২য় খণ্ড, ২৪শ সংখ্যা] শুক্রবার ৬ই কার্তিক, ১৩৭২ বঙ্গাব্দ [মূল্য ৪০ পয়সা.

এর কোমল স্পর্শে
সৌন্দর্য
বিকশিত হয়
শিশির স্নিগ্ধ সদ্য
প্রস্ফুটিত গোলাপের
পাপড়ির মত কোমল ও
তারুণ্যের আভায় উজ্জ্বল
আমার সুন্দর দেহশ্রী
এই মেখেই তো।
সাধনা
বিউটি স্নো
একটি অতি
অঙ্গরাগ

ওদের দিন
ব্রিটানিয়া
হরলিক্স
বিস্কুট
-ওরা
শক্তি পাবে
BRITANNIA
Horlicks
BRITANNIA
বাড়তি শক্তি খেলাধূলার জন্যে বুদ্ধিমতী মায়েরা খেলুড়ে ও ডানপিটে ছেলেদের সব সময় ব্রিটানিয়া হরলিক্স বিস্কুট দেন। মুড়মুড়ে, পুষ্টিতে ভরপুর, খেতে লোভনীয়। ব্রিটানিয়া হরলিক্স বিস্কুট ওদের স্কুলে নিয়ে যাবার সেরা জলখাবার আর বাড়িতে তো কথাই নেই!
ব্রিটানিয়া মানেই সেরা বিস্কুট

কুসুম কিন্তু আর পাঁচটা সাধারণ বনস্পতির মত নয়— কেন জানেন ?

কারণ কুসুম দিয়ে রান্না খাবার খেতে রুচি হয় ও কুসুমে তৈরী যে কোনো খাবারে খাঁটি স্বাদ-গন্ধ পাওয়া যায়। আজই এক টিন কিনে নিজে পরখ করে দেখুন।

কারণ কুসুম অন্য কোনো রান্নার তেল বা ঐ জাতীয় জিনিসের চেয়ে ঢের বেশীদিন টাটকা থাকে। রোজ কুসুম দিয়ে রেঁধে দেখুন মাসের শেষে খরচা কত কম পড়ে।

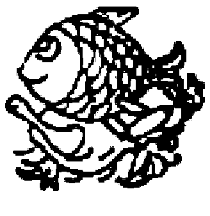

কারণ কুসুম দিয়ে বহুরকমারি রান্না করা যায়। শাক-সবজি, মাছ-মাংস যা-ই রাঁধুন, দারুণ লোভনীয় হবে। ডাল তরকারির স্বাদই হবে আলাদা, আর যে কোনো মিষ্টির তো কথাই নেই। কেক, বিস্কুট, ভাজাভুজি যা খুশি করুন, এমন কি চাপাটিতে মাখিয়ে বা গরম ভাতে খান—যেমন সুস্বাদু তেমনি স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো।

কারণ কুসুম সহজে হজম হয় আর ভারি পুষ্টিকর। প্রতি আউন্স কুসুম ৭০০ আন্তর্জাতিক ইউনিট 'এ' ভিটামিন এবং ৫৬ আন্তর্জাতিক ইউনিট 'ডি' ভিটামিনে সমৃদ্ধ।

স্বাদে-গন্ধে সব খাবার করে তুলুন চমৎকার

কুসুম বনস্পতি দিয়ে রাঁধুন

কুসুম প্রোডাক্টস লিমিটেড, কলিকাতা-১

THE
PENROSE ANNUAL
1970
The international review
of the graphic arts.
Edited by
HERBERT SPENCER
Published by
LUND HUMPHRIES
90s.
Special Indian Price Rs. 72.00

THE
ART OF INDIA
THROUGH THE AGES
By
STELLA KRAMRISCH
Traditions of Indian Sculpture Painting and Architecture with 180 illustrations in colour and Monochrome.
55s. • Rs. 49.50

Rupa & Co.
15 Bankim Chatterjee Street
Calcutta-12
Also at :
Allahabad-1 • Bombay-1
Delhi - 6.

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষের
বিচিত্র কাহিনী
ও
আরও বিচিত্র
কাহিনী
পড়ে আনন্দ পাবেন

অমৃত

১০ম বর্ষ ২য় খণ্ড — ২৪ সংখ্যা — মূল্য ৪০ পয়সা

Friday, 23rd Oct., 1970 — শুক্রবার, ৬ই কার্তিক, ১৩৭৭ — 40 Paise

CENTRAL LIBRARY UNIVERSITY

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
৮০৪	চিঠিপত্র		
৮০৬	সাদাচোখে		—শ্রীসমদর্শী
৮০৮	দেশেবিদেশে		—শ্রীপুণ্ডরীক
৮১১	সম্পাদকীয়		
৮১২	শুধু চিত্রকল্প নও	(কবিতা)	—শ্রীকৃষ্ণ ধর
৮১২	সূর্যপ্রতীক	(কবিতা)	—শ্রীশান্তিকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
৮১২	মাকড়সার সিঁড়ি	(কবিতা)	—শ্রীশোভা সিংহ
৮১৩	রাজার শেষ ঘুম	(গল্প)	—শ্রীমনোজ সান্যাল
৮২২	এই আমাদের দেশ		—শ্রীনন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
৮২৩	তুলসী-চরিত	(উপন্যাস)	—শ্রীনলিনীমাধব চৌধুরী
৮২৭	সুখের মেলা		—আবদুল জব্বার
৮৩০	সাহিত্য ও সংস্কৃতি		—শ্রীঅভয়ঙ্কর
৮৩৫	নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে	(উপন্যাস)	—শ্রীঅতীন বন্দ্যোপাধ্যায়
৮৪০	নিকটেই আছে		—শ্রীনিরপেক্ষ
৮৪২	মনের কথা		—শ্রীমনোবিদ
৮৪৬	নিজেরে হারায়ে খুঁজি	(স্মৃতিচারণ)	—শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী
৮৫১	বিজ্ঞানের কথা		—শ্রীঅয়স্কান্ত
৮৫৩	সকলের সকাল	(বড় গল্প)	—শ্রীচণ্ডী মণ্ডল
৮৫৭	ভিন গাঁয়ের চিঠি		—শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়
৮৫৯	আয়না	(গল্প)	—শ্রীরণজিৎ পাল
৮৬১	নেপালী লোক সাহিত্য		—শ্রীহরেন ঘোষ
৮৬৪	গোয়েন্দা কবি পরাশর		—শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র রচিত —শ্রীশৈল চক্রবর্তী চিত্রিত
৮৬৯	অঙ্গনা		—শ্রীপ্রমীলা
৮৭০	প্রেক্ষাগৃহ		—শ্রীনান্দীকার
৮৭৫	জলসা		—শ্রীচিত্রাঙ্গদা
৮৭৭	খেলার কথা		—শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়
৮৭৯	খেলাধুলা		—শ্রীদর্শক

প্রচ্ছদ : —শ্রীনিতাই ঘোষ

পি. ব্যানার্জীর
অর্শ চিকিৎসা
৩০ পিল টাঃ ২.৫০
১৬ পুরিয়া চূর্ণ ২.২২
মলম ৩০ গ্রাঃ ২.৫০
বিনামূল্যে বিবরণী দেওয়া হয়
পি. ব্যানার্জী
৩৬বি. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড
কলিকাতা-২৫
৫০, গ্রে স্ট্রিট, কলিকাতা-৬
১১৪এ. আশুতোষ মুখার্জী রোড
কলিকাতা-২৫

আমার পরম শ্রদ্ধেয় পিতা মিহিজামের ডাঃ পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আবিষ্কৃত ধারানুযায়ী প্রস্তুত সমস্ত ঔষধ এবং সেই আদর্শে লিখিত পুস্তকাদির মূল বিক্রয় কেন্দ্র আমাদের নিজস্ব ডাক্তারখানাদ্বয় এবং অফিস—
আধুনিক চিকিৎসা
ডাঃ প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত পারিবারিক চিকিৎসার সর্বশ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে সহজ বই
৪৭-৫০৮১, ৪৭-২০১৮, ৫৫-৪২২১

চিঠিপত্র

মনোজ বসুর উপন্যাস

শারদীয়া অমৃতে মনোজ বসুর 'আমি সম্রাট' উপন্যাসখানি পড়লাম। ইদানীং বর্তমান কালের সমস্যা নিয়ে কোন সাহিত্যিকের এমনতরো লেখা পড়েছি কিনা মনে করতে পারছি না। সেই গতানুগতিক কথা-পড়া ও যৌনাবেগ সম্বলিত তথাকথিত বিপ্লবধর্মী অত্যাধুনিক উপন্যাস না লিখে সাম্প্রতিককালীন যুবসমাজ তথা জাতির গুরুত্বপূর্ণ একটি দিকের যে পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা ও সমাধানের চেষ্টা করেছেন আমার মতে তা অতুলনীয় ও বাংলা সাহিত্যে প্রথম। অনেক পাঠকের কাছে ঘটনাটি অতিরঞ্জিত মনে হবে। কিন্তু আমাদের কেউ কি হলপ করে বলতে পারি যে, এমন ঘটনা ঘটছে না। আজ হয়তো অলক্ষ্যে ঘটছে—কিন্তু বর্তমান সমাজব্যবস্থা আর কিছুদিন চললে নিজের চোখের সামনে নিত্য এ ঘটনা ঘটতে যে দেখতে পাবো না সে অবিশ্বাস করি না। তাছাড়া লক্ষ লক্ষ যুবকেরাই জানে এ সত্যিই গল্প না অন্যকিছু। লেখক তাঁর লেখায় সন্দেহ প্রকাশ করেছেন একস্থানে যে ঘটনার পৌনঃপুনিকতায় পাঠকে বিরক্ত হতে পারেন। নিজের কথা বলতে গেলে আমি গল্পের ছিটেফোঁটা বা বিন্দুবিসর্গও বাদ দিতে পারিনি। কথা হচ্ছে যদি পড়তে গিয়েই পাঠকের বিরক্তি জন্মে তাহলে যাদের জীবনে এ জাতীয় ঘটনার পুনঃপ্রকাশ নিত্যদিনের তাদের জীবনটাকে কি সুসহ মনে হয় তা ভাববার অবকাশ রাখে।

'অন্যচিন্তায়' লেখক-অভিনেতা সৌমিত্র চ্যাটার্জি আশা করি এ উপন্যাসে কিছু খুঁজে পাবেন। ইচ্ছে করলে কিছু লেখক বর্তমান ব্যবস্থার উপর যে লিখতে পারেন দেখে হয়তো সান্ত্বনাও পেতে পারেন কিছুটা। লেখক যদিও সমস্যাটাই বড় করে তুলে ধরেছেন (বলতে গেলে সমস্তটাই সমস্যার বর্ণনায় ব্যয়িত হয়েছে) এবং সমাধানের কোন উল্লেখ করেননি তবুও আলোচ্য উপন্যাসটিকে বাংলার সাহিত্য ক্ষেত্রে আলোড়নের প্রথম পদক্ষেপ বলা চলে। অশ্লীল যৌনাবেগই যে সমাজের মৌল সমস্যা (অনেক লেখক তাই মনে করেন) নয় উপন্যাসটি তারই প্রমাণ। অমর হয়ে থাক সুব্রত ও পলির মতো কয়েকজন মেয়ে। জন্ম নিক লক্ষ লক্ষ সুব্রতা, লক্ষ লক্ষ পলি।

যেহেতু আমার মতে সমাজের সর্বস্তরের লোকের উপন্যাসখানি পড়া দরকার সেইহেতু বই-এর আকারে বেরুলে বইখানি যাতে সহজলভ্য হয় সেইদিকে নজর দেবেন—এইটুকু আপনাদের কাছে অনুরোধ। কারণ যাদের নিয়ে লেখা তাদেরও তো পড়তে হবে। দরকার হয় 'প্যাপার ব্যাক'-এ প্রকাশ করবেন।

সরোজকুমার বড়ুয়া,
খড়্গপুর

'নীলকণ্ঠ পাখীর খোঁজে'

'অমৃত' পত্রিকায় ধারাবাহিক উপন্যাস 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' নিয়মিত পড়ছি। এত সুন্দর উপন্যাস আমি 'অমৃত' পত্রিকায় কমই পড়েছি। সুজলা-সুফলা মাটির গন্ধ উপন্যাসে খুব বেশই মেলে। আমাদের শহুরে মানুষের কাছে এ এক নতুন উপলব্ধি। সবচাইতে বড় কথা উপন্যাসটিকে বুদ্ধি দিয়ে হৃদয়ে প্রবেশ করাতে হয় না। কখন যে আপনি হৃদয়ের দ্বার খুলে অন্তঃপুরে প্রবেশ করে টেরও পাওয়া যায় না। প্রথম চিঠিতে মনে পড়ছে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলাম, ঠিকঠাক এত সুন্দরভাবে শেষ করতে পারবেন তো? এখন আমার সে সন্দেহ দূর হয়েছে। অতীনবাবুকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানবেন আর সঙ্গে সঙ্গে ধন্যবাদ জানাই 'অমৃতের' সম্পাদকমণ্ডলীকে এমন সুন্দর একটি উপন্যাস আমাদের উপহার দেওয়ার জন্য।

দেবকুমার সরকার
কলিকাতা—২৮

'হিন্দী বাংলা অভিধানের জন্যে'

১০ম বর্ষ, ২য় খন্ড, ২১ সংখ্যা অমৃতে চিঠিপত্র বিভাগে শ্রীবিজেন্দ্রলাল যাদবের 'হিন্দী বাংলা অভিধানের জন্যে' চিঠির অনুরোধ অংশটি পূর্ণসমর্থনযোগ্য।

শ্রীযাদব 'আমি কি কষ্টে বাংলা শিখেছি' বলে উল্লেখ করেছেন। প্রসঙ্গত মনে পড়ছে জনৈক বিদেশী অধ্যাপককে একবার প্রশ্ন করা হয়েছিল 'আপনি এত ভাল বাংলা শিখলেন কার কাছে?' উনি বললেন—'কার কাছে শিখেছি জিজ্ঞেস করবেন না। বরং জিজ্ঞেস করুন—কেমন করে বাংলা শিখলেন?' আমি বলব কষ্ট করে শিখেছি।' সুতরাং দেখা যাচ্ছে ভাষা শিক্ষা ক্ষেত্রে অল্পাধিক কষ্ট বোধহয় সকলকেই স্বীকার করতে হয়।

হিন্দী থেকে বাংলা বা বাংলা থেকে হিন্দী অভিধান পাওয়া যায় না শ্রীযাদবের একথা ঠিক নয়। হিন্দী বা অন্য ভাষাভাষী যাঁরা বাংলা শিখতে চান তাঁদের কাজে লাগতে পারে এমন কয়েকখানি বই-এর নাম উল্লেখ করছি। ১। হিন্দী বাংলা অভিধান, শ্রীগোপালচন্দ্র বেদান্ত শাস্ত্রী ২। ব্যবহারিক বাংলা-হিন্দী প্রতি শব্দকোষ শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য ৩। ভারত কী পন্দ্রহ্ ভাষাএঁ প্রভাকর মাচওয়ে ৪। লার্ন বেঙ্গলী-বিধুভূষণ দাশগুপ্ত, ৫। বাংলা ভাষা প্রবেশ, বিধুভূষণ দাশগুপ্ত।

শান্তি ঠাকুর
ঘাটশিলা, সিংভূম।

'নিকটেই আছে প্রসঙ্গে'

এক কঠিন সমস্যার মধ্য দিয়ে প্রতিটি মানুষ জীবনযাপন করছে। চারিদিকে বিভীষিকার মধ্যে যেন হারিয়ে ফেলছে আত্মবিশ্বাস, ধ্যানধারণা আর নিজস্ব নীতিকে। সবই যেন ঘোলাটে হয়ে উঠেছে। সমাজের উপর বিশ্বাস নেই। অবিশ্বাস যেন ঘিরে ধরেছে আমাদের। সবটাই ধাপ্পা আর ঠকানিতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু এর জন্য দায়ী কে? আপনার বহুল প্রচারিত 'অমৃত' পত্রিকায় ধারাবাহিক সংযোজন 'নিকটেই আছে'তে এর সাবলীল এবং স্বচ্ছ সুন্দর উত্তর পাওয়া যায়।

কত ঘটনাই না ঘটে চলেছে প্রতিনিয়ত, আমাদের মত ছাপোষা মানুষ হয়ত জানতে পারছে না সমাজের কৌশলকে, কিন্তু লোকচক্ষুর সামনে মানুষ সমাজকে ফাঁকি দিচ্ছে। এরই সুনিপুণ চিত্র পাচ্ছি সন্দিপনের 'নিকটেই আছে' রচনাগুলিতে। অবক্ষয় অর্জরিত সমাজে কত তরুণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। মানবিকতা মনুষ্যত্ব হারিয়ে হতাশায় ভেঙে পড়ছে। গত ১৪ সংখ্যায় 'নিকটেই আছে'তে 'দোকানটা কিসের—চা না তেলাইয়ের' পড়ে অবাক হয়ে গেছি। মনে হয়েছে আমি আমার প্রতিবেশী একটি অবহেলিত যুবকের প্রতিচ্ছবি দেখছি। অধিকাংশ জায়গাতেই 'কেষ্ট' আছে, আর অধিকাংশ জায়গাতেই আছে ঐ ভানুর মত দিশেহারা, বেকার যুবকদের দল। ভানুর জন্য মনস্তাপ হবে সকলেরই। যেভাবে প্রতারক আর ঠকবাজদের দল সমাজকে ঘিরে ফেলেছে তা আজ আমাদের চিন্তার কারণ। লেখক সন্দিপন মশাই সেই ঠকবাজদের আর প্রতারকদের কালাকানুনকে আর কৌশলকে 'নিকটেই আছে'-তে তুলে ধরে যেভাবে আমাদের সাবধান করে দিয়েছেন এর জন্য প্রথমে সন্দিপন মশাইকে ধন্যবাদ জানাই আর সবশেষে এই সংযোজনের জন্য সম্পাদক মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাই।

চঞ্চল সিংহরায়
হুগলী

চিঠিপত্র

বিদ্যাসাগর : জীবনে ও চিন্তায় প্রসঙ্গে

'দয়ার সাগর' 'বিদ্যাসাগর' ইত্যাদি বলতে গিয়ে আমরা বীর্য ও দৃঢ়তার সেই রূপটি দিককে অনেক সময় ভুলে যাই। ঈশ্বরচন্দ্রের ব্যক্তিত্বে সত্যনিষ্ঠার যে শৌর্য-দীপ্ত রূপটি জাগ্রত ছিল, তাঁর করুণা ও কোমলতার স্নিগ্ধমধুর ছায়ায় সেই রূপটি অনেক সময় আমাদের দৃষ্টির আড়ালে থেকে যায়। শ্রীযুক্ত নন্দগোপাল সেনগুপ্ত তাঁর ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সেই বীর ঈশ্বরচন্দ্রের উজ্জ্বল রূপটি আমাদের দৃষ্টির সামনে তুলে ধরে অশেষ উপকার করেছেন। ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনীতে তাঁর বীরত্বের দৃষ্টান্ত আরো অনেক পাওয়া যায়। আমরা সকলেই জানি তাঁর প্রাক্ শিক্ষক এক বালিকাকে বিবাহ করে যখন গৃহে আনলেন, তখন ঈশ্বরচন্দ্র কেমন করে তার বিরোধিতা করেছিলেন। শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত তাঁর প্রবন্ধে ঠিক এই রকমের আর কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতে পারলে বিদ্যাসাগরের বীরত্বের প্রায়বিস্মৃত ছবিখানি আরো উজ্জ্বল হতে পারত।

—সুধাংশুশেখর রায়
ভদ্রক

মনের কথা প্রসঙ্গে

মনোবিদের 'মনের কথা' মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে আমাদের বেশ আগ্রহী করে তুলেছে। কেসহিস্ট্রিগুলি বেশ তথ্যনিষ্ঠ এবং বর্ণনাভঙ্গীও বেশ বিশ্লেষণধর্মী ও মনোজ্ঞ। গত ২৩ সংখ্যার 'অমৃত'-এ 'ভর হওয়া ভূত পাওয়া রুগীর আসুরিক চিকিৎসা' শীর্ষক লেখায় তিনি কয়েকটি কেসের বর্ণনা দিয়েছেন। সবগুলিকে তিনি 'সম্মোহিত অবস্থা' বলে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু একটা বিষয়ে আমাদের কৌতূহল হয়েছে। তিনি এক জায়গায় লিখেছেন, 'এই নে প্রসাদ, আমাকে আর জ্বালাসনে, সকলে সবিস্ময়ে লক্ষ্য করল জ্বলন্ত কয়লা হাতে নেওয়া সত্ত্বেও মেয়েটি নির্বিকার, মুখে যন্ত্রণার চিহ্ন পর্যন্ত নেই, হাত পুড়লনা, এমন কি ফোস্কা পর্যন্ত পড়ল না। এখন আমার প্রশ্ন, মেয়েটির হাতে ফোস্কা পড়ল না কেন? মেয়েটি যন্ত্রণাবোধ করল না কেন? আমাদের গ্রামে মনসা ও ভৈরবের পুজোর সময় ঢাক বাজার সঙ্গে ভক্তরা ঠাকুর নামাল, প্রচণ্ড পরিশ্রম হয় এবং লাফালাফির সময় বেশ আঘাতও লাগে, কিন্তু এরা নির্বিকার। ঠাকুর-ভর কুড়ি মিনিট থেকে আধ ঘণ্টা পর্যন্ত থাকে। ফাল্গুনে সংক্রান্তির সময় ভৈরবের পুজোর সময় ফুল খেলা হয়। 'ফুল খেলা' হল শালকাঠের আগুনে করে জ্বলন্ত অঙ্গার নিয়ে লাফালাফি করা এবং ওগুলোর ওপর গড়াগড়ি দেওয়া। ফুল খেলার পর দেখা গেছে ভক্তদের গায়ে কোন ফোস্কা পড়েনি। এই বারের পুজোর সময় বিজয়ার দিনে বাঁকুড়ায় একটি ১৪।১৫ বৎসরের মেয়ের উপর দুর্গার ভর হয়। পুজোর মন্ত্র পাঠ ভুল হয়েছে, অশৌচ অবস্থায় ঘটবারি আনা হয়েছে, নতুন করে পুজো করতে হবে, ঠিক মনোবিদের বর্ণনার মত কথাবার্তা বলতে শুরু করে। পুজো আবার নতুন করে শুরু হয়। প্রচণ্ড ভীড় হয় মেয়েটি চার পাঁচদিন নামমাত্র খেয়েছে, কিন্তু তার মধ্যে শারীরিক দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়নি। গত লক্ষ্মী পুজোর দিন ভর নেমে গেছে।

ভরের সময়কার কোন কিছুই রোগিনীর মনে থাকে না কেন? সেই অস্বাভাবিক অবস্থায় সে যা বলে বা করে তাতে তার একটা বিশেষ ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পায়। সেটা কি অবচেতন মনের ব্যাপার?

ধীরেন্দ্রনাথ কর
বাঁকুড়া

সুখের মেলা প্রসঙ্গে

সম্প্রতি উষা মুখোপাধ্যায় তাঁর চিঠিতে পরোক্ষভাবে আবদুল জব্বার মহাশয়কে অশ্লীল সাহিত্যিক বলে অভিযুক্ত করেছেন। আমার মনে হয় সৃষ্টির মধ্যে সাহিত্যিকের স্বাধীনতা থাকা বাঞ্ছনীয়। কারণ একজন সাহিত্যিক একজন দর্শকের থেকে বেশী গভীর করে দেখেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টি সম্বন্ধে 'সাহিত্য পথে' বলেছেন, 'মানুষ সৃষ্টি করে আত্মার প্রেরণায় মানুষ আপন সৃষ্টিকর্মে আপন পূর্ণতাকে দেখতে পাচ্ছে তার আত্মার আনন্দ থেকে তাকে উদ্ভাবিত করতে হবে স্বর্গলোকে, লক্ষপতির কোষাগারে নয়, পৃথিরাজের জয়স্তম্ভে নয়'

। পারিপার্শ্বিক গ্রাম্যজীবনের সর্বহারা সম্প্রদায়ের হুবহু সত্য ঘটনা ব্যক্ত করছেন জব্বার মহাশয় তাঁর সুখের মেলায়। একজন সমালোচক সাহিত্য সম্বন্ধে বলেছেন, অর্থাৎ সাহিত্য হচ্ছে উপলব্ধির বস্তু, হাত দিয়ে পরখ করার বা চোখে দেখার বস্তু নয়। সুতরাং কেউ যদি সেই সাহিত্যের অংশকে অশ্লীলমনে কাপড় তবে শ্লীল নতুবা তার কাছে অশ্লীল। ভাবলে আশ্চর্য হতে হয় এককালে ফরাসীদের নিকট শেক্স-পীয়ারের সৃষ্ট চরিত্র ওথেলোর মনোলগখানি ছিল অশালীন। সুতরাং সেটা পাঠক বা পাঠিকার রুচিবিচারে পার্থক্য আনতে পারে তার জন্য লেখক দায়ী নয়।

তবে একথা বলা যেতে পারে সামাজিক জীবনবিন্যাস ও প্রচলিত নৈতিকতার কথা চিন্তা করে যেন সাহিত্যিক তাঁর চরিত্রগুলি বিন্যাস করেন। তাই পরিশেষে প্রমথ চৌধুরীর অভিমত ব্যক্ত করে চিঠি শেষ করছি। প্রমথ চৌধুরী বলেন, 'যুগে যুগে লোকের মনে পরিবর্তন ঘটে। সুতরাং সেকালের বিধি-নিষেধের একালে সার্থকতা নেই। এ কথা সত্য বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ সত্য নয়।'

—সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়
বার্ণপুর, বর্ধমান।

দু'পা পেছনে

গত ২২ আশ্বিন 'অমৃতে' প্রকাশিত শংকর চট্টোপাধ্যায়ের 'দু'পা পেছনে' গল্পটি সময়োপযোগী সার্থক গল্প হয়েছে। বস্তাপচা সস্তা প্রেমের গল্প অথবা অশ্লীলতার প্রাচুর্যে ভরা কোনও গল্প এটি নয়। তিনি একটি সংগ্রামী আদর্শবাদী পরিবারের ছবি এঁকেছেন এই গল্পে। নিঃসন্দেহে লেখকের এটি একটি সাধু প্রচেষ্টা। গল্পটির মধ্যে শংকরবাবু স্বল্প যে কয়টি চরিত্র সৃষ্টি করেছেন তার প্রত্যেকটিই অপূর্ব সুন্দর। বিশেষ করে কনকলতার সহৃদয় মাতৃত্ববোধ পাঠককে অবশ্যই মুগ্ধ করে আর বাড়ীর কর্তা শম্ভুনাথ যাঁর পায়ের নীচের মাটিটুকু নানাবিধ সমস্যাভারে প্রতিনিয়তই কম্পমান, সেই শম্ভুনাথও কি কম মনুষ্যত্ববান এবং হৃদয়বান মানুষ? শুধু মনুষ্যত্ব রক্ষার জন্যেই তিনি নির্বিবাদে যে বিপদের ঝুঁকি নিয়েছেন তা আজকের দিনে আমাদের সমাজে বিরল। গল্পের শেষাংশে বিনোদকে ঘুষি মারা শম্ভুনাথের উপযুক্ত কাজ বলেই মনে হয়েছে। কারণ বিনোদ মিস্ত্রি এই গল্পে একজন সহানুভূতিশীল শয়তানের প্রতীক হয়ে দেখা দিয়েছে। এই সব মানুষের সংখ্যা আমাদের সমাজে কিছু কম নয়। শম্ভুনাথ বিনোদ মিস্ত্রিকে ঘুষি না মেরে যদি অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে চুপি চুপি ঘরে ঢুকতেন, তাহলে তাঁকে কাপুরুষ মনে হত। সবশেষে বলি শংকরবাবুর গল্পটি নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবী রাখে।

—মনসারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়
সিউড়ী, বীরভূম।

শাদা চোখে

পশ্চিমবাংলার রাজনীতি আবার বেশ সরগরম হয়ে উঠেছে। মধ্যবর্তী নির্বাচন হবে কি হবে না তার কোন স্থিরতা নেই। অথচ আবহাওয়াটা এমন উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে যে যেন কয়েকমাসের মধ্যেই বুঝি একটি চূড়ান্ত শক্তি পরীক্ষা সমাসন্ন। তবে একথা ঠিক মধ্যবর্তী নির্বাচন হউক বা না হউক আগামী সাধারণ নির্বাচনে কে কার মিত্র হতে পারে তার জন্য বোঝাপড়া শুরু হয়ে গেছে। পশ্চিমবঙ্গেও বর্তমানে যে দলাদলি চলছে তাও ১৯৭২ সালের নির্বাচনী বোঝাপড়ার মহড়া মাত্র।

সম্প্রতি এই রাজ্যে রাজনৈতিক আবহাওয়া উত্তপ্ত হওয়ার মুখ্য কারণ হয়েছে ডান কম্যুনিস্ট পার্টির সাধারণ পরিষদের রাজনৈতিক প্রস্তাব। এই প্রস্তাবে পশ্চিমবাংলায় ঐ দলের শাখার ভূমিকা কি হবে সেই সম্পর্কে তিনটি গাইডলাইন বেঁধে দেওয়া হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে যে, বর্তমানের অষ্টবাম জোটকে শক্তিশালী করতে হবে আর বাংলা কংগ্রেসকে ঐ জোটের অন্তর্ভুক্ত করে এই মোর্চাকে জোরদার করতে হবে। আর গণতান্ত্রিক বামপন্থী মোর্চাকে অধিকতর শক্তিশালী করবার জন্য শাসক কংগ্রেসের সঙ্গে 'সমঝোতা' করতে হবে। সমঝোতার অর্থ হচ্ছে, একটা বোঝাপড়া করে নেওয়া— পুরোপুরি ফ্রন্ট গড়ে মিতালীর সূত্রে আবদ্ধ হওয়া নয়। এই শেষ বক্তব্যই ঝড় তুলেছে। অষ্টবামের চারটি শরীক যথাক্রমে ফরওয়ার্ড ব্লক, সংযুক্ত সমাজতন্ত্রী দল, সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার ও বিদ্রোহী পি এস পি গোষ্ঠী এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বক্তব্য রেখে বলেছেন, তাঁরা সকল বর্ণের কংগ্রেসকে ও বাম কম্যুনিস্টকে সমান তফাতে রাখতে চান। অর্থাৎ অষ্টবামের বিগত ২৪শে মের সিদ্ধান্ত থেকে তাঁরা একচুলও নড়তে নারাজ। ২৪শে মে অষ্টবামের সিদ্ধান্ত ছিল : আদি ও শাসক দুই বর্ণের কংগ্রেসই [illegible], অতএব, হাত মেলাবার প্রশ্নই উঠতে পারে না। বস্তুতপক্ষে এটা একটি বুনিয়াদি তত্ত্বগত পার্থক্য। আর বাম কম্যুনিস্টদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত ছিল : বাম কম্যুনিস্টরা বিচ্ছিন্নতাকামী, সংকীর্ণতা-[illegible] মত। অতএব, তাঁদের সংগেও নৈব নৈব চ। এই পার্থক্যও উপেক্ষণীয় নয়। তবে হাত না মেলাবার পক্ষে একটি আরও কারণ মাত্র। এই দুই সিদ্ধান্তই অষ্টবামকে (ডান কম্যুনিস্ট পার্টি সহ) একত্রিত হতে সাহায্য করেছিল, অবশ্য একথা মনে রাখতে হবে যে, অষ্টবাম তখনও পর্যন্ত কোন ফ্রন্টের রূপ নেয়নি। কারণ যে সূত্রে মিলনের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল সেই সূত্র অর্থাৎ মধ্যবর্তী নির্বাচন আশু অনুষ্ঠিত হবার আশা নেই বলেই অষ্টবাম একটি ফ্রন্টে সামবেশিত হতে যায়নি।

এই সঙ্গে আরও মনে রাখা দরকার অষ্টবামের মধ্যে ডান কম্যুনিস্ট পার্টিকে তাঁদের পূর্বতন কমরেড বাম কম্যুনিস্টরা সরাসরি মিনিফ্রন্ট গঠনের চক্রান্তে [illegible] বলে যখনই অভিযোগ করেছিল তখনই তাঁরা বলতেন—পশ্চিমবঙ্গে এ ধরণের প্রচেষ্টা চলতেই পারে না। কারণ তাঁরা অর্থাৎ ডান কম্যুনিস্টরা যুক্তফ্রন্টের কোন শরীক কি বাম কম্যুনিস্ট কি বাংলা কংগ্রেস কাউকে বাদ দিয়ে সরকার গঠন করবেন না। তারপর আরও একটা ধাপ এগিয়ে [illegible] বলতেন শাসক কংগ্রেসের সঙ্গে কোনপ্রকার সমঝোতার প্রশ্ন উঠতেই পারে না। কারণ, পশ্চিমবঙ্গের শাসক কংগ্রেস দল হচ্ছে এক-চেটিয়া পুঁজিপতি ও বুর্জোয়া জমিদার শ্রেণীর প্রতিভূ মাত্র। যখনই ডান কম্যুনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক সততা সম্পর্কে সন্দেহ জেগেছে তখনই তা নিরসনকল্পে পশ্চিমবঙ্গ নেতৃত্ব সন্দেহকারীদের আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গে বোঝাপড়াতে রাজনীতি চলবে না—একথা বার বার ঘোষণা করেছেন। এটাই হচ্ছে ঘটনা।

সি পি আই তাঁদের রাজনীতি পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রেও পাল্টে দিলেন কেন— ? এই প্রশ্ন যাঁদের মনে জেগেছে—তাঁদের বলছি সি পি আই তাঁদের নীতি বদলায়নি। এতদিন বিভিন্ন প্রদেশে বিক্ষিপ্তভাবে সি পি আই যে নীতি অনুসরণ করছিল তাকে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে অর্থাৎ জাতীয় ক্ষেত্রে একটি সুসংহত রূপ দিল মাত্র। কাজেই আশ্চর্য হওয়ার কিছু আছে বলে মনে করি না। এতদিন পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে যে কথা বলা হচ্ছিল তা কৌশল মাত্র। শুধু বাম কম্যুনিস্টদের আক্রমণ থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য ব্যাফেল ওয়াল খাড়া করেছিল মাত্র সেই সমস্ত দলকে দিয়ে যাঁরা যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে সি পি এম-এর হাতে নির্মমভাবে মার খেয়েছিল। অন্য কোন কারণে নয়। আরও একটু পাতানো দিনে ফিরে গেলে দেখতে পাবেন সি পি আই হারেমে বিপ্লব ঘটাবার জন্য কংগ্রেসের মধ্যে প্রোগ্রেসিভ খুঁজে বার করছেন। এবং প্রোগ্রেসিভ পেয়েছেনও তাঁরা। শ্রীকৃষ্ণ মেননরা ছিলেন এখন শ্রীচন্দ্রজিৎ যাদব বা [illegible] ইত্যাদি আছেন। ইন্দিরাজীর কথা বলাই বাহুল্য। কংগ্রেস বিভক্ত হওয়ার সংগে সংগে শাসক কংগ্রেস পুরোপুরিই প্রোগ্রেসিভ। তাই সি পি আই স্লোগান দিয়েছিল— 'আমাদের অঙ্ক মিলছে, মিলবে—কংগ্রেস ভাঙছে, ভাঙবে।' সত্যিই ওঁদের অঙ্ক মিলেছে। কাজেই সি পি আই বর্তমানে যে নীতির কথা বা কৌশলের কথা ঘোষণা করেছে তা নূতন কিছু নয়। অন্য কেউ না বুঝলেও রাজনৈতিক নেতাদের অনেক পূর্বেই তা ভেবে রাখা উচিত ছিল। বর্তমানে স্তম্ভিত হওয়ার কোন কারণ তো দেখি না। যা ঘটছে তাই লজিক্যাল।

এখানেও কৌশল পর্বের শেষ নয়। দিল্লী থেকে ছুটে এসে শ্রীভূপেশ গুপ্ত ও শ্রীভবানী সেন অষ্টবামের শরীকদের বুঝোবার চেষ্টা করেছেন—যে প্রস্তাবে যা বলা হয়েছে তা শুধু 'সাজেসান' মাত্র। এবং এই কথা গুপ্ত মহাশয় বারম্বার নাকি জোরের সংগেই বলেছেন। আবার এই প্রস্তাব রাখার কারণ সম্পর্কে নাকি গুপ্ত মহাশয় বলেছেন যে, বর্তমানে রাজ্যের পারিপার্শ্বিকতার পরিবর্তন ঘটেছে। কাজেই নূতন করে দল-গুলি সম্পর্কে মূল্যায়ণ করা প্রয়োজন। বিশেষ করে শাসক কংগ্রেস সম্পর্কে কেন না তাঁদের সঙ্গে নাকি 'অসংখ্য [illegible]' আছে যাঁদের সঙ্গে নেওয়া একান্ত প্রয়োজন। কোন রাজনৈতিক তত্ত্বদর্শীর সঙ্গে তর্ক করা অসম্ভব। কেন না তাঁরাও শিল্পী। কাদা মাটি পেলেই যদৃচ্ছ মূর্তি তৈরী করে নিতে পারেন। কাজেই এই প্রস্তাব সমর্থনে নিদেন-পক্ষে সাতটি লেনিনের উক্তি উদ্ধৃত করে দেবেন এবং রাশিয়ার সেই সময়ে কি অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মহামতি লেনিন এই উক্তি করেছিলেন তা অবলীলাক্রমে বলে দেবেন। অবশ্য একথা ঠিক মার্কস-লেনিন তখন সকলেরই। কি সংশোধনবাদী, কি নয়া-সংশোধনবাদী বা কি মাওবাদী সকলেই তাঁদের ট্রেড মার্ক হিসাবে লেনিন সাহেবকে বাজারে চালাচ্ছেন। এখন লেনিনও তিন লেনিনে পরিণত হয়েছেন।

শ্রীভূপেশ গুপ্ত বার বার 'সাজেসান' হিসাবে উল্লেখ করলেও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কাউন্সিলও কেন্দ্রীয় প্রস্তাব সর্বসম্মতভাবে অনুমোদন করে বলেছেন তাঁরা [illegible]

বামকে সংহত করবেন, সুদৃঢ় রাখবেন আর 'গণতান্ত্রিক শক্তির' সঙ্গে মিতালির সূত্র বার করবার চেষ্টা করবেন। রাজা কার্টামিল তার প্রস্তাবে গণতান্ত্রিক শক্তি বলতে কি বুঝায় তা নাম করেননি। কারণ শাসক কংগ্রেস সম্পর্কে যখন এত হৈ চৈ হচ্ছে তখন নামটা বলার দরকারই বা কি? কাজেই নামটা উচ্চারণ না করে সাময়িকভাবে পর্দার আড়ালে রেখে দেওয়া হয়েছে। কল্পধারী স্বাতন্ত্র্যের সুযোগকে ব্যবহার করে অ-প্রয়োগের তীব্রতাটাকে যদি কমিয়ে নেওয়া যায় তবে মন্দ কি?

এই ব্যাখ্যা শুনে কি অন্তর্বামের শরীকেরা সন্তুষ্ট হতে পেরেছেন? তাঁদের মধ্যে কেউ বলেছেন তাঁরা বিভ্রান্ত। আবার কেউ বলেছেন পশ্চিমবাংলার নতুন শক্তিজোট গড়ে তুলতে হবে। তাঁরা আরও বলবার চেষ্টা করেছেন যে, সি পি এম বিরোধীতা করার অর্থ এই নয় যে, তাঁরা শাসক কংগ্রেসের বন্ধু হিসাবে পরিগণিত হতে চান।

কিন্তু সর্বভারতীয় দল হিসাবে অন্ত-বামের মধ্যে দুটি দলের ভূমিকা বর্তমানে পরিষ্কার রূপ নিয়েছে। একদিকে সি পি আই অন্যদিকে এস এস পি। কিন্তু অন্য যে কয়টি দল অন্তর্বামে আছেন তাঁদের সর্ব-ভারতীয় রূপ না থাকার ফলে দেশের অন্যত্র অনাবধি তাঁদের পরীক্ষা দিতে হয়নি। পশ্চিম বাংলাতেই তাঁদের পরীক্ষা দিতে হবে। তার মধ্যে ফরওয়ার্ড ব্লক, এস ইউ সি ও বিদ্রোহী পি এস পির কথা আসে। সি পি আই যেভাবে খোঁচায়ে খোঁচায়ে এ সমস্ত প্রদেশভিত্তিক দলকে তাঁদেরই অজ্ঞাতসারে কংগ্রেসমুখী করে তোলবার চেষ্টা করছেন, তা সত্যিই রাজনৈতিক কুশলতার পরিচয় বহন করে। অন্তর্বামের বাধা সত্ত্বেও সি পি আই রাজা কার্টামিল 'গণতান্ত্রিক শক্তির' আড়ালে রেখে কংগ্রেসের সঙ্গে বোঝাপড়ার চেষ্টা চালিয়ে যাবার সংকল্প ঘোষণা করেছেন। যাঁরা এ্যান্টি কংগ্রেসিসজম্-এ বিশ্বাসী এবং মনে করেন শাসক কংগ্রেস বস্তুতপক্ষে নব কলেবরে পুরানো কংগ্রেসের চেয়েও অধিকতর শক্তি-শালী হয়ে উঠছে তাঁদের উচিত সি পি আই-এর সঙ্গে সর্বাগ্রে বোঝাপড়া করা। কেননা একদিকে অন্য সাতটি বামপন্থী দলের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ থেকে কংগ্রেসের সঙ্গে সখ্য স্থাপনের প্রয়াস চললে—জলঘোলা করার সুযোগ থাকবে অনেক বেশী।

সি পি আই তাঁদের উদ্দেশ্য মত ঠিক পথেই চলছেন। যেমন মার্কসবাদী কম্যু-নিস্টদের প্রতি তাঁদের বৈরীতাকে আস্তে আস্তে জোটবন্দী হয়ে যেভাবে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন ঠিক তেমনি কালক্ষেপণের মাধ্যমে শাসক কংগ্রেসের সঙ্গে পাকাপোক্তভাবে মিতালি করবার ভিত্তিভূমি তৈরী করতে সক্ষম হবেন বলেই মনে হয়। তবে একটি আশঙ্কা যে নেই এমন নয়। সেটা হচ্ছে দলের রাজ্য শাখার মধ্যে আলো-ড়ন। যুক্তফ্রন্ট সরকার পতনের পর থেকে যখনই মিনিফ্রন্ট সরকার গড়ার কথা উঠেছে কেরালা-স্টাইলে তখনই সি পি আই নেতারা পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক তথ্যকে শুধু আলাদাভাবে বিশ্লেষণ করেন নি, অধিকন্তু তাঁরা কতখানি শাসক কংগ্রেস বিরোধী তা প্রমাণ করার জন্য কংগ্রেসকে এই রাজ্যের বৃহৎ বুর্জোয়া ও একচেটিয়া পুঁজিবাদের প্রতিভূ বলেছেন। ফলে দলের কর্মীদের মধ্যেও অনুরূপ একটি মানসিকতা তৈরী হতে বাধ্য। কিন্তু এক রাতারাতি পশ্চিমবঙ্গের সেই বৃহৎ বুর্জোয়া ও এক-চেটিয়া মালিকদের প্রতিভূগণকে প্রগতিশীল বলে বুকে তুলে নেওয়ার চেষ্টা হলে স্বাভাবিকভাবেই প্রতিক্রিয়া হতে বাধ্য। এই ব্যাখ্যাকে অবলম্বন করে রাজনৈতিক পণ্ডিতেরা বলছেন যে, সি পি আই যদি তার প্রস্তাবিত নীতি পশ্চিমবঙ্গে রূপায়িত করতে চান তবে এই রাজ্যে দলীয় নেতৃত্ব রদবদল করতে হবে। রাজ্য নেতৃত্ব যদি পুরোপুরি কেন্দ্রীয় প্রস্তাবকে সমর্থন করতে সক্ষম হত তবে শ্রীভূপেশ গুপ্ত ও শ্রীভবানী সেনকে কোলকাতায় ছুটে এসে ব্যাখ্যা দিতে হত না। আর শ্রীবিশ্বনাথ মুখার্জি গৃহীত প্রস্তাবের কাঁপ রেখে বসন্ত নিয়ে দিল্লী থেকে ফিরে আসতেন না। দল-বদল আরও এজন্য দরকার যে, হাল ফিল যাঁরা দলে এসেছেন তাঁদের মধ্যে দলের প্রতি আদর্শগত ঐক্যের চেয়ে অনেক বেশী ঐক্যই বেশী। অতএব কংগ্রেস বিরোধী আন্দোলনের যে সক্রিয় ভূমিকার মধ্য দিয়ে তাঁরা রাজনীতিতে দীক্ষা নিয়েছেন সেই নীতিভ্রংশের ফলে দলের রাজনীতির প্রতি তাঁদের হতাশা উদ্রেক হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

যা হউক—সি পি আই প্রস্তাব বাংলা কংগ্রেসের প্রস্তাবের প্রতিধ্বনি মাত্র। তবে যাঁদের সঙ্গে মিতালির জন্য এত আয়োজন—পাটনায় সেই শাসক কংগ্রেস সি পি আই-এর সঙ্গে প্রাপ্ত এলাইয়েন্সের প্রস্তাব বাতিল করে দিয়েছে। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও সি পি আই কেন শাসক কংগ্রেসের সঙ্গে মিতালি চাইছেন? তাঁদের অন্য কোন পথ নেই। কেন না তাঁরা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অঙ্গীকার-বদ্ধ। তবে অনেকে হয়ত ভাববেন চন্দ্রশেখর যাদবের সংশোধনী প্রত্যাখ্যাত হওয়ার ফলে কংগ্রেসের কম্যুনিস্ট বিরোধীতার ভূমিকা বেশ ঢিলেই আছে। যাদব মহাশয় জেনে-শুনেই ঐ প্রস্তাব রেখেছিলেন। সাংবাদিকরা যে টানবে যাবে একথা তিনি ভালভাবেই জানতেন। কিন্তু প্রস্তাবটা নিয়ে আলো-চনার ফলে অবচেতন মনে একটা মানসিকতা গড়ে উঠেছে। এভাবে বার বার আলোচনা হতে হতে যতটুকু কম্যুনিস্ট বিশ্বেষ শাসক কংগ্রেসের আছে তা ক্রমেই বেড়ে যাবে। কাজেই যাদব সাহেব যে অতীব চতুরতার সঙ্গে কাজ করেছেন সে সম্পর্কে সন্দেহ নেই। শাসক কংগ্রেস নেতারা পাটনা মঞ্চে বার বার বলেছেন তাঁরা এখন বামপন্থী হয়ে গেছেন কাজেই বামপন্থী শক্তি-গুলোকে সংহত করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির জনসংঘ-স্বতন্ত্র ও আদি-কংগ্রেসকে রুখবার জন্য। এই পরিপ্রেক্ষিতে যাদব সাহেবের প্রস্তাব অত্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সময়োচিত। আর শাসক কংগ্রেস রাজ্যে রাজ্যে সি পি আই-এর সঙ্গে যখন একসঙ্গে চলছেন তখন যাদব সাহেবের প্রস্তাব না গ্রহণ করার পক্ষে কি যুক্তি থাকতে পারে? শুধু আদি কংগ্রেসের চার্জ যে নিরর্থক সেটা সাময়িকভাবে প্রমাণ করার জন্যই ইন্দিরাজী কালক্ষেপণ করছেন মাত্র। নতুবা তিনি যে নীতির উপর দাঁড়িয়েছেন তা হাঁকে সি পি আই-এর অতীব নিকটেই নিয়ে গেছে মাত্র।

যা হউক, পশ্চিমবাংলাও শাসক কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে থেকে হয়ত কিছুটা বিদ্রোহের ধ্বনি উঠতে পারে। কিন্তু সেটাও হবে সাময়িক। কারণ বাংলা কংগ্রেস—শাসক কংগ্রেস এখনও "ইক নট ইকুয়াল টু পাওয়ার।" —সেখানে সি পি আই-এর প্রয়োজন আছে। সি পি আই এটা পার্টি ভোটের খোড়াই গ্রাহ্য করে। কেননা যে সমস্ত এলাকা থেকে তাঁদের প্রতিনিধি নির্বাচিত হবেন সেখানে বাংলা কংগ্রেস ও শাসক কংগ্রেসের সমর্থন পেলে অন্য সমস্ত বামপন্থী ঐক্যবদ্ধ হলেও তাঁদের কিছু করতে পারবে না। সেজন্য তাঁদের নীতি যাই, কৌশল কাজ করে, বিধান সভায় আসন সংখ্যাও ঠিক থাকে এবং হাতের বিপ্লব করার পথটাও প্রশস্ত হয়। অতএব মন্দ কি?"

—সমদর্শী

তিন মাস ধরে বর্ষণের পর প্রচণ্ড জল জমে যাওয়ায় মেকং অঞ্চলে সৈন্য চলাচল ব্যাহত হয়। জল কিছুটা নেমে যাওয়ার পর ভারী অস্ত্রশস্ত্রসহ সৈন্য চলাচল শুরু হয়েছে।

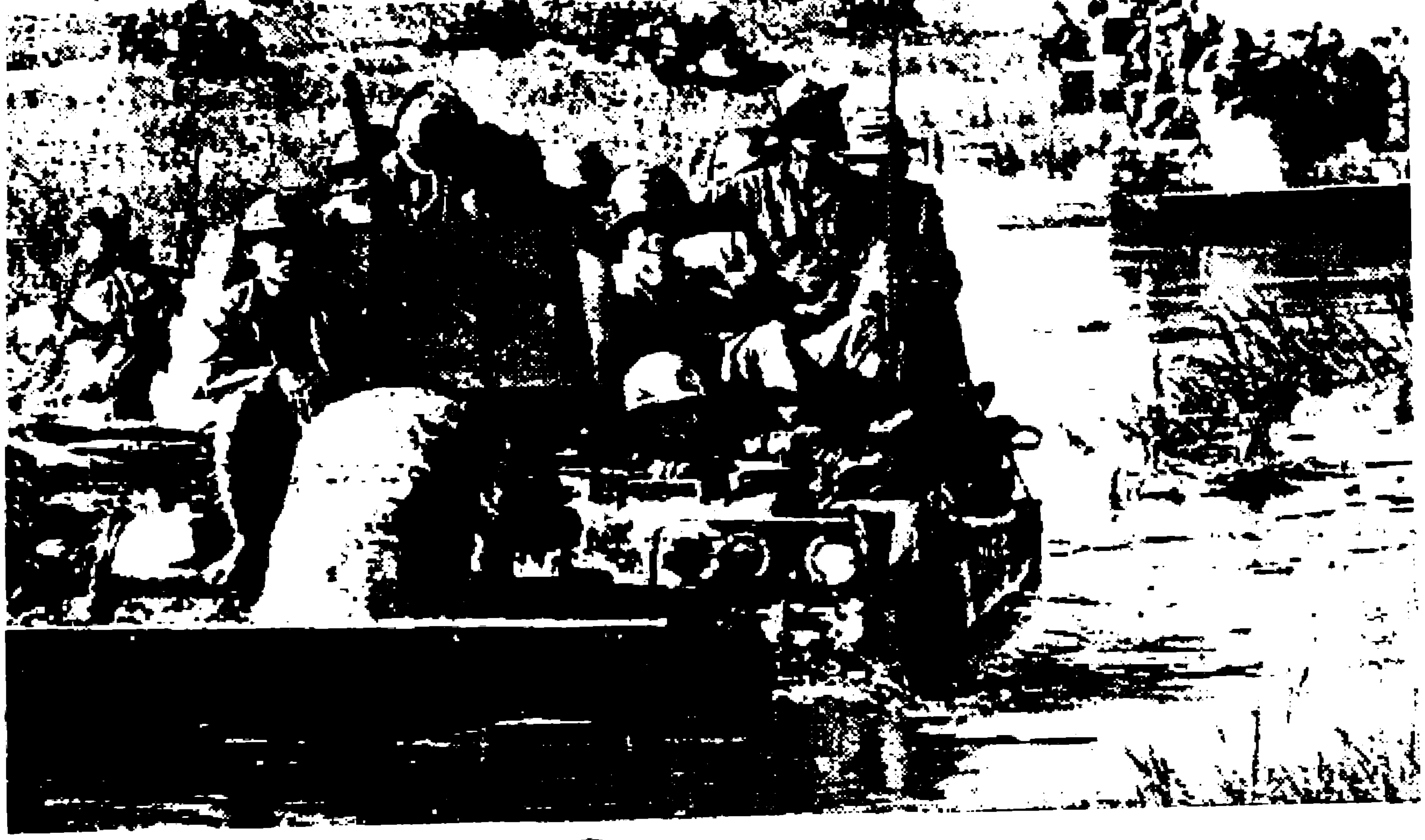

দেশে বিদেশে

পাটনার রাজেন্দ্রনগরে এবার শাসক কংগ্রেসের নিখিল ভারত কর্মিটির যে অধিবেশন হয়ে গেল সেখানে উৎসাহ-উদ্দীপনা আগেকার তুলনায় অনেক কম দেখা গেছে, এমন অনেক পর্যবেক্ষকই বলেছেন। শাসক কংগ্রেসের বোম্বাই অধিবেশনে ও গত জুন মাসে দিল্লীতে দলের কর্মিটির অধিবেশনে অনেক বেশী আগ্রহ লক্ষ করা গিয়েছিল। রাজেন্দ্রনগর অধিবেশনমণ্ডপ অধিকাংশ সময়েই ফাঁকা ছিল, যেটা এর আগে বোম্বাইয়ে বা দিল্লীতে দেখা যায় নি।

দলের সদস্যদের মধ্যে উৎসাহের এই অভাবের যে কারণই থাকুক না কেন, এটা ঠিক যে, এবার দলের জাতীয় কর্মিটির সামনে উপস্থিত করার মতো একটা সন্তোষজনক রেকর্ড দলের নেতাদের ছিল। কংগ্রেসের ভাগাভাগির অব্যবহিত আগে যেমন ব্যাঙ্কগুলির রাষ্ট্রীয়করণের সরকারী সিদ্ধান্ত দারুণ উৎসাহের সৃষ্টি করেছিল তেমনি এইবারও এ-আই-সি-সি সদস্যরা আশা নিয়েই এসেছিলেন যে, প্রাক্তন রাজন্য-ভাতা ও অন্যান্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধা বিলোপের যে প্রস্তাবটি দীর্ঘকাল ধরে কংগ্রেস ঝুলিয়ে রেখেছিল সেটি অবশেষে কার্যকর করতে চলেছেন শাসক সরকার। ইদানীংকালে কংগ্রেসের কথায় ও কাজে ফারাক যত বাড়ছিল দলের অধিবেশনে মঞ্চের উপর-বসা নেতাদের সঙ্গে মেঝেতে-বসা সদস্যদের ব্যবধানও তত বাড়ছিল। কংগ্রেস ভাগ হওয়ার পর শাসক কংগ্রেসের নেতারা অন্ততঃ সেই ফারাকটা কমাতে সমর্থ হয়েছেন।

রাজেন্দ্রনগরের অধিবেশনে অন্ততঃ এটা বোঝা গেছে যে, দলের সদস্যরা অনুভব করতে আরম্ভ করেছেন, অর্থনৈতিক সংস্কারের যেসব কর্মসূচী দীর্ঘকাল কাগজে-কলমেই রয়ে গেছে সেগুলির বাস্তব রূপায়ণের আশা এখন করা যেতে পারে। এখন দলের নেতাদের সামনে যে প্রশ্নটা বড় হয়ে দেখা দিচ্ছে সেটা হল, সাধারণ সদস্যদের মনে একবার এই আশা জাগিয়ে তুলে শেষ পর্যন্ত তাঁরা তাল সামলাতে পারবেন কিনা? রাজেন্দ্রনগরে দেখা গেল, নেতারা যতদূর এবং যে গতিতে এগোতে প্রস্তুত তার চেয়েও বেশী দূরে এবং দ্রুততর গতিতে এগোবার জন্য তাঁদের উপর চাপ আসছে। সাধারণ বীমা রাষ্ট্রায়ত্ত করা হবে কবে? শহরাঞ্চলে সম্পত্তির সীমা বেঁধে দেওয়ার কি হল? ব্যক্তিগত আয়ের সর্বোচ্চ সীমা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে না কেন? জমির মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা পরিবারের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট করা হচ্ছে না কেন? মন্ত্রীদের মধ্যে যাঁদের উচ্চসীমার বেশী জমি আছে তাঁদের বাড়তি জমি ছেড়ে দিতে বলা হবে কি? এইসব প্রশ্ন এই অধিবেশনে উঠেছে। এবং কোন প্রশ্নেরই খুব সদুত্তর অধিবেশন মঞ্চ থেকে পাওয়া যায় নি। 'এখনও সময় হয়নি', 'খুব ভালভাবে সব দিক ভেবে দেখতে হবে', 'সরকারের হাত বেঁধে দেওয়া ঠিক হবে না', ইত্যাদি বলে নেতাদের এই সব প্রশ্ন এড়িয়ে যেতে হয়েছে।

কিন্তু তাহলেও এবার এ-আই-সি সি-র অধিবেশনে কয়েকটি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিশ্রুতিটি এই যে, আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে ভারতবর্ষের প্রতিটি পরিবারের জন্য মাসিক অন্তত ১০০ টাকা আয়ের সংস্থান করা হবে। অর্থমন্ত্রী শ্রীচাবন বলেছেন যে, এই প্রস্তাবের দ্বারা কংগ্রেস এই প্রথম কার্যত স্বীকার করে নিল, জীবিকার অধিকার জনগণের অন্যতম মৌলিক অধিকার। দ্বিতীয় আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, ভারত সরকারের তরফ থেকে অর্থমন্ত্রী শ্রীচাবন

সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, তাঁরা সরকার ব্যক্তিগত আয়ের সর্বোচ্চ সীমা বেঁধে দেওয়ার কথা চিন্তা করছেন। তাছাড়া, আগামী বছরের শেষ ভাগের মধ্যে সমস্ত আবাদযোগ্য অথচ পতিত সরকারী খাস জমি ভূমিহীন কৃষকদের বিলিয়ে দেওয়া হবে বলেও প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছে।

এই সব অর্থনৈতিক সংস্কারের প্রতিশ্রুতির গুরুত্ব স্বীকার করে নিয়েও বলা যায় যে, সাধারণভাবে এবার দলের নেতাদের কাছ থেকে অপেক্ষাকৃত নরম সুর শোনা গেছে। সমাজতন্ত্রের সপক্ষে সেই প্রথম দিককার উচ্চনিনাদী কণ্ঠস্বর এবার অনুপস্থিত ছিল। তার একটা কারণ, পর্যবেক্ষকদের মতে, শাসক কংগ্রেসের নীতি বড় বেশী কম্যুনিস্ট-ঘেঁসা হয়ে পড়েছে এমন ধারণা দূর করার জন্য দলের নেতারা উদগ্রীব হয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, সভাপতি শ্রীজগজীবন রাম প্রভৃতি প্রায় সকলেই তাঁদের বক্তৃতায় বিশেষভাবে কম্যুনিস্ট পদ্ধতির সঙ্গে তাঁদের পদ্ধতির পার্থক্যটা উল্লেখ করতে ভোলেন নি। গত জুন মাসে দিল্লীতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনের সময় বিশেষ করে পশ্চিম বাংলার প্রতিনিধিরা অভিযোগ এনেছিলেন যে, দলের নেতারা কম্যুনিস্টদের সম্পর্কে নরম নীতি অবলম্বন করেছেন। এবার পাটনায় তেমন কোন অভিযোগ আসেনি, এটা লক্ষ্য করার বিষয়।

কম্যুনিস্টদের কাছ থেকে তফাতে থাকার এই আগ্রহটা এবারকার এ-আই-সি-সি অধিবেশনে আরও একদিক থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। শাসক কংগ্রেসের তরুণ তুর্কীরা চেয়েছিলেন যে, দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়া ও বামপন্থী চরম মতবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির সংহতির আহ্বান দেওয়া হোক। কিন্তু দলের নেতাদের বিরোধিতার ফলে এবার এই ধরনের কোন আহ্বান দেওয়া হয়নি। অথচ, শাসক কংগ্রেসের নিখিল ভারত কমিটির গত অধিবেশনে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল তাতে এই ধরনের আহ্বান দেওয়া হয়েছিল। ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে কমিটির বামপন্থী-ঘেঁসা সদস্য শ্রীচন্দ্রজিৎ যাদব প্রস্তাব এনেছিলেন যে, দিল্লী প্রস্তাবে বামপন্থী দলগুলি যেভাবে সাড়া দিয়েছে তার একটা সপ্রশংস উল্লেখ প্রস্তাবের মধ্যে থাক। কিন্তু দিল্লী প্রস্তাবের পুনরুল্লেখ অপ্রয়োজনীয়, এই যুক্তিতে কমিটির অধিকাংশ সদস্য শ্রীযাদবের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তরুণ তুর্কীদের সঙ্গে যোগ দিয়ে শ্রীসুব্রহ্মণ্যম বলেছিলেন যে, সি-পি-আই-এর সংগে বোঝাপড়া কেরলের নির্বাচনে কংগ্রেস ভাল ফল দেখিয়েছে, এর একটা স্বীকৃতি অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবের মধ্যে থাকা উচিত। তিনি নাকি আরও বলেছিলেন, আমরা অন্য দলের সহযোগিতা চাইব, অথচ তারা সেই সহযোগিতা দিলে আমরা সেটা স্বীকারও করতে চাইব না, এটা ঠিক নয়। কিন্তু এই যুক্তিও শাসক কংগ্রেস দলের নেতাদের মন টলাতে পারেনি। এই ঘটনাও একটা ইঙ্গিত যার থেকে পর্যবেক্ষকরা অনুমান করছেন যে, শাসক কংগ্রেস দলের নেতারা দলের ভাবমূর্তি কতকটা বদলে নিতে চাইছেন।

●

রাজেন্দ্রনগর অধিবেশনে উৎসাহ-উদ্দীপনার অভাবের একটা কারণ এই হতে পারে যে, বিভিন্ন রাজ্যে শাসক কংগ্রেসের সামনে যেসব সমস্যা দেখা দিয়েছে সেগুলির ছায়া এই অধিবেশনের উপর পড়েছিল।

বিহারের রাজধানীতে যখন এই অধিবেশন হচ্ছিল তখন ঐ রাজ্যের শাসক কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভাই আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহের সম্মুখীন হয়েছিলেন। বিহার বিধানসভায় শাসক কংগ্রেস দলের অন্তর্ভুক্ত ৭২ জন সদস্যের মধ্যে ২১ জন এ-আই-সি-সি অধিবেশন চলার সময়ে প্রধানমন্ত্রী, শ্রীজগজীবন রাম ও শ্রীচ্যবনের সঙ্গে দেখা করে দাবী জানিয়েছেন যে, মুখ্যমন্ত্রী দারোগাপ্রসাদ রায়কে দলের নেতার পদ থেকে ইস্তফা দিতে অথবা দলের ভিতর ভোট নিতে বলা হোক। তাঁদের অভিযোগ হল, শ্রীরায়ের মন্ত্রিসভার আমলে বিহারের আইন ও শৃংখলার পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে এবং ঐ মন্ত্রিসভার মন্ত্রীরা দুর্নীতিমূলক ও নীতিবিরুদ্ধ কার্যকলাপে লিপ্ত আছেন।

প্রকাশ যে, নেতারা এই বিদ্রোহীদের বিষয়টি নিয়ে এখনই খুব চাপ না দিতে পরামর্শ দিয়েছেন, তবে সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা এই প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন যে, অভিযোগগুলি তাঁরা বিবেচনা করে দেখবেন।

শোনা যাচ্ছে, বিহারের শাসক কংগ্রেস দলভুক্ত বিদ্রোহী সদস্যরা শ্রীদারোগাপ্রসাদ রায়কে সরিয়ে শ্রীভোলা পাসোয়ান শাস্ত্রীকে মুখ্যমন্ত্রী করার চেষ্টা করছেন। পি-এস-পি এর আগেই রায় মন্ত্রিসভা থেকে তাদের সমর্থন প্রত্যাহার করে নিয়েছে।

●

উত্তরপ্রদেশে শাসক কংগ্রেস দল ক্ষমতায় ফিরে আসতে পারবে কিনা সে বিষয়ে রীতিমত সন্দেহ দেখা দিয়েছে। বিরোধী কংগ্রেস, ভারতীয় ক্রান্তি দল, জনসংঘ, সংযুক্ত সমাজতন্ত্রী দল ও স্বতন্ত্র দল মিলে যে সংযুক্ত বিধায়ক দল গঠন করেছে তারা শ্রীটি এন সিংহকে কোয়ালিশনের নেতা নির্বাচিত করেছে। সংযুক্ত বিধায়ক দল দাবী করছে যে, তাদের সঙ্গে বিধানসভার ২৬২ জন

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

অপু

পথের পাঁচালী সমগ্র
অপরাজিত সমগ্র
কাজল তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

'পথের পাঁচালী' ও 'অপরাজিত' উপন্যাসে অপুর জীবনবৃত্ত সম্পূর্ণ নয়। বিভূতিভূষণ 'কাজল' নামে তৃতীয় খণ্ডের পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা করেছিলেন, কিন্তু অকালমৃত্যুতে রূপায়ণ সম্ভব হয়নি। বিভূতিভূষণের একমাত্র সন্তান

তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

তখন শিশু (তাকে নিয়েই কাজলের পরিকল্পনা, অনেকের বিশ্বাস)।

বাংলা সাহিত্যের একটি পরমাশ্চর্য ঘটনা

শিক্ষায় ও বয়সে যোগ্যতা অর্জন করে তারাদাস 'কাজল' শেষ করে ফেলেছেন। বিভূতিভূষণই যেন মহাকীর্তি সমাপ্ত করলেন তাঁর স্নেহের দুলালের হাত দিয়ে।

ডবল ডিমাই সাড়ে-আটশ' পাতার বিরাট গ্রন্থ—অসামান্য মুদ্রণ-পারিপাট্য। বহুল প্রচারার্থে মূল্য মাত্র ১৮, টাকা। এর উপরেও ২০% কমিশন বাদে গ্রাহকেরা আপাতত ১৪·৪০ টাকায় পাচ্ছেন। ডাকে পাঠাতে হলে ৩·০০ অগ্রিম পাঠাবেন।

... ...

জীবনানন্দ দাশের কাব্যগ্রন্থ

বনলতা সেন/রূপসী বাংলা/মহাপৃথিবী/ধূসর পাণ্ডুলিপি

কবির শ্রেষ্ঠ কাব্য-চতুষ্টয়। মূল্য ১২·০০ (২০% কমিশন বাদে ৯·৬০)।

গ্রন্থপ্রকাশ। বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ। ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলি-১২

সদস্য আছেন এবং অপরপক্ষ তাদের দল ভাঙাবার যতই চেষ্টা করুক না কেন, তাদের সমর্থক সংখ্যা ২০০-এর কম কিছুতেই হবে না। সংযুক্ত বিধায়ক দলের নেতারা ইতিমধ্যে রাজ্যপাল ডঃ গোপাল রেড্ডির সঙ্গে দেখা করে শ্রীসিংকে মন্ত্রিসভা গঠনের আমন্ত্রণ জানাবার দাবী জানিয়ে এসেছেন। সংযুক্ত বিধায়ক দলের মুখপাত্রের কথা যদি সত্য হয় তাহলে রাজ্যপাল তাঁদের এই দাবীর সারবত্তা মেনেও নিয়েছেন। অপরপক্ষে শাসক কংগ্রেস দলের নেতা শ্রীকমলাপতি ত্রিপাঠী ডাঃ রেড্ডির সঙ্গে দেখা করে বলে এসেছেন যে যেহেতু সংযুক্ত বিধায়ক দল পৃথকভাবে চিহ্নিত কোন একটি দল নয় এবং যেহেতু শ্রীসিংহের নির্বাচন শরিক দলগুলির প্রত্যেকটির দ্বারা পৃথক পৃথকভাবে অনুমোদিত হয়নি সেহেতু রাজ্যপাল শ্রীটি এন সিংকে মন্ত্রিসভা গঠনের আমন্ত্রণ জানাতে পারেন না, সেই আমন্ত্রণ বরং বিধানসভার একক বৃহত্তম দলের নেতা হিসাবে তাঁরই (শ্রীত্রিপাঠীর) প্রাপ্য।

•

আরও যে একটি রাজ্যে শাসক কংগ্রেসের সামনে নেতৃত্বের সঙ্কট পেকে ওঠার আগেই মিটে গেছে বলে মনে হচ্ছে সেটা হল আসাম। সেখানে শ্রীবিমলাপ্রসাদ চালিহা স্বাস্থ্যের কারণে বিধানসভার দলপতি পদ থেকে সরে দাঁড়াতে চেয়েছেন এবং কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টারি বোর্ড তাঁকে সেই অনুমতি দিয়েছেন। তাঁর জায়গায় কে দলপতি ও মুখ্যমন্ত্রী হবেন তা নিয়ে একটা বিরোধ বাধার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। কিন্তু শ্রীমহেন্দ্রমোহন চৌধুরীই শ্রীচালিহার জায়গায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন।

—পুণ্ডরীক

ভারত সফরে এসে লায়লা খালেদ এক সাংবাদিক বৈঠকে বিমান ছিনতাইএ তাঁর অপর একজন সঙ্গীর কথা শুনিয়েছেন। লায়লা জানিয়েছেন যে, বিমান ছিনতাইর জন্য তিনি এখনো তৈরী আছেন।

কম্বোডিয়ায় সায়গনী সৈন্যরা গ্রামবাসীদের মধ্যে খাদ্য বিতরণ করছেন। নামপেনের ৫৬ মাইল উত্তরে কাউক চাঁপের অধিবাসী এরা।

সম্পাদকীয়

পশ্চিমবঙ্গের সমস্যা

সকলকে বিজয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করি। প্রতি বৎসর আমরা এই উৎসবের লগ্নটির জন্য অপেক্ষা করে থাকি। উৎসব আসে এবং চলে যায়। থাকে শুধু তার স্মৃতি ও আগামী উৎসবের প্রতীক্ষা। পরস্পরের প্রতি প্রীতি ও শুভকামনা জ্ঞাপনই উৎসবের বাণী। আমরা সেই বাণীর কথাই আন্তরিকভাবে আজ স্মরণ করছি।

পশ্চিম বাংলার এবারের উৎসব এসেছিল নানা ক্ষয়ক্ষতির পটভূমিকায়। প্লাবনে দেশের অনেকাংশ প্রভূত ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিল। সেই আর্থিক ক্ষতির জের এখনো যায়নি। তা সত্ত্বেও বাংলাদেশের মানুষ উৎসবের দিন কটি আনন্দ করেছে। উৎসবের মধ্য দিয়ে পরস্পরের সঙ্গে মিলন এবং আত্মীয়তার যে বন্ধন তাকে শত দুঃখ-কষ্টের স্মৃতিও একেবারে ছিন্ন করতে পারে না। বাঙালীর কাছে এ উৎসব সে কারণেই এত প্রিয়, এত অপরিহার্য।

বাংলাদেশের দিকে তাকালে অবশ্য আনন্দ করবার কিছু নেই। তার অর্থনৈতিক দুর্গতি আজ চরমে। নানা স্তোকবাক্য শোনা যায় ওপর মহল থেকে। কিন্তু কোনোটাই কার্যে পরিণত হয় না। বন্যার জন্য বাংলার ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ হয়েছে প্রায় সোয়া একশো কোটি টাকার মতো। আপাতত সরকার মাত্র ৬০ কোটি টাকা প্রার্থনা করেছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে। তাও মঞ্জুর হয়নি। অথচ বলার সময় সকলেই বলেন যে, বাংলার জন্য যথাসম্ভব করা হবে।

আসলে বাংলাদেশ আজ সকলেরই মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাংলার বেকার সমস্যা দিনে দিনে বাড়ছে। শিক্ষিত তরুণ ঘরে ঘরে বসে আছে কাজ নেই। চতুর্থ পরিকল্পনায় কিছু আশাভরসা দেওয়া হয়েছিল যে নতুন কর্মসংস্থান তাতে হবে। তার ছিটেফোঁটাও এখন পর্যন্ত বাংলার দিকে আসেনি। বরং অনেক কল-কারখানা বন্ধ থাকায় বেকাররা হতাশ হয়ে সেই রুদ্ধ দরজাগুলোর দিকে তাকাচ্ছে।

এদিকে রাজনৈতিক অস্থিরতা এমন একটি রূপ নিচ্ছে যা মোটেই প্রীতিপ্রদ নয়। রাজনৈতিক হত্যাকান্ড ক্রমশই বেড়ে চলেছে। সমাজবিরোধীরাও এর সুযোগ নিয়ে এক চরম অরাজক অবস্থা সৃষ্টি করে তুলেছে যা সাধারণ মানুষের পক্ষে সহনীয় নয় মোটেই। কিন্তু যে-আমলারা প্রশাসনিক দায়িত্ব নিয়ে রাজ্য চালাচ্ছেন তাঁরাও এই গুরুতর সমস্যার মোকাবিলা করতে পারছেন না যথাযথভাবে। পুলিশও অনেকটাই অপ্রস্তুত। তাদের সাহায্য করার জন্য আনা হয়েছে কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ। কিন্তু তাতেও অবস্থার খুব উন্নতি হয়েছে বলা চলে না। সমগ্র রাজনৈতিক পরিস্থিতিই এখন ঘোরালো।

রাজনৈতিক ফ্রন্টেও উল্লেখযোগ্য কোনো পরিবর্তন হয়নি। কেরলের নির্বাচনের পর বাংলাদেশ সম্পর্কে দিল্লীর আগ্রহ বেড়েছে। এখানে কেরলের ধরণে কোনো ফ্রন্ট গড়া যায় কিনা তা নিয়ে কমিউনিস্ট পার্টি খুব আগ্রহ দেখাচ্ছে। তাদের জাতীয় পরিষদের প্রস্তাবে শাসক কংগ্রেসের সঙ্গে নির্বাচনী বোঝাপড়ার কথা বলা হয়েছে। স্বভাবতই কেরলে কমিউনিস্ট পার্টি শাসক কংগ্রেসের সঙ্গে বোঝাপড়া করে যে সাফল্য লাভ করেছে পশ্চিমবঙ্গে তার পুনরাবৃত্তিতে তাদের আগ্রহ। কিন্তু পশ্চিম বাংলার রাজনৈতিক আবহাওয়া পৃথক। কেরলে মন্ত্রিসভায় যোগ দেবার ফলে আর, এস পি দুভাগ হয়ে গেছে। সুতরাং তখনকার আট পার্টি জোট কমিউনিস্ট পার্টির প্রস্তাবের পর আস্ত থাকবে বলে মনে হয় না। ইতিমধ্যেই কমিউনিস্ট পার্টির এই রাজনৈতিক চিন্তাধারার বিরোধিতা করেছে ফরওয়ার্ড ব্লক, এস ইউ সি, আর এস পি, প্রমুখ জোটভুক্ত পার্টি।

কমিউনিস্ট পার্টি অবশ্য এটা আগেই অনুমান করেছিল যে আট পার্টির অনেক পার্টিই তাদের সঙ্গে থাকবে না। কিন্তু তা হলেও কংগ্রেসের প্রগতিশীল অংশ হিসেবে শাসক কংগ্রেসের সঙ্গে এই বোঝাপড়ার সিদ্ধান্তে কমিউনিস্ট পার্টি আর দ্বিধা করবে না। আট পার্টির অন্যান্য অংশীদার ফ্রন্টের আওতায় যত শক্তিশালী হয়েছিল ফ্রন্টের বাইরে তত শক্তি ওদের থাকবে না এটা কমিউনিস্ট পার্টি হিসেব করে নিয়েই বর্তমান রাজনৈতিক পরীক্ষায় ঝাঁপ দিয়েছে। অবশ্য শাসক কংগ্রেস কতটা আগ্রহে তাদের এই প্রস্তাবে সাড়া দেবে সেটাই হল দেখবার বিষয়। তবে যতদূর মনে হচ্ছে বোঝাপড়া একটা হবেই এবং বাংলাদেশে আরেকবার রাজনীতির এক আশ্চর্য খেলা জমবে।

সবাই বর্তমান অবস্থায় অতিষ্ঠ। এর অবসান হওয়া দরকার। কীভাবে তা হবে সেটাই [illegible] বিবেচ্য বিষয়। নির্বাচন কবে হবে তা নিয়েও জল্পনার শেষ নেই। কিন্তু বিভিন্ন দলে রাজনৈতিক বিরোধ এখন যে পর্যায়ে এবং যে রূপ হিংস্র আকারে দেখা দিয়েছে তাতে এখন নির্বাচনের ব্যবস্থা করলেও তা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করা যাবে কিনা তা নিয়ে ঘোরতর সন্দেহ। বাংলাদেশে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল আগেও ছিল। তাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতাও [illegible]। কিন্তু বিরোধীকে খুন করে স্তব্ধ করে দেওয়ার রাজনীতি অতি সাম্প্রতিক [illegible]। এত রক্তপাতে মানুষ আজ আতঙ্কিত। বাংলাদেশকে এই হিংসার আগুন থেকে কে রক্ষা করবে?

শুধু চিত্রকল্প নও ।।

কৃষ্ণ ধর

মা, তুমি শুধু কবিতার চিত্রকল্প নও
যাকে নিয়ে মনের ভেতরে তৃপ্তি পাওয়া যায়
তুমি শুধু ছন্দ যতি অনুপ্রাস উপমায় মিলে
অথবা বস্তুর মতো, ধরা দাও না তো
তোমাকে নিয়েই কাব্য, নাটকের শাণিত সংলাপ
পিকাসোর ছবি কিংবা বলাই পালের
লক্ষ্মীর পট আঁকা, শস্য বীজ নবান্নের সুবাসিত স্তব
তোমাকে নিয়েই হাসা কাঁদা।
তোমাকে রৌদ্রে চাই খাঁ খাঁ মাঠে নিঃসঙ্গ উত্তাপে
মধ্যরাতে কখনো বা উঠে
ডাক দিয়ে জানাই তোমাকে, তুমি আচম্বিতে জেগে
বিরক্তির ভান করে শোও পাশ ফিরে
তোমাকে অন্যত্র দেখি কখনো বা খিন্ন অবসাদে
নিজের ভিতরে এক আয়নার বুকে
কখনো রক্তের ভিতরে একটানা বহমান স্রোতে
তোমাকে খুঁজতে যাই অস্তিত্বের সংঘাতে।
আমার সত্তাকে তুমি মুনশের মতো বোলে বোলে
সজাগ সটান করো প্রখর চাটিতে
সখ্যে নয়, বৈরিতায় কখনো বা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়
আমাকে আহ্বান করো দুরন্ত দ্বৈরথে।

সূর্য প্রতীক ।।

শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়

আমরা অনেক দূরে, আমরা একান্ত কাছে থাকি,
আকাশে বলাকা ওড়ে, এক আকাশ, একই নীল রঙ,
ঝাপসা চোখের আলো, তবু চোখ বুজি না, বরং
দুঃখ দুহমাঝে বসে মনের দরজা খুলে রাখি।
কর্মক্লান্ত দিনশেষে কলোনীর ডোবাটার ধারে
হঠাৎ থমকে যাই, কানে গান—মনসা ভাসান।
মৃত্যুদূত বাধা পায়, লখাইকে ফিরে দিতে প্রাণ
বেহুলা বাসর জাগে মানচিত্র সীমার এপারে।

প্রথম আমের বোল, মৃদুগন্ধে মন দুলে যায়,
ধূসর গঙ্গায় মেশে বন্যা-জাগা সবুজের ঢেউ,
মেঘনার কূলে কূলে শাঁখে ডাক দিল বুঝি কেউ,
কে যেন নক্ষত্র কন্যা দিগন্তরে আবির ছড়ায়।

এখন গভীর রাত, সারারাত দৈত্য আনাগোনা,
এই রাত—দীর্ঘ রাত, তবু কাল সূর্য কি পাব না?

অবিশ্বস্ত সিঁড়ি ।।

শোভা মিত্র

ক্রমশই যেন সে বিশ্বাস হারিয়ে যায়
নিজের মধ্যে
একটা ভাঙা নড়বড়ে ঘোরানো কাঠের সিঁড়ির
অবিশ্বস্ত ধাপে ধাপে
রোজকার কি যেন এক অজানা ভয়,
সন্দেহ আর শঠতা বাসা বেঁধে থাকে।

দিনান্তে একঘেয়ে কর্মবিরতির পর
ঘরে ফেরার সাধ জাগে
উদ্দাম বাসনা ঘেরা স্বপ্নের এক সুউচ্চ প্রান্তসীমার
প্রতীক্ষারত এক বিশ্বস্ত হৃদয়ের
উত্তপ্ত নিবিড় ভালবাসার একান্ত সুখ সান্নিধ্যে
কর্মক্লান্ত মন নিশ্চিন্ত বিশ্রাম চায়
অথচ রোজকার সে একই সিঁড়ির
অবিশ্বস্ত ধাপে ধাপে,
সন্দেহ আর শঠতা বাসা বেঁধে থাকে—
সেই একই ভয় অজানা আশঙ্কা তাই,
সে প্রান্ত-সীমার পৌঁছবার।

রাজার শেষ ঘুম

মানব সান্যাল

সেই অনিবার্য মুহূর্তটি যখন হয় [illegible] মৃত্যু—অথবা [illegible] হাঁটাচলার [illegible] মুহূর্তে [illegible] অবধারিত [illegible] নিরবচ্ছিন্ন দৌড় [illegible] সমাপ্ত ভাবনা—যে নামেই চিহ্নিত করা হোক না কেন—সেই মুহূর্তটি আসবেই এবং পরমেশ সেন [illegible] একনাগাড়ে [illegible] এক সময় এক [illegible] মুহূর্তে [illegible] হঠাৎ [illegible] পরমেশ সেন [illegible] এক [illegible] মুহূর্তেও [illegible] মহিমা নিয়ে এই সচেতন বোধ থেকেও সম্পূর্ণ

মুক্ত হয়ে যাবেন—সেই পরম প্রার্থিত মহিমা-মণ্ডিত মুহূর্তটি আসতে আরও পাঁচ মিনিট বাকি আছে—হাত-ঘড়ির দিকে চেয়ে কথাটা মনে হতেই পরমেশ সেনের মনের মধ্যে ধূমপানের শেষ ইচ্ছাটা খুব প্রবল হয়ে উঠল।

এখন তাঁর বুকের মধ্যে আর কোন দম-ধরা ভাব নেই। বরং খুব জটিল এক সমস্যার সমাধান হয়ে গেলে যেমন হালকা খুশীর হাওয়া অস্তিত্বের চারপাশে ঘুর-ঘুর করে বেড়ায়—পরমেশের মনে হচ্ছিল—তিনি সম্পূর্ণ হালকা হয়ে গিয়েছেন।

শেষ পর্যন্ত ভয় থেকে মুক্ত হয়ে যেতে পেরেছেন।

স্লিপিং পিলের শিশিটা নাগালের মধ্যেই আছে। হাত বাড়ালেই মৃত্যু বুকের কাছে ঘন হয়ে আসবে নিঃশব্দ পায়ে। হয়তো মায়ের মত কোলে তুলে নেবে—কিংবা খুব বড়, বাঁকানো দুটো ধারালো শিং দিয়ে হৃৎপিণ্ডটাকে ফালা-ফালা করে ছিঁড়ে দেবে। অথচ পরমেশ সেনের চেতনায় তা ধরা পড়বে না।

আসুক এই নিঃশব্দ অচেতন মৃত্যুর ক্ষণ—পরমেশ সেনের কোন উদ্বেগ নেই—সেই মৃত্যুর চেহারা যতই ভয়ংকর হোক—পরমেশ সেন এখন সম্পূর্ণ ভয়হীন হয়ে গেছেন। হাত-ঘড়ির কাঁটা দুটো বারোটার ঘরে লম্বালম্বি, ওপর-নীচে খাড়া হয়ে দাঁড়ালেই ......।

কি আশ্চর্য নির্বোধ, শান্ত এই মৃত্যু—সে পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে বুকের কাছে ঘন হয়ে দাঁড়াল—অথচ পরমেশ সেনের চেতনায় তার কোন চেহারা নেই—ভয়ে সিঁটিয়ে নীল হয়ে যাওয়ার আর্ত-চীৎকার নেই—'আমি মরে যাচ্ছি, মৃত্যু আমার গলা টিপে ধরেছে', 'না, না, আমি মরতে চাই না', 'মৃত্যুর বড় ভয়ংকর, কে আছ, ওগো আমাকে বাঁচাও'—ভয়ংকর সব কণ্ঠোচ্চারিত শব্দের পীড়ন নেই—পরমেশ যেন খুব ভয়হীন এবং শান্ত মনে বসেছিলেন হাত-ঘড়ির দিকে সতর্ক দুটো চোখ রেখে। শুধু মাঝে মাঝে 'সংখ্যা' নামে একটি নিরীহ শব্দ তাঁকে ভাবনায় ডুবিয়ে দিচ্ছিল। আজ আর একটা কিংবা দুটো ঘুমের বড়িতে কাজ হবে না। পুরো শিশিটাই মুখের মধ্যে উপুড় করে দিতে হবে। মোটামুটি একটা সহজ হিসাবে স্লিপিং পিলের শিশিটার মধ্যে বাকি বড়িগুলোর সংখ্যা যা ধরা পড়ে—তা বত্রিশের কম তো হবেই না। অতএব অঙ্ক শুধু সংখ্যার হের-ফের—আনুষাঙ্গিক অন্যান্য অবস্থাগুলির আর কোন পরিবর্তন নেই। এক কিংবা দুই-এর বদলে দশ। শুধু সংখ্যাটাই পাল্টে যাবে। ব্যস তারপর নাগর-দোলায় দোল খেতে খেতে অচেতনার গর্ভীরে ডুবে যাও—তাকে ঘুমই বল, আর মৃত্যুই বল তার চুলচেরা বিচার করার জন্য পরমেশ সেনকে তো আর পাওয়া যাবে না।

শুধু জবা-কুসুমের মত একটা টুকটুকে লাল সূর্য—যা ক্রমশঃই বাড়ে আর পাম গাছগুলোর শিশিরে-ভেজা পাতায় পাতায় বড় ঘাটটায় অজস্র মুক্তোর বিন্দু হয়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ভেঙে পড়ে—সেই সুন্দর সূর্যোদয়ের প্রভাত আর কোনদিন ফিরে আসবে না। একে যদি মৃত্যু বলা যায়—তবে সেই মৃত্যুকে ভয় নেই।

আনুষাঙ্গিক যে অবস্থাগুলো রোজই উপস্থিত থাকে— আজ তাদের কোন ব্যতিক্রম নেই। অন্য রাতগুলোর মতই পরমেশ সেন বেডরুমে ঢুকেই ডান ডোরের পাল্লা-দুটো পটেন দিয়ে ল্যাচটা ঘুরিয়ে দিয়েছেন। বাইরে গুমোট ভাব থাকায় এয়ারকুলারটাকে ঠাণ্ডার দিকে কিছুটা বাড়িয়ে দিয়েছেন। অভ্যাসমত ঘরের চারপাশে একবার দ্রুত দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিয়েছেন। তবে অন্যদিনের মত আজ আর বাতিটা নিভিয়ে দেননি। অপেক্ষা করেছেন সেই অন্তিম মুহূর্তের। বিছানার ওপরে বসেই হাত-ঘড়িটার দিকে চেয়ে সময়কে সতর্ক পাহারা দিয়েছেন।

—আরও পাঁচ মিনিট সময় হাতে আছে। একটা গোটা সিগারেটকে বেশ মৌজ করে আস্তে আস্তে ধোঁয়া ছেড়ে, বাতাসে রিং ছুঁড়ে শেষ করতেই হাতের সময়টুকু ফুরিয়ে যাবে। তারপর ডানলপের গদীতে শরীরটা ডুবিয়ে বেড-সুইচটাকে টিপে দেবেন। ঘর অন্ধকার হয়ে যাবে। আজ আর ঘুম নিয়ে ভাবনা নেই। অন্ধকারে জেগে থেকে ভৌতিক সব ছায়া আর শব্দের অশরীরী অস্তিত্বের পীড়ন নেই। চাদরটা গায়ের ওপরে টেনে দিয়েই স্লিপিং পিলের পুরো শিশিটাই মুখের মধ্যে চালান করে দেবেন। তারপর ঘুম—গাঢ়, গভীর ঘুম—স্বপ্নের মধ্যেই রাজার মত মহিমা-মণ্ডিত মৃত্যু।

পরমেশ সেন সিগারেটটাকে দুই ঠোঁটের ফাঁকে চেপে ধরেছিলেন। ডানহাতের মুঠোয় লাইটারটাও তুলে নিয়েছিলেন।

আর ঠিক সেই সুন্দর পরিকল্পিত মুহূর্তটিকে হঠাৎ ভয়ংকর এক গম্ভীর ঘণ্টাধ্বনি পরমেশ সেনকে দারুণ চমকে দিল। সঙ্গে সঙ্গে ডান হাতটা কোলের কাছে গুটিয়ে গেল। ঢং...ঢং...ঢং...হল-ঘরের দেওয়াল ঘড়ি থেকে একটার পর একটা ঘণ্টার শব্দ ভেসে আসতে লাগল আর প্রত্যেকবার ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে পরমেশ সেনের হৃৎপিণ্ডটা লাফ দিয়ে দিয়ে ধক-ধক করে কানের পর্দায় ঘা মারতে লাগল।

বারোটা ভয়ংকর বুক-কাঁপানো শব্দের ঢেউ আছড়ে পড়ল হৃৎপিণ্ডের ওপরে। তারপর আবার আগের মতই সব চুপ। কোথাও কোন শব্দ, এমনকি অশরীরী কোন খস-খস সন-সন শব্দও শোনা যায় না।

শুধু পরমেশ সেনের বুকের মধ্যে বেজে চলেছে সেই ভয়ংকর ঘণ্টাধ্বনি। নিজের কানে হাত রাখেই সেই ঘণ্টাধ্বনি শুনে রক্তের মধ্যে শির-শির করে উঠল। পরমেশ সেন ডান হাতের মুঠোয় স্লিপিং পিলের শিশিটা চেপে ধরলেন। বুকের বাঁদিকে কণ্ঠার ঠিক নীচেই যেখানে হৃৎপিণ্ডটা খুব জোরে জোরে লাফ দিচ্ছিল—বাঁ হাতটা খুব জোরে খামচে ধরলেন।

তারপর দরজার মুখোমুখি ঘুরে বসতেই পরমেশের সারা দেহে কাঁপুনি ধরল। হঠাৎ খুব শীত করে উঠলে যেমন হাড় পর্যন্ত কাঁপিয়ে দেয়, পরমেশ থরথর করে কাঁপতে লাগলেন।

ঘাতকের দল নিশ্চয়ই এতক্ষণে দরজার গোড়ায় এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। এবার বন্ধ দরজায় অনেক ব্যস্ত হাতের ঘা পড়বে। ওদের কেউ একজন নিশ্চয়ই হেঁড়ে-গলায় চীৎকার করে উঠবে—ওহে পরমেশ সেন, আর প্রাণের মায়া কেন? আমরা যে এসে গেছি। এবার দরজা খোল।

পরমেশ সেন স্পষ্ট অনুভব করলেন—বুকের মধ্যে অবিরাম বেজে চলা সেই ঘণ্টার শব্দটা এখন খুব শীতল এক হিমের স্রোত হয়ে শির-শির করে রক্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে। হাত-পা সব যেন দারুণ ঠাণ্ডায় জমে গিয়ে ক্রমশঃই অবশ হয়ে আসছে। বাঁ হাতটা তখনও বুকের বাঁদিকে খামচে ধরা ছিল—হঠাৎ হাতটা খুব ভারী আর শিথিল হয়ে বুকের ওপর থেকে খসে পড়ল। ডান হাতের মুঠোটাও আলগা হয়ে এলো। পরমেশ সেন দৃঢ় ইচ্ছা-শক্তি প্রয়োগ করেও মুঠোটাকে শক্ত করতে পারলেন না। স্লিপিং পিলের শিশিটা শিথিল মুঠোর ফাঁক দিয়ে মেঝের ওপরে গড়িয়ে পড়ে ভাঙা কাচের টুকরো হয়ে ইতস্তত ছড়িয়ে পড়ল।

পরমেশ সেনের দু-চোখের বোবা দৃষ্টিতে আত্মসমর্পণের অসহায়তা ফুটে উঠল। ফ্যাল ফ্যাল করে বন্ধ দরজার দিকে চেয়ে রইলেন—সারা দেহে পক্ষাঘাতের অসাড়তা নিয়ে।

আশ্চর্য! ভয়টা তাহলে এতক্ষণ বুকের মধ্যেই ঘাপটি মেরে বসেছিল।

অথচ আজ সারাটা দিন—সকাল-দুপুর-সন্ধ্যা অ্যাটর্ণি, ব্যারিস্টার, ইনকাম ট্যাক্স আর সেলস্ ট্যাক্স অফিসের লোকেদের আসা-যাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে ভয়টা যখনই শিং উঁচিয়ে ঢু মারতে এসেছে, পরমেশ সেন জোর ধমকে হটিয়ে দিয়েছেন। শেষপর্যন্ত তাঁর মনে হয়েছিল—ভয়টাকে একেবারেই তাড়িয়ে দিয়েছেন এবং বুকের মধ্যে হঠাৎ ঘণ্টার শব্দ বেজে ওঠার আগেও তাঁর মনের মধ্যে দৃঢ় প্রত্যয় ছিল—তিনি সম্পূর্ণ ভয়হীন হয়ে গিয়েছেন।

ঘাতকদের চিঠিতে দিন এবং সময়ের যে স্পষ্ট উল্লেখ ছিল, তাতে বুঝতে মোটেই অসুবিধা হয়নি—আজ রাত বারোটায় হত্যার সময় নির্দিষ্ট হয়েছে। ফলে সারাটা দিন ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। বিষয়-সম্পত্তির যাবতীয় ঝামেলার কাজ শেষ করতে বুকের মধ্যে হাঁপ ধরে গিয়েছে। সম্পত্তি তো কম নয়—দু' মাইল এলাকা জুড়ে বিশাল কারখানা, রাজপ্রাসাদের মত সাজানো বাড়ী, ব্যাঙ্কে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা—এতসব বিষয়-আশয়ের কি হবে, কাকে দিয়ে যাবেন উত্তরাধিকার—ভেবেই কূল পাচ্ছিলেন না। শেষপর্যন্ত মাসে মাসে বরাদ্দ চাঁদার খাতাটা বার করে একটা খুব ছোটখাটো অনাথ আশ্রমের নাম বেছে নিয়েছিলেন। একবার মনে হয়েছিল—বিষয়-আশয়, সম্পত্তি সব ঘাতকদের পায়ে সমর্পণ করে প্রাণভিক্ষা চাইবেন। সঙ্গে সঙ্গে নিজের সারা দেহে সপাং সপাং চাবুক চালিয়ে কালা কালা দাগ করে দিতে ইচ্ছা হয়েছিল। পরমেশ সেন নামে এক দুর্ধর্ষ ঘোড়সওয়ার সারাজীবন রাজার মত মাথা উঁচু করে সময়কে শাসন করেছেন। আজ ভিখারী হয়ে গিয়ে ঘাতকদের পায়ের নীচে মুখ থুবড়ে

CENTRAL LIBRARY

পড়লেন নাকি? না, বাজের মতই মৃত্যুকে নিজের হাতে বুকের ওপরে তুলে নেবেন। পরমেশ সেন যেন সাজিয়ে-গুছিয়ে ঘটনার পারম্পর্যগুলি মনের মধ্যে ভেবে রেখেছিলেন।

ঘাতকের দল ঠিক রাত বারোটায় দরজার গোড়ায় এসে হাজির হবে। হাতে নিশ্চয়ই উদ্যত ছোরা কিংবা [illegible] কোন অস্ত্র থাকবে। কিন্তু পরমেশ সেন মিনিট-পাঁচেক আগেই অনেকগুলো ঘুমের বড়ি একসঙ্গে মুখের মধ্যে ফেলে দিয়ে চাদরটাকে মাথা পর্যন্ত টেনে দিয়ে অনন্ত নিদ্রায় ডুব দেবেন। ঘাতকেরা নিশ্চয়ই বন্ধ দরজায় ধা মেরে মেরে শেষ-পর্যন্ত দারুণ ক্রোধে ফুঁসে উঠে বুটের লাথি মারতে শুরু করবে দরজার পাল্লায়। ক্রস-ডোরের বিলাতী পাল্লাদুটো এক সময় ভেঙে পড়বেই। ঘাতকেরা উদ্যত ছোরা হাতে নিয়ে ঘরের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়বে। কিন্তু পরমেশ সেনের শবদেহ কোপ মেরে মেরে এক ফোঁটাও রক্ত ঝরাতে পারবে না।

এই পৃথিবীটার কাছে চাইবার আর কিছুই নেই পরমেশ সেনের। ফলে মৃত্যুর আগে খুব সহজেই বাসনা থেকে মুক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। শুধু একটি মাত্র দুঃ ইচ্ছা ছিল—দেওয়াল-ঘড়িটাকে শেষবারের মত হারিয়ে দিয়ে যাবেন। পরমেশ সেন সুপরি-কল্পিত এক স্বেচ্ছা-মৃত্যুর আয়োজনে কোন ত্রুটি রাখেননি।

সাতদিন আগেই চিঠিটা হাতে পেয়েই অনিবার্য মৃত্যুর কাছে পরমেশ সেন আত্ম-সমর্পণ করেছিলেন। কিন্তু হলঘরের প্রাচীন বৃদ্ধ দেওয়াল-ঘড়িটার মুখ থেকে অন্তিম মুহূর্তের ঘোষণা শোনা মানেই তো হেরে যাওয়া। সারাজীবন যে দুর্ধর্ষ সৈনিক সময়ের আগে আগে ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে—আজ সে সময়ের কাছে হেরে যাবে নাকি? মৃত্যু আসবেই, তাকে মেনে নিতে হবে—এটা একটা নিয়ম—দুর্লঙ্ঘ, অনিবার্য, কিন্তু তাই বলে প্রাচীন এক বৃদ্ধ ঘণ্টা বাজিয়ে বাজিয়ে সময়ের জয় ঘোষণা করবে—আর পরমেশ সেন নামে এক পরাজিত অশ্বারোহী সেই জয়-ঘোষণা শুনতে শুনতে ঘাতকদের হাত ধরে মন্থর শিথিল পায়ে বধ্যভূমির দিকে এগিয়ে যাবে—পরাজয়ের এই করুণ দৃশ্যকে প্রত্যক্ষ করার জন্য বেঁচে থাকা যায় না।

পরমেশ সেন সকালে ঘুম থেকে উঠেই রেডিওর সময় দেখে হাত-ঘড়িটাকে পাঁচ মিনিট এগিয়ে রেখেছিলেন। আর নিশ্চিত বিশ্বাসে হাত-ঘড়িটার দিকে চোখ রেখে অন্তিম মুহূর্তের অপেক্ষায় রাত জেগে বসেছিলেন। দেওয়াল-ঘড়িটাকে হারিয়ে দেওয়ার কি সুন্দর পরিকল্পনা। দেওয়াল-ঘড়িটা তখনও ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে সময়ের সঙ্গে তাল দিয়ে টিক্-টিক্-টিক্...পেণ্ডুলাম দোলাতে থাকবে। সময় পড়ে থাকবে পাঁচ মিনিট পিছিয়ে। অথচ হাত-ঘড়ির কাঁটাদুটো বারোটার ঘরে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়বে। পরমেশ সেন তখন টান টান হয়ে শুয়ে পড়েছেন, চাদরটা মাথা পর্যন্ত টেনে দিয়েছেন। ঘুম আসছে দু-চোখ জুড়ে। দেওয়াল-ঘড়িটা তখনও খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে সময়ের হাত ধরে চলছে। ঘাতকদের দল সে-ঘুম ভাঙাতে পারবে না।

এখন দারুণ আফসোস হচ্ছে। কেন যে হাত-ঘড়িটার ওপরে এতটা নির্ভর করে-ছিলেন? অথচ হাতঘড়িটা যে মাঝে মাঝে সময়ের আগা-পিছু হয়ে যায় এ তো তাঁর নিশ্চিত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা।

আর যখন তিনি নিখুঁত যোগ-বিয়োগের হিসাব করে দেওয়াল-ঘড়িটাতে রাত বারোটার ঘণ্টা বাজতে আরও দশ মিনিট দেরী আছে—এই নিশ্চিত সম্ভাবনায় ধূমপানের শেষ ইচ্ছাটা মিটিয়ে নিতে চাই-ছিলেন—বুঝতে পারেননি রেডিওর সময় দেখে যে হাতঘড়িটাকে সকালবেলাতেই পাঁচ মিনিট ফাস্ট করে রেখেছেন, সেটা সারাদিনে একটু একটু করে পিছিয়ে দশ মিনিট স্লো হয়ে গিয়েছে। আর ঠিক সেই মুহূর্তে দেওয়াল-ঘড়ির ঘণ্টার শব্দ হৃৎপিণ্ডের মধ্যে দারুণ জোরে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে দিল।

তাহলে মৃত্যুটা এখন আর হাতের মধ্যে রইল না। দেওয়াল-ঘড়িটার মুখ থেকেই ঘাতকদের আগমন ঘোষিত হল। আর পরমেশ সেন নামে এক পরাজিত ঘোড়-সওয়ারকে এখন ঘাতকদের হাত ধরেই বধ্যভূমির দিকে হেঁটে যেতে হবে।

কত বয়স হল দেওয়াল-ঘড়িটার? পরমেশ সেনই তো প্রায় একুশ বছর ধরে ঘড়িটার সঙ্গে হার-জিতের খেলা খেলছেন। আর উনচল্লিশে যুদ্ধের বছরে যখন পার্ক স্ট্রীটের এক অকশান হাউস থেকে ঘড়িটা কিনেছিলেন, তখনই ওটার সারা দেহে চাঁদের মা বুড়ীর হিজিবিজি মুখ আঁকা। একুশ বছর ধরে এই জরাগ্রস্ত, প্রাচীন বৃদ্ধটি সময়কে সতর্ক প্রহরীর মত পাহারা দিয়েছে আর পরমেশ সেন যতই দুরন্ত গতিতে ঘোড়া ছুটিয়ে সময়ের আগে আগে এগিয়ে গিয়েছেন—এই বৃদ্ধটি দম নিয়ে থেমে থেমে নিয়মিত ঘণ্টা বাজিয়ে বাজিয়ে তাঁকে সাবধান করে দিয়েছে।

কিন্তু কে শুনেছে বৃদ্ধ প্রহরীর সেই সাবধান-বাণী? পরমেশ সেন তখন দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়েছেন।

উনিশশো [illegible] পরমেশ সেন। [illegible] কন্ট্রাক্টের দিকে হাত বাড়াবার কথা ছিল না পরমেশ সেনের। [illegible] কন্ট্রাক্টের [illegible] নিয়ে [illegible] কোম্পানির [illegible] অফিসারদের পিছু পিছু ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। অথচ [illegible] কিন্তু [illegible] পরমেশ সেনই [illegible] সাহেবদের [illegible] গেলেন। [illegible] এদিক-ওদিক [illegible] পারে না। [illegible]

নন্দিতা। হ্যাঁ নন্দিতাই তার নাম—পরমেশ সেনের হাতে সংসারের চাবিটা তুলে দিল।

নন্দিতা তাঁর কাছে কিছুই চায়নি। ভারী ভারী সোনার গহনা দামী শাড়ি সবই তার ছিল। শুধু যেন কিছুদিন পরমেশ সেনের শরীরটাকে সে চেয়েছিল। ভোরের দিকে ক্ষুধার্ত বাঘিনীর মত পরমেশ সেনের হাড়-মাংস ছিঁড়ে খুঁড়ে শরীরটাকে চাটতে থাকত।

কিন্তু [illegible] কোম্পানির [illegible] কন্ট্রাক্ট-এর ব্যাপারটা পরমেশ সেনের একেবারে [illegible] হয়ে গেল। নন্দিতাই দুহাতে টান মেরে মেরে পরমেশের হাতের মুঠোয় তুলে দিত লাখ লাখ টাকার [illegible] কন্ট্রাক্ট। সেই নন্দিতা [illegible] বিলাতী ডাইনিং সেটের বায়না ধরেছিল।

বেনারসী শাড়ী
ইণ্ডিয়ান সিল্ক হাউস
কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা

কিন্তু জিদ ধরেছিল—পরমেশ সেনকে দাম নিতেই হবে।

পরমেশ সেন অকস্মাৎ দমে গিয়েছিলেন বিলাতী ডাইনিং সেটের ভাবনা নিয়ে। কিন্তু একটা পুরোনো দেওয়াল-ঘড়ি তাঁর মাথার মধ্যে কেমন যেন সব গোলমাল করে দিল। বিবর্ণ, পালিশ্‌-ওঠা ঘুণ-ধরা ঘড়িটা কিন্তু টক্‌-টক্‌-টক্‌ চলছে—দুটো কাঁটাতেই নির্ভুল সময়ের নির্দেশ। ঘড়িটার গায়ে প্যারিসের কোন অভিজাত দোকানের নাম খোদাই করা ছিল।

পরমেশ সেনের চোখের ওপরে কোন এক প্রাচীন রাজবাড়ীর বিশাল হলঘরের ছবি ভেসে উঠেছিল। সেরকম কোন হল-ঘর তিনি আদৌ দেখেছেন কিনা বুঝতে পারছিলেন না। কিন্তু স্মৃতিতে কোন অস্পষ্টতা ছিল না।

টানা লম্বা প্রশস্ত হলঘর, উঁচু ছাদ থেকে সোনালী শিকলে ঝোলানো ঝাড়-বাতিগুলোর গায়ে লাল-নীল-আলোর রঙ ঝলমল করছে। শ্বেতপাথরের ঠান্ডা মেঝে, মাঝ-বরাবর নরম কার্পেট বিছানো গোলাপ-ফুলের মত টকটকে লাল রঙ—হাঁটতে গেলে পা ডুবে যায়। চারপাশের দেওয়ালে ফ্রেস্কো। ওপর দেওয়ালে সার সার সোনালী ফ্রেমে বাঁধানো পাগড়ি-মাথা, পাকানো মোম-পালিশ গোঁফ, চোস্ত চাপকান-পরা রাজবংশের কীর্তিমান পুরুষদের বড় বড় লাইফ-সাইজ তৈলচিত্র।

আর মাঝ-দেওয়ালে খুব বড় একটা দেওয়াল-ঘড়ি, মসৃণ মেহগনি কাঠের বডিতে সোনালী জলের সূক্ষ্ম কাজ, পেন্ডুলামটা এপাশ-ওপাশ দুলতে দুলতে ঝাড়-বাতি-গুলোর লাল-নীল আলোয় ঝকমক করে জ্বলে উঠছে আর হঠাৎ গম্ভীর ঘন্টাধ্বনিতে ঝাড়-বাতিগুলোর রিনিরিনি, ঝুন্‌-ঝুন্‌ শব্দকে ডুবিয়ে দিচ্ছে।

পরমেশ সেন আর কিছু না ভেবেই নীলামের ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন। আশ-পাশে ক্রেতা ছিল না। মাত্র দশ টাকায় ঘড়িটা পেয়ে গিয়েছিলেন।

পরমেশ সেন নিজেও বোধহয় তখন রাজা হওয়ার স্বপ্ন দেখছিলেন। অসম্ভব দুরন্ত বেগে ছুটিয়ে দিয়েছিলেন সাফল্যের ঘোড়াটাকে।

বছর-পাঁচেকের মধ্যেই শুধু রাজা নয়, সম্রাট বনে গিয়েছিলেন পরমেশ সেন। যুদ্ধের এলাকা যত এগিয়ে গিয়েছে—পরমেশ সেনের শিল্প-সাম্রাজ্যের সীমাও দ্রুত চারপাশে ছড়িয়ে পড়েছে।

কন্ট্রাক্টে কন্ট্রাক্টে ছয়লাপ। নবনীতার মুঠোভর্তি কোমর ছাড়িয়ে পরমেশ সেনের হাত তখন অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েছে। মাল সাপ্লাই দিতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছিলেন। কারখানাটাকে যতই বড় করছেন, মনে হয়েছে—নাঃ, সাপ্লাই শর্ট হয়ে যাচ্ছে—আরও বড়ানো দরকার।

যুদ্ধ শেষ হওয়ার আগেই দু' মাইল এলাকা জুড়ে বিশাল কারখানা। অফিস, স্টাফ-কোয়ার্টার—এক বিশাল শিল্প-সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি পরমেশ সেন টগবগিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়েছেন দুরন্ত গতিতে।

না, সুষমা তখনও রানী হয়ে তাঁর রাজপ্রাসাদে আসেনি। সুষমা—সুষি—সু... আপন মনেই বিড়বিড় করে উঠলেন পরমেশ সেন। সুষমা, তোমাকে তো রানীর মত করেই ঘরে এনেছিলাম। বিশ্বাস কর তোমার মৃত্যু আমি চাইনি। কিন্তু তুমি কেন আমাকে থামিয়ে দিতে চাইলে? ঘোড়াটা যে তখন টগবগিয়ে ছুটছে। হঠাৎ লাগাম টেনে ধরলে যে নিজেই মুখ থুবড়ে পড়তাম।

পরমেশ সেনের মনে হল—জিব, গলা, ঠোঁট সব শুকিয়ে খট্‌খট্‌ করছে। জল চাই। পুরো এক গ্লাস ঠান্ডা জল। বেড-সাইড টেবিলের ওপরেই জলের গ্লাস। সহজেই হাতটা গ্লাসের দিকে এগিয়ে গেল। ঢক ঢক করে পুরো গ্লাসটাই গলায় ঢেলে দিলেন।

আঃ বাঁচলাম—বুকের বাঁ দিকে হৃৎ-পিন্ডের ওপরে আস্তে আস্তে হাত বুলাতে লাগলেন পরমেশ সেন।

ভয়টা আবার কোথায় যেন ঘাপটি মেরে লুকিয়ে পড়েছে। হাত-পাগুলো সহজেই নড়াচড়া করা যাচ্ছে। হৃৎপিন্ডটা স্বাভাবিক গতিতে ধুকপুক ধুকপুক নড়ছে।

ফাঁড়াটা বুঝি শেষপর্যন্ত আর এলোই না। কিন্তু বেঁচে থেকেই বা কি লাভ? আর তো রাজা হয়ে বাঁচতে পারবেন না পরমেশ সেন। রাজা যে নিজের হাতেই রাজত্ব ঐশ্বর্য সব বিলিয়ে দিয়েছেন।

এত বড় রাজ্য কিন্তু বিলিয়ে দিতে কিই বা সময় লাগল? একটা পুরো দিন বৈ তো নয়।

অথচ রাজা হয়ে বেঁচে থাকার জন্য কি না করেছেন পরমেশ সেন। এমনকি সুষমা নামে কাঁচ কলাপাতার রঙের কিশোরী মেয়েটি—যাকে তিনি রানী করে ঘরে এনেছিলেন—সেই বড় সাধের রানীর হাঁসের মত দীর্ঘ, পুষ্ট, নরম নধর গলাটাতে আঙুলগুলোকে একটু একটু করে চেপে বসিয়ে দিতে গিয়ে হাতদুটো একবারও কেঁপে ওঠেনি। লোভ! লোভ যাবে কোথায়? সাম্রাজ্য বিস্তারের দারুণ লোভে রানীকেও খুব ধারালো একটা অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন পরমেশ সেন।

রানী কিন্তু রাজাকেই আঁকড়ে ধরেই বাঁচতে চেয়েছিল। দৈত্যের মত মিলিটারী অফিসারটার হাতের থাবায় ধারালো দাঁতের কামড় বসিয়ে দিয়ে ছুটে ঘর থেকে বার হয়ে এসেছিল। সুষমার দু' চোখে তখন কি দারুণ ঘৃণা। কিন্তু উপায় ছিল না পরমেশ সেনের। আর এক রাজার সঙ্গে তখন যুদ্ধ চলছে। রায় বোস অ্যান্ড কোম্পানি তাঁর হাত থেকে দশ লাখ টাকার একটা মিলিটারী কন্ট্রাক্ট ছিনিয়ে নিয়েছিল। পরমেশ তখন মরিয়া। অফিসারটাকে খুব খাইয়েও কাবু করতে পারেননি। রায় বোসের সাকসেসের সিক্রেটটা ধরতে বেশী দেরী হয়নি পরমেশ সেনের। বাজারের মেয়েছেলেতে অফিসারটার যে মোটেই লোভ নেই—এ-খবরটাও তাঁর অজানা ছিল না। শেষপর্যন্ত সুষমাকেই কাজে লাগাতে হল। কিন্তু সুষমা তাঁর কথা শোনেনি। যুদ্ধে হেরে যাচ্ছিলেন পরমেশ সেন। ছুটন্ত ঘোড়াটাকে থামিয়ে দিতে চেয়েছিল সুষমা। অতএব সুষমাকে শাস্তি পেতে হল। রাজা নিজের হাতেই রানীকে ফাঁসি দিলেন।

অথচ সুষমাকে তো একদিন রানীর মত করেই ঘরে এনেছিলেন পরমেশ সেন। জ্যোৎস্না রাতে রাজা আর রানীর সেই বাঘ-হরিণীর আশ্চর্য ভালবাসার খেলাও তো মিথ্যা ছিল না।

পরমেশ সেনের সাম্রাজ্যের সীমা তখন দু' মাইল বিস্তৃত। এক বিরাট রাজপ্রাসাদ গড়ে তুলেছিলেন পরমেশ সেন। দু' বিঘা জমির ওপরে সেই বিরাট প্রাসাদ প্রচণ্ড দম্ভে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল। ভোরের প্রথম সূর্যের আলো সোনার মুকুটের মত ঝকঝক করে জ্বলত সেই রাজপ্রাসাদের মাথায়। উঁচু প্রাচীর-ঘেরা কম্পাউন্ডের চারপাশে সার সার ইউক্যালিপটাস, পাম আর ঝাউগাছগুলোর মাথায় মাথায় শন্‌-শন্‌ বাতাসের শব্দ উঠত।

পরমেশ সেনের রাজবাড়ীতে অনেক বাতাস ঘরে ঘরে হা-হা করে খেলে বেড়াত। কিন্তু সে-বাতাসে সৌরভ ছিল না। রাত যখন গভীর হত, ঘরে-ঘরে অন্ধকার ঘন হয়ে উঠত, ঝাউ-পাম আর ইউক্যালিপ্‌-টাসের মাথাগুলো অন্ধকারের ডানার নীচে ঘুমিয়ে পড়ত—পরমেশ সেন নামে এক নিঃসঙ্গ রাজা অন্ধকারেই হেঁটে বেড়াত আর নিঃশ্বাস টেনে টেনে বাতাসে রানীর অদৃশ্য শরীরের সৌরভ খুঁজত।

তারপর সুষমাকেই রানী করে ঘরে নিয়ে এলেন পরমেশ সেন। নোতুন-বৌ-এর হাত ধরে তর্‌-তর্‌ করে ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে ছাদের ওপরে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। সুষমার মাথা থেকে ঘোমটা খসে পড়েছিল। বুকের আঁচল মাটিতে লুটিয়ে পড়ে পায়ে পায়ে জড়িয়ে গিয়েছিল। পরিশ্রমে, উত্তেজনায় দারুণ হাঁপাচ্ছিল সুষমা। কুমারী বুকের ওপরে যেন সাগরের ঢেউ তোলপাড় করছিল। কাঁচ কলাপাতার শরীরে জ্যোৎস্নার রং মাখামাখি। কপালে, গালে, নাকের পাটায় বিন্দু বিন্দু ঘাম পোখরাজের দানা হয়ে জ্বলছিল।

পরমেশ সেন প্রসারিত দুই হাত ওপরে তুলে চাঁদটাকে টেনে হিঁচড়ে নামিয়ে সুষমার মাথায় মুকুটের মত বসিয়ে দিতে চেয়েছিলেন।

কিন্তু চাঁদ আকাশেই ছিল। আর পরমেশ সেনের বুকের নীচে অপরিসর অন্ধকারের ছায়ায় ঢাকা চাঁদের রঙ মাখানো এক আশ্চর্য স্নিগ্ধ কাঁচ কলাপাতার শরীরে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে গিয়েছিল।

পরমেশ সেনের রাজপ্রাসাদের বিশাল, প্রশস্ত ছাদটা ফুলের বাগান হয়ে গিয়েছিল। টবের ফুলের সে-এক আশ্চর্য

পুষ্পোদ্যান। জ্যোৎস্না রাতে রাজা আর রানী হাত ধরাধরি করে ঘুরে বেড়াত সেই ফুলের বাগানে। রাজা তার রাজ্যজয়ের গল্প শোনাত, রানী চুপ করে শুনত সেই কাহিনী।

রাত যখন আরও গভীর হত—জ্যোৎস্নার রুপালী আলোয় ফুলের গন্ধ ভেসে উঠত—রাজা আর রানী পুষ্পোদ্যানেই ফুলশয্যা পাতত। সারা দেহে ফুলের রেণু মেখে মেখে সে এক আশ্চর্য ভালবাসার খেলা। এত বড় সম্রাট পরমেশ সেন—মাঝে মাঝেই খেলায় হেরে যেতেন। সুরমার সে কি খিলখিল হাসি।

হেরে গিয়ে আরও দুর্দম, আরও দুর্দান্ত হয়ে উঠতেন পরমেশ সেন। সুরমা কিন্তু চঞ্চলা হরিণীর মত ছোট ছোট পায়ে ছুটে ছুটে পরমেশ সেনের বুকে হাঁপ ধরিয়ে দিত।

শেষ পর্যন্ত হরিণীকেই ধরা দিতে হত। সুরমাকে বুকের নীচে ফেলে বাঘের মত থাবা উঁচিয়ে থাকতেন পরমেশ সেন। হরিণীর নরম শরীরটাকে নিয়ে খেলা করতে করতে মাংস-ভক্ষণ করত এক হিংস্র বাঘ।

সুরমার দু-চোখ জলে ভরে যেত কিন্তু ঠোঁটের কোণে চাপা হাসি ফুটে উঠত। পরমেশ সেনের বুকের ওপরে ঝুঁকে একটু দুষ্টু স্বরে বলত—তুমি সত্যিই একটা বাঘ। হাড়-মাংস চিবিয়ে খাও।

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন.
লিনটাস- L 310-86

থাকছ, আর আমি কোনদিন ফিরতে চাই না।

বাড়ীটাকে সত্যিই রাজপ্রাসাদের মত করে সাজিয়েছিলেন পরমেশ সেন। সারা বাড়ীতে এক আশ্চর্য রাজকীয় গাম্ভীর্য থমথম করত। আর রাজবাড়ীর মতই টানা লম্বা প্রকাণ্ড হলঘরটাতে আজও ঝুম্-ঝুম্ ঝুন্‌ঝুন্ ঝাড়বাতিগুলো বাতাসে দোল খায়। তাদের গায়ে লাল-নীল আলোর রঙ দেওয়াল জুড়ে সার সার টাঙানো পরমেশ সেনের লাইফ-সাইজ তৈলচিত্রগুলোর গায়ে প্রতিফলিত হয়ে রাজকীয় গাম্ভীর্যের মহিমা-মণ্ডিত রূপ ফুটিয়ে তোলে।

ঘরে ঘরে কত সুদৃশ্য হাল-ফ্যাশনের দেওয়াল-ঘড়ি মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। সে সব ঘড়িতে কোনদিন ঘণ্টা বাজেনি। পরমেশ সেন ইচ্ছা করেই আর কোন ঘণ্টা-বাজা দেওয়াল ঘড়ি কেনেন নি।

শুধু হলঘরের মাঝ-দেওয়ালে প্রাগৈতিহাসিক এক বৃদ্ধের মত সময়ের সতর্ক প্রহরায় জেগে আছে এক জরাজীর্ণ, বিবর্ণ দেওয়াল-ঘড়ি। রাজা হয়ে যাওয়ার পর পরমেশ সেন অতীতকে একেবারে মুছে দিয়েছিলেন। শুধু অকশান সপ থেকে কেনা সেই প্রাচীন ঘড়িটাকে কাছছাড়া করেননি। হলঘরের মাঝ-দেওয়ালে নিজের হাতে পেরেক ঠুকে ঠুকে দেওয়াল ঘড়িটাকে বসিয়ে দিয়েছিলেন। সেই বিশাল রাজকীয় হলঘরের অজস্র সমারোহের মাঝে প্রাচীন বিবর্ণ, পালিশের রঙ-চটা দেওয়াল-ঘড়িটাকে বেমানান লাগে বৈকি। কিন্তু সুবমার অনুযোগে কান দেননি পরমেশ সেন। জীবনে সবকিছু মনমতসই করে সাজাতে গেলে তো পরমেশ সেন নামে এক প্রায়-বৃদ্ধ ধণধণে কোলাব্যাঙকে আজই নিজের বাড়ী ছেড়ে চলে যেতে হয়।

কোলা-ব্যাঙ—কথাটা মনে পড়তেই পরমেশ সেনের পেটের মধ্যে গুড়গুড়িয়ে হাসি উঠল।

কোলাব্যাঙ। বেশ মজার নাম। পেটে ভাত না জুটলে কি হয় রসবোধ আছে সেবারওয়ালগুলোর।

গতবার ধর্মঘটের সময় পরমেশ সেনের বাড়ী আর কারখানার দেওয়ালে কত যে সব পোস্টার সেঁটেছিল ওরা।

কোলাব্যাঙ পরমেশের ভুঁড়ি ফাঁসিয়ে দাও।

পেট-মোটা পরমেশের গোঁফের ঝাটায় আগুন ধরিয়ে দাও ইত্যাদি ইত্যাদি সব মজার পোস্টারে ছেয়ে দিয়েছিল কারখানা আর বাড়ীর দেওয়াল।

একবার স্টাইকের হুজুগ উঠলে হয়—সব একাকাটা। গতবার স্টাইকের সময় ছোকরাগুলো কি কম ভুগিয়েছে? ছেলে-বৌ-এর পেটের চামড়া শুকিয়ে ঝুলে পড়েছে। খালি পেটে পথে পথে কোটা ঝাকিয়ে চাঁদা তুলেছে। কিন্তু মিছিলের আওয়াজে একটুও ভাটা পড়ে নি।

এক মাস সতের দিন কারখানার চিমনিতে ধোঁয়া ওঠেনি। স্টাইক ভাঙার অনেক চেষ্টা করেছিলেন পরমেশ সেন। বেশ কিছু দালালও জুটিয়ে ফেলেছিলেন। কিন্তু ইউনিয়নের চাঁই গদাপ্রসাদ খুন হয়ে গেল। কারা যেন ধারালো অস্ত্র দিয়ে হাত দুটোকে কাঁধ থেকে নামিয়ে দিয়েছিল।

উঃ, কি বীভৎস মৃত্যু। শিউরে উঠলেন পরমেশ সেন। ভয়টা বুকের মধ্যে আবার সিরসির করে উঠল।

সেবারওয়ালগুলো মারাত্মক সব অস্ত্রশস্ত্র হাতে নিয়ে তাঁর বাড়ী পর্যন্ত ছুটে এসেছিল। আর কি সাংঘাতিক সব স্লোগান—মার কা বদলা মার। খুন কা বদলা খুন। কোলাব্যাঙ পরমেশের রক্ত চাই। শালা পরমেশের ভুঁড়ি ফাঁসিয়ে দাও।

কিন্তু পরমেশ সেনকে পাবে কোথায়? পাখি তখন শূন্যে উড়ে গিয়েছে। কারখানার গেটে লক-আউটের নোটিশ ঝুলিয়ে দিয়ে বি-ও-এ-সির প্লেনে চড়ে বসেছিলেন পরমেশ সেন।

অথচ সেদিনও বাড়ী থেকে বেরোবার আগে দেওয়াল-ঘড়িটা থেমে থেমে দম নিয়ে নিয়ে ঘণ্টা বাজিয়ে বাজিয়ে পরমেশ সেনকে অনিবার্য পরাজয়ের লজ্জার ঝাঁঝিয়ে দিতে চেয়েছিল—পরমেশ সেন, তুমি হেরে যাচ্ছ। সময় তোমাকে হারিয়ে দিচ্ছে। তোমার সাম্রাজ্যে ফাটল ধরিয়ে দিয়েছে সময়ের স্রোত। তোমার ঘোড়ার মুখে গাঁজলা উঠেছে। এবার তোমার ঘোড়াটা মুখ থুবড়ে পড়বেই।

কি লজ্জা। পরমেশ সেন এত সহজে হেরে যাবেন নাকি? তাঁর হাতে শক্ত চামড়ার চাবুক আছে। দুহাতের প্রচণ্ড শক্তি দিয়ে এখনও লাগামটা ধরে আছেন। ঘোড়াটা দু-পা সামনে তুলে চিঁহি চিঁহি করে ডাকছে। শুধু চাবুক মারার অপেক্ষা। ঘোড়া ছুটবে—দুরন্ত, দুর্বার গতিতে সময়কে পিছনে ফেলে ছুটে চলবে। ছুটন্ত ঘোড়ার খুরের ধুলোয় সময়ের পথ অন্ধকার হয়ে যাবে। ছুটতে ছুটতে ঘোড়ার মুখে গাঁজলা উঠবে। দু-কষ বেয়ে সাদা ফেনা গড়িয়ে পড়বে। কিন্তু ঘোড়া ছুটবে—খপ্-খপ্-খপ্—চিহপ-চিহপ-চিহপ।

পরমেশ সেন দু-হাত দিয়ে কান দুটো চেপে ধরে লাফিয়ে উঠে বসেছিলেন।

সেই পরমেশ সেন—ঘোড়ার খুরে খুরে শব্দ তুলে, দিগ্বিদিক অন্ধকার করে যিনি সময়ের আগে আগে সারাজীবন ছুটে চলেছেন, হলঘরের মাঝ-দেওয়ালে এক বৃদ্ধকে সযত্নে পালন করে একুশ বছর ধরে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়েছেন আর হার-জিতের এক মানুষ মজার খেলা খেলেছেন—আজ তাকে একেবারেই হেরে যেতে হল।

ঠক্...ঠক্...ঠক্—দরজায় কেউ যেন খুব সন্তর্পণে আঙুলের টোকা দিচ্ছে না? পরমেশ সেনের কান দুটো খাড়া হয়ে উঠল।

তাহলে ঘাতকরা এসেই গেল। হৃৎ-পিণ্ডটা যে আবার লাফ দিতে শুরু করল। ভয়টা যে আবার সিরসির করে শিরদাঁড়া বেয়ে নামছে। এখন কি করবেন? নিজের হাতেই দরজার পাল্লা দুটো খুলে দিয়ে ঘাতকদের আমন্ত্রণ জানাবেন নাকি?

মৃত্যুটা যদি ঘাতকদের হাতেই সংঘটিত হয় তো কেমন হবে সেই মৃত্যু?

একটু একটু করে যন্ত্রণা দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মারবে নাকি ওরা? কিংবা খুব ধারালো একটা তলোয়ারের কোপ মেরে তাঁর দেহটাকে খণ্ড খণ্ড করে ঘরের চারপাশে ছুঁড়ে দেবে নাকি? অথবা এমনও হতে পারে—ওদের কেউ একজন দুহাত দিয়ে গলাটা চেপে ধরে একটু একটু করে আঙুলগুলো বসিয়ে দেবে। সুবমার মুখটা যেমন যন্ত্রণায় লাল হয়ে গিয়েছিল—চোখের মণি-দুটো ঠেলে বেরিয়ে এসেছিল, সদ্য রক্তের দাগ দু গাল বেয়ে চুঁইয়ে পড়েছিল—সেই ভয়ংকর, বীভৎস এক মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তিনি নিজেকে রাজকীয় গাম্ভীর্যে অবিচল রাখতে পারবেন তো?

আরও একটি বিকল্প ব্যবস্থার কথাও মনে পড়ছে। কাল রাতে যে রাজকীয় মৃত্যুর দৃশ্যটি তাঁকে বারংবার ঘুম থেকে জাগিয়ে দিয়েছিল—ঘাতকদের কাছে সেই রাজকীয় মৃত্যুর মহিমা ভিক্ষা করলে কেমন হয়?

কিন্তু সমস্যা থেকেই যায়। রাজা ভিক্ষা চাইলে তো আর রাজাই থাকে না। ভিক্ষুক তো রাজকীয় মৃত্যুর অধিকারী হতে পারে না।

কাল রাতে স্বপ্নটা কিন্তু দারুণ জমজমাট ছিল।

সবুজ তৃণাচ্ছাদিত মাঠটায় সাদা জোৎস্না ধু ধু করছিল। মাঠের মাঝখানে ফাঁসির মঞ্চ। মঞ্চের মাথায় লাল-নীল পতাকাগুলো জোর বাতাসে পত্‌পত্ করে উড়ছিল। দড়ির ফাঁসটা এদিক-ওদিক দোল খাচ্ছিল। মঞ্চের দুপাশে উষ্ণীষ-মাথা-প্রহরীর দল লাইনে বেঁধে অ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল—কোমরে-বাঁধা খোলা তরবারির রুপোর বাঁট হাতে ছুঁয়ে। লাল ভেলভেটের ইউনিফর্ম-পরা ব্যাণ্ড-বাদকের দল মাঠের চারপাশে ঘুরে ঘুরে মার্চ করছিল। সামনে দলের নেতা খুব জোরে জোরে কাঁধ নাচিয়ে লেফট রাইট লেফট রাইট করে হাঁটছিল আর দুহাতে বর্শার মত একটা রুপোর লাঠি ঝন্ ঝন্ করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কসরৎ দেখাচ্ছিল। ব্যাগ-পাইপে মন্থর ঢিমে-লয়ের সুর বাজছিল। বোধহয় কোন বিদায়-সঙ্গীতের সুর। ব্যাণ্ড-বাদকের দল থেমে থেমে সেই সুরের সঙ্গে তাল দিচ্ছিল। পরমেশ সেনকে রাজার মত দেখাচ্ছিল। লাল মখমলের পোশাকে সোনালী জরীর নক্‌সা। মাথার চুল কিংবা শরীর থেকে খুব চড়া আতরের গন্ধ উঠছিল। বাতাসে অনেকদূর পর্যন্ত সৌরভ ছড়িয়ে পড়েছিল। রাজা মাথা উঁচু করে মন্থর পায়ে মঞ্চের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। পাশে পাশে মস্ত-মস্ত একটা সাদা ঘোড়ার লাগাম ধরে হাঁটছিল দুজন প্রহরী। ঘোড়ার পিঠে লাল ভেলভেটের গদী ছিল। মাথায় লাল সিল্কের ওড়না। ঘোড়াটা

হ্যাঁ, 'এভারেডী'
হলেই নিশ্চিন্ত

১ টাকা ১০ পঃ
কর আলাদা

পুরো ভরসা রেখে আপনার ট্র্যানজিস্টারে লাগিয়ে নিন

এভারেডী
নং ১০৫০

ট্র্যানজিস্টারকে ক্ষয়ক্ষতি থেকে বাঁচিয়ে শক্তি যোগানোর জন্যে বিশেষভাবে তৈরী রাউণ্ড ব্যাটারী

* বহুক্ষণ ধরে চালু রাখার একটানা শক্তি যোগায়।
* যন্ত্রপাতির ক্ষতি নিরোধ করাই এর বিশেষত্ব।
* এই ব্যাটারী লাগিয়ে বরাবর পরিষ্কার ও নিখুঁত আওয়াজ পাবেন।
* যেমন এর কর্মকুশলতা তেমনি দীর্ঘ এর স্থায়িত্ব।

এভারেডী নং ১০৫০ লাগিয়ে আপনার ট্র্যানজিস্টার থেকে সবচেয়ে সুন্দর কাজ পাবেন।

সমস্ত রকম ট্র্যানজিস্টারের জন্যই পাবেন 'এভারেডী' ব্যাটারী।

UC 5171

রাস্তার পাশে পাশে মন্থর-পায়ে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ খুব জোরে মাথা ঝাঁকালেন।

রাজা ফাঁসির মঞ্চের সামনে এসে থেমে দাঁড়িয়ে পড়ল। দু-পাশে লাইন বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকা প্রহরীর দল খট্-খট্ জুতোর শব্দ তুলে রাজাকে স্যালুট দিল। ব্যান্ডের বাজনা দ্রুত হল। জোরে জোরে কাড়াতে ঘা পড়তে লাগল। ব্যাগ-পাইপে খুব দুঃখের দুঃখের সুর বাজছিল। ব্যাগ-পাইপের সুর খুব দ্রুত হতে হতে এক সময় হঠাৎ থেমে গেল। বাদকের দল দু-পাশে হাত নামিয়ে লাইন বেঁধে দাঁড়িয়ে পড়ল। তার পরেই বিউগিলের তীব্র, তীক্ষ্ণ আওয়াজ মাঠের সারা জোছনাকে কাঁপিয়ে যন্ত্রণার এক বিলাপের মত বিলম্বিত লয়ে ওঠানামা করতে লাগল।

লাল কাপড়ে মুখ-ঢাকা হ্যাংম্যান রাজাকে মঞ্চের ওপরে দাঁড় করিয়ে দিল। রাজা কিন্তু তখনও ভয় পাননি। নিজের হাতেই দড়ির ফাঁসটার মধ্যে মাথাটা গলিয়ে দিয়েছিলেন।

পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত লোটানো কালো আলখাল্লা পরা, এক বৃদ্ধ ডান হাতটা মাথার ওপরে তুলে আকাশের দিকে আঙুল দেখিয়ে মঞ্চের পাশেই দাঁড়িয়েছিল। মাঠের বুকে শুধু বাতাসের সোঁ-সোঁ শব্দ শোনা যাচ্ছিল। বৃদ্ধের মাথায় একরাশ সাদা চুল এলোমেলো উড়ছিল।

রাজা নিজের ফাঁসটাকে গলায় জড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

কিন্তু সেই বৃদ্ধ হাতটা নামিয়ে দিতেই উঃ...পরমেশ সেনের শিরদাঁড়া বেয়ে দ্রুত একটা হিমের প্রবাহ নেমে গেল। হৃৎপিণ্ডটা ধক্-ধক্ করে লাফাতে লাগল। চোখ দুটো বন্ধ করে ফেললেন পরমেশ সেন।

কাল রাতে যে কি দারুণ ভয় পেয়ে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। সারা দেহে গল-গল করে ঘাম ঝরছিল। বালিশ, চাদর—সব ভিজে একশেষ।

দরজায় ঠক-ঠক—ঠক্ করাঘাতের শব্দটা থেমে গেল নাকি?

পরমেশ সেন দরজার পাল্লায় কান পাতলেন। নাঃ, এখন আর কোন শব্দ নেই। কিন্তু শব্দটা তো তিনি স্পষ্টই শুনেছেন। কে জানে হয়তো ঘাতকের দল দরজার গোড়ায় এসে ফিরে গেল। হয়তো তাঁকে ভয় দেখিয়ে খুব একটা মজার রসিকতা করল। কিংবা আজও হয়তো শব্দের প্রতারণার শিকার হলেন পরমেশ সেন। রোজই তো অনেক ভৌতিক শব্দ তাঁকে প্রতারিত করে। অফিসে তাঁর সম্পূর্ণ নিজস্ব এয়ারকন্ডিশনড্ অফিসঘরের মধ্যে যেখানে বাইরের জগতের আলো কিংবা শব্দের প্রবেশ নিষিদ্ধ—মাঝে মাঝেই হঠাৎ নিহতের চীৎকার শুনে চমকে ওঠেন পরমেশ সেন। রাতের বেলা বেডরুমের সুইচটা টিপে দিয়ে অন্ধকারেই যখন জেগে থাকেন নির্বাণ, দুরন্ত ঘুমের প্রতীক্ষায় হঠাৎ সড়-সড় খস-খস সব ভৌতিক শব্দে ঘরের মধ্যে ভয় ধরে। সাইকিয়াট্রিস্ট মিঃ সেন কি যেন সব ব্যাখ্যা দেন—হাঁ মনে পড়েছে—হ্যালুসিনেশন—পরমেশ সেন হ্যালুসিনেশনে ভুগছেন।

হয়তো দরজায় ঠক-ঠক, খট-খট শব্দগুলো বোধহয় মনের ভুল—হ্যালুসিনেশন।

কিন্তু এখন যে বাতাসে শন্‌শন্, সোঁ সোঁ শব্দ উঠছে—তাও কি মনের ভুল না কি?

হঠাৎ এক ঝলক জোর বাতাস পরমেশ সেনের গায়ের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। পাশেই কোন ঘরে দড়াম দড়াম শব্দে দরজার পাল্লার ঠোকাঠুকি হল। নাঃ, এবার আর শব্দ শুনতে ভুল করেননি পরমেশ সেন। বাইরে নিশ্চয়ই জোরে বাতাস উঠেছে। ইউক্যালিপটাস আর পাম গাছগুলো মাথায় মাথায় ঠোকাঠুকি করছে। পশ্চিমের জানালাটা বন্ধ করে দেওয়াই সুবিবেচনার কাজ। যতক্ষণ জীবন আছে—শারীরিক কষ্টগুলোকে দূরে সরিয়ে রাখাই ভাল।

পরমেশ সেন জানালার সামনে দাঁড়ালেন। সঙ্গে সঙ্গে চোখদুটোকে বন্ধ করে ফেলতে হল। জোর ঘূর্ণী হাওয়ার সঙ্গে ধুলোর ঝাপটা এসে দু-চোখে বিঁধে গিয়েছিল। চোখ না খুলেই পাল্লা-দুটো ঠেলে বন্ধ করে দিলেন। চোখ খুলতেই দেখলেন মেঝের ওপর কতকগুলো শুকনো পাতার সঙ্গে একটা ছেঁড়া কাগজের টুকরো এদিক-ওদিক নড়ে বেড়াচ্ছে। এক লাফে জানালার সামনে থেকে সরে এসে কাগজের টুকরোটা হাতে তুলে নিলেন। ঘাতকদের সেই দারুণ ভয়-ধরানো চিঠিটার মতই হলদেটে খসখসে কাগজ, কি লেখা আছে কাগজটাতে? ঘাতকরাই কি তাঁর মৃত্যুদণ্ড স্থগিত রেখে চিঠি পাঠাল? কাগজের টুকরোটা চোখের সামনে ধরেই হঠাৎ খুব জোরে হেসে উঠলেন। পরমেশ সেন। কোন্ এক এক্স-আর্ট-স্টুডেন্টের উপদেশামৃত। মোক্ষের অমোঘ দাওয়াই বাতলিয়ে অং-বং সংস্কৃত-বাংলার মিশ্রণের বেশ কড়া উপদেশ দিয়েছেন গুরুমহারাজ দত্ত—হে শিষ্যগণ, তোমরা শ্রবণ কর—মানুষ অমৃতের পুত্র। দেহের মৃত্যু আছে। কিন্তু আত্মা অমর। দেহকে কঠিন সংযমের শিকল দিয়ে বেঁধে রাখ, বাসনা-কামনা থেকে মুক্ত হতে হবে। আত্মা শুদ্ধ, নিত্য, শাশ্বত। দেহের বন্ধন থেকে আত্মাকে মুক্ত করে দাও। আত্মানং বিদ্ধি। দেহের মৃত্যু হলেই, মৃত্যুকে ভয় কোরো না।

যত সব প্রলাপ, বাজে ফাঁকিবাজি। মৃত্যুকে নিয়ে রসিকতা করার কত যে সব মজার ব্যাপার আছে সংসারে।

পরমেশ সেন খুব সন্তর্পণে বুকপকেট থেকে বার করলেন ঘাতকদের চিঠিটা। আর, সত্যিই তো, এখন আর ঘাতকদের মৃত্যু তাঁকে ভয় দেখাতে পারছে না। গুরুমহারাজের পরমেশ সেনকেও শিষ্য বানিয়ে ফেললেন নাকি? হৃৎপিণ্ডের গতি এখন বেশ স্বাভাবিক। ধুকপুক, ধুকপুক স্বাভাবিক নিয়মে কাজ করে যাচ্ছে।

ঘাতকদের নির্ধারিত সময়সীমা পেরিয়ে গিয়েছে—রাতে আর কোন হিসাবের গণ্ডগোল নেই। পরমেশ সেনকে ভয় দেখিয়ে গেল একটা জোরদার রসিকতা করল তারা যেন। অথচ পরমেশ সেন সাতদিন আগে চিঠিটা হাতে পেয়ে কি দারুণ সাংঘাতিক একটা ভয়ে কুঁকড়ে গিয়েছিলেন। ওঃ চিঠিটা তাঁকে এমন ভয় দেখিয়েছিল, গতকাল পর্যন্ত এই সাতটা দিন, তাঁকে ক্ষ্যাপা কুকুরের মত তাড়িয়ে বেড়িয়েছে। অথচ পাঁচটা নিরা-নৈর্ব্যক্তিক চিঠির মধ্যে একটা নিরীহ সাদা খাম—তার মধ্যে যে একটা সাংঘাতিক ভয় ওৎ পেতে বসে আছে, পরমেশ সেন বুঝতেই পারেননি। চিঠিটা চোখের সামনে খুলে ধরতেই ভয়টা বুকের ওপরে চড়ে বসে গলাটা কামড়ে ধরেছিল, নিঃশ্বাসটা কেমনরকমে গলা পর্যন্ত ঠেলে উঠে আটকে গিয়েছিল। বছরখানেক আগে একটা মাইল্ড স্ট্রোকের অভিজ্ঞতা আছে। সেই বুকের বাঁ পাশে চাপ-ধরা বেদনা—বাঁ হাতটা ক্রমশঃ অবশ হয়ে আসছে। অবসন্ন দেহটা চেয়ারের গদীতে এলিয়ে পড়েছিল। নিঃশ্বাসটা বুকের খাঁচা থেকে বেরোবার পথ না পেয়ে গলার কাছেই হাঁকুপাকু করছিল।

পরমেশ সেনের মনে হয়েছিল—ওটা চিঠি নয়—তাঁর মৃত্যুদণ্ড পরোয়ানা। একুশ বছর ধরে শ্রমিকদের রক্ত চুষে তাঁর মেদস্ফীত ভারী শরীর আর লালচে মুখে যত রক্ত জমেছে—সব রক্ত টেনে বার করে ফ্যাকাসে রক্তহীন শবদেহটাকে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার দারুণ ভয় ছিল সেই পরোয়ানায়।

পরমেশ সেনের কানের পর্দায় তখন মিছিলের চীৎকার আছড়ে পড়ছিল—সেই শব্দের প্রতারণা মিঃ সেন যাকে হ্যালুসিনেশন বলেন—খুন কা বদলা খুন, খুন কা বদলা খুন। পরমেশ সেনের রক্ত চাই।

তারপর সাতটা দিন শুধু ভয়ংকর ভৌতিক সব শব্দের প্রতারণা তাঁকে দিন-রাত পঙ্গু করেছে। মিঃ সেনের ওষুধের স্টকে যত ট্রাঙ্কুলাইজার আছে সব একে একে পরমেশ সেনের গলায় চালান হচ্ছে, কিন্তু সারাদিন কানের ফাঁকে ফাঁকে শব্দের অবিরাম প্রতারণা চলেছেই। পরমেশ সেন যত শব্দ শুনেছেন—সবই শুধু ঘাতকদের ভয়ংকর উপস্থিতির সম্ভাবনায় হৃৎপিণ্ডের মধ্যে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে দিয়েছে। অনেক রাত পর্যন্ত আলো জেলে বুকের ওপরে হাত চেপে বসে থেকেছেন বিছানায়। বাতিটা নিভিয়ে দিলেই শুধু অন্ধকারে সব ছায়া আর শব্দের হ্যালুসিনেশন, ঘুমিয়ে পড়লে ভয়ংকর সব যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুর স্বপ্ন। কাল রাতেই শুধু এক গম্ভীর রাজকীয় মৃত্যুর স্বপ্ন দেখেছিলেন। সেই স্বপ্নে যন্ত্রণা ছিল না। এবং স্বপ্নের মধ্যেই রাজা হয়ে গিয়েছিলেন ভেবে খুব সুখী মনে হয়েছিল নিজেকে। শুধু শেষ দিকটা সেই কালো আলখাল্লা পরা বৃদ্ধই সব মাটি করে দিল। আকাশের দিকে উঁচু করে তুলে ধরা ডান হাতের আঙুলটা মাটিতে নামিয়ে দিতেই রাজামশাই হঠাৎ ককিয়ে কেঁদে উঠেছিলেন। কিন্তু কান্নাটাকে গলার কাছে চেপে ধরেছিল দড়ির ফাঁস। কসাই-এর দোকানে ঝোলানো খাসীর মত রাজামশাই-

ওর দেহটা ফাঁসির দড়িতে লটকে দিয়েছিল আর রাজামশাই খাবি খেতে খেতে হঠাৎ সেই বৃদ্ধকে আলখাল্লার আড়াল থেকে একটা ঝকঝকে ছুরি বার করতে দেখে ভয়ে চোখদুটো বন্ধ করে ফেলতে চাইলেন।

কিন্তু স্থির এবং নিষ্পলক দুটো চোখের মণি ড্যাবড্যাব করে চেয়ে রইল সেই বৃদ্ধের দিকে।

বৃদ্ধ হাতের ছুরিটা রাজামশাইয়ের চোখের সামনে তুলে ধরে বাতাসে সাদা চুল আর দাড়ি উড়িয়ে খ্যাক্-খ্যাক্ করে হেসেছিল—রাজামশাই, আরও কিছুক্ষণ যে একটু কষ্ট করে আমাদের কৃপা করতে হবে। তোমার রাজদেহের চামড়াটা আমাদের চাই। একটা ডুগডুগি বানাতে হবে কিনা। এত বড় এক রাজার মৃত্যু হল—অথচ প্রজাবৃন্দের কাছে সেই টাটকা খবর পৌঁছাবে না—তাই কখনও হয় হে? বৃদ্ধের ছুরির ঠাণ্ডা ধারালো ফলাটা রাজামশাইয়ের মাথার খুলির চামড়ায় ঝিলিক দিয়ে উঠতেই পরমেশ সেন হঠাৎ চীৎকার করে ঘুম থেকে জেগে গিয়েছিলেন।

মাথায়, গলায় হাত বুলিয়ে ভিজে হাতটা অন্ধকারেই চোখের উপরে মেলে ধরেছিলেন। জিবের ডগাটা হাতের তালুতে ঠেকিয়েই নোনতা আস্বাদে চমকে উঠেছিলেন। হঠাৎ মনে হয়েছিল মাথায়, গলায় রক্ত চুঁইয়ে পড়ছে।

বেড সুইচটা টিপে দিয়েই চড়া-বাতির আলোয় সারা দেহে শুধু গলগলে ঘাম গড়িয়ে পড়তে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন—নাঃ, ঘামের স্বাদ রক্তের মতই নোনতা।

নিজের মনেই হেসে উঠলেন পরমেশ সেন। ঘাতকদের সেই দারুণ ভয়-ধরানো চিঠি, সাতটা দিন অসম্ভব আতঙ্ক, যন্ত্রণা, অশরীরী শব্দ আর ছায়ার পীড়ন, ভয়ংকর বীভৎস সব মৃত্যুর স্বপ্ন এবং শেষ পর্যন্ত কাল রাতে এক গম্ভীর রাজকীয় মৃত্যুর মুখ, আতঙ্ক—সবই যেন এক প্রহসনের মত তাঁর অস্তিত্বকে খুব জোর একটা নাড়া দিয়ে গেল।

এখন কী করবেন পরমেশ সেন? ইচ্ছা করলেই কাল সকালে দানপত্রের কাগজটাকে টুকরো টুকরো করে হাওয়ায় উড়িয়ে দিতে পারেন, তারপর আবার রাজার মতই খুব জোরসে ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়ে যুদ্ধ জয়ে বার হতে পারেন।

কিন্তু কি হবে আর রাজা হয়ে! অসম্ভব ক্লান্তিতে দেহ-মন ভেঙে পড়ছে। আর বোধহয় শক্ত হাতে ঘোড়ার লাগামটা চেপে ধরতে পারবেন না। সামনে অনেক যুদ্ধ। রাজা হয়ে বাঁচতে গেলে আরও অনেক যুদ্ধে জয়ী হতে হবে। পুজো বোনাসের হৈ-হল্লা শুরু হয়ে গিয়েছে। হিসাবের কারচুপি দিয়ে আর তো শ্রমিকদের ভোলানো যাবে না। আবার স্ট্রাইক, লক-আউট, থানা, পুলিশ, অন্ধকারে দালালদের সঙ্গে ফিস-ফিস ষড়যন্ত্র।

নাঃ, তার থেকে মৃত্যুকেই কাছে টেনে নেওয়া যাক। খুব নিরুদ্বেগ, যন্ত্রণাহীন ঘুমের মত মৃত্যু এসে তাঁকে কোলে তুলে নিক। রাজা তো রাজ্য, ঐশ্বর্য সব বিলিয়ে দিয়ে ভিখারী হয়েই গিয়েছেন। ভিখারীর মৃত্যুকে রাজকীয় মহিমা দেওয়ার প্রহসনে আর লোভ নেই।

পরমেশ সেন হঠাৎ মেঝেতে হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াতে লাগলেন। আর দু-হাতের মুঠোয় ছড়ানো ছিটানো ঘুমের বড়িগুলো খুঁটে খুঁটে তুলে নিতে লাগলেন।

বিছানায় উঠে বসলেন পরমেশ সেন। তারপর চিৎ হয়ে লম্বালম্বি শুয়ে পড়লেন। ঘুমের বড়িগুলো মুঠোর মধ্যেই ধরেই ছিলেন। বেড-সুইচটা টিপে দিলেন। অন্ধকারেই কয়েক মুহূর্ত কান খাড়া করে রইলেন। নাঃ, এখন আর কোন শব্দ কিংবা ছায়ার পীড়ন নেই। ডান হাতের মুঠোটা সামনে তুলে ধরলেন। সহজেই ঘুমের বড়িগুলো মুখের মধ্যে চালান হয়ে গেল।

পরমেশ সেনের হাতদুটো থরথর করে কাঁপছিল। আস্তে আস্তে চাদরটা মাথা পর্যন্ত টেনে দিলেন।

'কে—কে তুমি অন্ধকারে দাঁড়িয়ে?'

'আমাকে চিনতে পারছ না? আমি নুষমা।'

'কিন্তু তুমি তো নেই। তুমি মৃত। আমি নিজের হাতে তোমাকে ফাঁসি দিয়েছিলাম।'

'আমার দেহ নেই। কিন্তু আমি আছি।'

'আজ রাতে তো তোমার আসার কথা ছিল না।'

'আমি রোজই রাত গভীর হলে তোমার কাছে আসি। তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিই। তুমি আমাকে দেখতে চাও না—তাই আমাকে দেখতে পাও না।'

'আজ রাতেও তো তোমাকে আমি দেখতে চাইনি।'

'তুমি যে এতক্ষণ রাজা আর রানীর বাঘ-হরিণীর খেলা নিয়ে কত কথা ভাবছ—বুকে হাত দিয়ে বলতো—আমাকে তোমার দেখতে ইচ্ছে হয়নি?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ তোমাকে রানীর মত করে সাজিয়ে দু-চোখ ভরে দেখতে সাধ হয়েছিল।'

'আমাকে তো দেখতে পাবে না। খুব জোরে নিঃশ্বাস টান। বাতাসে আমার গন্ধ পাবে।'

'হ্যাঁ—তোমাকে অনুভব করতে পারছি। ঘর জুড়ে ভুরভুর করছে তোমার শরীরের সৌরভ। কিন্তু তোমাকে কি আর কোনদিন দেখতে পাব না? লক্ষ্মী মেয়ে, শুধু একবারটি দেখা দাও। ঘুমিয়ে পড়ার আগে শুধু একটিবার আমার চোখের সামনে।'

'আগে আমার হাত ধর। আমার পাশে পাশে হাঁটো। তোমার ছায়ায় আমার শরীর, মুখ সব একটু একটু করে ফুটে উঠবে।'

'কিন্তু ঘাতকের দল যদি হঠাৎ ছুটে এসে আমাকে ধাওয়া করে।'

'না, ওরা আর আসবে না। ওরা তো রাত বারোটায় তোমার দরজায় পৌঁছে এসে দাঁড়িয়েছিল। দরজায় আঙুলের টোকা মেরে তোমাকে ডেকেছিল। আমি ওদের তাড়িয়ে দিয়েছি। ওরা যে তোমার জমিদারী চামড়া ছাড়িয়ে তোমার শরীর থেকে একটু একটু করে সব রক্ত টেনে বার করে নিয়ে দর্জির কল দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তোমাকে মেরে ফেলত। তুমি যে ভয়ে ভয় পেয়ে ওদের পায়ের নীচে লুটিয়ে পড়ে প্রাণভিক্ষা চাইতে। ওরা তো তোমাকে রাজার মত মাথা উঁচু করে মরতে দিত না।'

'সুষমা, আমি যে রাজার মত মাথা উঁচু করেই মরতে চেয়েছিলাম।'

'না—না—তোমাকে আমি মরতে দেব না। তোমাকে বুকের ওপরে রেখে ঘুম পাড়িয়ে দেব। এসো, আমার হাত ধর। আমার হাত ধরে হেঁটে চল—আর এক মহিমমণ্ডিত ঘুমের রাজ্য—সেখানে গাছে গাছে কত ফুল, পাখী, জ্যোৎস্নার কত কত সৌরভ। আমি তোমার হাত ধরে পৌঁছে দেব সেই আশ্চর্য পুষ্পোদ্যানে। তুমি আর তোমার রানী ফুলের রেণু মেখে মেখে বাঘ-হরিণীর লুকোচুরির খেলা খেলবে। তারপর ফুল-শয্যায় রানীর নরম বুকে মাথা রেখে সেই পরম প্রার্থিত ঘুমে ঢলে পড়বে।'

'সুষমা, রানী আমার, তুমি অত জোরে ছুটছ কেন? আমি যে তোমার হাত ধরে পাশাপাশি হাঁটতে পারছি না।'

সুষমা ছুটছে তৃণাচ্ছাদিত সবুজ মাঠে পা ফেলে ফেলে। বুকের আঁচল মাটিতে খসে পড়ে পায়ে পায়ে জড়িয়ে যাচ্ছে।

সাদা জ্যোৎস্নায় চরাচর ধু ধু করছে। দূর থেকে দ্রিমি দ্রিমি ব্যাণ্ডের শব্দ ভেসে আসছে। ব্যাগপাইপে খুব দ্রুত লয়ে যুদ্ধের সুর বাজছে।

সামনেই বধ্যভূমি। ফাঁসির দড়িটা বাতাসে দুলছে। হঠাৎ দূর-সমুদ্রগামী কোন জাহাজের কান্নার মত বিউগলের তীব্র তীক্ষ্ণ করুণ আর্তনাদ চরাচরব্যাপী সাদা জ্যোৎস্নার সমুদ্রকে কাঁপিয়ে দিল।

ব্যাণ্ডের বাজনা থেমে গিয়েছে। সুষমা থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। দু-চোখে কান্না টলটল করছে।

পরমেশ যেন শিথিল মন্থর পায়ে এগিয়ে যাচ্ছেন ফাঁসির মঞ্চের দিকে। কালো আলখাল্লাপরা এক বৃদ্ধ বাতাসে সাদা চুল আর দাড়ি উড়িয়ে খ্যাক্ খ্যাক্ করে হাসছে। হাতের মুঠোয় ছুরির ফলাটা ঝকঝক করছে।

ওগো, আমি হেরে গেলাম। তোমাকে ফুলের বাগানে নিয়ে যেতে পারলাম না—সুষমা খুব জোরে কেঁদে উঠল।

বৃদ্ধ তখনও খ্যাক্ খ্যাক্ করে হাসছে আর কালো আলখাল্লাটা দিয়ে একটু একটু করে ঢেকে দিচ্ছে চরাচরব্যাপী সাদা জ্যোৎস্না, সবুজ তৃণাচ্ছাদিত মাঠ, সুষমার কচি কলাপাতার শরীর।

পরমেশ সেন ফাঁসির দড়িতে মাথা গলিয়ে দিয়েছেন। অন্ধকারেই বৃদ্ধের হাতের মুঠোয় ছুরির ফলাটা ঝিলিক দিয়ে উঠল।

এই আমাদের দেশ

বিচিত্র মূর্তির সংগ্রহশালা নলহাটি-ভদ্রপুর-বারাগ্রাম ঘুরে আসুন

বীরভূম ছেড়ে নড়তে ইচ্ছে করছে না। বীরভূমের মাটি আঠাকাঠির মত আটকে ধরেছে পায়ে। শীতের আমেজ পড়ছে, ভোরের দিকে একটা চাদর মুড়ি না দিলে বেশ গা শিরশির করে। বেড়াবার পক্ষে শীতকালটাই অবশ্য ভাল। দুটো মোটা কম্বল সঙ্গে থাকলে যত্রতত্র আস্তানা পোঁতা যেতে পারে। সৌখিন বেড়ানো হলে একটু মুশকিল বটে, তবে বাইরে যখন বেরুবেন তখন সব কিছুকেই খানিক সইয়ে নিতে হবে। মনের খোরাক ঠিকমতন পেলে বাকীগুলো তেমন গায়ে লাগে না। আর খুঁত-খুঁত করলে কোথায়ই বা যাবেন!

যেমন ধরুন বীরভূম ঘুরতে বেশ হাঁটাহাঁটি করতে হবে। সব জায়গায় বাস বা রিক্সা পাবেন না। গ্রামের রাস্তাঘাট একটু খন্দখোদলও বটে। নলহাটি-ভদ্রপুর-বারাগ্রাম ঘুরতে ঘুরতে মনে হচ্ছিল সারা বীরভূমটাই বোধহয় তন্ত্রপীঠ, সিদ্ধপীঠদের জায়গা। ধরুন না, ওদিকে সাঁইথিয়া, লাভপুর, এদিকে নলহাটি, তারাপীঠ। তান্ত্রিক ধর্ম ও শক্তিপীঠের জোয়ার আগে ছিল প্রবল এখন অবশ্য ভাটা পড়েছে। এখন রয়েছে রোমাঞ্চকর কিংবদন্তী।

স্টেশনের পাশেই নলহাটি গ্রাম। নলহাটির পূর্বে ভদ্রপুর। ছোট একটা টিলার ওপর নলহাটি পার্বতী মন্দির। বেশ পরিচ্ছন্ন। প্রথমটা দেখলে মনে হবে যেন টিলা ফুঁড়ে পার্বতী মন্দির গজিয়ে উঠেছে। সাধারণ চারচালা বাংলা মন্দিরের গড়ন। মন্দিরের ভেতর কোন দেবীমূর্তি নেই, পাথরের টুকরোকেই দেবীজ্ঞানে পুজো হয়। খুব অদ্ভুত লাগছিল। নিরাকার দেবীর পুজোর্চনা করেও মানুষ কত খুশি। এখানে নাকি দেবীর দেহাংশ নলা (নলো) পড়েছিল আবার কেউ বলেন এখানে পড়েছিল ললাট, ফলে এখানকার দেবীর নাম ললাটেশ্বরী। আর একটা অদ্ভুত জিনিস লক্ষ করলাম। দেবী মন্দিরের খানিক দূরেই একটি মসজিদ ও সমাধি। পার্বতী ও পীরের সহাবস্থান এর আগে কোথাও দেখিনি। প্রাচীন আমলের হিন্দু সংস্কৃতির নিদর্শনগুলি যেমন যত্ন করে লালন করা হয়েছে ঠিক তেমনই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে মুসলমান সংস্কৃতির ধ্বংসাবশেষের ওপর।

পীঠস্থান হিসেবে নলহাটি কখন প্রাধান্য লাভ করে তার নাকি সঠিক কোন ইতিহাস নেই। তবে কেউ বলেন চোদ্দশ পনের পুরুষ আগে স্মরনাথ শর্মার স্বপ্ন দর্শনের পর এই পীঠস্থানের উৎপত্তি। সে সময় নলহাটির কোন সাহা জমিদার মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেও সাড়ে তিনশো বছর আগেকার কথা। ঐতিহাসিকদের মতে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে পীঠ নির্ণয়ের বিষয় লিপিবদ্ধ করা হয়। প্রাচীন তন্ত্রগ্রন্থেও নাকি পীঠস্থান হিসেবে নলহাটির উল্লেখ নেই।

নলহাটি থেকে ভদ্রপুর। লোহাপুর স্টেশন থেকে মাইল পাঁচেক দূরে ভদ্রপুর গ্রাম। মহারাজা নন্দকুমারের জন্মস্থান বলে ভদ্রপুরের পরিচিতি। নন্দকুমার বংশের উত্তরসূরীদের কেউ কেউ এখনও এই গ্রামে বাস করেন। ভদ্রপুর বহু প্রাচীন গ্রাম।

অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে নন্দকুমারের জন্ম এই গ্রামে। রাজবাড়ির অবশিষ্ট কিছু নেই বললেই চলে। ধ্বসে পড়া ইট স্তূপের দিকে আঙুল বাড়িয়ে একজন বললেন, ওই ঘরেই নন্দকুমারের জন্ম হয়েছিল। প্রাচীন ইতিহাস চোখের সামনে দগদগে হয়ে উঠল। দোর্দণ্ডপ্রতাপ নন্দকুমার যেন বিরাট অট্টালিকার মধ্যে ইংরেজ শাসকের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ানোর শক্তি সঞ্চয় করছেন। চমক ভাঙলো একঝাঁক চামচিকির পাখা ঝাপটানিতে। নিরাপদ নির্ভাবনায় ওরা বসবাস করে যাচ্ছে কতকাল কে জানে!

ভদ্রপুরের গায়ে লাগানো আকালীপুরে স্বয়ম্ভূ গুহ্যকালী দেবী প্রতিষ্ঠিত। লোকে বলে মহারাজ নন্দকুমারই এই সর্পভূষিতা কালী প্রতিষ্ঠা করেন। ব্রাহ্মণী নদীর ধারেই শ্মশান, শ্মশানের ওপরই কালীমন্দির। কথিত আছে এই কালীমন্দির প্রতিষ্ঠার সময় নন্দকুমার নিজে উপস্থিত থাকতে পারেন নি, পুত্রকে নির্দেশ দিয়েছিলেন তান্ত্রিক মতে কালী প্রতিষ্ঠা করতে। গুহ্যকালী প্রতিষ্ঠার প্রসঙ্গ থেকে ধরে নেওয়া যেতে পারে নন্দকুমার শক্তিসাধক ছিলেন। দেবীমন্দিরের দক্ষিণে একটি সিংহাসন আছে, সেটা পঞ্চমুণ্ডের আসন বলে চালিত।

লোহাপুর স্টেশনের পাশেই বারাগ্রাম। শোনা যায় একসময় প্রচুর ব্রাহ্মণের বাস ছিল বারাগ্রামে। এখন প্রায় নেই বললেই চলে। মুসলমানপ্রধান গ্রাম। মুসলমান পীরের প্রচুর সমাধি ইতস্তত দেখতে পাওয়া যায়। গ্রামে ঢোকবার মুখেই জোহাজংগ পীরের সমাধি। পাল যুগের ভাস্কর্যের অনেক নিদর্শন এখানে পাওয়া যায়। হঠাৎ মনে হতে পারে যেন কাছাকাছি সব কটি অঞ্চলের যেখানে যত মূর্তি আছে সব এই বারাগ্রামে জড়ো করা হয়েছিল আজ থেকে বহু বছর আগে। কারণ ভাঙাচোরা মূর্তি গ্রামের সর্বত্রই ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। এবং তার অধিকাংশই নাকি চাষী মজুরদের কোদালের মুখে উঠে এসেছে। এখনও মাটি খুঁড়লে অনেক মূর্তি পাওয়া যেতে পারে বলে অনুমান করা হয়। মূর্তিগুলির অধিকাংশই বৌদ্ধ দেবদেবীর, হিন্দু দেবদেবীর মূর্তির সংখ্যাও কম নয়। এখানে ভুবনেশ্বরী নামে সিংহাসীনা এক দেবী মূর্তি এখনও পূজিত হন। মূর্তিটিকে কেউ বলেছেন 'ভুবনেশ্বরী গৌরী', কেউ বলেছেন 'সিংহনাদ লোকেশ্বর', কেউ 'প্রজ্ঞাপারমিতা'।

আরও একটি বিচিত্র দেবীমূর্তি আছে। চতুর্মুখ দেবী মূর্তি, তিনটি মুখ সামনে, একটি পিছনে। একটি হাতও অবশিষ্ট নেই, সব ভাঙা। পদ্মের ওপর পদ্মাসনে বসে আছেন। মাথার মুকুটটি দেখতে চৈত্যের মত। মূর্তি বিশারদরা বলেছেন, কোন বৌদ্ধ দেবীমূর্তি। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের রিপোর্টে নাকি বলা হয়েছে, 'উষ্ণীষ বিজয়া' মূর্তি। যাহোক এনিয়ে আমাদের মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। আপনি যদি যান বারাগ্রামে তবে মনে হবে মূর্তির খনিতে এসেছেন, এবং দিশেহারা হয়ে যাবেন।

মেক্ সাজিয়ে ভদ্রপুর ঘুরে আসবার কথা বলব না। কারণ যাতায়াতের অসুবিধা প্রচুর। যাঁরা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বাংলাদেশকে দেখতে চান তাঁদের কাছে নলহাটি-ভদ্রপুর-বারাগ্রাম খুবই উপভোগ্য হবে। সিউড়িতে আস্তানা পেতে বীরভূম পরিভ্রমণ করাই ভাল। সুবিধে অসুবিধে সবেরই হদিস সিউড়িতে মিলবে।

—নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

CENTRAL LIBRARY

তুলসীচরিত

মনীষবিব চৌধুরী

(১)

আমার গল্পের ভূমিকা।

একটি ভাল মেয়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার ইচ্ছা হয়েছে, কিন্তু ইতস্ততের ভাব যাচ্ছে না। তাকে সামনে দেখে লোকে কি চোখে তাকাবে তার দিকে, কি ধরনের কথা বলবে, কি রকমের হাসি হাসবে অনুমান করতে পারছি না।

ভেঙে চুরে তলিয়ে যেতে পারত সে অবস্থার চাপে, কিন্তু হয় নি। মস্ত বড় কথা এটা। আরও অনেক কথা আছে। সত্যি ভাল মেয়ে সে। তাকে অনাদর, অশ্রদ্ধা করলে মনে লাগবে।

তাই ভাবছি থাক না সে পরদার আড়ালে। কি ক্ষতি হচ্ছে তাতে? তাকে ভালবাসি, তার কথা বলতে ভালবাসি বলে হাত ধরে টেনে হাটের মধ্যে তাকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে 'দেখো, দেখো তোমার আমার পছন্দের এই মেয়েটিকে', একথা না বললে কি নয়?

থাক তাহলে, অপরিচয়ের পরদা নাই বা সরালাম এখন।

নিষ্কৃতির মৃদু হাসি দেখতে পাচ্ছি তোমার মুখে, হাঁফ ছেড়ে বাঁচলে হয়ত মনে করছ। বেশ। তোমার গল্পটা তোলা থাক, আমার গল্পটা বলব। তোমার যখন আসবার সময় হবে আমার গল্পের মধ্যে এসে পড়বে, কলমের আড় ভাঙবে তৎক্ষণে।

আমার গল্প আরম্ভ করতে গিয়ে মনে পড়ল আমার প্রাক্তন ছাত্র, নামকরা ব্যবসায়ী ও রোটেরিয়ান শ্রীমান অশোক পাল আমার বায়োগ্রাফি লিখছেন কিছুদিন আগে বলেছিলেন। তাঁর লেখা এগিয়ে থাকলে তাঁর কথা দিয়ে গল্প আরম্ভ করব স্থির করলাম। খোঁজখবর করতে সপ্তাহ দুই কেটে গেল তারপর তাঁর লিখিত অংশের একটা ইনস্টলমেন্ট হাতে পৌঁছল। এডিট না করে অবিকল তুলে দিচ্ছি সেই অংশ।

(২)

অশোকের প্রথম ইনস্টলমেন্ট।

ছেলে বেলা আমি অধ্যাপক প্রমথনাথ গাঙ্গুলীর কাছে কেমিস্ট্রি পড়েছিলাম তিন বছর। তখন তাঁর সঙ্গে আমার বয়সের তফাৎ তিন চার বছরের বেশী নয়।

চমৎকার চেহারা, পণ্ডিত মানুষ, পড়াতেনও ভাল। কিন্তু তাঁর মধ্যে এত বেশী ভালমানুষি ভাব ছিল যার জন্য ছেলেরা মানতে চাইত না, বিরক্ত করত তাঁকে, ক্লাস থেকে পালাত। ভাবতাম নিরীহ ভাবটা ঝেড়ে ফেলে ভদ্রলোক একটু কড়া হতে পারলে ভাল হত। কিন্তু তাঁর ভালমানুষি ভাব গেল না। তাঁকে পছন্দ করতাম আমি, শ্রদ্ধা করতাম, আবার একটু অবজ্ঞাও করতাম। মনে মনে বলতাম আপনি নাম করতে পারবেন না কখনও প্রোঃ পি এন জি, উন্নতিও বিশেষ হবে না, আপনার ভালমানুষির সুযোগ নিয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষ আপনাকে পেটভাতায় রাখবেন বরাবর।

একটা বাড়ী ছিল মাস্টারমশায়ের, কিন্তু অবস্থা সচ্ছল ছিল না। কলেজে যা পেতেন তাতে চলবার কথা নয়, টিউশানি করতেন, 'মেড ইজি' লিখতেন, কোচিং ক্লাস করতেন, মোট কথা খুব খাটতেন। নানা রকমে কোন রকমে চালাতেন। জানতাম তাঁর বিয়ে হয়েছিল, দু একটি সন্তান ছিল।

কলেজ ছাড়বার পরে দু' চার বার দেখা হয়েছে হয়ত, তারপর ভুলে গিয়েছিলাম তাঁর কথা। খাতনামা লোক হতে পারেন নি তিনি, কাগজে নাম বেরোত না, বেরোলে নিশ্চয় মনে পড়ত তাঁর কথা। বছর দুই আগে হঠাৎ রাস্তায় একদিন দেখা হয়ে গেল মাস্টারমশায়ের সঙ্গে। গাড়ী থেকে নেমে প্রণাম করলাম মিনিট পনের দাঁড়িয়ে আলাপ হল। শুনলাম টিউশানি, কোচিং ক্লাস ছেড়ে দিয়েছেন, একটা বড় কেমিক্যাল ফার্মাসিউটিকেল কোম্পানীর লেবরেটরীতে কাজ করেন বিকেলে, কিছু পান সেখানে। বললেন, চলে যাচ্ছে কোন রকমে।

বললাম, টিউশানি, কোচিং ক্লাস থেকে আপনার ভাল আয় হত শুনেছিলাম, ছাড়লেন কেন?

এমন কিছু আয় হত না। তাছাড়া টাকা আদায় করতে ঝামেলা পোয়াতে হত, অন্য রকমের অসুবিধাও হচ্ছিল। হেসে বললেন, আগে চলে যাচ্ছিল এখনও চলে যাচ্ছে। চলে যাবার বেশী কিছু হবে না আমার।

উপদেশ দিলাম নোট বই লিখুন মাস্টারমশাই, লেগে গেলে অনেক টাকা পাবেন।

লেগে যাবে মনে হয় না অশোক। এখন একটা কাজে হাত দিয়েছি—আচ্ছা, একটা কাজে যাচ্ছিলাম, দেরি হয়ে গেল, আজ চলি।

চলে গেলেন।

ভাবছিলাম তাঁর কথা। কোন রকমে চলে যাবার ওপরে উঠতে পারলেন না আপনি প্রোঃ পি এন জি—পণ্ডিত মানুষ হয়েও। পুশ না থাকলে মার্জিনাল লাইন থেকে যেতে হয় সারা জীবন। আপনার পুশ নেই, এলবো পাওয়ার নাই, নিরীহ ভালমানুষ আপনি, তাই এ দশা আপনার। আপনার ছাত্র তিন চান্সে পাশ করা অলোক পাল আজ গাড়ী হাঁকিয়ে বেড়াচ্ছে কলকাতার রাস্তায়, বিজনেস করে, দুখানা বাড়ী করেছে। আপনি কিছুটা নির্বোধ সৎ মানুষ প্রোঃ পি এন জি, নইলে শেয়ার মার্কেটে টেনে আনতাম আপনাকে, লাক্ থাকলে কিছুদূর উঠে পড়বার চান্স পেতেন। কিন্তু যা স্বভাব আপনার আর বেশী কিছু হবার নাই।

বছর কেটে গিয়েছে এর পর। একদিন সকালে কাগজ খুলে চোখ বুলাতে গিয়ে দুয়ের পাতায় একটা হেড লাইন চোখে পড়ল। প্রসিদ্ধ রসায়নবিদ অধ্যাপক প্রমথনাথ গাঙ্গুলীর নূতন ড্রাগ আবিষ্কার, চিকিৎসক ও কেমিস্ট মহলে চাঞ্চল্য, নূতন ড্রাগের অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা।

বিস্মিত হলাম, কি ব্যাপার?

হেড লাইনের নীচের খবরটুকুতে বিশেষ কিছু পাওয়া গেল না।

তারপরে দেখলাম বিভিন্ন কাগজের করেসপণ্ডেন্স কলামে দু তিন দিন অন্তর গাঙ্গুলী এলিক্সির সম্বন্ধে চিঠি বেরোচ্ছে। বেশীর ভাগ চিঠিতে ড্রাগের অনিষ্টকারিতার নিন্দা করে গালাগালি, দুঃখ সন্তাপ প্রকাশ, গবর্ণমেন্টকে ড্রাগ কন্ট্রোল আইন প্রয়োগ করবার অনুরোধ, দু' একখানা চিঠিতে ড্রাগ এবং তার আবিষ্কারকের প্রশংসা। বিজ্ঞাপনও বেরোতে লাগল। গালাগালির দাক্ষিণ্যে প্রোঃ গাঙ্গুলী একজন বিখ্যাত ব্যক্তি হয়ে উঠছেন দেখলাম।

বিস্মিত হয়ে বিজ্ঞাপন, চিঠিপত্রগুলো ভাল করে পড়তে বসলাম, দু চারজন কেমিস্ট ও ডাক্তারকে প্রশ্ন করলাম।

গাঙ্গুলী এলিক্সিরের জনপ্রিয়তার কারণ, তার কমার্শিয়াল ভ্যালু সম্বন্ধে একটু আন্দাজ পাওয়া গেল। চমকে গেলাম। হায় হায় করতে লাগল মন, কেন যেদিন রাস্তায় দেখা হয়েছিল ভদ্রতা করে প্রাক্তন অধ্যাপককে লিফট দেবার জন্য জিদ

291-20

না করে ছেড়ে দিলাম হেঁটে চলে যাবার জন্য।

ডাক্তার ও কেমিস্টদের মতে গাঙ্গুলী এলিক্সির সম্পূর্ণ নতুন আবিষ্কার নয়, কতকটা সুপরিচিত এল এস ডি—২৫এর মত। এলিক্সিরের মধ্যে লাইসারজিক এসিড ডিথিলামাইড আছে, অন্য জিনিসও আছে। অন্য কি কি উপাদান আছে এখনও সঠিক নির্ণয় করা যায় নি। অন্যান্য উপাদান যাই থাকুক গাঙ্গুলী এলিক্সির এল এস ডি—২৫এর মত হ্যালুসিনোজিক সাইকেডেলিক মানে ইট প্রোডিউসেস হ্যালুসিনেশন অফ ভিসন অ্যান্ড অফ হিয়ারিং। ড্রাগ কন্ট্রোল ডিপার্টমেন্টে অভিযোগ করা হয়েছিল, তাদের নির্দেশে কতকগুলো কেস পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে ইট প্রোডিউসেস এ গ্রেট সেন্স অফ ওয়েলবিয়িং লাইক এল এস ডি—২৫ বাট ইট ডাজ নট প্রোডিউস অ্যাস ডীপ ডিপ্রেসন অ্যাস এল-এস-ডি—২৫ ডাজ। স্বাস্থ্যের ওপরে এই ড্রাগ ব্যবহারের কোন ডানিষ্টকর ফল লক্ষ্য করা যায় নি। ড্রাগ কন্ট্রোলের কর্তারা আরও রিপোর্টের অপেক্ষা করছেন।

মেস্কালিন, মারিজুয়ানা, হিরোইন এল-এস-ডি—২৫, হ্যাস্যেশ আমেরিকায় চলে আসছে, এদেশে এগুলোর ব্যবহারের কারেক্ট রিপোর্ট পাওয়া যায় না। গাঙ্গুলী এলিক্সির বিদেশে রপ্তানী হচ্ছে ইট ইজ গোয়িং টু বি এ ডলার আর্নার।

প্রশ্ন করলাম এক ডাক্তার বন্ধুকে, গাঙ্গুলী এলিক্সির ব্যবহারের ফলে মাতলামির কোন কেস পাওয়া গিয়েছে কি?

আরে না না মাতলামির মত ভালগার ব্যাপার এলকোহোলিক এডিক্টদের এক-

ছেটে। আফিং ও গাঁজা এবং এ দুটো থেকে তৈরী চন্ডু ও চরসের স্পিরিচুয়াল কোয়ালিটি আছে, ভাঙেরও স্পিরিচুয়াল কোয়ালিটি আছে, তত্ত্বজ্ঞানের ভাব এনে দেয় মনে। এল-এস-ডি—২৫এর আমেরিকান ভক্তরা দাবি করেন এই ড্রাগ ব্যবহারের ফলে তৃতীয় নেত্র বা দিব্যচক্ষু খুলে যায়, হিন্দু-শাস্ত্রে যেমন বলা হয়েছে, ষট্‌চক্র ভেদ করে ভক্ত সমাধির স্তরে উঠে যান।

আমাকে হাসতে দেখে ডাক্তার বন্ধুটি বললেন, হেসো না অশোক, ইতিহাস খুঁজে দেখো দেখবে দুঃখকষ্টের মধ্যে হার্ড, ক্রুয়েল রিয়ালিটির মধ্যে বাস করে মানুষ কিছুক্ষণের জন্য আনন্দের স্বর্গে বেড়িয়ে আসবার আশায় কত রকম বস্তুর সাহায্য নিয়েছে। স্পিরিচুয়াল এক্সারসাইজের সংগে মদ, গাঁজা, ভাঙের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, হিন্দুর ছেলে হয়েও তুমি জানো না বলতে চাও?

হাসি থামিয়ে বললাম, গাঙ্গুলী ড্রাগ এল-এস-ডি—২৫এর নকল হতে পারে কিন্তু নেশা ছাড়ানো জোভিয়ানদের আসে না এটা কি করে সম্ভব করেছেন প্রোঃ গাঙ্গুলী? লাইসারজিক এসিড ডিথিলামাইড ছাড়া আর যা পাওয়া গিয়েছে তার কেমিকেল এনালিসিস হয় নি?

হয়েছে, সঠিক ধরতে পারা যায় নি এখনও। এখনও সেটা প্রোঃ গাঙ্গুলীর সিক্রেট।

আচ্ছা এই ড্রাগ থেকে প্রোঃ গাঙ্গুলী কি রকম টাকা পাবেন?

ডাক্তার বললেন, অনেক টাকা পাবার কথা। কি রকম পাচ্ছেন তাঁর কোম্পানী, তিনি নিজে এবং ইনকমট্যাক্সওয়ালারা বলতে পারে।

বললাম, ওয়ান্ডার ড্রাগ বের হল এক জাউমাস্টারের নিরেট মাথা থেকে। কনিষ্ঠ-খিলওয়ালারা মারামারি করে কিনবে, হাজার হাজার, লাখ লাখ টাকা আসতে পারে রয়্যালটি থেকে উঃ! বাড়ীতে পাওয়া যায় না ভদ্রলোককে, বা কলেজে পাওয়া যায় না, কোম্পানীর অফিসে পাওয়া যায় না। প্রাণ অস্থির হয়েছে মাস্টারমশায়ের পায়ের একটু ধুলো নেবার জন্য। কত গালাগালি যে করেছি মনে মনে, গুড-ফর-নাথিং গুড ফর নাথিং, অপদার্থ বলে। আচ্ছা আজ উঠি ডাক্তার।

ডাক্তার নিজের কাজে মন দিয়েছিল, বাঁ হাতের তর্জনী কপালে ঠেকাল, বলল, চিয়ারিয়ো!

(৩)

আমার প্রথম ইনস্টলমেন্ট।

অশোকের প্রথম ইনস্টলমেন্টের পরে আমার প্রথম ইনস্টলমেন্ট শুরু হচ্ছে।

বানপ্রস্থের বয়স হয়েছিল তবু বানপ্রস্থ নিতে দেরি হচ্ছিল নানা কারণে। যে বরাবর রুজি রোজগার করে আসছে তাকে অবসর নেবার কথা কেউ ভাবে না।

সংসারের সকলের পুঞ্জীভূত অসন্তোষের পাত্র যে, সব রকমের অভিযোগ যার একার বিরুদ্ধে করা চলে তাকে কি করে রেহাই দেয়া যায়?

দুটি ছেলে লেখাপড়া যতটা হবার শেষ করে কাজে ঢুকেছে। বড়টি সম্প্রতি লভ ম্যারেজ করে মায়ের সংগে নন-কো-অপারেশন চালাচ্ছে। দুটি মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। বাড়ীটা বাঁধা দিয়ে কিছু দেনা করতে হয়েছে একজন্য। ছেলেদের বললাম, তোমরা সংসার চালাও আমি দেনা শোধ করি, নয় তোমরা দু ভায়ে মিলে দেনা শোধ করো আমি যথাসাধ্য সংসার চালাচ্ছি। কোন প্রস্তাব তাদের মনঃপূত নয়, এক বছর ধরে তারা ভাবছে। যৌতুকের নানাবিধ তত্ত্বের ব্যাপার নিয়ে মেয়ে দুটি বাপকে চিঠিপত্রে খোঁচায় এখনও। গৃহিণী অনটনের মধ্যে সারা জীবন কাটিয়ে ছেলেদের চাকরির হবার পরে সুসময় হবার আশা করেছিলেন। আশা পূর্ণ হল না তাঁর বরাতের দোষে নয়, ছেলেদের বাপের কারসাজিতে।

সুখ উথলে উঠেছিল গার্হস্থ্যাশ্রমে তবু বানপ্রস্থ নিতে দেরি হচ্ছিল। একটা বড় রকমের গলদ রয়েছে আমার স্বভাবের মধ্যে, কোন কিছুতে বিচলিত বোধ করি না। ন্যায় অন্যায়, উচিত অনুচিত, শোভন অশোভনের মধ্যে যে সীমারেখা টানা হয়েছে সেটাকে পার্মানেন্ট, অর্থপূর্ণ বলে মনে হয় না আমার। যা হচ্ছে তাকে ফ্যাক্ট বলে মেনে নিয়ে চলতে অভ্যস্ত হয়েছি জীবনে। তুমি আমাকে তাচ্ছিল্য করা এটা হল ফ্যাক্ট, কেন তাচ্ছিল্য করা, আমি তোমার তাচ্ছিল্য পাবার যোগ্য না অযোগ্য এসব প্রশ্ন অবান্তর।

সুখে, সম্পদে, সফলতায়, সম্মানে আমার জীবন ঐশ্বর্যময় হয়ে ওঠে নি, অভাব অনটনে, গঞ্জনায়, অকৃতকার্যতায়, তাচ্ছিল্যে বিড়ম্বিত বোধ করিনি। যা আমার সাধ্য করে যাচ্ছি; আর কি করতে পারি আমি?

ক্ষুদ্র মানুষ আমি, তুচ্ছ আমার জীবন-যাত্রা, কিন্তু জীবনে অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্য আছে। দু-একটা অভিজ্ঞতা ছাপ রেখে গিয়েছে মনে তাই অভিজ্ঞতার কথা তুললাম। সমালোচনা বা নিন্দা করা আমার অভ্যাস নয়। অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে কিছু বাড়িয়ে বলছি বা পরোক্ষে কারো নিন্দা করছি এ সন্দেহ যেন কেউ না করেন।

চব্বিশ পঁচিশ বছর বয়সে কলেজের চাকরিতে ঢুকে দেখলাম বেতন সামান্য, অতিরিক্ত কিছু রোজগার করা আবশ্যক। মাস্টারের পক্ষে প্রাইভেট টিউশানি বাড়তি রোজগারের সহজ পথ। তাই প্রাইভেট টিউশানি করতে আরম্ভ করলাম।

বছরের পর বছর অনেক ছাত্রছাত্রীকে পড়িয়েছি। জন তিনেক ছাত্র-ছাত্রীর কথা অল্প কিছু বলছি। ছাত্রছাত্রীরা সকলেই

ব্রণ
দূর করবার জন্য
লিচেনসা

● ১০৮ টি দেশে ডাক্তাররা প্রেসক্রিপশন করেছেন।

● যে কোন নামকরা ওষুধের দোকানেই পাওয়া যায়।

পয়সাওয়ালা ঘরের, নইলে একশো, দেড়শো টাকা দিয়ে প্রাইভেট টিউটর রাখতে পারবে কেন?

আমার প্রথম ছাত্র সুপ্রিয়। বছরের পর বছর আই এস সি পরীক্ষায় ফেল করছে। অভিভাবিকা মাত, পিতা পরলোকগত। তিনি নিজেই ইন্টারভিয়্যু নিলেন। দেখলাম কিছু বয়স হলেও স্বাস্থ্য ভাল, সাজসজ্জা ভাল। দশ মিনিট ইন্টারভিয়্যুর শেষে চা, প্রচুর খাবার আসল। বললেন, মিষ্টিমুখ করুন একটু, কাল থেকে কাজে যোগ দেবেন।

বললাম, আপনার ছেলে যাকে পড়াতে হবে সে কোথায়?

ক্রিকেট খেলা দেখতে বেরিয়েছে, ফেরেনি। কাল দেখতে পাবেন।

এক বছর সুপ্রিয়র প্রাইভেট টিউটারি করলাম। পয়সাওয়ালা ঘরের শাসনবন্ধ ছেঁড়া স্ফূর্তিবাজ ছেলে, আলগা কথা বলাতে অভ্যস্ত। নানা রকমের আলগা কথা বলত নিজের পরিবারের সম্বন্ধে, মাতার সম্বন্ধে, বন্ধুবান্ধবের সম্বন্ধে। মাঝে মাঝে নানা উপলক্ষ্যে ছাত্রের বাড়ীতে খাবার নিমন্ত্রণ পেতাম।

একদিন সুপ্রিয় বললে, মাস্টারমশাই, পুজোয় মা আপনাকে যে ধুতি, পাঞ্জাবী, চাদর দিয়েছেন পরে মাকে দেখাবেন। সিল্কের পাঞ্জাবী ফার্স্টক্লাশ মানাবে আপনার চেহারায়। আমার মার টেস্ট আছে। আরেক দিন বলল, এতদিন পড়াচ্ছেন, এ-বাড়ীতে আসা-যাওয়া করছেন কোন ইম্প্রুভমেন্ট দেখা যাচ্ছে না আপনার ব্যবহারে, কথাবার্তায়। অল্প অল্প করে মদ খাওয়া ধরুন। কিনে খেতে হবে না, আমি সাপ্লাই করব। জানেন মাস্টারমশাই, আপনার কাছে পড়তে বসলে আমার শীত শীত করে, তাই একটু খেয়ে এ ঘরে ঢুকি। আচ্ছা বসুন দু মিনিট, আমি আসছি—

সুপ্রিয় আমি মদ খাইনে, মাথা ঘুরবে। মাথা ঘুরলে মাকে বলব, তিনি গাড়ী করে আপনাকে বাড়ীতে জমা দিয়ে আসবেন, ভয় নেই।

সুপ্রিয় আই এস সি পাশ করল। তাকে বি এস সি পড়াবার অনুরোধ করলেন তার মা। অনেক রকম করে, অনেক কথা বলে যা মেয়েরাই পারেন, অনুরোধ করলেন, মাইনে বাড়িয়ে দেবার কথাও বললেন।

সুপ্রিয় বলল, মাস্টারমশাই থেকে যান। আমাকে পড়াবার সময় কামরায় মাকে কিছুক্ষণ পড়াতে পারেন। আপনার পড়াবার সেন্স ভাল, চেহারাও বেশ ভাল। আপনার কাছে পড়তে রাজি হবেন মা। মাকে বলব?

বললাম, না সুপ্রিয়, বলো না। তুমি যদি বি এস সি পড়তে চাও, আরেকজন টিউটর দেখতে বলো তোমার মাকে, আমি পেরে উঠব না।

সুপ্রিয়র প্রাইভেট টিউটরের কাজ করতে না পারলেও বসে থাকতে পারলাম না টাকা রোজগারের প্রয়োজনে। জানাশোনা এক বাড়ীতে কাজ জুটে গেল। পড়াতে হবে বি এস সি ক্লাশের এক ছাত্রীকে। ছাত্রীর নাম দেবযানী।

কদিন পরে ছাত্রী পড়তে বসে প্রশ্ন করল, মাস্টারমশাই, আপনার বিয়ে হয়েছে?

মাথা নাড়লাম।

বলল, আশ্চর্য। তাহলে মাথা নামিয়ে বসে থাকেন কেন, অনভিজ্ঞ ছেলেদের মত? ইউ সুড লুক অ্যাট গার্লস বোল্ডলি ইন দেয়ার ফেসেস।

আচ্ছা, এবার বলো কেমিস্ট্রিতে কোথায় তোমার আটকায়।

ক্রমে দেখলাম কোথাও দেবযানীর আটকায় না, পড়াশোনায় ভাল সে, মেধাবিনী। আটকাতে লাগল আমার।

মাস তিনেক পরে একদিন বলল, আচ্ছা মাস্টারমশাই, বলতে পারেন আমি এত ভাবি কেন আপনার কথা?

চুপ করে রইলাম।

বলল, মনে হচ্ছে, আপনার প্রেমে পড়েছি। জানি আপনি বিবাহিত, কি হয়েছে তাতে?

গড়গড় করে অনেক কথা বলল দেবযানী, তার কথা বলবার স্টাইল ভাল।

চুপ করে রয়েছি তখনও। গায়ে ঠেলা দিয়ে বলল, ডোন্ট প্রিটেন্ড টু বি এ সেন্ট। মেট্রোতে কুওপেটা হচ্ছে, চলো দেখে আসি। মার পারমিশন আনছি এখুনি, একটু বসো।

আজ থাক দেবযানী। মাথাটা ধরে রয়েছে।

ঝট করে চেয়ার ছেড়ে আমার চেয়ারের পেছনে এসে মাথা দুহাতের মধ্যে ধরে বলল, আ-হা-হা, বলোনি কেন এতক্ষণ? বসো একটু, স্মেলিং সল্টের শিশিটা আনছি।

চলে গেল ভেতরে।

আমি উঠে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলাম।

রাখা গেল না চাকুরি। বাকী মাইনের টাকাটা নেবার জন্য দেবযানীদের বাড়ীতে যাবার সাহস হল না। পরের মাসের ৫ই তারিখে দেবযানী কলেজে এসে মাইনে দিয়ে গেল নিজে। কোন কথা বলল না, একটু হাসল শুধু।

মনে হলো মেয়েটি ভাল, কেন ওর বাপ-মা বিয়ে দিতে দেরি করছেন? চেহারায় খুঁত আছে সেটা ঢেকে দেবার মত টাকা আছে তাঁদের।

এর পরের এক ছাত্রের নাম অম্বর।

বি এস সির ছাত্র কিন্তু ঝোঁক সাহিত্যের দিকে। আমাকে ডি এইচ লরেন্স, সমরসেট মম, জোলার বই পড়তে দিত। জাপানী সাহিত্য, চীনা সাহিত্যের গল্প শোনাত। অনেক খবর রাখত অম্বর, বিলাতের নিউড কলোনীর সাহেব মেমদের আচার-ব্যবহার কি রকম গল্প করত।

মাস পাঁচ ছয় কেটে গেল একটা নতুন ব্যাপার আরম্ভ হল। দু-একটি করে ছাত্র, অম্বরের বন্ধু, আসতে আরম্ভ করল পড়বার ঘরে, পড়াবার সময়ে। অম্বর পরিচয় দিত আমার বান্ধবী। অর্পিতা জনান্তে আমার পিঠ থাবড়ে অম্বর বলল, ওরা সবাই সায়েন্সের ছাত্রী, আমার কাছে আপনার পড়াবার সুখ্যাতি শুনে এখানে আসে।

বললাম, কিন্তু ওরা গল্প করেন, পড়াশোনার ব্যাঘাত হয়।

অম্বর বলল, একটুআধটু হলই বা, কি হয়েছে?

বাড়ীর ব্যবস্থা কেমন জানি না, আমার অবস্থা ক্রমে কাহিল হয়ে উঠল। ছাত্রের বান্ধবীদের আড্ডা, ইয়ার্কি চলতে লাগল, আমার মাইনে বাকী পড়তে লাগল। দু মাসের মাইনে বাকী পড়তে ছাত্রকে বললাম, আমি গরীব মাস্টার, চালাই কি করে? টাকাটা চেয়ে নিয়ে এসে দাও।

মাথা চুলকে অম্বর বলল, পনেরো দিন সময় দিন মাস্টারমশাই, একসঙ্গে সব টাকা পাবেন। জানেন কি, টাকাটা মাস মাস আমার হাতে এসেছে, আর্জেন্ট দরকারে খরচ হয়ে গিয়েছে। পনেরো দিনের মধ্যে দিয়ে দেব আমি।

টাকার আশা ছেড়ে দিলাম। দুখানা মেড ঈজির কপি রাইট দুশো টাকায় বেচে দিতে হল দায়ে পড়ে।

পরপর আরও কটা টিউশানি করলাম ছাত্র-ছাত্রীর। সত্যি পড়াশোনা করতে চায় এবং করতে চায় না, বন্ধুর হিসাবে প্রাইভেট টিউটর রাখে এমন ছাত্রছাত্রীও পেয়েছি। ছাত্রীদের মধ্যে আর দুজনের কথা কিছু মনে আছে। জয়ন্তী বেশ পড়াশোনা করছিল, মাস দুই পরে, দেখলাম সিনেমার পেয়ে বসেছে ওকে। সিনেমা লাইনে গেলে তার প্রসপেক্ট কি হতে পারে, তার চেহারায় নায়িকার পার্ট মানাবে কিনা, হলিউডের নায়িকাদের আয় কত, কে কতবার বিয়ে করেছে, এ ধরনের আলাপ করতে আরম্ভ করল পড়াশোনার সময়ে। গরীব প্রাইভেট টিউটরকে নায়ক ধরে নিয়ে নায়িকার হাসি, চাহনভঙ্গী অভ্যাস করতে লাগল। এক মাসের মাইনে বাকী ফেলে চাকুরি ছেড়ে দিলাম। নমিতাকে এক মাসের বেশী পড়াতে পারিনি। কটা দিন মন দিয়ে পড়াশোনা করল তারপর কোন কনট্রাসেপটিভ ভাল, স্টেরিলাইজেশান করবার ফল স্বাস্থ্যের ওপরে কি রকম হতে পারে এ-ধরনের প্রশ্ন করতে লাগল পড়তে বসে। আমার অধীত শাস্ত্রে এসব প্রশ্নের উত্তর ছিল না।

এরপর প্রাইভেট টিউশানি ছেড়ে দিয়ে কোচিং ক্লাশ নিতে আরম্ভ করলাম। সারা বছর চলত যা ক্লাশ, পরীক্ষার দু-তিন মাস

আগে বেশ ছাত্র হত, ছাত্রীরাও পড়তে আসত। মাঝে মাঝে একটু গোলমাল হত টাকা-পয়সা নিয়ে, অন্য রকমের গোলমালও একটু আধটু হত, তবে বিশেষ কিছু না। সকালে, সন্ধ্যায় কোচিং ক্লাশ চলত পরীক্ষার সিজনে।

পরীক্ষার পরে বাড়তি রোজগার বন্ধ হত। তখন বাড়ীতে বসে 'মেড ইজি' লিখতাম। এই রকম মন্দার সময়ে একটা টিউশনির অফার এল।

ছাত্র নিজে আমার বাড়ীতে এসে দেখা করল। পরিচয়ও দিল। ইস্ট ইন্ডিয়া করপোরেশনের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর মিঃ এন সি ভান্ডারীর ছোট ছেলে, বি এস সি ক্লাসে পড়ছে। নাম বলল দেবাশিস।

দেখলাম বছর উনিশ কুড়ির অতি সুশ্রী, স্বাস্থ্যবান ছেলে, ভদ্র, বিনীত ব্যবহার, কথাবার্তা।

প্রস্তাব করল অসুবিধা না থাকলে আজ সন্ধ্যার পরে গিয়ে তার বাবার সঙ্গে দেখা করে প্রস্তাব পাকা করে নিতে পারি। জিজ্ঞেস করল, কখন যেতে পারবেন বলুন গাড়ী পাঠিয়ে দেব।

বললাম, তোমার বাবা অফিস থেকে ফেরেন কখন?

বলল, ছটা থেকে সাতটার মধ্যে।

তাহলে আটটায় যাব, গাড়ী পাঠাতে হবে না।

অচ্ছা।

(ক্রমশঃ)

মুখের মেলা

দৌলত মিয়া ও পাহাড়ী যুবতী

'বাবু একটা বিড়ি দিবি?'
'বিড়ি আমি খাই না।'
'ছিগারেট?'
'তা খাই। নেবে?'

'দিবি!' খুব উৎসাহ বোধ করে পাহাড়ী উপজাতীয় মেয়েটি হাত বাড়িয়ে ধরল। সিগারেট দিতে মেয়েটি বললে, 'দিলাই?'

ফোঁ করে কাঠি জেবলে কালো যুবতী চেহারার মেয়েটি তার হাতের রঙিন চিত্তির আঁকা তালু আড়াল দিয়ে সিগারেট ধরিয়ে টানতে লাগল।

ফাঁকা ছোট একটা স্টেশন। লোকজন নেই। কার্তিক মাসের শেষ দিক। কুয়াশায় চারদিকটা ঘোলাটে—প্রায় অদৃশ্য।

স্টেশন মাস্টার বললে, 'রাত বারোটায় একটা ট্রেন আসবে—তার আগে নয়। পথে গন্ডগোল। ট্রেন আটকে ডাকাতি করছিল। ধরা পড়েছে।'

ছোট একটা ওয়েটিং রুম। একটা বেঞ্চিতে আমি বসে আছি। কি কুক্ষণেই না সভা করতে এসেছিলাম। এখন সেই রাত বারোটা পর্যন্ত বসে থাকো।

একটা বালব্ জ্বলছে ঘরের মধ্যে। ম্যাড়মেড়ে আলো। ময়লা কাঁথার মধ্যে একটা লোক আপাদ মস্তক মুড়ি দিয়ে পড়েছিল। মেয়েটা দেওয়াল হেলান দিয়ে বসে সিগারেট টানল কিছুক্ষণ। তারপর লোকটাকে ঠেলা মেরে মেরে তুললে। আধখানা খাওয়া সিগারেট টানতে দিলে তাকে। মুখে ধরে দিলে। কারণ হাত নেই লোকটার। একটা হাতের কনুই থেকে কাটা। অন্য হাতটা কব্জি থেকে। লোকটার মুখের আদল দেখে মনে হল বাঙালী।

লোকটা বললে, 'এরই মধ্যে হিম পড়ে গেল বাবু—দোরটা বন্ধ করে দাও।' মেয়েটাই উঠে দোরটা বন্ধ করে দিলে।

'আপনি কোথা যাবে বাবু?'
'কলকাতায়।'
'আমরাও যাব।'
'তোমার নাম কি?'
'দৌলত মিয়া।'
'হাত কাটল কি করে?'
'সে বাবু অনেক কথা।'

ঘড়ি দেখলাম, মোটে নটা পনেরো। ঠায় তিন ঘন্টা বসে থাকতে হবে। অথবা......

'সারারাতও এখানে কাটতে পারে বাবু। শালার টেরেনের কোনো ঠিক নেই।'

'তাই বটে। দোকান-পাট, ভেন্ডাররাও সব বন্ধ। কেন বলত?'

'সন্ধ্যায় এখানে খুব মারামারি হয়েছিল। দুটো দল খুব একচোট লাঠি বাজি করেছিল। বোম পটকা পড়েছিল। পুলিস ধর-পাকড় করে নিয়ে গেছে। তাই সব দোকান-পাট বন্ধ। ইস্টিশন মাস্টারও এতক্ষণে ঘুমোচ্ছে।'

'আমাকে বলেছেন রাত বারোটায় গাড়ি আসবে।'

'ও শালা বুড়োর ঐ 'রহম' আশা দেওয়ার কথা। আমাকে বলেছে রেলের পাটি তুলে ফেলেছে। সে সব বলালে তবে।'

'ডাকাত ধরা পড়েছে নাকি?'

'হাঁ। তারা রেলের পাটি তুলে রেখে-ছিল।'

নিরাশ হয়ে পড়লাম। সারাদিনের ক্লান্তি, অবসাদ যেন শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করছিল। সন্ধ্যার পর মিটিং শেষ হল। সামান্য কিছু মিষ্টি খাইয়ে ছেলের দল রিকসায় করে এই স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে পবিত্র কর্তব্য পালন করে চলে গেল। হাতের ফুলের মালাটার দিকে মেয়েটি মাঝে মাঝে তাকাচ্ছিল। সেটাকে দূর করে ওর গায়ে ছুড়ে ফেলে দিতে ইচ্ছে করল। ঠেলে সরিয়ে রেখে আমি একটু আড় হলাম। ব্যাগের মধ্যে শতখানেক টাকা আছে তা নিয়ে আর এক রকমের ভয়।

মেয়েটার চেহারা ভাল। তবে চোখের কোলে কালি। মুখে যৌনক্ষুধা প্রকট। মেয়েটা ফুলের মালাটা হাতে নিয়ে একবার গভীর শ্বাস টেনে শুঁকল। তারপর 'আঃ!' করে খুশীর শব্দ করল মুখ থেকে। আবার মালাটা রেখে দিলে।

দৌলত মিয়া বললে, হাত দুটো না গেলে আমি কি আর এই 'অবস্থায়' পড়ে থাকি বাবু? খোকা চারশো টাকা মাইনে পেতাম। জাহাজের বড় 'মিস্তিরি' ছিলুম। কত চোরাই-মাল সাপ্লাই করতুম জাহাজ থেকে। রেডিও, ঘড়ি, টাইপ রাইটার, ক্যামেরা কত কি? হরদম বিলিতি মদ খেতুম। আর 'রান্ডী-মান্ডী' করে পয়সা ওড়াতুম। শেষে আমার মামু এসে পাকড়াও করে নিয়ে গিয়ে শালা মোর সাদি দিয়ে দিলে। ছোটবেলায় মা বাচ্চা রেখে মারা গেলে মামুর বাড়ি থাকতুম। মামুর বাড়ি থেকে কুড়িটা টাকা চুরি করে ধরা পড়ে মার খেয়ে সেই যে আঠারো কি বছর বেলায় শহরে পালিয়ে এনু আর যাইনি। পয়লা হোটেলের খানসামার কাজ করতুম খিদিরপুরে। চুরি করে বেশি 'গোস্ত' খেয়ে-ছিনু বলে হোটেলওয়ালা একদিন মারলে। আমিও গরম পানির জগ ছুড়ে তার মাথা ফাটিয়ে দিয়ে দে ছুট। তারপর হাওড়ার বেলিলিয়াস রোডের এক ঢালাই কারখানায় কাজ করনু এক বছর। সে কাজ ছেড়ে গেটু ডাক্তর মোটর কারখানায় কাজ শিখতে এলুম বাচ্চা বাজারে। সেখানে এক বুড়ো জাহাজী মিস্তিরির সঙ্গে দহরম-মহরম হল। সে আমাকে জাহাজে কাজ শিখালে। এ-জাহাজ সে-জাহাজে কাজ। কাজে আনন্দ পেলুম। বুড়ো মদ খাওয়াতে শেখালে। তারপর মিস্তিরি হয়ে গেনু মুই। তিন বছর বাদে বড় মিস্তিরি 'ইন্তেকাল' করলে (মারা গেলে) আমি তার 'পোস্টো' পেয়ে গেনু। তখন ভাল একটা বাসা নিইচি। একজন কাওয়াল আমার বাসায় থাকত। তার কাছেই কাওয়ালী গান শিখি। একদিন মামুর বাড়ি গেনু হঠাৎ সের পাঁচেক মেঠাই নিয়ে। তারা খুব খুশী। মামু, রোজগার করছি শুনে সাদী দিয়ে দিতে চাইলে। আমিও মত দিনু। কেন না বাইরের বেউশ্যা মাগীতে সুখ নেই। সব সময় শালা বড় 'ডেন্জার'। কতবার সোডার বোতল ফেটেছে মাথার ওপরে। একটা নবচা যুবতী মেয়ের টাটকা 'যৈবন' পাবার আশায় মামুর হাতে দুশো টাকা তুলে দিয়ে এনু। মামু দিনক্ষণ ঠিক করে মৌলবী ডেকে সাদি পড়িয়ে দিলে। তিন দিনের কনে এল মামুর বাড়ি। দেখা হয়নি তার শরীল, মুখ। তারপর সে বাপের বাড়ি চলে গেল। ফের মাস চারেক বাদে বউ আনতে গেলুম মুই। বউ এনে একরাত মামুর বাড়ি রইনু। বউটার নাম আকলিমা। বড্ড লজ্জাটে ঘোমটা খোলে না।'

কথা শুনে দৌলতের সঙ্গের মেয়েটি হাসতে লাগল।

আমি ওদের দুজনকে আবার সিগারেট দিলাম। নিজে ধরাবার পর খালি বাক্সটা ফেলে দিলাম দূর করে।

দৌলত মিয়া সোঁ সোঁ করে ধোঁয়া ছেড়ে নিয়ে জুত হয়ে একটু বসল। মেয়েটা গুয়ে নিতম্ব হেলিয়ে পাশ ফিরে শুয়ে সিগারেট টানতে লাগল, আড় চোখে তাকাতে তাকাতে। ওর গায়ে একটা লাল কুর্তো, একেবারে খাটো। পরনে একটা নীল রঙের ছাপা শাড়ি। মাথার চুলগুলো খোঁপা বাঁধা।

দৌলত মিয়া বলতে লাগল, 'বউ বড্ড লজ্জাটে! কিছুতেই মুখ দেখাতে চায় না। নানীকে বললুম, নাক চোখ নেই নাকি? চাপা খোলে না কেন? নানী বললে, বাসায় 'ফিরে' যেয়ে চোখ ভরসা করে দেখিস। দুটো 'কান', চারটে চোখ আছে। যাই হোক একটা কালো রঙের 'সিল্কের' বোরখা ঢেকে আমার 'পরিবার'কে নিয়ে তো শহরে আসব বলে বেরুলুম। রেল ইস্টিশনে টিকিট কেটে কৃষ্ণনগর থেকে সোনারপুর জংশনে গাড়ি বাঁধল। বউ কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বললে, 'পানি খাব।' আমি তাড়াতাড়ি একটা দোকান থেকে সোডা পানি এনে দিতে সে বোরখার মধ্যে লুকিয়ে নিয়ে খেতে লাগল। খাচ্ছে তো খাচ্ছেই শালা, আর ফুরোয় না। বললাম তাড়াতাড়ি করো, গাড়ি ছেড়ে দেবে—ঘন্টা বেজে গেছে। তারপর বোতলটা ছিনিয়ে নিয়ে ভেন্ডারের দিয়ে ছুটে আসতে গেলুম। 'টিরেন' গাড়ি তখন চলতে আরম্ভ করেছে। হঠাৎ কিসে ধাক্কা লাগল। হাতলটা ধরেও ধরতে পারলুম না শেষ কামরাটার। পড়ে গেলুম তলায়। হাত দুটো কখন কেটে গেল জানি নি। পড়বা মাত্তেরেই আমি মনে করেছিনু মরে গেছি। জ্ঞান হল হাস-পাতালে, দুদিন পরে। বউ কোথা জিগেস করতে নার্সের মেয়েরা হাসতে লাগল। বোরখা ঢাকা সেই বউ আমার সাতশো টাকার সোনার গয়না নিয়ে কোথায় চলে গেল তা কেউ জানে না। তারও মা বাপ কেউ ছিল না। মামুর বাড়ি মানুষ! তার মামুরাও খোঁজ পায়নি। আমার 'অবস্থা' দেখে সবাই আফসোস করতে লাগল। দিন কতক মামুর বাড়িতে রইলুম। তারপর তারা দূর ছি করতে লাগল।'

মামী বলবে, 'ভিখ মাগো যেয়ে। রোজ রোজ কে বসিয়ে খাওয়াবে।'

'তাই ভিক্ষে করতে বেরুলুম। পথে চলতে চলতে খুব কাঁদলুম। আমার চারশো টাকার চাকরী—নতুন বোরখা ঢাকা গয়না মোড়া বউ—সব কোথায় চলে গেল। তারপর পথ থেকে পথে।'......

আমি শুধোলাম, 'তা এই মেয়েটি কে? কোথায় থেকে জোটালে?'

দৌলত মিয়া তার নুলো হাতটা দিয়ে তার মুখটা একবার মুছলে। বললে, ওর নাম পিয়াসী। ওদের একটা মাগীর দল ছিল। একটা বুড়ো ঢোলক বাজাত আর ওরা নাচ-গান করত। বুড়োর নাতনী পিয়াসী। আমি ওদের গান শুনে বললুম আমাকে তাদের দলে ঠাঁই দিবি—কাওয়ালী গাইতে পারি। আমার কাওয়ালী শুনে ওরা খুব আদর করলে। পিয়াসীও গাইতে পারে খুব ভাল। বাজাতে পারে। নাচতে পারে। আমার কাওয়ালীতে বেশ উপায় হতে লাগল। যখন আমি ওদের দলে ভিড়ি তখন সবে পিয়াসীর 'যৈবন' এয়েছে। ওর 'যৈবনে'র দিকেই মানুষের লক্ষ্য। ভদ্দর-লোকরা গান শোনে বটে কিন্তুন শালা ওর দিকেই চেয়ে থাকে।'

পিয়াসী চিত হয়ে শুয়ে হাতের একটা ধাক্কা দিলে দৌলতকে। তার শরম লেগে গেছে ওর কথায়।

'তা সত্যি কথা বলতে কি বাবু, পিয়াসী শুনলে হয়তো চটে যাবে—আজ আমি বলছি একটা মস্ত পাপ আমি করে-ছিনু।'

কৌতূহলী চোখে পিয়াসী তাকাল দৌলত মিয়ার দাড়িভরা গুরুগম্ভীর মুখ-টার দিকে।

দৌলত বললে, গাছতলায় আমরা এক-দিন ঘুমুচ্ছিলাম। পিয়াসীর সঙ্গে তখন আমার দেহের মিল মনের মিল হয়েছিল। ঠিক করেছিলুম দুজনে পালাব। দুজনের আলাদা উপায় বেশি হবে। সুখে থাকব। তিনটে 'যৈবন' যাওয়া আধ বুড়ীদের আমরা টানব কেন? আর আমি নিজে ভাবলুম—এই বুড়োটাকেই আগে সরানো দরকার। কি করে মারব ভাবতে লাগলুম। গাঁয়ের সেই নির্জন মাঠে রাত্তিরে হঠাৎ বুড়োর গলাটা পা দিয়ে চেপে ধরে, মুখে কাপড় চেপে মেরে ফেললুম। শালার বুড়ো জ্বরে ভুগ-ছিল। কাহিল চেহারা। শুধু বার দুই যে রকম গাঁক গাঁক করে উঠেছিল ভয়েই আমার?......'

'পিয়াসী বললে, 'হারামী!' তারপর সে একদিকে বেঁকে বসে রইল।

দৌলত মিয়াও শুয়ে পড়ল কাঁথা মুড়ি দিয়ে। এগারোটা বেজে গেছে।

পিয়াসী কাঁদতে লাগল ফুলে ফুলে।

দৌলত বললে, 'শুয়ে পড়। নিদ যা। ট্রেন আজ আসবে না।'

সিগারেটও নেই।

দোর খুলে বাইরে এলুম। চারদিকে কুয়াশা। একটু দূরে একটা আলো, অনেক শ্যামা পোকা জমেছে তার চারপাশে।

পিয়াসীও বাইরে এল। দাঁড়িয়ে রইল আলো-আঁধারীতে।

পিয়াসী কাছে এসে বললে, 'একটা টাকা দিবি বাবু?'

আমি দ্বিধায় পড়লুম। যেন শুনতে পাইনি এমন ভান করলুম। সে আবার বললে, 'ফুলের মালাটা তুমার বউকে দিবে?'

'না। তুমি নিতে পার।'

'আমারে দিবি বাবু তুই?'

'হ্যাঁ।'

'একটা টাকা দিবি?'

'দৌলত মিয়া কিছু বলবে না?'

'না।'

'দোর। ওরা গান শোনা তবে। গাড়ি আসবে না।'

ঘরের মধ্যে দুজনে ঢুকে পড়লাম আবার।

পিয়াসী ঢোলক কোলে নিয়ে বাজাতে শুরু করলে আস্তে আস্তে। তার হাতের সবুজ লাল চুড়িগুলো দুলতে লাগল।

দৌলত বললে আপনি কি করো বাবু?'

'কিছু না।'

'পয়সা আছে?'

'না।'

'তবে পুলিসের লোক নাকি?'

'তাতে ভয় কি?'

'না ন্যাংটোকে আবার বাটপাড়ের ভয় কিসের!'

পিয়াসী বললে, 'বাবু গান শুনবে। তুই গা না মরদ।'

দৌলত মিয়া গান ধরলে। কাওয়ালী গান। ঢোলক বাজাতে লাগল পিয়াসী। চমৎকার গায় দৌলত মিয়া। অপূর্ব গলা। মেয়েটাও গাইল। রাত একটা পর্যন্ত আমি তাদের গান শুনলাম। দুটো টাকা দিলাম তাদের। খুব খুশী হল তারা।

চোখে ঘুম জড়িয়ে আসছিল। আলোটা নিভিয়ে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম। ওরা নিচে পাশাপাশি দুজনে শুয়ে আছে। বাইরে পোকা মাকড় ডাকছে।

ওরা কি যেন বলা বলি করছে ফিস-ফিস করে।

সন্দেহ হল। আমি ঘুমোলে দুজন চোরে আর পালাতেও ত পারে? টাকা-পয়সা নিয়ে পালাবে। পিয়াসীর মতলব বুড়ো-টাকেও তো মেরে ফেলেছিল।

শুধু ঘুমোবার ভান করে নাক ডাকতে লাগলাম।

হঠাৎ ঘণ্টা বাজতে লাগল।

ট্রেন এল তিনটের সময়। আলো জ্বেলে দিলাম। ওরা অঘোরে অচেতনভাবে পড়ে ঘুমোচ্ছে। পিয়াসী একখানি হাত দিয়ে গলা জড়িয়ে আছে দৌলত মিয়ার। দৌলত মিয়ার কাঁধ থেকে কাটা হাতটা পিয়াসীর গায়ে পড়ে আছে।

অপূর্ব দৃশ্য!

জগতে আমার এরাই সুখী।

তাড়াতাড়ি ট্রেন ধরতে হবে। ওদের আর ডাকলাম না। চলে এসে ট্রেনে উঠলাম।

—আব্দুল জব্বার

ইউনিয়ন

মস্কো থেকে প্রকাশিত

সচিত্র মাসিক পত্রিকা

এই জনপ্রিয় পত্রিকাটি ইংরেজী, হিন্দী ও উর্দুতেও প্রকাশিত হচ্ছে। সোভিয়েত দেশ ও তার জনগণের জীবনের সর্বাঙ্গীণ পরিচয় পাঠকদের সামনে উপস্থিত করবে এই পত্রিকাটি।

উপহার

প্রত্যেক গ্রাহককে একখানা করে ১৯৭১ সালের বহুবর্ণ রঞ্জিত ১২ পৃষ্ঠার ক্যালেণ্ডার দেওয়া হবে। ক্যালেণ্ডার সংখ্যা সীমিত। এখনই গ্রাহক হোন।

চাঁদার হার

১ বৎসর	···	৭.০০
২ বৎসর	···	১১.০০
৩ বৎসর	···	১৪.০০
প্রতি সংখ্যা	··	০.৭৫

পত্রিকা না পেলে, অথবা কোন গোলযোগ হলে, অথবা ঠিকানার পরিবর্তন হলে, সংশ্লিষ্ট এজেন্টকে লিখুন।

অধিকৃত এজেন্ট

মনীষা গ্রন্থালয় (প্রাঃ) লিঃ, ৪/৩-বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

ন্যাশনাল বুক এজেন্সী (প্রাঃ) লিঃ, ১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

ADMARK

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

উৎসবান্তিক

আরেকটি দুর্গোৎসব কেটে গেল। কেটে গেল সেই সঙ্গে শ্যামছায়াঘন দিন। বর্ষণ-মুখরিত সদা সন্ত্রস্ত শহরের রূপই পাল্টে গিয়েছিল। প্রসাধন যেমন কুরূপাকে সুন্দরী করে তোলে, প্রাচীনা নগরীর সমস্ত কদর্যতা ঢেকে দিয়েছিল দুর্গাপুজোর উন্মাদনা।

তিন দিনের উৎসব, কিন্তু তার পিছনে প্রস্তুতি অনেক দিনের। প্রাচীনকালে এই প্রস্তুতিপর্বের সূত্র হত রথযাত্রার দিন থেকে; এখন যে কবে থেকে হয় তা বলা কঠিন। দর্জিরা সাজ-পোষাক সেলাই করতে বসে বৈশাখ মাস থেকেই, বোম্বাই-এর মিলওয়ালা কাপড় যোগান দিতে সুরু করে প্রায় ঐ একই সময় থেকেই। তারপর আছে জুতো-মোজা ইত্যাদি। জিনিষপত্রের দর বেড়েছে ভীষণ ভাবে, ছোট ছেলে-মেয়েদের ফ্রক একালে পাঁচ সিকেয় পাওয়া যায় না, আর জুতোর দাম আকাশ-ছোঁওয়া: সাতাশ-আটাশ টাকা দামের জুতোর চামড়ার সম্পর্ক নেই। শাড়ি, ধুতি ইত্যাদির কথা বাদ দিয়ে একখানি গামছার কথা যদি ভাবা যায় তাহলেই যথেষ্ট, একটি যেমন-তেমন গামছার দাম তিন থেকে চার টাকা। কিন্তু এমনই মজা কিছুই পড়ে থাকে না, দোকানে ভীড় হয়। সিনেমাষ্টার-বৃন্দই বর্তমানকালে কলকাতার মর্তলোকে অন্যতম দেব-দেবী। তাই তাঁরা দোকানে বসে সিগারেট খাইয়ে কাপড় পছন্দ করছেন এমন বিজ্ঞাপনও কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায়। মোটকথা পুজোর উৎসব মানে কেনা-বেচার উৎসব। অর্থনীতির দিক থেকে ভালো কি মন্দ তার বিচার করবেন অর্থনীতিবিদ্‌রা। আমরা সাধারণ মানুষ তাই খালি-চোখে সমস্ত উৎসব অনুষ্ঠানের পিছনে একটি বহুদূর বিস্তৃত ব্যবসাদারি পরিকল্পনার সুনিপুণ ব্যবস্থা সহজেই দেখতে পাই। এক হিসাবে এই যে, উৎসবকেন্দ্রিক ছোট-খাটো কারবার তার মূল্য অসীম। কর্মহীন বাঙালীসমাজে রুজি-রোজগারের ব্যবস্থা সীমিত। সেইখানে এই ধরণের উৎসবকে কেন্দ্র করে যদি কিছুলোকের অন্ন হয় তাহলে উৎসবের মধ্যে একটা কল্যাণহস্তের স্পর্শ পাওয়া যায়। শুধু কি সাজ-পোষাক? ডাল-পটল শাকসব্জি, মাছ-মাংস, মিষ্টান্ন এবং দধি প্রভৃতি বাঙালীজীবনের অতি আবশ্যকীয় সামগ্রীগুলির দর এবং কদর যেভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে তা কি কেউ কোনোদিন কল্পনা করতে পেরেছিল? কিন্তু বাঙালীজীবনে সবটাই স্থূলরসের কারবার নয়, এর একটি সূক্ষ্ম দিকও আছে এবং সেই দিকটি গত কয়েক বছরে যেভাবে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে তাতে বাঙালী মাত্রেরই আনন্দিত হওয়ার কারণ আছে।

শারদীয় আনন্দকে কেন্দ্র করে সাহিত্য-সম্ভার পরিবেশনের রীতি নূতন নয়। আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর পূর্বেও শারদীয় সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে এবং সেই সব বিশেষ সংখ্যায় বিশেষ রচনাদি প্রকাশিত হয়ে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। স্বর্গতঃ হেমেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় 'কুন্তলীন পুরস্কার' নামক যে বাৎসরিক ছোটগল্প সংকলন প্রকাশ করতেন তা পুজোর সময় প্রকাশিত হত এবং অনেকেই জানেন রবীন্দ্রনাথের অনেক রচনা যেমন 'কুন্তলীন পুরস্কারের' বার্ষিকীতে প্রকাশিত হয়েছে তেমনই প্রকাশিত হয়েছে শরৎচন্দ্রের প্রথম দিকের রচনা। এছাড়া সেকালের বিশিষ্ট সাহিত্যিকরা সেই 'কুন্তলীন পুরস্কারে' গল্প লিখতেন।

পরবর্তীকালে 'হিমানী' প্রসাধন দ্রব্যের আবিষ্কর্তা স্বর্গতঃ জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'নিরুপমা পুরস্কার' বা বার্ষিকী প্রকাশ করতেন। ছবি-ছাপা এবং রচনা-সৌষ্ঠবে সেই বাৎসরিক পত্র ছিল অতুলনীয়।

'কেশরঞ্জন' নামক বিখ্যাত গন্ধ তৈলের প্রবর্তক স্বর্গতঃ কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেনের উদ্যোগে প্রকাশিত হত 'কেশরঞ্জন পুরস্কার'। কেশরঞ্জন পুরস্কার কিন্তু সাময়িক পত্র নয়, এই বাৎসরিক পত্রটিতে একটি মাত্র পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস থাকত। সেই সব উপন্যাসগুলি লিখেছেন সেকালের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক উপন্যাসকার স্বর্গীয় হরিসাধন মুখোপাধ্যায়। 'অমৃত' সম্পাদক শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষ মহাশয়ের ব্যক্তিগত

সংগ্রহে এই সব গ্রন্থাদির প্রায় সবই সংরক্ষিত হয়েছে।

১৩২৩-২৪ সালে 'আগমনী' নামে একটি শারদীয় বার্ষিক পত্র প্রকাশিত হয়। সেই বার্ষিক পত্রে রবীন্দ্রনাথ থেকে সুরু করে সেকালের সকল বিশিষ্ট লেখকের রচনা ও অবনীন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথের অনেক রঙিন চিত্র ছিল। এই পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন সাহিত্য সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি। সম্ভবতঃ ১৩২৮-২৯-এ বসুমতী সাহিত্য-মন্দিরের স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টায় মাসিক বসুমতী প্রকাশ সুরু হল। সম্পাদকীয় কাজকর্ম তখন দেখাশোনা করতেন বিখ্যাত সাংবাদিক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। হেমেন্দ্রপ্রসাদ এবং সতীশচন্দ্র প্রকৃতিতে রক্ষণশীল হলেও, মাসিক বসুমতীতে শরৎচন্দ্র, প্রমথ চৌধুরী প্রভৃতির রচনাবলী নিয়মিত প্রকাশিত হত। বসুমতীর উদ্যোগে 'বার্ষিক বসুমতী' কয়েক বছর প্রকাশিত হয়। সেই জাতীয় পত্রিকা একালে প্রকাশ করতে হলে তার দাম অন্ততঃ দশ টাকার কম হত না। রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি নাটক এবং কবিতা বার্ষিক বসুমতীতে প্রকাশিত হয়। এছাড়া অবনীন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, অমৃতলাল বসু, জলধর সেন প্রভৃতি সেযুগের প্রখ্যাত লেখক-লেখিকার গল্প-কবিতা এবং বিখ্যাত শিল্পীদের ছবিও প্রকাশিত হয়েছে।

সাপ্তাহিক পত্রগুলির বিশেষ সংখ্যা একটু আয়তনে বৃদ্ধি পেয়ে নির্বাচিত রচনা-গৌরবে সজ্জিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে বহুবর্ণে মুদ্রিত হয়ে। সংবাদপত্রের আলাদা কোনো সংস্করণ প্রথমদিকে হত না, দৈনিক পত্রিকার একটি সংখ্যা ৪০—৫০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত বৃদ্ধি পেত। তারপর অসহযোগ আন্দোলনের অবসানের পর ১৩৩২-৩৩ সাল থেকে কোনো কোনো সংবাদপত্র পূজার বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করতে সুরু করেন। এই সব সংখ্যাগুলি সাইজে প্রতিদিনের সংখ্যার অর্ধেক হত। কিন্তু সেই আকৃতিও ঢাউস। তথাপি সুনির্বাচিত রচনাবলীর গুণে সেই সব পত্রিকার মূল্য ছিল অসীম। 'বঙ্গবাসী' বা 'বাংলার কথা' নামক দৈনিকের ভারপ্রাপ্ত সাহিত্য-সম্পাদক ছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র শারদীয় সংখ্যার গোড়ার দিকের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ছিলেন বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় এবং 'যুগান্তরে'র শারদীয় সংখ্যার প্রথম যুগের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ছিলেন প্রবোধকুমার সান্যাল।

সেকালের পত্রিকাগুলি একটি বাঁধাধরা ছক মেনে চলত। সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক প্রবন্ধাবলীর সঙ্গে থাকত খ্যাতিমান নবীন ও প্রবীণ লেখকদের গল্প ও কবিতা। পত্রিকাগুলি প্রকাশিত হত মহালয়ার দিন।

ক্রমে এই সব শারদীয় সংখ্যার চাহিদা বৃদ্ধি পেল। ভারপ্রাপ্ত সম্পাদকগণ পাঠক সম্প্রদায়ের পরিবর্তনশীল রুচির সঙ্গে তাল রেখে পত্রিকার আভ্যন্তরীণ বিষয়বস্তুর রূপান্তর ঘটালেন। অনেক নতুন লেখক আবিষ্কৃত হল। শারদীয় সাহিত্যের ফসল বাংলা সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি করল। অনেক পরিচিত নাম যেমন হারিয়ে গেল অনেক নতুন নাম জেগে উঠল। অনেক নতুন গল্পকার অনেক নতুন কবির আবির্ভাব ঘটল।

রূপান্তর ঘটতে সুরু করেছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কাল থেকে। দেশবিভাগের পর সেই রূপ আরো পাল্টে গেল। বক্তব্য স্পষ্ট হল, চিন্তার ক্ষেত্রে অভিনবত্ব দেখা দিল। বাংলা সাহিত্যের নতুন দিগন্ত আবিষ্কৃত হল।

সাহিত্য বিকৃতি অবশ্য ঘটেছে, একথা অস্বীকার করে লাভ নেই। সিনেমার প্রসারের সঙ্গে অল্পশিক্ষিত সমাজের মধ্যে পড়াশোনার আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে, তাদের সেই ক্ষুধা নিবৃত্ত করার জন্য উৎকৃষ্ট মিষ্টান্নের পরিবর্তে মুখরোচক তেলেভাজা আমদানী করা হয়েছে। ফলে শারদীয় উৎসব উপলক্ষে প্রকাশিত সাহিত্য সম্ভারের সবটুকুই যে সাধু তা বলা যায় না। আর সিনেমা পত্রিকায় পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস দেওয়ার রেওয়াজ হওয়ার পরে সাহিত্য সাময়িকীগুলিতেও উপন্যাস দেওয়ার রীতি চালু হয়। এখন সিনেমা পত্রিকায় যদি দশখানি উপন্যাস এবং পাঁচখানি উপন্যাসোপম কাহিনী থাকে তাহলে সুরুচিসম্পন্ন উঁচুদরের পত্রিকায় পাঁচখানি উপন্যাস দিতে হয়। এই রীতিরও সুফল আছে। শারদীয় উৎসবের অবকাশে আগামী একটি বছরে কি কি উপন্যাস গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হবে তার একটা হদিশ পূজোর সময় পাওয়া যায়।

মোটকথা শারদীয় উৎসব আমাদের [illegible] বাঙালী জীবনে এক প্রসন্ন আশীর্বাদ। এই উৎসবের পরিবেশে আত্মীয় বন্ধু, অগ্রজ, অনুজ, শত্রু-মিত্র সকলকেই যথাযোগ্য সম্ভাষণ জ্ঞাপনের রীতি আছে। আমরাও 'অমৃতে'র অগণিত পাঠকবৃন্দকে আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অকুণ্ঠিত প্রীতিনন্দন জানাই।

—অভয়ঙ্কর

সাহিত্যের খবর

আফ্রো-এশীয় পশ্চিমবঙ্গ প্রস্তুতি সম্মেলন—আগামী ১৬ নভেম্বর থেকে দিল্লীতে যে চতুর্থ আন্তর্জাতিক আফ্রো-এশীয় লেখক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে, তার সমর্থনে গত ৪ ও ৫ অক্টোবর কলকাতা তথ্যকেন্দ্রে পশ্চিমবঙ্গ প্রস্তুতি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বিশেষ অতিথি হিসেবে মুলক রাজ আনন্দ এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। এ-ছাড়া উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম বাংলার বিশিষ্ট কবি লেখকরা। এক প্রস্তাবে এই সম্মেলনকে স্থায়ী সংগঠন করবার সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

রুশ সাহিত্যিকের নোবেল পুরস্কার লাভ—রুশ সাহিত্যিক সলঝেনিৎসিন এ-বছর সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেছেন। তাঁকে এই সম্মানে সম্মানিত করতে গিয়ে সুইডিশ আকাদমি বলেছেন: 'আলেকজাণ্ডার সলঝেনিৎসিন আমাদের কালের দস্তয়েভস্কি।' যাই হোক, সলঝেনিৎসিন যে পুরস্কার পেয়ে খুব খুশি হয়েছেন, তাতে সন্দেহ নেই। মস্কোতে একজন সুইডিশ সাংবাদিককে তিনি বলেন—'এই সিদ্ধান্তের জন্য আমি কৃতজ্ঞ। আমি স্টকহোমে গিয়ে নিজেই পুরস্কার গ্রহণ করবো।'

সলঝেনিৎসিনের জন্ম ১৯১৮ সালে। তাঁর জন্মের আগেই তাঁর বাবার মৃত্যু হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। লেনিনগ্রাদ যুদ্ধে তাঁর ভূমিকা ছিল খুবই প্রশংসনীয় এবং সেই সময়েই তিনি ক্যাপ্টেন হন। এর পরেই কিন্তু তাঁর মধ্যে একটা পরিবর্তন দেখা যায়। তিনি স্তালিনের আমলাতান্ত্রিক কার্যকলাপের সমালোচনা করে তাঁর এক বন্ধুকে একটি চিঠি লেখেন। শোনা যায়, এ-জন্যই নাকি তাঁকে আট বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

সলঝেনিৎসিনের একটি মাত্র উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে স্বদেশে। আর বাকী সবগুলি উপন্যাসই প্রকাশিত হয়েছে বিদেশে। তাঁর দুটি বিখ্যাত উপন্যাস 'দি ফার্স্ট সার্কল' ও 'ক্যান্সার ওয়ার্ড' রাশিয়ায় প্রকাশের অনুমতি পায়নি। আণ্ডারগ্রাউণ্ড পত্রিকা 'সমিজদৎ'-এর হাতে লেখা সংখ্যাগুলির মারফৎ নাকি স্বদেশেও কিছু কিছু প্রচারলাভ করে। পরে সেগুলি গিয়ে পড়ে পশ্চিমের কোন সমালোচকের হাতে। তাঁরাই সেগুলি সুন্দরভাবে ছাপিয়ে প্রকাশ করেন। তাঁর একমাত্র উপন্যাস, যেটি রাশিয়ায় [illegible]

CENTRAL LIBRARY

অনুমতি পেয়েছিল, তার নাম 'ওয়ান ডে ইন দ লাইফ অব ইভান দেনিসোভিচ'।

সুতরাং এই বার সাহিত্য রচনা নিয়ে অবশ্য, তাঁর নোবেল পুরস্কার লাভে যে সেই দেশের লোকেরা ক্রুদ্ধ হবেন, তাতে আর সন্দেহ কি? পাস্তারনাকের নোবেল পুরস্কার লাভের পরেও অনুরূপ সমালোচনার ঝড় উঠেছিল এবং তিনি পুরস্কার নিতে পারেন নি। কারণ, রুশ কর্তৃপক্ষ তাঁকে বাধা দিয়েছিল। সলঝেনিৎসিন-এর ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে, এর মধ্যেই সোভিয়েট লেখক সঙ্ঘ এর প্রতিবাদ করেছেন। তাঁরা মনে করেন, এই পুরস্কার প্রদানের ব্যাপারে রাজনৈতিক ব্যাপারটাই প্রাধান্য বিস্তার করেছে। অবশ্য পাস্তারনাক ও সলঝেনিৎসিনের মধ্যে এ-ব্যাপারে তুলনা করাটা ঠিক নয়। কেননা, পাস্তারনাক অনেক দীর্ঘ পরিচিত ছিলেন এবং স্বদেশে তাঁর খ্যাতিও ছিল যথেষ্ট। ৫২ বৎসর বয়স্ক সলঝেনিৎসিনের তা নেই। তাছাড়া, তাঁর রচনায় পাস্তারনাকের মত মানবিক আর্তির প্রকাশ তত প্রবল নয়। প্রসঙ্গতঃ 'ক্যান্সার ওয়ার্ড' উপন্যাসটির কথা ধরা যাক। গত বছর এই বইটি প্রকাশিত হয়েছে। কাহিনী গড়ে উঠেছে সোভিয়েট রাশিয়ার এমন একটি ক্যান্সার হাসপাতালকে নিয়ে। সেখানে বেডের চেয়ে রোগীর সংখ্যা অনেক বেশী। সুতরাং সুব্যবস্থার অন্ত নেই। ডাক্তার, নার্স বা অন্যান্য কর্মচারীরা যেন রোগীদের মানুষ বলেই গণ্য করেন না। আর ডাক্তার এবং নার্সদের ব্যবহার খুবই অমানবিক। চিকিৎসার দোহাইতেই তারা রেডিও সাকশনের সাহায্যে চিরফোঁড় করে দেয়। ফলে রোগীর অবস্থা আরো মুমূর্ষু হয়ে ওঠে। এইসব রোগীদের নিয়েই গড়ে উঠেছে এর কাহিনী। সলঝেনিৎসিন নিজেও ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। বোধ হয়, এই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা তাঁকে এই উপন্যাস রচনায় অনুপ্রাণিত করে থাকবে। যাই হোক, এই কাহিনীর মধ্যে সোভিয়েত সমাজ-ব্যবস্থার মারাত্মক ত্রুটির দিকগুলি নির্দেশ করা হয়েছে। এইসব দিকগুলি যে সব সময় যথার্থ হয়, এমন নয়। ভারতবর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে এ কথাগুলি বিশেষভাবেই মনে পড়ে। ভারতীয় জীবন ও সমাজের অসঙ্গতি এবং অপ-প্রচারমূলক ভারতীয় লেখকদের লেখা বইগুলিই নাকি পাশ্চাত্য দুনিয়ায় বেশি অভিনন্দিত। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশংকর, প্রেমেন্দ্র মিত্র বা জয়দেব-এর চেয়ে যেখানে নীরদচৌধুরীর কদর বেশি। সুতরাং সব সময়েই বাক্-স্বাধীনতার নামে একই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা ঠিক নয়। আসলে সাহিত্যিকের বিচার হবে তাঁর সাহিত্যের যথার্থ মূল্যায়নে। সলঝেনিৎসিনকেও তাই এই হট্টগোলের বাইরে রেখে তাঁর সাহিত্যিক মূল্যায়নে আমাদের তৎপর হতে হবে।

রবীন্দ্র সাহিত্য সভা—গত ৭ সেপ্টেম্বর রবীন্দ্র অ্যাকাডেমির উদ্যোগে রবীন্দ্র সাহিত্য পরিষদের উনিশতম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে পৌরোহিত্য করেন অধ্যাপক বিনয় ঘোষ এবং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শ্রীসত্যকিঙ্কর দত্ত। সভাপতির ভাষণে অধ্যাপক ঘোষ সমকালীন বাংলা সাহিত্যের গতি-প্রকৃতির উপর তাঁর মন্তব্য উপস্থাপন করেন। সম্মেলনে বর্ধমানের বিশিষ্ট কবি-লেখকরা তাঁদের স্ব-রচিত রচনা পাঠ করেন। এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনা সপ্তাহও পালন করা হয় মেমারী ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসের সৌজন্যে।

মোহিতলালের স্মরণে—প্রখ্যাত কবি-সমালোচক মোহিতলালের স্মরণে সম্প্রতি দক্ষিণ কলকাতার একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পৌরোহিত্য করেন শ্রীকুমারেশ ঘোষ। বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডঃ তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়। মোহিতলালের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে তিনি বলেন—'রবীন্দ্রনাথের পর বাংলা-সাহিত্যে মোহিতলাল অন্যতম প্রধান কবি-পুরুষ। বাংলা সমালোচনা সাহিত্যে তিনি দিয়েছেন নতুন দিগন্তের সন্ধান। সাহিত্য-শাস্ত্রকার হিসেবে তাঁর স্থান রবীন্দ্রনাথের ঠিক পরেই।' ডঃ ভবতোষ দত্ত তাঁর ভাষণে মোহিতলাল ও সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যের তুলনামূলক আলোচনা করে তাঁর কবি-প্রতিভার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেন। ডঃ উমা রায়, কবিপুত্র অধ্যাপক মনসিজ মজুমদার, নাট্যনেতা জগন্নাথ প্রমুখও সভায় ভাষণ দেন। মোহিতলালের কবিতা আবৃত্তি করে শোনান শ্রীরথীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। সঙ্গীত পরিবেশন করেন গোপা কাঞ্জিলাল, মঞ্জুষা বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবানী সেন ও ধীরেন বসু।

বিদ্যাসাগর সাহিত্য-সভা—বেলঘরিয়ার 'শিশুতীর্থ'র উদ্যোগে গত ৫ অক্টোবর স্থানীয় মডেল কে-জি স্কুল ভবনে বিদ্যাসাগর সার্ধ জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে এক সাহিত্য সভার আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, শিশুরাই এর সব। সভাপতি থেকে বক্তা পর্যন্ত। শিশু-সদস্য নাম্বরূপ চ্যাটার্জি এতে সভাপতিত্ব করেন।—গল্প, কবিতা, এবং বিভিন্ন রচনায় বিদ্যাসাগরের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন ভাস্কর সেন,… পিনাকী ব্যানার্জি, ত্রিদিব গোস্বামী, সন্দীপ গোস্বামী, প্রদীপ অধিকারী প্রমুখ। বড়দের মধ্যে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন শ্রীমনকুমার সেন ও শ্রীগোপাল দাস।

—চার্বাক

শারদ সাহিত্য

অভিনয় : সম্পাদনায় ছয় জনের সম্পাদক-মণ্ডলী। ১০১, হরিশ মুখার্জি রোড, কলকাতা—২৬। দাম : ৪-০০ টাকা।

বাংলাদেশে নাটক নিয়ে যতো হৈ-চৈ হয়, নাট্যসংক্রান্ত পত্র-পত্রিকা নিয়ে, বিশেষ করে সিরিয়াস কাগজ নিয়ে, তেমন কোন আলোচনা শোনা যায় না। অথচ নাট্য-আন্দোলনই শুধু নয়, সংস্কৃতি-আন্দোলনের ক্ষেত্রেও এইসব পত্র-পত্রিকার ভূমিকা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। 'অভিনয়' পত্রিকাটিও অত্যন্ত নিষ্ঠাসহকারে সেই গুরুদায়িত্বই পালন করছেন। বর্তমান শারদীয় সংখ্যাটি নাট্যরসিকদের কাছে বিশেষ আকর্ষণীয় হবে বলে মনে হয়; এ সংখ্যায় ৭টি পূর্ণাঙ্গ নাটক, ৩টি একাঙ্ক নাটক, ৫টি প্রবন্ধ ও ১টি চিত্রনাট্য। লেখকদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বিজন ভট্টাচার্য, কৃষ্ণ ধর, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, কবিতা সিংহ, রঞ্জনকুমার ঘোষ, সত্যেন মিত্র, উজ্জ্বল মজুমদার, যোগেশ দত্ত, নীতিশ মুখোপাধ্যায়, সুধাংশু দাশগুপ্ত, বরুণ গঙ্গোপাধ্যায়, অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

মানবমন (অক্টোবর সংখ্যা) সম্পাদক : ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ১০২।১ বিধান সরণী, কলকাতা—৩। দাম : ২-৫০ টাকা।

মনোবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞানের আধুনিক এবং পরিচ্ছন্ন ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'মানব মন'-এর বর্তমান সংখ্যাটি নানান কারণেই উল্লেখযোগ্য। এ সংখ্যায় লিখেছেন কণাদ শর্মা, ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, এস পি ত্যাপেজনিকোভ, ভ্যাদিমির দিমাকোভ, পরিতোষ গুপ্ত, ভাজেনতিন ইয়েরোফেয়েভ।

ক্রান্তি : সম্পাদক—বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, ৮বি কলেজ রো, কলকাতা ৯, দাম : ২-৫০ টাকা।

বর্তমান সংখ্যাটিতে প্রধানত লেনিন-বিষয়ক আলোচনাই প্রকাশিত হয়েছে এবং বেশির ভাগ প্রবন্ধই বিতর্কিত। লিখেছেন। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, সত্য চক্রবর্তী, বলেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়, সত্যপ্রিয় ঘোষ, ত্রিদিব চৌধুরী, মাখন পাল, অবিনাশ দাশগুপ্ত, বেলা দত্তগুপ্ত, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

সীমান্ত : সম্পাদক তরুণ সান্যাল ও গণেশ বসু, ৩২।২, হরতকিবাগান লেন, কলকাতা-৬। দাম : এক টাকা।

সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যের নৈরাজ্যবাদ, অসুস্থতার বিরুদ্ধে প্রগতিশীল সাহিত্যিকদের অন্যতম মুখপত্র 'সীমান্ত' সাহিত্য-ত্রৈমাসিকের বর্তমান সংখ্যাটি শারদ সংকলন হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। আলোচ্য সংখ্যার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গল্পটি হচ্ছে প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'মিতাবিনী'। অন্যান্য গল্প যাঁরা লিখেছেন তাঁরা হলেন

মিহির আচার্য, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, সুভাষ সিংহ, আবদুল জব্বার, চণ্ডী মণ্ডল। প্রবন্ধ লিখেছেন চিন্মোহন সেহানবীশ। রিপোর্টাজ রণেন মোদক। কবিতা লিখেছেন বিষ্ণু দে, অরুণ মিত্র, মণীন্দ্র রায়, রাম বসু, কৃষ্ণ ধর, তরুণ সান্যাল, চিন্ময় গুহঠাকুরতা, তুলসী মুখোপাধ্যায়, আশিস সান্যাল, সত্য গুহ, শিবেন চট্টোপাধ্যায়, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, শিশির সামন্ত, সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপেন রায়, দিগম্বর মাঝী, ধনঞ্জয় দাশ, অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, সুমিত চক্রবর্তী ও গণেশ বসু।

যুব-অভিযান : সম্পাদক গুরুদাস দাশগুপ্ত, ১০৭, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা।

যুবসমাজের পত্রিকা বলতে বিশেষ কোন কাগজ বাংলা দেশে নিয়মিত বেরোয় না। সেদিক থেকে যুব-অভিযানের প্রয়াস নিঃসন্দেহে আনন্দের। বর্তমান চতুর্থ সংখ্যাটি শারদ সংকলন হিসেবে বেরিয়েছে। প্রগতিশীল যুবসমাজের মুখপত্রের আলোচ্য সংখ্যায় লিখেছেন সুকুমার মিত্র, দেবেন দাশ, অন্নদাশংকর ভট্টাচার্য, দিলীপ বসু, মুহম্মদ আবুবকর, রণেন মোদক, স্বপ্না দেব, অমিতাভ দাশগুপ্ত, সিদ্ধেশ্বর সেন, সুকুমার মিত্র, গণেশ বসু এবং আরো অনেকে।

চিত্রাঙ্গদা : সম্পাদক : অজিতমোহন গুপ্ত। ৭২।১, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-১২। দাম—তিন টাকা।

প্রবন্ধ, স্মৃতিকথা, উপন্যাস, ভ্রমণকাহিনী, গল্প, রহস্য ও রোমাঞ্চ কাহিনী, কবিতায় সমৃদ্ধ সংখ্যাটিতে লিখেছেন বিনয় ঘোষ, পান্নালাল দাশগুপ্ত, নীরোদ রায়, জগদীশ ভট্টাচার্য, গোপাল ভৌমিক, পরিমল চক্রবর্তী, অহীন্দ্র চৌধুরী, নরেশ ভট্টাচার্য এবং আরো অনেকে।

শুকসারী : সম্পাদক মিহির আচার্য। ১৭২।৩৫, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা-১৪। দাম এক টাকা।

সাম্প্রতিক ছোটগল্প সম্পর্কে শচীন বিশ্বাসের আলোচনাটি মূল্যবান (এই সময়ের শিল্পরূপ : ছোটগল্প)। ফর্ম, টেকনিক ও কনটেন্টের বিচিত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কয়েকটি গল্প লিখেছেন অজিত মুখোপাধ্যায়, হিমাংশু রায়, বাসুদেব দেব, মানবেন্দ্র পাল, রবীন্দ্র গুহ, সাধন চট্টোপাধ্যায়, সুনীল দাশ, স্মরেশ দাশ, অমিয় চৌধুরী, আশিস সেনগুপ্ত, অশোককুমার সেনগুপ্ত ও গৌর বিশ্বাস। ইদানীংকালে প্রকাশিত গল্পপত্রিকাগুলির মধ্যে শুকসারীর রচনামান ও জীবনদৃষ্টি পাঠকের চিন্তাবোধকে নাড়িয়ে দেবে। একালের পাঠক হয়তো এমন একটি পত্রিকার জন্য অনুভব করবে গভীর মমতা ও আত্ম-সন্তুষ্টি।

বিশ্ববার্তা—সম্পাদক : কালীপদ চক্রবর্তী। ৪৪।৩, গড়চা রোড। কলকাতা-১৯। দাম দু টাকা।

লিখেছেন রমা চৌধুরী, কালিদাস রায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, প্রমথনাথ বিশী, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, নরেন্দ্র দেব, মনোজ বসু, সত্যজিৎ রায়, তপন সিংহ, ঋত্বিক ঘটক, সলিল সেন এবং আরো অনেকে।

মহিলা : সম্পাদিকা : আশা দেবী। ১২৩।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রোড, কলকাতা-৬। দাম : আড়াই টাকা।

মেয়েদের এই মাসিক পত্রিকাটির শারদ সংখ্যা থেকেই চব্বিশ বছর শুরু। দীর্ঘদিন ধরে এ পত্রিকাটি নানাভাবে বাঙালী মেয়েদের সেবা করে আসছে। উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনী, কবিতা, সাক্ষাৎকার, খেলা-ধুলা, রূপসজ্জা, সেলাইবোনা প্রভৃতির সমাহারে এই বিশেষ সংখ্যাটি মেয়েদের মনোরঞ্জন করবে সেকথা বলাই বাহুল্য। যাঁরা এই সংখ্যায় লিখেছেন তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য হচ্ছেন : ডঃ রমা চৌধুরী, আশাপূর্ণা দেবী, বাণী রায়, শৈলবালা ঘোষজায়া, হেনা হালদার, বেলা দেবী, সাধনা বসু, শিবানী বসু, রেণুকা দেবী, জয়ন্তী রায়, কনকলতা ঘোষ, সতীদেবী মুখোপাধ্যায়, হাসি গঙ্গোপাধ্যায়, সুজাতা প্রিয়ংবদা, হেনা চৌধুরী, লীলাবতী রায়, মীরা চট্টোপাধ্যায়, ইরা পাইন প্রমুখ।

কথাসাহিত্য—সম্পাদক : গজেন্দ্রকুমার মিত্র এবং সুমথনাথ ঘোষ। মিত্র ও ঘোষ। ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট। কলকাতা—১২। দাম সাড়ে তিন টাকা।

সুবৃহৎ আকারে প্রকাশিত শারদীয় কথাসাহিত্যের রচনাবৈচিত্র্য লক্ষণীয়। সম্পূর্ণ ধারাবাহিক উপন্যাস লিখেছেন নীহাররঞ্জন গুপ্ত এবং সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়।

কবিতা লিখেছেন কুমুদরঞ্জন মল্লিক, নলিনীকান্ত, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, গোপাল ভৌমিক, কৃষ্ণধন দে, উমা দেবী, বিমলচন্দ্র ঘোষ, আনন্দ বাগচী, অজাত চট্টোপাধ্যায় এবং অনেকে।

গল্প প্রবন্ধ অন্যান্য রচনা লিখেছেন অবধূত, কালিদাস রায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বিশী, পরিমল গোস্বামী, লীলা মজুমদার, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, বাণী রায়, হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীমধুসূদন ভট্টাচার্য, আশাপূর্ণা দেবী, প্রশান্ত চৌধুরী, আবদুল জব্বার, অমলতোষ মুখোপাধ্যায়, দক্ষিণারঞ্জন বসু, প্যারীচন্দ্র শর্মাচার্য, অনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায়, জরাসন্ধ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, মহাশ্বেতা দেবী। তাছাড়া সংখ্যাটির অন্যতম আকর্ষণ—দেবী চট্টোপাধ্যায় ও চন্দনা চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত বিভূতিভূষণের অপ্রকাশিত ডায়েরী।

কালি ও কলম—সম্পাদক : বিমল মিত্র। ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট। কলকাতা-১২। দাম—দু টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

গল্প কবিতা উপন্যাস প্রবন্ধ আলোচনায় আকর্ষণীয়। বীরেন্দ্রমোহন আচার্য (বিভ্রান্ত স্মৃতি), সবিতা সেনগুপ্ত (উপন্যাস), মানিক ঘোষ, স্বরজিৎ মুখোপাধ্যায়, দিলীপ মালাকার, ওঙ্কার গুপ্ত, দেবনারায়ণ গুপ্ত, সুভাষচন্দ্র সরকার, তারাজ্যোতি মুখোপাধ্যায়, অশোককুমার সেনগুপ্ত, আশিস সান্যাল, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, মণীন্দ্র রায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, গণেশ বসু, খোন্দকার ইলিয়াস আহমদ খান, আশুতোষ মুখোপাধ্যায় (গল্প), অরুণকুমার সেনগুপ্ত, বারীন্দ্রনাথ দাশ, হীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, নমিতা চক্রবর্তী, সুনীল রায়, অচ্যুত চট্টোপাধ্যায়, ছবি মুখোপাধ্যায়, চুনীলাল রায় এবং আরো অনেকে।

সারস্বত—সম্পাদক : অমিয়কুমার ভট্টাচার্য। ২০৬ বিধান সরণী। কলকাতা-৬। দাম—দু টাকা।

সাহিত্য ও সংস্কৃতিক বিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'সারস্বত'-এর বৈশিষ্ট্য শারদীয় সংখ্যাটিতে স্পষ্ট। প্রবন্ধ কবিতা এবং গল্প নির্বাচনে এঁদের রুচি স্বতন্ত্র স্বাদের। প্রবন্ধ লিখেছেন হারাণচন্দ্র নিয়োগী (প্রাচীন ভারতে সমুদ্র চিন্তা ও নরবলি প্রথা), প্রভাতকুমার গোস্বামী (লোকসংস্কৃতি প্রসঙ্গে), গণেশ লালওয়ানী (জৈন চিত্রকলা), রণেন নাগ (আন্তর্জাতিক বিনিময় ব্যবস্থার সংকট—পুঁজিবাদী উৎপাদনের পরিণতি), কুমুদ দাস (রাজমহলের যুদ্ধ ১৫৭৬) এবং নারায়ণ চৌধুরী (সমাজের বিবর্তনের পটভূমিকায় রাগ সংগীত)। কবিতা ও গল্প লিখেছেন বিষ্ণু দে, সুশীল রায়, অরুণ মিত্র, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, মণীন্দ্র রায়, চিত্ত ঘোষ, কৃষ্ণ ধর, জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়, দুর্গাদাস সরকার, তরুণ সান্যাল, অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, অমিতাভ দাশগুপ্ত, আশিস সান্যাল, গণেশ বসু, তুলসী মুখোপাধ্যায়, মিহির সেন, মানবেন্দ্র পাল এবং তপোবিজয় ঘোষ। বিদগ্ধ পাঠকমাত্রেই বইটি হাতে নিয়ে তৃপ্তি পাবেন।

গল্পকবিতা— সম্পাদক : কৃষ্ণগোপাল মল্লিক। ১৭।১ডি সূর্য সেন স্ট্রীট। কলকাতা—১২। দাম : এক টাকা।

এই বিশেষ সংখ্যাটিতে চিত্তিময় গল্প কবিতা মালা বিন্যস্ত লিখেছেন শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, প্রফুল্ল সেন, সুভাষ সিংহ, রবীন্দ্র গুহ, প্রবোধ রায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, গণেশ বসু, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ বাগচী, মৃণাল বসু চৌধুরী, রঞ্জিত রায় চৌধুরী এবং আরো অনেকে।

লেখা ও রেখা—সম্পাদক: ভাস্কর মুখোপাধ্যায়। ১২।১সি পাইকপাড়া রো। কলকাতা—৩৭। দাম : দু টাকা।

বাংলা দেশের অন্যতম সাংস্কৃতিক পীঠস্থান শান্তিপুর থেকে প্রকাশিত 'লেখা ও রেখা' প্রগতিশীল সুস্থ জীবন-দর্শনে অনুগত সাহিত্য-শিল্প পরিবেশন করছেন দীর্ঘ তেরো বছর। এটি হোল পঞ্চদশ বর্ষ প্রথম সংখ্যা। প্রবন্ধ লিখেছেন দেবব্রত মুখোপাধ্যায় (গৌড়), নন্দগোপাল সেনগুপ্ত (সংস্কৃতি ভাবনা : দ্বিতীয় প্রসঙ্গ), অরবিন্দ পোদ্দার (বাংলার রেনেশাঁস : কয়েকটি মন্তব্য), অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় (সত্যজিৎ রায়, একটি অবক্ষয়ের নিরীক্ষা), এবং রমেন নাগ (আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন প্রসঙ্গে)। গল্প এবং কবিতা লিখেছেন মনীশ ঘটক, মণীন্দ্র রায়, জগন্নাথ চক্রবর্তী, কৃষ্ণ ধর, অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, অজিতরঞ্জন দাশগুপ্ত, শান্তি চট্টোপাধ্যায়, রত্নেশ্বর হাজরা, ব্রজেশ মিত্র, শচীন বিশ্বাস, অশোককুমার সেনগুপ্ত, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, আশিস সেনগুপ্ত। কয়েকটি গ্রন্থ সমীক্ষা করেছেন মৃণাল দাশগুপ্ত, সুশান্ত বসু, অশোককুমার ভট্টাচার্য, রবীন ভৌমিক এবং কাবেরুল ইসলাম।

চতুষ্কোণ (আশ্বিন ১৩৭৭)—সম্পাদক-মণ্ডলী কর্তৃক সম্পাদিত। ৭৭।১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা—৯। দু টাকা।

প্রবন্ধসমূহ এই সংখ্যার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য আলোচনা লিখেছেন দীপেন্দু চক্রবর্তী (শিল্পীর অধিকার), অজিতকুমার সেন (প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে চীন প্রসঙ্গ), বিজনবিহারী ভট্টাচার্য (বৈজ্ঞানিক পরিভাষা ও বাগর্থবিধির গোড়ার কথা) এবং আরো অনেকে। অধিকাংশ প্রবন্ধের বিষয়ই বিতর্কমূলক। গল্প লিখেছেন জ্যোতিরিন্দ্র ঘোষ, মাধব চট্টোপাধ্যায়, ছবি বসু, মানবেন্দ্র পাল, অশোক সেনগুপ্ত ও দেবব্রত রায়। কবিতা লিখেছেন অরুণ মিত্র, কৃষ্ণ ধর, মণীন্দ্র রায়, আজিজ মাহমুদ, দুর্গাদাস সরকার, শামসের দে, অলোক বসু, তুলসী মুখোপাধ্যায়, অমিতাভ চট্টো-পাধ্যায় এবং আরো অনেকে। কয়েকটি মূল্যবান ভাস্কর্যের ছবি পত্রিকাটির ঐশ্বর্য বৃদ্ধি করেছে। প্রচ্ছদ চমৎকার।

দূরবিন্দু—সম্পাদক : অনিমেষ চট্টোপাধ্যায় এবং গৌরগোপাল দাস। বি—৫৯ রবীন্দ্রনগর। কলকাতা—১৮। দাম : এক টাকা।

লিখেছেন হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিতাভ চৌধুরী, রেবা হালদার, বেলা দে, অজয় রায়চৌধুরী, নির্মলেন্দু গৌতম, কৃষ্ণ ধর, গোপাল ভৌমিক, শান্তনু দাস, জয়ন্তী সেন এবং আরো অনেকে।

চিকিৎসক সমাজ : সম্পাদক : অমল ঘোষ হাজরা। ১৫১, আশুতোষ মুখার্জি রোড। কলকাতা—৩৫। দাম : তিন টাকা।

এই আকর্ষণীয় পত্রিকাটির বিষয়-বৈচিত্র্য ইতিমধ্যে পাঠকমহলে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। বিবিধ চিকিৎসাব্যবস্থা সম্পর্কে বিশেষ চিকিৎসকরা নিয়মিত লিখে থাকেন। শারদীয় সংখ্যায় গল্প কবিতা উপন্যাস এবং চিকিৎসা সম্পর্কে নানা ধরনের আলোচনা আছে। লিখেছেন দক্ষিণারঞ্জন ভট্টাচার্য, নীহাররঞ্জন গুপ্ত, জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়, অরুণ চক্রবর্তী, সত্যকাম, আনন্দকিশোর মুন্সী, নির্মল সরকার, বিশ্বনাথ রায় এবং আরো অনেকে।

জ্ঞান ও বিজ্ঞান : সম্পাদক : গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, পি—২৩ রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট। কলকাতা—৬। দাম : তিন টাকা।

লিখেছেন সতীশরঞ্জন খাস্তগীর, সুখদেব ভট্টাচার্য, নীলা মজুমদার, রমাপ্রসাদ দাস, অমূল্যরতন ভট্টাচার্য, অনুপকুমার রায়চৌধুরী, সুরেন্দ্রবিকাশ রায়, খগেন্দ্রনাথ দাস, প্রিয়দারঞ্জন রায়, শ্যামসুন্দর দে এবং আরো অনেকে।

কম্পাস—সম্পাদক : পান্নালাল দাশগুপ্ত। ১৪, কুদিরাম বসু রোড। কলকাতা—৬। দাম : দেড় টাকা।

কম্পাস পার্টিসিপেন্ট পত্রিকা নয়। রাজনীতি পর্যালোচনায় পত্রিকাটির ভূমিকা বিশেষভাবে চিহ্নিত। নানান বিষয়ে লিখেছেন বিনয় ঘোষ, জিতেন সেন, রেজাউল করীম, পুলকেশ দে সরকার, প্রফুল্ল গুপ্ত, অজিত ভট্টাচার্য, চিন্মোহন সেহানবীশ, রাখাল ভট্টাচার্য, অমিয়া সেন, দক্ষিণারঞ্জন বসু।

প্রবাহ—সম্পাদক : শৈলেন্দ্রনাথ বসু ও সুধেন্দু ভট্টাচার্য। ৩৮ মহাত্মা গান্ধী রোড। কলকাতা-৯। দাম—পঁচাত্তর পয়সা।

কয়েকটি বিতর্কমূলক আলোচনা এই সংখ্যাটির বৈশিষ্ট্য। নৃপেন্দ্র গোস্বামী, বিমলজ্যোতি মজুমদার, শৈলেন্দ্রনাথ বসু। কয়েক গল্প ও কবিতা আছে।

দুই বাংলার কবিতা—সম্পাদক : অঞ্জন সেন। পি ২০৯ লেক রোড। কলকাতা—২৯। দাম এক টাকা।

ত্রৈমাসিক 'সমরা'র এই শরৎকালীন সংকলনে দুই বাংলার কবিদের কবিতা, কাব্যনাটক, প্রবন্ধ ও আলোচনা আছে। কবিতাপিপাসু পাঠকদের কাছে পত্রিকাটি আদৃত হবে।

কিশলয়—সম্পাদক : নিখিলেন্দু চক্রবর্তী। নববারাকপুর।

কিশোর পাঠকদের উপযোগী গল্প, কবিতা, ছড়া, প্রবন্ধ কাহিনী সমৃদ্ধ।

কুশাঙ্কু—দীনেশচন্দ্র সিংহ। ১৪ বিবেকানন্দ রোড। কলকাতা-৬। দাম এক টাকা।

শারদীয় গল্প সংকলন। লিখেছেন মিহির সেন, নির্মল চট্টোপাধ্যায়, পিনাকীরঞ্জন গুহ, মদন পাল এবং আরো অনেকে।

প্রদীপ : বিপ্রদাস পালচৌধুরী জুনিয়র টেকনিক্যাল স্কুল। কৃষ্ণনগর। নদীয়া। সম্পাদক : সুনীল সরকার। প্রবন্ধ, কবিতা গল্প বিচিত্র রচনায় পূর্ণ।

সেন্টপলস স্কুল পত্রিকা—কুমুদরঞ্জন আচার্য এবং প্রণবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। সেন্ট-পলস স্কুল। ৩৩।১, আমহার্স্ট স্ট্রীট। কলকাতা—৯।

প্রাপ্তি স্বীকার

কার্মিক—সম্পাদক : গৌতম বাগচি এবং নৃপেন চক্রবর্তী। প্রেস কর্নার, ২৫, গোপীপাড়া লেন, কলকাতা—৬ থেকে ছাপা এবং ৯০ বাগুইআটি থেকে প্রকাশিত।

দিশারী—সম্পাদক : ভাস্করনারায়ণ চৌধুরী। ৩, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোড। কলকাতা—১৩। দাম : এক টাকা।

অভিনব অগ্রণী—সম্পাদক : দিলীপকুমার বাগ। ৮০, বৈষ্ণবপাড়া লেন। হাওড়া—১। দাম : এক টাকা।

উত্তরাধু—সম্পাদক : বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিশ্বনাথ দে। দাম : ত্রিশ পয়সা।

তথাৎ তথাৎ— সম্পাদক : পরিতোষ ভট্টাচার্য। ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট। দাম : কুড়ি পয়সা।

কেতু—সম্পাদক : দিলীপ চক্রবর্তী এবং রণজিৎ দাশগুপ্ত। আ:পানা প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স। কলকাতা—৯। দাম : ত্রিশ পয়সা।

জাহ্নবী—সম্পাদক : ত্রিদল। পায়রা ডাঙা। নদীয়া। দাম : কুড়ি পয়সা।

নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

(২৮)

সকাল থেকেই বিসর্জনের বাজনা বাজছে। দেবীর চোখে মুখে বিষণ্ণতা। তিনি আবার হিমালয়ে চলে যাচ্ছেন। আগমনী গান যে যার গাইবার এতদিন গেয়েছে। আর গাইবার কিছু নেই।

এইদিনে সব কিছুতে একটা বেদনার ছাপ। এত যে রোদ ঝিলমিল আকাশ, এত যে উজ্জ্বল দিন, কোথাও মালিন্য নেই—তবু কি যেন সকলের হারিয়ে যাচ্ছে। এই মণ্ডপের সামনে সকলেই এসে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকছে। বড় হুজুর সকাল থেকেই নাটমন্দিরে একটা বাঘের চামড়ার উপর বসে আছেন। পরিধানে রক্তাম্বর। কপালে রক্ত চন্দনের তিলক। এই দিনে—মা ভুবনময়ী, ভুবনমোহিনী হে মা জগদীশ্বরী, তুই একবার নয়ন ভরে তাকা মা—এমন প্রার্থনা এই মানুষের।

মেজবাবু এবারেও প্রতিবারের মতো ফ্লুট বাজাবেন। নগেন ঢালি এসেছিল ঢোল নিয়ে। সে গতকাল হাটে-বাজারে-গঞ্জে ঢোল পিটিয়ে চলে এসেছে।

এখন গ্রামান্তরে এই খবর রটে গেলে চাষী বৌর মুখের রঙ বদলে যায়। সকাল সকাল খেয়ে নিতে হবে। সেই শীতলক্ষ্যার তীরে গাঁ। জমিদার বাবুদের সব দালান-কোঠা নদীর পাড়ে পাড়ে। আঁচলে একটা চৌ-আনি বেঁধে, পানে ঠোঁট রাঙা করে ঘোমটা টেনে মুখে দশহরায় যাবে, যাবার আগে দিঘির পাড়ে বসে মেজবাবুর ফ্লুট বাজনা শুনবে। সকাল সকাল বের না হতে পারলে জায়গা পাওয়া যাবে না। নদীর পাড়ে পাড়ে যে সব জাম গাছ আছে, সে-সব গাছের নিচে রাত থাকতেই লোক এসে জমতে শুরু করেছে। চাষা মানুষেরা অথবা বৌরা সামিয়ানার নিচে যেতে পারবে না। কাছ থেকে দেখবে মেজবাবুকে এমন সখ এইসব দূরের চাষি বৌয়ের। কিন্তু সিপাইগুলো এমন ভয়, লাঠি নিয়ে এমন তাড়া করে কার সাধ্য ওরা সামিয়ানার নিচে গিয়ে বসে। কতবার চাষী বৌ ভেবেছে লুকিয়ে চুরিয়ে সে চলে যাবে সামিয়ানার নিচে, কাছ থেকে দেখবে মেজবাবুকে, ফ্লুট বাজনা শুনবে—কিন্তু তার মানুষ বড় ভীরু, সে কিছুতেই তার বৌকে ভিতরে ঢুকতে দেবে না। একটা ঝাউগাছের নিচে বসে ওরা বাবুর ফ্লুট বাজনা শুনবে। যতক্ষণ না নদীর জলে, সব গ্রামের প্রতিমা বিসর্জন হবে, ততক্ষণ মেজবাবু ক্রমাগত ফ্লুট বাজিয়ে যাবেন। একের পর এক সুর, সবই বড় তখন করুণ মনে হয়, নিরিবিলি এক জগৎ সংসারে কি যে কেবল বাজে, প্রাণের ভিতর কি যে বাজে—ফ্লুট শুনতে শুনতে তারা দুঃখী মানুষ হয়ে যায়।

সকাল থেকেই জায়গা নেবার জন্য দূর গ্রামান্তর থেকে লোকজন আসতে আরম্ভ করেছে। আমলা কর্মচারিদের কাজের বিরাম নেই। মঞ্চ করা হয়েছে। দিঘির পাড়ে এক মঞ্চ, রসনচৌকি যেন বাজবে সেখানে। সে মঞ্চে তিনি শীতলক্ষ্যার ও-পারে সূর্য ডুবে পড়লেই উঠে যাবেন। কলকাতা থেকে তাঁর আরও দুজন শিষ্য এসেছে। ওরাও বাজাবে। এখন খালেক কোথায়! খালেক পীড়িত। কাছারি বাড়ি পার হলে এক অশ্বশালা আছে, কিছু ঘোড়া আছে, সাদা রঙের কালো রঙের ঘোড়া, সেখানে আস্তাবলের এক পাশে খালেকের ছোট্ট ঘর। আলো নেই, বাতাস আসে না। সূর্য দেখা যায় না। খালেক সেই ঘরে শীর্ণকায় মানুষের মতো অনাহারী, দুঃখী এবং মুখে চোখে ক্লিষ্ট এক ভাব। খালেক চিৎ শরীর শক্ত করে পড়ে আছে। খালেক আজই সূর্যাস্তের সময় মারা যাবে। সে কিছু দেখতে পাচ্ছে না। তার শ্বাস কষ্ট হচ্ছে। হাত পা স্থবির। পাথরের মতো ভারি লাগছে সব। দশমীর দিন সেও ফ্লুট বাজায়, সেও মেজবাবুর পাশে বসে থাকে। আজ সে তার আঙুলগুলো এই দিনে নেড়ে নেড়ে দেখতে চাইছে পারছে না। ভারি ভারি—পাথরের মতো ভারি। ইব্রাহিম একবার দেখে এসেছে। ভূপেন্দ্রনাথ দুবার দেখে এসেছেন। ওষুধ অথবা পথ্য সে কিছুই খাচ্ছে না। সে যেন টের পেয়ে গেছে সূর্যাস্তের সময় ফ্লুট বাজলেই সে এক অদ্ভুত সুর লহরীর ভিতর ডুব দিতে দিতে পৃথিবীর যাবতীয় দুঃখ ভুলে যাবে। সে মরে যাবে। তবু সে এই দুঃসময়ে এটা তার দুঃসময় কি সুসময়, সে মনে মনে এটা সুসময় জানে, সে যেন কার পদতলে বসে সারাজীবন ফ্লুট বাজাবে তার জন্য তৈরি হচ্ছে।

যখন একটা মানুষ মরে যাবে বলে চিৎপাত হয়ে অশ্বশালার পাশে পড়ে আছে তখন একজন মানুষ আদিকালের এক তালপাতার পুঁথি সামনে রেখে পড়ে চলেছেন—ওঁ হ্রীং, ক্লীং হ্রীং। এই মানুষ মহালয়ায় চণ্ডীপাঠ করেন না। বিসর্জনের দিন চণ্ডীপাঠ। এমন উল্টো ব্যাপার ভূভারতে কবে কে দেখেছে। তিনি পদ্মাসন করে বসেছেন। বাঘছালের উপর বসে। সামনে দেবীপ্রতিমা। বিসর্জনের বাজনা বাজছে। তিনি উচ্চস্বরে বললেন, হে জগদম্বে হে মা ঈশ্বরী বলে দুই হাত ধরে যেন বলে চলেছেন অপরাধ ক্ষমা করতে আজো হয় মা। তুই আজ চলে যাবি, ও মা উমা, এই বুঝি তোর ইচ্ছা ছিল, বলে শিশুর মতো করজোড়ে তিনি কাঁদতে থাকলেন। এবং কাঁদতে কাঁদতে তিনি শুম্ভ নিশুম্ভ বধে চলে এলেন। কখনও মধু কৈটভ বধে। দেবীর পা ধরে কি তেজ স্বরে বলছেন। দেবীর কাঁপে থরথর। কি গো মা তুই ভয় পেলি, তিনি পাঠ

CENTRAL LIBRARY

করতে মাঝে মাঝে এইসব স্বগতোক্তি করছেন।—হে মা তুমি এখন মধু পান কর। থেমে তিনি বললেন মধু পান নিমিত্ত শরীরে অপার শক্তি সঞ্চয় করছ—মা দেবী সর্বভূতেষু, দেবী তোমার নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে হাজার হাজার দেবসেনা সৃষ্টি হচ্ছে, তারা যে সব মুহূর্তে বিনাশ হয়ে গেল মা! মহিষাসুর নিমেষে সব ধ্বংস সাধন করছে। মা তোর বুদ্ধি এই কপালে ছিল, মায়াপাশে আবদ্ধ করতে পারলি না! বলে তিনি যে সব ভক্ত পাশে বসে চণ্ডীর ব্যাখ্যা শুনছিল, তাদের ব্যাখ্যা করার সময়ই দেখলেন, এক বালক নাটমন্দিরের পশ্চিমের বারান্দায় বড় একটা থামের আড়ালে ঈশমের গল্পের মতো মনোযোগ দিয়ে চণ্ডী পাঠ শুনছে। সেই এক কিংবদন্তী, গর্জে গর্জে কে গর্জন করছে! দেবীর গর্জন না অসুরের।

এই বৃহৎ সংসারে তিনিই সব। অমলা কমলার ঠাকুর্দা প্রতাপশালী মানুষ। একমাত্র দেবীর সামনে এসে তিনি শিশু বনে যান। শিশুর মতো কাঁদেন। কেবল ক্ষমা ভিক্ষার মতো মুখ। সেই মুখে, চণ্ডীপাঠের সময় গর্জে গর্জে এমন শব্দ উচ্চারণে সোনা হেসে কোলাহল। তখনি চিৎকার। যেন গোটা বাড়িটা কাঁপছে। সকলে ছুটে এসেছে।—কে হাসে! সোনা পালাবে ভেবেছিল। কিন্তু চক্ষু রক্তবর্ণ, নাসিকা ঈগল পাখি প্রায়, কপালে রক্ত চন্দনের ফোঁটা এবং কাপালিক সদৃশ মুখ—ক্ষণে ক্ষণে মুখের কি পরিবর্তন—সোনা আর নড়তে পারে নি। বললেন—অঃ তুই। দেবী মহিমা শুনতে ভাল লাগছে!

সোনা ঘাড় কাত করে দিল।

—তবে দাঁড়া।

সোনা একটা থামের মতো দাঁড়িয়ে থাকল।

অনেকক্ষণ পরে হুঁস হল কমলা ওকে পিছন থেকে চুপি চুপি ডাকছে।—সোনা এখানে তুই কি করছিস।

সে বলতে পারল না চণ্ডীপাঠ শুনছে। ঋষি পুরুষেরা নানারকম কিংবদন্তী লিখে গেছে তালপাতার পুঁথিতে, এখন সে সবই দেবী মহিমা হয়ে গেছে। ওর কাছে প্রায় সবটাই ঈশমের সেই যে এক সর্প আছে না, জলের নিচে এক রূপালি মাছ আছে, মাছটা সর্প মুখে অথবা সেই মাছটা কি জালালি? যে কেবল, বিল পার হয়ে নদী পার হয়ে সাগরে চলে যায় সর্প মুখে। সকাল হলেই পূর্বদিকে সূর্যটাকে লটকে ডুব দেয় কেন। সাগরে সাগরে মহাসাগরে ঘোরা ফেরা তার।

সে বলতে পারত, ঋষি পুরুষেরা কিংবদন্তী লিখে গেছে তালপাতার পুঁথিতে। আমি তাই শুনছি। বলতে পারত, আমাদের ঈশম ওর চেয়ে অনেক বেশি ভাল ভাল কিংবদন্তী জানে। সে একদিন বড় হলে তালপাতার পুঁথিতে সেও তা লিখে রাখবে। সুতরাং সে চণ্ডীপাঠ শুনেছে, না কিংবদন্তী শুনছে পুরাকালের এখন এই মেয়ে কমলাকে তা প্রকাশ করতে পারল না।

সোনা কিছু বলছে না দেখে ফের কমলা বলল, পাঁচটা হাতী আসবে। হাতীতে আমরা দশরা দেখতে যাব। তুই আমাদের সঙ্গে যাবি।

সোনা বস্তুত এখন ঈশমের সেই কাল-রাত্রি, মহারাত্রি বলা যেতে পারে—জালালিকে তুলে আনছে বিলের পার থেকে, এমন একটা দৃশ্য দেখতে পাচ্ছে। জোৎস্না রাত, শীতে পাগল জ্যাঠামশাইর মুখে সাদা ফ্যাকাশে—ঠিক জ্যোৎস্নার মতো রং, এখন সোনার সব মনে হওয়ায় সে কমলার কথা কিছুই শুনতে পাচ্ছে না।

—এই শুনছিস আমি কি বলছি?

—কি!

—আমাদের সঙ্গে হাতীর পিঠে দশরা দেখতে যাবি।

—যাব।

—একটু সকাল সকাল ভিতরে চলে আসবি। আমরা তোকে সাজিয়ে দেব। পাউডার মেখে দেব।

সোনা হাঁটতে থাকল।

—ফিরে মনে থাকবে ত?

সে ঘাড় কাৎ করে বলল, মনে থাকবে তার। তারপর বলল, আর কে কে যাবে?

—আমি, দিদি, সোনাদি, রমা, বাচ্চু।

—আর কেউ যাবে না?

—আর কে যাবে জানি না। তুই কিন্তু আগে আগে চলে আসবি। মুখে তোর পাউডার মেখে দেব।

সোনা তার এই বয়স পর্যন্ত মুখে পাউডার মাখেনি। সে বেটাছেলে। বেটাছেলে পাউডার মাখে না বাড়িতে একটা এমন নিয়ম আছে। মা জ্যাঠিমাও কদাচিৎ মুখে পাউডার মাখেন। সে পাউডার মাখতে প্রায় দেখেইনি বললে চলে। দূর দেশের আত্মীয় বাড়িতে যেতে হলে হেজলিন স্নো মেখেছে, শীতকালে মা তার মুখে স্নো মাখিয়ে দিয়েছে। কিন্তু এই গরমের সময় সে পাউডার মাখবে এবং ওর মুখ আরও সুন্দর দেখাবে ভাবতেই লজ্জায় গুটিয়ে গেল।

সে বলল, জ্যাঠামশাই যাবে না?

—না।

—জ্যাঠামশাই না গেলে আমিও যাব না।

—তুই কিরে সোনা। বাবা ছোট তালাই যাবে। বড়রা হেঁটে যাবে। ঠাকুমা তোকে নিয়ে যেতে বলেছে। এই বলে সে যেমন দ্রুত সিঁড়ি ভেঙে নেমে এসেছিল তেমনি দ্রুত উপরে উঠে গেল! সিঁড়ির মুখে অমলা দাঁড়িয়ে আছে। সে বলল, ফিরে পেলি সোনাকে?

—হাঁ।

—কি বলল।

—সকাল যাবে।

—বলেছিসত সকাল সকাল আসতে। পাউডার মেখে দেব মুখে বলেছিস।

—সব বলেছি। তুই না দিদি, কি বলতে গিয়ে থেমে গেল। বাবা এদিকে আসছেন। বাবা এ কদিন ধুতি চাদর পরে একেবারে বাংলা দেশের মানুষ হয়ে যান। তারপর কলকাতায় যাবার দিন এলেই একেবারে সাহেব সুবো মানুষ। তখন তিনি বাংলাতে পর্যন্ত কথা বলেন না। তখন বাবাকে বরং বেশি পরিচিত মানুষ মনে হয় ওদের। ওরা বাবার সঙ্গে সহজেই তখন কথা বলতে পারে।

কিন্তু এখন ওরা পালাবার পথ খুঁজছিল। এই অসময়ে ওরা নাটমন্দিরের কাছে চলে এসেছে—এটা ঠিক না। দেখলেই বাবা ধমক দিবেন। সুতরাং ওরা যতবারই সোনাকে কাছারি বাড়ির দিকে খুঁজতে গেছে, খুব সন্তর্পণে গেছে। এমন কি অন্দরের দাসী-বাঁদিদের চোখেও যেন না পড়ে। প্রায় লুকোচুরি খেলার মতো চলে যাওয়া, তারপর সোনাকে না পেলে বিমর্ষ হয়ে ফিরে আসা।

বাবা এখন কাঁড়িভার পার হয়ে যাচ্ছেন, তিনি এখন নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেবেন। বাবার ঘরটা বাবা না থাকলে সব সময় তালা দেওয়া থাকে। বড় বড় আলমারি—কত বই সব এবং কাচের জানলা, দরজায় নানারকমের কারুকাজ। বাবার ঘরে পুরানো আমলের লম্বা আবলুস কাঠের খাট। এবং পালঙ্ক বলা চলে, কতকাল থেকে পালঙ্ক খালি। বাবা এলে এই পালঙ্কে না শুয়ে ছোট একটা তক্তপোষে শুয়ে থাকেন। ডানদিকের ঘরটাতে বিলিয়ার্ড টেবিল। অবসর সময় বাবা একাই টেবিলে লাল-নীল রঙের বল নিয়ে খেলা করেন। আর দেয়ালে বাবার কোর্টের ছবি। গভর্ণরের সঙ্গে বাবার ভোজ খাওয়ার ছবি। বিলাতে লিঙ্কন হলে পড়ার সময়কার ছবি। মায়ের সঙ্গে তোলা ফটো—বোধহয় জায়গাটা ওয়েলসের কোন একটা গ্রামের। মামাবাড়িতে যাবার সময় বড় একটা কাসল পড়ে। একটা ক্যাসেলের ছবিও এ-ঘরে রয়েছে। ছাত্রাবস্থায় বাবার সেই সতেজ মুখ দেখার জন্য দুই বোন চুরি করে এই ঘরে ঢুকে যায়। বাবার কাছে ধরা পড়লে দু বোন ছুটে পালায়। সোনা বলেছিল বাবার ঘরটা দেখবে। অমলা বলেছিল দেখাবে। কিন্তু কি করে যে দেখানো যায়, সোনার বুদ্ধি নেই মোটেই, কেবল কথা বললেই হাসে, চুপি চুপি দেখে যে চলে যাবে তেমন সে নয়। এটা কি, ওটা কেন, এই লাল-নীল রঙের বল দিয়ে কি হয়? আমি দুটো বল নেব। অথবা সে ওসব দেখতে দেখতে এমন অন্যমনস্ক হয়ে যাবে যে ধরা না পড়ে যাবে না। সোনা এমন ছেলে যে, ওকে নিয়ে কিছু করা যায় না। পালানো যায় না। সে বোকার মতো বার বার ধরা পড়ে যায়।

সোনা তখন ভূপেন্দ্রনাথকে বলল, জ্যাঠামশাই আমি দশরাতে যামু। কমলা আমারে নিয়ে যাইব। হাতীতে চইড়া যামু কইছে।

দশমীর দিন এই হাতী আসে বিকালে। জসীম জরির পোশাক পরে। মাথায় তার জরির টুপি। বাড়ির বালক এবং বালিকারা সকলে মিলে দশরা দেখতে যায়। হাতীর শুঁড়ে শ্বেত চন্দনে ফুল-ফল আঁকা থাকে। কপালে পানপাতা এবং শরীরে নানারকমের কলকা আঁকা অথবা ধানের ছড়া এবং লক্ষ্মীর পায়ের ছাপ। গলায় কদম ফুলের মালা। যেইনা মেজ-বাবুর ফ্লুট বাজনা আরম্ভ হবে, হাতীটা নিয়ে জসীম রওনা হবে পিলখানার মাঠ থেকে। তারপর সোজা অন্দর মহলের দরজায়। সেখানে হাতীটা দাঁড়িয়ে থাকবে। কপালে চাঁদমালা তার। তখন বাড়ির বৌরাণীরা সোহাগ মেখে দেবে প্রতিমার। প্রতিমার পায়ে সিঁদুর থেকে নিজের নিজের কৌটায় ভরে রাখবে। সম্বৎসর এই সিঁদুর কপালে দেবে। আর মেজ বৌরাণীর জন্যও সিঁদুর আসে সোনার কৌটায়। সেটা মেজবাবু কলকাতা যাবার সময় সংগে নিয়ে যান। মেজ বৌরাণী কপালে সিঁদুর দেন না। লম্বা গাউন পরেন। গীর্জায় যান। তবু এক ইচ্ছা এই পরিবারের— বিশেষ করে বৌঠাকুরাণীর অর্থাৎ মেজবাবুর মা— মন আদৌ মানে না। তিনি সব বৌদের জন্য সোনার কৌটায় দেবীর পা থেকে সিঁদুর কুড়িয়ে রাখেন তেমনি মেজ বৌ-রাণীর জন্যও সিঁদুর কুড়িয়ে নেন। মেজবাবুকে দেবার সময় অনুরোধ করবেন, একবার অন্তত সিঁদুরটা যেন কপালে ছোঁয়ায় বৌ। মেজবাবু তখন সামান্য হাসেন। তারপর যার জন্য দেবীর পা থেকে সিঁদুর সংগ্রহ করা—সে এই হাতী। সাক্ষাৎ মা লক্ষ্মী এই পরিবারের। দশমীর দিনে কপালে নিজ হাতে বৌ-ঠাকুরাণী সিঁদুর পরিয়ে দেন। চাঁদমালা পরিয়ে দেন। তারপরই বাজনা বাজে। ঢাকের বাজনা, বিসর্জনের বাজনা। পরি-বারের সব বালক-বালিকারা সেজে গুজে হাতীতে চড়ে বসে। প্রতিমা নিরঞ্জনের লোকেরা, জয় জগদীশ্বরী, জয় মা জগদম্বা জয় জয় বাড়ির বড় হুজুরের—এইসব জয় দিতে দিতে প্রতিমা বের করে নিয়ে যায়। এইসব জয়ের ভিতর শোনা যায় মেজবাবু মণ্ডপের উপর বসে ফ্লুট বাজাচ্ছেন। দক্ষিণের দরজা দিয়ে প্রতিমা যায়, উত্তরের দরজা দিয়ে হাতী যায়। আর মাঝখানে বড় চত্বর।

তারপর দিঘি। দিঘির পাড়ে রূপকথার মতো দৃশ্য, জয়াম্বর এক সুরে বেজে চলেছে। নদীতে এক দুই করে প্রতিমা নামছে। ক্রমে সন্ধ্যা নামছে নদীর চরে—কাশফুলের মাথায়। দশমীর চাঁদ আকাশে। আর ঢাক বাজছে, ঢোল বাজছে। নৌকার সারি সারি দেবী প্রতিমা, বিসর্জনের বাজনা, হৈ চৈ, আলো আঁধারির খেলা। হাউই পুড়ছে, আলো ফুটছে কত রকমের। থেকে থেকে মেজবাবুর ফ্লুট বাজনা—করুণ এক সুরে এই বিশ্বচরাচরে অপার মহিমা নিয়ে বিরাজ করছে। মেজবাবু, বুঝি এই সুরের ভিতর ফ্লুট বাজাতে বাজাতে স্ত্রীর ভালবাসার জন্য কাঁদেন।

আজ আবার সেই দিন এসে গেছে। নিত্যকার মতো ভূপেন্দ্রনাথ সকাল সকাল স্নান করে এসেছে নদী থেকে। নিত্যকার মতো ময়ূরের ঘর, বাঘের খাঁচা এবং হরিণেরা যে যেখানে থাকে সে-সব জায়গায় ভূপেন্দ্রনাথ ঘোরাঘুরি করছে। সাফ সাফ ঠিকমতো হয়েছে কিনা, এসব যদিও ওর দেখার কথা নয়—তবু এতগুলি জীব এই প্রাসাদে প্রতিপালিত, প্রায় মানুষের মতো ওদের সুখ দুঃখ বুঝে ভূপেন্দ্রনাথ নিজে দেখে শুনে সব বিধিমত ব্যবস্থা করে থাকে। তা ছাড়া আজ দেবী চলে যাচ্ছেন হিমালয়ে। কি এক বেদনা সব সময় সকাল থেকে প্রতিবারের মতো ওকে বিষণ্ণ করে রাখছে। তারপর নিত্যকার মতো মঠের সিঁড়ি থেকে ভিতরে ঢুকে শিবের মাথায় জল, বুদ্ধের পায়ে জল এবং শেকল টেনে এক দুই করে শতবার ঘণ্টা ধ্বনি।

খালেকের অসুখ। কুলীন-পাড়া থেকে ডাক্তার এসে দেখে গেছে। আর এখন যারা বিদায় চাইছে যেমন পুরোহিত এবং অন্য অনেকে, তারা এখন সবাই কাছারি বাড়িতে ভূপেন্দ্রনাথের অপেক্ষায় বসে আছে। তাছাড়া গত সন্ধ্যায় যারা কাণ্ড বোঝা নিয়ে গিয়েছিল তারা আসবে নতুন কাপড়ের জন্য। যেসব প্রজাদের জমি বিলি করার সময় ঠিক ছিল, মায়ের পূজায় পাঁঠা অথবা মোষ এবং দুধ-কলা, আনাজ যার যা কিছু ফসলের বিনি-ময়ে দেবার কথা—তারা তা দিয়েছে কিনা, না দিলে তাদের ডেকে পাঠানো এসব কাজও ভূপেন্দ্রনাথের জন্য পড়ে থাকে। আর এমন সব কাজের ভিতরই ভূপেন্দ্রনাথের দুপুর গড়িয়ে গেল। কিছুই আজ তার ভাল লাগছে না। বিষাদ বিষণ্ণ প্রতিমার পাশে সে চুপচাপ অনেকক্ষণ একা একা দাঁড়িয়ে ছিল। সে বড়বৌ এবং ধনবৌর জন্য দেবীর পা থেকে সিঁদুর তুলে নিয়েছে। আবার সেই নির্জনতা এই বাড়িকে গ্রাস করবে। একদিন কি ব্যস্ততা! কি সমারোহ! গোটা প্রাসাদ সারাদিন গম গম করছে। আজ কারো কোন ব্যস্ততা নেই। দিঘির চারপাশে সকলে জমা হচ্ছে।

বিকেলেই জসীম হাতিটার পিঠে পিল-খানার মাঠে চেপে বসল। তখন গরদের কাপড় পরছেন মেজবাবু। গরদের সিল্ক। হাতে হীরের আংটি। কালো রঙের পাম্পসু জুতো। মেজবাবু তার ঘর থেকে বের হচ্ছেন। তিনি ধীরে ধীরে হেঁটে যাচ্ছেন। আগে পিছনে পরিবারের আমলা কর্মচারী। আতরের গন্ধ সকলের গায়। সবার আগে ভূপেন্দ্রনাথ। পরে রঙিনঅপর্ণাই এবং সকলের শেষে বাবুর খাস খানসামা হরিপদ। মেজ একটা মিছিল নেমে যাচ্ছে দক্ষিণের দরজায়। ওরা নেমে এল নাটমন্দিরে। এখানে মেজ-বাবু শান্ত হলেন। দেবীর পায়ের মেলপ তা অঞ্জলির মতো করে নিলেন। ওরা যত এত ধাপের ও-পাশে এক সময় অদৃশ্য হয়ে গেলে সোনার মনে হল, দেবী এখন ওর দিকে তাকিয়ে নেই। দেবী তাকিয়ে আছেন ওদের দিকে। চোখমুখ কাঁপছে। ঘামের মতো মুখটা চকচক করছে। সে অমনও কাছে গেল। দুর্গাঠাকুরের চোখে জল পড়ছে কিনা দেখার জন্য একেবারে মণ্ডপের ভিতর ঢুকে গেল।

সে প্রথম সিংহটাকে একবার ছুঁয়ে দেখল। দিঘির পাড়ে সকলে এখন যে যার জায়গা নিচ্ছে বলে কেউ আর মণ্ডপে নেই। এই সময়, সুসময়ও বলা চলে, একেবারে হাঁটু ছুঁয়ে দেখা দেবীকে। অসুর অথবা সেই বাচ্চা ইঁদুরটাকে। মা গণেশের পায়ের কাছে একটা কাটালগাছ বসে আছে। সে সিংহের মুখে প্রথম হাতটা ভরে দিল। অসুরের বুক থেকে যে রক্ত একদিন গড়িয়ে পড়ছে সে সেটা হাত দিয়ে দেখল—কেমন শুকনো হয়ে গেছে রক্তটা। এবং সিংহটা খাবলা খাবলা মাংস তুলে নিয়েছে। ওর কেন জানি এই অসুরের জন্য মায়া হল। সে অসুরের মাথায় হাত দিয়ে কোঁকড়ানো চুল আদর করার মতো দাঁড়িয়ে থাকল। এবার মজা দেখাচ্ছি! সিংহটার চোখে সে একটা চিমটি কেটে দিল। কিছু রং উঠে এল নখে। দেবীর মহিমায় সিংহটা সোনাকে ভয় পাচ্ছে না। সে এবার উঁকি দিয়ে দেবীর চোখ দেখল, জল পড়ছে। তা তোমার এত কষ্ট যখন থেকে গেলেই হয়। সে দেবীর সংগে কথা বলতে চাইল মনে মনে। ওর ভয় ছিল, কাছে গেলেই দেবী রাগ করবে। কিন্তু কি ভালবাসার চোখ! সে বলল, তা তোমার এমন জীব কেন বাহন মা। আমি আর সুরসুরি দেব নাকে। এই বলে সে ছোট একটা কাঠি যেই না নাকের কাছে নিয়ে গেছে অমনি এক শব্দ হাঁচো। কেউ নেই আশে-পাশে—অথচ হাঁচো দিল কে। সিংহটা সত্যি তবে হাঁচি দিল! সে থতমত খেয়ে ছুটে পালাতে গিয়ে

হাওড়া
কুষ্ঠ কুটীর

সর্বপ্রকার চর্মরোগ, বাতরক্ত, অসাড়তা, ফুলা, একজিমা, সোরাইসিস, দূষিত ক্ষতাদি আরোগ্যের জন্য সাক্ষাতে অথবা পত্রে ব্যবস্থা লউন। প্রতিষ্ঠাতা: পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা কবিরাজ, ১নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া। শাখা: ৩৬, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৯। ফোন: ৬৭-২০৫৯।

দেখল পাগল জ্যাঠামশাই মণ্ডপের সিঁড়িতে। তিনি হাঁচি দিয়েছেন। পাগল মানুষের ঠাণ্ডা লাগে না। সোনা এই প্রথম জ্যাঠামশায়ের ঠাণ্ডা লাগায় ভাবলেন তিনি তবে ভাল হয়ে যাচ্ছেন। সে জ্যাঠামশাইর হাত ধরে বলল, আমি হাতীতে চড়ে নদীর পাড়ে যামু।

দিঘির পাড়ে তখন মেজবাবু ফ্লুট বাজাচ্ছেন। সোনার মনে হল ওর দেরি হয়ে গেছে। সে পাগল জ্যাঠামশাইকে ফেলে কর্তার বাড়িতে ছুটে গেল। জামা-প্যান্ট বদলে নিতে হবে তাড়াতাড়ি।

যারা প্রতিমা নিরঞ্জনের জন্য নাটমন্দিরে এসেছে তারা সবাই গামছা বেঁধেছে কোমরে। ওরা ঠাকুর কাঁধে নিয়ে বের হয়ে যাচ্ছে। রামসুন্দর যাচ্ছে মাথায় ঘট নিয়ে। ঠাকুর নদীর চরে নামানো হবে। সেখানে আরতি হবে, ধুপধুনো জ্বলবে। বড়দা মেজদা ঠাকুরের সঙ্গে নাচতে নাচতে চলে যাচ্ছে। সে যেতে পারছে না। ওর জন্য অমলা কমলা বসে রয়েছে। সে যাবে হাতীতে।

ভূপেন্দ্রনাথ সোনাকে জামা-প্যান্ট পরিয়ে দিল। মাথা আঁচড়ে দিল। সোনা আর দাঁড়াতে পারছে না। সে কেমন বসেও ছুটতে পারলে বাঁচে। সবাই সব নিয়ে চলে যাচ্ছে। ওর জন্য কেউ বুঝি কিছু রেখে যাচ্ছে না।

এখন রোদ নেমে গেছে। সেইসব হাজার হাজার লোক নদীর পাড়ে বসে পাম গাছ অথবা ঝাউগাছের ছায়ায় নিবিষ্ট মনে ফ্লুট বাজনা শুনছে। হাজার হাজার মানুষ, মানুষের মাথা গুনে বলা দায় কত মানুষ—এসেই যে যার মতো জায়গা করে মেজবাবুর ফ্লুট বাজনা শুনতে বসে যাচ্ছে।

অশ্বশালার পাশে এক মানুষ আছে—তার বুঝি ইন্তেকাল হবে এবার। সেও এক মনে, দুহাত বুকের উপর রেখে সেই সুরের ভিতর ডুবে যাচ্ছে। সে চিৎপাত হয়ে, গঞ্জে শহরে যেমন সে ফ্লুট বাজাত, তেমনি বুকের উপর দুহাত নাড়ছে। সেও বুঝি শেষবারের মতো মেজবাবুর সঙ্গে মনে মনে ফ্লুট বাজাচ্ছে। এমন আশ্বিনের বিকেলে এই পৃথিবীর বুকে সে ফ্লুট না বাজালে আর কে বাজাবে! সে দুহাত অনেক কষ্টে উপরে তুলে রাখল। যথার্থই সে আজ ফ্লুট বাজাচ্ছে। তারপর হাত দুটো ওর ক্রমে অসাড় হয়ে যাচ্ছে। বুকের উপর হাত, চোখ বোজা,—মানুষটার দুনিয়াতে কেউ নেই, আছে শুধু দুই ঘোড়া এক ল্যাণ্ডো আর এই ফ্লুট। সে চুরি করে মেজবাবু না থাকলে নিশুতি রাতে নদীর চরে একা বসে ফ্লুট বাজাত। সে নানা রকম সুরের ভিতর তন্ময় হয়ে থাকত। তেমনি আজও সে তন্ময় হয়ে যাচ্ছে। চরপাশটা, দিঘিরপাড়, শীতলক্ষ্যার চর, নদী মাঠ সব যেন এই সুরের ভিতর হাহাকার করছে। সে মেজবাবুর ফ্লুট বাজনা শুনতে শুনতে চোখ বুজে, এক আমা, আর কেমন শরিক নেই...শরিক নেই...নেই...সে আর শ্বাস নিতে পারছে না। অসহ্য এক যন্ত্রণা ভিতরে। সে হাত দুটো আর উপরে রাখতে পারল না। অবশ হয়ে আসছে সব। এক আশ্বিনের বিকেল ক্রমে এ-ভাবে মরে যাচ্ছে। কেউ খেয়াল করছে না।

তখনই সোনা ছুটছিল। হাতীটা অন্দরে এসে গেছে। জসীম হাতীর পিঠে বসে প্রতীক্ষা করছে নিশ্চয়। সবাই ওর জন্য হাতীর পিঠে নদীর পাড়ে এখনও নেমে যেতে পারছে না। হাতী বুঝি ওকে ডাকছে। ফ্লুট বাজছে। দিঘির পাড়ে হাজার মানুষ। বিচিত্র বর্ণের মেলা। ইব্রাহিম কলের ঘরটাতে বসে আছে। সময় হলেই আলো জ্বেলে দেবে।

সোনা সে তার পাগল জ্যাঠামশাইকে খুঁজতে গিয়ে দেরি করে ফেলেছে। যেন তার পাগল জ্যাঠামশাই, সে যা বলবে তাই শুনবে। জ্যাঠামশাই মেলায় চলে যাবে একা-একা। সে জ্যাঠামশাইর সঙ্গে মেলাতে মেলা দেখবে। হাতীর পিঠে বসে থাকবে না। ফেরার সময় দুজন হেঁটে হেঁটে লাড্ডু খেতে খেতে ফিরে আসবে।

কিন্তু জ্যাঠামশাই না দিঘির ঘাটে, না সেই সব মানুষের ভিতর। এদিকে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। হাতীটা অন্দরে দাঁড়িয়ে এখন শুঁড় নাড়ছে। কান দোলাচ্ছে। অমলা কমলা বিরক্ত হচ্ছে। জসীমকে হাতী ছাড়তে বারণ করে দিচ্ছে বুঝি। সে প্রাণপণ কাছারি বাড়ির মাঠ পার হয়ে এল। দারোয়ানদের ঘর অতিক্রম করে, সেই নাটমন্দিরের উঠোন।। সে এখানে এসে শ্বাস নিল। দেখল পকেটের পয়সাগুলি পড়ে গেল কিনা ছুটতে গিয়ে। সে ফ্লান্টা তামার চকচকে পয়সা পেয়েছে। দশমী দেখার জন্য বৌরাণীরা বাড়ির সব বালক বালিকার মতো ওর হাতে একটা করে তামার পয়সা দিয়েছে। সে বুঝেছে, সে একা নয়। ওরা দুজন। সে এবং

"ভয়ঙ্কর কাজের চাপে মাঝে মাঝেই আমার ভীষণ মাথা ধরে",
বলেন, বিপিন জৈন
বোম্বাইয়ের একজন অফিসার।

মাথা ধরেছে? অ্যানাসিন খান
তাড়াতাড়ি আরাম এনে দেবে

বড়দের উপযোগী যথেষ্ট জোরালো
বাচ্চাদের পক্ষেও একান্ত নির্ভরযোগ্য

অ্যানাসিন জোরালো,—সাধারণে ব্যথা-বেদনার উপশমে ডাক্তাররা যে-ওষুধ সুপারিশ করেন তাই এতে বেশী ক'রে দেওয়া আছে। অ্যানাসিন নির্ভরযোগ্য—নিরাপদ, ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্রের মত এটি নানান ভেষজের এক অপূর্ব সংমিশ্রণ। অ্যানাসিন খান—মাথাধরা, সর্দি আর ফ্লু, পিঠের ব্যথা, দাঁতের যন্ত্রণা আর পেশীর ব্যথায়।

জোরালো অথচ নির্ভরযোগ্য
অ্যানাসিন
ভারতে ব্যথা-বেদনার উপশমকারী
ওষুধগুলোর মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয়

৪ ভাবে কাজ করে।

Regd. User of TM: Geoffrey Manners & Co., Ltd.

তার পাগল জ্যাঠামশাই। সে পাগল জ্যাঠামশাইর জন্য একটা একটা পয়সা গুনে তিন পকেটে রেখে দিয়েছে। মেলা দেখা হলেই জ্যাঠামশাইর পকেটে পয়সাগুলি দিয়ে দেবে। কিন্তু সে কোথাও জ্যাঠামশাইকে পেল না। ওঁকে খুঁজতে গিয়ে ওর এত দেরি হয়ে গেল। সে সিঁড়ি ভেঙে ছুটছে। ওর যত দেরি হয়ে গেল। সে লম্বা বারান্দা পার হয়ে গেল রান্নাবাড়ির। এই পথে গেলে সে তাড়াতাড়ি উত্তরের দরজায় ঢুকে যেতে পারবে। ওরা ওর মুখে পাউডার মেখে দেবে—সে পাগল জ্যাঠামশাইর উপর মনে মনে ভীষণ রাগ করছে। মুখে ওর পাউডার মাখা হল না। দুঃখে ওর এখন কান্না পাচ্ছে। সবাই এখন নিশ্চয়ই উত্তরের দরজাতে আছে। সে অমলা কমলাকে তাদের ঘরে গিয়ে পাবে না ভাবল। সে পড়ি মরি করে জোরে ছুটতে থাকল। আর পেঁছেই দেখল, কেউ নেই। না হাতী, না জসীম। না অমলা কমলা। বাড়ির সব আলো জ্বলে উঠেছে। সবাই ওকে ফেলে বুঝি চলে গেছে। সে একা পড়ে গেল। সে যে এখন কি করে! তবু একবার অমলাদের ঘরে খোঁজ নিতে হবে। দাসী-বাঁদি কেউ নেই যে বলবে, ওরা গেল কোথায়? সে দৌড়ে সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠে গেল। বাড়ি ফাঁকা মনে হল। দু-একটি অপরিচিত মুখ। কেউ ওকে দেখে কথা বলছে না। সে ভয় পাচ্ছে। কোন রকমে অমলাদের ঘরটাতে যেতে পারলেই আর তার দুঃখ থাকবে না। অমলা কমলা ওকে ফেলে হাতীতে চড়ে মেলা দেখতে যাবে না। এমন সময়ই সে দেখল প্রাসাদের সব আলো নিভে গেছে। এত যে ঝাড় লণ্ঠন, এত যে বৈভব সব কেমন নিমেষে অন্ধকারের ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল। দিঘির পাড়ে ফুট বাজছে না। সেই ময়না পাখিটা তখনও অন্ধকারে ডাকছে, সোনা তুমি কোথায় যাও। কেউ নেই সোনা। আঁধার আঁধার।

এমন অন্ধকার সোনা জীবনেও দেখে নি। এক হাত দূরের মানুষটাকে দেখা যায় না। কেবল ছায়া-ছায়া ভাব। ছায়ার মতো মানুষেরা ছুটোছুটি করছে। ওর পাশ দিয়ে একটা লোক ছুটে বের হয়ে গেল। প্রায় অনুমানে সে যেন এসে পেঁছে গেছে। সে ভয়ে ভয়ে ডাকল, অমলা!

তখন একটা শক্ত হাত অন্ধকার থেকে বের হয়ে এল। এবং ওর হাত চেপে ধরল—কাকে ডাকছ?

—অমলাকে।

—তুমি কে?

—আমি সোনা।

—কোথায় যাবে?

—অমলার কাছে। ওরা আমারে নিয়া দশরাতে যাইব কইছে। আমার মুখে কমলা পাউডার মাইখা দিব কইছে।

—ওদের ঘরে তুমি যেতে পারবে না। বারণ। কেউ ঢুকতে পারবে না।

সোনা বলল, না, আমি যামু।

—না। সেই শক্ত হাত কার সোনা টের পাচ্ছে না। তবু সে যে স্ত্রীলোক সেটা সোনা বুঝতে পারল। সে বৃন্দাবনী হতে পারে। সোনা ভয়ে বিমূঢ়। রেলিঙে এসে দাঁড়াল। যদি কেউ ওকে দেখে এখন কাছারি বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসে। মনে হল সিঁড়ির মুখে লণ্ঠন। সে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দেখতে পেল মেজবাবু উঠে আসছেন। সামনে ওর খাস খানসামা হরিপদ। সে কেন এখান থেকে ছুটে পালাতে চাইল। মেজবাবুকে ধরে ধরে নিয়ে আসা হচ্ছে। শোকাচ্ছন্ন মুখ। সোনা অবাক। এই যে মানুষ, যাকে সে কিছুক্ষণ আগে দেখে এসেছে মণ্ডপে নিবিষ্ট মনে ফুট বাজাচ্ছেন।—এখন তিনি মূর্ছিত এক প্রাণ। সোনার ভিতরটা হাহাকার করে উঠল। অমলা কমলার কিছু হয় নি ত! ওদের ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। মনে হচ্ছে ভিতরে অমলা কমলা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

হাতীটা একা অন্ধকার প্রাসাদ থেকে ফিরে গেল। কেউ দশরাতে যেতে পারল না। কোন দুঃসংবাদ এ বাড়িতে চলে এসেছে। কি সেই দুঃসংবাদ কেউ যেন বলতে পারছে পারছে না। পরিবারের বিশেষ দু-একজন ব্যাপারটা জেনেছে। এবং ভূপেন্দ্রনাথ তাদের অন্যতম। সে দ্রুত হেঁটে যাচ্ছে। অন্ধকার প্রাসাদে সব বিসর্জন হয়ে গেছে, এখন একা এক নির্জন মাঠের ভিতর দিয়ে শুধু হেঁটে যাওয়া।

সোনা জেদি বালকের মতো বলল, অমলার কাছে যামু।

বৃন্দাবনী বলল, না। না।

সুতরাং সোনা বাইরের দিকে চলে এসে ওদের জানালার দিকে মুখ করে মাঠে বসে থাকল। আলো জ্বললেই ওরা জানালা থেকে সোনাকে দেখতে পাবে। দেখতে পাবে সে হাঁটু মুড়ে ঘাসের উপর ওদের সঙ্গে দেখা করার জন্য বসে আছে। কি যেন এক টান তার এই দুই মেয়ের জন্য, সোনা মনে মনে ভাবছে, ওদের কিছু হয়েছে, সে সবটা না জেনে কিছুতেই এখান থেকে নড়বে না ভাবল।

তখনও হাতীটা যায়। অন্ধকারে গাছ গাছালির ভিতর দিয়ে হাতীটা যায়। ইব্রাহিম কলমবে একটা টর্চ নিয়ে বসে আছে। কোথায় যে কি হল! সে আল্লার ঘর অন্ধকার করে বসে থাকল। শুধু হাতীর কানের শব্দ ভেসে আসছে। হাতীটা এখন নদীর পাড়ে নীরবে হেঁটে চলে যাচ্ছে।

আর কোথাও বোধ হয় প্রতিমা বিসর্জন হচ্ছিল। পাগল জ্যাঠামশাই কোথায় আছে কে জানে। সোনা অবশ্য জন্য জীবনে কিছু কিনতে পারল না। দু পকেটে ওর চকচকে তামার পয়সা। উপরে জানালা বন্ধ। তখন নদীতে শেষ প্রতিমা বিসর্জন। নদীতে যে আলো, ধুপধুনো ঢাকের বাদ্য ছিল এবার তাও নিভে গেল। কোথাও আর কিছু জ্বলছে না। শুধু অন্ধকার আর অন্ধকার। উপরে আকাশ নির্মল আকাশে সেই অন্তহীন হাজার হাজার নক্ষত্র। নক্ষত্রের আলোতে সে যেন পৃথিবীর যাবতীয় শুভবোধকে দাঁড়িয়ে রাখতে চায়। জানালা খুলে গেলেই সে ওদের জন্য কিছু করতে পারে। সে ওদের মুখ দেখার জন্য ঘাসের ভিতর বসে আছে। দু হাঁটুর ভিতর মাথা গুঁজে বসে আছে।

বিসর্জনের পর ভূপেন্দ্রনাথের হুঁস হল। সোনা কোথায়! ওকে পাওয়া যাচ্ছে না। সকলের যেন অন্ধকারে ছুটোছুটি। রামসুন্দর আবিষ্কার করল সোনা মেজবাবুর দালানবাড়ির নিচে শুয়ে আছে। সোনা সেখানে ঘুমিয়ে পড়েছে।

সকালে অন্দর থেকে একটা চিঠি পেল সোনা।—আমরা ভোর রাতের স্টিমারে চলে গেছি সোনা। তোর সঙ্গে আমাদের আর দেখা হল না।

কাছারিবাড়ির সিঁড়িতে সে সারাটা সকাল একা চুপচাপ বসে থাকল। তার কিছু আজ ভাল লাগছে না। তার মনে হল নদীর চরে কাশের বনে বনে কেবল কে যেন আজ চুরি করে ফুট বাজাচ্ছে।

(ক্রমশঃ)

রসুই গুঁড়া মশলা
ফোন : ৩৪-২৪৪১, ৩৩-২৪৭১
রসুই প্রোডাক্টস্
১৭ আর জি কর রোড, কলিকাতা-৪ ॥ ২০১ মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা-৭

নিকটেই আছে

পুজোর চাঁদা নিয়ে

এমনিতেই সারাবছর আলো জ্বলে না এ গলিতে। খোদ কাউন্সিলার সাহেব শত চেষ্টা করেও পারেন নি। সিনেমা হলের লাগোয়া পান-বিড়ি-সিগারেট, চা, স্টেশনারী ও মনোহারীর দোকানের বুক চিরে বেরিয়ে আসা এই ফালি গলিটা গলিতো নধারে দুটো ইমপরটেণ্ট রাজপথে গিয়ে মিশেছে। লম্বায় বড়জোর তিন-চারশো গজ। চওড়ায়, অফিসিয়াল মাপটা কি সঠিক না জানলেও, অনুমানে বলতে অসুবিধা নয় যে একটা দশ-বারো বছরের ছেলেকে শুইয়ে দেওয়ার পর বুকের বিঘৎখানেক জায়গা বাকী থাকবে কাঁচা ড্রেনটার গায়ে গড়িয়ে পড়তে। অষ্টমীর সন্ধ্যায় ঐ কাঁচা ড্রেনেই দু-দুটো উঠতি-উনিশ মুখ থুবড়ে পড়ল। সেই সঙ্গে গোটা গলি জুড়ে পরানো আলোর সাতনরী হার টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ল চতুর্ধারে। প্যান্ডেলে মা দুর্গা তার ছানাপোনা সমেত, আর ওদিকে পাড়ার ঘরে ঘরে দুয়ার আটকে নতুন জামা জুতোয় সাজানো গোছানো একপাল বাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে মানুষজন থর থর করে কাঁপতে লাগল। একটু বাদেই মোড়ের মাথায় অ্যাম্বুলেন্স এল। লাল দুটো উঠিয়ে নিয়ে গেল। আর অন্ধ ফালি-খাঁচাটার পাখিগুলোর বেরোনোর পথ আগলে পাহারা দিতে লাগল পুলিশ। পিন-ফোটানো বেলুনের মত আনন্দ-সাধ-আহ্লাদ সব এক নিমেষেই চুপসে গেল সে-রাতে।

নবমীর সকালে শুরু হল পোস্ট-মর্টেম। কেন এই হাঙ্গামা? পাড়ার বড়রা, যারা গত রাতে দরজার বাইরে পা দিতে সাহস করেন নি, তাঁরা লুঙ্গি পরে, সিগারেটের গোড়ায় কষে টান বসিয়ে, মা দুর্গার পায়ের কাছে শতরঞ্চি বিছিয়ে চুলচেরা হিসেবে ব্যস্ত হলেন। কানু নেই। নেই মানে বুক আর পেটের মাঝখানে দেহের জরুরী অংশটা ওর বারুদে ঝলসে একদম ছাই হয়ে গেছে। হাবুটা বাঁচলেও বাঁচতে পারে। তবে তেরাত্তির না-পেরোলে ভরসা নেই। হাবুর বড়দা বিপিন দাস আর কানুর বাবা কলাই পাল দুজনেই হাসপাতালে গেছে। কলাই পাল পুজো কমিটির প্রেসিডেন্ট। প্রেসিডেন্টের অনুপস্থিতিতে কাউন্সিলার সাহেব প্রিজাইড করছেন সভায়।

হাজার খানেক টাকার হিসাব পাওয়া যাচ্ছে না। চাঁদা উঠেছে সব শুদ্ধ আড়াই হাজার টাকা। বস্তি, পাকা বাড়ী মিলিয়ে, কাউন্সিলার সাহেব বললেন, মোট দেড়শো হোল্ডিং আছে পাড়ায়। দেড়শো হোল্ডিং থেকে উঠেছে সাড়ে সাত শো টাকা। অবশ্য এর মধ্যে আমি দিয়েছি দেড়শো টাকা।

কাউন্সিলার সাহেব কত দিয়েছেন এটা প্রত্যেকেই জানে। শুধু টাকা নয়, সেই সঙ্গে মন্ডপের ও রাস্তায় লাইটের বিল চোকানোর দায়িত্বও যে ওঁর এটাও জানে সবাই। বড় রাস্তার দোকানগুলো থেকে উঠেছে সাতশোর মত। বাকী টাকাটা ছিল খান দশেক বড় বেবী ফুডের কৌটোয়। ঐ টাকা থেকেই প্যান্ডেল, লাইট, মাইক, ও অন্যান্য খরচ-খরচা মেটানোর কথা ছিল। কৌটোগুলো ছিল কানুর কাছে।

গোটা সেপ্টেম্বর আর অক্টোবরের দুচারটে কটা দিন কানু, হাবু আর পাড়ার পুজো কমিটির ভলানটিয়াররা রোজ তিন টাইম সিনেমা হলের পয়সাওয়ালা পয়সার লাইনের মুখে দাঁড়িয়ে কৌটো বাজিয়ে চাঁদা কালেকট করেছে। টিকিট পিছু দশ পয়সা। ফিক্সড রেট। দাও, সিনেমা দেখ। না-দাও, পেঁদানি দিয়ে বিন্দাবন ছুটিয়ে দেব। এই ব্যবস্থায় গত দুবছরে বেশ পয়সা উঠেছে। তাই এবারও স্বাধীনতার মাসটা কাটতে না কাটতেই কৌটো-ফৌটো রেডি করে ভলানটিয়াররা লাইনে দাঁড়িয়ে পড়েছিল।

ব্যাপারটা বে-আইনী জেনেও কেউ বাধা দেয় নি। কারণ তার অনেক। পাশাপাশি অন্য পাড়াগুলোর তুলনায় এই গলির বাসিন্দাদের পকেটের অবস্থা যথেষ্ট খারাপ। তাই শুধু পাড়ার মানুষজন আর দোকানদারদের ভরসায় থাকলে ঠেলা করেই মা দুর্গাকে আনতে ও যেতে হবে। মন্ডপে মাইক বাজবে না। বছরে অন্তত চারটে দিনও গলিটার অন্ধকার দূরে হবে না। গলিতে ঢুকবার মুখে গেট বানানো যাবে না। তাছাড়া মা দুর্গার ভোগের পেসাদে মুখটা আঠা আঠা হলে যে একটু অন্য কিছু খেলে জিভটা ছাড়িয়ে নেবে ভলান-টিয়াররা, তারও উপায় থাকবে না। তাই সব দিক বিবেচনা করে ছোটদের এই বাড়তি চাঁদা কালেকশনের নভেল আইডিয়াটা নীরবে অ্যাপ্রুভ করেছিলেন পাড়ার বড়রা।

না-করেও উপায় ছিল না কোন। কানু, হাবুকে বাদ দিয়ে, তাদের ইচ্ছা অনিচ্ছাকে অগ্রাহ্য করে, এ পাড়ায় দাদাগিরি এমনকি বাবাগিরি করাও সম্ভব নয়। ব্যাপারটা সবার আগে বুঝতে পেরেছিল কলাই পাল আর বিপিন দাস। আর বুঝেছিলেন কাউন্সিলার সাহেব। পাড়া, সে যত ছোট যত দরিদ্রই হোক না কেন, তার ওপরে মোড়লী করার সুখ যে কি সে যে না করেছে সে বুঝবে না। কানুর বাবা কলাই তো কলাই পাল পুজো কমিটির প্রেসিডেন্ট। বিপিন দাস ট্রেজারার, হাবুর সুবাদে। কলাই পাল আর বিপিন দাস বশতা পাঁচটা কেরানীগিরির জীবনের অবসরটুকু কাউন্সিলার সাহেবের দোতলা বাড়ীর গ্যারেজে টু হার্টস, থ্রি ডায়মন্ডস, ডেকে ডেকেই কাটিয়ে দিচ্ছে। কাউন্সিলার সাহেবের গাড়ীটা বে-পাড়ার গ্যারেজে থাকে। মাস গেলে একশ টাকা গ্যারেজ ছাড়ার বদলে পাড়ার দেড়শো ঘরের ভোট চিরদিনের মত যে তারই হাতে বাঁধা থাকছে, পৌর-পিতৃত্বের চাবিকাঠিখানি যে তারই ট্যাঁকে ঝোলানো সেই আনন্দে নির্বাক সুখে বোবা হয়ে থাকেন কাউন্সিলার সাহেব।

কিন্তু নবমীর সকালে পান চিবুতে চিবুতে নতুন করে অ্যাকাউন্টস মেলাতে বসে নিমেন-হাঁকা গলায় দরাজ হলেন কাউন্সিলার—এতবড় অনাচার আর আমরা সহ্য করব না। কানু হাবু, এরা পেয়েছে কি? হাতির পাঁচ পা দেখেছে? যখন খুশী যা ইচ্ছে তাই করবে? না তা হতে দেব না। এটা কি মগের মুল্লুক। গত বছর কৌটোয় প্রায় হাজার টাকা চাঁদা উঠেছিল। ওরা নিজেরাই তা কব্জে করেছে। অথচ জমা

দিল কত? না, মাত্র দশ টাকা। তার আগের বছরও ঐ একই ব্যাপার। আর এ বছর ঐ টাকায়ই বখরা মেটাতে না পেরে বোমবাজি করতে গিয়ে পাড়ার এতবড় সর্বনাশ ওরা করল। গতকাল থানায় আমার কি বলেছে জানেন?

একটু থামলেন কাউন্সিলার সাহেব। চাল্সও শতরঞ্চির এধারে ওধারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে থাকা পাকা চুল মাথাগুলোর রি-অ্যাকশনটা বুঝবার চেষ্টা করলেন। এখন একটা ব্যাপারে তিনি নিশ্চিন্ত। পাড়ার বারবাকী উঠতি কচি-কাচারা মিন-রয়েক-এর মধ্যে আর মাথা তুলতে পারবে না। ওদের দুটো মাথাই কাল রাত্তিরের হুল্লোড়িতে কাটা পড়েছে। একটার লাশ আজ দুপুর নাগাদ পুলিশ দেবে বলেছে। আর একটা........। বলাই পাল আর বিপিন দাসকে আর কখনো খোসামোদ করতে হবে না। গোটা পাড়াটাই এই এক আঘাতে কেমন বোবা হয়ে গেছে। জানে না কি করবে? এই সুযোগ। এবার ঠিক মত পাশার দান ফেলতে পারলে রাজ-মুকুটের জন্য আর কখনো কারুর সাহায্য চাইতে হবে না।

না, থাক, সে কথা আর বলতে চাই না। শুনলে আপনারা সকলেই দুঃখিত হবেন, গলাটা কেলেটেসে সাফ সুতরো করে ফের থেই ধরলেন কাউন্সিলার সাহেব। শুধু একটা কথাই বলব—পুজোর বাকী খরচ বা কিছু আছে, তা আট-নশ যাই হোক না কেন, সবই আমি বেয়ার করব। এবার আপনারা অনুমতি দিলে আমি একবার হাসপাতালে যাব। সেখান থেকে থানায়। কানুর লাশটা যাতে ভেত বডিটা যাতে আমরা আজকের মধ্যেই পেতে পারি, তার ব্যবস্থা করতে হবে।

কাউন্সিলার সাহেব চলে গেলেন। গাকের আওয়াজ ছাপিয়ে, মাইকের গলা ডুবিয়ে শ্মশানে পাড়া কেঁপে উঠল। সহৃদয় পৌরপিতার আশ্বাসে আশ্বস্ত হয়ে সবাই মেতে উঠল পুজোর শেষ-রেশটুকু থাকল-খুবলে চেটে-পুটে নিতে।

বিকেলে মিছিল বেরোল কানুর ভেত বডি নিয়ে। সবার সামনে কাউন্সিলার সাহেব। ফুলের মালায়, ধূপের গন্ধে আচ্ছন্ন ঠাণ্ডা কানু এক গভীর দুঃখের গহবরে শুয়ে যেতে যেতে জানতেও পারল না, তার বহু সুখ-দুঃখের একমাত্র সাক্ষী, অশনীদার হাবু ঠিক এই মুহূর্তে কোথায় কি ভাবে পড়ে আছে? আর জানল না বশটা বেশী ফুলের ভোটটা ঐ প্রচণ্ড ডামাডোলের, হাঙ্গামা-হুজ্জতির মধ্যে গোপনে কোথায় পাচার হয়ে গেল?

নবমীর রাত ফুরোনোর আগেই কে বা কারা পাড়ার একমাত্র তাদের আড্ডা, গ্যারেজ ঘরের কোলাপসিবেল গেটের নিশ্চিন্ত নিরাপত্তার আড়ালে বসে সমস্ত খুচরো গুনে গেঁথে একটা চটের থলের ভরে, টুকরো কাগজে লিখে রাখল নশ তেতাল্লিশ টাকা তিন পয়সা। ভোটগুলো হাতুড়ী দিয়ে পিটিয়ে দুমড়ে মুচড়ে ভাস্টবিনের নোংরা গাদায় পুঁতে দিল তারাই। কানু, হাবু, বলাই পাল বা বিপিন দাস কেউ জানল না ব্যাপারটা।

—সম্বিৎসু

মনের কথা

মায়া মোহের ইতিবৃত্ত

সমর-লীলা কাহিনী

হ্যাল্‌সিনেশন ও ইল্যুইশনের শারীরবৃত্তিক ও বিকারতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা বিষয়ে নানা মুনির নানা মত। আমরা প্রথমে হ্যাল্‌সিনেশন (বাংলায় বলা হয় মায়া বা অমূলক প্রত্যক্ষ) নিয়ে আলোচনা করব, পরে ইল্যুইশন (বাংলায়—মোহ বা ভ্রান্তি)-এর শারীরবৃত্ত ও বিকারতত্ত্ব বোঝবার চেষ্টা করব।

কোনো বস্তু বা ঘটনা সম্পর্কে প্রাথমিক পর্যায়ের ধারণা জন্মায় সংবেদন (সেনসেশন) থেকে। সংবেদন মৌলিক ইন্দ্রিয়-অনুভূতি; বস্তুর খণ্ডিত বিচ্ছিন্ন রূপ-গন্ধের প্রতিফলন। সংবেদন বস্তুর সম্পূর্ণ বা সামগ্রিক ধারণা বহন করে না। সাদা-কালো, শক্ত-নরম, দুর্গন্ধ-সুগন্ধ, কটু-তিক্ত, ইত্যাদি ইন্দ্রিয়বাহিত ধারণা দিয়ে বস্তু বা ঘটনা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান জন্মাতে পারে না। শক্তশাদা বস্তু হাজার রকমের হতে পারে, নরম-সুগন্ধযুক্ত বস্তু অজস্র আছে। দর্শন-স্পর্শন শ্রবণ ইত্যাদি ইন্দ্রিয়ভিত্তিক সংবেদন বস্তুর একটা, দুটো বা অনেকগুলো গুণের ধারণা দিলেও, বস্তুর সামগ্রিক রূপের ধারণা দিতে অক্ষম।

প্রতিফলন-ক্রিয়া সংবেদন-স্তরে থেমে থাকে না বলেই আমরা বহির্জগৎ সম্পর্কে অনেকটা সঠিক সামগ্রিক ধারণা করতে পারি। সংবেদিত গুণগুলোর বিচার, বিশ্লেষণ, সমন্বয়ের মাধ্যমে বস্তুর অখণ্ড বা সামগ্রিক সত্তার পরিচয় লাভ প্রত্যেকটি সুস্থ মানুষের পক্ষেই সম্ভব। এই মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়াকে বলা হয় 'পারসেপশন' (বাংলায় প্রত্যক্ষকরণ, উপলব্ধি)। যা কিছু আমাদের চারপাশে রয়েছে বা ঘটছে, সবকিছুই আমাদের প্রত্যক্ষগোচর হয় সংবেদনের মাধ্যমে; তা-বলে প্রত্যক্ষকরণ বা উপলব্ধিকে ইন্দ্রিয়-সংবেদনের জটিল যোগফল ভাবলে ভুল হবে। উপলব্ধি সংবেদনের থেকে উচ্চতর স্নায়ুপ্রক্রিয়া, সক্রিয় জ্ঞানার্জনের পথে অগ্রতর পদক্ষেপ। যখন কোনো কিছু উপলব্ধি করি, তখন তার অন্তস্থ গুণগুলোও উপলব্ধি করি। কিন্তু উপাদানগুলো তখন স্বতন্ত্র হারিয়ে বস্তুর পূর্ণ প্রতিরূপের মধ্যে মিশে থাকে।

উপলব্ধির বস্তু সব সময়েই মস্তিষ্কে একটা ছাপ রেখে যায়। কোনো কিছু দেখলে বা শুনলে, তার স্পষ্ট বা অস্পষ্ট প্রতিবিম্ব মনের মধ্যে জেগে থাকে। বহি-র্বাস্তবের প্রতিফলনের মূর্ত উপলব্ধি। বাক্‌-স্ফূর্তির পর শিশুর প্রতিবিম্বের জগৎ বাড়তে থাকে। তার সাহায্যে মূর্ত উপলব্ধিগুলোকে সামান্যকৃত করা চলে, একই ধরণের প্রতিবিম্বকে এক সাধারণ নামে অভিহিত করা যায়। এইভাবে সাধারণ ধারণা বা কল্পনার উদয় ঘটে; মূর্ত ধারণা সামান্যীকরণ ও বিমূর্তী-করণের ফলে 'কনসেপ্টে' পরিণত হয়। 'কনসেপ্ট' বা কল্পনার সাহায্যে আমরা বিভিন্ন বস্তু বা ঘটনার মধ্যেকার সম্পর্ক বুঝতে পারি, এ-ছাড়া এমন অনেক কিছু জানতে পারি যা প্রত্যক্ষভাবে ইন্দ্রিয়গোচর হতে পারে না। কেবলমাত্র ভাষার সাহায্যে সেগুলো প্রকাশ করা চলে। 'গাছ' বা 'চেয়ার' বলতে যে সামান্য বিমূর্ত কল্পনার প্রকাশ, প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়ানুভূত কোনো বিশেষ ছবির সংগে তাকে মেলানো চলে না। অথচ সবরকমের চেয়ার বা গাছের সংগে তার সম্পর্ক থেকে যায়। এই সাধারণ মূর্ত ও বিমূর্ত কল্পনা সৃষ্টি দ্বিতীয় সাংকেতিক স্তরের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য।

এরপর বিচারক্ষমতার উন্মেষ ঘটে। সংবেদন, উপলব্ধি, কল্পনা, সর্বোপরি চিন্তন-ক্ষমতা;—এই নিয়ে মানুষের অব-ধারণার জগৎ। 'আকাশে মেঘ জমেছে, বৃষ্টি হতে পারে', ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে, হয়ত কোথাও আগুন লেগেছে'—এই ধরণের কথাবার্তার মধ্যে মানুষের বিচার-ক্ষমতার পরিচয় মেলে। মায়া মোহ ইত্যাদির বিকার-তাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় স্বাভাবিক অবধারণার শারীরবৃত্তের জ্ঞান অপরিহার্য, তাই এই ভূমিকা।

'হ্যাল্‌সিনেশন' বা অমূলপ্রত্যক্ষের বিকারতাত্ত্বিক ব্যাখ্যার আগে বোঝা দরকার ব্যাপারটা কি? ভুল দেখা বা ভুল শোনা বললে সবটা বলা হয় না। 'ইল্যুইশন'-এর প্রতিশব্দও মায়া, ইল্যুশন ও হ্যাল্‌সিনে-শন-এর মত উপলব্ধির বিশৃঙ্খলা। কিন্তু এ-দুয়ের মধ্যে আছে মৌলিক পার্থক্য।

সুস্থ স্বাভাবিক মানুষেরও দৃষ্টিবিভ্রম শ্রুতি-বিভ্রম ঘটতে পারে; দৃষ্টি বা শ্রুতির বিশৃঙ্খলা মাত্রেই 'হ্যাল্‌সিনেশন' নয়। 'অপটিক্যাল ইল্যুশন'-এর সংগে স্কুলের ছাত্ররাও পরিচিত। একটা লাঠিকে জলে ডুবিয়ে রাখলে ভাঙা মনে হয়; জলের ভিতরের ও বাইরের অংশ আর অবিচ্ছিন্ন মনে হয় না। জল ও বাতাসের প্রতি-সরাঙ্ক (রিফ্র্যাকটিভ ইনডেক্স) আলাদা হবার দরুন এইরকম দেখায়। অমনোযোগিতার দরুন ও উপলব্ধির বিভ্রম ঘটতে পারে। আলো কম থাকলে আমরা আগন্তুককে পরিচিত ব্যক্তি বলে ভুল করতে পারি। শোনা কম গেলে আমরা পরিচিত শব্দকে অপরিচিত বলে মনে করতে পারি; এ-রকম ঘটে উদ্দীপনার স্বল্পতার জন্য। ক্রোধ বা ভয়ে বশবর্তী হয়ে আমরা ভুল শুনে থাকি, ভুল দেখে থাকি। মানসিক রোগেও এই রকমের 'ইল্যুশনের' সৃষ্টি হতে পারে। আবার শারীরিক পীড়াতে যদি কোনো কারণে চৈতন্যের বিশৃঙ্খলা ঘটে, তা হলেও দৃষ্টিবিভ্রম, শ্রুতিবিভ্রম ঘটতে পারে। এইসব ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়প্রান্তিক উদ্দী-পনার বস্তুর অবস্থিতি রয়েছে কিন্তু বস্তুটির উপলব্ধি নির্ভুল হচ্ছে না। ডাক্তারকে হয়ত খুনী মনে করে এবং স্টেথসকোপকে পিস্তল ভেবে রোগী ভয় পেয়ে উঠছে। 'হ্যাল্‌সিনেশন'-এর ক্ষেত্রে উদ্দীপকের অবস্থিতির প্রয়োজন হয় না।

দুই-ই উপলব্ধির গোলমাল; 'ইল্যুশনের' বেলায় উপলব্ধির মূলে উদ্দীপক আছে, 'হ্যাল্‌সিনেশনের' বেলায়—ইন্দ্রিয়-প্রান্তকে উত্তেজিত বা উদ্দীপিত করার কোনো বস্তু নেই;—উপলব্ধি বা প্রত্যক্ষের কোনো মূল খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু 'হ্যাল্‌-সিনেশনের' রোগীর কাছে উপলব্ধি কখনও ভ্রান্ত মনে হয় না।

'তাই ত' সে দেখতে পাচ্ছে, স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে তার মৃত স্ত্রী জানালার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে: এইমাত্র সরে গেল।' আতঙ্কের দৃষ্টিতে জানালার দিকে তাকিয়ে

চমৎকার স্বাদ
হচ্ছে এক জিনিষ
আর শক্তিদায়ক পুষ্টি যোগানো
আরেক জিনিষ
আর কেমন মজা কোরে চিবিয়ে খেতে খেতে সেই পুষ্টিলাভ করা যায়। পার্লে গ্লুকো বিস্কুটে দুধ, গম, আর চিনির যাবতীয় উপকারিতা পাওয়া যায়— প্রোটিনে আর ভিটামিনে একদম ভরপুর।
PARLE
Gluco
তাইতো
পার্লে গ্লুকো বিস্কুট
বাচ্চাদের পক্ষে সবিশেষ উপকারী
ভারতের সর্বাধিক বিক্রীত বিস্কুট
everest

CENTRAL LIBRARY

'হ্যালুসিনেশনের' রোগী এইরকম বলবে। অথবা অনেকক্ষণ এক দৃষ্টিতে সেই দিকে তাকিয়ে থাকবে। শ্রুতিজনিত অমূল-প্রত্যক্ষের (শ্রুতীয় হ্যালুসিনেশন) রোগী কান পেতে থেকে ফিসফিস করে বলবে—'শুনতে পাচ্ছেন, ওরা শুরু করে দিয়েছে! বলছে, ফিরে যাও, তোমার নিজের দেশে ফিরে যাও। অইত, ঘরের বাইরে থেকে ওরা আমার নাম ধরে ডাকছে, আর গালি দিতে বলছে।' হ্যালুসিনেশনের প্রকৃতি অনুযায়ী রোগীর ব্যবহার পালটায়। রোগী উত্তেজিত হতে পারে, ভয় পেতে পারে, আনন্দে অধীর হয়ে দু'হাত তুলে নৃত্যগীত শুরু করে দিতে পারে। সুস্থ লোকের এ রকম ঘটতে দেখা যায় না। হ্যালুসিনেশন বেশির ভাগ সময়েই অসুস্থতার সঙ্গে সম্পর্কিত এবং কোনো সময়েই ভ্রান্ত-উপলব্ধির জন্য দায়ী বস্তু রোগীর দৃষ্টিপথে, শ্রুতিপথে থাকে না। কিছু সুস্থ লোক দৃষ্টিমায়া শ্রুতিমায়ার দৌলতে অলৌকিক শক্তির অধিকারী বলে প্রসিদ্ধি লাভ করে থাকেন। তাঁদের দাবী সম্পর্কে কোনোরকম বিজ্ঞানসম্মত অনুসন্ধান চালানো হয়েছে বলে শুনিনি। প্রায় সকল ধর্মের আদিগুরু ও প্রচারকরা শ্রুতি ও দৃষ্টিজনিত অমূলপ্রত্যক্ষ ক্ষমতার কথা বলেছেন ও এই ক্ষমতার বলে সাধারণের কাছে শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। ঈশ্বরকে দেখা ও তাঁর বাণী শ্রবণ করার জন্যই তাঁরা ঈশ্বরের প্রেরিত বা নির্ধারিত প্রতিনিধি বলে বিবেচিত হয়েছেন।

আগেই বলেছি, হ্যালুসিনেশনের বিকারতাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় নানা মুনির নানা মত।

ইন্দ্রিয়ের প্রান্তস্থ গ্রাহী অংশের অসুস্থতা বা বিশৃঙ্খলার জন্যে দৃষ্টিবিভ্রম, শ্রুতিবিভ্রম ইত্যাদি ঘটে থাকে;—এই ছিল এক সময়কার প্রচলিত ধারণা। আধুনিক গবেষণায় এই তত্ত্ব অগ্রাহ্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। হ্যালুসিনেশনের রোগীদের স্পর্শেন্দ্রিয়, শ্রবণেন্দ্রিয়, দর্শনেন্দ্রিয়ের কোনো ত্রুটী পরীক্ষায় ধরা পড়ে নি। অডিটরী (শ্রবণসম্পর্কিত) নার্ভ সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার পরও শ্রুতিজনিত হ্যালুসিনেশন থেকে যায়; অন্ধ দর্শনেন্দ্রিয়বর্জিত 'হ্যালুসিনেশনে' ভুগে থাকে;—এই থেকে প্রান্তিক তত্ত্বকে (পেরিফেরাল থিওরি) সম্পূর্ণভাবে নাকচ করা যেতে পারে।

জার্মান মনোরোগবিদ্ ভার্ণিকের 'কেন্দ্রীয় তত্ত্ব' (সেন্ট্রাল থিওরি) অনুযায়ী হ্যালুসিনেশন-এর জন্য দায়ী মস্তিষ্কের কোষবিশেষের উত্তেজনা। দর্শন কেন্দ্রের কোষগুলোর উত্তেজনা থেকে 'ভিসুয়াল হ্যালুসিনেশন' বা দৃষ্টিসম্পর্কিত মায়া, শ্রবণকেন্দ্রের কোষের উত্তেজনা আনে শ্রবণসম্পর্কিত মায়া। বিভিন্ন ইন্দ্রিয় কেন্দ্রে তড়িৎপ্রবাহ পাঠিয়ে বিভিন্ন ধরনের 'হ্যালুসিনেশন' বা দৃষ্টিবিভ্রম সৃষ্টি করা যায়। এই তত্ত্ব অনুযায়ী শারীরবৃত্তিক ব্যাখ্যা অর্থাৎ কি ঘটছে সেটা জানা গেল, কিন্তু কেন ঘটছে সেটা বোঝা গেল না।

এরপর পাভলভ ও তাঁর সহযোগীদের আবিষ্কার হ্যালুসিনেশন বুঝতে আরো খানিকটা সহায়তা করেছে। স্বপ্ন ও মায়ার ব্যাখ্যায় পাভলভের 'সম্মোহন পর্ব' (হিপনটিক ফেজ) 'প্রহরীস্তম্ভ' (গার্ড-পোস্ট) মতবাদ বিশেষ উপযোগী। নিদ্রাকালীন নিস্তেজনায় মস্তিষ্কের সব কোষ সমানভাবে প্রভাবিত হয় না। কিছুসংখ্যক কোষের নিস্তেজনার মাত্রা কম থাকে; কিছুসংখ্যক হয়ত আদৌ নিস্তেজিত হয় না। সেই সব জায়গায় উত্তেজনার আধিক্য দেখা যায়। এই জায়গাগুলোকে পাভলভ গার্ড-পোস্ট বা প্রহরী-স্তম্ভ নাম দিয়েছেন। স্বপ্ন ও মায়ার মূলে আছে এই অল্প-নিস্তেজিত ও উত্তেজিত কোষগুলোর ক্রিয়া-প্রক্রিয়া। পরবর্তীকালে ঔষধ প্রয়োগে কোষগুলোর উত্তেজনার জড়ত্ব বা অনড়ত্ব দূর করার ফলে অনেক ক্ষেত্রে স্বপ্ন বা মায়া দূর করা সম্ভব হয়েছে। পাভলভের মতবাদ এইভাবে সমর্থিত হয়েছে।

ঘুমের অবস্থায় স্বপ্ন আর জাগ্রত অবস্থায় মায়া (হ্যালুসিনেশন), পাভলভের মতে একই ধরনের শারীরবৃত্তিক ব্যাপার। সম্মোহনের বিভিন্ন দশায় বা পর্বের মতবাদ মায়ার বিকারতত্ত্বের উপর আরো খানিকটা আলোকপাত করেছে। জাগ্রত অবস্থায় সব কোষগুলো সমানভাবে জেগে থাকে না। কিছুসংখ্যক কোষ আধাজাগ্রত আধা-ঘুমন্ত অবস্থা (উত্তেজনা-নিস্তেজনার মাঝামাঝি) থেকে ক্রমশ পুরো ঘুমন্ত অবস্থার দিকে যেতে থাকে। এই কোষগুলোর জাগ্রত থেকে ঘুমন্ত অবস্থায় সংক্রমণের প্রধান তিনটি পর্বের কথা আমরা আগে উল্লেখ করেছি। এ সম্পর্কে 'অমৃত' পত্রিকার নিয়মিত পাঠকরা নিশ্চয়ই খানিকটা অবহিত। দ্বিতীয় পর্বে (যাকে বলা হয়, 'প্যারাডক্সিক্যাল ফেজ' বা স্ববিরোধী পর্ব) স্নায়ুতন্ত্র শক্তিমান উদ্দীপনায় সাড়া দেয় না, অথচ অতি দুর্বল উদ্দীপনায় উদ্দীপনায় উত্তেজিত হয়। বহির্জগতের জোরালো উদ্দীপনা যা মস্তিষ্কে প্রতিফলিত হয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় উপলব্ধি ঘটায়, এখন শক্তিহীন। অনেক আগেকার উপলব্ধির ছাপ বা প্রতিবিম্ব, যা স্বাভাবিক অবস্থায় শক্তিহীন, এখন শক্তিশালী হয়ে মায়া বা অলীক উপলব্ধির সৃষ্টি করছে। শুধু তাই নয়, উপলব্ধ বস্তু বহির্জগতে অভিক্ষিপ্ত হয়ে অলীক উপলব্ধির বাস্তব অস্তিত্ব সম্পর্কে রোগীর মনে দৃঢ়প্রত্যয় এনে দিচ্ছে। স্বপ্ন ও মায়ার মধ্যেকার আসল পার্থক্য সকলেই জানেন। সুস্থ অসুস্থ সব মানুষই স্বপ্ন দেখে, কিন্তু মায়া বা হ্যালুসিনেশন প্রায়শই অসুস্থ মস্তিষ্কের ধর্ম।

শ্রুতিবিভ্রমের রোগীর সাক্ষাৎ আমরা বেশি পেয়ে থাকি। এদের নিয়ে গবেষণাও বেশি হয়েছে। পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে জানা গেছে যে প্রথম সাংকেতিক স্তরের উত্তেজনা-প্রক্রিয়ার জড়ত্ব, 'প্যারাডক্স' পর্বের আবির্ভাব, এবং শ্রবণকেন্দ্রের সঙ্গে সম্পর্কিত দ্বিতীয় সাংকেতিক স্তরের কিছু কোষের বিকার;—এই তিন কারণে শ্রবণভিত্তিক হ্যালুসিনেশন সৃষ্ট হয়। ক্যাফিন ও ব্রোমাইড দিয়ে অনেক রোগীর শ্রবণভিত্তিক হ্যালুসিনেশন বন্ধ করা যেতে পারে।

এইবার সমরবাবুর কাহিনী থেকে হ্যালুসিনেশনের মনস্তাত্ত্বিক কারণ বোঝবার চেষ্টা করা হবে।

সমরবাবুর, বয়স বত্রিশ। স্ত্রীর সংগে চিকিৎসার জন্য এলেন। সঠিকভাবে বলতে গেলে বলা উচিত, স্ত্রী সমরবাবুকে এক রকম জোর করে চিকিৎসার জন্যে নিয়ে এলেন। সমরবাবু শ্রুতিবিভ্রমে ভুগছেন, কিন্তু তিনি সে কথা স্বীকার করেন না। তিনি মনে করেন এই রকম কথা বা নির্দেশ সবার কানেই আসছে। তিনি বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী হবার দরুন নির্দেশগুলো শুনতে পাচ্ছেন, অন্যেরা শুনছেন বা শোনার চেষ্টা করছে না। তাঁর বন্ধুরাও নাকি নির্দেশ শুনে থাকেন।

সমরবাবু এক সরকারী সংস্থার গুদাম-রক্ষক ছিলেন। তিন বছর হল সেই গুদামের কিছু মাল চুরি হয় বা মালের হিসেব মেলে না। সেই সময় থেকে তিনি কথা বা নির্দেশ শুনতে পাচ্ছেন। প্রথমদিকে শুনতেন, পাশের ফ্ল্যাটের লোকেরা তাঁর সম্বন্ধে আলোচনা করছে। এক রাত্রে পাশের ফ্ল্যাটে গিয়ে তিনি চেঁচামেচি হৈ-হল্লা করেন, তাঁকে জোর করে নিজের ফ্ল্যাটে ফিরিয়ে আনতে হয়। এর পর থেকে চিকিৎসা আরম্ভ হয়। প্রথমদিকে এলোপ্যাথিক চিকিৎসায় বিশেষ ফল পাওয়া যায় না। তাঁর স্ত্রীর মুখে শুনলাম 'ট্রাংকুইলিজার' জাতীয় ওষুধে নাকি তাঁর উত্তেজনা বেড়ে যেত তাই হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসা চলতে থাকে। হোমিওপ্যাথিতে কিছু ফল পাওয়া যায়। মাথা ঠাণ্ডা হল, রাগ কমল। কিন্তু কথা বা নির্দেশ তিনি শুনতেই থাকলেন। এখন আর পাশের ফ্ল্যাটে নয়, তাঁর সম্বন্ধে কোনো মানহানিকর আলোচনাও নয়; কথাগুলো আসতে থাকল অনেক দূর থেকে, নির্দিষ্ট কতকগুলো নির্দেশের আকারে। কাজেই আবার এলোপ্যাথিক চিকিৎসা শুরু হল। এবার তাঁকে রাখা হল 'সাইকিয়াট্রিস্টের' চিকিৎসাধীনে। কিন্তু এবারও 'ট্রাংকুইলিজারে' মাথা গরম হল, উত্তেজনা বাড়ল। আবার হোমিওপ্যাথিতে যেতে হল।

এই তিন বছরে তাঁকে দুবার বদলী করা হয়েছে। এখন আর তিনি গুদামরক্ষক নন, গুদামের একজন কেরানী। মালচুরির ফয়সালা একরকম হয়ে গেছে। বিভাগীয় তদন্তে কয়েকজন অপরাধী শাস্তি পেয়েছে। সমরবাবুর বিরুদ্ধে কোনো চার্জ টেঁকে নি; তবে হয়রানি হয়েছে প্রচুর। প্রথমদিকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছিল, পরে আবার তাঁকে চাকরীতে নিয়োগ করা হয়েছে। প্রথমদিকে কয়েক মাস অসুস্থতার জন্য তিনি নিয়মিত অফিস যেতে পারেন নি। এখন নিয়মিত অফিসে যান। সেখানেও নির্দেশ শোনেন, বাড়ীতে এসেও নির্দেশ শোনেন। মাঝে মাঝে রাস্তার লোকেরা তাঁর পাশ দিয়ে যাবার সময় তাঁর সম্বন্ধে দু'একটা খারাপ কথা বলে যায়। সেই সময় তিনি উত্তেজিত হয়ে তাদের পিছু পিছু হাঁটতে থাকেন, অথবা মাঝে মাঝে তাদের সঙ্গে কিছু কথাবার্তা বলেন। তবে আগের মত রেগে গিয়ে গালমন্দ করেন না। রাত্রে প্রায়ই জেগে জেগে দূরাগত নির্দেশ শুনতে থাকেন।

আমার সামনে বসেও তিনি বললেন, তিনি নির্দেশ শুনতে পাচ্ছেন। কি ধরনের নির্দেশ? এক এক সময় এক এক ধরনের নির্দেশ শোনা যায়। একটি বা দুটি শব্দে বহুদূর থেকে তাঁকে সাবধান করে দেওয়া হয়। সব সময়েই ইংরিজিতে নির্দেশ আসে। হল্ট! সাইলেন্স! লাফ্ দাই নেবার! এই তিনটে নির্দেশই আজকাল বেশি শুনছেন। এর আগে শুনতেন অন্য ধরণের নির্দেশ। গো এ্যাহেড'—এগিয়ে যাও! এই নির্দেশটি বছর খানেক আগে শুনতেন। তার আগে আরো অনেক ধরনের কথা শুনেছেন; সব এখন মনে নেই।

প্রথম দিকে কি শুনতেন? অনেক চেষ্টা করেও মনে করতে পারলেন না। স্ত্রীর কাছে জানলাম, তখন তিনি মালচুরির ব্যাপার নিয়ে নানা কথা শুনতেন। কোনো সময় শুনতেন যে প্রতিবেশীরা তাঁকে দোষী মনে করছে, কোনো সময় আসল অপরাধীদের নাম তাঁর কানে বাতাসে ভেসে আসত। কোনো সময় আবার কে বা কারা যেন তাঁকে অন্যকে আঘাত করার নির্দেশ জানাত। বিভাগীয় তদন্তের পর আর এ ধরনের কথাবার্তা তিনি শুনছেন না। এখন যা শুনছেন তা অনেক দূর থেকে আসছে, মৃদু কিন্তু স্পষ্ট!

ভদ্রলোকের সঙ্গে তিনবার সাক্ষাৎকারের পরও তাঁকে বোঝাতে পারলাম না যে তিনি ভুল শুনছেন। তবে এই নির্দেশ তাঁকে চঞ্চল করে, অস্থির করে, একথা তিনি স্বীকার করলেন। এই নির্দেশ বন্ধ হলে তিনি অখুশী হবেন না। এই নির্দেশের সঙ্গে মালচুরির ব্যাপারের কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে, তিনি মানতে চাইলেন না।

সমরবাবুকে দেখে মনে হবে তিনি শান্তশিষ্ট স্বভাবের নির্বিরোধী মানুষ। চিকিৎসার প্রয়োজন নেই জেনেও স্ত্রীর অনুরোধে চিকিৎসা করাতে আসছেন। স্ত্রীর উপর বিশেষ নির্ভরশীল। স্ত্রীকে মাঝে মাঝে আঘাত করতে চেয়েছেন (রোগের প্রথম দিকে), কিন্তু কোনোদিন আঘাত করেন নি। ওষুধপত্র স্ত্রীর নির্দেশে নিয়মিত খেয়ে আসছেন। এঁরা নিঃসন্তান। প্রায় আট বছর হল বিয়ে হয়েছে।

সমরবাবু শৈশবে বাবামাকে হারিয়ে মিশনারীদের কাছে মানুষ হন। তাঁর স্ত্রী ও তাঁরই মত মিশনারীদের বোর্ডিং স্কুলে থেকেছেন। দুজনেরই শৈশব কৈশোর বাংলার বাইরে কেটেছে। এঁরা দীক্ষিত নন, কিন্তু নিয়মমত বাইবেল পড়েন। একটা ছোট শহরের শান্ত পরিবেশে দিন কাটিয়ে কোলকাতা এঁদের কারুরই ভালো লাগছে না। আত্মীয়স্বজন বলতে বিশেষ কেউ আছেন বলে মনে হল না। অশান্ত অস্থির-মতি স্বামীকে এই তিন বছর ধরে ভদ্র-মহিলা একাই সামলে এসেছেন। সে যে কত কঠিন কাজ সেটা আমি বুঝি।

সমরবাবু কোনো কিছু বলতে চান না। স্ত্রীর বয়স অল্প, তাঁর কাছ থেকে এদের পারিবারিক ইতিহাস বেশি কিছু জানা গেল না। আমার কাছ থেকে কিছু কথা যেন এঁরা গোপন করতে চান। ওষুধে কাজ হয় না কেন?—স্ত্রীর এই অনুযোগ। আর স্বামীটি তো ধরেই নিয়েছেন দূরাগত বাণী সবার কাছেই আসছে। কিন্তু শোনার ও বোঝার সৌভাগ্য সকলের হয় না। এদিক থেকে তিনি অন্যের থেকে বিশিষ্ট শক্তির অধিকারী।

চতুর্থ দিনে সমরবাবু মুখ খুললেন। খুব অল্প মাত্রায় 'প্যারাডক্সিক্যালি' কাজ হয়েছে; মনে হল। আগে মাথা ঠাণ্ডা করার ওষুধ খেয়ে মাথা গরম হচ্ছে, উত্তেজনা বাড়ছে, শুনেই আমি বুঝেছিলাম ভদ্র-লোকের মস্তিষ্ক কোষগুলোর কিছু অংশ স্ববিরোধী (প্যারাডক্সিক্যাল) অবস্থায় রয়েছে। তাই স্বাভাবিক মাত্রায় ওষুধে বিপরীত ফল হয়েছে। সমরবাবু দূরাগত নির্দেশের উৎস সম্পর্কে আমাকে অবহিত করলেন।

মধ্য-ভারতের এক ছোট শহরের গির্জা-সংলগ্ন কবরখানা থেকে নির্দেশবাণী ধ্বনিত হচ্ছে। কাদার ড্যানিয়েলের সমাধি থেকে নির্দেশ আসছে। এ গোপন কথা তিনি বিশ্বাস করে শুধু আমাকেই জানালেন। অন্য কাউকে একথা জানালে নরকের আগুনে জ্বলে মরতে হবে। কাল রাতে সমরবাবু আমাকে গোপন কথা জানাবার নির্দেশ পেয়েছেন। নীলকে অর্থাৎ স্ত্রীকে এখনও জানানো চলবে না। আরও অনুতাপ, আত্ম-শুদ্ধির পর নীলা একথা জানার অধিকারী হবে।

সমরবাবু শুধু যাকে নয় মেয়েও আসলে 'হ্যালুসিনেশন' ও 'ডিলুইশন'—দুই-ই সমরবাবুকে পীড়িত করছে। রোগ-বৃত্তান্ত নিয়ে অগ্রসর হবার আগে ডিলুইসন এর স্বরূপ—জানা দরকার।

'ডিলিউশন' (বাংলায়—মোহ বা ভ্রান্তি) রোগগ্রস্তের মিথ্যা ধারণা বা মতামত। এই মিথ্যা ধারণা তর্ক করে বা নানারকমের যোগাই পেড়ে দূর করা যায় না। বস্তুর সঠিক বিন্যাস বা অবস্থান দেখেও 'ডিলুই-শনের' রোগী তার ভ্রান্তিকে আঁকড়ে ধরে থাকে। বস্তুজ্ঞান বিকৃত প্রতিফলন থেকে ভ্রান্তির সৃষ্টি। অনেকে মোহ বা ভ্রান্তিকে প্রধানত প্রাথমিক ও আনুষঙ্গিক এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। মায়ার (হ্যালু-সিনেশনের) সঙ্গে সম্পর্কিত নয় যে সব ভ্রান্তি তাদের বলা হয় প্রাথমিক ও মায়া সম্পর্কিত ভ্রান্তিকে বলা হয় আনুষঙ্গিক বা সেকেন্ডারী। সমরের ভ্রান্তি দ্বিতীয় পর্যায়ে পড়ে।

ভ্রান্তি অন্য দিক থেকে দু'বার সংবেদনমূলক ও ব্যাখ্যামূলক;—এই দুই ভাগে বিভক্ত। সংবেদনমূলক ভ্রান্তি মূর্ত, স্পষ্ট, প্রথম সাংকেতিক স্তরের সঙ্গে সম্পর্কিত; আর ব্যাখ্যামূলক ভ্রান্তি বুদ্ধি-তর্কের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, বিমূর্ত চিন্তা-প্রক্রিয়ার ব্যাপার, দ্বিতীয় সাংকেতিক স্তরের সঙ্গে সম্পর্কিত।

আমরা আত্মপ্রাসঙ্গিক ভ্রান্তি (ডিলুই-শন অফ রেফারেন্স) ও নিবর্তনমূলক ভ্রান্তির (ডিলুইশন অফ পারসিকিউশন) সঙ্গে সব থেকে বেশি পরিচিত।

আত্মপ্রাসঙ্গিক 'ডিলুইশনের' রোগী মনে করে আশে পাশের সব কিছুই তার সঙ্গে সম্পর্কিত। সবাই তাকে দেখছে, তার সম্বন্ধে কথা বলছে, তাকে নিয়েই আলোচনা করছে, তার কথা ভেবেই অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় করছে। চেনা অচেনা সকলেই তার প্রসঙ্গেই মত্ত। ও কেন ওর দিকে তাকিয়ে হাসল? ওরা কানে কানে কি কথা বলল? নিশ্চয়ই আমাকে নিয়েই কথা বলছে। সিগারেটের ধোঁয়ায় রিং তৈরীর ওর কি সত্যিই দরকার ছিল? নিশ্চয়ই আমাকে উদ্দেশ্য করেই রিং তৈরী করেছে। ও সেদিন বাঁ হাত দিয়ে আমার চাবিটা নিল। আমাকে অশ্রদ্ধা দেখানোর জন্য নিশ্চয়ই। ঘরে ঢুকেই দেখলাম সবাই হাসি থামিয়ে অন্য দিকে তাকিয়ে আছে। এর নিশ্চয়ই একটা অর্থ আছে। এই রকম নানা ভাবে আত্মপ্রাসঙ্গিক ভ্রান্তির উপসর্গ রোগীর কথাবার্তায় বেরিয়ে আসে। অতি তুচ্ছ বা সাধারণ ঘটনাকে বিকৃত করে তার থেকে আত্মপ্রাসঙ্গিক তাৎপর্যপূর্ণ অর্থ বের করে 'ডিলিউশনের' রোগী।

নিবর্তনমূলক ভ্রান্তি প্রথমদিকে আত্ম-প্রাসঙ্গিক রূপে দেখা দিয়ে পরে আরো জটিল রূপ গ্রহণ করে। সমরবাবু 'হ্যালু-সিনেশনের সঙ্গে নির্বর্তনমূলক ভ্রান্তিতে ভুগছেন।

—অশোকবন্ধু

নিজেরে হারায়ে খুঁজি

অহীন্দ্র চৌধুরী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কতোদিন পর স্টারে এলাম?

সেদিন ২ জুলাই সন্ধে সাতটার স্টারে এসেই পুরোনো দিনের কথা মনে পড়লো। এই স্টারের নাম তখন ছিল আর্ট থিয়েটার। সে কি আজকের কথা? ১৯২৩ সাল। এই আর্ট থিয়েটারেই আমার পেশাদারী মঞ্চ-জীবনের শুরু। এই মঞ্চেই প্রথম অভিনয় করেছিলাম কর্ণার্জুন নাটকে অর্জুনের ভূমিকায়।

পুরোনো দিনের স্মৃতি মনের পর্দায় ফুটে উঠলো। স্মৃতি নয়—আমারই অভিনয়-জীবনের প্রতিচ্ছবি।

দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে আবার সেই পুরোনো মঞ্চে এলাম। সেদিনের আর্ট থিয়েটার আজকের স্টার।

গেলাম সলিলবাবুর কক্ষে। কথা হলো। আমি এখনই এই মঞ্চের শিল্পী তালিকায় নিজের নাম লিপিবদ্ধ করেছি। গেলাম পুরোনো দিনের সেই কক্ষটিতে, যেখানে আমি 'মেক-আপ' নিতাম। দেখা হলো, পুরোনো দিনের অনেক কর্মী-কলাকুশলীর সঙ্গে। বেশ বুঝতে পারলাম, সময়ের সঙ্গে আমারও কতো পরিবর্তন। সেদিনের সেই উচ্ছ্বাস আজ স্তিমিত হয়ে এসেছে। আজ আমি শান্ত ধীর, সংযত। তবুও সেই পুরোনো স্মৃতি মনে আনতে কখন যেন অন্য মনে অতীতের পটভূমিকায় হারিয়ে গেলাম।

সলিলবাবুর সঙ্গে নানা বিষয়ের কথা হলো। তারপর মহেন্দ্র গুপ্ত তাঁর নাটক পাঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিং-এর কথা তুললো। এই নাটকে আমাকে অভিনয় করতে হবে নাম-ভূমিকায়।

এর কদিন বাদেই ১১ জুলাই রণজিৎ সিং-এর অভিনয় আরম্ভ হলো। মহেন্দ্র গুপ্তই নাটকে কর্ণ সিং-এর চরিত্রে রূপ দিলেন। সরযূ, পূর্ণিমা, ফিরোজা, রানীবালা—এরাও ছিল এই নাটকের শিল্পী-তালিকায়।

এদিকে মিনার্ভায় যে বাংলা নাটকের অভিনয় হতো, তা বন্ধ হলো। সংবাদটা নিঃসন্দেহে দুঃখদায়ক।

যে সময়ের কথা বলছি, তখন 'বহুরূপী' সম্প্রদায় প্রায়ই নাটক অভিনয় করছেন। 'বহুরূপী'র সঙ্গে বাংলার নবনাট্য আন্দোলনের একটা বিশেষ যোগসূত্র রয়েছে। শম্ভু মিত্র এই সংস্থার কর্ণধার। তারপর তুলসী লাহিড়ীর মতো প্রগতিশীল নাট্যকার এবং অভিনেতা এই সংস্থার আর এক উদ্যোগী পুরুষ।

ঐ সময়ে তুলসী লাহিড়ীর নাটক 'ছেঁড়া তার' রঙমহলে অভিনয় করেন বহুরূপী সম্প্রদায়। বলা বাহুল্য, 'সমকালীন' সমাজ-ব্যবস্থাই এই নাটকের পটভূমিকা। এই ধরনের নাটক লিখে তুলসী লাহিড়ী বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে একটা নতুন ধারার প্রবর্তন করেছিলেন।

এই সময়ের আর একটি সফল নাটক 'নতুন ইহুদী'—যেটি বহুরূপী সম্প্রদায় প্রায়ই অভিনয় করতো। রঙমহলেও ঐ সময়ে নতুন ইহুদীর নিয়মিত অভিনয় চলছিল।

স্টারের কথা বলতে বলতে অন্য কথায় চলে এসেছি। স্টারে যে শুধু রণজিৎ সিং অভিনীত হচ্ছে, তাই নয়। মাঝে মাঝে মিশরকুমারী, গৈরিক পতাকা, শাজাহান প্রভৃতি নাটকও অভিনীত হচ্ছে।

চলতি দিনের মধ্যে একটি দিন, তিরিশে আগস্ট—অভিনয় শেষে আমরা নাট্যকার শচীন সেনগুপ্তের বাড়িতে গেলাম সহানুভূতি জানাতে। শচীনবাবু তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুতে কেমন যেন ভেঙে পড়েছেন।

তিনকড়ি চক্রবর্তীকে আমি বরাবরই তিনকড়িদা বলে ডাকি। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি আমার অভিনয়-গুরু। কতো দিন পর তিনি আবার শ্রীরঙ্গমে অভিনয় আরম্ভ করলেন শিশিরবাবুর সঙ্গে। বৃদ্ধ মানুষ, ঠিক মতো পারবেন কেন চিরকুমার সভায় অক্ষয়ের ভূমিকায় অভিনয় করতে। বয়সের তো একটা ধর্ম আছে! শ্রীরঙ্গমের আরো নাটকে তিনি অভিনয় করতে আরম্ভ করলেন। একদিন কোন এক অপেশাদার দলের হয়ে তিনকড়িদা শ্রীরঙ্গমে এসেন। সেদিন নাটক ছিল প্রফুল্ল। যে-মানুষ একদিন বাংলা রঙ্গমঞ্চে পাদপ্রদীপের সামনে দাঁড়িয়ে হাজার দর্শককে চমৎকৃত করেছেন, সেই মানুষ আজ কতো অসহায়। অভিনয়ের পর পায়ে হেঁটে এলেন আমার কাছে। বললাম, একে চোখে কম দেখেন, তারপর এই শরীর—এভাবে আপনার পক্ষে পায়ে হেঁটে এত দূর আসা ঠিক নয়।

সেই দিনই বুঝলাম, তিনকড়িদার দুঃখের কথা। মানুষটি সর্বরিক্ত। ভাবলাম, কেন এমন হলো? বাংলাদেশের প্রতিভাশালী অভিনেতা, যিনি নিজেই একটি যুগ—সেই মানুষটি আজ আর্থিক দিক থেকে কতটা অসহায়।

ভাবলাম, আমরা কি কিছু করতে পারি না। আমাদের দেশবাসী, আমাদের সরকার কি এমন কিছু করতে পারেন না, যাতে এই গুণী মানুষেরা জীবনের শেষদিনগুলো স্বস্তিতে কাটাতে পারেন। করুণা নয়, এই সব কৃতী পুরুষকে প্রণামী দিয়ে।

কিন্তু কে শুনবে আমার কথা, আর কাকে বা বলবো।

কতো দিন আর পুরোনো নাটক নিয়ে চলবে। স্টারের ভাবনাটা আমারও ভাবনা। নতুন নাটক কই। কমাস গেল—একনাগাড়ে একের পর এক পুরোনো নাটক নিয়েই চলেছি।

সর্বত্রই একই অবস্থা। একমাত্র সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি মিনার্ভায় শচীন সেনগুপ্তের নাটক 'কাঁটা ও কমল' অভিনয় আরম্ভ হলো। নাটকটির পরিচালক শচীনবাবু নিজে, আর প্রযোজিকা ছিলেন অঞ্জলি রায়।

স্টার তখন বিভিন্ন নাটক নিয়ে চলেছে। কখনো মিশরকুমারী, কখনো শাজাহান, কখনো কঙ্কাবতীর ঘাট, কিংবা অন্য নাটক।

এই একঘেয়েমির মধ্যে একটি নতুন ধরনের নাটকের কথা শুনলাম। এই নাটকটি হলো রঙমহলে অভিনীত গণনাট্য সংঘের 'আগুন'।

গণনাট্য সংঘ সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। সমাজবাদে বিশ্বাসী একদল প্রগতিশীল তরুণ—যারা এই সংস্থার সঙ্গে জড়িত, তারা নাটকে, গানে একটা পরিবর্তন আনতে চায়। একদিক থেকে এই সব তরুণদের মধ্যে একটা সংগ্রামী মন ছিল।

নয়তো প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও তাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ ব্যাহত হয়নি।

এখানে আর একটি নাটকের কথা বলি। নাটকটি হলো মিনার্ভায় অভিনীত ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কেরানীর জীবন'। যার পরিচালক রাসবিহারী রায়।

সেদিন তিরিশে অক্টোবর, স্টারে নাটক ছিল চন্দ্রশেখর, বাইরে লবীতে এসে দেখা হলো নাট্যবান্ধবের সঙ্গে। খবর জিজ্ঞাসা করাতে শুনলাম, সরযূবালার কথা। সে নাকি আজই স্টার ছেড়ে চলে যাবে। কোন কথাই শুনবে না। বলছে, আজই তার স্টারের শেষ রজনী।

যে যাবে, তাকে তো ধরে রাখা যায় না। এক মঞ্চ ছেড়ে আর এক মঞ্চে যাওয়া—এ-ঘটনা তো নতুন কিছু নয়।

কিন্তু প্রভা চলে গেল জীবনের রঙ্গ-মঞ্চ ছেড়ে। কেউ তাকে ধরে রাখতে পারলো না। বাংলা রঙ্গমঞ্চের একটা দীপশিখা নিবে গেল প্রভার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে।

সেদিন তারিখ ছিল ৮ নভেম্বর। প্রভার মৃত্যু-সংবাদ ছড়িয়ে পড়লো শহরে। বন্ধ হলো থিয়েটারের দরজা। অনুরাগীরা শেষ প্রভাকে শেষদর্শন করতে।

পরদিন রঙমহলে যে শোকসভায় পরলোকগত প্রভার উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানানো হয়, তাতে পৌরোহিত্য করেন শচীন সেনগুপ্ত। আর প্রধান অতিথি ছিলেন বিখ্যাত কথা-শিল্পী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীরঙ্গমেও সেদিন অভিনয় অনুষ্ঠানের পূর্বে প্রভার স্মরণে শিশির ভাদুড়ী একটি ভাষণ দিয়েছিলেন।

নাটক আর অভিনয়ের কথার মধ্যেও নতুন পর্যায়ে ডি এল রায়ের দুর্গাদাস নাটকের উদ্বোধন হবে স্টারে। নাটকের শিল্পী-তালিকায় আমি ছিলাম ঔরঙ্গ-জীবের ভূমিকায়, মিহির ভট্টাচার্য ছিল নাম-ভূমিকার শিল্পী আর মহেন্দ্র গুপ্ত ছিল দিলীর খান চরিত্রে। নারীচরিত্রে ছিল রাণীবালা, বন্দনা ও পূর্ণিমা।

এই প্রসঙ্গে কিছু বলা দরকার। আমি মিনার্ভায় এই নাটকের অভিনয় দেখেছি। দানীবাবু অভিনয় করতেন দুর্গাদাসের ভূমিকায়। সে-অভিনয়ের স্মৃতি আমার মনের মধ্যে আছে। সেদিনের অভিনয়ের কথা স্মরণে রেখেই মহেন্দ্রবাবুকে বললাম, দুর্গাদাসের ভূমিকাটা আপনি নিন। মিহিরকে দিন দিলীর খানের ভূমিকা। তাতে নাটকের অভিনয়ের নিকটা জোরালো হবে। কেননা, মিহিরের অভিনয়ে দুর্গাদাসের ব্যক্তিত্ব রূপ পায় না।

মহেন্দ্রবাবু সেই মুহূর্তে কিছু বললেন না। তবে আমার কথাটা তাকে ভাবিয়ে তুললো বৈকি।

শ্রীরঙ্গমে অভিনয় বন্ধ হলো পাঁচিশে ডিসেম্বর থেকে। শুনলাম, পরবর্তী নাটক 'প্রশ্ন'-র প্রস্তুতি চলছে শ্রীরঙ্গমে।

বছরের যে-কটি দিন বাকি ছিল, একটা একটা করে সে-কটি দিনও ফুরিয়ে এলো।

জীবনের ওপর দিয়ে এমনি করে কতো বছর পেরিয়ে গেছে। প্রতিটি বছরের শেষের দিনটিতে পিছনের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছি।

কিন্তু এবারে আর পিছনের দিকে নয় তাকিয়ে আছি সামনের দিকে। নানা চিন্তার মধ্যে থেকে একটি নতুন চিন্তাকে আজ মনের মধ্যে স্থান দিয়েছি। সেটি হলো অভিনয়-জগৎ ছেড়ে যাওয়ার চিন্তা। দেখেছি, আর না—অনেক রঙ দেখেছি, অনেক চরিত্রে রূপ দিয়েছি, নাটকের অনেক সংলাপ উচ্চারণ করেছি—এবারে দেখতে চাই এ-সবের বাইরে কি আছে।

এই চিন্তার মধ্যেই ১৯৫২ শেষ হলো। যে ক্লান্তি, যে অবসাদ ছিল বছরের শেষ দিনটিতে, ঠিক সেই সুরটিই মনের মধ্যে ছিল বছরের প্রথম দিনটিতে।

মুক্তি চাইছি, তবু মুক্তি পাচ্ছি না। নিজের বন্ধনে নিজে জড়িয়ে আছি। নাটকের সংলাপ উচ্চারণ করবো না, এ-কথা ভাবলে কী হবে, তবু সেই একই মঞ্চে পাদপ্রদীপের আলোয় ঔরঙ্গজীবের রূপসজ্জায় অভিনয় করলাম আমি।

১৯৫৩ সালের ডায়েরীতে প্রথম পৃষ্ঠায় লিখে রেখেছিলাম, আমার ক্লান্তির কথা, অবসাদের কথা।

কদিন বাড়িতে বেশ সানন্দেই ছিলাম ভানুকে নিয়ে। কিন্তু তারও আবার সাগর-পারে যাবার সময় হলো। ১৮ জানুয়ারী এয়ার ইণ্ডিয়ার প্লেনে কলকাতা থেকে জুরিখ যাত্রা করলো। পরদিন দুপুরে তার ফোন পেলাম। জুরিখ থেকে সে তার পৌঁছনোর সংবাদ দিলে।

জানুয়ারী মাসের বাকি দিনগুলো একরকম কাটলো। তবে শেষের দিকে একটা বিশেষ খবর দিল্লীতে ফাইন আর্টস আকাদমির উদ্বোধন। রাষ্ট্রপতি ডা রাজেন্দ্র-প্রসাদ স্বয়ং এর উদ্বোধক। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্যে কলকাতা থেকে শিশিরবাবু, শচীনবাবু এবং আমি আমন্ত্রিত হয়েছিলাম। কিন্তু যেতে পারি নি। শচীনবাবু আকাদমির সদস্য মনোনীত হলেন, আর শিশিরবাবুকে ফেলোশিপ দেওয়া হলো। কিন্তু শিশির-বাবু আকাদমিতে যোগ দেন নি।

একটা কথা বলা হয়নি, জানুয়ারীতেই স্টারে অভিনয় হতে লাগলো সিরাজদ্দৌলা। ঐ নাটকে আমি মিরজাফর চরিত্রে অংশ নিতাম। এই সঙ্গে ঐতিহাসিক নাটক দুর্গাদাসও চলছিল।

এই পুরোনো নাটকের ভিড়ে ছবি বিশ্বাস মিনার্ভায় একটি নতুন নাটক উপহার দিলেন। রচয়িতা মন্মথ রায়। নাটকটির নাম 'জীবনটাই নাটক'। নাটকের নামকরণটি বড়ো চমৎকার লাগলো।

মার্চের প্রথম পৃষ্ঠায় কালো অক্ষরে লেখা রয়েছে একটি মানুষের মৃত্যুর খবর, যে মানুষটি হলেন স্বনামধন্য লেখক নির্মল চন্দ্র। বাংলা দেশকে যারা ভালো বেসেছেন, নির্মলচন্দ্র তাদেরই একজন। বাংলা দেশের জনসেবার ক্ষেত্রে তিনি একজন নীরব সেবক। এছাড়া মঞ্চের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল তাঁর। একসময় আর্ট থিয়েটারের কর্ণধারস্থানীয় ছিলেন। নির্মল চন্দ্রের মৃত্যুতে সেদিন শহরে শোকের ছায়া নেমেছিল।

কদিন আগে ছবি বিশ্বাস মিনার্ভায় 'জীবনটাই নাটক' উপহার দিয়েছে। কদিন পরেই মিনার্ভায় ছবি বিশ্বাস 'দিল্লীর বন্দী' অভিনয় সুরু করলে।

মিনার্ভায় দিল্লীর বন্দীর উদ্বোধন হলো ৫ মার্চ।

ঐদিনই আমি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লাম। কেমন যেন দুর্বল, অশক্ত মনে হলো নিজেকে। স্নায়বিক দৌর্বল্য—এর আগেও মাঝে মাঝে দেখা দিয়েছে কিন্তু এমন অসহায় অবস্থায় পড়িনি।

আবার ঐ দিনেই ছিল শৈলজানন্দের কঙ্কাবতীর শেষ রিহার্সাল। জানালাম মহেন্দ্রবাবুকে, আমার পক্ষে নাটকে অংশ নেওয়া বোধহয় সম্ভব হবে না।

তবু অংশ নিতে হলো। শরীর অশক্ত, মন অবসর নিতে চায়—তবু মুক্তি নেই। নিজেকে এক কঠিন নিগড়ে বেঁধে ফেলেছি।

৬ মার্চ উদ্বোধন হলো কঙ্কাবতীর। মঞ্চে নামতে হলো। তবে নিজেকে অব-লম্বন নিতে হলো। একটা লাঠি।

তবে কি এবারে সত্যিই বার্ধক্যের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছি? এ প্রশ্ন আমার মনে। কিন্তু আমার মন তো এখনো সতেজ। এখনো সবুজের মেলায় ভরে আছে। তবে দেহটা হয়তো জীর্ণ হয়ে পড়ছে। পড়বে বৈকি। দেহটা তো নশ্বর সামিল। কিন্তু বন্দী আমিটা তো অম্লান। তার বয়স নেই। কালের রেখা সেখানে পড়ে না।

যেদিন কঙ্কাবতীর উদ্বোধন হলো, সেইদিনই অরোরার ছবি 'ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য' মুক্তিলাভ করলো। সে ছবিতে আমিও অভিনয় করেছি।

শরীর অসুস্থ। তবু অভিনয় করে চলেছি। এদিকে চিকিৎসাও চলছে যথা-রীতি। কিন্তু মন চায় না, আর অভিনয় করি। অথচ ছাড়তে পারছি না।

এরই মধ্যে একদিন ডাঃ রায় অধিকারী তাঁর এক অধ্যাপক বন্ধুকে নিয়ে বাড়িতে এলেন। নানাকথার পর আমাকে পরীক্ষা করলেন।

ডাঃ অধিকারী বললেন, আমি তো জানি আপনার নার্ভ যেকোন মানুষের চেয়ে শক্তিশালী। সুতরাং যেটুকু দুর্বলতা এটা কিছুটা পরিশ্রমের জন্যে।

সেদিন ডাঃ অধিকারী ব্যবস্থাপত্রও দিলেন আমার জন্যে।

কঙ্কাবতী তেমন জমলো না। মাঝে মাঝে অন্য নাটকও অভিনীত হচ্ছে স্টারে। ২ এপ্রিল পাপিনী, আর ৯ এপ্রিল দুর্গা-দাস অভিনীত হলো। এই দুটি নাটকে আমিও অংশ নিতাম।

দিনগুলো একই ধারায় চলছে। নতুনত্ব কিছু নেই। সেই পুরাতনের পথ ধরেই চলা। এ যেন আর ভালো লাগছে না। মনে হয়, সব ছেড়ে দিনকতক কোথাও ঘুরে আসি।

এইরকম যখন মানসিক অবস্থা, তখনই একটি মনের মতো খবর শুনলাম। আমার মেয়ে জামাই, আর তাদের ডাক্তার বন্ধু দেবেশ মল্লিক সস্ত্রীক কাশ্মীর যাচ্ছে। শুনে স্থির থাকতে পারলাম না। সঙ্গে সঙ্গে মেয়ে-জামাইকে জানালাম, তোমাদের সঙ্গে আমিও যাবো। সুধীরাও অবশ্য সঙ্গে থাকবে। সেই মতো টিকিট কাটাও হলো।

আমার মন তখন বাইরে যাবার জন্যে উন্মুখ। তবু যে কটা দিন মাঝখানে আছি সে কদিন কিন্তু আমাকে যথারীতি অভিনয় করতে হবে।

এই দুর্বল শরীরেও মিশরকুমারীর মতো নাটকে অভিনয় করতে হলো। ঐ নাটকে 'আবন' চরিত্রটি ছিল আমার। আমি তো জানি, ঐ চরিত্রটিতে যথাযথ রূপ দিতে কতোখানি শক্তির প্রয়োজন। সেই শক্তি নেই—অথচ মঞ্চে দাঁড়ালে কী এক শক্তির গোপন উৎসমুখ খুলে যায়। নয়তো অভিনয় করবো কেমন করে।

কিন্তু অভিনয় শেষে যখন আমি মঞ্চের বাইরে এসে দাঁড়ালাম—তখনই মনে হতো আমি দুর্বল, আমি অশক্ত। এই মঞ্চে অভিনয়, আমার পক্ষে আর সম্ভব নয়।

স্টারে যোগ দিয়েছিলাম, কমাস আগে। এবারে স্টার ছেড়ে যাবার পালা। কর্তৃপক্ষ ছাড়তে না চাইলেও আমাকে ছাড়তে হলো।

আমাদের কাশ্মীর যাবার দিন আগে থেকেই ঠিক ছিল। ৫ মে। দিনটি দেখতে দেখতে এসে গেল।

যেদিন কাশ্মীর যাবো, ঐদিনই সংবাদ-পত্রে দেখলাম, নাট্যকার শচীন সেনগুপ্ত মিনার্ভায় যোগ দিয়েছেন পরিচালক হিসেবে।

কাশ্মীর যাবো—মনে তখন এই একটিই চিন্তা। আর একটু চিন্তা আমাদের সহ-শিল্পী ভূমেনের জন্যে। ভূমেন অসুস্থ, রোগটাও সামান্য কিছু নয়—সম্ভবতঃ টি, বি—মনে মনে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলাম, ভূমেন যেন সেরে ওঠে।

৫ মে আমরা কাশ্মীর রওনা হলাম। আমি, সুধীরা, কন্যা মীরা, জামাতা ডাঃ সন্তোষ বসু এবং সস্ত্রীক ডাক্তার দেবেশ মল্লিক। নাতনী গৌরীও সঙ্গে আছে।

পথে যখন চলি, দুচোখ খুলে রেখে চলি। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলা ট্রেনের জানালায় বসে চলমান ছবি দেখতে দেখতে নিজেকে হারিয়ে ফেলি।

দিন গেল। রাত গেল। ৬ মেয় সূর্য ওঠা দেখলাম ট্রেনে বসে। প্রচণ্ড দাব-দাহের মধ্যে আমাদের ট্রেন ছুটে চলেছে। সেদিনও গেল চলতি ট্রেনে। ৭ মে একটু বেলা হতেই পৌঁছলাম পাঠানকোট স্টেশনে।

পাঠানকোটে ক্ষণিকের যাত্রা বিরতি। কিন্তু বিরতির কাল কতটুকুই বা। আবার আমাদের চলার সময় হলো। এবারের পথ সমতলভূমি ধরে নয়, হিমালয়ের পাদদেশ ধরে জম্মু পেরিয়ে পাহাড়ের দুর্গম পথ ধরে কাশ্মীর উপত্যকা।

পথে জম্মুতেও কিছুক্ষণের জন্যে অবসর পেলাম। অবসরের কণাটুকু ভরিয়ে নিতে চাই। যতটুকু দেখার দেখে নিই। শহরের প্রাণকেন্দ্র রঘুনাথজীর মন্দির। দর্শন করলাম, কিন্তু দুদণ্ড দাঁড়িয়ে দেখার অবসর কই। তবু সংক্ষিপ্ত অবসর-টুকু পূর্ণ করে নিই।

হিমালয়ের পাদদেশে জম্মু শহর। শহরটাকে যেটুকু দেখেছি তাতে প্রাণচঞ্চল মনে হলো।

জম্মু থেকে যাত্রা শুরু হলো। উধম-পুরের নাম শুনেছি। এবারে চোখে দেখলাম। এখানে সেনাবাহিনীর বিরাট ছাউনী রয়েছে।

উধমপুর পার হবার পরেই হিমালয়ের বিরাট রূপের কিছুটা চোখে পড়লো।

পথটি দুর্গম হলেও মনোরম। পথের একদিকে পাহাড়ের দেয়াল, অন্যদিকে গভীর খাদ। সবুজ সরলবর্গীয় বৃক্ষের সমারোহ পাহাড়ের অঙ্গ জুড়ে।

চলতি পথে সন্ধ্যা নামলো। সবুজ বনভূমির রূপটা অস্পষ্ট লাগলেও এক বিচিত্র রূপে দেখা দিল। যেন প্রকৃতির ক্যানভাসে আঁকা জলরঙের ছবি।

একটানা চড়াই পথ ধরে চলেছি। চলার মুহূর্তগুলি সুন্দর। এবং রোমাঞ্চকর।

অবশেষে 'কুদ'-এ বাস দাঁড়ালো। এখানেই আজকের মতো যাত্রা বিরতি।

পাহাড়ের ওপর মনোরম এই কুদ। চারদিকে পাহাড়ের হাতছানি, তারই মাঝে চলতি পথের সরাইখানা। অনেকগুলো পাঞ্জাবী হোটেল রয়েছে। যেখানে যাত্রীদের জন্যে সব রকমের খানা-পিনার ব্যবস্থা।

হোটেল থেকে রাতের আহার গ্রহণ করে আমরা স্থানীয় ডাকবাংলোয় এলাম। এখানেই রাত কাটাতে হবে।

কদিনের ক্লান্তিতে দেহে অবসাদ জড়িয়ে আছে। রাত এগারোটা বাজতে আমরা শয্যা গ্রহণ করলাম।

শুধু রাতটুকু। ভোরেই আবার কুদ ছেড়ে রওনা হবার পালা।

প্রাতরাশ সেরে যখন আমরা কুদ ছাড়লাম, তখন সকাল সাতটা।

এবারের পথ আরো দুর্গমে চলেছে। পথে একটি জায়গার নাম দেখলাম রামবান। যেখানে সামরিক পরিবেশ জুড়ে রয়েছে সুরম্য বনভূমি।

এবারে আমাদের যেতে হবে বানি-হালের সুড়ঙ্গ পথ পেরিয়ে। এখন আমরা চলেছি সুউচ্চ বানিহাল পর্বতমালার ওপর দিয়ে।

মাঝে পড়লো 'চিনার' নদীর তীরে ক্ষুদ্র অধিত্যকা। তারপর আবার সেই চড়াই পথ ধরে ওঠা।

বানিহাল টানেলের মুখে কিছুক্ষণের জন্যে বাস দাঁড়ালো। আমরা প্রায় নহাজার ফুট ওপরে এসেছি। এখানে দাঁড়িয়ে চারদিকে লক্ষ্য করি। দেখি, যদি কোথাও চোখে পড়ে 'স্বর্গ দ্বিপত্রের' বাসা। শুনেছি

১৯৭০ সালে আপনার ভাগ্য

যে-কোন একটি ফুলের নাম লিখিয়া আপনার ঠিকানাসহ একটি পোষ্টকার্ড আমাদের কাছে পাঠান। আগামী বৎসরে আপনার ভাগ্যের বিস্তারিত বিবরণ আমরা আপনাকে পাঠাইব: ইহাতে পাইবেন ব্যবসায়ে লাভ - লোকসান চাকরিতে উন্নতি বদলী, জমি বিবাহ ও সন্তান-সম্বন্ধিয় বিবরণ—আর থাকিবে কষ্টে প্রতিকার প্রকাশ ... নির্দেশ। একবার পরীক্ষা করিলেই ... পারিবেন।

Pt. DEV DUTT SHASTRI
Raj Jyotshi (AWC) P. B. 86
JULLUNDUR CITY

হিমালয়ের এই সব অঞ্চলে স্বর্ণ ঈগলের সন্ধান পাওয়া যায়।

যদিও থাকে, তবে এরা মানুষের আসা-যাওয়ার পথের ধারে থাকে না, তারা নিশ্চয়ই আছে কোন নিরাপদ নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে। মানুষের পায়ের চিহ্ন যেখানে পড়ে না।

এবারে বানিহাল সুড়ঙ্গপথে আমাদের বাস ধীরে ধীরে প্রবেশ করলো। দীর্ঘ অন্ধকার সুড়ঙ্গপথ। ওপর থেকে অনবরত জল চুঁয়ে পড়ছে। ঠিক যেন বৃষ্টি হচ্ছে। হেডলাইট জেলে বাস চলেছে। ধীর গতিতে। কেমন যেন গা ছম-ছম করে এই সুড়ঙ্গপথ অতিক্রম করার সময়ে। সুড়ঙ্গ-পথ পেরিয়ে এলাম। পথের পরিবেশ এবং পটভূমিকা মুহূর্তে বদলে গেল।

ওপর থেকে বিহঙ্গ দৃষ্টিতে দেখলাম, নীচে রমণীয় উপত্যকা। মনে হলো, কে যেন একটি চিত্রিত সবুজ কার্পেট বিছিয়ে রেখেছে। এবারে আমাদের পথ উৎরাই হয়ে নেমে গেছে উপত্যকার সন্ধানে। অবশেষে উপত্যকার পথে নেমে এলাম। সমতল পথ চলে গেছে সিধে, আর সড়কের কিনারা দুপাশে রেখে।

পথের দুপাশে দৃষ্টিপাত করি। সবুজ ফসলের ক্ষেত, ফলের বাগান, ছায়াঘন চিনার বৃক্ষ তারপর মাঝে মাঝে জনপদ,

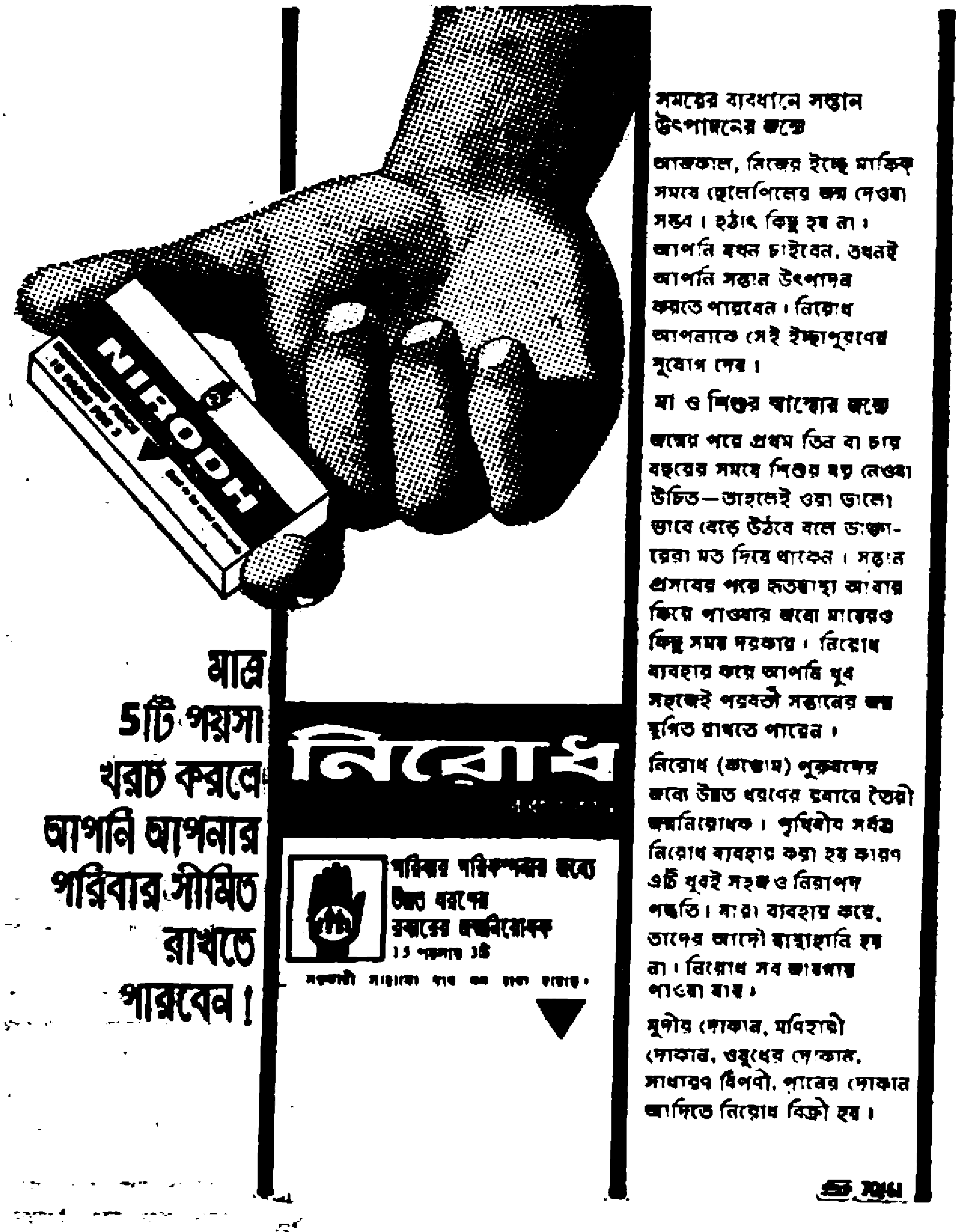

বসতি। দূরে দৃষ্টি দিই, যেখানে হিমালয়ের স্বপ্ন জড়িয়ে আছে, ছড়িয়ে আছে।

বেশ কিছুদূর ছুটে এসে আমরা রাজধানী শ্রীনগরে এসে পৌঁছলাম।

আমরা উঠবো মিস্টার কে. রায়ের শান্তভবনে। সুতরাং সেদিক থেকে নিশ্চিত। আমাদের অপেক্ষায় ছিলেন রায় দম্পতি। সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন আমাদেরকে। আতিথেয়তার কোন ত্রুটি রাখেন নি রায় দম্পতি। মুহূর্তে ভুলে গেলাম পথের কষ্ট। মনেই হলো না, আমরা দূরদেশে এসেছি। শ্রীনগরে মিস্টার রায়ের বাসভবনে এসে একটি কথাই মনে হলো, যেন আমরা কোন আপনজনের কাছে এসেছি।

চিরকাল আমার ওই এক স্বভাব। কোথাও এলে বিশ্রামের কথা ভুলে যাই। এখানেও তার ব্যতিক্রম হলো না। ক্ষণ-বিশ্রামের পর বেরিয়ে পড়লাম। যে ঝিলমের কথা শুনেছি, সেই ঝিলম চোখে দেখলাম। এই ঝিলমের ধারার সঙ্গে ভারত-উপমহাদেশের ইতিহাসের অনেক কিছু ধারা প্রবাহিত হয়েছে। ঝিলমের তীরে বাঁধের ওপর নিবিড় বৃক্ষ-বিন্যাসের মধ্যে দাঁড়িয়ে দেখলাম, সুসজ্জিত হাউস-বোটগুলোকে। দেখলাম, ভাসমান শিকারা। হাউসবোট আর শিকারা—এই দুয়ের মধ্যে কাশ্মীরের শুধু বৈশিষ্ট্যতা নয়, বৈচিত্র্যও মিশে রয়েছে। ঝিলমের তীরে ইতস্ততঃ ঘোরাঘুরি করে ফিরে এসেছি নির্দিষ্ট আশ্রয়ে।—দ্বিতীয় দিনের সকাল থেকে আরম্ভ হলো কাশ্মীর দেখার পালা।

ভোর হতে চা-পানের পর বেরিয়ে পড়লাম। প্রথমেই গেলাম ঝিলমের তীরে। ঝিলমের তীরে দাঁড়িয়ে দেখলাম, দূরে তুষারাচ্ছাদিত গিরি-শিখর। দেখলাম, বিস্তৃত হিমালয়ের প্রচ্ছদপট।

দেখলাম, শহরের প্রাণকেন্দ্র ডালের তীরে শঙ্কর পর্বত। ভারত-ঋষি শঙ্করাচার্যের স্মৃতিবিজড়িত শঙ্কর পর্বতের ওপরে রয়েছে মন্দির। সোপান বেয়ে ওপরে উঠতে হয়। ওপরে ওঠা আজই হলো না। তবে ইচ্ছে রইলো। এলাম ডালের তীরে। রমণীয় ডাল হ্রদ—হাউস বোট আর শিকারার ভিড়। দেখলাম, এপারে ওপারে নানা বৃক্ষের বিন্যাস। ডাল-এর তীরে মহারাজার প্রাসাদ। রাজকীয় প্রাসাদ। যেদিকে তাকালেই মনে পড়ে, কয়েকটি বছর আগের কথা। যেদিন ওই প্রাসাদকে ঘিরে আন্তর্জাতিক রাজনীতির দাবা খেলা বসেছিল। এখনো সে খেলার শেষ হয়নি। তবে সেদিনের মতো সে উত্তেজনা আজ আর নেই।

ডাল-এর রূপের তুলনা নেই। তবে এ রূপের মধ্যে প্রসাধনের চিহ্নটা সুস্পষ্ট। মানুষের হাতের স্পর্শ পড়েছে—কৃত্রিমতার চিহ্ন সেখানে [illegible] লাগে, তবু মনে হয় দিনের পর দিন দাঁড়িয়ে থাকি ডাল-এর পারে—আর কিছু না হোক, একটু তৃপ্তি তো পাবো। কাশ্মীরকে বলা হয়, ভূস্বর্গ। আমি তা বলতে চাই না। তবে এটুকু বলবো, কাশ্মীরের রূপের তুলনা নেই। যুগে যুগে কাশ্মীর উপত্যকাকে মানুষ নানা অলঙ্কারে সাজিয়েছে। এখনো চলেছে তার সাজানোর পালা। কাশ্মীরের রূপের মধ্যে কোথাও বৈরাগ্যের চিহ্ন নেই। কাশ্মীর যেন নানা অলঙ্কারে ভূষিতা বনিতা—যে যেমন ভাবে পারে, তার মনোরঞ্জন করতে চেয়েছে।

তাইতো কাশ্মীরকে এমন করে কাছে পাওয়ার বাসনা মানুষের। আমিও তার বাইরে নই।

যে কদিন থাকবো, অবসর পেলেও অবসর যাপন করবো না। দেখবো ঘুরে ঘুরে—যা কিছু দেখার। মনের মধ্যে তার ছবি এঁকে নেব।

ঐতিহাসিক মোগল উদ্যানগুলো দেখলাম। নিশাতবাগ, শালিমারবাগ, দেখলাম চশমাশাহী, দেখলাম টাঙ্গমার্গ। টাঙ্গমার্গ পেরিয়ে গেলাম সবুজ পাহাড়ের চড়াই পথে গুলমার্গ। ভালো লাগলো গুলমার্গের রমণীয় পরিবেশ। দু'চোখে বিস্ময় নিয়ে দেখলাম, পাইনের বন, দেখলাম মরশুমী ফুলের বর্ণাঢ্য সমারোহ। ভারতবর্ষে এমন জায়গা নেই, যেখানে মন্দির নেই। কাশ্মীরের ক্ষীরভবানী মন্দিরের প্রসিদ্ধির কথা শুনেছি, দেখলাম। পুজো দিলাম, প্রসাদ গ্রহণ করলাম। রাজধানী শ্রীনগরের যা কিছু দর্শনীয় দেখেছি। তবু মনে হয় যেন দেখার শেষ নেই। সবচেয়ে সুন্দর লাগতো ডাল-এর বুকে সন্ধ্যা কাটানো। শিকারায় চেপে ডাল-এর বুকে ইতস্ততঃ ভেসে বেড়ানো—মনে হতো যেন কোন স্বপ্নলোকে বিহার করছি।

আরো ভালো লাগতো যখন ডালের তীরে কোন নির্জন ভূমিখণ্ডের ওপর দাঁড়িয়ে কান পেতে শুনতাম, পাইনের মর্মরধ্বনি। মনে হতো, স্বর্গ যদি কোথাও থাকে, তবে তা এখানে। এই কাশ্মীরে।

মানুষের মন তো, স্বপ্ন সেখানে থাকবেই। স্বপ্ন বাদ দিয়ে জীবনকে চিন্তা করা যায় না।

আমি তো দেখেছি—বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যখন বস্তুবাদী মন নিয়ে জীবনকে চেয়েছি, তখন সে চাওয়ার মধ্যে সব পেয়েছি, কিন্তু আনন্দ খুঁজে পাইনি। আমার যা কিছু আনন্দ, সে যেন স্বপ্নের মধ্যে। আমার স্বপ্নলোকের চাবিটি খুঁজে পাই পরিচিত পরিবেশের বাইরে এলে। আর এরই জন্যে বোধহয় এমনি করে ছুটে চলার নেশা।

শ্রীনগর থেকে একদিন এলাম পহলগাঁও-এ।

নতুন করে বিস্মিত হলাম পহলগাঁও-এর সৌন্দর্য সুষমা দেখে। লীডারের পাহাড়ের পাদমূলে রমণীয় পহলগাঁও। এক নজর দেখলাম। পীর পাঞ্জালের পাদদেশে সাগরপৃষ্ঠ থেকে প্রায় সাত হাজার ফিটের ওপরে এই রমণীয় অধিত্যকা পহলগাঁও। পহলগাঁও-এর অর্থ নাকি মেষপালকদের গ্রাম'।

দু'চোখে বিস্ময় নিয়ে দেখলাম, চারদিকে পাহাড়ের প্রচ্ছদপট, চীর আর পাইনের বন। সবচেয়ে সুন্দর লাগে লীডারের দিকে তাকালে। অজস্র উপলখণ্ডের মধ্যে দিয়ে চঞ্চলা লীডার ছুটে চলেছে। হয়তো ওরও মনে সাগরের নেশা। কিন্তু আমার দু'চোখে কীসের নেশা? হয়তো ভালোবাসার নেশা। প্রকৃতি এখানে যেন আমার পরম।

পহলগাঁও থেকে গেলাম চন্দনবাড়ি। হিমালয়ের বিরাট রূপ যেখানে আরো স্পষ্ট। চন্দনবাড়িই শেষ জনপদ। এখানে আরণ্যক পরিবেশে কয়েকটি রমণীয় বাংলো রয়েছে। যেখানে ভ্রমণ-বিলাসী মানুষ এসে আশ্রয় নেয়। এই চন্দনবাড়ি হয়েই চলে গেছে অমরনাথের পায়ে চলা পথ। দূর থেকে লক্ষ্য করলাম, সামনে পিসু ঘাঁটির সেই চড়াই পথ। শ্রাবণী পূর্ণিমার প্রাক্কালে যে চড়াই পথ পেরিয়ে স্বামী অমরনাথের উদ্দেশে চলে যাত্রীর মিছিল।

যতো আগ্রহ-ই থাক, এখন তো উপায় নেই অমরনাথ যাবার। তবু চন্দনবাড়ির পথের ধুলো মাথায় নিয়ে ভাবলাম, এই আমার তীর্থদর্শন। এই আমার পথের সম্বল। একটি বরফের সেতুও পেরিয়ে এলাম ওপারের পাহাড়ে। তারপর একটি পাথরখণ্ড কুড়িয়ে ফিরে এলাম।

চন্দনবাড়ি ত্যাগ করে আবার ফিরে এলাম পহলগাঁও-এ।

পহলগাঁও থেকে আবার শ্রীনগর।

আসা-যাওয়ার পথে দেখেছি অবন্তীপুর, দেখেছি কোকরনাগ, দেখেছি মার্তণ্ড মন্দির। ইতিহাসের স্মৃতিবিজড়িত আরো কতো শহর, জনপদ দেখেছি। দেখেছি যা কিছু দেখার। ফিরে এসেছি শ্রীনগর। কিন্তু ফিরে যাবার সময় তো হলো—সুতরাং এবার ফিরে যাওয়ার চিন্তা।

দূরদেশে এলে জীবনে যেন নতুন উপলব্ধি আসে। জানি না এটা ক্ষণিকের কিনা। হোক না ক্ষণিকের তবুও এই ক্ষণটুকু তো সত্যি। কিন্তু উলারে এসে সবচেয়ে আনন্দ পেলাম। মনে হলো সুন্দর যদি কিছু থকে তবে তা এখানে।

যে পথ ধরে এসেছিলাম, সে পথে নয়, বিমানে এলাম পাঠানকোট।

(ক্রমশঃ)

বিজ্ঞানের কথা

চক্ষু রোগের চিকিৎসায় আলট্রাসোনিক শব্দতরঙ্গ

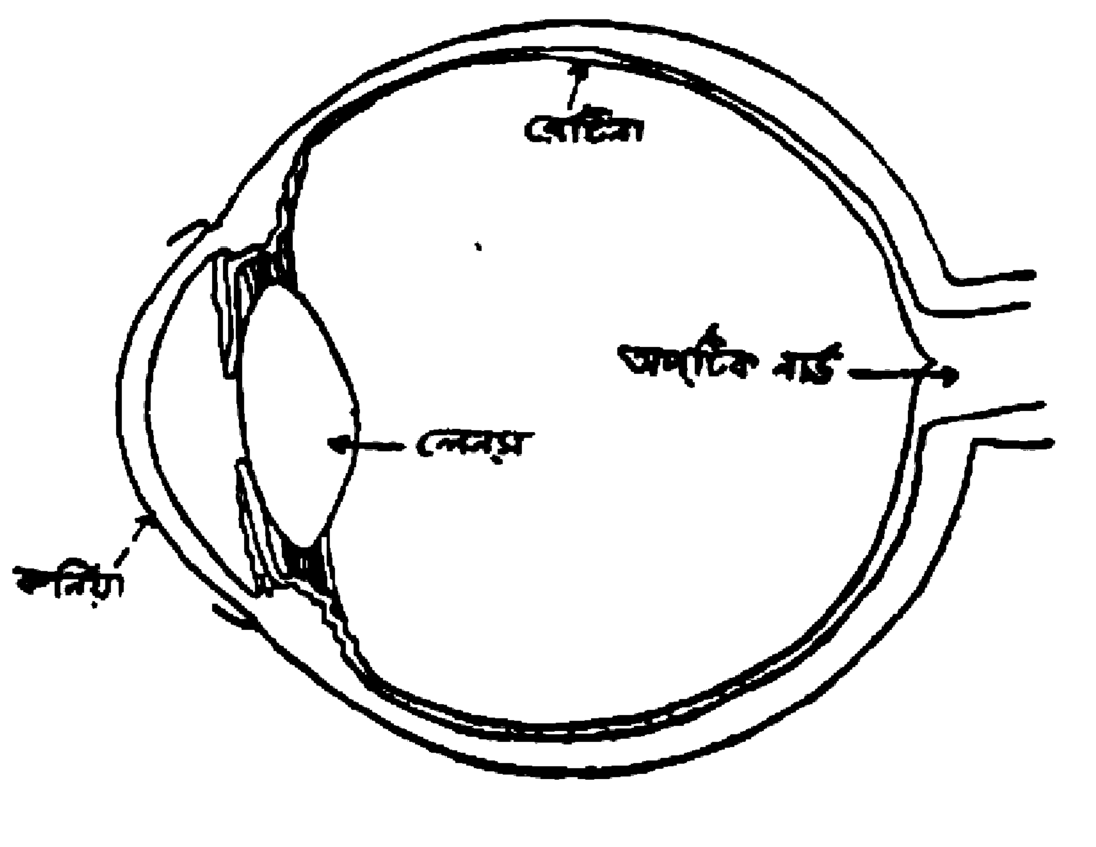

সব শব্দ আমরা শুনি না। শব্দ হচ্ছে এক ধরনের তরঙ্গ যা বাতাস বা অন্য কোনো বাস্তব মাধ্যমকে আশ্রয় করে আমাদের কানে এসে পৌঁছয়। এই তরঙ্গের কাঁপুনি সেকেন্ডে তিরিশ হাজারের বেশি হলে আমরা আর তা শুনতে পাই না, যদিও শব্দের তরঙ্গের মতোই তরঙ্গ। এই শ্রবণাতীত শব্দতরঙ্গকেই ইংরেজিতে বলা হয় আলট্রাসোনিক বা সুপারসোনিক শব্দতরঙ্গ। আমরা ইংরেজি শব্দটিই ব্যবহার করব। শ্রবণাতীত মানে যা শোনা অসাধ্য। কথাটা শুধু মানুষের বেলাতেই সত্যি। পশুপাখিদের মধ্যে অনেকেই এই শ্রবণাতীত শব্দ শুনতে পায়। বাদুড় তো অন্ধকার রাত্তিরে আকাশে উড়ে বেড়াবার সময়ে এই শ্রবণাতীত শব্দতরঙ্গ ছুঁড়ে ছুঁড়ে হদিশ নেয় সামনে কোনো বাধা আছে কিনা, যদি থাকে তো তাতে বাধা পেয়ে শ্রবণাতীত শব্দের প্রতিধ্বনি ফিরে আসে। পাখিরা যে অনেক আগে থেকেই ঝড়ের পূর্বাভাস পায় তাও এই শ্রবণাতীত শব্দ শুনতে পাবার ক্ষমতার জন্যে। কুকুরের কান যে মানুষের চেয়ে অনেক বেশি সজাগ তার মূলেও খানিকটা এই ক্ষমতাই।

কিন্তু মানুষ যদিও শুনতে পায় না কিন্তু আলট্রাসোনিক শব্দের খবর তার অগোচরে থাকে নি। শুধু তাই নয়, এই আলট্রাসোনিক শব্দকে কাজে লাগিয়ে বহু দুরূহ কাজ সে সম্পন্ন করে নিচ্ছে। আজকের বিজ্ঞানের কথায় চক্ষুরোগের চিকিৎসায় আলট্রাসোনিক শব্দের ব্যবহার সম্পর্কে কিছু খবর জানাতে চাই। খবরগুলো নেওয়া হয়েছে কলিকাতাস্থিত সোভিয়েত কনসুলেট জেনারেলের প্রচার বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত বুলেটিনে ভিক্তর বুর্মুকিনের একটি প্রবন্ধ থেকে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ তখন পুরোদমে চলছে। সমুদ্রের এলাকায় জার্মানির ডুবোজাহাজের প্রবল প্রতাপ, মিত্রপক্ষ নাস্তানাবুদ। ডুবোজাহাজের হদিশ পাবার জন্যে একটা কিছু উপায় বার করা দরকার। ফরাসী সমর দপ্তর তৎকালীন একজন বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানের শরণ নিলেন। রুশদেশ থেকে একজন বিজ্ঞানী এলেন তাঁকে সাহায্য করতে। প্যারিসে এই দুই বিজ্ঞানীর সাক্ষাৎকার ঘটল।

রুশ বিজ্ঞানী প্রস্তাব করলেন, ডুবোজাহাজের হদিশ পাবার জন্যে আলট্রাসোনিক প্রতিধ্বনিকে কাজে লাগানো হোক।

অর্থাৎ, সমুদ্রের জলের নিচে চারদিকে আলট্রাসোনিক শব্দ ছোড়া হতে থাকবে। জলের নিচে কোথাও ডুবোজাহাজ থাকলে তাতে ধাক্কা খেয়ে প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে আসবে সেই আলট্রাসোনিক শব্দ। ডুবোজাহাজের হদিশ ধরা পড়বে এই প্রতিধ্বনি থেকে।

এই একই উপায়ে সমুদ্রের জলের নিচের মাছের ঝাঁকের হদিশও টের পাওয়া যেতে পারে।

ফরাসী বিজ্ঞানী কিছুদিনের মধ্যেই ডুবোজাহাজের হদিশ পাবার একটি যন্ত্র বানিয়ে ফেললেন। আবার ডুবোজাহাজের হদিশ পাওয়া গেলে সেটাকে ধ্বংস করাটা বিশেষ শক্ত ব্যাপার নয়। তারপর থেকেই জার্মান ডুবোজাহাজের আধিপত্য শেষ হয়েছিল।

ফরাসী বিজ্ঞানী সে-সময়েই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে আলট্রাসোনিক শব্দ চিকিৎসার ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা চলবে। পঞ্চাশের দশকে পশ্চিম জার্মানির চক্ষু-চিকিৎসকরা চক্ষুর আভ্যন্তরিক রক্তক্ষরণে ও অন্য কোনো কোনো রোগের চিকিৎসায় আলট্রাসোনিক শব্দ প্রয়োগ করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তাঁরা এই চেষ্টা থেকে বিরত হলেন, কেননা আলট্রাসোনিক শব্দের প্রয়োগে রোগ নিরাময় হয় বটে কিন্তু চোখের ক্ষতিও করে। উপরন্তু আলাপ-আলোচনার পরে পশ্চিম জার্মানির চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞদের সমিতি থেকে চক্ষুরোগের চিকিৎসায় আলট্রাসোনিক শব্দের ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হল।

মনে হয়েছিল বিশেষজ্ঞদের এই নিষেধাজ্ঞাই চিরকালের জন্যে বলবৎ থাকবে। কিন্তু তা থাকে নি। বিজ্ঞানের ইতিহাসে 'না'-কে 'হাঁ' করার ও 'হাঁ'-কে 'না' করার ঘটনা বারে বারেই ঘটেছে। এবারেও এই নিষেধ অপ্রমাণ করার ক্ষমতাসম্পন্ন সাহসী বিজ্ঞানীর আবির্ভাব ঘটল।

তাঁর নাম রস্তিস্লাভ বারসুক, ডি এস-সি, ওদেসা-স্থিত চক্ষুরোগ ও টিসু থেরাপির ফিলাতভ ইন্সটিটিউটের গবেষক বিজ্ঞানী। তিনি স্থির করলেন, চক্ষুরোগের চিকিৎসায় আলট্রাসোনিক শব্দ প্রয়োগের যৌক্তিকতা তিনি প্রমাণ করবেন।

অবশ্য গোড়ায় তিনি গবেষণা শুরু করেছিলেন অন্য উদ্দেশ্য নিয়ে। তিনি চেয়েছিলেন জন্তু-জানোয়ারের ওপরে প্রয়োগ করে টিসুর ওপরে ও সুস্থ চোখের ওপরে আলট্রাসোনিক শব্দের প্রভাব

পর্যবেক্ষণ করতে। এই গবেষণা নিয়েই তিনি বাকি জীবন কাটাবেন এমন কোনো ইচ্ছা তাঁর ছিল না। কিন্তু গবেষণা শুরু করতেই এমন সমস্ত তথ্য উদ্ঘাটিত হতে লাগল যার কোনো ব্যাখ্যা তখনো পর্যন্ত জানা ছিল না। তখন তিনি এই গবেষণার মধ্যেই পুরোপুরি ঝাঁপিয়ে পড়লেন। জীবকোষে আল্ট্রাসোনিক শব্দের ক্রিয়া সম্পর্কে যা-কিছু পড়ার ছিল পড়ে নিলেন। হাতে-কলমে প্রচুর গবেষণা করলেন। শেষ পর্যন্ত পূর্বসূরীদের ভুল তাঁর কাছে ধরা পড়ল। তিনি বুঝতে পারলেন, অন্যান্য ওষুধের প্রয়োগের মতো আল্ট্রাসোনিক শব্দের প্রয়োগও কড়াকড়ি রকমের মাত্রাবদ্ধ হওয়া দরকার। চোখের ক্ষতি অল্পেতেই হয়ে থাকে, কাজেই দেহের অন্যান্য অংশে প্রয়োগ করার সময়ে যে-মাত্রা নিরাপদ চোখের বেলায় তা কিছুতেই নয়। পরীক্ষার পর পরীক্ষা চালিয়ে বার্থিস্লাভ মামদুর চক্ষুরোগের চিকিৎসায় আল্ট্রাসোনিক শব্দের তীব্রতার মাত্রা নির্দিষ্ট করে দিলেন।

অতঃপর একটি শুভ যোগাযোগ ঘটল। বার্থিস্লাভ মামদুর যোগ দিলেন প্রখ্যাত চক্ষুরোগ-বিশেষজ্ঞ প্রফেসর ডেভিড হর্লাফের সঙ্গে। দুজনে একযোগে গবেষণা শুরু করলেন এ-ব্যাপারটি জানতে যে কর্নিয়া বা অচ্ছোদ পটল পুনঃস্থাপনের পরে যে বিশেষ ধরনের চক্ষুরোগ দেখা দিয়ে থাকে তার চিকিৎসায় আল্ট্রাসোনিক শব্দ কতখানি প্রযোজ্য। কর্নিয়া পুনঃস্থাপনের পর কোনো কোনো ক্ষেত্রে চোখের ওপর হানি পড়তে শুরু করে এবং চোখের মণি ঢাকা পড়ে যায়। কর্নিয়া পাল্টানো এমনিতেই অতি দুরূহ একটি অপারেশন, কিন্তু তার পরেও যদি হানি পড়ার দরুন রোগীর দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে তার চেয়ে দুঃখের ব্যাপার আর কিছু হতে পারে না। রোগীকে তখন আরো একবার কর্নিয়া বদল করার প্রস্তাবে রাজী হতে হয় কিন্তু তবুও আশঙ্কা থেকে যায় যে দ্বিতীয়বার কর্নিয়া বদলের পরেও দ্বিতীয়বার হানি পড়তে পারে। আর দ্বিতীয়বার কর্নিয়া বদলের প্রস্তাবে রাজী না হলে চিরকালের মতো দৃষ্টিহীনতাকেই মেনে নিতে হয়।

বার্থিস্লাভ মামদুর ও ডেভিড হর্লাফ্ড প্রমাণ করলেন যে এই বিশেষ রোগের চিকিৎসায় আল্ট্রাসোনিক শব্দের প্রয়োগে সুফল পাওয়া যেতে পারে। জন্তু-জানোয়ারের ক্ষেত্রে দেখা গেল একেবারে গোড়ার অবস্থায় আল্ট্রাসোনিক শব্দ প্রয়োগ করলে হানি-পড়া বন্ধ হয় এবং ক্ষেত্রবিশেষে হানি মিলিয়েও যায়।

চিকিৎসার এই পদ্ধতি অতঃপর ১২৬ জন রোগীর ওপরে প্রয়োগ করে দেখা হল। শতকরা ষাটজন রোগীর ক্ষেত্রে চিকিৎসায় সুফল পাওয়া গেল, দ্বিতীয়বার কর্নিয়া বদলের আর কোনো প্রয়োজন থাকল না। বাকি শতকরা যে চল্লিশটি ক্ষেত্রে চিকিৎসা ব্যর্থ হল তা এই কারণে যে কর্নিয়া বদলের বহু পরে চিকিৎসা হয়েছিল, ততদিনে চোখের হানি হয়ে উঠেছিল ঠাণ্ডা আর শক্ত।

এই ঘটনার পরেই চক্ষুরোগের চিকিৎসায় আল্ট্রাসোনিক শব্দ প্রয়োগের যথার্থতা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করল। শুধু এই একটি রোগের চিকিৎসাতেই নয়, ক্রমে ক্রমে আরো বহু-প্রকারের জটিল চক্ষুরোগেও।

চক্ষুরোগের চিকিৎসায় ভারতীয় বিজ্ঞানীর কৃতিত্ব

ডঃ এন এস কাপানি কুড়ি বছরেরও বেশি কাটিয়ে এসেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। প্রায় ষাটটি গবেষণা-নিবন্ধ ও গ্রন্থ রচনা করেছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আবিষ্কারকদের জাতীয় পরিষদের সদস্য ও বহু সম্মানের প্রাপক হয়েছেন। সম্প্রতি তিনি ভারতে এসেছেন এবং দিল্লীতে অবস্থানকালে টাইমস অব ইন্ডিয়ার সাংবাদিকের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে চক্ষুরোগের চিকিৎসায় তাঁর আশ্চর্য পদ্ধতির কিছু বিবরণ দিয়েছেন।

চোখের রেটিনায় কাটা বা ছেঁড়া সারাতে হবে। তাহলে ডঃ কাপানির বিবরণ অনুসারে ঘটনাটি দাঁড়াবে এইরকম : রোগীকে বাঁধাছাঁদার দরকার নেই, বিশেষ কোনো অবস্থানে নিয়ে যাওয়ারও দরকার নেই। তিনি এসে বসবেন একটি চেয়ারে, আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে। সামনে থাকবে একটি যন্ত্র, নাম 'লেসার ফটো কোয়াগুলেটর'। এই যন্ত্র থেকে লেসার আলোর রশ্মি এসে ঘা দিতে থাকবে রোগীর চোখের ওপরে, অতি দ্রুত, পঞ্চাশ থেকে একশো বার পর্যন্ত। চোখের রেটিনাটি তখন বাইরে বেরিয়ে আসবে ও প্রায় একটা ভাসমান অবস্থায় পৌঁছবে। এই অবস্থাতেই রেটিনার প্রয়োজনমতো মেরামত-কার্য চলবে, অনেকটা দূর-নিয়ন্ত্রিত ঝালাইকার্যের মতো। পলকপাতের মধ্যেই চিকিৎসা শেষ, না দরকার হল রোগীকে অজ্ঞান করার, না রোগীর চোখের পাতা উলটোবার, না রোগীর চোখে গরম ছুঁচ ফোটাবার। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই সম্পূর্ণ সুস্থ রোগী পায়ে হেঁটেই বেরিয়ে যেতে পারবেন।

চিকিৎসার এই পদ্ধতি ডাঃ কাপানির কল্পনা বা স্বপ্নের বিষয় নয়। গত দুই দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপে পঞ্চাশ হাজারেরও বেশি রোগীর চোখে এ ধরনের 'পলকে অপারেশন' করা হয়েছে। যে যন্ত্রটির কথা বলা হল সেটি ও অনুরূপ আরো চল্লিশটি যন্ত্র ডাঃ কাপানি নিজেই আবিষ্কার করেছেন।

—অয়স্কান্ত

নিয়মিত ফরহ্যান্স টুথপেষ্ট দিয়ে ব্রাশ করলে মাড়ির গোলযোগ ও দাঁতের ক্ষয় বন্ধ হয়

ছোট বড় সকলেই ফরহ্যান্স টুথপেষ্টের অযাচিত প্রশংসা করেন। এই প্রশংসাপত্রগুলি জেফ্রি ম্যানার্স এন্ড কোং লিমিটেডের যে কোনও অফিসে দেখতে পারেন।

এই দেখুন, তাঁদের মধ্যে একজন কি বলছেন : "বৈজ্ঞানিক উপায়ে তৈরী ফরহ্যান্স পেষ্ট সহজপ্রাপ্য করার জন্যে আপনাদের ধন্যবাদ জানাই। গত পাঁচ বছরেরও বেশী দিন ধ'রে, আমার মাড়ির জন্যে আমি এই টুথপেষ্ট ব্যবহার ক'রে আসছি। এই টুথপেষ্ট আমার খুবই প্রিয় হ'য়ে ওঠায়, বোম্বাইয়ে আমার কিছু বন্ধুও এখন ফরহ্যান্স ব্যবহার করতে শুরু করেছেন।"

—এস এ অকরামন, বোম্বাই

বিনামূল্যে "দাঁত ও মাড়ির যত্ন" পুস্তিকার জন্যে এই ঠিকানায় ২০ পয়সার ডাকটিকিট পাঠান : ম্যানার্স অ্যাডভাইসরী ব্যুরো, পোষ্ট ব্যাগ নং ১০০৩১, বোম্বাই—১। এই পুস্তিকা বাংলা ভাষায় পাওয়া যায়।

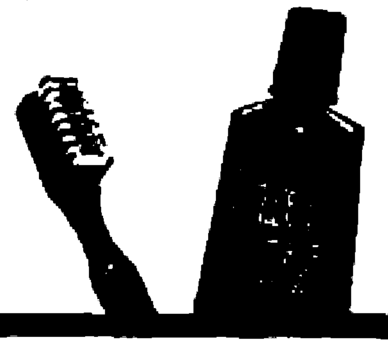

ফরহ্যান্স টুথপেষ্ট—এক দন্তচিকিৎসকের সৃষ্টি A7

846 102 Ben,

(তিন)

সজন সত্যকে উপলব্ধি করেছে, জড়ের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়েছে এবং মানুষের আত্মার মুক্তির পথ সে তৈরী করেছে, তার বিশ্বাস ছিল মানুষ তাকে ভুল বুঝবে না। কিন্তু যখন সকলে তাকে ভুল বুঝল সজন ক্ষুব্ধ হল না কোন প্রতিবাদ করল না। নীরবে নিজের প্রতি তার শ্রদ্ধা অনেক বাড়িয়ে দিল। আসলে কেউ আমাকে বুঝতে পারে না, সজন মনে মনে হাসল, এই সমাজের কেউ আমাকে বুঝবার উপযুক্ত নয়। সকলে বলে চলল সজন নিজের স্বার্থের জন্যে নিজের কুশ্রী স্বার্থের নগ্ন রূপটাকে আড়াল করার জন্যে এক অভিনব নীতিবিদের ভূমিকা নিয়েছে। যেমন করেই হোক ললিতাকে জীবন থেকে সরিয়ে দিয়ে জীবনে অন্য নারীর জায়গা করে দেবার জন্যে সে এক অদ্ভুত জীবননীতি আশ্রয় করেছে। এবং সজন যে মনে মনে খুব একটু আত্মপ্রসাদ লাভ করল একটা মহান দায়িত্ব সে পালন করেছে এই কথা বিশ্বাস করে, তার এই বিশ্বাস এবং আত্মতৃপ্তির যোগ্য পুরস্কার সমাজ তাকে দেবে—সমাজের প্রত্যেকটি মানুষ দিল তাকে তাদের সমস্ত অবজ্ঞা। সজন সমাজের এই অবজ্ঞা পরম আনন্দের সঙ্গে বরণ করে নিল। সমাজের এই অবজ্ঞা আর উপেক্ষা তাকে একটা মৃত সমাজের রুদ্ধশ্বাস পরিবেশের মৃত্যুসম [illegible] থেকে মুক্তি পেতে সাহায্য করেছে। সকলে বুঝেছে সজনের মুক্তি চেতনার মূলে আছে তার প্রখর স্বার্থবুদ্ধি। সজন স্বীকার করল, ঠিক তাই। আমি একটা স্বতন্ত্র ব্যক্তি, আমি কখনোই আমার মৃত্যুকে অভিনন্দন জানাতে পারি না। প্রত্যেকেরই আছে এই ব্যক্তিত্বের তাড়না। তাই ললিতাও আমাকে ক্ষমা করে নি। ললিতা অন্তত নির্বোধ ছিল না। তাই সে আমাকে ভালোবাসার চেষ্টা করে নি। অর্থাৎ সকলেই নিজের ব্যক্তিত্বের ওপর দাঁড়িয়েই যা কিছু করার করে, যে দিকে চলা দরকার চলে। তাই ব্যক্তিত্বের স্বার্থে সে যা করেছে সজনের সন্দেহ নেই সে ঠিকই করেছে। সে বিশ্বাস করে না তার ব্যক্তিত্ব অন্য কাউকে আঘাত করতে পারে যা করেছে।

এ কথা সত্য যে রাত্রির অবিকল অস্তিত্বকে সজন নিজের অন্তরে গভীরভাবে অনুভব করেছিল এবং নিশ্চিত জেনেছিল জীবন সম্পর্কিত যে কোন প্রশ্নে একমাত্র রাত্রিই তার অবলম্বন। সে অনেক আগেও জানত এখন আবার জানল ললিতার অর্থাৎ যে কোন কিছুর বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিজের প্রার্থিত সম্ভাবনায় নিজেকে মুক্তি দেওয়া এই হল তার উদ্দেশ্য। তাকে অনেক বড় হতে হবে, পৃথিবীতে পরিচিত হতে হবে। জীবন সম্পর্কে তার যে ধারণা সেইভাবে জীবনকে গড়তে হবে। আর কে অস্বীকার করবে ললিতা তার জীবনের এই চলার পথে একটা দুরূহ বাধাস্বরূপ ছিল। সেই বাধা পেরিয়ে রাত্রিতে আবদ্ধ হওয়া সে-ও একটা বাধা সজন মনে মনে জানত। কিন্তু ললিতা যখন ছিল বাধা তাকে দূর করার জন্যে মুক্তির পথ হিসাবে রাত্রিকে স্বীকার করতে হয়েছিল। এখন প্রার্থিত মুক্তির জন্যে সজন নিশ্চয়ই ভুলে যাবে না যে রাত্রি ও তার জীবনের পথে একটা দুর্বিসহ বাধা হয়ে উঠবে।

তবে রাত্রির প্রতি কৃতজ্ঞও কিছু কম নয় সজন। যে তাকে অনেক বড় হতে প্রেরণা দিয়েছে তাকে অসীমের স্বপ্ন দেখিয়েছে সে যে আর কেউ নয়, রাত্রি, সজনের চেয়ে বেশী আর তা কে জানে। এখন সজন তার সেই স্বপ্নের অনেক কাছাকাছি, সে প্রতিষ্ঠিত কবি—দিনে দিনে এই প্রতিষ্ঠা আরো বেড়ে চলবে, তারপর—। সুতরাং এখন যদি রাত্রি আমার জীবনে নাও থাকে, সজন ভাবল, যদি আর কখনোই এই জীবনে আর কোনদিন রাত্রির সঙ্গে দেখা না হয় তাহলেও যে পরিচয় আমি লাভ করেছি, যে পরিচয় আমি লাভ করব (যদিও জানি, জানব আমার সমস্ত পরিচয়ের মূলে রাত্রি) তা রাত্রি আমার থেকে ফিরিয়ে নেবে না, এবং আমি আমার কিছুই

চায়নি না আমার জীবনে রাত্রির মধ্যে যে সৌন্দর্য যে লাবণ্য যে তুলনাহীন পরিচয় আবিষ্কার করেছিলাম তার সমস্ত কৃতিত্বই আমার নয়। কে জানে হয়ত রাত্রির নিজের যে পরিচয় ছিল তা আদৌ তাবার মত নয়। হয়ত নিজের প্রয়োজনেই আমি রাত্রিকে নিজের মনের সমস্ত ঐশ্বর্যে মণ্ডিত করে ভেবে আমি হয়ত বা নিজেরই অন্তরের অসীম ঐশ্বর্যের সাধনা করেছি।

কিন্তু একটা কথা, বিশ্বসংসারে এত অসংখ্য মেয়েই তো আছে তাহলে রাত্রিকেই, কেন সজন আশ্রয় করেছিল? রাত্রি নিশ্চয়ই ছিল অনন্যসাধারণ। সজন গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গেই তা স্বীকার করল এবং মনে মনে একান্তভাবে কামনা করল রাত্রি সে যতদূরে যেখানেই থাক তার প্রতি রইল আমার অন্তরের অসীম শুভ কামনা। হে রাত্রি, বিদায়! এখন সজন নিজের দিকে তাকাবে।

নিজের অন্তরের প্রেম সৌন্দর্য আদর্শ দিয়ে পৃথিবীর কোন নারীকে গড়তে গেলে বিপন্ন হতে হয়। অথচ পৃথিবীতে জীবনে সৌন্দর্য এবং প্রেমের—ভালোবাসার অবকাশ না থাকলেও চলে না। পৃথিবীর কোন নারীকেই নিজের ইচ্ছার মত করে পাওয়া যায় না। তাই নিজের সমস্ত ইচ্ছা দিয়ে নারীকে গড়ে নিতে হয়। কিন্তু নারীকে নতুন করে গড়া যায় না। কাউকে নিজের ইচ্ছা অনিচ্ছা ভাবনা কল্পনা দিয়ে দেখা এ অন্যায় এ তার প্রতি অবিচার, এই অবিচার সে সহ্য করে না, সে বিদ্রোহ করে চলে যায়। সে যেমনটি বা তার [illegible] রূপে তাকে এতটুকু বিকৃত না করে ঠিক তার স্বরূপটিকেই মেনে নিতে হবে। কিন্তু তা সম্ভব নয়। তাই অন্তরের স্বপ্ন-বাসনা সমস্ত চিরদিন অপূর্ণ অতৃপ্তই থেকে যায়। জীবনের এই অপূর্ণতার কথা জেনে না জেনে সকলেই বেঁচে চলেছে অবিরাম। সংসারে জীবনের এই আড়ম্বরে সজনকেও একটি সাধারণ ভূমিকা বরণ করে নিতে হবে।

যে সমাজ যে মানুষকে সে একদিন অস্বীকার করেছিল শুধু একটা জোরের সঙ্গে, আজ সজন সেই সমাজ ও তার মানুষের কাছে নিজের জীবনের স্বীকৃতি চায়। কুমল বয়েস বাড়ছে। জীবনের বাস্তবীর কল্পনা অমৃতের অবকাশ এবং বোহিমেনী আবেগ সমস্ত ক্রমশ নিভে যেতে থাকে। জীবনের সত্য একে একে কুয়াশা-মুক্ত হয়। এখন কিছু করার আগে সজন নিজেকে সঠিক বুঝতে চেষ্টা করে। এবার ভুল করলে সে নিজেই আর নিজেকে ক্ষমা করতে পারবে না।

আসলে নারীর সম্পর্কে তার নিজের ভাবনা কল্পনাকেই সে ভালোবেসেছিল, রাত্রিকে নয় নিশ্চয়ই। আসলে ভালোবাসা মূলত কিছুই নয়। নিজের মনে সে সম্পর্কে একটা কুয়াশাময় ধারণা থাকে তারপর তাকেই সত্য ভেবে গভীর আবেগে একটি নারীকে আশ্রয় করা নিজের মনের ভালো-বাসা দিয়ে তাকে অনুভব করা ভালোবাসা—এ সমস্তই একপ্রকার মানসিক বিকৃতি। মেয়েরা অন্তত এই সত্যটা বোঝে। তারা ভালোবাসাকে এমন গুরুত্ব কখনোই দেয় না যাতে ভালোবাসার জন্যে অন্য কিছুর ক্ষতি হয়। অন্য যে কোন কিছুর থেকে ভালোবাসা তুচ্ছ। অর্থাৎ জীবনে অনেক কিছুর স্থান আছে কিন্তু ভালো-বাসার কোন স্থান নেই। যেমন ললিতার বেলায় যে ব্যাপারটা হল—সজন বিশ্বাস করেছিল ললিতা বুঝি তার কাছ থেকে ভালোবাসা চায় আর সে তা দিতে পারে না, ললিতাকে সে ভালোবাসা দিতে পারে না। এবং আশ্চর্য যে সে সত্যিই বিশ্বাস করেছে ললিতার নারী শরীরের স্বাভাবিক সৌন্দর্যগুলিও তাকে আকৃষ্ট করে না, তারপর নিজেকে সে অদ্ভুত অপরাধী কল্পনা করেছে ললিতার জীবনের এই বঞ্চনার জন্য সে-ই দায়ী। এখন সজন নিজের অসল অপরাধটা পরিষ্কার বুঝতে পারে।

এতদিনে সংসারের সমস্ত রহস্য যেন পরিষ্কার হল। জীবনের এই সত্য উপলব্ধিতে এখানে পৌঁছবার জন্যে অনেক অভিজ্ঞতা পেরিয়ে আসতে হয়েছে। সজন এখন শেষ সন্দেহটুকু থেকেও মুক্ত হয়ে বেদের বাণীর মত নির্ভীকভাবে সত্য ঘোষণা করতে পারে যে নারী হল একটি শরীর মাত্র, একটি ভোগ্য শরীর; তার শরীরের বিচিত্র কারুকার্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গের প্রকাশ অনেক অলৌকিক অসীম কল্প-কল্পনার প্রেরণা যোগাতে পারে কিন্তু এর নারীর শরীরের কোন ক্ষয়-ক্ষতি বা লাভ কিছুই হয় না।

সজনের স্বীকারোক্তি— সামাজিক প্রতিষ্ঠা দৈহিক প্রয়োজন বা কোন শুধু স্বার্থের তাড়নায় যে আমি রাত্রিকে ভুলে যাচ্ছি তা নয়। রাত্রিকে আমি কোনদিনই মনে রাখিনি। রাত্রি কেউ নয় কিছুই নয়, তার বস্তুরূপ বা ভাবরূপ কিছুই নেই, সে একটা মায়া, অস্বাভাবিক মনই তার উৎস। এই অস্বাভাবিক আবহাওয়া জীবনের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকর। অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে জীবনের মধ্যেই আমি জীবনের স্বাভাবিক সত্যকে স্বীকার করে নিলাম।

অন্যান্য সকলের মত স্বাভাবিক সহজ-ভাবে বাঁচতে গিয়ে অন্য কারো মত অর্থ-হীন উদ্দেশ্যহীনভাবে বাঁচা নয়, জীবনে সত্যের সঙ্গে সার্থকতার সঙ্গে পরিচয় হবে একদিন সেই উজ্জ্বল পরম মুহূর্তের মুখোমুখি হবার জন্যেই সে এই সহজ জীবনকে সজন স্বীকার করে নিয়েছে। জীবনের এই চলার পথে একজন অন্তরঙ্গ সঙ্গীর প্রয়োজন সে অনুভব করল। সত্যের উদ্দেশ্যে এই জীবনযাত্রার পথে যে বাস্তব দুঃখ-সুখ বিষাদ বঞ্চনাগুলোকে এড়ানো যাবে না তাদের আঘাতে যে ক্ষতের সৃষ্টি হবে তার জীবনে, তার ওপর একজনের—একটি স্নেহ-কোমল হাতের নিবিড় সান্ত্বনার খুব প্রয়োজন হবে, সজন সমস্ত অন্তর দিয়ে সেই প্রয়োজনের গুরুত্ব অনুভব করল। সজন একটি মেয়েকে বিয়ে করল।

•

তার নাম লাবণ্য। লাবণ্যকে বিয়ে করার ঠিক পরেই কিন্তু সজনের মনে হল যে লাবণ্য রাত্রি নয়। লাবণ্যকে দেখলেই রাত্রিকে মনে পড়ে। সজন বিস্মিত হল। বিস্মিত হয়ে না থেকে সে ভাবল লাবণ্য সে লাবণ্যই হবে তাই-ই একান্ত স্বাভাবিক। কেন আমি লাবণ্যকে রাত্রির সঙ্গে তুলনা করতে চাই? আমি আবার ভুল করেছি? সজন ভীষণ জোরের সঙ্গে নিজেকে বোঝাতে চাইল না আমি কিছুতেই ভুল করিনি, না-না-না-না। কিন্তু কেন মনে হচ্ছে আবার আমি ভুল করেছি? আমি ভুল করলে আমার আশা সব শেষ হয়ে যাবে আমি জানি। আমি জানি আমি আবার সেই ভুলই করেছি। কিন্তু সেই কথা সে ভুলে থাকতে চাইল।

সজন লাবণ্যর শরীরে আশ্রয় পেতে গেল। লাবণ্যর শরীরের গভীরে আছে মন।

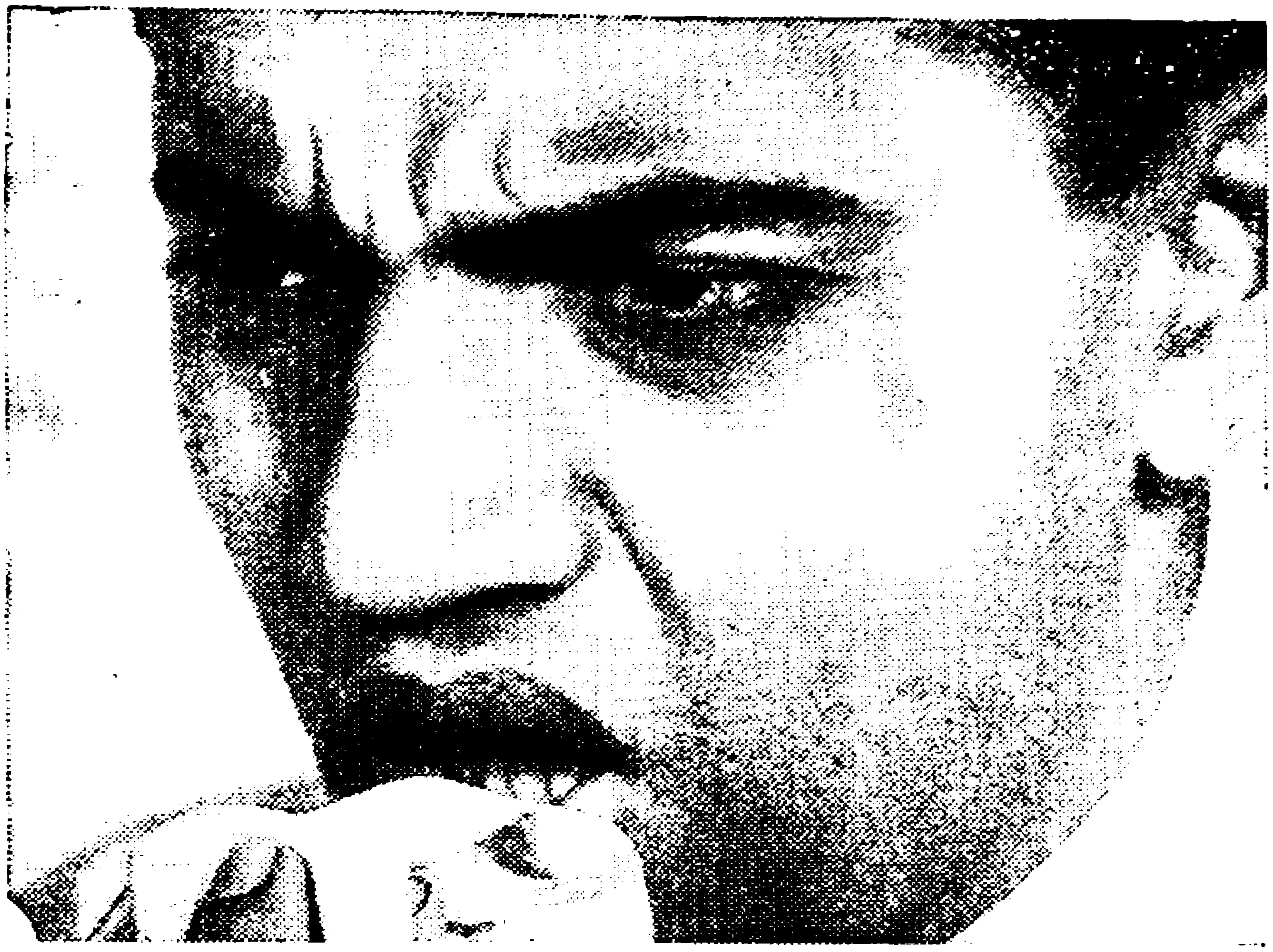

কাশিতে শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে — আর পাঁচরকম রোগে ধরে

স্বাস্থ্য
ও শক্তির জন্য
ওয়াটারবেরিজ কম্পাউণ্ড

সর্দি-কাশি হলে শরীরের রোগ- নিরোধক শক্তি কমে যায়, শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে ও অন্যান্য রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশংকা থাকে। নিয়মিত ওয়াটারবেরিজ কম্পাউণ্ড খান। ওয়াটারবেরিজ রেড লেবেল-এ রয়েছে কতিপয় শক্তিদায়ক উপকরণ যা হারানো কর্মশক্তি ফিরিয়ে আনে, খিদে বাড়ায়, শরীরে রোগ- প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলে। এতে 'ক্রিয়াসোট' ও 'গুয়াকল' থাকায় সর্দি-কাশির উপশম হয়। সেই জন্যেই ওয়াটারবেরিজ রেড লেবেল আপনাকে সুস্থ সবল রাখবে।

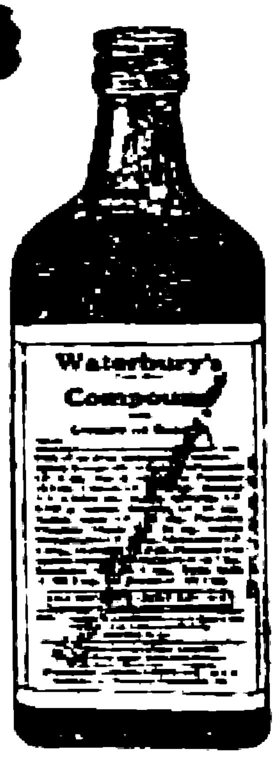

ওয়াটারবেরিজ কম্পাউণ্ড -
সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য টনিক

ওয়ার্নার-ল্যাম্বার্ট এর উৎকৃষ্ট উৎপাদন।

পৃথিবীর আর কোন নারীরই যদি মন না থাকে শুধু লাবণ্যর তা আছে।" একমাত্র লাবণ্য—সে অনন্যা। তার আছে আশ্চর্য শারীরিক লাবণ্য। অনন্ত হৃদয় ধনে সে ধনী। সে শুধু সজনেরই জন্য। পৃথিবীতে প্রত্যেকটি পুরুষের জন্যে থাকে একটি বিশেষ নারী। সজনের জীবনে সেই বিশিষ্টা নারী লাবণ্য। লাবণ্য ও সজন দুজনের মিলিত স্পর্শে মিলিত পরিচয়ে দুজনই হবে পূর্ণ। কিন্তু লাবণ্যর শরীর মন সজনের মনে হয় সমস্তই রাত্রির। লাবণ্যর শরীর ব্যবহার করে মনকে আন্দোলিত করে সজনের শুধুই মনে হয় এই শরীর রাত্রির এই মন রাত্রির। এতে অবশ্য সজন সুখী হতে পারে না। সে জানে লাবণ্যকে রাত্রি ভাবলে রাত্রি জানলে তাতে লাবণ্যর কোন আনন্দ নেই। একদিন লাবণ্যর তা জানতে বাকী রইল না যে সে ব্যবহৃত হচ্ছে। সে স্পষ্ট প্রতিবাদ করল। সজন অস্বীকার করে না লাবণ্যর অভিযোগ মিথ্যা নয়। সজন কেমন করে অস্বীকার না করে পারে তার নিজের অন্তরকে! তার অন্তরের সত্তা সজনকে যে সে রাত্রিকেই ভালোবাসে।

কিন্তু আমার এই সমস্যা যদি লাবণ্যকে বোঝাবার চেষ্টা করি তাহলে লাবণ্য আমাকে আরো অক্ষম ভাববে। তাহলে আমি কী করতে পারি? সজন ভাবল, রাত্রি যদি লাবণ্যকে অধিকার করে তাহলে আমি কিছুই বলতে পারি না। কিন্তু লাবণ্যর কাছে আমার পৌরুষের পরাজয় সেও আমি সহ্য করতে পারি না। তাহলে লাবণ্য হোক লাবণ্য ও রাত্রি। লাবণ্য নিজের প্রাপ্য পেয়ে খুশি হবে আর রাত্রি তার কথা শুধু আমিই জানব। লাবণ্য অবশ্য রাত্রির কথা কিছুই জানল না। কিছুতেই সেই সন্দেহ তার হল না যে রাত্রি নামের কেউ আমার তার মতো অর্ধেক জায়গা দখল করে আছে। সে শুধু অনেক সহজে বুঝতে পারল যে সজনকে সে সম্পূর্ণ পাচ্ছে না। সে আবার তীব্র প্রতিবাদ করল। সজন বিস্মিত হল না, ক্ষুব্ধ হল না, বরং সহজভাবেই সমস্ত অপরাধ যে তার নিজের সেই কথা স্বীকার করে নিল। সজন বুঝল লাবণ্য নিজেকে সম্পূর্ণরূপে আমাকে নিবেদন করেছিল কিন্তু আমি তাকে সম্পূর্ণ লাবণ্য রূপে গ্রহণ করিনি, ফলে আমি তাকে যা দিতে পেরেছি তা লাবণ্যর কাছে অসম্পূর্ণ মনে হয়েছে অর্থাৎ লাবণ্য আমাকে পেয়েছে অসম্পূর্ণভাবে অর্থাৎ সে আমাকে বুঝতে পারেনি। আমি তাকে দিইনি কিছুই, তার শরীর মন নিয়ে শুধু অদ্ভুত খেলা খেলেছি। অর্থাৎ আমি লাবণ্যর নারীত্বকে করেছি কুণ্ঠাবদ্ধ অবহেলিত অপমানিত। আর আমার এই অপরাধের পিছনে আছে আমার নির্বুদ্ধিতা। তাই নিজের প্রতি আমার কোন মমতাও নেই। এখন সমাজের বদ্ধ মানুষের কাছে আমি আমার নিরপরাধের যুক্তি দেখাব, আমার স্বাধীন বাসনার স্বরূপ প্রকাশ করব সে জোর এখন আর আমার নেই। ফলে সমাজ মানুষ এবার আমাকে নির্মমভাবে আক্রমণ করবে। আমার শাস্তি হবে নিশ্চয়। সজন হতাশায় ভেঙে পড়ল। অসহায় দুর্বলের মত অনেক বিনীতভাবে সে অন্য কারো নয় নিজেরই সামান্য একটু সহানুভূতি প্রার্থনা করল। এই যে আমি এত সমস্যা তৈরী করেছি, আমার জীবনে এবং লাবণ্যর জীবনে, এতে কী আমি সুখী হতে পেরেছি? আমি কী শান্তি পাচ্ছি? তার নিজের মনও তাকে কোন সান্ত্বনার পথ বলে দিতে পারল না। বরং নিজের বিবেকের কাছে সে প্রচণ্ড আঘাত খেল। আমি কী নিজেকে নিয়ে জটিলতার খেলায় মাতিনি? সমস্ত সমস্যার জন্মই তো জটিলতা থেকে। এখন এই সমস্যার ভার বড়ই অসহ্য হোক আমি নিজে ছাড়া কে আর বইবে! সজন মাথা নিচু করে সমস্ত উপদেশ মেনে নিল। মেনে নিতে পারল পারল না। কিন্তু কিছুই করতে পারল না। নিষ্ফল আক্রোশে শুধু মনে মনে জ্বলে পুড়ে যেতে লাগল। থাকত যদি আমার সেই বিদ্রোহী মনের জোর তাহলে নিজের বিবেকের বোঝা ফেলেই আমি নিজেকে মুক্ত করতে পারতাম। আমি মুক্ত কণ্ঠে বলতে পারতাম আমার কোন অপরাধ নেই, আমার কোন বিবেক নেই, নীতি নিয়ম কিছু নেই। আমার আছে একমাত্র সত্য আমার জীবন। আমার জীবনের জন্য আমার জীবনের উদ্দেশ্যের জন্য আমার জীবনের প্রার্থিত সার্থকতার জন্য—আমি আমি আমি সজন-সজন-সজন-সজন—। সজন আর ভাবতে পারে না। ব্যর্থ হয়ে গেছে, সকলের জন্য হয়ে গেছে আমি সজন, আমি জীবন নিয়ে খেলা করি সেই খেলায় নাকি আমার জীবন আনন্দ! এখন আমার সমস্ত খেলার অবসান হবে।

বাইরে, আকাশে মেঘ করেছে। বৃষ্টি হবে। বাতাস বইছে হু-হু করে। কত খবর বাতাসে ভেসে আসে। সে কোথায় কত কত দূরে, তার ঠিকানা জানি না। সজন ভাবে, আমি এক হতভাগ্য ভাগ্যহীন এক নির্বোধ জীবনজীবী। মলিন আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে সজন আত্মপ্রকাশ করল, আমি আসলে লাবণ্যকে পেতে চাইনি। আমি রাত্রিকেই ভালোবাসি, তাকেই পেতে চেয়েছি। কিন্তু রাত্রিকে পাওয়া যায় না তাই লাবণ্যকে পেতে হয়েছে। তাই লাবণ্যকে রাত্রি ভেবেছি। কিন্তু লাবণ্য শুধুই লাবণ্য। তাই এই পৃথিবীর জীবন সে আমার জন্য নয়। পৃথিবীতে সকলেই বাস করে, সকলের স্বপ্নে প্রার্থিত বৃষ্টি নামবে। সকলের বাসনা বড় হয়ে উঠবে একদিন, ফুলে ফলে গন্ধে ভরে উঠবে সকলের জীবন। আর আমার হতাশা আমার যন্ত্রণা বুক চিরে কঠিন নখ বেয়ে সারাক্ষণ আমার মুখকে পাণ্ডুর করে রাখবে। ব্যর্থতার ভারে জীর্ণ হয়ে হয়ে এই যৌবনেই যেন আমি জীবনের অন্তিমে এসে পৌঁছেছি।

একদিন খবর এল লাবণ্য অন্য একজনকে ভালোবাসে, সজনের জীবন থেকে যত শিগগীর সম্ভব সে বিচ্ছিন্ন হতে চায়। সজন এক মুহূর্তের জন্য হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। সেই ভাবটা কেটে যেতেই সে ভাবল লাবণ্যর সঙ্গে আমার কোন সম্পর্কই ছিল না। লাবণ্য যদি কাউকে ভালোবাসে এই প্রথম নিশ্চয় সে কাউকে ভালোবাসছে। এতে সজনের কিছুই এসে যায় না।

লাবণ্য একদিন চলে গেল। সজন ভাবল, লাবণ্যর এই চলে যাওয়া এ লাবণ্যর মুক্তি নয়, কেননা লাবণ্যর কোন বন্ধন ছিল না। সে ছিল সজনের জীবনে একটা বাধা। তাই লাবণ্য মুক্তির পথে মুক্তি দিয়ে গেল সজনকেই। গভীর আবেগে নিজের অন্তরকে সজন প্রশ্ন করল, কিসে আমার মুক্তি?

(ক্রমশঃ)

CENTRAL LIBRARY

ভিনগাঁয়ের চিঠি

বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়

বিলাতের দীর্ঘ উৎসবান্তে জনমানসের অবসন্নতা দূর করবার জন্যেই সম্ভবত বৃটেনে অগাস্টের শেষ সপ্তাহে একটি ছুটির ব্যবস্থা চালু হয়েছে। সাধারণ সপ্তাহ শেষের দুটি ছুটির দিনের সঙ্গে সোমবার জুড়ে তিনদিন ছুটি। সে-ছুটি শহর ছেড়ে বাইরে যাবার প্রতি বছরের শেষ হিড়িক। এরপরের ছুটি একেবারে খৃস্টমাসে। তার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পারিবারিক মিলনে।—এবারের অগস্ট ছুটি যখন এলো তখন বাইরে কোথাও যাবো-কি-না-যাবো এই দ্বিধার মধ্যে আছি, তখন হঠাৎ টেলি-ফোনের ও-প্রান্ত থেকে অপ্রত্যাশিতভাবে বন্ধু-কণ্ঠের ডাক এলো। সেই খবরী পরোয়ানা এতই অতর্কিত যে, প্রথমে বুঝেই উঠতে পারলাম না যে, তা কি করে সম্ভব হলো। আমার বিস্ময় দেখে ও-প্রান্তে ওরা দুজনেই পুলকিত, অমিতাভ চৌধুরী ও তাঁর স্ত্রী নীপা।

অমিতাভ চৌধুরী যুগান্তরের পাঠকদের কাছে অবিস্মরণীয় 'নিরপেক্ষ'। সেই উপলক্ষে একটি বাংলা সংবাদপত্রে যে-আলোড়ন সৃষ্টি করে তার ঢেউ বহুদূর বিস্তৃত হয়ে পড়ে। অমিতাভ ভারতীয় সাংবাদিকদের মধ্যে সর্বপ্রথম ফিলিপাইনের বিশ্ববিখ্যাত ম্যাগসেসে পুরস্কার লাভ করেন। বর্তমানে তিনি সারা দক্ষিণ এশিয়ার জন্যে একটি রবিবাসরীয় সংবাদপত্র ও সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি গড়ে তুলতে ব্যস্ত। তিন বছর পরে এক মাসের ছুটি নিয়ে ইউরোপে বেড়াতে এবং সেই সঙ্গে কিছু কাজে এসেছেন।

সেদিন আমার বাড়ীও গুলজার। ছুটির মেজাজ নিয়ে কয়েকজন সাংবাদিক বন্ধু, কাশীর গান্ধী বিদ্যাপীঠের এবং বর্তমানে লন্ডন স্কুল অব ইকনমিকসের ভিজিটিং লেকচারার সুগত দাশগুপ্ত এবং প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের স্থায়ী সভাপতি দেবেশ দাশ, লন্ডনে বাংলা সাহিত্য ত্রৈমাসিক দর্পণের সম্পাদক এম এস সুলতান প্রভৃতিরা নিমন্ত্রণে এসেছেন। অমিতাভ ও নীপা আসাতে আসর জমে উঠলো।

অন্য অতিথিরা বিদায় নিলে অমিতাভ এবং নীপা প্রস্তাব করলেন যে, ক'দিন গাড়ী করে কোথাও ঘুরে আসা যায়। সে প্রায় আট বছর আগে আমি, নীপা ও আর দুজন সঙ্গী গাড়ী করে ওয়েলসের এক-প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত ঘুরেছিলাম। রাস্তার মানচিত্র ছাড়া সেবার ভ্রমণের আর কোন পরিকল্পনা ছিল না। চলতে চলতে যেখানে সন্ধ্যা ঘনাতো সেখানে কোন চাষীর বাড়ীতে, কিম্বা সরাইখানা বা 'ইনে' রাত কাটাতাম। আবার চলা। ওয়েলসের তুলনা-বিহীন পাহাড়-বন-মাঠ, হ্রদ-ঝর্ণা ও সমুদ্র-তীর নয়নভরে দেখা, থামা ও চলা। তারপর কতবার কত আমন্ত্রণ ও প্রয়োজনেই তো ওয়েলস্ গেছি কিন্তু তার কোনটাই অত স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে নেই। সুতরাং প্রস্তাব হলো সেরকমভাবেই উত্তর ইংল্যান্ডের কিম্বা স্কটল্যান্ডের হ্রদাঞ্চলে যাওয়া যাক। কিন্তু সময়ের কথা ভেবে সিদ্ধান্ত মুলতুবী রইলো।

পরের দিন অমিতাভর পরিকল্পনা প্রস্তুত। আমরা পশ্চিম ইংল্যান্ডের শ্রপ্টার-শায়ারের লাইব্রেরীতে গিয়ে ক'টি দিন কাটিয়ে আসবো। অবসারভার পত্রিকার প্রাক্তন সাহিত্য-সম্পাদক এবং বর্তমানে ওয়েস্টমিনস্টার প্রেস লিমিটেডের এডিটোরিয়াল ডিরেক্টর জিম রোজ সেখানে কয়েকবার গিয়ে থেকেছেন। স্থানটি নাকি নিজস্ব সৌন্দর্যে নিরুপম। তিনিই সোয়ান নামে একটি ছোট হোটেলের সন্ধান বলে দিলেন। আর রবিবাসরীয় টাইমসের সম্পাদক হ্যারী এভানস কয়েক দিনের জন্যে ব্যবহার করতে দিলেন তাঁর মহার্ঘ, আরামপ্রদ ও অত্যাধুনিক স্বয়ংক্রিয় গাড়ী।

লাইব্রেরী একটি গ্রাম

লন্ডন ছাড়তে আমাদের রাত্রি প্রায় সাড়ে নটা হয়ে গেল। লাইব্রেরী প্রায় পঁচাত্তর মাইল পথ। হিসেব করে দেখলে ঘন্টা-তিনেক লাগার কথা। সেই অনুযায়ী সোয়ান হোটেলে একটি ফোন করবার ব্যবস্থা করা হোল। কিন্তু অন্ধকারে, গ্রামের বিসর্পিল পথে এবং একটি হোটেলে রাত্রির আহার সমাধা করতে অনেক দেরী হয়ে গেল। শেষপর্যন্ত লাইব্রেরীতে পৌঁছে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সবাই একটু ঘাবড়েই গেলাম। রাত্রি তখন আড়াইটে। সোয়ান হোটেল খুঁজে পেতে দেরী হলো না। রাত্রির অন্ধকারেও বোঝা গেল যে, হোটেলটির পরিবেশ অনন্য। সামনে খর-স্রোতা তটিনী, পেছনে অরণ্যাবৃত নীচু পাহাড়। কিন্তু হোটেলটি নীরব, নিস্তব্ধ, অন্ধকার। দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে সদর দরজা ও কলিং-বেল খুঁজে পেলাম। বেলটি অকেজো। তাই দ্বারে করাঘাত শুরু হলো। কোন সাড়া নেই। আবার দেশলাই-এর কাঠি জ্বেলে এবং পথ-চলতি মটরের ধাবমান আলোর চকিতে দেখে দেখে হোটেলটির চারপাশ ঘুরে পেছনে আঙিনায় গেলাম। ওপরে আলো জ্বলছে। একটি ঘূর্ণী সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠলাম। সাধ্য ও শোভনমত ধাক্কা ধাক্কি করা গেল। কিন্তু কোন সাড়াই পাওয়া গেল না। অতএব বাকি রাতটুকু মটরে বসে কাটানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে গাড়ীতে ফিরে আসা গেল।

তবু শেষ চেষ্টা হিসেবে মাইলখানেক দূরে আরেকটি বৃহৎ হোটেলে গিয়ে ধাক্কাধাক্কি করা গেল। একটি ফোন বক্স থেকে সোয়ান হোটেলে ফোন করে কাউকে ঘুম ভাঙানোর জন্যে দূর থেকে বহুক্ষণ ঘন্টা বাজানো গেল। কিন্তু মনে হলো সে-রাতের মত সবাই যেন গ্রামটা ছেড়ে চলে গেছে। শেষপর্যন্ত সোয়ান হোটেলের উল্টো দিকে, খরস্রোতা তটিনীটির ওপরে পাথরের সেতুটির ওপারে একটি পার্কিং স্থানে গাড়ীটি রেখে রাত কাটানোর জন্যে প্রস্তুত হওয়া গেল। আকাশ নির্মল নীল, নক্ষত্র উজ্জ্বল। খানিক পরেই আমাদের পাশে এসে আরেকটি গাড়ী দাঁড়ালো। যাত্রীরা নামলো। বাবা-মা ও আঠারো-বিশ বছরের একটি ছেলে। গাড়ীটির বুট খুলে তারা স্টোভ ও চায়ের আয়োজন নামালো। আমরা উৎসুক চোখে তাদের কর্মব্যস্ততা লক্ষ্য করতে লাগলাম। সেই রাত্রি-শেষে মটরাশ্রয়ে এক কাপ গরম চা কিম্বা কফির চেয়ে বাঞ্ছনীয় আর কী বা থাকতে পারে? —অমিতাভ কি মনে করে ওদের সঙ্গে আলাপ করতে নেমে গেলেন। কী আলাপ করলেন তিনিই জানেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই ওই গাড়ীর গৃহিণী এ-গাড়ীর দ্বারে এসে আমাদের চায়ের আমন্ত্রণ জানালেন। রীতিমত বাহ্যিক আপত্তি জানিয়ে আমরা আন্তরিক উল্লাসের সঙ্গে নিমন্ত্রণরক্ষার জন্যে বেরিয়ে এলাম। আমন্ত্রণকারীরা ইয়র্কশায়ারের লোক। চলেছেন কর্ণওয়ালের সমুদ্রতীরে তাঁবু খাটিয়ে ছুটি কাটাতে। গাড়ীর ছাদে ও বুটে দুটি তাঁবু। বাদবাকি সব আয়োজন। তাঁদের সামনে [illegible] হুইল। এতক্ষণ পরিবারের কর্তা গাড়ী চালিয়েছেন। চা-পান শেষে পুনর্যাত্রা শুরু হলে ছেলে গাড়ী চালাবে। তিনি বিশ্রাম নেবেন। ছেলেটি মোটাসোটা। তাকে নিয়ে মা বাবার নানান কৌতুক। চা তৈরী হলে তাঁরা চায়ের সঙ্গে বিস্কুট নেবারও অনুরোধ জানালেন তিনি। একটি বিনিদ্র রজনী শেষে তার কোন প্রয়োজন ছিল না। চা পর্ব শেষ করে তাঁরা গন্তব্যপথে যাত্রা করলেন। নাম পরিচয় তো দূরের কথা অন্ধকারে ভালো করে পরস্পরের মুখই দেখা হলো না। তবু একটি মধুর স্মৃতি পেছনে রেখে তাঁরা চলে গেলেন। অমিতাভ সারা পথটা গাড়ী চালিয়ে এসে ছিলেন। তাই পেছনের সীটে গিয়ে আধ শোয়া অবস্থাতেই ঘুমিয়ে পড়লেন। হয়তো দেশ বিদেশে ঘুরে ঘুরে ঐ চমৎকার অভ্যাসটিকে তাঁর আয়ত্ত করতেই হয়েছে।

আমি ও নীপা বিনিদ্র ভাবেই রাত কাটালাম। ক্রমশ পথ দিয়ে গাড়ীর চলা একেবারেই বন্ধ হয়ে গেল। অন্ধকারে অদৃশ্য খরস্রোতা নদীটির তরল রব এবং তার বুক থেকে মাঝে মাঝে হাঁসের চকিত ডাক ছাড়া আর সব কিছু মৌন হয়ে গেল। আরো খানিক পরে আকাশের সব তারা নিভে গেল। অন্ধকার গাঢ়তর হয়ে উঠলো। অবশেষে ক্লান্ত-বিলম্বিত প্রভাত এলো। কিন্তু আদিগন্ত কুয়াশা ঢাকা। আবার হোটেলের দ্বারে করাঘাত। তখনো উত্তর দেবার মত কেউ জাগেনি কিম্বা আসেনি। প্রদোষ কাল থেকে সাড়ে সাতটা পর্যন্ত ধর্ণা দেবার পর পেছন দিকের খিড়কি দিয়ে অনধিকার প্রবেশ করে দেখা গেল হোটেলের রন্ধনশালায় একটি লোক সবে প্রাতরাশের আয়োজন শুরু করেছে। ধাক্কাধাক্কি করে তাকে বের করা গেল। আমাদের বিড়ম্বনার কথা শুনে সে খিড়কি দিয়েই আমাদের হোটেলের বসবার ঘরে নিয়ে গেল। বললে, আটটার সময় সবাই এসে যাবে। ইতিমধ্যে সে আমাদের চায়ের ব্যবস্থা করছে।

ঠিক আটটার সময় চকিতে হোটেলটি সরগরম হয়ে উঠল। মাত্র দিন-পনেরো আগে হোটেলটির মালিকানা হাত-বদল হয়েছে। বর্তমান মালিক ফরাসী। আমাদের বিপত্তির কথা শুনে প্রভূত আফসোস প্রকাশ করলেন। বললেন, এখনো সব ব্যবস্থা, এমনকি দরজা-ঘণ্টির ব্যবস্থাও করে উঠতে পারেননি। আমাদের জন্যে তখনই গরম ও প্রচুর প্রাতরাশের ব্যবস্থা হলো। আমরা নিজের নিজের ঘরে গিয়ে উষ্ণ স্নান সেরে খানিক ঘুমিয়ে নিলাম।

দুই

সমগ্র অঞ্চলটির নাম কটস্‌ওল্ড। নরম চুনাপাথরের নম্র পাহাড়, ঊর্মিল প্রান্তর, খরস্রোতা তটিনী, ওক-বার্চ ও পপলারের অরণ্যভূমি এবং আদিগন্ত পাকা ফসলের ক্ষেত। অথচ তার দিগদিগন্ত জুড়ে অতীতের অগণ্য শতাব্দীর মানুষের কর্মব্যস্ততার সাক্ষ্য দাঁড়িয়ে আছে। শুধু যেন বিংশ শতাব্দীকেই পরিহার করার চেষ্টা চলেছে। —এই অঞ্চলের বহু দ্রষ্টব্যের মধ্যে নটগ্রভ লংবারো নামক স্থানে খৃস্টপূর্ব ২৫০০ শতাব্দীর প্রাগৈতিহাসিক লোকেদের বিস্তীর্ণ কবরভূমি দেখা যায়। ছোট ওলফোর্ড এবং চ্যাসেলটনে দেখা যায় খৃস্টপূর্ব ৫০০ থেকে ৫০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত লৌহ-যুগের মানুষদের দুর্গ। তবে এ-অঞ্চলের বিশেষ দ্রষ্টব্য হচ্ছে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বিশাল বিশাল রোমান ধ্বংসস্তূপ। তাদের প্রাসাদ, দুর্গ ও স্নানাগারের অতিকায় অবশেষ। বিলাসবৈভব, ক্ষমতাপ্রভুত্ব, সেই সঙ্গে মহান স্থাপত্য ও অত্যুন্নত সভ্যতার বিপুল স্মারক। আমাদের ওপর যারা প্রায় দুশো বছর প্রভুত্ব করেছিল, তাদেরই যে আর কেউ প্রায় পাঁচশ বছর অধীন করে রেখেছিল, তা কল্পনা করে একটা অদ্ভুত অনুভূতি জাগে। রোমানদের পর স্যাক্সন-নর্মান, টিউডর প্রভৃতি রকমারি যুগের গীর্জা, দুর্গ ও অট্টালিকা কটস্‌ওল্ডের ছোট ছোট গ্রাম ও জনপদগুলিতে ছড়িয়ে আছে। একদা কটস্‌ওল্ডের পশম ছিল বিখ্যাত। সেই পশম বোনার পুরোনো তাঁতবাড়ী ও বায়ুকলও মাঝে মাঝে চোখে পড়ে। গ্রামের বাড়ীগুলির অধিকাংশে ছাদ, প্রাচীর ও জলস্রোতগুলির ওপর সেতু কটস্‌ওল্ডের নানা জাতের নরম ও শক্ত পাথরে ছাওয়া ও গাঁথা।

ইয়োরোপের প্রায় সব দেশেই অর্থ-নৈতিক প্রয়োজনে আদি বনভূমি উজাড়ের পর নতুন বনভূমির প্রয়োজনে দ্রুত বর্ধিষ্ণু লাভজনক ও সহজসাধ্য কনিফার বা ঝাউ জাতীয় সরলবর্গীয় বনভূমির সৃষ্টি করা হচ্ছে। ফলে অক্ষৌহিণীর পর অক্ষৌহিণী সেই বনভূমি দেখতে দেখতে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সে অনেক স্থানকেও নরওয়ের একাংশ বলে মনে হয়। কটস্‌ওল্ড তার ব্যতিক্রম। এখানে বৃটেনের সুপ্রসিদ্ধ ও সুষমা ওক-এলম্‌-বীচ ও অ্যাশের বিপুল বিস্তার। সৌন্দর্যে ও প্রয়োজনে ওকের তুল্য তরু উদ্ভিদ-রাজ্যে খুব কমই আছে। গৃহ-স্থালীর মহার্ঘ আসবাব থেকে জাহাজ তৈরীর কাজে ওর সমান কদর। বস্তুত অতীতে ইংল্যাণ্ডের সপ্তসমুদ্রে শাসনে ওকের অবদান কম নয়। তাই রাণী প্রথম এলিজাবেথের যুগে ইংল্যাণ্ড বিজয়ের জন্যে আর্মাডা পাঠাবার সময় স্পেনরাজ ফিলিপ ইংল্যাণ্ড পরাজিত হলে ওকের বনভূমিগুলির খাণ্ডব দহন করে তার নৌশক্তি চিরতরে খর্ব করার হুকুম দেন। ইংল্যাণ্ডে ওক গাছের সবচেয়ে বড় শত্রু ছিল মুনাফাখোর জমিদারেরা আর রক্ষক ছিল নৌ-সেনাপতিরা।

কটস্‌ওল্ডের ছোট নদী-খণ্ড, এক-দিগন্ত মনোভিরাম ছবি দেখতে দেখতে মনে হয় যেন কনস্টেবলের কোন চিত্রপট বহুদূরে ছেড়ে দিক-দিগন্তে ছড়িয়ে পড়েছে। তার নদীগুলি অগভীর, জল স্বচ্ছ, শয্যা পাথরের। ইংল্যাণ্ডে ভ্রমণকারীদের প্রিয় কেন্দ্রগুলিতে যেখানে জলাশয় আছে সেখানে সাধারণত রাজহাঁস ও পেলিকান জাতীয় বিরল, বৃহৎ শুভ্র জবরজং জল-চারীদের কৃত্রিম বসতি স্থাপন করা হয়। কিন্তু তারা বহিরাগত। ক্রুসেডের রণক্ষেত্র থেকে ফেরার সময় সিংহহৃদয় রিচার্ড রাজহংসদের সংগ্রহ করে আনেন। তদবধি তারা আইন-সংরক্ষিত হয়ে ইংল্যাণ্ডে বংশবিস্তার করেছে। তাই ছবিতে তারা সংযোগ, স্বাভাবিক নয়। কটসওল্ডের নদীনালায় তাই তাদের স্থান নেই। তার জলে মাছরাঙা, ম্যালার্ড, শিখা-শির ও মুচপুচ্ছ প্রভৃতি ছোট ছোট আটপৌরে হাঁস আর অগণন ট্রাউট মাছ। ছুটি কাটাতে আসে ওই হাঁস ও মৎস্যদের খাদ্য বিতরণ করা এক মহাকৌতুকের ব্যসন। একটুকরো রুটির জন্যে সদলে মানুষের কাছে হাঁসদের কত কসরৎ। আর সেই রুটির জন্যে স্বচ্ছজলে স্রোতের উজানে সাঁতরে আসছে ঝাঁক-ঝাঁক ট্রাউট। খানা ধরতে গেলে স্রোতের বিপরীত দিকে সাঁতার কেটে আসাতেই তাদের সুবিধে।

হোটেলের সামনের নদীটি খানিকটা পার্ক। হোটেলবাসী মৎস্যশিকারীদের জন্যে সংরক্ষিত। কিন্তু স্থানীয়দের মধ্যে কাউকেই মাছ ধরতে দেখা গেল না। মেছেল মানেই তো আর মাছমার নয়! পরিবেশ তাদেরও তো পরিবর্তিত করতে পারে। মাছধরার পার্ক ছাড়াও নদীটির তীরে হোটেল-বাসিন্দাদের জন্যে একটি ছায়া ঘেরা পার্ক আছে। মাটিতে তার নরম ঘাসের ঘনশ্যাম জাজিম, খানিকটা করে জায়গা জুড়ে মৌসুমী ফুলের উচ্ছ্বাস এবং নদীটির একটি বিভক্ত খাত তারই মধ্যেই ঝিরি-ঝিরি বইছে। পার্কটির ওধারেই ট্রাউট মাছের চাষের উপযোগী করে নদীটিকে ঘুরিয়ে ছড়িয়ে পাথরে বাধা দিয়ে, নাচিয়ে-ফেনিয়ে চঞ্চল করে রাখা হয়েছে। দূরে সেই জল খেতে ট্রাউটেরা অবিশ্রান্ত লম্ফঝম্প দিচ্ছে মিঠে রোদ্দুরে ঝলক দিয়ে উঠছে। দুপুরে, বাইবেরীর বাইরে না গেলে, কিম্বা বাইবেরীতে ফিরে এলে আমরা সেই পার্কে বসে কাটিয়ে দিতাম। আমাদের পাশাপাশি এসে পায়রা, ঘুঘু, চড়াই, ব্ল্যাকবার্ডরাও এসে নির্ভয়ে গড়াগড়ি খেতো রোদ পোয়াতে। হোটেল থেকে আমাদের জন্যে স্যাণ্ডউইচ-কেক, চা-পেস্ট্রি এলে উঁকি-ঝুঁকি দিত। ভাগ পেলে উল্লসিত হতো। অনাহূত হয়ে ঝাঁক বেঁধে আসতো মৌমাছিরা। জ্যাম জেলি পেস্ট্রির ওপরই তাদের বিশেষ লোভ। হয়তো নিদাঘের বিদায়বেলা যে আসন্ন সে সম্পর্কে তারা সচেতন। তাই শীতের জন্যে মধুসঞ্চয় সংগ্রহে অত তৎপর।

প্রকৃতির একান্ত পক্ষপাতিত্বে সেই সঙ্গে মানুষের সচেতনতায় এই দ্বীপ-পুঞ্জে মশা মাছি নেই বা না থাকারই মত। সাপ নেই বিছে নেই। হালকা রোদ্দুর ও বৃষ্টিতে বসন্ত ও গ্রীষ্মের প্রকৃতি চোখ-জুড়োনো মনমাতানো মধুর। দুপাশেও আধুনিক জীবনের সব উপকরণ, বিদ্যুৎ ফোন-টেলিভিশন। মাথা নত মাতৃগর্ভে। ধুলো নেই, কাদা নেই। সব-কিছুর পরিচ্ছন্ন, পরিপাটি। আর আশ্চর্যভাবে নীরব, নিথর, নিস্তব্ধ। আপাতদৃষ্টিতে প্রায় জনমানবহীন। বিকালে আমরা গ্রামের বিসর্পিল রাস্তায় চড়াই-উৎরাই ভেঙে সেই অপার স্তব্ধতার মধ্যে নিজেদের পায়ের প্রতিধ্বনি শুনতে শুনতে ঘুরে বেড়াতাম। আকাশে কনে-দেখা-আলোর সমুদ্রে সাঁতার কেটে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখিরা ঘরে ফিরতো। ক্রমে দূরে ওক-বার্চ ও পপলারের বনে অন্ধকার জমাট বাঁধতো। অবশেষে মহাকাশ থেকে জ্যোতির্ময় সূর্যের শেষ রশ্মিটুকুও মুছে যেত। স্মৃতির মণিকোঠায় জমা পড়তো আলোকে-আনন্দে, সৌন্দর্যে সোহাগে উজ্জ্বল এক-একটি দিন।

—আমার সঙ্গে চালাকি? আমি চৌধুরী বাড়ীর তারাপদ! ভুলে গেছ আমি কে!

তারাপদ বকবক্ করতে থাকে আপন-মনে। নতুন ভাঁজ করে পরা কাপড়ের খুঁটটা দিয়ে নড়বড়ে সার্সির আয়নাটার কাঁচের ওপর ঘসতে থাকে। বিরক্তির ভাব তার চোখে মুখে।

ইস্, দেখাই যায় না একেবারে!

এদিক ওদিক তাকায়, আর মৃদু গলায় মনের ভাবনাগুলো এলোমেলো উচ্চারিত হয়।

—না এতে হচ্ছে না। এটা থাকাও যা, না থাকাও ...। না থাক। তবু দেখা যাচ্ছে।

আয়না

রণজিৎ পাল

খোলা দরজা দিয়ে বাইরে তাকায় তারাপদ।

—বেলা তো তেমন বেশী হয়নি, কিন্তু গরমটা এরই মধ্যে জোরে বসেছে, যেওন দিন ...যেন ভরে নেবে। কসমেটিক শেষ হতে না হতেই—।

কাপড়টা খুলে ফেলে, বিছানার ওপর ছুঁড়ে দেয়। আয়নায় নিজের চেহারাটা একবার দেখতে থাকে। পরনের আন্ডার-ওয়্যারটার দিকে নজর পড়ে।

—কি কালোটাই না হয়েছে, তেল চিট-চিটে। থাকলে! কিন্তু চেহারাটা, হাঁ, চমৎকার একেবারে—তেল-মাখানো। ডান হাতের গুলোটা দমবন্ধ করে ফোলায়, বাঁ-হাতের

আঙুল দিয়ে টেপে—শক্ত ইট। চৌধুরী-বাড়ীর সোনা ধরা ইট নয়, টোকা দিলেই ঝরঝরে ঝুরঝুরে—এ যাওয়া পড়ুমিলের এক নম্বর, হুঁ হুঁ।

মানুষসমান উঁচু আয়নায় পুরো চেহারাটা পা থেকে মাথার চুল পর্যন্ত তারিয়ে তারিয়ে দেখে, তারিফ করে—খাসা! যেন সিনেমার কুমার টুমার। চান্স একটা পাওয়ার দিলেই হয়। পটলটা বলে, শার্ট-মার্কা চেহারা হলেই চলবে না যে—এস্মার্ট, হ্যাঁ বাব্বা এস্মার্ট হওয়া চাই। খিদির মুক্ত করতে হবে। —আচ্ছা দেখা যাবে, কোথাকার হাটার কোথায় পড়ায়।

ভাল লাগছে না তারাপদর কোন কিছু। কিছুতেই মন বসে না। আয়নার সামনে থেকে চলে আসে টেবিলটার পাশে। টেবিলের ওপর একটা পুরনো খবরের কাগজ—তাতে চা কোম্পানির চায়ের বিজ্ঞাপন। তারাপদর হঠাৎ চায়ের তেষ্টা পায়।

একটু চা পেলে হতো। বড্ড তেষ্টা। হঠাৎ রাগ হয় ভেতরে ভেতরে। চিন্তা করতে করতে সব রাগটা তার মায়ের ওপর গিয়ে পড়ে।

—মায়ের কন্দের মধ্যে ধম্ম। অ্যাক্কারে হাওয়া, সাত সকালে। ধম্মর নম একবার চললেই হয়। আর জুটেছে ওই হরিপিসী। যতসব—

ধুতিটা আবার কোপাট্টা করে জড়িয়ে নেয় কোমরে। চায়ের তেষ্টা ওকে পেয়ে বসেছে। বিজ্ঞাপনের পাশের কলামে লেখা—'জোড়ামাথা অদ্ভুত মানবসন্তান'। হেসে ওঠে তারাপদ হাঃ হাঃ করে। পরক্ষণে হাসি থামিয়ে আয়নার সামনে এসে একটা ছোট্ট টুলে বসে আয়নায় নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে আবার হাসে আর বলে—আমার মা আমাকে বলে, 'মানব-সন্তান'—হ্যাঁ বাব্বা, জলজ্যান্ত মানুষের বাচ্চা। আর রঞ্জা? ওটা একটা ..না কিসসু নয়...একটা বোকচণ্ডী।

—পটলা বলে, না-রে-না। তুই একটা [illegible], তোদের ইনস্কিরিতে যাকে বলে ইনটুপিড।

—হ্যাঁ, আমি বোকা। আর তুই? খুব ধড়িবাজ। আরে ছোঃ।

—আমাকে আবার জ্ঞান দিচ্ছে, লড় ফড় ছাড়, সব ভাঁওতা, তোকে খেলাচ্ছে, তোর মাথা খাচ্ছে।

ভেংচী কাটার ভঙ্গি করে বলে যায় তারাপদ—চুপ বে, আমার মাথা খাচ্ছে, খাওয়াচ্ছি, সবুর কর।

হাসি হাসি মুখটা তারাপদর মুহূর্তে পাল্টে যায়। নিজে নিজেই আঁতকে ওঠে।

—তখন কি হবে? ধম্ম-ধম্ম ভাবের মা আমার। রাতদিন ত খালি ঠাকুর সেবা। বাড়ীটাকে অ্যাকেবারে পেঠস্থান করে ছাড়লো। বাবা আমার পরম পূজনীয় বাবা উড়িয়ে পুড়িয়ে দিয়েও যে কটা রেখে গেছে, মায়ের পরলোকের কাজ করতে করতে দেখছি শেষ হয়ে যাবে। বলি মরণের পরে তো পরলোক। বলি, এখন কি পরলোকের কাজ হচ্ছে না বাপের ছেলেকে পরলোকে নিয়ে যাবার রাস্তা তৈরি হচ্ছে। নিত্যিকাল পৈতৃক সিন্দুকে কতই যা আছে কে জানে। কাছে ঘেঁসাই দায়—মা যেন অ্যাকেবারে, অশোকবনে সীতা পাহারা দিচ্ছে।

জানলার দিকে এগিয়ে যায়, দুটো গরাদে দুটো হাতের ভর রেখে একটু ঝুঁকে বাইরে তাকায়। —না গলাটা অ্যাক্কারে শুকিয়ে যাচ্ছে। একটু চা.. তবুও তাকায়। কাকে যেন খোঁজে। চোখ দুটো ঘোরে এদিক-ওদিক।

—রঞ্জাটা গেল কোথায়? এক কাপ চা করতে পারে না—বাপের মেয়ে জাহানারা। সব তাতেই নবাবি। শুধু বসে বসে নাক নাড়া, খেটে খেতে পারেন না। ইদিকে আগ বাড়িয়ে বলা চাই, আমি তারাদাকে চা করে খাওয়াব জেঠিমা, আপনার কিছু ভাবতে হবে না।

চাঁদসোহাগী, আদরে গলে গেলেন। আদিখ্যেতা। পায়চারি করতে থাকে তারাপদ আয়নার সামনে এসে দাঁড়ায়। নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে থাকে।

—মেয়ে আমার মুখে নড়। ভাবের আবেগে মুচ্ছ যায়। কাজের কাজী মোটেই না। সুযোগ সুবিধের ধার জানে না। আজকে সারা বাড়ীটা খালি। শুধু তুই আর আমি।

—সেদিনই দিতুম চিট করে, সিঁড়ির তলাটার অন্ধকারে। ধরেছিলুম কায়দামাফিক, পিছলে বেরিয়ে গেল। স্রেফ একটা ব্যাঙ। 'এই তারাদা, দেখ কে? ...'-আচমকা চমকে একটু অন্যমনস্ক হয়ে ভেবেছি, মা বোধহয়, ব্যাস হাওয়া।

—হরিপিসির জ্যান্ত মৌনং। কথার ঢং কি? কান ঝালাপালা করে ছাড়বে। মুখ-পোড়াটার সঙ্গে অত আলিত-গলিত কেন রে ছুঁড়ি। বলি, অগামেড়া, হাদা-চৈতন ছেলেদের পোষবার ক্ষেমতা আছে? মা যদি একটা কানাকড়ি না ঠ্যাকায় ত অগাধ জলে, বুঝলি।

—শয়তানের শিরোমণি মা যখন বাড়ী থাকবে দিদি-দিদিমণি।

—এদিকে আড়ালে ত বাবুমা, হাত করবে ছুঁড়ি ওই ডাইনি বুড়িকে। যখের ধন আগলে বসে আছে। ওরে নিজে চোখে দেখেছি, বসে খেলে সাতপুরুষেও ফুরুবে না।

—সেই কথা বল্। তোর মত সাত-সাতটা চাকরানী আর তোর ভাইঝিকে কেনাদাসী করে রাখতে পারি। কেবল মা—

একটু চমকে ওঠে। ভাবে মা বুঝি আশে-পাশেই আছে শুনে ফেলবে, জেনে ফেলবে তার ইচ্ছেটা। ধুত্তে.. কোথায় মা? এতক্ষণে দক্ষিণেশ্বরের বাঁধানঘাটে নেমে মুক্তির চান করছে।

ঠোঁটটা একটু বেঁকিয়ে হাসির ভঙ্গী করে জানালার কাছে ঠিকরে চলে আসে। তলায় তাকায় মাথা খোলা বাথরুমের দিকে।

—রঞ্জাবতী, এদিকে পেছন ফিরে কেন? যা ঘুরছো। আহ্, আহ্।

জানালার খড়খড়িতে মাথা ঠুকে যায় তারাপদর—ঠক করে শব্দ হতে ওপরে জানালার দিকে তাকায় রঞ্জনা। চোখাচোখি হয়ে যায়। মুখভঙ্গী করে হাত তুলে মারবার ইঙ্গিত করে। মুখটা হাসি হাসি না রোষের আভাস মেশান বুঝতে পারে না তারাপদ। তারাপদ একটু দৃষ্টি সরাতেই টুপ করে বসে পড়ে ভাঙা টিনের আড়ালে।

—বারে! বেশ ত! চক্কর নিয়েছে উধাও। ছলাকলা জানে চাড্ডি। আবার কিল দেখানো। হ্যাঁ বাপে বেটীতে তফাত আছে। বাপের সাত চড়ে রা সরে না—আর বেটী যেন কালগোখরো—একটুতেই ফোঁস করে ওঠে। কেরানীর মেয়ের রোখ দ্যাখো-দিনি। হরিমতী পিসীটার হাতপুরো রেখেছে। আচ্ছা দ্যাখা যাবে, একটা কাজের বন্দোবস্ত হোক। আবার বলে কি—হবে না, তোমার মত বোকা লোকের চাকরী? আরে দেখবি, তোর বাবাই ধরে দেবে নিজের গরজে—সাহেবের পায়ে ধরে। তখন বুঝবি কে চালাক তুই না আমি।

তারাপদ ফিরে আসে জানালা থেকে। গাটা, হাত-পাগুলো ছড়িয়ে দিয়ে দুপ্‌ শে বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে।

তেষ্টাটা চাগাড় দিয়ে ওঠে তারাপদর। সামান্য চা—নিয়ে আসবে ত একটা কাপে এক কাপ। এসে বলবে, নাও ধর তারাদা। বলি, কুড়ি বছর বয়স হলো এখনও বুদ্ধি হলো না। শুধু চায়ে কি তেষ্টা মেটে? লম্বা পঁচিশ বছরের তেষ্টা। মা নয় বুড়ি, সে বোঝে না। কিন্তু তুই, তোর ত বোঝা উচিত। আর ধম্ম ধম্ম মা যেন কি একটা, এখনও ডাকবে, 'খোকা, ও খোকা'; খোকা আর খোকা—কানটা ঝালাপালা ধরে যায়।

সেদিন মা আবার হরিপিসীকে বলল, দেখ হরিমতী ছেলের বিয়ে দিলেই হবে না। আর বৌ ছেলেকে দুবেলা খেতে দিতে পারলেই ছেলে সক্ষম হয়েছে তা নয়। দেখতে হবে তার শিক্ষাদীক্ষা বুঝতে হবে পরে যে সব বাচ্চা-কাচ্চা আসবে তাদের মানুষের মত গড়ে তুলতে পারবে কিনা?

পাশ ফিরে শুতে গিয়ে লক্ষ্য পড়ে ঠাকুর্দা দেবনারায়ণের ছবিটার ওপরে।

—বলি, বুড়ো বাহাদুর ছিল বটে। কায়েত হয়ে বামুনের মেয়েকে বিয়ে করে নিয়ে এলো, স্রেফ টাকার জোরে। টাকা থাকলে কিনা হয়। সমাজ-টমাজ সব উল্টে যায়। একালে যা হচ্ছে ওকালে তাই ছিলো। তবে লেগপুলে কেন এসব নিয়ে।

লেগপুল কথাটায় তারাপদর হাসি পায় বারবার। কারণ রঞ্জনা তাকে প্রায়ই লেগপুল করে। বোধহয় ভাবে তারাপদ বোকা, ক্যাবলা।

—সত্যি বটে, আমি দেখতে ক্যাবলা—কিন্তু আসলে...? যতই লেগপুল কর রঞ্জাবতী কলেজের ছেলেদের মত, আমি পড়ছি না। আর যদি পড়িতো তোমাকে নিয়ে পড়বো। আমি শালার তারাপদ চৌধুরী—ফোর টোয়েন্টি নট-টু-হেয়ার। আমার সঙ্গে চালাকি বাজী।

CENTRAL LIBRARY

হঠাৎ ঠাকুর্দার ফটোর পাশে তার বাবার ফটোটা চোখে পড়ে। একটু ব্যস্ত হয়ে পড়ে তারাপদ। উঠে দাঁড়ায়। কাপড়টার একটা দিক ঝুলতে থাকে মেঝেতে। একটানে কাপড়টা খুলে ফেলে। কাছে গিয়ে ভাল করে দেখতে থাকে তার বাবার ফটোটা। বিরক্তি বোধহয় তার মায়ের ওপর।

—না, মায়ের জন্য সবই যেতে বসেছে। শেষে দেয়াল দিয়ে জল চুঁইয়ে ফটোটা ভিজে যাচ্ছে। তা ছাদের আর দোষ কি? আজকের বাড়ী? নবাব সিরাজদ্দৌলার আমলের—এতে জল না চুঁইয়ে থাকবে? মায়ের আবার আদিখ্যেতা করে বলা চাই—সব যাবে, সব যাবে। বহু লোকের চোখের জলে চুন-সুরকি ভিজিয়ে বাড়ী তৈরী। কত মানুষের দীর্ঘশ্বাস প্রতিটি ইটের ফাঁকে ফাঁকে জমে আছে, সে সব যাবে কোথায়? পূর্বপুরুষের জমান পাপ তাদের বংশধরকে এমনি করে তিলে তিলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।'

বাবা এতোই যদি মনে হয় তবে ছেড়েছুড়ে দিয়ে যাওনা—কাশীধামে, নয়তো স্বর্গধামে। মাঝে মাঝে মনে হয় বলি—আমাদের পূর্বপুরুষ কবে কি করেছিল বলেই ত মাথা পেতে এত বড় বড় কথা বলে বেড়াচ্ছ। আমাকে আবার উপদেশ দেওয়া—দেখ খোকা সাধারণ মানুষের মধ্যে থেকে সাধারণ জীবন কাটিয়েও অসাধারণ হওয়া যায়। আর বাপ-ঠাকুর্দার নাম ভাঙিয়ে খোঁটার জোরে গদী আঁকড়ে বসে নবাবি করা একমাত্র আমাদের দেশে চলে—অন্য কোথাও এর চল নেই।

—বলি আসল কথা কি জানো, মেয়ে-ছেলেদের লেখাপড়া শেখাতে নেই—শিখিয়েই ত দেশটা উচ্ছন্নে গেল। মা যে আমার বই-এর কীট। বই পড়ে পড়ে মাথাটা গোল্লায় গেছে। তা নইলে বলে— খেটে খাও, মেহনত করে খাও। মেহনতী মানুষের মত যদি খেটে খেয়ে বেঁচে থাক, সেটা গৌরবের। কিন্তু তোমার বাপ-ঠাকুর্দা যে ঐশ্বর্য—টাকা-পয়সা, ধনদৌলত রেখে গেছে সাধারণ মানুষকে দিয়ে প্রবঞ্চনা করে, তোমার মত বংশধরের উচ্ছন্নে যাওয়ার পক্ষে যা যথেষ্টই, তা দিয়ে তুমি হয় দেশের লোককে আরও শোষণ করবে, দেশের হোমরা-চোমরা হবে নিজেকে জাহির করবে, আর বুর্জোয়াদের দল তোমায় নিয়ে নাচাবে। নয়তো তুমি নিজের মানবতাকে হত্যা করে উচ্ছন্নে যাবে—তার কোনটাই আমি বেঁচে থাকতে হতে দেবো না।

—হঠাৎ মায়ের ছোট ফটোটার দিকে চোখ পড়ে যায় তারাপদর। অজানা ভয়ে শিউরে ওঠে—ওর মনে হয় মা যেন সাক্ষাৎকারের সব কথা শুনেছে। মায়ের সামনে দাঁড়িয়ে তার মত ছেলে এ ধরনের কথা বলবে—রায়বাঘিনী রাজনন্দিনী কমলসুন্দরী, রাজা প্রদ্যোতনারায়ণের মেয়ে তাকে ছেলে বলে ক্ষমা করবে সে শিক্ষা তার মা পায়নি। টোলের পণ্ডিত মায়ের দাদামশাই-এর কাছে ওর মা যে শিক্ষা পেয়েছে, তার জন্যে মা তার গর্ব করে বলে,—তার শিক্ষা [illegible] গোলাপের মত বিকাশ করে সকলের কাছে প্রিয় হওয়ার, প্রশংসা পাওয়ার শিক্ষা নয়, এ শিক্ষা কুলপ্লাবিনী স্রোতধারার মত শৈল-চূড়ার থেকে পাথর কেটে পথ করে নেমে আসা সমতলে—শস্য-শ্যামলা করতে বসুন্ধরার বন্ধ্যা সংকীর্ণ ক্ষেত্রটাকে। এ কাজ হাসিল করার শিক্ষা নয়, এ কাজ করার শিক্ষা—এ তোমাকেও শিখতে হবে। আমি এ শিক্ষার বাস্তব রূপ দেখিনি, তোমার কাজের মধ্যে দিয়ে দেখতে চাই। একটু দম নিয়ে নেয়, আস্তে আস্তে বুজে আসে চোখ দুটো, বলতে থাকে কিন্তু তা হতে দিচ্ছি না, কারণ তোমরা এ দেশে জন্মেছ। এই দেশের দূষিত জল-হাওয়ায় মানুষ হয়েছো, সমাজ তোমাদের পঙ্গু করে দিয়েছে দেহে আর মনে। সমাজে ঘুণ ধরেছে তোমাদের বাড়ীর কড়ি-কাঠের মত। তাই আমার সকল ঐকান্তিক চেষ্টা প্রতিধ্বনির মত ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসছে বারবার জীর্ণ নোনাধরা দেয়ালে আঘাত খেয়ে।

—আমার মায়ের বলবার ক্যাপাসিটি আছে। একবার নয় দুবার নয়, বারবার এ-কথা বলেছে, আমার কানে গিয়ে একেবারে নামতার মত মুখস্থ হয়ে গেছে। এখন আমি মায়ের মত করে হুবহু বলতে পারি। কিন্তু মায়ের মত অরিজিনালিটি থাকে না।

হঠাৎ চোখটার দৃষ্টি খোলা দরজা দিয়ে বাইরে গিয়ে পড়ে, বেলাটা বাড়ছে একটু একটু করে। তারাপদর চায়ের তেষ্টাটা আবার চাগাড় দিয়ে ওঠে।

—ধ্যাত্ তেরি ছাই। রজাটা এখনও চাটা আনলে না। নিশ্চয়ই এখনো মশগুলে বসে আছে। খালি গায়ে জল ঢালে ত ঢালতেই থাকে। বলি, একি গায়ের জ্বালা মেটায়। বাপু এত জ্বালাই বা কেন? একি দেহ-জ্বরের জ্বালা? হ্যাঁ, দেহজ্বর! কোথায় যেন শুনেছিলুম কথাটা ও হ্যাঁ মনে পড়েছে —পটলাটা কিন্তু অন্য কথা বলে। যখন যা মনে আসে তাই বলে। মুখে আকতাক নেই। কিন্তু কোয়ালিটি আছে। বুদ্ধিশুদ্ধি একেবারে কেষ্টনগরের ছুরি-কাঁচির মত পাকা স্টিলের —শান দিলেই ঝলসে ওঠে রজার গায়ের রঙের মত। কিছুক্ষণ কি ভেবে নেয়। তারপর কান পেতে শোনে একটা আওয়াজ সিঁড়িতে যেন কার পায়ের শব্দ। —এসো বাবা এস। এতক্ষণে সময় হলো। না আওয়াজটা থেমে গেলো কেন? না, কান-যন্ত্রটা গেছে—যাবে না, হিন্দী গান আর নেতাদের আওড়ান বক্তৃতা। কানের আর দোষ কি? বারোটা ত বাজবেই। একটা ফাংশান হোক, একটা জলসা হোক, সিনেমায় যাও এমনকি রেডিওটা খোল—মুখ দিয়ে যা বলবো তাই হবে কাবলাটা এক এক জায়গায় এক এক রকম। আসলে কোন হেরফের নেই। না, হিন্দীটা না শিখে ছাড়বে না।

—বলি, শেখাও বাবা শেখাও। আমার মা মানবতা শেখাচ্ছে। তাতে যে রকমটি শিখছি ভবিষ্যত গড়তে, তেমনটি করে তাদের শেখাও তোমাদের দেশের ভবিষ্যত গড়ে উঠবে গড় গড় করে—পাঁচালার কারবারের মত। হিন্দী কেন বাবা যত ভাষা দেশে আছে সব শেখাও। আমিও শিখতে রাজী। কিন্তু চাকরী দেবে তো? ইংরেজরা তো ইয়েস, নো, ভেরি ওয়েল বললে চাকরী ত দিতই, দুর্নোহ ত কাউকে কাউকে ডেপুটিও করতো। তেমনি খাওয়া হ্যায়, যায়, খায় শিখলে তোমাদের রাজত্বে একটা চাকরী মিলবে তো? এতে যদি চাকরী পাই, তাহলে সত্যিই বলছি, মায়ের লেকচারমার্কা ভাষার কথা বলা ছেড়ে দেবো। সত্যিই বলছি দেবো।

এখন আবার রব উঠেছে, ছোঁড়াদের তিন তিনটে ভাষা শিখতে হবে। আমি হলে স্পষ্টাস্পষ্ট জানিয়ে দিতুম, বাঁচিয়ে আমি ডুবতে পারব না ভাষার ত্রিবেণী সঙ্গমে। আবার এর ওপরে পটলাদের ভাষা।

—হ্যাঁ পটলার ঐ সাবলীল ভাষাটা শিখেছি, আরও শিখতে হচ্ছে। আর এই রকমে কি কোন ঠিক আছে? আজকে এ-পার্টী, কাল সে-পার্টী, পরশু অমুক—তরশু তমুক, তার পরের দিন পার্টী নেই, একা একা। তারপর ভাগাভাগি—দেশ ভাগাভাগি, হয়তো হবে জেলা দুভাগ, গ্রাম দুভাগ। নিজেরাই ঠিক করে নেবে—একভাগে আমি আর এক ভাগে তুমি। এক একজনের ভাষা হবে এক এক রকম—চলা, বলা, শ্লোগান, মায় রেকর্ডের গানগুলো। আমি তারাপদ, পটলার সাকরেদ হয়ে শেষে ফালতু কাজে নাক গলাতে হবে দেখছি।

—আবার যেন কার পায়ের শব্দ পাচ্ছি সিঁড়িতে। না আবার হয়তো ভুল হতে পারে অন্যের মত। দরকার কি? যে আসবার ঠিকই আসবে।

—যত্ত তেরি। কিছু ভাল লাগে না—পড়াশুনোটা না ছাড়লেই হতো। আমার মায়ের কড়া কড়া নিয়ম। বলে—তোমার যদি পড়ার মনোযোগ নাই থাকে ত নাই পড়লে। কাজের সন্ধান দ্যাখো, স্বাবলম্বী হও। টাকার জোরে কলেজের একটা সীট আটকে রাখা, কোন স্বাধীন দেশের লোকের উচিত নয়।

—কি স্বাধীন রে বাবা। আমি ত স্বাধীনতার গন্ধই পাই না। সন্ধ্যের পর এক পা বাড়ীর বাইরেই বেরুতে পারি না। কথায় কথায় হাজার রকম কৈফিয়ৎ দিয়ে চলতে হয়। এই কিনা স্বাধীন? পটলাটা আবার অন্য কথা বলে—কিসের স্বাধীন রে তোরা। আমাদের হেবো নন্দদের লোক-গুলোর হাড়গোড় চেহারা দেখেছিস?—আমারও ওরকম হতো। আমি মানে একটু পেটে চালি, আর কটিক মল্লিকের সিনেমা-হলটা আছে বলে। বুঝলি, আমি না থাকলে ও-হলটা আমিনের তোদের পোড়ো বাড়ীর মত হয়ে যেতো।

—না, পটলাটা গুণ্ডামি করে টাকা নেয় বটে, বেশ মোটা, কিন্তু হলটা বেঁচে যাচ্ছে ত

ওর ম্যাখন্তার। তা নাহলে আমরা সিনেমা দেখতুম কোথায় টিকিট ব্লাক করে?

—পটলা বলে, ধুত্, তাহ্দ তোর বুদ্ধির কলকেতে মাল নেই। সাফা বাদ। খালি ব্লাক করা দেখলি—আর পাঁচিশ-তিরিশটা লোক ওখানে কাজ করেই ত সংসার চলাচ্ছে। তা নইলে বাড়ীতেই বাবসা খুলতে হতো।

—যাচ্ছি যাওরা যাচ্ছি। অত ব্যস্ত কেন? মেঝে থেকে কাপড়টা তুলে দু ভাঁজ করে পরে তারাপদ তারপর আস্তে আস্তে আসে।

—বাব্বা, তলার ছিটকিনি ত আঙুলটা গলিয়ে খোলা যায়। সবই ত জানো—তবু ন্যাকামি যোল আনা। আমাকে উঠিয়ে আনার জন্য নকসা মারা হচ্ছে। আচ্ছা আমিও মজা দেখ—আ—। দরজাটা খুলেই চমকে ওঠে তারাপদ। যুগপৎ বিস্ময় ও বিরক্তির ভাব চোখে মুখে ফুটে বেরোয়।

—বামুনদি তুমি?

—হ্যাঁগো আমি, ওরকম আঁতকে উঠলে যে?

—এখন হঠাৎ কি মনে করে?

—বলছি, বলছি,—সব বলছি। আগে ভিতরে যেতে দাও।

—কেন, সকালে তোমাকে মা বলেনি, আজকে আর আসতে হবে না।

—বলেছে গো, বলেছে।

—তবে?

—আগে ভেতরে পানে যেতে দাও, তার পরে ত—।

ওর প্রায় ছ' ফুট লম্বা চেহারাটাকে পাশ কাটিয়ে, দরজার চৌকাঠে রাখা বহুখানার তলা দিয়ে অক্লেশে গলে বারান্দা দিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে ঝড়ের মত। আসবার সময় ঘাড় বেঁকিয়ে চোখ ঠেরে বলে আসে—

—দরজাটা এঁটে দিয়ে চলে এসো গো বাবা-বাবু—

তারাপদ যন্ত্রচালিতের মত দরজাটা ঠেলে দিয়ে ঘরের ভেতর এসে ঢোকে।

বামুনদি চাপাস্বরে বললে—কিগো, তোমার গিয়ে সেই ঐ যে গো, ঐ তলার মা-খাকী মেয়েটা—।

রত্নার প্রসঙ্গ আচমকা আসতে তারাপদ একটু হতভম্ব হয়ে যায়—হাঁ করে বড় বড় চোখ পাকিয়ে বামনদির দিকে তাকিয়ে থাকে।

ঢোক গিলে নিজেকে সামলে নিয়ে বামনদি বললে—হাঁ করে তাকিয়ে আছ কি? ঐ যে তোমার হরিপিসীর ভাইঝি রত্না না মত্না, সে এখানে নেই তো? সে মেয়েটা তো আবার হুট হুট করে তোমার কাছে যাসে।

তারাপদ একটু প্রতিবাদের সুরে বলে—কি যে বল, বামুনদি তোমার বুদ্ধিসুদ্ধি অ্যাক্কেবারে নেই। দেখছ মা বাড়ী নেই, হরিপিসী নেই, ওর বাবা গেছে অফিসে আর ও একটা আইবুড়ো মেয়ে আমার কাছে—।

—থাক থাক আর বলতে হবে না। আমি বুঝেছি। তোমার কথার ত কোন আড়-ঢাক্ নেই। এখুনি কি বলতে কি বলবে।

—থাক তোমার এখন আসার কারণটা বল দেখি।

এদিক ওদিক তাকিয়ে, পেটের কাছের কাপড়ের একটা গিঁট যেন খুলতে চায়, হাত দুটো নিয়ে যায় পেটের ওখানে।

তারাপদ বামুনদিকে ভাল করে লক্ষ্য করে। বামুনদির চেহারাটার খোলস এখন আরও একটু খোলতাই হয়েছে কালো নরুণ-পেড়ে মিলের ধুতিটা পরে— দশ বছর কমিয়ে অ্যাকেবারে পঁচিশে নামিয়ে এনেছে। ভ্রমর কালো চেহারায় আটকে থাকা যৌবনটার দিকে তাকিয়ে থাকে।

বামুনদি একটু লজ্জা পেয়ে যায় মুহূর্তের জন্য। কিন্তু বহু লোকের দৃষ্টিতে স্পর্শে, স্বাদে, মন্থনে বহুবার মথিত হয়েছে বামুনদির কালো টলটলে ভরন্ত যৌবনবাহী দেহটা। সে ভয় পায় না তার এই ছোট্ট দাদাবাবুকে। আর দাদাবাবুর

দিতে পটলাকে। দুজনকেই ছোটবেলা থেকে দেখছে বড় হতে তারই চোখের ওপর।

—চেহারা দেখেছ। পটলা ঠিকই বলে—বামুনদির চেহারাটা যেন খাই খাই করছে। কোমরের ওখানে বোধহয় গিঁট পড়েছে।

—কিরে বাব্বা কাপড়টা সত্যিই খুলবে নাকি? সেরেছে—এ আবার কি রসিকতা। শেষে কিনা কাপড় খুলে ঠাট্টা।

বামুনদি হঠাৎ চীৎকার করে ওঠে—হোয়েছে। দাঁড়াও আগে সব দেখাই তোমাকে।

—সেরেছে, কি দ্যাখাবে?

বামুনদি কোমরের কাছে আটকান কাপড়ের গিঁটটা খুলতে থাকে। আঁচলটা মাথার থেকে খসে পড়ে। কাঁধের থেকে আস্তে আস্তে আঁচলটা খসে পড়ে। বামুনদির খেয়াল থাকে না বোধহয়। ওর নাকের ডগায় ঘামের বিন্দু কাল-কচুর পাতায় ওপর ছোট ছোট শিশিরকণার মত জ্বলজ্বল করে।

—বামুনদির কসরত দেখে আমি যে ঘেমে যাচ্ছি রে বাব্বা। এ গরমে আবার সর্দিগর্মী না হয়? হাতে কাগজের ঠোঙ্গায় একটা ন্যাকড়ায় জড়ান—পুঁটলীর মত। বামুনদি পুঁটলীটা বিছানায় রেখে, বলে—দাদাবাবু এগুলো আমার যথাসব্বস্ব। আমার বের গওনা। এগুলো অনেক কষ্টে রেখেছি না খুইয়ে। আমার সব কিছু খুইয়েছি—কিন্তুক এগুলো আগলে রেখেছি যখের মত। কেন রেখেছি জানো? একটু থেমে আবার বলে—যখন খাটতে খুটতে পারব না, তখন এগুলো দিয়ে আমার পেট চালাতে হবে।

—তা' এগুলো আবার এখানে আনলে কেন?

—আগে শোন ত, সবই বলছি। আমি, দাদাবাবু, আমার শ্বশুরে গাঁয়ে যাবো। এগুলো রেখে যাই কোন চুলোয়। যেই পাবে সেই মেরে দেবে। শত্তুরের ত অভাব নেই। তোমার মা নেই, তাই তোমার কাছে রেখে গেনু। কাল-বাদ পরশু কাজে এসে নিয়ে যাব। তুমি এগুলো একটু সাবধানে রেখো। আর মা এলে বলো। আমার একটু তাড়া, আবার ট্রেন ধরতে হবে।

তারাপদ নিশ্চল পাথরের মত দাঁড়িয়ে থাকে। চোখ দুটো বুজে যায় আস্তে আস্তে। কয়েকটা মুহূর্ত চুপ করে থাকে, ঘটনাগুলো কেন আচমকা ঘটে যায়—কিছুক্ষণ বাদে নিজস্ব বুদ্ধিটা খেলে যায় মাথায়। চোখ খুলে দ্যাখে।

—যাক বামুনদি কেটেছে। তাজ্জব। এ্যাকেবারে তাজ্জব ব্যাপার।

—হ্যাঁ ঠিকই।

পুঁটলীটা হাতে তুলে নেয়, আস্তে ওঠায় আর নামায় হাতের তেলোতে রেখে।

—তা হবে বেশ, সের-দুই ত বটে। বাব্বা এত গয়না তোমায় বিয়েতে দিয়েছে তোমার বাপ। বলিহারি তোমার বাপ। রাখ দেওয়ার আর জায়গা পাও না আমাকে? যাক, হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলছি না। একবার যেকালে সুযোগ এসেছে হাতে, তাকে হ্যালা-ফ্যালা করে সব নষ্ট হতে দেবো না।

গয়নাগুলো বিছানায় ঢেলে ফেলে বিছিয়ে নেয় এক এক করে।

মাগ্গী-গণ্ডার বাজারে তা হবে বেশ। এতেই চলে যাবে। পটলার প্ল্যান এবার নির্ঘাত সাকসেসফুল। দেবো পাড়ি। পটলাকে সঙ্গে নিতে হবে। নইলে ও-ব্যাটা সব প্ল্যান ভেস্তে দেবে। আর এতগুলো ঝাড়ব কোথায়?

—এ তো অনেকবার বলেছি, মায়ের সিন্দুক ভাঙ। যা পাবি সঙ্গে সঙ্গে মাল বেপাত্তা করে দেব, বুঝলি—কাক-পক্ষীতেও টের পাবে না।

—যাক এতে যা টাকা পাওয়া যাবে তাতেই পাড়ি দেওয়া যাবে বম্বে। তারপর সিনেমায় চান্সটা ত হাতের পাঁচ।

সবগুলো জড়ো করে, আবার ছড়িয়ে দেয় বিছানায়। হাতে করে তুলে নেয় মোটাসোটা বিছে হারটা।

—তা ভরি-আষ্টেক হবে। আর এই আংটিটা। এটা হীরে না মুক্তো—না হীরে। আরে শালা হীরের দাম কত? কে জানে? পটলাটা নিশ্চয় জানে। এটা কিরে বাব্বা, এটা ত সেরখানেক হবে। এটা আবার কোথায় পরে রে বাব্বা। হ্যাঁ, হ্যাঁ বুঝেছি, কোমরে—মারও আছে। আরে এটা কোমরে পরে কি করে? মাকে ত কোনদিন পরতে দেখিনি। মাকে ত কোনদিনই গয়নাই পরতে দেখিনি। খালি একটা সরু হার আর দুগাছি বালা, হাতীর দাঁতের তৈরি, তাতে সোনার তার জড়ান জড়ান। বাস্। আবছা আবছা মনে পড়ে। বাবার মরণের পর তাও সব শেষ। মার সুন্দর নিটোল সাদা হাত সুন্দর, বেশ সুন্দর। গয়না পরলেও যা, না পরলেও তা।

শত্তুরের ছাই যত বাজে চিন্তা। গয়নাগুলোর সদ্গতি করি কি করে? পটলাটাকে ডাকতে হবে। ঐ যা করে করবে। ওই ত সেদিন বলেছে মুক্তোমালার প্রথম ছবি দেখে—আরে তেরো মুক্তোমালাকে পেতে কিস্সু না, শুধু কিছু টাকা ব্যস। বম্বে গিয়ে ফাস্ট একটা ছবিতে নামা।

—তবে? এতে কি কিছু টাকা? বেশ কিছু আসবে বাব্বা—সুড়সুড় করে আসবে। একবার সিনেমার হিরো হলে তার থেকেও আসবে। তখন একটা ছোট্ট ছিমছাম বাংলো প্যাটার্নের বাড়ী। না বড় বাড়ী—লক্ষ্মী-কুমারের প্রাসাদের মত। আর দেখতে হবে না মুক্তোমালা, সুরসুন্দরী, পটলাটা বলে, ছন্দসুন্দরী—আমার ফেবারিট আর্টিস্টের নামটাকে অ্যাকেবারে খাস্তা করে দিয়েছে। যাক, সকলকে নিয়ে যখন-তখন ঘুরবো, বেড়াবো। বাড়ীতে আনবো, হোটেলে নিয়ে যাবো—টাকা কত তখন? কারোর পরোয়া করি। পত্রিকায় পত্রিকায় ফটো নাম, জীবনী —জীবনী লিখবে কে? হ্যাঁ, আমি লিখবো, না কেবল আমার নামটা থাকবে, সুশীলকে দিয়ে লেখাব। পড়ুরে হয়েছে—হিংসের তখন ফেটে মরবি রে। টাকা দিয়ে তোকে কিনে রাখব। টাকার জুতি মেরে—অঢেল টাকা, নামী দামী লোক টাকার জোরে নফর-চাকর বানিয়ে রাখব। দাসদাসী, চাকর-বাকর, সারভেণ্ট-মেডসারভেণ্ট—উঃ, কি হবে যে না আমার—সমস্ত গয়নাগুলো ঠোঙায় ভর্তি করে দুহাতে চেপে বুকের কাছে নিয়ে আসে—একটা লাফে সাবেকী আয়নার সামনে এসে দাঁড়ায়, দ্যাখে।

—অনেক টাকা, রাজার ঐশ্বর্য। হ্যাঁ, তখন একটা বিয়েও করতে পারি। আরে ছোঃ রঞ্জা—ঐ বাঁদরটাকে। দু'একদিন কিছু টাকা দিয়ে নয় এদিক-ওদিক করতে পারি। তা বলে—।

—হ্যাঁ, মটর ত থাকবেই। একখানা হুডখোলা টু-সিটার শুধু সকালে হাওয়া খাওয়ার, সুইমিং পুলে যাওয়ার—ওটা ত ওনার ড্রাইভ। আর একটা ইমপালা পিছনের সিটে বসে থাকব—মোড়ের বাড়ীর পর্-মিলার বাপ কুনখুনেওয়ালা, না রিকশ-ওয়ালা—গজকচ্ছপের মত চেহারা, ওই শয়তানটার মত? আরে ছোঃ।

—তখন ওর গাড়ীটাই কিনে নেব—তা নইলে ফরেন মাল পাওয়া বড় দায়। ওর ফুলটাইম মাইনে করা ড্রাইভারটাকেও আর পেটমোটা অ্যালসেশিয়ানটাকে। কুকুরটাকে নিলে আবার ছুঁড়ীটাকে নিতে হবে। যা পেয়ার দুজনে যেন হুর-পরীরিত। রাতে বেসামাল হলেও কোন ভয় থাকবে না।

—বাড়ীতে ত পার্টি হবেই। কখনও বা বাগান-বাড়ীতে, কখন বা হোটেল-মোটেলে। বাগানবাড়ীরটাই হবে মজাদার। ইংলিশ ডিস মোগলাই খানা। ইংরিজী কায়দা। ইংলিশ মিউজিকের সঙ্গে ড্যান্স। নাইস। ওয়াণ্ডারফুল। অ্যান্ড ড্রিঙ্ক এনজয় কর। যা খুশি কর। কি আইডিয়া—।

—কি আইডিয়া তারাদা?

তারাপদ ঠোঙাটা দেরাজটা টেনে তার মধ্যে রেখে দেয়। তারপর দেরাজটা বন্ধ করে দিয়ে, মুখ ফিরিয়ে তাকায়। হাতের কাপ-দুটো দেয়ালের সঙ্গে ঠেসান দেওয়া সেগুন কাঠের টেবিলটার ওপর রাখতে রাখতে রঞ্জনা বলে—কি গো তারাদা, কি আবার আইডিয়া মাথায় ঢুকলো। জেঠিমা বলে—তোমার মাথায় বালি আর গোবর ভরা আছে। একটুও ফাঁক নেই, তাতে আই-ডিয়াটা ঢুকলে কি করে?

কাপদুটো একটা কাগজ পেতে তার ওপর রেখে, ডিসদুটো চাপা দিতে দিতে

বললে—আইডিয়াটা যা ঢুকেছে, নিশ্চয়ই সিনেমার নায়ক হওয়া অর অগাধ টাকা রোজগার করে বড়লোক হওয়া। তা বেশ। ধনী হিসেবে নায়ক হিসেবে তোমার নাম-ডাক হলে আমার কথাটা মনে রেখো—অন্তত অজকের কথাটা। ঘুঁটের ধোঁয়া খেয়ে কাঁদতে কাঁদতে তোমার জন্য চা করে এনেছি। তোমার বড় কাপটা আমার ছোট কাপটা। অর-বা কথায় কথায় দেরী হয়ে গেল, তলায় তেল আর মশলা মাখা মুড়ির সরাটা—এতক্ষণে কাগে সাবাড় করে দিলো। যা মুখপোড়া কাকের দৌরাত্ম্য। আমাদের জায়গায় তারাই হয়তো কাটাকাটি করে আরম্ভ করে দিয়েছে। ঝিলিক হাসি হেসে বেরিয়ে যায় রঞ্জনা।

—না মেয়েটা আমায় হাড়মাস খেলে। নিস্তার নেই একটু স্থিরভাবে মাথা ঠাণ্ডা করে একটা চিন্তা করব—তা নয়, কোথা থেকে কোথা উড়ে এসে জুড়ে বসলো। র‍্যাবিস্। কথা জানে না। মানায় জানে না। জংলী। ঘুঁটে, ধোঁয়া, কান্না, ছোট কাপ, বড় কাপ। ননসেন্স। আবার তেল আর মশলা নিয়ে মাখা মুড়ি। ও একটা উইচ্। কাটি কাটি খাওয়ার মিউজিক দেখেছো? ইস্-পিটারেট, আনকালচারড্, প্রনানসেসান জানে না—কাককে বলে কাগ! বত্ত সব।

—কিগো তারাদা আবার কি হল? বক-বক করছ কি? মুড়ির সরাটা নামিয়ে রাখতে রাখতে বলতে লাগলো রঞ্জনা—বাঁজ চোরের মত তাকিয়ে দেখছো কি? চুরি করে ধরা পড়ে গেছ বলে মনে হচ্ছে। ভয় নেই আমি কাউকে বলব না গো, বলব না। এরকম সুযোগ আসলে নেবতও সুযোগটা নেয়। আর তুমি ত মানুষ। দাঁড়াও জল নিয়ে আসি।

—বলে কি? সব দেখেছে। সব জেনেছে। একবার স্যারনা! এরকম শান্-সা মেয়ে হাজারে একটা মেলে। ভাগ চায় না কি? গরীব কেরানীর মেয়ে টাকার গন্ধ পেয়েছে আর হাড়ে। যাবে অর্ধেকটা। আবার পটলাটা ত আছেই। আমার কি হল শুধু বদনাম। তারপর আমার মায়ের কানে গেলেই হয়েছে। আর এ যা মেয়ে, ভাগ না দিলে, হয়তো মাকে সর্বনাশ বলেই দেবে। তবে ভাগের কথা এখন বলব না। দেখে দেখা যাবে।

—কি গো তারাদা, চুপ করে কেন, খাও। তোমার খুব ভয় হয়েছে না। তুমি বোকা, আমাকে তুমি বোঝ না? জেঠিমার আদরে সোহাগে আর বুদ্ধির বলে নষ্ট হয়েছে—নিজের বুদ্ধি খাটাতে হয়নি বলেই জীবন সম্বন্ধে আকেবারে অজ্ঞ। কে কি চায় তাই তুমি বোঝ না! আমি কি চাই তা তুমি বুঝতে পার না এখনও? আমি মেয়ে, তুমি পুরুষ। পুরুষের যা কাজ সে তা করে। কিন্তু তোমার উল্টো, তাই আমাকে লজ্জার মাথা খেয়ে তোমাকে বলতে হচ্ছে। চায়ে চুমুক দিতে দিতে বলতে থাকে রঞ্জনা—তুমি মন খারাপ করো না, আমি জেঠিমাকে কোন কথাই বলব না, আর বলা যায়ও না।

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে ধরা ধরা গলায় বলে—তোমার বয়েস হয়েছে, আমারও বয়েস হয়েছে। তোমার মনেতে যা চায় আমার মনেতে তাই চায়। তোমাকে না দেওয়ার আমার কিছু নেই, তোমাকেও কিন্তু দিতে হবে সবকিছু।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে যায় রঞ্জনা। তারাপদ ওর মুখের দিকে তাকায় চোখ বড় বড় করে। নোও ঠ্যালা। এখন বলে সবটা চাই। সব ওনাকে দিয়ে দিই তারপর আমি বেই টিমিয়ে সেই টিমিয়ে। আমার কপালে ওই তাহলে সবটাই ফক দিতে চায়। আমিও টারাপদ চৌধুরী, কত ধানে কত চাল তাও আমার জানা আছে।

—তারাদা চা-মুড়ি খেয়ে নাও। কথা বলবে না বুঝি আমার সঙ্গে? তুমি এই রকম। তার মানে তোমার কাছ থেকে কিছুই পাব না! তুমি এই রকম?

দরকার নেই, যা দিলুম তাই চাল। রঞ্জনা মিচ্‌কি মিচ্‌কি হাসতে হাসতে উঠে এসে তারাপদর পিছনে দাঁড়ায়। তারাপদর কপালে তার হাতটা রাখে। তারাপদর মাথাটা রঞ্জনা তার বুকের ওপর চেপে ধরে। তারাপদ একটা নরম স্পর্শ অনুভব করে তার মাথায়। তারাপদর চোখটা বুজে আসে। মাথাটা পেছন দিকে আরো হেলিয়ে শিথিল করে দেয় শরীরটা। গালের মধ্যে দেওয়া মুড়ি চিবুতে যেন ভুলে যায়। মুখের মধ্যে আস্তে মুড়ি ভিজে নরম হয়ে যায়। রঞ্জনা মনে মনে একটা পুলক অনুভব করে। রঞ্জনা তার মুখটা তারাপদর মুখের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

—ওরে ও খোকা কোথায় গেলি? গঙ্গাজলের ঘটিটা ধর ত দেখি, দুজনের চিন্তাধারা ছুটে যায় মুহূর্তে। রঞ্জনা মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে সামলে নিয়ে দৌড়ে বারান্দায় গিয়ে জেঠিমার হাতের থেকে গঙ্গাজলের ঘটিটা নিজের হাতে নেয়। তারাপদ বেরিয়ে আসে ঘর থেকে, মায়ের পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার ভয়ভাবে চোখ বুলিয়ে নেয়, নিজের মধ্যেই তারাপদর একটা পরিবর্তন এসে গেছে। মাও তার দিকে তাকিয়ে সেটা অনুভব করে। তারা-পদ বলে- [illegible] মা, তুমি এর মধ্যে ফিরে এলে? [illegible] থেকে দক্ষিণেশ্বর যাওয়া-আসা হয়ে [illegible] এর মধ্যে—দুপুর আড়াই ঘণ্টার মধ্যে।

'ছাড়ে [illegible] পুঁটলীটা [illegible] হাতে দিয়ে, দুটো হাত দুজনের [illegible] রেখে বলতে থাকেন—[illegible] বাপু, যা না চাইলে খাওয়া যায় কি? অবশ্য গঙ্গাস্নান তারা-মায়ের দর্শন, পুজো দেওয়া [illegible] কালীঘাটে [illegible]। উত্তরের বাস [illegible] [illegible] গঙ্গাস্নান। সেজন্যে কালীঘাটেই মায়ের [illegible] সারলুম। সর্বত্র সমান। এখানে যা, ওখানে তা—শুধু দরকার ভক্তি-নিষ্ঠা।

রঞ্জনা [illegible] নিজের মত করে নেওয়ার জন্যে বলে—জেঠিমা চা খাবেন না?

দাঁড়া রে মা প্রসাদটা দিই। মাটির প্লেট থেকে প্রসাদ [illegible] দিতে [illegible] তারাপদ মুখের দিকে অভিনিবেশসহকারে তাকায়, সন্দেহের [illegible]— খোকা তোর মনটা এত উতলা [illegible] রে?

[illegible] কমাসুন্দরী সামনে দাঁড়িয়ে অনাহ চিন্তা তারাপদ আর করতে পারে না, তা কাদের চোখে [illegible] পড়লেও তার [illegible] চোখকে এড়িয়ে যেতে পারে না তারপদ।

[illegible] তারাপদ তার [illegible] বলে—এ, [illegible] একগাদি [illegible] আমার [illegible] [illegible] পারে [illegible] আনন্দ

পরের জিনিস রাখলি কেন? যদি খোয়া যায়? যাক্ ওরা রক্ষা, লক্ষ্মী মা আমার, হিটারটা ধরিয়ে এক কাপ চা করো তো মা। তোমার পিসি গেছে তোমাদের এক আত্মীয়ের বাড়ী। পরে ফিরবে। কমাসুন্দরী আস্তে আস্তে নিজের ঘরের দিকে চলে যায়, রঞ্জনা ঘরের মধ্যে ঢুকে ভাঙা সাবেকী আয়নাটার সামনে দাঁড়ায়, পেছনে তারাপদ এসে আলতো করে ওর কাঁধে একটা হাত রাখে। রঞ্জনার সঙ্গে আয়নার মধ্যে দিয়ে চোখাচোখি হয়ে যায় তারাপদর। রঞ্জনার চোখের কোণে জল চিক্‌চিক্ করে ওঠে। সাবেকী আয়নাটার মধ্যে দুজনের ছবি মুহূর্তের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে ওঠে দুজনের চোখে।

রঞ্জনা হঠাৎ লজ্জা পেয়ে যায়—সরে দাঁড়ায়, এই তারাদা, হিটারটার প্লাগটা দিয়ে দাও, আমি কেটলিটা তলা থেকে নিয়ে আসি জল ভরে।

তারাপদ আবেগের চালে উত্তর দেয়—আমার বয়ে গেছে।

রঞ্জনা জিভ বার করে একটা ভেংচি দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে আয়নায় তার মুখ ভেসে ওঠে। তার মুখের আহ্লাদের হাসি ধরা পড়ে সাবেকী আয়নায়।

'সবাইকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে—
কি পড়াশুনোয়,
কি খেলাধুলোয়!'
কিছুদিন আগেও ওর কিছুই যেন ভাল লাগত না। সব সময় কেমন মনমরা, আর খিটখিটে। ইস্কুলের পড়াশুনো বা খেলাধুলো কিছুতেই মন নেই। অগত্যা বাড়ীর ডাক্তারকে দেখালাম।
ডাক্তারবাবু বললেন, "ভাববেন না, আপনার মেয়ের কোন অসুখ হয় নি। শুধু এই বাড়ন্ত বয়সে ওর কিছুটা বাড়তি পুষ্টি চাই। ওকে রোজ হরলিক্স খেতে দিন।"
হরলিক্স খেয়ে মেয়ের আশ্চর্য উন্নতি হ'ল। ওর স্ফূর্তি আর উৎসাহ আবার ফিরে এসেছে। ইস্কুলের রিপোর্টও এখন খুব ভালো।
হরলিক্স-এর গুণেই উন্নতি হল
বাড়ন্ত বয়সে ছোটদের যে হারে শক্তি-ক্ষয় হয়, রোজকার মামুলী খাবারে তার পূরণ হয় না। হরলিক্স খেলে বাড়তি পুষ্টি পেয়ে ওদের অতিরিক্ত শক্তি গড়ে ওঠে—মনে স্ফূর্তি আসে, সব কাজ ভালো হয়। ডাক্তাররা তাই বাড়ন্ত ছেলেমেয়েদের হরলিক্সই দিতে বলেন।
Horlicks
মাখন না-তোলা দুধের সঙ্গে গম ও যবের পুষ্টি-কর সারাংশ।
হরলিক্স বাড়তি শক্তি যোগায়!

নেপালী লোকসাহিত্য

হরেন ঘোষ

লোক-সাহিত্য সম্পর্কে সম্প্রতিকালে আলোচনা ও গবেষণা চলছে। শুধু আমাদের দেশেই নয়, সভ্য বিশ্বের প্রায় সর্বত্র আজ লোক-সাহিত্য সম্বন্ধে গভীর অনুসন্ধিৎসা, কৌতূহল। অথচ দীর্ঘদিন সাহিত্যের এই শাখাটি অনাদৃত অবহেলিত ছিল।

বাঙলা দেশের নানা প্রান্তের লোক-সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে বিশিষ্ট গবেষকবৃন্দ বিভিন্ন তথ্য আবিষ্কার করেছেন। এ বিষয়ে একাধিক সুলিখিত গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে। অথচ নেপালী লোক-সাহিত্য সম্পর্কে বাঙলা ভাষায় রচিত কোন প্রবন্ধ চোখে পড়েনি। পশ্চিম বাঙলার উত্তরাঞ্চলে দার্জিলিং জেলার পার্বত্য খণ্ডের তিনটি মহকুমায় অর্থাৎ দার্জিলিং, কার্শিয়াং, কালিম্পং-এ নেপালী ভাষাভাষীর প্রাধান্য। নানা পার্বত্য অধিবাসী, যেমন তিব্বতী, ভুটানী, সিকিমী এবং ভারতের নানা প্রান্তের অধিবাসী এই অঞ্চলে বসবাস করলেও সংখ্যাধিক্য নেপালী ভাষাভাষীর। নানা উপ-ভাষা অধ্যুষিত বাংলাদেশে পাশাপাশি দুটি মূল ভাষা, বাংলা ও নেপালী—দুটি একই গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। একটু চেষ্টা করলেই যে কোন সুধী বাঙালী পাঠক নেপালী ভাষা বুঝতে পারবেন। উভয় ভাষার জননী এক—সংস্কৃত।

নেপালী ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি আমার মমতা ও অনুরাগ আছে। আমি সব সময় স্মরণ রাখি বাংলা-সাহিত্যের আদি গ্রন্থ চর্যাচর্য বিনিশ্চয় বা চর্যাপদ নেপাল রাজ-দরবারে সুরক্ষিত ছিল এবং সেখান থেকেই মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এই গ্রন্থটি আবিষ্কার করেন। তুর্কী আক্রমণের সময় যখন বাংলা-দেশের অমূল্য সাহিত্য বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছিল, তখন বিশ্বের একমাত্র হিন্দুরাজ্য নেপাল সযত্নে বাংলাসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ রক্ষা করেছে। বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে নেপালী সাহিত্যের যোগাযোগ আজকের নয়, এক হাজার বছরের পুরোনো এ সম্পর্ক। বর্তমান প্রবন্ধে মূল নেপালের লোক-সাহিত্য সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করা হচ্ছে না—পশ্চিম বাঙলার উত্তরাঞ্চলের পার্বত্য ভূখণ্ডের নেপালী ভাষাভাষীদের মধ্যে প্রচলিত লোক-সাহিত্যের আলোচনা করা হচ্ছে সংক্ষিপ্ত ভাবে।

অলিখিত সাহিত্য মাত্রই লোকসাহিত্য। লোক-সাহিত্য প্রাচীন হলেও নতুন। প্রাচীনের সঙ্গে নতুনের যোগসূত্র রচনায় লোক-সাহিত্যই একমাত্র উপায়। লোক-সাহিত্য লোকসমাজ সৃষ্ট সাহিত্য। সমষ্টির চেতনা ও চিত্ত নির্যাসে এর জন্ম। লোক-সাহিত্য কোন ব্যক্তি-বিশেষের একক সৃষ্টি নয়, সংহত সমাজের সামগ্রিক সৃষ্টি। লোক-সাহিত্যের সঙ্গে সমাজ-বিজ্ঞানের সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ। লোক-সাহিত্য মানবজাতির সংস্কৃতির একটি মূল্যবান উপকরণ। পৃথিবীর প্রত্যেক জাতির ইতিহাস এবং সংস্কৃতির বিকাশে লোক-সাহিত্যের দান রয়েছে। কোন জাতির সমাজ-বিবর্তনের ইতিহাস যদি পরীক্ষা করতে হয়, তবে তার লোক-সাহিত্যকে বিচারের আওতায় আনতে হবে।

নেপালী লোক-সাহিত্যের প্রধান অংশ জুড়ে আছে লোক-সঙ্গীত ও প্রবাদ-প্রবচন। সরল ধর্মভীরু, সৎ গ্রাম্য নেপালী নর-নারীরা নৃত্য-গীতের মাধ্যমে আনন্দে দিন কাটাতে ভালোবাসে। এরা উৎসবপ্রিয় জাতি, তাই যে-কোন উপলক্ষে আনন্দ-উৎসবে মেতে উঠতে চায়। থাকুক না অভাব অভিযোগ, দৈনন্দিন দুঃখ বেদনা তো থাকবেই, যতক্ষণ পারো হেসে-খেলে আনন্দে জীবনকে উপভোগ করে নাও। অত্যন্ত কষ্টসহিষ্ণু, কর্মঠ, পার্বত্য জাতির হৃদয় কিন্তু পাষাণ নয়, সেখানে ঝর্ণাধারার মত প্রস্রবণের নির্মল রসনির্ঝর।

নেপালী লোক-সাহিত্যের মধ্যে লোক-গীতির স্থান মুখ্য। নেপালী লোকগীতি নানা পর্যায়ে বিভক্ত, নানা নামে পরিচিত।

ঝাউরে গীত—খুব সংক্ষিপ্ত প্রেম-সংগীত। নায়ক-নায়িকার মনোভাব সুন্দর ভাবে প্রকাশিত হয়। সবাই গীত—কাহিনী সংগীত। যে কোন বিষয়বস্তু নিয়ে কাহিনী গীত হয়ে থাকে। মালসিরি—প্রধানতঃ দুর্গাপূজার সময় গীত হয়। মহালয়া থেকে অষ্টমী পর্যন্ত গাওয়া হয়ে থাকে। অত্যন্ত জনপ্রিয় সংগীত। জুয়ারী—প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে যে কোন উৎসবে গাওয়া হয়। অনেকটা কবিগানের মত। তবে পক্ষ-প্রতিপক্ষ হবে প্রেমিক-প্রেমিকা। সাঙিনী গীত—গ্রামের বিবাহিত মহিলারা দলবদ্ধ ভাবে এই গান গেয়ে থাকে। যদি কোন বিবাহিতা মহিলা আহূত হয়েও এই গানের দলে যোগ না দেয়, তাহলে নাকি পরের জন্মে ঘোড়া হয়ে জন্মাবে। রসিয়া গীত—ক্ষেতে কাজ করার সময় সমবেত ভাবে এই গান গাওয়া হয়। বালুন গীত—রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী লোক-সঙ্গীতের সুরে গাওয়া হয়। রত্যোলি গীত—বিবাহ বাসরে এই গান গাওয়া হয়। আদিরসপ্রধান এই গান। নানী ভুলাউনে গীত—বা ছেলেভুলোনো গান। এই গানে সুরের বৈচিত্র্য নেই, আছে আন্তরিকতা।

লোক-সঙ্গীতের রচয়িতার নাম জানে না কেউ, কবি বা রচয়িতা খ্যাতির জন্যে লালায়িত নন—শুধু মনের ভাব প্রকাশ করতে পারলেই তারা খুশি। নিজের মনের ভালোলাগাটুকু আর দশজনের মনে ছড়িয়ে দিতে পারলেই হল। নেপালী লোক-সঙ্গীতে নগাধিরাজ হিমালয়ের একটি মুখ্য ভূমিকা আছে। ধ্যানমৌনী হিমালয়-বন্দনা অনেক লোক-সঙ্গীতের বিষয়। এ-ছাড়া প্রকৃতিবিষয়ক অজস্র সঙ্গীত আছে, যেখানে দেখি ঝর্নার গান, কুয়াশায় ঢাকা পাহাড়-চূড়োর ছবি, অবিশ্রান্ত বৃষ্টিধারা, মাটি গাছ পাথর। আর আছে খান, জুটো—দৈনন্দিন জীবনের অত্যাবশ্যক খাদ্যবিষয়ক সঙ্গীত।

এবার লোক-সঙ্গীতের আরো কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা যাক।

লহরী লালী মাই—একটি জনপ্রিয় সঙ্গীত। চৈত্র-বৈশাখে যখন ভুট্টার চারা লাগান হয়, তখন এই গান গাওয়া হয়। একজন একটি কলি গেয়ে যায়, তখন সম-স্বরে সকলে বলে—লহরী লালী মাই। দীর্ঘক্ষণ এই গান গাওয়া যেতে পারে।

জৈষ্ঠ-আষাঢ়ে ধান রোপণের সময় গাওয়া হয় 'অসারে গীত'। নায়ক-নায়িকা কথোপ-

কথনের ভঙ্গিতে গেয়ে থাকে এই গান। যেমন নায়িকা বলে :—

> ধান হৈ রোপন, ছপ্পমা ছপ্
> অসারকো মাসমা
>
> বাজাকো বেটি মো কস্ত কেটি,
> বসিন্ হু আশমা।'

কুমারী কন্যা আমি, কেমন জীবন-সঙ্গী পাব জানি না। ধান বুনছি আর আশায় আশায় দিন গুনছি।

অগ্রহায়ণ মাসে ধান মাড়াইয়ের সময় গাওয়া হয় রাশি গীত।

মারুনী গীত—বিখ্যাত ও জনপ্রিয়। এই গানের সঙ্গে নাচ থাকবেই। এই নাচ ও গান কালী পুজোর অমাবস্যা থেকে একাদশী পর্যন্ত চলে।

মাদলে গীত বারো মাস গাওয়া চলে। গানের সঙ্গে মাদল বাজান হয়। সেলো বা **ঝম্রুক গীত**—নেপালের উত্তরে হিমালয়ের কোলের আদিবাসী তামাংদের নিজস্ব সংগীত। যারা ভেড়া পালন করে সেই গোয়ালাদের নিজস্ব সঙ্গীতের নাম টুংনা'। দোতারার মত বাদ্যযন্ত্রের নাম টুংনা। সেটি বাজিয়ে এই গান গাওয়া হয়।

বিবাহের সময় বরযাত্রী ও কন্যাপক্ষের লোকদের মধ্যে রঙ্গ-রসিকতা চলে কবিতার মাধ্যমে। এই গানের নাম **কবিত**। পূর্ব নেপালের আদিবাসী রাই ও লিম্বু শ্রেণীর নিজস্ব সঙ্গীত পালাম। এই গানকে কর্ম-গীতও বলা হয়। যে-কোন পুজো-পার্বণ বা যাগ-যজ্ঞের পর গাওয়া হয় খেঁজরি ভজন। মূলত ধর্ম-সংগীত, এবং পুরুষরাই গেয়ে থাকে।

তজোরে বা তীজ—ভাদ্র মাসে বাড়ির মেয়েদের কুমারী বা বিবাহিতা—আদরযত্ন করে খাওয়ান হয় এবং এই গান গাওয়া হয়। আর কয়েকটি জনপ্রিয় লোক-সঙ্গীতের নাম হল—সিলোক, ভজন, দোহা, লহরি হাকপারে, খালী, ঝুমুর, চুড়কে ইত্যাদি। তবে সবচেয়ে জনপ্রিয় ও সুপ্রচলিত দেওসী ও ভৈলো সঙ্গীত। দেওসী উৎসবের ব্যাখ্যা নিয়ে মতভেদ আছে। একদল বলেন দেওসীর মূলে দেবশ্রী। রামচন্দ্রের সিংহল বিজয়কে কেন্দ্র করে এই উৎসব। অন্যদল বলেন, বলিরাজা শ্রীকৃষ্ণকে বলেন—তোমার পা রাখ আমার শিরে। অর্থাৎ দাও শিরে। কালীপুজোর রাত্রে লক্ষ্মী-পুজো করা হয়। তার পরদিন থেকে চলে এই উৎসব। দল বেঁধে গাঁদাফুলের মালা গলায় পরে বাড়ি বাড়ি ঘুরে মাঙ্গলিক গান গায় ছোটবড় সবাই। দীর্ঘক্ষণ চলতে পারে এই গান। একজন মূল গায়েন আরম্ভ করে, আর সবাই সমস্বরে ধুয়ো দেয়—দেও শিরে। অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পারলে যথেষ্ট আনন্দ পাওয়া যায়। নমুনা দেওয়া যাক—মূল গায়েন বলে—ঝিলিমিলি ঝিলি-মিলি, সঙ্গীরা বলে দেও শিরে। মূল গায়েন বলে—কেকো ঝিলিমিলি, সবাই বলে—দেও শিরে। এইভাবে চলতে থাকে। ফুলকো ঝিলিমিলি—দেও শিরে, রাতো মাটো—দেও শিরে, চিপ্লো বাটো—দেও শিরে। চারিদিকে আলোর রোশনাই, শুভ লক্ষণ, তোমার দরজায় এসেছি আমরা, নিজেরা আসিনি, বলী রাজার আদেশে এসেছি—আমাদের দক্ষিণা দাও, তোমাদের মঙ্গল হবে। এবার চলে আশীর্বাদের পালা। তুমি রাজা হবে, দু-দশ টাকা ইঁদুরেও নিয়ে যায়, তুমি দাতাকর্ণ আমরা জানি—অতএব চটপট দিয়ে দাও। দলের সঙ্গে খোল করতাল মাদল থাকে অনেক সময়। লক্ষ্মীপুজোর রাতে মহিলারা বাড়ি বাড়ি ঘুরে ভৈলো গান গায়। এটিও মাঙ্গলিক গান। সারারাত চলে এই গানের আসর। গানের মর্মার্থ খুব হৃদয়গ্রাহী।

নেপালী লোক-সাহিত্যের সবচেয়ে বড় শাখা লোকসঙ্গীত। এ-ছাড়া আছে নানা গাথা, কিংবদন্তী, প্রবাদ প্রবচন ছড়া।

কথায় কথায় ছড়া কাটে এরা, প্রবাদ আওড়ায়। বিশেষ করে বৃদ্ধ-বৃদ্ধারাই বেশি ব্যবহার করেন। প্রবাদকে বলে উখান। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

(১) অন্ধ্যারোকো কাম, খোলাকো গীত—অন্ধকারে কাজ করা, কলায় গান গাওয়ার মত অর্থহীন।

(২) আকাশলাই থুকা আপনৈ মুখমা ফিটা—আকাশে থুথু দিলে নিজের মুখেই পড়ে।

(৩) আগি সমঝে সদা সুখী, পছি সমঝে সদা দুখী—যে আগে চিন্তা করে সে সর্বদা সুখী হয়, যে পরে ভাবে সে সর্বদা দুঃখী।

(৪) অদুবা খাই শহর পসনু, মূলা খাই বন পসনু—আদা খেয়ে শহরে প্রবেশ করবে মূলো খেয়ে বনে যাবে। অর্থাৎ আদার গন্ধ ভালো, মূলোর গন্ধ ভালো নয়। (৫) আফৈ মর্দাস, আফৈ ধামী—নিজেই ভূত নিজেই ওঝা। (৬) বন ভাড়কো মযূর সবৈলে দেখছন, মন ভাড়কো কসৈলে দেখেইন—বন পুড়লে সবাই দেখতে পায়, মন পুড়লে কেউ দেখে না। বড়ু চণ্ডী-দাসের শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের রাধার উক্তি মনে পড়ে যায়। রাধা বলছেন, বন পোড়ে আগ সভাই জগজনে জানি, মোর মন পোড়ে যেন কুম্ভারের পনী। (৭) ন হুনে মামা ভন্দা কানে মামা নিকো—নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো। (৮) ধন হুনেকো মন ছৈন মন হুনেকো ধন ছৈন—ধনবানের মন নেই, যার মন আছে তার অর্থ নেই। (৯) কাটেকো থাউমাথি নুনচুক—কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে। এমনি অজস্র প্রবাদ প্রচলিত আছে। অধিকাংশ প্রবাদের সঙ্গে বাংলা প্রবাদের মিল আছে।

সংক্ষিপ্ত পরিসরে নেপালী লোক-সাহিত্যের আলোচনা শেষ করার আগে দুটি জনপ্রিয় নেপালী লোকসংগীতের সংক্ষিপ্ত বঙ্গানুবাদ দিচ্ছি। "মাটিই আমার মা, মাটিই আমার বাবা, মাটিই আমাদের অন্ন দান করে। আমি মাটিকে ভালোবাসি, সম্মান করি, মাটি-মা আমার ধন্য।" হিমালয় সম্পর্কে প্রচুর গান আছে। একটি সুপরিচিত গান—

> 'হিমালয় শিখরের অন্য পারে
> কবে বরফ জমবে—
>
> প্রবাহিত জলধারা, উধাও মন আমার
> কোথায় গিয়ে থামবে?

গোয়েন্দা কবি পরাশর

প্রেমেন্দ্র মিত্র রচিত
শৈল চক্রবর্তী চিত্রিত

CENTRAL LIBRARY

অঙ্গনা

মেয়েদের কর্মসংস্থান

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রকের তথ্য থেকে একটি পরিসংখ্যান পাওয়া গিয়েছে। যার বিষয়বস্তু ছিল চাকরির ও জীবিকার লড়াইয়ে মেয়েদের অগ্রগতি। তাতে দেখা যাচ্ছে রাজ্যবিশেষে চাকরির প্রবণতায় মেয়েদের মধ্যে কিছুটা ফারাক। দেশের সর্বত্র মেয়েদের ঝোঁক এক রকম নয়। তাই দেখা যায়, যে, কেরলা ও আসাম অন্য রাজ্যের তুলনায় তাদের মেয়েদের চাকরির সুযোগ অনেক বেশি দিয়ে থাকে। অথচ রাজ্য দুটি শিল্পে অনগ্রসর। কিন্তু দুই রাজ্যই আবার বাগিচা শিল্পে সমৃদ্ধ। এবং যে কোন শিল্পের চেয়ে বাগিচা শিল্পে মেয়েরা অনেক বেশি কাজ পায়।

এ ব্যাপারে কিন্তু মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু এবং পশ্চিমবঙ্গের চিত্র ভিন্ন। এসব রাজ্যে শিক্ষিত মেয়েরা বেশি করে ঝুঁকছে চাকরির দিকে। আবার শিক্ষিতের হারে কেরালা ভারতের অন্যতম অগ্রণী রাজ্য। তাই এই রাজ্যের শিক্ষিত মেয়েদেরও ঝোঁক চাকরির দিকে। সর্বশেষ হিসেবে দেখা যাচ্ছে যে, ১৯৮১ সালের জুন মাস পর্যন্ত মেয়েরা চাকরির ১০-১ শতাংশ দখল করেছিলেন।

সর্বমোট হিসেবটা দাঁড়াচ্ছে এই রকম, ভারতের সুসংহত সংস্থায় নিযুক্ত প্রতি দশজনের মধ্যে মেয়ের সংখ্যা একের অধিক। কৃষি এবং বনজঙ্গলের কাজে নিযুক্ত প্রতি দশজনের মধ্যে প্রায় চারজনই মেয়ে। খনির অভ্যন্তরে মেয়েদের কাজ করা নিষিদ্ধ। কিন্তু বাইরের কাজে তাদের অংশ নিতে বাধা নেই। এ-কাজেও মেয়েদের হার খুব একটা খারাপ নয়। ৯-১ শতাংশ মেয়েরা এখানে নিজেদের দখলে রাখতে পেরেছে। এ পর্যন্তই মেয়েদের সব কাজের হিসেব সমাধা হলো এমন নয়। সর্বত্রই তারা ছড়িয়ে পড়েছে এবং নিজেদের জায়গা করে নিয়েছে। কোন কিছু তৈরি হয় এমন শিল্পে মেয়ে কর্মীর হার ৮-৫ শতাংশ।

এই হলো মেয়েদের সামগ্রিক কর্মসংস্থানের চিত্র। অনেকেই হয়তো এই চিত্র দর্শনে উঃ আঃ করবেন। মনে মনে ভাববেন অথবা চিৎকার করে গলা ফাটাবেন, ছেলেদের চাকরির সুযোগ নষ্ট হচ্ছে। এই মনোভাবের কারণ সম্ভব শুধু সমানাধিকারের সুপ্রয়োগে। সমানাধিকার চলছে কিন্তু সে সম্বন্ধে আমাদের সচেতনতা তেমন বাড়ছে না। তাই মেয়েদের চাকরিবাকরিতে অগ্রগতির সংবাদে অনেকের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। কেউ কেউ এটাকে সুনজরে দেখতেও রাজি নন। তাঁদের বক্তব্য, মেয়েরা গৃহকোণেই থাকুক। ছেলেমেয়ে সামলান, হেঁসেল ঠেলুন। [illegible] আঁতুড়ঘর ঘুরে আসুন। আর সমাজ-সংসার এবং জীবন-জীবিকার দায়িত্বটা বরাবরের মতো বহন করবে বৃষস্কন্ধ পুরুষেরা।

কিন্তু আর তা হবার নয়। সমাজের তৈলচিত্রে নতুন প্রলেপ পড়েছে। এ অবস্থায় সবাইকে সবাইর সংস্থান করে নিতে হবে। অপরের ভরসায় হাত পা গুটিয়ে বসে থাকলে কোন কাজ হবে না। তাতে বরং পস্তাতেই হবে। তাই আজ দ্রুত সবকিছু বদলে যাচ্ছে। অর্থনৈতিক দিক থেকে মেয়েরা ক্রমেই সচেতন হচ্ছে। জীবন এবং জীবিকার লড়াইয়ে তাদের ন্যায্য পাওনাটা বুঝে নিতে তারা তৎপর। এক্ষেত্রে এখনো যেটুকু অস্পষ্টতা রয়েছে সেটুকুও কেটে যাবে। এবং সময়ের ধারানুসারে আমাদের আশা, সফলের চিত্র আরও সমুজ্জ্বল হবে আরো অনেক মেয়ের কলহাস্যে।

জীবনধারণের জন্য প্রাণপাত সংগ্রাম চলছে। আর সে চিত্র পরিষ্কার করার জন্য চাকরি-বাকরির বাইরে দৃষ্টিপাত করতে হবে। তাহলেই সংস্কারের ভূতটা অনেকখানি হাল্কা হবে।

প্রতিদিন ফুটপাথে চলার অভিজ্ঞতা আমাদের সকলের। সেদিনও ফুটপাথে যেমন ভিড় আজও তেমনি। অবস্থার পরিবর্তন এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির - সঙ্গে সঙ্গে ভিড়টা একটু বেড়েছে এই যা। হয়তো আরো বাড়বে। ফুটপাথে সেদিনও দোকান পসারের ভিড় ছিল। হকাররা ফুটপাথের সর্বত্র ছড়িয়ে থাকতেন। নানা পসরা শোভা পেতো। আজও সে ছবি অক্ষুণ্ণ আছে। ঘটেছে কিছু নতুন সংযোজন।

ফুটপাথে পসরা সাজিয়ে বসতে সেদিন মেয়েদের দেখা যায় নি। এখন কিন্তু এমন চিত্র আর দুর্লভ নয়। বিশেষ, অফিসপাড়ার ফুটপাথে। চুপচাপ ফুটপাথ ধরে হাঁটতে থাকলে নজর পড়বে একাধিক মহিলাকে। জীবন এবং জীবিকার সংগ্রামে যাঁরা রাজপথ বেছে নিয়েছেন। এঁদের অধিকাংশই হলো লটারির টিকিট বিক্রেতা। রাস্তার মোড়ে মোড়ে বসে লটারির টিকিট বিক্রি করছে। কোন সংকোচ বা জড়তা নেই। দিব্যি খদ্দেরের সঙ্গে কথাবার্তা বলছে। নিয়মকানুন বুঝিয়ে দিচ্ছে। তারপর চার্ট বের করে দেখিয়ে দিচ্ছে, এখান থেকে টিকিট কিনে ক'জনের ভাগ্য নতুন পথে মোড় নিয়েছে। এরকম অসংখ্য লটারির টিকিট বিক্রেতা মহিলার সন্ধান পাওয়া যাবে ফুটপাথে। শুধুমাত্র চাকরির পথ চেয়ে তারা থাকে নি। নিজেদের পথ নিজেরাই করে নিতে চেয়েছে এবং সফলও হয়েছে।

আবার কেউ কেউ অন্যভাবেও নিজের ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখছে। তারা ফুটপাথের ভিড়ে নিজেদের হারিয়ে ফেলতে চায় নি। একই জীবিকার ভিন্নতর পথ অবলম্বন করেছে। তারা অফিসে অফিসে ঘুরে বিক্রি করছে লটারির টিকিট। হয়তো আপনি চেয়ারে বসে আছেন, এমন সময় একটি মেয়ে আপনার সামনাসামনি দাঁড়িয়ে অনুরোধ করবে একটি লটারির টিকিট কিনতে। আপনি কিনতে রাজি না হলেও সে প্রায় নাছোড়বান্দা। নানাভাবে বুঝিয়ে টিকিট ঠিক বিক্রি করবে। সেলস গার্লের সব কায়দাই তার জানা। তাই টিকিট বিক্রি করতে তার বিশেষ অসুবিধা হবার কথা নয়। হয়ও না।

এসব মেয়েদের অনেকেই লেখাপড়া জানা। এক এবং একাধিক পরীক্ষার চৌকাঠ অনেকে ডিঙিয়েছে। চাকরির আশায় থেকে থেকে হন্যে হয়ে গিয়েছে। তারপর নিজের পথ নিজেই করে নিতে এগিয়ে এসেছে।

অফিসপাড়ায় এমন কিছু মেয়ে আবার দেখা যায়, যারা খাবার বিক্রি করে। এদের সংখ্যা এখনো তেমন বাড়ে নি। তবু যে ক'জন আছে তারা বেশ জাঁকিয়েই ব্যবসা করে। অনেক খদ্দের তাদের নিয়মিত। টিফিন আওয়ার্সে খদ্দের সামলাতে তারা হিমসিম খায়। এরা আসে কলকাতার ধারকাছ থেকেই। এদের মধ্যে দু-একজন বিবাহিতও। তাদের স্বামীরা হয়তো কাজ করেন কল-কারখানায়। আর সেই সুযোগে ফুটপাথে ব্যবসা করে স্বামীর আয়ে কিছু জোগান দিয়ে সংসার স্বচ্ছল করছে। না হলে সব অচল।

শুধু ফুটপাথে বসেই এরা ব্যবসা করছে না। কেউ কেউ অফিসে ঘুরে খাবার বিক্রি করে। তবে যারা ফুটপাথে বসে তারা সেখান থেকে কেউ নড়ে না। যারা ফুটপাথের ভিড়ে নিজেদের হারিয়ে ফেলতে রাজি হয় নি অথবা জায়গার অভাবে সুবিধা করতে পারে নি তারা যায় অফিসে অফিসে, টেবিলে টেবিলে। অনেকেই ইদানিং এই খাবার পছন্দ করছেন। ঘরে তৈরি খাবার দিয়ে খিদে মেটাতে সবাই চান। তাই এসব মহিলার পরিবেশিত খাবারকে সবাই স্বাগত জানিয়েছেন।

লটারির টিকিট আর খাবার শুধু নয়। কেউ কেউ আবার অন্যভাবেও ফুটপাথে লাক ট্রাই করছেন। রীতিমতো রেডিমেড জামা-কাপড়ের দোকান। এ রকম দৃশ্যও এখন চোখে পড়ে। অথচ এভাবে জীবন এবং জীবিকার লড়াই চালাতে হবে মেয়েদের সে-কথা কারো জানা ছিল না। সমানাধিকার হওয়ার পরেও। কিন্তু নিরুপায় হয়েই নতুন উপায়ের ভাবনা ভাবতে হয়েছে বারে বারে। আর তারপরই অবশ্যম্ভাবী নতুন পথের নির্দেশ। এবারও ঠিক তাই হয়েছে। চাকরি-বাকরির দরজা যখন একে একে দুরতিক্রম্য হয়ে উঠছে এখন মেয়েরা ভাবছে নতুন পথের কথা। এবং ভেবে ভেবে অফিসের আরামের আকাঙ্ক্ষা ছেড়ে সরাসরি নেমে এসেছে ফুটপাথে। এক নিমেষে সব সংকোচ সব দ্বিধা দূরে ঠেলে ফেলে দিয়ে।

তাই মেয়েদের কর্মসংস্থানের অগ্রগতিতে এদের অর্জিত স্থান নির্দিষ্ট হয়ে রইলো। সে স্থান থেকে এদের কেউ সরাতে পারবে না। ভবিষ্যতে এখান থেকেই আসবে মেয়েদের নতুন পথনির্দেশ। আর সে নির্দেশই হবে আমাদের শিরোধার্য। সংকোচ এবং সংশয়ের দ্বিধা এরাই কাটিয়েছে। এরা তাই আমাদের নতুন পথের দিশারী। পথিকৃৎ।

—প্রমীলা

প্রেক্ষাগৃহ

চিত্র-সমালোচনা

কল্পনা দিয়ে গড়া জীবনী আলেখ্য

স্ব-রচিত রামায়ণের সঙ্গে কবি কৃত্তিবাস যে সংক্ষিপ্ত আত্মপরিচয় দিয়েছেন, তা থেকে জানা যায়, নদীয়া জেলার ফুলিয়া গ্রামে মুখোপাধ্যায় বংশে ১৪০২ খৃষ্টাব্দে মাঘ মাসের শ্রীপঞ্চমীর দিনে রবিবারে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম ছিল বনমালী ওঝা, মাতা মালিনী দেবী। পিতামহ মুরারি ওঝা সুপণ্ডিত ছিলেন। আরও জানা যায়, বিদ্যাশিক্ষার জন্য বড়গঙ্গা পার হয়ে গুরুগৃহে গমন করেন এবং শিক্ষান্তে যথেষ্ট পাণ্ডিত্য লাভ করে তিনি গৃহে ফিরে আসেন। পরে কোনো এক গৌড়েশ্বরকে আটটি স্বরচিত শ্লোক উপহার দিয়ে তাঁর সভাকবির সম্মান লাভ করেন ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই সংক্ষিপ্ত আত্মচরিতের ওপর নির্ভর করে কোনো পূর্ণাঙ্গ জীবনীচিত্র নির্মাণ করা সম্ভব নয়। এবং এটা জানা আছে বলেই রামায়ণ চিত্রম-এর নিবেদন 'মহাকবি কৃত্তিবাস'-এর কাহিনী-সংকলয়িতা মন্টুকুমার মিত্র তথ্যের চেয়ে ঢের বেশী নির্ভর করেছেন কল্পনাশক্তির ওপর। তাই তিনি ধরে নিয়েছেন, রামসীতার বিচ্ছেদের কথা রচনার জন্যে কবির নিজের জীবনে বিরহের প্রয়োজন আছে এবং সেই বিরহ আনয়নের জন্য তাঁর আদরিণী স্ত্রী স্বেচ্ছায় নির্বাসন বরণ করেছিলেন। স্ত্রী-বিরহকাতর কৃত্তিবাস কিন্তু এর ফলে এমনই অস্থির হয়ে উঠেছিলেন যে, তিনি মনকে সংহত করে লেখনী ধারণ করতে পারছিলেন না কোনো-মতেই। এমন সময়ে তাঁর জীবনে দেখা দেয় দুঃখের সমুদ্রে অবগাহন-করা এক সদানন্দ পুরুষ, যে কবিকে সাহচর্য দিয়ে তাঁকে ঠিক পথে চালিত করে। ইতিহাস বলে, কবির আশ্রয়দাতা গৌড়েশ্বর হচ্ছেন আসলে তাহেরপুরের কংসনারায়ণ। কিন্তু ছবির কাহিনীকার তাঁকে করেছেন রাজা গণেশ। অবশ্য এক্ষেত্রে বলাই ভাল যেখানে কল্পনা-নির্ভর, সেখানে কিছুতেই কিছু যায় আসে না। বাঙালীর যেখানে কোনো তথ্যনির্ভর সামাজিক ইতিহাস নেই, সেখানে 'মহাকবি কৃত্তিবাস'-ছবিটিকে আমরা একটি সম্পূর্ণ কল্পনানির্ভর পৌরাণিক চিত্ররূপে দেখেই খুশী থাকতে বাধ্য। কবির জীবনে বিরহ আনার জন্যে কবিপত্নীর আত্মনির্বাসন এবং কালীমন্দিরের সেবিকার কাছে গোপনে অবস্থানের সময়ে সেখানে কবির আকস্মিক আগমনে তাঁর উন্মাদনা প্রভৃতি পরিস্থিতি রচনার মধ্যে কিছুটা নাটকীয়তা আনবার চেষ্টা নিশ্চয়ই প্রশংসনীয়। তবে ছবিটিও কিন্তু বড্ডোই মোটের উপর দৈববাণীর প্রতি নির্ভরশীল হয়ে এবং সেই কারণে এটি কাহিনীই হয়েছে, নাটক হয়নি।

কব কিউ আউর কাঁহা/ববিতা

ছবিটিতে কোনো শিল্পীরই চূড়ান্ত রকম নাট্যনৈপুণ্য প্রকাশের বিশেষ সুযোগ না থাকলেও কবিপত্নীর ভূমিকায় মিলি চক্রবর্তী প্রাপ্ত সুযোগের যথেষ্ট সদ্ব্যবহার করেছেন। কোনো কোনো দৃশ্যে তাঁর মরমী অভিনয় চিত্তস্পর্শী। নামভূমিকায় অসীমকুমার কবির রূপটিকে দর্শকসমক্ষে তুলে ধরেছেন অত্যন্ত সংযমের সঙ্গে। সদানন্দের ভূমিকায় সুখেন মুখোপাধ্যায় যথেষ্ট প্রাণসঞ্চারের চেষ্টা করেছেন। এছাড়া দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায় (শিক্ষাগুরু), স্বরূপ-কুমার (বনমালী ওঝা), পদ্মপতি বসু (গোবিন্দ), কুমারী চিত্রাণী মুখোপাধ্যায় (বালিকা বয়সে কবি-স্ত্রী), সীতা প্রধান (কালীমন্দিরের সেবিকা), নবীন বন্দ্যো-পাধ্যায় (রাজা গণেশ), ভোলা পাল, শম্পা দেবী প্রভৃতি স্ব-স্ব ভূমিকায় উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ মধ্যমানের। পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাংলায় সাধারণ নরনারী ও রাজারাজড়ারা কি ধরনের পোশাকপরিচ্ছদ পরতেন বা তখন রাজপ্রাসাদ, সাধারণ গৃহস্থের বাসগৃহ প্রভৃতি কেমন ছিল, তা জানবার বোধ করি কোনোই উপায় নেই। তাই ছবিটিতে এমন পোশাক ও স্থাপত্যের নিদর্শন রয়েছে, যা সচরাচর আমরা বাংলা পৌরাণিক ছবিতেই দেখতে অভ্যস্ত। ছবিটির শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ হচ্ছে এর গানগুলি। কিরণবালা ঘোষ-দস্তিদারের লেখা বিশেষ ভাবসম্পন্ন সুরারোপিত গানগুলি মান্না দে, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, অনুপ ঘোষাল, শ্যামল মিত্র, আরতি মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির কণ্ঠনিঃসৃত হয়ে অত্যন্ত চিত্তহারী ও শ্রুতিসুখকর হয়েছে।

এখানে শিপ্রা/অপর্ণা সেন এবং দীপঙ্কর দে। ফটো : অমৃত

রামায়ণ চিত্রম-এর নিবেদন মহাকবি কৃত্তিবাস সঙ্গীতসমৃদ্ধ ও তারকাসমন্বিত হওয়ায় জনচিত্তগ্রাহী হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

মর্মস্পর্শী দুঃখ-কষ্ট-ভরা পাঞ্জাবী ছবি

জয়ন্তী উত্তরণ হবার পথে হচ্ছে মনোগান। এস. বীরেন্দ্র-এর নিবেদন পান্না-লাল মহেশ্বরী প্রযোজিত এবং রাম মহেশ্বরী রচিত ও পরিচালিত কল্পনালোক-এর পাঞ্জাবী ছবি নানক নাম জাহাজ হায় বলার প্রয়োজনে নামই হচ্ছে সংসার-সমুদ্র পার হওয়ার একমাত্র জাহাজ। ছবিটি গোড়া থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত প্রায় প্রতিটি দৃশ্যে এই মহাবাণী শোনা যায় বটে, কিন্তু শুনে আশ্চর্য হবেন, ছবিটি আদৌ প্রচলিত অর্থে ধর্মমূলক ছবি নয়। সোজাসুজিভাবে ছবিটিকে বলা যেতে পারে দুই বন্ধুর কাহিনী। বন্ধু হলে কি হবে, বয়েসে বড় গুরুমুখ সিং ছোট প্রেম সিংকে নিজের ছোট ভাইয়ের মতো দেখে। নিজের স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করে গুরুমুখ প্রেমের বিবাহ দিল এক ধনীর বিলাসিনী কন্যার সঙ্গে এবং বিবাহের এক বিশেষ শর্ত অনুযায়ী ঐ ধনীকন্যার ভাই দুর্লভও এক বোনের সঙ্গে ওদের বাড়ীতে বাস করত। দুর্লভ ছিল দুষ্ট প্রকৃতির। সে যখন দেখল, গুরুমুখের বাচ্চা ছেলে গুরবিন্দরকে ওর বোন অন্তরের সঙ্গে স্নেহ করতে শুরু করেছে, অথচ ওর নিজের কোনো ছেলেপুলে হচ্ছে না, তখন সে বোনকে আড়ালে ডেকে বললে, তোমার স্বামীর বিষয়সম্পত্তি সবই তো ওদের হয়ে যাবে; তোমার নিজের ছেলে হল না, গুরবিন্দরকে নিয়ে তোমার আখের মিটবে? প্রথমটা দুর্লভের কথায় কর্ণপাত না করলেও ক্রমেই প্রেমের স্ত্রীর মনে বিষক্রিয়া চলতে লাগল। এমনকি নিজের মালীর মেয়ে চাঁদের সঙ্গে গুরবিন্দরের বিবাহের যে-প্রস্তাব সে নিজেই করেছিল তাও সে বানচাল করে দিতে চাইল এবং রাগের বশবর্তী হয়ে সে গুরবিন্দরের হাত থেকে সরবতের গেলাসটা কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল। তার এই কাজের ফলে গুরবিন্দর তার চোখে আঘাত পেল এবং অন্ধ হয়ে গেল। এই ঘটনায় স্ত্রীর উপর রেগে গিয়ে প্রেম তাকে হত্যা করতে উদ্যত হলে গুরুমুখ তাকে এই বলে নিরস্ত করল যে, সবই ভগবানের পরীক্ষা। এর ওপর গুরবিন্দর যখন বললে, কাকী যাই করে থাকুন না কেন, তিনি মার মা, তখন প্রেমের স্ত্রী অবাক হয়ে গেল। তার জীবনে এল পরিবর্তন। সে বললে, বিধাতার কাছে প্রার্থনা করে সে গুরবিন্দরের অন্ধত্ব ঘোচাবে। চাঁদ কাকীর অনুমতি নিয়ে রোজের যোগে ওদের সঙ্গ নিল। হঠাৎ একদিন যখন গুরবিন্দর বুঝতে পারল যে, যে-মেয়েটি সারা পথ ওর সেবা করে এসেছে, সে হচ্ছে চাঁদ, তখন কাকী গুরবিন্দরকে রাজী করালেন চাঁদকে বিবাহ করতে। কিন্তু ফুলশয্যার রাতে চাঁদ গুরবিন্দরকে জানাল, সে ব্রত গ্রহণ করেছে, যতদিন না গুরবিন্দর তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে পায়, ততদিন সে কৃচ্ছসাধন করবে এবং যদি গুরবিন্দর তার চোখ ফিরে না পায়, তাহলে সে নিজে অন্ধত্ব বরণ করবে। শেষ পর্যন্ত ভগবানের দয়ায় অবশ্য গুরবিন্দর তার চোখ ফিরে পায় এবং অপরদিকে দুষ্ট দুর্লভের চোখ নষ্ট হয়ে যায়।

—এই পারিবারিক কাহিনীটির আনন্দ-বেদনাকে একটি সুগঠিত চিত্রনাট্যের মাধ্যমে এমন অপরূপভাবে চিত্রিত করা হয়েছে যে পাঞ্জাবী ভাষার অ-আ-ক-খ না জানা সত্ত্বেও ছবিটিকে বুঝতে এবং উপভোগ করতে আমাদের খুব একটা অসুবিধে হয়নি।

ছবিটির আরম্ভ করা হয়েছে, সারা ভারতে অনুষ্ঠিত নানক জন্ম পঞ্চশত বার্ষিকী উৎসবগুলিকে চিত্রিত করে। এই উৎসবে যোগ দিতে দেখা গেল আমাদের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী থেকে শুরু করে সীমান্ত গান্ধী খান আবদুল গফ্ফর খাঁ পর্যন্ত। এরই ভিতর থেকে প্রথম দেখা পাওয়া গেল ধর্মপরায়ণ গুরুমুখ সিংয়ের এবং সঙ্গে সঙ্গে ছবির কাহিনীরও হল আরম্ভ। শেষের দিকে যখন গুরবিন্দরের কাকী তার অন্ধত্ব সারাবার জন্যে তাকে নিয়ে সকল শিখতীর্থ ঘুরে বেড়াচ্ছে, তখন ভারতীয় গুরুদ্বারগুলি দেখে দর্শকসাধারণ —বিশেষ করে শিখধর্মীরা—অত্যন্ত পুলকিত হন।

ছবিটিতে প্রতিটি শিল্পী অভিনয় ব্যাপারে যে আন্তরিকতা প্রদর্শন করেছেন, তা রীতিমত বিস্ময়কর। পাঞ্জাবী চলচ্চিত্রশিল্পীদের কি অপরিসীম নিষ্ঠা তার অকাট্য প্রমাণ এই ছবিটি। ছবির প্রধান আকর্ষণ হচ্ছে সর্দার গুরুমুখ সিংয়ের ভূমিকায় ষাটোর্ধ পৃথ্বীরাজ কাপুরের প্রাণ-ঢালা অভিনয়। গুরুমুখ ধর্মপ্রাণ, কিন্তু সংসারের টান থেকে সম্পূর্ণরূপে সে বিমুখ নয়। প্রেম সিংয়ের নবপরিণীতা স্ত্রীর আগমনে যুবক-যুবতীরা যখন নেচে-গেয়ে আনন্দে মাতিয়েছে, তখন প্রৌঢ় গুরু-মুখও যেন তার বিগতপ্রায় যৌবনকে ফিরে পেয়েছে; সে তার স্ত্রীকে ডেকে গান করতে বলল। বুড়ো হয়ে মরতে চললাম, সখ যায়নি এখনও, বলে স্ত্রী দূরে সরে গেল। কিন্তু গুরুমুখের আনন্দ হয় [illegible] সংক্রামিত হতে দেরী লাগল না, ওরা দুজনেই নেচে-গেয়ে উৎসবের আনন্দকে উচ্ছল করে তুলল। এবং আমরা অবাক হয়ে এক নতুন পৃথ্বীরাজকে দেখি। এই ভূমিকাটি পৃথ্বীরাজের সুদীর্ঘ অভিনয়জীবনের একটি স্মরণীয় হয়ে রইল। আমরা বুঝি না, এই ভূমিকা চিত্রিত করেও তিনি এবারের উর্বশী পুরস্কার পেলেন না কেন? গুরুমুখের স্ত্রীর ভূমিকায় নিরূপা রায়ও অসামান্য দক্ষতা প্রদর্শন করেছেন। চাঁদরূপিণী [illegible] প্রেমের স্ত্রীর ভূমিকায় [illegible] পরিবর্তনশীল রূপকে সার্থকভাবে রূপায়িত করেছেন। প্রেম সিং ও গুরবিন্দর রূপে যথাক্রমে [illegible] চরিত্রোচিত অভিনয় করেছেন। দুষ্ট প্রকৃতির ভূমিকায় [illegible] একেবারে অনবদ্য, তাঁর অভিনয় দেখবার পরই মনে রাখবার মতো। অন্যান্য ভূমিকায় [illegible] প্রভৃতির অভিনয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগ সম্বন্ধে এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, কি বহিঃদৃশ্য কি অন্তর্দৃশ্য—ছবির প্রতিটি দৃশ্যকেই চমৎকারভাবে বাস্তব করে তোলা হয়েছে; চিত্রনাট্য ও চিত্রগ্রহণে কোন খুঁত নেই কোনোখানে। ছবির অন্যতম আকর্ষণ হচ্ছে—এর গানগুলি। গুরু নানক রচিত গানগুলিতে অনবদ্য সুরারোপ করেছেন এস. মহিন্দর। সুরকার হিসেবে তিনি যে অত্যন্ত সাফল্যমণ্ডিত হয়েছেন, তার প্রমাণ, তিনি এবারে শ্রেষ্ঠ সুরকার রূপে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার দ্বারা সম্মানিত হয়েছেন।

গুরু নানক প্রবর্তিত সর্ব ধর্মের সঙ্গে প্রচারকদের সম্পর্ক কোথায় চিত্রিত করা যায়, তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ কল্পনালোকের নানক নাম জাহাজ হ্যায় ছবি।

বিপ্লবী ডিরেক্টরের পালায় কম্যান্ড হো চি মিনের রূপসজ্জায় প্রসেন্দুশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়

অথবা বাঁচবো কি করে? অস্ত্রেক্তকরা দেহের ভিতরে আছে আনন্দের বড় সত্তা; তারও ভোজন প্রয়োজন।' স্মৃতিচারণ করে তিনি বলেন, '১৯১৬।১৭ সালে প্রথম কলকাতায় এসে দেখি 'শান্তি কি শান্তি'তে দানীবাবুর অভিনয়। ঐ অভিনয় আমার জীবনকে নানা-ভাবে প্রভাবিত করেছে।' প্রধান অতিথি রূপে ভাষণ দেন বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়।

সভানুষ্ঠানের পর শিল্পী-মহাবদর-এর প্রযোজনায় নিবেদিত হয় কবিগুরু রবীন্দ্র-নাথ রচিত 'বিনি পয়সার ভোজ' এবং শ্রীমঞ্চ নাট্যসংস্থা পরিবেশন করেন নটগুরু গিরিশচন্দ্র বিরচিত প্রহসন 'ম্যায়সা-কা ত্যায়সা'।

রঙ্গনা মঞ্চে নিয়মিতভাবে অভিনয় করছেন নান্দীকর সম্প্রদায় ৭ অক্টোবর, দুর্গাপূজার দিন থেকে।

মূকাভিনয় : গত ৫ অক্টোবর আকাদেমী অব ফাইন আর্টস মঞ্চে মূকাভিনেতা হিসেবে একক মূকাভিনয় পরিবেশন করলেন। এ দিনের ফিচারগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভিসকাউন্ট অব ইণ্ডিয়া অক্টোবর বিপ্লব, বোনাস ও পুরাতন ভৃত্য হাসা-রসাশ্রিত ফিচার হিসেবে তিনি দেখালেন 'একটি অ্যারিস্টোক্রেট মহিলার চরিত্র' ও 'ডেলী প্যাসেঞ্জারের জীবনী'।

শিল্পীর অভিব্যক্তির প্রকাশ, অঙ্গ সঞ্চালন ও মুদ্রার সুষ্ঠু প্রয়োগে চরিত্র-গুলিকে মূর্ত করে তুলতে পেরেছে। আবহ-সঙ্গীতে নির্দেশনায় ছিলেন—টি বন্দ্যোপাধ্যায়, আলো—কাশীনাথ পাল ও রূপ নির্দেশনা—নির্মল গুহরায়।

ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দিরে : বাটানগর গত ৪ অক্টোবর সন্ধ্যায় বাটানগর রিক্রিয়েশন ক্লাব হলে ক্লাবের সাফল্যে নৃত্যবিদ নীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের নির্দেশনায় ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দিরের বিভিন্ন শাখার ছাত্রীদের দ্বারা উচ্চাঙ্গ ও লোকনৃত্য অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন শ্রীবসন্তকুমার সেন। অনুষ্ঠানে ভারতনাট্যম, কথাকলি, মণিপুরী (চোল), রাজস্থানি, সাঁওতালি, গুজরাটি, নাগা, তারকাসুর বধ (কথাকলি) বাংলার ধান উৎসব নৃত্যে কৃষ্ণ রায়, চিত্রা চ্যাটার্জি, রিংকু ভাদুড়ী, অপর্ণা দে, বনিতা ঘোষ, বৃন্দ সেন, কৃষ্ণা ঘোষ, বিদুষী বাসু, মায়া ভট্টাচার্য, তন্দ্রা রায়, শুভ্রা ধর, অর্দ্ধেন্দু সেন, শিপ্রা সেন, মিত্রা পাল, বনানী চৌধুরী, শিপ্রা দত্ত, শান্তি চৌধুরী বিভিন্ন নৃত্যে দর্শকদের প্রশংসা অর্জন করে। লোকসঙ্গীতে নির্দেশনায় ছিলেন শ্রীমতী স্বপ্না সেনগুপ্ত ও অরবিন্দ মিত্র।

ছদ্মবেশধারার ভক্ত পরিবেশন করছেন হরবোলা শ্রীঅজয় গঙ্গোপাধ্যায়।

মূকাভিনয় : পদাবলী নিবেদিত রবীন্দ্র সদনে বেঙ্গল দলের মূকাভিনয় আগামী ২৫ অক্টোবর রবিবার সন্ধ্যায়। আবহ সঙ্গীত : হিমাংশু বিশ্বাস, মঞ্চ ও আলো : সুরেশ দত্ত ও তাপস সেন, রূপসজ্জা : অনন্ত দাস, পোশাক : খালেদ চৌধুরী। এই অনুষ্ঠানে শ্রীদত্ত নতুন কয়েকটি মূকাভিনয় পরিবেশন করবেন।

সম্প্রতি শ্রীমতী অমলা শঙ্করের জন্ম-দিবস পালন করা হয়। জন্ম দিনের কেক

ষ্টার

[শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত নাট্যশালা]

৫০০তম অভিনয় অতিক্রান্ত

অগ্নিশিখা

অভিনব নাটকের অপূর্ব রূপায়ণ
প্রতি বৃহস্পতি ও শনিবার : ৬॥টায়
প্রতি রবিবার ও ছুটির দিন : ৩টা ও ৬॥টায়
॥ রচনা ও পরিচালনা ॥
দেবনারায়ণ গুপ্ত

॥ রূপায়ণে ॥
অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, অপর্ণা দেবী, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, নীলিমা দাস, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, সতীন্দ্র ভট্টাচার্য, দীপিকা দাস, শ্যাম লাহা, প্রেমাংশু বসু, বাসন্তী চট্টোপাধ্যায়, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, গীতা দে ও

শান্তির জন্য এক কৌতুকপ্রদ অবদান

৭০ বছর বয়স্ক জার্মান লেখক এরিখ কাসনার, ছোট ও বড়দের জন্য লেখা যাঁর বই বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে, তিনি সবসময়ই যে কোন ধরনের যুদ্ধের ঘোর বিরোধী। ২০ বছর আগে পৃথিবী যখন অতীতের চেয়ে আরও ভীষণ এক যুদ্ধে লিপ্ত, তখন 'পশুদের সম্মেলন' নামে তিনি একটি গল্প লেখেন। লেখকের সঙ্গে সহযোগিতায় বর্তমানে এই গল্পটি নিয়ে পূর্ণ দৈর্ঘ্যের জার্মান ট্রিক ছবি করলেন পশ্চিম জার্মানীর ট্রিক ফিল্মমেকার কার্ট ল্যানতা। কার্ট ১৯৬৭ সালে ফেডারেল ফিল্ম অ্যাওয়ার্ড পেয়েছিলেন। গল্পটির মর্মকথা হল : পশুরা বিশ্ব সম্মেলনে বসে ঠিক করল যে, শান্তির জন্য মানুষদের বাধ্য করতে তারা মানুষদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের বন্দী করে রাখবে যতক্ষণ না বড়রা শান্তি স্থাপনে সম্মত হয়। কার্ট এই গল্পটিকে এক সংগীতবহুল হাসির নাটকরূপে উপস্থাপিত করেছেন। কাসনারের প্রগাঢ় রসবোধের সঙ্গে ছবিটি ছোট বড় সকলকে আনন্দ দেবে নিঃসন্দেহে। সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর পরিবারে যুদ্ধের কারণ ও কী করে তার প্রতিকার করা যায়, সে সম্পর্কে ছবিটি সম্ভবত আলোচনার সূত্রপাত করবে।

জলসা

সুরদাস সঙ্গীত সম্মেলন : এবার সুরদাস সঙ্গীত সম্মেলনের ষষ্ঠ বার্ষিকী সংগীতাসর পরিবেশিত হয়েছিলো আকাদেমি অফ ফাইন আর্টস প্রেক্ষাগৃহে। উদ্বোধক পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রধান উপদেষ্টা শ্রী বি বি ঘোষ। তাঁর হাতে সংস্থার পক্ষ থেকে সম্পাদক শ্রীস্বদেশ সান্যাল ২৫১, টাকা বন্যাত্রাণ তহবিলে অর্পণ করেন। সঙ্গীতানুষ্ঠান শুরু হয় শ্রীমানিক দাসের তবলা লহরা দিয়ে। ত্রিতালের ওপর গৎ ছাড়াও কায়দা, পরণ ও ঠেকার ওপর ইনি প্রশংসাযোগ্য দখল প্রদর্শন করেন। তারপরই ছিল শ্রীমতী টি এ রাজলক্ষ্মীর শিষ্যা নীরজা পালের ভারতনাট্যম নৃত্য। শিল্পীপ্রদর্শিত আলারিপ্পু, জতিস্বরম, শব্দম, তিল্লানায় লয় ও সুষমামণ্ডিত পদক্ষেপ ও নৃত্যভঙ্গিমায় শিক্ষার ছাপ ছিল কিন্তু অভিনয় অঙ্গ আরো পরিশীলিত হওয়া প্রয়োজন। শ্রীমতী সীতা রামচন্দ্রনের সুরেলা কণ্ঠসঙ্গতে এই অনুষ্ঠান বিশেষ উপভোগ্যতা এনেছে। যন্ত্রসংগীতের অনুষ্ঠানে স্মরণযোগ্য শিল্পী ছিলেন নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাহাদুর খাঁ। বাহাদুর খাঁর 'হেমাবতী'-তে অভিজাত বন্দেজ, পাণ্ডিত্য লয় ও সুরের কারুকার্য ছাড়াও যে বস্তু রসিকচিত্ত জয় করে নিয়েছে সে হলো তাঁর কল্পনার বিস্তার। নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিল্পীজনোচিত ধ্যানগাম্ভীর্যে পরিবেশিত ললিত ও ভৈরবী সুর ও ছন্দের এমন এক মায়াময় ধ্বনিলোক সৃষ্টি করেছে যার অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণে প্রতিটি শ্রোতা মন্ত্রমুগ্ধবৎ— অপনাপন আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। আব্দুল হালিম জাফরের 'চম্পাকলি'-তে সংতানের বাহার আনন্দদায়ক। তরুণ শিল্পী সুব্রত রায়চৌধুরীর 'বাগেশ্রী' প্রশংসনীয় একাধিক কারণে। প্রথমতঃ শিল্পীর নিষ্ঠা, দ্বিতীয়তঃ পূর্বসূরীদের বাদনশৈলীর প্রতি শ্রদ্ধাবনত স্বীকৃতি, তাঁদের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হবার মহৎ গৌরব—সর্বোপরি আত্মবিশ্বাস। আমজেদ আলি খাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রহমৎ খাঁর সরোদে 'আল্লা মরি' করবার মত কোন উপাদানই ছিলো নাঁ কন্ঠও দুর্বল। তবে উপযুক্ত রেওয়াজে অবিচলিত থাকলে শিল্পী হয়ে ওঠা এঁ'র পক্ষে অসম্ভব নয়। কণ্ঠসঙ্গীতে ওস্তাদ নিসার হোসেন খাঁর খেয়াল ও তারানায় ওস্তাদের বয়সের বাধা অতিক্রম করেও রামপুর ঘরানার অভিজাত ঐতিহ্যের নিশ্চিত স্বাক্ষর-চিহ্ন রসজ্ঞ শ্রোতার শ্রদ্ধা ও সম্মান আদায় করে নিয়েছে।

একই কথা প্রযোজ্য বেনারসের সুপ্রসিদ্ধা গায়িকা সিদ্ধেশ্বরী দেবী সম্বন্ধে। ঠুংরী নিছক চিত্ত-বিনোদনী লঘু-সঙ্গীতের প্রকারই নয়। এ সঙ্গীতের ব্যাপ্ত, বিস্তার চপলবৈচিত্র্যেও যে নিজস্ব একটা মেজাজ আছে—এ সম্বন্ধে অবহিত হবার জন্য সঙ্গীতাসরে সিদ্ধেশ্বরী দেবীর মত শিল্পীর উপস্থাপনার প্রয়োজন।

কণ্ঠসঙ্গীতে স্থানীয় শিল্পীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান ছিল সুরেশ চক্রবর্তীর পুত্র বিজয় চক্রবর্তীর। শাম কেদের বিস্তার, তান ও সুরস্থিতিতে নানান ঘরানার প্রভাব হঠাৎ অশোর ঝলকানির মত চমকপ্রদ ও ভাবসমৃদ্ধ করেছে। ওপরের পর্দায় কণ্ঠ-সঞ্চালন মাঝে মাঝে শিল্পীর পক্ষে আয়াসসাধ্য মনে হয়েছে। লয়টি সুন্দর। আরতি বাগচীর 'দক্ষরা' সংগীতে যে লয়ে সাধারণতঃ গান ছেড়ে দেওয়া হয় সেই লয়ে তাঁর দীর্ঘস্থিতি তখনই প্রশংসনীয় কিন্তু লয়ের আন্দাজে সুর বড় কম বলেই বোধহয় ভারসাম্যতা রক্ষিত হয়নি। শিপ্রা বসু সতেজ কণ্ঠ, তানসৌকর্য ও স্বতস্ফূর্ত আনন্দ শ্রোতাদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা আদায় করে নিয়েছে।

অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায়, আনিস আহমেদ

হোসেন এবং বেরাম খাঁ ও কানাই দত্ত প্রমুখ সঙ্গীতিরবৃন্দ।

দক্ষিণায়নের বিচিত্রানুষ্ঠান : আগামী ২২ অক্টোবর দক্ষিণায়ন সংস্থা কলামন্দিরে একটি চিত্তাকর্ষক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন। যোগদানকারী শিল্পীরা হলেন সর্বশ্রী মমতা দে, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, উৎপল কুমার, অরতি মুখোপাধ্যায়, শৈলেন মুখোপাধ্যায় অধ্যাপক দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, রবি ঘোষ ও যন্ত্রসঙ্গীতে থাকেন মুন্সী।

মণিপুরী নৃত্যে অনন্য প্রতিভা

দেববানী চালিহা : পুজোর ঠিক আগেই কলামন্দিরে কে কে আচার্য নিবেদিত শ্রীমতী দেববানী চালিহার মণিপুরী নৃত্য প্রতিভাময়ী শিল্পীর নিষ্ঠাভরা শিক্ষা ও সাধনা ছাড়াও নিজস্ব ভাব ও ধ্যানের এক অপূর্ব কল্পনালোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিলো।

ভারতীয় নৃত্যগীতের প্রেরণার উৎস যোগ অধ্যাত্মচেতনা। মণিপুরী নৃত্যও তার ব্যতিক্রম নয়। মণিপুর রাজ্যটি ক্ষুদ্র হলেও প্রত্যন্ত দেশ বলে চিরদিন যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকতে হয়েছে। তাই শিল্পকলা চর্চার বিস্তৃত অবকাশ মণিপুরবাসীর জীবনে ছিলো না। কিন্তু যুদ্ধবিগ্রহ সত্ত্বেও মণিপুরী নৃত্যকে আপন স্বাতন্ত্র্য ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আজও অনাহত তার কারণ এ নৃত্য এদের ধর্মের অন্তর্ভুক্ত এটেই তাছাড়া লোকনৃত্য স্বরূপ। জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক প্রসার একে সংরক্ষণের সঞ্জীবিত রেখেছে। বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন অধ্যায়ে শৈব ও বৈষ্ণব দুই ধর্মের প্রভাব এই নৃত্যে পরিলক্ষিত। গুরু আতম্বা সিং-এর সুযোগ্য শিষ্যা শ্রীমতী দেববানী চালিহা। মাইবি জাগোই, খুবক ইশৈ, লাইমা জাগোই, বান্দিয়া চালম, মাস রাজন, কুঞ্জ অভিসার, গোপীনৃত্য—মণিপুরী নৃত্যের অভিজাত অধ্যায় ঐশ্বর্য ছাড়াও যে সম্পদ রসিক দর্শকবৃন্দকে মুগ্ধ করেছেন সে হোলো তাঁর সর্বোত্তম মনের সাহিত্যবোধ ও দর্শন। শ্রীমতী চালিহা যে দর্শন ছাড়া চিন্তা-গভীর নৃত্যই তার প্রমাণ।

মাইবি জগোই নৃত্য শিব যুগের। এই নৃত্য এদের প্রাচীনতম নৃত্য। মাইবি অর্থাৎ যোগীর আবাহনে দেবাত্মার জাগরণ ও

দেববানী চালিহা

ভক্তের আহ্বানে দেবাত্মার জাগরণ ও ভক্তের অন্তরে অবতরণ এবং ভক্ত ও দেবতার একাত্মতাই এই নৃত্যের বিষয়বস্তু।

বন্দনা, ভঙ্গী সঙ্গীত সর্বোপরি শিল্পীচিত্তের অনুভব দিয়ে লীলায়িত মধুর ছন্দে নৃত্যের ভাববস্তুকে শ্রীমতী চালিহা সহৃদয়-হৃদয় সংবেদ্য করে তোলেন। খুবাক ইশৈ তে বিষ্ণবী উচ্ছ্বাস করতালি ও পদবিক্ষেপের সৌন্দর্য বিস্তার ছন্দে উত্তাল হয়ে ওঠার পরই লাইমা জগোই নৃত্যে আকর্ষণ উচ্ছল বান্দিয়া নৃত্যে লয় ও ছন্দের কাব্য সন্ধের সমাধি এবং আরো নানাতরো নৃত্যের পর মণিপুরী আঙ্গিকে দুটি রবীন্দ্রসঙ্গীতে আমারে কে নিবি ভাই ও ধরণীর গগনে। আপন সৃজন প্রতিভারই পরিচয় দিয়ে রাখলেন। কাকিমুরই যে কলকাতায় নতুন করে মণিপুরী নৃত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন সে সত্য স্মরণ করবে সেবার গুরু দায়িত্বও দেববানী সুষ্ঠুভাবেই পালন করেছেন। নিখিলেশ রায়ের পরিচালনায় শিল্পী [illegible] অরবিন্দ বিশ্বাসের কণ্ঠসঙ্গীত এবং এল তেজেন্দ্রমান সিং, নিখিলেশ রায়, সৌমেন বসু, সমরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠসঙ্গীত সঙ্গীত অনুষ্ঠান সার্থকতার কারণ।

১৫ পল্লী সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি

১৫ পল্লীর সভাবৃন্দ তাঁদের বিশোত্তম বর্ষ কলাবোধী এক মনোজ্ঞ বিজয়া সম্মিলনীর আয়োজন করেন। এই উপলক্ষে শ্রীপূর্ণ দাসের বাউল সংগীত, চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, বাদ্যবিদ্যা তৎসহ পোস্টার নাটিকা এবং বিশিষ্ট শিল্পীসমন্বয়ে বিচিত্রানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের শেষ দিনে সংস্থার সভাবৃন্দ অতীশ সাহাগ্রায় সহিত শৈলেশ গুহনিয়োগীর 'ফাঁস' নাটকটি মঞ্চস্থ করেন। একক ও দলগত অভিনয়ে শিল্পীবৃন্দের স্বতঃস্ফূর্ত অভিনয় বিশেষ অভিনন্দনযোগ্য। সৌখীন নাট্যাভিনয়ে প্রতিটি চরিত্রের এত সুষ্ঠু রূপায়ণ খুব কমই নজরে আসে। অভিনয়ে সর্বাগ্রে নাম উল্লেখ করতে হয় সর্বশ্রী সৌরীন্দ্রনাথ চৌধুরী (ডি, এস, পি), মধুময় চক্রবর্তী (সোমনাথ), মানু সরকার (সুভাষ), বুদ্ধদেব রক্ষিত (কাপলা) এবং শ্রীমতী গীতা সেন (তারকা)। অন্যান্য চরিত্রে যথাযথ অভিনয় করেন কার্তিক সরকার, প্রণব যোগবিন্দার; পুলিন হালদার, শান্তু ঘোষ, বিদ্যু ঘোষ, মিলন চক্রবর্তী, স্বপন রায় এবং আরতি মণ্ডল।

সামগ্রিক নির্দেশনা ও প্রয়োগ পরিকল্পনায় শ্রীবিকাশ ঘোষ দস্তিদার অপূর্ব দক্ষতার পরিচয় দেন।

—চিত্রাঙ্গদা

রঙ্গনা বিশ্বরূপার রাস্তায় সার্কুলার রোডের মোড়ে
নান্দীকার
শনি ৬॥ রবি ৩, ৬॥
তিন পয়সার পালা
২১শে বৃহস্পতিবার (কালীপূজো) ৬টায়
শের আফগান
নির্দেশনা : অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়
।।রঙ্গনায় (৫৫-৬৮৪৬) টিকিট পাবেন।।

CENTRAL LIBRARY

খেলার কথা

ক্ষেত্রনাথ রায়

ছাই নিয়ে যুদ্ধ

মেরীলিবন ক্রিকেট ক্লাব (সংক্ষেপে এম সি সি) চলতি অক্টোবর মাসের ২৮ তারিখ থেকে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে তাদের ১৯৭০-৭১ সালের ক্রিকেট সফর সুরু করবে। এই সফরে তারা চিরাচরিত প্রথায় ইংল্যাণ্ডের প্রতিভূ হিসাবে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে টেস্ট ম্যাচ খেলবে। ইংল্যাণ্ড-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট ক্রিকেট খেলার আর এক নাম ফাইট ফর দি এ্যাসেজ অর্থাৎ ছাই নিয়ে যুদ্ধ। এই দুই দেশের ১৮৮২ সালের ওভাল মাঠের টেস্ট ক্রিকেট খেলাকে কেন্দ্র করেই শেষ পর্যন্ত এই অভিনব 'ফাইট ফর দি এ্যাসেজ' নামকরণ হয়েছে। আন্তর্জাতিক টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে নাটকীয় আখ্যায় যে কটি টেস্ট খেলা প্রসিদ্ধি লাভ করেছে তাদের মধ্যে ১৮৮২ সালের ইংল্যাণ্ড-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট খেলাটি আপন মহিমায় শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে। এমন কি ভবিষ্যতের কোন টেস্ট ক্রিকেট খেলাও এই খেলার ঐতিহ্য ম্লান করতে পারবে না।

ওভাল মাঠে ১৮৮২ সালের ২৮ ও ২৯ আগস্ট তারিখে অনুষ্ঠিত ইংল্যাণ্ড-অস্ট্রেলিয়ার সেই ঐতিহাসিক টেস্ট খেলাটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ নীচে দেওয়া হল।

অস্ট্রেলিয়ার ১৮৮২ সালের ইংল্যাণ্ড সফর তালিকার মধ্যে একটা টেস্ট খেলা ছিল —কেনিংটন ওভাল মাঠে। ফলে এই খেলার আকর্ষণ ছিল বহুগুণে। কিন্তু খেলার দিন সকাল থেকেই মুষলধারায় বৃষ্টি নেমে খেলার জৌলুষ মাটি করে দেয়। বৃষ্টির বহর দেখে দর্শকরা প্রমাদ গুনলেন —এ রকম ভিজে মাঠে কোন মতেই বেশী রান করা সম্ভব হবে না। ক্রিকেট খেলায় প্রচুর পরিমাণ রান দেখার আনন্দই তো আলাদা।

অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক ডব্লিউ এল মার্ডোক টসের বাজিতে ইংল্যাণ্ডের অধিনায়ক এ এন হর্ণবিকে হারিয়ে দিয়ে প্রথমেই দলের পক্ষে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নিলেন। দর্শকদের ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেল। ভিজে পিচে বল দেওয়ার সুযোগ পেয়ে বোলাররা ব্যাটসম্যানদের একহাত নিলেন। প্রথম দিনের খেলায় ২০টা উইকেট পড়ে গেল—দু'দলেরই ১০টা করে। প্রথম দিনে দু'দলের মোট রান দাঁড়ালো ১৬৪—অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসে ৬৩ রান এবং ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংসে ১০১ রান—অস্ট্রেলিয়ার থেকে ইংল্যাণ্ডের ৩৮ রান বেশী। অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসে ইংল্যাণ্ডের দুই বোলার—আর জি বার্লো

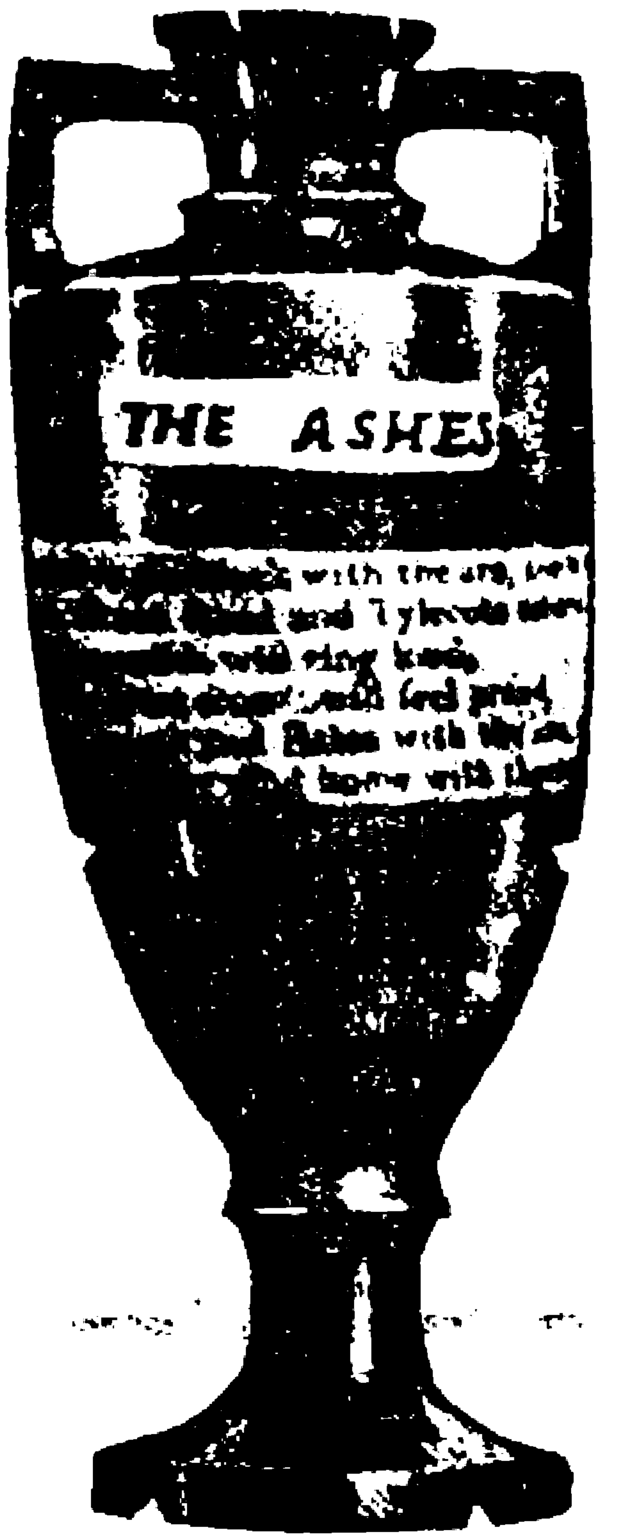

ঐতিহাসিক মৃৎপাত্র—এর মধ্যে আছে ১৮৮৩ সালে মেলবোর্ণের দ্বিতীয় টেস্টে ব্যবহৃত উইকেট ও বেলের পবিত্র চিতাভস্ম।

১৯ রানে ৫টা এবং পিট ৩১ রানে ৪টে উইকেট পেলেন। অপর দিকে ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংসের খেলায় অস্ট্রেলিয়ার এফ আর স্পফোর্থ একাই পেলেন ৭টা উইকেট ৪৬ রান দিয়ে। প্রথম দিন খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময়ের প্রায় [illegible] [illegible] ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংসের খেলা শেষ হওয়াতে অস্ট্রেলিয়া প্রথম দিনে আর তাদের দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নামেনি।

খেলার দ্বিতীয় দিন সকাল থেকেই ছাড়াছাড়া বৃষ্টি নামে। ঠিক [illegible] বৃষ্টিপাত! মাঠে উইকেটের ওপর কোন আচ্ছাদনের বন্দোবস্ত ছিল না। সুতরাং পিচের যে কি শোচনীয় অবস্থা দাঁড়াবে তা দর্শকরা সহজেই অনুমান করলেন। খেলা হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম জেনেও দলে দলে দর্শকরা মাঠে হাজির হলেন। মাঠ লোকারণ্য হল। এখন খেলা আরম্ভ হলেই তাঁদের এত কষ্ট করে মাঠে খেলা দেখতে আসা সার্থক হয়। নির্ধারিত সাড়ে এগারটায় খেলা আরম্ভ হল না। বারোটা বেজে পাঁচ মিনিটে দুজন আম্পায়ারকে মাঠে নামতে দেখে দর্শকরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংসের সূচনা ভাল হয়নি। ম্যাসাই আক্রমণাত্মক ভঙ্গীতে তাঁর বলিষ্ঠ ৫৫ রান তুলে আউট হলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর এই ৫৫ রানই হয়ে দাঁড়ায় উভয় দলের পক্ষে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রান। অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় ইনিংসে ১২২ রান সংগ্রহ করে—প্রথম ইনিংসের থেকে ৫৯ রান বেশী। অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংসে এস পি জোন্সের রান আউট নিয়ে অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়রা খুবই ক্ষুব্ধ হন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে অস্ট্রেলিয়ার দুর্ধর্ষ ফাস্ট বোলার স্পফোর্থ জোরের সঙ্গে ঘোষণা করলেন ইংল্যাণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় তিনি এর প্রতিশোধ নেবেনই।

দ্বিতীয় দিনে বেলা ৩-৪৫ মিনিটে ইংল্যাণ্ড দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নামে। খেলায় জয়লাভ করতে ইংল্যাণ্ডের মাত্র ৮৫ রানের প্রয়োজন। হাতে যথেষ্ট সময়; সুতরাং

জয়লাভের এই প্রয়োজনীয় ৮৫ রান সংগ্রহ করা মোটেই অসম্ভব নয়।

ইংল্যান্ডের অধিনায়ক দুর্দান্ত দলের ব্যাটিং অর্ডার বদলে গ্রেসের সঙ্গে হর্নবি খেলতে নামলেন। স্পফোর্থ ইংল্যান্ডের ১৫ রানের মাথায় [illegible] দিয়ে ইংল্যান্ডের [illegible]। তাঁর পরে উইকেটে [illegible] খেলতে নেমে পরপরই বিদায় হলেন। স্পফোর্থের প্রথম বলেই তিনি বোল্ড আউট। ইংল্যান্ডের মাত্র ১৫ রানের মাথায় দু'জন আউট। গ্রেসের সঙ্গে ৩য় উইকেটের জুটি বাঁধলেন উলেট। এই দু'জন চমৎকার খেলতে থাকেন। দলের ৫১ রানের মাথায় স্পফোর্থের বল খেলতে গিয়ে উলেট যে ক্যাচ তুললেন তা উইকেট-কিপার ব্ল্যাকহাম সহজেই ধরে ফেলেন। তিনটে উইকেট পড়ে যখন ইংল্যান্ডের দলের ঘরে ৫১ রান জমা পড়েছে। জয়লাভের জন্য আর মাত্র ৩৪ রান দরকার। হাতে জমা ৭টা উইকেট এবং পর্যাপ্ত সময়। গ্রেস এবং লুকাস ৪র্থ উইকেটের জুটি খেলছেন। গ্রেস আরও ২ রান তুলে দলের ৫৩ রানের মাথায় ব্যানারম্যানের হাতে ক্যাচ দিয়ে বিদায় নিলেন। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল গ্রেস ইংল্যান্ডের উভয় ইনিংসের খেলায় ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রান (৩২ রান) করেছেন। গ্রেসের বিদায়ের পর লুকাসের জুটি হলেন লিটেলটন। ইংল্যান্ডের ৬৬ রানের মাথায় ৫ম উইকেটের পতন হল—লিটেলটন বিদায় নিলেন। এদিক হিসাব নিয়ে দেখা গেল ইংল্যান্ডের জয়লাভের জন্যে আর মাত্র ১৯ রান দরকার। হাতে জমা আছে ৫টা উইকেট। ইংল্যান্ডের হাতে অস্ট্রেলিয়ার হার অবধারিত ধরে নিয়ে ইংল্যান্ডের অনেক সমর্থকই মাঠে বসে সেই হার স্বচক্ষে দেখার থেকে বিজয়-উৎসবের আয়োজনের জন্য ব্যস্ত হলেন। ক্রিকেট খেলার ফলাফল কত অনিশ্চিত এবং ফলাফল সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা কত যে বোকামী তা জেনেও ইংল্যান্ডের সমর্থকরা দলের সুনিশ্চিত জয় ধরে নিয়েছিলেন।

আর মাত্র ১৯টি রান হলেই ইংল্যান্ডের জয়—উইকেটে খেলছেন ৬ষ্ঠ উইকেট জুটি লুকাস এবং স্টীল। লুকাস ৪ রান যোগ করলেন—দলের রান দাঁড়াল ৭০। স্টীল এই ৭০ রানের মাথায় স্পফোর্থের বল খেলে তাঁরই হাতে ধরা দিলেন। স্কোর বোর্ডে স্টীলের নামের পাশে গোল্লা থেকে গেল। হাতে ৪টি উইকেট জমা এবং ইংল্যান্ডের জয়লাভের জন্যে আর মাত্র ১৫ রান দরকার—এক ধার স্পফোর্থ (অস্ট্রেলিয়া)—৪৬ রানে ৭ এবং ৪৪ রানে ৭টা উইকেট পান।

খেলার এই অবস্থায় রীড খেলতে নেমে দলের এক রানও বাড়াতে পারলেন না, স্পফোর্থের বলে বোল্ড আউট হলেন। রীডের পরিত্যক্ত উইকেটে বার্নেস খেলতে নামলেন। উইকেটে খেলছেন ইংল্যান্ডের ৮ম উইকেট জুটি লুকাস এবং বার্নেস। জয়লাভের জন্যে ইংল্যান্ডকে আরও ১৫ রান তুলতে হবে। বার্নেসের ২ রান এবং ৩টে বাই-রান—এই ৫ রান নিয়ে ইংল্যান্ডের মোট রান দাঁড়াল ৭৫। জয়লাভের প্রয়োজনীয় ৮৫ রান থেকে ইংল্যান্ড মাত্র ১০ রান পিছনে—এই অবস্থায় ইংল্যান্ডের ৭৫ রানের মাথায় স্পফোর্থের বলে লুকাস বোল্ড-আউট হলেন। লুকাস ৪র্থ উইকেটে খেলতে নেমে দলের কাপ্তানের মত দীর্ঘ সময় আটকে ছিলেন। বার্নেসের ৯ম উইকেটের জুটি হলেন স্টাড। ইংল্যান্ডের হাতে দুটো উইকেট জমা, অপরদিকে খেলায় জয়লাভ করতে আরও ১০ রান তুলতে হবে। বার্নেস ধরা পড়লেন মার্ডোকের হাতে। ইংল্যান্ডের ৭৫ রান স্থির থেকে গেল। ইংল্যান্ডের শেষ খেলোয়াড় পিট ধীর পদক্ষেপে মাঠে নামলেন।

সারা কেনিংটন ওভাল মাঠ নিস্তব্ধ। ইংল্যান্ডের শেষ ১০ম উইকেট জুটি স্টাড এবং পিট খেলছেন। এঁরাই ইংল্যান্ডের জয়লাভের শেষ ভরসা। জয়লাভের জন্যে আর মাত্র ১০ রান দরকার। বয়েলের বল লেগের দিকে পাঠিয়ে পিট ২ রান তুলে তাঁর পরবর্তী বলেই বোল্ড আউট হলেন। ৭৭ রানের মাথায় ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হওয়াতে অস্ট্রেলিয়া ৭ রানে জয়ী হল—ইংল্যান্ডের মাটিতে টেস্ট ক্রিকেট খেলায় অস্ট্রেলিয়ার এই প্রথম জয়।

অস্ট্রেলিয়ার দুর্ধর্ষ বোলার স্পফোর্থ ইংল্যান্ডের ২য় ইনিংসে ৪৪ রানে ৭টা উইকেট নিয়ে তাঁর প্রতিজ্ঞা রেখেছিলেন।

অস্ট্রেলিয়ার এই জয়লাভ ইংল্যান্ডের জনসাধারণ সহজভাবে মেনে নিতে পারেননি। জাতীয় ক্রিকেট খেলায় ইংল্যান্ডের পরাজয়ে সারা দেশে যে শোকের ছায়া নেমে আসে তার প্রতিচ্ছবি খেলার পরের দিন বিখ্যাত 'স্পোর্টিং টাইমস' পত্রিকায় প্রকাশিত এক অভিনব শোক-সংবাদ প্রস্তাবে ছাপার হরফে মূর্ত হয়ে উঠেছিল। শোক-সংবাদে ইংল্যান্ডের এই পরাজয়কে ইংলিস ক্রিকেটের মৃত্যুর সামিল করে বলা হয়েছিল অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পর চিতাভস্ম অস্ট্রেলিয়াতে বহন করে নিয়ে যাওয়া হবে। এই চিতাভস্ম বহনের প্রস্তাব নিছকই কাল্পনিক ছিল। তবে ভিন্ন অবস্থায় ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট ক্রিকেট খেলার 'চিতাভস্ম' বাস্তবে পরিণত হতে মাত্র কয়েক মাস সময় লেগেছিল। ১৮৮২ সালের আগস্ট মাসে এই ঐতিহাসিক টেস্ট খেলার পরই ডিসেম্বর মাসে আইভন ব্লিগের (পরবর্তীকালে লর্ড ডার্নলে) নেতৃত্বে ইংলিস ক্রিকেট দল অস্ট্রেলিয়া সফরে যায়। ১৮৮৩ সালের জানুয়ারী মাসে (১৯, ২০ ও ২২) মেলবোর্নের দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় ইংল্যান্ড এক ইনিংস ও ২৭ রানে অস্ট্রেলিয়াকে পরাজিত করে খেলার ফলাফল সমান করে। এই দ্বিতীয় টেস্ট খেলার শেষে মেলবোর্নের কয়েকজন মহিলা ইংল্যান্ডের অধিনায়ক আইভন ব্লিগের হাতে একটি মৃৎপাত্র উৎসর্গ করে পাত্রটি ইংল্যান্ডে নিয়ে যাওয়ার অনুরোধ করেন। এই মৃৎপাত্রে ছিল মেলবোর্নের দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় ব্যবহৃত উইকেট এবং বেলের চিতাভস্ম। ইংল্যান্ডের লর্ডস মাঠের যাদুঘরে এই ঐতিহাসিক চিতাভস্মপূর্ণ মৃৎপাত্রটি সযত্নে সুরক্ষিত আছে। এই পবিত্র চিতাভস্মের সম্মানার্থে ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট ক্রিকেট খেলার নাম দেওয়া হয়েছে 'ফাইট ফর দি এ্যাসেজ'—অর্থাৎ 'ছাই নিয়ে দ্বন্দ্ব'।

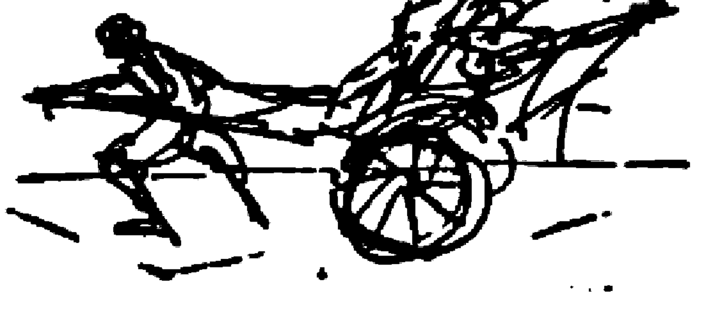

রিলে দৌড়ে বিশ্ব রেকর্ড : লন্ডনের ক্রিস্টাল প্যালেসে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় ৪×৮০০ গজ রিলে দৌড়ে নতুন বিশ্ব রেকর্ড (সময় ৭ মিঃ ১১-৬ সেঃ) স্রষ্টা কেনিয়া দল। বাঁদিক থেকে—হেজেকিয়া নিয়ামু, নাফতালি বন, রবার্ট ওউকো এবং টমাস সাইসি।

খেলাধুলা

দর্শক

জাতীয় সন্তরণ প্রতিযোগিতা

বাঙ্গালোরের উলসুর সুইমিং পুলে আয়োজিত ২৭তম জাতীয় সন্তরণ প্রতিযোগিতায় সার্ভিসেস দল পুরুষ বিভাগে এবং মহারাষ্ট্র মহিলা, বালক ও বালিকা বিভাগে দলগত খেতাব জয়ী হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য সার্ভিসেস দল এই নিয়ে পুরুষ বিভাগে উপর্যুপরি ১০-বার দলগত চ্যাম্পিয়ান হয়েছে এবং রেলওয়ে ওয়াটার পোলোতে এবার নিয়ে উপর্যুপরি ৯-বার খেতাব জয়ের গৌরব লাভ করেছে। সাঁতারে অসাধারণ ব্যক্তিগত কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন বৃটিশ সপ্তদশী কুমারী শিলানিস হিউম (মহারাষ্ট্র)। কুমারী হিউম মোট ৮টি স্বর্ণপদক পেয়েছেন—ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানে ৭টি এবং রিলেতে ১টি। তাছাড়া তিনি মহিলাদের তিনটি বিষয়ে নতুন ভারতীয় রেকর্ড করেছেন।

পশ্চিম বাংলা পুরুষ ও বালক বিভাগে ২য় স্থান এবং মহিলা বিভাগে ৩য় স্থান লাভ করেছে।

দলগত চূড়ান্ত ফলাফল

পুরুষ বিভাগ: ১ম সার্ভিসেস (১৬২ পয়েন্ট), ২য় বাংলা (৬৭ পয়েন্ট) এবং ৩য় মহারাষ্ট্র (৬৬ পয়েন্ট)

মহিলা বিভাগ : ১ম মহারাষ্ট্র (৮৭ পয়েন্ট), ২য় দিল্লী (৫৭ পয়েন্ট) এবং ৩য় বাংলা (২৭ পয়েন্ট)

বালক বিভাগ: ১ম মহারাষ্ট্র (৭০ পয়েন্ট), ২য় বাংলা (৩১ পয়েন্ট) এবং ৩য়

বালিকা বিভাগ: ১ম মহারাষ্ট্র (৫৯ পয়েন্ট), ২য় দিল্লী (৩৭ পয়েন্ট) এবং ৩য় গুজরাট (১১ পয়েন্ট)।

জাতীয় রেকর্ড

সদ্য সমাপ্ত ২৭তম জাতীয় সন্তরণ প্রতিযোগিতায় মোট ১৫টি নতুন জাতীয় রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—পুরুষদের ৯টি, মহিলাদের ৩টি, বালকদের ২টি এবং বালিকাদের ১টি। এই ১৫টি নতুন রেকর্ড করেছে মাত্র এই দুটি দল—মহারাষ্ট্র (৯টি রেকর্ড) এবং সার্ভিসেস (৬টি রেকর্ড)। তিনটি করে ব্যক্তিগত রেকর্ড করেছেন পুরুষ বিভাগে মহীন্দর সিং রাণা (সার্ভিসেস) ও টিম্পু খাটাও (মহারাষ্ট্র) এবং মহিলা বিভাগে বৃটিশ সপ্তদশী কুমারী শিলানিস হিউম (মহারাষ্ট্র)।

পুরুষ বিভাগ

২০০ মিটার ফ্রিস্টাইল:
—মহীন্দর সিং রাণা (সার্ভিসেস)

৪০০ মিটার ফ্রি স্টাইল:
—মহীন্দর সিং রাণা (সার্ভিসেস)
সময়: ৪ মিঃ ৪৪-৮ সেঃ (হিট)

১,৫০০ মিটার ফ্রিস্টাইল :
—মহীন্দর সিং রাণা (সার্ভিসেস)
সময়: ১৮ মিঃ ৫১-৫ সেঃ (হিট)

৪০০ মিটার ব্যক্তিগত মেডলে:
—টিম্পু খাটাও (মহারাষ্ট্র)
সময়: ৫ মিঃ ৫৮-১ সেঃ (হিট)

১০০ মিটার বাটার ফ্লাই:
—টিম্পু খাটাও (মহারাষ্ট্র)
সময়: ১ মিঃ ৬-৫ সেঃ

২০০ মিটার বাটার ফ্লাই:
—টিম্পু খাটাও (মহারাষ্ট্র)
সময়: ২ মিঃ ৩৪-৪ সেঃ

৪×২০০ মিটার ফ্রি স্টাইল রীলে:
—সার্ভিসেস
সময়: ৯ মিঃ ২১-৫ সেঃ

৪×১০০ মিটার ফ্রি স্টাইল রীলে:
—সার্ভিসেস
সময়: ৪ মিঃ ১১-৮ সেঃ

৪×১০০ মিটার মেডলে রীলে :
—সার্ভিসেস
সময় : ৪ মিঃ ৪৫-১ সেঃ

মহিলা বিভাগ

১০০ মিটার [illegible]:
—শিলানিস হিউম (মহারাষ্ট্র)

লণ্ডনে রয়াল এলবার্ট হলে অনুষ্ঠিত ১০ রাউণ্ডের হেভিওয়েট মুষ্টি যুদ্ধে বৃটেনের জো বাগনার (ডানদিকে) এবং আর্জেণ্টিনার ইডোয়ারডো করলেটি (বাঁদিকে)। লড়াইয়ে বাগনার ৫০—৪৭½ পয়েন্টে জয়ী হন।

১০০ মিটার ব্যাকস্ট্রোক :
—শির্লানিস হিউম (মহারাষ্ট্র)
সময়: ১ মিঃ ১৭-৭ সেঃ

২০০ মিটার ব্রেস্টস্ট্রোক মেডলে:
—শির্লানিস হিউম (মহারাষ্ট্র)
সময়: ২ মিঃ ৩৬-৬ সেঃ

বালক বিভাগ

১০০ মিটার ফ্রি স্টাইল
—এম ওয়ালকার (মহারাষ্ট্র)
সময়: ১ মিঃ ০-৪ সেঃ (হিট)

১০০ মিটার ব্যাকস্ট্রোক:
—এম ওয়ালকার (মহারাষ্ট্র)
সময়: ১ মিঃ ১৫ সেঃ

বালিকা বিভাগ

১০০ মিটার বাটার ফ্লাই:
—এস দেশাই (মহারাষ্ট্র)
সময়: ১ মিঃ ২৯-৮ সেঃ

ভারত বনাম সিংহল শৈত্য সন্তরণ প্রতিযোগিতা

বাঙ্গালোরের কেন্সিংটন সুইমিং পুলে আয়োজিত ৩য় ভারত বনাম সিংহলের শৈত্য সন্তরণ প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষ ১৪৬-৯০ পয়েন্টে দলগত খেতাব জয়ী হয়েছে। পুরুষ বিভাগে ভারতবর্ষ ১১৪-২৬ পয়েন্ট এবং মহিলা বিভাগে সিংহল ৬৪-৩২ পয়েন্টে চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করে। ওয়াটারপোলো টেস্ট খেলায় ভারতবর্ষ ১ম টেস্টে ১৮-২ গোলে এবং ২য় টেস্টে ৮-০ গোলে জয়ী হয়।

মৈনুদ্দৌল্লা গোল্ড কাপ

হায়দ্রাবাদের লালবাহাদুর স্টেডিয়ামে আয়োজিত মৈনুদ্দৌল্লা গোল্ড কাপ ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফাইনালে স্টেট ব্যাঙ্ক প্রথম ইনিংসে বেশী রান করার সুবাদে মোট চারবার মৈনুদ্দৌল্লা গোল্ড কাপ জয়ী হয়েছে।

প্রথম দিনের খেলায় স্টেট ব্যাঙ্কের প্রথম ইনিংস ২৬৬ রানের মাথায় শেষ হলে হায়দরাবাদ কোন উইকেট না খুইয়ে ১৫ রান সংগ্রহ করে।

দ্বিতীয় দিনে হায়দরাবাদের প্রথম ইনিংসে ২০২ রানের মাথায় ফেলে দিয়ে স্টেট ব্যাঙ্ক ৪৪ রানে এগিয়ে যায় এবং বাকি ৬২ মিনিটের খেলায় দ্বিতীয় ইনিংসের ৩ উইকেটের বিনিময়ে ৩১ রান সংগ্রহ করে। হায়দরাবাদের প্রথম ইনিংসের গোড়াপত্তন কিন্তু খুবই পাকাপোক্ত হয়েছিল। লাঞ্চের সময় তাদের রান ছিল ১২২ (১ উইকেটে)। খেলার এক সময় যেখানে ৩ উইকেটের বিনিময়ে তাদের ১৫১ রান ছিল সেখানে দেখা গেল তাদের বাকি ৭ উইকেটে মাত্র ৫১ রান উঠেছে। চা-পানের চার মিনিট পর ২০২ রানের মাথায় হায়দরাবাদের প্রথম ইনিংসের খেলা শেষ হয়। স্টেট ব্যাঙ্কের লেফট-আর্ম স্পিনার অশোক যোশী ৭২ রানে ৭টা এবং ভি কুমার ৪৯ রানে ৩টে উইকেট পান। প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে ৩য় ও ৪র্থ দিনের খেলা আরম্ভ করাই সম্ভব হয়নি।

অল ইংল্যাণ্ড স্কুল ক্রিকেট দল

আগামী নভেম্বর মাসের শেষদিকে অল-ইংল্যাণ্ড স্কুল-কলেজ ক্রিকেট দল ভারত সফরে আসছে। তারা ১৯৭০-৭১ সালের ভারত সফরে ১০টি খেলায় অংশ গ্রহণ করবে—পাঁচটি টেস্ট ম্যাচ এবং পাঁচটি আঞ্চলিক খেলা। সর্বভারতীয় স্কুল ক্রিকেট দলের সঙ্গে তাদের টেস্ট খেলার আসর বসবে এই পাঁচ জায়গায়—দিল্লী, বোম্বাই, আমেদাবাদ, কটক এবং মাদ্রাজ। সম্প্রতি সফর তালিকায় কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে। চতুর্থ টেস্ট খেলার আসর কলকাতা থেকে সরিয়ে কটকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং পূর্বাঞ্চলের খেলার আসর বসবে কটকের পরিবর্তে গোহাটিতে। সুতরাং কলকাতায় ইংলিশ স্কুল বয়েজ ক্রিকেট দলের কোন খেলাই হচ্ছে না।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

শ্রেষ্ঠ রচনা

সাহানা দেবীর **মৃত্যুহীন প্রাণ ৪॥**

শংকু মহারাজের **গঙ্গাসাগর ৮৲**

আশাপূর্ণা দেবীর

একাল সেকাল অন্যকাল

১৫৲

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস

মক্ষীরাণী ৫॥ কাঞ্চনময়ী ৫॥

নীরদচন্দ্র চৌধুরীর বাংলায় প্রথম বই

বাঙালী জীবনে রমণী ১০৲

ডঃ সুকুমার সেনের ভূমিকা সম্বলিত
ডঃ ভবতারণ দত্ত সংকলিত

বাংলা দেশের ছড়া ১০৲

কমলা মিশ্রের

কাশ্মীর থেকে কুমারিকা ৭৲

জয়ন্তকুমারের

অভিনেত্রী খুন ৪৲

॥ নীহাররঞ্জন গুপ্তের ॥

রক্তের রজনীগন্ধা ৫৲, ছিন্নপত্র ৫৲, মেঘকালো ৪৲, শংখবলয় ৬৲, তালপাতার পুঁথি ১৫৲, স্মৃতির প্রদীপ জ্বলো ৯৲, হাসপাতাল ৮॥, কিরীটী রায় ১১৲ মধুমিতা ৫॥, কলঙ্কিনী কঙ্কাবতী ৭॥, মল্লার ৪৲, উত্তর ফাল্গুনী ৭৲ বেলাভূমি ৮॥, বহ্নি মিনতি ১০৲, বাদশা ৫৲, কালো ভ্রমর (১।২) ৬৲, কালো ভ্রমর (৩।৪) ৬·৫০, হীরা চুনি পান্না ৫৲, নীলতারা ৫৲, নূপুর ৪৲, কাজললতা ৬৲, কন্যাকুমারী ৬৲, অপারেশন ৭॥, অরণ্য ৬॥, ঝড় ১০৲, সেই মরুপ্রান্তে ১১৲, ঘুম নেই ৫॥, মুখোশ ৫॥, বহ্নিশিখা ৮৲, মনের গোমতী ৫৲, নিশিপদ্ম ৫৲, সুর্বতপস্যা ১০৲, লালুভুলু ৪॥, কালোহাত ৬৲, আন্তি ভাগীরথী তীরে ৭॥, মায়ামৃগ ৬৲, শ্রাবণী ৬৲, রাত্রি নিশিথে ৭৲।

প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়ের

যমুনোত্তার হতে গঙ্গোত্রী ও গোমুখ ৫৲

বিভূতি রচনাবলী

বহু সুধীজনের অনুরোধে গ্রাহক হওয়ার তারিখ আগামী ১৪ই নভেম্বর পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হইল।

এখন যাঁহারা গ্রাহক হইবেন প্রথম তিন খণ্ড তখনই তাঁহারা দয়া করিয়া লইয়া যাইবেন।

বিভূতি রচনাবলীর দিল্লী গ্রাহক কেন্দ্র :
অপর্ণা ভাণ্ডার
১৬, নেতাজী সুভাষ মার্গ,
দরিয়াগঞ্জ।

প্রমথনাথ বিশী
সম্পাদিত ও ভূমিকা সম্বলিত

রজনীকান্ত সেনের
কান্তকবি রচনাসম্ভার ১০৲

ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের
ভূদেব রচনাসম্ভার ১০৲

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের
বিদ্যাসাগর রচনাসম্ভার ১০৲

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের
বঙ্কিম রচনাসম্ভার ১২॥৹

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের
দ্বিজেন্দ্রলাল রচনাসম্ভার ১০৲

মাইকেল মধুসূদন দত্তের
মাইকেল রচনাসম্ভার ১০৲

বিহারীলাল চক্রবর্তীর
বিহারীলাল রচনাসম্ভার ১০৲

রমেশচন্দ্র দত্তের
রমেশ রচনাসম্ভার ১০৲

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের
ত্রৈলোক্য রচনাসম্ভার ১২৲

গিরিশচন্দ্র ঘোষের
গিরিশ রচনাসম্ভার ১২॥৹

মিত্র ও ঘোষ : ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২ ফোন : ৩৪-৮৭৯১ — ৩৪-৩৪৯২

KUSUM
VANASPATI
ENRICHED WITH VITAMINS A & D
কুসুম কিন্তু আর পাঁচটা সাধারণ বনস্পতির মত নয়— কেন জানেন ?
কারণ কুসুম দিয়ে রান্না খাবার খেতে রুচি হয় ও কুসুমে তৈরী যে কোনো খাবারে খাঁটি স্বাদ-গন্ধ পাওয়া যায়। আজই এক টিন কিনে নিজে পরখ করে দেখুন।
কারণ কুসুম অন্য কোনো রান্নার তেল বা ঐ জাতীয় জিনিসের চেয়ে ঢের বেশীদিন টাটকা থাকে। রোজ কুসুম দিয়ে রেঁধে দেখুন মাসের শেষে খরচা কত কম পড়ে।
কারণ কুসুম দিয়ে রকমারি রান্না করা যায়। শাক-সব্জি, মাছ-মাংস যা-ই রাঁধুন, দারুণ লোভনীয় হবে। ডাল তরকারীর স্বাদই হবে আলাদা, আর যে কোনো মিষ্টির তো কথাই নেই। কেক, বিস্কুট, ভাজাভুজি যা খুশি করুন, এমন কি চাপাটিতে মাখিয়ে বা গরম ভাতে খান—যেমন সুস্বাদু তেমনি স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো।
কারণ কুসুম সহজে হজম হয় আর ভারি পুষ্টিকর। প্রতি আউন্স কুসুমে ১০০ আন্তর্জাতিক ইউনিট 'এ' ভিটামিন এবং ৫৩ আন্তর্জাতিক ইউনিট 'ডি' ভিটামিনে সমৃদ্ধ।
স্বাদে-গন্ধে সব খাবার করে তুলুন চমৎকার
কুসুম বনস্পতি দিয়ে রাঁধুন
কুসুম প্রোডাক্টস লিমিটেড, কলিকাতা-১

১০ম বর্ষ
৪র্থ খণ্ড

অমৃত

২৭ সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday, 30th Oct., 1970 শুক্রবার, ১৩ই কার্তিক, ১৩৭৭ 40 Paise

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
৮৮৪	চিঠিপত্র		
৮৮৬	সাদা চোখে		—শ্রীসন্দর্শী
৮৮৮	দেশেবিদেশে		—শ্রীপুণ্ডরীক
৮৯০	ব্যঙ্গচিত্র		—শ্রীকাফী খাঁ
৮৯১	সম্পাদকীয়		
৮৯২	নেই	(কবিতা)	—শ্রীআনন্দ বাগচী
৮৯২	চাঁদ খুন করে	(কবিতা)	—শ্রীপূর্ণেন্দু সরকার
৮৯২	পেলে না তো?	(কবিতা)	—শ্রীপ্রতিমা সেনগুপ্ত
৮৯৩	স্বদেশে-প্রবাসে	(গল্প)	—শ্রীমিহির আচার্য
৮৯৭	মুখের মেলা		—আবদুল জব্বার
৯০১	তুলসী-চরিত	(উপন্যাস)	—শ্রীনীলমাধব চৌধুরী
৯০৪	সাহিত্য ও সংস্কৃতি		—শ্রীঅভয়ংকর
৯০৯	ভারত সাহিত্য পরিক্রমা		—শ্রীপর্যবেক্ষক
৯১৫	নিকটেই আছে		—শ্রীসন্ধিৎসু
৯১৮	নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে	(উপন্যাস)	—শ্রীঅতীন বন্দ্যোপাধ্যায়
৯২৪	অথ কালীঘাট মন্দির কথা		—শ্রীদেবনাথ মুখোপাধ্যায়
৯২৯	মনের কথা		—শ্রীমনোবিদ
৯৩২	সজনের সকাল	(বড় গল্প)	—শ্রীচণ্ডী মণ্ডল
৯৩৬	নিজেরে হারায়ে খুঁজি	(স্মৃতিচারণ)	—শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী
৯৪১	বিজ্ঞানের কথা		—শ্রীঅয়স্কান্ত
৯৪৭	সামান্য ভালোবাসা	(গল্প)	—শ্রীসঞ্জিত মুখোপাধ্যায়
৯৪৮	গোয়েন্দা কবি পরাশর		—শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র রচিত —শ্রীশৈল চক্রবর্তী চিত্রিত
৯৪৯	অঙ্গনা		—শ্রীপ্রমীলা
৯৫১	জলসা		—শ্রীচিত্রাঙ্গদা
৯৫৩	প্রেক্ষাগৃহ		—শ্রীনান্দীকর
৯৫৮	খেলার কথা		—শ্রীকমল ভট্টাচার্য
৯৫৯	খেলাধুলা		—শ্রীদর্শক

প্রচ্ছদ : শ্রীপ্রদীপ দাস

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে অমৃতে প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য অমৃতের কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে অমৃতের কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পিতে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে অমৃতের কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

		কলিকাতা		মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা	২০-০০	টাকা	২২-০০
ষান্মাসিক	টাকা	১০-০০	টাকা	১১-০০
ত্রৈমাসিক	টাকা	৫-০০	টাকা	৫-৫০

'অমৃত' কার্যালয়
১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোন : ৫৫-৫২০১ (১৪ লাইন)

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষের
বিচিত্র কাহিনী
ও
আরও বিচিত্র কাহিনী
পড়ে' আনন্দ পাবেন

CENTRAL LIBRARY

চিঠিপত্র

কলকাতার উন্নয়ন

সম্প্রতি কলকাতা উন্নয়ন নিয়ে যে ব্যস্ততা লক্ষ্য করা যাচ্ছে, তা নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য। কলকাতা পুরোন শহর। লোকসংখ্যাও বিপুল। এর সংকট নিরসনে পরিকল্পনার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অর্থব্যয় হয়েছে প্রচুর। কিন্তু সুযোগ-সুবিধা খুব বেশী বেড়েছে বলে জানি না। সংবাদে দেখলাম কলকাতার পৌর এলাকায় জঞ্জাল পরিষ্কার ও জল নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নতির উদ্দেশ্যে ১৯৬৯-৭৪এর চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পনেরটি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পাঁচ বছরব্যাপী এই প্রকল্পগুলি রূপায়ণের জন্য ১৪ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

১৯৭০-৭১এ নির্দিষ্ট ব্যয়ের অংক হল দু কোটি তিন লক্ষ টাকা। প্রস্তাবিত প্রকল্প পনেরটি বিস্তৃত তালিকা নিম্নরূপ :—

কাশীপুর-বরানগর জঞ্জাল পরিষ্কার পাতিপুকুরস্থ নগর এলাকায় জঞ্জাল পরিষ্কার, টালীগঞ্জ পঞ্চান্নগ্রামে জলনিষ্কাশন মনিখালি - খড়দা- ক্যাওড়াপুকুর বেঁচি-তলা জল নিষ্কাশন।

হাওড়ার অংশের জন্য : জঞ্জাল নিষ্কাশনের বিভিন্ন শাখাপ্রশাখা। তোপসিয়া, পাগলাডাঙ্গা, কুলিয়া-ট্যাংরা বেলেগাছিয়া মানিকতলা, মোমিনপুরের পাম্পিং ব্যবস্থার উন্নতির জন্য কলকাতা পৌর সংস্থার প্রস্তাবিত প্রকল্পগুলি। কলকাতার জল নিষ্কাশন পথগুলির পুনর্নির্মাণ ও উন্নতির বিধান; কলকাতার অবহেলিত অঞ্চলগুলির জঞ্জাল পরিষ্কার ব্যবস্থা, টালীগঞ্জ নর্দমা প্রকল্প, মানিকতলা জঞ্জাল নিষ্কাশন ও নর্দমা ব্যবস্থা কাশীপুর চিৎপুর জঞ্জাল ও জল নিষ্কাশন প্রকল্প, হাওড়ার নর্দমা ও জল নিষ্কাশন, হাওড়ার নর্দমা প্রণালীর উন্নয়ন, বরানগর-কামারহাটি গভীর নর্দমা ব্যবস্থা, কলকাতা এবং হাওড়ার সাধারণের ব্যবহার্য শৌচাগার ইত্যাদির নির্মাণ।

জঞ্জাল পরিষ্কার ও জল নিষ্কাশন সংক্রান্ত বাকী প্রকল্পগুলি পরবর্তী পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বহির্ভূত থেকে পৃথকভাবে রূপায়নের আয়োজন করা হবে।

এই প্রকল্পগুলির তালিকা নিম্নরূপ : কলকাতার সন্নিহিতাঞ্চলের (আংশিক) জমাজল নিষ্কাশন ব্যবস্থা, উত্তর-পূর্ব টালীগঞ্জের পয়ঃপ্রণালী, উত্তরপাড়া-কোতরং জল নিষ্কাশন, শ্রীরামপুর, জঞ্জাল পরিষ্কার ব্যবস্থার উন্নতি ও বিস্তৃতি, কোন্নগরের নর্দমা ব্যবস্থার উন্নতি, চন্দননগর অঞ্চলের (চন্দননগর ও হুগলী-চুঁচুড়া) জঞ্জাল পরিষ্কার ব্যবস্থা, টালী নালার উন্নয়ন, হাওড়ার জঞ্জাল সাফাই ব্যবস্থা—১ম ও ২য় দফা, কেষ্টপুর-ভাঙ্গড় কাটাখালের পুনর্নির্মাণ, ভাটপাড়া ও টিটাগড়ের জঞ্জাল প্র-যোজন, কবরখানার উন্নয়ন, কুলটি গঙ্গা থেকে কেষ্টপুর-ভাঙ্গড় কাটাখাল—নতুন কাটাখাল-সার্কুলার খাল হয়ে হুগলী নদী পর্যন্ত জলপথকে নাব্য করে তোলা, মানিকতলা অঞ্চলের জল-নিষ্কাশন (ফীডার খাল), খড়দা আঞ্চলিক জল-নিষ্কাশন (ফীডার খাল), চুড়িয়াল আঞ্চলিক জল-নিষ্কাশন, বাগের খালের উন্নয়ন, টালীগঞ্জ-পঞ্চান্নগ্রামের জল নিষ্কাশনের জন্য চৌভাগায় অতিরিক্ত পাম্প স্থাপন, খাটা পায়খানাগুলিকে স্যানিটারী পায়খানায় পরিণত করার অগ্রপ্রকল্প, দমদম অঞ্চল জঞ্জাল পরিষ্কার ব্যবস্থা, সহরতলী অঞ্চলে (আংশিক) জমাজল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা, কলকাতা পৌর অঞ্চলে জঞ্জাল পরিষ্কার ও জল-নিষ্কাশনের নয়া প্রকল্প।

এই যে চৌদ্দ কোটি টাকা ব্যয়ের প্রকল্প তা কতদূর সার্থকরূপ পাবে জানি না। সাধারণ মানুষের জীবনধারণ এবং সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির যদি কোন বাস্তব চেহারা দেখতে পাই, তাহলে নিশ্চয়ই সরকারী প্রকল্পের সহযোগিতায় জনসাধারণ এগিয়ে আসবে। ,পরিকল্পনা যেন ফাইল-বন্দী হয়ে না থাকে, এই অনুরোধ।

সিদ্ধার্থ চৌধুরী
বারাসাত

নিজেরে হারায়ে খুঁজি

অমৃত-র ৬ কার্তিক, ১৩৭৭ সংখ্যায় প্রকাশিত, শ্রদ্ধেয় নটসূর্য শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরীর 'নিজেরে হারায়ে খুঁজি।' জীবন স্মৃতিচারণে উল্লিখিত কয়েকটি তথ্য সম্পর্কে সবিনয়ে যা নিবেদন করতে চাই, তা এই রকম :—

১। স্টারে রঞ্জিত সিংহ' নাটকে মহেন্দ্র গুপ্ত 'কর্ণ সিং' নয়, 'খড়্গ সিংহ'-এর ভূমিকায় অভিনয় করেন।

২। ঐ নাটকে (অন্ততঃ প্রথম রজনীতে) রাণীবালা অংশগ্রহণ করেননি।

৩। ২২ জানুয়ারী, ১৯৫০ তারিখে স্টারে নবপর্যায়ে গিরিশচন্দ্রের 'জনা-র' প্রথম অভিনয় রাত্রে নটসূর্য বিদূষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন বলে স্মৃতি-চারণে উল্লিখিত হলেও সমকালীন সংবাদপত্রে দেখা যায় ঐ রজনীতে চরিত্রটি রূপ দেন সন্তোষ দাস নামক জনৈক অভিনেতা।

৪। ৬ মার্চ, ১৯৫০ স্টারে শৈলজানন্দের 'কলংকবতী'র উদ্বোধন হয় 'কঙ্কাবতী' নয়।

শিশির বসু
কাঁচরাপাড়া

দিবস বিভাবরী

এবারে পূজো সংখ্যায় প্রকাশিত 'দিবস বিভাবরী' উপন্যাসখানি পড়ে খুব আনন্দ লাভ করেছি। ঔপন্যাসিক যে দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে উপন্যাসখানি রচনা করেছেন তা সচরাচর দেখা যায় না, আমার কাছে এ উপন্যাসটা বেশ সুখপাঠ্য।

আজকাল প্রায় উপন্যাসে শ্লীলতা, অশ্লীলতার প্রশ্ন ওঠে। এতে সম্পূর্ণ-ভাবে অশ্লীলতা না থাকলেও যে ভাবমূর্তি তার মাঝে মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে তার ভাষা সংযত, সংহত, সুরুচিপূর্ণ। উপন্যাস-খানি পড়তে পড়তে কয়েক জায়গায় মনে হয় রাত্রির নিস্তব্ধতায় অনেক অবিন্যস্ত চিন্তা আমাদের মনে আসে, সেগুলো থেকে আমরা কোন সময়ে রেহাই পাই না, প্রকৃতির ক্ষেত্রেও তাই হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে লেখক মহাশয় ওর মনের চিন্তাটাকে নিয়ে একটু বেশী করেই মাথা ঘামিয়েছেন। তাই কোন কোন জায়গায় তাঁর মনের কথা বলতে গিয়ে এমন কয়েকটা নিজের উক্তি দিয়ে ফেলেছেন, (যথা (ক) আমরা ঘটনার দর্শক হিসাবে লেখককে ধরে (এই) তা খুব একটা ভাল লাগে নি। সেখানে কি রকম একটা খারাপ, খারাপ ভাব আমাদের মনের মধ্যে আসে।

ঘটনাকে লেখক যেভাবে ব্যক্ত করেছেন তাতে শ্যামলকে খারাপ ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারি না। একটা 'চাপা' মনের মানুষ কোথায় কি করে বসে কেউ সহজে তা বুঝতে পারে না। সেই একটা এক-কেন্দ্রিক চরিত্র বলে আমার মনে হয়। তার জন্যই 'প্রকৃতির অন্তর্দ্বন্দ্ব আর প্রীতির সঙ্গে শ্যামলের গোপনে গোপনে প্রেম বিনিময়, প্রীতির সঙ্গে শ্যামলের গুপ্ত প্রেমের যে ইঙ্গিত এক জায়গায় দিয়েছেন আর একটা কি দুটো ইঙ্গিত দিলেই মনে হয় ভাল হত। আমার মনে হচ্ছে পুরো ঘটনাটা এখানে প্রকাশ পায় নি। প্রকৃতির মনের মধ্যে যেমন সংস্কার, বাধা আছে শ্যামল যে তাকে না পেয়ে প্রীতিকে একটা কর্তব্যকর্মের জন্য বিবাহ করল তার পূর্বে অন্তর্ধানের মধ্যে কি কোন দ্বন্দ্ব ছিল না? সে অন্তর্দ্বন্দ্বটি লেখক প্রকাশ করেন নি কোথাও।

চিঠিপত্র

যে সমস্ত সস্তা দামের উপন্যাস আজকাল বাজারে আমরা অহরহ দেখতে পাচ্ছি দুটি বিপরীতধর্মী চরিত্র খুব কম দেখতে পাওয়া যায় এর একটা যেমন প্রীতি অন্যটা প্রকৃতি আর তেমনি একটা শ্যামল, সন্দেহ নেই শ্যামলও আমাদের মধ্যে কম নয়। তারাও এমনি করে একটা ভুল করে চলেছে। কিন্তু আমার প্রশ্ন তারা এরকমভাব করে চলেছে কেন? উপন্যাসটিতে শ্যামল যে প্রীতিকে বিবাহ করল তার মনেও কি কোন বাধা বা বেদনা ছিল না? একটা কর্তব্যবোধও মনের মধ্যে থাকতে পারে?

এমনিতেই বেশ ভাল লেগেছিল, কিন্তু শেষে ২৩ পরিচ্ছেদে এমন একটি দৃশ্য আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন পাঠক মনের চিন্তাকে তা বিকলাঙ্গ করে দিয়েছে। শেষ পরিচ্ছেদে প্রকৃতির অন্তরের হাহাকারটাই ব্যক্ত করা হয়েছে। সেইখানেই সবকিছু সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। কিন্তু আমরা পাঠক, আমরা চিন্তা করব কেন এমন হল? ধরুন, সকলে যেভাবে একটা জিনিসকে দেখে লেখকরা একটা বিশেষ দৃষ্টি নিয়ে তাকে দেখেন—আমাদের অর্থাৎ পাঠকদের মনে সে রকমভাবে উপস্থাপিত করতে পারলেই তারা চিন্তা করলে—তারাই সমস্ত কিছু বিচার করলে? লেখক এমনভাবে ঘটনাটিকে এমনভাবে প্রকাশ করেছেন—তাতে একটা ইতিহাস ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না।

হরিপদ রায়
মেদিনীপুর।

নিকটেই আছে প্রসঙ্গে

আজকাল সবাই হৈহৈ করেন। সকলের কণ্ঠে একই আক্ষেপ, ছেলেরা একদম বয়ে গেল, ঠগ-জোচ্চোরে দেশ ছেয়ে গেল, হা-হুতাশ করেই আমরা কর্তব্য সমাধা করি। তার বেশি আর নয়। আবার কেউ কেউ ভাসা ভাসা গভীরে ঢুকে আঁচড়কাটা মন্তব্য করেন, বেকারি, দারিদ্র্য, হতাশাই এসবের মূলে। বাস ঐ পর্যন্ত। আর পথ ভাঙতে আমরা কেউ রাজী নই।

এতো সত্যি ঠগ-জোচ্চোরে দেশ ছেয়ে গেছে। প্রতিনিয়ত আমরা প্রতারিত হচ্ছি। বিশ্বাসের ভিত্তিভূমি ভীষণ চিড় খাচ্ছে। শক্তমাটি খুঁজে পাওয়া ভার যেখানে নিশ্চিন্তে দু-দণ্ড দাঁড়ানো চলে। ঠকে ঠকে এখন সম্পূর্ণ ব্যাপারটা আমাদের গা-সহা হয়ে গেছে। সহজ বিশ্বাসের ভাবটাই আমাদের মধ্যে থেকে উবে গেছে। এখন আমরা বিশ্বাসের বদলে অবিশ্বাসের ভঙ্গীতেই লোকজনের দিকে তাকাতে অভ্যস্ত। পাছে ঠকে আবার বেকুব বনে না যাই।

তাই অমৃত-এ যেদিন বিজ্ঞাপন দেখলাম, ঠগ-জোচ্চোর নিকটেই আছে সেদিন থেকেই উৎসাহিত হয়েছিলাম। ঠগ-জোচ্চোরদের স্বরূপ চিনে নেওয়ার জন্য। তারপর অসীম আগ্রহে 'নিকটেই আছে' ফিচারের উপরে হামলে পড়েছিলাম। সে ঘোর এখনো কাটেনি। প্রতি সপ্তাহে পড়ে যাচ্ছি নিকটেই আছে। যত পড়ছি ততই জানতে পারছি যে, ওরা সত্যি সত্যি চারপাশ থেকে আমাদের ঘিরে ধরেছে। কখন যে গোটা সমাজটা শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যাবে তার ঠিক নেই।

রেশন দোকানদারের সেই গোদা গুণ্ডা আবার পুজোর চাঁদা সংগ্রহের উদ্যমী বখাটে ছোকরা দুটো। ওদের দিয়ে কত লোক কত কাজ হাসিল করে নিচ্ছে। ইলেকসনে ওরা প্রাণ লড়িয়ে কাজ করে আবার বিপদে-আপদে আশ্রিতের ত্রাতার ভূমিকা নেয়। এর পরিবর্তে ওরা কিন্তু সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কাছ থেকে ঘৃণাই কুড়োয় কৃতজ্ঞতা নয়। আর সকলের তো কথাই নেই। সবাই দিন গোনে, কবে এদের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে।

এদের সম্বন্ধে আমরা জানছি—শুনেছি। কিন্তু এদের স্বপক্ষে কোনদিন ভুলেও কিছু বলি না। সামনাসামনি বলার সাহস নেই। অথচ কিভাবে সমাজজীবনে এদের আবির্ভাব ঘটলো তা ভেবে দেখি না, দেখতে চাইও না। ওরাও যে আমাদের মতই মানুষ হয়ে জন্মেছিল, বাঁচার স্বপ্ন ছিল বড় হওয়ার স্বপ্ন দেখতো সেসব কথা ভুলেও কখনো মনে আসে না। কোন এক দুর্বল মুহূর্তের ত্রুটির সুযোগ নিয়ে সমাজের রুই-কাতলারা ওদের ব্যবহার করছে দাবার ঘুঁটির মতো। সুস্থ হয়ে বাঁচার অধিকার ওরা সেদিনই হারিয়েছে। আর এই মাশুল গুণতে হবে ওদের আমৃত্যু।

এ সম্বন্ধে কেউ আলোকপাত করবেন কি?

রবি ব্যানার্জি
কলকাতা—৩৬

পূর্ববঙ্গের নতুন মানুষ

পূর্ববঙ্গ থেকে আবার অবিশ্রান্ত মানুষের স্রোত আসছে। তাদের দেখতে গিয়েছিলেন বসিরহাট অঞ্চলে আমাদের মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। পশ্চিমবঙ্গের ওপর যে চাপ বাড়ছে, তাতে তিনি উদ্বেগবোধ করেছিলেন। এই সমস্ত 'উদ্বাস্তু'-দের সরকারী সাহায্যও দেওয়া হচ্ছে বলে শুনেছি। কয়েকটি পরিবারের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে আলাপ করে তাদের বর্তমান অবস্থার সঙ্গে কিছুটা পরিচিত হয়েছি। এদের অধিকাংশই কৃষক অথবা মৎস্যজীবী। অধিকাংশ পরিবারে লেখাপড়া-জানা লোকের সংখ্যা খুবই কম। সুতরাং কোন রকম চাকুরী দিয়ে এদের বাঁচার পথ তৈরী করা যাবে না। যে ধরনের কাজ এরা করে এসেছে, সেই কাজই এদের দিতে পারলে সম্ভবত পরিবারগুলি বেঁচে যেত।

বাঙলা দেশের ভিতরে এখনও কোন কোন অঞ্চলে উদ্বাস্তুদের বসতি দেওয়া যেতে পারে। জায়গাও আছে। প্রতিদিন ট্রেন ভর্তি হয়ে এসে নামছে শিয়ালদায়। আবার ট্রেন ভর্তি হয়ে চলেছে কোথায়, তা তারাও জানে না। বিতাড়িত মানুষদের জীবনকে বর্তমান সমস্যাকে আন্তরিক সহানুভূতি ও মমত্বের সঙ্গে বিবেচনা করলে ভাল হয়। ওরা মানুষ, ওদের আছে বাঁচার অধিকার। না খেয়ে দিনের পর দিন এক অমানুষিক যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য দেশের স্বাধীনতা আসে নি। ক্রমশ এদের নৈতিকমান ভেঙে পড়ছে এবং দুঃস্বপ্নময় ভবিষ্যৎ নিয়ে দিন গুনছে এরা। সবকিছুতে মৌখিক সহানুভূতি জানিয়ে আমরা তুষ্ট। মনে রাখতে হবে, ওদের ওপর আমাদের দায়িত্বও কম নয়। ওরাও আমাদের প্রতিবেশী। একই জাতির মানুষ। সকল শ্রেণীর মানুষের কাছে আমার এই আবেদন।

অনুপকুমার বসু
কলকাতা—১৪

এই আমাদের দেশ প্রসঙ্গে

দেশ দেখার আগ্রহ আমাদের সকলের। অথচ সামর্থ্য নেই তেমন এক সর্বসাধারণের অনটন তার দেশ সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানের অভাব। ঠিক কোনখান থেকে শুরু করে কোথায় শেষ করবো তা অনেকটা জানা নেই। আবার মাঝে মধ্যে দু-একদিনের ছুটি হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়া হয়তো চলে তবে টনটনে জ্ঞান থাকা চাই। সময় কম, সামর্থ কম। অথচ ঘুরতে হবে। ভেতর থেকে ধাক্কা আসছে। তাই স্পষ্ট একটা চিত্র পেলে অন্তত নিজের আশপাশটা ঘুরে দেখা যায়।

এতদিনের একটা মস্তবড়ো অভাব পূরণ হলো অমৃত-এ 'এই আমাদের দেশ' ফিচারটির সংযোজনায়। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ফিচারটি পাঠককে টেনেছে। দেশ দেখার পক্ষে এ যেমন সহায়ক তেমনি দেশভ্রমণের নেশাও এতে অনেকটা মেটে। সম্পাদককে ধন্যবাদ।

তমাল লাহিড়ী
শিলিগুড়ি

শাদা চোখে

বাংলা কংগ্রেস প্রস্তাবিত গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের রূপরেখা নির্ণয় করেছেন। নয়া দিল্লীতে সাংবাদিক সম্মেলনে এই ফ্রন্টের ছবি এঁকেছেন যুক্তভাবে শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুশীল ধাড়া। ঘোষণার পূর্বমুহূর্তে তাঁরা শাসক কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে নিভৃত আলোচনা করেছেন। অর্থাৎ শাসক কংগ্রেসের তরফ থেকে কোন গূঢ় বিষয়ে নিশ্চিত আশ্বাস পাওয়ার পরই বাংলা কংগ্রেস নেতৃদ্বয় তাঁদের গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের কথা দ্বিধাহীন চিত্তে ঘোষণা করলেন।

প্রস্তাবিত এই ফ্রন্টের রূপরেখা কি হবে এটা আগেই অনেকে আঁচ করেছিলেন। কিন্তু তবুও আশাবাদীর মত কিছু কিছু বামপন্থী দল মনে করছিলেন যে বাংলা কংগ্রেস হয়ত আগের শাসক কংগ্রেসের সঙ্গে কিছুসংখ্যক আসন ভাগাভাগির উপর জোর দিতে পারে মাত্র। একেবারে তাঁদের সঙ্গে একত্র হয়ে যাওয়ার মত ঝুঁকি বাংলা কংগ্রেস হয়ত নেবে না। কারণ পশ্চিম বাংলায় কংগ্রেসবিরোধী আন্দোলন এখনও প্রবল এবং জনতার মধ্যে কংগ্রেসবিরোধী প্রবণতাও এখন পর্যন্ত যথেষ্ট পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। অতএব, এই পারিপার্শ্বিকতার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা কংগ্রেসের পক্ষে শাসক কংগ্রেসকে সংগে নিয়ে চলার মত এত বড় ঝুঁকি নেওয়া সম্ভব নাও হতে পারে।

রাজনৈতিক তথ্যাভিজ্ঞ মহল মনে করে যে ডান কম্যুনিস্ট পার্টির জাতীয় কাউন্সিলে শাসক কংগ্রেসের সংগে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে একটি বোঝাপড়ার প্রস্তাব পাশ হওয়ার সংগে সংগেই বাংলা কংগ্রেস তার গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের রূপরেখা টানবার জন্য সাহসী হয়ে উঠলেন। নতুবা তথাকথিত 'টপ সিক্রেট'র কথা বলে বলে আরও কিছুদিন বাজার সরগরম রাখতে হত। শ্রীঅজয় মুখার্জি যুক্তফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রীত্ব থেকে যখন পদত্যাগের মানসিকতা সৃষ্টি করছিলেন তখনই বাংলা কংগ্রেস এই 'টপ সিক্রেট' কথাটা ব্যবহার করতে সুরু করেন এবং অদ্যাবধি পশ্চিম বাংলার মানুষকে সেই টপ সিক্রেটের নাগপাশ থেকে মুক্তি দেন নি। বরঞ্চ প্রতিনিয়তই, আসিতেছে এরকম একটা বাকচাওয়া সৃষ্টি করে দলের রাজনৈতিক উপযোগিতা সম্পর্কে গণমনে একটা অনুকূলতা সৃষ্টির প্রয়াস পাচ্ছেন। শ্রীমুখার্জির পদত্যাগের কথা টপ সিক্রেটের আচরণে রাখলেও সকল বঙ্গবাসী মাত্রই আগেই তা জেনেছিলেন। আর এবারের টপ সিক্রেট শাসক কংগ্রেসের সঙ্গে মিলনের কথা। রাজনীতি যাঁরা এতটুকু বোঝেন তাঁদের কারও গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের রূপরেখা জানতে কিছুই কষ্ট হয় নি। কেউ কেউ বলছেন শ্রীমুখার্জির টপ সিক্রেটের সব অংশ এখনও জানা যায় নি। যেটুকু বাকী আছে সেটুকু কোন রাজনৈতিক দলকে বেআইনী করবার জন্য সুপারিশ কিম্বা কোন তারিখে নির্বাচন হওয়া উচিত তার ইঙ্গিত থাকতে পারে মাত্র। অন্য কিছু নয়। এসব টপ সিক্রেট বাঙালীর জীবনে কিছু পরিবর্তন আনতে পারবে বলে ত মনে হয় না।

শ্রীমুখার্জি নয়াদিল্লীতে গিয়ে আইনশৃংখলা পশ্চিম বাংলায় কিভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে পারা যায় সে সম্পর্কে নাকি কিছু সুপারিশ করে এসেছেন। সবিনয়ে শ্রীমুখার্জিকে একটি প্রশ্ন করতে চাই। সেটা হচ্ছে আইনশৃংখলা বলতে তিনি কি বোঝেন ? এই প্রশ্ন অন্যান্য রাজনৈতিক নেতাদের পক্ষেও প্রযোজ্য, প্রকাশ্য দিবালোকে খুন হলেই আইনশৃংখলা বিপর্যস্ত হয়েছে একথা: যেমন বলা চলে তেমনি শত সহস্র কালোবাজারি, মুনাফাশিকারী অহোরাত্র পণ্যের দাম বৃদ্ধি করে আজ জনতার যে গলা কেটে চলেছে এটাও কি আইনশৃংখলার আওতায় পড়ে না ? শুধু কালনেমির লঙ্কাভাগের মত অহর্নিশ কে কার সঙ্গে জোট বেঁধে লালদীঘির দপ্তরটা কুক্ষিগত করা যাবে, এই মতলব আঁটলে পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ কাউকে ক্ষমা করবে বলে মনে হয় না। এই মূল্য বৃদ্ধির রোধ করবার জন্য শ্রীমুখার্জির কি টপ সিক্রেট প্ল্যান আছে তা অবিলম্বে জনতা জানতে পারলে অনেকখানি আশ্বস্ত হতে পারতো।

যাক ও সব কথা আলোচনা না করে পুনরায় রাজনীতির আলোচনায় ফিরে আসা যাক। বাংলা কংগ্রেস এতদিন অন্টবামের প্রতি যে বন্ধু-বন্ধু ভাব দেখাচ্ছিলেন তা একেবারে নস্যাৎ করে দিয়ে বলেছেন যে তাঁরা অষ্টবামকে স্বীকৃতি দিতে পর্যন্ত প্রস্তুত নন। যদি দরকার মনে করেন তবে অষ্টবামের শরীকদের সঙ্গে বাংলা কংগ্রেস পৃথক পৃথক ভাবে আলোচনা করবেন। এই বক্তব্য অপমানসূচক হলেও অষ্টবামের মধ্যে একমাত্র এস এস পি ছাড়া অন্য কোন দল এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবার মত সাহস এখনো পর্যন্ত দেখান নি। এমন কি অষ্টবামের ঐক্যের উপরে জোর দেওয়ার প্রশ্ন তুলেও বাংলা কংগ্রেসকে অদ্যাবধি জানিয়ে দেওয়া হয় নি যে অষ্টবামের কোন শরীক পৃথক পৃথক ভাবে বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে আলোচনা করবেন না; যদি প্রয়োজন হয় বাংলা কংগ্রেস যেন অষ্টবামের প্রতিনিধিদের সংগেই আলোচনার জন্য প্রস্তুত থাকেন। কিন্তু সে কথা জানানো ত দূরের কথা, ইতিমধ্যেই তলে তলে ডান কম্যুনিস্ট পার্টির প্রতিনিধিরা বাংলা কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅজয় মুখার্জির বাসভবনে নৈশ অভিযান চালিয়েছেন, সাংবাদিকদের কাছে উভয়পক্ষই বলেছেন, দিল্লীতে শ্রীমুখার্জি ইন্দিরাজীর সঙ্গে কি কথাবার্তা বলেছেন তাই আলোচনা করেছেন মাত্র। কিন্তু আসলে তা নয়। ডান কম্যুনিস্ট পার্টির ধারণা, শ্রীবিশ্বনাথ মুখার্জির ছোটো শ্রীঅজয় মুখার্জির একটু বামপন্থী দুর্বলতা আছে। তিনি আসলে চান নি শাসক কংগ্রেসের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে কোন এলায়েন্স করতে। অজয়বাবুর প্ল্যান ছিল নাকি বাংলা কংগ্রেস অষ্টবামের সংগে সমঝোতা করবে, আর কিছুসংখ্যক আসন শাসক কংগ্রেসকে ছেড়ে দিয়ে একটি অলিখিত গ্র্যান্ড এলায়েন্স গড়ে তুললে হাতে সর্বাত্মকভাবে সি পি এমএর ক্ষমতা-দখলের প্রচেষ্টাকে নস্যাৎ করে দেওয়া যায়। বাংলা কংগ্রেস সাধারণ সম্পাদক শ্রীসুশীল ধাড়ার নাকি, অবশ্য সি পি আইএর মতে, দক্ষিণপন্থী দুর্বলতা আছে। তিনিই নাকি বাংলা কংগ্রেসকে এক রকম জোর করে 'গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের' কাণ্ডারী করে তুলেছেন। শ্রীধাড়ার মতে নাকি সি পি এম ও সি পি আইএর মধ্যে গুণগত পার্থক্য খুব নেই, এবং ঐ দুই শক্তিই জাতীয়তাবাদী নয়। তাই শ্রীধাড়া নব কংগ্রেস, পি এস পি প্রভৃতি দলের সঙ্গে জোট বাঁধতে আগ্রহী। শ্রীধাড়ার এই প্রচেষ্টাকে নাকি বানচাল করার জন্য সি পি আই নেতারা শ্রীঅজয় মুখার্জির সঙ্গে কথাবার্তা চালাচ্ছেন। এই যুক্তির কথা শুনলে যুগপৎ বিস্মিত ও হতাশ হতে হয়। সি পি আই কাউন্সিল রাজনৈতিক অবস্থা পর্যালোচনা করেই এই সিদ্ধান্তে এসেছে যে পশ্চিমবঙ্গে এখন শাসক কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতা করার সময় এসেছে। এই সিদ্ধান্ত যদি তাঁদের ঠিক হয় তবে তাঁরা শ্রীধাড়াকে কেন দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির জন্য দায়ী করছেন তা ত বোঝা যায় না। [illegible] ঐ প্রস্তাবিত

গণতান্ত্রিক ফ্রন্টে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না বলেই কি শ্রীঘোষ দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল হলেন? যাহোক, বাংলা কংগ্রেসের মধ্যে প্রগ্রেসিভ সেকসান খুঁজে পাওয়া যাবে না বলেই ধারণা। কারণ শ্রীধাড়া যেদিকে যাবেন শ্রীমুখার্জিও সেদিকেই যাবেন। তাঁরা অভিন্ন। অবশ্য, অষ্টবামে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা চালাচ্ছেন—এই বক্তব্যের আড়ালে যদি সি পি আই বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে তাদের কৌশল ও সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বোঝাপড়া করে আসেন সে আলাদা কথা।

অষ্টবামের অন্য শরীকদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া যে একেবারে হয় নি তা নয়। তাঁদের অনেকেই উপলব্ধি করতে সুরু করেছেন যে সংগ্রামের কথা, পুলিশী অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার কথা ইত্যাদি বলে শুধু কালক্ষেপণের মাধ্যমে তাঁদের এক প্রকার প্রায় 'নাকে দড়ি' দিয়ে শাসন কংগ্রেসকে প্রগতিশীল বলে মেনে নেওয়ার জন্য টেনে নেওয়া হচ্ছে। তাঁরা অবিলম্বে এই অবস্থার অবসান চান। এবং শুধু তাই নয়; কংগ্রেস ও সি পি এমএর মধ্যে একটি তৃতীয় শক্তি গড়বার জন্য ইতিমধ্যে কথাবার্তাও সুরু করে দিয়েছেন। এই সম্পর্কে ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা শ্রীঅশোক ঘোষের সঙ্গে আর এস পি নেতা শ্রীমাখন পালের আশু বৈঠক খুবই গুরুত্বপূর্ণ হবে বলে রাজনৈতিক মহলের ধারণা। আবার অষ্টবামের অন্যতম শরীক এস এস পি পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছেন যে শাসক কংগ্রেস সম্পর্কে ও বাংলা কংগ্রেস সম্পর্কে অষ্টবামের ভূমিকা পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা আর অষ্টবামের সভায় যোগ দেবেন না। এস এস পি আরও সিদ্ধান্ত করেছেন, যে ডান কম্যুনিস্ট পার্টি ছাড়া অষ্টবামের অন্য ছয় শরীকের সঙ্গে তাঁরা দ্বিপাক্ষিক আলোচনা করবেন এবং জানতে চাইবেন যে শাসক কংগ্রেস সম্পর্কে তাঁদের কোন দুর্বলতা আছে কিনা? এস এস পি আর এস পি ও লোকসেবক সঙ্ঘের সঙ্গেও আলোচনা করে একটি প্রকৃত কংগ্রেসবিরোধী ফ্রন্ট গঠনের পক্ষপাতী। এস এস পি মনে করেন, সি পি আই তাদের সর্বভারতীয় সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করতে পারেন না। অতএব, তলে তলে তাঁরা আট পার্টিতে থেকেই বাংলা কংগ্রেসের মাধ্যমে শাসক কংগ্রেসের সঙ্গে মিতালি গড়ে নেবেন। কাজেই অষ্টবামের রাজনৈতিক লাইন কি হবে সেটা পরিষ্কার ভাবে ঘোষিত হওয়া উচিত। এসব ডাল-গোলপাকানো রাজনীতি আর চলতে দেওয়া উচিত নয়।

অন্যদিকে ষড়বামের সর্বাধিনায়ক শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত অষ্টবামের শরীকদের বিশেষ করে ফরওয়ার্ড ব্লক, এস ইউ সি ও এস এস পিকে লক্ষ্য করে বলেছেন যে, একই সঙ্গে কংগ্রেস ও কম্যুনিস্ট বিরোধিতা করা চলবে না। কম্যুনিস্ট-বিরোধিতা বলতে শ্রীদাশগুপ্ত বাম কম্যুনিস্ট-বিরোধীতার কথাই বলেছেন। তাঁর মতে কম্যুনিস্ট পার্টি বলতে তাঁর দলই। অন্যরা ত সংশোধনবাদী ও প্রতিবিপ্লবী বা এডভেঞ্চারিস্ট মাত্র। শ্রীদাশগুপ্ত আবার গর্ব করে বলেছেন, কম্যুনিস্ট পার্টির অর্থাৎ তাঁর দলের বিরোধিতা করার জন্যই নাকি অন্য সব 'পেটি বুর্জোয়া' দলগুলি ভেঙে যেতে বাধ্য। শ্রীদাশগুপ্তের দল শ্রেণীভিত্তিক দল বলেই ভাঙছে না। অবশ্য নকশাল হয়ে যাওয়াটা দল ভাঙা কিনা সে কথা শ্রীদাশগুপ্ত বলেন নি। জিজ্ঞাসা করলে হয়ত বলতেন তাঁদের বের করে দেওয়া হয়েছে মাত্র। অন্য দল বের করে দিলে সেটা বের করা হয় না। সেটাকে ভাঙন বলে। তাই পাঁচ শত টুকরো হলেও কম্যুনিস্ট পার্টি বা শ্রীদাশগুপ্তের দল ভাঙে নি। শ্রীদাশগুপ্তের বক্তব্য থেকে মনে হচ্ছে, তিনি অষ্টবামকে ভেঙে দিতে চাইছেন। কারণ তা হলে তাঁর দলের পক্ষে যাকে বলে ডিরেক্ট কনফ্রনটেশান সেটা করা যায়! এবং তার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে অন্য ছোট দলকে, অন্তত যে-গুলো রাজ্যভিত্তিক, হয়ত সি পি আই-এর সঙ্গে কংগ্রেসের পাকে ভিড়তে হবে, নতুবা তাঁর দলের সঙ্গে যোগ দিয়ে অস্তিত্ব বিলুপ্তির জন্য প্রস্তুত হতে হবে। এই আশা করেই শ্রীদাশগুপ্ত হয়ত হুমকি দিচ্ছেন যে, কংগ্রেস ও কম্যুনিস্ট বিরোধিতা একসঙ্গে চলবে না। শ্রীদাশগুপ্ত কি মনে করেন যে তাঁর দলের এমন শক্তি পশ্চিমবঙ্গে হয়েছে যে তার ফলে তিনি এককভাবে লড়াই করে ক্ষমতার সিংহদ্বারে উপস্থিত হতে পারেন? কারণ তাঁদের এই দম্ভই কি যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতনের অন্যতম কারণ ছিল না? প্রমোদবাবুর হুমকি দেখে মনে হয় যেন অন্য দলগুলো কেবলমাত্র তাঁর হুকুম মানবার জন্যই সৃষ্টি হয়েছে। অন্যদের আদর্শও নেই বক্তব্যও নেই। কিন্তু তাঁদের তো উচিত পশ্চিমবাংলার অন্যতম বৃহত্তম দলের নেতা হিসাবে ধীরে সুস্থে কথা বলা। বাংলা কংগ্রেসের সিদ্ধান্তের ফলে যে নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তাকে কৌশলের সঙ্গে কাজে লাগানো। সকলকেই একই সঙ্গে আঘাত করে শত্রু বৃদ্ধি করা সুস্থ রাজনীতির পরিচয় কিনা ভেবে দেখা দরকার।

অন্যদিকে বাংলা কংগ্রেসের প্রস্তাবিত গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট কতখানি শক্তিশালী হবে তা নিয়ে জল্পনাকল্পনার অন্ত নেই। শাসক কংগ্রেস ও বাংলা কংগ্রেস মিলেই ভোটযুদ্ধে খুব সুবিধা হবে এমন লক্ষণ এখনও দেখা যাচ্ছে না। তাঁদের সহযোগী হিসাবে পি এস পিকে পাবেন বলে তাঁরা ধরে নিয়েছেন। এবং পি এস পির সঙ্গে সমঝোতা হলে পশ্চিম বাংলায় স্বাভাবিক ভাবেই বিদ্রোহী পি এস পিকে বাইরে থাকতে হবে। আর শোনা যাচ্ছে এস এস পির কিছু লোক নাকি ঐ জোটে যোগ দেবেন। তাঁরা কারা? তাঁরা নাকি এস এস পির নালিকুলের ভগ্নাংশ। প্রকৃতপক্ষে নামেই তাঁদের অস্তিত্ব। সংগঠন নয়। আর মুসলমানদের যে অংশ পাবেন তাঁরাও রাজনীতিতে এখন ফসিল মাত্র। অতএব, প্রস্তাবিত গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের উল্লেখমাত্রই পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক হাওয়া উল্টোদিকে বইতে সুরু করবে, এমন লক্ষণ এখনো দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। একমাত্র সি পি আই যদি গিয়ে ঐ জোটে ভেড়ে তবেই পালে একটু হাওয়া লাগতে পারে। নয়তো পরিস্থিতি খুব আশাব্যঞ্জক বলে ত মনে হচ্ছে না। কাজেই কিছু একটা ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গেই সব পার্টি জোটবন্দী হতে সুরু করবে, পশ্চিমবাংলার রাজনৈতিক অবস্থা তত অনুকূল নয়। এখনো গঙ্গা দিয়ে অনেক জল প্রবাহিত হবে। তারপর যদি রূপরেখা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। সব দলই এখন কৌশলের খেলায় ব্যস্ত। আখেরে কে জেতে তা ক্রমশ প্রকাশ্য।

—সমদর্শী

কলকাতা বন্দরের একটি নমুনা বা নকসার ফটো। শ্রীবিনয়ভূষণ দে এটি তৈরী করেন। কলকাতা বন্দরের প্রদর্শনীতে এটি একটি চিত্তাকর্ষক দ্রব্য। এই নমুনাটির মাপ হবে প্রায় ১২'×৯'. এতে দেখান হয়েছে খিদিরপুর ডক, কিং জর্জেস ডক, হুগলী নদী, মালগুদামসমূহ, বন্দরের বিভিন্ন পূর্ত কার্য ও ইমারতাদি, দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের হেড অফিস ও অন্যান্য রেলওয়ে ভবন, কে পি ডক ও তথাকার ক্রমান সেতু প্রভৃতি, রেলওয়ে লাইন ও ইয়ার্ড, শেড প্রভৃতি আরও অনেক। এই প্রদর্শনী দেখতে বহু জনসমাগম হচ্ছে।

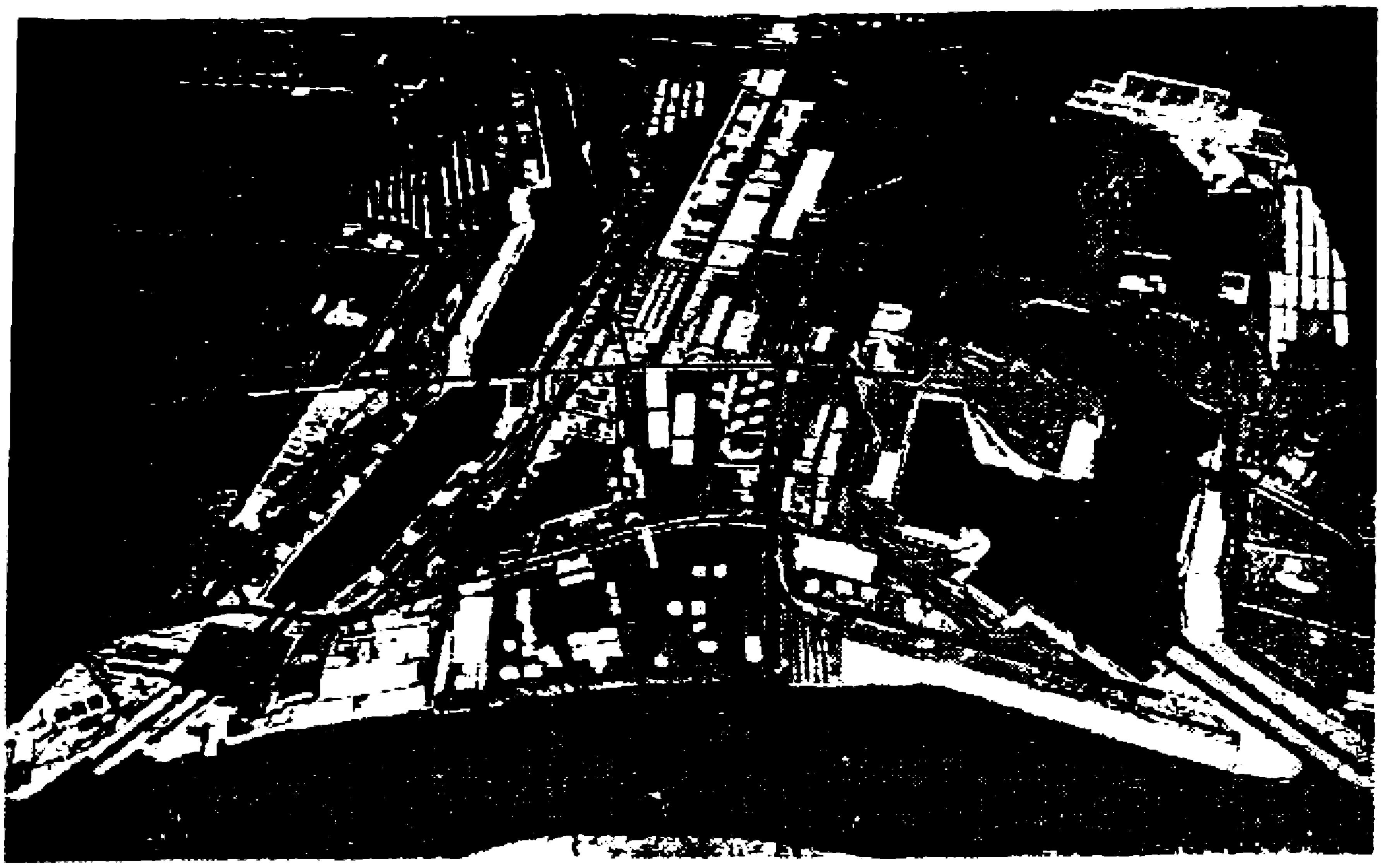

দেশে বিদেশে

উত্তরপ্রদেশ থেকে রাজনীতির চাকা কি উল্টো দিকে ঘুরতে আরম্ভ করল? লক্ষ্ণৌতে শ্রীত্রিভুবননারায়ণ সিংহের নেতৃত্বে সংযুক্ত বিধায়ক দলের মন্ত্রিসভা শপথ গ্রহণের পর থেকে এই প্রশ্ন বড় হয়ে উঠেছে।

ভারতবর্ষের রাজনীতিতে উত্তরপ্রদেশের একটি বিশিষ্ট স্থান রয়েছে। লোকসভার ৫২০জন নির্বাচিত সদস্যের মধ্যে ৮৫জন উত্তর প্রদেশ থেকে নির্বাচিত হয়ে আসেন, অর্থাৎ লোকসভার প্রতি ছয়জন সদস্যের ৫.৫ প্রায় একজনই হচ্ছেন উত্তর প্রদেশের: আর কোন রাজ্যই লোকসভায় মোট ভোটের এত বড় একটা অংশের মালিক নয়। একথাও মনে রাখা যেতে পারে যে, এ-যাবৎ যে তিনজন ভারতের প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন তাঁরা সকলেই উত্তর প্রদেশের মানুষ। ভবিষ্যৎ নির্বাচনে নয়াদিল্লীতে শাসক কংগ্রেসের হাতে ক্ষমতা রাখতে হলে উত্তর প্রদেশকে হাতে রাখা দরকার। সম্ভবত রাজনীতির এই অঙ্ক মনে রেখেই শাসক কংগ্রেস দলের নেতারা ঐ রাজ্যে ভারতীয় ক্রান্তিদলের সঙ্গে কোয়ালিশন ভেঙে দিয়ে শ্রীচরণ সিংহের মন্ত্রিসভাকে ক্ষমতাচ্যুত করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন।

কিন্তু শাসক কংগ্রেস দলের পক্ষে দুর্ভাগ্যের কথা এই যে, তারা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম অঙ্গ-রাজ্যে রাজনীতির এই অঙ্ক মেলাতে পারল না। দলের রাজ্য ও কেন্দ্রীয় স্তরের নেতারা চেষ্টার ত্রুটি করেন নি; কিন্তু অন্য দলের সদস্যদের ভাঙিয়ে এনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করা শাসক কংগ্রেস দলের পক্ষে সম্ভব হয়নি। শ্রীত্রিভুবননারায়ণ সিংহ সংযুক্ত বিধায়ক দলের শরিক দলগুলির সমস্ত এম-এল-এর দ্বারা নেতা নির্বাচিত হননি, এই অজুহাতে শ্রীসিংকে ক্ষমতার আসন থেকে দূরে রাখার জন্য শাসক কংগ্রেস যে শেষ চেষ্টা করেছিল সেটাও রাজ্যপাল ডাঃ গোপাল রেড্ডি বানচাল করে দিলেন। ইদানীং-কালের ভারতবর্ষের রাজনীতিতে এটি একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। এই ঘটনার যেসব তাৎপর্য এখনই পরিষ্কার হয়ে উঠছে সেগুলি হচ্ছে: (১) শাসক কংগ্রেস দলের মধ্যে হতাশা—এবং কতকটা উদ্বেগ দেখা দিচ্ছে। (২) উত্তরপ্রদেশে শাসক কংগ্রেস মহলের কিছু অংশ শ্রীকমলাপতি ত্রিপাঠীর নেতৃত্বের বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করছেন। উত্তরপ্রদেশ বিধানসভার শাসক কংগ্রেস দলের নেতৃত্ব ও ঐ রাজ্যে শাসক কংগ্রেস কমিটির সভাপতিত্ব, দুটিই এখন শ্রীত্রিপাঠীর হাতে। এই দুই পদের একটি ছাড়বার জন্য দলের কেন্দ্রীয় নেতারা চাপ দিচ্ছেন, এরকম একটা সংবাদ খুব ব্যাপকভাবে রটছে। (৩) রাষ্ট্র-পতি শ্রীগিরিকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাবার জন্য সংযুক্ত সোস্যালিস্ট পার্টি যে উদ্যোগ করে-ছিল সেটা এখন চাপা পড়েছে। রাজ্যপালের সুপারিশমত শ্রীচরণ সিংহের মন্ত্রিসভা ভেঙে দিয়ে উত্তরপ্রদেশে রাষ্ট্রপতির শাসন চালু করার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে সমালোচনা হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাজ্যপাল সং-যুক্ত বিধায়ক দলের নেতা শ্রীত্রিভুবননারায়ণ সিংকে মন্ত্রিসভা গঠন করতে আমন্ত্রণ করায় সেই সমালোচনা চাপা পড়েছে। কারও কারও বিশ্বাস যে, রাষ্ট্রপতির হস্তক্ষেপেই শেষ পর্যন্ত শাসক কংগ্রেসের দাবী উপেক্ষা করে শ্রীসিংকে মন্ত্রিসভা গঠনের আমন্ত্রণ জানাবার সিদ্ধান্ত করা হয়। (৪) সর্ব-ভারতীয় ক্ষেত্রে উত্তরপ্রদেশের ধাঁচে সংযুক্ত বিধায়ক দল গড়ে তোলার কথা উঠছে। লোকসভায় বিরোধী কংগ্রেস দলের নেতা ডাঃ রামসুভগ সিং বলেছেন, 'উত্তরপ্রদেশের

গড়বেতা থানার কেঁউয়া গ্রামের কংসাবতী ক্যানেলের 'এ্যাকুইডাক্টের' উপর দিয়ে সেচের জল ছাড়া হয়েছে। এর ফলে ৬৫০০০ হাজার একর জমি জল পাবে। সেচের জল ছাড়ার প্রথম উদ্বোধন করেছেন ১৯৫৯ সাল থেকে কর্মরত এক শ্রমিক দম্পতি শ্রীঅবিরাম হেমব্রম ও শ্রীমতী কাজলা হেমব্রম। এই ক্যানেলটির বৈশিষ্ট্য হল যে, নীচে দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের রেলপথ এবং উপরে সেতুর মত ক্যানেল দিয়ে জল চলেছে, পাশে জীপ ও মানুষ চলাচলের পথ। ভারতবর্ষে এই ধরনের ক্যানেল দ্বিতীয় নেই।

আজকের রাজনৈতিক চিত্র ভবিষ্যতে অন্যান্য রাজ্যের এবং এমন কি কেন্দ্রেরও রাজনৈতিক চিত্র হয়ে উঠবে।' ভারতীয় ক্রান্তি দলের কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টারি বোর্ডও এই ধরনের একটি সর্বভারতীয় সংযুক্ত বিধায়ক দল গড়ে তোলার চেষ্টা করবেন বলে সিদ্ধান্ত করেছেন।

উত্তরপ্রদেশে রাষ্ট্রপতির শাসন এবার মাত্র এক পক্ষকাল স্থায়ী হয়েছিল। এর আগে আর কোথাও এত অল্প সময়ের মধ্যে রাষ্ট্রপতির শাসনের অবসান ঘটেনি। রাষ্ট্রপতির শাসনের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী রূপে শপথগ্রহণ করলেন শ্রীত্রিভুবন নারায়ণ সিং, যাঁর সঙ্গে ইদানীংকালে রাজনীতির বিশেষ প্রত্যক্ষ যোগ ছিল না। শ্রীসিং পরলোকগত লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর সহপাঠী ও ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন, এককালে সাংবাদিক বৃত্তিতে নিযুক্ত ছিলেন এবং জওহরলাল নেহরু কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'ন্যাশনাল হেরাল্ড' পত্রিকার জেনারেল ম্যানেজাররূপে কাজ করেছেন এবং পরবর্তী কালে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিমণ্ডলীর ও পরিকল্পনার সদস্য হয়েছেন। অতীতের কর্মজীবনের এই ধরনের রেকর্ড থাকা সত্ত্বেও শ্রীসিং সম্প্রতি কালে রাজনীতির সম্মুখের সারিতে ছিলেন না। উত্তরপ্রদেশের বিধানমণ্ডলীর সদস্যও তিনি নন যদিও তিনি রাজ্যসভায় আছেন। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, সংযুক্ত বিধায়ক দলের শরিকদের সকলেরই পক্ষে গ্রহণযোগ্য একজন কাউকে নেতৃত্ব দেওয়ার উদ্দেশ্যেই যবনিকার অন্তরালবর্তী এই মানুষটিকে রাজনীতির মঞ্চে পাদপ্রদীপের সামনে এনে দাঁড় করান হয়েছে। নেহরু পরিবারের এককালের একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে বিপরীত শিবিরের নেতৃত্ব করতে দেখা নিশ্চয়ই প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর পক্ষে বেদনাদায়ক।

শ্রীত্রিভুবননারায়ণ সিংহের মন্ত্রিসভায় আপাতত মাত্র আর দুজন সদস্য গ্রহণ করা হয়েছে। তাঁরা হলো বিরোধী কংগ্রেস দলের শ্রীগিরিধারী লাল এবং ভারতীয় ক্রান্তি দলের শ্রীবীরেন্দ্র বর্মা। জনসংঘ স্থির করেছে তারা মন্ত্রিসভায় যোগ দেবে। স্বতন্ত্র পার্টির সিদ্ধান্ত এখনও জানা যায় নি। সংযুক্ত সোস্যালিস্ট পার্টি যদিও সংযুক্ত বিধায়ক দলের অন্যতম শরিক তাহলেও তাদের মন্ত্রিসভায় যোগ দেওয়ার সম্ভাবনা সম্পর্কে অনিশ্চয়তা রয়েছে। একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ন্যূনতম একটা কার্যসূচী পালন করা হবে, কেবলমাত্র এই সর্তেই কোয়ালিশন সরকারে যোগ দেওয়া এস-এস-পির সাধারণ নীতি। উত্তরপ্রদেশের ক্ষেত্রেও পার্টি যদি সেই নীতি আঁকড়ে থাকে তাহলে জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে। এস-এস-পির এই অনিশ্চিত ভূমিকা লক্ষ্য করেই উত্তরপ্রদেশের কম্যুনিস্ট নেতা জেড এ আহমেদ বলেছেন, 'সংযুক্ত সোস্যালিস্ট পার্টিই সংযুক্ত বিধায়ক দলের এক্সপ্লোশন স্কোয়াড' পরিণত হবে।'

•

উত্তরপ্রদেশের ঘটনায় যাঁরা ভারতীয় রাজনীতির প্রবাহে উল্টো স্রোতের টান লক্ষ্য করেছেন তাঁরা বোম্বাই শহরে প্যারেল কেন্দ্রের উপনির্বাচনের ফলাফলেও অনুরূপ ধারা লক্ষ্য করেছেন।

এই উপনির্বাচনে প্রার্থী ছিলেন শিবসেনা দলের শ্রীবামন মহাদিক ও কম্যুনিস্ট পার্টির শ্রীমতী সরোজিনী দেশাই। শ্রীমতী দেশাই হচ্ছেন প্যারেল কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত মহারাষ্ট্র বিধানসভার প্রাক্তন কম্যুনিস্ট সদস্য কৃষ্ণ দেশাইয়ের বিধবা পত্নী। কৃষ্ণ দেশাই কিছুদিন আগে আততায়ীর হাতে খুন হয়েছেন। তাঁর মৃত্যুতেই প্যারেল কেন্দ্রের উপনির্বাচন হচ্ছিল।

এই উপনির্বাচনের গভীর রাজনৈতিক তাৎপর্য ছিল। বোম্বাই মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের নির্বাচনে উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করার পর এই প্রথম শিবসেনা দল মহারাষ্ট্র বিধান সভায় প্রবেশ করার চেষ্টায় নেমেছিল। এই প্রথম শিবসেনা দলকে সমস্ত বামপন্থী দল ও শাসক কংগ্রেসের সম্মিলিত বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। সর্বভারতীয় দলগুলির মধ্যে এক মাত্র জনসংঘ এবং স্বতন্ত্র পার্টির কয়েকজন নেতা শিবসেনা প্রার্থীকে সমর্থন করছিলেন। বিরোধী কংগ্রেস দলনিরপেক্ষ ছিল।

ভোটের ফলাফল প্রকাশিত হলে দেখা গেল, শ্রীমহাদিক পেয়েছেন ৩১৫০১ ভোট আর শ্রীমতী দেশাই ২৯৯১৩ ভোট। অর্থাৎ শিবসেনা ১৬৭৮ ভোটে জয়ী হয়েছে। প্যারেল একটি শ্রমিক-প্রধান অঞ্চল, দীর্ঘকাল ধরে এই কেন্দ্র কম্যুনিস্ট পার্টির হাতে

যুগলে স্ফিংস মিলন

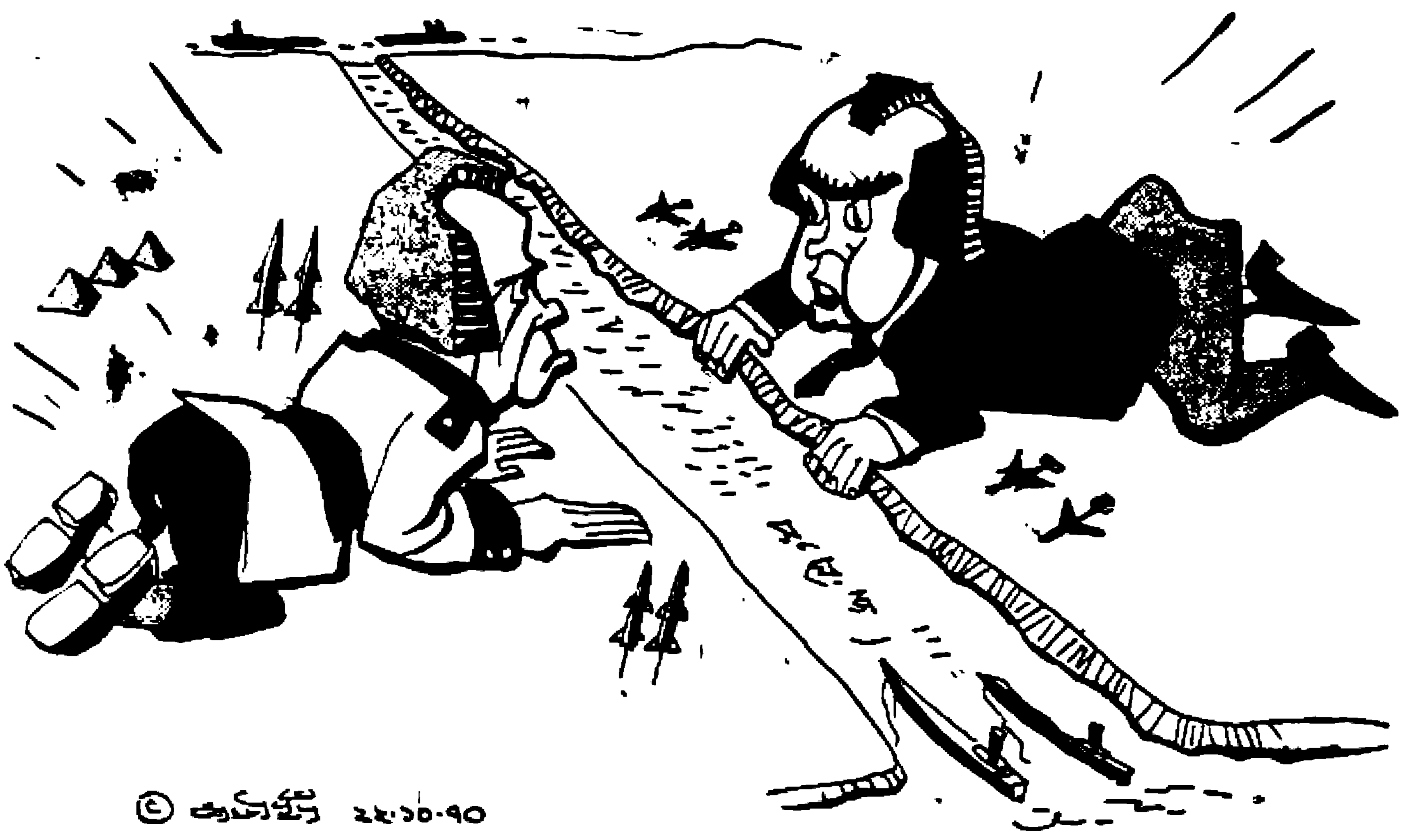

রয়েছে এবং এই কেন্দ্র বিশেষ করে কম্যুনিস্ট নেতা শ্রীডাঙ্গের বিপুল প্রভাব রয়েছে বলে বলা হয়ে থাকে। এই ধরনের একটি নির্বাচক-মণ্ডলী থেকে বামপন্থী দলগুলি ও শাসক দলের মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে মোকাবেলা করে একজন কট্টর দক্ষিণপন্থী প্রার্থীর জয়ী হওয়া একটি লক্ষ্য করার মত ঘটনা।

●

কানাডার কুইবেক প্রদেশের শ্রমমন্ত্রী ৪৯ বছর বয়স্ক পিয়ের লাপোর্ট তাঁর বন্দী দশা থেকে শেষ যে চিঠি লিখেছিলেন তাতে তিনি করুণ আবেদন জানিয়েছিলেন, তাঁর দুই ভাই মারা গেছেন, তাঁর বৃদ্ধা মা, ভগ্নীরা, স্ত্রী ও দুই কন্যা তাঁর উপর নির্ভরশীল; অতএব তাঁর জীবন রক্ষার জন্য যেন চেষ্টা করা হয়।

তাঁর সেই আবেদন নিষ্ফল হয়ে গেছে। মন্ট্রিয়াল শহরের একটি সবুজ রংয়ের শেভ্রলে গাড়ীর পিছনে মাল রাখার জায়গায় রক্তমাখা কম্বলে মোড়া অবস্থায় পিয়ের লাপোর্টের মৃতদেহ পাওয়া গেছে। ময়না তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে যে, একটা লোহার শিকল গলায় জড়িয়ে তাঁকে দম বন্ধ করে মারা হয়েছে।

হতভাগ্য লাপোর্ট এইভাবে কানাডার একটি উগ্রপন্থী বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের শিকার হন। এই আন্দোলনের সংগঠনের নাম এফ এল কিউ অর্থাৎ কুইবেক মুক্তি ফ্রণ্ট। আন্দোলনকারীদের উদ্দেশ্য হচ্ছে ফরাসী-ভাষী কুইবেক প্রদেশকে কানাডা থেকে বিচ্ছিন্ন করা। কানাডায় ফরাসীভাষীদের অভিযোগ দীর্ঘকালের। সংখ্যায় তাঁরা কানাডার মোট জনসংখ্যার শতকরা ৩০ ভাগ, অথচ শিক্ষা, জীবিকা ইত্যাদি সুযোগ-সুবিধার দিক থেকে তাঁরা ইংরেজীভাষীদের তুলনায় বঞ্চিত হয়ে রয়েছেন। ১৯৬৪ সালে রাণী এলিজাবেথ যখন কানাডা সফর করতে গিয়েছিলেন তখন সেখানকার সংখ্যালঘু ফরাসীভাষীরা রাণীর সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছিলেন। ফ্রান্সের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট দ্য গল ১৯৬৭ সালে কানাডা সফর করতে এসে স্বাধীন কুইবেক জিন্দাবাদ' ধ্বনি দিয়ে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের উৎসাহিত করে গিয়েছিলেন।

ইতিমধ্যে এই আন্দোলন যে কানাডার পক্ষে এতখানি বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে সেটা টের পাওয়া গেল এফ এল কিউ-এর সন্ত্রাস-বাদীরা এক সপ্তাহের মধ্যে পর পর দুজনকে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়ায়। প্রথমে অপহৃত হলেন কানাডায় বৃটিশ বাণিজ্য দূত মিঃ জেমস ক্রস, তারপর মিঃ লাপোর্ট। কুইবেক মুক্তি ফ্রণ্টের দাবী: সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের অভিযোগে তাঁদের দলের ২৩ জনকে সরকার আটক করে রেখেছেন তাঁদের সকলকে মুক্তি দিতে হবে, তাঁদের নিরাপদে হয় কিউবায় বা আলজেরিয়ায় পাঠিয়ে দিতে হবে এবং মুক্তি শুল্ক হিসাবে পাঁচ লক্ষ ডলার মূল্যের সোনা দিতে হবে। ঐ সব শর্ত নিয়ে একজন আইনজীবীর মারফৎ সরকারী মুখপাত্রদের সঙ্গে অপহরণকারীদের আলোচনা চলছিল। কানাডা সরকার বলেছিলেন যে, অপহরণ-কারীরা ধৃত ব্যক্তিদ্বয়কে ছেড়ে দিলে এক ঘণ্টার মধ্যে তাঁদের নিরাপদে কিউবায় পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। কানাডাস্থিত কিউবার দূতও বলেছিলেন যে, 'মনুষ্যত্বের খাতিরে' তাঁরা অপহরণকারীদের তাঁদের দেশে আশ্রয় দিতে রাজী আছেন। যে আইনজীবী ভদ্রলোক মুক্তি ফ্রণ্টের তরফ থেকে সরকারী মুখপাত্রদের সঙ্গে কথা বলছিলেন তিনি এই সরকারী শর্তকে একটা 'অবিশ্বাস্য তামাসা' বলে অভিহিত করে আলোচনা ভেঙ্গে দেন।

তারপরই সবুজ রংয়ের শেভ্রলে গাড়ীর পিছনে পিয়ের লাপোর্টের রক্তাক্ত মৃতদেহ পাওয়া গেছে। মিঃ ক্রসের ভাগ্যে কি ঘটেছে তা এখনও জানা যায় নি। তবে তাঁর কাছ থেকে সর্বশেষ যে চিঠি পাওয়া গেছে তাতে তিনি লিখেছেন, তিনি জীবিত ও সুস্থ আছেন: তবে পুলিশ যেন তাঁকে খুঁজে বার করার চেষ্টা না করে, কেননা, এই বিষয়ে পুলিশের সাফল্যের অর্থ হবে তাঁর নিজের মৃত্যুদণ্ড।

কানাডা সরকার ইতিমধ্যে সারা দেশে যুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থা সংক্রান্ত আইন চালু করে পুলিশকে অভূতপূর্ব ক্ষমতা দিয়েছেন, সেনাবাহিনীকে রাস্তায় নামানো হয়েছে এবং দেশ জুড়ে ধরপাকড় চলছে।

—শ্রীপুণ্ডরীক

CENTRAL LIBRARY

সম্পাদকীয়

চীন-ভারত সম্পর্ক

গত আট বছর ধরে চীনের সঙ্গে ভারতের সদ্ভাব নেই। এই দুই দেশের পক্ষে তো বটেই আন্তর্জাতিক দুনিয়াতেও এই অসদ্ভাব গভীর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। পঞ্চাশের দশকে চীন-ভারত মৈত্রীর বাণী প্রচার করে জওহরলাল নেহরু তাঁর বিখ্যাত পররাষ্ট্রনীতির গোড়াপত্তন করেন। পঞ্চশীল নীতির উদ্ভবও সেই সময়ে। এটা খুবই দুর্ভাগ্যের কথা যে, চীন-ভারত মৈত্রী দীর্ঘস্থায়ী হল না। তিব্বতের দলাই লামাকে মানবিকতার কারণে আশ্রয় দেওয়াই এর একমাত্র কারণ নয়। ক্রুশ্চেভের ক্ষমতালাভের পর থেকে রাশিয়ার সঙ্গে চীনের যে মতাদর্শগত বিরোধ শুরু হয় তখন থেকেই চীনের পররাষ্ট্রনীতির পরিবর্তন। ভারতের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনও চীন সে সময়েই ছিন্ন করে উগ্র বৈরীরূপ গ্রহণ করে। ১৯৬২ সালে তা প্রকাশ্য ব্যাপক আক্রমণের আকার নেয়। ভারত-চীন সম্পর্ক তখন থেকেই অচলাবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে।

শুধু ভারতের সঙ্গেই নয়, দুনিয়ার অনেক দেশের সঙ্গেই চীনের কূটনৈতিক সম্পর্ক ভাল ছিল না। চীনা বিপ্লবকে আমেরিকা কোনোদিনই মেনে নিতে পারে নি। তাই ফরমোজাকে চীনা-রাষ্ট্র বলে তাঁরা চালাচ্ছেন। আমেরিকা ও তার অনুগামীদের বিরোধিতার জন্যই চীন রাষ্ট্রসংঘের সভ্য হতে পারে নি। চীনকে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অবরোধের চেষ্টাও আমেরিকার তরফ থেকে হয়েছে। এ সমস্ত কারণ চীনের ক্ষোভ ঘটাতে পারে। কিন্তু রাশিয়ার সঙ্গে তার বিরোধের কোনো যুক্তি খুঁজে পাই না। রাশিয়া ও চীন দুই-ই কমিউনিস্ট শিবিরের অন্তর্ভুক্ত। চীনের বিপ্লবে রাশিয়ার বন্ধুত্ব ও সহযোগিতাকে অস্বীকার করা যায় না। বিপ্লব সমাধানের পর দশ-বারো বছর চীনের বৈষয়িক ও বৈজ্ঞানিক উন্নয়নে রাশিয়া অকাতরে সাহায্য করেছে। আজ সেই সহযোগিতার বদলে দুই দেশে সশস্ত্র সংঘর্ষ ঘটছে। সুতরাং চীনের বিরোধ শুধু ভারতের সঙ্গে নয়, কমিউনিস্ট চূড়ামণি, লেনিনের দেশ সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গেও।

যাই হক, প্রত্যেক দেশই তার জাতীয় স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে পররাষ্ট্রনীতির বিচার করে। চীন অতিবিপ্লবী হলেও অর্থনৈতিক কারণেই পশ্চিমী ধনতান্ত্রিক দেশগুলোর সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনে দ্বিধা করে নি। পশ্চিমী ধনতান্ত্রিক দেশগুলোও কমিউনিস্টবিরোধী হলেও বাণিজ্যের মুনাফা লুটবার জন্য চীনের বৃহৎ বাজারকে কখনো অগ্রাহ্য মনে করে নি। এইভাবেই রাজনৈতিকভাবে কোণঠাসা চীন গত একুশ বছরের বিপ্লবকে সুসংগঠিত করে আজ পারমাণবিক শক্তিধর বৃহৎ শক্তিতে পরিণত হয়েছে।

ভারতের দিক থেকে চীনের সঙ্গে সমমর্যাদার ভিত্তিতে সদ্ভাব ফিরিয়ে আনতে অনেকবারই আগ্রহ দেখানো হয়েছে। চীন এতদিন তার কোনো মূল্য দেয় নি। ভারতবর্ষের আভ্যন্তর রাজনীতি নিয়ে চীনা বেতারে অনেক কটূকাটব্য শোনা গেছে। ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের কোন অংশটা সাচ্চা, কোনটা ঝুটা তাও চীনের মন্তব্যে প্রকাশিত হয়েছে। ইদানীং যেন চীনা সরকারের তরফ থেকে এই নীতিপরিবর্তনের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। দুনিয়ার বহু দেশের সঙ্গে চীন কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করতে আগ্রহী। রাশিয়ার সঙ্গেও তার পারস্পরিক সম্পর্কের উন্নতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। তার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের সঙ্গেও স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপনে চীন সম্প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

১৯৬২ সালে চীনা আক্রমণের পর থেকে দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন না হলেও রাষ্ট্রদূত প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছিল। বহুদিন পর গত মে দিবসে পিকিং-এ এক অনুষ্ঠানে ভারতের ভারপ্রাপ্ত দূতের সঙ্গে মাও সে তুং করমর্দন করে ভারতের জনগণের সুখ ও সমৃদ্ধি কামনা করেন। এর পর থেকেই দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিক করবার একটা প্রচেষ্টা চীনের তরফ থেকে দেখা যাচ্ছে। ভারতের ন্যায্য এলাকা চীনের অধিকৃত হয়ে আছে। তা সত্ত্বেও স্বাভাবিক কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে ভারত আগ্রহী। সম্প্রতি কায়রোতে ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে চীনা উপ-রাষ্ট্রপতি মিঃ কুয়ো মো জো-র দীর্ঘ সাক্ষাৎকার হয়। কুয়ো মো জো নাসেরের অন্ত্যেষ্টিতে যোগ দেবার জন্য কায়রো গিয়েছিলেন। তিনিই ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে এই আলোচনার ব্যবস্থা করার জন্য বলেন। আলোচনার ফল আশাপ্রদ হয়েছে বলেই ওয়াকিফহাল মহলের ধারণা। চীনের সঙ্গে ভারতের স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপন এশিয়া তথা বিশ্বশান্তির পক্ষে মঙ্গলজনক হবে সন্দেহ নেই। চীন ও ভারত এশিয়ার দুই বৃহৎ দেশ যার ইতিহাস সভ্যতা ও সংস্কৃতি পারস্পরিক মৈত্রীতেই কোনদিন উজ্জ্বল ছিল। সাময়িক বিরোধ সেই মৈত্রীকে আচ্ছন্ন রেখে যে দুর্ভাগ্যের সূচনা করেছিল তার অবসান সকল শান্তিকামী মানুষেরই কাম্য। চীন তার এই আগ্রহকে কিভাবে বাস্তবে রূপায়িত করে সেটাই এখন লক্ষণীয় বিষয়।

নেই ।।

আনন্দ বাগচী

দেউড়িতে যে রোদ্র জ্বলতো প্রহরীর মত, অন্তপুরে
বিচিত্র ছায়ার অন্তর্বাস, অলঙ্কৃত শ্রোণীভার,
দেওয়ালে নিহত পশু, দম্ভের উলঙ্গ তরবারী
জ্বালা মশাল রাতে, জলসাঘরে রংমশাল
যুদ্ধে যা জুয়ায় গেছে, শুনো শেষ ফানুসের মত,
এখন মানুষ নেই, কোনোখানে মানুষের অবয়ব নেই
মাংসের ভিতরে হাড় চূর্ণ, ছায়া রৌদ্রের ভিতর,
রক্তের ভিতরে জল, হৃৎপিণ্ড স্তব্ধতার স্তূপ
দেউড়িতে হুতোম পাঁচা, কড়িকাঠে ঝুলছে দড়ি।।

চাঁদ খুন করে ।।

সুখেন্দু সরকার

এমনি এক অদ্ভুত আঁধারে তুমি ছিলে আমার পাশে
অথচ আজকের রাত তোমরা কেউ জানলে না।
এই বোবা রাতেই আমি চাঁদ খুন করে
অমাবস্যার সাধনা করেছি।
প্রপেলারের ধারায় বেঁধে আমি ওর কাটা দেহ
নুনের সমুদ্রে নিয়ে ফেলেছি।

ওর কথা ভেবে ভেবে নিশ্চুপ গাছের পাতা
পড়ে পড়ে সারা হয়ে গেছে
ওকে আর কোনদিন প্রজন্মে দেখাবো না!
সব স্মৃতি খুঁজে খুঁজে শেষ হয় আশা
শুধু কেন
পুকুরে নোঙর ফেলে সমুদ্রের ঢেউ আশা করা।

পেলে না তো ? ।।

প্রতিমা সেনগুপ্ত

ভারি জানতে ইচ্ছে করে
কি তুমি পেলে না?
'কিছুই পেলাম না জীবনে'...বলে যে আক্ষেপ করো
তার মানে কি?
কি পেলে না তুমি সারা জীবনে?
আমি যদি বলি—
আমার তিন দিব্যি করে বলো
আর কেউ যেন আমায় নিতে না পারে
তার আগে ডবল ডেকারের তলায়...
তবুও কি বলবে কিছুই পেলে না?
তাহলেও কি শোনাবে (মনে মনে)...
'যতদিন আছে থাকুক, আপত্তি কি?
তারপর চলে গেলেই হল?'......
আর চলে গেলেই শুরু করবে—
বাণী দেবে...'কিছুই পেলাম না জীবনে'......
আশ্চর্য!
ভারি আশ্চর্য!
তোমরা!

স্বদেশে-প্রবাসে

মিহির আচার্য

সন্ধ্যাবেলা আপিস থেকে ফিরে বাড়ির দরজায় পা দিতেই অমলের এখন মনে পড়ল আজ বিজয়ার আসার তারিখ। কথাটা স্মরণ হতেই অমলের নতুন করে ক্লান্তি আর অপরিচ্ছন্ন অবসাদ বোধ হল। চাকরিস্থল থেকে এই দীর্ঘ ছুটির দিনগুলোতে বিজয়ার সংসারে প্রত্যাবর্তন একটা হোঁচটের মতো সমস্ত চেতনাকে যেন নাড়া দেয়। পুরু চশমার কাচে ঈষৎ স্থূলে বিজয়ার শিক্ষয়িত্রীর ভূমিকাটুকু কঠিন বিচারকের মতো এ বাড়িতে যেন একটা অস্বস্তি রচনা করে। ঘরদোর, বিছানা আসবাব থেকে রান্নার ঘর পর্যন্ত বিজয়ার চোখে নিন্দনীয় হয়ে ওঠে।

অমলের তরফ থেকে জবাব দেবার অনেক কিছু থাকে। কিন্তু আজকাল চুপ করে উদাসীন থাকতে ভালোবাসে। বাইরে থেকে দুদিন এসে কিনা ধরছে সমালোচনার অনেক কিছু থাকে। সম্ভবত এই সমালোচনাগুলোই বিজয়ার এক ধরনের আনন্দ। কিংবা ওর কাছে সংসার মানেই এই ঘরদোর, বিছানা আসবাব, রান্নাঘর, আর কিছু নয়।

ঘরের ভেতরে পা দিতেই বিজয়া এগিয়ে এল: 'এই যে। অজ আমি আসছি জেনেও...'

অমল নিঃশব্দে বিছানায় এসে বসল।

'আমার চিঠি পাওনি?'

'কোন চিঠি?' অমল ক্লান্ত চোখ তুলল।

'বা। তুমি দিন দিন...'

'কী?'

'না। কিছু নয়। চা খাবে তো?'

'দিতে পারো। বুবু কোথায়?' নিশ্বাস ফেলল অমল।

বিজয়া ডাকল: 'বুবু, বাবা ডাকছেন।'

বুবু খাটের পেছনে জড়সড় হয়ে দাঁড়াল। কত বয়েস হল বুবুর? বারো না তেরো? আবার নিশ্বাস ফেলল অমল। বুবু, আমার মেয়ে, আশ্চর্য। ওকে কবে একদিন হসপাতাল থেকে নিয়ে এসেছিলাম। এই এতটুকু! তারপর ও বড় হল। ছ বছর? তাই বোধহয়। মার সঙ্গে চলে গেল। আরো দশজন ছাত্রীর সঙ্গে বুবুর পড়াশোনার গুরু দায়িত্বও বিজয়া একাই কাঁধে তুলে নিল। গ্রীষ্মের আর পুজোর ছুটি। অলক্ষ্যে বুবু কখন বারো থেকে তেরোয় পৌঁছে গেল।

'রোগা হয়েছিস কেন?' অমল হাসল। বুবুও। 'আচ্ছা তোর কী বাবার কথা মনে পড়ে না। যদি আর কোনোদিন ছেড়ে ছেড়ে না দিই? মা! মা থাক ওর মাস্টারি নিয়ে। অনেক ছাত্রী পাবে মানুষ করবার। সেবার তুই মিউজিয়ামে যেতে চেয়েছিলি। কালই নিয়ে যাব।'

বুবু বিব্রত হয়ে বলল: 'কাল? কাল যে মা মাসিমণির ওখানে যাবে।'

অমল হাসল। 'আচ্ছা।'

চা নিয়ে এল বিজয়া: 'কী ষড়যন্ত্র হচ্ছে তোমাদের?'

অমল বলল: 'না কিছু না।'

'তোমার আদরে...' বিজয়া বলল।

অমল বলল: 'বোসো।'

'হাঁ এখন আমার বসবার সময় কিনা! মাংস চাপিয়েছি...'

'তবু বোসো।'

'কিছু বলবে?'

'না। তবু বোসো। আমি চাটা শেষ করি।'

'তুমি না আগের মতোই আছ—'

'আগের মতো! কী জানি।' অমল অন্যমনস্ক হল। 'এবার কদিনের মেয়াদ?'

'প্রতিবার একই কথা জিগ্যেস করো কেন বলো তো?'

অমল হাসল। 'অমনি।'

বিজয়া বলল: 'কী ভাবো এত? এমন ভাবুক তো তুমি ছিলে না।'

'বয়েস হচ্ছে না? এ কিছু নয়। বয়েসের ভাবনা।'

'আমার বুঝি বয়েস বাড়ছে না?'

'আচ্ছা বিজয়া—'

'কী?'

'না। থাক।'

'সেই পুরনো অসুখ। তুমি এখনো মানিয়ে নিতে পারলে না।'

'মানিয়ে নিতে পারাটাই কী বড় কথা বিজয়া? মানিয়ে তো নিলাম, কী হল? আমাদের কথা ছেড়ে দিলাম। কিন্তু বুবু…'

'কেন? বুবু তো ভালোই আছে।'

'ও আমার কাছে লজ্জা পায়।'

'তোমার কেবল বানানো অজুহাত। বাবার কাছে আবার মেয়ের লজ্জা কী।'

'সেকথা যদি তুমি বুঝতে।' অমল নিশ্বাস ফেলল।

'এই যে দেড় মাস তোমার কাছে থাকবে…'

'দে-ড় মা-স।' অমল স্বগত উচ্চারণ করল: তুমি কী মনে করো এইটেই যথেষ্ট। তারপর, তারপর কী হবে? আমার কথাটা কে ভাববে?'

'তোমার কথা।' বিজয়া আশ্চর্য হল। 'তোমার না একা-একা থেকে একটা কমপ্লেকস গড়ে উঠেছে। তুমি…'

অমল বলল: 'সেটা কী অস্বাভাবিক? একা থাকব বলে তো সংসার করিনি।'

বিজয়া নম্র হয়ে বলল: 'প্রতিবার একই কথা বলে আমাকে অকারণ কষ্ট দাও কেন বলো তো? শখের চাকরি তো করিনে, প্রয়োজনেই…। মনে হয় আজকাল তুমি আমাকে অপরাধী করছ। অথচ যা হবার নয়।'

অমল চুপ করে রইল।

'চাকুরে মেয়ে, চাকরি করতে পারবে ভেবেই তুমি আমাকে বিয়ে করেছিলে। করোনি? আর আমার যখন কিছু ক্ষমতা আছে, বাড়িতে বসে না থেকে সংসারের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে করবই-বা না কেন।'

অমল বলল: 'তুমি কী সুখী হয়েছ?'

'কী কথা?' বিজয়া হাসল: 'নিত্য অভাববোধই বুঝি আমাদের সুখী করত। ছেলেমানুষি।'

অমল বলল: 'কী জানি, বুঝতে পারিনে, স্বাচ্ছন্দ্য না সুখ কোনটা মানুষ চায়। প্রয়োজনের রাক্ষসটা প্রতিনিয়ত হাড়মাস চিবিয়ে খাচ্ছে। আমরা যেন ঠিকভাবে বাঁচতে পারছিনে। ওখানে তোমার একটা সংসার এখানে আমার একটা সংসার, কী আর হচ্ছে? একটা স্বার্থপরতার মধ্যে আমরা দুজনেই ঘুরপাক খাচ্ছি। তোমার ব্যাংকে তোমার পাসবুকে আমার ব্যাংকে আমার, সেভিংস বাড়ছে। কিন্তু কেন? আমার ও তোমার জমানো টাকা একদিন বুবু পাবে। অথচ আজ এই মুহূর্তে, বুবু তেরোতে পা দিল, ওর জন্যে আমরা কী আদর্শ ধরে রাখতে পেরেছি? বুবু বড়ো হচ্ছে, ও যদি বলে: আমি বাবা-মা দুজনকেই একসঙ্গে পেতে চাই…। কে জানে, ওর বাড়ন্ত মনের ইচ্ছেগুলো আমাদের এই পৃথকবাসে দুরন্ত বাধা পাচ্ছে কিনা।'

বিজয়া বলল: 'তুমি একটা মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দাঁড় করাচ্ছ।'

অমল বলল: 'সেই ব্যাখ্যাটাকে তুমি উড়িয়ে দেবে কোন যুক্তিতে? প্রতিদিন বেঁচে থাকার অর্থটা সন্ধানে বুঝতে চাই। বুবুর জীবনে প্রতি মুহূর্তে তার বাবার অস্তিত্বটা কেন অবশ্যপ্রয়োজনীয় হয়ে উঠবে না? আমারও তো ওর কাছে একটা মূল্য চাই। তেরো বছর বয়েস হল ওর, কৈশোর যৌবনের সেই দুরন্ত তরুণ কঠিন নতুন অভিজ্ঞতায় সে প্রবেশ করতে যাচ্ছে।'

বিজয়া মূক।

অমল আবার বলল: 'কী করে তুমি বোঝাবে ওকে বাবার সর্বদা এই দূরে এড়িয়ে থাকার বিষয়টা? ও কোনোদিন আমাকে জিজ্ঞেস করবে না। ওর অভিমান নিজেই পাথর হয়ে দুস্তর ব্যবধান রচনা করবে। হয়তো এতদিনে এই বিষ ওর মধ্যে কাজ করছে।'

'ও জানে বাবার চাকরির খাতিরেই দূরে থাকতে হয়।'

'আমার চাকরির খাতিরের কোনো মূল্য ওর কাছে আছে? নেই। ওর ভাবতে অসুবিধে কোথায় বাবা ওকে ভালোবাসে না। স্বার্থপর বাবা একাকী নির্ঝঞ্ঝাট আরামে থাকতে চায়। ও বড় হচ্ছে বলেই ব্যাপারটা আমাকে, আমাদের নতুন করে ভাবতে হবে। নিজেদের ছেলেবেলার কথা ভাবো। আমরা আরো পাঁচটা ভাইবোনের সঙ্গে মানুষ হয়েছি, কিন্তু বুবুর বাবা আর মা ছাড়া কে আছে। আমি যতদিন বেঁচে আছি তুমি নিশ্চয় ওর বাবার ভূমিকায় একসঙ্গে অবতীর্ণ হতে পারবে না।'

বিজয়া ছটফট করে উঠল। 'যাই। ওদিকে ডাকে বোধহয়—'

অমল বিছানায় চিত হয়ে সিগারেট ধরাল। আমি কী অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছি বিজয়ার ওপর? আজকের এই অবস্থাটার জন্যে একা ওকেই দায়ী করছি? বিজয়া প্রথমে চায়নি অতদূর চাকরি করতে যেতে। ওর মনের গড়নটুকু আগে এমন ছিল না। সপ্তাহে-সপ্তাহে একবার ও চিঠি লিখত: পারছিনে। বিশ্রী ফাঁকা-ফাঁকা লাগছে। তাহলে এত কান্নাকাটি ঘেঁটে তোমাকে বিয়ে করলাম কেন! সেসব দিনে এই আর্তি কী আমার কাছে রোমান্সের মতো লাগেনি? আর, মাঝে মাঝে বিজয়ার ফিরে আসার উত্তেজনা-আনন্দ-বিচ্ছেদ-সুখের দিনগুলো। এরি মধ্যে একদিন জন্ম হল বুবুর। বুবু, এই মিলন-বিরহের অস্থিরতার ফলেই ভূমিষ্ঠ হয়েছে। তারপর একদিন ঝি মেয়েকে নিয়ে চলে গেল বিজয়া। আমি নিজেই তাদের রেখে এসেছি। এইভাবে একই নিয়মে দীর্ঘ কতকগুলো বছর নষ্ট হয়ে গেল। একবারে ছুটিতে বিজয়ার ফিরে-আসা দিনগুলো উদগ্র পিপাসার মতো আমাকে মগ্ন করে রাখত। কিন্তু কোনোদিন এই মা-মেয়ের জগতে আমার কোনো হস্তক্ষেপ ছিল না। ওরা আসত নিজের নিয়মে, যেতও তাই। আমি ওদের আবির্ভাব এবং বিদায়ে নিষ্ক্রিয় ভূমিকায় ছিলাম। যেন ওরা আমার অতিথি, আমার এই সংসারের সত্তা নয়।

অমল জানালার বাইরে অবসন্ন সন্ধ্যাকাশকে দেখল। দু-একটি বিষণ্ণ তারা। আমি কী ক্লান্ত হয়ে পড়ছি। ওরা না এলে আমার ক্লান্তির ছাপগুলি এমন করে চোখে পড়ত না। আমার সব থেকে কেউ নেই। আমি অভিশপ্ত যক্ষ। আমার অস্তিত্বের বৃত্তটা ক্রমশ ছোটো হতে-হতে আমাকে পিষ্ট করতে উদ্যত। বিজয়া কীভাবে, ওর কী কোনো ক্লান্তি নেই, অবসাদ নেই। জীবনটা কী কখনো তার কাছে অর্থহীন পীড়ন বলে বোধ হয় না। অতীতে কখনো কখনো বিজয়ার মুখে হতাশা ক্ষোভ ফুটে উঠত। স্বামীর ওপর স্পষ্ট অনুযোগও ছিল। কিন্তু… ইদানীং ওকে আর বোঝা যায় না। বিজয়া ভীষণ চাপা। অথবা ভিতরের প্রয়াসে দুঃখকে গোপন রাখবার প্রতিজ্ঞা ওর জন্মগত। আমি প্রতিবার ওকে একই কথা বলি কেন। যখন জানি কিছু হবার নয়। বহুদিন আগেই ও এ সংসার থেকে বেরিয়ে গেছে এবং সেটাই স্বাভাবিক হয়ে গেছে। আমরা কেউই সহজে এর থেকে মুক্তি পাব না। শুধু সব কথা আমি বলে যাব, আর ও শুনে যাবে।

অমল নিশ্বাস ফেলল।

বিজয়া আঁচলে হাত মুছতে-মুছতে ফিরে এল।

'বসে না থেকে চান করে নাও না। কী গুমোট গরম।'

অমল ওর দিকে শান্ত চোখে তাকাল। এতক্ষণ পর বিজয়ার পরিচ্ছন্ন বেশবাস আর ভারি দেহের ওপর মনোযোগ রাখতে হঠাৎ দিগন্তের বেদনার মতো অনুভূতি জড়িয়ে ধরল অমলকে। বিজয়া যেন স্থির, দুর্গের মতো আটকে পড়েছে। ওর প্রতি একটা আকর্ষণে অমল কেমন একটা উত্তেজনা বোধ করল। বিজয়া একটা আকর্ষণ, ওর অস্তিত্ব তাকে নিয়ত অদৃষ্টের মতো টানে। অমল ভাবল এই অদৃষ্টের টান থেকে তার কোনো অব্যাহতি নেই। বিজয়াও বিষয়টা জানে। এবং সেইখানেই সে সম্রাজ্ঞী।

অমল হাসল।

বিজয়া বাঁকা করে ভ্রূ তুলল: 'হাসছ যে?'

অমল বলল: 'আমি।'

'ওঠো না। শুয়ে শুয়ে কী কুঁড়েমি হচ্ছে?'

'বুবু কোথায়?'

'ও কী এতক্ষণ জেগে থাকতে পারে? খাইয়ে দিয়েছি। ওঘরে ঘুমোচ্ছে।'

অমল সিগারেট ধরাতে যাচ্ছিল বিজয়া বাধা দিল। 'অত সিগারেট গিলে কী হয়? ডাক্তার না তোমাকে বারণ করেছে?'

'আচ্ছা।' অমল তোয়ালে কাঁধে বাথরুমে চলে গেল। বিজয়া অমার স্বাস্থ্যের কথা মনে রাখে। সেদিন আপিসে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিলাম, বিজয়ার কী কান্না। ওহে বয়েসটা, ডাক্তার বললেন, লো প্রেসার। নাঃ ওকে বলে কাজ নেই। কষ্ট পাবে। কিংবা, কিংবা ভাববে এটাও আমার একটা করুণ আবেদন। আমাদের সম্পর্কের একটা দিকে কারুর সমঝোতা নেই। অথবা আমরা প্রশ্নটাকে এড়িয়ে যেতে চাই। বিজয়াকে খবরটা দিলে কী হবে? রাগ করবে। কেন ভালো করে ডাক্তার দেখাচ্ছনে, খাওয়া-দাওয়ার উন্নতি করছনে, নিয়মের বাড়ি ধরে চলছনে কেন ইত্যাকার উপদেশে সে আমাকে পিষ্ট করে ফেলবে। ওকে বলা বৃথা। স্বাস্থ্য পালনের নিয়ম বলতে সে ঐটুকুই জানে। অমলের বেঁচে-থাকার চেষ্টাগুলো বাস্তবিক আড়াকে বাঁধা থাকবে। ঈশ্বর বিজয়াকে সুস্থ ও নীরোগ রাখুন।

খাওয়া-দাওয়ার পর রাত্রি ঘনিয়ে এল।

অমল শয্যায় গড়িয়ে পড়ল।

বিনোদের মা রান্নাঘরে পাট চুকিয়ে বিদায় হলে বিজয়া সদরের দরজা বন্ধ করল। বুবুর মশারি ঠিক আছে কিনা দেখে এল একবার। তারপর এঘরে এসে দাঁড়াল। সজল চোখে শায়িত মানুষটিকে দেখল। বড় আয়নাটার দিকে ফিরে বিজয়া মুখে ক্রিম ঘষল। সৌরভ ঘরময় ছুটোছুটি করতে লাগল। তারপর পাউডারের কৌটো নিয়ে ভারি পায়ে বিছানায় উঠে এল বিজয়া।

'ইস কী ঘুম। একটু সরে শোও।'
অমল সরে গেল।

বিজয়ার সুবাসিত অস্তিত্বটা বক্ষমাংসপিণ্ডে অমলের চেতনায় অনিবার্য হয়ে উঠল।

'আঃ বাঁচলাম।' জড়ানো গলায় স্পষ্ট উচ্চারণ করল বিজয়া।

অমল চোখ বুজেও বলে দিতে পারে বিজয়া এরপর কী কী করবে। ওর গায়ের জামা সরানোর খসখসানি, সর্বাঙ্গময় পাউডারের ধুলো-বৃষ্টি। পাশ ফিরে অমলকে আক্রমণঃ একটু পাউডার মাখতে পারো না, গায়ে কী বিশ্রী গন্ধ...। অমল পাউডারের রেণুগুলো দেহের ওপর অনুভব করল। বিজয়াকে কী বলব আমার সাম্প্রতিক স্বাস্থ্যের কথা? নাঃ বলা যায় না। বিজয়ার ঠাণ্ডা পাথরের বেদীর মতো দেহটা। হঠাৎ অমল নিষ্ঠুর, ঈর্ষা বোধ করল। এবং আক্রোশ। পুরুষাভিমানবোধ পোষালো আবেগে থর থরে উঠল অমল। জীবনমরণের বন আকর্ষণটা তাকে মরিয়া করে তুলল।

ঘরের সবুজ আলোটা নিবোতে দেয় নি বিজয়া। এই আলোতে বিজয়ার জলভরা চোখ দুটো সাপের মতো দেখাচ্ছে। পুরু গালে তার হাসির ঢেউটা এখনো অদৃশ্য হয় নি। এমন কি সামনের সেই আধখানা ভাঙা ধারালো দাঁতটা। বিজয়ার গায়ে ভিজে মাটির সোঁদা গন্ধ উঠছে। বুবু ঘুমঘোরে হেসে উঠল।

'এই ভাবুকমশায়, তোমার ভাবনাগুলো এবার সরাও।'

'না ভাবিনি।'

বিজয়ার মাথাটা অমলের গলায়, ওর ঠোঁট দুটো স্তনের মতো নড়ছে।

'তুমি আমাকে আর ভালোবাসো না।'

'কী করে বুঝলে?' হাসির আওয়াজ।

'মেয়েরা এমনিতেই বোঝে।' ওর মুখটা অমলের কপালে, চোখে।

'কী করলে ভালোবাসা হয়?'

'জানো না'?
'না।'

বিজয়ার স্খলিত চুলের স্পর্শ অমলের নাকে, চুলের গন্ধ। বিজয়ার পীবর বাহু অমলের কণ্ঠলগ্নে। রক্তমাংসের, গন্ধের বন্যা। বিজয়ার ভিজে শরীরের ঢেউগুলো ভেঙে-ভেঙে পড়ছে। বিজয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বাইরের আকাশটা হঠাৎ নৌকোর মতো উল্টে পড়ল।

ভিজে জবাফুলের মতো বিজয়ার দেহটা নানারঙে জড়িয়ে ধরছে।

'আমি তো যেতে চাই নে। বেশ তো ধরে রাখো না...' বিড়বিড় করে বলল বিজয়া।

'তোমার চাকরি ছেড়ে দাও।'

'দেবো।'

'জয়া—'
'উঁ?'

উলটোনো ভারি নৌকোটাকে ওরা প্রাণপণে বালিভূমিতে ঠেলে তুলছে। স্বেদ-উত্তেজনা-সংশয়-বিশ্বাস ক্রমে দুলছে।

আমি কী আমার অসহায়তাকে মুছে ফেলতে পারছি? অমলের মস্তিষ্ক মৌমাছির মতো গুন-গুন করে উঠল ঃ নাকি ওই অনুভূতিটা আমাকে বিভ্রান্ত করে তাড়না করছে। অন্ধকার পেরোতে ভীতু কিশোরের মতো আমি দুর্গানাম জপছি। কে জানে আমার এই সান্নিধ্যটুকুই বিজয়াকে অন্য এক রোমাঞ্চে উত্তীর্ণ করছে। দামাল শিশুর দুরন্তপনাকে যেমন জননী উপভোগ করে। তাহলে আমি আমার নির্জন চেতনাগুলো নিয়ে একা, ভয়ঙ্কর একা। বিজয়া এতদিন পরে এসে সুদে তার পাওনা-গণ্ডাগুলো আদায় করে নিচ্ছে। আমি ওকে বাধা দিতে পারছি নে। কারণ বাধাটা আরো লজ্জার। তা হলে বিজয়া কী সবরকমে জিতে যাচ্ছে না? এইসব অন্তরঙ্গতার মুহূর্তগুলোতে? ওর প্রয়োজন মতো তাক থেকে তুলে এনে বাঁশিটাকে কে ফুঁ দিচ্ছে। বাজনাটাও ওর তৈরি। আশ্চর্য, আমি নিষ্ফল হয়ে চলেছি। যেন এরই জন্যে আমি অপেক্ষা করে ছিলাম। বিজয়া অমার অভিমানের শেকড়টা যেন এইখানেই গ্রথিত দেখেছে। পুরুষ মানুষ আর কত দূর দেখতে পায়! দাম্পত্যের কর্তব্য ছাড়া বিজয়ার নির্ভাবন মুখটা দেখতেও শরীর হিম হয়ে যাচ্ছে আমার।

অমল হতাশায় যেন চিরে যেতে লাগল।

সময়ের হিসেবে দেড় মাস আর কতটুকু আয়তন ধরে!

ঘুম ভেঙে গেল অমলের। বাথরুমে বিজয়ার স্নানের শব্দ। দীর্ঘ দশ ঘণ্টার জার্নিতে স্নান না করে নিলেই নয়। নটায় ওর ট্রেন। এখুনি হয়তো ট্যাক্সির জন্যে ও তাড়া দেবে। বুবু কোথায়? বু-বু।

অমল অলসের মতো বিছানা আঁকড়ে রইল। কাল শেষ রাত্রি। অনেকক্ষণ ওকে জাগিয়ে রেখেছিল বিজয়া। 'বছরের মাঝ-মধ্যি তো রেজিগনেশন দেয়া যায় না। মেয়েদের কষ্ট হবে। দেখো, সামনের বছরে নিশ্চয়ই...। এই রাগ করো না।' নাঃ রাগ করে নি অমল। তার চোখে আঠার মতো ঘুম নেমে আসছিল। 'শরীরের যত্ন নিও। সব সময় তোমার শরীরের জন্যে চিন্তা হয়। নাঃ একটুও ভুল বুঝবে না। দুধ বাড়িয়ে দাও। আর টনিকটা তো তোমার স্যুট করেছিল, খাও না আরো কয়েক শিশি।' খাবে অমল, নিশ্চয়ই খাবে। আর কটা মাস। তারপরই তো পুজো। দার্জিলিঙে তোমার না কোন্ বন্ধু থাকে...

'এখনো শুয়ে আছ? আটটা বাজে।'
'হ্যাঁ। উঠি।'
'চট করে মুখহাত ধুয়ে নাও।'
'হ্যাঁ যাচ্ছি।'

'বুবু বোকা পায়ে যাও। জুতোটা পালিশ করা উচিত ছিল। এত বড় মেয়ে...' বিজয়া বকতে-বকতে সুটকেসে ছাড়া জামা-কাপড়গুলো পুরে নিল। ব্যাগ খুলে টাকাগুলো দেখে নিল। 'তোমার অনেক খরচ করে দিয়েছি। এই টাকাগুলো রাখো। আচ্ছা।' আসন্ন যাত্রার উত্তেজনায় বিজয়াকে বিষণ্ণ এবং অকারণ ব্যস্ত দেখাচ্ছে।

ট্যাক্সিতে কোনো কথা নয়।

টিকিট কেটে ট্রেনে উঠে পড়ে যেন নিশ্চিন্ত হল বিজয়া।

ট্রেনটা অনেক লেট করছে। কামরার ভেতরে বিজয়া আর প্ল্যাটফরমে অমল এই স্বল্প অপেক্ষার বোঝায় যেন মুহ্যমান হয়ে পড়েছে। দুজনেই চুপ। অমল দূরের সিগনালের দিকে চেয়ে পাথর হয়ে রইল।।

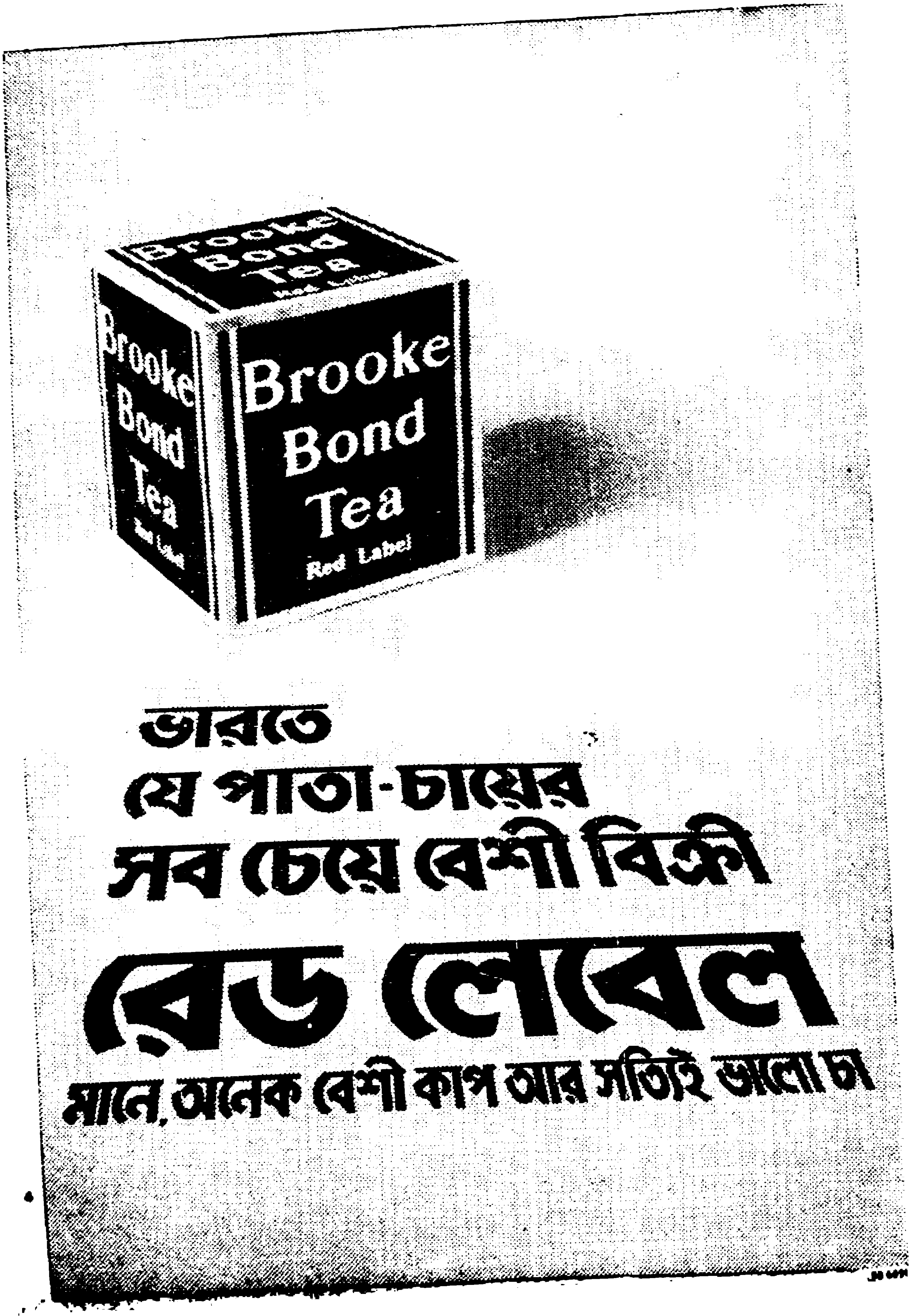
Brooke Bond Tea Red Label
ভারতে
যে পাতা-চায়ের
সব চেয়ে বেশী বিক্রী
রেড লেবেল
মানে, অনেক বেশী কাপ আর সত্যিই ভালো চা

মঙ্খের মেলা

পাগলা শশীকান্ত

পাগলা শশীকান্ত রায়—মাথায় পরিপাটি করে আঁচড়ানো সব চুল— গোঁফ-দাড়ি—চুলগুলো তার একটু কটা রঙের, লালচে—নাকখানা খাঁড়ার মতন—সুন্দর চোখ দুটোর কোণের ভাঁজ সরু হয়ে টেনে বেরিয়ে গেছে কানের দিকে—বয়স ছাপান্নর কম নয়—রঙ পাকা পমের মতন—পরণে গেরুয়া কাপড় লুঙ্গির মতন করে পরা—একো গায়ে শুভ্র উপবীত—গম্ভীর মেজাজে মোড়ের চা-দোকানের বেঞ্চিতে বসে খবরের কাগজের সম্পাদকীয় পাতার লেখাগুলো দেখছিলেন।

একটি ছেলে কতকগুলো গাছ-লতা-পাতা হাতে করে এসে তাঁর পায়ের কাছে ফেলে রেখে পাশে বসল। কাগজ পড়া শেষ হলে, ইচ্ছে হল, তাঁকে জিগেস করবে, এগুলো কী গাছ শশীবাবু?

শশীকান্ত গাছগুলো হাত বাড়িয়ে তুলে নিয়ে বেঞ্চির ওপরে রেখে দিলেন—পায়ের কাছে নয়—অবজ্ঞা করা হয়।

কাগজটা রেখে দিতে ছেলেটা শুধোলে, 'এগুলো কি কি গাছ বলে দিন তো শশীবাবু?'

'তোমার নাম কি?'

'নির্মলেন্দু সরকার। অমিয় সরকারের ছেলে। এই গাঁয়েই বাড়ি।'

'কি করো?'

'কলেজে পড়ি আর এমনি নিজেদের ক্ষেতখামারে কাজ করি।'

'তোমার হঠাৎ গাছ-গাছড়ার নাম জানবার বাতিক হল কেন?'

'বাতিক ঠিক নয় স্যার, পাশাপাশি আছি, ওদের পরিচয় জানব না?'

'হুঁ। শোনো এটা মুক্তোঝুরী গাছ, এটা আপাং, এই গাছগুলো কিনা কনকনি, ইঁশিরি, ভুঁই-কুমড়ো, বড়-গোপানন, নিমুখী এইটা ওরে শালা, এযে জল-বিছুটি! তুই বাবা তামাসা করতে চাস? এটা গায়ে লাগলে যে কিটোবে—আর ধুলে আরো বিপদ! একটুখানি লাগিয়ে দেখ—'

বলেই কিনা শশীকান্ত ছেলেটার হাতের এক জায়গায় ঘষে দিলেন!

কিছুক্ষণ বসে থাকবার পর নির্মলেন্দু বললে, 'চিড়িং' 'চিড়িং' করছে। শোঁয়াপোকা লাগলে যেমন জ্বালা করে আর কিটোয়। জল দিয়ে কি দেখবো?'

'দেখ—আরাম পাবিখন: গোবর লাগালে আরো।'

জল লাগালে নির্মলেন্দু। বললে, 'এযে ফুলে গেল—ভীষণ কিটুচ্ছে—কি দিলে ভাল হবে?'

'কি দিলে ভাল হবে? তুলসী গাছের মতন সর্বাঙ্গ লাল একটা গাছ দেখেছিস, বেড়া হয়, বাবুরা বাগানে সুদৃশ্য কেয়ারী করে—গাছটার নাম বেলেডোনা গাছ—তার পাতার রস দিলে শিঙিমাছের কাঁটা মারার যন্ত্রণা ভাল হয়ে যায়। ভীমরুল, বোলতা, মৌমাছি কামড়ালে বেলেডোনা গাছের রস দিলেই সেরে যাবে।'

'সে গাছ আমাদের আছে, ঠাকুর-দা বসিয়ে রেখেছেন 'খাটকুলোর' কাছে—আমি জানি। এই বোমকেদার, নিয়ে আয় তো কুকুর-দৌড় দিয়ে গিয়ে।'

বোমকেদার বকসী এক ছুটে গিয়ে নিয়ে এল গাছটার কতকগুলো পাতা।

CENTRAL LIBRARY

শশীকান্ত পাতাগুলো নিয়ে কর-জোড়ে নমস্কার করে হাতের তালুতে ঘষে ঘষে রস বার করে বিদ্‌ঘুটেলাগা জায়গাটিতে লাগিয়ে দিলেন। ব্যস, আরাম হয়ে গেল!

একটি অন্ধ লোক বললে, 'ঠাকুর-মশায় অমের মাথায় তালুতে শুধু যন্ত্রণা হয়—একটা যেন দাহ—কিছু ওষুধ দিতে পারো?'

'মাথায় খানিকটা গোবর নিয়ে বসে থাকলে যা বেটা—অথবা ঘৃতকুমারীর পাতার শাঁস মাথায় দিও বা। কিম্বা এটা মোরেল পাতাকে বেটে লাগালে পরে তা পাতার মতন জমে গেলে মাথায় দে রোজ। আর তোর পিত্তি পড়ে। রোজ খালি পেটে এক বাটি করে ছিপের রস খা। ছাগল-দুধ খাবি।'

একজন পাগলাঠাকুরকে খ্যাপাবার জন্যে বললে, 'গাধার দুধ খেলে কি হয় ঠাকুর?'

'তোর মাসির একশিরে ভাল হবে শালা? —কেন গাধার দুধ খেলে কি রোগ সারে না—বসন্তরোগ সেরে যায়।'

নির্মলেন্দু শুধোলে, 'আপনি কি সব বৃক্ষ গাছ চেনেন?'

'অনেক চিনি—সব চিনি না। কেউ তা জানে না।'

'ভগবান জানেন তো?'

'ভগবান' শব্দের অর্থ তুমি জান?'

'সাধু।'

'না, ঐশ্বর্যবান। তাঁর ঐশ্বর্যের খবর তিনি অবশ্যই রাখেন। ভগবান সম্বন্ধে যারা কটাক্ষ করে আধুনিক বা সংস্কারমুক্ত হবার লক্ষণটা কিন্তু নির্বোধদের। নির্বোধরা নিজেদের চাইতে বড় অন্য কিছু আছে ভাবতেই পারে না। তুমি রবীন্দ্রনাথের নিন্দে করে তাঁর সমালোচনা করছ, তুমি কি তাঁর চাইতে বড়? ইডিয়ট?'

নির্মলেন্দু বললে, 'ভক্তি বা শ্রদ্ধার মধ্যে সচেতন কিছু সন্দেহ থাকা কি ভাল নয়?'

'ভাল কেবল স্বার্থপর লোকের জন্যে। আমার জন্যে নয়। আমি পুরোপুরি বিশ্বাস করেও ঠকতে রাজি। কবির কথা, মানুষের ওপর বিশ্বাস হারানো পাপ।'

'ভগবান তাহলে আছেন?'

'আছেন বৈকি। তিনি হলেন প্রাণ, গতি, শক্তি। তোমার অপরিণত বয়স, অপরি-পূর্ণ মন তাই একমাত্র জাগ্রত কথা ছাড়া দ্বিতীয় কিছু অর্থাৎ সন্দেহ, ঘৃণা বা তাদের ভাবনায় বীতস্পৃহ হবে কেন? এখন খেয়ে যাও—শিখে যাও—দেখে যাও—তবে মন্দ কাজের প্রতি আসক্তি রাখবে না—মন্দ খাবা খেলে শরীরের ক্ষতি করে যেমন মন্দ চিন্তাতেও তেমনি মনের স্বাস্থ্য পণ্ড করে।'

অনন্ত বোবাটা শুনছিল বামুন। তাঁর বরাবরটা একটু কুঁচ-কালে। বললেন, 'মনের আবার স্বাস্থ্য—বোঝ ঠেলা— পাগলের আর কাণ্ড কত!'

শশীকান্তর চোখে বিদ্যুৎ খেলল। বললেন, 'স্বাস্থ্য যেমন তোমার আছে অনন্ত, মনেরও আছে। অনন্ত মানে যার অন্ত নেই। তুমি কেমন অনন্ত। তোমার আবার স্বাস্থ্য কেন?'

'আমি যে মানুষ!'

'তুমি মানুষ? তুমি অনন্ত—তাই বুড়ো মাকে ভাত দাও না—কোনখানটাতে তোমার মানুষ দেখাতে পারো? তোমার মা এসে আমার কাছে কত কাঁদে। আহা, সন্তান ধারণে কত কষ্ট তা তুমি জানো না অনন্ত—তোমার মাকে আমি রোজ প্রণিপাত হয়ে পুজো করি—তাই মাও আমাকে স্নেহ করেন—সন্তান দুঃখ পায় এমন তিনি কিছু বলবেনও না, করবেনও না। তুমি মায়ের শ্রদ্ধা হারিয়ে এখন অভিযোগ করলে তো হবে না যে মা অন্যায় করেন, অন্যায় বলেন। যা দেবে তাই ফিরে পাবে। আমার সঙ্গে যেমন ব্যবহার করবে তেমন ব্যবহার পাবে—তার চাইতে ভাল ব্যবহার আশা করলে পাবে কোথায়?'

লোকজনরা চারদিকে জটলা করে দিয়ে দুলে-দুলে জলালে। শশীকান্ত বললেন, 'এই জল ছিটোনো এরা সংস্কারের মতন অর্থ না বুঝে ছিটোয়—এর অর্থ হল ধুলো উড়বে না। ধুলোটা হল শালগাছের আঠা—ওর গন্ধে কলেরা ইত্যাদি রোগের জীবাণু মরে যায়। সুঘ্রাণও লাগে। সেটা ফুসফুসে গেলে সর্দির মধ্যে যদি বিষ থাকে ধ্বংস হয়। মুনি-ঋষিরা ভেবেচিন্তে মানুষের মঙ্গলের জন্যে এসব বিধান দিয়েছেন।'

চাষীবাসীরা পাগল শশীকান্তর কথা শোনে। পাগলাবাবাকে সবাই 'ছেন্দামানি' করে। হঠাৎ তিনি বাউল সদানন্দকে দেখে বলে ওঠেন, 'ও বাবা সদু, একটা গান শোনা না বাবা—তোর গান তো রেডিওতেও বাজে'—

বাউল বললেন, 'আমার এখন মুড নেই ঠাকুর।' গর্জে ওঠেন শশীকান্ত, 'মুড নেই! শালা বাউলের গায়ে আতরের গন্ধ! ছুঁড়িদের গান শেখাতে যাচ্ছে। দে তোর একতারাটা—আমি গান গাই।'

চুলে চুড়োবাঁধা আধুনিক আলখাল্লা-ধারী সদানন্দ বাউল তাঁর একতারাটা দিতে না চাইলেও শশীকান্ত ছিনিয়ে নেন। তার-পর বেহালে সুর ধরে দেন। তাঁর গলা ভাল। বেশ মাজাঘষা। লোকজন তাঁর গান শোনে। গান শেষ হলে বলেন, 'অহংকার করো না সদু, তোমার এত সুখ্যাতি, হঠাৎ একদিন যদি গলাটা ধরে যায়?—স্বর আর না ফোটে—তখন?'

সদানন্দ কটাক্ষ হেনে যান অকস্মাৎই উঠে চলে গেলেন। সম্ভ্রান্ত ভদ্রপল্লীর ধনী বাড়ির সুন্দরী কন্যাদের বাউল শেখাতে যান তিনি—দেশ-দেশান্তরে নাকি গানের দল নিয়ে ঘুরে বেড়ান।

শশীকান্ত বলেন, 'সোনার তো কদর হবেই। তবে কিনা এক সাধু একটি ফুলের মালা পরা বেশ্যাকে দেখে বলেছিলেন, ভগবানের কি রসবোধ, নর্দমাকে সাজিয়েছেন ভেলভেট দিয়ে!'

নির্মলেন্দু বলে ফেললে, 'আপনি কি ওঁকে ঘৃণা করলেন?'

'সে ওঁর ব্যবহারকে। উনি গুণী মানুষ—গুণী মানুষের বিপদ হল সে যখন অহংকারী হয়।'

'তো সময়ের দাম নেই, এখন যদি ওঁর ঠিক নটার মধ্যে হাজিরা দেবার কথা থাকে!'

'বল তুই, ঠিক বলেছিস। শিল্পীর সময়ের দাম অনেক—নষ্ট করতে নেই। কিন্তু ওঁর মুড নেই : সৌখিন কথাটা সইতে পারলাম না। কে জানে, বেচারা মনে কষ্ট পেলেন কিনা!'

নির্মলেন্দু বললে, 'আচ্ছা, ওসব কথা থাক—আধ্যাত্মিক সুফী-রসের একটা গল্প শোনান—সেটা আমার মনে যেন সারাদিন বাঁশির মতন বাজতে থাকে। আপনি তো অনেক জানেন—মুড নেইও বলবেন না।'

'শোনো। সুফি সাধকদের নাম শুনেছ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, সুফি সম্প্রদায়? যাঁরা গুরুবাদ মানেন? শুনেছি বইকি, খুব শুনেছি।'

শশীকান্ত বললেন, 'তবে রে বেটা, তুই ভগবান আছে কিনা জিগ্যেস করছিলি আগে? তাই বলছিলাম, যারা অপরিপূর্ণ তারা ওসব বলে। তারা বোকা, হাঁদারাম। সব ধর্মেই ভাল জিনিস, ভাল কথা, দর্শন কাব্য আছে, সেই সাধক কবির কথাই বলি, এমন মানব জনম রইল পতিত আবাদ করলে ফলত সোনা! আবাদ করো, ফসল পাবে। এ ফসল লুঠ করে, জোর করে নিশান পুঁতে দখল করা যায় না গো!'

'আচ্ছা আপনি এত ভাল লোক এত জানেন, তবে আপনার স্ত্রীর সঙ্গে বনল না কেন, জানতে বড় আগ্রহ হয়।'

শশীকান্ত রায় তাঁর পটল চেরা চোখ মেলে খানিকক্ষণ গম্ভীর মেজাজে নির্মলেন্দুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। আস্তে আস্তে বললেন, 'তুমি কি জানো নরনারীর প্রেম কি জিনিস?'

নির্মলেন্দু চুপ করে রইল।

'বলো, লজ্জা কি?'

'কলেজের একটি মেয়ের সঙ্গে আমার ভালবাসা হয়েছে—তবে দৈহিক সম্পর্ক হয়নি শশীবাবু।'

'হুঁ! তাহলেও কিছুটা বুঝবে। সত্যি নয়। স্ত্রীর রুচি যদি কাকের মতন হয়—যদি তোমার ভালবাসার সেই মেয়েটি বলে, ওগো তোমাকে ছাড়া আমি আর কাকেও স্বপ্নেও ভাবি না, আর গোপনে কদাপাত্র চাটে—তুমি কি বলবে না—ছি—এসব করতে নেই! মানুষ কুকুরের মতন হবে কেন?'

'হয়তো আপনার মধ্যেও কোনো কিছুর অভাব ছিল।'

'বোধহয়। ভগবান জানেন। তিনি ঐশ্বর্যময়, জানি না তিনি কোন্ ঐশ্বর্যের ঘাটতি রেখেছিলেন আমার মধ্যে। তবু সে মেয়েই চেয়েছিল বোধহয়, কেন না, আমার নির্দেশ ছিল আমার মাকে কখনো কটু কথা বলবে না। সে কিন্তু একদিন ঝগড়া করার পর আমার মায়ের চুলের ঝুঁটি ধরে নাড়া দিয়ে কাপড় চোপড় পরে নিয়ে বাপের বাড়ি চলে যায়—আমি আর তাকে

আনতেও যাইনি—সে আসেও নি। শুনি নাকি তার একটা বাচ্চা হয়েছিল—সে এখন অনেক লেখাপড়া শিখে ব্যারিস্টার হয়েছে।'

'ছেলেকে আপনি আলো দেখেন নি?'

'না।'

'স্ত্রীর সঙ্গে দেখা হয়নি আর কখনো?'

'না।'

'স্ত্রী চলে যাবার পর থেকেই আপনি পাগল হয়ে গেলেন?'

'পাগল! কোন্ শালা বলে? আমি চাষ আবাদ করাই, খড় গুনে বেচে দিই, বাঁশ বেচি, একটা গাই গরু আছে, খড় কুঁচিয়ে দিই, সেবা করি, দুধ দুই নিজে—মা কত কাঁদেন আর সংসার করলাম না বলে'—

'আপনার ছেলেকে দেখতে ইচ্ছে হয় না?'

'আমার ছেলে?'

'তবে?'

'আমার ছেলে নয়। আমার স্ত্রীর। আমার হলে, আমার কাছে আসত।'

'যদি আমি আপনার ছেলেকে আনতে পারি?'

'তুমি?'

'হা। আপনার ছেলে আমাদের একজন প্রফেসার কবির বন্ধু। তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছে। তিনি আসতে চান। এদিকের গ্রামের নাম তাঁর জানা আছে শুনে আশ্চর্য হই। তিনি বলেন, মামণি আমাকে বলেছেন: বাবা নাকি সাধু অথবা পাগল হয়ে এই গাঁয়ে আছেন। আমি বলেছি এই গাঁয়ের পাশেই আমাদের গ্রাম। আপনার বাবার কি শশীকান্ত রায়? বললেন, হাঁ। কি অসীম আগ্রহ তাঁর আপনাকে দেখবার।'

শশীকান্ত নির্মলেন্দুর হাত ধরে উঠে পড়লেন। পথ ধরে অনেকখন হাঁটতে লাগলেন।

তাঁর চোখ থেকে জল ঝরতে লাগল। তিনি কাঁদতে লাগলেন।

নির্মলেন্দু কোনো প্রশ্ন করলে না।

কাঁদুন উনি।

এক সময় শশীকান্ত বললে, 'না খোকাকে তুমি এনো না। তার মা শুনলে মনে কষ্ট পাবে।'

'স্ত্রীর উঞ্ছবৃত্তি সম্বন্ধে আপনি যা বললেন তখন, তাঁর সম্বন্ধে আপনি কি সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ?'

'না। সেইটাই তো আমাকে পাগল করে দিয়েছে রে নির্মল। আমিই বোধহয় সন্দেহপরায়ণ ছিলাম। স্ত্রীকে এত বেশি ভালবাসতাম যে অন্ধের মতন ছিলাম—কেউ কথা বললে, তার সঙ্গে মাখামাখি করলেই চটে যেতাম। মনে করতাম আমার সন্দেশটার বুঝি কাকে ঠোকর দিলে! আর আমার স্ত্রী ছিল ভয়ানক সুন্দরী। আমার ছোট-ভাইটা তার বড় ন্যাওটা ছিল। স্ত্রী চলে যেতে ভাইকে বলি যে তুই বৌদিদির সঙ্গে গর্হিত পাপে লিপ্ত। শুনে সে সেই রাত্রেই গলায় দড়ি দিয়ে মারা গেল! এত সব ঘটলে কোন্ শালাই বা আর না পাগল হবে?' স্বরভঙ্গ হয়ে গেল শশীকান্তর। কাঁদতে লাগলেন। বললেন, 'না, খোকাকে আনিস না—যেটুকু পাগল হতে বাকি আছে—হয়ে যাবে আবার কোথায়?'

নির্মলেন্দু বললে, 'পাগল হতে হলে পুরোপুরি হওয়াই তো ভাল শশীবাবু।'

শশীকান্ত হঠাৎ মহা চটে গেলেন, 'দূর শালা ছোকরা, তুই শালা বেরো! আমি এই নির্জন গাছতলায় বসে থাকি নরম ঘাসের ওপরে। আমি নির্বান্ধা হতে চাই। শালারা যত সব জ্বালাতন!'

নির্মলেন্দু হাসতে হাসতে চলে গেল। ও'র ছেলেকে একদিন সে ও'র কাছে এনে হাজির করবেই।

পাগলা শশীকান্ত তখন গান ধরেছে:

'জীবন যখন শুকায়ে যায়
করুণা ধারায় এসো!'

—আবদুল জব্বার

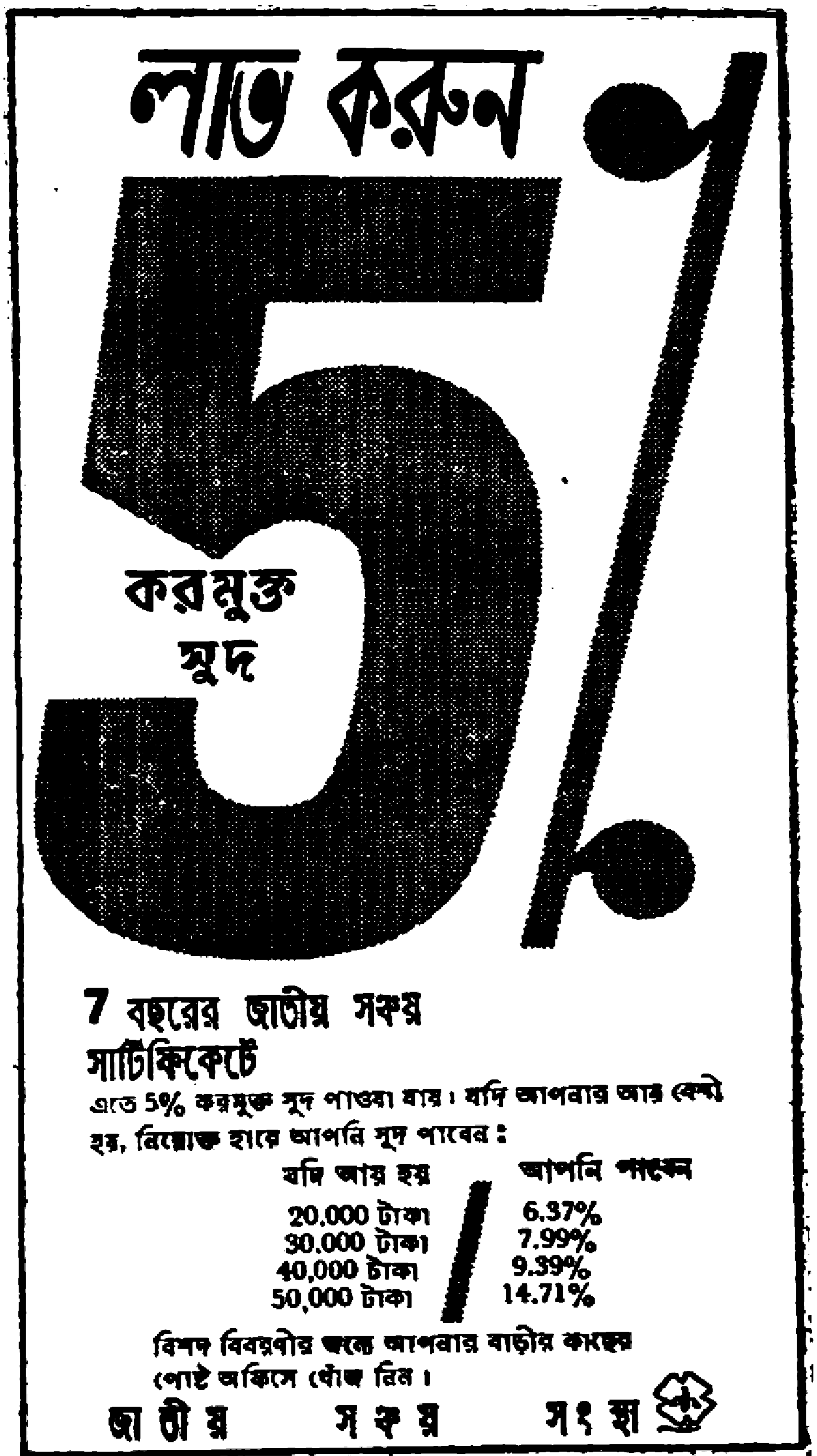

70/365

কেউ পছন্দ করেন
পাউডার

কেউ করেন পেস্ট

কিন্তু সকলেরই এক কথা—
মাজন হওয়া চাই—
ডেন্টনিক

দাঁত ঝকঝকে ও
মাড়ি সুস্থ রাখতে
ডেন্টনিক অদ্বিতীয়।
তাই এর ব্যবহার
দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে।
আপনার দাঁতের
যত্নের জন্য ডেন্টনিক
পাউডার বা পেস্ট
ব্যবহার করুন।

বেঙ্গল কেমিক্যাল এ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিঃ
কলিকাতা - বোম্বাই - কানপুর - দিল্লী - মাদ্রাজ

KALPANA/D.I.B.

তুলসীচরিত

ননীষবির চৌধুরী

(৪)

অশোকের দ্বিতীয় ইনস্টলমেন্ট।

যেখানে যাই গাঙ্গুলী ড্রাগের কথা। ড্রাগস ব্যবসায়ী মহলে, কেমিস্ট মহলে, চিকিৎসক, ছাত্রছাত্রী মহলে নূতন ওয়ান্ডার ড্রাগের কথা।

যে যা বলে কান পেতে শুনি, আশায় থাকি যদি কোন সূত্র মিলে যায় যে সূত্র ধরে ঠিক জায়গায় পৌঁছোবার চেষ্টা করা সম্ভব।

কেউ বলে বেদের সোমরস খুঁজে পেয়েছেন প্রোঃ গাঙ্গুলী, হিমালয়ে মেলেনি, হিন্দুকুশ পর্বতে খুঁজে পেয়েছেন সোমলতা। কেউ বলে আফিংয়ের রস রিফাইন করা। আফগানি মশলা মেশানো, কি ফাইন টেস্ট দেখেছিস? কেউ বলে গাঁজার এক্সট্রাক্ট, কেউ বলে সিদ্ধির এক্সট্রাক্ট। কফি হাউজের মিশ্র মক্কেলরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিলেন। ড্রপার দিয়ে এক ফোঁটা জিভেতে লাগাতে হয়, বাস, সুপ্রামেন্টাল ওয়ার্লডে পুরো আট ঘণ্টার ট্রিপ। মার্ভেলাস কথা সব মনে আসবে, তুরীয়ানন্দের মধ্যে ভেসে বেড়াবে। কানের কাছে রবিশংকরের সেতার শুনবে, শুনবে ওম তৎ সৎ, তত্ত্বমসি।

চিকিৎসক, কেমিস্ট, সাইকিয়াট্রিস্ট মহলে শুনি আসলে এটা বডি থ্রিলার, Clan বাড়ায়, সেন্স অব ওয়েল বীয়িং বাড়ায়, অন্য বডি থ্রিলার ড্রাগ থেকে তফাৎ এই যে এই ড্রাগ মনের সক্রিয়তা চরমে নিয়ে যায়, ইট স্টিমুলেটস দি মাইন্ড টু দি হায়েস্ট ডিগ্রি। লাফালাফি করবার ইচ্ছা জাগায় না, আর সব চাইতে বড় কথা এফেক্ট শেষ হলে অবসাদ আসে না। একজন বললেন, ইট গিভস ইউ এ ট্রিপ টু দি ওয়ান্ডারল্যান্ড অফ অ্যালিস। আট ঘণ্টা আরামচেয়ারে বসে থেকে ওয়ান্ডারল্যান্ডে বেড়িয়ে বেড়াবে। তারপর টুপ করে নিজের জগতে ফিরে আসবে।

গাঙ্গুলী ড্রাগের সম্বন্ধে ব্রিটিশ মেডিকেল জার্নালে, জার্নাল অব কেমিস্ট্রি, মেডিকেল এসোসিয়েশনের কাগজে প্রবন্ধ বেরিয়েছে।

কীর্তি বাড়ছে দেশ-বিদেশে।

সমাজকল্যাণ-কামীরা, সনাতন ধর্মরক্ষাকারীরা সরকারের ওপরে চাপ দিচ্ছেন জাতির জনকের দোহাই, এই নয়া উৎপাত গাঙ্গুলী ড্রাগ বিক্রি বন্ধ করো।

কলকাতা চষে ফেললাম ওয়ান্ডার ড্রাগের আবিষ্কারক প্রোঃ পি এন জি'র পায়ের ধুলো নেবার জন্য। কোথায় উধাও হলেন তিনি?

দুবছর হল বাড়ী ছেড়ে চলে গিয়েছেন তিনি শুনলাম, বাড়ীটা স্ত্রীর নামে লিখে দিয়ে। কোথায় আছেন এখন বাড়ীর কেউ, ছেলেমেয়েরা, স্ত্রী কেউ জানেন না বললেন। কলেজের চাকুরি এক বছর হল ছেড়ে দিয়েছেন। কেমিক্যাল, ফার্মাসিউটিকেল কোম্পানীর রিসার্চ লেবরেটরীর দুটো দারোয়ান টিপস পেয়েও ভেতরে ঢুকতে দেয় না, কেবল জবাব দেয় গাঙ্গুলী-সাব নোকরি ছোড় দিয়া।

একজন স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, পুত্রবধূ, নাতি-নাতনীওয়ালা মধ্যবয়স্ক, হঠাৎ বিখ্যাত ব্যক্তি এভাবে হাওয়া হয়ে গেলেন? মনে পড়ল তাঁর স্ত্রী একটু হিন্ট দিয়েছিলেন, উনি গেরুয়া নিয়ে হিমালয়ে চলে গিয়েছেন বোধহয়। অসম্ভব কথা। চিরকালের অভাবী মাস্টারমানুষ, টাকা আসছে ছপ্পর ফুঁড়ে, এই কি হিমালয়ে যাবার সময়? চিন্তা করতে লাগলাম ধর্মভাবের কোন পরিচয় আকারে ইঙ্গিতে প্রকাশ করেছেন কি? স্বল্পভাষী কেমিস্ট্রির অধ্যাপক, ভালমানুষ বোঝা যেত, ভক্তমানুষ কিনা বোঝা যেত না।

কোন পাত্তা মেলাতে পারলাম না।

এই ক'বছরের মধ্যে আমার অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়ে গেল। শেয়ারবাজারে উপরি উপায় ক'টা মার খেয়ে যা করেছিলাম সব গেল। স্ত্রীর বেনামিতে করা ছিল বলে ছোট বাড়ীটা কোনমতে বেঁচে গেল। বড় বাড়ীটা, গাড়ী, রেফ্রিজারেটর, রেডিয়ো সব কিছু গেল দেনার দায়ে। মানে একেবারে গরীব হয়ে গেলাম আমি। ছোট বাড়ীর অর্ধেকটা ভাড়া দিতে হল, পেট চালাবার জন্য এক মাড়োয়ারী ফার্মে সামান্য মাইনের চাকুরি নিতে হল।

পথচারীদের পায়ের ধুলো খাওয়াতাম এতকাল গাড়ী ছুটিয়ে, এখন নিজে পেটভরে পথের ধুলো খেতে খেতে হেঁটে বেড়াতে লাগলাম রাস্তায় রাস্তায়।

অনেক কষ্ট করে দশ পাঁচ টাকা সঞ্চয় করছিলাম মাঝে মাঝে আবার লাক ট্রাই করব বলে। যে বাজার পড়েছে পুঁজি বাড়বে কি পুঁজি ভাঙাতে হয় মাঝে মাঝে।

দুঃখ-কষ্টের স্রোতের মধ্যে দিয়ে ক'টা বছর কেটে গেল, চুলে পাক ধরল অকালে।

একটা ছুটির দিনে শহরতলির একটা জায়গায় গিয়েছিলাম কোন কাজে। তাড়াতাড়ি ফিরছিলাম বাসের রাস্তায় পৌঁছবার জন্য; সামনাসামনি দেখা হয়ে গেল প্রোঃ পি এন জীর সঙ্গে।

গড় হয়ে প্রণাম করে পায়ের ধুলো মাথায় দিলাম, কেমন আছেন মাস্টারমশাই?

(৫)

আমার দ্বিতীয় ইনস্টলমেন্ট।

দেবাশিসের সঙ্গে কথামত সন্ধ্যা আটটার সময় তাদের বাড়ীতে গেলাম তার বাবার সঙ্গে কথা কইতে।

ইস্ট ইন্ডিয়া করপোরেশনের কর্তা মিঃ এন সি ভাদুড়ী নামকরা বড়লোক, প্রতিপত্তিশালী লোক জানতাম। দেখলাম ধনবানের মত বড় বাড়ী, রুচিবান বড়লোকের মত সাজানো।

একটু বিস্মিত হলাম যখন দেবাশিসের সঙ্গে বৈঠককে সাজানো ঘরে ঢুকতে তিনি উঠে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা করলেন, নমস্কার করে বসতে বললেন, আমি না বসা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে রইলেন। কথাও বললেন বাংলায়।

বললেন, দেবাশিস আপনার কথা বলেছে আমাকে। সে নিজে যখন আপনাকে খুঁজে বের করে বাড়ীতে এনেছে বেশী কথা অনাবশ্যক। দেবাশিস কেমিস্ট্রিতে অনার্স নিয়ে বি এসসি পড়ছে, কেমিস্ট্রির কোন একটা বিভাগে স্পেশালাইজ করতে চায়। পড়াশোনায় সে ভাল। আশা করি আপনার বিশেষ অসুবিধে হবে না তাকে নিয়ে।

তারপর প্রশ্ন করলেন, সপ্তাহে ক'দিন পড়াতে পারবেন?

বললাম, তিন দিন, দরকার হলে চার দিন পারব।

বেশ, সপ্তাহে চার দিন আসবেন। পড়াবার ব্যাপার রুটিনের মধ্যে আবদ্ধ না রেখে বিভিন্ন বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের উন্নতির সম্বন্ধে কথাবার্তা বলবেন যাতে ছাত্রের সায়েন্টিফিক আউটলুকে বিকাশের সাহায্য হয়।

আচ্ছা, সে চেষ্টা করব।

আপনার বেতন এখন দু'শো টাকা হলে অসুবিধে হবে কি?

বললাম, না, চলে যাবে।

দেবাশিসের মা এলেন ঘরে। মিঃ ভাদুড়ী পরিচয় দিয়ে বললেন, প্রোঃ গাঙ্গুলী দেবাশিসকে পড়াবেন কাল থেকে, ইনি দেবাশিসের মা।

নমস্কার বিনিময় করে একটু তাকিয়ে দেখলেন।

দেবাশিসকে বললেন, তোমার পড়বার ঘরে নিয়ে গিয়ে মিনিট পনেরো আলাপ করো। একটু চা খেয়ে যাবেন প্রোফ গাঙ্গুলী। উঠে দাঁড়ালেন।

হাত জোড় করে বললাম, রাত হয়েছে, এখন কিছু খেতে চাইনে।

বললেন, আচ্ছা, থাক তবে।

দুজনকে নমস্কার করে বেরিয়ে এলাম দেবাশিসের সঙ্গে।

পরদিন থেকে কাজে লাগলাম।

দেবাশিস আমার প্রাইভেট টিউটরের জীবনের শেষ ছাত্র। প্রায় তিনটি বছর তাকে পড়িয়েছি। এম এস সি ক্লাসে ভর্তি হয়ে কমাস পরে বিলাতে চলে গেল সে।

এই তিন বছরে তার বাবা, মা, পরিবারের আর সকলের সম্বন্ধে যে সব খবর পেয়েছি দেবাশিসের কাছে এখন সে সম্বন্ধে কিছু বলব না, শুধু জানিয়ে রাখতে চাই তার মা ধর্মচর্চায় খানিকটা সময় কাটাতেন প্রতিদিন এবং তাঁর একজন গুরুদেব ছিলেন।

বাইরটা দেখে ভেতরের কথা অনুমান করতে গেলে কতটা ভুল হতে পারে দেবাশিসের ইতিহাসের যতটা দিতে পারছি এখন তা থেকে বোঝা যাবে। ভদ্র, বিনয়ী, বুদ্ধিমান, অতি সুদর্শন ছেলে দেবাশিস, তাকে প্রথম দেখে এই ধারণা হয়েছিল, এবং এ ধারণা পরিবর্তন করবার কোন কারণ ঘটেনি তিন বছর তাকে পড়াবার সময়ে। পড়াশোনা সে মন দিয়ে করত। দুচার মাস যেতে বুঝতে অসুবিধে হল না যে, কোন প্রাইভেট টিউটর না রাখলেও ভাল করে পাশ করতে তার আটকাবার কথা নয়।

প্রায় এক বছর কেটে গেল রুটিন মত পড়াশোনায়। দেবাশিসের মত ছাত্র পেয়ে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করলাম। দ্বিতীয় বছরে পড়াশোনায় খানিকটা সময় দিয়ে বাকী সময়টা সে অন্য নানারকম প্রসঙ্গের আলোচনায় ব্যয় করতে আরম্ভ করল দেখলাম। রোজ নয় মাঝে মাঝে এ আলোচনা হত। এই সব আলোচনার মধ্যে দিয়ে দেবাশিসের আরেকটা চেহারা ক্রমে পরিস্ফুট হতে লাগল। সে চেহারা অপ্রত্যাশিত, বিস্ময়কর, আকর্ষক আর অস্বস্তিকর।

দুজনের বয়সের মধ্যে প্রায় পিতাপুত্রের বয়সের মত পার্থক্য, দুজনের সম্পর্ক শিক্ষক ও ছাত্রের। কিছুদিন পরে অনুভব করলাম সম্পর্কের কিছুটা পরিবর্তন ঘটেছে। দেখলাম তার কুরধার বুদ্ধির তুলনা নাই, তার চিন্তার দুঃসাহসের তুলনা নাই। অত্যুক্তি না করে বলতে পারি আমাকে স্তম্ভিত, অভিভূত করেছিল দেবাশিস। জীবনে একটা নূতন জিনিস আবিষ্কার করছি এই রকমের মুগ্ধভাব নিয়ে তার কথা শুনতাম।

আমার পরের কথাগুলো কিছু এলোমেলো মনে হবে। উপায় নাই, গুছিয়ে এ ধরণের কথা বলা শক্ত।

একদিন পাঠাপুস্তক সরিয়ে রেখে বলল, মাস্টারমশাই, বাবা পার্মিশান দিয়েছেন খানিকটা সময় আমরা আলোচনায় ব্যয় করতে পারি আমার বিজ্ঞানীর দৃষ্টিভঙ্গী বিকাশের সহায়তা করবার জন্য। কেমন তো?

মাথা নাড়লাম।

বেশ। আমি জানবার জন্য প্রশ্ন করব, আপনি বলবেন।

যতটা জানি বলব।

আচ্ছা, এবার বলুন লাইফ কি?

লাইফ যার আছে তাকে বলে প্রাণী। জন্ম, বংশবৃদ্ধি, জরা, মৃত্যু লাইফের লক্ষণ।

বায়োলজি, বায়ো-কেমিস্ট্রি যা বলে তার কিছু সংক্ষেপে বললাম।

বলল, আপনি বডি মেকানিক্স, বডি কেমিস্ট্রি সম্বন্ধে বলছেন, প্রোসেস অব লাইফ, ফাংশান অব লাইফ সম্বন্ধে বলছেন। আমার প্রশ্ন লাইফ সম্বন্ধে এ সব বিজ্ঞান যা বলছে তা থেকে কি সিদ্ধান্তে আসা চলে?

বললাম, লাইফ ইজ এ কন্টিনুয়াস প্রোসেস, এই সিদ্ধান্ত করা যায় না কি?

দেবাশিস বলল, কন্টিনুইটি ছাড়া আর কোন মানে নাই, সার্থকতা নাই যার সেটা মিনিংলেস প্রোসেস। কি ক্ষতি হবে এক সময়ে এই কন্টিনুইটি ভেঙ্গে গেলে? যা চলছে তাই চালিয়ে যাওয়া ছাড়া বড় কোন লক্ষ্যে পৌঁছে দিচ্ছে না যে প্রোসেস সেটা অর্থহীন, বাজে ব্যাপার নয় কি?

অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম এক মিনিট, বললাম, কন্টিনুইটি ভেঙ্গে দিতে চাও নাকি?

হেসে বলল, ইচ্ছে থাকলেও পারছি কই মাস্টারমশাই?

বললাম, জমা করা এটম, হাইড্রোজেন বোমাগুলো একসঙ্গে ফাটতে থাকলে তোমার ইচ্ছা সফল হতে পারে।

বলল, অসম্ভব। সবগুলো ফাটলে দশ-বিশ লাখের জায়গায় দশ-বিশ কোটি মরবে হয়ত, দশ পনেরো বছরের মধ্যে ঘাটতি পূরণ হয়ে যাবে। ধরুন যদি সব মানুষ যায়। ছোট বড় জন্তু জানোয়ারগুলোও যায়, যা অবাস্তব কল্পনা, কীটপতঙ্গ, সরীসৃপ থাকবে, ব্যাকটেরিয়া, ভিরাস থাকবে। এরা কন্টিনুইটি রক্ষা করে রাজত্ব করবে পৃথিবীতে।

হেসে বললাম, নিশ্চিন্ত হয়ো না, আবার মানুষ দেখা দেবে।

হাসতে লাগল দেবাশিস।

তারপর বলল, আমার ফাইন্ডিং কি জানেন মাস্টারমশাই, লাইফ একটা বিস্ময়কর নিয়ম-বদ্ধ ব্যাপার, আর কিছু নয়। নিয়মানুবর্তিতা সত্যি বিস্ময়কর, কিন্তু লাইফ, বিশেষ করে যে শ্রেণীর জন্তুর মধ্যে ব্রেন ডেভেলপ করেছে, মানে মানুষের মধ্যে, লাইফ বাজে ব্যাপার। লাইফকে সিরিয়াসলি নেয় যাদের ভাত, কাপড়, আশ্রয় নিজেদের সংস্থান করে নিতে হয়, অর্থাৎ গরীব লোকেরা। যাদের এগুলোর সংস্থান আছে বা সহজে সংস্থান হয়ে যায় তারা লাইফকে সিরিয়াসলি নেয় না, তারা মানুষের জীবন, মানুষের শান্তি, তাদের কষ্ট করে অর্জন করা সম্পত্তি নিয়ে খেলা করে।

মাস দুই পরে একদিন পড়তে পড়তে দেবাশিস উঠে গেল, বলল এখুনি আসছি।

পাঁচ মিনিট পরে ফিরে এল দুহাতে দুটো ডিস নিয়ে। দেখলাম চারটি করে চপ। একজন ভৃত্য এল দু কাপ কফি নিয়ে।

বলল, আজ বিকেলে আমি খাইনি মাস্টারমশাই, ক্ষিদে পেলে খাব বলেছিলাম। এতক্ষণে ক্ষিদে পেয়েছে।

বললাম, তোমার ক্ষিদে পেয়েছে খেয়ে নাও। আমার তো ক্ষিদে পায়নি, বাড়তি ডিশ কেন?

আমি খাব আপনি না খেয়ে বসে দেখবেন এটা ভারি দৃষ্টিকটু হবে। খান মাস্টারমশাই। বেশীটা প্রোটিন, একটু কার্বোহাইড্রেট, একটু ফ্যাট দিয়ে তৈরী এই চপ নামে পরিচিত খাবার, পেটের গোলমাল হবে না

ডিশ ও একটা কাপ এগিয়ে দিয়ে অনুনয়ের দৃষ্টিতে চাইল।

খেতে শুরু।

খেতে খেতে দেবাশিস বলল, আমি একটা থিওরী গড়বার চেষ্টা করছি মাস্টারমশাই, প্রোটিন প্লাস এলকোহল বেসড্ সভ্যতা এবং কার্বো-হাইড্রেট প্লাস ওয়াটার বেসড্ সভ্যতা, এ দুটোর মধ্যে কোনটা মানুষের পক্ষে বেশী উপযোগী।

কি সিদ্ধান্তে এসেছ?

আসতে পারিনি, পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। তা ছাড়া সিভিলাইজেশন কথাটার মানে নিয়ে খটকা রয়েছে মনে।

কি খটকা বলো তো।

বড় খটকা এই যে, সিভিলাইজেশন কথাটার মানে যদি পিসফুল, হেলদি, স্যাটিসফ্যাকটরী প্রোগ্রেসিভ কন্ডিশন্স অফ এক্সিসটেন্স হয় আমার ধারণা মানুষ কোনদিন সভ্য হতে পারবে না। তার লাইফ প্রোসেসের মধ্যে এমন সব জিনিস রয়েছে যে মানুষ কোনদিন পুরো সিভিলাইজেশনের স্তরে পৌঁছতে পারবে না, চেষ্টা করতে করতে পৃথিবীর আয়ু শেষ হয়ে যাবে।

পৃথিবীর আয়ু বলে কিছু আছে বলে তোমার ধারণা?

নিশ্চয় আয়ু আছে। তা না হলে সূর্য থেকে এতগুলো উপগ্রহ হয়ে সোলার য়ুনিভার্স হল কি করে? একদিন পৃথিবী ভাঙ্গতে শুরু করবে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম, তারপর?

মানুষের বাসভূমি পৃথিবী একটা অপরিণত উপগ্রহ, খালি ভাঙ্গছে, ভূমিকম্পে ভাঙ্গছে, জলে ভাঙ্গছে, বরফে ভাঙ্গছে, ঝড়ে ভাঙ্গছে। আবার দেখা যায় প্রাণীজগতে খেয়োখেয়ির ব্যাপার লেগে রয়েছে। পশুপাখী, কীটপতঙ্গ, সরীসৃপের মধ্যে খেয়োখেয়ি মানুষের মধ্যেও তাই। ম্যান ইজ বর্ণ উইথ দি ভাইরাস অব সেলফ-ডেসট্রাকসন, তার দেহের উৎপত্তি ধ্বংস হবার জন্য, তার তৈরী সভ্যতার জন্মও ধ্বংস হবার জন্য। মানুষ কোনদিন পুরোপুরি সিভিলাইজড হতে পারবে না।

বললাম, দেবাশিস, নিজে চিন্তা করে এ সব কথা বলছ?

হ্যাঁ মাস্টারমশাই, এ ধরণের চিন্তার উৎপত্তি থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারি না।

একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেললাম।

মাস কয়েক পরে একদিন লক্ষ্য করলাম দেবাশিস পড়ছে কিন্তু মন লাগাতে পারছে না। চুপ করে রইলাম।

কিছুক্ষণ পরে বলল, মাস্টারমশাই একটা কথা বলব?

বলো, যদি পড়ায় মন দিতে না পারো।

হেসে বলল, সত্যি পারছিলাম না মন দিতে। পরশু একটা ছবি দেখতে গিয়েছিলাম চার্লি চ্যাপলিনের ছবি, ডিকটেটর।

ভাল লাগল?

ফানি, বেশী ভাল লাগল না। প্রোপাগান্ডা আছে, সুপারম্যানের মাইন্ডের ওয়ার্কিং দেখাতে পারেন নি চ্যাপলিন, অনেকটা মেকানিক্যাল হয়েছে।

তাকালাম তার দিকে, বললাম, তোমার আইডিয়ার সঙ্গে মেলে না?

না মাস্টারমশাই, মেলে না।

তোমার আইডিয়া কি?

মাথা নামিয়ে কিছুক্ষণ ভাবল দেবাশিস।

সেই ফাঁকে তার খোলা পার্কারের পেনটা বন্ধ করে টেবিলের ধার থেকে সরিয়ে মাঝখানে এনে রাখলাম। তাকিয়ে দেখল।

বলল, মাস্টারমশাই, আমার একটা বদ অভ্যাস হয়ে গিয়েছে সব জিনিসের কি, কেন ভাবা। এটা না থাকলে হয়ত ভাল ছেলে হতে পারতাম।

তুমি তো ভাল ছেলে দেবাশিস।

না মাস্টারমশাই, আমি ভাল ছেলে নই। আচ্ছা, এবার বলছি। আমি চিন্তা করে দেখেছি মানুষের মধ্যে যে আশ্চর্য ব্রেণ ডেভেলপমেন্ট হয়েছে তার ফল কি হল। চুনকাম ও পালিশ করবার আর্ট আয়ত্ত করেছে মানুষ, আত্মরক্ষা ও শত্রুবিনাশের উপায় বাড়িয়েছে, অপরকে দাবিয়ে তাঁবেদার বা স্লেভ করতে শিখেছে। এত যে রকেট, স্যাটেলাইট ছাড়ছে, স্পেস কংকোয়েস্টের প্রতিদ্বন্দ্বিতা তার মধ্যে সায়েন্স ও টেকনোলজিকে সামরিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করবার অভিপ্রায় বেশী দেখা যায়। টাকা চায় মানুষ টাকা ছড়িয়ে, বহু লোককে হাতের মুঠোয় আনবার জন্য। ক্ষমতা চায় স্লেভ ট্রেড চালাবার জন্য। যে ব্যক্তি ক্ষমতা দখল করে অসংখ্য স্ত্রী-পুরুষকে গরু-ভেড়ার মত হত্যা করতে পারে, লোভের কল টিপে, মৃত্যুর ভয়, নির্যাতনের ভয় দেখিয়ে, ধর্ম, আইডিয়ালিজমের মিথ্যা প্রোপাগান্ডা চালিয়ে বহুসংখ্যক মানুষকে ক্রীতদাসে পরিণত করতে পারে নির্বোধেরা তাকে সুপারম্যান বলে পুজো করে। আসলে কিন্তু সমাজের ব্রেনিয়েস্ট র‍্যাসকেল, সাকসেসফুল স্কাউন্ড্রেল ছাড়া সুপারম্যান আর কিছু নয়।

তুমি কি সুপারম্যান হতে চাও দেবাশিস?

না মাস্টারমশাই, চাই না। সাধারণ মানুষ এত শাস্তি ভোগ করেছে ও করছে সুপারম্যানদের হাতে যে —

হেসে বলল, সুপারম্যান ছাড়া মানুষের চলেও না দেখতে পাই। নতুন সুপারম্যানের আবির্ভাব হতে দেরী হলে পুরনো সুপারম্যানগুলোকে কুলুঙ্গি থেকে নামিয়ে পুজো করতে বসে যায় লোক রা।

মনে একটা অস্বস্তির ভাব নিয়ে সেদিন বাড়ী ফিরলাম। অসম্ভব মাথা যাক, এই একুশ বাইশ বছরের ছোকরাকে যদি টাকার নেশায়, ক্ষমতার নেশায় ধরে তাহলে তার ফল কি হবে?

(৬)

অশোকের তৃতীয় ইনস্টলমেন্ট।

গড় হয়ে প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিয়ে বললাম, মাস্টারমশাই, আপনাকে কত যে খুঁজেছি।

কেন বল তো? তোমার গাড়ী কই?

বললাম, গাড়ী বাড়ী সব গিয়েছে মাস্টারমশাই। আমিও যাবার দাখিল।

শেয়ার মার্কেটের চোরাবালির কথা সবিস্তারে বললাম।

এখন কি করছ

উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছি। কিছু ক্যাপিটেলের অভাবে সুবিধা করতে পারছি না।

হেসে বললেন, ক্যাপিটেলের জন্য আমায় খোঁজ করছিলে কি? আমার অনেক টাকা হয়েছে শুনেছ বাজারে?

তা শুনেছি কিছু মাস্টারমশাই।

ভুল শুনেছ। কিছু টাকা পেয়েছিলাম বটে, সেটা খরচ হয়ে গিয়েছে দেনা শোধ করতে আর একটা ছোট বাড়ীর পেছনে। মাস মাস কিছু পাই, চলে যায় কোনরকমে।

সে কি কথা মাস্টারমশাই? শুনেছি হাজার হাজার টাকা রয়েলটি পাচ্ছেন ওয়াণ্ডার ড্রাগ থেকে।

ওটার ফরমুলা বেচে দিয়েছি অশোক কিছু নগদ টাকা ও মাস মাস কিছু টাকার বিনিময়ে। লাভ যা হচ্ছে সেটা কোম্পানীর।

বিশ্বাস হল না কোন সুস্থ মানুষে সজ্ঞানে এমন গাধার মত কাজ করতে পারে। নিশ্চয় মিথ্যা কথা বলছেন মাস্টারমশাই টাকা ধার চাইব ভয়ে। বললাম, কেন এমন কাঁচা কাজ করলেন আপনি?

কাঁচা কাজ? হয়ত তাই। কি আর করা যাবে?

বললাম, আর একটা কিছু বের করুন মাস্টারমশাই, যাতে প্রচুর কাঁচা টাকা হু-হু করে আপনার পকেটে আসে সে রকম বন্দোবস্ত করে দেব আমি। বিজনেসের মাথা না থাকলে টাকা ঘরে আনা যায় না।

তোমার তো বিজনেসের মাথা আছে অশোক।

আমি করছিলাম ফাটকাবাজি, ফ্রেচারাস জিনিস। আপনার ওয়াণ্ডার ড্রাগের মত একটা জিওর সাকসেসের জিনিস হাতে পেলে দেখিয়ে দিতাম বিজনেস কাকে বলে।

হাসলেন মাস্টারমশাই, কিছু বললেন না।

আমার কেমন মনে হল মাস্টারমশাই আর আগেকার মত ভালমানুষটি নেই। বেশভূষা আগেকার চাইতে খারাপ হয়েছে কিন্তু চোখ-মুখে একটা নূতন এলার্টনেস লক্ষ্য করা যায়। নিজের আবিষ্কারের ফরমুলা বেচে দিয়ে নিজের পায়ে কুড়ুল মেরেছেন যিনি তাঁর এই এলার্টনেস জেনুইন হতে পারে না, এটা নকল জিনিস। জেনুইন হলে ধরতে হবে ফরমুলা বেচবার কথা ধাপ্পাবাজি, ধাপ্পা দিয়ে আমার মত শুভাকাঙ্ক্ষীকে বোকা বানাতে চান।

বললাম, নতুন একটা বাড়ী করেছেন বলছিলেন, কোথায় বাড়ী করলেন, আপনার নিজের বাড়ীর কি হল?

সেটা আমার স্ত্রীকে দান করেছি। এসব কথা থাক, তুমি কি কোন কাজের খোঁজ করছ?

হ্যাঁ মাস্টারমশাই। কোন কাজের সুযোগ পেলে একবার চেষ্টা করে দেখব ভদ্রভাবে খেয়ে পরে থাকবার উপায় করতে পারি কিনা।

তা পারতে পারো যথাসাধ্য খাটলে, লোভ সংযত করে চললে। আচ্ছা, দিন পনেরো পরে তুমি ইস্ট ইণ্ডিয়া কর্পোরেশনের কর্তা মিঃ ভাদুড়ীর সঙ্গে দেখা করতে পারো তাঁর পক্ষে তোমাকে কোন কাজ দেয়া সম্ভব কিনা জানবার জন্য। আমি এর মধ্যে তাঁকে তোমার কথা বলে রাখব।

বিস্মিত হলাম প্রস্তাব শুনে। মিঃ ভাদুড়ীর মত বড়লোকের সঙ্গে এত খাতির মাস্টারমশায়ের? হবেও বা, মাস্টারমশাই তো এখন টাকাওয়ালা মানুষ।

বললাম, দয়া করে একখানা চিঠি যদি দেন দুটো কথা বলে—

যদি হবার হয় ঐতে হয়ে যাবে। কিন্তু অশোক, তোমার পুরনো বিজনেসের চাল বদলে নতুন মানুষ হতে হবে। এফিসিয়েন্ট, অনেস্ট লোক পছন্দ করেন মিঃ ভাদুড়ী।

আবার গড় হয়ে প্রণাম করলাম, আপনার আশীর্বাদে একটা চান্স পেলে যথাসাধ্য চেষ্টা করব মাস্টারমশাই।

আচ্ছা, এসো তাহলে।

কি ভাবতে ভাবতে ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে একটা পানের দোকানের সামনে দাঁড়ালেন মাস্টারমশাই, পান বা সিগারেট কেনবার পয়সার জন্য পকেটে হাত দিলেন।

বুঝলাম তিনি কোন দিকে যান, কোথায় যান আমাকে জানাতে চান না। নিজের পথ ধরলাম।

এবার নিশ্চিত বুঝলাম মাস্টারমশাই আর গোবেচারী ভালমানুষটি নাই। টাকায় কত পরিবর্তন আনে মানুষের চরিত্রে চোখের ওপরে দেখলাম।

(ক্রমশঃ)

CENTRAL LIBRARY

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

ভিয়েতনাম ! ভিয়েতনাম !

হিরোশিমার ছবি যেমন সমগ্র মানব জাতির মনে এক নিদারুণ বিভীষিকা সৃষ্টি করে, তেমনই করে ভিয়েতনামের ছবি। মানসিক দুর্গতির আকৃতি সর্বত্র সমান। যুদ্ধকবলিত দেশে মানুষের যা অবস্থা দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত মানুষেরও সেই একই অবস্থা, বোমা আর বুভুক্ষার তীব্রতা কোথাও কম নয়। মানুষের দৃষ্টি কিন্তু ক্ষমা করে না, তাদের চোখে অপরাধীরা অভিযুক্ত, তারা ক্ষমার অযোগ্য। এই সব অত্যাচারিত কোটর প্রবিষ্ট চোখে ভয়ের ছাপ, আতংকের বিহ্বলতা, কিছু চোখ শুকনো আবার কতকগুলি চোখ জলে ভরা। ভিয়েতনামে এই চোখ হয়ত কোনো বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর চোখ, বক্ষে শিশুর মৃতদেহ দেখে হয়তই প্রতিবাদে আত্মাহুতি দান করছেন, কিংবা কোনো ধরা পড়া ভিসি, কিংবা কোনো লাঞ্ছিতা রমণী—

> "Who has both arms burned off by naplam and her eyelids so badly burned that she can not close them."

ফেলিকস গ্রীন ক্যালিফোর্নিয়ার অধিবাসী, অবশ্য জন্মেছেন ব্রিটিশ হিসাবে। গ্রীন মনে করেন যে কোনো যুদ্ধ মানবিকতার বিরুদ্ধে এক জঘন্য অপরাধ। ফেলিকস গ্রীনের ভিয়েতনাম! ভিয়েতনাম! একধারে এশিয়ার একটি ক্ষুদ্র অঞ্চলে অনুষ্ঠিত ঘৃণিত নিষ্ঠুরতার চিত্রময় বিবরণ বা ফোটোগ্রাফিক রিপোর্ট আর সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ভিয়েতনামে মার্কিন নীতি সংক্রান্ত কিছু তথ্যভিত্তিক দলিল। ফেলিকস গ্রীন এই গ্রন্থটি একটি মাত্র উদ্দেশ্য নিয়ে রচনা করেছেন। ভিয়েতনামের প্রকৃত পটভূমি সম্পর্কে মার্কিন মুলুকের মানুষকে অবহিত করাই তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য—

> "If the people of the United States only knew more of the background to the war in Vietnam, and what is being done there in their name, they would and could effectively insist on the war being at once broght to an end"

ভিয়েতনামে যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম চলেছে একথা কেউ আজ অস্বীকার করে না। ভিয়েতনামে পৌনে এক মিলিয়ন মার্কিন সেনা লড়ছে। তথাপি এই যুদ্ধ এক অঘোষিত যুদ্ধ আর এই যুদ্ধে ফেলিকস গ্রীনের মত যে—সব শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের বিবেকে বাজে তাঁরা এই জাতীয় গ্রন্থাদির সহায়তায় পৃথিবীর মানুষকে প্রকৃত অবস্থাটা যে কি তা জানাবার চেষ্টা করছেন। গ্রীনের এই বিবরণ যে নৈর্ব্যক্তিক তা তিনি বলেন নি, তিনি একটি পিঠের ছবি দেখিয়েছেন, তাঁর এই গ্রন্থ—

> "Condemns without qualification, the policies pursued by the political and military leaders of the United States in Vietnam."

সমগ্র তথ্যাবলী অতি সুন্দরভাবে এই গ্রন্থে পরিবেশিত হয়েছে। প্রথম ১১১ পৃষ্ঠার ফটো চিত্রগুলির মধ্যে কতকগুলি অতি সাধারণ, কিছু বীভৎস এবং কয়েকটি মধুর—এই সব ছবিগুলির মাঝে মাঝে মন্তব্য এবং সুনির্বাচিত উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে। শ্লেষটুকু কোথাও প্রচ্ছন্ন নেই।

একটি ফটোগ্রাফে যুক্তরাষ্ট্রের বোমারু বিমানের পাশাপাশি সাজানো হয়েছে একটি শিশু আর তার মা, সেই সঙ্গে দেওয়া আছে জনসনের একটি উদ্ধৃতি—

> "Our course is resolute....our conviction is firm....we shall not be diverted from doing what is necessary in the cause of freedom."

একটি চিত্রে ভিয়েতকংদের নির্যাতনের দৃশ্য দেখানো হয়েছে; তার নীচে আছে জেমস গ্রীনের একটি উদ্ধৃতি, যা মর্মে বেঁধে—

> "The strange new feature about the photographs of torture now appearing is that they have been taken with the approval of the torturers and published over captions that contain no hint of condemnation."

এর শেষাংশটুকু আরো তীব্র এবং তীক্ষ্ণ।

ভিয়েতনাম! ভিয়েতনাম! এই সুরটিকে নিয়ে গ্রন্থের নামকরণ করা হয়েছে, অতএ সমগ্র গ্রন্থটির প্রতিটি পৃষ্ঠায় সেই সুর-ই অনুরণিত। প্রবল যুক্তরাষ্ট্রের দুর্দমনীয় শক্তির পাশাপাশি সর্বক্ষেত্রে দেখানো হয়েছে ভিয়েতনামের মানুষের দারিদ্র্য। যুক্তরাষ্ট্রের প্রবল শক্তির দৃষ্টান্ত হিসাবে দেখানো হয়েছে তার নানাবিধ যুদ্ধাস্ত্র যথা : আক্রমণকারি ধারা বা টক্সিক স্প্রে, এই ধারা বর্ষণ করা হয় ধানের ক্ষেতে, যাতে ধান নষ্ট এবং বিষাক্ত হয়। ন্যাপলাম আগুনে বোমা এবং যাদু চালিত মিসাইল বা ক্ষেপণাস্ত্র। এর পাশাপাশি দেখানো হয়েছে ভিয়েতনামের মানুষের আদিম যুগের অস্ত্র আর সেই সব [illegible]

CENTRAL LIBRARY

পণ লড়াই। ছবির দ্বারা এই বৈপরীত্য প্রদর্শন করা হয়েছে।

গ্রন্থটির শেষ খণ্ডে ভিয়েতনামে মার্কিনী হস্তক্ষেপের দুঃখকর ইতিহাস বিধৃত করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র কিভাবে ফরাসীদের স্থানচ্যুত করেছে, দিয়েমের আধিপত্যের কালের নৃশংস অত্যাচার, ম্যাপ-ম্যাল নিধারেশন ফ্রণ্টের উদ্ভব। দিয়েমের নিধন এবং তার পরিবর্তে উপযুক্ত কাউকে পাওয়া গেল না। সাতটি বিভিন্ন সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এলেন জেনারেল কাই (এঁর একমাত্র পূজনীয় নেতা হলেন এডলফ হিটলার)।

এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত উপকরণ দেখে গ্রীনের মনোভঙ্গী যে কিঞ্চিৎ পক্ষপাতদুষ্ট একথা মনে হতে পারে। গ্রন্থের অজস্র উদ্ধৃতি সকল প্রকার সম্ভাব্য ক্ষেত্র থেকে আহরিত। এই জাতীয় একটি উদ্ধৃতি দৃষ্টান্ত হিসাবে দেওয়া গেল—

> "My solution? Tell the Vietnamese they have got to draw in their horns and stop aggression or we're going to bomb them back into the stone age."—General Courtis Le May.

পরিশিষ্ট অংশে কর্তৃপক্ষ কি বলেছেন এবং কি করেছেন তা পাশাপাশি সাজিয়ে দেখানো। যুক্তরাষ্ট্র যে জেনোসাইড বা গণহত্যার অপরাধে অপরাধী তা প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে মার্কিন সংবাদ-পত্রাদির প্রত্যক্ষদর্শী রিপোর্টারদের উক্তি উদ্ধৃত করে। এই পরিচ্ছেদটি (১৬০—১৬৫ পৃঃ) অতিশয় পীড়াদায়ক।

পরিশেষে গ্রীন বলেছেন এই যুদ্ধ যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে একটি নৈতিক বিপর্যয় এবং এই যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের জয় অসম্ভব কেননা বিজয়ী হতে হলে প্রতিটি ভিয়েত-নামীকে হত্যা করতে হবে। সুতরাং যুক্ত-রাষ্ট্র অবিলম্বে ভিয়েতনাম থেকে সরে এসে তাদের জাতীয় ইতিহাসের কলঙ্কিত অধ্যায়কে রুদ্ধ করুন।

ফেলিক্স গ্রীন নর্থ ভিয়েতনাম বা চীনের প্রতি সপ্রশংস মনোভাব সম্পন্ন হলেও তিনি স্বয়ং একজন কম্যুনিস্ট নন। তিনি উদারনীতিক। তাঁর বিবেকে প্রচণ্ড আঘাত লেগেছে। যেমনটি দেখা গেছে প্রখ্যাত মার্কিন লেখক নরম্যান মেইলারের ক্ষেত্রে। ভিয়েতনাম যুদ্ধ বিরোধী আন্দোলনে এবছরের এই বিশিষ্ট মার্কিন লেখকের নেতৃত্বে আজ যুক্তরাষ্ট্রে এক বিরাট যুদ্ধ বিরোধী সংগঠন গড়ে উঠেছে।

এই গ্রন্থে কোনো রকম ভিয়েতকঙ্গ নৃশংসতার ছবি নেই, অথচ 'চোখের বদলে চোখ এবং দাঁতের বদলে দাঁত' এই নীতি যে যুগে প্রচলিত সেই যুগে অপর পক্ষেও নৃশংসতা ঘটে থাকতে পারে।

এই গ্রন্থটি সর্বপ্রথম আমেরিকাতে ফুলটন পাবলিশিং কোম্পানী প্রকাশ করেছেন। এই গ্রন্থ আমেরিকায় নিষিদ্ধ নয় এবং গ্রন্থটির বহু সহস্র কপি সেই দেশে বিক্রী হয়েছে। এইদিক থেকে মার্কিন উদারনীতির প্রশংসা করতে হয়। বাক্‌-স্বাধীনতা সে দেশে যাচ্ছা আছে। প্রতি-বাদের কণ্ঠস্বরকে যে সে দেশে দুর্দান্ত রুদ্ধ করা হয় না এটা আশার কথা।

আমাদের কাছে ভিয়েতনামের গেরিলা যুদ্ধ বিষয়ক আরেকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ আছে। এই গ্রন্থের নাম 'ভিয়েতনাম—ইনসাইড স্টোরী অব দি গেরিলা ওয়ার'—এই গ্রন্থের লেখক উইলফ্রেড জি বুর্চেট একজন আমেরিকান এবং গ্রন্থটির প্রকাশক নিউ ইয়র্কের 'ইন্টারন্যাশনাল পাবলিশার্স'।

এই সব প্রতিবাদ চিন্তাশীল মানুষের মনকে নতুন চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করান এবং একদিন হয়ত শুভবুদ্ধির উদয় হবে।

এই গ্রন্থের প্রকাশসৌষ্ঠব বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে।

—অভয়ংকর

● VIETNAM! VIETNAM! By Felix Greene. Penguin Books Ltd (London). Price: 12s. 6d. only.

সাহিত্যের খবর

করুণানিধির সম্মান লাভ ।। মাদ্রাজের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী এম, করুণানিধি যে একজন বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্য-সমালোচক, একথা মাদ্রাজের বাইরে তেমন পরিচিত নয়। কিন্তু তামিলভাষী শিক্ষিত মানুষ মাত্রেই তাঁর কবিতার সঙ্গে পরিচিত। তামিল ভাষা ও সংস্কৃতির মাধ্যমে বিশ্ব কবিতার সেবা করার জন্য 'দি ওয়ার্ল্ড পোয়েট্রি সোসাইটি ইণ্টারন্যাশনাল' ১৯৬৯ সালের বিশেষ পুরস্কার তাঁকে প্রদান করেছেন। এই পুরস্কার প্রদান সম্পর্কে বলা হয়েছে: তামিলনাড়ুর খাঁটি কবিশ্রেষ্ঠর মত আপনি আপনার অনুপম কবিতাগুলির মধ্যে তামিল ভাষার সমস্ত দীপ্ত মহিমা মিশিয়েছেন এবং ৬টি মহাদেশের ৫ কোটি তামিলভাষী আপনাকে তাদের ৬ হাজার বছরের পুরনো সংস্কৃতির অজেয় সমকালীন নেতা হিসেবে দেখে আনন্দিত। এই পুরস্কার প্রদানের জন্য উক্ত সংস্থার সভাপতি প্রখ্যাত আমেরিকান প্রাচ্যতত্ত্ববিদ ডঃ আর্ভিন সি, মিলার মাদ্রাজ আগমন করেন।

তামিল ভাষা ও সাহিত্যের উন্নয়নে শ্রীকরুণানিধির চেষ্টার অন্ত নেই। কিছুদিন আগে প্যারিসে কলেজ দ্য ফ্রান্স-এ তৃতীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। সেখানেও বিশেষ অতিথি হিসেবে শ্রীকরুণানিধি উপস্থিত ছিলেন।

সাঁওতালি ভাষার জন্য রোমান লিপি ।। গত ১৬ ও ১৭ সেপ্টেম্বর দুমকায় সারা ভারত সাঁওতালি সাহিত্য ও সংস্কৃতি উন্নয়ন পরিষদের দুইদিনব্যাপী এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মে-লনটি ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কারণ, এখানে বাংলা, বিহার, আসাম, মধ্যপ্রদেশ, নেপাল, সিকিম ইত্যাদি রাজ্যে ইতস্তত বিচ্ছিন্ন প্রচলিত সাঁওতালি ভাষার মধ্যে একটা ঐক্যস্থাপনের চেষ্টা করা হয়। সবচেয়ে উল্লেখ্য, এখন থেকে রোমান লিপিতে সাঁওতালি ভাষা লিখবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ভাষাতত্ত্ববিদরা নিঃসন্দেহে এই সিদ্ধান্তের প্রতি তাঁদের অকুণ্ঠ সমর্থন জানাবেন। কারণ, এর চেয়ে বিজ্ঞানসম্মত আর কিছু হত বলে মনে হয় না। তবে সাঁওতালি ভাষা ও সাহিত্যপ্রেমীদের অবিলম্বে আরো কিছু করণীয় আছে। যেমন—(১) সাঁওতালি লোকসাহিত্য সংগ্রহ এবং গ্রন্থ প্রকাশ, (২) সাঁওতালি ভাষার ইতিহাস এবং (৩) রোমান লিপিতে একটি পত্রিকা প্রকাশ। এতে আধুনিক সাঁওতালি ভাষায় রচিত গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ ইত্যাদি নিয়মিত প্রকাশের ব্যবস্থা করতে হবে। কেননা, সময়ের সঙ্গে তাল রেখে না চললে কোন ভাষাই গতিশীল হতে পারে না। মনে হয়, উক্ত সংস্থা নিশ্চয়ই এ ব্যাপারে ভেবেছেন।

এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন বিহারের এম-এল-এ শ্রীকালেশ্বর হেমব্রম এবং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় উপশিক্ষামন্ত্রী শ্রীঅমর-কুমার কিস্কু। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবাংলার প্রাক্তন এম-এল-এ শ্রীনাথানিয়েল মুর্মু। প্রধান অতিথির ভাষণে শ্রীকিস্কু বলেন—'সাহিত্য আকাদমীর মত এমন একটি সংস্থা গঠনের কথা আমরা ভাবছি, যা আদিবাসী ভাষা-সমূহের সংরক্ষণ ও উন্নতিতে সহায়তা করবে।'

হিন্দিতে আলবেনিয়ান কবিতার অনুবাদ ।। বিশিষ্ট তরুণ কাশ্মীরী কবি শ্রী আর, এম, কৌশিক একালের ৫০ জন আলবেনিয়ান কবির কবিতা হিন্দিতে অনুবাদ করে প্রকাশ করেছেন। সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে তিনি এই বইয়ের একটি কপি ভারতে নিযুক্ত আলবেনিয়ান রাষ্ট্রদূতের

হাতে উপহার হিসেবে দেন। এর আগে তিনি হিন্দিতে কানাডিয়ান কবিতার অনুবাদ প্রকাশ করেছেন। তাঁর বিশ্বাস, এভাবেই আন্তর্জাতিক মৈত্রীর বিকাশ ঘটবে।

একটি সুইডিশ উপন্যাস ।। ১১ জুলাই, ১৮৯৭ সাল। সলোমন অগাস্ট এণ্ড্রী নামক একজন সুইডিস ইঞ্জিনীয়ার দুজন বন্ধুকে নিয়ে বেলুনে চড়ে এক দুঃসাহসিক যাত্রায় বেরিয়েছিলেন। তাঁরা আর কোনদিন দেশে ফিরে আসেননি। তেত্রিশ বছর পরে এক সাগরদ্বীপে তুষার অবস্থায় তাঁদের কঙ্কালটি পাওয়া যায় এবং সেই সঙ্গে পাওয়া যায় একটি মূল্যবান ডায়েরী। প্রখ্যাত সুইডিস ঔপন্যাসিক পার ওলফ সুন্দমান এই ডায়েরীটিকে কেন্দ্র করে এণ্ড্রীর সেই দুঃসাহসিক অভিযানকে নিয়ে একটি উপন্যাস লেখেন। সুইডেনে বইটি বছরের সর্বাধিক বিক্রীত বইয়ের সম্মান লাভ করেছে এবং গত বছর সাহিত্যে নর্ডিক পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছে। বইটির জর্মান অনুবাদ বেরিয়েছিল গত বছর। এ বছর প্রকাশিত হল ইংরেজি অনুবাদ। ইংরেজিতে বইটির নাম হয়েছে ফ্লাইট অব দি ঈগল।'

উপন্যাসটির একটি সমালোচনায় একে ডকুমেন্টারীরূপে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। অন্য সমালোচক বইটির রচনাভঙ্গির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। যদিও লেখক ডায়েরীতে উল্লিখিত ঘটনাবলীর যথাযথ অনুসরণ করেছেন, তবু রচনার গুণে বইটি বিশিষ্ট সাহিত্য মর্যাদা লাভ করতে সমর্থ হয়েছে। উপন্যাসে কাহিনীটি গল্প বলার ভঙ্গিতে সাজানো হয়েছে। তিন বন্ধুর মধ্যে সবশেষে মৃত্যু হয়েছিল কার্ণ ফ্রাঙ্কেন-ফেলের। উপন্যাসে তারই মুখ দিয়ে বলানো হয়েছে এই দুঃসাহসিক অভিযানের কাহিনী। তাদের এই করুণ পরিণতির জন্য তারা আত্মসমালোচনা করেছে। মৃত্যুকে নিশ্চিত জেনে এই করুণ আত্মসমালোচনার জ্বলন্ত কাহিনীই উপন্যাসটিকে এত স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত করেছে।

সরোজিনী নাইডুর জীবনী তাজাক ভাষায় ।। তাজাক ভাষায় সরোজিনী নাইডুর জীবনী প্রকাশের একটি উদ্যোগ চলছে। শ্রীমতী মালচেট শাহাবোভা এই জীবনী রচনায় অগ্রণী হয়েছেন। তিনি নিজেও একজন কবি এবং তাজিকীস্থানের বিদেশী ভাষা শিক্ষাকেন্দ্রের প্রধান। এর মধ্যেই তিনি শ্রীমতী নাইডুর জীবনী সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগ্রহ করে ফেলেছেন।

বাংলায় গর্কির রচনা সম্বন্ধে ।। গর্কির যে সমস্ত রচনা বাংলায় প্রকাশিত হয়েছে, তার উপর কোন পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ এতদিন পর্যন্ত ছিল না। সম্প্রতি সে অভাব দূর করেছেন শান্তি ভট্টাচার্য। তিনি বাংলায় গর্কির অনূদিত গ্রন্থাবলীর উপর একটি বিজ্ঞানসম্মত মূল্যায়ন দলিল রচনা করেছেন। লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক প্রখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ গ্রন্থটি সম্বন্ধে বলেছেন—'গবেষণা কর্মটি এমন বহুসংখ্যক মূল তথ্যের সন্ধান দিয়েছে, যার অনেকখানিই এই প্রথম বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে বিশ্লেষিত হল। গর্কি চর্চার ক্ষেত্রে এটি একটি মূল্যবান সংযোজন।' রবীন্দ্র পুরস্কার বিজয়ী প্রাচ্যতত্ত্ববিদ ভেরা নভিকভা বলেছেন : 'এই গবেষণা আমাদের সাহিত্য বিজ্ঞানকে নতুন নতুন তথ্য, মন্তব্য এবং সিদ্ধান্তে অনেকখানি সমৃদ্ধ করেছে।' এই গবেষণার ভিত্তিতে লেনিনগ্রাদ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্ব বিভাগের অ্যাকা-ডেমিক কাউন্সিল সর্বসম্মতিক্রমে শান্তি ভট্টাচার্যকে ভাষাতত্ত্ব বিজ্ঞানের প্রার্থী-সদস্যসূচক ডিগ্রি দিয়েছেন।

জব্বলপুরে বিচিত্রার শারদ সাহিত্য সভা ।। গত ১৭ অক্টোবর রবিবার সন্ধ্যায় শ্রীমতী অশ্রু রায় ও শ্রীশ্যামল মুখো-পাধ্যায়ের যুগ্ম উদ্যোগে মধ্যপ্রদেশের বাংলা সাহিত্য ত্রৈমাসিক 'সাতপুরা' কার্যালয়ে 'বিচিত্রা সাহিত্য বাসরের' শারদ সাহিত্য সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অশ্রু রায়ের উদাত্তকণ্ঠের 'ভোরের হাওয়া এলো ঘুম ভাঙাতে কী নয়নে চুম হেনে...' উদ্বোধন সঙ্গীত দিয়ে সাহিত্য সভার কাজ আরম্ভ হয়। স্বরচিত গল্প পাঠ করে শোনালেন হেনা হালদার, শ্যামাচরণ মিত্র, তারাপ্রসাদ বসু, শ্যামল মুখোপাধ্যায় ও অশ্রু রায় স্বরচিত কবিতা পাঠ করে সাহিত্যসভাকে কবি সম্মেলনের রূপ দিলেন। 'সাহিত্যিক বিমল মিত্র' ও বিমল মিত্রের সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করলেন "বিচিত্রা সাহিত্য বাসর" সম্পাদক কুসুম-বিহারী চৌধুরী। সাতপুরার শারদীয়া সংখ্যার একটি প্রদর্শনী সাহিত্য বাসরের সভাকে শ্রীমণ্ডিত করে তুলেছিল। সভান্তে সাতপুরা কর্তৃপক্ষ জলযোগে সকলকে আপ্যায়িত করেন।

—চার্বাক

শারদ সাহিত্য

সাহিত্য ও বিজ্ঞান : প্রধান সম্পাদক : মুরারিমোহন চক্রবর্তী। সাহিত্য ও বিজ্ঞান পরিষদ, সোদপুর, ২৪ পরগনা। দাম : এক টাকা।

শহরতলীর এই ত্রৈমাসিক সাময়িক-পত্রটি ইতিমধ্যে সাহিত্যপাঠকের প্রশংসা-দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে তার সুনির্বাচিত রচনাগুলির জন্যে। এই সংখ্যার গল্প-কবিতা প্রবন্ধ-নাটক ইত্যাদির মধ্যে বিশেষ করে উল্লেখ্য হচ্ছে দ্বিজেন্দ্রলাল নাথের 'বনফুল'-এর উপন্যাসে সমাজচেতনা, অশোক সর-কারের বাংলা নাটকে সশস্ত্র সংগ্রামের প্রথম আভাস : শরৎ-সরোজিনী, মৃত্যুঞ্জয় সুরাইয়ের গল্পগুচ্ছ : বালিকা বধূ, দীপ্তিকুমার সেনের দৈনন্দিন জীবনের বিজ্ঞান, প্রদীপ চৌধুরীর শনিগ্রহের বলয়, সত্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের এনজাইম বিক্রিয়ার গতিবেগ, রসায়নবিদদের ভেষজ বিজ্ঞানে প্রাকৃতিক উপাদান বনাম কৃত্রিম রাসায়নিক উপাদান,—প্রবন্ধগুলি। সাহিত্য ও বিজ্ঞান সম্পর্কে মৌলিক এই প্রবন্ধগুলি সিরিয়স পাঠকবর্গের নিঃসন্দেহে প্রশংসালাভ্য হবে। এছাড়া লিখেছেন : পলাশ মজুমদার, দিব্যেন্দু সাহা, গোপাল ভৌমিক, দিব্যেন্দু পালিত, কবিশেখর কালিদাস রায়, উমা-শংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়দেব রায় প্রমুখ।

রাজধানী—সম্পাদক নিশিনাথ সেন।। ৩৪ ডাঃ নরেন ঘোষ লেন, কলকাতা ৩১। দাম—দু' টাকা।

অনিয়মিত কবিতার ত্রৈমাসিক। দুই বাংলার শতাধিক কবির কবিতা স্থান পেয়েছে। আধুনিক কবিতার আদর্শ সম্পর্কে সুনীলচন্দ্র সরকারের প্রবন্ধটি মূল্যবান। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কবিতা লিখেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, মণীন্দ্র রায়, লোকনাথ ভট্টা-চার্য, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, শান্তনু দাস শান্তি লাহিড়ী, আশিস সান্যাল, শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, কৃষ্ণ ধর, দিনেশ দাস এবং আরো কয়েকজন। কবিতা ও প্রবন্ধের মান উন্নত। ইদানীংকালে এত সুন্দর আর কোনো কবিতার কাগজ বেরোয়নি।

তরঙ্গিমা (শারদীয়া সংখ্যা) : প্রধান সম্পা-দক হরিদাস ঘোষ, ৪০।১, বনমালী সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৫ থেকে প্রকাশিত। দাম দু' টাকা।

শারদীয়া তরঙ্গিমার প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটি শুধু নাটকের সংকলন। স্থান পেয়েছে ছোট-বড় মিলিয়ে মোট চারটি নাটক : বিখ্যাত নাট্যকার মন্মথ রায়ের শিকারিণী; অগ্নিমিত্রের চার্বাকের জন্ম; মীরাটলালের ভাঙছি, নিয়ম ভাঙছি; এবং রঞ্জিত মুখোপাধ্যায়ের নির্বাপিত ধ্বনির মাস্তুলে। তরঙ্গিমার উদ্দেশ্য হল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে থেকে এ পর্যন্ত বাংলা নাট্যধারার একটা সুস্পষ্ট ছবি তুলে ধরা। কিন্তু একথা ভুললে চলবে না যে, নাট্য-আন্দোলনকে আরো অগ্রসর করে তুলতে হলে বিশেষভাবে প্রয়োজন প্রতিভাবান নাট্য-কারের অনুসন্ধান এবং সেই সঙ্গে গুণগত উৎকর্ষ সাধন। এদিকে লক্ষ্য রেখে আগা-মীর তরঙ্গিমা পত্রপত্রিকার আসরে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে অনন্য হয়ে উঠবে।

প্রান্তিক : সম্পাদক স্নেহাশিস শুকুল ও বরেন ভট্টাচার্য।। ৫০, পটলডাঙ্গা স্ট্রীট, কলকাতা-৯। দাম—ষাট পয়সা।

রুচিসম্মত ক্ষীণ-আয়তনের সাহিত্যপত্র। ছাপা ও অঙ্গসজ্জা চমৎকার। লিখেছেন সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সুধাংশু ঘোষ, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, রত্নেশ্বর হাজরা, শচীন বিশ্বাস ও আরো অনেকজন।

কবিকণ্ঠ : সম্পাদক অসীমকৃষ্ণ দত্ত।। রবীন্দ্র সরণী, আসানসোল।। দাম : এক টাকা।

দেশী-বিদেশী কবিতার মেলা। আলোচনা-সমালোচনা কিছুই ছাপা হয়নি। লিখেছেন কিরণশংকর সেনগুপ্ত, তুলসী মুখোপাধ্যায়, মংগলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, তরুণ সেন এবং আরো অনেকে।

ত্রিবৃত্ত—সম্পাদক রণজিৎ দেব।। ১, ত্রিবৃত্ত সরণী, কুচবিহার।। দাম—এক টাকা।।

সুদূর উত্তর বাংলার মফঃস্বল শহর থেকে প্রকাশিত কবিতার একটি উল্লেখযোগ্য কাগজ। নির্বাচিত কবিতা ও প্রবন্ধ সমৃদ্ধ। গোষ্ঠীচেতনায় দ্বারা অনাচ্ছন্ন। লিখেছেন অমিয়ভূষণ মজুমদার, অরুণকুমার শিকদার, বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, আলোক সরকার, শংকর চট্টোপাধ্যায় এবং আরো অনেকে। একটি কাব্য-নাটক লিখেছেন রণজিৎ দেব।

অরণি—সম্পাদক বিনয় গুহ ও সোমেশ ভট্টাচার্য।। পূর্বাচল, মিলনপুর, গৌহাটি, আসাম।। দাম—এক টাকা।

আকার আয়তনে বড় না হলেও অরণির এ সংখ্যাটি সুনির্বাচিত গল্পে সমৃদ্ধ। লিখেছেন আশিস সান্যাল, সুভাষ সিংহ, সতীশচন্দ্র শিকদার, হোমেন বরগোহাঞি, শংকর দাশগুপ্ত এবং আরো কয়েকজন। আসাম থেকে প্রকাশিত পত্রিকাগুলির মধ্যে অরণি এরই মধ্যে বেশ সুনাম অর্জন করেছে।

বিচিত্রা—সম্পাদক নলিনীকুমার চক্রবর্তী, সুব্রত রাহা ও জীবন ভৌমিক।। ৬৫, তর্কসিদ্ধান্ত লেন, বালি, হাওড়া।। দাম—এক টাকা।

সাহিত্যের কাগজ হলেও কবিতার সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি। লিখেছেন নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, নিমাই গুপ্ত, সুনীল ভট্টাচার্য, দীপক রায়, রঞ্জিত সিংহ, সিদ্ধার্থ দাশগুপ্ত এবং আরো অনেকে।

কান্দী বান্ধব—সম্পাদক সত্যেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়।। বাসন্তী প্রেস, পোঃ কান্দী, মুর্শিদাবাদ।। দাম : এক টাকা।

কান্দী-বান্ধব মফস্বল থেকে না বেরিয়ে কলকাতা থেকে ছাপা হলে হৈ হৈ পড়ে যেতো। মূল্যবান প্রবন্ধে সংখ্যাটি সমৃদ্ধ। কয়েকটি প্রবন্ধের নাম ভুবনমোহিনী প্রতিভার কবি নবীন মুখোপাধ্যায়ের (ডঃ অমলেন্দু মিত্র), ভাষার উদ্ভব বৈচিত্র ও মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের ভাষা বৈশিষ্ট্য, (নির্মলকুমার সিংহ), কান্দী মহকুমা চণ্ডীমণ্ডপের উৎপত্তি প্রসঙ্গ (প্রভাত মুখোপাধ্যায়), এক মর্মচ্ছেদ এক মন্দির (ফজলুল হক), দক্ষিণ কালীর আজন (মোহিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়) দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ ও লালাবাবু (ভাবগ্রাহী), মুর্শিদাবাদের রাঢ় এলাকা ইত্যাদি। এমন একটি শারদীয়া সংখ্যা উপহার দেবার জন্য আমরা সম্পাদককে অভিনন্দন জানাই।

বহুমুখী—সম্পাদক স্বরাজ সেনগুপ্ত।। জিয়াগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।। দাম—এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা।।

কয়েকটি পুরনো লেখার পুনর্মুদ্রণ সময়োপযোগী হয়েছে। প্রতিটি প্রবন্ধই সুলিখিত। উল্লেখযোগ্য কবিতা লিখেছেন কৃষ্ণ ধর, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, আশিস সান্যাল, তুলসী মুখোপাধ্যায় এবং আরো কয়েকজন। আয়ানেস্কোর অনুসরণে একটি নাটক লিখেছেন স্বরাজকুমার সেনগুপ্ত।

দুর্গাপুর বাণী—সম্পাদক কালিদাস মুখোপাধ্যায়।। প্রজেক্ট প্রেস, বেনাচিতি, দুর্গাপুর—১৩।।

নবীন-প্রবীণ লেখকদের লেখায় পত্রিকাটি আকর্ষণীয়। তবে অধিকাংশ লেখাই প্রাচীনধর্মী। লিখেছেন হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায়, তুলসী মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্র গুহ এবং আরো অনেকে।

বাংলা সাহিত্য পত্র—সম্পাদক উমাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়। ২৬, বাবুপাড়া, ভাটপাড়া, ২৪-পরগণা। দাম—চল্লিশ পয়সা।

বাংলা ইংরেজী দ্বিভাষিক কবিতাপত্র। লিখেছেন গৌরাঙ্গ ভৌমিক, গণেশ বসু, সৌমিত্রশংকর দাশগুপ্ত, হেনা হালদার, পরেশ মণ্ডল, নচিকেতা ভরদ্বাজ, দর্পণ হালদার এবং আরো কয়েকজন। ইংরেজী প্রবন্ধ ও কবিতা লিখেছেন মিস জুডি স্কিলিংস ও নির্বাচন নিয়োগী। সুধাংশু সেন লিখেছেন বাংলা কথাসাহিত্য সম্বন্ধে বিপ্লবের পদধ্বনি।

এবং—সম্পাদক অমিয় সিংহ ও গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায়। ২৩।১, সঙ্গীবাগান লেন, কলকাতা-২৭। দাম—পঞ্চাশ পয়সা।

ঘোষণায় বলা হয়েছে, সময় দশকের গল্পপত্র। লিখেছেন নির্মলেন্দু গৌতম, শান্তনু দাস, জয়ন্ত দত্ত, গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিয় সিংহ এবং সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়।

পরিচয়—সম্পাদক : দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তরুণ সান্যাল। ৮৯, মহাত্মা গান্ধী রোড। কলকাতা-৭। দাম—আড়াই টাকা।

পরিচয়ের পুরোন বৈশিষ্ট্য শারদীয় সংখ্যায় স্পষ্ট। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ লিখেছেন হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বিপ্লব, আবেগ ও প্রজ্ঞা), অমলাশংকর রায়, বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (মার্কসবাদ প্রসঙ্গে কয়েকটি গোড়ার কথা), দিলীপ বসু (বৈজ্ঞানিক এষণাজল), চিন্মোহন সেহানবীশ কল্যাণ দত্ত, রবীন্দ্র মজুমদার, গৌতম চট্টোপাধ্যায়, শংকর চক্রবর্তী, বাসব সরকার এবং সত্যপ্রিয় ঘোষ (সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্য কি প্রগতিশীল?)। গল্প লিখেছেন অসীম রায়, চিত্তরঞ্জন ঘোষ, মিহির সেন, গুণময় মান্না, অমলেন্দু চক্রবর্তী, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র নিয়োগী এবং অসিত ঘোষ। কবিতা লিখেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিষ্ণু দে, বিমলচন্দ্র ঘোষ, কিরণশংকর সেনগুপ্ত, দক্ষিণারঞ্জন বসু, মণীন্দ্র রায়, মংগলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সতীন্দ্রনাথ মৈত্র, তরুণ সান্যাল, লোকনাথ ভট্টাচার্য রাম বসু, কৃষ্ণ ধর, চিত্ত ঘোষ, সিদ্ধেশ্বর সেন শান্তিকুমার ঘোষ, বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত, শংকর চট্টোপাধ্যায়, অভয় ঘোষ, শান্তনু দাস, শিবেন চট্টোপাধ্যায়, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, তুলসী মুখোপাধ্যায়, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, শিবশম্ভু পাল, অমিতাভ দাশগুপ্ত, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, আশিস সান্যাল, তরুণ সেন, সত্য গুহ, অনন্ত দাস, গণেশ বসু, সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, নিরঞ্জন দাস এবং আরো কয়েকজন।

আলোছায়া—সম্পাদক —মাধবলাল মল্লিক। ১৬।১৭, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা—১২, দাম—৩্।

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, জরাসন্ধ, বনফুল, আশাপূর্ণা দেবী, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ যশস্বী লেখকের উপন্যাস ও গল্পে, কৃপাল চট্টোপাধ্যায় বোম্বানা বিশ্বনাথন, আবু আতাহার, নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, ডাঃ অবনী সিংহ, অজিত দে, রাধুকৃষ্ণ পি কে চৌধুরী প্রমুখ লেখকের নানা বিচিত্র ধরণের বহু লেখায় সমৃদ্ধ ও চিত্র ও মঞ্চ শিল্পীদের নানাবর্ণের চিত্রে শোভিত এই শারদীয় সংখ্যাটি সহজেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে বলেই বিশ্বাস রাখি। সম্পাদকের বিষয় নির্বাচন ও রুচিজ্ঞান প্রশংসনীয়।

স্বাক্ষর—সম্পাদক বীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য।। ১।১।১এ, লক্ষ্মী দত্ত লেন, কলকাতা-৩।। দাম দু টাকা।।

এ সংখ্যায় উল্লেখযোগ্য রচনা এলিয়ট সম্পর্কে একটি সাক্ষাৎকার। লিখেছেন প্রশান্ত দাঁ। বাংলাদেশে এলিয়টের কাব্য-নাটক প্রসঙ্গে লিখেছেন পুলক চন্দ। অন্যান্য লেখকদের মধ্যে আছেন অশোক দাস, ভোলানাথ ভট্টাচার্য, দীনেন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রণব রায় ও আরো কয়েকজন। পত্রিকাটি পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করে। প্রবন্ধগুলি মূল্যবান।

CENTRAL LIBRARY

সাহিত্য সেতু—সম্পাদক শুভেন্দু সেনগুপ্ত। সংগঠন সম্পাদক তপনবন্ধু কুণ্ডু। বাঁশবেড়িয়া কুণ্ডু গলি, পোঃ বাঁশবেড়িয়া, হুগলী। দাম—তিন টাকা।

গল্প কবিতা আলোচনা সমালোচনা ও অন্যান্য নিয়মিত বিভাগে সাহিত্য সেতুর এই বিশেষ সংখ্যাটি আকর্ষণীয়। লিখেছেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, শুভেন্দু বসু, জয়ন্তী সেন, রণজিৎ সেন, বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, অশোককুমার সেনগুপ্ত, আবু আতাহার, শান্তিলাল রায়, ভোলানাথ ঘোষ, শ্যামল গুপ্ত, দীপ্তি রায় প্রমুখ। প্রচ্ছদ ভালো। রচনা নির্বাচন উন্নতমানের।

সংক্রান্তি—সম্পাদক দিব্যেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ও শংকর দাশগুপ্ত। ৬৭এ, মিডল রোড, কলকাতা-১৭। দাম—এক টাকা।

ছোটগল্পের ত্রৈমাসিক। প্রতিটি গল্পেই লেখকের চিন্তার ধারক। লিখেছেন দিব্যেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় শংকর দাশগুপ্ত, আবাল্ল জব্বার, মৃণালিকা দাশগুপ্ত, দীপঙ্কর দাস, সাগর চক্রবর্তী, সমীর রক্ষিত, অজয় সেন, উদয় ভট্টাচার্য, জীবন সরকার, প্রদ্যুৎ সেন, দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও স্বপন ঘোষ।

সাতপুরো—সম্পাদক শ্যামল মুখোপাধ্যায়। ৩১২, পূর্ব ঘামাপুর, জব্বলপুর, মধ্য প্রদেশ। দাম—এক টাকা।

প্রবাসী বাঙালীরা এই পত্রিকার লেখক লেখিকা। শহর কলকাতা থেকে অনেক দূরে থেকেও সাহিত্যের প্রতি সমান আগ্রহী। দু একজন কলকাতার লেখক অবশ্য তাঁদের সারস্বত সাধনার অংশ নিয়েছেন। এ সংখ্যায় লিখেছেন শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায়, শোভন সোম, হেনা হালদার, তারাপ্রসাদ বসু, উমাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, অজয় রায়, সুনীল বসু, বিমল বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিদন্ময় দত্ত প্রমুখ।

দীপান্বিতা—সম্পাদক দেবাশিস ঘোষ, বিবেকানন্দ সেনগুপ্ত, রণজিৎ দাস। উত্তরবঙ্গ প্রেস, টেম্পল স্ট্রীট, জলপাইগুড়ি। দাম—এক টাকা।

লিখেছেন দেবল দেববর্মা, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, অসীম বর্ধন, দুর্গাদাস বসু, গণেশ সেন, নচিকেতা ভরদ্বাজ প্রমুখ।

পান্থ (শারদীয়া)—সম্পাদক : সুশীল মণ্ডল। ৭৯, শ্যামনগর রোড, কলকাতা ৫৫। পঁচিশ পয়সা।

ছোটদের উপযোগী রচনাসম্ভারে পত্রিকাটি সত্যিই আকর্ষণীয়। চমৎকার প্রচ্ছদ। পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত অবনীন্দ্রনাথের একটি কবিতার পুনর্মুদ্রণ ছাড়াও দক্ষিণারঞ্জন বসু, কৃষ্ণ ধর ও গৌরাঙ্গ ভৌমিকের কবিতা তিনটি চমৎকার। অন্যান্য লেখকদের মধ্যে আছেন পরিমল ভট্টাচার্য, নীতিশ মুখোপাধ্যায়, অজয় নাগ, দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, নন্দলাল ভট্টাচার্য এবং আরো কয়েকজন।

স্বস্তিকা—সম্পাদক : সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। স্বস্তিকা প্রকাশন ট্রাস্ট। কলকাতা ও আগরতলা থেকে প্রকাশিত।

ছোটগল্প, বড় গল্প, গবেষণামূলক প্রবন্ধ, অন্যান্য প্রবন্ধ, বিশেষ রচনা, পূর্ণাঙ্গ নাটকের রস-রচনা, কবিতা।

কবিতাশিল্প—সম্পাদক : কল্যাণশঙ্কর সেনগুপ্ত। ২ রাজা কালীকৃষ্ণ লেন। কলিকাতা-৫। দাম পঞ্চাশ পয়সা।

অভিনব রীতির কবিতা পত্রিকায় লিখেছেন মনুজেশ মিত্র, অসীমকৃষ্ণ দত্ত, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, দুর্গাদাস সরকার, স্বদেশরঞ্জন দত্ত, সুনীল সরকার, বুদ্ধদেব সরকার। আলোচনা, সাক্ষাৎকার কয়েকটি আছে।

খেয়া : সম্পাদক—মলয়কুমার দাশ। ২৬৪, ডায়মণ্ড হারবার রোড। কলকাতা-৩৪। দাম পঁচিশ পয়সা।

প্রায় এক শ পাতার মিনি পত্রিকা খেয়ায় আছে গল্প, কবিতা, শব্দছন্দে, কুইজ, কৌতুক, খেলাধুলো, চলচ্চিত্র এবং আরো অনেক কিছু।

পরিচিতি (শারদ সংখ্যা) সম্পাদক : সত্য মণ্ডল ও পরিমলকুমার গুপ্ত। ৭৭এ ইব্রাহিমপুর রোড, যাদবপুর, কলকাতা—৩২। এক টাকা।

প্রবোধকুমার সান্যালের একটি চিঠি দিয়ে শুরু হয়েছে পত্রিকা ছাপা। প্রচ্ছদে ঘোষিত হয়েছে : 'নতুনদের একমাত্র সাহিত্যপত্রিকা'। লেখক-লেখিকাদের মধ্যে আছেন গোরাচাঁদ দে, সমর ভট্টাচার্য, বৃন্দাবন গোস্বামী, তারাশঙ্কর আদিত্য এবং আরো অনেকে। কিন্তু রচনানির্বাচনে নতুনত্ব কম।

প্রাপ্তিস্বীকার

শ্রী (শারদীয়া ১৩৭৭)—সম্পাদক আশিস দাশগুপ্ত।। অভিযান সাংস্কৃতিক সংস্থা, আতাবাগান, গড়িয়া, ২৪ পরগণা।। চল্লিশ পয়সা।।

পিপাসা : সম্পাদক বিশ্বনাথ ঘোষ, ভূপাল সিংহ রায়, সামসুল আলম সরকার।। চাঁপারুই জি টি রোড, দিগসুই (মগরা), হুগলী।। এক টাকা।।

স্ফুলিঙ্গ—(শারদীয়া ১৩৭৭)—সম্পাদক রমেন চক্রবর্তী, পবিত্র জ্ঞানী রায়, পান্নালাল মল্লিক।। কাছারীপাড়া, বসিরহাট।। এক টাকা।।

আধুনিক কবিতা (চতুর্বিংশ সংকলন)—সম্পাদিকা রেখা দত্ত।। ৪, মিডল রোড, কলকাতা-৩২।। দাম ৫০ পয়সা।।

পদাতিক (শারদীয়া)—সম্পাদক শ্যামল সাহা।। হালিশহর (নবনগর), পোঃ হালিশহর, ২৪ পরগণা।। এক টাকা।।

বহিদ্বন্দ্ব (শারদীয়া ১৩৭৭)—সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল।। গরিফা, পোঃ হালতু, ২৪ পরগণা।। এক টাকা।।

দিশারী (শারদ সংকলন)—সম্পাদক কৃষ্ণচন্দ্রকুমার মজুমদার ও পাঁচুগোপাল রায়।। বিশালাক্ষীতলা, বারুইপুর, ২৪ পরগণা। পঁচিশ পয়সা।।

কাকলি (শারদীয়া ১৩৭৭)—সম্পাদিকা পারুল দাস।। অভয়নগর, আগরতলা, ত্রিপুরা।। ১-৫০ টাকা।।

খামখেয়ালী (শারদীয়া ১৩৭৭)—সম্পাদক রাজেন্দ্রকুমার মিত্র।। ১১বি, গোকুল মিত্র লেন, কলকাতা ৫।। দাম ১-৫০ টাকা।

প্রতীকী : সম্পাদক দেবকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, অচিন্ত্যকুমার সাঁতরা।। ৩২ পটলডাঙ্গা স্ট্রীট, কলকাতা-৯।। ষাট পয়সা।।

রবিবাসরীয় : সম্পাদক কালাচাঁদ রায়।। ৩১, রাজা রোড, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।। পঞ্চাশ পয়সা।।

উত্তরীয় : সম্পাদক শ্যামল ধর।। ময়নাগুড়ি জলপাইগুড়ি।। এক টাকা।।

বনলতা : ২০ দমদম রোড, ব্লক নং এন-১, ফ্ল্যাট নং-৫, কলকাতা-৩০।। ৪০ পয়সা।।

কণ্ঠস্বর : সম্পাদক সত্যরঞ্জন বিশ্বাস।। ৪১ এল ।৭ নারকেলডাঙ্গা (নর্থ রোড) কলকাতা—১১।। এক টাকা।

শারদ সাহিত্য পরিক্রমা

ছোট গল্প

পর্যবেক্ষক

আমাদের এ-সময়ে, সত্তরের দশকে এসে, এই আর্থ-রাজনৈতিক সামাজিক পরিমণ্ডলে সাহিত্যের পক্ষ থেকে ফলাও করে কিছু বলতেও যেন সঙ্কোচ হয়। সন্দেহ হয়, সমাজ-মানসে সাহিত্যের কোন স্বতন্ত্র এবং বিশিষ্ট ভূমিকা আছে কিনা। সাহিত্য সমাজ মানসের দর্পণ, এতে দেশ কাল পাত্রের স্বরূপ প্রতিফলিত হয়, মানুষ আশা-আকাঙ্ক্ষা ও সম্ভাবনার পথ দেখতে পায়—ইত্যাদি কথা বাজার-চলতি প্রচলিত বুলি কিনা তাও চিন্তার বিষয়। বাংলাদেশে ইদানীং পাঠকের সংখ্যা বেড়েছে, ঘরে ঘরে এখন খবরের কাগজ রাখা হয়, অনেকেই পত্র-পত্রিকা কেনেন, সাহিত্যের সম্মেলন ও আলোচনা হয়। তদ্‌সত্ত্বেও মানুষ তার প্রাত্যহিক জীবনযাপনের ক্ষেত্রে সাহিত্যের প্রয়োজন কতটা বোধ করে; লেখকগণই বা সমাজ-জীবনের কতটা কাছাকাছি আসতে পেরেছেন, একালের সাহিত্যিক মানুষকে, সমাজ-সভ্যতাকে কোন সত্যে বিধৃত দেখতে চান। এসব জিজ্ঞাসা গুরুত্বপূর্ণ, জটিল এবং তর্কসাপেক্ষও বটে। আসলে জীবনযাত্রার বহুতর ক্ষেত্রে যে গোঁজামিল, অমীমাংসিত দ্বন্দ্ব এবং সমস্যা থেকে যাচ্ছে, যে বিচ্ছিন্নতা জ্ঞাতে অথবা অজ্ঞাতে সমাজ-মানুষে বর্তমান, সাহিত্যও তার থেকে মুক্ত নয়। লেখক-পাঠক সম্পর্কের জটিল ও দুরূহ ঠিক একই কারণে সৃষ্টি হয়েছে। একে আমরা আধুনিককালের অন্যতর বৈশিষ্ট্যও বলতে পারি।

শারদোৎসব ও সাহিত্য—

তবুও সাহিত্য আছে এবং থাকবে। আর সময়ও পরিবর্তিত হয় বৈকি! মধ্য-ষাটের কোন একটা বছরের সঙ্গে সত্তরের বর্তমান সময়ের পার্থক্যও বিস্তর। এজাতীয় আলোচনার কথা ভাবাও যেত না, হয়ত প্রয়োজনও ছিল না, সময়টা যদি ৬৪ কি ৬৭ সাল হতো। এখন আমরা ভাবছি। অর্থাৎ সাহিত্যের সঙ্গে সামাজিক জীবনযাত্রার যোগসূত্র আর একবার স্পষ্টতর হয়ে উঠতে চাইছে বলে আমাদের ধারণা,—গত শারদ মরশুম থেকেই যার ভূমিকা প্রস্তুত হচ্ছিল, এ বৎসর নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য উত্তরণ। বাংলা দেশে শারদীয় পত্র-পত্রিকার বিপুল ও বিচিত্র সমারোহ বহুকালের ঐতিহ্য। মাঝে ষাটের দশকে নানা কারণে সেই সমারোহ কিঞ্চিৎ স্তিমিত হলেও অতি-সাম্প্রতিককালে শারদ-সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। এমন ব্যাপক সাহিত্য-সৃষ্টি এবং প্রচারের আয়োজন আমাদের দেশের অন্য কোন ভাষাতে ও হয়ই না, এমন কি পৃথিবীর অন্য কোন দেশেও হয় কিনা সন্দেহ। বাংলাদেশের বহুতর নিজস্বতার মধ্যে শারদ সাহিত্য অন্যতম। সাহিত্য পাঠে বিশেষ অনাগ্রহী পাঠকও এ-সময়ে একখানা শারদীয় সংখ্যা কিনে থাকেন, পূজোর বাজেটে অন্য সব কেনা কাটার মধ্যে দুই-একখানা পত্র-পত্রিকাও ধরা থাকে।

ছোটগল্প । পত্র-পত্রিকার ভূমিকা—

বাংলা সাহিত্যের কনিষ্ঠতর শাখা ছোট গল্প পত্র-পত্রিকার অন্যতম আকর্ষণ। পুস্তকাকারে ছোটগল্পের চাহিদা কিছুটা কম হলেও সাময়িক ও সাহিত্য পত্র-পত্রিকায় তার চাহিদা ও গুরুত্ব আগেও যেমন ছিল এখনও তেমনি আছে। একালের মানুষ তার বহুবিধ সমস্যা ও কর্মের ফাঁক-অবসরে পত্রিকার পৃষ্ঠায় মন দেয়। স্বভাবত ছোটগল্পের আকার-প্রকার তার আকর্ষণ ও জনপ্রিয়তার হেতু, একমুখী সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তুও অন্যতর কারণ। বস্তুত পত্র-পত্রিকার পরিচালনগত সুবিধা এবং সম্পাদকের তাগিদ বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন দেশে ছোটগল্পের সমৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছে। গত শতাব্দীর একেবারে শেষ কয়েক বছরের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। ভারতী পত্রিকাই রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প রচনায় হাতে খড়ি দেয়। তারপর শিলাইদহের পদ্মার বুকে বোটে বসে অনেক গল্প লেখেন হিতবাদী-সাধনার জন্য। 'হিতবাদীতে তিনি প্রতি সপ্তাহে একটি করিয়া ছোটগল্প লিখিয়া দিতে লাগিলেন: বোধহয় ছয় সপ্তাহে ছয়টি লেখেন।... সাধনার টানে ছোটগল্প পুনরায় দেখা দিল : প্রথম বৎসরে প্রতি মাসে একটি করিয়া গল্প লেখেন'—(প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়—রবীন্দ্রজীবনী ১ম খণ্ড)। বাংলা ছোটগল্প কনিষ্ঠতর হলেও সত্তর-পঁচাত্তর বছরের বয়স্ক ও পরিণত রূপে বিশ্বসভায় সে তার নিজের আসন করে নিয়েছে মোপাসাঁ চেকভ, গর্কি, হেমিংওয়ে, সমরসেট মমের সঙ্গে। আর এই অগ্রগতি ও পুষ্টির পেছনে নীরব ভূমিকা পালন করেছে নানা-শ্রেণীর পত্র-পত্রিকা, বিশেষ করে ছোট-বড় সাহিত্য-পত্রিকাগুলি। সুতরাং আজও কোন পত্র-পত্রিকা একটি উল্লেখযোগ্য ছোটগল্প পাঠকদের উপহার দিতে পারলে খুশি হয়, গর্ব অনুভব করে। সেদিক থেকে ভারতী হিতবাদী সাধনা যে ভূমিকা পালন করেছে প্রাথমিক স্তরে, কল্লোল কালি-কলম ও প্রগতি যে ভূমিকা পালন করেছে তিরিশের যুগে, সমকালে বা কিছু পরের প্রবাসী, বিচিত্রা, বঙ্গশ্রী বা শনিবারের চিঠির যে ভূমিকা, ঠিক সেই ভূমিকাই পালন করে চলেছে একালের বেশ কিছু একান্তভাবে ছোটগল্পের পত্রিকা সহ অসংখ্য নামী অনামী বিভিন্ন ধরণের পত্রিকা।

এ সময়ের শারদ সংখ্যা পত্রিকার সঠিক হিসাব করা দুরূহ। কোলকাতা সহ বাংলার বিভিন্ন জেলা শহর, এমন কি পল্লী অঞ্চল থেকেও পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

প্রবীণ গল্পকারগণ—

বাংলা ছোটগল্পের প্রথম সার্থক শিল্পী রবীন্দ্রনাথের পর যুদ্ধোত্তরকালের ব্যাপকতর সমাজ পটভূমি, নতুন যুগের সমস্যা, মন ও মননের অধিকার নিয়ে এলেন তিরিশের যুগের তরুণ গল্পকারগণ। দীর্ঘ ৩০।৪০ বছরের অনলস সাহিত্য চিন্তার পরিণত ছোটগল্প যাঁদের কাছ থেকে এখনও মাঝে দু-একটি পাওয়া যায়, তাঁদের মধ্যে প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, শৈলজানন্দ, তারাশঙ্কর, বনফুল, অন্নদাশঙ্কর, মনোজ বসু প্রমুখ অন্যতম। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সমকালে বা আগে পরে যাঁদের আবির্ভাব সেইসব প্রবীণ এবং অভিজ্ঞ গল্পকারদের কাছ থেকেও আমরা ছোটগল্প পাই। প্রবীণ লেখকদের মধ্যে সকলেই প্রায় বছরের অন্যান্য সময়ে গল্প রচনায় ততটা আগ্রহী নন, উপন্যাস বা অন্যান্য রচনা নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। কেবল শারদ মরশুমে তাঁদের কিছু কিছু নতুন গল্প আমাদের পড়ার সৌভাগ্য হয়। কেবল পত্রিকা-সম্পাদকের তাগিদেই এঁরা ছোটগল্প লেখেন, এটা ভাবলে মনে হয় ভুল হবে। উপরন্তু আমাদের মনে হয়, এদেশের কথা-সাহিত্যিকদের প্রায় প্রত্যেকেরই প্রিয় আর্ট-ফর্ম ছোটগল্প। জীবনের আন্তরিক অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির কথা তাঁরা ছোটগল্পের মাধ্যমে বলতেই ভালবাসেন। তবুও কেবল ছোটগল্প লিখেই লেখক টিকে থাকতে পারেন না, কেননা ছোটগল্পের চাহিদা থাকা সত্ত্বেও তার থেকে খ্যাতি ও

অর্থ প্রাপ্তি - উপন্যাস লেখকের তুলনায় অতি নগণ্য।

তিরিশের যুগের গল্পকার

বাংলা ছোটগল্পের খ্যাত-কীর্তি রূপকার প্রেমেন্দ্র মিত্র বলেছেন, 'গল্পের নায়কের সিংহাসন উল্টে গেছে। যাবারই কথা। কিন্তু মানুষের মিছিল সেখানে থামবার নয়।' (অমৃত সাহিত্য সংখ্যা ১৩৭৭)। এবারের শারদীয় ছোটগল্প পড়ে যে কোন সচেতন পাঠকই এই মন্তব্যের যথার্থ উপলব্ধি করতে পারবেন। প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর নিজের কয়েকটি গল্পেও এই সময়ের অস্থির মানুষের দ্বন্দ্ব-সংঘাতকে, চাওয়া-পাওয়া আশা-হতাশাকে জীবন্ত রূপদান করেছেন। এক পড়ন্ত বড় বাড়ির এক খেয়ালী বৌঠাকুরাণীর চরিত্র-ঐশ্বর্য ঐ বিরাট রহস্যময় বাড়িটার মতই উন্মোচিত করেছেন 'অসমাপিকা' (অমৃত) গল্পে। আছে পাশে পরিপূরক কিছু মানুষের মুখ। 'নিজের অসহায় মূঢ়তার গোলকধাঁধায় ছেড়ে দেওয়া জীবনের কথা লেখকের গল্প বলার অসামান্য জাদুস্পর্শে পাঠকের মনে দাগ কেটে যায়। বাক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত এক মহিলার দুই পুরুষ-কেন্দ্রে আকর্ষণের গল্প 'দ্বিচারিণী' (সীমান্ত) আধুনিক বাঙালী সমাজে স্বীকৃত বিবাহ-বিচ্ছেদের অন্ধকারের দিক প্রেমেন্দ্র মিত্র সূক্ষ্ম ইঙ্গিতে দেখিয়েছেন। তিনি উল্টোরথ, প্রগতি প্রভৃতি পত্রিকাতেও লিখেছেন। তাঁর গল্পে বিষয় গৌরব, বিষয় উপযোগী ভাষা, প্রকাশের মুন্সিয়ানা, গভীর অন্তর্দৃষ্টি সর্বদাই স্বাদ-বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করে। এবারের গল্প-গুলিতেও সে-বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ আছে। অচিন্ত্যকুমারের 'বিকেলের সানাই' (অমৃত) বা দ্বিতীয়া (যুগান্তর)-র মুখ্য উপজীব্য প্রেম। পুরাতন প্রেম-সম্পর্ক বয়স্ক মন ও মননে গভীর, স্মৃতি-বিস্মৃতিতে রহস্যময়। এক যাযাবর স্বভাবের বাদাম মেয়েকে ভালবেসে প্রাণ দিল সাপুড়ে যুবক। সে ঘর বাঁধতে চেয়েছিল। বিহঙ্গীকে কি খাঁচায় আটকানো যায়। এবারের বেতার জগতে প্রকাশিত সূক্ষ্ম প্রেমের গল্প শৈলজানন্দের 'বন-বিহঙ্গী।' নারী মনস্তত্ত্বে সম্ভবত সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ—যৌবন সম্পদ। তারা-শঙ্করের 'সখী ঠাকরুণ' (আনন্দবাজার। গল্পের এলোকেশী ষোল থেকে পঞ্চাশ বৎসর পর্যন্ত কঠোর ব্রহ্মচর্য ও সংযমী জীবন আচরণের মধ্য দিয়ে দেব সেবায় নিয়োজিত থাকলেও আজ তাকে সরে যেতে হবে তার কারণ সে বিগত-যৌবনা। বৎসর গুনতি হিসাবেই কি যৌবন বিচারের সব? এতকাল ধরে যে আশ্চর্য সতর্কতা ও সাধনায় যৌবনকে রক্ষা করে এলো তার মূল্য কি কিছু নেই। এ-গল্পে তারাশঙ্কর তাঁর নিজস্ব গল্প-রীতির বৈশিষ্ট্য রক্ষা করেছেন। তাঁর অন্যান্য গল্প 'আলোছায়া' 'প্রগতি'-তে প্রকাশিত। বনফুল তাঁর নক্সা ও চিত্র-ধর্মী গল্পে যথারীতি শ্লেষাত্মক ও তির্যক ভঙ্গী অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। 'লেখক ও নিধিরাম' (যুগান্তর) ছোট্ট পরিসরে এ-সময়ের সমাজ-জীবনের ছায়া পড়েছে। কথা-সাহিত্য, দেশ উল্টোরথ প্রভৃতি পত্রিকায় আরও লিখেছেন তিনি। বর্তমান অস্থির সময়ে, বিশেষ করে রাজনৈতিক অস্থিরতার পটভূমিতে উচ্চ শিক্ষিত বড় অফিসারের মানসিক টানা পোড়েনের গল্প অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'বারুণী' (অমৃত)। শ্রীযুক্ত রায়ের গল্প মনন প্রধান। মনোজ বসু তাঁর ছোটগল্প 'ভূমিকম্প' বসুমতী সাপ্তাহিক জনৈক পদ্মভূষণ উপাধি প্রাপ্ত গণ্যমান্য ব্যক্তির সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দেখিয়েছেন, আন্তরিকতাহীন লোক-দেখানো অনুষ্ঠানকে। তিনি যুগান্তর সিনেমা জগৎ ইত্যাদি পত্রিকাতেও লিখেছেন। তাঁর গল্পে মূঢ় বাস্তব এবং সরস বাক-ভঙ্গী লক্ষণীয়।

চল্লিশের যুগ : যুদ্ধোত্তর কাল

প্রবীণ লেখকদের মধ্যে বেশ কিছুদিন পরে গল্প লিখলেন সুবোধ ঘোষ। এক রূপসী মধ্য বয়স্কা মহিলার ক্ষমতা ও ব্যক্তিত্বের অপপ্রয়োগে একটি সদ্য বিবাহিতা কর্মপ্রার্থীর জীবন কিভাবে ব্যর্থ হয়ে গেল তারই আকর্ষণীয় কাহিনী 'অধীশ্বরী' (দেশ)। অনেকদিন পর গল্প লিখলেন সতীনাথ গুহ-ও। এ-কালের একজন উচ্চ শিক্ষিত বিবাহিত তরুণ অধ্যাপকের রুচিশীল সংবেদী মনে এক 'হীরের টুকরো' 'মার্ভেল আ্যান্ড ডিফিকল্ট' তরুণী ছাত্রী ঝড় তুলেছিল। 'জীবন যত নির্মমই হোক কোথাও না কোথাও কবিতার মত কোন না কোন একটা মিল থেকেই যায়।' শিক্ষক-ছাত্রীর 'দূরতম-নিকট' সম্পর্কের মধ্যে তা ব্যক্ত হয়েছে। লেখকের 'সুভদ্রার রথ' (অমৃত) গল্পে। এই দুটি গল্পেই আধুনিক বুদ্ধি-দীপ্ত উচ্চ-বিত্তের পরিমণ্ডল। উভয় ক্ষেত্রেই মার্জিত তীক্ষ্ণ ভাষা ও প্রকাশভঙ্গী পাঠকের ভাল লাগবে।

মধ্যবিত্তের সামাজিক ও মানসিক সমস্যা ও চিন্তা-ভাবনা নিয়ে যে সব প্রবীণ লেখক গল্প লেখেন তাঁদের মধ্যে নরেন্দ্রনাথ মিত্র, দক্ষিণারঞ্জন বসু, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, আশাপূর্ণা দেবী প্রমুখ অন্যতম। স্বল্প পরিসরে তির্যক ভঙ্গীতে লেখা একটি নতুন ধরনের গল্প নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'স্বনামধন্যা' (কালান্তর)। একুশ বাইশ বছরের সুদর্শনা দীর্ঘাঙ্গী গৌরী মেয়ে, পোশাকে, আচরণে, কথাবার্তায় জড়তাহীনা, লেখকের কাছে যিনি কাগজের জন্য লেখা চাইতে এসেছিল। মেয়েটির সবখানিই যেন স্বরচিত, তার রচনা নামটা থেকে জীবন-পরিবেশ পর্যন্ত সব। লেখকের চিন্তা, এদের তুলনায় তাঁর পঞ্চাশোর্ধ জীবন কতখানি স্বরচিত। শ্রীমিত্র কথা সাহিত্য, দেশ, বিচার, সুন্দর জীবন, সিনেমা জগৎ প্রভৃতি পত্রিকায় এবার লিখেছেন। একটি বধূর মরফিয়া ইনজেকশন নিয়ে নেশা করার কাহিনী দক্ষিণারঞ্জন বসুর 'মরফিয়া' (যুগান্তর), আর একজন মননশীল বুদ্ধিজীবী অধ্যাপকের একা-কীত্বের বেদনার অন্তরঙ্গ চিত্র 'সুখী মানুষ' (সাপ্তাহিক বসু-মতী)। শ্রীযুক্ত বসুর সহজ সরল গল্প বলার ভঙ্গী পাঠককে আনন্দ দেয়। তিনি কথা-সাহিত্য, বিচার-এ গল্প লিখেছেন। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সমান্তরাল (অমৃত) মনস্তত্ত্বনির্ভর কাহিনী। বেশী বয়সে বিয়ে করা স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের উপর সন্দেহ করেছেন, শেষে একে অন্যের উপর বড় বেশী নির্ভরশীল, দুজনে মিলে নিজস্ব জগৎ সৃষ্টি করেছেন। তাঁদের একমাত্র মেয়ে কোন ফাঁকে অন্য এক পৃথক বিন্দুতে অবস্থান করে স্পষ্টত এক সমান্তরাল রেখায় স্থাপিত করেছে নিজেকে। স্বামী-স্ত্রী যখন এই দুঃখের কথা বুঝতে পারল তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। এক প্রকার শূন্যতা-বোধের বেদনা এই গল্প পাঠককে ভারাক্রান্ত করে তুলতে পারে। সাপ্তাহিক বসুমতী, বেতার জগৎ, কালি ও কলম, মৌসুমী প্রভৃতিতে শ্রীমুখোপাধ্যায় লিখেছেন। পিতা-মাতা অভিভাবকের ধমক ও শাসনের দাপটে ছোট ছেলে কিভাবে ভীত আতঙ্কিত হয়ে উঠতে পারে দেখিয়েছেন আশাপূর্ণা দেবী তাঁর 'আতঙ্কিত' (অমৃত) গল্পে। মহিলা গল্পকারদের মধ্যে আশাপূর্ণা অনলস এবং নিয়মিত গল্প লেখেন। কথা সাহিত্য, মধ্য-বাণী, যুগান্তর প্রভৃতিতে লিখেছেন। মধ্য-বিত্তের ঘরোয়া জীবন, প্রেম ও অন্যতর বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা লিখেছেন মন্মথনাথ ঘোষ (যুগান্তর, অমৃত) আশা দেবী (অমৃত, বেতার জগৎ, সাপ্তাহিক বসুমতী) বাণী রায় (যুগান্তর) সুশীল রায় (দেশ, যুগান্তর, বেতার জগৎ), হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় (বিচার, বেতার জগৎ, আলোছায়া), লীলা মজুমদার (বেতার জগৎ)।

উল্লেখযোগ্য হাসা-কৌতুক ও সরস গল্প লিখে শিবরাম চক্রবর্তী (দেশ, মৌসুমী) এবং পরিমল গোস্বামী (অমৃত) পাঠকদের এবারও আনন্দ দিয়েছেন।

এ-সময়ের অবক্ষয়, বেহিসাবী জীবন-যাপন, হতাশ-শূন্যতা বোধ প্রেম-যৌনতার উপর গল্প লিখেছেন সন্তোষকুমার ঘোষ, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, বিমল কর প্রমুখ। 'বেঁচে থাকা থেকে পরিত্রাণ পেতেও আমরা তেমনি যে যে-দিকে পারি ছুটছি।' দুই রাত্রির (দেশ) নায়ক ছুটেছে বন্ধুর স্ত্রীকে নিয়ে। পরস্পরের উষ্ণ সান্নিধ্য ও যৌন সম্ভোগের গল্প। মাঝে মাঝে মনে আসে উত্তম পুরুষের একটা গল্প। গল্প? না, গল্পের মত।' কবিতা-গল্পের মাঝামাঝি একটা চিন্তা-প্রবাহ 'নোট বুক থেকে' (অমৃত)। মারাত্মক রূপসী স্ত্রীর রূপ-যৌবনে কোন এক যুবক উত্তেজিত, অসহিষ্ণু, অস্থির—শেষে উন্মাদ-প্রায়। অথচ কি যে সে চেয়েছিল ভাল করে যুবকটি বুঝতেও পারল না। জ্যোতিরিন্দ্র তাঁর স্বভাব-সিদ্ধ মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গীতে 'চাওয়া' (প্রসাদ) গল্পটি লিখেছেন। শ্রীনন্দী এবারে সিনেমা ও যৌন বিষয়ক পত্রিকাতেই

বেশী লিখেছেন। বিমল কর তার 'টোকা' (প্রসাদ) গল্প দেখিয়েছেন সুখী বিবাহিত জীবন অতীত স্মৃতি অতর্কিতে টোকা দিতে পারে এবং সে টোকার শব্দ স্বামী-স্ত্রীর কানে দুরকম মনে হতে পারে।

এই সময়ের রূপ : প্রবীণদের গল্প

এবার শারদ মরশুমের ছোটগল্পে সবিশেষ লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য সম্ভবত এই যে, বর্তমান বাংলা দেশের তথা ভারতবর্ষের আলোড়ন ও অস্থিরতা, সামাজিক ও রাজনৈতিক সংঘাত, অর্থ-বৈষম্য, শরিকী সংঘর্ষ, খুন জখম রাহাজানি, দারিদ্র্য ও বেকারী, শহরে-গঞ্জে-গ্রামের নতুন চেতনা, মাঠ জমি কৃষক, এক কথায় অভিনব সাম্প্রতিক জীবন-ধারা ছোটগল্পের বিষয়-বস্তু হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। এমন তরতাজা ঘটনা, সমস্যা ও সংঘাত নিয়ে যে গল্প হতে পারে, হওয়া উচিতও বটে, তা ইতিপূর্বে এমন ব্যাপকভাবে অনুভূত হয়নি। সাধারণভাবে শ্রমিক কৃষক কর্মচারীর জীবনও আজ নানা সমস্যায় জর্জরিত। সংকট বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়-ও। সমাজ জীবনে এ-সব আমাদের নিত্য চিন্তা ও শিরঃপীড়ার কারণ। সম্ভবত এখন আমরা স্পর্শকাতরতা কাটিয়ে সাবালক হলে, স্বভাবতই চাইব আমাদের নিত্য-দেখা জীবন সাহিত্যে প্রতিফলিত হোক। আমরা যে সময়ের মাটিতে পা ফেলছি, সাহিত্যের ফসলও সেই মাটি থেকেই ফলুক। আশার কথা, অসংখ্য তরুণ এবং এ-কালের সক্রিয় অনেক কথা-শিল্পীর গল্পে আমরা তা পেয়েছি : আরও আশার কথা প্রবীণ লেখকদের কারো কারো রচনাতেও তার সন্ধান পাওয়া গেছে। কিছু কিছু গল্পের কথা আগেই বলা হয়েছে। আর দুজনের গল্পের প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। বিষয় ও ফলশ্রুতি সম্পর্কে মতপার্থক্যের সম্ভাবনা সত্ত্বেও এ-জাতীয় গল্প সর্বাধিক আগ্রহের বস্তু।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এবার বেশ কিছু গল্প পড়ার সুযোগ আমাদের দিয়েছেন। তাঁর 'ফিউজ' (অমৃত) 'ছায়া' (আনন্দবাজার) 'করতির শব্দ' (কালান্তর) 'কে যে লোকটা' (দেশ) 'ক্যারিকেচার' (প্রসাদ) ওরা (সাপ্তাহিক বসুমতী) প্রভৃতি গল্পগুলি এ-সময়ের চলমান জীবনের বিভিন্ন ও বিচিত্র চিন্তা ও ঘটনার প্রতিচ্ছবি। শ্রীগঙ্গোপাধ্যায় সর্বদাই সমসাময়িক ঘটনা তাঁর গল্পের বিষয় হিসাবে গ্রহণ করেন, এবার তাঁকে সবিশেষ সচেতন মনে হবে। শরিকী সংঘর্ষ আজকের বাংলার রাজনৈতিক জগতের অন্যতম প্রধান লক্ষণীয় বিষয়। আর যেহেতু রাজনৈতিক ঘটনা সমাজ-জীবনকেও প্রভাবিত করে, সুতরাং এই সমস্যা আজকের সমাজ-জীবনের সাধারণ সমস্যা বলেও গণ্য। সেদিক থেকে এই বিষয়ের উপর আলোকপাত করে প্রবীণ গল্পকার গজেন্দ্রকুমার মিত্র একটি সময়োচিত কর্তব্য করেছেন তাঁর 'বধ্যমেধ' (অমৃত) গল্পে। 'ওদের দল ছেড়ে যেদিন চলে গেছে, সেইদিন থেকেই অপরাধী বলে চিহ্নিত করা হয়েছে তাকে, আর এ অপরাধের একমাত্র শাস্তিই হলো—এ-পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়া।' অন্তরঙ্গ বন্ধুকে রাজনৈতিক মতপার্থক্যের হেতুতে খুন করে জনৈক যুবকের পলায়ন, আত্মর লাঞ্ছনা চণ্ডী, রাতের অন্ধকারে বন-প্রান্তরে আত্মগোপন করে কষ্ট ভোগ ও তীব্র মানসিক প্রতিক্রিয়ার পুঙ্খানু-

ইউনিয়ন

মস্কো থেকে প্রকাশিত

সচিত্র মাসিক পত্রিকা

এই জনপ্রিয় পত্রিকাটি ইংরেজী, হিন্দী ও উর্দুতেও প্রকাশিত হচ্ছে। সোভিয়েত দেশ ও তার জনগণের জীবনের সর্বাঙ্গীণ পরিচয় পাঠকদের সামনে উপস্থিত করবে এই পত্রিকাটি।

উপহার

প্রত্যেক গ্রাহককে একখানা করে ১৯৭১ সালের বহুবর্ণ রঞ্জিত ১২ পৃষ্ঠার ক্যালেণ্ডার দেওয়া হবে। ক্যালেণ্ডার সংখ্যা সীমিত। এখনই গ্রাহক হোন।

চাঁদার হার

১ বৎসর	...	৭.০০
২ বৎসর	..	১১.০০
৩ বৎসর	...	১৪.০০
প্রতি সংখ্যা	..	০.৭৫

পত্রিকা না পেলে, অথবা কোন গোলযোগ হলে, অথবা ঠিকানার পরিবর্তন হলে, সংশ্লিষ্ট এজেন্টকে লিখুন।

অধিকৃত এজেন্ট

মনীষা গ্রন্থালয় (প্রাঃ) লিঃ, ৪/৩-বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট কলিকাতা-১২
ন্যাশনাল বুক এজেন্সী (প্রাঃ) লিঃ, ১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট কলিকাতা ১২

ADMARK

দৃশ্য বর্ণনা দিয়ে শ্রীমিত্র গল্পটিকে বৈশিষ্ট্য-পূর্ণ করে তুলতে যত্ন করেছেন।

নবীন ও তরুণ গল্পকারগণ

স্বাধীনতা-উত্তরকালে পঞ্চাশ বা ষাটের দশক থেকে যাঁরা লিখছেন তাঁদের অনেকে বয়সে তরুণ হলেও ইতিমধ্যে কেউ কেউ পাঠক মহলে পরিচিত এবং খ্যাত-ও বটে। কেননা বেশ কয়েক বছর বাংলা দেশের গল্পের আসর মুখ্যত এঁরাই অধিকার করে আছেন। আগেই আমরা দেখেছি পত্র-পত্রিকার প্রয়োজনে কিভাবে গল্পকারদের সংখ্যা হতে হয়। আর প্রবীণরা যেহেতু গল্প বেশী লেখেন না, নামী অ-নামী হরেক রকম পত্র-পত্রিকার সারা বছরের ভরসা এই সব তরুণ ও নবীন গল্পকারগণ। এঁরা গল্প-ভাবনায় নতুনকালের বিষয়বস্তু গ্রহণ করলেন, প্রকাশ-ভঙ্গীতেও অভিনবত্ব সৃষ্টি করলেন। বিষয়, ভাষামাধ্যম ও টেকনিক মিলে ছোটগল্প-অবয়বে একটা নবতর পরিমণ্ডল সৃষ্টি হয়েছে। কল্লোলকালের লেখকদের অভিনব বিষয়-নিষ্ঠ ছোটগল্পের পরে আমাদের গল্প-ধারায় আরেকটা উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের কাল, যদিও সম্ভাবনা তার শেষ প্রান্ত স্পর্শ করতে পারেনি, যেহেতু পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাল এখনও শেষ হয়নি।

একালের তরুণ ও নবীন লেখকগণ বেশী লিখতে পারেন না। এঁদের অনেকেই একই গল্প নিয়ে অধিক দিন চিন্তা করেন, সংশোধন ও পরিমার্জনের কাজও চলে দীর্ঘদিন ধরে। অর্থাৎ গল্পের সম্ভাবনার দিকগুলিকে ফুটিয়ে তুলতে যত্নবান হন। একালের লেখক সমবেতভাবে বেশী লেখেন, এমন নয়। এবারের শারদ-সংখ্যাতেও তার ব্যতিক্রম ঘটেছে বলে মনে হয় না। তবুও কেউ কেউ বেশী পরিশ্রমী, সক্রিয় মনে হবে। তাঁদের মধ্যে অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় (অমৃত, পরিচয়, কালান্তর, সীমান্ত) মানবেন্দ্র পাল, (সাপ্তাহিক বসুমতী, চতুষ্কোণ, শুকসারী, সারস্বত, গল্প-ভারতী), সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ (লেখা ও রেখা, সীমান্ত, অমৃত, বেতার-জগৎ, জীবন-যৌবন), মিহির সেন (সারস্বত, পরিচয়, আন্তর্জাতিক, ঘরোয়া), তপোবিজয় ঘোষ (সারস্বত, লেখা ও রেখা, চতুষ্কোণ) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। এঁদের প্রত্যেকের রচনাতেই এ-সময়ের সমাজ-বাস্তবতা, সম-সাময়িক কালের চলতাজা ঘটনা, সমস্যা ও জিজ্ঞাসা বিষয়বস্তু হিসাবে এসেছে। বিচ্ছিন্নতা-বোধ ও অবক্ষয়ের উপর লিখেছেন মতি নন্দী (আনন্দবাজার), শীর্ষেন্দু মুখো-পাধ্যায় (দেশ), সুধাংশু ঘোষ (অমৃত) এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও ক্ষুধা-তাড়িত মানুষের জীবনযাপনের চিত্র বলোদাজীবন ভট্টাচার্যের গল্প (অমৃত)। শেষোক্ত গল্পকারদের রচনা এবার কোন সাহিত্য (লিটল) পত্রিকাতে তেমন চোখে পড়েনি। একালের বিশিষ্ট গল্পকারদের মধ্যে শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবেশ রায়, সন্দীপন চট্টো-পাধ্যায় আলো গল্প লেখেননি। সমরেশ বসুর গল্পও চোখে পড়েনি। দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য দীর্ঘদিন লেখেন না। বেশ কিছুদিন পরে শীর্ষেন্দু নিয়োগীর কয়েকটি এবং পূর্ণেন্দু মামার একটি গল্প পড়ে পাঠক খুশি হবেন। শ্রীনিয়োগী কালান্তর, আন্তর্জাতিক, পরিচয় ও শ্রীমতী লিখেছেন পরিচয়ে। মিহির আচার্যের গল্পটি (সীমান্ত), একটি মাত্র গল্পই লিখেছেন তিনি, পাঠককে ভাবাবে।

কোলকাতা ও শহর জীবনের কথা

বহু তরুণ গল্পকার এবার কোলকাতা ও শহর জীবন, আন্দোলন চিন্তা-ভাবনা, বেকারী-জীবিকার সমস্যা, আইন শৃঙ্খলা, ছিনতাই-ডাকাতি প্রভৃতি তাঁদের গল্পের বিষয়বস্তু হিসাবে গ্রহণ করেছেন। জীবন-জীবিকা, শিল্প ও কর্তব্যবোধের গল্প অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিপন্ন মানুষ' (অমৃত)। মাঝেমধ্যে নাচ-গান অভিনয়ের জন্য অফিস কামাই করত লোকটা। ফলে তার চাকরীও যায়। লোকটা আত্মহত্যার কথাও ভেবে-ছিল। অবশ্য শেষ পর্যন্ত তার চাকরীও থাকে এবং আত্মহত্যা করারও প্রয়োজন হয় না। চাকরীতে রাখবার মালিককে তার প্রেমিকা চিঠি লিখেছিল, 'সংসারের পালা গান গাইবার নেশা আছে, তোমার যেমন আমার প্রতি নেশা আছে। ওকে কাজে নিয়ে নিও।' অতীনের তুলিতে লেখনে (কালান্তর) কোলকাতার অস্থির উপদ্রুত জীবন-যাপনের কথা। বোমা, টিয়ারগ্যাস, গুলী ট্রাম-বাস বন্ধ তবু আতঙ্ক-মিশে ধ্বংসের জীবন। অথচ এরই মাঝে কেউ কেউ নিশ্চিন্ত আরামে থাকা কিছু স্বার্থপর মানুষ। এক অস্থির যুবকের গল্প লেখেন ফুল ফোটে কিনা (সীমান্ত) দুর্ঘটনার সাক্ষী কোন অসহায় দম্পতির জীবন-কথা দুর্ঘটনা (পরিচয়)। নীতি ও সমসাময়িক সমস্যার উপর একজন প্রতিষ্ঠিত ডাক্তারের মানসিক টানাপোড়েনের গল্প সুভাষ সিংহের লড়াই (কলেজ স্কোয়ার)। সুভাষ সিংহ সীমান্ত, অগ্রণি, স্বদেশ প্রভৃতিতে লিখেছেন। কোলকাতার রকবাজ বেকার ছেলেদের জীবনাচরণের চিত্র মিহির পালের 'রকবাজ' (এষা) ঘনিষ্ঠ আন্তরিকতার গল্প। 'হাত সাফাই' এই বন্দর শহর কোলকাতায় কৌশলে বেঁচে থাকার কাহিনী। সমীর রক্ষিতের কোল-কাতা বিষয়ক গল্প 'এখন বন্ধুরা' (অম্বিষ্ট) জনৈক উচ্চশিক্ষিত চাকুরে যুবকের এই সময়ের জীবনাচরণ। ব্যাঙ্ক-ডাকাতির অভিযোগে অভিযুক্ত বন্ধুর পাল্লায় পড়ে তাকেও বিলক্ষণ হেনস্তা সইতে হয়েছিল। সুভাষ সমাজদার লিখেছেন 'চিন্তাহরণের আজকাল পরশু' (সাপ্তাহিক বসুমতী)। ব্যাঙ্ক ডাকাতির অভিযোগে ছেলেকে পুলিশ গ্রেপ্তার করলে পিতার মনে হয়েছিল, পায়ের তলায় মাটি নেই। একটু একটু করে অন্ধকারের সমুদ্রে সে হারিয়ে যাচ্ছে আর দূরে বহু দূরে আদর্শ বিশ্বাস মূল্য-বোধ মনুষ্যের মহত্ব উদারতা এক এক টুকরো বুদ্বুদের মত ভেসে চলেছে।' জটিল রোগ বহন করে চলেছে একটা মানুষ; অথচ রোগের কথা সে কাউকে বলতে পারে না—'স্বপ্নের কঙ্কাল' (অগ্রণি) আশিস সান্যালের এই দুঃখী মানুষটার কথা। কল্যাণ সেনের 'যেদিন' (অনুক্ষণ)র নায়ক ভাবছে 'আসলে আমার কিছু ঠিক মত করার অভ্যাস নেই।' কর্মহীন বেকার তরুণের শূন্যতাবোধের চিত্র অজয় সেনের 'অন্ধকার পেরিয়ে' (সহজিয়া)। ঐ একই প্রকার তরুণদের সমস্যা সমাজ পটভূমিতে স্থাপন করে তীব্র করে তুলেছেন দিব্যেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ব্রত (সহজিয়া) গল্পে। 'লেখাপড়া শেখোনি কাল সুজনের কোন কষ্ট নেই।' কষ্ট ছিল না ঠিকই, কিন্তু হলো, যেদিন তার হাতে একখানা চিঠি এলো এবং সে তা পড়তে পারল না—উদয় ভট্টাচার্যের গল্প সুজনের দিনকাল (শিলীন্ধ্র), আশিস সেনগুপ্তের আমার দুঃখ আমার দুঃখ (শুকসারী)র বিষয় শিশু-পরিবেশ; বর্তমান শহরের মলিন পরিবেশ থেকে শিশুকে কৃত্রিমভাবে বাইরে রাখলেই সে কি মানসিক সমৃদ্ধি পাবে। সামান্য একটা কুকুরের বাচ্চাকে বাঁচানোর জন্য বরেন ভট্টাচার্যের আপ্রাণ (প্রাশ্নিক)-এর ড্রাইভার বাসশুদ্ধ লোকের জীবনের ঝুঁকি নিয়েছিল। পরবাসে তরুণকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন শেষের সেই দিন। অম্বিষ্টে অতীন্দ্রিয় পাঠকের কোলকাতা বিষয়ক গল্প লোকটা বিজয় ও আমি। আমাদের মত মেয়েদের পরিণতি ত দেখছি চোখের সামনে' ভাবতে ভাবতে বিজয় আশার জগতে ঘুরপাক খায় সি আই টি ফ্ল্যাটের দুই বান্ধবী—বর্তমান শহরে সমাজ বাস্তবতায় মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েদের আশা-হতাশার কথা লিখেছেন অমল হালদার আশাবরী পত্রিকায়।

শেষোক্ত গল্পকারদের মধ্যে অনেকেই অতি তরুণ এবং উল্লিখিত পত্রিকাগুলিও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ক্ষীণ কলেবর। তা হোক, এখান থেকেই অনেক সম্ভাবনার জন্ম। সাহিত্য পত্রিকার আর্থিক সঙ্গতি বেশী নয়। এদের উদ্যমই এদের পাথেয়।

দীন দুঃখী দরিদ্রের সংসার

অভাব অনটন দারিদ্র্য আজ সাধারণ মানুষের নিত্য সঙ্গী, দুঃখী মানুষ আজ অনেকেই, অর্থের জন্য, প্রতিষ্ঠা-অস্তিত্বের জন্য, প্রেম-ভালবাসার জন্য, এমন কি মন-মননের জন্যও বটে। কিন্তু দরিদ্রের অর্থা-ভাবের দুঃখ, ক্ষুধার কষ্টের বোধহয় তুলনা হয় না। চিত্তরঞ্জন ঘোষের 'হার পের স্বপ্নরবাড়ি' (কালান্তর)-র হারাণের কথাই ধরা যাক। লোকটা বেকার এবং কপর্দক-

পণা। বৌ ছেলেমেয়েকে সে পশ্চিমবঙ্গের মাগে দুটি ভাতের জন্য, একটু আশ্রয়ের জন্য। তিনমাস পরে তাদের দেখতে আসার সময় ছেলেমেয়েদের জন্য বিস্কুট কিনে আনার পয়সাটাও তার নেই। হাবাদের দুঃখের কথা পড়তে পড়তে পাঠক মন নিশ্চিত কাতর হয়ে উঠবে। শ্যামল ঘোষের 'অন্নাহার' (পরিচয়) ও দীন দুঃখী এক চাকুরীজীবী পরিবারের দিনযাপনের কাহিনী। অর্থাৎ পেটে খোকামেয়েদের দিকে না তাকিয়ে 'এই মাঠাটার ভাত' খেয়ে নেয়। ক্ষুধা মানবকে বিচিত্র পথের সন্ধান দেয়। ন্যায়-নীতি মানে না, মানবকে মনুষ্যত্বহীন করে পরিণত করে। আমাদের চোখে আসা দেশ পশ্চিমবঙ্গের নাম ভাঙিয়ে পয়সা আদায় করে এক সম্প্রদায় বেঁচে থাকার কাহিনী বীরেন্দ্র নিয়োগীর 'পাঁচিল' (আন্তর্জাতিক)। সমাজের নিম্নবর্গের কোন এক মানুষ সম্প্রদায়ের মড়ক ও অকালের সময়ে অন্নসংস্থান পাওয়ার জীবনযাপনের কাহিনী অমলেন্দু চক্রবর্তীর কিংবদন্তি (পরিচয়) পাঠককে আতঙ্কিত করে তুলবে। মনোজ কান্তিদেবের মাছের (অমৃত) গল্পটার কথা মনে পড়ে যায়।

ক্ষুধা মেটানোর ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুরতার গল্প সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের 'জননী' (লেখা ও রেখা)। ঐ ছোকরা দেখ-উটা মা বোঝে না বাপ বোঝে না, খড় পড়ে। উটা মা বাপের জন্য কাঁদে না, ভূখের জন্যেও কাঁদে। ভূখ মিটলে উটার বড় সুখ।' ক্ষুধার জ্বালায় দিশেহারা জননী ছেলেটাকে বিলাতে চলেছে, বিক্রী করে দিতে চায়। সমাজের নিচুতলার বাসিন্দাদের গল্প অসিত ঘোষের 'পর্যটক' (পরিচয়)—রোজ আনে রোজ খায়, কোন রকমে বেঁচে থাকাটাই তাদের সমস্যা। রবীন্দ্র গুহের 'দুর্দিন' (আলোক সর্বাণী)-ও এক অভাবের সংসারে দুই বোনের বেঁচে থাকার কাহিনী।

এই জাতীয় গল্প লেখকদের আন্তরিক মানবিক সহানুভূতি ও ভালবাসা পাঠক মন স্পর্শ করবে।

প্রেম ভালবাসা যৌন জীবন

এই সেদিন পর্যন্ত তরুণদের অনেকের গল্পে প্রেম ভালবাসা আবেগ যৌনবোধ বা অবক্ষয়-বিচ্ছিন্নতার বোধ জটিলতা মুখ্যস্থান লাভ করত। এবার উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম। প্রেম-ভালবাসাদির গল্প যাঁরা লিখেছেন, তাঁদের মধ্যে আবদুল জব্বার অন্যতম। জব্বারের 'প্রথম বর্ষণ' (সহজিয়া) সদ্য যৌবনে পা দেওয়া দুই যুবক-যুবতীর প্রথম বর্ষার জলে পাট ক্ষেতের মধ্যে মাছ এ যৌবন ধরার গল্প। অমজমনের শরীরের এই প্রথম পুরুষের আগুন লাগে। জব্বারের অন্য গল্প 'কাপুরুষ' (অমৃত)-ও প্রেম-ভালবাসার স্বাদে-গন্ধে সুখপাঠ্য। সদ্য যৌবনে পা দেওয়া এক নিঃসঙ্গ ছেলের প্রথম প্রেমের সুখ-দুঃখের কথা প্রকাশ পেয়েছে 'ভালবাসার রং' (সহজিয়া)।

নারীর রূপ-মোহ কিভাবে পুরুষকে বিপথগামী করতে পারে এবং পুরুষ হিংস্র হয়ে কত জঘন্যতম কাজ করতে পারে তারই দৃষ্টান্ত সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের 'শত্রু' (জীবন-যৌবন)। সুধাময়ীর সুন্দর ও সুঠাম দেহ ভদ্রলোক এমন কি ভূস্বামী বংশের লোকেদেরও আকর্ষণের ব্যাপার। সুধাময়ীর মধ্যে কি যে আছে, ছোট লোকের ঝাকড়া গুণ্ডারা পাওয়া সত্ত্বেও একবার দেখুন—তোতা না মিঠে।' সেবারের 'নায়িকার জন্মেও' (সেতার জগৎ), ভালবাসার রূপ রস ছড়ানো আছে।

শ্রমিক জীবন ও অন্যান্য জীবিকা

শ্রমিক শিক্ষক কর্মচারীদের জীবন নিয়ে এবার অনেক গল্প লিখেছেন তরুণ ও নবীন লেখকগণ। উল্লেখযোগ্য গল্প সাধন চট্টোপাধ্যায়ের একটি বিদ্রোহের কাহিনী (পুরসাথী)। এবং কৃষ্ণ চক্রবর্তীর 'কলতা' (নন্দন)। শ্রমিকদের একদল কর্মী সম্প্রদায় শোষণ ও অত্যাচার, মিথ্যা অজুহাতে সবকিছু, মিল শ্রমিকদের মুক্তি জীবন-যাপন, অসহায় মহাজন শ্রমিক, ইউনিয়ন ও সংগ্রাম তাদের মধ্যে বিদ্রোহ সৃষ্টির চেষ্টা, প্রতিবাদ করার দিন শ্রমিকদের দাবি নিয়ে মালিকদের জীবনের বাস্তব দিক এইসব গল্প। শিক্ষক ও সরকারী কর্মচারীদের জীবন-যাত্রা চিন্তা ও সংগ্রামের উপর দুটি গল্প লিখেছেন ...। আমাদের এখানে ইচ্ছা করলেই যার কোন পথে

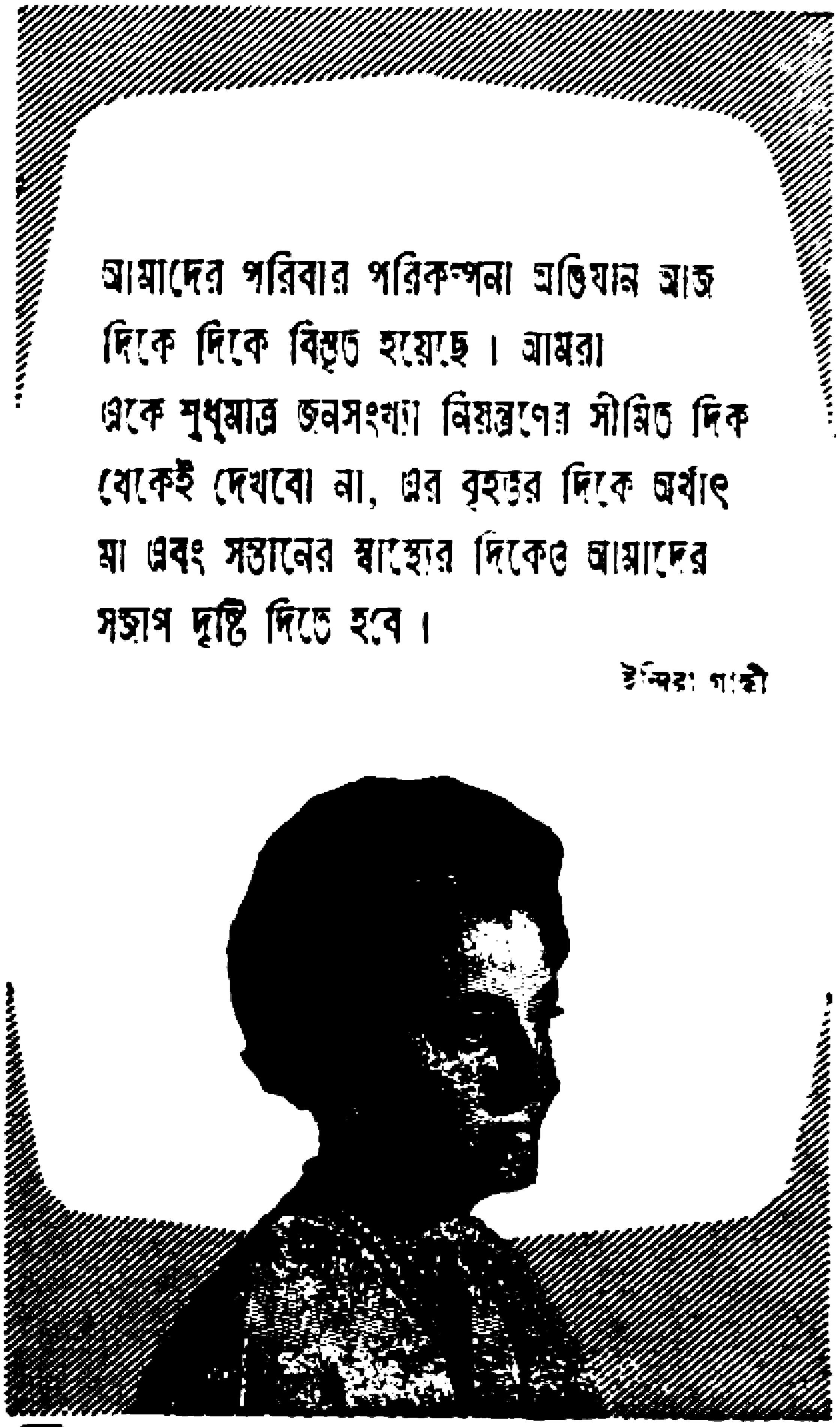

dayp 70/300

তিনি পূর্ণ করতে পারেন।' এই বৃদ্ধ শিক্ষকও (স্বাপ্ন চতুষ্কোণ) দাবি-দাওয়ার আন্দোলনে সামিল হতে কার্পণ্য করলেন। 'হরিদাস মজুমদার' (লেখা ও রেখা) এক কেরানীর যুবকের অনটনের জীবন-যাপন, এখানেও সে ইচ্ছামত সাধ-আহ্লাদ মেটাতে পারে না। না পারারই কথা। কেননা শিক্ষক বা সরকারী কর্মচারীর বাঁধা-সীমিত বেতনে যেখানে নুন আনতে পান্তা ফুরোয় সেখানে বাড়তি শখ, ফুল কিনে ফুলদানি সাজানোর ইচ্ছা কিভাবেই বা পূর্ণ হতে পারে: নরককুণ্ডের দারোগা (সীমান্ত) অমলেন্দু কুম্ভারের চটকল শ্রমিকদের জীবন-যাত্রা ও সংগ্রামের চিত্র। একালের শ্রমিক তাদের ম্যানেজারকে বলতে ভয় পায় না, 'আপনার মাইনে তিন হাজার টাকা আর আমাদের মাইনে এক শ চল্লিশ টাকা।' এবং কাজের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদে তারা মিলও বন্ধ করে দিতে পারে, দেয়ও।

এই সময়ের তরতাজা ঘটনা-প্রবাহ

বর্তমান সময়ের আইন-শৃঙ্খলা, সমাজ-বিরোধী দৌরাত্ম্য খুন জখম রাহাজানি, নকশালী-সংঘর্ষ, রাজনৈতিক প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসার উপর অনেকে গল্প লিখে সময়োচিত কর্তব্য করেছেন। খুন-গুণ্ডামি সমাজ বিরোধী কার্যকলাপ পুলিশের সন্ত্রাস, জঙ্গল লোবাই কামে নিরীহ ছেলেদের ধরে মার দেওয়ার গল্প তপোবিজয় ঘোষের 'এখন এই সময়' (সারস্বত)। অনীশ রায়ের গল্প 'শ্রেণীশত্রু' (পরিচয়) নকশালী সংঘর্ষের পটভূমিতে লেখা। পাড়ায় পাড়ায় বন্ধুদের মধ্যে শ্রেণীশত্রু খতমের রক্তক্ষয়ী বন্ধুত্বের রক্ত চলছে আজকের সময়ে ('বন্ধুত্বের' সহচরী)। বৃদ্ধ শিক্ষক মশাই বলেছিলেন, 'তোরা রাজনীতিতে এসেছিস কিসের জন্য? রাজনীতির চেহারা পাল্টে দেবার জন্য। সেজন্যই ত আসা। তোদেরই ত বিশ্বাস আমার লোকের মনের মধ্যে।' গল্পের নায়ক বন্ধুদের ঠিক চিনেছে' কিন্তু বন্ধুদের ব্যাপারে মনস্থির হতে এখনও বাকি।' মহাশ্বেতা দেবীর কান্না (প্রমাণ)-র কলেজ-নায়কেরা পরীক্ষা দেওয়া না-দেওয়া নিয়ে খুনোখুনি করে। মানস নাথ ওরা এই দলের মধ্যে অন্যা-শাকিন্তভাটুকুও দেখাতে পায় না। ছিনতাই পার্টির খুন ও লুটের চিত্র মানবেন্দ্র পালের 'চেন মুখ' (সাপ্তাহিক বসুমতী)। জনবহুল কোলকাতার হ্যারিসন রোডের উপরে নারকীয় হত্যাকাণ্ড ঘটেছে, তবে কেউ দরজা খোলে না। 'আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম, কেউ বাধা দিতে পারলাম না।' নগর জীবনযাত্রায় এই বস্তুহীন ঘটনা আমরা প্রতিদিনবর্তী প্রত্যক্ষ করছি। 'কোনটা রাজনৈতিক কোনটা সামাজিক অপরাধ আর কোনটাই বা গুণ্ডামি এ তফাৎ করা মুশকিল এখন।' রাজনীতির পরিমণ্ডল সংস্পর্শিত উৎপল [illegible] 'অনীতির জঙ্গল' (পরিচয়) সাম্প্রতিক [illegible] এক [illegible] একজন [illegible] চলতি .. [illegible] দাদা হিসাবে নিজেকে সাজিয়ে তুলছে, তারই চিত্র।

মিহির সেনের 'সেই আগুনটা' (সারস্বত) দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কাল থেকে দীর্ঘ [illegible] কাল [illegible] এক [illegible] গ্রামের কাহিনী। যে আগুন দিয়ে সে কৃষকদের মন জেলেছিল সেই আগুনের একটি ধার অনেক আগে, তারপরই এ-কাল এসে [illegible] সময়ে, শরিকী সংঘর্ষের সময়। কৃষকদের নিজেদের মধ্যে 'আত্মঘাতী সংঘর্ষ থামানোর' চেষ্টা করেও সফল হননি তিনি।

মিহির আচার্যের গল্প 'আমার মরে যাওয়া' (সীমান্ত। এ-কালের নতুন ভাবনায় আলোকপ্রাপ্ত যুবকের গল্প। ইউনিভার্সিটির ব্রিলিয়ান্ট কেরিয়ারসম্পন্ন যুবক সন্তানের পিতা, 'চৌষট্টি টাকার একটা চোখ ধাঁধানো ঠাট্টার' সঙ্গে সম্পর্ক-ছেদ করে বেরিয়ে যায়, যেহেতু 'বর্তমান বেঁচে আছি, জীবনের তাৎপর্য আমাকে খুঁজে পেতে হবে।' সে ঐতিহ্যের পরিমণ্ডলে যে মানুষ অনায়াসে সে তার অস্তিত্বের সঙ্কটকে অন্যভাবে মিটানোর সুযোগ পেত। এই যুবক একটা ধাবমান অস্থির সময়, মহীরুহের বাঁকা [illegible] মতন রুক্ষ, কাণ্ডহীন, নির্জীব সময়ের আক্রমণে কার্পাসের তুলো হয়ে পড়েও নিজের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম করেছে।

মাঠ জমি কৃষক : বৃহত্তর বাংলা

বাংলাদেশ সম্পর্কে আজও আমাদের কাছে যেটা বড় বাস্তব সত্য তা হলো আমাদের বেশীরভাগ লোক গ্রামবাসী, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে খেত-খামারের সঙ্গে যুক্ত। একালের জমি ও কৃষক এক বিরাট জিজ্ঞাসা। যদিও বাংলার পল্লী ও কৃষি-জীবন নিয়ে ব্যাপক সাহিত্য সৃষ্টি এখন দেখা যায় না, তবে আমাদের ধারণা সাহিত্য আরেকবার তার প্রাণ সম্পদ বাংলার মাটি থেকে আহরণ করবে।

এবারের শারদ মরশুমে গ্রাম-বাংলা ও কৃষি-জীবন নিয়ে যে কটা গল্প পাওয়া গেছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রফুল্ল রায়ের বাঁচার জন্য (অমৃত), মহাশ্বেতা দেবীর পিপাসা (অমৃত), মনোরঞ্জন হাজরার 'এই ছবি' (নন্দন), সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের 'গ্রাম পুরুষ' (সীমান্ত), যশোদাজীবন ভট্টাচার্যের মাহুব (অমৃত), নির্মলেন্দু গৌতমের 'চাঁদমারীর টিবি' (বৈতানিক), অসিত ঘোষের 'পক্ষী-যুগল' (আন্তর্জাতিক), বাসুদেব দেবের 'সবুজ শিকল' (শুকসারী), আশিস সেনগুপ্তের 'ফুলজান' (লেখা ও রেখা) চণ্ডী মণ্ডলের পুষ্পচয়ন (কালান্তর) নমিতা চক্রবর্তীর 'জোতদারের ছেলে' (কালি ও কলম), অশোককুমার সেনগুপ্তের মানুষের হাত (চতুষ্কোণ), কুমার মিত্রের 'প্রবাহ' (আলোক সরণি) প্রভৃতি।

আজ তিনদিন কাজ নেই বিষ্টুপদের। জল নেই, কাজেই রোজগারও নেই। তার মতন ভূমিহীন দিন-মজুরের ঘরে কাঁড়ি কাঁড়ি সোনাদানা জমানো থাকে না যে বসে বসে খেতে পারবে। দু-চার দানা যা জলটান ছিল, কাল পর্যন্ত চলেছে। আজ যদি কিছু জোটাতে পারে, বউ ছেলেপুলে খেতে পাবে। নইলে উপোষ।' জমি নেই অথচ কৃষক, ভাগ্যের এ-এক নিদারুণ পরিহাস। 'জমিন কুথায় পাব?' 'মজুর খাটি' শুধু গতরের উপর ভরসা করে তাইতে বাঁচা প্রফুল্ল রায় তাঁর 'বাঁচার জন্য' (অমৃত) গল্পে ক্ষুধার্ত দুই ভূমিহীন নারী-পুরুষের ক্ষুধা-মেটানোর সংগ্রামকে লিপিবদ্ধ করেছেন। মেয়েটির স্বামী জোতদারের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছে। সুতরাং নিরুপায় অসহায়ভাবে তাকে মাঠে ঘাটে ঘুরে বেড়াতে হয় খাদ্যের অভাবে। এই দুই যুবক-যুবতী বুনো শুয়োরের সঙ্গে লড়াই করে খায় আর সংগ্রহ করে। গল্পটির মধ্যে গ্রামের ভূমিহীন চাষীদের জীবন সংগ্রাম, বিশেষ করে ক্ষুধার জন্য এই দুই অপরিচিত নারী পুরুষের একত্রে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাঁচার জন্য গভীর আন্তরিক ইচ্ছার দিক ফুটে উঠেছে।

মহাশ্বেতা দেবীর 'ভীষ্মের পিপাসা' (অমৃত) কৃষকের স্বপ্ন-সাধ ও লাঞ্ছনার চিত্র, 'এ পিপাসা জলের নয়, ধানের পিপাসা।' পিপাসা আর ক্ষুধা যশোদাজীবনের গল্প মাহুবেরও (অমৃত) কেন্দ্রবিন্দু।। 'বর্ষার দৃষ্টি যার কেবল ধু ধু করা পাথুরে মাঠ, যে মাঠে জল মেলে না, ফুল ফোটে না, ফসল ত কোন ছার।' এমনি এক দুর্ভোগের দিনেও এক যুবককে 'রোদ মাথায় করে ঘুরে বেড়াতে হয়। মজার বাড়া গাছ নেই, পেটের ভাত যুগিয়ে দেই মানুষের।' ক্ষুধা আজ গ্রামের মানুষের সম্মুখে বিরাট সমস্যা। ক্ষুধা মানুষের জীবনাচরণেরই অন্য নাম। গ্রামের মানুষের খাদ্য কাছে কৃষকদের চাহিদা মেটাতে আসছেন ভাগ্য বিধাতার বেশে মহামান্যবর গ্রাম পুরুষ। তিনি এলেন, গ্রামের লোকদের দুঃখ কষ্টের কথা শুনলেন, বক্তৃতা দিলেন, অতঃপর অমীমাংসিত সমস্যাদি রেখে উধাও হলেন। সিরাজের 'গ্রাম পুরুষ' (সীমান্ত) গল্পের বুদ্ধিমান পুরুষটি অবশ্য বুঝতে পারছেন, এই বারবার যাওয়া-আসার পথ ধরে একদিন কোথাও আগুন জ্বলে উঠবে। মরু মহানদীতে জোয়ার আগুনের শিখা আস্তে আস্তে ছড়িয়ে আসবে জাতীয় মহাসড়ক বেয়ে চারপাশের জনপদে তারপর পৃথিবীতে সে এক নতুন দিনের সূর্য।

এবারের ছোট গল্পে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য আশা করি পাঠক বুঝতে পারবেন। দেখা যাচ্ছে আমাদের এ-সময়ের গল্পে মানুষের জীবনের বাস্তব ঘটনা, বেঁচে থাকার তাৎপর্য ও সম্ভাবনার দিক বেশী প্রভাব বিস্তার করছে। যৌনজীবন, অবক্ষয়, বিচ্ছিন্নতার কথা মানুষের সংগ্রামী চেতনার পাশে আর তেমন গুরুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছে না। প্রেমেন্দ্র মিত্রের কথাটা আবার স্মরণীয় 'মানুষের মিছিল সেখানে থামবার নয়।'

নিকটেই আছে

দাবাই

একপাশে ভুটিয়ারা সোয়েটার, কম্বল, রং-বেরং-এর বীডের মালা সাজিয়ে বসেছে; ওধারে রেলিং-এর গায়ে বুনো শিলাজিৎ চর্বি জনাল দিয়ে বাতের ওষুধ বানাচ্ছে হরিণগাড়িয়ারা—মাঝে শহরের হৃৎপিণ্ডের কেন্দ্রে টুল ফিট করে মাইক-ফাটানো গলায় শতখানেক প্রশংসাপত্রকণ্টকিত ব্যানারের সামনে দাঁড়িয়ে জোশ্ত হিন্দীতে নিজের ওষুধের প্রশস্তি গাইছেন সুশীলদা—আমাদের ছেলেবেলার আদি অকৃত্রিম সুশীলদা।

কোই মাদুলী লেতা হ্যায় নোকরীকে লিয়ে, কোই তাবিজ লেতা হ্যায় ছোকরীকে লিয়ে, মগর—মগর এই রকেটের যুগে বঙালকা শিক্‌ষিত আদমী ভেন কোভি ভুলে না জান যে পেট-ই সব। এই পেটের খাতিরে মানুষ সব করতে পারে, করেও। এই পেট যাতে ভুখা না মরে তাই সবাই চাকরী,বেওসা, হরেক কিসিমের রোজগারের ফিকিরে দিনরাত পরিশ্রম করে। কিন্তু কি হবে পরিশ্রম করে যদি পেটেই গড়বড় হয়ে যায়। তাই মেরা বঙালকা ভাইলোগ আপনাদের জন্য, শুধুমাত্র আপনাদের জন্য আমার কোম্পানী আমায় পাঠিয়েছে—মন দিয়ে শুনুন, কেন পাঠিয়েছে।

আপনারা সবাই একটু কাছে এগিয়ে আসুন। আমি ডাকদারী কিতাব থেকে ছবি তুলে তুলে দেখাব কেমন করে এই পেট থেকে বাহাত্তর রকমের অসুখ হয়। বলতে বলতে স্মার্ট শান্ত হয়ে টুলের পাশে দাঁড়ানো সহকারীর হাত থেকে একটা অত্যন্ত পুরোনো নোংরা রেজিস্টার্ড খাতা টেনে নিয়ে পট পট করে খানকয়েক পাতা উল্টে-পাল্টে দেখিয়ে দিলেন ভেতরে কি বস্তু আছে। তিন চার সেকেণ্ডের ব্যাপার। তাতেই চোখে পড়ল গোটাদুয়েক বোঁচকা-নাকি চীনে মেম ও এক-জোড়া বিলাতী সাহেব মেম সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে তাদের অ্যানাটমির অন্দর-বাহারকা খেল দেখাচ্ছে। ছবির খাতাটা হাতে তুলে নিতেই দেখলাম ভিড়টা বেশ খানিকটা সুশীলদার দিকে এগিয়ে গেল। ততক্ষণে তোড়ে নেক্সট রাউণ্ডের গলাবাজী শুরু করে দিয়েছেন দাদা।

ইয়ে কোই ম্যাজিক নেহি হ্যায়—ইয়ে সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক ব্যাপার। ইয়ে শুনেসে কা বাত হ্যায়। ম্যায়নে হিন্দুস্থানকা তামাম শহর, সিটি, টাউন দেখা হ্যায়। সৌরাষ্ট্র, গুজরাট, বোম্বাই, ব্যাঙ্গালোর, মাদ্রাজ, কোয়েম্বাটুর, ত্রিবান্দ্রম, দিল্লী, কাশ্মীর, শ্রীনগর, ইউ-পি, লক্ষ্ণৌ, কাটমাণ্ডু, নেপাল, বর্ধমান, শিলিগুড়ি, আসাম, গৌহাটি হরজায়গা ঘুরে পর কলকাতায় এসেছি। এ কথা খুবই সত্যি। ছোটবেলা থেকে দাদাকে জানি। এর একবর্ণও মিথ্যে নয়। সুশীলদার বাবা ছিলেন কবিরাজ। নামডাক না থাকলেও মোটামুটি সংসার চালানোর মত আয় ছিল। একমাত্র ছেলে সুশীলদাকে কোবরেজ-জ্যাঠার ইচ্ছে ছিল অ্যালোপ্যাথি পড়াবেন। তা পড়াবেন কাকে। সে তো তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের মধ্যে তিনশো দিনই পাড়া-বেপাড়ার সিনেমার লাইনে মাস্তানীতে ব্যস্ত। তাছাড়া কি শনিবার গড়ের মাঠে আর টালিগঞ্জে অশ্বকোষ্ঠি বিচার করে টিপস দেওয়ার মত গুরুত্বের দায়িত্ব খুব ছোটবেলা থেকেই দাদা পালন করে আসছেন। সব দেখেশুনে, ছেলের কিছু হবে না জেনে খুব হতাশ হয়েই কোবরেজ-জ্যাঠা কার্তিকের এক উজ্জ্বল সকালে হাঁপানির টানে অস্থির হয়ে টুক করে কেটে পড়লেন। সুশীলদা বাড়ী ছিলেন না। বাস্তুহারা বাজারের গায়ে আদিগঙ্গার ওপর কাঠের সাঁকোর তলায় বসে চেলা-চামুণ্ডাদের নিয়ে বাবা বিশ্বনাথের পেসাদ মাথায় ঠেকিয়ে দমভরে টানছিলেন। খবরটা শুনে গম্ভীরভাবে উঠে এলেন।

শ্রাদ্ধশান্তি চুকে যাবার পর দেখি একদিন সুশীলদা এলেন স্কুলে। নেড়া মাথা, পায়ে রুশপাম্প আর কলারতোলা গেঞ্জি। হেডমাস্টার গোপীবাবুকে প্রণাম করে বললেন—আমার আর পড়াশোনা হবে না স্যার। খুব সংক্ষেপে বিশাল গোঁফজোড়া নাচিয়ে হেডস্যার বললেন—তা জানি। কিন্তু কি করবে এখন সুশীল? তুমি তো ম্যাট্রিকটাও পাশ করতে পারলে না। যে তিনবারেও ম্যাট্রিক পাশ করতে পারে না, সে আর কি করবে? আমরা, মানে ক্লাস সেভেনের হুদু, মধুসূদন, শান্ত আর আমি অফিস ঘরের কোনায় দাঁড়িয়ে হেডস্যার ও সুশীলদার ঐ ঐতিহাসিক কনভারসেশন শুনছিলাম। এরপর সুশীলদা জবাবে কি বললেন তাই শুনতে উৎকর্ণ হতেই, কানে এল—ব্যবসা করব স্যার। স্বাধীন দেশ, আমরা ইয়ং জেনারেশন। এই কেরানীগিরির পড়াশোনা না করে, ব্যবসা......। বাকী কথা-কটা আর শুনতে পাই নি। গোটা স্কুলবাড়ী কাঁপিয়ে হেডস্যারের বাজখাই ধমকের ওয়েভটা বড় রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ার আগেই আমরা অফিস থেকে দুড়দাড় করে ছুটে পালিয়ে গিয়ে ক্লাসে ঢুকে পড়েছি।

অবাক কাণ্ড। অতবড় বাবড়ানি খেয়েও কিন্তু সুশীলদা একটুও দমলেন না। সত্যি সত্যি ব্যবসা করতে শুরু করলেন। আর সুশীলদার ব্যবসার বিলিপত্রসহ সেলসম্যান ছিলাম আমরা। আমরা ফুলস্কেপ সাইজের কাগজের দুপিঠে ছাপানো হ্যাণ্ডবিল পাড়ায় পাড়ায় বিলি করতাম। হ্যাণ্ডবিলের মাথায় পাসপোর্ট সাইজের একটা ফোটো—নেড়া মাথা, গালবোঝাই দাড়ি। তলায় লেখা সুশীলকুমার চট্টোপাধ্যায়, কবিরাজ। দাদাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, দাড়িটা পেলেন কোথায়? উত্তরে সুশীলদা বলেছিলেন, মা কালীর মন্দিরের সামনে যে ফোটোর দোকানগুলো আছে ওখানে দাড়ি কেন, বৌ চাস তো পাশে দাঁড় করিয়ে ওরা তোর ফোটো তুলে দেবে। পাছে সত্যি সত্যি তাই করে, সেই ভয়ে হাজার ইচ্ছে সত্ত্বেও ঐ দোকানগুলোর একটাতেও ঢুকতে সাহস হয়নি কোনদিন।

কিন্তু সুশীলদার কি প্রচণ্ড সাহস! শান্তিবটি, জয়বটি আর অমরবটি—তিনটি অসাধারণ গুণসম্পন্ন ওষুধ আবিষ্কার করার কথা হ্যাণ্ডবিলে ছাপিয়ে প্রচার করতে লাগলেন। এক ফাইল এক টাকা। তিন ফাইল একসঙ্গে নিলে কনসেশন হিসেবে আট আনা। প্রতি ফাইলে আছে একুশটা বড়ি। সকালে খালি পেটে ঈষদুষ্ণ জলের সঙ্গে একটি আর রাত্রে খাওয়ার পর একটু দুধের সঙ্গে দুটি বড়ি। ব্যস আর দেখতে হবে না। সাতদিনেই বাত, আমবাত, স্নায়বিক দৌর্বল্য, অজীর্ণ, ধাতুর দোষ, মাথাধরা, মচকানো ঘাড়, পিঠ, কোমর,—আর্থিক সব অসুখেরই উপশম হবে। আর তিন ফাইল খেলে তো কথাই নেই। তাহলে একুশ দিনের মধ্যে সব অসুখ দূর হয়ে নির্ঘাৎ তিন সের ওজন বাড়বে। আপনি হবেন অজেয় স্বাস্থ্য ও অফুরন্ত শক্তির অধিকারী। হ্যাণ্ডবিলের উল্টোপিঠে সেই অজেয় স্বাস্থ্য ও অফুরন্ত শক্তির একটি জ্বলন্ত উদাহরণের মত নিরাবরণ পোজে দাঁড়ানো সুশীলদার ঘনিষ্ঠ বন্ধু কেওড়াতলা ব্যায়ামাগারের বাদলদা।

বাবলনঙ্ক সর্বাণী বন্ধ মামলের প্রেস্তে ব'ই যাচ্ছে। ওঁপাঠে-ওঁপাঠে সুশীলদার আর বাবলদার 'সুবুন্দ' বই শেষ—আমরা মুগ্ধ বিস্ময়ে হ্যান্ড বিলিয়ে দেয়ালে দেয়ালে ভক্তের আঠা দিয়ে সেঁটে প্রচারের কাজটা এগিয়ে নিচ্ছিলাম। এমন সময়, আমরা তখন ক্লাস এইটে উঠব, খবর পেলাম সুশীলদা হাওয়া। পুলিশ নাকি সুশীলদার কবিরাজি-ফ্যাক্টরী রেড করেছে। সেখানে কোবরেজ কাঠামো ওষুধের বদলে ছিলো থাকি বড় বড় বোয়াম, কিছুটা গোলা টমাক, দুটো বড় বড় শিল নোড়া আর হামানদিস্তা ছাড়াও নাকি আধাপোয়াটাক আফিম পাওয়া গেছে। সেই যে সুশীলদা বেপাত্তা হোল তারপর আর কোন খবর পাইনি।

কাল এল, সুশীলদা ছবিগুলো দেখিয়ে বাড়ির ফ্যানকাটা দোকাচ্ছেন। রাবড়ি, মালাই, দই, রোটি, মহাল, মনস চান ভাল যত খাবারই খান না কেন আপনি, যদি পেট গড়বড় করে তাহলে কিছুতেই তাগদ আউর তন্দুরস্তি আসবে না। ইঁস লিয়ে শহরমে বিনা আংরেজ আউর বিলাইতি সাহেব আছে সবাই সপ্তাহে একদিন করে অন্ততঃ পেট সাফ করে জোলাপ নিয়ে। কিন্তু আমরা, হিন্দুস্থানের যারা বাসিন্দা, তারা কি করি? কিছু না। অঙ্গ করি না বলেই, এত খেয়েও আমাদের স্বাস্থ্য ভাল হয় না, গায়ে তাগদ পাই না। ছাতি আউর শিনা দুবলা হয়ে পড়ে। আর তাই ঘরে ঘরে এত ঝগড়া।

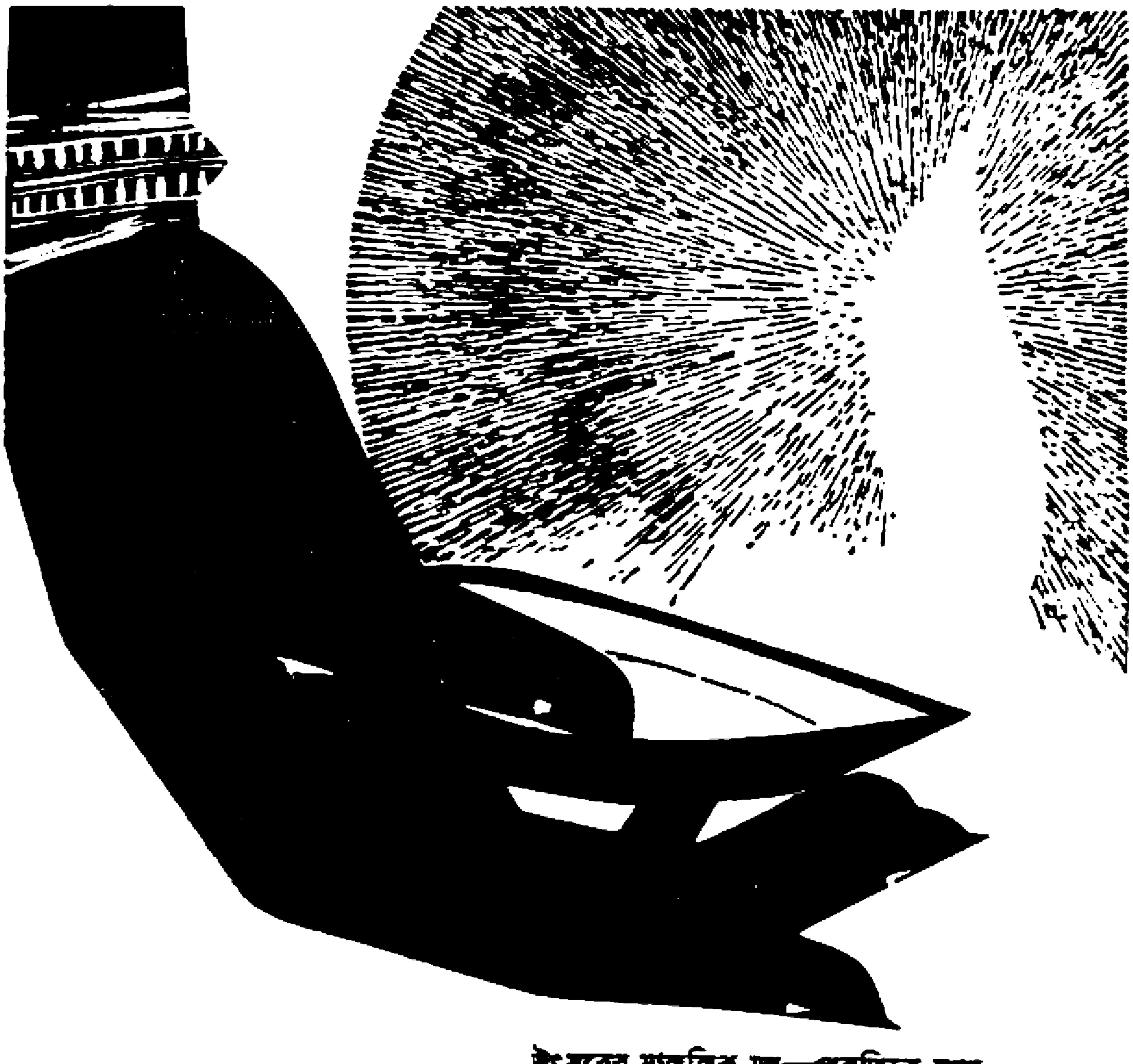

আলোকের উৎসবে

উৎসবের মাঙ্গলিক মন্ত্র—প্রকৃতিকে মুখর ক'রে তুলেছে, নতুন করে প্রকৃতি সেজেছে সোনালীরোদ্দুর মেখে।

সারা বছরের ব্যস্ততার পর এসেছে অবসরের বেলা। প্রিয়জনের মুখে হাসি ফুটিয়ে তোলার সময় এখন—যা সার্থক হবে কেবল গত দিনগুলির সঞ্চয়ের নির্দেশেই—ইউবিআই রেকারিং ডিপোজিট অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে।

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া
হেড অফিস:
৪, নরেন্দ্র চন্দ্র দত্ত সরণি, কলিকাতা-১

ভাইলোগ, ঘরের বউকে যদি ঘরেই বেঁধে রাখতে চান তো পেট সারিয়ে তুলুন। মনে রাখবেন এই পেটই সব। আর পেটের গোলমাল হলে কিছুতেই কিছু হবে না। হাজার হাজার টাকা ব্যয় করেও তখন আর গায়ে বল পাবেন না। আর গায়ে তাগদ না থাকলে, আপনার বৌ আপনার কাছে থাকতে চাইবে না। হাঁ।

ইয়ে মামুলি বাত্ নেহি। ইয়ে আসলি বাত। বলতে বলতে সুশীলদা একটু থামলেন। তারপর টুলের পাশে দাঁড়ানো সঙ্গীর হাত থেকে সবুজ কাগজে মোড়া একটা বড় পার্শেল নিয়ে বললেন—এই পার্শেলের মধ্যে আমার কোম্পানীর ওষুধ আছে। একটি ছোট প্যাকেট বার করে সবাইকে দেখিয়ে বললেন—আমার ওষুধ কিনতে হবে না। আপনারা এগিয়ে আসুন। আমি প্রত্যেককে ফ্রিতে দুটো করে বড়ি দেব। আজ রাতে খেয়ে দেখুন। যদি ফল পান, তবে কাল বিকালে আসবেন। আমি রোজ এখানে আসি।

ফ্রিতে বড়ি পাওয়া যাবে শুনে ভিড়টা সুশীলদার টুলের ওপর একেবারে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। সুশীলদা একটা প্যাকেটের মুখ ছিঁড়তে ছিঁড়তে চেঁচাতে লাগলেন—ফ্রি স্যাম্পেল, ফ্রি স্যাম্পেল। লেকিন এক শর্ত হায়। আমকা আবার আউর ইমলিকা খাট্টা, দয়া করে কেউ খাবেন না। তাতে আমার ওষুধের গুণ নষ্ট হয়ে যাবে। আর যদি কেউ বলেন এই ওষুধ খেয়ে ফল পান নি, তাহলে আমি মিটি সমক্ষের এই সমস্ত ওষুধ জলে ভাসিয়ে দেব। অবাক হয়ে দাদার কেরামতি দেখতে লাগলাম। ফ্রি স্যাম্পেলের লোভ দেখিয়ে ভিড়টাকে কাছে টেনে নিয়ে ওষুধের গুণকীর্তনে মেতে উঠলেন দাদা। সাত রকম দুষ্প্রাপ্য গাছগাছড়া আর ধাতুর সাহায্যে এই ওষুধ তৈরী। লোহা ভস্ম, সফেদ মুসলী, ব্রাহ্মী বটি, ত্রিফলা, শিলাজিৎ, মুলাক্ষুম, বটকা আধা,—তামাম হিন্দুস্থান ঢুঁড় কর বহুৎ দাম দিয়ে দাদার কোম্পানী এই সব জিনিস সংগ্রহ করেছে। আর তারই ফসল এই শান্তিবটি, জয়রবটি, অমরবটি। প্রতিটি প্যাকেটের গায়ে কোম্পানীর নাম ঠিকানা লেখা আছে। ইচ্ছা করলে আপনারা কোম্পানীর অফিস থেকেই এই ওষুধ সংগ্রহ করতে পারেন। অথবা প্রচারকে দিয়ে রোজ বিকেলে আমি আসি এখানে—আমার কাছেও আপনারা পাবেন। প্রতি প্যাকেট দু টাকা। প্রত্যেক প্যাকেটে আছে একুশটা বড়ি—সাতদিনের ব্যবস্থা। ফুলকোর্স—তিন প্যাকেট, একুশ দিনের। আইয়ে আইয়ে লিজিয়ে লিজিয়ে।

তারপর শুরু হয়ে গেল পি সি সরকারের ম্যাজিক। ডজন ডজন হাত শূন্যে টাকা বাড়িয়ে দিচ্ছে। আর সুশীলদা একহাতে টাকা নিয়ে অন্য হাতে বড়ির প্যাকেট সাপ্লাই দিচ্ছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম। দেখলাম যারা ফ্রিতে ওষুধ পাবার আশায় এগিয়ে গিয়েছিল তারা আগাম দাম দিয়ে মাল নিয়ে গেল। ফ্রি স্যাম্পেলের কথা বেমালুম ভুলে গেছে।

ভিড়টা পাতলা হতে হতে রাজভবনের গম্বুজের আড়ালে আগুনের লাল গোলাটা

কখন যে টুপ করে খসে পড়েছে টেরও পাইনি। হ্যাজাক, হ্যারিকেন জ্বলে উঠেছে এসপ্ল্যানেডের ফিরিওয়ালাদের ফ্রাস্তার-দোকানে। হাজার হাজার ব্যস্ত মানুষ চারদিকে বাড়ী ফেরার তাড়ায় ট্রাম ধরার আশায় ছোটাছুটি করছে। একজনেরই দেখলাম কোন তাড়া নেই। সে টুলের ওপর বসে এক গোছা দলাপাকানো নোট আঙুলের টানে ইস্ত্রি করে গুনে গেঁথে নিচ্ছে। পাশে সঙ্গীটি দাঁড়িয়ে একটা হ্যান্ড ব্যাগে উপবুড় ওষুধের প্যাকেটগুলো ভরছে। সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম একবার চোখ মেলে তাকালেন সুশীলদা। তারপর ঝরঝরে বাংলায় স্পষ্ট উচ্চারণে বললেন—তোকে আগেই দেখেছি কান্তু। দাঁড়া একটু। টাকা কটা গুনে নিই।

টাকা গুনে নিয়ে সঙ্গীটিকে কখন চলে যেতে বলে আমার পিঠে হাত দিয়ে সুশীলদা বললেন—চ, একটা দোকানে বসে একটু চা খাই। এত বছর পরে দেখা। অথচ সুশীলদার ভাব-ভঙ্গীতে একটুও বিস্ময়ের চিহ্ন নেই। যেন রোজই আমাদের দেখা হয়।

চা খেতে খেতে শুনলাম গত আঠারো বছরে তামাম হিন্দুস্থান চষে বেড়িয়েছেন দাদা। তার ওষুধ এখন দারুণ চলছে আসাম আর ত্রিপুরায়। মাদ্রাজেও চলছে মন্দ নয়। তারপর আমাদের সবার খোঁজ-খবর নিলেন। কে কি করছি? কেমন আছি? তারপর পুরোনো পাড়ার খবর কি?

আধঘন্টা বাদে চা-টা খেয়ে উঠে পড়লাম দুজনে। সুশীলদা উঠেছেন চৌরঙ্গীতে। বৌদিকেও নিয়ে এসেছেন নিজের মুলুক দেখাতে। এত দিন পর্যন্ত পারেন নাই মার্ক করাইন। রথও দেখাবেন, কলাও বেচবেন। আজকাল নিজে আর ওষুধ খান না। সারাদিন ঘুরে প্রচার করে হাঁপিয়ে ওঠেন। বৌদিই তাই ম্যানুফ্যাকচারিং-এর ধকলটা পোহান। রাস্তায় বেরিয়ে বললেন—একদিন আয় না আমার কাছে। আর বেশীদিন থাকছি না। দেখলাম দাদার উচ্চারণটাও কেমন পাল্টে গেছে। ভাঙা ভাঙা হিন্দী মেশানো বাংলায় বললেন—তোর বৌদি কিন্তু এদেশী নয় রে। হিন্দুস্থানী। তোকে দেখলে খুব খুশী হবে। আসবি তো?

বললাম—নিশ্চয়ই যাব। ততক্ষণে দাদা একটা ট্যাক্সি দাঁড় করিয়েছেন। ভেতরে ঢুকতে যাবেন, ঠিক তখুনি বিকেল থেকে যে প্রশ্নটা মাথার মধ্যে কিলবিল করছিল, সেটা ঠোঁট কেটে গড়িয়ে পড়ল—তোমার ওষুধ তো দেখলাম দারুণ চলছে। মগজের ভাগটা কি সেই একই আছে? হাসতে হাসতে জবাব দিলেন সুশীলদা—ভাল ওষুধ, যাতে উপকার হয় তা কিনতে আমার কাছে কে আসবে বল। তাই ঐ আফিম মেশানো গুলিই বেচি। এক প্যাকেট শেষ করতে না করতেই নেশা ধরে যায়। তখন পাগলের মত খুঁজে বেড়ায় শান্তিবটি, জয়রবটি, অমরবটি। দেখ না এবার কলকাতাতে একটা অফিস পার্মানেন্টলি খুলে যাব। একটা ভাল লোক ঠিক করে দে না, যে অনেস্টলি ব্যবসাটা দেখবে। মোটা কমিশন দেব।

—ট্যাক্সি ছেড়ে দিল। জানলার কাচের আড়ালে পরিষ্কার আলোর মত ঘামে ভেজা তেলতেলে দাদার মুখটা সাফল্যের চর্বিতে দারুণ উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। দাদার ব্যবসাটা সাংঘাতিক রকম জমে উঠেছে।

—অগ্নিধ্বংস

নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

(২৯)

এবার ওদের ফেরার পালা। ঈশম সকাল সকাল দুটো রান্না করে খেয়ে নিয়েছে। সে খুব সকালে গোটা নৌকার পাটাতন ধুয়েছে। গলুইতে জল জমে ছিল, সব ফেলে দিয়ে একেবারে নৌকা হাল্কা করে রেখেছে। পালে যেখানে যেখানে সামান্য ছেঁড়া ছিল গতকাল সারাটা দিন সেখানে সযত্নে সুচ-সুতো দিয়ে মেরামত করে নিয়েছে। কোন কারণেই যেন নৌকা চালাতে কষ্ট না হয়। গুণ টানার দড়ি ঠিক-ঠাক করে সে বসে থাকলে দেখল, মেজকর্তা আসছেন সকলের আগে। মাঝে সোনা লালটু, পলটু, পাগল কর্তা, আশ্বিনের কুকুর পিছনে।

এখন স্টিমার ঘাটে খুব ভিড়। যে যার মতো পূজোর দিনগুলি গ্রামে কাটিয়ে চলে যাচ্ছে। এই গ্রাম প্রায় শহরের সামিল। এখানে হাইস্কুল আছে। পোস্টঅফিস আছে। বাজার-হাট, আনন্দময়ীর কালীবাড়ি আর বড় বড় জমিদারদের প্রাসাদ মিলে এক জাঁক-জমক এই পূজার কটা দিন—তারপর ফের বাবুদের কেউ ঢাকা চলে যান, কলকাতায় যান, গ্রাম থেকে একে একে সবাই চলে গেলে —পুরি খাঁ-খাঁ করে।

ভূপেন্দ্রনাথের এমনই মনে হচ্ছিল। ওরা চলে যাচ্ছে। সকাল সকাল ওরা সেদ্ধ ভাত খেয়ে নিয়েছে। ভূপেন্দ্রনাথ পাড়ে দাঁড়িয়ে ওদের বিদায় দিল। যতক্ষণ নৌকাটা শীতলক্ষ্যার বুকে দেখা গেল ততক্ষণ সে পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকল। ওর আর কেন জানি এ সময় কাছারিবাড়িতে ফিরতে ইচ্ছা হল না। সে হেঁটে হেঁটে কালীবাড়ির দিকে চলে এল ভাবল, চুপচাপ সে বারান্দায় বসে মাকে দর্শন করবে। পুরোহিত কালু চক্রবর্তী মাঝে মাঝে এসে নানারকম কুশল সংবাদ নিলে হুঁ হাঁ করবে। আর বারান্দায় বসলেই সেই ভাঙা প্রাচীন শ্যাওলা ধরা দুর্গের মতো বাড়িটাতে যেন মন্দিরের সাদৃশ্য খুঁজে পায় কিনা। কি সাহস মৌলভিসাবের, সে এখানে হাজার লক্ষ মানুষ নিয়ে এসে নামাজ পড়তে চায়। কোরবাণী দিতে চায়। এসব করলেই এ অঞ্চলে আগুন জ্বলে উঠবে। সে বলল, মা তুমি শক্তিদায়িনী। তুমি শক্তি দিও মা। সে মনে মনে যেন কেন ধর্মযুদ্ধের স্বপ্ন দেখছে। যেন এই মা, আনন্দময়ী, শক্তিদায়িনী মা হাজার হাজার দেবসৈন্য তৈরি করবে শরীর থেকে। এবং মহিষাসুর বধের মতো সব যুদ্ধে উদ্যত হবে। যুগে যুগে মা তুমি মুণ্ডমালা ধারিণী।

তারপর ভূপেন্দ্রনাথ মনে মনে হাসল। অবহেলায় ওর মুখ কুঁচকে উঠল। থানার দারোগা, পুলিশসাহেব সদরের, মায় ম্যাজিস্ট্রেট সব বাবুদের হাতে। একটা তার করে দিলেই স্টিমার বোঝাই করে সৈন্য-সামন্ত হাজির হবে। সে অবহেলায় মুখ কুঁচকে রাখল। ভিতরে ভিতরে সে এত বেশি উত্তেজিত যে হাঁটতে হাঁটতে সে নিজের সঙ্গে নিজেই কথা বলছে। সে যেন একটা রণক্ষেত্রের উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে।

তখন ঈশম হালে বসে সোনাকে বলল, কি গ' কর্তা মুখ কলা ক্যান।

সোনা মুখ ফিরিয়ে রাখল। যেন ঈশম ওর মুখ দেখতে না পায়।

—আর কি, এইবারে নাও ঘাটে লাগাইয়া দিমু। আপনের মার ঠিক ঘাটে খাড়াইয়া থাকব। গেলেই আপনারে কোলে তুইলা নিব।

পাগল মানুষ মণীন্দ্রনাথ নৌকার গলুইয়ে বসে আছেন। রোদ মাথার উপর। ঈশম বারবার অনুরোধ করেছে ছইয়ের ভিতরে বসতে—তিনি বসেন নি। একেবারে অচঞ্চল পুরুষ। পদ্মাসন করে বসে আছেন। রোদে মুখ লাল হয়ে গেছে। সোনার এখন এসব ভাল লাগছে না। সে বাড়ি যাচ্ছে। অমলা কমলা এখন কত দূরে। সে বাড়ি গিয়ে মাকে কেমন দেখবে। কেমন এক পাপ বোধ ওকে সেই থেকে দুঃখ দিচ্ছে। অমলা কমলার কান্না, অথবা সেই রাত্রি ওকে যেন আরও বেশি সচেতন করে দিয়েছে। কেউ যেন বলছে, তুমি এটা ভাল করনি সোনা। সে যে জন্য চুপচাপ সারাক্ষণ বসেছিল নৌকায়।

বাড়ির ঘাটে নৌকার শব্দ পেয়েই ধনবৌ ছুটে এসেছিল। বড় বৌ এসেছে। সে খবর পেয়েছে পাগলমানুষ, সাঁতার কেটে, কখনও গ্রামের পথে হেঁটে মুড়াপাড়া চলে গেছে। যেদিন সোনা ওরা ফিরবে সেদিন তিনিও ফিরবেন।

সোনা নৌকা থেকে লাফ দিয়ে নেমেই মাকে জড়িয়ে ধরল। এতক্ষণ যে মনটা ভারি ছিল, এখন তা একেবারে হাল্কা হয়ে গেছে।

বড় বৌ বলল, কি সোনা মার জন্য কাঁদিসনি ত।

সোনা ঘাড় কাত করে না করল।

—ঠিক কেঁদেছিস? তোর চোখ মুখ বলছে। কিরে লালটু সোনা কাঁদে নি।

—না, জ্যাঠিমা।

—তাহলে আর কি, এবার জ্যাঠামশাইর মতো হয়ে গেলি। যেখানে খুশি চলে যাবি। কারো জন্য মায়া হবে না।

বড়বৌ যেন এই কথায় পাগল মানুষকে সামান্য খোঁচা দিল। আর পাগল মানুষ মণীন্দ্রনাথও যেন সে খোঁচা ধরতে পেরে তাকালেন বড়বৌর দিকে।

বড়বৌ বলল, এস। যেন বলতে চাইল, তুমি কোথাও চলে গেলে আমার ভারি কষ্ট হয়। ভয় হয়। আমার আর কে আছে!

সোনা প্রায় যেন বিশ্ব জয় করে ফিরেছে। তার নূতন অভিজ্ঞতা, হরিণ, ময়ূর এবং বাইস্কোপের বাকস এসব তার সকলকে দেখতে না পারলে অথবা বলতে না পারলে সে মনে মনে শান্তি পাচ্ছে না। প্রথম মালতী পিসিকে সে এসব দেখাবে ভাবল। গোপাটে ফাতিমা এলে তাকে দেখাবে ভাবল।

সোনার মনে হল কত দিন পর সে যেন এখানে ফিরে এসেছে, যেন সে দীর্ঘদিন এখানে ছিল না। সবাইর সঙ্গে দেখা না করা পর্যন্ত সে স্বস্তি পাচ্ছে না। সে প্রথমে বড় ঘরে ঢুকেই ঠাকুমা ঠাকুরদাকে প্রণাম করল। তারপর উঠোনে নেমে এলে বড় বৌ বলল, সোনা জামা-প্যান্ট ছেড়ে ফেলে নাও।

সোনা এসব শুনল না। ওরা সেই কখন খেয়ে বের হয়েছে, সুতরাং ক্ষুধা পাবার কথা। বড়বৌ, ওরা হাত পা ধুয়ে এলেই খেতে দেবে। কিন্তু কেউ খেতে আসছে না। সোনা দৌড়ে পুকুর পাড়ে চলে গেল। অর্জুন গাছটার নিচে দাঁড়াল। দক্ষিণের ঘরে আবেদালি বসে আছে। ছোট কাকা বাড়ি নেই। পালবাড়ির সুভাষের বাবা নেই। হারান পালের বাড়ি খালি। সোনা অর্জুন গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে সব লক্ষ্য করল।

শুধু জলে এখন মালতীপিসির পাতিহাঁস সাঁতার কাটছে। সে পুকুর পাড় ধরে কয়েদ বেল গাছটার নিচে চলে গেল। এখান

থেকে লোভা আবেদের বাড়ি চোখে পড়ে। সে হাটিজলে নেমে সোজা ওদের বাড়ি উঠে দেখল নরেন দা বাড়িতে নেই। সব কেমন খাঁ-খাঁ করছে। লোভা আবু নেই। ওর মা নেই। এমন কি সে মালতী পিসিকেও দেখতে পেল না। কেবল মনে হল ওদের তাঁতঘরে কেউ বসে বসে তামাক কাটছে।

সোনার কেমন ব্যাপারটা ভূতুড়ে মনে হল। কেউ নেই। সে একা। সূর্য অস্ত গেছে। অথচ বাড়ির পর বাড়ি সে দেখছে খালি পড়ে আছে। হয়ত একজোড়া একটা লম্বা হাত, লোভা আবু, সেই যে গল্প সে শুনেছে, লোভা আবুর লম্বা হাত, এ-ঘর থেকে ও-ঘর পার হয়ে যাচ্ছে—সে তাড়াতাড়ি উঠোন পার হয়ে বাড়ির দিকে ছুটবে ভাবল, আর তখন দেখল মালতীপিসি একটা পিটকিলা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছে। একা। নির্জনে কার সংগে যেন কথা বলছে।

সে কাছে গেল। অন্য দিন হলে মালতী-পিসি ওকে জড়িয়ে ধরত, আদর করত। কিন্তু আজকে মালতীপিসির চোখ কঠিন। চুল বাঁধে নি। কেমন রুক্ষ চোখ-মুখ। মাঝে মাঝে থু-থু ফেলছে। মাঝে মাঝে ঠিক নয়, যেন এক অশুচি ভাব সারাক্ষণ শরীরে—সব সময়ই সে থু-থু ফেলে শরীর পবিত্র রাখতে চাইছে। আর কার সঙ্গে বিড়-বিড় করে কথা বলছিল, সোনাকে দেখে আর কথা বলছে না। একেবারে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। সে যে সোনাকে চেনে এমন মনেই হচ্ছে না। গাবছার নিচে গিয়ে দাঁড়াল। দক্ষিণের ঘরে সোনা এসেছিল ওর বাইস্কোপের বাক্স দেখাতে, আর এখন এমন একটা চেহারা দেখে সে কথা পর্যন্ত বলতে পারল না। মালতীপিসির কি একটা অসুখ হয়েছে। অসুখ হলে মানুষের চোখ-মুখ এমন হয়। সোনা আর দাঁড়াতে পারল না। সে ছুটে এসে জ্যাঠিমাকে বলল, মালতীপিসি গাছের নিচে…সে বলে শেষ করতে পারল না। জ্যাঠিমা বললেন, ওর কাছে যাবে না। ওকে বিরক্ত করবে না।

সে জ্যাঠিমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, ছোট-কাকা তারা কোথায়? লোভা আবু, নরেন দাস কোথায়? পালবাড়ির সুভাষের বাবা নেই কেন! এসব শুনে বড়বৌ এক ফকিরের দরগায় মেলা বসেছে এমন বলেছিল। গ্রাম ভেঙে মানুষ-জন মেলা দেখতে গেছে।

সোনার মনে হল এই পৃথিবীতে আবার একটা কিংবদন্তী সৃষ্টি হচ্ছে।

এ এক অলৌকিক ক্রিয়া। কারণ এক রাতে দুটো ঘটনা ঘটে কি করে! ঘটে না, ঘটতে পারে না। রাতের মাঝামাঝি সময় ফকিরসাবের অলৌকিক আবির্ভাব নরেন দাসের বাড়িতে। সাক্ষাৎ মকদ্দরী, অথবা জননীর মতো ফকিরসাব মালতীকে রেখে গেল। আর আশ্চর্য, সকলের মানুষেরা অথবা যারা ইন্তেকালে এসেছিল কবর দিতে তারা দেখেছে, ফকিরসাবের বিবি, লম্বা ঘোমটা দিয়ে রাতভর বসে আছে। পাশে কফিনের ভিতর ফকিরসাবের মৃতদেহ। অলৌকিক ঘটনা না ঘটলে এমন হয় না। দশ ক্রোশের ফারাক—নদী নালার দেশ। জোয়ারের জল কখন আসে কখন যায় কেউ টের পায় না। সেই জলে জলে ফকিরসাবের বিবি দিনমানের পথ মুহূর্তে পাড়ি দিয়ে-ছিল। মানুষের মনে যেমন একটা অবিশ্বাস গড়ে উঠতে পারে নি। গ্রাম মাঠের জায়গা, নদীনালা দেশ, খবর পৌঁছতে সময় লাগল না। নরেন দাস সকলকে ফকির-সাবের অলৌকিক আবির্ভাবের কথা রটিয়ে দিয়েছিল। মধ্য রাতে, আল্লা রহমানে রহিম বলে সেই উঁচু লম্বা মানুষের আগমন, এবং মৃত্যুর খবর শুনতেই নরেন দাসের মনে হয়েছিল, যোজন দূরে মাথা উঠে গেছে ফকিরসাবের, দুঃখিনী মালতীকে তিনি আলখাল্লার ভিতর থেকে ছোট একটা পুতুলের মতো বের করে দিয়ে নিমেষে হাওয়ায় লীন হয়ে গেছেন। এই ঘটনায় ফকিরসাব রাতে-রাতে পীর বনে গেলেন। আবার কিংবদন্তী। ধর্মের মতো, অথবা সেই তালপাতার পুঁথির মতো কেবল কিংবদন্তী। বিশ্বাস নিয়ে নিরন্তর বিবদমান দুই সাম্রাজ্য। একপাশে সে। মাঠ পার হলে গোপাট, গোপাটের ওপাশে ফতিমা।

ফতিমা এলেই সোনা সেদিন সেই সন্ধ্যায় বাইস্কোপের বাক্স তাকে দিয়ে দিল।

—কেডা দিল সোনাবাবু।

—অমলা।

—ক্যান দিল।

—খুব ভালবাসে আমারে।

ফতিমা অর্জুন গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে চুপচাপ বাবুর মুখ দেখল। তারপর বলল, বাইস্কোপের বাক্স আমার লাগে না।

সোনা বলল, ক্যান লাগে না!

—লাগে না। আমি নিমু না।

সোনা বলল, ক্যান নিবি না?

ফতিমা কথা বলল না। সে সোনা বাবু মুড়াপাড়া থেকে ফিরে এসেছে শুনেই জল ভেঙে চলে এসেছে এখানে। এখন জল বেশি নেই গোপাটে। পায়ের পাতা ডুবে যায় এমন জল। ফতিমা বাবুর সংগে কথা না বলে শাড়িটা একটু তুলে উপরে, জলে নেমে গেলে সোনা বলল, অমলা আমার পিসি হয়।

ফতিমা ঘাড় কাত করে তাকাল এবং উঠে এসে বাইস্কোপের বাক্সটার জন্য হাত পাতল।

সোনা দেবার আগে ফতিমাকে কাচে চোখ রাখতে বলল। সে ছবি পাল্টে পাল্টে দেখাচ্ছে। ফতিমা এই ভাবিশুনার ভিতর আরব্য রজনীর রহস্যময় জগত আবিষ্কার করে কেমন বিমূঢ় হয়ে গেল। যেন এবার ওর চোখ তুলে বলার ইচ্ছা—সোনাবাবু এতদিন কোথায় ছিলেন। তারপর ওর চোখ মুখ দেখলেই টের পাওয়া যায়, সে বিকেল হলেই ওদের পুকুরপাড়ের পেয়ারা গাছটার নিচে এসে দাঁড়িয়ে থাকত। সেই গাছটার নিচ থেকে মাঠের এপারে এই অর্জুন গাছ স্পষ্ট। অর্জুন গাছের নিচে কেউ এসে দাঁড়ালেও স্পষ্ট। কেবল পাট গাছগুলো জোষ্ঠ-আষাঢ়ে বড় হয়ে গেলে বুড়ো গাছের নিচই ঢাকা পড়ে যায়। কেউ কাউকে দেখতে পায় না। পেয়ারা গাছের নিচে দাঁড়ালে এ-পারে অর্জুনের ছায়ায় কেউ দাঁড়িয়ে আছে কিনা বোঝা যায় না। পাট কাটা হলে সব আবার খালি। সারা বছর ফতিমা বিকালে গাছের নিচে দাঁড়ালেই টের পায় সোনাবাবু কোথায়? সে বিকেলে গাছের নিচে দাঁড়িয়ে থেকেছে। অথচ সে বাবুর মুখ দেখতে পায় নি একবার। কেমন একটা অভিমান ভিতরে ভিতরে ছিল। বাইস্কোপের বাক্সটা দিতেই সে অভিমান ওর জল হয়ে গেল।

ফতিমা বলল, নানী কইছে একবার যাইতে।

সোনা বলল, বলবি, নানী বলেছে যেতে

—এটা ত বইয়ের ভাষা।

—বইয়ের ভাষায় কথা বলতে শিখবি।

—আমার লজ্জা লাগে।

—আমারও। বলে সে হাহা করে হেসে উঠল। অমলাপিসি জ্যাঠিমার মত কথা বলে।

• আলকালকা টনিক • কিংস হোমোটোন
• কিংকোর আর্নিকা হেয়ার অয়েল
• ক্যাসিনা সিরাপ • ইউট্রোটোন
কিং এণ্ড কোম্পানীর নিজস্ব গবেষণায় প্রস্তুত ঔষধগুলি
এখন আপনার সেবায় নিয়োজিত।
প্রস্তুতকারক:
কিং এণ্ড কোং
৯০/৬এ, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭
ল্যাবরেটরী:
২০বি, গাধী বাগান লেন, কলিকাতা-৯
GRACE/K/30/70
কিং এণ্ড কোম্পানীর সকল শাখায় এবং বিভাগ প্রতিদিন সকাল ৮টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত খোলা থাকে

আমাকে বলে সোনা যাম্‌, কিরে, যাব বলবি।

—আপনে কি কইলেন [illegible],

—কইলাম লজ্জা লাগে।

—আমারও লাগে। বলেই ফতিমা ছুটে নেমে গেল জলে, তারপর সারা মাঠে জল ছিটিয়ে ফতিমা মাঠের ওপরে উঠে গিয়ে পেয়ারা গাছটার নিচে হাত তুলে দিল। সোনাও হাত তুলে দিল। সিগনাল পেয়ে যার যার গাড়িতে যে যার বাড়িমুখো রওনা দিল।

সোনা দক্ষিণের ঘরে ঢুকে দেখল, অলিমদ্দিও নেই। আবেদালি শুধু বসে রয়েছে। অলিমদ্দি এবং জোটনকাকার ফিরতে দেরি হবে। ফকিরের দরগায় গেছে ওরা। সুতরাং এতবড় বাড়িতে কোন পুরুষ মানুষ থাকবে না, রাতে চোর-ছ্যাচোড়ের উপদ্রব, সে জন্য শচীন্দ্রনাথ আবেদালিকে রেখে গেছে বাড়ি পাহারা দিতে। আবেদালি থাকবে, খাবে, এবং বাড়ি পাহারা দিবে। সোনা নিজে একটা হ্যারিকেন এনে বৈঠকখানার দাওয়ায় রেখে দিল।

সোনা আবেদালিকে বলল, আপনে যাবেন না?

—কোনখানে?

—ফকিরসাবের দরগায়।

—কাইল যামু।

কারণ ঈদের সময় যখন এসে গেছে তখন আর ঘরে থাকবার কথা নয়। সবাই যাবে দরগাতে। সময় পেলেই চলে যাবে।

কোথাও যাবার নাম শুনলে সোনারও যাবার ইচ্ছা হয়। মেলার কথা মনে হলেই সেই সার্কাসের কথা মনে হয়, দুই বাঘের কথা মনে হয়। সে কি ভেবে এবার হ্যারিকেনের উপর ঝুঁকে বসল। আজও পড়া থেকে ওদের ছুটি। কাল থেকে, ঠিক কাল থেকে নয়। কোজাগরি লক্ষ্মীপূজো শেষ হলে রাত দিন জেগে পড়া। স্কুল খুললেই পরীক্ষা। সুতরাং সে একটু সময় পেয়ে আবেদালির মুখ দেখছে।

আবেদালি কেমন নির্জীব মানুষ হয়ে গেছে। জব্বর এখনও নিখোঁজ। আবেদালির শরীর ক্রমে ভেঙে আসছে।

জালালি মরে যাবার পর থেকে দ্বিতীয় পক্ষের বিবিটা ওর অভাব অনটন বুঝতে চায় না। কেমন খাই-খাই ভাব। যা রাঁধবে, নিজে একা খাবে, ওকে পেট ভরে খেতে দেবে না। সে এই বাড়িতে আজ রাতে পেট ভরে খেতে পাবে। ওর কাঁচাপাকা দাড়ির ভিতর পেট ভরে খাবার লোভী মুখটা ধরা পড়ছে। কেমন চোখ দেখলে টের পাওয়া যায় জব্বরটা ওকে বড় ছোট করে দিয়ে গেছে। থানা পুলিশ হত, কিন্তু ফকিরসাবের এমন অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ডের পর সবাই সব ভুলে গিয়ে দরগায় মেলা নিয়ে মেতে উঠেছে।

আর সব চেয়ে আশ্চর্য এই মালতী। সে সে-রাতে ফিরে এলে হল্লা করে লোক জড় করল নরেন দাস। চেঁচামেচিতে বোঝা যায় সব—তবু ওর যা কথা, তাতে 'বোঝা যাচ্ছে ফকিরসাব, আর সাধারণ মানুষ ছিলেন না। [illegible] জলে উঠেছিল এক অগ্নিশিখা—শিখার প্রচণ্ড আলোতে ফকিরসাবের সহস্র মুখ যেন সারা উঠোন জুড়ে বেড়াচ্ছিল—যেন বলছেন ফকিরসাব, আমার জননীরে কেউ অসতী করে নাই নরেন দাস। তারে তুমি তুলে লহ।' প্রায় গোটা ব্যাপারটা নরেন দাসের কাছে সীতার বনবাসের মতো মনে হয়েছিল।

মালতী অন্ধকারে চুপচাপ। সে কোন কথা বলছিল না। পাষাণ প্রতিমার মতো তার শক্ত মুখ। চোখ দুটো কেবল জ্বলজ্বল। তাকে প্রশ্ন করলে কোন জবাব পাওয়া যাচ্ছে না। সে ক্রমে শক্ত হয়ে যাচ্ছে। সে চুপচাপ, অর্থহীন দৃষ্টি, সে বারান্দার চিড়িয়াখানার জীবের মতো বসে থাকল। পাড়া-প্রতিবেশীরা তাকে দেখে যাচ্ছে এবং ভিন্ন ভিন্ন মন্তব্য ছুঁড়ে দিচ্ছে। ফকির সাহেবের মতো শক্ত মানুষ হয় না। আল্লার বান্দা তিনি।

এভাবে একদিন গেল, দুদিন গেল। নরেন দাস তার বোনকে কেন জানি আর জল চল করে নিতে পারল না। জাতিতে যবন, এরা মানুষ না, ওরা চুরি করে নিয়ে গেছে, সুতরাং বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা, যবনে ছুঁলে ছত্রিশ, সে মালতীর জন্য ঢেঁকিঘরের বারান্দায় একটা খুপরি করে দিল। সেই খুপরিতে ঠিক একটা পাতিহাঁসের মতো মালতী এক সকালে ঢুকে গেল।

আর আশ্চর্য খুপরি ঘরে একা এক সুন্দরী বিধবা একা থাকতে সাহস পেয়ে গেল। শরীরে তার আর কি আছে যা মানুষ জোর করে কেড়ে নিতে পারে। সে এতদিন যা সোহাগে লালন করছিল, এবং আকাশে নানা রকম নক্ষত্রের ছবি দেখলে তার যার কথা মনে হত, সেই রঞ্জিত, যুবক এক, তাকে না বলে চলে গেছে, সে তাকে আর কিছু দিতে পারল না। এই উচ্ছিষ্ট শরীরের কথা ভাবলেই ওর মুখে থুথু উঠে আসে। সে সারাদিন জলে ডুবে থাকতে চায়। জলে নামলেই মনে হয় তার শরীর পবিত্র হয়ে যাচ্ছে। জলে ডুবে গেলে মনে হয়, আহা কি শান্তি মা জননী জাহ্নবীর কোলে। সে ডুবে গেল কিনা, তার আঁচল অথবা চুল ভেসে থাকল কিনা, কি শীতের রাত, কি গ্রীষ্মের দাবদাহে শুধু তার যেন এক প্রশ্ন, তোমরা পাড়ে দাঁড়িয়ে দ্যাখো, আমি ডুবে যাচ্ছি, কিভাবে যাচ্ছি দ্যাখো, সব চুল, আঁচল, এমন কি আমার সামান্য যা কিছু, সব ডুবে যাচ্ছে কিনা দ্যাখো।

প্রতিবেশী বালকদের এটা একটা খেলা হয়ে গেল। মালতী পিসি কেমন ভোঁস ভোঁস করে একটা উদবিড়ালের মতো ডুবত ভাসত। ওরা পাড়ে দাঁড়িয়ে খেলা করত অথবা মজা তামাশা, পিসির আঁচল ভেসে আছে, অথবা চুল, না না চুল, না না তোমার পাসির আঙুল দেখা গেছে, হাতের আঙুল, তোমার কাপড় জলের ভিতর বাতাস পেয়ে পাল তুলে দিতে চেয়েছে, তোমার সব ডুবে যায়নি, তুমি কেমন কিছু না কিছু নিয়ে জলের উপর ভেসে থাক, এমন যখন বলত বালকেরা, তখন মালতীর কি করুণ মুখ! আমার সব ডুবে ডোবে না, আমার কিছু না কিছু ভাইসা থাকে! দ্যাখ দ্যাখ সোনা ডুবে আছি কিনা দ্যাখ।

সোনা বলত, পিসি তুমি ভুইবা গাছ।

তারপরই মালতী সারা ঘাটে জল ছিটিয়ে উঠে আসত। চারপাশে শুধু অপবিত্র এক ভাব। সে কলাত থেকে জল ছিটাত আর ঘরের দিকে এগিয়ে যেত। শুচিবাইগ্রস্ত মালতী এভাবে এসে জলে ডুবে থাকতে থাকতে এক সময় শ্রীহীন রুক্ষ, এবং পাগল প্রায় হয়ে গেল। সারা রাত অভিমানে চোখ ফেটে জল আসে। চোখে ঘুম থাকে না। সোনা যখনই ঘাটে এসেছে, দেখেছে মালতী পিসি জলে সাঁতার কাটছে। জল থেকে কিছুতেই উঠতে চাইছে না। মুখ বড় করুণ। তার শরীর থেকে কারা যেন তার প্রাণপাখি নিয়ে পালিয়েছে। নরেনদাস বকে বকে জল থেকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে।

এভাবে শরৎকালটা কেটে গেল সোনার। শশীভূষণ পূজার ছুটি শেষ হলে চলে আসবে। হেমন্তের দিনে পড়ার চাপ বেশি। ওকে সকালে এবং রাতে বেশিসময় শশীভূষণ নিজের কাছে পড়ার জন্য বসিয়ে রাখবে। পাগল জ্যাঠামশাই কিছুদিন হল কোথাও যাচ্ছেন না। সোনার ধারণা সেই জ্যাঠামশাইকে শান্ত এবং ধীর-স্থির করে তুলছে। জ্যাঠামশাই সেই যে হাতী দেখতে গিয়ে ভাল হয়ে যেতে থাকলেন, যেন ক্রমে তিনি সেই থেকে ভাল হয়ে যাচ্ছেন। সে মাঝে মাঝে জ্যাঠামশাইকে তামাক সেজে দেয়। তামাক খান তিনি। বসে বসে আপন মনে সেই কবিতা আবৃত্তি করেন। স্নানের সময় স্নান, আহারের সময় আহার। রাতে তিনি ওদের পড়ার টেবিলের একপাশে ছোট্ট পড়ুয়ার মতো সরল বাংলা ব্যাকরণ নিয়ে বসে থাকেন। যেন খুব নিবিষ্ট পড়াশোনায়। তিনি কখনও সোনার শ্লেট নিয়ে পেনসিলে নানা রকমের প্রজাপতি, অথবা শূন্য একটা সাঁকো, মাঠের ছবি আঁকেন। কাউকে তিনি আর বিরক্ত করেন না। সোনা লক্ষ্মী পূজোর জন্য টুনি ফুল আনতে গিয়েছিল। জ্যাঠামশাই নৌকা বাইছিলেন। এবং যেখানে এই দুর্লভ টুনিফুল পাওয়া যায় ঠিক সেখানে, তিনি তাকে পৌঁছে দিয়েছিলেন। এই সব জীবনের ভিতর সোনা দেখেছে বড় জ্যাঠিমা খুব খুশী। তিনি সারাদিন সংসারের জন্য উদয়াস্ত পরিশ্রম করছেন। জ্যাঠামশাই বাড়ি থাকলে, জ্যাঠিমার আর কোন দুঃখ থাকে না। কপালে বড় গোল করে সিঁদুর, মাথায় লম্বা সিঁদুর, লাল পেড়ে কাপড়, কি ধবধবে এবং সাদা, তার শ্যামলা রঙের জ্যাঠিমাকে কখনও কখনও রামায়ণে বর্ণিত নারী চরিত্রের সঙ্গে তুলনা করতে ইচ্ছা হয়।

এভাবেই কার্তিক পূজার দিন এসে গেল। ফতিমা অর্জুনগাছের নিচে এসে একদিন বলে গেছে, ওর জন্য এবার দুটো

'সবাইকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে—
কি পড়াশুনোয়,
কি খেলাধুলোয়!'
কিছুদিন আগেও ওর কিছুই যেন ভাল লাগত না। সব সময় কেমন মনমরা, আর খিটখিটে। ইস্কুলের পড়াশুনো বা খেলাধুলো কিছুতেই মন নেই। অগত্যা বাড়ীর ডাক্তারকে দেখালাম।
ডাক্তারবাবু বললেন, "ভাববেন না, আপনার মেয়ের কোন অসুখ হয় নি। শুধু এই বাড়ন্ত বয়সে ওর কিছুটা বাড়তি পুষ্টি চাই। ওকে রোজ হরলিক্স খেতে দিন।"
হরলিক্স খেয়ে মেয়ের আশ্চর্য উন্নতি হ'ল। ওর স্ফূর্তি আর উৎসাহ আবার ফিরে এসেছে। ইস্কুলের রিপোর্টও এখন খুব ভালো।
হরলিক্স-এর গুণেই উন্নতি হল
বাড়ন্ত বয়সে ছোটদের যে হারে শক্তি-ক্ষয় হয়, রোজকার মামুলী খাবারে তার পূরণ হয় না। হরলিক্স খেলে বাড়তি পুষ্টি পেয়ে ওদের অতিরিক্ত শক্তি গড়ে ওঠে—মনে স্ফূর্তি আসে, সব কাজ ভালো হয়। ডাক্তাররা তাই বাড়ন্ত ছেলেমেয়েদের হরলিক্সই দিতে বলেন।
HL 2573A
মাখন না-তোলা দুধের
Horlicks
হরলিক্স বাড়তি শক্তি যোগায়!

স্ত্রীঘট রাখতে হবে। সে মাকে বলেছে, জ্যাঠিমাকে বলেছে। সে ওদের প্রত্যেকের কাছ থেকে স্ত্রীঘট নিয়ে রাখবে। এবং কার্তিক পূজার পরদিন ফতিমা এলে দুটো নয়, এবার চারটা দেবে। যেমন অমলা-কমলা ওকে নানাবিধ দ্রব্য দিয়ে খুশী করতে চেয়েছে, সে তেমনি এই মেয়ে— কি যে মেয়ে, পায়ে মল, নাকে নোলক, ডুরে শাড়ি পরা মেয়ে তার জন্য অপেক্ষায় থাকে— সে তাকে কিছু দিতে পারলেই মহৎ কিছু করে ফেলেছে এমন ভাবে।

আজ কার্তিক পূজার দিনই ঘটনাটা ঘটল।

ওরা বিকেলে গেছে মাঠে। সন্ধ্যার সময় চারপাশের জমিগুলোতে আগুন জ্বালানো হয়েছে। ভাল বুড়োতে আগুন দিচ্ছে সবাই। সংসারের যাবতীয় পাপ দূরে, পরিজনের মানুষেরা হেমন্তের মাঠ থেকে পুণ্য তুলে আনতে গেছে। অলক্ষ্মী ফেলে লক্ষ্মী আনতে গেছে সবাই। সোনা লালটু পলটু তিনজন তিনটা ভাল-বুড়োতে আগুন দিয়ে এখন মাঠের উপর ছুটছে। ওরা ওদের সবচেয়ে যে জমি ভাল ফসল দেয় সেখানে আগুনের নুড়োগুলো পুঁতে দিল। তারপর চাই কার্তিক পূজার জন্য সবচেয়ে পুষ্ট ধানের ছড়া। এখন ওরা তিনজন এই হেমন্তের মাঠে সেই পুষ্ট ছড়ার জন্য জমি থেকে জমিতে ক্রমে সোনালি বালির নদীর চর পার হয়ে চলে যাবে। যে যত বড় ছড়া নেবে সে তত বেশি পুণ্য বহন করবে সংসারের জন্য। এভাবে এক প্রতিযোগিতা—সোনা একটা বড় ছড়া কেটে বলল, কি বড় দাখ দাদা! আর তখন পলটু বলল, কৈ দাখি। দেখে বলল, বড় না ছাই। বলে সে একটা বড় ছড়া দেখাল। এবং ক্রমে এভাবে ওরা ছড়ার জন্য দূরের মাঠে নেমে গেল। পছন্দ হচ্ছে না। মনে হয় এ জমি পার হয়ে গেলে বড় মিয়ার জমি, জমিতে ফসল হয় সবার সেরা, অথবা কোথাও এমন জমি আছে যেখানে তাদের জন্য পুষ্ট ছড়া নিয়ে মা-লক্ষ্মী অপেক্ষা করছেন। ওরা এখন মাঠে মাঠে মা লক্ষ্মীকে খুঁজছে।

ওরা তিনজন এভাবে অনেকদূরে চলে এল। পুষ্ট এবং বড় ধানের ছড়া না নিতে পারলে গৌরব করা যাবে না। বড় জ্যাঠিমা বলবেন না, দাখ ধন তোর ছেলে কত বড় ছড়া এনেছে! এই মাঠে পুষ্ট ধানের ছড়াটির জন্য ওরা জমি থেকে জমিতে ঘুরছে। আবছা অন্ধকার। হেমন্তের মাঠ বলে সামান্য কুয়াশা। অস্পষ্ট জ্যোৎস্না আকাশে বাতাসে। ওরা নুয়ে একটা একটা করে ধানের ছড়া দেখছে আর বেছে নিচ্ছে! হাত দিয়ে মাপছে। না, বড় ছোট। প্রায় হাত লম্বা না হলে কার্তিক ঠাকুরের গলায় মালার মতো ঝোলানো যাবে না।

তখন লণ্ঠন হাতে কারা যেন নদীর পাড়ে পাড়ে হেঁটে এদিকে আসছে। লণ্ঠনের আলো দেখে মনে হল ওরা অনেক দূরে চলে এসেছে। ওদের খেয়ালই ছিল না, ওরা নদীর চর ভেঙে হাইজাদির মাঠে পড়েছে। লণ্ঠনের আলো দেখে ওদের বাড়ি ফেরার কথা মনে হল।

কাছে এলে সোনা দেখল কেলু যাচ্ছে। মাথায় বড় একটা ট্রাঙ্ক। সে এক হাতে মাথায় বড় ট্রাঙ্ক নিয়ে চলে যাচ্ছে। পিছনে সামসুদ্দিন। এবং সবার পিছনে ফতিমা। ফতিমা আজ শালোয়ার পরেছে। লম্বা ফুল হাতা ফ্রক সোনালি রঙের। কাল ফতিমার আসার কথা অর্জুনগাছটার নিচে। সে ফতিমার জন্য চারটা স্ত্রীঘট রেখে দেবে। এ-সময়ে কোথায় যাচ্ছে ফতিমা সেজেগুজে। সে ফতিমাকে দেখেও কিছু বলতে পারল না।

সামসুদ্দিন এত বড় মাঠে ওদের তিনজনকে দেখে কেমন একটু বিস্মিত হল। সে বলল, আপনেরা!

—ধানের ছড়া খুঁজতে আইছি।

সামসুদ্দিনের এতক্ষণে মনে পড়ল আজ কার্তিক পূজা। সবাই বের হয়ে পড়েছে পুষ্ট ধানের ছড়া খুঁজতে মাঠে। সে বলল, পাইছেন নি!

ওরা যা সংগ্রহ করেছিল দেখাল।

সামসুদ্দিন হাসল। —মা লক্ষ্মী এত ছোট হইব ক্যান। আসেন আমার লগে।

ওরা যেন হাঁটছিল। সোনা কিছুতেই কিছু বলছে না। সে ফতিমার পাশাপাশি হাঁটছে। তবু কথা বলছে না। ফতিমাও কিছু বলছে না। সে আর বেশিক্ষণ অভিমান নিয়ে থাকতে পারল না। বলল, তুই ছিরাঘট নিবি না!

—রাইখা দিবেন। ঢাকা থাইকা আইসে নিমু।

—তুই ঢাকা যাইবি।

—আমরা সবাই ঢাকায় যামু। আমি স্কুলে পড়মু। বাড়িতে নানী একলা থাকব। সোনা বলল, কই তুই আগে কস নাইত!

—কমু কি! বাজি সকালে সব কইল।

সোনা জানে ফতিমার বাবা বাড়ি এলে সে কোথাও যায় না। সোনা আবার চুপ করে গেল। ফতিমাও কিছু বলছে না। সে বলল, সোনাবাবু আপনে আমারে চিঠি দিবেন।

—যা! চিঠি দিমু কিরে।

—আপনে কেমন থাকেন জানাইবেন।

—ছোট কাকার বকব।

ফতিমা বলল, বিকালে আমি কানতে ছিলাম, বাজি কইল তুই কান্দস ক্যান?

—তর আবার কান্দনের কি হইল!

—কিছু হয় নাই!

তখন সামসুদ্দিন বলল, এই দ্যাখেন পুষ্ট ধানের ছড়া। সে বিলের জলে একটা গামছা পরে নেমে গেল। —এত বড় ধানের ছড়া কোনখানে খুঁইজা পাইবেন না। এই বলে সে তিনজনের হাতে তিন গুচ্ছ বড় বড় ধানের ছড়া দিয়ে বলল, জলে না নামলে কেহ শিখে না সাঁতার। কি কইলেন কর্তা। লক্ষ্মীরে আনতে গেলে কষ্ট লাগে। এই বলে সে গামছা দিয়ে শরীর মুছে ফেলুকে বলল, তুরা হাঁটতে থাক। আমি অগ নিয়া আসি। অরা পথ চিনা বাড়ি উইঠা যাইতে পারব না।

সামসুদ্দিন অর্জুন গাছটা পর্যন্ত এল। পুবের বাড়ি সামনে এবং সেখানে মালতী আছে—জব্বর মালতীকে চুরি করার তালে ছিল, ফকিরসাব ওকে এখানে রেখে গেছেন—এবং জব্বর ওর দলের পান্ডা—সুতরাং এই অপরাধের জন্য সে কিছুটা দায়ী, ওকে দেখলে এমন মনে হয়। সামসুদ্দিন ভিতরে ভিতরে এই অসম্মানের জন্য পীড়িত। সে নিজেকে বড় অসহায় বোধ করল। সে নানাভাবে মুসলমান মানুষের ভিতর আত্মপ্রত্যয় ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছে, যা এতদিন নসিব বলে মেনে আসছিল সবাই, সে তা আঙুল তুলে দেখিয়ে দিয়েছে—ওটা নসিব নয়। ওটা আপনাদের অসম্মান। আপনারা এতদিন তা গায়ে মাখেননি। কিন্তু জাতির আত্ম-প্রত্যয় ফিরিয়ে আনতে গেলে কিছু কঠিন উক্তি তাকে সময়ে অসময়ে করতে হয়েছে। কিন্তু তার বিনিময়ে জব্বরের এমন ইতর কাজ! ভিতরে ভিতরে তার জন্য সে জ্বলে পুড়ে খাক হচ্ছিল। সহসা গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়া নানা মানুষ নানাভাবে ব্যাখ্যা করবে। সে যাচ্ছে। যাচ্ছে, কেন এখানে থাকলেই ওর মালতীর সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। সে কিছু বলতে পারবে না। সে মাথা নুয়ে অসম্মানের দায়ভাগ কাঁধে তুলে নেবে শুধু। মালতীর সামনে পড়ার ভয়েই বোধ হয় সে দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে। অবশ্য সে হাজিসাহেবের ছোট ছেলে আকালুকে দলের পান্ডা করে দিয়ে গেছে। শহরে কাজের চাপ তার বেড়ে গেছে। সে এখন থেকে শহরেই থাকবে।

সামসুদ্দিন আর উঠে আসতে সাহস পেল না। নরেন দাসের বাড়িতে কোন লম্ফ পর্যন্ত জ্বলছে না। সে একা দাঁড়িয়ে থাকল অর্জুন গাছটার নিচে। যতক্ষণ না ওরা উঠে গিয়ে বলল, আপনে যান, ততক্ষণ সে গাছের নিচে দাঁড়িয়ে বার বার লক্ষ্য রাখছে নরেন দাসের বাড়িতে লম্ফ জ্বলছে কিনা। সে কেমন এখানে ভীতু মানুষের মতো দাঁড়িয়ে আছে। বার বার লম্ফের আলোতে মালতীর মুখ দেখার ইচ্ছা। মালতী তুই আমার কসুর মাপ কইরা দেইস, এমন বলার ইচ্ছা। সে আবার মাঠের দিকে হেঁটে গেলে গাছের নিচটা কেমন খালি হয়ে গেল।

সোনা বাড়ি উঠে এসে দেখল দক্ষিণের ঘরের বারান্দায় মাস্টারমশাই দাঁড়িয়ে আছেন। শশীভূষণ দেশ থেকে চলে এসেছে। ওদের দেখেই তিনি বললেন, কি তোমরা লক্ষ্মী কেমন অলক্ষ্মী এনেছ। দেখাও তো লক্ষ্মীরে।

ওরা ধানের ছড়া আলোতে তুলে দেখাল।

—খুব বড় ছড়া দেখছি। কোথায় পেলে?

সোনা ওর ছড়াও দেখাল। ওরটা সবার বড় কিনা, না ছোট, সে তার মাস্টার মশাইর কাছ থেকে ছড়া দেখিয়ে তার সার্টিফিকেট চাইল।

শশীভূষণ সোনার ইচ্ছা বুঝতে পেরে বলল, সবার বড় সোনার ছড়া। সোনা সেই না শুনে ছুটে গেল ভিতরে। মা জ্যাঠিমা কার্তিক পূজার ঘরে নানারকম আলপনা দিয়েছে। হ্যাজাকের আলো জ্বলছে। জল-চৌকিতে কার্তিক ঠাকুর। নিচে সারি সারি শ্রীঘট। ঘটে আতপ চাল, উপরে জলপাই। সে তার ধানের ছড়া মাকে দিল। মা দু হাতে ছোট্ট এই বালকের হাত থেকে ধানের ছড়া বরণ করে নিলেন।

কিন্তু শশীভূষণকে দেখেই সোনার বুকটা কেঁপে উঠেছিল। সে আর খুব একটা এ পূজায় উৎসাহ পেল না। মাস্টার-মশাই বড় কড়া প্রকৃতির লোক। তিনি খুব সকালে উঠবেন। সবার দরজায় গিয়ে ডাকবেন, সোনা ওঠ। লালটু ওঠ। পলটু ওঠ। হাত-মুখ ধোবে। তিনি সবাইকে ঘুম থেকে তুলে মাঠে নিয়ে যাবেন। প্রাতঃ-কৃত্যাদি হলে, মর্টিকলার ডাল দেবেন। দাঁত মাজতে বলবেন। তিনি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে দাঁত মাজা হলে বলবেন, উঠে এস। তার জন্য একটা তক্তপোষ দিয়েছেন শচীন্দ্রনাথ। বড় তক্তপোষ। সে সেখানে রাজ্যের সব গাছ গাছড়া জড় করে রেখেছে। পেটের পীড়া, দাঁত ব্যথা, বাত এবং মাথা ধরা এবং অন্যান্য যাবতীয় রোগে সে ওষুধ দেবে। ওরা মুখ ধুয়ে এলেই ভিজা ছোলা দেবে গুনে গুনে, গুড় দেবে। এবং গুনে গুনে ফ্রি হ্যান্ড একসারসাইজ করাবে। পড়া হলে স্নান। তেল মেখে দেবে সোনার মাথায়। সকলকে নিয়ে সে পুকুরঘাটে সাঁতার কাটবে। তারপর গরম ভাত ডাল, ভাজা এবং হেঁটে হেঁটে স্কুলে যাওয়া। শশীভূষণ এলেই ওরা একটা নিয়মের ভিতর আবার মানুষ হবে এমন ঠিক থাকে।

এই নিয়মের ভিতর শশীভূষণের যত রাগ লালটুর উপর। লালটুর ডন-বৈঠক দুশ দশ বার। সোনার একশ দশবার। আর পলটুর তিনশ দশ বার। পলটু ঠিক ওঠা বসা করে কাজ সেরে নেয়। সোনাও। কিন্তু লালটু দেরি করে ওঠা বসা করবে। মাঝে মাঝে উঠতে বসতে ওর প্যান্ট হড়হড় করে নেমে আসে। শশীভূষণ তখন কান ধরে তুলে ধরে। এবং চিৎকার করতে থাকে, ধনবৌদি ধনবৌদি!

চিৎকার চেঁচামেচি শুনে ধনবৌ ছুটে এলে দেখতে পায়, লালটু উলঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। উঠতে বসতে ওর প্যান্ট খুলে গেছে। প্যান্টে ওর দড়ি নেই।

—এটা কি!

—আমি কি করমু কন! ওর প্যান্টে কিছুতেই জোর থাকে না।

—আচ্ছা দেখছি। বলে তিনি পাট দিয়ে বেশ শক্ত করে সুতলি পাকিয়ে ওর প্যান্টে জোর ভরে দিতেন। লালটু ভয়ে ভয়ে আর প্যান্ট থেকে দড়ি খুলে ফেলত না। লালটু জব্দ এই মাস্টার মশাইর কাছে।

সোনা শশীভূষণকে দেখলেই এসব মনে করতে পারে।

মনে করতে পারে একটা উড়ো জাহাজের কথা। সেই প্রথম এ-অঞ্চলের উপর দিয়ে উড়ো জাহাজ উড়ে যাচ্ছে। ঢাকার কাছে কার্মিটোলাতে যুদ্ধের জন্য ঘাঁটি হয়েছে। যুদ্ধ ব্যাপারটা সোনার ভাল জানা নেই। মেজ-জ্যাঠামশাই বাড়ি এলে যুদ্ধের গল্প করেন। মাঠ থেকে উড়ো জাহাজ দেখে সে যখন বাড়ি ফিরছিল তখন রাস্তায় দেখা।
—এই খোকা শোন!

সে বিদেশী শব্দ শুনেই থমকে দাঁড়িয়েছিল।

—ঠাকুর বাড়ি কোন দিকে।

—সে আঙুল তুলে দেখিয়ে দিল।

ছোট করে ছাঁটা চুল মানুষটার। তিনি নবদ্বীপের মানুষ। এখানে তিনি হাই-স্কুলের হেড মাস্টার হয়ে এসেছেন। বারদি থেকে হেঁটে এসেছেন বলে হাতে পায়ে ধুলো। সোনা বাড়িটা দেখিয়েই ছুটে হারাণ পালের বাড়ির ভিতর ঢুকে সোজা চলে এসে ছোট কাকাকে খবরটা দিল। দিয়েই সে আবার বার বাড়ির উঠানে দাঁড়িয়ে থাকল—কতক্ষণে সেই মানুষ উঠে আসে।

শশীভূষণ বাড়িতে ঢুকে বলেছিল, এটা তোমাদের বাড়ি!

সে মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়েছিল।

—শচীন্দ্রনাথ তোমার কে হয়?

—কাকা।

একবার কাকাকে ডাকো দেখি।

ততক্ষণে শচীন্দ্রনাথ বার বাড়ির উঠানে উঠে এসেছে। ওকে দেখেই শশী-ভূষণ নমস্কার করেছিল। বলেছিল, এলাম।

—আসেন। শচীন্দ্রনাথ বৈঠকখানায় নিয়ে ওকে বসিয়ে দিল। —এই আপনের ঘর এই তক্তপোষ। আর এই তিন বালক।

সোনা ততক্ষণে বুঝতে পেরেছিল, ওদের স্কুলের হেড মাস্টারমশাই—যার আসার কথা অনেকদিন থেকে, যিনি বরিশালের কোন অঞ্চলের শিক্ষকতা করতেন সেকেন্ড মাস্টারের, এখানে হেড মাস্টারের চাকরি পেয়ে চলে এসেছেন। শচীন্দ্রনাথই এ-ব্যাপারে বেশী খেটেছে। এবং কথা ছিল হেড মাস্টার মশাই তার বাড়িতেই থাকবেন খাবেন। এবং এই তিন বালকের প্রতি নজর রাখবেন।

শচীন্দ্রনাথ বলেছিল, তোমরা মাস্টার-মশাইকে প্রণাম কর।

ওরা সেদিন কে কার আগে প্রণাম করবে—ঠেলেঠুলে প্রণাম করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছিল পায়ে।

প্রথমেই তিনি বলেছিলেন, তোমাদের দাঁত দেখি।

সোনা দাঁত দেখাল।

—ভাল করে দাঁত মাজা হয় না। বলে তিনি নিজে হাত পা ধুয়ে আসার সময় এক রাশ মর্টিকলার ডাল কেটে আনলেন। এবং সবাইকে একটা একটা করে দিয়ে—কি ভাবে দাঁত মাজতে হয়, দাঁত নিচ থেকে উপরে মাজতে হয়, এই দাঁত মাজা আমরা আদৌ জানি না, দাঁত থেকেই সব রোগের উৎপত্তি এসব বলতে বলতে তিনি একটা খাঁটি ডেমন স্ট্রেশন দিয়েছিলেন।

সোনা লালটু পলটু বাইরে এসে হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়েছিল।

সেই মাস্টার মশাই এসে গেছেন। সোনা আর এখন যখন তখন পড়া ফেলে অর্জুন গাছের নিচে ছুটে যেতে পারবে না। সোনা হ্যারিকেন নিয়ে হাত পা ধুতে ঘাটের দিকে চলে গেল সে কেমন বিমর্ষ। ফতিমা নেই। এবং সে অন্যমনস্ক। অন্যমনস্ক না হলে সে একা একা ঘাটে হ্যারিকেন নিয়ে হাত পা ধুতে আসতে পারত না। ওর ভয় করত।

সে ঘাটে নেমে গেল। হ্যারিকেনটা তেঁতুল গাছের গোড়ায় রেখেছে। সে পা ধোওয়ার জন্য জল তুলতেই সামনে কি দেখে ভয় পেয়ে গেল। জলের উপর, ঠিক মাছ-রাঙা পাখির মতো, এক জোড়া পায়ের পাতা ভাসছে। লাল। যেন সিঁদুর গুলে পায়ের পাতায়, কেউ মা লক্ষ্মীর জলে ভাসিয়ে গেছে। লক্ষ্মীর পায়ের মতো দু পা জলে ভাসিয়ে নিচে কেউ ডুবে আছে। সে দেখেই লাফ দিয়ে ছুটে পালাল। হ্যারিকেন পাড়ে জ্বলে পড়ে গেল। সে হাঁপাতে হাঁপাতে শশীভূষণের ঘরে ঢুকে কেমন তোতলা বনে গেল।

শশীভূষণ মুহূর্ত আর দেরি করল না। শচীন্দ্রনাথ এবং নরেন দাস ছুটে এল। শশীভূষণ জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। নিচে জল চলা মানুষ কাছে একটা শক্ত কিছু লাগছে। সে ডুব দিয়ে তুলে আনল দেখল, মালতী। গলায় কলসী বেঁধে জলে ডুবে আত্মহত্যার চেষ্টা করছে। পায়ে অলক্তা পরেছে। কপালে সিঁদুর আর হাতে গলায় ওর যত গয়না ছিল সব পরে সে জলের নিচে অন্তর্ধান করতে চেয়েছে।

শচীন্দ্রনাথ নাড়ি টিপে বুঝল, প্রাণটা ভিতরে এখনও আছে। চোখ দুটো বোজা। মালতী অজ্ঞান হয়ে আছে গল গল করে জল বমি করছে। ফ্যাকাশে মুখ। কপালে বড় সিঁদুরের ফোঁটা। সিঁথিতে চওড়া সিঁদুর, পায়ে আলতা। চার পাশে যে এত ভিড় শচীন্দ্রনাথ তা লক্ষ্য করল না। সে অপলক অভাগিনী মেয়েটার দিকে তাকিয়ে আছে। ওরা নুন দিয়ে ওর শরীর ধীরে ধীরে ঢেকে দিতে থাকল। মেয়েটা চোখ বুজে এখন নুনের নিচে বুঝি নিশ্চিন্তে ঘুম যাচ্ছে। সকাল হলেই জেগে উঠবে। সেই আশায় সকলে আলো জ্বালিয়ে চারপাশে বসে থাকল। সোনা সে রাতে ঘুম যেতে পারল না। শিয়রে সেও জেগে বসেছিল। বার বার রঞ্জিত মামার কথা তার মনে পড়ছে। তার কেন জানি রঞ্জিত মামার উপর ভীষণ রাগ হচ্ছিল।

(ক্রমশঃ)

অথ কালীঘাট মন্দির কথা

বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়

বন-জঙ্গল আর খরস্রোতা গঙ্গার কোলে একদা গড়ে উঠেছিল কালীঘাট। অরণ্যে ছিল বাঘ আর নদীতে কুমীর। অনেক কিংবদন্তীর আলো-আঁধারিতে পথ ছিল দুর্গম। তবু অনেকের সুখ-দুঃখের সঙ্গেই এর ইতিহাস আছে জড়িয়ে। সাবর্ণ চৌধুরীদের পারিবারিক গৌরব ও ঐশ্বর্য মিশে আছে কালীঘাটের আকাশে-বাতাসে। আর গোটা সহর কলকাতার ইতিহাস যে মা কালীকে ঘিরে গড়ে উঠেছে সে কথা ম্লেচ্ছ ইংরেজদের পর্যন্ত অজানা নয়।

মন্দিরে অধিষ্ঠিতা দেবীকে নিয়ে যেমন অনেক নাটকীয় ঘটনা শোনা যায়, শোনা যায় অনেক কিংবদন্তী, মন্দিরের ইতিহাসও সে দিক থেকে আলাদা নয়। একালের যে মন্দিরটি আমরা দেখতে পাই, তার নির্মাণের ইতিকথা গল্পের মতনই রোমাঞ্চকর। কিশোরী কলকাতা খেলা-ঘর থেকে তখনো বেরোয় নি। তাকে ঘিরে আবর্তিত হচ্ছে ঈর্ষা-দ্বন্দ্ব-স্বার্থপরতা, খেয়ালী বাবুদের বিলাস আর হঠাৎ-ধনীদের সামাজিক প্রতিষ্ঠার দুর্বার মোহ। কিশোরী কলকাতার কাছে এ সব ছিল একেকটি খেলনা। ঐ খেলনা নিয়েই একদা সে বানিয়ে চলল একটি মন্দির। কালীঘাটের মন্দির। আর মন্দির মানে গল্পের মত একটি নিটোল ইতিহাস।

এ গল্পের নায়ক কে?—এ ইতিহাসের রাজা?—বলা কঠিন। কখনো মনে হতে পারে হাটখোলার দত্তবংশীয় চন্দ্রশিববাবুই এর নায়ক। অথবা তাঁর ছেলে কালীপ্রসাদ। কালীপ্রসাদের কথা উঠতেই চন্দ্রশিববাবুই অনিবার্যভাবে আসে শোভাবাজারের রাজবাড়ি। ওঠে নবকৃষ্ণের কথাও। কিন্তু না, এঁদের সকলের কথাই ম্লান হয়ে যাবে যখন আমরা সাবর্ণ সন্তোষের কথা চিন্তা করব। সাবর্ণ পরিবারের সন্তোষ রায় কালীঘাটের ইতিহাসের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত, সুতরাং তাঁকে বাদ দিয়ে কি কখনো আমরা মন্দির-নির্মাণের কথা আলোচনা করতে পারি?—তাই ইতিহাসের রাজা কে তা বলা কঠিন।

তবু এ কাহিনী আরম্ভ করতে হলে সন্তোষ রায়কে দিয়েই আরম্ভ করা ভালো। কেননা, কালীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক খুব কাছের। আর তাঁর জীবন নানারকম রোমাঞ্চকর ঘটনায় ভরা। পলাশীর যুদ্ধের বছর বারো আগে যখন বাংলা দেশে বর্গীর হাঙ্গামা দেখা দেয়, তখন তিনি যুবক। বড়িশা-বেহালার তিনি আত্মরক্ষক।—মারাঠা দস্যুরা সেদিন রাঢ়-বাংলার সৃষ্টি করেছে রীতিমত আতঙ্ক। গ্রামের পর গ্রামে লাগিয়ে দিচ্ছে আগুন। লুঠ করছে সম্পদ। তখন মুর্শিদাবাদে নবাবীর তক্তে বসে ছিলেন যিনি, সেই আলীবর্দী হিমসিম খাচ্ছেন এদের সঙ্গে লড়াইয়ে। এবং অনেক চেষ্টা করেও শেষ পর্যন্ত এদের এঁটে উঠতে পারলেন না। তাই মারাঠা দস্যুদের সঙ্গে সন্ধি হল। 'চৌথ' দেবার স্বীকৃতিতে বাংলা দেশে শান্তি কিনলেন আলীবর্দী। নবাব আলীবর্দী। আর 'চৌথ' মানেই একরাশ টাকা। মুর্শিদাবাদের ধনাগারে এমনিতেই ছিল প্রচুর অপব্যয়। এখন বড়ো ঘাটতি দেখা। ফলে রাজকোষ হয়ে উঠল নিঃশেষিত হবার মতন।

আলীবর্দী তাই বকেয়া খাজনা আদায়ে মন দিলেন। জমিদার আর রাজারাজড়াদের ওপর চাপালেন করের ভার। এ বোঝা বহন করতে যাঁরা অস্বীকার করলেন তাঁরা নবাবের কোপ-দৃষ্টিতে পড়লেন। এমন কি কেউ কেউ বন্দীও হলেন। ঐ বন্দী হওয়া ব্যক্তিদের ভেতর পড়লেন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ং এবং আমাদের কালীর সেবক সন্তোষ রায়।

অবশ্য কিছুদিন পরেই এঁরা ছাড়া পেলেন। তবে তা অনেক কৌশলে। না, সন্তোষ রায়ের ব্যাপারটি কৌশল না বলে আপন মহিমায় বলা যেতে পারে। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র আপন জমিদারী দেখাবার জন্য নবাব আলীবর্দীকে টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন দক্ষিণের গঙ্গায়। বজরা করে ভেসে যেতে যেতে জঙ্গলের দিকে হাত বাড়িয়ে দেখিয়েছিলেন নিজের জমিদারী। এ জমিদারী মানে গভীর বন। সে বনে মাঝে মাঝে শোনা গিয়েছিল বাঘের ডাক। কৃষ্ণচন্দ্র সে ডাক শুনিয়ে নবাবকে বলেছিলেন, 'হুজুর, ওরা আমার প্রজা। ঐ প্রজাদের কাছ থেকে কেমন করে খাজনা আদায় করব বলুন তো!' নবাব আলীবর্দী গোঁফে তা দিতে দিতে কৃষ্ণচন্দ্রের ব্যাপারটি একটু বুঝেছিলেন। এবং মুর্শিদাবাদে ফেরবার পর রেহাই দিয়েছিলেন রাজাকে।

আর সন্তোষ রায়? তাঁর কি হল?—নবাব তাঁকে বন্দী করে রেখেছিলেন মুর্শিদাবাদের একটি বাড়ীতে। মানী ব্যক্তিকে যথোচিত মর্যাদা দিয়েই রেখেছিলেন। সঙ্গে দিয়েছিলেন তাঁদের পালনের জন্য ভৃত্য এবং রান্নার জন্য পাচক। আর নবাবের কাছ থেকে প্রতিদিন প্রয়োজনমত আসত খাবার সামগ্রী। পাচক সেগুলিকে দিত রান্না করে।

সন্তোষ রায়ের চেহারা ছিল বিশাল। এবং খোরাকও ছিল বিপুল। নবাবের বরাদ্দ খাবারে ঠিক মত তাঁর কুলোত না। সর্বদাই তিনি ক্ষুধার্ত বোধ করতেন। একদিন সকালে হঠাৎ দেখলেন নবাবের ছাগরক্ষকেরা অনেকগুলি ছাগল নিয়ে চলেছে তাঁর বাড়ির সামনে দিয়ে। সন্তোষ রায় তাঁর একজন চাকর পাঠিয়ে জোর করে ওখান থেকে ছিনিয়ে আনলেন একটি পাঁঠা। তারপর সেটিকে কেটে ব্যবস্থা হল রান্নার। অত্যন্ত পরিতৃপ্তির সঙ্গে পেটের ভেতর ঢুকিয়ে ফেললেন।

এদিকে নবাবের ছাগ-রক্ষক যথাসময়ে এ খবর পৌঁছে দিল নবাবের কানে। নবাব প্রথমে এ কথা বিশ্বাসই করতে পারলেন না। পরে কৌতূহলী হয়ে নিজে এলেন অনুসন্ধান করতে। সন্তোষ রায়কে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'রায় মশাই আপনি আমার ছাগ-রক্ষকের কাছ থেকে পাঁঠা চুরি করে কি করেছেন?'

'খেয়েছি, হুজুর।'

'খেয়েছেন?'

'হ্যাঁ, হুজুর। আপনার পাঠানো খাবারে পেট ভরে না, তাই এ কাজ করেছি। গোটা পাঁঠাটাই অত ভারি পরিতৃপ্তির সঙ্গে আহার করেছি।'

'বটে! কিসের ইশারা খেলে গেল আলীবর্দীর চোখে-মুখে। দাড়িটি চুমড়ে নিলেন। তা দিলেন গোঁফে। তারপর কটমট করে সন্তোষ রায়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ঠিক বলছেন তো?'

হ্যাঁ, হুজুর ঠিকই বলছি। অবিশ্বাস হলে হুজুর আমাকে আরেকবার খাইয়ে দেখতে পারেন।'

সন্তোষ রায়ের কথাটি সঙ্গে সঙ্গে লুফে নিলেন নবাব বাহাদুর। পরদিনই নবাব খাওয়াবার উদ্যোগ করলেন। এবং নিজে বসে বসে দেখলেন খাওয়া। সন্তোষ

রায় এদিনও অত্যন্ত পরিতৃপ্তির সঙ্গে আহার করলেন। না একটু ভাত, না এক-টুকরো মাংস—কিছুই পড়ে রইল না তাঁর পাতে। যা ছিল সব চেটে-পুটে খেয়ে নিলেন।

এই খাওয়া দেখে নবাব আনন্দে গদগদ হয়ে পড়লেন। সন্তোষ রায়কে বললেন, 'ভারি খুশি হলাম, রায়মশাই, আপনার এ খাওয়া দেখে। তা এতখানি যাঁর আহার, তিনি যে আমার রাজস্ব বকেয়া রাখবেন, তাতে অবাক হবার কিছু নেই। তাই আপনার বাকি খাজনা মকুব করে আপনাকে এখনই আমি ছেড়ে দিচ্ছি। আর আপনার যাতে কখনো আহারে টানাটানি না পড়ে তার জন্য আলাদা একটি মহল লিখে দিচ্ছি। এ হবে আপনার খোরাকী মহল।'

না, নবাব বাহাদুর আর দেরী করলেন না। ডায়মণ্ডহারবারের কাছাকাছি 'আবজা-খালী' নামে একটি মহল ছিল সেকালে। সেই মহলটি ব্রহ্মোত্তর হিসাবে তাঁকে দান করে দিলেন। লোকেরা মুখে মুখে এর নাম হয়ে গেল খোরাকী মহল।

এই হল সন্তোষ রায়। ইনি যে কেবল নিজে খেতে ভালোবাসতেন, তা নয়। এঁর আনন্দ ছিল সকলকে খাওয়াতে। তাই এঁর দান-ধ্যান ছিল অনেক। শোনা যায়, লক্ষ বিঘে জমি ইনি দান করেছিলেন চারমেলের ব্রাহ্মণদের। এবং যথার্থ কুলীনদের। এই সব ব্রাহ্মণদের নিয়ে অত্যন্ত সরলভাবে তিনি যাপন করতেন জীবন। জাঁকজমক বা অকারণ আড়ম্বর সমারোহ কখনও তিনি পছন্দ করতেন না।

শোনা যায়, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র একবার কালীঘাটে এসেছিলেন রাজকীয় সমারোহে। আর সেই সমারোহ নিয়েই দেখা করতে এলেন সন্তোষ রায়ের সঙ্গে। মহারাজা ধীরে ধীরে এগোন। তাঁর আগে পিছে চলে আশা-সোটা, নকীব, বরকন্দাজ, হাতী-ঘোড়া-পাল্কি ইত্যাদি। সন্তোষ রায় সামান্য বেশে ও সাধারণভাবে দেখা দিলেন রাজার কাছে। সঙ্গে ছিল গুটিকয়েক আত্মীয় এবং দুয়েকটি চাকর। এ সরলতা দেখে রাজার তরফের কে একজন যেন বলে বসলেন 'কি ব্যাপার, সন্তোষ রায়ের এ অবস্থা কেন? লক্ষ লক্ষ বিঘে জমি যিনি দান করেন ব্রাহ্মণদের, মস্ত যাঁর জমিদারী, তাঁর এমন দশা? কোথায় গেল তাঁর আশা-সোটা, বরকন্দাজ আর হাতী-ঘোড়া-পাল্কি?'

প্রশ্নটি শুনে হা-হা করে হেসে উঠলেন সন্তোষ রায়। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ডাক পাঠালেন চারমেলের ব্রাহ্মণদের। এনে হাজির করলেন কুলীন-সন্তানদের। দেখিয়ে বললেন, 'মহারাজ! এরাই আমার আশাসোটা আর বরকন্দাজ। এরাই আমার হাতী-ঘোড়া উট-পাল্কি।'

এরকম অভাবিত উত্তর যে পাওয়া যাবে, মহারাজ তা আদৌ আশা করেন নি। তাই লজ্জায় মাথা হেঁট করলেন।

কালীঘাট মন্দির থেকে প্রত্যাবর্তন (একটি পুরোন ছবি)

যাই হোক, এই হল সন্তোষ রায়। অনেক কিংবদন্তীর তিনি নায়ক। অনেক গল্প তাঁকে ঘিরে। এবং বিচার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সত্যসত্যিই নানা নায়কোচিত গুণের সমাবেশ ছিল তাঁর চরিত্রে। ব্রাহ্মণদের প্রতি তিনি ছিলেন ভক্তিমান। দীনের আশ্রয়দাতা। আশ্রিতকে রক্ষা করতেন তিনি সর্বদা। দরকার হলে সকল খাড় দিয়ে। আর কালীঘাটের কালীর ছিলেন তিনি একান্ত সেবক।

তাঁর আয়ুষ্কালও ছিল সুদীর্ঘ। আলীবর্দীর আমলে তাঁর যৌবন, আর তাঁর বার্ধক্য নেমে আসে কর্ণওয়ালিস-শাসনের কলকাতায়। অনেক সামাজিক পারবর্তনের তিনি ছিলেন সাক্ষী। দেখেছিলেন তিনি অনেক ওঠা-নামা। দিনে দিনে তাঁরই সামনে বিকশিত হতে দেখছেন কালীঘাটের মহিমা।—তবে কালীঘাটে মায়ের মন্দিরটি তখন ভালো ছিল না। একটু একটু করে আসছিল জীর্ণ হয়ে। সেবক সন্তোষ রায়ের ইচ্ছা ছিল তিনি মায়ের জন্য একটি সুন্দর মন্দির করে দেবেন, কিন্তু অনেক চেষ্টাতেও তিনি তা পেরে ওঠেন নি। শেষ জীবনে এটুকুই ছিল তাঁর দুঃখের। অথচ সহর কলকাতার আকাশে-বাতাসে সেদিন উড়ে বেড়াচ্ছে টাকা। অজস্র টাকা। বাবুদের বিলাসে ও রাজাদের খেয়ালে কত টাকাই না ব্যয়িত হয়।

সে সব টাকার সামান্য একটু অংশ পাওয়া গেলেই মায়ের যে মন্দির তৈরী হয়ে যেতে পারত, তাতে কোনো সন্দেহ ছিল না। বৃদ্ধ সন্তোষ রায় দান করেই ফতুর। তবু মায়ের মন্দিরের জন্য কখনো একমনে চিন্তা করতেন আর দীর্ঘশ্বাস ফেলতেন!

*

এদিক সহর কলকাতায় সেদিন যে বিপুল পরিবর্তন এসেছিল, তার একটু সামান্য ইতিহাস নেওয়া যাক। পলাশীর যুদ্ধের পর থেকে জন কোম্পানী দিনে দিনে যেন ফুলে উঠতে থাকল। তার এ সমৃদ্ধির দিনে প্রায়ই সে অমত মায়ের কাছে ঢাকঢোল বাজিয়ে পাঁঠা কোলে করে। বলিদান দেওয়া হত, আর পুজো দেওয়া হত জাঁকজমক করে। মন্দিরের অধিষ্ঠিতা দেবী নিতেন এ পুজো এবং তাঁর কৃপাতেই কোম্পানি একদিন বসল রাজা হয়ে।

এ নতুন রাজার অনুগ্রহে অনেক সাধারণ লোকের ভাগ্যও বদলে গেল।

বনেদী বড়লোকদের বাড়ির পাশে হঠাৎ বিকশিত হয়ে উঠল হঠাৎ-বাবুদের এশ্বর্য্য ঐশ্বর্য। দেখা দিল নিত্য-নতুন বাড়ি। তাদের নতুন নতুন খেয়াল। এবং বিলাসিতা।

শোভাবাজারের প্রতিষ্ঠাতা নবকৃষ্ণের কথাই ধরা যাক। পলাশীর যুদ্ধের আগে তিনি ছিলেন সামান্য একজন ব্যক্তি। যুদ্ধের প্রস্তুতি পর্ব থেকেই তাঁর বরাত খুলতে আরম্ভ করল। এঁর পূর্বপুরুষ মুঘল সরকারের অধীনে কাজ করে উপাধি পেয়েছিলেন, ব্যবহর্তা। আনুমানিক সতেরোশ বত্রিশ খৃষ্টাব্দে জন্ম হয়েছিল নবকৃষ্ণের। ছেলেবেলাতেই তিনি শিখেছিলেন আরবী-ফারসী-উর্দু। পরে ইংরেজি। রাজা সুখময় রায়ের মাতামহ ধনকুবের লক্ষ্মীকান্ত ধরের কাছে প্রথম যৌবনে ইনি কাজ করতেন। ধর মশায় ছিলেন সেকালের একজন নামকরা ধনী ব্যক্তি। জবচার্নকের সঙ্গে হুগলী থেকে সুতানুটিতে এসে বসবাস করেন—এ ধরনের জনশ্রুতি আছে। পলাশীর যুদ্ধের আগে ক্লাইব সাহেব এঁর পোস্তার বাড়িতে প্রায়ই আসতেন। আসতেন নানারকম কাজে, এমন কি কোমপানির হয়ে টাকা ধার নিতেও। শোনা যায়, ধর মশায় সেকালের কোমপানিকে মহারাষ্ট্র যুদ্ধের সময় ন লাখ টাকা ধার দিয়েছিলেন। আর নবকৃষ্ণকে পরিচিত করিয়ে দিয়েছিলেন ক্লাইবের সঙ্গে। এবং এই ক্লাইবের মাধ্যমে নবকৃষ্ণ চেনেন ড্রেক-হলওয়েল-ওয়ারেন হেস্টিংস্-কে।

এর ফলে জনকোমপানি ও নবকৃষ্ণ উভয়েই হলেন লাভবান। নিদারুণ দুর্দিনে অনেক বিপদের হাত থেকে কোমপানিকে বাঁচিয়েছিলেন এই নবকৃষ্ণ। মুন্সী হিসেবে ষাট টাকা মাইনে পেতেন ইনি প্রথমে। সে সময় অনেক গোপন চিঠি তিনি মুসাবিদা করেছিলেন। সতেরোশ ছাপ্পান্নতে সিরাজ-উদ্দৌলার হাতে মার খেয়ে ইংরেজরা যখন একান্ত অসহায় অবস্থায় আশ্রয় নিল ফলতায়, তখন এই নবকৃষ্ণই জীবন তুচ্ছ করে একটানা ছয় মাস ধরে রসদ যোগান দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন তাদের। আর তাঁরই পাঠানো গোপন খবরে নির্ভর করে কলকাতা উদ্ধারে সমর্থ হয়েছিলেন ক্লাইভ।

সুতরাং দুর্দিনের এ বন্ধুকে ইংরেজরা কি ভুলতে পারে?—পারে নি। তাদের ভাগ্য-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হল নবকৃষ্ণের ভাগ্যও। নবাবের খাজানার লুণ্ঠনে ক্লাইব সাহেবের সঙ্গে তিনিও চললেন সঙ্গী হয়ে। জনশ্রুতি আছে, মুর্শিদাবাদের কোষাগার থেকে লুঠ করা কয়েক কোটি টাকা মূল্যের সোনা-রুপো মণি-মাণিক্যের অধিকারী হয়েছিলেন তিনিও। আরো নানা-রকম উপায়ে তিনি যে প্রভূত অর্থের মালিক হয়েছিলেন, সে সব কথা না তোলাই ভালো?

এইভাবেই দেখতে দেখতে অতি অল্প সময়ের ভেতর 'ব্যবহর্তা' বংশের ছেলে 'রাজা' হলেন। ক্লাইব সাহেব সত্যি-সত্যিই সম্রাট শাহ আলমের কাছ থেকে 'রাজা বাহাদুর' উপাধি আনিয়ে দিলেন। শুধু কাগজে-কলমের রাজা নয়, পেলেন দশ হাজারী মনসবদারের অধিকার। ঘোড়াশালায় ঘোড়া হল, হাতীশালায় হাতী। তৈরী হল নতুন রাজার নতুন প্রাসাদ। এর নাম, শোভাবাজার। লোক-লস্কর, পাইক-বরকন্দাজে এ বাড়ি সর্বদাই থাকত গম্‌গম্‌ করতে।

সকলে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল। বলল, হ্যাঁ, সত্যিসত্যিই রাজা বটে। বড়ো বড়ো ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা এলেন। জগন্নাথ তর্ক-পঞ্চানন এবং বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারের মত ডাকসাইটে পণ্ডিতেরা অলঙ্কৃত করলেন তাঁর সভা।

সবই হল। তবু তৃপ্তি নেই। তৃপ্তি নেই কেন?—কলকাতার বনেদী ধনী সমাজ এই হঠাৎ-রাজাকে স্বীকৃতি দিল না। রাজায় রাজায় রেষারেষি যেমন চলে, আরম্ভ হল সে রকম প্রতিদ্বন্দ্বিতা। একদিকে বনেদিআনা, অন্যদিকে হঠাৎ-বাবুদের খেয়ালিপনা। একদিকে অবজ্ঞা, আর অপর-দিকে প্রতিষ্ঠার জন্য দুর্বার দাবী, এই নিয়ে বেড়ে চলল উত্তেজনা। জমল নাটক।

সেকালে পোস্তার লক্ষ্মীকান্ত ধরের মতই ধনী ছিল হাটখোলার দত্তরা। যেমনি ছিল এঁদের অঢেল অর্থ, তেমনি ছিল অপরিমিত অপব্যয়। দত্তদের সারা বাড়িটা ধোয়া হত আতর দিয়ে। খাওয়া-দাওয়ার জন্য এঁদের বাড়িতে ব্যবহৃত হত সোনা-রুপোর থালা বাটি। এবং সে থালাবাটি পেতল-কাঁসার মত যেখানে সেখানে পড়ে থাকত। বাবুরাও ছিলেন ভীষণ আয়েসী। পাড়ের কর্কশতায় তাঁদের বাবুআনি বাধিত হত বলে, তাঁরা পাড় ছিঁড়ে কাপড় পরতেন।

এই ছিল হাটখোলার দত্তদের অবস্থা। তাঁদের সংসারে থেকে কত লোক যে অবস্থা-গুছিয়ে নিত, তার হিসাব নেওয়া কঠিন। এবং দানে-দাক্ষিণ্যে দত্তরা ছিল সত্যি-সত্যি বদান্য। এঁদের বাড়িতে সামান্য কাজ করতে করতে কিভাবে একজন ধনী হতে পারেন, তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলেন রামদুলাল দেব ওরফে রামদুলাল সরকার।

এই রামদুলাল ছিলেন ছাতুবাবু লাটুবাবুর বাবা। মদনমোহন দত্তের কাছে বিল সরকার হিসাবে কাজ করতেন পাঁচ টাকার মাইনেতে। কয়েক বছর পরে প্রমোশন হল। মাইনে হল দশ টাকা। তখন তিনি কাজ আরম্ভ করলেন জাহাজ সরকারের। টুলো কোমপানির অফিসে তিনি একদিন প্রভুর অনুমতি ছাড়াই একটি ডাক দিয়ে বসেছিলেন নিলামের। একটি জলমগ্ন জাহাজ বিক্রি হচ্ছিল। চোদ্দ হাজার টাকায় প্রভুর পক্ষে সেটি কিনে নিয়েছিলেন রামদুলাল। হঠাৎ সেখানে নাটকীয়ভাবে এক সাহেব ঢুকলেন। এবং কোমপানির ঘরে রাম-দুলালের টাকা জমা পড়ার আগেই, সেটি সাহেব রামদুলালের কাছ থেকে কিনে নিলেন এক লাখ টাকায়। রামদুলাল সেদিন খুব খুশি মনেই এ লাভের টাকা এনে দিলেন প্রভুর হাতে তুলে। একপয়সাও খরচ না করে এক লাখ টাকা রোজগার, একি কম কথা।

হাটখোলার দত্ত মশাই অবাক হয়ে গেলেন রামদুলালের সততায়। কেননা, এ টাকা রামদুলালের বুদ্ধিতেই অর্জিত। দত্তবাবুর অর্থে নয়। এবং এ টাকা কোনো জাহাজ-সরকারই প্রভুর হাতে তুলে দেয় না। দত্তমশাই তাই সন্তুষ্ট হলেন। সব টাকাটাই তিনি খুশি মনে তুলে দিলেন রামদুলালের হাতে। রামদুলালও অবশ্য মর্যাদা রেখেছিলেন এ টাকার। অনেক দান ধ্যান করেছিলেন। আর মৃত্যুকালে এই পাঁচ টাকা মাইনের বিল সরকার তাঁর ছেলেদের জন্য রেখে গিয়েছিলেন এক কোটি বাইশ লক্ষ টাকা। আর রেখে গিয়েছিলেন দত্তদের প্রতি চিরকালীন আনুগত্য।

•

কালীঘাটের কালীমন্দিরের সঙ্গে এসব কাহিনীর অবশ্য কোনো যোগ নেই। বাবুদের যে ক্ষীণ যোগ ছিল, তা হল কালীর সঙ্গে। কেননা, এসব সেকালের বাবুরা মাঝে-মাঝেই ঢাকঢোল বাজিয়ে পুজো দিতে আসতেন কালীঘাটে। দেখতেন কালীঘাটের জীর্ণ মন্দির। নতুন করে সে মন্দির তৈরী করা দরকার এ সব ধনকুবেররা কোনোদিন ভাবতেন না। কোনোদিন না। আসতেন মল্লিকরা। পাইকপাড়ার রাজারা। কেউ দিতেন সোনার মুকুট। কেউবা রুপোর হাত। সোনার হাতও মা একবার পেয়েছিলেন।

শোভাবাজার থেকেও এ ধরনের পুজোই আসত। সে পুজোয় খুবই ঢাকঢোল বাজত।

কিন্তু কে জানত, বাবুদের অলক্ষ্যে ভেতর দিয়ে মন্দির তৈরীর ভূমিকা তৈরী হচ্ছে। কে জানত, এ রেষারেষির ভেতর এসে যাবেন বৃদ্ধ সন্তোষ রায় এবং হাটখোলার দত্তদের প্রতি কৃতজ্ঞ মানুষ রামদুলাল সরকার।

যাই হোক, আগের কথা আগে বলে নেওয়া দরকার। এবং সে কথা বলতে গেলে শোভাবাজারের রাজবাড়ির কাছেই হাট-খোলার দত্তবংশীয় যে চূড়ামণি দত্ত থাকতেন তাঁকে নিয়েও দুকলম লেখা দরকার।

হঠাৎ-রাজা নবকৃষ্ণের প্রতিষ্ঠাকে স্বীকার করতেন না চূড়ামণি। কোনো রকমেই না। বরং সর্বদাই চেষ্টা করতেন যাতে তাঁকে হেয় করা যায়। তাই কারণে অ-কারণে বাধিয়ে বসতেন বিবাদ। লাগিয়ে দিতেন টক্কর। কায়স্থ সন্তান চূড়ামণি এ সব খেয়ালে পয়সা খরচ করতে দ্বিধা করতেন না। ভালোবাসতেন প্রচণ্ড।

একবার পারিবারিক একটি অনুষ্ঠান বসেছে শোভাবাজারের রাজবাড়িতে। সুন্দর করে সাজানো হয়েছে বাড়ি। ঝাড়লণ্ঠন দিয়ে মুড়ে ফেলা হয়েছে প্রাসাদ। অতিথিরা আসছেন একে একে। বহুমূল্য গালিচা, কিংখাপের সমারোহ এবং আলোর ঐশ্বর্যে অনেকেরই চোখ যাচ্ছে ধাঁধিয়ে।—সে সভায় চূড়ামণি দত্তের মেয়েও ছিলেন নিমন্ত্রিত। এলেন তিনি। আর কি আশ্চর্য, সে সভায় চূড়ো দত্তের মেয়ের প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে রঙ বদলে গেল গোটা মণ্ডপের। মাথার ওপর ছিল লাল রঙের সামিয়ানা। মুহূর্তের ভেতর সেটি ময়ূরপঙ্খীর রঙ ধারণ করল। আর চারদিক থেকেই বেরোতে থাকল এক আশ্চর্য জ্যোতি। সকলে অবাক। মহিলারা হতবাক। রাজা নবকৃষ্ণ নিজেও কৌতূহলী হলেন। এবং জানলেন যে চূড়ো দত্তের মেয়ের হাতে

CENTRAL LIBRARY

একটি আশ্চর্য অঙ্গুরীয় আছে। তাতে খচিত আছে বহুমূল্য নীলকান্তমণি। সেই মণির প্রভাবেই ঘটেছে এ বর্ণবিপর্যয়।

রাজা নবকৃষ্ণ হাতে তুলে দেখলেন আংটিটি এবং নীলকান্তমণি। তারপর অনেক প্রশংসা করে চূড়ো দত্তের মেয়ের হাতে প্রত্যর্পণ করলেন সেটি।

এদিকে মেয়ে যথাসময়ে বাড়ি ফিরে সব কথা চূড়ো দত্তের কাছে নিবেদন করলেন। চূড়ো দত্ত লুফে নিলেন সুযোগটি। পরদিন আরো পাঁচটা জিনিসের সঙ্গে আংটিটি উপঢৌকন পাঠালেন নবকৃষ্ণের কাছে। অর্থাৎ কানমলে যেন জানিয়ে দিলেন, 'বাছাধন, এ সব জিনিসতো সাতপুরুষে দেখোনি। এখন দেখে চক্ষু সার্থক কর।'

রুচির সূক্ষ্ম লড়াইয়ে বেচারি নবকে হার স্বীকার করতেই হল।

আরেকবার এক ব্রাহ্মণ এসেছিল শোভাবাজারের রাজবাড়িতে। হাতে একটি ছোট পাথর বাটি। রাজবাড়িতে ঢোকার পর তার দেখা হয়ে গেল নবকৃষ্ণের পোষ্যপুত্র গোপীমোহনের সঙ্গে। সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ কাতর হয়ে রাজপুত্রের কাছে নিবেদন করল, 'প্রভু, আমার ছেলের কানে ব্যথা। সম্ভবতঃ কান পেকেছে। যদি এক ফোঁটা পচা আতরও দেন, তবে বড়ো উপকার হয়। বেচারির কানে লাগাতে পারে।'

ব্রাহ্মণের এ প্রার্থনা শুনে হঠাৎ দুষ্টুবুদ্ধি খেলে গেল রাজকুমারের মাথায়। কৌতুক করে বলল, 'ঠাকুর, এখানে এসে তোমার বেশ সুবিধা হবে না। তুমি বরং যাও চূড়ো দত্তের কাছে। বাবুর বাড়িতে অঢেল আতর। তবে তাঁর মেজাজটি বড়োই চড়া। ঐ ছোট পাথরের বাটি নিয়ে গেলে তিনি ভীষণ রেগে যাবেন। তাঁর কাছে যাও, তবে সঙ্গে নিয়ে যাও একটি কলসী।'

ব্রাহ্মণটি ছিল সরল চিত্ত। সে তাই করল। কলসী নিয়ে গুটি গুটি গিয়ে হাজির হল এবং সব কথা নিবেদন করল চূড়ো দত্তের কাছে।

চূড়ো দত্ত সে সময় তেল মাখছিলেন বসে বসে একটু বাদেই হয়ত যাবেন চান করতে। ব্রাহ্মণের কথা শুনে হেসে উঠলেন তিনি হা-হা করে। তারপর আদুরে ছেলে কালীপ্রসাদকে ডাকলেন। বললেন, 'গন্ধী আতরওয়ালাকে এখনই ডেকে পাঠা, কালী। এখনই। এই ব্রাহ্মণকে এক কলসী আতর এনে দে। এ আতর দেওয়ার পর আমি চান করব।'

চূড়ো দত্ত বয়সে কিছু বড়ো ছিলেন নবকৃষ্ণের থেকে। তাই রাজা হলেও শোভাবাজারের মালিককে তিনি নাম ধরে 'নব' বলেই ডাকতেন। এবার ব্রাহ্মণকে সম্বোধন করে তিনি বললেন, 'দেখ ঠাকুর, তোমাকে এখানে পাঠিয়েছে যে, ঐ গোপী ছেলেমানুষ। তুমি বরং এ আতরটা নবকে গিয়ে দেখিয়ে এসো; বোলো যে আমি দিয়েছি।'

যথারীতি ব্রাহ্মণ এ কলসী নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে এলো নবকৃষ্ণকে। তারপর ফিরে এলো চূড়োর কাছে। চূড়ো ব্রাহ্মণকে বললেন, 'ঠাকুর, এত টাকার আতর নিয়ে কি করবে তুমি? এ আতরের দাম আড়াই হাজার টাকা। তুমি বরং আড়াই হাজার টাকা নিয়ে যাও, আর নিয়ে যাও প্রয়োজনমত সামান্য একটু আতর। এতে তোমার উপকার হবে।'

ব্রাহ্মণ তাই করল। বাড়ি গেল সে আশীর্বাদ করতে করতে। আর এদিকে রাজা ধমকাতে আরম্ভ করলেন গোপীমোহনকে ডেকে।

এইভাবে নিত্য লেগে থাকত রেষারেষি। নিত্য। ছেলেদের মধ্যেও ছিল প্রতিযোগিতা এবং তাও রোমাঞ্চকর। সেকালের বাবুরা যে ধরনের বাবুগিরি ও বিলাসিতা পছন্দ করতেন, এঁদের গতি ছিল সেদিকে। নবাবী জাঁকজমক আর আমিরী মেজাজ ভালোবাসতেন এঁরা।

সেকালের কলকাতায় বিবি আনার নামে ছিল এক পরমাসুন্দরী মুসলমান রমণী। সে বিবির রূপের রোশনাইয়ে অনেকেরই চোখ গিয়েছিল ধাঁধিয়ে। অনেক বাবুই চেয়েছিল সেই পদ্মিনী বিবিকে আয়ত্ত করতে, কিন্তু সকলকে হটিয়ে দিয়ে তাকে করায়ত্ত করতে পেরেছিল যে সে আর কেউ নয়, চূড়ো দত্তের ছেলে কালীপ্রসাদ। লক্ষ্ণৌ ফ্যাশানে তার মত রপ্ত ছিল না কেউ সহর কলকাতায়। সে ছিল যেমনি বিলাসী, তেমনি কেতা দুরস্ত। চুড়িদার পায়জামা ও চাপকান পরে, কোমরে দোপাট্টা বেঁধে এবং মাথায় বাঁকাটুপি হেলিয়ে দিয়ে বাবু কালীপ্রসাদ যখন পথে বেরুত তখন পথের লোক 'আহা আহা!' করে উঠত। সাড়া পড়ে যেত খেমটা ও বাইজী মহলে।

বিবি আনারকে নিয়ে বাবু কালীপ্রসাদ রীতিমত সাড়া তুলেছিল সেকালে। তার কাছেই অনেক নিশুতি রাত পর্যন্ত পড়ে থাকত বাবু। কখনো বা রাত কাটাত অকুস্থলেই। যবনীর সঙ্গে উতরোল হয়ে উঠত অনেক মধুর রাত।

ওদিকে নবকৃষ্ণের ঔরসজাত পুত্র রাজকৃষ্ণের যবনীবিলাসও ছিল নামকরা। চূড়োর ছেলে কালীপ্রসাদের সঙ্গে এ খেয়াল যেন চলত পাল্লা দিয়ে। কেবল যবনী সহবাস নয়, মুসলমান বাবুর্চি ছাড়া বাবুর আহার্য ভালো লাগত না। তাঁর সকল সভাসদ ও সহচর ছিল মুসলমান। শুধু কি তাই? গান লিখতেন তিনি মহরমের। এবং মহরমের শোভাযাত্রায় বুক চাপড়াতে চাপড়াতে তিনি চলতেন সকলের আগে। নবকৃষ্ণের মৃত্যুর পর উত্তরোত্তর বেড়েই চলল এ বিলাস।

যাইহোক পাল্লা দিয়ে বংশানুক্রমে এইভাবেই রেষারেষি চলছিল রাজবাড়িতে দত্তবাড়িতে। চলছিল মনকষাকষি। এই 'টাগ অব ওয়ার' যখন চরমে ঠিক সেই সময় শোভাবাজারকে অনাথ করে দিয়ে দুম করে মারা গেলেন নবকৃষ্ণ হঠাৎ। সেবার সতেরোশ সাতানব্বই সাল। শীতকাল। নভেম্বর মাসের বাইশ তারিখ। দুপুরে বেলা খাওয়া দাওয়ার পর একটু বিশ্রাম করছিলেন রাজা মশাই। হঠাৎ এলো ঘুম। কাল ঘুম। বেলা দুটো নাগাদ চাকর ডাকতে এসে দেখে যে রাজামশাই মরে কাঠ। ঠিক কখন যে মারা গেছেন তার ঠিক নেই।

সঙ্গে সঙ্গে খবর ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। রাজার সাতরাণী কেঁদে আকুল। কিন্তু ওদিকে। ওদিকে হাসতে থাকল দত্ত। কেননা, এ মৃত্যু সেকালে ছিল খুবই নিন্দনীয়। এ আবার মৃত্যু নাকি? অর্ধেক দেহ শোয়ান থাকল না গঙ্গাজলে, কানের কাছে নাম করল না কেউ ঠাকুর দেবতার,—অঙ্গে রইল না হরিনামামৃত, সুতরাং এ আবার মৃত্যু নাকি। —তাই রাজার এ মৃত্যুতে রাজবাড়িতে যতই শোকের ছায়া পড়ুক না কেন, বাইরেতে ছড়িয়ে পড়ল চাপা কেচ্ছা! এবং সে খবর যথাসময়ে পৌঁছল গিয়ে রাজবাড়িতে।

এদিকে চূড়ো দত্ত দীর্ঘদিন ছিলেন অসুস্থ। তিনি নবকৃষ্ণের এ মৃত্যুকে গ্রহণ করলেন চ্যালেঞ্জ হিসাবে। সার্থক মৃত্যু কাকে বলে তা দেখাবার জন্য তিনি প্রস্তুত হলেন মনে মনে।

কিছুদিন পরে যখন তিনি খুবই দুর্বল বোধ করলেন, তখন ডেকে পাঠালেন পুত্র কালীপ্রসাদকে। বললেন, 'বাবা, আমার কাল আরো ঘনিয়ে এসেছে। এখন আমার শেষ ইচ্ছা পূর্ণ কর।'

কালী কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল, 'কি ইচ্ছে, বাবা?'

চূড়া দত্ত বললেন, আমার অন্তর্জলী যাত্রার ব্যবস্থা কর। আমি একটি গান লিখেছি, এ গানটি গাইতে গাইতে নিয়ে চল আমাকে শোভাবাজারের রাজবাড়ির সামনে দিয়ে।'

ব্যস, যে কথা সেই কাজ। ব্যবস্থা হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। চূড়ো দত্ত চললেন গঙ্গায়। বসানো হল তাঁকে কিংখাপের গদিতে, রূপোর চতুর্দোলায়। আগে পিছে চলল ঢাক-ঢোল আর খোল-কত্তাল। দলে দলে লোক চলল লাল পতাকা নিয়ে। চতুর্দোলার মাথায় রইল নামাবলীর চন্দ্রাতপ। তুলসীমালার ঝালর। আর চারদিকে তুলসী গাছ। চূড়ো দত্ত রক্ত রংয়ের চেলী পরে, নামাবলী গায়ে জড়িয়ে এবং তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসলেন জপের মালা নিয়ে। ওদিকে কীর্তনের সুরে গায়করা গান ধরল:

জগৎ জিনিয়া চূড়া—যম জিনিতে যায়।
ও নবা, তুই দেখবি যদি আয়।
আয়রে আয়—নগরবাসী! দেখবি যদি আয়।
যম জিনিতে যায়রে চূড়ো, যম জিনিতে যায়।
জপ-তপ কর কি, মরতে জানলে হয়।
ও নবা, তুই দেখবি যদি আয়!

রাজবাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নানারকম অঙ্গভঙ্গী করে দত্তমশায়ের লোকেরা এ গান গাইল। নবকৃষ্ণের মৃত

আত্মার প্রতি এ অবজ্ঞা এবং মৃত্যুর প্রতি কটাক্ষ অনেকের কাছেই হয়ে উঠল অসহ্য। তবু সেদিনের এ অপমান নীরবে সহ্য করল রাজবাড়ি। এবং প্রতিশোধের জন্য রইল অধীর প্রতীক্ষায়। উপযুক্ত মুহূর্তের সন্ধানে।

এদিকে বুড়ো চুড়ো দত্ত মারা গেলেন যথাসময়ে। আর তারপর সাজো সাজো পড়ে গেল শ্রাদ্ধের জন্য। বিবি আনারের কাছ থেকে ছুটি নিয়ে কয়েক দিনের জন্য কঠোর কৃচ্ছসাধনে ব্রতী হন কালীপ্রসাদ।

•

সেকালের বাবুদের যা কিছু গৌরব তা সাধারণতঃ প্রকাশ পেত শ্রাদ্ধের আড়ম্বরে। লাখ লাখ টাকা ব্যয়িত হত এ অনুষ্ঠানে। অজস্র লোককে নিমন্ত্রণ করে আপ্যায়িত করা হত। বিদায় দেওয়া হত দেশ-দেশান্তরের ব্রাহ্মণদের। মোট কথা, সে এক এলাহি ব্যাপার ঘটে যেত।

আর এ অনুষ্ঠানকে যদি কোন রকমে পণ্ড করে দেওয়া যেত, তবে তার থেকে শত্রুপক্ষের পক্ষে সুখের ব্যাপার আর কিছুই ছিল না। শোভাবাজার অন্য কোনো পথ না পেয়ে, বেছে নিল এই নিকৃষ্ট রাস্তা। বিবি আনারের সঙ্গে কালীপ্রসাদের সম্পর্ক তুলে তাঁরা এ শ্রাদ্ধ বয়কট করতে উদ্যত হলেন। সহরের ঘরে ঘরে আড্ডায় এবং বাবুদের আসরে আসরে উচ্চরোল হয়ে উঠল কালীপ্রসাদের কুৎসা! এমন কি তৈরী হল নতুন নতুন গান। পাড়ায় পাড়ায় শোনা গেল, 'গেল গেল হিন্দুয়ানী!'

সহরের কাণ্ডকুল বেঁকে বসল। কালীপ্রসাদ নিরুপায় হয়ে বসে পড়লেন মাথায় হাত দিয়ে। উপায়? —কি উপায় হবে? সবই কি তা' হলে পণ্ড হয়ে যাবে?

ঠিক এমনি যখন অবস্থা, তখন ডাক পড়ল দত্তবাড়ির সেই হিতৈষী মানুষটির। অর্থাৎ রামদুলাল সরকারের। রামদুলাল সে-দিন সমাজের মাথা। বিত্তেও তিনি অনেকের ওপরে। সব কথা শুনে তিনি বলে-ছিলেন, বটে! এই ব্যাপার। কালীপ্রসাদকে নিয়ে ওরা চায় হাঙ্গামা বাধাতে? বেশ ঠিক আছে। দেখা যাবে।' তারপর কিছুক্ষণ নীরব থেকে পাড়ার মাতব্বরদের ডেকে বলেছিলেন হেসে, 'জাত হে, জাত আমাদের বাক্সের ভেতর। বাক্স থেকে টাকা বের করে ছড়িয়ে দিতে পারলেই সব ব্যাটা চুপ!'

রামদুলাল কেবল কথা বলেই নিরস্ত থাকেননি, লেগে গেলেন কাজে। পরের দিন অতি প্রত্যুষে নৌকো করে পাড়ি দিলেন দক্ষিণের দিকে। প্রথমে গিয়ে পৌঁছুলেন কালীঘাট। সেখানে মায়ের পুজো দিলেন। তারপর সেখান থেকে সোজা গিয়ে উঠলেন কালীর সেবাইত ও পরমভক্ত সন্তোষ রায়ের কাছে। সেই সন্তোষ রায়, যিনি গোটা পাঁঠা খেয়ে চমকে দিয়েছিলেন আলীবর্দীকে। আর পেয়েছিলেন খোরাকী মহল।

সন্তোষ রায় তখন বৃদ্ধ। শালপ্রাংশু মহাভুজ সেদিন লোলচর্মধারী। তবু সন্তোষ রায় মানেই সন্তোষ রায়। মরা হাতী লাখ টাকা। তখনো তাঁর ডাকে হাজারে হাজার লোক এসে একত্র হয়। ওঠে বসে তারা সন্তোষ রায়ের কথায়।

গড়গড়ায় তামাক খেতে খেতে তিনি শুনলেন সব কথা। রামদুলাল নরমে-গরমে পরিবেশন করলেন রাজবাড়ির শত্রুতার বিবরণী। কায়স্থ সমাজের বিরূপতার কথা। এবং সব তথ্য নিবেদন করে প্রার্থনা করলেন আশ্রয়।

আশ্রয় দিলেন সন্তোষ রায়। বললেন, 'চিন্তা নেই। আমার ব্রহ্মোত্তর ভোগী ব্রাহ্মণ আছে হাজার হাজার। তারা যাবে শ্রাদ্ধে।'

সাঁত্য সত্যিই হাজারে হাজারে ব্রাহ্মণ এলো শ্রাদ্ধের দিন। এলো অনেক কায়স্থ সন্তানও। রামদুলাল সরকার রসিয়ে রসিয়ে বললেন বড়ো বড়ো মাতব্বরদের : 'জাত হে, জাত আমাদের বাকসের ভেতর, কি বল? টাকা গললেই সব মিটে যায়!'

স্বয়ং সন্তোষ রায়ও এলেন বড়িশা থেকে। কালীপ্রসাদ শ্রাদ্ধ শেষে সন্তোষ রায়কে প্রণাম করে পঁচিশ হাজার টাকা তুলে দিলেন ব্রাহ্মণ বিদায়ের জন্য।

সন্তোষ রায় হাহা করে হেসে উঠলেন। ব্রাহ্মণদের ডেকে বললেন, কালীপ্রসাদ আপনাদের বিদায়ের জন্য অনেক টাকা দিয়েছে। অনেক টাকা। এ টাকা কি আপনারা নেবেন? যদি নেন, লোকে বলবে টাকার লোভে পড়ে এই বামুনঠাকুররা এক পতিত-বাড়ির পণ্ড পিতৃশ্রাদ্ধ উদ্ধার করেছে। এই অপবাদ কি ভালো হবে? তার চেয়ে বরং একটি ভালো কাজে লাগানো যাক টাকাটা। —কি বলেন?'

কি ভালো কাজ? সকলের মনেই উদ্যত হয়ে উঠল এ প্রশ্ন।

সন্তোষ রায় বললেন, 'আসুন, এ টাকা দিয়ে আমরা কালীঘাটে মায়ের একটা ভালো মন্দির বানিয়ে দিই, কি বলেন?'

সন্তোষ রায়ের কথায় সকলে সাধু-সাধু বলে উঠল। রামদুলাল বললেন, 'এই না হলে সন্তোষ রায়!' সন্তোষ রায় বললেন, 'বাবার হে, এই হল আমার আসার খোরাকি।'

•

এরপরের ইতিহাস খুবই সংক্ষিপ্ত। রাজায় রাজায় রেষারেষি এবং কালীপ্রসাদী হাঙ্গামা এসে শেষ হল কালীঘাটের মন্দিরে। শ্রাদ্ধ যে মন্দির পর্যন্ত গড়াবে তা কে জানত? চুড়ো দত্ত বা নবকৃষ্ণ কেউই জানতেন না যে তাঁরা দলাদলি করে পরোক্ষ-ভাবে কাজ করে চলেছেন মায়ের। আর কালীপ্রসাদের নাম সার্থক হল মায়ের কৃপা থেকে বঞ্চিত না হয়ে। এবং মায়ের সেবায় লেগে। প্রসাদ পেয়ে।

সেকালের মন্দিরের চারদিকে পাঁচশ পঁচানব্বই বিঘে জমি দেবোত্তর হিসাবে দান করেছিলেন সন্তোষ রায়। এখন সে মন্দিরের মাঝখানে আট কাঠা জায়গার ওপর তৈরী হল নতুন মন্দির। মন্দিরটি তৈরী হতে সময় লাগল আট বছর। এবং অর্থ লাগল তিরিশ হাজার টাকারও বেশি। ষাট হাত পরিমাণ করা হল মন্দিরের উচ্চতা। আর ভেতরে পরিসর রাখা হল পঞ্চাশ হাতের মতন।

এ মন্দির তৈরী করতে করতেই একদিন দেহ রাখলেন সন্তোষ রায়।

সন্তোষ রায়ের অসমাপ্ত কাজ সমাধা করলেন তাঁর পুত্র রামলাল রায়। এবং ভ্রাতুষ্পুত্র রাজীবলোচন। এঁদের তত্ত্বাবধানে নির্মাণের কাজ শেষ হল। —সেদিনের তারিখ? —তখন উনিশ শতক এসে গেছে। সেদিনের তারিখ আঠারোশ ন সাল।

মায়ের নতুন ভক্তরা নতুন মন্দিরে চলল পুজো দিতে। এ পুজোর সময় সশরীরে চুড়ো দত্ত বা নবকৃষ্ণ কেউই উপস্থিত ছিলেন না বটে, ছিলেন না সন্তোষ রায়ও, কিন্তু তাঁদের বিদেহী আত্মা যে এই পুজো দেখে তৃপ্ত হয়েছিল, তাতে আর সন্দেহ কি?

মনের কথা

ভ্রান্তির শারীরবৃত্ত
সমরবাবুর পরিণতি

ভুল বিশ্বাস, ভ্রান্তি, মোহ (ডিলিউশন) আত্মপ্রসঙ্গ থেকে ক্রমশ নির্যাতনের প্রসঙ্গে চলে যেতে পারে। কোনো সময় রোগী বলে যে বিশেষ কতকগুলি চেনা লোক তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে, তার ক্ষতি করতে চেষ্টা করছে, তার খাবারে বিষ মেশাচ্ছে; ইত্যাদি। কোনো কোনো রোগীর নির্যাতনের ভ্রান্তি আবার অতটা স্পষ্ট নয়। তার ক্ষতি করবে, তাকে জব্দ করবে, তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হচ্ছে সবই বলবে, কিন্তু নির্যাতনকারী বা ষড়যন্ত্রকারীদের সনাক্ত করবে না।

আরো নানা ধরনের ভ্রান্তির উল্লেখ করা যেতে পারে। হীনমন্যতার ভ্রান্তি, অপরাধবোধের ভ্রান্তি, প্রবঞ্চিত হবার ভ্রান্তি, রোগাতংকের ভ্রান্তি, বিশালতা বা চমৎকারিত্বের ভ্রান্তি, ইত্যাদি নানা ধরনের ভ্রান্তির রোগীর সংগে চিকিৎসকেরা পরিচিত। বিশেষ বিশেষ রোগীদের কাহিনী প্রসঙ্গে এই সব বিচিত্র ভ্রান্তির বিশদ বিবরণ নিয়ে আলোচনা করব। বর্তমানে শুধু এইটুকু জানানো দরকার যে আপাতদৃষ্টিতে ভ্রান্তিরোগ (ডিলিউশন) ও আবেশ (অবসেশন) অনেকটা এক রকমের মনে হলেও, এদের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য আছে এবং সে পার্থক্য খুব সহজেই নজরে পড়ে। 'অবসেশনের' রোগী স্বীকার করবে যে ধারণাটা ভুল কিন্তু সে তবু ধারণাটা ছাড়তে পারছে না। অন্যলোক তার রোগবৃত্তান্ত নিয়ে আলোচনা করতে যাবে কেন? বুদ্ধি দিয়ে যুক্তি দিয়ে ব্যাপারটা অসম্ভব মনে হয়; কিন্তু তবু বিশ্বাসটা বা অভ্যাসটা পালটাতে পারছি না। কিন্তু 'ডিলুইশনের' রোগী এ ধরনের কথা কখনও বলবে না। তার ভ্রান্তির মধ্যে সন্দেহের কোনো অবকাশ থাকে না। 'অবসেশনের' রোগীর মত সে আত্মসমালোচনা করে না অথবা ভ্রান্ত ধারণা থেকে মুক্ত হবার জন্য কোনোদিন চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয় না। যুক্তিতর্ক দিয়ে সাময়িকভাবেও তার ভ্রান্তি সম্পর্কে তাকে সজাগ করা যায় না।

সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ ও মাঝে মাঝে ভ্রান্তির বশবর্তী হয়ে অদ্ভুত আচরণ করে থাকে। মন প্রক্ষোভ-পীড়িত থাকলে তুচ্ছ ঘটনাকে আমরা অতি গুরুত্ব দিয়ে থাকি। 'ডিলিউশনের' ভয়, রাগ, দ্বেষ অনেক সময়েই অবাস্তব বা কাল্পনিক ঘটনাশ্রয়ী; কিন্তু এই তথাকথিত স্বাভাবিক মানুষের ভ্রান্তির মূলে সামান্য কোনো কিছু থাকে যেটা সে অনেক বাড়িয়ে দেখে। বন্ধু বা বান্ধবীর কাছে অবহেলিত হলে, কোনো দলের কাছে মতামতের জন্য সমালোচিত হলে, বা অন্য কারণে অন্তরে আঘাত পেলে, আমরা অনেক সময় সেই ঘটনাটিকে বড় ফলাও করে দেখি এবং নিজের মনে অযথা কষ্ট পাই। এই সময় অন্য কোনো চিন্তা মনে আসে না। ঐ বন্ধু বা ঐ দল আমার প্রতি অন্য সময় যে ভাল ব্যবহার করেছে, ভালবাসা দেখিয়েছে, আমাকে নানা বিপদে সাহায্য করেছে, সে সব ভুলে গিয়ে আমরা আক্রোশের বশবর্তী হয়ে বন্ধুদের সম্বন্ধে অনেক অযৌক্তিক ধারণা পোষণ করি, অন্যের কাছে মিথ্যা কাহিনী প্রচার করি ওদের বিরুদ্ধাচরণ করার চেষ্টা করি। তাদের প্রত্যেকটি হাবভাব, কথাবার্তা অভিসন্ধিপূর্ণ ও আমাকে অবহেলা করার উদ্দেশ্যে প্রণোদিত; এই রকম মনে করি। 'অবসেশন'এর রোগী তার আবেশিত চিন্তা থেকে মুক্তি চায়, কিন্তু এই ধরনের ব্যক্তি তার সন্দেহ অবিশ্বাস আক্রোশকে জীইয়ে রাখতে চায়। যখন যেখানেই থাকুক, যে কাজই করুক, এরা ঐ একই চিন্তাপ্রবাহে তাড়িত হতে থাকে। 'ওরা আমাকে অপমান করেছে।' 'ওরা আমাকে দল থেকে তাড়াতে চায়।' 'ভদ্রলোকটিকে তেমন ভালমানুষটি মনে কর, উনি আসলে সে রকম নন। মতলববাজ ও স্বার্থপর।' ভদ্রলোকটি সম্বন্ধে কয়েক মাস আগেও হয়ত সে বিপরীত মত পোষণ করেছে। এরা সুস্থ মানুষ হিসেবে সমাজে চালু; কিন্তু আমার মনে হয় এদের ঠিক স্বাভাবিক মানুষ বলা চলে না। এরা সব বিষয়েই, বিশেষ করে নিজের প্রসঙ্গে, অতিরঞ্জিত ধারণা পোষণ করে।

ভ্রান্তি নানা ধরনের মানসিক রোগেই দেখা দিতে পারে। তবে ভ্রান্তির সংগে প্যারানইয়া রোগের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। 'প্যারানইয়া' শব্দটি গ্রীক থেকে এসেছে। গোড়াতে সব প্রলাপের রোগী 'প্যারানইয়া' রোগে ভুগছে, এই রকম বলা হত। পরবর্তীকালে শৃংখলাবদ্ধ একমুখী ভ্রান্ত ধারণা বা চিন্তাকে 'প্যারানইক সিনড্রোম' বলে অভিহিত করা হয়। প্রথমে এই শৃংখলাবদ্ধ একমুখী চিন্তার মধ্যে রোগীর চেনা-অচেনা নানা লোকের উপস্থিতি থাকে; রোগীকে এই চিন্তার নাটকে কোনো ভূমিকা গ্রহণ করতে দেখা যায় না। পারানইয়াক রুগ্ন রোগী নিজেও জড়িয়ে পড়ে, নাটকে বিশেষ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। বিশুদ্ধ প্যারানইয়া রোগীর মায়া (হ্যালুসিনেশন) থাকে না। তাদের ধারণার মধ্যে লজিকের অভাব দেখা যায় না। অবশ্য ধারণার মূলেই থাকে কোনো এক অবাস্তব কল্পনা; যেটাকে বাদ দিলে এদের বক্তব্য বা যুক্তিতর্কের মধ্যে কোনো অস্বাভাবিকতা আছে বলে মনে নাও হতে পারে। 'জানালাটা খোলা চলবে না। কেননা সামনের পার্কে সাদা পোশাকে পুলিশ ঘোরা-ফেরা করছে।' 'আমার পাশের বাড়ীর ভদ্রলোক এক গোপন যন্ত্র বসিয়ে আমাদের পার্টির সকলের চিন্তাভাবনাকে প্রভাবিত করে চলেছে।' 'আমি 'ক্যানসার'এর প্রতিষেধক যথার্থ এক ওষুধ আবিষ্কার করেছি, কিন্তু প্রয়োগ করার সুযোগ পাচ্ছি না।' এই রকম ধরনের অবাস্তব চিন্তা বা ধারণা দিয়ে শুরু হয়, তারপর কিন্তু রোগীর চিন্তাধারা ও বক্তব্য পুরোপুরি লজিক মেনে চলে। আবার এমন কতকগুলো ধারণা বা বিশ্বাসের কথা রোগী বলতে পারে, যা ডাক্তারের পক্ষে ভ্রান্ত কি সঠিক নির্ণয় করা দুরূহ। অমলবাবু একজন পুলিশের গুপ্তচর বা সি আই এর এজেন্ট—অমলবাবুর একথা 'ডিলিউশন' না সঠিক;—এ বিচার করা চিকিৎসকের পক্ষে সত্যিই কঠিন হয়ে পড়ে। কয়েকদিন কথা বলার পর, এবং আত্মীয়-স্বজনের কাছে আরো বিশদ খবরা-খবর জানবার পর বোঝা যায় একথাগুলো 'প্যারানয়েডের' ডিলিউশন না সন্দেহবাতিকের সন্দেহের অভিব্যক্তি। 'স্ত্রী ব্যভিচারে লিপ্ত আছে'—স্বামীর এই অভিযোগ সত্য না মিথ্যা ডাক্তারের পক্ষে নির্ণয় করা সম্ভব নয়। অন্য আচরণের বা কথাবার্তার অসংগতি না থাকলে এই সব রোগীর রোগ নির্ণয় রীতিমত কঠিন হয়ে পড়ে। 'ডিলিউশন' সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ পরবর্তী সংখ্যায় লেখবার চেষ্টা করব। বর্তমানে এর উদ্ভবের কারণ নিয়ে আলোচনায় অবতীর্ণ হওয়া যাক।

'হ্যালুসিনেশন' 'ডিলিউশন' ইত্যাদির উদ্ভব সম্পর্কে এখনও বিজ্ঞানীরা সুস্পষ্ট কোনো ধারণায় আসতে পেরেছেন, বলে মনে হয় না। তবে বিজ্ঞানভিত্তিক ধারণায় পৌঁছুবার পথ খুঁজে পাওয়া গেছে বলে অনেকে মনে করছেন। 'হ্যালুসিনেশন' সম্পর্কে গতকাল গত সংখ্যায় কিছু বলা হয়েছে, [illegible] ও চিন্তাবাজের বিশৃংখলা সম্পর্কে কিছু বলছি। তা না হলে, সমরের

রোগউপসর্গ আমাদের কাছে রহস্যাবৃত থেকে যাবে।

চিন্তার বিশৃংখলা, অদ্ভুতত্ব, ভ্রান্তি সম্পর্কে পুরনো মনোবিজ্ঞানীরা নানাধরনের মতবাদ পোষণ করেন। উন্মাদের প্রলাপ আদিম মানুষের চিন্তার সংগে তুলনীয়,—এই তত্ত্ব একসময় খুবই প্রচলিত ছিল। পূর্ব-পুরুষের স্বভাবপ্রাপ্তি ঘটে উন্মত্ততায়, অর্থাৎ ক্রমবিকাশের ঘটে বিপরীতমুখী প্রত্যাবর্তন। খুবই রোমান্টিক এই তত্ত্ব। এই ভাববাদী তত্ত্বের পাশাপাশি চালু ছিল চৈতন্যের সংকোচন' তত্ত্ব। সাইকিক টোন' বা নার্ভের গ্রাহীক্ষমতার হ্রাস ঘটে তাই চিন্তার ধারণা ও চিন্তার বিশৃংখলা দেখা দিয়ে থাকে। আর একদল মনে করেন মস্তিষ্কের 'ফ্রন্টাল লোবে' (সামনের দিকে) অসুস্থ পরিবর্তন ঘটার ফলে চিন্তার বিশৃংখলা সৃষ্টি হয় আর 'টেমপোরাল লোবে' পরিবর্তন ঘটার দরুণ ভ্রান্তি বা 'ডিলিউশন' উদ্ভূত হয়।

এই সব ধারণা পরীক্ষা-নিরীক্ষাভিত্তিক নয়। মানসিকতার শারীরবৃত্তিক কারণ সম্বন্ধে এ'রা উদাসীন। বাস্তব পরিবেশকে এ'রা আমল দেন না। মস্তিষ্কের উপর বহির্বাস্তবের প্রতিফলন থেকে যে সর্বপ্রকার মানসিক ক্রিয়ার উদ্ভব; দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের এই মতবাদকে অগ্রাহ্য করার ফলে এ'রা বিজ্ঞানভিত্তিক কোনো তত্ত্বের কাছাকাছি যেতে পারছেন না।

চিন্তার বিশৃংখলা, বিশেষ করে 'অব-সেশন' সম্পর্কিত পাভলভীয় ধারণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা নিয়ে আগেই আলোচনা করা হয়েছে। ল্যাবরেটরীতে কুকুরের উঁচু জায়গার আতংক (অ্যাক্রোফোবিয়া) সৃষ্টি করার বিবরণ আমাদের জানা আছে। অনড় উত্তেজিত কোষগুলোর পাশের কোষগুলি নিস্তেজিত হয়, এও আমরা জানি। এই নিস্তেজনা যদি মস্তিষ্কের অনেকটা জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে, তবে মূল ধারণা সম্বন্ধে আর সংশয়ের কোনো অবকাশ থাকে না। অর্থাৎ রোগীর 'ক্রিটিক্যাল অ্যাটিচিউড' নষ্ট হয়; আত্মসমালোচনা করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। 'অবসেশানের' রোগী নিজের ভ্রান্ত ধারণা সম্পর্কে অবহিত; কিন্তু 'ডিলিউশনের' রোগী নিজের ধারণা সম্পর্কে একেবারে স্থির নিশ্চয়। মস্তিষ্কের অন্য অংশের ক্রিয়া-প্রক্রিয়া, অর্থাৎ যুক্তিতর্ক ইত্যাদি নিস্তেজনা তরংগের ব্যাপ্তি ও গভীরতার জন্য অনড় অংশকে কোনো মতেই প্রভাবিত করতে পারে না।

মস্তিষ্কের অন্য একটি 'অবস্থা' যাকে বলা হয় অতিস্মর্যবিরোধী বা আলট্রাপ্যারা-ডক্সিক্যাল ফেজ' ভ্রান্তির পোষক ও ধারক। এই অবস্থায়, আমরা জানি, সদর্থক উদ্দীপনা নঞর্থক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। যারা ভাল-বাসে তাদের শত্রু মনে হয়, যারা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী তাদের উপর অবিশ্বাস সন্দেহের উদ্রেক হয়। বেনারস থেকে কোল-কাতাগামী ট্রেনে চড়ে রোগী মনে করে সে উল্টোদিকে লক্ষ্যে অভিমুখে যাচ্ছে।

পাভলভের মতে ভ্রান্তি দুটি শারীর-বৃত্তিক ব্যাপারের উপর নির্ভরশীল, অর্থাৎ ভ্রান্তি বা 'ডিলিউশনের উদ্ভবের মূলে আছে প্রথমত কোষের বিকারগত অনড়ত্ব, আর দ্বিতীয়ত অতিস্মর্যবিরোধী অবস্থা। এই দুটি ব্যাপার একসংগে বা পর পর ঘটতে পারে। সেই অনুযায়ী উপসর্গের হেরফের ঘটে থাকে।

পাভলভ তত্ত্ব 'হ্যালুসিনেশন' 'ডিলি-উশন'এর সব কিছুর ব্যাখ্যা দিতে না পারলেও, প্রকৃত বিজ্ঞান অনুমোদিত পথে উন্মাদ রোগের দুই গুরুত্বপূর্ণ উপসর্গ বোঝবার প্রথম পদক্ষেপ।

এইবার সমরবাবুর উপসর্গগুলোর তাৎপর্য বুঝতে চেষ্টা করা যেতে পারে। সমরবাবুর ভ্রান্তিভ্রমের প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়েছে। প্রথমদিকে তিনি গো-ডাউনের চুরির আসামীদের নাম শুনেছেন। আসামীদের মধ্যে তাঁর নামও ছিল। তাই তিনি উত্তেজিত হয়ে পড়তেন। একবার পাশের বাড়ীর লোককে অপমান পর্যন্ত করেছিলেন। তাঁর মনে হয়ে-ছিল আশেপাশের সকলেই তাঁকে চোর মনে

'aqua sheeba'

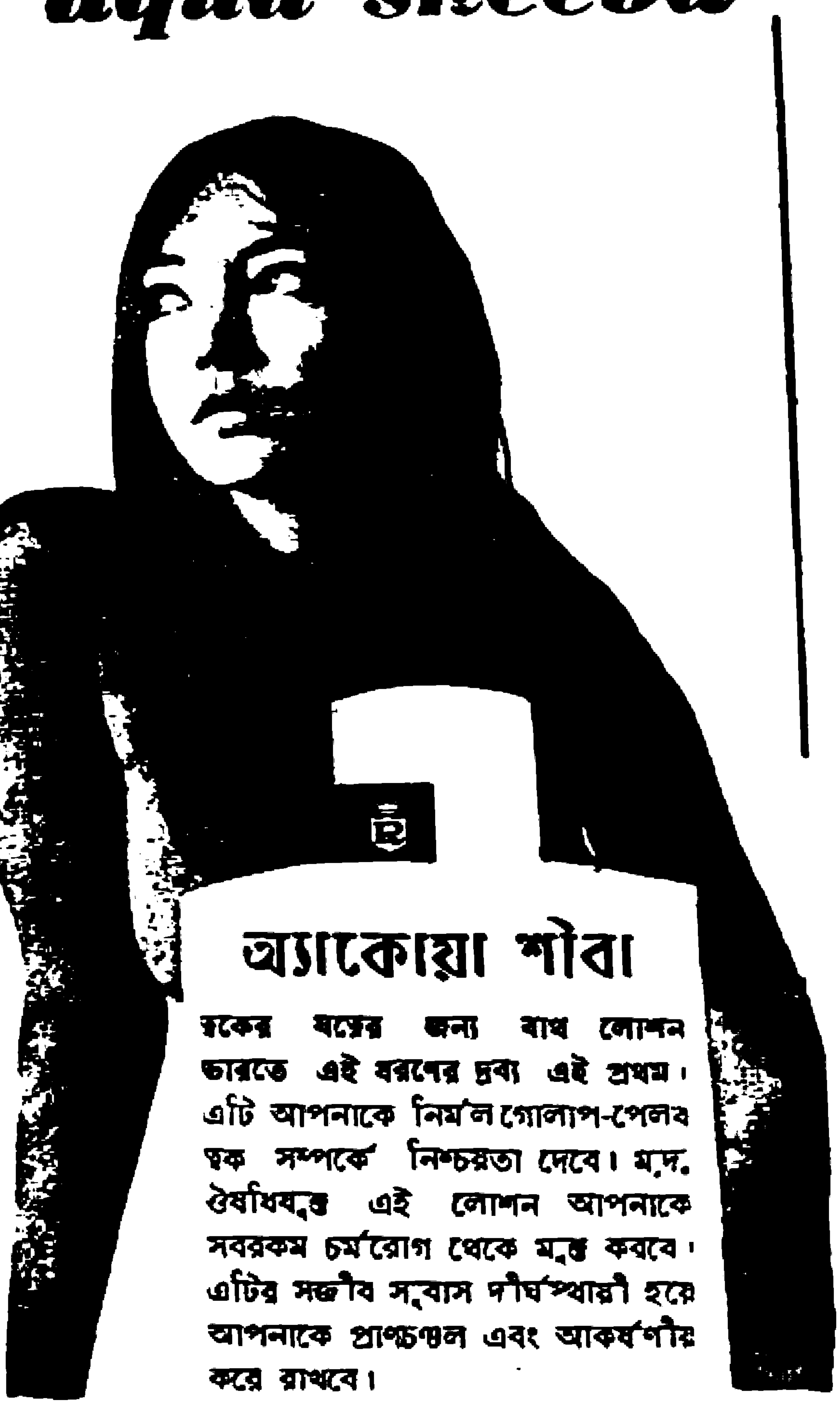

কলিকাতায় সোল ডিস্ট্রিবিউটর্স : লক্ষ্মী এণ্টারপ্রাইজেস্
৪২/সি, হরিশ মুখার্জি রোড, কলিকাতা—২৫ ফোন—৪৭৬৭১৬

করছে। প্রতিভ্রমের সংগে ভ্রান্তি, মায়ার সংগে মোহ যুক্ত হয়ে তাঁকে অস্থির ও অসুস্থ করে তুলেছে। 'হ্যালুসিনেশন' ও 'ডিলিউশন' একই সংগে তাঁকে পীড়িত ও প্রভাবিত করছে। প্রথম দিকে 'হ্যালুসিনেশন'-এর প্রভাব 'ডিলিউশনের' থেকে বেশি ছিল; অবশ্য এটা আমার অনুমান। কেননা সেই সময়কার কোনো বিস্তারিত বিবরণ আমি পাইনি। বর্তমানেও হ্যালুসিনেশন শুনছেন; কিন্তু অস্পষ্টভাবে কথাগুলো কানে আসছে। ফাদার ড্যানিয়েল নির্দেশ দিচ্ছেন;—হল্ট! সাইলেন্স! লাস্ট গাই লেফট! থাম! চুপ কর! প্রতিবেশীকে ভালবাস। প্রতিটেমে বা অডিটারী হ্যালুসিনেশনের উৎসটি তাঁর নিজস্ব কল্পনা, ভ্রান্ত বা ডিলিউশন।' এখন ফাদার ড্যানিয়েল সম্বন্ধে এবং স্ত্রী সম্বন্ধে তিনি কতকগুলো ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করছেন, যেগুলো তাঁর মানসিকতাকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করছে। ফাদার ড্যানিয়েল সম্বন্ধে তাঁর স্ত্রী কোনো আলোকপাত করতে পারলেন না। মধ্যভারতের সেই ছোট্ট শহরের ড্যানিয়েলের কোনো সমাধি আছে কিনা; এ সম্পর্কেও কোনো সঠিক তথ্য মিলল না। ড্যানিয়েলের নির্দেশ স্ত্রীকে শোনানো চলে না, কেননা সে অনুতাপ করে শুদ্ধ হয়নি।

আমার মনে হল ভদ্রলোকের রোগ এক পর্যায় থেকে অন্য পর্যায়ে এসেছে। গো-ডাউনের চুরির ব্যাপার মিটে যাওয়ার পর দ্বিতীয় পর্যায় সুরু হয়েছে। প্রথমদিকের নির্যাতনভিত্তিক 'ডিলিউশন' এখন স্ত্রীর সতীত্বের প্রতি সন্দেহভিত্তিক 'ডিলিউশনে' রূপান্তরিত হয়েছে। স্ত্রীকে সরাসরি সন্দেহের কথা তিনি বলেননি। কেননা, স্ত্রীকে সন্দেহ করছেন আবার স্ত্রীর উপর একান্তভাবে নির্ভর করছেন। স্ত্রীর উপর সন্দেহের কারণ; মস্তিষ্কের অন্তর্বিরোধী অবস্থা। যখন পাড়া-প্রতিবেশী অফিসের সকলে তাঁকে গো-ডাউনের চুরির ব্যাপারে সন্দেহ করেছে, (তাঁর মতে) তখন স্ত্রী তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে তাঁকে আশ্বাস দিয়েছেন, সর্ব-প্রকারে সাহায্য করেছেন। স্ত্রীর ভালবাসা ও বিশ্বাস এখন তাঁর মস্তিষ্কে বিপরীত ধারণার সৃষ্টি করেছে। স্ত্রীকে পরিত্যাগ করার চিন্তা মনে আসবার আগেই ফাদার ড্যানিয়েলের সতর্কবাণী কানে ভেসে আসছে। হল্ট! থাম! স্ত্রীকে সন্দেহ সংক্রান্ত কোনো কিছু বলবার চিন্তা মনে আসতেই শুনতে পাচ্ছেন ড্যানি-য়েলের নির্দেশ, সাইলেন্স! চুপ! কোনো কথা নয়। প্রতিবেশী পুরুষদের সংগেই স্ত্রী ভ্রষ্টা, প্রতিবেশীরাই তাঁকে চুরির ব্যাপারে সন্দেহ করেছে; কাজেই প্রতিবেশীদের ঘৃণা করার বা অন্যায়ের প্রতিশোধ নেবার চিন্তা মনে আসার সংগে সংগেই কানে বেজে উঠছে ড্যানিয়েলের উপদেশ—প্রতিবেশীকে ভাল-বাস। সন্তান না হবার কারণ হিসেবে সমর-বাবু আমাকে প্রথমে স্ত্রীর জরায়ু সংক্রান্ত রোগের কথা বলেছিলেন। পরে স্ত্রী স্বামীর সামনেই আমাকে জানালেন যে তিনি স্বামীর সংগে বহুদিন সহবাস করেননি। স্ত্রীর সান্নিধ্য সমরবাবুকে আর উত্তেজিত করছে না, তাঁর দেহ-মনের উত্তাপ অন্তর্হিত।

স্বামী-স্ত্রী দুজনেই শৈশব থেকে মাতৃ-স্নেহে বঞ্চিত। সমরবাবুর চরিত্রে দুর্বল নিস্তেজনাপ্রবণ। প্রথম বা দ্বিতীয় সাংকোচক স্তরের কোনোটিতেই বিশেষ প্রাধান্য নেই। নীরস কর্তব্য পালন ও কঠোর নিয়মশৃংখলার মধ্যে মানুষ হওয়ার ফলে অনেকখানি শান্তিপ্রিয় ভাবাপন্ন। সব কিছুর প্রতি আকর্ষণ বা আগ্রহ কম। ন্যায়-অন্যায় নীতি-দুর্নীতি সম্পর্কে মনের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট ছক কাটা ছিল। চুরির ব্যাপারে বিভাগীয় তদন্তের সময় তাঁকে নানাপ্রকারভাবে জেরা করা হয়। কোনো কোনো অফিসার স্পষ্টভাবে না হলেও পরোক্ষে তাঁর সততার সম্বন্ধে কিছু কিছু বিদ্রূপ মন্তব্য করেন। সমরবাবুর দুর্বল অথচ নীতিবাগিশ মনের উপর এই সব মন্তব্য অশেষ প্রভাব বিস্তার করে এবং এর প্রতিক্রিয়াতেই তিনি বোধহয় অসুস্থ হয়ে পড়েন ও যন্ত্রণাদায়ক 'হ্যালুসিনেশন' শুনতে থাকেন।

চুরির অভিযোগ থেকে অব্যাহতি পাবার পর রোগের গতি পরিবর্তিত হল কিন্তু রোগ সারল না। 'গো-ডাউন'-রক্ষকের পদ থেকে অপসারিত হয়ে অন্যত্র বদলি হওয়ায় অবমাননার জ্বালার উপশম ঘটল না। 'হীনমন্যতার ডিলিউশন' ভদ্রলোককে পীড়িত করতে লাগল। তারই অভিব্যক্তি স্বরূপ স্ত্রীর প্রেমে সন্দেহ ও অবিশ্বাস।

'আমি অপদার্থ, আমার এমন কোনো গুণ নেই যার জন্যে স্ত্রী আমাকে ভাল-বাসতে পারে বা শ্রদ্ধা করতে পারে।'—এই কথা স্পষ্টভাবে একদিন সমরবাবু আমাকে জানালেন। তাছাড়া আমি শক্তিহীন, আমি বীর্যহীন। আমার উপর এতবড় একটা অবিচার করা হল, অথচ আমি প্রতিবাদ করতে পারলুম না। চাকরী ছাড়বার শক্তি নেই, উপরওয়ালাদের বিরুদ্ধে মামলা করারও ক্ষমতা নেই।'

সমরবাবু এই নগরীর কোলাহল ছেড়ে শৈশবের সেই শান্ত শহরটিতে ফিরে যেতে চান। কিন্তু শহরটিতে এখন নাকি অনেক লোকের বসতি, সেখানে গিয়েও স্বস্তি পাওয়া যাবে না, শান্তি পাওয়া যাবে না। শহরটির এক প্রান্তে শান্ত নিরালা পরি-বেশ আছে। সমাধিস্থান। সমরবাবুর মন সেই সমাধিস্থানের আশে-পাশে ঘোরাঘুরি করছে। শুধু তাই নয়, সমরবাবু মনে মনে নিজেকে কফিনের মধ্যে স্থাপিত করেছেন। কফিনটি উদ্যানের এক কোণে রাখা হয়েছে। মাটির তলা থেকে অনেক আত্মা উঠে এসেছে। নিঃশব্দে চলাফেরা করছে। এই-বার সমরের কফিনটি কবরের মধ্যে নামিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু নামানো গেল না। ফাদার ড্যানিয়েলের নির্দেশ শোনা গেল,—

—হল্ট! সবাই থেমে পড়ল। যে-যার কবরের মধ্যে আবার ঢুকে পড়ল। 'প্রতি-বেশীকে ভালবাস।' ড্যানিয়েলের কণ্ঠস্বর সমরবাবু ছোট্ট শহরের কবরখানা থেকে আবার ফিরে এলেন জনকীর্ণ কোলকাতার পথে। নীলা অনুতপ্ত হোক, নীলা শুদ্ধ হোক। তাহলেই ওকে সমরবাবু গ্রহণ করতে পারেন। নীলার সংগে এক শয্যায় শয়ন করা চলে না। আবার তাকে পরি-ত্যাগ করাও সম্ভব নয়। নির্দেশ আসবে, একদিন ড্যানিয়েলের নির্দেশ আসবে, নীলাকে গ্রহণ করতে নির্দেশ দেবেন ড্যানিয়েল। সেইদিন সমর জানতে পারবে নীলা শুদ্ধ হয়েছে। অনুতাপের আগুনে পুড়ে শুদ্ধ হয়েছে। নীলাকে, নীলার দেহকে গ্রহণ করা যাবে।

আমার সামনে বসে একদিন বিড়বিড় করে এই ধরনের কথা, এই ধরনের অভি-মান দাবি করলেন। ফলে, আমার কাছে ওঁর মনের কথা আরো স্পষ্ট হয়ে উঠল। নীলার কাছে সমরবাবু নিজের হৃত সম্মান প্রতিষ্ঠিত করতে চান। তাঁর ধারণা হয়েছে স্ত্রীর কাছে, প্রতিবেশীর কাছে তাঁর সম্মান চলে গেছে, তাই তাদের অন্যভাবে অভিভূত করে নিজের সমপর্যায়ে আনতে চাচ্ছেন। বর্তমানকে এড়িয়ে অতীতে পলায়ন করার ইচ্ছে মনে জেগে স্তিমিত হচ্ছে। তাঁর নিজের কফিনটা সমাধিস্থ করা যায়নি। অর্থাৎ বর্তমানের কোলাহল-মুখরিত জীবনকে তিনি গ্রহণ করতে চান, কিন্তু সামর্থ্যের অভাব বোধ করছেন। তাঁর সত্তা এখনও পুরোপুরি খণ্ডিত হয়নি। জীবন-মুখীন চিন্তাধারার প্রাধান্য লক্ষিত হচ্ছে। ড্যানিয়েল কে? সমরবাবু জানেন না। ন্যায়-বিচারের প্রতীক কি ড্যানিয়েল? ড্যানিয়েলের নির্দেশ কি ন্যায়ের অমোঘ নির্দেশ। সমরবাবু বলতে পারেন না। 'ডিলি-উশনের' রোগীরা সব ব্যাপারে সংকেত প্রতীকের সন্ধান খোঁজে। ড্যানিয়েলের বাণীর মধ্যে কোনো বিশেষ প্রতীক খুঁজে পাচ্ছেন না কেন সমরবাবু? সমরবাবুর 'হ্যালুসিনেশন' আরো অস্পষ্ট হয়ে আসছে! ড্যানিয়েলের নির্দেশ কিছুদিনের মধ্যেই দুর্বোধ্য রইল না। স্ত্রীর উপর সন্দেহের তীব্রতাও কমের দিকে। হয়ত এটা একটা অসুস্থ সন্দেহ,—এই রকমও একদিন বললেন। সমরবাবু আরোগ্যের পথে চলেছেন। সমরবাবু ভাল হয়ে যাবেন।

চুরির ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ে মস্তিষ্ক কোষে ভয়ের দরুণ যে উত্তেজনা ঘটেছিল, সেই উত্তেজনার অনড়ত্ব ক্রমশ দূর হয়ে যেতে লাগল। এতদিন ধরে স্নায়ুতন্ত্র 'প্যারা-ডক্সিক্যাল' ও 'আলট্রা-প্যারাডক্সিক্যাল' ফেজের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল। ওষুধের ক্রিয়ায় ও অভিভাবকের প্রভাবে ক্রমশ মস্তিষ্কের এই বিকার দূর হল, স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এল। তবে এই দুর্বল মানুষটি আর যে-কোনো সামান্য আঘাতে অসুস্থ হয়ে পড়তে পারেন, এই সম্ভাবনা রয়েই গেল।

—ধন্বন্তরি

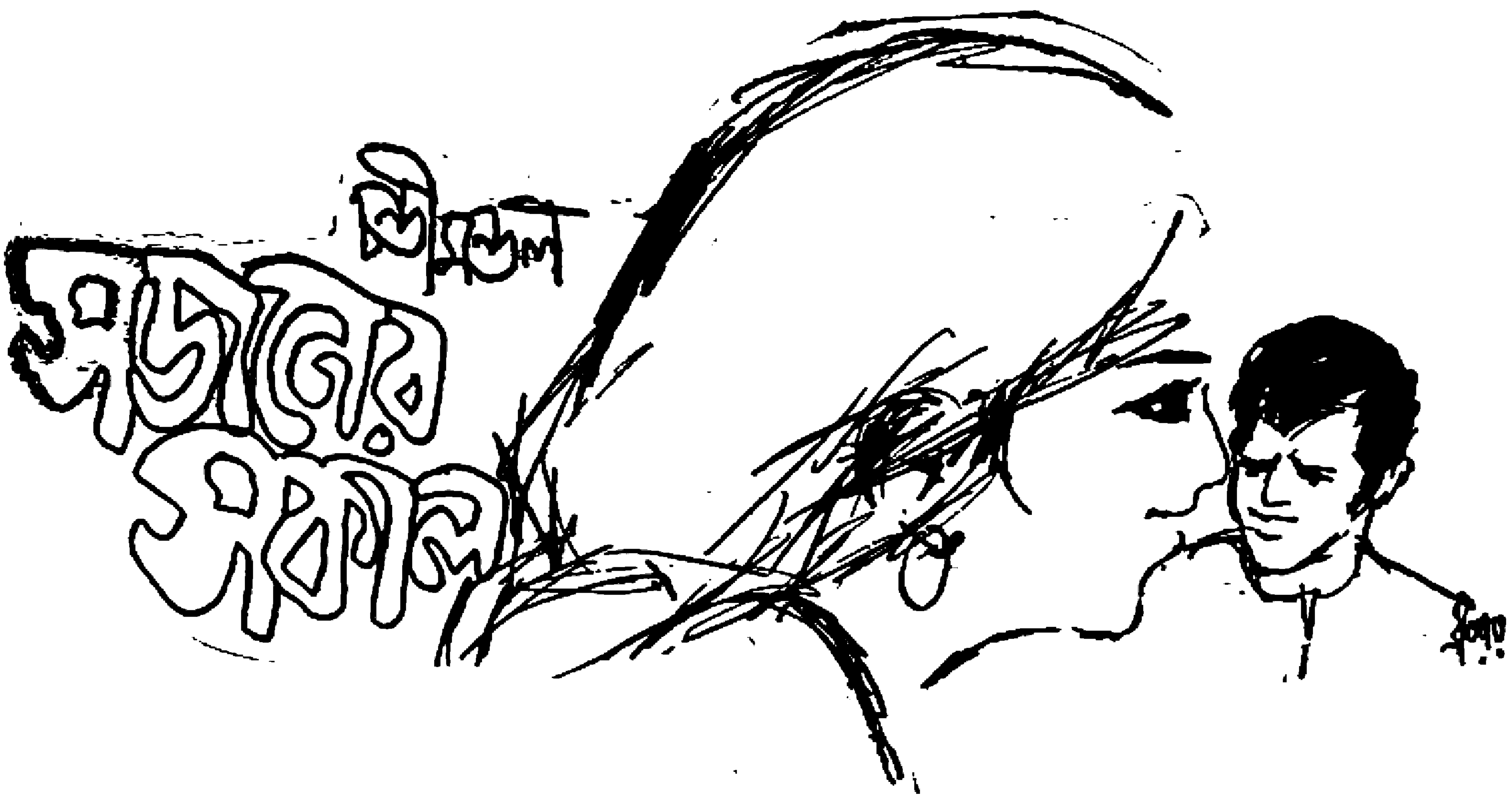

(চার)

সজন অনুভব করল কোথাও তার মুক্তি নেই। তার জীবনে মুক্তি বলে কিছু নেই। সে মুক্ত। তার কোন উদ্দেশ্য নেই, কোন স্বপ্ন কোন আশা কামনা বাসনা কিছুই নেই তার। তার কোন লক্ষ্যই নেই। কিছুই হওয়ার নেই। জীবনযাত্রা মানে নিরুদ্দেশ যাত্রা। পৃথিবী হল তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ অন্তহীন সমুদ্র এবং প্রত্যেকটি মানুষ এক একটি নিঃসঙ্গ ভেলা। অন্তত সে নিজে তাই, সজন বিশ্বাস করে। তার হাতে কোন হাল নেই, সে শুধুই ভেসে চলেছে। চিরদিন এমনি চলবে, কখনো কোথাও পৌঁছবে না। এই অবিশ্রাম অকারণ চলার পথে স্পন্দ, দুঃখ-সুখ আনন্দ বিষাদের বিচিত্র অনুভূতি—লৌকিক অলৌকিক। বিপন্ন বিপর্যস্ত হতে হতেই সে চলবে; কোনদিন জানবে না তার কী পরিণতি হতে পারে, তার শেষ পর্যন্ত কী হবে। একসময় সে হঠাৎ তলিয়ে কোথায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। সেই-ই সম্ভবতঃ তার মৃত্যু। প্রত্যেকের মৃত্যুই একান্ত ব্যক্তিগত। একজনের মৃত্যুর অভিজ্ঞতা অন্য আর এক জনের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। আসলে কারো-রই মৃত্যুর অভিজ্ঞতা হয় না। জীবন এবং মৃত্যু এই দুটি ঘটনার মাঝখানে যে সময় তা এত সংক্ষিপ্ত এত বেশী সূক্ষ্ম যে জীবনে প্রতিষ্ঠিত থেকে কারো পক্ষেই মৃত্যুকে উপলব্ধি করা সম্ভব হয় না। এবং মৃত্যুর পর জীবন সম্পর্কে এই অভিজ্ঞতার অবকাশও নেই যে মৃত্যুই জীবনের পরিণাম। কেননা, মৃত্যু অনন্ত চৈতন্যহীন অনস্তিত্বের অবস্থা, যে কোনরকম অবস্থাহীন অবস্থা, যেখানে জীবনের স্মৃতি স্মরণের কোন অবকাশই নেই। অর্থাৎ জীবনের উদ্দেশ্য জানার কোন সুযোগ নেই।

তবে বিশ্বসংসারের নানান অভিজ্ঞতায় মনে হতে পারে যে মৃত্যু বা ঐ অনস্তিত্বই জীবনের উদ্দেশ্য। অনস্তিত্ব যার পরিণাম তার সূচনাও নিশ্চয়ই ঐ অনস্তিত্ব থেকেই। অসীম শূন্যতার মাঝখানে মানুষের জীবন অকূল সমুদ্র মধ্যবর্তী এক একটি দ্বীপের মত। মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছা কামনা-বাসনা গুলি হল ঐ দ্বীপবাসী পাখিগুলির মত। ঐ পাখিগুলি দিনের পর দিন ঐ দ্বীপে বাস করে চলে তবু ঐ দ্বীপের ওপর তাদের কোন মোহ নেই। তারা জানে অতল সমুদ্রের গর্ভ থেকে যে দ্বীপ একদিন জন্মেছে সে এক-দিন আবার ঐ সমুদ্রেই তলিয়ে যাবে। তখন ঐ পাখিগুলিকে ফিরে যেতে হবে সেই আকাশে,—অসীম শূন্যতায়, যেখান থেকে তারা একদিন এসেছিল। মানুষের কামনা-বাসনা ইচ্ছাগুলির পরিণাম ঐ পাখিগুলির পরিণামের মত। তাই দীর্ঘদিন জীবনের সঙ্গে যুক্ত থেকেও তারা জীবনকে ভালো-বাসে না।

জীবন কিছুই নয়, জীবনের এই অভি-জ্ঞতার জন্যেও জীবন স্বীকার করে নিতে হয়। সজনও তাই করল। ধর্ম নীতি সমাজ আদর্শ সব মিথ্যা। সে ইচ্ছামত জীবনকে বেয়ে নিয়ে যাবে। কিন্তু তার ইচ্ছাই সেই ইচ্ছা, যার কোন বন্ধন নেই। সজনের এই ইচ্ছাই তার জীবনকে বেয়ে নিয়ে যাবে অর্থাৎ তার জীবন আপনা থেকেই বয়ে চলবে। জীবনযাত্রায় সে চলছে অথচ সে জানবে সে যাত্রী নয়। ক্ষুধা-তৃষ্ণা শারীরিক মানসিক অসংখ্য সমস্যা তার আছে এবং অনেক সমস্যাকেই সমাধান করার চেষ্টা সে করবে কিন্তু সে বিশ্বাস করবে সে কিছুই করবে না। সে এবার উদাসীন জীবনযাত্রার শরিক হবে।

সজন কবিতা লেখা বন্ধ করল। তার বন্ধুরা তার সঙ্গে দেখা করতে এসে বলল: কী খবর সজন?

সজন মনে মনে বলল এরা আমার বন্ধু কেন?

প্রকাশ্যে বলল : কিসের কি খবর?

: তুই হঠাৎ কবিতা লেখা বন্ধ করলি কেন?

: কবিতার প্রয়োজন আছে কি? কবিতা কী?

: কবিতা কি তার কী প্রয়োজন তুই এতদিন কবিতা লিখলি তুই জানিস না?

: জানি, তাই এখন আর কবিতা লিখি না।

: কিন্তু কী জেনেছিস যে কবিতা লেখার আর প্রয়োজন নেই জেনেছিস?

: জেনেছি যে কবিতা সবকিছুই, কিন্তু কোন কিছুই কিছু নয়।

: মানে?

: কোন কিছুর কোন মানে নেই।

: তাহলে ঐ কোন কিছুটা কী?

: ওটা কোন কিছুই নয়।

: ওটা কোন কিছু নয় কেন?

: ওটা কোন কিছু নয় বলে।

: নয় কেন?

: নয় তাই নয়।

: তুই পাগল হয়ে গেছিস সজন।

: কে বলতে পারে, যে পাগল নয় সে-ই হয়ত পাগল।

: তোর অসুখ করেছে সজন।

: কে বলতে পারে, সুস্থতাই হয়ত অসুস্থতার লক্ষণ।

: সজন জীবন নিয়ে তুই এত বেশী ভাবিস কেন।

: জীবন নিয়ে ভাববার কিছু নেই বলে।

: তুই এত ভাবিস কেন সজন?

: আমার কোন ভাবনা নেই বলে।

: তোর জীবন নেই?

: আমাকে তোরা একটু একলা থাকতে দে।

সজন প্রচণ্ড ধাক্কা খেল। তার ভাবনা-লোকে যেন ভূমিকম্প ঘটে গেল। জীবন সম্পর্কে সে এত বেশী ভাবে কেন? সে বলেছে তার ভাবনা নেই। নেই হয়ত। কিন্তু তার কি জীবন নেই? তাহলে সে জীবন নিয়ে এত ভাবে কেন? সে জীবনকে জানতে চায় তাই? কিন্তু জীবনকে জানতে চাওয়া কেন? জীবন বিশ্বাস করে তাই। জীবনকে বিশ্বাস করা কেন? জীবন ভালোবাসি তাই। কিন্তু জীবন সম্পর্কে এত বেশী ভাবি, জীবনকে এত বেশী বিশ্বাস করি কেন? আমি জীবনকে সবচেয়ে বেশী ভালোবাসি তাই। সজন নিজের স্বরূপ জেনে অবাক হল না। কেননা তার জীবনের শুরু থেকেই তার এই রূপের সঙ্গে তার নিবিড় পরিচয়। সেই পরিচয় অতি বড় কোন দুর্ঘটনাতেও এতটুকু ম্লান হয়নি। জীবন কিছুই নয়, মাঝে মাঝে এই কথা বিশ্বাস করে আমি অনেক বেশী বিশ্বাস করতে চেয়েছি যে জীবন অনেক বেশী কিছু। সজন এতেও তৃপ্ত হল না।

সজন কোথাও তৃপ্তি পায় না। সে এখনও তার জীবনের কোন সার্থকতায় পৌঁছতে পারেনি। পারে নি তাই জীবনের সার্থকতায় উপর তার বিশ্বাস অনেক বেড়ে গেছে। দুটি সত্য আছে। জীবন ও মৃত্যু। মৃত্যু সম্পর্কে কারো কোন অভিজ্ঞতা নেই। যদি কারো থাকেও বা সে পৃথিবীতে তার সেই অভিজ্ঞতা জানাবার সুযোগ পায় না। মৃত্যু সম্পর্কে হাজার ভেবেও, মৃত্যুকে জানার জন্য মৃত্যু গ্রহণ করলেও যখন মৃত্যুকে জানা যাবে না, তখন তাকে যার মৃত্যু ভয়ংকর সত্য হলেও তাকে অবহেলা করলে কোন ক্ষতি নেই। বরং অনেক লাভ। জীবনই একমাত্র সত্য হয়ে উঠবে।

সজন বিশ্বাস করল জীবনই একমাত্র সত্য। কিন্তু জীবনকে সে কতটুকু জেনেছে! জীবনকে অনেক বেশি জানলে সে জানবে জীবন আরো কত বেশি সত্য। সজন গভীর আবেগে আবার রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হল; আমার কামনায় কোন সীমা নেই, আমার অনন্ত বাসনা, অসীম আমার স্বপ্ন, জীবনের তৃষ্ণা আমার আকণ্ঠ আমার দু-চোখে জীবনের উগ্র নেশা। আমি জীবনের উল্লাসে মাতাল।

এটা একটা চমৎকার সজ্জিত পৃথিবী। জীবনের উল্লাসের আয়োজন এখানে অপরিসীম। উত্তেজনায় সজন ঠিক বুঝতে পারে না কেমন করে কীভাবে সে শুরু করবে তার ভোগ। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত করল জীবনযাত্রার যতরকম পদ্ধতি প্রচলিত আছে সে সমস্ত তো বটেই, যদি প্রয়োজন হয় তো সে নিজেই নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করে সেগুলিও সে অনুসরণ করবে। ভোর থেকে সকাল, সকাল থেকে দুপুর, বিকেল সন্ধ্যা, সন্ধ্যা থেকে রাত্রি গভীর মধ্যরাত্রি পর্যন্ত সজন ঘুরে বেড়ায় আর জীবনের কত বিচিত্র ভঙ্গীই না সে দেখে। দেখে আর আরো দেখার নেশা বেড়ে যায়। উত্তেজনায় কোন রাত্রেই তার ঘুম হয় না।

কলকাতা একটা বিরাট বিজ্ঞাপনশালা মনে হয়। এখানে প্রতিদিন বিজ্ঞাপিত হচ্ছে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত শ্রেণীর জীবন, জীবনের সম্ভব অসম্ভব সমস্ত ভঙ্গী। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত শ্রেণীর ও প্রকৃতির নারীরা এখানে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে নিয়মিত। এক-একটি নারী এক এক শ্রেণীর যৌনতার বিজ্ঞাপন। এখানে পৃথিবীর পরম প্রাচুর্যের বিজ্ঞাপন এবং ক্ষুধার যন্ত্রণার আত্মহত্যা ও অপমৃত্যুর বিজ্ঞাপন পাশাপাশি। সুখ-দুঃখ আনন্দ বিষাদ, জন্ম-মৃত্যু সমস্ত পাশাপাশি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে। সজন বিজ্ঞাপিত প্রায় সমস্ত জীবনের শরিক হওয়ার চেষ্টা করল। প্রেম, অপ্রেম লজ্জা, লজ্জাহীনতা আশা আশাহীনতা, তৃপ্তি অতৃপ্তি সংগ্রাম সংগ্রামহীনতা, জীবনের প্রতি চরম বিতৃষ্ণা জীবনের প্রতি প্রখর তৃষ্ণা এখানে সমস্তই জীবনের পক্ষে। সকলেই এক-একটি আদর্শকে আশ্রয় করে এগিয়ে চলেছে, বেঁচে থেকে কেউ বেঁচে চলেছে, আত্মহত্যা করে কেউ বাঁচতে চাইছে। এর মধ্যে কোন পথটি সজনের জন্যে নির্দিষ্ট, শেষ পর্যন্ত সজন সেই পথ আবিষ্কার করতে পারল না।

তার আগে আবিষ্কার করতে হবে আমি কী পেতে চাই। সজন ভাবল, আমি যা পেতে চাই তা কখনো পাইনি। তাকে কি কখনো পাওয়া যায় না? যাকে কোনদিন পাওয়া যাবে না সে কে, কেমন সে? সে কি এই পৃথিবীর কেউ, না অপার্থিব?

কতদিন পরে রাত্রিকে মনে পড়ল। রাত্রিকেই সজন পেতে চেয়েছিল। তারপর তার সেই বার্থতা থেকে প্রথম ভুলের জন্ম তারপর আবার ভুল, তারপর আবার বারবার। সজন এই ভুলের অভিজ্ঞতা দিয়ে জেনেছে এমনি অসংখ্য ভুলের মধ্যে দিয়েই তার জীবন কেটে যাবে। রাত্রিকে পাওয়া যাবে না, তাই ললিতা, [illegible] এরও হয়েছে মিথ্যা। তখন সজন জেনেছে তার নিজের জীবনটাও মিথ্যা। জীবন মিথ্যা এটাই জীবনের সত্য। জীবনের কোন উদ্দেশ্য নেই, নিরুদ্দেশ্যই জীবনের উদ্দেশ্য। তারপরেই সেই প্রচণ্ড ধাক্কা। অলীক কল্পনা বিলাসের ওপর জীবনের হৃদয়হীন বাস্তব—তার আঘাত। এই আঘাতের জন্যই সজন দিনে দিনে অলৌকিক তার কল্পনায় বায়বীয়-রূপ-এ রূপায়িত

সংস্কৃতি-বিষয়ক গ্রন্থমালা

উদ্বাস্তু

শ্রীহিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত। উদ্বাস্তু সমস্যা ও সমাধানের তথ্যচিত্র। [১০·০০]

রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি

ডঃ সুধাংশুবিমল বড়ুয়ার গবেষণা গ্রন্থ। অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেনের ভূমিকা। [১০·০০]

কালিকট থেকে পলাশী

শ্রীসতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় রচিত পাশ্চাত্য জাতিগুলির প্রাচ্য অভিযান কাহিনী। ১০টি চিত্র সম্বলিত। [৬·৫০]

বাঁকুড়ার মন্দির

শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত বাঁকুড়া তথা বাংলার মন্দিরগুলির সচিত্র পরিচয় ও ইতিহাস। ৮৭টি আর্ট প্লেট। [১৫·০০]

ঠাকুরবাড়ীর কথা

শ্রীহিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর পূর্বপুরুষ উত্তরপুরুষের সুষ্ঠু আলোচনা। [১৫·০০]

উপনিষদের দর্শন

শ্রীহিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত উপনিষদসমূহের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা। [৭·০০]

ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য

ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত এই বইটি রচনার জন্য সাহিত্য অকাদেমী পুরস্কারে ভূষিত। [[illegible]]

সাহিত্য সংসদ

৩২এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-[illegible]

CENTRAL LIBRARY

হচ্ছিল। বায়ুরোগ নিমেষে বাতাসে মিলিয়ে গেল। দীর্ঘ উপবাসের পর সজন সমস্ত অনুভূতি নিয়ে জীবনের মুখোমুখি হল। তবু শান্তি পেল না। শেষ পর্যন্ত একই অতৃপ্তি। অথচ স্থির বিশ্বাসে উপলব্ধি করেছে জীবনের উদ্দেশ্য একটা আছেই এবং জীবনের সেই উদ্দেশ্যের সঙ্গে একদিন না একদিন কোন একদিন তার মিলন হবেই হবে।

কিন্তু রাত্রি, সে কোথায় কত দূরে? আমি তাকে কোথায় পাব? সজন সংসারের প্রতি আবার উদাসীন হয়ে গেল। সে বুঝেছে, সমস্ত অন্তর দিয়ে বুঝেছে, এই পৃথিবী এতদিনে সেই গোপন কথাটি আমাকে বলেছে, বলেছে রাত্রিই নাকি আসল পৃথিবী আমার।

সজন তার কোন এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করল। বলল : আমি রাত্রির খবর চাই।

বন্ধুটি অবাক হয়ে বলল : রাত্রি! সে কে?

রাত্রির নাম শোনেনি এমন কেউ আবার পৃথিবীতে থাকতে পারে এবং সজন আবার তা বিশ্বাস করবে! এ-নিয়ে তর্ক করলে রাত্রির অস্তিত্বের প্রতি অসম্মান করা হয় এই ভেবে সজন খুব সহজভাবে রাত্রি কে বলল। তারপর বলল অনেকদিন আগের সেই ঘটনার কথা।

বন্ধুটি বলল : হ্যাঁ হ্যাঁ, এখন মনে পড়ছে বটে। সেই রাত্রি, মেয়েটির নাম রাত্রি ছিল কী? আচ্ছা সে যাই হোক, কিন্তু তোর এখনও তাকে মনে আছে? মনে হচ্ছে তুই তাকে রীতিমত জানিস। শুধু জানিস বললে বোধহয় ভুল বলা হবে। আচ্ছা মজার ব্যাপার তো! কিন্তু আমি তো তার কোন খবর জানি না-রে! তুই অন্য কারো কাছে—।

সজন : অন্য আর কে জানে?

: আমি তা-তো জানি না-রে।

: তুই যা জানিস তাই বল।

: সজন, আমাকে বড় মুশকিলে ফেললি রে। তবে আমার একটু একটু মনে পড়ছে। তোর সেই দুর্ঘটনার খবর সম্ভবত সেই মেয়েটি—কী যেন নাম—রাত্রি, হ্যাঁ সে শুনেছিল বটে। কিন্তু তারপর সে কী হল তা-তো জানি না।

: তারপর রাত্রিকে তোরা আর কোন-দিন দেখিসনি?

: না, কোনদিন আর তো দেখিনি। দেখিনি বলেই তো মনে হচ্ছে। তবে একটা কথা ; তখন এই কথাটা মনে হয়েছিল কিনা জানি না কিন্তু এখন যেন মনে হচ্ছে যে সেই মেয়েটি সম্ভবত ভেবেছিল সে-ই বুঝি তোর দুর্ঘটনার জন্য দায়ী। আর তুই বলতিস, বলতিস না—ঠিক তার আগের দিনই তুই—সে যাক। তবে একটা কথা তোকে বলি সজন, তুই এবার এই পাগলামোটা ছাড়। অযথা তুই দুঃখ ডেকে আনছিস। কী দরকার তোর সেই মেয়েটাকে-এখন?

সজন : আমার জন্যে ভেবে তোদের আর দুঃখ পেতে হবে না তো, তুই থাম, এবার তোর কথা বল।

বন্ধুটি : আমরা সাধারণ মানুষ ভাই। আমাদের শোনাবার মত কোন কথা নেই। নেই বলে আমাদের কোন দুঃখও নেই। তুই তো আবার ভাবিস আমাদের এই কোন দুঃখ নেই বলে তোর দুঃখ হয়।

সজন : তোরা তাহলে আমাকে রীতি-মত জানিস বল?

বন্ধুটি : ভেবে তোকে বুঝতে পারি কিনা জানি না, তবে এটা তুই ঠিক জানিস সজন, তোর জন্যে খুব কষ্ট হয়। আমরা তোর বন্ধুরা তোর জন্যে কিছুই করতে পারি না।

তোরা নিশ্চিন্ত থাক, আমার জন্যে যা কিছু করা দরকার তার জন্যে আমি নিজেই যথেষ্ট—এই বলে সজন আবার নিজের কাছে ফিরে এল। তার স্বরূপে।

সজন বিশ্বাস করল রাত্রি নিশ্চয়ই তাকে ভালোবেসেছিল। সে এখন কোথায় আছে আবিষ্কার করতে হবে। সেও হয়ত ভুল জীবনের বন্ধনে বন্দী হয়ে তিলে তিলে কষ্টের যন্ত্রণা সহ্য করছে। আমার ভালোবাসা ছাড়া তার জীবনও পূর্ণ হতে পারবে না। সজন যেন অলৌকিক এক বার্তা পেয়েছে, রাত্রির কাছে পৌঁছে যাবার দিন ঘনিয়ে এসেছে। এবার স্বপ্নের সফলতার মরশুমে শুরু হবে তার জীবনে। সারাদিন সারারাত সে রাত্রির পৃথিবীতে এখন বাস করে। মনে হয় রাত্রি তার খুব কাছে কোথাও আছে, বাতাসে তার শরীরের গন্ধ, তার পদধ্বনি মধুর সঙ্গীত হয়ে বেজে ওঠে সজনের অনুভূতিতে। সজন সজাগ হয়ে ওঠে। পথে চলতে চলতে প্রত্যেকটি মেয়ের মুখ লক্ষ্য করে গভীরভাবে, এমনি হঠাৎ একদিন রাত্রিকে সে আবিষ্কার করবে। কখনো মনে হয়, রাত্রি তার অন্তরে পৌঁছে গেছে, এবার সে বাইরে আত্মপ্রকাশ করবে। ততোক্ষণ সজন অন্তরের রাত্রির সঙ্গে কথা বলে। অনেক কথা বলে। তার নিজের ব্যর্থতা দুঃখের কথা, তার এতদিনের কত অভিজ্ঞতার কথা, কেমন করে সমস্ত বন্ধন হতে মুক্ত হয়ে রাত্রির জন্যে তার মুক্তির দিন গুনছে সেই কথা, আরো অনেক কথা, যে-কথা সে নিজেও জানে না। পৃথিবীর সমস্ত প্রেম সৌন্দর্যের প্রকাশ আকাশ, সূর্য, নক্ষত্র, নদী পাখি আলো, অন্ধকার মানুষ-জীবনের অনন্ত বৈচিত্র্য সমস্ত কিছুর সঙ্গে সজন গভীর আত্মীয়তা অনুভব করে। অনুভব করে বিশ্বে বিশ্ব জুড়ে এক অন্তহীন প্রাণের প্রবাহ বয়ে চলেছে অবিরাম অবিশ্রাম। সেই প্রাণের স্পন্দিত সঙ্গীতের মধ্যে কত বিচিত্র সুর সেই সুরের ঐকতান মূর্ছনায় সজন বিস্মিত বিহ্বল হয়ে বড় ভালোবাসায় নিবিড় সঙ্গ লাভ করে সেই ভালোবাসা, আমার কবিতা, কবিতা আমার জীবন, আমার জীবনের মূলে আছে একটি নারী, সে আর কেউ নয়, রাত্রি। সজন এই জীবন-রসে আকণ্ঠ আপ্লুত হয়ে যায়।

যার সঙ্গে দেখা হয়, সেই বলে, 'কী আশ্চর্য, তুমিই সেই সজন? তুমি এ কী হয়ে যাচ্ছ? তোমার তো এত বয়েস নয়। ভেতরে কোন অসুখ বিসুখ—তা নিজেকে এ-রকম অবহেলা করা তো তোমার উচিত হচ্ছে না সজন। একজন ভাল ডাক্তার-টাক্তার দেখিয়ে একবার ভেতরটা পরীক্ষা করিয়ে নিলে কি ভাল হয় না? দেখ—যা ভাল বোঝ—। তবে তুমি বড় বেশি ভাবাচ্ছ সজন। এবার একটু বোঝ।'

সজন বেশ বোঝে যে সে ভাল আছে। তাকে কেউ বোঝে না তাহলে এটা কী করে সকলে বুঝল যে সে কী-রকম হয়ে যাচ্ছে, দুর্গত? তাকে যে সত্যিই কেউ বোঝে না এটা আরো ভাল করে বোঝা যাচ্ছে। সজন মনে মনে বলল, আমি তো আমাকে জানি। আমি জানি যে আমি যেমন, আমি তেমনই আছি। আমি রাত্রির জন্যে অপেক্ষা করছি। রাত্রি কবে আসবে, তা রাত্রিই জানে। রাত্রির তো আমার প্রতি দায়িত্ব আছে। আমি তাকে ভালোবাসি এটা তো আর মিথ্যা নয়, তাহলে আমার ভালোবাসা মিথ্যা হয়ে যেতে পারে না। রাত্রি নিশ্চয়ই আসবে। আমি তার জন্যে অপেক্ষা করব মৃত্যু পর্যন্ত। রাত্রি যদি কোন ব্যক্তিগত জরুরী কারণে একান্তই আসতে নাও পারে কিন্তু আমি তো মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা করব এবং মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত আশা করব রাত্রি এই এল বলে। তারপর মৃত্যু একবার হয়ে গেলে আমি সমস্ত আশা-নিরাশা সার্থকতা ব্যর্থতার অতীত। তাহলে অযথা মৃত্যু আমি যত পিছিয়ে দিতে পারব জীবনকে যত বেশি দীর্ঘ করতে পারব ততই আমার আনন্দ। এবং আমি জানি আমার কোন অসুখ করেনি। আমি জানি যে আমার বয়সের তুলনায় আমি অনেক বেশি সতর্ক হয়ে আছি। অর্থাৎ সত্যিই আমার এমন কিছুই হয়নি যে খুব তাড়াতাড়ি আমার মৃত্যু হবে। সজন বারবার নিজেকে বলতে লাগল আমার যেমন কিছুই হয়নি। আমি তো জানি আমার কিছুই হয়নি। আমি বৃদ্ধ হয়ে যাচ্ছি না। আমার কোন ভয় নেই।

কিন্তু রাত্রি এখনও আসছে না কেন? সজন হঠাৎ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল। আমি কেন নিজেকে বারবার বোঝাতে চাইছি, আমার কোন ভয় নেই? তাহলে নিশ্চয়ই কোন ভয়ের কারণ আমার মধ্যে ঘটেছে। তাহলে আমার কিছু একটা হয়েছে। আমার কী হয়েছে? আমি এত ভয় পাচ্ছি কেন? আমার অসুখ করেছে। আমার কী অসুখ করেছে? আমার কী হবে? সজন ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল। বুকে যেন একটা চাপা তীক্ষ্ণ ধাক্কা লাগল। তারপরই সমস্ত শরীর ঠাণ্ডা হয়ে যেতে লাগল। মাথাটা যেন দপ্-দপ্ করে জ্বলে উঠল। তীব্র যন্ত্রণাকর অসংখ্য উজ্জ্বল কীট কীট পোকার মত আর অনুভূতিতে চরে

বেড়াচ্ছে। সজন যেন একে একে অন্য আর একজনে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে। তার স্মৃতি হারিয়ে যাচ্ছে! সে আতঙ্কে আর্ত নাদ করে উঠল। সকলে ছুটে এল, কী হয়েছে সজন? কী হয়েছে তোমার? এই তো আমরা—আমরা তোমার আত্মীয়-বন্ধু, বল তোমার কী হয়েছে, কী হচ্ছে, কী কষ্ট হচ্ছে, তুমি ভাল আছ কিন্তু, দুর্দিন তোমার এই দেখ, দেখ দেখ আমরা, আমাদের চিনতে পারছ না? তুমি খুব ভয় পেয়েছ? তোমার কোন ভয় নেই—তুমি শুধু একটু দুর্বল হয়ে পড়েছ, আর তা হবে না! নিজের ওপর কী অত্যাচার না তুমি করেছ! যা হবার হয়ে গেছে--। এখন থেকে আর একটুও ভাববে না। সব ভাল হয়ে যাবে। সজন নিজেকে নদীর পাড়ে একলা বসে থাকতে আবিষ্কার করল।

কিন্তু আর সে নিজেকে উপেক্ষা করল না। অভিজ্ঞ ডাক্তারের সাথে দেখা করল। ডাক্তার যা বলল—কারে কয়ে আপনার শরীর মন প্রায় শেষ অধ্যায়ে পৌঁছে গেছে দেখছি। এ-যাত্রা হয়ত বেঁচে গেলেন, তবে এ-যাত্রার সত্যিকারের বেঁচে থাকার জন্যে কিছুদিনের জন্যে এই কলকাতা, কলকাতার আবহাওয়া, কলকাতার জীবনকে [illegible] আপনার না জানালেই নয়। সজনবাবু, ভাবিত হবেন না, চলে যান কোন ঝাউ-গাছের সমুদ্রে—গড়ে যাই। উইস ইউ এ হ্যাপি ফিউচার।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্ত হবে)

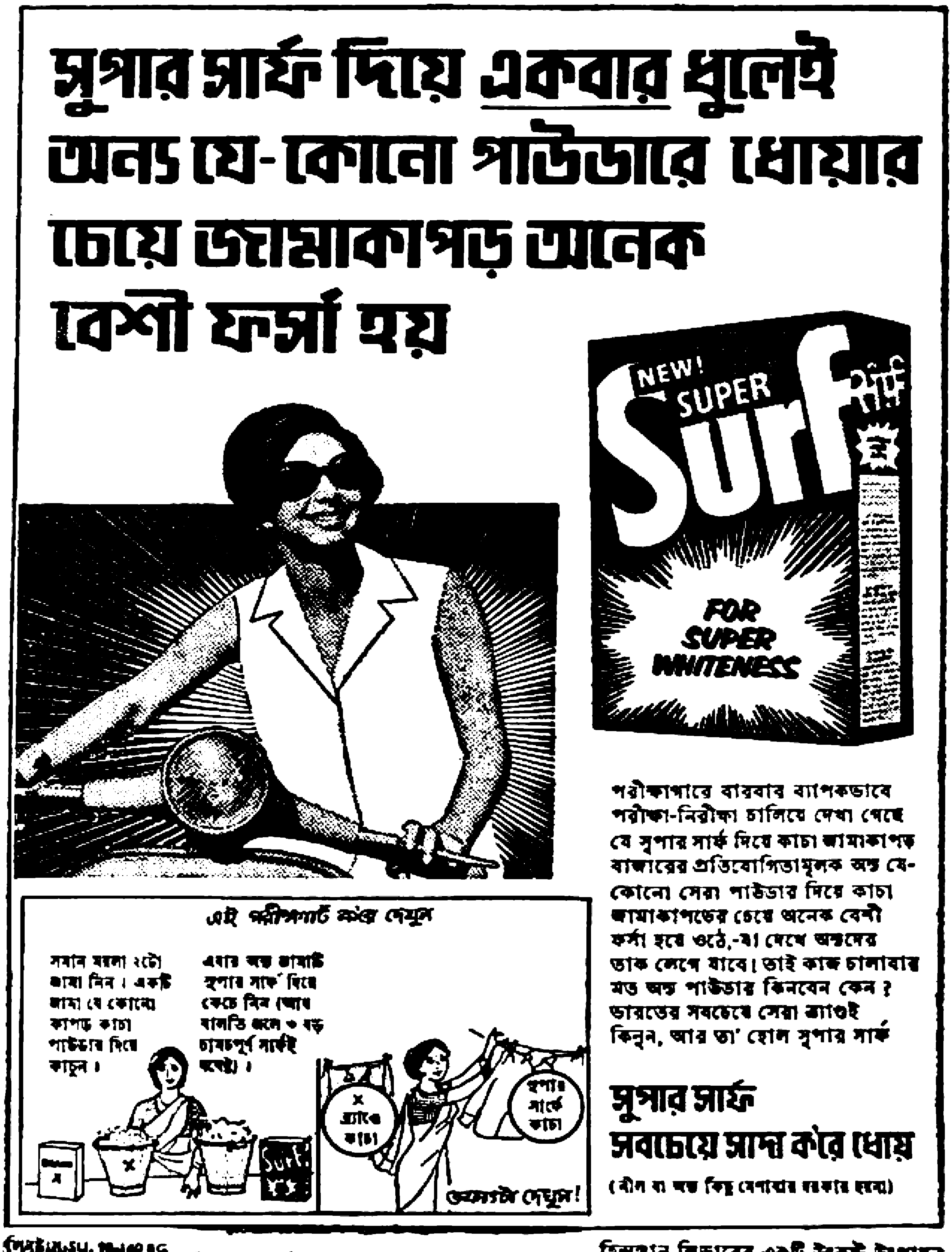

লিন্টাস/SU. 78-140 BG
হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

হারায়ে নিজেরে খুঁজি

অহীন্দ্র চৌধুরী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কোথাও আসতে হলো আনন্দ, আবার ফিরে যেতে হলো বেদনা। পথের মতো আনন্দ-সম্ভার সবই তো পথেই ফেলে যেতে হয়। সঞ্চয় তো কিছুই থাকে না। শূন্য পাত্র পূর্ণ করে নিই পথের সঞ্চয়ে। আর সে সঞ্চয় কখন যেন পথেই হারিয়ে যায়। ফিরে আমি আবার শূন্যমনে।

কিন্তু ভ্রমণে এখনো পূর্ণচ্ছেদ পড়ে নি। এখনো বাকি রয়েছে অমৃতসর যাওয়া। সেখানে স্বর্ণমন্দির দেখবো, আর দেখবো শহীদতীর্থ জালিয়ানওয়ালাবাগ।

অমৃতসরের কথা শুনেছি, পড়েছি—কিন্তু চোখে দেখা এই প্রথম।

মন্দিরের প্রাঙ্গণপথে দাঁড়িয়ে এক নজরে চারিদিকের পরিবেশ লক্ষ্য করলাম। ভালো লাগলো। এবারে ভিতরে যাবার পালা। ভিতরে যাবার আগে জুতো খুলে রাখতে হলো। তারপর হাত-পা ধুয়ে মাথায় রুমাল জড়িয়ে এগিয়ে চললাম মন্দিরের দিকে। এখানকার বিধি এই। মুক্তহস্তে মন্দির প্রবেশ নিষিদ্ধ।

প্রথমে পরিক্রমা করলাম অমৃতসাগর। এটি কৃত্রিম জলাশয়। জলাশয়ের চতুর্দিকে প্রশস্ত পথ। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। তারপর ঐতিহাসিক স্বর্ণমন্দির দেখার পালা। যে স্বর্ণমন্দিরের কথা শুনেছি, পড়েছি—আজ শিখতীর্থ সেই স্বর্ণমন্দির প্রত্যক্ষ করলাম। এখানে বিগ্রহ নেই। 'গ্রন্থসাহেব' এখানে দেবতা। প্রথম থেকেই মনে কৌতূহল ছিল, পাঞ্জাবকেশরী রঞ্জিৎ সিংহের কীর্তির কোন নিদর্শন এখানে দেখতে পাবো কিনা। পেলাম না তেমন কিছুর সন্ধান। স্বর্ণমন্দির দর্শনান্তে এলাম ভারতের মুক্তিতীর্থ জালিয়ানওয়ালাবাগ দেখতে। সংকীর্ণ পথ ধরে গেলাম সেই চিহ্নিত স্থানটিতে, যেখানে মিশে আছে ভারতের মানুষের রক্ত। আর যে রক্তে লেখা আছে শাসক ইংরেজের কলঙ্ককথা। জালিয়ানওয়ালাবাগ ভারতের আর এক তীর্থ। বিগ্রহ যেখানে ভারতের মন্ত্র-দেবতা। প্রার্থনা যেখানে স্বাধীনতার শপথ-মন্ত্রে। অঞ্জলি যেখানে আত্মদানে। জালিয়ানওয়ালাবাগ, যেখানে একদিন ইংরেজের নির্মম বুলেট এসে বিঁধেছিল নিরস্ত্র ভারতবাসীর বুকে। যেদিন যে নারকীয় হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়েছিল, সেই হিংস্র-বর্বরতায় রোমহর্ষ পশুও লজ্জা পায়।

মনে মনে ভারতের মুক্তিতীর্থ জালিয়ানওয়ালাবাগের কথা ভেবেছি—আজ সেই তীর্থ দর্শন করে ধন্য হলাম।

দেখলাম, দেয়ালে সেই নির্মম বুলেটের ক্ষতচিহ্ন, দেখলাম সেই অন্ধকার ইঁদারা, নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও যেখানে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল মানুষ। দাঁড়িয়ে রইলাম। কান পেতে শুনলাম, ইতিহাসের কান্না। উপলব্ধিতে স্পষ্ট শুনেছি, সেদিনের কণ্ঠস্বর। নর-নারী শিশু, বৃদ্ধের মিলিত কণ্ঠস্বর—'আমাদের রক্তে তোমরা শপথ নাও, ভারতের মুক্তির। তোমাদের মুক্তিতে আমাদের মুক্তি।'

—কী ভাবছো?

সচকিত হয়ে আমি ফিরে তাকালাম। সুধাংশু ডাকছে। মীরাও রয়েছে তার মায়ের পাশটিতে।

জালিয়ানওয়ালাবাগে এসেছি যখন, যেন আকাশ থেকে আগুন ঝরছে। দেখলাম, ছোট ছোট গাছপালার সবুজ পাতা শুকিয়ে গেছে প্রচণ্ড দাবদাহে। দেখলাম, চারদিকের পরিবেশ জুড়ে কেমন যেন উদাস আবহাওয়া।

এর পরেই এলাম রামবাগে। যেখানকার জল শুধু সুস্বাদু নয়, টনিক বিশেষ। সেই জল পান করলাম।

রামবাগ থেকে এসেছি অমৃতসর স্টেশনে। স্টেশনে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো।

স্টেশনের ওয়েটিং রুমে বসে মনে মনে কদিনের হিসেব করছিলাম। কোথায় ছিলাম, কোথায় এসেছি, আবার কোথায় যাবো?

কিন্তু যাবার ঠিকানা তো একটাই। জীবনে বারোই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাই না, তবু তো ঘরের চৌহদ্দিতেই বার বার ফিরে যেতে হয়। তবু ভালো লাগে এই বাধা বন্ধনহীনভাবে ছুটে চলতে। এর মধ্যে জীবনকে আর একভাবে খুঁজে পাওয়া যায়। ফিরে যেতে হবে সেই পুরোনো পরিবেশে। ফিরে যেতে মন চায় না। যে বিহঙ্গ একবার আকাশে ডানা মেলেছে, সে কি আর খাঁচায় ফিরতে চায়। কিন্তু আমি তো বিহঙ্গ নই। আমি মানুষ। আমার নির্দিষ্ট নাম আছে, নির্দিষ্ট ঠিকানা আছে—যে নামে আমার পরিচয়, যে ঠিকানায় আমার আশ্রয়। চিন্তায় ছেদ পড়লো। ডাউন অমৃতসর মেল প্ল্যাটফরমে এসে দাঁড়িয়েছে।

ফিরে এসেছি কলকাতায়। সেই পুরোনো ঠিকানায়। পথের ক্লান্তিতে দেহ অবসন্ন। বাড়ি ফিরে আজ আর কোন কাজ নয়, নিশ্চিন্তে বিশ্রাম।

কিন্তু বিশ্রাম চাইলে কি পাওয়া যায়। দুপুরের পর ফোন এলো। বিজয় ফোন করছে। রাসবিহারী সরকার আমার সঙ্গে দেখা করতে চান।

বললাম, আজ কোন কাজ নয়, কথা নয়—বরং আগামীকাল কথা হবে। রাসবিহারীবাবুকে জানিয়ে দিও, কাল যেন আসেন।

পরদিন। ডায়েরীর পাতায় সেদিনটি চিহ্নিত ১৮ মে বলে। সেদিন রাসবিহারীবাবু এলেন। সঙ্গে নাট্যকার শচীন সেনগুপ্ত আর সীতানাথ মুখার্জী। ওরা আমাকে নতুন করে থিয়েটারের ব্যাপারে উৎসাহিত করতে চাইলেন। কিন্তু আমি নাটক বা থিয়েটারের ব্যাপারে আজকাল তেমন উৎসাহ পাই না। তবে সেকথা কাউকে বলার নয়। সেটা আমার মনের কথা। অথচ আমি তো জানি, আমি এখন ছুটি চাই—নিজের কাছে ফিরে যেতে চাই। দিনের সঙ্গে আমার মানসিক চেহারা অনেক বদলে গেছে। হয়তো আরো যাবে।

ঐদিনই মিঃ এস. সি. গুপ্ত এলেন। এঁর পরিচয় বোধহয় আগেই দিয়েছি কোন সময় কথা প্রসঙ্গে। মিঃ গুপ্ত থিয়েটারে অনেক সময় অর্থ লগ্নী করতেন।

মিঃ গুপ্ত তাঁর কথার মধ্যে এক সময় বললেন, আপনার ছেলের সঙ্গে জুরিখে আমার আলাপ হয়েছিল। বড়ো ভালো আপনার ছেলে।

যাই হোক, বাড়িতে ফিরে আসার পরেই আবার পুরোনো কথা, পুরোনো পরিবেশের সঙ্গে জড়িয়ে পড়লাম।

এর কদিন বাদে ২১ মে স্টারে মহেন্দ্র গুপ্তের নতুন নাটক রাজনর্তকীর শুভ উদ্বোধন হলো। কিন্তু এ সম্পর্কে আমাকে মহেন্দ্রবাবু কিছু জানান নি। তাঁর কাছ থেকে একটা ফোন অন্তত আশা করেছিলাম। তবে স্টারের অনিল বসু আমাকে ফোন করে মহেন্দ্রবাবুর অসুবিধের কথা জানিয়েছিলেন।

মে মাসের শেষদিকে শিশিরবাবুর ভাই হৃষীকেশ ভাদুড়ী আমাকে ফোন করলেন, শ্রীরঙ্গম থেকে। জানালেন, পরদিন তিনি আমার সঙ্গে দেখা করবেন। অথচ কারণ কিছুই বললেন না।

পরদিন ২৯ মে হৃষীকেশবাবু এলেন। যে কথা ফোনে বলেন নি সেকথা সাক্ষাতে বললেন।

শ্রীরঙ্গমে শিশিরবাবু প্রফুল্ল অভিনয়ের আয়োজন করেছেন। তাঁর ইচ্ছে আমি ঐ নাটকে রমেশের ভূমিকায় অভিনয় করি।

একটু চিন্তা করে বললাম, শিশিরবাবু আমাকে ডেকেছেন, এ-তো আনন্দের কথা। কিন্তু—বলে চুপ করে গেলাম।

হৃষীকেশবাবু বললেন, কোন কিন্তু নেই। তিনিই আমাকে পাঠিয়েছেন।

বললাম, ঠিক আছে, বড়োবাবুকে জানাবেন আমি অভিনয় করবো।

এই প্রসঙ্গে বলা দরকার শিশিরবাবু থিয়েটার জগতে 'বড়োবাবু' নামেই পরিচিত ছিলেন। তিনি আমাদের সবার কাছে বড়োবাবু।

বলা বাহুল্য শ্রীরঙ্গমে পর পর দুদিন প্রফুল্ল অভিনীত হয়েছিল। শিশিরবাবুর সঙ্গে অনেকদিন বাদে আবার একসঙ্গে মঞ্চে নামলাম।

সেদিন ১লা জুন। ইস্ট ইণ্ডিয়া ফিল্মস-এর ছবির কাজে স্টুডিও গিয়েছিলাম। ছবির নাম ঠিক মনে করতে পারছি না। তবে একটা কথা মনে আছে সেদিন স্টুডিও ফ্লোরে একটি নতুন মেয়েকে দেখেছিলাম, যার নাম সুচিত্রা সেন।

অনেকদিন পর একটি সুখের রেখার সম্ভাবনার আভাস পেলাম, যদি নিষ্ঠা থাকে, তাহলে এ মেয়ে একদিন চিত্রজগতের শিরোনামায় স্থান পাবে।

৩ জুন তারিখটির মধ্যে বিশিষ্টতা আছে। ঐ দিনেই শ্রীরঙ্গমে গেলাম। দেখা হলো শিশিরবাবুর সঙ্গে। দীর্ঘদিন পরে দেখা। এক যুগ হয়ে গেছে। সেই ১৯৪০-এর প্রথমদিকে মিনার্ভায় মিলনকুমারী অভিনয়ের মঞ্চে দেখা হয়েছিল, তারপর আজ এই দেখা। অথচ আমরা পরস্পরের কতো কাছের মানুষ।

দেখা হতেই পরস্পর আলিঙ্গনে বদ্ধ হয়ে দুজনের মনের সঞ্চিত আবেগ উজাড় করে দিলাম।

তারপর দুজনের মধ্যে আরম্ভ হলো অন্তরঙ্গ আলাপ।

৬ জুন তারিখে শ্রীরঙ্গমে অভিনয় হলো প্রফুল্ল। দর্শকপরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে সেদিনের অভিনয়ের কথা ভুলবার নয়। শিশিরবাবু অভিনয় করলেন যোগেশের ভূমিকায়। আর রমেশ চরিত্রটি ছিল আমার। নামভূমিকার শিল্পী ছিল সরযূবালা। রেবা দেবী, নিভাননী, নিরোদা, ইন্দুবালা এরাও ছিল সেদিনের অভিনয়ে।

পরদিনও প্রফুল্ল অভিনীত হলো। সেদিনেও অগণিত দর্শকসমাগম হয়েছিল।

এরপর আবার শ্রীরঙ্গমে শাজাহান অভিনীত হলো ১৩ ও ১৭ জুন। দুদিনে অজস্র দর্শকে পরিপূর্ণ ছিল প্রেক্ষাগৃহ।

কী জানি কেন, নতুন করে যেন উৎসাহ পেলাম। মনে হলো, এখনি ছুটি নয়, এখনই অবসর নয়—এখনো মঞ্চ আমাকে আকর্ষণ করে, এখনো মুক্তির প্রহর আসে নি।

শ্রীরঙ্গমে অভিনয় চলতে লাগলো। একই মঞ্চে শিশির ভাদুড়ি আর আমি। এছাড়া অন্যান্যরা তো আছেনই।

অনেকে বলে থাকেন, শিশিরবাবুর সঙ্গে আমার বরাবর একটা দ্বন্দ্ব ছিল। কিন্তু তাঁরা জানেন না, আমাদের মধ্যে কতো নিবিড় সম্পর্ক ছিল। তফাৎ যেটুকু ছিল, সেটুকু পারস্পরিক চিন্তায়। বাইরে থেকে অনেকে যাকে দ্বন্দ্ব বলে মনে করতেন। কিন্তু এখানে আমি দ্বিধা না রেখেই বলতে পারি, আমাদের মধ্যে কোথাও দ্বন্দ্ব ছিল না। তবে দুজনের মধ্যেই ছিল আত্ম-স্বাতন্ত্র্যবোধ। এখানেই ছিল আমাদের মিল, আর বড়ো অমিল তাও এখানে।

বাংলা দেশ তথা ভারতের মানুষের কাছে ২৩ জুন তারিখটি চরম দুঃখের। ঐ দিনেই বাংলার বরেণ্য সন্তান, ভারতের জনপ্রিয় লোকনেতা ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগরে অন্তরীণ অবস্থায় পরলোকগমন করলেন। ডঃ শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যু যেমন আকস্মিক, তেমনি বেদনাদায়ক। তাছাড়া এই মৃত্যুর মধ্যে সেদিন রহস্যের গন্ধ পেয়েছিল মানুষ। যে রহস্য আজো ভারতবর্ষের একদল মানুষের মনে।

এর কদিন পরে ২১শে জুন বাংলা রঙ্গমঞ্চের একটি জ্যোতিষ্ক খসে গেল। ভূমেন রায় মারা গেলেন। ভূমেনের সঙ্গে সম্পর্ক আমাদের তো কমদিনের নয়। অনেকদিনের। একই সঙ্গে অভিনয় করেছি, একই সঙ্গে সুখ-দুঃখের অংশ নিয়েছি—কিন্তু আজ সে সব ছেড়ে চলে গেল।

এই প্রসঙ্গে বলবো, প্রথম জীবনে ভূমেন রায় ছিলেন ফুটবল খেলোয়াড়। ভূমেন, পরে স্থায়ীভাবে মঞ্চে যোগ দেয়। এবং আপন নিষ্ঠার জোরে স্থায়ী আসন করে নিয়েছিল অভিনেতাদের মধ্যেই। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে তার শান্তি ছিল না। আমি জানতাম, তার এই অশান্তি কেন। কিন্তু আজ যে সব অশান্তির বাইরে চলে গেছে, আজ তো তার কাছে শান্তির অভাব নেই।

ভূমেনের মৃত্যুতে ব্যথা পেলাম। মনে মনে প্রার্থনা করলাম ঈশ্বরের কাছে, সে যেন স্বর্গে স্থান পায়।

বিভিন্ন মঞ্চে বিভিন্ন নাটক চলছে। চলতে হয় চলা। নয়তো নতুন এমন কোন নাটক আসছে না যা নিয়ে আলোচনা করতে পারি।

মহেন্দ্র গুপ্ত স্টার ছেড়ে চলে গেল। কেন সেই জানে। ভাবলাম, হঠাৎ সে স্টার ছাড়লো কেন? তাছাড়া তখন সে করবেই বা কি। তবে একটা কথা বুঝেছিলাম, মহেন্দ্রর মধ্যে অস্থিরতা পেয়ে বসেছে।

চলতি দিনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু নেই, এক শ্রীরঙ্গমে চিরকুমার সভার অভিনয় ছাড়া। শিশিরবাবু নেমেছিলেন রসিকের ভূমিকায়, আর আমি ছিলাম চন্দ্রবাবুর চরিত্রে। কিন্তু কী জানি কেন সেদিন নাটক তেমন জমেনি।

অজকাল প্রায়ই শিশিরবাবুর সঙ্গে অভিনয় করছি শ্রীরঙ্গমে। একটা নতুন সম্পর্ক গড়ে উঠেছে বড়োবাবুর সঙ্গে।

এমনি করে দিন, মাস কাটছে। অভিনয় করছি। কিন্তু স্বস্তি পাচ্ছি না। মঞ্চের মায়া আর আমাকে ধরে রাখতে পারছে না। তবু যেদিন ৩০শে জুলাই তারিখটি ছিল আমার ব্যক্তিগত জীবনের স্মরণীয় দিন। তিরিশ বছর আগে আমি এই দিনটিতে প্রথম পেশাদারী মঞ্চে অভিনেতা হিসেবে যোগ

সকল ঋতুতে অপরিবর্তিত ও অপরিহার্য পানীয়

চা

কেনবার সময় 'অলকানন্দার' এই সব বিক্রয় কেন্দ্রে আসবেন

অলকানন্দা টি হাউস

৭, পোলক স্ট্রীট কলিকাতা-১

২, লালবাজার স্ট্রীট কলিকাতা-১

৩৩, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ কলিকাতা-১২

॥ পাইকারী ও খুচরা ক্রেতাদের অন্যতম বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান ॥

দিয়েছিলাম। প্রথম নাটক ছিল মন্মথ রায়ের কর্ণার্জুন। আর আমার ভূমিকা ছিল অর্জুনের।

মনে হয়, এই তো সেদিনের কথা। কিন্তু একবার কি ভেবে দেখেছি, তিরিশ বছরের পথ পিছনে পড়ে রয়েছে। যে পথে রয়েছে নানা ঘটনার স্মৃতি।

এতোর মধ্যেও সামনের দিকে তাকালে তেমন উৎসাহ পাই না। মনে হয়—আর অভিনয় নয়, এবারে জীবনে ফিরে যেতে হবে।

আর এই জীবনে যতো ফিরে যেতে চাই, ততোই যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলি। আবার হারিয়ে যাওয়া আমাকে নতুন করে আবিষ্কার করি।

এই যখন মানসিক অবস্থা, ঠিক সেই সময় নেপাল যাওয়ার চিন্তাটা মাথায় এলো :

আমি নেপাল যাবো শুনে অনেকেই নিষেধের বাণী উচ্চারণ করলেন। বিশেষ করে কবিরাজ বিমলানন্দ তর্কতীর্থ, আর ডাক্তার রাম অধিকারী বললেন, এই ঠান্ডায় নেপাল যাবেন? না যাওয়াই উচিত।

কিন্তু বাইরে যাবার ডাক এলে আমি কোন বাধাই মানি না। আর এ কথাও ঠিক—বাইরে বেরোলে আমি যেন বদলে যাই। মনে হয় না, আমি দুর্বল, আমি অসুস্থ।

অক্টোবর মাসের ঊনত্রিশ তারিখ সকালে আমি নেপালের উদ্দেশে দমদম বিমানবন্দর থেকে রওনা হলাম। পথে পাটনায় কিছুক্ষণের যাত্রাবিরতি। তারপর কাঠমাণ্ডুর পথে যাত্রা শুরু।

আগে থেকেই কংগ্রেসনেতা অতুল্য ঘোষের কাছ থেকে একটা চিঠি নিয়ে কাঠমাণ্ডুতে সামশের জং বাহাদুর রাণাকে পাঠিয়ে দিলাম। সেই চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে নেপালের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী এম পি কৈরালার কাছে গুরুত্ব দিয়েই বলা হয় যে

কলকাতা থেকে মিঃ অহীন্দ্র চৌধুরী আসছেন, তাঁকে যেন বিমানঘাটি থেকে সরাসরি সরকারী অতিথিশালায় নিয়ে যাওয়া হয়।

প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত সহকারী মিঃ প্রধান, গৌচর বিমানঘাটি থেকে আমাদেরকে নিয়ে এলেন সরকারের অতিথিশালায়। সেই দিনই আমি তাকে কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলাম, যে আমি ব্যক্তিগতভাবে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই, তিনি যেন আমার জন্য সে ব্যবস্থাটুকু করেন।

প্রথম দিনেই দুপুর পর্যন্ত বিশ্রামের পর, চা-পানান্তে বিকেলের দিকে বেড়াতে বেরোলাম। বেশি দূর নয়, এলাম বাগমতীর সেতু পর্যন্ত। দেখলাম, কয়েকটি মন্দির—প্রতিটি মন্দিরের গঠনশৈলী এক। প্যাগোডার মতো।

আজ আর বেশী সময় নয়, সন্ধ্যে হতেই ফিরে এলাম।

ইচ্ছে ছিল পরদিন প্রথমেই শ্রীশ্রীপশুপতিনাথের মন্দিরে যাবো দেব-দর্শন করতে। কিন্তু ইচ্ছে থাকলেও সব সময় সব কিছু হয় না। কিন্তু রাত্রেই ফোন পেলাম মিঃ প্রধানের কাছ থেকে, আগামী কাল সকালে প্রধানমন্ত্রী আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন।

যাই হোক, পরদিন সকালে ট্যাক্সী করে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে এলাম। প্রবেশ-পথেই সান্ত্রী, আমাকে আটকালো। মুখে বললেও, ওরা কিছু শুনেন না। শেষটা মিঃ প্রধানের কাছে আমার নামের কার্ড পাঠালাম। এবারে মিঃ প্রধান নিজে এলেন আমাকে ভিতরে নিতে।

ভিতরে এলাম। প্রশস্ত হলে রাজকীয় আড়ম্বরের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী এম পি কৈরালা উপবিষ্ট। তাঁকে ঘিরে বেশ কিছু লোক-জন। বুঝলাম, এঁরা সবাই শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তি। ঘরে ঢুকবার সময় মিঃ কৈরালা এক নজরে আমাকে দেখেছিলেন।

এবারে মিঃ কৈরালা উঠে দাঁড়ালেন। আমাকে সানন্দে কাছে ডাকলেন। পাশেই একটি সোফা। বসতে অনুরোধ করলেন।

প্রথমেই চিন্তা হলো, কী ভাষায় কথা বলবো, ইংরেজী না হিন্দী। এমন সময় মিঃ কৈরালা পরিষ্কার বাংলায় কথা বলতে আরম্ভ করলেন। তাঁর প্রথম কথা—আপনার কোন অসুবিধে হচ্ছে না তো?

—না, তারপরেই বললাম, বাঃ আপনি এতো চমৎকার বাংলা বলেন।

মিঃ কৈরালা হেসে বললেন, আমি আপনাদের প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র। অনেকদিন কলকাতায় ছিলাম।

তারপর বেশ খানিক সময় কথাবার্তা হলো, বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে চলে এলাম মিঃ প্রধানের সঙ্গে।

অতিথিশালায় এসেই আবার সুধীরাকে নিয়ে মন্দিরে ছোটা।

ট্যাক্সী নিয়ে সরাসরি শ্রীশ্রীপশুপতি-নাথের মন্দিরের সামনে এসে দাঁড়ালাম।

জীবনে পশুপতিনাথের কথা কতোবার শুনেছি। শুনেছি হিমালয়ের দুর্গম পথ পেরিয়ে ভারত ভূখণ্ড থেকে তীর্থযাত্রীদল শ্রীনগর, চন্দ্রগিরির চড়াই পথ পায়ে হেঁটে অতিক্রম করে আসে পশুপতিনাথ দর্শন করতে।

মনের মধ্যে চাপা কৌতূহল নিয়ে মন্দিরের তোরণ পেরিয়ে এলাম। সামনেই বিরাটকায় নন্দীবৃষ আর গরুড়স্তম্ভ—তারপরেই স্বর্ণশীর্ষ পশুপতিনাথের মন্দির।

অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকি। দেবতা নয়—মন্দিরের দিকে। মন্দিরের কারুকার্য দেখে অভিভূত হতে হয়। তারপর রাজেশ্বরের প্রলেপ জড়িয়ে মন্দিরের সর্বাঙ্গে।

লক্ষ্য করলাম, পশুপতিনাথের গঠন-শৈলী প্যাগোডা ধাঁচের। অবাক হয়ে দেখছি সব কিছু।

দাঁড়িয়ে রইলে কেন? সুধীরার জিজ্ঞাসা, দেব-দর্শন করবে না?

—ও, হ্যাঁ। মুহূর্তে নিজেকে সহজ করলাম। —চলো। মন্দিরে এলাম। দর্শন করলাম, ভগবান পশুপতিনাথকে। যুগ যুগ ধরে মন্দিরে বিরাজ করছেন ভগবান। যাঁর দর্শন-মানসে কতো যুগ যুগ আগে থেকে হিমালয়ের দুর্গম পথ পেরিয়ে ছুটে এসেছে মানুষ। দর্শন করেছে দেবতা। কী পেয়েছে জানি না, তবু মানুষ এসেছে দেবতার চরণে ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন করতে।

আমরা করজোড়ে প্রণাম করেছি। পুজো দিয়েছি। কিন্তু কিছুই চাইতে পারিনি। সর্বরিক্ত দেবতার কাছে কী চাইবো! চাইবার তো কিছু নেই। শুধু একটি কথাই বলতে চেয়েছি মনে মনে, হে ভগবান—তোমাকে বিশ্বাস করে যেন শান্তি পাই। আর কিছু নয়।

মন্দির দর্শনান্তে বাগমতীর কাছে এলাম। বাগমতীর ওপর দিয়ে সেতু। ওপারে যাবার পথ। ওপারে টিলা পাহাড় পেরিয়ে সতী-পীঠ গুহ্যেশ্বরী। গুহ্যেশ্বরী এখানে ভৈরবী আর ভৈরব পশুপতিনাথ।

সিঁড়ি পথ দিয়ে টিলায় উঠতে হয়। টিলার ওপরে গোরক্ষনাথজীর মন্দির শুধু নয়, আরো ছোট-বড়ো মন্দির। কেমন যেন শূন্যতা এই সব মন্দিরের পরিবেশ জুড়ে।

এসেছি গুহ্যেশ্বরী মন্দিরে। পুজো দিয়েছি। দর্শন করেছি দেবীকে। বিষ্ণুচক্রে খণ্ডিত সতীদেহের গুহ্যাদেশ পড়েছিল এখানে।

মন্দিরের দেশ নেপাল। এতো মন্দির, এতো দেবতা কোথাও দেখিনি। আর প্রতিটি মন্দিরের গঠনশৈলী একই ধাঁচের। একমাত্র ব্যতিক্রম, পাটনের কৃষ্ণজী মন্দির, আর

স্বয়ম্ভূ মন্দির। স্বয়ম্ভূ মন্দিরের আর এক নাম 'বোধনাথ'।

দেখেছি কাঠমান্ডু ঘিরে কতো শহর আর জনপদ। অবাক বিস্ময়ে দেখেছি, আর একটি কথাই ভেবেছি, দেশটা এখনো অতীতের ঐতিহ্যের কথা ভুলতে পারেনি। সর্বত্র প্রাচীনত্বের ছাপ আর অতীতের গন্ধ। ভালো কি মন্দ জানি না, তবে একটা কথা ঠিক—যদি প্রাচীনত্বের মধ্যে কোন কিছু বৈচিত্র্য থাকে, তবে সে বৈচিত্র্যের সন্ধান পাওয়া যাবে নেপালে।

হিন্দু সংস্কৃতি, বিশেষ করে তন্ত্রের পীঠভূমি নেপাল। যদিও বৌদ্ধ সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটেনি এমন নয়। তবুও হিন্দুত্বের ছাপটাই এখানে সুস্পষ্ট।

কতো মন্দির দেখেছি। তার মধ্যে শহর থেকে দূরে দক্ষিণা কালীর কথাটাই আগে মনে পড়ে। এখানে ডিম পর্যন্ত পূজো দেওয়া হয়। এর মধ্যে আমি নির্বিকারত্বের লক্ষণ খুঁজে পেয়েছি।

আর একটি মন্দির—দেবতা যেখানে ভদ্রকালী, সেটি শহরের প্রাণকেন্দ্রেই অবস্থিত। মন্দির বলতে প্রশস্ত চত্বরের মধ্যে চতুষ্কোণ জায়গায় ছোট একটি মন্দির। সেখানে অধিষ্ঠিতা ভদ্রকালী। যেখানে প্রতিদিন সকালে ও রাত্রেই দেবীর উদ্দেশে নানা ধরনের ভক্তিগীতি এবং রাগ সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়। সকালে এই সঙ্গীতের আসরে আমি প্রায় নিয়মিতভাবে একবার যেতাম।

মন্দিরের মধ্যে বালাজু মন্দিরের প্রসিদ্ধি আছে। পাহাড়ের পাদদেশে এই মন্দিরটি। এখানে জল-শয্যায় শায়িত নীলকণ্ঠের বিশাল মূর্তি—দেবতার প্রতীক।

মচ্ছেন্দ্রনাথের মন্দির শহর থেকে বেশ দূরে ভাতগাঁও-এ। আর এই মন্দিরের যাওয়ার পথটি অত্যন্ত বন্ধুর। সেই বন্ধুর পথ ধরেই গাড়ী চলে। 'নাথ পন্থী' সম্প্রদায়ের অন্যতম পীঠ এই মচ্ছেন্দ্রনাথ। ওই সম্প্রদায়ের মানুষ বাংলা দেশেও বেশ কিছু আছেন। গোরক্ষনাথজী এঁদের ধর্মগুরু।

কাঠমান্ডুর প্রতিটি মন্দির দেখেছি, দেখেছি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থানগুলি। শহরের হনুমান ঢোকা, উপকণ্ঠে ললিতপুর বা পাটন, ওদিকে ভক্তপুর—সবই দেখেছি। দেখেছি ললিতপুরের প্রাচীন দরবার গৃহ। যার কারুকার্যের বৈচিত্র্যের অন্ত নেই। তাছাড়া সবচেয়ে আকর্ষণীয় এইসব প্রাচীন ভবনগুলিতে কাঠের কারুকাজ। কতো দিন গেছে, ইতিহাসের কতো উত্থান-পতন, তবু তার মধ্যেও কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে পুরোনো দিনের এই সব মন্দির, ভবন, আর প্রাসাদ।

পুরোনো দিনের অনেক নিদর্শন দেখা যায়, মিউজিয়মে। যেখানে অতীত ইতিহাসের অনেক স্মৃতি বর্তমান।

তন্ত্রের দেশ নেপালে কালীপূজো দেখলাম। মহা সমারোহে তন্ত্রমতে কালীপূজো অনুষ্ঠিত হয় এদেশে। এই শুভ তিথিটিতে পশুপতিনাথের মন্দিরে গেলাম, দেব দর্শন করতে। এদিনে দেখলাম, দেবতার শৃঙ্গার বেশ। বহুমূল্য রত্নখচিত নানা অলঙ্কারে ভূষিত দেবতা। জানি না, সর্বত্যাগী শঙ্করকে এ বেশে মানায় কিনা। তবুও দেখলাম। দেখলাম শঙ্করারতি। তারপর এলাম বাগমতীর তীরে, যেখানে অন্ধকারের মধ্যে সন্ন্যাসীদের ধুনি জ্বলছে।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিন গেলাম, সুন্দরী জল ঝর্ণা দেখতে। শহর থেকে বেশ কয়েক মাইল দূরে এই সুন্দরী জল। যেখান থেকে কাঠমান্ডু শহরে জল সরবরাহ করা হয়।

এই দিনে যাওয়ার পথে লক্ষ্য করলাম, নেপালের প্রতিটি জনপদ, গ্রাম যেন উৎসবে মেতেছে। ভ্রাতৃদ্বিতীয়া রূপ নিয়েছে সার্বজনীন লোক-উৎসবের। ছেলেমেয়েরা মালা পরেছে, কপালে দিয়েছে চন্দনের টিপ—পথ চলছে গান গাইতে গাইতে। এ উৎসব যেন এক খুশীর উৎসব। তারপর জায়গায় জায়গায় দেখলাম দোলনা করা হয়েছে। দোলনায় দোল খাচ্ছে ছেলে-মেয়েরা—হাসছে, গান গাইছে। নেপালের প্রতিটি ঘরে উৎসবের স্পর্শ।

সুন্দরী জল ঝর্ণা এলাকা সংরক্ষিত। কারণ, এখান থেকে শুধু জল সরবরাহ হয় না, বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয় শহরে। তবুও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ আমাকে কিছুটা দেখার সুযোগ করে দিলে।

শহরে, শহরের বাইরে যা কিছু দর্শনীয়, প্রায় সবই তো দেখা হলো। বাগমতী পেরিয়ে গ্রামীণ পরিবেশে টিলার ওপর লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দির, তা-ও দেখেছি। যতো মন্দির, যতো কিছুর সন্ধান পেয়েছি সবই দেখতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু নেপালে যদি কিছু মুগ্ধ করে থাকে, তবে তা হলো এর প্রাচীন ঐতিহাসিক নিদর্শন, আর মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশ। শহরে-জনপদে দেখেছি ইতিহাসের চিহ্ন আর দৃষ্টি প্রসারিত করলে দেখেছি হিমালয়ের প্রচ্ছদপট। দেখেছি তুষারমৌলী গিরিশিখর, দেখেছি সবুজ অরণ্য। দেখেছি পার্বত্য নদী, ঝর্ণা। আর দেখেছি, উপত্যকার পথে ফসলের ক্ষেত, দেখেছি পরিশ্রমী চাষী কেমন করে পাহাড়ের গায়ে সব্জী ফলায়, দেখেছি দেহাতী কাঠুরিয়া দূরের পাহাড় থেকে কেমন করে কাঠ বয়ে আনে শহরে।

কিন্তু রাজধানী কাঠমান্ডুর বাইরের ঐশ্বর্য দেখে যতোই মন ভরুক না তার চেয়ে অধিক বেদনায় ক্ষত-বিক্ষত হয়েছি। দারিদ্র্যের এমন নির্মম চেহারা যেখানকার সাধারণ সমাজে, সেখানে মুষ্টিমেয় পরিবারের ঐশ্বর্যের প্রকাশে কী আসে যায়।

সাধারণ মানুষের দীর্ঘশ্বাস হয়তো একদিন নেপালের ভবিষ্যৎ রাজনীতিতে বিস্ফোরণ ঘটাবে।

কাঠমান্ডুর দিন ফুরিয়ে এলো। এবারে ফিরে যাবার পালা।

নভেম্বরের শীতের সকালে গোচর বিমানঘাটি থেকে আমরা পাটনার পথে রওনা হলাম। ঐ দিনই বিকালে পাটনা থেকে কলকাতায় ফিরে এলাম।

কলকাতায় ফেরার পর দিনই শ্রীযুক্ত ভাদুড়ীর ফোন পেলাম। সবে বাইরে থেকে ফিরেছি—নাটকের কথায় মন নেই, তবু আবার নাটক নিয়েই কথা আরম্ভ হলো।

বাইরে থাকলে সব কিছু ভুলে থাকা যায়। কিন্তু ফিরে এলই আবার সেই নানা ঘটনার মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে ফেলা।

যাত্রাজগতের নামকরা অভিনেতা এবং সুখ্যাত নাটকার ফণী রায় মারা গেল ১৭ নভেম্বর। 'বান্ধব সমাজে' সে অভিনয় করতো। এক সময় অনেক যাত্রার পালাও সে রচনা করেছে।

পরদিন ১৮ নভেম্বর, শ্রীরঙ্গমে এলাম। শিশিরবাবুর সঙ্গে সেদিন অনেক কথা হলো। আমার কাছ থেকে নেপালের কথা আগ্রহ নিয়ে শুনলেন। তারপর শিশিরবাবু বললেন, মুখ্যমন্ত্রী বিধান রায়ের সঙ্গে জাতীয় রঙ্গশালা নিয়ে আলোচনার কথা। এ ব্যাপারে শিশিরবাবু দৃঢ় মত—সরকার কখনো জাতীয় নাট্যশালার চিন্তাকে রূপ দিতে পারবে না। তবে কথা হচ্ছে হোক।

আমি এ বিষয়ে অনুরূপ মত পোষণ করি। শিশিরবাবুকে সে কথা বললামও। জাতীয় রঙ্গশালার এই পরিকল্পনা, পরিকল্পনা হয়েই থাকবে।

যাই হোক, শিশিরবাবুর সঙ্গে শ্রীরঙ্গমে বিভিন্ন নাটকে অংশ নিচ্ছি। কখনো শাজাহান, কখনো প্রফুল্ল কিংবা অন্য কোন নাটক। যার আকর্ষণ আছে।

একই মঞ্চে শিশিরবাবু আর আমার অভিনয়—এই নিয়ে পত্র-পত্রিকায় এবং নাট্যানুরাগী মহলে নানা ধরনের আলোচনা প্রকাশিত হতে লাগলো। কারণ এর কিছু নয়—শিশির ভাদুড়ী আর অহীন্দ্র চৌধুরী, একই নাটকে একই মঞ্চে অভিনয় করা, এরকম ঘটনা আগে খুব বেশী ঘটে নি। বরং আমরা যেন সাধারণের কাছে বিপরীত শিবিরের অভিনেতা হয়ে উঠেছিলাম। এসম্পর্কে আমার কথা, আমরা একই শিবিরের, আমাদের একই পরিচয়—অভিনেতা। তবে মত আলাদা হলেও পথ আলাদা নয়। ধর্ম আলাদা নয়।

শ্রীরঙ্গমে থাকতে প্রায়ই শিশিরবাবুর সঙ্গে নানা ধরনের সুখ-দুঃখের কথা হতো। শিশিরবাবুর সঙ্গে কথা হওয়া মানে, মঞ্চ কিংবা নাটক নিয়ে। আমাদের দুজনেরই তো নাট্যজগৎপ্রাণ। এই সময়ে কতো কথা হতো। মনে আছে, শিশিরবাবু তখন চোখে কম দেখতেন, অথচ অভিনয়ের সময়ে মঞ্চে এসে দাঁড়ালে কে বলবে যে, উনি চোখে কম দেখেন। এক-একদিন পর্দা পড়লে, ওকে বেশ অসুবিধেয় পড়তে হতো। দেখতাম, হয়তো ওঁকে হাত ধরে নিয়ে যাবার জন্য অনেক সময় কেউ দাঁড়িয়ে থাকতো না। তবে তার জন্যে কারো ওপর উনি অনুযোগ করতেন না।

CENTRAL LIBRARY

মনে আছে, সে যুগে রঘুবীর নাটকের অভিনয় ছিল। রঘুবীর চরিত্রটিতে শিশির-বাবুর অভিনয় ছিল অসাধারণ। আমি করতাম অনন্ত রাও। রঘুবীর চরিত্রে শিশিরবাবু যে দরদ দিতেন, তার তুলনা মেলে না। কিন্তু আজ-কাল বেশ কষ্ট হয় তাঁর। তবুও করেন। মঞ্চে দাঁড়ালে অভি-নেতার জীবনে যে এক শক্তি জন্ম করে। যাই হোক, এই অভিনয়ের সময়ে, মঞ্চে মাঝে আমাকে বলতেন, রাখাল—দেখো, দুঃশা-[illegible] অবস্থা। কী যে কষ্ট হয় এ বয়সে। কিন্তু কী করবো। মনের জোরে আজ করেই চলেছি। এক-একদিন বলেছি, এই দুরূহ চরিত্র আর করেন কেন? বলেছেন, কী করবো। এছাড়া যে দর্শক হবে না। তাই দুঃসাধ্য করে অভিনয় করি।

তারপর আরো কতো কথা হতো এই সময়। প্রায়ই অভিনয়ের অবসরে আমরা কথায় বসতাম। কতো কথা। সেগুলো এখনও মনের মধ্যে বাজে।

জীবন গাঙ্গুলী সে আসরের নায়ক অভিনেতা। বিরাট প্রতিশ্রুতি নিয়ে এসে-ছিলেন। মারা গেলেন ২৮ ডিসেম্বর। অনেক দিন থেকেই টি বি-তে ভুগছিলেন। তাঁদের ছিল অর্থাভাব। যদিও নানাভাবে সাহায্য তুলে তাঁকে হাসপাতালে রেখে চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা হয়েছিল, তবুও কোন ফল ফললো না। হাসপাতালেই তাঁর মৃত্যু হলো।

জীবন গাঙ্গুলীর মৃত্যুতে ব্যথা পেয়ে-ছিলাম সেদিন। আর এ ব্যথার মুহূর্ত তো আমার জীবনে কম আসে নি। আমি তো দেখছি, চোখের সামনে দিয়ে এক-এক করে কতো জন চলে গেল। কিন্তু আমি বসে আছি, যেন অতীতের স্মৃতি বহন করার জন্য।

নানা রঙের দিনের মধ্যেও কতো বেদ-নার রঙ। তবু তার মধ্যে দিন ঠিকই কেটে যায়।

বছরের যে কটা দিন বাকি ছিল কেটে গেল। শেষ হলো ১৯৫০। বছরের শেষ দিন-টিতে বসে বসে একটি কথাই ভাবছিলাম, কবে আমার নাটক নিয়ে খেলা শেষ হবে। আমি আর পারছি না। অভিনয় তো অনেক করেছি, আর কেন?

নতুন বছর যে এমনি দুঃসংবাদ দিয়ে শুরু হবে, এ কী আগে ভেবেছিলাম।

আমার নট-জীবনের আচার্য তিনকড়ি চক্রবর্তী পরলোকগমন করলেন ২ জানু-য়ারী। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর।

তিনকড়িদার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে নাট্য-জগতের এক অধ্যায়ের সঙ্গে বর্তমানের যোগসূত্র যেন ছিন্ন হয়ে গেল। মনে পড়ে পুরোনো দিনের কথা, ভবানীপুরের সেই বান্ধব সমাজের মহড়াভিনয়ের কথা। যেখানে আমার অভিনয়-জীবনের শুরু। তারপর বান্ধব সমাজ থেকে তিনকড়িদার সঙ্গে আর্ট থিয়েটারে যোগ দেওয়া, এবং মঞ্চে অভিনয় শুরু—সবই মনে পড়ে।

তিনকড়িদার মৃত্যুতে আমি দারুণ মর্মাহত হয়েছিলাম।

পরদিনই আর এক দুঃসংবাদ—আমার শ্বশ্রুমাতার মৃত্যু। খবর পেয়েই ছুটে এলাম শ্বশুরালয়ে। শবানুগমন করে এলাম কেওড়াতলা মহাশ্মশানে। শেষকৃত্য সমা-পনান্তে ফিরে এলেম ভারাক্রান্ত মনে।

সময়ের সঙ্গে সব দুঃখই মানুষ ভুলে যায়। কিন্তু সাময়িকভাবে সে দুঃখ যেভাবে জড়িয়ে থাকে, তাতে বড়ো কষ্ট হয়।

কিন্তু নটজীবনের আনন্দ বোধহয় বাইরের সব দুঃখ কষ্টকে দূরে সরিয়ে দেয়।

আমার নট-জীবনের শেষ অধ্যায় চলেছে। এখন মনস্থির করে ফেলেছি এবারে অবসর নেব।

যে সময়ের কথা বলছি, তখন শ্রীরঙ্গমে চন্দ্রগুপ্ত, আর স্টারে সমারোহের সঙ্গে শ্যামলী অভিনীত হচ্ছে। শ্যামলীর অন্য-তম আকর্ষণ উত্তমকুমার আর সাবিত্রী চ্যাটার্জি। এরই মধ্যে অভিনেতা রবি রায় যোগ দেবার জন্যে আমন্ত্রণ জানিয়ে গেল। তারই কাছে শ্যামলীর সাফল্যের কথা শুনলাম।

মহাকবি গিরিশচন্দ্রের অন্যতম সৃষ্টি বলিদান। বলিদান নতুন করে শ্রীরঙ্গমে মঞ্চস্থ হলো। যাতে করুণাময় চরিত্রে ছিলেন শিশিরবাবু স্বয়ং, আর আমি ছিলাম রূপ-চাঁদের ভূমিকায়।

আগেই বলেছি এ বছরটা শুরু হয়েছে দুঃসংবাদ নিয়ে। আবার মর্মান্তিক দুঃসংবাদ পেলাম ২১ জানুয়ারী। নাট্যকার অভিনেতা মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বিকল হওয়াতেই তাঁর এই আকস্মিক মৃত্যু। চোখের সামনে দেখছি, এক-এক করে কতো জন চলে যাচ্ছে। কতো পরিচিত মুখ আজ হারিয়ে যাচ্ছে মঞ্চের পাদ-প্রদীপের আলো থেকে। কিন্তু আমরা যারা আছি, তারা এদের স্মৃতিকে বহন করবো জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত।

জীবনে পরিচিত মানুষের হারিয়ে কেমন যেন নিঃসঙ্গ মনে হয়। মনে হয়, আমারো থাকার অধিকার যেন ফুরিয়ে এসেছে। কিন্তু তবু তো থাকতে হবে। ছুটি চাইলেও তা ছুটি পাওয়া যায় না। এই তো মনে করছি: অভিনয়জগত ছেড়ে যাবো তাই বা পারছি কই। কতো জন জীবনের মঞ্চ ছেড়ে অন্য জগতে চলে যাচ্ছে।

ছেড়ে যাবো বলছি, অথচ অভিনয় করছি, বিভিন্ন নাটকে। কখনো মিশরকুমারী, কখনো ভোলামাস্টার কখনো অন্য কোন নাটক।

এরই মধ্যে পশ্চিমবাংলার প্রচার অধি-কর্তা প্রকাশস্বরূপ মাথুরের কাছ থেকে চিঠি পেলাম। চিঠিতে জানানো হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় আমার সঙ্গে দেখা করতে চান।

সেইমতো এপ্রিল রাইটার্স বিল্ডিংসে মুখ্য-মন্ত্রীর দপ্তরে গেলাম। সেখানে উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন প্রকাশস্বরূপ মাথুর, অজয় গাঙ্গুলী, চীফ সেক্রেটারী এস এন রায়, ডাঃ ডি এম সেন। এখানে ডাঃ রায়ের সঙ্গে আলোচনা শুরু হলো। ডাঃ রায়ের ইচ্ছা, সঙ্গীত, নাটক আকাদমীর আঞ্চলিক সংস্থা গঠিত হোক কোলকাতায়। আর নাটক শাখার দায়িত্বটা যাতে আমি গ্রহণ করি, সে অনুরোধও এলো। ডাঃ রায়ের ইচ্ছায় আপত্তি করলাম না। তারপর ডাঃ রায় জানা-লেন, নাট্যশিক্ষার জন্য একটা পাঠ্যক্রম তৈরী করা হোক। আর সে দায়িত্বও আমার ওপরেই পড়লো।

সেদিন ডাক্তার রায়ের সঙ্গে আলোচনান্তে বাড়ি ফিরেছি। ভাবলাম, হয়তো এবারে সঙ্গীত নাটক আকাদমী উপলক্ষ্য করে অভিনয়জগত ছাড়তে পারবো।

এরই মধ্যে আকাদমীর জন্যে নাটকের সিলেবাস তৈরি করে প্রচার-অধিকর্তা মাথুরের কাছে দিলাম। তার কদিন বাদেই আবার একদিন রাইটার্সে গেলাম মাথুরের কাছে। সেখানে আগে থেকেই উপস্থিত ছিলেন নৃত্যশিল্পী উদয়শঙ্কর এবং অমলা-শঙ্কর। সেদিন নানা আলোচনার মধ্যে নাট্য-চর্চার জন্য অধ্যাপক নিয়োগ সম্পর্কে কথা হলো। ঠিক হলো সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়ে উপযুক্ত অধ্যাপক নিযুক্ত করা হবে। সে দায়িত্বটাও আমার ওপর।

যাই হোক, আকাদমীর প্রাথমিক কাজ ইতিমধ্যে আরম্ভ হয়ে গেল। ভালোই হলো, এবার আকাদমী নিয়ে পড়বো। এতোদিন মঞ্চজগৎ ত্যাগ করবো ঠিক করেছি, এবার সত্যি ত্যাগ করতে পারবো।

আজকাল মাঝে মাঝে নানা অনুষ্ঠানেও আমাকে যোগ দিতে হয়। সেদিন ১ আগস্ট দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণ মহামণ্ডলের আন্তর্জাতিক অতিথিশালায় গিরিশ তর্পণ অনুষ্ঠানে গেলাম। যে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বর্ষীয়সী অভিনেত্রী নরী-সুন্দরী। যিনি গিরিশচন্দ্রের কাছে অভিনয়ের হাতেখড়ি নিয়েছেন, সেদিনের অনুষ্ঠানে প্রখ্যাত নাট্যসমালোচক ডঃ হেমেন দাশ-গুপ্ত ছিলেন অন্যতম বক্তা।

সেদিনের অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে একটি কথা মনে পড়ে। আমি কি ভাষণ দেব, ভাবি নি। অথচ ঠাকুরকে স্মরণ করে ভাষণ শুরু করেছিলাম। নিজেই বুঝতে পারিনি, কোন প্রেরণায় সেদিন অমন ভাষণ দিতে পেরেছিলাম। সত্যি, সেদিন আমি মনে মনে ভেবেছিলাম, কোন ঐশী প্রেরণা ভিন্ন এ ধরনের ভাষণ আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব ছিল না।

অনুষ্ঠান আজকাল লেগেই আছে। কদিন বাদেই আবার ল্যান্সডাউন রোডে ইউ এস এ থিয়েটার আর্টসের প্রতিনিধিদের সম্বর্ধনা সভায় আমাকে যেতে হলো। সেখানে সভাপতি ছিলেন ডঃ কালিদাস নাগ।

মাথার মধ্যে আকাদমীর চিন্তাটাই বড়ো। তবুও নাটকের ভাবনা নেই এমন নয়। বেশ বুঝতে পারছি এবারে সত্যিই অভিনয়জগতের সঙ্গে আমার বন্ধনটা শিথিল হয়ে আসছে।

(ক্রমশঃ)

CENTRAL LIBRARY

বিজ্ঞানের কথা

পরিবেশ ও জলবায়ু সম্পর্কে

পৃথিবীটা ক্রমেই মনুষ্যবাসের অনুপযোগী হয়ে উঠছে। আর সেজন্য দায়ী অন্য কেউ নয়, মানুষ। বিষয়টি নিয়ে বিশ্বের বিজ্ঞানী মহল আলোচনায় মুখর। নানা জনে নানা পাল্টা ব্যবস্থার কথা বলছেন। বলা বাহুল্য, যে-যে কারণে পৃথিবীকে মনুষ্যবাসের অনুপযোগী মনে করা হচ্ছে তা দূর করাটাই আসল কথা, যদি অবশ্য মানুষের সাধ্যাতীত না হয়। প্রধান কারণ দুটি—পরিবেশ বদলে যাওয়া ও জলবায়ু দূষিত হয়ে যাওয়া। পরিবেশ কেন বদলাচ্ছে? জলবায়ু কেন দূষিত হচ্ছে? মানুষ কি এখন ইচ্ছে করলেই পরিবেশের বদল ও জলবায়ুর দূষিত হওয়া বন্ধ করতে পারে? বিজ্ঞানীদের মতে, পুরোপুরি নয় তবে এমন মাত্রা পর্যন্ত নিশ্চয়ই যাতে এই পৃথিবী মনুষ্যবাসের অনুপযোগী না হয়। বিষয়টির গুরুত্ব আমাদের দেশের পক্ষেও সর্বাধিক। কেননা, পরিবেশ বদলানো ও জলবায়ু দূষিত করার ব্যাপারে কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমরা এমন একটা অবিবেচনার পরিচয় দিয়ে থাকি যে মনে হতে পারে আমরা ধরেই নিয়েছি মনুষ্যের ভবিষ্যৎ বলে কিছু নেই। আমেরিকার বিজ্ঞানীরা যখন বিষয়টি নিয়ে শোরগোল তোলেন তখন ধরে নিতে হয় যে যা-কিছু ব্যবস্থা নেওয়া মনুষ্যের সাধ্যের মধ্যে তা নেবার পরের অবস্থার কথা বিবেচনা করা হচ্ছে।

পরিবেশ বদল

ভূপৃষ্ঠের বিরাট বিরাট এলাকা জুড়ে মানুষ বসতি গড়ে তুলছে, এ-দৃশ্য আমাদের কাছে খুবই পরিচিত। ফলে প্রাকৃতিক পরিবেশটি অতি দ্রুত বদলে যায়। বসতি মানে তো শুধু বাসস্থান নয়, সঙ্গে সঙ্গে থাকে খামার ও কল-কারখানা। ফলে বিরাট এলাকা জুড়ে অরণ্য লোপ পায় ও কল-কারখানার দূষিত রাসায়নিক পদার্থে বায়ুমণ্ডল কলুষিত হয়ে ওঠে। গত অনেক-শো বছরে এমনিভাবে ভূপৃষ্ঠের পরিবেশে বড়ো রকমের বদল ঘটে গিয়েছে। পরিবেশগত এই বদলকে বড়ো রকমের একটি বিপ্লবের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। এ-বিপ্লব প্রাকৃতিক কারণে ঘটেনি, ঘটেছে মানুষেরই কার্যকলাপের ফলে। পৃথিবীতেই জীব মানুষ—যে প্রাকৃতিক পরিবেশে তার জন্ম ও বড়ো হয়ে ওঠা, তার জীবন-ধারণের তাগিদেই তার অস্তিত্ব লোপ পায়।

এ-ধরনের ব্যাপার এই প্রথম ঘটল তা নয়, পৃথিবীর ইতিহাসের দিকে তাকালে তুলনীয় নজির পাওয়া যায়। পৃথিবীর ইতিহাসের গত একশো বছরের ইতিহাসে এমনি বিপ্লব একাধিক। এমন কথাও বলা চলে, অতীতের ইতিহাসে প্রাকৃতিক পরিবেশের বদল ঘটেছে আরও অনেক ব্যাপকভাবে। তবে এত দ্রুত কখনোই নয়।

ডাঙায় উদ্ভিদ জন্মাতে শুরু করেছিল আজ থেকে প্রায় ৪০ কোটি বছর আগে। কিন্তু কার্বনিফেরাস কালে (৩০ থেকে ৩৫ কোটি বছর আগে) ডাঙায় জন্মাত যেমন এসেছিল প্রাচুর্য তেমনি বৈচিত্র্য। মাটির নিচে বড়ো বড়ো কয়লার খনি তৈরি হওয়ার সূত্রপাত এখন থেকেই। প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্যে ভরা এই উদ্ভিদ-জগতের লোপ পাবার কারণ কি? পরিবেশ কি বদলে গিয়েছিল? বিজ্ঞানীদের মতে, তাই। প্রচুর পরিমাণে উদ্ভিদ সৃষ্টি হবার ফলে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইডে টান পড়েছিল, সমুদ্রের ক্ষারীয়তা বেড়ে গিয়েছিল—সম্ভবত এই কারণেই আজ থেকে ২২·৫ কোটি বছর আগে এমন অস্বাভাবিক রকমের ব্যাপক একটি ধ্বংসকাণ্ড।

এ-ধরনের ঘটনা আরো অনেক।

জীবের সৃষ্টি ও ক্রিয়াকলাপের ফল কী, এক-একটি বিশেষ কালের সেডিমেন্ট বা পললে তার ছাপ পাওয়া যায়। ৩০০ কোটি বছর বা তারও আগের পাললিক শিলার সন্ধান পাওয়াটা অসম্ভব ব্যাপার নয়, তখন থেকে শুরু করে যে-সময়ে প্রাকৃতিক পরিবেশের ওপরে জীব-জগতের ক্রমবর্ধমান প্রভাব পড়তে শুরু করে—এই গোটা সময়কালেরও।

ভূ-পৃষ্ঠের বড়ো এলাকা জুড়ে রয়েছে এই পাললিক শিলা। কয়লা থেকে যে জ্বালানী পাওয়া যায় তার উদ্ভব এই শিলায়। বহু প্রকারের প্রাকৃতিক সম্পদও পাওয়া যায় এই শিলা থেকে। প্রাকৃতিক পরিবেশের দিক থেকে পলল সেডিমেন্টকে যদি ব্যাখ্যা করতে হয় তাহলে জানা দরকার অতীতের ও বর্তমানের পরিবেশে জীবের ক্রিয়া কতখানি।

একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। ভূ-বিজ্ঞানীরা বলে থাকেন, আলবার্টার তেল ও গ্যাসের বেশিটা উদ্ভব ৩৬ কোটি বছর আগেকার ডেভোনিয়ান কালের 'প্রবাল-স্তর' থেকে। কিন্তু খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করলে টের পাওয়া যাবে, আজকের দিনের প্রবাল-স্তর একেবারেই পৃথক। বিষয়টির বিচার হওয়া দরকার ক্রম-বিকাশের দৃষ্টিকোণ থেকে।

পাললিক শিলার স্তর থেকে জীব-জগতের ক্রম-বিকাশগত প্রমাণগুলো সংগ্রহ করে করে যদি একটি ছকের মধ্যে ফেলা ধরা হয়, তাহলে চোখে পড়বে, ক্রম-বিকাশের ব্যাপারটি খুব একটা নিয়মবদ্ধ ব্যাপার নয়। জীব-জগতে অনেক বড়ো বড়ো দল একেবারেই লোপ পেয়েছে, অথচ কেন লোপ পেয়েছে তার ভালো কোনো ব্যাখ্যা নেই। কখনো কখনো এমনও চোখে পড়বে, নতুন যারা আসছে তারা বাতিল-হওয়াদের চেয়ে কোনদিক থেকে শ্রেষ্ঠ তার স্পষ্ট কোনো হদিশ নেই। কখনো কখনো একদল জীব লোপ পাচ্ছে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অন্য স্থানে অপর একদল জীবের আবির্ভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হক। আজ থেকে ৬০ কোটি বছর আগের একদল জীবের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে যাদের বলা হয় আর্কিওসায়াথিডা। দেখতে অনেকটা স্পঞ্জের মতো। তারা একসময়ে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে, আবার এক সময়ে শেষ হয়ে যায়। আর্কিওসায়াথিডার অবশেষ থেকেই সাইবেরিয়া ও অস্ট্রেলিয়ায় শত-শত ফুট চুনাপাথরের সৃষ্টি। ক্যামব্রিয়ান কালের মাঝামাঝি সময়ে (আজ থেকে প্রায় ৫৪ কোটি বছর আগে) এই জীবকুলের অস্তিত্ব শেষ। কিন্তু উষ্ণ ও অগভীর সমুদ্রের যে এলাকাটি এই জীবের অধিকারে ছিল তা পরবর্তী আট কোটি বছর ধরে শূন্য থেকে যায়। একেবারে গোড়ার দিকের প্রবালের আবির্ভাব আরও পরে।

যে-কটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হল সব ক্ষেত্রেই জীবের ক্রিয়ার ফলে পরিবেশের বদল ঘটেছে বটে, কিন্তু কোনো ক্ষেত্রেই পরিবেশের ওপরে জীবের কোনো কর্তৃত্ব ছিল না। মানুষ নামক জীবের ক্রিয়ার ফলেও পরিবেশের বৈপ্লবিক বদল ঘটেছে, কিন্তু এখানে পরিবেশের ওপরে এই জীবটির কিছুটা কর্তৃত্বও থেকে গিয়েছে। কাজেই পরিবেশের এই বৈপ্লবিক বদল মানুষ নামক জীবকে কোন পরিস্থিতির

আর্কিওসিয়াথিডস-এর ফসিল, সেই সঙ্গে চুনা পাথর। নীচের দিকে জীবন্ত অবস্থায়।

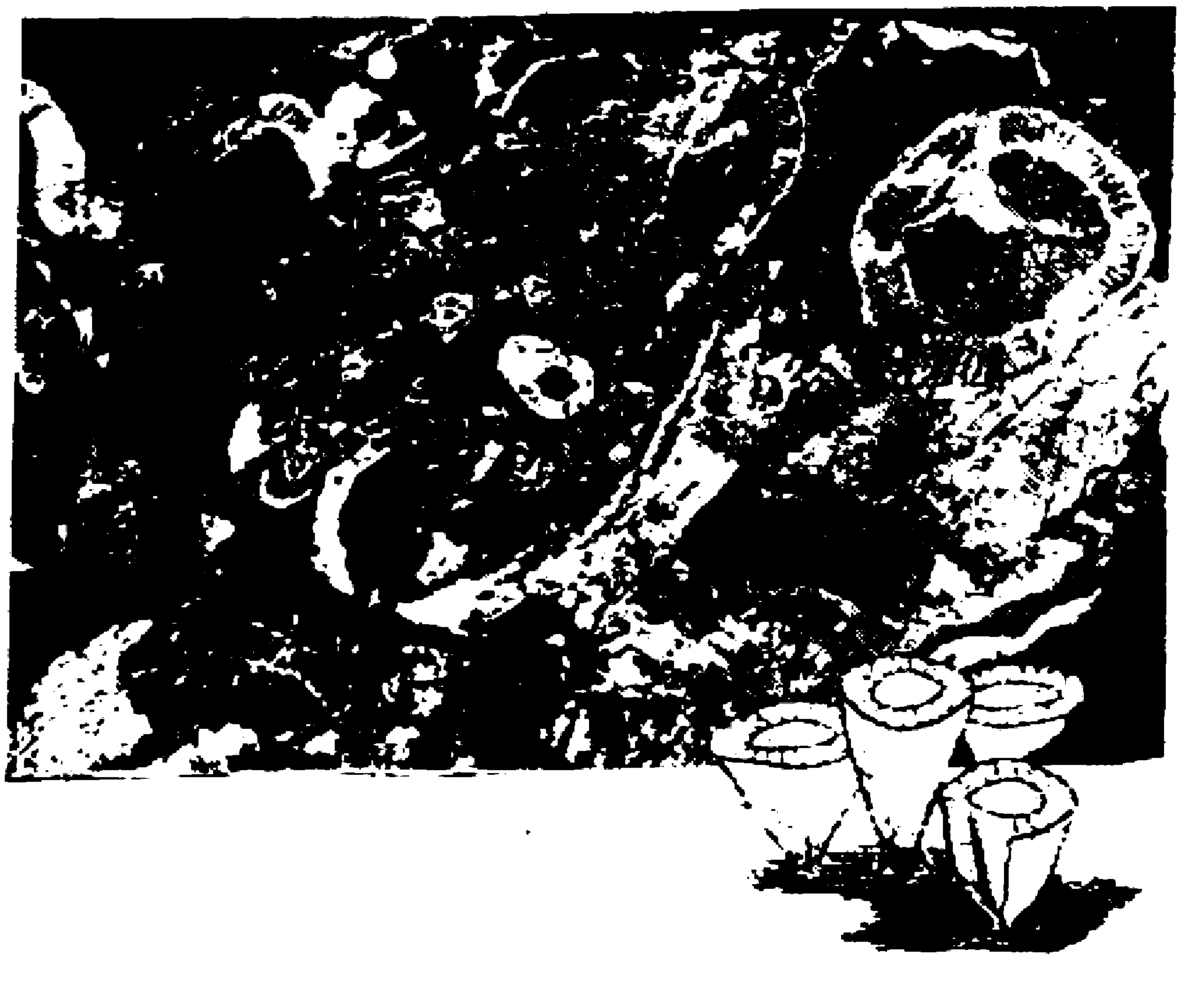

দিকে নিয়ে যাবে, তা কৌতূহলের বিষয়। নতুন কোনো পরিবেশগত বিন্যাস কি আসন্ন? কেননা পরিবেশ হচ্ছে মূলত জৈবিক ক্রিয়া-কলাপেরই ফল।

জলবায়ু দূষিত হওয়া

কলকাতা গড়ে ওঠার ফলে জলবায়ু দূষিত হচ্ছে, এ এক ভয়ংকর খবর। অতএব এই মুহূর্তেই কিছু করা দরকার। এই একটি কাজ এখনো থেকে গিয়েছে যা নিয়ে কারও বিপরীত মত থাকার কথা নয়। পুজোর আগে কলকাতার মেয়র কলকাতাকে আবর্জনামুক্ত করার কাজে হাত দিয়ে সকলেরই সমর্থন পেয়েছিলেন (আমার নিজের ব্যক্তিগত ধারণা, যতোদিন কলকাতার লোক ভাত খাবে ও শালপাতার ঠোঙা রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলবে, ততোদিন কলকাতাকে আবর্জনামুক্ত করা কিছুতেই সম্ভব নয়)।

তথাপি কলকাতা তথা বিশ্ব যদি আবর্জনামুক্ত হয়, তাহলে তার চেয়ে কাম্য আর কিছু হতে পারে না। অথচ খানিকটা দূরদৃষ্টি, খানিকটা উদ্যম, খানিকটা সংযম ও সঠিক চিন্তাশীলতা নিয়ে অগ্রসর হলে এই বিশ্বকে অবশ্যই আবর্জনামুক্ত করা চলে—যে অবস্থা বর্তমানে নেই, অতীতেও ছিল না।

বিজ্ঞানীদের মতে, বর্তমান বিশ্বে সবচেয়ে বড়ো আবর্জনা হচ্ছে নিউক্লিয়র শক্তি উৎপাদনের জন্যে যে নিউক্লিয়র বিস্ফোরক ব্যবহার করা হচ্ছে তার দরুন সৃষ্ট তেজস্ক্রিয়তা। [illegible] বাসযোগ্য করে যেতে হলে এই আবর্জনাকে সবচেয়ে আগে পরিষ্কার করা দরকার।

তেজস্ক্রিয়তার ছোঁয়াচ বড়ো ভয়ংকর ব্যাপার, আরো বিশেষ করে ভয়ংকর এ-কারণে যে আমাদের ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে এই বিপদ সম্পর্কে আমরা অবহিত হতে পারি না। অথচ যন্ত্রের সাহায্য নিলে অতি সহজেই অবহিত হওয়া যায়। যন্ত্রের নাম গাইগার কাউন্টার, তেজস্ক্রিয়তার ছোঁয়াচটুকুও এই যন্ত্রে ঠিক ঠিক সাড়া জাগায়। এও জীবন এক অস্বস্তিকর ব্যাপার। ইন্দ্রিয় দিয়ে ধরা যাচ্ছে না অথচ গাইগার কাউন্টারে ঠিক ঠিক সাড়া জাগাচ্ছে!

আবার এটা একটা স্বস্তির ব্যাপারও। যন্ত্র দিয়ে যা ধরা যাচ্ছে তার বিরুদ্ধে সতর্কতা কেন সম্ভব হবে না? সামান্য একটা যন্ত্র দিয়ে যা ধরা যাচ্ছে তাকে ঠেকিয়ে রাখাটাও খুব একটা অসামান্য ব্যাপার হবার কথা নয়।

বিপদের কথাই যদি ওঠে তাহলে জীবনের চেয়ে বিপজ্জনক আর কী আছে! জীবাণুর কথা ধরা যাক। দুটি জীবাণু হয়তো চেহারায় অভিন্ন কিন্তু ক্রিয়ায় বিপরীত। একটি থেকে হয়তো ওষুধ তৈরী হচ্ছে, অপরটি থেকে বিষ। অথচ দুয়ের মধ্যে রাসায়নিক পার্থক্য হয়তো পারমাণবিক বিন্যাসের সামান্য হেরফের। তবুও, কোনটির ক্রিয়া কী প্রকারের, তা জানাটা বহু বছরের গবেষণা সাপেক্ষ।

তেজস্ক্রিয়তার ছোঁয়াচ নিয়ে কিন্তু এতটা ঝামেলা নেই। ধরা যাক কোনো একটি ক্ষেত্রে তেজস্ক্রিয়তার ছোঁয়াচ লেগেছে। তার ফলটি কিন্তু সকল ক্ষেত্রে একই প্রকারের—সেই ছোঁয়াচ আলফা কণা বা বিটা কণা বা গামা কণা বা কসমিক রশ্মি বা অন্য যে-কোনোটিই হোক। কাজেই তেজস্ক্রিয়তার ফলগুলো অনেক বেশি সহজে এবং অনেক বেশি সম্পূর্ণ ও নির্ভরযোগ্য ভাবে জেনে নেওয়া যেতে পারে।

এখন একটি কথা পরিষ্কারভাবে জেনে নেওয়া দরকার। পৃথিবীর জীব কোনো সময়েই তেজস্ক্রিয়তার ছোঁয়াচ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকে নি—এখন তো নয়-ই, অতীতেও নয়। এমনকি আমাদের পূর্ব পুরুষেরা যারা গাছের ডালে বাস করত বা চার পায়ে ঘুরে বেড়াত বা সমুদ্রের জলে সাঁতার [illegible]—তারা সকলেই কিছু না কিছু মাত্রায় তেজস্ক্রিয়তার ছোঁয়াচের মধ্যে পড়েছে। কোথাও সামান্য একটু বেশি, কোথাও সামান্য একটু কম, কিন্তু কোথাও এমন মাত্রায় [illegible] নয় যা ক্ষতিকর। পৃথিবীতে মানুষ আসার পর থেকে এতকাল পর্যন্ত তেজস্ক্রিয়তার মাত্রায় মোটামুটি কোনো হেরফের ঘটে নি। মোটামুটি স্থির একটি মাত্রা বজায় ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক শক্তি কমিশনের মতে এই মাত্রা দ্বিগুণ না হওয়া পর্যন্ত মানুষের শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর নয়।

অতএব আমাদের করণীয় এটুকু যে তেজস্ক্রিয়তার ছোঁয়াচকে এমন একটি মাত্রায় ধরে রাখা যাতে তা ক্ষতিকর না হয়। জলবায়ুকে পরিষ্কার রাখার এই হচ্ছে একটি উপায়—যতোই কেননা পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটিয়ে পরমাণু শক্তি উৎপন্ন হোক।

নিষিদ্ধকরণের কথা বলা হচ্ছে না। তাহলে তো অনেক কিছুই নিষিদ্ধকরণের কবলে পড়ে। মোটরগাড়ি চলতে দেওয়া চলে না, কলকারখানা বন্ধ করতে হয়, ইত্যাদি ইত্যাদি। সেক্ষেত্রে ছিটেফোঁটা শিল্প মাত্র বজায় রাখা চলে।

আশা করা চলে ভবিষ্যৎ তার চেয়েও উজ্জ্বল। পারমাণবিক শক্তির সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে, বিদ্যুৎ হবে অনেক সস্তা, বিদ্যুতের সাহায্যেই মোটরগাড়ি চলবে ও উত্তাপ সৃষ্টি হবে, তেল ও কয়লা পোড়াবার কোনো প্রয়োজন থাকবে না। বিদ্যুতের সাহায্যে আরো সস্তায় ও পরিষ্কার পদ্ধতিতে সস্তায় অ্যালুমিনিয়ম তৈরি হতে পারবে।

অর্থাৎ, বোঝা যাচ্ছে, জল ও হাওয়াকে পরিষ্কার রাখতে হলে বিদ্যুৎ সরবরাহ হওয়া চাই প্রচুর পরিমাণে ও অল্পমূল্যে। তা হতে পারে পারমাণবিক তেজের সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হলে। পারমাণবিক চুল্লীর উদ্দেশ্য যদি হয় শান্তিপূর্ণ তাহলে তা অবশ্যই কাম্য—আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যেই তার প্রয়োজন আছে।

—অমলকান্ত

সামান্য ভালোবাসা

অজিত মুখোপাধ্যায়

জমজমে কালো মেঘলা অন্ধকার মাঝে-মাঝে ভারী দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ে, ঠিক তানের গায়ের ওপর যেন। তান চমকে-চমকে ওঠে। চারিদিকে দেখার চেষ্টা করে লম্ফের আলোতে। কাউকে দেখা যায় না। বায়ুকোণ থেকে আর্দ্র বাতাসের ঝাপটা আসার সময় মনে হয় কোনো মেয়ে উড়ন্ত আঁচলের পত-পত শব্দ করে ছুটে আসছে। কেউ আসে না। কলাপাতাগুলো বাগানে কাঁপতে থাকে।

কে যেন আছে...তান বুঝতে পারে না। তাকে চক্কর দিচ্ছে...তার চতুষ্পার্শ্বে সঞ্চরণ করছে...ঘন অন্ধকার নামলেই কে যেন ওপর থেকে তার গালে শীতল দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

হঠাৎ কে মাটি থেকে আকাশ পর্যন্ত বিশাল আকারে দাঁড়িয়ে পড়ে। ঘোর বর্ষার দিনে এই রকম বিশাল ছায়া সে অনেকবার দেখেছে। ঝিরঝিরে, কি ঝম-ঝমে বর্ষার রাত্রে লম্ফ হাতে যখন একা-একা হোস্টেলের পাট চুকোতে থাকে তখন সে কতবার বলে ওঠে, কী, কী বলছ?

ঘরে গিয়ে তান প্রশ্ন করে, তুমি ডাকছিলে, না?

উত্তর আসে ভবেশের নাসিকাগর্জন।

কোনো কোনো দিন ভবেশ জেগে থাকে...উশখুশ করে...তন্দ্রাজড়িত অস্ফুট শব্দ করে মুখে, উঁ...উঁ......

কেন সে চমকাচ্ছে ইদানীং। তান ভিতু নয়...তার দুরন্ত সাহস। কত জায়গা সে ঘুরেছে...শ্মশান-মশানে গেছে রাত-বিরাতে। এ গাঁয়েও তার কেটে গেল পুরো দুটি বছর......

ঘরের লোকটিকে যখন তান কদর করত তখন সে এই অপ্রাকৃত জগতের সন্ধান পায় নি...যে দিন ওই লোকটাকে দেখে তার গা শিরশির করছে, তারপর থেকেই গাঢ় অন্ধকার তার সঙ্গে মস্করা শুরু করেছে, হাড়-জ্বালানো মস্করা।

হোস্টেলের কপাটে তালা বুলিয়ে শোবার ঘরে ঢুকতে গিয়ে উপুড়-করা বালতিটাতে লাথি মেরে বসল তান। বালতিটা উঠোনে পড়ে ককিয়ে উঠল।

মশারীর পর্দা তুলে মুখ বাড়াল ভবেশ, কনুইয়ে ভর দিয়ে শব্দের কারণ অনুমান করার প্রয়াস পেল। নেমে পড়ল বিছানা থেকে।

বারান্দায় এসে ভবেশ বলল, সাহায্য করব!

তানের হাতে এ'টো বাসনের বাণ্ডিল। আজকাল ছে'সেলে কিছু রাখার জো নেই রাত্রে চুরির ভয় বেড়েছে খুব......

তান কেন শুনতেই পায় নি......

ভবেশ আবার প্রশ্ন করল, কী, সাহায্য করব।

থাক্। আমাকে আর সাহায্য করতে হবে না......

তানের গলায় বিরক্ততা ভবেশ টের পেয়ে মৃদু স্বরে বললে, আমাকে সাহায্য কে করে!

তোমাদের অবসর আছে...ছুটি আছে... শরীর খারাপ আছে...আমি আর পারছি না...আমাকে পিসির বাড়ি পাঠিয়ে দাও!

এই চাষের সময়।

হাঁ...চাষের সময়।

দপ করে রেগে উঠল ভবেশ, চিরকেলের মত যাবি?

চিরকেলের মত।

কিছুক্ষণ ভবেশ নিজের খুতনিতে চিমটি কাটতে লাগল, পরে সে খুব নিজের কপালে হাঁসকল দিয়ে আবার এল তক্ত-পোষের কাছে। কোলঙ্গা থেকে দেশী বাণ্ডিল বিড়ি নিয়ে তানের হাতে-ধরা লম্ফের আলোর শিখায় বিড়ি ধরাতে লাগল।

কপালের ঘামে চোখ করকর করছে, চাষের সময় চাষী সে-ঘাম মুছে ফেলার সময় পাবে না। চাষী-বৌও কাঁচ শরীর জমা চাপাতে পারবে না, পরিশ্রমের তাতে। শক্ত চাষীর ঘরের লোক চাই সমান শক্ত। নইলে চাষ উঠবে লাটে।

সামনের দুয়ারে পাটার পর পা ধুয়ে এল তান। খসড়ে-খসড়ে গামছায় পা মুছল। ওপাশের চালা থেকে বুড়ি শাশুড়ি নীরদার নাসিকাগর্জন ভেসে আসছে। কদম গাছের তলায় দুর্বনের পাখসাটের শব্দ, ঝিঁ-ঝিঁ ও ব্যাঙের ডাক আকাশ জুড়ে।

লম্ফটা কোলঙ্গায় গুঁজে দিয়ে তান সরল দৃষ্টিতে ভবেশকে বলল, নথ এনেছ?

গাল চাপড়ে ভবেশ বলল, হাই দ্যাখ!

আধ-ছেঁড়া মাদুরটা টেনে নিয়ে তান ভিতর দুয়ারে পাতল ফরফর শব্দ করে, ছুটে গেল ভবেশ তানের পিছু-পিছু। তানের চিবুক আকর্ষণ করে ওর মুখ ফেরাতে গেল ভবেশ। ভবেশের হাত কামড়ে ধরল তান।

ছাড়-ছাড়, ছাড় বৌ...আর্তনাদ করে উঠল ভবেশ।

ঘরে গিয়ে লম্ফের আলোতে তান হাতটা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখল ভবেশ। দাঁতের দাগ বসে গেছে। দাগের কোলে-কোলে ফুলে উঠেছে মাংস।

নথের জন্য এই সাজা!...বাঁ হাতে লম্ফ নিয়ে বাইরে আসতে-আসতে স্বগতোক্তি করল ভবেশ।

পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে তান...ওর মুখের পাশে লম্ফ নিয়ে গেল ভবেশ। তান মুখ দেখাতে চায় না...বারবার সে মুখ লুকোচ্ছে। সজোরে ভবেশ তানের কাঁধ চেপে ধরে আলোটা নাকের দিকে তুলে ধরতেই ভবেশ দেখতে পেল, তান কাঁদছে।

কী দিয়েছ তুমি? তোমার তো একটা বিনি মাইনের ঝি আছে, যা বলবে করবে তাই! কী দিয়েছ...একটা নথ...যার কুনো দাম নাই! সেটা পর্যন্ত নিয়ে আসতে পারলে না!

পারলু না, পারলু না কে কইলে?

এনেছ? এনেছ কিনা বল!...উঁচু পর্দায় তান চেঁচিয়ে উঠল।

পরের হাটে......

আর কুনো হাটে আনতে হবে না। যদি আন তো ছেলের মাথা খাও।

হো-হো করে হেসে উঠল ভবেশ... আজ অবধি তাদের কোনো সন্তানই হল না।

তানের হাত ধরে ভবেশ মৃদু আকর্ষণ করল...চ...চ বৌ। ভুতে ধরবে। তোর আবার উদলা চুল......

চুল বাঁধে নি তান, সিঁদুর পরে নি কপালে অথবা সিঁথিতে...চোখে কাজল টানে নি...সময়ের অভাবে নয়, স্বেচ্ছায় সে নিজেকে সুসজ্জিত করতে চায় নি।

ঘরে চিড়-বিড়ে গরম। আমি ঘরে শুতে পারব না...তান মাদুরে বসে শরীর এলিয়ে দিল...মাটির বারান্দা...চুলগুলি ধুলোয় আর কাদায় লুটোপুটি খেয়ে [illegible]। সন্ধ্যেবেলার প্রবল বর্ষণের ছাটে মাটির ঘরে বারান্দায়— সর্বত্রই, কোথাও না কোথাও, ডোবাগুলিতে জল জমে কাদা হয়েছে।

হাতের লম্ফটা ইতস্তত সঞ্চালিত করতে-করতে তীক্ষ্ণ স্বরে ভবেশ আচমকা বলল, কেঁনদাই! কেঁনদাই গো!

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল না তান। অথচ কেন্নাই ব্যাঙ বা কেঁচো প্রভৃতি কিম্ভূতদর্শন প্রাণীগুলিকে সে বড় ভয় করে।

তান বিবাগী গলায় বললে, থাকুক গে......

বেশীক্ষণ সে চুপচাপ পড়ে রইতে পারল না। মাথা তুলে এদিক-সেদিক দেখতে লাগল...শেষে কেন্নাইটাকে শাড়ির আঁচল ছুঁড়ে তাড়িয়ে দিয়ে আবার শুয়ে পড়ল।

দালান গিটতে হবে না? টালি বসাতে হবে না?...কৈফিয়ৎ পেশ করল ভবেশ।

সে তো কবে থেকে শুনে আসছি!... ধীর গলায় বলেই তান সহসা ঝাঁকিয়ে উঠল, একটা নথের জন্যে তোমার দালান কি ঠুঁটো হয়ে থাকবে। ভাব তুমি...ভেবে দ্যাখ ঠাণ্ডা মাথায়......

কাদাতে প্যাওলাতে তোরই কষ্ট। তুই-ই তো মাটির ঘরে দু-বেলা কাঁদিস। কাদা প্যাচপ্যাচ করবে না...ইঁদুরে ডোবা-জঙ্গল করবে না...কেঁনদাই চলবে না...সে জন্যেই তো......

অমন দালানের ছাঁচায় আগুন! চাই নে অমন দালান! নথের জন্যে তোমার দালান আটকে যাচ্ছে! আমাকে আর বোকা বুঝিও না!...তুমি আমাকে কিছু দেবে না... কোথাও নিয়ে যাবে না...আমার কপালে আনন্দ নাই!

তোকে কিছুই দিই নি! গভীর বিষণ্ণ সুরে ভবেশ বলল।

না, দাও না! দাও নি...জেনেই দ্যাখ না।

বেঁচে আছিস কী করে!

দুবেলা দু-মুঠো খেতে, আর সম্বছরে দুটো পরতে সবাই দেয়। একটা নথের দাম কত, অ্যাঁ? কত...সোনার না, রুপোর নয়, পেতলের নথ?

সত্যি, আজ ভুলে গেছি।

এটা নিয়ে ক'বার ভুললে খেয়াল আছে? চারবার!

ভোরবেলা মনে ছিল ভবেশের। কিন্তু দু মাইল দূরে আউশের জমি! ছুটে গিয়ে কুটি কাঁকুড় পটল ঝিঙে ছিঁড়ে বাজরা ভরেছে...সেখান থেকে পাঁচ মাইল দূরে পায়ে চলার পথে হাট...মাথায় ভারী বাজরা বয়ে ভিজে-ভিজে ছুটে গেছে হাটে...আজ পাঁজিপুঁথির মতে হাট বসতে দেরী।

হাওড়া
কুষ্ঠ কুটীর
সর্বপ্রকার চর্মরোগ, বাতরক্ত, অসাড়তা, ফুলা, একজিমা, সোরাইসিস, দূষিত ক্ষতাদি আরোগ্যের জন্য সাক্ষাতে অথবা পত্রে ব্যবস্থা লউন। প্রতিষ্ঠাতা: পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা কবিরাজ, ১নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া। শাখা: ৩৬, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৯। ফোন: ৬৭-২০৫৯।

হয়েছে...তাই বিক্রি শেষ হতেও গাঁ ফিরতে রাতি...সেই দুপুরে হাটে কয়েক খাবলা মুড়ি গিলেছে, শুকনো মুড়ি। ফেরার পথ ঘাড় কনকন করে...আর যাবার সময় ছোটে এক বুক উৎকণ্ঠা নিয়ে...যা খামখেয়ালী বাজার দর!

তোর সুখ তোর সাধের জন্যেই ত, আমি দিন-রাত খেটে মরছি!...আর্তস্বরে বলে উঠল ভবেশ।

আর বেশী মুখ নেড়ো না। ওসব ভুজুং-ভাজুং আগে বিশ্বেস করতুম। যাও.. শুতে যাও...চোখ টেনে আসছে...রাত দুপহরে আর জ্যাজ-জ্যাজ করো না!

তানের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল ভবেশ। তার হৃদয় ক্রমশই বাষ্পাচ্ছন্ন হতে লাগল। খেটে-খেটে ভবেশের শরীর শুকনো বাঁশের মত খটখটে হয়ে যাচ্ছে...সারা দিন তার চিন্তায় একটা মরীচিকা বাসা বেঁধে থাকে...কখন ঘরে ফিরে দু দণ্ড হাত-পা ছড়াবে, কখন তানের সঙ্গে গুলতানি করবে...কখন শ্রাবণের কচু ডাঁটার মত তানের সতেজ অস্তিত্ব দিয়ে নিজেকে আচ্ছন্ন করবে।

তির্যক কচু পাতার মত পেছল তানের মন...সংসারের যাবতীয় বস্তু গলে দিয়ে তানের মনে করে পড়লেও লেগে থাকে না।

যাবি না বউ?...ঘড়ঘড়ে গলায় ভবেশ বললে, কণ্ঠনালীতে শ্লেষ্মা জমে গিয়েছিল, সাফ করল কেশে।

ডান বাহুতে মাথা রেখে তান হাঁটু দুটো তার বুকের কাছে চেপে ধরেছে... কোনো শব্দ করল না।

তোকে আমি কত ভালোবাসি......

তানের বাঁ হাতের ঝাপট ভবেশের কথা মাঝপথে স্তব্ধ করে দিল।

ভবেশ তানের বাঁ হাতটা তার কোলে টেনে নিয়ে আঁকড়ে ধরল। আবার বলতে লাগল, হাঁরে, তুই জানিস না......

ধড়মড়িয়ে উঠে বসল তান, তার চোখ দুটো ঘৃণায় টসটস করছে, কত আর ন্যাকা করবে, অ্যাঁ?

ভবেশের সত্তা থেকে কে যেন অকস্মাৎ স্বাচ্ছন্দ্য কেড়ে নিল। একেবারে মুখ বন্ধ করে টলতে-টলতে উঠে গেল তার ঘরে। এবং সশব্দে কপাট বন্ধ করে হাঁসকলটা তুলে দিয়ে বিছানায় ঢলে পড়ল।

কিছুক্ষণ পর তার বুকের ভিতরে অসহ্য চাপ ক্রুদ্ধ বেড়ালের মত ফুলতে লাগল।

ভয়ে তান অন্ধকারে উঠে বসল... অদূরবর্তী গ্রাম্য রাস্তা দিয়ে কারা লণ্ঠন দোলাতে-দোলাতে তাল কুড়োতে যাচ্ছে... আলোগুলো মেঘের আড়ালে চলে যেতেই আকীর্ণ অন্ধকারের বর্ধমান তোলপাড় উপলব্ধি করতে লাগল তান...তার চোখের উপর দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ল কে...ভয়ে চোখ বন্ধ করল...আসন্ন বর্ষণের, প্রথমে ক্ষীণ এবং তারপর ক্রমশ প্রমত্ত শব্দ বয়ে আনল জোড়ো বাতাস...অনতিবিলম্বে প্রবল বর্ষণ শুরু হল...বৃষ্টির ছাট এবং আর্দ্র হাওয়ায় তানের শরীর ক্রমশই সোঁতিয়ে যেতে-যেতে এক সময় উত্তপ্ত হয়ে উঠল।

শেয়াল-ডাকা ভোরে ভবেশ লাঙল-কাঁধে গরু হাঁকাল...নীরদাকে বলে গেল, বৌকে বলে দিও, আজ তিনটে জোন (জন) হবে.....

অম্বলের নিত্য রোগী নীরদা বিছানা ছাড়ে খুব ভোরে...কাজকর্ম করতে পারুক আর নাই পারুক। মুখটি চলে তার সারা দিন। অবশ্য আর সব শাশুড়ির মত তানের সঙ্গে অকারণ খটামটি করে না বলে তান নীরদাকে কিছুতে হাত লাগাতেও দেয় না। বিশেষ, ভারী কাজ।

আজ ঘর নিকিয়ে গোয়াল কাড়তেই তানের দেহ আলগা হয়ে এল। ঝুড়িতে সার-খড় বোঝাই করে ঘুণধরা খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে পড়ল। অন্য দিন অসংখ্য বিহঙ্গের কলধ্বনিতে কান পেতে থাকে। কখন পাপিয়া সুর ধরবে, কখন কোয়েল বাঁশি বাজাবে, চাতক দম্পতি ধুয়া তুলবে...সব তানের স্মৃতিদর্পণে লিপিবদ্ধর মত আবদ্ধ। কোনো দিন ভোরে পাপিয়ার স্বর না শুনলে তানের ইন্দ্রিয় বিকল হয়ে পড়ে ...অজস্র কাকলীর ধ্বনিপুঞ্জে তানের সঙ্গে অলৌকিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। অতি-প্রাকৃত ব্যঞ্জনা কাকলীর মাধ্যমে তানের স্নায়ুতে বিচিত্র ঝঙ্কার তোলে...তান তার অর্থ ব্যাখ্যা করতে পারবে না, কারণ বোঝাতে পারবে না। কিন্তু এই গ্রামটাকে সে কাকলীর শব্দপুঞ্জ দিয়ে ভালোবেসে ফেলেছিল...আজ কোথাও তানের মন নেই...কোনো শব্দ কোনো দৃশ্য তার ইন্দ্রিয়গুলি আজ গ্রহণ করতে পারছে না... আজ যেন তান আর নিজের মধ্যে নেই।

কি রে, ঝুলন দেখতে যাবি?

ভবেশদের গোয়ালের পাশেই সরকারদের গোয়াল। ওখান থেকে সরকারদের বিধবা বড় বউ কালো গরুটার দুধ দুইতে দুইতে প্রশ্ন করল।

কী! কী বলছ দিদি...খুঁটি ছেড়ে তান সোজা হয়ে দাঁড়াল।

বালাগড়ে আজ ঝুলন, জানিস না?

বড় জাঁকের পুজো রে...

যাচ্ছ তোমরা?

দেখছিস না? গাড়ি তো তোর চোখের সুমুখে।

সত্যিই তো। ছই বেঁধে খড়-কম্বল বিছিয়ে গাড়িটা সাজানো। জোয়াল দুটি তেল-সিঁদুর মাখা চকচকে [illegible] মাড়ছে।

ছটফট ছটফট তান ঝাঁড়-ঝাঁড় ফেলে ঘরে গেল। নীরদাকে তড়বড় করে কী বললে। নীরদা খ্যানখেনে গলায় কী যেন ক্যাঁ ক্যাঁ করলে। চোখের পলকে তান বাসি কাপড় ছেড়ে চওড়া সোনাপেড়ে শাড়িটা গায়ে জড়িয়ে কালো জামাটা গলিয়ে নিজের তোরঙ্গ থেকে বিয়ের সময় পাওয়া সাত টাকা একুশ পয়সা বাঁধা পরিষ্কার ন্যাকড়ার ছোট্ট পুঁটলিটা কোমরে গুঁজেই, মা আসছি গো। ...বলেই ছুট।

সরকারের কিষেণ দেউল তখন গরু জুতেছে, নিজে চেপে বসতে উদ্যত...গরু ঠেলে দিয়ে এক লাফে হুড়মুড় করে তান সরকার গিন্নির কোলের উপর উঠে বসল... সরকার গিন্নি তানের পিঠে দুমদাম চড় বসিয়ে দিল...তরতর করে ছুটে চলল গাড়ি।

সারা বেলা হাটাহাটি করে তিনটে ঝকঝকে পুঁতির মালা ও চারটে চার রঙের পাথর বসানো নথ কিনল তান। সাদা লাল আর সবুজ মালা ও নথ কেনার পরেই তার উৎসাহ নিভে গেল। ঘরে চার-চারজন সমর্থ পুরুষ ও বুড়ি শাশুড়ির রান্না কে করবে? নীরদাকে আজ রান্না করতে হল, কাল ওকে খাটে তুলতে হবে।

তানের গা ভোর থেকেই গরম ছিল... কাঁপুনি দিয়ে জ্বর এল...সরকার গিন্নির কানের কাছে ঘ্যান-ঘ্যান করতে লাগল।

বললে, আমি এখুনি বাড়ি চলু দিদি...

সরকার গিন্নি পাড়ার কর্ত্রী...তানের গায়ে হাত ঠেকিয়ে পরীক্ষা করল, তারপর চেঁচিয়ে উঠল, এক-গা জ্বর নিয়ে তুই হেঁটে যাবি!

ঝুলন তো সেই সাঁঝের পর? তান বললে বিমূঢ় কণ্ঠে।

১৯৭০ সালে আপনার ভাগ্য

যে-কোন একটি ফুলের নাম লিখিয়া আপনার ঠিকানাসহ একটি পোস্টকার্ড আমাদের কাছে পাঠান। আগামী বারমাসে

আপনার অদৃষ্টের বিস্তারিত বিবরণ আমরা আপনাকে পাঠাইব; ইহাতে পাইবেন ব্যবসায়ে লাভ-লোকসান, চাকরিতে উন্নতি, অবনতি, জন্ম, বিবাহ ও সুখ-সমৃদ্ধির বিবরণ—আর থাকিবে দুষ্টগ্রহের প্রকোপ হইতে আত্মরক্ষার নির্দেশ। একবার পরীক্ষা করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

Pt. DEV DUTT SHASTRI
Raj Jyotshi (AWC) P. B. 86
JULLUNDUR CITY

CENTRAL LIBRARY

টিনশেডের বৃষ্টি পড়ছে ...আকাশ মেঘে থমথম করছে। ভ্যাপসা গরমে প্রাণ কেঁপে উঠছে...কুকুর মন্দিরে আটচালার ছাউনি মন্দির ঠেলাঠেলি...কে যে কার গায়ে পড়ছে তার হুঁশ নেই।

তিনটে জোন আছে যে গো...ভান বললে, আমি চাই...এ কিছু হবে না... মেয়ে মানুষের হাড়...এ বড় কঠিন বস্তু...

কাজের কাছে আর কত মালখালাস পাওয়া যায়? সরকার পিল মঞ্জুর জারী করলে, আমার কুলো দায় নেই কিন্তু...

ভান কুকুর মন্দির ছেড়ে মাঠের খাল-পারে এসে পড়ল, আর মেঘ বললে আজ বৃষ্টি আর কম নামবে না। মাথার চুল থেকে দেহের প্রতিটি লোমকূপ পর্যন্ত ভিজতে লাগল...তিন ক্রোশ রাস্তা কি সহজ কথা। যখন বাড়ির দুয়ারে বাঁশের খুঁটিটা শক্ত মুঠিতে চেপে ধরল— তখন ভানের মনে হল বড় পর্যন্ত ...দেহটা টেনে নিয়ে যেতে পারবে না। বাঁশের পাটি দুটি এমন জোরে এবং ... টেনে থাকে, মনে হচ্ছে হাড়গুলি যে কোন মুহূর্তে পাউডার হয়ে যেতে পারে।

বিকেল নেমে গেছে, হেঁসেলের চাল ফুঁড়ে ধোঁয়া বাদলা ঠেলে ওপরে উঠতে পারছে না...কাঁপতে কাঁপতে কয়েক পা এগিয়ে উঁকি মারল ভান...নীরদা উনুনে জ্বাল ঠেলছে...ভাতে ফোটার টগবগ শব্দ আসছে মৃদু মৃদু...তাহলে ভবেশ মাঠ থেকে ফিরে নিজেই রান্না চাপিয়েছে...

ভবেশ কলাপাতা কাটার জন্যে দুয়ার পেরিয়ে যেতে যেতে কটাক্ষে দেখলে ভানকে...কিন্তু কোনো কথা না বলে হেঁসোটা নিয়ে নেমে পড়ল ভবেশ...কোনো রকমে ঘরে ঢুকে কাঁপতে কাঁপতে ভান শাড়ি বদলাল।

রান্নাঘর অসার সময় ভান মনস্তাপে কাতর হয়ে পড়েছিল...ভবেশকে দেখেই ভানের মনে অদ্ভুত নিষ্ঠুরতা আশ্রয় নিল ...আসবার পিঁড়িখানা সে জলচৌকি সরিয়ে বসল। কাঁপুনি কিন্তু সমানে তার দেহ ছত্রখান করে দিচ্ছে...রাত বেহুঁশভাবে তক্তপোষ পর্যন্ত গিয়ে শুয়ে পড়ল এবং কম্বল দিয়ে সারা শরীরটা পুঁটলির মত যথাসাধ্য ঢেকে দেবার চেষ্টা করল। চোখ বন্ধ করতেই ভানের মনে হল তক্তপোষটা ক্রমশই ভারী হয়ে হয়ে তার বুকের উপর চেপে বসছে... কাঁকড়া ছায়া তাকে নিয়ে লোফালুফি করছে...সে দামোদরের বন্যায় ...অকূল অন্ধকারে ভেসে চলেছে...

বাইশ বছরের যুবক ভবেশ অন্য সব কাজে উৎসাহী ও পটু, একমাত্র রান্নাবান্না ছাড়া। ফ্যান গালাতে গিয়ে হাতে ফ্যান ছিটকে পড়ল ভবেশের...মাথায় রাগ নেচে উঠল। ভানের মাথার চুল ছিঁড়ে দেবার জন্য ছুটে গেল ঘরে...ভানের মাথায় হাত লাগতেই থমকে পড়ল...ইঃ এ যে পুড়ে যাচ্ছে। ভানের গায়ে প্রবল জ্বর। চেঁচিয়ে, আগুন! নিজের খাওয়া শিকেয় উঠল...

কোলকের থেকে নিয়ে নিজে ঘড়া ঘড়া জল ঢালতে লাগল ভানের মাথায়।

দশ দিন পরে জ্বর ছাড়ল ভানের... ডাক্তার ডেকে আনতে হয়েছিল...নিয়মিত ওষুধও এনে দিয়েছে ভবেশ। কিন্তু ভান জানলা গলিয়ে ওষুধগুলো আশশ্যাওড়া ও কচুর জঙ্গলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েই শেষ করেছে...

ক্রমশ ভানের দেহ সুস্থ হয়ে উঠল... কিন্তু মেজাজ হারাল ভারসাম্য। ঘটি-বাটি ইত্যাদি যা আড়ালে পায়, ভান ঠুকে ঠুকে তাল-তুবড়া করে রাখে। মুখে স্বীকার করে না...মুখ দেখে ধরারও উপায় থাকে না।

হাসপাতালের বহির্বিভাগে ভানকে নিয়ে গেল ভবেশ। ডাক্তার কিছু দামী-দামী টনিক লিখে দিলেন...ধার-দেনা করে টনিক কিনে আনল ভবেশ।

সারা গেরস্থালীর কাজ করে ভান... কিন্তু অবকাশে সে একা বেরোতে চায় না ...দিনের বেলা রোদ হেলে পড়লে কাল-কাসুন্দের জঙ্গলে একা একা দিব্যি পড়ে থাকে মাদুর পেতে...নানান বিচিত্র পাখী ভিড় করে তার কাছে। তার হাতের উপর বসে বসে মিঠে শিস দেয়, খোপা খুলেখুলে ফড়ফড় করে মাথার উপর। আর সবার অলক্ষ্যে আঁচলের গেরো খুলে মুঠো মুঠো চাল ছড়িয়ে দেয় ভান নিজের চারদিকে... যে-চাল ভবেশ বেড়া শোধ দেবে বলে ধার করে এনেছে।

নীরদা গজগজ করে, বউ তো আমার ডেকরা...এ নিশ্চয় মরাজন্মের হাতসাফাই ...হেসে আমার খুবই মরণ যে...

ভবেশ বলে, তাই বলে তিনদিনের চাল দুদিন যাবে না। এত ঠকাবে!

মনে কষ্ট লাগে ভবেশের...কুলকিনারা ঠাউরাতে পারছে না...জলখাবার বেলায় তালগাছের ডগার তাল দেখতে দেখতে মুড়ি চিবোচ্ছিল ভবেশ...পুকুর পাড়ে শিরীষ গাছের মাথায় পাখীর দল ভিড় জমাচ্ছিল ওরা উড়ছিল চঞ্চলভাবে...হলুদ-কালো গা আর লাল ঠোঁট একটা পাখী হঠাৎ চ্যাঁ চ্যাঁ চ্যাঁ শব্দে আর্তনাদ করতে লাগল...

ভবেশ ডাকল, বৌ...ও বৌ...

নীরদা বসে বসে ঢুলছিল, বলল... পুকুর গেছে...চাল ধুতে...

কী রকম সন্দেহ হল...মুড়ির থালা ফেলে উঠে পড়ল ভবেশ। পা টিপে টিপে এল পুকুর পাড়ে।

ভানের পা দুটো পুকুরের জলে... হাতের মুঠোয় ওই হলুদ-কালো গা লাল ঠোঁট একটা পাখী। পাখীটার দুটো ঠোঁট নির্মমভাবে ফাঁক করে দিয়ে ভান চাল গুঁজে দিচ্ছে...আর বলছে : খা, গিলে খা ...তোর মত কোন্ কে এমন করে খাওয়ায়? খা না...। পাখীটা ভয়ে ছটফট করছে।

বৌ...ভবেশ গর্জন করে উঠল।

ভান চমকে ফিরে তাকাতেই তার বাহু-পাশে আবদ্ধ চালের পেতেটা ঝুপ করে উল্টে পড়ল পুকুরের জলে।

কাঁড়ি কাঁড়ি খরচা করলুম এই জন্যে... ডাক্তার যে আর ওষুধ যে করে তোর প্রাণ বাঁচালুম এই জন্যে! আমাদের সর্বনাশ করবি বলে!

পেতেটা জল থেকে তুলে নিয়ে ভান দুহাতে গলায় ধপ ধপ শব্দ করে। ডান হাত ভবেশের এঁটো...ও ছুটে গিয়ে বাঁ হাত দিয়ে পেতেটা কেড়ে নিল। বলল, হাত-পা মেলে শুয়ে থাক্...তোকে আর কুটোটি দুখান করতে হবে না...

মানে? আমি কি কুঠো?

কুঠো হলেই বাঁচতুম...আমাদের এমন সর্বনাশ করতে পারতিস না...

করব...সর্বনাশ করব...

ভান মাথা ঝাঁকাতে লাগল, তার খোলা চুলগুলি ঠিকরে বেরিয়ে আসা চোখদুটি বারবার ঢেকে দিতে লাগল।

কেন, কেন তুই সর্বনাশ করবি? আমরা তোর কী সর্বনাশ করলুম?

করেছ। তুমি আমার সর্বনাশ করেছ। তুমি আমাকে অসতী করেছ!

অসতী!

হাঁ, অসতী। বিনা পিরীতের লোকের সঙ্গে ঘর করলেই তো অসতী!

আমি তোকে পিরীত করি না?

না সাত-সাতটা দিন বিছানায় পড়ে রইনু, ক-দণ্ড আমার পাশে বসেছিলে? চৌ-প্রহর কাৎরেছি, চু দেখেছি চৌপহর... যাতনায় আমার সারা অঙ্গ জ্বালিয়ে রাখছিল ...তুমি দু-দণ্ড আমার গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়েছ?

ডাক্তারের ওষুধ এনে দিয়েছি...খাইয়ে দিয়েছি...

ক দাগ ওষুধ খেয়েছি...,

যখনই অবসর পেয়েছি, খাইয়ে দিয়েছি ...তা পরে তুমি খেয়েছ কি খাওনি, তার আমি কী জানি!

তুমি তো কিছুই জানো না। আমার কী হয় না-হয় তার তুমি কী জানবে!

সংসার আছে না? এদিকে ছুটি তো ও-দিক ঢিলে: এ-দিকে যাই তো ওদিকে বারোটা বাজে। একা মানুষ ক-দিক সামলাই...তুই সুস্থ দেখাবি, তবে দুদিক সামলাতে পারব!

আমি তোমার সংসার দেখতে পারব না...আমাকে কে দ্যাখে, অ্যাঁ?

কার সংসার?

তোমার। আমার নাকি? এ-সংসারে আমি কে। আমি তো দিন-মাইনের ঝি, আমি পিসির বাড়ি যাব...

তোর পিসির নিজেরই দিন চলে না... ওর ঘাড়ে চাপলে সে দুজনেই মরবি।

কী, আমার পিসির দিন চলে না? তুমি চালিয়ে দাও তোমার ঠেঙে হাত পাততে আসে!

তানের পিসি খুবই গরীব। লোকের বাড়ি বাড়ি ঝি খেটে কোনো রকমে একা পেট চালায়। নিত্যি খেতেও জোটে না। আজকাল পেটভাতে লোক পোষার ক্ষমতা ক' জনার। বেশির ভাগ লোকেই ঠিকা মাইনের ঝি রাখে। পিসির দারিদ্র্যের জন্যই তান রাগ করে এ-বাড়ি থেকে বেরিয়ে পিসির বাড়ি যেতে পারে না। আর, তানের পিসি ছাড়া কেউ নেই-ও তার তিন কুলে।

অত গরীব ঘরের মেয়ে আনতে রাজী ছিল না নীরদা...গরীব ঘরের মেয়েদের মন নাকি বড় ছোট হয়...কিন্তু ভবেশ তানের রূপটি দেখেই মজে গিয়েছিল।

ধৈর্যের প্রান্তে এসে পড়ল ভবেশ। সে দাঁতে দাঁত ঘষে বললে, আমি তো বলেই দিয়েছি, তেজ দেখিয়ে পিসির বাড়ি গেলে আর ফিরে আসতে পাবি না...

রাত্রে আবার সংঘর্ষ বাধল। আকাশ মাঝে মাঝে ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে বিদ্যুতের আঘাতে...চাপ চাপ অন্ধকার ক্রমশই ঘনীভূত হচ্ছে...ব্যাঙ ঝিঁঝি প্যাঁচা তক্ষক ও শেয়ালের পাল একসঙ্গে ডেকে উঠল...লম্ফের আলোয় আরশিতে মুখ দেখে তান গলায় ঝোলাল সবকটি পুঁতির মালা এবং আরশোলার ডিমের মত লাল রঙের পাথর বসানো নথটা এঁটে দিল নাকে, তারপর দীঘল হেঁসোটা আঁচলের তলায় লুকিয়ে কী মনে পড়ে গেল, সিঁথিতে মোটা দাগে এবং কপালে বড় ফোঁটায় সিঁদুর পরল। শোবার ঘরে গেল সন্তর্পণে...

নাক ডাকছে ভবেশের...

মশারী ফেলা...

ধীরে ধীরে নিঃশব্দে এগিয়ে গিয়ে ডাকল, ঘুমোচ্ছ?

সাড়া পাওয়া গেল না। তান লম্ফটা রাখল মেঝেতে।

মশারীর পর্দা তুলে ধরল সাবধানী হাতে...আস্তে আস্তে ভবেশের গালে ঠোঁট নামাল...তারপর গলায়, তারপর আবার গালে, কপালে এবং ঠোঁটে...চোখে জল এসে পড়তেই দ্রুত বেরিয়ে এল মশারী থেকে। আর, অস্বস্তি এবং তীব্র দ্বিধাদ্বন্দ্বে তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠল... সুন্দর মুখের রেখাগুলি দুমড়ে মুচড়ে বিকৃত হয়ে যেতে লাগল...মৃত্যু চিন্তায় তানের কপাল ও মনের চোখ ক্রমশ ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে...পা টিপে টিপে কপাট খুলতে গিয়ে আপাদমস্তক শিউরে উঠল। না সে মরবেই...ওই লোকটা তাকে ভালোবাসে না... ও কেবল নিজের উন্নতির জন্যে মুখে রক্ত তুলে খেটে মরছে সারা পৃথিবীটা জ্বলে-পুড়ে যন্ত্রণায় ছটফট করলেও, ও নিজের তালে এগিয়ে যাবে, কারুর দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকাবে না লোকটা।

আর একবার মশারীর পর্দা তুলে ভবেশের গলায় নিজের ঠোঁটটা ডুবিয়ে নেবার ইচ্ছে জাগল...মাত্র একবার...কিন্তু নিজের গালে চড় মারল তান...নিজের হাত কামড়ে ধরল তারপর দ্রুত হাতে হাস-কলটা খুলতে গিয়ে লম্ফটা পড়ে গেল মাটিতে...নিভে গেল দপ করে...ঘর অন্ধকার...

কে কে!

প্রশ্ন করল ভবেশ বিছানা থেকে.. পাশের শূন্য স্থানটি হাৎড়ে আবার বললে, তান?

শুকনো নীরস গলায় তান সাড়া দিল ধীরে ধীরে।

মশারীর পর্দা থেকে মাথা বের করে হাৎড়ে হাৎড়ে দেশলাই জ্বালাল ভবেশ...নিভে গেল কাঠিটা সামান্য জ্বলেই...ভবেশ নামল বিছানা থেকে, জ্বালাল আবার একটা দেশলাইয়ের কাঠি...কাঠিটা ছোঁয়াল লম্ফের পলতেয়...

বলল ভবেশ, বাইরে যাবি?

বিহ্বল চোখে তান ভবেশের দিকে তাকিয়ে রইল...তার কপালের সিঁদুর সারা মুখে লেপে গেছে...কপালের ঘাম এসে ঝুলছে নাকের ডগায়...ঠোঁটদুটো ঈষৎ কম্পমান...ভাষা বেরোচ্ছে না...ভবেশ ক্ষিপ্র নজর বুলিয়ে পর্যবেক্ষণ করতে লাগল তানকে। তানের জানুর কাছে কী যেন চিকচিক করছে...তানের আঁচল সরিয়ে ভবেশ খপ করে হেঁসো-সুদ্ধ কব্জিটা চেপে ধরল।

চাপা স্বরে তান বললে, ছাড়...ছেড়ে দাও...

না, কী করবি?

যা করি করব।

বল আগে কী করবি। তোর মতলব তো ভালো ঠেকছে না!

যা করি করব, আমার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কী!

ধস্তাধস্তি করার চেষ্টা করল তান... ভবেশের ক্ষমতার সঙ্গে সে কতক্ষণ লড়বে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই হেঁসোটা কেড়ে নিল ভবেশ।

তান গজরাতে লাগল, তুমি আমাকে ঠেকাতে পারবে?

কী করতিস তুই? হেঁসোটা নাড়াচাড়া করতে করতে ভবেশ প্রশ্ন করল, লম্ফের আলোয় একটা জাতসাপের মত হেঁসোটা ঝকমক করছে...ভবেশ কাতর কণ্ঠে আবার বললে, আমাকে খুন করবি?

একটা জানোয়ারকে খুন করব? না।

আমি জানোয়ার! আকাশ থেকে পড়ল ভবেশ।

যে মরদ ভালোবাসতে জানে না, সে জানোয়ার।

আমি ভালোবাসতে জানি না?

না না...জানো না। জানো না।

কী করে ভালোবাসা যায় শিখিয়ে দিবি?

জানোয়ারকে শিখানো যায় না...

দাঁতে কড়মড় শব্দ করছে তান...সে হাসকল খুলে বাইরে পা বাড়াল...ভবেশ হেঁসোটা নিজের বালিশের তলায় লুকিয়ে বাইরে এল। বলল খুব মধুর স্বরে, সোনা-দানা দিলেই কি ভালোবাসা হয় রে?

থামো! একটা গয়না দিয়েছ কখনো? আমি কি রাজার মটুক চেয়েছি, না রানীর হাতের অনন্ত চেয়েছি! না এই চোখা নথ আর মালা চেয়েছিনু!

আচমকা গলার মালাগুলি দুহাতে দিয়ে ছিঁড়ে তান ছড়িয়ে ফেলে দিল অন্ধকার কুঁড়েনে...হঠাৎ তান টলে উঠেছিল, খুঁটি ধরে তাল সামলাল, তার মস্তিষ্কে রক্তের সহস্র শিখা তাতা থৈথৈ নৃত্য শুরু করে দিয়েছে...কিছুক্ষণ খুঁটিটা জড়িয়ে ধরে বাহুর উপর মাথা রেখে ঝিমুনিটা থিতিয়ে নিল তান, তারপর মুখ ঘুরিয়ে রক্তবর্ণ চোখে আগুন ঝরাতে লাগল।

লম্ফ হাতে ধীরে ধীরে ভবেশ তানের কাছে গিয়ে চাপা ও দৃঢ়কণ্ঠে বললে, তান, তুই জানিস না, আমি তোকে কত ভালো-বাসি।

হিহি...হিহি...হিহি... পাগলের মত দমকে দমকে হেসে উঠল তান।

তুই জানিস? আবার ভবেশ বললে ক্রমশ তার আক্রোশক স্ফীততর করতে করতে; মাথাটা নামিয়ে আনল তানের মুখের সম্মুখে।

আমি তোকে কত ভালোবাসি তুই জানিস না...এই মেয়েমে, এই মেয়েমে কেন, তিন ভুবনে আমার মত কেউ ভালোবাসতে পারবে না, এই তোকে বলে দিনু...

হিহি...হিহি...হিহি...হিহি বেশ বাতা করছ তো...হিহি...হিহি...হিহি...হিহি বেশ করছ, বেশ যত্ন করল। তানের চোখে উন্মত্ততার ঘোর ক্রমশই স্পষ্ট হতে লাগল। ঘৃণা অশ্রদ্ধা নৈরাজ্য ইত্যাদি একত্রীভূত হয়ে তানের মস্তিষ্কের স্বরগ্রাম বিপর্যস্ত করে দিতে লাগল। হয়তো তান একেবারে পাগল হয়ে যেত, যদি না শেষ রাত্রির সাঁই-সাঁই অন্ধকারে কেউ আর্তনাদ করে উঠত...তানের শরীরে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে লাগল একদল কবন্ধ ছায়া...আঁচল দুলিয়ে পতপত শব্দ করে ছুটে পালাল কে...চোখের সম্মুখে ভবেশের নিজ হাতে তৈরি, দালানের জন্য পোড়ানো পাঁজার ইঁট, ভাঁটি থেকে বয়ে এনে থাক দেওয়া; স্তূপী-কৃত অন্ধকার যেন। ইঁটের রাশির উপর ঝুঁকে পড়েছে ঝাঁকড়া আমগাছের বিরাট মোটা ডাল। মাটি থেকে আকাশে একটা অতিকায় ছায়ামূর্তি ওখানে দাঁড়িয়ে...ওই ছায়ামূর্তিটা আমন্ত্রণ করছে তানকে : আয় না, আয়, কাছে আয়। ভয়ে তানের বুক শুকিয়ে গেল, চোখ বন্ধ করল। কিন্তু একটু পরেই ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে খুলতে হল চোখ...আবার ছায়াটা তাকে ডাকছে। তান সম্মোহিতভাবে উঠে পড়ল, ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল মূর্তিটার দিকে।

ছায়ামূর্তিটা ক্রমশই মানুষের আকার ধারণ করতে লাগল এবং শেষে গলায় দড়ি এক ঝুলন্ত মানুষই হয়ে গেল...প্রত্যুষের প্রথম অবিস্পষ্ট আলোটা সামান্য উজ্জ্বল হতেই সিঁদুরের ছাপ দেখা গেল মূর্তিটার গালে ও ঘাড়ে...

কিছুক্ষণ পরেই তানের বেহায়াপনা দেখে দেশসুদ্ধ লোক মস্করা করলে বুঝেও, তান সিঁদুরের ছাপগুলি মুছে দিতে এগিয়ে যেতে পারল না।

গোয়েন্দা কবি পরাশর
প্রেমেন্দ্র মিত্র রচিত
শৈল চক্রবর্তী চিত্রিত
পরাশর কথা বলতে হঠাৎ থেমে যায়
আরো কি বেয়াড়া প্রশ্ন আছে শুনি।
আছে, ভেজাল ওষুধের মামলার সময় উনি আপনার বিপক্ষে…
অমন ভাবে কি দেখছেন, মিঃ ভর্মা?
মনে হচ্ছে আপনার বাড়িতে চোর ঢুকেছিল, রতনলালজী!
চোর! কোথায় দেখলেন?
ওই জানলার বাইরে দেখলাম।
আপনার ছোট বাগানের দেয়াল টপকে একটা লোক চলে গেল। মুখটা তার চাদরে ঢাকা…
আমার বাগানে চোর ঢুকবে কেন?
আবার মুখ-ঢাকা চোর!
তাইতেই ত অবাক হচ্ছি।
এটা কি রতনলালের আঙুল দেখবার একটা মিথ্যে ফিকির!
আঙুলগুলো ত সম্পূর্ণ স্বাভাবিক!

অঙ্গনা

একটি গাঁয়ের কথা

বর্ষায় গাঁয়ের রাস্তা জলে ভাসে, চলতে ফিরতে হাঁটু কাদায় ডুবে যায়। এই কাদা মেশানো জলই গিয়ে আবার জমা পড়ছে পাতকুয়োয়। তাই হচ্ছে সুপেয়। এই তো এদেশের গাঁয়ের জীবন। সেই কবে থেকে এভাবে ন্যেঙচাতে ন্যেঙচাতে চলে আসছে। কিন্তু আজো পুরোপুরি খোঁড়া হয়ে যায় নি। আর সুন্দর করে বলা চলে, সেই ট্রাডিশন সমানে চলছে।

ইতিমধ্যে পার হয়ে গেছে স্বাধীনতার একুশটি স্বর্ণ সকাল। কিন্তু সেই সোনা রংয়ের খুব সামান্যই এসব গ্রামের ভাগ্যে জুটেছে। প্রয়োজনের তুলনায় খুবই ছিটে-ফোঁটা। আদর্শ গ্রাম গড়ে উঠেছে। ইঁট বাঁধানো রাস্তা, পাকা নর্দমা, টিউবওয়েল, ইন্দারা আর সুন্দর সুন্দর বাড়ি। ছবির মতো গ্রাম। সারা দেশ চষে ফেললে এরকম দুশো যে নজরে পড়বে না তা নয়। কিন্তু প্রদীপ শুধু একাই। আর তার বিস্তীর্ণ অন্ধকারে ডুবে আছে কত নাম না জানা গ্রাম। তাদের সবই আছে। নেই শুধু কোন সংস্কার। সেই বাপপিতামোর আমল থেকে একই অবস্থায় দাঁড়িয়ে এখন শুধু ধুঁকছে। ধ্বসে পড়ার প্রতীক্ষায়।

এমনি একটি গ্রামের এক অধিবাসী দেবী সহায়। নিজের গাঁয়ের জরাজীর্ণ দশা দেখে আসছে সে কবে থেকে। সেই যেদিনে স্বামীর ঘর করতে এলো। দিনে দিনে তার বয়স বেড়েছে। গ্রামের কেমন চেহারার আদলে লাগছে তবটা পাশুটে মেরে গেছে। তার সক্ষম সমর্থ ছেলেরা গাঁও ছেড়ে শহরে চলে গেছে। ক্ষেতখামার দেখা শোনা করেন তাঁর বুড়ো স্বামী। ছেলেরা মাঝে মধ্যে আসে। এটুকুই যা সুখ। অথচ দেবী সহায় একদিন ভাবতো, স্বাধীন হলো দেশ। এবার জীয়ন কাঠির ছোঁয়ায় খলখলিয়ে উঠবে তাদের গাঁও। আবার সব দেহাতী ঘরে ফিরে আসবে। তার ছেলেরাও। হাসিখুশিতে গাঁয়ে নতুন প্রাণ প্রবাহ বয়ে যাবে। কিন্তু তা আর হয়নি। অনেকদিন পথ চেয়ে চেয়ে বসে সে ও এবার আশা ছেড়ে দিয়েছে। এখন শুধুই অন্ধকার। আর স্বপ্ন দেখা চলে না।

উত্তরপ্রদেশের এই অজ গাঁ তবু একদিন গড়ে উঠলো। প্রায় ওদের গা ঘেঁষে তৈরী হতে শুরু হলো বিরাট ইমারত। ইণ্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ টেকনোলজির কানপুর শাখা। এজন্য দেবী সহায়দের অনেককেই অনেক জমি জায়গা ছেড়ে দিতে হলো। চোখের সামনে সেই চোখ জুড়নো বিরাট অট্টালিকা দেখে ওদের মনো হলো: গাঁটা এবার আরো নীচে পড়ে গেল। আমরা আর উপরে উঠতে পারবো না। দেবী সহায়ের খেদোক্তি। বরং এগিয়ে আসছে নিঃশেষের পথ। একদিন এই বাড়ি আমাদের গ্রাস করে বসবে। নিজের প্রয়োজন মেটাতে সে নিশ্চয়ই সাম্রাজ্য বিস্তার করবে। এই তো দেবী সহায়ের অভিজ্ঞতা। জমিদাররা এমনিভাবেই বাগান করতো, পুকুর কাটাতো। না হলে এ গাঁয়ের উন্নতি হচ্ছে না কেন? গাঁ থেকে পা বাড়ালেই জি টি রোড। আর পাশ দিয়ে চলে গেছে মিটার-গেজ রেলপথ। সোজাসুজি আগ্রা যাবার রাস্তা। তবু গাঁয়ের কোন উন্নতি হয়নি। আর এবার তো পুরোপুরি অবলুপ্তি।

দেবী সহায় তখনো জানতো না যে, জীয়ন কাঠির ছোঁয়া এবার গ্রামে লাগলো বলে। অভাব আর অসুখ ওদের নিত্য সঙ্গী। এই নাগপাশ থেকে ছাড়া পাবার কোন উপায় ওদের নেই। ইতিমধ্যে এলেন ইণ্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ টেকনোলজিতে এক বিদেশী অধ্যাপক। আর সঙ্গে তাঁর স্ত্রী। ভদ্রমহিলা ডাক্তার। নাম তাঁর বোর-ওয়াল্কার। আমেরিকান এই মহিলা দেশে চিকিৎসা শাস্ত্রের গবেষণায় ডুবে ছিলেন। এখানে এসে তিনি যেন নতুন প্রাণ পেলেন। অসুখ বিসুখ আর অভাবে জীর্ণ লোক-গুলির চিকিৎসার সুযোগ পেলেন তিনি। সাগ্রহে এগিয়ে গেলেন সেদিকে। ওদের দারিদ্র্যে নিজেকে হারিয়ে ফেললেন। সেই তাঁর ধ্যানজ্ঞান, সাধনার সিদ্ধি।

এখানেই যেন জীয়ন কাঠির ছোঁয়া লুকিয়ে ছিল। এতদিন গ্রামের শতখানেক পরিবার অদৃষ্টের উপর নিজেদের সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিল। ভবিষ্যত পরিণতির জন্য নিজেদের তৈরি করছিল। কিন্তু বিদেশী ডাক্তার ভদ্রমহিলা একদল ছাত্র নিয়ে এসে দিনরাত ওদের জন্য কাজ করতে শুরু করলেন। এবার গ্রামবাসীরা নড়েচড়ে বসলো। দিনে দিনে গ্রামের চেহারা বদলাতে লাগলো। আর গ্রামবাসীদের মুখেচোখে একটা নতুন জীবনের অনুভূতি ক্রমেই স্পষ্ট হতে শুরু করলো। ছেলেগুলো যেন লকলকিয়ে উঠলো। ওদের ক্ষুদ্র জীবনে এই বোধহয় প্রথম জল সিঞ্চন হলো।

তিনি প্রথমেই নজর দিলেন গ্রামের স্বাস্থ্যোন্নয়নে। সেই কাদা থকথকে রাস্তা আর পানীয় জলের দুরবস্থা দূর করার জন্য তিনি এগিয়ে এলেন সর্বাগ্রে। বর্ষায় কাদায় হাঁটু ডুবে যায় আর সেই হলো পানীয় জল। বৃষ্টি হলে একবার আর রক্ষে নেই। তাই অসুখবিসুখের প্রকোপ থেকে এদের বাঁচাতে হলে শুধু ওষুধে চলবে না। সর্বাগ্রে চাই এই পঙ্কশয্যার দূরীকরণ। এ ব্যাপারে তাঁর সাহায্যে এগিয়ে এলেন ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের ছাত্রো এবং স্থানীয় স্যানিটারি ইঞ্জিনীয়র। ওঁদের সকলকে নিয়ে তিনি গ্রামের উন্নয়নের জন্য একটা পরিকল্পনা খাড়া করলেন। তারপর শুরু হলো কাজ। রাস্তাঘাটের দিকে প্রথম নজর। যাতে বর্ষায় জলকাদা আর না জমে। পাকা রাস্তা তৈরি হলো। ইঁট পেতে পেতে রাস্তা তৈরির কাজ চলতে লাগলো। সঙ্গে সঙ্গে চললো জল নিষ্কাশী ব্যবস্থার উন্নয়ন। নর্দমাও তাই পাকা। এবার বর্ষার জলের সুব্যবস্থা। ইন্দারার ব্যবস্থা হলো গ্রাম জুড়ে। চাপিয়ে দেওয়া রোগগুলি গাঁ ছাড়া হবার পথ পেলো না।

প্রথমে কিন্তু কাজ শুরু হয়েছিল খুব ছোট করে। টাকা জুগিয়েছিল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ এবং ছাত্ররা। তাই দিয়ে কাজ আরম্ভ হলো। গ্রামের বড় রাস্তায় প্রথম হাত দেওয়া হলো। মাত্র একটি কুয়োর যোগান তৈরি সম্ভব হলো। আস্তে আস্তে বড় রাস্তা তৈরি শেষ হলো। সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের চেহারাও গেল বদলে। যারা এতদিন হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন, এ গ্রামের কিছু হবে না। তাদেরও চোখ ফুটলো। অনেকেই এগিয়ে এলেন। এ ভাবেই পরিচয় ঘটলো রোটারী ক্লাবের স্থানীয় শাখার সঙ্গে। ওঁরা প্রতিশ্রুতি দিলেন, গ্রামের আরো উন্নতির জন্য টাকার অভাব হবে না।

তিনি এই টাকার ভরসায়ই বসে রইলেন না। তিনি ফেটের ব্যবস্থা করলেন। সেই সঙ্গে টাকার জন্য আবেদন করলেন নিজের দেশবাসীর কাছে। সংকল্পে টাকার অভাব হয় না। টাকা আসতে লাগলো। সুদূর সানফ্রান্সিসকো থেকে এলো টাকা গ্রামের উন্নয়নকল্পে তাঁর প্রশংসনীয় কাজের প্রতি সমর্থন জানাতে।

গ্রামের চেহারা এবার দ্রুত মোড় নিলো। দেখতে দেখতে সব রাস্তা পাকা হলো। সেই সঙ্গে পাকা ইন্দারা। আর কোনক্রমেই পানীয় জল দূষিত হওয়ার আশংকা নেই।

উন্নয়ন কাজ তা বলে থেমে নেই। গ্রামের জীবনকে স্বনির্ভর করার জন্য তিনি উঠে পড়ে লেগেছেন। একটি ছোটখাটো ডাক্তারখানা এবার অসুখবিসুখের আকস্মিক আক্রমণের বিরুদ্ধে সৎ প্রহরীর মতো মাথা উঁচু করে দাঁড়ালো। তাকে পেরিয়ে রোগাক্রমণ খুব একটা সহজ হবে না।

অনেক উন্নতির সঙ্গে গ্রামের লোকদের জীবনে আনন্দের ছোঁয়াচ দেবার জন্য তিনি

চেষ্টার ত্রুটি রাখলেন না। একটি প্রমোদ কেন্দ্রও গড়ে উঠলো। আর সেই সঙ্গে একটি গ্রন্থাগার। গ্রামের ছেলেমেয়েরা ভিড় করে এলো এই গ্রন্থাগারে। গান বাজনায় মুখর হয়ে উঠলো প্রমোদ কেন্দ্র। এবারে তিনি পরিকল্পনা করেছেন একটি কো-অপারেটিভ ডেয়ারীর। এতে গ্রামবাসীদের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য বিধান হবে। একই সঙ্গে স্বাস্থ্যেরও উন্নতি। কারণ শহরবাসীর জেলের আস্তানা হবে গ্রাম থেকে দূরে একটি ক্ষেতে।

গ্রন্থাগার, প্রমোদ কেন্দ্র আর রাস্তাঘাটের উন্নতি সবই গ্রামে নতুন জীবনের সূচনা। আবার কো-অপারেটিভ ডেয়ারীও হচ্ছে। তাই গ্রামবাসীরা হাসিতে ঝলমল। আর সব পরিবর্তনের মধ্যে এটাই হলো মুখ্য। ওদের জীবনের গতি ছন্দে এখন অনেক পরিবর্তন হয়েছে। এ যেন ওদের নবজন্ম। এবার নিজেদের উন্নয়নে ওরা নিজেরাই হাত লাগিয়েছে। আর পারস্পরিক সহযোগিতার নতুন সেতুতে দূরে হয়েছে ওদের অবাধ যাতায়াত।

এবার দেবী সহায়ের মুখে হাসি ফুটেছে। সীতা ওরা অনাদৃত হয়ে থাকেনি। বরং নতুন উল্লাসে বাঁচতে শিখছে। এবার ছেলেরা হয়তো গাঁয়ে ফিরে আসবে। ছেলের বউরা। হাসিতে হাসিতে গ্রাম উৎসব-মুখর হয়ে উঠবে। অপ্রত্যাশিত একটা জীবনকে তারা ছুঁয়ে ফেলেছে। এতো অনেক কাছেই ছিল। তবু কতদূরে মনে হতো। এবার সব দুঃখের অবসান। আর এই কৃতিত্বের সবটুকু পাওনা সেই বিদেশী ভদ্রমহিলার। যিনি ডাক্তারী ব্যাগ নিয়ে গ্রামময় ঘুরে বেড়ান। ঘাড় ধরে তিনি স্থির। এখনো তার মাথা ঠাসা নানা উন্নয়ন চিন্তায়। —প্রবীণা

পরিবার পরিকল্পনা : নীরব সামাজিক বিপ্লব

জনগণের কাছে পরিবার পরিকল্পনার বার্তা আমরা পৌঁছে দিতে পেরেছি কিনা পরীক্ষার উদ্দেশ্যে গত বছর রাষ্ট্রসংঘের একজন পর্যবেক্ষক ভারতের জনসাধারণের কাছে তাদের বিবৃতি গ্রহণ করেন। পর্যবেক্ষকরা অবাক হয়ে লক্ষ্য করেন যে, গ্রামাঞ্চলের শতকরা ৭৫জন লোক অশিক্ষিত সত্ত্বেও তাদের মধ্যে শতকরা নব্বইজন পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে পুরো মাত্রায় সচেতন হয়েছেন।

পরিবার পরিকল্পনার গণ-সমর্থন

আমাদের মাপকাঠিতেও পরিবার পরিকল্পনার সচেতনতা দেখানো যেতে পারে। এবছরের জুন অবধি এদেশে ৭০০ লক্ষ নরনারী নির্বীজকরণ অথবা বন্ধ্যাকরণের জন্য অস্ত্রোপচারের সাহায্য নিয়েছেন, ৩৪ লক্ষ মহিলা লুপ ধারণ করেছেন এবং পনের লক্ষ লোক জন্ম-নিয়ন্ত্রণের অন্যান্য পথ বেছে নিয়েছেন। এই হিসেব থেকেই বোঝা যায়, ভারতে একটি নীরব বিপ্লব শুরু হয়েছে—যার ফলে দেশের সুদূর-প্রসারী সুখ ও সমৃদ্ধি আসবে।

এই বিপ্লবে আমাদের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে যথা প্রথমতঃ এপর্যন্ত যারা কোন না কোন পরিবার পরিকল্পনা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন তাদের মধ্যে এক কোটি লোককে সর্বদা দেখাশোনা করতে হবে এবং তাদের পরিবারের কল্যাণের জন্য সর্ববিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ প্রতি বছর পরিবার পরিকল্পনা ব্যবস্থা গ্রহণেচ্ছুক ব্যক্তির সংখ্যা যাতে বৃদ্ধি পায় সেজন্য সচেষ্ট হতে হবে। তৃতীয়তঃ চলতি দশকের মধ্যেই যাতে চূড়ান্ত সাফল্য লাভ করা যায়, সেজন্য সব ব্যবস্থা নিতে হবে।

এ সকল উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমরা যে সমস্ত ব্যবস্থা নিয়েছি তা আলোচনা করা যেতে পারে। এই ব্যবস্থাবলীর মূল-মন্ত্র হচ্ছে স্বাস্থ্য চিকিৎসা এবং সেবা ও এদের ব্যাপক প্রচেষ্টা। এই উদ্দেশ্যে প্রতি ৮০ থেকে ১০০ হাজার লোকের জন্য একটি করে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং প্রতি ১০ হাজার লোকের জন্য একটি করে সাহায্যকারী প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের বন্দোবস্ত করা হয়েছে।

অন্য একটি বিভাগ হল দম্পতি পরিসন্ধান কেন্দ্র। প্রতিটি প্রজননক্ষম দম্পতিকে পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে সচেতন করে তোলা এবং তাদের সুবিধা অসুবিধা দেখা, প্রয়োজনে পরামর্শ দেওয়াই হবে এই সংস্থার কাজ। পরিবার পরিকল্পনার অনেক উপায় আছে। যে দম্পতির কাছে যেটা উপযুক্ত কিংবা যারা যেটা পছন্দ করেন সেইমত ব্যবস্থা গ্রহণ—তাদের সেই অবাধ স্বাধীনতা আছে। একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় লক্ষ্য করা গেছে ক্রমান্বয়ে অপেক্ষাকৃত কম বয়সের দম্পতিরা পরিবার পরিকল্পনার পথ বেছে নিচ্ছেন।

ধারণা সঠিক নয়

অনেকে মনে করেন যে পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে গ্রামবাসীরা উৎসাহী নয়। কার্যক্ষেত্রে ভারতে পরিবার পরিকল্পনা ১/৩ অংশের সাফল্যের মূলেই গ্রামের অবদান রয়েছে। এ বিষয়ে গ্রামাঞ্চলের লোকেদের আগ্রহ এবং ইচ্ছাকে প্রশংসা না করে পারা যায় না।

আশার কথা

যে বিষয়টি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছে তা হল, জাতিবর্ণ নির্বিশেষে সবাই পরিবার পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য এগিয়ে এসেছেন। এই প্রচেষ্টার বিজ্ঞানভিত্তিক আবেদনের জন্য সম্প্রদায়গতভাবে কেউ এর বিরোধিতা করেন নি।

গত কয়েক বছরে নির্বীজকরণ বা বন্ধ্যাকরণ অস্ত্রোপচারের সংখ্যা কমলেও নিরোধ জাতীয় দ্রব্যের ব্যবহার ক্রমাগত বেড়ে যাচ্ছে।

মহৎ সহায়তা

পরিবার পরিকল্পনার প্রতি পদক্ষেপে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী ও শিল্প সংস্থা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। ভারতে পরিবার কল্যাণের জন্য বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সংখ্যা অনধিক ৭০০। বিভিন্ন সংগঠিত শিল্প সংস্থাও আমাদের দেশের সামাজিক অভ্যুত্থানে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে। এই সমস্ত শিল্প সংস্থা পরিবার পরিকল্পনার অংশ গ্রহণকারী শ্রমিকদের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা দিয়েছে। আমাদের দিক থেকে কিছু কিছু সুযোগ সুবিধা দিলে আরও অনেক শ্রমিক এ-ব্যাপারে অংশ নেবে বলে আশা করা যায়। এই সমস্ত সংস্থার সাথে সরকারী ব্যবস্থাপনার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের একান্ত দরকার হয়ে পড়েছে।

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে প্রভাব

বর্তমানে পরিবার পরিকল্পনার বাণী বিভিন্ন আনন্দানুষ্ঠানের মাধ্যমে জন-মানসে আবেদন রাখছে। এর পেছনে আমাদের শিল্পীদের দান শ্রদ্ধার সাথে স্মরণীয়। পরিবার পরিকল্পনার স্মারক দুটি শিশু সন্তান নিয়ে পিতা-মাতার ছবি, আর বাচ্চা এখনই নয়—দুই বা তিনের পরে কখনই নয়, প্রভৃতি শ্লোগান আশাতীত সাড়া জাগিয়েছে। বিভিন্ন নৃত্য ও নাট্য সংস্থা, পুতুল নাচের দল গ্রাম্য গীতি পরিবেশক দলের মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনার বাণী দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে।

এ সমস্যা শুধু আমাদের নয়

জনবিস্ফোরণের সমস্যা শুধু ভারতেরই নিজস্ব সমস্যা নয়—এ সমস্যা সারা বিশ্বের তবে আমাদের দেশই প্রথম যে সরকারীভাবে এই সমস্যার সমাধানে ব্রতী হয়েছে। এর যথেষ্ট কারণও বিদ্যমান। ১৯২০ সালে ভারতের জনসংখ্যা ছিল ২৫·১ কোটি; আর এ-বছর এই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫৪ কোটিতে। দেশের সম্পদ ও আয়ের তুলনায় আমাদের জনসংখ্যা দ্রুততর বেড়ে চলেছে। এই হার বছরে ২·৫ শতাংশ। জনসংখ্যার এই হার যদি বজায় থাকে তাহলে কেমন করে আমরা আমাদের জীবনযাত্রার মান উঁচু করতে পারব?

CENTRAL LIBRARY

নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়, কিষণ মহারাজ এবং কালিদাস সান্যাল

সুনন্দা পট্টনায়ক

জলসা

সদারং সঙ্গীত সম্মেলন : 'এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ—তবু রঙ্গে ভরা'—এ সত্যকে নতুন করে অনুভব করলাম এবার সদারং সঙ্গীত সম্মেলনের সমাপ্তি রাত ও প্রাতে। রাত ও প্রাতে একসঙ্গেই বলছি এজন্য যে অনুষ্ঠান সুরু হয়েছিলো ১ অক্টোবর সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার এবং শেষ হয় ২রা অক্টোবর বেলা সাড়ে এগারটা'য় এবং বিস্ময়-মিশ্রিত আনন্দে লক্ষ্য করলাম এত বেলাতে অনুষ্ঠান প্রলম্বিত করে রাত্রি জাগরণ-ক্লান্ত শ্রোতাদের বসিয়ে রাখতে শিল্পীরা সঙ্কুচিত, কিন্তু শ্রোতারা অক্লান্ত। বেলা সাড়ে এগারোটা'র সময়ও নাছোড়-বান্দা—ভজন ও ঠুংরী না শুনে তারা সুনন্দা পট্টনায়ক ও নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়কে ছাড়বেনই না। আজকের দৈনন্দিন জীবনের হাজারো সংকটের মধ্যেও বাঙ্গালীর রস-পিপাসা অনাহত। সৌন্দর্য-তৃষ্ণার ব্যাকুলতা এতটুকুও মন্দীভূত নয়, এ অভিজ্ঞতা সত্যিই গৌরবের। মনে পড়ে গেল অমৃতের প্রতিনিধির কাছে লতা মঙ্গেশকারের স্বতঃস্ফূর্ত হৃদয়োচ্ছ্বাস 'বাঙ্গালীর মত সংগীত প্রেমী জাত আমি সারা ভারতবর্ষে কোথাও দেখিনি। সারারাত ভোর জেগে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে গান শুনতে একমাত্র বাঙ্গালীই পারে'। এবার সদারং সঙ্গীত সম্মেলন উদ্বোধন করলেন মহম্মদ দবীর খান, প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন সঙ্গীতশাস্ত্রী কুমার বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী।

সম্পাদকীয় ভাষণে কালিদাস সান্যাল বলেন—সর্বভারতীয় সদারং সঙ্গীত সম্মেলন হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের ভিত্তি ধ্রুপদকে অন্যান্য বারের মত এবারেও যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করেছে। সেইজন্যই বাংলাদেশে সেনী ঘরাণার প্রবীণ ধ্রুপদী দবীর খাঁর সঙ্গে লাহোরের ভাগবতস্বরূপ ঠাকুরকেও আহ্বান জানানো হয়েছে। গত বছর সদারং-এর উদ্বোধন সভায় প্রধান অতিথি শ্রীতুষারকান্তি ঘোষের ধ্রুপদী মৃদঙ্গ পাখোয়াজকে পুনঃ-কৌলিন্য প্রতিষ্ঠিত করার প্রস্তাব স্মরণে আমরা এবার রামাশীষ পাঠকের স্বতন্ত্র একটি পাখোয়াজ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেছি। এছাড়া সু-প্রতিষ্ঠিত তরুণ শিল্পীদের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিভাবান তরুণ শিল্পীদের যথাযোগ্য সুযোগ দেবার চেষ্টা করা হয়েছে দ্বিতীয়তঃ উদীয়মান তরুণ তবলাবাদকদের শীর্ষস্থানীয় শিল্পীদের সঙ্গে একটি করে অনুষ্ঠান রাখা হয়েছে। এতে করে এঁরা উৎসাহ এবং শিক্ষার সুযোগ দুটোই পাবেন বলে আমরা মনে করি।

ধ্রুপদ—সেনী ঘরাণার প্রবীণ শিল্পী মহম্মদ দবীর খাঁর ধ্রুপদ দিয়ে অনুষ্ঠান হয়। নাগার বাণী অঙ্গে অলাপ জোড় ধামারের মর্যাদা গম্ভীর ভক্তিভাবের প্রকাশে সারা প্রেক্ষাগৃহ যেন মন্দির হয়ে উঠেছিলো। রাগের শুদ্ধ ভাব, বিশেষ করে দেখাবের প্রয়োগবিধিতে বেহাগ ও কল্যাণের মিলন ও আপনাপন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দক্ষতার সঙ্গে লক্ষ্য করার বস্তু। এঁর সঙ্গে চৌতাল ও ধামারে পাখোয়াজ সঙ্গত করেন রামাশীষ পাঠক।

ধ্রুপদে এবার এক নতুন শিল্পীকে শোনা গেল। ইনি লাহোরের শিল্পী, পণ্ডিত ভাগবতস্বরূপ ঠাকুর। লাহোরের গান্ধর্ব মহাবিদ্যালয়ে ১৯৩১এ এঁর সংগীত জীবন সুরু হয়। এ-ছাড়াও পণ্ডিত গজানন রাও এবং ধ্রুপদীয়াজ পালুসকার (গোয়ালিয়র), ফিরোজ নিজামী (কিরানা ঘরানার) কাছে শিক্ষা লাভ করেন এবং বিষ্ণুপুর ঘরানার গোবিন্দদাস পাকড়াশী'র সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে এসে তাঁর পরিকল্পনা ও নির্দেশে ধ্রুপদে আত্মনিয়োগ করেন।

এই ব্যাপক শিক্ষার সুবিস্তীর্ণ পটভূমিকা ছাড়াও শ্রীঠাকুরের নিজস্ব সঙ্গীত-চিন্তা ও পরিবেশনা-শৈলীর মূল্যও যথেষ্ট। তারই ফল-শ্রুতি সেদিনের অনুষ্ঠান '[illegible]' রাগের ধ্রুপদ। কল-গাম্ভীর্য ছাড়া স্ব-সৃষ্ট মাধুর্যের ছোঁয়াও এ অনুষ্ঠানের উপভোগ্যতা বৃদ্ধি করেছে। বাংলার তরুণ ধ্রুপদ গায়ক তপন বন্দ্যোপাধ্যায় 'বেহাগ' রাগে ধ্রুপদানুষ্ঠানের প্রতিশ্রুতিশীলতাই শুধু নয়। তার আগের অনুষ্ঠানের তুলনামূলক বিচারে প্রশংসনীয় অগ্রগতি আনন্দদায়ক।

খেয়াল—খেয়ালের অনুষ্ঠানে প্রধান দুই আকর্ষণ ছিলেন দুই বিতর্কিত

বিশ্বরূপা ২রা নভেম্বর
সন্ধ্যা ৬-৩০টায়
তরুণ অপেরা নিবেদিত
রমলা সাফেস
৫৫ ৭১১১

নেপোলিয়ান
কবে
কোথায়।

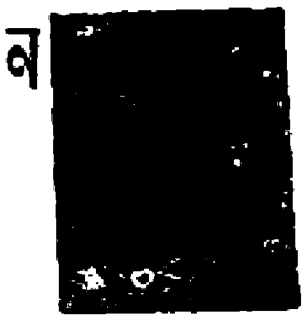

শিল্পী রাজ্জা প্রবীণ শিল্পী ওস্তাদ আমীর খাঁ ও কর্নাট্য তরুণ শিল্পী সুনন্দা পট্টনায়ক।

আমীর খাঁ সাহেব নামেই শুধু আমীর নন— গায়কোনা-শৈলীতেও আমীর—এ সত্য যেন নতুন করে অনুভূত হয় এবারের অনুষ্ঠানে। তাঁর গায়কী ও অনুষ্ঠান-পর্যায় নিয়ে সম্প্রতি কিছু কিছু বিরূপ মন্তব্য শোনা যাচ্ছে। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনায় প্রবেশ না করেও বলা যায়—আপন মেজাজ, সঙ্গীতভাবনা, মন ও কল্পনার উপযোগী যে পর্যায় তিনি সৃষ্টি করেছেন—সে বস্তু একেবারেই তাঁর। কিন্তু তাঁর মত অসামান্য সঙ্গীতব্যক্তির ও প্রতিভাকে যা হটগ্রস্তের মত সাজে প্রতিভাহীন অনুকরণ-দুষ্ট শিল্পীর কণ্ঠে তার বিকৃত প্রকাশকে তাঁর খাতিরে ওপর ছায়াকিস্তার করতে দেওয়া উচিত নয়। স্বর্ণকণ্ঠার তানের মধ্যে তাদের অসীম আকাশকে মূর্তিতে তোলার ক্ষমতায় আমীর খাঁর জুড়ি দুর্লভ। শ্রোতাদের হাততালি দেবার সুযোগ না দিয়েই আমি রাগ থেকে রাগান্তরে চলে যাই—সঙ্গীতজিজ্ঞাসা প্রসঙ্গে অমৃত প্রতিনিধিকে তিনি জানান। এবার তিনি শোনালেন বাগেশ্রী কানাড়া ও মালকোষ। কণ্ঠ-মাধুর্য হয়ত আগের তুলনায় ম্লান। ওপরের দিকে স্বচ্ছন্দও নয়—কিন্তু শিল্পীর ধ্যান-সমাহিত প্রশান্ত, স্বপ্নময় রাগের ইশারা এবং ভাব-গভীরতা তাঁকে প্রাজ্ঞতার স্বাতন্ত্র্যে প্রতিষ্ঠিত রেখেছে। 'ভজন আমি আলাদা করে গাই না, কারণ গাইতে পারলে ভক্তির অনুভবে খেয়ালই ভজন হয়ে উঠতে পারে—খেয়াল মানেই লয়ের মারামারি ও তানের চাকী-বাজী, আমি তা মানি না। আমার তারানাতেও আমি শান্তভাব বজায় রাখি।' —বলেন আমীর খাঁ। এ-সঙ্গীত-দর্শনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছিলো তাঁর এবারের অনুষ্ঠানে—তাঁর সঙ্গে সুযোগ্য তবলা সঙ্গত করেন উদীয়মান তবলিয়া গোবিন্দ বসু।

আর এক সঙ্গীত-দর্শনের স্মরণযোগ্য উদাহরণ পেশ করেছেন সঙ্গীতালঙ্কার সুনন্দা পট্টনায়ক। আমীর খাঁর শান্ত রসাশ্রিত বুদ্ধিদীপ্ত সঙ্গীতরূপ যেমন উদ্দাত্তের রসিক শ্রোতারা গ্রহণ করেছেন— তেমনই উচ্ছ্বসিত আনন্দে অভিনন্দন জানিয়েছেন সুনন্দা পট্টনায়কের আবেগ-রঞ্জিত তান বিস্তার, তান-বৈচিত্র্য ও রাগের সমৃদ্ধ খেয়াল। উচ্ছ্বাসই সঙ্গীতের মূলভাব তাঁর। কিন্তু আমীর খাঁ অনেক-সংযম বিশ্বাসী, কোনো প্রতিদান কামনা না রেখে হৃদয়ের নিবিড়তম সুরের অর্ঘ্য সুরলক্ষ্মীর চরণে পৌঁছে দেওয়াই যেন তাঁর লক্ষ্য।

সুনন্দা আত্মহারা নিবেদনের অর্ঘ্যকে হৃদয়ের সম্ভারে কেবল আনন্দ ও ঐশ্বর্য সাজিয়ে নিবেদন করেই শুধু ক্ষান্ত নন। বরঞ্চ অন্তরের সঙ্গীতলক্ষ্মীর প্রসন্ন আস্বাদের প্রয়াসী। তাই অন্তর-সম্পদ-দীপ্ত তাঁর গানে প্রশস্ত আলাপ ছাড়াও সুর ভরা মীড়, গমক, তারানায় বিদ্যুদ্বেগ গতি স্বর-কম্পনের উন্মাদনা ত্রি-সপ্তক পরিক্রমার নানারূপী বাহার। এ বাহারে চিত্ত দুলে না উঠে পারে না।

প্রতিবারের মত এবারেও প্রথম দিনে তিনি একটি স্ব-সৃষ্ট রাগ 'অকেশ্বর'— উপহার দেন। মহম্মদ দবীর খাঁ, সঙ্গীত-শাস্ত্রী বীরেন্দ্রকিশোর প্রমুখ গুণীজনের সঙ্গে আলোচনায় জানা গেল—গিরিজা শংকর চক্রবর্তী, নগেনবাবু, বাদল খাঁ—এই ধ্রুপদী প্রথায় খেয়াল গাইতেন। বিশেষ উল্লেখযোগ্য বোলতানের বিস্তার। দ্বিতীয় দিনে ইনি কোমল-ভৈরব ও বিশেষ অনুরোধে 'যোগী মত যা' গেয়ে শোনান। প্রথম রাতে বিশ্বনাথ বসু ও কল্লন খাঁ দ্বিতীয় প্রভাতে কেরামতুল্লা খাঁ ও সগীরুদ্দিন খাঁ যথাক্রমে এ'র সঙ্গে তবলা ও সারেঙ্গীতে সহযোগিতা করেন। আগ্রা-ঘরানার আঙ্গিকে স্থানীয় শিল্পীদ্বয় রবি কিচলু ও বিজয় কিচলুর গীত 'পূরবী' সঙ্গীত, তবে আরো বেশী ভালো লেগেছে এঁদের বাহারে। ঐ রাতে একই ঘরানার অপর শিল্পী সরাফৎ হোসেন খাঁর 'ভৈরব' রাগের খেয়ালও বেশ জমে উঠেছিল। গমক-ছেড় এবং তানে শক্তিমত্তার পরিচয় অবশ্যই ছিল। কিন্তু তান-বাহুল্য ও চাপল্য 'ভৈরব' রাগের শান্ত গম্ভীর ভাবকে অনেকাংশে ক্ষুণ্ণ করেছে। শ্রোতাদের বিশেষ আগ্রহে গাওয়া 'বাদুরে মেরা'—কোন বিশেষ রস সৃষ্টি করতে পারেনি। আর এক আকর্ষণীয় শিল্পী ছিলেন এম আর গৌতম। তাঁর গাওয়া 'শদ্ধি কানাড়া' সুরের মাদকতায় শ্রোতাদের মুগ্ধ করেছে।

মুশাব্বর হোসেন খাঁর 'শুদ্ধ-কল্যাণ' শিল্পীর আপন যোগ্যতায় তারিফ পেয়েছে। সুরের ওপর তিনি ক্রমশ কায়েমী হচ্ছেন দেখে মনটা খুশী হয়ে উঠলো।

মালবিকা কাননের 'মধুকোষ' তাঁর স্বভাবানুগ মাধুর্যে বিস্তৃত হয়েছিলো। দাদাজের ছোটোর কণ্ঠ-মাধুর্যের অভাব সত্ত্বেও প্রশংসা পাবেন 'মল্লার'-এ রাগ-শুদ্ধতা সুরক্ষিত হয়েছে বলে। এ ছাড়া টি এল রানার শিষ্যা কল্পনা চট্টোপাধ্যায়, কালিদাস সান্যালের শিষ্যা নমিতা চট্টোপাধ্যায়, গোয়ালিয়র ঘরানার জয়রাম সিং-এর শিষ্যা জয়ন্তী রায়চৌধুরীও প্রশংসাযোগ্য অনুষ্ঠান করেছিল।

সুবাহ-এ যন্ত্রসঙ্গীতের ধারা অনুসরণ করে দেখা গেল অসম্ভব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে সেতার। দিকপাল শিল্পী ছাড়াও প্রতিভাসম্পন্ন বেশ কয়েকজন তরুণ শিল্পীর আবির্ভাব আমাদের আশান্বিত করেছে। এর মূলে পণ্ডিত রবিশঙ্কর, ওস্তাদ বিলায়েত খাঁ ও নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রেরণার অবদান অনস্বীকার্য। প্রসঙ্গতঃ মণিলাল নাগ, ইমরাৎ খাঁ ও রইস খাঁর নাম উল্লেখযোগ্য। মণিলাল নাগ বাজান 'কৌশি-কানাড়া' রবিশঙ্কর ও নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাদন-শৈলীর সঙ্গে নিজস্ব শিক্ষা, চিন্তা প্রকাশভঙ্গির মিলনজাত রস ও আবেদন এক জম-জমাট পরিবেশ রচনা করে। আরো জমেছিলো কিষণ মহারাজের তবলা-সঙ্গতের দরুণ।

ইমরাৎ খাঁ দুদিনের অনুষ্ঠানে যথাক্রমে 'ইমন' ও 'যোগ' বাজিয়ে শোনান। বাজের দাপট, তানের দক্ষতা গমক ইত্যাদি সকল অলঙ্কারে তাঁর অসাধারণ দক্ষতা চমক লাগাবার মত। এই সঙ্গে রাগের অন্তর্গত সাহিত্যের প্রতি একটু নজর থাকলে তাঁর সম্বন্ধে বলার কিছু থাকত না। রইস খাঁর সেতার অত্যন্ত চিত্তগ্রাহী হয়েছিল—আগের বাজনার তান-চাঞ্চল্য ও আঙ্গিক কুশলতা প্রদর্শন প্রয়াসী মনের এবারে সংযত, অন্তর্মুখীতা রূপান্তরের করেন। যন্ত্রের ওপর দখল ছাড়াও সংযত অভিব্যক্তি তাঁর বাজনাকে প্রথম থেকে আকর্ষণীয় করেছে। 'টোড়ি' রাগে সোজা-নাঁক পঞ্চমের প্রয়োগ ছাড়া অন্য কোনো ত্রুটি চোখে পড়েনি।

বাহাদুর খাঁর শিষ্য মনোজশংকরের বাজনায় সু-শিক্ষার স্বাক্ষর ছিল।

আশা টান্ডনের অনুষ্ঠানে উল্লেখযোগ্য উন্নতি পরিলক্ষিত। যন্ত্র-সঙ্গীতের মধ্যমণি রূপে জ্বলজ্বল করছিলো বাহাদুর খাঁ ও নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরোদ ও সেতার। ধ্রুপদী অঙ্গের আলাপ জোড় ও তারপরের বাহাদুর খাঁর পাণ্ডিত্য এবং গতের অঙ্গে সর্বাঙ্গী ও বৈচিত্র্য ছাড়াও কল্পনায় রং স্মরণ করিয়ে দিয়েছে আলি আকবর খাঁর পরে সরোদী তাঁরই সুযোগ্য ভ্রাতা বাহাদুর খাঁ।

নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়-এর 'ভাটিয়ার' রাগের আলাপ ও 'বসন্ত মুখারী' রাগের গৎ একাধারে গায়কী অঙ্গ, তথা বীণকার ঘরানার আঙ্গিক-শৈলীতে স্বরবাজনার বিশুদ্ধতার মাধুর্য ছাড়াও যে বস্তু বিশেষ উল্লেখের দাবীদার তা হোল তাঁর "High tone of seriousness. শ্রীমতী মীরা দাশগুপ্তের পরিচালনায় "নৃত্যের তালে তালে" প্রতিষ্ঠানের 'কথক-নৃত্যের আঙ্গিকে 'রাধাকৃষ্ণের লীলা' উপাখ্যান দর্শকদের আনন্দ দিয়েছে: পণ্ডিত কিষণ মহারাজের খেয়ালী মেজাজের তবলা—পরিবেশকে মাতিয়ে তুলেছিলো।

—চিত্রাঙ্গদা

বিশ্বরূপা

২রা নভেম্বর
সন্ধ্যা ৬॥টায়

তরুণ
অপেরা
নিবেদিত

রমলা সার্কেস

পাইকপাড়া • কলকাতা

ফোন নিং — ৫৫-৩২৫২

৩১শে অক্টোবর সন্ধ্যা ৭টায়

ইন্দিরা থিয়েটার (কলাটি)

বালিকান বালিকাদের উদ্দীপিতে

"জীবন"

১লা নভেম্বর পশ্চিমবঙ্গ ময়দানে

সন্ধ্যা ৬॥টায় "পটলদাস"

প্রতিদ্বন্দ্বী/ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায় এবং কৃষ্ণা বসু। পরিচালনা/সত্যজিৎ রায়

প্রেক্ষাগৃহ

চিত্র-সমালোচনা

অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'নিশিপদ্ম'

পল্লীগ্রামের ইতিকথার নগ্ন বাস্তব রূপ তুলে ধরায় কৃতিত্বে বিভূতিভূষণের লেখনী স্মরণীয় হয়ে আছে। একদিকে পাড়াগাঁয়ের রোজকার জীবনের শঠতা সংস্কার, প্রেম-প্রীতি, ভালোবাসা ইত্যাদির ছবি আঁকতে তিনি যেমন কুশলী, তেমনি স্মরণীয়-বরণীয় চরিত্র সৃষ্টিতেও তিনি সমান নিপুণ। 'নিশিপদ্মে'র অনঙ্গ (উত্তম-কুমার) ও পুষ্প (সাবিত্রী) তাঁর অন্যতম সুন্দর সৃষ্টি বলা যেতে পারে। পরিচালক অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় বিভূতিভূষণের 'নিশিপদ্ম'কে চিত্ররূপের জন্য বেছে নিয়েছিলেন বোধ হয় ঐ দুটি চরিত্রেরই আকর্ষণে। এবং তাঁর সেই প্রীতি পর্দায় যথার্থ রূপ পেয়েছে বলেই সাধুবাদ জানাব শ্রীমুখোপাধ্যায়কে। বিভূতিভূষণের অনঙ্গ বা পুষ্প পর্দায় এসে কেউই হারিয়ে যাননি। বরং প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে বলা যায়।

বৈষ্ণবের মেয়ে পুষ্পর বিয়ে যদিও হয়েছিল ছোটোবেলায়, কিন্তু স্বামীর দ্বিতীয়বার বিবাহের দরুন নিঃসন্তান পুষ্পকে স্বামীর ঘর ছেড়ে আসতে হয়। সামাজিক সংস্কারের চাপে বেঁচে থাকার কোনো সামান্যতম উপায়ও না পেয়ে আত্মহত্যার পথেই তাকে দেহ নিতে হয়। কিন্তু অর্থলোলুপ পাড়ার এক কাকা তাকে অর্থের লোভ দেখিয়ে শহরে নিয়ে এসে পতিতার বৃত্তি নিতে বাধ্য করে। পুষ্পর নতুন জীবন শুরু হয়। মক্ষিরাণী পুষ্প এখন অনঙ্গর প্রাণপ্রতিমা। ধনী কিন্তু বিবাহিত জীবনে অসুখী অনঙ্গ পুষ্পের মধ্যে তার অচরিতার্থ স্বপ্নের ছবি দেখতে পায়। নাটক জমে ওঠে তখনই যখন অপুত্রক পুষ্প তার এক প্রতিবেশী গাঁয়ের দাদার শিশুপুত্র ভুতোর প্রতি মাতৃস্নেহ নিয়ে এগিয়ে যায়। নষ্ট মেয়ের সঙ্গে ভুতোর মেলামেশা তার বাবা-মা সহ্য করতে পারেন না। বাড়ী বদলে চলে যান তাঁরা অন্যত্র। হারিয়ে যায় পুষ্প। পনের বছর বাদে ভুতো শহরে এসে নতুন রূপে পুষ্পকে (সে তখন বিধবা) আবিষ্কার করে, অনঙ্গর সাথে দেখা হয়।

বিভূতিভূষণের কাহিনী-বিন্যাসকে পরিচালক অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় সামান্য পরিবর্তন ছাড়া মোটামুটি মেনেই চলেছেন। আলগা চিত্রনাট্যের জন্য ছবির গতি প্রথমাংশে ব্যাহত হলেও, শিল্পীদের আন্তরিক নিষ্ঠায় ও অভিনয়ে 'নিশিপদ্ম' সুঅভিনীত ছবি বলা চলে। অনঙ্গ চরিত্রে উত্তমকুমার শুধুমাত্র তাঁর স্বভাবজ নিপুণতার পরিচয়ই দেননি, রঙে, রসে, গাম্ভীর্যে, গভীরতায় চরিত্রটিকে প্রাণবন্ত করে তুলেছেন। অনঙ্গ তাঁর অন্যতম সার্থক সৃষ্টি। পুষ্পর চরিত্রে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় সাবলীল, সুন্দর। অন্যান্য চরিত্রে অনুপকুমার, গঙ্গাপদ বসু, অসীম চক্রবর্তী, তপতী ঘোষ, মঃ মজিদ, জহর রায় চিত্রনাটীর প্রয়োজন মিটিয়েও দর্শকের মনে ঠাঁই করে নেবেন বলা যায়।

নচিকেতা ঘোষের সুরে মান্না দে-র দুটি গান জনপ্রিয় হবে আশা করা যায়। সুখ-দুঃখ, হাসি-গান, ব্যথা-বেদনা সবকিছুর সুষ্ঠু সমন্বয়ে বলতে পারি চিরন্তন চিত্রের 'নিশিপদ্ম' আকর্ষণীয়, চিত্তবিনোদনকারী ছবি হিসেবে সার্থক।

স্টুডিও থেকে

পুজোর কদিন ঝিমিয়ে থাকার পর টালিগঞ্জের স্টুডিওপাড়া আগের মত আবার জেগে উঠেছে। বাস্ত কাজ আর কাজ। যেখানেই গেছি চোখে পড়েছে শুধু কর্ম-ব্যস্ততা। এন টি-র এক নম্বর থেকে শুরু করে পুলিসাইটীর খালের পাড়ে ক্যালকাটা মুভিটোন পর্যন্ত সবকটা স্টুডিওর একই রূপ।

পিনাকী মুখার্জির 'আলো আমার আলো', কনক মুখার্জির 'শহরটির নাম কলকাতা', নবেন্দু চ্যাটার্জির 'রাণুর প্রথম ভাগ', সলিল সেনের 'খুঁজে বেড়াই' ও আরও কয়েকজনকে কোনো না কোনো স্টুডিওয় ব্যস্ত দেখেছি নিজেদের ছবি পরিচালনার কাজে।

যাঁরা এখানে নেই, তাঁরাও ব্যস্ত অন্যত্র। হীরেনবাবু গেছেন 'বিগলিত করুণা জাহ্নবী যমুনা'র ইউনিট নিয়ে সুদূর উত্তর ভারতে। তরুণ মজুমদার রূপনারায়ণের

পাড়ে কাজ করছেন ইতিমধ্যে ফিরেও এসেছেন সম্ভবতঃ। 'নিমন্ত্রণ' ছবির। হেমন্তবাবু সম্প্রতি ফিরে এসেছেন 'অনিন্দিতা'র কাজ শেষ করে। শুনেছি দীনেনবাবু পুজোর মধ্যেই কোনো এক প্যান্ডেলে তাঁর নতুন ছবি 'আজকের নায়কের' কিছু দৃশ্যগ্রহণ করেছেন। স্টুডিওতে তিনি এখন অনুপস্থিত।

দুদিন ধরে সবক'টা স্টুডিও ঘোরার পর যা দেখলাম, যা শুনলাম তাতে এটাই বুঝলাম, টালিগঞ্জ যেন বলতে চায় 'রিং আউট দি ওল্ড, রিং ইন দি নিউ'। নতুনের জয়গান আর নবীনের কলহাস্যে মুখর তাই আজ টালিগঞ্জ। তাই ভুলেও চোখ কখনো দেখতে পায় না সুশীল মজুমদারকে, দেখে না চিত্ত বসুকে, রাজেন তরফদারকে। শুনেছি সুশীলবাবু বম্বে পাড়ি দিয়েছেন, চিত্তবাবুর খবর জানা নেই আমার। সবচাইতে দুঃখ হয় রাজেনবাবুকেও চোখে পড়ে না বলে। একাধিকবার শুনেছি তিনি

আজকের নায়ক/পরিচালনা দীনেন গুপ্ত/জয়শ্রী রায়। ফটো : অমৃত

প্রেমেন্দ্র মিত্রের লেখা গল্প 'সংসার সীমান্তে'কে চিত্ররূপ দেবেন। অদ্যাবধি তার কোনো পাকাপাকি সংবাদ না পেয়ে একদিন সশরীরেই হাজির হয়েছিলাম রাজেনবাবুর বাড়ীতে। 'অন্তরীক্ষ', 'গঙ্গা'র স্রষ্টা তিন বছর যাবৎ কেন নীরব সেটা ভাববার মত বটে।

আসল ব্যাপার আর পাঁচজন পরিচালকের মত রাজেনবাবু জীবিকানির্বাহের জন্য শিল্পের এই মহান কলাটির ওপর চাপ সৃষ্টি করেননি। ছবি করা না করা তাঁর কাছে পুরোপুরি মানসিক প্রস্তুতির ব্যাপার। তাই ছবি করার একঘেয়েমি থেকে রিলিফ পাবার জন্যই স্বেচ্ছাকৃত এই বিরতির আয়োজন।

তাঁর সর্বশেষ ছবি 'আকাশ ছোঁয়া' মুক্তি পেয়েছে বছর-তিনেক আগে। তারপরই শুনেছি তাঁর 'সংসার সীমান্তে'র খবর। এখনও শুনছি। তিনি বললেন—

'এ-গল্পটার চিত্রায়ণের কথা ভেবেছি অনেক আগেই। চিত্রনাট্যও শেষ করেছি বহুদিন আগে। একটা চোর ও একটা বেশ্যার প্রণয়ঘটিত কাহিনী নিয়ে ছবির গল্প।' অনেকদিন আগে থেকেই ফাইনান্সিয়ার খুঁজছিলেন তিনি। গল্পও শুনিয়েছেন তাঁদের। কিন্তু কেউই রাজী হননি। কারণ, সমাজের নীচের তলার ওরকম দুটো চরিত্র নিয়ে রসালো জমজমাট কোনো ছবি করতে না পারলে আর্থিক অনিশ্চয়তার সম্ভাবনা নাকি নেই-ই। কাজেই 'সংসার সীমান্তে' তৈরীর খবর খবরই রয়ে গেছে। ফ্লোরে এখনও গিয়ে উঠতে পারেনি।

রাজেনবাবুও অনন্যোপায় হয়ে হাজির হয়েছিলেন ফিল্ম ফিনান্স কর্পোরেশনের কাছে। কাগজে-কলমে তাঁরা মঞ্জুর করেছেন দু' লক্ষ টাকা। হাতে এখনও পাননি। পেলেই কাজ শুরু করবেন। এখন চলছে শিল্পী-নির্বাচন পর্ব। প্রথম দিকে স্থির হয়েছিল

রঙ্গনা বিশ্বরূপার রাস্তায় শ্যামবাজার মোড়ের মোড়ে

নান্দীকার

শনিবার ৬-৩০টায়

রবিবার ৩টা ও ৬-৩০টায়

তিন পয়সার পালা

৫ই নভেম্বর বৃহস্পতিবার ৩ ও ৬॥টায়

মঞ্জরী আমের মঞ্জরী

নির্দেশনা : অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

।। রঙ্গনায় (৫৫-১৮২৮) টিকিট পাবেন ।।

স্টার [শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত নাট্যশালা]

৪০০তম অভিনয় অতিক্রান্ত

শর্মিলা

প্রতি বৃহস্পতি ও শনিবার : ৬॥টায়

প্রতি রবিবার ও ছুটির দিন : ৩টা ও ৬॥টায়

॥ রচনা ও পরিচালনা ॥

দেবনারায়ণ গুপ্ত

॥ রূপায়ণে ॥

অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, অপর্ণা দেবী, নীলিমা দাস, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, সতীন্দ্র ভট্টাচার্য, কালীপদ চক্রবর্তী, দীপিকা দাস, শ্যাম লাহা, প্রেমাংশু বসু, বাসন্তী চট্টোপাধ্যায়, ভোম্বল মুখোপাধ্যায়, ...গীতা দে ও বাসবী ঘোষ।

বিশ্বজিৎ ও সন্ধ্যা রায় প্রধান চরিত্র-দুটি করবেন। রাজেনবাবুর কাছ থেকেই শুনলাম ওঁরা ছবিতে কাজ করছেন না। সম্পূর্ণ নতুন মুখ নিয়ে তিনি কাজ করবেন।

নতুনদের নিয়ে কাজ করার আর্থিক সাফল্যের অনিশ্চয়তার কথা জানালে তিনি বললেন—নতুনদের নিয়ে ছবি করলেই যে সে-ছবি দর্শক-চিত্তকে আনন্দ দিতে পারে না—এ-ধারণা ঠিক নয়। তার প্রমাণ বাংলার কাছে অনেক আছে। তাছাড়া নতুনদের নিয়ে কাজ করার সুবিধেও অনেক। পুরোনোদের [illegible] জনপ্রিয়তায় দর্শকের চোখে প্রতিষ্ঠিত [illegible] নেই। আসল কথা খ্যাতনামা শিল্পীরা অনেকেই নিজেদের ইমেজ পেরিয়ে চরিত্র সৃষ্টি করে উঠতে পারেন না। এর জন্য দায়ী অবশ্য দর্শকরাই। তাঁরাই অভিনীত চরিত্রের চাইতে শিল্পীকে আদরের স্থান দেন বেশি।

'আমার মতো যাঁরা ছবি করাকে শিল্প-মাধ্যম হিসাবে বেছে নিয়েছেন, তাঁরা স্বভাবতঃই এ-ব্যাপারে সন্তুষ্ট হতে পারেন না। তাই নতুনদের নিয়ে কাজ করতেই হয়। যাদের কখনো-সখনো পুরোনোদের নিয়ে কাজ করা হয় সেখানে সেই শিল্পীর ইমেজটা বদলে নিতে চেষ্টা করি আমরা।'

এ-কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল [illegible] সন্ধ্যা রায় ও [illegible] সুপ্রিয়া চৌধুরী অভিনীত চরিত্র দুটোর কথা। [illegible] সন্ধ্যা রায় তখন নবাগতা। আর [illegible] সুপ্রিয়া চৌধুরী তখন রীতিমত স্টার। অথচ দুটো চরিত্রই নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর এখনও। এ হল আর কিছু নয়, পরি-চালকের সৃজনীক্ষমতার বৈশিষ্ট্য!

রাজেনবাবু তাঁর আগামী ছবি 'সংসার সীমান্তে'ও [illegible] বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যের পরিচয় হাজির করতে পারবেন বলে তিনি আশা করেন। 'পলাতক'-এর পর তাঁর অন্য কোনো ছবি আর সেরকম কি আর্থিক, কি শিল্পগত সাফল্য কেন পেল না সে-সম্পর্কে প্রশ্ন করায় তিনি জানালেন—এ-ব্যাপারে কারোর কিছু বলা সম্ভব নয়। চেষ্টা তো করেছি সাধ্যমত। তবে কিনা 'পলাতক' আমার [illegible]। ওর সঙ্গে কারও তুলনা করতে পারি না। 'পলাতক'-এর মত দ্বিতীয়টি সৃষ্টি করতে পারিনি—সেটা আমারই অক্ষমতা। মহৎ সৃষ্টি তো ভূরি ভূরি হয় না। অদৃষ্টে একটা-দুটোই হয়। সত্যজিৎ-বাবুর 'পথের পাঁচালী' একটাই হয়েছে। আর হবে কি?

এই রাজেন তরফদারকে এখনও পর্যন্ত টালিগঞ্জের পাড়ায় দেখতে পাচ্ছি না। তিনি নবীন নন নিশ্চয়ই, আবার প্রবীণের দলেও তাঁকে ফেলতে পারি না। তাই স্টুডিও পাড়ার নতুন জোড়া হাওয়ায় তাঁকে দেখতে পেলে খুশি হতাম। বাংলার দর্শকরা আরও খুশি হবে তাঁর কাছ থেকে 'সংসার সীমান্তে' পেলে।

মঞ্চাভিনয়

সারথীর নাট্যানুষ্ঠান: গত ২০ সেপ্টেম্বর [illegible] সারথী মুক্ত অঙ্গন মঞ্চে প্রমথ-নাথ বিশীর 'ভূতপূর্ব স্বামী' নাটকটি অভূতপূর্ব সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করেন। একক ও দলগত অভিনয়ে [illegible] উপস্থাপনা ও [illegible] নাট্য [illegible] নাট্য পরিচালক [illegible] বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। অভিনয়ে সর্বাগ্রে নাম করতে হয় [illegible]। [illegible] উপস্থিত করেন। [illegible] ও [illegible] চরিত্রে [illegible] [illegible]।

তরুণ অপেরা: ১ নভেম্বর পার্ক সার্কাস ময়দানে কল্যাণ সংঘ আয়োজিত অনুষ্ঠানে সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় শম্ভু বাগ রচিত অমর ঘোষ পরিচালিত হিটলার অভিনীত হবে। শ্রেষ্ঠাংশে শান্তিগোপাল এবং বর্ণালী বন্দ্যোপাধ্যায়। ২ নভেম্বর বিশ্বরূপা রঙ্গমঞ্চে সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় এদেরই রমনা সার্কাস অভিনীত হবে। রচনা এবং পরিচালনা অমর ঘোষ। শ্রেষ্ঠাংশে শান্তিগোপাল এবং বর্ণালী বন্দ্যোপাধ্যায়।

বড়দিদি। গত ৭ সেপ্টেম্বর হের্ প্যাস-পোর্ট (ফরেনার্স সেকশান) রিক্রিয়েশন ক্লাবের ষষ্ঠ বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে শরৎ-চন্দ্রের বড়দিদি নাটকটি বিশ্বরূপায় মঞ্চস্থ করা হয়। নাট্যকার ও পরিচালক শ্রীমণি দত্তের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং অভিনেতা-অভিনেত্রীবৃন্দের একাগ্রতায় নাটকটি উপ-ভোগ্য হয়। বড়দিদির ভূমিকায়—মমতা চট্টোপাধ্যায়, শান্তির ভূমিকায়—তৃপ্তি দাস, এলোকেশীর ভূমিকায়—আশা বোস সু-অভিনয় করেন। পুরুষ চরিত্রে সুরেন্দ্র-নাথের ভূমিকায়—উপেন সাহা, মথুরানাথের ভূমিকায়—এককড়ি মাইতি, শিবনাথের ভূমিকায়—তপন চক্রবর্তী, ধর্মদাসের ভূমিকায়—প্রণব মুখোপাধ্যায়, পরাণ মণ্ডলের ভূমিকায়—সুদর্শন বড়াল, সাহেবের ভূমিকায়—একরেন আলী এবং সুরেন্দ্রনাথের ইয়ারগণের ভূমিকায়—দিলীপ দে, দিলীপ দাস এবং ননী রায় ইত্যাদি সু-অভিনয় করেন। অন্যান্য ভূমিকায় অভিনয় যথাযথ।

অষ্টম বার্ষিক প্রকাশ স্মৃতি বাংলা পূর্ণাঙ্গ সর্বভারতীয় নাট্য প্রতিযোগিতা: লাখনউ বেঙ্গলী ক্লাব ও যুবক সমিতির উদ্যোগে আয়োজিত অষ্টম বার্ষিক সর্ব-ভারতীয় প্রকাশ স্মৃতি পূর্ণাঙ্গ বাংলা নাট্য প্রতিযোগিতা এবার খুব উৎসাহ ও উদ্দীপনার সুরু হচ্ছে আগামী ১২ ডিসেম্বর থেকে। প্রতিযোগিতার প্রবেশ মূল্য ধার্য হয়েছে ৪০ টাকা। যথারীতি অন্যান্য পুরস্কার ছাড়াও শ্রেষ্ঠ প্রযোজনার জন্য প্রথম পুরস্কার ৫০১ টাকা ও দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ প্রযোজনার জন্য ২৫১ টাকা দেওয়া হবে। দলের নাম পাঠাবার শেষ তারিখ ৩০ নভেম্বর, ১৯৭০ স্থির হয়েছে। ১৯৭০ সাল সমস্ত মানব জাতির পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়। এ বছর রাষ্ট্রসংঘের জন্মের ২৫ বছর পূর্ণ হল। যে মহান সমন্বয়, প্রীতি ও প্রগতির ভাবনা নিয়ে এই মহাসংঘের ভিত্তিস্থাপনা হয়েছিল, সেই উদ্দেশ্যকে আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষমতার দ্বারা, সুস্থ নাটক পরিবেশনার মাধ্যমে এগিয়ে নিয়ে যাবার ইচ্ছাই এবছরের নাট্য উৎসবের তাৎপর্য। নিয়মাবলী ও অন্যান্য অনুসন্ধানের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন:—১। সম্পাদক, বেঙ্গলী ক্লাব ও যুবক সমিতি, ২০, শিবাজী মার্গ, লখনউ-১। সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার পর—ফোন: নং ২৭১২০। ২। বিনয় দাশগুপ্ত, ১০।৩, গ্রে স্ট্রীট, কলকাতা-৫, ফোন: নং ৫৫-২১২৬।

৩০শে অক্টোবর, শুক্রবার শুভমুক্তি

অপরাধীদের সবচেয়ে দুঃসাহসিক কাহিনী! রঙের বৈচিত্র্যে আকর্ষণকারী ও উত্তেজনাপূর্ণ কল্পনাদীপ্ত ...।

পরিচালক কেবল মিশ্র সঙ্গীত ভোলীক ওমী

অপেরা প্রত্যহ বিশ্রাহরিক প্রদর্শনী বেলা ১১-৪৫টায় **ক্রাউন - প্রভাত**

গণেশ - খান্না - রূপালী - পার্কশো

প্যারামাউন্ট - ভবানী বঙ্গবাসী - ন্যাশনাল - অজন্তা অশোক - খাতুনমহল

নিউ তরুণ - প্রফুল্ল - স্বপ্না - শ্রীকৃষ্ণ - বিভা - শ্রীলক্ষ্মী - লীলা - চন্দ্রাজিৎম
হালদক - ইন্দ্রধনু (নবদ্বীপ) - বিচিত্রা (বর্ধমান) - রূপকথা (আসানসোল)

বিবিধ সংবাদ

প্রতিদ্বন্দ্বী মুক্তি পেল: সত্যজিত রায়ের প্রতিদ্বন্দ্বী মুক্তি পেয়েছে কাল পূজার দিন মিনার বিজলী ছবিঘর সহ অন্যান্য চিত্রগৃহে। সাময়িক কালের একটি ঘটনা এইচিত্রের উপজীব্য। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় যুবকদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য যে প্রাণপণ সংগ্রাম করতে হচ্ছে তারই আলেখ্য এই কাহিনী চিত্র।

অভিনয়ে আছেন কয়েকজন আনকোরা শিল্পী: ধৃতিমান চ্যাটার্জী, জয়শ্রী রায়, কৃষ্ণা বোস, দেবরাজ রায় শেফালী, ইন্দিরা দেবী, ধারা রায়, মমতা চ্যাটার্জী এবং অন্যান্য। সঙ্গীত পরিচালনা এবং চিত্র-নাট্যের দায়িত্ব পরিচালকের।

সত্যজিত রায়ের অনন্য সম্মান: সত্যজিত রায় ২৮ অক্টোবর সান-ফ্রান্সিস্কো ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে গেছেন। সেখানে তাঁকে সম্বর্ধনা জানানো হয় ৩০ অক্টোবর। এই উপলক্ষে দিবা রাত্রির 'অরণ্যের দিনরাত্রি' চিত্রটি প্রদর্শিত হয়।

কলাবিদের সম্বর্ধনা। গত ৭ অক্টোবর শনিবার ভারত চেকোশ্লোভাক সংস্কৃতি সংস্থা প্রখ্যাত চেক প্রাচ্যকলা বিশেষজ্ঞ ডঃ লুবোর হায়েককে এক চা-চক্রে আপ্যায়িত করেন। সম্বর্ধনার উত্তরে ডঃ হায়েক বলেন শিল্পকলার ক্ষেত্রে প্রাচ্য দেশের যে অফুরন্ত সম্পদের সন্ধান তিনি পেয়েছেন তা বিস্ময়কর। বিশেষত বাংলা দেশের ও বাঙ্গালী শিল্পীদের সম্পর্কে তিনি বিশেষ শ্রদ্ধা ও আস্থা পোষণ করেন। সমিতির পক্ষ থেকে অধ্যাপক সুনীল কর ডঃ হায়েককে একটি বিশেষ স্মারক ও যতগুলি তৈলচিত্র উপহার দেন। উপস্থিত অভ্যাগত-দের মধ্যে ছিলেন প্রাক্তন এম-এল-এ ডঃ এ এম ও গণি, অভিনেতা শ্রীপাহাড়ী সান্যাল,

অদ্রিজা মুখার্জী ও দিলীপ বসু প্রভৃতি। অনুষ্ঠানে গান পরিবেশন করেন নমিতা মুখার্জি, সুমিত ধর ও অন্যান্য।

সুরে সুরে তালে তালে

সম্প্রতি ঘরোয়া সংস্কৃতি পরিষদের উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত অবলম্বনে নৃত্য সহকারে একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান 'সুরে সুরে তালে তালে' অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বালিগঞ্জ শিক্ষাসদনে। সঙ্গীতে, নৃত্যে এবং কথনে অপূর্ব গ্রন্থনা এই 'সুরে সুরে তালে তালে' সাম্প্রতিক সংস্কৃতি জগতের তথাকথিত ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীত এক আশ্চর্য সুন্দর অনুষ্ঠান। সবচেয়ে বড়ো কথা রবীন্দ্র-সঙ্গীতের গভীরে প্রবেশ করে মানব-মনে তার প্রভাব প্রতিক্রিয়া এমন নিপুণ শৈল্পিক দৃষ্টিতে গ্রন্থক শ্রীপ্রকাশচন্দ্র মিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন যা সচরাচর লক্ষ্য করা যায় না। এবং নিজ কণ্ঠে তিনি ত, অর্থাৎ পদ্যাংশ আবৃত্তি করে পরিবেশটিকে যথাযথই রাবীন্দ্রিক করে তুলতে সফল ভূমিকা নেন। সঙ্গীতে সবচেয়ে কৃতিত্বের পরিচয় দেন সংগীত নির্দেশক শ্রীশান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, আর নৃত্যে দেন পুরুষের ভূমিকায় চামেলী চক্রবর্তী ও নারীর ভূমিকায় দীপালি চক্রবর্তী। গানে ও নাচে অন্যান্য যাঁরা উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করেন তারা হলেন অঞ্জনা মিত্র, অশোক দাস, গৌরী গুহ, মঞ্জরী দত্ত, প্রভাত ঘোষ, ছবি ঘোষ, শেফালি চক্রবর্তী, চন্দ্রা সিংহ প্রমুখ। ব্যবস্থাপনায় ছিলেন প্রভাত ঘোষ ও দীপালি চক্রবর্তী।

উপভোগ্য অনুষ্ঠান

বিহারঃ কাতরাসগড় (ধানবাদ) শারদীয়া সম্মিলনীর নিজস্ব প্রাঙ্গণে গত ১৫।১০।৭০ অভিনেতা ধীরেন দে (বাদল) ও পীযূষকান্তি দত্তর (নাড়ু) যুগ্ম পরিচালনায় এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান হয়েছে। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে সভাপতি রসিকলাল পাঠক, সাংবাদিক তরুণ ঘোষ ও অভিনেতা ধীরেন দে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। কোলকাতার বহু শিল্পী এ অনুষ্ঠানে যোগ দেন, মানসকুমার, শম্ভু মুখোপাধ্যায়, গুল মহম্মদ সংগীত পরিবেশন করে শ্রোতাদের প্রচুর আনন্দ দেন। হাস্যকৌতুক অভিনেতা শীতল বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাস্যকৌতুক ও অমল চট্টোপাধ্যায়ের কৌতুকগীতি প্রশংসার দাবী রাখে।

কোলকাতার 'ইউরেকা' ও শিশির শ্রীরঙ্গম নাট্যগোষ্ঠী যথাক্রমে অভিজেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নানা রঙের দিন' ও বিমল বসু রচিত 'অভিনয়' দুটি একাংক নাটক মঞ্চস্থ করেন। তরুণ ঘোষ নির্দেশিত ও অভিনীত 'নানা রঙের দিন' নাটকটি সকলে উপভোগ করেন। দর্শকমণ্ডলীর অত্যধিক চাপ থাকায় প্রাঙ্গণটি সম্পূর্ণ ভরে যায়, এমন কি বহু দর্শক বাড়ীর ছাদে নিজেদের স্থান করে নেন। অধিক রাত্রি পর্যন্ত অনুষ্ঠান চলে। স্থানীয় যুবকবৃন্দের সহযোগিতায় অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। শব্দ সংযোজনায় অসীমকুমার পাল কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

বর্গী এলো দেশে

বিহারঃ কাতরাসগড় (ধানবাদ) রেলওয়ে ইনস্টিটিউটের সভ্যবৃন্দ কর্তৃক গত ৮ অক্টোবর অষ্টমী পূজোর দিন পালাকার ব্রজেন দে রচিত 'বর্গী এলো দেশে' পালাটি নিজস্ব মঞ্চে অভিনীত হল, উল্লেখযোগ্য অভিনয় নৈপুণ্য দেখিয়েছেন 'দিবাকর', গঙ্গারাম, ও বিশুর ভূমিকায় যথাক্রমে অমিয়কুমার মল্লিক, বিশ্বনাথ মুখার্জী ও শ্রীমান বিলু। এছাড়া ভাল অভিনয় করেন সুকুমার চাটার্জী (ভাস্কর পণ্ডিত), গঙ্গাসাগর সাহা (সিরাজ) ও নারায়ণচন্দ্র রায় (আলিভাই)। স্ত্রী চরিত্রে কুমারী মঞ্জুশ্রী দাস (কাজলী) ও অনিমা ব্যানার্জী (মেহেরউন্নিসা) সাবলীল অভিনয় করেন। অন্যান্য কয়েকটি চরিত্রে অংশ নেন—ডাঃ হরনাথ মুখার্জী, মুরারী চাটার্জী, হরিশংকর পাল, সত্যরঞ্জন চক্রবর্তী, অনিল সরকার, সত্যরঞ্জন প্রামাণিক, সুধাংশু দাস, ও আরো অনেকে, শব্দ-সংযোজনায় সুধাংশু দাস, ও আরো অনেকে, শব্দ-সংযোজনায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন অসীমকুমার পাল।

অশনিঃ সম্প্রতি সেনাবাহিনীর ছাউনীতে বসেজ রেজিমেন্ট ট্রেনিং সেন্টারে বাঙালীদের সার্বজনীন পূজোর অষ্টমীর রাত্রিতে 'অশনি' নাট্যসংস্থা সতীশ নিয়োগীর 'উত্তাল তরঙ্গ' মঞ্চস্থ করেন। বর্তমান বাংলার সমস্যা কণ্টকিত যুব-সমাজের বিপথগামী প্রবণতাকে পাগলাবাবার আত্মোৎসর্গের দ্বারা সৎপথে আনবার প্রচেষ্টা—এই বক্তব্যকে সঙ্ঘবদ্ধ অভিনয় নৈপুণ্যে 'অশনি' গোষ্ঠী তুলে ধরতে পেরেছেন। চা-অলা দোকানী জীবনের নাম-ভূমিকায় গোবিন্দ দে, সুরেশবাবুর ভূমিকায় তপনকুমার ব্যানার্জি, ইন্দ্রজিতের ভূমিকায় অশোককুমার বসু ও ইন্‌স্পেকটারের ভূমিকায় সুধীরকুমার রায়ের অভিনয় বিশেষ প্রশংসিত হয়। রূপসজ্জা ও আবহসংগীত সুন্দর। সর্বশ্রী প্রবীর সেন, রবীন পাল মধু চৌধুরী ও শ্রীমতী ইন্দ্রাণী চাটার্জির।

'অশনির আসন্ন পরবর্তী আকর্ষণ এবং ইন্দ্রজিৎ।'

লক্ষ লক্ষ দর্শকের অভিনন্দন ধন্য—

দীপাবলীর শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ !

লাবণ্যময়ী ববিতা তার শিল্পীজীবনের সব থেকে মধুর এবং সুন্দর ভূমিকায়—
উৎকণ্ঠা, শিহরণ, হত্যা, রহস্য, অনুপম গীত, নৃত্যসঙ্গীত এবং নৃত্যোচ্ছল

প্রচণ্ড ভীড় এড়াবার জন্য অগ্রিম বুক করুন :

পরিচালনায় অর্জুন হীঙ্গোরানী সংগীত কল্যাণজী আনন্দজী

প্রত্যহ ৩, ৬ ও ৯টা : সহরতলী যথারীতি

রক্সি — মেনকা — জেম — নাজ — লিবার্টি — ছায়া
মৃণালিনী - এরোরা - নারায়ণী - রিজেন্ট - শান্তি - পারিজাত - নবভারত
কমল - লক্ষ্মী - শ্রীরামপুর টকিজ - অনুরাধা - রিগ্যাল (জামসেদপুর)
কোনার্ক (রাউরকেল্লা) - ব্রিজভ্যাও (শিলং)

CENTRAL LIBRARY

কমল ভট্টাচার্য

খেলার কথা

ময়দানের অবক্ষয় ও আমাদের দায়িত্ব

অক্টোবরের শুরুতেই ফুটবল তার আসর গুটিয়ে নেয় কলকাতার মাঠ থেকে। এখন অক্টোবরের শেষ। নভেম্বরের গোড়া থেকেই শুরু হয়ে যাবে ক্রিকেটের মরশুম। খেলাধূলার জগতে এই অক্টোবর মাসের একটা বিশেষত্ব আছে। অনেক ক্রীড়ারসিক এই মাসটাকে মরা মাস বলে অভিহিত করে থাকেন। কারণ, এ মাসে শহরের মাঠ বা ময়দানে খেলাধূলা সম্পূর্ণ বন্ধ থাকে। অক্টোবরের প্রথম পনের দিন ময়দানে কোনরকম খেলাধূলো করা আইনত নিষিদ্ধ। আর বাকি কদিনও কোন খেলা হয় না। যাঁরা শুধুমাত্র প্রাণচঞ্চল ময়দানের রূপ দেখতেই অভ্যস্ত, এ সময়ে ময়দানের দিকে গেলে তাঁরা কিছুটা আশ্চর্য নিশ্চয়ই হবেন। কদিন আগেও ফুটবলের হাঁকডাকে যে জায়গাটা সরগরম ছিল, সেখানে হঠাৎ যেন নেমে এসেছে মৃত্যুর স্তব্ধতা। বছরে এই একটি মাসই বিশ্রাম পায় মাঠ এবং এই সময়টুকুতে চলে সারা বছরের জন্য মাঠ তৈরীর কাজ।

ভালো খেলতে গেলে যেমন শুধু অনুশীলন বা ক্রীড়াকৌশল রপ্ত করার দিকে নজর দিলেই চলে না শরীর তৈরী এবং শরীরের যথোপযুক্ত বিশ্রামের দিকে লক্ষ্য রাখতে হয়, তেমনি খেলার মান বাড়াতে গেলে মাঠকেও সেই অনুপাতে উপযুক্ত করে তুলতে হয়। খেলোয়াড়দের যেমন প্রয়োজন সময়মত বিশ্রামের তেমনি মাঠেরও বিশ্রামের প্রয়োজন আছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এই এক মাসে সারা বছরের নানান রকম খেলাধূলো করার জন্য উপযুক্ত ভাবে মাঠ তৈরী কি সম্ভব ?—না, কিন্তু সময়ই বা কই ?

নভেম্বরের গোড়ার দিকে ক্রিকেট মরশুমের শুরু। এ মরশুম চলে মার্চ মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত। এর পরই হকির আসর পাতা হয়ে যায়। হকির জন্যে বেশী সময় না পেলেও, মে মাসের সঙ্গে সঙ্গে ফুটবল আরম্ভ হয়ে যায়। সেপ্টেম্বরের মধ্যে ফুটবলের সমস্ত টুর্ণামেন্ট শেষ করা এক কষ্টসাধ্য ব্যাপার। সুতরাং মাঠ তৈরীর জন্য যথেষ্ট সময় দিতে চাইলেও তা সম্ভব হয়ে ওঠে না। তাই ক্রিকেটের অনুপযুক্ত, উঁচু নীচু জমি পীচে খেলার ফলে খেলোয়াড়দের নিজেদের আসল প্রতিভার প্রকাশ ঘটানো তাদের পক্ষে কষ্টকর হয়ে পড়ছে।

ফুটবলের ক্ষেত্রেও এই একই কথা প্রযোজ্য। এইতো সেদিন ভারতের বাইরের দুটি দল আই এফ এ শীল্ডের খেলায় অংশ নিতে এসেছিল। দুটি খেলায় এরা আমাদের কাছে পরাজিত হয়েছে। এটা সত্যিই আনন্দের কথা। কিন্তু বহিরাগত দল দুটির খেলার কথা ভাবতে গিয়ে এই কথাটি বারবার মনে হয়েছে, তাদের খেলার আসল পরিচয় কি আমরা পেলাম ? তাদের খেলার আসল চেহারাটি কিন্তু এমন নয়। অনেক সুন্দর এবং পরিচ্ছন্ন।

তাদের যথার্থ খেলা দেখতে না পাওয়ার জন্য আমাদের বেশ কিছুই নিতে পারলো না তাদের কাছ থেকে। এটা কম দুঃখের নয়। দেখেশুনে শেখার এবং নিজেদের মধ্যে তার ক্রমবিকাশ ঘটানো জীবনের সর্বস্তরেই প্রযোজ্য।—বড়ো হওয়ার মূলধন। আর এই মূলধন জোগাড় করবার জন্যই আমরা এতো খরচ করে বাইরের নামী ও দামী দলগুলিকে এদেশে এনে থাকি। কিন্তু আমার উদ্দেশ্য সফল হয় না কেন ? এর জন্যে যাকে বিশেষভাবে দায়ী করা যায়, সে হল আমাদের দেশের মাঠ।

আমাদের দেশের মাঠ ও আবহাওয়ার সঙ্গে ইরাণের পাস ক্লাব যদিও বা কিছুটা মানিয়ে নিতে পেরেছিল, জার্মানীর নীধার স্যাসেন ক্লাব তা পারেনি। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমাদের মাঠ যে কতো অনুপযুক্ত এইটাই কি তার বিরাট প্রমাণ নয় ? আমাদের দেশের ক্রীড়ামানের অগ্রগতির পথে এটা একটা বিরাট বাধা। এই সমস্যাকে আরও বেশী প্রকট করে তুলতে সাহায্য করেছে স্টেডিয়ামের অভাব।

ব্যাপারটাকে একটু খুলে বলাই বাঞ্ছনীয়। বাংলা দেশে কোন স্টেডিয়াম নেই, অথচ দর্শকসংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। সুতরাং দর্শকদের চাহিদা মেটাতে গিয়ে আমরা ফুটবলের আসরকে ইডেনে স্থানান্তরিত করতে বাধ্য হয়েছি। বড় বড় খেলাগুলি ওখানেই খেলাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এতে হচ্ছে কি, বাংলাদেশের ক্রিকেট খেলার উপযুক্ত যে একটিমাত্র মাঠ, সেই ইডেন মাঠটিও দিন দিন ক্রিকেটের অনুপযুক্ত হয়ে পড়ছে। এছাড়া ইডেনের যা চরিত্র, তাতে করে সেখানে ফুটবলের আসরপাতা মানে খেলার মান নীচে নামাতে একরকম বাধ্য করা। এঁটেল মাটির তৈরী ইডেন ক্রিকেট খেলারই উপযোগী। কিন্তু বর্ষার সময়ে ইডেন হয়ে ওঠে আঠালো ও পিচ্ছিল। তাই এই মাঠে ফুটবল খেলতে গিয়ে স্বভাবতই নিজের দেহের ভারসাম্য বজায় রেখে খেলা কোন খেলোয়াড়ের পক্ষেই সম্ভব নয়।

একদিকে যেমন ইডেন ফুটবল খেলার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত অপরদিকে শুধুমাত্র দর্শকদের চাহিদা মেটাতে গিয়ে একমাত্র উপযুক্ত এবং ঐতিহ্যপূর্ণ ইডেনকে ক্রিকেটের পক্ষেও অনুপযুক্ত করে তোলা হচ্ছে। এর ফলে ফুটবল এবং ক্রিকেট দুয়েরই মান নীচে নেমে যাচ্ছে।

বর্তমানে বাংলার খেলাধূলার জগতে এটা একটা বিরাট সমস্যা। এ সমস্যার সমাধান হওয়া কি একেবারেই অসম্ভব ? এমন কিছু কি করা সম্ভব নয় যাতে করে ক্রিকেট এবং ফুটবলের জন্য কয়েকটি করে মাঠ নির্দিষ্ট করে রাখা যায় ? যেখানে ফুটবলের জন্য নির্দিষ্ট মাঠে ফুটবল এবং ক্রিকেটের জন্য নির্দিষ্ট মাঠে ক্রিকেট ছাড়া আর কোন খেলা হতে দেওয়া হবে না। এটা যদি সম্ভব হয়, তবে মাঠকে বিশ্রাম দেওয়ার সময় আমরা যেমন পাবো তেমনি মাঠকে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার উপযুক্ত করে তৈরী করারও সময় পাবো।

আজ এ ব্যাপারে যথেষ্ট চিন্তা এবং তাকে যথাযথভাবে রূপদান করার সময় এসেছে। আশা করবো, আমাদের দেশের ফুটবল এবং ক্রিকেট কর্তৃপক্ষরা এ ব্যাপারে সতর্ক এবং সচেষ্ট দৃষ্টি রাখবেন। দুঃখের বিষয় দেশের সরকারও যথেষ্ট নীরব। সরকারকে এ ব্যাপারে উপযুক্ত সাহায্য নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। আমার মতে যে খেলায় যে রকম মাঠ দরকার আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী সেই রকম মাঠ তৈরী করতে হবে। ইডেনের মতো আন্তর্জাতিক খেলার মাঠকে কদাচ বিনষ্ট করা নয়।

মুষ্টিযোদ্ধার একটি দৃশ্য। ইতালীর প্রাক্তন ইউরোপীয়ান মিডলওয়েট চ্যাম্পিয়ান কার্লো ডুরান (ডানদিকে)
[illegible]

খেলাধুলা

দর্শক

জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা

জলন্ধরের গুরুগোবিন্দ স্টেডিয়ামে ২৭তম জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার আসর বসেছিল। ফাইনালে খেলেছিল মহীশূর এবং পাঞ্জাব। ফাইনাল খেলা হয়েছিল দু দিন। প্রথম দিনের ফাইনাল খেলা ১—১ গোলে অমীমাংসিত ছিল। দ্বিতীয় দিনের খেলায় পাঞ্জাব ০—১ গোলে মহীশূরকে পরাজিত করে প্রথম সন্তোষ ট্রফি জয়ের গৌরব লাভ করেছে।

মহীশূর এবার নিয়ে ৮ বার ফাইনালে খেলল। ইতিপূর্বে তারা ৪ বার সন্তোষ ট্রফি জয়ী হয়েছে (১৯৪৬, ১৯৫২, ১৯৬৭ ও ১৯৬৮)। অপর দিকে পাঞ্জাবের এই প্রথম ফাইনাল খেলা।

সেমি-ফাইনালে মহীশূর ২—২ ও ২—১ গোলে মহারাষ্ট্রকে পরাজিত করেছিল। অপর দিকে গত বছরের সন্তোষ ট্রফি বিজয়ী বাংলা বনাম পাঞ্জাবের সেমি-ফাইনাল খেলা ০—০ ও ১—১ গোলে অমীমাংসিত থাকে। শেষ পর্যন্ত নতুন নিয়ম অনুযায়ী পেনাল্টি কিকের সাহায্য নিতে হয়। এই ব্যবস্থায় পাঞ্জাব ৪—২ গোলে বাংলাকে পরাজিত করে। এখানে উল্লেখ্য, জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার ইতিহাসে এই তিনটি বিষয়ে বাংলার রেকর্ড আজও অক্ষুন্ন আছে—সর্বাধিকবার ফাইনালে খেলা (মোট ২১ বার), সর্বাধিকবার সন্তোষ ট্রফি জয় (মোট ১২ বার) এবং উপর্যুপরি সর্বাধিকবার সন্তোষ ট্রফি জয় (৪ বার— ১৯৪৭, ১৯৪৯—৫১)।

আন্তঃ রাজ্য স্কুল ক্রিকেট

জামসেদপুরের কিনান স্টেডিয়ামে আয়োজিত আন্তঃ রাজ্য স্কুল ক্রিকেট প্রতিযোগিতার (কোচবিহার ট্রফি) পূর্বাঞ্চলের ফাইনালে বাংলা ১০ উইকেটে বিহারকে পরাজিত করেছে।

প্রথম দিনে খেলা ভাঙার নির্দিষ্ট সময়ের ১৭ মিনিট আগে বিহারের প্রথম ইনিংস ১১৪ রানের মাথায় শেষ হলে বাকী সময়ে বাংলা কোন উইকেট না খুইয়ে ১০ রান সংগ্রহ করে। লাঞ্চের সময় বিহার দলের রান ছিল মাত্র ৩২, ৪ উইকেট পড়ে। নেয়ার এবং বোধ সিংয়ের জুটি ৮৯ মিনিটের খেলায় দলের যে ৫৩ রান তুলেছিলেন তার ফলেই বিহারের মুখরক্ষা হয়। বাংলার মুকুল দাস ২০ রানে ৪ উইকেট এবং বরুণ বর্মণ ১৯ রানে ২টো উইকেট পান।

দ্বিতীয় দিনে চা-পানের বিরতির কিছু আগে বাংলার প্রথম ইনিংস ১৯৮ রানের মাথায় শেষ হলে বাংলা প্রথম ইনিংসের খেলায় ৮৪ রানে অগ্রগামী হয়। বাংলার উদয়ভানু ব্যানার্জি উভয় দলের পক্ষে সর্বাধিক ৫১ রান করেন। তৃতীয় উইকেটের জুটিতে সম্পতি এস চৌধুরী এবং উদয়ভানু ব্যানার্জি দলের ৬০ রান তুলে দেন। বিহারের অধিনায়ক এস সোম ৬৫ রানে ৬টি উইকেট পান। দ্বিতীয় দিনের খেলার বাকী সময়ে বিহার দ্বিতীয় ইনিংসের দুটো উইকেটের বিনিময়ে ২৫ রান সংগ্রহ করে।

তৃতীয় অর্থাৎ খেলার শেষ দিনে চা-পানের বিরতির ৪৭ মিনিট আগে বিহার দলের দ্বিতীয় ইনিংস ১০২ রানের মাথায় শেষ হলে বাংলা খেলায় জয়লাভের প্রয়োজনীয় মাত্র ১১ রান তুলতে দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নামে এবং কোন উইকেট না-খুইয়ে ১১ রান তুলে দশ উইকেটে জয়ী হয়।

অস্ট্রেলিয়া সফরে এম সি সি

রে ইলিংওয়ার্থের নেতৃত্বে এম সি সি গত ২৮শে অক্টোবর থেকে ১৯৭০-৭১ সালের অস্ট্রেলিয়া সফর শুরু করেছে। তাদের অস্ট্রেলিয়া সফরের শেষ খেলা শুরু হবে ১৯৭১ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী। এবারের সফর-তালিকায় মোট খেলার সংখ্যা ২৬টি—৬টি টেস্ট খেলা নিয়ে। ইংল্যান্ড-

কুয়ালালামপুরে আয়োজিত আসন্ন মহিলাদের এশিয়ান বাস্কেটবল প্রতিযোগিতায় যোগদানের উদ্দেশ্যে নির্বাচিত ভারতীয় মহিলা বাস্কেটবল দল

অস্ট্রেলিয়ার একটি টেস্ট ক্রিকেট সিরিজে ইতিপূর্বে পাঁচটির বেশী টেস্ট ক্রিকেট খেলা কখনও স্থান পায় নি।

ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট ক্রিকেট খেলার উদ্বোধন হয়েছে আজ থেকে ৯৩ বছর আগে, ১৮৭৭ সালের ১৫ই মার্চ, অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ণ মাঠে। এই দুই দেশের এই টেস্ট খেলার সূত্রেই পৃথিবীর মাটিতে টেস্ট ক্রিকেট খেলার সূচনা। এ পর্যন্ত ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট ক্রিকেট খেলার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২০০টি—আন্তর্জাতিক সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে একমাত্র ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট খেলাই ২০০ সংখ্যায় পূর্ণতা লাভ করেছে। বর্তমানে ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট ক্রিকেট খেলার ফলাফল এই রকম দাঁড়িয়েছে : মোট খেলা ২০০, অস্ট্রেলিয়ার জয় ৮০, ইংল্যান্ডের জয় ৬৬ এবং খেলা অমীমাংসিত ৫৭। টেস্ট সিরিজের ফলাফল : মোট সিরিজ ৪৯, অস্ট্রেলিয়ার 'রাবার' জয় ২২, ইংল্যান্ডের 'রাবার' জয় ২১ এবং সিরিজ অমীমাংসিত ৬। ১৯৬৪ সালে অস্ট্রেলিয়া ১—০ খেলায় (ড্র ৪) ইংল্যান্ডকে পরাজিত করে কাল্পনিক 'এ্যাসেজ' খেতাব জয়ী হয়েছিল। এর পর ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার ১৯৬৬ ও ১৯৬৮ সালের টেস্ট সিরিজ অমীমাংসিত থাকায় বর্তমানে অস্ট্রেলিয়ার হাতেই 'এ্যাসেজ' খেতাব থেকে গেছে।

১৯৭০-৭১ সালের টেস্ট খেলা

১ম (ব্রিসবেন) : নভেম্বর ২৭—ডিসেম্বর ২
২য় (পার্থ) : ডিসেম্বর ১১—১৬
৩য় (মেলবোর্ণ) : ডিসেম্বর ৩১—জানুয়ারী ৫
৪র্থ (সিডনি) : জানুয়ারী ৯—১৪
৫ম (এডিলেড) : জানুয়ারী ২৯—ফেব্রুয়ারী ৩
৬ষ্ঠ (সিডনি) : ফেব্রুয়ারী ১২—১৮

জাতীয় স্কুল ক্রীড়ানুষ্ঠান

আগরতলায় আয়োজিত ১৬শ জাতীয় স্কুল ক্রীড়ানুষ্ঠানে পশ্চিম বাংলা চারটি বিষয়ে চ্যাম্পিয়ান এবং তিনটি বিষয়ে দ্বিতীয় স্থান লাভের সূত্রে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে। পশ্চিম বাংলা চ্যাম্পিয়ান হয়েছে ফুটবল, বালকদের সাঁতার, বালিকাদের বাস্কেটবল এবং টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায়। দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছে বালকদের বাস্কেটবল, বালকদের টেবল টেনিস এবং বালিকাদের সাঁতারে।

চূড়ান্ত ফলাফল

ফুটবল : ১ম পশ্চিম বাংলা, ২য় বিহার, ৩ দিল্লী।

বাস্কেটবল (বালক) : ১ম রাজস্থান, ২য় পশ্চিম বাংলা, ৩য় পাঞ্জাব।

বাস্কেটবল (বালিকা) : ১ম পশ্চিম বাংলা, ২য় দিল্লী, ৩য় গুজরাট।

সাঁতার (বালক) : ১ম পশ্চিম বাংলা (৭০ পয়েন্ট), ২য় ত্রিপুরা (২৪ পয়েন্ট), ৩য় মণিপুর (৪ পয়েন্ট)।

সাঁতার (বালিকা) : ১ম ত্রিপুরা (৩৩ পয়েন্ট), ২য় পশ্চিম বাংলা (১৯ পয়েন্ট), ৩য় গুজরাট (২ পয়েন্ট)।

টেবল টেনিস (বালক) : ১ম দিল্লী, ২য় পশ্চিম বাংলা, ৩য় পাঞ্জাব।

টেবল টেনিস (বালিকা) : ১ম পশ্চিম বাংলা, ২য় এম-পি, ৩য় পাঞ্জাব।

কাবাডী : ১ম এম পি, ২য় গুজরাট, ৩য় পাঞ্জাব।

খো-খো : ১ম এম পি, ২য় গুজরাট, ৩য় ত্রিপুরা।

ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে পশ্চিম বাংলা ১—০ গোলে বিহারকে পরাজিত করে।

এশিয়ান বাস্কেটবল প্রতিযোগিতা

ম্যানিলায় আয়োজিত ৫ম এশিয়ান বাস্কেটবল প্রতিযোগিতায় ফিলিপাইন অপরাজিত অবস্থায় চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করেছে। ভারতবর্ষ পেয়েছে ৩য় স্থান—জয় ২ এবং পরাজয় ৫। ভারতবর্ষ অপ্রত্যাশিতভাবে দক্ষিণ কোরিয়াকে ৮১—৮০ পয়েন্টে এবং তাইওয়ানকে ৮৯—৮৩ পয়েন্টে পরাজিত করে।

ওয়ার্ল্ড সুটিং চ্যাম্পিয়ানসীপস্

আরিজোনার ফোনিক্সে আয়োজিত ৪০তম 'ওয়ার্ল্ড সুটিং' প্রতিযোগিতায় রাশিয়া পুরুষ এবং মহিলা বিভাগে দলগত চ্যাম্পিয়ানশীপ লাভ করেছে।

চূড়ান্ত ফলাফল

পুরুষ বিভাগ : ১ম রাশিয়া (১,৫১৪ পয়েন্ট), ২য় ফিনল্যান্ড (১,৫১৩ পয়েন্ট), ৩য় পশ্চিম জার্মানী (১,৫০৩ পয়েন্ট)।

মহিলা বিভাগ : ১ম রাশিয়া (১,১১০ পয়েন্ট), ২য় পশ্চিম জার্মানী, ৩য় আমেরিকা।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ-চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

KUSUM
VANASPATI
ENRICHED WITH VITAMINS A & D
কুসুম কিন্তু আর পাঁচটা সাধারণ বনস্পতির মত নয়—
কেন জানেন ?
কারণ কুসুম দিয়ে রান্না খাবার খেতে রুচি হয় ও সুস্বাদে তৈরী যে কোনো খাবারে খাঁটি স্বাদ-গন্ধ পাওয়া যায়। আজই এক টিন কিনে নিজে পরখ করে দেখুন।
কারণ কুসুম অন্য কোনো রান্নার তেল বা ঐ জাতীয় জিনিসের চেয়ে ঢের বেশীদিন টাটকা থাকে। রোজ কুসুম দিয়ে রেঁধে দেখুন মাসের শেষে খরচা কত কম পড়ে।
কারণ কুসুম দিয়ে বহুরকম রান্না করা যায়। শাক-সবজি, মাছ-মাংস যা-ই রাঁধুন, দারুণ লোভনীয় হবে। ডাল তরকারীর স্বাদই হবে আলাদা, আর যে কোনো মিষ্টির তো কথাই নেই। কেক, বিস্কুট, ভাজাভুজি যা খুশি করুন, এমন কি চাপাটিতে মাখিয়ে বা গরম ভাতে খান—যেমন সুস্বাদু তেমনি স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো।
কারণ কুসুম সহজে হজম হয় আর ভারি পুষ্টিকর। প্রতি আউন্স কুসুমে ৭০০ আন্তর্জাতিক ইউনিট 'এ' ভিটামিন এবং ৫৬ আন্তর্জাতিক ইউনিট 'ডি' ভিটামিনে সমৃদ্ধ।
স্বাদে-গন্ধে সব খাবার করে তুলুন চমৎকার
কুসুম বনস্পতি দিয়ে রাঁধুন
কুসুম প্রোডাক্টস লিমিটেড, কলিকাতা-১

তুলুন গোলাভরা ফসল

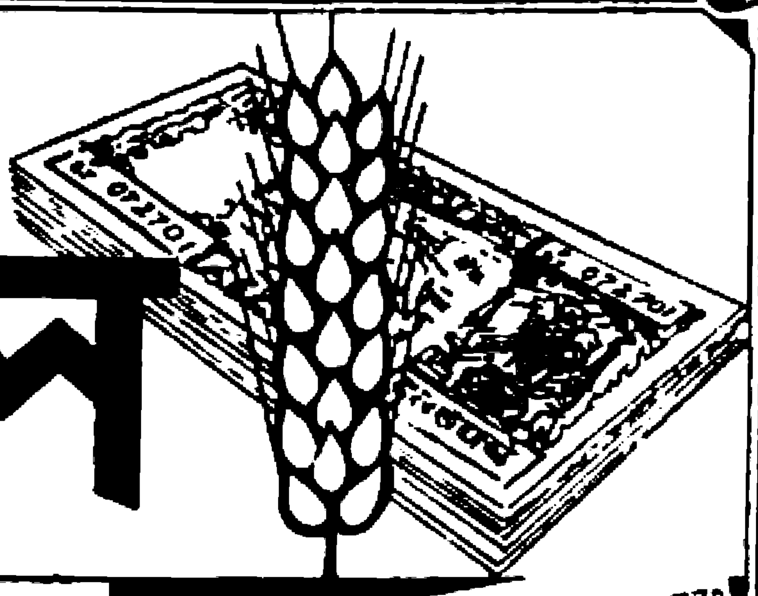

বিশদ বিবরণীর জন্যে নিম্নোক্ত ঠিকানায় শীঘ্র যোগাযোগ করুন:

"হলো শুরু চাষের মরশুম মাঠে মাঠে লাগে কাজের ধুম"। চাষীভাইদের এখন একমাত্র লক্ষ্য-কিভাবে খামার ভরে সোনার ফসল তোলা যায়। এর জন্যে চাই খুঁটিনাটি সমস্ত সরঞ্জাম জোগাড় করা, রাসায়নিক সার তো বটেই।

কৃষক, তালিকাভুক্ত সার বিক্রেতা এবং সমবায় সমিতিদের এইতো সুবর্ণ সুযোগ—খামার ভরা ফসল তোলার।

ভারত সরকার আমদানি করা (পাঁচমেশালি) সার বেশী পরিমাণে কেনার জন্যে ক্রেতাদের আকর্ষণীয় হারে ঋণ এবং অন্যান্য সুবিধে দিচ্ছেন। ভারতীয় খাদ্য নিগম এবং কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গুদাম নিগমগুলিতেও আপনি তৈরী মাল হাতে হাতে পেতে পারেন। রেলগাড়ীতে দ্রুত মাল পৌঁছান হয়।

ক্ষেত্রিয় ম্যানেজার,
ভারতীয় খাদ্য নিগম
- কলকাতা
- বোম্বাই
- মাদ্রাজ

ম্যানেজিং ডাইরেক্টার,
কেন্দ্রীয়
গুদাম নিগম
- সি-90, সাউথ এক্সটেনশন (পার্ট 2)
নয়া দিল্লী-49

ম্যানেজিং ডাইরেক্টার,
প্রাদেশিক
গুদাম নিগম
- অন্ধ্রপ্রদেশ
- গুজরাট
- হরিয়ানা
- মহারাষ্ট্র
- মধ্যপ্রদেশ
- মহীশূর
- পাঞ্জাব
- রাজস্থান
- তামিল নাড়ু
- উত্তর প্রদেশ

অথবা, নিম্নলিখিত ঠিকানাতেও যোগাযোগ করতে পারেন:
আণ্ডার সেক্রেটারি মহাশয় (ফার্টিলাইজার-1) ভারত সরকার
খাদ্য এবং কৃষি মন্ত্রণালয় (কৃষি শাখা)
কৃষি ভবন, নয়া দিল্লী-1। (টেলিফোন: 384179)

davp 70/406

UNIVERSITY

১০ম বর্ষ
৩য় খণ্ড

অমৃত

২৬ সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday, 6th November, 1970. শুক্রবার, ২০শে কার্তিক, ১৩৭৭ 40 Paise

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
৪	চিঠিপত্র		
৬	সাদা চোখে		—শ্রীসমদর্শী
৮	দেশেবিদেশে		—শ্রীপুণ্ডরীক
১১	সম্পাদকীয়		
১২	হাওয়ার ভেতরে	(কবিতা)	—শ্রীকিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত
১২	পুবালী ঝড়	(কবিতা)	—শ্রীসত্যানন্দ ভট্টাচার্য
১২	বড়বাজারে জ্বর	(কবিতা)	—শ্রীসাধনা মুখোপাধ্যায়
১৩	দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন : কর্মে ও চিন্তায়		—শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত
১৫	দেশবন্ধুর কণ্ঠস্বর		
১৭	দেশবন্ধুর জীবনপঞ্জী		
১৮	দেশবাসীর অভিনন্দন		
১৮	দেশবন্ধু		
২১	আলোর উৎসে	(গল্প)	—শ্রীবীরেন্দ্র দত্ত
২৯	এই আমাদের দেশ		—শ্রীনন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
৩১	তুলসী-চরিত	(উপন্যাস)	—শ্রীনলিনীমাধব চৌধুরী
৩৫	মুখের মেলা		—শ্রীআবদুল জব্বার
৩৮	সাহিত্য ও সংস্কৃতি		—শ্রীঅভয়ঙ্কর
৪০	শারদ সাহিত্য পরিক্রমা		—শ্রীপর্যবেক্ষক
৪৭	বইকুণ্ঠের খাতা		—শ্রীগ্রন্থদর্শী
৫১	নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে	(উপন্যাস)	—শ্রীঅতীন বন্দ্যোপাধ্যায়
৫৬	নিকটেই আছে		—শ্রীসাম্যংস্
৬০	মনের কথা		—শ্রীমনোবিদ
৬৩	সজনের সকাল	(বড় গল্প)	—শ্রীচণ্ডী মণ্ডল
৬৭	বিজ্ঞানের কথা		—শ্রীঅয়স্কান্ত
৬৯	নিজেরে হারায়ে খুঁজি	(স্মৃতিচিত্রণ)	—শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী
৭১	গোয়েন্দা কবি পরাশর		—শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র রচিত —শ্রীশৈল চক্রবর্তী চিত্রিত
৭২	অঙ্গনা		—শ্রীপ্রমীলা
৭৭	জলসা		—শ্রীচিত্রাঙ্গদা
৭৩	প্রেক্ষাগৃহ		—শ্রীনান্দীকর
৭৮	খেলার কথা		—শ্রীঅজয় বসু
৭৯	খেলাধুলা		—শ্রীদর্শক

প্রচ্ছদ : শ্রীসুনীল সাহা

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে অমৃতে প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য অমৃতে'র কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পিতে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে অমৃতে'র কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফস্বল
বার্ষিক	টাকা ২০·০০	টাকা ২২·০০
ষান্মাসিক	টাকা ১০·০০	টাকা ১১·০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৫·০০	টাকা ৫·৫০

'অমৃত' কার্যালয়
১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

সবিনয় নিবেদন,
সুস্থ ও জীবনধর্মী সাহিত্যের সপক্ষে আমাদের প্রকাশিত গ্রন্থগুলি দেখেছেন কী? পুস্তক বিক্রেতা ও পাঠাগারকে শতকরা ২৫% কমিশন দিয়ে থাকি। ভি. পি. পি-তে বই সরবরাহ করা হয়। ডাক খরচ আংশিক আমাদের।

নিবেদক
শান্তি আচার্য
কর্মাধ্যক্ষ, শুকসারী

আজ কাল পরশু/মিহির আচার্য	৫·০০
পূর্ব বাঙলার কবিতা/মিহির আচার্য সম্পাদিত	৪·০০
পূর্ব বাঙলার গল্প সংগ্রহ/মিহির আচার্য সম্পাদিত	৫·০০
তিরিশের কবিতা/পল্লব সেনগুপ্ত সম্পাদিত	৩·০০
নষ্ট বিভাবরী/আশিস সেনগুপ্ত	২·০০
স্বদেশ, আমার স্বদেশ/কৃষ্ণ ধর সম্পাদিত	৮·০০

॥ শুকসারী প্রকাশক ॥
১৭২।৩৫ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলিকাতা-১৪

চিঠিপত্র

শারদীয় অমৃত প্রসঙ্গে

সুলেখনীর ডালি নিয়ে যাঁরা শারদীয় অমৃতকে সাজিয়ে দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে যাঁর লেখনী খুব বেশী দাগ কেটেছে, সেগুলি হল,—সাহিত্যিক মনোজ বসুর 'আমি সম্রাট' উপন্যাসটি। যুগোপযোগী একখানা সত্যিকারের সার্থক এই উপন্যাস। 'আমি সম্রাট' একটা বাস্তব ও জীবনধর্মী উপন্যাস। পড়তে পড়তে আজকের যুগের নির্যাতনের এ ঘটনার সঙ্গে একত্ব হয়ে গেছি। আজকের যুবক সমাজের প্রতিভূ অরুণের সঙ্গে পরিচিত হলাম।

নিজেদের চারপাশের এই সমাজকে আরও বেশী করে চিনলাম। তাছাড়া মিহির আচার্যের 'নিকস নিরুদ্দেশী' ও ভবানী মুখোপাধ্যায় অনূদিত আনন্দের 'অশ্রু, রক্ত ও স্বপ্ন' উৎকণ্ঠায় ভরা ও রুদ্ধশ্বাসে পড়ার মত সহজ ও সাবলীল লেখনী। গল্পের মধ্যে শ্রীপ্রফুল্ল রায়ের 'বাঁচার জন্য' একশ্রেণীর লোকের জীবনালেখ্য। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের 'মানুষ ও বেমানুষ' ভাল লেগেছে এবং আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের 'সমান্তরাল' পড়ে আমার যা মনে হয়েছে, সেটা আমি ঠিক বলে বোঝাতে পারব না।

শুভেন্দু চক্রবর্তী
এস. এস. কলেজ
হাইলাকান্দি, আসাম

(২)

শারদীয়া 'অমৃতে' শ্রীবিমল মিত্রের 'রাগভৈরব' আমি একটানা পড়ে ফেললুম। অনেকদিন পর—বলতে গেলে 'সাহেব-বিবি-গোলামের' পর, আমার মনে হয়েছে, আমরা আবার যেন নতুন করে শ্রীমিত্রের দেখা পেলুম। তাঁর সেই নিজস্ব চমকপ্রদ ভঙ্গীতে তিনি আজকের সমাজ-জীবনের বিপর্যস্ত অভিশাপকে আমাদের সামনে ছবির মতো তুলে ধরেছেন। আজকে যখন জাতির তরুণসমাজ নানা কারণে বিক্ষুব্ধ এবং বিভ্রান্ত, তখন উপন্যাসের মূল চরিত্র ভৈরব চক্রবর্তী—তার পুরোনো মানবিকতা এবং মূল্যবোধ নিয়ে তাদের সামনে তীব্র প্রতিবাদের মতো রুখে দাঁড়িয়েছে। অথচ এই বিভ্রান্ত সমাজের প্রতি তার সহানুভূতি এবং ভালোবাসাও কিছু কম নয়। ভৈরব চক্রবর্তীর আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে উপন্যাসের পরিসমাপ্তি। কিন্তু তখন হত্যাকারীদের চোখে জল। বিমলবাবু এখানে কী ইঙ্গিত করতে চেয়েছেন জানি না। কিন্তু আমার মনে হয়েছে—প্রতিহিংসাপরায়ণ তরুণসমাজও যে মানবিকতা হারিয়ে ফেলেনি—এটা যেন তারই ইঙ্গিত।

ছোটো উপন্যাসটিকে কোথাও উপন্যাস বলে মনে হয়নি। এ যেন লেখক স্বয়ং এসে পাঠকের কাছে বর্তমান সমাজের কথা বলে যাচ্ছেন বিনা আড়ম্বরে। সুতরাং 'রাগভৈরব' কেবলমাত্র উপন্যাস নয়—আজকের সমাজের মূল্যবান দলিল। পড়া শেষ হলে আমি বুঝতে পারলুম একটা ভয়ানক দীর্ঘনিঃশ্বাস আমার বুক চিরে বেরিয়ে এল। এবং তা ঘুণ পোকার মতো সারাঘরে ঘুরতে লাগল। সত্যি বলতে কি—এই উপন্যাসের জন্য আমি বিমলবাবুর কাছে কৃতজ্ঞতা অনুভব করছি। এবং 'অমৃতে'র সম্পাদককে অভিনন্দন জানাই—তিনি এরকম একটি যুগোপযোগী আলেখ্য আমাদের উপহার দিয়েছেন বলে।

সম্পূর্ণ গোস্বামী
স্টেশন রোড, ব্যারাকপুর

শারদ সাহিত্য পরিক্রমা

'আসলে জীবনযাত্রার বহুতর ক্ষেত্রে যে গোলমাল, অমীমাংসিত দ্বন্দ্ব এবং সমস্যা থেকে যাচ্ছে, যে বিচ্ছিন্নতা, জ্ঞাতে অথবা অজ্ঞাতে সমাজ-মানসে বর্তমান, সাহিত্যও তার থেকে মুক্ত নয়।' পর্যবেক্ষক-এর শারদ সাহিত্য পরিক্রমা প্রসঙ্গে এ ভূমিকার প্রয়োজন ছিল। ঠিকই তো, 'মানুষ তার প্রাত্যহিক জীবনযাপনের ক্ষেত্রে সাহিত্যের প্রয়োজন কতটা বোধ করে?' আমাদের এ-সময়ের জীবনযাপন থেকে সাহিত্যকে যদি বাদ দিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে ক্ষতি কি! সাহিত্যিক কি জীবনযাপনের প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার কাছাকাছি আসছেন, না খেয়ালখুশি মত যাহোক লিখে যাচ্ছেন। এসব কথা ভেবে দেখবার সময় প্রায় অতিক্রান্ত। যাঁরা আজও পাঠক ঠকানোর জন্য জাল পাতেন, রহস্য রোমাঞ্চ, প্রেম যৌনতার মাদকতা দিয়ে আজও যাঁরা মানুষকে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে চান, তাঁদের স্বরূপ আমরা চিনতে পেরেছি। যাঁরা অবক্ষয় হতাশার নাম করে মানুষের অধঃপতিত রূপের বাস্তব (?) চিত্র এঁকে দুপয়সা করছেন তাঁদেরও আমরা চিনি। পাঠককে কি তাঁরা পুতুল বানাতে চান?

আশার কথা, এক শ্রেণীর সাহিত্যিক আজ, অতি সম্প্রতি—জীবনের দিকে মুখ রেখে লিখছেন, এ সময়ের জীবনকে—সমস্যা ও সংগ্রামের চিত্রকে, দুঃখ দারিদ্র্যের রূপকে ফুটিয়ে তোলার সৎ চেষ্টা করছেন। পর্যবেক্ষক মশাই ঠিকই লিখেছেন, সাহিত্যের সঙ্গে সামাজিক জীবনধারার যোগসূত্র আর একবার স্পষ্টতর হয়ে উঠতে চাইছে। কিন্তু তার উদাহরণ সর্বদা আমাদের চোখে পড়ে না। পাঠক হিসাবে আমাদের সেখানেই হয়তো বড় দুর্বলতা। আমরা যেমন অসৎ সাহিত্য পড়ে নিন্দা করি, সৎ সাহিত্য পড়ে সেইরূপ উৎসাহ দেই কি? আসলে সচেতনভাবে মিলিয়ে পড়ার অভ্যাস আমাদের অনেকেরই নেই। প্রায় লটারীর মত দুই-একখানা শারদীয় সংখ্যা অতি ব্যস্ততার মধ্যে শিয়ালদার স্টল থেকে কিনে নিই। তারপর ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে এসে ট্রেন ধরি। সেই পত্রিকাতে ভাল কিছু পেলে খুশী হই, না পেলে অভিযোগ করি না। সেক্ষেত্রে আমরা অসহায়ের মত বঞ্চিত হই। আলোচ্য প্রবন্ধের লেখককে ধন্যবাদ যে, তিনি তাঁর দীর্ঘ আলোচনায় সৎ সাহিত্য চেনাবার চেষ্টা করেছেন। কত অনামী সব গল্পকার রয়েছেন যাঁদের কথা আমরা ভেবেই দেখি না। আজকে যাঁরা প্রবীণ তাঁরাও একদিন নবীন ছিলেন। আজকের নবীনদের হাতেই বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। এই জাতীয় রচনা প্রকাশের জন্য লেখক ও আপনাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

গোপাল সামন্ত
সোদপুর

চলচ্চিত্র প্রসঙ্গে

গত অমৃতের ২০শ সংখ্যায় প্রেক্ষাগৃহের সংবেদনশীল প্রতিবেদন পড়লাম। বিশেষ করে ভালো লাগলো এই দেখে যে, আজকের প্রায় বন্ধ্যা ভারতীয় চলচ্চিত্রের মধ্যেও যে একটুখানি আশার ঝলক দেখা দিয়েছে—তার প্রতি লেখক সম্পূর্ণ সুবিচার করেছেন। প্রথমেই তাই লেখককে অভিনন্দন জানাই আন্তরিকভাবে।

সেই সঙ্গে পরিপূরক হিসাবে বোধহয় আরও কিছু তথ্য জানানো যায় জেমিনীর 'সমাজ কো বদল ডালো' ছবিটি মূল মালয়লম চলচ্চিত্র 'তুলাভরম্'-এর হিন্দী রূপ। লেখক তোপ্পিল (থেপ্পিল নয়) ভাসী। প্রসঙ্গক্রমে স্মরণ করা যেতে পারে, এই মালয়লম ছবিটিতেই সু-অভিনয়ের জন্য শ্রীমতী সারদাকে ১৯৬৮ সালে উর্বশী পুরস্কার দেওয়া হয়।

তোপ্পিল ভাসী কেরালার স্বনামধন্য নাট্যকার। তাঁর প্রথম এবং জনপ্রিয় নাটক 'তুমি আমায় কম্যুনিস্ট করেছ' কিছুদিন আগে মুক্তিলাভ করেছে। খুব সম্ভব বইটির বঙ্গানুবাদও আছে। এই চলচ্চিত্রটিও এখানে খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। এছাড়া তাঁর জনপ্রিয় নাটকগুলির

চিঠিপত্র

কয়েকটি 'নূতন আকাশ, নূতন পৃথিবী', 'মূলধন', 'মুকসাক্ষী'। শ্রীভাসীর নাটকের বৈশিষ্ট্য হলো বলিষ্ঠ বক্তব্য। অথচ এগুলির কোনটাই 'পোস্টার' নাটিকা হয়ে ওঠেনি। তাঁর শিল্পকৃতির বৈশিষ্টই এখানে।

এই প্রসঙ্গে একটা কৌতূহলোদ্দীপক খবর না দিয়ে পারছি না। শ্রীউৎপল ভাসী কম্যুনিস্ট আন্দোলনের একজন সমর্থক। একজন কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে তাঁর সরাসরি সংযোগ না থাকলেও, এক সময়ে (১৯৪৮—১৯৫৯) তিনি কম্যুনিস্ট আন্দোলনের প্রথম সারির নায়ক ছিলেন। এখন তিনি পুরোপুরিভাবেই নিজেকে চলচ্চিত্র-শিল্পের সঙ্গে জড়িয়ে রেখেছেন।

কমলাক্ষ সরকার,
হিরাপুরাম।

অতুলপ্রসাদ শতবার্ষিকী

নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের লক্ষ্ণৌ শাখা অগ্রণী হয়ে আগামী (১৯৭১) অতুলপ্রসাদ জন্ম শতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের জন্য এক বিরাট পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। উত্তর প্রদেশের মহামান্য রাজ্যপালও এই পরিকল্পনায় পৃষ্ঠপোষকতা দানে স্বীকৃত।

অতুলপ্রসাদ সুদীর্ঘ বত্রিশ বছর কাল এই শহরে বাস করেছেন এবং শেষ নিঃশ্বাসও ফেলেছেন এখানেই। তাঁর জীবিতকালে ত বটেই, মরণোত্তরকালেও সম্প্রদায় নির্বিশেষে এখানকার বহু প্রতিষ্ঠান আজও তাঁর অকৃপণ দানে ধন্য। একাধারে কবি, সঙ্গীতজ্ঞ, দেশপ্রেমিক, দানবীর, দরিদ্রবন্ধু ও ব্যারিস্টার অতুলপ্রসাদের জন্মশতবার্ষিকী পালনের জন্য লক্ষ্ণৌ শাখা সমস্ত সম্প্রদায় এবং অতুলপ্রসাদের বন্ধুস্থানীয় গুণিজনের সমবায়ে একটি আহ্বায়ক কমিটি গঠন করেছেন। এই কমিটির প্রথম অধিবেশন আগামী ৮ নভেম্বর, ১৯৭০ খৃঃ স্থানীয় বাঙালী ক্লাব ও যুবক সমিতি প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হবে। কমিটির আলোচনার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলি রাখা হয়েছে ঃ

(১) অতুলপ্রসাদ স্মরণী ডাকটিকিট প্রকাশের ব্যবস্থা, (২) আকাশবাণীতে অতুলপ্রসাদ সম্বন্ধে রাজ্যপালের ভাষণ, (৩) অতুলপ্রসাদের অতিপ্রিয় মুশায়রা, কবি সম্মেলন ও লক্ষ্ণৌয়ের বিশিষ্ট গীতি-[illegible] (৪) নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের ১৯৭৬ খৃঃ অধিবেশন লক্ষ্ণৌতে অনুষ্ঠিত করা। কারণ অতুলপ্রসাদকে কেন্দ্র করেই ১৯২২ খৃঃ এই প্রতিষ্ঠানের সূচনা। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য সম্মেলনের ৫ এপ্রিল ১৯৭০ খৃঃ পরিচালক পরিষদের বৈঠকে লক্ষ্ণৌতে ১৯৭১ খৃঃ সম্মেলনের অধিবেশন করা সর্বসম্মতিক্রমে স্বীকৃত হয়েছে, (৫) অতুলপ্রসাদের স্মৃতিরক্ষার্থে স্থায়ী কোনও ব্যবস্থা, (৬) অতুলপ্রসাদের সঙ্গীত ভাবধারার প্রসারণের জন্য তাঁর গানগুলির সাধ্যমত হিন্দী, ইংরাজী ও উর্দু অনুবাদ করা।

বাংলা দেশে ও বাংলা দেশের বাইরে সকলের কাছেই লক্ষ্ণৌ শাখার নিবেদন যে তাঁরা যেন এই পরিকল্পনায় সর্বান্তকরণে সাহায্য করেন। যাঁরা ১৯৭১ খৃঃ এই অনুষ্ঠানে সঙ্গীত বা আলোচনার মাধ্যমে যোগদান করতে চান অবিলম্বে নাম ও ঠিকানা পাঠিয়ে যোগাযোগ করুন। অনুষ্ঠানে যাঁরা অংশগ্রহণ করবেন তাঁদের তালিকা এখন থেকেই প্রস্তুত হচ্ছে।

প্রয়োজনীয় বিষয় ঃ

(ক) অতুলপ্রসাদ গীত রেকর্ড, (খ) তাঁর সঙ্গে পত্রালাপের প্রতিলিপি, (গ) তাঁর বিষয়ে কোনও প্রবন্ধ, (ঘ) অতুলগীতির পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্বন্ধে কোনও লেখা বা কথোপকথনের প্রামাণিক তথ্য, (ঙ) তাঁর বিষয়ে কোনও বৈঠকী গল্প বা কাহিনী, (চ) অতুলগীতির গ্রামোফোন রেকর্ডের সংকলন;

এই অনুষ্ঠানের সাফল্যের জন্য অন্য কোনও সহৃদয় পরামর্শ থাকলে তাও সাদরে গৃহীত হবে। কলকাতায় অনুরূপ অনুষ্ঠানে যাঁরা ব্রতী হবেন তাঁদের কর্তৃপক্ষের সঙ্গেও আমরা যোগাযোগ করতে উৎসুক।

দ্বিজেন্দ্রনাথ সান্যাল
১০ সরোজিনী দেবী লেন
লক্ষ্ণৌ—১

(২)

বত্রিশ বছর হয়ে গেল অতুলপ্রসাদ সেন পরলোক গমন করেছেন। এই বিশিষ্ট মানবেতির নানামুখী অবদানকে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করে তাঁর দীর্ঘজীবনের কর্মক্ষেত্র লক্ষ্ণৌ শহর তাঁর নামে একটি রাস্তা ও মর্মরমূর্তি স্থাপন করে হয়তো কিছুটা ঋণমুক্ত হয়েছে। কিন্তু 'অ-মাঁর বাংলা ভাষার গীতিকার সম্পর্কে' বাংলাদেশ আশ্চর্যভাবে উদাসীন। সম্প্রতি রেডিও ও গ্রামোফোনের মাধ্যমে তাঁর কিছু গান প্রচারিত হওয়ায় সঙ্গীতরসিক ও কৃষ্টিবান মহলের দৃষ্টি, রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক অথচ সম্পূর্ণ রবীন্দ্র প্রভাবমুক্ত এই বিদগ্ধ সঙ্গীত রচয়িতা ও সুরকারের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। এটা আশার কথা সন্দেহ নেই। কিন্তু গান রচনা ও সুরসৃষ্টি যে অতুলপ্রসাদের একমাত্র পরিচয় নয় একথা বিস্মৃত হলে বাঙালী জাতির পক্ষে সেটা ক্ষতি। কারণ দীর্ঘদিন প্রবাসী থেকেও অতুলপ্রসাদ তাঁর সমস্ত কাজ ও চিন্তাধারার খাঁটি বাঙালী রয়ে গেছেন। সেই জন্যেই তাঁর গানের ভেতর, তা ভক্তিমূলকই হোক বা স্বদেশমূলকই হোক—বাঙালীর প্রাণের সুরটা ধরা হয়ে বেজেছে। এই মানুষটিকে আমাদের মনে রাখা দরকার। আর ঠিক এক বছর পর অর্থাৎ ১৯৭১ সালের ২০ অক্টোবর তাঁর জন্মের শতবর্ষ পূর্ণ হবে। বাংলা দেশ কিভাবে সেটি পালন করবে তার জন্য এখন থেকেই প্রস্তুতির দরকার। দেশের চিন্তাশীল এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের আমরা এ বিষয়ে অবহিত হতে অনুরোধ করছি।

সোমেন গুপ্ত,
কলকাতা—২৯

সুখের মেলা প্রসঙ্গে

আমি আপনার বিখ্যাত এবং সুধী-সমাজে জনপ্রিয় 'অমৃত'-এর নিয়মিত গ্রাহক এবং অনুরাগী পাঠক। বেশ কিছুদিন যাবৎ 'অমৃত'-এর কয়েকটি গল্প এবং উপন্যাস যেমন—আজকের সমাজ, বিশেষ করে 'সুখের মেলা' পড়ে বেশ আনন্দ পাচ্ছি। কারণ আমরা সুদূর পল্লীগ্রামে বসবাস করে, এই ধরনের গল্প এবং উপন্যাস পড়তে সুযোগ পাই না। কিন্তু 'অমৃত'-এর প্রতি সংখ্যায় পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা পড়ে অনেক আশা মিটেছে। আশা করি এই ধরনের গল্প, উপন্যাস আরো অনেক পড়তে সুযোগ পাব। তবে আমি বা আমার মত পাঠক অনুরাগীর জানবার আশা বা স্পৃহা চরিতার্থ হবে।

শিবশঙ্কর ভট্টাচার্য,
২৪-পরগণা।

সাদা চোখে

বিচ্ছিন্নতাবাদী বামপন্থীর সংগে সহযোগিতা করার চেয়ে দক্ষিণপন্থী বিবর্তনবাদী শক্তির সংগে জোটবাঁধা অনেক নিরাপদ। কারণ, রাজনৈতিক সংগঠনের নেতৃত্বে বিচ্ছিন্নতা প্রবণতার ঝোঁক বাড়তে থাকলে সেই শক্তিকে সংহত করে শৃংখলার সংগে বিপ্লবের পথে পরিচালনা করা দুঃসাধ্য। আর ঐ শক্তি যদি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে পারে, তবে তাকে পরাস্ত করে বিপ্লবের প্রকৃত আবহাওয়া সৃষ্টি করা আরও কষ্টসাধ্য হয়ে উঠে। কিন্তু দক্ষিণপন্থী বিবর্তনবাদী শক্তি যদি ক্ষমতা পায় তবে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের কাঠামো বজায় থাকে। বুর্জোয়া গণতন্ত্রের আবহাওয়া বিপ্লবী পরিবেশ সৃষ্টির পক্ষে অনুকূল। আর ঐ পরিবেশে বিপ্লবী শক্তিকে সংগঠিত ও সংহত করাও অতীব সহজ।

এই তত্ত্বগত যুক্তিকে গ্রহণ করলেই দক্ষিণপন্থী কম্যুনিস্টদের সংগে শাসক কংগ্রেসের মিতালির অর্থ নিরূপণ করা মোটেই কঠিন নয়। কাজেই যেখানেই বিচ্ছিন্নতাকামী বামপন্থী শক্তির প্রাধান্য থাকবে অর্থাৎ ক্ষমতা দখল করার মত শক্তি থাকবে সেইখানেই—যাঁরা প্রকৃত বিপ্লবী শক্তি বলে নিজেদের দাবী করেন তাঁরা দক্ষিণপন্থী বিবর্তনবাদীদের দিকে স্বাভাবিকভাবেই ঝুঁকে পড়বেন। পশ্চিমবঙ্গে উগ্র বামপন্থীরাই যে বিবর্তনবাদী দক্ষিণপন্থী শক্তির পুনরুজ্জীবনে সহায়তা করছে, শুধু নির্বাচনের পটভূমিকায় নয়, সাধারণভাবে রাজনৈতিক ও সমাজজীবনেও তার হদিস পাওয়া যাচ্ছে। তাত্ত্বিক ও বাস্তব দিক থেকে বিচার করলে এ তথ্য সত্য।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে পশ্চিম বাংলার ক্ষেত্রে এই তত্ত্বগত সিদ্ধান্ত কার্যকর করার আগে কোন যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় কি? এই রাজ্যের প্রত্যেকটি গণতান্ত্রিক ও বামপন্থী দলের শক্তির তুলনামূলক বিচার করলে উত্তরটি সহজেই মিলবে। বিগত মধ্যবর্তী নির্বাচনের ফলাফলকে মাপকাঠি হিসাবে ধরে নিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে বিচ্ছিন্নতাকামী বামপন্থী দল অর্থাৎ সি পি এম 'সবকলী' একথা বলা যায় না, সি পি এম-এর একথা সহযোগী দলগুলিই তাদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ এনেছেন। যে সংখ্যক আসন দখল করেছিল তা এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করলেও অন্যান্য বামপন্থী দলগুলির মিলিত শক্তির সমান নয়। গণতান্ত্রিক শক্তির কথা বাদই দিলাম। আর দক্ষিণপন্থী বিবর্তনবাদী কংগ্রেস ক্ষমতাবিচ্যুত শুধু হয়নি অধিকন্তু সামান্য সংখ্যক আসনই পেয়েছিল। সেই নির্বাচনের পর যুক্তফ্রন্টের শরীকরা এই রাজ্যের আমজনতার কাছে তাঁদের সেবার আহ্বান রেখে গেছেন। কাজেই নির্বাচন ও সরকারগঠনের পরিস্থিতি স্বাভাবিকভাবেই ভিন্নরূপ পরিগ্রহ করেছে। নির্বাচনের পূর্বে এই রাজ্যে একমাত্র আওয়াজ উঠেছিল, কংগ্রেসকে পরাস্ত করা। কংগ্রেস দল সেই উত্তাল জনতরংগের আঘাত সহ্য করতে পারে নি। ফলত, বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক দল হিসাবে বাংলা কংগ্রেস যুক্তভাবে নতুন পথের দিশারী হিসাবে এই রাজ্যের রাজনৈতিক আকাশে উদিত হয়েছিল। তার পরের ইতিহাস কারও অজানা নয়। এবং আজকের কোন্দলের তাপ ও তারা সকলেই অবগত আছেন।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই রাজনৈতিক পটভূমিকায় সি পি এম একার পক্ষে বা তাদের সংগে যাঁরা জোটবেঁধে আছেন সেই যুক্তশক্তির পক্ষে বাংলার মসনদ অধিকার করা কি সম্ভব? এককথায় উত্তর হচ্ছে, না। কেননা সরকারে যোগ দেবার পর সি পি এম যে শক্তি সঞ্চয় করেছে তার জোরে নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে ক্ষমতা দখল করার মত অবস্থা আসেনি। উপরন্তু, সরকারে থাকাকালীন যে পন্থা অবলম্বন করে তাঁরা বিপ্লবের শর্টকাট তৈরি করার চেষ্টা করছিলেন তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটছে। নির্বাচন হলে এই বক্তব্যের প্রমাণ পাওয়া যাবে। অন্যদিকে রাজ্যের এমন অবস্থাও উদ্ভব হয়নি যে জনতা আবার কংগ্রেসের দিকে ঝুঁকে পড়বে। মনে হয় এটাই বাস্তব রাজনৈতিক অবস্থা। অতএব, ক্ষমতার ভারসাম্য পুরোপুরিভাবে এখনও নির্ভর করছে সেই সমস্ত দলগুলির ঐক্যের ওপর, যাঁরা বিচ্ছিন্নতাকামী বামপন্থীর বিরোধী আর দক্ষিণপন্থী বিবর্তনবাদী শক্তির পুনরুজ্জীবনের পথ চিরতরে রুদ্ধ করে দিতে চান।

এই সূত্রের বা তথ্যের যাঁরা ধারক বা বাহক সেই সমস্ত দলগুলি হচ্ছে ফরওয়ার্ড ব্লক আর এস পি, এস এস পি, এস ইউ সি, বিপ্লবী পি এস পি, আর সি পি আই, লোকসেবক সংঘ ও গোর্খা লীগ। সি পি আই, বাংলা কংগ্রেস ও পি এস পির কথা উল্লেখ করা হল না। এই কারণে যে তাঁরা উগ্র বামপন্থীকে রুখবার জন্য দক্ষিণপন্থী বিবর্তনবাদীদের সংগে হাত মেলাতে উৎসুক। তবে সি পি আই ঐ তত্ত্বে শুধু বিশ্বাসী নয় বরঞ্চ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ঐ নীতি অনুসরণের জোরদার প্রস্তুতি চালাচ্ছেন, এবং সিদ্ধান্তও নিয়েছেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে এসে ঐ নীতি মার খাবার উপক্রম হয়েছে। এই রাজ্যে, আগেই বলেছি, উগ্রবামপন্থার শক্তি এত বেশী নয় যে ক্ষমতা দখল করতে পারে। কাজেই দক্ষিণপন্থীদের দিকে ঝোঁকবার প্রশ্নটা জনতা সহজে মেনে নিতে পারবে না। তাই সি পি আই একটি বিশেষ সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে।

কিন্তু ডান কম্যুনিস্ট পার্টিকে বাঁচাবার জন্য অষ্টবামের কিছু শরীক নীরবে রাজনীতি চালিয়ে যাচ্ছেন। অবশ্য সি পি আইকে বাঁচাবার জন্য বললে একটু বেশী বলা হবে। বরং যদি একটু কঠোরভাবে কথাটা রাখি তাহলে প্রশ্নটা এই দাঁড়ায় আগামীদিনের দিকে লক্ষ্য করেই সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে প্যাঁচ দেওয়া হচ্ছে। সি পি আই-এর সিদ্ধান্ত হচ্ছে, শাসক কংগ্রেসের সংগেও মিতালি করবে আর যুক্তফ্রন্টকেও জোরদার করবে। অষ্টবামের মিলনের পটভূমিকা বিচার করলে সি পি আই-এর এই সিদ্ধান্ত কূটনৈতিক চালে ভরপুর। তা সত্ত্বেও অষ্টবামের কিছু শরীক অষ্টবামের সংস্থাটাকে একটি কার্যকর যুক্তফ্রন্টে রূপায়িত করবার জন্য ঘরোয়া সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এবং এই ফ্রন্টের একটি রাজনৈতিক বক্তব্যের খসড়াও তৈরি করেছেন। সমস্ত শরীকদের কাছে এর অনুলিপি পাঠানো হয়েছে মতামত চেয়ে। এবং একজন মুখপাত্র এ আশাও প্রকাশ করেছেন যে আগামী ১০ই নভেম্বরের সভার পর অষ্টবাম আর অষ্টবাম থাকবে না, একেবারে 'সংযুক্ত ফ্র-

পন্থী গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট নাম ধারণ করে একাত্ম হয়ে যাবে। আশা করলেও আশংকা যে বিদ্যমান, সেই বক্তব্যটা এখন পেশ করা প্রয়োজন।

এস ইউ সি নেতা শ্রীসুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায় অন্তর্বামের মধ্যে যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে তাকে দূর করে এই রাজনৈতিক দলগুলিকে একটি ফ্রন্টে সংহত করে আসরে নামবার উদ্দেশ্যে ফরওয়ার্ড ব্লক ও বিদ্রোহী পি এস পি গোষ্ঠীর সঙ্গে আলোচনা করে নাকি এই খসড়া দলিল তৈরি করেছেন।

আপাতদৃষ্টিতে দেখলে দলিলটি সুন্দর ও স্বচ্ছ মনে হবে। কারণ রাজনৈতিক বক্তব্যটা অত্যন্ত স্পষ্ট। কি কারণে এই তৃতীয় জোট গঠন করা একান্ত প্রয়োজন তার জন্য যে আর্গুমেন্ট করা হয়েছে তাও প্রণিধানযোগ্য। এত স্বচ্ছতা সত্ত্বেও একটি বক্তব্য এই খসড়া দলে নির্দিষ্ট হয়নি। সেটা হচ্ছে, শাসক কংগ্রেসকে নিয়ে যদি কেউ ফ্রন্ট করে সেই ফ্রন্টের সঙ্গে এই ফ্রন্টের সম্পর্ক কি হবে। এই প্রশ্নেই যথেষ্ট ফাঁক থেকে গেছে। যদিও দলিলটা খসড়ার স্তরেই আছে, যে তিনটি দল এই ডকুমেন্ট রচনার জন্য দায়ী তাঁরা মনে হয় এই প্রশ্ন সম্পর্কে সম্পূর্ণ সজাগ থেকেই ঐ ফাঁকটা রেখে দিয়েছেন। ঐ ফাঁকটা থাকলে সি পি আই-এর পক্ষে ফ্রন্টে থাকার অসুবিধা আদৌ হবে না। কারণ তাঁরা তাঁদের জাতীয় পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ীই কাজ করে যেতে পারবেন। আর এই খসড়া দলিল যেমনটি আছে তেমনভাবে গৃহীত হলে শাসক ও বাংলা কংগ্রেসের প্রস্তাবিত গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের সঙ্গে সহযোগিতা করার পথেও কোন বাধা থাকবে না। অবশ্য এই খসড়া দলিলের রচয়িতারা যুক্তি দেখাবেন যে দলিলের কোথাও বড়বামের সঙ্গে সমঝোতা করা যাবে না এমন কথাও লিপিবদ্ধ হয়নি। অর্থাৎ দরকার হলে বড়বামের সঙ্গেও হাত মেলানো যাবে। এই যুক্তির অবতারণা করে আসল উদ্দেশ্যকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা হবে বলেই অনেকে আশংকা করছেন। অনুপরে যদি গণতান্ত্রিক শক্তি বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গেই অন্তর্বর্তী সমঝোতা করে তবেও দোষের কিছু হবে না। কারণ খসড়া দলিলে শুধু বাম কম্যুনিস্ট ও শাসক কংগ্রেসের কেন বিরোধিতা করা হবে সেই বক্তব্যই অভিজ্ঞতা ও তথ্যের ভিত্তিতে তত্ত্বগত দিক থেকে পেশ করা হয়েছে। কাজেই বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতা করতে পারলে পরোক্ষে শাসক কংগ্রেসকে মদৎ পৌঁছানো গেল আর প্রস্তাবিত ফ্রন্টকে অতীব শক্তশালী করে তোলা গেল। ফলে, লালদীঘির দপ্তর কব্জার মধ্যে থাকবে। অর্থাৎ সাপও মরল লাঠিও ভাঙল না। আর তাত্ত্বিকদের তত্ত্বও রক্ষা পেল, বিচ্যুতি ঘটল না। এস ইউ সির অবিসম্বাদিত নেতা শ্রীশিবদাস ঘোষও নাকি এই তত্ত্বের সঙ্গে একমত। তিনিও নাকি সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন 'লেফট সেকটেরিয়ানিজম্‌কে' পরাস্ত করা আশু কর্তব্য এবং সেজন্য দরকার হলে রাইট রিফর্মিজম্‌-এর সঙ্গে হাত মেলানো যায়। তাতে বিচ্যুতি ঘটে না। এটা একটা রাজনৈতিক কৌশল মাত্র। ফরওয়ার্ড ব্লকও মার্কসবাদী। অতএব, তত্ত্বের দিক থেকে তাঁরাও যে এই সুনির্দিষ্ট বক্তব্যের সঙ্গে সহমত হবেন তাতে আর আশ্চর্য কি! কাজেই এই তিন দল থেকে খসড়া-দলিল উপস্থিত করা হয়েছে বলে অন্যরা 'বাহবা বাহবা' বলে মেনে নেবেন এই আশাই হয়ত তাঁরা করছেন।

এই খসড়া-দলিল একেবারে দোষমুক্ত, রচয়িতারা একথা না বললেও তাঁদের প্রত্যেকের দলীয় সিদ্ধান্ত প্রকাশ করে তাঁরা বোঝাতে চেয়েছেন, তাঁদের শাসক কংগ্রেস বিরোধিতা মেকি নয়। ফরওয়ার্ড ব্লক দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছেন যে তাঁরা শাসক কংগ্রেস ত দূরের কথা শাসক কংগ্রেসের সঙ্গে মিতালি-করা-কোন-দলের সঙ্গেও সমঝোতা করবে না। অনুরূপ কথা এস ইউ সি ও বিদ্রোহী পি এস পিও বলেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা যে দলিল প্রণয়ন করেছেন তাতে এই কথা রাখলেন না কেন—সেটাই বিস্ময় লাগছে। কিন্তু এত প্যাঁচ কিসের জন্য? এস এস পি-কে জোটে রাখবার জন্য নাকি? এস এস পি-র পাঁচ সদস্য হলেও অন্তর্বামের মধ্যে তাঁরা তৃতীয় স্থানে আছেন। যদিওবা ঐ রকম কোন কথা চললে আর এস পি ও লোকসেবক সংঘকেও পাওয়া যেতে পারে।

পাল্টা সম্ভাবনা হিসাবে বলা যায়, এস এস পি, আর এস পি ও লোকসেবক সংঘের সঙ্গে বাম কম্যুনিস্টদের সমঝোতা হবার প্রবল সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে। এস এস পি ও বাম কম্যুনিস্টদের কেন্দ্রীয় নেতাদের মধ্যে শ্রীমধু লিমায়ের গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠনের পটভূমিকায় একদফা আলোচনাও হয়ে গেছে। কেরলের কথা ভেবে দেখলে পশ্চিমবঙ্গেও যে ঐ নাটকের পুনরাভিনয় হতে পারে তা পরিষ্কার উপলব্ধি করা যায়। বাম কম্যুনিস্ট পার্টি যাঁদের সঙ্গে জোট বেঁধে আছে তাঁদের নিয়ে ফ্রন্ট গঠন করতে পারবে না, একথা যেমন সত্য—তেমনি এস এস পি, আর এস পি ও লোকসেবক সংঘের সঙ্গে সমঝোতা হলে কি হবে সে-কথা বলাও মুশকিল। কারণ তখন ঐ পাঁচ-জোটই নিজেদের বামপন্থী জোট হিসাবে জনগণের কাছে চিহ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। আর আজ অবধি কংগ্রেসবিরোধী যে আবহাওয়া সৃষ্টি হয়েছে তার পুরো হাওয়াটা ওদেরই পালে লাগতে পারে।

এই সম্ভাবনাকে নিবারিত করার জন্য অন্তর্বামের উচিত কোন কৌশল না করে লোকশক্তি যেভাবে রাজনৈতিক বক্তব্য রেখেছেন, তার ভিত্তিতে সংঘবদ্ধ হওয়া। তাহলে বামপন্থী হাওয়াটা পুরোপুরি বাম কম্যুনিস্টরা কাজে লাগাতে পারবে না। অন্তর্বামের পালেই তো বেশীর ভাগ লাগার কথা। আর সেক্ষেত্রে বাম কম্যুনিস্টদের ক্ষমতায় আসার সম্ভাবনাও কমে যেতে থাকবে। পশ্চিমবাংলার রাজনৈতিক অবস্থাটা এরকম হলে অবাক হওয়া চলবে না।

—সমদর্শী

CENTRAL LIBRARY

শ্রীমতী নলী সেনগুপ্তা চিকিৎসার জন্য পাকিস্থান থেকে ভারতে এসে পৌঁছেছেন। হরিদাসপুর চেকপোস্ট দিয়ে সীমান্ত অতিক্রমের আগে তাঁকে স্ট্রেচারে তোলা হচ্ছে।

দেশে বিদেশে

আগামী ৯ই নভেম্বর সংসদের শীত-কালীন অধিবেশন আরম্ভ হওয়ার কথা আছে। তার আগেই লোকসভা ভেঙে দিয়ে নতুন নির্বাচন করার জন্য প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী রাষ্ট্রপতির কাছে সুপারিশ করবেন কিনা তা নিয়ে আবার জল্পনাকল্পনা শুরু হয়েছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সেরকম একটা সম্ভাবনার কথা মনে রেখে প্রস্তুতি করছে বলেও খবর পাওয়া যাচ্ছে।

যাঁরা মনে করছেন যে, শ্রীমতী গান্ধী অন্তর্বর্তী নির্বাচনে নেমে পড়তে পারেন তাঁদের যুক্তি হল : উত্তর প্রদেশে সংযুক্ত বিধায়ক দলের সরকার শাসক কংগ্রেসের বিচলিত করে তুলেছে। ঐ রাজ্যে সংযুক্ত বিধায়ক দলের মন্ত্রিসভা যদি স্থায়ী হবার সময় পায় তবে সরকারী ক্ষমতা কাজে লাগাবার সুযোগ পাবে তারা। ১৯৭২ সালের নির্বাচনে সেখানে শাসক কংগ্রেস দলকে বিশেষ অসুবিধায় পড়তে হবে। উপরন্তু কেন্দ্রে ক্ষমতা রাখতে হলে রাখার জন্য উত্তর প্রদেশের উপর অনেকখানি নির্ভর করতে হবে। সুতরাং সেখানে শ্রীমতী গান্ধীর দল অতিরিক্ত ঝুঁকি নিতে পারে না। দ্বিতীয়ত, উত্তর প্রদেশের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে বিরোধী কংগ্রেস দল অন্যত্র একই কৌশলে শাসক কংগ্রেস দলকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে। বিরোধী কংগ্রেস দলের সভাপতি শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা পাটনায় গিয়ে শ্রীদারোগা রায়ের মন্ত্রিসভার সংকট উস্কে দিয়ে এসেছেন। সেখানেও উত্তর প্রদেশের ধরনের একটি সংযুক্ত বিধায়ক দল গঠনের সম্ভাবনা বেশ উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। উত্তর প্রদেশের সেই একনীতি কেন্দ্রেও এসে পৌঁছাচ্ছে। জোট গঠনের চেষ্টা করে বিরোধী কংগ্রেস দলের নেতারা কিছুকাল আগে পিছিয়ে এসেছেন সেই মহাজোটেরই নাম বদল করে এখন পার্লামেন্টের ভিতর সংযুক্ত বিধায়ক দল গঠনের চেষ্টা চলছে।

সুতরাং শাসক কংগ্রেস দলের সামনে এখন প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, প্রতিপক্ষকে আর এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ না দিয়ে এখনই নির্বাচনে নেমে পড়াটা শাসক কংগ্রেস দলের পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ হবে কিনা। তৃতীয়ত, ব্যাংক রাষ্ট্রায়ত্ত ও প্রাক্তন রাজন্যদের ভাতা বিলোপ করার পর এখন শাসক কংগ্রেস দলের পালে যতটুকু হাওয়া আছে তা ভবিষ্যতে আর না থাকতে পারে। ভাল ফলনের সৌভাগ্য কতদিন থাকবে তাও বলা যায় না। অতএব, যা করার এখনই। চতুর্থ আর একটা যুক্তি হল, একবার লোকসভায় শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সরকারের হার হয়ে গেলে তাঁদের আর কিছুই করার থাকবে না। শোনা যাচ্ছে যে, বঞ্চিত প্রাক্তন রাজন্যরা মরিয়া হয়ে উঠেছেন। তাঁরা শাসক কংগ্রেস থেকে সদস্য ভাঙানোর জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করছেন। প্রাক্তন রাজন্যদের ভাতা ও অন্যান্য বিশেষ সুযোগসুবিধা লোপ করার আগে এ বিষয়ে সরকার সুপ্রীম কোর্টের পরামর্শ নিল বলে শাসক কংগ্রেস দলের অনেক এম-পি যে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন তা থেকেই বোঝা গিয়েছিল, লোকসভায় শাসক কংগ্রেস দলের মধ্যে প্রাক্তন রাজন্যদের প্রভাব বা তাঁদের প্রতি সমর্থন অথবা সহানুভূতি যথেষ্ট পরিমাণেই আছে। সেই হেতু লোকসভায় একবার যদি শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সরকারের পরাজয় ঘটে তাহলে রাষ্ট্রপতি পরাজিত সরকারের

স্কটল্যাণ্ডের উপকূলের অদূরে বৃটিশ পেট্রোলিয়াম সংস্থা উত্তর সমুদ্রে তৈল উত্তোলনের জন্য পরীক্ষা কার্য চালাচ্ছে। এখানে নাকি প্রচুর পেট্রল পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

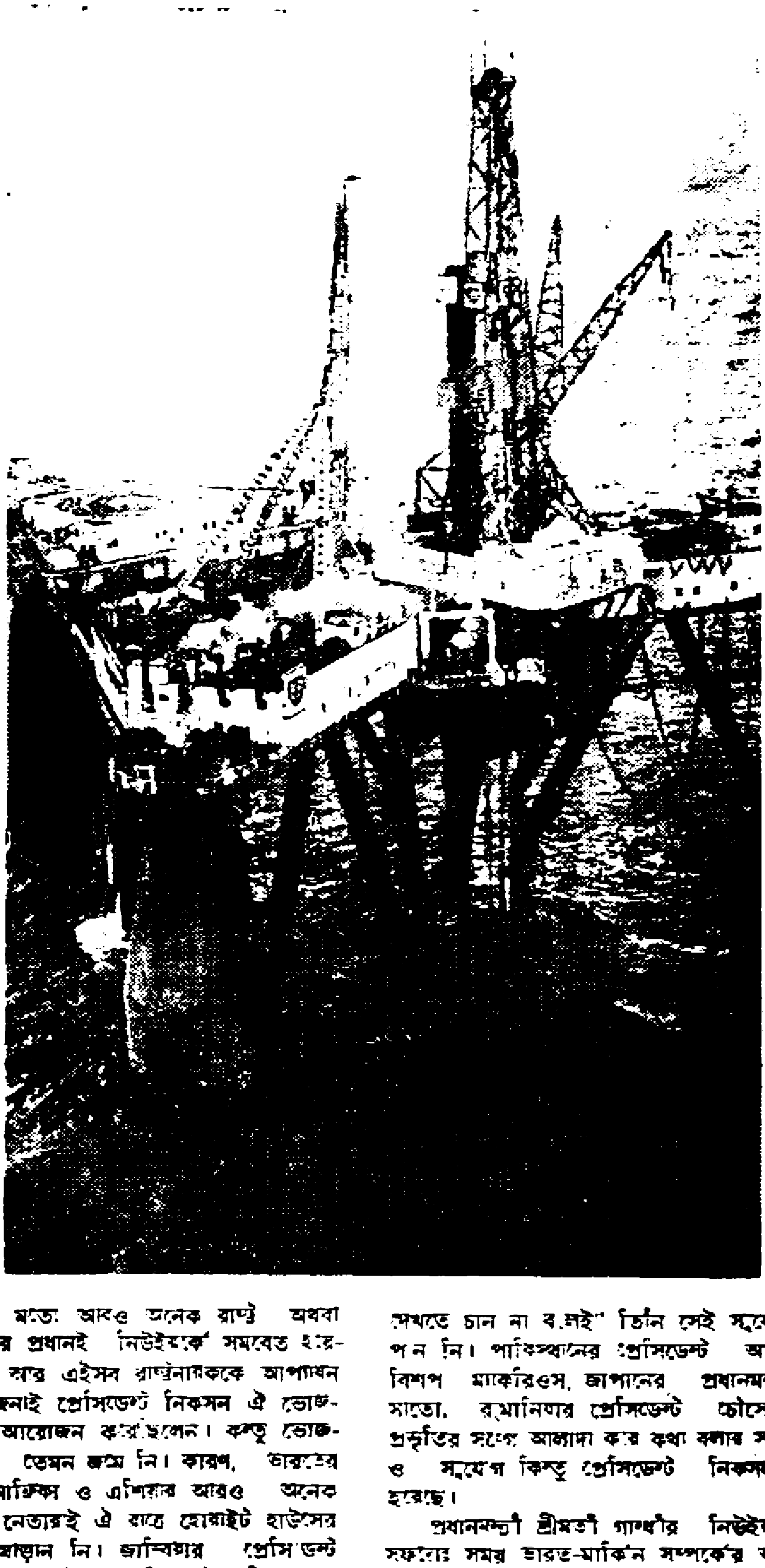

প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ মেনে নিতে বাধ্য থাকবেন না।

মাস কয়েক আগে আর একবার যখন এই জাতীয় ঘটনা ঘটেছিল তখন প্রধানমন্ত্রী নিজে বিবৃতি দিয়ে সংশয় নিরসনের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর সেই কথাকেই শেষ কথা বলে রাজনৈতিক মহল মেনে নিতে চাইছেন না।

*

ভারতবর্ষস্থিত মার্কিন রাষ্ট্রদূত কেনেথ বি কিটিং যে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীকে বিদায় সম্বর্ধনা জানানোর জন্য পালাম বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিলেন না তার দ্বারা তিনি কি কূটনৈতিক পদ্ধতিতে তাঁর সরকারের তরফ থেকে ভারত সরকার সম্পর্কে তাঁদের কোনরকম বিরাগ প্রকাশ করতে চেয়েছেন? অনুরূপভাবে, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নিক্সনের ভোজসভায় যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে শ্রীমতী গান্ধী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে কিছু কূটনৈতিক ভর্ৎসনা করতে চেয়েছেন?

যদিও দুই পক্ষই এই ঘটনাগুলির উপর তেমন গুরুত্ব আরোপ করতে চাইছেন না তাহলেও সন্দেহবাদীরা অন্যান্য কতকগুলি ঘটনার সঙ্গে এই দুটি ঘটনাকেও যুক্ত করে দেখাতে চাইছেন যে, ভারত-মার্কিন সম্পর্কে অবনতির লক্ষণগুলিই নানা দিক দিয়ে ফুটে বেরোচ্ছে।

রাষ্ট্রদূত কিটিং তাঁর কৈফিয়তে বলেছিলেন যে, দূতাবাসের একজন কেরানীকে বলে রাখা হয়েছিল, তিনি যেন ভোরবেলায় রাষ্ট্রদূতের ঘুম ভাঙিয়ে দেন। কিন্তু তাঁকে যখন ঘুম ভাঙিয়ে দেওয়া হল তখন শ্রীমতী গান্ধীর বিমান রওনা হয়ে গেছে। বেচারা কেরানীটি সাসপেন্ড হয়েছেন। কিন্তু রাষ্ট্রদূতের আর বিমানবন্দরে যাওয়া হয় নি। এই খবর বেরোবার পর রাষ্ট্রদূত কিটিং ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান থেকে গোটা কয়েক অ্যালার্ম ঘড়ি উপহার পেয়েছেন। এবং কানপুরে ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে ছাত্রদের বিক্ষোভের সম্মুখীন হয়েছেন। শ্রীমতী গান্ধী দেশে ফিরে এসে বলেছেন, এরকম একটা ছোট ব্যাপার নিয়ে এতখানি হৈ-চৈ করা হচ্ছে দেখে তিনি বিস্ময় বোধ করছেন। তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফর করতে যান নি। গিয়েছিলেন রাষ্ট্রসংঘের অধিবেশনে যোগ দিতে।

শ্রীমতী গান্ধী একথাও বলেছেন যে, প্রেসিডেন্ট নিক্সনের ভোজসভায় যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ যে তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন তারও কোন বিশেষ তাৎপর্য নেই। এই ভোজসভায় যোগ দিতে হলে তাঁকে আরও একটা দিন বিদেশে কাটাতে হত। সেটা তিনি করতে চান নি।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে নিউইয়র্কে যে রজত জয়ন্তী অধিবেশন হয়েছিল তাতে যোগ দেওয়ার জন্যই শ্রীমতী গান্ধী গিয়েছিলেন। এই উপলক্ষে শ্রীমতী গান্ধীর মতো আরও অনেক রাষ্ট্র অথবা সরকারের প্রধানই নিউইয়র্কে সমবেত হয়েছিলেন শুধু এইসব রাষ্ট্রনায়ককে আপ্যায়ন করার জন্যই প্রেসিডেন্ট নিক্সন ঐ ভোজসভার আয়োজন করেছিলেন। কিন্তু ভোজসভাটি তেমন জমে নি। কারণ, ভারতের মতো আফ্রিকা ও এশিয়ার আরও অনেক রাষ্ট্রের নেতারাই ঐ রাত্রে হোয়াইট হাউসের রাস্তা মাড়ান নি। জাম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট ডাঃ কেনেথ কাউন্ডা প্রেসিডেন্ট নিক্সনের সঙ্গে আলাদা করে দেখা করতে চেয়েছিলেন: কিন্তু ডাঃ কাউণ্ডার ভাষায় "প্রেসিডেন্ট নিক্সন বোধহয় আমাদের কুৎসিত মুখগুলি দেখতে চান না বলেই" তিনি সেই সুযোগ পান নি। পাকিস্থানের প্রেসিডেন্ট আর্চবিশপ মাকারিওস, জাপানের প্রধানমন্ত্রী সাতো, রুমানিয়ার প্রেসিডেন্ট চৌসেস্কু প্রভৃতির সঙ্গে আলাদা করে কথা বলার সময় ও সুযোগ কিন্তু প্রেসিডেন্ট নিক্সনের হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর নিউইয়র্ক সফরের সময় ভারত-মার্কিন সম্পর্কের অবনতির কথাটা যে কারণে বিশেষ করে উঠেছিল সেই কারণটা হচ্ছে এই যে, তাঁর এই সফরের অব্যবহিত আগেই পাকিস্থানকে মার্কিন অস্ত্রশস্ত্র বিক্রী করার ব্যাপারে

ভুবনেশ্বরে ৫ নভেম্বর 'উড়িষ্যা-৭০' প্রদর্শনীর উদ্বোধন হচ্ছে। বহু শত শিল্পী, কারুশিল্পী এবং কর্মী এই প্রদর্শনীর সাফল্যের জন্য পরিশ্রম করছেন দিনরাত। উড়িষ্যা সরকারের শিল্প অধিকর্তার পরিচালনায় এই বিরাট শিল্প প্রদর্শনীতে ভারী শিল্প ছাড়াও আরও বহু দর্শনীয় জিনিস থাকবে।

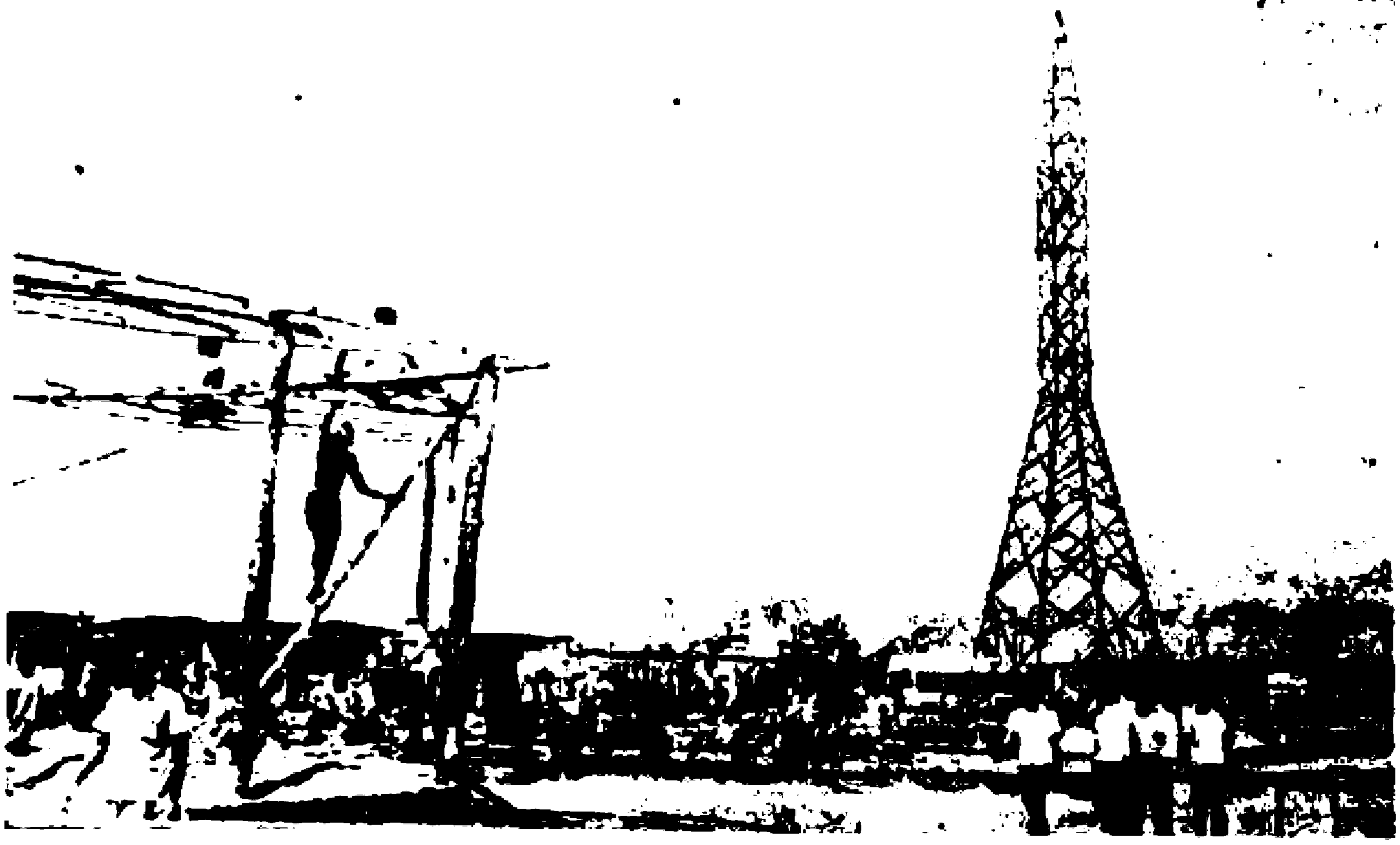

ভারতে অত্যন্ত বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীও আমেরিকার এই বিষয়ে ভারতের মনোভাব সেখানকার সরকারী কর্তৃপক্ষকে জানাতে কসুর করেন নি। মার্কিন পররাষ্ট্রসচিব উইলিয়াম রজার্সের সঙ্গে এ বিষয়ে শ্রীমতী গান্ধীর ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীস্বরণ সিংয়ের কথা হয়েছিল। শ্রীসিং শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে রাষ্ট্রসংঘে গিয়েছিলেন। প্রকাশ যে, রজার্স তাঁদের বলেছেন যে, পাকিস্থানকে এই একবারই অস্ত্র সরবরাহ করা হল। এর দ্বারা এমন বোঝায় না যে, এদিকে যে নিষেধ বলবৎ করা হয়েছিল মার্কিন সরকার তা তুলে নিয়েছেন। ওয়াশিংটনে মার্কিন সাংবাদিকদের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারেও শ্রীমতী গান্ধী প্রসঙ্গটি তুলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, মার্কিন সরকারের এই সিদ্ধান্তে ভারতবর্ষের মানুষ বিচলিত হয়েছে।

*

রাষ্ট্রসংঘের রজত জয়ন্তী অধিবেশনে শ্রীমতী গান্ধী যে বক্তৃতা দিয়েছেন তাতেও মার্কিন কর্তৃপক্ষের খুব খুশী হওয়ার কথা নয়।

তিনি বলেছেন যে, বৃহৎ শক্তিগুলি অন্যান্য দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করছেন এবং 'প্রযুক্তিবিদ্যাসংক্রান্ত নয়া উপনিবেশবাদ' চালিয়ে যাচ্ছেন। শক্তিমানদের ধিক্কার দিয়ে তিনি বলেন যে, এরা নানাভাবে নিজেদের প্রভাব খাটিয়ে এবং নিজেদের প্রভাবাধীন এলাকা বাড়াবার জন্য নিরলস চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

শ্রীমতী গান্ধীর মতে, লীগ অব নেশনস্‌কে যেমন বিভিন্ন জাতির নিজস্ব স্বার্থ পোষণের কাজে লাগান হয়েছিল রাষ্ট্রসংঘের ক্ষেত্রেও তেমনি ঘটছে।

শক্তিশালী জাতিগুলি "উন্নতিশীল দেশগুলিকে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার জন্য যেসব শর্ত দেয় এবং দরিদ্র জাতিগুলিকে যেভাবে তাদের বাজার থেকে সরিয়ে রাখে" তার জন্যও শ্রীমতী গান্ধী ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, "অনুন্নত জাতির পক্ষে বিচিত্র পরিহাস এই যে, আমাদের হাতে উপায় আছে, আমরা স্বপ্নও দেখি, কিন্তু জোর কদমে সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য যে ইচ্ছাশক্তি ও বিশ্বাসের প্রয়োজন তা আমাদের নেই।"

সংবাদে প্রকাশ যে, শ্রীমতী গান্ধীর এই বক্তৃতা রাষ্ট্রসংঘে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তাঁর বক্তৃতার পর অনেক প্রতিনিধি নিজেদের আসন থেকে উঠে গিয়ে শ্রীমতী গান্ধীকে অভিনন্দন জানিয়ে আসেন।

*

যদিও রাষ্ট্রসংঘের এই রজত জয়ন্তী অধিবেশনে যোগ দেওয়ার জন্য প্রায় ৫০টি দেশের রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রীরা নিউ-ইয়র্কে এসেছিলেন তাহলেও এই অধিবেশন যতটা আশা করা গিয়েছিল ততটা গুরুত্ব লাভ করে নি। তার প্রধান কারণ, বৃহৎ শক্তিগুলির শীর্ষ নেতারা এই অনুষ্ঠান থেকে তফাতে ছিলেন। সোভিয়েট রাশিয়ার কোসিগিন এই অধিবেশনে আসেন নি। প্রেসিডেন্ট নিকসনও শুধু অধিবেশনে এসে একটি বক্তৃতা দিয়েই চলে গেছেন।

রাষ্ট্রসংঘের ২৫ বছর বয়ঃপূর্তি উপলক্ষে স্বভাবতই এই বিশ্বসংস্থার অতীত ও ভবিষ্যৎ, তার সাফল্য ও ব্যর্থতা সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। সমবেত প্রতিনিধিরা সকলেই একথা স্বীকার করেছেন যে, যে উদ্দেশ্য নিয়ে ২৫ বছর আগে রাষ্ট্রসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নি। ভিয়েৎনামে এবং পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধের আগুন এই মুহূর্তে রাষ্ট্রসংঘের সীমাবদ্ধতাকে উজ্জ্বল করে তুলে ধরেছে। কিন্তু একথাও কোন প্রতিনিধি বলতে পারেন নি যে, রাষ্ট্রসংঘের প্রয়োজন ফুরিয়েছে।

সকলের হয়ে শ্রীমতী গান্ধী আশা প্রকাশ করেছেন, "সকলের সম্মিলিতে দুঃস্বপ্নের এক নূতন যুগ সৃষ্টি করার জন্য, ন্যায়বিচার ও শান্তির একটা নবযুগ আনয়নের জন্য রাষ্ট্রসংঘ চেষ্টা করে যাক।"

৩০-১০-৭০

—[illegible]

সম্পাদকীয়

দেশবন্ধু প্রণাম

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের জন্মশতবার্ষিকী আজ সারাদেশে উদযাপিত হচ্ছে। এই মহান দেশপ্রেমিক, লোককল্যাণব্রতী, কবি ও জনদরদীর উদ্দেশে জানাই আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি। দেশবন্ধুকে বাংলা তথা ভারতবাসী হৃদয়ে স্থান দিয়েছে। ত্যাগে ও সেবায় তিনি ছিলেন অনন্য। সে কারণেই তাঁর দেশবন্ধু নাম। ভারতবর্ষের রাজনীতিতে এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে তিনি ছিলেন এক উজ্জ্বল ভাস্কর। সুভাষচন্দ্রের মতো মহানায়কের তিনি ছিলেন গুরু। গান্ধীজী তাঁকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন এক মহান নেতারূপে। তাঁর জন্মশতবর্ষে এই অনন্যসাধারণ লোকপ্রিয় নেতার জীবনী ও কর্মসাধনা আজ বিশেষভাবে অনুধাবন করার প্রয়োজন আছে। দেশবন্ধু ইতিহাসের মানুষ। তিনি নিজের জীবন দিয়ে এই দেশকে, সমাজকে, এই দেশের মানুষকে মহত্তর সার্থকতায় মহিমান্বিত করে গেছেন।

চিত্তরঞ্জনের কর্মজীবন ছিল গৌরবদীপ্ত। চৌখস ব্যারিস্টার। কলকাতার অভিজাত মহলে পয়লা সারির লোক তিনি। ভারতজোড়া তাঁর খ্যাতি। অর্থের কোনো চিন্তা নেই। সেই বিপুল খ্যাতি নিয়ে তিনি বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের পুরোধা অরবিন্দ, বারীন ঘোষ ও উল্লাসকর দত্তের মামলার কৌঁসুলী হলেন। বোমা মামলায় জড়িয়ে ইংরাজ শাসকরা এই তিন বিপ্লবীকে ফাঁসি দেবার জন্য যে-ষড়যন্ত্র করেছিল আইনবিদ চিত্তরঞ্জনের অত্যাশ্চর্য ক্ষমতায় ও নিষ্ঠায় এই তিন বিপ্লবীকে তিনি মুক্ত করে আনলেন। আলিপুর বোমা মামলার সেই কাহিনী আজ ইতিহাস হয়ে আছে। সন্ন্যাসী-বিপ্লবী ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে যে মামলা হয় তাতেও উপাধ্যায়ের পক্ষ সমর্থন করে তীক্ষ্ণ আইন-বিশ্লেষণের পরিচয় দিয়েছিলেন চিত্তরঞ্জন।

এই আইনজ্ঞ ব্যারিস্টার, শৌখীন জীবনে অভ্যস্ত চিত্তরঞ্জন একদিন সর্বত্যাগী হলেন দেশের জন্য। দয়ার সাগর বিদ্যাসাগরের পর এমন দানশীল করুণা-হৃদয় জননায়কের সাক্ষাৎ বাংলাদেশ পায়নি। রাজনীতিতে তিনি ছিলেন বিচক্ষণ, বাস্তববাদী ও দূরদর্শী, নীতির প্রবক্তা। বিলাসী চিত্তরঞ্জন দেশের ডাকে বিলাতী দ্রব্য বর্জন করলেন এক কথায়। সন্ন্যাসীর ত্যাগ ব্রতে তিনি দীক্ষা নিলেন। কংগ্রেসের সভাপতিরূপে ১৯২২ সালে গয়া অধিবেশনে তিনি ঘোষণা করলেন, জনসাধারণের সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় ও সহযোগিতায় স্বরাজের জন্য জাতিকে সংগঠিত করতে হবে। অসহযোগের প্রশ্নে গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁর মতভেদ হল। ১৯২৩ সালে তিনি কংগ্রেসের মধ্যেই গঠন করলেন স্বরাজ্য দল। কাউন্সিলে, কর্পোরেশনে প্রবেশ করে ইংরেজের আইনেই বৃটিশ ক্ষমতাকে জব্দ করার নীতি গ্রহণ করলেন তিনি। মতিলাল নেহরু, সুভাষচন্দ্র প্রমুখ নেতারা হলেন তাঁর সহযোগী। চিত্তরঞ্জনের এই নীতি ভারতের রাজনীতির মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল। বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের বনিয়াদ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন চিত্তরঞ্জন। কংগ্রেসকে পরে চিত্তরঞ্জনের রাজনৈতিক পন্থাই অনুসরণ করতে হয়েছিল। অসহযোগ চিরস্থায়ী হয়নি। কিন্তু চিত্তরঞ্জন তা দেখে যেতে পারেননি। ১৯২৫ সালে অকালে চিত্তরঞ্জনের প্রয়াণ ভারতবর্ষের রাজনীতির পক্ষে এক অপূরণীয় ক্ষতি। চিত্তরঞ্জনের স্থান আর পূর্ণ হয়নি। বাংলার দুর্দশার সূত্রপাত তখন থেকেই। ভারতীয় রাজনীতিতে বাংলাদেশ তখন থেকে স্থান নিল পিছনের সারিতে। বাংলা বিভাগের মধ্য দিয়ে হল তার সকরুণ বিয়োগান্তক পরিণতি।

সর্বত্যাগী চিত্তরঞ্জনের বাসভবন রূপান্তরিত হল চিত্তরঞ্জন সেবাসদনরূপে। রবীন্দ্রনাথ অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন, 'এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ, মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান।' এ দানের তুলনা নেই। স্বদেশবাসীর পক্ষ থেকে চিত্তরঞ্জনকে যে অভিনন্দনপত্র দেওয়া হয়েছিল তাতে শরৎচন্দ্র লিখেছিলেন, 'বীর তুমি, দাতা তুমি, কবি তুমি, তোমার ভয় নাই, তোমার মোহ নাই, তুমি নির্লোভ, তুমি মুক্ত, তুমি স্বাধীন। রাজা তোমাকে বাঁধিতে পারে না, স্বার্থ তোমাকে ভুলাইতে পারে না। সংসার তোমার কাছে হার মানিয়াছে। বিশ্বের ভাগ্যবিধাতা তাই তোমার কাজকেই দেশের শ্রেষ্ঠ বলে গ্রহণ করিলেন, তোমাকেই সর্বলোকচক্ষুর সাক্ষাতে দেশের স্বাধীনতার মূল্য সপ্রমাণ করিয়া দিতে হইল।'

আজ এই মহাপ্রাণ নায়ককে আমরা স্মরণ করি। প্রত্যেক মহাপুরুষের জীবনই জাতির ইতিহাসকে উজ্জ্বল করে দিয়ে যায়। চিত্তরঞ্জন শুধু দেশনায়ক নন, তিনি দেশবন্ধু। দেশের এই দুঃখের দিনে দেশবন্ধুকেই তো জাতি সর্বান্তকরণে প্রার্থনা করে। দেশবন্ধুর স্মৃতি অমর হোক।

হাওয়ার ভেতরে ॥

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

হাওয়ার ভেতরে আর আর্দ্রতা পাই না যেমন অনেকে পায়।
জলের ভেতরে শীতলতা...যেরকম অনেকের বুকে।
পাহাড়চূড়ার ওই মন্দিরের শীর্ষে দেবতাকে
দেখি না, যেমন অনেকেই
অনায়াসে দেখে নিতে জানে। সারাক্ষণ
জ্বলন্ত অঙ্গারে পোড়ে ভরার্ত দিনের ছবি। শ্যাওলায়

পুকুরের চোখ ঢেকে আছে। দূর্বাদলে
দস্যুর পায়ের ছাপ, স্তব্ধ বৃক্ষমূলে
সাপের খোলস। আমি আনন্দিত বাক্যালাপে
একদিন ভরিয়েছিলাম
কৈশোর, যৌবন। আজ সারা কৈশোরের যৌবনের চোখে
তিক্ততার ভেজ আর জ্বালা; অতএব
হাওয়ার ভেতরে কোনো আর্দ্রতা খুঁজি না।।

প্রবালী ঝড় ॥

সত্যানন্দ ভট্টাচার্য

সুস্পষ্টে হাজির দোরে
জীবন ইসারা
স্নায়ুতে লেগেছে আজ
চেতনার ছোঁয়া।
স্বৈরিণী কড়িতে জরা
বন্ধ জনপদ
মৃত্যুর দুর্গন্ধে ভরা
নারকীয় খাদ।
মোহিনী কুহকে বন্দী
চক্রী দরবার
লুব্ধ পতঙ্গেরে ডাকে
দগ্ধ চুল্লী কার।
মরিয়া মানুষ ফোঁসে
মরণ যন্ত্রণা
শোক ঘৃণা থেকে ক্রোধ
প্রাণের নিশানা।
প্রবালী ঝড়ের বেগ
ব্যর্থ কভু নয়
উদ্দীপ্ত প্রদত্ত প্রাণ
সুনিশ্চিত জয়।

বড়বাজারে জ্বর ॥

সাধনা মুখোপাধ্যায়

যেমন করে লোকে পুরীর সমুদ্রের হাওয়া
ফুসফুসে টেনে নেয়
কৃপণের মতো কলকাতায় গিয়ে খরচ করতে
সেই রকম আমি সুলভ কচুরীপানা
কলা বা নারকোল গাছ দেখলেই
চোখের চুম্বকে সব রঙ টেনে নিই
বড়বাজারে দুর্লভ সবুজ কোন
ঘুসঘুসে জ্বরে
বারো মাস ভুগে ভুগে মরতে।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন : কর্মে ও চিন্তায়

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আমাদের দেশ দরিদ্র বলে দানশীলতা জিনিসটাকে আমরা খুব বড় করে দেখি। কিন্তু সমাজ কাঠামো যদি অপরিবর্তিত থাকে, যদি শিক্ষিতে-অশিক্ষিতে, ধনী-দরিদ্রে জীয়ান থাকে দুরতিক্রম্য দূরত্ব, তাহলে ব্যক্তিগত বদান্যতায় আমরা কতটুকু হিত করতে পারি দেশের? সত্যিকার হিতসাধন যদি লক্ষ্য হয় আমাদের, তাহলে সেজন্যে চাই সমাজ সংগঠনের আমূল পরিবর্তন। এই সামূহিক পরিবর্তনই চেয়েছিলেন চিত্তরঞ্জন। একথা ঠিক যে তিনি জাতীয়তাবাদী ছিলেন এবং সংসদীয় গণতন্ত্রের ছাঁচকেই মনে করতেন প্রশাসনের অভিপ্রেত আদর্শ, কারণ সাম্য বা সমাজতন্ত্র তখন রাশিয়ার পরীক্ষার স্তরে থাকলেও তার দিকে সপ্রীতি দৃষ্টিতে তাকান নি তিনি। তা সত্ত্বেও সাম্যের মূল ভিত্তিটা স্বীকার করতেন তিনি এবং দুঃখব্রতী ও শ্রমকারী সাধারণ মানুষের অভ্যুত্থান চেয়েছিলেন একাগ্র নিষ্ঠায়।

ভাবী সমাজের গড়ন কেমন হবে, তা ব্যাখ্যা করে তিনি একটি বক্তৃতায় বলেন যে, তাঁর পরিকল্পিত ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ শূদ্র থাকবে না, থাকবে না ধনী দরিদ্র। রক্তকৌলীন্য ও ধনকৌলীন্য মানুষে-মানুষে যে ভেদের প্রাচীর রচনা করেছে, তা গুঁড়িয়ে ধুলোয় মিশিয়ে দিতে হবে। গড়ে তুলতে হবে এমন এক সুবিচার ও সমদর্শিতাপূর্ণ পটভূমি যেখানে কর্মই হবে মানুষের মূল্য নিরূপণের মাপকাঠি। সমাজকে যিনি শ্রম, সেবা ও চিন্তার ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ করবেন তিনি যে পদ বা পদবীরই মানুষ হন, তাঁকে কড়ায়-গণ্ডায় বুঝিয়ে দিতে হবে তাঁর ন্যায্য পাওনা। যে সমাজে কেউ সুবিধার আসনে বসে হুকুম করছেন, কেউ নীচে দাঁড়িয়ে হুকুম তামিল করছেন, কারো কুকুর দুধ খাচ্ছে, কারো শিশু দুধাভাবে মারা যাচ্ছে, সে সমাজকে ধ্বংস করতে হবে।

CENTRAL LIBRARY

বলা নিষ্প্রয়োজন যে, সাম্যবাদের যা গোড়ার কথা, তার সঙ্গে এ বক্তব্যের কোন বিরোধ নেই। কিন্তু লক্ষ্য শুভ ও সুন্দর হলেও তাতে পৌঁছানর পথটা কি হবে? বিপ্লবের রক্তরাঙা পথে সমস্ত প্রতিরোধের বাধা চূর্ণ করে, কায়েমী স্বার্থের প্রতিভূদের সমূলে উৎখাত করেই কি সেই ভাবী সমাজের বনিয়াদ তৈরী করতে হবে? চিত্তরঞ্জনের কাছে এতে সায় মেলে নি। সেখানে তিনিও গান্ধীজীর মতই হিতবাদের সমর্থক। তিনি বলেছেন, অন্যায় ও অশুভের পথ ধরে কল্যাণের লক্ষ্যে পৌঁছান যায় না। যারা দুর্নীতিপরায়ণ, ভ্রষ্টবুদ্ধি, বিকৃতদৃষ্টি, তাঁরাও দেশের মানুষই। তাঁদের অন্যায়কে দমিত করতে হবে, তার জন্যে তাঁদের অনাচরণের বিরুদ্ধে অভিযানও চালাতে হবে। কিন্তু তবু তাঁদের ব্যাপকভাবে নিপাত করা নীতিজ্ঞানসম্মত নয়। এমন সমাজের শাসন চাই, যাতে অন্যায়ের আঘাত সম্ভবই হবে না।

একথার মধ্যে উনিশ শতকী উদার মানবতাবাদের প্রভাব হয়ত উঁকি দিচ্ছে, কিন্তু তাই বলে চিত্তরঞ্জন বিপ্লববিরোধী ছিলেন এবং সশস্ত্র সংঘাতকে তিনি সর্বাবস্থায় বর্জনীয় ভাবতেন মনে করলে ভুল করা হবে। পুলিশ কমিশনার টেগার্টকে মারতে গিয়ে ভুল করে কোন সওদাগরী অফিসের ম্যানেজারকে হত্যা করায় যখন গোপীনাথ সাহার ফাঁসি হয়, গোপীনাথের দেশপ্রেমকে প্রশংসা করে তাঁর উদ্দেশে শোক-প্রস্তাব গ্রহণের দাবী কংগ্রেসে তুলেছিলেন তিনিই। স্পষ্ট পরিচ্ছন্ন ভাষায় তিনি বলেছেন তাঁর একটি বক্তৃতায় যে সূক্ষ্ম বিচারের তুলাদণ্ডে হিংসা-অহিংসার মূল্য যাচাই করে বৃথা সময় নষ্ট করা মূঢ়তা। দেশকে বন্ধনমুক্ত করার কাজে কোন পথই নগণ্য নয়। রাণাপ্রতাপ, গুরুগোবিন্দ সিং ও ছত্রপতি শিবাজী অহিংসাবাদী ছিলেন না বলে কি তাঁদের অদেশপ্রেমিক বলব?

অনেকে ভাবেন কবিকর্মে ও স্বভাবধর্মে চিত্তরঞ্জন গৌড়ীয় বৈষ্ণবাদর্শের অনুগামী ছিলেন বলে, রাজনৈতিক কর্মপন্থাতেও তিনি স্থিতাবস্থারই সমর্থক ছিলেন এবং চলতি সমাজের ঠাট বজায় রেখে শুধু সম্প্রীতির আবেদনে তিনি জনমনস্তত্ত্বে মৌলিক পরিবর্তন ঘটাতে চাইতেন। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, এ তাঁর সম্বন্ধে ভুল বিচার ত বটেই, অবিচারও। প্রথমত ব্যক্তির অভিরুচি ও লাভালাভের প্রশ্নকে তিনি জাতীয় স্বার্থ ও সম্ভ্রমের পাশে নিতান্ত তুচ্ছ মনে করতেন। দ্বিতীয়ত দেশের স্বাধীনতাকে তিনি এত বড় করে দেখতেন যে, তার পথে বাধা সৃষ্টি করবে বুঝলে তিনি ধর্ম ও সাহিত্যশিল্পের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতেও কুণ্ঠিত হতেন না। প্রথম জীবনের গৃহীত প্রত্যয় আর পরবর্তী জীবনের রূপান্তরিত দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে তাঁর যে বিরাট একটা পার্থক্য ঘটে গিয়েছিল, এ অনেকে তলিয়ে দেখেন নি।

কিন্তু নিজের মানসিক বিবর্তনের এই রূপটি তিনি মোটেই অস্বচ্ছ রেখে যান নি। তিনি বলেছেন, আমি কি চাই, আপনি কি বিশ্বাস করেন, সেটা বড় কথা নয়। সমস্ত দেশের সমষ্টিগত ভাবে সমগ্র জাতির প্রয়োজনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থ, সুবিধা, বিশ্বাস ও অভিরুচিগুলো বলি দিতেই হবে। ব্যক্তিগত লাভ লোকসানের নিরিখে খাড়া করে জাতীয় অগ্রযাত্রার পথ রোধ করা চলবে না। ইতিহাসই দেবে না তা করতে। ... ... সাহিত্য জীবনের প্রকাশ সন্দেহ নেই। ধর্ম মানুষের চরম আশ্রয়ও হয়ত। কিন্তু প্রয়োজন হলে সাহিত্য ও ধর্মকে বর্জন করব, কিন্তু মানুষের মুক্তি ও কল্যাণের দাবীকে কোন অবস্থাতেই ছাড়তে পারব না। সাহিত্য ও ধর্মের জন্যে মানুষ নয়, মানুষের জন্যেই সাহিত্য ও ধর্ম। কত সাহিত্য লুপ্ত হয়ে গেছে, কত ধর্ম মুছে গেছে। কিন্তু মানুষের প্রবাহ অব্যাহতই আছে, থাকবেও চিরদিন। এই খণ্ড-খণ্ড বক্তব্যের মধ্যে মানুষ চিত্তরঞ্জনের যে অখণ্ড ছাঁচ স্বরূপটি ফুটে ওঠে, আমাদের সেদিনকার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আবেষ্টনীতে কোথাও তার জুড়ি পাওয়া যাবে না। অন্তর্লোকে এই রকম সক্রিয় বিপ্লবী ছিলেন বলেই তিনি গান্ধী নেতৃত্বের সার্বিক অভ্যুদয়ের দিনেও তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করে স্বরাজ্য দল গড়তে পেরেছিলেন। স্বয়ং গান্ধীজী তাঁর এই অসম সাহসিক ভিতরের রূপটি চিনেছিলেন, তাই তাঁর নমনীয় অনুগামীদের চেয়ে এই বিদ্রোহী অনুজকেই বেশী সম্মানের অধিকারী করেছিলেন তিনি। চিত্তরঞ্জনের মহাপ্রয়াণের অল্প পরের একটি আলোচনায় তিনি লিখেছিলেন, ন্যায় ও সত্যের তিনি দৃঢ়ব্রত সৈনিক ছিলেন। কোন প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব বা নেতৃত্বের খাতিরেই যুক্তি ও বিবেকের বিরুদ্ধ পথে পা বাড়াতেন না তিনি। তাঁর এই সংগ্রামশীল সৌহার্দ্যই তাঁকে আমার এতটা প্রিয় করেছিল।

আজ চিত্তরঞ্জন জন্মশতবর্ষের সূচনায় তাঁর ভেতরের সেই বিদ্রোহী সত্তাটিকে জনগণের সামনে উন্মুক্ত করে দেওয়া দরকার। কারণ তা হলে এই অমিত শক্তিমান মানুষটিকে কোন দিনই আমরা চিনব না। সুরেন্দ্রনাথ ও গোখলেদের আপোষপন্থী নেতৃত্ব নাকচ করে গান্ধীজীর আবির্ভাব নিশ্চয়ই একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। কিন্তু গান্ধীজীর অহিংসাপন্থী নেতৃত্বের ওপর চিত্তরঞ্জনের সংগ্রামশীল নেতৃত্বও কম গণনীয় ঘটনা নয়। কিন্তু দুঃখের কথা যে, চিত্তরঞ্জনের অকাল প্রয়াণ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, আমাদের রাজনৈতিক চিন্তাধারায় দ্রুত পরিবর্তন, ইংরেজ শাসনের অবসান ও দেশের স্বাধীনতা লাভ...একের পর এক দ্রুতলয়ে ঘটেছে এবং তার অনিবার্য ফল হিসাবেই চিত্তরঞ্জনের চিন্তা ও কর্মের মূল্যায়নে এসেছে খানিকটা অনবধানজনিত অবিচার, যার জন্যে তিনি অনিচ্ছাভাবেই গিয়ে পড়েছেন সনাতনী শিবিরে, যা তিনি নন।

নিজের রাজনৈতিক লক্ষ্যবস্তু ব্যাখ্যা করে তিনি বলেছেন, ইংরেজ যদি স্বেচ্ছায় ভারত ছেড়ে না যায়, দরকার হলে আমরা বিদ্রোহের পথে দেশ স্বাধীন করব। আর স্বাধীন দেশকে অনুন্নত মুক্ত করব বিপ্লব ঘটিয়ে। অন্যায় শাসনের মতই অন্যায় শোষণও দেশের পরম শত্রু। নিছক স্বাধীনতা লাভের ফলেই সে শত্রু নিপাত হবে না। স্বাধীনতা লাভের দুই দশকেরও বেশী আগে জীবনান্ত হয়েছে চিত্তরঞ্জনের। তখন তিনি যে কথা বলে গেছেন, স্বাধীনতা লাভের দুই দশকের পরেও আজ আমরা বুঝছি তা কত সত্যি কথা। শুধু স্বাধীনতাই যে সব নয়, তাকে জনজীবনের সহায়ক করাই যে আসল কাজ এবং তা যে সমাজ বিপ্লবের দ্বারা ভিন্ন সম্ভব নয়, এ আমরা বুঝেছি কি আজ পর্যন্ত? এখনো কি ধারণা হয়েছে আমাদের যে, বিদ্রোহ আর বিপ্লব এক নয়? প্রথমটা দ্বিতীয়টার ভূমিকামাত্র এবং সেখানে থেমে দাঁড়ালে প্রতিবিপ্লব এসেই সমস্ত গঠনকে গ্রাস করে?

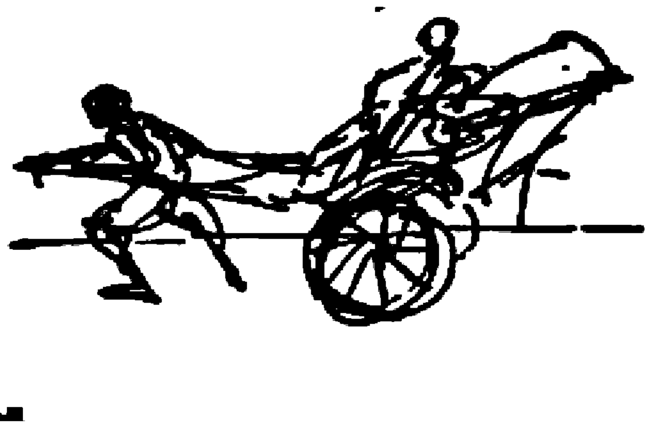

দেশবন্ধুর কণ্ঠস্বর

এক ।।

আমাদের দেশে আজকাল অল্পসংখ্যক অতিরিক্ত লোকের মত ছাড়িয়া দিলে প্রায় সকলেই মনে করেন যে, এই যে নূতন জীবন সঞ্চার—যাহাকে আমাদের সংবাদপত্র সকল স্বদেশী আন্দোলন নামে অভিহিত করিয়াছেন—ইহাই অচিরে আমাদের এই অধঃপতিত দেশের মুক্তির একমাত্র কারণ হইয়া উঠিবে। অনেকেই বিশ্বাস করেন যে, আমাদের সমস্ত দেশব্যাপী দারিদ্র্য বিনাশ করিতে হইলে এই স্বদেশী আন্দোলনই একমাত্র উপায় এবং সেই কারণেই এই আন্দোলন অবশ্য বাঞ্ছনীয়। এই কথা আজকাল আমাদের দেশের অনেক কথার মত একেবারে মিথ্যা না হইলেও সম্পূর্ণভাবে সত্য নহে। জাতীয় দারিদ্র্য সমস্ত জাতীয় দারিদ্র্য সমস্ত জাতীয় অধঃপতনের অংশমাত্র, সমস্ত জাতীয় অধঃপতনের সঙ্গে ইহার একটা অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ আছে,-এবং একথা অতি সত্য যে, সমস্ত জাতির উন্নতি না হইলে এ দারিদ্র্য কিছুতেই ঘুচিবে না; কিন্তু এই যে নবজীবন সঞ্চারিণী আশা—যাহা আমাদের সমস্ত দেশটাকে সচকিত করিয়া তুলিয়াছে, ইহা কি একমাত্র দারিদ্র্য-বিনাশের কারণ? ইহার মধ্যে কি গভীরতর সত্য নিহিত নাই? ইহা কি আমাদের চক্ষে আঙুল দিয়া মুক্তির পথ দেখাইয়া দিতেছে না? ইহা কি সমস্ত বাঙালী জাতির শ্রবণ-বিবরে এক আশ্চর্য অপূর্ব স্বাধীনতা-সঙ্গীত ঢালিয়া দিতেছে না?

'আমার কাছে এই নব আন্দোলন যে যে কারণে সর্বাপেক্ষা বাঞ্ছনীয়, তাহার মধ্যে সর্বপ্রধান কারণ এই যে, ইহা স্পষ্ট ও মুলত বাঙালী জাতির আত্মনির্ভর পথে প্রথম পদক্ষেপ। এই কারণেই আমার ধ্রুব ধারণা যে, এই আন্দোলনের সফলতার উপরেই আমাদের জাতীয় উন্নতির আশা নির্ভর করিতেছে। জগতের ইতিহাসে বারে বারে সপ্রমাণ করিয়া দিয়াছে যে, এক জাতিকে অন্য কোন জাতি হাতে ধরিয়া স্বাধীনতা তুলিয়া দিতে পারে না। প্রত্যেক জাতির মুক্তিও সেই জাতিকেই সাধন করিয়া লইতে হয়। সহস্র বৎসর ধরিয়া অন্য জাতির মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিলেও প্রকৃত মুক্তির পথ কখনো মিলিবে না।

আমরা এতদিন ধরিয়া ইংরাজের মুখাপেক্ষী হইয়াছিলাম। মনে করিয়াছিলাম, ইংরাজ আমাদের অনেক দৈন্য ঘুচাইবে, ইংরাজ আমাদিগের হাতে ধরিয়া মানুষ করিয়া তুলিবে। এখন সেকথা ভাবিতেও স্বপ্নের মত মনে হয়, কিন্তু ইহা অবশ্য সত্য যে একদিন আমরা ইংরাজের বাক-চাতুরীতে মুগ্ধ হইয়া শুধুমাত্র তাহার মুখের কথার উপর আমাদের মনে আশা-ভরসার ভিত্তিস্থাপন করিয়াছিলাম। এমনি করিয়া ক্রমে ক্রমে আমরা ইংরাজের কৃপা দেখিয়া আত্মপ্রভাব হারাইয়াছিলাম, ইংরাজের ছলাকলায় প্রতিনিয়ত প্রতারিত হইয়াছিলাম, ইংরাজের কথার উপর সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিয়াছিলাম। মহারাণীর যে ঘোষণা (Proclamation) লইয়া আমরা এত গর্ব করি, তার মধ্যে যে আমাদের সকল আশা-ভরসাকে উপেক্ষা করিবার জন্য 'So far as it may be —' এই মারাত্মক বাক্যটি লুক্কায়িত ছিল, তাহা একবারও অনুভব করিতে পারি নাই। কার্জন বাহাদুরকে ধন্যবাদ, তিনি আমাদের চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া তাহা দেখাইয়া দিয়াছেন। আমরাও এখন ভাল করিয়া মহারাণীর ঘোষণার এই গূঢ় তত্ত্ব মর্মে মর্মে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি। ভগবান আমাদের সহায় হউন, এই সত্যজ্ঞান যেন চিরদিন আমাদের জাতীয় জীবনকে সচেষ্ট ও সচকিত করিয়া রাখে।

এক শ্রেণীর লোকের ধারণা এই যে, Pax Britanica-র প্রসাদে ভারতে এখন মহাশান্তি বিরাজ করিতেছে। হায়রে ব্রিটিশ রাজ্যের শান্তি, হায় আমরা অভাগা আমরা এতদিন বুঝিতে পারি নাই যে, এই দেশব্যাপী নিষ্ক্রিয় শান্তি আমাদের জীবনকে আড়ষ্ট করিয়া রাখিবার উপায় মাত্র। ইহা যদি শান্তি হয়, আমি বলিব ইহা মৃত্যুর শান্তি। ইহার উপরে কোনদিন কোন কালে জীবনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না।

'উৎসাহের প্রভাবে আমাদের জাতীয় জীবন হইতে মরণ-ভয়রূপী এই কুজ্ঝটিকা অপসৃত হইয়াছে। এই নব-উন্মোচিত জাতীয়তার প্রভাতালোকে আমাদের জাতীয় জীবনের সত্য অবস্থা আমাদের চক্ষের সম্মুখে সুন্দর পরিষ্কাররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই নব-আন্দোলন আমাদের কাছে সর্বাপেক্ষা বাঞ্ছনীয়; ইহাই আমাদের আত্মনির্ভরের প্রথম পদক্ষেপ। আজিকার দিনে এই দেশব্যাপী আন্দোলনে লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে উচ্চারিত বন্দে মাতরম্ মন্ত্রেও যে তাহার আহ্বান শুনিতে পায় নাই, সে নিতান্ত হতভাগ্য।

[১৯০৬ খৃঃ অক্টোবরে কাঁকুড়গাছি হিন্দু হলে বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বক্তৃতার অংশ]

দুই ।।

...সমগ্র জীবনটাকে টুকরা টুকরা করিয়া ভাগ করিয়া লওয়া আমাদের শিক্ষা-দীক্ষা ও সাধনার স্বভাববিরুদ্ধ। আমরা ইউরোপ হইতে ধার করিয়া এই প্রথা অবলম্বন করিয়াছি এবং ধারকরা জিনিস ভাল করিয়া বুঝি নাই বলিয়া আমাদের অনেক পরিশ্রম, অনেক চেষ্টাকে সার্থক করিতে পারি নাই। যে জিনিসটাকে রাজনীতি বা Politics বলিতে অভ্যস্ত হইয়াছি, তাহার সঙ্গে কি সমস্ত বাংলা দেশের সমগ্র বাঙালী জাতির একটা সর্বাঙ্গীণ সম্বন্ধ নাই? কেহ কি আমাকে বলিয়া দিতে পারে আমাদের জাতীয় জীবনের কোন্ অংশটা রাজনীতির বিষয়, কোন্ অংশটা অর্থনীতির ভিত্তি, কোন্ অংশটা সমাজনীতির প্রাণ, আর কোন্ অংশটা ধর্মসাধনের বস্তু? জীবনটাকে মনে মনে খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া, এই সব মন-গড়া জীবনখণ্ডের মধ্যে কি আমরা অলঙ্ঘ্য প্রাচীর তুলিয়া দিব? এই কাল্পনিক প্রাচীর-বেষ্টিত যে কাল্পনিক জীবনখণ্ড উহারই মধ্যে কি আমাদের রাজনৈতিক আলোচনা বা আন্দোলনের যে বিষয়, তাহাকে 'ব- বাঙ্গালী জাতির যে জীবন, সেই জীবনের

সব দিক দিয়া কি দেখিতে চেষ্টা করিব না? যদি না দেখি, তবে কি সত্যের সন্ধান পাইব?...বাংলার রাজনৈতিক আন্দোলনের অর্থ এই যে, আমাদের দেশে রাজা-প্রজার যে সম্বন্ধ, তাহা পরীক্ষা করা ও কিরূপ হওয়া উচিত, তাহাই বিচার করা।

কিন্তু ঐ যে রাষ্ট্রীয় চিন্তা বা চেষ্টা, ইহার সার্থকতা কোথায়? এক কথায় বলিতে হইলে, বাঙালীকে মানুষ করিয়া তোলা। বাঙালী যে অমানুষ, তাহা আমি কিছুতেই স্বীকার করি না। আমি যে আপনাকে বাঙালী বলিতে একটু অনির্বচনীয় গর্ব অনুভব করি, বাঙালীর যে একটা নিজের সাধনা আছে, শাস্ত্র আছে, কর্ম আছে, ধর্ম আছে, বীরত্ব আছে, ইতিহাস আছে, ভবিষ্যৎ আছে। বাঙালীকে যে অমানুষ বলে সে আমার বাংলাকে জানে না।

আমাদের যে রাজনৈতিক আন্দোলন, ইহা একটা প্রাণহীন, বস্তুহীন, অলীক ব্যাপার। ইহাকে সত্য করিয়া গড়িতে হইলে বাংলার সব দিক দিয়াই দেখিতে হবে। বাংলার যে প্রাণ, তাহারই উপর ইহার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। তাই আজ এই মহা-সভার কর্মাটি বাংলার কথা বলিতে আসিয়াছি। বাঙালী হিন্দু হউক মুসলমান হউক, খৃস্টান হউক, বাঙালী বাঙালী। বাঙালীর একটা বিশিষ্ট রূপ আছে, একটা বিশিষ্ট প্রকৃতি আছে। একটা স্বতন্ত্র ধর্ম আছে। এই জগতের মাঝে বাঙালীর একটা স্থান আছে, অধিকার আছে, সাধনা আছে, কর্তব্য আছে। বাঙালীকে প্রকৃত বাঙালী হইতে হইবে।

তিন ।।

...আমাদের অনেক বাধা, অনেক বিঘ্ন। কিন্তু আমাদের সবচেয়ে বেশি বিপদ যে, আমরা ক্রমশই আমাদের শিক্ষাদীক্ষা, আচার-ব্যবহার অনেকটা ইংরাজভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছি। রাজনীতি বা Politics শব্দটি শুনিবামাত্র আমাদের দৃষ্টি আমাদের দেশ একেবারে অতিক্রম করিয়া ইংলণ্ডে গিয়া পৌঁছায়। ইংরাজের ইতিহাসে এই রাজনীতি যে আকার ধারণ করিয়াছে, আমরা সেই মূর্তিরই অর্চনা করিয়া থাকি। বিলাতের জিনিসটা আমরা যেন একেবারে তুলিয়া আনিয়া এই দেশে লাগাইয়া দিতে পারিলে বাঁচি। এই দেশের মাটিতে তাহা বাঁচিবে কিনা, তাহা ত একবারও ভাবি না, ...ইউরোপে রাজনীতির যত স্কুল আছে, সব স্কুলের কেতাবে ও কোরানে যত ধারাল বাক্য আছে, একেবারে এক নিশ্বাসে মুখস্থ করিয়া ফেলি, আর মনে করি এই-বার আমরা বক্তৃতা ও তর্কে অজেয় হইলাম, দেখি আমাদের শাসনকর্তারা কেমন করিয়া আমাদের তর্ক খণ্ডন করেন। মনে করি, রাজনৈতিক আন্দোলন শুধু তর্ক-বিতর্কের [illegible]তার ব্যাপারমাত্র। আমরা বক্তৃতা করিয়া, তর্ক করিয়া জিতিয়া যাইব। আমাদের সকল উদ্যম ও সকল চেষ্টার উপরে আমাদের ধার-করা কথার ছাপ লাগাইয়া দিই। যাহা স্বভাবত সহজ সরল তাহাকে মিছামিছি বিনাকারণে জটিল করিয়া তুলি। শুধু যাহা আবশ্যক তাহা করি না; দেশের প্রতি মুখ তুলিয়া চাই না; বাংলার কথা, বাঙালীর কথা ভাবি না, আমাদের জাতীয় জীবনের ইতিহাসকে সর্বতোভাবে তুচ্ছ করি। কাজেই আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলন অসার, বস্তুহীন। তাই এই অবাস্তব আন্দোলনের সঙ্গে আমাদের দেশের প্রাণের যোগ নাই; এই কথা হয়ত অনেকে স্বীকার করিবেন না।

...বাংলার কথা যেন অচিরে বাঙালীর কার্যে পরিণত হয়। সমবেত চেষ্টা চাই, সকলের উদ্যম চাই, বাঙালীর স্বার্থত্যাগ চাই। এই যে জীবনযজ্ঞ ইহা শুদ্ধচিত্তে পবিত্র প্রাণে আরম্ভ করিতে হইবে। সকল বিদ্বেষ, সকল স্বার্থ ইহাতে আহুতি দিতে হইবে। ইহাতে বর্ণধর্মনির্বিশেষে সকলকে আহ্বান করিতে হইবে। কর্মক্ষেত্রে অনেক বাধা, অনেক বিঘ্ন। অসহিষ্ণু হইলে চলিবে না। যে অধিকার আজ আমরা দাবী করিতেছি, তাহা যুক্তিসঙ্গত, ন্যায়সঙ্গত, আমাদের স্বভাবধর্মসঙ্গত। এই অধিকার হইতে কেহ আমাদিগকে বঞ্চিত করিতে পারিবে না।'

[ভবানীপুর বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে সভাপতির ভাষণ ১৯১৭ খৃঃ এপ্রিল।

চার ।।

দেশই আমাদের ধর্ম, আমার চির-জীবনের আদর্শ—ঐ দেশ। দেশ বলিতে আমি আমার সম্মুখে আমার ভগবানকে দেখিতে পাই।...আপনারা দেশ ও রাজনীতি পৃথক করিবেন না। আপনাদের শিক্ষাদীক্ষা ও রাজনৈতিক আন্দোলনের সহিত যথেষ্ট সম্বন্ধ আছে। উহা আপনাদের ধর্মের অভিব্যক্তি। এদেশের মধ্যে এমন লোক আছেন, যাঁহারা মনে করেন, মানবজীবন পৃথক পৃথক বিভাগে বিভক্ত। তাঁহাদের মতে রাজনীতি স্বতন্ত্র পদার্থ। তাঁহারা ভুলিয়া যাইতেছেন যে, মানুষের আত্মা সর্বত্র সমান। প্রত্যেক ব্যক্তির আত্মা যেমন এক জাতির প্রাণও তেমনি এক।

[ময়মনসিংহ বক্তৃতা ১৯১৭ খৃঃ ১০ অক্টোবর]

পাঁচ ।।

স্বায়ত্তশাসন সম্বন্ধে গভর্ণমেন্ট আমাদিগকে অধিকার দিবেন, কতটুকু অধিকার চাহিলে তাহা গভর্ণমেন্ট শুনিবেন তাহা ভাবিবার আবশ্যকতা নাই। দেশের মঙ্গলের জন্য যতটুকু আবশ্যক তাহাই চাহিতে হইবে—ভীত হইবেন না, দেশের জন্য যাহা প্রয়োজন তাহা নির্ভয়ে দাবী করিতে হইবে। ইংরাজ রাজপুরুষগণ যে ভিন্ন ধর্ম, ভিন্ন জাতি ও ভিন্ন স্বার্থ, অধিকাংশের সংখ্যাধিক্যকে স্বায়ত্তশাসনের পরিপন্থী বলে নির্দেশ করেন, আমি বলি সেইজন্যই স্বায়ত্তশাসন চাই। এই জাতিগত, ধর্মগত, বর্ণগত বৈষম্য দূর করিতে ও দেশে শিক্ষাবিস্তারের জন্যই আমরা স্বায়ত্তশাসন চাই—এই সমস্ত অনৈক্য দূর করিতে স্বায়ত্তশাসনই একমাত্র পন্থা।

[ঢাকা বক্তৃতা ১৯১৭ খৃঃ অক্টোবর]

আমি আগেও বলেছি আবার এখনো বলছি যে, আমি রাজনৈতিক গুপ্তহত্যা যে কোন প্রকারের হিংসাত্মক কাজের বিরোধী। আমি মনে করি ইহা আমাদের ধর্মীয় শিক্ষারও বিরোধী। আমি সুনিশ্চিতভাবেই অনুভব করি যে, যদি হিংসাত্মক কার্য আমাদের রাজনৈতিক জীবনের গভীরে প্রবেশ করে, তাহলে স্বরাজের পথ চিরদিনের মতো রুদ্ধ হয়ে যাবে। কাজেই এখন আমরা দেশে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে আমি এর অবসান কামনা করি।

আমি আগেও বলেছি, আবার এখনো বলছি যে, আমি সকলরকম সরকারী অত্যাচারের বিরুদ্ধে এবং হিংসাত্মক কার্যের মতো আমি এই জাতীয় অত্যাচারকে ঘৃণা করি। অত্যাচার দ্বারা রাজনৈতিক গুপ্ত-হত্যা কখনো বন্ধ হয় না। এবং অত্যাচারের ফলে ইহার পরিমাণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়া বিচিত্র নয়, অস্বাভাবিক নয়। আমরা স্বরাজ-লাভের জন্য দৃঢ়সংকল্প এবং সাম্রাজ্যের মধ্যে সম্মানজনক অংশীদারিত্ব ও সমতার ভিত্তিতেই আমরা ভারতের স্বাধীনতা চাই। হয়ত এই সংগ্রাম সুদীর্ঘ হবে, কিন্তু আমরা শেষ পর্যন্ত সংগ্রাম করার জন্য দৃঢ়সংকল্প।

বাংলার তরুণদের আমি বলি—স্বরাজ-লাভের জন্য তোমরা সংগ্রাম কর, কিন্তু পরিষ্কারভাবে সংগ্রাম কর। তোমাদের অতীতের উপরে যেন কলঙ্ক আরোপিত না হয়। কঠিন ও অবিশ্রান্ত সংগ্রামের পথে আমি তোমাদের আহ্বান করছি। স্বরাজলাভ করতে সমস্ত বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে এগিয়ে চলো।

[১৯২৫ খৃঃ ২১ মার্চ]

ছয় ।।

মুক্তির আদর্শ লইয়া আলোচনা প্রসঙ্গে আমার মনে হয়, স্বরাজের আদর্শ অপেক্ষা স্বাধীনতার আদর্শ অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ। ইহা সত্য যে স্বাধীনতার অর্থ অধীনতার অভাব। সুতরাং এই আদর্শ মূলতঃ অভাবাত্মক কিন্তু অধীনতার অভাব হইলেই ভাবাত্মক (positive) কিছু স্বতঃই আমরা নাও পাইতে পারি। আমি অবশ্য ইহা বলি না যে, স্বাধীনতা ও স্বরাজ পরস্পর বিরোধী অথবা ইহার একের সঙ্গে অপরের সামঞ্জস্য-বিধান হইতে পারে না। এমন কথা আমি বলি না। কিন্তু আমাদের প্রয়োজন শুধু অধীনতার অভাব নয়—

ভাবাত্মক বা বস্তুগত এক অখণ্ড স্বরাজের প্রতিষ্ঠা। কল্য প্রভাতেই ভারতবর্ষ স্বাধীন হইতে পারে, যদি যে-কোন উপায়েই হউক ইংরাজরাজ এদেশ হইতে চলিয়া যায়। কিন্তু তাহাতেই আমি স্বরাজ অর্থে যাহা বুঝি, তাহার প্রতিষ্ঠা হয় না। স্বরাজলাভ একটা বিশেষ রকমের ভাবাত্মক বস্তুর উদ্ভব বা প্রতিষ্ঠা। সেই বস্তুটি কি? কি উপায়ে ইহার প্রতিষ্ঠা? ইহাই প্রশ্ন এবং সভাই ইহা সুস্পষ্ট উত্তরের দাবী আমাদের নিকট করিতে পারে। স্বরাজের স্বাধীনতার আদর্শ হইতে স্বরাজের আদর্শে পার্থক্য কি? স্বরাজের আদর্শে কি আছে যাহা স্বাধীনতার আদর্শে নাই? আমি বলি, আমাদের জাতির সর্বাঙ্গীন স্বাধীনতার যে আদর্শ, তাহাই স্বরাজ।

কেবল স্বাধীনতায়ই স্বরাজলাভ হইবে না। স্বরাজের আদর্শ আরও মহত্তর। ইংরাজ চলিয়া গেলে অধীনতাপাশ হইতে মুক্ত হইতেও বা পারি, তথাপি কেবল তাহাতেই স্বরাজ অর্থে আমি যাহা বুঝি তাহার প্রতিষ্ঠা হয় না। পক্ষান্তরে ইংরাজ থাকিলেও যদি জাতির সর্বাঙ্গীন বিকাশ লাভে কোন বাধা না জন্মে, তবে ইংরাজ থাকুক, তাহাতে আপত্তি কি? স্বরাজ আর স্বায়ত্তশাসন এক নয়। আমার স্বরাজের আদর্শের সহিত শাসন প্রণালী—তাহা ঘরেরই হউক অথবা পরেরই হউক—কোন রূপেই সংশ্লিষ্ট নয়। তবে যে স্বায়ত্তশাসন আত্মকল্যাণের জন্য বিধিবিধান, তাহা কতকটা স্বরাজের আদর্শের নিকটবর্তী। জাতীর সর্বাঙ্গীন বিকাশলাভের অবাধ প্রকাশই খাঁটি স্বরাজ সাধনা।

[ফরিদপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনের অধিবেশন সভাপতির ভাষণাংশ ১৯২৫ খৃঃ ২ মে]

দেশবন্ধুর জীবনপঞ্জী

১৮৭০ খৃঃ ৫ নভেম্বর—জন্ম।
১৮৮৬ খৃঃ—এণ্ট্রান্স পাশ।
১৮৯০ খৃঃ—বি, এ, পরীক্ষায় পাশ ও সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্য লণ্ডন গমন।
১৮৯১-৯২ খৃঃ—সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা অসমাপ্ত রাখেন।
১৮৯৩ খৃঃ—ডিসেম্বর—ব্যারিস্টার হয়ে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন এবং কলকাতা হাইকোর্টে যোগদান।
১৮৯৫ খৃঃ—প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'মালঞ্চ' প্রকাশ।
১৮৯৬ খৃঃ—পিতৃঋণের জন্য আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত।
১৮৯৭ খৃঃ—৩ ডিসেম্বর বাসন্তী দেবীর সঙ্গে বিবাহ।
১৮৯৯ খৃঃ—পুত্র চিত্তরঞ্জনের জন্ম।
১৯০৫ খৃঃ—স্বদেশীমণ্ডল স্থাপন ও স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান।
১৯০৬ খৃঃ—ইন্‌সলভেন্স কোর্টের আশ্রয় গ্রহণ।
১৯০৬ খৃঃ—বরিশাল প্রাদেশিক সম্মেলনের প্রধান প্রস্তাব রচনা।
১৯০৭ খৃঃ—ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় এবং বিপিনচন্দ্র পালের মামলায় তাঁদের পক্ষ সমর্থন। এঁরা রাজদ্রোহে অভিযুক্ত হন।
১৯০৭-৮ খৃঃ—রাজনৈতিক কারণে অভিযুক্ত বিপ্লবীদের পক্ষ গ্রহণ।
১৯০৯ খৃঃ—আলিপুর বোমার মামলায় অরবিন্দের পক্ষ অবলম্বন। ডুমরাঁও মামলা গ্রহণ।
১৯১০ খৃঃ—ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলায় অনুশীলন সমিতির নেতা পুলিন দাসের পক্ষ অবলম্বন।
১৯১১ খৃঃ—দ্বিতীয়বার ইংল্যাণ্ড গমন ও 'সাগর-সঙ্গীত' রচনা।
—সেন্সাস কোর্টে ভাষণ।
১৯১৩ খৃঃ—দেউলিয়া থেকে নিষ্কৃতিলাভ। মাতা নিস্তারিণী দেবীর মৃত্যু।
১৯১৪ খৃঃ—দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলায় অসামীপক্ষের পক্ষ অবলম্বন।
—'নারায়ণ' প্রকাশিত।
১৯১৭ খৃঃ—ভারতসচিব মন্টেগুর সঙ্গে সাক্ষাৎকার।
—ভবানীপুরে প্রাদেশিক সম্মিলনের সভাপতি।
—বাঁকিপুরে বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনে সাহিত্য শাখার সভাপতি।
১৯১৮ খৃঃ—বোম্বাইএ কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে যোগদান।
—দিল্লী কংগ্রেসে রাউলাট কমিটির প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বক্তৃতা।
১৯১৯ খৃঃ—ময়দানের জনসভায় সত্যাগ্রহের শপথ গ্রহণ।
—ময়মনসিংহ প্রাদেশিক সম্মিলনীতে যোগদান।
—কংগ্রেস-পরিচালিত জালিয়ানওয়ালাবাগ তদন্তকার্যে যোগদান।
—অমৃতসর কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে যোগদান এবং নতুন শাসন-সংস্কারের বিরুদ্ধে বক্তৃতা ও প্রস্তাব উত্থাপন।
১৯২০ খৃঃ—কলকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে গান্ধীর অসহযোগনীতির বিরোধিতা।
—নাগপুরে কংগ্রেসের পূর্ণ অধিবেশনে যোগদান ও অসহযোগনীতির সমর্থন।
—২০ ফেব্রুয়ারি পাঞ্জাব এনকোয়ারি কমিটিতে সাক্ষ্যদান।
—১০ ডিসেম্বর ঢাকায় জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা।
—১৮ জানুয়ারি ওরিয়েণ্টাল জীবনবীমা কোম্পানির সেক্রেটারী শ্রীকিশোরবিহারী গুপ্ত 'দেশবন্ধু' আখ্যা দিয়ে অমৃতবাজার পত্রিকায় একটি চিঠি লেখেন। সেই থেকে দেশবন্ধু নামে পরিচিত।
১৯২১ খৃঃ—আইনব্যবসায় ত্যাগ।
—বাংলায় অসহযোগ আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ।
—দেশবন্ধুর অধীনে কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্রের যোগদান।
—সংশোধিত ফৌজদারী আইনে গ্রেপ্তারবরণ।
—আমেদাবাদ কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত।
১৯২২ খৃঃ—ছয় মাসের জন্য বিনাশ্রমে কারাদণ্ড।
—গয়া কংগ্রেসের সভাপতি।
১৯২৩ খৃঃ—মতিলাল নেহরুর সহযোগিতায় 'স্বরাজদল' গঠন।
—নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বোম্বাই অধিবেশনের সভাপতি।
—ইংরেজি দৈনিক 'ফরওয়ার্ড' প্রকাশ।
১৯২৪ খৃঃ—কলকাতা পৌরসভার প্রথম মেয়র নির্বাচিত।
—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপরিষদে স্বরাজ্য দলের প্রথম দলপতি।
—তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ পরিচালনা।
—সিরাজগঞ্জ প্রাদেশিক সম্মিলনীতে যোগদান।
—কলকাতায় নিখিল ভারত স্বরাজ্য দলের সম্মিলন।
—শেষবারের মত কংগ্রেসের বেলগাঁও অধিবেশনে যোগদান।
১৯২৫ খৃঃ মে—ফরিদপুরে প্রাদেশিক সম্মিলনীর সভাপতি।
১৯২৫ খৃঃ ১৬ জুন—দার্জিলিং-এ মৃত্যু।

[হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের 'দেশবন্ধুর স্মৃতি' এবং দীপ বাগচীর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন গ্রন্থ থেকে]

দেশবাসীর অভিনন্দন

শ্রদ্ধাস্পদ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের
শ্রীকরকমলে—

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন!

হে বন্ধু, তোমার স্বদেশবাসী আমরা তোমাকে অভিবাদন করি। মুক্তিপথযাত্রী যত নরনারী যে যেখানে যত লাঞ্ছনা, যত দুঃখ, যত নির্যাতন সহ্য করিয়াছে, হে প্রিয়, তোমার মধ্যে অজ আমরা তাহাদের সমস্ত মহিমা প্রত্যক্ষ করিয়া সগৌরব সবিস্ময়ে নমস্কার করি। সুজলা সুফলা শ্যামলা মা আমাদের অবমানিতা শৃঙ্খলিতা। মাতার শৃঙ্খলতার যত সন্তান তাহার স্বেচ্ছায় স্কন্ধে তুলিয়া লইয়াছে, তুমি তাহাদের অগ্রজ; হে বরেণ্য, তোমার সেই সকল খ্যাত ও অখ্যাত ভ্রাতা ও ভগিনিগণের উদ্দেশে স্বতঃউচ্ছ্বসিত সমস্ত দেশের প্রীতি ও শ্রদ্ধার অঞ্জলি গ্রহণ কর।

একদিন দেশের লোক তোমাকে কবিতে ও গীতিকের আসরে বলিয়া জানিয়াছিল, সেদিন সে ভুল করে নাই। কিন্তু সে কথা তুমি নিজে চিরদিন গোপন করিয়াছ—দাতা ও গ্রহীতার সেই নিভৃত করুণ সম্বন্ধ—আজো সে তেমনই গোপন শুধু তোমাদের জনাই থাক। কিন্তু, আর একদিন এই বাংলাদেশ তোমাকে ভাবুক বলিয়া, কবি বলিয়া, বরণ করিয়াছিল। সেদিনও সে ভুল করে নাই। সেদিন এই বাংলার নিগূঢ় মর্মস্থানটি উদ্ঘাটিত করিয়া দেখিতে, তাহার একান্ত গোপন অন্তর বাণীটি নিরন্তর কান পাতিয়া শুনিতে, তাহাকে সমস্ত হৃদয় দিয়া উপলব্ধি করিয়া লইতে তোমার একাগ্র সাধনার অবধি ছিল না। তখন হয়ত তোমার সকল কথা বাংলার ঘরে ঘরে গিয়া পৌঁছায় নাই, হয়ত কাহারো রুদ্ধদ্বারে ঘা খাইয়া সে ফিরিয়াছে, কিন্তু যার যেখানে মত ছিল, সেখানে সে কিছুতেই ব্যর্থ হইতে পারে নাই।

তাহার পরে একদিন মাতার কঠিনতম আদেশ তোমার প্রতি পৌঁছিল। সেদিন দেশের কাছে স্বাধীনতার সত্যকার মূল্য নির্দেশ করিয়া দিতে সর্বস্বদানে তোমাকে পথে বাহির হইতে হইল, সেদিন তুমি দ্বিধা কর নাই।

বীর তুমি, দাতা তুমি, কবি তুমি—তোমার ভয় নাই, তোমার মোহ নাই, তুমি নির্লোভ, তুমি মুক্ত, তুমি স্বাধীন। রাজা তোমাকে বাঁধিতে পারে না, স্বার্থ তোমাকে ভুলাইতে পারে না, সংসার তোমার কাছে হার মানিয়াছে। বিশ্বের ভাগ্যবিধাতা তাই তোমার কাছেই দেশের স্বাধীনতার মূল্য প্রমাণ করিয়া দিতে হইল। যে কথা তুমি মুখে বল নাই—স্বাধীনতার জন্য বুকের জ্বালা কি, তাহা তোমাকেই সকল সংশয়ের অতীত করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইল। বুঝাইতে হইল—নানার পন্থা বিরাতে অধনার। এই ত তোমার ব্যথা। এই তো তোমার দান।

ছলনা তুমি জান না, মিথ্যা তুমি বল না, নিজের তরে কোথাও কিছু লুকাইতে তুমি পার না,—তাই বাংলা যখন তোমাকে 'বন্ধু' বলিয়া আলিঙ্গন করিল, তখন সে ভুল করিল না, তাহার নিঃসঙ্কোচ নির্ভরতা কোথাও লেশমাত্র দাগ লাগিল না।

আপনার বলিয়া, স্বার্থ বলিয়া কিছু তোমার নাই। সমস্ত স্বদেশ, তাইত আজ তোমার করতলে। তাইত, তোমার ত্যাগ আজ শুধু তোমার নয়, আমাদের। শুধু বাঙ্গালীকে নয়, তোমার প্রায়শ্চিত্ত আজ বিহারী, পাঞ্জাবী, মারহাট্টা, গুজরাটি যে যেখানে আছে, সকলকে নিষ্পাপ করিয়াছে। তোমার দান আমাদের জাতীয় সম্পত্তি,—এ ঐশ্বর্য বিশ্বের ভাণ্ডারে আজ সমস্ত মানবজাতির জন্য অক্ষয় হইয়া রহিল। এমনি করিয়াই মানব-জীবনের দেনাপাওনার পরিশোধ হয়, এমনি করিয়াই যুগে যুগে মানবাত্মা পঙ্গুলতাকে অতিক্রম করিয়া চলে।

একদিন নশ্বর দেহ তোমার পঞ্চভূতে মিলাইবে। কিন্তু যতদিন সংসারে অধর্মের বিরুদ্ধে ধর্মের, সবলের বিরুদ্ধে দুর্বলের, অধীনতার বিরুদ্ধে মুক্তির বিরোধ শান্ত হইয়া না আসিবে, ততদিন অবমানিত, উপদ্রুত মানবজাতি সর্বদেশে, সর্বকালে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে তোমার এই সুকঠোর প্রতিবাদ মাথায় করিয়া বহিবে এবং কোনমতে কেবলমাত্র বাঁচিয়া থাকটা যে অনুক্ষণ শুধু বাঁচাকেই ধিক্কার দেওয়া, এ সত্য কোনদিন বিস্মৃত হইতে পারিবে না।

জীবনতত্ত্বের এই অমোঘবাণী—স্বদেশে বিদেশে, দিকে দিকে উদ্ভাসিত করিবার গুরুভার বিধাতা স্বহস্তে যাঁহাকে অর্পণ করিয়াছেন, তাঁহার কারাবসানের তুচ্ছতাকে উপলক্ষ সৃষ্টি করিয়া আমরা উল্লাস করিতে আসি নাই। হে চিত্তরঞ্জন, তুমি আমাদের ভাই, তুমি আমাদের সুহৃদ, তুমি আমাদের প্রিয়,—অনেকদিন পরে তোমাকে কাছে পাইয়াছি। তোমার সকল ধর্মের বড় গর্ব—বাঙ্গালী তুমি, তাইত সমস্ত বাংলার হৃদয় তোমার কাছে আজ বহিয়া আনিয়াছি,—আর আনিয়াছি, বঙ্গজননীর একান্ত মনের আশীর্বাদ, তুমি চিরজীবী হও, তুমি জয়যুক্ত হও।

—তোমার গুণমুগ্ধ স্বদেশবাসিগণ।

[দেশবন্ধুর কারামুক্তির পর ২৬ শ্রাবণ, শুক্রবার ১৩২৯ সালে মির্জাপুর পার্কে সম্বর্ধনা সভায় পঠিত মানপত্র। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়]

দেশবন্ধু

এক ।। প্রফুল্লচন্দ্র রায়

দেশবন্ধুর মৃত্যুতে আজ বাংলার একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত হাহাকার পড়িয়াছে কেন? রাজা মহারাজা বল, নরমপন্থী চরমপন্থী বল, দেশবাসী সকলে বল, সকলের মধ্যেই ক্রন্দনের রোল উঠিল? যাঁহারা রাজনীতিক্ষেত্রে কখনই তাঁহার সহিত একমত হইতে পারেন নাই, এমনকি বিপরীত মতাবলম্বীও ছিলেন, তাঁহারাও আজ সমস্বরে তাঁহার মৃত্যুতে যে কেবল শোক প্রকাশ করিতেছেন তাহা নয়, তাঁহার গুণকীর্তনেও শতমুখ। প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরিয়া আমি বাংলার রাজনীতি আলোচনা করিয়াছি। অনেকেই ইঁহার পূর্বে এই কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন সত্য; কিন্তু দেশবন্ধুর ন্যায় অনন্যকর্মা ও সর্বত্যাগী হইয়া স্বরাজলাভের উদ্দেশ্যে এই প্রকার আত্মোৎসর্গ করিতে কদাপি দেখি নাই। যিনি ভোগ-লালসা ও বিলাসিতার মধ্যে আশৈশব মানুষ হইয়াছিলেন, এবং পরিণত বয়সেও তাহাতে ডুবিয়া ছিলেন; তিনিই এক মহাশুভ মুহূর্তে, দেশের পক্ষে এক মহামাঙ্গলিক ক্ষণে, সকল ছাড়িয়া ভিক্ষু হইয়া বহু শতাব্দী পূর্বেকার কপিলাবস্তুর রাজপুত্রের ন্যায় পরিণাম বিবেচনা না করিয়া ফকিরের বেশ ধারণ করিলেন। হয়ত তিনি আর্ত, বিপন্ন, লাঞ্ছিতা দেশমাতার অস্ফুট ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে পাইয়াছিলেন। দেশের কাজে এ-প্রকার আত্মোৎসর্গ, এ-প্রকার জীবনাহুতি কখনও দেখি নাই—আর দেখিব কিনা তাও জানি না। সকলেই আজ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছেন—হাঁ, বাঙ্গালীর ঘরে একটা মানুষ জন্মিয়াছিল বটে! যিনি নিজের স্বার্থের দিকে না তাকাইয়া, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া, লাভ লোকসান গণনা না করিয়া, সর্বস্ব পণ করিয়া, প্রাণ দিয়া দেশের সেবায়, স্বরাজসাধনায়,

তাঁহার সমস্ত শক্তি, সামর্থ্য, বুদ্ধি ও প্রতিভা নিয়োগ করিয়াছিলেন, আর সেই নিয়োগের ফলেই আজ এমন অসময়ে তাঁহার বিয়োগ ঘটিয়াছে। দেশবন্ধু প্রকৃত প্রস্তাবে মরেন নাই। তাঁর নশ্বর দেহ ভস্ম ও বাষ্পে পরিণত হইয়া পঞ্চভূতে বিলীন হইয়া গিয়াছে মাত্র; কিন্তু তাঁহার অমর ও সাধনাপূত আত্মা বাঙ্গালী মাত্রেরই মধ্যে জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। এই প্রকারে মানুষ মরিয়াও অমর হয়। ভগবান করুন, যেন তাঁহার চিতাভস্ম সমগ্র ভারতের আকাশ-বাতাসে মিলাইয়া গিয়া নিঃশ্বাসের সহিত দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া প্রত্যেক ভারতবাসীকে তাঁহার মহান আদর্শে ও অনুরাগে, প্রদীপ্ত প্রতিভা ও প্রেরণায় অনুপ্রাণিত, উদ্বুদ্ধ ও জাগ্রত করিয়া তুলে। ভারতের জননীগণ যেন এই প্রকার সন্তানই গর্ভে ধারণ করেন।

'সেই ধন্য নরকুলে লোকে যারে নাহি ভুলে;
মনের মন্দিরে নিত্য সেবে সর্বজন।'

শ্রীমতী বাসন্তী দেবীকে লেখা চিঠি

(দেশবন্ধুর জবাবরোধের সময় লেখা)

ইউনিভার্সিটি কলেজ অফ সাইন্স
১৬-১২-২৭

প্রিয় ভগিনী

আমার হৃদয় এরূপ উদ্বেলিত হইয়াছে যে, আমি আমার মনের ভাব ভাষায় প্রকাশ করিতে পারিতেছি না। শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস বোমার মামলার সময় শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষের

একই ধোপে ৩ ভাবে কাজ ক'রে...

ডেট বেশী সাদা করে

—অন্য যে কোন পাউডারের তুলনায়

কেন এবং কিভাবে তা করে দেখুন

১ ডেট-এ রয়েছে বিশেষ সক্রিয় পদার্থ যা কাপড়ের ভেতরের কঠিন ধুলোময়লা সহজেই দূর করে—কাপড় চমৎকার পরিষ্কার হয়।
২ ডেট -কাপড়ের ময়লা বার ক'রে আবার তা কাপড়ে জমতে দেয়না, কাপড় বেশী পরিষ্কার হয়, বেশী পরিষ্কার থাকে।
৩ ডেট—কাপড়ে বাড়তি সাদা যোগায়—কাপড় আগের চেয়ে অনেক বেশী সাদা ও উজ্জ্বল হয় (এতে নীল বা সাদা করবার জন্য কিছুই যোগাতে হয়না)

আজই কিনুন—ডেট

স্বস্তিক অয়েল মিলস, বোম্বাই

SHILPI HPMA 38A/70 BEN

পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন, তাহা রাজনৈতিক মামলার ইতিহাসে বিশেষ বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছে। সেই হইতে তিনি জনসাধারণের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করিয়াছেন। তাঁহার অসীম বদান্যতা, তাঁহার আন্তরিক স্বদেশপ্রীতি, তাঁহার উচ্চ আদর্শ ও সর্বস্বকে আত্মদান বরাবরই আমাদের বিস্ময় ও ভক্তি উৎপাদন করিয়াছে। তাঁহার বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব যে বাঙলার ও ভারতের যুবকবৃন্দের হৃদয় অধিকার করিয়াছে, ইহাতে আশ্চর্যের বিষয় কিছুই নাই। রাজনীতি ক্ষেত্রে তাঁহার সহিত যাঁহাদের মত-বিরোধ আছে, তাঁহারাও তাঁহার অপূর্ব স্বার্থত্যাগে বিস্মিত না হইয়া পারেন না। তাঁহার বর্তমান পরীক্ষার সময় আমার মন তাঁহার জন্য ব্যাকুল হইয়া রহিয়াছে। আমি জনসাধারণ হইতে কতকটা বিচ্ছিন্ন আছি; সুতরাং আমার মনে হয় আমি হয়ত তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য ভালরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি না। কবি বলিয়াছেন—বৈজ্ঞানিকেরা পার্থিব গৌরবকেই অধিক ভালবাসিয়া থাকে। সারাজীবন আমি আমার প্রিয় বিষয়ে নিবিষ্ট থাকাতে হয়ত আমার অন্তর্দৃষ্টি কতকটা নষ্ট হইয়াছে। আমার মানসিক শান্তিও অনেকটা কমিয়া গিয়াছে।

প্রিয় ভগিনী, আমার উদ্দেশ্য ছিল, আমার প্রিয় আলোচ্য বিষয়ের মধ্য দিয়াই আমি আমার দেশের সেবা করিব। আমাদের দুজনের উদ্দেশ্যই এক। ভগবান জানেন আমার আর কোন উদ্দেশ্য নাই। আপনি বীরের মত হাসিমুখে সমস্ত বিপৎপাত সহ্য করিতেছেন, এবং আপনি বর্তমান বঙ্গদেশের নারীজাতির নিকট এমন এক আদর্শ উপস্থিত করিয়াছেন, যাহা রাজপুতদের সেই গৌরবের দিনের পর হইতে আজ পর্যন্ত আর কেহ প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। আমি সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করি যে, আমাদের মাতৃভূমির ভাগ্যাকাশ যে ঘোর মেঘে আচ্ছন্ন হইয়াছে, তাহা শীঘ্রই দূরীভূত হইবে, এবং আপনার স্বামীও আমাদের নিকট শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবেন।

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়

দুই ।। সুভাষচন্দ্র বসু ।।

দেশবন্ধু বিভিন্ন বর্ণ ও শ্রেণীর মধ্যে সংগ্রাম বা বিবাদ পছন্দ করিতেন না এবং তিনি এ বিষয়ে কার্ল মার্কসের বিরোধী ছিলেন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তাঁহার আশা ছিল যে, ভারতের সকল ধর্মসম্প্রদায় ও শ্রেণীর মধ্যে চুক্তিপত্রের (Pact) সাহায্যে সকল বিবাদ দূর হইবে এবং জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকল ভারতবাসী স্বরাজ আন্দোলনে যোগদান করিবে। অনেকে তাঁহাকে বিদ্রূপ করিয়া বলিতেন যে, চুক্তিপত্রের সাহায্যে প্রকৃত মিলন সংঘটিত হইতে পারে না, কারণ উহা সমবেদনা ও সহানুভূতির উপর নির্ভর করে দরকষাকষির উপর নির্ভর করে না। দেশবন্ধু ইহার উত্তরে বলিতেন যে, আপোষে মিটমাট না করিয়া [illegible] পারলে মানুষ একদিনও এ সংসারে বাঁচিতে পারে না এবং মনুষ্যসমাজও একদিনও টিঁকিতে পারে না।

ভারতের হিন্দু জননায়কদের মধ্যে দেশবন্ধুর মতো ইসলামের এত বড় বন্ধু আর কেহ ছিলেন বলিয়া আমার মনে হয় না—অথচ সেই দেশবন্ধুই ভারতবর্ষের সত্যাগ্রহ আন্দোলনে অগ্রণী হইয়াছিলেন। তিনি হিন্দুধর্মকে এত ভালবাসিতেন যে তার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিলেন অথচ তাঁর মনের মধ্যে গোঁড়ামি আদৌ ছিল না। সেইজন্য তিনি ইসলামকে ভালবাসিতে পারিতেন। দেশবন্ধু ধর্মমত হিসাবে বৈষ্ণব ছিলেন। কিন্তু তাঁহার বুকের মধ্যে সকল ধর্মের লোকের স্থান ছিল। চুক্তিপত্রের দ্বারা বিবাদ ভঞ্জন হইলেও তিনি বিশ্বাস করিতেন না যে শুধু তাহারই দ্বারা হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে প্রীতি ও ভালোবাসা জাগরিত হইবে। তাই তিনি কালচারের দিক দিয়া হিন্দুধর্ম ও ইসলামের মধ্যে মৈত্রী সংস্থাপনের চেষ্টা করিতেন।

ভারতে স্বরাজের প্রতিষ্ঠা হইবে উচ্চশ্রেণীর স্বার্থসিদ্ধির জন্য নয় জনসাধারণের উপকার ও মঙ্গলের জন্য, একথা দেশবন্ধু যেরূপ জোর গলায় প্রচার করিয়াছিলেন, প্রথম শ্রেণীর আর কোন নেতা সেরূপ করিয়াছিলেন বলিয়া আমার মনে হয় না। স্বরাজ জনসাধারণের জন্য, একথা পৃথিবীতে নূতন নয়। ইয়োরোপে বহুকাল পূর্বে এ মন্ত্র প্রচারিত হইয়াছিল কিন্তু ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে এ কথা নূতন বটে। অবশ্য স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার 'বর্তমান ভারত' গ্রন্থে প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে একথা লিখিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু স্বামীজীর সে ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতিধ্বনি ভারতের রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে শুনা যায় নাই।

বাংলার সভ্যতা ও শিক্ষার সারসংকলন করিয়া তাহাতে রূপ দিলে যেরূপ মানুষের উদ্ভব হয় দেশবন্ধু অনেকটা সেইরূপ ছিলেন। তাঁহার গুণ বাঙ্গালীর গুণ, তাঁহার দোষ বাঙ্গালীর দোষ। তাঁহার জীবনের সবচেয়ে বড় গৌরব ছিল যে তিনি বাঙ্গালী। তাই বাঙ্গালী জাতিও তাঁহাকে এত ভালবাসিত। বাংলার যে একটা বৈশিষ্ট্য আছে, বাঙ্গালীর চরিত্রে যে সে বৈশিষ্ট্য মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে—একথা দেশবন্ধু যেরূপ জোরের সহিত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার পূর্বে সেরূপ আর কেহ করিয়াছিলেন বলিয়া আমার মনে হয় না। দেশবন্ধু তাঁহার স্বদেশপ্রেমের মধ্যে বাংলাকে ভুলিয়া যাইতেন না। অথবা বাংলাকে ভালবাসিতে গিয়া স্বদেশকে ভুলিতেন না। তিনি বাংলাকে ভালবাসিতেন প্রাণ দিয়া, কিন্তু তাঁহার ভালবাসা বাংলার চতুঃসীমার মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। দেশবন্ধুর সময়ে বাংলা স্বরাজ আন্দোলনে নেতৃত্ব করিয়াছিল। তাঁহার দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা আবার নেতৃত্ব হারাইয়াছে, কবে ফিরিয়া পাইবে ভগবানই জানেন।

তিন ।। উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ।।

কর্মীদের উপর তাঁহার অসীম ভালবাসা। ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী এত লোককে তিনি যে এক উদ্দেশ্যে চালিত করিতে পারিয়াছিলেন তাহার কারণই এই। হিংসা ও অহিংসা, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ও ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন, শ্রমিক ও ধনিক প্রভৃতি হাজার বিষয় লইয়া তাঁহার সঙ্গে তর্ক বিতর্ক ও মতভেদ হইত। কিন্তু তাঁহার সঙ্গে তর্ক করিবার সময় সর্বদাই একথা মনে থাকিত যে এ সমস্ত মতভেদ অবান্তর; আসল কথা এই যে তিনি দেশের প্রতি অগাধ ভালবাসার জোরে আমাদের সকলকে পিছনে টানিয়া লইয়া চলিয়াছেন!

বিপ্লববাদীদের সঙ্গে তাঁহার কি সম্বন্ধ ছিল এ সম্বন্ধে সংবাদপত্রে ও লোকের মুখে অনেক গবেষণা শুনিয়াছি। দুই একখানা ফিরিঙ্গী সংবাদপত্র একথাও বলিয়াছে যে তিনি প্রচ্ছন্নভাবে উহাদিগকে প্রশ্রয় দিতেন। এসব কথা যে কতদূর হেয়, তাহা আমি নিজের অভিজ্ঞতা হইতেই জানি। আমি যখন স্বরাজ দলের সংস্রবে আসি তখন তিনি আমার নিকট হইতে প্রতিশ্রুতি লইয়াছিলেন যে অহিংস সম্বন্ধে স্বরাজ দলের আদর্শ ও কার্যপ্রণালী আমি নিজে মানিয়া চলিব, এবং এমন কোন লোককে স্বরাজ দলে টানিয়া আনিব না যিনি এই আদর্শে আস্থাবান নহেন। আমি একথা আজ [illegible] যে অহিংসাকে তিনি নিজে [illegible] হিসাবেই মানিয়া লইয়াছিলেন।

চার ।। ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী ।।

নেতার যেসব গুণ থাকার প্রয়োজন তা তাঁর ছিল। দেশের মঙ্গলের জন্য যাহা প্রয়োজন তাহা তিনি করিতে দ্বিধাবোধ করিতেন না। তাই অবস্থা বিশেষে তিনি Policy change করিতেন। সকল মতের সহিত সামঞ্জস্য করিয়া চলিবার ক্ষমতা তাঁর ছিল। তাঁর খাঁটি দেশপ্রেমের জন্য সকল দলই তাঁর নিকট মাথা নত করিয়াছিল।

পাঁচ ।। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ।।

অন্যান্য গুণাবলীর সহিত দেশবন্ধুর অসাধারণ কর্মশক্তি এবং অসাম্প্রদায়িক উদারতায় আমি সর্বদাই মুগ্ধ থাকিতাম। এইরূপ উচ্চাঙ্গের উদারতা ভিন্ন হিন্দু-মুসলমান সমাধান অসম্ভব। আমরা উভয়ে যখনই এ সম্বন্ধে কথাবার্তা বলিতাম, তিনি ভুলিয়া যাইতেন তিনি হিন্দু, আমি ভুলিতাম যে আমি মুসলমান। বেঙ্গল প্যাক্ট সম্বন্ধে তাঁহার সিদ্ধান্ত অত্যধিক উদারতা ও অসাম্প্রদায়িকতার ফল।

ছয় ।। হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ।।

চিত্তরঞ্জন বীর-সাধক ছিলেন। যখনই যে কাজ ধরিতেন, ধ্যাননিষ্ঠ তাপসের ন্যায় আহাতে জীবনপাত করিতেন। কি আইন ব্যবসায়ে, কি লোকহিতকর অনুষ্ঠানে, কি স্বদেশসেবায় হৃদয়ের একপ্রাণতার জন্যই সর্বদা জয়লাভ তাঁহার করতলগত থাকিত।

আলোর উৎসে

বীরেন্দ্র দত্ত

হঠাৎ দপ্ করে সমস্ত আলো নিভে গেল। বিরাট হলঘরের একদিকে ঠিক আগের মতই বাজনা বেজে চলেছে। নিরুপম একভাবে চেয়ারে বসে রইল। মনে হল নিরুপমের মাথা থেকে পা পর্যন্ত ভারী, অনড়। নিরুপম নিশ্চুপ। ওর পাশের চেয়ারে একটু আগেই বসে ছিল মধুমিতা। মধুমিতার দু'গাল বেয়ে মন অর্ধ-উন্মত্ত বুকের খাঁজে ফোঁটা ফোঁটা জমছিল। আর বসে বসে সারা শরীর দিয়ে নিরুপমকে ভালবাসার আহ্লাদে ভেঙে পড়ছিল। আলো নিভতেই উঠে গেছে। নিরুপমের মনে হল, বিরাট হলঘরের মেঝেটা অন্ধকার-কালো জলে-ভর্তি সরোবর হয়ে গেছে! আর শঙ্খিনী সাপেরা দু'টি দু'টি করে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে খেলার বিলাসে ভীষণ মেতে উঠেছে। যেন কখনো বা জল থেকে লাফিয়ে উঠেছে ঘনিষ্ঠতার উচ্ছ্বাসে। চারপাশে সাপগুলির সমবেত নিঃশ্বাস, গোপন পদশব্দ! নিরুপমের গা শির শির করে উঠল। অথচ চেয়ার ছেড়ে ওঠার কোন চেষ্টাই নেই ওর।

আলো জ্বলে উঠল কয়েক মুহূর্তের মধ্যে। আর সঙ্গে সঙ্গে বাজনা থেমে গেল। নিরুপম তখনো নির্বিকার। দেয়ালে আটকানো নকল গির্জাটির ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে ফাঁকা হলঘরের দিকে তাকাতেই নিরুপম ভীষণ চমকে উঠল। হলের মধ্যে অপরিচিতদের কেউ নেই। সব পাশের ছোট ছোট ঘরগুলোয় লুকিয়ে পড়েছে, আর মাত্র কয়েকজন নিরুপমকে নিয়ে খেলার সুখে মাতাল। নিরুপম ওদের সকলকে চেনে — মধুমিতা, বল্লরী, তনুশ্রী, কল্পমায়া, বাসন্তিকে সোনালি, আরও কে কে যেন! নিরুপম ভয়ে কাঠ হয়ে একভাবে তাকিয়ে রইল ওদের দিকে। ওরা সবাই নগ্নদেহ। প্রত্যেকের শরীর দুধের সর দিয়ে মাজা, পরিচ্ছন্ন। মুখ, বুক, গ্রীবা, নিতম্ব, নাভি-রেখার নিম্নদেশ, জানু থেকে পায়ের পাতা — সমস্ত কিছু দিয়ে নিরুপমকে এমনভাবে জড়িয়ে ধরেছে, নিরুপম এখানে, এই চেয়ারে বসে ভয়ে স্থির, নির্জীব। ওখানে নিরুপম বড় পুলকিত, আবিষ্ট। এখানে নিরুপম একা, বিষণ্ণ। একে ওরা কেউ চেনে না।

নিরুপম ওই রমণীগুলির দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। ওদের শরীর এত পবিত্র! একবারে গাছের মুঠোর মধ্যে ছোট-হয়ে-আসা গন্ধহীন ফুল ওরা! এখন ওদের দেখে নিরুপমের একটুকু বিস্ময় বা শিহরণ জাগছে না। তাকিয়ে থাকতে থাকতে নিরুপম ভীষণ বিরক্ত বোধ করল। নতুন একটা মদের বোতলের মুখে হাত রেখে

ছিপি খুলতে লাগল। ছিপি কেবল ঘুরিয়েই যাচ্ছে, কিছুতেই খুলছে না। নিরুপম মনে মনে বিড়বিড় করল, রমণীদেহ ঈশ্বরের নিজের হাতে তৈরী বেন! ওরা কি সেই দেহে অত্যাচার বা ছলনা অথবা শুধুমাত্র লোভ মিশিয়েই নিরুপমকে এমনভাবে বিরক্তিকর আকর্ষণে ধরতে চাইবে? ওরা কি বাঁধতে জানে না? হঠাৎ দূরের রমণীগুলি যেন খেলায় হেরে গিয়ে চেয়ারে বসে-থাকা নিরুপমের দিকে এগিয়ে আসছে।

নিরুপম চকিতে উঠে দাঁড়াল। ভীষণ ভয় পেয়ে গেছে নিরুপম। বড় সুইং দরজা ঠেলে রাস্তায় বেরিয়ে এল ও। গভীর রাতের চৌরঙ্গীর নির্জন রাস্তা। সামনে ফাঁকা ময়দান। যুদ্ধকালীন বিপদসঙ্কেতে যেন সমস্ত আলোর মাথায় ঠুলি পরানো। একটা দমকল চলেছে তীব্রবেগে দক্ষিণ দিকে। নিরুপম দৌড়তে লাগল। ভীষণ জোরে, লম্বা লম্বা পা ফেলে। এমন তেত্রিশ বছর বয়সে নিরুপম কখনো দৌড়য়নি। পিছন ফিরে না তাকালেও নিরুপম বুঝতে পারছে, রমণীগুলি ওর পিছু নিয়েছে। হাঁপাতে হাঁপাতে গঙ্গার ধারে এসেই নিরুপম ঘাসে-ঢাকা মাটির ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। ভিজে মাটি আর কাঁচা সবুজ ঘাসের গন্ধ নাকে আসছে। কোথাও বুঝি ফুল ফুটে আছে। নিরুপম হঠাৎ তারও গন্ধ পেলো। 'এই যে, ওঠো নিরুপম, আমার হাত ধরো!' নিরুপম উপুড় হয়ে থেকে ওপর দিকে তাকাতেই ভয়ে সিঁটিয়ে গেল। অসিতা ওকে ডাকছে। ও এখানে এলো কি করে! ভাবতে হবে না এখন, ওঠো।' হাত বাড়িয়ে দিয়েছে অসিতা। ওকে তুলতে চাইছে। 'উঠছি দাঁড়াও।' নিরুপম উঠতে চেষ্টা করল। কিন্তু কিছুতেই পারছে না। নিরুপম ঘামছে ভীষণ। উঠতে পারল না ও। নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে নিরুপমের। ঘাসে মুখ গুঁজে নিরুপম অসহনীয় শ্বাসকষ্টে ছটফট করছে। নিরুপম বুঝি মরে যাবে......

ঘুম ভেঙে গেল নিরুপমের। বুকের ওপর দুটি হাত উপুড় করে পড়েছিল। নিরুপম স্বপ্ন দেখছিল। সর্বাঙ্গে শিরে হাতদুটো বাথায় টন টন করে উঠল। দরদর করে ঘাম দিচ্ছে। মাথার বালিশ ভিজে গেছে। গায়ের ভেজা গেঞ্জীও যেন অসহ্য গরমে পুড়ছে। স্বপ্নের চাপা ভয়ে নিরুপমের বুকের মধ্যে স্পন্দও যেন কিছু অনিয়মিত। ঘরের চারপাশ দেখে নিয়ে নিরুপম বিছানার ওপর উঠে বসল। মাথা ভার হয়ে আছে এখনো।

দুদিন জ্বর না থাকলেও শরীরের দুর্বলতা যায়নি। মাথার কাছে টেবিলে পিসিমা জল রেখে গেছেন। এক নিশ্বাসে জলটা খেয়ে নিল নিরুপম। এখন কটা বাজে? টেবিলের ওপর হাতঘড়ি দেখল। চারটে বাজেনি এখনো। সেই দুপুর থেকে ঘুমোচ্ছে নিরুপম। এমন অসহ্য গরমে পাখা ঘুরলেও ঘুম আসার কথা নয়; শুধু দুর্বলতা আর নিঃসঙ্গ অসহায় চিন্তার ভারে নিরুপম ঘুমিয়ে পড়েছিল। গেঞ্জি খুলে পাশে রেখে দিল। বালিশের ঘামে-ভেজা দিকটা উল্টে মাথায় দিল। টান হয়ে শুয়ে পড়ল আবার। ফুল স্পীডে ঘোরা পাখার বাতাসও অসহ্য।

এতদিন পরে নিরুপম এমন অদ্ভুত স্বপ্নটা দেখল কেন? মধুমিতাদের সঙ্গে তো অনেকদিন দেখা করা বন্ধ করে দিয়েছে? অসিতার স্বপ্নও এদের সঙ্গে জড়িয়ে গেল কেন? নিরুপম ভয় পেলো। একটা কালো অন্ধকার ছায়া ওর শূন্যতার মধ্যে ভেসে এল। কয়েকদিন আগে পার্ক স্ট্রীটের এক সন্ধ্যায় যেন সোনালিকেই দেখেছিল নিরুপম গাড়ির মধ্যে। পাশে এক সুদর্শন পাঞ্জাবী যুবক! নিরুপমের মনে পড়ে, এই সোনালির সঙ্গেই শেষ সন্ধ্যাটুকু কাটাতে হয়েছিল ওকে!

'হ্যালো নিরুপম!'

মেট্রো সিনেমার উল্টোদিকে গাছটার নীচে দাঁড়িয়ে পড়েছিল নিরুপম, ওর গা ঘেঁষে সোনালির গাড়ি।

'এমন অন্যমনস্ক হয়ে কোথায় চলেছ?' নিরুপমের মাথা থেকে পা পর্যন্ত দেখে নিয়ে বলল, 'কি পোষাক পরেছ! সো পুওর!' গলা নামিয়ে বলল, 'অবশ্য তোমাকে যে-কোন পোষাকেই দারুণ মানায়।'

নিরুপম শান্ত নিরুৎসাহ চোখে তাকিয়ে রইল সোনালির দিকে।

'উঠে এসো গাড়িতে, কথা আছে।'

'না, আজ থাক।' নিরুপম সোনালিকে স্পষ্ট করে দেখল। না, ও আজ মদ খেয়ে বেরোয়নি।

'কেন, দেখে তো মনে হচ্ছে কোন কাজ নেই!'

'কাজ না থাকলেও বাড়ি ফেরা দরকার।' নিরুপম এড়িয়ে যেতে চাইল।

'এই সন্ধ্যেবেলায় বাড়ি! স্যাড!' নিরুপমের দিকে তাকিয়ে কটাক্ষ করল। 'এমন ঠাণ্ডা মেরে যাচ্ছো কেন? ওঠ তো।' বলেই সোনালি ওর পাশের দরজা খুলে দিল।

নিরুপমকে বাধ্য হয়েই উঠতে হয়েছিল। রাস্তার চারপাশে উৎসুক পথচারীদের দৃষ্টি ওকে বিব্রত করছিল।

গাড়ি ঘুরিয়ে নিল সোনালি। 'তোমার কদিন পাত্তাই নেই নিরুপম! ব্যাপার কি বলতো? শুনলাম, তুমি নাকি মদ খেকে শুরু করে একেবারে সবকিছুই ছেড়ে দিয়েছ! মিঃ সেন, মিঃ বাগচী—তোমার সব বন্ধুরা তোমার বাড়ি গিয়ে হতাশ হয়ে আশা ছেড়ে দিয়েছে। আমিও তো কদিন ফোন করেও পাইনি। অবশ্য তোমার মা-বাবার স্যাড নিউজের কথাটাও ভেবেছি।'

গাড়ি আস্তে আস্তে চলেছে। নিরুপম বাইরে তাকিয়ে ছিল। 'কথাটা ঠিকই। আমার কিছু ভাল লাগছে না।'

সোনালি খিলখিল করে হেসে উঠল। নিরুপমকে কয়েক মুহূর্ত নিবিষ্ট চোখে দেখে নিয়ে স্বগতোক্তির মত বলল, 'আহ্, সো লাভলি ইউ আর, নিরুপম!' নীরব থেকে কি যেন ভাবল। 'হোটেলে যাবে? চল, ওখানেই কিছু খেয়ে নেবে। দেখবে, এই সব রাবিশ চিন্তাগুলো আর থাকবে না।'

'না মিস্ গুপ্ত।' নিরুপমের গলা ঠাণ্ডা, ঈষৎ কঠিন।

'কতদিন তোমাকে একা পাইনি নিরুপম! তুমি এত নীতি হয়ে উঠছ!'

'তুমি কোথায় বেরিয়েছ বল। সেখানে গিয়ে আমাকে ছেড়ে দাও।'

সোনালি হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। কিছুক্ষণ চুপচাপ। গাড়ি পার্ক স্ট্রীটের মোড়ে লাল আলোয় থেমে গেল। সোনালি স্টিয়ারিং-এর ওপর হাতদুটো অলসভাবে রেখে বলল, 'আজ আমি ভীষণ লোনলি নিরুপম। তোমাকে পেয়ে যেন স্বর্গ পেয়েছি। আমাকে একটু সঙ্গ দাও।'

সোনালি ওর পুরনো কোন দুঃখ শোনাতে বসবে ভেবে নিরুপম সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'আমি কিন্তু হোটেলে যাব না। চল, বরং ভিক্টোরিয়ার সামনে একটু বসি। ওখানে বসে বসেই গল্প করা যাবে।'

'না, ওখানে ভীষণ ভিড়। নিরুপম তার চেয়ে বরং আমাদের বাড়ি চল। সন্ধ্যেটা মন্দ লাগবে না।' সোনালি নীল বাতি জ্বলতেই গাড়ি সোজা চালালো।

'আমাকে কিন্তু ভাল লাগবে না সোনালি, দেখো, ভীষণ বোরিং লাগবে। আমিও আজকাল ঐ চার দেয়ালের মধ্যে একটুতেই হাঁপিয়ে উঠি।'

সোনালি নিরুপমকে আড়চোখে দেখে নিয়ে বলল, 'জানি, তুমি ভীষণ কোল্ড, ক্যালাস হয়ে পড়ছ নিরুপম। চল তো, দেখবে, আমার কাছে থাকলে তোমার এক মুহূর্তও বোরিং লাগবে না। আমারও না।' বব চুলের একটা গুচ্ছ বাতাসে ঠোঁটের ওপর পড়ছিল। মাথা ঈষৎ নেড়ে ঠিক করে নিয়ে বলল, 'বলো, আমার কাছে থেকে সত্যি কোনদিন কি তুমি বোরড ফিল করেছ?'

নিরুপম নিজের মধ্যে চমকে উঠেছিল।

সেদিন সন্ধ্যায় সোনালির বাড়ি ওর মা, বাবা, ভাই-বোন কেউ ছিল না। এমন নির্জন হবে, নিরুপমের ধারণায় ছিল না। সোনালির ঘরে বসে সোনালি বার বার অনুরোধ করলেও মদ খায়নি সেদিন। সোনালি নানা কথায় এক সময়ে নিরুপমের পাশে এসে বসেছিল।

'নিরুপম!'

'চল সোনালি, বাইরে বেড়াই। এই ঘর ভাল লাগছে না। মাথা ঝিম ঝিম করছে।' নিরুপম বিষন্ন গলায় বলল।

'ভাল লাগবে, তুমি আমার কাছে এসো।' সোনালি নিজেই সরে এসেছিল নিরুপমের কাছে। নিরুপমকে তখনো নীরব, নিশ্চেত দেখে সোনালি জড়িয়ে ধরেছিল। 'নিরুপম, তুমি কি বুঝতে পারছ না, নাউ আই অ্যাম ডাইং ফর এ কিস! প্লীজ!'

নিরুপম তখনি এক শূন্যের মধ্যে ভাসছিল। 'আমাকে ছেড়ে দাও সোনালি, আমি সত্যি ক্লান্ত।'

সোনালি আর একটি কথাও বলতে দেয়নি। নিরুপমকে জড়িয়ে ধরে অজস্র চুমুতে সারা মুখমণ্ডল ঢেকে দিচ্ছিল তখন। নিরুপম কাঠের মূর্তির মত স্থির, নিষ্প্রাণ। এক সময়ে পাশেই হাত বাড়িয়ে দেয়ালের গায়ে ঝোলানো সুইচ টিপে আলো নিভিয়ে দিয়েছিল সোনালি। শরীরে কোন আবরণ রাখেনি। সোনালি ওর গাছ-গাছড়া, ডাল-পালা, পাতা-ফুল-ফল—সব দিয়ে নিরুপমকে ধরতে চাইছিল। জলে ভেজা শরীরে কচুরিপানার পাতা যেমনভাবে লেপটে থাকে, সোনালি সেইভাবে লেগে থাকছিল। নিরুপমের তখনি চিবোনো ডাঁটার কথা মনে হচ্ছিল। নিরুপম কাটা গাছের শক্ত গুঁড়ির মত বসেছিল। সোনালি গুঁড়িটার সমস্ত শুকনো ছাল সরাতে পেরেছিল এক এক করে। কিন্তু ভিতরের কাঠটা যে একেবারে রসহীন হবে, ভাবেনি। সোনালি অন্ধকার ঘরে লজ্জায়, অপমানে নিরঙ্ক শরীরে কেঁদে ফেলেছিল। নিরুপমকে রাগে-দুঃখে এলোপাথাড়ি মারতে চেয়েছিল। নিরুপম অন্ধকারেই সমস্ত পোষাক এক এক করে পরে কোন কথা না বলে ওর বাড়ি থেকে চলে এসেছিল। বল্লরী, মধুমিতা, রূপমায়ারা যে যার মত নিরুপমকে বুঝে নিয়েছিল। তাই গোপনেই তারা নিরুপমের কাছ থেকে সরে গিয়েছিল। সবশেষে সোনালি বুঝতে পেরেছে ভেবে নিরুপম সেদিন খুশী হয়েছিল খুব।

নিরুপম এখন ভেবে দেখল, এর পর আর কারো সঙ্গে দেখা করেনি ও। ওদের মধ্যে যাবার এতটুকু লোভও হয় নি। মিঃ সেন, বাগচী, লাহিড়ীদেরও সরাতে পেরেছে। এখন তাহলে কি রকম নিরুপম? শান্ত, শীতল, নুয়ে-পড়া এক বৃদ্ধের মত নির্বিকার, নিরাসক্ত। বহু ভোগের পর আর এক ভণ্ড সাধু নয় তো? নিরুপম নিজে-নিজেই হেসে উঠল।

'ঘুম ভেঙেছে নিরুপম?' পিসিমা ঘরে ঢুকলেন। কাছে এগিয়ে এসে বললেন, 'শরীর-কি রকম?'

'ভাল', তবে মাথা ভার এখনো যায় নি।'

'দুর্বল থাকলে এরকম মনে হয়। কিছু খেয়ে নে, ছাড়বে।' নিরুপমের গায়ে হাত বুলিয়ে তাপমাত্রা বুঝতে চাইলেন। হাত সরিয়ে বললেন, 'চিঠিটা নে। তোর চিঠি। বোধ হয় কোথাও চাকরীর ব্যাপার কিছু।'

নিরুপম চিঠিটা নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে খাম ছিঁড়ল। পড়ে নিয়ে বলল, 'শেষ যে ইন্টারভিউ দিয়েছিলাম, সেখানেই চাকরীটা হল পিসিমা।' হাসল নিরুপম। 'তোমার কথাই ঠিক।'

'কবে জয়েন করতে হবে?'

'সামনের মাসের এক তারিখে।'

'তার আগেই তুই সেরে উঠবি। ভালই হল রে, মন খারাপ করে এখানে-ওখানে ঘুরছিলি, এবার মন ভাল হবে।'

নিরুপম মৃদু হাসল।

'উঠে বস। মুখ ধুয়ে নে। খাবার পাঠিয়ে দিচ্ছি।' পিসিমা চলে গেলেন।

নিরুপম দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসল। সিগারেট ধরালো। অসিতাও একদিন বলেছিল, 'দেখবেন, চাকরী পেলেই আপনার এই একা-একা থাকার অসুখটা চলে যাবে। দশটা-পাঁচটা ডিউটি, নতুন পরিবেশ। তখন আজে-বাজে চিন্তার সুযোগই পাবেন না!' তাই কি! নতুন পরিবেশ, নতুন পরিচয়ে নিরুপম তখন অন্য মানুষ' অফিসের পর মাঝে-মাঝে অসিতার দুটি ভাই টিটু-মিটুদের পড়াতে যাবে। ওর অতীত ওকে আর শূন্যের মধ্যে ফেলতে পারবে না! নিরুপম ঈষৎ উত্তেজিত বোধ করল।

অনামনস্ক হয়ে সিগারেট টানতে-টানতে নিরুপম সামনে আলমারীর বড় আর্শির দিকে তাকাল। ভাগ্য নিরুপমকে আবার কোথায় নিয়ে যাবে? নিরুপম বিড়-বিড় করল। নিরুপম নিজেকে নতুন করে দেখল। সত্যি সে সুন্দর, ফর্সা এক সুদর্শন যুবক। মুখ, চোখ তীক্ষ্ণ, স্মার্ট। মধুমিতারা তাই বলত। ওরা প্রত্যেকে গোপনে নিরুপমকে নিয়ে খেলা করেছে। ভয়ঙ্কর খেলা। আর নিরুপম মাতাল হয়ে সেই খেলায় ডুবে ছিল অনেক দিন।

নিরুপম আর্শির প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে অনামনস্ক হয়ে গেল। কিশোর বয়স থেকেই ভয়ঙ্কর বিলাসে পরিতৃপ্ত মা নিরুপমকে ওদের সমাজের মত করে গড়ে তুলছিলেন। বিরাট এক কোম্পানীর ম্যানেজার বাবাও মায়ের ইচ্ছার মত দিয়েছিলেন। কিন্তু বাবা-মা কোনদিন খোঁজ রাখেন নি, নিরুপম এ সবের মধ্যে কেমন তিল-তিল করে এক শূন্যের মধ্যে চলে আসছিল। নেশা থেকে কি ভয়ানক এক ক্লান্তি, বিরক্তি নিরুপমকে দুরারোগ্য ব্যাধির মত আক্রমণ করছিল। নিরুপম নিজের মনেই হাসল। এক বছর আগে বিভার পথে বাবার আকস্মিক মৃত্যু, তার পর কয়েক দিনের মধ্যে মায়ের সেরিব্রাল থ্রম্বোসিসে শেষ হয়ে যাওয়া, দেনার দায়ে বাড়ী-গাড়ী বিক্রী হয়ে যাওয়ার মত ঘটনাগুলি নিরুপমকে কি অদ্ভুত বাঁচিয়ে দিয়েছে!

নিরুপম ভাবতে-ভাবতেই বাইরে তাকাল। 'এই ভালো' নিরুপম নিজের মনে উচ্চারণ করল। বাবা-মার কাছে পিসিমা নানা উপকার পেয়ে কৃতজ্ঞ ছিলেন। নিরুপম সমস্ত কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পিসিমার কাছে বেশ আছে। পিসিমার দুই ছেলে বাইরে। মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। একমাত্র ছোট, দশ বছরের ছেলে শম্ভু যেন নিরুপমের বন্ধু। এই শম্ভুকে স্কুলে ভর্তি করতে গিয়েই অসিতাকে প্রথম দেখে নিরুপম।

অসিতার কথা মনে হতেই আবার একটু আগে দেখা স্বপ্নটার কথা মনে পড়ল। মধুমিতাদের স্বপ্নের সঙ্গে অসিতা কেমন জড়িয়ে গেছে! নিরুপমের মনে পড়ে, ও তখন একা চুপ করে বাড়ীতে বসে থাকত। নিরুপমের মধ্যে যেন চতুষ্পার্শ্বের কোন আকর্ষণ ছিল না। ফাঁকা, শূন্য মনে

হত নিজেকে। নানান অকলার মধ্যেই মাঝে-মাঝে মাথার যন্ত্রণা হত। নিরুপম দু চোখ বন্ধ করে এক অন্ধকারের মধ্যে এসে দাঁড়াত। শ্বাসকষ্ট হত ওর। পেটে একটা অকারণ যন্ত্রণা ঠেলে উঠত। নীরব থেকে নিরুপম তা সহ্য করত। আর সব যন্ত্রণা সরে গেলে নিরুপম ভীষণ অসহায়, ক্লান্ত, বিষন্ন বোধ করত। এটা ওর গোপন ব্যাধি ছিল, পিসিমা বুঝতে পেরেছিলেন বলেই নিরুপমকে নানা কাজে-অকাজে বাইরে পাঠাতে চাইতেন।

মাস ছয়েক আগে শন্তুর নতুন ক্লাসে ওঠার ব্যাপারেই পিসিমা নিরুপমকে পাঠিয়েছিলেন ওর স্কুলে। ঐ স্কুলেই শন্তুর ক্লাস-টিচার অসিতার সঙ্গে প্রথম দেখা। এর পর বেশ কয়েকবার নিরুপমকে যেতে হয়েছিল ওদের স্কুলে। অসিতাই শন্তুর ভর্তির ব্যাপার ঠিক করে দিয়েছিল। এই কদিনের দেখা হওয়ার মধ্যে নিরুপম-অসিতা দুজনের মুখ-চেনা হয়ে গিয়েছিল। অসিতা কোথায় থাকত, নিরুপম জানত না। নানা কথার মধ্যে একবারও জানার ইচ্ছে হয় নি। অসিতাও অন্য সব অভি-ভাবকদের মত নিরুপমকে মনে রাখতে চেয়েছিল। নিরুপম কোথায় থাকে, কি করে—এসবে ওরও কোন উৎসাহ ছিল না।

একদিন হঠাৎ স্বল্প-নির্জন গলির মধ্যে অসিতার সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। তখন সন্ধ্যের অন্ধকার উঁচু বাড়ীগুলোর আনসে ঢাকছিল নিঃশব্দে। পরিচ্ছন্ন আকাশ দু-একটা নক্ষত্রের আলোয় কাঁপতে শুরু করেছিল। নিরুপম অন্যমনস্ক হয়ে হাঁটছিল। পাশের মেয়েটিকে চেনা মনে হতেই নিরুপমের হাল্কা অন্যমনস্কতা সরে গিয়েছিল। নিরুপম থেমে যাওয়ার ভঙ্গি করে বলেছিল, 'নমস্কার! চিনতে পারছেন?'

'খুব চেনা মনে হচ্ছে, কিন্তু কোথায় দেখেছি মনে পড়ছে না তো!' অসিতা বলেছিল।

'আপনাদের স্কুলে!'

'হাঁ, এবার মনে পড়ছে। কাকে যেন ভর্তির ব্যাপারে এনেছিলেন, তাই না? আপনার কোন পিসতুতো ভাই যেন!'

নিরুপম মৃদু হাসছিল। 'মনে পড়েছে। এখন সে আপনার ছাত্র।'

অসিতা হাসল। 'এবার বুঝেছি!' হাত-ঘড়ি দেখল অসিতা। ওর টিউশানিতে যাওয়ার সময় হয়ে যাচ্ছিল। বলল, 'কোন-দিকে যাবেন? এদিকে তো? আসুন, হাঁটা যাক।' অসিতা এগিয়ে চলল; নিরুপম পাশে।

'এদিকে কোথায় যাবেন?'

'কোথাও না। এমনি বেরিয়ে পড়েছি, কিছু ভাল লাগছে না।' নিরুপম সেদিন ভীষণ একা হয়ে গিয়েছিল মনের মধ্যে। শালাপিঠেলার চলে যেতে হচ্ছে। 'আপনি কোথায়?'

'এই একটু এদিকে।' অসিতার কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে দূরে বড় রাস্তায় বোমা পড়ার শব্দ হল। অসিতা থমকে দাঁড়িয়ে বলল, 'কি ব্যাপার বলুন তো?'

'কি আবার?' নিরুপম হাসল। স্থির দাঁড়িয়ে থেকে সামনে তাকাল। কিছু লোক এই গলির মধ্যে দৌড়তে দৌড়তে ঢুকছে। গলির মুখে দাঁড়িয়ে জটলা করছে আর মজা দেখছে। 'এ একটা রাজনৈতিক মজা। জানেন, আগে শুধু গুণ্ডারাই এই মজার খেলায় মাততো। এখন দেশের সমস্তরকম রাজনীতি খেলাটায় বেশ জমিয়ে বসেছে।' অসিতার দিকে তাকাল। 'যাবেন নাকি মজা দেখতে?'

'পাগল হয়েছেন?' অসিতা হাতঘড়ি দেখল। 'ইস, বড় রাস্তাটা না পেরোতে পারলে দরকারী কাজে যাওয়া যাবে না। অথচ দেরীও হয়ে যাচ্ছে।'

নিরুপম বলল, 'আপাতত আসুন, পাশের রেস্টুরেন্টটায় বসি। একটু পরেই থেমে যাবে মনে হয়, তখন বেরুবেন।'

অসিতা নিরুপমের দিকে তাকিয়ে হাসল। রেস্টুরেন্টের ছোট কেবিনে মুখো-মুখি বসল দুজনে।

চায়ের অর্ডার দিল নিরুপম। 'আর কিছু খাবেন?'

'কিছু না।' হাতের ব্যাগটা টেবিলের ওপর রেখে বলল, 'আপনার ছোট ভাইটি পড়ছে কি রকম?' সাধারণ কথা বলে অসিতা সহজ হতে চাইল।

'ভালই তো মনে হয়।'

'আপনি বুঝি কোন খোঁজই রাখেন না?'

'ছোট ছেলেদের দেখাশোনার, পড়ানোর কাজ তো পুরুষদের নয়।'

অসিতা হাসল। 'তাহলে বড় বড় ছেলেদের পড়াতে ভালবাসেন, বলছেন? কিন্তু স্কুলের উঁচু ক্লাশের ছেলেদের সামলানো খুব শক্ত। ওঃ, আজকাল যা হয়েছে ওরা, বোমা পাশে নিয়ে পড়তে বসে। সে বাড়ির প্রাইভেট টিউটর বলুন, বা স্কুলের মাস্টার বলুন—সব জায়গাতেই।'

বেয়ারা চায়ের কাপ রেখে চলে যেতেই নিরুপম কাপ সামনে টেনে নিতে নিতে বলল, 'মনে হচ্ছে, আপনি খুব ভাবছেন ব্যাপারটা নিয়ে! ভেবে কি হবে? এ সমস্যা তো সমাজের এক ধরনের ক্যান্সার।'

'ভাবব না মানে!' অসিতা চোখ বড় করল। 'আমার দুটি ভাই পড়ে। ওদের জন্যেই সবচেয়ে বেশী ভাবনা।'

চায়ে চুমুক দিল নিরুপম। 'নিন চা খান! কোন ক্লাশে পড়ে ওরা?' নিরুপম আগের প্রসঙ্গ থেকে সরে গিয়ে ঘরোয়া হতে চাইছিল।

'একজন ইলেভেন, আর একজন নাইন-এ। তবে এখনো ওরা তেমন তৈরী হয়নি। কিন্তু হতে কতক্ষণ, বলুন? অথচ জানেন, ওদের মানুষ না করতে পারলে আমাদের সব ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে।' অসিতা হঠাৎ যেন অনেক দূরে চলে গিয়েছিল।

নিরুপম অবাক হয়ে তাকিয়েছিল অসিতার দিকে। 'সব কিছু মানে!'

অসিতা চায়ে চুমুক দিতে দিতে যেন দূর থেকে আবার কাছে চলে এসেছিল। 'আমার পরেই এই দু'টি ভাই। ওদের দুজনকে দাঁড় করাতে না পারলে এদের পরের দু'টি বোন, ছোট ভাই দাঁড়াবে কোথায়? মাকেও তো দেখতে হবে!'

'আপনি একাই সব দেখাশোনা করেন?' নিরুপমের কেন যেন ভাল লাগছিল অসিতার বিবরণটা।

অসিতা হেসেছিল। 'তাতে আর কি? এখন ওরা মানুষ হলে তো!' একটু থেমে বলেছিল, 'জানেন, আজকালকার স্কুলে উঁচু ক্লাশগুলোর কোর্স এমন হয়েছে, একটা টিউটার না রাখলে চলে না। সব সময় তো তা সম্ভবও হয় না।'

'কেন! আপনি তো আছেন?'

'আমি!' অসিতা হেসে উঠেছিল। 'সামান্য বি-এ পাশের বিদ্যেতে তা হয় না।'

নিরুপমও হেসেছিল অসিতার সঙ্গে। 'নাকি ঘরামির ঘরেও জল পড়ার অবস্থা?'

'কিছুটা হয়ত তাই।' অসিতা চুপ করে চা নিঃশেষ করেছিল। নিরুপমকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'আপনি অফিসের পর কি করেন? একটু দেখিয়ে দিন না ওদের। এই যেমন ঘুরতে বেরিয়েছেন, এইরকম ঘুরতে ঘুরতেই কোন-কোনদিন চলে গেলেও কাজ হবে।'

নিরুপম একভাবে তাকিয়ে থেকে অসিতার কথা শুনছিল। অসিতা থামলে বলল, 'অফিস!' হেসে উঠেছিল। 'আমি বিশুদ্ধ বেকার। পিসিমার পয়সায় থাকি, খাই। বাবা-মার সামান্য যা পুঁজি ছিল, ও থেকে হাতখরচ চালাই। আর সন্ধ্যে হলে প্রায়দিনই—' নিরুপম থেমে গিয়েছিল।

'এক-আধটা টিউশানি করেন তো? তবে! আসুন না আমাদের বাড়ি। ভাইদের একটু না হয় দেখবেন।' হাসতে হাসতে বলেছিল, 'চা-টা খাবেন। আর কিছু যদি মনে না করেন, তা হলে বলি, ব্যাপারটা একেবারে নিরামিষ হবে না।'

নিরুপম তখনো হাসছিল। 'ওদের না হয় সন্ধ্যাটা কাটাতে গিয়ে একটু দেখিয়ে দিলাম। কিন্তু—' নিরুপম চুপ করে গিয়েছিল।

অসিতাও চুপ করে থেকে নিঃশেষে চায়ের কাপের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবছিল।

'আমাকে কিছু দিলে যে করুণা করা হবে!' নিরুপম একসময়ে বলেছিল।

অসিতা চোখ তুলে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বলেছিল, 'না নিলে আমাকেও তো এক ধরণের অনুকম্পা করা হয়।'

নিরুপম কিছুক্ষণ তাকিয়ে ছিল অসিতার দিকে। হঠাৎ খুব সহজ হয়ে বলেছিল, 'দু-পক্ষেই যখন একটা অসুবিধে থেকে যাচ্ছে, তখন ব্যাপারটা একেবারে বাদ দিয়ে দিন। আমি তো টিউশনি করি না। আমরা দুজনে যখন এত পরিচিত হয়ে গেছি, তখন না হয় সময় কাটানো আর পুরোনো পড়াশুনাকে একটু ঝালিয়ে নেওয়ার জন্যেই যাবো। সেটা কি খুব খারাপ দেখাবে ?'

অসিতা নিরুপমের সহজ অন্তরঙ্গতায় খুশি হয়েছিল। ওর বাড়ি যাবার জন্যে ঠিকানা দিয়েছিল। নিরুপমের ঠিকানা নেয়নি। এত কথার পরও নিরুপম বেশ কিছুদিন অসিতাদের বাড়ি যায়নি। অসিতাও কোন খোঁজ নেয়নি।

অসিতার কথা প্রায় ভুলতে বসেছিল নিরুপম। ওরকম এক মানসিকতার মধ্যে নিরুপম হঠাৎ এক সন্ধ্যায় চলে গিয়েছিল অসিতাদের বাড়ি। ভীষণ একা, নিঃসঙ্গ লাগছিল সন্ধ্যেটা। নিরুপম মদ খাওয়ার জন্যে মেট্রো সিনেমার পিছনে মদের দোকানে চলে যেতে পারত। হয়ত বা মধুমিতাদের মধ্যে গিয়ে পড়ত। এইরকম এক যন্ত্রণায় নিরুপম অসিতাদের বাড়ি গিয়েছিল। অসিতা বাড়ি ছিল না। টিউশনিতে গিয়েছিল। নিরুপম ওর মা, ভাই তিতু, মিতু ও ছোট ভাই-বোনদের মধ্যে কাটিয়ে চলে এসেছিল। এরপর যতবার গেছে দেখা হয়নি অসিতার সঙ্গে। তিতু, মিতুদের পড়িয়ে চলে এসেছে।

কেন ছুটির দিনে হঠাৎ অসিতাদের বাড়ি নিরুপম গেলে হয়ত দেখা হয়ে যেত অসিতার সঙ্গে। নিরুপমকে তখন নানা গল্প করতে করতে অসিতা বাস স্টান্ড পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে যেত। এইরকম সব মুহূর্তে নিরুপমকে চিনেছিল অসিতা। অসিতাকে একটু একটু করে বুঝতে পারছিল নিরুপম। নিরুপমের কেউ নেই, চাকরী খুঁজছে, মাঝে মাঝে নিঃসঙ্গ হলে মদ খায়, এসব অসিতা শুনেছিল। এসব শুনে অসিতা নিরুপমকে নিয়ে কোন বাড়াবাড়ি করেনি। শুধু একদিন বলেছিল, 'আর যাই করুন শরীরকে কষ্ট দেবেন না। দেখবেন, চাকরী আপনি নিশ্চয়ই পাবেন। আর এতসব মানসিক অস্বস্তি, অশান্তি কেটে যাবে।' একটু থেমে বলেছিল, 'আপনার মত আমিও মানি। বাবার বড় বড় বন্ধু বা বসদের ধরে চাকরী খুঁজতে যাবেন কেন? ওদিকে গেলেই আপনি আবার কোথাও জড়িয়ে পড়বেন।'

নিরুপম কোনদিন মধুমিতাদের প্রসঙ্গ অসিতাদের বলেনি। বলার প্রয়োজন বা অবকাশ দেখা দেয়নি। অসিতা কি বুঝতে পেরেছিল, এভাবে চাকরী খুঁজলে নিরুপম মোটা মাইনের চাকরী পাবে, আর ওর কল্পনা আবার উঁচুতলার মেয়েদের মধ্যে ভেসে যাবে? নিরুপম নিভানো সিগারেটটা অ্যাসট্রেতে ফেলে চুপ করে বসে রইল। বাইরে তাকিয়ে থাকল। নিরুপম মনে মনে বিড়বিড় করল—অসিতার কোন দাবী বা অনুরোধ নেই ওর কাছে। মা, ভাই, বোন, স্কুল, টিউশনি—এসবের মধ্যে ডুবে থাকে অসিতা। বাবার পেনসন, গ্র্যাচুইটি, অল্প কয়েকটি টাকার ইন্সিওরেন্স আর ওর নিজের আয়ের টাকা যোগ করে কেবল কি হিসেব করতে থাকে, কিভাবে সংসারটাকে দাঁড় করাবে? এসব থেকে সরে এসে অসিতার কি কোন চিন্তা নেই? সুদর্শন নিরুপম যে কোন মেয়ের কাছে লোভনীয়—কই, মধুমিতাদের মত সেরকম ভাবে তো অসিতা কোনদিন ওর দিকে তাকায়নি? নিরুপমের একটি চাকরী হোক, নিরুপম যেন শরীরটাকে নষ্ট না করে, এই কথা কি শুধু ভদ্রতার? না, কোন এক সময়ে অসিতার নিজস্ব ভাবনার?

নিরুপম এতবার ওদের বাড়ি গেছে, অসিতা তো একবারও আসতে চাইল না? বাড়ির ঠিকানাও জিজ্ঞেস করেনি! অসিতার কি কোন নিঃসঙ্গতা নেই? আজ থেকে দিন-পনেরো আগে, ওর অসুখে পড়ার ঠিক আগের দিনেই নিরুপমকে বাসে তুলে দিতে আসার সময় অসিতাকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'আপনি ছুটির দিনগুলোয় কি করেন?

'কি আবার? নানারকমের সাংসারিক কাজ।'

'যেমন!'

'কাপড় কাচা, ঘরদোর পরিষ্কার করা, ভাই-বোনদের দেখা! কিছু সেলাইয়ের কাজও পড়ে থাকে। তার ওপর স্কুলের পরীক্ষার খাতাপত্তর তো লেগেই থাকে।'

'বিকেলেও ওই?'

'কখনো বাড়ি বসে থাকি, কখনো বা ওদের নিয়ে একটু বেরোই। টুকটাক বাজারও করতে হয়। এইভাবেই সময় কেটে যায়।'

'আমার কিন্তু বসেই সারাদিনে কাজ থাক, রাত্রে বিছানায় শুলেই ঘুম আসে না। অনেক সময় তো ঘুমের বড়ি খেতে হয়। আপনি এদিক থেকে ভাল ভাগ্য করেছেন।'

'সবদিন তা হয় না।' অসিতা হেসেছিল। 'এত চিন্তা থাকে মাথায়!'

নিরুপম অবাক হয়ে বলেছিল, 'আপনি এখনো সংসারের চিন্তা করেন!'

অসিতা যেন অন্যমনস্ক দৃষ্টি তুলে নিরুপমকে দেখছিল। হঠাৎ চুপ করে গিয়েছিল। বাস আসতে একটু দেরী হয়েছিল। যতক্ষণ অসিতা নিরুপমের পাশে ছিল, কেন যেন একটি কথাও বলেনি সেদিন!

নিরুপম আজও অসিতাকে বুঝতে পারে নি। কিন্তু কেন কেন মনে হয়, অসিতা বুঝি বা সোনালি মধুমিতা, বন্দনাদের কথা ভুলিয়ে দিচ্ছে। আজকের স্বপ্নটা কি তাই এমনভাবে জড়িয়ে গেল?

'দেখ, কাকে এনেছি!'

নিরুপম চমকে সামনে তাকাল। দেখল, দরজার সামনে সদ্য স্কুল-ফেরত শম্ভু দাঁড়িয়ে পিছনে অসিতা। 'আপনি!' নিরুপম অবাক হল 'আসুন। শম্ভু, চেয়ারটা পরিষ্কার করে দাও, উনি বসবেন।'

শম্ভু এগিয়ে এসে চেয়ারের ওপর থেকে কাপড়-জামা সরিয়ে রাখল। অসিতা বসতে বসতে বলল, 'আপনি তো ঠিকানাও দেননি। স্কুল খুঁজতে হবে এলাম।'

'পুজোর ছুটির পর আজই স্কুল খুললো তা হলে!'

অসিতা চকিতে ঘরটায় চোখ বুলিয়ে হাসতে হাসতে বলল, 'আপনি সেই যে সপ্তাহ-দুই আগে গিয়েছিলেন, তার পর আর দেখাই নেই। তিতু, মিতু তো আমাকে খেয়ে ফেলল। জানতামই না আপনার শরীর খারাপ। তা-ছাড়া ঠিকানাও দেননি, যে ওরা এসে একবার খোঁজ নিয়ে যাবে।' শম্ভুর দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বলল, 'স্কুল খুলতে শম্ভুর কাছে শুনেই দেখা করতে এলাম।'

নিরুপম অসিতাকে দেখছিল। বলল, 'ভালই করেছেন।' শম্ভুকে বলল, 'তুমি যাও শম্ভু, স্কুলের জামা-প্যান্ট ছাড়ো। মাকে বলো, তোমাদের দিদিমণি এসেছেন।' শম্ভু চলে যেতে বলল, 'আজই সন্ধ্যা দিকে একবার আপনাদের বাড়ি যাবো ভাবছিলাম।'

'যেতেন কি করে? বিছানাই ছাড়েননি এখনো!'

সকল ঋতুতে অপরিবর্তিত ও অপরিহার্য পানীয়

চা

কেনবার সময় 'অলকানন্দার' এই সব বিক্রয় কেন্দ্রে আসবেন

অলকানন্দা টি হাউস

৭, পোলক স্ট্রীট কলিকাতা-১

২, লালবাজার স্ট্রীট কলিকাতা-১

৫৬, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ কলিকাতা-১২

॥ পাইকারী ও খুচরা ক্রেতাদের অন্যতম বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান ॥

হেসে উঠলো নিরুপম। 'না, না, এত দুর্বল ভাববেন না। যেরুবার মত শক্তি আছে।'

'কি হয়েছিল?'

'কালিক দিনটা ভয়ঙ্করভাবে দেখা দিয়েছিল হঠাৎ। তার সঙ্গে জ্বর।'

অসিতা একটু অন্যমনস্ক হল। একটু বা গম্ভীর। কয়েক মুহূর্ত পরেই সহজ হয়ে বলল, 'আবার মদ খেয়েছিলেন নিশ্চয়ই। মোটেই ভাল করেন নি।'

'নাঃ, ও পাড়ায় যাওয়া কবে ছেড়ে দিয়েছি! শরীরটাকে ভাল করতে হবে না?' নিরুপম হেসে হাল্কা করতে চাইল প্রসঙ্গটা।

'মাঝে-মাঝে আপনার এই কথা একটুও বিশ্বাস হয় না। আপনিই তো বলেন, কাঁকা মনে হলেই মদের মত ওষুধ কিছুটা খেয়ে নিতে হয়। রোগ সেরে যাবে!' অসিতা মুখের ভাব নির্বিকার করে রাখল। ঘরের চার পাশ যেন খুঁটিয়ে দেখছে অসিতা।

অসিতা যেন অন্যমনস্ক। নিরুপমের তাই মনে হল। চুপ করে থেকে অসিতাকে দেখল। সেই পরিচিত পোশাক। হাতে বড় ব্যাগ, আর ফোল্ডিং ছাতা। স্কুলের পর সারা শরীরে ক্লান্তি নিয়ে বসে আছে। মাথার দীর্ঘ চুলের ভারী অগোছালো খোঁপা যেন পিঠের ওপর এখনি ভেঙে পড়বে। মধুমিতাদের মত সুন্দরীও নয়, আবার চপলতাও কোথাও নেই! অসিতা সুশ্রী পরিচ্ছন্ন। এত ক্লান্তিতেও সেই সুশ্রী ভাব চেহারা থেকে এতটুকু মুছে যায় নি। চিবুকের দু পাশ থেকে মসৃণ চোয়ালের রেখায় এক ধরনের গাম্ভীর্য সব সময়েই অসিতার প্রচ্ছন্ন ব্যক্তিত্বকে স্পষ্ট করে রাখে।

নিরুপম কথা বলল, 'কিছু বলছেন না যে! আমার কথা বিশ্বাস না করে নিশ্চয়ই রেগে গেছেন।'

অসিতা ভিতরে চমকে উঠল। অপ্রস্তুত হয়ে বলল, 'সে কি! না, না, আপনার ওপর রাগ করব কেন?' অসিতার অন্য কি কথা মনে পড়ায় হাতঘড়ি দেখল। 'আমি এবার উঠব।'

'বসুন, বসুন, পিসিমার সঙ্গে পরিচয়ই হল না!'

অসিতা একভাবে বসে থেকেই বলল, 'আপনি কিন্তু আরও কদিন রেস্ট নিন। তিতুর তো রেজাল্ট বেরুবার সময় হয়ে এল। ওর আর তাড়া কি? মিতুকে বলব এখন, পরে যে কোন দিন আসবেন।'

'তা হলে ওদের আর একটা কথাও বলবেন, সামনের মাসের এক তারিখ থেকে একটা চাকরী পেয়েছি।'

'সত্যি!' অসিতা অবাক হল, 'কই আমাকে তো বলেন নি!'

'এই তো বললাম' নিরুপম হাসল, 'এটাও যদি বিশ্বাস না হয়, দেখুন।' নিরুপম চিঠিটা এগিয়ে দিল।

অসিতা হাসতে-হাসতে চিঠিটা নিল। মন দিয়ে পড়ে নিরুপমের দিকে তাকাল। 'খুব ভাল খবর নিরুপমবাবু। এই চাকরীই আপনাকে বাঁচাবে।'

'মাঝে-মাঝে মনে হয়, আপনার কথাই হয়ত ঠিক হবে। দেখা যাক।'

অসিতা নতুন করে যেন নিরুপমকে দেখতে লাগল।

পিসিমার সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর অসিতা সামান্য কিছু খেয়ে নিরুপমের বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ল। বাইরে সন্ধ্যার ভূমিকা। নিরুপম ওকে কিছুটা এগিয়ে দিল। ফেরার পথে নিরুপম একটা কথা ভাবল, এতদিন ওর চারপাশে এক ভয়ঙ্কর বর্ণহীন শূন্যতা ওকে ঘিরে রেখেছিল। ওকে যেন সমস্ত পরিচিত-অপরিচিত পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল। এখন সে শূন্যতা নেই। যেন এক অন্ধকার-এর স্তূপ ঘন মেঘের মত অতিমন্থর গতিতে ভেসে এসে সেই ফাঁকটায় স্থির হয়ে গেছে। নিরুপমের এই প্রথম পাওয়া চাকরীর অনুভূতি, পুরনো মদের আকর্ষণ, অসিতার সান্নিধ্য, মধুমিতার স্মৃতি, নিরুপমের নিজেরই কয়েকটা ভাবনা—সব কেমন জটিলতম মিশ্রণে সেই অন্ধকারের মধ্যে পাক খাচ্ছে। নিরুপমের অনেক দিন পরে নিজেকে বড় অসহায় লাগছে। এখনি বাড়ী ফিরতে ভাল লাগছে না। দূরের এক সবুজ তৃণাচ্ছাদিত পার্কের দিকে পা বাড়াল নিরুপম।

একদিন সন্ধ্যায় বৃষ্টি কিছুক্ষণ থেমে থাকায় নিরুপম অসিতাদের বাড়ী চলে এল। গতকাল সন্ধ্যা থেকে মেঘ জমতে শুরু করেছিল। বৃষ্টি হয় নি। আজ সকালেও মেঘ থমথমে, গুমোট ছিল চারদিকে। বৃষ্টি হয় নি। বেলা একটু বাড়তেই মুষল ধারে বৃষ্টি হয়ে গেছে একটানা এক ঘন্টার ওপর। তার পর থেকে সারা দিনে বিরাম নেই। কখনো গুঁড়ি-গুঁড়ি, কখনো বা ভীষণ বেগে বৃষ্টি নেমেছে। সারা শহর জলে ভাসছে যেন।

নিরুপম সারা দিন বাড়িতে কাটিয়ে সন্ধ্যার দিকে বৃষ্টি বন্ধ হতেই বেরিয়ে পড়ল। নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছিল নিজেকে। অসিতাদের বাড়ীর বাইরের দরজা খোলা ছিল। নিরুপম বাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়ল।

'আরে, আসুন!' বিস্মিত চোখে অসিতা নিরুপমকে দেখল। 'এই বৃষ্টিতে বেরিয়ে পড়েছেন?'

'এলাম। তিতুর খবর কি?' বলতে-বলতে নিরুপম অসিতার ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়াল।

'ফার্স্ট ডিভিশন। আপনার জন্যেই কিন্তু!'

'ওসব কথা থাক।' ঘরের মধ্যে চার-পাঁচটি মেয়ে বসে আছে। 'ওরা কারা? ছাত্রী নিশ্চয়ই।'

'আমার স্কুলের ছাত্রী। সবাই পাশ করেছে। এইমাত্র জেনেই দেখা করতে এসেছে।'

'এই বৃষ্টিতে! এলো কি করে?' নিরুপম ওদের দিকে তাকাল।

অসিতা উত্তর দিল, 'ওরা সব কাছাকাছি থাকে। তাছাড়া বুঝতেই পারছেন, আজ ওদের কি আনন্দের দিন। রিক্সা করেই চলে এসেছে।'

মেয়েগুলি লজ্জায় মাথা নিচু করল। নিরুপম ওদের দিকে তাকিয়ে রইল। অসিতা মেঘ ডাকার শব্দ শুনতেই বলল, 'শোন, তোমরা এবার যাও। মনে হচ্ছে এখনি বৃষ্টি নামবে। স্কুলে তো আসছ? দেখা হবে আবার।'

আবার অসিতাকে প্রণাম করে মেয়েগুলি বেরিয়ে গেল। ওরা চলে যেতেই নিরুপম অবাক হয়ে বলল, 'বাড়ীতে আর কাউকে দেখছি না কেন?'

'ও, বলা হয় নি। সবাই আজ সকালেই দমদমে মামার বাড়ী গেছে। আজই ফেরার কথা, কিন্তু একটু আগে রেডিওয় যা বলল, তাতে তো দমদম জলের নীচে শুনলাম। কেউ আসতে পারবে বলে মনে হচ্ছে না।'

'তিতু তাহলে পরীক্ষার খবর এখনো পায় নি।'

অসিতা হেসে উঠল। 'নিশ্চয়ই ওখানে এতক্ষণে পেয়ে গেছে। আমার এক মামাতো ভাইও পরীক্ষা দিয়েছে।'

বাইরে জোরে বৃষ্টি নামল। 'ইস্, আপনি যাবেন কি করে?'

নিরুপম হাসল। 'আমি ঠিক চলে যাবো। কিন্তু কেউ না এলে আপনি একাই এ বাড়ীতে থাকবেন?'

'ঠিকে ঝিটাকে দুপুরে বলে রেখেছি, আমার এখানে আজ রাতটা থাকবে। খেয়ে-দেয়ে আসবে বলেছে।' বলতে-বলতে অসিতা একটা জানলার নীচের দিকটা বন্ধ করে ছিটকিনি এঁটে দিল। 'আপনি একটু বসুন। আমি বরং চাটা করে আসি। ছাত্রীরা এসে পড়ায় দেরী হয়ে গেল। অবশ্য আপনার যাওয়ার তাড়া থাকলেও তো যেতে পারবেন না! যা বৃষ্টি!'

নিরুপম জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল একবার। 'ঠিক আছে, আপনি আসুন তো, আমি বসছি।'

দুটি ঘরের মাঝের দরজা দিয়ে যাবার সময় অসিতা কি ভেবে থমকে দাঁড়াল। 'তিতু পাশ করায় আপনার খাওয়া পাওনা আছে। আজ বাইরে থেকে কিছুই আনা

সম্ভব নয়। তবে ছাত্রীরা প্রণাম করতে এসে মিষ্টি দিয়ে গেছে। ভাগ্য আমাদের ভালই। ওটাকেই বরং দুজনে মিলে কাজে লাগানো যাবে। বসুন!' নিরুপমকে একবার দেখে নিয়ে অসিতা চাপা উল্লাস নিয়ে বেরিয়ে গেল।

নিরুপম চুপ করে বসে রইল। অসিতার ব্যবহারের সহজ অন্তরঙ্গতা নিরুপমকে যেন কোন এক জায়গায় আশ্বস্ত করছে। শিশুকে শান্ত করতে মা যেমন করে মাথায় হাত রাখে, অসিতার কথা, আচরণ অতি-সংগোপনে নিরুপমকে সে রকম কোন তন্দ্রার আরামে শান্ত করছে।

নিরুপম সিগারেট ধরালো। মাথা ভার বিকেলেই বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়েছিল। এখনও কমে নি। বিকেল হলেই মাথা ধরে। আজ এই মাথা ধরায় নিরুপম যেন ভিতরে নিজেকে সামলাতে পারছিল না। খালাসি-টোলা বা অন্য কোন মদের আড্ডায় চলে যেতে পারত। মাঝে-মাঝে মধুমিতাদের কথাও মনে হচ্ছিল। নিজের মধ্যে কেন যেন চাপা উত্তেজনা বোধ করছিল। বাড়ী থেকে বেরুবার সময়ও ভাবে নি এখানে আসবে। মাঝপথে হঠাৎ ঠিক করে চলে এসেছে।

অসিতার নির্জন ঘরে বেতের চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে রইল। দৃষ্টি জানালার বাইরে। বৃষ্টির শব্দ যেন বাইরের সমস্ত কিছু থেকে নিরুপমকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে চাইছে। হঠাৎ দমকা হাওয়া বইল। আর সঙ্গে-সঙ্গে মাঝের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। এ ঘরে আলো। ও পাশের ঘরে অসিতা আলো জেলে রেখে যায় নি।

কতক্ষণ অন্যমনস্ক ছিল, নিরুপম জানে না। পাশের ঘর থেকে অসিতার উচ্ছ্বসিত কণ্ঠস্বর শুনল, 'কি, আছেন তো, নাকি চলে গেলেন?' হাসছে অসিতা। 'এইবার যাচ্ছি। আমার কিন্তু খুব খারাপ লাগছে, আপনি একা বসে আছেন'

নিরুপম বুঝল, অসিতা এইমাত্র বাথ-রুম থেকে ঘরে এল। দপ্ করে আলো জ্বলে উঠল ঘরের। নিরুপম নিজের মনে হাসল। সিগারেটের শেষ অংশটায় জোরে কয়েকবার টান দিয়ে ফেলে দিল।

আর মুহূর্তের মধ্যে আর একটা দমকা হাওয়া মাঝের দরজায় ধাক্কা দিল। একটা কপাট খুলে গেল। আর একটা কপাটের মাথার ওপরের ছিটকিনি আটকে গেছে। নিরুপম চকিত দৃষ্টিতে ওঘরের দেয়ালে একটি নগ্নমূর্তির ছায়া দেখল। কয়েক মুহূর্ত স্থির থাকার পরেই ওঘরের আলো নিভে গেল। মাঝের দরজার এপাশের ঘর আলোকিত, ওপাশে ঘন অন্ধকার। শুধু অল্প কিছু আলোর রেখা চৌকাঠের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু ঘন মেঘ আর তুমুল বর্ষার ছায়ায় ঢাকা ওঘরের অন্ধকারকে এতটুকু তরল করতে পারে নি।

নিরুপম এমনভাবে বসে আছে, যেভাবেই হোক, ওঘরের অন্ধকার ওর চোখে পড়বেই। স্থির, চাপা উত্তেজনার অবস্থায় বসে রইল নিরুপম। ও ঘর নিঃসাড়। এমন নিস্তব্ধতা, অন্ধকার এ বাড়িতে কোনদিন নিরুপম অনুভব করে নি। এখন এ বাড়ীতে নিরুপম-অসিতা ছাড়া কেউ নেই। বৃষ্টি যেন ওদের দুজনকে এক দ্বীপের মধ্যে রুদ্ধশ্বাসে আটকে রেখেছে। সামনের অন্ধকার নিরুপমকে কি ভীষণ ভয় দেখাচ্ছে! 'নিরুপমের বুকের মধ্যে কয়েকটা অতিরিক্ত শব্দ হল যেন। অসিতা দরজাটা বন্ধ করছে না কেন? বাসন্তিকা বলেছিল, 'নিরুপম এমন বৃষ্টির দিনে আমার দিকে তাকিয়ে দেখ।' নিরুপমের চিবুকে বাসন্তি-কার নগ্ন বুকের স্পর্শ ছিল তখন। নগ্ন-দেহ সোনালি বিকেলের গা-ধোয়া শেষ করে কাছে এসে বলেছিল, 'দেখ, দেখ, নিরুপম, আমি কত সুন্দর! আলো জ্বলছে বলে ভয় পাচ্ছ? বেশ তো, আলো নিভিয়ে দিলাম। এবার দেখ। বৃষ্টিতে ধোয়া বাইরের আলোয় তোমায় কি সুন্দর লাগছে নিরু-পম। আহ!' মধুমিতা সন্তর্পণে ঘরে ঢুকে আলো নিভিয়ে দিয়েছিল। 'বেড়ালের মত পা ফেলে নিরুপমকে জড়িয়ে ধরে-ছিল। সদ্য গা-ধোয়ার সাবানের গন্ধ সারা শরীরে—'নিরুপম, এই নিরুপম, আমাকে একবার জড়িয়ে ধরো, প্লীজ, লক্ষ্মীটি। আমাকে একটু আদর করো। এমন বৃষ্টির দিনে এ ঘরে এখন কেউ আসবে না। নিরুপম, এই নিরুপম, এই, এই—'

'না, না, আমি ভিতরে মরে গেছি, ফুরিয়ে গেছি। বিশ্বাস করো আমার কিছু ভাল লাগছে না।' নিরুপম দু হাতের মধ্যে মাথা রাখল। দু হাতের মুঠোয় চুলের গোছা জোরে টানতে লাগল। 'অসিতা, তুমি যাও, তুমি সরে যাও আমার কাছ থেকে। এভাবে এসো না। বিশ্বাস করো, আমি এসব ভাবিনি। না, তুমি এরকম কখনই হতে পার না!'

'এই যে নিরুপমবাবু, কি হল আপনার?' অসিতা সামনে দাঁড়িয়ে আছে মনে হতেই নিরুপম আচমকা অসিতার দিকে তাকাল। 'আপনার কি মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছে? শরীর খারাপ?' অসিতার কণ্ঠস্বর উদ্বিগ্ন। সামনে একটু ঝুঁকল অসিতা।

নিরুপম অসিতাকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখল। অপ্রস্তুত বোধ করতেই বলল, 'না, না, ও কিছু না, এমনি মাথাটা ধরেছে।'

'ওহ্, তাই বলুন। আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। দু-তিনবার ডেকে সাড়াই পাচ্ছিলাম না!' ভাবলাম, পেটের পেনটা বুঝি হঠাৎ আরম্ভ হয়েছে। আপনি যা চাপা, বলেন না তো!'

'তাই নাকি?' নিরুপম অসিতার দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। বিকেলের গা-ধোয়ার পর অসিতাকে অত্যন্ত স্নিগ্ধ মধুর লাগছে। নিরুপম অসিতার সান্নিধ্য থেকে সাবান আর প্রসাধনের গন্ধ পাচ্ছে। নিরুপম হাসল।

'বসুন, চা করি। বেশী দুধ দিচ্ছি বরং। আদা দিয়ে চা খাবেন? মাথাটা কিন্তু ছেড়ে যাবে। আমি তো যখনি মাথা ধরে, আদা দিয়ে চা খাই। ওসব ট্যাবলেট আমার সহ্যই হয় না।'

'তাই করুন।' নিরুপম চেয়ারে হেলান দিল। বড়ুল করে একটা সিগারেট ধরাল।

অসিতা রান্নাঘরে যাচ্ছিল, থমকে দাঁড়িয়ে নিরুপমের দিকে তাকাল। 'আপনি খুব সিগারেট খান। এত খাবেন না। আপনার পেটের পেনটা কিন্তু খুব খারাপ!'

'আপনার ডাক্তারটি অবশ্য খারাপ নয়। আমি দেখছি, কিছুটা মেনে চললে উপকার হয়।'

অসিতা হেসে উঠল। ঠাট্টা করছেন? পরে বুঝবেন। আচ্ছা বসুন, এখনি চা করে আনছি।'

চা সামনে নিয়ে নিরুপম অসিতা অনেকক্ষণ গল্প করল। অসিতা ওর সংসার, স্কুল, ছাত্র-জীবনের সমস্ত কথা উজাড় করে বলল। নিরুপম মন দিয়ে শুনল। কথা বলতে-বলতে এক সময়ে হঠাৎ অকারণ ওরা দুজনেই চুপ করে গেল। কখন বৃষ্টি থেমে গেছে, আকাশে মেঘ ছিঁড়ে-ছিঁড়ে ভাসতে শুরু করেছে, বাতাস বন্ধ হয়ে গেছে, টের পায় নি দুজনেই। বাইরে ঝি-এর কড়া নাড়ার শব্দ কানে আসতেই দুজনে সচকিত হল।

নিরুপম হাতঘড়ি দেখল। 'ইস, রাত অনেক হয়েছে! দশটা? উঠি।' নিরুপম উঠে দাঁড়াল। 'আপনাকে শুধু-শুধু বসিয়ে রাখলাম।'

'বা, আপনি কোথায় বসিয়ে রাখলেন? আমিই তো আজে-বাজে সব বকে আপনাকে বিরক্ত করছিলাম।'

'দেখুন, বাইরে কখন বৃষ্টি থেমে গেছে বুঝতেই পারিনি আমরা।'

অসিতা হাসল। ঝি-এর কড়া নাড়ার শব্দে খিল খুলতে এল অসিতা। নিরুপম সঙ্গে সঙ্গে চলে এল।

বাইরে পা দিয়ে নিরুপম বলল, 'চলি। তিতুরা এলে আসব।'

'নিশ্চয়ই। না এলে ওরাই ধরে আনবে আপনাকে। বাড়ি তো আমি চিনে গেছি, আর পালাতে পারবেন না।'

নিরুপম অসিতার ঘরোয়া ভঙ্গী দেখছিল। হাসল। অসিতাও মৃদু হাসল। নিরুপম আর দেরী না করে পা বাড়াল বড় রাস্তার দিকে।

চাকরীর প্রথম দিনেই নিরুপম অফিস থেকে সোজা চলে এল অসিতার বাড়ি। বাইরের দরজা বন্ধ। নিরুপম কড়া নাড়ল।

দরজা খুলে নিরুপমকে দেখেই তিতু একটু অবাক হল। খুশি হয়ে বলল, 'আপনি এসে গেছেন, খুব ভাল হয়েছে।'

বাড়ির মধ্যে পা দিতে দিতে নিরুপম বলল, 'কেন বল তো?'

'দিদির জ্বর। বাড়িতে কেউ নেই। আমি আটকে পড়েছি। আপনি এলেন। আমি তবু একটু বেরুতে পারব।' নিরুপমের পিছনে কথা বলতে বলতে তিতু দিদির ঘরের দরজা পর্যন্ত এল।

'আর সব কোথায়?' নিরুপম ঘরে ঢোকার আগে থমকে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল।

'দুদিন হল মা আর সকলকে নিয়ে মামার বাড়ি গেছে। কাল ছোটমামার ছেলের অন্নপ্রাশন।'

নিরুপম ঘরে ঢুকল। অসিতা ওদের দিকে তাকিয়ে কথা শুনছিল।

তিতু বলল, 'আমি তাহলে বেরুচ্ছি দিদি। ফেরার সময় ডাক্তারবাবুর কাছে ঘুরে আসব। তুমি যা বলেছ, ঐ বললেই হবে তো?'

অসিতা শুয়ে শুয়েই ঘাড় নাড়ল। 'তাড়াতাড়ি ফিরবি। এখানে অনেক কাজ আছে।'

তিতু বেরিয়ে গেল। বাইরের দরজা জোরে বন্ধ করার শব্দ এল। অসিতা বিছানার ওপর উঠে বসল। 'আপনি এসে খুব অবাক করে দিয়েছেন। আপনার আজ অফিসে জয়েনিং ডেট না?'

'ওখান থেকেই আসছি।' বিছানার সামনে চেয়ার টেনে নিয়ে বসল নিরুপম। 'আপনার স্কুলে একটা ফোন করেছিলাম।'

'সেকি! কখন?' অসিতা সত্যি অবাক হল। মুখের ভাব এমন, কথাটা ও কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাইছে না যেন।

'বিশ্বাস করছেন না!' নিরুপম হাসল। 'গাইড থেকে নম্বর বের করে সত্যিই ফোন করেছিলাম। ওখানেই শুনলাম, আপনি স্কুলে গিয়েই চলে এসেছেন। শরীর নাকি খুব খারাপ? কি ব্যাপার!'

অসিতা অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল। 'কাল সকাল থেকেই শরীরটা ম্যাজ ম্যাজ করছিল, আজ স্কুলে কোনরকমে গিয়েছিলাম। মাইনেটা নিয়েই স্কুল থেকে বেরিয়েছি। কয়েকটা কাজ সেরে সেই যে শুয়েছি, এখন মনে হচ্ছে, আরও কিছুদিন শুইয়ে রাখবে।'

'কেন?'

'ভীষণ গা-হাত-পা কামড়াচ্ছে। মাথাটা যেন ছিঁড়ে পড়ছে। কদিন জলে ভিজে-ছিলাম। ইনফ্লুয়েঞ্জাই ধরল।'

নিরুপম একটু ঝুঁকে পড়ল। 'আপনি বসে আছেন কেন? শুয়ে পড়ুন।'

'তাতে কি হয়েছে?'

'না না, শোন তো, না হলে আমার খুব খারাপ লাগছে।'

অসিতা শুয়ে পড়ল।

'আমি কতদিন দেখছি আপনাকে, কোনদিন অসুস্থ হয়ে বিছানায় শুতে দেখিনি। কথাটা ভেবে মাঝে মাঝে খুব ভাল লাগত। অথচ আপনি কি ভীষণ পরিশ্রম করেন!'

'তাহলে আপনার অভিশাপেই—' খুক খুক করে হেসে ফেলল অসিতা।

নিরুপমও হাসল। 'অভিশাপ নয়, বলুন ছোঁয়াচে রোগ। আমাকে তো যখন-তখন বিছানা নিতে হয়। যেমন মিশছেন, তার ফল।' নিরুপম অসিতার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল।

'অফিস করেছেন। কি রকম লাগল?'

'আপনার কথাই ঠিক হবে। মনে হচ্ছে, অফিস আমায় বাঁচিয়ে দেবে।' নিরুপম অসিতাকে দেখতে দেখতে বলল, 'আপনার চোখ ছলছল করছে, জ্বর বেশী বুঝি!'

'নাহ, জ্বর বেশী না। তিতু তো থার্মোমিটারে দেখল। আসলে গা, হাতে ভীষণ যন্ত্রণা। মাথা ভার। জ্বর হয়তো পরে আসবে।'

'চা খাবেন? খুব গরম চা খান না।' নিরুপম হঠাৎ বলল।

'পাবেন কোথায়?' অসিতা উৎসুক চোখে তাকাল।

'কেন! আমি করে দিচ্ছি। আপনার মা বা আপনি যেরকম গোছানো, চা-এর সরঞ্জাম খুঁজে নিতে দেরী হবে না।' নিরুপম চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

'না, না, আপনি করবেন কি? কিছু জানেন না।' অসিতা অপ্রস্তুত বোধ করল। উঠে বসবার চেষ্টা করে বলল, 'তিতু আসুক না, ও আপনাকে চা করে দেবে এখন। তখনি খাব। আপনি অফিস থেকে আসছেন।'

'আপনি উঠবেন না, চুপ করে শুয়ে থাকুন। আমি ঠিক করে আনছি। আপনি আমাকে কি ভাবেন বলুন তো? দেখুন, যদি দশটা-পাঁচটা নিয়মিত অফিস করতে পারি, ওভারটাইম করি, তবে দরকার পড়লে এসব কাজও করতে পারি।' নিরুপম আর কোন কথা না বলে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

অসিতা অবাক হয়ে নিরুপমের বেরিয়ে যাওয়া লক্ষ্য করল।

চা করে নিয়ে নিরুপম যখন অসিতার ঘরে ঢুকল, অসিতা তখন ঘুমিয়ে পড়েছে। শরীরটাকে একটু ছোট করে পাশ ফিরে শুয়েছে। পায়ের বালিশটাকে জড়িয়ে নিয়েছে ঘন করে। নিরুপম আস্তে বেতের টেবিলটা টেনে আনল। চায়ের কাপদুটো টেবিলের ওপর রাখল। অসিতা ঠাণ্ডা চা খেতেই অভ্যস্ত। নিরুপম তাই এখনি ঘুম ভাঙাতে চাইল না। চুপ করে অসিতার সামনে চেয়ারে বসল।

নিরুপম এই প্রথম অসিতাকে পরিষ্কার করে দেখল। পাখার বাতাসে শুকনো চুল অসিতার নিদ্রিত মুখের ওপর মাঝে মাঝে উড়ে এসে পড়ছে। অসিতার সুশ্রী কোমল মুখে শান্ত স্বভাব মাখানো। গরমের দিনে ভিজে মাটির ওপর গাছের ছায়ার মত। তারই মধ্যে মুখের রেখায় নিরুপম কর্তব্য, দায়িত্ববোধ, অভিজ্ঞতা, ক্লান্তি, দুঃখ—সমস্ত কিছুর সূক্ষ্ম ছায়াগুলি লক্ষ্য করল।

আজ অফিসের পর নিরুপমের মাথা ধরেছিল। এক চাপা অস্বস্তিতে নিরুপম শূন্য বোধ করছিল। অসিতার বাড়ি আসার পথে মনে হয়েছিল, সেই শূন্যের মধ্যে চাপা অন্ধকার স্থির হতে শুরু করেছে। নিরুপম সেই জটিল অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে যেন অসিতাকে দেখতে লাগল।

অসিতার ঘর নিখুঁত হয়ে চোখে পড়ল। সুন্দর গোছানো। টেবিলের ওপর এ-মাসের ইলেকট্রিক বিল। আজই জমা দিয়ে এসেছে। ধোবার খাতা খোলা। নানা-রকম অঙ্ক কষেছে। মাসের সাংসারিক হিসেবের খাতায় অসিতা কি সব লিখেছে যেন! বাড়ি ভাড়া, বাজার, সরকারী দুধ, তিতু-মিতুদের স্কুল-কলেজের মাইনে, ঝি-জমাদারদের টাকা, দোকান, টয়লেট, মায়ের চশমার কাচ বদলানোর খরচ—আরও কত কি সব হিসেব করেছে। সবশেষে নিজের হাত-খরচ, অন্য কি সব খরচের অঙ্ক লিখেছে অসিতা। নানা হিজিবিজি কাটা। নিরুপম হাসল। ঘরের কোণে চারটি কফি রাখা। অসিতা ফেরার পথে কিনে এনেছে, এখনো রান্নাঘরে নিয়ে যায়নি।

নিরুপম অসিতার দিকে তাকাল। এই ঘরে বসে অসিতাকে বড় আপন মনে হল। অসিতা ঘুমোতে ঘুমোতে চাপা গোঙানির শব্দ করল। নিরুপম ঝুঁকে কপালে হাত রাখল। অসিতা চোখ মেলল হঠাৎ।

'কষ্ট হচ্ছে? তোমার গা কিন্তু বেশ গরম!'

অসিতা নিরুপমের দিকে তাকিয়ে থাকল। দুচোখে বিস্ময়। হাসল ঈষৎ। কিছুক্ষণ নিরুপমকে দেখে বাঁ হাত দিয়ে নিরুপমের হাতটা কপালে চেপে ধরে থাকল। 'হাতটা এখানেই থাক, খুব আরাম লাগছে।' গলা নামিয়ে বলল অসিতা।

নিরুপম অসিতার ডান হাতটা হাতের মধ্যে নিল। নরম হাতের তলায় কোথাও কোথাও শক্ত লাগছে। কড়া পড়েছে অসিতার হাতে। নিরুপম উজ্জ্বল আলোয় আবৃত অসিতার মুখমণ্ডলে দৃষ্টি রাখল। হাতড়ে কিছু খুঁজছে। 'চা খাবে না? ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।'

'থাক, পরে খাবো। তুমি খেয়েছো তো?' অসিতা বলল।

'তাহলে থাক, পরেই খাবো।'

চোখে চোখ রেখে দুজনেই মৃদু হাসল।

এই আমাদের দেশ

গীতি-গঙ্গার সঙ্গম
জয়দেব-কেঁদুলির মেলায়

ললিতলবঙ্গলতাপরিশীলন-
কোমলমলয়সমীরে
মধুকরনিকরকরম্বিতকোকিল-
কূজিতকুঞ্জকুটিরে

গীতগোবিন্দের পদাবলী দিয়েই কেঁদুলি দেখা শুরু করছি। যদিও বসন্ত এখন দোরগোড়ায় আসেনি, লবঙ্গলতাও বাতাসকে আলিঙ্গন করছে না, ভ্রমর-কোকিলও সুরে মেতে ওঠার অবকাশ পায়নি তবু কেবলই মনে হচ্ছে, জয়দেব-কেঁদুলিতে সব সময়েই সুর খেলা করছে। কেঁদুলি আসার এখন সময় নয়, এখন কেঁদুলি দেখে মন ভরবে না। আপনারাও এখন আসবেন না, পৌষ-সংক্রান্তির মেলার সময় আসবেন, তখন জমজমাট। শীতে ঠকঠক কাঁপতে কাঁপতে জয়দেবের গ্রাম দেখার আলাদা আনন্দ আছে। বীরভূম যখন এসেই পড়েছি, তখন ঘুরেই যাই এই ভেবে আসা।

বর্ধমান-বীরভূম সীমান্তে অজয় নদের তীরে এই গ্রাম। অজয়ের স্রোতধারার সঙ্গে সুরের ঝর্ণাধারা মিলেমিশে কেমন এক হয়ে গেছে। রাজা লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি ছিলেন জয়দেব। সে আজ থেকে আটশো বছরের কথা। আটশো বছরের প্রাচীন গ্রাম কেঁদুলি এখনো তার ঐতিহ্য বুকে নিয়ে টিঁকে আছে। মেলারও প্রাচীনতা প্রায় একইরকম। এত পুরনো মেলা আর কোথাও আছে বলে আমার জানা নেই।

এমনিতেই বীরভূমে বারো মাসে তের পার্বণ লেগেই আছে। ধর্মঠাকুরের প্রাধান্য এখানে বেশি। অবশ্য সিউড়ি শহরে উৎসবের জাঁকজমকটা বেশি। ধর্মঠাকুর নিয়ে প্রচুর কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। প্রায় দেড়শো বছর আগে নাকি ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় এখানকার খুব প্রভাবশালী উকিল ছিলেন। সে সময় সেহারাপাড়ায় ধুমধামে ধর্মপুজো হত। কী কারণে একবার মনের অমিল ঘটে। ত্রৈলোক্যবাবুর উৎসাহে আলাদা ধর্মপুজোর ব্যবস্থা হল। কোন একটা মুদিখানা দোকান থেকে বেশ ভারি একটা পাথর তেল-সিঁদুরে ডুবিয়ে এনে ঢাকঢোল বাজিয়ে ধর্মঠাকুরের প্রতিষ্ঠা হয়। ত্রৈলোক্যবাবু পুজো বাবদে এক টাকা চাঁদা দেন। অবশ্য তখনকার দিনে এক টাকায় পুজোর কোন অসুবিধে ছিল না। সেই থেকে ধর্মপুজোর সময় সর্বপ্রথম মুখোপাধ্যায় পরিবার থেকে একটি টাকা নেওয়ার প্রথা চলিত আছে।

এইরকম দলাদলি থেকেই ধর্মঠাকুরের সংখ্যা বীরভূমে প্রচুর। সিউড়িতে সাধারণত ধর্মপুজো হয় আষাঢ় বা শ্রাবণ পূর্ণিমায়। কিন্তু বৈশাখ থেকে শ্রাবণ পূর্ণিমা পর্যন্ত বীরভূমের অন্যান্য জায়গায় ধর্মপুজোর ধুম পড়ে। মজাটা হোল যে পাড়ায় ধর্মপুজো হল বৈশাখী পূর্ণিমায়, পাশের পাড়ায় তখন সময় বদল করে আয়োজন হয় পরের কোন পূর্ণিমায়। প্রতিযোগিতায় কোন পাড়াই কম যায় না। পুজোর পনের কুড়ি দিন আগে থেকেই ধর্মতলা মাটির ঝাড় ও ফুলের মালা দিয়ে সাজানো হয়। পুজোর আগের দিন চোখে ঘুম থাকে না কারো। মশাল নিয়ে ঢাক বাজিয়ে ভক্ত্যারা পুকুরে স্নান সেরে মোটা সুতোর পৈতা পরেন। পরের দিন ভোরে ধর্মতলায় কাঠকুটো জড়ো করে অগ্নিকুণ্ড তৈরী হয়। সেই অগ্নি-কুণ্ডের আগুন অঞ্জলি ভরে তাঁরা ধর্মরাজের কাছে নিয়ে যান। তারপর শুরু হয় আগুনে খেলা, কাঁটাখেলা। আগে বলিদানের রেও-য়াজ ছিল এখন নেই। দুপুরবেলা পুজো। ধর্মরাজের মাথায় পদ্মফুল চড়ানো হয়, পুরোহিত মন্ত্রপাঠ করতে থাকেন। প্রচণ্ড জোরে ঢাক বাজতে থাকে, সকলে উন্মুখ হয়ে প্রতীক্ষা করেন কখন ফুল পড়ে। ফুল পড়ার পর শোভাযাত্রা করে সকলে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরতে থাকে। কয়েক বছর আগেও বিচিত্র সং বেরোত। এখন অবশ্য সং হয় কিন্তু তেমন বৈচিত্র্য নেই। এখন লাঠিখেলার প্রচলন আছে। বিভিন্ন জায়গার শোভাযাত্রা সিউড়িতে এসে জড়ো হয়। তখন সেখানে চলতে থাকে বেশ কয়েক ঘন্টার নাচগান। বাজনদাররা তুমুল উৎসাহে ঢাক বাজাতে থাকে, সমস্ত বীরভূম উৎসবে মাতোয়ারা হয়ে ওঠে। আগে মহাভারতের, রামায়ণের কাহিনী নিয়ে সং হোত, এখনকার সমস্যা নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মধ্যে দিয়েও সং হয়।

আহমদপুর থানার বড় সাংড়ার ধর্ম-পুজো খুব মজার। বৈশাখী পূর্ণিমার দিন পুজো। ধর্মরাজের নাম পুরুন্দর। প্রথম দিন উপোস করে থাকার পর মূল ভক্ত্যার ভর হয়। ভরের মধ্যে তিনি পাড়ার কে কি অপরাধ করেছে সারা বছর তা বলতে থাকেন। দ্বিতীয় দিন উপোসের পর একটি কাঠের পাটাতনে লোহার শিক বিঁধে সেটিকে পুকুরঘাটে স্নান করিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। এটিকে বলে বানেশ্বরী। বানেশ্বরীর সঙ্গে সকলেই স্নান করে। পুজোর পর বানেশ্বরীর ওপর একজন ভক্ত্যা শুয়ে পড়লে তাকে কাঁধে করে মন্দিরে আনা হয়। অন্যান্যরা নিজেদের হাতে বান ফোঁড়ে। গভীর রাতে ধর্মরাজকে কাঠের ঘোড়ার ওপর বসিয়ে কয়েকজন ভক্ত্যা সেই ঘোড়া কাঁধে করে পাশের মালিগ্রামে যায়। সেখানেও ধর্মরাজ আছেন। দুই ধর্মরাজের মুখোমুখি দেখা হয়। তারপর বড় সাংড়ার ধর্মরাজ মালিগ্রাম থেকে আবার ফিরে আসেন। এই অনুষ্ঠানের নাম বলবেড়া। বলবেড়া অনুষ্ঠানের পর সকলে ফলাহার খায়। তৃতীয় দিনও উপবাস। সকালে পুকুরে গিয়ে ঘট ভর্তি করে জল নেয় ভক্ত্যারা। সেই ঘট মাথায় নিয়ে এক জায়গায় সবাই দাঁড়ায়। তারপর প্রচুর ধুপধুনো জ্বালিয়ে জায়গাটিতে অন্ধ-কার করে দেওয়া হয় এবং তুমুল শব্দে ঢাক বাজতে থাকে। একে একে সমস্ত ভক্ত্যা অচৈতন্য হয়ে পড়ে। এখন তাদের তুলে নিয়ে আসা হয় ধর্মতলায়, তারপর ধর্ম-রাজের পুজো আরম্ভ হয়। জয়দেব-কেঁদুলিতেও এই রকমের ধর্মপুজো প্রচ-লিত আছে।

কেঁদুলি আর পাঁচটা গ্রামের মতই সাধারণ গ্রাম। বলা যেতে পারে উপে-ক্ষিত। জয়দেবের জন্মস্থান হিসেবে যাতায়াতের ভাল ব্যবস্থা থাকা উচিত ছিল। বছরের অন্য সময় কেঁদুলি নির্জন, দু'চারজন অতি উৎসাহী যাত্রী হয়ত জয়-দেবের স্মৃতি স্মরণ করে বেড়িয়ে আসতে যান। ওখানে কিছু মোহন্ত আছেন, সাধু-সন্ন্যাসীদের আস্তানা আছে তাঁরাও অধীর আগ্রহে বোধহয় প্রতীক্ষা করেন পৌষ সংক্রান্তির দিনটির জন্যে। সে সময় কেঁদুলির চেহারা পাল্টে যায়। হাজার হাজার যাত্রী এসে জমা হন, আর জমা হন বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বাউলরা। একমাত্র বাউলদের আকর্ষণেই কেঁদুলির মেলায় যাওয়া যেতে পারে। কোন বাউলের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে একান্তে যদি গান শুনতে পারেন তো তন্ময় হয়ে যাবেন। সে-গান শহুরে আধুনিক সুরে মেশানো মিহি গলার নয়, দরাজ ভরাট গলায় প্রাণখোলা গান। বাণীর মধ্যে উচ্চারণের হয়ত কিছু ইতরবিশেষ থাকে কিন্তু সোঁদা মাটির স্পর্শ আছে তাতে। একতারাতে সুর উঠলে শহুরে শীতেও একটু অশান্তি লাগে না।

পৌষ সংক্রান্তিতে মেলার অন্যতম কারণ মনে হয় নতুন ফসল ওঠার জন্যে। যে-বছর ফসল ভাল হয় সেবছর মেলার জৌলুস বাড়ে। কারণ মেলার আর একটি বৈশিষ্ট্য হল অন্নসত্র। হাজার হাজার যাত্রী জাতিবৈষম্যের কথা ভুলে গিয়ে অন্নসত্রের মেলায় একসঙ্গে পাতা পেড়ে বসে খেয়েছেন। এ দৃশ্যের তুলনা নেই। গাঁটি-গন্দার সঙ্গম হিসেবে কেন্দুলিকে যেমন চিহ্নিত করা যায় তেমনি মদ্যপানে অন্নসত্রের মধ্য দিয়েও আন্তরিকতার অনুভূতি আসে। বিভিন্ন আশ্রম ও সেবা প্রতিষ্ঠানও এই অন্নসত্রে অংশ নেয়।

মেলাতে যেমন আসেন সাধারণ মানুষ নিছক মেলা দেখার আনন্দ পেতে, তেমনি আসেন পণ্ডিত সুধীসমাজ তথ্য আহরণ করতে। অথচ গ্রামের কোন এক কৃষক পরিবার বিশাল বটগাছের তলায় বসে যখন তাদের সিকনি নাকে ছোট ছেলেটাকে একগাল ভাত খাওয়াতে ব্যস্ত তখন দেখা যাবে মেলার অন্য একপ্রান্তে যোগদপ্রান্ত স্যুট পরা কোন একজন বাউলদের উপরে ক্যামেরা টেপ করতে ব্যস্ত। সারারাত্রিই চলে বাউলদের গানের আসর, কখনও বটগাছটিকে ঘিরে, কখনও ছোট ছোট আশ্রমগুলির পাশে পা ছড়িয়ে দিয়ে। হয়ত কেন্দুলির বাউলদের একতারার সুরেই জয়দেবের স্মৃতি অক্ষয় হয়ে থাকবে চিরকাল।

—নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

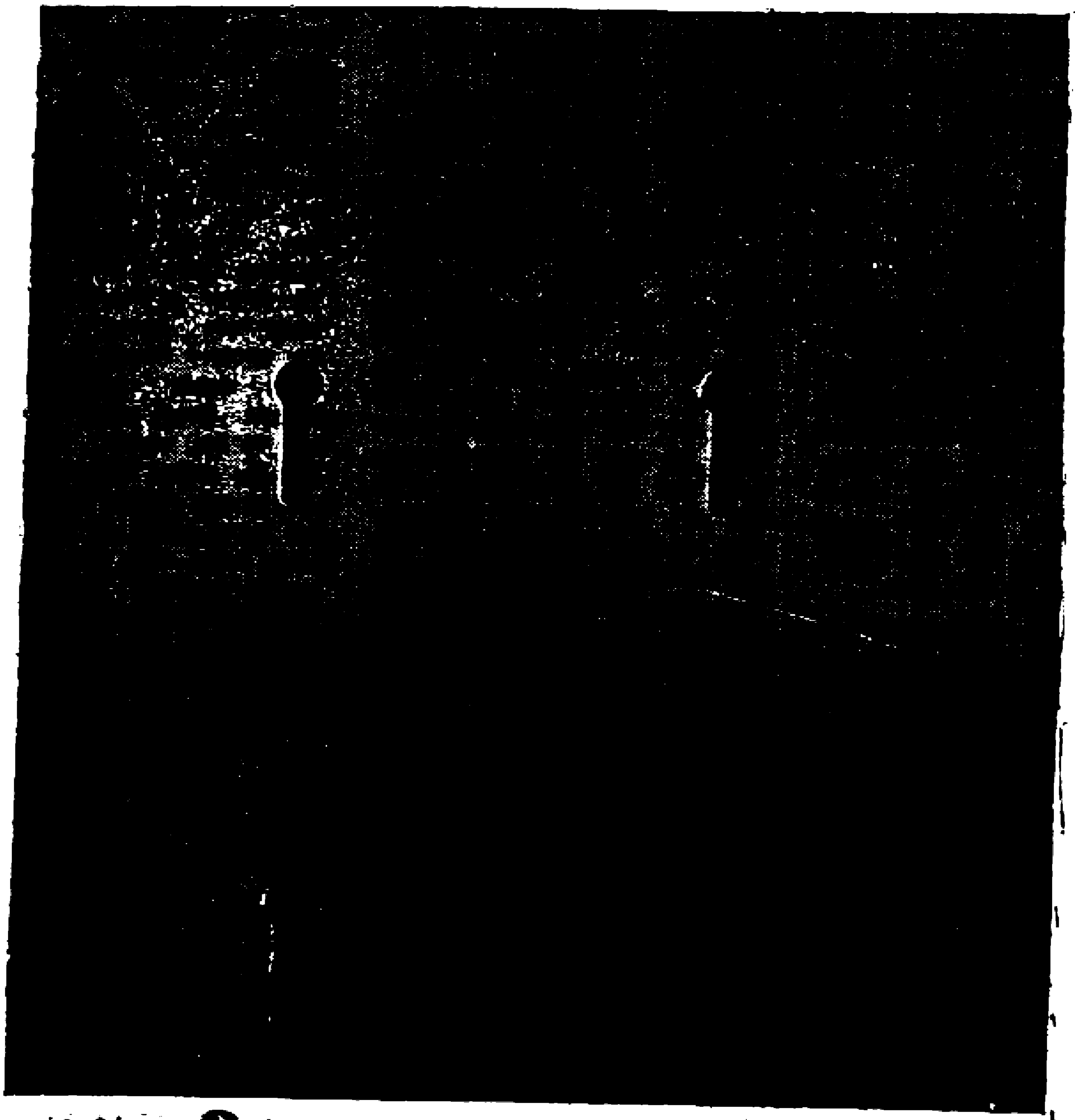

ভেতরে কী?
শুধু আপনিই জানেন ভেতরে কী আছে

আপনার গয়নাগাঁটি, পৈতৃক সম্পত্তি, দলিল-দস্তাবেজ...যাবতীয় দামী জিনিসপত্র সম্পূর্ণ সুরক্ষিত থাকে ব্যাঙ্ক অফ বরোদার সেফ ডিপজিট লকারে। না চোরের ভয়... না আগুনের আশঙ্কা। আর, মাসে খরচ পড়ে মাত্র ১ টাকার সামান্য বেশী।

নির্ভরশীল লোকের
ব্যাঙ্ক অফ বরোদা
হেড অফিস : মান্ডবী, বরোদা

Shilpi-BOB-12/70 Ben.

তুলসীচরিত

নীষবিব চৌধুরী

(পূর্বানুবৃত্তি)

(৭)

আমার তৃতীয় ইনস্টলমেন্ট

আরেক দিন আলাপ হচ্ছিল।
প্রসঙ্গ আমি তুলেছিলাম।

বললাম, দেবাশিস, তুমি সেদিন বলেছিলে ম্যান ইজ বর্ণ উইথ দি ভাইরাস অফ সেলফ ডেস্ট্রাকশন; মানুষ জন্মেছে নিজের মধ্যে আত্মহননের বীজাণু বহন করে। কিন্তু আত্মসংবরণের বীজাণুও তো তার মধ্যে রয়েছে। অনেক প্রতিকূলতার সঙ্গে সংগ্রাম করে ধীরে-ধীরে হলেও মানুষের সমাজ ও সভ্যতা এগিয়ে চলেছে, মানুষের জীবনে আদর্শ ও মান ক্রমশ উন্নত হচ্ছে একথা স্বীকার করতে হবে। অনেক অসাধারণ মনীষীসম্পন্ন, মহাপ্রাণ মানুষ জন্মেছেন যাঁরা অহিংসা, শান্তি, প্রেমের বাণী প্রচার করে বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীকে এক ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে বাঁধবার জন্য নিজেদের জীবন ব্যয় করেছেন। গৌতম বুদ্ধের, যীশু খৃস্টের বাণী—

দেবাশিসের মুখে হাসির রেখা দেখে কথা শেষ না করে থামলাম।

বললাম, হাসি পেল কেন তোমার?

বলল, এ'রা মানুষের মধ্যে অহিংসা, শান্তি, প্রেম প্রতিষ্ঠা করতে কতটা কৃতকার্য হয়েছেন। মাস্টারমশাই? এ'দের দুজনের প্রচারিত ধর্ম দেশের সীমানা ছাড়িয়ে পৃথিবীতে প্রচারিত হয়েছে। কিন্তু ধর্ম কতকগুলো মানুষকে একটা আলগা গাঁড়িতে বেঁধে দেয় মাত্র, মানুষের মৌলিক প্রকৃতির কোন পরিবর্তন করতে পারে না। তাঁদের শিক্ষা তাঁদের সমসাময়িক কালের পরিচিত অনেকের ওপরে প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। গৌতম বুদ্ধকে বিষাক্ত খাদ্য খাইয়ে মেরেছিল, তার পরিচিত গোষ্ঠীর মানুষ, যীশু খৃস্টকে তাঁর নিজের জাত-ভাইরা ক্রুশে বিঁধিয়ে মেরেছিল। জুডা থেকে সে ধর্ম য়ুরোপে প্রচারিত হল কিন্তু ক্রীশ্চান য়ুরোপের জাতগুলো ধর্মের নামে যে সব কাণ্ড করেছে তা অহিংসা, শান্তি, প্রেমের, এক ভ্রাতৃত্ববোধের পরিচয় দেয় কি? টাকা ও ক্ষমতার লোভে মানুষ বহু অন্যায় এবং ধ্বংস ও হত্যাকাণ্ড করেছে, তার তুলনায় ধর্মের নামে মানুষ যে অন্যায় ও জীবননাশ করেছে তার ইতিহাস বেশী ভাল কি মাস্টারমশাই?

একটু হেসে বলল, নৃশংসতায় দৃষ্টান্ত হিসাবে ইতিহাস অ্যাটিলা, চেঙ্গিজ খান, তৈমুর লঙের নাম করে। কিন্তু বহুপরবর্তী কালের বিশ শতাব্দীর সভ্যযুগের জহ্লাদদের তুলনায় এ'রা শিশু। খাঁটি আর্যবাদের প্রচারক ক্রীশ্চিয়ান এডলফ হিটলার লক্ষ-লক্ষ মানুষকে গ্যাস চেম্বারে ঠেলে দিয়েছে। আরেকজন খাঁটি ক্রীশ্চিয়ান হ্যারী ট্রুম্যান দুটি এটম বোমা ফেলে সাড়ে তিন লক্ষ জাপানীকে কয়েক মিনিট সময়ের মধ্যে খতম করে দিয়েছে। বাংলা দেশের ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের কথা মনে আনুন মাস্টারমশাই। জাপানীদের হাতে পড়তে পারে বলে বাংলার চাষীদের ঘরের ধান-চাল কেড়ে নিয়ে শাসকগোষ্ঠী ও ব্যবসায়ীরা মিলে যে দুর্ভিক্ষ ঘটাল তার ফলে তিন লক্ষ মানুষ নিঃশেষ হয়ে গেল। অপরাধীদের শাস্তি দিয়েছে কি সমাজ?

আড়াই থেকে দু হাজার বছর আগে গৌতম বুদ্ধ ও যীশু খৃস্ট অহিংসা, শান্তি ও প্রেমের বাণী শুনিয়েছিলেন মানবসমাজকে। তাঁদের বাণী রক্তে আত্মহননের বীজাণুবাহী মানুষের মধ্যে কতটা কার্যকর হয়েছে সেকালে ও একালে?

হয় নি, কোন কালে হবেও না।

গৌতম বুদ্ধ ও যীশু খৃস্টের নামে দুটো ধর্ম প্রচারিত হয়েছে। সম্প্রদায় ও দল সৃষ্টি হয়েছে, দু-চারজন মানুষ ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের উপদেশ অনুসরণ করবার চেষ্টা করেছে জীবনে, এর বেশী কিছু হয় নি।

মানুষের প্রকৃতিগত নিষ্ঠুর বর্বরতা অপরিবর্তিত রয়েছে।

বললাম, দেবাশিস, একটা ভুল তুমি করছ। মানুষের মধ্যে আত্মহননের তাড়না যেমন আছে তেমনি শুভবুদ্ধির প্রেরণা রয়েছে। শুভবুদ্ধির প্রেরণা মানে নিজেকে বাঁচাবার তাগিদ। একক ও দলগতভাবে এ তাগিদ সকল শ্রেণীর জীবের মধ্যে রয়েছে। এই শুভবুদ্ধির প্রেরণা থেকে সমাজ, সংসার, ধর্ম নীতি ও নীতিবোধ, শান্তি, অহিংসা ও প্রেমের কথা এসেছে।

ধর্মের গ্লানি দূর করবার জন্য ভগবান যুগে-যুগে আবির্ভূত হবেন এটা মানুষের শুভবুদ্ধিতে বিশ্বাসের কথা। শুভবুদ্ধির নামে মানুষকে আশ্বাস দেবার কথা।

নিজের মধ্যে আত্মহননের প্রবৃত্তির তীব্রতা ও দুর্দমনীয়তা দেখে মানুষ উন্মাদ হয়ে যায় নি। বরাবর সে বাঁচবার চেষ্টা করেছে, করবে।

মুখ তুলে দেবাশিস বলল, হয়ত করবে।

একটু হেসে বলল, না করলেই বা এমন কি ক্ষতি হচ্ছে? মারামারি কাটাকাটি করে মানুষ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলে এই পৃথিবী গ্রহের কি ক্ষতি হবে তাতে? সৌরজগতে পৃথিবীর প্রতিবেশী আর কোন গ্রহের কি ক্ষতি হবে তাতে? মানুষের সভ্যতা, সমাজ, ধর্ম, বিজ্ঞান, সাহিত্য সব ধ্বংস হলে, মানুষের সব বুদ্ধির গৌরব, এমোশানের ঐশ্বর্য ছাই হয়ে গেলে এক ফোঁটা চোখের জল ফেলবার জন্য এই অসীম বিশ্বে কাউকে পাওয়া যাবে না মাস্টারমশাই।

মনে মনে শিউরে উঠলাম দেবাশিসের কথা শুনে।

আমার দিকে চেয়ে একটু হেসে দেবাশিস আবার বলল, পদার্থবিজ্ঞানীরা পার্টিকলস ও অ্যান্টি-পার্টিকলস, ম্যাটার ও

অ্যান্টি-ম্যাটার-এর কথা বলেন। তাঁদের অনুসরণ করে ম্যান ও অ্যান্টি-ম্যানের কথা বলা চলে কি মাস্টারমশাই? ম্যান ও অ্যান্টি-ম্যান সংঘর্ষ চলছে এবং শেষ কি হবে অনিশ্চিত। হয়ত সামগ্রিক ধ্বংস ঘটবে। তাতে কিছু যায় আসে কি?

জবাব বেরোল না আমার মুখ থেকে।

চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, দুজন ধর্মপ্রতিষ্ঠাতার নাম করেছেন আপনি। আমি আরও দু-একটা কথা বলতে চাই এ সম্পর্কে। বলব কি?

বলো, আমি তোমার কথা শুনে যাচ্ছি।

ধর্ম প্রতিষ্ঠার ইতিহাস সব দেশে মোটামুটি এক রকম। প্রতিষ্ঠাতা উপলক্ষ্য মাত্র। তাঁকে মূলধন করে ধর্মের কারবার চালু করে তাঁর লেফটেন্যান্ট দল। উদ্দেশ্য, মানুষকে বশীভূত করে ক্ষমতা লাভ করা। ভিক্ষার-বিশ্বাসকে, জিজ্ঞাসাকে morcutise করে অন্ধ বিশ্বাসকে মানুষের মনে প্রতিষ্ঠিত করে ধর্ম। উপায়টা প্রিমিটিভ, কিন্তু মানুষকে বশীভূত করবার শক্তিতে এ উপায়ের তুলনা নাই।

কিছু মিরাকল, প্রধানত ব্যাধি উপশম সংক্রান্ত, দেখাতে হবে, তারপর দলে-দলে লোক পিছনে ছুটবে, যেমন যীশু খৃষ্টের জীবনে হয়েছিল। শেষের দিকে দেখা যায় মিরাক্‌ল দেখে অভিভূত ভক্তরা যীশুকে সন অব গড পদে অভিষিক্ত করল (এম ৮, ২৯), রিজারেকশনের পরে তাঁর উপাসনার প্রচার হল (এম ২৮, ৯)।

একটু হেসে বলল, যীশু মানুষের ভ্রাতৃ প্রেম, শান্তির কথা বলেছেন কিন্তু তিনি পুরোপুরি শান্তিবাদী ছিলেন না, থিঙ্ক নট দ্যাট আই অ্যাম কাম টু সেন্ড পিস অন-আর্থ; আই কাম নট টু সেন্ড পিস বাট এ সোর্ড (এম, ১০,৩৪)। তাঁর উদারতা সব মানুষের প্রতি নয়, শুধু তাঁর অনুচরদের প্রতি 'হি দ্যাট ইজ নট উইথ মি ইজ এগেনস্ট মি (এম ১২, ৩০)। এটা কি একজন ধর্মপ্রতিষ্ঠাতার কথা না সেন্ট-পার্সেন্ট সোবিটিক [illegible] লীডারের কথা?

মাথা নামিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল সেবাশিস, তারপর ধীরে-ধীরে বলল, প্রেমের কথা, ভ্রাতৃত্বের কথা, মানুষের ইতিহাসে ক্ষীণ কণ্ঠে মাঝে-মাঝে উচ্চারিত হতে শোনা যায়। এ যেন মানুষের হিংস্রতার বিরুদ্ধে তার নিজেরই প্রতিবাদ, আপনার কথায় নিজের শুভবুদ্ধির কাছে মানুষের আবেদন। কিন্তু আবেদনে কোন ফল হয় নি মাস্টারমশাই, ভাল কথা, ভাল আদর্শ নিয়ে ধর্মপ্রতিষ্ঠাতারা মানুষের ভাল করতে কাজে লেগেছেন, তৈরী হয়েছে শুধু অগণ্য সংঘ, সম্প্রদায়, তৈরী হয়েছে কলহ ও কাটাকাটি করবার নতুন উপলক্ষ্য।

আমি সেবাশিসের মাস্টারমশাই, কিন্তু স্বীকার করছি পাঠ্যপুস্তকের বাইরে কোন বিষয় যুক্তিতর্ক দিয়ে তাকে বোঝাবার সাধ্য আমার নাই।

তার কথার কোন জবাব না দিয়ে পাঠ্য বিষয় নিয়ে কিছুক্ষণ কাটিয়ে যখন বাড়ী ফেরবার জন্য উঠলাম আমার মন অস্বস্তিতে ভরে উঠেছে।

(৮)

বয়স হলে নানারকম অভিজ্ঞতার ফলে বিস্মিত হবার মনোভাব নষ্ট হতে শুরু হয়। বিস্মিত হবার, খুশী হবার সামর্থ্য যদি যায় আনন্দ পাবার বারো আনা সম্বল চলে গেল জীবন থেকে। বয়সের ধাক্কা এই-ভাবে মনে এসে লাগে প্রথমে।

টিউশানির দু বছর শেষ হতে চলল। সেবাশিসের মত বা বিশ্বাসের আরও পরিচয় প্রকাশ পেতে লাগল। যে ধরনের কথা এতদিন শুনেছিলাম তার মুখ থেকে আমার মনে একটা ছক তৈরী হয়েছিল তা থেকে। তাই তার কথাগুলো তেমন বিস্ময়কর মনে হল না, তার চিন্তাধারাও অপ্রত্যাশিত মনে হল না।

লক্ষ করছিলাম তার ব্যবহারের মধ্যেও ক্রমে পরিবর্তন আসছিল।

শুধার ম্যান সম্বন্ধে তার অভিমত প্রকাশ করবার পরে কমোন ম্যানের কথা তুলল সেবাশিস কোন সরকারী মুখপাত্রের বক্তৃতার আলোচনা প্রসঙ্গে।

বলল, কমোন ম্যান কথাটা আজকাল প্রায়ই শোনা যায়। যা কিছু করা হচ্ছে সব নাকি কমোন ম্যানের হিতের জন্য। এনালাইজ করলে দেখা যায়, কমোন ম্যানিজম হচ্ছে হিরো ওয়ার্শিপের উল্টো দিকের ওয়ার্শিপের রকমফের। যারা কমোন ম্যানকে ঘানিতে ফেলে সব তেল বের করে নিচ্ছে অথবা আস্টে-পৃষ্ঠে শেকল পরিয়ে ক্রীতদাস করতে দ্বিধা করে না তারা দুবেলা নিয়ে তারাই আবার ওম কমোন ম্যানায় স্বাহা বলে অঞ্জলি দিচ্ছে। বোদিক থেকে দেখা যায় মনে হয় কর্তারা ভাঁওতায় পারেন বলে কমোন ম্যানের সৃষ্টি এই ধারণা চালু হয়েছে।

হেসে বলল, ভাঁওতায় থাওয়া মানে মাথায় হাত বুলিয়ে বা সেখড়ক পিটুনি দিয়ে দু রকমই হতে পারে।

মাস কয়েক কেটে গেল। কথাবার্তা থেকে মনে হল রুটিনমত পড়াশোনা করা ছাড়া সে নিজে কিছু পড়াশোনা করছিল। একদিন সংবাদপত্রের একটি খবরের প্রসঙ্গে মোরালিটি ইমমোরালিটির কথা উঠল। সেবাশিসের মুখে তার নূতন এথিকসের ব্যাখ্যা শুনলাম।

বলল, মোরালিটি একটা সোস্যাল চেক, গোষ্ঠোপ্তলোকের সেফটি ডিভাইস। মোরালিটি নেচারে নাই, পশু-পাখীতে নাই, মানুষের জীবনেও নাই। মোরালিটিতে বিশ্বাস রয়েছে এক শ্রেণীর ইণ্টেলেকচুয়ালী রিটার্ডেড লোকের মধ্যে। মোরালিটিতে বিশ্বাস করে এবং জীবন যাপন করছে এমন দৃষ্টান্ত দিতে পারবেন কি মাস্টারমশাই?

বললাম, তুমি যে সব মত প্রকাশ করো সত্যি সে সব মতে তোমার বিশ্বাস আছে, সে সব মতানুসারে কাজ করতে পারো ধারণা থাকলে দৃষ্টান্ত দেবার চেষ্টা করতাম। আমার ধারণা তোমার মতগুলো ইণ্টেলেকচুয়াল একসপ্লোরেশনের ফল, তোমার কনভিকশান নাও হতে পারে।

ভেবেছিলাম এই নিহিলিস্ট যুবকের চোখে আগুনের ফুলকি দেখা যাবে, কিন্তু না, সে মুখ নামিয়ে একটু হাসল, বলল, আমি মাত্র একটা বিষয়ে অনেস্টিতে বিশ্বাস করি মাস্টারমশাই, সেটা হচ্ছে ইণ্টেলেকচুয়াল অনেস্টি।

মুখ তুলে তাকাল আমার দিকে, বলল, আমার কোন মতের জন্য ওরিজিনালিটি দাবী করি না। চিন্তার ব্যাপারে আমরা জানা ম্যাকাডেম করা কোন রাস্তায় ঠেলা গাড়ী, সাইকেল, বড়জোর মোটর গাড়ী চালাই, তাইতে আমরা অভ্যস্ত, পরিচিত জিনিস ছাড়া আর কোন দিকে চোখ যায় না। চিন্তার জগতে স্পেস ট্রাভেল করে যারা, মানুষের পৃথিবীকে দূরে থেকে দেখতে পায়, মানুষকে তারা ক্লাসিফাই করে থিঙ্কিং ম্যামাল বলে। সায়েন্টিস্টের চোখ দিয়ে মানুষের উন্নতি, বৃদ্ধি, প্যারাফারন্যালস, পসিবিলিটি বিচার করে তারা। যারা শুধু টেকনোলজিস্ট তারা অবশ্য কোন কালেই চিন্তাই করে না।

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল, তারপর একটু হেসে বলল, মোরালিটির কথা চলছিল।

১৯৭০ সালে আপনার ভাগ্য

যে-কোন একটি ফুলের নাম লিখিয়া আপনার ঠিকানাসহ একটি পোস্টকার্ড আমাদের কাছে পাঠান। আগামী বৎসরে

আপনার জন্মের ভবিষ্যৎ বিবরণ আমরা আপনাকে পাঠাইব; ইহাতে পাইবেন ব্যবসায়ে লাভ - লোকসান, চাকরিতে উন্নতি বদলী, অর্থ বিবাহ ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিবরণ—আর থাকিবে দুষ্ট গ্রহের প্রকোপ হইতে আত্মরক্ষার নির্দেশ। একবার পরীক্ষা করিলেই মুক্তির পাইবেন।

Pt. DEV DUTT SHASTRI
Raj Jyotshi (AWC) P. B. 86
JULLUNDUR CITY

আরও কিছু বলতে চাই এ-সম্বন্ধে, আপনি কিছু মনে না করলে।

বললাম, তোমার কথা শুনে যাই আমি, কিছু মনে করি না।

বলল, মোরালিটির কথায় সেক্স মোরালিটি এসে পড়ে।

পড়ে।

সেক্স মোরালিটি বলে সত্যি কিছু আছে কি মাস্টারমশাই? পৃথিবীর অসংখ্য শ্রেণীর প্রাণীর মধ্যে মানুষ একটি শ্রেণী মাত্র। তাদের মধ্যে যা নাই, মানুষের মধ্যে সেটা আসবে কোথা থেকে? সেক্সের উদ্দেশ্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা। আমাদের দেহের সেলগুলো একটা ভেঙে দুটো, দুটো ভেঙে চারটে হয়। বংশবৃদ্ধির প্রবক্তা লাইফের সেলের স্টেজ থেকে রয়েছে দেখুন। অসংখ্য সেলের সমষ্টি নিয়ে গড়া কীট-পতঙ্গ, মৎস, পাখী, সরীসৃপ, ম্যামাল ইত্যাদি জাতীয় প্রাণীদের মধ্যে সংখ্যা-বৃদ্ধির জন্য স্পেশালাইজড প্রসেস হল, সেক্স ডিফারেনসিয়েশন এল, স্ত্রী ও পুরুষ জাতীয় প্রাণীর মধ্যে দৈহিক মিলন সংখ্যা বৃদ্ধির একমাত্র ভিত্তি হয়ে দাঁড়াল। সংখ্য বৃদ্ধির কাজে যাতে অরুচি না ধরে তার জন্য দুই শ্রেণীর মধ্যে পরস্পরের প্রতি প্রবল, অতি শক্তিশালী, চুম্বকী আকর্ষণের বীজ ঢুকিয়ে দেয়া হল কতকগুলো টিসুর মধ্যে। সেক্সের কাজ সম্পূর্ণ মেকানিকেল। সেক্সের ব্যাপার এই কিনা মাস্টারমশাই?

হুঁ। নতুন কথা বলছ কি?

না মাস্টারমশাই। অতি পুরনো কথা কিন্তু আমাকে জানতে হয়েছে নতুন করে। সেক্স সেন্সের উন্মেষ, সেক্স একসাইটমেন্টের চেহারা, সেক্স পারফরম্যান্স, তার আনন্দ নতুন করে আবিষ্কার করে প্রত্যেক স্ত্রী-পুরুষ, রিপ্রোডাকটিভ টিসুগুলো সাহায্য করে এ-কাজে। দেহের অন্য টিসুগুলোর কাজের সম্পর্কে মোরালিটি-ইমমোরালিটির প্রশ্ন ওঠে না, রিপ্রোডাকটিভ টিসুগুলোর কাজের সম্পর্কেও ওঠে না। ওঠে কি?

বললাম, আমি তোমার কথা শুনছি। তোমার সঙ্গে তর্ক করছি না। তর্ক যুদ্ধে চ্যালেঞ্জ করছ কি?

না মাস্টারমশাই, করছি না। তর্ক যুদ্ধ করে কোন মীমাংসায় আসা যায় না এসব ফান্ডামেন্টাল বিষয়ে। আমি যা বলছি সেটা বিশ্বাস করি।

একটু থেমে বলল, সেক্স ডিজায়ার একটা ইনকিওরেবল স্কিন ডিজিজের মত, সব সময় ইরিটেট করছে কমপেলিং ওয়ান টু রিয়েক্ট ইন আগলি, স্টুপিড ম্যানার। একটা ন্যাস্টি ব্যাপারকে এক রাশ থ্রিল দিয়ে মুড়ে এমন করা হয়েছে যে, তার বীভৎসতায় দিক চোখে পড়ে না। মানুষ যে থ্রিল অনুভব করে পশুপাখীদের সেক্স থ্রিল থেকে কি সেটা আলাদা, না বেশী সফিস্টিকেটেড? কিছুক্ষণ মাথা নামিয়ে চুপ করে বসে রইল দেবাশিস, তারপর বলল, এই নিছক দেহজ ব্যাপারে মোরালিটির স্থান কোথায়? ম্যান মেড মরালিটি হ্যাস নাথিং টু ডু উইথ নেচার মেড সেক্স পারফরম্যান্স অ্যান্ড স্যাটিসফ্যাকশন।

আরও কিছুক্ষণ পরে উঠে গেল সেদিনকার মত। অন্য দিনের মত ফটক পর্যন্ত এগিয়ে দিল না, আজ থাক বলে চলে গেল ভেতরে।

দেবাশিসের সম্বন্ধে আমার মনে ভয় ঢুকেছিল। যে দু-চারটে ব্যাপার চোখে পড়েছিল, যে দু-একটা লক্ষণ দেখতে পাচ্ছিলাম তা থেকে ভয় হয়েছিল দি জায়েন্ট মে টার্ণ ইন্টু এ মনস্টার।

বুদ্ধিতে জায়েন্ট বটে। স্পেশালাইজড জ্ঞান নেই কোন শাস্ত্রে, প্রোফেশনালদের মত, যে চেষ্টা ও সময় ব্যয় করা প্রয়োজন, তার জন্য সেটা কিছু নয় দেবাশিসের কাছে। ইচ্ছা করলে, প্রয়োজনমত পরিশ্রম করলে যে-কোন প্রোফেশানের শীর্ষস্থানে ওঠবার মত মেরিট আছে তার। বুদ্ধিকে উত্তপ্ত লোহ-শলাকার মত করে মানুষের বিশ্বাস নীতিধর্ম, হৃদয়বৃত্তি, দেহবৃত্তি, মননক্রিয়া, সমাজ-সভ্যতা, ইতিহাস সকলের মর্মস্থানে সেই তপ্ত, তীক্ষ্ণ লোহশলাকা প্রবিষ্ট করে মূল পর্যন্ত দগ্ধ করে দিয়েছে সে, যে সব সংস্কার, বিশ্বাস, বাধানিষেধ পরিবার ও সমাজের ভিত্তিস্বরূপ, সেগুলোও পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে হয়ত।

জীবনে কি করবে দেবাশিসের মত যুবক? বিজ্ঞানের গবেষণা করতে পারে, অর্থ-প্রতিপত্তি লাভের পথে যেতে পারে। সে সব ভবিষ্যতের কথা। উপস্থিত দেখা যাচ্ছে সে বহুপদ-পিষ্ট একটা পথে চলেছে। অর্থ আছে, সুন্দর রূপ আছে, যৌবনে পা দিয়েছে সে, বাড়ি প্লেজারের তৃষ্ণা আসে এ-বয়সে। বুদ্ধির প্রখরতা, বিশ্লেষণের ছুরি রুখতে পারে না এ-তৃষ্ণাকে, তৃষ্ণা দেহের প্রতিটি জীবকোষের মধ্যে নিহিত রয়েছে। আমার ভয় বুদ্ধির বন্ধনহীন, হৃদয়ের বন্ধনহীন ছেলে কোথায় চলে যাবে সেক্স-থ্রিলের নেশায়? জায়েন্ট কি সত্যই মনস্টারে পরিণত হবে?

রাস্তায় তার গাড়ীতে একাধিক অপরিচিতা মেয়েকে দেখেছি, দু-চারবার পাড়ির বোঝাবার সময়ে গাড়ীতে বসে অপরিচিতা মেয়েকে অপেক্ষা করতে দেখেছি, দূরে দাঁড়িয়ে মিনিট-দশ পরে দেবাশিসকে বেরিয়ে এসে সে গাড়ীতে উঠতে দেখেছি।

এসব নিয়ে আমার দুশ্চিন্তা করবার কথা নয়, আমি একজন প্রাইভেট টিউটর মাত্র। তবু প্রায় তিনটি বছর ভদ্র, বিনয়ী স্বভাব, পড়াশোনার নিষ্ঠা, বুদ্ধির তীব্র ঔজ্জ্বল্য দেবাশিস মোহমুগ্ধ করে রেখেছিল আমাকে, তার ভবিষ্যৎ চিন্তা করা ঠেকাতে পারি না। কোন নীতিবোধ তার নাই, থাকলে না হয় দু-একটা কথা বলবার চেষ্টা করতাম।

কেমিস্ট্রি নিয়ে এম এস-সি ক্লাশে ভর্তি হয়েছিল দেবাশিস। আমি চাকুরি ছেড়ে দেবার প্রস্তাব করলাম, সে রাজি হল না। মাস-চারেক পরে হঠাৎ একদিন দেবাশিসের বাবার কাছ থেকে একখানা চিঠি পেলাম লোক মারফৎ, সঙ্গে তিন মাসের বেতনের একখানি চেক। চিঠিতে জানিয়েছেন দেবাশিস কাল হঠাৎ বিলাতে রওনা হয়ে গিয়েছে। আগের দিন তার বাবার ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছে আমাকে জানিয়েছিল। সেদিন আপনার আসবার কথা নয়, কিছু জানাতে পারিনি, সম্ভবত দেবাশিসও আপনাকে কিছু জানায়নি। আগে আপনাকে জানানো হয়নি, এজন্য তিন মাসের বেতন পাঠালাম। অবসরমত একদিন আসবেন, কিছুক্ষণ কথাবার্তা হবে।

॥ নিত্যপাঠ্য তিনখানি গ্রন্থ ॥

সারদা-রামকৃষ্ণ

—সন্ন্যাসিনী শ্রীদুর্গামাতা রচিত—

অল ইন্ডিয়া রেডিও বেতারে বলেছেন,—বইটি পাঠকমনে গভীর রেখাপাত করবে। যুগাবতার রামকৃষ্ণ-সারদাদেবীর জীবন আলেখ্যের একখানি প্রামাণিক দলিল হিসাবে বইটির বিশেষ একটি মূল্য আছে।

বহু চিত্রশোভিত সপ্তম মুদ্রণ—৮৲

গৌরীমা

যুগান্তর:—তিনি একাধারে পরিব্রাজিকা, তপস্বিনী, কর্মী এবং আচার্যা। ঘটনার পর ঘটনা চিত্তকে মুগ্ধ করিয়া রাখে।... গৌরীমার অলোকসামান্য জীবন ইতিহাসে অমূল্য সম্পদ হইয়া থাকিবে।

বহু চিত্রশোভিত পঞ্চম মুদ্রণ—৫৲

সাধনা

বেদ, উপনিষৎ, গীতা, মহাভারত প্রভৃতি শাস্ত্রের সুপ্রসিদ্ধ উক্তি, বহু স্তোত্র সাড়ে তিন শত বাংলা, হিন্দী ও জাতীয় সঙ্গীত গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

বসুমতী বলেন—এমন মনোরম স্তোত্র-গীতি পুস্তক বাঙ্গলায় আর দেখি নাই।

পরিবর্ধিত পঞ্চম সংস্করণ—৪৲

শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম

২৬ গৌরীমাতা সরণী, কলিকাতা—৪

বিস্মিত হলাম। হঠাৎ এভাবে চলে যাবার মানে কি? কিছু অনুমান করতে পারলাম না।

তারপরের দিন রেজেস্টারী ডাকে একখানা চিঠি পেলাম দেবাশিসের। লিখেছে, মাস্টারমশাই, হঠাৎ খুব তাড়াতাড়ি আমাকে দেশ ছাড়তে হল। বিলাতে কি করব তার বন্দোবস্ত করে তারপর যাব ইচ্ছা ছিল, সেটা সম্ভব হল না।

আমি কোন কথা না বললেও যে-ধরনের ব্যাপারে ক্রমে জড়িয়ে পড়ছিলাম, তার খানিকটা হয়ত জানতে পেরেছেন। এর সংগে আমার না বলে দূরে চলে যাবার কিছু সম্পর্ক থাকতে পারে আপনার পক্ষে অনুমান করতে অসুবিধা হবে না। ইমোশনাল হ্যাং-ওভার-এর উৎপাত সীমা ছেড়ে চলছিল।

বাবার কানে কিছু কথা পৌঁছেছে হয়ত। তিনি অসন্তুষ্ট হয়েছেন। টাকা যা দিয়েছেন বেশী দিন চালানো যাবে না। ওখানে গিয়ে কিছু করতে হবে।

আপনার কাছে গভীর কৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ আমি। কতবার স্পর্ধার সীমা লংঘন করেছি, আমার সব বাচালতা নির্বিকারভাবে সহ্য করেছেন। একটা লেসন এটা।

একটা অনুরোধ করছি, সম্ভব হলে রক্ষা করবেন। আর প্রাইভেট টিউশানি করবেন না, আপনার যোগ্য কাজ নয় এটা। বাবার মোটা টাকার শেয়ার আছে এমন একটা কেমিক্যাল এণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানীকে অনুরোধ করিয়েছি বাবাকে দিয়ে তাদের লেবরেটরীতে আপনাকে রিসার্চের সুযোগ দিতে। তারা রাজি হয়েছে বাবার অনুরোধে, হয়ত শীঘ্রই ডাক পাবেন। মাসে মাসে কিছু দেবে।

এই সংগে দুটো ফরমুলা পাঠালাম। নিজে করব বলে কিছু খরচ করে কিছু চেষ্টা করে সংগ্রহ করেছিলাম। আমি পারলাম না, আপনি একটু চেষ্টা করে দেখবেন।

কোম্পানী থেকে ডাক আসতে দেরি হলে বাবাকে একটু বলবেন। আমার প্রণাম নেবেন।

দেখলাম পিন দিয়ে আটকানো দুখানা শিটে দুটো ফরমুলা লেখা রয়েছে। এর জন্য চিঠি রেজেস্টারী করা দরকার হয়েছে বুঝলাম।

(৯)

আমার আশংকা হয়েছিল জ্যাকেট মনস্টারে পরিণত হবে। ভয়ংকর মনস্টারে পরিণত হয়েছিল দেবাশিস।

সে চলে যাবার তিনমাসের মধ্যে একটি মেয়ের সুইসাইডের খবর কাগজে বেরোল। লেকে ডুবে মরেছে। করোনারের রিপোর্টে জানা গেল অন্তঃসত্ত্বা ছিল। দেবাশিসের সংগে এই আত্মহত্যার কোন সম্পর্ক আছে এ কথা কাগজে বেরোয়নি। প্রেস্টিজ বাঁচাবার জন্য মরবার আগে তার বাড়ীর লোকের জন্য যে চিঠি রেখে গিয়েছিল সে চিঠিতে দেবাশিসের নাম ছিল এবং বাড়ীর লোকেরা তাকে ধরবার জন্য তার বাড়ীতে গিয়েছিল এবং আশ্চর্যের কথা তার ঠিকানা পাবার জন্য আমার কাছেও এসেছিল। চিঠি পুলিশের হাতে গিয়েছিল এবং পুলিশ খোঁজ-খবর নিয়েছিল। এর মাস দুই পরে এবরশন করতে গিয়ে মৃত্যুর কেস পুলিশের হাতে এল। এ মেয়েটি শেষ স্টেটমেন্টে দেবাশিসকে জড়িয়েছিল। মেয়েটির বাপ ছিল না, ভাইকে পুলিশ এবরশনের প্রোরোচনা দেবার অভিযোগে ধরেছিল, তার ফলে স্টেটমেন্টের কথা কিছুটা জানাজানি হল।

ভাবলাম হতভাগিনীরা প্রেম করতে গিয়ে গণ্ডগোলে পড়ল কেন, বাজারে কি কনট্রাসেপটিভের অভাব হয়েছিল? ভাবলাম দেবাশিস কি বিয়ে করবার প্রলোভন দেখিয়েছিল এই মেয়েদের? মনে হয় না। একদিনের কথা মনে পড়ল। পড়তে বসে ছোট একটা চিঠি লিখেছিল, সন্দেহ হল মদ খেয়েছে। নিজে থেকে মেয়েদের সংগে সম্পর্কের কথা তুলে যা বলল তার অর্থ এই যে, একটি লোক বিয়ে করবে না জেনেও কোন মেয়ে যদি অন্ধের হয়ে তার পেছনে ঘোরে তাহলে সে কি করতে পারে? মোহমুদগর খোলালে কি তার হাত থেকে রেহাই পাওয়া সম্ভব?

দেবাশিস মোর‍্যালিটি মানত না, মানবার ভানও করত না। যে দুটি মেয়ে প্রাণ দিল তারাও মোর‍্যালিটি মানত না। মোর‍্যালিটি মানত না কিন্তু প্রেস্টিজ নষ্ট হবার ভয়টুকু ছিল মনে। সন্তান গর্ভে আসবার পরে প্রেস্টিজ রক্ষা করবার জন্য চেষ্টা করেছিল নিশ্চয়, দেবাশিসকে ভয় দেখিয়েছিল হয়ত। বোকা মেয়েরা দেবাশিসকে চিনতে ভুল করেছিল। পারিবারিক স্ক্যাণ্ডেলের ভয় দেখিয়ে কোন বন্ধু হয়ত তাকে পালাবার পরামর্শ দিয়েছিল। নইলে হয়ত এখানে থেকে যেত সে এবং আদালত পর্যন্ত গড়ালে পাল্টা জবাব দিত কোন বয়স্থা মেয়ে যদি রাত্রি শোজারের জন্য একজন যুবককে তার সংগে এক শয্যায় রাত কাটাবার জন্য তাকে ডাকে তাহলে সে কি করতে পারে? একাধিক জায়গা থেকে এরকম নিমন্ত্রণ আসতে পারে। যেখানে বিয়ের কথা নাই, উভয়ের আনন্দ লাভের জন্য অস্থায়ী মিলনটা মাত্র আছে সেখানে এই একজন যুবকের ফলাফলের জন্য লোশ্যাল রেসপনসিবিলিটি স্বীকার করবার কথা কি করে ওঠে?

সম্ভবত তার জবাব শুনলে সমাজ-রক্ষক, ন্যায়দণ্ড পরিচালক আদালত শিউরে উঠত, দেবাশিসকে এক নম্বর সমাজের শত্রু বলে ঘোষণা করত, নীতিকল্যাণপূর্ণ বিজ্ঞ জাজমেন্ট দিত, আইনের বিধান অনুযায়ী কঠোরতম শাস্তি দিত।

স্ক্যাণ্ডেলের ভয়ে হোক, শাস্তির ভয়ে হোক দেবাশিস পালিয়েছে। তার পিতা অসন্তুষ্ট হয়েছেন, টাকা দিতে পারবেন না ছেলেকে একরকম জানিয়েছেন। পড়বার খরচটা দিলে ভাল হত, নিয়মিত পড়াশোনা করে একটা কিছু করতে পারত। যে দেশে সে গিয়েছে টাকা না থাকলে কেউ ফিরেও তাকায় না রাস্তায় দাঁড়িয়ে অদ্ভুত কাণ্ড কিছু না করলে। তাহলে বিদেশে কি করবে দেবাশিস? ভগবান জানেন কি করবে। মনস্টার জ্যাকেটকে শেষ করে দেবে না জ্যাকেট তার জ্যাকেটত্ব প্রমাণ করতে পারবে?

আমি প্রৌঢ় হয়েছি, আমি গরীব গৃহস্থ, আমি মোর‍্যালিটি মানি, তবু স্বীকার করতে লজ্জা নাই দেবাশিসকে আমি ভালবেসেছিলাম। ভালবাসি এখনও। তার দুশ্চরিত্রতা, তার আইকনোক্লাজম, তার চিন্তার বল্গাহীন নিলজ্জতা সব নিয়ে সে একজন অসাধারণ ছেলে। যদি তার চোখ অর্থহীন, উদ্দেশ্যহীন জীবনের একটা অর্থ খুঁজে পায় সে তবেই তার বাঁচবার চান্স আছে, নইলে অলসে মরে যাবে।

দেবাশিস আজকার বিজ্ঞানীযুগের একজন একসাম্পিলিষ্ট ইন্টেলেকচুয়াল। তার ভাষা কোট করে বলতে পারি তার দুশ্চরিত্রতা একটা চর্মরোগ বিশেষ, আর সব ঠিক আছে। তার প্রোব্লেম আজকার রিজ্ঞবিশ্বাস, আশাভরসাহীন, অসুখী ইন্টেলেকচুয়ালদের প্রোব্লেম। বিশ্বাসের অভাবে, জীবনে আঁকড়ে ধরবার মত কিছু মেলাতে না পেয়ে তাদের কর্মের উদ্যম পক্ষাঘাতগ্রস্ত, মন অন্ধকার, হৃদয়ের সব সরলতা শুকিয়ে কাঠ হয়েছে। তাই বেঁচে থাকবার অবলম্বন খোঁজে তারা সেক্স-শোজারে।

বিজ্ঞানী যুগের কধুর পথে অসুখী, অসুস্থ প্যারোনিয়ার দলের পুরোভাগে চলেছে সব দেশের দেবাশিসের মত উদভ্রান্ত ইন্টেলেকচুয়ালরা। কবে এরা সত্যের পথ দেখতে পাবে জানি না, সর্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করছি জ্যোতির্ময় আবরণের দ্বারা যে সত্যের স্বরূপ আবৃত করেছে সেই সত্য প্রতিভাত হোক তাদের নিকট, প্রতিভাত হোক দেবাশিসের নিকটে।

জানি না সে সুদিন আসবে কিনা, যদি আসে যখন আসবে আমি তখন টিকে থাকব কিনা। না থাকলেই বা কি হয়েছে, মরবার সময়ে সুদিন আসছে মনে এই আশা নিয়ে দেবাশিসের মঙ্গলের প্রার্থনা নিয়ে মরব।

(ক্রমশঃ)

মধুখের মেলা

জানকের বাবা

'দশ বছরের 'চিসানে,' তখন থেকে আমি লাঙলের মুঠ' ধরেছি—হাল করতে করতে গলা শুকিয়ে গেলে মায়ের দুধ খেয়েচি-বড় মামা যখন তেজি গরু দুটোর 'ন্যাজ' মলে সুনো-দড়ির চাবুক হেনে মই দৌড় করাতো তার কোমর জাপটে ধরে থাকতে হতো—ছেড়ে দিয়ে পড়ে পাকা ঢেলা-মাটিতে আছাড় খেয়ে কাঁদলেই বড় মামা 'কানমুত্তা' ফাটিয়ে দিত কড়া-পড়া হাতের আঘায়ে চাপড় মেরে। বড় মামার গতর ছিল যেন পাথর! সে কব্জি চেপে ধরলে এ অঞ্চলে হেন লোক ছিল না যে আছাড় কাছাড় করে সাত ঘন্টাতেও হাত ছাড়াতে পারে! সেই মামার পাল্লায় পড়ে আমার গতরও পাষাণ হয়ে গেল। চাষের সব কাজ শিখে ফেললুম। জোয়ান বয়েসে কপাটি খেলায় কত যে 'মেডেল' পেয়েছিলুম তার ঠিক নেই। কাজের গুমোর তুমি আমার কাছে করো না পঞ্চানন! কোনো শালা আজ পর্যন্ত কোনো কাজেই আমাকে হারাতে পারে না। সে পাট-কাটা বলো, ধান-কাটা বলো, পাট-কাচা বলো, ধান-ঝাড়াই বলো! পুকুর কাটা, জল ছেঁচা, ঘর ছাওয়া, পটলের জাঁটি টানা, ধানের গোলা বোনা, জমি রোয়া, বীজতলা ভাঙা, বোঝা বওয়া, গাছে ওঠা, খেজুর গাছ কাটা, গুড় জ্বাল দিয়ে পাটালী করা, জাল বোনা, ঝ্যাংলা বোনা, দড়ি পাকিয়ে দোলা বোনা—

'থাম শালা, হয়েছে, তোকে আর রাজ্যের 'ফিরেন' দিতে হবে না। সব কাজ তুই পারিস ঠিকই, কিন্তু অনেক কাজ তুই পারবি না।'

পঞ্চাননের কথায় সোজা হয়ে বসল কানাই ঢেঁকি। বললে, 'কি, কাজটা কি শুনি?'

'তুই কি এঁড়ে গরুর দুধ দুইতে পারিস?'

'দুর শালা। এঁড়ে গরুর দুধ হয়?'

'তুই কি খোলাম-কুচির পিত্তি বার করতে পারিস?'

'না।'

'তুই কি ন্যাংটো হয়ে শ্বশুরবাড়ি যেতে পারিস?'

'না। এসব কাজ নয়।'

'তবে কাজের কথাই হোক। ঢেঁকি চাইতে পারিস?'

'পারি। বিশটা ঢেঁকি আছে এই সাতখানা গেরামে আমার হাতের। মা-মাসীরা ধান ভেনে খাচ্ছে তাতে।'

'আচ্ছা তুই ঘোড়া ছোটাতে পারিস?'

'শালা! ঘোড়ার সখ ছিল আমার কে না জানে? একটা ঘোড়া ছিল না, স্যাকরালী সেখের ঘোড়াটায় চড়ে কত রুমাল, ঘড়া, কাপ জিতে আনতুম। একবার রহিম খোয়াড়অলার খোঁয়াড়ে কারখানা অঞ্চলের হিন্দুস্থানীরা একটা ঘোড়া দিয়ে গেল তাদের 'গেহু' (গম) খেয়েছিল বলে। তিনমাস কেটে গেল, কেউ আর ছাড়াতে এল না। আমি ঘোড়াটার পিঠে চড়ে বেড়াতুম। রহিম সেখ আমাকে ঘোড়াটা বেচতে চাইলে মাকে বললুম। মা বললে, 'হাঁরে হতভাগা, ম'শস্তা টাকা তুই পাবি কোথা?' শেষে মা তার বাপের দেওয়া বহুকালের গোছে রাখা সখের ধন একটা সোনার টিকুলি বেচে এনে টাকা দিলে। নেই-মেই একটা ছেলে, সাধ করেছে

ঘোড়া কেনার...তা ঘোড়াটা কিনে ফেললুম। হরদম দৌড় করতুম। ঘোড়ায় চড়ার কি যে সুখ—কি যে আনন্দ, সে তুমি বুঝবে না পঞ্চানন! শেষবেলা শালা ঘোড়াটার পিঠে ঘা হয়ে গেল!"

CENTRAL LIBRARY

পঞ্চানন জাল বুনেছিল টকাটক 'কেত্তন' নাকি চালিয়ে। সন্ধ্যার সময় চা-দোকান সব জমজমাট। অনেকেই তাদের কথা শুনেছিল। কেউ গাঁজায় দম দিচ্ছিল। কেউ-বা রেসের টিকিট বিক্রি করছিল ফ্যাকল জুটিয়ে নিতে আর ফাঁক ফাঁক এইসব বলতে বলতে। চা-দোকানে রেডিও চলছে— হিন্দী সিনেমার সিনেমার ছাপা সস্তা ছবি দোকানের চারদিকে।। প্রায় উলঙ্গ বিখ্যাত হিরোইনদের অশ্লীল অসভ্য ছবির আড়ত যেন গাঁয়ের চা-দোকানগুলো। আর অশ্লীল কথার স্রোতাত! এরই মধ্যে আবার মনসার পাঁচালী পড়ছে বট-তলার শান বাঁধানো চত্বরে বসে কিনুর সরদার। জগদেব বাগের হাতে করতাল, অক্ষয় মালিক হারমোনিয়াম ধরে বসে আছে, নকুড় বাবাজীর কোলে খোল। হরিনাম গাইবে ওরা। আট-দশটা চা-দোকানে লোকের ভিড়, মুদিখানায় বেচাকেনা চলেছে। ডাক্তারখানায় তাস পেটা চলেছে বাজি রেখে। ছুতোর মিস্ত্রিরা কাঠ চাঁছে চলেছে খ্যাসের খ্যাসোর শব্দে।

যে যার কথায় মশগুল আছে। এর মধ্যে আবার রাজনীতির কর্তা-ব্যক্তিরা ভোটের জন্যে কর্মীদের পাড়ায় পাড়ায় ছড়িয়ে পড়ে কি কি করা বা বলা কর্তব্য তার নির্দেশ দিচ্ছেন।

চলে খেল, তেলেভাজা, পাঁপর কড়াইশুঁটি—বলে মাঝে মাঝে চেঁচাচ্ছে অম্বল অধিকারী।

পঞ্চানন পন্দান হঠাৎ গম্ভীর মেজাজে কানাই চৌকিকে শুধোলে, 'অ তোর ঘোড়ার পিঠে ঘা হল কেন শুনি?

কানাই বললে, 'হল।'

'হল কেন তাই বল্ না?'

কানাই চুপ করে হাসতে লাগল।

একজন লোক সে বলে, 'হাঁ গো কত্তা, আমাদের বেগুন চুরির একটা সালিশ বসেছে—যাবে নাকি গো তোমরা?'

'বেগুন চুরি? কে চুরি করেছে? ধরা পড়ল কি করে? যে ধরা পড়ে সে আবার চোর কিসের?' বললে কানাই।

পঞ্চানন বললে, 'তাছাড়া দু'কোঁচ বেগুন চুরির জন্যে তোমাকে এখন দশ টাকার চা-পান-বিড়ি খরচা করতে হবে সালিশ বসাতে। যাও বাবু, দু'ঘা চড়-চাপড় দিয়ে, না, বলিয়ে পড়িয়ে ছেড়ে দিলে চুরি করা হয়, চুরি করা মহাপাপ বলে বিদ্যাসাগরী উপদেশ দিয়ে মুখে দুটো চুমু খেয়ে চোরটাকে ছেড়ে দাও। পেটের জ্বালায় কেউ দু'এক কোঁচ বেগুন পালং কলা মুলো হাতালে তোমরা যদি সালিশ ডাকো তাহলে দুনিয়া থেকে চোর নামক আদরের জীবটি পলাতক হন।'

পঞ্চানন পন্দান (প্রধান) কইয়েবলিয়ে লোক। পেটে যা-হোক দু-এক ফোঁটা কালির আঁচড় পড়েছে। তাকে নইলে বিচার সালিশ হবে কেমন করে?

কিন্তু সে যেতে নারাজ হল। লোকটা চলে যেতে বললে, 'শালা পানবসন্ত (প্রাণ-বসন্ত) আড়াল নিজেই বজ্জাতের ঢেঁকি! ঢেঁকি বললুম বলে কানাই তুই যেন ভাই রাগ করিসনি তোর পদবি তুলে কথা বললুম মনে করে। ও লোকটা কি রকম জানো, প্রত্যেক বছর জমির আইল ঠেলবে, রাস্তা কেটে জমি বাড়াবে রাস্তার ধারে বাঁশ বসাবে, বন্ধুর বউকে নিয়ে পালিয়ে এসে মামলা-পুলিশ করে ছাড়ান-ছিড়েন হল—দেড় বছর কেটে গেল—এখন আবার বন্ধুর নামে তার বউয়ের নামে, ছেলের নামে—বন্ধুর বি-এ পাস শিক্ষিত তিন-চারটে শালার নামে মিথ্যে ডাকাতি কেসের ওয়ারেন্ট চাপিয়ে তাদের দেশছাড়া করেছে। বেগুন ওর গাছে হয়তো হয়ইনি, শালা, খালি খামখা ব্যক্তিকে জ্বালাতন করছে।'

সবাই বললে, 'বাদ দাও, বাদ দাও।'

কানাই হঠাৎ বললে, 'আচ্ছা পঞ্চাদা, তুই কটা মাছের নাম জানিস?'

'জানি সবই—বলবার সময় কি মনে হয় আর? দেখলে চিনতে পারব। গাঙের বা সমুদ্দুরের অনেক মাছ আমরা চিনি না। জেলেরা জানে।'

কানাই বললে, 'আমি তো জেলে। অনেক কাল অবিশ্যি গাঙে জাল বাইতে যাইনি—জমি-জমা ছেড়ে গেছে ঠাকুরদা সাগরে 'শুকটি' মারতে যেয়ে যমের হাতে পরাণ দেবার পর। এখন আমরা চাষা হয়ে গেছি। তা আমি অনেক মাছের নাম বলতে পারি, শোন। তিমি, হাঙর, বোয়াল, ভেকটি (ভেকুট) শাল, শোল, ল্যাটা, মাগুর, শিঙি, কই, রুই, কাতলা, মিরগেল, কাল-বোস, বাটা, কুচিবাটা, ভাঙ্গন, চেতল, কুলই, পাবদা, নদো, বা ভেদা, খোলসে, চাং, পাঁকাল, বান, বেলে, কেকলেস, ভায়ুই, চেলা, মৌরলা, পুঁটি, সরলপুঁটি, মোচা-চিংড়ি, কট-চিংড়ি, পার্টি-চিংড়ি, গেঁটে-চিংড়ি, পুকুরে-চিংড়ি, নোনা-চিংড়ি, বাগদা-চিংড়ি, গলদা-চিংড়ি, গুতে, ট্যাংরা, আড়, সোল, লোটাখাগর, লেল, মুগোপাটি, তপোয়ার, তেলচাপাটি, নিরেচে, ইলিশ, চাঁদা, ভাজভারুই, কুকুরজিভে, পমফ্রেট, সিমলে, ভোলা, তপসে, গুড়জাওলি, কালিন্দী, চাক-চাকালি, চুনো, ফুলকুড়ি বেলে, তেলা-পিয়া—সব মনে হওয়া সত্যিই মুশকিল।'

পঞ্চানন বললে, 'বললুম তো, লিখে রাখলে মনে থাকে। এই যে কলা, কত রকমের আছে। কাঁটালী, বোম্বে, চাঁপা, কাবলিই, মর্তমান, ঢাকাই মর্তমান, কানাই-বাঁশি, রামকানাই, সিঙ্গাপুরী, কাবুলী। আখ আছে অনেক রকম: সামসোড়া, বোম্বাই, কাজলী, খড়ি, রসখড়ি, কাঠ-বেড়োলী, বর্মী, হিংলী। ধানের নাম: দিশি, চন্দদিশি, কালুকে ভগা, মগাই, কড়াই, ছাঁচি, মিঠে, মজাল, গেছো, গাজিপুরী, ভাবনা-বাঙাল, হাংকে বাশ্গাল, গুলে বাশ্গাল, চল বাশ্গাল, বাগেমহাটি, ভেড়া-মারি, হরগৌরী, বনগেঁটে। আর, কলাই, নারকোল, সরষে, বেগুন, মুলো, পালং সিম, বাঁশ, সবই অনেক রকমের আছি।

একই জিনিস মাটি, হাওয়া, আলোর জন্যে ভিন্ন স্বাদের, ভিন্ন রং বা চেহারাও হয়। যেমন আম—কিষেণভোগ অথবা হিমসাগর, হুগলী জেলার হলে একরকম, মালদহের হলে অন্য রকম। আবার চব্বিশ পরগণার হলে কিছুটা টক হয়। একই তরকারী ভিন্ন ভিন্ন মেয়ে রান্না করলে ভিন্ন ভিন্ন স্বাদ লাগে। গরু, ছাগল, মানুষ সবকিছুর চেহারা মাটি আলো-হাওয়ার গুণে নানা জায়গায় নানান রকম। বাঁশের শিকড় থেকে সুন্দর ছড়ি হয় একথা বললে ২৪ পরগণার লোক হাসবে, কিন্তু চট্টগ্রামে এমন একরকমের বাঁশ হয় যার শিকড় যেটা হবে অনেকখানি জুড়ে বড় হয়—তার কী যে সুন্দর ছড়ি হয়।'

কানাই তার গোঁফ দুটোয় পাক দিতে দিতে ছুঁচলো করে যাত্রাদলের রাজপুত্রর মতন করে একটা ছেলের দিকে ভয় দেখানো ভাব দেখাতে সে তার পিঠকুড়কে ধরে দেখায়। সবাই হেসে ওঠে।

ওদিক থেকে হরিনাম শোনা যায়। রেডিও থেকে খবর পড়া হয়। পূর্ব বাংলার নাকি ঝড়ের ক্ষতি-খাওয়া আমাদের চাইতে অনেক বেশি হয়েছে। মৃতের সংখ্যা বিস্ময়কর, রোমহর্ষক।

খবর শেষ হতেই আবার তারা চাষ-আবাদের কথায় ফিরে আসে।

খোঁয়াড়-অলা রহিম সেখ একটু 'গোলো' লোক। সে বললে, 'তোরা কত বড় মুলো হতে দেখেছিস?'

CENTRAL LIBRARY

কানাই বললে, 'আমার দেওয়াল-ভাঙা মাটিতে চাষ কে-জি পর্যন্ত হতে দেখেছি।'

'আমার আধমণ মুলো হয়েছিল।' বললে রহিম বুড়ো।

পঞ্চানন বললে, হাঁ। চাচার মুলো তো!' রহিম বুড়ো রেগে গেলো; 'মুই কি তোদের সঙ্গে ইয়ার্কি কর্তিচি! মুই হন্দ্ তোদের দ্বিগুণ বয়েসের মুরুব্বি মানুষ!'

কানাই তেঁকি ঊরুতে চাপড় মেরে বললে, 'রহিমদা রেগেছে! দেখো দাদা, মাদী ছাগলের দাড়ি হলেও সে যেমন মানী হয় না, তেমনি গাধা বা ঘোড়ার অনেক বয়েস হলেও সে মুরুব্বি হয় না।

সকলেই কানাইয়ের কথায় হো-হো করে হাসতে লাগল।

রহিম লাল চোখ বার করে বললে, 'আমার আধমণ মুলোটা থাকলে এখন এনে তোদের . প্যাটের ভেতর ঢুকিয়ে দিলেই মালুম—হাঁ বাবা—রহিমের মুলো বটে!'

পঞ্চানন বললে, 'তা হতে পারে। আধমণ কেন—একমণও হতে পারে। তেমন সার মাটি পড়লেই হবে। নইলে রাক্ষসেরা কুম্ভকর্ণ, ভীম, এঁরা জন্মালেন কি করে? তা গড়া, মুলোটা কাটলে কি দিয়ে—করাত দিয়ে কাটতে ক'দিন লাগল?'

.হিম তখন রাগে চিংড়ি মাছের মতো ছটফটাতে লাগল।

'শালারা সব আমাকে অপমান! আচ্ছা, তোদের গরু-ঘোড়া, হাঁস-মুরগী আমম খোঁয়াড়ে আসুক একবার। তোদের বউরেরা এসে তখন 'কি হবে চাচা, তুমি আমাদের বাপ-সমান লোক' বলে প্যান-প্যানালে দুয়ে করে ছেড়ে দোব। তিন টাকা দিলে তবে তোদের গরু ছাড়ব—মনে রাখিস?'

রহিম শেখ গম ভাঙানো আটার বালটো কাঁধে তুলে নিয়ে চলে গেলে কানাই মন্তব্য করে, 'লোকটা একটু বদরাগী বটে, কিন্তু মনখানা পরিষ্কার। সেদিন বলে, শালা সমরেজের কাণ্ড শুনেছিস ভাই কানাই, আমার গাছ থেকে একটা 'কদু' (লাউ) চেয়েছিল দিইনি বলে শালা মাঝরাত্রি আধখেনা কেটে নিয়ে গ্যাছে—আর বাকি আধখেনা হাবলার গাছে ঝুলছে! শুধু তাই নয় আমরা মেয়ে-মদ্দ'রা শুয়ে আছি আর শালা বাড়িয়ে এসে মুরগীটা ধরে নিয়ে পালিয়ে গ্যাছে! পাঁচসিকেতে বেচে ফেলে শালা গাঁজা কিনে খেয়ে ফেলেছে! এখন তার আর মুই কি করি বল?'

সকলে হাসিতে ফেটে পড়ে। হা-হা-হা হো-হো-হো—হি-হি-হি—জিতা রহ ভাই সমরেজ—তুমি রহিমের দুষ্টু বউটাকে নিয়ে গেলে না কেন!'

কানাই কিছুক্ষণ পরে বলে, 'উঠি ভাই সব, মনটা খারাপ! ঝড়ে আমার ঘরটা বেকল হয়ে হুমড়ি খেয়ে আছে। বউ ছেলে মেয়েদের সব ডর। যদি চাপা পড়ে তো সবাই মরবে।'

পঞ্চানন বলে, 'ঘরামির ঘর ফাঁকা। ভাল দেওয়াল দিতে পারিস, কাঠামো করতে পারিস তো তোর ঘরটা অমন কেন?'

'ঐ গরুর নেশায় আমার সব গেল। জুতসই হালের গরু করবার জন্যে ফি বছর গরু বেচে কিনি। এ বছর ভাল দেখে জোড়াটা হল—ভগচরণের পাঁচ বিঘে জমি পেয়ে চাষ-আবাদ করলুম মেলাপাতি করে, কাবুলীর কাছ থেকে ধার করে, দয়াময় ভগবান সব ডুবিয়ে-পচিয়ে দিলে—আবার যা ছিল ঝড়ে পড়ে শিষ বেরোবার মুখেই কার্তিক মাসের গোড়াতেই শেষ হয়ে গেল। সমনের বছরে খাবে কি বালবাচ্চারা ভাবনায় হাত-পা পেটে সেঁধিয়ে যাচ্ছে।'

পঞ্চানন সহানুভূতির স্বরে বললে, 'সবারই এক দশা কানাই। আমার ডহর জমিতে পান, কলস, খোঁটা-কালাম, সূর্যমুখী, দুধ-কলম, পান-বাটি, হামাই—এই সব মোটা ধান ছিল—সবে শীষ ঠেলেছিল—বলতে গেলে ভরা পোয়াতি — সব পড়ে গেছে—জল পিয়ে তরতর করে মানুষসমান বেড়ে গেছিল—ঝড়ে পাটবন বিছিয়ে গেছে। হাত শুইয়ে কনুই থেকে সোজা করলে যেমন দেখায় তেমনিভাবে অনেক শিষ ঠেলে উঠে দাঁড়াবে বটে তবে নিচেরগুলো পচে যাবে। খড়েরও খুব দুরবস্থা হবে আগামী বছরে।'

হঠাৎ কার যেন ঘর পড়ে যাওয়ার হুড়মুড় করে শব্দ হয় পূর্বদিকে।

কানাই চিৎকার করে ওঠে : 'ওরে! বোধহয় আমার সর্বনাশ হল রে! আমার ঘর পড়ে গেছে বোধহয়! কাপসকলরা তোরা ছুটে আয় সবাই!' অন্ধকারে ছুটতে-ছুটতে এসে কানাই দেখলে সত্যিই, তার সন্দেহ ঠিকই। ঘর পড়ে গেছে তার। চারদিক থেকে চিৎকার, আলো লোকজন ছুটে এল। ঘরের চাল, দেওয়ালের মাটি সরিয়ে ফেললে লোকজন। মরা লাস বেরুলে চারটে। কানাইয়ের বউ, আর তিনটে ছেলে-মেয়ে। কানাই কিন্তু তখনো তার গরু নিয়ে পাগল। গরু দুটো তার মরে নি। পিঠের-ওপরে-পড়া উল্টে চাল চাগিয়ে নিয়ে তারা নাকি দাঁড়িয়ে ছিল।

কিন্তু কানাই সব কটার রক্তমাখা মরা লাস দেখার পর চেঁচিয়ে উঠে হঠাৎ বললে, 'আমার জনক কোথায়? জনক, আমার ছোট ছেলে!'

খোঁজাখুঁজি করে জনককে পাওয়া গেল। আশ্চর্য, সে তখনো মরে নি। কাঁথা মুড়ি দিয়ে পড়ে আছে উপরে দেওয়ালের মাটি পড়ে ঠেলে এসে চাপা পড়া তক্তপোষের নিচের ফাঁকটাতে। কানাই তাকে বুকে তুলে নিয়ে কাঁদতে-কাঁদতে বললে, ভয় কি বাবা, আমি আছি! গরু দুটো আছে—তুই বড় হবি—আবার ঘর বাঁধব—চাষ-আবাদ করব...'

পঞ্চানন পন্দান আর রহিম শেখ তার অবস্থা দেখে চোখের জল মুছতে লাগল।

—আবদুল জব্বার

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

মৃত্যুহীন প্রাণ

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের জন্ম-শতবার্ষিকী এই সপ্তাহ থেকে ভারতে সর্বত্র প্রতিপালিত হবে। চিত্তরঞ্জন জন্মসূত্রে বাঙ্গালী ছিলেন, তিনি মাত্র পঞ্চান্ন বছর কাল বেঁচে ছিলেন এবং সেই সামান্য কালটুকুর মধ্যে কি বিরাট কর্ম করে গেছেন তা আজ ১৯৭০ খৃষ্টাব্দের এই অশান্ত কালে বসে পরিপূর্ণ বিচার হয়ত সম্ভব নয়। তবু অতীতের সব কিছুই পরিত্যাজ্য নয়। অস্বীকৃতি আর অসম্মানে অতীতকে নিশ্চিহ্ন করা যায় না। ইতিহাসের ধারা কেউ পরিবর্তন করতে পারে না।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সংকটময় দিনে আধুনিক রাশিয়া এই নির্মম সত্য উপলব্ধি করেছিল, তাই সেই কালে সোভিয়েত সরকার একটি প্রাচীর চিত্র প্রকাশ করেন। এই প্রাচীর চিত্রে ছিল ১৮১২ খৃষ্টাব্দের নেপোলিয়ন বিজেতা কুটোজভের ছবি। ছবিটির নীচে জ্বলন্ত লাল রক্তের অক্ষরে স্তালিনের নিম্নলিখিত বাণী উদ্ধৃত করা ছিল :

'আপনার স্মরণীয় পূর্বপুরুষদের গৌরবময় ঐতিহ্য এই যুদ্ধে আপনাকে অনুপ্রাণিত করে তুলুক—'
১৯৪১-এর ৭ই নভেম্বর প্রদত্ত বক্তৃতায় স্তালিন এইসব পূর্ব-পুরুষদের নামোল্লেখ করেছেন—

আলেকজান্দার নেভস্কি, ডিমিট্রি ডনস্কয়, কুজমা মিনিন, ডিমিট্রি পোজো-হেরস্কী, আলেকসান্দ্রা সুভরভ, ও মিখাইল কুটোজভ—'

এঁদের কেউ-ই শ্রমিক শ্রেণীভুক্ত ছিলেন না, অধিকাংশই রাজ বংশোদ্ভূত কুমার আর কুজমা ছিলেন একজন ব্যবসায়ী। এই সব ব্যক্তিরা রাশিয়াকে বিজয়ের পথে পরিচালিত করেছেন, রাশিয়ার সংকটকালে তাকে ত্রাণ করেছেন। 'ডিমিট্রি ডনস্কয়' নামক ১৯৪১-এ প্রকাশিত বোরোদিন রচিত উপন্যাস প্রসঙ্গে আলোচনায় 'প্রাভদা' শিরোনাম দিয়েছিল 'রুশ জনগণের বরণীয় পূর্ব-পুরুষ সংক্রান্ত গ্রন্থ'।

এই কথাগুলি বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিটি বাঙ্গালীর বিচার করা প্রয়োজন। এই একই কারণে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন প্রভৃতি ঐতিহাসিক মনীষীদের স্মরণ ও মননের মধ্যে আছে জাতীয় দায়িত্ব, দেশকে এবং দেশের মানুষের পুনরুজ্জীবনে তাই প্রয়োজন মরণ-সাগর পারে যাঁরা অমরত্ব লাভ করেছেন, তাঁদের জীবন ও বাণীর মধ্য দিয়ে অতীতের পুনরাবিষ্কার।

২৬শে শ্রাবণ, শুক্রবার ১৩২৯ সালে দেশবন্ধুর এক সম্বর্ধনা সভা অনুষ্ঠিত হয় ভবানীপুরের হরিশ পার্কে। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। দেশবন্ধু ছ'টি মাস কারাদণ্ড ভোগ করে মুক্তি পেয়েছেন তাই এই সম্বর্ধনা। সেই সভায় যে সুদীর্ঘ অভিনন্দন পত্র পাঠ করা হয় সেটি রচনা করেছিলেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,—সেই অভিনন্দন পত্রের সামান্য অংশ উদ্ধৃত করা হল—

...বীর তুমি, দাতা তুমি, কবি তুমি,—তোমার ভয় নাই, তোমার মোহ নাই,—তুমি নির্লোভ, তুমি মুক্ত, তুমি স্বাধীন। রাজা তোমাকে বাঁধিতে পারে না, স্বার্থ তোমাকে ভুলাইতে পারে না, সংসার তোমার কাছে হার মানিয়াছে। বিশ্বের ভাগ্যবিধাতা তাই তোমার কাছেই দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ বলি গ্রহণ করিলেন; তোমাকেই সর্বলোকচক্ষুর সাক্ষাতে দেশের স্বাধীনতার মূল্য প্রমাণ করিয়া দিতে হইল। যে কথা তুমি বার বার বলিয়াছ—স্বাধীনতার জন্য বুকের জ্বালা কি, তাহা তোমাকেই সকল সংশয়ের অতীত করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইল। বুঝাইতে হইল নানাঃ-পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

এই ত' তোমার ব্যথা এই ত' তোমার দান!'

দেশবন্ধুর সম্পত্তি জাতীয় সম্পত্তি। শরৎচন্দ্র লিখেছিলেন 'সমস্ত স্বদেশ আজ তোমার করতলে'—সত্যই সেদিন দেশবন্ধু ছিলেন ভারতের মুকুটবিহীন সম্রাট।

শরৎচন্দ্র দেশবন্ধু চরিত্র বিশ্লেষণে আরও একটি কথা বলেছিলেন—'এমনি করিয়াই যুগে যুগে মানবাত্মা পশুশক্তিকে অতিক্রম করিয়া চলে—'

চিত্তরঞ্জনের দেশপ্রাণতার কথা অনেকের পরিচিত, আজ শত-বার্ষিকী উৎসবে সে সব কথা আবার নতুন করে পরিবেশিত হবে, কিন্তু কবি চিত্তরঞ্জনের কথা বোধ হয় আর কারো তেমন স্মরণে নেই। কবি চিত্তরঞ্জন হিসাবে তাঁর আত্মপ্রকাশ সেই কালে যখন তিনি আইন ব্যবসায় সুপ্রতিষ্ঠ। পৃথ্বীশচন্দ্র রায় তাঁর 'লাইফ অ্যান্ড টাইমস অব সি, আর, দাশ' নামক গ্রন্থে লিখেছেন—

> "Chittaranjan was born an heir to the rich legacy of the emotional poetry of an earlier age and was temperamentally fitted to enjoy his spiritual heritage."

দেশবন্ধুর কাব্য গ্রন্থাবলীর সংখ্যাও প্রচুর নয়। চিত্তরঞ্জন যখন সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্য বিলাত যাত্রা করেন, তখন জাহাজেই তাঁর প্রথম প্রকাশিত কাব্য-গ্রন্থ 'মালঞ্চ'র কবিতাগুলি রচিত হয়। এই কাব্য-গ্রন্থ 'সাহিত্য' প্রেসে মুদ্রিত হয় এবং চিত্তরঞ্জন এই গ্রন্থটি 'প্রাইভেট সার্কুলেসন' হিসাবে অন্তরঙ্গ মহলে উপহার দিয়েছিলেন। এই কাব্যে তাঁর জীবন-যন্ত্রণার পরিচয় আছে। চিত্তরঞ্জনের 'প্রেম ও প্রদীপ' কবিতার একটি অংশ—

"তবু মনে হয়, তুমি শুনেছ আমার
অন্তরের আর্তস্বর, অন্তর মাঝারে!
নিবাও প্রদীপ তব, বন্ধ কর দ্বার,
এস ভেসে স্বপ্ন-সম অন্তর আঁধারে।
জ্বালগো প্রদীপ জ্বাল অন্তরে আমার
অন্ধকার-ঘেরা এই সন্ধ্যার মাঝার!"

আবার 'মালঞ্চের'

"তোমার ও প্রেম সখী! শাণিত কৃপাণ,
দিবানিশি করিতেছে হৃদি রক্তপান।"

কিংবা—

"তোমার ও প্রেম সখী! দুঃস্বপ্নের মত
জীবন জড়ায়ে মোর আছে অবিরত।"

প্রভৃতির মধ্যে আছে যৌবন বেদনা এবং নাস্তিক মনোভঙ্গী। তাঁর 'বারবিলাসিনী' কবিতাটি নিয়ে সেকালের ব্রাহ্মসমাজে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি হয়। এই কবিতায়

কিন্তু মানবিক সহৃদয়তার পরিচয় আছে। এই কবিতার দুটি ছত্র স্মরণীয়—

> 'ধর্মহীন কর্মহীন, কলঙ্কবাহিনী
> চিরদিন যৌবনে যোগিনী।'

চিত্তরঞ্জনের 'মালা' কাব্য গ্রন্থটিতে দরিদ্রের জন্য তাঁর প্রাণের আকুলতার পরিচয় আছে। তিনি সেই কালেই লিখেছেন—

> 'অপরের দুঃখ-জ্বালা হবে মিটাইতে
> হাসি আবরণ টানি দুঃখ ভুলে যাও,
> জীবনের সরবস্ব অশ্রু মুছাইতে,
>
> বাসনার স্তর ভাঙ্গি বিশ্বে ঢেলে দাও।'

উত্তরকালে কবি চিত্তরঞ্জন জীবনেও এই নীতিই গ্রহণ করেছিলেন। কবি 'মালঞ্চে'র একটি কবিতায় তাঁর উপলব্ধির পরিচয় দিয়েছেন, মানবিক বেদনার যে অশান্ত কল্লোল তাঁকে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী বানাচ্ছে তার বীজ যেন এই ক'টি ছত্রের মধ্যে আছে—

> 'আনন্দে বধির হয়ে শুনি নাই এতদিন
> ক্রন্দন ধরার—
> বাজেনি হৃদয়ে কভু মর্মাহত ধরণীর
> চির মর্মভার।'

তাঁর কবিতার মধ্যে মর্মজ্বালার পরিচয় যেমন আছে, তেমনই আবার আত্ম পথ সন্ধানের আকুলতা।

> 'যে পথেই লয়ে যাও যে পথেই যাই,
> মনে রেখ আমি শুধু তোমারেই চাই।'

কিংবা—

> 'ভাবনা ছাড়িনু, হবে—এই দাঁড়াইনু, আমি
> যে পথে লইতে চাও লয়ে যাও অন্তর্যামী।'

'অন্তর্যামী'র আর একটি অংশে—

> 'যেতে হবে যেতে হবে যেতে হবে মোরে।
> যেমন করেই হোক যেতে হবে মোরে।
> পথখানি বাঁকা থাক, পারি আমি পারি
> যেমনি করেই হোক যাব আমি যাব।'

অন্যত্র—

> 'ওই ছায়া মন্দিরের কোথা যে দুয়ার—
> কোন্ পথে যেতে হবে?
> কেবল আমার কবে?
> যেন হায় মনে মনে বন্ধ চারিধার!
> ওই ছায়া মন্দিরের কোথারে দুয়ার!'

তারপর একটি কবিতায় তিনি যেন সহসা পথের সন্ধান পেয়েছেন মনে হয়, তিনি লিখছেন—

> 'সবকর্ম শেষে আজ, মন একতারা
> বাজিতেছে সেই সুরে অন্ধ দিশাহারা!
> সেই পথ লাগি আজ মন পথ-বাসী
> সেই পথখানি মোর গয়া গঙ্গা কাশী।।'

চিত্তরঞ্জনের 'সাগর-সঙ্গীত' কাব্য গ্রন্থটি সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। শ্রীঅরবিন্দ স্বয়ং এই গ্রন্থটি ইংরাজীতে অনুবাদ করেছেন। এই কবিতাগুলির মধ্যে একটা আত্মসমর্পণের ভঙ্গী আছে—

> 'তোমার এ গীত প্রাণে সারা দিনমান
> আমি যে হয়েছি তব হাতের বিষাণ!
> আমি বন্দ্র তুমি বন্দ্রী—বাজাও আমারে
> দিবস যামিনী ভরি আলোকে আঁধারে
> বাজাও নির্জন তীরে—বিজন আকাশে,
> সকল তিমির ঘেরা আকুল বাতাসে
> মায়ালোকে ছায়ালোকে তরুণ উষায়
> বাজাও বাসনাহীন উদাস সন্ধ্যায়
> ওগো বন্দ্রী, আমি যন্ত্র বাজাও আমারে—
> তোমার অপূর্ব এই আলো অন্ধকারে।'

চিত্তরঞ্জনের একটি মাত্র গল্প 'ডালিম' তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়। এই গল্পটির মধ্যেও তাঁর রচনায় মানব-প্রত্যয়ের অসামান্য পরিচয় পাওয়া যায়। চিত্তরঞ্জন তাই ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ১০ই অকটোবর তারিখে যখন বললেন—

'দেশকে সেবা করিলে, জাতিকে সেবা করিলে মানব-সমাজকে সেবা করা হয়। আবার মানব-সমাজের সেবাতে, মনুষ্যত্বের সেবাতেই ভগবানের পূজা সমাপ্ত হয়।'

এই মনোভঙ্গীই চিত্তরঞ্জনকে মৃত্যুহীন করেছে। বাঙ্গালীর মর্মমূলে তাঁর আসন চিরস্থায়ী, সেই মর্মর বেদীর ভিত্তিপ্রস্তর সুদৃঢ়—তাকে কিছুতেই টলানো সম্ভব নয়। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের অমর জীবনের একটি সামান্যতম অংশ তাঁর কবিজীবন।

—অভয়ঙ্কর

সাহিত্যের খবর

হোল্ডারলিনের দ্বিশতবার্ষিকী।। প্রখ্যাত জার্মান কবি ফ্রিডরিখ হোল্ডারলিনের নামের সঙ্গে এদেশের সাহিত্য পাঠকদের পরিচয় সুদীর্ঘদিনের। বিভিন্ন ভারতীয় ভাষাতেও তাঁর কবিতার অজস্র অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমান বছরে তাঁর দ্বিশত-বার্ষিকী পালন করা হচ্ছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে। এই উপলক্ষে একটি সুন্দর অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন স্টুটগার্টের "হোল্ডারলিন সোসাইটি"। তিন দিনের এই অনুষ্ঠানে হোল্ডারলিন সম্পর্কে বিশেষজ্ঞরা উপস্থিত ছিলেন। এঁদের মধ্যে মার্টিন ভালসার, বের্নহার্ড বোয়েশেনস্টাইন, ভোলফগ্যাংগ, ভিলহেল্ম প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। মার্টিন ভালসারের আলোচ্য বিষয় ছিল 'হোলডারলিনের উত্তরে'। হোলডারলিন সম্পর্কে যত আলোচনা হয়েছে, তার মধ্যে এটি নিঃসন্দেহে একটি উল্লেখযোগ্য আলোচনা। ফরাসী বক্তারা জার্মান ও ফরাসী কাব্যে কবির অবদান, তাঁর ইতিহাস চেতনা এবং সোফোক্লেসের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের উপর আলোচনা করেন। এ ছাড়াও জার্মানীতে সম্প্রতি আরো কয়েকটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কবির প্রতি শ্রদ্ধা জানান হয়।

মারবাখের শিলার জাতীয় গ্রন্থশালা কবির প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার জন্য একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন। ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত প্রদর্শনীটি খোলা ছিল। এ-ছাড়াও এ বছর হোলডারলিনের উপর বেশ কয়েকটি বই প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় ফরাসী জার্মান বিশেষজ্ঞ পিয়ারে বের্তোর বহু আলোচিত বই 'হোলডারলিন ও ফরাসী বিপ্লব' বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ। হোলডারলিনের রচনা ও পত্রাবলীর দুটি খণ্ড সম্পাদনা করে প্রকাশ করেছেন ফ্রিডরিখ বাইসনার ও জোখেন শ্মিট। আলফ্রেড বেক ও পল রাবে রচনা করেছেন কবির এক সমালোচনামূলক জীবনী। পূর্ব জার্মানী থেকে আউফবাউ-এর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে চার খণ্ডে হোলডারলিনের জীবনী ও চিঠিপত্র।

নেপালী ভাষার স্বীকৃতির দাবীতে— ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে নেপালী ভাষার প্রচলন আছে। কয়েকজন বিশিষ্ট নেপালী লেখকও ঐ ভাষায় কয়েকটি উল্লেখ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন। এই কারণে, ভারতীয় সংবিধানে নেপালী ভাষাকে স্বীকৃতি দেবার জন্য নেপালীভাষীরা দীর্ঘদিন ধরে দাবী জানিয়ে আসছেন। ভূতপূর্ব সংসদ সদস্যা শ্রীমতী মায়াদেবী ছেত্রী লোকসভাতেও এই ব্যাপারে দাবী উত্থাপন করেছিলেন। সম্প্রতি তিনি রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করে নেপালী ভাষাকে সংবিধানে স্বীকৃতির জন্য একটি স্মারকলিপি পেশ করেছেন। বিবেকবান নাগরিক মাত্রেরই এর প্রতি সমর্থন থাকবে, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এই সঙ্গে নেপালী সাহিত্য-দরদীদের আর একটি দিকের প্রতিও লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন বলে মনে করি। তা হল, নেপালী ভাষা ও সাহিত্যের সমৃদ্ধির জন্য নেপালী লেখকদের এগিয়ে আসতে হবে। নেপালী লোক-সাহিত্য সংগ্রহ, নেপালী ভাষার অভিধান প্রকাশ এবং আধুনিক নেপালী গল্প, কবিতা প্রকাশের জন্য পত্র-পত্রিকা প্রকাশের দিকেও নজর দেওয়া উচিত। এ-ছাড়া নেপালী-সাহিত্যের সঙ্গে অ-নেপালী-ভাষীরাও যাতে পরিচিত হতে পারেন, তাঁর দিকেও দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

জার্মান প্রকাশকদের শান্তি পুরস্কার— এ-বছর 'পশ্চিম জার্মান প্রকাশন সংস্থার' শান্তি পুরস্কার লাভ করেছেন সুইডিশ

সম্প্রতি পুথোর ও আলতো মিরভান। কয়েকদিন আগে ফ্রাঙ্কফুর্টে যে বার্ষিক আন্তর্জাতিক পুস্তক প্রদর্শনীর আয়োজন হয়েছিল, সেখানে এই এক হাজার মার্ক মূল্যের পুরস্কারটি প্রদান করা হয়। এ-বছর উক্ত শহরের ঐতিহাসিক সেন্ট পলস গীর্জায় আয়োজিত এই প্রদর্শনীতে পৃথিবীর ৬১টি দেশের মোট ৩০০৮টি প্রকাশক সংস্থা যোগদান করেছিলেন।

গুজরাটি কবির পরলোকগমন—প্রখ্যাত গুজরাটি কবি কান্তভাই আর বাস গত ২০ অক্টোবর বোম্বাই শহরে পরলোকগমন করেছেন। গুজরাটি সাহিত্যে তিনি 'স্বপ্নস্থ' নামে কবিতা রচনা করতেন। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৯৬৭ সালে। বইটির নাম ছিল 'অচলা'। এ পর্যন্ত তাঁর গুজরাটি ভাষায় ১৬টি কবিতার বই প্রকাশিত হয়েছে। গুজরাটি সাহিত্যে যাঁরা প্রগতিশীল সাহিত্য আন্দোলনে অগ্রণী ছিলেন, তিনি তাঁদের অন্যতম। ১৯৬৬ সালে তিনি 'সোভিয়েট ল্যান্ড নেহেরু' পুরস্কারে সম্মানিত হন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৭ বৎসর।

ইন্দোনেশিয়ার কবিতা — প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে আমাদের পরিচয় খুবই সীমিত। রাজনীতির দিক থেকে কিছুটা পরিচয় থাকলেও, শিল্প সংস্কৃতির দিক থেকে পরিচয় তেমন নেই। এই কারণেই বোধকরি, এই বৃহৎ মহাদেশে আমরা এত বিচ্ছিন্ন। আমাদের ভাষায় প্রতিবেশী এইসব রাষ্ট্রের শিল্প, সাহিত্য এবং সংস্কৃতির বিশেষ পরিচয় নেই। বিশেষ অনুবাদ নেই এই সব দেশের। তবু মাঝে মাঝে ইংরেজি ভাষায় কিছু কিছু সংকলন প্রকাশিত হয়। সম্প্রতি ইন্দোনেশিয়ার কবিতার এমন একটি সুন্দর ইংরেজি অনুবাদ সংকলন চোখে পড়ল। বইটি সম্পাদনা করেছেন বার্টন রাফেল। প্রকাশ করেছেন ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া প্রেস। এর থেকে ইন্দোনেশীয় কবিতা সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানা গেল।

বইটিতে চল্লিশের যুগ থেকে সম্প্রতি কালের কবিদের কবিতা অনূদিত হয়েছে। অনেক কবির কবিতাই স্থান পেয়েছে এতে কিন্তু মুখ্য স্থান অধিকার করেছেন মাত্র পাঁচজন। এই পাঁচজন কবি হলেন— আমীর হামজা, চৈরিল আনোয়ার, রিভাই এপিন, সিতর সিতুমোরাং এবং ডব্লু এস রেন্দ্রা। আমীর হামজার দুই-একটি কবিতা বাংলায় অনূদিত হয়েছে। তিনি অনেকের মতে এ-যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ইন্দোনেশীয় কবি। 'তাহাসা মালয়'-এ তিনি কবিতা রচনা করেন। তাঁর কাব্যে পারশ্য কবিতার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। আনোয়ার আর একজন বিশিষ্ট কবি। মাত্র ২৭ বৎসর তিনি জীবিত ছিলেন। এই স্বল্প-জীবনে কবিতা লিখেছেন তিনি মোট ৭৫টি। তাঁর কবিতার ইংরেজী অনুবাদ সংকলন এর আগেই নিউইয়র্কের 'নিউ ডাইরেকসান' প্রকাশন সংস্থা স্বতন্ত্র ভাবে প্রকাশ করেছেন। আনোয়ার আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্য পাঠ করেছেন অনেক এবং তাঁর রচনায় ইউরোপীয় প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। 'ভাহাসা ইন্দোনেশীয়া'তে তিনি কাব্য রচনা করেছেন।

রিভাই এপিনের পরীক্ষা-নিরীক্ষাও ইন্দোনেশীয় কবিতার ইতিহাসে অনুধাবনযোগ্য। এঁদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ বোধকরি রেন্দ্রা। ১৯৩৫ সালে তাঁর জন্ম হয়। কবিতাগুলি সম্পাদনা করেছেন কয়েকজন বিশিষ্ট অনুবাদক। এশিয়ার সাহিত্য সম্বন্ধে উৎসাহী পাঠকদের কাছে বইটি একটি প্রয়োজনীয় সংযোজন বলে স্বীকৃতি লাভ করবে। —চার্বাক

নতুন বই

নীলাঙ্গুরীয় (নবীন সংস্করণ)—বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক—রবীন্দ্র লাইব্রেরী; ১৫।২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা—১২। দাম—দশ টাকা।

নীলাঙ্গুরীয় গ্রন্থের কথাশিল্পী বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের স্মরণীয় সৃষ্টি। সম্প্রতি পরিমার্জিত আকারে প্রকাশিত এর এই নবীন সংস্করণ পাঠক মহলে যথারীতি সমাদৃত হবে, সন্দেহ নেই।

এ-উপন্যাসের নায়ক শৈলেন গৃহশিক্ষক। ধনী ও সম্ভ্রান্ত এক ব্যারিস্টার মিঃ রায়ের ন' বছরের মেয়ে মলয়কে সে পড়ায়। আর সে নিজে পড়ত এম-এ ক্লাসে। কিন্তু পড়া বা পড়ানোর কোনোটাই নয়, তবুর দিদি মীরার সঙ্গে মন দেয়া-নেয়ার খেলাতেই শৈলেন বিপর্যস্ত হল শেষ অবধি। মীরার কাছ থেকে সে পেল দুর্বার-মেশান ভালবাসা। এরই মধ্যে অপ্রত্যাশিত থেকে বাল্যসখী সৌদামিনী এসে তাকে দিতে চেয়েছিল খাঁটি সোনা। কিন্তু সে নিতে পারে নি; কারণ, ভালবাসার নিখাদ সোনা নিতে হয় নিখাদ সোনা দিয়েই। তার সুবর্ণ আগেই দেয়া হয়ে গিয়েছিল মীরাকে।

এদিকে মীরাকেও শৈলেন পারেনি। তার দুর্বলতা এবং বিশেষ করে মন স্থির করে উঠতে না-পারার ব্যর্থতা একেবারে দায়ী। দায়িত্ব হয়তো মীরার দিক থেকেও আছে। সব সময় নিজেকে সে ঠিক করে ধরতে পারে নি শৈলেনের সামনে। তাই শৈলেনও তাকে ঠিক চিনতে পারে নি, সর্বনাশ থেকে জোর করে টেনে নিতে পারে নি।

মীরা ও শৈলেনের এই ইতিকথা আশ্চর্য সূক্ষ্মদর্শিতার সঙ্গে চিত্রিত করেছেন লেখক। বর্ণনা ও বিশ্লেষণের গুণে অতি সামান্য ঘটনাকেও তিনি এখানে অসামান্য করে তুলেছেন।

লিন্ডসে ক্রেসেন্ট-এর টি-পার্টিতে মীরার হঠাৎ ভাবান্তর, ডায়মন্ড-হারবার রোডের ঘটনা, শ্রীরামপুর-সাঁতরায় মীরার হঠাৎ আবির্ভাব এবং রাঁচী থেকে মীরা ও শৈলেন উভয়েরই হঠাৎ চলে-আসা—এই সব কিছুর মধ্যেই লেখক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মনোবিশ্লেষণ-কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন। মীরার মা স্নেহময়ী অপর্ণা চরিত্রটিও জীবন্ত আমাদের কাছে। সন্তানহারা তুলসীকে আশ্রয় দেয়ার মধ্য দিয়ে বিলেত-প্রবাসী তার অপদার্থ পুত্রের প্রতি স্নেহই আমাদের সামনে প্রকট হয়ে উঠেছে। আর একদিকে, শ্রীরামপুর-সাঁতরায় শৈলেনের অভিন্নহৃদয় বন্ধু অনিলের সংসারটিও কম আকর্ষণীয় নয়। যেমন অনিল, তেমনি তার স্ত্রী অম্বুরী প্রথম-দর্শনেই অভিভূত করে দেয় পাঠকদের: অনিলের অদ্ভুত শৈলেন-প্রীতি এবং অম্বুরীর অন্ধ অনিল-প্রীতি পাঠকদের স্তম্ভিত করে।

অনিল ও শৈলেনের বাল্যসঙ্গী সৌদামিনী এ-উপন্যাসের এক আশ্চর্য চরিত্র। সব সময় সে চলছে,—জ্বলন্ত অঙ্গারের ওপর দিয়ে কখনও, আবার কখনও বা শালবনের গাছের ছায়ার ওপর দিয়ে চলছে সে। তার জীবনের নাটকীয় পরিণতির জন্যে সে যতটা দায়ী নয়, যতটা দায়ী তার নিষ্ঠুর-নির্দয় পরিবেশ। এ-ছাড়া, এ-উপন্যাসে কম-বেশী নাটকীয়তা সৃষ্টি করেছে সরমার স্নিগ্ধ-প্রেম ও ইমানুলের অন্ধ-প্রেম।

কিন্তু তবু বলবো, এ সব কিছুই বাহ্য এ-উপন্যাস সম্পর্কে। মীরার দুর্বার-মেশান ভালবাসা, শৈলেনকে দেয়া মীরার একটি নীলা পাথর, বিয়ের বন্ধ-মেশান একটি হীরা, শৈলেন যা নাকি আংটি করে অনামিকায় ধারণ করেছে, তার স্মৃতি উপন্যাসটি শেষ করার অনেক পরেও ঝলমল করে। মনে হয়,—হ্যাঁ, দুর্বার মেশান ভালবাসার উপযুক্ত প্রতীক এই নীলাঙ্গুরীয়। ভালবাসা এখানে হীরার মতই নীল, হীরার মতই খাঁটি।

শারদ সাহিত্য

কিশোর ভারতী—সম্পাদক : দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাঃ লিঃ। ৭২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯। দাম—ছয় টাকা।

প্রতি বছরের মত এবারের কিশোর ভারতীর শারদীয় সংখ্যাটি বেশ আকর্ষণীয় আকারে বেরিয়েছে। অসংখ্য রঙিন ছবি ভর্তি সুদৃশ্য প্রচ্ছদসমৃদ্ধ সংখ্যাটিতে বাংলা সাহিত্যের প্রবীণ এবং নতুন লেখকরা লিখেছেন। ছবি উপন্যাস লিখেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, নীহাররঞ্জন গুপ্ত, ধীরেন্দ্রলাল ধর, দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন ঘোষ এবং সঙ্কর্ষণ রায়। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের টেনিদার গল্প, শিবরাম চক্রবর্তীর হর্ষবর্ধনের গল্প, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের ফুলকোবাবুর গল্প, অহীন্দ্র চৌধুরীর স্মৃতিকথা এবং মন্মথ রায়ের নাটক সংখ্যাটির বিশেষ আকর্ষণ। তাছাড়া স্বপ্নগাথা, বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প, ভৌতিক গল্প, মজার গল্প, হাসির গল্প, সামাজিক গল্প করুণরসের গল্প, শিকার কাহিনী, দরদী গল্প, কবিতা, উপকথা, অভিযান জীব-জগতের কাহিনী, রহস্য গল্প, প্রাচীন সাহিত্যের গল্প, ইতিহাসনির্ভর গল্প, হাস্যরসাত্মক নাটক, নাট্য নকসা, সাগর তলের কাহিনী, ভ্রমণকাহিনী, মিষ্টিমধুর গল্প, সংবাদবিচিত্রা, টুকরো হাসি, জাদুবিদ্যা, বিজ্ঞানসংবাদ, রূপকথা, খেলাধুলো, ছবিতে কৌতুক কাহিনী, ছবিতে গোয়েন্দা কাহিনী, ছবিতে বিচিত্র কাহিনী, প্রচুর আর্ট প্লেট এবং আরো অনেক কিছু আছে। লিখেছেন বিমলচন্দ্র ঘোষ আশাপূর্ণা দেবী, নরেন্দ্র দেব, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, শক্তিপদ রাজগুরু, ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য, অতীশ বর্ধন, প্রভাকর মাঝি, রণজিৎকুমার সেন, দুর্গাদাস সরকার, আশা দেবী, শৈবাল চক্রবর্তী, জ্যোতিভূষণ চাকী, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, ইন্দিরা দেবী, অমিয়কুমার চক্রবর্তী, স্বপনবুড়ো, কুমারেশ চক্রবর্তী এবং আরো অনেকে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এবং রমেশচন্দ্র দত্তের রচনার পুনর্মুদ্রণ আছে। সংখ্যাটির প্রয়োজন সাময়িক নয়—দীর্ঘদিন কিশোর পাঠকের জ্ঞান বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।

ঝুমঝুমি —সম্পাদক : গীতা দাশ এবং সরল দে। এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি। কলেজ স্ট্রীট মার্কেট। কলকাতা—১২। দাম দু টাকা।

কচি পাঠকের কাছে পত্রিকা ঝুমঝুমি এবারের শারদ সংখ্যাগুলির মধ্যে একটি বিশেষ আকর্ষণ। সুন্দর ছাপা রঙীন ছবি এবং সম্পাদনার সুরুচির পরিচয় ঝুমঝুমিকে কেবল কচি পাঠকদের নয়, বড়দেরও প্রিয় করে তুলেছে। একটি উপন্যাস লিখেছেন মিহির সেন। গল্প লিখেছেন শিবরাম চক্রবর্তী, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, বলরাম বসাক, শৈল চক্রবর্তী, আশা দেবী, ধীরেন্দ্রলাল ধর, আনন্দ বাগচী, কার্তিক ঘোষ, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, ভূপতি ভট্টাচার্য, প্রবাস দত্ত, শৈলশেখর মিত্র, অশোককুমার মিত্র এবং গৌরী রক্ষিত। ছড়া এবং কবিতা লিখেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, মৌমাছি, জ্যোতিভূষণ চাকী, মণীন্দ্র রায়, অমিতাভ চৌধুরী, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণ ধর, প্রীতিভূষণ চাকী, উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সরল দে, সামসুল হক, চণ্ডী লাহিড়ী, শ্যামলকুমার চক্রবর্তী, নির্মলেন্দু গৌতম, মনোজিৎ বসু, জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়, প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়, দেবকুমার গড়গড়ি, তপনজ্যোতি মিত্র, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরো কয়েকজন। নিঃস্বের বর্ণটি বিদেশিক অনুবাদ করেছেন অশোককুমার মিত্র এবং শৈলশেখর মিত্র। মজার ছবি এঁকেছেন শৈল চক্রবর্তী এবং চণ্ডী লাহিড়ী। আরো অনেক ছবি এবং লেখা আছে। দশ বছরের শিল্পী কমলা ত্রিপাঠীর প্রচ্ছদ সকলকে আকৃষ্ট করবে।

পরাগ — সম্পাদক : অমিয় চট্টোপাধ্যায় এবং আশীষতরু মুখোপাধ্যায়। ১২২এ, বালিগঞ্জ গার্ডেন্স। কলকাতা—১৯। দাম এক টাকা।

পরাগকে পৃথিবীর প্রথম মিনি পত্রিকা হিসাবে দাবী করা হয়ে থাকে। মিনি হলেও, বাঙলা দেশের প্রখ্যাত লেখকদের রচনায় সমৃদ্ধ এই পত্রিকাটি হাতে নিয়ে পাঠক বিস্মিত হবেন। লিখেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, মণীন্দ্র রায়, কৃষ্ণ ধর, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, অমিতাভ চৌধুরী, পরমানন্দ সরস্বতী, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, ফ্রানৎস চাপেক, তুষার রায়, পার্থপ্রতিম চৌধুরী, কাজল ঘোষ, কবিরুল ইসলাম, রেবন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, আবু আতাহার, সামসুল হক। পূর্ব বাঙলার কবিতা লিখেছেন শামসুর রাহমান, ওমর আলি, দাউদহায়দার, আমিন মাহমুদ, সৈয়দ সামসুল হক এবং বিমলচন্দ্র সাহা।

সেঁজুতি—সম্পাদক : গোপাল আচার্য। ৬৮।৪, প্রতাপাদিত্য রোড, কলকাতা—২৬। দাম পঁচিশ পয়সা।

সুন্দর ছাপা এই মিনি পত্রিকাটি বেশ আকর্ষণীয় এবং বৈচিত্র্যময়।

বৈতানিক : সম্পাদক ভবানী মুখোপাধ্যায়। এস সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ। ১সি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট। কলকাতা ১২। দাম দু টাকা।

সাহিত্য ও শিল্পের ত্রৈমাসিক বৈতানিক সুনির্বাচিত রচনার সমাবেশে বিদগ্ধ পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, নাটক, আলোচনা সমৃদ্ধ এই সংখ্যাটিতে লিখেছেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, মনোজ বসু, প্রবোধকুমার সান্যাল, আশুতোষ ভট্টাচার্য, রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, গোপিকানাথ চৌধুরী, শিশির নিয়োগী, তপতি বসু, মনোজিৎ বসু, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, দীপেন্দু চক্রবর্তী, নির্মল সরকার, বিভূতি রক্ষিত, নির্মলেন্দু গৌতম, দুর্গাদাস রুদ্র, ভবানী মুখোপাধ্যায়, দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, বিনয় ঘোষ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, মণীন্দ্র রায়, সুনীল রায়, দক্ষিণারঞ্জন বসু, কৃষ্ণ ধর, শঙ্খসত্ত্ব বসু, আশিস সান্যাল, অজিত মুখোপাধ্যায়, বিষ্ণু মুখোপাধ্যায়, সুধীর করণ এবং আরো অনেকে।

কল্পবাণী : সম্পাদক—রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। ১১, শ্যামপুকুর লেন। কলকাতা—৪। দাম এক টাকা।

একটি কাব্য-নাটক লিখেছেন বুদ্ধদেব বসু। গল্প লিখেছেন জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, আবদুল জব্বার, রঞ্জিত রায়চৌধুরী, রমানাথ রায় এবং আরো কয়েকজন। কবিতা লিখেছেন এবং অন্যান্য আলোচনা করেছেন নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, তরুণ সান্যাল, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিতাভ দাশগুপ্ত, কিরোজ চৌধুরী, সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুন্ধতী সেনগুপ্ত, প্রতিমা সেনগুপ্ত, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, অরুণ সেন, রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় শান্তিকুমার ঘোষ এবং আরো কয়েকজন।

কা পর্বোহি : সম্পাদক—বার্ণিক রায়। ৫, গগন সরকার রোড। কলকাতা—১০। দাম দেড় টাকা।

বাংলা সাহিত্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক সাহিত্যের একমাত্র দ্বিভাষিক ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'কা পর্বোহি'। রোমান হরফে বাংলা কবিতা মুদ্রণ সংখ্যাটির বিশেষ আকর্ষণ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ মিত্র, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, শিবশম্ভু পাল, বিজয়া মুখোপাধ্যায়, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, সুখেন্দু মল্লিক এবং বার্ণিক রায়ের কবিতা রোমান অক্ষরে ছাপা হয়েছে। অনুবাদ করেছেন ক্ষিতিশ রায়, বিবেকানন্দ রায়, সিদ্ধনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শম্ভু বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বার্ণিক রায়। কবিতা ও প্রবন্ধ লিখেছেন মনীন্দ্র ঘটক, হরপ্রসাদ মিত্র, দক্ষিণারঞ্জন বসু, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, জগন্নাথ চক্রবর্তী, লোকনাথ ভট্টাচার্য, গোপাল ভৌমিক, শ্যামকুমার মুখোপাধ্যায়, শান্তি-

কুমার ঘোষ, শঙ্খ ঘোষ, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়, মঞ্জুশ্রী দাস, বিজয়া মুখোপাধ্যায়, মৃত্যুঞ্জয় হাজরা, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, অমিতাভ দাশগুপ্ত, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, রঞ্জিত সিংহ, বার্ণিক রায়, সুনীল রায়, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, শিবশম্ভু পাল, মনোজিৎ বসু এবং আরো অনেকে। কয়েকটি বিদেশী কবিতার অনুবাদ আছে।

চলার পথে—সম্পাদক : কমলা মুখোপাধ্যায়। মডার্ন প্রেস। ১৬৬।২, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা—১২। দাম দু টাকা।

এই সংখ্যাটিতে লিখেছেন মণি চট্টোপাধ্যায়, আশাপূর্ণা দেবী, বীণা ভৌমিক (দাস), প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, রমা বসু, আশা দেবী, ভক্তি বিশ্বাস, জ্যোতির্ময়ী দেবী, মৈত্রেয়ী দেবী, উমা দেবী, বীণা দত্ত এবং আরো কয়েকজন।

ত্রিবেণী — ৭৭। সম্পাদক — ভবেশচন্দ্র বসু। ২৫২এ, পিকনিক গার্ডেন রোড, কলকাতা — ৩৯ থেকে প্রকাশিত। দাম : ১'০০।

বহু প্রখ্যাত প্রবীণ ও নবীন লেখকের রচনা সংকলন করে এই শারদ সংকলন গ্রথিত। প্রেমেন্দ্র মিত্র, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, কৃষ্ণ ধর, রাণা বসু, মনজ ঘোষ, কুমারেশ ঘোষ, প্রদ্যোতকুমার ঘোষ প্রমুখ লেখকদের রচনাগুলি বিশিষ্টতার দাবী রাখে।

প্রতিভা : সম্পাদক — প্রদীপকুমার বসু মজুমদার, ৩২।ই।১, বাবুরাম ঘোষ রোড, কলকাতা—৪০, দাম : ২৫ পয়সা।

প্রায় ২৪টি কবিতা ও একটি গদ্য রচনা নিয়ে বিশেষ আকারে প্রকাশিত এই পত্রিকাটির ছোট্ট সম্পাদকীয়তে যে বলিষ্ঠতার প্রত্যয় রয়েছে কবি নির্বাচনে কিন্তু তা নেই। বরং খুশি হওয়া যেত যদি সত্যি সত্যিই নতুন কবি-কণ্ঠ তাঁরা আবিষ্কার করতেন। সম্পাদকীয়ের মর্যাদা রাখতেন। লিখেছেন আলোক সরকার, শংকর চট্টোপাধ্যায়, মৃত্যুঞ্জয় হাজরা, নীরেন্দ্র গুপ্ত, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, শান্তিকুমার ঘোষ, রথীন্দ্র মজুমদার সহ নতুন কবিরা।

কার্নিশ : সম্পাদক—মিহির দাশ, ১৪বি, ব্রজ স্ট্রীট, কলকাতা — ১৯, দাম : এক টাকা।

ঝকঝকে ছাপা এই কাগজটির বর্তমান সংখ্যায় লিখেছেন অন্নদাশংকর রায়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, ভবানী মুখোপাধ্যায়, সমীর রক্ষিত, বীরেন্দ্র দত্ত, অর্চনা মিত্র কমলেশ মিত্র, ইন্দ্রজিৎ বসু, সৈয়দ কওসর জামাল, রমা বসু এবং আরো অনেকে।

অন্বেষা অভিযান—সম্পাদক সুনির্মল চট্টোপাধ্যায় ও নীরারণ দেবনাথ ।। ১৭, জাস্টিস দ্বারকানাথ রোড, কলকাতা—২০, দু টাকা।

বহু কবিতা ও অন্যান্য রচনা সমৃদ্ধ এই সংকলনে লিখেছেন অমল সেন, [illegible] [illegible] মোহিত চক্রবর্তী, সুভাষ সিংহ, জয়ন্ত চক্রবর্তী, সুনির্মল চট্টোপাধ্যায়, জয়িতা বন্দ্যোপাধ্যায়, হারান রায় এবং আরো অনেকে। প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা সুচিন্তিত।

বলাকা—সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি বিবেকানন্দ দাস ।। ঠিকানা : অনুল্লিখিত। দাম : ছাপা হয়নি।

ছয়জন সম্পাদকের যৌথ সম্পাদনায় পত্রিকাটি প্রকাশিত। বলাকার মর্মকথা লিখেছেন বিজয়কৃষ্ণ বসু। অন্যান্য লেখকদের মধ্যে অমিতাভ গুপ্ত, প্রলয় চৌধুরী, নিশীথ ভড়, দীনেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, শিবশম্ভু পাল, এবং আরো অনেকে।

বর্ণালী—সম্পাদিকা শিপ্রা আদিত্য ।। ৮, ডঃ আশুতোষ শাস্ত্রী রোড, কলকাতা—১০ ।। দাম দু টাকা।

দেবব্রত মুখোপাধ্যায়ের চমৎকার প্রচ্ছদ ও অসংখ্য চিত্রে পত্রিকাটি উন্নত রুচির পরিচায়ক। লেখাগুলি সুনির্বাচিত। আগাগোড়া দু রঙে ছাপা। লিখেছেন মণীন্দ্র রায়, কৃষ্ণ ধর, সুভাষ মুখোপাধ্যায় অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, বাদল সরকার, মতি নন্দী, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, মিহির সেন এবং আরো অনেকে। আধুনিক সাহিত্য পাঠকের পক্ষে একটি পাঠযোগ্য সংকলন।

উত্তরণ—সম্পাদক কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত ।। ৩১১, গাঙ্গুলী বাগান, কলকাতা—৪৭ ।। দাম : এক টাকা।

এ সংখ্যায় উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ 'আধুনিক কাব্য ও সুধীন্দ্রনাথ'। লিখেছেন বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। বিদ্যাসাগরের সার্ধশতাব্দী উপলক্ষে কয়েকটি কবিতা ও আলোচনা লিখেছেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, দক্ষিণারঞ্জন বসু, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণ ধর, দুর্গাদাস সরকার, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অরবিন্দ পোদ্দার, অমিয়ভূষণ মজুমদার, সুশীল রায় এবং আরো অনেকে। পত্রিকাটি সংগ্রহযোগ্য।

সমর্থ : সম্পাদক উৎপলকুমার গুপ্ত ।। গোয়ালপাড়া লেন, বহরমপুর ।। দাম : এক টাকা।

উন্নত মানের কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছেন উৎপল চট্টোপাধ্যায়, গোকুলেশ্বর ঘোষ ও তপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। কবিতা লিখেছেন কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, দীপেন রায়, সৈয়দ কওসর জামাল প্রমুখ। গল্প লিখেছেন নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য, দিবোশচন্দ্র লাহিড়ী, দুর্গাদাস ভট্ট, অরুণকুমার মজুমদার, উদয় ভট্টাচার্য ও উৎপলকুমার গুপ্ত।

শিশুমেলা : সম্পাদক অরুণ চট্টোপাধ্যায় ৩৬, রমা বসাক স্ট্রীট, কলকাতা—৩৬ ।। পঁচাত্তর পয়সা।

ছোটদের উপযোগী ছড়া, গল্প, কবিতায় সমৃদ্ধ। অঙ্গসজ্জা আকর্ষণীয়। লিখেছেন শিবরাম চক্রবর্তী, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায়, সরল দে, গোপাল ভৌমিক, স্বপনবুড়ো এবং আরো অনেকে।

আলোর পত্রিকা — সম্পাদক : সর্বাচরণ ঘোষ। যুগ্ম-সম্পাদক — সরোজ ঘোষ। ২।১এ, নারায়ণ দত্ত স্ট্রীট, কলকাতা— ৫ থেকে প্রকাশিত। দাম ১'৫০।

প্রবন্ধ, গল্প, রম্যরচনা কবিতা ও নানা বিচিত্র বিবিধ রচনায় সমৃদ্ধ আমার পত্রিকার শারদীয়া অর্ঘ নানা স্বাদে খুবই আকর্ষণীয়। ডঃ ক্ষেত্র গুপ্তর : মধুসূদনের একটি ইংরাজি প্রবন্ধ, শরদিন্দুনারায়ণ ঘোষের : দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সাহিত্যপ্রীতি, রবীন্দ্রনাথ গুপ্তর পুরনো বাংলার হারানো সাহিত্য—একটি নাটক : আচার্য্য সুকুমার বোম্বাচাক, মনজ ঘোষের গল্প : লক্ষ্মীর ঘর, মনোজ মিত্রের রম্য রচনা : ডঃ সাধনকুমার স্মরণে এবং নানা কবির আধুনিক কবিতার পরীক্ষানিরীক্ষা বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

প্রাপ্তি স্বীকার

জংশন—সম্পাদক দিগ্বিজয় চৌধুরী। সি-১৯২ ইউনিক পার্ক, কলকাতা ৩৪। পঞ্চাশ পয়সা।

নান্দীমুখ—গৌরীশঙ্কর দে কর্তৃক ৭/১৯, শহীদনগর, হালতু, ২৪ পরগণা। দাম—৮০ পয়সা।

প্রশ্ন—সম্পাদক বিনয়ভূষণ ভট্টাচার্য। টাউন প্রেস, শিলচর-১।

সুপর্ণ — সম্পাদিকা ঐন্দ্রিলা চৌধুরী। ১৬২/৪ লেক গার্ডেন্স, কলকাতা—৪৫। দাম পঞ্চাশ পয়সা।

উত্তরসূরী—প্রধান সম্পাদক অজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ৪৫ নীলমণি মল্লিক লেন, হাওড়া—১।

চার্বাক—সম্পাদক রণজিৎ দাস। টাটা ইন্ডাস্ট্রিজ স্পোর্টস ক্লাব। ৪৩ চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা—১৬।

নির্মাণচিন্তা—সম্পাদক সুধাংশু সেন ও বিমান চট্টোপাধ্যায়। ৩০/৪১ রামকৃষ্ণ এক্সটেনশন, দুর্গাপুর-৪। পঁচাশ পয়সা।

এষণা—সম্পাদক অনুপম রাহা। ২/২সি, ঈশ্বর মিল লেন, কলকাতা—৬। দাম ৩০ পয়সা।

বসুধা—সম্পাদক সৌমেন বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০বি/৭ গোয়ালাপাড়া রোড, বেহালা, কলকাতা—৬০। দাম ৫০ পয়সা।

শারদ সাহিত্য পরিক্রমা

উপন্যাস

পর্যবেক্ষক

শতাধিক বৎসরের সুদীর্ঘ ঐতিহ্যে বাংলা উপন্যাস আমাদের গর্বের বস্তু। আর এই সমৃদ্ধতার পেছনে আছে ছোট বড় লেখকের অনলস চিন্তা ও পরিশ্রম। জগৎ-জীবনের রূপকার এই সব লেখকেরা সর্বদা সকলেই পাদপ্রদীপের সামনে এসেছেন এমন নয়। সেক্ষেত্রে অনেকের নীরব নেপথ্য ভূমিকাও কম নয়। অবশ্য বাঙালী পাঠক লেখকদের মূল্য দিয়েছেন, দিচ্ছেন। একজন লেখকের পক্ষে সেটাই হয়ত শ্রেষ্ঠ পাওনা। সেইজন্য লেখকের বড় চিন্তা পাঠক তাঁকে কেমনভাবে নিচ্ছেন। তাঁর ভাব-ভাবনার কথা, উপলব্ধি বা জীবন-দর্শনের কথা পাঠক কতটা গ্রহণ করেন, এ চিন্তা থাকে। যিনি বলেন, পাঠকের মুখ চেয়ে লিখি না, তিনি হয়ত জনরুচির ব্যাপারে বীতশ্রদ্ধ হতেও পারেন, কিন্তু সর্বদা এবং সকলের গ্রহণ ক্ষমতা নিম্নমুখী নয় নিশ্চয়ই। আসলে এ জাতীয় মনোভাবের পিছনে হয়তো একপ্রকার জীবন-বিমুখতা ও উৎকেন্দ্রিক অহংবোধও কোনো কোনো ক্ষেত্রে সক্রিয় থাকে। সেটা আমাদের এ সময়ে বিশেষভাবেই কাম্য নয়, যেহেতু জীবনের সঙ্গে, সমাজ-মানসের সঙ্গে এ সময়ের লেখকদের ঘনিষ্ঠ সংযোগ রক্ষা করে চলতেই হয়। দূর থেকে জীবন দেখা বা নিজের আত্মার সঙ্গে সংলাপের দিন বোধকরি শেষ হতে চলেছে।

এবারের শারদীয় পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত উপন্যাস পড়তে পড়তে এসব কথা মনে পড়ল। মনে পড়ল আরও এই জন্য যে, পাঠকের প্রত্যাশার অনেকখানি পূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও, বাংলা উপন্যাসে সমাজ-মানসের প্রতিফলন উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পেলেও, এ-সময়ে সত্তরের দশকের পরিবর্তিত সময়ে সব লেখকই এ বিষয়ে সচেতন কিনা, সেই কথা ভেবে।

প্রথমেই স্বীকার করা ভাল, এবারের শারদ সংখ্যায় প্রকাশিত সব কটা উপন্যাসই পড়া হয়ে ওঠেনি। এই অল্প সময়ে সবগুলো পড়েছি বললে রচনার সংখ্যাল্পতাই স্বীকার করা হয়। আসলে সংখ্যার হিসাব অন্যরকম। যে কোন একখানা পত্রিকাতেই পাঁচ-সাত আট কি দশখানা উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। সে ক্ষেত্রে বহুবিধ পত্রিকার দিকেই লক্ষ্য রাখার চেষ্টা করেছি। আমাদের মনে হয়, উপন্যাস রচনাতে লেখক ছাড়াও পত্রিকা-সম্পাদকেরও একটা দায়িত্ব থাকে। সেটা পত্রিকার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভরশীল। একটা সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত উপন্যাস কোন সিনেমা বা যৌন-বিষয়ক পত্রিকায় প্রকাশিত উপন্যাসের থেকে ভিন্ন ত হবেই। বিষয়ে, রীতি-ভঙ্গীতে, আকারে-প্রকারে নানা পার্থক্য। দুঃসাহসী সম্পাদক গতানুগতিকতা ভেঙে দেন, আবার অনেকে চলতি সাফল্যেরই সন্ধান করেন। সাধারণ অভিজ্ঞতা অনেকাংশেই এই রকমই।

পত্র-পত্রিকার শারদ সংখ্যায় একাধিক উপন্যাস প্রকাশের রেওয়াজ বেশী দিনের নয়। স্বাধীনতা-উত্তরকালে, এমন কি পঞ্চাশের দশকের প্রথমাংশে খুব কম পত্রিকাতেই উপন্যাস ছাপা হত। এখন ত সিটিং বা সাহিত্য পত্রিকাতেও উপন্যাস ছাপা হচ্ছে। যতদূর মনে পড়ছে, সিনেমা-পত্রিকাই একাধিক উপন্যাস প্রকাশের প্রথা চালু করে। উপন্যাস বেশী ছাপলে সে পত্রিকা কি পাঠক বেশী কেনেন। খুবই সম্ভব। কিছুসংখ্যক বিশেষ বিষয়ে অনুরাগী পাঠকের কথা বাদ দিলে সাধারণ পাঠক গল্প-উপন্যাস পড়তেই ভালবাসেন। পুজোর ছুটি কাটাতে বিস্তৃত টানা গল্প আকর্ষণের ব্যাপার। যে কোন একখানা ছোট উপন্যাসও পুস্তকাকারে চার পাঁচ টাকার কমে পাওয়া যায় না। সেক্ষেত্রে পাঁচ টাকায় একখানা পত্রিকা কিনলে একত্রে অনেকগুলি উপন্যাস পাওয়া যায়। পয়সার দিক থেকে বিশেষ সাশ্রয়। সপরিবারে পুজোর ছুটি কাটানোর একটা বাড়তি আকর্ষণও বটে।

সুতরাং শারদ সাহিত্যের মরশুমে পত্র-পত্রিকায় উপন্যাসের ভিড় বাড়ছে। শোনা যায়, যে সব লেখকের উপন্যাসের চাহিদার বেশি, তাঁদের একটা পুজো যেতে না যেতেই পরবর্তী পুজোর প্রস্তুতি নিতে হয়। খুবই স্বাভাবিক। এবারই তিন চারখানা উপন্যাস লিখেছেন এমন লেখকের সংখ্যা কম নয়। সঙ্গে গল্প প্রভৃতি অন্যান্য রচনা আছে। শিশুদের জন্যেও কিছু লিখতে হয়। পুজোতে একখানা দুখানা উপন্যাস অনেকেই লেখেন। তরুণ ও নবীন লেখকদের উপন্যাসের চাহিদাও ইদানীং বাড়ছে, এবং তা ক্রমবর্ধমান।

একটা প্রশ্ন বোধহয় প্রসঙ্গত ওঠে। পুজোর যে সব উপন্যাস লেখা হয়, সংক্ষিপ্ত আকৃতি-বদ্ধ। অনেকাংশে দ্রুততার জন্য গুণগত ব্যাপারেও এ সব রচনা উপন্যাস-পদবাচ্য, আদৌ কিনা, এ অভিযোগ নিতান্তই অমূলক, এ কথা বলা যায় না। সম্ভবত লেখকরা নিজেরাও তা বলবেন না। দ্রুততা থাকে অবশ্যই, যতই আগে থেকে শুরু করা যাক না কেন। তারপর আছে সম্পাদকের তাগিদ, একাধিক দাবী মেটানোর ব্যাপার। তবুও লেখকগণ নিজ নিজ ক্ষমতা ও প্রকৃতি অনুযায়ী চেষ্টা করেন নিশ্চয়ই। গুণগত উৎকর্ষ তার উপরেই নির্ভরশীল। আকার-প্রকার ছোট হলেই বা ক্ষতি কি। উপন্যাসে সর্বদা বিশাল পটভূমি, একটা জাত বা সম্প্রদায়ের উত্থান-পতন বা একটা জীবনের নানা জটিলতা-দ্বন্দ্ব দেখাতেই হবে, এমন কি দাসখত দেওয়া আছে। জীবনের কোন একমুখী সরল কাহিনী নিয়েও উপন্যাস হতে পারে, হচ্ছেও। সনাতন দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিচার করলে অধিকাংশ শারদ-উপন্যাসেই ব্যাপ্তি মিলবে না। সে চেষ্টা লেখকগণ অন্য সময়ে করবেন নিশ্চয়ই। তবে পাঠযোগ্য এবং উত্তীর্ণ রচনাই আগ্রহের বস্তু, সে কথা স্বীকার করতেই হবে।

বয়স্ক ও অভিজ্ঞ লেখকদের মধ্যে এবার যাঁদের আমরা পেয়েছি তাঁরা হলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (অমৃত, নব-কল্লোল), বনফুল (নব-কল্লোল), প্রেমেন্দ্র মিত্র (যুগান্তর), সরোজকুমার রায়-চৌধুরী (সাপ্তাহিক বসুমতী), মনোজ বসু (অমৃত), সুবোধ ঘোষ (উল্টোরথ), নরেন্দ্র মিত্র (সাপ্তাহিক বসুমতী, রূপা-বাণী), নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (যুগান্তর, বেতার জগৎ, উল্টোরথ), বিমল মিত্র (অমৃত, গল্প-ভারতী), গজেন্দ্রকুমার মিত্র (যুগান্তর, সিনেমা জগৎ), আশুতোষ মুখোপাধ্যায় (যুগান্তর, উল্টোরথ, ঘরোয়া), সমরেশ বসু (দেশ, সিনেমা জগৎ), আশাপূর্ণা দেবী (মৌসুমী, গল্প-ভারতী, বিচার), হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় (মৌসুমী, রূপাবাণী), শক্তিপদ রাজগুরু (মৌসুমী), জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী (সিনেমা জগৎ), সত্যজিৎ রায় (দেশ), বিমল কর (দেশ), আর শংকর-এর উপন্যাস, ভবানী মুখোপাধ্যায় কর্তৃক অনূদিত (অমৃত), বুদ্ধদেব গুহ (আনন্দলোক, সাপ্তাহিক বসুমতী), মিহির আচার্য (অমৃত)।

ঐতিহ্যের রূপান্তর • বাস্তব মননে

এবারের উল্লেখযোগ্য উপন্যাস তারাশঙ্করের 'গোপাল বাঁয়ের গল্পকথা' (অমৃত) লেখকের জগৎ ও জীবন দেখার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীতে বিশিষ্ট। বাংলাদেশের ক্রমশ ক্ষয়প্রাপ্ত সামন্ত শ্রেণীর বিরাট-ব্যাপ্ত উত্থান-পতনের কাহিনী তারাশঙ্করের উপ-

CENTRAL LIBRARY

ন্যাসের মুখ্য বিষয়বস্তু। লেখক তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতা দিয়ে বাংলাদেশের এক ঐতিহ্যের রূপান্তর লক্ষ্য করেছেন, গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়ে উপন্যাসে সন্নিবিষ্ট করেছেন। আলোচ্য উপন্যাসেরও কেন্দ্রীয় বিষয় ঐ একই ঐতিহ্যের রূপান্তর। তবে এই রূপান্তর পরিণতি লাভ করেছে ইদানীংকালের এক জাগ্রত-জিজ্ঞাসার মধ্যে এসে, ভূমিহীন চাষীদের জমি ও ধানের অধিকার সমস্যায় এসে। গোপালপুরের বিখ্যাত ঘোষ বংশের দীর্ঘ কাহিনীর মধ্যে জমিদারী, মামলা মোকদ্দমা, পরিবর্তিত [illegible] সমাজ-নীতি রাজনীতি এবং ব্যক্তিমানসের আশা-আকাঙ্ক্ষা-চাহিদার সর্বপ্রকার আয়োজনই দেখা যায়। বংশপরম্পরায় এ-সবই যথারীতি রূপান্তর ও পরিণতি লাভ করেছে। চিন্তা-ভাবনা, শিক্ষা ও রীতি-রুচির ব্যাপারেও এসেছে পরিবর্তন। গোপালপুরের ঘোষেরা জাতে ছোট হয়েও বংশে-গুণে পয়সা বা সম্মানে কারো থেকে ছোট নন—। ঐ বংশেরই ছেলে একালের শিক্ষা ও ভাবধারায় গড়ে ওঠা গোপাল [illegible] সত্ত্বেও পছন্দমত বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ-পরিবারের প্রভু কামাখ্যাচরণ তাঁর ছেলে গোপালের কথাবার্তার মধ্য দিয়ে একালের চিন্তা-ভাবনা সম্পর্কে অনেক কথা শুনেছেন। কৃষকেরা ধান কেটে নিচ্ছে, তিন-চারশ লোকের জমায়েত। এককালের ডাক-সাইটে মানুষ এখন জীবন-সায়াহ্নে এসে মেয়ের মুখ থেকে শুনলেন, 'তুমি কি সত্যিই বলতে পার বাবা জমি তোমার।' কামাখ্যাচরণ শুনলেন। কৃষকদের ধান কাটার দৃশ্যও দেখলেন দূর থেকে। 'আজ কাউকেই ফিরিয়ে দেওয়ার সামর্থ্য নেই তার। তাঁদের কাল তাঁদের ভালমন্দ সব সেকেলে হয়ে গেছে।' এক পড়ন্ত ব্যক্তিত্বের বর্তমান মানসিক দ্বন্দ্ব, অতীত দীর্ঘ ঐতিহ্য। এ-কালের নব-জাগ্রত চেতনার পটভূমিতে স্থাপন করে হৃদয়গ্রাহী করে ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি। দীর্ঘকাহিনী, বিরাট জিজ্ঞাসা ছোট পরিসরে সুসংহত করে গোপাল ঘোষের [illegible]কে তিনি একটি অভিজ্ঞতার মননশীল রচনার মর্যাদা দিয়েছেন।

মঞ্জরী অপেরার পর অভিনেত্রীর জীবন-কথা তারাশঙ্কর এবার লিখেছেন তাঁর 'অভিনেত্রী' উপন্যাসে (নব-কল্লোল)।

ভিন্নতর রূপে-রসে-বর্ণে ভিন্নতর কাঠামোতে একই কাহিনী বলেছেন [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'হাঁসের আকাশ' (বেতার জগৎ) উপন্যাসে। এখানেও পটভূমিতে আছে হতগৌরব সামন্ত প্রভুদের অতীত কীর্তিকলাপ, বংশপরম্পরায় সৃষ্ট তাঁদের ঘর-বাড়ি, রীতি-নীতি মাঠ-ঘাট ঐতিহ্য। এ-যেন অন্য জগৎ। কলকাতা থেকে আসত দলজোড়া উচ্চ-শিক্ষিত, উচ্চতর বিত্তশালী দম্পতি এবং একজন সুশিক্ষিত বেড়াতে এসেছে এই একদা-জমিদারের প্রাসাদে। তাদের শিকার-যাত্রার গল্প এ-কাহিনীর অন্যতম আকর্ষণ। উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ [illegible] জঙ্গল, জলা বিজন বা বনভূমির বনের কথা [illegible] অনেক উপন্যাসে পাওয়া গেছে। 'হাঁসের আকাশে'র বিস্তীর্ণ রহস্যজনক পড়ো জঙ্গল, রোমাঞ্চকর জলা-বিল বা 'আউটসাইডারে'র মত রহস্যময় এ-উপন্যাসের অন্যতম আকর্ষণ। শিকার শেষ পর্যন্ত শেষ হয়েছে. এই বিস্তীর্ণ পটভূমিতে স্থাপিত নর-নারীর মানসিক টানা-পোড়েন, মনস্তত্ত্ব-সংঘাত প্রাধান্য পেয়েছে। নারায়ণবাবুর কেন্দ্র সেটাই স্বাভাবিক, তাঁর লেখা প্রকৃত জীবন-বিচ্ছিন্ন স্বপ্নলোকসর্গ নয়, বরং বলা চলে জীবনের কঠোর বিবর্তিত সর্বদাই সেখানে জীবন অধিকার স্থাপনের চেষ্টা করছে। [illegible] শিকারী নামে [illegible] শিকার শিকারটি তখন [illegible] বলে, 'আমাদের জমিদারীর [illegible] আছে হে, কিন্তু আর ম্যানেজার, [illegible] সব চিবকুট করে দিয়েছে। কয়েকটা চাষী-টাষী এখন দু-চারকাঠা জমি পেলে পাকাতে, একটা লাঙ্গল পেলে বাঁচত।'— তখন ঐ দীর্ঘ-লালিত ঐতিহ্যের নিষ্ফল দম্ভ [illegible] মুখ লুকায়। সে মুখ ঐ কালের সমাজ-মানসের দিকেই ফেরানো।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় অন্যান্য উপন্যাস লিখেছেন মহানন্দা, [illegible] পরিক্রমা।

[illegible] সম্বন্ধে [illegible] অনন্যসাধারণ লেখা [illegible]। [illegible] নিষ্ঠুর পরীক্ষা ও মহিলা সম্পর্কে নব সংস্কার এবং আদর্শের মানদণ্ড ভিন্ন ভিন্ন হবে গড়ে উঠেছে এবং তাঁর ব্যক্তি-সত্তার আলোচনা করেছে তা প্রত্যক্ষ-দর্শীর সময়ের অভিজ্ঞতার আঘাতে সহজে চূর্ণ হয়ে যায়।

পতিত-জীবনকথা

এ-সমাজের পতিত জীবনকথা অনেক লেখকের উপন্যাসের বিষয় হয়েছে। আগেকার দিনের লেখকরাও এ-বিষয় নিয়ে উপন্যাস লিখেছেন। কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য আছে অনেক। থাকারই কথা। এ কালের লেখকগণও বিষয়টিকে অনেকে বিভিন্ন দৃষ্টিতে দেখেছেন। কেবল যৌন-জীবনকে প্রাধান্য দিয়ে লিখেছেন এমন লেখক যেমন আছেন, আবার এদের জীবনের পশ্চাৎ পটভূমি ব্যাখ্যা করে আর্থ-সামাজিক কারণ বিশ্লেষণ করেছেন এমন লেখকও আছেন। প্রেমেন্দ্র মিত্র নিঃসন্দেহে শেষোক্ত শ্রেণীর লেখক। 'বিনি বিধাতা' (যুগান্তর) নামক ছোট্ট উপন্যাসে তিনি একটি মেয়ের পতিত-জীবনকে আশ্চর্য সহানুভূতি ও সংযমের মধ্য দিয়ে দেখিয়েছেন। ছোটবেলা থেকে মেয়েটি কিভাবে বড় হয়েছে, পরবর্তীকালে মঞ্চ-অভিনয়ের মাধ্যমে কিভাবে সে বিচিত্রতর অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে, কেন একটা জীবন্ত মন থাকা সত্ত্বেও সে তার সার্থকতায় কোন মূল্য পায়নি—সবই মেয়েটির জীবন দিয়ে স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে। এই মেয়েটি জন্মের থেকেই দুঃখী। মেয়েটির 'প্রকৃত মা নিজের বিলাস জীবনের বিড়ম্বনা এড়াতে প্রথম যৌবনের অবৈধ প্রেমের সন্তানটিকে এই ধাত্রীর কাছে গচ্ছিত রেখেছিল।' এই যার জন্ম-রহস্য, তার পরবর্তী জীবন যে সুখের হবে না সে ত জানা কথা। একজন [illegible] সম্পর্কও গড়েছিল। 'জীবনটায় তারপরই অনেক পরিবর্তন এসেছে তা ঠিক।' এই পরিবর্তনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কাহিনী 'বিনি বিধাতা'। অভিনয়-জীবনে নির্মলা দেখেছে, যে সব নাটকে অভিনয় করতে হয় তা জীবনের সঙ্গে মোটেই যুক্ত নয়। 'গোটাকত লাগসই বুলির গ্রামোফোন।' নির্মলাকে এক সময় সন্ন্যাসিনী বেশেও দেখা যায়। তার চোখে কখনও মিথ্যা-মোহের অঞ্জন লাগে নি। সেখানেই 'বিনি বিধাতা'র বাস্তবতা ও সুস্থতার দিক।

ওরাও আছে......

দেশের জনসাধারণ সামান্য লোক, কিন্তু একটু খোঁজ করলেই বুঝবে, তারা সামান্য হলেও অসামান্য, নানা দুঃখ কষ্ট সহ্য করেও তাদের মধ্যে অনেকেই মহৎ থাকবার চেষ্টা করে। তারাই দেশের মেরুদণ্ড, তারাই দেশের ভরসা। উপন্যাসিক বনফুল তাঁর এবারের উপন্যাস 'ওরাও আছে' (নব-কল্লোল)তে সমাজের নিতান্ত সাধারণ মানুষের কথা অত্যন্ত সাদাসিধা ঢঙে ও সরল ভঙ্গীতে বর্ণনা করেছেন। সাধারণ [illegible], ফেরিওয়ালা, ডাক্তার, গৃহস্থ বধূ—এদেরই জীবনকথা 'ওরাও আছে।'

প্রেম-ভালবাসা। দাম্পত্য জীবন

প্রবীণ ও অভিজ্ঞ লেখক সরোজকুমার রায়চৌধুরীর উপন্যাস 'সূর্য-তামসী' (সাপ্তাহিক বসুমতী) লেডি ডাক্তার অসীমার জীবনের কর্ম ও প্রেম-ভালবাসার মনোরম কাহিনী। অসীমা বিলেত থেকে সিগারেট খাওয়া অভ্যাস করে এসেছে এই জন্য তার ডাক্তার স্বামীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। তারপর দীর্ঘ টানাপোড়েনের কাহিনী। শেষাংশে দেখা যায়, অসীমা তার বস ডঃ মহলানবীশকে বিয়ে করে কেন্দ্রস্থ হওয়ার চেষ্টা করছে। ঠিক তখনই তার আগের স্বামীর কাছে যেতে হয়। কেননা সন্তান মৃত্যুশয্যায়। আরও পরে অসীমা কলকাতা ছেড়ে যা-মরা ছেলেটাকে নিয়ে। অসীমা ও শিবতোষের হৃদয়-বিদারক বিচ্ছেদের চিত্র পাঠক-মনে ছায়া ফেলে। প্ল্যাটফরমের বাইরের দিকে নিঃশব্দে চেয়ে রইল। কোথা যাচ্ছিল, যন্ত্রণায় তার বুকের ভিতরটা যেন চূর্ণ হয়ে যাচ্ছিল?

এক সময়ের পরিশ্রান্ত সমাজজীবনের রূপকার সরোজকুমারের পরিণত মনের গভীর উপলব্ধিসঞ্জাত উপন্যাস আমাদের প্রত্যাশা।

আন্তরিক কল্যাণ-চিত্র সুবোধ ঘোষের 'শতকিয়া' (উল্টোরথ)। জীবন-যুদ্ধে ক্লান্ত ও বিষণ্ণ একটি তরুণী সততার উজ্জ্বল পরিণতিতে আমরা খুশি হয়ে উঠতে পারি। সমাজ-জীবনে যেমন একটা অন্ধকারের দিক আছে, আবার আলোকিত দিকও আছে। সেইজন্যই সবচেয়ে ভাল লাগে সততার

সংযত আচরণ। সেই রকমই ভাল লাগে, নায়ক অনিমেষের চরিত্রটি। যদিও উপন্যাসের সামান্য অংশই সে অধিকার করেছে। আরও দুটি ছোট চরিত্র ভাল লাগবে—জনার্দন ও বধূর মা। জীবনের সহস্র বিরোধিতা সত্ত্বেও লেখক যেন একটি বিশ্বাসকে সুন্দরভাবে লালন-পালন করেছেন। এই বিশ্বাসের প্রতি আস্থা এর পূর্বেও সুবোধ ঘোষের মধ্যে দেখা গেছে। উপন্যাসটি মিষ্টি, এবং পড়তে ভাল লাগবে।

ঘরোয়া জীবন-চিত্র নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'স্বপ্নদ' (সাপ্তাহিক বসুমতী) উপন্যাসও। শ্রীমিত্র মধ্যবিত্তের সুখ-দুঃখের দক্ষ রূপকার। 'স্বপ্নদ' অবশ্য অনেকটা উচ্চবিত্তের একটি একান্নবর্তী পরিবারের কর্তা-গিন্নী, পুত্র-পুত্রবধূদের জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা চাওয়া-পাওয়ার কাহিনী। যেহেতু অর্থের চিন্তা নেই সুতরাং কিছুটা অলস চিন্তাবিলাস আছে, শিল্প সাহিত্য রাজনীতির অহমিকা আছে, আর মদ্যপানও আছে। কিন্তু এই পানাসক্তির প্রত্যক্ষ চলাচলি নেই, দ্বিতীয়ত 'স্বপ্নদ' উপন্যাসে সুযোগ থাকা সত্ত্বেও বড় ঘরের বড় কথাকে কেচ্ছা-কেলেঙ্কারী বা যৌন আবেদনের মধ্যে ঘুরপাক খাওয়াননি লেখক। অনাচারের ক্লান্তিকর বর্ণনাও করেননি। বরং এখানকার চরিত্রগুলি প্রাণসম্পন্ন, স্বচ্ছন্দ, সরল, রসিকও। শেষাংশে 'নির্মলের' ব্যাধিগ্রস্ততা মনকে ছুঁয়ে ধরা এবং তার সম্ভাব্য নিরাময়ের ইঙ্গিত দিয়েছেন লেখক। শিক্ষিতা, সুন্দরী, বুদ্ধিমতী স্ত্রী অর্চনাই পারে তার রোগ সারাতে। 'তুমিই ব্যাধির শুশ্রূষা।' অর্চনা চরিত্রটি পাঠকের মনে দাগ কাটবে।

'আপনার গল্প আমার ভালো লাগে কেন জানেন? ট্র্যাজেডি হোক বা কমেডি হোক ভালবাসার প্রতি আপনার কিছু বিশ্বাস আর শ্রদ্ধা আছে।' 'প্রণয় আদিম' (যুগান্তর)-এর লক্ষ্মণ আয়েঙ্গার সংগে পাঠকও আশা করি একমত হবেন যে, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের প্রেমের উপন্যাস ভালবাসার প্রতি বিশ্বাসে আকর্ষণীয়। 'প্রণয় আদিম'ও নিঃসন্দেহে ভালবাসার প্রতি বিশ্বাসের ছবি। বন-পাহাড়ের অরণ্য-কন্যা মাতিলদা। অর্ধ-নগ্ন বেশবাস। যৌবন সর্বাঙ্গ দিয়ে বিচ্ছুরিত। কিন্তু সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অসচেতন এই মেয়ে। সরল, প্রকৃতির মতই সে সরল। তার ভালবাসার পাত্র সভ্য সমাজের লোক। শিক্ষিত মানুষ। কিন্তু মাতিলদার প্রেমে অনুরক্ত। সেই অনুরক্ত পুরুষের টাকার প্রয়োজন। 'সভ্য সমাজে ভালবাসা জিইয়ে রাখতে টাকার দরকার হয়, টাকা না থাকলে ভালবাসা মরে যায়, সব অন্ধকার হয়ে যায়।' মেয়েটি একথার অর্থ বোঝেনি। কিন্তু ভয়ঙ্কর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল নিজেকে সাবাড়ো। প্রেমিকার প্যাভেল ইঙ্গিতে সে ধরা দিয়েছিল। এতেই মাতিলদার জীবনের নিদারুণ পরিসমাপ্তি। কিন্তু মাতিলদা তার ভালবাসার পাত্রের জন্য তার বিশ্বাসকে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ধ্রুব করে রেখেছিল।

শ্রীমুখোপাধ্যায়ের অন্য উপন্যাস, 'প্রবল-পাশা' (উল্টোরথ) সার্কাস-জীবনের বিচিত্র ঘটনা। প্রেম-যৌনতা, আশা-ব্যর্থতার বাস্তব কাহিনী।

বুদ্ধদেব গুহ-র 'সাঁতঘর' (আনন্দবাজার)। এর মানুষটা বলেছিল, 'আমি একটি মেয়েকে আমার যা কিছু ছিল সব কিছু দিয়ে ভালবেসেছিলাম।' কিন্তু ভালবাসার মধ্যে এত বেদনা কেন। উপন্যাসের পটভূমিতে সাগরের অশান্ত গর্জন, বেলাভূমি, ঝাউবন। লেখকের অন্য উপন্যাস 'অনুভবীর জন্য' (সাপ্তাহিক বসুমতী)-ও প্রেম মুখ্য, পটভূমি আলমোড়া।

এখনও ডালহৌসীর অফিস পাড়ায় একটি মেয়েকে, নাম তার প্রকৃতি, দেখা যায়। 'মাথায় পাতলা হয়ে আসা চুল, সাদা চওড়া সিঁথি, স্বাস্থ্যঘটিত অসুখে ডান পা একটু টেনে চলে। কাঁধে ব্যাগ। হাতে প্লাস্টিকের খোসা। ওর শরীরে শুকনো আভা, ওর বয়েস ধরা যায় না, পঁচিশও হতে পারে কিংবা বত্রিশ।' মিহির আচার্যের 'দিবস বিভাবরী' (অমৃত) নায়িকা এই মেয়ে, পরিণামী চিত্রটা তার ঐ রকম। বোঝা যায়, জীবনযুদ্ধে পোড়খাওয়া নিদারুণ ঝলসানো এই মুখ। বাবা মারা গিয়েছিলেন বি-এ পরীক্ষার নির্বাচনে। তারপর নিজেকে প্রতিষ্ঠার লড়াই। ঘরে এবং বাইরে। চাকরী সে একটা পেয়েছিল, কেরানীর চাকরী। কিন্তু যৌবনে পূর্ণ অন্তঃপুরে যে তখন দাউদাউ করে জ্বলছে, যে যৌবনকে তৃপ্ত করতে চেয়েছে নিতান্ত নামগোত্রহীন এক যুবককে দিয়ে। তারপর মন! মন কি ভরছিল। নিজেকে টুকরো টুকরো করে দিয়েও সে শেষরক্ষা করতে পারেনি। মধ্যবিত্ত জীবনের হতশ্রী আত্মবঞ্চনার কাহিনী। মিহির আচার্য নগর-কেন্দ্রিক জীবনাচরণের বাস্তব ভিত্তির উপর তাঁর কাহিনী স্থাপন করেছেন, ইদানীংকালের অনেক অভিজ্ঞ লেখকেরা যার রূঢ়তাকে একপ্রকার এড়িয়েই চলেন।

বেকার জীবন : বর্তমান সময়

মনোজ বসু তাঁর বহু উপন্যাসে বর্তমান সময়ের সমস্যা ও সঙ্কটের কথা লিখেছেন। শিক্ষক-জীবনের কথা লিখেছেন যেমন চোরদের অন্তরঙ্গ জীবনের ছবিও তেমনি দক্ষতার সংগে চিত্রিত করেছেন। এবার তিনি লিখেছেন বেকার জীবনের দুঃখ-দুর্দশার কাহিনী তাঁর 'আমি সম্রাট' (অমৃত) উপন্যাসে। নিতান্ত দরিদ্র পরিবারের ছেলে সে, লেখাপড়া শিখেছিল অন্ত করে নিষ্ঠার সংগে। ইচ্ছা ছিল চাকরী করে বৃদ্ধা মা ও অসহায় দাদাকে সুখে রাখবে। চাকরী পাওয়ার জন্য নানাপ্রকার টেকনিক্যাল নন-টেকনিক্যাল ট্রেনিং ও ডিপ্লোমাও সে নিয়েছে। কিন্তু কোন যোগ্যতাই তার কাজে লাগল না। একসঙ্গে পড়ত, অত্যন্ত চালাক এবং চালু মেয়ে তার স্ত্রী হয়ে চেষ্টা করেছে, দু'একজন প্রভাবশালী ব্যক্তিও চেষ্টা করেননি তা নয়, শেষ পর্যন্ত সবই ব্যর্থ হয়েছে। বিচিত্র-বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা হয়েছে ছেলেটির। 'বছরের পর বছর উমেদারি চালাচ্ছি।' সে বেকারই থেকে গেছে।

'আমি সম্রাট'-এ অরুণ সরল, সহজ সপ্রতিভ বুদ্ধিমান। বান্ধবীর সংগে মেলামেশাতেও সে আশ্চর্য স্বাভাবিক, সরল এবং সংযমী। সে অর্থাভাব ও বেকারীর জন্য যথেষ্ট কষ্ট ভোগ করেছে, কিন্তু সব কিছু সহনশীলতার সংগে গ্রহণ করেছে। কালোবাজার, পকেটমার বা গুণ্ডাদের দলে নাম লেখায়নি। এমনকি এই দুর্ভাগ্যের জন্য সে একবারও বর্তমান সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে জেহাদ পর্যন্ত ঘোষণা করেনি। দীর্ঘ বাঁচার সংগ্রামের শেষে তাকে ঘরে যুগান্ত মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়।' তার মৃত্যু-কালীন বক্তব্য : আমার মৃত্যুর জন্য রাজ্যসুদ্ধ দায়ী, কেবল আমি ছাড়া। সম্ভবত সে ভেতরে ভেতরে অসহিষ্ণু, বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। তার এই মর্মান্তিক পরিণাম দেখে পুলিশ মন্তব্য করেছে : 'শিক্ষিত লোক হয়ে আত্মহত্যা করলেন—ছিঃ।'

আমরা এক অস্থির সময়ের মধ্য দিয়ে আজ প্রায় অনিশ্চিত জীবনযাত্রা নির্বাহ করে চলেছি। এই সময়ের যথাযথ রূপ উপন্যাসে প্রতিফলিত দেখতে পেলে চেনা ঘটনা নতুনভাবে আস্বাদনের স্বাদ পাই। বিমল মিত্র তাঁর 'রাগভৈরব' (অমৃত) উপন্যাসে সমসাময়িক ঘটনা গ্রহণ করে সময়োচিত কর্তব্য করেছেন। স্বাধীনতা-উত্তরকালের মূল্যবোধের নীতিবোধের রূপান্তরের একটা চিত্র পাওয়া যায় এই উপন্যাসে। বিমল মিত্র উপসংহার টেনেছেন এইভাবে : আমাদের সমাজেরও একটা শত্রু হারিয়ে গেছে। আমাদের শত্রুই হলো আমাদের চরিত্র। আমরা চরিত্রই হারিয়ে ফেলেছি।'

এই সময়ের অস্থিরতার চিত্র অন্যভাবে সমরেশ বসু তাঁর 'বিশ্বাস' (দেশ) উপন্যাসে চিত্রিত করেছেন। চারদিকে যখন অস্থির-

অবাস্তব অবস্থা তখন এ সময়ে বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে জীবন যাপন কি সম্ভব। নায়কের স্বগত-চিন্তায় 'অবিশ্বাসের যে-সব ধর্ম, তার বুলি তার নামাবলী সবাই জানে চেনে, সেই ধর্মের কাছে বিশ্বাসটাই চোর, কখনও বিশ্বাসী হওয়া চলবে না। ...তথাপি বিশ্বাস আমার মধ্যে একরকম আত্মরক্ষার্থেই সাসপেন্সকে জিইয়ে রাখবে।' কিন্তু বিশ্বাসহীন আদর্শহীন মানুষ। অথচ রাজনৈতিক বিশ্বের তার প্রভাবের উপর বার বার আঘাত করে। হয়ত সেইজন্যই লোকটা ব্যক্তি-জীবনে নীতিহীন, অসংলগ্ন এবং উৎ-কেন্দ্রিক। কোন রাজনৈতিক দলও তাকে দৃঢ় বিশ্বাসে পৌঁছে দিতে পারে না। কি পারে প্রেম? নায়ক প্রেমের ব্যাপারেও খুব আধুনিক। সে একটা প্রেম করে বটে, সুযোগ পেলে অন্য এক ষোড়শী কিশোরীকে চুম্বন ও আদরসোহাগ করতে ছাড়ে না। বিশ্বাসের মেয়েরা প্রত্যেকেই কোন না কোন যৌনসংসর্গে লিপ্ত। আসলে সমসাময়িক রাজনৈতিক পরিমণ্ডল উপন্যাসের ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করা হলেও উপস্থাপন, চরিত্রচিত্রণ ভাষা ব্যবহারে বিশ্বাস বিরুদ্ধেই পরিপক্ক উপন্যাস।

ইতিহাস-আশ্রিত, গোয়েন্দা ও রহস্য কাহিনী

কয়েক বছর আগে ইতিহাসআশ্রিত উপন্যাস অনেকে লিখতেন। ইদানীং দুই-এক বছর মনে হচ্ছে, তার প্রচলন কমেছে। এবারে উল্লেখযোগ্য রচনা গজেন্দ্রকুমার মিত্রের 'রাণী-কাহিনী' (যুগান্তর) কিছু ইতিহাস, কিছু কিংবদন্তি কিছু বা কল্পনা। সহস্র বছর পূর্বে বাঙলা দেশের কুমিল্লার নিকটবর্তী পট্টিকেরা রাজ্যের নৃপতি [illegible] ও ব্রহ্মদেশের পগানের রাজপুত্রী সোয়েন্তীর প্রেম ও ব্যর্থতার কাহিনী। লেখকের রচনানৈপুণ্যে পাঠক এক রূপকথার রোমান্সের পরিমণ্ডলীতে উপনীত হবেন।

সত্যজিৎ রায়ের 'গ্যাংটকে গণ্ডগোল' (দেশ) গোয়েন্দা ফেলুদার কীর্তি-কাহিনী। কাহিনীর পটভূমিকা সিকিমের গ্যাংটক শহর। বিচিত্র সব চরিত্রের সমাবেশ, এমনকি একজন হিপিকেও কাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে দেখা যাবে। গোয়েন্দা গল্পের প্রথা অনুসারে এ-কাহিনীর বিভিন্ন পাত্র সম্পর্কে ক্ষণে ক্ষণে সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠেন। লেখকের কুশলী রচনার গুণে শেষ পর্যন্ত পাঠকের কৌতূহল অক্ষুণ্ণ থাকে।

চিরঞ্জীব সেন একটি রহস্য উপন্যাস লিখেছেন 'রোমাঞ্চ' পত্রিকায়।

একটি উল্লেখযোগ্য অনুবাদ

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'একথা বলা বাহুল্য যে, এশিয়ার প্রত্যেক দেশ আপন শক্তি প্রকৃতি ও প্রয়োজন অনুসারে আপন ঐতিহাসিক সমস্যা সমাধান করবে, কিন্তু আপন উন্নতির পথে তারা প্রত্যেকে যে প্রদীপ নিয়ে চলবে তার আলোক পরস্পর-সম্মিলিত হয়ে জ্ঞানজ্যোতির সমবায় সাধন করবে।' এশিয়ার দেশগুলি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্য দীর্ঘকাল সত্য হয়ে উঠতে পারেনি। আমরা জীবনা-চরণের প্রতি ক্ষেত্রে ইউরোপীয় দেশগুলি সম্পর্কে যত আগ্রহ-সচেতনতা দেখিয়েছি, নিজেদের মহাদেশ সম্পর্কে তা দেখাইনি। সুখের বিষয় ইদানীংকালে রাজ-নৈতিক-সাংস্কৃতিক বহু ক্ষেত্রে সে ভাব বিনিময় হচ্ছে। সেদিক থেকে ভিয়েতনাম সম্পর্কে আমাদের আগ্রহ উল্লেখযোগ্য। যতদূর জানা যায়, ভিয়েতনামের প্রাণ-পুরুষ হো-চি-মিনের কিছু কবিতা এবং অন্যান্য ভিয়েতনামী লেখকের দু-চারটি গল্পের অনুবাদ ছাড়া আমাদের দেশে ভিয়েতনামী সাহিত্যের অনুবাদ নেই। ভবানী মুখোপাধ্যায় অনূদিত আন্‌হ্ দুকের 'অশ্রু রক্ত স্বপ্ন' বাংলা সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট সংযোজন। ভিয়েতনামের জনগণের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে সংগ্রামী মানুষের লড়াইএর বাস্তব চিত্র 'অশ্রু রক্ত স্বপ্ন' বাঙালী পাঠক এমনকি লেখকদের সামনেও এক নতুন জিজ্ঞাসা। এরূপ একটি মূল্যবান রচনা প্রকাশের জন্য 'অমৃত' ধন্যবাদার্হ।

তরুণ লেখকদের উপন্যাস

কয়েক বছর আগেও তরুণ কোন লেখকের একখানা উপন্যাস প্রকাশিত হলে পাঠক, বিশেষত তরুণ পাঠকমহলে খুবই আগ্রহের সৃষ্টি হত। এখন অনেকেরই উপন্যাস প্রকাশিত হওয়ার পর, আগ্রহের মাত্রা স্বভাবত কম, তবুও প্রত্যাশা তরুণ লেখকদের উপন্যাসের ক্ষেত্রে এখনও নিশ্চয়ই আছে। কারণ এদেশে যাঁদের আমরা তরুণ লেখক বলছি, স্বাধীনতা-উত্তরকালে, স্বাধীনতা এবং নতুনতর সমাজ-বাস্তবতার পটভূমিতে দাঁড়িয়ে তাঁরা প্রথম চিন্তা-ভাবনা শুরু করেছেন। সুতরাং দেশের সমাজ এবং মানুষের পরিবর্তন এবং সম্ভাব্য পরিবর্তনের চেহারা নিয়ে তরুণদের উপন্যাসের বিষয় হবে এবং হতে থাকবে সেটাই প্রত্যাশিত। দেশের দ্রুত পরি-বর্তনের সঙ্গে সমান তালে তরুণ শিল্পীই সমতা রেখে চলতে পারে। বলা বাহুল্য, ইতিমধ্যেই তরুণেরা আমাদের সমস্ত প্রত্যাশা মেটাতে পেরেছেন একথা বলা চলে না। কোথাও কোথাও বরং হতাশাই সৃষ্টি হয়েছে। তবুও তাঁদের উপন্যাস সম্পর্কে পাঠকের আশা আছে এবং থাকবেও।

বর্তমান শারদ মরশুমে উল্লেখযোগ্য উপন্যাস লিখেছেন অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় (জনবাণী), শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় (আনন্দবাজার), সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ([illegible]), মিহির মুখোপাধ্যায় (সাপ্তাহিক বসুমতী), সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (দেশ), সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় (অমৃত), তপোবিজয় ঘোষ (নন্দন), কার্তিক লাহিড়ী (এক্ষণ), সমীর সরকার (আলোক-সরণি), সুচিত্রা সেনগুপ্ত (কালি ও কলম) প্রমুখ।

প্রেম-ভালবাসা, যৌন জীবন, সংগ্রাম, মধ্যবিত্ত সমাজ, মাস্তানতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা, শ্রমিক কৃষক, অবক্ষয়-হতাশা, বেকার, মধ্যবিত্ত— এ-সমস্ত তরুণদের উপন্যাসে প্রভাব বিস্তার করেছে। তবে কম বেশী সকলের লেখাতেই নতুনত্ব প্রকাশভঙ্গী ও মননশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। সন্দীপন চট্টো-পাধ্যায়ের 'একক প্রদর্শনী' (অমৃত) নায়ক এ-সময়ের এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী তরুণ-দের প্রতিভূ। কোন মেয়েকে চুমু খেয়েও যার কিছু মনে হয় না। এই সময়ের প্রভাব তাকে নিঃসঙ্গ করেছে। সে অবক্ষয়ের বেড়া-জালে আবদ্ধ। তার হয়ত কখনও মনে হয়, 'আমি একটা অবাস্তব।' মৃত্যুর ঘটনাকে সামনে রেখেও সে আশ্চর্য নিরাসক্ত, নির্মোহ। সে একই সঙ্গে অশান্ত এবং শান্ত। এই সব আপাতবিরোধ নিয়েই সে মানুষটা, কিন্তু বিন্দুমাত্র ভান নেই, সে অকৃত্রিম।

ঠিক ভিন্ন কোটির যুবকদের পরিচয় পাওয়া যাবে, তপোবিজয় ঘোষের 'সামনে লড়াই' (নন্দন) উপন্যাসে। পার্টি কর্মী যুবকদের দলের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ঘূর্ণায়মান কতকগুলি ক্ষুব্ধ যুবক-যুবতী শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই ঘোষণায় সক্রিয় এবং সোচ্চার। তারা জগৎ-জীবনকে মার্কসীয় দর্শনের দৃষ্টিতে দেখে। সুতরাং তাদের কাছে প্রতিক্রিয়া নয়, সক্রিয়তাই সত্য। এদের শরীর মন ও কর্মধারা সর্বদা গতিশীল।

সন্দীপন বা তপোবিজয় দুই ভিন্ন কোটির লেখক হলেও দুজনেই এই সময়ের রূপকার। যেহেতু তাঁদের রচনার বিষয় এই সময়ের মাটির রস থেকে সংগৃহীত। আর প্রকাশভঙ্গীতে দুজনেই মননশীল, সংযমী এবং নিরাসক্ত। ভাষা কাহিনীর উপযোগী এবং উন্নত।

প্রবীণ ও নবীন অনেকের উপন্যাসেই বর্তমান সময়ের চিন্তা ভাবনার প্রভাব আছে। কিন্তু একটা কথা ভেবে দেখা দরকার, সনাতন-গতানুগতিক বিষয় ও কাহিনী বিস্তারের মাঝে হঠাৎ আচমকা কিছু সমকালীন ঘটনা বা বক্তব্য জুড়ে দিলেই তা অভিনব ও এ-সময়ের প্রত্যাশিত রচনা হয়ে ওঠে না। মানুষ যে মাটির উপর দাঁড়িয়ে বাঁচার জন্য অনবরত সংগ্রাম করে যাচ্ছে, উপন্যাসের শিকড়ও যদি সেই মাটিতেই প্রোথিত থাকে, তাহলেই সে-কাহিনীর সঙ্গে পাঠক একাত্মতা স্থাপন করতে পারবেন। সময়ের দ্রুত পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধও দ্রুত পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। মানুষের মনে সাড়া তুলছে নতুন সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি, প্রেম, জীবিকা, মন-মননের কথা, দারিদ্র্য, বেকারী, বিচ্ছিন্নতা, অবক্ষয় কোনটাই আজ আর সমাজ-ব্যক্তির থেকে আলাদা কিছু নয়। সব কিছু এক কার্য-কারণ সূত্রে গ্রথিত। প্রক্ষিপ্ত নয়, স্বয়ম্ভূও নয়। বাংলা উপন্যাস কেন কোথায় একটা সীমাবদ্ধতায় আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। একালে একটি ছোটগল্প বা একটি ছোট কবিতা পাঠককে যে প্রত্যাশায় পৌঁছে দিচ্ছে একখানি উপন্যাস তা পারছে না কেন, ভেবে দেখা দরকার।

বইকুণ্ঠের খাতা

মফঃস্বলের লিটল ম্যাগাজিন

কলকাতার বইয়ের স্টলগুলি এখন নানারকম কাগজপত্রে ঠাসা। পুজোর ঔজ্জ্বল্য নেই। ধুলো ময়লা পড়েছে মলাটের ওপর। নতুন কাগজ বের না হওয়া পর্যন্ত ওরা থাকবে। তারপর শুরু হবে নিয়মিত কাগজের প্রদর্শনী। যাতায়াতের পথে কেউ উল্টে দেখবেন সূচীপত্র। কেউ কিনবেন, কেউ কিনবেন না। দু'একটা লিটল ম্যাগাজিনও বেঁচে থাকবে দুর্বল শরীর নিয়ে। বর্তমানের সময় বেরুবে দু-একটা ভালো স্বাস্থ্যের সিনেমা পত্রিকা।

সাহিত্যের প্রবহমানতায় সাময়িক পত্রের এটাই নিয়তি এবং পরিণতি।

এ জন্যে কেউ দুঃখিত নন। না লেখক, না পাঠক। সপ্তাহ পেরিয়ে গেলে সাপ্তাহিকের চাহিদা থাকে না। মাস পেরুলে মাসিকের মর্যাদা নষ্ট নয়। পাঠক অপেক্ষা করতে থাকেন নতুন সংখ্যার জন্য। চাই আরো গল্প, আরো উপন্যাস। লেখক লিখতে চান আরো।

এই দৃশ্য প্রধানত কলকাতার।

তার বাইরেও সাহিত্যের আরেকটা জগৎ আছে— আরেকটা বাজার। তার অবস্থান কলকাতা কিংবা শহরতলিতে নয়, মফঃস্বলের প্রাণকেন্দ্রগুলিতে। ওখান থেকেও বেরোয় নানারকম পত্র-পত্রিকা। অধিকাংশই কলকাতাবিমুখ। কলকাতার ফুটপাথে সেই সব কাগজপত্রের বড়ো একটা দেখা-সাক্ষাৎ মেলে না। কালেভদ্রে এসে পড়ে।

বছর দুয়েক আগেকার একটা ঘটনার কথা বলি।

একটি গ্রামে গিয়েছিলাম একটা সাহিত্যসভার অতিথি হয়ে। পুজোর সামান্য আগে হবে বোধহয়। জায়গাটা থেকে হাওড়া স্টেশন থেকে বেশী সময় লাগে না। তবু সন্ধ্যার অন্ধকারে, গাছ-গাছালির রহস্যময়তায় অদ্ভুত লাগছিল। কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে যেন কলকাতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি। চারদিকে অপর্যাপ্ত ধানের ক্ষেত, আর সবুজের সমারোহ। মাঝে মাঝে জলের ছপছপ শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম। সভার শ্রোতারা আসছিলেন ঐ আলবাঁধা পথে। কেউবা এসেছিলেন পাঁচ-ছ মাইল দূর থেকে, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের কালো পীচের পথ ধরে।

কলকাতার সাধারণত সাহিত্য-সভায় লোক হয় না। এখানে হয়েছিল।

অদ্ভুত সারল্যে কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করছিল, কলকাতার সাহিত্যিকদের কথা। কলকাতার তরুণরা সাধারণত যাঁদের আদৌ পাত্তা দিতে চান না, তেমন কবি সাহিত্যিকরাই তাঁদের প্রিয় এবং পরিচিত। আমি তাদের প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিলাম সংক্ষেপে, কারুর বা বিস্তৃতভাবে। সভাশেষে লক্ষ্য করলাম, আমার শান্তিনিকেতনী ঝোলাটা বেশ পুরুষ্ট হয়ে উঠেছে নানা ধরনের পত্র-পত্রিকায়।

ডজন দেড়েক শারদীয়া সংখ্যা পেয়েছিলাম সেদিন।

বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম, এতো সব কাগজ বেরোয় নাকি এখান থেকে? অথচ কলকাতা থেকে আমরা এসব কাগজপত্রের কোনো খবরাখবর রাখি না! কাছাকাছি কোথাও ভালো প্রেস আছে?

জনৈক তরুণ কবি সসংকোচে বললেন, নিয়মিত কোনো কাগজই বেরোয় না। মাঝে মাঝে বেরোয়। কলকাতার সঙ্গে আমরা যোগাযোগ রাখবার চেষ্টা করি। কিন্তু কেউ পাত্তা দেয় না। লেখা চাইতে গেলে টাকা চান। আমাদের কি আর সে সামর্থ্য আছে? ধরাধরি করে দু-একটা লেখা সংগ্রহ করি। অথচ জানেন তো কলকাতার লেখকরা না লিখলে মফস্বলের কাগজপত্র দাঁড়ায় না! এখানে কোনো ভালো প্রেস নেই। সিনেমার হ্যান্ডবিল, রসিদ বই, ছোটখাটো বিজ্ঞাপন ছাপার মতো দু-একটা প্রেস আছে কোথাও কোথাও। আমরা পায়ে হেঁটে, সাইকেলে চড়ে কিংবা বাসে যাতায়াত করে কাগজপত্র ছাপাই। সবই ট্রেডল মেসিন। পাতা হিসেবে দাম নেয়। একেক পৃষ্ঠা ছাপতে খরচ পড়ে সাড়ে তিন টাকা, চার টাকা। কখনো কখনো তার চেয়েও বেশী নেয়। তিন-চার পৃষ্ঠার বেশী কম্পোজ করার মতো টাইপ পর্যন্ত অধিকাংশ প্রেসে নেই। গাঁয়ের প্রেস বুঝতেই পারছেন তো?

রাত্রিতে আমাদের থাকার জায়গা হলো, স্থানীয় একটি কলেজের হস্টেলে। কলকাতা থেকে অনেকের যাবার কথা ছিল। কেউ যাননি। আমি একা। স্বভাবতই আমার আদর বেশী। কেউবা দুঃখ প্রকাশ করছিলেন, প্রখ্যাতদের দেখা পাননি বলে।

খাবার টেবিলে পরিচয় হলো জনৈক ভদ্রলোকের সঙ্গে। বয়সে প্রৌঢ়। ওকালতি করেন তমলুকে। কিন্তু যৌবনে সাহিত্যের নেশায় প্রায় সব খোয়াতে বসেছিলেন। এখনো সেই নেশায় মশগুল। যখনই কোনো সাহিত্য সম্মেলনের খবর পান, তখনই ছুটে যান সেখানে। বছর কয়েক ধরে একটি সাহিত্য পত্রের সম্পাদনা করছেন।

তিনি দুঃখ করে বললেন, স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়েরা এখন আর তেমন সাহিত্যের ব্যাপারে উৎসাহী নয়। লেখা ছাপাবার জন্য তারা আসে। ছাপা না হলেই যোগাযোগ রাখে না। অথচ ত্যাগ স্বীকার না করলেও কি কেউ কখনো সাহিত্যিক হতে পারে?

বড় বড় সাহিত্যিকের সঙ্গে তিনি পরিচিত! কালিদাস রায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, প্রমুখ তাঁর কাগজে লিখেছেন এবং লিখছেন। বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে গিয়েছেন কয়েকবার। একটি বইও লিখেছেন রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী উপলক্ষে।

আমি পত্রিকাটি কখনো দেখিনি কলকাতার স্টলে। অথচ, সাহিত্যের অগ্রগতিতে পত্রিকাটির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা তিনি বারবার স্মরণ করেন। বহু সাহিত্যিকের আবির্ভাব যে ঐ পত্রিকার মারফতে ঘটেছে—সেজন্যেও তিনি গর্বিত।

এরকম সাহিত্যপ্রাণ গ্রামীণ সম্পাদকের সংখ্যা ইদানীং বিরল হয়ে আসছে। একটি পত্রিকার উদ্যোগে চুঁচুড়ায় একটি সাহিত্য সম্মেলনে একজন প্রৌঢ় সম্পাদককে দেখেছিলাম, একটি সংবাদ সাময়িকীর পৃষ্ঠা থেকে অতীতের সংবাদ পড়ে শোনাতে। প্রায় সত্তর বছর ধরে পত্রিকাটি বেরিয়েছে অসচ্ছল নিয়মিত। আমরা কলকাতার পাঠক সেইসব পত্রপত্রিকার খবর রাখি আর কতটুকু?

আসলে, কলকাতা মফস্বল সম্পর্কে উদাসীন। লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত না হলে গ্রামীণ সংস্কৃতি সম্পর্কে কেউ আগ্রহ বোধ করেন না। অপরপক্ষে, কলকাতা সম্পর্কে মফস্বলের সম্পাদকদের শ্রদ্ধা অপরিসীম। বেশ কিছুকাল ধরেই লক্ষ্য করছি, মুর্শিদাবাদ কিংবা কৃষ্ণনগরে, হুগলি কিংবা দুর্গাপুরের দু-একটা কাগজের সদর দপ্তর স্থাপিত হয়েছে কলকাতায়। বন্ধু-বান্ধবের বাড়ী কিংবা আত্মীয়-স্বজনের বাসাকেই সাধারণত সাব্যস্ত করা হয় 'কলকাতা কার্যালয়' হিসেবে।

এগুলি প্রকৃত মফস্বলী কাগজ কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ প্রচুর।

মফস্বল থেকে এমন দু'চারটে কাগজ বেরোয়, যার সম্পাদক প্রকৃতপক্ষে কলকাতার মানুষ। অধ্যাপনা কিংবা অন্য কোনো কার্যোপলক্ষে আস্তানা বেঁধেছেন দূর মফস্বলে কিংবা কলকাতা থেকে দূরবর্তী কোনো শিল্পনগরীতে। সাহিত্যের নেশাটা ওখানে গিয়েই তো নিঃশেষিত হয়ে যায় না। প্রকৃত নাগরিক মননশীলতা ও কলাজ্ঞানই ছাপ পড়ে সেরকম সাহিত্যের কাগজে।

বিশেষ করে, ভিলাই, দুর্গাপুর, চিত্তরঞ্জন প্রভৃতি শিল্পনগরী থেকে প্রকাশিত পত্রিকাগুলো প্রধানত শহুরে মননশীলতার অভিব্যক্তিতে প্রায় কলকাতার সমধর্মী। তার কারণ, ঐসব অঞ্চলে স্থায়ী বাসিন্দার সংখ্যা কম। অনেকেই কলকাতা কিংবা উপকণ্ঠের বাসিন্দা। নাগরিক জীবনের ক্লান্তি বিষাদ ও বিচ্ছিন্নতাবোধ তাঁদের জীবনেও সমভাবে সম্প্রসারিত।

প্রকৃত মফঃস্বলী কাগজের চেহারা আলাদা। প্রচ্ছদ, অঙ্গসজ্জা, রচনা নির্বাচনে তা ধরা পড়ে। স্থানীয় কোনো স্কুলের শিক্ষক, কোনো সমিতির সেক্রেটারী, কলেজের ছাত্র-ছাত্রী কিংবা সমাজকর্মীর

উদ্যোগে সেসব কাগজ বেরোয়। বহিরাঙ্গের আড়ম্বর প্রধান হয়ে ওঠে না। হয়তো কাগজের প্রথমেই ছাপা হয় কোনো অধ্যক্ষ কিংবা অধ্যাপকের গুরুগম্ভীর একটি সাহিত্যসম্পর্কিত মূল্যবান প্রবন্ধ।

এ জাতীয় কাগজপত্রের আর্থিক সামর্থ্য প্রায় নেই বললেই চলে। বন্ধু-বান্ধবেরা মিলে স্থানীয় ডাক্তারখানার বিজ্ঞাপন, জুতোর দোকান কিংবা বিড়ির দোকানের বিজ্ঞাপন যোগাড় করে। তা ছাড়া টেলারিং শপ, মুদির দোকান প্রভৃতির বিজ্ঞাপনও সংগ্রহ হয়ে যায় দু-একটা। কখনো কখনো স্থানীয় বীজ ও সারের দোকানের বিজ্ঞাপন জুটে যায়। মফস্বল শহরের কাগজে কৃষি-দপ্তরের কিংবা সমাজকল্যাণ বিভাগের বিজ্ঞাপনও বেরুতে দেখেছি কখনো-সখনো।

অজস্র অসুবিধা এবং প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও কাগজ বেরোয়। লেখা সংগ্রহের জন্য তাঁরা কলকাতায় ধাওয়া করেন। দু-একজন নামী লেখকের লেখা না হলে পত্রিকার মর্যাদা বাড়ে না।

আমি এ ব্যাপারে কলকাতার সাহিত্যিকদের মনোভাবটা জানি। তাঁরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুরনো লেখা ছাপতে দেন সেসব কাগজে। কিংবা হেলাফেলা করে যা হোক দু-চার ছত্র লিখে দায়সারা গোছের একটা কাহিনী দাঁড় করান। খুব বড় ধরনের মুরুব্বি না থাকলে কেউ কলকাতায় লেখা সংগ্রহই করতে পারেন না। অনেক সময় সেরকম মুরুব্বি জুটেও যায়। স্থানীয় কোনো স্কুলের শিক্ষক কিংবা ডেভেলাপমেন্ট অফিসের কর্মচারীর মারফতে ছোট কিংবা মাঝারি গোছের কবি-সাহিত্যিকদের সঙ্গে পরিচয় ঘটে।

কলকাতার সঙ্গে মফস্বলের লিটল ম্যাগাজিনের পার্থক্যটা এখানেই। কলকাতার কোনো কাগজ সহজে মফস্বলের দিকে নজর দেয় না। মফস্বল কলকাতার দিকে মুখ ফিরিয়ে আছে সর্বদাই।

আমি এই প্রবণতার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে জনৈক তরুণ কবিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আপনারা কলকাতার লেখা সংগ্রহ করতে এত ব্যস্ত হয়ে ওঠেন কেন? নিজেরা লিখলেই তো পারেন।

ভদ্রলোক বিষণ্ণ কণ্ঠে বললেন, লেখা মানেই তো কিছুটা প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা। স্বীকৃতির প্রত্যাশা—তাই না? স্থানীয় কোনো কাগজে লিখে তা পাওয়া যায় না। হয়তো গাঁয়ের মানুষ তাঁকে নিয়ে গর্ব করে। কিন্তু লেখক হিসেবে আমাদের কি তাতে সান্ত্বনা থাকতে পারে? কলকাতার কাগজে লেখা না বেরুলে মনে হয় কিছুই হল না। অন্তত, দেশ পত্রিকায় লেখা চাই। আমাদেরও অহং তৃপ্ত হয়। গাঁয়ের মানুষ ভাবে, হাঁ লেখকের মতো লেখক বটে। আমি কত লেখা পাঠিয়েছি কত কাগজে! কেউ ছাপেনি। অথচ কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগ থাকলে বড় কাগজে না হোক, ছোট কাগজে লেখার জন্যে কোনো অসুবিধে হয় না।

অর্থাৎ তাঁর মনোবেদনাটা উপলব্ধি করতে পারছিলাম বৈকি: বললাম, তবুও গ্রামের মানুষকে নিয়ে কি সাহিত্যের একটা সমাজ গড়ে তোলা যায় না। গ্রামের সমাজ ও সমস্যা নিয়ে গল্প লেখা যায় বলেই তো আমার ধারণা।

তীব্র প্রতিবাদের সঙ্গে তিনি বললেন, যায় না। কিছুকাল গ্রামে গিয়ে থাকলেই বুঝতেন আসল কারণটা কি? একে তো সাহিত্যের চর্চা নেই ওখানে। তার ওপরে জীবনের যে উত্তাপ উত্তেজনা এখন সাহিত্যের ক্ষেত্রে চলছে, তার ধারণ-ধারণটা শহরে কাছ থেকে আমাদের শিখে নিতে হয়। গ্রামের অভিজ্ঞতা নিয়ে শহরে এসে সাহিত্য করা যায়, গ্রামে বসে করা যায় না। তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ পেরেছিলেন কিন্তু অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ পারেননি। তাঁদের কলকাতায় এসে বাসা বাঁধতে হয়েছে। প্রফুল্ল রায়ও কলকাতায় না এলে হয়তো আদৌ লিখতেন না। কলকাতা ওঁদের সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। আপনি বুঝতে পারবেন না, গ্রাম একেকজন শিক্ষিত মানুষকে কি রকম ভোঁতা করে দেয়। উৎসাহ নেই, উদ্যম নেই। কলকাতার পত্র-পত্রিকার দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আমরা নিরুপায়।

মফস্বল শহরের লিটল ম্যাগাজিন-গুলো অবশ্য এতটা নির্জীব নয়। কলকাতার মতোই অস্থির, চঞ্চল এবং শহুরে রীতিতে অভ্যস্ত। হয়তো পুরোপুরি নয়। শিক্ষিতের হার কিছুটা বেশী বলেই কলকাতার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে।

কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, আসামের শিলং আগরতলা, কৈলাশহর থেকে প্রকাশিত উত্তর কিংবা পূর্ব সীমান্তের কোনো কোনো কাগজে রীতিমত নাগরিক বৈদগ্ধ্যের প্রকাশ ঘটেছে আশ্চর্য রকমে। কয়েকদিন আগে কোচবিহারের একটি কাগজের প্রচ্ছদে দেখেছি কয়েকটি লাইন:

(১) যারা সূর্য সাক্ষী রেখে কবিতা পড়েন, কবিতা পড়তে পড়তে শিল্পীর কাছে হাত বাড়িয়ে বাজারের থলি চেয়ে নেন, তাদের আমরা তুণজ্ঞান করি।

(২) যে-সকল লেখক সম্পাদককে মদ্যপানে আপ্যায়িত করে কবিতা ছাপান, গোষ্ঠীচেতনাকে মনে-প্রাণে বেশী প্রাধান্য দেন, তাঁদের আমরা তৃণজ্ঞান করি।

নিঃসন্দেহে এই ঘোষণা মফস্বলী নয়। মফস্বলের শহরগুলিতে ক্রুদ্ধ, শান্ত, রাগী, ধার্মিক, অধার্মিক—নানা মেজাজের কবি সাহিত্যিকরা সংখ্যায় বেড়ে চলেছেন ক্রমাগত। এমন একদিন আসবে যখন শহর-গ্রামের সাহিত্যের ব্যবধান নির্ণয় করা কঠিন হবে। এরই মধ্যে আঞ্চলিকতার সীমা ভেঙে যেতে শুরু করেছে।

এবার পুজোয় আমার হাতে এমন কয়েকগুলি কাগজ এসেছে, যেগুলি সত্যিই প্রশংসার্হ। কলকাতার সঙ্গে সেসব কাগজের কোনো যোগাযোগ নেই। আত্ম-সন্তুষ্ট সম্পাদকেরা নিজস্ব লেখক-গোষ্ঠীকে লাগিয়েছেন লেখার কাজে। লেখার বিষয় প্রায় প্রতিটিই কিসেকালের। কলকাতার 'রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা, সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা' কিংবা 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'র সঙ্গেই তার তুলনা চলে। দু-একটি লেখা নিশ্চয়ই দুর্বল। অধিকাংশই আঞ্চলিক এবং প্রাচীন সাহিত্যের বৈশিষ্ট সম্পর্কে মূল্যবান আলোচনা। স্থানীয় পত্রিকাগুলি আঞ্চলিক সংস্কৃতির বাহন হয়ে উঠতে পারলে হয়তো উপকারই হতো।

মহকুমা শহরগুলি থেকে সারা বছরই কোনো না কোনো একটি সংবাদ সাপ্তাহিক কিংবা পাক্ষিক বেরোয়। পুজোর সময় শারদীয়া সংখ্যা বেরোয় তাদেরও। এসব পত্র-পত্রিকাকে কলকাতা মুখাপেক্ষী বলা চলে না। পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লেখকলেখিকারাই মূলত তাদের লেখক-লেখিকা। বিখ্যাত লেখক-দের আশীর্বাণী ছাপা হয় পত্রিকার প্রথম দিকে।

এবার মফস্বলের কয়েকটি শহর থেকে ছোটদের উপযোগী কয়েকটি পত্রিকা বেরিয়েছে। ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত 'কাকলি' তাদের মধ্যে অন্যতম। উত্তরবাংলা থেকে প্রকাশিত 'সীমান্তিক'-এর লেখা কম্পোজ করেছেন পত্রিকার তরুণ সদস্যরা। কলকাতার সঙ্গে এঁদের কোনো বিরোধ আছে কিনা জানি না। মনে হয়, এসব কাগজ আত্মসন্তুষ্ট।

আমি কয়েকদিন আগে মফস্বলের কয়েকটি লিটল ম্যাগাজিনের সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম, কিভাবে এই সব পত্রিকা বের হয়? কি তাদের উদ্দেশ্য? জানতে চেয়েছিলাম, এইসব কাগজপত্র না বেরুলে ক্ষতি কী?

তুখোড় জবাব দিয়েছিলেন জনৈক সম্পাদক, না বেরুলে কলেজ স্ট্রীটের হৈ-হুল্লোড় বন্ধ হয়ে যেতো। গ্রামে গ্রামে আমরা লাইব্রেরী বানাই, সাহিত্যের আলোচনা করি, গল্প-কবিতা লিখতে চেষ্টা করি। তাহলে, যদি আমরা না লিখতাম, না পড়তাম—তা হলে বাংলা সাহিত্যের কি দশাটা হতো? কেউ বই কিনতো না, সাহিত্যের আলোচনা করতো না, সাহিত্যিকদের প্রতিষ্ঠা বাড়তো না। কলকাতার পাঠক কেনে কম। আমরাই কিনি। এমন কি বস্তাপচা সাহিত্যের খদ্দেরও আমরাই। নিজেরা কাগজ করতে গিয়ে আরো দশটা কাগজের আলোচনা করি। কলকাতার প্রখ্যাত সাহিত্য পত্রিকা-গুলিতে কে কি লিখছেন না লিখছেন তার গবেষণা করে সময় কাটাই। মফস্বলের লিটল ম্যাগাজিনগুলো কবি-সাহিত্যিক তৈরী করুক না করুক সাহিত্যের পাঠক ও খদ্দের তৈরী করে নিঃসন্দেহে।

অন্য একজন সম্পাদক কলকাতার সাহিত্যিক রাজনীতিতে দারুণ বিক্ষুব্ধ হয়ে লিখেছেন, ওসব আপনাদের কুট-কচালি। আমরা সাহিত্য বুঝি, ক্রিকেটের খবরে পারি না। একমাত্র একজন সাহি-

লিটারেচারের প্রশংসা করতে গিয়ে ভীষণ ঝামেলায় পড়েছিলাম। খবরা-খবর আগে থেকে জানা না থাকলে হুট করে এক জনের প্রশংসা আরেকজনের কাছে করাও মুশকিল। এদিক থেকে আমরা, মফঃস্বলের লেখক-লেখিকারা অনেক মুক্ত। লেখকের চেয়ে লেখাই আমাদের কাছে প্রধান বিবেচ্য। এমনিতেই তো কাউকে চিনি না। অনেকের সঙ্গে চিঠিপত্রে যোগাযোগ হয়। সেজন্যেই হয়তো ঝগড়াঝাটির প্রত্যক্ষ সম্পর্কটা কারুর সঙ্গেই গড়ে ওঠেনি আমাদের। আপনারা, যাঁরা সাহিত্যের মালতামামি লেখেন, তাঁরা যদি মফঃস্বল থেকে প্রকাশিত লিটল ম্যাগাজিনগুলোর সমস্ত প্রবন্ধ আর কবিতার একটি পর্যালোচনা এবং সুনির্বাচিত সংকলন প্রকাশের চেষ্টা করতেন, তা হলে দেখতে পেতেন কতো মূল্যবান রচনা কেবল অবহেলায় হারিয়ে যাচ্ছে। কলকাতার কাগজগুলো তবু অনেকের নজরে পড়ে। আমাদের লেখালেখির খবরাখবর রাখবার মতো আমার লোক পর্যন্ত নেই। বহু মূল্যবান প্রবন্ধ মফঃস্বলের কাগজে হামেশাই বেরোচ্ছে। কিন্তু সেসব লেখা গ্রন্থাকারে বেরুবে না কোনোদিনই।

ভাটপাড়া থেকে প্রকাশিত 'বাংলা সাহিত্য পত্র'-র সম্পাদক এখনো কলেজের ছাত্র। তিনি লক্ষ করেছেন : মফঃস্বলের কিছু কিছু পত্র-পত্রিকার একটি করে সম্পাদকমণ্ডলী থাকে। পত্রিকাপৃষ্ঠে তাঁদের নাম ছাপা হয়। সভাপতি, প্রধান উপদেষ্টা, পৃষ্ঠপোষক বা ঐ রকম একটা কিছু পদে বিগ-গানদের নাম জ্বলজ্বল করে।'

তিনি সংক্ষুব্ধ লিখেছেন : "এসব নাম ঘোষণার গৌরবটা কোথায়? আমার নাম কে ঘোষণা করে? তরুণ উঠতি লেখক ও সম্পাদকদের তাঁরা আদৌ স্বীকার করেন না। কাজেই আমার নিবেদন, বিগ-গানদের বাদ দিন। তাঁদের নামের বদলে স্কুল হেড-পণ্ডিতদের নাম বসান। কেননা নতুনরা কি তাঁদের চাইতে কার্যক্ষমতায় কম? তাছাড়া, ছোটোখাটো পত্র-পত্রিকার সঙ্গে হোমরা-চোমরাদের নাম জড়িয়ে রাখাতেও কোনো লাভ নেই। পত্রিকার জন্যে যদি কিছু আর্থিক সাহায্য করতে বলা যায়, তাহলে তাঁদের পকেট থেকে একটা অচল সিকিও বেরুবে কিনা সন্দেহ।"

মাঝে মাঝে একটা জিনিস লক্ষ করেছি, মফঃস্বলের কোনো কোনো লিটল ম্যাগাজিনে বিজ্ঞাপন বেরোয় : 'অমুক পত্রিকার গ্রাহকেরাই প্রধানত লেখক। বাংলা দেশের একমাত্র গ্রাহক সাধারণের পত্রিকা। আপনিও গ্রাহক হয়ে লেখক তালিকাভুক্ত হোন।' কিংবা নিয়মাবলীতে একটি লাইন থাকে : 'এই পত্রিকার গ্রাহকদের লেখা অগ্রাধিকার পাবে।'

সম্ভবত এই প্রশ্নটার আরেকটা বহিঃপ্রকৃতি হলো, গ্রামবাংলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রকাশিত নানাধরনের কবিতা এবং গল্পের সংকলন। লেখকদের কাছ থেকে চাঁদা সংগ্রহ করে ছাপা হয় একেকটি 'উজ্জ্বল' ও 'সম্ভাবনাপূর্ণ' কবিতা কিংবা গল্পের বই। আমি একবার কয়েকজন তরুণের মুখোমুখি হয়েছিলাম, একটি কঠিন প্রশ্নের সমাধানের জন্য! তাঁরা সকলেই কফি হাউসী সাহিত্যের গতি-প্রকৃতিতে বিরক্ত। বললেন, "আমরা গাঁয়ের কবি-সাহিত্যিকদের নিয়ে একটা পত্রিকা এবং সাহিত্যিক গোষ্ঠী গড়ে তুলতে চাই। কয়েকদিনের মধ্যেই দেখিয়ে দেবো, বাংলা দেশের সাহিত্যটা কেবল কলকাতার একচেটিয়া সম্পত্তি নয়। এতে গ্রামের লেখক-লেখিকাদের দান কম নয়।"

এই উদ্দেশ্যে তাঁরা আমার কাছ থেকে কিছু কবি সাহিত্যিকের ঠিকানা জেনে নিয়েছিলেন। শুনেছি, যোগাযোগের প্রাথমিক পর্বটা সম্পন্ন হয়েছিল। উপযুক্ত সাড়া পাননি বলে, তাঁদের সেই মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়নি।

উত্তরবাংলার একটি কলেজের জনৈক অধ্যাপককে জিজ্ঞেস করেছিলাম, মফঃস্বল বাংলার লিটল ম্যাগাজিনগুলোর বিশেষ কোনো বৈশিষ্ট্য কি আপনার নজরে পড়ছে? তাদের স্বাতন্ত্র্য কোথায়? এসম্পর্কে আপনার মতামত কি?

অধ্যাপকসুলভ দীর্ঘ বিশ্লেষণে ভদ্রলোক যে-সব বৈশিষ্ট্যের কথা বলেন, তা এই আলোচনার পক্ষে পুনরুল্লেখের কারণ বলে মনে হতে পারে। সংক্ষেপে আমি তাঁর প্রধান সূত্রগুলিই উল্লেখ করছি।

১। সাহিত্যিক হবার আকাঙ্ক্ষা এবং কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের ইচ্ছা নিয়েই প্রতিটি পত্র-পত্রিকার জন্ম।

২। কলকাতা থেকে নির্বাসিত তরুণদের উদ্যোগে কিংবা প্রেরণায় কোনো কোনো কাগজের সূত্রপাত।

৩। কলকাতার সংবাদপত্র ও বড় পত্র-পত্রিকায় লেখা পাঠিয়ে বার বার ব্যর্থ হয়ে—আত্মপ্রকাশের তাগিদায় কেউ কেউ নতুন পত্রিকা বের করেন।

৪। অধিকাংশ কাগজই ক্ষীণায়ু।

৫। রুচি ও শিক্ষাভেদে পত্র-পত্রিকাগুলির চেহারা চরিত্রও নানারকম। যেমন, শিক্ষক ও অধ্যাপকদের প্রেরণায় প্রকাশিত সাহিত্যপত্রিকাগুলি প্রায়শ প্রবন্ধপ্রধান, প্রাচীনপন্থী স্থানীয় প্রেস-মালিকের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত পত্রিকাগুলি আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত, জেলা সংস্কৃতি পরিষদ জাতীয় সংস্থা থেকে প্রকাশিত পত্রিকাগুলি প্রাচীন ঐতিহ্য বিষয়ে রচনাসম্ভারে আগ্রহী, স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্যোগে প্রকাশিত পত্রিকাগুলি কবিতাপ্রধান—ইত্যাদি।

৬। প্রতিটি কাগজেই ভালো লেখার পাশাপাশি অত্যন্ত দুর্বল লেখাও স্থান পায় অসংকোচে। স্থানীয় কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তির লেখা পেলে সহজেই তা মুদ্রণ-সৌভাগ্য লাভ করে।

৭। মফঃস্বলের কাগজগুলি আঞ্চলিকভাবে সাহিত্যিকদের সমবেত করে, সাহিত্যের পরিমণ্ডল গড়ে তোলে। কলকাতায় এখন সাহিত্যের তেমন ভালো আড্ডা নেই। মফঃস্বল শহরগুলিতে কোথাও কোথাও আলোচনার কেন্দ্র গড়ে উঠেছে।

৮। অধিকাংশ মফঃস্বলী কাগজই চরিত্রের দিক থেকে পাঁচমিশেলী। গল্প, কবিতা, সিনেমার খবর, খেলাধুলার খবর, শিশুমহল, মহিলা বিভাগ ইত্যাদি নানারকম বিভাগে বিভক্ত। উদ্যোক্তারা একেকজন বিভাগের দায়িত্ব নেন। এঁরা পুরনো ভালো সিনেমার ব্লক সংগ্রহ করতে পারলে আলাদা কাগজে ছাপার ব্যবস্থা করেন। অনেক সময় লেখকের কাছ থেকে টাকা নিয়ে তার ছবি ব্লক করিয়ে কাগজে ছাপেন। কলকাতার বাজারী কাগজগুলোই তাদের আদর্শ।

৯। সংখ্যায় বেশী না হলেও ক্রমাগত বৃদ্ধি লাভ করছে নাগরমুখী সাহিত্যের পত্রিকাগুলি। দেশী-বিদেশী সাহিত্যের আলোচনা অনুবাদ ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক জীবন-জিজ্ঞাসার প্রতিফলন এইসব কাগজপত্রে সর্বাধিক। শহর ক্রমাগত গ্রামের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। রাস্তাঘাট, বিজলী আলো ও শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে শহুরে চিন্তা-ভাবনাও গ্রামের দিকে দ্রুত অগ্রসরমান।

১০। ইদানীং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সভ্য ও সমর্থকরা শহর ও আধা শহরগুলি থেকে নানারকম সংবাদপ্রধান কাগজপত্র বের করছেন। সেই সব কাগজে দল-আন্দোলন, সমাজতত্ত্ব ও রাজনীতি বিষয়ে প্রবন্ধনিবন্ধ ছাড়া সমাজবাদী গল্প, কবিতা, অনুবাদ

বিনা অস্ত্রোপচারে
অর্শ থেকে
আরাম পাবার
জন্য
হ্যাডেনসা
ব্যবহার করুন!
DOL-327 BEN

ইত্যাদি ছাপা হয় বিশেষ সংকলনগুলিতে। শুধু মফস্বল থেকে অবশ্য রাজনীতি-আশ্রয়ী পত্র-পত্রিকা এখনো বেশী বের হয় না।

কেবল বাংলাদেশ থেকে নয়, বহির্বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকেও বাংলা ভাষায় প্রকাশিত পত্র-পত্রিকার সংখ্যা কম নয়। ভারতবর্ষের বাঙালীপ্রধান শহরগুলি থেকে বেরোয় কয়েক শ কাগজ। বিহারের বিভিন্ন শহর থেকেই বেরোয় কম করে দশ-বারোটি কাগজ। বেরোয় পাটনা, রাঁচি, মজঃফরপুর থেকে, দিল্লী এবং জব্বলপুর থেকে। ত্রিপুরা এখন আলাদা রাজ্য। আসাম বাঙালীপ্রধান প্রদেশ। স্থানীয় জনসমষ্টি ও প্রধান ভাষার সঙ্গে মানিয়ে চলার জন্যই হোক, কিংবা সাহিত্যিক যোগাযোগের খাতিরেই হোক, বিভিন্ন প্রদেশ থেকে প্রকাশিত সাহিত্যপত্রিকাগুলিতে প্রায়শ সেখানকার আঞ্চলিক ভাষার লেখার অনুবাদ কিংবা তার ওপরে প্রবন্ধ বেরোয়। যেমন আসাম থেকে প্রকাশিত 'পূর্বভারতী' পত্রিকায় দেখেছি অসমীয়া সাহিত্যের ওপর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা ছাপা হতে। বিহার থেকে প্রকাশিত মিলি পত্রিকার মধ্যেও দেখেছি হিন্দী সাহিত্যিকদের বাংলা রচনা কিংবা হিন্দী সাহিত্যের অনুবাদ.

—গ্রন্থদর্শী

নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

(৩০)

উপরে হেমন্তের আকাশ। নিচে ধানের মাঠ। আর রাতের অজস্র তারার আলো এবং মানুষ জনের ভিড় চারপাশে, মালতী নুনের নিচে শুয়ে আছে। যেন ঘুম যাচ্ছে। সোনা রাত বাড়লে আর জেগে থাকতে পারে নি। সে যে সতরঞ্চ পাতা আছে দক্ষিণের ঘরে সেখানে এসে শুয়েছিল। কিন্তু কেন জানি তার ঘুম এল না। এবং সে ফের যখন সেখানে গিয়ে দাঁড়াল, আশ্চর্য দেখল, রঞ্জিত মস্ত একটা লাঠি হাতে ভিড়ের ভিতর দাঁড়িয়ে আছেন। ছোট কাকা মামাকে কি সব বলছেন। রঞ্জিত মালতীর পায়ের কাছে এসে বসল। ওর এটাচিটা সোনা এনে বড় জ্যাঠামশাইকে দিয়ে দিল। মুখে ওর খোঁচা খোঁচা দাড়ি ক' রাত জেগে জেগে হেঁটে হেঁটে এতদূর এসেছে। ক্লান্ত এবং ঘুম যাবে বলে উঠে এসেছিলেন। ভিড় এবং হাজাকের আলো রঞ্জিতকে প্রথম বিস্মিত করেছিল, কিন্তু এই বিস্ময় প্রচণ্ড-ভাবে ওকে নাড়া দিয়েছে। ওর মনে হল নরেন দাসই এই আত্মহত্যার জন্য দায়ী। নরেন দাস ওকে একটা খুপরিতে রেখে দিয়েছে। অথবা সেই জব্বর। সে এখন কোথায়! ওর অবশ্য এসব কথা ভাববার বেশি সময় ছিল না। সে ডান হাতটা নুনের ভিতর থেকে বের করে আনল। নাড়ি দেখল। আলোর দিকে। সে পায়ের পাতায় কতটুকু গরম আছে দেখার জন্য নুন সরাল। পাতায় আলতার দাগ। ভিতরটা রঞ্জিতের ভীষণ কেঁপে উঠল। মালতীর মুখ দেখতে ইচ্ছা হচ্ছে। সে মুখ থেকে নুন সরিয়ে দিল। এখন শেষ রাত। এখন সে একা পাহারায় আছে। নুন সরাতেই ওর কেন জানি মনে হল সে বড় বড় শ্বাস ফেলছে। ওর কপালে সিঁদুর, মাথায় সিঁদুর। কে বলবে মালতী বিধবা। মালতীর এই সুন্দর মুখ এবং শরীর দেখে রঞ্জিত নির্বোধের মতো বসে থাকল। সে ছুঁয়ে ছুঁয়ে তার কপাল দেখল। চিবুক দেখল। ভাগ্যিস সে বুঝিয়ে সকলকে ঘুমোতে যেতে বলেছে। সবাই এক সঙ্গে জেগে কি লাভ। সে মালতীকে চুরি করে ভালবাসার [illegible] আকাশের দিকে তাকাতেই মনে হল ভোর হয়ে আসছে। সে এবার মালতীকে নুন থেকে একেবারে বাচ্চা করে দক্ষিণের ঘরে নিয়ে গেল এবং সতরঞ্চিতে একটা বালিশে শুইয়ে দিল। ডাকল, মালতী আমি এসে গেছি।

বস্তুত এই জলা জমির দেশের মাটি আর মানুষ জলের নিচে আশ্রয় খোঁজে। মালতী প্রাণ ধারণে কোন আর উৎসাহ পাচ্ছে না। সে জলের নিচে তার সেই প্রিয় নিরুদ্দিষ্ট হাঁসটিকে খোঁজার জন্য বুঝি ডুব দিয়েছিল। আমি আর ভাসব না জলে, জলের নিচে ডুবে যাব, এই ছিল তার আশা।

সকাল হলে রঞ্জিত থানা পুলিসের ভয়ে একবার শচীন্দ্রনাথকে থানায় যেতে বলল। দু' ক্রোশের মতো পথ। সুতরাং কিছুটা হেঁটে থানায় যাবার জন্য সে প্রস্তুত হল।

শচীন্দ্রনাথ থানায় চলে গেলে রঞ্জিত নরেন দাসের কাছে গেল। বলল, ওকে এ-ঘরে ফেলে রেখেছেন কেন?

নরেন দাস তানা হাঁটছিল। মালতী এখন ক্রমে গলগ্রহ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সে উত্তর করল না।

রঞ্জিত বুঝতে পারল নরেন দাসের ইচ্ছা নয় মালতী বড় ঘরে থাকুক। লক্ষ্মীর পট আছে, ধর্মাধর্ম আছে। নরেন দাস এখন এ-সবে মাথা ঘামাতে চাইছে না। রঞ্জিত আর কিছু বলতে সাহস পেল না। সে মালতীর কে! সামান্য খুপরি ঘরেই এখন থাকার আস্তানা মালতীর। তাকে আর ভিতর বাড়িতে নেওয়া যাবে না। জীবনে তার আর খোলা বাতাস, মুক্ত মাঠ, বর্ষার বৃষ্টিতে উদোম গায়ে ভেজা হবে না। সব তার হারিয়ে গেল।

স্টিমারেও একজন মানুষ বড় অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছে। সে রেলিঙে দাঁড়িয়ে বিশাল মেঘনা নদী দেখতে দেখতে কেবল মালতীর কথা ভাবছে। দু' পাড়ে কত গ্রাম গাছপালি। স্টিমারটা যত এগুচ্ছে তত যেন এক কৈশোরের বালিকা গাছ-পাছালির নিচে নদীর পাড় ধরে ছুটছে। ওর চুল উড়ছে। খালি গা। কোমরে প্যাঁচ দিয়ে শাড়ি পরেছে। সে ক্রমান্বয়ে ছুটছে। [illegible] মঠ পিছনে। সামনে এবার উদ্ধবগঞ্জও পড়বে। কিন্তু মানুষটা কিছু দেখছে না—দেখছে শুধু নিরন্তর এক বালিকা মাঠ পার হয়ে যাচ্ছে। কি যেন ছুঁতে চাইছে, পারছে না। সামসুদ্দিন মালতী নিখোঁজ হবার পর থেকেই কেমন যেন ভেঙে পড়েছিল। জব্বর তার ভাতভাই, লীগের পাণ্ডা। সামান্য অর্থের লোভে সে কাজটা করেছে। একটা ফুলের মতো জীবনকে নষ্ট করে দিয়েছে। যে তার কৈশোরে সারা মাস কাল নানাভাবে ফুল ফুটিয়েছিল, সে এখন নির্জীব পাগল প্রায়। এবং যেন কি একটা দুর্ঘটনা ঘটবে—সে ভয়ে ভয়ে চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে। এখানেই সে নামবে। তার এখানে আজ আবার কিছু উৎকট হিন্দুবিদ্বেষী কথা বলতে হবে।

সে মঞ্চে উঠে যাবার আগে বলল, ভাইসব আমার শরীরটা আজ ভাল নয়। আমাদের মিঞাসাহেব ইকবাল আপনাদের আজ কিছু বলবেন। বলে সে মঞ্চ থেকে নেমে নদীর পাড়ে একটা নিরিবিলি জায়গায় এসে বসে থাকল। সে যে কি করতে যাচ্ছে নিজেও ঠিক তা যেন বুঝতে পারছে না।

তখন ফেলু তার বাছুরটা নিয়ে মাঠে নেমে যাচ্ছে। হেমন্তের সকাল। ধানের মাঠ শুধু চারপাশে। সে বাছুরটাকে এইসব ধানের মাঠের জন্য আলগা ছেড়ে দিতে পারছে না। আলগা ছেড়ে দিলেই ধান খেতে অথবা কলাই খেতে মুখ দেবে। এ মাসেই নবাব গোঁর সরকারের বান্দা লোক আবদুল বাছুরটাকে খোঁয়াড়ে দিয়ে এসেছে। সে পঙ্গু বলে কেউ আর তাকে ডর পাচ্ছে না। জীবনে সে বহু গুনাহ করেছে। আল্লা তার ফল হাতে-নাতে দিচ্ছেন এমনভাবে সব মানুষ। ওর মনে হয় তখন শালা এ-দুনিয়ার হালাফিল যত মাকিয়াল্লা আছে, সকলের রক্ত সে খোঁচা দিয়ে দেখে— কিন্তু হায় পারে না। হাতে তার শক্তি আর নেই। কালো-কড়ি তারে বাঁধা হাত মরার মতো শরীরের এক পাশে ঝুলে থাকে। একেক সময় মনে হয় সেবে এক কোপে শেষ করে। গলা হাৎ করার মতো শরীর থেকে হাতটা বাদ দিয়ে দেবে। কিন্তু পারে না। এই মরা হাতটার জন্যে তার বড় মায়া হয়। কোলে হাত নিয়ে বসে থাকলে হাতটাকে তার নিজের সন্তানের মতো মনে হয়।

সে দড়ি ধরে হাঁটিতে থাকল। বাছুরটা কিছুতেই এগোতে চাইছে না। হাড় বের করা এই গরুর বাচ্চাটাকে সে কিছুতেই পেট ভরাতে পারে না। তার পঙ্গু হাত আর এই বাঁশ (ভালো) বাছুর তাকে পাগল করে দিচ্ছে। আর দিচ্ছে আন্নু। সে [illegible]

ফেলু নেই, হা-ডুডু খেলোয়াড়ও নয়—বিবি তার এখন অন্য বাড়ি ঘর—কাকে সে কি করে! রাতেরবেলা বিবি পাশে থাকলে চোখে ঘুম থাকে না। বিবি তার কোথাও রস রসে ডুবে আছে। হাজি সাহেবের ছোট বেটা আকালু বাঁশবনে লুকিয়ে থাকে। সে বাছুর নিয়ে বের হলে অথবা ফসল চুরি করতে গেলে—এবং যখন সে দূরে দূরে বনের দুঃখে কাঁদতে থাকে তখন বুকেভী তার রসরসে ডুবে থাকে।

অথবা এখন সে যে কি করে খায়, দু' পেটের সংস্থান। সে-কোন কোন দিন বনের দুঃখে নদীর পাড়ে হেঁটে বেড়ায়—বাছুরটা সঙ্গে থাকলে সে ছুটতে পারে না। সে বাছুরটা নিয়ে হাঁটে, এবং ফসলের শিষ কেটে নেয়—ঠিক জোটনের মতো। কসাই গন্ধ তুলে আনে রাতে। যব গমের দিনে যব গম। সে একা পারে না। বিবি তার মাঝে মাঝে সঙ্গে থাকে। বিবি তার জ্যোৎস্নারাতে মাঠের ভিতর চুরি করে ফসল কাটে আর সে আলে দাঁড়িয়ে থাকে। মাঝে মাঝে জমির আল থেকে হাঁক আসে, কে জাগে! শিস দেবার মতো জবাব আসে, আন্নু হাঁকে, আমি জাগি।

—জাগো কে জাগে।

—মিঞা সাব জাগেন। আন্নু খুশী থাকলে সে ফেলুকে মিঞাসাব বলে। আন্নু যেন এ-সময় তার নিজের বান্দু! পীরিত করে কার সনে—সে কথা তার মনে থাকে না। এই আন্নুকে নিয়ে ফসল চুরি করতে বের হলে ফেলু বুঝতে পারে, বিবি তার ঘরেই আছে। কিন্তু একা মাঠে নেমে এলে তার সন্দেহটা বাড়ে। বিবি তার চুরি কইরা অন্য বাড়ি যায়। সে তখন দুঃখে এবং অক্ষমতার জন্য রাগি বাছুরটার পাছায় লাথি মারে।—হালার কাওয়া আমারে ডরায় না! এবং চার পাশে মাঠ মাঠের দিকে তাকালেই এক মানুষ হেঁটে হেঁটে যায়। মাথার উপর নানা রকমের পাখি ওড়ে। সে তখন কর্কশ গলায় হাঁকতে থাকে, ঠাকুর তুমি আমারে কানা কইরা দিলা!

শুধু সে ডান হাতে সম্বল করে বাছুরটাকে টানছে। বাছুরটা হিজল গাছটার নিচে এসেই শক্ত হয়ে গেল। ফেলু বাছুরটাকে টেনে, একটুকু হেলাতে পারছে না। এমন এক ছোট জীবকে সে হেলাতে পারছে না! রাগটা তার ক্রমে বাড়ছে। বাছুরটা মাঠে কি দেখে ভয় পাচ্ছে! সে আবার চার পাশে তাকাল। হালার হালা খোদাই ষাঁড়। হাজি সাহেবের খোদাই ষাঁড়টা দু'পা সামনে দু'পা পিছনের দিকে ঠেলে দেহ খাড়া করে শিঙ দিয়ে মাটি তুলছে। ফেলুর রাগি বাছুরটাকে ভয় দেখাচ্ছে। অমিত তেজে সে যে যোয়ানকেবা করে—ফসল খায় কেউ কিছু বলতে পারে না, শিঙ দিয়ে মাটি তুলে তা পরীক্ষা করছে। ধারালো শিঙ। ছুরির ফলার মতো। চক্ চক্ করছে সব সময়। সে ছাড়া থাকে ধর্মের ষাঁড় বলে কেউ কিছু বলে না। রাজা বাদশার মতো এখন শিঙ নেড়ে ঘাড় গর্দান লম্বা করে দাঁড়িয়ে আছে মাঠে। ধানের মাঠে এমন এক জীব, জবরদস্ত জীব দেখলে ফেলুর প্রাণটা শুকিয়ে যায়। রাগি বাছুরটাকে দেখলেই তেড়ে আসার স্বভাব। কোনদিন বাছুরটার পেট এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে দেবে। সে তবু ফেলু বলে, (তার ভয় ডর নাই বলে মানুষ জানে) সামান্য এক জীবকে সে মনুষ্য কুলের কেউ বলে ডরায় না। ফেলু এমন একটা ভাব দেখাবার জন্য খোদাই ষাঁড়টাকে বলল, হালার পো হালা!

সে ধর্মের ষাঁড়কে হালার পো হালা বলল। তার কেন জানি কোরবানির চাকুটা পেলে বিসমিল্লা রহমানে রহিম বলে জবাই করতে ইচ্ছা হয় ষাঁড়টাকে। এটা যে সে এখন কাকে ভেবে বলছে বোঝা দায়। কোন ষাঁড়টা বেশি বেইমান—এই সামনে দাঁড়িয়ে থাকা, না আকালু, কে—বড় দুশমন ওর, সে বলল, হালার কাওয়া। হালার আকালু। খোপকাটা লুঙ্গি পরে দাঁড়িতে আতর মেখে সে যায় উঠোন পার হয়ে। ফেজ টুপি মাথায়। লাল রঙের লম্বা ফেজ টুপি, কালো গরু শাঁড়কাকের মতো, তুমি মিঞা আমার বিবির গায়ে হাত দাও। হালার কাওয়া। উঠানের উপর দিয়া যাও কি কইরা শালা। বলেই সে উঠোনের উপর মান্দারের ডাল দিয়ে বেড়া দিয়ে দিল।—এডা পথ না মিঞা। এডা সদর রাস্তা না। কিন্তু সকাল হলেই ফেলু দেখেছিল, সব মান্দারের ডাল কাটা তুলে ফেলে দিয়ে গেছে। সে তখন বিবির মুখের দিকে তাকাতে পারে না পর্যন্ত। যেন প্রশ্ন করলেই ফ্যাচ করে উঠবে—আমি কি কইরা কই, কেডা মান্দারের ডাল তুইলা ফ্যালাইছে আমি তার কি জানি!

—হালির হালি! তুই আবার না জানস কি! ফেলু তখন এমন চিল্লাচিল্লি করতে পারত। কিন্তু কাকে বলবে! সে যে পঙ্গু হাতে বিবিকে এখন ভয় পায়। সেই যবে জব্বর সবুজ রঙের ডুরে শাড়ি কিনে দিয়ে গিয়েছিল, গন্ধ তেল দিয়েছিল—বিনিময়ে জব্বর আন্নুর কাছ থেকে কি নিয়ে গেছে কে জানে। তবু সে হাত পঙ্গু বলে সব সে হজম করেছে। এখন বিবির এক গামছা আর ছেঁড়া শাড়ি সম্বল। মাঠে ফসল চুরি করতে যাবার সময় সে ছেঁড়া শাড়ীটা পরে যায়। আর দিনমান আতা-বেড়ার আড়ালে সে যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ এক খাটো গামছা সম্বল। কখনও কখনও গামছাটা ভিজে গেলে আতাবেড়ার উপর শুকাতে দেয়। তখন আন্নু প্রায় নগ্ন। প্রায় কেন, সবটাই নগ্ন। আতাবেড়ার আড়াল, সামনে ঝোপ জঙ্গল, উঠোনের উপর দিয়ে গেলে কেউ টেরই পায় না আতা-বেড়ার ও-পাশে ফেলু, অন্দরে বিবি তার উলঙ্গ হয়ে বসে আছে, ধান সেদ্ধ করছে, গম ভাজছে, কাওন জলে ভিজাচ্ছে। দুখন-কার যা অর্থাৎ যা সব ফসল চুরি করে আনছে তা দিয়ে সম-বৎসর যাবে এই ভেবে দিনমান কাজ করে যাচ্ছে বিবি।

যতক্ষণ বিবিটা এ-ভাবে উলঙ্গ হয়ে অন্দরে ঘোরাঘুরি করবে ততক্ষণ সে উঠানে বসে থাকবে গুড়ুক গুড়ুক তামাক টানবে—আর মনোহর সব দৃশ্য, আতাবেড়ার ভিতর বিবির যৌবন কচি কলাপাতার মতো, আর শরীরে তার নাভি, যেন নির্জন সোনালি বালির নদীর চরে এসে একটা বালিহাস বসেছে। অপটু হাতের ব্যবহারে সব নষ্ট করে ফেলছে ফেলু। ওর চুলে তেল থাকে না। চোখে সুর্মা টেনে দিতে পারে না। পার্বণের দিনে সে ধার করে তেল মেখে মাথায় মুখে তেল দিলে ফেলু যে ফেলু, তার পর্যন্ত আন্নুকে কি নিয়ে নৌকা ভাসতে ইচ্ছা হয়।

যতক্ষণ সে বাড়ি থাকবে, দাওয়ার বসে থাকবে। সে পাহারায় থাকবে। কেউ এলে তুড়ি বাজাবে হাতে। দূরের তুড়ি বাজালেই আন্নু টের পায়। তাড়াতাড়ি হাতের কাজ ফেলে ডুরে শাড়ি পরে বসে থাকা। সব শস্যদানা হাঁড়ি পাতিলে ঢেকে রাখে। কেউ যেন টের না পায় ওরা রাতে বিরাতে ফসল চুরি করে আনছে।

এসব দৃশ্য দেখতে বড় মজা। সে চুরি করে আতাবেড়ার এ-পাশ দেখে আর মজা পায়। কখনও বিবির শরীরে জাল জাল গামছা—প্রায় চিকের মতো। হাজি সাহেবের ঘাটের ও-পারে ঝোপের ভিতর যখা তখন বসে ছিল মাইজলা বিবিকে দেখবে বলে, সে ঘরের ভিতর তেমনি কখনও কখনও বসে থাকে। নিজের বিবির শরীর চুরি করে দেখতে ফেলু বড় মজা পায়।

এত অভাব অনটনেও বিবিটা যে কি করে এমন লাবণ্য ছিটিয়ে রেখেছে শরীরে—হায় তখন ফেলু, আকালুর লম্বা শরীর, শক্ত বুক, লাল রঙের ফেজ টুপি কেবল মরীচিকার মতো দেখতে পায়। খুশবু আতর মেখে দাঁড়িতে আকালু। আকালু বড় চালাক। সে যখনই রাস্তা দিয়ে যায়, আতর মেখে দাড়িতে যায়। বিবি আতরের গন্ধ পেলেই আতাবেড়ার এ-পাশে নেচে উঠে। মানুষ তার এসে গেছে। সে টের পায় আতরের গন্ধে এক মানুষ এই রাস্তায় জানিয়ে গেল সে বাঁশবনের দিকে হেঁটে যাচ্ছে। বিবিটা তখন সবুজ রঙের জব্বরের দেওয়া শাড়িটা পরে যায়—কই যাও তুমি! যাই মতিউরের কাছে। চিড়ার ধান ভিজাইছি। চিড়া ভাইঙ্গা দিলে দুই খোলা চিড়া দিব।

—আর কিছু দিব না!

—আর কি দিব!

—কান চুমা দিব না তরে।

বিবি বুঝতে পারে মানুষটা ওকে সন্দেহ করছে। আতরের গন্ধ সে টের পেয়ে গেছে। যা আল্লা, মানুষটার শনি হরণ কইরা নিলা, চুল হরণ কইরা নিলা না ক্যান! জান হরণ কইরা নিলা না ক্যান। আন্নু তখনও কখনও ভালবাসার জন্য মরিয়া হয়ে উঠে।

ফেলু টের পায় এ-ভাবে আকালু তার বিবির ভালবাসা হরণ করে নিচ্ছে। সে কোরবানির চাকুটার তালাসে থাকে তখন। কিন্তু কোনদিন দুপুরের দিকে সে দেখতে পায় মাঠের উপর আকালু, মাথায় লম্বা লাল রঙের ফেজ টুপি পরে, কালো রঙের

ঝিন্‌ঝিনে খাঁদি গায়ে খোপকাটা লুঙ্গি কোমরে—আকালু আর একটা ধর্মের ষাঁড় হয়ে গেছে। যেন তিন ষাঁড় তিনদিক [illegible] ওকে পাগল করে দিচ্ছে। এক আকালু, দুই হাজি সাহেবের খোদাই ষাঁড়, তিন পাগলা ঠাকুর। সে বাছুরটাকে ফের টানতে থাকল।

মাঝে মাঝে ফেলু কোবরেজের চাকুটা চালাঘরের এ-বাতায় ও-বাতায় গুঁজে রাখে। আর, ওর গলা কেটে সটকে পড়তে পারে। নিশিদিন ঘরের ভিতর এক অবিশ্বাস, বাতায় অথবা চালের খড়ের ভিতর সে মাঝে মাঝে উঁকি দিয়ে দেখে—ওটা ঠিক আছে কিনা, না আকালু বিবিকে দিয়ে ওটাও হরণ করে নিয়েছে।

সে এ-ভাবে বাছুরটাকে টেনেও নড়াতে পারল না। ধর্মের ষাঁড়টা একইভাবে চার-পায়ের উপর শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মহান জীব যেন কে [illegible] তার [illegible] নেই, মাঝে মাঝে ষাঁড়টা তার চোখের উপর দিয়ে আকালুদিগের হয়ে যাচ্ছে। ষাঁড়টা ওর বাছুরটাকে ছেড়ে আসবে কখন [illegible] তুলে দিচ্ছে।

ষাঁড়টা এবার শিঙ উঁচিয়ে এদিকে ছুটে আসতে পারে। ষাঁড়টা ছুটে এলেই বাছুরটাও ছুটবে। ছুটে ষাঁড়ের দিকে উঠে যাবে। ফেলু শক্ত ধরে থাকলে টানতে টানতে তাকেও নিয়ে ষাঁড় ছুটবে। ঐ সাদা রঙ, এক মহাজীব জীবের চোখ লাল—যেন তার সামনে অথবা দূরে যা কিছু, মাত্র,

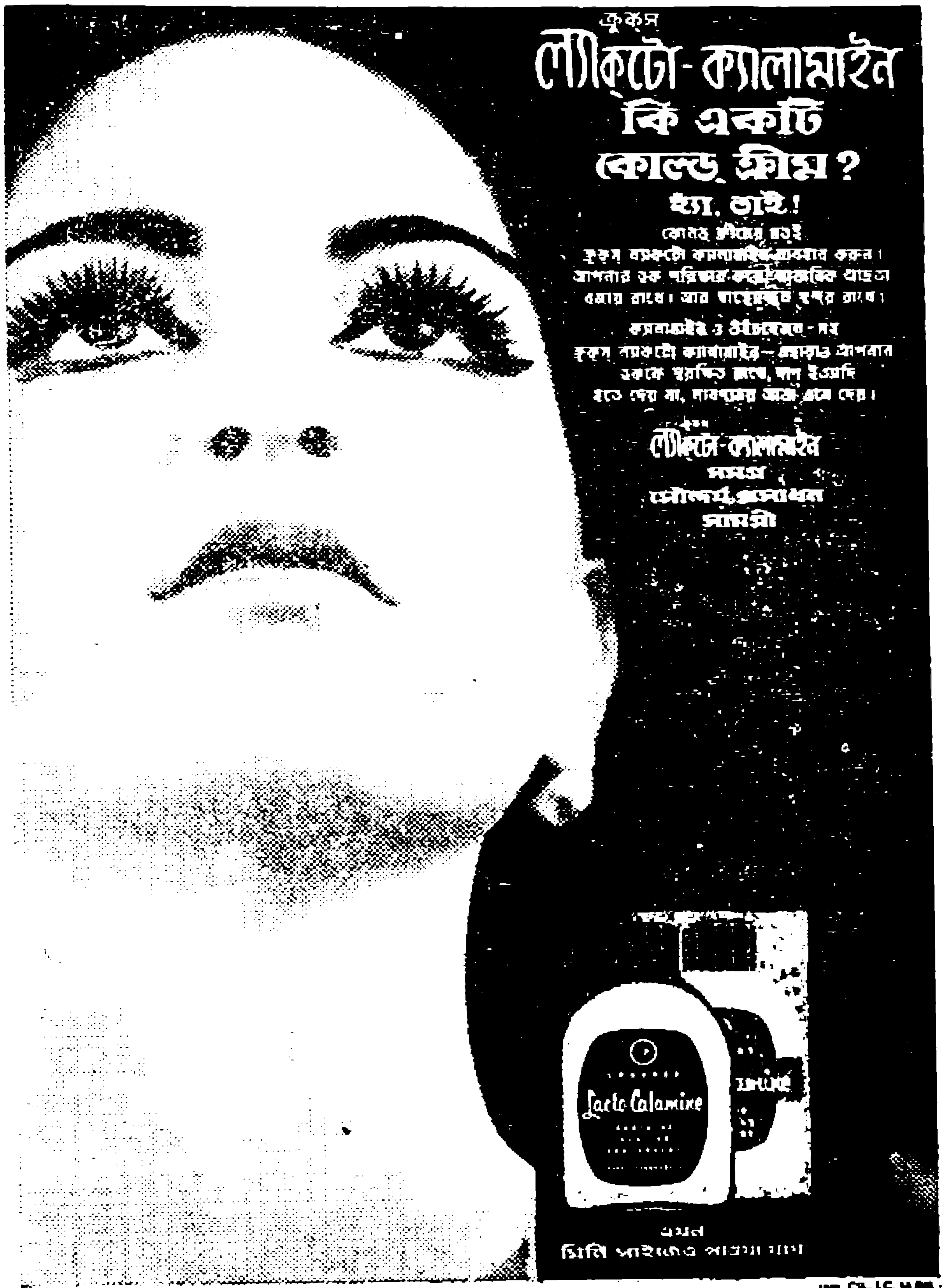

ক্রুকস্ ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড, বোম্বে-২৫

বিনামূল্যে! —আপনার বিনামূল্যের সুন্দর পুস্তিকার জন্যে আজই লিখুন—ডিপার্ট-৩, পোঃ বক্স ৬৮৫২, বোম্বাই-১৮

রা কিছু ফসল এবং কচি ঘাস সব তার ভোজনের নিমিত্ত। আর কে আছে এ মহা-পৃথিবীতে আমার ফসলে ভাগ বসায়। আমার সামনে দিয়ে যায়। ফেলু জোর খিস্তি করল, ও হালা বাগি বাছুর সামনা দিয়া যাইতে ডর পায়।

বাগি বাছুরের আর দোষ কি! ফেলু নিজেও ডর পাচ্ছে। সে তাড়াতাড়ি একটা ছিটকিলার ডাল ভেঙে ফেলল। এক হাতেই সে ডাল থেকে পাতা ফেলে ওটাকে একটা পাচনের মতো করে নিল। সে হাতের উপর ডালটা ঘোরাতে থাকল। ষণ্ডটা দ্যাখুক ফেলুর কি সাহস আর শক্তি! সে লাঠি ঘুরিয়ে এখন ষণ্ডটাকে ভয় দেখাচ্ছে। এবং বাগি বাছুরটার কাছে সে নিজের প্রতিপত্তি কত বেশি, সে যে ফেলু, এক হাত গিয়েও সে ফেলুই আছে এমন বোঝাতে চাইছে। জীবটা কাছে এলেই খোতামুখ ভোঁতা করে দেবে।

একদিন ফেলু দেখছে ষণ্ডটা ওর বাছুরটাকে তাড়া করে আসছে। সে পঙ্গু হাতে পেরে উঠছে না। বাছুরটা ওকে টেনে নিয়ে বাড়িতে ঢুকেছে। ষণ্ডটা তখন মহামারির মতো তেড়ে এসে একেবারে উঠোনে উঠে গেছে। বাছুরটাকে সে চুরি করে ঘাস খাওয়াচ্ছিল। ষণ্ডের প্রতাপ কত, ষণ্ডটা উঠানে উঠে এলেই হায় হায় রব। গেল গেল। চিৎকার চেঁচামেচি। বাছুরটা ঘরে ঢুকে গেছে। বোধ হয় চুস মেরে ফেলুর কুঁড়ে ঘর উড়িয়ে দিত। কিন্তু আমুর হাতে ছিল গরম ফ্যানের গামলা। সে জীবের রোষমূর্তি দেখে ভয়ে সব ফেনটা ছুড়ে দিল ষণ্ডের মুখে। আর তখন জীবটা হাম্বা হাম্বা করে ডাক দিল। মুখটা পুড়ে গেছে। মহাবন্দ মাঠের উপর দিয়ে লেজ তুলে ছুটছে। সেই থেকে জীবটা তার সীমানায়। ফেলু নিজের সীমানায়। দুই সীমানায় দুই জীব। পোড়া মুখ ষণ্ডের। এক চোখ গলে কপালের ভিতর ঢুকে গেছে। ফেলুর কপালে আছে একটা চোখ। দুই জীব এখন এক চোখে সমর পেলেই লড়ছে।

হাওড়া
কুষ্ঠ কুটীর

সর্বপ্রকার চর্মরোগ, বাতরক্ত, অসাড়তা, ফুলা, একজিমা, সোরাইসিস, দুষিত ক্ষতাদি আরোগ্যের জন্য সাক্ষাতে অথবা পত্রে ব্যবস্থা লউন। প্রতিষ্ঠাতা: পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা কবিরাজ, ১নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া। শাখা: ৩৬, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৯। ফোন: ৬৭-২০৫৯।

কি যে ডর ফেলুর! তবু হাতে লাঠি থাকায় ডর কমে গেল। সে বাছুরটাকে নিয়ে আবার হাঁটতে থাকল। ভাল ঘাস সে খুঁজছে। দেখল মাঝিদের মাঠে আলের উপর নরম ঘাস। সে বাছুরটার দড়ি ধরে বসল। চারপাশে ধান খেত। সে বাছুরটাকে আলে আলে ঘাস খাওয়াচ্ছে। ঘাস খেতে খেতে বাছুরটার দপ্ দপ্ শব্দ, ফুৎফাৎ শব্দ। লেজ নেড়ে নেড়ে বাছুরটা নিশ্চিন্তে ঘাস খাচ্ছে। এই ঘাস খাওয়া দেখতে দেখতে ফেলু কেমন আবিষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এবং কেন জানি তার গত রাতের কথা মনে হচ্ছে বার বার। সে কাল সারা রাত ভয়ে ঘুমাতে পারে নি। আমু সন্ধ্যার পর ঘরে ছিল না। ডোরা ডুরে শাড়ি পরে বিবি তার যে কোথা গেল! সে ডাকে এ-বাড়ি ও-বাড়ি খুঁজেছে। সে হাজি সাহেবের বাড়ি যেতে পারে না। গেলেই মাইজলা বিবি, ওলো সই ললিতে ও-গানটা গায়। পাচনের গুঁতো মারতে পারে হাজি সাহেব। সে ফিরে এসেছিল। না কোথাও নেই। আমু যখন এল তখন রাত অনেক। মাথায় তার এক বোঝা কলাই গাছ। সে গাছ চুরি করে এনেছে হাজি সাহেবের জমি থেকে। এনেছে না, দোষ ঢাকবার জন্য এক বোঝা কলাই গাছ দিয়েছে আকালু সে বুঝতে পারছে না।

না বলে না কয়ে গেলেই ফেলুর মনে হয় বিবি তার মসকরা করতে গেছে। অথবা আকালুর সঙ্গে বনে মাঠে পীরিত করতে গেছে। গতকাল রাতে কোথাও যাবার কথা নেই অথচ না বলে না কয়ে চলে গেল। জালসা পেটে পেটে। ফেজ টুপি মাথায় আনধাইর রাইতে দাড়িতে খুসবো মেখে আকালু নেমে গেছে। বিবি, কোন অন্ধকারে খোপকাটা লুঙ্গি পরে আকালু দাঁড়িয়ে থাকে গন্ধ শুঁকে শুঁকে টের পায়। সে সেদিন গৌর চন্দ্রের বাড়ি। ফিরতে রাত হবে কথা ছিল। সেই ফাঁকে বিবিটা বন মাঠে নেমে গেল।

না কি বিবি তার কাজ কামবার হয়ে গেলে, বাছুরের ঘাস নেই বলে আনধাইরে যাচ্ছে সব কলাই তুলে এনেছে জমি থেকে। কি যে হচ্ছে! গাঁয়ের মানুষও জানে জবরদস্ত ফেলুর বিবি এখন পীরিত করছে। জবরদস্ত ফেলুর এই অবস্থা! বিবি তার পীরিত করে অন্য জনার সঙ্গে। সে ভিতরে ভিতরে আগুন। বিবি ঘাস মাথা থেকে নামাতে পারে নি। কোমর বরাবর ঝাঁকি। গা তো তার আর পঙ্গু না। বরং হাতের ব্যাধি এখন তার পায়ে এসে জমেছে। ঝাঁকি খেয়ে আমু সামলাতে পারে নি। উপুড় মুখ থুবড়ে পড়েছে। আমুকে মারলেই সে দাওয়ায় বসে আগে ইনিয়ে-বিনিয়ে কাঁদত। মজা মারছে বাড়িতে এখন কান্না। কান্নার সঙ্গে নানারকম অশ্লীল শব্দ সুর করে বলে যাওয়া, মাঠের ধার দিয়ে কেউ গেলেই বুঝতে পারত শালা ফেলু আবার ক্ষেপে গেছে।

নিত্যকারের ব্যাপার বলে কেউ আসে না। আবার দ্যাখো কি পীরিত দুজনায়।

কিন্তু আজকাল সবাই যেন টের পেয়েছে আমু মতিহার সাদাপাতা দাঁতে মাখছে। আমু গতকাল মুখ থুবড়ে পড়ে গিয়েও কাঁদে নি। কোথায় সে একটা শক্ত জায়গা পেয়েছে পা রাখবার। কাঁদলে-কাটলে কটূক্তি করলে ফেলুর ডর থাকে না। আজ সে কোন কটূক্তি করছে না। কোনদিকে সে এবার যথার্থই চলে যাবে। ফেলু শুধু জানে সে তালাক না দিলে বিবি কোথাও যেতে পারবে না। আকালু চায় ফেলু তালাক দিক। তালাকে দিলে কিছু পয়সা পর্যন্ত মিলে যাবে ফেলুর এমন লোভ দেখিয়েছে আকালু। ফেলুর মুখ দেখলে তখন মনে হয় এই যে কথায় কথায় মার ধোর করা সবই দাম তোলবার জন্য। কত দাম দিবা মিঞা। কিন্তু ফেলুর অন্তর জানে সে এ-সব পারে না। সে আমু না থাকলে মরে যাবে।

কিন্তু ফেলু যখন আমুর দাম দর নিয়ে মাথা ঘামায়, এক চোখে মুচকি হাসে, বসন্ত দাগ মুখের চারপাশে খোপকাটা লুঙ্গির মতো এখানে সেখানে তার দাড়ির ভিতর গোটা মুখ কি যে বীভৎস, তা মিঞা বরাবর হইয়া থাউক। মুক্তীর বিনিময়ে টাকা আসে। কতদিন বিবি আছে ততদিন অভাবে অনটনে টাকা ধার—আমু না থাকলে শালা হারামের ছাও ফেলুকে ভিটে মাটি ছাড়া করত এতদিনে। শুধু মাঝে মাঝে ওর উঠোনের উপর দিয়ে যাওয়াটা সহ্য করতে হয়। তখন ক্ষণে ক্ষণে ইচ্ছা হয় ফেলুর ভাঙা মরা ডালে মারে এক বাড়ি। শালার ইতরের বাচ্চার পীরিত ছুইটা যাউক। পরক্ষণেই মনে হয় ওর হাত নেই—এক হাত সম্বল। তেড়ে গেলে হারামের বাচ্চা ওর ঘাড়টা ধরে ফেলবে এবং এমন মোচড় দেবে পঙ্গু হাতে যে সে একটা পাগলা কুকুরের মতো চিৎকার করতে থাকবে। সেজন্য আকালু গেলে সে হাসি হাসি মুখে বলবে—কৈ যান ভাইসাব? মাঠে ধান কেমন হইল। তা কার্তিক সাল ধানের ভাত কতকাল খাই না। ধান উঠলে আমুরে পাঠাইয়া দিমু। দুই কাঠা ধান দিয়া দিবেন।

আকালুর চোখে সর্ষে ফুল ফুটে ওঠে। ফেলুটা তক্কে তক্কে আছে কবে ধান উঠবে। সে কি বলবে ভেবে পায় না। আমুটা কোথায়? আতাবেড়ার ফাঁকে চোখ ঠেলে দেয়। সে কি তার দাড়ির আতরের গন্ধ পায়নি। বাধ্য হয়ে আমুকে দেখার জন্য উঠোনে দাঁড়ায়। কিছু কথা বলতে হয়। সে চোখ এধার ওধার করতে করতে বলল, বিবিরে পাঠাইয়া দিয় মিঞা। দুই কাঠা ধান দিমু। গুয়া দিমু। তামুক পান যা লাগে দিয়া দিমু। তারপর আমুকে যে চুরি করে দেখার তালে আছে সেটা ধরা পড়লেই মিঞার মুখে থুথু দিয়ে চলে যাবার ইচ্ছা। আমুর কি জ্বালা এই মানুষকে নিয়ে। কিছুতেই ছেড়ে আসতে পারছে না।

কি করে কোথা থেকে যে এমন একটা খুব-সুরত বিবি ধরে এনেছে কেউ জানে না বললে ঠিক হবে না, জেনেও জানে না যেন—এতদিনে এটাই নিয়ম হয়ে গেছে ফেলুর

বিবি আমু। ফেলু নিয়মমাফিক তালাক না দিলে সে ঘরে চলে নিতে পারবে না। পারে এক কোনদিকে চলে যেতে, আমুকে নিয়ে কোন গঞ্জে চলে গেলে কেউ টের পাবে না।

ফেলু যেন তখন টের পায় বিবি তার যথার্থই ভাগবে। শুধু ভাগবে না, যেমন সে খাং করে মিঞা সাহেবের গলা দু ফাঁক করে দিয়েছিল, তেমনি বিবি তার গলা দু ফাঁক করে ভাগবে। এবং এই ভেবে বসে সে কেবল বিবির মুখ দেখছিল। একবার সে কাঁদল না। শক্ত হয়ে সারাক্ষণ কুপির আলোতে মুখ নিচু করে গোঁজ হয়ে বসে থাকল। ভয়ে ফেলু রাতের প্রথম দিকে ঘুম যেতে পারল না। হোগলা বিছিয়ে সে শুয়ে চুপিচুপি বিবির মুখ দেখছে। কঠিন মুখ, শক্ত চোখ বিবর্ণ। চোখ জ্বলছে। বাইরে তখন কি একটা পাখি ডাকছিল। হেমন্তের মাঠে শিশির পড়ছে। কোড়াপাখিদের ডিম ফুটে নিশ্চয়ই এতদিনে বাচ্চা হয়েছে। ফেলু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলতেই মনে হল বিবি নড়েচড়ে বসেছে। এবং এবার তার বুঝি একটু মায়া হল। বড় জোরে সে মেরেছে। সে বলল, কৈ গ্যাছিলি?

—মরতে গ্যাছিলাম।

—মরতে কই গ্যাছিলি?

—মাঠে।

—ক্যান, কি কামডা মাঠে?

—ঘাস না আনলে তর সাধের বাছুরডা খাইত কি। সারাদিন কি খাইতে দিছ।

—দিমু কি হইয়া! দিনের বেলা মাঠে মানুষজন ঘুইরা বেড়ায়।

আর রাইতের বেলা বাড়ি থাইকা পালাইয়া যান।

মনে হয় বিবির রাগটা কমে আসছে। সে উঠে বসল। —দে দুইডা খাইতে দে।

—পারমু না।

—ক্যান পারবি না। কেডা তরে ভাত দ্যায়। বলেই সে তেড়ে যাবে ভাবল। কিন্তু সেই রকমের গোঁজ হয়ে বসে থাকা দেখে সে উঠতে সাহস পেলে না। বাতায় যেখানে কোরবানির চাকুটা লুকিয়ে রেখেছিল সেটা সেখানে ঠিকমতো আছে কিনা দেখল। কিন্তু চাকুটা নেই। সে উদ্বিগ্ন চোখে মুখে তাকাচ্ছে। একটা চোখে দেখতে হয় বলে ঘাড় পুরোটা না ঘুরালেও সে দেখতে পায় না। একবার মনে হল অন্য কোথাও রেখেছে। সে অযথা বিবির ওপর রাগ করছে। খুঁজে দেখলেই হবে। তা ছাড়া সে বিবিকে কি সুখটা দিল! ক্ষণে ক্ষণে মায়া পড়ে যায়। ক্ষণে ক্ষণে তার অবিশ্বাস। সে মায়া পড়ে গেলে কাছে গিয়ে বসল। পিঠে হাত দিয়ে আদর করতে চাইল। সাপটে ধরে আদর করতে চাইল। আমু যেন এবার গলা কামড়ে ধরবে, সাপের মতো ফুঁসে উঠছে। মিঞা তুমি আমারে দুই-বলা। তুমি ইবলিশ। তুমি না-পাক।

—কি কইলি! আমি ইবলিশ, না-পাক মানুষ। ফেলু তড়াক করে লাফিয়ে উঠল। ওকে যেন বিবি এতদিন পর চিনিয়ে দিচ্ছে—তুমি ইবলিশ তুমি শয়তান। তোমার ধর্মাধর্ম জ্ঞান নাই।

ফেলুর পায়ের রক্ত চড়াং করে মাথায় উঠে গেল। সে বুঝি কঠোর কঠিন কিছু একটা এবার করবে। সে বাইরের অন্ধকারে নেমে এল। ঘরে থাকলে এক্ষুণি হত্যাকাণ্ড ঘটবে। সে চালের বাতায় সেটা খুঁজল। না নেই। আমি ইবলিশ, না-পাক মানুষ, সে খুঁজতে খুঁজতে এমন সব বলল। নামাজ পড়ি না, আল্লার নাম মুখে আনি না, আমার গুনার শেষ নাই। তা তুই এহনে এগুলান কবি। বলেই সে লাফ দিয়ে ঘরে ঢুকে বিবির সামনে ধপাস করে বসে পড়ল। তারপর বাঁ-হাতটা জন হাতে তুলে মরা সাপের মতো বিবির চোখের সামনে দোলাতে থাকল। বলল, বিবি তর সাহসের বলিহারি যাই। এডা আমার মরা হাত, হাত তরে সাহস দিছে। তুই আমারে না-পাক কইলি! না হইলে কার হিম্মত আছে, কাইল্যা মরে কত বান্দা লোক—তুইত মাইয়া মানুষ আমু! হাসুয়াড়া কোনখানে রাখছস! কোরবানের চাকুডা।

—ক্যান তুমি আমার গলা কাটবা?

—দিলে দেহন যায় গলা তর কাটে কি না!

আমু এবার আরও শক্ত হয়ে গেল। —এই আছিল তর মনে! বলে সে খড়ের ভিতর থেকে হাসুয়া এবং কোরবানির চাকুটা ফস করে বের করে ফেলল।—আইনা দিলাম। ইবারে চালাও দাহি। করছ একখানা তবে বুঝি! বলে সে দুই চোখ বিস্ফারিত করে, যেন রুপবাহিনী, ভুরে শাড়ি খুলে ফেলে প্রায় উলঙ্গ আমু সামনে গলা বাড়িয়ে দিল।—হিম্মত মিঞা নই! পার না পোচাইয়া গলা কাটতে! বলেই সে ফের কেমন শক্ত হয়ে গেল। ফেলুর যা মেজাজ, এক্ষুণি সে গলা চেপে নলি কেটে দিতে পারে। এক্ষুণি সে কিছু একটা করে ফেলবে। কিন্তু আমু এতটুকু ভয় পাচ্ছে না। কারণ চোখ দেখে সে টের পাচ্ছে—মানুষটার ভয়ে ধরেছে। সে আগের মতো দুই চোখ বিস্ফারিত করে, যেন আগুন জ্বলছে চোখে—মাঠের ভিতর স্বামীর হত্যার কথা শুনে সে যেমন হা হা করে হেসে উঠেছিল পালিয়ে আসার সময়, আজ আবার তেমনি পাগলের মতো হাসতে থাকল।

সঙ্গে সঙ্গে ফেলু তার মরা হাতের মতো নিস্তেজ হয়ে গেল। সে তাড়াতাড়ি অস্ত্র দুটো হাতের পিছনে লুকিয়ে ফেলল। সে গোপনে অস্ত্র দুটোকে খড়ের গাদায় লুকিয়ে রাখল অন্ধকারে। আমু কঠিন চোখে দেখছে জবরদস্ত মানুষটা ক্রমে রাতের পোকা হয়ে যাচ্ছে। সে কঠিন গলায় বলল, পারলা না মিঞা। জানে আর হেকমত নাই।

—নাই বিবি।

—তাহলে পোড়ামুখ মাইনসেরে আর দ্যাখাইও না।

ফেলুর মনে হল সত্যি তার আর বাঁচার অর্থ হয় না। নিজের মুণ্ডু নিজে কেটে দণ্ড দিতে পারলে অথবা দু হাতে মুণ্ডুটিকে নাচাতে পারলে যেন বিবির কথা সঠিক জবাব দেওয়া হত। কিন্তু অন্ধকার, ও-পাশের গোয়ালে বাছুরের চোখ এবং চুরি করে ধান অথবা ফসল কেটে আনা—সবই কেমন মায়াময়—সে কিছুতেই কাটা-মুণ্ডু নিয়ে এখন আর নাচতে পারে না। সে বিবির অলক্ষ্যে দুই অস্ত্র খড়ের গাদায় লুকিয়ে হোগলাতে শরীর টান করে দিয়েছিল। তারপর প্রায় সারারাত সে ঘুমুতে পারে নি। সে ঘুমিয়ে পড়লেই বিবি ঘরে আগুন জ্বালিয়ে বুঝি ভেগে পড়বে। এক পোড়া মানুষ, কুঁকড়ে থাকবে আগুনে—আগুন, হত্যার ছবি—ফেলু একেবারে পাগল হয়ে যেত, যদি সে না দেখত এক সময় বিবিটা আঁচল পেতে এক পাশে শুয়ে আছে। সে সন্তর্পণে কাছে উঠে গেল। দেখল আমু যথার্থই ঘুমোচ্ছে কিনা, না ঘুমের ভান করে মটকা মেরে আছে। সে কুপির আলোতে দেখল আমু যথার্থই ঘুমোচ্ছে। ওর মনটা সহসা অদ্ভুত বিষণ্ণ হয়ে গেল। বিবিকে আদর করার ইচ্ছা হচ্ছে। সে মুখটা কাছে নিয়ে গিয়েও ফিরিয়ে আনল। ভয়, বড় ভয়। নাগিনীর মতো ভয়। আদর করলেই গলা কামড়ে ধরবে। সে বিবির পাশে গামছা পেতে শুয়ে পড়েছিল। এবং সকালে আমুই তাকে ডেকে দিয়েছে—বাছুরডারে মাঠে দিয়া আস।

মাঠে বাছুর নিয়ে নেমে এলে এই কাণ্ড। এই ষণ্ড চার পায়ের উপর শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বিশাল মাঠ, ধান ক্ষেত, সোনালি বালির নদীর চর উপেক্ষা করে ফেলুকে ভয় দেখাচ্ছে।

এবং হাজি সাহেবের ছোট বেটা, যত লম্বা মানুষ না তার চেয়ে বেশি লম্বা হবার সখ। লাল রঙের টুপি মাথায়। খোপ কাটা লুঙ্গি পরে তাজা রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে আছে। দাড়িতে খুসবো আতরের গন্ধ। বিবি বেমালুম গত রাতের পাছায় লাথি তুলে বাঁশ বনে হয়ত নেমে যাচ্ছে।

সে এবং ষণ্ড আর আকালুদ্দিন, পাগল ঠাকুর সবাই ক্রমে পরস্পর প্রতি পথ হয়ে যাচ্ছে। এক মহিমামণ্ডিত মানুষ হেমন্তের সকালে সোনালি বালির নদীর চরে শুয়ে আছে। কেবল তিনিই জানেন, ষণ্ডটা কত-বেগে ছুটলে ফেলুর পেট এফোঁড়ওফোঁড় করে দিতে পারে।

যেন ষণ্ডটা ফেলুকে দেখে, পায়ের উপর মরণ নাচন নাচছে। এবার ষণ্ডটা বুঝি ছুটবে।

(ক্রমশঃ)

নিকটেই আছে

বড় বকুলপুরের হাটে

চারদিনের টানা খোঁজাখুঁজি আজই শেষ হল। কাল অনাদি ফিরে যাবে কলকাতায়। কলকাতায় ফিরে রিপোর্ট সাবমিট করতে হবে। ঐ রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠবে কোম্পানীর সেলস প্রোমোশন স্কীম। অনাদির সাজেশন যদি কাজে করে ফল পাওয়া যায় তখন ন্যাশনাল স্কেলে গোটা দেশ জুড়ে সমস্ত বাড়াবার পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামাঞ্চলের চাষী, তাঁতী, কুমোর, কামারদের লোন দেওয়ার বর্তমান ব্যবস্থাটাকে আরো সায়েন্টিফিক করে তুলবে ব্যাঙ্ক। গত একবছর ধরে সরকারী নির্দেশে চাষীবাসীদের ঢালাও ভাবে লোন দিয়ে ব্যাঙ্কের এখন মাথায় হাত দেওয়ার জোগাড়। লাখ লাখ টাকা বেরিয়ে গেছে। কিস্তির পিরিয়ড পেরিয়ে গেলে এখানা দিকেও টাকা আদায় হচ্ছে না। কিন্তু সে তো দূরের কথা যে সেলস রিপোর্ট জমা দেওয়ার কথা ছিল, তা পর্যন্ত কোথাও জমা পড়ছে না। এভাবে আর কিছুদিন চললে শেষ পর্যন্ত হয়তো লাল বাতি জ্বালাতে হবে। আর তাই মার্কেট সার্ভে করার জন্য অনাদিকে পাঠিয়েছে কোম্পানী।

চারদিন ধরে এই জেলার সব ইমপরট্যান্ট টাউন আর হাট চষে বেড়িয়েছে অনাদি। কালিয়াপুর, কানাইতলা, সজনেরহাট, বড় বকুলতলা, জংশন স্টেশন চিংড়ীহাটা, দেবীপুর, সোনাগঞ্জ, বিবিরহাট, তেঁতুলহাটি, কিছু বাদ রাখেনি অনাদি। ঘুরে ফিরে, দেখে শুনে অবাক হয়ে গেছে। বাবো মানুষ কত সরল, কত অজ্ঞ, কত অনভিজ্ঞ, আর কত প্রচণ্ড পরিশ্রমে অসহায়! অথচ কত কাছে কলকাতা। কলকাতাই তাকে পাঠিয়েছে, এই দরিদ্র অসহায় মানুষগুলোর হাতের নাড়ির সঙ্গে সন্ধান নিতে। আর সেই সন্ধান নিতে গিয়েই এক বিচিত্র অবস্থার মুখোমুখি হয়েছে আজ অনাদি। সেই অবস্থার কথাই যে কি করে গুছিয়ে গাঁথিয়ে রিপোর্ট লিখবে, তার হদিস না পেয়ে একটার পর একটা সিগারেট পুড়িয়ে চলেছে অনাদি। হোটেলের ছোকরা চাকরটা একটু আগে চা দিয়ে গেছে। তাকিয়ে দেখল এরই মধ্যে একটা হাল্কা আলোয়ান গায়ে চাপিয়ে নিয়েছে কাপড়ের ঐ বাদামী টোনটাকে জড়িয়ে। একটা গুবরেপোকা উড়ে এসে পড়েছে ঐ আলোয়ানের ওপর। কয়েক সেকেন্ডের ব্যাপার। তার মধ্যেই, অনাদি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল, পোকাটা বারকয়েক নড়েচড়ে চেষ্টা করল উঠে উড়ে পালাবার। পারল না, দম বন্ধ হয়ে মরে পড়ে রইল কাপড়ের ভেতরে। আলোয়ানের গায়ে একটু ছেঁদা হয়েছিল। আস্তে আস্তে পোকাটা ঐ ছেঁদা দিয়ে ভেতরে গলে গেল। সেই সঙ্গে ঐ ফাঁকটুকু ক্রমশ বন্ধ হয়ে আসতে লাগল। উঠে দাঁড়াল অনাদি। ঘরের বাইরে মফস্বল শহরের প্রধান রাজপথে তখন হাজার সাইকেল রিকসা, লাউডস্পীকার আর দু'একটা লরীর আওয়াজ সব তালগোল পাকিয়ে কিম্ভূত-কিমাকার হয়ে উঠেছে। দূর থেকে ভেসে আসছে ইলেকট্রিক ট্রেনের তীক্ষ্ণ চীৎকার। একটানা কে যেন কাকে বলছে, কাল আসব, পৌঁছিয়ে ঠিক আসব। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল কাল অভিমন্যুর আসবার কথা। কাল সাড়ে এগারোটার ট্রেনে অনাদি রওনা দেবে। তারই আগে ওর একটা ব্যবস্থা করে দিয়ে যাবে কথা দিয়েছে অনাদি।

কিন্তু পারবে কি? অনাদির রিকোয়েস্টে একটা লোনের ব্যবস্থা নিশ্চয়ই ব্যাঙ্কের লোকাল ব্রাঞ্চের ম্যানেজার করে দেবেন। তাতে কি অভিমন্যুর সব প্রবলেম মিটবে? মনে তো হয় না। ব্যাঙ্কের কাছ থেকে লোন পেলেও ও আবার ছুটবে গোবিন্দ বসাকের কাছে। এতদিনের পুরোনো হ্যাবিট, নেশায় দাঁড়িয়ে গেছে। এত আর সিগারেটের ছাই না যে টুসকি দিলেই ঝরে পড়ে যাবে। তা ছাড়া অন্য প্রয়োজনের দিকটাও তো দেখতে হবে।

ব্যাঙ্ক তো অভিমন্যুকে কাঁচা টাকা দেবে না। তার বদলে ও যেখান থেকে সুতো কিনবে সেই আড়তদার বা পাইকারী মহাজনের বিল মেটাবে ব্যাঙ্ক। তাহলে সংসার চলবে কি করে অভিমন্যুর! আর তখন সংসার চালানোর দায়েই বেচারা ছুটবে আবার বসাক বা সাধুখাঁর দোকানে।

তেঁতুলহাটি, বিবিরহাট, বড় বকুলপুর, সজনেরহাট, সব জায়গায় হাঁ করে বসে আছে বসাক, সাধুখাঁ আর সাহারা, অভিমন্যুর মত ছোট ছোট তাঁতীদের গেলবার আশায়। লাখ লাখ টাকার কারবার ওদের। সুতো মিলের ব্যবসা। পুরুষানুক্রমিক চালিয়ে আসছে। তাঁতীদের সঙ্গে একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। সেই সম্পর্কের জাল ফেলেই হাজার হাজার টাকার মাল এক-এক হাটে ধরে তুলছে মহাজন। বিনিময়ে অভিমন্যুরা পাচ্ছে কি? কি আর পাবে— কচুপোড়া! দু' হপ্তার কড়ারে হলুদের চিরকুটখানা ট্যাঁকে গুঁজে হেঁটে কুসীদজীবী মহাজনের দোরে।

বড় বকুলপুরের হাটেই গত বেস্পতি-বার অভিমন্যুকে আবিষ্কার করেছে অনাদি। চিংড়িহাটা ব্রাঞ্চের ম্যানেজার বলেছেন, গোটা তল্লাটে কাপড়ের সবচেয়ে বড় কেনা-বেচার সেন্টার ঐ হাট। কোন কোনদিন বারো তেরো লাখ টাকার বিকিকিনি পর্যন্ত হয় ঐ হাটে। এতগুলো টাকার লেনদেন হচ্ছে হাজার হাজার মানুষ কিনছে, বেচছে, অথচ ব্যাঙ্কের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। শুনে চমকে গিয়েছিল অনাদি। বলে কি, এও কি সম্ভব! অন্তত আজকের দিনে যেখানে এত টাকার ট্রানজাকশন হচ্ছে সেখানে ব্যাঙ্কের নামগন্ধও নেই। এমন নয় যে আশেপাশে কোন ব্যাঙ্ক নেই। অনাদিদের ব্যাঙ্কেরই ব্রাঞ্চ আছে চিংড়িহাটায় কালিয়াপুরে। বড় বকুলপুর থেকে চিংড়িহাটা বড়জোর মাইল তিনেক। কালিয়াপুর আধাআধি একটু দূর হয়ে যায়। তাও বিশ বাইশ মিনিটের পথ। তবু এই ডামাডোলের বাজারে মানুষ কোন সাহসে এতগুলো টাকা নিয়ে কেনাকাটা করতে আসছে? একটু খোঁজ নেওয়া দরকার।

সেই খোঁজ নিতেই গিয়েছিল বকুলপুরে। বেলাবেলি রওনা দিয়ে যখন পৌঁছল তখন প্রায় তিনটা বাজে। ব্যাঙ্কের ম্যানেজার দু-একজন রইস মহাজনের নাম বলে দিয়েছিলেন। তাদেরই একজন ঐ গোবিন্দ বসাক। নামডাকের লোক। দু-পুরুষ এ বংশে কাটালেও, উচ্চারণে পুরোনো টানটা এখনো লেগে আছে। কলকাতায় বাড়ী। কারবার সব এই জেলাতেই ছড়ানো। এক-এক হাটে এক-এক ভাই বসেন। বড় বকুলপুরে লেনদেনের পরিমাণটা বেশী

বলেই. স্বয়ং গোবিন্দ বসাক নিজেই বসেন।

ইচ্ছে করলে অনাদি পরিচয় দিয়ে খাতির বত: আদায় করতে পারত। কিন্তু তাহলে ব্যবসার রহস্যটা গোপনই থেকে যেত। কেউ আর মুখ খুলত না। চুপচাপ ঘুরে ঘুরে সব দেখছিল অনাদি। দূর-দূর গাঁ থেকে, আশ-পাশের শহর গঞ্জ থেকে লরী, টেম্পো, গরুর গাড়ী, মানুষের মাথায় চাপিয়ে মাল নিয়ে এসেছে তাঁতীরা। পরিমাণ দেখলে চোখ টাঁড়া হয়ে যায়। সে যে কত গাঁটরী শাড়ি আর ধুতী গুণে শেষ করা মুস্কিল। সবই তাঁতের। বহুদিনের পুরোনো হাট এই বকুলপুরে। বলতে গেলে এই হাটের জনাই এই আধা-শহর আধা-গ্রামটা কোনক্রমে টিঁকে আছে। লোকাল লোক গোটা সপ্তাহটা হাঁ করে বসে থাকে বেস্পতিবারের আশায়। হাটে ব্যাপারীরা আসে। তাদের যা ব্যয় সেটাই এদের আয়। মুদি, কলু' মনোহারী দোকানদার, মিস্টির কারবারী সবাই যে যার ব্যবসাপাতির ঝোলা ঝেড়ে দুটো পয়সা রোজগারের ফিকির করে। আর সবারই লক্ষ্য ঐ তাঁতীরা। তবে আয়-ব্যয়ের মোটা ভাগটাই যায় বসাকদের পকেটে, সেটা সেদিন ভাল করেই বুঝতে পেরেছে অনাদি।

শাল কাঠের খুঁটির ওপর টিনের চাল বসানো, মেঝেটা সিমেন্ট করা। একধারে উঁচু বেদীর ওপরে বসে গোবিন্দ বসাক আর তার তিনজন কর্মচারী। উল্টোদিকে মেঝের ওপর টাল দিয়ে সাজানো ধুতি আর শাড়ীর বস্তা। ফাঁকে ফাঁকে উঁচু হয়ে বসে আছে তাঁতীরা। শাড়ীস্তূপের আড়াল থেকে সব দেখছিল অনাদি।

গোবিন্দ বসাকের কাজ খুব নীট। খেরো খাতায় তাঁতীদের নাম লেখা আছে। একজন কর্মচারী নাম ডাকছে। ডাক শুনে নিজের গাঁটরী নিয়ে এগিয়ে আসছে তাঁতী। গাঁট খুলে সঙ্গে সঙ্গে দেখিয়ে দিচ্ছে ধুতি বা শাড়ী। অনেক দিনের কারবার। বসাক মশাই বা কর্মচারীরা জানেন কে কি বোনে। দু-তিন মিনিটেই দরদাম সারা। কলকাতায় যে শাড়ি পঁচিশ তিরিশ টাকায় বিক্রী হয়, পাইকারী রেটে তাই এখানে বসাক মশাই কিনছেন এগারো বড় জোর সাড়ে এগারোয়। খুব স্মুথলি সব চলছিল। কিন্তু অভিমন্যুই বাগড়া দিল। জেনের কম দাম দিলে খরচাই পোষাবে না তো সংসার চালাবে কি করে? লোকটা একটু ঠোঁটকাটা টাইপের। রোখা-সোখা মানুষ। মানী লোক গোবিন্দ বসাকের মুখের ওপরই চ্যাটাং-চ্যাটাং করে বলে উঠল—বাড়ীতে হাঁড়ি চড়িয়ে এসেছি বলে কি নিজের তৈরী

সুতোর নামটাও জানি না কর্তামশাই। সুতোর দাম এখন কত জানেন? কলকাতার বড় কোম্পানীতে তো এখন স্ট্রাইক চলছে। দুনো দামেও সুতো মেলে না। তেরো টাকার কম পাঁস কিনলে পোষাবে কি করে বলুন তো?

রোগা হিলহিলে লোকটার পরনের ধুতিটে শুধু নেংটা নয় যথেষ্ট খাটো। হাড় পাঁজরা খালি চোখেই গোনা যায়। কুলচার মত চোখদুটো লাল। বোধহয় গাঁজা-টাজা খায় মনে হল অনাদির। তবে মাথাটা খুব সাফ। কথাটায় ধার আছে। খোঁজ-খবরও রাখে।

গোবিন্দ বসাক হুঁশিয়ার লোক। মনসার মাথায় পা রেখে চলেন। তাই ধুনোর গন্ধ পেয়েই গোড়াতেই ফয়সালা করে দিলেন। এখনো অনেক তাঁতী বসে আছে। অভিমন্যুর উস্কানিতে যদি বাদ বাকী সবাই ব্যাগড়বাই শুরু করে, তাই আর ঘোঁট পাকাতে দিলেন না। কর্মচারীদের টাকল করতে না দিয়ে, নিজেই গদী থেকে নেমে এলেন। থলথলে মোটা মানুষ। উঠতে বসতে কষ্ট হয়। তবু অভিমন্যুর খাতিরে সে কষ্টটুকু মেনে নিলেন। আড়তের এক-ধারে টেনে নিয়ে কি ফুসমন্তর দিলেন কানে, অভিমন্যু গলে জল হয়ে গেল।

খানিক বাদে যখন অভিমন্যু আড়তের বাইরে এল, তখনই অনাদি চোখের ইসারায় ওকে ডেকে নিল। টেরিলিনের প্যান্ট সার্ট পরা, সিগারেট-ফোঁকা মানুষটাকে কিছুতেই যেন বিশ্বাস করতে চায় না অভিমন্যু প্রথমে। অনেক বলাকওয়ার পর, ব্যাঙ্কের লোক শুনে শেষ পর্যন্ত সহজ হয়েছে অভিমন্যু। আর তখনই ওর নামটা জানতে পেরেছে অনাদি। সেই সঙ্গে জেনেছে গোবিন্দ বসাকের কারবারের আসল রহস্য।

চব্বিশটা শাড়ি সাড়ে বারোর দরে বেচে তিনশো টাকার বদলে অভিমন্যু, কালী-ওলার নামকরা বংশের তাঁতী অভিমন্যু দাস পেয়েছে একটা চিরকুট মাত্র। চিরকুটে লেখা আছে ছ' সপ্তাহ পরে এর বদলে নগদ টাকা দিতে বাধ্য থাকবেন গোবিন্দ বসাক। অর্থাৎ মাল আগাম, দাম পরে।

এই তল্লাটের সব হাটেরই এই এক ব্যবস্থা। তাঁতীরা কাপড় এনে জমা দেবে মহাজনের ঘরে, বদলে পাবে হুণ্ডি। এখন

এই হাণ্ডি ভাঙিয়ে খাও, মাল কেন, যা ইচ্ছে তোমার।

অভিমন্যুর মুখে সেদিন যা শুনেছে, চিৎড়িহাটা ব্রাঞ্চের ম্যানেজার বললেন ওর সবই সত্যি। ঐ হুণ্ডি ভাঙিয়েই খায় অভিমন্যুরা। ঐ হুণ্ডির দাম অসামান্য। ব্যাঙ্কের চেকের সমান দাম ঐ হুণ্ডির। ইচ্ছা করলে অভিমন্যু ঐ হুণ্ডি বিক্রী করে সুতোর মহাজনের কাছ থেকে সুতো কিনতে পারে। তবে মহাজন প্রতি টাকায় দু-পয়সা করে কমিশন কেটে রাখবেন। আফটার অল হুণ্ডি তো আর নগদ টাকা নয়। তবে গোবিন্দ বসাকের বাজারে দারুণ সুনাম বলেই কমিশনের রেট মাত্র টু পারসেন্ট। সাধুখাঁদের হুণ্ডি সুতোর কারবারীরা ফাইভ পার্সেন্ট কমিশনে কেনে। তাই সব তাঁতীই যোটে বসাকদের গদীতে।

কিন্তু বাবু, সারা হপ্তা ধরে যে মাল বানাই তা তো আর সুতো কেনার জন্যে নয়। সবই যদি সুতো কিনি তা'লি খাব কি?—হাটের মাঝে চায়ের দোকানের চালির তলায় বসে কথা হচ্ছিল অভিমন্যুর সাথে। অনাদি বলল, কেন ঐ হুণ্ডির যখন এত দাম তখন ঐটা ভাঙিয়ে চাল, ডাল, তেল, নুন কেনো।

তাই তো করি বাবু—গরম চায়ের ভাঁড় থেকে মুখটা সরিয়ে এনে ম্লান হাসি হেসে বলল, অভিমন্যু—সে বেলায় যে মহাজন শতকরা দশ কখনো কখনো পনেরো টাকা কেটে রেখে দেয়।

তার মানে?—চমকে ওঠে অনাদি।

তার মানি, ঐ যে দূরে বটগাছটা দেখতে পাচ্ছেন, ওরই তলার চলা-ঘর-গুলোয় বসে আছেন সব টাকার মহাজন। এক-একটা কুমীর। ওরা জানেন আমাদের অবস্থার কথা। আমরা ছ' হপ্তা কেন দু ঘণ্টারও অপেক্ষা করতে পারি না বাবু। এই আপনার সঙ্গে কথা শেষ করেই যাব ঐ মহাজনের কাছে। ওরা নগদ টকা দিয়ে এই হুণ্ডি কেনবে। তিনশো টাকার হুণ্ডি আমায় বেচতে হবে দু'শ সত্তর ট্যাকায়। তাও যে দুশো সত্তর পাব তা হুণ্ডিটা বসাকবাবুর বলেই। অন্য কোন কাপড়ের মহাজনের এত সুনাম নেই। তাদের হুণ্ডি বেচতে গেলে একশ টাকই পাই পঁচাশী কখনো আশী। আমাদের বাবু নগদ টাকা ছাড়া চলে না, তাই বসাকবাবু কম দাম দিলেও ওর কাছেই কাপড় বেচি। অন্য মহাজনের কাছে বেচলি এক টাকা দেড় টাকা কাপড় পিছু বেশী পেতাম। কিন্তু ওদিকে যে টাকার মহাজনের কমিশনেই সব খেয়ে নেবে। তবে বসাকবাবুরা লোক বড় ভাল। গোবিন্দবাবু, বড় ভাই করেন কাপড়ের মহাজনী। মেজ ভাই ধর্মোবাবু করেন টাকার। বড় ভাইয়ের কাছে কাপড় বেচে যে হুণ্ডি পাই তাই আবার ভাঙাতে নিই মেজ ভাইয়ের দোকানে। ধর্মোবাবু একশ ট্যাকায় দশ ট্যাকা কেটে রখেন।

গোবিন্দ বসাক আর ধর্ম বসাক। একই হাটের দু-প্রান্তে বসেন দুজনে। একজন কাপড় কেনেন আর একজন কেনেন হুণ্ডি। যৌথ কারবারে ঘরের টাকা ঘরেই থেকে যায়। মাঝখান থেকে মোটা একটা প্রফিট আদায় করে নেন। ছ সপ্তাহে যদি দশ পার্সেন্ট সুদ গুনতে হয় চাষীকে তাহলে বাহান্ন সপ্তাহে অর্থাৎ এক বছরে প্রায় নব্বই পার্সেন্টের বেশী সুদ দিতে হবে তাকে। অথচ মজার ব্যাপার মালটা আগাম দিয়েও গাঁট গচ্চা দিতে হচ্ছে তাকে। যেহেতু অভিমন্যুরা অপেক্ষা করতে পারে না।

এই বসাকদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কি ব্যাঙ্ক পারবে? পারবে সারা দেশ জুড়ে হাজার হাজার গঞ্জে হাটে ছড়ানো এদের ব্যবসার মনোপলি ভাঙাতে? তাহলে ব্যাঙ্ককে যা যা করতে হবে—না, না রিপোর্টে সে সব সাজেস্ট করতেও ভয়। অনাদি জানে সে সব সাজেশন একটাও ওপর-ওয়ালারা মানবেন না। হেসে উড়িয়ে দেবেন। তারা চান তাদেরই মনোমত, তাদেরই পুরোনো থিওরি মত সাজেশন—তার বাইরে কিছু বলতে গেলে অনাদির মাথায় গণ্ডগোল হয়েছে বলে সবাই ঠাট্টা করবে। তার চেয়ে অনেক সহজ অভিমন্যুর জন্য একটা লোনের ব্যবস্থা করে দেওয়া। যদিও অনাদি জানে, তার পরেও অভিমন্যু আবার ছুটবে গোবিন্দ বসাকের আড়তে।

সিগারেটের ছাই ঝাড়তে গিয়ে দেখল অ্যাসট্রের পাশেই চায়ের কাপটায় আরো গোটাকতক শ্যামা পোকা উড়ে এসে পড়েছে। কাপটা এবার গব গব করে ওদের গিলে ফেলবে। পেনটা বন্ধ করে, লাইট নিভিয়ে দিয়ে অন্ধকার ঘরে পাতা বিছানায় নিজেকে টান টান করে মেলে দিল অনাদি। এখন আর রিপোর্ট নিয়ে ভাবতে ইচ্ছে করছে না।

—সন্ধিৎসু

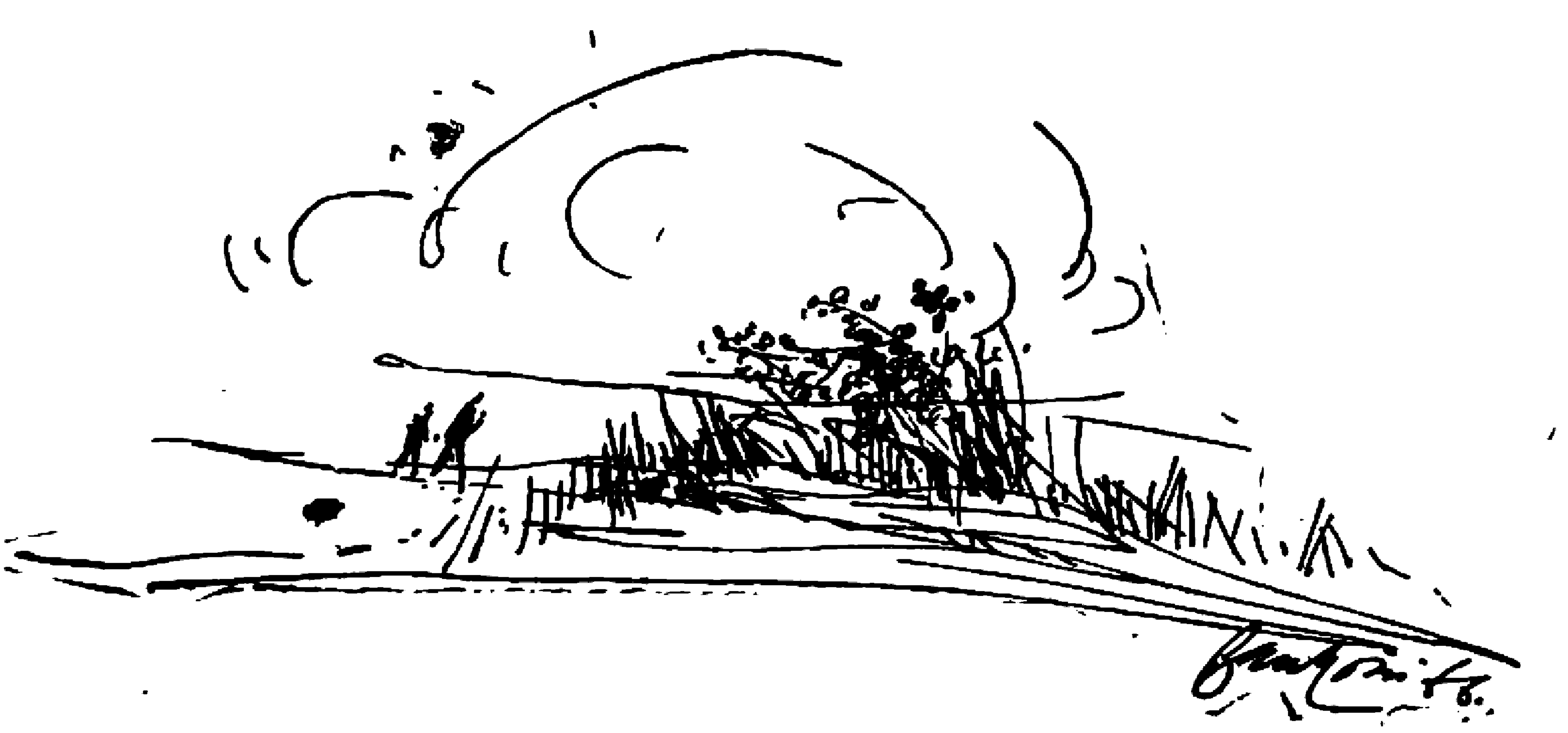

শিশুরা সব জমাতে শেখো
ডোনাল্ড ডাককে পয়সা দিয়ে
ফলটা কি হয় তোমরা দেখো !

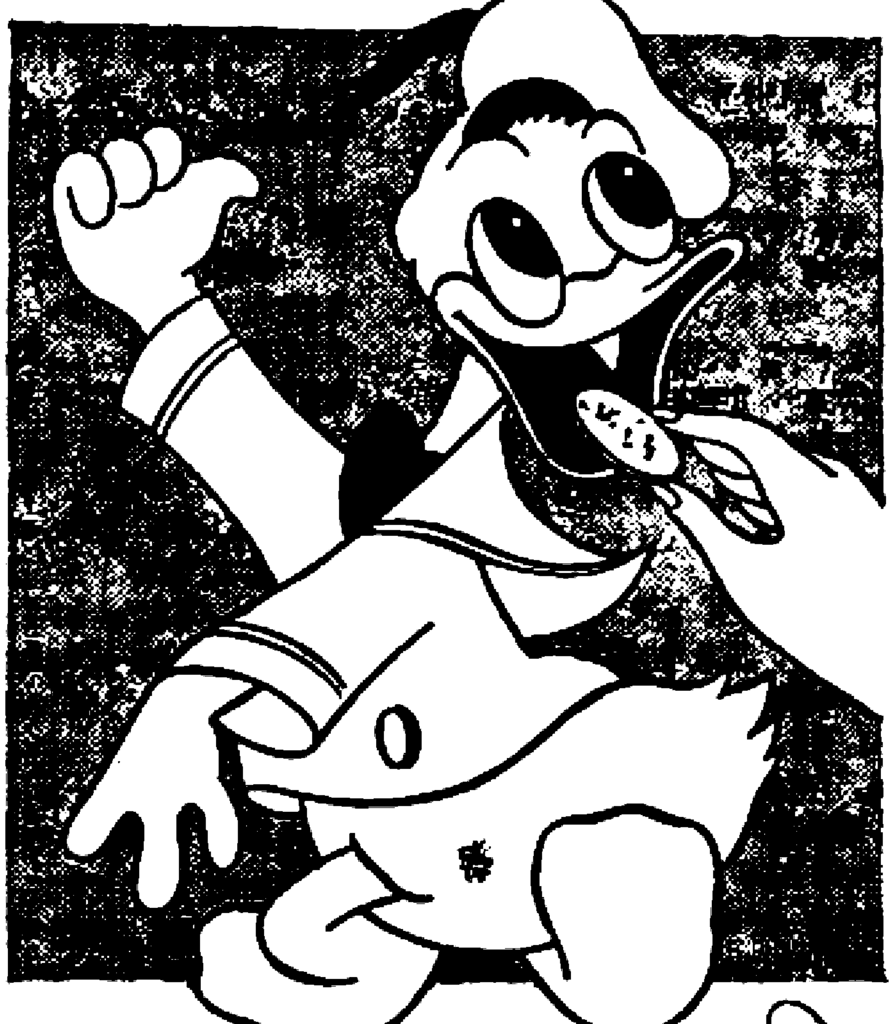

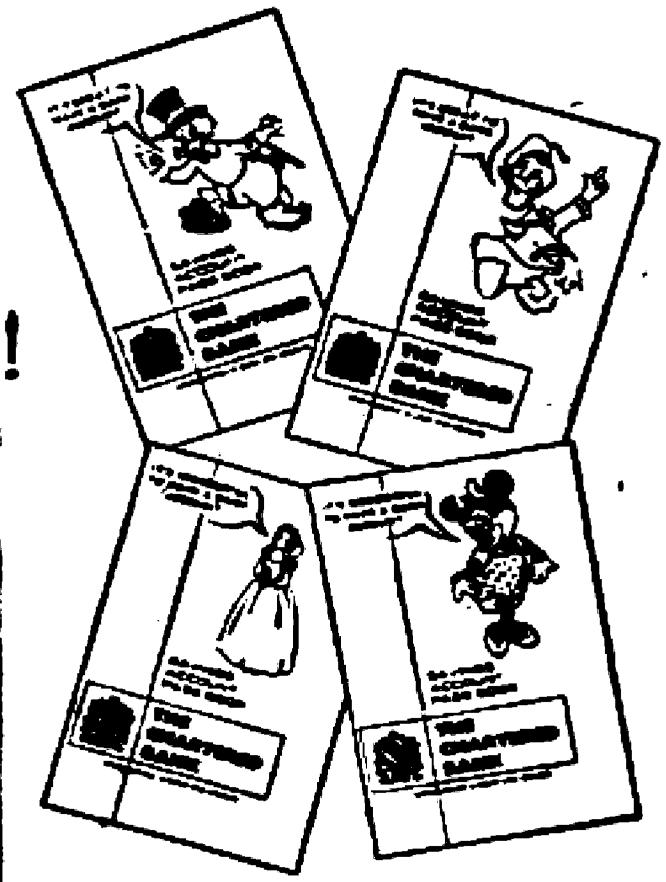

এসব ডিজনি সেভিংস বুকের মধ্যে কোনটি পছন্দ ?

© WALT DISNEY PRODUCTIONS

একটি ডিজনি সেভিংস অ্যাকাউন্ট খুললে নানারকম লোভনীয় ডোনাল্ড ডাক সেভিংস বক্সের মধ্যে যে-কোন একটি বাক্স আর তার সঙ্গে একটি লোভনীয় সচিত্র ডিজনি সেভিংস পাশবুক পাওয়া যায়।

ডিজনি সেভিংস অ্যাকাউন্টের টাকা বার্ষিক ৩½% হার সুদে বাড়তে থাকে।
আরও কিছু জানতে হ'লে এইসব অফিসের যে-কোন একটিতে এলেই হবে।

দি চার্টার্ড ব্যাঙ্ক

অমৃতসর, ● বোম্বাই, ● কলিকাতা, ● কালিকট, ● কোচিন, ● দিল্লী, ● কানপুর, ● মাদ্রাজ, ● নিউ দিল্লী, ● অমৃতসর বা শাখা

দি ইস্টার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

বোম্বাই, ● কলিকাতা, ● মাদ্রাজ,

দি চার্টার্ড ব্যাঙ্ক গোষ্ঠী

CENTRAL LIBRARY

মনের কথা

মায়ামোহের অনুবৃত্তি
রঙ্গলালের প্যারানইয়া

মায়ামোহ (হ্যালুসিনেশন, ডিলিউশন) ইত্যাদি নানারকমের উপসর্গের ব্যাখ্যা খুঁজতে আজকাল বিজ্ঞানীরা সিবারনেটিক্সের সাহায্য নিচ্ছেন। মানসিক রোগের অনুরূপ অবস্থা কুকুর-বানরের মধ্যেও তেমন সাহায্যে তৈরী করা হচ্ছে। ভ্রান্তিমূলক উন্মাদরোগীর বিবরণ পেশ করার আগে, এই সব সম্পর্কে সামান্য কিছু সংবাদ পরিবেশন করছি।

ইন্দ্রিয়পরিবাহিত সংবাদ থেকে মস্তিষ্ককে বঞ্চিত রাখলে মানসিক বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে পারে, এ খবর আগেই জানিয়েছি। কানাডার মনোবিজ্ঞানী ডঃ হেবের একটি পরীক্ষার কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। কয়েকজন সুস্থ যুবককে ছোট একটা অন্ধকার শব্দরোধী শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ঘরের মধ্যে ছত্রিশ ঘন্টা থেকে দশদিন পর্যন্ত স্পর্শানুভূতি বঞ্চিত করে রাখার বন্দোবস্ত করা হল। হাতে দস্তানা পরিয়ে ও কার্ডবোর্ডের টিউব লাগিয়ে স্পর্শন অনুভূতি রহিত করা হয়েছিল। ছত্রিশ ঘন্টার পর থেকে নানারকমের বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে লাগল। এই নিঃসঙ্গ অবস্থা, এই ইন্দ্রিয়ের নিষ্ক্রিয়তা কোনো মস্তিষ্কই সহ্য করতে পারল না। হ্যালুসিনেশন ও ডিলিউশনের উপসর্গ সবার মধ্যে প্রকাশ পেল। মহাকাশ শারীরবৃত্তের অতি-আধুনিক গবেষণার ফলাফল থেকেও প্রমাণিত হয়েছে যে মস্তিষ্ককে ইন্দ্রিয়ানুভূতি থেকে বঞ্চিত রাখলে মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হয়। মস্তিষ্কের ১৪০০০ মিলিয়ন নার্ভকোষের সমন্বয়পূর্ণ ক্রিয়াকলাপের জন্যে ইন্দ্রিয়গুলি সচল ও সক্রিয় থাকা অত্যাবশ্যক। এই অবস্থায় স্বাভাবিক ক্ষুধাতৃষ্ণা থাকে, ঘুম হয়, দুরূহ গাণিতিক প্রশ্নের উত্তরও সঠিকভাবে দেওয়া যায়। মস্তিষ্কের কোনো রোগ হয়েছে বলা চলে না, আবার মানসিক ক্রিয়াকলাপ স্বাভাবিকভাবে চলছে, একথাও ঠিক নয়।

ল্যাবরেটরীতে কুকুর ও বানরকে ভেষজ দ্রব্য ইনজেকশন দেবার পর তাদের নানাধরনের বিচিত্র ব্যবহার লক্ষ্য করা গেছে। কোনোটা হয়তো মাতালের মত টলছে, কোনোটা ঘাড় গুঁজে বিচিত্রভংগীতে শুয়ে আছে, কোনোটা বা পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে। একটা বানর শোয়া অবস্থা থেকে ধড়মড়িয়ে উঠে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে কান খাড়া করে কোনো-কিছু শোনবার চেষ্টা করছে. অন্য একটা ভয়ে জড়সড় হয়ে খাঁচার কোণে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। তাদের দেখে বোঝা যায় যে, তাদের মধ্যে মানসিক রোগের উপসর্গ দেখা দিয়েছে। অবশ্য পশুর উপর শারীরিক রোগের অনুরূপ অবস্থা তৈরী করা যতটা সোজা মানসিক রোগের অনুরূপ অবস্থা সৃষ্টি করা তত সহজ নয়। মানবমন গুণগতভাবে পশুমন থেকে আলাদা, কাজেই রোগবৈশিষ্ট্যও স্বতন্ত্র। এই সব পরীক্ষা থেকে এটুকুই শুধু বোঝা যায় যে কতকগুলি রাসায়নিক দ্রব্যের ক্রিয়ায় স্নায়ুতন্ত্রের উত্তেজনা বৃদ্ধির ফলে উন্মাদরোগের কিছু কিছু উপসর্গের সৃষ্টি হতে পারে।

এক একসময় দেখা যায় যে ইলেক্ট্রনিক কম্পিউটার তার নির্দিষ্ট কর্মসূচী পালন করার পরিবর্তে একই বৃত্তে ঘুরে চলেছে। বার বার করে একটা অপারেশনই করে চলেছে, পরবর্তী অপারেশন করতে পারছে না। যন্ত্রটার যেন মাথা খারাপ হয়েছে। অনেকে মনে করেন, এই অবস্থার সংগে মানবমনের অবসেশন, ডিলিউশনের তুলনা চলতে পারে। কোনো কোনো মাদকদ্রব্য স্নায়ুপ্রবাহের অগ্রগতি রোধ করে তাকে এইরকম একই বৃত্তে বাহিত করতে পারে।

সাধারণত, একব্যাপারে বেশিক্ষণ মনঃসংযোগ করার ক্ষমতা মানুষের থাকে না। এই রকম পুনর্বৃত্তি ঘটলে, একই ব্যাপারে বা একই চিন্তায় ডুবে যেতে বাধ্য হলে মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ে। অন্য সব চিন্তাভাবনার পরিবর্তে একটি বদ্ধ ধারণা বা চিন্তা অনবরত মনের মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকে, ফলে নির্যাতনমূলক অথবা আত্মশ্লাঘী ভ্রান্ত ধারণায় (ডিলিউশন অফ পার্সিকিউশন অর ডিলিউশন অফ গ্র্যাঞ্জার) বশবর্তী হয়ে পরিবেশকে সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করতে পারে না। সিবারনেটিক্স বিশারদদের মতে মস্তিষ্কের সংবাদ পরিবহন ও সংবাদ সঞ্চয় প্রক্রিয়ার ত্রুটী থেকে মানসিক রোগের, বিশেষ করে হ্যালুসিনেশন ডিলিউশনের উৎপত্তি। অপ্রয়োজনীয় পুনর্বৃত্তির কাজে ব্যাপৃত থাকে অনেকগুলো নার্ভকোষ; কর্মক্ষম কোষের সংখ্যা বহুলাংশে হ্রাস পায়; কাজেই তাদের দিয়ে মস্তিষ্কের সব রকম জটিল কাজকর্ম চালানো অসম্ভব হয়ে পড়ে। যেসব খবর মূল্যহীন, যাদের বাতিল করা দরকার, তারাই স্মৃতিপটে দৃঢ়ভাবে মুদ্রিত হয়ে যায়। পরবর্তীকালে এই সব স্মৃতি থেকে ভ্রান্ত ধারণার উদ্রেক ঘটে। অস্তিত্ব নেই এমনি সব জিনিসের প্রতিবিম্ব মস্তিষ্কে অভিক্ষিপ্ত হয়, অমূলপ্রত্যক্ষ বা হ্যালুসিনেশনের উদ্ভব হয়।

এবার পাভলভের শর্তাধীন পরাবর্তের সাহায্যে ব্যাপারটা বোঝা যেতে পারে। খাদ্যের সংগে অনেকবার শর্তাধীন উদ্দীপক (ঘন্টাধ্বনি বা আলোকপাত বা যে কোনো ইন্দ্রিয় উত্তেজনা) সংযুক্ত হলে, তবেই উদ্দীপকটি খাদ্যের সঠিক সংকেত বলে বিবেচিত হয়। এইভাবে অবান্তর বা ভুল উদ্দীপনার উত্তেজনা থেকে মস্তিষ্ক নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করে। কেবলমাত্র সঠিক সংকেতে মস্তিষ্ক সাড়া দিয়ে থাকে; রিফ্লেক্সমাত্রেই বহির্বাস্তবের নির্ভুল প্রতিফলন। সুস্থ মস্তিষ্কের ধর্ম শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় উদ্দীপনাকে, সঠিক সংকেতকে গ্রাহ্য করা, আমল দেওয়া। কোনো কারণে মস্তিষ্কের এই ক্ষমতা, কেবলমাত্র সঠিক সংকেতে সাড়া দেবার ক্ষমতা যদি নষ্ট হয়ে যায়, (যেমন ভয় পেলে বা মাদকদ্রব্য সেবনে হয়ে থাকে) অবান্তর উদ্দীপকগুলোও রিফ্লেক্স তৈরী করতে পারে। এইভাবে অপ্রয়োজনীয় সংবাদের ভিড়ে মস্তিষ্ক ভর্তি হয়ে যায়, সঠিক সংবাদ গ্রহণ, বহন বা স্মরণ করার ক্ষমতা কমে যায়। পরিবেশের ভ্রান্ত প্রতিফলন ঘটতে থাকে মস্তিষ্কে। অসমর্থিত সংকেত ভুল রিফ্লেক্সের জন্ম দেয়। উদ্দীপকগুলো সঠিক রিফ্লেক্স তৈরী করতে পারে না, তার ফলে উদ্দীপকজাত স্নায়ুস্পন্দনগুলি পরস্পরের পিছনে বৃত্তাকারে ঘুরতে থাকে। এছাড়া সঞ্চিত সংবাদের বিশৃঙ্খলা থেকেও ডিলিউশন হ্যালুসিনেশনের সঞ্চার হতে পারে। বিশেষ অবস্থায় প্রাণী খাদ্যের সংকেতকে তৃষ্ণার সংকেত বলে ভুল করতে পারে। এ-নিয়ে একটা পরীক্ষার কথা এখানে উল্লেখ করা চলে।

ঘন্টার শব্দ শুনিয়ে ও আলো দেখিয়ে একটা কুকুরকে অনেক জটিল প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে পায়ের চাপে একটা যন্ত্র চালিয়ে খাবার উপায় শেখানো হল। ক্ষুধার্ত না হলে ঘন্টা ও আলোর উদ্দীপনায় সে সাড়া দেবে না। এখন তার গলায় খানিকটা খুব নোনতা মাংসের ঝোল ঢেলে দেওয়া হল। ক্ষুধার বদলে তৃষ্ণায় অস্থির হল

কুকুর। এই সময় ঘন্টা বাজালে ও আলো দেখালে, কুকুর এই সংকেতকে তৃষ্ণা মেটাবার সংকেত মনে করে সাড়া দিল। তৃষ্ণার্ত মস্তিষ্ক বিশ্লেষণের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে, তৃষ্ণা মেটাবার পুরনো রিফ্লেকস খাদ্য-সংকেতে চালু হয়েছে, অন্য একটি ল্যাবরেটরীতে তৈরী ভ্রান্তির অনুরূপ অবস্থা।

যন্ত্র ও পশু নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার খবরের পর আবার মানুষের কথায় ফিরে আসা যাক। পরস্পর-সম্পৃক্ত প্রণালীবদ্ধ ভ্রান্তি (সিসটেমেটাইজড ডিলিউশন) 'প্যারানইয়া' রোগের প্রধান উপসর্গ। ম্যানিয়া ও স্কিৎজোফ্রেনিয়া রোগেও ভ্রান্তি দেখা দিয়ে থাকে। আমরা বর্তমানে প্যারানইয়া নিয়েই আলোচনা করব।

প্রণালীবদ্ধ ভ্রান্তি কিভাবে উদ্ভূত হয়? মৌলিক ভ্রান্তির সংগে অন্যান্য ধ্যান-ধারণাকে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা থেকে ভ্রান্তি পরস্পরসম্পৃক্ত ও প্রণালীবদ্ধ হয়ে থাকে। রোগী তার প্রধানতম মৌলিক ভ্রান্তবিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ঘটনার স্বকপোলকল্পিত ব্যাখ্যার সাহায্যে এর যাথার্থ ও যৌক্তিকতা প্রমাণ করার চেষ্টা করে। তার নিজের ভুল-বিশ্বাসকে যুক্তিযুক্ত করার প্রচেষ্টা প্যারানইয়া রোগীর বিশেষত্ব। নিজের ডিলিউশনের বাইরে রোগীকে পুরোপুরি সুস্থ ও স্বাভাবিক মনে হয়। ডিলিউশনের সংগে সম্পর্কিত ঘটনা বা ব্যাপারের বেলায় কিন্তু রোগী তার ডিলিউশন বা ভ্রান্তিকেই প্রাধান্য দেবে এবং এই সব সংশ্লিষ্ট ঘটনার ব্যাখ্যা করবে মৌলিক ভ্রান্তির পরিপ্রেক্ষিতে। এই ভ্রান্তির সংগে তার আবেগ অনুভূতি গভীরভাবে জড়িত থাকার ফলে সংশ্লিষ্ট ঘটনার সুবিধামত ব্যাখ্যা উদ্ভাবন তার পক্ষে সহজ হয়ে থাকে।

'প্যারানইয়াকে একটা আলাদা রোগ বলে প্রথম মনে করেন ক্রেপলিন। তাঁর মতে অন্তর্জাত কারণের ফলে এই রোগের আবির্ভাব ঘটে। চিরস্থায়ী অনড় ভ্রান্ত বিশ্বাস সত্ত্বেও রোগী অন্য সর্বদিকে সুস্থ স্বাভাবিক থাকে। অন্য সব ইচ্ছা চিন্তা কাজের বেলায় সে যুক্তিহীন নয়। ক্রেপলিনের মতে এই রোগ সারে না।

আর একদল বিশেষজ্ঞের মতে (ব্লুলার, ম্যাকডুগাল) প্যারানইয়াকে রোগ বলা উচিত নয়। তাঁরা বলেন যে, নিজের সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা সকলেরই থাকে, স্বাভাবিক এই অবস্থার চরম অভিব্যক্তি দেখতে পাওয়া যায় ডাক্তারদের কাছে আসা রোগীদের মধ্যে। নির্যাতনমূলক ও আত্মম্ভরিতার ডিলিউশন অল্পবিস্তর সবারই আছে, চরম অবস্থাতেও রোগী নিজের কাজকর্ম ভালভাবেই করে যেতে পারে। ব্লুলারের অভিমত এই যে, বিশেষ অবস্থায় সকল মানুষই আত্মপ্রাসঙ্গিক চিন্তাকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে, উৎকণ্ঠা-জড়িত মানুষ মাত্রেই অন্তত সাময়িকভাবে যুক্তিহীন হয়ে পড়ে। এই অবস্থা যদি বার বার ঘটতে থাকে অথবা এই ভ্রান্তি দূর বা কমা না হয় তবেই ক্রেপলিন বর্ণিত 'প্যারানইয়া' রোগ দেখা দিয়ে থাকে। অন্তর্জাত কারণের থেকে বহির্জাত মানসিক কারণ প্রণালীবদ্ধ অনড় ভ্রান্ত বিশ্বাস উৎপাদনে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। আসলে প্যারানইয়া ঘটনাবিশেষের প্রতিক্রিয়া। কোনো মানসিক আঘাত না পেলে, আয়ত্তাধীন নয় এমন অবস্থার মধ্যে না পড়লে, প্রণালীবদ্ধ ডিলিউশন দেখা দিতে পারে না। একটা কিছু বড়দরের কাজ করে নাম করবার ইচ্ছা অনেকেই মনে মনে পোষণ করে। বুদ্ধি বা চরিত্রগত দৈন্যের জন্য সাফল্য লাভ না করতে পারলে একদল লোক ভাগ্যকে দায়ী করে মনের শান্তি লাভ করে। যদি ভাগ্যকে দায়ী করা না যায়, অথবা নিজের দৈন্যকে স্বীকার করতে না পারা যায়, তবে স্বাভাবিকভাবেই আমরা পরিবেশের উপর দোষারোপ করব। অন্যের দোষে, অন্যের বাধা বা শত্রুতা-মূলক আচরণের জন্যে আমি অভীষ্ট লাভে অক্ষম হয়েছি,—তখন এই রকম চিন্তাধারাকে আমরা প্রশ্রয় দেব। এইভাবে নির্যাতনমূলক ভ্রান্তি জন্মলাভ করে। আবার আমি যদি হালকা খামখেয়ালী স্বভাবের লোক হই, তবে কল্পনায় অভীষ্ট লাভ করে বাস্তব থেকে সরে গিয়ে আত্মম্ভরিতা ও জাঁকজমকের ভ্রান্তিকে আঁকড়ে ধরব।

ম্যাকডুগাল সুস্থ মানুষের ডিলিউশন ও রুগ্ন ডিলিউশনের মধ্যে কোনো প্রকার গুণগত পার্থক্য দেখতে পান নি। যখন ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করে ভুল ধরতে পারা যায় না, বন্ধু-বান্ধব শুভানুধ্যায়ীর পরামর্শে ভ্রান্তি দূর হয় না, যখন প্রণালীবদ্ধ ভ্রান্তি অনড় অচল হয়ে যায়, তখনই ম্যাকডুগালের মতে ডিলিউশনকে 'ফিক্সড' বলা চলে। 'আমার বরাতটাই খারাপ', 'ভাগ্য চিরকালই আমাকে বিড়ম্বিত করেছে', 'সৎ ব্যক্তি কখনও সাফল্যলাভ করে না': ইত্যাদি অতি সাধারণ উক্তি আমরা অনেকের মুখেই শুনে থাকি। প্যারানইয়ার রোগীর মুখে এই সব উক্তিরই চরম অভিব্যক্তি শোনা যায়। 'সবাই আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে', 'কেউ আমাকে চায় না, সকলেই আমার অমঙ্গল চায়'—প্যারানইয়া রোগীর এ-সব কথা প্রলাপের পর্যায়ে পড়ে।

যান্ত্রিক-বস্তুবাদী মনোবিজ্ঞানীরা মাত্রাগত পরিবর্তন গুণগত পরিবর্তনে রূপান্তরিত হবার প্রক্রিয়ায় বিশ্বাসী। কাজেই তাঁরা প্যারানইয়ায় মস্তিষ্কের অন্যান্য অংশ সুস্থ থাকা সত্ত্বেও প্যারানইয়াকে একটা প্রতিক্রিয়ামূলক অসুস্থতা মনে করেন। মূল কারণ দূর করা সম্ভব হলে পরিবেশকে সহনীয় করে তুলতে পারলে, প্যারানইয়া রোগ সারে। অবশ্য অনেক সময় সে সুযোগ থাকে না, অথবা দীর্ঘস্থায়ী ভ্রান্ত বিশ্বাস পরিত্যাগ করা কোনো কোনো ক্ষেত্রে রোগীর পক্ষে অবাঞ্ছনীয় হতে পারে।

ম্যাকডুগালের মতে প্যারানইয়ার রোগীর গোপনমনে পাপবোধ বা হীনমন্যতাবোধ লুকিয়ে থাকার দরুণ সে তার ভ্রান্তবিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে। অবদমনের ফলে আত্মসমালোচনা করতে অপারগ হয়; কাজেই ভ্রান্তি ক্রমশ সুসংগঠিত ও প্রণালী-বদ্ধ হতে থাকে। আমার সামান্য অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যে, সবসময় এরকমটি ঘটে না। স্ত্রীর ব্যভিচারে দৃঢ়বিশ্বাসী কয়েকজন রোগীর কথা আমি জানি যাদের অবদমিত কোনো কমপ্লেক্সের সন্ধান পাওয়া যায় নি। সাইকোথেরাপিতে তারা সুস্থ হয়েছে। পাভলভীয় পদ্ধতিতে তাদের চিকিৎসা করা হয়েছে। কর্টিকাল কোষ উত্তেজনাস্তরে অনড় হয়ে রয়েছে, এবং সম্মোহনপর্বের 'আলট্রা-প্যারাডক্স' পর্যায়ে রয়েছে স্নায়ুতন্ত্র;—এই দুটি পাভলভীয় প্রত্যয়কে ভিত্তি করে চিকিৎসা চলেছিল।

নির্যাতনমূলক ভ্রান্তি ও আত্মম্ভরিতা-কেন্দ্রিক ভ্রান্তি পরস্পরের পরিপূরক। একই রোগীর মধ্যে এই দুই ধরনের ডিলিউশন দেখা দিতে পারে। সবাই রোগীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে, এই ধারণার মূলেও রয়েছে আত্মম্ভরিতার ইংগিত। রোগী একজন বিরাট পুরুষ না হলে সকলে তার বিরুদ্ধে যাবে কেন? সকলে রোগীকে অপমান করছে, ভূতপ্রেতের উৎপাতে টেকা যাচ্ছে না, সব দল তার দলের বিরুদ্ধে একজোট হয়েছে; এ সবই নির্যাতনমূলক ডিলিউশনের নিদর্শন। রোগীর স্ত্রী ব্যভিচার করছে,—এ চিন্তার মূলেও রয়েছে নির্যাতনের ডিলিউশন। অন্য দেশের রাষ্ট্রনায়ক রোগীর চিন্তার হদিস পেয়ে রোগীর দেশের পুলিশকে তার বিরুদ্ধে নিয়োগ করেছে; এই ধরনের বিশ্বাসের মূলে একই সংগে নির্যাতনমূলক ও আত্মম্ভরিতার ভ্রান্তি কাজ করছে। রোগীর শিক্ষাদীক্ষা পেশা ইত্যাদির সংগে তার ডিলিউশন বিশেষভাবে সম্পর্কিত।

এইবার রোগ-ইতিহাসের বিবরণ দিচ্ছি।

রণলাল যখন চিকিৎসার জন্য এল তখন তার বয়স পঁচিশ। অবিবাহিত ডাক্তার মামার সংগে এক বাড়ীতে থাকে, সরকারী এক গবেষণা সংস্থায় রিসার্চ অ্যাসিস্টেন্টের কাজ করে। ডাক্তার মামা কয়েকদিন ধরে লক্ষ্য করছেন যে রণলাল যেন কিছুটা বিভ্রান্ত। পাশের ঘরে অনেক রাত পর্যন্ত পায়চারী করে, মামা সেটা বুঝতে পারলেন। ঘুম হচ্ছে না; খাদ্যেও অরুচি। কর্মস্থলে যাচ্ছে; কাজকর্মও করছে, কিন্তু মনে শান্তি নেই। কয়েকদিন পরে মামার কাছে তার সমস্যার কথা বলল। তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলছে। বিদেশী রাষ্ট্রের প্রজাতন্ত্রশাসিত প্রেসিডেন্ট, ভারতের প্রধানমন্ত্রী, বাংলা-দেশের পুলিশ প্রধান এই ষড়যন্ত্রের নায়ক। সংগে জড়িত আছে আরো অনেকে। রাত্রে সে জোর করে জেগে থাকে, অনেকবার কফি খেয়ে ও অন্যান্য ওষুধের সাহায্যে ঘুম তাড়াবার চেষ্টা করে। পায়চারী করার উদ্দেশ্য সজাগ থাকা। সজাগ না থাকলে সর্বনাশ ঘটবে। অতর্কিতে পুলিশ এসে

তাকে ধরে নিয়ে যাবে। গোপনীয় কিছু কাগজপত্র একটা কিটব্যাগে ভরে সারারাত সে পালিয়ে যাবার জন্যে তৈরী থাকে। পুলিশের আগমন সংবাদ টের পেলেই পাশের বাড়ীর ছাদ দিয়ে সে পালিয়ে যাবে। শেষ রাত্রের দিকে পুলিশ আসার সম্ভাবনা। কাজেই সে ঘুমুতে পারে না, ঘুমুতে সে চায়ও না। দিনের বেলায়, রাস্তায় অথবা তার কর্মস্থলে পুলিশ তাকে পাকড়াও করতে পারে, এ চিন্তা তার মনে আসে না। দিনের বেলায় মোটামুটি সুস্থ থাকে। ষড়যন্ত্রের কথা মনে থাকলেও ধরা পড়ার ভয় মনে আসে না। রাত জাগার ক্লান্তি ছাড়া, অন্য সব দিক থেকেই সে তখন প্রায় স্বাভাবিক। তার গবেষণাসংক্রান্ত হিসাব-নিকাশ, দুরূহ গাণিতিক প্রশ্নের মীমাংসায় তার ভুল হয় খুবই কম। মামার ঘুমের ওষুধ সে খেল না। রাতের অস্থিরতা ক্রমে বেড়ে চলল। এই অবস্থায় মামার পরামর্শে আমার সঙ্গে দেখা করল। চিকিৎসার জন্যে নয়, পরামর্শের জন্য।

প্রায় পনেরো ষোলো বছর আগেকার কথা। রণলাল প্রথম দিকে ষড়যন্ত্রের কথা ছাড়া অন্য কোনো কথাই বলতে চাইল না। তার বিশ্বাস উৎপাদন করতে কিছুটা সময় লাগল। আমার উপর আস্থা স্থাপিত হলে তার পুরনো ইতিহাস জানতে পারলাম।

দেশ স্বাধীন হবার পর বছর তিনেক কেটে গেছে। রণলাল এক বামপন্থী পার্টির সঙ্গে পরোক্ষভাবে জড়িত হয়ে পড়েছে। এই পার্টির বেশ কিছু সংখ্যক সভ্য এই সময় 'আন্ডার গ্রাউন্ডে' যেতে বাধ্য হয়। রণলাল পার্টি সভ্য নয়, 'ফেলো ট্রাভলার'। তার উপর পুলিশের নজর নেই। পড়ুয়া ছাত্র বলে তার সুনাম আছে। কাজেই মাঝে মাঝে দু'একজন সভ্য তার ঘরে রাত্রিযাপন করতে থাকে। কিছু কিছু গোপনীয় চিঠিপত্র আদান-প্রদানের ভার তার উপর বর্তায়। মনের ভয় চেপে রেখে এই দুঃসাহসিক রাজনৈতিক কার্যকলাপে লিপ্ত হয়ে পড়ে রণলাল। যে-কমরেড মারফত যোগাযোগ ঘটেছিল তার কাছে বাহবার মোহে রণলাল এই কাজে ব্রতী হয়। এ-ছাড়া বিপজ্জনক কাজ করার একটা নিজস্ব মাদকতা আছে। রণলালের তরুণ-মন তার দ্বারাও আকৃষ্ট হয়েছিল। এই সব ভয় বা বাহাদুরির মোহের খবর রণলালের গোপন মনে নির্বাসিত ছিল, মনে হয় না। আমার সঙ্গে কথাবার্তায় খোলাখুলি সে নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করল। এর পর পার্টির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হল। আত্মগোপনকারীরা আত্মপ্রকাশ করলেন। গোপনীয় কার্যকলাপের আর প্রয়োজন রইল না। কিছুদিন পরে রণলালের সরকারী চাকরী মিলল। আরো বছর দুয়েক পরে চাকরীটি স্থায়ী হবার সম্ভাবনা দেখা দিল। এখন সব কিছু নির্ভর করছে পুলিশ-রিপোর্টের উপর। ঠিক এই সময় রোগলক্ষণ দেখা দিল। পুরনো দিনের সঞ্চিত ভয় ও প্রাণীবন্ধ নির্যাতনমূলক ডিলিউশনের পীড়নে রণলাল অস্থির হয়ে উঠল।

কেন এই সময়ে রণলাল অসুস্থ হল? কেন প্যারানইয়ার উপসর্গ তার মধ্যে দেখা দিল? এই দুটি প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে রণলালের স্নায়ুতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য ও মানসিকতার বিশিষ্টতা সম্পর্কে কিছুটা ধারণা দরকার।

রণলালের ইতিহাস থেকেই বোঝা গেছে যে সে তীক্ষ্ণবুদ্ধি ছেলে। 'ইন-হিবিটরী' টাইপের মস্তিষ্কে দ্বিতীয় সাংকেতিক স্তরের আধিক্য। সব কিছুকে, নিজের 'ডিলিউশনকে' বৈজ্ঞানিক যুক্তি দিয়ে সে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। বিদেশী রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ও আমাদের প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে যোগাযোগ প্রসঙ্গে সে এক ধরনের নতুন যন্ত্রের কথা অবতারণা করল, যেটা সম্পূর্ণ কাল্পনিক হলেও; একেবারে অসম্ভব পরিকল্পনা নয়। কথোপকথনের প্রত্যেকটি ধাপ সে বৈজ্ঞানিক যুক্তি দিয়ে সমর্থিত করার চেষ্টা করল। মার্কসীয় দর্শন ও আধুনিক বিজ্ঞানের অনেক বিষয় নিয়েই যুক্তিনিষ্ঠ চিন্তা করে থাকে বোঝা গেল।

তার মধ্যে বড় হবার, প্রশংসা ও বাহবা অর্জন করার ঝোঁক খুব বেশী। যে দলের সভ্যদের আশ্রয় দিয়েছিল, সেই দলের সঙ্গে তার একাত্ম ঘটে নি। ব্যক্তিগত বাহাদুরীর মোহেই সে নিজের ভয়কে চেপে রেখে বিপজ্জনক কাজে নেমেছিল। ছাত্র হিসেবে তার সুনাম ছিল, কিন্তু ছাত্রমহলে লাজুক ও ভীরুস্বভাবের জন্য প্রতিপত্তি বা প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পারেনি। এই প্রতিপত্তি লাভ ছিল তার মনের প্রধান চালকশক্তি। সরকারী গবেষণা সংস্থার চাকরীর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা লাভের আকাঙ্ক্ষা তার মনের মধ্যে যখন তীব্র হয়ে উঠেছে, তখন দুটো বিপরীত চিন্তা তাকে সমানভাবে পেয়ে বসল। অনুকূল পুলিশ-রিপোর্ট যদি না হয় তবে চাকরী হারাতে হবে, বড় হবার সব আকাঙ্ক্ষা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হবে। সরকারী চাকরী মানে বামপন্থী সরকারবিরোধী মনোবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ। চাকরী স্থায়ী হলে বামপন্থী পার্টির বন্ধুবান্ধবদের কাছে সে ছোটো হয়ে যাবে। সে যে মনে মনে 'কেরিয়ারিস্ট' ছিল এইটেই প্রমাণিত হবে। আত্মগোপনকারীদের আশ্রয় দেবার সময় থেকেই ভয়ের অভিজ্ঞতায় সে পীড়িত। প্রতিরাত্রে সে কল্পনা করেছে সার্চ হবে, পুলিশ আসবে। এই ভয় ক্রমশ তার স্নায়ুতন্ত্রে সম্মোহনপর্বের দ্বিতীয়-তৃতীয় স্তরের (প্যারাডক্স, আলট্রাপ্যারাডক্স) আবির্ভাব ঘটেছে, শেষ রাত্রের সার্চের বিভীষিকা তার কিছু মস্তিষ্ক কোষকে অনড় উত্তেজনায় আচ্ছন্ন রেখেছে; এইভাবে প্যারানইয়ার ক্ষেত্র তৈরী হয়েছে। আবার এও ভেবেছে যে পুলিশের হাতে ধরা পড়লে কাগজে নাম বেরুবে; তার মত মেধাবী ছাত্র একটা আদর্শের জন্যে নিজের ভবিষ্যতের কথা ভাবেনি, এ নিয়ে নিশ্চয়ই জনসাধারণের মনে তার সম্পর্কে শ্রদ্ধার উদ্রেক ঘটবে। তার আত্মত্যাগের ইতিহাস বন্ধুদের কাছে তার প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা বাড়াবে। কিছুদিন আগেও তার মনে হয়েছিল যে রিপোর্টে যদি তার রাজনৈতিক কার্যকলাপের কথা প্রকাশ পায় এবং তার ফলে যদি তার চাকরী চলে যায়, তাহলেও তার সম্ভ্রম বাড়বে। কয়েকজন আত্মগোপনকারীকে আশ্রয় দিয়েছিল এই সংবাদ এমন কিছু বড়দরের সংবাদ নয়। আত্মগরিমা চরিতার্থ হয় যদি বিরাট কোনো ষড়যন্ত্রের সূত্রপাত হয় তাকে কেন্দ্র করে। রাতের বেলায় ভয়ের মূলে রয়েছে সেই বন্ধুদের আত্মগোপনকালীন ভয়ের উদ্দীপক। এতদিন পরে এখন অসুস্থ হবার কারণ এখন তার চাকরীর স্থায়িত্ব ও পুলিশ-রিপোর্টের প্রশ্ন উঠেছে। প্যারানইয়া রোগের উদ্ভবের ব্যাখ্যাও মনে হয় পাওয়া গেছে।

প্যারানইয়া সম্পর্কে ফ্রয়েডের লিবিডো-ভিত্তিক প্রকল্প চিকিৎসক মহলে বিশেষ চালু। এ সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার।

ফ্রয়েড বলেন, নির্যাতনমূলক ডিলিউশনের সাহায্যে রোগী নিজের সমকাম প্রবণতা থেকে আত্মরক্ষা করে। হোমোসেক্সুয়াল পার্টনার অর্থাৎ সমকামী ভালবাসার পাত্র হঠাৎ ঘৃণার পাত্রে রূপান্তরিত হয়ে নির্যাতনমূলক ডিলিউশনের নায়ক হয়ে যায়। নির্যাতনের নায়ক খুব কম ক্ষেত্রেই একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তি। রণলালের বেলায় আমরা জানি নির্যাতনের কাল্পনিক নায়ক একাধিক। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পরিবেশের সব কিছুর মধ্যেই রোগী তার নির্যাতনের নায়ককে দেখতে পায়, সমগ্র পরিবেশকেই সে ষড়যন্ত্রকারী শত্রু মনে করে। ম্যাকডুগাল মনে করেন নির্যাতনমূলক ডিলিউশন হোমোসেক্সুয়ালপ্রবণ ব্যক্তিদের বিশেষভাবে প্রভাবিত করে, একথা ঠিক। এইসব ব্যক্তি সমকামপ্রবণতাকে, এমনকি হস্তমৈথুনকেও অপরাধ ও পাপ মনে করে, তাই এদের মধ্যে প্যারানইয়া রোগের আধিক্য দেখা যায়। পুরুষদের সমকাম-প্রবণতা আইনের চক্ষে অপরাধ (ম্যাকডুগালের সময়ে) বলে পরিগণিত হত, মেয়েদের সমকামপ্রবণতা ততটা ঘৃণিত মনে করা হয় না। তাই পুরুষদের মধ্যে প্যারানইয়া রোগীর সংখ্যাধিক্য। এছাড়া ম্যাকডুগাল অন্য একদিক দিয়ে ফ্রয়েডীয় প্রকল্পকে খণ্ডন করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে সমকামবিকার যাদের মধ্যে জন্মগত, তাদের প্যারানইয়া রোগের সম্ভাবনা কম। যারা এই বিকারকে পরিবেশের চাপে অর্জন করতে বাধ্য হয়, তাদের মধ্যেই মানসিক দ্বন্দ্ব-নিরোধের ফলে এই রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। ম্যাকডুগাল ও সমমতাবলম্বী চিকিৎসকেরা মনে করেন যৌনশক্তির স্বল্পতার দরুণ যে হীনমন্যতা জন্মায়, তা থেকে নির্যাতনমূলক ডিলিউশনের উন্মেষ। অন্য রোগীর প্রসঙ্গে এ-নিয়ে আলোচনার ইচ্ছে রইল।

—মনোবিদ্

সজন বলল, 'আপনার ভুল হয়নি। আমিই আসলে ভুলে গেছি। অপরাধী করবেন না যেন, সম্ভবত অনেক দিন আগে একবার আমাদের পরিচয় হয়েছিল। এতদিনে স্বাভাবিক ভাবেই আপনি নিশ্চয় অনেক বদলে গিয়ে থাকবেন। অথচ জানেন, আমার বন্ধুরা বলে মানুষ যে প্রতিদিন ঘণ্টায় ঘণ্টায় মিনিটে মিনিটে প্রতি সেকেণ্ডে কী অবিশ্বাস্যরকম বদলে যেতে পারে তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন আমি—সজন। আর আপনি, অথচ আমাকে কত সহজেই চিনে নিলেন। আশ্চর্য। আপনার এই প্রতিভার কোন রকম প্রশংসা আমার মুখে শোভা পায় না। কেননা এই অদ্ভুত বিবর্তনশীল জীবটি এখনও আপনাকে ঠিক চিনতে পারেনি।' সজন সলজ্জ হাসল।

চণ্ডী মণ্ডল

সজনের সকাশে

(পাঁচ)

এখনও সন্ধ্যা নামে নি। শুকনো নরম বেলাভূমির ওপর সজন দাঁড়িয়েছিল। সামনে শেষ সূর্যালোকস্নাত দিগন্তপ্লাবী শান্ত সমুদ্রের গর্জন। উপরে অসীম আকাশে নিঃশেষের অপূর্ব মায়া। সমুদ্রচিলগুলি সারাদিন সমুদ্রের আকাশে ভেসে চলেছে খিদের জ্বালায়। ঝাঁকে ঝাঁকে ছোট ছোট সাদা ডানাওয়ালা সমুদ্র পাখিরা এখনও খিদের সন্ধান করে চলেছে। সজনের বুকের ওপর দুর্বোধ্য রহস্যময় বাতাসের উথাল-পাথাল ঢেউ, অবিরাম অবিশ্রাম। চারপাশে স্বাস্থ্য-প্রেমিক নরনারীর মেলা। হঠাৎ সজন শুনতে পেল যেন কেউ তাকে ডাকছে। ভাবল সে ভুল শুনেছে, কেউ তাকে ডাকছে না। এখানেও আবার ভুলের পৌনঃপুন্য সজন আবার শুনতে পেল তার নাম ধরে কেউ যেন তাকে ডাকছে। ভাবল, এখানে তার নাম কে জানে যে তার নাম ধরে ডাকবে। ভাবল, আসলে আমার নিজের নাম আমার মনে ঘুরছে আর কে কাকে ডাকছে আর আমার মনে হচ্ছে বুঝি নাম ধরে আমাকেই কেউ ডাকছে। কিন্তু আবার যেন কেউ তার নাম ধরে ডাকল। দেখল, একজন ভদ্রমহিলা তার দিকে এগিয়ে আসছে। ভাবল ভদ্রমহিলা সম্ভবত ভুল করেছেন। তাই বলে সে ভুল করতে যাবে কেন। তাই সে ভদ্রমহিলাটির দিকে এমনভাবে তাকাল যার অর্থ—শুনুন, আপনি আসলে আমাকে ডাকছেন না। ভদ্রমহিলা ততোক্ষণে অনেক কাছে এসে গেছেন। সজন একবার তাঁর দিকে তাকিয়ে এই কথাই বলতে চাইল আপনি কি সত্যিই আমাকে ডাকছেন? ভদ্রমহিলাই প্রথম কথা বললেন: এতক্ষণ ধরে দূর থেকে আপনাকে ডাকছি—, কী ব্যাপার বলুন তো, খবর কাগজের কিছু ছাড়া আপনি কি আর কিছুই বিশ্বাস করেন না? আমাকে এখনও চিনতে পারলেন না?

সজন লজ্জিত হল, ক্ষমা করবেন। সত্যিই আপনাকে ঠিক চিনতে পারলাম না। তবে আপনাকে নিশ্চয়ই চিনি, না হলে আপনি আমাকে চিনলেন কী করে।'

'কিন্তু আমার যে মনে হচ্ছে আমার ভুল হয়নি। আপনাকে দেখেই মনে হল আপনাকে চিনেছি। অবশ্য সে অনেকদিন আগে আপনাকে দেখেছিলাম। কী জানি হয়ত আমারই ভুল হচ্ছে। তবে জানেন অনেকদিন আগে যাঁকে দেখেছিলাম তাঁকে আপনি ভাবলে প্রায় ভুল হয় না। তাঁর নাম ছিল সজন।'

'আমি রাতি।' রাতি মৃদু স্বভাবসিদ্ধ হাসি হাসল।

'ও, হাঁ—চিনতে পেরেছি। এখন মনে হচ্ছে অনেক আগেই আপনাকে চিনতে পারা উচিত ছিল। চিনতে যে একেবারে পারিনি তা ঠিক না জানলে—কী রকম যেন জোর পাচ্ছিলাম না, ঠিক সাহস হয়নি। তবে আপনার দান আমি অস্বীকার করব না। আপনি এত স্পষ্ট করে আপনাকে চিনিয়ে না দিলে—কত মাথা—, খেয়েছেন তো আমার মাথা।'

রাতি মুখ তুলে হেসে বলল, 'এতদিন কোথায় ছিলেন?' সমুদ্রের কল্লোলের সহযোগিতায় রাতির কণ্ঠস্বর হল সঙ্গীতের মত।

'কোথাও তো ছিলাম না।' পরমুহূর্তেই সজন আত্মসচেতন হল, 'অজন্তায় ছিলাম।'

রাতি : সে-ই কবে—তারপর কত দিন পরে দেখা হল। কী খবর আপনার বলুন—কেমন আছেন—আপনার কিন্তু এত বয়স হয়নি। কী ব্যাপার আমাকে আবার ভুলে গেলেন নাকি—না অনেকদিন আগের চেনা লোককে এতদিন পরে এখন নিজের বলে ভাবতে আপত্তি? কী?

CENTRAL LIBRARY

সজন : কিছুই না। আপনি এখনও কবিতা পড়েন?

: আপনি কবিতা লিখতেন না। মনে পড়ছে। এখনও কবিতা লেখেন? নিশ্চয়ই লেখেন। দেখলেই যে কারো মনে হবে। তাহলে আপনি কিন্তু এখন দার্শনিক। কবিরা শেষের দিকে পাগল অথবা দার্শনিক হয়। আপনি দার্শনিক তো? রাত্রি আবার হাসল।

সজনও হাসল। বলল : আপনার খবর বলুন?

রাত্রি : আমার স্বামী কলকাতার একজন ডাক্তার। দীর্ঘ অসুখভোগের পর চেঞ্জে এসেছেন।

সজন : কী অসুখ আপনার স্বামীর? আপনাদের পারিবারিক—ব্যক্তিগত ব্যাপারে অনাহূতের মত প্রবেশ করলাম, জানি না পুরস্কার কী তিরস্কার বা অন্য কী—:

রাত্রি : কিছুই হবে না। আসলে শারীরিক নয় মানসিক—মনের অসুখ। উনি একজন মনের ডাক্তার। মনের ব্যবসায়ী বলা যায়, কী বলেন? সাংঘাতিক ব্যবসা, মনে একটু বেশি রিস্কী। একটু অসতর্ক অন্যমনস্ক হলেই হল—. চলুন কোথাও বসি, আপনার সঙ্গে কেউ—

: না। আপনিও একাই এসেছেন বুঝি?

: হাঁ। সমুদ্র উনি একেবারেই সহ্য করতে পারেন না। একথা শুনে তবু ডাক্তার ওঁকে সমুদ্রেই পাঠিয়েছেন। ফলে প্রায় সারাক্ষণই উনি ঘুমিয়ে চলেছেন। আপনি নিশ্চয় মনোবিজ্ঞান পড়েছেন?

: আমার একটু একটু মনে পড়ছে, আপনি কিন্তু এত কথা বলতে পারতেন না। আসলে বলতেন না।

: তা নয়। আসলে আমি সত্যিই বদলেছি অনেক। আপনি তো এখন দার্শনিক, বলবেন তা নয়,—মানুষ চিরদিন জন্মমুহূর্তেই থেকে যায়—, সময় বদলায় বাইরের পৃথিবী সংসার বদলায় আর তাই মনে হয় যেন মানুষও বদলায়।—ঠিক বলিনি?

সজন হাসল। : আপনি তো কবি ছিলেন না, তাহলে দার্শনিক হলেন কেমন করে?

: এক সময় কবিতা পড়তাম। আপনি কিন্তু, মনে আছে, আপনার একটা কবিতাও শোনাননি। কিন্তু কী চেহারা হয়েছে আপনার। ভীষণ রোগা হয়ে গেছেন। শরীরের একটুও যত্ন নেন না। বিয়ে করেন নি? বলুন—আমি একেবারে সাধারণ মেয়েলি কথা বলছি!

রাত্রি আবার বলল : এবার সকলের যে যার হোটেলে ফিরে যাবার সময় হল। আজ যেন কী তিথি—চতুর্দশী, কাল পূর্ণিমা। দেখছেন কী রকম জোৎস্না নেমেছে সমুদ্রে। জোৎস্না-রাতের প্রতিভা আছে. চেনা চারপাশের পৃথিবীকে কেমন অচেনা মায়াময় করে তোলে। আপনি কবে এসেছেন? জানেন আমরা এক মাস হয়ে গেল এখানে আছি। সারাদিন আমি একা থাকি। ভালই লাগে. নিজেকে সব সময় নিজের কাছেই পাওয়া যায়। বেশ বোঝা যায় নিজে কত কী আবার কিছুই যে নয়। আপনি কিন্ত আমার কথা শুনছেন না। তাহলে একটা কথাও বলছেন না কেন?

সজন : চুপ করে বসে আপনার কথা শোনা আমার খুব দরকার। আমার খুব ভাল লাগছে।

রাত্রি : প্রথম থেকেই দেখছি আপনি শুধু ভাবছেন। যেন ভেবে কোন কূল-কিনারা পাচ্ছেন না, আরো বেশি করে ভাবছেন। মনে পড়ছে—তখনও আপনি ঠিক এমন ভাবুক ছিলেন। কিন্তু সত্যিই বলুন তো কেন এত ভাবেন? এত ভাববার কী আছে? এত ভাবনা কি সত্যিই আছে? আপনারা প্রথম থেকেই ঐ যে নিজেদের কোন কার্যকারণযোগে একবার ভাবুক বলে ভেবে নিয়েছেন তারপর নিজের, অন্যের দুঃখ-সুখের কথা ভাবেন না, ভেবে ভেবে শুধু ভাবনা তৈরি করেন আর দুর্ভাবনা বাড়ান। আপনারা ভীষণ স্বার্থপর। নিজেদের এত ভালবাসেন—। মানুষ অন্যকে বিচার করে নিজেকে দিয়ে। এটা কি ঠিক? উনি—ডঃ মজুমদার, উনি নিজের মনের জটিলতা দিয়ে ওঁর রুগীকে বুঝতে গিয়েছিলেন—তারপরই সম্ভবত এই অ্যাকসিডেন্ট। কিন্তু ভাবছি আপনি কি ভেবেই নিয়েছেন কোন কথা বলবেন না?

সজন : এখন আপনার কথা বলার সময়।—এখনও আপনার কথা শেষ হয়নি অথচ এখনই যদি আমি আরম্ভ করি তাহলে তো আবার অ্যাকসিডেন্ট অবশ্যম্ভাবী।

রাত্রি : আপনার কথা আগে কিছু শোনান। আপনার অতীতের কথা বলুন, বর্তমানের কথাও বলুন।

সজন : আমার অতীত বর্তমান কিছুই নেই।

রাত্রি : কেন?

সজন : নেই বলে তাই।

রাত্রি : কী আশ্চর্য মিল, আমারও যে তাই মনে হয়। আমি ঠিক আপনার মত বিশ্বাস করি।

সজন : কী বিশ্বাস করেন?

: কিছুই বিশ্বাস করি না।

: তাহলে?

: তাহলেও তো দিব্যি বেঁচে আছি। এবং দিনের পর দিন বেঁচে যাচ্ছি। একে বিশ্বাস বা অবিশ্বাস করার কী আছে?

সজন বলল : ও আচ্ছা। একটু থেকে আবার শুরু করল : অনেকক্ষণ সন্ধ্যা হয়েছে, অবশ্য অন্ধকার হতে পারেনি। তবু আপনার এখন হোটেলে ফেরার দরকার নেই?

: না। আমাকে ডঃ মজুমদারের এখন দরকার নেই। উনি এখনও ঘুমিয়ে আছেন। আপনার বোধ হয় এখনই ঘুমোবার দরকার নেই। আছে নাকি? অবশ্য জানি না কী ঘটনা বা দুর্ঘটনার পর আপনি এখানে এসেছেন। তবু আপনি থাকুন আরো কিছুক্ষণ। কত দিন পরে দেখা। আচ্ছা, আপনার সেই দিনটির কথা মনে পড়ে? কী ভীষণ ছেলেমানুষই না আপনি ছিলেন।—আমি যে তোমাকে ভালোবাসি রাত্রি,—আমি যে তোমার ভালোবাসা চাই—তুমি কি আমাকে ভালোবাসার কথা ভাববে না?—পাগল একটা! কেন অমন করেছিলেন? আপনি যেন কী রকম হয়ে গিয়েছিলেন। আমার শেষে এমন ভয় করছিল। কী হয়েছিল বলুন তো আপনার? মনে আছে সে সব কিছু? জানেন বাড়ি এসে মাকে আমি সব কথা বললাম। মার সে কী হাসি। বলল—তুই শেষে একজন পাগলের হাতে পড়লি! আমিও খুব হেসেছিলাম। পরের দিন শুনলাম আপনার নাকি কী অসুখ করেছে। একদিন আপনাকে দেখতে যাব ভেবেছিলাম। তারপর হঠাৎ আমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেল এক মনের ব্যবসায়ীর সঙ্গে। উনি আর আমাকে নিজের ব্যবসার সঙ্গে জড়াতে চাইলেন না। আমি খেয়ে-ঘুমিয়ে সিনেমার ছবি দেখে দিব্যি বাঁচতে লাগলাম—বেঁচে গেলাম। আমার গল্পটি ফুরোল। এবার শুরু করুন কথা বলা।

সজন : এক দেশে একটি লোক ছিল। সে প্রথম থেকেই ভেবে নিল আমি ভিনদেশী। সে দিব্যি খেয়ে ঘুমিয়ে গল্প পড়ে বাঁচবার লোক অথচ ভাবল একটা কিছু তো হতে হয়! কী হবে কী হবে? শেষ পর্যন্ত কবি হল। শেষ পর্যন্ত এমন হল যে আর কবিতা হচ্ছে না। সেই লোকটি এখন সমুদ্রে এসেছেন কবিতার সন্ধানে।

রাত্রি : কবিতা আর হচ্ছে না সুতরাং অসুখ করেছে. ভদ্রলোক সমুদ্রে এসেছেন বড় যন্ত্রণায় বড় আশায় যদি কবিতার মোহ না কাটে যদি কাটে।

সজন : ঠিক তাই। তারপর অতীতের পরিচিতা স্বনামধন্যা আপনার সঙ্গে নতুন করে পরিচয়। মানে কবিতার স্বরূপ সন্ধানী এক ক্ষ্যাপার হঠাৎ দেখা আপনার সঙ্গে।

রাত্রি : গুরুত্ব এত কম দিচ্ছেন কেন? বলুন—আবিষ্কার।

সজন : ঠিক। কিন্তু পরিণাম?

রাত্রি : অন্য অনেক আবিষ্কারের যে পরিণাম হয়, আশা করা যায় মঙ্গলজনকই হবে।

সজন : আপনি যে একজন শ্রেষ্ঠ আশাবাদী স্বীকার করছি।

রাত্রি : অন্য কত জায়গা থাকতে ঠিক এই সমুদ্রে আপনার এই যে আসা—এটা

কিন্তু আপনার শ্রেষ্ঠ নিরাশাবাদীর শ্রেষ্ঠ প্রমাণ নয়।

সজন : তা নয় মানছি। মানছি এখনও আশা আছে, অন্তত এই মুহূর্তে তো তাই-ই মনে হচ্ছে।

রাতি : এবার কিন্তু মাটিতে ফিরে আসা যাক। কী বলেন? হাওয়ায় ভাসতে তো মনে হচ্ছে সেই আগের মত এখনও আপনার খুব একটা ক্লান্তি নেই। আমার কিন্তু শূন্যের আনন্দ ভোগের জন্য কোন ডানা নেই। এক আধবার— চেষ্টা করে ডানা কল্পনা করে—কিন্তু লজ্জা পেয়ে না শূন্যের মত বাতাসেও স্বাসরুপ হয়ে মস্কার ভয়ে মাটিতে নেমে বেঁচে যাই। সে যাই হোক এতক্ষণ প্রায় সারাক্ষণই নিজের কথা বলে গেলাম। ভাল লাগল কি কীরকম লাগল জানি না তবে আমার সম্বন্ধে যে অনেক কথা জেনে গেলেন তাতে সন্দেহ নেই। আছে নাকি? এবার বলুন দেখি আপনার কী হয়েছে?

সজন যেন খুব অবাক হল, 'আপনি কার কথা বলছেন বলুন তো?'

রাতি বলল, 'মনে হচ্ছে আপনি হঠাৎ সজন থেকে বিজন বা অন্য কেউতে রূপান্তরিত হয়ে গেছেন।'

'তা কেন হবে?'

'তাহলে আপনি সজনই? তাহলে আপনিই তো বলেছেন আপনার কবিতা আর হচ্ছে না—যাক। এই শূন্যে কাল চলে আসুন আমাদের প্রতিবেশিনীর। নিন মান

রাখুন নিউ লাইফ ডিলাক্স হোটেলের পাঁচতলার ন' নম্বর স্যুটে। সকালেই আসুন। এই শুনুন, আসবেন কিন্তু নিশ্চয়ই। আর শুনুন, ও'কে কাইন্ডলি জানতে দেবেন না আপনার সঙ্গে আমার অনেক দিনের আলাপ বা এখানেও যে আমার সঙ্গে আলাপ হচ্ছে তাও বলবেন না।'

'কিন্তু আমি যদি কোন কারণে আসতে না পারি—মানে যদি—।'

'আশ্চর্য! অসম্ভব! আপনি আমার কী সব ভাবছেন মশাই আপনিই জানেন ভাল। আসলে আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় আছে জানলে উনি ভাববেন আমি ও'র জন্য খদ্দের সংগ্রহ করছি। আপনাকে তো প্রথমেই বলেছি উনি চান না ও'র ব্যবসার সঙ্গে আমাকে জড়াতে।'

'কিন্তু আমাকে ও'র ব্যবসার সঙ্গে জড়াচ্ছেন কেন বুঝতে পারছি না।'

'আমিই তা ঠিক বুঝতে পারছি না, আপনাকে কেমন করে বোঝাব?'

'তাহলে?' সজন দেখল আকাশ ও সমুদ্রের পটভূমিতে জ্যোৎস্নার প্রভায় রাত্রিকে বেশ সুন্দরই দেখাচ্ছে। রীতিমত সুন্দরী। অসাধারণ বলা যায়।

রাত্রির এই রূপ ভাবার—নিশ্চয়ই ভাবার।

রাত্রি বলল : তাহলেও ভাবনার কোন দরকার নেই। আপনি চলে আসুন মনে কোন দ্বিধা না রেখে। কথা দিচ্ছি আতিথেয়তার কোন ত্রুটি হবে না—। মনে আছে, সেই, সেই পাগলামির দিন চা খাইয়েছিলেন—অবশ্য শুধুই চা। তবু ভুলিনি। আজ যাই।

সজন হাসল, বলল : আপনি অনেক বদলে গেছেন।

রাত্রিও হাসল, বলল : সেটা জানতে ডঃ মজুমদারেরই কাছে না-হয় আসুন যে আপনার ব্যাপারটা কী। চলি। আবার দেখা হবে। আমার নিশ্চয়ই দেখা হবে।

সজনের মনে হল এতক্ষণ সে স্বপ্নের মধ্যে ছিল। কিন্তু কোনমতেই নিজেকে তা বোঝাতে পারল না। বুঝতেই হল, না, সে স্বপ্নের মধ্যে ছিল না। তাহলে এতদিন সে নিশ্চয়ই স্বপ্নের মধ্যে ছিল। এই সেই রাত্রি—যার জন্যে দিনরাত্রি আমি—সজন আর ভাবতে পারল না। এখন জ্যোৎস্না কুয়াশার মত চরাচরকে গ্রাস করছে। সমুদ্র ধূধূ—শুধু অশান্ত রুদ্ধ গর্জন। বাতাসের বেগ অনেক বেড়ে গেছে। সজনকে নিয়ে যেন ছিনিমিনি খেলায় মেতেছে। চাঁদকে এত পাণ্ডুর দেখাচ্ছে যেন কোন দুষ্ট ক্ষত হঠাৎ তার সমস্ত লাবণ্য গ্রাস করেছে। সজন শান্তভাবে দেখল একটা ভুলের মধ্যে দিয়ে কেমন করে তার জীবনের এত দীর্ঘদিন কেটে গেল। যেতে পারল। ক্রমশ জ্যোৎস্না আরো ধূসর হয়ে উঠেছে, অন্ধকার একটু একটু করে ঘনিয়ে আসছে, এই অনুজ্জ্বল মহিমাহীন চাঁদটাও এবার ডুবে যাবে। তখন নিরন্ধ্র অন্ধকার। কুয়াশাময় বেলাভূমিতে হাঁটতে হাঁটতে সজনের মনে হল ঘনায়মান ঐ কালো রাত্রি আর কখনো কোনদিন সকাল হবে না। যারও আর কিছুই করার নেই। চারপাশের শ্মশানসদৃশ নির্জনতায় দু'একটা কালো পাখি প্রেতের মত উগ্র সাংকেতিক ভাষায় চাপা চিৎকার করতে করতে সজনের মাথার উপর দিয়ে উড়ে আকাশের ধোঁয়ায় আবার মিলিয়ে যাচ্ছে। একসময় মনে হল ঐ সাধারণ অতি তুচ্ছ রাত্রি ও একটি মেয়ে মাত্র আর কিছুই নয়, ঐ মেয়েটির জন্যে আমার জীবন মিথ্যা? না। রাত্রির সেই যোগ্যতাই নেই। আসলে আমার নিজের মধ্যেই আছে ভুল সেই ভুলই আমাকে এমন নিঃস্ব করেছে আমার এতবড় সর্বনাশ করেছে। আমার সেই ভুলকে প্রশ্রয় দিয়েছিল রাত্রি, না, রাত্রি কিছুই করেনি, আমিই রাত্রিকে কল্পনা করেছিলাম—আমি যাদের ভুল করেছিলাম। আমার এই সব ভুল হওয়ার জন্যে আমি, একমাত্র আমিই দায়ী। মধ্যরাত্রিতে কুজ্ঝটিকাময় সমুদ্রের ওপর গর্জন শুরু হয়েছে। অসংখ্য অশান্ত প্রশ্ন নিষ্ফল আক্রোশে ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে। তার কী তীব্র অনুশোচনা কী দারুণ গ্লানি! আত্মশ্লাঘা! সজন হতাশায় ভেঙে পড়ল, এই ভয়ংকর ভুলের থেকে মুক্ত হয়ে আবার আমি নতুন করে বাঁচতে পারি না, পারব না। আমার দীর্ঘ সময় অতিবাহিত। আমি এখন শ্রান্ত ক্লান্ত, অবসন্ন উৎসাহবিহীন, সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হবার অপেক্ষায় আমি দিন গুনছি। আমার আর কোন আশা নেই। না না না না না না.....

ক্রমশ যেন আকাশে, সমুদ্রে, চরাচরে ভোর হচ্ছে। এখন দীর্ঘ অন্তর্দ্বন্দ্বের পর সজন নিজের উদ্দেশ্যে বলেছে : জীবনের অনেক দিন বৃথাই কেটে গেছে। তবু তেমন অনুতাপ হওয়া সেও হয়ত ঠিক নয়। এখনো তো এ জীবনে সেই সার্থকতায় পৌঁছন হয়নি যার জন্য জীবন জীবন হয়, যার জন্য এতদিন কেটে গেল। বৃথাই কেটে গেল। কখন যে জীবন জীবন হবে কেউ জানে না, যখন একদিন তা হয়ে ওঠে তখনই তো জীবনজন্মের সার্থকতা—জীবনের সেই আনন্দের উদ্দেশ্যেই তো এই দিনরাত্রির জীবনযাত্রা। সেই সত্যের সঙ্গে এখনও তো তোমার পরিচয় হয়নি সজন। তুমি এখনও অপূর্ণ। তাই কোন ভুলই তোমার ভুল নয়, তোমার কোন মিথ্যাই মিথ্যা নয়—জীবনে যে সময় এতদিন নষ্ট হয়েছে তার কী মূল্য আছে! আর জীবন তো তোমার মিথ্যার মধ্যে দিয়ে শেষ হবে না সজন। কারো জীবনই তা হয় না।

রাত্রিও শেষপর্যন্ত সকাল হল। সজন প্রথম ট্রেনেই উঠে বসল। ট্রেন ছেড়ে দেবার শেষ বাঁশি যখন বেজে উঠল বুকটা অসহ্য ব্যথায় হুহু করে উঠল। এতদিনের সুখ-দুঃখের জীবন চিরদিনের মত পিছনে পড়ে থাকবে। তাকে সঙ্গে নেওয়া হবে না। ছুটে চলে যাই রাত্রির কাছে তাকে একবার দেখে আসি। কিন্তু তখন আর সময় নেই, ট্রেন ছুটতে শুরু করেছে। নির্দিষ্ট স্টেশনে পৌঁছবার আগে কোন আবেগ দিয়েই একে আর থামান যাবে না।

(শেষ)

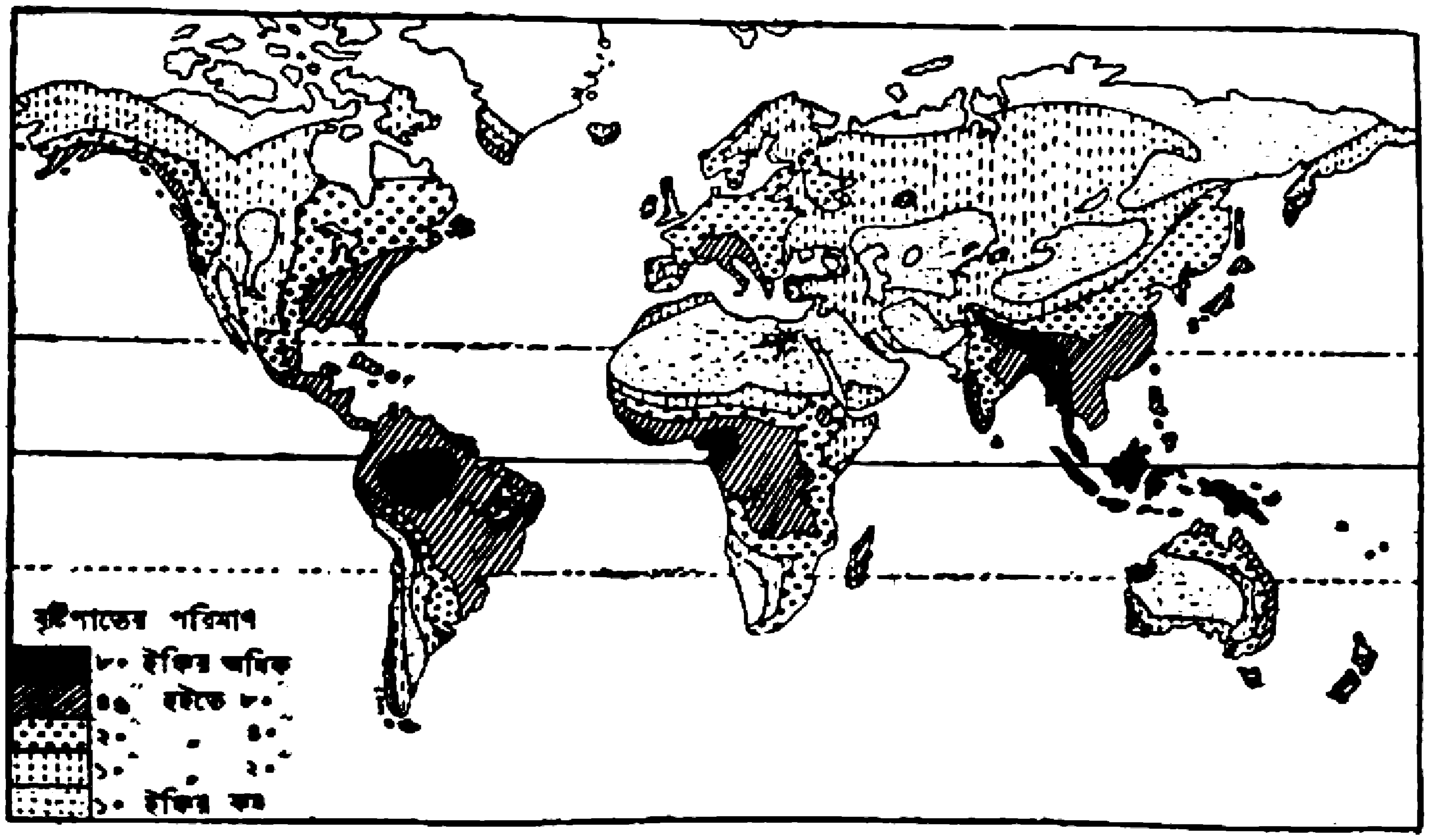

বিজ্ঞানের কথা

তিনভাগ জল একভাগ স্থলের এই পৃথিবীতেও জলের আকাল

শুনলে অবাক হতে হবে, এই পৃথিবীতে নাকি জলের আকাল দেখা দেবার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। হ্যাঁ, জলের আকাল, যদিও পৃথিবীতে মজুদ জলের পরিমাণ দেড় বিলিয়ন ঘন কিলোমিটার। বিলিয়ন মানে এক হাজার মিলিয়ন বা একশো কোটি, সংখ্যায় লিখতে হলে একের পর নটি শূন্য বসাতে হবে। এই বিপুল পরিমাণ জল মজুদ থাকা সত্ত্বেও আকালের আশঙ্কা করা হচ্ছে কেন? কারণ, মজুদ জলের পরিমাণ বিপুল বটে কিন্তু তার বেশির ভাগটাই নোনা—সমুদ্রের ও সাগরের জল, ব্যবহারের অনুপযোগী। টাটকা জলের পরিমাণ পৃথিবীতে খুব বেশি নয়, অনধিক ৩০-৫ মিলিয়ন ঘন কিলোমিটার। আবার এই টাটকা জলের সবটাই যদি মানুষের কাজে লাগত তাহলে কোনো কথা ছিল না। ৩০-৫ মিলিয়ন ঘন কিলোমিটার টাটকা জলের প্রায় সবটাই, সঠিক হিসেবে ৯৭ শতাংশ, জড়ো হয়ে আছে পর্বতের হিমবাহে ও মেরুদেশের বরফের আস্তরে। এই জল মানুষের কোনো কাজে লাগে না। বাকি থাকে ৩ শতাংশ বা ৮২৬,০০০ ঘন কিলোমিটার টাটকা জল। এই জল পাওয়া যায় নদীতে, হ্রদে ও মাটির নিচে। যে-জলকে বলা হয় মানুষের প্রাণ, এই হচ্ছে তার পরিমাণ, পৃথিবীর জলের মোট পরিমাণের ০-০৬ শতাংশ মাত্র। এই জলের ওপরে নির্ভর করেই মানুষকে বেঁচে থাকতে হবে।

বিজ্ঞানীদের হিসেব থেকে জানা যায় বর্তমান পৃথিবীর মানুষের জলের প্রয়োজন বছরে প্রায় ৮,০০০ ঘন কিলোমিটার। তাই যদি হয় তাহলে, সাধারণ বুদ্ধিতে মনে হতে পারে, যে-পরিমাণ টাটকা জল নাগালের মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে মানুষের প্রয়োজনের পক্ষে তা যথেষ্ট।

তবুও কিন্তু টাটকা জলের আকাল দেখা দেবার আশঙ্কা করা হচ্ছে। কেন? এ-সপ্তাহের বিজ্ঞানের কথায় এ-বিষয়ে কিছু আলোচনা তুলতে চাই। তথ্যগুলো নেওয়া হয়েছে সোভিয়েত প্রচার দপ্তর প্রচারিত বুলেটিনে ওয়াই পডিলাস্কির একটি প্রবন্ধ থেকে।

সকলেই জানেন, পৃথিবীতে টাটকা জলের একটি অবিরাম সঞ্চলন ঘটে চলেছে। সূর্যের তাপে সমুদ্রের জল বাষ্প হয়, বাষ্প জমাট বেঁধে মেঘ, মেঘ থেকে বৃষ্টি, নদী-পথে বৃষ্টির জল আবার সমুদ্রে। এই ব্যাপারটি সবসময়েই ঘটে চলেছে, চক্রের মতো।

কিন্তু বৃষ্টি সব জায়গায় সমান নয়, কোথাও বেশি কোথাও কম। বৃষ্টি বেশি হয়ে থাকে এশিয়ায়, আফ্রিকায়, সোভিয়েত ইউনিয়নের উত্তরাঞ্চলে, ইউরোপে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দক্ষিণ আমেরিকার গ্রীষ্ম এলাকায়, কানাডায়: মোটামুটিভাবে বলা চলে বিশ্বের সমগ্র আর্দ্র এলাকায়। বহু পার্বত্য এলাকায় বৃষ্টিপাত খুবই বেশি। হিমালয়ের পাদদেশে কোনো কোনো এলাকায় বৃষ্টি হয়ে থাকে বছরে বারো মিটার। আর্দ্র এলাকায় অজস্র নদী প্রবাহিত হয়ে থাকে। পৃথিবীর সমস্ত হ্রদ ও হিমবাহও এই এলাকাতেই।

পৃথিবীর যে-সব এলাকাকে বলা হয় শুষ্ক বা অর্ধ-শুষ্ক এলাকা, সেখানে বৃষ্টি হয়ে থাকে খুবই কম, কোথাও কোথাও না হওয়ার মতোই। দশ বছরের মধ্যে মাত্র একবার বৃষ্টি হয়, আফ্রিকায় এমন এলাকাও আছে।

ভূপৃষ্ঠের ডাঙার অংশে শতকরা প্রায় ৬০ শতাংশ শুষ্ক বা অর্ধ-শুষ্ক।

এই শুষ্ক বা অর্ধ-শুষ্ক এলাকাতেও রয়েছে বিশ্বের কয়েকটি অতি শিল্পোন্নত দেশ—যেমন, ব্রাজিল, চিলি, ইস্রায়েল, মেক্সিকো, ইরাণ, ইন্দোনেসিয়া, আলজেরিয়া, সৌদি আরব ইত্যাদি। এই দলে পড়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্ধেকখানেক রাজ্য ও সোভিয়েত ইউনিয়নের কয়েকটি রিপাবলিক। এসব জায়গায় জলের যোগান কম, ফলে শিল্পগত ও কৃষিগত উন্নয়নে বাধা সৃষ্টি হয়ে থাকে।

এ থেকে [illegible] পাওয়া হয় যে জল সরবরাহ [illegible] সমস্যা [illegible]-

ভাবেই শুষ্ক বা অর্ধশুষ্ক এলাকার সমস্যা তাহলে ভুল করা হবে। বর্তমানে বিশ্বের প্রায় প্রত্যেকটি শিল্পোন্নত দেশে টাটকা জলের ঘাটতি পড়েছে, এমন সব দেশেও যেখানে এই সেদিনও জলের সরবরাহ ছিল অঢেল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কয়েকটি রাজ্য (ক্যালিফোর্নিয়া, নিউ জার্সি, টেক্সাস ইত্যাদি) জলাক্রান্ত এলাকা বলে ঘোষিত হয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের কয়েকটি এলাকায় টাটকা জলের সাংঘাতিক ঘাটতি। বিশ্বের কয়েকটি বড়ো বড়ো শহর—যেমন, নিউইয়র্ক, টোকিও, প্যারিস, সান পাওলো, বাকু, ব্যাংকক ইত্যাদি—যাকেমনকেই জল-কষ্টে পড়ে যায়।

বিশ্বে জলের ব্যবহার ক্রমেই বাড়ছে, কিন্তু জলের যোগান বাড়ছে না। শিল্পে, কৃষিতে ও মানুষের ব্যবহারের জন্যে যে-পরিমাণ জল চাই, যোগান তার চেয়ে কম। আর জলের ঘাটতি দেখা দিলে অনিবার্যভাবেই কারখানা বন্ধ হয়ে যায়, নতুন শিল্প গড়ে উঠতে পারে না, সবচেয়ে বড়ো কথা—মানুষের জীবন ও স্বাস্থ্য বিপন্ন হয়ে পড়ে।

জলের যোগানে ঘাটতি পড়ার কারণ কি? কারণ, কলকারখানার ব্যাপক পত্তন, ক্ষেতখামারে ব্যাপক জলসেচ, জীবনযাত্রার মানে উন্নতি এবং অবশ্যই জনসংখ্যা বৃদ্ধি।

মধ্যযুগে একজন মানুষ ব্যবহার করত দৈনিক ১০ থেকে ১৫ লিটার জল। এখন মাথাপিছু হিসেবে জল-ব্যবহার দৈনিক ১৫০ থেকে ৬০০ লিটার পর্যন্ত। তার ওপরে আছে শিল্পে ও কৃষিতে ব্যবহারের জন্য জল। সব মিলিয়ে মাথাপিছু মোট জলের খরচ আরো বেশি। কোথাও কোথাও ৬,৫০০ লিটারের মতো (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে)।

বর্তমান কালে শিল্প দ্রুত বাড়ছে, সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে জলের টান। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা চলে, এক টন রাসায়নিক তন্তু তৈরি করতে বিশুদ্ধ টাটকা জলের দরকার ২,০০০ ঘনমিটার। এক টন নিকেল বা অ্যালুমিনিয়ম তৈরি করতে ১,৫০০ ঘন-মিটার। এক টন ইস্পাত তৈরি করতে ১২০ ঘনমিটার। এক টন নিউজপ্রিন্ট তৈরি করতে ১০০ ঘনমিটার।

কৃষির জন্যে আরো বেশি পরিমাণ টাটকা জল চাই। খাবোর ফলন বাড়াতে হলে আবাদের এলাকা বাড়াতেই হয়। ফলে জলের খরচও বাড়ে। যে-সব জমিতে কৃত্রিম জলসেচ ব্যবস্থার সাহায্যে চাষ হয় সেখানে প্রতি হেক্টর জমির জন্য বছরে জল দরকার হয় প্রায় ২,০০০ ঘনমিটার। এক টন দানা-শস্য ফলাতে জল চাই ১,০০০ ঘনমিটার। এক টন ধান ফলাতে ৪,০০০ ঘনমিটার। সারা পৃথিবী জুড়েই জলের চাহিদা এমনিভাবে প্রচণ্ড বেড়ে গিয়েছে। অথচ টাটকা জলের স্বাভাবিক যোগান বাড়েনি। ফলে যোগান আর খরচের মধ্যে দেখা বড়ো রকমের ফারাক।

সারা বিশ্ব জুড়েই তাই জলের আকাল দেখা দেবার আশঙ্কা। জাতিসংঘের ইউনেস্কো তাই জল-সরবরাহের সমস্যাটির ওপরে খুব বেশি রকমের গুরুত্ব দিয়েছেন। ক্ষুধার বিরুদ্ধে সংগ্রাম যতোখানি গুরুত্ব-পূর্ণ, ইউনেস্কোর মতে জলের আকালের বিরুদ্ধে সংগ্রামও তার চেয়ে কম নয়। ইউনেস্কোর হিসেব অনুসারে, বিশ্বের মোট অধিবাসীর তিনভাগের একভাগ যদি থেকে থাকে ক্ষুধার মধ্যে তাহলে অর্ধেক আছে জলের আকালের মধ্যে।

বিশ্বের বিজ্ঞানীদের সামনে আজ একটি বড়ো প্রশ্ন : জলের আকাল রোধ করা এবং ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্যে জলের ব্যবস্থা করা।

সম্ভত কারণেই বিজ্ঞানীদের নজর গিয়েছে সবার আগে মাটির নিচের জলের সঞ্চয়ের দিকে। ভূ-বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন মাটির নিচে বিরাট বিরাট এলাকা জুড়ে আছে জলাধার (আর্টেজীয় বেসিন), এমনকি সাহারার নিচেও। তবে এক্ষেত্রেও আশঙ্কার কারণ ঘটেছে। মাটির নিচের এই জল এত বেশি পরিমাণে ব্যবহার করা হচ্ছে যে পুনঃস্থানের টানে সমুদ্রের জল মহাদেশের তলদেশ পর্যন্ত পৌঁছে যাবার আশঙ্কা।

ব্যবহারের পরের নোংরা জল বিশুদ্ধ করে নিয়ে আবার ব্যবহার করা যেতে পারে। অভিজ্ঞতা থেকে জানা গিয়েছে, এটা খুব বেশি খরচের ব্যাপারও নয়, অসম্ভব ব্যাপারও নয়। নভশ্চররা যেদিন মঙ্গলগ্রহে বা শুক্রগ্রহে পাড়ি দেবেন, তাঁদের জল-সরবরাহের সমস্যার সমাধানও এইভাবেই করা হবে ঠিক করা হয়েছে। অর্থাৎ ব্যবহারের পরের নোংরা জল বারবার বিশুদ্ধ করে নিয়ে বারবার তাঁরা ব্যবহার করে চলবেন।

মেরুদেশের বরফ জলের একটি বড়ো উৎস। শুধু বড়ো নয়, বলা যেতে পারে সব-চেয়ে বড়ো উৎস। মাঝারি আকারের একটি হিমবাহ তৈরি হতে কোটি কোটি টন জলের দরকার—বড়োগোছের একটি নদী থেকেও সারা বছরে তার চেয়ে বেশি জল পাওয়া যায় না। মেরুদেশের জলে হাজার হাজার হিমবাহ ভেসে বেড়াচ্ছে। গরম আবহাওয়ার দেশের উপকূলে এই হিমবাহকে টেনে আনার ব্যবস্থা যদি করা যায় তাহলে আর কোনো সমস্যাই থাকে না। সম্প্রতি এই ব্যবস্থা করার ব্যবস্থা সম্পর্কে বিজ্ঞানীমহলে প্রচুর আলোচনা চলছে। ক্যালিফোর্নিয়া, চিলি ও আমেরিকার কয়েকটি অঞ্চলের জলকষ্ট হিমবাহের জলের সাহায্যে দূর করার পরিকল্পনা করা হয়েছে।

খাল কেটে কেটে এক এলাকার টাটকা জলের সরবরাহকে অপর এলাকায় নিয়ে যাবার কথাও বিজ্ঞানীরা ভাবছেন। এক্ষেত্রে খরচ নির্ভর করবে খাল কতখানি লম্বা হবে এবং খাল দিয়ে কি পরিমাণ জলের যোগান যাবে তার ওপরে।

জলের সবচেয়ে বড়ো উৎস অবশ্যই সমুদ্র। বলা যেতে পারে, অফুরন্ত উৎস। তবে সমুদ্রের নোনা জলকে মিষ্টি জলে পরিণত করার উপায় থাকা দরকার। উপায় আছে দুটি। এক, সমুদ্রের জলকে গরম করে বাষ্পে পরিণত করা, এই বাষ্পকে ঠাণ্ডা করে জল। দুই, সমুদ্রের জলকে ঠাণ্ডা করে বরফে পরিণত করা, এই বরফ গলিয়ে জল। বিজ্ঞানীরা এখনো পর্যন্ত প্রথম উপায়টি নিয়েই মাথা ঘামাচ্ছেন।

সমুদ্রের জলে আছে নুন ছাড়াও বহু মূল্যবান পদার্থ—সোনা, টাইটেনিয়াম, প্ল্যাটিনাম ইত্যাদি। সমুদ্রের জল থেকে বিশুদ্ধ জলের অংশটুকু বার করে নেওয়ার প্রক্রিয়ার অঙ্গ হিসেবে এই পদার্থগুলোও বিচ্ছিন্ন করা যেতে পারে।

সামরিক প্রয়োজনে ব্যয়

স্টকহোম আন্তর্জাতিক শান্তি গবেষণা ইনস্টিটিউটের ইয়ারবুকে বিশ্বের অস্ত্রসজ্জা সম্পর্কে কিছু তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। ১৯৬৫ সালে সামরিক প্রয়োজনে বিশ্বের যে-পরিমাণ সম্পদ ব্যয় করা হত এখন ব্যয় করা হচ্ছে তার ৩০ শতাংশ বেশি, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৪০ শতাংশ বেশি। ওয়ারশ চুক্তিভুক্ত অন্য দেশগুলোতেও সামরিক প্রয়োজনে ব্যয় বৃদ্ধি যথেষ্ট বেশি।

অন্যান্য এলাকাতেও কম নয়। আরব-ইসরায়েল সংঘর্ষের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত নয় মধ্যপ্রাচ্যের এমন দেশগুলিতেও সামরিক প্রয়োজনে ব্যয় যথেষ্ট বেড়েছে। আফ্রিকায় বাড়ছে প্রতি বছরে সাত থেকে আট শতাংশ হারে। সামরিক প্রয়োজনে ব্যয় সামান্য মাত্রায় বেড়েছে একমাত্র ইউরোপের জোট-নিরপেক্ষ দেশগুলিতে ও ল্যাটিন আমেরিকায়। বিশ্বে বর্তমানে যে-পরিমাণে উৎপাদন হচ্ছে তার সাত থেকে আট শতাংশ ব্যয় করা হচ্ছে সামরিক প্রয়োজনে—প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে ব্যয় করা হত ৩-৫ শতাংশ। অর্থাৎ প্রতি পনেরো বছরে ব্যয়ের মাত্রা দ্বিগুণ হচ্ছে।

আধুনিক ও প্রযুক্তিবিদ্যার দিক থেকে উন্নত যুদ্ধাস্ত্র এখন আর তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলিতেও অপরিচিত নয়। এমনি উনিশটি দেশের সংগ্রহে দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্রও আছে (১৯৫৭ সালে একটিরও ছিল না)। শব্দের চেয়েও দ্রুতগামী (সুপারসোনিক) বিমান আছে তৃতীয় দুনিয়ার ৩২টি দেশে (১৯৫৫ সালে একটিরও ছিল না)। মোট সামরিক ব্যয় এই দেশগুলিতে যদিও অপেক্ষাকৃত কম, কিন্তু বৃদ্ধির হার অপেক্ষাকৃত বেশি। ষাটের দশকে বিশ্বের অস্ত্র-সরবরাহের ৭০ শতাংশ করা হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে।

—[illegible]

নিজেরে হারায়ে খুঁজি

অহীন্দ্র চৌধুরী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

তবুও মঞ্চের খবর রাখি বৈকি। ষ্টারে শ্যামলীর দ্বিশততম অভিনয়রজনীর স্মারক অনুষ্ঠান হলো ২৫ আগস্ট। তার পরদিনই ছিল ভাগ্যলক্ষ্মীর রাজপথ চিত্রের মহরৎ। যে মহরৎ অনুষ্ঠানে চিত্রজগতের অনেকের সঙ্গেই দেখা হলো।

অভিনেতৃ সংঘের মিটিং ছিল বসুশ্রী সিনেমায়। মিটিং-এ নানা আলোচনার মধ্যে রাজ্যপালের যক্ষ্মা আরোগ্যশালা নিকেতনের সাহায্যার্থে, ভেটারন বনাম অভিনেতৃ সংঘ ফুটবল ম্যাচের বিষয় আলোচনা হলো। প্রস্তাবিত ফুটবল ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে ১৮ সেপ্টেম্বর।

সেদিনের চ্যারিটি ম্যাচে অতীতের ফুটবলজগতের অনেক দিকপাল উপস্থিত ছিলেন। সুধীর চ্যাটার্জি ছাড়াও পুরাতন দিকপাল খেলোয়াড়দের আরো অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

এই চ্যারিটি ম্যাচে সংগৃহীত হয়েছিল চোদ্দ হাজার, দুশ দু' টাকা। যে টাকাটা রাজ্যপালের যক্ষ্মা আরোগ্যশালা নিকেতনের তহবিলে দেওয়া হয়েছিল।

বেশ কিছুদিন পর আবার একটা ভ্রমণ-সূচী তৈরি হলো। এমন কিছু দূরে নয়—হাজারীবাগ যাওয়াই ঠিক। ১৬ অকটোবর রাঁচী এক্সপ্রেসযোগে রওনা হলাম। দলটিও খুব ছোট নয়, সপরিবারে চলেছি।

রামগড় পৌঁছলাম পরদিন ১৭ অকটোবর। ঐ দিনেই হাজারীবাগ।

একটি মনোরম বাংলো আমাদের আশ্রয়। এই হাজারীবাগের বাংলোয় অমৃতবাজার পড়তে গিয়ে একদিন নজর পড়লো একটি খবর—যেখানে সঙ্গীত নাটক আকাদমীর প্রসঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে একটি সংবাদ। পড়লাম, উদয়শঙ্কর নিযুক্ত হয়েছেন ডীন অব ডান্স। আর আমার নামও প্রকাশিত হয়েছে, ওই একই বিশেষণ নিয়ে। ডীন অফ ড্রামা।

বাইরে এসে কোথাও স্থির থাকতে পারি না। যেটুকু সময়, ভরিয়ে নিই ঘুরে বেড়িয়ে। যা কিছু দেখার সবই দেখি। এতো দেখি, তবু হয়তো অনেক কিছু অদেখা থেকে যায়।

তিলাইয়া বাঁধ, রামগড় রাজের প্রাসাদ, প্রভৃতি আরো অনেক কিছু দেখেছি। কিন্তু সবচেয়ে ভালো লাগে চারদিকের পাহাড় আর অরণ্যকে। এই আরণ্যক পরিবেশে কোন পাহাড়ের কাছে দাঁড়িয়ে থাকার মধ্যেও একটা অবাক্ত আনন্দ মিশে থাকে, যে আনন্দের কথা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

জীবনে আমি এমন একটা জগৎ বেছে নিয়েছিলাম, কর্মক্ষেত্র হিসেবে—যেখানে সবই আছে, শুধু আপনাকে আত্মস্থ করার অবসর নেই। অথচ নিজের মধ্যে নিজেকে দেখার, একটু অবসর—এই তো খুঁজে বেড়িয়েছি সারা জীবন। এই অবসর যদি কোথাও পেয়ে থাকি, তবে তা জনকোলাহলের বাইরে, হয় পাহাড়ে, না হয় সমুদ্রে না হয় কোন আরণ্যক পরিবেশে।

নানা জায়গায় বেড়াই। হাজারীবাগ এসে কার্হেপিঠ যতটুকু দেখার দেখলাম। বোকারো দেখতে গেলাম একদিন। আধুনিক বিশ্বকর্মার বিরাট কর্মযজ্ঞ প্রত্যক্ষ করলাম।

কিন্তু এতোর মধ্যেও নতুনত্বের স্বাদ পেলাম নরসিংহ স্থান মেলায়। হাজারীবাগ থেকে মাইল তিনেক দূরে একটি প্রাচীন মন্দিরকে ঘিরে এই মেলা। আশপাশের দূর-দূর গ্রাম থেকে [illegible] ছুটে এই মেলায় ঢল নামে। সর্বত্র যেমন, এখানেও তেমন। কিন্তু নরনারীর মধ্যে [illegible] যেন বেশী। তাই বোধ হয় মেলা এমন আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে আমাদের কাছে।

হাজারীবাগ থেকে একদিন গয়া গেলাম। গয়াতে এসে পিতৃ-পুরুষের শ্রাদ্ধ তর্পণ না করলে নয়। আমিও ফল্গু নদীর তীরে বিষ্ণুপাদ-পদ্মে পিতৃ-পুরুষের উদ্দেশ্যে তর্পণাদি করলাম।

এতোদিন শুনে এসেছি রাজরাপ্পার ছিন্নমস্তা মন্দিরের কথা। এবারে দর্শনের সুযোগ পেলাম। দামোদরের ওপর, ভেরা নদীর প্রপাত ধারে বিখ্যাত ছিন্নমস্তার মন্দির। শুনেছি, দেবী এখানে জাগ্রতা।

রামগড় থেকে জীপে করে আমরা সদলে এসেছি দেবী ছিন্নমস্তার মন্দিরে। দর্শন করেছি দেবী—পূজো দিয়েছি, গ্রহণ করেছি দেবীর প্রসাদ। মন্দির সামনে দাঁড়িয়ে দেখলাম, পাহাড়ের পটভূমিকা। দেখলাম গভীর খাদের ভিতর দিয়ে প্রবল কলোচ্ছ্বাসে প্রপাতের জল ছুটে চলেছে। সত্যি, এখানেই মানায় দেবী ছিন্নমস্তাকে।

দেবী ছিন্নমস্তাকে নিয়ে নানা কাহিনী লোকমুখে ছড়িয়ে আছে। সে সব কাহিনীর অবতারণা এখানে করতে চাই না—শুধু মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে মনে হলো, আমরা যেন এক কিংবদন্তীর রাজ্যে এসে সিংহাসনের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর মন্দিরে এসে পৌঁছেছি।

হাজারীবাগের দিন ফুরিয়ে এলো। হয়তো কলকাতা থেকে বাদুলালজীর তার না পেলে আরো কয়েকটা দিন থাকতাম।

কিন্তু আর থাকার উপায় নেই। এখনো নির্মীয়মান ছবিতে চুক্তিবদ্ধ হয়ে আছি—না গেলে তো চলবে না।

সতেরোই নভেম্বর হাজারীবাগ থেকে রওনা হয়ে পরদিন কলকাতায় এসে পৌঁছলাম।

আবার সেই পুরোনো পরিবেশ, আবার সেই দৈনন্দিন জীবনের জের টেনে চলা।

তবু একটা বৈচিত্র্য খুঁজে পেলাম, আকাদমী নিয়ে। কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল—কিছু অভিনেতা, অভিনেত্রীর জন্য। দরখাস্তও এসেছিল। তাদের ইন্টারভিউ নেওয়া হলো ২০ নভেম্বর।

পরদিন সকালে নাট্যকার শচীন সেনগুপ্ত বীরেন ভদ্র [illegible] এলেন আমার বাড়িতে। প্রায় ঘণ্টা-খানেক কাটলো নানা গল্পে।

CENTRAL LIBRARY

আজকাল এ ধরনের বৈঠকী গল্প মন্দ লাগে না। কিন্তু গল্প করে কাটাবার মতো সময় কই। সামনে তো কাজের দিন পড়ে রয়েছে।

রাজ্যপাল হরেন্দ্রনাথ মুখার্জীর সঙ্গে দেখা করতে রাজভবনে যেতে হলো ২৭ নভেম্বর।

বোম্বে এবং কলকাতার শিল্পীদের নিয়ে একটি ক্রিকেট খেলার আয়োজন চলছে, উদ্দেশ্য রাজ্যপালের তহবিলে সাহায্য।

আবার ঐ দিনেই লোকরঞ্জন শাখার জন্যে কয়েকজনের ইন্টারভিউ নেওয়া হলো। সেখানে আমি ছাড়াও পঙ্কজ মল্লিক এবং মথুর উপস্থিত ছিলেন।

এ সবের মধ্যেও ছবির কাজ আছে। শ্রীমতী পিকচার্সের দেবত্র ছবির স্যুটিং ছিল ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে। শিল্পীদের মধ্যে কানন দেবী এবং গুরুদাসও ছিলেন।

অভিনেতা শরৎ চাটুজ্যের জীবন এভাবে শেষ হবে, এ স্বপ্নেরও অতীত। মৃত্যু তার আকস্মিক, কিন্তু দুঃখ তার জন্যে নয়, দুঃখ তার জীবনের শেষ দিনগুলোর জন্যে।

শরতের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল নিবিড়। তাকে তো দেখেছি, মানুষ হিসেবে সে ছিল সাধারণ মানুষের চেয়ে বড়ো। বিশেষ করে তার হৃদয় মনের ব্যাপ্তি ছিল অনেকখানি। স্বার্থপরতা ছিল না, এমন কথা বলবো না, কিন্তু হীন স্বার্থবুদ্ধি নিয়ে সে কখনো চলে নি। নিজে থিয়েটার করেছে, মালিক হয়েছে, অনেক গর্বও পেয়েছে—কিন্তু যতো না রোজগার করেছে তার চেয়ে খরচ করেছে অনেক বেশী। ভবিষ্যতের জন্যে সঞ্চয় করা দূরে থাক, হয়তো ভবিষ্যতের কথা ভাবেও নি। আর তারই জন্যে হয়তো এই পরিণতি।

যে মানুষ ছিল থিয়েটারের মালিক-অভিনেতা, যে দামী গাড়ী ভিন্ন চড়তো না, দামী পোশাক ছাড়া পরতো না, খরচ করতো দু হাতে—সেই মানুষ শেষটা যাত্রা করতে আরম্ভ করেছিল আপন অস্তিত্ব বজায় রাখতে।

অথচ মরবার আগের রাত্রেও সে যাত্রাভিনয় করে ভোরে বাড়ি এসেছিল। বাড়ি ফেরার কিছুক্ষণ বাদেই মানুষটা আচমকা ফুরিয়ে গেল।

শরতের মৃত্যুর খবর পেলাম স্টুডিওতে বসে। মনটা খারাপ হলো। শিল্পীজীবনে এমন মর্মান্তিক পরিসমাপ্তি কোন শিল্পীই কামনা করে না। বিলাসের মধ্যে প্রাচুর্যের মধ্যে যার দিন কেটেছে, তার জীবনের শেষ পর্যন্ত কাটলো দারিদ্র্যের মধ্যে। আর এই দারিদ্র্যই বোধ হয়, তাকে এমনভাবে ছিনিয়ে নিয়ে গেল।

বছরটা শেষ হতে আর কদিনই বা বাকী। বাকী দিনগুলোর কথা আর কি বলবো। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোকরঞ্জন শাখা, অভিনেতৃ সংঘ—এ সব নিয়েই কাটলো। এর মধ্যে দুটো ছবির কাজ অবশ্য করেছি, ছবি দুটো হলো ভারতলক্ষ্মীর রাজপথ আর শ্রীমতী পিকচার্সের দেবত্র।

শেষ হলো উনিশ শ চুয়ান্ন। নতুন বছরের প্রথম দিনটিকে স্বাগত জানালাম প্রতিবারের মতো।

বছরের প্রথম দিনটিতে অনুরোধ এলো মহেন্দ্র গুপ্তের কাছ থেকে। মহেন্দ্রবাবু মিনার্ভা নিয়েছেন। মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের জাহাঙ্গীর অভিনয়ের আয়োজন করছেন। মহেন্দ্রবাবু এলেন আমার কাছে। অনুরোধ, আমি যেন মিনার্ভায় যোগ দিই।

'আমাকে ভুল বুঝবেন না, আমি আর পারবো না অভিনয় করতে।' আমার কথা আমি জোরের সঙ্গেই বললাম। নতুন করে আর জড়াতে চাই না যেটুকু জড়িয়ে আছি, তা থেকে মুক্ত হবার চেষ্টা করছি।

মহেন্দ্রবাবু চলে গেলেন। এ ব্যাপারে মণিলালবাবুও আসতে চেয়েছিলেন আমার কাছে। আমি না করলাম।

আর অভিনয় নয়—আর পারবো না। এবারে নতুন করে জীবনকে দেখতে চাই। জানি না আমার সে আশা পূর্ণ করতে পারবো না কিনা। কিন্তু আশা নিয়েই তো মানুষ বাঁচে। আমি তো তার বাইরে নই।

তবুও নাট্যজগতের খবর রাখি। শুনলাম, শিশিরবাবু শ্রীরঙ্গমে মিশরকুমারী করছেন। আর শিশিরবাবু অভিনয় করছেন আবনের ভূমিকায়। কিন্তু মিশরকুমারী কদিন চলেই বন্ধ হলো। আবার ঐ একই নাটক মিনার্ভায় অভিনীত হলো মহেন্দ্রবাবুর পরিচালনা। সেখানে আবনের ভূমিকায় আছেন মহেন্দ্রবাবু।

ভারত-চীন সুহৃদ সমিতির সহ-সভাপতি ছিলাম আমি। সুতরাং চীনা সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি দলের কলকাতা আগমন উপলক্ষে আমারও কাজ কিছুটা বাড়লো বৈকি।

চীনা প্রতিনিধি দল হাওড়া স্টেশনে এলে তাঁদের স্বাগত জানাতে আমাকেও যেতে হয়েছিল। সেদিন তারিখ ছিল ৬ জানুয়ারী। ঐ দিনেই কলকাতার মেয়র নরেশ মুখার্জী চীনা প্রতিনিধি দলকে পৌর সম্বর্ধনা জানালেন। সেখানেও আমাকে উপস্থিত থাকতে হয়েছিল।

পরদিন ৭ জানুয়ারী চীনা প্রতিনিধিগণকে সম্বর্ধনা জানালো চীনা কনসাল অফিস। সেখানেও কলকাতার শিল্পীগোষ্ঠীর অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে অর্ধেন্দু মুখার্জি, সুপ্রভা মুখার্জী, জহর গাঙ্গুলী, বিকাশ রায়, সরযূবালা, নাট্যকার শচীন সেনগুপ্ত প্রমুখ ছিলেন।

চীনা সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি দলকে আরো কয়েকটি অনুষ্ঠানে সম্বর্ধনা জানানো হয়েছিল। আর প্রতিটি অনুষ্ঠানেই আমি উপস্থিত ছিলাম।

অভিনেতৃ সংঘ যে চীনা প্রতিনিধিগণকে সম্বর্ধিত করেছিল, সেখানে শ্রেষ্ঠ শিল্পী সমন্বয়ে অভিনীত হয় শচীন সেনগুপ্তের সিরাজদ্দৌলা। নাটকে আমি ছিলাম গোলাম হোসেন, আর নামভূমিকায় ছিলেন ছবি বিশ্বাস।

পুরোনো দিনের কথা লিখতে বসলে, সব কিছুর যেন খেই হারিয়ে যায়। ছোট বড়ো কতো ঘটনা দিনপঞ্জীর পাতায় পাতায়। তার মধ্যে কতক লিখি, কতক লিখি না।

শ্যামলী সে সময়ের একটি মঞ্চসফল নাটক। ঐ নাটকটির তিনশত রজনীর স্মারক অভিনয় অনুষ্ঠিত হলো ১৫ই জানুয়ারী। ফেব্রুয়ারী মাসের এগারো তারিখে আশুতোষ মেমোরিয়াল হলে ললিতকলা আকাদমীর উদ্যোগে 'হাঙ্গারীর লোকশিল্প' প্রদর্শনীর উদ্বোধন হলো। উদ্বোধন করলেন রাজ্যপাল। এখানেই লেডি রাণু মুখোপাধ্যায় আমার সঙ্গে অধ্যক্ষ রমেন চক্রবর্তীর আলাপ করিয়ে দিলেন। শ্রীচক্রবর্তী আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ।

দিল্লীতে যে ফিল্ম সেমিনার অনুষ্ঠিত হবে, তাতে বাংলাদেশ থেকে যোগ দেবার কথা ছিল ছবি বিশ্বাসের। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমাকেই যেতে হলো।

বাইরে যাবার নামেই আমি মানুষটা যেন বদলে যাই। দিল্লীর পথে রওনা হলাম ২৪শে ফেব্রুয়ারী। আমি একা নই—চলেছি সপরিবারে। এ ছাড়া আছেন দেবকী বসু, সৌরীন সেন ছাড়া আরো অনেকে। পথে মথুরা দর্শন করলাম। বৃন্দাবনও বাদ গেল না।

তীর্থস্থানে এলে সুধীরা তো কোন মন্দিরই বাদ দেয় না। বৃন্দাবনে যতো মন্দির সর্বত্র গেল। দেবতা দর্শন করলো। আমিও এ সবের বাইরে নই। তবুও সুধীরার সঙ্গে আমার দৃষ্টিভঙ্গীর অনেক তফাৎ। ও যখন দেবতার কাছে করজোড়ে প্রণাম নিবেদন করে, হয়তো আমি তখন মন্দিরগাত্রে কোন শিল্প-নিদর্শন দেখতে ব্যস্ত।

(ক্রমশঃ)

গোয়েন্দা কবি পরাশর

প্রেমেন্দ্র মিত্র রচিত
শৈল চক্রবর্তী চিত্রিত

অঙ্গনা

জনপ্রিয় শাড়ি-ওড়না

একটা কথা সেদিন ভাবিনি। কিন্তু আজ ভাবতে হচ্ছে। অবশ্য এর মহড়া শুরু হয়ে গেছে চাল আমাদের বেচাল করার অনেক আগে থেকেই। চালের বদলে রুটি-সবজি খেয়ে খাদ্যাভ্যাসে বিপ্লব আনছি। সেটা নেহাত বিপাকে পড়ে। কিন্তু অন্যদিক থেকে স্বচ্ছলতা সত্ত্বেও অনেক মোহে অনভ্যস্ত মজে বসে আছি। তা হলো ট্রাউজার্স। এর প্রতাপে ধুতি এখন শহর এলাকায় ক্রমেই অবহেলা হচ্ছে। ট্রামে-বাসে আর রাস্তা-ঘাটে খুব কম লোকই ধুতি-শোভিত দেখা যায়। ট্রাউজার পরাটা ইদানিং একটা রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সবাই এ-ঘাটে মাথা মুড়োচ্ছেন। যাঁরা বাদ ছিলেন তাঁরাও। দেখতে দেখতে চোখটা পচে যাচ্ছিল। একদিন সরাসরি একজনকে জিগেস করে বসলাম। কলেজে পড়ি। কো-এডুকেশন। এক সহপাঠী নিয়মিত ধুতি পরে আসতো। সেভাবেই তাকে দেখতে অভ্যস্ত। অন্য সহপাঠীর মধ্যেও ধুতি পরা জনাকয় সহজ মনোযোগ আকর্ষণ করে। হঠাৎ দেখি একদিন সেই ছেলেটি ধুতি ছেড়ে প্যান্ট পরেছে। আশা করিনি। খারাপ লাগলো। কারণ জানতে চাইলাম। বাস-ট্রাম, চলাফেরা ইত্যাদি নানাকথা অজুহাতে পরিবেশে টীকা জুড়ে দিল, ইকনমিক। পাশেই দাঁড়ানো তারই সহ-পাঠী মন্তব্য করলো, ট্রাম-বাস ওসব কিছু নয়, তবে শেষের কথাটা কিছু সত্যি। ধুতি পরা সেই সহপাঠী প্যান্টের তুলনায় অনেক বেশি জবজবে করছিল। আর সেই মুহূর্তে ওকে অসম্ভব স্মার্ট মনে হচ্ছিলো।

সেদিনই বোঝা যাচ্ছিল ধুতির বাজার শেষ। এবার এর দেখা হয়তো পাওয়া যাবে পালা-পার্বণে। কিন্তু সে আশাও নস্যাৎ হয়ে গেছে। এখন উৎসবের আলোয় সাজতে গিয়ে সকলের মনে পড়ে ট্রাউজারের কথা। ধুতি হলো তোলা পোশাক। তবে খুব কমই পরা হয়। আবার কারো কারো সব সময়েই তোলা থাকে। এভাবে এক বিদেশী পোশাকের দাপটে দিশী পোশাককে আমরা ভুলে বসে আছি। অন্যভাবে বলা যায়, ভুলতে বাধ্য হয়েছি।

প্রসঙ্গান্তরে কিছুটা আলোচনা হলো বটে কিন্তু অবস্থা আজকে এরকমই। এবার একটু অন্যদিকে নজর ফেরানো যাক। সম্প্রতি নয়াদিল্লীর এক খবরে প্রকাশ যে ভারতীয় ওড়না বিদেশে খুবই জনপ্রিয় হয়েছে এবং বিদেশী মুদ্রা সংগ্রহের অন্যতম সহায়ক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এবছর ছয় কোটি টাকার ওড়না বিদেশে রপ্তানি হয়েছে। মাত্র কয়েক বছর পূর্বেও অর্থমূল্যে যা ছিল মাত্র দুই কোটির মধ্যে সীমাবদ্ধ। এ-খবরে সবাই উৎসাহিত হবেন। ভারতীয় পোশাক বিদেশী ললনাদের মন আলো করছে একথা আমাদের জানা থাকলেও এতটা জনপ্রিয়তার তথ্য অবজ্ঞাতই ছিল। সেদিক থেকে বরং শাড়ি যে বিদেশে কেউ কেউ পোশাক হিসেবে পছন্দ করছেন সেটাই আমাদের বেশি জানা ছিল।

শাড়ি এবং ওড়না এই দুই পোশাকই বিদেশে জনপ্রিয় হচ্ছে। অথচ সে দেশ-গুলির মধ্যে আছে ফ্যাশানে বিপ্লবসৃষ্টি-কারীরা পর্যন্ত। নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ওঁরা মেতেছিলেন। একই পোশাক কত-রকম ছাট-কাট করে নতুন ফ্যাশান হিসেবে ওঁরা বাজারে ছাড়ার চেষ্টা করেছেন তার ইয়ত্তা নেই। সেই ফ্যাশান কখনো হাঁটু ছুঁয়েছে। আবার কখনো হাঁটু ছাড়িয়ে গোড়ালির ওপর দিয়ে চলাফেরা করেছে। কিন্তু সে ফ্যাশানে সাময়িক আলোড়ন ছাড়া আর কিছুই সম্ভব হয়নি। নতুন স্বাদ জোগানোর সকল চেষ্টাই বদ্ধ জলাশয়ের মতো এপারে-ওপারে ধাক্কা খেয়েছে।

তাই এবার ওদের আর একটা প্রয়াস দেখা গেল মিনির প্রবর্তনে। রাতারাতি মিনিতে বাজার ছেয়ে গেল। মিনি স্কার্ট আর মিনি জামা ছাড়া কোন পোশাক নেই। সেই ঢেউ আমাদের পর্যন্ত নাড়া দিয়ে গেল। তাড়াতাড়ি সব পোশাককে খরচের খাতায় জমা করে এই নিয়ে আমরাও মত্ত হয়ে গেলাম। বেশি কিছু ভাববার ফুরসতও ছিল না। পিছিয়ে পড়ে আফশোষ করে লাভ নেই। তাই দিনের সঙ্গে তাল মেলাতে বাধ্য হলাম।

এখন আবার মিনির বাজার ঢিমে হয়ে এসেছে। পুরোপুরি রেশ কেটে না গেলেও অনেকেই নতুন কিছুর সন্ধান করছেন। বাসন্তি ঢঙে দুল্গি-কামিজ এবার ফ্যাশানে নতুন যোগান। এই ফ্যাশান তেমন বাজার অবশ্য এখনো পাচ্ছে না। তবে কেউ কেউ পছন্দ করছেন। হয়তো সবাই একবার অন্তত চোখ দেখবেন। নতুন কিছু না বের হওয়া পর্যন্ত এই ফ্যাশান চলবে।

উঠতি মেয়েদের মধ্যে চলতি ফ্যাশানই জনপ্রিয়। ওরা শাড়ির কথা বড় একটা ভাবে না। অথচ একটা সময় ছিল যখন মেয়েরা বড় হয়ে শাড়ির কথাই ভাবতো। কবে শাড়ি পরতে পারে সেই রঙীন ভাবনায় মশগুল হয়ে থাকতো। আর যেদিন অনভ্যস্ত শরীরে শাড়ি চাপাতে পারতো সেদিন তার আনন্দের কথা বলে বোঝানো যায় না। রাস্তা দিয়ে এমনভাবে চলাফেরা করতো যেন সবাই ওর দিকে তাকিয়ে আছে। বাড়িতে সবাই ঠাট্টা করতো, তোকে যে আর চেনা যাচ্ছে না। এবার বিয়ের চেষ্টা দেখতে হয়।

ঠিক একরম আকাঙ্ক্ষা বোধহয় উবে গেছে। তার পরিবর্তে বাজার-চলতি ফ্যাশান সকলের মন টানে। এমনিভাবে একেত্রেও আমরা বেপাত্তা হতে চলেছি। ট্রাউজার ধুতির রাজ্য থেকে আমাদের উৎখাত করেছে। আর নতুন ফ্যাশানের ঢেউ এবার সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে শাড়ি থেকে। এরই মধ্যে বোমা ফাটানোর মতো খবরটা এসে পৌঁছুলো, বিদেশে শাড়ি-ওড়না ক্রমেই জনপ্রিয় হচ্ছে।

আদিম মানুষ বাকল পরতো। সেদিনও ফ্যাশান ছিল। তারপর বুদ্ধি-বৃত্তির সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিজ নিজ পোশাক রূপ নিয়েছে। আমরা পছন্দ করেছি শাড়ি। সারা শরীর ঢেকে এক অদ্ভুত সৌন্দর্য সৃষ্টির চেষ্টা করেছি। অন্যান্যরা অন্যভাবে ভেবেছেন। আভিজাত্য লজ্জা ঢাকার জন্যই সারা শরীর আবৃত করেছি। সেই সৌন্দর্য কিছু কম নয়। সবকিছু অপ্রকাশ রেখেও এমন সুস্পষ্ট সৌন্দর্য আর নেই।

দিনকাল বদলেছে। অনেকে এতে সন্তুষ্ট হয়নি। প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। দেহসৌন্দর্য প্রকাশ করে ফ্যাশান চাই। যোগানদার প্রস্তুতই ছিল। যা কিছু চাহিদার দরকার। সে চাহিদা যখন সৃষ্টি হলো আর পিছুটান নয়। বাজারে আলো ফ্যাশান সব বেরুতে লাগলো। সুঠাম শরীরের নিখুঁত মাপে। সবই স্পষ্ট। কোথাও অস্পষ্টতা নেই। এক-বারও ভেবে দেখার সুযোগ হলো না যে দিন দিন এভাবে এগুতে থাকলে যেখান থেকে আমরা উঠে এসেছি আবার সেখানে ফিরে যাবো। সেই পরিণতিটা খুব একটা ভয়াবহ হবে না। কারণ সেই আগামী প্রত্যূষে সকলের তো একই অবস্থা। উন্মুক্ত আলোয় স্বচ্ছন্দ বিচরণ করা চলবে, গুহা খুঁজতে হবে না।

বিদেশে শাড়ি-ওড়নার জনপ্রিয়তায় মনে হচ্ছে, সেই অনিবার্য পরিণতি পিছিয়ে যাচ্ছে। ফ্যাশানের কোন বৈচিত্র্যে ওদের মন ভরেনি। তাই এবার বেছে নিলো শাড়ি। মিনিতে অনেক সুপ্রকাশ থেকেও ওদের ফ্যাশান-তৃষ্ণা ছিল অতৃপ্ত। খোলা-মেলার চেয়ে ঢাকাচুকিতে যে বাহার আরো খোলে এ বোধেই ওরা এবার হাত বাড়িয়েছে শাড়ির দিকে। চিরন্তন এই ফ্যাশানই শেষপর্যন্ত বাজিমাৎ করলো দেখা যাচ্ছে।

তবু ট্রাউজারের মোহ কাটবে কি? ধুতির কাছাকাছি ফিরে আসার চেষ্টা করবেন কি উঠতি যুবকের দল? কারণ, ফ্যাশানে তারাও কিছু মেয়েদের চেয়ে কম নয়। তবে আশা করা যায়, বিদেশে শাড়ি-ওড়নার কদরের পর উঠতি মেয়েরা এ সম্বন্ধে কুতূহলী হবে। সবদিক থেকে বেপাত্তা হবার আশঙ্কা অন্তত কিছুটা দূর হয়।

—প্রমীলা

প্রেক্ষাগৃহ

বিলেত ফেরৎ/পরিচালক : চিদানন্দ দাশগুপ্ত, ক্যামেরাম্যান: ধ্রুব বোস ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়।
ফটো : সমন্ত

চিত্র-সমালোচনা

চলচ্চিত্র ভাষার সার্থক প্রয়োগ :

একদিন ছিল, যখন দর্শকগণ বাস্তব জগতের কঠিন নাগপাশ থেকে অন্তত কিছুটা সময়ের জন্যে মুক্তি পাবার লোভে লোকে সিনেমা গৃহে গিয়ে কাহিনী চিত্রের মধ্যে স্রেফ ডুবে গিয়ে তার মনের পলায়নী-বৃত্তির বা এসকেপিজম-এর চরিতার্থতা সাধন করত। কিন্তু ব্যবসায়ীদের হাত থেকে চলচ্চিত্র ক্রমেই সৃষ্টিধর্মী চিত্রকারদের তথা পরিচালকদের করায়ত্ত হচ্ছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইটালী ও ফ্রান্সে ব্যাপারটা শুরু হয়ে আমাদের পশ্চিমবঙ্গ পর্যন্ত তা ছড়িয়ে পড়েছে, তার প্রমাণ পাওয়া গেল সত্যজিৎ রায় কৃত ও প্রিয়া ফিল্মস নিবেদিত 'প্রতিদ্বন্দ্বী' ছবি দেখে। যিনি এই অত্যন্ত আধুনিক ছবিখানি দেখতে গিয়ে নিশ্চিন্ত মনে চেয়ারের পিছনে হেলান দিয়ে তাঁর আগে দেখা আর পাঁচটা ছবির মতো এই ছবিটিরও কাহিনীর গলাধঃকরণ করবার আনন্দ উপভোগ করতে চাইবেন, তিনি নিশ্চয়ই ভুল করবেন। কারণ, ছবিখানি শুরুতেই তাঁর মনকে সজোরে নাড়া দেবে এবং ছবি যত এগুবে, ততই তিনি তাঁর চেয়ারে সোজা খাড়া হয়ে বসে ছবিটির সক্রিয় অংশীদার হয়ে উঠতে চাইবেন। আজকের কলকাতার একটি মধ্যবিত্ত ঘরের উচ্চাকাঙ্ক্ষী যুবকের জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার চেষ্টা নিত্য বিপরীত সংঘাতের দ্বারা কিভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়ে তার মধ্যে বিরাট নৈরাশ্যের সৃষ্টি করতে পারে, সম্পূর্ণ চলচ্চিত্রভাষার সাহায্যে শ্রীরায় তাকেই সুস্পষ্টরূপে অঙ্কিত করেছেন। বাঙময় ছবি ও ধ্বনির সুষ্ঠু সমন্বয়ে তিনি এই ছবিতে যে চলচ্চিত্রভাষার প্রয়োগ করেছেন, তার তুলনা পাই আন্তোনিওনির ব্লু অ্যাপ্ এর-তে। ভারতে এই চিত্রভাষার সার্থক প্রয়োগ এই প্রথম দেখা গেল।

ছবিটির মূল কাহিনীকারের নাম বিজ্ঞাপিত হওয়া সত্ত্বেও আমরা বলব, সত্যজিৎ রায় তাঁর চিত্রভাষার মাধ্যমে তাঁর বক্তব্যকে যেভাবে দর্শকদের সামনে তুলে ধরেছেন, সেই বক্তব্যকে ঐভাবে সাহিত্যের মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে ব্যক্ত করা আদৌ সম্ভব নয়। চলচ্চিত্র যে সাহিত্য নির্ভর নয়, তার যে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ শিল্পসত্তা আছে, সেই কথাই সুপ্রমাণিত করেছেন শ্রীরায় তাঁর 'প্রতিদ্বন্দ্বী' চিত্রের মাধ্যমে।

ছবির নায়ক সিদ্ধার্থ চৌধুরীর মন অতীতের সঙ্গে যুক্ত। জীবনের সনাতন মূল্যমানকে সে সহজে উপেক্ষা করতে পারে না। অথচ তার বাড়ীতেই সে দেখছে, তার বয়স্থা অবিবাহিতা ছোট বোন সুতপা তার অফিস-বসের সঙ্গে ঘুরে বেড়ানোকে অন্যায় মনে করে না। তার পার্সোন্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট হতে পারাকে সে গর্বের জিনিস মনে করে। এই ছোট বোনের সঙ্গে কি সম্প্রীতিই না ছিল তার ছেলেবেলায়। ছোট ভাই টুনু আজ বেপরোয়া; সে সামাজিক আদর্শকে ভেঙে ফেলতে চায়, পুরাতনের প্রতি তার কোনো শ্রদ্ধা নেই। সিদ্ধার্থ সারা দিন ধরে আপিসপাড়ায় মনের মতো চাকরীর খোঁজ করে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। সন্ধ্যার পর বন্ধুদের আড্ডায় গিয়ে সে একটু চাঙ্গা হয়। কিন্তু 'রেডক্রশ'-এর চাঁদাভরা টিনের কৌটো থেকে টাকা বার করে নেওয়া, মদ খাওয়া কিংবা সুলভা নারীর সঙ্গ লাভ করায় তার মন আতঙ্কে ওঠে। তাই ওর কথায় বলে, পেটে খিদে, মুখে লাজ। সিদ্ধার্থ মুখ বিকৃত করে অল্প পরিমাণে মদ খায়ও, কিন্তু সুবেশা নারী নর্তকীর বেহায়াপনা তার কাছে অসহ্য; তাই সে নিমেষে দূরে সরে যায়। অথচ কলেজে পড়া শিষ্ট মেয়ে কেয়ার সান্নিধ্য তার ভালোই লাগে। এমন কি, যখন সে মেডিক্যাল সেলসম্যান হিসেবে বালুরঘাটে কাজ শুরু করেছে, তখন সে সুদূরে নিরালায় চিঠি লেখে ঐ কেয়াকেই।

'প্রতিদ্বন্দ্বী'তে শ্রীরায় চিত্রগ্রহণে আগাগোড়া যে পরিমিত শট্-এর প্রয়োগ করেছেন তা রীতিমত বিস্ময়কর। শেষ ইন্টারভিউ-এর দৃশ্যে কর্মকর্তাদের অমানুষিকতার প্রতিবাদে সিদ্ধার্থ যখন সবকিছু তছনছ করে বেরিয়ে আসে, তখন তাকে আমরা রাস্তায় ক্ষণিকের জন্যে দেখার পরেই দেখি, ক্যামেরার সামনে দিয়ে সবেগে

CENTRAL LIBRARY

অপসৃয়মান নানা লেখা-ভরা দেয়াল এবং পরে সিন্ধু ডিপ-দাগ ডিজাইন। এরই পরে একটি কনুই দেন দ্রুত চলমান ট্রেনের জানলায় ভর করে রয়েছে এবং তার পরই একটি গ্রাম-গুলের খোলাবাড়ড়া পার হয়ে একটি সিঁড়ির ওপরে রাখা ক্যামেরার মাধ্যমে দেখা যায়, একটি মোটা মাথার লোকের পিছনে উঠছে সিদ্ধার্থ—সোজা কলকাতা থেকে বালুরঘাট। এবং দৃশ্যগুলিকে অত্যন্ত সংক্ষেপে দর্শকদের চোখের সামনে তুলে ধরার মতো মন্তে তিনি অ্যাবস্ট্রাক্টের জন্যে প্রয়োগ করেছেন সঙ্গীত ও শব্দের সংমিশ্রণ। এক এক জায়গায় বিচিত্র ধ্বনি সৃষ্টির জন্যে তিনি যে কি কৌশল অবলম্বন করেছেন, তা সহজে বোঝাই যায় না। কি বাস্তব চিত্র, কি ধ্বনি প্রয়োগ—কলাকৌশলের দিক দিয়ে একেবারে উন্নত; টেকনিক্যালি এত অ্যাডভান্সড ছবি শ্রীরায় এর আগে কখনো করেন নি।

'প্রতিদ্বন্দ্বী'র শিল্পীতালিকা প্রায় সকলেই নতুন। এবং এই নতুনের মধ্যে নায়ক 'সিদ্ধার্থ'র ভূমিকায় প্রেসিডেন্সী কলেজের ভূতপূর্ব ছাত্র, তার্কিকাগ্রণী ধৃতিমান ,সুন্দর। চট্টোপাধ্যায় এই প্রথম চিত্রাবতরণেই যে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন, তার তুলনা নেই। আড়ষ্টতা নেই কোথাও—সর্বত্র তাঁর সহজ, সাবলীল ভঙ্গী, ইংরেজী বাচন শোনবার মতো। বন্ধু অভিনয়ের ভূমিকায় কল্যাণ চট্টোপাধ্যায়ও বাচনে, ভঙ্গীতে অনবদ্য। সিদ্ধার্থের ছোট ভাই টুনু বেশে শ্রীমান দেবরাজ রায়ও স্বচ্ছন্দভাবে তাঁর চরিত্রটি চিত্রণ করেছেন। বাস্তব জীবনে শ্রীমান সুখ্যাত নাট্যকার-পরিচালক-অভিনেতা তরুণ রায়ের পুত্র। পুণা ফিল্ম ইনস্টিটিউটের পাশ করা ছাত্র ভাস্কর চৌধুরী বন্ধু সিদ্ধার্থের ছোট ভূমিকায় বিশেষ কোনো নৈপুণ্য প্রদর্শনের সুযোগ পান নি। সুতপার ভূমিকায় কৃষ্ণা বসু চরিত্রোচিত সু-অভিনয় করেছেন অত্যন্ত প্রাণবন্তভাবে। কলেজছাত্রী কেয়া চট্টোপাধ্যায়কে সুন্দর ও মধুর ভাবে চিত্রিত করেছেন জয়শ্রী রায়। একটি ছোট দৃশ্যে অফিস-বস-এর উপপত্নীর ভূমিকায় আবেদনপ্রবণ অভিনয় করেছেন মমতা চট্টোপাধ্যায়। হাসপাতালের সেবিকা, শুল্ক চরিত্রে মেয়ে নর্তকীর ভূমিকায় সার্থকভাবে প্রকট করেছেন শেফালি। সুতপার অফিস-বস এবং কেয়ার বাবার ভূমিকায় যথাক্রমে শোভেন লাহিড়ী ও পিশু মজুমদার উল্লেখযোগ্য সু-অভিনয় করেছেন। ছোট সিদ্ধার্থ টুনু ও সুতপা রূপে যে বালকদ্বয় ও বালিকাটি অবতীর্ণ হয়েছে তারা অত্যন্ত প্রীতিপ্রদ। অপরাপর সকল ভূমিকাই প্রয়োজনীয়ভাবে সুনির্বাচিত হয়েছে।

ছবির কলা-কৌশল সম্পর্কে নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। সত্যজিৎ রায়ের সার্বিক নির্দেশে প্রতিটি বিভাগের কর্মীই অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁদের দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন যথাসাধ্য। তবু বিশেষ করে এই ছবিটিতে পাখীর ডাক থেকে শুরু করে ধ্বনির সমারোহ বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার মতো। এ বিষয়ে জে ডি ইরাণী ও দুর্গাদাস মিত্র নিশ্চয়ই প্রশংসা দাবি করতে পারেন।

শহুরে সমকালীন সমাজের বাস্তব প্রতিচ্ছবি হচ্ছে 'প্রতিদ্বন্দ্বী'। এমন আধুনিক ছবি আমরা শুধু পশ্চিমবঙ্গ কেন, ভারতীয় চিত্রজগতে আগে কখনও দেখি নি। তবে ছবিটি সম্পর্কে আমাদের দুটি অভিযোগ আছে, এক, ছবিটিতে ইংরেজীর বহুল প্রয়োগ; দুই, ছবিটিকে অপ্রত্যাশিতভাবে নায়িকার প্রতি নায়কের চিঠির মাধ্যমে শেষ করা হয়েছে। এ দুই-ই পরিহার করা চলত।

'প্রতিদ্বন্দ্বী' ছবি ভারতীয় চিত্রজগৎকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অনেক দূর অগ্রসর করে দিল। এবং এর জন্যে অকুণ্ঠ ধন্যবাদ সত্যজিৎ রায়কে।

স্টুডিও থেকে

জয়া ভাদুড়ীর পর বাংলা ছবির নতুন নায়িকার তালিকায় আরেকটি নাম বাড়ল। নতুন মুখ নিয়ে কাজ করতে এখন সত্যজিৎ-মৃণালই নয়, প্রবীণ নবীন সবাই-ই চাইছেন। পরিচালক হীরেন নাগ এ পর্যন্ত যেকটি ছবি করেছেন তার সব ক'টিই টপ কাস্টিং-এর ছবি। নতুন ছবি '[illegible]'-তে উত্তমকুমার, সাবিত্রী চ্যাটার্জি, অনুপ দত্ত প্রমুখরা রয়েছেন। কিন্তু 'বিগলিত করুণা জাহ্নবী যমুনা'র প্রধান দুটি চরিত্রে আছেন শুভেন্দু চ্যাটার্জি আর মধুছন্দা চক্রবর্তী।

নতুন যে নায়িকার কথা বলছিলাম মধুছন্দা চক্রবর্তীই তিনি। বর্তমানে থাকেন বোম্বাইয়ে। হীরেন নাগের এ ছবিতে তাঁর অভিনয়ই প্রথম নয়। [illegible] বাসু চ্যাটার্জির পরীক্ষামূলক ছবি 'সারা আকাশ'-এর নায়িকা চরিত্রেই তাঁর প্রথম চিত্রাবতরণ।

পরিচালক বাসু চ্যাটার্জি কিছুদিন আগে কলকাতায় এ ছবির এক বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন সাংবাদিকদের জন্য। তখনই সৌভাগ্য হয়েছিল ছবিটি দেখার। ঐ ছবির নায়িকা চরিত্রে শ্রীমতী চক্রবর্তীর অভিনয় ছিল শান্ত অথচ প্রাণবন্ত। হীরেন নাগের নবতম ছবি 'বিগলিত করুণা জাহ্নবী যমুনা'র নায়িকা চরিত্রে মধুছন্দা চক্রবর্তীর নির্বাচন প্রশংসনীয়।

পূজোর আগে শ্রীনাগ উত্তর ভারতে গিয়েছিলেন ছবির আউটডোরের কাজে। সম্প্রতি তিনি ফিরে এসেছেন। কাজ সব শেষ না হলেও যেটুকু হয়েছে তা নির্বিঘ্নেই সম্পন্ন হয়েছে। হনুমান চটি গোমুখ প্রভৃতি জায়গায় তাঁরা কাজ করেছেন।

•

মৃণাল চক্রবর্তীর পরবর্তী ছবির নাম হলো 'তিমির লগন'। মহাশ্বেতা দেবী লিখিত ঐ নামের সাড়াজাগানো উপন্যাস অবলম্বনে ছবির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন পরিচালক শ্রীচক্রবর্তী নিজে। শ্রীসরস্বতী চিত্রের ব্যানারে তৈরী এ ছবির সঙ্গীত পরিচালনা করবেন গোপেন মল্লিক। প্রধান দুটি চরিত্রের জন্য এ পর্যন্ত মনোনীত হয়েছেন উত্তমকুমার ও তনুজা। আগামী সপ্তাহ থেকে চিত্রগ্রহণ শুরু হবে বলে আশা করা যায়।

•

চলচ্চিত্র মঞ্চ ও সঙ্গীত শিল্পীদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল শিল্পী সংসদ বছর দেড়েক আগে। সংরক্ষণ সামরিক অভিযানের সময় ইত্যাদি নিয়ে যখন প্রচুর জলঘোলা হয়েছিল তখনই জন্ম নিয়েছিল শিল্পীসংসদ।

সম্প্রতি জানলাম এই সংস্থা চিত্র প্রযোজনায় হাত দিচ্ছে। রমাপদ চৌধুরীর বিখ্যাত উপন্যাস 'বনপলাশীর পদাবলী'-র স্বত্ব আপাততঃ সংসদ নিয়েছেন ছবি করার জন্য। চিত্রনাট্য লেখা ও পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সংসদ সভাপতি উত্তমকুমারের ওপর। সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন সংসদেরই সভ্য [illegible] সুধীন

স্টারে
[শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত নাট্যশালা]
৪০০তম অভিনয় অতিক্রান্ত
শর্মিলা
অভিনব নাট্যের অপূর্ব রূপায়ণ
প্রতি বৃহস্পতি ও শনিবার : ৬৷টায়
প্রতি রবিবার ও ছুটির দিন : ৩টা ও ৬৷টায়
॥ রচনা ও পরিচালনা ॥
দেবনারায়ণ গুপ্ত
॥ রূপায়ণে ॥
অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, অপর্ণা দেবী, নীলিমা দাস, মঞ্জুলা চট্টোপাধ্যায়, সতীন্দ্র ভট্টাচার্য, কালীপদ বাগচী, দীপিকা দাস, শ্যাম লাহা, প্রেমাংশু বসু, বাসন্তী চট্টোপাধ্যায়, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, ...গীতা দে ও বঙ্কিম ঘোষ।

রসুই
গুঁড়া মশলা
ফোন : ৫৫ ২৯৪১, ৩৩-১৪৭১
রসুই প্রোডাক্টস্
১৭ আর জি কর রোড, কলিকাতা-৪ ॥ ২০১ মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা-৭

পরিচালক। তাঁরা হলেন হেমন্ত, শ্যামল, দ্বিজেন, মানব ও সতীনাথ। চরিত্রচিত্রণে থাকবেন উত্তমকুমার, সুপ্রিয়া দেবী, সুব্রতা চ্যাটার্জি, তরুণকুমার প্রমুখ ছাড়া সংস্থের প্রায় সকল শিল্পী সভ্যবৃন্দ।

•

এ সপ্তাহে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের জন্ম-শতবর্ষ উপলক্ষে মুক্তি পাচ্ছে মিত্র প্রোডাকসনের 'দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন'। রাজ্য সরকার চিত্তরঞ্জন শতবার্ষিকী কর্মসূচীতেও এই ছবিটি দেশের বিশেষ ব্যক্তিবর্গ ও রাষ্ট্রনায়কদের দেখাবার আয়োজন করেছেন। সরোজেন্দ্রনাথ মিত্র প্রযোজিত এ ছবির সংগীত পরিচালনা করেছেন হেমন্ত মুখার্জি। নামভূমিকায় অভিনয় করছেন অনিল চ্যাটার্জি, বাসন্তী দেবীর রূপসজ্জায় আছেন লিলি চক্রবর্তী। রঞ্জিত পিকচার্স পরিবেশিত এ ছবির অপরাপর বিশিষ্ট চরিত্রে আছেন হারাধন ব্যানার্জি, চিন্ময়ী মণ্ডল, নির্মল চ্যাটার্জি, অমর দত্ত, সুব্রত সেন, শমিতা বিশ্বাস, আনন্দ মুখার্জি, দীপক মুখার্জি, রত্না ভট্টাচার্য মাঃ শঙ্কর, সমরকুমার, গৌর শী, অনন্ত মুখার্জি প্রমুখ শিল্পীরা।

•

: সরকার প্রোডাকসন্সের নবতম নিবেদন জরাসন্ধর কাহিনী অবলম্বনে 'অপর্ণা'র চিত্রগ্রহণ কাজ গত ২৬ অক্টোবর থেকে নিয়মিতভাবে নিউ থিয়েটার্স ২নং স্টুডিওতে একটানা চলছে। ছবির নায়িকা তনুজা—ছবির চিত্রগ্রহণের জন্য গত ২৭ অক্টোবর কলকাতায় এসে পৌঁছেছেন। সলিল সেন ছবিটির পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন—আর সংগীত পরিচালনা করবেন রবীন চট্টোপাধ্যায়। সৌমিত্র চ্যাটার্জি ও তনুজা এই ছবির নায়ক-নায়িকা। অন্যান্য চরিত্রে আছেন—গঙ্গাপদ বসু, অরুণ মুখার্জি, গীতা নাগ, গীতা দে, মাঃ অরিন্দম, শর্মিলা দাস প্রভৃতি। পরিচালক শ্রীসেন ও পরিবেশক শ্রীরাধেশ্যাম কাংকারিয়ার সঙ্গে আলাপে জানা গেছে—২।৩ মাসেই ছবির কাজ শেষ হবে।

মঞ্চাভিনয়

ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দিরের 'চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্য—২৩শে অক্টোবর সন্ধ্যা সাতটায় পার্কসার্কাস বেনিয়াপুকুর সংযুক্ত পূজো কমিটির (পার্কসার্কাস ময়দান) আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নৃত্যবিদ নীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের নির্দেশনায় ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দিরের 'চণ্ডালিকা' নৃত্যনাট্য সু-অভিনীত হয়। 'চণ্ডালিকা' নৃত্যনাট্যের বিভিন্ন ভূমিকায় কৃষ্ণা রায় (প্রকৃতি), চিত্রা চ্যাটার্জি (মা), বিজন পাল (দইওয়ালা), সখী ও গ্রামবাসীদের ভূমিকায় মিতা পাল, পিকু দত্ত, বনানী চৌধুরী, শান্তি চৌধুরী, রিঙ্কু ভাদুড়ী, শিপ্রা সেন, শিপ্রা দাশগুপ্তা, আলো দে, দর্শকবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রকৃতির জল তোলার দৃশ্যে শ্রীঅজয় গাঙ্গুলীর বিভিন্ন প্রকারের পাখির ডাক দর্শকবৃন্দকে আনন্দ দান করে। শ্রীনির্মলেন্দু বিশ্বাসের পরিচালনায় দীপা সেনগুপ্তা, মীরা চৌধুরী, কাজল বোস প্রভৃতি সুসংগীত পরিবেশন করেন।

শিশির একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা—ফিল্ম অ্যাণ্ড থিয়েটার আরকাইভস আয়োজিত ও শ্রীনাট্যম পরিচালিত ৪র্থ বার্ষিক শিশির একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা বারাকপুরের সুভাষ-মঞ্চে শুরু হচ্ছে আসছে ডিসেম্বর মাসে। সাংবাদিক, শিক্ষাবিদ, শিল্পী ও কলা-কুশলীদের নিয়ে গঠিত বিচারকমণ্ডলীর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিভিন্ন বিভাগে প্রতিযোগী সংস্থা ও শিল্পীদের পুরস্কৃত করা হবে। উক্ত প্রতিযোগিতায় যোগদানের শেষ তারিখ ১৫ নভেম্বর, ১৯৭০। যোগাযোগের ঠিকানা

১। আরকাইভস অফিস : (৩৩-১৬০০) : ৮১, বিধান সরণি, কলকাতা—৪

২। শৈলেশ মুখোপাধ্যায় (২৪-৬৯৮০) পানশিলা, সোদপুর।

৩। শ্রীনাট্যম, চন্দনপুকুর বারাকপুর।

ঘটাফটক : কলকাতা।। অন্যতম মহিলা সাংস্কৃতিক সংস্থা চলন্তিকার দ্বিতীয় নাটক প্রশান্ত চৌধুরীর 'ঘটাফটক' সম্প্রতি কালিঘাট শিক্ষাসদনে অভিনীত হলো। অনুষ্ঠানে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন—অধ্যাপক নির্মল ভট্টাচার্য ও মলিনা দেবী। সভাপতি ও প্রধান অতিথি বাংলা নাটক ও অভিনয় সম্পর্কে জ্ঞানগর্ভ ভাষণ দান করেন। সংস্থার সভাপতি প্রণব ব্যানার্জি অতিথি ও অভ্যাগতদের ধন্যবাদ জানান। কেবলমাত্র মহিলা শিল্পীবৃন্দ কর্তৃক অভিনীত নাটকটি প্রতিটি শিল্পীর অভিনয়ের গুণে খুবই হৃদয়গ্রাহী হয়। খাসমহলের দর্পনারায়ণ (তমালিকা গুহ) ও বাইমহলের রত্নাবাই (অঞ্জলি ব্যানার্জি, যার প্রেম এই নাটকের পটভূমিকা। দুশ্চরিত্র নেপাল রক্ষিতের (দেবী গুপ্তা) দুরভিসন্ধির বাধা কাটিয়ে এই প্রেম জয়ী হল। অত্যাশ্চর্য অভিনয় করেছেন তপতী গুপ্তা, পঞ্চাননের ভূমিকায়। অঞ্জলি ব্যানার্জির রত্না বাঈ এক দুরূহ চরিত্র, দর্পনারায়ণের সঙ্গে আবেগময় মুহূর্ত ও পিসীমা পিয়ারী বাই বা (প্রণতা ভট্টাচার্য) সঙ্গে বেদনাময় উচ্ছ্বাসে তা অভিব্যক্ত দর্শকদের অভিভূত করে। অদিতি ঘোষ মুস্কিল আসানে ও মালবিকা ঘোষের রক্ষিত মহাজন মনে রাখবার মত। জমিদারের কর্তৃত্ব যথাযোগ্য ভাবে ফুটিয়েছেন গীতা মুখার্জি। অন্যান্য চরিত্রে—দেবী গুপ্তা, শুক্লা, স্বপ্না মজুমদার, পরী, মণ্টু, অভিনয় করেছেন। অবশ্য নাটকটির দোষ-ত্রুটিও আছে, আবহসংগীত, গ্রন্থনা ও পরিচালনা নিম্নমানের। সামগ্রিক ভাবে বিচার করলে, অভিনয়ের গুণে এই নাটকটি বিশেষ উপভোগ্য হয়েছে।

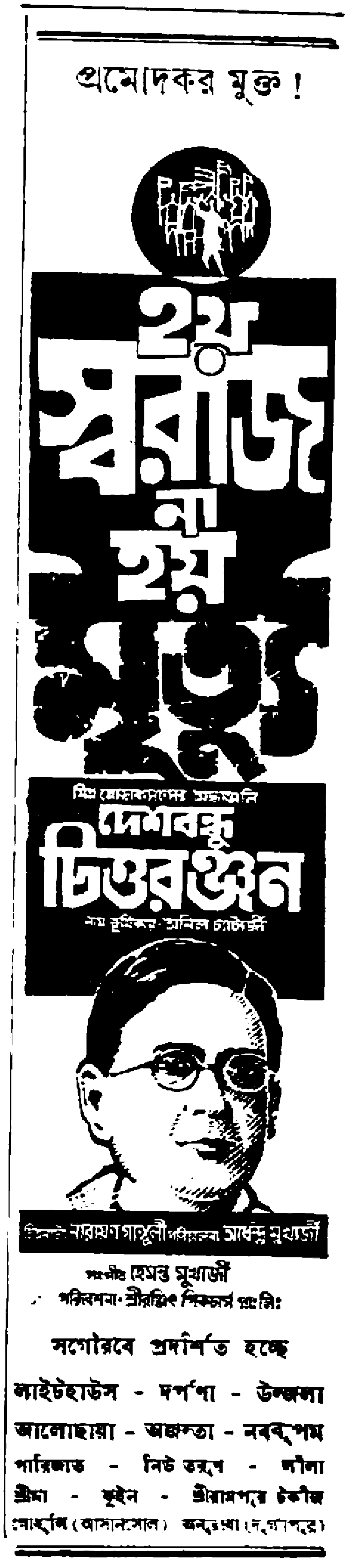

বিবিধ সংবাদ

যোগেশ দত্ত ও মূকাভিনয় :—গত ২৫ অক্টোবর সুপরিচিত মূকাভিনেতা যোগেশ দত্ত দু ঘণ্টা ব্যাপী এক অনুষ্ঠানে তার কলাশিল্প প্রদর্শনের আয়োজন করেছিলেন। উপলক্ষ তাঁর শিল্পীজীবনের দ্বাদশ বছর পূর্তি পালন।

মূকাভিনয়কে নিজস্ব শিল্পভাবনার মাধ্যমরূপে গ্রহণ, বিষয়বস্তুকে অধ্যয়ন ও আপন দৃষ্টিভঙ্গি ও অনুভবের আলোয় মেলে ধরার প্রয়াসে শ্রী দত্তর নিঃসন্দেহ প্রতিভার স্বাক্ষর অনস্বীকার্য। কিন্তু প্রতিভাবান বলেই এই তরুণ শিল্পীর ওপর আমাদের আশা অনেক। তাঁর কয়েকটি বিষয়ের ওপর তাঁর দৃষ্টি আমরা আকর্ষণ করছি। সেদিনের অনুষ্ঠান তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ছিলো চলা, বাসযাত্রী, চোর, ফটোগ্রাফার, সীতা ও হনুমান, আধুনিকা ও জন্ম থেকে মৃত্যু।

চলা, বাসযাত্রী, চোর ও সীতা হনুমান-এ তার মূকাভিনয় ও জীবন্ত অভিব্যক্তি বক্তব্য বিষয়ের ওপর যথাযোগ্য আলোকপাত করতে পেরেছে এবং এখানে যোগেশ দত্তর সংস্কৃতিমান, রসবোধের পরিচয় অকুণ্ঠ অভিনন্দনের দাবী রাখে। কিন্তু 'সোসাইটি লেডী' আরো অনুশীলনের অপেক্ষা রাখে। প্রথমতঃ 'সোসাইটি লেডীর' বাংলা অনুবাদ ঠিক 'আধুনিক' (অনুষ্ঠান পুস্তিকানুসারে) হবে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। এই অনুষ্ঠানে বর্ণিত 'সোসাইটি লেডি'কে শুধুমাত্র হাস্যকৌতুকের সামগ্রী করে তোলার কাজে শিল্পী তাঁর অভিনয় প্রতিভাকে ব্যাপৃত না করে যদি 'সোসাইটি লেডির' হাস্যোদ্রেকী কৃত্রিম সাজসজ্জা ও প্রতিভাটির অসামঞ্জস্য তার অন্তরালে রিক্ত জীবনের অশ্রুউচ্ছল দারুণের দিনটির প্রতিও যথাযথ আলোকপাত করতেন তাহলে এটি একটি উচ্চাঙ্গের শিল্পবস্তু হয়ে উঠতে পারত। জীবনের বহির্মুখী হাল্কামোও শিল্পীর ধ্যাননিবিড়তার স্পর্শে এক ঐশ্বর্যলোককে উদ্ভাসিত করতে পারে। যোগেশ দত্ত'র ধারণা ধ্যানের সম্পূর্ণতায় সার্থক হয়ে ওঠার সম্ভাবনাদীপ্ত এবং দীপ্তির পূর্ণপ্রকাশের জন্য আমরা সাগ্রহে প্রতীক্ষা করব। হিমাংশু দত্ত'র আবহ-সংগীত রচনায় তাঁর কল্পনা রঞ্জন মনটির পরিচয় ছিলো। বিশেষ করে সীতা ও হনুমান ও জন্ম থেকে মৃত্যুতে সিন্ধুভৈরবীর ছোঁওয়া তারিফ করবার মত। কিন্তু 'সোসাইটি লেডি'তে পিলু রাগাভিত্তিক সঙ্গীত সুখশ্রাব্য হলেও বিষয়বস্তুর ভাবের সংগে ঠিক খাপ খায়নি। এখানে আনন্দলহরী বা অন্যকোনো ছন্দপ্রধান কণ্ঠ দিয়ে বক্তব্যকে পরিস্ফুট করা যেত। স্থানে স্থানে হিমাংশু বিশ্বাসের বাঁশী অপূর্ব সুরের আবেশ রচনা করেছে। এ-ছাড়াও অনুষ্ঠান-সার্থকতার কৃতিত্ব প্রাপ্য যাঁদের তাঁরা হলেন তাপস সেন (আলো) সুরেশ দত্ত (মঞ্চ) খালেদ চৌধুরী (সজ্জা) অনন্ত দাস।

গৌরচন্দ্রঘাট, চাতরা শ্রীশ্রীশ্যামাপূজা কমিটির বিচিত্রানুষ্ঠান :—গৌরচন্দ্রঘাট, চাতরা, শ্রীশ্রীশ্যামাপূজা কমিটির সভাবৃন্দ প্রতিথযশা শিল্পী সমন্বয়ে আগামী ৭ নভেম্বর এক বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন। অংশ গ্রহণ করবেন সর্বশ্রী গোরাচাঁদ মুখোপাধ্যায়, অধীর বাগচী, মন্টু ভট্টাচার্য (হরবোলা), দিলীপ চক্রবর্তী, পিন্টু দত্ত (কৌতুক গীতি), অঞ্জনা বসু ও বাবলু, সুশীল চক্রবর্তী (হাস্যকৌতুক) ও তপন দত্ত (মূকাভিনয়)।

'হরবোলা' অজয় গঙ্গোপাধ্যায় :—জনপ্রিয় 'হরবোলা' বেতার শিল্পী শ্রীঅজয় গঙ্গোপাধ্যায় 'শিক্ষাসদন হলে' সুরেন্দ্র চক্রবর্তী ইন্সটিটিউটের অনুষ্ঠানে একক 'হরবোলার' অনুষ্ঠানের পর 'বালিগঞ্জ শিক্ষাসদন স্কুলের' নাট্যানুষ্ঠানে নেপথ্য থেকে নানান জন্তুর ডাকের মাধ্যমে কণ্ঠের দ্বারা দৃশ্যের অবতারণা করেন 'চিলড্রেন্স নভেল থিয়েটার-এর' নাটকে। গত ১৫ অক্টোবর পার্কসার্কাস আদি উদ্দীপনীকারের অনুষ্ঠানে 'কৌতুক হরবোলা' হিসাবে প্রাণীদের কথা বলায় গুণী নিজ কণ্ঠ দর্শকদের শুনিয়ে বিশেষ প্রশংসা লাভ করেন। গত ২০ অক্টোবর 'আদি নৃত্যনাট্য সমাজ' ম্যাক্সমুলার ভবনে 'মাথুর' নামক যে নৃত্য-নাট্যটি পরিবেশন করেন কণ্ঠের সাহায্যে দৃশ্যের অবতারণা করার পর শ্রীঅজয় গঙ্গোপাধ্যায়কে দেখা গেল 'ম্যাক্সমুলার ভবনের' আয়োজিত কয়েকদিন ব্যাপী শিশু উৎসবে নেপথ্য থেকে নানা শব্দের ও ডাকের মাধ্যমে শিশুদের উপহার 'চিলড্রেন্স নভেল থিয়েটার-এর 'সোনালী সিং' ও 'নকল রাজা নামক' নাটকে বিভিন্ন [illegible]

রবি ৪ঠা নভেম্বর ৬৷৷টা
রবীন্দ্র সরোবর মঞ্চ
শতাব্দীর অভিনয়
রচনা ও নির্দেশনা
বাদল সরকার
টিকিট ১৲ থেকে ৫৲; ছাত্রছাত্রী ৫০ পঃ।
অভিনয়ের দিন সকাল থেকে হলে।

রঙ্গনা
বিশ্বরূপার রাস্তার
সার্কুলার রোডের মোড়ে
নান্দীকার
৩রা শনিবার ৬৷৷টায়
৪ঠা রবিবার ৩টে ও ৬৷৷টায়
তিন পয়সার পালা
নির্দেশনা : অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়
॥ রঙ্গনায় (৫৫-৮৪৫৮) টিকিট পাবেন ॥
কালপারে পূর্বনির্ধারিত শো থাকায় আগামী সপ্তাহে বৃহস্পতি (১২ই), শনি (১৪ই) ও রবিবার (১৫ই) রঙ্গনায় নান্দীকারের অভিনয় হবে না।
১১শে নভেম্বর বৃহস্পতিবার ৬৷৷টায়
যখন একা
২১শে শনি ৬৷৷টায়, ২২শে রবি ৩টে ও ৬৷৷টায়
তিন পয়সার পালা
॥ ১ই নভেম্বর থেকে রঙ্গনায় টিকিট পাবেন।

ঘরে ঘরে আজ শিশুরা
নতুন বেবী সোপ নিয়ে কানাকানি
করছে আর তা হল
বেঙ্গল কেমিক্যালের
বেবী সোপ

প্রত্যেক মায়েরা চান এমন একটি বেবী-সোপ
যার ব্যবহারে শিশুদের মাতৃত্বক কোমল,
মোলায়েম ও স্নিগ্ধ রাখে। বেঙ্গল কেমিক্যালের
বেবী সোপে এই সমস্ত গুণই বর্তমান—
ঘরে ঘরে তাই এই সাবানের এত কদর।
কস্‌মেটিক ডিভিসন
বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা, বোম্বাই, কানপুর, দিল্লী, মাদ্রাজ, পাটনা

জলসা

'ভারতী' রেকর্ড কোম্পানীর অনুষ্ঠান—সম্প্রতি মহাজাতি সদন-মঞ্চে ভারতী রেকর্ড কোম্পানীর পক্ষ থেকে এক সংগীতোৎসবের আয়োজন করা হয়। দুই ঘণ্টা ব্যাপী এই আসরে যাঁরা গান গেয়ে শুনিয়েছেন—তাঁরা অনেকেই সুকণ্ঠ প্রতি-শ্রুতিসম্পন্ন। সমর গুপ্ত ত' প্রতিষ্ঠিত শিল্পী। ইনি ছাড়াও শ্রোতাদের খুসী করাতে পেরেছেন যাঁরা, তাঁরা হলেন জয়ন্তী সেন, সুস্মিত সেন, মানসকুমার, প্রভাতভূষণ। জয়ন্তী সেন ও সুস্মিত সেন হিমাংশু বিশ্বাসের সুরে 'রাত হয়ে যায়' ও 'পিঞ্জলার ভাব লেগেছে'—মানসকুমার অলোকনাথ দের পরিচালনা স্ব-সৃষ্ট সুরে পুলক বন্দোপাধ্যায় রচিত দুটি গান গেয়ে প্রচুর আনন্দ দিয়েছেন।

অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যে সুবিজয় দাসের রবীন্দ্রসংগীত, দিজন শেঠ, পাপিয়া দে, বিদ্যুৎ দত্ত, রুমা চট্টোপাধ্যায়, গুলে মহম্মদ, পুষ্পিতা চট্টোপাধ্যায়, শিখা দে, রমেন চক্রবর্তী, ছায়া মুখোপাধ্যায়, সজনী রায়, সলিল চাক্লা, বিষ্ণুপদ রায়ের আধুনিক গান, মলয় রাহার কৌতুক-নকসা ও মনোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গীটার উপ-ভোগ্য হয়েছে।

'দাক্ষিণায়ন'-এর সঙ্গীতোৎসব : বৃহস্পতিবার ২২ অক্টোবর নবগঠিত সংস্থা 'দাক্ষিণায়ন' প্রযোজিত সঙ্গীত সন্ধ্যা আনন্দমুখর এক কাব্যময় পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন 'কলামন্দির' প্রেক্ষাগৃহে সুষ্ঠু অনুষ্ঠান পরিচালনার কৃতিত্ব প্রাপ্য শ্রী ও শ্রীমতী অসীমা ও দীলিপ ভট্টাচার্য্যর। সংগঠক ধ্রুবজ্যোতি চৌধুরীর বক্তব্যে জানা গেল পেশিক্ষত তরুণ প্রতিভাদের রসিক সমাজের গোচরে আনা, মাঝে মাঝে সুযোগ্য শিল্পীদের বিচিত্রানুষ্ঠান দ্বারা কর্মক্লান্ত জীবনে রসসঞ্চার এবং এই সকল অনুষ্ঠানার্জিত অর্থ জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করাই এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য।

সঙ্গীতানুষ্ঠান সুরু হয় অধ্যাপক দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায়ের কণ্ঠসঙ্গীত নিয়ে। উদীয়মান শিল্পী হিসাবে ইতিমধ্যেই তিনি সুপরিচিত। সেদিন 'বলেছি যখন আমি যাব গো' ও 'যদি জানতাম কেউ আসবে'-র প্রথমটি সুরপ্রধান ও দ্বিতীয়টি ছন্দপ্রধান। উভয় দিকটির প্রতিই দীপংকরবাবু যথোপযুক্ত আলোকপাত করতে পেরেছেন। পরিশীলিত কণ্ঠ, গাইবার আনন্দ এক কথায় শিল্প-জনোচিত সকল গুণেই এঁর মধ্যে আছে। অনুশীলনে একনিষ্ঠ থাকলে আশানুরূপ মানে পৌছতে এঁর দেরী হবে না। জনপ্রিয় শিল্পী আরতি মুখোপাধ্যায় শ্রোতাদের চাহিদা মেটাতে চিত্রগীতি 'ছায়া ছায়া আঁধার যখন' নাটকীয় রসসমৃদ্ধ 'খোলা আকাশের নীচে' এবং মেহাতী উপাখ্যান সম্প্রতি 'এক শৈশবে দেখা হোল দুজনার'—ইত্যাদি বৈচিত্র্য সমৃদ্ধ গান গেয়ে আসর জমিয়ে তুলতে পেরেছেন এবং শ্রোতাদের আব্দারে গত বছর ও এবছরের পুজোর দুটি গান—শুনিয়েছেন। এছাড়া মহম্মদ সগীরুদ্দিনের সুরে গাওয়া রাগাশ্রিত সঙ্গীতও সাগ্রহে গৃহীত হয়েছে। কণ্ঠমাধুর্য ছাড়াও শিল্পীর প্রাণবন্ত পরিবেশনা আনন্দসৃষ্টির কারণ হয়ে উঠে-ছিলো।

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়—মঞ্চে উপস্থিত হবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রোতাদের উচ্ছ্বাস জানিয়ে দিল জনপ্রিয়তার শীর্ষে আজও তিনি সগৌরবেই প্রতিষ্ঠিত। এবারের পুজোর গান সুকান্ত ভট্টাচার্যর 'ঠিকানা', 'এই সুন্দর পৃথিবীতে' 'এবার নীরব করে দাওহে তোমার', 'কানার' পর্যন্ত প্রতিটি গানই প্রাপ্য অভিনন্দন পেয়েছে কিন্তু 'সবাই চলে গেছে শুধু একটি মাধবী তুমি আজও ফুটে আছ' মাধুর্য ভোলার নয়। এসব ছাড়াও প্রধানত অনুরাগীবৃন্দের অনুরোধে 'দুটি মন', 'খামোশী' ও পরিশেষে 'আমার হৃদয় তোমার আপন হাতের দোলে' গেয়ে অনুষ্ঠান সমাপ্ত করেছেন।

উত্তমকুমার 'ছিন্নপাতার ভাসাই তরণী' ও আরও একটি গান গেয়ে শোনালেন। গানটা এখানে মুখ্য নয়—দর্শকবৃন্দের উত্তমকুমারকে দর্শনের অধীর আগ্রহ মোটা-মোটাই প্রধান আকর্ষণ। এ তৃষ্ণা মিটেছে কিনা তারাই জানেন তবে উত্তমকুমারকে বেশ কিছুক্ষণ মঞ্চে উপস্থিত রাখার সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনায় কোনো ত্রুটি ছিলো না। সর্বশেষ অনুষ্ঠান ছিলো মান্না দের। এ অনুষ্ঠান শোনা আমাদের হয়ে ওঠেনি। তবে কার্পণ্যহীন পরিবেশনায় ইনি ভক্তদের তুষ্ট করতে পেরেছেন বলে খবর পাওয়া গেছে।

সঙ্গীতানুষ্ঠান ছাড়া ওয়াই এস মুলকি ও খোকন মুখোপাধ্যায়ের আকি-র্ডিয়ন ও স্প্যানিশ গীটার সমন্বিত অর্কেস্ট্রা এবং রবি ঘোষের কৌতুক-নকসা অনুষ্ঠানকে সমৃদ্ধ করেছে।

তবলা সঙ্গতে ছিলেন সর্বশ্রী রাধাকান্ত নন্দী, নরেশ ঘোষ, রামদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীত চট্টোপাধ্যায় ও প্রশান্ত বসু।

খ্যাতনামা সঙ্গীতশিল্পী শ্রীবিমল-ভূষণের দুখানি আধুনিক বাংলা গানের একটি রেকর্ড সম্প্রতি হিন্দুস্থান রেকর্ড কোং বের করেছেন। গান দুটি হল—শ্রীপ্রবোধভূষণের লেখা 'দুই ফোঁটা জল ঝরে' এবং শ্রীলক্ষ্মীকান্ত রায়ের লেখা 'কি জানি কখন, এ দুটি নয়ন।' গান দুটিতে সুর সংযোজনা করেছেন শ্রীহিমাংশু বিশ্বাস।

একক ছড়া গানের আসরে : সম্প্রতি 'মঞ্জুলেখা' আয়োজিত একটি একক গানের আসরে প্রথিত-নামা শিল্পী শ্রীমতী জপমালা ঘোষের গান শোনার সুযোগ ঘটেছিল। 'ছেলে ভুলানো' ছড়া গানের নিজস্ব একটি আবেদন আছে এবং যথাযথরূপে পরিবেশিত হলে বড়রাও এ গান শোনার আনন্দ যে ঠিক ছোটদের মতই উপভোগ করে থাকেন তারই এক উল্লেখযোগ্য নজীর সেদিনের অনুষ্ঠান।

জপমালা ঘোষ

শ্রীমতী ঘোষ মোট ১৪ খানি গান গেয়ে শোনান। কোনটি সবচেয়ে ভালো বলা কঠিন। কারণ বিষয়বস্তু সুর ও তালের বিভিন্নতায় প্রতিটি গানের স্বাতন্ত্র্য পরি-লক্ষিত। সবশেষে এবং সকলের অনুরোধে গাওয়া তাঁর সুবিখ্যাত রেকর্ড নজরুলের মজার ছড়া গান 'লিচু চোর' দিয়ে অনু-ষ্ঠানের সুন্দর পরিসমাপ্তি ঘটে।

একক রবীন্দ্রসংগীতের আসর : গত ৩১ অক্টোবর সন্ধ্যায় দক্ষিণ কলকাতার পিয়াসী ভবনে একক রবীন্দ্রসংগীতের অনু-ষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। নির্ধারিত শিল্পী ছিলেন কৃষ্টি উদয় সঙ্ঘের পরি-চালক শ্রীসমীপেন্দ্র লাহিড়ী। পূজা, প্রকৃতি ও প্রেম পর্যায়ের একুশটি গান সুললিত ও দরদী কণ্ঠে পরিবেশন করে সমীপেন্দ্রবাবু অসাধারণ প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁর বিশুদ্ধ গায়কী ও মেলোডিয়াস কণ্ঠ রবীন্দ্র সংগীত শিল্পী হিসেবে অনুপম। বিশেষভাবে 'আমি যখন তাঁর দুয়ারে', 'তোমার শেষের গানের রেশ নিয়ে কানে,' 'আমায় থাকতে দে-না আপন মনে' 'আমার যে গান তোমার পরশ পাবে' ইত্যাদি গান-গুলিতে তিনি অসামান্য বৈদগ্ধ্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। অনুষ্ঠানে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির সমাগম হয়। কলকাতার বুকে মফস্বলের একজন তরুণ শিল্পীকে নিয়ে এই একক অনুষ্ঠানের আয়োজন করার জন্য পিয়াসী সঙ্ঘের সভাবৃন্দ অভিনন্দনযোগ্য।

শিল্পী সকাশে বৈজ্ঞানিক : বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে ব্রজেন্দ্রকিশোর সঙ্গীত সংসদের এক অধিবেশনে প্রাচীন ধ্রুপদী কণ্ঠ শোনবার জন্য উপস্থিত হলেন বৈজ্ঞানিক সত্যেন্দ্রনাথ বসু।

—চিত্রাঙ্গদা

অজয় বসু

খেলার কথা

খুশিরামের খোশমেজাজ

সার্থক নামকরণ—খুশিরাম!

খেলা দেখিয়ে সবাইকে খুশি তো রাখছেনই। উপরন্তু নিজেও সব সময় খোশমেজাজে রয়েছেন। ওই মেজাজের সন্ধান জেনে মানুষটিকে যেন আরও ভাল লাগলো।

ম্যানিলায় এশীয় ফেডারেশন আয়োজিত পঞ্চদশীয় বাস্কেট বল খেলে দেশে ফিরলেও ঘরে ফিরতে পারেন নি। সঙ্গে সঙ্গে ডাক এলো বর্ধমানে যাবার। সেখানে আন্তঃ রাজ্য বাস্কেট বলের খণ্ড জাতীয় খেলার আসর বিছানো হয়েছে। রাজস্থান গতবারের আঞ্চলিক বিজয়ী। বিজয়ীর মর্যাদা ধরে রাখার মস্তো দায়িত্ব ওই খুশিরামের ঘাড়েই। অতএব তাঁকে ম্যানিলা থেকে দিল্লী ফিরেই ছুটতে হলো কলকাতা হয়ে বর্ধমানের দিকে। সেখানেই হলো আমাদের একান্তে আলাপ। সন্ধান পেলাম তাঁর খুশি খুশি মেজাজের।

আমাদের দেশে খেলাধুলা ও খেলোয়াড়দের পৃষ্ঠপোষকতায় সরকার বিশেষ কিছু করছেন না, কবে যথার্থ কিছু করে সরকার খেলোয়াড়দের ভাগ্য ফিরিয়ে দেবেন এবং ভারতীয় ক্রীড়ার মানোন্নয়নে সার্বিক পদক্ষেপ ঘটাবেন? এই অভিযোগ এখনো খেলাধুলার সব মহলেই সোচ্চার।

বাস্কেটবল অনুরাগী মহলে তো ওই অভিযোগ আরও উচ্চকণ্ঠে তুলতে পারেন। কারণ, জাতীয় সরকার এখনও বাস্কেটবলকে ক্রিকেট, টেনিস, ফুটবল, হকির মতো 'মেজর গেম' বলে ভাবতে চান না, দেখেনও না তেমন স্নেহসিক্ত নজরে। স্বভাবতই, বাস্কেটবল অনুরাগীদের মনের কোণে স্বভাবতই অনেক ক্ষোভ জমে রয়েছে।

হয়তো খুশিরামের মনের কোনো নিভৃত অন্তরে সেই ক্ষোভের উত্তাপও সঞ্চিত আছে। কিন্তু কই, সে কথা তিনি তো আমাকে একবার জানতেও দিলেন না! বললেন, এই 'মাইনর গেম' খেলেই, মানে খেলার মতো খেলে, আমরা নাম কিনবোই। আন্তর্জাতিক কোর্টে প্রতিষ্ঠা পাবোই। যেদিন পাবো সেদিন কিন্তু কেউ আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকতে চাইবে না। সাহায্য, সহযোগিতা, পৃষ্ঠপোষকতা, সব কিছুই তখন অকাতরে প্রসারিত হবে বাস্কেট বলের দিকে।

কথাগুলো আমার উদ্দেশ্যে বলা বটে। কিন্তু ওই মুহূর্তে মনে হচ্ছিল, খুশিরাম যেন আপন মনেই কোনো সংকল্প-বাক্য পাঠ করছিলেন। নিজের মনেই শপথ নিচ্ছিলেন। সত্যিই, খুশিরামের প্রত্যয় এমনিই নিটোল। নিজের বাহুবলে তাঁর বিশ্বাস সমুদ্রের মতো সীমাহীন। ভারতীয় দলের অন্য খেলোয়াড়েরা যদি খুশিরামের প্রত্যয়ে ভাগ বসাতে পারতেন কিংবা তাঁরই মতো অপত্যস্নেহে বাস্কেট বলকে জড়িয়ে ধরতে পারতেন, তাহলে, আমার ধারণা, আমাদের জাতীয় দলের চীতামান এতোদিনে আরও উঁচুতে উঠে দাঁড়াতে পারতো। খুশিরাম বাস্কেটবলের পায়েই আত্মসমর্পণ করেছেন। তাঁর 'ডেডিকেশন' ভেজালবিহীন। এমন খাঁটি জিনিসের বিনিময়ে তিনি নিজে যা (নাম, প্রতিষ্ঠা, ভবিষ্যতের নিরাপত্তা) পেয়েছেন তাতেই

খুশিরাম

যেন পরিতৃপ্ত। ক্ষোভ ও অস্থিরতা, অভিযোগ ও অশান্তি যে কালের ধর্ম, সেই কালেই খুশিরামকে মস্তো এক ব্যতিক্রম বলে মনে হলো।

খুশিরাম ১৯৫৯ সাল থেকে জাতীয় প্রতিযোগিতায় খেলছেন। আন্তর্জাতিক আসরে তাঁর আবির্ভাব ১৯৬৪তে। সেই থেকেই খুশিরাম স্বদেশে দিল্লী-দিল্লী করছেন এবং বিদেশে পাড়ি জমাচ্ছেন প্রায় বছর বছরই। স্ট্যান্ডার্ড ধরে রাখতে তাঁকে নিত্যই মেহনত করতে হয়। নিদেন পক্ষে ঘণ্টাখানেক তো বটেই। এদিকে বয়সও বাড়ছে। বয়স কতো? খুশিরামের নিজের কথায়, চৌত্রিশ। দেখে মনে হবে, আরও বেশি। কিন্তু তবু ওঁর ক্লান্তি নেই।

একবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আর কতোদিন খেলবেন? অবসর নেওয়ার কোনো পরিকল্পনা আছে কি?

সঙ্গে সঙ্গে জবাব পেলাম, সে রকম কোনো পরিকল্পনা নেই। যতোদিন পারবো, খেলবো। যতোদিন ভাল লাগে, ততোদিনই। ছাড়বো কেন?

সত্যিই তো, খুশিরাম এখন অবসর নেবেন কেন? বয়স বাড়ছে, তবু তাঁর দক্ষতায় এতোটুকু টান পড়ে নি। এই তো, কদিন আগে ম্যানিলায় পঞ্চদশীয় বাস্কেটবলের আসরে ওই খুশিরামই সর্বোত্তম খেলোয়াড়ের স্বীকৃতি পেলেন। ম্যানিলায় ব্যক্তিগতভাবে সর্বাধিক পয়েন্ট সংগ্রহ করে 'বেস্ট স্কোরার'-এর এবং 'মোস্ট ভ্যালুয়েবল' খেলোয়াড়ের স্বীকৃতি আদায় করলেন। তাছাড়া, বলা বাহুল্য যে ম্যানিলায় পঞ্চদশীয় প্রতিযোগিতা চলার সময় সর্ব-এশীয় দল গড়তে গিয়ে নির্বাচকেরা তাঁর নামটিই সর্বাগ্রে উচ্চারণ করলেন।

খুশিরামের আদিবাস হরিয়ানার ঝামরি। ঝামরি অজ পাড়াগাঁ। সেখানে বাস্কেট বলের চলন কোনোদিনই ছিল না। আজও নেই। তাহলে খুশিরাম কি করে বাস্কেটবল খেলতে শিখলেন?

প্রশ্নটি রাখতেই তিনি জানালেন যে ছেলেবেলায় কিশোর সেনাবাহিনীতে যোগ দেবার সুবাদে বছর চোদ্দ বয়সেই তিনি বাস্কেটবল খেলতে শেখেন। শিক্ষা ও প্রতিষ্ঠা লাভ, সবই সেনাবাহিনীতে থাকার সময়। বছর দুয়েক হলো রাজস্থানের এক রেশম কলে চাকুরী পেয়ে খুশিরাম সেনাবাহিনীর সংস্রব ছেড়েছেন। খেলার জন্যেই চাকুরী। চাকুরীতে খাটুনী আছে। আবার সুবিধেও আছে। ভারতীয় দলের হয়ে বিদেশে খেলতে যাবার সময় বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বাস্কেটবল খেলোয়াড়দের গাঁটের পয়সা খরচ করতে হয়। বিচিত্র, তবে এইটিই রীতি। 'মাইনর গেমস' যাঁরা খেলেন তাঁদের এখনও অনেক ক্ষেত্রে এ জাতীয় কুফিকার সইতে হয়। খুশিরামকে অবশ্য কোনোদিন গাঁটের টাকা বার করতে হয়নি। ওই যে বললাম, চাকুরীতে সুবিধে আছে। ওর নিয়োগকর্তাই ওইসব টাকাকড়ির ঝামেলা পোয়ান ও মেটান।

হেসেখেলে কাটাচ্ছেন বটে. তবুও খুশিরাম ঘোর সংসারী তিন সন্তানের জনক। ছেলেরা খেলতে চায় কিন্তু ওদের মার আব্দার খেলার মতো বীতরাগ।"

খেলাধুলা

দর্শক

আন্তঃ রাজ্য 'বি' জোন বাস্কেটবল প্রতিযোগিতা

বর্ধমানে বর্ধমান জেলা ভলিবল এবং বাস্কেটবল এসোসিয়েশনের ব্যবস্থাপনায় দ্বিতীয় আন্তঃরাজ্য 'বি' জোন বাস্কেটবল প্রতিযোগিতা সম্প্রতি শেষ হল। প্রতিযোগিতায় গত বছরের চ্যাম্পিয়ান রাজস্থান অপরাজিত অবস্থায় এবারও প্রথম স্থান লাভ করেছে। দ্বিতীয় স্থান পেয়েছে মহারাষ্ট্র এবং তৃতীয় স্থান পশ্চিম বাংলা। মহারাষ্ট্র এবং পশ্চিম বাংলার সমান ছয় পয়েন্ট ছিল। কিন্তু ৬টি খেলায় পয়েন্টের ব্যবধানে মহারাষ্ট্র শেষ পর্যন্ত গত বছরের রানার্স-আপ পশ্চিম বাংলাকে হারিয়ে দিয়ে দ্বিতীয় স্থান পায়। প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেছিল এই চারটি রাজ্য রাজস্থান, মহারাষ্ট্র, পশ্চিম বাংলা এবং গুজরাট। প্রতিযোগিতায় পাঁচটি রাজ্যের যোগদানের কথা ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত মধ্যপ্রদেশ প্রতিযোগিতা থেকে নাম প্রত্যাহার করে নেয়।

চূড়ান্ত ফলাফল

	খেলা	জয়	পয়েন্ট
রাজস্থান	৬	৬	১২
মহারাষ্ট্র	৬	৩	৬
পঃ বাংলা	৬	৩	৬
গুজরাট	৬	০	০

ইংলিস স্কুল ক্রিকেট দল

চলতি নভেম্বর মাসের শেষ দিক এ জে হর্বাজউ পেজের নেতৃত্বে প্রথম সরকারী ইংলিশ স্কুল ক্রিকেট দল ভারত সফরে আসবে। তিন বছর আগে যে প্রথম ইংলিশ স্কুল ক্রিকেট দলটি ভারত সফরে এসেছিল তাকে ঠিক প্রতিনিধিমূলক ইংলিশ স্কুল দল বলা যায় না। বর্তমানে দলটি ইটন, হ্যারো, উইনচেস্টার, চেস্টারফিল্ড প্রভৃতি খ্যাতনামা বিদ্যালয়ের ১৫জন খেলোয়াড় নিয়ে গঠিত। এই স্কুল দলটি ভারত সফরে মোট ১০টি ম্যাচ খেলবে—পাঁচটি আঞ্চলিক এবং পাঁচটি সরকারী টেস্ট ম্যাচ (দিল্লী, বোম্বাই, আমেদাবাদ, কটক এবং মাদ্রাজ)।

ক্রিকেট সফর

আগামী ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ভারতীয় ক্রিকেট দল ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে যাবে। এবং এই সফর শেষ করে ২৩শে

আন্তঃরাজ্য 'বি' জোন বাস্কেটবল প্রতিযোগিতায় বিজয়ী রাজস্থানের খ্যাত খেলোয়াড় খুশীরাম।

জুন ইংল্যান্ড সফর সুরু করবে। ১৯৬৭ সালের ইংল্যান্ড সফরে ভারতীয় ক্রিকেট দল যে শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছিল, তার প্রধান কারণই ছিল সেখানের প্রতিকূল আবহাওয়া। এপ্রিল মাসের দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় ভারতীয় ক্রিকেট দলের পক্ষে ইংল্যান্ড সফর মোটেই অনুকূল নয়। ১৯৭১ সালের ইংলিশ ক্রিকেট মরশুমে এই দুটি দেশ সফর করবে—প্রথম ভাগে পাকিস্তান এবং দ্বিতীয় ভাগে ভারতবর্ষ। ১৯৬৭ সালে মরশুমের দ্বিতীয় ভাগে সফর করার জন্যই ভারতবর্ষের মত পাকিস্তানকে প্রতিকূল আবহাওয়াতে খেলতে হয়নি; ফলে ভারতবর্ষ যেখানে তিনটি টেস্ট খেলাতেই হেরেছিল সেখানে পাকিস্তানের হার ২, ড্র ১।

টেস্ট খেলা

১৯৭১ সালের ইংল্যান্ড সফরে ভারতবর্ষ তিনটি টেস্ট খেলা এইভাবে শুরু করবে—লর্ডস মাঠের প্রথম টেস্ট ২২শে জুলাই, ম্যাঞ্চেস্টারের দ্বিতীয় টেস্ট ৫ই আগস্ট এবং ওভালের তৃতীয় টেস্ট ১৯শে আগস্ট।

এশিয়ান গেমস

আগামী ডিসেম্বর মাসে ব্যাঙ্ককে এশিয়ান গেমসের আসর বসছে। এই ক্রীড়ানুষ্ঠানে যোগদানের উদ্দেশ্যে ভারতীয় অলিম্পিক এসোসিয়েশনের সাধারণ পরিষদ সভায় ১৫৭জন সদস্য নিয়ে ভারতীয় দল গঠন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। ভারতবর্ষ এই ৮টি ক্রীড়ানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করবে—অ্যাথলেটিক্স, হকি, ফুটবল, বাস্কেটবল, সাঁতার, মুষ্টিযুদ্ধ, কুস্তি এবং সাইক্লিং। সদস্য সংখ্যার দিক থেকে অ্যাথলেটিক্স দলটিই হবে সব থেকে বড়—মোট সদস্য সংখ্যা ৩১জন। নীচে বিভিন্ন ক্রীড়ানুষ্ঠানে প্রতিযোগী এবং কর্মকর্তাদের সংখ্যা দেওয়া হল :

অ্যাথলেটিক্স : মোট ৩১জন—অ্যাথলীট ২৫, ম্যানেজার ১, প্রশিক্ষক ১ এবং প্রতিনিধি ৪

ফুটবল : মোট ২০জন—খেলোয়াড় ১৬, ম্যানেজার ১, প্রশিক্ষক ১ এবং প্রতিনিধি ২

হকি : মোট ২৪জন—খেলোয়াড় ১৮, ম্যানেজার ১, প্রশিক্ষক ১ এবং প্রতিনিধি ৪

বাস্কেটবল : মোট ১৭জন—খেলোয়াড় ১২, ম্যানেজার ১, প্রশিক্ষক ২ এবং প্রতিনিধি ২

সাঁতার : মোট ১৯জন—সাঁতারু ১৫, ম্যানেজার ১, প্রশিক্ষক ১ এবং প্রতিনিধি ২

কুস্তি : মোট ১৭জন—কুস্তিগীর ১০, ম্যানেজার ১, প্রশিক্ষক ১ এবং প্রতিনিধি ৫

মুষ্টিযুদ্ধ : মোট ১৪জন—মুষ্টিযোদ্ধা ৮, প্রশিক্ষক ২ এবং প্রতিনিধি ৪

সাইক্লিং : মোট ১৪জন—সাইক্লিস্ট ১০, ম্যানেজার ১, প্রশিক্ষক ১ এবং প্রতিনিধি ২

অ্যাথলেটিক দল

ভারতবর্ষের এমেচার অ্যাথলেটিক ফেডারেশন ২৪জন অ্যাথলীটকে ভারতীয় অ্যাথলেটিক দলে নির্বাচিত করেছেন। এই ২৪ জনের মধ্যে ১১জন অ্যাথলীট যোগদানের নির্দিষ্ট মান স্পর্শ করেন। মহীন্দর সিং, দেবী টমাস এবং গুরমেজ সিংকে 'রিজার্ভ' হিসাবে দলভুক্ত করা হয়েছে।

গত এশিয়ান গেমসের সটপুটে স্বর্ণপদক বিজয়ী যোগীন্দর সিং ভারতীয় অ্যাথলেটিক দলের অধিনায়ক নির্বাচিত হয়েছেন।

পুরুষ বিভাগ : ৫০০০ মিটার—হার্মিক সিং (সার্ভিসেস)। ১৫০০ মিটার—এডওয়ার্ড সিকুইরা (স্টীল প্ল্যান্ট); ৪×১০০ মিটার রীলে—ও এল টমাস (সার্ভিসেস), আর বি হাওয়ার্ড (মাদ্রাজ), কে এল পাওয়েল (স্টীল প্ল্যান্ট), এ পি

পোলভল্টে বিশ্ব রেকর্ড : গ্রীসের চারিস পাপানিকলাউ গ্রীস-যুগোশ্লাভিয়ার দ্বৈত অ্যাথলেটিক্স অনুষ্ঠানে ১৮ ফিট (৫·৪৯ মিটার) উচ্চতা অতিক্রমের সূত্রে বিশ্ব রেকর্ড করেছেন।

ব্রহ্মচারী (স্টীল প্লান্ট) এবং হরিচাঁদ (মাদ্রাজ); ৪×৪০০ মিটার রীলে—পি সি পোনাপ্পা (স্টীল প্লান্ট), বি এস বড়ুয়া (সার্ভিসেস), নৃপ সিং (সার্ভিসেস) এবং আজমীর সিং (পাঞ্জাব); লং জাম্প—চাঁদ সিং (সার্ভিসেস), কে ছেদনাথন (বিহার) এবং মাহীন্দর সিং (মাদ্রাজ); ট্রিপল জাম্প মাহীন্দর মাহীন্দর (মাদ্রাজ); ডিসকাস থ্রো—পার্বতন কুমার (পুলিশ) এবং হরচরণ সিং (স্টীল প্লান্ট); হ্যামার—হরনেক সিং (সার্ভিসেস); শটপুট—জোগীন্দর সিং (সার্ভিসেস) এবং গুরদীপ সিং (পুলিশ)।

ডেকাথলন—এস মোহন (বিহার) এবং এম জি ঘোষ;

স্টিপলচেজ—গুরমেজ সিং (সার্ভিস);

মহিলা বিভাগ : ১১০ মিটার হার্ডলস—কুমারী মঞ্জিৎ ওয়ালিয়া (পাঞ্জাব); ৪০০ মিটার—কুমারী কমলজিৎ সিন্ধু (পাঞ্জাব);

ক্যাসিয়াস ক্লে বিজয়ী

ক্যাসিয়াস ক্লে (বর্তমান নাম মহম্মদ আলী) তৃতীয় রাউন্ডের লড়াইয়ের মাথায় জেরী কুয়ারিকে টেকনিক্যাল নক্ আউটে পরাজিত করে সাড়ে তিন বছর পর পুনরায় আন্তর্জাতিক মুষ্টিযুদ্ধের আসরে ফিরে এসেছেন। ১৯৬৭ সালের এপ্রিল মাসে তাঁর হেভীওয়েট বিভাগের বিশ্ব খেতাবটি বাতিল হয়ে যায়। জেরি কুয়ারির বিপক্ষে ক্যাসিয়াস ক্লের আলোচ্য লড়াইটি ১৫ রাউন্ড পর্যন্ত নির্দিষ্ট করা ছিল; কিন্তু ক্লে তৃতীয় রাউন্ডের লড়াইয়ে কুয়ারিকে এক প্রচণ্ড ঘুঁসি মেরে জখম করেন কুয়ারির বাঁ চোখের উপরে বড় রকমের ক্ষত দেখা দেয় এবং তাঁর সারা মুখে রক্তগঙ্গা বয়ে যায়। আরও বিপদজনক অবস্থা হওয়ার আগেই রেফারী লড়াইটি বন্ধ করে ক্লেকে বিজয়ী ঘোষণা করেন। এই লড়াইটি ৯ মিনিটে শেষ হয়। বর্তমান হেভীওয়েট চ্যাম্পিয়ান জো ফ্রেজার আগামী ১৮ই নভেম্বর তাঁর বিশ্ব খেতাব অক্ষুন্ন রাখার জন্য বব ফস্টারের সঙ্গে লড়বেন। জো ফ্রেজার যদি এই লড়াইয়ে জয়ী হন তাহলে ১৯৭১ সালে তাঁকে ক্যাসিয়াস ক্লের সঙ্গে লড়তে হবে। এখানে উল্লেখ্য ক্যাসিয়াস ক্লে তাঁর গত দশ বছরের পেশাদার খেলোয়াড় জীবনে যে ৩০ বার জয়ী হয়েছেন তার মধ্যে নকআউটে ২৪ বার।

পোলভল্টে বিশ্ব রেকর্ড

গ্রীস-যুগোশ্লাভিয়ার দ্বৈত অ্যাথলেটিক্স অনুষ্ঠানে গ্রীসের চারিস পাপানিকলাউ পোলভল্টে ১৮ ফিট (৫·৪৯ মিটার) উচ্চতা অতিক্রম করে 'বিশ্বরেকর্ড' ভেঙেছেন। এখানে উল্লেখ্য পোলভল্টে ১৮ ফিট উচ্চতা অতিক্রমের নজির এই প্রথম। পূর্বের 'বিশ্বরেকর্ড' ছিল ১৭ ফিট ১১ ইঞ্চি (৫·৪৬ মিটার)—উলফগ্যাং নর্ডউইগ (পূর্ব জার্মানী)।

নেহরু হকি প্রতিযোগিতা

দিল্লীর শিবাজী স্টেডিয়ামে আয়োজিত নেহরু হকি প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় দিনের ফাইনালে অল ইণ্ডিয়া পুলিশ দল ১—০ গোলে গত বছরের রানার্স-আপ নর্দার্ণ রেল দলকে পরাজিত করে নেহরু ট্রফি জয়ী হয়েছে। প্রথম দিনের ফাইনাল খেলা গোলশূন্য অবস্থায় অমীমাংসিত ছিল। সেমি-ফাইনালে অল ইণ্ডিয়া পুলিশ দল ১—০ গোলে ওয়েস্টার্ণ রেল দলকে এবং নর্দার্ণ রেল দল ৪—১ গোলে কলকাতার সাউথ ইস্টার্ণ রেল দলকে পরাজিত করে ফাইনালে উঠেছিল।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

বিভূতি-রচনাবলী

আগামী ১৪ই নভেম্বর গ্রাহক হওয়ার শেষ তারিখ।

প্রথম খণ্ড—১৪, : ২য় খণ্ড—১৪, : ৩য় খণ্ড—১৪, ডাক মাশুল একত্রে

গ্রাহকগণকে ভি পি'তে পাঠানো সম্ভব নয় তিন খণ্ড ৫·১০

।। নূতন বই ।

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের

মক্ষীরানী ৫৷৷

আশাপূর্ণা দেবীর অর্বাচীন

একাল সেকাল অন্যকাল ১৫্

কমলা মিত্রের

কাশ্মীর থেকে কুমারিকা ৭্

সাহানা দেবীর

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের স্মৃতিকথা

মৃত্যুহীন প্রাণ ৪৷৷

ভবতারণ দত্ত সংকলিত

বাংলা দেশের ছড়া ১০্

প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়ের

যমুনোত্তরী হতে গঙ্গোত্তরী ও গোমুখ ৫্

আবদুল জব্বারের

বাংলার চালচিত্র ১০্

নজরুল ইসলামের

সান্ধ্যমালতী ৪৷৷

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের

একই পথের দুই প্রান্তে ৪্

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ভ্রমণ কাহিনী

মণিমহেশ ৬৷৷

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

আমি কান পেতে রই

।। তৃতীয় মুদ্রণ — চৌদ্দ টাকা ।।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের

ভগবতীতনু ১০্ মৃগমদ ৮্

মানসী মুখোপাধ্যায়ের

গ্রীণরুম ৫্

প্রমথনাথ বিশীর

শাহী শিরোপা ৩৷৷ কেরী সাহেবের মুন্সী ১০্

বিমল মিত্রের

কুমারী ব্রত ৫্ কলকাতা থেকে বলছি ৬্

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের

ঈশ্বরের আবাস ৬্ ইস্টবাকল্যান্ড রোড ৮৷৷

সুমথনাথ ঘোষের

নীলাঞ্জনা ৭·৫০ বাঁকা স্রোত ৬·৫০

প্রফুল্ল রায়ের

বাতাসে প্রতিধ্বনি ৭্ মুক্তা ৫্

নীহাররঞ্জন গুপ্তের

সেই মরুপ্রান্তে ১১্ কালো ভ্রমর ১২৷৷

তারাশঙ্করের

রাধা ৮্ কালিন্দী ১০্ না ৩্

সৈদ মুজতবা আলীর

টুনিমেম ৮্ বড়বাবু ৭্ রাজাউজীর ৮্

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের

নগর পারে রূপনগর ১৮্

কাল, তুমি আলেয়া ১২৷৷

শঙ্কু মহারাজের

বিগলিত করুণা জাহ্নবী যমুনা ৮্

গহন গিরিকন্দরে ৬্

প্রবোধকুমার সান্যালের

এক চামচ গপ্পা ৪্

মিত্র ও ঘোষ :: ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

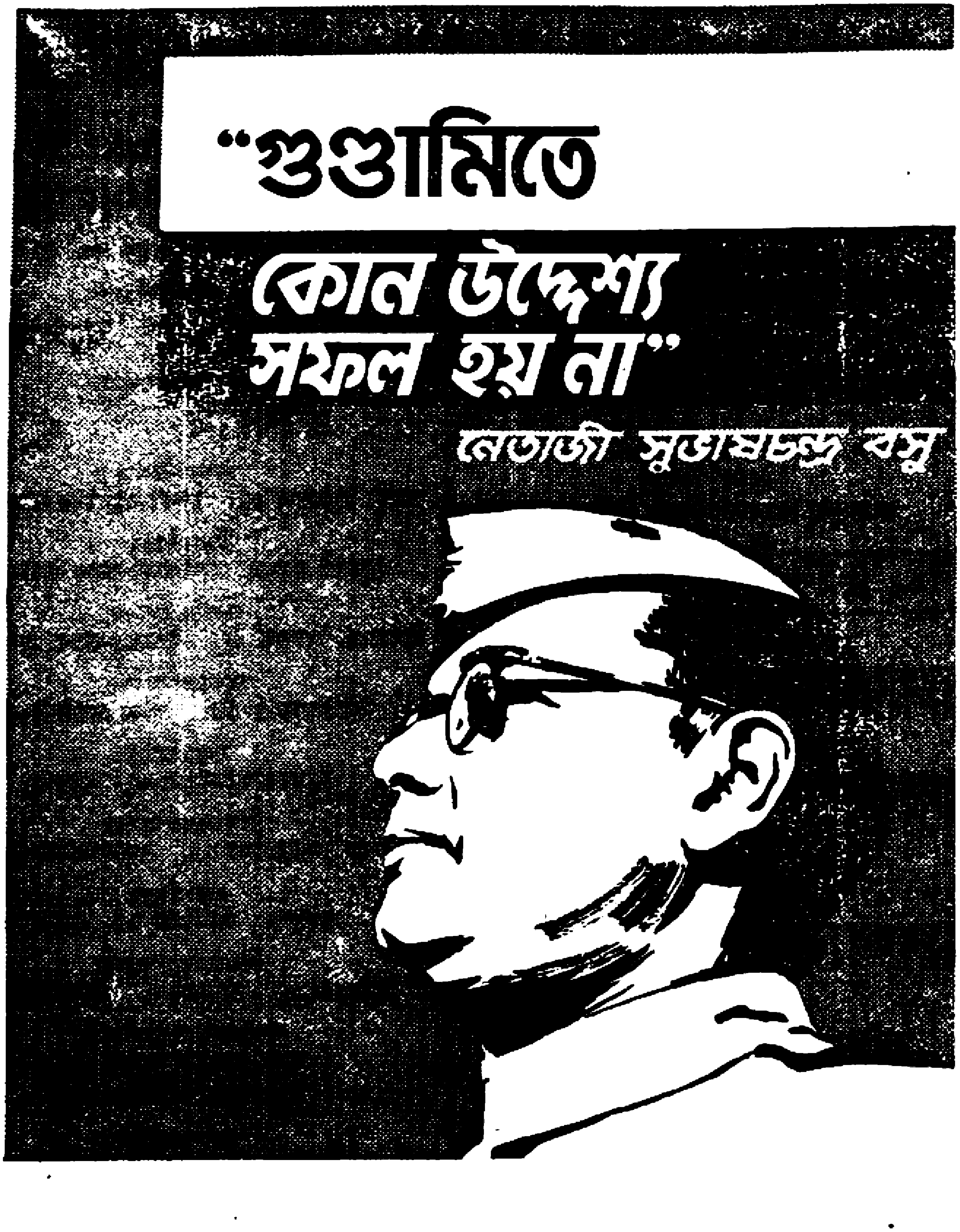
"গুণ্ডামিতে
কোন উদ্দেশ্য
সফল হয় না"
নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু

১০ম বর্ষ
৩য় খণ্ড

অমৃত

২৭ সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday, 13th Nov. 1970. শুক্রবার, ২৭শে কার্তিক, ১৩৭৭ 40 Paise

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
৮৪	চিঠিপত্র		
৮৬	সাদাচোখে		—শ্রীসমদর্শী
৮৮	দেশেবিদেশে		—শ্রীপুণ্ডরীক
৮৯	ব্যঙ্গচিত্র		—শ্রীকাফী খাঁ
৯১	সম্পাদকীয়		
৯২	পরলোকে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়		
৯৩	দৃশ্যপট সামনে	(গল্প)	—শ্রী[illegible]
১০১	এই আমাদের দেশ		—শ্রীনন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
১০৩	সি-এম-ডি-এ		—শ্রীবিপ্র ঘোষ
১০৭	তুলসী চরিত	(উপন্যাস)	—শ্রীনন্দমাধব চৌধুরী
১১২	মুখের মেলা		—আবদুল জব্বার
১১৫	সাহিত্য ও সংস্কৃতি		—শ্রীঅভয়ঙ্কর
১১৮	শারদ-সাহিত্য পরিক্রমা		—শ্রীপর্যবেক্ষক
১২২	শিল্পী অশোক মুখোপাধ্যায়		—শ্রীবিশেষ প্রতিনিধি
১২৩	নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে	(উপন্যাস)	—শ্রীঅতীন বন্দ্যোপাধ্যায়
১২৭	নিকটেই আছে		—শ্রীসন্ধিৎসু
১২৯	মনের কথা		—শ্রীমনোবিদ
১৩৩	আমিষ নিরামিষ প্রাত্যহিক	(গল্প)	—শ্রীপ্রভাত দেব সরকার
১৩৭	নিজেরে হারায়ে খুঁজি	(স্মৃতিচিত্রণ)	—শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী
১৪০	বিজ্ঞানের কথা		—শ্রীঅয়স্কান্ত
১৪৩	পিঞ্জর	(বড় গল্প)	—শ্রীসুভাষ সিংহ
১৪৮	গোয়েন্দা কবি পরাশর		—শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র রচিত —শ্রীশৈল চক্রবর্তী চিত্রিত
১৪৯	অঙ্গনা		—শ্রীপ্রমীলা
১৫০	বাংলা ছোটোগল্পের গোপন সমস্যা		—শ্রীসুরজিত চক্রবর্তী
১৫১	প্রেক্ষাগৃহ		—শ্রীনান্দীকর
১৫৬	প্রদর্শনী পরিক্রমা		—শ্রীচিত্ররসিক
১৫৭	খেলার কথা		—শ্রীশঙ্করবিজয় মিত্র
১৫৯	খেলাধুলা		—শ্রীদর্শক

প্রচ্ছদ : শ্রীগোবিন্দ মণ্ডল

বেঙ্গল মোশন পিকচার ডায়রী
বর্ধিত কলেবরে নবতর রূপে
"ইণ্ডিয়ান মোশন পিকচার অ্যালমানাক"
(নতুন নামে)
প্রকাশিত হতে চলেছে

চলচ্চিত্র শিল্প সম্পর্কিত সংস্থা ও ব্যক্তিবর্গ স্ব-স্ব নতুন ঠিকানা ও ঠিকানা পরিবর্তন ও জ্ঞাতব্য বিষয়াদি ৩০শে নভেম্বরের মধ্যে নীচের ঠিকানায় পাঠান।

বি, ঝা, শর্ট্ পাবলিকেশনস্
৩-বি, ম্যাডান স্ট্রীট, কলি : ১৩

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষের
বিচিত্র কাহিনী
(৪র্থ সংস্করণ)

নবীন ও প্রবীণদের সমান আকর্ষণীয়

অজস্র চিত্র সম্বলিত
বিচিত্র গল্পগ্রন্থ। মূল্য : দুই টাকা
লেখকের

আর একখানা বই
আরও বিচিত্রকাহিনী
অসংখ্য ছবিতে পরিপূর্ণ
মূল্য : তিন টাকা

প্রকাশক :
এম সি সরকার এণ্ড সন্স
প্রাইভেট লিমিটেড

সকল পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

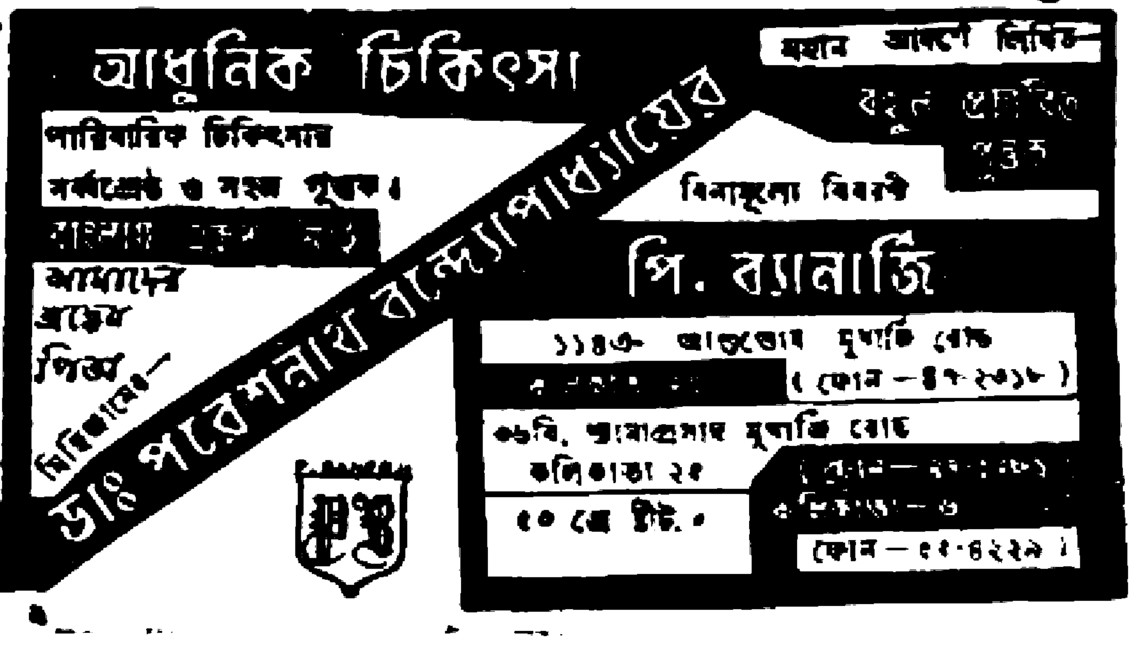

চিঠিপত্র

শারদ সাহিত্য পরিক্রমা

শারদ সাহিত্য পরিক্রমা শীর্ষক প্রবন্ধের মাধ্যমে এবারে বিভিন্ন শারদীয় পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত ছোটগল্পের সুচিন্তিত ও বিস্তৃত আলোচনা পড়লাম। শ্রীপর্যবেক্ষক লিখিত এই আলোচনাটি ছোটগল্পের লেখক, তাঁদের আবির্ভাবের কাল ও বৈশিষ্ট্য, ছোটগল্পের বিষয় অনুযায়ী শ্রেণী বিন্যাস, নবীন ও তরুণ গল্পকারদের ছোটগল্পের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও বিচিত্র গতি-প্রকৃতির পরিচয় স্বতন্ত্র উপ-শিরোনামে চিহ্নিত করে এমন-ভাবে সাজানো হয়েছে যে সাধারণ পাঠকও এবারের ছোটগল্পের একটা সহজবোধ্য পরিচয় পাবেন। বাংলাদেশে শারদীয় পত্র-পত্রিকার সংখ্যা বহু এবং তাদের চোখ ধাঁধানো চকমারী বিজ্ঞাপনের জাঁকজমকের বাজারে কোন্‌টা সৎ সাহিত্যের এবং কোন্‌টা বা অসৎ সাহিত্যের প্রচারক তা সাধারণ পাঠকের পক্ষে বুঝে ওঠাই দুরূহ। তাছাড়া আমাদের পক্ষে মফস্বলী বহু-বিচিত্র পত্র-পত্রিকার অনেকগুলো পড়া সম্ভব হয়ে ওঠে না। বিশেষত সাহিত্য পত্রিকা সম্পর্কে এখনও ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি হয়নি। স্বভাবতই আমাদের এ সময়ের কথা কে কিভাবে বলছেন তা বিস্তৃতভাবে জানাও সম্ভব হয়না। পর্যবেক্ষকের বর্তমান আলোচনাটি সেদিক থেকে আমাদের যথেষ্ট প্রয়োজনীয় সহায়ক হবে সন্দেহ নেই। প্রচুর গল্পের বিষয়বস্তু নিয়েও তিনি আলোচনা করেছেন। আজকাল অধিকাংশ প্রবন্ধে যেমন অহেতুক কাগজকালি বিস্তর দেখা যায় এবং অতি সাধারণ বিষয়ও জটিলতর করে তোলা হয় এই আলোচনাটি তা থেকে মুক্ত। অত্যন্ত শ্রম ও নিষ্ঠার সঙ্গে লেখক প্রবীণ ও নবীন গল্পকারদের এ সময়ের গল্পের পরিচয় দিয়েছেন।

সবচেয়ে ভাল লাগল, এই সময় ও সমাজ-ভাবনা প্রবীণ ও নবীন লেখকরা কে কিভাবে তাঁদের ছোটগল্পের বিষয় করে তুলছেন তার আলোচনা। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সন্তোষকুমার মিত্র প্রমুখ প্রবীণ গল্পকাররাও যে বর্তমান সময়ের ভয়ঙ্কর ঘটনা প্রবাহ নিয়ে ভাবছেন এটা খুবই আনন্দের বিষয়। নবীন ও তরুণ গল্পকার যেমন, মিহির আচার্য, প্রফুল্ল রায়, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, মুস্তাফা সিরাজ, মিহির পাল, তপোবিজয় ঘোষ, অমিয় রায়, মহাশ্বেতা দেবী, যশোদাজীবন ভট্টাচার্য, সঞ্জয় সমাদ্দার এবং আরও অনেকেই বর্তমান সমাজের সমস্যা, সংকট এবং চাওয়া-পাওয়ার কথা নিয়ে আলোকপাত করছেন, এটা সামাজিক কর্তব্য করার মতই গুরুত্বপূর্ণ। সমাজের সর্বস্তরে অসন্তোষ, সমসাময়িক ঘটনা প্রবাহ, সমস্যা ও জিজ্ঞাসার উপর আরও ব্যাপকতর আলোকপাত করে সময়োচিত কর্তব্য পালন করতে বিশেষ করে নবীন ও তরুণ লেখকরা আরও সক্রিয় হয়ে উঠুন। কারণ তাঁদের কাছে আমাদের প্রত্যাশা অ-নে-ক। আজকের বিশৃঙ্খল এবং জীবনযুদ্ধে হতাশ মানুষ সাহিত্যিকদের কাছ থেকে বাঁচার প্রেরণা পেতে চায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় নামকরা সাহিত্যিকদের মধ্যে কারো কারো ইদানিং এই সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর তেমন কোন সাড়া দেখা যায় না। তাঁরা প্রেম ও মামুলি বিষয়ের উপর এত বেশী জোর দেন যে মনে হয় ঐসব বিষয় ছাড়া আমাদের সমাজ জীবনে আর কোন সমস্যাই নেই।

অমৃতের নিয়মিত পাঠক হিসাবে আমি খুশি যে আপনারা বর্তমানে সমাজ-ভাবনা বিষয়ক গল্প নিয়মিত প্রকাশ করেন, বিশেষ করে এবারের মূল্যবান শারদ সংকলনে অনেক উল্লেখযোগ্য গল্প প্রকাশ করেছেন। অসমাপিকা, সুভদ্রার মুখ, কল্পমেধ, বাঁচার জন্য, ভীষ্মের পিপাসা, মহিষ, বিপন্ন মানুষ প্রভৃতি গল্প একই সংকলনে পাওয়া নিঃসন্দেহে খুশি হওয়ার মত। পর্যবেক্ষকের প্রবন্ধে এই জাতীয় গল্পের বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব স্থান পাওয়ায় গল্পগুলো সাধারণ পাঠকেরও বোঝবার সহায়ক হয়েছে। জীবনানন্দ দাশের একটি গল্প (মনতো) এবং শচীন বিশ্বাসের দুটি গল্প (লেখা ও রেখা, প্রান্তিক) উক্ত প্রবন্ধে স্থান পেলে আমরা আরও খুশি হতাম।

ক্ষুদিরাম দাস
ধুবুলিয়া, নদীয়া

সঙ্গীত সমালোচনা

সাপ্তাহিক অমৃতের আমি একজন নিয়মিত পাঠক। প্রত্যেকবারের মত এবারও আমি সব সঙ্গীত সম্মেলনের সমালোচনাগুলি পড়েছি। এর মধ্যে সদারঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলনের সমালোচনাটি খুবই মনোগ্রাহী হয়েছে। সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গী প্রশংসার দাবী রাখে। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শাস্ত্রে কণ্ঠসঙ্গীতকেই প্রথম যন্ত্রসঙ্গীতকে দ্বিতীয় এবং নৃত্যকে তৃতীয় স্থান দেওয়া হয়েছে। শুধু এইভাবে বিন্যাসই নয় সমালোচনার মধ্যে সমালোচকের জ্ঞানের সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। আমি কলকাতার সব সঙ্গীত অনুষ্ঠানেই প্রায় যোগদান করি এবং সব সাপ্তাহিক এবং দৈনিক কাগজগুলির উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত বিষয়ক সমালোচনাগুলিই দেখি। আপনাদের সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রকাশিত সমালোচনাগুলিতে পক্ষপাতিত্বশূন্য এবং স্পষ্টবাদিতার ছাপ থাকে। সমালোচকের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের জ্ঞানও যথেষ্ট আছে বলে মনে হয়।

নিরঞ্জন লাহিড়ী
কলকাতা—৩০

দিবস বিভাবরী

এইমাত্র শারদীয় সংখ্যায় শ্রীমিহির আচার্য প্রণীত 'দিবস-বিভাবরী' উপন্যাসটি পাঠ করে আমাদের বর্তমান অস্তিত্ব সম্পর্কে আতঙ্কিত হয়ে উঠলাম। এরূপ হৃদয়হীন নির্মম চিত্রণ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পর বাংলা উপন্যাসে খুব বেশী দেখিনি। বর্তমান সমাজে কৌমার্যের লোভে মধ্যবিত্তশ্রেণী যে দোদুল্যমানতার শিকার হয় নায়িকা প্রকৃতিও সেই অন্ধ কৌমার্যের তৈরীর কানামাছি। এই পথে পুরুষের অপেক্ষা মেয়েদেরই অধিক জীবনের দাম দিতে হয়। প্রকৃতিও দিয়েছে। পরিণামে তার সর্বহারা জীবনে আমরা দুঃখিত হলেও একে অনিবার্য সিদ্ধান্ত বলে মনে করি। এমন নিষ্ঠুর কাহিনী বর্ণনে লেখক যে কোথাও ভাবালুগ্রস্ত হননি এর জন্য তাঁকে পুনরায় ধন্যবাদ।

নিরঞ্জন নাথ
গরফা, যাদবপুর

বিমূর্ত দাহ

'অমৃত' ২০শ সংখ্যায় শ্রীঅজিত সেন 'বিমূর্ত দাহ' ছোট গল্পটি পাঠ করে মুগ্ধ হয়েছি। মধ্যবিত্ত সমাজের জীবন-যন্ত্রণা ও মথিত প্রাণের নিরুচ্চার বেদনাকে শ্রীসেন দরদী মনের আলোয় উদ্ভাসিত করেছেন। শিল্পীর সৃষ্টি তখনই সার্থক যখন সেই সৃষ্টি অন্যের মনে সাড়া জাগায়—সেই নিরিখের বিচারে শ্রীসেন সম্পূর্ণ সফল। তাঁকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। সোনা এবং হেনা, সোনার তিরিশ পার হয়েছে, হেনার চৌত্রিশ। এই হেনাই নিজের জীবন যৌবন বিসর্জন দিয়ে অনুজ অসীমকে মানুষ করেছে। কিন্তু অসীম তার মানসীকে রেজেস্ট্রি করে বিয়ে করেছে—সোনা-হেনার কথা একবারও ভাবেনি। হেনাকে বিয়ের জন্য দেখতে এলে তার—আনুষঙ্গিক খরচও হেনারই দিতে হয়—অসীম এ ব্যাপারে উদাসীন। বার বার ব্যর্থ হয়ে হেনা বুঝেছে তার চির কৌমার্য ঘুচবে না। কিন্তু কার জন্য তার এ অবস্থা? তার নিজের সাধ-স্বপ্ন কার জন্য সে বিসর্জন দিয়েছিল? যে সংসার তার সব নিয়েছে, তাকে সে দিয়েছে কি? এ

চিঠিপত্র

প্রশ্ন শুধু হেনার নয়, অনেক মধ্যবিত্ত পরিবারের চিরকুমারীদের মনেই আজ এই নির্মম প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। সোনার জীবনে শুভেন্দুর ক্ষণিক আবির্ভাবও লেখক কৃতিত্বের সঙ্গে এঁকেছেন। যৌবন-সীমান্ত উপনীত অনেক মেয়েই পুরুষ-সান্নিধ্য খোঁজে, যদিও ভাল করেই জানে তাদের মিলন সম্ভবপর নয়। রমলা চরিত্রটিও বাস্তবানুগ। অনেক অভিভাবক মেয়েদের নির্বাধ স্বাধীনতা দেন, তাদের দায়িত্ব এড়াবার জন্য তার ফল হয় ভয়াবহ। সবচেয়ে ভাল লেগেছে গল্পাংশের শেষ ভাগটি যখন হেনা তার কানের দুলের জন্য চীৎকার করছে। তার আগের মুহূর্তেই সে শুনেছে তার অষ্টাদশী খুড়তুতো বোন মঞ্জুর বিয়ে স্থির হয়েছে। ঐ ঘটনার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াই হেনার মানসিক ভারসাম্যের অভাব। একটি ছোট গল্পের পরিসরে অজিতবাবু আশ্চর্য সুন্দর মুন্সীয়ানার প্রমাণ দিয়েছেন।

অরুণা সরকার
কলকাতা—২

নীলকণ্ঠ পাখীর খোঁজে

আপনার সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'অমৃত' পত্রিকায় অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' উপন্যাসটি নিয়মিত পড়ছি ও আশ্বিনের সংখ্যায় শিশুদের যে ঘটনাটি বর্ণনা করা হয়েছে, আমার কাছে তা অশ্লীল বলে মনে হয়েছে। শিশুর জীবনে যৌনবিকৃতি সহজাত বা উত্তেজনা-জনিত নয়, কুশিক্ষাজনিত। ঘটনাগুলি হয়ত মিথ্যাও নয় কিন্তু সেটা মনস্তত্ত্ববিদ বা চিকিৎসকের বিষয়। এটাকে সর্বজন-গ্রাহ্য সাহিত্যের অঙ্গীভূত করা যায় কিনা সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। আপনার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যই এই চিঠি।

গৌরগোবিন্দ চক্রবর্তী
দক্ষিণ গড়িয়া
২৪ পরগণা

(২)

আমি সাপ্তাহিক 'অমৃত' পত্রিকার নিয়মিত পাঠক। শ্রীঅতীন বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত ধারাবাহিক উপন্যাস 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' নিয়মিত পড়ছি। এত সুন্দর আর সহজ মধুর উপন্যাস 'অমৃত' পত্রিকায় খুব কমই পড়েছি। প্রতি সপ্তাহে যখনই নতুন পত্রিকা পাই আমি খুব আগ্রহের সঙ্গে পড়ি নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে উপন্যাস। যতই পড়ি ততই ইচ্ছা হয় আর একবার পড়ি। পড়তে পড়তে মনে করিয়ে দেয় আমাদের আগেকার দেশের আসল দিনগুলির কথা। আমরা যতই বড় হচ্ছি ততই ভুলে যাচ্ছি সেখানকার ভাষা, সমাজ, পরিবেশ, আচার আচরণ। এমনিভাবেই লেখক সোনার চরিত্রকে তুলে ধরেছেন আমাদের সামনে। সোনা আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে, আর মাতৃভাষা ছেড়ে কিছু কিছু বই-এর ভাষা শুরু করেছে। এত সুন্দর বাস্তবানুগ সহজ পদ্ধতিতে উপন্যাস লেখার জন্য অতীনবাবুকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।

নীলকমল বিশ্বাস
দুইয়া, ২৪ পরগণা

'তিনগাঁয়ের চিঠি' প্রসঙ্গে

৬ই কার্তিকের অমৃতে শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় "তিন গাঁয়ের চিঠি"তে বিলেতের একটা প্রসংগ উল্লেখ করেছেন যা সত্যি নয়। তিনি লিখেছেন "লন্ডনে বাংলা সাহিত্য ত্রৈমাসিক দর্পণ..."

জানি না বিশ্বনাথবাবু পত্রিকাটি পড়েন কিনা তবে সেটা সাহিত্য পত্রিকা নয়। তার পরিচয় পত্রে লেখা "স্বাধীন নিরপেক্ষ বাংলা সাময়িকী"। অবশ্য ওপরে সাহিত্য পত্রিকা লিখলেই সৎ সাহিত্য হয় না।

এই প্রসঙ্গে আমার বক্তব্য লন্ডনে এশিয়াবাসীদের অনেক "সাময়িকী" আছে। বিভিন্ন ভাষায়। মায় ইংরাজীতেও। তবে সাহিত্য পত্রিকা একটি। সেটা বাংলা ভাষায়। নাম 'সাগর পারে'। বাংলার দিকপাল সাহিত্যিকরাও তাতে লেখেন।

যাইহোক ভবিষ্যতে লন্ডনের বুকে আরও সাহিত্য পত্রিকা গড়ে উঠলে সুখের কথা হবে।

হিরণ্ময় ভট্টাচার্য
সম্পাদক
'সাগর পারে'

'নিকটেই আছে' প্রসঙ্গ

আমি আপনাদের 'অমৃত' পত্রিকার একজন নিয়মিত পাঠিকা। এই পত্রিকায় সংযোজিত 'নিকটেই আছে' বিভাগটি বর্তমানের জুয়াচুরি জালিয়াতিপূর্ণ আবহাওয়ায় খুবই যুগোপযোগী হয়েছে।

পথে-ঘাটে-স্কুল-কলেজে-চাকুরীর ইন্টারভিউতে সর্বত্র আজ প্রতারণার ফাঁদ-পাতা। সরল নিরীহ মানুষের একটু অসাবধানে সে ফাঁদে পতন অনিবার্য।

এই প্রসঙ্গে আমি আর একরকম প্রতারণার কথা আপনাদের জানাচ্ছি। সেটি হ'ল অসৎ-অসাধু-অনামী পুস্তক প্রকাশক কর্তৃক তরুণ লেখক-লেখিকাদের প্রতারণার সংবাদ। ইদানীং কলেজ স্ট্রীটের পাড়ায় বেশ কিছু অসাধু প্রকাশক (বলা বাহুল্য কোনও নামী প্রকাশক নয়) গজিয়ে উঠেছে যাদের কাজই হল তরুণ লেখক-লেখিকাদের ঠকানো। এঁরা পুস্তক প্রকাশনার নামে লেখকদের কাছ থেকে বেশ মোটা অংকের টাকা আত্মসাৎ করেন। তারপর খুব অল্প টাকায় নিকৃষ্ট চেহারায় সেই লেখক বা লেখিকার পুস্তক প্রকাশ করেন। এবং পরিশেষে দুই বছর পরে লেখক বা লেখিকাকে একটি নোটিশ দেন যে, "আপনার বই বৎসরে ৮০ কপির বেশি বিক্রি হচ্ছে না। অতএব 'আন প্রফিটেবল' বলে ধরা হোল।" অর্থাৎ সোজা কথায় প্রকাশক কর্তৃক সেই লেখক বা লেখিকার সমস্ত বই 'বাজেয়াপ্ত' করা হল।

তারপর সেই হতভাগ্য লেখক বা লেখিকাকে এই অবস্থায় অন্ধকারের কোন্ অতল তলে গিয়ে দাঁড়াতে হবে—তা আশা করি সহজেই অনুমান করতে পারছেন।

অপর্ণা চট্টোপাধ্যায়
কল্যাণনগর, আমতলাহাট
২৪ পরগণা

রণজিৎ পালের আয়না

অমৃতের ১০ বর্ষ ২৪ সংখ্যায় প্রকাশিত রণজিৎ পালের 'আয়না' গল্প আধুনিক মননের তোলপাড়-চিন্তা। তারপর গল্পের সেই তোলপাড় চিন্তার ফাঁকে আর দুটো ভাবনা। আর এদের ভাবনাই মনস্তত্ত্বের দার্শনিককে যৌনমনে ডুবিয়ে দেয় অপার সাগর জলে।

আধুনিক ছোট গল্পের পাঠক নিটোল মনস্তত্ত্বের তত্ত্বভাবনায় মশগুল হতে ভালবাসে। মানবমনের মর্মমূলে শত আঘাতের চঞ্চলতায় সেই হৃদয়তন্ত্রী কত সুরে ঝংকার তুলতে পারে তাই দেখতে চায় আধুনিক গল্প-পাঠক। আমাদের হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে আবদ্ধ সূক্ষ্ম মননির্যাস যা প্রচন্ড আবেগে দানা বেঁধে রয়েছে তার বহুতর দৃষ্টিভঙ্গীর যাতাপথ দেখানো আধুনিক গল্পকারের উদ্দেশ্য হলেই পাঠকের মনের ক্ষুধার নিবৃত্তি হয়। রণজিৎবাবুর বলিষ্ঠ শিল্পীসত্তার গুণে এবং সম্পাদক মহাশয়ের নির্ভীক সত্যপালনের ও যথার্থ শিল্পের চরিতার্থতার সহায়তার গুণে আমাদের মানসলোক ধন্য হয়েছে একথা না স্বীকার করে পারলাম না।

কেশব আড্ড
বালুলো, হাওড়া

শাদা চোখে

বাংলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শ্রীসুশীল ধাড়া দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বার বার ঘোষণা করছেন যে তাঁর দলের আট পার্টি জোটে যোগ দেওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। শ্রীধাড়া কেন একথা বলছেন তা বুঝতে আদৌ কষ্ট হয় না। অষ্টবামের জোটে না গেলেও শ্রীধাড়া জানেন বা হয়ত বুঝতে পারছেন, তাঁর দল তাঁরই প্রস্তাবিত গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের নেতৃত্ব দিয়ে পশ্চিম বাংলায় পুনরায় ক্ষমতা দখল করতে পারবে। হয়ত একথাও তিনি ভেবেছেন যে বামপন্থীদের সঙ্গে যেখানে প্রতি পদক্ষেপেই কর্মক্রম ও চিন্তার পার্থক্য পরিস্ফুট হয়ে ওঠে সেক্ষেত্রে আর একবার কোয়ালিশান সরকার করে হাত পোড়ানো উচিত হবে না। কাজেই বার বার 'সমভাবাপন্ন' দলগুলির সঙ্গে ঐক্যের কথা বলে শ্রীধাড়া ইতিমধ্যেই পশ্চিমবাংলায় একটি গণতন্ত্রী মনোভাব গড়ে তুলবার মত অবস্থা সৃষ্টি করে ফেলেছেন। শ্রীধাড়ার এই বক্তব্যের পর আট পার্টি জোটের বিদ্রোহী পি এস পি বলেছে তাঁরা বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে কথাবার্তা চালিয়ে যাবেন। কেন এ ধরনের সিদ্ধান্ত বিদ্রোহী পি এস পি নিল তা বোঝা মোটেই কষ্টসাধ্য নয়। মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমার চারটি আসনের জয়লাভের প্রশ্নটা অনেকখানি বাংলা কংগ্রেসের সহযোগিতার উপর নির্ভর করছে। তাই সেখানকার পূর্বতন সমস্যা চাপ সৃষ্টি করেছেন যে বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে আঁতাত গড়তেই হবে। পি এস পি নেতৃত্ব এ দাবীকে অগ্রাহ্য করতে পারে নি। কাজেই আসনের সংখ্যার দিকে লক্ষ্য রেখেই তাঁদের রাজনৈতিক লাইন ঠিক করতে হল।

অন্যদিকে আবার ডান কম্যুনিস্টরাও একটু বিপদে পড়েছেন। তাঁদের সর্বভারতীয় নীতি হিসাবে তাঁরা সোজাসুজি না হলেও বাংলা কংগ্রেসের মাধ্যমে শাসক কংগ্রেসের সঙ্গে মিতালি করতে সচেষ্ট ছিলেন। কিন্তু সেখানেও তাঁর বাধা এসেছে শ্রীসুশীল ধাড়ার কাছ থেকে, এবং শাসক কংগ্রেসের নেতৃত্বের একাংশ ও যুব কংগ্রেস এবং ছাত্র পরিষদের তরফ থেকে। এ বাধা আসাটা স্বাভাবিক। কারণ, ডান কম্যুনিস্ট পার্টি বর্তমানে যতই নীতি বদলাবার কথা বলুক না কেন, কংগ্রেসীরা তাঁদের সান্নিধ্যে সন্দিহান হতে বাধ্য। কম্যুনিস্টদের আন্দোলনের তীব্রতা পশ্চিমবঙ্গে সবচেয়ে বেশী ছিল। আর কংগ্রেসকে সব সময়েই এ আন্দোলনের মোকাবিলা করতে হয়েছে। কাজেই তাঁরা কম্যুনিস্ট পার্টির সদিচ্ছাকে ধৃতরাষ্ট্রের আলিঙ্গনের মতই মনে করেন। অন্যান্য রাজ্যে কম্যুনিস্টদের আন্দোলন নেই বললেই চলে। অবশ্য কেরল ও অন্ধ্র ব্যতীত্ ক্ষেত্রে। কাজেই সেই সমস্ত রাজ্যে নব কংগ্রেসের কর্মীদের মধ্যে কম্যুনিস্ট ভীতিটা এত দানা বেঁধে ওঠেনি যে পরিমাণে পশ্চিম বাংলায় তা হয়েছে।

শ্রীসুশীল ধাড়া ও শ্রীঅজয় মুখার্জিও এক সময় কম্যুনিস্টদের সম্পর্কে অত্যন্ত কঠোর মনোভাব পোষণ করতেন। বিশেষ করে শ্রীঅজয় মুখার্জি ত এমন একদিন ছিল যখন কম্যুনিস্টদের মুখোস না খুলে' দিন কাটাতেন না। কেবলমাত্র শ্রীঅতুল্য ঘোষের রোষবহ্নিতে পড়েই শ্রীমুখার্জি কম্যুনিস্টদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে অপমানের প্রতিশোধ নিয়েছিলেন। শ্রীমুখার্জির এটা একটি কৌশল ছিল মাত্র। আসলে তাঁর সঙ্গে কম্যুনিস্টদের যে আদর্শগত পার্থক্য আছে তা তিনি ভোলেন নি। আর একসঙ্গে কাজ করার পর এতদিনের তত্ত্বগত পার্থক্য অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বাস্তবক্ষেত্রে আরও দৃঢ় ভিত্তিভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত হল। তাই শ্রীসুশীল ধাড়া বার বার সমভাবাপন্ন দলগুলির ঐক্যের উপর জোর দিচ্ছেন। সি পি আই যত বন্ধুত্বের হাত সম্প্রসারিত করুক না কেন বর্তমানে বাংলা কংগ্রেসের মনোভাব দেখে মনে হয় কোন ক্রমেই তাঁরা সি পি আই-এর সংশ্রবে যেতে রাজী নন। অধুনা মেদিনীপুরে সর্বত্রই যেভাবে বাংলা কংগ্রেস কর্মী ও সি পি আই কর্মীদের মধ্যে মুখোমুখি সংঘাত চলছে তাতে মনে হয় সমঝোতা থেকে শত্রুতার ক্ষেত্রেই বেশী পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ছে। এমন কি ইতিমধ্যে বহু জায়গায় বাংলা কংগ্রেস কর্মীকে খুন করা হয়েছে বলেও ঐ দলের পক্ষ থেকে সি পি আই-এর বিরুদ্ধে সরাসরি অভিযোগ আনা হয়েছে। তদুপরি সবেমাত্র ধান কাটার মরশুম সুরু হচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই আশঙ্কা করা যায় বিরোধের ক্ষেত্র এই সময় আরও প্রসারিত হয়ে পড়বে। কারণ, কৃষকের সমস্যার প্রতি দুই দলের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে বুনিয়াদী পার্থক্য আছে।

শ্রীধাড়া ও তাঁর বাংলা কংগ্রেস চান ক্ষমতায় থেকে আইন করে আস্তে আস্তে যা কিছু পরিবর্তন তা নিয়ে আসা। বামপন্থীদের সঙ্গে তাঁদের এখানেই দৃষ্টিভঙ্গীর বুনিয়াদী পার্থক্য। বামপন্থীরা চান ক্ষমতায় থেকে প্রশাসনিক যন্ত্রকে হাতিয়ার করে আইন ও গণশক্তিকে কাজে লাগিয়ে সমাজে দ্রুত পরিবর্তন আনার উপযোগী আবহাওয়া সৃষ্টি করা। গণশক্তিকে কাজে লাগানোর প্রশ্নেই হিংসা ও অহিংসার কথাটা এসে পড়ে। এই গণশক্তিকে কাজে লাগাতে গিয়ে যে হিংসা হয় বামপন্থীরা তাকে স্বীকৃতি দিতে রাজী। বাংলা কংগ্রেসের মতে এখানেই হিংসা ঘটছে, এবং আইন শৃঙ্খলা ভেঙ্গে পড়ছে। এই যেখানে পার্থক্য সেখানে বাংলা কংগ্রেস পুনরায় কি করে হাত মিলিয়ে পশ্চিম বাংলায় রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টির কাজে সাহায্য করতে পারে?

তাই শ্রীধাড়া—তাঁর সঙ্গে কোন দল একমত হচ্ছে কি হচ্ছে না তাকে উপেক্ষা করে—একলাই প্রায় পশ্চিমবঙ্গে এক নতুন রাজনৈতিক নেতৃত্ব সৃষ্টির চেষ্টা করছেন। আর এই উদ্দেশ্য চরিতার্থ করবার জন্য মুখ্যত তিনি তিন কংগ্রেস, অর্থাৎ শাসক, আদি ও বাংলা কংগ্রেসের মধ্যে একটি সমঝোতা সৃষ্টির কাজে ইতিমধ্যেই গোপনে আত্মনিয়োগ করেছেন। বাংলা কংগ্রেস ও শাসক কংগ্রেসের মধ্যে ইতিমধ্যেই একটি সম্প্রীতির ভাব গড়ে উঠেছে। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী যখন এটা চান, তখন পশ্চিমবাংলায় যাঁরা বাধা দেবার কথা ভাবছিলেন তাঁদের সরে দাঁড়াতেই হবে। এবং ইতিমধ্যে সরে গেছেনও। এখন বাকী রইল আদি কংগ্রেস। আদি কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতার প্রশ্নে সবচেয়ে বড় বাধা হচ্ছে শ্রীঅতুল্য ঘোষ। কারণ তাঁরই বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত ক্ষোভের পরিণতি হিসাবেই পশ্চিমবাংলায় কংগ্রেসের ভরাডুবি ঘটেছিল। অতুল্যবাবু ছাড়া অন্য সকল কংগ্রেস কর্মী ও নেতাদের মধ্যে মোটামুটি একটা সম্প্রীতির ভাব এখনও আছে। কাজেই অতুল্যবাবুকে বাদ দিয়ে একবার এড হক কংগ্রেস করে অজয়বাবুকে ফিরিয়ে এনে কংগ্রেসকে পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু তখন তা সম্ভব হয়নি। কারণ অতুল্যবাবুর হাত তখনও সুদৃঢ় ছিল। কিন্তু বর্তমানে অতুল্যবাবু পর্দার আড়ালে চলে গেছেন। বস্তুতপক্ষে এখন শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের উপরই পশ্চিমবাংলার আদি কংগ্রেস নির্ভরশীল। তদুপরি 'প্রফুল্লদা' সকলেরই প্রিয়। হালফিল কোন একজন শাসক কংগ্রেস নেতা নাকি প্রফুল্লবাবুকে 'দেশবন্ধু শতবার্ষিকী কমিটিতে' সদস্য হিসাবে গ্রহণ করবার বিরুদ্ধে আপত্তি জানিয়েছিলেন। তখনই শ্রীঅজয় মুখার্জি সহ অনেকেই নাকি তাতে বাধা দিয়ে বলেছেন, তবে তাঁদেরও ঐ কমিটি থেকে বাদ দেওয়া হোক। পরে যিনি শ্রীসেনকে সদস্য হিসাবে গ্রহণ করার বিরোধিতা করেছিলেন তিনিই পশ্চাদপসরণ করেন। এখনও 'প্রফুল্লদার' প্রতি শ্রদ্ধার চিত্র হচ্ছে এই রকমই। কাজেই শ্রীঅতুল্য ঘোষ যদি রাজনৈতিক অবসর গ্রহণ করেন তখন সমঝোতার পথে কাঁটা কোথায়? এই সমঝোতার জন্য ইতিমধ্যে সেন-মুখার্জি বৈঠকও হয়ে গেছে। আদি কংগ্রেসের বক্তব্য দেখলেও মনে হয়, তাঁরাও দলগতভাবে এরকম একটি প্রস্তাবের আদৌ বিরোধী নন। তাঁদের মুখপাত্র ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র বলেছেন, সাম্প্রদায়িক দল, কম্যুনিস্ট বা জাতীয়তা বিরোধী দলগুলি ছাড়া তাঁরা অন্য সব দলের সঙ্গেই সমঝোতায় রাজী। আবার সঙ্গে সঙ্গে ২৮০টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার বাসনার কথা বলেও আঁতাতটা যাতে তাড়াতাড়ি হয় তার জন্য চাপ সৃষ্টি করবার চেষ্টা করেছেন। অন্যভাবে বললে এই দাঁড়ায় যে, আদি কংগ্রেস সমস্ত আসনে প্রার্থী দেবেন বলে ঘোষণা করে সমঝোতাটা যে হচ্ছে তা আপাতঃ জনতাকে বুঝতে দিতে চান না। যে কোন কারণেই হোক প্রচারের ফলে

কেবলমাত্র আদি কংগ্রেসই 'প্রতিক্রিয়াশীল' বলে চিহ্নিত হয়ে গেছে। অতএব তিন কংগ্রেস জোট বাঁধছে একথা তাড়াতাড়ি প্রকাশ হয়ে পড়লে কিন্তু বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হতে পারে, এই আশংকায় হয়ত উনি চন্দ সকল আসনেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন বলে ঘোষণা করেছেন। কিন্তু সমঝোতা করবার জন্য তিনি যে সীমানা চিহ্নিত করেছেন তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে দুই বক্তব্যের মধ্যে অসঙ্গতি স্পষ্ট হবে।

যা হোক ১৯৬৭ সালের নির্বাচনে কংগ্রেসের পরাজয়ের একমাত্র কারণ ছিল শ্রীঅজয় মুখার্জি ও স্বর্গত হুমায়ুন কবিরের কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ ও বামপন্থীদের সঙ্গে মিতালি। যুক্তফ্রন্টকে হেনস্থা করে গদী থেকে অপসারিত করার পরও ১৯৬৯ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনে প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেসের সমর্থন কমে নি। অন্যদিকে সমস্ত বামপন্থী দল, ইস্তক শ্রীমুখার্জির বাংলা কংগ্রেস সহ সকলে একজোট হয়ে কংগ্রেসের সঙ্গে লড়াই করেছিলেন। তদুপরি সৈয়দ বদরুদ্দোজা প্রভৃতি মুস্লিম নেতৃবৃন্দও বামপন্থীদের সঙ্গে ছিলেন। স্বর্গত হুমায়ুন কবির বামপন্থীজোটের বিরোধিতা করলেও সেবারের নির্বাচনে কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মেলান নি। ১৯৬৭ সালে গদী থেকে বরখাস্ত হওয়ার পর স্বাভাবিকভাবেই বামপন্থীদের প্রতি জনতার অনুরাগ ছিল। তদুপরি প্রতিশ্রুতি রূপায়ণের সময় দেওয়া হয়নি বলেও কংগ্রেসের প্রতি জনসাধারণের বীতশ্রদ্ধ ভাব থাকারই কথা। এতদসত্ত্বেও ১৯৬৯ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনের ফলাফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, কংগ্রেসের সমর্থন ত কমেইনি বরঞ্চ বেড়ে গিয়েছিল। আসন কম পাওয়ায় গদী হারিয়েছিল মাত্র, ভোটের সংখ্যা বেশি পেয়েছিল।

কিন্তু ১৯৬৯ সালের নির্বাচনে জয়লাভের পর যুক্তফ্রন্টের 'তেরো মাসা' খুব সুখকর কাহিনী নয়, যতই আস্ফালন করুন না কেন, শরীকী সংঘর্ষ পশ্চিমবাংলার মানুষের মনে যে ত্রাসের সঞ্চার করেছে তা তখনও কাটেনি। এবং নির্বাচনী ম্যানিফেস্টোয় আমজনতাকে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল তা পূরণ করা ত দূরের কথা, তাকে রূপায়িত করবার প্রাথমিক প্রচেষ্টা পর্যন্ত চালানো হয়নি। মাঝে মাঝে এই হচ্ছে, ঐ করা হবে, বলে ঘোষণা করে গণমনে আশার সঞ্চার করা হয়েছিল মাত্র। কাজেই আমজনতা বামপন্থীদের কার্যকলাপে খুবই যে উৎসাহিত বোধ করেছেন একথা বলা যায় না। জনতার হাবভাব খানিকটা যেন বুক ফাটে ত মুখ ফাটে না গোছের। ১৯৬৯ সালে অবিভক্ত কংগ্রেস যে গণসমর্থন পেয়েছিল তা এখন হারিয়েছে একথা বলা যায় না। কংগ্রেস বিভক্ত হওয়ার ফলে সমর্থকের মধ্যে হয়ত খানিকটা বিরক্তির উদ্রেক হতে পারে মাত্র। যদি আবার সমঝোতার মাধ্যমে জনতার সামনে একটা ঐক্যের ছবি তুলে ধরা হয় তবে তাঁদের সমর্থনে ভোটের নাও ধরতে পারে। কংগ্রেস সংগঠনের দিক থেকে কোথাও বিশেষ শক্তিশালী নয়। তাঁদের যা সমর্থন তা হচ্ছে আমজনতার স্বাভাবিক অনুরাগের ফলশ্রুতি মাত্র। কাজেই এবার তিন কংগ্রেস যদি এক হয়ে ময়দানে নামে তবে রাজনৈতিক চিন্তা যে অনেকখানি পাল্টাবে একথা বলা যায়। তদুপরি সৈয়দ বদরুদ্দোজা সাহেবের সমর্থনটা কম কথা নয়। কারণ, বদরুদ্দোজা সাহেব স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর থেকেই একটানা কংগ্রেস বিরোধী ভূমিকা গ্রহণ করে এসেছেন। কাজেই তিনি যদি বাংলা কংগ্রেস ও শাসক কংগ্রেসের সঙ্গে যান তাতে আর কোথাও না হোক মুর্শিদাবাদে নিঃসন্দেহে একটি রাজনৈতিক ভূমিকম্প হতে পারে।

বাংলা কংগ্রেস সাধারণ সম্পাদক শ্রীসুশীল ধাড়ার রাজনীতিটা এখানেই। তিনি এই সমস্ত চিন্তা যথাযথ অনুধাবন ও বিশ্লেষণ করে পা বাড়িয়েছেন। কাজেই মার্কসবাদের জন্য তিনি পরোয়া করবেন কেন? বরঞ্চ অন্তর্বাম ও বহির্বামের মধ্যে লড়াইটা বজায় থাকলে তাঁর ফর্মুলা কার্যকর যে হবে সে সম্বন্ধে তিনি নিঃসন্দেহ। কাজেই সি পি আইকে বাংলা কংগ্রেস কোনমতেই গ্রহণ করতে পারে না, এবং তাদের গণতান্ত্রিক শিবিরেও তিনি ভিড়তে দিতে পারেন না। সি পি আই ঐ শিবিরে ভিড়লে অন্তর্বাম দুর্বল হয়ে যাবে এবং বাকী দলগুলির সি পি এম-এর সঙ্গে ভিড়ে যাবার আশঙ্কা থাকবে। কাজেই অন্তর্বামকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করে শ্রীসুশীল ধাড়া তাঁর থিয়োরীকে বাস্তব রূপ দিতে চান। তত্ত্বগত দিক থেকেও তাঁর বক্তব্য ও ব্যবহারে কেউ অসামঞ্জস্য দেখতে পাবেন না। শ্রীধাড়া ক্রমেই যে রাজনীতিতে বিচক্ষণতার প্রমাণ দিচ্ছেন তাঁর বর্তমান ভূমিকাই তা প্রমাণ করে।

—সমদর্শী

সুভাষ সমাজদারের নতুন বই
আবগারী দারোগার ডায়েরী ৫·০০
কুমারেশ ঘোষের নতুন উপন্যাস
এক বর অনেক কনে ১০·০০
শংকর-এর
যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ ২০শ মুদ্রণ ৫·৫০
চৌরঙ্গী ২২শ মুদ্রণ ১২·৫০
মানচিত্র ১৮শ সং ৬·০০
সার্থক জনম ৪র্থ সং ৫·৫০
পাত্রপাত্রী ১১শ মুদ্রণ ২·৫০
রূপতাপস ১ম মুদ্রণ ৫·০০
বিমল মিত্রের
এর নাম সংসার ৮·৫০
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের
দেনাপাওনা ৬·০০
বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের
তাঞ্জাম দাম ঃ ৪·৫০
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের
অযাত্রায় জয়যাত্রা ২য় মুদ্রণ ৪·৫০
আলোকপর্ণা দাম ঃ ১০·০০
জরাসন্ধ-র
স্বীকৃতি দাম ঃ ৪·৫০
পাড়ি ১১শ মুদ্রণ ৩·৫০
মসিরেখা ৫ম মুদ্রণ ৯·০০
মহাশ্বেতার ডায়েরী ২য় মুদ্রণ ৪·০০
মণীন্দ্র রায়ের
ছড়ানো জালের বৃত্তে দাম ঃ ৫·৫০
চাণক্য সেনের
তিন তরঙ্গ ৩য় মুদ্রণ ৭·০০
শুধু কথা ২য় মুদ্রণ ৩·৫০
বনফুলের
অধিকলাল ২য় মুদ্রণ ঃ ৪·৫০
এক ঝাঁক খঞ্জন দাম ঃ ৬·০০
শৈলেন রায়ের
তরাই দাম ঃ ১০·০০
দেবল দেববর্মার
রাত তখন দশটা ৬·০০
ওস্কার ওয়াইল্ডের সচিত্র ব্যঙ্গ রচনা
ব্যাপার বহুতর ৫·০০
বাক্-সাহিত্য প্রাইভেট লিমিটেড, ৩৩, কলেজ রো, কলকাতা—৯

শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষের বিবাহের পঞ্চাশ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত গুণমুগ্ধ সাহিত্যিকদের একটি বিশেষ ঘরোয়া অনুষ্ঠানে শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষ, শ্রীযুক্তা বিভারাণী ঘোষ (শ্রীতুষারকান্তি ঘোষের স্ত্রী), শ্রীযুক্তা নন্দ্রা ঘোষ (শ্রীতরুণকান্তি ঘোষের স্ত্রী), শ্রীলেখা বসু (শ্রীতুষারকান্তি ঘোষের কন্যা) এবং সর্বশ্রী নরেন্দ্র দেব, রাধারাণী দেবী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অন্নদাশঙ্কর রায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, চারু রায়, প্রবোধকুমার সান্যাল, মনোজ বসু, সমরেন্দ্রনাথ ঘোষ, বিশু মুখোপাধ্যায়, নির্মল সরকার, মণীন্দ্র রায়, প্রিয় গুহ, তুলসীকান্তি দে বিশ্বাস, আশাপূর্ণা দেবী, নবনীতা সেন, সুপ্রিয় সরকার, সুশীল রায়, শ্রীমতী অনিমা সরকার এবং আরো অনেকে।

দেশে বিদেশে

উত্তর প্রদেশে শ্রীত্রিভুবননারায়ণ সিংহ ও বিহারে শ্রীদারোগাপ্রসাদ রায়, এই দুই মুখ্যমন্ত্রীর কারোরই স্বস্তিতে দিন কাটছে না। আসামে নূতন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমহেন্দ্র-মোহন চৌধুরীও তাঁর মন্ত্রিসভার কাজ আরম্ভ করলেন একটা অস্বস্তিকর বিরোধের মধ্য দিয়ে।

এদিকে, সংসদের শীতকালীন অধি-বেশন আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারকে বেকায়দায় ফেলার জন্য বিরোধী দলগুলিতে প্রস্তুতি চলেছে।

উত্তর প্রদেশে শ্রীত্রিভুবননারায়ণ সিং তাঁর পূর্ণ মন্ত্রিসভা এখনও তৈরী করে উঠতে পারলেন না। তিন সপ্তাহ আগে তিনজনের মন্ত্রিসভা নিয়ে তিনি কাজ আরম্ভ করেছিলেন, ইতিমধ্যে আরও দুজনকে নেওয়া হয়েছে। অন্যান্য মন্ত্রীদের কবে নেওয়া হবে তার কোন হদিশ নেই। ভারতীয় ক্রান্তি দলের নেতা ও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীচরণ সিংকে মন্ত্রিসভার বাইরে রেখে শ্রীত্রিভুবননারায়ণ সিং ও বিরোধী কংগ্রেস দলের অন্যান্য নেতারা নিশ্চিত বোধ করতে পারছেন না। তাঁরা ও তাঁর নিজের দলের একাংশও শ্রীচরণ সিংকে উপ-মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে যোগ দিতে পরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু এখন পর্যন্ত বি-কে-ডি নেতা রাজী হচ্ছেন না। এদিকে, উত্তর প্রদেশ মন্ত্রিসভায় যোগ দেওয়ার প্রশ্নে সংযুক্ত সোস্যালিস্ট পার্টির ভিতরে গুরুতর বিরোধ দেখা দিয়েছে। পার্টির কেন্দ্রীয় নেতারা ঐ মন্ত্রিসভায় যোগ দেওয়ার জন্য দলের পাঁচজন প্রতিনিধির নাম স্থির করেছেন বলে শোনা যাচ্ছে! উত্তর প্রদেশে সংযুক্ত সোস্যালিস্ট পার্টির কিছু সদস্য দলের এই মনোনয়নে মোটেই সন্তুষ্ট নন। তাঁরা দলের নেতা শ্রীরাজ-নারায়ণের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন যে, তিনি "ডিক্টেটরের" মত কাজ করছেন।

বিহারে বিধানসভায় শাসক কংগ্রেস দলের ভিতর শ্রীদারোগাপ্রসাদ রায়ের নেতৃত্বের বিরোধীরা দলের সর্বভারতীয় নেতাদের পরামর্শ অগ্রাহ্য করে তাঁদের আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁদের বক্তব্য হচ্ছে, শ্রীরায়কে না সরালে সেখানে পরিস্থিতি অত্যন্ত খারাপ হয়ে উঠবে। তাঁদের মতে, মুখ্যমন্ত্রী নিজে কিছু দেখছেন না বলে প্রশাসন অচল হয়ে যাচ্ছে, এমন কি চীফ সেক্রেটারীর মত একটা পদও মাসের পর মাস খালি রেখে দেওয়া হয়েছে।

"ভিন্নমতাবলম্বী" পাঁচজন সদস্য অবশ্য ইতিমধ্যে নয়াদিল্লীতে গিয়ে একটা মিটমাট করে এসেছিলেন, কিন্তু অন্য 'ভিন্নমতা-বলম্বীরা' বেঁকে বসেছেন। তাঁদের এক গোঁ—শ্রীদারোগাপ্রসাদ রায়কে নেতৃত্ব ছাড়তে হবে অথবা তাঁকে নেতৃত্ব থেকে সরাতে হবে। বিহার থেকে যাঁরা কেন্দ্রীয় মন্ত্রি-

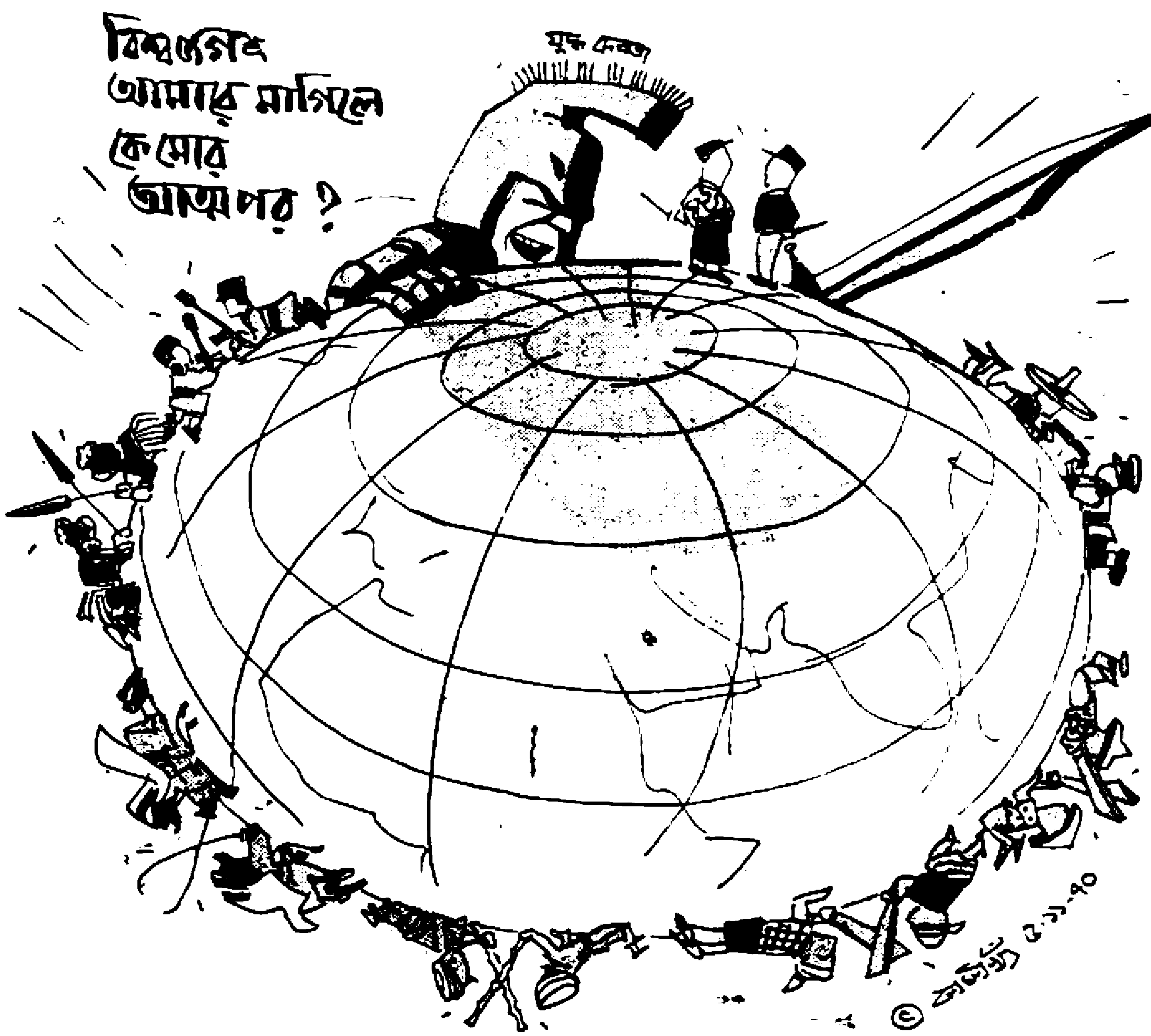

মন্ত্রীত্বে গেছেন তাঁদের মধ্যে একজন উপমন্ত্রী শ্রীভগবৎ ঝা আজাদ এই দাবী সমর্থন করছেন। অন্যদিকে, আর একজন উপমন্ত্রী শ্রীললিতনারায়ণ মিশ্র শ্রীদারোগাপ্রসাদ রায়কে সমর্থন করছেন।

বিহার বিধানসভায় শাসক কংগ্রেস দলের মধ্যে শ্রীরায়ের সমর্থক কতজন আর বিরোধীদের সংখ্যা কত তা বোঝা যাচ্ছে না এবং তাঁর বিরোধীরা তাঁকে বাদ দিয়ে কাকে নেতা করতে চান তাও পরিষ্কার নয়।

শ্রীদারোগাপ্রসাদ রায়ের অস্বস্তির আর একটি কারণ হল এই যে, ক্ষমতাসীন কোয়ালিশনের পাঁচটি শরিক—ঝাড়খন্ড পার্টি, হুল ঝাড়খন্ড পার্টি, বি-কে-ডি, 'পান্টা' পি-এস-পি এবং শ্রীবি পি মন্ডলের নেতৃত্বাধীন শোষিত দল—একটি 'যুক্ত ফ্রন্ট' গঠন করেছে। এই যুক্ত ফ্রন্ট-এর উদ্দেশ্য কি তা পরিষ্কার করে ঘোষণা করা হয় নি; কিন্তু তারা ইতিমধ্যে স্থির করেছে যে, কোয়ালিশনের সমন্বয় কমিটির বৈঠকে তারা যোগ দেবে না।

আসামে মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে শ্রীবিমলাপ্রসাদ চালিহার বিদায় ও সেই পদে শ্রীমহেন্দ্রমোহন চৌধুরীর অধিষ্ঠান খুবই নির্বিঘ্নে ও সৌষ্ঠবের সঙ্গে সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু তাঁর মন্ত্রিসভার সূচনা শুভ হয় নি। কারণ, প্রথমত আসাম প্রদেশ কংগ্রেস (শাসক) কমিটির সভাপতি শ্রীবিজয়চন্দ্র ভগবতী তাঁর মন্ত্রিসভায় যোগ দিতে রাজী হন নি এবং দ্বিতীয়ত, তিনি মৈনুল হক চৌধুরীকে তাঁর মন্ত্রিসভায় নিতে রাজী হন নি। প্রথমজনকে নেওয়ার জন্য মহেন্দ্রবাবু উৎসুক ছিলেন আর দ্বিতীয়জনের জন্য প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী (ও আসামের প্রতিনিধি) ফকরুদ্দিন আলি আহমেদ তদ্বির করেছিলেন। শ্রীমহেন্দ্রমোহন চৌধুরী যেভাবে তাঁর মন্ত্রিসভা গঠন করেছেন তাতে তিনি শ্রীভগবতী ও মৈনুলের সমর্থকদের চটালেন এবং দিল্লীর নেতাদেরও অসন্তুষ্টির কারণ ঘটালেন। এর পর তিনি কি করে সামলাবেন সেটা দেখার বিষয়।

•

ভারত ও নেপালের সম্পর্ক এমনিতেই ভাল যাচ্ছিল না, দিল্লীতে ভারত-নেপাল বাণিজ্য আলোচনা ভেঙে যাওয়ার পর সেই সম্পর্কের অবনতির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।

অথচ, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যতটা খবর পাওয়া যাচ্ছিল, আলোচনা সন্তোষজনকভাবেই এগোচ্ছিল। একদিকে ছিলেন বৈদেশিক বাণিজ্য দপ্তরের উপমন্ত্রী শ্রীললিতনারায়ণ মিশ্রের নেতৃত্বে ভারতীয়

শাসক কংগ্রেসের নেতারা ডায়মণ্ডহারবার রোডে ক্যালকাটা হসপিটাল অ্যান্ড মেডিক্যাল রিসার্চ ইনস্টিটিউটে গিয়ে শ্রীমতী নেলী সেনগুপ্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। শ্রীমতী সেনগুপ্তা এখানে চিকিৎসার জন্য আছেন। বাঁদিক থেকে রয়েছেন —পঃ বঃ প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শ্রীঅরুণকান্তি ঘোষ ও পার্লামেন্টের কংগ্রেস সদস্যা শ্রীমতী পূরবী মুখার্জি।

প্রতিনিধি দল, অন্যদিকে ছিলেন নেপালের শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী শ্রীনবরাজ সুবেদীর নেতৃত্বে সে দেশের প্রতিনিধিদল। কিন্তু যখন মনে হচ্ছিল যে আর কয়েক ঘন্টার ভিতরেই দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে তখনই জানা গেল যে, আলোচনা ব্যর্থ হয়ে গেছে। যে সব বিষয়ে মতবিরোধের জন্য আলোচনা শেষ পর্যন্ত ভেস্তে গেল সেগুলি হচ্ছেঃ—

(১) নেপাল দাবী করেছিল যে, পশ্চিমবঙ্গের রাধিকাপুর দিয়ে রেলপথে ও সড়কে পাকিস্থানে নেপালী পণ্য পাঠাবার জন্য তাকে অবাধ সুযোগ দিতে হবে।

(২) পেট্রোলিয়াম, স্টীল ও রাসায়নিক দ্রব্যজাতীয় যে-সব পণ্য বিদেশ থেকে আমদানি করে নেপালে নামমাত্র 'প্রোসেস' করে ভারতে চালান দেওয়া হয় সেগুলির সম্পর্কে বিশেষ ব্যবস্থা চাই বলে ভারতের পক্ষ থেকে উত্থাপন করা হয়েছিল।

(৩) নেপালের দাবী ছিল ভারত-নেপাল বাণিজ্য সম্পর্কে এবং ভারতের উপর দিয়ে নেপালের যে-সব পণ্য তৃতীয় দেশে যাবে সেগুলির সম্পর্কে পৃথক চুক্তি করতে হবে।

(৪) ভারতবর্ষ প্রস্তাব করেছিল যে, নেপালের রপ্তানি পণ্য ভারতবর্ষের রাষ্ট্রায়ত্ত ট্রেডিং কর্পোরেশনের মারফৎ পাঠাতে হবে।

●

পর পর কয়েকটি বড় বড় রেল দুর্ঘটনা হয়ে যাওয়ায় রেলওয়ে মন্ত্রী শ্রীগুলজারীলাল নন্দ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন। এই বিষয়ে বিভিন্ন রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজারদের এবং নিরাপত্তা আধিকারিকদের এক সম্মেলন ডাকা হয়েছে।

দশ দিনের মধ্যে গোটা তিনেক বড় রেল দুর্ঘটনা ঘটেছে। মিটার গেজ লাইনে আমেদাবাদ থেকে দিল্লীগামী এক্সপ্রেস ট্রেন রেওয়াড়ির কাছে লাইনচ্যুত হয়ে যায়। ধর্মেপুর আলিগড়-দিল্লী প্যাসেঞ্জার ট্রেনের সঙ্গে ধাক্কা লেগেছিল গাজিয়াবাদ থেকে আগত একটি মালগাড়ীর। আর পেরাম্বুরে স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকা কোচিন মেলের পিছন থেকে এসে ধাক্কা মেরেছিল ম্যাঙ্গালোর মেল।

এক দেশের রাষ্ট্রনায়কদের অন্য দেশে সফর এখন আন্তর্জাতিক কূটনীতির অপরিহার্য উপাদানে পরিণত হয়েছে। এই ধরনের সফর যে কখনও কখনও বন্ধুত্বের বন্ধন রচনা না করে অভাবিত বিড়ম্বনার কারণ ঘটাতে পারে সেটা করাচীর বিমানবন্দরে একটা অভূতপূর্ব ঘটনায় পোল্যান্ডের পররাষ্ট্র বিভাগের উপমন্ত্রী জিগফ্রিড ওলাসিয়াকের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হল। পাকিস্থানে সফররত পোল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট স্পাই-চালস্কি ও অন্যান্য বিদেশী অতিথিরা বেঁচে গেছেন বটে, কিন্তু পাকিস্থানের গোয়েন্দা বিভাগের ডেপুটি ডিরেক্টর ও দুজন প্রেস ফটোগ্রাফার বিমানবন্দরের মালবাহী ট্রাকের তলায় চাপা পড়ে মারা গেছেন।

এই ঘটনায় পোল্যান্ড ও পাকিস্থানের সম্পর্ক ক্ষুণ্ণ হবে কিনা এখনই বলা যাচ্ছে না; তবে এটা একজন উন্মাদের কান্ড অথবা এর ভিতরে একটা চক্রান্ত আছে সে বিষয়ে নির্ভরযোগ্য তদন্ত করে পাকিস্থানকে পোল্যান্ডের আস্থা লাভ করতে হবে।

৭-১১-৭০

—পুন্ডরীক

সম্পাদকীয়

জঞ্জালের শহর

কলকাতাকে যখন পোড়ো শহর, মিছিল নগরী, বলা হয়েছিল তখন আমরা ক্ষুব্ধ হয়েছিলাম। বলেছিলাম কলকাতায় মিছিল চললেও তা প্রাণবন্ত। বলেছিলাম, এ শহর পোড়ো নয় বরং অতিমাত্রায় জনতাকীর্ণ। ধীরে ধীরে কলকাতার সব কিছুই বেড়েছে। তার লোক বেড়েছে, মিছিল বেড়েছে, বেড়েছে তার জঞ্জাল। এখন যদি এই শহরের নামে কেউ সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠেন, তার নোংরা-আবর্জনার স্তূপ দেখে শিউরে ওঠেন তাহলে আমাদের বলার আছে কি?

গত সপ্তাহে কলকাতা পৌরসভার মজদুররা পাঁচদিন ধর্মঘট করেছিল। সেই ধর্মঘট মিটেছে কিন্তু পাঁচদিনে যে পাহাড় প্রমাণ জঞ্জাল স্তূপীকৃত হয়েছিল তা সরানো একদিনের কর্ম নয়। তার ওপর প্রতিদিন আবার নতুন জঞ্জাল জমতে সুরু করেছে।

কর্পোরেশনের স্বাস্থ্য কমিটি গত সপ্তাহে জানিয়েছেন যে শীতের মুখে কলকাতা শহরে কলেরার প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। জঞ্জাল পরিষ্কার না হলে তা মারাত্মক আকার ধারণ করবে। শহরের নানাস্থানে পূতিগন্ধময় জঞ্জাল হয়ে আছে। তার ফলে অনেক জায়গায় ট্রাম-বাস চলাচলও বিঘ্নিত। এ সমস্ত খবর শহরবাসীদের জানা। তারা এর ভুক্তভোগীও। কিন্তু কলকাতার নাগরিকদের বোধ হয় প্রাণ-ধারণের ক্ষমতা একটু বেশি। ঈশ্বর গুপ্তের আমলে বলা হত 'রেতে মশা দিনে মাছি এই নিয়ে কলকাতায় আছি'—এখনও তার বিশেষ কিছু পরিবর্তন হয়নি। কলকাতার অবস্থা দিনকে-দিন খারাপের দিকেই যাচ্ছে। এই শহরে প্রতিদিন যে ময়লা জমে তার পরিমাণ নেহাৎ কম নয়—দু' হাজার টনের মতো। এই ময়লা পরিষ্কার করতে একজন হারকিউলিসের দরকার। এ যুগে হারকিউলিস তো একজন ব্যক্তি নয়। কর্পোরেশনের হাজার হাজার মজদুর, শত শত লরী একজোট হলে নিশ্চয়ই হারকিউলিসের মতো শক্তি তাদের হয়। কিন্তু কার্যত দেখা যাচ্ছে এই কাজটি সহজে হচ্ছে না। তাই শহর মাঝে মাঝেই 'গান্ধা' হয়ে পড়ে। তার জঞ্জালের স্তূপে শহরেরই চাপা পড়ে মরার আশংকা। কলকাতা পৌরসভার ব্যাপারই একটু আলাদা। ময়লা সরাবার জন্য তাদের হেফাজতে আপাতত শতাধিক লরী আছে কাগজে-পত্রে। কিন্তু স্টেট ট্রান্সপোর্টের মতো এখানেও অর্ধেক লরীই ঠুঁটো জগন্নাথ। গাড়ি আছে তো চাকা নেই, চাকা আছে তো ইঞ্জিন খারাপ। তা ছাড়া ড্রাইভারদেরও মাঝে মাঝেই অনুপস্থিতি কোনো না কোনো কারণে। তার ফলে এই গাড়িগুলোকে সচল অবস্থায় পাওয়া এক দুর্লভ ব্যাপার। যেগুলো কোনো রকমে সচল তারাও দু'বারের বেশি ময়লা সাফাইয়ের ট্রিপ দিতে পারে না। এই ভাবেই কাজ চলছে। কর্পোরেশনের বাবুরা যেমন তার গাড়িও তেমনি হবে তাতে আর বিচিত্র কি? তার ফলে লরী ভাড়া করে জঞ্জাল সাফাই করতে হয়। লরী ভাড়ার কেলেঙ্কারী তো কর্পোরেশনের একটা ঐতিহ্যের মতো। এত সব কান্ড করে কলকাতার রাস্তার জঞ্জাল সাফ করা কি সহজ কথা? তাই শহরে জঞ্জাল জমে, নাগরিকরা চীৎকার করেন। কর্পোরেশন 'কাজ করছি' বলে এগিয়ে এসে দেখে যে তাদের করণীয় বেশি কিছু নেই। যেমন চলছিল তেমনি চলছে শহরের জঞ্জাল সাফাইয়ের মন্থরগতি। সুতরাং কলকাতার জন্য দুশ্চিন্তার শেষ নেই। ক্যালকাটা মেট্রোপলিটান ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি এই শহরকে প্রসাধন লাগিয়ে একটু সুন্দর করার জন্য কাজে হাত দেবে বলে স্থির করেছে। তার এক্তিয়ার নিয়ে কর্পোরেশনের সঙ্গে তর্ক বেধে উঠেছে। কী কাজ করা হবে তার চাইতে কে কাজ করবে তা নিয়েই তর্ক। শহরবাসীরা হতভম্ব। কর্পোরেশন তার অধিকার সম্পর্কে খুবই সচেতন। দেশবন্ধুর আমলে যে অধিকার কর্পোরেশন অর্জন করেছিল তার নজীর দেখিয়ে এখন শুধু অধিকারের সীমানা নিয়ে যুক্তিতর্ক কেমন জানি অলীক গল্পের মতো শোনায়। কলকাতাকে এক সময় প্রাচ্যের অন্যতম সুন্দর শহর বলা হত। বৃটিশরা এই শহরকে রাজধানী করেছিল। কিন্তু আজ কলকাতার দিকে তাকালে কার না দুঃখ হয়। আমরা আমাদের নিজেদের গর্বের ও গৌরবের শহরকে ধূলিমলিন জঞ্জাল পরিকীর্ণ করে ফেলে রেখেছি। এই অকর্মণ্যতা ও অপদার্থতার কোনো যুক্তি দিয়েই কি আমরা খণ্ডন করতে পারি? কলকাতা ক্রমশ মানুষের বসবাসের অযোগ্য হয়ে উঠছে এটাই সত্য। এবং সব জেনেও তার প্রতিকারে সর্বশক্তিতে আত্মনিয়োগের কোনো প্রয়াস পৌর কর্তৃপক্ষের দেখা যাচ্ছে না। এ অভিযোগই আজ কলকাতার নাগরিকদের।

পরলোকে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

খ্যাতি প্রিয় কথাশিল্পী ও শিক্ষাব্রতী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় পরলোকগমন করেছেন। তাঁর মাত্র ৫০ বছর বয়স হয়েছিল। তিনি স্ত্রী ও এক পুত্র রেখে গেছেন।

গত বৃহস্পতিবার রাতে তিনি সেরিব্রাল থ্রম্বসিস রোগে আক্রান্ত হন। তাঁকে সেদিন শেষ রাতের দিকে শেঠ সুখলাল কারনানী হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। পরে অবস্থার কিছু উন্নতি হয়েছিল। অবস্থা আবার খারাপের দিকে যেতে থাকে এবং সন্ধ্যার কিছু পরেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুর সময় হাসপাতালে তাঁর স্ত্রী ও পুত্র উপস্থিত ছিলেন।

মাত্র ৫০ বছর বয়সে বাংলা সাহিত্যের এই উজ্জ্বল দীপশিখার আকস্মিক নির্বাপনের সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যিক ও সাহিত্যানুরাগীদের ছাত্র ও শিক্ষক মহলে এক গভীর বিষণ্ণতা নেমে আসে।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর প্রথম অধ্যাপনা জীবন আরম্ভ করেন জলপাইগুড়ির আনন্দচন্দ্র কলেজে। সেখান থেকে কলকাতার সিটি কলেজে এবং তারপর মৃত্যু পর্যন্ত তিনি ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের রীডার।

ইদানীং অসুস্থ শরীরে মৃত্যুর কথা তাঁর মনে উঁকিঝুঁকি মারছিল। সুনন্দর জার্নালে তিনি শেষ লেখা লিখেছেন: "অসুস্থ শরীরে জার্নাল লিখতে লিখতে ভাবছি, পরের সংখ্যায় সুনন্দর পাতাটি যদি না থাকে তা হলে জানবেন আর একটি কলমজান বাঙালির অবলুপ্তি বা শান্তিবিসর্জন ঘটল।" শ্রীগঙ্গোপাধ্যায়ের সম্পর্কে আগামী সপ্তাহে লিখবেন শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

তাঁর অবদান

রামমোহন প্রভৃতি জীবনী-চিত্র তিনি রচনা করেছেন। 'বাংলা সাহিত্যে গল্প' বিষয়ে গবেষণামূলক কাজের জন্য তিনি ডি-ফিল উপাধি পান। উত্তর বঙ্গে মানুষের জীবনের উপর লেখা তার ছোট গল্প 'অঙ্কুর' প্রথম চলচ্চিত্র রূপায়িত করেন শ্রীতপন সিংহ। তিনি নিজেই এর চিত্রনাট্য লিখে দেন। বর্তমানে প্রদর্শিত 'দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন' তাঁরই লেখা চিত্র-নাট্য।

সাহিত্যজীবন

পদ্মা-মেঘনা-কালাবদর আশ্রিত যাঁর জীবন-তরঙ্গ উন্মথিত 'উপনিবেশ' নিয়ে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন। বরিশালের নদী মোহনায় সমুদ্রগর্ভ থেকে সদ্যোত্থিত সোনা-মাটির চরে মানুষের গড়ে তোলা প্রথম ঘর থেকে আরম্ভ করে ডুয়ার্স-তরাই ও হিমালয়ের হিংস্র অরণ্যভূমি পর্যন্ত তাঁর সাহিত্য দৃষ্টি সমভাবে প্রসারিত ছিল। উপন্যাসের পটভূমি ও পরিবেশ রচনায়, অধ্যাপনায়, স্মরণশক্তিতে এবং বক্তা হিসাবে বর্তমান বাংলা দেশে তাঁর জুড়ি বিশেষ কেউ ছিলেন না।

সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যের প্রতিনিধিস্থানীয় শিল্পী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের আসল নাম তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। জন্ম বাংলা ১৩২৫ সালে দিনাজপুর জেলার বালিয়াডাঙ্গি গ্রামে। আদি নিবাস বরিশাল জেলার বাসুদেবপাড়া। ১৯৪১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা সাহিত্যে এম-এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন। ছাত্রাবস্থায় কাব্য রচনা দিয়েই সাহিত্য সাধনার আরম্ভ। প্রথম উপন্যাস 'উপনিবেশ' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই সাহিত্য সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। 'বীতংস' তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ। উপন্যাস ও ছোট গল্প সংগ্রহের মধ্যে 'উপনিবেশ' (তিন খণ্ড), সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী, স্বর্ণসীতা, মন্দ্রমুখর, সূর্য-সারথি, বৈতালিক, শিলালিপি, ভাঙা বন্দর, দুঃশাসন, জন্মান্তর, আলোকপর্ণা, ভোগবতী, কালাবদর উল্লেখযোগ্য। (দৈনিক যুগান্তর থেকে)।

দৃশ্যপট সামনে

দেবল দেববর্মা

প্ল্যাটফর্মে পা রেখেই সমীরণ নন্দকে খুঁজল। নিশিকান্তর আসবার কথা।—চিঠিতেও সে কথা লিখেছে। স্টেশনে নিশ্চয় হাজির থাকবে। অবশ্য দু-পাঁচ মিনিট দেরি হলে সমীরণ যেন না উতলা হয়। নিশিকান্ত পৌঁছবার আগে না ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে পড়ে।

গাড়ি প্রায় এক ঘণ্টা লেট। হয়তো আর খানিক আগেই পৌঁছত। কিন্তু কপালে ভোগান্তি। লাইন ক্লিয়ার না পেয়ে অভিমানে মুখভার করে সেই যে দাঁড়িয়ে রইল, আর ছাড়বার নামটি নেই। প্রায় মিনিট পনের পরে, ফের কাঁপা কাঁপা হুইসিল বাজিয়ে গাড়িটা নড়েচড়ে উঠল। তারপর সার্কাস পার্টির বাঘ-সিংহ যেমন খুব অনিচ্ছুকভাবে গজরাতে গজরাতে খাঁচার দিকে এগোয়, অনেকটা তেমনিভাবে প্ল্যাটফর্মে এসে দাঁড়াল।

সমীরণের কপালে ক্ষণিকের মত সরু চিন্তার রেখা পড়ল। খুঁটিতে হাত রেখে সে ভাবছিল, নিশিকান্ত এত দেরি করছে কেন? গাড়ি বেশ লেট। ঠিক সময়ে পৌঁছে পড়লে অনেক আগেই তার পৌঁছ-বার কথা। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সমীরণ একবার সময়ের হিসেব করল। তারপর শিশু যেমন ব্যাকুলভাবে জননীকে খোঁজে, অনেকটা তেমনি দ্রুত, সন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ফের হতাশ হয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

প্ল্যাটফর্মে লোকজন গিজগিজ করছে। এত বড় গাড়িটার পেট থেকে কম লোক তো নামেনি। পিলপিল করে সব গেটের দিকে এগোচ্ছে। কুলির মাথায় মালপত্তর চাপিয়ে মেয়েপুরুষ চলেছে। কেউ কারুর হাত ধরেছে। কেউ খাড়া হাত-পা নিশ্চিন্ত।

হাতে একটা ছোট স্যুটকেস কিম্বা পোর্ট-ফোলিও ব্যাগ নিয়ে হন হন করে হাঁটছে।

ভিড়ের মধ্যে থেকে কে একজন এগিয়ে এসে তাকে শুধোল—'হ্যাঁ মশায়, ট্রেনটা কতক্ষণ এলো বলতে পারেন?'

সমীরণ নিজের কথা ভাবছিল। সে বিরক্তমুখে জবাব দিল,—'এই তো এলো। দেখছেন না এখনও লোকজন সব বেরোয় নি।'

লোকটি বেশ কালো। চোখে ধরেরী মোটা ফ্রেমের চশমা। সে সমীরণের মুখের উপর একবার নজর বুলিয়ে নীরবে তাকিয়ে রইল। তারপর প্রায় আচমকাই কাঁধের উপর একটা চাপড় মেরে বলল,—'কিরে, আমাকে চিনতেই পারলি না?'

মুখের দিকে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে সমীরণ একটা স্বল্পালোকিত ছেলেবেলার দিনের কথা মনে পড়ল। বিস্ময়ে চোখদুটো বড় করে সে বলল,—'নিশিকান্ত, তুই?'

—'আমি জানতাম তুই চিনতে পারবিনে। তাই তো মজা করে শুধোলাম, ট্রেনটা কতক্ষণ এসেছে বলতে পারেন? তুই একবার আমার মুখের দিকে তাকালি, কিন্তু চিনতে পারলি নে।'

সমীরণ হেসে বলল—'বাপস্। চিনতে পারব কেমন করে? যা মুটিয়েছিস। তেমনি একখান চশমাও হয়েছে। মুখখানা ঠিক যেন একটা হাঁড়ি—আমাদের সেই পশী মাস্টারমশায়ের মত গম্ভীর লাগছে।'

নিশিকান্ত হো হো করে হাসল। বলল,—'বেড়ে বলেছিস কিন্তু। ঠিক পশী মাস্টারমশায়ের মত। দেখিস, মনো শুনলে তোর মতামতের তারিফ করবে। কথাটা গিয়েই আজ বলতে হবে ওকে।' কেন মুখ নীচু করে এদিক ওদিক তাকিয়ে সে শুধোল—'কই রে? তোর মালপত্র সব কোথায়?'

সমীরণ ঘাড় ফিরিয়ে রেলের কামরার দিকে ইঙ্গিত করল। বলল—'ওখানেই আছে। তুই এলি না দেখে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিলাম। নামিয়ে আনার উৎসাহ হয় নি।'

নিশিকান্ত আর দেরি করল না। একটা কুলি ডেকে হোল্ড-অল আর স্যুট-কেসটা গাড়ির ভিতর থেকে বের করে আনল। একটু ব্যস্ত হয়ে বলল,—'আর গল্প নয়। তাড়াতাড়ি চল সমীরণ। নইলে ফেঁসে যাবি। ট্যাক্সি পেতে ঘণ্টা কাবার হবে।'

সমীরণ অবাক হয়ে শুধোল,—'বলিস কি রে? ট্যাক্সি পেতে এক ঘণ্টা লাগবে?'

—'অসম্ভব নয়।' নিশিকান্ত লম্বা লম্বা পা ফেলে হাঁটছিল। প্ল্যাটফর্মের বড় ঘড়িটার দিকে একনজর তাকিয়ে সে বলল, '—পাঁচটা বাজলেই মুস্কিল। তখন খালি ট্যাক্সি মানেই সোনার হরিণ। মাথা খুঁড়লেও তার দেখা পাবি না। তবে স্টেশনে একটা সুবিধে,—লাইনে দাঁড়ালে কখন হোক চান্স আসবে।'

যৌবনের মত ভিড়টা আর নেই। এখন জল স্রোতের পাখির মত জনতা স্রোতেও হাঁটা যায়। একটা সৈন্যবাহিনীর মত এতক্ষণ যারা প্ল্যাটফর্মের উপর হাঁটছিল, তারা সব গেট পেরিয়ে স্টেশনের বাইরে গিয়ে পৌঁছেছে। বন্ধুর পাশে যেতে যেতে সমীরণ বলল,—'তোর দেরি দেখে আমি ভাবছিলাম বুঝি আর এলি না।'

'—পাগল। তুই চিঠিপত্র লিখে আমাকে সব ভার দিয়ে বসে আছিস। আর আমি না এসে পারি?' পরে ক্ষমা চাইবার ভঙ্গিতে সে বলল,—'দেরি কি সাধে? কলেজ স্ট্রীটে একগুচ্ছ বোমাবাজী হয়ে গেল। ট্রাম-বাস বন্ধ, মায় ট্যাক্সি পর্যন্ত যেতে চায় না। শেষে হাত বুলিয়ে বাঁক দেখার মতো এসপ্ল্যানেড হয়ে হাওড়া পৌঁছলাম।'

সমীরণ ভ্রূ কোঁচকাল। ভয়ে, আশঙ্কায় চোখ দুটি একটু ছোট হ'ল। সে শুধোল,—'আমরা এখন আবার কলেজ স্ট্রীট পেরিয়ে যাব নাকি?'

'—তার জন্যে দুশ্চিন্তা নেই।' নিশিকান্ত নির্ভয়ে কথা কইল। এতক্ষণ সব চুপচাপ, ট্রাম-বাস, মানুষজন ফের চলেছে। আসলে গন্ডগোল এখন গা-সহা ব্যাপার। সবাই জানে ও শরতের বিষ্টি। বড় বড় ফোঁটায় ভড়বড়িয়ে যেমন নামে, তেমনি হুস করে চলে যায়। ফের নীল আকাশ। মানুষজন, ট্রাম-বাস সব বেরুবে। কেউ চিন্তাও করবে না, একটু আগেই এখানে কুরুক্ষেত্র কাণ্ড হয়ে গেছে।'

ট্যাক্সি পেতে প্রায় এক ঘণ্টার মত লাগল। মাঝারি লাইন।...জন কুড়ি পঁচিশ লোকের পিছনে নিশিকান্ত এসে দাঁড়াল। তবু সৌভাগ্য বলতে হয়। প্রথম দিকে ট্যাক্সি নেই। একটি, দুটি করে আসছিল। শেষ দিকে ছোট্ট এক ঝাঁক পাখির মতো সাত-আটটা ট্যাক্সি প্রায় একসঙ্গে এসে থামল।

ট্রেন জার্নির পর এতক্ষণ দাঁড়িয়ে সমীরণের কোমরে ব্যথা,—পা দুটো টনটন করছিল। গাড়িতে উঠে পিছনের সীটে সে বেশ আরাম করে বসল। হাত দুটো ছড়িয়ে বলল,—'হোটেলটা কোথায় রে? তোর বাড়ির কাছেই নাকি?'

নিশিকান্ত মুচকি হেসে উত্তর দিল,—'খুব কাছে। একেবারে হাতের নাগালে।'

কথায় চাপা রহস্যের গন্ধ। সমীরণ বুঝতে পেরে সোজা হয়ে বসল। শুধোল, 'হাতের নাগালে? তার মানে কি?'

নিশিকান্ত খুলে বলল,—'মানেটা সহজ। হোটেলে রুম নেওয়া হয়নি। তুই আমার ওখানেই থাকবি।'

সমীরণ মৃদু প্রতিবাদ করল। 'দূর। তাই কখনও হয়? আমি দিন তিনেক থাকব। মিছিমিছি তোদের ঝামেলা নেওয়া হবে। আমাকে বরং একটা হোটেলে নিয়ে চল।'

নিশিকান্ত মাথা নেড়ে বলল—'অসম্ভব। মনো তাহলে ভীষণ রাগ করবে। আপাতত আমার ওখানেই চল। তারপর যদি অসুবিধে হয়, তখন হোটেলেই যাবি।'

সমীরণ অনুযোগ করল, 'আমি কিন্তু চিঠিতে হোটেলের কথাই লিখেছিলাম।'

নিশিকান্ত রাগল না। বন্ধু এখন অতিথি। মনে লজ্জা এবং দ্বিধা দুই। তাই অনুযোগ যেনিকে উঠছে। সে বলল—'বিশ্বাস কর, আমি হোটেল খোঁজ করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু মনো ভীষণ আপত্তি করল। ও বলল, তোমার বন্ধু দশ বছর পরে বাংলাদেশে এলেন। মোটে তিনটে দিন থাকবেন। আমরা থাকতে আবার মেস-হোটেলে কেন যাবেন?'

যুক্তি নয়,...সেন্টিমেন্ট। তবু কথার মধ্যে আর্দ্র কোমলতা,......একটা আন্তরিক রিনরিনে সুর। সমীরণ তাই চুপ হল। সে পিছনের সীটে ফের গা এলিয়ে বসল। বলল—'আমার কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু তোদের কষ্ট। বাড়িতে একজন গেস্ট থাকলে নানা ঝামেলা।'

'—ঝামেলা কিসের?' নিশিকান্ত মৃদু হাসল। 'তাছাড়া তোকে গেস্ট বলে ভাবতে আমাদের বয়ে গেছে। তিনটে দিন বইতো নয়। না হয় ঘরের লোকের মতই থাকবি। অবশ্য তোর যদি খুব অসুবিধে না লাগে।'

বাড়িটা পুরনো। সামনেটা কতদিন রং হয়নি কে জানে। বাইরে অত আলো।......বুক্ষরে সতেজ বিকেল। কিন্তু সিঁড়ির মুখে ঢুকতেই শীর্ণ ভিখারি মেয়ের মত কুণ্ঠিত আঁধার। বন্ধুর পিছু পিছু সন্তর্পণে সিঁড়ি বেয়ে সমীরণ দোতলায় উঠল। বাঁ দিকের ফ্ল্যাটটা নিশিকান্তর। দরজায় সাদা রঙের প্লাস্টিক বোর্ডের উপর কালো কালো নামের অক্ষর। উঁচুতে ডান দিকে কলিং বেল টেপার বোতাম। নিশিকান্ত আঙুলের ডগা দিয়ে সামান্য চাপ দিতে বেলটা ভিতরে বেজে উঠল।

দরজা খুলতেই একটি মেয়ের মুখ ভেসে উঠল। সে খুব সলজ্জভাবে মৃদু হেসে তার দিকে তাকিয়ে মৌন অভ্যর্থনা জানাল। সমীরণের মনে হ'ল মেয়েটির বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশের মত হবে। পরনে আধময়লা শাড়ি। আঁচলের কাছে হলুদের ছোপ। হাতের আঙুলে মশলার দাগ। খুব সম্ভব, এতক্ষণ সে রান্নাঘরেই কাজ-কর্ম সারছিল।. কলিং বেলের শব্দ শুনে ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে এসেছে।

তাকে নিয়ে নিশিকান্ত একটা ঘরে এসে ঢুকল। ঠাট্টা করে বলল,—'এই তোর ঘর। অপছন্দ হলে না হয় বল,—হোটেলের ব্যবস্থা দেখি।'

সমীরণ অন্ধকারে টর্চের আলো ফেলার মত খুব দ্রুত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে চারদিক দেখল। ঘরটা নেহাৎ ছোট নয়। মাঝারি সাইজ, দক্ষিণ খোলা। বেশ বড় জানালা রয়েছে। পরিমিত আসবাব। ছোট একটা পালঙ্ক,—তাতে একজনের স্বচ্ছন্দে শোয়া চলে। কোণের দিকে ছোট্ট একটা শো-কেস, তার নীচের তাকে অনেকগুলি বই। উপরের তাকে নানা রকমের পুতুল,—জন্তু-জানোয়ার।

সমীরণ হেসে বলল—'বেশ ঘর। পছন্দ হবে না কেন?'

নিশিকান্ত স্যুটকেস আর হোল্ড-অলটা একপাশে সরিয়ে রাখছিল। বলল—

'তার বিছানাপত্তর আর বের করে কাজ নেই। যেমন এলোমেলো, তেমনি থাক। মিছিমিছি ঘাটাঘাটি করবার কি দরকার?'

পালঙ্কের উপর খয়েরী রঙের সুন্দর বেডকভার। কোণের দিকে একটু সরে গিয়েছে। খাট বড়ের পালঙ্কের মোটা ধবধবে সাদা চাদরের খানিকটা অংশ চোখে পড়ে। মাথার কাছে একটা ছোট তেপায়া টেবিল। তার উপর সুন্দর একটা প্লাস্টিকের ট্রে। ইচ্ছে করলে সমীরণ ওখানে হাতঘড়ি, খুচরো পয়সা-টয়সা, টুকিটাকি আরো দুটো জিনিস রাখতে পারে।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে সমীরণ দেখল নিশিকান্ত চায়ের টেবিলে অপেক্ষা করছে। সেই মেয়েটি চায়ের কাপ, জলখাবার সাজাচ্ছে। ডিসে ফুলকো লুচি, বেগুন-ভাজা। দুটি বড় সাইজের সন্দেশ। কাঁচের গ্লাসে কানায় কানায় ভর্তি টলটলে জল। গরম চা এখনও টি-পটে। কাপে ঢালা হয় নি। সমীরণ ভাবছিল মেয়েটি কে? ইতিমধ্যে কখন ও সেজেগুজে বেশ ছিম-ছাম, পরিচ্ছন্ন হয়েছে। ময়লা কাপড় বদলে হালকা গোলাপী রঙের একটা শাড়ি পরেছে। চুলে চিরুনি বোলানো। এবং অল্প একটু প্রসাধন করেছে বলে মুখখানি বেশ কচি কমনীয় লাগছে। ভালো করে তাকিয়ে সে নিশ্চিন্ত হল, মেয়েটি অন্য কেউ,—নিশিকান্তর বউ নয়।

জামাটামা পরে সমীরণ এসে চেয়ারে বসল। শুধোল,—'মিসেস কোথায়? এখনও তার সঙ্গে দেখা হল না।'

হাতঘড়ির দিকে একবার তাকিয়ে নিশিকান্ত জবাব দিল—'এই তো মোটে ছটা বাজল। যমুনার ফিরতে এখনও ঢের দেরি।' পরিহাস করে ফের বলল—'ভাবনা কিসের? যমুনা নেই কিন্তু সামনেই নর্মদা রয়েছে। এর সঙ্গেই আগে আলাপ কর।'

সমীরণ উৎসুক চোখে তাকাল।

নিশিকান্ত পরিচয় করিয়ে দেবার ভঙ্গিতে বলল,—ইনি শ্রীমতী নর্মদা। আমার পরমাত্মীয়—'

সমীরণ হাত তুলে নমস্কার করল। মেয়েটি পটু হাতে টেবিলের উপর জিনিস-পত্র গোছাচ্ছিল। সমীরণের দিকে তাকিয়ে সে ফিক করে একটু হাসল। হাত তুলে ছোট একটি নমস্কার সেরে ফের কাজে মন দিল।

নিশিকান্ত হেসে বলল,—নর্মদার ভরসাতেই তোকে আনলাম কিন্তু এই ঘর-গেরস্থালী, রান্না-ভাঁড়ার সব ওর হাতে। যমুনা আর বাড়িতে কতটুকু সময় থাকে? সকাল নটা বাজলেই বেরোয়। ফিরতে সাতটা,...কোনোদিন আটটাও হয়। এরপর আবার উনোনের ধারে যেতে কার উৎসাহ থাকে বল?'

সমীরণ একটা ফুলকো লুচির গায়ে খানিকটা বেগুন ভাজা জড়িয়ে নিয়ে শুধোল,—'মিসেসের অফিসটা কোথায়? ডালহৌসীতে?'

'—দূর, তাহলে কি ফিরতে এত রাত হয়?' নিশিকান্ত খাবার থেকে চোখ তুলে জলের গ্লাসের দিকে হাত বাড়াল। বলল, —'যমুনার অফিস আলিপুরে। ট্রাম-বাসের যা অবস্থা এখন। সকাল আটটা থেকে রাত্তির দশটা অব্দি ঠেস-চাপা ভিড়। অফিসটাইমে আর ছুটির পরে একটা মাছি গলবার পথ নেই। পুরুষমানুষই গলদঘর্ম,......মেয়েছেলে। তা মেয়েরা চটপট আসবে কেমন করে?'

অনুযোগ করে নর্মদা বলল,—'আপনার কথা কিন্তু কিছুই খাচ্ছেন না নিশিদা।'

আড়চোখে এক নিমেষ তাকিয়ে নিশিকান্ত মুচকি হাসল। বলল,—'মিথ্যে লজ্জা করছিস সমীরণ। এক হিসেবে তুই নর্মদারই গেস্ট। এই তিনদিন তোর দেখা-শুনো, যত্ন-আত্তি সব ওই করবে। সুতরাং ফ্রি হওয়াই ভালো।'

সমীরণ একটু অপ্রস্তুত হয়ে ডিসের উপর থেকে একটি সন্দেশ হাতে তুলে নিল। নর্মদার দিকে তাকিয়ে সহাস্যে বলল,—'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। খাওয়ার ব্যাপারে আমার কোনো লজ্জা-সঙ্কোচ নেই। তবে কি জানেন? আপনার নিশিদার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারব না। ভোজনে ও ভীষণ বেপরোয়া। একবার এক বন্ধুর বিয়েতে বরযাত্রী গিয়ে তিন কুড়ি রসগোল্লা খেয়ে সকলকে হতচকিত করে দিয়েছিল।'

নর্মদার খুব হাসি পাচ্ছিল। সে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল। পরে বলল,—'বাব্বা! জামাইবাবু ভোজনরসিক জানতাম। কিন্তু তাই বলে এমনি পেটুক। কই নিশিদা, এ গল্প তো কোনোদিন আগে করেন নি।'

—'পাগল নাকি?' নিশিকান্ত একটা ছোট ঢেকুর তুলল। 'তারপর পাঁচজনের কাছে এইসব বলে বেড়াও। আর লোকে আমাকে একটি ক্ষুদে বকরাক্ষস ভাবুক।' সে হা—হা করে হাসল।

চেয়ার ছেড়ে নিশিকান্ত উঠল। সামনেই কল......মুখ ধোয়ার বেসিন। সে হাত-মুখ ধুয়ে কুলকুচো করল। দেওয়ালের গায়ে একটা তোয়ালে আলগা ঝোলানো আছে। নিশিকান্ত দাঁত বের করে মাড়ি-টাড়ি, ফাঁকফোকর পরীক্ষা করল। খাবারের কুচি-টুচি লেগে নেই দেখে সে নিশ্চিন্ত হল। নর্মদা একটি পরিষ্কার তোয়ালে আনল। সে তোয়ালেতে মুখ মুছে শুধোল,—'আচ্ছা জিতেন কোথায়? এখনও ফেরেনি?'

নর্মদা মুখ নিচু করে উত্তর দিল—'শ্যামবাজারে কি দিদির দরকার, তাই গেছে। বেরোবার সময় বলে গেল, ফিরতে রাত হবে।'

নিশিকান্ত ভুরু কোঁচকাল। খানিকটা মনোযোগের মত বিরক্তি করে বলল,—দরকার না ছাই। সারাদিন টো-টো করে কোথায় যে ঘোরে, তা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন।' একটু থেমে সে ফের শুধোল,—'কখন বেরিয়েছে বলো ত?'

'—ভাত খাবার একটু পরে। তখন বেলা একটা-দেড়টা হবে।' নর্মদা মুখ তুলে কথা কইল।

'—আশ্চর্য! এতটার সময় বেরিয়ে এখনও ফেরার সময় হল না? ও কোথায় যায়, কি করে কোনোদিন খোঁজ নিয়েছ তুমি?'

নর্মদা নিরুত্তর। তার ঠোঁট নড়ল না।

নিশিকান্ত একটু উত্তেজিতভাবে বলল, —'ব্যাপারটা তোমার দিদিকে একদিন বলো। দিনকাল সুবিধের নয় নর্মদা। জিতেন কোথায় যায়, কার সঙ্গে মেলামেশা করে আমাদের জানা উচিত।'

নর্মদা ম্লান হাসল। বলল,—'আমরা চাইলেই কি সব কথা ও আমাদের বলবে নিশিদা? বড় ছেলে,—বেশী জোর করলে মিথ্যে উত্তর দেবে। কিম্বা ছল করে জবাবটা এড়িয়ে যাবে।'

নিশিকান্ত পকেট হাতড়ে সিগারেটের প্যাকেট খুঁজল। খুলে দেখল আর একটি মোটে সিগারেট আছে। ঠোঁটের ফাঁকে সেটি চেপে ধরে নিশিকান্ত তাতে অগ্নি-সংযোগ করল। নর্মদাকে লক্ষ্য করে বলল,—

বেনারসী শাড়ী
ইণ্ডিয়ান সিল্ক হাউস
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা
আমাদের কোন ব্রাঞ্চ নাই

তুই বস সমীরণ। আমি এক চক্কর বাজার থেকে ঘুরে আসি।'

সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়ে নিশিকান্ত নাক-মুখ দিয়ে প্রচুর ধোঁয়া বের করল। তারপর ঠিক একটা স্টীম এঞ্জিনের মত হেলতে দুলতে দরজার দিকে এগোল।

চায়ের কাপ খালি। সমীরণ তাই উঠল। নর্মদা টেবিলের কাছেই দাঁড়িয়েছিল। সমীরণ হেসে বলল,—'আপনার প্রশংসা না করে পারছি না। সুন্দর চা।' জলের কলের দিকে এগোবার আগে সে ফের যোগ করল,—'দেখুন, চা ভালো না হলে আমার কেমন মন ভরে না।'

নর্মদা সাগ্রহে শুধোল,—'আর এক কাপ খাবেন? আমি এখুনি বানিয়ে দিতে পারি।'

—'না না।' সমীরণ আপত্তি করল। মুখ-হাত ধুয়ে পকেট থেকে রুমাল বের করে সে মুখ মুছল। তারপর একটু কুণ্ঠিত ভঙ্গিতে বলল,—'মিছামিছি আপনাকে কষ্ট দিচ্ছি। নিশিকান্তকে লিখেছিলাম হোটেলে একটা ঘর ঠিক করে রাখতে। হঠাৎ এসে যদি সুবিধেমত জায়গা না পাই। কিন্তু ও একটি পাগল। স্টেশন থেকে সোজা এখানে নিয়ে এল। আপাতত আপনার দুর্ভোগ।'

—'ওমা! দুর্ভোগ কেন হতে যাবে? ছি ছি! এসব কি বলছেন আপনি?' নর্মদা মৃদু প্রতিবাদ করল। ফের মুখ নামিয়ে বলল, —এসব কথা দিদি শুনলে কিন্তু ভীষণ দুঃখ পাবে।'

উত্তরে সমীরণ কিছু বলল না, শুধু হাসল। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সে শুধোল, —'আপনার দিদির ফিরতে এখনও আধ-ঘণ্টার মত দেরি। তাই না?'

—'আধঘণ্টা তো কম বলছেন।' নর্মদা ঘাড় দুলিয়ে জবাব দিল। 'দিদির বাড়ি ফিরতে প্রায় সাড়ে সাতটা হয়, কখনও আটটা বাজে। সমস্ত দিন ঘরের মধ্যে আমি কেন হাঁপিয়ে মরি। দিদি থাকে না, নিশিদা থাকেন না। বেলা একটা-দেড়টা [illegible] জিতুও বেরিয়ে যায়। সন্ধ্যে পর্যন্ত হাঁকর মত আমি ঘর আগলাই। একা একা বিশ্রী লাগে।—'

—'আপনিও একটু বেড়িয়ে এলে পারেন।'

—'তা পারি। কিন্তু সময় কই বলুন? বিকেল হলেই জলখাবার তৈরি করতে বসি। সন্ধ্যের একটু আগেই নিশিদা ফিরে আসেন। কোন্ সকালে সেই দুটি খেয়ে যান। অত বড় মানুষটা। বাড়ি ফিরে খাবার জন্যে ঠিক ছেলেমানুষের মত হৈ-চৈ শুরু করেন।'

সমীরণ শুধোল,—'আচ্ছা জিতু কে? একটু আগে নিশিকান্ত ওর কথাই আপনাকে বলছিলেন না?'

নর্মদা মুখ উজ্জ্বল করে বলল,— 'জিতু আমার ছোট ভাই। ভালো নাম জিতেন্দ্রনারায়ণ রায়। নিশিদা ওকে জিতেন বলে ডাকেন। ভীষণ চঞ্চল আর বকবকে। দেখবেন না আপনার সঙ্গে একদিনেই আলাপ জমিয়ে নেবে।'

—'জিতেন কি করে এখন? পড়াশুনো?'

—'পড়াশুনো করলে এত ভাবনা ছিল না।' নর্মদা ম্লান হাসল। একটা ভারী নিশ্বাস ফেলে সে বলল,—'পাশ করেই হয়েছে মুস্কিল। আজ দু-বছর হল ভাইটি বেকার। কোনো চাকরি-বাকরি জুটল না।'

পরিচিত কারো মুখ থেকে হঠাৎ কোনো শোকসংবাদ শুনলে মানুষ যেমন দুঃখিত হবার চেষ্টা করে, সমীরণও তাই করল। কিন্তু সে কোনো কথা বলল না। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

আবহাওয়াটা ক্রমেই গুমোট হচ্ছে। নর্মদা তাই লঘুস্বরে বলল,—'ওসব কথা থাক। আপনি রাত্তিরে কি খান বলুন তো? ভাত, না রুটি?'

সমীরণ ঈষৎ হাসল। সে বলল, —'আমার জন্যে আলাদা ব্যবস্থার প্রয়োজন নেই। আপনারা যা খাবেন, আমারও তাই চলবে।'

—'উঁহু।' নর্মদা ঠোঁট টিপে একটি সুন্দর ভঙ্গি করল। 'দিদি তাহলে আমাকে আর আস্ত রাখবে না। রাত্তিরে আপনি কি খান, তাই জেনে ব্যবস্থা করতে বলে গেছে।'

—'বেশ। রাত্তিরে আপনারা কি খান বলুন? ভাত, না রুটি?' সমীরণ পাল্টা প্রশ্ন করল।

নর্মদা হেসে বলল,—'তার কি ঠিক আছে? নিশিদা রুটি খান, জিতুও রুটি ভালোবাসে। দিদি অবশ্য ভাতই পছন্দ করে—'

—'আর আপনি?'

নর্মদা সলজ্জভাবে জানাল,—'আমি রুটি খেতে পারিনে। রাত্তিরেও আমার একমুঠো ভাত চাই।'

সমীরণ বলল,—'আমাকেও আপনার দলে নিন। দিল্লিতে অবশ্য রুটিই খাই। কিন্তু বাংলাদেশে এসে আর রুটি চিবোতে ইচ্ছে করছে না। মনে হচ্ছে নিখাদ ভেতো বাঙালী সাজি।'

—'বেশ তো, ভাতই খাবেন রাত্তিরে।' নর্মদা সায় দিয়ে বলল, 'কিন্তু ভেতো বাঙালী কলকাতায় আর কজন? সব বাড়িতেই মেয়েরা এখন রাত্তিরে রুটি গড়ে। ভাতের হাঁড়ি উনুনে চড়ায় না।'

•

মিনিট-কুড়ি বাদে ফের কলিং বেল বেজে উঠল। সমীরণ পাখার নীচে বসে খবরের কাগজের পাতায় চোখ বুলোচ্ছিল। বেলের শব্দ কানে যেতেই সে উৎকর্ণ হল।

দরজা খুলে নর্মদা বলল,—'দিদি, তুই? যা হোক বাবা, শুধু একটু তাড়াতাড়ি এসেছিস। আমি এতক্ষণ ভেবে অস্থির। কি যে রান্না করব, তাই ঠিক করতে পারছিলাম না।'

—'ভদ্রলোক এসেছেন?' যমুনা চোখ নাচিয়ে শুধোল।

—'অনেকক্ষণ।' তেরছাভাবে ঘরের দিকে একবার তাকিয়ে নর্মদা জবাব দিল।

—'চা-টা দিয়েছিস তো?' যমুনা ফিসফিস করে কথা কইল।

—'সব।' নর্মদা ঘাড় হেলিয়ে রইল।

—'তোর নিশিদা কোথায়?' যমুনা ফের শুধোল।

—'একটু বাজারে পাঠিয়েছি দিদি।' মনে হয় এখুনি ফিরবেন।'

যমুনা কোনোদিকে না তাকিয়ে দ্রুত পায়ে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল। পিছু পিছু নর্মদা এসে বলল,—'ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করবিনে দিদি?'

ভ্যানিটি ব্যাগটা টেবিলের উপর নামিয়ে রেখে যমুনা বলল,—'মুখের চেহারাখানা দেখছিস তো? কি ভীষণ টায়ার্ড লাগছে। একটু ফ্রেস না হয়ে কারো সামনে যাওয়া যায়?'

নর্মদা হেসে বলল,—'তোর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে ভদ্রলোক খুব ব্যস্ত। কখন আসবি তাই অন্তত দু-তিনবার জিজ্ঞেস করেছেন।'

মাথার খোঁপাটা ভেঙে যমুনা চুলগুলি পিঠের উপর ছড়িয়ে দিল। জামা-টামা আলগা করে বাথরুমে যাবার জন্য তৈরি হল। বোনকে চোখ টিপে বলল,—'তোর নিশিদা আসুক না। তার বন্ধু,—সেই নিয়ে গিয়ে আলাপ করিয়ে দেবে।'

খানিক বাদেই নিশিকান্ত ফিরল। যমুনা তখন প্রসাধনে ব্যস্ত। ঘাড়ে, গলায়, পাউডারের পাফটা সে আলতোভাবে বুলিয়ে চলেছে।

চৌকাঠে পা রেখেই নিশিকান্ত চেঁচিয়ে উঠল। 'যমুনা কতক্ষণ ফিরলে? সমীরণের সঙ্গে দেখা হয়েছে?'

স্ত্রী মাথা নাড়তেই সে ব্যস্তভাবে বলল,—'আরে এসো এসো। তোমার সঙ্গে দেখা করবে বলে সমীরণ অপেক্ষা করে আছে।'

যমুনা আর দেরি করল না। স্বামীর পিছু পিছু সমীরণের ঘরে গিয়ে ঢুকল।

পরিচয় হলে নিশিকান্ত বলল,—'ওকে একরকম জোর করেই নিয়ে এলাম যমুনা। হোটেলে রুম বুক করা হয়নি শুনে সমীরণ একেবারে খাপ্পা। ভীষণ চটে গিয়েছিল।'

যমুনা কিছু বলার আগেই সমীরণ তার বক্তব্য রাখল,—'না, না। আমি একটুও রাগ করিনি। তবে কি জানেন, এখানে এসে ওঠা মানেই আপনাদের ঝামেলা দেওয়া। মিছামিছি অসুবিধের সৃষ্টি করা।'

যমুনা হেসে বলল,—'ওমা। অসুবিধে কিসের? আপনারা দুজনে পুরনো বন্ধু। এতদিন পরে কলকাতায় এলেন। বন্ধুর

ফ্ল্যাটে বাড়তি ঘর থাকতে আপনি কেন হোটেলে উঠলেন?'

নিশিকান্ত প্রস্তাব করল,—'চল সবাই মিলে ছাদে যাই। বেশ জমিয়ে আড্ডা দেওয়া যাবে।'

যমুনা সায় দিয়ে বলল,—'সেই ভালো। ঘরের মধ্যে এই পাখার হাওয়া আর ভালো লাগে না।'

তিনতলার উপর কমন ছাদ, সিঁড়ি বেয়ে ওরা উপরে উঠে এল। নিশিকান্ত বলল,—'একটু চা পেলে ভালো হত। গলা না ভেজালে আড্ডা জমবে না।'

যমুনা হেসে বলল,—'সে আমি জানি। নর্মদাকে বলে এসেছি। মাস্টো উনুনে বসিয়ে চা নিয়ে আসবে।'

দূরে কোথাও এক পশলা বৃষ্টি হয়েছে। তাই বাতাসটা ভেজা...স্পর্শে শরীরমন জুড়িয়ে যায়। আকাশে মেঘ আছে বটে...কিন্তু ছেঁড়া কাপড়ের মতো ফাটি-ফাটা। ফাঁক দিয়ে নীল আকাশ...আংটিতে বসানো জ্বলজ্বলে পাথরের মত দু-একটি নক্ষত্রও চোখে পড়ে।

সর্বাণী বলল,—'আপনার অফিস তো অনেক দূরে? আসতে-যেতে খুব কষ্ট, তাই না?'

—'তা বলবেন না!' যমুনা জানাল। 'বাড়ি থেকে বেরিয়ে অফিস পৌঁছতেই এক-দেড় ঘণ্টা লাগে। ফেরার সময়ও তাই। যাতায়াত এক সমস্যা। পথে নেমে আজই কি দুর্ভোগ দেখুন না!—'

রূপের এ-দুই সহচরী, মরি মরি, কী লাবণ্যে দিল তোমার অঙ্গ ভরি'

প্রথমে সারা মুখে মাখুন কোমল-স্নিগ্ধ প্রিয়া স্নো...তারপর আলতো ক'রে বুলিয়ে দিন রেশমের মত মিহি মোলায়েম উর্বশী ফেস্ পাউডার। এবার চেয়ে দেখুন তো। শিশির-ভেজা পাপড়ির মত কী কমনীয় সুন্দর মাধুর্যে হয়ে উঠেছে আপনার মুখশ্রী।

কসমেটিক ডিভিসন
বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা বোম্বাই কানপুর
দিল্লী মাদ্রাজ পাটনা

Progressive/BC-PU-4/70

—'আজ আবার কি হল?' নিশিকান্ত প্রশ্ন করল, —'আজ তো তেমন দেরি হয়নি।'

—'ছাই।' যমুনা স্বামীর পানে কটাক্ষ হানল। ফের সমীরণের দিকে তাকিয়ে বলল,—'চেতলায় ওদিকে বাস-কণ্ডাকটরের সঙ্গে কি যেন ঝোটপাট হয়েছে। অমনি রুটের বাস বন্ধ করে দিল। সাড়ে চারটের সময় অফিস থেকে বেরিয়ে বাড়া দেড়ঘণ্টা স্টপে দাঁড়িয়ে রইলাম। একটা ট্যাক্সি পর্যন্ত নেই।'

—'এলে কেমন করে?' নিশিকান্ত ব্যগ্র হয়ে শুধোল।

—'সে-কথা শুনে তোমার লাভ কি?' যমুনা বাঁকা চোখে তাকাল।

সমীরণ বলল,—'আমাকে তো বলবেন?'

যমুনা ফিক করে হাসল। বলল,—'একটা প্রাইভেট গাড়ি ছজন মেয়ে মিলে ভাড়া করে এসেছি। শেয়ালদা পর্যন্ত প্রত্যেকের দু টাকা করে ভাড়া।'

নিশিকান্ত পরিহাসের সুরে বলল,—'ড্রাইভারটা নেহাৎ বেরসিক। নয়তো নির্ঘাত খোজা। নইলে একসঙ্গে আধ-ডজন মেয়ে পেলে কেউ আবার ভাড়া চায়?'

যমুনা ভ্রূভঙ্গি করে বলল,—'রসিকতা রাখ। বরং চেতলার দিকে একটা বাড়ি-টাড়ি পাওয়া যায় কিনা খোঁজ কর। নিত্য-দিন এমনি হাঙ্গামা পোয়াতে হলে আমি কিন্তু চাকরিই ছেড়ে দেব।'

চায়ের ট্রে হাতে নর্মদা এসে দাঁড়াল।

নিশিকান্ত বলল,—'তোমার দিদি চাকরি ছেড়ে দিতে চাইছে নর্মদা। দেখ চেষ্টা করে তুমি যদি ওটা বাগাতে পার।'

চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে নর্মদা বলল,—'আমার এখন মরবার ফুরসৎ নেই নিশিদা। উনুনে মাংস বসিয়ে এসেছি। আপনার সঙ্গে গল্প জুড়লে রান্না কিন্তু আর মুখে দিতে হবে না।'

ঘরে ঢুকে নর্মদা দেখল জিতেন নীচু হয়ে জুতোর ফিতে খুলছে। তাকে দেখে মুখ উঁচু করে বলল,—'কোথায় গিয়েছিলি রে ছোড়দি?'

—'ছাদে।' নর্মদা মুখ ফিরিয়ে অন্য-দিকে তাকাল।

জিতেন ভ্রূ কুঁচকে শুধোল,—'মনে হচ্ছে খুব রেগে আছিস। কারণটা কি বাবা?'

নর্মদা মুখ ভার করে বলল,—'রাগ নয় জিতু। তবে নিশিদা আজ খুব বিরক্ত হয়েছেন। তুই দুপুরে ভাত-টাত খেয়ে বেরিয়ে যাস। রাত আটটা পর্যন্ত কোথায় টো-টো করে ঘুরে বেড়াবি, কার সঙ্গে মেলামেশা করিস, কিছুই ভাঙতে চাস না। এর কি অর্থ হয়?'

জিতেন মাথা চুলকে বলল,—'নিশিদা রাগ করেছেন তাহলে?'

নর্মদা ভ্রূ কুঁচকে জবাব দিল—'রাগ করাটা কি অন্যায় জিতু?' কথাটা তুই ভেবে দেখ।

জিতেন এক মুহূর্ত চিন্তা করল। তারপর ব্যাপারটা লঘু করবার জন্য হেসে শুধোল,—'তোর ঘরে কার জামা-প্যান্ট ঝুলছে রে ছোড়দি?'

—'সেই ভদ্রলোক দিল্লী থেকে এসে-ছেন যে—'

—'ওহো!' জিতেন সোৎসাহে বলে উঠল। 'তাই বুঝি তুই সন্ধ্যেবেলায় কোমর বেঁধে মাংস রাঁধতে লেগেছিস?'

নর্মদা কোনো জবাব দিল না। সোজা রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল।

জিতেন ফের শুধোল,—'ভদ্রলোক কোথায় রে?'

—'ছাদে বসে গল্প করছেন। নিশিদা আর দিদিও আছে। ইচ্ছে করলে তুই যেতে পারিস।'

—'নারে ছোড়দি।' জিতেন মাথা নেড়ে বলল। 'এখন আর গল্প করতে ভাল লাগছে না।' একটু পরে সে বলল,—'নিজের ঘরটা তো অন্যকে ছেড়ে দিলি। তুই তাহলে শুবি কোথায়?'

—'দিদি বলেছে তোর ঘরেই এই ক'দিন আমার বিছানা করতে। গিয়ে দ্যাখ আমি সব ঠিক করে রেখেছি।'

—'আমার ঘরে শুবি? কিন্তু আমি যে অনেক রাত্তির অব্দি পড়াশুনো, কাজ-কর্ম করি। তোর অসুবিধে হবে না?—'

—'অসুবিধে হলেও উপায় নেই। ক'টা দিন কষ্ট করতেই হবে। বাড়িতে কি আর ঘর আছে?' নর্মদা মাংসের হাঁড়িতে খুন্তি নামাল।

জিতেন কোনো মন্তব্য করল না। সে গুন-গুন করে একটা গানের কলি ভাঁজতে ভাঁজতে বাথরুমের দিকে এগোল।

*

যমুনা নিচে নেমে গেলে নিশিকান্ত ফের একটা সিগারেট ধরাল। ছাদের উপর ঝিকঝিকে অন্ধকার। মেঘ সরে গেছে। তাই আকাশে পাথরকুচির মত কয়েকটি তারা। কলকাতার আকাশ স্বচ্ছ নয়। ধুলো আর ধোঁয়ার আড়াল। তাই নক্ষত্রের ভিড় কম....খুব বেশী চোখে পড়ে না।

সমীরণ হেসে বলল,—'তুই এবার বাড়ির খোঁজ কর। মিসেস তো নোটিশ দিয়ে গেলেন। অফিসের কাছাকাছি বাড়ি না পেলে চাকরি ছেড়ে দেবেন।'

—'তুই ক্ষেপেছিস!' নিশিকান্ত গা দুলিয়ে হাসল। যমুনা অমন বলে। বিশ মাইল দূরে অফিস হলেও ও চাকরি খোয়াবে না।'

—'সত্যি বলছিস?' সমীরণ অবাক চোখে তাকাল।

সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে নিশিকান্ত ঘুরে দাঁড়াল। মুখখানা ছুঁচলো করে একটা চিমনির মত প্রচুর ধোঁয়া ছাড়ল। বন্ধুকে বলল,—'তুই বিয়ে-থা করলিনে। মেয়েদের মনের কথা কেমন করে বুঝবি? চাকরিটা তোর আমার কাছে সম্পদ, প্রয়োজন আর প্রলোভন দুই। কিন্তু মেয়েদের কাছে ওটা নেশা, প্রেমের মতো আকর্ষণ। একবার মন সঁপে দিলে মুখ ফেরানো কঠিন। রোজ বাড়ি ছুটে আসতেই হবে।'

নিশিকান্ত সিগারেটের ছাইটুকু সন্তর্পণে ঝাড়ল। ফের বলল,—'বাড়ি পাওয়া কি চাট্টিখানি কথা? তিন মাসের ভাড়া সেলামি গুনে এই ফ্ল্যাটটা জোগাড় করেছিলাম। সে প্রায় তিন-চার বছর হল। অবশ্য ঠকিনি। তিনখানা ঘর,—মোটে একশ' পঁচাত্তর টাকা ভাড়া। ছেড়ে দিলে এই ফ্ল্যাটই এখুনি তিনশ' টাকায় লুফে নেবে।'

সমীরণ মুখ তুলে বলল,—'তার মানে যাতায়াতের প্রবলেমটা থাকবেই। মিসেসের বাড়ি ফিরতে সাতটা-আটটা, কোনোদিন ন'টাও হতে পারে।'

—'খুবই সম্ভব।' সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নিশিকান্ত সৈনিকের মত সোজা হয়ে দাঁড়াল। বলল,—'কলকাতায় এখন পদে পদে সমস্যা। ছোট-বড় পাহাড়ের মত সব ঘিরে রয়েছে। বেশী চঞ্চল হয়ে লাভ নেই। তাই যাতায়াতের সমস্যাটা আমার কাছে প্রবলেমই নয়। আসলে আমি যা সমস্যা বলে মনে করছি, সেটা অনেক বেশী গুরুতর।'

—'কি সমস্যা আবার?'

নিশিকান্ত ম্লান হাসল। বলল,—'সমস্যা নর্মদাকে নিয়ে। বেচারী আমার বাড়িতে রাঁধুনি সেজে বসে আছে। জিতেনের কথা ভাবলে আরো বেশী দুশ্চিন্তা হয়। তুই বোধহয় জানিস না জিতেন একজন সিভিল ইঞ্জিনীয়ার। দু' বছর আগে শিবপুর থেকে পাশ করে বেরিয়েছে। বললে বিশ্বাস করবি নে, মাস-তিন-চার আগে আমি জোর করে ওকে দিয়ে ব্যাঙ্কের একটা কেরানীগিরির জন্য দরখাস্ত করিয়েছিলাম। কিন্তু এমনি কপাল, সেটাও ওর হয়নি।'

নিশিকান্ত ফের বলল,—'জানিস তো, অলস মস্তিষ্ক মানেই শয়তানের কার-খানা। জিতেনকে নিয়ে তাই আমার এত ভাবনা। ও যে কি করছে, কোথায় যায় কিছুই আমি বুঝতে পারি না। আচ্ছা তোদের কোম্পানীতে ওর একটা চান্স হয় না?'

CENTRAL LIBRARY

—'আমি চেষ্টা করব।' সমীরণ সান্ত্বনা জোগাল। একটু থেমে ফের বলল,—চাকরি একদিন হবেই। অত ভাবিস কেন?'

—'কি জানি', নিশিকান্ত একটা চতুষ্কোণ ভঙ্গি করে ফের সিগারেটটা ঠোঁটে চেপে ধরল।

•

নটার আগে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই অফিস বেরিয়ে গেল।

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে জিতেন শুধোল,—'ভিতরে আসতে পারি?'

—'আসুন, আসুন', সমীরণ সাগ্রহে বলল। 'আপনার সঙ্গে এখনও ভালো করে আলাপই হল না।'

খাটের একপাশে জিতেন চেপে বসল।

—'কাল রাত্তিরে নিশিকান্ত আপনার কথাই বলছিল।' সমীরণ আলাপ শুরু করল।

জিতেন ভ্রূ কুঁচকে তাকাল। 'নিশিদা আমার কথা বলেছেন বুঝি? তাহলে তো আপনি সবই জেনে ফেলেছেন। আমি পাশ-করা সিভিল ইঞ্জিনীয়র। দু' বছর ধরে নিষ্কর্মা, বেকার একটা কেরানীগিরি পর্যন্ত জোটাতে পারিনি। তারপর আমার চাকরির জন্য নিশ্চয় চেষ্টা করবেন বলেছেন?'

—'হ্যাঁ, তা বলেছি।' সমীরণ একটু আশ্চর্য হল

জিতেন হা-হা করে হাসল। 'আমি জানি নিশিদার এই কাণ্ড। বন্ধু-বান্ধব কাউকে কাছে পেলেই বেকার শ্যালকের গল্প করবেন।' হাতের আঙুলের সাহায্যে প্রায় একটা মুদ্রা রচনা করে সে ফের বলল,—'বন্ধু চাকরি পাবে কোথায়?' বাংলাদেশে ওটা এখন মগডালের রোদ্দুর। যাকে-সাকে দেখা যায় এই পর্যন্ত। ছোঁয়া যায় না।

সমীরণ হেসে বলল,—'এত ভাবছেন কেন? চাকরি একদিন নিশ্চয় হবে।'

—'ভাবছি?' জিতেন আরো জোরে হাসল। 'চিন্তা-ভাবনা অনেক আছে মশায়। কিন্তু চাকরির জন্যে একটুও নেই। গ্রীষ্মে গরম, বর্ষায় বিষ্টি, শীতে ঠাণ্ডা পড়ার মতো এদেশে চাকরি না পাওয়াটা স্বাভাবিক!' নাটকের একটি চরিত্রের মতো জিতেন ফের বলে চলল,—'বুদ্ধদেবের সেই গল্পটা আপনার মনে আছে? মৃত শিশুকে কোলে নিয়ে জননী এসে দাঁড়াল সিদ্ধার্থের কাছে। বলল,—তুমি দিব্যজ্ঞানী, মহাঋষি। বরদান করে আমার মৃতপুত্রকে প্রাণ ফিরিয়ে দাও। সিদ্ধার্থ শোকার্ত জননীর দিকে চেয়ে ঈষৎ হাসলেন। বললেন, আমি নিশ্চয় তা করব। কিন্তু মন্ত্র পড়ার জন্য এক মুষ্টি সরষের বড় প্রয়োজন। শুধু একমুঠো সরষে? তাহলেই মৃত সন্তান চোখ মেলে চাইবে?' জননী আনন্দে উন্মুক্ত হয়ে ছুটে যেতে চাইল। এর চেয়ে সহজ আর কি হতে পারে? বুদ্ধ বললেন, কিন্তু একটি কথা। যে বাড়িতে মৃত্যু কোনোদিন প্রবেশ করেনি, সেখান থেকে এই সরষে আনতে হবে। দ্বার হতে দ্বারে জননী ঘুরে বেড়াল। কিন্তু প্রতিবারই ব্যর্থ। সন্ধ্যার একটু পরে নিরাশ অন্তরে সে এসে লুটিয়ে পড়ল সিদ্ধার্থের চরণে। বুদ্ধ শুধোলেন, সরষে এনেছ মা? মেয়েটি কোনো কথা না বলে ডুকরিয়ে কেঁদে উঠল।'

সমীরণ শান্তকণ্ঠে বলল,—'আপনি ভীষণ হতাশ। দারুণ ফ্রাসট্রেটেড জিতেন-বাবু।'

—'একটুও হতাশ নই।' জিতেন পাল্টা জবাব দিল। 'আমি বাংলাদেশের সঠিক ছবি এঁকেছি মশায়। আজ ঘরে ঘরে বেকারী। শহরে-গ্রামে শিক্ষিত বেকার অসংখ্য।... অশিক্ষিত বেকারের অঙ্ক পরিসংখ্যানও বলতে লজ্জা করে। একমুঠো সরষের সন্ধানে যেখানে যাবেন, সেখানেই নিরাশ হয়ে ফিরতে হবে। কিন্তু এই অবস্থাকে আমরা মেনে নেবো না। সবকিছু ভেঙেচুরে গুঁড়ো করে দেব।'

—'ভাঙা তো সহজ,' সমীরণ মুচকি হাসল। তারপর গড়বেন কি করে?'

—'সে-কথা পরে ভাবা যাবে।' জিতেন সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল।

অনেকক্ষণ পরে সে নিজেই কথা শুরু করল,—'অবশ্য আপনার হাতে চাকরি থাকলে সেটা ছোড়দিকেই দেওয়া উচিত। সত্যি কথা বলতে কি, আপনার জন্য ও অনেক করেছে।'

—'কি রকম?' সমীরণ কৌতুক করে বলল।

—'ধরুন এই ঘরখানা। আসলে এটা ছোড়দির। কিন্তু আপনি কাল আসবেন বলে ও বেচারী নিজের জিনিসপত্তর নিয়ে আমার ঘরে শিফ্ট করেছে। অবশ্য কেউ এলে গেলে এরকম শিফ্ট করতেই হয়। কিন্তু শুধু তাই নয়। কাল দুপুরে খেয়েদেয়ে উঠে, ও নিজে এই ঘরখানা ঝেড়েমুছে সাজিয়েছে। তারপর আপনার জন্যে যে স্পেশ্যাল ডিস-টিসগুলো তৈরি হচ্ছে, এসবই ওর পরিকল্পনা আর পরিশ্রম। সুতরাং আপনার হাতে চাকরি থাকলে ছোড়দির দাবি সর্বাগ্রে।'

—'তাতো বুঝলাম।' সমীরণ মধু সুরে কথা কইল। 'কিন্তু যোগ্যতা?'

—'মাই গড!' জিতেন গালের উপর তর্জনীর অগ্রভাগ চেপে ধরল। বলল,—'ছোড়দির কোয়ালিফিকেশন জানেন না আপনি? শী ইজ অ্যান এম-এ। ফিল-জফিতে মার্কারি সেকেণ্ড ক্লাস। কিন্তু বি-এ-তে অনার্স ছিল।'

—'বলেন কি?' সমীরণ চোখ বড়ো করে তাকাল।

জিতেন আশ্চর্য হয়ে শুধোল,—'এসব কথা নিশিদা বলেননি আপনাকে?'

—'কই, না তো—'

—'তাহলে বলতে লজ্জা পেয়েছেন।' সে হাসতে লাগল।

বেলা একটা নাগাদ জিতেন সাজগোজ করে বেরিয়ে গেল। সমীরণ বইয়ের পাতায় চোখ বুলোচ্ছিল।

নর্মদা এসে শুধোল,—'কি করছেন?'

সমীরণ আড়চোখে তাকাল। নর্মদার পরনে পাটভাঙা ডুরে শাড়ি। পিঠে এলো চুল ফিতে দিয়ে বাঁধা। ঠোঁটদুটি পানের রসে লাল। দেখলেই বোঝা যায় এই মাত্র খেয়ে-দেয়ে উঠেছে।

পত্রিকাটা সরিয়ে রেখে সমীরণ উঠে বসল। বলল,—'আসুন, আসুন। আমার জন্যে তো আপনার দুর্ভোগের শেষ নেই। এত রান্নাবান্না,—আবার নিজের ঘরখানা পর্যন্ত ছেড়ে অন্যত্র যেতে হয়েছে।'

—'ওমা! এ-কথা আপনাকে কে বলল? নিশ্চয় জিতেন?—'

—'যেই বলুক না, কথাটা তো সত্যি!' সমীরণ হাসল।

—'সত্যি হলেই বা কি?' নর্মদা ভ্রূ কুঁচকে রইল। 'বাড়িতে গেস্ট এলে অমন এক-আধটু হয়ে থাকে।'

—'কিন্তু আপনি আমার কাছে একটা খবর বেমালুম চেপে গিয়েছেন। নিশিকান্ত পর্যন্ত ভাঙেনি। সত্যি বলছি, একথা জানলে আমি কখনও আপনার বোঝা বাড়াতাম না।'

নর্মদা খুব অবাক হয়ে শুধোল,—'কথাটা কি আগে খুলে বলুন।'

—'আপনি যে একজন এম-এ, অনার্স গ্রাজুয়েট একথা তো আগে বলেননি?'

—'ও, তাই বলুন।' নর্মদা বেশ টেনে টেনে কথা বলল। 'আমি এম-এ পাশ মেয়ে। দুবেলা রান্না করে নিজের সংসারের জোয়াল টানছি ভেবে আপনার একটু করুণা হচ্ছে সমীরণবাবু, তাই না?'

—'ছি, ছি! এ আপনি কি বলছেন?' সমীরণ কথাটা চাপা দিতে চেষ্টা করল।

নর্মদা ম্লান মুখে অন্যদিকে তাকিয়ে-ছিল। মুখ না ফিরিয়েই সে জবাব দিল,—'রান্নার কাজ না করেই বা উপায় কি বলুন? তিন বছর আগে এম-এ পাশ করেছি। এতদিনেও তো কিছু জুটল না।

এ তবু মাস গেলে পঁচাত্তরটা টাকা হাতে পাই। নেই মামার চেয়ে কানা মামাই বা মন্দ কি?'

—তার মানে?' সমীরণ গলা বাড়িয়ে শুধোল।

নর্মদা ফের হাসল। শীতের মরা নদীর মত দীর্ঘ হাসি। বলল,—'আমাকে দিয়ে রান্না করাতে কেউ চায়নি। দিদি নয়, নিশিদা তো নয়ই। রান্নার কাজটা আমি সেধে নিয়েছি সমীরণবাবু। বলুন তো, বসে বসে দু-আড়াই শ টাকা তো কাটল। আর কতদিন নিষ্কর্মা হয়ে থাকি। মাস ফুরোলে দিদি আমাকে ডেকে বলল,—কিছু মনে করিসনে নর্মদা, এই টাকাটা তোর কাছে রেখে দে। প্রথমে বুঝতেই পারিনি। দিদি বলল,—মাসে মাসে এই টাকাটা তো আমার লাগছিলই। কাজটা যখন তুই চালিয়ে দিচ্ছিস, তখন টাকাটা তোরই প্রাপ্য।' একটু থেমে নর্মদা ফের বলল,—'সেদিন টাকাকটা হাত পেতে নিতে খুব খারাপ লেগেছিল আমার, কিন্তু এই কমাসে আমিও যেন কেমন হয়ে গেছি। এখন দরকার হলে অনায়াসে দিদির কাছে টাকা চাই। মানে আমায় নিই বলতে পারেন।'

পরদিন সমীরণকে প্রায় চাকরিবাজির মত দৌড়তে হল। সকাল দশটা থেকে রাত্তির আটটা পর্যন্ত কাজ। যখন বাড়ি ফিরল, তখন প্রায় নটা। দরজায় দাঁড়িয়ে নর্মদা পরিহাস করল, —'বাব্বা! এই নইলে কাজের মানুষ। সারাদিন কোথায় ডুব দিয়ে রইলেন বলুন তো?'

—কি করবো?' সমীরণ কৈফিয়ৎ দিতে চেষ্টা করল. 'একদিনেই সমস্ত কাজ সারতে হয়েছে। কাল সকালেই তো আবার ট্রেন—'

—ও হাঁ তো!' নর্মদা ভারী গলায় বলল 'আমি ভুলেই গিয়েছিলাম আপনি তো তুফানে যাবেন? সকাল দশটার ট্রেন না?'

সমীরণ কোনো কথা বলল না। শুধু হাসল।

•

অনেক রাতে সমীরণের ঘুম ভেঙে গেল। বুকের উপর নরম আঙুলের চাপ... কোমল, অথচ তীক্ষ্ণ স্পর্শ। কেউ যেন তাকে জাগাবার চেষ্টা করছে।

চোখ মেলেই সমীরণ নর্মদাকে দেখতে পেল। তার ভীত, ত্রস্ত চাউনি। প্রায় রক্তশূন্য মুখ। হঠাৎ যেন ভয় পেয়ে সে ছুটে এসেছে।

—'শিগগির উঠুন,' নর্মদা চাপা গলায় বলল, 'বাড়িতে পুলিশ এসেছে। ওরা ঘর-দোর সার্চ করবে।'

কথাটা সত্যি। বাইরে পা দিয়েই সমীরণ তা বুঝতে পারল। প্রায় জন-দশ-বারো পুলিশ। হাতে রাইফেল, পায়ে ভারী বুট। মাথায় লোহার টুপি। তাদের দলপতি একজন সাব-ইন্সপেক্টর। নিশি-কান্তর সঙ্গে সেই কথা বলছিল।

এগিয়ে গিয়ে সমীরণ শুধোল,—'ব্যাপার কি রে?'

—কি আবার!' নিশিকান্ত শুকনো গলায় বলল,—'জহরকে এরা অ্যারেস্ট করে নিয়ে যাবে।'

শুধু অ্যারেস্ট নয়। কম-বেশি সমস্ত বাড়িটাই ওরা সার্চ করল। দশ মিনিটেই ঘরদোরের বিপর্যস্ত তছনছ অবস্থা। তারপর জহরকে নিয়ে ওরা ফের সিঁড়িতে পা বাড়াল।

নর্মদা কাঁদল। নিচের সিঁড়ি পর্যন্ত গিয়ে সে বারবার কান্না চাপার চেষ্টা করছিল। কিন্তু পারল না। গাড়িতে ওঠার আগে জহর বলল,—'কাঁদিস নে ছোড়দি। তুই কাঁদলে আমার খুব খারাপ লাগবে।'

সান্ত্বনা দেবার ভঙ্গিতে নিশিকান্তও বলল—'কেঁদো না নর্মদা। কাল কোর্ট থেকে আমরা ওকে জামিনে ছাড়িয়ে আনবার চেষ্টা করব।' একটু থেমে সে ফের বলল, —'আমার বিশ্বাস জহর জামিন পাবে। তুমি দেখো—'

সকালে চায়ের টেবিলে বসে নিশিকান্ত বলল,—'আমরা এখুনি বেরোচ্ছি সমীরণ। উকিলের বাড়ি যেতে হবে, সেখান থেকে ফের কোর্টে। তার সঙ্গে আর দেখা হবে না।'

—তাতে কি হয়েছে?' সমীরণ চায়ের কাপে ঠোঁট ছোঁয়াল। বরং আমার আজ থেকে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু উপায় নেই, রিজার্ভেশান হয়ে গেছে।' সে একটা হতাশ ভঙ্গি করল।

চা শেষ করেই নিশিকান্ত উঠল। যমুনাও সঙ্গে যাবে। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই তৈরি। যাবার সময় নিশিকান্ত বলল,—'তুমি তাহলে কোর্টে চলে এসো নর্মদা। সাড়ে দশটা নাগাদ এলেই হবে। কেমন?'

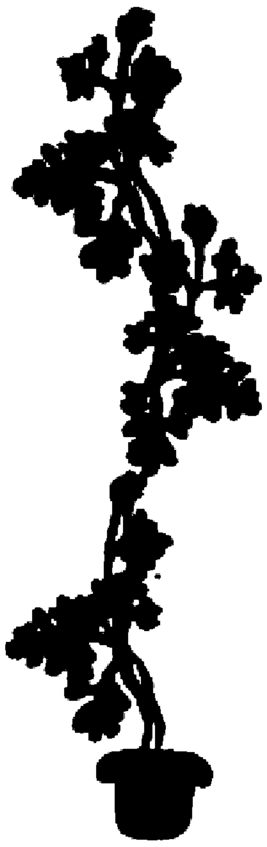

সাড়ে আটটা বাজতেই সমীরণও ট্যাক্সি ডেকে আনল। আর একটু পরেই গাড়ি পাওয়া কঠিন হবে। বিছানা বাক্স ট্যাক্সিতে তুলে সমীরণ দেখল সাজগোজ করে নর্মদাও বেরোবার জন্য তৈরি।

—চলুন, আপনাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে আসি।' সে নিজেই প্রস্তাব করল।

—'আপনি আবার কষ্ট করে কেন? মিছিমিছি—'

নর্মদা কোনো উত্তর না দিয়েই গাড়িতে উঠে বসল।

ট্রেন ছাড়তে দেরি নেই। লোকজন প্রায় সবাই উঠে গেছে। দরজার মুখে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের দল এখনও জটলা করছে। ঘড়িতে প্রায় দশটা—।

সমীরণ বলল,—'আপনার কোর্টে পৌঁছতে দেরি হয়ে যাবে কিন্তু।'

নর্মদা [illegible] একটা ভঙ্গি করে বলল, —'আমি আর কোর্টে যাওয়া হবে না।'

—সে কি? [illegible] তো আপনাকে কোর্টে যেতেই বলে গেল। জহরকে দেখবেন না?'

—উপায় নেই।' দাঁত দিয়ে নর্মদা নীচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরল। 'আজ আমার একটা ইন্টারভ্যু আছে।' সে স্পষ্ট উচ্চারণ করল।

—সত্যি? কোথায়? আগে তো বলেন নি—'

নর্মদা গলা নামিয়ে বলল,—'কেউ জানে না, কাউকে বলিনি। কাগজপত্রে এরা বিজ্ঞাপনও দেয়নি। আমার এক বন্ধুর বাবা এখানে চাকরি করেন। উনিই খবরটা দিয়েছিলেন—। পরশু চিঠি এসেছে।'

—চাকরি হলে আমায় লিখবেন, কেমন?'

নর্মদা এক চিলতে হাসল। করুণ হাসি। শুধোল,—'চাকরি হবে আমার? বলুন না—'

সমীরণের মনে হল, তার সামনে নর্মদা নয়। এক মৃতবৎসা রমণী মলিন মুখ করে তাকিয়ে আছে। অন্তরের ইচ্ছা সব মৃত সন্তানের রূপ ধরে বারবারই তো মাটিতে এল। কেউ আলোয় চোখ মেলল না।

তবু সমীরণ বলল,—'চাকরি হবে বৌদি। নিশ্চয় হবে।'

আশ্চর্য! এই মুহূর্তে নর্মদা হাসল। মুখখানা হাসিতে উজ্জ্বল। রুক্ষ মাটির বুকে একটি শ্যামল পল্লবীর স্বপ্ন অল্প-কালের জন্য হলেও ধরা দিয়েছে।

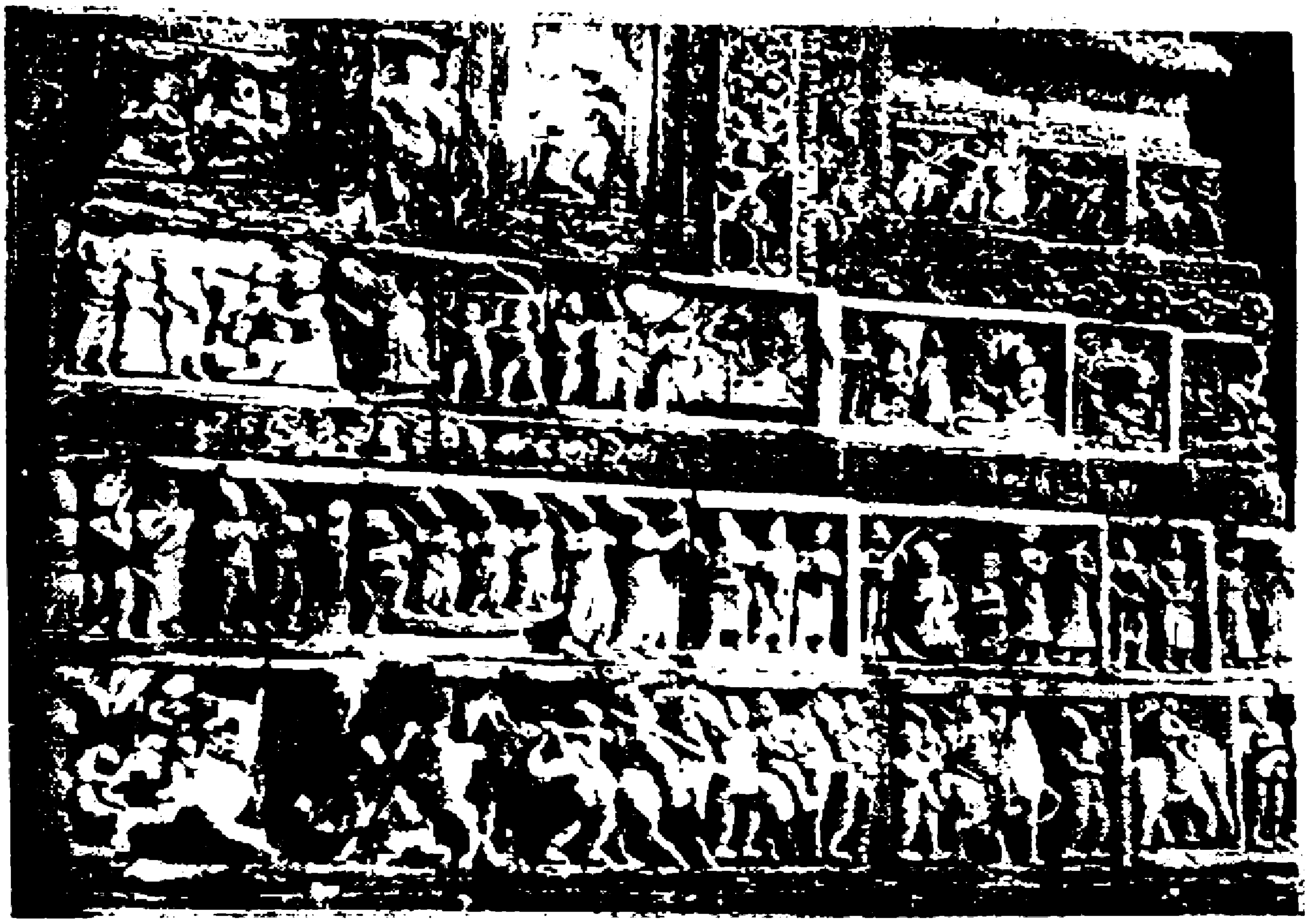

চার বাংলার মন্দিরের কারুকাজ। বড়নগর

ফটো : শীতাংশু মিত্র

এই আমাদের দেশ

রাণীভবানীর স্নেহধন্য বড়নগরের মন্দিরে মন্দিরে

রাতের ট্রেনে চড়ে বসলে আজিমগঞ্জ পৌঁছুবেন ভোরেরও আগে। বেশ অন্ধকার থাকবে। ট্রেনে রাত কাটানো একদিক থেকে ভাল, ভোর নাগাদ গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গেলে সারাটা দিন হাতে পাওয়া যায়। স্টেশনে পৌঁছে হাত মুখ ধুয়ে চা পর্বটা মিটিয়ে নেবেন। ইচ্ছে করলে আশপাশ একটু টহল দেওয়া যায় সকাল হওয়া পর্যন্ত। জলযোগ সেরে বেরিয়ে পড়লেন বড়নগরের পথে। মন্দিরময় বড়নগর ঘুরিয়ে দেখতে বেশ সময় নেয়।

রাণী ভবানীর মন্দির দেখবার মত। স্থাপত্য শিল্পের নিপুণ ঐতিহ্য এখনও ধুকে ধুকে বয়ে বেড়াচ্ছে বড়নগর। বাংলাদেশে ভবানীশ্বর শিবের মন্দিরের মত এত উঁচু মন্দির খুব কমই চোখে পড়ে। আটটি প্রবেশপথ, চতুর্দিকে বারান্দা ঘেরা। বারাণসীর ভবানীশ্বর মন্দির ও বড়নগরের মন্দির একই সময়ে তৈরী হয়েছে বলে শোনা যায়। আর আছে রাজরাজেশ্বরীর মন্দির ও মদনগোপালের মন্দির। ভবানীকন্যা তারাসুন্দরী গোপাল মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেন। আরও মুগ্ধ করবে চার বাংলার মন্দির। মন্দিরের গায়ের কারুকাজ অত্যন্ত সূক্ষ্ম, এখনও একটু টস খায়নি। সবই পোড়ামাটির কাজ। পৌরাণিক কাহিনীর অসংখ্য ছবি মন্দিরের গায়ে উৎকীর্ণ। ছবিগুলি দেখে পুরো একটি গল্প চোখের সামনে ভেসে উঠবে। মদনগোপালের মন্দিরটি বড়নগড়ের প্রথম রাজা উদয়নারায়ণ স্থাপন করেছিলেন। তাছাড়া দেখবেন অষ্টভুজ গণেশের মন্দির, ভবানীর গুরুবংশীয় মঠবাড়ী ব্রহ্ম-

নাথ সন্ন্যাসী প্রতিষ্ঠিত নবরত্নী কষ্টি পাথরের কালীমূর্তি। রাণীর দত্তকপুত্র রাজা রামকৃষ্ণের পঞ্চমুণ্ডের আসনটিও অনেকের কাছে দর্শনীয়।

মন্দিরময় বড়নগর আপনাকে প্রচুর আনন্দ দিতে পারবে। উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বড়নগর এই অঞ্চলের প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র হিসেবে গণ্য হোত। এখনও যে বহরমপুরের খাগড়ার পেতল-কাঁসা-ভরণের বাসনের এত কদর তার মূলে কিন্তু বড়নগরের বাসন শিল্পীরা। টেকসই বাসন কেমন সওদা করেও আনতে পারেন, কলকাতার থেকে খানিক সস্তা।

বড়নগর সেরে গঙ্গা পেরিয়ে জিয়াগঞ্জ। এখানে খাওয়া-দাওয়া সারতে পারেন। হোটেল আছে। অবশ্য মার্কামারা গোছের। খুব একটা খারাপ খাওয়াও না। তারপর জৈন মন্দির দেখতে বেরিয়ে পড়া। পুরোনো দিনের জৈন মন্দিরগুলির শিল্প-সুষমা এখনও বেশ টানে। সেকালে জৈন বণিকরা নিজেদের দেশ ছেড়ে বাংলাদেশের মাটিতে আস্তানা পেতেছিলেন, মুখ্যত বাণিজ্যের লোভে, আর বাকীটা বাংলাদেশের মাটির টানে। বাণিজ্য কেন্দ্র হিসেবে মুর্শিদাবাদের রবরবা তখনকার দিনে অনেক বণিককেই টেনেছে। যা হোক এ দেশের বেশভূষা, খাওয়া-দাওয়া, চালচলন জৈনরা বেশ রপ্ত করে নিয়েছিলেন।

জিয়াগঞ্জের প্রাচীন নাম গাম্ভীলা। বিন্ধ্যাচলের এক বৃদ্ধা সন্ন্যাসিনী ভাগীরথী তীরে এসে বসবাস করেন। তাঁর মৃত্যুর পর ভক্তরা গাম্ভীলা নাম বদলে রাখেন জিয়াগঞ্জ। কারণ এই সন্ন্যাসিনীর নাম জিয়া। সেদিক থেকে গাম্ভীলা বৈষ্ণবদের কাছে খুব প্রিয় জায়গা। নরোত্তম দাস ঠাকুরের শিষ্য পণ্ডিত গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তী মশাই এখানে বসবাস করতেন। ঠাকুর নরোত্তমের তিরোধানের পর ভক্তরা এখনও তাঁর স্মৃতিকে অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। প্রতি বছর কোজাগরী লক্ষ্মীপূজোর পর পঞ্চমীতে মেলা হয়। স্থানীয় কুমোররা নরোত্তম ঠাকুরের সন্ন্যাসমূর্তি তৈরী করে মেলায় বিক্রি করে।

জিয়াগঞ্জের লাগোয়া সাধকবাগ। মস্তরাম সাধুর আখড়া। এটিও দেখবার মত। তখনকার দিনে মস্তরাম সাধুর খুব নামডাক ছিল শারীরিক ও যৌগিক শক্তির জন্যে। লোকে বলে, তিনি নাকি পায়ে হেঁটে নির্বিঘ্নে ভাগীরথী পার হতেন। মস্তরাম সাধু মুর্শিদকুলি খাঁ, আলিবর্দী ও নবাব সিরাজদ্দৌলার সমসাময়িক লোক। একবার নবাব আলিবর্দী একটি শাল ও কিছু স্বর্ণমুদ্রা তাঁকে উপহার হিসেবে পাঠিয়েছিলেন। হয়ত এ ধরনের উপহার পছন্দসই হয়নি। ফলে শালটি অগ্নিকুণ্ডে পুড়িয়ে দিয়েছিলেন ও মুদ্রাগুলি নদীর জলে ফেলে দিয়েছিলেন। ব্যাপারটা শুনে নবাব আলিবর্দী ভয়ানক রেগে যান ও উপহার ফেরত চেয়ে পাঠান। মস্তরাম তখনি সেই রকম দশটি শাল অগ্নিকুণ্ড থেকে এবং পাঁচগুণ স্বর্ণমুদ্রা নদী থেকে বার করে আলিবর্দীকে তাক লাগিয়ে দেন। এই অলৌকিক ক্ষমতা দেখে নবাব আলিবর্দী মুগ্ধ হন, একটি ঢাল ও একটি তলোয়ার উপহার পাঠিয়ে দেন। নবাবের দেওয়া ঢাল-তলোয়ার এখনও সাধকবাগের আশ্রমে রাখা আছে। তাছাড়া মস্তরামের ব্যবহৃত ছড়ি, খড়ম ও অন্যান্য জিনিষপত্র কিছু আছে। নাটোরের মহারাণী ভবানী, বড়নগরের রাজা উদয়নারায়ণও মস্তরামের একান্ত অনুগত ছিলেন। রথযাত্রার সময় আখড়ায় ধুমধাম করে উৎসব হয়। এখনও বহু লোক কোন বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার আশায় ও রোগমুক্তির জন্যে আখড়ায় পূজো দেন।

এরপর মুর্শিদাবাদ। বাংলার শেষ নবাবের স্মৃতিবিজড়িত মুর্শিদাবাদের পোকায়-কাটা ইতিহাসকে দুচোখ মেলে দেখে নেওয়া যাবে।

—নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

ভবানীশ্বর মন্দির। বড়নগর। ফটো : শীতাংশু মিত্র

CENTRAL LIBRARY

সি-এম-ডি-এ

বিপ্র ঘোষ

পশ্চিমবংগ সরকারের উদ্যোগে হালে বৃহত্তর কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থা বা সংক্ষেপে সি-এম-ডি-এ গঠন নিয়ে সরকারের সঙ্গে কলকাতা কর্পোরেশনের মতপার্থক্য দেখা দিতে বৃহত্তর কলকাতার সামগ্রিক উন্নয়নের কথাটা আবার সংবাদপত্রের পাতায় স্থান পাচ্ছে। কিন্তু সি-এম-ডি-এ বলতে কোন অঞ্চল বোঝায়, তার সামগ্রিক উন্নয়নের অর্থ কী, এ-সব ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত অথচ সম্যক ধারণা বিরল। প্রায়-বিপর্যস্ত নাগরিক জীবনের সমস্যার চেহারাটার আংশিক রূপ কলকাতা বা তার আশ-পাশের নাগরিকের প্রাত্যহিক জীবনের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় খানিকটা ধরা পড়ে—যখন বাসে-ট্রামে বাদুড়-ঝোলা হয়ে কর্মস্থানে যেতে হয়, বাসস্থানের সন্ধানে ছন্নছাড়া হয়ে ঘুরতে হয়, বাড়ীর ছেলেকে স্কুলে ভর্তি করাতে গিয়ে যাযাবরের মতন ঘুরতে হয় আর চাকুরী অথবা জীবিকার অন্বেষণে শেষ অবধি হতাশ্বাস হতে হয়। কিন্তু সমস্যার ব্যাপকতা, গভীরতা ও তীব্রতার প্রকৃত রূপ এককভাবে দেখতে পাওয়া সম্ভব নয়। সমগ্রভাবে পর্যবেক্ষণ করে আহরিত তথ্য একত্র করলে সেই ছবিটা খানিকটা পাওয়া সম্ভব। আর উন্নয়নের কথা অনুধাবন করতে গেলে সমস্যার অনুধাবন করাটাই প্রাথমিক কাজ। এ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা আমাদের উদ্দেশ্য।

কলকাতার হুগলী নদীর তীর বেয়ে পূর্ব ও পশ্চিমে উত্তর থেকে দক্ষিণে বিস্তীর্ণ প্রায় ৪৯০ বর্গ মাইল জায়গা জুড়ে কলকাতা মেট্রোপলিটান ডিস্ট্রিক্ট, সংক্ষেপে সি এম ডি বৃহত্তর কলকাতা বলতে এই অঞ্চলই বোঝায়। কলকাতা শহরের সামগ্রিক উন্নতি বিধানের উদ্দেশ্যে ১৯৬১ সালে গঠিত সি-এম-পি-ও বা কলকাতা মেট্রোপলিটান অর্গানিজেশন সরজমিনে ব্যাপক অনুসন্ধান ও সমীক্ষা চালাতে গিয়ে উক্ত অঞ্চলকে যে ঐরকম সীমানা দিয়ে চিহ্নিত করেছিলেন তার একটা কারণও আছে। শিল্প-বাণিজ্য নিয়ে কলকাতা শহরের নাগরিক জীবন-যাত্রার ঢেউ প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে ছড়িয়ে পড়েছে ঐ অঞ্চল পর্যন্ত। অর্থাৎ শহর কলকাতার ঐ অঞ্চল অবধি প্রসারিত হওয়ার প্রবণতা আছে। যাই হোক, ঐ অঞ্চলের উত্তর-পূর্ব-দিকে কল্যাণী শহর, আর দক্ষিণ-পূর্বে কল্যাণপুর। আর কলকাতার দিক থেকে হুগলী ও'পারে উত্তর-পশ্চিমে বাঁশবেড়িয়া আর দক্ষিণ-পশ্চিমে উলুবেড়িয়া।

এই চার সীমানার চৌহদ্দিতে দুটি কর্পোরেশন, ৩৩টি মিউনিসিপ্যালিটি, ৩৭টি শহর-অঞ্চল, কিন্তু মিউনিসিপ্যাল অঞ্চল সালের হিসাব অনুযায়ী সি-এম-ডির সালের হিসাবে অনুযায়ী সি-এম-ডির জনসংখ্যা হোল ৭৫ লক্ষ। আন্দাজ করা যায় গত বছরে নিশ্চয় কিছু বেড়েছে। এই ৭৫ লক্ষ মানুষের ৬০ লক্ষ লোক একেবারে ঠেসে ২১৭ বর্গমাইলের মধ্যে বসবাস করে। সামগ্রিকভাবে জনবসতির ঘনত্ব প্রতি বর্গ-মাইলে ২৭,৬০০। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় ও বাস্তব শহর কলকাতার জনবসতির ঘনত্ব পৃথিবীর অনেক সেরা শহরের চেয়েও বেশী। প্রতি বর্গ-মাইলে কলকাতায় যেখানে ৭৬,৪৯০ জন লোক বাস করে পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম শহর জাপানের টোকিওতে প্রতি বর্গমাইলে ৩৭,২১৫, প্যারিসে ৬৯,৯৭৬, নিউ-ইয়র্কে ২৫,০৫৪ আর ভারতের বোম্বাই শহরে ৩০,২০৫ জন লোক বাস করে। সি-এম-ডির সমস্ত অঞ্চলটাই সমানভাবে শহুরে নয় অর্থাৎ কলকারখানা ও বাণিজ্যের ঘনত্ব একভাবের নয়। গোটা সি-এম-ডির শতকরা ৭২ ভাগ শহরাঞ্চল অঞ্চল হচ্ছে হুগলী নদীর পূর্ব দিকে—কলকাতা আর তাকে কেন্দ্র করে ঘেরা অঞ্চলে। হুগলী-নদীর পূর্ব দিকে (কলকাতার দিকে) উত্তরে কাঁচরাপাড়া থেকে দক্ষিণে গার্ডেন রিচ পর্যন্ত একটানা শহরাঞ্চল বলা চলে। হুগলী নদীর পশ্চিমে (হাওড়ার দিকে) উত্তরে বাঁশবেড়িয়া থেকে খাস হাওড়া শহর পর্যন্ত-ও এই কথাটি খাটি। এই দুই সীমানার বাইরে হুগলী নদীর উভয় দিকেই মাঝে মাঝে শহরাঞ্চল অঞ্চল, কলকারখানা, আবার মাঝে মাঝে গ্রামীণ জীবনযাত্রা।

এখন প্রশ্ন হোল, এত লোক এখানে এলো কোথা থেকে আর কেনই বা এল? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে কল-কারখানা-শিল্প-বাণিজ্য এখানে এত জমাট বাঁধল কেন তার কারণ অনুসন্ধান করা। কেননা শিল্প-বাণিজ্যের মাধ্যমে জীবিকার উদ্দেশ্যেই লোকে এখানে এসে বাসা বেঁধেছে।

হুগলীর মোহনায় এত চমৎকার কলকাতা বন্দর থাকার জন্য বহি-র্বাণিজ্যের সুবিধা আর কাঁচামাল দেশের অভ্যন্তর থেকে আনার সুযোগ থাকার ফলেই কলকাতা শহরে কলকারখানা আর শিল্প-বাণিজ্য গড়ে উঠেছে। শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় জ্বালানী কয়লা রাণীগঞ্জ থেকে কলকাতায় আনতে খুবই সুবিধা—মাত্র ১০০ মাইল দূরে। কলকাতার সীমানার পূর্বদিকে দিয়ে তারের জালের মত যে খাল আছে (এ' খালের অনেকগুলিই নষ্ট হয়ে গেছে, কিছু কিছু বুজিয়ে ফেলা হয়েছে) সেগুলির হুগলী নদীর সংযোগ থাকার ফলে সুবিধা নিশ্চিত হবেই। কাঁচাপাট আসত পূর্ববঙ্গ থেকে। অর্থাৎ মূল কথা হোল হুগলী নদীর অবস্থিতি এবং পূর্বাঞ্চলের একমাত্র বন্দর হওয়ার ফলে সমগ্র পূর্বাঞ্চলে শিল্প-বাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রস্থল হয়ে দীর্ঘকাল ধরে কলকাতা গড়ে ওঠে। কলকারখানা চালু রাখার জন্য, যন্ত্রপাতি ঠাণ্ডা করার জন্য জলের প্রয়োজন হয়। হুগলী নদীর জল সে কাজেও লাগে। কলকারখানা চালু করার জন্য প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করা এ' অঞ্চলে তুলনামূলকভাবে সোজা হুগলী নদীর অবস্থানের জন্যই। হুগলী কথায় নদীর নাব্যতা, কয়লা ও তার থেকে উদ্ভূত বিদ্যুৎশক্তি এখানে শিল্পায়ন প্রচেষ্টাকে সুবিধা করে দিয়েছে।

দীর্ঘকাল ধরে সি-এম-ডি অঞ্চলে শিল্প-বাণিজ্য প্রসারিত হতে হতে কী পরিমাণ আর্থনীতিক কর্মকাণ্ড এ-অঞ্চলে ঘনীভূত হয়েছে কয়েকটা টুকরো নমুনা হিসাব নিলে তার চেহারাটা স্পষ্ট হবে। সারা বাংলা দেশে বয়ন-শিল্পমিল (সুতির কাপড় ও চটের তৈরী জিনিস) ৩৯৬, তার মধ্যে ৩৩১ খানি সি-এম-ডি অঞ্চলে অবস্থিত। রাসায়নিক কারখানার সংখ্যা ৬৬৭, তার মধ্যে ৬২৫ খানিই সি-এম-ডিতে। মেসিনারি তৈরীর কারখানা গোটা বাংলা দেশে ৫৫৪ তার মধ্যে মাত্র ২৭টি সি-এম-ডি অঞ্চলের বাইরে। সারা ভারতের ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পের শতকরা ১৫ ভাগ সি-এম-ডি অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত। এই স্বল্প-আয়তন শিল্পের অবস্থান সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গের শিল্প-অধিকর্তা বিভাগের উপরোক্ত হিসাবটি ছয় বছরের পুরোন হলেও খুব বড় রকমের একটা হেরফের ইতিমধ্যে হয়ে যায় নি।

সি-এম-ডির অন্তর্ভুক্ত বৃহত্তম শহর-বন্দর কলকাতা আনুষ্ঠানিকভাবে পশ্চিমবংগের রাজধানী হলেও উড়িষ্যা, বিহার ও

মুক্তরাজ্যের পূর্বপ্রান্তবর্তী জেলা, আসাম, মণিপুর, নেফা অঞ্চল হোল কলকাতার বাণিজ্যিক পশ্চাদ্‌ভূমি। উক্ত অঞ্চলগুলির মোট প্রায় ১৫ কোটি লোকের জীবিকা, কর্ম-সংস্থান কলকাতা বন্দরের সঙ্গে, তার বাণিজ্যিক সফলতার সঙ্গে আচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে। সারা ভারতের আমদানী বাণিজ্যের শতকরা ৩২-১ ভাগ কলকাতা বন্দর মারফত হয়েছিল ১৯৬৪-৬৫ সালে ; ঐ একই সময়ে সারা ভারতের রপ্তানী বাণিজ্যের শতকরা ৪৩-৪ ভাগ হয়েছিল এই কলকাতা বন্দর দিয়েই। ভারতের ব্যাঙ্ক-শিল্পে বছরে যত টাকা লেন-দেন হয় তার শতকরা ৫০ ভাগ হয় সি-এম-ডি অঞ্চলে। সি-এম-ডি অঞ্চলে কর্মরত মানুষ বছরে ২৮ কোটি টাকা মনি-অর্ডার করে বাইরে পাঠায়। সি-এম-পি-ওর সমীক্ষা অনুযায়ী—

> "The present economic dominance of the Calcutta Metropolitan District in the total economy of West Bengal needs little emphasis of the total income generated in the State—Rs 1.105.2 Crores—as much as Rs 641 crores or 58% are generated in the South Eastern districts which includes the Calcutta Contribution along the banks of the Hooghly of the total number of persons employed in the registered factories in the State. In 1961, 83% or 5,85,000 were employed in the four districts of Howrah, Hooghly, 24 Parganas and Calcutta which from het greater part of the C.M.D. Of the total industrial income 78.7% is derived from the Southeastern Region, Centred on Calcutta and Howrah. (Basic Development Plan 1966-86, P.28.)

এক কথায় বলা চলে, শিল্প-জগতে ভারতের সম্পদ সৃষ্টিতে ধমনী, অবশ্য ও অন্যতম হৃৎপিণ্ড হচ্ছে এই সি-এম-ডি। বর্ধমানের দুর্গাপুরকে কেন্দ্র করে পশ্চিম-বঙ্গের শিল্প-বিন্যাস অন্যধারে ছড়িয়ে পড়লেও সি-এম-ডি অঞ্চলের গুরুত্ব থেকেই যাবে।

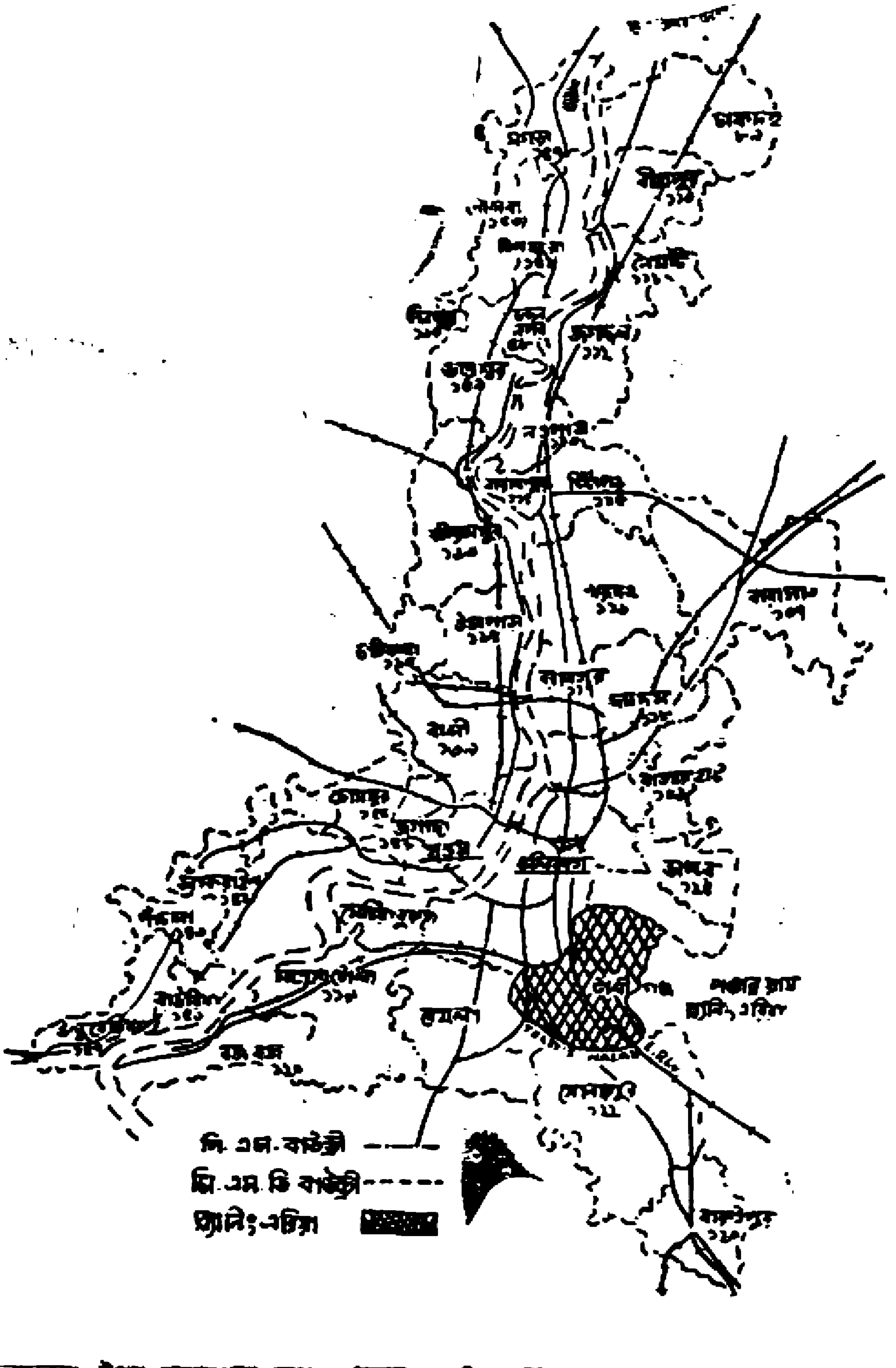

অর্থনৈতিক জগতে এই বিরাট কর্ম-কাণ্ডকে সচল রাখার জন্য বিপুল জনশক্তির উপস্থিতি অপরিহার্য। কৃষি-কর্ম থেকে উদ্বৃত্ত লোক জীবিকার সন্ধানে দলে দলে কোলকাতায় এসেছে। তাছাড়া এসেছে পশ্চিমবঙ্গের বাইরে থেকেও বিশেষ করে কলকাতা-বন্দরের বাণিজ্যিক পশ্চাদভূমি বলে চিহ্নিত অঞ্চল থেকে। সি-এম-ডির মোট জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশী হল পশ্চিম-বঙ্গ থেকে বহিরাগত। কর্মক্ষম ও কর্ম-সন্ধানী ব্যক্তির যোগদান এত বেশী হওয়ায় এখানে তুলনামূলকভাবে অল্প খরচে লোক-নিয়োগের সুযোগ অন্যদিকে মূলধন-নিয়োগ-কারীদের এখানে শিল্প-বাণিজ্য পত্তনের উৎসাহ দিয়েছে। তাছাড়া এসেছে দেশ-বিভাগের পর পূর্ববঙ্গ থেকে দলে দলে উদ্বাস্তু। দেশ-বিভাগের ফলে বেশ কয়েকটি বড় বড় বাণিজ্য-কেন্দ্রিক শহর ভৌগোলিক কারণে পূর্ব পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় কলকাতার উপর জনসংখ্যার চাপ পড়তে বাধ্য। কেননা কলকাতা ছাড়া আর বিকল্প শহর সেদিন পর্যন্ত ছিল না। (দুর্গাপুর অনেক পরে হয়েছে) সি-এম-ডি অঞ্চলে—বিশেষ করে কলকাতার উপকণ্ঠে কী দ্রুত-হারে জনসংখ্যা বেড়েছে কয়েকটি মাত্র হিসাব দিলেই যথেষ্ট। গত দশ বছরে উত্তর দমদমে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা ২১০ ভাগ ; দক্ষিণ দমদমে শতকরা ৮১ ভাগ ; পানিহাটির মত স্বল্প-পরিসর জায়গায় শতকরা ৮৯ ভাগ ; বারা-সতের মত জায়গায় শতকরা ৮২ ভাগ।

প্রথমে দেখা যাক এই বিপুলসংখ্যক জনসাধারণ কীভাবে বসবাস করছে।

১৯৬১ সালের হিসাব অনুযায়ী সি-এম-ডিতে ৬৭ লক্ষ লোকের মধ্যে ৩,৬৬,০০০ বাস করে কোন বাসগৃহে নয়—হাস-পাতাল, কলেজ, দোকানঘরে, ইত্যাদিতে। আর ৩০,০০০ বাস করে রাস্তায়, ফুটপাথে। মনে রাখতে হবে এই সংখ্যা আরও বেশী হওয়া-ই সম্ভব। কেননা এই জনসংখ্যাকে ঠিকমত পরিমাপ করা খুবই শক্ত। তাছাড়া এক-একটা সময়ে এই সংখ্যা অস্থায়ী অথচ নিয়মিতভাবে বৃদ্ধি পায়। যাই হোক, বাকী ৬৩,২৫,০০০ লোক গৃহে বাস করে ১৩,২৯০০ গৃহ-ইউনিটে। (ইউনিট বসস্থান পরিমাপের সুবিধার জন্য একটি নির্দিষ্ট একক ধরা হয়েছে) শুধু এই হিসাব থেকে প্রকৃত চেহারাটা বোঝা যাচ্ছে না ; আরও দুটি তথ্য সন্নিবেশিত করলে খানি-কটা আঁচ পাওয়া যাবে। ১৯৬১ সালের হিসাবে, সি-এম-ডি অঞ্চলে ইউনিটের গড়-পড়তা সাইজ হল ১-৫৫ খানা ঘর। ঐ জায়-

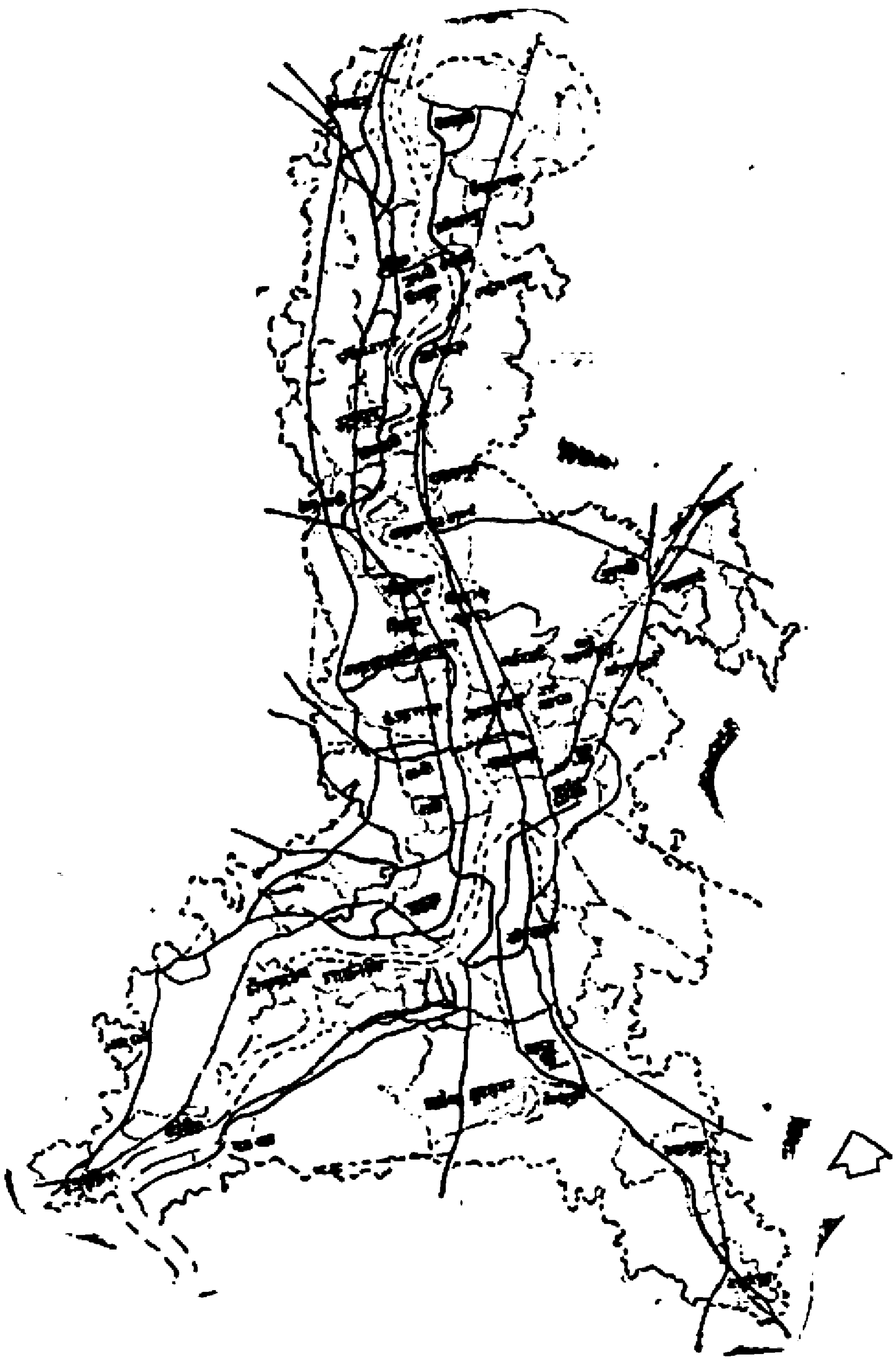

গার বসবাসী গড়পড়তা লোকসংখ্যা হোলে ২-৯৯ জন অর্থাৎ প্রায় তিনজন লোক। হিসাবমত দেখা যায় শতকরা ৭৭টি পরিবার ১৯৫৭ সালে মাথাপিছু ৪০ বর্গ ফুটেরও কম জায়গাতে কোনরকমে থাকত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বাসস্থানের আয়তন বন্টনটা খুবই অসম। খুব অল্পসংখ্যক লোক, আয় যদের বেশী, তারা বেশী জায়গা ভোগ করে। তার অর্থ হোল যে জনসংখ্যার বেশীর-ভাগ অংশ মাথাপিছু ৪০ বর্গ ফুট জায়-গাও পায় না। উপরন্তু বসবাসের জায়গা মানুষের কতটা বাসযোগ্য সেটা বুঝতে হলে সি-এম-ডি অঞ্চলের বস্তিবাড়ী পর্যবেক্ষণ করা দরকার হবে। সি-এম-পি-ও'র হিসাবে কলকাতার জনসংখ্যার এক চতুর্থাংশ বস্তীতে বাস করে। আর হাওড়া শহরে ৫-১২ লক্ষ লোকের মধ্যে (১৯৬১ সালের আদমসুমারি অনুযায়ী) এক তৃতীয়াংশ লোক বস্তীতে বাস করে। (হিসাব পুরানো, আরও কিছু বেড়ে থাকা অসম্ভব নয়)।

শহর-জীবনের প্রয়োজনীয় জিনিস হোল বৃষ্টির জল ও দূষিত ময়লা নিষ্কাশ-নের সুষ্ঠু ব্যবস্থা—পর্যাপ্ত পানীয় জলের যোগান। কলকাতা কর্পোরেশানের এলাকা-ভুক্ত অঞ্চলে অর্থাৎ কলকাতা শহরের শতকরা ৫৪ ভাগ মাত্র জায়গায় পয়ঃপ্রণালী আছে। হাওড়ার মত শহরে ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালী নেই-ই। আর শ্রীরামপুরে, ভাটপাড়া ও টিটা-গড়ে যা আছে তা নামমাত্র। কলকাতার অধিকাংশ জায়গায় ও সি-এম-ডির অন্যান্য অঞ্চলে দূষিত ময়লা অপসারিত হয় ময়লার গাড়ীতে। কলকাতা ও হাওড়া বাদে অন্য মিউনিসিপ্যাল শহরগুলিতে ১,২৬০০০ খাটা পায়খানা আছে। বর্ষার সময় বাস-স্থানের জায়গা, পুকুর ইত্যাদি খাটা পায়-খানার সঙ্গে মিশে গিয়ে যে সংহত বীভৎসতার চেহারা নেয় তা অচিন্তা-নীয়। জনস্বাস্থ্যের পক্ষে কতখানি বিপ-জ্জনক তা প্রতি বছরে সি-এম-ডি অঞ্চলের অধিকাংশ জায়গায় কলেরা মহামারির আকারে দেখা দিয়ে জানিয়ে দিয়ে যায়। পরিশ্রুত পানীয় জলের যোগান কত অল্প তা সাধারণ হিসাব থেকেই বোঝা যাবে। কলকাতা বাদে ৩৩টি মিউনিসিপ্যালি-টিতে, ২০ লক্ষ অধিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে মাথাপিছু ১২·৩ গ্যালন পরিশ্রুত জল প্রতিদিন পায়। সি-এম-ডি অঞ্চলের ১০ লক্ষ ৭১ হাজার অধিবাসী পরিশ্রুত পানীয় জল বলতে এক ফোঁটাও পায় না!

যান-বাহন ব্যবস্থা সি-এম-ডি অঞ্চলে বিশেষ করে কলকাতা, ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চল ও হাওড়ায় কী ভীষণ আকার ধারণ করছে তা সহজেই অনুমেয়। কলকাতা ও হাওড়া শহরে চাকুরী ও জীবিকার জন্য প্রতি-দিন বহু মানুষ আসেন। সারা বছরে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ৮০ কোটি।

বাসিন্দা পরিবারের অপরিহার্য প্রয়ো-জন স্কুল ছেলেমেয়েদের শিক্ষার সুযোগ। ১৯৬১ সালের হিসাব অনুযায়ী সমগ্র সি-এম-ডিতে শতকরা ৩২ জন প্রাথমিক শিক্ষার কোন সুযোগ পায় নি আর শতকরা ৫৬ জন কুনিয়ার সেকেন্ডারি শিক্ষার কোন সুযোগ পায় নি! শিক্ষা-দীক্ষার এই অপ্রতুলতার পাশাপাশি কর্মসংস্থানের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলে সি-এম-ডির বাসিন্দাদের অনিশ্চিত দুর্বিষহ জীবনযাত্রার ছবি সম্পূর্ণ আকারে আসে। সমগ্র সি-এম-ডি অঞ্চলে সমগ্র জন-সংখ্যার শতকরা ৫·৬ ভাগ সম্পূর্ণ বেকার (১৯৬১ সালের হিসাব অনুযায়ী) ছিল অর্থাৎ কর্মপ্রার্থী ছিল অথচ কাজ পায় নি। নয় বছরের পরে এখনকার সমীক্ষায় আরও বেশী দাঁড়াবে এই সংখ্যা।

বহুমুখী সমস্যার যে চিত্ররূপ তুলে ধরা হোল তা খুবই সংক্ষিপ্ত। প্রত্যেকটি দিক নিয়ে আরও বিশদ পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব। কিন্তু তা হলেও সি-এম-ডির সামগ্রিক উন্নয়ন বলতে কী বোঝায় তার একটা ছবি ছোট আকারে আমাদের চোখে ধরা পড়েছে। সি-এম-ডির শিল্প-বাণিজ্যের বর্তমান উৎপাদন সামর্থ্য ও প্রসারের সম্ভা-বনার পূর্ণ সদ্ব্যবহার উন্নয়নের একটি প্রধান কর্তব্য। অবশ্য একথা মনে রাখতে হবে সি-এম-ডির ওপর সামগ্রিক চাপ কমা-বার জন্য অন্য শিল্পাঞ্চিত অঞ্চল (যেমন দুর্গাপুরে) গড়ে তোলা-ও দরকার দ্রুত-গতিতে।

আর এখানকার বাসিন্দারা মানুষের মত জীবনযাত্রা যাপন করে কর্মক্ষম ও সচল থাকে তার জন্য সমস্ত সমস্যাগুলির পরস্প-রের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সমাধান অবশ্য-কর্তব্য।

কুসুম কিন্তু আর পাঁচটা সাধারণ বনস্পতির মত নয়— কেন জানেন?

কারণ কুসুম দিয়ে রান্না খাবার খেতে রুচি হয় ও কুসুমে তৈরী যে কোনো খাবারে খাঁটি স্বাদ-গন্ধ পাওয়া যায়। আজই এক টিন কিনে নিজে পরখ করে দেখুন।

কারণ কুসুম অন্য কোনো রান্নার তেল বা ঐ জাতীয় জিনিসের চেয়ে ঢের বেশীদিন টাটকা থাকে। রোজ কুসুম দিয়ে রেঁধে দেখুন মাসের শেষে খরচা কত কম পড়ে।

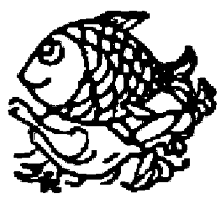

কারণ কুসুম দিয়ে রকমারি রান্না করা যায়। শাক-সব্জি, মাছ-মাংস যা-ই রাঁধুন, দারুণ লোভনীয় হবে। ডাল তরকারীর স্বাদই হবে আলাদা, আর যে কোনো মিষ্টির তো কথাই নেই। কেক, বিস্কুট, ভাজাভুজি যা খুশি করুন, এমন কি চাপাটিতে মাখিয়ে বা গরম ভাতে খান—যেমন সুস্বাদু তেমনি স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো।

কারণ কুসুম সহজে হজম হয় আর ভারি পুষ্টিকর। প্রতি আউন্স কুসুম ১০০ আন্তর্জাতিক ইউনিট 'এ' ভিটামিন এবং ৫৬ আন্তর্জাতিক ইউনিট 'ডি' ভিটামিনে সমৃদ্ধ।

স্বাদে-গন্ধে সব খাবার করে তুলুন চমৎকার

কুসুম বনস্পতি দিয়ে রাঁধুন

কুসুম প্রোডাক্টস লিমিটেড, কলিকাতা-১

তুলসীচরিত

নীরবিব চৌধুরী

(১০)

অশোকের চতুর্থ ইনস্টলমেণ্ট।

অনেক টাকার মালিক হয়েছেন মাস্টার-মশাই সন্দেহ নাই। [illegible] ব্যবহারের পরিবর্তন হয়েছে। পায়ে হেঁটে বেড়ান, বেশ-ভূষায় ধনশালিতার পরিচয় নাই, এ সব চালাকি, ভণ্ডামিও বলা চলে। টাকা কি সেকেলে কঞ্জুসদের মত হাঁড়িতে পুরে গর্তে লুকিয়ে রাখবার জন্য না একেলে কঞ্জুসদের মত ব্যাঙ্কে বসে ডিম পাড়বার জন্য হয়েছে? টাকা হলে ভাল খাবে, ভাল থাকবে, ভালভাবে চলাফেরা করবে যাতে লোকে খাতির করে, মান্য করে। মাস্টার-মশায়ের গরীবী চাল ভণ্ডামি। কেউ হাওলাত চাইলে, সাহায্য চাইলে তাকে প্রত্যাখ্যান করবার জন্য এই ভণ্ডামি।

ফরমুলাটা বেচে দিয়েছেন বললেন। মিথ্যা কথা। যে লেখাপড়া করেছে, যার বয়স হয়েছে, সারাজীবন যে কষ্ট করে চালাচ্ছে সে সোনার ডিম পাড়ে যে হাঁস তাকে বেচে দিয়েছে নগদ পাঁচশিকায়, আহাম্মকের মত এই কথা বলে দিলেন। সত্যিকার আহাম্মকের মাথার থেকে ওয়ান্ডার ড্রাগের ফরমুলা বেরোয় না, আহাম্মক নয়, ভণ্ড মিথ্যাবাদী হয়েছেন এককালের ভালমানুষ মাস্টারমশাই।

এইটা ঘৃণা হল তাঁর ভণ্ডামির পরিচয় পেয়ে যে ইস্ট ইণ্ডিয়া করপোরেশনের কর্তা মিঃ ভাদুড়ীর সঙ্গে দেখা করবার উপদেশ একটা ধাপ্পাবাজি বলে মনে হল। একখানা চিঠি দিলেও না হয় বুঝতাম এক ফোঁটা সিনসিয়ারিটি আছে উপদেশের মধ্যে। অফিসে দেখা করতে যাব দারোয়ান, আর্দালীকে টিপস্ দিয়ে, দয়া করে কাজের জন্য হাত বাড়ালে স্লিপে লিখব, অশোক-কুমার পাল, নাম দেখেই মিঃ ভাদুড়ী সসম্মানে ডেকে পাঠাবেন বোধহয়? বাজে ধাওতা দিয়ে তাড়িয়ে দিলেন মাস্টারমশাই এ-ছাড়া আর কি বলব?

সিরীয়াসলি নিতে পারলাম না পরামর্শ। মাস দেড়েক কেটে গেল। রাগ খানিকটা পড়ে এল। মাস্টারমশায়ের রেফারেন্স দিয়ে একখানা দরখাস্ত পাঠালাম। তিন দিনের দিন চিঠি এল দেখা করুন। সত্যি বলতে কি বেশ অবাক হয়ে গেলাম। মাস্টারমশাই তাহলে ধাওতা দেননি, কিছু বলেছেন মিঃ ভাদুড়ীকে।

দেখা করলেন, ভদ্র ব্যবহার করলেন, তিনটে কাজের নাম করে বললেন, এক সপ্তাহ কাজের জায়গায় ঘুরেফিরে দেখে একটা রিপোর্ট দিন। রিপোর্ট দেখে কোথায় দেয়া যেতে পারে আপনাকে স্থির হবে। সুপারভাইজারের বেতন পাবেন এ মাত দিন।

রিপোর্ট দেবার তিন দিন পরে কাজে নিযুক্ত হলাম। মিঃ ভাদুড়ী বললেন কাজে এফিসিয়েন্সি দেখাতে পারলে উন্নতি হবে।

মনে মনে প্রণাম করলাম মাস্টার-মশাইকে। পায়ের ধুলো নিলাম, বললাম হয়ত অত্যন্ত অভাবে পড়ে ফরমুলাটা বেচে দিয়েছেন আপনি, সেলস অরগানাইজেন সম্বন্ধে কিছু জানা নাই, পাব্লিসিটি অর-গানাইজ করতে পারতেন না, বেচে দিয়ে ঠিক কাজ করেছেন আপনি। অবিশ্যি বেশী না হোক টু পার্সেণ্ট রয়ালটির সর্তটা করে নিলেও পারতেন। আপনাকে ভণ্ড বলায় পাপ হয়েছে মাস্টারমশাই, দেখা হলে পায়ের ধুলো নিয়ে ক্ষমা চাইব।

গাঙ্গুলী ড্রাগ বাজারে বেশ চলছে খবর পাই। নতুন আর কোন জিনিস তিনি বের করতে পারলেন কিনা জানা গেল না, অনেক চেষ্টা করেও। যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি তাঁর সঙ্গে আবার দেখা করবার জন্য, ঠিকানা খোঁজ করতে পারিনি। মিঃ ভাদুড়ীকে জিজ্ঞেস করেছিলাম একদিন, বললেন ঠিকানা জানেন না তিনি, দেখাসাক্ষাৎ হয় না।

বছর তিন কেটে গেল। মিঃ ভাদুড়ীর সুনজরে পড়েছি আমি। নতুন নতুন কাজের ভার আসতে লাগল হাতে। রোজগার অনেক বেড়ে গেল। ঘা খেয়েছি একবার, খরচপত্র সম্বন্ধে সাবধান হলাম, টাকা জমাতে লাগলাম। গাড়ী কিনতে হয়নি অফিসের গাড়ী পেয়েছি। ভাড়াটে তুলে দিয়ে ছোট বাড়ীটা কিছু বাড়িয়ে, কিছু বদলে আমার বর্তমান পদ-মর্যাদার উপযোগী করে নিয়েছি। বড় বাড়ীটা উদ্ধার করবার ইচ্ছা ছিল, বিক্রি দামের ডবল দিতে উদ্যত ছিলাম, কিন্তু তাতেও পাওয়া গেল না। ঐ বাড়ীর আশা ছেড়ে দিয়ে শহরতলিতে কিছু জমি কিনলাম। ভাবলাম দু-চার বছর যাক, দাম বাড়লে কিছু বেচে দেব, খানিকটাতে একটা বাড়ী করব। শহরতলিতে বাড়ীর সংখ্যা, লোকের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে হু-হু করে। টাকাটা ব্লক হয়ে রইল, অপেক্ষা করলে সুদে আসলে উঠে আসবে।

আরও বছর-দুই কেটে গেল। শহর-তলির জমির অর্ধেকটা বেচে দেব কিনা ভাবছিলাম, একটা আশঙ্কা মনে উদয় হওয়ায় বেচতে পারলাম না। ক'টা লক্ষণ দেখে ইস্ট ইণ্ডিয়া করপোরেশনের ভবিষ্যৎ এবং নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশংকার উদয় হয়েছিল।

নিজের ভবিষ্যৎ ভেবে একটা ছোটখাট ইণ্ডাস্ট্রি আরম্ভ করবার কথা মনে হল। জমিটা আর বেচলাম না। কাছাকাছি আরও কিছু জমি একটু চড়া দরে কিনে ফেললাম। কিছুদিনের মধ্যে ইণ্ডাস্ট্রি চালু করবার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করায় হাত লাগালাম।

ইস্ট ইণ্ডিয়া করপোরেশনের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশংকার কথা বলছি।

মিঃ ভাদুড়ী যে তাঁর শ্রেণীর অন্য বড় বিজনেসওয়ালাদের মত নন সেটা আবিষ্কার করতে বেশী সময় লাগেনি। তিনি বুদ্ধিমান, উদ্যমশীল কর্মী পুরুষ, নিজের চেষ্টায় এতবড় কারবার গড়ে তুলেছেন। মানুষ হিসেবে অতি ভদ্র, সাধু-প্রকৃতির, কোন রকমের দোষ বা বদখেয়াল ছিল না। ক্লাবে যেতেন কারবারের খাতিরে, মদ ছুঁতেন না। বছর তিনের পুরনো হতে জানতে পারলাম, তাঁর স্ত্রী সাধন-ভজন করেন। তাঁর এক গুরুদেব আছেন, মাঝে মাঝে পাঁচ-সাতটি শিষ্য নিয়ে তিনি মিঃ ভাদুড়ীর বাড়ীতে ওঠেন এবং রাজকীয় সমাদরে বাস করেন। এই গুরুদেবকে আমি দেখিনি কিন্তু মিসেস ভাদুড়ীর ক'টি গুরুভাইকে অফিসে ঘোরাফেরা করতে দেখেছি।

কিছুদিন আগে জানতে পারলাম স্ত্রীর প্রভাবের ফলে মিঃ ভাদুড়ী তাঁর গুরুদেবের কাছে দীক্ষা নিয়েছেন। তারপর থেকে তাঁর বাড়ী গুরু-ভাইদের স্থায়ী আড্ডা এবং তাঁর অফিস তাঁদের চরণক্ষেত্র হল। গুরু-ভাইরা অতি ধূর্তপ্রকৃতির সাধু বলে মনে হল আমার। ছোট-খাটো অনেক ব্যাপারে তারা নাক গলাতে আরম্ভ করল।

এরপর মিঃ ভাদুড়ীর বড় দুই ছেলের সংগে এদের কলহ আরম্ভ হল। পিতার কাছে এদের বিরুদ্ধে অভিযোগের কোন ফল হয় না দেখে, দু-ভাই মিলে বড়টা পরে সরাতে লাগল দু'হাতে, বাপ-মায়ের সংগে আলাদা হয়ে বাড়ী ছেড়ে চলে গেল। তাদের সংগে যোগ দেবার জন্য অনুরুদ্ধ হয়েছিলাম আমি কিন্তু রাজি হতে পারিনি। চারদিকের অবস্থা দেখে চাকুরি ছাড়বার জন্য প্রস্তুত হয়ে নিজস্ব কারবার আরম্ভ করেছিলাম আমি দু' ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে।

সাধন-ভজনের, বেশী ধর্মভাবের ফলে মানুষের মতিভ্রম হয় কিনা জানি না, কিন্তু ক্রমে দেখলাম মিঃ ভাদুড়ীর চোখের সামনে তাঁর গুরু-ভাইরা লুটপাট শুরু করে অবস্থা কারবার নষ্ট করে দিতে আরম্ভ করল। তাঁর চেহারার কেমন একটা পরিবর্তন হয়েছে মনে হল।

শেয়ার হোল্ডাররা আন্দোলন করতে আরম্ভ করল, অডিটে অনেক রকমের গোলমাল প্রকাশ পেল। কোম্পানী লিকুইডেশনে গেল। গুরু-ভাইরা বাড়ীটা মিঃ ভাদুড়ীকে দিয়ে গুরুদেবের নামে লিখিয়ে নিয়েছিল শোনা গেল।

এর আগেই ইস্ট ইণ্ডিয়া করপোরেশনের সংগে আমার সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছিল। মিঃ ভাদুড়ীর মত সংলোকের দুর্দশা দেখে বড় কষ্ট হল কিন্তু আমার কিছু করবার ছিল না।

কিছুদিন পরে খবর পেলাম মিঃ ভাদুড়ী সস্ত্রীক গুরুদেবের আশ্রমে চলে গিয়েছেন। তারপর খবর পেলাম গুরু-ভাইরা গোপনে বাড়ীর জিনিসপত্র জলের দামে বেচতে শুরু করেছে। একদিন গিয়ে কম দামে মিঃ ভাদুড়ীর বাড়ীর দু-চারটে জিনিস সংগ্রহ করলাম। মাল বাড়ীতে পৌঁছলে দেখলাম কখানা ছবি অন্যান্য মালের সংগে এসেছে। একখানা ছবি একটি ছোকরার, খুব সুন্দর বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা! কাগজে মুড়ে চারখানা ছবি কারখানা-বাড়ীতে পাঠিয়ে দিলাম।

বছর-দুই কেটে গেল। কারবার ভাল চলছে। দু' ছেলেকে কারবারের মধ্যে ঢুকিয়েছি, দু' মেয়ে বিয়ে দিয়েছি। হাতে কিছু টাকা জমেছে। শখ হল কারখানার কাছে যে জমিটা কিনেছি, সেখানে একটা বাড়ী করবার। দৌড়ঝাঁপ করতে হবে না। কাছে থেকে কাজ দেখা যাবে।

জমির ছোটখাট জঙ্গল কাটতে লোক লাগালাম। জঙ্গল কাটা হয়ে গেলে একদিন জমিটা মাপ করিয়ে তিন-চার মিনিটের পথ বড় রাস্তায় আসছিলাম, চোখে পড়ল একটি বৃদ্ধ ভদ্রলোক একটি মেয়ের সংগে গল্প করতে করতে যাচ্ছেন। ভদ্রলোকটির চেহারা চেনা-চেনা মনে হল। পেছন থেকে ধরতে পারছিলাম না ঠিক। পা চালিয়ে এগিয়ে যেতে ভদ্রলোকটি তাকিয়ে দেখে একটু দাঁড়ালেন, তখনই আবার চলতে লাগলেন।

তিনি চিনতে না পারলেও আমি পারলাম, আমার প্রাক্তন মাস্টারমশাই, যাঁর জন্য এত অনুসন্ধান করেছি।

চিনতে পারলেও আমাকে চিনতে চাইবেন কিনা সন্দেহ হওয়াতে একটু দূরে থেকে যেন নিজের চিন্তায় মগ্ন হয়ে চলেছি এইরকম ভাব দেখিয়ে তাঁর অনুসরণ করলাম।

সংগের মেয়েটি হয়ত তাঁর নাতনী হবে মনে হল। স্কুল কি কলেজে পড়ে বোধহয়। হাতে কখানা বই রয়েছে।

(১১)

আমার চতুর্থ ইন্ভেস্টমেন্ট।

কলেজ থেকে পাশ করে বেরিয়ে কিছুকাল শখ হিসেবে ড্রাগ রিসার্চের কাজ করেছিলাম দু-একটা ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানীর রিসার্চ লেবরেটরীতে। বিদেশী কোয়ালিফিকেশন বা বাজারে নাম না থাকলে পেটভাতা দিয়েও কোন কোম্পানী রিসার্চ ওয়ার্কার রাখতে চায় না, রিসার্চের সুবিধে দিতে চায় না। সংসার চালাবার জন্য আমার টাকার প্রয়োজন কাজেই বেশী দিন চালাতে পারলাম না। শখটা মরি মরি করে রয়ে গিয়েছিল মনের মধ্যে।

দেবাশিস কথাবার্তায় এ খবরটি জানতে পেরেছিল। বিশেষ কোন আলোচনা তার সংগে এ সম্বন্ধে হয়েছে বলে মনে পড়ে না। কথাটা সে ভোলে নাই বিদেশে যাবার মুখে ফরমুলা দুটো পাঠানোতে একথা প্রমাণ হল।

দেবাশিস চলে যাবার মাসখানেক পরে বড় একটা কেমিকেল এণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানীর অফিস থেকে চিঠি পেলাম। মিঃ ভাদুড়ীর একখানা চিঠিও পেলাম। চিঠিতে জানিয়েছেন, আপাততঃ দুশো টাকা করে দেবে কোম্পানী, কাজ দেখাতে পারলে বাড়াবে। কোন অসুবিধে হলে ফোন করে তাঁকে জানালে তিনি অসুবিধে দূর করবার চেষ্টা করবেন।

দেবাশিসের একটা ফরমুলা নিয়ে কাজ করতে আরম্ভ করলাম। বছর খানেক লেগে গেল, তারপর নতুন ড্রাগ বাজারে বেরোল। ফরমুলা দেবাশিসের। ড্রাগের নাম হল গাঙ্গুলী এলেকসির। মাস পাঁচ-ছয় পাবলিসিটির পরে ড্রাগের কাটতি বাড়তে লাগল।

এক বছর রয়ালটি দিল কোম্পানী, তারপর প্রস্তাব করল কিছু টাকা নিয়ে ফরমুলা বেচে দিন, এই টাকা বাদে বছরে সাড়ে তিন হাজার দেয়া হবে আপনাকে পনেরো বছর। তাদের লেবরেটরীতে কাজ করতে পারব যতদিন ইচ্ছা, তার জন্য আলাদা কিছু দেয়া হবে।

দেখলাম একটা ড্রাগে আমার অদৃষ্ট ফিরে গেল। বললাম টাকার অঙ্কটা কিছু বাড়িয়ে দিন, নিজে একটা ছোটমত লেবরেটরী করতে চাই। কিছু বের করতে পারলে আপনাদের সেব কথা দিচ্ছি। প্রয়োজন মত আপনাদের লেবরেটরী ব্যবহার করব, তার জন্য মাইনে দিতে হবে না। কোম্পানী রাজি হয়ে গেল।

হাতে টাকা হতে দেখলাম স্ত্রী, পুত্র, কন্যা সকলের ব্যবহার বদলাতে লাগল। শুধু স্ত্রী-পুত্র-কন্যা কেন বহুদিনের পরিচিত সার্কেলের সংগে আমার যেন নতুন পরিচয় হল এই রকম ভাব প্রকাশ পেতে লাগল। পরিবর্তন আমার ভেতরেও ঘটল বুঝতে পারলাম।

ছাত্র হিসাবে ভালই ছিলাম আমি, উচ্চাশাও ছিল মনে। পাঠজীবন শেষ হবার মুখে পিতার মৃত্যুর পরে দেখলাম বাড়ীটা মর্টগেজে আবদ্ধ, নগদ টাকা বাড়ীতে বাক্স প্যাটরায় নাই, ব্যাঙ্কেও নাই। পিতা মারা যাবার আগে স্নাতক মুখ দেখবার আশায় রাজগারক্ষম হবার আগেই ফিরে নিয়েছিলেন।

উচ্চাশা বিসর্জন দিয়ে এম এস সি পরীক্ষার ফল বেরোবার পরে কলেজের চাকুরিতে ঢুকতে হল। পিতার দেনাটা শোধ করে বাড়ীটা বাঁচাবার এবং ক্রমবর্ধমান পরিবার প্রতিপালনের চেষ্টায় রোজগার বৃদ্ধির চেষ্টায় মন দিলাম। দু'চার বছর যেতে দেখলাম শুধু উচ্চাশা নষ্ট হওয়া নয় বুদ্ধির ধার এবং মনের উদ্যম জৈবিক সংগ্রহ সংগ্রামের ফলে ক্ষীয়মাণ ও ম্রিয়মাণ হয়েছে। বড় কথা, ভাল কথা ভাববার অবসর অমিল হয়েছে।

ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে উঠতে নতুন ঝঞ্ঝাট শুরু হল তাদের নিয়ে। তাদের ওপরে চোখ রাখবার অবসর ছিল কম। ফলে চোখের সামনে যাদের চিনি না এমন ধরনের মানুষ হয়ে উঠতে লাগল তারা!

রসুই

গুঁড়া মশলা

ফোন : ৫৫ ২৪৪১, ৩৩-১৪৭১

রসুই প্রোডাক্টস্

১৭ আর জি কর রোড, কলিকাতা-৪ ॥ ২০১ মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা-৭

তাদের দাবীমত পোশাক-পরিচ্ছদ, থাকা-খাবার ব্যবস্থা করতে পিতার অক্ষমতা তাদের চোখে পিতার অকর্মণ্যতার পরিচয়, স্ত্রীর চোখে স্বামী সম্বন্ধে অকর্মণ্যরূপে প্রকট হয় তাঁর নিজের ইচ্ছামত খরচ করবার উপযুক্ত অর্থের যোগান দিতে না পারলে। এক বাড়ীতে থেকে, এক হাঁড়ির ভাত খেয়ে বাড়ীর প্রত্যেকটি লোক যে যার মত হয়ে উঠলেও একটা বিষয়ে ঐকমত ছিল সকলে, কলেজের মাস্টার প্রমথ গাঙ্গুলী অতি অযোগ্য লোক, কোন দিক দিয়ে শ্রদ্ধার পাত্র নয়।

পয়তাল্লিশ বয়সে পৌঁছে দেখলাম আমি নিজের বাড়ীতে একজন আউট-সাইডার। ভুলে গেলাম আমি এক সময়ে নবীন যুবক ছিলাম, আমার মনে উচ্চাশা ছিল, স্বপ্ন ছিল, আমি ভালবাসতে, স্নেহ করতে জানতাম। প্রেম আমার জীবনে মধুর স্বপ্নের মত দেখা দেয়নি, স্নেহ, শ্রদ্ধা আমার প্রৌঢ় জীবনে মিষ্টত্ব আনে নি। সীমাহীন গভীর হতাশায় মন ভরে উঠেছিল।

হাতে টাকা হতে বাড়ীর আবহাওয়া বদলে গেল দেখলাম। প্রৌঢ়া গৃহিণীর বচন মধুমাখা হয়ে মুখ থেকে নিঃসৃত হতে লাগল, স্বামীর প্রতি পরম ঔদাসীন্যের স্থান কেটে গিয়ে স্বামীর সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি সুদৃষ্টি পড়ল। কড়া স্বরে নয় তাঁর মিষ্টি হেসে তিনি নানা প্রয়োজনের কথা তুলে অতিরিক্ত টাকা চাইতে লাগলেন। দুটি বিবাহিতা কন্যার সংসারের কাজের চাপে এতদিন বাপের কথা মনে করবার সময় পেত না, হঠাৎ ওরা বড় পিতৃভক্তি প্রকাশ করতে লাগল চিঠিপত্রে এবং শ্বশুরের, শাশুড়ির, স্বামীর কৃপণ স্বভাবের নিন্দা করে মাঝে মাঝে নানা অজুহাতে কিছু টাকা পাঠাবার আবদার জানাতে লাগল। দুই পুত্রের পিতৃভক্তিও হঠাৎ বিস্মৃতির অতলগর্ভ হতে মাথা তুলল। পুত্ররা ভণিতা করে বাড়ী মেরামত, আসবাব কেনা ইত্যাদি সাংসারিক প্রয়োজনে টাকা চাইতে লাগল। তারা নিজেরাও চাকুরি করত কিন্তু ভবিষ্যতের ভাবনায় তাদের রোজগারের টাকা ব্যাঙ্কে চলে যেত, তাদের নাবালকদিগের মত খাওয়া পরার খরচটা বাপকেই দিতে হত, হাতখরচের অনটন পড়লে সেটাও দিতে হত।

বৈরাগ্যবশে নয় সাংসারিক চিন্তা করে বাড়ীটা স্ত্রীর নামে লিখে দিলাম শহরতলিতে একটা ছোট বাড়ী কেনবার পরে। আমার বোবা সন্তানহীনা বিধবা ভগ্নীকে নিয়ে নতুন বাড়ীতে সরে এলাম স্ত্রী-পুত্র কন্যাদের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে, অর্থাৎ সবাইকে কিছু কিছু নগদ দক্ষিণা দিয়ে। আস্তে আস্তে একটা ছোট ল্যাবরেটরী গড়ে তুললাম নতুন বাড়ীতে।

বৈরাগ্যবশে নয় বলেছি। এটা বানপ্রস্থের একটা এক্সপেরিমেন্ট। হয়ত একটুখানি আশা মনের কোন কোণে লুকিয়ে ছিল যদি জীবনের নষ্ট ঐশ্বর্যের কিছু পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয় গার্হস্থ্যাশ্রম ছেড়ে বানপ্রস্থ নেবার ফলে। জীবনের ঐশ্বর্য কি? প্রীতি, স্নেহ, ভালবাসা, সহানুভূতি, উদারতা যা মানুষকে মানুষের সঙ্গে বেঁধে দেয়।

নতুন বাড়ীতে আসবার বোধহয় বছর দেড়েক পরে হঠাৎ দেবাশিসের একখানা চিঠি পেলাম আমেরিকা থেকে।

(১২

চিঠি হাতে করে একটু পুলকের ভাব এল মনে। তাহলে দেবাশিস বেঁচে আছে? মাস্টারমশাইকে বলবার মত কথা এতদিন পরে খুঁজে পেল?

ধীরে ধীরে মন দিয়ে চিঠিখানা পড়লাম।

লিখেছে, বাবা তাঁর এক বন্ধুর মারফৎ যে টাকার ব্যবস্থা করেছিলেন তাতে কলেজে ভর্তি হয়ে দু-তিন বছর পড়াশোনা চালানো অসম্ভব, বড় জোর বছর খানেক অর্ধাহারে থেকে বেঁচে থাকা চলে। কিছুদিন এ কলেজ সে কলেজ, এ রাস্তায় সে রাস্তায় ঘোরাফেরা করে যা হোক একটা চাকুরির চেষ্টায় হাই কমিশনারের অফিসে ধর্ণা দিয়ে একটা চাকুরির যোগাড় হল চেহারা ও পোশাকের জোরে। ভাল চেহারার সঙ্গে পোশাক যোগ করতে পারলে মানএক্স-

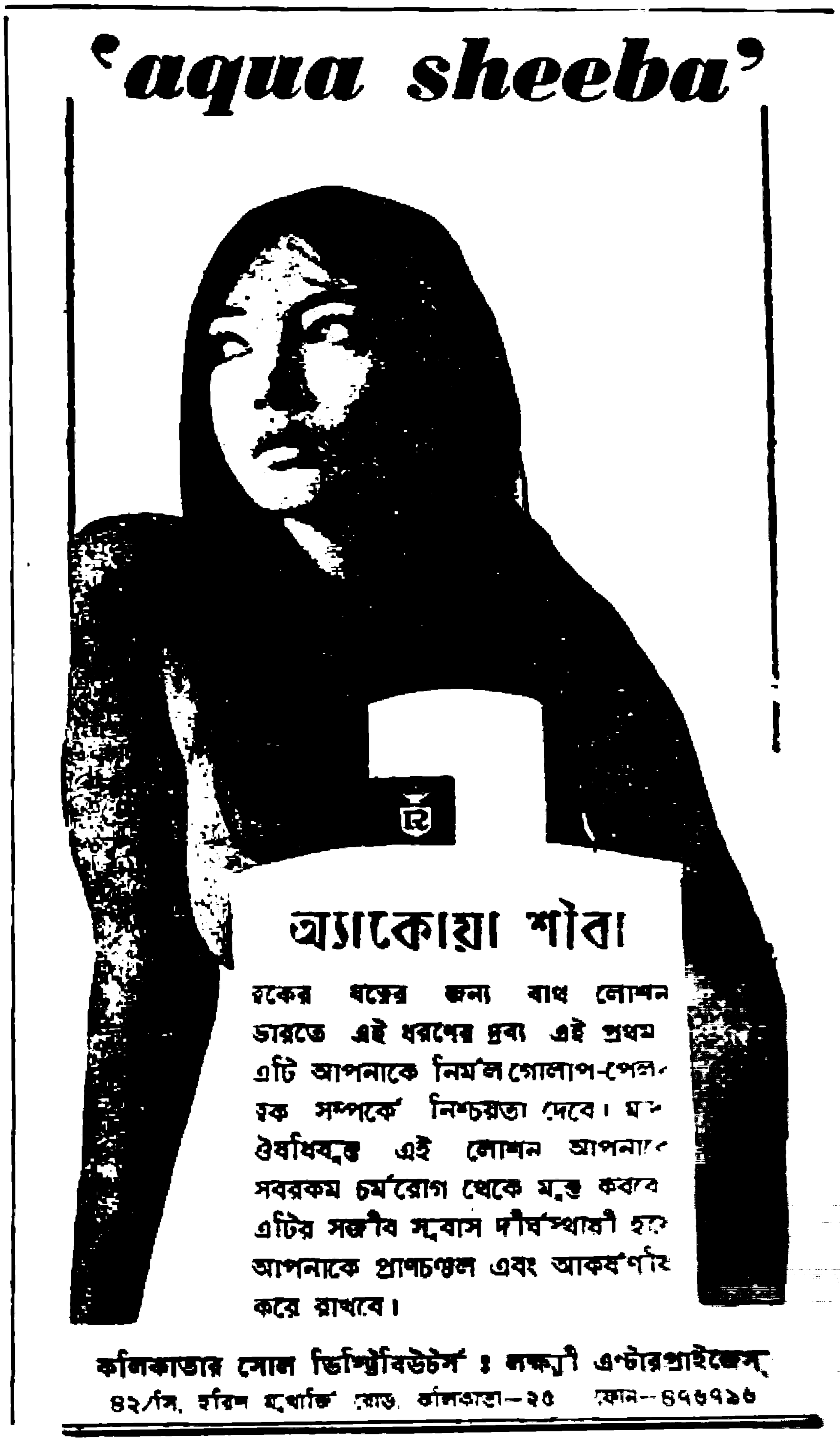

পেক্টেড দাম পাওয়া যায় এদেশে। এ সত্য আবিষ্কার করে অনেকগুলো পাউন্ড নষ্ট করেছিলাম পোশাকে। কিছুদিন কমল হালচাল রপ্ত করতে। বিভিন্ন স্তরের ফিলোজফি ও বুলি রপ্ত করতে।

হাই কমিশনারের অফিসের একটা কাজ সোশ্যাল ও কালচারাল ফাংশানের মাধ্যমে এদেশের লোককে ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত করা। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য মানে শাড়ি, গহনা পরবার স্টাইল, রকমারি রান্নাবান্না, নাচ ও গান, পিলাউ, মুরগী-মসল্লা, পান্তুয়া ইত্যাদি। দেশে থাকতে কোনরকমের নাচাম জানতাম না, গানও জানতাম না, স্টেজে নেমে একটিং কারিন কখনো, দু-একটা বাদ্যযন্ত্রে টুং-টাং করতে পারতাম। দু-তিন মাসের মধ্যে সোস্যাল এন্ড কালচারল ফাংশানের সব রকম ব্যাপার, মায় ভারতের শাশ্বত শান্তির আদর্শ এবং যোগ সিস্টেম সম্বন্ধে সংস্কৃত কোটেশান সহ বক্তৃতা দেয়া শিখে নিলাম। আমার ওপরে কর্তৃপক্ষের সুনজর পড়ল।

সুনজরে পড়লেও প্রয়োজনীয় টাকার প্রশ্নের সুরাহা হল না। মাইনে যা দেয় খেয়ে পরে তা থেকে কিছু বাঁচানো যায় না। আমার অনেক টাকার দরকার, খরচ করে ভালভাবে থাকবার জন্য, জমাবার জন্য, টাকা না জমালে পড়াশোনা করব কি করে, এদের কাছ থেকে কিছু শিখে নেব কি করে? এ যদি না পারলাম তাহলে ইংল্যান্ডে না এসে কাঠমণ্ডুতে বা ভুটানের গ্যাংটকে যেতে পারতাম।

বাড়তি রোজগারের কথা ভাবতে লাগলাম। বাড়তি রোজগারের দু-একটা অলিগলি চোখে পড়ল।

আমাদের দেশে মেয়েরা প্রেম করবার জন্য খরচপত্র কিছু করতে চায় না, বয়ফ্রেন্ডরা খরচ করবে এক্সপেক্ট করে। বড় জোর রেস্তোরাঁর বিলটা শোধ করে দু-একদিন, সিনেমার টিকেটের দাম দেয় দু-একবার। কিছুসংখ্যক মেয়ে বয়ফ্রেন্ডদের সঙ্গে ঘোরে, আবার নাইট ক্লাবে ঢুকে কিছু কিছু রোজগার করে। মোট কথা বয়ফ্রেন্ডদের এক্সপ্লয়েট করবার দিকে ঝোঁক দেখা যায় ওদেশের গার্ল ফ্রেন্ডদের মধ্যে।

ওদেশে সিচুয়েশন অন্য রকমের। সামাজিক স্বাধীনতা বেশী, লোকলজ্জা বা প্রেস্টিজের চড়া দাম দেয় না কেউ, মনকে আটকাবার তুক-তাক মন্ত্র নাই, যাদের লজিক্যাল আর্জের স্যাটিসফ্যাকশানের, যাকে এক্সপিরিয়েন্স অব লাইফ বলা হয় তার ক্যান্ডিডেট মেয়ের সংখ্যা বেশী। গার্ল ফ্রেন্ডরা খরচ করে বয় ফ্রেন্ডদের পেছনে, টাকা ধার দেয় বয় ফ্রেন্ডকে আদায় হবে না জেনেও। কেউ কেউ নিয়মিতভাবে ধার দেয়। এটা হল বয় ফ্রেন্ডের রিটেনিং ফি।

এ পথে ঘোরাফেরা করে সুবিধে হল না। কিছুদিন পরে সমস্ত জিনিসটা অতি বিস্বাদ লাগতে লাগল। মনের ভেতরে কোথাও খচখচ করতে লাগল। মনে হল এই কি টাকা রোজগারের উপায়? টাকা জমছেই বা কোথায়? য়ুনিভার্সিটিতে ঢোকবার আশা ছেড়ে দিতে হল।

কিছু করবার ব্যর্থ আশা মনে নিয়ে তিন বছর পরে হাই কমিশনারের একটা সুপারিশপত্র সংগ্রহ করে আমেরিকায় চলে গেলাম।

আমেরিকার কথা পরে লিখব। একটা য়ুনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়ে পড়াশোনা করছি, কিছু কিছু রিসার্চের কাজও করছি।

আপনার "এক্সিকিউসিয়নের" খবর এদেশে পৌঁছেছে, পপুলারিটি বাড়ছে খবর পাই।

(১০)

দেবাশিসের চিঠি পড়ে খুশী হলাম। সে কি করছে না করছে বেঁচে থাকবার জন্য তা নিয়ে আমার শিরঃপীড়া নাই, সে কি করছে সেইটে বড় কথা। সকলের বড় কথা জয়েন্ট কি মনস্টারকে ঘায়েল করতে পারবে? এখনও সে সম্বন্ধে কিছু বলবার সময় আসেনি।

তার চিঠি আবার পাব এ সম্বন্ধে নিশ্চিত বোধ করলাম।

যেমন খবর পাচ্ছি মনে হয় দেবাশিসের বাবা মিঃ ভাদুড়ির বড় কারবার ডুবে যাবে। বড় কারবার ডেঙ্গে যাওয়া এমন কিছু ব্যাপার নয় মিঃ ভাদুড়ীর মধ্যে যে শক্তি ছিল সে শক্তির অপব্যয় হল এইটে আপশোষের কথা। তাঁর কারবারকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে পাঁচজনের জীবিকা নির্বাহের উপায় হয় এমন কিছু দিতে গিয়ে দিতে পারলেন না তিনি। সত্যিকার শক্তিমান মানুষের অভাব রয়েছে দেশে, শক্তির অপচয় হতে দেখলে কষ্ট হয়।

নিজের জন্মস্থান পৈতৃক বাড়ী এবং পরিবার-পরিজন প্রায় সবাইকে ছেড়ে শহরতলিতে একটা ছোট বাড়ীতে নয়ে এলাম শখের বানপ্রস্থ আশ্রম পালন করবার জন্য। এই শখের বানপ্রস্থ আশ্রম গ্রহণ করবার মধ্যে দুটো আইডিয়া ছিল। মৃত্যুকাল পর্যন্ত জীবিকা অর্জনের চেষ্টায় নিজেকে ক্ষয় করে ফেলবার দায় থেকে শাস্ত্রোক্ত বানপ্রস্থের বয়সে অব্যাহতি পেয়ে গেলাম ভাগ্যক্রমে। মনে করলাম দরজা খিল চুকিয়ে দিয়ে বসে নিজের পছন্দমত কাজ, মানে লেবরেটরীতে এটা-ওটা নিয়ে নাড়াচাড়া করব। আরেকটা কথাও ছিল মনে, সংসারের নাগপাশ থেকে মুক্তি পাবার পরে জীবনের নষ্ট ঐশ্বর্যের কিছু পুনরুদ্ধার হয় কিনা দেখব। কথাটা আগে একবার বলেছি।

প্রথম আইডিয়া কাজে পরিণত করা নিজের হাতের মধ্যে। দ্বিতীয়টা পরের হাতে এবং ভাগ্যের ব্যাপার। শক্ত ব্যাপার।

সংসারে সকলে নিজের কাজে ব্যস্ত। জীবিকা অর্জন, সংসার প্রতিপালন সামাজিকতা রক্ষা। একটু ধর্মকর্ম, একটু কালচারের ছিটেফোঁটা, কিছুটা পলিটিক্সের কাইট-ফ্লাইং কিছু পরচর্চা, আরও কত ব্যাপার নিয়ে মানুষ ব্যস্ত। আমাকে শ্মশানঘাটে নিয়ে যাবার প্রয়োজন হয়নি এখনও, রোগেশোকে কাতর হয়ে শয্যাশায়ী হইনি এখনও, কার দায় পড়েছে আমাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে? কেউ আসবে না। ভাবলাম না আসলে কি আর করা যাবে?

আমার বানপ্রস্থের সংসার চারজন লোক নিয়ে। আমি, আমার নিঃসন্তান কাছেরের ছোট বিধবা ভগ্নী, সংসারের কাজে তাকে সাহায্য করবার জন্য একজন বুড়ো ঝি এবং বানপ্রস্থের আশ্রম হলেও বাড়ীটা নৈমিষারণ্যে পরিণত না হয় দেখবার জন্য একজন লোক। সে এ কাজ করত, বাজারহাট করত। সেও আধ বুড়ো মানুষ, নাম অধর।

আমার ভগ্নীর নাম মহামায়া। নিরীহ মানুষ, অত্যন্ত ভালমানুষ। স্বামীর মৃত্যুর পরে স্বামীর সংসারে ঠাঁই হল না, ভাশুরপক্ষের বিনয়ে উদ্বাস্ত, খাটুনির এবং নীরবে সব লাঞ্ছনা-গঞ্জনা পরিপাক করবার অভ্যাস থাকলেও। তাকে খাটিয়ে নাকাল, গঞ্জনা দিয়ে নাকাল করবার জন্য সংসারের অধিকাংশ মানুষ স্বভাবজ আবেগ সংবরণ করতে পারতেন না। আত্মরক্ষার অক্ষমতা যে হতভাগ্য প্রকাশ করে তার নিস্তার নাই। মানুষের মধ্যে যে পাশবিক নিষ্ঠুরতা লুকিয়ে থাকে তার হাত থেকে। শ্বশুরবাড়ী থেকে সরে এসে পিতার গৃহে, ভ্রাতার আশ্রয়ে থেকেও মহামায়ার যে অবস্থা হল হয়ত শ্বশুরের ভিটায় তার চাইতে সে ভাল ছিল। নিজের চোখে সব দেখেও কোন প্রতিকার করতে পারলাম না। অত নিরীহ ভালমানুষকে মাসোহারার ব্যবস্থা করে কাশী, বৃন্দাবনে পাঠাতে সাহস হল না, টাকা পয়সার স্বচ্ছলতা ছিল না।

বিনা অস্ত্রোপচারে
অর্শ থেকে
আরাম পাবার
জন্য
হ্যাডেনসা
ব্যবহার করুন!
ODL-117/BEN

CENTRAL LIBRARY

টাকা আসতে আরম্ভ করল তাকে কাশী পাঠাবার প্রস্তাব করলাম। মহামায়া বলল, এ সংসারে তোমাকে কে দেখবে দাদা? তোমার কাছে রয়েছি, আমার কোন কষ্ট নাই বিশ্বাস করো। বিশ্বাস করলাম।

সংসার থেকে সরে পড়বার সময় যখন এল মহামায়াকে নিয়ে সরে এলাম। বললাম, যে কটা দিন আমি আছি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে চলে ফিরে বেড়া।

আমার দেরি হল কাছাকাছিতে যে প্রতি-বেশীরা থাকেন তাঁদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হতে, মহামায়ার দেরি হল না।

যত দুঃখ, কষ্ট, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা সে সহ্য করেছে জীবনে তার মনের ওপার কোন ছাপ ফেলতে পারেনি। মানুষ নিমিত্ত মাত্র, সব আঘাত এসেছে ভগবানের হাত থেকে, ভগবান তাকে নিয়ে পরীক্ষা করছিলেন তার বিশ্বাস খাঁটি না মেকী, এই হল তার কথা। কথাটা শুনতে মন্দ লাগে না হয়ত। মহামায়ার মতে সব মানুষ ভাল, মানুষের মধ্যে যেটুকু দুষ্টিকত, বলে মনে হয় সেটা সাময়িক বিকার মাত্র। কারো ওপার রাগ পুষে রাখতে নাই মনে, সবাইকে ভালবাসবার চেষ্টা করতে হবে। প্রতিদানে কেউ তোমাকে ভালবাসেন, ভাল কথা, না বাসলে কিছু যায় আসে না, তুমি তো ঠিক রইলে ভগবানের চোখে।

মহামায়ার সৌন্দর্যের খ্যাতি ছিল কম বয়সে। সব রূপ জ্বলেপুড়ে গিয়েছিল সংসারের প্রখর তাপে। পয়তাল্লিশ ছেচাল্লিশ বছর বয়সে আবার তার রূপ ফিরে আসছে দেখলাম। সদা প্রসন্ন, অনলস কর্মী, ধর্মপ্রাণা তপস্বিনীর রূপ। স্বল্পবাক, মুখে স্নিগ্ধ হাসি, শান্ত, গম্ভীর, প্রসন্ন মূর্তি মহামায়াকে দেখে প্রতিবেশিনীদের কেউ কেউ যে আকৃষ্ট হয়ে নিজেরা এসে আলাপ পরিচয় করলেন, আসা-যাওয়া করতে লাগলেন এতে বিস্মিত হলাম না।

ক্রমে আমার সঙ্গেও দু চারজন প্রতি-বেশীর আলাপ হল।

নানা জায়গা থেকে এসেছেন এঁরা আশ্রয় ও জীবিকা সংগ্রহের চেষ্টায়। ভদ্রঘরের, কিছু কিছু লেখাপড়া জানা লোক সবাই, নানা রকম কাজ করে পরিবার প্রতিপালন করবার চেষ্টা করছেন। শহর থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসে এখানে ঘরবাড়ী করে-ছেন এমন কিছু লোকও আছেন।

এঁদের সম্বন্ধে জানবার কথা, ভাববার কথা অনেক আছে হয়ত, সমাজকল্যাণকর্মী-দের। রাষ্ট্রের কিছু কিছু করবার আছে এঁদের সম্বন্ধে সন্দেহ নাই, কিন্তু আমি আবার নিজের কাঁধের ভার নিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে, হোঁচট খেয়ে খেয়ে চলেছি, আগ্রহ, কৌতূহল, হিতৈষণা সব চলে গিয়েছে আমার মন থেকে। সময়ও যে বেশী হাতে পাই তা নয়। কেউ দয়া করে এলেন, পাঁচ দশ মিনিট কথাবার্তা হল, যথাসময়ে এসে এক কাপ চা, দুখানা বিস্কুট দিয়ে আপ্যায়ন করতাম, এর বেশী পেরে উঠতাম না।

একটি পরিবারের সঙ্গে কিছু ঘনিষ্ঠতা হল কিছুকাল পরে। ভদ্রলোকের নাম বরদাবাবু, বয়স আমার চেয়ে কিছু কম হবে। আগে একটা বড় ফার্মে চাকরি করতেন, ভাল মাইনে পেতেন। ফার্ম লিকুইডেশনে গেলে অন্য একটা ছোট ফার্মে চাকরি পেয়েছেন। বড় ছেলেটি এম-কম পড়ছে, একটা চাকরিও করে। ছোট ছেলেটি স্কুলে পড়ে। মেয়েটি তার বড়, কলেজে ঢুকেছে। স্ত্রী আছেন, তিনি শিক্ষিতা, অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়ে শুনেছি। বাড়ীটা করতে গিয়ে বরদাবাবুর কিছু দেনা হয়েছে শুনেছি। ছেলেদের দুটির পড়বার খরচ চালাতে হয়, সংসার চালাতে হয়। বড় ছেলেটি যা রোজগার করে পড়া চালাবার জন্য, কাপড়চোপড়, টিফিন, ট্রাম-বাসে চলে যায়, মায় হাতে কখনো দু পাঁচ টাকা দেয় মাত্র। কিছু ভাল-ভাবে থাকতে অভ্যস্ত হয়েছিলেন বরদাবাবু, এখন টানাটানির মধ্যে চালাতে হয়। পকেট ক্রনিক টানাটানি পড়লে কাপড়চোপড়ে, কথায়, ব্যবহারে তার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। বরদাবাবুকে কিন্তু দেখে তেমন মনে হয়। বেশ ফিটফাট চেহারা ও পোশাক।

সংসার চালান অবশ্য তাঁর স্ত্রী। কিছু বস্তু আছে তাঁর মধ্যে মনে হয় তাঁকে দেখে, এত টানাটানির মধ্যে চলাও মুখের হাসিটি লুকোয়ান। তাঁর সহজ, সরল ব্যবহার লক্ষ্যের মধ্যে পড়ে। মহামায়ার সঙ্গে তাঁর বেশ ভাব হয়েছে। দুপুরের পর মাঝে মাঝে তার কাছে এসে বসতেন দেখেছি। তার পারিবারিক খবর যা দিলাম মহামায়ার কাছে পেয়েছি। আমার সঙ্গে দু একটা কথাবার্তা চলবার মত অবস্থায় পৌঁছুতে বছরখানেক লেগে গেল। এই এক বছরের মধ্যে তাঁর দু ছেলের সঙ্গে আলাপ হল, মেয়েটির সঙ্গেও আলাপ হল। ছেলেদের নাম সত্য ও স্বর্ণ। মেয়ের নাম তুলসী।

কিছু অপূর্ব সুন্দরী না হলেও তুলসী দেখতে বেশ ভাল। একটা মিষ্টি ভাব আছে বুদ্ধিদীপ্ত মুখের চেহারায়। সামনে এসে দাঁড়ালে তাকিয়ে দেখার ইচ্ছা হয়, তাকিয়ে দেখে মনে হয় শান্ত, ঠাণ্ডা মেয়ে নয়, একটু ছটফটে। মাঝে মাঝে মায়ের সঙ্গে আসে যায় দেখেছি। প্রথম যেদিন সামনাসামনি দেখা হয়ে গেল একটা প্রণাম করে মাথা নামিয়ে দাঁড়াল।

বললাম, ভাল আছ? তুলসী তোমার নাম তো?

বলল, ভাল আছি। আমার নাম তুলসী।

চলে যায় একটু অপেক্ষা করে। আলাপ করতে চায় মনে হয়, একসঙ্গের বয়সে চায় এই জেঠাটিকে যার সম্বন্ধে নানা রকমের কথা হয়ত শুনেছে।

এরপর দেখলাম লেবরেটরী ঘরে কাজে ব্যস্ত থাকলে এক পা ভেতরে এসে বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে দেখে চারদিকে, একটু পরে সরে যায়। বারান্দায় বসে কাগজ বা বই পড়ছি, এসে দু তিন পা নড়চড়ে বেড়ায়, একটু দাঁড়ায়, তারপর চলে যায়। কোনদিন দু চারটি কথা বলি, কোনদিন কথা হয় না।

মাস কয়েক কেটে গেল। দেখলাম তুলসী সাহস সঞ্চয় করছে।

একদিন বারান্দায় বসে একখানা জার্নালের পাতা ওল্টাচ্ছিলাম, চা খাবার কথা মনে হল। মহামায়া চা, সামান্য কিছু খাবার দিয়ে যায় এই সময়ে, আজ দেরি হচ্ছিল। ভাবলাম হয়ত কেউ এসে-ছেন তার কাছে তাই দেরি হচ্ছে। একটু পরে চায়ের কাপ ও একটা ডিশ হাতে নিয়ে তুলসী কাছে এসে দাঁড়াল।

বললাম, তুমি কখন এলে তুলসী? তোমাকে চা আনতে হল কেন?

বলল, একটু দেরি হল, নিমকি ভাজ-ছিলাম।

বলো কি, নিমকি করতে জানো তুমি? কিন্তু করতে গেলে কেন? দুখানা বিস্কুট হলে হয়ে যায় আমার।

হেসে বলল, একদিন না হয় নিমকি খেলেন।

বললাম, তুমি কষ্ট করে করেছ, আমি আরাম করে খাবো বইকি। কিন্তু কষ্ট করতে গেলে কেন তুমি?

কষ্ট আবার কি? দুখানা নিমকি বানাতে কষ্ট হয় নাকি?

তোমার মতে হয় না আমার মতে হয়। সে কথা যাক। যা করেছ সব দিয়েছ বোধ হয়। তোমার নিজের জন্য আছে?

করে নেব। আপনি খান তো।

বললাম, দেখো বাপু, পরের জন্য যারা কষ্ট করে নিজের জন্য তারা কষ্ট করতে চায় না। তোমার কথা আমার পক্ষে বিশ্বাস করা শক্ত। দেখি ক'খানা আছে?

দেখুন, ছখানা মাত্র আছে।

বেশ, আরেকটা ডিশ আনো।

বলল, আমি করে নেব বলছি তো।

করে নিয়ো। তুমি ছেলেমানুষ করে নিয়ে দশখানা খেয়ো, এখন তিনখানা তুলে নাও।

বলল, আপনি ভারি অবুঝ মানুষ।

অবুঝ মানুষ, ঠিক ধরেছ। তুলে নাও তো তিনখানা।

মুখ ভার করে দুখানা নিমকি তুলে নিয়ে চলে গেল।

ক্রমে তুলসীর সঙ্গে ভাব হল। আবিষ্কার করলাম তার মধ্যে কিছু বস্তু আছে। যে ছেলেমেয়েদের মধ্যে বস্তু থাকে তাদের আমি পছন্দ করি।

দেখলাম তুলসী আমার পছন্দমত মেয়ে। বেশ মেয়ে সে। বেশ থাকতে পারবে কিনা জানি না, তবে এখন বেশ রয়েছে।

উল্টোপাল্টা টানে পড়ে ছেলেমেয়েরা বদলে যায় তুলসীও বদলাবে নিশ্চয়, জানি না তখন তাকে পছন্দ করতে পারব কিনা।

একদিন তাকে বললাম, তুলসী, তুমি আমার পছন্দসই মেয়ে আমার কাছে ভয়, লজ্জা, সংকোচ রেখো না।

হাসল তুলসী চট করে উঠে আমার চেয়ারের পেছনে গিয়ে গলা জড়িয়ে ধরে কানের কাছে মুখ এনে বলল, আপনাকে ভালবাসি জেঠামশাই।

(ক্রমশঃ)

মধুখের মেলা

অরণ্য বিহার

কার্তিক মাসের জোৎস্না-ভাসা সুন্দরবনের সৌন্দর্য বর্ণনাতীত। সবুজ সতেজ গোলপাতার আন্দোলন, সুন্দরী, হিজলী, গরাণ পাতার চকচকে নাচন, বাতাসের ঢেউ কী অপূর্ব অপরূপ! সুন্দরবন নদীর কী অবর্ণনীয় নৈসর্গিক শোভা।

ফণী-মনসা, মনসা, বাজবরণ, লক্ষ্মীশিরে, হ্যাঙ্গামারা লতা, গোলপাতা, হেন্তাল, হরকোচ, তেকাটিল, বসকাঁমা, পার্শ্বিটলী, জল-ডুমুর, সেঁয়াকুল, বইচি, সোনাকাটা, কাশ, ধানীঘাস, সোঁ-করাতে ঘাস—জটিল ভয়ঙ্কর কণ্টকাকীর্ণ অরণ্যের কাঁটা-ডাল-পাতা সব এখন জোৎস্নার মায়ায় উদ্ভাসিত—একাকার। লক্ষ্মীশিরের গাছ যেন ফোয়ারার উচ্ছ্বাস।

চোখ ফেরাতে পারে না কৃষ্ণ রায়। গরাণ কাঠের পাকা শক্ত ডাল পুঁতে গরাদে করা জানালায় চোখ রেখে বন্দুকের নল বার করে চুপচাপ বসে থাকে।

মণীন্দ্র বসু আর একটি জানালায়। দুজনেই সুদর্শন ব্যক্তিমান যুবক। স্টোভ জেলে রান্না করছিল মাধুরী আর কাবেরী। কাবেরী কৃষ্ণর বোন আর মাধুরী মণীন্দ্রর। দুজনেরই সিঁথি এখনো সাদা। গল্পের নায়ক-নায়িকাদের মতো এরাও এ ওর বোনকে ভালবাসে—আর সে ভালবাসা লুকোছাপা নেই। এক্স প্লটের মধ্যে গভীর অরণ্যের একটি আস্তানা। চারদিকে বাঁশের খুঁটি পুঁতে ঘের দেওয়া—মাথাটাও ঢাকা। বিপদমুক্ত গোলাকার গোলার মতো একটি আশ্রম। ভিতরে মাটির ঘর। হ্যারিকেন জ্বলছে দুটো।

দুজন পাথর-কালো তেল-চকচকে উদোম-গা গলায় তাবিজ-বাঁধা বাউলী তাদের বিরাট মোটা বাবলা কাঠের গদার মতো খেটে পাশে রেখে গাঁজা টানছে মৌতাত করে।

'এই বাবু, আরে, আরে, দেখে যাও—ওটা কী!' মাধুরী ছুটে এসে কৃষ্ণর পাশে বসে বাইরের দিকে চোখ রাখলে। কাবেরীও এসে মণীন্দ্রর পাশে বসল। বাউলীকে ডাকতে একজন এসে উঁকি মেরে দেখে হা-হা করে হাসতে লাগল। বললে, 'সাপ রে বাবু, হে হে, মারিস না গুলী মেরে, উ কামড় দিবে না—আর নাম কর বুবে-কেউটে—বড়া কেউটিয়া।'

মাধুরী বললে, 'কী সুন্দর দেখ। গায়ে জোৎস্না পড়ে কেমন ঝিকমিক করছে!'

সহসা বাঘের গর্জন শোনা গেল। মাধুরী আর কাবেরী আতঙ্কিত হয়ে ওদের জড়িয়ে ধরে বললে, 'পালিয়ে এস—জানালায় বাঘ লাফ দেবে!'

বাউলী লক্ষ্মণ সামন্ত বললে, 'বাঘ এয়েছে বাবু। আলো নিভিয়ে দে সব। থাকে শালারা নজরদিগে এসবেতে। কাছ থিকে দেখা পাবি।'

'ও বাবা। আলো নেভালে যে ভয় লাগবে!' বললে কাবেরী।

লক্ষ্মণ সামন্ত নিজেই হ্যারিকেন দুটো নিভিয়ে দিলে একেবারে। স্টোভের সোঁ-সোঁ শব্দ শুধু। স্টোভের আলোর আভাকেও আড়াল করে দিলে গোলপাতার গোড়ার চওড়া খোল দিয়ে।

হঠাৎ আঁধারের ভিতরে বাঘের ডাক শুনে চারজনেই ভয়ে কাঠ হয়ে গেল। এ ওকে জড়িয়ে ধরে কাঁপতে লাগল।

হঠাৎ কৃষ্ণর মনে হল লক্ষ্মণ বাউলী নিজেই বাঘের ডাক নকল করে তাদের ভয় দেখাচ্ছে! খুব মজা পাচ্ছে ওরা দুজনে।

গহর বাউল এসে ফিসফিস করে বললে, 'শালা লক্ষ্মণ বাঘ ডাকতেছে—ঐ ডাক শুনে বাঘ এসবে—ভয় নেই। বাঘ এলে গুলী কারিসনি বাবু। ঘায়েল হয়ে পালালে ফাঁকতে বিপদ হবে।'

অন্ধকার। বাতাসের মরমর শব্দ। কাছেই দুধের মতন সাদা সরু নদীর জল চকচক করছে। পাখীদের বিচিত্র কলকাকলী। তিনক্রমে তারা মাঝে মাঝে ডেকে উঠছে। বাদুড় উড়ে বেড়াচ্ছে। পেঁচা পাতকোয়া তাহুক ডাকছে ক্রমাগত। বাঁদর-হনুমানেরা ডাকছে। কটাফট-কটাফট শব্দঃ বাউলীরা বলে, 'ওটা গোহাড়গেল' বা গোসাপের ডাক।'

মোরগের চিৎকার শোনা যায়। ঝিঁঝির ডাক অরণ্যজোড়া। কোটি কোটি জোনাকি আলোর জাল বুনেছে—শোভাময় করে তুলেছে বাদলা গাছগুলোকে।

হঠাৎ হা-হা-হা — হি-হি-হি — হো-হো-হো রবে দীর্ঘায়িত শব্দের লহরা। টানা ঝড়ের শব্দে তা ভেঙে ভেঙে যায়। দূরে সমুদ্র গর্জন। বাউলী বলে, 'এই হল বরিশাল ডাক বাবু। 'হঠাৎ করে মনে হবে তোর নাম ধরি' কেউ যেন ডাকতিছে। তাতেই নতুন 'লোক' পথ ভুল করে—সি হল গে যাও 'অরণ্য-মরীচিকে'। চুপ্—ঐ দেখ্—একজোড়া বড়া বাঘ এয়েছেন! ঐ যে, হিজলী গাছের গোড়ায়!' হঠাৎ জানালার কাছে মুখ এনে বাঘ ডাকতে শুরু করলে গহর আলী। অবিকল বাঘের ডাক। বাঘদুটো বেশ বড়। কী সুন্দর গোলগাল চেহারা! কালো ডোরাগুলো সাপের মতন কী ভয়ঙ্কর। পেটটা ঝুলছে—দুলছে। চোখদুটো জ্বলজ্বল করছে অঙ্গারের মতন। মাটি আঁচড়ে হ্যা-হ্যা করে শব্দ করবার পর ভীষণ মেঘগর্জনের মতো হালুম হালুম ডাক ছেড়ে এগিয়ে এলো কাছে। একেবারে নিকটেই।

টুলে বসা কৃষ্ণর প্রায় কোলে বসে কাঁপছিল মাধুরী।

মণীন্দ্রর কাছে কাবেরী।

মণীন্দ্র শুধোলে, 'গুলী করব একটাকে?'

বাউলী বললে, 'না। অদের খেলা দেখ্। মর্নিবার সাড়া পেয়িছে, শালারা সহজে অ্যাখন সরবোনি।'

একটি বাঘ ফাঁকা জায়গাটিতে চার-পা একদিকে করে শুয়ে পড়ল। তার পিছনে বসে পুরুষ বাঘটি আদর করতে লাগল। আশ্চর্য দৃশ্য! এ-দৃশ্য কেউ দেখেনি।

মাধুরীর কাঁধে হাত দিয়ে দাঁড়িয়েছিল বাউলী লক্ষ্মণ সামন্ত। মাধুরীর মনে হচ্ছিল হাত নয়—বাঘের থাবা। হাতটা সে আস্তে আস্তে সরিয়ে দিলে।

হঠাৎ মাদী বাঘটা চিৎকার করে উঠে পড়ল। কামড়া-কামড়ি শুরু করলে দুজনে।

কৃষ্ণ বললে, 'বাউলী তুমি যাও—আমরা দেখছি।'

লক্ষ্মণ সরে গেল।

বলার কিছু নেই। উপভোগের, উপলব্ধির দৃশ্য!

হঠাৎ মণীন্দ্র পাঁচ সেলের ফ্লাশ লাইট ফেলতেই তারা গর্জন করে উঠে দাঁড়িয়েই এক লাফ মারলে জানালার ওপরে।

'বাপরে!' বলেই চারজনে টুল থেকে নিচে পড়ে গেল। জানালায় আঁচড়াতে-কামড়াতে লাগল বাঘদুটো। বাউলী দুজন ছুটে এসে আলো জেলে দিলে। মশাল জেলে আগুনটা জানালার বাইরে ঘোরাতে শুরু করতে বাঘদুটো ভয় পেয়ে সরে গেল। দূরে গিয়ে গর্জন করতে লাগল।

তারপর নীরব চারদিক। কাক—কাক। গোলিকানের কণ্ঠস্বর বাতাস চিরে ভেসে আসছে মধ্যে-মধ্যে দূর থেকে।

কৃষ্ণ মণীন্দ্রকে বললে, 'তুই একটা ইডিয়েট। লাইট মারতে গেলি কেন? ওদের সুখে বুঝি তোর ঈর্ষা হচ্ছিল?

মণীন্দ্র বললে, 'ঐ বদ অভ্যাসটা আমার গেল না, যখন কেউ খুব মজা করে আমার যেন সহ্য হয় না—দিই খোঁচা!'

কাবেরী বললে, 'মারাত্মক লোক তাহলে তো তুমি! নিজের সুখেও অশান্তি কামনা করবে—তুমি তাহলে দুঃখবাদী।'

মাধুরী বললে, 'ঠিক, দাদা ওই রকম। কাবেরী রোগটা সারাস।'

খাওয়া-দাওয়ার পর কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল চারজনে। মাধুরী আর কাবেরী এক জায়গায়—মণীন্দ্র আর কৃষ্ণ আর এক জায়গায়। বাউলী দুজন অন্য একটা ছোট কামরায় শুয়েছে। কম্বল গায়ে রাখা যায় না। মাঘ মাসের শীতের দিনেও সামান্য গরম থাকে সুন্দরবনে। কিন্তু বৈশাখের রাত্রে নদীতে নৌকোয় থাকলে কাঁথা-কম্বল মুড়ি দিতে হয়।

'কাবেরী ঘুমিয়ে পড়েছে, দাদার নাক ডাকছে—আমার চোখে ঘুম আসছে না কৃষ্ণ তুমি সিগারেট টানছ—আমি কি করি—একটা গান গাইব?'

'ধোৎ! চুপ করে ঘুমোও—না-হয় আমার কাছে চলে এস।'

'মরি মরি!'

'কেন? আপত্তি কিসের?'

'সত্যি! যাব?'

মাধুরী উঠতে যেতেই কাবেরী তার আঁচল ধরে টান দিলে।

'ওমা! তুই ঘুমুসনি!'

কাবেরী ফুলে ফুলে হাসতে লাগল।

মণীন্দ্র হঠাৎ যেন ঘুমে ঘুমে বকতে লাগল—মানুষও ঐ শালা বাঘের মতন। পশুর মতন। অন্ধকারে। ভগবান, যদি জন্তু হতাম!'

চারজনেই হেসে উঠল। হাহা-হিহি—হিহি-হোহো।

বাঘদুটো আবার ডাক দিয়ে উঠল একটু দূর থেকে। তাদের কামড়া-কামড়ি অথবা খুনসুটি-কলহের ধ্বনি শোনা গেল কিছুক্ষণ। তারপর...

সকাল হবার আগে তারা সবাই কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছিল। বাউলীরা তাদের ডেকে তুললে।

হালকা কুয়াশা কেটে যাবার পর আরো চারজন বাউলী এল খোঁটে কাঁধে নিয়ে। ডিঙিনৌকোর করে এসেছে তারা।

প্রাতঃকৃত্য সেরে কফি, কলা, কেক, বিস্কুট, চানাচুর ইত্যাদি খেয়ে নিয়ে ফ্লাস্ক, ক্যামেরা, বন্দুক নিয়ে তারা বাউলী ছ-জনের সঙ্গে অরণ্যচারণ করতে বের হল। গাছপালার নাম নোট করতে শুরু করলে মণীন্দ্র।

কাঁটাগুল্ম চারদিকে—তাই শাড়ি পরেনি মাধুরী আর কাবেরী। মিনিস্কার্ট পরেছে। অরণ্যের ডালে ডালে বিরাট মধুর চাক ঝুলে আছে। গাছের পাশ দিয়ে যাবার সময় ভনভন করে ডাঁস মাছি উড়তে থাকে। সেলো যা বাউলীদের এলো গায়ে বসে হুল ফুটতে গেলে তারা চাপড় মেরে, মেরে ফেলে দেয়।

লক্ষ্মণ বলে যায়, 'এই ডাঁস মাছি সব একসঙ্গে ছেঁকে ধরলি আগুন জ্বালাতে হয়। ওটা ঐ যে মস্ত পাঁচশ হাত উঁচু গোটা গাছজোড়া ভীমরুল চাপ। ঐ দেখ বড় বড় থালার মতন বোলতার চাপ। শুকনো ডালে হাত দিব না—কাঠপিঁপড়ে কামড়াবে। ঐ দেখ, গোসাপ দৌড়চ্ছে। ঐ হেঁতাল বনের মধ্যে বাঘ থাকতে পারে। নরখাড়ির জঙ্গলেও থাকে। মাটিতে বাঘের থাবার দাগ। বাঘের পেচ্ছাবের গন্ধ। যে-গাছে পেচ্ছাব পড়বে, সেই গাছে মানুষের পা লাগলে কিটোবে—চুলকোবার পর জ্বালা করবে। এটা হোগলা বন। তরোয়াল দুলতেছে যেন। রাজ্যের বালিহাঁস—জলপিপি—যেন শুকনো নারকোল ভাসতিছে।

দুটো বড় বড় বনমোরগ আর বালিহাঁস শিকার করলে মণীন্দ্র আর কৃষ্ণ। বাউলীরা কুড়িয়ে আনলো।

'হরিণ, খরগোস, বন্যবরাহ—এসব তো দেখছি না বাউলী?' শুধোলে মণীন্দ্র।

'আছে। দেখতে পাবিখনে। তবে কমে 'যাচ্ছে'। বাঘ সব খেয়ে ফেলিছে। মোরাও মেরে দি-খাই। খাবার নেই বলে সোঁদরবনের বাঘ মাছ অবধি খায় শালা। নদীর চরে—বালিয়াড়ি খাঁড়ির মধ্যে কুমীর, কচ্ছপ, সমুদ্দুরে কাঁকড়া, সাগর-বিছে আছে।'

'হঠাৎ যদি বাঘ সামনে পড়ে যায়!'

'ঠিক আছে, ভয় কী!' বললে গহর আলী। 'মার দক্ষিণা রায়—বনবিবী মা বাঁচাবে—মোরা 'মন্তর' জানি। বাঘমামা মোদের এই খেটেকে ভয় করে!'

CENTRAL LIBRARY

কাঁটা খোঁচায় হাত-পা ছিঁড়ল সকলেরই।

এক রকমের সরু নালচে বাঁশগাছ—শিকড় বেয়ে চলেছে মোটা হয়ে। কত বিচিত্র গাছ। হাড়ভাঙা লতাগাছের খোঁচার মতন সাদা ফুল ফুটেছে। পাকা লাল মাকাল ফল ঝুলছে কত!

মাঝে মাঝে খাদ—নরম মাটি—চোরা-বালির দহ। সারা বছরের ঝরাপাতা বর্ষায় ভেসে গেছে—নতুন পাতা ঝরে পড়েছে। মানুষের সাড়া পেয়ে ফড়ফড় করে ডানার শব্দ করে ডাকতে ডাকতে পাখিরা উড়ে চলে যায়। শাল, শোল, বোয়াল, ভেটকি, পোনা, কই-মাগুর—অজস্র মাছ আছে খাঁড়ির মধ্যে।'

'কি কি পাখী আছে এখানে—নাম বল?' কৃষ্ণ শুধোলে।

লক্ষ্মণ বললে, 'বালিহাঁস, জলপিপি, ডাহুক, পানকৌড়ি, শামুক-খোল, মানিক-জোড়, বক, পান-পায়রা, বনমোরগ, হরি-তাল, মাছরাঙা, কাদাখোঁচা—এইসব পাখীই বেশি এখানে। এ-সময় দক্ষিণ মহাসাগর থেকে বিরাট বিরাট পেলিকান রাজহাঁস আসে—সমুদ্দুরের ঢেউয়ে বিরাট ডানা মেলি তীর বেগে তারা ছুটি আসে—কেউটে সাপের পানা যেন ডং তুলি আসে। একটা মারলি ৪।৫ কেজি মাংস হয়। এখন কার্ত্তিক মাসে এসে অরা অরণ্য ছেড়ে ফেলে—আবার শীত পড়লি পরে দক্ষিণ দেশের দিগে চলি যায়। ঐ দেখ দেখ—হরিণের দল কেন উড়ি চলিছে—'আগাশের মাঘের' পানা ঢেউ খেলি খেলি যায়। কখন পা ফেলে দৌড়নোর সময় কেউ তা দেখতি পায় না। তাদের পেছনে বাঘ তাড়া করিছে। সাবধান—চারদিগে লোক হয়ে বাইরের দিগে মুখ করি দাঁড়াও। জঙ্গলে বাঘ তাড়া করলি বুনো বরাহও ছুটে এসে সামনে কিছু পড়লি শালা দাঁতাল শুয়ো মেরে ফেড়ে ফেলি দিবে। ঐ জলের মধ্যে কুমীর শুয়ে আছে—তেড়ে এলে গাছে উঠি পড়বি সবাই।'

মাধুরী বললে, 'সর্বনাশ, আমরা যে-গাছে উঠতে জানি না!'

সেতোরা হাহা করে হাসতে লাগল। ওরা খালি পায়েই চলে-হেঁটে বেড়াচ্ছে—কাঁটা ফুটলে গালাগালি করতে করতে টেনে বার করে ফেলে দিচ্ছে। হাঁটতে হাঁটতে ওরা বিস্তীর্ণ একটা নদীর কিনারে এসে দাঁড়াল। সামনে একটা দ্বীপ। কাঁটাঝোপের ভরা। দুটো লাল নিশান তীরে পোঁতা আছে।

'লাল নিশান কেন ওখানে?' শুধোলে কাবেরী।

গহর বললে, 'ঐ লাঠিটার মাথায় লাল কাপড়ে এক মুঠো চাল আর পয়সা বাঁধা আছে। নিশান হল সাবধান চিহ্ন। দুটো নিশান মানে দুজন লোক এখান থিনে শালা বাঘের প্যাটে 'গ্যাছে'! কাঠুরেরা কাঠ কাটতি আসে, মউলেরা মউ ভাঙতি আসে—তাদের জান গেলি পর ঐরকম নিশান পুঁতি দি-যায়।'

হঠাৎ দেখা গেল কালো কালো শত শত রাজহাঁসের দল যেন ঢেউ ভেঙে উড়ে আসছে সাগরের দিক থেকে। তারা মানুষ দেখে অন্য দিকে সরে জঙ্গলে চলে গেল। ক্যাঁক ক্যাঁক স্বরে দীর্ঘ লয়ে ডাক শোনা যেতে লাগল শুধু তাদের।

বাঁদরগুলো গাছের ডালে লম্ফঝম্প শুরু করেছে দেখে বাউলারী কি যেন বলা-বলি করতে লাগল। খেঁটে কাঁধে তুলে হেঁতালের বনটার দিকে তাকিয়ে রইল তারা।

মাধুরী কৃষ্ণর কানে কানে বললে, ধোৎ! এখানে রোমান্সের গন্ধ মাত্র নেই।'

কৃষ্ণ বললে, 'এই তো রোমান্স! রোমান্টিকতার স্থান অরণ্য সুন্দরবনে নয়। মনে হচ্ছে কোনো বিপদের গন্ধ পেয়েছে বাউলীরা।'

বাঘকে বিভ্রান্ত করে বাঁদররা। ধরা পড়বার লোভ দেখিয়ে মানুষকে বাঁচাতে চায়। পথ ভুলিয়ে অন্যদিকে নিয়ে যেতে চেষ্টা করে। কিন্তু তা না পারলে তারা চিৎকার জোড়ে। ডালে ডালে ছুটতে থাকে।

অতএব এ-দৃশ্যে সাবধান হওয়া দরকার। বাউলীরা তা জানালে। কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর ফেরার নির্দেশ দেয় লক্ষ্মণ সামন্ত। সে এগিয়ে চলে ধীরে ধীরে।

অল্প একটু আসার পর হঠাৎ থমকে দাঁড়ায়। গরুখাড়ির জঙ্গল থেকে একটা বাঘ একেবারে হাত তিরিশ দূরে এগিয়ে আসছে, লোলজিহ্বা বার করে গাল চাটতে চাটতে।

মানুষ দেখে হঠাৎ একবার থমকে দাঁড়াল বাঘটা।

লক্ষ্মণ তাকে লক্ষ্য করে হেঁকে বললে, 'দাঁড়িয়ে যা শালা!'

বাঘটা দাঁড়িয়ে গেল।

লক্ষ্মণ আরো খানিকটা এগিয়ে গেল। মাত্র হাত-বিশেকের ব্যবধান। বাঘটা হ্যা-হ্যা করে গর্জন করতে লক্ষ্মণও অবিকল সেই রকম নকল করে গরজাতে লাগল। তারপর গালাগালি শুরু করলে, 'শালা হারামী, খানকীর বাচ্চা, তোর বাপের মাথা ভেঙেছি, এই খেঁটের ঘায়ে—চুপ শালা, তোর বোনাই হই—চলে যা—মানুষের দেবতা দক্ষিণা রায়, তোর দেবতা কুন শালা?'

দাঁত খিঁচিয়ে উবুতে চাপড় মেরে ভয়ানক হাস্যকর ভঙ্গী করতে লাগল লক্ষ্মণ সামন্ত।

মণীন্দ্র বন্দুক তাক করলে বাউলীরা গুলী করতে নিষেধ করলে।

বাঘটা গোমরাতে গোমরাতে একদিকে চলে গেল। তার কুকুরের মতন ল্যাজ নাড়া দেখে মনে হল বোধহয় সে ভয় পেয়েছে।

কৃষ্ণ-মণীন্দ্র-মাধুরী-কাবেরীর তখন ভয়ে ঘাম গড়াচ্ছে শরীর থেকে, দরদর করে। কান্নাটো গুলগুলে করছে।

বাউলীরা হাসতে লাগল।

কৃষ্ণ মাধুরীর কানে কানে বললে, 'বাঘটার কোনো ঘটনবোধ নেই। হঠাৎ আমাকে আর মণীন্দ্রকে মেরে ফেললে পাষাণ চেহারার বাউলীরা তোমাদের নিয়ে যেতে পারত—তারপর 'বনদেবী' বলে পুজো করত!' হি-হি করে হেসে উঠল হঠাৎ মাধুরী।

মণীন্দ্র চটে উঠল, 'এখন হাসির কি আছে! ভয়ে মরে আমার আত্মারাম খাঁচাছাড়া।'

আবার চলতে শুরু করলে সকলে। দুজন বাউলী মণীন্দ্রদের মাঝখানে রেখে চলতে লাগল।

লক্ষ্মণ বললে, 'একবার আমার বাপ অমনি বাঘের সামনে পড়ে। বাঘটা মানুষ খেয়েছ্যালো এগো। মানিষের মাংস-অক্তের স্বাদ যি বাঘ পায় সি শালা সহজে নড়ে না। ওৎ পাতে। সেই বাঘটা গালাগালি শুনে সরি যায়লো বটে কিন্তুন ফের উল্টো দিগ থিনে এসে লাফ দিয়ে পড়ল। বাপের নাড়ীভুঁড়ি বার করি দিলে। আমি তার গালে খেঁটে মেরে দাঁত মাথা শালা ভেঙে দিনু। বাপকে কাঁধে তুলি বাঘের ল্যাজ ধরি টেনে আনুনু। বাপের প্যাটের নাড়ীটা তাখন আমার পেছনে পেছনে টেনে টেনে চলেছে। গাছপালায় আটকাচ্ছে।'

কাবেরী বললে, 'চলো, পালাই এবার—আর নয় ঢের হয়েছে বাবা! এরকম রিস্ক নেওয়া ঠিক নয়।'

'ওটা শালা কেলো বাঘ দিদি—ভয় নেই!' বললে গহর আলী।

আখড়ায় চলে আসার পর তারা যেন স্বাভাবিক প্রাণ ফিরে পেলে চারজনে। কৌপিন আঁটা বাউলীরা ভাত বসিয়ে গাঁজা টানতে লাগল।

হাঁস-মোরগের মাংস রান্না করে আরামসে খেলে সকলে।

আর একরাত থাকার কথা বললে মণীন্দ্র।

কাবেরী বললে, 'না। আজই চলে যাব।'

অগত্যা। নৌকোয় উঠে তারা ক্যানিং-পোর্টে চলে এল। টাকা নিয়ে বাউলীরা চলে গেল গোসাবার দিকে—তাদের বাড়ি-ঘরে।

'কার্তিক মাসের জোৎস্নাস্নাত সুন্দর-বন যে না দেখেছে তার বাংলাদেশের কিছুই দেখা হয়নি'—বললে কাবেরী।

মণীন্দ্র বললে, 'চলো না ভবে আবার ফিরে যাই।'

কাবেরী বললে, 'ওরে বাপ! নমস্কার হে অরণ্য, সুন্দর, ভীষণ ভয়ঙ্কর!—সুন্দরবন, তোমাকে শতকোটি প্রণাম!'

—আবদুল জব্বার

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

অর্বাচীনের উক্তি

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য যে আজ বিশ্বের সাহিত্য ইতিহাসে এক অসামান্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত একথা সংস্কারমুক্ত বিদগ্ধ সমাজে স্বীকৃত। দীর্ঘকালের ইতিহাস বাংলা সাহিত্যের এবং বাঙালীর আজ যদি কোনো কিছু গর্ব করার মত থাকে, তাহলে তার নাম বাংলা-সাহিত্য। দুই বাংলার লেখকবৃন্দের সমবেত চেষ্টায় বঙ্গ-ভারতীর বিজয়-যাত্রা সৌভাগ্যক্রমে আজো অব্যাহত। ঠিক এই মুহূর্তে কেউ যদি বলে বসেন 'বাংলা-সাহিত্য অপরিণত, একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ব্যতিক্রম, তাও আবার তাঁর রচনা আমাকে উত্যক্ত করে—' তাহলে সেই মন্তব্যটুকু যে নিছক অর্বাচীনের উক্তি এ-ছাড়া আর কি বলার আছে?

অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সাহিত্যের অন্যতম খ্যাতিমান লেখক রাজা রাও এক সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে এই কথাগুলি বলে ফেলেছেন। রাজা রাও দক্ষিণ ভারতের কর্ণাটকে জন্মগ্রহণ করেছেন, লেখাপড়া শিখেছেন প্যারিসের সরবোনে, বর্তমানে টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দু-দর্শন অধ্যাপনা করেন। তাঁর 'কণ্ঠপুরা' নামক উপন্যাসটি ভারতীয় পটভূমিতে রচিত এবং বিদেশে প্রশংসিত। 'দি সার্পেন্ট অ্যাণ্ড রোপ' উপন্যাসটিতেও হিন্দু চিন্তাধারার প্রকাশ আছে তাই লরেন্স ডারেল বলেছেন এই উপন্যাসটির দ্বারা কালের পরিমাপ করা যায়।

সবই উত্তম। আমেরিকার 'টাইম ম্যাগাজিন' রাজা রাও সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন—'এ ফ্যাসিনেটিং নভেলিস্ট'। সুতরাং তিনি একজন মনীষী ব্যক্তি, এবং নানারকম বাণী দেওয়ার অধিকারী।

দিল্লীর সাংবাদিক সুরেশ কোহলী এদেশে আগত বিদেশী সাহিত্যিকদের সঙ্গে মাঝে মাঝে সাক্ষাৎকার করে নানারকম প্রশ্নাদির উত্তর জেনে তা এখানে-ওখানে প্রকাশ করে থাকেন। তাঁর অন্য কোনো পরিচয় আছে কিনা জানি না, তবে এইটুকু জানি তিনি বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে কিছু ওয়াকিবহাল, এবং বুদ্ধদেব বসু, সমর সেন, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতির কবিতা সম্পর্কে মাঝে মাঝে মন্তব্য করে থাকেন তা লক্ষ্য করেছি।

সুরেশ কোহলী রাজা রাও সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে প্রথমেই প্রশ্ন করলেন—

> "What do you think is the future of Indo-English Literature? Don't you think our Universities like many American and British Universities, should take up this literature as a regular course of study and also is it not cynical on our part to look to the West for encouragement even in this field of literature?"

প্রশ্নটি অতিশয় স্পষ্ট। এর উত্তরে কিন্তু রাজা রাও সবিনয়ে বললেন—এ-দেশের বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে তেমন কিছু জানি না। তবে আমার বন্ধুবান্ধব কোনো কোনো জায়গায় আমার বই পাঠ্য করেছেন।

> "I should say Indian Literature in English is still at a very formative stage. So is the case about Indian Literature in other Indian Languages. But we are not talking in terms of any language being superior. I do not know much of Bengali but from the little contact that I have I can say that it is immature, except Tagore. So I don't think even Bengali literature is a developed one".

পাঠক নিশ্চয়ই লক্ষ্য করবেন মূল প্রশ্নের জবাব প্রসঙ্গে বাংলা-সাহিত্য সম্পর্কে অনুদার মন্তব্য করার বিশেষ প্রয়োজন ছিল না। তবুও রাজা রাও সাহেব আকস্মিক ভাবে বাংলা সাহিত্য বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও এমন একটি উক্তি কেন করলেন। ভক্ষণ না করেই পিষ্টকের স্বাদটা কেমন তা বলা যায় না, আগে পিঠে খেতে হয়। রাজা রাও সাহেব নিজেই বলছেন 'ডু নট নো মাচ অব বেঙ্গলী', তেমন বিশেষ কিছুই জানি না কিন্তু 'বাট ফ্রম দি লিটল কনটাক্ট দ্যাট আই হ্যাভ'—এই সামান্য সংযোগটুকু কি ভাবে ঘটেছে তা তিনি ব্যক্ত করেননি। বোধ করি 'বাঙালী ভারতীয়' এই পরিচয় দেওয়ার কালে তিনি রবীন্দ্রনাথের নাম শুনেছেন এবং সেই উত্যক্ত করা কবিটির কাব্যগ্রন্থের অনুবাদ পাঠ করেছেন। কারণ, তিনি বলেছেন—

> "Tagore was certainly a very authentic poet but he bores me. I'm afraid we have yet to produce the post-Tagorean literature which one can say is worthwhile for the Universities to get interested in".

রাজা রাও সাহেবের এই উক্তিটুকু বিশ্লেষণ করলে মনে হয়, তাঁর মনের গহন কোণে ভারতবর্ষীয় ভাষাসমূহের মধ্যে বাংলা ভাষা যে প্রধান এই অবচেতন চিন্তা ছিল তাই কোনো হেতু না থাকলেও তিনি বাংলা ভাষা সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন 'ইভেন বেঙ্গলি লিটারেচার'—অর্থাৎ বাংলা ভাষা যে সর্বোপরি এই চিন্তা তাঁর মনে ছিল, আর সেই কথাটাই স্বতোৎসারিত ভঙ্গীতে প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। তিনি তাই অনুগ্রহ করে বলেছেন 'এক্সেপ্ট টাগোর'—কিন্তু টাগোর একজন 'অথেন্টিক পোয়েট' হলেও তিনি রাজা রাওকে উত্যক্ত করেছেন—'হি বোরস মী'।

রাজা রাও অনুভব করেছেন যে, ঠাকুর-উত্তর সাহিত্য গড়ে তোলা প্রয়োজন ইদানিং।

এই সঙ্গে মনে পড়ছে আরেকটি সাক্ষাৎকারের কথা। এই সাক্ষাৎকারের প্রশ্নকর্তাও সুরেশ কোহলী এবং উত্তর দিয়েছেন বিখ্যাত ফরাসী লেখিকা নাতালী সারোৎ। যিনি সম্প্রতি কলকাতা, দিল্লী প্রভৃতি ঘুরে গেলেন। নাতালী সারোৎ-এর প্রতিটি উত্তরের মধ্যে একটা নতুন চিন্তার সন্ধান পাওয়া গেছে, আর পাওয়া গেছে সেই উদারতার আভাস যা সাহিত্যিককে ঊর্ধ্বলোকে নিয়ে গিয়ে বিশ্ব-মানবের সম্পত্তিতে পরিণত করে।

রাজা রাও সাহেবের এই উক্তির মধ্যে সঙ্কীর্ণতার পরিচয় আছে আর সেই কারণে আমরা ব্যথিত। আজ কেউ যদি বলেন, বাংলা সাহিত্য 'অপরিণত' তাহলে বাঙালীর মনে জ্বালা ক্ষোভ জাগা স্বাভাবিক। বাঙালীর একমাত্র কর্তব্য মুখ টিপে হাসা, অবজ্ঞার হাসি হাসা।

CENTRAL LIBRARY

'টাইম ম্যাগাজিন' বা লরেন্স ডারেল রাজা রাও সাহেবকে যেমন সার্টিফিকেট দিয়েছেন এমন অজস্র সার্টিফিকেট বাংলা-সাহিত্য ও বাঙালী সাহিত্যিকরা পেয়ে আসছেন দীর্ঘকাল ধরে।

বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ এই দুই লেখক ভারতের বাইরে যথেষ্ট সমাদর লাভ করেছেন একথা সর্বজনবিদিত। পূর্ব-য়ুরোপের অনেকগুলি দেশে রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতির গ্রন্থাবলী নতুন করে অনুবাদ করানো হয়েছে। এ-ছাড়া, শরৎচন্দ্র এবং তাঁর পরবর্তীকালের লেখক বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায় ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য কর্মের সংগেও অন্য বিশ্বের পরিচয় ঘটেছে। রবীন্দ্রোত্তর বাঙালী কবি কাজী নজরুল ইসলাম, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, সমর সেন, জীবনানন্দ দাশ, অমিয় চক্রবর্তী প্রভৃতি কবিবৃন্দের অজস্র কবিতা ইংরাজী ভাষায় অনূদিত হয়েছে এবং যথোচিত সমাদর লাভ করেছে।

বাংলা দেশের ছোট গল্পকারগণ যথেষ্ট শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। যাঁরা প্রবীণ এবং আজো আমাদের মধ্যে আছেন তাঁদের অনেক গল্প বিদেশী ভাষায় অনূদিত হয়েছে। যাঁরা অপেক্ষাকৃত নবীন অথচ শক্তিমান তাঁদের রচনাবলীর যথেষ্ট অনুবাদ এখনও হয়ত হয়নি, কিন্তু রবীন্দ্রোত্তর সাম্প্রতিক সাহিত্যিকরাও যে শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন তাতে বাঙালী মাত্রেরই গৌরব বোধ করার কারণ আছে।

এমন সময় কেউ যদি কিছু না জেনেই বলেন 'বাংলা সাহিত্য অপরিণত', তাহলে সেই উক্তি অর্বাচীনের উক্তি বলেই হেসে উড়িয়ে দিতে হবে। এই ব্যাপারের মধ্যে যে সংকীর্ণ প্রাদেশিক মনোভাব প্রচ্ছন্ন আছে একথা বলা বাহুল্য।

—অভয়ঙ্কর

RAJA RAO: The Man and the Mask: (An Interview) By Suresh Kohli: (Times weekly dated September 13, 1970).

সাহিত্যের খবর

আফ্রো-এশীয় সম্মেলনে বাংলার প্রতিনিধি ।। আগামী ১৬ নভেম্বর থেকে দিল্লীতে চতুর্থ আন্তর্জাতিক আফ্রো-এশীয় লেখক সম্মেলন আরম্ভ হচ্ছে। সম্প্রতি দিল্লীতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে প্রস্তুতি কমিটির পক্ষ থেকে শ্রীমুলকরাজ আনন্দ জানিয়েছেন যে, এই সম্মেলনে এশিয়া ও আফ্রিকা থেকে প্রায় চারশত লেখক যোগ দেবেন। এতে বিভিন্ন আলোচনা ছাড়াও চারটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে।

জানা গেছে পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরা থেকে প্রায় ত্রিশজন লেখক এই সম্মেলনে যোগ দেবেন। পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধিদের মধ্যে আছেন সর্বশ্রী প্রেমেন্দ্র মিত্র, মনোজ বসু, দক্ষিণারঞ্জন বসু, মণীন্দ্র রায়, সন্তোষ মুখোপাধ্যায়, চিন্মোহন সেহানবীশ, প্রফুল্ল রায়, নির্মল সেন, ধনঞ্জয় দাস, প্রসূন বসু, তরুণ সান্যাল, সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপ্লব মাজি, আশিস সান্যাল এবং আরো কয়েকজন।

রো-রো-রো ।। নাম শুনে ঘাবড়ে যাবেন না। আসলে এ হল জার্মানীর একটি জনপ্রিয় প্রকাশন সংস্থার চিহ্ন। আসল নাম: 'রোভোল্টস্, রোটেশানস্ রোমানে ইন ক্রাইনফরম্যাট'—অর্থাৎ রোভোল্টের ক্ষুদ্রাকৃতির রোটেশন উপন্যাস। পকেট বই সিরিজে এর প্রথম বই বেরিয়েছিল আজ থেকে কুড়ি বছর আগে। এই পরিকল্পনার সূচনা করেছিলেন আর্ণস্ট রোভোল্ট। ১৯৬০ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। যাই হোক—এই 'রো-রো-রো' চিহ্নিত বই জার্মানীতে এখন খুবই জনপ্রিয়। এর কারণ, এই সংস্থা কম পয়সায় জনগণকে ভাল সাহিত্য পড়বার একটা সুযোগ এনে দিয়েছে। সম্প্রতি এক বিশেষ অনুষ্ঠানে এই সংস্থার বিশ বছর পূর্তি উৎসব পালন করা হয়।

জোনিস পুরস্কার পেলেন জাভার গৌড় ।। সোভিয়েত ইউনিয়নের কিয়েভ বিশ্ববিদ্যালয় মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রী ডি জাভার গৌড়কে জোনিস পুরস্কারে সম্মানিত করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিশেষ অনুষ্ঠানে এই কথা ঘোষণা করা হয়। শ্রীগৌড় কানাড়া ভাষায় টলস্টয়ের যে অনুবাদ করেছেন, তার জন্যই এই পুরস্কার প্রদান করা হয়। সম্প্রতি শ্রীগৌড় সোভিয়েত রাশিয়া ভ্রমণ করছেন। তাঁর এই সম্মান লাভে ভারতীয় সাহিত্য প্রেমিক মাত্রেই আনন্দিত হবেন বলে আশা করি।

একটি সুইডিশ উপন্যাস ।। আইভার লো-জোহানসন সুইডিশ সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট নাম। বর্তমানে তাঁর বয়স ৬৭ বৎসর। তাঁর প্রথম বই প্রকাশিত হয়েছিল ১৯০২ সালে। এরপর থেকে এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে তাঁর ২২টি গ্রন্থ। সম্প্রতি স্টকহম থেকে বেরিয়েছে 'মার্তারেন' নামে একটি ছোট গল্প সংগ্রহ। এই গ্রন্থে সংকলিত গল্পগুলির মধ্যে একদিক থেকে একটা মিল আছে। মিলটা হল, গল্পগুলি রচিত হয়েছে শহিদদের নিয়ে। প্রথম গল্পটি রচিত হয়েছে প্রাচীন রোমে ধর্মযুদ্ধে নিহত ক্রিস্টিনাকে নিয়ে। অন্যান্য গল্পগুলিও অনুরূপ চরিত্রের মানুষকে নিয়ে। তিনি দেখাতে চেয়েছেন, এই সব শহীদরা মৃত্যুকে বরণ করেছেন প্রধানতঃ তাঁদের বিশ্বাসের জন্য। ফলে তাঁর লেখা গল্পগুলি সেই পুরাতনের ভিত্তি ত্যাগ করে আধুনিক রূপ লাভ করে। কিন্তু এত মুন্সীয়ানা সত্ত্বেও গল্পের মধ্যে কিন্তু মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ তেমন জমাট বাঁধেনি।

অবজ্ঞার পরিণাম ।। ম্যাক হাইম্যান আমেরিকান সাহিত্যের একটি অবহেলিত নাম। পাঠকের কাছ থেকে পেয়েছেন কেবল অবহেলা আর বোধ হয় তাই পরিণামে একটা অনিশ্চিত অস্থিরতার মধ্যে মাত্র ৪০ বৎসর বয়সে ১৯৬০ সালে হৃদক্রিয়া বন্ধের ফলে মৃত্যুবরণ করেন। কি এমন সাহিত্য রচনা করেছিলেন তিনি, যাতে পাঠক তাঁকে মনে রাখতে পারে? 'নো টাইম ফর সার্জেন্ট' নামে একটি উপন্যাস, তিনটি গল্প এবং একটি প্রবন্ধ—আর মৃত্যুর পর বেরিয়েছে 'টেক নাও দাই সান' নামে আর একটি উপন্যাস। এত স্বল্প পরিমাণ রচনা এবং তাও তেমন অত্যাশ্চর্য হবার মত নয়—সুতরাং কেমন করে আর পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন?

সম্প্রতি বেরিয়েছে তাঁর চিঠিপত্রের একটি সংকলন। তাঁর বইয়ের চেয়ে এর আকর্ষণ পাঠকের কাছে অনেক বেশি এবং এর মধ্যেই বইটি বেশ হৈ-চৈ সৃষ্টি করেছে। চিঠিগুলির সম্পাদনা করেছেন উইলিয়ম ব্ল্যাকবার্ণ এবং ভূমিকা লিখেছেন ম্যাকস স্টীল। এই চিঠিগুলির মধ্যে ম্যাক হাইম্যানের ব্যক্তি জীবনের অনেক খবর ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। চিঠিগুলি পড়লে দেখা যায়, সাহিত্যই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র ধ্যান ধারণা। তিনি যা রচনা করতে চেয়েছিলেন তা তিনি কখনই পারেন নি। লিখতে বসে মনে হয়েছে, ঠিক সে রকম করে লেখা যাচ্ছে না। ডিউক বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৪৬ সালে ম্যাক হাইম্যান ছাত্র হিসেবে পড়াশুনা করছিলেন। সেই সময়ে তাঁর সহপাঠী যাঁরা ছিলেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই লেখক হিসেবে আজ প্রতিষ্ঠিত। যেমন—উইলিয়ম স্টাইরন, রেড চাপেল, এ্যানী টেলার প্রমুখ। কিন্তু সে সময়ে তাঁর লেখাই ছিল সকলের চেয়ে চিত্তাকর্ষক। বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডী পেরিয়ে তিনি কেবলই ঘুরে বেড়িয়েছেন জীবনের সত্য সন্ধানে। কিন্তু প্রতিক্ষেত্রেই তাঁর সেই সন্ধান ব্যর্থ হয়েছে। নিউ ইয়র্কের জীবন তাঁকে সান্ত্বনা দেয়নি। দক্ষিণের দেশগুলিও দেয়নি। হিরোশিমার উপর বোমা বর্ষণ তাঁকে সন্ত্রস্ত করে তুলেছে। কোথাও তিনি শান্তি পাননি। এই বেদনাকর জটিল অন্তরের কথা

এই চিঠিগুলির প্রতি বর্ণে সঞ্চারিত হয়েছে। প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক ম্যাক্স ফ্রিশ ভূমিকায় যথার্থই বলেছেন : এই চিঠিগুলির মধ্যে পাওয়া যাবে একজন লেখকের নিভৃত মননের কথা আর তাঁর সাক্ষাৎকারের শিল্প মানসের পরিচয়।"

রেকর্ডে বাংলা কবিতা ।। বছর আড়াই আগে যখন আধুনিক বাংলা কবিতার লং প্লেয়িং রেকর্ড বেরিয়েছিল তখন সকলেই অভিনন্দন জানিয়েছিলেন সেই প্রচেষ্টাকে। তারপরও অবশ্য কবিকণ্ঠে আধুনিক কবিতার এবং অন্য কণ্ঠেও আধুনিক কবিতার রেকর্ড বেরিয়েছে। কিন্তু সেগুলি হয়েছিল বিক্ষিপ্তভাবে। শোনা যাচ্ছে সম্প্রতি গ্রামোফোন কোম্পানী এ ব্যাপারে আবার অগ্রণী হয়েছেন। তাঁদের এই প্রচেষ্টাকে সকলেই অভিনন্দন জানাবেন আশা করি। কারণ, আধুনিক কবিতাকে জনপ্রিয় করবার এ এক সার্থকতম প্রচেষ্টা। তবে এই ধরনের প্রচেষ্টা যতদূর সম্ভব প্রাতিষ্ঠানিকতামুক্ত হওয়া প্রয়োজন। তাহলে তার প্রভাব পাঠক মহলে দীর্ঘস্থায়ী ও গভীরতর হবে তাছাড়া ব্যবসায়িক দিক দিয়েও এতে সম্ভাবনা বেশি।

—চার্বাক

নতুন বই

রবীন্দ্রনাথের শিশুসাহিত্য : মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার। ৩৮, বিধান সরণী, কলকাতা—৬। দাম : পাঁচ টাকা।

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় যে শিশু-সাহিত্য সম্পর্কে বিশেষ উৎসাহী, তা তাঁর ইতিপূর্বে প্রকাশিত শিশুদের জন্য কয়েকটি মৌলিক গ্রন্থ ও আলোচনাই প্রমাণ করে। সাহিত্যে শিশুমন এবং শিশুদের সাহিত্য যে তাঁকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে, 'রবীন্দ্রনাথের শিশুসাহিত্য' গ্রন্থটির প্রকাশেই তার আর একটি প্রমাণ চিহ্নিত হল। বস্তুত আলোচ্য গ্রন্থটি শুধুমাত্র রবীন্দ্রনাথের স্বতন্ত্র একটি ব্যক্তিত্বের অভিনবত্ব বাখানের প্রয়াস হয়েই থাকেনি, এর মধ্য দিয়ে বাংলা শিশুসাহিত্যের আদিতম কথা, তার প্রবাহ, শিশুমনের বিভিন্ন স্তর ইত্যাদি বহু প্রসঙ্গকে স্পষ্ট করেছে।

আলোচ্য গ্রন্থটির প্রবন্ধগুলি রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে রচিত। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হলেও প্রকাশের বিচ্ছিন্নতা গ্রন্থে সংকলনের বাধা হয়নি। শিশু-সাহিত্যের রবীন্দ্র-ব্যক্তিত্বকে সামগ্রিকভাবে ধরা যায়। প্রবন্ধগুলিকে সাজানোর মধ্যে এবং আলোচনার দ্বারা স্পষ্টত প্রবন্ধকারের গবেষক-বৈশিষ্ট্য প্রমাণ করে। রবীন্দ্রনাথের সহজ পাঠ, সে খাপছাড়া, ছড়া ইত্যাদির আলোচনাগুলি তাঁর নাটক, কাব্য, গদ্য-গ্রন্থের পাশাপাশি রেখেই করেছেন। এতে প্রবন্ধলেখকের মুন্সিয়ানা প্রশংসনীয়। লেখকের আলোচনার ভাষা ও বহু মন্তব্য অভিনন্দনযোগ্য। গ্রন্থটির প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণে মুদ্রকের অভিনবত্ব আছে।

শিল্পিত স্বভাব : অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার। ৩৮, বিধান সরণী, কলকাতা—৬। মূল্য : ৭-৫০।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত মূলত কবি হলেও তাঁর প্রবন্ধ ও গদ্যভাষা স্বভাব কবিতার আবেগধর্মিতা থেকে অনেকাংশে বিমুক্ত। বক্তব্য, যুক্তি-পরম্পরা, ভাষারীতি, শব্দ ইত্যাদির ব্যবহারে এবং স্থায়ী সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে আলোচ্য লেখক স্বতন্ত্র মননের পরিচয় দিয়েছেন।

'শিল্পিত স্বভাব' গ্রন্থের 'প্রসঙ্গত' অংশে লেখক জানিয়েছেন—'প্রবন্ধ রচনা লিরিকের মতোই কোনো একটি মুহূর্তের দ্বারা উদ্বুদ্ধ। তা সত্ত্বেও লিরিকে মুহূর্তই যখন প্রধান শর্ত, গদ্য রচনায় তাকে বৃহত্তর পটভূমির সঙ্গে সন্নিস্থাপন করতেই হয়।' আলোচ্য লেখক সেই সন্নিস্থাপনের নির্মিতিতে লক্ষ্য রেখেছেন প্রতিটি প্রবন্ধেই। প্রবন্ধগুলি বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রন্থে সংকলিত হওয়ায় প্রবন্ধকারের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী স্পষ্ট হয়।

বস্তুত গ্রন্থটির অন্যতম বিভাব হল, 'সৃষ্টিধর্মী মর্চেটানা চরিত্র মানসের অভিঘাত ও রূপান্তরের সংগ্রামী সমস্যাই' এবং সেক্ষেত্রে লেখকের রচনাগুলির তাৎপর্য 'কয়েকটি ধ্রুব বিষয় ও মুহূর্তের আস্বাদন এবং উদ্‌যাপন।' 'সন্নিধানের সাধক: ব্রজেন্দ্রনাথ শীল', 'উপেন্দ্রকিশোর' 'ভক্তিরসের কবিতা' 'প্রোফুমাযুক্ত' ইত্যাদি প্রবন্ধ তা প্রমাণ করে। 'সুন্দর ও কার্ল মার্কস' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ও মার্কসের দৃষ্টিভঙ্গীর তুলনামূলক আলোচনাটি বিশেষ অভিনবত্বের দাবী করে। অন্যান্য প্রবন্ধগুলিতে ব্লেক, শেকসপীয়ার, অবনীন্দ্রনাথ, শিলার, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখকে নতুন করে ভাবতে ও বুঝতে হয়। প্রবন্ধগুলিতে লেখক যে ভাষারীতি প্রয়োগ করেছেন, যে সমস্ত শব্দ অবলীলায় ব্যবহার করেছেন, তা প্রাবন্ধিক অলোকরঞ্জনের নিজস্ব এবং বিশিষ্টতাপূর্ণ গ্রন্থটি বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য।

সংকলন ও পত্র-পত্রিকা

মহর্ষি লেনিন : সম্পাদক : সুপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়। উত্তরপাড়া অমরেন্দ্র বিদ্যাপীঠের বার্ষিক মুখপত্র।

লেনিন শতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত একটি বিদ্যালয়ের মুখপত্র যে এমন সুনির্বাচিত রচনা প্রকাশ করতে পারে—তা যেন ভাবাই যায় না। গভীর দায়িত্ববোধের সঙ্গে সম্পাদক লেখা নির্বাচন করেছেন। লিখেছেন হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সুমন্ত্র চট্টোপাধ্যায়, দাশরথি দাস, দুর্গাশংকর তুমার, অসিতকুমার সরকার, অনাদিনাথ সরকার, নাদেজদা ক্রুপস্কায়া, গেওর্গি দিমিত্রভ, মার্কসিম গোর্কি এবং আরো অনেক। বিদেশী লেখাগুলো স্বচ্ছন্দতই অনুবাদ। প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা চমৎকার।

ত্রিবৃত্ত : সম্পাদক মানিক চক্রবর্তী, অরবিন্দ ভট্টাচার্য, বিমল দেব। মায়া ভাণ্ডার, পোঃ কৈলাশহর, ত্রিপুরা। পঞ্চাশ পয়সা।

পূর্ব প্রান্তের ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত কবিতা-প্রধান এই সাহিত্যপত্রটি আধুনিক মননশীলতায় পাঠককে আকর্ষণ করবে। লিখেছেন—গোপাল ভৌমিক, ফণিভূষণ আচার্য, কমলেশ দেব, বিজিতকুমার ভট্টাচার্য, সুধীরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী, অরবিন্দ ভট্টাচার্য, পীযূষ রাউত, মানিক চক্রবর্তী এবং আরো অনেকে।

সবিনয় নিবেদন,

সুস্থ ও জীবনধর্মী সাহিত্যের সপক্ষে আমাদের প্রকাশিত গ্রন্থগুলি দেখেছেন কী? পুস্তক বিক্রেতা ও পাঠাগারকে শতকরা ২৫% কমিশন দিয়ে থাকি। ভি. পি. পি-তে বই সরবরাহ করা হয়। ডাক খরচ আংশিক আমাদের।

নিবেদক
শান্তি আচার্য
কর্মাধ্যক্ষ, শুকসারী

আজ কাল পরশু/মিহির আচার্য ৫.০০
পূর্ব বাঙলার কবিতা/মিহির আচার্য সম্পাদিত ৪.০০
পূর্ব বাঙলার গল্প সংগ্রহ/মিহির আচার্য সম্পাদিত ৫.০০
ভিয়েতনামের কবিতা/পল্লব সেনগুপ্ত সম্পাদিত ৩.০০
মত বিতর্কী/আশিস সেনগুপ্ত ২.০০
ব্যালেন, আমার ব্যালেন/কৃষ্ণ ধর সম্পাদিত ৮.০০

॥ শুকসারী প্রকাশক ॥

১৭২।৩৩ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলিকাতা-১৪

CENTRAL LIBRARY

শারদ সাহিত্য পরিক্রমা

কবিতা

বাংলা আধুনিক কবিতা সম্পর্কে এই সেদিন পর্যন্ত দুর্বোধ্যতার অভিযোগ ছিল। এখন সুখের বিষয়, সে অভিযোগের কথা তেমন আর শোনা যায় না। তার কারণ এই হতে পারে যে, আধুনিক কবিতা পড়বার এবং বুঝবার শক্তি পাঠকদের বৃদ্ধি পেয়েছে অথবা কবিরাই এ-ব্যাপারে সচেতন হয়েছেন। আমাদের মনে হয়, দুটোই সত্য। সাম্প্রতিককালে কবি ও কবিতা পাঠকের মধ্যে বোঝাপড়ার ভাব বৃদ্ধি পেয়েছে। ষাটের দশকে কবিতার যে উল্লেখযোগ্য সন্ধি ঘটেছে তার অন্যতম হেতুও এখানেই সন্ধান করতে হবে। এ-বারের শারদীয় পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত কবিতার সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ করলে বাংলা কবিতার অধুনা জনপ্রিয়তার হেতু স্পষ্টতর হবে।

যে-সময়ের মধ্য দিয়ে এ-কালে আমরা জীবনযাত্রা নির্বাহ করে চলেছি তার স্বরূপ—সমস্যা সংঘাত, আর্থ-রাজনৈতিক আলোড়ন, দারিদ্র্য বেকারী, মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্তের জীবন-সংগ্রাম, অরাজকতা শক্তির সংঘর্ষ এবং সর্বশ্রেণীর সাধারণ মানুষের বাঁচার কথা এবারের কবিতায় ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে। এই প্রবণতার শুরু গত দশক থেকেই এবং সমস্ত কবিতা যাঁরা পড়েন সেই সাধারণ পাঠক পরিচিত জীবনযাত্রার প্রতিরূপ কবিতার মাধ্যমে পেয়ে খুশি হয়েছেন। খুবই বিস্ময়ের কথা, সমকালীন জীবন-ভাবনা উপন্যাসের ক্ষেত্রে আশানুরূপ ছাপ ফেলতে না পারলেও ছোটগল্প এবং কবিতার ক্ষেত্রে তার স্বাক্ষর অত্যন্ত স্পষ্ট। এবারের প্রবীণ এবং নবীন বহু কবির কবিতায় আমরা এই সময়ের ভাবনা চিন্তা সমস্যা সংকটের ছবি দেখেছি। কিছুসংখ্যক কবি অবশ্যই যথারীতি আত্মমগ্ন, মন্থর; অনেকে রোমান্টিক প্রেমানুভূতির লিরিক লিখেছেন, বিশুদ্ধ কাব্যিক অনুভবের ঐতিহ্য এ-সময়েও বিস্তৃত, কেউ কেউ বীট-হাংরি প্রজন্মের ধারাও বহন করছেন। অদল বদল কিছু ঘটেছে বটে, সেটা কবি বিশেষের বিচিত্র মুডের ব্যাপার। সাধারণভাবে এবারের কবিতায় মোটামুটি বৈশিষ্ট্য এই রকমই।

কেবল কবিতার পত্রিকাই এবার বহু; কোলকাতার, মফস্বলের বাংলার বাইরের অনেক কবিতার কাগজ, লিটল ম্যাগাজিন আমাদের হাতে এসেছে। সেই সঙ্গে অগণিত প্রবীণ-নবীন কবির বিচিত্র কাব্য-ভাবনা।

একদা সমাজের তথাকথিত অন্ত্যজ ব্রাত্য মানুষ—কামার কুমোর মুটে মজুর বা ছুতোরের জীবনে যে অকৃত্রিম শরিক হয়ে রয়ে তাঁর 'পাতার নেশা' নিয়ে এসেছিলেন এবং যিনি দীর্ঘ চার দশক ধরে অনলস-ভাবে জীবনের পক্ষে লিখে যাচ্ছেন তিনি কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র। আর্ট-ফরমের নানা পরীক্ষা করেছেন তিনি, কিন্তু তাঁর শিল্প-চেতনা ও জীবন-দর্শন মানুষের সুখ দুঃখ আর চাওয়া পাওয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে দৃঢ় সত্রে বিধৃত। কবির সূর্য-সন্ধান মানুষের প্রতি আন্তরিক আস্থায় উদ্ভাসিত। 'উদ্ভাসন' (আন্তর্জাতিক) কবিতায় তিনি বলেছেন—

সূর্য খুঁজি কোথায়?

... ...

খুঁজি এই মানুষের মধ্যে
গহন পরম অনাদি সূর্য।

প্রেমেন্দ্র মিত্র এবার পরিচয়, বৈতানিক, রাজধানী, একক, অমৃত, সাপ্তাহিক বসুমতী প্রভৃতি বহু পত্রিকায় কবিতা লিখেছেন। তিন যুদ্ধের অবসরের সময়ের

পর্যবেক্ষক

মুখোমুখি বসে হিসাব নিকাশ করার চিত্র 'সময়' (বৈতানিক)। সময় এখন হাসা-হাসি করে। 'তা করুক। যাকটুকু শুধু দিক জীবনকে করতে চাওয়ার সাহস আর শান্তির।' সময় অন্যভাবে এ-কালের গুরুতর ঘটনা বোমা বিস্ফোরণের শব্দে গতিশীল: 'বিস্ফোরণ' (পরিচয়) কবিতায়—

সময়! সময়!
কত বিস্ফোরণ চাই
এ প্রাণের পরিসর একটু বাড়াবার?

প্রবীণ কবি বিষ্ণু দে-কেও আমরা পেয়েছি সমাজ-মানসের একনিষ্ঠ রূপকার হিসাবে। দীর্ঘকাল কবিতা লিখছেন তিনি। আর বয়স তাঁর মনে কোন শৈথিল্য আনতে পারে নি। তার প্রমাণ, এবার কবিতা রচনাতে যে কোন তরুণ কবিকেও হার মানিয়েছেন তিনি। অমৃত, পরিচয়, সীমান্ত, সারস্বত, আন্তর্জাতিক, আনন্দ-বাজার, সাহিত্যপত্র, যুগান্তর কালান্তর, অনুক্ত প্রভৃতি বহু পত্র-পত্রিকায় লিখেছেন। লেনিন শতবর্ষে এবার উল্লেখযোগ্য বিষ্ণু দের লেনিন প্রশস্তিমূলক কবিতা গুচ্ছ। সাধারণ মানুষ প্রত্যেকেই বিরাট কর্মবীর রাষ্ট্রনেতা মানবিক গুণে গুণান্বিত লেনিনের কথা ভাবতে ভাবতে লেনিনের স্বপ্ন সাধে পৌঁছে যাবে—'শুনেছি যে লেনিনেরও সাধ ছিল একদিন সকলেই হয়ে যাবে শতায়ু লেনিন।' (সারস্বত)। তিনি অমৃত, পরিচয় প্রভৃতি পত্রিকাতেও লেনিন বিষয়ক কবিতা লিখেছেন।

এ-সময়ের শ্বাসরুদ্ধকারী অস্তিত্ব রক্ষার প্রশ্ন কবি বিষ্ণু দে-কে ভাবিত করে। সহজ লৌকিক ভাষা-শব্দে সে কথা বলতে তিনি সহজতর—'সাধো সাধে' (আনন্দবাজার) কবিতায়—

ছোট ঘর, অনেক মানুষ,
গাছ ঘাস শুষে খাক ইঁট,
হাওয়া কম, আলো ক্ষীয়মাণ
দিনে টানে নিশি-পাওয়া গিট।

এই অবস্থায় নারী 'উদ্‌ভ্রান্ত ম্রিয়মাণ' এবং পুরুষেরা 'উম্মায়ু পৌরুষ।' অথচ বাঁচার ইচ্ছায় আমরা সকলেই তৎপর। কবি 'বক্তের অবাক শক্তি' (কালান্তর) কবিতায় লিখেছেন—

আমরাও মানুষেরা বেঁচে থাকি
শ্যামাঙ্গীর প্রাণের পিয়াসে,
যেমন সবুজ ধান হাওয়ায় হাওয়ায়
দোলে মেঘের উল্লাসে,
যেমন ঘাসের ফুল বর্ণময়
অমরতা ছড়ায় শিরায়।

প্রবীণ আর যাঁরা উল্লেখযোগ্য কবিতা এবার লিখেছেন, তাঁদের মধ্যে বিমলচন্দ্র ঘোষ (পরিচয়, আন্তর্জাতিক, নব কল্লোল), অরুণ মিত্র (অমৃত, সারস্বত, চতুষ্কোণ), দিনেশ দাস (অমৃত, দেশ, রাজধানী), দক্ষিণারঞ্জন বসু (অন্তর্জাতিক, পরিচয়) প্রমুখ এই সময়কে তাঁদের কবিতায় ধরার চেষ্টা করেছেন। আমাদের এই অস্থির সামাজিক পটভূমিকায় বিমলচন্দ্র ঘোষের 'যুগ সঙ্কট' (আন্তর্জাতিক) কবি-মনের দ্বিধা-দ্বন্দ্বকেই ব্যক্ত করেছে। দীর্ঘকাল ধরে জীবনের অন্তার্থক ভাবনাই যাঁর কবিতার প্রাণ, তিনি এখন লিখছেন, 'আমরা কি লিখব আজ?' কেন এই দ্বিধা। অরুণ মিত্র সূর্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে: সেখানে 'সন্তানসন্ততির মুখ আর অগণ্য দোসরের পাশাপাশি' তাঁরা কবির 'মমতার সংলগ্ন' সেখানে কোনো আশা কখনো মরে না।' (সারস্বত)। অন্যত্র লিখেছেন, 'আমার গর্ব ছিল এক প্রকাণ্ড সূর্যের, খণ্ড প্রস্তরের, আসমুদ্র নদীর স্রোতের (চতু-ষ্কোণ)। 'কাস্তে' 'ভুখ মিছিলের' কবি দীনেশ দাস 'আমার সেই স্বপ্নের বীজটি

কেউ ফিরিয়ে দিতে পারে?' (অমৃত)-তে কম্পিত স্মৃতিজীবী। দক্ষিণারঞ্জন বসু পেছনে ফিরে স্মৃতিতে কল্পনাতে পদ্মাকে গঙ্গাকে দেখেছেন—'পদ্মাকে গঙ্গাকে আমি কোনোদিনই ভুলবো না।' কেননা—'পদ্মার বাতাসে প্রাণে অসার আনন্দের ঝড় ওঠে। গঙ্গার হাওয়ায় আমি জীবনের অমৃত গান শুনি' (আন্তর্জাতিক)। 'কালো পৃথিবীর মানুষ' (পরিচয়) কবিতায় দুনিয়ার শোষিত মানুষ, বিশেষত আফ্রিকার সেই কালো মানুষটি/আমেরিকার সেই নিগ্রো মেয়েটির জন্য কবি-মনের আলোড়ন দেখা যায়। এই আলোড়ন নিগৃহীত মানবাত্মার প্রতি গভীর ভালবাসারই প্রকাশ।

দ্বিতীয় যুদ্ধকালে চরম অর্থনৈতিক সংকট এবং সামাজিক বিপর্যয় প্রচলিত সমস্ত ধ্যান-ধারণার মূলে যে আঘাত হানল, তারই পটভূমিকায় কবিতার ক্ষেত্রে যাদের আবির্ভাব তাঁদের মধ্যে আজও কবিতা রচনায় অনলস মণীন্দ্র রায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, সুভাষ বসু প্রমুখ কবিগণ।

এ-সময়ের সুস্থ সমাজবোধ এবং মানুষের প্রতি অসীম বিশ্বাস ও ভালবাসার একনিষ্ঠ রূপকার হিসাবে মণীন্দ্র রায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ-বৎসরের শারদ সংখ্যায় কয়েকটি দীর্ঘ কবিতাসহ বহু পত্র-পত্রিকায় লিখেছেন তিনি। 'হতে পারে না' (অমৃত) যন্ত্রের অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে প্রত্যাশার কবিতা। 'জীবন/হারাবে বাগিচে বাঁজা তেপান্তরের এই?/—না, হতে পারে না, হতে পারে না/...না!' মণীন্দ্র রায়ের কাছে কবিতা—

লাঙলে ওল্টানো মাটি,
রোদ্দুরের তাপ বুকে নিয়ে
বীজ রোপনের মতো গড়ে প্রজনন,
......(পরিচয়)

'স্বাধীন কিশোর' (বেতার জগৎ) এবং 'মানুষ মানুষ' (যুগান্তর) এবারের দুটি উল্লেখযোগ্য দীর্ঘ কবিতা। এ-জাতীয় কবিতা একমাত্র মণীন্দ্র রায়ই লিখেছেন। শিশু ও কিশোরের মনোজগৎ ও তার চতুঃপার্শ্বস্থ কল্পনা-বাস্তবতার কাহিনী, স্বপ্নে-ঘেরা, রহস্যময় (স্বাধীন কিশোর), রূপসী বাংলার একটা শাশ্বত জীবন্ত ছবি বাস্তব মানসিকতার বাঙ্ময়। 'মানুষ মানুষ' কর্ম ও কল্পনার সম্মিলিত পৃথিবী। এই কবিতা দুটিতে কবি-হৃদয় স্মৃতি-বিস্মৃতিতে, বিস্তৃত কল্পনায়, রহস্যবোধে, বেদনায় আশায় তীব্র আলোড়িত।

বাংলার প্রিয় কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় এবার কমই লিখেছেন বলতে হয়। 'পদাতিকের' কবি পরবর্তী জীবনের কবিতা শিল্পরূপ নিয়ে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা করছেন। এবারের দেশ, কালান্তরে দুটি ভাল কবিতা পেয়েছি। বিশেষ করে দেশের কবিতাটি খুবই ভালো। তবু বলব, সুভাষবাবু অন্যত্র আমাদের প্রত্যাশা পূরণ করেন নি। 'সফরীতে (বেতার জগৎ) মাট পৌরে ভঙ্গী জটিল ভাব, ঈষৎ বাঙ্গ —সবাই আছে সাঁতা, কিন্তু সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাছে প্রত্যাশা আমাদের অনেক বেশি। 'হাত বাড়িয়ে রেখেছি' (কালান্তর)-তে 'শুধুই ঘুরপাক', 'মাথা ঠেকে যাওয়া' বা 'সংগ্রামের আরেক নাম যেখানে নিজেকে ভাঙা', তৃপ্ত করে আমাদের।

কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ খুবই স্পষ্ট। আমাদের এ-সময়ের ভাবনা-চিন্তায় সকলেই অগ্নি-মূর্তি হবেন এ প্রত্যাশা করা যায় না। কেবল সেজন্য কেউ আক্রমণের লক্ষ্য হবেন, তাও না হয় স্বীকার করা গেল; কিন্তু সেটা সর্বদাই রূপায়িত হবে বাঙ্গ কবিতার মাধ্যমে—এটাই কেমন যেন একঘেয়ে লাগে।

বীরেন্দ্রবাবুর 'প্যারি কমিউন,' 'বক্তের ভিতরে' (গণবার্তা) বা 'ক্রুশবিদ্ধ মানুষের জন্য' (পরিচয়) বা 'তিনি কি শুধু' (কালান্তর) প্রভৃতি স্যাটায়ারের মধ্যে এ-কালের মানুষের কোন প্রত্যাশা পূর্ণ হবে।

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় এ-সময়ের তর-তাজা ঘটনা, যেমন অবিশ্বাস শত্রুতা, শরিকী সংঘর্ষ ও রাজনৈতিক অস্থিরতার উপর কবিতা লিখেছেন। শুধু আজ ঘরে-বাইরে, শুধু নিজের অন্তঃপুরে—

তারপর গলির মোড়ে ভাইকে ভাই-হুরির
কাজকের বন্দুকে আজ বোমা—
সব জিন্দাবাদ সব গলাগলি বন্দুকের
মুখে আসিক্ত বারুদ

এ-জাতীয় বস্তু-মুখ্য সাম্প্রতিক ঘটনা নিয়ে কবিতা লেখার ঝুঁকি অনেক। মঙ্গলাচরণ অবশ্য খুব সাবধানে অগ্রসর হয়েছেন।

'আজ ভালোবেসে কথা বলবার তেমন প্রেমিক কোথাই নেই' 'ভালোবাসার কথা' (সাপ্তাহিক বসুমতী) লিখেছেন কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত। 'ভীষণ সময়' (লেখা ও রেখা) অন্তর্মুখী বাংলাদেশে এখন একটা ভীষণ এসময়-এর কবিতা। সুভাষ বসু লিখেছেন অনিশ্চিত সময়ের কথা 'নিষ্ঠা' (একক)। 'আমি খুঁজি সেই আলো—খুঁজবে যে আজ অবক্ষয়' (অমৃত) অবক্ষয় থেকে বাঁচার অন্বেষা।

স্বাধীনতার কিছু আগে পরে যাদের আবির্ভাব তাঁরা দেশ ভাগ এবং আনুষঙ্গিক সমস্যায় কখনও অস্থির কখনও ক্ষুব্ধ। এঁদের মধ্যে এবার উল্লেখযোগ্য কবিতা লিখেছেন রাম বসু (সীমান্ত, অমৃত, পরিচয়, সাপ্তাহিক বসুমতী) কৃষ্ণ ধর (অমৃত, নাগরোজি, চতুষ্কোণ, রাজধানী) সিদ্ধেশ্বর সেন (পরিচয়, কালান্তর) জগন্নাথ চক্রবর্তী (আনন্দবাজার, অমৃত, বেতার জগৎ, লেখা ও রেখা) প্রমুখ কবিগণ।

'যার শেষ নেই' (সীমান্ত) কবিতায় রাম বসু স্পর্ধিত ঘোষণা রাখেন—

ভূর্যমুখী তুমি স্পর্ধা দাও
মাটি সূর্যের শরীর ভেঙা
মাটি কুমারী অরণ্য
সাজাও নিজেকে
তার ভালবাসা আবেগের পবিত্রতা
তার ভালবাসা ভূমিকম্প
সুন্দর মৃত্যুর জন্যে তৈরী হও।

একই সময়-চেতনা 'রোদে পোড়া লাশ' (আন্তর্জাতিক) অথবা 'কানামাছি' (পরিচয়)-তে পাওয়া যাবে। রাম বসু তাঁর এই সময়ের বক্তব্য কথনে সাধারণ লৌকিক ভাষা ব্যবহার করেছেন। 'তোমাকে যখন খুঁজি' (চতুষ্কোণ) কবিতায় প্রেমে-স্মৃতির অনুভূতিতে সার্থক। 'তোমাকে এখন সর্বত্র খুঁজি। আমি। হতভম্ব হয়ে দেখি আমার মতই আরও সব মানুষ। চলেছে। চোখে তাদের স্বপ্নের নীল ছায়া।' জগন্নাথ চক্রবর্তীর 'অনুৎ-পাতের পর' (লেখা ও রেখা) মনন-প্রধান, কিন্তু সমাজ ভাবনা তাকে সহজতর করে তুলেছে—'আমি উন্মুক্ত করেছি। তোমার স্বরূপ অন্ধকার থেকে। আলোর নিয়ে এসেছি'— উপনিষদের মন্ত্রোচ্চারণের মত গম্ভীর ও আশাবাদী।

এই সময়ের কথা আরও যাঁদের কবিতায় সংকটে-আশার উচ্চারিত হয়েছে তাঁদের মধ্যে ধনঞ্জয় দাশ (অমৃত, পরিচয়, সীমান্ত) সতীন্দ্রনাথ মৈত্র (পরিচয়, অমৃত), দুর্গাদাস সরকার (চতুষ্কোণ, বৈতানিক, রাজধানী) শচীন বসু (যুগান্তর, বৈতানিক, এষা), মৃগাঙ্ক রায় (অমৃত) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

এ-সময়ে সমাজবাদী তরুণ কবিদের মধ্যে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছেন তরুণ সান্যাল। তাঁকে এবার কবিতা রচনায় খুবই সক্রিয় মনে হবে। সীমান্ত, পরিচয়, নববার্তা, অমৃত, আন্তর্জাতিক, একক, কালান্তর প্রভৃতি বহু পত্রিকায় তিনি লিখেছেন। কবিতায় তিনি সজীব এবং গতিশীল। বর্তমানে বাংলাদেশের সাম্যবাদী অগ্রগণ্য কবিদের অন্যতম তরুণ সান্যালের কবিতায় ঐতিহ্যসম্মত ভাব ও ভাষার সঙ্গে প্রচলিত লৌকিক ভাব ও ভাষার আশ্চর্য সমন্বয়, ললিত ভাষার সঙ্গে লৌকিক ভাষার মিশ্রণে তিনি কবিতায় ক্ষেত্রে নতুন প্রেরণা সৃষ্টি করতে চান। চতুর্দিকে যন্ত্রের দ্রিমিক। রৌদ্রপাত গুঞ্জনে ভ্রমর (অমৃত) কিংবা 'ঈশ্বর ঈশ্বর' (পরিচয়) কবিতায় 'অশ্রুপাত, রক্ত, লোনা সমুদ্রের ফেনপুঞ্জে উচ্ছ্রিত বকুল ঝরে আছে' এর পাশে 'মায়ের কোলের কাছে মরা ছেলে, ফুট-পাথে রক্তের ছোপ' প্রভৃতি পঙক্তিতে কবির এই বৈশিষ্ট্য ধরা আছে।

সমাজবাদী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে যে সব কবি পঞ্চাশের দশক থেকে লিখছেন এবং এবারেও বেশ সক্রিয় তাঁদের মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য কবিতা লিখেছেন অমিতাভ চট্টো-পাধ্যায়। তিনি অমৃত, চতুষ্কোণ, উত্তর সূরী, সারস্বত, লেখা ও রেখা, নববার্তা প্রভৃতি বহু পত্রিকায় লিখেছেন। তার সমকালীন (চতুষ্কোণ) এ-সময়ের মানুষের পদক্ষেপের, অগ্রগমনের ক্ষেত্রে একটা

সাবধান-বাণীর মত কাজ করবে। তাই যেতে হবে সমুদ্র উপকূলে। উপরন্তু জলোচ্ছ্বাস ভেঙে তীক্ষ্ণ নেমে যেতে হবে অন্ধকারে...'

> কেননা, শিখরে পৌঁছে মুহূর্তেই
> সকল স্ফূরিত রৌদ্রোজ্জ্বল লুপ্ত লীন
> হতে পারে মেঘে। অথচ মৌসুমী
> শাসনে, অন্ধকারে।

মানস রায়চৌধুরী (গণবার্তা, কবিকণ্ঠ) অমিতাভ দাশগুপ্ত (সাহিত্যপত্র, নরবাণী, পরিচয়, গল্প-কবিতা, আন্তর্জাতিক) এবং আরও কয়েকজন এবারে উল্লেখযোগ্য কবিতা লিখেছেন।

নন্দন-উত্তরসূর প্রভৃতি পত্রিকাকে ঘিরে যে সব প্রবীণ-নবীন কবিরা সংগ্রামী কবিতা লিখছেন তাঁরা পাঠকমহলে যথেষ্ট প্রেরণা সৃষ্টি করেছেন। এঁদের প্রথম শ্যামসুন্দর দে, রবীন্দ্রনাথ ভৌমিক, অমল চক্রবর্তী, সুনির্মল কুন্ডু, প্রণব চট্টোপাধ্যায়, মঞ্জুশ্রী দাশগুপ্ত প্রমুখ উল্লেখযোগ্য কবিতা লিখেছেন এবার। নব জাগ্রত গ্রাম-শহরের অধুনা আন্দোলন শ্যামসুন্দর দে-র কবিতায় দেখা যাবে। 'খবর এলো গ্রাম-নগর প্রাণ চঞ্চল / মন্বন্তরের মৃত্যুপণ' (উত্তর সূর্য), ক্রান্তিকালে : সুকান্তকে' (নন্দন), প্রণব চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা, পাঠককে ভাবাবে :

> শিল্পীর তুলি হাতে তুমি এলে
> রক্তের পাত্র দিলে মন।

ষাটের দশকের যে সব কবির মধ্যে এই সময় এবং সমাজ-ভাবনা সক্রিয় এবং কবিমানসে স্থানলাভ করেছে তাঁদের মধ্যে আশিস সান্যাল, গণেশ বসু এবং গৌরাঙ্গ ভৌমিকের নাম উল্লেখযোগ্য। আশিস সান্যাল এবার পরিচয়, অমৃত, চতুষ্কোণ, সীমান্ত, সারস্বত, আশাবরী, রাজধানী, কিশীবা, বৈতানিক, কালি ও কলম, একক, কবিকণ্ঠ প্রভৃতি বহু পত্রিকায় লিখেছেন। আশিসের কবিতায় এই সময়ের নানা অস্থিরতার মধ্যে সংগ্রামী প্রত্যয়ের কথা ধ্বনিত হচ্ছে :

> কম্পমান পটভূমি, কোনদিকে আর
> ফিরবার পথ নেই
> চতুর্দিকে অবিরত
> আসন্ন বন্যার ভয়াল বিপুল
> শব্দ (পরিচয়)

গণেশ বসু অমৃত, সীমান্ত, পরিচয়, চতুষ্কোণ, সারস্বত, নব অভিযান প্রভৃতি অনেক পত্রিকায় লিখেছেন। গণেশ বসুর কাব্য-ভাবনাতে সমাজচেতনা, মেহনতী মানুষের কণ্ঠ সোচ্চার হয়েছে—

> হাওয়ায় বারুদ বোল মুদঙ্গের,
> এ কেমন যৌবন ছোটে দৌড়ে,
> কলতায় দাপাই কাঁপাই
> কবিতার সোনা যায় ক্ষোভে ক্রোধে
> প্রেমের পলাশ।

(কালি ও কলম) এবং গৌরাঙ্গ ভৌমিকের কণ্ঠেও সম-উচ্চারণ—

> তুমি আমার দিকে তাকিয়ে রইলে
> আমার বর্শাসহ হাতের দিকে
> বললে : এবার সূর্যোদয় হোক।
> (আশাবরী)

এ ছাড়াও যে কয়েকজন সমমনোভাবাপন্ন তরুণ কবি তাঁদের এবারের কবিতায় আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন, তাঁরা হলেন, তুলসী মুখোপাধ্যায় (পরিচয়, চতুষ্কোণ, সীমান্ত, নরবাণী, একক) চিন্ময় গুহঠাকুরতা (সীমান্ত, অমৃত), সত্য গুহ (পরিচয়, সীমান্ত) শান্তনু দাশ (পরিচয়, গণ্ডোত্রী, রাজধানী), তরুণ সেন (পরিচয়, কালান্তর), সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায় সীমান্ত, আন্তর্জাতিক, পরিচয়), শিবেন চট্টোপাধ্যায় (সীমান্ত, পরিচয়), দীপেন রায় (সীমান্ত, আন্তর্জাতিক) বাসুদেব দেব (নরবাণী, পরিচয়, কিশীবা, আলোক সরণি, লেখা ও রেখা) সুমিত চক্রবর্তী (অমৃত, সীমান্ত) প্রমুখ। 'বেঁচে থাকতে হলে একটা আওয়াজ চাই'—এই বিশ্বাসের উচ্চারণ দেখা যাবে তরুণ সেনের কবিতায়, অনেকের কবিতায়ই।

যেকালে আমরা বাস করছি, সেই কালের কথা যদি কবিতায় প্রভাব বিস্তার করে, পাঠক খুশি হবেন। এবং সুখের বিষয় এবারের অনেক কবির কবিতায় সমাজভাবনার যথার্থ রূপ আমরা দেখেছি। কিন্তু সময় তার সমকালীন বস্তুরূপেই সব নয়; তার উত্তরণ এবং সম্ভাবনাতেই সার্থক। এবারের কিছু কিছু কবিতা ঘটনার চাপে বেশী বস্তু-প্রধান হয়ে উঠেছে। ফলে এই বস্তুপুঞ্জের ভিড় অতিক্রম করে অনেক ক্ষেত্রে কবির জীবন-দর্শন ও বিশেষ মনোভঙ্গীর কাছাকাছি পৌঁছানো সম্ভব হয় না। বিশেষ করে তরুণতরদের কবিতায় কোথাও কোথাও বিষয়কে কেন্দ্র করে উত্তরণের পরিবর্তে বিষয়ের আবর্তে ঘূর্ণপাক খেতেই দেখা গেছে। সেই পুরনো কথা বলা যায়, উপাদান উপাদেয় হয়ে ওঠেনি। আমাদের প্রত্যাশা পূরণের সূত্রপাত হয়েছে—এ-বিশ্বাসে অবশ্য আমরা আস্থা রাখছি।

উপরোক্ত কবি-সম্প্রদায়ের পাশাপাশি অন্য আরেক কবি-সম্প্রদায়ও লিখছেন, যাঁদের কবিতায় বিষয়বস্তু হিসাবে ব্যক্তি-ভাবনা ও মন্ময় উপলব্ধি মুখ্যস্থান লাভ করেছে। এই শ্রেণীর কবিগোষ্ঠীর মধ্যে যাঁরা পুরোধা তাঁদের অনেকেই এবার লেখেন নি। যে কজন লিখেছেন, তাঁরাও অত্যন্ত স্বল্প। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অজিত দত্ত (দেশ, আনন্দবাজার, বেতার জগৎ), হরপ্রসাদ মিত্র (আনন্দবাজার, অমৃত, অন্তর), নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (দেশ, রাজধানী, আনন্দবাজার, বিচিত্রা) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী কবিতায় যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন, এবারেও তা লক্ষ্য করা যায়। একাধারে লিরিকধর্মী, অন্যদিকে গভীর জীবনানুভূতিতে তাঁর কবিতা সহজবোধ্য ও উজ্জ্বল। নীরেন্দ্রনাথের সাম্প্রতিক কবিতা নিশ্চয়ই দীর্ঘকালের দুর্বোধ্যতার অভিযোগমুক্ত। 'আগুনের দিকে' (রাজধানী) কবিতার দৃপ্ত পদক্ষেপ লক্ষণীয়—

> আর তাই
> চতুর্দিকে প্রাকার বজ্রদণ্ড
> আলাদা করা সব

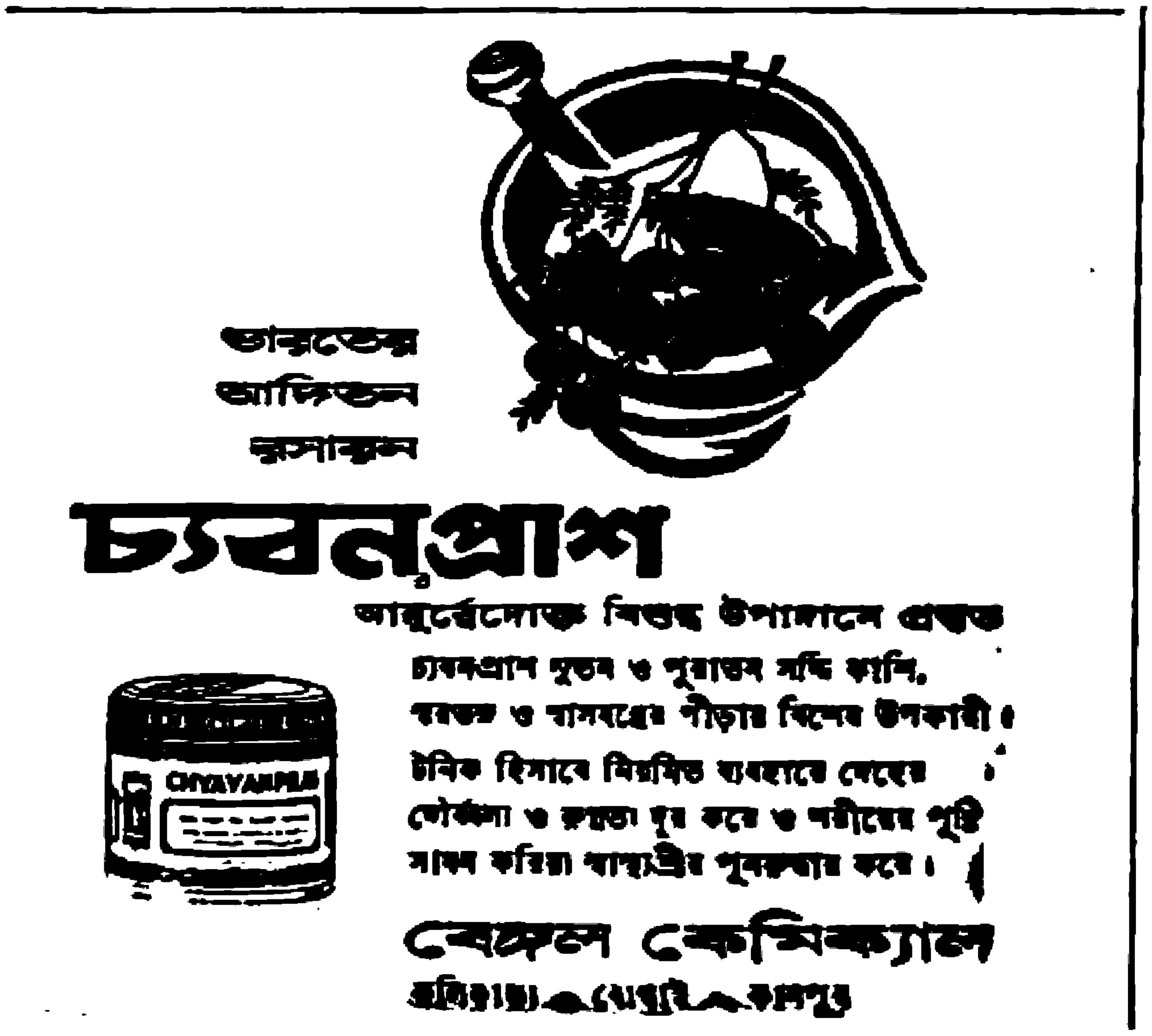

দেশেও আমাকে
এগিয়ে যেতেই হয়...
আগুনের দিকে
এগিয়ে যেতেই হয়।

স্বাধীনতা-উত্তরকালে যে কয়েকজন কবি মন্ময় লিরিক ভাবনা সমৃদ্ধ কবিতা রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে এবার লিখেছেন অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, (লেখা ও রেখা, অনুষ্টুপ, অমৃত, দুই বাংলার কবিতা), আলোক সরকার (আনন্দবাজার, জিজ্ঞাসা), শঙ্খ ঘোষ (দেশ, এক্ষণ, পরিচয়, অনুষ্টুপ), সুনীলকুমার নন্দী, (অনুষ্টুপ, চতুষ্কোণ, কবি ও কবিতা), প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত (দেশ, জিজ্ঞাসা), সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত (আনন্দবাজার, দেশ, পরিচয়, একক, অমৃত), লোকনাথ ভট্টাচার্য (অমৃত, নাগরিক, পরিচয়), রাজলক্ষ্মী দেবী (দেশ, অমৃত, সাপ্তাহিক বসুমতী) কবিতা সিংহ (দেশ, রাজধানী), শঙ্কর চট্টোপাধ্যায় (পরিচয়, এক্ষণ, গল্প কবিতা) প্রমুখ কবিগণ। এরা একসময়ে কবিতা রচনায় খুবই সক্রিয় ছিলেন, কিন্তু বর্তমানে সামান্য কয়েকজন ছাড়া অনেকেই কম লিখছেন।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত তাঁর মন ও মননের দুপ্ত সংক্ষে ভঙ্গী কবিতায় ছড়িয়ে দিতে পারেন। বাচনভঙ্গীতেও স্বকীয়তা আছে। 'আমি এক চটুল জোনাকি। তোমার পায়ের কাছে আনি চিরায়ত উপহার', বা,

এখনো তোমার হাতে

শুভ নববর্ষের নিশান
চিত্রের সংক্রান্তি শেষে পোড়া পায়
(অমৃত)

প্রভৃতি পঙক্তিতে অলোকরঞ্জনের কবি-মনের অনুভূতি ধরা যায়। আলোক সরকার কবি-হৃদয়ের আত্মকথনে দ্বিধাহীন। 'আমার কথা বলা অনেক সময়েই নীরবতা' আমি কেবল ভাবি। কেউ কি কান পেতে আছে, চমকে উঠবে কেউ? / কোথাও কোনো দৃশ্য নয়, কোথাও নয় আলোড়ন' (আনন্দবাজার)। শঙ্খ ঘোষ সহজ প্রতীকী ভঙ্গীতে লিখেছেন 'চিতা' (পরিচয়)। তাঁর কবিতাটি আপাত সহজ, আসলে অন্তর্নিহিত অর্থেই তার ব্যঞ্জনা ও উত্তরণ। 'সকাল থেকে কেউ আমাকে সত্যি কথা বলে নি। কেউ না। চিতা, জ্বলে ওঠো' (পরিচয়)। 'কলকাতার আলো বসন্ত' (অমৃত) লোকনাথ ভট্টাচার্যের কোলকাতা-ভাবনার কবিতা। আজকের কোলকাতা, কৃষ্ণচূড়া কবিমনে বেদনার ছায়া ছড়ায়, 'কেমনা কৃষ্ণচূড়া গাছটা আজ—নিসর্গের চাবুক-কষা পরিহাস, আমার শহরের এ কী দিন এলো দিকে দরজায় — সব কথায় মর্মান্তিক অর্থহীনতায়, যেই যেই মৃত্যুর মুকুটপরা শির অন্য আরেক কবিতা!' প্রভৃতি রাজলক্ষ্মী দেবীর কবিতাতেও অনাভাবে, অন্যচিন্তায় আসে, 'প্রাকৃতিক দুর্যোগের পড়ে থাকে গায়কের অর্থহীন ছবি' (সাপ্তাহিক বসুমতী)।

সমমনোভাবাপন্ন তরুণতর কবিরা অনেকে অবশ্য বেশ সক্রিয়। তাঁদের মধ্যে রত্নেশ্বর হাজরা (লেখা ও রেখা, দেশ, অনুক্ষণ, প্রান্তিক, গঙ্গোত্রী) রাণা চট্টোপাধ্যায় (অনুক্ষণ, জিজ্ঞাসা, ত্রিবৃত্ত) রবীন সুর (দরবারী, একক, কবিকণ্ঠ) মৃণাল বসু চৌধুরী (পরিচয় প্রান্তিক), রবীন ভৌমিক (রাজধানী, নিম সাহিত্য, জিজ্ঞাসা, পরবাস), কালীকৃষ্ণ গুহ (দুই বাংলার কবিতা, দরবারী), সামসুল হক (একক, লেখা ও রেখা, রাজধানী), কবিরুল ইসলাম (নাগরিক) রবীন্দ্র গুহ (বৈতানিক, বাংলা সাহিত্য পত্রিকা) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। রত্নেশ্বর হাজরা যখন বলেন 'দুহাত ভরে শিশির ধরবো সাদা পদ্মে জমিয়ে রাখবো। পাথর ছুঁয়ে দেখে যাবো কালপুরুষের ছবি' (লেখা ও রেখা) বা রবীন ভৌমিকের 'জন্মদিনের পরিচয় নিয়ে। আমি তোমার হয়ে রইলাম। শুকনো বুকে জমা হয়ে রইলো আমার ছেড়া উৎসুক' (জিজ্ঞাসা) শুনি, তখন তরুণ রোমান্টিক মন এবং ভাবনার স্পর্শ পাই। 'সভা নিঃসঙ্গতার নির্বাসিত' (কালান্তর) বা 'আমার কবিতা' (অমৃত)-র পবিত্র মুখোপাধ্যায় পাঠকমন স্পর্শ করেন ঠিকই, কিন্তু এবারে পবিত্র যেন কিছুটা নিষ্প্রাণ, কেন? বোধের ভারে নুয়েপড়া কবিতা আর নয়, মন্ময় কবিতা, তা হৃদয় উৎস থেকেই আসুক, প্রাণস্পর্শী হোক, জীবনের কবিতা হয়ে উঠুক।

আমেরিকা ও ইংলণ্ডের বীট কবি সম্প্রদায়ের মত আমাদের দেশেও একালে অনেকটা সমমনোভাবাপন্ন, কিছুটা বা প্রভাবিত 'বীট-হাংরি কবি সম্প্রদায়' উঠেছিলেন। এঁদের পুরোধাদের যাঁদের কবিতা এবার দেখছি তাঁরা হলেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (গল্প কবিতা, বেতার-জগৎ), শক্তি চট্টোপাধ্যায় (শিলীন্ধ্র, কালান্তর, আনন্দবাজার, অমৃত), শরৎ মুখোপাধ্যায় (আনন্দবাজার) এবং এদের অনুসরণকারী আরও অনেক কবি যেমন তুষার রায় (আনন্দবাজার) বেলাল চৌধুরী (একক) দেবী রায় (গল্পকবিতা) অরুণ বসু (গল্পকবিতা) পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল (গল্পকবিতা) প্রমুখের কবিতা কয়েকটি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। মলয় রায়চৌধুরী বেশ কয়েক বছর নীরব। এই কবি গোষ্ঠীর অনেকেই অবশ্য ইদানীং স্বক্ষেত্র থেকে সরে এসেছেন। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এখন গদ্য রচনাতেই অধিক আগ্রহী এবং ফলে কবিতায় ক্ষেত্রে তিনি পূর্বের নিষ্ঠা রাখতে পারছেন না। শক্তি চট্টোপাধ্যায় অবশ্য কবিতায় অনলস এবং তাঁর কবিতা পাঠক-মহলে আদৃতও বটে। তাঁর কবিতায় লিরিক-ভাবনা লক্ষ্য করার মত। 'দুই বাংলার কবিতায়' শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের লিরিক-ভাবনার প্রমাণ—

প্রথম সুন্দর এসে কথা বলে
আমাকে এতদিন নিঃশব্দ দিয়েছে।

অন্যত্র 'এই নীল সভ্যতার ভিতর ভিতর' (আনন্দবাজার) কবিতায় কবি বর্তমান সভ্যতার অসহ ব্যবস্থার প্রতি কটাক্ষ ক'রে বলেছেন, 'কেন ভালোবাসা সকলের কাছে নয় সমান প্রত্যয়?' সংসারের বৃত্তাকার অনুসরণের কবিতা শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়ের নকশা ২২ (আনন্দবাজার), 'পরস্পরকে অনুসরণ ক'রে অন্তরঙ্গ। বৃত্তাকার।' শরৎকুমার অন্য উল্লেখযোগ্য কবিতা 'জা পার্লিয়ামেন্ট' প্রকাশিত।

এবারের শারদ পত্র-পত্রিকায় অনেক নতুন মুখের সন্ধান পাওয়া যাবে। এঁদের কেউ কেউ ষাটের উপান্ত থেকে, এমনকি কেউ কেউ সত্তরের থেকেও লেখা শুরু করেছেন। এঁদের অনেকেই আবার বয়সের দিক থেকেও খুবই তরুণ। এদের মধ্যে যাঁদের লেখা ভাল লাগবে, তাঁরা হলেন নগেন্দ্র দাশ (জিজ্ঞাসা) অজয় সেন (দুই বাংলার কবিতা) শুভ মুখোপাধ্যায় (শিলীন্ধ্র) রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় শিলীন্ধ্র) শিবাজী রায় (অনুক্ষণ) হেমন্ত আঢ্য (প্রান্তিক) চাঁড়ুং চৌধুরী (জিজ্ঞাসা) উমাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (বাংলা সাহিত্যপত্র) সুলেখা মজুমদার (কবিকণ্ঠ) অলোক সান্যাল (উত্তর যুগ) চন্দন সেন (ফুল ফুটুক) বিশ্বজিৎ মাঝি (সীমান্ত) পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায় (গণবার্তা) জয়ন্ত সাহা (সিংহাসন) নিশিনাথ সেন (রাজধানী) সুচেতা মিত্র (বেতার-জগৎ) সৌগত বন্দ্যোপাধ্যায় (একালীন) সুদীপা ভট্টাচার্য (অন্বীক্ষণ)।

ইদানীংকালে আমরা পূর্ববঙ্গের কবিদের কবিতার স্বাদ অনুভব করবার সুযোগ পাচ্ছি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে। এবারেও কয়েকটি শারদীয় সংখ্যায় পৃষ্ঠায় ও-পার বাংলার কবিতা আমরা পেয়েছি। সে সব কবিতা নিজস্ব স্বাদে স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল। পূর্ববঙ্গের মাঠঘাট এবং একালের ভাবনা-চিন্তার ফসল ওঁদের কবিতা বিশেষ বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখে। রাজধানী, একালীন, দুই বাংলার কবিতা কালি ও কলম প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় পূর্ববঙ্গের কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। যাঁদের কবিতা বিশেষভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে—তাঁরা হলেন মেজবাহ-উদ্দীন আহমদ খান, শাউন হায়দার, সিরাজুল ইসলাম, শহীদ কাদরী নুর মোহাম্মদ, আবদুল হাই মাশরেকী, আবু কায়সার, মীর আবুল খায়ের, আহসান হাবীব, আহসান হাবীব, আবুল হাসান, আবদুল মান্নান সৈয়দ প্রমুখ কবিগণ। দুই দেশের উঁচু প্রাচীর ইদানীং-কালের কবিরা ভেঙে ফেলছেন পূর্ব-পশ্চিম উভয় বঙ্গই সৌভাগ্যে তৎপর এবং সচেতন। —[illegible]

শিল্পী অশোক মুখোপাধ্যায়

আকাদমি অফ ফাইন আর্টসের হলে স্বর্গত শিল্পী অশোক মুখোপাধ্যায়ের আঁকা ছবির একটি প্রদর্শনী শুরু হয়েছে ১ নভেম্বর থেকে। মাত্র এক বছর আগে শিল্পী এ জগত ছেড়ে গেছেন। গত তিরিশ বছর ধরে আঁকা তাঁর ছবির একটি নির্বাচিত অংশ এই প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে।

জলরং তেলরং-এ আঁকা ছবি ছাড়াও কালি-কলমে আঁকা বেশ কিছু স্কেচ রাখা হয়েছে। কয়েকটি ছবির বিষয় বাদ দিলে অশোক মুখোপাধ্যায়ের সব ছবির বিষয়বস্তু মানুষ অথবা আরও বিশদ করে বলতে গেলে মানুষের মুখ। দুঃখ, ভয়, স্বপ্ন, হতাশার অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছে এই সব ছবিতে।

তাঁর ছবিগুলি বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যে উজ্জ্বল নয়—তিনি ফর্ম আর রং নিয়ে নানা হেরফের করে দেখেছেন। ডিসটর্সনের মধ্য দিয়েই তিনি নানা মুড ধরে রেখেছেন। তবু মনে হয় তাঁর প্রিয় রং ছিল ইন্ডিয়ান রেড আর ব্রাউন। জীবনের গভীর ভাব হয়ত এই রঙেই ফোটে বেশী। মুখের ডিসটর্সনের ছবির মধ্যে কালো মেয়ে (১৬), দি লাস্ট অফ দি রোমানস (১১) বা প্রাইড (২০) উচ্চশ্রেণীর ছবি। আবার এর পাশাপাশি আছে শ্যামলী (৭১) বা বধূ বা যে কোন একটি গাছের ছবি স্নিগ্ধ প্রশান্তির ভাব এনে দেয়।

অশোকবাবুর তেলরঙের ছবির সংখ্যা এ প্রদর্শনীতে বেশী নেই। কিন্তু যে কটি ছবি রাখা হয়েছে প্রত্যেকটি রং ও রেখার ব্যঞ্জনায় ও ভাবের গভীরতায় সমৃদ্ধ। ১৭৮ নম্বর ছবিটি ভারত সরকারের নির্বাচিত ছবির প্রদর্শনীর সঙ্গে বাইরে ঘুরে এসেছে।

এর পাশে আছে উড়িষ্যার পটের রীতিতে আঁকা দুখানি ছবি। এগুলি দেখলে বোঝা যায়, যে হাতে তুলি চাবুক হয়ে ওঠে সেই হাত দিয়েই বর্ণাঢ্য অলংকরণও বেরোতে পারে। এই রীতির বেশ কিছু ছবি বিদেশীরা সংগ্রহে নিয়েছেন, উড়িষ্যা সরকারও কিনে নিয়েছেন।

অশোকবাবু ফর্ম নিয়ে বহু এক্সপেরিমেন্ট করেছেন। অ্যাবস্ট্রাক্ট কম্পোজিশনের ছবিও কয়েকটি আছে।

বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য অত নেই কিন্তু এক মুখই তিনি কত রীতিতে কতভাবে এঁকেছেন। কত বিচিত্র অভিব্যক্তি বহন করে এনেছে সেই মুখের মিছিল। শেষের দিকে এঁকেছেন যীশুখৃষ্টের কয়েকটি ছবি—তার দুখানি প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে। এ দুটি ছবিতে অপার প্রশান্তি। শিল্পী যেন সব ক্ষোভ, স্বপ্ন পার করে এই প্রশান্তিতে পৌঁছে ছিলেন।

এ প্রদর্শনীর যাঁরা আয়োজন করেছেন তাঁদের ধন্যবাদ জানাই—তাঁরা যে সুন্দর ক্যাটালগটি বার করেছেন তার জন্য। এতে শিল্পীর নিজের ছবির সঙ্গে তাঁর আঁকা সাতখানি ছবির ফটোগ্রাফ রয়েছে। এর লেখাগুলিও মনোজ্ঞ। শিল্পীর নিজের কথাও খুব সহজ অথচ জোরালো ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে। অশোকবাবু বিশ্বাস করতেন যে শিল্পীকে প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ব সমাজের। আমাদেরও মনে হয় এমন একটি জোরাল হাতের কাজকে সম্মানিত করার দায় আমাদের।

—বিশেষ প্রতিনিধি

নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

(৩১)

তখন মালতী হাসছিল। রঞ্জিতের কথা শুনে হাসছিল। এমন দুঃখ থাকে হাসিতে, রঞ্জিত মালতীর মুখ না দেখলে যেন টের পেত না। কি করুণ আর অসহায় মুখ মালতীর। কি কঠিন হাসি!

খুপরি ঘরটার ভিতর মালতী একটা পাতিহাঁসের মতো বসেছিল। হেমন্তের শেষ রোদ নেমেছে ওর ঝাপের দরজায়। হেমন্তের শেষ বলে শীতশীত করছে। একটা পাতলা কাঁথা গায়ে মালতী ছোট কম্বলের আসনে বসে আছে। অশৌচের শরীর যেন। অবজ্ঞা চারপাশে। নরেন দাস খড় রোদ থেকে তুলে এক জায়গায় জড় করছে। আভারাণী ধান ঝাড়ছে। শোভা আবু বাড়ি নেই।

মালতী সহজে ঘর থেকে আজকাল বের হতে চাইছে না। মাঝে মাঝে বাড়ির নিচে এক ঝোপ গাব গাছ আছে, সেখানে গিয়ে বসে থাকছে।

রঞ্জিত এলেই ঝাপটা খুলে দিয়েছিল মালতী। কারণ এই ঝাপ থাকলে অন্ধকার চারপাশে। সে ক্রমে অন্ধকার ভালবাসছে। চিড়িয়াখানার জীবের মতো আর বেঁচে থাকতে পারছে না। সে যে এখন কি করবে। ভিতরে তার কি যে হচ্ছে! সারাক্ষণ শীত শীত, ভয় ভয়। বুকটা কাঁপে। কঠিন হাসি হাসলে নরেন দাস ভয় পায়। রঞ্জিতের সঙ্গে দেখা হলেই বলা, বল, গিয়া দ্যাখের পাগলের মত হাসতাছে।

এমন শুনেই রঞ্জিত এসেছিল। এলেই মালতী কিভাবে বাধ্যের যুবতী হয়ে যায়। সে একটা জলচৌকি ঠেলে দেয় বাইরে। ওকে মাথা নীচু করে বসতে বলে। রঞ্জিত বসলেই যেন মালতী কেমন বল পায় শরীরে। তার এই একমাত্র মানুষ, যাকে সে কথাটা বলবে বলে স্থির করেছে। সে যে এখন কি করবে বুঝতে পারছে না। বুঝতে পারছিল না বলেই চোখে মুখে দীনহীন চেহারা। সে কিছুতেই কথাটা বলতে পারে না। অন্ধকারে শরীর থেকে আলোর ভিতর সেই মানুষের মুখ দেখতে দেখতে মুহ্যমান হয়ে যায়।

রঞ্জিত বলল, তুমি এমন পাগলামি করলে চলবে কেন মালতী।

—কি পাগলামি ঠাকুর।

—মাঝে মাঝে তুমি গাব গাছতলায় ছুটে যাও। সেখানে চুপচাপ বসে থাক। কিছু খাচ্ছ না।

—কিছু খেতে ভাল লাগে না ঠাকুর।

—ভাল না লাগলেও চলবে না। খেতে হবে। বাঁচতে হবে।

—তোমারে ঠাকুর কইলাম একটা চাকু দিতে। তুমি কিছুতেই দিলা গ্যালা না।

—আবার তোমার এক কথা।

—আমার আর কোন কথা নাই।

—তুমি এমন করলে নরেন দা কি করে তোমাকে নিয়ে!

—আমারে নিয়া কারো কিছু করতে হইব না।

—এমন বলে না। বলতে নেই। যেন অসুস্থ মালতীকে রঞ্জিত বোধ প্রবোধ দিচ্ছে।

—তোমার কি মনে হয় ঠাকুর আমারে ছুতে পাইছে।

—তুমি ত জান্ মালতী এ-সব আমি মানি না।

—তবে তুমি দাদার কথা বিশ্বাস কর ক্যান?

—করি, কারণ তোমার মুখ দেখলে আমার ভয় হয়।

—কি ভয়?

—কেমন অস্বাভাবিক চোখ মুখ তোমার। তুমি ত এমন ছিলে না মালতী। তুমি মনে মনে ঈশ্বরকে ডাক। তিনি তোমার সব ভাল করে দেবেন।

—ঠাকুর তোমার বিশ্বাস এত ভগবানে!

—এখন আমি আর কি বলব তোমাকে। আমার কেবল ভয় হয় তুমি কোনদিন আবার মরে যাবে।

—আমি মরতে চাই না ঠাকুর। বিশ্বাস কর আমি মরতে চাই না। তুমি কাছে থাকলে আমি মরতে পর্যন্ত সাহস পাই না। বলে সে কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে বলল, যদি চাকুটা দিতা। তোমারে আমারে মরতে পর্যন্ত দিলা না। আমি এখন কি যে করি!

রঞ্জিতের মাথায় এখন হেমন্তের রোদ। আর কোথাও কোন পরিচিত পাখির ডাক, এই ঘরে যুবতী মেয়ে অন্ধকারে মুখ বাড়িয়ে রেখেছে। সে যেন দীর্ঘদিন থেকে রঞ্জিতকে কিছু বলবে বলে ঘুম যেতে পারছে না। চোখের নিচে কালি। হাত পা শীর্ণ। মুখে ক্লান্তি। এবং চারপাশে অদ্ভুত এক নির্জনতা। অথচ বার বার সে চাকুর প্রসঙ্গে ফিরে আসছে।

সে বলল, মালতী তুমি কপালে সিঁদুর দিয়ে ছিলে। পায়ে অলতা। কি যে সুন্দর লাগছিল!

মালতী জবাব দিল না।

—তোমার এমন সুন্দর চোখ মালতী। আমি কিছু পারছি না। তোমাকে আর কি বলব।

মালতী মাথা নীচু করে রাখল। কিছু যেন ভাবছে।

রঞ্জিত বলল, আমি যাব মালতী। তোমার সঙ্গে আর দেখা হবে কিনা জানি না। কবে দেখা হবে তাও বলতে পারছি না। আমার অজ্ঞাতবাস শেষ হয়ে গেল। যাবার আগে তোমার সঙ্গে দেখা করে গেলাম।

মালতীর চোখ বড় বড় দেখাচ্ছে। সে বলল, আমি জোরে জোরে পাগলের মত হাসি ক্যান জিগাইলা না?

—কি জিজ্ঞেস করব। কিছু করতে পারছি না। জিজ্ঞেস করে লাভ কি!

মালতী বলল, তোমার অজ্ঞাতবাস শেষ। মালতীর বুকটা বলতে গিয়ে হাঁসফাঁস করে উঠল।

—শেষ। পুলিশ খবর পেয়ে গেছে আমি এখন এ-অঞ্চলে আছি। আজ কি কাল পুলিশের সঙ্গে এনকাউন্টার হতে পারে ভেবে পালাচ্ছি।

মালতী এনকাউন্টার শব্দটা বুঝল না। সে এখন নিজের যে এক অতীব দুঃখ আছে ভুলে যাচ্ছে। সে কেবল তার প্রিয়জনের মুখ দেখছিল। এই মানুষ তার কাছে এলে কোন সন্দেহের কারণ থাকে না। কারণ সে এই মেয়েকে কতদিন লাঠি খেলা ছোরা খেলা শিখিয়েছে। রঞ্জিত এক মহান আদর্শে নিমজ্জিত। সামান্য এক বিধবা যুবতী তার কাছে কিছু না। বরং মালতীর কঠিন চোখ মুখ সে এলেই সহজ হয়ে যায়। নরেন দাসের ধারণা এবং অন্য সকলের ধারণা মালতী রঞ্জিতকে ভয় পায়। আর এখন সেই যুবক যেন নিরুদ্দেশে যাবে। নিরুদ্দেশে গেলে তার আর থাকল কি। সে এখন সবই ওকে বলে দিতে পারে। অথচ কিভাবে বলবে! এমন একটা কথা, যা নরেন দাস জেনেও বেমালুম চেপে যাচ্ছে, এবং ক্রমে সংসারে এক কঠিন অবহেলা অথবা ক্রমে এই যুবতী তার ধর্মাধর্ম থেকে উৎক্ষিপ্ত হবে, তারপর কি হবে কেউ জানে না, জানে না বললে ঠিক হবে না, যেন [illegible]

নদীর পাড়ে এক রাতে জলবসে নিতে আসবে—মালতী এবার কান্না কান্না গলায় বলে ফেলল, ঠাকুর আমি মরতে চাই না। তুমি আমাকে কোথাও নিয়ে চল।

রঞ্জিত দেখল চোখ ফেটে জল পড়তে মালতীর।

ক্রমে বিকাল হয়ে আসছে। মাঠ থেকে ধানের গন্ধ আসছিল। কেন মনে হয়, এই যে মাঠ চারদিকে, কলমা সবুজ এবং কলাই খেতে দাঁড়িয়ে রঞ্জিত বলল এবং ধান উঠতে আরম্ভ করেছে, দূরের মাঠে ধান কাটার গান শোনা যাচ্ছিল—সবই অর্থহীন মালতীর কাছে। মালতী কি করবে এখন, সোনার জন্য অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছে।

এতদিন রঞ্জিত পার্টির নির্দেশে কত বড় বড় কাজ অবহেলায় সমাধান করেছে। কুমিল্লাতে সে ইংরেজ সাহেবকে খুন করে পালাতক। পুলিশের লোক জানে সে আগরতলা হয়ে শিলচর এবং শিলচর থেকে আসামের কোথাও উধাও হয়েছে। নিখোঁজ। তার শৈশবের পরিচয় দীর্ঘদিন চেষ্টা করেও পুলিশ সংগ্রহ করতে পারেনি। সে রঞ্জিত সেই সুন্দর বনে, সেই কখনও চরণ মণ্ডল এবং সে যে নদী পার হতে একবার নৌকোর হালি ধরেছিল গোপাল সামন্ত নামে—সে-সব পুলিশ খবর রেখেও রঞ্জিত নামে এক বালক এখানে কৈশোর কাটিয়ে পলাতক তা তারা জানে না। এ-অঞ্চলের মানুষেরা জানে রঞ্জিত দেশের কাজ করে বেড়ায়—এই পর্যন্ত। এখন মালতী তার সামনে লোভ হয়ে বসে রয়েছে এবং জীবনপাত করে যে আদর্শ সবই অর্থহীন, মালতীর লোভ হয়ে বসে থাকা সে একেবারে সহ্য করতে পারছে না। সে বড় দুর্বল বোধ করছে।

তার সামনে কত বড় মাঠ, শস্য ক্ষেত্র। সে সামান্য ফসলের জমি নিয়ে কি করবে! মালতীকে সে কোথাও পৌঁছে দিতে পারছে না। এই নিয়তি মালতীর। কিছু বলতে পারল না। মাথা নীচু করে হেঁটে হেঁটে সে শাহপাড়ার ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল।

মালতী যেমন দুপুর থেকে একটা হাঁসের মতো বেশ হয়ে এসেছিল,

হাওড়া
কুষ্ঠ কুটীর
সর্বপ্রকার চর্মরোগ, বাতরক্ত, অসাড়তা, ফুলা, একজিমা, সোরাইসিস, দূষিত ক্ষতাদি আরোগ্যের জন্য সাক্ষাতে অথবা পত্রে ব্যবস্থা লউন। প্রতিষ্ঠাতা: পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা কবিরাজ, ১নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া। শাখা: ৩৬, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৯। ফোন: ৬৭-২৩৫৯।

তেমনি সে ধীরে ধীরে ভিতরে ঢুকে বসে থাকল। একটু পরে এল শোভা। বাঁ হাতে ওর লণ্ঠন। ডান হাতে কলাই করা থালাতে খই এবং গুড়, মালতীর রাতের আহার। খেতে দিয়েই মালতী ঝাপ বন্ধ করে দেবে। তারপর এক অন্ধকার নিয়ে, চোখ কোটরাগত করে সে শুয়ে থাকবে। ঘুম নেই চোখে কেবল মনে হয়, কোন মরু প্রান্তে একটা পত্র পুষ্পহীন বৃক্ষ হাতছানি দিচ্ছে।

রঞ্জিত হাঁটতে হাঁটতে পুকুর পাড়ে চলে এল। সেই এক অর্জুন গাছ, গাছটা ডালপালা মেলে বড় হয়ে যাচ্ছে। চারপাশে ক্রমে অন্ধকার নামছে। দক্ষিণের ঘরে শশীমাস্টার ছেলেদের পড়াচ্ছে। সোনা খুব জোরে জোরে পড়ছে। সে তার কঠিন কঠিন শব্দ রঞ্জিত বাড়ি এলেই শুনিয়ে শুনিয়ে পড়ে। সে যে কত বড় হয়ে গেছে এবং কত সব কঠিন কঠিন শব্দ জেনে ফেলছে এই বয়সে সে রঞ্জিত মামাকে তা জানাতে চায়। সে এত দুঃখের ভিতরেও মনে মনে হাসল। সে চলে যাবে। এসব ছেড়ে যেতে ওর সব সময়ই কেমন কষ্ট হয়। দিদির কাছে সে মানুষ হল, যা-কিছু টান এই দিদির জন্য। এবং স্বামী তার পাগল বলে সব সময়ই মনের ভিতর নানারকমের চিন্তা—বাকিটা একভাবে সারাজীবন বাঁচবে, আর কতটা আবৃত্তি করবে, দিদির জীবনটা বড় দুঃখে কেটে গেল। এখানে এলে সে নিজের বাড়িতে ফিরে এসেছে এমন ভাবে। সব মাঠঘাট চেনা। তাই যেন যাবার আগে সব ঘুরে ঘুরে একটু দেখে যাওয়া। পুকুরপাড় থেকেই সে দক্ষিণের ঘরের আলোটা দেখতে পেল। শশীমাস্টার দুলে দুলে পড়ান। ইতিহাস থেকে তিনি—জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী ছেলেদের বলার সময় কেমন মাটি এবং মানুষের নিমিত্ত তিনি উত্তাপ পান। শশীমাস্টার এই তিন ছেলেকে সন্তানের মতো স্নেহ করেন।

সে অন্ধকার থেকে এবার উঠে এল। সংসারে আপনজন বলতে তার দিদি। আর কেউ নেই। স্বামী পাগল মানুষ। সে সোজা বাড়ি উঠে এল এবার। নিজের ঘরে ঢুকে পোশাক পাল্টাল। ওর সুটকেসের ভিতর যা যা থাকার কথা ঠিক আছে কিনা দেখে নিল। মহেন্দ্রনাথ নিজের ঘরে বসে আছেন। এ-সময় তিনি সামান্য গরম দুধ খান। দিদি নিশ্চয়ই মহেন্দ্রনাথের পায়ের কাছে বসে আছেন।

সে দিদিকে বলে দুটো খেয়ে নিল। মহেন্দ্রনাথের ঘরে ঢুকে প্রণাম করার সময় বলল। আমি আজই চলে যাচ্ছি।

বড়বৌ আর এখন এসবে বিস্মিত হয় না। সে, কখন, কোথায় থাকবে অথবা যাবে কেউ জানতে চাইলে চুপচাপ থাকে। আগে বড়বৌ এ-নিয়ে সামান্য অশান্তি করত রঞ্জিতের সঙ্গে। এখন আর করে না। অসময়ে কোথাও চলে যাচ্ছে বললে দুশ্চিন্তাও হয় না। সব ঈশ্বর নিয়তির উপর ছেড়ে দেয়। কথা বেশি বলে না। রঞ্জিত বুঝতে পারে দিদি তার এই চলে যাওয়া নিয়ে ভিতরে ভিতরে কষ্ট পাচ্ছে। যত চুপচাপ থাকবে সে টের পায়, চলে গেলে নিশ্চয়ই দিদি তার কাঁদবে। সে যাবার আগে যেমন প্রণাম করে থাকে, এবারেও তা করল। তারপর বিষন্ন মুখ দেখে যেমন বলে থাকে, কই তুমি হাসলে না। আমি যাব অথচ তুমি হাসলে না। না হাসলে যাব কি করে?

বড়বৌ জোর করে হাসে তখন। হেসে বিদায় দেয় এই ছোট ভাইটিকে।

—এই ত আমার দিদি। বলে সে সকলের কাছ থেকে বিদায় নেবার জন্য প্রথম দক্ষিণের ঘরে ঢুকে গেল। শশীমাস্টারকে বলল, চলে যাচ্ছি। সোনার মাথায় কি ঘন চুল হয়েছে সে চুলে হাত ঢুকিয়ে আদর করল সোনাকে। বলল, যাচ্ছি আমি। তোমরা ভাল হয়ে থেক। মার কথা শুনবে। জ্যাঠামশাইকে দেখে রাখবে।

শশীমাস্টার বলল, তাহলে আবার নিরুদ্দেশে যাচ্ছেন।

—যেতে হচ্ছে।

—ফিরবেন কবে।

—বোধ হয় আর এখানে ফিরতে পারব না।

—কেন?

—অসুবিধা আছে।

—আপনি স্বদেশী মানুষ, আপনাদের সব জানার সৌভাগ্য আমাদের হয় না। কিন্তু মাঝে মাঝে আপনার মতো নিরুদ্দেশে যেতে ইচ্ছা হয়। জাতির সেবা করতে ইচ্ছা হয়।

—জাতির সেবা ত আপনি করছেন। এর চেয়ে বড় সেবা আর কি আছে।

—কিন্তু কি জানেন বলে শশীমাস্টার উঠে দাঁড়ান। দেশ স্বাধীন যে কবে হবে বুঝতে পারছি না।

—হবে-আবে।

—হবে ঠিক। তবে দেরি হয়ে যাচ্ছে। আমরা সবাই ঝাঁপিয়ে পড়তে পারছি না বলে দেরি হচ্ছে।

রঞ্জিত এমন কথার কোন জবাব দিতে পারল না।

—আপনার কি মনে হয়?

—কিসের ব্যাপারে বলছেন।

—এই দেশ স্বাধীনতার ব্যাপারে।

—সবাই ঝাঁপিয়ে পড়লে সংসার চলবে কি করে?

—তা ঠিক বলেছেন। কিন্তু লীগ যেভাবে উঠেপড়ে লেগেছে, তাতে যে শেষপর্যন্ত কি হয়!

রঞ্জিত এ-কথার জবাব দিতে হবে বলেই অন্য কথায় চলে এল।—এরা কিন্তু আপনার খুব ভক্ত। এরা আজকাল খুব নিয়ে মত্ত থাকছে।

শশীমাস্টার বলল, দীনেই সব। আপনার দীক্ষা দেখি।

অন্য সময় হলে রঞ্জিত কি করত বলা যায় না। কিন্তু এখন সে চলে যাচ্ছে বলে

খুব সরল সহজ হয়ে গেছে। মনে মনে সে আজ জীবন বা জার্মান, যা-কিছু স্বপ্ন ছিল, সব মিথ্যা প্রতিপন্ন করে অন্য জীবনে ঝাঁপিয়ে পড়বে। দেশ উদ্ধারের চেয়ে কাজটা কেন জানি কিছুতেই কম মহৎ মনে হচ্ছে না। তাই সে কোন কুণ্ঠা প্রকাশ না করে শশীমাস্টারকে দাঁত দেখাল।

শশীমাস্টার লণ্ঠন তুলে সবকটা দাঁত দেখল। যেন কুশলী ডাক্তার ওর দাঁত দেখছে। মাড়ি টিপে টিপে দেখল। তারপর পল্টুকে এক ঘটি জল আনতে বলে রঞ্জিতের মুখের দিকে তাকাল।—আপনার নিচের পাটির দাঁত কিন্তু ভাল না।

রঞ্জিত হাসতে হাসতে বলল, কি করলে ভাল হবে?

—রোজ রাতে একটা করে হরতুকি খাবেন। বলে সে বাইরে গেল। হাত ধুল। তারপর ফিরে এসে বলল, হরতুকিতে দাঁত শক্ত হয়। পিত্তাশয়ের কাজ ভাল হয়। সুনিদ্রা হবে। এবং পরিপাকে এত বেশি সাহায্য করবে...বলে একটু থামল। কি যেন খুঁজল বিছানার নিচে, খুঁজে খেরো-খাতাটা পেলে পাতা উল্টে গেল। 'হ' এই শব্দের পাতা থেকে হরতুকি কত নম্বর পাতায় আছে খুঁজে হরতুকির গুণাগুণ ব্যাখ্যা করে শুনাতে থাকল।

রঞ্জিত দেখল লম্বা খাতায় নানারকম আয়ুর্বেদীয় ফুল-ফলের নাম। তাদের উপকারিতা সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ। রঞ্জিত বলল, এদের এসব ফলন। এ-দেশের মাটিতে যা হয় পৃথিবীর কোথাও তা পাওয়া যায় না।

শশীমাস্টার বলল, কি লালটু-পলটু, মামা কি বলছেন। তোমার মামা ত আজ চলে যাবেন। প্রণাম কর।

সকলে একসঙ্গে উঠে এসে কে আগে প্রণাম করবে, দুপদাপ প্রণাম সেরে কে আবার নিজের জায়গায় গিয়ে সবার আগে বসবে তার প্রতিযোগিতা যেন। রঞ্জিত বলল, পরীক্ষা পাসের সময় এটা চাই। সবার আগে যেতে হবে। সবকিছুতে জিততে হবে। এবং এ-সময়েই দেখল রঞ্জিত ও-পাশের অন্ধকার বারান্দায় মাড়ির পাগল মানুষ চুপচাপ বসে আছেন। সে তাঁর কাছে গিয়ে বলল, জামাইবাবু আমি আজ চলে যাচ্ছি। বলে সে দুপায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করল। প্রণাম করার সময় বলল, আশীর্বাদ করবেন, আমি যেন ভাল কিছু করতে পারি।

তিনি বসেছিলেন। বসে থাকলেন। কোন উচ্চবাচ্য নেই। তাঁর চোখ অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না। তবু বোঝা যায় সারা-জীবন ধরে মানুষটি এক সোনার হরিণের পেছনে ছুটছেন। মানুষটার দিকে তাকালেই রঞ্জিতের চোখ জল জল করে ওঠে।

সে তাড়াতাড়ি এবার পশ্চিমের ঘরে ঢুকে গেল। ধনবৌকে প্রণাম করার সময় বলল, ধনদি, আজ চলে যাচ্ছি।

ধনবৌ বলল, সাবধানে থাকিস।

তারপর সে শচীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করে খুব ঘন অন্ধকারের ভিতর মাঠে নেমে গেল। শশীমাস্টার, সোনা, লালটু, পলটু, হ্যারিকেন নিয়ে পুকুরপাড় পর্যন্ত এসেছিল। তারপর আর যায়নি। রঞ্জিত নিজেই বলেছে, আপনারা ফিরে যান মাস্টারমশাই। অন্ধকারে আমি ভাল পথ দেখতে পাই। আলো থাকলে বরং চোখে ঝাপসা লাগে।

অন্ধকারে নেমে আসতেই আবার সেই মাঠ, সোনালী বালির নদী, তরমুজের জমি এবং উপরে আকাশ, চিত্র-বিচিত্র সব নক্ষত্র আর মাঠের এক নির্জনতা ওকে শৈশবের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। শৈশবে সে এবং সামসুদ্দিন আর মালতী—মালতীকে নিয়ে এরা নদীতে সাঁতার কাটত। সাঁতার কেটে ও-পারে উঠে যেত। গয়না নৌকার নিচে কখনও কখনও রঞ্জিত লুকিয়ে থাকলে মালতী ভয় পেত। সে ডাকত, ঠাকুর।

কে যেন তেমনি মনে হয় এখনও তার পিছনে ডাকছে। ঠাকুর তুমি আমাকে কার কাছে রেখে গেলে। তুমি দেশের কাজ করে বেড়াও, আমি কি তোমার দেশ না? তোমার এই জলা-জমি অথবা মাটিতে আমি বড় হয়ে উঠি না! আমার সুখ-দুঃখ তোমার সুখ-দুঃখ না! ঠাকুর, ঠাকুর কি কথা বলছ না কেন?

রঞ্জিত যত দ্রুত হাঁটবে ভেবেছিল, সে তত দ্রুত হেঁটে যেতে পারছে না। কে যেন তাকে কেবল নিরন্তর ডেকে চলেছে। আমি কি করি ঠাকুর। মনে হল সে যেতে যেতে কোন গাছের ছায়ায় অন্যমনস্কভাবে দাঁড়িয়ে পড়ছে। যত তাড়াতাড়ি সে এ-অঞ্চল ছেড়ে যাবে ভেবেছিল, কেন জানি সে যেতে পারছে না। বস্তুত ওর পা চলছিল না। তার মাথার উপর বড় এক আকাশের মতো পবিত্রতা নিয়ে মালতী জেগে রয়েছে। সে আর এক পা বাড়াতে পারল না।

সে সেই অশ্বত্থ গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে থাকল। অন্ধকার কি ঘন। আর কি প্রাচীন মনে হয় এই সব তরুলতা। সে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে কিছু প্রত্যক্ষ করার চেষ্টা করছে। বিন্দু বিন্দু সব আলো গাঁয়ের ভিতর জ্বলছে নিভছে। রাত এখনও তেমন গভীর নয়। ভূজঙ্গ এবং কবিরাজকে লাঠিখেলা, ছোরা খেলার সব নির্দেশ, আর কি আখড়া খুলতে হবে নতুন, সে গেলে কার সঙ্গে ওদের যোগাযোগ রাখতে হবে সবই সে ঠিকঠাক বলেছে কিনা আর একবার এই গাছের নিচে দাঁড়িয়ে ভেবে নিল। কোথাও তখন কোন কুকুর আর্তনাদ করছে। শেয়ালেরা ডাকছে। জালালির কবরে এক ঝোপ কাশের বন সৃষ্টি হয়েছে এত-দিনে। সেই কাশের সাদা ফুল এই অন্ধকারে এক কাঁদিল জ্যোৎস্নার মতো দুলছে চোখে। বেঁচে থাকার জন্য আপ্রাণ জীবন-সংগ্রাম ছিল জালালির। মৃত্যুর পর এক-খণ্ড ভূমি পেয়ে সে এখন কি মনোরম হাসছে। কারণ রঞ্জিতের মনে হচ্ছিল অন্ধকারে, না কাশ ফুল, না জ্যোৎস্না, যেন একখণ্ড জমির জন্য ভালবাসা ছিল জালালির। সে তা পেয়ে ছোট শিশুটির মতো হাসছে। কাশ ফুলের মতো পবিত্র হাসিটি মুখে লেগে আছে জালালির।

অন্ধকারে দাঁড়িয়ে মনে হল, এই এক-খণ্ড জমি সকলের প্রাপ্য। সবাইকে এই দিতে হবে। অভুক্ত এবং ভূমিহীন মানুষ, ভূমিহীন বলতে পায়ের নিচে মাটি নেই এমন মানুষ সে ভাবতে পারে না। তার ঘর থাকবে, চাষ আবাদের জমি থাকবে, সে কিছু খাবে, খেতে পাবে, খেতে না পেলে মানুষের স্বাধীনতার অর্থ হয় না। স্বাধীনতা বলতে সে মানুষের এই বোঝে। তার কেন জানি এবার মনে হল, সে এক খণ্ড জমি মালতীকেও দেবে।

অথবা এই অন্ধকারে, ঘন অন্ধকারে দাঁড়ালেই সে কেমন সাহসী মানুষ হয়ে যায়। ওর মৃত্যুভয় থাকে না। রাতের পর রাত, এমন সব মাঠ-জঙ্গল, নদী-বন, যদি কোথাও পাহাড় থাকে, সিংহ-শাবকের মতো পাহাড় বেয়ে ওঠা, যেন নিরন্তর এক গ্রহ থেকে অন্য গ্রহে অভিযান—দুঃসহ এইসব অভিযান তাকে মাঝে মাঝে বড় বেশি বাঁচার প্রেরণা দেয়। কিছু না করতে পারলেই মনে হয় সে মৃত। একঘেয়ে জীবন তখন। বাঁচার কোন প্রেরণা থাকে না। উৎসাহবিহীন মানুষের মতো তাকে অধার্মিক করে ফেলে। হাডসন সাহেবকে হত্যার পর সে আবার নতুন কিছু করতে যাচ্ছে। প্রায় এক গ্রহ থেকে অন্য গ্রহে অভিযানের মতো এই ঘটনা। অন্ধকার থেকে নরেন দাসের বাড়ি স্পষ্ট। বিন্দু বিন্দু আলো এখনও জ্বলছে। বোধ হয় নরেন দাস গোয়ালে গরু বাঁধছে। এবং আভারানী ঘাট থেকে বাসন মেজে এলেই সে এগুতে পারবে। ওদের এবার শুয়ে শুয়ে পড়তে দেরি। মালতীকে নিয়ে ভয়-ডর তাদের কমে গেছে। কারণ মালতীর শরীরে আর এখন যোড়া দৌড়ায় না। মালতী রুগ্ন, শীর্ণকায়, অবসন্ন। এবং শরীরের ভিতর মালতীর ধর্মাধর্ম এখন ঢাকঢোল বাজাচ্ছে। মালতীকে ঘরে জায়গা দিচ্ছে না নরেন দাস। মালতী এখানে থাকলে পাগল হয়ে যাবে।

ক্রমে রাত বাড়ছে। ভোর রাতের দিকে ঠাকুরবাড়ি পুলিশে ঘিরে ফেলবে। এমন খবরই তার কাছে আছে। সন্তোষ দারোগা নারানগঞ্জে গেছে আর্মড ফোর্সের জন্য। সামান্য একজন মানুষকে ধরবার জন্য সন্তোষ দারোগা গোপনে গোপনে মহোৎ-সবের ব্যাপার করে ফেলেছে। ভীষণ হাসি পেল দারোগার ভয় এত বেশি ভেবে।

কে সেই মানুষ, সে এখন ভেবে পাচ্ছে না—যারা তাকে ধরিয়ে দিচ্ছে। এখানে তার কার সঙ্গে শত্রুতা। কয়েক ক্রোশ দূরে থানা। যেতে আসতে সময় অনেক। জলা-জায়গা বলে কেউ বড় এদিকটাতে আসতে

CENTRAL LIBRARY

চায় না। সে এখানে বেশ অজ্ঞাতবাসে কাটিয়ে দিচ্ছিল। কিন্তু চুপচাপও বসে থাকা যায় না। সমিতির কাছে সে নির্দেশ চেয়ে পাঠাল। তাদের নির্দেশমতো একের পর আখড়া খুলে চলছিল গ্রামে গ্রামে। তারপর এক খবর, এক মানুষ কাটল সেজে চিঠি দিয়ে গেল—পুলিশ তার সূত্র আবিষ্কারে ব্যস্ত। তাকে পালাতে হবে।

এবার মনে হল নকুল দাসের বাড়ির যে কিছু কিছু আলো জ্বলছিল, তা নিভে গেছে। সে জেলের মতো লুঙ্গি পায়ে দিয়েছে। উপরে জহর কোট। কোটের নিচে হাত রেখে দেখল—না, ঠিক আছে। সে এবার সন্তর্পণে এগুতে থাকল। তার আর এখন কোন ভয় নেই। দেখল সামনের অন্ধকারে একটা জীব ঘেউ ঘেউ করছে। সে রিভলবারটা চেপে ধরতেই মনে হল, ওটা বাড়ির আশ্রমের কুকুর। সে চলে যাচ্ছে বলে তাকে বিদায় জানাতে এসেছে।

রঞ্জিত বলল, বাড়ি যা। এখানে কি।

কুকুরটা তবু পায়ে পায়ে আসতে থাকল।

সে বলল, তুই যা বাবা। আমি এত-দিনে একটা ভাল কাজ করতে যাচ্ছি।

কিন্তু কুকুরটা পাশে পাশে হাঁটছেই।

—কি বলছি যে শুনতে পাচ্ছিস না।

কুকুরটা এবার পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ল।

—হ্যাঁ হয়েছে। খুব হয়েছে। এবারে যা।

কুকুরটা যথার্থই এবার ছুটে পুকুর-পাড়ে উঠে গেল। এবং অর্জুন গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে রঞ্জিত কোন্‌দিকে যাচ্ছে দেখল।

রঞ্জিত মালতীর দরজার সামনে সন্তর্পণে দাঁড়াল। বাঁশের দরজা। টর্চ জ্বেলে সে বাঁশের দরজার ফাঁক আছে কিনা দেখল। সে কোন ফাঁক খুঁজে পেল না। সুতরাং ধীরে ধীরে বাইরে দাঁড়িয়ে ডাকল, মালতী। মনে হল তখন ভিতরের জীবটা জেগে আছে। সামান্য ডাকেই তার সাড়া মিলেছে। সে উঠে বসেছে। গলার স্বর চিনতে পেরে মালতীর বুক কাঁপছিল। সে কাঁপা হাতেই ঝাঁপ খুলে দিল।

—আমি।

মালতী কথা বলল না।

—এবার আমরা যাব।

মালতী বুঝতে পারছে না—আমরা যাব বলে রঞ্জিত কি বোঝাতে চাইছে। সে মাথা নিচু করে ঠিক একইভাবে দাঁড়িয়ে আছে।

—আমার সঙ্গে তুমি যাবে।

—কোথায়? সহসা মালতী রঞ্জিতের মতো প্রশ্ন করল।

—যেদিকে দুচোখ যাবে।

—কিন্তু আমার যে কথা ছিল ঠাকুর।

—এখন আর কোন কথা না মালতী। দেরি করলে আমরা ধরা পড়ে যাব।

—কিন্তু আমার ভয় করছে। তোমাকে সবটা বলতে না পারলে।

—রাস্তায় সবটা তোমার শুনব। তুমি তাড়াতাড়ি এস।

মালতী এবার খুপরির ভিতর ঢুকে দুটো সাদা থান, সেমিজ এবং পাথরের থালা নিল সঙ্গে।

—এত নিয়ে পথ হাঁটতে পারবে না।

সে পাথরের থালা রেখে দিল।

রঞ্জিত বলল, আমাদের রাতে রাতে গজারীর বনে গিয়ে ঢুকে পড়তে হবে।

ওরা নদীর চরে নেমে আসতেই শুনল চৌজারবাগের ও-পাশে কারা টর্চ জ্বালিয়ে আসছে। ঘোড়ার খুরের শব্দ। রঞ্জিত বুঝতে পারল, রাতে রাতে সন্তোষ দারোগা গ্রাম ঘিরে ফেলছে। সে মালতীকে বলল, জলে ঝাঁপিয়ে পড়।

পুলিশের লোকগুলি টর্চ এবারে নিভিয়ে দিল। ওরা চলে যাচ্ছে।

রঞ্জিত বলল, জলে ডুবে থাক।

ওরা জলের ভিতর যখন ডুব দিল, তখনই মনে হল কেউ টের পেয়ে গেছে। সে বলল, মালতী সাঁতার কাটতে হবে। যত জোরে সম্ভব। বলে সাঁতার কেটে ওরা নদীর পাড়ে উঠলে দেখল টর্চের আলো এসে এ-পারে পড়েছে। বুঝি রঞ্জিত ধরা পড়ে গেল। টর্চের আলোতে বুঝি ওকে খুঁজছে।

রঞ্জিতের এমন একটা ভয়াবহ ব্যাপারে যেন ভ্রূক্ষেপ নেই। মালতীকে নিয়ে যা সামান্য অসুবিধা। সে মালতীকে বলল, বুঝতে পারছ ওরা কিছু টের পেয়েছে। ওরা আসে আসে এসে গেল।

মালতী কিছু বুঝতে পারছে না। সে বসে বসে এখন ওক দিচ্ছে।

—কি হয়েছে তোমার?

মালতী বলল, ঠাকুর তুমি পালাও। দেরি করলে ওরা ধরে ফেলবে।

রঞ্জিত যেমন স্বভাবসুলভ হাসে, তেমনি হাসল। সে বলল, এটা তুমি পার। এটা আমাকে বিপদ থেকে অনেকবার রক্ষা করেছে।

মালতী দেখল, কালো রঙের একটা বোরখা। ওরা বনের ভিতর ঢুকে পোষাক পাল্টে ফেলল। সে তার সুটকেস থেকে এক এক করে সব বের করল। বলল, এখানে চিপলে গুলী বের হবে। এই দ্যাখো। এটাকে বলে ট্রিগার। সে আলো জ্বেলে সব বোঝাল। এই ট্রিগার। ভাল হোল্ডিং চাই। দৃষ্টি খুব তীক্ষ্ণ দরকার। কিন্তু একি মালতী, ওক দিচ্ছ কেন? মালতী ওক দিতে দিতে কথা বলতে পারছে না।

রঞ্জিত বলল, তোমার কি হয়েছে মালতী, তুমি ঠিক করে বল। আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

মালতী যা এতদিন বলবে ভাবছিল, দুঃখে যা বলতে পারছিল না, এখন এই দুঃসময়ে রঞ্জিতকে সে তা মরিয়া হয়ে বলে ফেলল।

—ঠাকুর, আমি মা হইছি। তিন মানুষে আমারে জননী বানাইছে। আর কিছু বলতে পারছে না। মালতীও উপর্যুপরি ওক দিচ্ছে কেবল।

অন্ধকারে রঞ্জিত কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। মালতী পায়ের কাছে বসে ওক দিচ্ছে। ও-পারে অজস্র টর্চের আলো। বনের ভিতর আলো ঢুকছে না। সেই আলোর কণা শুধু বৃষ্টিপাতের মতো পাতার ফাঁকে ফাঁকে ঢুকছে। রঞ্জিত এবার হাঁটু গেড়ে বসল। মাথায় হাত রাখল মালতীর। বলল, আমাদের অনেক পথ হাঁটতে হবে মালতী। আমরা কোথায় যাব জানি না। তুমি ওঠ।

এ-ভাবে নদীর পাড়ে যে বন, যে বনে একবার পাগল জ্যাঠামশাইর সঙ্গে হাতীতে চড়ে অতিক্রম করেছিল, সে বনে মালতী এবং রঞ্জিত সারারাত সকাল হবার আশায় গাছের নিচে পাশাপাশি শুয়েছিল। রঞ্জিত আর একটা কথাও বলেনি। মালতী ভয়ে ঘাসের ভিতর মুখ লুকিয়ে রেখেছে। দুজনই সারারাত জেগে ছিল। এরপর কি কথা বলে যে আবার স্বাভাবিক হওয়া যায় রঞ্জিত ভেবে উঠতে পারছে না। কোথায় যাবে, কার কাছে নিয়ে যাবে এবং সে এমন এক মেয়ে নিয়ে এখন যে কি করে? গাছের শাখা-প্রশাখা বাতাসে আন্দোলিত হচ্ছে। শেষ রাতের জ্যোৎস্না গাছের পাতায় পাতায়। সেই যেন পাতায় পাতায় পড়ে নিশির শিশির। অথবা কে যেন আবার উচ্চস্বরে পড়ে চলেছে—এট লাস্ট দি সেলফিস জায়েন্ট কেম। খুব সকালে আকাশ ফর্সা না হতে মালতীই ডেকে দিয়েছে। রঞ্জিতের চোখে ভোর রাতের দিকে ঘুম এসে গেছিল।

রঞ্জিত ধড়ফড় করে উঠে বসল। সে নিজে একটা লুঙ্গি পরল। সে তার সুটকেস থেকে আঠা এবং রঙিন কিছু পাট বের করে একেবারে সে অন্য মানুষ সেজে গেল। বোরখার নিচে বিবি, আর রঞ্জিত এক মিঞাসাব। ভাঙ্গা হাড়ি বগলে। মিঞা-বিবি যেমন বাড়ি যাচ্ছে এমনভাবে রঞ্জিত খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে থাকল।

যেতে যেতে মালতী বলল, তুমি ঠাকুর আমারে জোটনের কাছে রাইখা যাও।

রঞ্জিত কথা বলল না। এ-অবস্থায় ওকে কোথায় আর নিয়ে যাওয়া যাবে। সে সড়কে উদ্দেশ্যে হাঁটতে থাকল। দিনমান হাঁটলে সে মালতীকে নিয়ে জোটনের দরগায় পৌঁছাতে পারবে। মালতীকে আপাতত জোটনের কাছে রেখে সে কোথাও চলে যাবে ভাবল।

আর সে হাঁটতে হাঁটতেই কার উপর আক্রোশে মনের ভিতর সহসা চিৎকার করে উঠল, বন্দেমাতরম্‌। আক্রোশের প্রতিপক্ষ জব্বর, না সন্তোষ দারোগা ওর চোখমুখ দেখে তা ধরা গেল না।

(ক্রমশঃ)

CENTRAL LIBRARY

নিকটেই আছে

সব খেলা খেলা না

শীত আসতে আর দেরী নেই বিশেষ। সরকারী স্কুল-কলেজে নাকি এরই মধ্যে শীত পড়ে গেছে—ফ্যান-টান সব বন্ধ। ভাগ্যিস কলেজটা পুরোপুরি সরকারী নয়। স্পনসরড তাই রক্ষে। রেগুলেটরের কাটাটা ঘুরিয়ে 'অন' দাঁড় করিয়ে দিলেন প্রফেসর মিত্র। দরদর করে কপাল বেয়ে ঘাম ঝরছে। সারা শরীর এখনো কাঁপছে। এতবড় স্পর্ধা লোকটার। বলে কিনা—আপনি তো দিলেন না স্যার, কিন্তু যারা নেবার তারা আপনাকে কলা দেখিয়ে দিল। গোড়ায় যদি আমার রিকোয়েস্টটা রাখতেন...। লোকটা অবিশ্যি আর এগুতে সাহস করেনি। বোধ হয় প্রফেসরের চোখ-মুখ ওর বিশেষ সুবিধার ঠেকে নি। তাই তাড়াতাড়ি সটকে পড়তে যাচ্ছিল। তার আগেই বাঘের মত গর্জে উঠলেন প্রফেসর মিত্র—গেট আউট, ইউ স্কাউন্ড্রেল, আই সে, গেট আউট।

প্রফেসর মিত্রের গলার আওয়াজে প্রফেসরস রুমেই সবাই চমকে উঠেছিল। দু একজন তাড়াতাড়ি ছুটে এসেছিল। অনিল সেন, বিজয় ঘোষ এখন প্রফেসর মিত্রের কলিগ হলেও একদিন এই কলেজেই পড়েছে। ওরাই আগে এল। জিজ্ঞাসা করল—কি হয়েছে স্যার?

জবাবটা দেওয়ার আগেই 'স্কাউন্ড্রেলটা' চোরের মত ছুটে ঘর ছেড়ে পালিয়ে গেছে। সবাই জানতে চাইল কি ব্যাপার? কি হল প্রফেসর মিত্র? কি হয়েছে স্যার? হইল কি মিস্টার, অত চটলা ক্যান? সবাই তখন ছেঁকে ধরেছে প্রফেসর মিত্রকে। শান্ত নির্বিরোধী এই লোকটাকে কেউ কোনদিন রাগতে-চাঁচাতে দেখে নি। বাড়ী-কলেজ আর কলেজ-বাড়ীর মধ্যেই যার জীবনের তেইশটা বছর কেটে গেল, মাইক্রো ইক-নমিকসের প্রবলেমের বাইরে আর কোন প্রবলেম যে মানুষের জীবনে থাকতে পারে এ কথা যার মুখে কেউ কখনো শোনে নি, সে কেন হঠাৎ এ রকম ক্ষেপে উঠল?

কিন্তু ততক্ষণে ক্লাসের ঘণ্টা বেজে উঠেছে। ফোর্থ পিরিয়ডে থার্ড ইয়ারের একটা ক্লাস ছিল। ক্লাসের দোহাই পেড়ে এতগুলো লোকের অনুরোধ ঠেলে বলতে গেলে তখন এক রকম পালিয়েই বেঁচে ছিলেন প্রফেসর মিত্র। কিন্তু ক্লাসে গিয়েও লাভ হোল না কিছু। মনটা দারুণ অস্থির হয়ে পড়েছে। হাজার চেষ্টা করেও নিজেকে গুছিয়ে নিতে পারলেন না। কথা ছিল আজ কস্ট অব প্রোডাকশন অ্যান্ড কস্ট কার্ভস পড়াবেন। যতবার পড়াতে গেলেন ততবারই মনে হোল এতদিন ধরে টেকস্ট আর রেফারেন্স বই ঘেঁটে কস্টের যে সংজ্ঞা আর সমাধান জেনেছেন, তা ঠিক নয়। বই-এর পাতার বাইরেও আরো অনেক ব্যাপার আছে যা থাকে যা নিজে জানলেও ছাত্রদের বলা চলে না। পড়াতেই পারলেন না। খানিক বাদে ফিরে এলেন নিজের ঘরে। ফুলফোর্সে ফ্যানটা চালিয়ে দিলেন। তারপর চুপচাপ কিছুক্ষণ বসে রইলেন চেয়ারে। দু একজন কাছাকাছি ঘুরঘুর করছে। বুঝতে পারলেন তারা জানতে চায় কেন প্রফেসর মিত্র এমন হঠাৎ অত চটে উঠলেন? কিন্তু একটা নোংরা ব্যাপার নিয়ে বেশী ঘাঁটাঘাঁটি করতেও ইচ্ছে করে না। তার চেয়ে সব ব্যাপারটা প্রিন্সিপ্যালকে লিখে জানিয়ে এই বিশেষ দায়িত্বের বোঝাটা নামিয়ে রাখলে কেমন হয়?

স্বেচ্ছায় তো আর এই দায়িত্ব উনি নেন নি। বলতে গেলে একরকম জোর করেই বোঝাটা প্রিন্সিপাল এবারের টিচার্স কাউন্সিলের মিটিংয়ে ও'র ঘাড়ে চাপিয়ে দিলেন। নাহ্, কেউ আর শান্তিতে থাকতে পারবে না। এতদিন প্রফেসর ব্যানার্জীই এই সব ঝক্কি ঝামেলা পুইয়েছেন। পুইয়ে-ছেন না ছাই। লোকটা যা যা বলেছে তার একাংশও যদি সত্যি হয়—ছি ছি। অধ্যাপক হয়ে কি করে প্রফেসর ব্যানার্জী এই নোংরামিতে নিজেকে জড়ালেন? আর তার ফল কি হয়েছে—না, এসব ধারণা সব অধ্যাপকই দাবি হয়ে। সবাই ইয়ে চায়। ছাত্ররাও সব জানে।

প্রফেসর ব্যানার্জী অনেকদিন ধরেই বাস যাব করছিলেন। স্মার্ট ইয়ংম্যান। শিক্ষকতাটা ও'র ধাতে পোষায়নি কোনদিনও। নিরুপায় হয়েই এতদিন পড়ে ছিলেন। অবিশ্যি হাল ছাড়েন নি কখনো। চেষ্টাচরিত্র করছিলেন। যদি কোথাও ভিড়ে পড়তে পারেন। আর এমনই কপাল, যখন বাজারে এখন কোথাও কোন চাকরী নেই, ঠিক এই সময়েই বোম্বের ডাকসাইটে কার্বে এক্সিকিউটিভ পোস্টে বহাল হয়ে গেলেন। মোটা মাইনে প্লাস বোনাস। রাজকন্যা আর অর্ধেক রাজত্বের চেয়েও আর যা লোভনীয়। উনি চলে গেলেন।

আর চলে যেতেই যত ঝামেলা বাধল। এতদিন প্রফেসর ব্যানার্জীই ছিলেন প্রফেসর-ইন-চার্জ অব গেমস। প্রিন্সিপাল পড়লেন ফাঁপরে। কেউ আর ঐ দায়িত্ব নিতে চায় না। বলে, রক্ষে করুন, একেই টিচার্স-স্টুডেন্ট সম্পর্কটা খুব সুবিধের নয়, তারপর কি করতে কি করে বসব বা কি বলতে কি বলে ফেলব, তাই নিয়ে কুরুক্ষেত্র বেধে যাবে। তার চেয়ে অমুককে দিন, উনি জোর এফিসিয়েন্ট, স্টুডেন্টস-প্রবলেম-গুলো ভালো বোঝেন, ট্যাকলও করতে পারবেন।

একে একে সবাই যখন মুখ ঘুরিয়ে নিল, তখন করুণ মুখে প্রিন্সিপ্যাল প্রফেসর মিত্রের দিকে তাকিয়ে রিকোয়েস্ট করলেন—এই ভাঙা সেশনটা আপনি দয়া করে চালিয়ে দিন। কথা দিচ্ছি নেকস্ট সেশনে আর কেউ যদি রাজী নাও হন, আমি নিজেই এ দায় সামলাব। আপনি আর কাইন্ডলি 'না' বলবেন না। ...এরপর কি আর না বলা যায়? অন্তত প্রফেসর মিত্র পারেন নি।

আর তাছাড়া 'না' বলবারই বা কি আছে? গেমসের ব্যাপার, ছেলেরাই সব করবে, আপনি শুধু ওপর ওপর একটু দেখাশোনা করবেন, প্রিন্সিপ্যাল তখন এই সব বলেছিলেন। অবিশ্যি মিটিংয়ের শেষে অনিল, বিনয় ওরা অন্য কথা বলেছিল—এ দায়িত্ব আপনি না নিলেও পারতেন স্যার। আপাতদৃষ্টিতে কোন ঝামেলা নেই ঠিক, কিন্তু পরে দেখবেন ভেতরে অনেক প্যাঁচ। আমরা তো অনেক বছর আগেও এই কলেজেই ছাত্র ছিলাম স্যার।

তা তোমরা বাবা কেউ দায়িত্ব নাও না। এই বুড়ো মানুষটাকে দিয়ে কেন টানাটানি করছ। আমি এসব জানিও না, বুঝিও না—কেমন ভয় পেয়েই কথাগুলো বলে-ছিলেন প্রফেসর মিত্র।

স্যারের কথা শুনে অনিল সেন, বিজয় ঘোষ যেন চমকে উঠেছিল—না না স্যার। তবু আপনি বয়োজ্যেষ্ঠ বলে পার পেয়ে যাবেন। আমরা পারব না স্যার। তাছাড়া এখনকার আবহাওয়াটা স্যার রীতিমত জোয়ারে।

আবহাওয়াটা যে জোয়ারে, সে তো ভালো মতই জানেন প্রফেসর মিত্র। তবু নতুন দায়িত্বটার জোরটা তখন বুঝতে পারেন নি। পারলেন পুজোর ছুটিতে।

পুজোর কটা দিন কাটতে না কাটতেই একদিন ভোরে ছাত্রদের গেমস সেক্রেটারী সুবিনয় এল এক ভদ্রলোককে সঙ্গে নিয়ে। পরিচয় করিয়ে দিল—ইনি ব্যবসায় স্পোর্টসের লোকজন। সামনে ক্রিকেট সীজন। আমাদের ক্রিকেটের সব ব্যাপার

এদের কাছ থেকেই বরাবর কিনি। তাই আপনার কাছে নিয়ে এলাম।

তা বেশ করেছ। তবে এখন তো ছুটি চলছে। ছুটি শেষ হোক, কলেজ খুলুক—তারপর তোমাদের যা যা লাগে লিস্ট করে দিও, আমরা কোটেশন কল করব। মোটামুটি ফেয়ার প্রাইসে যাঁরা দেবেন, তাঁদের কাছ থেকেই আমরা সাপ্লাই নেব।—ব্যাপারটা সহজ করে তুলতে চেয়েছিলেন প্রফেসর মিত্র। প্রিন্সিপ্যালই তাকে কলেজের নিয়মকানুন সব বুঝিয়ে দিয়েছেন। স্পোর্টস ফান্ডের টাকাটা ছেলেদেরই। বছরে প্রায় হাজার নয়েক টাকার কেনাকাটা হয়। জলরোডি ফুটবলের জন্য তিন, সাড়ে তিন হাজার ব্যয় হয়ে গেছে। ওসব খরচপত্র প্রফেসর ব্যানার্জীর সময়ই হয়েছে। সামনে আছে বড় বড় দুটো খরচ—ক্রিকেট আর অ্যানুয়াল স্পোর্টস। একটু দেখেশুনে না চালালে ফান্ড সর্ট পড়তে পারে। আর তাছাড়া ছেলেরা বায়না ধরলেই সব কেনা চলে না, কারণ অত টাকা নেই।

সুবিনয় চলে গেল সেদিন। কিন্তু সেই যে কেউ লাগিয়ে দিয়ে গেল, সে আর ছাড়ে না কিছুতেই। নিত্য আসতে লাগল—সকাল, বিকেল দুবেলা। নানা রকম প্রাইস লিস্ট খুলে কোনটার দাম কত, কোনটা বেশী টেকসই, কোনটা কলেজ গেমের উপযোগী, সব বোঝাতে শুরু করল। প্রফেসর মিত্র ভদ্রতার খাতিরে তাড়িয়েও দিতে পারেন না, কিন্তু ভেতরে ভেতরে অতিষ্ট হয়ে উঠলেন। যত বলেন—দেখুন জীবনে আমি ক্রিকেট খেলি নি, কাকে আপনারা লং হ্যান্ডেল বলেন আর কাকে বলেন সর্ট হ্যান্ডেল সে সব কিছুই জানি না। যারা এসব জানে, তাদের এখন ছুটি চলছে। কলেজ খুলুক, ছাত্ররা আসুক। তারপর রিকোয়ারমেন্ট বুঝে আমরা কেনাকাটা করব।

কিন্তু কেউ কি অত সহজে ছাড়ে? তার জানার পরিধি দেখে অবাক হয়ে গেলেন প্রফেসর মিত্র। কবে কোন বছর তার কলেজ কোন স্পোর্টস গুডসের দোকান থেকে কি কি কিনেছিল, সে সবের দাম কত, তার মধ্যে কোনটা এখন কলেজে আছে, কোনটা ভেঙে গেছে বা সারানোর অযোগ্য, কোনটা মিসিং—হি নোজ এভরিথিং।

ঠিক আছে আপনার এই লিসটটা আমায় দিয়ে যান, বললেন প্রফেসর মিত্র, কলেজে গিয়ে এর সঙ্গে মিলিয়ে আমাদের নতুন লিস্ট বানাব। সেকেন্ড নভেম্বর কলেজ খুলবে, তার এক সপ্তাহ বাদেই না হয় আপনি দেখা করবেন। ইন দ্য মিন টাইম আমরা কোটেশন পাঠাব সব দোকানে। আপনারাও পাবেন একই সঙ্গে।

সে তো স্যার পরেই। তবে কি, আপনি যদি একটু রাজি হন, তাহলে মিছিমিছি এসব কোটেশনের ঝামেলায় যেতে হয় না, আর অর্ডারটার সম্বন্ধে আমাদের কোম্পানীও নিশ্চিন্ত হয়।

লোকটার কথা বলার ঢংয়ে একটু বিরক্তই হয়েছিলেন প্রফেসর মিত্র। বিস্মিত হওয়ার চেয়েও রাগই হয়েছিল বেশী। তুমি বাপু সেলসম্যান, তোমার সেলস নিয়েই থাকো, আমার কি করণীয় তা তোমার কাছ থেকে শুনতে চাই না। কিন্তু এসব বলতে চক্ষুলজ্জায় আটকায়, তাই ভদ্রভাবেই বলেছিলেন—আপনার কোম্পানীকে নিশ্চিন্ত করার চেয়েও কলেজের, ছাত্রদের ইন্টারেস্টটাই দেখা আমার উচিত নয় কি?

তাতো ঠিকই স্যার। তবে কি জানেন, প্রফেসর ব্যানার্জীর আমলে আমরা চিরকালই আগেভাগে অ্যাশিওর্ড হয়েছি। বুঝতেই তো পারছেন বাজারের অবস্থা কি। স্পোর্টস গুডসের বাজারে প্রচণ্ড কম্পিটিশন। কোম্পানী সামান্য ক পয়সা মাইনে দেয়। যা পাই তাতো আসে কমিশন থেকে। একশ টাকার মাল বেচলে আমাদের টুয়েলভ পার্সেন্ট। আর সে তো আপনাদের দয়াতেই।

সারাজীবন কলেজে ইকনমিকস পড়াচ্ছেন প্রফেসর মিত্র। জিনিসের দাম, সাপ্লাই, ডিম্যান্ড, পারফেক্ট কম্পিটিশন, মনোপলি, কস্ট কার্ভের জটিল রহস্য-এর বাইরে যে জীবন তার পরিচয়, নিজের বাঁচার প্রয়োজনের অতিরিক্ত, কোনদিনই জানতে চান নি বা পারেন নি। ইচ্ছে হোল জানতে, স্পোর্টস গুডসের একজন সেলসম্যান কত মাইনে পায়? কমিশন থেকেই বা আসে কত? কতগুলো কোম্পানী আছে এ লাইনে? কেনে কারা? বছরে কত টাকার ট্রানজ্যাকশন হয়? হাজারটা প্রশ্ন তখন মাথার ভেতরে জমে উঠেছে। আর ঠিক তখুনি কানে এল—।

আপনাদের সাহায্য ছাড়া আমরা এক পাও এগোতে পারি না। বলতে বলতে ভদ্রলোক থামলেন একটু। তারপর একটা আলগা চতুর হাসি হেসে বললেন—এর জন্য স্যার আপনারাও ঠকেন না।

তার মানে!—যেন ভীষণ একটা ধাক্কা খেয়ে জেগে উঠলেন প্রফেসর মিত্র।

মানে তো স্যার জানেনই। টাকা দিয়েই টাকা তুলতে হয়। এটাই বিজনেস ট্রিক।

কাঠ কাঠ কথাকটা শুনে লোকটা ঘাবড়ে গেল। তাড়াতাড়ি প্রাইস লিস্ট আর অন্যান্য টুকিটাকি দু একটা কাগজ হ্যান্ডব্যাগে ভরতে ভরতে উঠে দাঁড়াল। তারপর গলার স্বরটা আন্তরিকতায় চুবিয়ে ফিসফিসিয়ে বলল—স্যার প্রফেসর ব্যানার্জী নিতেন ফাইভ পার্সেন্ট। আপনাকে না হয় আর এক পার্সেন্ট বেশীই দেব। আপনারা এ সীজনে আরো সাড়ে পাঁচ হাজার টাকার মাল কিনবেন ক্রিকেট আর স্পোর্টস মিলিয়ে। আমাদের কাছ থেকে নিলে আপনি নগদ—।

গেট আউট, আই সে, গেট আউট—সেদিনও এ রকম পাগলের মত চেঁচিয়ে উঠেছিলেন প্রফেসর মিত্র। বাবার উন্মত্ত চীৎকার শুনে পাশের ঘর থেকে বড় ছেলে মন্টু আর মেয়ে বুলা ছুটে এসেছিল। জিজ্ঞাসা করেছিল—কি হয়েছে বাবা? খোলা দরজার দিকে আঙুল উঁচিয়ে রাগে কাঁপতে কাঁপতে সেদিন প্রফেসর তাঁর ছেলেমেয়েদের বলেছিলেন—ঐ লোকটাকে কোনদিন আর এ বাড়ীতে ঢুকতে দিবি না।

কিন্তু কি লাভ হোল? নিজে ভালমানুষ সাজতে গিয়ে অজান্তে যে পাতা ফাঁদেই আজ আটকে গেলেন। পাছে কেউ কোনদিন এই অপবাদ দেয় যে প্রফেসর মিত্র ছেলেদের ঠকিয়েছেন, তাই কলেজ খোলার সঙ্গে সঙ্গে ক্লার্ককে বলেছিলেন ছেলেদের সঙ্গে কনসাল্ট করে রিকোয়ারমেন্টের তালিকা বানাতে। সেই অনুযায়ী কোটেশনও কল করা হোল। কিন্তু, কি করে কি হয়ে গেল, অর্ডারটা ঐ লোকটাই পেয়ে গেল। পরে অবশ্য টের পেয়েছেন কি করে পেল। কিন্তু এ সব নোংরা কারণ আর কি করে অপরকে বলবেন প্রফেসর মিত্র। তাই মনে মনে ডিসিশনটা পাকা করেই, দেরাজ থেকে নিজের লেটারহেডটা বার করে খসখস করে একটা আর্জির মুসাবিদা শুরু করে দিলেন—

"......কারণ জানানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমার আন্তরিক অনুরোধ এই দায়িত্ব থেকে আমাকে মুক্তি দিন।"

—অণিবেশ

মনের কথা

ব্যাভিচার ও অভিচার
ভ্রান্তিরোগের বিশিষ্টতা

প্যারানইয়ার রোগীর ডিলিউশনে ব্যভিচার ও অভিচার-বিভ্রমের বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। স্ত্রীর ব্যভিচারের বিশদ বিবরণ রোগী এমন নিপুণভাবে পরিবেশন করে যে চিকিৎসকের মনেও মধ্যে মধ্যে সন্দেহ সংক্রমিত হয়ে পড়ে। অভিচার সম্পর্কে অবশ্য এ কথা বলা চলে না। তন্ত্রমন্ত্রাদি প্রক্রিয়ার সাহায্যে রোগীর শারীরিক বা মানসিক অনিষ্ট সাধন করা হচ্ছে—এই অভিচার-বিশ্বাস ডাক্তারকে আদৌ প্রভাবিত করে না। ব্যভিচার অভিচার, দুইই নির্যাতনমূলক ডিলিউশনের অন্তর্গত। স্ত্রীর ব্যভিচারকে রোগী আত্মমর্যাদা ও পৌরুষের উপর নির্যাতন মনে করে, অভিচারকে মনে করে শত্রুপক্ষের প্রত্যক্ষ নির্যাতনের প্রমাণ। প্রথমে ব্যভিচার-বিভ্রমের দুটি ঘটনা বিবৃত করছি।

মিশিরজীকে নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়েছেন তাঁর বন্ধুবান্ধব সহকর্মীরা। স্ত্রীর উপর তিনি উৎপীড়ন চালাচ্ছেন। তাঁর মতন সৎ ও শান্তপ্রকৃতির মানুষ স্ত্রীকে মারধোর করছেন জেনে তাঁর পরিচিত সকলেই বিস্মিত বোধ করছেন। অন্য কোনো দিকে তাঁর আচরণে কোনো বিশৃঙ্খলা দেখা যাচ্ছে না। তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধুদের জানিয়েছেন যে স্ত্রী ব্যভিচারে লিপ্ত, তাকে শায়েস্তা করবার উদ্দেশ্যে তিনি শাসন করছেন। স্বামী হিসেবে এই শাসন করার অধিকার তাঁর আছে। ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনার উদ্দেশ্যে দুই সহকর্মীর অনুরোধে মিশিরজী আমার সংগে দেখা করলেন। মিশিরজী এক শ্রমিক ইউনিয়নের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। বয়স ৪৫, প্রায় ৩০ বছর কোলকাতায় আছেন। হিন্দীভাষী উত্তরভারতের লোক। প্রথমে কয়েক বছর দরোয়ানী করেছেন। এখন সারাক্ষণের ইউনিয়নকর্মী। নিজের চেষ্টায় হিন্দী উর্দু শিখেছেন। ইংরিজি বাংলাতেও কথা বলতে পারেন। সুবক্তা ও সংগঠক হিসেবে শ্রমিকদের মধ্যে যথেষ্ট সুনাম। সংগীত রচনা করেন, নিজের লেখা গানে সুর আরোপ করেন ও ছোটখাটো সভায় সংগীত পরিবেশন করেন। নিজের গাঁয়ে বছরে একবার করে যাতায়াত করেন, সেই সময়েই স্ত্রী ও সন্তানদের সংগে দেখাসাক্ষাৎ ঘটে। বর্তমানে কয়েক মাস ধরে স্ত্রী কোলকাতায় আছেন। একটা দুর্ঘটনায় মিশিরজী আহত হন, সেই সময় তাঁর স্ত্রী সেবাশুশ্রূষার জন্য এখানে আসেন। সেই থেকে তিনি কোলকাতাতেই রয়ে গেছেন। গাঁয়ে ফিরে যাবার ইচ্ছে থাকলেও যেতে পারছেন না, কেননা তাঁর ভয় মিশিরজীর সন্দেহবাতিক তার ফলে হয়তো আরো বেড়ে যাবে। তা ছাড়া স্বামীকে এই অবস্থায় রেখে যেতে তাঁর মন সরছিল না। কিছুদিন আগে এক শ্রমিক বস্তীতে একখানা ঘরে মিশিরজী থাকতেন। সেই ঘরে ভিতর থেকে তালাবন্ধ করে চাবিটা মিশিরজী লুকিয়ে রাখতেন। তাঁর ধারণা তিনি ঘুমিয়ে পড়লে স্ত্রী বাইরে গিয়ে পরপুরুষের সংগে মিলিত হচ্ছিলেন, তাই এই ব্যবস্থা। দুর্ঘটনায় মিশিরজীর বাঁ হাতের হাড় ভেঙে যায়। এই সময় যন্ত্রণায় ভাল ঘুম হতো না। আধ ঘুমন্ত অবস্থায় শুনতেন পাশের ঘরের অবিবাহিত ছেলেটি থালা-বাসনের শব্দ-সংকেতে তাঁর স্ত্রীকে অভিসারের ডাক দিচ্ছে। ঘুম ভেঙে গেলে মাঝে মাঝে স্ত্রীকে শয্যায় পেতেন না। বাইরে গিয়ে স্ত্রী ও তার প্রেমিককে হাতেনাতে পাকড়াও করার অদম্য ইচ্ছা তিনি অতি কষ্টে চেপে রাখতেন। এই ব্যাপার নিয়ে হৈ-চৈ করার বাসনা তাঁর ছিল না। তাছাড়া প্রেমিক ছেলেটি তাঁর একজন ভক্ত ও সক্রিয় নিষ্ঠাবান সহকর্মী। তার উপর সকলের অগাধ আস্থা। মিশিরজী তাকে ভালবাসেন ও কিছুদিন আগে পর্যন্ত তার নামে কেউ এই ধরনের বদনাম দিলে তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করতেন না। কিন্তু আজ আর সে বিশ্বাস নেই। তাহলেও এর এই দুর্বলতা অন্য লোকের কাছে প্রকাশ করতে তিনি চান না। ছেলেটি ইউনিয়নের কাজে মিশিরজীর দক্ষিণহস্ত। এই ঘটনা প্রকাশ করে ছেলেটিকে হারাতে তিনি চান না। সে যদি মালিক পক্ষের ইউনিয়নে চলে যায়, তাহলে মিশিরজীর ইউনিয়ন বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কাজেই গোড়ার দিকে কাউকেও তিনি সন্দেহের আভাস দিতে চান নি। দরোজায় তালা বন্ধ করে তিনি স্ত্রীর পরপুরুষাসক্তি দূর করতে ও সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বেশীদিন ব্যাপারটাকে গোপন রাখা গেল না। দরোজা বন্ধের কারণ জানবার জন্যে পীড়াপীড়ি করাতে স্ত্রীকে জানাতে বাধ্য হলেন মিশিরজী যে তিনি তার গোপন মিলনের সব খবর রাখেন এবং প্রেমিককেও চেনেন। স্ত্রী স্তম্ভিত হলেন। নারী জাতির অভিনয়দক্ষতা সম্বন্ধে মিশিরজীর জ্ঞানের অভাব ছিল না। স্ত্রীর অবাক-বিস্ময়াহত অবস্থা দেখে তাঁর পূর্ববিশ্বাসে কোনোরকম ফাটল ধরল না। প্রেমিকের নাম বলাতে স্ত্রী প্রথমটায় ভাবলেন স্বামী বোধ হয় তাঁর সংগে ঠাট্টা-পরিহাস করছেন; অনেকটা আশ্বস্ত বোধ করলেন। কিন্তু স্বামীর মুখমণ্ডলের চেহারা দেখে একটু পরেই তাঁর ভুল ভাঙল এবং তিনি রীতিমত ভয় পেয়ে গেলেন। স্ত্রীর অপরাধ ঢাকবার চেষ্টা দেখে মিশিরজী উগ্রমূর্তি ধারণ করে বললেন যে স্ত্রী অপরাধ স্বীকার করে দেশে ফিরে যেতে রাজী হন যদি তবে তিনি তাঁকে ক্ষমা করবেন। স্ত্রীর ভয় কাতর এবং স্বামীর মারমুখী অবস্থা দেখে তিনি ঘর থেকে পালিয়ে আত্মরক্ষা করতে চাইলেন। মিশিরজী দরোজা বন্ধ করে পথ রোধ করলেন। তাঁর তর্জনগর্জনে অন্যান্য ঘর থেকে লোক ছুটে এল। তারা দরোজায় ধাক্কা দিতে মিশিরজী আত্মসংবরণ করে দরোজা খুলে দিলেন। এরপর ব্যাপারটা আর গোপন থাকল না। আসল ব্যাপারটার অস্পষ্ট আভাস মিশিরজীর অন্তরঙ্গ বন্ধুরা তাঁর মুখেই শুনলেন, আর অন্যরা অনুমান করলেন। মিশিরজী সকলকে ঘর ছেড়ে চলে যেতে বললেন। মিশিরজীর নির্দেশ মেনে নিয়ে দুঃখিত ও বিস্মিত হয়ে যে যার ঘরে ফিরে গেলেন। এই রাত্রি থেকে নিয়মিত স্ত্রীর উপর তিনি অত্যাচার চালাতে লাগলেন। এক হাত প্লাস্টার করা, অন্য হাত খোলা। সেই খোলা ডান হাত দিয়ে স্ত্রীর হাত মুচড়ে ধরে তাঁকে যন্ত্রণায় অস্থির করে তুলতেন। স্ত্রী চেঁচিয়ে কাঁদতে পারতেন না। পাছে

পাশের ঘরের বাসিন্দার কানে শব্দ যায়, এই ভয়ে যতক্ষণ পারতেন সহ্য করে থাকতেন। তারপর চোখের জলে স্বামীর পা ভিজিয়ে শপথ করতেন যে আর ব্যভিচারে লিপ্ত হবেন না। স্ত্রীর স্বীকারোক্তি ও শপথের পর মিশিরজী নিশ্চিন্ত হয়ে নিদ্রা যেতেন। কয়েক রাত এই রকম চলার পর স্ত্রী একদিন মিশিরজীর এক বন্ধুর কাছে সব খুলে বললেন। বন্ধুটি সেইদিনই কয়েক মাইল দূরের এক পরিত্যক্ত বাগান-বাড়ীতে মিশিরজী ও তাঁর স্ত্রীকে রেখে এলেন। এই বাড়ীতে পুরুষ বলতে আছে শুধু অতি বৃদ্ধ এক মালী, কাজেই তাঁর মনে হল, এইবার মিশিরজীর সন্দেহবাতিক সারবে। কিন্তু মিশিরজী দু সপ্তাহের মধ্যেই বন্ধুকে জানালেন যে একবার ব্যভিচারে মত্ত হলে মেয়েদের কাণ্ডজ্ঞান বাছবিচার সবই লোপ পায়, ঐ অতিবৃদ্ধ মালীটিকেই স্ত্রী কন্দর্পকান্তি যুবক মনে করেছেন এবং তার সংগে সুযোগ পেলেই রতিক্রীড়ায় মেতে উঠছেন। এইবার ডাক্তারের পরামর্শ নেবার কথা মনে হল বন্ধুটির। ফলে ঘটল আমার সংগে যোগাযোগ।

এই ইতিহাস মিশিরজীকে দেখার আগে তাঁর বন্ধুটি আমাকে শোনালেন। এর পর ভদ্রলোককে দেখলাম। হাসাময় প্রশান্ত চেহারা। বুদ্ধিদীপ্ত চাহনি।

—অনর্থক আপনার হয়রানি। এ-ব্যাপার নিয়ে ডাক্তার কনসাল্ট করার কি আছে আমি জানি না। শুনেছেন তো সব?

এই বলে আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন। আমিও হেসে উত্তর দিলাম।

—কিছুটা শুনেছি। হয়রানির কথা ভাববেন না। এ রকম হয়রানি আপনারও কম হয় না নিশ্চয়ই। আপনার লাইনের অনেক কিছু নিয়েই তো আপনার বন্ধু-বান্ধবরা আপনার সংগে সলাপরামর্শ করে থাকেন।

—তা ঠিক। কিন্তু এখানে ফয়সালাতো হয়েই গেছে। ও সবই স্বীকার করেছে। কিছুতেই দেশে ফিরতে চাইছে না। এই ব্যাপারে আপনি কিছু করতে পারেন কিনা দেখুন।

—তাহলে একদিন মিসেসকে এখানে নিয়ে আসুন। দেখা যাক, কিছু করা যায় কিনা?

মিশিরজী রাজী হয়ে সেদিনের মত বিদায় নিলেন।

অধিকাংশ প্যারানইয়ার রোগীর মত মিশিরজী চিকিৎসা করাতে চান না। তাঁর কোনো অসুখ আছে বলে তিনি মনে করেন না। নেহাৎ দায়ে পড়ে, বন্ধুর অনুরোধ এড়াতে না পেরে আমার কাছে এসেছেন। মিশিরজীর সন্দেহ একেবারে ভিত্তিহীন বলে কিন্তু আমার মনে হল না।

পরদিন মিসেস মিশিরকে দেখে আমি হতবাক। ভদ্রমহিলা ঘোমটা দিয়ে আমার সামনের চেয়ারে এসে বসলেন, এবং আমার কথার জবাব দিতে লাগলেন। কিছু পরে আমার অনুরোধে ঘোমটা খুলতে তাঁর মুখশ্রী দেখলাম। মিশিরজী নিজে কয়েক মিনিট আগে এঁকে ঘরে এনে তাঁর স্ত্রী বলে পরিচয় করে দিয়েছেন। সংগের বন্ধুটিও অনুমোদন করেছেন। না হলে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারতাম না আমার সামনে বসা মহিলাটি মিশিরজীর স্ত্রী! কাঁচাপাকা চুল, মুখে বলিরেখা, সামনের দুটো দাঁত নেই। ভদ্রমহিলার বয়স অন্ততঃ ৫৫ হবেই। ভদ্রমহিলা নিজের মুখে বললেন তাঁর উমর কিঞ্চিৎ জেয়াদা। মিশিরজীর চেয়ে তিনি বয়সে বছরের বড়। মিশিরজী পাঁচ বছর বয়সে সতেরো বছরের ঊর্মিলার পাণিগ্রহণ করেন। ওঁদের দেশে এই রকম সাদির রেওয়াজ আছে।

এতক্ষণে বুঝলাম মিশিরজীর বন্ধুরা গোড়া থেকেই তাঁর সন্দেহবাতিক সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়েছিলেন কি কারণে। মিশিরজীর স্ত্রীর জরাজীর্ণ দেহশ্রী দর্শনে অনুকম্পা ছাড়া কারুর মনে অন্য কোনো রসের সঞ্চার ঘটতেই পারে না। অসুস্থ মনের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। মিশিরজী নিশ্চয়ই অসুস্থ, প্যারানইয়ায় ভুগছেন।

স্ত্রী ব্যভিচারিণী—এ ধারণা মস্তিষ্কে বদ্ধমূল হবার আগে স্ত্রীর রূপযৌবন অন্য পুরুষকে আকৃষ্ট করতে পারে, এই ভ্রান্ত বিশ্বাসে মিশিরজী আচ্ছন্ন হয়েছেন। মিশিরজীর সংগে কয়েকদিনের আলাপ-আলোচনার ফলে মিশিরজীর ডিলিউশনের শারীরবৃত্তিক ও বিকারতাত্ত্বিক কারণগুলোর হদিশ পাওয়া গেল। মিশিরজীর বিশ্বাস উৎপাদনে আমি সক্ষম হয়েছিলাম বলেই মিশিরজী খোলাখুলি সব বিষয়ে আমার সংগে আলোচনা করতেন। মিশিরজীকে আমার ভাল লেগেছিল, সেই কারণেই বোধ হয় তিনি আমার উপর আস্থা স্থাপন করতে পারলেন। মিশিরজী স্বভাবকবি। যে কোনো বিষয়ে মুখে মুখে উর্দু বয়েত তৈরী করতে পারেন। তার বয়েতগুলো সত্যিই আমাকে মুগ্ধ করল। আমি তাঁর গুণগ্রাহী, এটা সহজেই তিনি বুঝলেন, এবং আমাদের মধ্যে সুস্থ সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপিত হতে দেরী হল না।

প্রথম যৌবনে যখন দারোয়ানী চাকরী করতেন, তখন এবং পরে কোনো বছরই এক মাসের বেশী ছুটি পেতেন না। বছরে এই একমাস মাত্র স্ত্রীসম্ভাষণ করবার সুযোগ হত। সমবয়সী বাঙালী বাবুরা এই নিয়ে অনেক ঠাট্টাতামাসা করতেন। যারা বছরে একবার এক মাসের জন্যে বাড়ী যায় তাদের স্ত্রী এগারো মাস কিভাবে কাটায়—এই ছিল বন্ধুদের তামাসার বিষয়। মিশিরজী ঠাট্টা-তামাসায় যোগ দিতেন না বটে, কিন্তু কথাগুলো তাঁকে আহত করত। তিনি পিউরিটান টাইপের, গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তা বলে কাম-উত্তেজনা থেকে রেহাই পেতেন না। আত্ম-সংযম করতে খুবই বেগ পেতে হত। সন্ধ্যার পর রামায়ণ পড়ে নিজেকে শুদ্ধ রাখবার চেষ্টা করতেন। তাছাড়া, এই সময় থেকে ইউনিয়নের কাজে নেমে পড়েন এবং বাবুদের কাছে পড়াশুনো করতে থাকেন। দিনরাতে ষোলো ঘণ্টার বেশি মেহনত করতে হত। প্রথম দিকে পড়াশুনো, পরের দিকে আন্দোলন স্ট্রাইক গেট-মিটিং ইত্যাদির মধ্য দিয়ে দিনরাত কিভাবে কাটত, তিনি বুঝতেই পারতেন না। আত্মচিন্তা করার অবসর খুব কমই মিলত। কামাবেগ তাঁকে বিচলিত করলেও নীতিভ্রষ্ট করতে পারেনি। তাঁর চরিত্রে এই যৌন নিরাসক্তির দিকটি সঙ্গীসাথীদের কাছে তাঁকে শ্রদ্ধার পাত্র করে তুলেছিল। তিনি মনে করেন, শ্রমিক মহলে তাঁর প্রভাব প্রতিপত্তির মূলে তাঁর বাসনা চরিতার্থকরণে পরাঙ্মুখতা। বস্তি-বাসীরা এ ব্যাপারে সাধারণত উচ্ছৃঙ্খল, তাই সংযমের প্রতি তাঁদের এই অতি সমীহ ভাব। আর এই শ্রদ্ধা যাতে বজায় থাকে সেদিকে মিশিরজীর বিশেষ লক্ষ্য ছিল। সব সময়েই সঙ্গীসাথী চেলা-চামুণ্ডারা ঘিরে রাখত, অন্যের অজ্ঞাতসারে কোনো কিছু করার সুযোগও মিলত না।

কিন্তু স্ত্রীর কথা মনে পড়লেই তিনি শঙ্কিত হতেন। স্ত্রী লেখাপড়া জানেন না, গৃহকর্ম ছাড়া অন্য কোনো ব্যাপারে আগ্রহ নেই। যৌন-সংযম তাঁর পক্ষে কি সম্ভব? যৌন-উত্তেজনার বিকল্প কোনো উন্মাদনা (ধর্মীয় বা রাজনৈতিক) সমস্যকে প্রভাবিত করে না। কামচরিতার্থ করার সুযোগ-সুবিধাও তার বেশী। রামায়ণ-মহাভারতে মিশিরজীর দখল আছে। রামায়ণ মহাভারত পড়ে তিনি জেনেছেন নারীর কামাবেগ পুরুষের আট গুণ বেশী। কড়া বিধিনিষেধের মধ্যে না রাখলে স্ত্রী মাত্রেই বিপথগামিনী হতে পারে। ভীষ্ম-দেব থেকে মনু, সকলেই নাকি এই রকমই

১৯৭০ সালে আপনার ভাগ্য

আপনার ঠিকানাসহ একটি পোস্টকার্ড

Pt. DEV DUTT SHASTRI
Raj Jyotshi (AWC) P. B. 86
JULLUNDUR CITY

বলেছেন। এই সব চিন্তা মনে আসলেই তিনি অস্থির হয়ে পড়তেন। চিন্তা তাড়াবার জন্যে ক্লাবে আড্ডা দিতেন কিংবা কিছুক্ষণ কোনো সহকর্মীকে নিয়ে বস্তি পরিক্রমায় বেরিয়ে পড়তেন।

স্ত্রীর চরিত্রে সন্দেহ মিশিরজী অনেকদিন ধরেই করে আসছেন। তবে সন্দেহের মেঘ মনের আকাশে বাসা বাঁধতে পারেনি এতদিন। নানা রকমের যুক্তিতর্কের হাওয়ায় মেঘ উড়িয়ে দিয়েছেন, কাজের মধ্যে ডুবে গিয়ে সন্দেহ ভুলে থেকেছেন। দুর্ঘটনার পর স্ত্রী যখন কোলকাতায় এলেন তখন মিশিরজী হাসপাতালে। হাত ভেঙেছে, মাথায় চোট লেগেছে। যন্ত্রণায় অস্থির। ঘুমের ওষুধ দিয়ে তাঁকে আচ্ছন্ন করে রাখা হয়েছে। আচ্ছন্ন অবস্থায় তিনি স্বপ্ন দেখেছেন। নানা রকমের স্বপ্ন। স্বপ্নের মধ্যে সেবারতা নার্সকে দেখছেন, স্ত্রী নার্স হয়ে তাঁকে সেবা করছেন, কোনো সময়ে নার্স স্ত্রী হয়ে তাঁকে আদর করছেন। এই পিরিয়ডে টেম্পারেচর ছিল ১০৪—১০৫ ডিগ্রী। দেহের উত্তাপ ও ঘুমের ওষুধ, এই দুয়ের প্রভাবে সব সময়ে এক অদ্ভুত অনুভূতিতে তাঁর দেহমন ভরে থাকত। স্বপ্ন-কল্পনা-বাস্তব সব মিলিমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। গভীর রাতে তন্দ্রার মধ্যে অস্ফুট প্রেমগুঞ্জন শুনতে পেতেন। তাঁর ওয়ার্ডের তরুণী নার্সকে কে যেন প্রেম নিবেদন করছে। সত্যই এ রকম ব্যাপার ঘটত না তিনি স্বপ্ন দেখতেন? হয়ত এ সব উদ্ভ্রান্ত মস্তিষ্কের কল্পনা। কয়েকদিন পরে, (মিশিরজী তখন চলাফেরা করতে পারেন) অনেক রাত্রে তিনি একটি দৃশ্য দেখে চমকে উঠেছিলেন। করিডরের মধ্যে আলিঙ্গনাবদ্ধ মেয়েটিকে তিনি চিনতে পেরেছিলেন। অস্পষ্ট আলোতে পুরুষটিকে চিনতে পারেন নি। দুদিন পরে নিজের আস্তানায় ফিরে এলেন।

এবার নার্সিং-এর ভার পড়ল স্ত্রীর উপর। ঘুমের ঘোরে মাঝে মাঝে স্ত্রীকে তরুণী নার্স বলে ভুল করতে লাগলেন। এর কিছুদিন পর থেকে ডিলিউশনের আবির্ভাব। মিশিরজী তন্দ্রার মধ্যে অস্ফুট প্রেম নিবেদন শুনতে লাগলেন। জেগে উঠে পাশের ঘরের ছেলেটির সন্দেহজনক সঙ্কেত ইঙ্গিত শুনতে পেলেন। তাঁর মনে হতে লাগল স্ত্রী ঘুমের ভান করে পড়ে আছেন। মিশিরজী ঘুমিয়ে পড়লেই সংকেত অনুসারী প্রেমিকের সংগে মিলিত হবেন। কাজেই দরোজায় তালা লাগাতে বাধ্য হলেন।

প্রেমনিবেদন-শ্রবণ অডিটারী হ্যালুসিনেশন নয়, স্বপ্ন। সংকেত ইংগিতগুলো পাশের ঘরের ছেলেটির চলাফেরা, বাসনপত্র নাড়াচড়া শব্দের ভ্রান্ত ব্যাখ্যা : ডিলিউশন। এই সব ইতিহাস কয়েকদিন ধরে একটু একটু করে বললেন মিশিরজী। এর মধ্যে মনঃসংযোগ ক্ষমতা বাড়াবার জন্য মিশিরজী হিপনটিক সাজেশান নিতে রাজী হয়েছেন। অভিভাবনের ফলে তাঁর অনেক কিছু পুরনো ঘটনা মনে পড়ছে, হাসপাতালে তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় অনেক খুঁটিনাটি ব্যাপার তিনি আমাকে গুছিয়ে বলতে পারছেন।

মিশিরজীর ডিলিউশনের সুসমঞ্জস ব্যাখ্যা চলে কিনা দেখা যাক।

প্রথম জীবনেই মিশিরজীর মনে দুটি বিপরীতধর্মী আকর্ষণের আভাস দেখা দিয়েছিল। একদিকে শান্ত পারিবারিক জীবন, অন্যদিকে কর্মবহুল রাজনৈতিক জীবন। নিজের সতত পরিশ্রম ও অন্যান্য মানসিক ধর্মের গুণে রাজনৈতিক জীবনে যত প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে লাগলেন, পারিবারিক জীবন থেকে তত দূরে সরতে থাকলেন। স্ত্রীর প্রতি আকর্ষণ সন্দেহের রূপ নিতে লাগল। বন্ধুবান্ধবদের তরল পরিহাস, রামায়ণ-মহাভারতের আখ্যান, ভীষ্মদেবের মতামত, মনুর বিধান, সব মিলে সন্দেহ বাড়িয়ে দিল, সন্দেহ ক্রমশ দৃঢ়মূল হয়ে উঠল। সন্দেহ এ সময় মানসিক শান্তি নষ্ট করতে পারেনি, কিন্তু মস্তিষ্কের কতকগুলো কোষ ধীরে ধীরে সন্দেহের উদ্দীপনায় উত্তেজিত অবস্থায় অনড় হয়ে যেতে লাগল। এর পর রাজনৈতিক জীবনেও বিপর্যয় দেখা দিল। সোভিয়েত রাশিয়ায় ঘটল স্তালিন যুগের অবসান। এক সময়কার পরমপূজনীয় পরম শক্তিমান নেতার ইমেজ ভেঙে পড়ার ফলে মিশিরজী অস্থির ও সন্দেহাকুল হয়ে উঠলেন। বিশ্বাসের ভিতটাই তাঁর নড়ে গেল। নিকটতম বন্ধু, পরীক্ষিত কর্মীদের উপরও বিশ্বাস রাখা কঠিন মনে হল।

এই সময় দুর্ঘটনার ফলে মিশিরজী জখম হলেন। শারীরিক আঘাত ও নিস্তেজক ওষুধের প্রভাবে স্নায়ুতন্ত্র দুর্বল হয়ে পড়ল। মস্তিষ্কে উদ্ভূত হল সম্মোহন পর্বের তৃতীয় দশা, যাকে বলা হয় অতি স্ববিরোধী অবস্থা (আলট্রা-প্যারাডক্সিকাল ফেজ)। ডিলিউশন গঠনের প্রধান দুটি শর্ত প্রতিপালিত হল। মস্তিষ্কের কিছু কোষ উত্তেজিত অবস্থায় অনড়, আর নেমে এসেছে অতি স্ববিরোধী অবস্থা। হাসপাতালের দৃশ্যটি ও হাসপাতালের স্বপ্নগুলোও বিশেষভাবে ডিলিউশন সৃষ্টিতে সহায়তা করল। এই অবস্থায় বৃদ্ধাকে তরুণী মনে হওয়া, বাসনের শব্দকে প্রেমিকের সংকেত ভাবা মোটেই বিচিত্র নয়।

চিকিৎসার বিবরণ পাঠকদের কাছে কৌতূহলোদ্দীপক নাও লাগতে পারে জেনেও দুটো-একটা কথা বলতে হচ্ছে। ঘুমের ওষুধ বন্ধ হওয়ার ফলে মস্তিষ্কের অবস্থা ক্রমশ স্বাভাবিক হয়ে আসছিল। সম্মোহিত অবস্থায় অভিভাবন (হিপনটিক সাজেশন) সুস্থতাকে ত্বরান্বিত করল। অতিস্ববিরোধী অবস্থা কাটতে খুব দেরী হল না। লোলচর্ম পলিতকেশ বৃদ্ধার পক্ষে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া সম্ভব নয়, এটা মিশিরজী সহজেই বুঝলেন। আরো বুঝলেন যে, স্ত্রীর সেবা-শুশ্রূষাতে তিনি স্বস্তি বোধ করছিলেন। এই অস্থির রাজনৈতিক জীবনের প্রতি খানিকটা বিতৃষ্ণা এসেছিল, স্ত্রীর সেবা ও সান্নিধ্য শান্ত পারিবারিক জীবনের প্রতি আকর্ষণ বাড়াতে পারে, রাজনীতি থেকে পলায়নী মনোবৃত্তিকে প্রশ্রয় দিতে পারে; এই জন্যে শঙ্কিত। এর পর কয়েকদিন ধরে প্রেম, কাম, স্ত্রী-পুরুষের মানসিকতার পার্থক্য ইত্যাদি নিয়ে চলল বিস্তারিত আলোচনা। স্ত্রী-জাতির কামাধিক্য সম্পর্কিত ভ্রান্ত ধারণা ক্রমশ পরিবর্তিত হল। মিশিরজী সুস্থ হয়ে উঠলেন। তাঁর কর্মস্থল নিজের জেলাতে স্থানান্তরিত করলেন। রাজনৈতিক জীবন ও পারিবারিক জীবনের মধ্যে অনেকটা সংগতি স্থাপিত হল। ঘন-ঘন স্ত্রী ও সন্তানদের সঙ্গে দেখা হতে লাগল। চিকিৎসার প্রায় চার বছর পরেও তাঁকে সুস্থ দেখেছি। বর্তমানের খবর জানি না।

দ্বিতীয় ঘটনাটি সংক্ষেপে বলছি।

ঘটনাটির নায়ক কুমুদবাবু। কেন্দ্রীয় সরকারে চাকরী করেন। বয়স চল্লিশ, স্বাস্থ্যবান, সুপুরুষ। স্ত্রীর বয়স আটাশ, সুন্দরী না হলেও সুগঠিত দেহশ্রীর অধিকারিণী। কুমুদবাবুরা চার ভাই। যৌথ পরিবার। ছোট ভাই ছাত্র, আর সবাই রোজগার করেন। বাবা পেন্সন-ভোগী। বড় ভাই কুমুদবাবুর শিক্ষাদীক্ষা বুদ্ধি-রোজগার অন্য ভাইদের তুলনায় কম। মেজ ভাই সুরেশবাবু অধ্যাপক। তাঁর কাছ থেকে রোগের প্রাথমিক ইতিহাস জানলাম।

বছরখানেক ধরে রোগের সূত্রপাত। গত তিনমাস ধরে বাড়াবাড়ি চলছে। স্ত্রীর গায়ে হাত তুলছেন ও চেঁচামেচি শুরু করেছেন। আগে ছোট ভাই প্রবালকে সন্দেহ করতেন, বর্তমানে বাবাকেও সন্দেহ করতে শুরু করেছেন। প্রবালের বয়স আঠারো, তার ছ' বছর বয়সের সময় দাদার বিয়ে হয়। বৌদির খুব বাধ্য ছোটবেলা থেকেই। একসঙ্গে লুডো খেলে, সিনেমায় যায়। বৌদি তাকে ছোট ভাইয়ের মত ভালবাসেন। এক বছর আগেও দাদার উৎসাহে প্রবাল বৌদিকে নিয়ে সিনেমায় যেত। এখন প্রবালের দিকে তাকানোও বারণ। এ-ব্যাপারটা যতই কদর্য হোক, তবু কোনোরকমে সহ্য করা গেছে। বর্তমানে দাদার অত্যাচার অসহনীয় হয়ে উঠেছে। পাশের বাড়ীর লোকরাও অনেক কিছু বুঝতে পারছে। বাবা-মা একেবারে মুষড়ে পড়েছেন। পারিবারিক কেলেঙ্কারী চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। দাদার যে মাথা খারাপ হয়েছে, এ তিনি বুঝতে পারছেন না। অন্যেরাও বুঝবে বলে মনে হচ্ছে না। কি করে চিকিৎসার জন্যে আনা যায় তাও ঠিক করতে পারছেন না সুরেশবাবু।

অনেক আলোচনার পর ঠিক হল যে, তাঁর 'এ্যামিবিয়াসিস্'-এর জন্যে চিকিৎসা দরকার। এটা তাঁকে বোঝানো হবে। ভদ্রলোকের এক বন্ধু এ্যামেচার হোমিওপ্যাথ। তাঁর উপর কুমুদবাবুর বিশ্বাস অগাধ। তাঁর সঙ্গে কুমুদবাবুকে আনা হবে। কুমুদবাবু পেটের গোলমালের জন্যে আমার চিকিৎসাধীনে থাকতে রাজী হলেন।

ইতিমধ্যে কুমুদবাবুর স্ত্রী বাপের বাড়ী যাবার নাম করে আমার সঙ্গে দেখা করলেন। ভদ্রমহিলাকে দেখে বেশ বুদ্ধিমতী মনে হল। তাঁকে আমার প্ল্যান খুলে বললাম। তাঁর স্বামী তাঁর ব্যভিচার-প্রবৃত্তি দূর করার জন্যে যদি আমার কাছে চিকিৎসার জন্য আনতে চান, তিনি যেন রাজী হয়ে যান। স্বামীর 'সন্দেহবাতিক' তর্ক করে বা কান্নাকাটি করে দূর করা যাবে না। তিনি যেন দোষ স্বীকার-অস্বীকার কিছুই না করেন। আমি তাঁকে ওষুধ দেব, সাজেশান দেব। ভদ্রমহিলা এই চিকিৎসার অভিনয়ে অংশগ্রহণে রাজী হলেন।

কুমুদবাবু 'এ্যামিবিয়াসিস্' চিকিৎসা-প্রসঙ্গে দু-একদিনের মধ্যে নিজের যৌন-দুর্বলতার কথা স্বীকার করলেন এবং স্ত্রীর চরিত্র-দোষের কাহিনীও বিশদভাবে বর্ণনা করলেন। আমি মনোযোগ দিয়ে ভদ্রলোকের কথা শুনলাম, তাঁর দুর্ভাগ্যে সহানুভূতি প্রকাশ করলাম। আর বললাম, অতিরিক্ত কামপ্রবণতা একটা রোগ, এর চিকিৎসা আছে। কুমুদবাবু খুসী হলেন। আমি তাঁর কথা বিশ্বাস করাতে আমার উপর তাঁর আস্থা বাড়ল। তবে স্ত্রী চিকিৎসিত হতে চাইবেন বলে তাঁর মনে হল না। নিজের ব্যভিচারের ইতিহাস স্ত্রী গোপন রাখতে চান, কিছুতেই নিজের পাপ নিজমুখে স্বীকার করবেন না। তাহলে অবশ্য আমার আর কিছু করবার নেই, আমি জানালাম।

আমার নির্দেশমত স্ত্রী চিকিৎসা করাতে রাজী হলেন এক শর্তে। স্বামী তাঁর মিথ্যা সন্দেহ দূর করার জন্য চিকিৎসিত হবেন; এই হল তাঁর শর্ত। কুমুদবাবু আমার কাছে এসে পরামর্শ চাইলেন। স্ত্রীর চিকিৎসার জন্যে ত্যাগ স্বীকার করা উচিত, আমি পরামর্শ দিলাম। ভদ্রলোকও ভদ্রমহিলার মত চিকিৎসার অভিনয়ে অংশগ্রহণে রাজী হলেন। কেন রাজী হলেন? কারণ, তিনি স্ত্রীর উপর নির্ভরশীল, স্ত্রীকে ভালবাসেন; দ্বিতীয়ত নিজের যৌনদুর্বলতা দূর করার জন্য আমার সাহায্যকে তিনি মূল্যবান মনে করেছেন।

সত্যিই কি তিনি যৌনদুর্বলতায় ভুগছেন? এ-দুর্বলতা স্বাভিভাবনের ফল। এর মূলে আছে তাঁর হোমিওপ্যাথ বন্ধুর অসতর্ক মুহূর্তের একটি কথা। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বয়সের ব্যবধান পাঁচ বছরের বেশী হলে ফল ভাল হয় না। এই মত কোনো এক সেক্স-সাইকলজির বই থেকে কুমুদবাবুকে বন্ধুটি একদিন পড়ে শুনিয়েছিলেন। আরো বলেছিলেন, পুরুষ পঞ্চাশ বছরের পর অকর্মণ্য (যৌনশক্তির ব্যাপারে) হয়ে যায়, কিন্তু মেয়েদের কামেচ্ছা নাকি পঁয়তাল্লিশ বছরের পর বৃদ্ধি পায়। কি বই, কে লেখক কিছুই কুমুদবাবু বলতে পারেননি। তবে এই থেকে তাঁর দুশ্চিন্তার সূত্রপাত এবং যৌনক্ষমতার অবনতি ঘটতে থাকে। আর একটা কারণও ছিল। 'এ্যামিবিয়াসিস্'-এর রোগীদের অনেক ক্ষেত্রেই 'প্রিম্যাচিওর ইজাকুলেশন' ঘটে থাকে।

ভদ্রলোক ভাইদের মধ্যে কম শিক্ষিত ও কম রোজগার করেন, আগেই বলেছি। এর ফলে ভাইদের সম্পর্কে একটু ঈর্ষার ভাব তাঁর বরাবরই ছিল। হীনমন্যতা দেখা দিচ্ছিল। যৌনশক্তির ক্রমাবনতি এই হীনমন্যতাকে বাড়িয়ে তুলল। যৌনক্ষমতাকে উদ্দীপ্ত করতে কুমুদবাবু মাদক দ্রব্যের সেবনে অভ্যস্ত হলেন। মাদক দ্রব্য সাময়িক উত্তেজনা আনল বটে, কিন্তু স্নায়ুতন্ত্রকে নিস্তেজিত করে তুলল। ঘনঘন স্ত্রী-সহবাসের বাসনা হতে লাগল এবং সহবাস-সময় কমতে লাগল। শেষের দিকে স্ত্রী-সহবাসে রাজী হতেন না। দিনের বেলায় স্বামীর আহ্বান আসলে তিনি কোনো অছিলায় ঘর থেকে সরিয়ে গিয়ে প্রবালের সঙ্গে লুডো খেলতে বসে যেতেন। হীনমন্যতাবোধ ও মাদকের প্রভাবে এই সময় থেকে স্ত্রীর চরিত্রের উপর সন্দেহ হতে থাকে। তাঁর ডাকে কেন স্ত্রী সাড়া দিচ্ছেন না? ও'কে নিজের উপযুক্ত মনে করেন না নিশ্চয়ই। স্ত্রী বিয়ের পর পড়াশুনো করে গ্রাজুয়েট হয়েছেন, স্বামীরই উৎসাহে। স্বামী বি-এ ফেল করে চাকরীতে ঢুকেছিলেন, আর পরীক্ষা দেওয়া হয়নি। স্ত্রী বেশী শিক্ষিত, যৌবন-শক্তি তার বেশী। কমবয়সী ছেলেদের প্রতি আকর্ষণ স্বাভাবিক। এই সব চিন্তা অস্থির করে তুলল কুমুদবাবুকে। মাদকের মাত্রা বাড়তে লাগল, স্নায়ুতন্ত্রে অস্বাভাবিকতা দেখা দিল। সন্দেহ এখন প্রণালীবদ্ধ ডিলিউশনের আকার ধারণ করল। স্ত্রীকে এই সময় নিজের সন্দেহের কথা জানালেন। স্ত্রী কুপিত হয়ে ঝগড়া করলেন। সন্দেহ বাড়ল। স্ত্রী যত ব্যভিচারের কথা অস্বীকার করতে লাগল, ততই স্বামীর মনে ব্যভিচার-বিভ্রম দানা বেঁধে উঠতে লাগল। স্ত্রী অপমানিত বোধ করে সহবাসে অস্বীকৃত হলে কুমুদবাবু মারধোর শুরু করলেন। ক্রমে বাড়ীর লোকরা ব্যাপারটা জানল। বৃদ্ধ পিতার কানে কথাটা গেল। তিনি কুমুদবাবুকে ডেকে তীব্র ভর্ৎসনা করলেন এবং বললেন, অশুচি মন নিয়ে ভদ্রলোকের পাড়ায় তাঁর বাস করা উচিত নয়। ভদ্রলোক স্ত্রীকে নিয়ে হোটেলে উঠে যেতে মনস্থ করলেন, কিন্তু স্ত্রী রাজী হলেন না। সেই থেকে পিতাকেও স্ত্রীর প্রেমিক মনে করে আক্রোশে ফুলতে লাগলেন।

হীনমন্যতাবোধ, স্বামী-স্ত্রীর বয়সের পার্থক্য সম্বন্ধে অবৈজ্ঞানিক ধারণা, সর্বোপরি মাদক দ্রব্যে আসক্তি, কুমুদবাবুর প্যারানইয়া রোগের প্রধান কারণ এই তিনটি। মনে হয় তাঁর মস্তিষ্কের নিস্তেজনা ক্ষমতা প্রথম থেকেই কম ছিল। একরোখা কোপন স্বভাবের লোক তিনি। বুদ্ধিবৃত্তির প্রয়োগে কোনো কিছু বোঝবার চেষ্টা তিনি কম করতেন। এই সব মিলিয়ে মস্তিষ্কের মোহ বা ডিলিউশনের সৃষ্টি হয়েছিল। অফিসের কাজকর্মে বা বাইরের লোকের সঙ্গে কথাবার্তায় কুমুদবাবুর কোনো রকম ত্রুটি বা অস্বাভাবিকতা ধরা পড়েনি। চিকিৎসার আশানুরূপ ফল পাওয়া গিয়েছিল।

কুমুদবাবুর চিকিৎসার জন্যে যে কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করতে হল, সব ক্ষেত্রে ঐ রকম কৌশল সাফল্য লাভ করবে, এমন নয়। প্রত্যেকটি কেসই স্বতন্ত্র। আমার মনে হয়, কুমুদবাবু আমার কাছে খানিকটা ইচ্ছে করেই ধরা দিয়েছিলেন। স্ত্রীর ভালবাসা ফিরে পাওয়া এবং নিজের যৌনক্ষমতা ফিরে পাওয়া—দুই-ই তাঁর পক্ষে অত্যাবশ্যক হয়ে উঠেছিল।

—মনোবিদ

আমিষ নিরামিষ প্রাত্যহিক

প্রভাত দেবসরকার

বাজারের থলিটা বাঁ-হাতে ঝাগিয়ে ধরে ডান হাতের চেটোয় পয়সাগুলো গুনে নিতে গিয়ে শশধরবাবু যেন চমকে উঠলেন, একি, কত দিচ্ছ?

অম্লান বদনে দোকানদার বললে, ঠিক দিয়েছি, দেখে নেন-ন-ন।

চমকটা বিরক্তিতে রূপান্তরিত হল, শশধরবাবু বললেন, দেখে নেব কি, কত দিয়েছ তাই বল? এই তো—

খুচরো পয়সা সমেত হাতের চেটোটা শশধরবাবু দোকানীর মুখের ওপর বাড়িয়ে ধরলেন। যেন চোখে খোঁচা দিয়ে দেখাতে চান হিসেবের ভুলটা!

দোকানী যেন দেখেও দেখলো না, আর একজন খরিদ্দারকে ওজন মেপে দিতে লাগল। বড় ব্যস্ত!

আর বুঝি নিজেকে সামলাতে পারলেন না শশধরবাবু, চীৎকার করে বললেন, কত দাম নিলে 'হাফ' কিলোর জন্যে?

পঞ্চাশ-শ্ পয়সা! দোকানদার আর একজন খরিদ্দারের দিকে মন দিলে।

কাল কত নিয়েছিলে? আজ বেশি নিচ্ছ যে। রুক্ষস্বরে শশধরবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

দোকানী তেমনি অম্লান বদন, বললে কালকের কথা ভুলে যান বাবু! দাম বেড়ে গেছে!

হাতটা মুঠো করে গজ-গজ করে শশধরবাবু বললেন, রোজ রোজ দাম বাড়ছে? যত সব চোর্-র-র!

ব্যস, পাটা ছেড়ে দোকানী লাফিয়ে পড়ে আর কি, আশপাশ থেকে সবাই মিলে ধরাধরি করে দুজনকে আলাদা করে দিলে, বাজারের মুখে ভিড় জমে গেল, হঠাৎ গোলমালটা কিসের?

শশধরবাবু সাক্ষী মেনে বললেন, রোজ রোজ দাম বাড়বে, ওজনে কম দেবে, এদিকে কিছু বলতে পারবে না। দেখুন দিকি মজা! চোর তো ভাল কথা, ডাকাত বলা উচিত!

ওজনে কম হোক, দরে বেশি হোক, তবু যেন ক্রেতার পক্ষে চোর-ডাকাত আখ্যা দিয়ে বিক্রেতাকে কিছু বলা উচিত নয়। শশধরবাবু তাঁর পক্ষে কাউকে উচ্চবাচ্য করতে শুনলেন না। দোকানদার বরং তার হয়ে বলবার

অনেককে গেল, নয়ে না বনে অন্যত্র দেখতে পারেন, দর করতে পারেন, তা বলে অকথ্য গাল দেবেন এ কোনধারা ভদ্রতা! দোকানীর গলা সপ্তমে উঠলো।

শশধরবাবু ভিড় কাটিয়ে মাথা নিচু করে চটের থলিটা বাগিয়ে একদিকে সরে যেতে যেতে বললেন, ভদ্রতা! ভদ্রতা শেখাতে এসেছে সব! কত সব ভদ্র জানা আছে! চোরের সাক্ষী—

বাজার নয় যেন খুন্তি-সেঁকা গরম চাটু, যাতেই হাত দাও ছেঁকা লাগে! আলু, কুমড়ো, শাক-পাতা সবই দিন দিন দুর্মূল্য হয়ে উঠছে। আজ এক দর, কাল আর এক! বলবার কিছু নেই, পোষায় নাও, নইলে শূন্য থলি হাতে ফুটবলে লাথি-খাওয়ার মত ঘুরে বেড়াও, খোসামোদ কর, ছেঁড়া-ছিঁড়ি কর! তারপর বাড়ী যখন ফিরবে তখন দুটো উনুনের আঁচ পুড়ে ছাই হয়ে যাবে! সরমা তো মুখিয়েই আছে, এদিকে কয়লা বেশি পোড়ার জন্যে টিক-টিক করবে, বাজার গেলে তো আর ফেরবার নাম কর না!

হ্যাঁ, নাম করে না বটে! মনে হয় আর বুঝি সশরীরে বাজার নিয়ে বাড়ী ফিরতেও পারবে না! শূন্য থলি শূন্যই থেকে যাবে! অদ্ভুত নিয়ন্ত্রণ নিত্য-নৈমিত্তিক—আলুর পর, শাক; শাকের পর কুমড়ো কি লাউ, তারপর মাছ!—উঃ, যেন বারবার মেয়ে-মানুষের সূতিকাগারে যাওয়া, বারবার প্রতিজ্ঞা কি সঙ্কল্প করা, আর নয় এই শেষ! এই সুখ এই আনন্দ, এই জীবন?—না, চাই না!

আলুর বাঁধা দোকানগুলোর কোল ঘেঁসে সারি সারি সব্জিওলা, গ্রামের চাষী। বাঁধা-দোকান নয় বলে হয়তো দু-চার পয়সা এদিকে সস্তা! কিন্তু লোক চলাচলের পথটা বড় সংকীর্ণ, ভিড় বেশি, ঠেলাঠেলি, গুঁতোগুঁতি। তার ওপর পচা-ধসা আনাজের গলিত আবর্জনা, শব-সাধনার মত মাড়িয়ে যাও!

আরে মশাই ঠেলছেন কেন? সামনের লোকটি ঘুরে দাঁড়াবার চেষ্টা করেন।

আমি ঠেলছি? দেখছেন না পিছন থেকে ঠেলা দিচ্ছে!

দেখাদেখির কিছু নেই, ওরই মধ্যে পথ করে নিতে হবে, আপনাদের সব্জি-ওলাদের সঙ্গে দরদস্তুরও করতে হবে! সামনে-পিছনে লোক, যেন পচা জলে নর্দমার মুখ আটকে আছে, থৈ-থৈ করছে!

পাঁকাল মাছের মত ভিড়ে পাঁক ঠেলে এক ফাঁকে মুখ বাড়িয়ে শশধরবাবু চাষীদের কাছ থেকে কিছু সওদা করলেন। তারপর শিথিলপ্রাণশক্তায় ভিড়ের সঙ্গে মিশে হাঁটতে লাগলেন। মুখে বললেন, শালা বাজার নয়, নরক! অনেক পাপ করলে—

এই যে শশধরবাবু! বাজার হলো?

শশধরবাবু পরিচিত ভদ্রলোকের কথায় বাজারের থলিটা নাড়লেন। মুখোমুখি ভিড়টা যেন যুদ্ধ করছে। শশধরবাবু কাৎ হয়ে পাশ কাটালেন।

বাজারে পরিচিত অপরিচিত অনেকের সঙ্গেই দেখা হয়, লোকগুলোকে কেমন যেন মনে হয়, বাজারকরা মানুষ আর পাড়ার-হাঁটা মানুষ যেন এক নয়। ওই যে লোকটি আপ্যায়িত সুরে বললেন, বাজার হলো? ও'কে কেমন যেন বাজার-বিরত আর ব্যস্ত মনে হল, হাতভর্তি জিনিসে কেমন যেন ভারসাম্য রক্ষার জন্যে সচেষ্ট হয়ে আছেন। আর আশ্চর্য, স্পর্শকাতর ভদ্রলোকের! মাছের থলি শাক-সব্জির থলি দুটো দু'হাতে ধরেছেন যেন ছোঁয়াছুঁয়ি না হয়, কে জানে ঘরের গৃহিণীর শুচিবায়ুগ্রস্ততার জন্য কিনা!

ভিড় ঠেলে অপেক্ষাকৃত একটু ফাঁকা জায়গায় এসে বাজারের থলিটা দু' হাঁটুর মধ্যে চেপে ধরে কোমরের কষিটা শশধরবাবু ঠিক করে নিলেন। একটু নিশ্চিন্ত হয়ে মৃত্যু-পরোয়ানা পাওয়া জল্লাদের মত কৌতূহলে বাজারের ভিড়টা অবলোকন করলেন। আশ্চর্য, এত ভিড়ে দিব্যি লোক-জন যাওয়া-আসা করছে কোন অসুবিধা হচ্ছে না যেটুকু ঠেলাঠেলি বা ছোঁয়াছুঁয়ি যেন ধর্তব্যের মধ্যেই নয়! এই জীবন, প্রাত্যহিক!

'বাজারটা যদি রোজ কেউ করে দেয়?' তাহলে কি, যেন বাজারের মধ্যে দিশাহারা ব্যস্ত হয়ে শশধরবাবু কিছুতে সঠিক উত্তর খুঁজে পান না কোনদিন।

শশধরবাবু হঠাৎ খেঁকিয়ে উঠলেন, আরে মশাই আপনার থলিতে কি আছে, গায়ে ফুটছে যে! আঃ!—সামলে নিন—

ভদ্রলোক 'সরি' বলে পাশ কাটাবার চেষ্টা করতে খোঁচাটা যেন আরো জোরে লাগল, শশধরবাবু যন্ত্রণায় উঃ করে উঠলেন। কিছু ঠাহর করবার আগেই থলির মালিক ভিড়ের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

মাছের বাজারের দিকে পা-পা করে এগুতে এগুতে শরীরের খোঁচা লাগা জায়গা-টায় হাত বুলোতে বুলোতে কথাটা শশধর-বাবুর মনে পড়ে গেল—এতখানি জীবনে নিত্য বাজার করার বিশেষ একটি দিনের এক অভিজ্ঞতা! তাঁর বাজারের থলি থেকে কোন ফাঁকে বেসেড়া মরা টাংরা মাছের কাঁটা এক ভদ্রলোকের পাছার মধ্যে বিঁধে গিয়ে এক কাণ্ড বাধিয়ে ছিল—শেষটা দুজনকেই ডাক্তারখানায় গিয়ে সে-কাঁটা তুলতে হয়েছিল, মাছের দামের দ্বিগুণ ডিসপেনসারীর কম্পাউণ্ডারকে দিতে হয়েছিল। ইস্-স্ মাছ খাওয়ার সে এক নিদারুণ অভিজ্ঞতা। ছবিটা এখনো যেন চোখের ওপর ভেসে ওঠে—ভদ্রলোক যেই উঃ করলেন, শশধরবাবু বাজারের থলিটা বাগিয়ে ধরে পা আড়াল

দেবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু অত সহজে ছাড়া পেলেন না, ভদ্রলোকও আঃ অঃ করতে করতে তাঁর পিছু পিছু ছুটে এলেন, আর মশাই কি করছেন? গেলুম গেলুম! আপনার থলিতে কি?

আর থলিতে কি, শশধরবাবু প্রমাদ গুনলেন—অনেক দরদস্তুর করে তিন দিনের বাসি টাংরা মাছ কিনে থলির মধ্যে পুরে-ছিলেন, তখন ভাবেন নি চটের থলের মধ্যে সে ট্যাংরা মাছ জ্যান্ত হয়ে এমনি অঘটন ঘটাবে!

আর সেই থেকে শশধরবাবু প্রতিজ্ঞা করেছেন কখনো ট্যাংরা মাছ কিনবেন না, জ্যান্ত হোক, বাসি হোক, পচা হোক! সস্তা বা সুবিধা দরে পেলেও না!

হঠাৎ রাস্তায় কুকুরে পথচারীর পা কামড়ে ধরলে পথচারী যেমন করে পা ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে তেমনিভাবে ভদ্রলোক শশধরবাবুর থলি ধরে টানাটানি করছিলেন আর খেয়ো কুকুরের মত অবস্থা হয়েছিল সেদিন শশধরবাবুর —ছি, ছি! বাজার শুদ্ধ লোকের সামনে লজ্জার এক শেষ!

স্ত্রী সরমাকে শশধরবাবু কিছুতে বুঝিয়ে উঠতে পারেন না, আজ-কাল মাছ খাওয়া অনেক ঝামেলা, মাছের বাজার আগুন! যে পয়সায় মাছ খাবে সেই পয়সায় অন্য কিছু খাও।

একেবারে নির্বোধ মেয়েছেলে, মুখে-মুখে তর্ক করবে, অন্য কিছু মানে তা ঐ কচু-ঘেচু? ভাবি তো সপ্তায় দুদিন মাছ কেনা, তার এত কারণ কাবা! অত কথার দরকার কি! খাব না মাছ।

অনেকবার রাগ করে শশধরবাবু বলে-ছেন, খেও না! বাজার-হাট কর না তো, তাহলে বুঝতে মাছ খাওয়া কি, ভাল মাছ খেতে গেলে কত পয়সার দরকার হয়।

না, শাসানেও যেমন হোক, যে করে হোক শশধরবাবু কোলার মধ্যে সপ্তাহে দু-তিন দিন মাছ নিয়ে আসেন, কোন কোন দিন বুঝি ব্যতিক্রমও হয়, চার দিনও হয়ে যায়, সেদিন নিজেকে খুব স্বচ্ছল উদার মনে হয়। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক সহজ হয়।

আজ দিন নয়, তবু মনটা যেন মাছের বাজারের দিকে কেমন টানছে। মনে হচ্ছে, সত্যি এমন কারণ কাবা করে বেঁচে থেকে কোন লাভ নেই। মাছ খাবে না, দুধ খাবে না, তা হলে আর কি খেয়ে মানুষ বাঁচবে? সরমা ঝগড়া করে মিথ্যে বলে না—খাওয়া না গেলা! যত কোপ বাজারের পয়সার ওপর! সব জিনিসের দাম বাড়ছে, মাছের দাম বা বাড়বে না কেন? আর সংসারের সব বাড়তি খরচের বেলায় ধার-দেনা যে করেই হোক টাকা বেরয়, কিন্তু বাজারের বেলায় পয়সার কারণ-কাবা কাটছাঁট। কমাও 'ডেলী' বাজার,

ফটো : প্রদীপ সেন

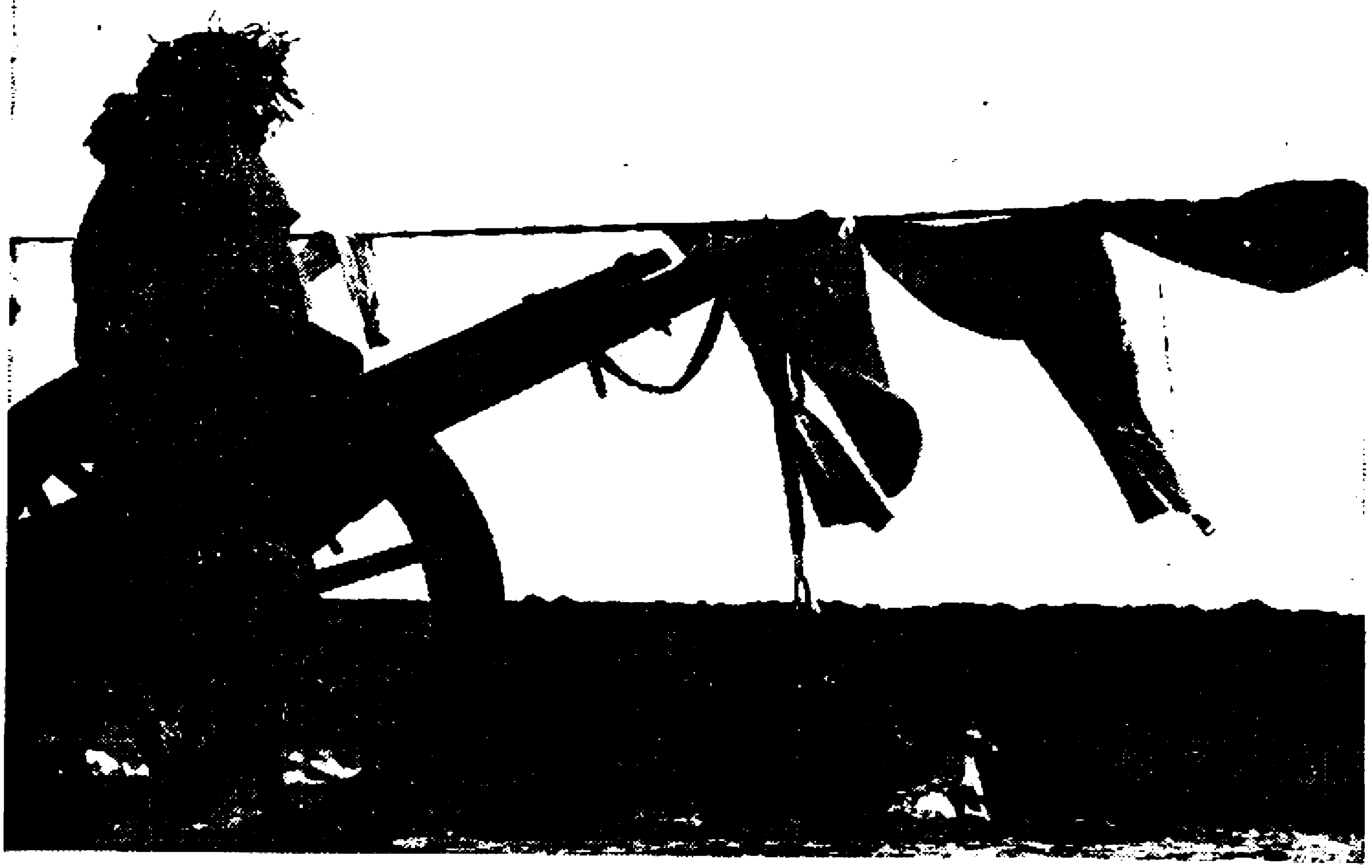

বাঁচাও পয়সা বাজারের। বুড়ো আঙুলে ঠেলে মানুষ কত ভাত খেতে পারে?

কিন্তু নিত্য বরাদ্দের আড়াই টাকার মাছ হয় কি করে? আট দশ টাকা যার কিলো তার কতটুকু ঐ বরাদ্দে সংগ্রহ করা যায়? সেকথা আর কে বুঝছে!

না, আজ শশধরবাবু মাছ কিনবেন, সরমাকে অবাক করে দেবেন। বুধবারে কেবল কচু-ঘেঁচুই তিনি নিত্য সওদা করেন না। তবে—

বেশ স্বাচ্ছন্দ্য প্রত্যয় নিয়ে শশধরবাবু মাছের বাজারের দিকে এগিয়ে গেলেন। যেন নিত্য তিনি মাছ কিনে থাকেন. বিশেষ দিনে বিশেষ বরাদ্দ তিনি আমিষের জন্যে করেন না। রোজ মাছ-ভাত খান।

মাছের বাজার নয়, যেন মার-মার, কাট-কাট করে পরের জমির দখল-নেওয়া! এত সব তবু সেখ লোকগুলো যেন মৌচাকে মাছির মত মাছওলাদের ছেঁকে ধরেছে। মেছো কাকে দেয়, কাকে না দেয়। হৈ-হৈ, গোলমাল। শশধরবাবু অনেকক্ষণ এক পাশে দাঁড়িয়ে দেখলেন, কারো পায়ের ফাঁক দিয়ে কারো ঝুড়ির রন্ধ্রপথে দৃষ্টি বুলিয়ে নিলেন। মাছগুলো বোধ হয় টাটকা, ধারে-কাছে কোন পুকুর থেকে ধরে আনা হয়েছে! ক্রেতারা খুবই উৎসাহিত. আহা এমন টাটকা মাছ বোধ হয় তারা কখনো দেখে নি। ভিড়ের পিছনে দাঁড়িয়ে শশধরবাবু যেন বাঙালীর এই আমিষ লোলুপতার জন্যে মনে মনে মজা পেলেন! সাধে অব বলে মাছ-ভাতে বাঙালী। মছলীখোর!

হঠাৎ কি হলো, অর্ধচক্রাকার ভিড়টা কেমন যেন ভাবড়াবেঁকা হয়ে গেল, মাছওলা যেন সামলাতে পারছে না, এদিক-ওদিক থেকে অধৈর্য ক্রেতারা এক-একটি মাছ তুলে নিয়ে বিক্রেতাকে ওজন করে দিতে তাড়া দিচ্ছে—মাছ ওজন করতে করতে মাছওলা যেন দিশাহারা হয়ে গেল, দৃষ্টি তার পাল্লার ওপর নিবদ্ধ!

শশধরবাবু হাত বাড়িয়ে হাত সরিয়ে নিলেন। না থাক, সবার হোক, তারপর নেবেন, তাড়া নেই। কিন্তু ভাল মাছগুলো সব উঠে যাচ্ছে. যে যেমন পাচ্ছে নিয়ে মেছোকে তাড়া দিচ্ছে, কই নাও, নাও ওজন কর!

পুষ্করিণীর ধারে বৃদ্ধ বকের মত শশধরবাবু নিবিষ্ট মনে অপেক্ষা করতে লাগলেন। মাছওলা লোকটাকে কোনদিন মাছের বাজারে দেখেছেন বলে মনে পড়ল না, হয়তো সুবিধে মত মাছ পেয়ে বাজারে ছুটে এসেছে. ঠিক শহুরে মাছওলা বলে মনেও হয় না, তেমন চালাক-চতুরও নয়, পয়সার হিসেবও ঠিকমত করতে পারছে না। মুখে বসন্তের দাগ, মাথার চুলগুলো এলো-মেলো অযত্ন লালিত খড়োপাতা যেন—গায়ের ফতুয়াটা বেশী জীর্ণ। ওজন করতে গিয়ে বারকতক দাঁড়িপাল্লার দড়ি ছিঁড়ে গেল, ক্রেতারা হৈ-হৈ করে উঠলো।

এদিকে বৃদ্ধ বক নড়েচড়ে উঠলো, কেউ লক্ষ্য করলে না। শশধরবাবু দম বন্ধ করে পেছন ফিরে যেন ছুটে দিলেন। বাজারের মুখে পাটের বসা আলুওলার সঙ্গে চোখা-চোখি হল। আলুওলা যেন কিছু বলবার জন্যে ইশারা করলে, শশধরবাবু গট গট করে বাজার থেকে বেরিয়ে পড়লেন। শালা ফেব!

সরমা অবাক হয়ে বললে, হঠাৎ এত মাছ? কি ব্যাপার? আজ তো—

শশধরবাবু কোন কথা বললেন না, স্ত্রীর হাত থেকে জল নিয়ে হাত ধুয়ে ঘরে এসে জামা খুলে বসলেন, তারপর চেঁচিয়ে বললেন, রোজ খাই না বলে একদিন বেশি

খাবার ইচ্ছা হয় না? কি ভাব আমাকে? মাছ কিনতে পারি না?

তর্ক করে লাভ নেই, সরমা মাছ কোটায় মন দিলে।...

সকালে আপিসের তাড়ায় আর শশধরবাবুর মাছ খাওয়া হয় নি। সরমা বলেছিল, রাত্তির বেলা মাছের কালিয়া করে খাওয়াবে, খুব করে রান্না করবে ঘি গরমমশলা দিয়ে—অনেকদিন পরে এতবড় মাছ এসেছে! সেই কবে খুকীর বিয়ের সময় বড় বড় মাছ এসেছিল, তাও কি নিজেদের মুখে উঠেছিল, পাঁচজনকে খাইয়ে নিজেরা হয়তো হাত চেটেছিল। তবু দেখে চক্ষু সার্থক, গর্ব, নিজেরা না খাক, পাঁচজনকে এত বড়ো মাছ খাওয়াতে পারছে। আর কথাটা মনে পড়লে এখনো সরমা কেমন লজ্জা পায়—কাজ-কর্মের বাড়িতে কোন্ ফাঁকে অতবড় জোকটা দুখানা ভাজা মাছ চুপিচুপি এনে কলঘরে ঢুকে বলে কিনা খেয়ে নাও, কেউ দেখবে না, আমি দাঁড়িয়ে আছি! সরমা কিছুতে ভাবতে পারে নি নিজের জিনিস নিয়ে সেদিন শশধর কেন অমন লুকোচুরি করেছিলেন।

মাছের কালিয়ার বাটিটা স্বামীর পাতের কাছে সাড়ম্বরে উপস্থাপিত করে সরমা বললে, আমরা সব ওবেলা দুখানা করে খেয়েছি, তুমি যেন আবার কারো জন্য পাতে রেখো না।

শশধরবাবু আড়চোখে স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে দেখলেন, আশ্চর্য খুশী খুশী, পরিতৃপ্ত মনে হচ্ছে আজ সরমাকে। যেন গৃহিণীপনায় আজই পরিপূর্ণ সুখ পেয়েছেন। যেন কোন অভাব বা অনটন নেই আর তাঁর সংসারে।

মাছের বাটিতে হাত দিয়ে কি ভাবলেন শশধরবাবু সামান্য মাছ তাঁর সংসারে আবহাওয়াটাই কেমন বদলে দিতে পারে! মাছের শক্তি এত—এত! ও! ও! কথাটা যেন মনের ভাবনার মধ্যে হোঁচট খেলে। কত দাম হবে মাছটার? শশধরবাবুর কত দিনের দৈনিক বাজার খরচ চলে যেত? এ মাছ পয়সা দিয়ে কিনে তাঁর মত অবস্থার লোকের কি ক্ষতি হয়, কি বেহিসেবী খরচ হয়? পাঁচ দিন তিন তিন করে না খেয়ে একদিন এমন করে খাওয়ার কি কোন মানে হয় না? কে জানে।

স্বামীর মুখের ভাব লক্ষ্য করে সরমা বললে, খেতে খেতে কি অত ভাবছো! সেই থেকে দেখছি—

মাছের বাটিতে হাত ডুবিয়ে শশধর বললেন, ভাবছি নাকি, তাই মনে হচ্ছে?

চট করে সরমা মাছের বাটিটা স্বামীর পাতের ওপর ঢেলে দিয়ে বললে, নাও নাও খেয়ে-দেয়ে ভেবো। একদিন খাবে বাপ্পা! কোথায় একটু স্ফূর্তি করে খাবে, তা নয় খেতে বসে যত রাজ্যের ভাবনা, যেন কি নয় কি খোয়া গেছে! কি না কি অন্যায় করেছো।

পাতের ওপর মাছের কালিয়ার ঝোল গড়িয়ে গেল, শশধরের যেন খেয়ালই নেই, ম্লান হেসে বললেন, কি আর খোয়া যাবে, আছেই বা কি!

তবে? সরমা তাড়া দিলে, নাও, খাও-ও!

শশধরবাবু আবার যেন থমকে অপেক্ষা করলেন, চারপাশ দেখে নিলেন, যতই আজ পাতে মাছ দিয়ে খাদ্যবস্তুর সমারোহ থাক, তাঁর ঘর-দোর-পরিবেশ তেমনি যেন দীনহীন! কতকাল যে বাড়ীঘর চুনকাম করা হয়নি, কতকাল দেওয়ালের পলেস্তারা খসে গেছে, কতকাল—

কিন্তু বেশ অল্পে সন্তুষ্ট এরা, খেতে-পরতে পেলেই যেন বর্তে যায়। কি খাতির এখন, খাও-খাও, মাথা খাও। আহা, কি আমার আপনার জন সব! কত যেন মমতা, মায়া!—এদিকে অনুষ্ঠানের ত্রুটী হলে আর রক্ষা নেই, কত আক্ষেপ, কত দুঃখ আপন জ্বালা আর একজনের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিল বলে। কেমন হিসেব কি পেয়েছে, কি পায় নি, —কত আক্ষেপ নিরামিষাশীর গৃহিণী বলে!

হঠাৎ চোর রত্নাকরের কথাটা শশধরের মনে হল। বেচারা অত পরিশ্রম আর পাপ করে সংসারযাত্রা নির্বাহ করলে, কেউ তার পাপের ভাগ নিলে না, না বাপ-মা, না স্ত্রী, না ছেলেমেয়ে।

এই মুহূর্তে যদি শশধরবাবু বলে ফেলেন, তাঁর মনটা ব্যক্ত করেন, সকাল থেকে যে বিপরীত কাজের সমর্থনে মনের মধ্যে নানা যুক্তির জাল বুনেছেন তা প্রকট করেন, তাহলে সরমা কি বলবে, মানবে কি শশধরবাবু অন্যায় কিছু করেন নি? মানে, তাঁর কাজের অংশ ভাগ নিচ্ছে সে!

সরমা তাড়া দিলে সেই বসে আছ? কি গো একদিন বাজারে বেশি পয়সা খরচ করেছ বলে দুঃখ হচ্ছে? আচ্ছা লোক যা হোক!

শশধরবাবু আর অপেক্ষা করলেন না।

মাছ মুখে দিয়ে 'ওয়াক' 'ওয়াক' করতে করতে পাত ছেড়ে উঠে পড়লেন, পেট যেন তাঁর ঘুলিয়ে উঠতে লাগল। সরমা কি বলবে না বলবে ভেবে পেল না। দুঃখ পেল এমন একটা দামী পদে এসে বেচারার খাওয়া নষ্ট হয়ে গেল! ভাল খাওয়া বরাতে নেই, সে আর কি করবে। লোকটা যেন কি, চিরজীবন কেবল হিসেব করেই গেল।

তারপর সংসারের পাট চুকলে, ছেলেমেয়েরা যে যার বিছানায় শুয়ে ঘুমে কাদা হয়ে গেলে, আলো নিবোলে অন্ধকার ঘরে সরমা যেন স্বামীকে ফিসফিস করে কি বললে। খাটের বিছানায় শুয়ে তখনো শশধরবাবুর চোখে ঘুম আসে নি, যেন শুয়ে শুয়ে খাওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে মনে মনে বিচার করে দেখছিলেন, আলো অন্ধকারে ঘরজোড়া মেঝের বিছানাটা কেমন যেন ব্লটিং কাগজে কালি জবড়ানো!

সরমার গলাটা কৌতুক যেন, খাওয়াটা তোমার মাটি হল! আপিস যাবার সময় যদি খেতে—

শশধরবাবুর ইচ্ছে করল, খাট থেকে লাফিয়ে পড়ে ঘর থেকে ছুটে যান, যেমন পালিয়ে এসেছিলেন সকালবেলা মাছের বাজার থেকে!

ফিসফিস গলাটা কেমন যেন কৈফিয়ৎ চাওয়ার মত মনে হল, অমন করলে কেন? ওয়াক তুললে, রান্না ভাল হয় নি।

পাশ ফিরে আনুনাসিক সুরে শশধরবাবু বললে, কেমন গন্ধ লাগল মাছটা, মনে হল—

কথাটা যেন অনেক আগে থেকে বলবে বলে সরমা ভেবে রেখেছিলেন, ছেলেমেয়েদের বিছানা ছেড়ে উঠে এসে স্বামীর গা ঘেঁসে শুয়ে বললে, তোমাকে বলবো মনে করেছিলুম, মাছটা তেমন ভাল ছিল না, গন্ধ আমারও লেগেছিল, কিন্তু তোমার মত নয়, দিব্যি খেয়ে নিলুম। পচা নয়, তবে নরম যেন। ছেলেমেয়েরাও কিছু বললে না, সব দুখানা করে খেলে, কি খুশী! অনেকদিন পরে তো!

স্ত্রীর অঙ্গস্পর্শটা যেন বিশেষ অস্বস্তির কারণ হল, দেহটাকে যথাসম্ভব সঙ্কুচিত করে শশধর বললে, পচা মাছ খেলে তোমরা?

সরমা যখন স্বামীকে স্পর্শ করে বললে, পয়সা দিয়ে কিনে ফেলে দেবো? কি যে বলো!

শশধরবাবু দম বধ করে উপুড় হয়ে বালিশ আঁকড়ে পড়ে রইলেন। সরমা অনেক চেষ্টা করে শশধরবাবুকে পাশ ফেরাতে না পেরে যেন রাগ করে বললে, তোমার একটুতেই ঘেন্না! গন্ধগন্ধবাই। এমন করলে যেন সত্যিকারের পচা মাছ তোমাকে রেঁধে দিইছি! বাবাঃ! যেন পোয়াতি মেয়ের 'ওয়াক তোলা' জল খেয়েও—

শশধরবাবু কোন সাড়া করলেন না! মাছটা পচা কি টাটকা সে বিচার করবার এখন আর কোন মুখ তাঁর নেই।

তারপর যেন ক্ষুব্ধ হয়ে স্বামীর বিছানা থেকে নেমে যেতে যেতে সরমা বললে, কাল মাছওয়ালাকে জিগ্যেস করো কেন সে পচা মাছ দিয়েছিল। খুব করে ধমকে দিয়ো—চোরামির জায়গা পায় নি? যত সব চোর কোথাকার!

শশধরের ইচ্ছে হল সরমার মুখটা টিপে ধরে, রাতদুপুরে জ্ঞান দিতে এসেছে!

কিন্তু হায়, তাঁর সে শক্তিও যেন নেই।

CENTRAL LIBRARY

নিজেরে হারায়ে খুঁজি

অহীন্দ্র চৌধুরী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

যাই হোক যেতে হবে দিল্লী। সুতরাং তীর্থের আকর্ষণে আর বসে থাকা নয়।

দিল্লীর স্টেশনে পৌঁছতেই সেমিনার কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে আমাদেরকে স্বাগত জানালো কিন্তু সর্বকিছুর মধ্যে আসল ব্যাপার হলো ভাবের আদান-প্রদান।

আগ্রায় এলেই মনটা কেমন একটা ব্যথায় ভরে যায়। হয়তো দু'এক ফোঁটা জলও ঝরে পড়ে চোখ দিয়ে। মুহূর্তে কেমন যেন আচ্ছন্ন হয়ে পড়ি। মনে হয়, আমি অহীন্দ্র চৌধুরী নই—বৃদ্ধ শাজাহান, আগ্রা দুর্গে বন্দী' জীবনে আমার একমাত্র সান্ত্বনা ওই প্রেমের মন্দির তাজমহল। হয়তো শাজাহানের ব্যথাটা নিজের মধ্যে গ্রহণ করেছিলাম, বলেই বোধহয় আমার নাটকের শাজাহান ব্যর্থ হয়নি। আমি তো জানি, মঞ্চে শাজাহান অভিনয় করতে কখনো মনে হয়নি, আমি অভিনয় করছি, মনে হয়েছে সত্যিই আমি ভারতসম্রাট শাজাহান।

যাক সে কথা। আগ্রায় এসে উঠেছি আগ্রা হোটেলে। হোটেল থেকে তাজমহল স্পষ্ট দেখা যায়।

দেখলাম ইতিহাসের স্মৃতির স্বাক্ষর। আগ্রা এবং তার আশেপাশে যা কিছু দর্শনীয় দেখেছি। দেখেছি আগ্রা ফোর্ট দেখেছি, 'সেকেন্দ্রা' দেখেছি মৃতনগরী ফতেপুর সিক্রী। ফতেপুর সিক্রীতে গেলে মনটা কেমন প্রস্তরীভূত হয়ে যায়। মনে হয়, কোথাও প্রাণের উত্তাপ নেই, চারদিক জুড়ে শুধু ইতিহাসের ব্যর্থ কান্না।

আগ্রায় দিন ফুরিয়ে এলো। ১১ মার্চ, আমরা আগ্রা থেকে রওনা হলাম কলকাতার পথে।

কলকাতায় এসেই আবার সেই নানা কাজের মধ্যে দিন কাটানো। আর ভালো লাগে না, এতো কাজ। তবু একেবারে লোকের বাইরে যেতে চাইছি না। থিয়েটার সিনেমা ছাড়তে চেয়েছি, হয়তো শীগগির ছেড়ে দেব। তখন সময় কাটানোর জন্যে অন্য কোন কাজ চাই তো। তাই আজকাল আমার নানা অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার পর্বটা বেড়ে গেছে।

থিয়েটার সেন্টার এক নাট্যোৎসবের আয়োজন করলে। আমাকে ভাষণ দিতে হলো অনুষ্ঠানে। কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায় উদ্বোধন করলেন অনুষ্ঠানের।

নীহারবালা সে আমলের বিখ্যাত অভিনেত্রী। মঞ্চে তাঁর জুড়ি ছিল না। কী অভিনয়ে, কী নাচে, গানে—মঞ্চে সে ছিল অদ্বিতীয়া। নীহারবালার মৃত্যুর খবর আমরা কেউই সহজভাবে নিতে পারিনি। নীহারবালার মৃত্যুর সঙ্গে সে আমলের সঙ্গে একটি যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে গেল।

যে নীহারবালা জীবনে অভিনয়কে ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন, যিনি অভিনেত্রী রূপে খ্যাতির শিখরে আরোহণ করেছিলেন—সেই অভিনেত্রী একদিন শুধু মঞ্চ ত্যাগ করে নয়, একেবারে সমাজ-সংসারের বাইরে চলে গিয়েছিলেন। জীবনের শেষ দিনগুলো কাটে শ্রীঅরবিন্দের পণ্ডিচেরী আশ্রমে। অভিনেত্রী নীহারবালার মৃত্যু হলো আশ্রমিকা রূপে। পণ্ডিচেরীর আশ্রমের পবিত্র পরিবেশেই তাঁর শেষনিঃশ্বাস পড়ে।

আমরা কলকাতায় বসে খবর পেলাম। দূর থেকে স্বর্গতা শিল্পীকে স্মরণ করলাম।

সঙ্গীত-নাটক আকাদমীর পশ্চিমবঙ্গ শাখার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয় বাংলা নববর্ষে। সেদিনের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় থেকে আরম্ভ করে বাংলা দেশের রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক জগতের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

এর মধ্যে একদিন রাজভবনে শেকসপীয়র সোসাইটির একটি সভা হয়। রাজ্যপাল উপস্থিত ছিলেন সেদিনের সভায়।

কঙ্কাবতীর ঘাট সে আমলের বিখ্যাত নাটক। এইটিই চিত্রে রূপায়িত হয়েছিল। যেটিতে আমি মিঃ মুখার্জির চরিত্রে রূপ দিয়েছিলাম। জীবনে যেসব চরিত্রে রূপ দিয়ে আনন্দ পেয়েছি, এইটি তার মধ্যে অন্যতম। চিত্রটি কলকাতায় মুক্তি পেল ১২ই আগস্ট।

বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর ডাকনাম হাবুল। আর সেই নামেই সে থিয়েটার মহলে পরিচিত। পরিচিত মানুষটি হারিয়ে গেল, কিন্তু নামটা হারিয়ে যাবার নয়। হাবুল এক সময়ে মঞ্চে যোগ দিয়েছিল প্রম্পটার হিসাবে, পরে অভিনেতা হিসাবে নাম করে। সে ছিল প্রত্যেকের কাছে প্রিয়। এই সবার প্রিয় মানুষটির মৃত্যুসংবাদ পেলাম ১২ আগস্ট তারিখে।

জীবনের রঙ্গমঞ্চ ছেড়ে এক-এক করে কতোজন চলে যাচ্ছে। যাদের সঙ্গে অভিনয় করেছি মঞ্চে, রং মেখেছি, সংলাপ উচ্চারণ করেছি—তারা যখন চলে যায়, তখন নিজের দিকে তাকিয়ে ভাবি, আমাকে আর কতোকাল এখানে থাকতে হবে। কিন্তু যাবো বললেই তো আমি পালিয়ে যেতে পারবো না। ডাক যতোদিন না আসবে আমাকে থাকতে হবে। তবে একটা ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছে। অনেকদিন থেকেই মনে করছিলাম, মঞ্চ ছেড়ে দেব, ছেড়ে দেব অভিনয় করা—এবার সত্যি বোধহয় অভিনয়জগতের বাইরে আসতে পারবো। এতোদিন মঞ্চে আমার পরিচয় ছিল অভিনেতা। পরিচয় হারিয়ে যায়নি, তবে আগে মঞ্চে দাঁড়াতাম অভিনেতা সেজে, আজকাল মঞ্চে দাঁড়াতে হয় বক্তা হিসেবে। একদিনের অভিনেতা, অন্যদিনের বক্তা। আর এই বক্তার মঞ্চ, 'আকাদমী'। আমাকে নাটকের ছাত্রদের পড়াতে হয়, অভিনয়-কলা সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে হয়। অভিনেতা অহীন্দ্র চৌধুরী এখন মাস্টার—মন্দ নয়।

অভিনেতার জাতকুল হয়েছে। আকাদমীর কাজ তো আছেই উপরন্তু বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যেতে হচ্ছে প্রায়ই। নাট্যাচার্য শিশির ভাদুড়ীকে পশ্চিম বংগ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা জানানো হলো স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে। আমাকে সভাপতিত্ব করতে হলো। শিশিরবাবুকে সম্বর্ধনা জানিয়ে, কংগ্রেস একজন সভাকার গুণীকে সম্বর্ধনা জানালেন। সেদিনের অনুষ্ঠানে, ও সি গাঙ্গুলী, সজনী দাস, বিমল সিংহ, সুনীতি চ্যাটার্জি, নরেন্দ্র দেব, কালিদাস রায়, তারাশংকর প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। এ-ছাড়া চিত্র ও মঞ্চ-জগতের অনেকেই ছিলেন সেদিনের উৎসব মণ্ডপে। সেদিনে শিশির সম্বর্ধনায় আমি শিশিরবাবুকে আমাদের অগ্রণী পথ-নির্দেশক বলে অভিহিত করেছিলাম। কিছুদিন বাদেই নাটাকার দেবনারায়ণ গুপ্তকে একটি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে স্টুডেন্ট হলে সম্বর্ধনা জানানো হয়। সেখানে আমি ছিলাম প্রধান অতিথি।

বাইরে যাবার সুযোগ খুঁজছিলাম সুযোগ করেও নিলাম। এবারে যাবো রাজস্থানের পথে। ভারতের ইতিহাস-তীর্থ রাজস্থান—যেখানে উষর মাটিতে আজও

বাতাসে ছড়িয়ে আছে ইতিহাসের নানা স্মৃতি।

রাজস্থান ভ্রমণ-সূচীর প্রথমেই এলাম বিখ্যাত জৈনতীর্থ মাউন্ট আবুতে।

প্রবাসে কোথাও এলে, স্থির থাকতে পারি না। এ অস্থিরতা আমার আজকের নয়। অনেকদিনের। আর এইজন্যেই বোধহয় ঘরের বাইরে ছুটে চলার এতো আগ্রহ আমার। তাছাড়া কোথাও বিশ্রামের অবসর যাপন করতে আসি না। মাউন্ট আবুতে এসে প্রথমেই আমাদের নির্দিষ্ট হোটেলে আশ্রয় নিলাম। তারপরই কোথায় কী দেখবো, তারও ছক ঠিক করে ফেললাম মনে মনে।

রাতটা হোটেলেই কাটলো নিশ্চিন্ত বিশ্রামে। দারুণ শীতের রাত। যেন শেষ হতে চায় না। তবু শেষ হলো। রাত ভোরে হোটেলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখলাম সূর্যোদয়।

সকালে আর কোথায় যাবো—হোটেলের কাছাকাছি কিছুক্ষণ বেড়ালাম। ঘুরতে ঘুরতে একবার বাজারের দিকেও গেলাম। তারপর দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর বিখ্যাত হ্রদ নক্কীতালাও দেখতে গেলাম। রমণীয় হ্রদ। পাহাড়ের মনোরম পাদদেশে পরম রমণীয় হ্রদে বিহার আর এক অভিজ্ঞতা। বিশেষ করে হ্রদের বুকে ছোট ছোট দ্বীপখণ্ডের পাশ দিয়ে যখন আমাদের স্পীড বোট-গুলো ছুটে চলছিল, তখন বারবার একটি কথাই মনে আসছিল, যদি এখানে এই নির্জন দ্বীপে দিনকতক থাকতে পারতম। কিন্তু এ চিন্তা ক্ষণিকের। এ চিন্তাকে কোনদিন বাস্তবে রূপ দিতে পারবো না। সুতরাং স্বপ্নবিলাসী মনকে পিছনে রেখে বাস্তব চিন্তায় ফিরে এসেছি। বস্তুবাদী মন নিয়ে দেখেছি চারদিকের রমণীয় পরি-বেশ। দেখেছি, যা কিছু দর্শনীয়।

অচলগড়ের কথা শুনেছি, দেখার আগ্রহও অনেকদিনের। তাছাড়া ইতিহাস-বিখ্যাত স্থানগুলো দেখবার জন্যে মনের মধ্যে বিশেষ আগ্রহ জমা হয়ে থাকে। চির-দিন নাটক করেছি, এবং ইতিহাস-আশ্রিত নাটকের চরিত্রে রূপ দিতে দিতে এমনই হয়ে গিয়েছি, যে ইতিহাসের কথা শুনলে সেই দিকেই ঝুঁকে পড়ি।

শিরোহী রাজপুতদের দুর্গ ছিল এই অচলগড়। যে দুর্গের ধ্বংসাবশেষ এখনো বর্তমান।

দুর্গ দেখলাম। দুর্গের পাথরে পাথরে পুরোনো ইতিহাসের কথা। কান পেতে শুনি সেই অব্যক্ত কথা।

ইতিহাসের স্মৃতিবিজড়িত এইসব দুর্গ দেখলে বারবার অতীতের রাজপুত শৌর্যের কথা মনে পড়ে। সে যুগ আমাদের চোখে অদেখা, কিন্তু এইসব জায়গায় এসে দাঁড়ালে সেদিনের অদেখা ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

আজকাল একটা ঝোঁক আমাকে পেয়ে বসেছে। ঝোঁকটা ছবি তোলার। যেখানেই যা কিছু সুন্দর—তার ছবিকে ক্যামেরায় ধরে রাখার ঝোঁক।

এবারে শারদোৎসবের দিনগুলি প্রবাসেই কাটছে। বাংলা দেশের পুজোর চেহারাটা এসব দেশে পাওয়া যায় না। তবে দশেরা উৎসবটি এসব দেশে জমকালো।

পুজোর মধ্যে একটি দিনে দিলওয়ারা মন্দির দেখতে গেলাম। এটি একটি জৈন তীর্থ। মর্মর পাথরে নির্মিত এই মন্দিরটি সত্যই দর্শনীয়।

বলেছি তো, আমার ছবি তোলার ঝোঁক। অনেকগুলি ছবি তুললাম।

প্রতিদিনই অভ্যাস মতো বেড়াতে যাই। আজ এখানে, কাল সেখানে। প্রবাসের দিনগুলো নানা রঙে ভরিয়ে তুলি।

বিজয়াদশমীর দিনে পাহাড়ী পথ ধরে বেড়াতে বেড়াতে এলাম লক্ষ্মী তলাও-এ। এদিক-ওদিক ঘুরে সৌন্দর্য উপভোগ করলাম। তারপর ফিরে এলাম নির্দিষ্ট আশ্রয়ে।

বিজয়াদশমীর পর একটা কাজ হলো, পরিচিত প্রিয়জনদের বিজয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানানো। অনেক চিঠি লিখলাম মাউন্ট আবু থেকে। দূরদেশে এলে কি হবে, পিছনের টান ঠিকই থাকে।

মাউন্ট আবু থেকে যোধপুরে রওনা হয়ে, যোধপুরে এসে পৌঁছলাম সন্ধ্যা সাড়ে ছটায়।

স্টেশন থেকে সার্কিট হাউস। আশ্রয় নিলাম সার্কিট হাউসে। সুন্দর ব্যবস্থা। কোথাও কোনো অসুবিধে নেই।

আজ আর বেড়ানো নয়, নিশ্চিন্ত বিশ্রাম। রাত নটায় রাতের আহার্য গ্রহণ করে শয্যা গ্রহণ করলাম। শুধু মাথায়—রাত ভোর হতে আবার বাইরে যাবার নেশা। সকাল সাড়ে সাতটায় স্নান ও প্রাতঃরাশ সেরে যোধপুরের দর্শনীয় স্থানগুলি পরি-দর্শনে বেরিয়ে পড়লাম।

জীপে করে পরিক্রমায় বেরিয়েছি। সঙ্গে গাইডরূপে পেয়েছি ইসাককে। প্রথমেই এলাম মহামন্দিরে। মহারাজার গুরু-মন্দির এটি। পথে দেখলাম ঐতিহাসিক যোধপুরের নানা দৃশ্যপট। প্রাচীন রাজধানী দেখলাম। রাঠোর রাজপুতদের স্মৃতি-বিজড়িত এই প্রাচীন রাজধানী। দেখলাম, রাজবাড়ী। দেখলাম, বিরাট হলঘর—যেখানে বিরাজ করছে ঐতিহাসিক শূন্যতা। প্রাচীন রাজধানীর অনেককিছুর মধ্যে আমাকে আকৃষ্ট করলো 'জেনানা মহল'। জেনানা মহলে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে অনু-ভব করলাম—এই প্রাসাদের পাষাণে পাষাণে কতো নারী-হৃদয়ের উত্তপ্ত নিঃশ্বাস মিশে রয়েছে।

ঘুরে ঘুরে দেখলাম, আরো যা কিছু দর্শনীয়, দেখলাম, রমণীয় উদ্যান, রমণীয় প্রাসাদ—সব আছে, কিন্তু সব কিছু আজ অতীতের স্মৃতি হয়ে গেছে। এখানে আর প্রাণ নেই, নেই উচ্চারিত কণ্ঠস্বর—যা আছে তা যেন দীর্ঘনিঃশ্বাসের মতো। প্রাণ অজিত সিংহের স্মৃতিসৌধটি দেখে এই কথাটাই মনে হলো।

যোধপুরে আর একটি স্থান সুন্দর লাগলো। এটি হলো কৃত্রিম হ্রদ 'বাল সমুদ্র'। মরুভূমির দেশে এই রমণীয় হ্রদের আকর্ষণ কম নয়।

এর পর এলাম যোধপুর দুর্গে। যেখানে সর্বত্র ছড়িয়ে আছে, জড়িয়ে আছে রাজপুত যুগের নানা কাহিনী। আজ সবটাই অতীত, তবু বর্তমানের পথিক আমি, আগ্রহভরে সব কিছুই দেখি।

যোধপুর দুর্গ থেকে আমরা এলাম মহারাজা যশোবন্ত সিংহের স্মৃতি-বিজড়িত প্রাসাদ দেখতে। আমার অভিনয় জীবনে শাজাহান নাটকে এই চরিত্রটি উচ্চ কণ্ঠে কতো কল্পিত সংলাপ উচ্চারণ করেছে—আজ চোখের সামনে ইতিহাসের সেই রাজপুত বীরের অনুচ্চারিত সংলাপ শুনলাম। যে নাটককেও হার মানায়। এখানে আমি অভিনেতা নই, এখানে ভারত সম্রাটের 'মেক-আপ' নিয়ে আসিনি। এখানে নির্বাক নাটকের দর্শক আমি। আমি দেখছি—আমি কান পেতে নয়, হৃদয়ের সূক্ষ্ম উপলব্ধিতে শুনছি, যশোবন্ত সিংহের জলদ গম্ভীর কণ্ঠস্বর।

রাতের মধ্যে আমার কাছে শরতের কোজাগরী পূর্ণিমার রাতটাই সবচেয়ে রমণীয়। এই রাতের তুলনা নেই।

এবারে কোজাগরী পূর্ণিমার সৌন্দর্য আমি উপভোগ করছি রাজস্থানের উষর পরিবেশে।

রাজস্থানের মানুষের কাছে দিনরাতের কী মূল্যায়ন, তার খবর রাখি না—তবে আমার কাছে রাজস্থানের রাতের তুলনা নেই। রাত এখানে আমার কাছে একটা বিরাট সান্ত্বনা।

এই দিনে আমরা দর্শন করলাম বৈষ্ণবদের প্রিয় মন্দির—দেবতা যেখানে কুঞ্জবিহারী। তারপর দেখলাম এখানকার হ্রদসদৃশ একটি মনোরম জলাধার।

যোধপুর থেকে চল্লিশ মাইল উত্তরে মরুভূমির মধ্যে দর্শনীয় স্থান ওসিয়া। আমাদের ওসিয়ার সহযাত্রী প্রসাদবাবু এবং তাঁর এক ডাক্তার বন্ধু।

বন্ধুর পথ ধরে আমরা চলেছি ওসিয়ার দিকে। পথের দুধারে ছড়িয়ে রয়েছে উষর এলাকা। যাকে মরুভূমি বললেও ভুল হয় না। মাঝে মাঝে দেখছি ছোট ছোট জনপদ, দেখছি সবুজ উদ্যানের স্পর্শ। দেখছি উটের মিছিল।

এই রুক্ষতা—তবু তার মধ্যে কী যেন এক সৌন্দর্য লুকিয়ে আছে, যা রাজস্থান ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় না।

চলতি পথে দেখলাম, একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা। এটি আর কিছু নয়—বিবাহের শোভাযাত্রা। রাজপুত যুবক চলেছে বিয়ে করতে। পরনে মূল্যবান বর্ণাঢ্য পোশাক—সঙ্গে যাঁরা চলেছে তাঁরাও কম যায় না। দেখতে ভারি সুন্দর লাগলো। মনে হলো কোন রূপদক্ষ শিল্পীর আঁকা বহু বর্ণে রঞ্জিত ছবি দেখলাম।

বন্ধুর পথ অতিক্রম করে যখন ওসিয়া পৌঁছলাম তখন বেলা পৌনে বারোটা।

এখানে এসে প্রথমেই গেলাম চামুণ্ডা মন্দিরে। সুন্দর মন্দির। চারদিকে দুর্গ-প্রাকারের মতো সুউচ্চ প্রাচীর-দেশ। দেখলাম মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে। পূজো দিলাম—প্রণাম করলাম দেবীকে। তারপর এলাম অন্যত্র। যেখানে সুন্দর একটি দীর্ঘিকা। যেখানে 'গাগরী ভরণে' এসেছে রাজপুতবালারা।

রাজপুতেরা রং ভালোবাসে। তাদের পোশাকে তাই নানা রঙের বিন্যাস।

সত্যিই বিচিত্র এই ভারতবর্ষ। একটি বিরাট দেশ, বিরাট জাতি—যার বৈচিত্র্যের অন্ত নেই। নানা বৈচিত্র্যের মধ্যেও এদেশে সমন্বয়ের সুর।

সুদূর বাংলাদেশ থেকে রাজস্থানে এসেছি। দেখছি যা কিছু দেখার। সংগ্রহ করছি যা কিছু পাই। আমার সংগ্রহশালায় গোটা ভারতবর্ষকে বন্দী করার ইচ্ছা। যেখানে যা কিছু পেয়েছি, তার মধ্যে কিছু না হোক, একটি চিহ্নও সংগ্রহ করে এনেছি। রেখেছি আমার ব্যক্তিগত সংগ্রহশালায়। আর কিছুর জন্যে নয়—জীবনে যখন চার দেয়ালে বন্দী হয়ে থাকবো—তখন এইসব চিহ্নের মধ্যে আমি ভারতবর্ষকে দেখবো এই ইচ্ছা। আরো একটি ইচ্ছা—হয়তো এই সবের মধ্যে আমি একজনকে আবিষ্কার করবো, যার পরিচয় পথিক অহীন্দ্র চৌধুরী।

চলতি পথে ছেদ চিহ্ন টানতে আমার মন চায় না। এবারে আমি চলেছি উদয়পুরের পথে।

উদয়পুর রাজপুত বীরদের স্মৃতি নিয়ে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অমর।

উদয়পুরের আকর্ষণ আমার কাছে কোন জায়গার চেয়ে কম নয়। রাজপুত রাণাদের উত্থান-পতনের বহু কাহিনী জড়িয়ে আছে এখানকার প্রাসাদে, রাজপথে, উষর মরুপ্রান্তে।

শহর দেখলাম। প্রাচীনত্বের গন্ধ সর্বত্র ছড়ানো। দেখলাম, রাণা অমর সিংহের প্রাসাদ, দেখলাম জয় সমুদ্র, রাজ সমুদ্র, দেখলাম রাণাদের পূজিত দেবতা একলিঙ্গেশ্বর। শহর থেকে এই মন্দির বেশ কিছু দূরে।

আরো দেখলাম, মোগল সম্রাট শাজাহানের সহেলীবাগ। যেখানে শাজাহান নর্তকীদের নিয়ে প্রমোদে মত্ত থাকতেন। আজ সে সাম্রাজ্য নেই, নেই সম্রাট শাজাহান। কিন্তু তাঁর স্মৃতিটা এখনো জড়িয়ে আছে সহেলীবাগে।

সহেলীবাগ মনোরম উদ্যানে দাঁড়িয়ে মনে-মনে দেখছি সেদিনের কল্পিত ছবি। দেখছি, যেন সম্রাট এসেছেন সহেলীবাগে—তাঁকে ঘিরে ক্রীতদাসীরা, যার মধ্যে অজস্র সুন্দর মুখ রয়েছে, দেখছি—সুন্দরী নর্তকীরা শাজাহানকে ঘিরে আছে নৃত্যের ভঙ্গিমায়, সম্রাটের নির্দেশ পেলেই শুরু হবে নৃত্য।

কিন্তু পরক্ষণে কল্পনার ছবিটা মন থেকে সরে যায়। মনে হয়, বাস্তবে যা ঘটতো—হয়তো আমার কল্পনা সেখানে পৌঁছতে পারবে না।

বেশ কয়েকটা দিন উদয়পুরে কাটলো। দেখলাম অনেক কিছু। কিন্তু অমর সিংহের বিরাট প্রাসাদে এসে দাঁড়াতে একটা কথাই মনে হয়েছিল, ইতিহাস একবিন্দুতে স্থির থাকে না। ইতিহাস তলিয়ে যায়, তার স্বাভাবিক পথে। পড়ে থাকে ইতিহাস—শুধু স্মৃতি হয়ে।

চিতোরগড় দেখার স্বপ্ন আমার অনেক দিনের। সেই স্বপ্নের চিতোরগড়ে এসে পৌঁছলাম নভেম্বরের এক শীতের দুপুরে।

স্থানীয় ডাকবাংলোতে আমাদের আশ্রয় নির্দিষ্ট হয়েছে। কিন্তু এখানে এসেই অনেকের কাছ থেকেই একটি কথাই শুনলাম। যে ডাকবাংলোর চেয়ে রেলওয়ে রিটায়ারিং-এ থাকা ভালো। তখন সহকারী স্টেশন মাস্টার একজন বাঙালী যুবক। সে-ও বার-বার বলতে লাগলো, ডাকবাংলো যেখানে, জায়গাটা বড় নির্জন। তার চেয়ে রিটায়ারিং রুমে থাকুন। শুধু নির্জন নয়, রাতেরবেলা এখানে নানা রকম উপদ্রব ঘটাও অসম্ভব নয়।

যাই হোক শেষ পর্যন্ত ডাকবাংলোয় আর থাকা হলো না।

চিতোরগড় রাজপুত ইতিহাসের পাতায় একটি বিশেষ স্থান নিয়ে আছে। রাজপুত বীররা এই চিতোরগড় রক্ষা করতে আত্মবলিদান দিয়ে একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। সেই আত্মবলিদানের দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। চিতোরগড় শুধু রাজপুতদের কাছে নয়, সারা ভারতের দেশপ্রেমিকের কাছে শহীদ-তীর্থ। স্বাধীনতাকামী রাজপুতদের রক্ত ঝরেছে রাজস্থানের মাটিতে, বীরাঙ্গনারা জহরব্রত অবলম্বন করে বীরপুরুষদের অনুগামিনী হয়েছে।

নানা কথা মনের মধ্যে নিয়ে আমরা ভ্রমণে বেরিয়েছি। চিতোরগড়ের প্রধান ফটকের কাছে এসে দাঁড়ালাম এক সময়। এখানে সম্রাট আকবরের সঙ্গে যুদ্ধে সুরযমল আর বাদল প্রাণত্যাগ করেছিলেন। রাজপুতবীরদের রক্ত ঝরেছিল যেখানে, সেখানে রয়েছে স্মৃতিফলক। শুধু এক জায়গায় নয়, চিতোরগড়ে এমন অনেক স্মৃতিফলক রয়েছে। যেখানে পাথরে খোদিত রয়েছে সেই অমর বীরদের কথা।

নওলক্ষ ভাণ্ডার দেখলাম, দেখলাম রাণাকুম্ভের প্রাসাদ, দেখলাম ধাত্রীপান্নার মহল। দেখলাম পূজামণ্ডপ, দেখলাম দরবার গৃহ, দেখলাম অতীতের অনেক ধ্বংসাবশেষ।

মীরাবাঈ—ভারতের আধ্যাত্মিক জগতের সম্রাজ্ঞী। মীরাবাঈ-এর স্মৃতি-বিজড়িত গিরিধারী মন্দির দেখলাম। দেখলাম ভক্তিমতী মীরার মর্মর মূর্তি। মনটা ভরে গেল।

চিতোরের জয়স্তম্ভটি আজ দু চোখে প্রত্যক্ষ করলাম। দেখতে গেলাম কালিকা মাতার মন্দির। দেখলাম সন্ধ্যা দেবী এবং চিতোরেশ্বরী। রাজপুতেরাও ছিলেন শক্তির পূজারী।

এতো দেখলাম, এতো ঘুরলাম—কিন্তু পদ্মিনী মহলে এসে যেন আর এক জগতে হারিয়ে গেলাম। রাণী পদ্মিনীর নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে একটি করুণ কাহিনী। তবুও দেখলাম। পদ্মিনী মহলের পাথর-পাথরে কান পেতে শুনলাম, পদ্মিনীর অব্যক্ত কথা। তারপর ব্যথাতুর মন নিয়ে এলাম হাওয়াই মহলে। যেখানে এসে মনের ব্যথাটা দূরে সরিয়ে ফেললাম।

এতো দূর দেশে এসেছি। দেখছি কতো ঐতিহাসিক স্থান; কিন্তু এই দেখার মধ্যেও স্টেশনের সহকারী স্টেশন মাস্টার জনৈক চৌধুরীর ছোট্ট সুন্দর সংসারটিও আমাকে কম মুগ্ধ করে নি।

চৌধুরীর ছোট্ট সংসার—ঘরে সুন্দরী তরুণী স্ত্রী। আর আছে এক রাজপুতানী—যে ঘর-কন্নার কাজে এদের সাহায্য করে। এই ছোট্ট সংসারের পরিবেশে এসে আমি বাংলা দেশকে খুঁজে পেলাম।

কতোদিন হয়ে গেছে, স্মৃতির দরজা খুললে এখনো দেখতে পাই—মনের কোণে ঠাণ্ডা পানীয় হাতে দাঁড়িয়ে আছে সেই তরুণী বাঙালী বধূটি। মুখে যার ভীরু লজ্জা মেশানো হাসি।

এই স্মৃতি নিয়ে আছি। স্মৃতির মধ্যেই নিজেকে আবিষ্কার করি। আমারই স্মৃতির দর্পণে, আমারই নানা রূপ—সে যেন এক অপরূপ দৃশ্য।

বেরিয়েছি ভ্রমণে। কোথাও আমি তখন স্থির নই। এবারে আমরা চললাম মহাতীর্থ পুষ্কর এবং সাবিত্রী দর্শন করতে।

পুষ্করে এসে প্রথমে দর্শন করলাম রঙ্গজীর মন্দির। দাক্ষিণাত্যের স্থাপত্য রীতিতে গঠিত মন্দির। যেখানে রয়েছে বিরাট গোপুরম।

দেখলাম পুষ্করের হ্রদ এবং ব্রহ্মা মন্দির। ব্রহ্মা এবং গায়ত্রী—বিশ্বপিতা এবং বিশ্বমাতার প্রতীক। এখানে দেখা হলো ভাটপাড়ার একটি দলের সঙ্গে। যাঁরা তীর্থদর্শনে বেরিয়েছেন। ওঁরা আগ্রহভরে আমার ছবিও নিলে। দূরদেশে এসে বাংলা দেশের মানুষ দেখে আনন্দ হলো। আবার তাদের ছবিও আমি তুললাম।

এবারে সাবিত্রী পাহাড়ে ওঠার পালা। আগে হলে হয়তো পায়ে হেঁটেই উঠতাম। কিন্তু এখন আর সে সামর্থ্য নেই। অগত্যা আমরা ডুলি করে নিলাম।

পাহাড়ের ওপরে উঠেছি। দর্শন করেছি মন্দিরের দেবীকে। এখানেও অনেক বাঙালী তীর্থযাত্রীর সঙ্গে দেখা হলো।

(ক্রমশঃ)

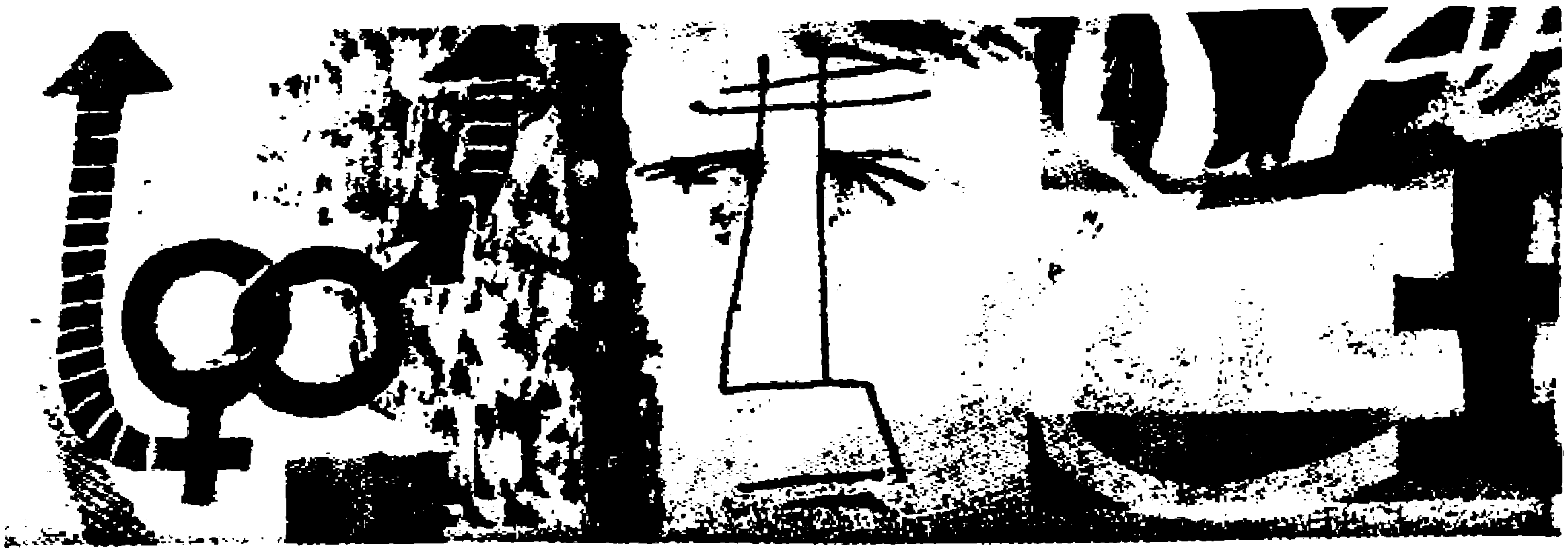

বিজ্ঞানের কথা

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে অন্য চিন্তা

'নিউ সায়েন্টিস্ট' পত্রিকার গত ১লা অক্টোবরের সংখ্যায় গিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিদ্যা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক হ্যারল্ড এ ব্রেটন জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। প্রবন্ধটির নাম 'জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ না সামাজিক বিপ্লব?' ইংরেজি ফার্টিলিটি কন্ট্রোল-এর বাংলা এখানে করা হয়েছে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ। যে-ব্যাপারটি তিনি বোঝাতে চাইছেন তা আমাদের দেশে পরিবার পরিকল্পনা নামে সাড়ম্বরে চালু রয়েছে। লাল ত্রিকোণ মার্কা প্রচারের দৌলতে আমরা সবাই জেনে গিয়েছি, ছোট পরিবারই সুখী পরিবার, দুটি বা বড়ো জোর তিনটি সন্তানের বেশি কখনোই নয়, ইত্যাদি ইত্যাদি। উপায়টিও নাগাল ও সামর্থ্যের মধ্যে, মাত্র পাঁচ পয়সার একটি —নিরোধ! পরিবার পরিকল্পনার পক্ষ নিয়ে কথা বলছেন জ্ঞানী/চিন্তাশীল ও দূরদর্শী ব্যক্তিরাও। এ-অবস্থায় আমরা সাধারণ মানুষেরা মোটামুটি এই ধারণা বদ্ধমূল করতে পেরেছি যে দেশের সুখী ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার পথ হচ্ছে পরিবার পরিকল্পনা। এ-বিষয়ে যে অন্য বক্তব্যও থাকতে পারে তা জানার সুযোগ আমাদের বিশেষ নেই। অধ্যাপক ব্রেটন এই অন্য বক্তব্যকেই তুলে ধরেছেন যথেষ্ট জোরের সঙ্গে। এ-সপ্তাহে বিজ্ঞানের কথার পাঠকদের সামনে এই বক্তব্যটি রাখতে চাই। গত ২২শ সংখ্যায় 'জনসংখ্যার তত্ত্ব ও তথ্য' শিরোনামায় যে আলোচনা তুলেছিলাম তা এইসঙ্গে মনে রাখলে অধ্যাপক ব্রেটনের বক্তব্যের জোর ও ধার আরো স্পষ্ট হবে।

ইতিহাসের পরিহাস বলতে হবে, ম্যালথাস যে-সময়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধির বিরুদ্ধে কামান দাগতে শুরু করেছিলেন সে-সময়েই ক্যারিবীয় অঞ্চলে ব্রিটিশ বাগানে নিগ্রো দাসদের ঘরে প্রতিটি শিশুর জন্মের জন্যে ভারপ্রাপ্ত ওভারশিয়ারদের আর্থিক পুরস্কার দেওয়া হচ্ছিল। বাগানের মালিকরা কখনোই বাগানে থাকতেন না, কিন্তু যেখানেই থাকুন এই পুরস্কার দেওয়ার জন্যে তাদের দেয় ট্যাক্সো থেকে কিছুটা ছাড় দেওয়া হত। এই নীতির ফলে দাসদের ঘরে ঘরে প্রচুর সংখ্যায় শিশুর জন্ম হয়েছিল। এত প্রচুর সংখ্যায় যে পরে আফ্রিকা থেকে দাসদের চালান বন্ধ হয়ে যাবার পরেও ক্যারিবীয় অঞ্চলের ব্রিটিশ বাগানে দাসদের সংখ্যায় টান পড়েনি।

এ-ঘটনা আঠারো শতকের শেষদিকের। ম্যালথাস বিচলিত হয়েছিলেন ব্রিটেনের জনগণের ব্যাপক দারিদ্র্য দেখে। প্রায় দুশো বছর পরে দেখা যাচ্ছে বিশ্বের অনেকগুলো দেশে একই ধরনের দারিদ্র্যের ছবি, বিশেষ করে এশিয়ায় আফ্রিকায় ও ল্যাটিন আমেরিকায়। তিনি যেমন মনে করতেন যে ব্রিটেনের জনগণের অপরিসীম দারিদ্র্যের মূল কারণ জনসংখ্যা-বৃদ্ধি, তাঁর বর্তমান শিষ্যরাও তেমনি মনে করেন যে এশিয়া আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলিতে (শ্রুতিমধুর একটি বিশেষণ প্রয়োগ করে যে-দেশগুলোকে বলা হয় 'উন্নতিশীল') জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রচণ্ড চাপের দরুণই এত নিচু জীবনযাত্রার মান, এত বেশি দারিদ্র্য। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্যে ম্যালথাস চেয়েছিলেন 'নৈতিক সংযম' আর নব্য-ম্যালথুসীয়রা চাইছেন 'নিরোধ'। এই নিয়ে এমন একটা প্রচারের দামামা চলেছে যে মনে হতে পারে নিরোধ চালু করাটাই আজকের দিনে প্রধান সামাজিক কর্তব্য ও দায়িত্ব।

অধ্যাপক ড্রেটন বলছেন, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারকে এভাবে অগ্রাধিকার দেওয়াটা শুধু যে মানুষের উদ্যম দক্ষতা ও সময়ের অপচয় তাই নয়, বিপজ্জনকও। কেননা এর ফলে মানুষের মনোযোগ অন্যদিকে যাচ্ছে, তারা দেখতে পাচ্ছে না যে দারিদ্র্যের মূল কারণ সামাজিক-অর্থনৈতিক এবং খোলাখুলিভাবেই রাজনৈতিক। এই মূল কারণগুলোর ওপরে যতক্ষণ না হাত পড়ছে ততক্ষণ বাচ্চার জন্ম বন্ধ করার উপায় যতো নিশ্চিতভাবেই প্রযুক্ত হোক না কেন সমস্যা থেকেই যাবে।

সাবেকী ম্যালথুসীয়দের যুক্তি ছিল এই রকম : জনসংখ্যা বৃদ্ধি যতো বেশি খাদ্য—উৎপাদন বৃদ্ধি ততো বেশি নয়, অতএব দুয়ের মধ্যে অসামঞ্জস্য ঘটবেই, অতএব অবশ্যম্ভাবী দারিদ্র্য। নব্য-ম্যালথুসীয়দের পক্ষে এই যুক্তি আশ্রয় করাটা কিছুটা অস্বস্তিকর, কেননা অতি-ফলনশীল বীজের কল্যাণে এমনকি এশিয়া আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার দেশগুলিতেও 'সবুজ বিপ্লব' ঘটছে, ভারতেও ঘটেছে (এই ঘটনাকে স্মরণীয় করে রাখার জন্যে ভারতে একটি ডাকটিকিটও প্রকাশ করা হয়েছে)। মেক্সিকো ফিলিপাইন, ভারত ইত্যাদি দেশে গম ও ধানের ফলন এখন আগের চেয়ে অনেক অনেক বেশি। অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কৃষি-উৎপাদন ইচ্ছে করেই কমানোর চেষ্টা করা হয়, তা সত্ত্বেও সে-দেশে কৃষি-উৎপাদনে বিপুল উদ্বৃত্ত।

অধ্যাপক ড্রেটন এ-বিষয়ে বিশেষ অবহিত যে এশিয়া আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলির অবস্থা একরকমের নয়, প্রত্যেকটি দেশেরই রয়েছে নিজস্ব অনন্যতা ও বৈশিষ্ট্য। প্রাকৃতিক সম্পদ ও উন্নতিসাধনের উপকরণের প্রাচুর্য বা অনটনের দিক থেকেও দেশে দেশে প্রচুর পার্থক্য। সুতরাং কোনো একটি দেশের সমস্যা বিশেষ করে সেই দেশেরই সমস্যা, তার সমাধানও তাই, সকল দেশের ক্ষেত্রে তা সমানভাবে প্রযোজ্য নয়। তবুও অধ্যাপক ড্রেটন মনে করেন গিয়ানার ছবিটি তুলে ধরলে বর্তমান শতকের অনেকগুলো গরীব দেশের সামাজিক অভিজ্ঞতার চমৎকার একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে।

গিয়ানা পূর্বে ছিল ব্রিটিশ গিয়ানা, ব্রিটিশ উপনিবেশ। আয়তন ৮৩,০০০ বর্গমাইল, ব্রিটেনের আয়তনের প্রায় সমান। কিন্তু জনসংখ্যা মাত্র সাড়ে ছ' লক্ষ। ইউরোপ থেকে সাজসরঞ্জাম আমদানীর ফলে স্বাস্থ্যব্যবস্থায় কিছুটা উন্নতি ঘটে ১৯২০ থেকে। তারপর থেকেই মৃত্যুর হার কমছে, যদিও মাঝেমধ্যেই মহামারি দেখা দেয় ও সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ বাড়ে—

ডঃ জুলিয়স আক্সেলরড (আমেরিকা): ইনি সুইডেনের ডঃ উলফ্ ফন্ ইউলার এবং ইংল্যাণ্ডের স্যার বার্নার্ড কাটজের সঙ্গে যৌথভাবে চিকিৎসা-বিজ্ঞানে (শারীরবৃত্তে) ১৯৭০ সালের নোবেল পুরস্কার লাভ করেছেন।

তখন আবার মৃত্যুহার মাত্রাছাড়ানো। কিন্তু আখের ক্ষেতের মজুররা সংখ্যায় কমুক আখের ক্ষেতের বর্তমান মালিকদের তা কাম্য নয়। ফলে ১৯৪৫ সালে ডি-ডি-টি অভিযান শুরু হতে না হতেই তার এটি প্রথম প্রয়োগক্ষেত্র হয় গিয়ানা এবং ম্যালেরিয়ার বাহন এনোফেলিস মশা ধ্বংস হয়। ম্যালেরিয়া লোপ পেতে মৃত্যুহারও অনেক কমে যায়। অন্যদিকে ম্যালেরিয়া লোপ পেতে বহুগুণ জন্ম দেবার ক্ষমতাও বেড়ে যায়, ফলে জন্মের হারও।

এ-প্রসঙ্গে বিশেষভাবে বলবার বিষয় এই যে মৃত্যুর সংখ্যা হাজারে বাইশ থেকে হাজারে বারোতে কমিয়ে আনতে যেখানে ব্রিটেনে সময় লেগেছে সত্তর বছর, গিয়ানায় সেখানে মাত্র দশ বছর। বর্তমানে মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৭-৭, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বছরে শতকরা তিন। জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বয়স পনেরোর কম। ১৯৬০ সালে কর্মক্ষম বয়সের প্রতি কাজের লোকের সংখ্যা ছিল অন্তত এক, বর্তমানে সাড়ে-তিন। কর্মক্ষম বয়সের ব্যক্তিদের মধ্যে শতকরা ২০ জন বেকার। মাইনাদের মধ্যে শতকরা মাত্র ১৩ জন চাকুরিজীবী। জীবনযাত্রার বর্তমান মান বজায় রাখতে হলে (জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বছরে শতকরা তিন ধরে নিয়ে) জাতীয় উৎপাদনের অন্তত ১৫ শতাংশ বরাদ্দ থাকা দরকার।

স্বীকার করতেই হবে অবস্থা গুরুতর, উদ্ধার পাওয়াটা সহজ ব্যাপার নয়। তবুও, যে-সব দেশকে বলা হয় 'ধনী', যে-সব দেশের জীবনযাত্রার মান উঁচু, সে-সব দেশের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নেবার চেষ্টা করা যাক।

একটি বিষয়ে এই দেশগুলোর মধ্যে সাধারণ মিল : শিল্পোৎপাদনের ভিত্তিতে নগর-সংস্কৃতির পত্তন। শিল্পায়ন ও আধুনিকীকরণের সঙ্গে সঙ্গে ঘটেছে যন্ত্রের প্রবর্তন, কৃষিতে আমূল উন্নতি ও তার ফলে বিপুল ফলন, ভোগ্যপণ্যের ব্যাপক সমাহার, এবং সর্বোপরি মাথাপিছু উপার্জন বৃদ্ধি, জীবনযাত্রার মানে উন্নতি, স্বাস্থ্যে উন্নতি, শিক্ষায় উন্নতি। আর কী চাই!

এই দেশগুলির জনসংখ্যা সম্পর্কিত ছবিটি কি রকম? শিল্পায়ন ও আধুনিকীকরণ ঘটেছে এমন প্রত্যেকটি দেশে (জাপান সমেত) গোড়ার দিকে মৃত্যুর হার কমেছে, তারপরে বছর পঞ্চাশেক সময় নিয়ে কমেছে জন্মের হার। এই দুটি পরিবর্তন কী কী কারণে ঘটেছে তার আনুপূর্ব একটি তালিকা সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীরা যথাযথ পেশ করতে পারবেন এমন ভাবার কোনো কারণ নেই। জীবনের ও অবসরের পরিবর্তিত চরিত্র, জীবন থেকে বৃহত্তর প্রত্যাশা, মেয়েদের সামনে ভিন্নতর সুযোগ-সুবিধা ও ভিন্নতর সার্থকতার পথ—এমনি আরো অনেকগুলো কারণ রয়েছে এই পরিবর্তনের মূলে। তবে লক্ষণ দেখে মনে হয় এই পরিবর্তনগুলো ঘটাতে হলে উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণের নির্দিষ্ট একটি মাত্রায় পৌঁছানো চাই, যাকে বলা যেতে পারে নির্ধারক মাত্রা। গিয়ানা যতোক্ষণ না এই মাত্রায় পৌঁছচ্ছে, অর্থাৎ গিয়ানা যতোক্ষণ সাংস্কৃতিক অগ্রগতির প্রাক-শিল্পায়ন পর্বে থেকে যাচ্ছে, ততোক্ষণ গিয়ানায় জন্মের হার থেকে যাবে 'কৃষিসমাজসুলভ' উঁচুমাত্রায়, যদিও অন-

সকল ঋতুতে অপরিবর্তিত ও
অপরিহার্য পানীয়

চা

কেনবার সময় 'অলকানন্দায়'
এই সব বিক্রয় কেন্দ্রে আসবেন

অলকানন্দা টি হাউস

৭, পোলক স্ট্রীট কলিকাতা-১
২, লালবাজার স্ট্রীট কলিকাতা-১
৫৬, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ কলিকাতা-১২

॥ পাইকারী ও খুচরা ক্রেতাদের
অন্যতম বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান ॥

দিকে মৃত্যু হারও নিচুমাত্রায়। এ-অবস্থায় নিরোধ জাতীয় জন্ম বন্ধ করার উপায় নাগালের মধ্যে থাকলেও (যদি ধরেই নেওয়া যায় যে তা ব্যবহার করার কায়দা সকলের জানা) এমন মনে করার কোনো কারণ নেই যে সাধারণ কৃষকদম্পতি তা ব্যবহার করতে চাইবেন।

তাহলে পিয়ানাকে কৃষিপ্রধান দেশ থেকে আধুনিক শিল্পোন্নত দেশ করে তুলতে বাধা কী? অধ্যাপক স্ট্রেটন বলছেন, বাধা হচ্ছে অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত বিলি হবার ধরনগুলো, যা বজায় থাকার দরুন মুনাফা ও ডিভিডেন্ড গিয়ে পৌঁছয় বক্সাইট শিল্পের ক্ষেত্রে আমেরিকান ইজারাদারদের পকেটে, ক্ষেতখামার দোকানপাটের ক্ষেত্রে ব্রিটেনবাসী মালিকদের পকেটে, কিংবা স্থানীয় অভিজাত শ্রেণীর পকেটে।

কাজেই ধরনগুলো যাতে বজায় থাকে তা এই মুনাফা ও ডিভিডেন্ড ভোগী সকলেরই স্বার্থ। দেশের প্রকৃত শিল্পোন্নতি কখনোই এদের কাম্য হতে পারে না। এসব পক্ষে যেটুকু সম্ভবপর তা বড়ো জোর কিছু চুনো শিল্পপত্তন—টয়লেট পেপার বা বকলস বা টুথপেস্ট বা বীয়ার-হুইস্কি-জিন ইত্যাদি উৎপাদনের কারখানা। তাও এমনভাবে যাতে মজুরের সংখ্যা কম হয় ও আরো বেশি মুনাফা পকেটস্থ করার পথ খোলসা হয়।

এই মুনাফাভোগীরা শিল্পায়নের জন্যে পুঁজি লগ্নী করবেন এমন আশা করা চলে না, যতোই সুযোগসুবিধা দেওয়া হোক না কেন। বেসরকারী পুঁজি আকর্ষণের চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য, যেমন হয়েছে পুয়ের্তো রিকোয়, জামাইকায় ও ত্রিনিদাদে। ইউরোপের দেশগুলিতে, বিশেষ করে ব্রিটেনে, শিল্পের পুঁজি এসেছে উপনিবেশের শোষণ থেকে ও দাসব্যবসায় থেকে। কিন্তু শতকের দ্বিতীয়ার্ধে গিয়ানার পক্ষে তা আর সম্ভব নয়, গিয়ানার গভর্নমেন্টকে অবশ্যই পরিকল্পিত একটি কর্মসূচী নিয়ে উদ্বৃত্তের সদ্ব্যবহার করতে হবে। এই কর্মসূচী যদি থাকে তাহলেই পরিবার পরিকল্পনায় সার্থকতা থাকতে পারে।

গিয়ানার এই ছবি মোটামুটি ল্যাটিন আমেরিকার সব দেশেরই ছবি, আর্জেন্টিনা ও উরুগুয়ে বাদে। শেষোক্ত দুটি দেশে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি যথেষ্ট উঁচুমাত্রায়, ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি বছরে ১-৫। অন্য সবকটি দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি শতকরা আড়াইয়েরও অনেক বেশি, আট-কোটি মানুষের দেশ ব্রাজিলে শতকরা ৩-৪, কোস্টারিকায় ৪-৩, গুয়াতেমালায় ৩-২। বর্তমান শতকের শেষদিকে দক্ষিণ আমেরিকার জনসংখ্যা সাতগুণ হবার সম্ভাবনা।

ল্যাটিন আমেরিকার জমির ৫ শতাংশে মাত্র আবাদী। মধ্যসামন্য পরিমাণের অনুর্বর কিছু জমিতে গরীব চাষীরা পুরুষানুক্রমে সব্জির চাষ করে থাকে, বাদবাকি জমিতে মালিক জমিদাররা (অধিকাংশই বিদেশে থাকে) আর সেই জমিতে ফলানো হয় রপ্তানীযোগ্য ফসল। যেমন, গুয়াতেমালা ও কোস্টারিকা থেকে রপ্তানী হয় কলা, ব্রাজিল থেকে কফি, ইত্যাদি। আর যদি কৃষি-সম্পদ না হয় তো খনি-সম্পদ— ভেনেজুয়েলা ও ত্রিনিদাদ থেকে তেল, গিয়ানা থেকে বক্সাইট ও ম্যাঙ্গানীজ, ইত্যাদি। আর আমদানী সবসময়েই হয়ে থাকে উৎপন্ন সামগ্রী ও উচ্চ-মূল্যের খাদ্য।

ল্যাটিন আমেরিকার জমি খুব উর্বর বা বিনা আয়াসেই অনাবাদী জমি উদ্ধার করা যাবে এমন দাবি করা হচ্ছে না। কিন্তু কাজটা অসম্ভবও নয়।

দুটি বিষয়ে ভাববার আছে। ইউরোপের উন্নত দেশগুলিতে 'গেল! গেল!' বলে একটা রব তোলা হয়েছে। এই বুঝি জলহাওয়া বিষাক্ত হয়ে গেল! এই বুঝি জনসংখ্যার বিস্ফোরণ ঘটে গেল! তবুও সত্য কথা যা থেকে যায় তা এই যে এই দেশগুলির জীবন ও জীবনযাত্রার মান আমাদের চেয়ে অনেক উঁচুতে, এই দেশগুলির পরিবেশ শুধু যে একশো বছর আগেকার তুলনায় অনেক ভালো তাই নয় আমাদের তুলনায় স্বর্গরাজ্য। যদি কারও সন্দেহ থাকে আমাদের দেশের বস্তি ও গ্রামের চেহারা স্বচক্ষে দেখে যেতে পারেন।

দুশো বছর আগে দাসপ্রথার কালে একটি দাস-জননীকে বাচ্চা বিয়োবার জন্যে একটি কম্বল ও একটি রূপোর ডলার পুরস্কার দিলেই কাজ হত। কিন্তু এখন যদি বাচ্চা বিয়ানো বন্ধ করার জন্যে পুরস্কার দিতে হয় তাহলে কম্বল বা রূপোর ডলারে নয়, তার জীবনে আনতে হবে নতুন সামাজিক বিন্যাস, তার জীবনযাত্রায় আমূল গুণগত পরিবর্তন। ইংলণ্ডের স্ত্রী-পুরুষের হাতে তো নিরোধ জাতীয় পদ্ধতি বহু আগে থেকেই ছিল কিন্তু তার প্রয়োগ কেন শুরু হতে পারল এই বিন্যাস ও পরিবর্তন ঘটার পরে!

অতএব একটি সামাজিক বিপ্লব চাই। বিজ্ঞানীদের প্রধান কর্তব্য জনসংখ্যা বৃদ্ধি বা ইত্যাদি জাতীয় ডঙ্কানিনাদের সঙ্গে সুর মেলানো নয়, সামাজিক পরিবর্তনের জন্যে গণ-তৎপরতায় সামিল হওয়া।

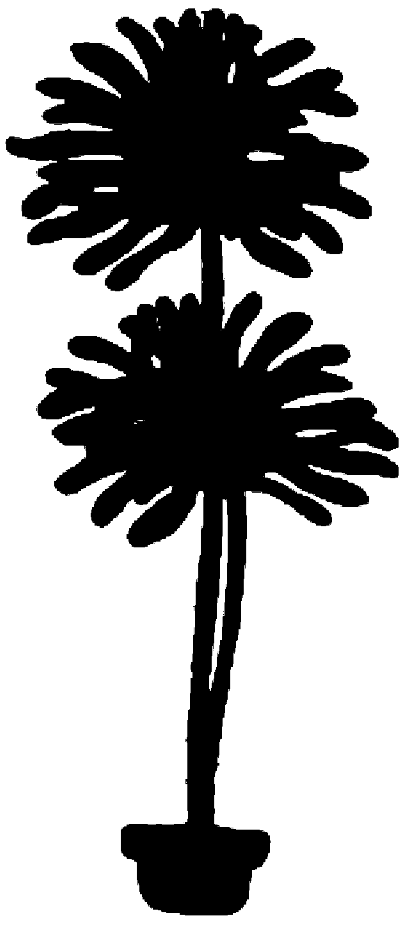

নোবেল পুরস্কার

এবছর পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন দুজন:—গ্রেনোবলে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের নিউক্লিয়ার গবেষণা কেন্দ্রের অধ্যক্ষ অধ্যাপক লুই নীল (৬৫) ও স্টকহোম রয়েল টেকনিকাল হাই স্কুলের অধ্যাপক হান্নেস আলফ্‌ভেন (৬২)।

রসায়ন বিদ্যায় নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন বুয়েনোস এয়ারেস-এর জৈব-রসায়নিক গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক লুই লেলোয়া (৬৪)।

ভেষজবিদ্যায় পেয়েছেন তিনজন: মেরীল্যাণ্ডের বেথেসডায় ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ মেন্টাল হেলথ-এর ল্যাবরেটরী অফ ক্লিনিকাল সায়েন্সের প্রধান আমেরিকান বিজ্ঞানী ডঃ জুলিয়াস আক্সেলরড, লণ্ডনের ইউনিভার্সিটি কলেজের জৈব-পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক ব্রিটিশ বিজ্ঞানী স্যর বারনার্ড কাট্‌জ ও সুইডিশ ক্যারোলিন ইনস্টিটিউটের শারীর বিজ্ঞানের অধ্যাপক সুইডিশ বিজ্ঞানী উলফ ফন ইউলার।

শান্তি পুরস্কার পেয়েছেন নরওয়েজীয়-আমেরিকান বংশোদ্ভূত ও আমেরিকা-নিবাসী ডঃ নরম্যান আর্নেস্ট বোরলাগ। অতি-ফলনশীল গম উদ্ভাবনে কৃতিত্বের জন্যে তাঁকে এই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।

অধ্যাপক নীলের গবেষণা কঠিন পদার্থের চৌম্বক ধর্ম সম্পর্কে। অধ্যাপক আলফ্‌ভেন-এর অতি-উত্তপ্ত গ্যাস বা প্লাজমা সম্পর্কে।

অধ্যাপক লেলোয়ার গবেষণা শর্করা নিউক্লিওটাইড সম্পর্কে।

ভেষজবিদ্যায় পুরস্কার স্নায়ুকোষে রাসায়নিক পদার্থ কিভাবে সঞ্চারিত ও জমা হয় এবং ক্রিয়া করে তা আবিষ্কারের জন্যে।

পরের কোনো সংখ্যায় এই বিজ্ঞানীদের জীবন ও আবিষ্কার নিয়ে বিশদ আলোচনার ইচ্ছে রইল।

—জয়ন্ত

সকালবেলায় খেয়েদেয়ে রাস্তায় বেরোবার পর ঝিমঝিম করে উঠেছিল সমস্ত মাথা। তেমন একটা গ্রাহ্য করেনি বিনয়। ভেবেছিল, রাত্রে ভাল ঘুম না হওয়ার ফলে, শরীর ও মাথায় যন্ত্রণাবোধ করছে। কিন্তু এখন চারটে ক্লাস নেওয়ার পর, আর সে পারছে না। কপালের দু-পাশের রগ দপদপ্ করছে, নাক দিয়ে জল ঝরছে অবিরত আর অসম্ভব ব্যথা চোখের নীচে, নাকের দু'পাশে।

বিরাট হলঘর। শ'দেড়েক ছাত্র ওর মুখের দিকে তাকিয়ে। চুপচাপ। ওর ক্লাসে গণ্ডগোল হয় না। ছাত্রদের সঙ্গে সে সহজভাবে মেশার চেষ্টা করে। ফলে সে ওদের কাছে প্রিয়।

হেডমাস্টারকে জানিয়ে বিনয় বাইরে এল। আসার সময় দু'একজন সহকর্মীর সঙ্গে দু'চারটে কথার আদানপ্রদান হয়। ঠিক মনে পড়ছে না কী ধরনের প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করেছে। এখন টের পাচ্ছে মাথার ভিতর অসংখ্য পোকা কিলবিল করে হেঁটে বেড়াচ্ছে।

—এই রিকশা! বেশ জোরে চিৎকার করে ডাকল বিনয়।

ব্রেক কষে থামাবার চেষ্টা করলেও কিছুদূরে এগিয়ে রিকশাটা থামল।

চুপচাপ সীটে বসে বিনয় আঙুল দিয়ে কপালের দু'পাশের রগ চেপে ধরল। অনেক চেষ্টার পর যা হোক একটা স্কুলে কাজ পেল, তা সে কলকাতার বাইরে। বাড়ি থেকে স্কুলে পৌঁছাতে পাক্কা ঘণ্টা দেড়েক দুই লাগে। ট্রেন জার্নি, বাস ট্রামের ধকল, বাড়ি পৌঁছবার পর প্রতিদিন মনে হয়, পরের দিন আর সে স্কুলে যেতে পারবে না!

ঠিক কীভাবে সে বাড়ি পৌঁছল স্পষ্ট মনে পড়ছে না। শুধু মনে আছে, আচ্ছন্ন-অবস্থায় ট্রেন চেপেছে, স্টেশন পেরিয়ে বাস ধরেছে, তারপর গলির মুখ থেকে কয়েক মিনিট হাঁটার পর বাড়ি।

—মা! বিনয় সটান বিছানায় শুয়ে পড়ল। মার স্নেহস্পর্শের জন্যে সে ভীষণ লালায়িত। কতক্ষণ চোখ বুজে অপেক্ষা করছিল সে খেয়াল নেই। মনে হয় অনেকক্ষণ।

দেয়ালে বড় ঘড়িটার ক্লান্তিকর টিক্-টিক্ শব্দ এখন অস্বস্তিকর। কেননা ঘড়ি সময়কে স্মরণ করিয়ে দেয়। সেটা তার অপছন্দ। কারণ এখনও সে সময়হীনতার কথা ভাবে। যদিও ইদানীং ঐ ধরনের চিন্তা হাস্যকর মনে হয়। সে না চাইলেও বয়স তার বাড়ছে। বাড়ছে নাকি? 'ঠিক এইরকমভাবেই, উঃ মাথাটা যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে...' হরিবলাস মিত্র, তার পিতৃদেব, কয়েক বছর আগে, এমনি সময় অসুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছিলেন; তখন তারা একটা কলোনীতে থাকত, বাড়ি ফিরে কয়েক দিনের অসুখে ভদ্রলোক মারা যান...। কত বছর আগে?

—মা! মা! বিনয় চোখ খুলে ক্ষোভ আর বিরক্তি নিয়ে তাকায়। এতবার সে ডাকল, তবু মার পাত্তা নেই। এত ঘুম মার!

—মাসীমা বাড়ি নেই।

শেফালী চৌকাঠ পেরিয়ে ঘরে ঢুকল। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। হাতে চায়ের কাপ। টেবিলের ওপর কাপ রেখে তাকাল বিনয়ের দিকে। মুখে পাতলা হাসি।

—নিন। চা খান। মাসীমার ফিরতে সেই সন্ধে। মীরাদির বাসায় গেছেন। ওকি! আপনার চোখ দুটো অমন ছলছল করছে কেন।

শেফালী এগিয়ে এসে বিনয়ের কপালে হাত রাখল। তারপর চিন্তিত মুখে বলল, ইস্, বেশ গরম! জ্বর হয়েছে আপনার। চা খেয়ে চাদর দিয়ে গা ঢাকুন।

বিনয় নিঃশব্দে হাসল। তাকাল শেফালীর দিকে। তারপর কনুই-এর ওপর ভর দিয়ে একটু উঠে বসল। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে আবার তাকাল। চোখাচোখি হতে শেফালী মাথা নত করল।

শেফালীর কোমর সরু, বুক ও নিতম্ব বেশ ভারী। চোখ দুটো বড় বড়। গায়ের রঙ ফর্সা। ফিগার ভালই বলতে হবে। সুশ্রী না বলে উপায় নেই। দুই পরিবারের মধ্যে যথেষ্ট অন্তরঙ্গতা। এর জন্যে মা

CENTRAL LIBRARY

দায়ী। তাঁরই যাতায়াত বেশি। শেফালীকে উনি একটু বিশেষ দৃষ্টিতে দেখেন। কত বয়স হল মেয়েটার? বছর তেইশ হবে। ওর মা বলেন বুড়ি। হাসি পেল বিনয়ের। এম-এ পড়ছে। বাংলায় এম-এ পাশ করে তার মত মাস্টারী করবে মফস্বলের কোন স্কুলে শেষ পর্যন্ত।

—হাসছেন যে বড়! শেফালী বুকের ওপর শাড়ি ভাল করে জড়ায়। মাঝে মাঝে বিনয়দার চাহনি বড় অস্বস্তিকর। ওই পর্যন্ত। আর কিছু না। না, ভয় সে করে না। অন্তত বিনয়দাকে। ন্যাকা মেয়েদের সে দুচক্ষে দেখতে পারে না। ওদের ধারণা পুরুষদের কাছে গেলে তারা বাঘের মত লাফিয়ে পড়বে।

—কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে। বিনয় বলল, ওই চেয়ারটা টেনে বস। বেশ মুস্কিলে পড়া গেল। কখন মা ফিরবেন কে জানে।

—কী দরকার বলুন না। শেফালী অল্প হাসল, আপনি দেখছি এখনও ছেলে-মানুষ রয়ে গেলেন। মার আঁচল ধরে চিরকাল তো চলতে পারবেন না!

—তা পারবো না। তাই ভাবছি এখন থেকে তোমার আঁচল ধরে চলার চেষ্টা করবো।

শেফালী রাগ করল না। বিনয়দাটা ওই রকমই কথাবার্তা বলে থাকে। প্রথম প্রথম বেশ রাগ হোত। দুকথা শুনিয়ে দিত। পরে ভেবে দেখেছে ওতে কিছু লাভ নেই। এখন তো ওদের মধ্যে সবরকম ঠাট্টাইয়ার্কি চলে। সেও ছেড়ে কথা বলার মেয়ে নয়।

ভ্রু কুঁচকে তাকাল শেফালী, লোভ তো কম নয়। জানেন, আমার আঁচল ধরার জন্যে আপনার চেয়ে ঢের ঢের রূপবান গুণবান যুবক অপেক্ষায় রয়েছে!

—কে সেই ভাগ্যবান? বিনয় হাল্কা সুরে বলে, আশ্চর্য! মাথার যন্ত্রণাটা যেন আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে। শুধু এক কাপ চা। কোন ওষুধ মিশিয়ে দাওনি তো?

শেফালী কোন জবাব দিল না। একটা সাপ্তাহিক পত্রিকার পাতা ওল্টাতে থাকে। একবার মৃদু হেসে তাকাল বিনয়ের দিকে। সত্যিই কী মাথা ধরেছিল?

—এই আমার কথার কোন জবাব দিলে না তো। আচ্ছা, এই যে তুমি একা আমার কাছে এ ঘরে রয়েছো, তোমার মা আবার ভাববেন না তো কিছু! তাঁকে জানিয়ে এসেছো?

শেফালী অবাক হওয়ার ভান করল কী আবার ভাববেন। হঠাৎ এ প্রশ্ন বিনয়দা?

বিনয় অন্যদিকে তাকায়। বুঝেছে প্রশ্ন এড়িয়ে যাচ্ছে শেফালী। চালাক আছে মেয়েটা। সে মনে মনে হাসল। এখুনি সব চালাকি শেষ করে দিতে পারে। সব মেয়েই কম বেশি ভান বা অভিনয় করে থাকে। শেফালীকে এভাবে নির্জনে কোনদিন...।

আস্তে আস্তে বিনয়ের ভাবান্তর হয়। হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যায়। না, এর আগে কোনদিন, অনেক সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও, একটা চুমো অথবা জড়িয়ে ধরা...আসলে ভাল লাগে মেয়েটাকে, ওই পর্যন্ত, অন্য কোন বিশেষ দৃষ্টিতে দেখেনি। না, প্রেম-প্রেম জাতীয় কোন কিছু এখনও পর্যন্ত অনুভব করছে না।

—এমনি। বিনয় হাসল, তারপর হঠাৎ মুখ বিকৃত হয়ে ওঠে, উঃ আবার মাথার যন্ত্রণা শুরু হচ্ছে! বলতে বলতে ওর সত্যি মুখ বিবর্ণ দেখায়। স্বগতোক্তি করল, কখন মা ফিরবেন কে জানে।

একটু ঘুমিয়ে নিতে পারলে মাথা ধরাটা ছেড়ে যেত। কিন্তু ঘুম এখন আসবে না। মা থাকলে কপালে হাত বুলিয়ে দিতেন। তখন নিশ্চয়ই ঘুম আসতো তার। মাঝে মাঝে মনে হয় একমাত্র মাকে ছাড়া অন্য কোন স্ত্রীলোককে বোধহয় জীবনে ভালবাসতে পারবে না। বিনয়ের মনে পড়ল রামুবৌদি ও মধুদার কথা। ভালবাসা নয় ওদের প্রতি ছিল তার নিছক যৌনাকর্ষণ। আজ সে সব বুঝতে পারে। কী ভীষণ সেন্টিমেন্টাল আর বোকা ছিল সে!

—আপনি ঘুমোবার চেষ্টা করুন। মাসীমার ফেরার সময় হয়ে এল। শেফালী উঠে দাঁড়াল, ভাল কথা বিনয়দা। কই আমাকে পড়াশুনার ব্যাপারে একটু সাহায্য করবেন বলেছিলেন, শুধু এড়িয়ে যাচ্ছেন। আমার জন্যে না হয় একটু সময় নষ্ট করলেন।

—আর একটু বসো শেফালী। বিনয় পাশ ফিরে তাকাল, বাজারে কত নোটবই রয়েছে, ওগুলো মুখস্থ করলেই তো পাশ করে যাবে। তাছাড়া তোমার সেই রূপবান গুণবান যুবকটিই তো রয়েছে। তার সাহায্য চাইছো না কেন! কে সেই ভাগ্যবান যুবক?

—জেনে আপনার লাভ কী হবে। শেফালী হঠাৎ অনুভব করলো ঘরের ভিতরটা বেশ অন্ধকার। এবং অন্ধকারে এভাবে বিনয়দার মুখোমুখি বসে থাকতে দেখলে যে-কেউ অন্য কিছু ভাবতে পারে। ফলে সে লাইট জেলে দেয়।

বাইরে পদশব্দ শোনা যায়। শেফালী তাড়াতাড়ি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

নীহার ঘরে ঢুকলেন। একটু আগে শেফালীকে বারান্দা দিয়ে যেতে দেখেছেন। হাসলেন মনে মনে। শুধু বিনয়ের জন্যে তাঁর একমাত্র চিন্তা। আশঙ্কায় বুক কেঁপে উঠল বিনয়কে শুয়ে থাকতে দেখে। এমন অসময়ে।

—কী হয়েছে বিনু! নীহার বিছানার এক পাশে বসে কপালে হাত দিয়ে চমকে উঠলেন, কখন ফিরেছিস? এ যে দেখছি জ্বর!

বিনয় মার কোলে মুখ ডুবিয়ে বলল, ওসব কিছু নয়। মাথা ধরেছে খুব। সেই কখন ফিরেছি। শেফালী জানাল তুমি মীরার ওখানে গিয়েছো। মাথা টিপে দাও।

আঃ! বিনয়ের আরামে চোখ বুজে আসে। মাকে ছাড়া সে একদিনও থাকতে পারবে কিনা সন্দেহ। শেফালী ঠাট্টা করে বললো সে ছেলেমানুষ। বলুক। বিনয় জানে কী দুঃসময়ের মধ্য দিয়ে তাদের আগলে রেখেছেন মা। কত অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করেছেন। বাবার মৃত্যুর পর এই মা দৃঢ় হাতে সংসারের সব কিছু ভার নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন। রজতদার সঙ্গে মীরার বিয়ে, তার পিছনেও মা-র নেপথ্য ভূমিকার কথা বিনয়ের চেয়ে বেশি করে আর কেউ বা জানে। সেই সময়ে মাকে তার ছোট মনে হয়েছিল। কিন্তু আজ কয়েক বছর পরে, ঠান্ডা মাথায় ভাবলে বুঝতে পারে, মা যা কিছু করেছেন সব তাদের মঙ্গলের জন্যে। এখন যদি কয়েক বছরের দাম্পত্যজীবনের পর হঠাৎ আবিষ্কার করা যায় মীরা সুখী হতে পারেনি, রজতদাকে প্রথম দিকে যা ভাবা গিয়েছিল, আসলে সে তেমনটি নয়; এর জন্যে মা দায়ী নন, মা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন যাতে সকলে সুখে বাঁচতে পারে।

অস্পষ্ট স্বরে শুনলো মা কিসব বলছেন। বিনয় মুখ তুলে তাকায়। সব চুল পেকে গেছে মার। মা যেন দুঃখের প্রতিমূর্তি। সব সময় সারা মুখে বিষাদ ছড়িয়ে থাকে। এত বেশি চিন্তা করলে স্বাস্থ্য ভাল থাকে কি করে। কতদিন বলেছি অত চিন্তা করো না। তুমি সবার হাসিমুখ দেখতে চাও কিন্তু নিজে এক-বারটি হাসতে পার না। কেন এত আত্মত্যাগ! তোমার মূল্য কে দেবে? কেউ দেবে না। যে-যার আপন খেলায় মত্ত। কেউ তোমার দিকে ফিরে তাকাবে না। মা, তুমি সব বুঝতে পার অথচ না বোঝার ভান করো। কেন?

—কিছু বলছো? বিনয়ের মনে হলো মা যেন চোখের জল গোপন করার চেষ্টা করছেন। জীবনে এত চোখের জল ফেলেছেন মা যে, সব এক জায়গায় জমা রাখতে পারলে ছোটখাট একটা পুকুর হয়ে যেত।

নীহার বলেন, স্কুল থেকে ফিরে কিছু খেয়েছিস? শেফালীকে বলে গিয়েছি তুই ফিরলে একটু চা বানিয়ে দিতে।

—চা খেয়েছি। একটা কথা বলবো মা, রাগ করো না। শেফালী পরের মেয়ে, ওকে দিয়ে কাজ করানো ভাল দেখায় না। ওর মা বাবা এসব হয়তো পছন্দ নাও করতে পারেন।

চুপ কর বিনু! নীহার একটু বিরক্ত হয়ে বলেন, এসব ব্যাপার নিয়ে তোকে মাথা না ঘামালেও চলবে। কত ভাল মেয়ে শেফালী। ও যে ঘরে যাবে সেই ঘর আলো হয়ে উঠবে। আমার খুব ইচ্ছে হয় তোর জন্যে এরকম একটা মেয়ে...। হাসছিস কেন? কেন বিয়ে কী কোনদিন করবি না ঠিক করেছিস? তোর আসল ইচ্ছেটা কী শুনি?

বিনয় কোন জবাব দিল না। শুধু নীরবে হাসতে লাগলো। এমনি গঞ্জনা মা প্রায়ই দিয়ে থাকেন। আর পাঁচটা বাঙালী মায়ের মত তিনিও চান পুত্রবধূ ঘরে

আসুক, ছোট ছেলেমেয়েদের কলহাস্যে মুখরিত হয়ে উঠুক সংসার। বিনয়কে সংসারী না করে যেন তিনি কিছুতেই শান্তি পাচ্ছেন না।

বিয়ে একদম করবে না এমন ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা বিনয় করেনি। বয়স কম হলো না। মাস্টারী আর টিউশোনী করে যা পায় তাতে যে বিয়ে করা একদম চলে না এমন নয়। অদূর ভবিষ্যতে তার উপার্জন এক লাফে অনেকদূর এগিয়ে যাবে সেরকম কোনও সম্ভাবনা নেই। যেভাবে চলছে অর্থাৎ মোটামুটি খেয়েপরে বাঁচতে পারছে, বাকী জীবনটাও এভাবেই কাটবে। তবে বিয়ের ব্যাপারে পিছিয়ে যাচ্ছে কেন? বিনয় নিজেও এর কোন সদুত্তর খুঁজে পায় না। এটুকু বুঝেছে তার নিজের আগ্রহ খুব একটা নেই। তাছাড়া সে ভেবে দেখেছে কোন মেয়েকে ভালভাবে না জেনে বিয়ে করাটা ঠিক হবে কিনা। এই রকম সাতপাঁচ ভেবে একটির পর একটি বছর সে পার করে দিয়েছে। এভাবেই তার দিনগুলি কেটে যেত যদি না মাঝে মাঝে মা ঝামেলার সৃষ্টি করতেন। সহজে মাকে আঘাত দিতে চায় না।

রাগ করে মা উঠে যান। বিনয় খানিকটা বিমর্ষ হয়ে ওঠে। শেফালীকে খুব পছন্দ মার। ইঙ্গিতে অনেকদিন ওর কথা জানিয়েছেন। ওর মা বাবারও বোধকরি অমত নেই। থাকলে এভাবে যখনতখন মেয়েকে আসতে দিতেন না। শেফালী নিজে কী জানে?

জামাকাপড় ছেড়ে বিনয় বাথরুমে ঢুকল। ঠাণ্ডা জলে হাতমুখ ধোয়ার পর বেশ ফ্রেস লাগছিল তার। ঘরে ফিরে দেখল টেবিলের উপর কফি আর খাবার রেখে চলে গেছেন মা। রেগে গেলে কথা বলেন না। নীরবে সব কাজ করে যাবেন। মার স্বভাব ভাল করেই জানে বিনয়। কিভাবে রাগের উপশম করতে হয় সে ফন্দীও তার জানা।

কফিতে চুমুক দিয়ে একটা সিগারেট ধরাল বিনয়। অতীত জীবনের ধূসর দিনগুলি হানা দেয় মাঝে মাঝে। কিছুতেই সে ভুলতে পারে না। মনে হয় হাত বাড়ালেই সেই দিনগুলিকে মুঠোর মধ্যে ধরতে পারবে। একা থাকলেই সব এসে ভীড় করে। শুধু জাগরণে নয়, স্বপ্নেও তারা হামাগুড়ি দিয়ে আসে। সে যে শুধু দুঃখ পায় তা নয়, বিষাদমাখানো আনন্দও অনুভব করে। মনে হয় আবার যদি সেইসব দিনগুলি, সেইসব মানুষের, যাদের প্রতি ওর ঘৃণা-ভালবাসা-স্নেহ-মমতা সব ছিল, একবার শুধু এক মুহূর্তের জন্যেও হাত দিয়ে তাদের স্পর্শ করতে পারতো!

খুব হালকা বোধ করল বিনয় নিজেকে। ড্রয়ার খুলে একটা ধূপকাঠি জেলে দেয়। একটু পরে সুন্দর গন্ধ অনুভব করল। চারিদিকে তাকিয়ে তার নিত্যদেখা প্রতিদিনকার ঘর, আত্মতৃপ্তিতে ভরপুর হয়ে উঠল সমস্ত মন। এমনটি সে চায়। ছিমছাম ঘরের প্রতিটি জিনিস। বালিশে মুখ ডুবিয়ে শুয়ে রইল কিছুক্ষণ। এখন আর মাথার কোনরকম যন্ত্রণা নেই।

আবার মনে পড়ছে সব কথা। অতীত যুগপৎ আনন্দময় ও দুঃখজনক। হাসি পেল বাবার কথা ভেবে বিনয়ের। সেইসব দুঃখ দিনগুলি, যখন সামান্য একটা চাকরীর জন্যে হন্যে হয়ে উঠেছিল, বি-এ ক্লাশে ভর্তি না হওয়ার জন্যে কত তিরস্কারই না করেছেন! আজ বেঁচে থাকলে তিনি নিশ্চয়ই খুশী হতেন, কেননা বিনয় চাকরী করাবস্থায় রাত্রে কলেজে পড়ে এম-এ পাশ করেছে। অবশ্য বাংলায় এম-এ। আজকাল বাংলায় এম-এ-দের নিয়ে কাগজে ঠাট্টা করা হয়। যেন বাংলা ভাষাটা খুব বাজে, ফেলনা।

নিজেকে তিরস্কার করল বিনয়: 'তোমার বাপু এত ভাবালুতা কেন!' সাতা কেরানীর চাকরী করতে করতে সে যেন ক্রমশ ক্লান্ত, নির্জীব হয়ে উঠেছিল। কিছুদিন চাকরী করার পর তার আবার পড়াশুনার দিকে মন যায়। তখন তার একমাত্র চিন্তা যে-করেই হোক এই দশটা পাঁচটার প্রতিদিনকার একঘেয়েমি থেকে রেহাই পেতে হবে। বি-এ পাশ করার পর এম-এ পড়ার সময় তার শিক্ষকতার দিকে ঝোঁক চাপে। ভেবেছে এ লাইনে স্বাধীনতা আছে, কাজের তৃপ্তি আছে। আজ সে দেখছে শিক্ষার জগতও কলুষিত। এখানেও নোংরা রাজনীতি, স্বজনপোষণ, চাটুকারিতা, একে অন্যের পিছনে লাগা ইত্যাদি তো আছেই; তাছাড়া যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার স্বপ্ন সে কৈশোর থেকে দেখে আসছে, বেশ ভালভাবেই বুঝেছে চিরকাল তা অনায়ত্ত থাকবে। জন্মের পর থেকেই মানুষ পরাধীন। মৃত্যু পর্যন্ত এই পরাধীনতার গ্লানি তাকে বহন করতে হবে!

তবু মাস্টারী করা অন্যান্য চাকরীর থেকে অনেক বেশি সহনীয়। বিনয় চেষ্টা করে অনেক বিষয়ে নির্লিপ্ত থাকতে। কোন দলাদলির মধ্যে যায় না। যদিও একান্ত চেষ্টা সত্ত্বেও এড়াতে পারে না। কাউকে খোসামোদ করা তার স্বভাববিরুদ্ধ। সহকর্মীদের মধ্যে কেউ কেউ গায়ে পড়ে আঘাত দেয়, ঠাট্টাবিদ্রূপও করে। প্রতিবাদ করে না সে। কয়েক বছর আগে হলে হয়তো ঝগড়া বেধে যেত। কিন্তু এখন বয়সের সঙ্গে সঙ্গে অনেক নরম হয়ে এসেছে। কোনকিছু করার আগে ঠাণ্ডা মাথায় বিবেচনা করতে ভুল হয় না। ভুলের ক্ষমা নেই। সময় বড় নির্মম। আজ সামান্য একটা ভুলের জন্যে উপার্জনের পথ যদি বন্ধ হয়ে যায়, পাশে এসে কেউ দাঁড়াবে না। এর মানে এই নয় যে, সে চাকরী বাঁচাবার জন্যে আত্মমর্যাদা বিসর্জন দিয়ে বসে আছে। তা নয়। শুধু চারদিক দেখেশুনে চলতে শিখেছে। এতে নিরাপত্তা এসেছে খানিকটা।

খুব বেশি স্পর্শকাতর হওয়া ভাল নয়। আগে সব সময় মনে হোত তার অস্তিত্বটা বড় বেশি জরুরী। যেন সে না থাকলে পৃথিবীটাই উল্টে যাবে। ওসব কিছু নয়। অসংখ্য জনসমষ্টির সে সামান্য ভগ্নাংশ। অতএব অভিমান বা স্পর্ধার... বিমলের সঙ্গে বহুকাল দেখা নেই, ও বোধ হয় এতদিনে পাকা একজন টিপিকাল কেরানী বনে গিয়েছে......দেখা হ'লে যদি ইনক্রিমেন্ট, মাইনে, ছেলেমেয়ের অসুখ, স্ত্রীর খিটখিটে মেজাজ ইত্যাদি......। এসব শুনতে তার ভাল লাগে না। তাই মনে হয় বিমলের সঙ্গে দেখা হলে সে নিশ্চিত ওকে এড়িয়ে যাবে।

মা মা মাগো! অস্ফুটস্বরে আপন মনে ডেকে উঠল বিনয়। একটু পরে টের পায় রান্নাঘরে খুন্তি নাড়ার শব্দ। মার মুখের দিকে তাকিয়ে নতুন উদ্যমে পড়াশুনা করেছে। পাশ করে অনেক হাঁটাহাঁটির পর একটা স্কুলে (সরকারী অনুমোদিত) কাজও অবশেষে পেল। একটু যা দুঃখ হয়ে গিয়েছে। যাক সুযোগ হলে কলেজেও কাজ জুটে যেতে পারে। মা তার একটি বিয়ে দিতে পারলেই...শেফালী মেয়েটি মন্দ নয়, চেহারাটি ভাল, সামনের বছর পাশ করে বেরোতে পারলে সেও একটা স্কুলে দুজনের রোজগার, বাঃ ভাবতে বেশ ভালই তো লাগছে!

বিনয় পা টিপে টিপে এগিয়ে যায়। রান্নাঘরের দরোজার কাছে দাঁড়িয়ে মাকে দেখল। একবার শুধু চোখাচোখি হয়। বেশ গম্ভীর মার মুখ। পরক্ষণেই মা মাথা নীচু করে মশলা পিষতে থাকেন। খারাপ লাগল বিনয়ের। একটা কি রাঁধার কথা কতদিন বলেছে। মা হেসে বলেছেন, 'মোটে দুটো লোকের জন্যে ঝি-চাকর—তের খুব টাকা হয়েছে, না বিনু?' সারা জীবনটা কষ্টের মধ্যে দিয়ে কেটেছে। শেষবয়সে একটু আরামে থাকবেন, তাই চেয়েছিল বিনয়।

নিজের ঘরে ফিরে এল বিনয়। সাদা আলোটা নিভিয়ে হাল্কা সবুজ আলো জেলে চেয়ারটা টেনে জানালার পাশে বসে। একটা সিগারেট ধরায়। গলিতে লম্বা লম্বা ছায়া ফেলে নরনারী যাচ্ছে-আসছে। তাদের মৃদু কথার বা হাসির শব্দ শুনতে পেল। রাস্তার ধারে ঘর। প্রথম-প্রথম অসুবিধে হোত। স্কুলে কাজ পাওয়ার পরই এখানে চলে আসে মাকে নিয়ে। কলোনীর প্লটটা অবশ্য আছে। গ্রামসুবাদে দূরসম্পর্কের দরিদ্র এক আত্মীয়কে বসিয়ে এসেছে। ওখানে থাকার কোন স্পৃহা অনুভব করে নি। রঞ্জনের সঙ্গে বিয়ের পর মীরা চলে যায়। তার আগেই বাবা গত। ওখানে থেকে মনটা বিষিয়ে উঠেছিল। বিশেষ করে মীরা আর রঞ্জনদাকে কেন্দ্র করে কুৎসা রটনা করেছিল প্রতিবেশীরা। তারপর যখন যুক্তি বাসা-ভাড়া করে থাকবার মত অবস্থা এসেছে। চলে এল এই হরচন্দ্র মল্লিক স্ট্রীটে।

স্কুলে কাজ পাওয়ার পর হাতে বেশ সময় থাকে তার। সপ্তাহে তিন দিন টিউশোনী। সন্ধ্যার দিকে। আজ আর

যাওয়া হলো না। সময় কাটাবার সমস্যা তার নেই। বই পড়তে ভালবাসে। ন্যাশনাল লাইব্রেরীর মেম্বার। এক সময় একটু-আধটু লেখার বাতিক ছিল। এখন ওই রোগ থেকে রক্ষা পেয়েছে। লেখক হওয়ার মোহ আর নেই। বেঁচে গেছে। তবে পড়ার অভ্যাসটা আছে, বরং আরও বেড়েছে। অতএব সময় কেটে যায়। বন্ধু-বান্ধব বলতেও এখন কেউ নেই। সে বন্ধুহীন, নির্জন। মাঝে-মাঝে অসহ্য বোধ হয়। বড় একা মনে হয়। খুব ছোট গণ্ডীর মধ্যে জীবনটা বাঁধা। অনেকেই তো কাছাকাছি ছিল। সব দূরে সরে গিয়েছে। সেই কী সরিয়ে দিয়েছে? রজতকে আর সে টলারেট করতে পারে না। এক সময়ের স্বপ্নের রজত। তার ভাবলে হাসি পায়। এমন কী আকর্ষণ ছিল যে, এই লোকটাকে অন্ধের মত অনুসরণ করলো। মীরা কী সুখী হয়েছে? রজতও কী সুখী? সে জানে না সঠিক। এটা ঠিক ওর আর কোন সম্ভব নেই রজতের সঙ্গে।

—এখন তুমি?

সামান্য চমকে উঠল কিরণ। ঘরের থেকে উঠে বারান্দায় এসে মাকে জড়িয়ে বলে, তুমি কি রাগ করেছো? মা, মুখ ফেরালে চলবে না। কি অন্যায় করেছি?

নীহার বললেন, ছাড় কিনু। আমার কিছু ভাল লাগছে না। আমাকে রেহাই দে। আর পারছি না!

—চল খেতে দেবে। মা, আর কিছুদিন অপেক্ষা করো। বিয়ে একরকম করবো না কখনো বলি নি।

নীহার কোন জবাব দিলেন না। মুখ শিহর-শিহর রকমের চোখে দিচ্ছে। বস হলো বিয়ে সংক্রান্ত ব্যাপারে একটা নেগোশিয়েশন করা, সুকুমার আর মুখ দেখা উচিত নয় বাকি। মনে-মনে বলল, তোমার হাসিমুখ দেখতে চাই মা।

॥ দুই ॥

ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে রজত টাই বাঁধছে—রজত। লক্ষ্য করল ধীরে-ধীরে একটি মুখ এগিয়ে আসছে। শাড়ি বিন্যস্ত হতে ও একবার মৃদু হাসল। কেন কে জানে মীরার মুখো অবাক করতে ওর দিকের মুখে। কানের পাশে দু-একটি চুলে পাক ধরেছে। মেয়েমানুষের মত নিজেকে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখে রজত দূরে দাঁড়ায়। এবার মীরার মুখোমুখি। আবার ওরা পরস্পরকে দেখল।

—না, আর দেরী করা চলবে না। রজত হাত ঘড়ির দিকে তাকিয়ে অমায়িক কণ্ঠে বলল, তুমি এভাবে তাকিয়ো না মীরা। ভাল লাগে না। কিছু বলবে?

নীচু-অথচ কঠিন কণ্ঠে মীরা জবাব দেয়, এত আর-তুমি ভেবে পারবে না, বলে এগিয়ে এসে রজতের টাই হঠাৎ আঁকড়ে ধরে, আমার নিজের-সত্তা-কথাই না—নিজের সন্তানের কথাও কী একবার ভাববে না। সন্তানের জন্যে দেখছি এতটুকু মমতা নেই!

—কী হচ্ছে! রজত ধমক দিল, টাইটা ছেড়ে দাও। দিন-দিন বিশ্রী স্বভাব হচ্ছে তোমার।

—না, ছাড়বো না। মীরার সমস্ত দেহ কাঁপতে থাকে। চোখ বড়-বড় করে ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বলে, রোজ-রোজ কোথায় যাও। সত্যি করে বলো কোন্ আকর্ষণে আমাদের এভাবে ভুলে যাচ্ছ। এত নিষ্ঠুর তুমি?

রজত খুব রেগে গেলেও অতিকষ্টে সংযত করল নিজেকে। খুব জোরে কথা বলা যায় না। আশে-পাশে ভাড়াটে রয়েছে। লোক হাসাতে চায় না সে। মীরার চোখে জল দেখে সে মোটেই বিচলিত হলো না। এখন কী করবে ভেবে পেল না। সাহস বেড়েছে মীরার। ওর অভিযোগ ভিত্তিহীন। পল্টু ঘুমুচ্ছে। এখন চেঁচামেচি করলে জেগে উঠতে পারে।

দু হাত দিয়ে সজোরে নিজের দিকে টেনে আনল মীরাকে। ওর দৃঢ় আলিঙ্গনের মধ্যে ছটফট করে উঠল মীরা।

—ছেড়ে দাও! থাক, আর আদর করতে হবে না। ভেবেছো এতেই আমি গলে যাব।

ঠোঁটের উপর পর-পর কয়েকটা চুম্বন করল রজত।

আলুথালু বেশ মীরার। চুল ভেঙে পড়েছে মুখের ওপর। দু হাত দিয়ে পিছনে সরিয়ে মীরা ফুঁসে উঠল, একটা ছোটলোক তুমি।

—কী হয়েছে তোমার? রজত কুঁচকে-যাওয়া টাইটা ঠিক করতে থাকে, তোমার মেজাজের কোন হদিশ পাই না। কী চাও তুমি?

রজতের দিকে নির্নিমেষে তাকায় মীরা। রজত কী জানে না সে কোন্ প্রত্যাশা নিয়ে বেঁচে আছে? সবচেয়ে খারাপ লাগে ওকে ছলনার আশ্রয় নিতে দেখলে। ইদানীং ভয় পাচ্ছে মীরা। এমনটি সে চায় নি। দিনের অনেক আগেই তাদের সম্পর্কের বন্ধন আলগা হয়ে যাবে—জ্ঞাতসারে কোন পাপ সে করে নি, সকলের মঙ্গল চেয়ে এসেছে। তবে কেন সে আজ এমন অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সম্মুখীন। একটু-একটু করে টের পাচ্ছে সব। রজত লুকোতে চায়। ওকে বোধ হয় বোকা ভাবে। অনেক দিন ভেবেছে একটা বোঝা-পড়া হয়ে যাক। পল্টুর জন্যে থমকে দাঁড়াতে হয়। তখন ওর মাথা নুয়ে আসে। কিন্তু কতদিন ওর মুখ চেয়ে এই অশান্তির জীবন বয়ে বেড়াবে? বেশিদিন পারবে না। ওর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যাচ্ছে। মীরার মনে হলো বিস্ফোরণের আগের অবস্থা ওর।

—চুপ করে থেকো না। রোজ এ অশান্তি ভাল লাগে না মীরা। বলে রজত টাই-এর নট আলগা করল প্রথমে, পরে সম্পূর্ণ খুলে নিক্ষেপ করল ড্রেসিং টেবিলের দিকে। দ্রুত পোশাক বদলে মুখোমুখি হলো মীরার। আজ সে শুনতে চায় তার বিরুদ্ধে কী অভিযোগ আছে।

তবু গেল না মীরা। একবার অদূরে ঘুমন্ত পল্টুর দিকে তাকাল। ছেলেটা বড় দুষ্টু হয়েছে। ওর দিকে তাকালে ও নিতে যায়। কিন্তু আর চুপচাপ থাকা যায় না। রজত ক্রুর দৃষ্টিতে তাকিয়ে। বাইরে যেতে না পেরে ক্ষেপে উঠেছে। শয়তান কোথাকার! আরও কত গুণ আছে কে জানে। কেউ চিনতে পারে নি রজতকে। না মা না দাদা। ও নিজেও কী চিনতে পেরেছিল? তখন রজত ব্যবহারে কত দরদবান। উপকারীর ভূমিকায় একটা পতনোন্মুখ সংসারকে রক্ষা করতে এগিয়ে এসেছিল। দিনের পর দিন পাকা খেলোয়াড়ের মত অগ্রসর হয়েছে। মা কিছু বুঝতে পারেন নি। বরং নিজেই আগ্রহের সঙ্গে ওকে ঠেলে দিয়েছেন রজতের দিকে।

আজ সব পরিষ্কার। ওর প্রতি রজতের আর কোন মোহ নেই। তাই বাড়ীতে বেশিক্ষণ থাকতে চায় না। অজুহাত লেগেই আছে। মীরার দিন কাটতে চায় না। শুধু খাওয়া আর ঘুম। তবু পল্টুকে নিয়ে অনেকটা সময় কেটে যায়। কেবল স্বাচ্ছন্দ্য সে চায় নি। রজত একটু-আধটু মদ খেলেও, অনেক দিন রাত্রে পাশে এসে শোবার সময় তীব্র গন্ধ সে অনুভব করেছে, কোনদিন উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করে নি। মীরা প্রথম দিকে কান্নাকাটি করেছে। লাভ হয় নি কিছু। এর চেয়েও বেশি মর্মান্তিক ব্যাপার হলো ওর প্রতি রজতের অনাগ্রহ। কী নিয়ে বাঁচবে সে?

সিগারেট ধরিয়ে রজত আড়চোখে তাকায়। মীরার মুখ দেখে বোঝবার জো নেই এই মুহূর্তে কী সে ভাবছে। মেজাজটা খিঁচড়ে দিয়েছে। এতক্ষণে বন্ধুরা ওর অপেক্ষায় থেকে নিশ্চয়ই অধৈর্য হয়ে উঠেছে। সারাদিন অফিস করে সন্ধ্যেবেলায় ঘরে বসে থাকা ভাল লাগে না। কেন মীরা তো রয়েছে। কে যেন ফিসফিস করে ওর কানের কাছে বলে উঠল। রজত সামান্য অস্বস্তিবোধ করল। একা সে থাকতে চায় না। কারণ একা থাকলেই ওর মনে হয় অলক্ষ্য থেকে কারা যেন জেরায় জর্জরিত প্রশ্ন ছুঁড়ে মারছে। বড় মারাত্মক সব প্রশ্ন। কোনকিছু অমতা বলে উড়িয়ে দিতে পারে না। আবার স্বীকার করার অর্থ হলো নিজেকে অপরাধী মনে করা। তার চেয়ে কাজের মধ্যে, বন্ধু-বান্ধব নিয়ে হৈ-হল্লা, মদ্যপান ও স্বর্গলোকের সান্নিধ্য—ইদানীং কতিপয় সুন্দরী রমণীর সংস্পর্শে এসেছে, তারা ইন্টেলিজেন্ট, বেশ জোরালো ও উত্তেজক: এই সব নিয়ে দ্রুত নিঃশব্দে রাতগুলি পার করে দেওয়া অনেক বেশী আরামের ও নিরাপদ। না, কোন গ্লানি নেই। কেন থাকবে? সে তো মীরার প্রতি কোন অবিচার করছে না। সুন্দর ফ্ল্যাটে দামী আসবাব, ক'টা অবশ্য দামী শাড়ি, অলংকার কিছু আর কী চাইতে পারে মীরা? সেদিন দুবারে পার্কস্ট্রীট

রজত। মীরা আসলে আর পাঁচটা নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের সাধারণ মেয়ের মত। স্বামীকে পুরো পাওয়া চাই। স্বামী অন্য কোন স্ত্রীলোকের সংস্পর্শে গেলে (আসলে তাদের মধ্যে নিছক বন্ধুত্বের সম্পর্ক) মুখ ঘুরে যায়, নানারকম সন্দেহ, আত্মহত্যার ভয় দেখানো, রাত্রে উপোস করা, বুকের ওপর এলোচুলে, কাজল-লেপটে-যাওয়া-চোখে আছড়ে পড়া ইত্যাদি।

—কী ব্যাপার? তীব্র চোখে তাকায় রজত। বেশ হাসিমুখে ওর কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে মীরা।

—কিছু না। একটু কফি খাবে? বলে মীরা ওর উত্তরের অপেক্ষা না করে দ্রুত পায়ে রান্নাঘরের দিকে চলে যায়।

সোফায় কাৎ হয়ে অনেকটা শোবার ভঙ্গিতে রজত পাশের ছোট্ট টেবিলের ওপর থেকে একটা ইংরেজী ম্যাগাজিন তুলে নেয়। ঝাপসা কতগুলি অক্ষর। দূর ছাই। উঠে বসল সে। এখন স্ত্রীর মুখোমুখি বসে কফি পান করতে হবে। 'আজ স্ত্রীর প্রতি এত বিতৃষ্ণা কেন রজত!' ঝিমঝিম করতে থাকে মাথাটা। মাঝে মাঝে এমনি হয়। হয় সে শুনতে ভুল করে অথবা ব্যাপারটা নিছক মনগড়া। যাই হোক না কেন, নিজেকে সে অসুখী মনে করে। আর বিস্বাদ ঠেকে সবকিছু। তবে বেশিক্ষণ না, এই যা সান্ত্বনা। আবার নতুন উত্তেজনায় ডুবে ভুলে যায় সবকিছু।

মুখোমুখি বসে পট থেকে কফি ঢেলে কাপ এগিয়ে ধরে মীরা। এরই মধ্যে মনে হলো রজতের, কফিতে চুমুক দিতে দিতে আড়চোখে তাকিয়ে, একটু বিশেষভাবে সাজগোজ করেছে মীরা। মনে মনে হাসল। পল্টু হওয়ার পর চেহারাটা বেশ খারাপ হয়েছিল। এখন স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে অনেকদিন পর নতুন আবিষ্কারের মত মনে হলো, চেহারায় চাকচিক্য আগের চেয়ে ঢের বেশি। একটু মোটা হয়েছে। তাতে বেমানান হয়নি কিছু। গাত্রবর্ণের উজ্জ্বলতা বেড়েছে। তাহলে বেশ সুখেই আছে। তবে মাঝে মাঝে ওরকম বিসদৃশ আচরণ করে কেন।. কী চায়? সম্পূর্ণ ওর খেয়ালখুশি-মত রজত চলবে, নিজের পৌরুষ ব্যক্তিত্বকে বিসর্জন দিয়ে স্ত্রৈণ হয়ে যাবে। তাতেই বোধ করি শান্তি পাবে মীরা।

খুক করে হেসে মীরা বলল, ভাল লাগছে না বুঝি। মন পড়ে রয়েছে বাইরে। আমি সব বুঝতে পারি মশাই। তুমি কত বদলে গেছ। আজকাল হেসে একটা কথা পর্যন্ত বলো না। কেন এমন করছো?

—আই অ্যাম টায়ার্ড মীরা।

—জানি। কিন্তু কীসে তোমার ক্লান্তি। শুধু আমাদের কাছে থাকলেই; না? সারা-দিন অফিস করে ফিরে এসে ফের বেরিয়ে যাও। অনেক রাত্রে ফিরে খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ো। তোমার তাতে সময় কাটে, বেশ ভাল-ভাবেই তা জানি। কিন্তু আমার কথা কখনও ভেবে দেখেছো?

রজত কাঁধ নেড়ে বলল, সময় কাটানো তোমার কাছে একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে দেখছি। কেন বইটই পড়তে পার না। কত ম্যাগাজিন রয়েছে। রেডিও আছে। তারপর পল্টু। তাছাড়া পাশের ফ্ল্যাটের ভদ্রমহিলার সঙ্গে তো পরিচয় হয়েছে। মাঝে মাঝে গল্প করতে পার।

—থাম। মীরার মুখের হাসি মিলিয়ে যায়, তুমি সব বুঝেও না বোঝার ভান করো। আসলে আমি কী চাই জান না?

—কী চাও? স্পষ্ট করে বলো। তোমার হেঁয়ালী কথাবার্তা বুঝতে পারি না।

—থাক বুঝে কাজ নেই।

চোখ ফেটে জল বেরিয়ে পড়ার উপক্রম। তাড়াতাড়ি মীরা ট্রের উপর পট কাপ তুলে রান্নাঘরে চলে আসে। প্রাণপণে নিজেকে সংযত করল। এভাবে অভিমান করে লাভ নেই। রজত ওকে এড়িয়ে চলছে। এখন চেপে না ধরলে পরে আর ধরে রাখতে পারবে না। একদম নাগালের বাইরে চলে যাবে। সে কী চায় স্পষ্ট করে বলতে হবে। প্রতারক কোথাকার! ক্রোধে মীরার সব শরীর কাঁপতে থাকে।

—মা, আজ কী কী রান্না করবো?

—যা ইচ্ছে হয় কর।

বিরক্তির সঙ্গে কথাটা বলে রামুর দিকে তাকাল মীরা। বড় বিব্রত রামু। বহুদিন আছে রজতের কাছে। রান্না বেশ ভালই করে। মীরার চেয়ে বরং রামুর রান্নাই বেশ পছন্দ রজতের।

ঘরে ফিরে দেখল, রজত ডিভানে শুয়ে রেডিও শুনছে। মীরা এগিয়ে যায়। রেডিওটা বন্ধ করে দেয় হঠাৎ। অসহ্য লাগছে সবকিছু। ইচ্ছে করছে সবকিছু ভেঙে তছনছ করে ফেললে কিছুটা স্বস্তি পাবে।

—রেডিওটা কি দোষ করল? রজত মীরার থমথমে মুখ লক্ষ্য করে দরজার দিকে তাকায়। এক ছুটে পালিয়ে গেলে কেমন হয়!

—সন্ধ্যের সময় রোজ কোথায় যাও?

—কেন ক্লাবে। তুমি কী জানতে না? রজত অবাকদৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে তাকায়। বেশ কঠিন চোখমুখ মীরার। উঃ আর সে পারছে না সহ্য করতে। মীরা তাকে ইদানীং সন্দেহ করছে। খুব খারাপ। সহজভাবে কথা বললেও ক্ষেপে উঠছে। এখন সে কী করবে। রজত সাবধান হয়ে ওঠে।

—ক্লাবে কারা আসে। কী করো ক্লাবে?

—বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে গল্প করি। বিলিয়ার্ড খেলি কখনো।

—মেয়েরা আসে না?

—মেয়েরা নয়। আসে বন্ধুদের স্ত্রীরা বা তাদের বান্ধবীরা। যাবে একদিন আমার সঙ্গে?

—না। মীরা ঠোঁট উল্টে বলল, আমি গিয়ে কী করবো। তাছাড়া পল্টু রয়েছে। ওকে কে দেখবে।

রজত কোন জবাব দিল না। বুঝতে পারছিল মীরা কী বলতে চায়। হ্যাঁ, সন্দেহ ঢুকেছে মনে। বেশ চিন্তিত হলো সে। সন্দেহ রোগটা বড় খারাপ। এতে শরীর খারাপ হয়। মন-মেজাজ ভাল থাকে না। সবকিছু অস্বাভাবিক মনে হয়। এভাবে চললে মীরা অসুস্থ হয়ে পড়বে। কিন্তু সে কী করতে পারে!

—চল না একটু ঘুরে আসি। মীরা এগিয়ে এসে ডিভানে বসে। নীচু হয়ে ঝুঁকে রজতের ঠোঁটে চুম্বন করে পরপর কয়েকবার।

রজত বেশ ঘাবড়ে যায়। মীরার ব্যবহার অদ্ভুত। কোনরকম উত্তেজনা অনুভব করল না সে। দেখা যাক কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়।

—ওঠো। জামাকাপড় পরে নাও তাড়া-তাড়ি। ডিভান থেকে সরে গিয়ে মীরা আয়নার সামনে এসে দাঁড়ায়।

—কোথায় যাবে? রজত অল্প হাসল, পল্টুর কথা ভেবেছো। ও জেগে তোমাকে দেখতে না পেয়ে কাঁদবে না? -রামু কী পারবে ওকে সামলাতে? তার চেয়ে দুজনে গল্প করি। কাছে এসে বসো না।

হাসি ফুটল মীরার চোখমুখে।

ওকে সাময়িকভাবে খুশি করবার জন্যে রজত সম্মতি জানিয়েছে। এখন থেকে অফিস থেকে ফিরে বাইরে বেরুনো চলবে না। ঘরে থাকতে হবে। স্ত্রী ছেলে নিয়ে গল্পগুজব, কখনো কাছে পার্কে গিয়ে খানিকক্ষণ বেড়ানো, অথবা মাঝে মাঝে সিনেমায় যাওয়া—পতি পরম গুরু, সুখী দাম্পত্য-জীবন, আদর্শ স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক, বাহবা আর কী চাই! 'তোমাকে কাছে পেলেই আমার সব পাওয়া।' বলার সময় সোহাগে বিড়ালীর মত কেমন করে উঠেছিল মীরা। ভেবে হাসি পেল রজতের।

রাত্রে খাওয়ার টেবিলে বসে মীরা হাসি-গল্পে মেতে উঠল। বহুদিন পর রজতকে কাছে পেয়েছে। এখন আর মনে কোন ক্ষোভ নেই। বরং মনেমনে সে জন্য কিছু ভাবছিল। যদিও খুব বেশি আশা সে করে না। কয়েকটা দিন দেখা যাক। রজত তার কথার মর্যাদা রাখে কিনা দেখতে চায়।

অন্ধকারে কেউ কারু মুখ দেখতে পারছিল না। বারবার তাকাচ্ছিল মীরা। কোলের উপর পল্টু ঘুমিয়ে। একটু পরে ছবি শুরু হয়। রজত পর্দার দিকে তাকিয়ে। ওর মুখের একটা দিক চোখে পড়ছে। মীরা টের পেয়েছে। ছবির দিকে মনোযোগ দিতে চেষ্টা করল। না, পারছে না সে। এভাবে রজতকে কাছে পেতে চায় না। আনমনা রজত। বেশ গম্ভীর। ওর ব্যবহারে আহত মীরা। কী অপমান! হ্যাঁ, তাচ্ছিল্য ছাড়া কী! পাঁচ কথা বললে তবে একটা কথার জবাব দেয়। ভেবে পায় না তার প্রতি রজতের অনাগ্রহের কারণ কী। সে কী বুড়িয়ে গেছে? নাকি বিতৃষ্ণার বোঝা? তা নয়। তবে? তবে কী রজত অন্য নারীতে আসক্ত? ভাবতেই দমবন্ধ হয়ে আসতে চায় মীরার। কিছুই সে বুঝতে পারছে না। অথচ সব তার জানা দরকার। মুখ বুজে সবকিছু সহ্য করবার মত মেয়ে সে নয়।

(ক্রমশ)

গোয়েন্দা কবি পরাশর

প্রেমেন্দ্র মিত্র রচিত
শৈল চক্রবর্তী চিত্রিত

CENTRAL LIBRARY

ডিজাইন সেণ্টার

'অঙ্গনা'র কাজে একাধিক শিল্প-কেন্দ্রের সংস্পর্শে এসেছি। কত রকমের কাজ। সুন্দর সুন্দর ডিজাইন। সুদূর পাহাড় থেকে এই শহর। কোথাও বিফল মনোরথ হইনি। সুন্দরের স্পর্শ ঠিক পেয়েছি। কৃত্রিম হাসির বিকৃতি নয়, সহজ স্বাভাবিক আনন্দে চির সমুদ্ভাসিত। চোখেমুখে তারই আলাপন। রেখায় রেখায় সমুজ্জ্বল। কথা বেশি বলতে পারিনি। শিল্পকে মনে ধরবার চেষ্টা করেছি। মুগ্ধ-চিত্তে বেরিয়ে এসেছি। ও'রা ক্ষুণ্ণ হয়েছেন কিছু আলাপ না করায়। মৃদু হেসেছি সেই উজ্জ্বল আনন্দে। সুখে থেকেছি, কাজেই তো আপনাদের জানা হয়ে গেছে।

এক একটি ডিজাইন তুলতে অনেক সময় লাগে। সবাই প্রতীক্ষা করে থাকেন কি অধীর আগ্রহে। শিল্প এবার কি রূপ নেয় দেখার জন্য। সেই অনুযায়ী তৈরী হবে কাজের ছক। একজন জানালেন সকালে এসে বসি। দুপুরে খাওয়ার জন্য একটু ছুটি। আবার বসি। উঠি যখন বিকেল আলো গড়িয়ে যায়। একনাগাড়ে কাজ। তবু খুব একটা এগোয় না। মাথায় হয়তো একটা চিন্তা ঘুরঘুর করছে এমন সময় ক্রেতা এলো কাজ নিতে। ওদের সব বুঝিয়ে দিতে দিতে সেই চিন্তা তৎক্ষণাৎ আবাউট টার্ন করে বিদায় নিয়েছে। এরকম কতবার হয়েছে। এখনও হয়।

কেউ কেউ অভিযোগ করেছেন, তাঁর ডিজাইন বাজারে ছাড়ার পরই সবাই নকল করতে বসে যায়। এতে তিনি অসন্তুষ্ট। খুবই স্বাভাবিক। ও'রা চেষ্টা করলে আরো নতুন কিছু হতে পারে। কিন্তু সন্তোষও আছে। তাঁর ডিজাইন বাজারে কদরসহ চলছে। প্রচার বাড়ছে। অবশ্য তাঁর নয়, তাঁর ডিজাইনের। এসব পণ্য আবার স্বদেশ ছেড়ে বিদেশেও যাচ্ছে। এ স্বীকৃতি খুব একটা ছোট ব্যাপার নয়।

এরকম শিল্পকেন্দ্রও কলকাতা এবং উপকণ্ঠে আছে যা শিল্পনৈপুণ্যে দেশ-বিদেশ একাকার করে ফেলেছে। সেই কাঁথা প্রতিষ্ঠানের কথা বড়ো বেশি মনে পড়ছে। বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী একটি শিল্প নতুন প্রাণ পেয়েছে এই প্রতিষ্ঠানের সাধনায়। কাঁথা থেকে কত সুন্দর সুন্দর জিনিষ। শাল, আলোয়ান পর্যন্ত। সূচের কাজ অনবদ্য। আমরা কাঁথার দেশের মানুষ। তাই এসব জিনিষ নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাই না। কিন্তু আমেরিকায় এ বস্তুর কদর খুব। জোর চলছে। আর সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী মুদ্রাও আসছে।

'শিল্পশ্রী'র শ্রীমতী মীরা চৌধুরীও এমনি ডিজাইনের অভিনব পরিকল্পনা এবং বিন্যাসে দেশ-বিদেশ জয় করেছেন। প্রতিবারই তিনি চেষ্টা করেন নতুন কিছু করার। প্রায়ই সফল হন। কাঁচ বসানো জামা-জুতো আর স্কার্ফে তিনিই অগ্রণী। এর আদরও হয়েছে খুব। অনেক বিদেশী দূতাবাসের মহিলা-পুরুষ তাঁর কাছে ছুটে আসেন নতুন ডিজাইনের জামার জন্যে। বাজার চলতি সব কিছুই তাঁর কাছে প্রায় অচল। নতুন ডিজাইন তোলেন। নিজে দিনরাত পরিশ্রম করেন। এখানে যাঁরা কাজ করেন তাঁদেরও খাটতে হয় খুব। তবে এ খাটুনিতে সবাই খুশি। নতুন ভাবনা যেখানে নিত্য বহমান পরিশ্রম সেখানে নিবৃত্তির আনন্দ।

স্পষ্ট মনে নেই। কোথাও কোথাও এমন ডিজাইনও দেখেছি যা চিরকালের জন্য শিল্পসদনে স্থান পেতে পারে। সম-সাময়িক ক্ষণিকতা ছাড়িয়ে একটি অনন্য শিল্পদীন সেখানে নিজের স্থান করে নিয়েছে। কালের চঞ্চলতায় হারিয়ে ফেলতে চায়নি নিজেকে। এরকম শিল্পসমৃদ্ধ ডিজাইন খুব বেশি হয় না। যা হয় তাই সংরক্ষণ করতে হয়। তাতে শিল্পী যেমন সম্মানিত হন তেমনি আগামী দিনের কাছেও বর্তমানের একটা আবেদন থাকে। এটুকু শিল্পীরও দাবী এবং ন্যায্য প্রাপ্য।

এমনি একটি ডিজাইন সেণ্টার আছে লণ্ডনে। পিকাডিলির কাছে হে মার্কেটে। একটি সাধু উদ্দেশ্য নিয়ে এই সংস্থাটি গঠিত হয় ১৯৪৪ সালে। মুখ্যত উদ্যোগ ছিল শিল্পপতিদের। সরকারের সমর্থন ছিল। এই সংস্থার লক্ষ্য ছিল, ব্রিটিশ শিল্প সামগ্রীর ডিজাইনের উন্নতিসাধনে সাহায্য করা। সেই ধারা আজো বজায় আছে।

এই ডিজাইন সেণ্টারের প্রতিটি সামগ্রীই কাউন্সিল অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন অনুমোদিত। এই শিল্প কেন্দ্রটিকে স্থায়ীভাবে পরিচালনার দায়িত্বও কাউন্সিল বহন করে। এটি একটি স্থায়ী কেন্দ্র। তা বলে কখনো কোণাকুণি কিম্ভূতে পৌঁছে যায়নি। এর বৈশিষ্ট্যই হলো, নিরত রূপের পরিবর্তনে।

ঐতিহ্য সমন্বিত প্যাটার্ন ও তাদের আধুনিক রূপের বিবর্তনে দর্শককে সাহায্য করার জন্যে সেণ্টারের একটি সচিত্র সূচী রয়েছে। এই তালিকা থেকে ১০ হাজারেরও বেশি দ্রব্যের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যাবে। এই কারণে সেণ্টারে দর্শক সমাগম প্রায় লেগেই থাকে। বছরের যে কোন সময়ই এখানে মেলার ভিড়।

এই ভিড় সামলানোর জন্য সারা বছর এই সেণ্টার খোলা থাকে। দর্শকদের সুবিধার্থে এখানে ঢুকতে কোন দর্শনী লাগে না। সারা পৃথিবী থেকে লোক আসে এই সেণ্টার দেখতে। ১৯৬৮ সালে দর্শক সংখ্যা দশ লক্ষ ছাড়িয়ে যায়। প্রতি দিনের গড় হিসাবে ৩৮২৭ জন আসেন এই সেণ্টার পরিদর্শন করতে। এই বিপুল সংখ্যক দর্শক রেকর্ড বিশেষ।

অসংখ্য রকমের জিনিষের ডিজাইন এখানে উপস্থাপিত হয়ে থাকে এবং তাদের পরিকল্পনায় এখান থেকে সাহায্য করা হয়। বিরাটাকার সামুদ্রিক জাহাজ এলিজাবেথ—২ থেকে শুরু করে প্রিন্স অব ওয়েলস-এর অভিষেকের স্মারকপত্র, মিড ওয়াইফদের ইউনিফর্ম, হাসপাতালে রোগীর সরঞ্জাম, বিমানে ব্যবহৃত বিশেষ টেবিল ক্লথ এবং আরো কত কি।

ব্রিটেনের নির্মাতারা তাঁদের শিল্পদ্রব্যকে সবসময়ই কার্যোপযোগী ও সুন্দর করে তুলতে চেষ্টা করেন। তাঁদের তৈরী কাগজ ডিসপেনসারে শুধু আঙুল চালানোই সহজ নয়, তা চক্ষুকেও তৃপ্তি দেয়। এজন্যই এই শিল্পদ্রব্যের একটি নমুনা গত বছর ডিউক অব এডিনবরা পুরস্কার লাভ করেছে।

ছোটো বস্তুই বা কত। পাল প্রোপেলার, ব্রিফ কেস, পোর্টেবল ফ্রাংকিং মেশিন, গ্যাসের হিটার দেয়ালে বসানো বৈদ্যুতিক কেটলি—সবই পরিচ্ছন্ন, ছিমছাম। কাজের উপযুক্ত আকারেও এবং এমনভাবে অলংকৃত নয় যে ধুলো জমতে পারবে।

মাঝে মাঝে অনুষ্ঠিত হয় এই ডিজাইন সেণ্টারের বিশেষ প্রদর্শনী। তখন দর্শকের চাপ খুব বাড়ে। এমনি একটি প্রদর্শনী হয়ে গেল 'লাইটিং ফর লিভিং' নামে। ঘর ও কারখানা আলোকিত করার কৌশল প্রদর্শিত হয় এতে। বহু আগ্রহীর সমাবেশ হয়েছিল। আর একটি প্রদর্শনী হলো 'গোয়িং মেট্রিক'। এই প্রদর্শনী দর্শকদের শিখিয়ে দিল দশমিক পদ্ধতিতে চলতে। এ প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখ্য যে সত্তরের দশকে ব্রিটেনে ওজন ও মাপজোখ চালু হবে দশমিক পদ্ধতিতে।

আমার মনে পড়ে আমাদের দেশের কথা। অসংখ্য শিল্পকেন্দ্র গড়ে উঠেছে। কুটিরশিল্পের নানা প্রতিষ্ঠানও। নতুন ডিজাইন আজো মাথাভর্তি বিজ্ঞাপনে পোকার তাড়নায় আজো পালাচ্ছে। আমার অতীতেও ছিল। সব নিশ্চয়ই লুপ্ত হয়ে যায়নি। অথচ সেসবের সঙ্গে একই আসরে পরিচয়ের সুযোগ নেই বললেই চলে। এরকম শিল্পসদনও আমাদের গড়ে ওঠেনি। শিল্পীদের জন্য দরদ আছে আমাদের। এটুকু হলে শিল্পের জন্য শিল্পীর দরদ মর্যাদা পায়। হাতের কাছে সব নিদর্শন পেলে শিল্পীর সৃজন ক্ষমতাও নতুন মুক্তির পথ পাবে।

কিন্তু সে সম্ভাবনার রুপোলী রেখা কবে দেখা যাবে?

—প্রমীলা

CENTRAL LIBRARY

বাংলা ছোটোগল্পের গোপন সমস্যা

বাংলা সাহিত্যের সাধারণ উৎকর্ষ কোন স্তরের, সে বিষয়ে তর্ক থাকতে পারে। কিন্তু ভালো কিছু কবিতা আর ছোটোগল্প যে লেখা হ'য়েছে, এ বিষয়ে সকলেই আমরা একমত। বিশেষ করে ছোটোগল্পের এ ব্যাপারে একটা প্রধান জিত এই যে, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও গল্প লিখেছেন, এবং বলা যায় তাঁর হাতেই ঘটেছে আধুনিক ছোটোগল্পের গোড়াপত্তন। তাঁর মধ্যবর্তিনী, নষ্টনীড়, স্ত্রীর পত্র, হালদার গোষ্ঠী বা পয়লা নম্বর ইত্যাদি গল্প পৃথিবীর যে কোনো সাহিত্যের তুলনাতেই সামনের সারিতে আসন পাবার যোগ্য।

রবীন্দ্রনাথ এই যে গভীর সুরে বাংলা ছোটোগল্পের তার বেঁধে দিয়ে গেলেন, তা বজায় রাখা বড় সহজ ছিল না। কিন্তু সুখের বিষয়, প্রভাত মুখোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, পরশুরাম এবং অনতিবিলম্বেই গল্পের আসরে যাঁরা যোগ দিলেন সেই বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ, প্রেমেন্দ্র মিত্র অচিন্ত্যকুমার, বুদ্ধদেব বসু, তারাশঙ্কর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়—এঁদের হাতে বাংলা ছোটোগল্পের বিচিত্রবীণা বহু স্বর-সংযোগে ঐকতানের মতো বেজে উঠল। কিন্তু আমি পুরোপুরি ইতিহাস তৈরি করতে বসিনি। কাজেই নামের তালিকা দিয়ে আপনাদের ভারাক্রান্ত করব না। বক্তাওয়ারি আলোচনার মধ্যেও যাব না। যাঁদের নাম আমি উল্লেখ করলাম এখানে, তাঁরা ছাড়াও আরো অনেক সার্থক গল্পলেখক সেকালেও ছিলেন, আর একালে যে তাঁদের সংখ্যা কী পরিমাণে বেড়ে গেছে, কলেজ স্ট্রীটের বইপাড়ার শো-কেসগুলোতে একটু ইতস্ততঃ নজর বুলিয়ে নিলেই তা আন্দাজ করা যাবে।

বস্তুত ছোটোগল্প এখন বাংলা সাহিত্যের সব থেকে ফলবান বিভাগ। এবং এদিকে চর্চাও যেমন গভীর, তেমনি এর জনপ্রিয়তাও খুবই ব্যাপক।

কিন্তু এইখানেই একটা কথা ওঠে। ছোটোগল্প যে পাঠকদের খুবই পছন্দসই তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এর আর কোনো প্রমাণ বাদ দিলেও শুধু এবারকার পূজা সংখ্যাগুলোতে একটু নজর দিলেই দেখতে পাবেন প্রায় সব বড় কাগজেই ডজন-ডজন গল্প ছাপা হ'য়েছে। অর্থনীতির ডিমান্ড অ্যান্ড সাপ্লাইয়ের তত্ত্ব অনুসারে নিঃসন্দেহেই বলা চলে, চাহিদা না থাকলে যোগান থাকত না। পাঠকেরা গল্প চান বলেই সম্পাদকেরা গল্প ছাপতে উৎসাহী হন। এবং লেখকেরা, ধরে নেওয়া যাক যে তাঁরা নিজের খেয়ালেই গল্প লেখেন তবু, সম্পাদকের মারফৎ পাঠকদের এই গল্প-পড়ার আগ্রহ এবং লেখানো তাগিদ দেওয়া যে লেখকদেরও বেশ মাতিয়ে তোলে তাতেও কোনো সন্দেহ নেই। কেননা তা না হলে এক-একজন লেখক শুধু শারদীয় মরশুমেই এক ডজন-দু' ডজন ক'রে গল্প লিখতেন না। কিন্তু তার পরেই ঘটে একটা অদ্ভুত কাণ্ড। পুজোর সময় এই যে কয়েক শ' গল্প বাঙালি পাঠকের চিত্ত-হরণ করে, পুজোর পর তার বেশির ভাগই পুরনো কাগজবিক্রিওয়ালার মারফৎ লোক-চক্ষুর অন্তরালে চলে যায়। এবং তখন ভালোলাগা গল্পগুলো কেবল পাঠকের মনেই উঁকিঝুঁকি দেয়, তাকে চোখের সামনে ধরে দ্বিতীয়বার পড়াও যায় না, পছন্দসই প্রিয়জনকে পড়ানোও যায় না।

কেন? কারণটা হল এই যে, বেশির ভাগ প্রকাশকই ছোটোগল্পের বই বার করতে উৎসাহী নন, কেননা, তাঁরা বলেন ছোটোগল্পের বইয়ের বিক্রি নেই।

জবাবটা যে অবাক ক'রে দেবার মতো তা মানতেই হবে। যে গল্প মাসিক বা সাপ্তাহিক পত্রিকায়, কিম্বা শারদীয়

দুর্লভ চক্রবর্তী

সংখ্যায় পড়ে পাঠক তারিফ করেন, সেই গল্পই বই আকারে বেরোলে কেন তাঁরা উদাসীন থাকেন, তার কারণ খুঁজে পাওয়া সত্যিই বড় দুরূহ। তবে একালে বাংলা বইয়ের প্রধান পাঠক এবং প্রধান বিক্রয়-মাধ্যমের বিষয়ে একটু ওয়াকিবহাল হলে এই দুর্বোধ্য ধাঁধাও অনেকটা প্রাঞ্জল হয়ে আসে বটে।

বাংলা বইয়ের প্রধান পাঠক পুরুষ নন মেয়েরা। এবং বিক্রির প্রধান মাধ্যম হল লাইব্রেরী। একালে ব্যক্তিগত সংগ্রহের জন্যে বাংলা বই কেনা প্রায় নেই বললেই চলে। যাঁরা উচ্চশিক্ষিত এবং হাতে যাঁদের পয়সা আছে, তাঁরা ইংরেজি বই কেনেন। যাঁদের পয়সা নেই, বই কেনাটা তাঁদের পক্ষে মর্মান্তিক বিলাসিতা। অথচ বই পড়েন এই নিম্নবিত্ত সম্প্রদায়ের লোকেরাই। এবং পড়েন বলাবাহুল্য লাইব্রেরীর মারফৎ-ই। মুশকিল দেখা দেয়, লাইব্রেরীতে পছন্দসই বই পাওয়া নিয়ে; এবং পাঠিকা যেহেতু মেয়েরা সেজন্যে লাইব্রেরী থেকে পুরনো বই বদলিয়ে নতুন বই আনাও একটা সমস্যা—কেননা এ ব্যাপারে বাড়ির পুরুষদের শরণ নিতে হয়। এবং পুরুষরা স্বভাবতই প্রতিদিন বাড়ির মেয়েদের ফরমাস খাটতে রাজি নন। অথচ গল্পের বই পড়া হ'য়ে যায় চটপট, কাহিনীবিস্তারে জটিলতা এবং ব্যাপ্তি উপন্যাসের তুলনায় অনেক কম থাকে বলে তারিয়ে-তারিয়ে উপভোগ করেও সময়টা ভরাট করে রাখা যায় না। কাজেই সব সমস্যার সমাধান হল, লাইব্রেরী থেকে গল্পের বদলে উপন্যাসের বই আনা, এবং বেশ মোটা সাইজের বই আনা—যাতে এক-বার আনলে সপ্তাহখানেকের মতো নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। বাংলা ছোটোগল্পের বইয়ের চাহিদা কম হওয়ার একটা কারণ সম্ভবত এইরকমই।

এতে যে ছোটোগল্পের ক্ষতি হবে তাতে সন্দেহ নেই। লেখকরা ক্ষমতা থাক আর নাই থাক, বই ছাপানোর সুবিধে হবে বলে অনেকেই উপন্যাসের দিকে ঝুঁকবেন, এবং ছোটোগল্প থাকবে অবহেলিত। তারপর, আদিগঙ্গার মতো ছোটো গল্পের ধারাও যদি স্তিমিত হয়ে আসে, তাতেও অবাক হওয়া চলবে না।

কিন্তু সময়ে সজাগ হলে এ পরিস্থিতি থেকে আত্মরক্ষা করা একেবারে অসম্ভব তা বলা চলে না। বিশেষ করে আমাদের দেশের লাইব্রেরী সংগঠনগুলো যদি একটু সচেতন হন, তাহলে অনেককিছুই হয়তো করা সম্ভব।

প্রথমত, লাইব্রেরীর পক্ষ থেকে 'হোম সার্ভিস' প্রথার প্রচলন করা চলে। যদি লাইব্রেরী থেকে বই নেওয়া-দেওয়ার অসুবিধেই গল্পের বই না নেবার প্রধান কারণ হয়, তবে বাড়িতে বসে বই পেলে (হোম সার্ভিসের মারফৎ) ছোটোগল্পের বইয়ের পাঠকসংখ্যা বাড়তে পারে।

দ্বিতীয়ত, লাইব্রেরীর যিনি কর্ণধার তিনি যদি সক্রিয় হন, তাহলেও উপকার পাওয়া যেতে পারে। এদেশের বেশির ভাগ গ্রন্থাগারিকই শুধু হাতের কাছে বই জুগিয়ে দেবার মধ্যেই তাঁদের কর্তব্যকে সীমাবদ্ধ রাখেন। কিন্তু তা না করে তিনি যদি সদস্যদের বন্ধু হিসেবে তাঁদের সঙ্গে বই পড়া উচিত এবং কোন কোন বই পড়লে বাংলা সাহিত্যের বিষয়ে তাঁরা মোটা-মুটি একটা ধারণা তৈরি করতে পারবেন, এ বিষয়ে আলোচনা করেন ও পরামর্শ দেন তাহলেও হয়তো ছোটোগল্পের বইয়ের প্রচলন বাড়তে পারে। কেননা, আগেই বলেছি, বাংলা সাহিত্যের একটা প্রধান উৎকর্ষ দেখা দিয়েছে ছোটোগল্পের ক্ষেত্রে। অন্তত, ছোটোগল্পকে বাদ দিয়ে বাংলা সাহিত্যের রূপরেখার বিষয়ে আন্দাজ করা যে শক্ত তাতে সন্দেহ নেই। এই জরুরী ব্যাপারটিই যদি গ্রন্থাগারিক তাঁর গ্রন্থাগারের সদস্যদের মনে সঞ্চারিত ক'রে দিতে পারেন, তা হলে ক্রমে ক্রমে তাঁদের রুচি পরিবর্তন ঘটাও অসম্ভব নয়। তখন পাঠকেরা নিজেরাই এসে ছোটোগল্পের বই চাইবেন, এবং তারিফ করে পড়বেন। গল্প-লেখকেরাও প্রকাশকের বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে ভালো গল্প লিখতে উৎসাহী হবেন। আমার তো অন্তত এই মনে হয়।

প্রেক্ষাগৃহ

অন্য অতীত/পরিচালনা : হীরেন নাগ/সুপ্রিয়া দেবী এবং উত্তমকুমার।

ফটো : অমৃত

শতবার্ষিকীর প্রণাম

যাঁর আকস্মিক অকাল মৃত্যুতে ব্যথিত হয়ে কবিকণ্ঠ বলে উঠেছিল :

এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ,
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান।

সেই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ দেশমাতৃকার আহ্বানে যেদিন তাঁর অর্ধ লক্ষ মাসিক আয়ের ব্যারিস্টারী ছেড়ে বাঙলার রাজনৈতিক নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন, সেদিন থেকে তাঁর মহাপ্রয়াণের পূর্বক্ষণ পর্যন্ত তিনি ছিলেন আপামর বাঙালীর মুকুটহীন সম্রাট। মধ্যগগনের প্রদীপ্ত ভাস্কর যদি সহসা অন্তর্হিত হয়, তাহলে তা যেমন নিশ্ছিদ্র অন্ধকারময় শূন্যতার সৃষ্টি করে, দেশবন্ধুর অকাল প্রয়াণে সেই শূন্যতারই সৃষ্টি হয়েছিল তাঁর দেশবাসীর মনে। ...১৯২৫-এর সেই বিষাদময় ১৭ জুনের সেই দারুণ দাবদাহপূর্ণ দ্বিপ্রহরটি আজও মনে আছে, যেদিন তাঁর মরদেহ শিয়ালদহ থেকে কেওড়াতলার মহাশ্মশানে নীত হয়েছিল। মাতৃপূজার উৎসর্গীকৃত-প্রাণ দেশবন্ধু মহাত্মা গান্ধীজী প্রবর্তিত অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন সর্বস্ব পণ করে। তিনি আইন ব্যবসা ত্যাগ করে শুধু ইংরেজের আদালতই বর্জন করেন নি, বিলাতী বর্জনের জন্যে তিনি সকল রকম বিলাসিতা ত্যাগ করে 'দাশসাহেব' থেকে খদ্দরের ধুতি-পাঞ্জাবীধারী খাঁটি বাঙালী চিত্তরঞ্জনে পরিণত হয়েছিলেন; এমন কি স্বাস্থ্যহানির কারণ জেনেও তিনি চিকিৎসকদের সানুরোধ পরামর্শ উপেক্ষা করে তাঁর বহুদিনের অভ্যস্ত মদ্যপান পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে পরিহার করেন। শুধু কি তাই? বিলাতী বস্ত্র বর্জন আন্দোলনে নারী স্বেচ্ছাসেবিকাদের নেতৃত্ব করবার জন্যে তিনি তাঁর স্ত্রী ও কন্যাকে পথে নামবার নির্দেশ দেন এবং শেষপর্যন্ত রসা রোডস্থ তাঁর বসতবাড়ীটি জনকল্যাণের জন্যে দান করেন (বর্তমানে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোডস্থ চিত্তরঞ্জন সেবাসদন প্রতিষ্ঠানটি তাঁরই বসতবাড়ী ভেঙে নির্মিত হয়েছে)। দেশের কাজে চিত্তরঞ্জনের মতো এমনভাবে সপরিবারে সর্বস্বান্ত হয়েছেন, এমন নেতা বাঙলায় কেন, সারা ভারতেও বিরল।

দেশ ও দশের এই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের জন্মশতবর্ষপূর্তি উৎসবের দিনে মিত্র প্রোডাকশনস তাঁদের শ্রদ্ধাঞ্জলি স্বরূপ উপহার দিয়েছেন 'দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন' নামে বাঙলা ছবিটি। প্রযোজক নরেন্দ্রনাথ মিত্র যে এই দেশনায়ক দেশবন্ধুর জন্মশতবর্ষে তাঁর পূত জীবনীচিত্রটি নির্মাণের কথা চিন্তা করেছিলেন, তার জন্যেই তিনি তাঁর স্বদেশবাসীর ধন্যবাদের পাত্র।

ব্যারিস্টারী পাশ করবার পরে চিত্তরঞ্জনের স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনে ছবির শুরু এবং দার্জিলিংয়ের 'স্টেপ অ্যাসাইড' বাড়ীটিতে তাঁর জীবনদীপ নির্বাপণে ছবির পরিসমাপ্তি। প্রথম জীবনে তাঁর ব্যারিস্টারীতে ব্যর্থতা, মফস্বল আদালতে আইনজীবী হওয়া, পাওনাদারদের জ্বালায় পিতা ভুবনমোহন যখন দেউলিয়ার খাতায় নাম লেখান, তখন তাঁর অপমানের অংশীদার হয়ে চিত্তরঞ্জনেরও প্রোনোটে সই করা, মানিকতলা বোমার মামলায় অরবিন্দ ঘোষের পক্ষ সমর্থন করবার জন্যে তাঁর বহু অর্থ ব্যয় করা এবং জয়যুক্ত হওয়া, কৃতী ব্যারিস্টাররূপে স্বীকৃতি লাভের সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর অর্থ উপার্জন করা, পিতার ঋণ সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করা, অভাবগ্রস্ত দরিদ্রদের অকাতরে সাহায্য করা, সাহিত্য চর্চা, সাধ্বী স্ত্রী বাসন্তী দেবীর আন্তরিক সহযোগিতায় সুখেদুঃখে অবিচল থেকে সংসারযাত্রা নির্বাহ করা এবং শেষে অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়া থেকে স্বরাজ্য দল গঠন করে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় সদলে আসন দখল করার মধ্য দিয়ে দেশের কাজে কারাবরণ করা, সুভাষচন্দ্রকে মুক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত করা ও কারারুদ্ধ হবার পরেও ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করা এবং দেশের চিন্তা করতে করতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়া পর্যন্ত দেশবন্ধুর ঘটনাবহুল জীবনকে বর্ণক্রমে সামনে তুলে ধরবার

প্রয়াস পেয়েছেন চিত্রনাট্যকার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ও পরিচালক অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায় যুগ্মভাবে। এর ফলে চিত্তরঞ্জনের জীবনের বহু তথ্য বর্তমান যুগের দর্শকদের জানানোর প্রয়োজনীয়তা নিশ্চয়ই মিটেছে, কিন্তু ছবিটি পল মুনি অভিনীত 'এমিল জোলা', 'লুই পাস্তুর' বা 'ওয়ারেজ'-এর মতো নাটকীয়তাসম্পন্ন একখানি রসঘন চিত্রে পরিণত হতে পারেনি। বহু হৃদয়স্পর্শী ঘটনার সমাবেশ সত্ত্বেও ছবিটি সমগ্রভাবে একটি অখণ্ড শিল্পসৃষ্টিরূপে প্রতিভাত হয়নি, এ সত্য না মেনে উপায় নেই। দিল্লী ন্যাশনাল থিয়েটারের অধিকর্তা মিঃ অল্কাজিকে যখন প্রশ্ন করা হয়েছিল, গান্ধীজীর জীবনী অবলম্বনে কোনো নাটকের সম্বন্ধে তাঁর কি রকম উৎসাহ, তখন তিনি বলেছিলেন, গান্ধীজীর সমগ্র জীবনী নিয়ে কোনো নাটক তৈরী সম্ভব নয়, খ্রীকাভেরীকৃত গান্ধী জীবনী চিত্রের মতো তা মাত্র তথ্যমূলক হতে বাধ্য; কিন্তু যদি তাঁর জীবনের এমন কোনো ঘটনা অবলম্বন করে নাটক তৈরী করা যায়, যা তাঁর জীবনে একটা বিরাট পরিবর্তন এনেছিল

প্রতিবাদ ঃ/আনন্দপ্রসাদ/সুলতা চৌধুরী ও মৌসুমী চট্টোপাধ্যায়

বা অন্য কোনো রকমে একটা বিরাট প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল, তাহলে তার অভিনয় দর্শকদের ভীষণভাবে আলোড়িত করবে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের জীবনী সম্বন্ধেও সমান কথাই বলা চলে।

নাম ভূমিকায় অনিল চট্টোপাধ্যায় গৃহীত চরিত্রের মর্যাদা সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন হয়েই চরিত্রটির রূপদান করেছেন। এবং বহু স্থানেই তাঁর চরিত্র চিত্রণ সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। পিতা ভুবনমোহন বেশে হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায় যথেষ্ট সংযমের সঙ্গে চরিত্রটির আনন্দ ও বেদনাকে প্রকাশিত করেছেন। দেশবন্ধু সহধর্মিণী বাসন্তী দেবীর ভূমিকায় লিলি চক্রবর্তী চরিত্রের সহধর্মিতাকে মাধুর্যের সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। চিত্তরঞ্জনের ভগ্নী অমলা চরিত্রটিকে সার্থকভাবে রূপায়িত করেছেন শমিতা বিশ্বাস। ছবিটিতে ভীড় করে রয়েছে বহু চরিত্র অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই। তবে যাঁর সুস্পষ্ট আহবানে ব্যারিস্টার সি আর দাশ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন হবার সাধনায় সর্বস্ব ত্যাগ করেছিলেন, সেই মহাত্মা গান্ধীর চরিত্র ছবিটির মধ্যে অনুভূতিতেই থেকে গেছে, মূর্তি পরিগ্রহ করে উপস্থিত হয়নি। মনে হয়, এটা একদিক দিয়ে ভালোই হয়েছে। গান্ধীজীকে রূপায়িত করা খুব সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। ছবিতে প্রদর্শিত বহু চরিত্রের মধ্যে বিশেষভাবে যাঁদের মনে পড়ছে, তাঁরা হচ্ছেন : ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় (সুব্রত সেনশর্মা), ব্যারিস্টার বি সি চ্যাটার্জি (আনন্দ মুখোপাধ্যায়), রাজা সুবোধ মল্লিক (বীরেন চট্টোপাধ্যায়), কাজী নজরুল ইসলাম (কৌশিকীব্রত দত্ত), কুমারকৃষ্ণ মিত্র (জীবেন বসু), বীরেন্দ্রনাথ শাসমল (অমরেশ দাস), অরবিন্দ ঘোষ (নির্মল চট্টোপাধ্যায়), সুভাষচন্দ্র (অমর দত্ত), বিপিন পাল (দীপক মুখোপাধ্যায়) এবং আরও কেউ কেউ।

ছবিটির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ সর্বত্র সমান নয়—কোথাও বেশ দক্ষতার পরিচায়ক, আবার কোথাও বা সাধারণ মানের। চিত্তরঞ্জনের ভূমিকায় কেশবিন্যাসে ছবির শেষাংশে যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হয়নি। তিনি যে রোল্ড গোল্ড (বা সোনার) চশমা পরতেন, তা ছিল ডিম্বাকৃতি (ওভাল শেপড)। এসব ব্যাপারে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত ছিল। ছবিতে বিভিন্ন পরিবেশে গান আছে এগারোখানি। এর মধ্যে আছে রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, কাজী নজরুল ইসলাম . এবং স্বয়ং চিত্তরঞ্জনের রচনা। দেশবন্ধুর মহাপ্রয়াণের অব্যবহিত পূর্বে ব্যবহৃত তাঁর রচনা 'নাবিয়ে নাও জ্ঞানের বোঝা' গানখানি অত্যন্ত সুপ্রযুক্ত হয়েছে। 'বাঁধন কাটবে তুমি', 'যায় যেন মোর সকল ভালোবাসা' প্রভৃতি গান সম্বন্ধেও

স্টারে

[শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত নাট্যশালা]

৪০০তম অভিনয় অতিক্রান্ত

শ্যামলী

অভিনব নাটকের অপূর্ব রূপায়ণ
প্রতি বৃহস্পতি ও শনিবার ঃ ৬৷৷টায়
প্রতি রবিবার ও ছুটির দিন ঃ ৩টা ও ৬৷৷টায়

॥ রচনা ও পরিচালনা ॥
দেবনারায়ণ গুপ্ত

॥ রূপায়ণে ॥
অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, অপর্ণা দেবী, নীলিমা দাস, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, সতীন্দ্র ভট্টাচার্য, কালীপদ চক্রবর্তী, দীপিকা দাস, শ্যাম লাহা, প্রেমাংশু বসু, বাসন্তী চট্টোপাধ্যায়, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, ...গীতা দে ও বঙ্কিম ঘোষ।

অর্ধ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ

চা ব্যবসায়ী

বি, কে, সাহার

খুচরা ও পাইকারী নূতন বিক্রয় কেন্দ্র

বি ৩০, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট (ভিতর)

CENTRAL LIBRARY

প্রায় সমান কথাই বলা চলে। এছাড়া আবহ-সঙ্গীতরূপে রবীন্দ্রসঙ্গীতের ব্যবহারও বহু ক্ষেত্রেই সার্থকতা লাভ করেছে।

মিত্র প্রোডাকসন্স-এর শতবার্ষিকীর প্রণাম 'দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন' জনসাধারণকে দেশবন্ধুর চরিত্র সম্পর্কে যথেষ্ট সজাগ করে তুলবে। —নান্দীকর

স্টুডিও থেকে

তপনবাবু এখন ভীষণ ব্যস্ত। বম্বে থেকে ফিরেই পুরোদমে কাজ শুরু করেছেন আবার। নভেম্বরের মধ্যেই 'এখনই'র কাজ শেষ করে ফেলতে চান তিনি। গত সপ্তাহে একটানা চার-পাঁচদিন একটি ক্রিকেট ক্লাবের মাঠে চিত্রগ্রহণ করলেন। কলকাতায় 'এখনই'র কাজ শেষ করে বম্বেতে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব 'জিন্দগী'র কাজ শুরু করতে চান।

বাংলা দেশের দর্শকরা সাগ্রহে প্রতীক্ষা করছে তপনবাবুর 'এখনই'র মুক্তি কবে পাবে। সমসাময়িক যুব সমাজ ও তৎসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সমস্যার ভিত্তিতে লিখিত রমাপদ চৌধুরীর এই উপন্যাস বহুপঠিত। 'সাগিনা মাহাতো'র পর 'এখনই' তপন সিংহের আরেকটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ হবে বলা যায়: বাংলার তিনজন খ্যাতনামা পরিচালক সত্যজিৎ রায়, তপন সিংহ ও মৃণাল সেন—তিনজনই একসঙ্গে যে ছবি তিনখানার কাজ করছিলেন তার প্রতিটিই 'কনটেম্পোরারী' কাহিনীর ওপর ভিত্তি করে।

মৃণালবাবুর 'ইণ্টারভিউ' মুক্তি পাচ্ছে এ সপ্তাহে। একজন বেকার যুবকের একদিনের ইণ্টারভিউ দিতে যাবার কাহিনীই এ ছবির আখ্যান। পরিচালক শ্রীসেন এ ছবিতে আধুনিক কনটেন্টেরই শুধু আশ্রয় নেননি, ফর্মের দিক থেকেও আধুনিকতার ছোঁয়াচ পাওয়া যাবে। শ্রীসেন কারিকুরিগতও বহু বৈচিত্র্য ও বিশেষত্বের পরিচয় রাখতে চেষ্টা করেছেন এই ছবিতে। এ সপ্তাহেই মৃণালবাবুর ছবি দেখবেন দর্শকরা।

তপনবাবুর ছবি 'এখনই' এখনও প্রস্তুতির পথে। তিনিও যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন ছবিকে মেজাজে ও আঙ্গিকে আধুনিক করে তুলতে।

• • •

অজিত গাঙ্গুলী 'জননী', অজিত লাহিড়ীর 'আটাত্তর দিন পরে' ও অরবিন্দ মুখার্জীর 'ধনী মেয়ে' তিনটি ছবির নায়িকার চরিত্রেই এ নামটি দেখা যাবে। কিছুদিন আগে যখন ফিল্ম এ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট অফ ইণ্ডিয়ার সমাবর্তন উৎসব হয়েছিল পুণায় সেদিন বি আর চোপরার দীক্ষান্ত ভাষণের পর ডিপ্লোমা বিতরণের সময় জয়া ভাদুড়ীর নাম তিনবার ডাকা হয়েছে, প্রতিবারই সে ধীর পদক্ষেপে, গাম্ভীর্যের সঙ্গে এগিয়ে গেছে ডায়াসের দিকে। অভিনয়ে গতবার একমাত্র জয়া ভাদুড়ীই প্রথম শ্রেণীর সম্মান পেয়েছিল, অন্য কেউ তার পাশে দাঁড়াতে পারেনি, না ছেলে না মেয়ে। যে তিনটি ছবিতে সে এখন কাজ করছে তার প্রত্যেকটিতেই আমার উক্তির সারা হয়ে গেছে একাধিকবার। কিন্তু সেটে এর্টিস্টদের জন্য অকারণ গাম্ভীর্য নিয়ে বসে থাকতে দেখিনি শ্রীমতী ভাদুড়ীকে। হয়তো সেটের প্রতিটি কলাকুশলী ও সহযোগী শিল্পীদের সঙ্গে জমিয়ে গল্প করছেন নয়তো পরিচালকের নির্দেশমত আপনমনে পরবর্তী টেক নিয়ে কাজের কথা ভাবছেন, আপনমনেই সংলাপ আউড়ে চলেছেন। শিল্পীর কর্তব্যই তো তাই।

কলকাতায় জয়ার হাতে তো মাত্র তিনখানা ছবি, ওর বম্বেতে চাহিদা আরও বেশী। ওখানে ওর হাতে এখনও ছ'খানা ছবি আরও দু'একটার কথাবার্তা চলছে। হৃষিকেশ মুখার্জী যদিও তাকে সব চাইতে প্রথমে সাইন করিয়েছিলেন, কিন্তু রাজশ্রী পিকচার্সের সমাপ্তির কাজ শুরু হয়েছে আগে। খ্যাতনামা শিল্প নির্দেশক সুধেন্দু রায় এ ছবির পরিচালক। এবং জয়ার বিপরীতে ছবির নায়কও কলকাতার—স্বরূপ দত্ত। 'ধনী মেয়ের' সেটে শ্রীমতী ভাদুড়ী জানালেন যে রবিঠাকুরের গল্পটি খুব ছোট পরিচালক শ্রীদেব নতুন চিন্তাতে তাই দু-একটি পরিবর্তন করেছেন। গত সপ্তাহে জয়া কলকাতায় ছিলো না। অরবিন্দবাবুর ধনী মেয়ের আউটডোরের কাজে বাইরে গিয়েছে। এ পর্যায়ের আউটডোরে অংশ নিয়েছেন উত্তমকুমার, রবি ঘোষ, হরিধন মুখোপাধ্যায়, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, জহর রায়, তপেন চট্টোপাধ্যায়, সুখেন দাস প্রমুখ। এ সপ্তাহেই অবশ্য তাঁরা ফিরছেন সবাই নয়, কেউ কেউ।

• • •

স্বদেশ সরকার এতদিন বাদে [illegible] ফিরে আসছেন আবার। একটি ছবি করেই দীর্ঘ বিশ্রামান্তের পর শুধু শ্রীসরকারই ফিরছেন না, আরও নতুন আসছেন, একজন হলেন 'দিবা রাত্রির কাব্য' ছবির অন্যতম পরিচালক শ্রীবিমল ভৌমিক আর অপরজন হলেন স্ব-নাম খ্যাত শিল্পী ও-সি ওরফে

দয়াশঙ্কর সুলতানিয়া নিবেদিত

মৃণাল সেন-এর বাংলা ছবি

ইণ্টারভিউ

ক্যামেরা : কে. কে. মহাজন
সংগীত : বিজয় রাঘব রাও
কাহিনী : আশীষ বর্মণ

০ একযোগে চলছে ০

গ্লোব - রাধা - পূর্ণ - আলোছায়া

পদ্মশ্রী ০ সুচিত্রা ০ মায়া ০ শ্রীদুর্গা
মৃণালিনী ০ আনন্দম্ ০ প্রফুল্ল ০ চিত্রা ও অন্যত্র

[illegible] অভিনীত নবজাত নাটকের একটি দৃশ্য।

ও-সি গাঙ্গুলী। কিন্তু 'গোয়েন্দার গলি' উনি করেছিলেন প্রায় বছর ছয়েক আগে।

স্বদেশবাবু ও বিমলবাবু যে দুটি কাহিনী নিয়ে আগামী ছবির প্রস্তুতি চালাচ্ছেন সে দুটি গল্পেরই কাহিনীকার শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। একটি 'পদ্মপাতায় জল' অন্যটি 'ধস'। দুজনেই চিত্রনাট্য তৈরীর কাজে ব্যস্ত। স্বদেশবাবু কিছুদিন আগে অবশ্য জানিয়েছিলেন 'পদ্মপাতায় জলের' চিত্রনাট্য শেষ তিনি করে রেখেছেন এবং নায়ক-নায়িকা হিসাবে মালাদানের জুটি সৌমিত্র-নন্দিনীকেও বেছে রেখেছিলেন। এখন সম্ভবতঃ শ্রীসরকার চিত্রনাট্যের কিছু পরিমার্জন করছেন। ও-সব নতুন ছবির কাহিনীকার তিনি নিজেই, চিত্রনাট্যও লিখছেন তিনি। ফ্লোরে যেতে এখনও দেরী আছে কিছু। কারণ ছবির কাজ শুরুর আগে প্রাক-প্রস্তুতির কাজ এখনও বাকি অনেক। তার মধ্যে অন্যতম হলো শিল্পী নির্বাচন। যতদূর জানি সম্পূর্ণ না হলেও প্রধান চরিত্রগুলোতে নতুন মুখ নিয়ে কাজ করতে তিনি বদ্ধ পরিকর।

• • •

জয়া ভাদুড়ী যদি নবাগতাদের মধ্যে ব্যস্ততম নায়িকা হন, অপর্ণা সেন তাহলে পরিচিত মুখের মধ্যে ব্যস্ততম। দু সপ্তাহ আগের একটা ঘটনা মনে পড়ছে। টেকনিশিয়ানের দু নম্বর ফ্লোরের সেটে বসে তখন তিনি একটি ছবির পরবর্তী টেকের অপেক্ষা করছেন। পরিচালক কিছুক্ষণ আগে তাঁর সংলাপের রিহার্সাল দিয়ে গিয়েছেন। আলোকনিয়ন্ত্রণের কাজে ক্যামেরাম্যানের সঙ্গে পরিচালকও ব্যস্ত। সেই ফাঁকে শ্রীমতী সেন পরবর্তী দৃশ্যে তার সংলাপ ও ভঙ্গী নিয়ে বসে বসে চিন্তা করছেন। ইতিমধ্যে অপর্ণার সেক্রেটারী এসে জানিয়ে গেল—'অমুক বাবু ফোনে জানালেন কাল ক্যালকাটা মুভিটোনে এগারটার সময় যেতে।' মুহূর্তের জন্য তিনি অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেও পুনরায় মনোনিবেশ করলেন পরবর্তী দৃশ্যের চিন্তায়। আগামীকাল আবার অন্য ছবির কাজ। অন্য চরিত্র অন্য সিকোয়েন্স। এতটুকু ক্লান্তির চিহ্ন নেই মুখে। বিরামহীনভাবে কাজ করে চলেছেন। প্রতিটি ছবির ভিন্ন কাহিনী, ভিন্ন চরিত্র, ভিন্ন পরিচালক, ভিন্ন আবহাওয়া। অথচ এক অপর্ণা সেনই একই সময়ে অভিনয় করছেন। শ্রীমতী সেনের হাতে এখন প্রায় এক ডজনের মত ছবি। এই মুহূর্তে যে কটা নাম মনে আসছে সেগুলি হোল দাবী, স্বীকৃতি, আজব শহর কলকাতা, এখনই খুঁজে বেড়াই, জয়-জয়ন্তী, চিদানন্দ দাশগুপ্তের বিলাত ফেরত ইত্যাদি। সুতরাং অপর্ণা সেন আজকের কলকাতার ব্যস্ততম শিল্পী বলতে বাধা কোথায়।

মঞ্চাভিনয়

গত ২০শে অক্টোবর ষ্টার রঙ্গমঞ্চে মনোজ বসুর 'নূতন প্রভাত' নাটকটি সুহাস ভট্টাচার্যের পরিচালনায় কমার্শিয়াল রিক্রিয়েশন ক্লাব, চাঁদপুর, ইষ্টার্ণ রেলওয়ের সভ্যবৃন্দের দ্বারা অভিনীত হয়। পরিচালকের সুষ্ঠু পরিচালনায় নাটকটি দর্শকবৃন্দের বিশেষ প্রশংসা অর্জন করে।

অফিস ক্লাবের দলগত অভিনয় পরিচালনার গুণে যে সুন্দরভাবে অভিনীত হতে পারে, পরিচালক তাহা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করেছেন। অভিনয়ে শ্রীমতী মলিনা দেবী এবং তাঁর কন্যা কুমারী মুণু বড়াল যে অভিনয় করেন, বহুদিন দর্শকেরা মনে রাখবে। পরিচালক শ্রীসুহাস ভট্টাচার্যের অভিনয় অতুলনীয়, এছাড়া অন্যান্য ভূমিকায় প্রত্যেকেই কৃতিত্বের দাবি রাখেন।

প্রতিবারের মতো এ-বছরও পাটনা কালীবাড়ীর নাট্যোৎসব দেখতে দূর-দূর থেকে লোক এসেছিলেন। আগে এখানে ঐতিহাসিক নাটক হতো, এ-বছর সবকটাই সামাজিক নাটক হয়েছে। নানাদলের ছেলেরা মিলে এখানে নাটক করে বলে অভিনয়ের মান বরাবরই এখানে উচ্চ হয়ে থাকে। এ-বছর তিনটি নাটক অভিনীত হয় এখানে। ২৯ অক্টোবর বাছাই শিল্পীদের নিয়ে বিচিত্রানুষ্ঠান হয় এবং তার সঙ্গে অরুণকুমার দে লিখিত 'আগন্তুক' নাটক। নবীনেরা অভিনয় মন্দ করেন নি, তবে সংলাপ মুখস্থ বলার ব্যাপারে এঁদের আরো বেশি পরিশ্রম করার প্রয়োজন ছিলো। দলগত অভিনয় খুব ভালো না হলেও দেবাশীষ মুখোপাধ্যায় ও বিশ্বনাথ

কোলকাতার সর্বজনপ্রিয় যাত্রা সংস্থা

তরুণ অপেরার

"লেনিন"

'সোভিয়েট দেশ' পুরস্কার পেল।

'লেনিন' পালাটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নাট্যকার, পরিচালক, শিল্পী, কলাকুশলী ও জগতের অন্যান্য যাঁরা আশাতীতভাবে সহযোগিতা করেছেন ও অকৃত্রিম অভিনন্দন পালাটিকে এর বিরাট সার্থকতা লাভের সুযোগ করে দিয়েছেন তাঁদের সকলকেই অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা নিবেদন করছে........

তরুণ অপেরা

কলিকাতা ৬ ।। ৫৫-৭১২১

কলকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই ক্যাস বিভাগের সদস্যদের দ্বারা অভিনীত 'জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার' নাটকের একটি দৃশ্য।

চক্রবর্তী বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। দ্বিতীয় নাটকটি অভিনয় হয় ৩০ অক্টোবর—ধনঞ্জয় বৈরাগীর পরিচিত নাটক 'ধৃতরাষ্ট্র'। নাটকটির গতি একটু শিথিল ছিলো বটে, তবু সব মিলিয়ে অভিনয় ভালোই হয়েছে বলা চলে। উপেন রায়, কালীপদ ঘোষ ও অসিত বিশ্বাস টৈমানের অভিনয় না করলেও, মন্দ নয়। রীতা রায় ও আইভি গোস্বামী সুঅভিনয় করেছেন। গোবেল রায় ছোট্ট একটি ভূমিকায় সুন্দর অভিনয় করেন। এছাড়া মীনাক্ষী দে, বাসুদেব মুখোপাধ্যায়, অসীম সেনগুপ্ত ও সোনা রায় চরিত্রানুযায়ী অভিনয় করেছেন। তৃতীয় ও সর্বশেষ নাটক শচীন ভট্টাচার্যের 'কাঁটাতারের বেড়া' অভিনীত হয় ৩১ অক্টোবর। অত্যাধুনিক বিষয়বস্তু এবং 'বল হরি বোল' জাতীয় সংলাপ থাকায় (পুজোমণ্ডপের নাটক বলে) অনেকে বিরক্ত হন, কিন্তু উচ্চমানের অভিনয়ের দরুন কোনো কিছুই অসংলগ্ন মনে হয়নি। পাঁচটি প্রধান চরিত্রে রূপদান করেন দিলীপ গাঙ্গোপাধ্যায়, সমীর সেনগুপ্ত, অর্ণব সরকার, সুশান্ত দাস ও শংকর আচার্য।

নাজমা হোসেন: সম্প্রতি ৩১ অক্টোবর শনিবার বহুবাজারে 'নিউ তরুণ সঙ্ঘের' শিল্পীরা সাফল্যের সংগে অভিনয় করলেন শ্রীরবীন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর 'নাজমা হোসেন'। সুবুদ্ধি রায়, মেদিনী রায় ও জনার্দনের ভূমিকায় শ্রীরবীন্দ্রনাথ সিংহ, শ্রীরজনীকান্ত পরিডা ও শ্রীবংশীধর পাত্র উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেন। স্ত্রী ভূমিকায় 'রেবতী' চরিত্রে শিবানী ব্যানার্জী, মন্দিরা ও কাদম্বিনীর ভূমিকায় প্রভাতী মিত্র ও প্রীতিরেখা দাস, সুনাম অর্জন করেন। রাধাকৃষ্ণ দাস, রাধাকৃষ্ণ সেন, সুধাংশু রুদ্র, মানিক চ্যাটার্জি, জয়দেব বসাক খগেন্দ্রনাথ দে, মাস্টার গুণময় ও অন্যান্য শিল্পীদের অভিনয় প্রশংসনীয়। শ্রীশিবনাথ রায় ও শ্রীরজনীকান্ত পরিডা নাট্য পরিচালনায় দক্ষতার স্বাক্ষর রাখেন।

লবণাক্ত: শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত সমাজের কয়েকটি যুবকের আশা-আকাঙ্ক্ষা হতাশা ও মানবতাবোধের পটভূমিকায় রচিত 'লবণাক্ত' নাটকটি সম্প্রতি 'মেট্রো রিক্রিয়েশন' ক্লাব বিশ্বরূপা মঞ্চে অভিনয় করেন। নাটকটি সুপরিচালনা ও দলবদ্ধ অভিনয়ের গুণে দর্শকবৃন্দের কাছে বেশ সমাদৃত হয়। বিশেষ করে বিজয়, মিনু, বাণীর ভূমিকায় যথাক্রমে শীবুককান্তি দাশগুপ্ত, কার্তিকচন্দ্র ব্যানার্জী ও বাসন্তী চ্যাটার্জীর অভিনয় দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অন্যান্য চরিত্রে শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, পান্নালাল অধিকারী, প্রবালকুমার দাস, শ্রীমতী অজন্তা চৌধুরীর অভিনয় প্রশংসনীয়। নাটকটি পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন শ্রীশৈলেন মুখার্জী।

'টাকায় রং কালো': গত মহানবমীর দিন রাত্রিতে দিল্লীর ডিফেন্স কলোনীর দুর্গাপূজা উপলক্ষে বাঙ্গালী অধিবাসীরা মঞ্চ সফল হাসির নাটক 'টাকায় রং কালো' অভিনয় করেন। স্থানীয় বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালী এবং দিল্লীর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা এই নাটক দেখেন। অভিনয়ের মান খুব উঁচু স্তরের ছিল এবং দর্শকবৃন্দ খুবই আনন্দ লাভ করেন। দিগম্বরের ভূমিকায় শঙ্কর ঘোষের অভিনয় হয়েছিল খুবই উচ্চাঙ্গের। শঙ্কর ঘোষের অভিনয়, চলাফেরা, বাচনভঙ্গী, চরিত্র চিত্রণ ইত্যাদি হয়েছিল চমকপ্রদ এবং দর্শকগণ সর্বক্ষণ অভিভূত হয়েছিলেন তাঁর অভিনয় প্রতিভায়। পশুপতির ভূমিকায় অমরেশ দত্ত এবং কমলার ভূমিকায় সুব্রতা ঘোষও ভাল অভিনয় করেন।

দিল্লীতে যাত্রাভিনয়—দিল্লীর দুর্গাপুজোয় বিশেষ আকর্ষণ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলি। আবৃত্তি, সঙ্গীত, ছুঁচ প্রতিযোগিতার সঙ্গে হুলুধ্বনি, শঙ্খবাদন, আলপনা, আরতি, নৃত্য-প্রতিযোগিতাও চলে। কিন্তু নাটকের অনুষ্ঠানগুলি খুবই জনপ্রিয়। এ-বছরে দিল্লীতে প্রায় পঞ্চাশটি দুর্গাপুজো হয়েছে। অধিকাংশ সার্বজনীন, দু-একটি ঘরোয়া। যথারীতি বহু মণ্ডপে বহু নাটক মঞ্চস্থ হয়। শৈলেশ গুহনিয়োগীর ... স, 'অমৃতলাল বসুর 'বাবু' এবং মনোজ ...ের 'নীলকণ্ঠের বিষ'—বহু জায়গায় ...ভিনীত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের নৃত্য-নাট্য ...এবং নাটক অভিনয়ও কিছু কিছু হয়েছে। ...উৎপল দত্তের 'রাইফেল' নাটক কয়েক জায়গায় থিয়েটার মঞ্চে এবং কোন কোন জায়গায় যাত্রার আঙ্গিকে অভিনয়ও জনপ্রিয় হয়েছে। কিন্তু বাংলার প্রাচীন ঐতিহ্যময় যাত্রা-নাটের একমাত্র অভিনয় করেন 'শ্রীমতী অপেরা' তাঁদের নবম নিবেদন 'লালবাঈ' নাটক মঞ্চস্থ করে। নাম-ভূমিকায় শ্রীমতী কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায় অসাধারণ সঙ্গীত নৈপুণ্য এবং সুন্দর অভিনয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। রাণী চন্দ্রপ্রভার ভূমিকায় সুন্দর এবং সাবলীল অভিনয় করেন শ্রীমতী মায়া মুখার্জি।

বিভিন্ন ভূমিকায় নৃপেন্দ্র চক্রবর্তী, সুশীল চক্রবর্তী, রবি বসু এবং দিলীপ ঘোষ প্রশংসনীয় অভিনয় করেন। মিষ্টি অভিনয় দিয়ে কাকলী রায় ও কাজলী রায় সকলের মন জয় করে নেন। দিল্লীর যাত্রার ভগীরথ প্রাণ রায় তাতার নজরুদ্দিনের ভূমিকায় অসাধারণ নাট-নৈপুণ্যের পরিচয় দান করেন। কুশলী পরিচালকের নিপুণ হাতের চিহ্ন যাত্রার প্রতি দৃশ্যে দেখা যায়। বাংলার এই প্রাচীন সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে জাগিয়ে রাখার জন্য শ্রীমতী অপেরাকে ধন্যবাদ।

৮

রঙ্গনা বিশ্বরূপার রাস্তায় মাকুলার হোটেল মোড়
নান্দীকার
১৯শে নভেম্বর বৃহস্পতিবার ৬৷৷টায়
যখন একা
২১শে শনি ৬৷৷টায় ২২শে রবি ৩টে ও ৬৷৷টায়
তিন পয়সার পালা
নির্দেশনা: অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়
রঙ্গনায় (৫৫-৮৯৪৬) টিকিট পাবেন

বিবিধ সংবাদ

বেহালা অঞ্চলের অন্যতম আধুনিক সুসজ্জিত ১৬০ আসনবিশিষ্ট 'ইলোরা' চিত্রগৃহটি বেহালা ট্রাম যেখানে শেষ থামে, তারই পাশে অবস্থিত। বেহালার রায়-পরিবারের সুসন্তান পার্লামেন্টের সদস্য বীরেন রায় এই চিত্রগৃহটির সমগ্র আয়কে নানাবিধ কল্যাণমূলক কার্যে ব্যয় করবার জন্যে এই চিত্রগৃহকে একটি ট্রাস্টের অধীন পরিচালিত করবার ব্যবস্থা করেছেন। ইতিমধ্যেই এর আয় থেকে একটি দাতব্য চিকিৎসা কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। এছাড়া প্রেসিডেন্সী কলেজে দুটি স্কলার-শিপ, গোখেল মেমোরিয়াল গার্লস কলেজে একটি স্কলারশিপ, সায় পি সি রায় বিজ্ঞান ও নকশা প্রদর্শনীতে বার্ষিক ১০০০ টাকা পুরস্কার এবং বেহালা অঞ্চলে অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা করা হয়েছে। তার ওপর চৌদ্দ পরগণা কল্যাণের জন্যে এককালীন দান হিসেবে ৫,০০০ টাকা এবং কলকাতার মহরজনীতে প্রয়োজনীয় ঔষধ ও খাদ্যসম্ভারের জন্যে ১,০০০ টাকা দান করা হয়েছে। শ্রীরায় খাস কলকাতাতে আর একটি চিত্রগৃহনির্মাণের জন্য মনস্থ করেছেন যাতে তাঁর এই কল্যাণমূলক পরিকল্পনাকে আরও প্রসারিত করতে পারেন। আমরা শ্রীরায়ের চেষ্টাকে জয়যুক্ত দেখতে চাই এবং তাঁর এই মহানুভবতার ভূয়সী প্রশংসা করি।

নারী সেবাসংঘের গৃহ নির্মাণার্থে অর্থ সংগ্রহের জন্য আগামী ২৮ নভেম্বর রবীন্দ্র সদনে শ্রীমতী যামিনী কৃষ্ণমূর্তির একক নৃত্যানুষ্ঠান মঞ্চস্থ হবে বলে সংঘ কর্মী—শ্রীমতী কণা বিশ্বাস আমাদের জানিয়েছেন।

শিল্পী : সুচিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রদর্শনী পরিক্রমা

দীপক ব্যানার্জি ও সুচিত্রা ব্যানার্জি উভয়ে গত ২৪ থেকে ২৮ অক্টোবর ৪ নম্বর সানি পার্কে এক ঘরোয়া আবহাওয়ায় এচিং ও কাপড়ে বোনা ছবির প্রদর্শনী করেন। সব মিলে প্রায় চল্লিশখানি বর্ণাঢ্য কাজ। এচিংগুলি নানা ধরনের অ্যাবস্ট্রাক্ট ফর্মের পরীক্ষার নিদর্শন। ফরাসী সরকারের বৃত্তি নিয়ে দীপক ব্যানার্জি প্যারিসে উইলিয়াম হেটারের স্টুডিওতে বৎসরকাল শিক্ষা লাভ করেন। তাঁর শিক্ষার নিদর্শন কিছু কিছু দেখা গেল। মূলতঃ বিভিন্ন জ্যামিতিক ফর্ম-এর ওপর তিনি কাজ করেছেন। কয়েকটি কাজ নিছক ডিজাইন ঘেঁষা। অন্যগুলি বিভিন্ন জ্যামিতিক ফর্মের কম্পোজিশন এবং কিছু কাজ আছে যা নিসর্গ দৃশ্যের অ্যাবস্ট্রাকশন। কয়েকটি সাদা কালোয় করা এচিং বেশ জোরালো। ১, ৩, ১০ ও ৩৪ নম্বরের ছবিগুলি উল্লেখযোগ্য।

সুচিত্রা ব্যানার্জির কাপড়ের ওপর করা ছবিগুলি লোকশিল্পের রং ও ফর্মে প্রভাবিত। জগন্নাথ মূর্তি, গণেশ ঠাকুর মূর্তি এবং নানা ভারতীয় ডিজাইন ও উজ্জ্বল রঙের প্রয়োগ এগুলিকে সুন্দর করে তুলেছে। প্রদর্শনীর সব কাজগুলিই মাপে ছোট তাই যে কোন গৃহকেই সুসজ্জিত করে তুলতে পারে।

এঁরা উভয়ে আগামীতেই প্রদর্শনীটি দিল্লীতে নিয়ে যাচ্ছেন সেখানকার ত্রিবেণী আর্ট গ্যালারিতে প্রদর্শনের জন্য।

•

ম্যাক্সমুলার ভবনে ২৪ থেকে ৩০শে অক্টোবর শিশুদের জন্যে একটি বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন হল। প্রদর্শনীতে শিশুদের খেলনা, আঁকা ছবি ও বই প্রদর্শিত হয়। তাছাড়া প্রতিদিন থিয়েটার, পুতুল নাচ, গল্প বলার আসর ইত্যাদির আয়োজনও ছিল।

এই প্রদর্শনীটি ভারতবর্ষে অবস্থিত ম্যাক্সমুলার ভবনের বিভিন্ন শাখা ও জার্মানীতে অবস্থিত হেড অফিসের সহযোগে করা হয়। উল্লেখযোগ্য খেলনা নির্বাচনের এক কমিটি এই খেলনাগুলি বেছে দিয়েছেন এবং মিউনিখের স্টুডিও অব দি ইন্টারন্যাশনাল ইয়ুথ লাইব্রেরী থেকে বিয়াল্লিশখানি ছোটদের আঁকা ছবি আনা হয়। ছবিগুলি ১৯৭২-এর অলিম্পিকের ওপর আঁকা এবং প্রদর্শনীর অন্যতম প্রধান আকর্ষণ—যদিও এগুলির ডিসপ্লে অনেক ভাল হতে পারত। নানারকম খেলাধুলোর ওপর ছবিগুলি আঁকা। বেশীর ভাগ শিল্পীর বয়সই ৭ থেকে ১৫এর মধ্যে। এঁরা প্রায় সকলেই প্যাস্টেল এবং জল রং ব্যবহার করেছে। ওয়াটার-পোলো, ফুটবল, ভারোত্তোলন, সাঁতার ইত্যাদি নানা বিষয়ের ওপর আঁকা ছবিগুলির রঙের ব্যবহার লক্ষ্য করার মত।

খেলাধুলোর খেলনাগুলি চারটি ঘরে সাজানো ছিল। অবশ্য এগুলিকে ঠিক সাজানো বলা চলে কিনা তা বিতর্কের বিষয়। বলা যেতে পারে—টেবিলের ওপর জড়ো করা ছিল। বিভিন্ন বয়সের ছেলেমেয়েদের জন্যে বিভিন্ন ধরনের খেলনা রাখা হয়। কাঠের তৈরী নানারকম মোটর গাড়ি, রেল গাড়ি, মাটি তোলার যন্ত্র ইত্যাদিগুলি সুদৃশ্য কিন্তু বর্ণহীন। শিশুদের খেলনা একটু নাড়া লাগলেই ভাঙ্গা হয়। এগুলি যেন বড়দের ঘরের রূপসজ্জার উপকরণ হিসেবেই মানায় ভাল। রঙীন পুতুলের মধ্যে কাপড়ের তৈরী নানারকম সুন্দর সুন্দর পুতুল দেখা গেল। তার কয়েকটির মুখের অভিব্যক্তি দেখে মনে হয় এগুলি যেন কোন রকম পরিস্থিতিতে প্রত্যক্ষ থেকে তৈরী। একটু বেশী বয়সের ছেলেমেয়েদের খেলনার মধ্যে নানারকম যান্ত্রিক খেলনা ও যন্ত্রপাতি তৈরীর সাজসরঞ্জামগুলি সুন্দর।

প্রদর্শনীর উদ্যোক্তারা বলেন যে, খেলনার প্রদর্শনীটি কেবলমাত্র ছোট ছেলেমেয়েদের আনন্দবর্ধনের জন্যেই করা হয়নি এটি করা হয়েছে আরো গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য নিয়ে—ভারতীয় খেলনা নির্মাতাদের শিক্ষার্থে। উদ্দেশ্য সফল করতে হলে ভারতীয় খেলনার একটি সর্বাঙ্গীন প্রদর্শনী হওয়া বাঞ্ছনীয়। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে মাটি, কাপড়, কাঠ, তালপাতা ইত্যাদি নানা জিনিসের বহুরকম পুতুল ও খেলনা আছে তার একটি সংগ্রহ প্রদর্শিত হলে ভাল হয়। সেখানে খেলনা নির্মাতারা জার্মান খেলনার রং রূপ ও নির্মাণ কৌশল থেকে কতখানি লাভবান হতে পারেন তা আলোচনা করতে পারেন।

লাইব্রেরীতে ছোটদের বইএর একটি ছোট প্রদর্শনী রাখা হয়। এখানে জার্মান ও জার্মান থেকে অনূদিত ইংরিজি ও বাংলা বইও রাখা হয়েছিল। বইগুলির মুদ্রণপারিপাট্য লক্ষণীয়। পাশাপাশি বাংলা ও ইংরাজীতে ভারতে প্রকাশিত কিছু ছোটদের বইও ছিল। তবে এগুলির চাইতে উন্নততর দেশীয় প্রকাশন একটু চেষ্টা করলে কলেজ স্ট্রীটেই পাওয়া যেত। প্রদর্শনীটি এরপরে মাদ্রাজ, ব্যাঙ্গালোর, হায়দরাবাদ, পুণা, বোম্বাই, নয়াদিল্লী ও মুরকেলায় দেখানো হবে।

—চিত্ররসিক

CENTRAL LIBRARY

খেলার কথা

শঙ্করবিজয় মিত্র

ক্যাচ দেম ইয়ং

'ক্যাচ দেম ইয়ং' প্রবচনটি জীবনের সকল ক্ষেত্রেই খাঁটি। লেখা পড়ায় বা খেলাধুলোয় গড়ে তুলতে হলে অল্প বয়স থেকেই শুরু করতে হয় শারীরিক ও মানসিক ছাঁচটা যখন নরম থাকে। অনেকটা শিল্পীর হাতে মাটির ঢেলা তুলে দেওয়ার মত, আর শিল্পী সেই মাটি দিয়ে সুন্দর সুন্দর মূর্তি তৈরী করে উপহার দেন। সমস্ত তরুণের মধ্যে অফুরন্ত সম্ভাবনা রয়েছে, একাগ্রতার সঙ্গে লক্ষ্য করে সেই সম্ভাবনার মুখ খুলে দিতে হবে। তাহলে স্ব স্ব মনোবৃত্তি সঠিক পথে চলে প্রতিভাকে পরিপূর্ণ বিকাশের সুযোগ দেবে। 'ক্যাচ দেম ইয়ং' এর আসল উদ্দেশ্যই তাই।

খেলাধুলোর ক্ষেত্রেও এই প্রবচনটির সার্থক প্রয়োগ চলেছে ইউরোপ ও আমেরিকার দেশগুলিতে এবং তার ফলশ্রুতিতে এই সকল দেশের তরুণ প্রতিভার আবির্ভাব সকলকে চমৎকৃত করে। সোভিয়েট রাশিয়ায় এ সম্পর্কে বিস্তৃত কর্মসূচী অনুসৃত হয়। শহর থেকে দূরতম পল্লীর প্রতিটি ছাত্রকে শারীর শিক্ষায় দীক্ষা নিতে হয়। কিন্ডারগার্টেন স্কুলগুলিতে শারীর শিক্ষার শিক্ষকরা তাদের জিমন্যাস্টিক শেখান। যেসব ছেলেমেয়ের স্কুলে যাবার বয়স হয়নি তাদেরও শিক্ষা দেওয়া হয় বিভিন্ন ক্রীড়াকেন্দ্রে। এর জন্যে কোন ফি লাগে না। ছোটদের যার যেটি ভাল লাগে সেইভাবেই খেলাধুলো শেখান হয় তা সে সাঁতার থেকে স্কেটিং কিছুই বাদ যায় না। সাধারণ বিদ্যালয়গুলিতে শারীর শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন খেলাধুলো শিক্ষণ দেওয়া হয় বিদ্যালয়ের কার্যসূচীর বহির্ভূত বিষয় হিসেবে ক্রীড়া শিক্ষা কেন্দ্রগুলিতে সুশিক্ষিত কোচ রাখা হয়। এইসব কোচদের শুধুমাত্র শারীর শিক্ষায় ডিগ্রি নিলে চলে না, চিকিৎসা শাস্ত্রেরও প্রাথমিক জ্ঞান প্রয়োজন হয়। দেশব্যাপী ছাত্র সমাজের ক্রীড়া-প্রতিভা বিকাশের জন্য সোভিয়েট রাশিয়া এই বিরাট পরিকল্পনায় বছরের প্রায় সাতশো কোটি রুবল ব্যয় করে। ছাত্রছাত্রীদের ট্রেনিং-এর জন্য দেশব্যাপী প্রায় দুকোটি প্রাথমিক ক্রীড়াকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এ রকম ব্যাপক ও বিপুল কর্মসূচী আমাদের কল্পনাতীত। তাছাড়া আমাদের বিদ্যালয়গুলিতে খেলাধুলো শিক্ষার কোন ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। কলকাতার মত বড় বড় শহরেরও সব স্কুলে খেলাধুলোর কোন উদ্যোগই নেই। না আছে খেলার মাঠ, না আছে এজন্য কোন শিক্ষক। পল্লী অঞ্চলের বিদ্যালয়গুলিতে ত কোন প্রচেষ্টাই লক্ষিত হয় না। শিক্ষা বিভাগের এজন্য কোন মাথাব্যথা পরিলক্ষিত হয় না। তারই মধ্যে অতি সীমিত পরিসরে বিদ্যালয়ের তরুণরা খেলাধুলোর চর্চায় প্রবৃত্ত হয় এবং মাঝে মাঝে তাদের মধ্যে প্রতিভাধর খেলোয়াড় ও এ্যাথলিটের আবির্ভাব ঘটে। তবে সম্প্রতি আমাদের দেশে যেন কিছুটা চৈতন্যের সঞ্চার হয়েছে এবং স্কুল কলেজে শিক্ষা ব্যবস্থায় সঙ্গে খেলাধুলো প্রসারের যে প্রয়োজন এবং তা জাতির স্বার্থেই প্রয়োজন এই সত্যটা উপলব্ধি হয়েছে। প্রতিভাধর ছাত্রছাত্রীদের অন্বেষণের জন্য সরকার একটি কর্মসূচী হাতে নিয়েছেন। এই বছর থেকে তা চালু হবার কথা। এতে ১৪ থেকে ১৮ বছরের ছাত্রছাত্রীকে খেলাধুলো চর্চার জন্য বৃত্তি দেবার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। উদ্দেশ্য যাতে খেলাধুলোয় প্রতিভাসম্পন্ন ও উৎসাহী ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করে তাদের মধ্যে আগ্রহ ও উদ্দীপনা সঞ্চারিত করে এই ধরনের পরিকল্পনাকে সাফল্যমণ্ডিত করা যায়।

স্কুলের ছেলেমেয়েদের মধ্যে এ ধরনের প্রতিযোগিতা প্রচলিত রয়েছে বেশ কিছুকাল ধরেই এবং সেই সূত্রে আমরা সম্প্রতি তরুণ প্রতিভা আবিষ্কার করে জাতীয় ক্রীড়াক্ষেত্রে সমৃদ্ধি ঘটাবার প্রয়াসী হয়েছি বলা যেতে পারে। ভারতের সমস্ত রাজ্যের স্কুলের ছেলেমেয়েদের মধ্যে এই প্রতিযোগিতার নাম হল জাতীয় স্কুল ক্রীড়া। ভারতের সমস্ত স্কুল দল এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে তাদের কৃতিত্ব প্রদর্শন করে থাকে।

কয়েক দিন আগে জাতীয় স্কুল ক্রীড়ার শরৎকালীন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হল আগরতলায়। বিভিন্ন রাজ্য থেকে প্রায় এক হাজার ছাত্র প্রতিযোগী এবং প্রায় তিনশো ছাত্রী এতে অংশগ্রহণ করে অনুষ্ঠানটিকে প্রাণবন্ত করে তোলে। বিভিন্ন বিভাগীয় ক্রীড়ার অনুষ্ঠানের জন্য শহরের আটটি জায়গায় প্রতিযোগিতাগুলির ব্যবস্থা করা হয়। বীরবিক্রম কলেজের মাঠে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ত্রিপুরার লেঃ গভর্নর শ্রীএ্যান্টনী ল্যান্সলট ডায়াস। বিভিন্ন বক্তা এই অনুষ্ঠানের গুরুত্ব এবং জাতীয় জীবনে এর উপযোগিতার কথা বর্ণনা করেন।

ফুটবল, বাস্কেটবল, টেবল টেনিস, সাঁতার, কাবাডি, খো-খো প্রভৃতি ক্রীড়ায় তীব্র প্রতিযোগিতা হয় এবং বিভিন্ন রাজ্যের ছাত্রছাত্রীরা পূর্বের তুলনায় উন্নত মানের স্বাক্ষর রাখেন। বাংলার ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন বিভাগে নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন এবং প্রায় সকল বিভাগেই তাঁরা বাংলার সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন।

ফুটবল খেলার অনুষ্ঠানে এবার তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা অনুভূত হয়েছে। এবারের ফাইনাল খেলা হয় বাংলা ও বিহারের মধ্যে। ফাইনাল খেলার আগে সেমিফাইনালে বাংলা একদিকে ত্রিপুরাকে ০—০ গোলে হারিয়ে ফাইনালে ওঠে। অপর দিকে ফাইনালে উন্নীত হয়েছিল বিহার দিল্লীকে ন্যূনতম গোলের ব্যবধানে পরাজিত করে। ফাইনালে বাংলা ও বিহারের খেলায় প্রায় সমপ্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব পরিস্ফুট হয়। তীব্র প্রতিযোগিতার পর বাংলা কোনক্রমে

CENTRAL LIBRARY

বিহার দলকে এক গোলে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ানশিপ লাভ করে। তৃতীয় স্থান নির্ধারণের জন্যে সেমিফাইনালের বিজিত দুটি দলের মধ্যে যে খেলা হয় তাতে ত্রিপুরাকে দু গোলে হারিয়ে দিয়ে দিল্লী এই স্থানটি দখল করে।

ছাত্রদের বাস্কেটবলে চ্যাম্পিয়ানশীপ লাভ করে রাজস্থান। ফাইনালে রাজস্থান বাংলাকে পরাজিত করে এই গৌরবের অধিকারী হয়। এতে তৃতীয় স্থান পায় পাঞ্জাব। ছাত্রদের টেবল টেনিসেও এই একই ফলাফল পরিলক্ষিত হয়। এতে চ্যাম্পিয়ান হয় দিল্লী। দ্বিতীয় স্থান নেয় বাংলা, তৃতীয় স্থান দখল করে পাঞ্জাব। বাংলার ছাত্রীরা এবার বাস্কেটবলে ও টেবল টেনিসে শীর্ষস্থান অধিকার করে চ্যাম্পিয়ান হয়।

এবার সবচেয়ে প্রীতিপ্রদ অনুষ্ঠান হয়েছিল সাঁতারের প্রতিযোগিতা। এতে বাংলার ছাত্র ও ছাত্রীরা বিশেষ কর্ম-কুশলতার পরিচয় প্রদান করেছে। বাংলার ছাত্রছাত্রীরা ৭০ পয়েন্ট পেয়ে দলগত শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে। ত্রিপুরা ২৫ পয়েন্ট পেয়ে দ্বিতীয় এবং মণিপুর চার পয়েন্ট পেয়ে তৃতীয় স্থান অধিকার করে। বাংলার ছাত্ররা পনেরটি স্বর্ণ, ৪টি রৌপ্য এবং তিনটি ব্রোঞ্জ এবং ছাত্রীরা পেয়েছে একটি স্বর্ণ ও দুটি ব্রোঞ্জ পদক। সাঁতারে যে সাতটি রেকর্ড ভাঙ্গাভাঙ্গি হয়েছে তাতে বাংলার ছাত্র ও ছাত্রীরা পাঁচটি রেকর্ড স্থাপন করেন। সঞ্জীব সাহা শত মিটারের চিত সাঁতার ও বাটার ফ্লাই স্ট্রোকে, সুধীর দাস ৪০০ ও ৮০০ মিটার ফ্রি স্টাইলে এবং ছাত্রী কল্পনা মল্লিক ১০০ মিটার বুক সাঁতারে রেকর্ড করে সকলের প্রশংসাভাজন হয়েছেন।

স্কুল ছাত্র ও ছাত্রীদের প্রায় সপ্তাহ-ব্যাপী এই অনুষ্ঠান বিশেষ উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়েছে। তবে দুটি অপ্রীতিকর ঘটনা এই কল্যাণকর অনুষ্ঠানে কলঙ্ক লেপন করেছে। দেশব্যাপী অস্বাচ্ছন্দ্যের আবহাওয়ার মধ্যেও এখানে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সমাগত স্কুল ছাত্ররা পরস্পর আদান-প্রদান ও সৌহার্দের এক মনোরম পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। সমস্ত ক্রীড়া অনুষ্ঠানও সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়। দুটি অনুষ্ঠানে যে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে তার মূলে ছিলেন ছাত্ররা নয় তাদের প্রশিক্ষক ও কর্তাব্যক্তিরা। প্রথম ঘটনা ঘটে ফুটবল খেলার অনুষ্ঠানে। বাংলার সঙ্গে পাঞ্জাবের খেলায় পাঞ্জাবের একজন খেলোয়াড় বাংলার একজনকে বিশ্রীভাবে ফাউল করলে দর্শকদের মধ্যে অসন্তোষ ও উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। এর মধ্যে পাঞ্জাবের প্রশিক্ষক মাঠের মধ্যে ঢুকে পড়ে দল-বল নিয়ে মাঠ ত্যাগ করে চলে যান। ছাত্রদের শান্তভাবে সুশৃঙ্খলভাবে চলতে না দিয়ে তাদের এইভাবে বিপথে পরিচালিত করার জন্য পাঞ্জাবের কোচ ও ম্যানেজারকে আজীবন সাসপেন্ড করে স্কুল ক্রীড়া পরিচালকবৃন্দ একটি মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। আশা করি ভবিষ্যতে আর এমন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটবে না।

কাবাডি প্রতিযোগিতায় ওড়িষ্যা ও মণিপুরের মধ্যে খেলার সময় মণিপুরের প্রশিক্ষক ও ছাত্রেরা রেফারীকে শাসাতে থাকে। এর জন্যও কর্তৃপক্ষরা যখন বিচারের ব্যবস্থা করেন সেই সময় মণিপুরের কোচ তাঁর এই অশালীন আচরণের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করায় ব্যাপারটি আর বেশী দূর গড়ায় নি।

এবার সর্বভারতীয় স্কুল ক্রিকেট প্রতি-যোগিতায় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নির্বাচক মণ্ডলীর জনৈক সদস্য নিগৃহীত হওয়ায় বাংলার ম্যানেজার এবং জনকয়েক খেলো-য়াড়কেও হাজতবাস করতে হয়েছে। ঘটনাটি কোর্ট পর্যন্ত যাওয়ায় এখনকার ক্রিকেটের কর্ণধারদের জামসেদপুরে ছোটা-ছুটি করতে হয়েছে। পরে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছে দুঃখ প্রকাশ করে ক্ষমা প্রার্থনা করায় কোর্ট থেকে মামলা প্রত্যাহৃত হয়। পরে বাংলার যে সমস্ত খেলোয়াড় অশালীন ব্যবহার করেছেন তাঁদের পুনর্বার দলে পাঠান হবে না ঘোষণা করে বাংলার ক্রিকেট কর্ণধাররা যে আদেশ জারী করে-ছেন সেই সিদ্ধান্ত সকলের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেছে।

ছাত্রদের সুশৃঙ্খল ও নিয়মনিষ্ঠ করে তোলার জন্যে কাজে ও আচরণে দৃষ্টান্ত স্থাপন করা যাদের কর্তব্য সেই কর্তা-ব্যক্তিরা নিজেরাই যদি উচ্ছৃঙ্খল হন তাহলে তারচেয়ে আর পরিতাপের বিষয় কিছু নেই। এই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি প্রতি-রোধের জন্য স্কুল ক্রীড়ার পরিচালকরা যে সচেষ্ট ও সক্রিয় হয়েছেন এটা খুবই সুবিবেচনার ও আশার কথা। ক্রীড়া জগতের অন্যান্য ক্ষেত্রে যদি এঁদের এই কঠোর মনোভাবের অনুসরণ করা হয় তাহলে বহু ইতরামি বন্ধ হতে পারে।

খেলাধূলায় বিভিন্ন স্কুল ছাত্রদের মধ্যে বহু নূতন প্রতিভার সন্ধান পাওয়া যায় এই সব অনুষ্ঠানে। উত্তরকালে তারা প্রবীণ ও দক্ষ খেলোয়াড়দের শূন্যস্থান পূরণে যে সমর্থ হবে শুধু তাই নয়, দেশের ক্রীড়ামান উন্নত করতে পারবে। পশ্চিম-বঙ্গে জেলা ভিত্তিক যে সকল ক্রীড়ানুষ্ঠান স্কুল ছাত্রদের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয় তাদের মধ্যে এখানে বহু সম্ভাবনাপূর্ণ নিপুণ ক্রীড়া-কারিগরের সাক্ষাৎ পেয়েছি। কিন্তু এদের প্রকৃত শিক্ষণ দিয়ে গড়ে তোলার চেষ্টা এ পর্যন্ত তেমন কিছু হয় নি বলে বহু সম্ভাবনাই অকালে শুকিয়ে যায়। সরকার ও ক্রীড়া কর্তৃপক্ষ এদিকে যথাসময়ে নজর দিলে আমরা ক্রীড়ামানকে আন্ত-র্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত করতে পারি।

CENTRAL LIBRARY

বুদাপেস্টে আয়োজিত বিশ্ব জিমন্যাস্টিক প্রতিযোগিতায় জাপানের মহিলা প্রতিযোগিনী তাকাকো হাসিগুচি।

খেলাধূলা

দর্শক

স্যার ফ্র্যাঙ্ক ওরেল কাপ

লক্ষ্ণৌতে আয়োজিত দ্বিতীয় বার্ষিক স্যার ফ্র্যাঙ্ক ওরেল কাপ ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফাইনালে গত বছরের বিজয়ী কলকাতার মোহনবাগান ক্লাব প্রথম ইনিংসে বেশী রান করার সুবাদে গত বছরের রানার্স-আপ জামসেদপুরের বুসি মোদী একাদশ দলকে পরাজিত করেছে।

প্রথম দিনের খেলায় মোহনবাগান ৫ উইকেটের বিনিময়ে ২১৬ রান সংগ্রহ করে। দ্বিতীয় দিনে মোহনবাগানের প্রথম ইনিংস ২১৫ রানের মাথায় শেষ হলে খেলার বাকি সময়ে বুসি মোদীর দল প্রথম ইনিংসের ৯ উইকেট খুইয়ে ১৬৬ রান সংগ্রহ করে। তৃতীয় অর্থাৎ শেষ দিনে বুসি মোদী দলের প্রথম ইনিংস ১৭২ রানের মাথায় শেষ হলে মোহনবাগান ১৩ রানে এগিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে খেলতে নামে এবং ৪ উইকেটের বিনিময়ে ১৬৫ রান সংগ্রহ করে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। খেলার বাকি ৯০ মিনিট সময়ে বুসি মোদীর দল দ্বিতীয় ইনিংসের ৩ উইকেটে ৭৫ রান তুলেছিল।

আন্তঃ জেলা ফুটবল প্রতিযোগিতা

ইছাপুরে আয়োজিত আন্তঃ জেলা ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে ২৪-পরগণা জেলা দল ১—০ গোলে চন্দননগর দলকে পরাজিত করে মোট ১২ বার 'এ মজুমদার ট্রফি' জয়ের গৌরব লাভ করেছে। সর্বাধিকবার এই ট্রফি জয়ের রেকর্ড ২৪-পরগণা জেলা দলেরই। সেমি-ফাইনালে ২৪-পরগণা জেলা দল ১—০ ও ১—০ গোলে নদীয়া জেলা দলকে এবং চন্দননগর ২—০ ও ১—০ গোলে জলপাইগুড়ি জেলা দলকে পরাজিত করে ফাইনালে উঠেছিল।

ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট দল

ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট দল অশোক গায়কোয়াড়ের নেতৃত্বে তিন সপ্তাহের সিংহল সফর শেষ করে স্বদেশে ফিরে এসেছে। এই সিংহল সফরের ৬টি খেলায় ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট দলের পক্ষে খেলার ফলাফল দাঁড়িয়েছে—জয় ২ (টেস্ট খেলায়) ড্র ২ এবং পরাজয় ২ (এক দিনের খেলায়)। সিংহল সম্মিলিত বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট দলকে প্রথম টেস্ট খেলায় এক ইনিংস ও ৬১ রানে এবং দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় এক ইনিংস ও ১২৪ রানে পরাজিত করে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট দল 'রাবার' জয়ী হয়েছে। টেস্ট সিরিজের এক ইনিংসের খেলায় সর্বাধিক ব্যক্তিগত রান সংগ্রহের গৌরব লাভ করেছেন ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় দলের সুনীল গাভাস্কার। তিনি দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম ইনিংসে ৩১৫ মিনিটের খেলায় ২০৩ রান সংগ্রহ করে অপরাজিত থাকেন—২৬টা বাউণ্ডারী এবং ১টা ওভার বাউণ্ডারী করেন।

টেস্টের সংক্ষিপ্ত স্কোর

প্রথম টেস্ট :

সিংহল বিশ্ববিদ্যালয় : ৫০ রান (জাগদেল ১১ রানে ৪ উইকেট) ও ৩০ রান (মহীন্দর অমরনাথ ৮ রানে ৫ ও কৈলাস ঘাটনী ১৭ রানে ৩ উইকেট)।

যুগোশ্লাভিয়াতে আয়োজিত বিশ্ব জিমন্যাস্টিক প্রতিযোগিতার পুরুষ বিভাগে পদকবিজয়ী জাপানের সদস্যবৃন্দ। জাপান পুরুষ বিভাগে ১৬টি পদক (স্বর্ণ ৭, রৌপ্য ৫ ও ব্রোঞ্জ ৪) এবং ৫৭১-১০ পয়েন্ট সংগ্রহের সূত্রে দলগত চ্যাম্পিয়ানশীপ লাভ করে।

ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় : ১২১ রান (৭ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড)।

দ্বিতীয় টেস্ট :

সিংহল বিশ্ববিদ্যালয় : ৮০ রান (জোসী ৩০ রানে ৬ এবং জায়দেল ১৬ রানে ৩ উইকেট) ও ১৪৬ রান (জোসী ৪২ রানে ৫ এবং জাগদেল ৪০ রানে ৪ উইকেট)।

ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় : ৩৫১ রান (১ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। সুনীল গাভাস্কার ২০০ নট আউট, জয়ন্তীলাল ৭৪, এস অমরনাথ ৫০ নট আউট)।

বিশ্ব জিমন্যাস্টিক প্রতিযোগিতা

যুগোশ্লাভিয়াতে আয়োজিত বিশ্ব জিমন্যাস্টিক প্রতিযোগিতার পুরুষ বিভাগে জাপান এবং মহিলা বিভাগে রাশিয়া দলগত চ্যাম্পিয়ানশীপ লাভ করেছে।

চূড়ান্ত ফলাফল

পুরুষ বিভাগ :

দলগত : ১ম জাপান (৫৭১-১০ পয়েন্ট), ২য় সোভিয়েট ইউনিয়ন (৫৬৪-৩৫ পয়েন্ট) এবং ৩য় পূর্ব জার্মানী (৫৫৩-১৫ পয়েন্ট)।

ব্যক্তিগত : ১ম ইকো কেনমোতসু (জাপান)—১১৫-৫ পয়েন্ট, ২য় ইৎসু তুকাহারা (জাপান)—১১৩-৮৫ পয়েন্ট, ৩য় একিনোরী নাকায়ামা (জাপান)—১১৩-৮০।

মহিলা বিভাগ :

দলগত : ১ম সোভিয়েট ইউনিয়ন (৩৮০-৬৫ পয়েন্ট), ২য় পূর্ব জার্মানী (৩৭৭-৭৫ পয়েন্ট), ৩য় চেকোশ্লোভাকিয়া (৩৭১-৯০ পয়েন্ট)।

ব্যক্তিগত : ১ম লুডমিলা তুরিচেভা (সোভিয়েট ইউনিয়ন)—৭৭-০৫ পয়েন্ট, ২য় ইরিকা জুচোল্ড (পূর্ব জার্মানী), ৩য় জোয়োনিনা (সোভিয়েট ইউনিয়ন)।

এশিয়ান মোটর র‍্যালী

গত ৭ই নভেম্বর ইরাণের তেহরাণ থেকে দ্বিতীয় এশিয়ান মোটর র‍্যালীতে যোগদানকারী মোটর চালকেরা পূর্ব পাকিস্তানের ঢাকা অভিমুখে যাত্রা করেছেন। এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন ইরাণের দশ বছর বয়সের যুবরাজ রেজা পাহলভি। ১৫ই নভেম্বর ঢাকায় এই প্রতিযোগিতা শেষ হবে। তেহরাণ থেকে ঢাকার দূরত্ব ৬,৮০০ কিলোমিটার (৪,২৫০ মাইল)। এই প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী মোটর চালকেরা ইরাণ, আফগানিস্থান, পাকিস্থান (পশ্চিম ও পূর্ব), ভারতবর্ষ এবং নেপাল—এই পাঁচটি দেশের রাস্তা দিয়ে যাবেন।

আন্তর্জাতিক টেনিস টুর্ণামেন্ট

জাপানের টোকিওতে আয়োজিত আন্তর্জাতিক টেনিস টুর্ণামেন্টে এই তিনটি দেশ যোগদান করেছিল—জাপান, ভারতবর্ষ এবং ইতালী। জাপান থেকে যোগদান করেছিল দুটি দল ('এ' এবং 'বি')। প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান পেয়েছে জাপানের 'বি' দল, দ্বিতীয় স্থান জাপানের 'এ' দল এবং তৃতীয় স্থান ভারতবর্ষ। তিনটি খেলায় ভারতবর্ষের ফলাফল দাঁড়ায়—জয় ১ (ইতালীর বিপক্ষে ২—১ খেলায়) এবং পরাজয় ২। ভারতবর্ষের পক্ষে খেলেছিলেন রমানাথন কৃষ্ণান এবং শিব মিশ্র।

বিশ্ব ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতা

আরিজোনার ফোনিক্সে আয়োজিত বিশ্ব ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতার ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানে ১৬টি স্বর্ণ পদক জয়ের সূত্রে সোভিয়েট ইউনিয়ন প্রথম স্থান এবং আমেরিকা ১১টি স্বর্ণপদক সংগ্রহ করে দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছে।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

চমৎকার স্বাদ
হচ্ছে এক জিনিষ
আর শক্তিদায়ক পুষ্টি যোগানো
আরেক জিনিষ
আর কেমন মজা কোরে চিবিয়ে খেতে খেতে সেই পুষ্টিলাভ করা যায়! পার্লে গ্লুকো বিস্কুটে দুধ, গম, আর চিনির যাবতীয় উপকারিতা পাওয়া যায়—প্রোটিনে আর ভিটামিনে একদম ভরপুর।
PARLE
Gluco
তাইতো
পার্লে গ্লুকো বিস্কুট
বাচ্চাদের পক্ষে সবিশেষ উপকারী
ভারতের সর্বাধিক বিক্রীত বিস্কুট
everest/291d/PP bn

CHARMINAR
THE VAZIR SULTAN TOBACCO CO. LTD.
HYDERABAD DECCAN
৩৩ পয়সায় ১০টি
একটু জিরিয়ে নিন!
একটা চারমিনার খান
এতে পাবেন টোস্ট-করা
খাঁটি তামাকের স্বাদ।
চারমিনারের
বিক্রী ভারতের মধ্যে সব চেয়ে বেশী
ভাজির সুলতান-এর তৈরী

CMVS-7-253

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য অমৃতের কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে অমৃতের কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পিতে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে অমৃতের কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা		মফস্বল	
বার্ষিক	টাকা	২০-০০	টাকা	২২-০০
ষান্মাষিক	টাকা	১০-০০	টাকা	১১-০০
ত্রৈমাসিক	টাকা	৫-০০	টাকা	৫-৫০

'অমৃত' কার্যালয়

১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,

কলিকাতা—৩

ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

১৩শ বর্ষ
৩য় খণ্ড

অমৃত

২৮ সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday 20th Nov. 1970 শুক্রবার, ২০শে নভেম্বর, ১৯৭০ 40 Paise

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
১৬৪	চিঠিপত্র		
১৬৬	সাদা চোখে		—শ্রীসমদর্শী
১৬৮	দেশেবিদেশে		—শ্রীপুণ্ডরীক
১৭০	ব্যঙ্গচিত্র		—শ্রীকাফি খাঁ
১৭১	সম্পাদকীয়		
১৭২	শ্মশান কিশোর	(কবিতা)	—শ্রীগণেশ বসু
১৭২	ইদানিং রাতে	(কবিতা)	—শ্রীআরতি দাস
১৭২	উল্টো খেয়ায় ফিরতে গেলে	(কবিতা)	—শ্রীশিশির ভট্টাচার্য
১৭৩	পরাজিত পরীক্ষা	(গল্প)	—শ্রীশচীন্দ্রনাথ বসু
১৭৭	ইন্দিরা গান্ধী		—শ্রীসবিতা সেনগুপ্ত
১৭৯	কুলদাচরিত	(উপন্যাস)	—শ্রীনলিনীমাধব চৌধুরী
১৮০	দুই বাংলার সাংস্কৃতিক যোগাযোগের সমস্যা		—শ্রীতারাপদ লাহিড়ী
১৮৫	সুখের মেলা		—আবদুল জব্বার
১৮৮	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় স্মরণে		—শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
১৯০	সাহিত্য ও সংস্কৃতি		—শ্রীঅভয়ঙ্কর
১৯৪	অন্ধকারে আলোর ঝলক		—শ্রীনলিনীরঞ্জন বসু
১৯৫	বইকুণ্ঠের খাতা		—শ্রীপুস্তকদর্শী
১৯৯	নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে	(উপন্যাস)	—শ্রীঅতীন বন্দ্যোপাধ্যায়
২০৪	নিকটেই আছে		—শ্রীকমিবসু
২০৭	মনের কথা		—শ্রীমনোবিদ
২১০	নিজেকে হারায়ে খুঁজি	(স্মৃতিচিত্রণ)	—শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী
২১৩	ঠিকানা নেই	(গল্প)	—শ্রীবারীন্দ্র মৈত্রেয়
২১৮	বিজ্ঞানের কথা		—শ্রীঅয়স্কান্ত
২২০	গোয়েন্দা কবি পরাশর		—শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র রচিত —শ্রীশৈল চক্রবর্তী চিত্রিত
২২১	অঙ্গনা		—শ্রীপ্রমীলা
২২৪	পিঞ্জর	(বড় গল্প)	—শ্রীসুভাষ সিংহ
২২৭	জলসা		—শ্রীচিত্রাঙ্গদা
২৩১	প্রেক্ষাগৃহ		—শ্রীনান্দীকর
২৩৭	খেলার কথা		—শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়
২৪০	খেলাধুলা		—শ্রীদর্শক

প্রচ্ছদ : শ্রীসমীরকুমার গুপ্ত

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষের

বিচিত্র কাহিনী

ও

আরও বিচিত্র কাহিনী

পড়ে' আনন্দ পাবেন

চিঠিপত্র

শারদ সাহিত্য পরিক্রমা

শারদ সাহিত্য পরিক্রমায় গল্প ও উপন্যাস বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা পড়লাম। শারদ সাহিত্য নিয়ে এমন ব্যাপক আলোচনা ইতিপূর্বে আমাদের চোখে পড়ে নি। এই পরিকল্পনার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ জানাই। শ্রীপর্যবেক্ষক অল্প পরিসর হলেও গল্প-উপন্যাসের দায়সারা নাম উল্লেখ না করে সুযোগ-সুবিধে মত আলোচনা ও সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করেছেন। বর্তমান কথাসাহিত্যে বাস্তব জীবন ও সমাজ ভাবনা কোথায় কিভাবে কতটা ছাপ ফেলেছে তাও তিনি দেখিয়েছেন। আমাদের এ সময়ে যে সব সাহিত্য কর্ম হচ্ছে তা আমাদের মত সংসার-পীড়িত মানুষের পক্ষে পড়ে ওঠা সম্ভব হয় না। নানা সমস্যা ও সঙ্কটের মধ্য দিয়ে আমরা জীবনযাত্রা নির্বাহ করছি। তবু আমি বিশ্বাস করি একটা দেশের, একটা জাতির নানা প্রকার সমস্যা সঙ্কটের মধ্যে সাহিত্য ধ্রুবতারার মত জ্বলে। সাহিত্যের কাছে আমাদের প্রথম এবং শেষ দাবী সততা। দুঃখের বিষয় সন্দেহ নেই, আমাদের দেশে একজন তৃতীয় শ্রেণীর রাজনৈতিক নেতার যা মর্যাদা একজন ভাল সাহিত্যিকের সে-টুকুও নেই। সাহিত্যের মাধ্যমে একালের দুঃসহ জীবন সংগ্রামের কথা আমরা পড়তে চাইতে পারি। বাস্তবধর্মী বিষয় নিয়েও যে সুন্দর সাহিত্য সৃষ্টি হতে পারে তার প্রমাণ এবারের শারদ সংখ্যা অমৃতে প্রকাশিত মনোজ বসুর 'আমি সম্রাট' ও মিহির আচার্যের 'দিবস বিভাবরী' উপন্যাস দুটি এবং বেশ কয়েকটি ছোট গল্প। পর্যবেক্ষক তাঁর উপন্যাসের আলোচনায় এই প্রত্যাশাই ব্যক্ত করেছেন। বাস্তব জীবন থেকে উপন্যাসে উপাদান গ্রহণ করলে তা সীমাবদ্ধতার আবদ্ধ না হয়ে কাম্য প্রত্যাশাই পৌঁছান সম্ভব মনে করি।

অমলকুমার দাস
রাণাঘাট

মাছের মেলা

'অমৃতের' (২৫ সংখ্যা ২০শে কার্তিক ৭৭) মাছের মেলায় আবদুল জব্বার সাহেব কেবল কিছু মাছের নাম উল্লেখ করেছেন। বাঙালীর 'মছলীখোর' দুর্নাম অনেক দিন হয় ঘুচে গেছে। আজ শুধু বাংলায় নয়, ভারতের প্রায় প্রতিটি অঞ্চলেই মাছের চাহিদা। দেশ ভাগ হয়ে যাওয়ার ফলে নদীমাতৃক পূর্ব বাংলার 'নদীর ফল' অর্থাৎ মাছ পশ্চিমবঙ্গে আসছে না। ভারতের অন্যান্য প্রদেশ থেকেও আমদানী কম। মাছ কেনা এখন প্রায় সাধারণ লোকের আর্থিক ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে। বাজারে প্রত্যহ যা ওঠে তাই বিক্রি হয়ে যায়। কোন মাছের কি নাম এ সবের আর কে খবর রাখে? জব্বার সাহেবের লেখাটি পড়ে পরিচিত অনেক মাছের নামই মনে পড়ে গেল। আমার জানা, এবং পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম বাংলার বাজারে চালু মাছের একটি তালিকা তাই দিচ্ছি। আড়, আমোদি, ইলিস, কৈ, কাঠ কৈ, কাজলি, কাচকি, কাউন মাগুর, কোরাল, কালবোস, কাইকলা, কাংলা, কালোবেলে, কুকুরজিভ, কৈভোল, খলিসা, খয়রা, খমা, খরশুলা, খড়চাদা, গুইলসা, গোলচাদা, গজার, গুলে, ঘম্রা, ঘাগড়া, ঘাউরা, ঘিকলা, চেলা, চন্দনা, চাইপলা, চিতল, চেউরা (লাল ও সাদা) চিংড়ি (৩-৪ প্রকারের পূর্ব বাংলার সাধারণ নাম ইচা), কাইটকা, টাটকিনি, টেপটেপা, টাইট্টা ভাঙনা, ট্যাংরা, টাকি (৩-৪ প্রকারের), ঢাইন (চাঁই), তাউয়া (গুরজালি), তেলাপিয়া, তপসী (তপসে), তারাবাইম, তুলারডাটি, দাড়কিনা, পাঙ্গাস, পোয়া (ভোলা), পমফ্রেট, পাবদা, পারসে, পুটি, পাঁকাল, ফটক, ফ্যাসা, ফলুই, বোয়াল, বাচা, বেলে, বাঁশপাতা, বজুরি, বইচা, বাটা, ভোলপোয়া, ভেদা, ভেটকি, মাগুর, মহাসের, ম্যাকরেল, মৃগেল, মেদ, মৌরালা, রাই, রিঠা, লাইট্টা (বোমলা), শোল (শাল), সাকুস (শঙ্কর), সরপুটি (সরলপুটি), সিলং, সিপি, সুবর্ণখড়কে, সূর্যপোলা (ভেচোকো) ইত্যাদি। মনে হয় অনেকেই হয়তো নামগুলি পড়ে স্রেফ হাসবেন — কারণ এখন এসব জেনে আর কি লাভ?

চিত্তরঞ্জন কর্মকার
কলিকাতা—৩২

মনের কথা প্রসঙ্গে

১৫ আশ্বিন ও ২২ আশ্বিনের অমৃতে মনোবিদ রচিত ধারাবাহিক নিবন্ধ 'মনের কথা প্রসঙ্গে' শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীসুধাংশুশেখর রায়ের চিঠি পড়লাম। মনোবিদ মনস্তাত্ত্বিকদের মত উল্লেখ করে বলেছেন 'আশৈশব পরিচিত লোকের সঙ্গে রোমান্টিক প্রেম হতে পারে না। বয়সের সমতা থাকলেও নয়।' পত্রলেখকদ্বয় এই উক্তিতে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তাঁদের যুক্তি, দক্ষিণ ভারতে মামা-ভাগ্নীর বিয়ে, মুসলমান সমাজে 'খুড়', 'মামা', 'মাসি' ইত্যাদি নানা ধরনের—তুতো ভাই-বোনের বিয়ে এবং পুরনো বাঙালী হিন্দু সমাজে শৈশববাকদানসম্ভূত বিয়ে প্রায়শই সার্থক, অতএব বাল্যপ্রণয় সম্ভব। তাঁদের অবগতির জন্য সবিনয় নিবেদন করছি প্রেম এবং নেগোশিয়েশন ম্যারেজ (আয়োজিত বিবাহ) এক জিনিস নয়। পূর্বপ্রেম ছাড়াও বিয়ে হয় এবং সেই সব বিয়ের অনেকগুলিই নিঃসন্দেহে সার্থক। সামাজিক প্রথানুযায়ী অভিভাবকদের উদ্যোগে সংঘটিত বিয়ের পাত্র-পাত্রীদের মধ্যে আশৈশব পরিচিতি ও সেই সব বিয়ের ভবিষ্যৎ সার্থকতা সম্পর্কে মনোবিদ কোন সন্দেহ প্রকাশ করেন নি। তাঁর বক্তব্য বাল্য-প্রণয় সম্পর্কে। ছোটবেলা থেকে যার সঙ্গে পরিচিত অধিকাংশ সময়েই তাকে নিয়ে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে রোমান্টিক ইমেজ গড়া সম্ভব হয় না। তার অন্তরঙ্গ খুঁটিনাটি সম্বন্ধে অন্য পক্ষের অবাধ জ্ঞান স্বপ্নের ডানা ঝরিয়ে দেয়। মনোবিদ সম্ভবত এই কথাই বলতে চেয়েছিলেন।

উষ্ট্রী গঙ্গোপাধ্যায়
কলকাতা—৫০

নিকটেই আছে

গত ১০ কার্তিক সংখ্যার 'অমৃত' পত্রিকায় 'চিঠিপত্রে' প্রকাশিত ছবি ব্যানার্জির 'নিকটেই আছে প্রসঙ্গে' শীর্ষক নিবন্ধটি পড়লাম।

লেখিকা যে সমাজ-চিত্রটি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন তার সম্বন্ধে আলোকপাত করার জন্য আবেদন জানিয়েছেন। আলোকপাতের প্রয়োজনীয়তা আছে বলে তো মনে হয় না। আজ সব দিক দেখে-শুনে মনে হয়, কি বড়, কি ছোট—সকলেই আমরা ভাল-মন্দের বিচারবোধ হারিয়ে ফেলেছি। সামাজিক দায়িত্ববোধ আমাদের আজ আছে বলে তো মনে হয় না। শুধু ছাপার অক্ষরে কতকগুলো কথা লিপিবদ্ধ হলো, কাজের কাজ কিছু হোল না—এ অবস্থায় আলোকপাত করে লাভ কি? তবু বিষয়টি বড়ই বেদনাদায়ক, তাই ব্যথার ব্যথী হয়ে কিছু লিখতে প্রবৃত্ত হলাম।

প্রথমেই আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা বড়ই ত্রুটিপূর্ণ। স্বয়ংসম্পূর্ণ শিক্ষা-ব্যবস্থা বলতে যা বোঝায় তা আমাদের দেশে নেই। এই না থাকার জন্য সামান্য কয়েকজন ছাড়া বেশির ভাগ ছেলেকেই বেকার-জীবনের মত অভিশপ্ত-জীবন যাপন করতে হয়। বেকার-জীবনের যে কি নিদারুণ মর্মজ্বালা তা ভুক্তভোগী ছাড়া আর কে বুঝবে! ছেলেরা যখন এভাবে দিনের পর দিন প্রবঞ্চিত হচ্ছে

চিঠিপত্র

তখন তারাও যে জাতিকে প্রবঞ্চিত করবে—এ আর বেশি কথা কী!

দ্বিতীয়ত, ছেলেরা যে আজ কুপথ-গামী, তারা যে আজ নিয়ম-শৃঙ্খলা মানতে চায় না, তার কারণ হোল—আর্থনীতিক। আর্থিক সচ্ছলতা না থাকায় তাদের পড়াশুনার যথেষ্ট ব্যাঘাত হয়। আর্থিক অনটনের জন্য অনেক ছেলেকে দেখেছি শিক্ষা সমাপ্ত হবার অনেক আগেই ইস্কুল ছাড়তে। এর ফলে এরা আস্তে আস্তে বিপথে যায়, কুসংসর্গের আশ্রয় নিয়ে নিজেদের চরিত্র কলুষিত করে। তখন এরা সমাজবিরোধী কাজে নিজেদের সম্পূর্ণভাবে বিলিয়ে দেয় এবং পরিণামে সমাজে ডেকে আনে নিদারুণ বিপর্যয়।

অনেকে আমরা এ-বিষয়ে অভিভাবকদের দোষ দিই। কিন্তু একথা কারও অজানা নেই যে, বাংলা দেশের হাজার হাজার পরিবার আজ দারিদ্র্যের কঠিন নিষ্পেষণে জর্জরিত। ইচ্ছা থাকলেও আর্থিক অনটনের জন্যে এই সমস্ত অভিভাবকেরা তাঁদের সন্তানদের ঠিকমতো লেখাপড়া করাতে পারেন না। অন্নবস্ত্রের চিন্তাতেই তাঁদের সারাদিন কাটে, ছেলেদের দিকে নজর দেবেন কখন! এ কারণে অসুস্থ আবহাওয়ায় গড়ে-ওঠা ছেলেরা যখন লেখাপড়ার কাজে ইস্তফা দিয়ে বদখেয়ালে গা ঢেলে দেয় তখন অভিভাবকের শুধু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর কিছুই থাকে না।

তৃতীয়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিণাম ও অবাঞ্ছিত দেশবিভাগের ফলে বাঙালীর জাতীয় জীবন আজ বিপর্যস্ত। সমাজের সকল স্তরে আজ দেখি সুন্দরের জায়গায় অসুন্দরের স্থান। সমাজবোধ বলতে আজ আর কিছুই নেই, শুভবুদ্ধি বা চেতনার আজ অপমৃত্যু ঘটেছে। যে শক্তির উৎস থেকে আমাদের মনে কল্যাণবোধ জাগ্রত হয়, সেই শক্তি আজ আমরা হারিয়ে ফেলেছি। সারা দেশে আজ শঠতা, হিংসা, চাতুর্যের জয়-জয়কার, সত্যের জায়গায় মিথ্যার বেসাতি চলেছে, ধর্ম আজ পর্যুদস্ত, সঙ্কীর্ণতা, স্বার্থপরতা, নীচতা, কালোবাজারী আজ চারিদিকের আবহাওয়াকে দূষিত করে তুলেছে। সমাজের সকল স্তরেই যখন নীচতা ও নোংরামি প্রকাশ পাচ্ছে তখন ছেলেদের কাছ থেকে সুন্দরের প্রত্যাশা করাটা বাতুলতামাত্র। আমরা বড়রাই প্রকৃতিস্থ নই। সুতরাং ছোটদের কাছ থেকে কি করে আমরা ভালটা আশা করতে পারি। ছোটরা বড়দের কাছ থেকেই তো সকল জিনিস আয়ত্ত করে।

বারিদচরণ ঘোষ
চুঁচুড়া,
হুগলী।

(২)

সুশীলদাকে চোখের সামনেই দেখছি, দেখেছি আবার দেখবো। অমৃতের প্রতি সংখ্যাই যেন এক একটা চমক। লেখকের লেখায় যেন একখানা ল্যাণ্ডস্কেপের রূপ দিয়েছে ধর্মতলা ট্রাম টার্মিনাসের বটগাছতলা। কোলকাতা থেকে এত দূরে থেকে যেন মনে হয় আমি সেই ধর্মতলার কোথাও বসে-বসে একাগ্রচিত্তে প্রতিনিয়ত ছবিগুলো দেখে যাচ্ছি। সুশীলদা আজকের ট্রেনের হকার, সুশীলদা আজকের হাটবাজারের ভ্রম ফেরিওয়ালা। এমন সুশীলদার প্রাণবন্ত রূপ কত সুন্দর সহজ ভাষার মধ্যে তুলে ধরেছেন লেখক। সে ধন্যবাদ অবশ্যই পাবেন, কিন্তু তার আগে লেখককে অনুরোধ করব, তিনি যেন সেই সব প্রতারকদের হৃদয়ের কথাগুলোও লিখে আমাদের আশ মেটান। কেননা এভাবে লিখে চললে একতরফাই লেখা হবে, প্রকৃত চরিত্রগুলোকে আরও ভাল করে চেনা যাবে না।

আপাত দৃষ্টিতে সুখের মেলার চরিত্র এবং নিকটেই আছের চরিত্রের পার্থক্য অনেক। কিন্তু কতগুলো জায়গায় সুখের মেলার তুলনায় সুশীলদার কাহিনী অনেক বাস্তবতার ছোঁয়া এনেছে। কোথায় গল্পে বলা পাগল শশী কাওরার আর কোথায় সেই ডাহা ধড়িবাজ কবিরাজ সুশীলদা। এক্ষেত্র ভাষার যতই তারতম্য থাক সুখের মেলার ঘটনা অপেক্ষা নিকটেই আছে অনেক বাস্তব মনে হয়েছে আমার। আশা করি আরও কিছুদিন বাস্তবতার স্পর্শ ছোঁয়া আরও কয়েকটি প্রতারকের চেহারার সঙ্গে আমরা পরিচিত হবো।

সঞ্জয় গুহঠাকুরতা
হাজারিবাগ।

মফঃস্বলের লিটল ম্যাগাজিন

গত ২০ কার্তিক গ্রন্থদর্শীর লেখা 'মফঃস্বলের লিটল ম্যাগাজিন' আলোচনাটি সুন্দর লাগল। মফঃস্বলের লেখক এবং সম্পাদকদের কাছে গিয়ে এবং নানা শ্রম-স্বীকার করে তিনি যে তথ্য সংগ্রহ করেছেন তা অত্যন্ত সত্য। বিশেষ করে তাঁর লেখার মধ্যে একাধিক জায়গায় দেখতে পেয়েছি মফঃস্বলের কবি সাহিত্যিক সম্পাদকদের একটিই অভিযোগ যে, তাঁদের দিকে কেউ তাকান না, অথচ বাংলাদেশের সাহিত্য শিল্পের ক্ষেত্রে মফঃস্বলের দান চিরকাল সীমাহীন। একথা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ একালে ও বাংলা সাহিত্যের যাঁরা দিকপাল সাহিত্যিক তাঁদের অধিকাংশই এসেছেন মফঃস্বল থেকে। নানা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যদি আজ তাঁরা সুযোগ না পেতেন, তাহলে বাংলা সাহিত্যকে অনেক পিছিয়ে থাকতে হত নিশ্চয় বলা যায়।

আমি নিজে একজন মফঃস্বলের তরুণ লেখক। সেই হিসাবে আমিও মফঃস্বলের বহু তরুণ কবি, সাহিত্যিক শিল্পীর সঙ্গে সহৃদয়ভাবে দীর্ঘদিন মিশেছি। সেখানে দেখেছি তাঁদের অভিযোগ একই। তাঁরা বলেন, দূরে বসে যতই ভাল লেখা যাক না কেন, কলকাতায় গিয়ে দলভারী এবং কিছু তদ্বির না করলে, লেখক হওয়া যায় না। তাঁদের এই অভিযোগ যদি সত্য হয়, তাহলে আগামীদিনের বাংলা সাহিত্য এবং আমাদের ভাবধারাটা কেমন হবে গ্রন্থদর্শী মশাই একটু চিন্তা করে দেখবেন কি? সবশেষে এই মূল্যবান আলোচনাটির জন্য গ্রন্থদর্শী ও সম্পাদক মহাশয়কে অভিনন্দন জানাই। বারান্তরে মফঃস্বলের কবি সাহিত্যিকদের আত্মপ্রকাশের সমস্যা সম্পর্কে আরো গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা আমার প্রিয় পত্রিকা 'অমৃতের' পাতায় দেখার আশা রাখি।

মনসারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়
সিউড়ী, বীরভূম।

আয়না প্রসঙ্গে

গত ৬ কার্তিক অমৃত সংখ্যায় রণজিৎ পালের 'আয়না' নামক গল্পটি পড়ে খুব ভাল লাগল। আধুনিক ধাঁচের গল্পের অনুকরণেই লেখা। লেখক এই গল্পটিতে বক্তা হিসাবে রেখেছেন গল্পের নায়ক তারাপদকে। নিজের প্রতিচ্ছবি আয়নায় দেখে নায়ক তারাপদ যে সব উক্তি নিজের মন থেকে ছুঁড়ে দিলেন, লেখকের এই টেকনিক প্রশংসার দাবী রাখে। নায়িকা রঞ্জনার মাধ্যমে সাধারণ মেয়েদের এক ছবি এই গল্পটির মধ্যে সৃষ্টি করেছেন। অন্য দু-একটা চরিত্রও বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীতে অঙ্কিত হয়েছে। সব থেকে উল্লেখযোগ্য চরিত্রগুলি হাস্যরসের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন।

আকবর কবীর
মুর্শিদাবাদ।

সাদা চোখে

ক্ষমতা অতি বিষম বস্তু। একবার আস্বাদ পেলে ত্যাগ করার কথা ভাবাও কষ্টকর। ক্ষমতা করায়ত্ত করবার জন্য কিম্বা, আয়ত্বে রাখবার জন্য ক্ষমতাভোগী যে কোন উপায় অবলম্বনে দ্বিধাবোধ করেন না। ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে এ বক্তব্য যেমন প্রযোজ্য, দলগত প্রশ্নেও আজকাল এ কথা খাটছে। আবার দলের মধ্যেও ব্যক্তিবিশেষ দলের নিয়ম নীতিকে উপেক্ষা করে ক্ষমতা আস্বাদনের জন্য পাগল হয়ে উঠেন। এবং এত নগ্নভাবে এই প্রচেষ্টা চালানো হয় যে, আদর্শের ভোল থাকা সত্ত্বেও নগ্নতা ধরা পড়ে। এই মন্তব্যকে জোরদার করার জন্য নিশ্চয়ই নজীর উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। কেননা এর উদাহরণ অধুনা এত বেশী হচ্ছে যে, শত চেষ্টা করলেও নজর এড়ানো যায় না।

প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে ক্ষমতা দখল করে স্বীয় আদর্শ অনুযায়ী যে কর্মসূচী গ্রহণ করা হয় তাকে রূপায়ণ করা। কিন্তু ক্ষমতা দখলের প্রশ্নেও রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে মৌলিক পার্থক্য আছে। কৌশলকে কেন্দ্র করেই এই মৌল প্রশ্নের উদ্ভব হয়েছে। অনেকগুলি দল আছে যাঁরা মনে করেন যে-কোন উপায়ে ক্ষমতা দখল করাই উচিত। কারণ, তাঁদের মতে গণমঙ্গলের কর্মসূচী রূপায়ণ করাটাই বড় কথা। এবং সেখানে সাফল্য লাভ করলে কি উপায়ে ক্ষমতা দখল করা হয়েছিল তার যৌক্তিকতা বা তত্ত্বগত দিক নিয়ে তখন আর প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু অনেক দল আছে যাঁরা কোন হিংসাত্মক পন্থায় ক্ষমতা দখল করার কথা চিন্তাই করেন না। তাই আদর্শগত বিচ্যুতির ভয়ে তাঁরা শুধু পরিষদীয় গণতন্ত্রের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলে বিশ্বাসী। এই দুই ভিন্ন কৌশলে বিশ্বাসী দলগুলির মধ্যে স্বভাবতঃই আদর্শগত পার্থক্য সুস্পষ্ট। এতদ্সত্ত্বেও, একমাত্র নকশালবাদী ছাড়া, অপর সকল দলই বর্তমানে প্রায় একাকার হয়ে গেছে। গান্ধীবাদী বলুন আর মার্কসবাদী বা লেনিনবাদীই বলুন না কেন কৌশল ও আচার-ব্যবহারে এই সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে প্রকারভেদ করা খুবই কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাজনীতিতে খুবই অভিজ্ঞ ব্যক্তি বা তাত্ত্বিক ছাড়া বর্তমানে অন্য কাহারও পক্ষে দলগুলির মধ্যে একটি বাস্তব সীমারেখা টানা খুবই কঠিন। ফলে, বিভ্রান্তি এমন এক স্তরে গিয়ে পৌঁচেছে যে, ভয় হয় গণতান্ত্রিক পন্থা শেষ পর্যন্ত না ফ্যাসিবাদের সড়ক হয়ে দাঁড়ায়।

ক্ষমতা আস্বাদনের রাজনীতি সুরু হওয়ার পর থেকেই এই অদ্ভুত অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। আদর্শের খোলস অনেক দলের ও নেতার খুলে পড়েছে এবং তাঁদের স্বাভাবিক চেহারাটা প্রকাশ হয়ে গেছে। পশ্চিমবাংলার রাজনৈতিক দলগুলির চরিত্র বিশ্লেষণ করলে এই বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যাবে।

এই রাজ্যে ক্ষমতা দখলের লড়াইকে কেন্দ্র করে প্রত্যেকটি দল যে সুবিধাবাদী নীতির প্রশ্রয় দিয়েছেন তা আজ কারও অজানা নয়। যেন-তেন-প্রকারেণ প্রায় প্রত্যেক দলই কায়েমীস্বার্থের দপ্তর আঁকড়ে থাকবার চেষ্টা করেছেন। সেই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করতে চাই না। ঐ ক্ষমতা আস্বাদনের পর থেকে প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলে যে বিশৃঙ্খলা ক্রমেই বাড়ছে এবং দলীয় নিয়ম নীতির ঊর্ধ্বে উঠে ব্যক্তিবিশেষ যে ব্যবহার করতে সুরু করেছেন তা জনসমক্ষে তুলে ধরবার জন্য এই ক্ষুদ্র ভূমিকা ও প্রয়াস। কারণ, রাজনৈতিক নেতাদের ব্যবহারের প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া সমাজে ঘটে থাকে। আজকের অব্যবস্থা, অস্থিরচিত্ততা এবং বিশৃঙ্খলা পশ্চিমবাংলার বিভ্রান্তিকর রাজনীতিরই প্রত্যক্ষ ফল। অন্য কিছু নয়।

এই ক্ষমতা দখলের রাজনীতি প্রসঙ্গ উত্থাপন করে কংগ্রেস দলের কথা টেনে আনতে চাই না। বক্তব্য শুধু বামপন্থী আদর্শবাদী দলগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে চাই। যতদিন পর্যন্ত এঁরা ক্ষমতায় আসতে পারেন নি ততদিন এঁদের ভূমিকা খুবই সুস্পষ্ট ছিল, ক্ষমতায় আসার পর থেকেই চিত্তচাঞ্চল্য ঘটেছে। কমবেশী প্রত্যেক দলেই ভাঙ্গনের সূত্রপাত হয়েছে। এমন কি দলছুট ব্যক্তিদেরও সন্ধান পাওয়া গেছে। ক্ষমতায় আসার পর যে পরিবর্তিত পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে বামপন্থী দলগুলির অনেকেই তা পূর্বাহ্নে আঁচ করতে পারেন নি। সোজা কথায় বললে এই দাঁড়ায় যে, নির্বাচনের মাধ্যমে এত সত্বর যে কিস্তিমাৎ হবে, অনেক দলের পক্ষে তা স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। ফলে মানসিক প্রস্তুতি না থাকায় হঠাৎ ঝড়ের মুখে নৌকা পড়লে যে দশা হয়—পশ্চিম বাংলায় বামপন্থী দলগুলির সেই হাল হয়েছিল। স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি এমন অনেক ব্যক্তিই রাতারাতি মন্ত্রী হয়ে গেছেন। অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে তাঁদের চিত্তচাঞ্চল্য ঘটেছে। তারপর গদী হারিয়েছেন—আবার পেয়েছেন—আবার হারিয়েছেন। এই খেলায় যে লোভের জন্ম তা এখন অনেকের মনকেই জাঁকিয়ে বসেছে। গদীর কাছে আদর্শ সেকেন্ডারী হয়ে গেছে। ফলে, দলের মধ্যে টানাপোড়েন সুরু হয়েছে, এবং সেজন্যই পশ্চিম বাংলায় নির্বাচনের তারিখ ঠিক হবার পূর্বে জোটবন্দীর চেষ্টা চলছে অবিরাম। এই জোটবন্দীর প্রচেষ্টায় রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে যে লুকোচুরি খেলা চলছে তার কারণ হচ্ছে আসনসংখ্যা সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চয় হওয়া। আবার দলীয় নেতাদের আসনগুলো পাকাপোক্ত করা। সেই কাজগুলো নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হলেই জোটবাঁধার নীতিও অবিলম্বে স্থির হয়ে যাবে। এত আদর্শগত বক্তব্যের ধূম্রজাল সৃষ্টি হবে না।

আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হবে মনোলিথিক রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে বুঝি কোন আন্তর্দলীয় কোন্দল নেই বা মন্ত্রিত্বের গদীর জন্যও কর্মীদের মোহ নেই। কিন্তু আসলে তা ঠিক নয়। ঐ সমস্ত দলের মধ্যে যাঁরা সর্বক্ষণের কর্মী তাঁরাই সাধারণতঃ মন্ত্রিত্বের গদি পান। যদি না পান তবে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করতে সাহসী হন না। কেননা Party-wage হারাবার প্রচণ্ড ভয় থাকে। কাজেই অন্তরে দাবদাহের সৃষ্টি হলেও প্রকাশ্যে তা কেউ মুখ ফুটে বলতে পারেন না। দলের সমর্থকগণ দলীয় নিয়মশৃঙ্খলার বাহবা দিয়ে বলেন আমাদের দলের মধ্যে এসব জিনিষ ঘটে না। কারণ সকলেই আদর্শে বিশ্বাসী ও দলের নিয়মানুবর্তিতা মেনে চলেন। কথাগুলি শুনলে এমন মনে হবে যে, ঐ দলের সদস্য হলে তাঁর মানবীয় বৃত্তিগুলি অকেজো হয়ে যায়। তিনি একটি দলীয় বস্তুতে পরিণত হয়ে পড়েন। যতই ঢাকঢোল পিটিয়ে এসব কথা প্রচার করা হোক না কেন, আসলে যে তা সত্য নয় একটু খুঁটিয়ে দেখলে তা পরিষ্কার বুঝতে পারা যায়। এতদ্সত্ত্বেও এই মনোলিথিক দলগুলি থেকে দলত্যাগ ঘটেছে এবং ঘটবেও।

ইংলিশ করেসপণ্ডেন্স ইনস্টিটিউট

২২, নন্দন ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬

নিম্নলিখিত ছাত্রগণ ১৯৬৯ সালের এম-এ ইংলিশ পরীক্ষায় কৃতকার্য হওয়ায় আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি।

শ্রীমনোরঞ্জন গিরি, ক্রমিক নং ৩১৬
শ্রীদিলীপকুমার রায়, ক্রমিক নং ৪৮৪
শ্রীনিরঞ্জন ব্যানার্জি, ক্রমিক নং ১০৫২

ডাকযোগে নোট দেওয়া হয়

কৌশলের নাম করে যতই ডান-বাম করা হোক না কেন গদীর প্রতি মোহের ভাবটা প্রকাশ হয়ে পড়েই।

পশ্চিম বাংলায় সি পি এম অন্যাবধি বৃহত্তম দল। সংগঠন মনোলিথিকও বটে। কিন্তু 'কি উপায়ে' নির্বাচনের মাধ্যমে গদী দখল করা যায় এই চিন্তা থেকে একটুও বিচ্যুতি ঘটেনি যদিও বা 'যে কোন উপায়ের' উপর জোর দিয়ে বিপ্লবী চরিত্রটা বজায় রাখার চেষ্টা হচ্ছে। এই 'কি উপায়' প্রশ্নটাই এখন দলের কাছে মারাত্মক হয়ে উঠেছে। প্রথমে ধারণা ছিল দল ও তার সহযোগীরা মিলে ক্ষমতা দখল করতে পারবে। কিন্তু যতই দিন যাচ্ছে বাস্তবের কঠোর আঘাতে সেই ধারণা ভেঙে খান খান হয়ে যাচ্ছে। দলের রাজ্য শাখার সম্পাদক এই বাস্তব অবস্থাকে নাকি মোটেই স্বীকৃতি দিতে রাজী নন। লড়কে লেঙ্গে ভাব নিয়ে নাকি তিনি এখনও অটল, অচল। কিন্তু তাঁর এই জঙ্গী মনোভাবকে অনেরা অর্থাৎ যাঁরা গদীয়ান হয়েছিলেন তাঁরা মোটেই বরদাস্ত করতে রাজী নন। বার বার দলের মধ্যে প্রশ্ন তুলছেন তাত্ত্বিক যুক্তির ভিত্তিতে। তাঁরা বলছেন দল ক্রমেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। যাঁরা শ্রেণীসংগ্রামকে তীব্রতর করতে চান তাঁরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছেন একথা ভাবলে চলবে কেন? তাঁদের একক-ভাবেই ত লড়াই করতে হবে। কিন্তু আসলে তা নয়। বিচ্ছিন্নতার প্রশ্ন তোলার অর্থ হচ্ছে জোটকে বড় করে যেন-তেন-প্রকারেণ পুনরায় ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করা। আখেরে যা ঘটুক না কেন। তাই প্রকাশ্যে না হলেও অভ্যন্তরে যে ভীষণ টানা পোড়েন চলছে তা নেতৃবর্গের উক্তিগুলি থেকে বুঝা যায়। তাই না শ্রীচন্দ্ররায় এস এস পি নেতা শ্রীমধু লিমায়ের নিকট চিঠি লেখেন।

যতই তাত্ত্বিক বক্তব্য রাখা হোক না কেন সি পি আই-এরও অবস্থাটা প্রায় সেইরকম। পশ্চিমবাংলায় শাসক কংগ্রেস ও বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে জোট বাঁধলে মন্ত্রিত্বটা নাও পাওয়া যেতে পারে। রাজ্যের জাগ্রত জনমত সহ্য করবে না—এ ধরণের মিতালি—বা পার্টির ভরাডুবি হতে পারে—এই দুই সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করে রাজ্য নেতৃত্ব একটি নয়া ফরমুলার উদ্ভাবনের চেষ্টায় আছেন। কারণ, আট পার্টির জোটে থাকলে নির্বাচনের পর একক সংখ্যাগরিষ্ঠ না হলেও কেরালার মত অন্ততঃ একটি সরকার গঠনের সম্ভাবনা যে প্রবল হয়ে উঠবে তা অনেকেই আন্দাজ করছেন। অতএব, আগে ভাগে মুখ পুড়িয়ে লাভ কি? যদি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সিদ্ধান্তই ঠিক হয় তবে রাজ্য নেতৃত্ব তার ফাঁক খুঁজে বার করার চেষ্টা করছে কেন?

তারপর ধরা যাক্ ফরওয়ার্ড ব্লকের কথা। প্রস্তাবে শাসক কংগ্রেস ও সি পি এম-এর বিরোধীতা করলেও দলের মধ্যে এখনও অনেক নেতা কোন দিকে গেলে মন্ত্রীত্বটা পুনরায় হস্তগত করতে পারবেন তা নিয়ে শুধু গবেষণা চালাচ্ছেন এমন নয়, পরন্তু খানিকটা মনস্থির করে নিয়েছেন। তাই দলের অভ্যন্তরে লড়াইও নাকি সুরু হয়ে গেছে। হাওড়ায় এই নিয়ে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে একদফা লড়াই হয়ে গেছে। তবে এই দ্বন্দ্ব সি পি আইকে নিয়ে আট জোটে থাকা—না সি পি এম-এর সঙ্গে যাওয়া— এই প্রশ্ন নিয়ে। শাসক কংগ্রেসের সঙ্গে যদি বাংলা কংগ্রেসের মাধ্যমেও সমঝোতার প্রশ্ন আসে তবে দলের গোটা উত্তরবঙ্গ শাখা বিদ্রোহ করবে। কারণ সেক্ষেত্রে উত্তরবঙ্গের কয়েক-জন নেতার আসন হারাবার ভয় সর্বাধিক। এই অবস্থায় হাওড়া, হুগলী ও উত্তর-বঙ্গের মধ্যে বুঝাপড়ার ভাবটা খানিক বেশী হতে বাধ্য। তবে সি পি এম-এর খাঁতাতের প্রশ্ন উঠলে উত্তরবঙ্গ নেতাদের পরিত্যাগ করে কর্মীরা অন্য ব্যবস্থা নিতে পারেন। কেননা লড়াইটা তাদেরই বেশী লড়তে হয়েছে। কর্মীদের চাপে সি পি এম বা কংগ্রেসের সঙ্গে যাওয়া খুব কঠিন। কিন্তু নেতারা পড়েছেন বিপাকে। মুখে এই নীতির সমর্থক হলেও লালদীঘির কথাটা চিন্তা করে দলের অভ্যন্তরে এখনও কৌশলের সাট্ কাট্ এঁটে যাচ্ছেন।

তারপরে আর এস পির কথায় আসা যাক। কেরলে দলের রাজ্য শাখাকেই গদীর মোহ পেয়ে বসেছিল। তাই আর এস পি আজ কেবল বাংলা দেশেই সীমিত হয়ে পড়েছে। কিন্তু শোনা যাচ্ছে এখানেও সে টানাপোড়েন সুরু হয়েছে। বিশেষ করে সৈয়দ বদরুদ্দোজা সাহেবের বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে গাটছড়া বাঁধার কথাটা পাকা হলেই মুর্শিদাবাদে আর এস পি দলের অভ্যন্তরে অন্তর্ঘাতি প্রচেষ্টা নাকি সুরু হবার আশংকা রয়েছে। এই নাকি-কারজনক অবস্থা থেকে মুক্ত থাকবার জন্যে আগেভাগেই দলের কিছু কর্মী তাঁদের একজন সর্বভারতীয় নেতা রাষ্ট্র-দূত হবার চেষ্টা করছেন বলে প্রচার চালাচ্ছেন। অন্যদিকে নয়া অবস্থার মূল্যায়ন করে নূতনভাবে পার্টি থিসিস লেখা হচ্ছে বলেও খবর পাওয়া যাচ্ছে। উদ্দেশ্য : দলের অভ্যন্তরে গদীলোভী সদস্যদের শৃঙ্খলার নিগড়ে আবদ্ধ রাখা ও দলের অবলুপ্তি রোধ করা। দেখা যাক, কি পরিণতি ঘটে!

তারপর ধরুন এস এস পির অবস্থা। এই রাজ্যে বর্তমানে সোজাসুজি দুই মত চলছে। একদল বলছেন কংগ্রেস ও বাম কম্যুনিস্টদের সঙ্গে কোন সমঝোতা নয়। একথা বলেই সঙ্গে সঙ্গে আবার বলছেন শাসক কংগ্রেসের দিকে যদি পাল্লা ভারী হয়ে ক্ষমতায় আসার কোন সম্ভাবনা দেখা দেয় তবে দরকার হলে বাম কম্যুনিস্টদের সঙ্গে বুঝাপড়া হবে না এমন কথা বলতে পারা যায় না। অন্য দল বলছেন, না—বাম কম্যুনিস্টদের সঙ্গে কোন মতেই নয়। বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গেই বুঝাপড়া করতে হবে। অর্থাৎ পরোক্ষে শাসক কংগ্রেসের সঙ্গে আঁতাত গড়ে তুলতে চান। এই দল মনে করেন সি পি আই তাঁর সর্বভারতীয় নীতি থেকে বিচ্যুত হতে পারে না। অতএব বাংলা কংগ্রেসের মাধ্যমে শাসক কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতা করবে। ফরওয়ার্ড ব্লকও আখেরে আসতে বাধ্য হবে। অতএব, বাকী রইল, নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা ঠেকায় কে? তখন মন্ত্রিত্বও রুখতে পারবে না কেউ। এক অংশ ইতিমধ্যে আবার সোস্যালিস্ট পার্টির জন্ম দিয়ে বসেছেন। উদ্দেশ্য : দল হিসাবে এক। মন্ত্রিত্বের প্রশ্ন আসলে সেয়ার মিলবেই। ফলে, অনেকদিনের আশা পূরণের ক্ষীণ আলোও দেখা দিয়েছে।

এমনিভাবে, যদি নির্বাচন হয়, কিভাবে গদীতে যাওয়া যাবে তাই নিয়ে বিশেষ করে বামপন্থী দলগুলির মধ্যে আন্তর্দলীয় কোন্দল সুরু হয়েছে। তাই বার বার আন্দোলন করার হুমকী দিয়েও কেউ জনতার দুঃখদুর্দশার দিকে দৃকপাত করার সময় পাচ্ছেন না। শুধু বিবৃতি দিয়ে দায় দায়িত্ব থেকে মুক্তি পাবার জন্য চেষ্টা করছেন মাত্র। আগে গদী পাবার পর লড়াই হয়েছে। এখন গদীতে কিভাবে যাওয়া যাবে তার জন্য লড়াই লেগেছে। আদর্শ, নীতি, কৌশল ইত্যাদি বলে যে চোখা চোখা বাণী দেওয়া হয় তা শুধু আত্মস্বার্থ-রক্ষার কুৎসিত রাজনৈতিক চেহারা ঢাকবার চেষ্টা মাত্র। আর এই চক্রান্তের জন্যই আজ পশ্চিমবঙ্গের এই দুর্দশা।

—পাঞ্চজন্য

দেশে বিদেশে

দলের মধ্যে বিদ্রোহের সম্মুখীন হয়ে বিরোধী কংগ্রেস নেতারা আর একবার জনসঙ্ঘ ও স্বতন্ত্র পার্টির সঙ্গে একটা ব্যাপক বোঝাপড়ায় আসার চেষ্টা পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন।

এই নিয়ে দ্বিতীয়বার পার্লামেন্টের ভিতরে ও বাইরে বিরোধী কংগ্রেস-জনসঙ্ঘ-স্বতন্ত্র আঁতাত গড়ার চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল। এর আগে এই 'মহাজোট' গঠনে উদ্যোগী হয়েছিলেন বিরোধী কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা, শ্রীমোরারজী দেশাই, শ্রী এস কে পাতিল, শ্রী অশোক মেহতা। সেবারও দলের ভিতর এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় এবং তারপর বিরোধী কংগ্রেস নেতারা পিছিয়ে আসতে বাধ্য হন।

এবার সংসদের শীতকালীন অধিবেশন আরম্ভ হওয়ার প্রাক্কালেই আবার নূতন করে এই জোট গড়ার কথা উঠতে থাকে। 'মহাজোট' বা 'গ্র্যান্ড অ্যালায়েন্স' কথাটি সযত্নে এড়িয়ে গিয়ে এবার বলা হতে থাকে যে, উত্তর প্রদেশের ধরনের একটা 'সংযুক্ত বিধায়ক দল' অথবা 'জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট' গঠন করা হবে। প্রথম ধাপে পার্লামেন্টে একজন নেতার অধীনে তিন দলের জোট তৈরী করার কথা হয়। প্রস্তাবিত জোটের অন্য দুই শরিক, জনসঙ্ঘ ও স্বতন্ত্র পার্টি, এই বিষয়ে খুবই আগ্রহ দেখাচ্ছিল। কিন্তু প্রথম থেকেই এটা বোঝা যাচ্ছিল যে, এই প্রস্তাব এবারও বিরোধী কংগ্রেস দলের সদস্যদের মধ্যে বিশেষ সমর্থন পাবে না। এই প্রস্তাব যাঁরা অঙ্কুরেই বিনষ্ট করতে সচেষ্ট হন তাঁদের মধ্যে ছিলেন লোকসভায় বিরোধী কংগ্রেস দলের নেতা ডাঃ রাম-সুভগ সিং। তিনি চান যে, পার্লামেন্টে বিরোধী দলগুলির বিশেষ করে অকম্যুনিস্ট দলগুলির, কার্যকলাপের মধ্যে একটা সমন্বয় সাধন করা হোক। বিরোধী কংগ্রেস যদি শুধু দুটি বিরোধী দলের সঙ্গে আঁতাত করে তাহলে অন্যান্য বিরোধী দলের সঙ্গে এই ধরনের সমন্বয় সাধন করা সম্ভবপর হবে না। তার উপর আর একটি বিভ্রাট বাধে গেল। স্বতন্ত্র পার্টির নেতা শ্রীমিনু মাসানি অভিযোগ করলেন যে, গুজরাটে স্বতন্ত্র পার্টি থেকে বহিষ্কৃত সদস্যদের দলে নিয়ে বিরোধী কংগ্রেস স্বতন্ত্র পার্টিকে বেকায়দায় ফেলেছে। কড়া জবাব দিয়ে ডাঃ রামসুভগ সিং বললেন, মাসানি তাঁর ভুল নীতির দ্বারা স্বতন্ত্র পার্টিকে ধ্বংসের মুখে এনে ফেলে-ছেন; তাঁর কথা শুনে চলার কোন দরকার নেই।

এরপর যখন বিরোধী কংগ্রেস দলের পার্লামেন্টারি পার্টির সভায় এই জোট গড়ার প্রস্তাব এল তখন কয়েকজন সদস্য প্রচণ্ড বাধা দিলেন। যাঁরা বাধা দিলেন তাঁদের মধ্যে দলের চীফ হুইপও ছিলেন। একজন সদস্য প্রশ্ন করলেন, বিরোধী কংগ্রেস কি অন্য দুটি দলের সঙ্গে মিশে যাবে এবং একটা অভিন্ন কর্মসূচী নিয়ে নির্বাচনে নামবে? আর একজন বললেন যে, কেবল দুটি দলের সঙ্গে ফ্রন্ট গঠন করে বিরোধী কংগ্রেসের কোন সুবিধা হবে না।

পার্লামেন্টারি পার্টির এই সভাতেই বিরোধী কংগ্রেস-জনসঙ্ঘ-স্বতন্ত্র জোটের উদ্যোক্তাদের প্রথম পরাজয় ঘটল। পার্টি এই বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত না করে ওয়ার্কিং কমিটির উপর ছেড়ে দিল।

ওয়ার্কিং কমিটিতে গিয়েও কিন্তু মতানৈক্যের অবসান হল না। উপরন্তু, ইতি-মধ্যে কয়েকজন সদস্য প্রস্তাব দিয়ে বসলেন, শাসক কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতার চেষ্টা করা হোক। পার্টির মধ্যে ভাঙ্গন এড়াবার জন্য ওয়ার্কিং কমিটি পার্লামেন্টে সংযুক্ত বিধায়ক দল গড়ার ও শাসক কংগ্রেসের সঙ্গে ঐক্যের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন এবং রাজ্য স্তরে বিভিন্ন দলের সঙ্গে সম-ঝোতা করার প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। শুধু 'জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট'-এর উদ্যোক্তাদের মুখ রক্ষা করার জন্য ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবে এইটুকু বলা হল যে, গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে 'সম্ভবদ্ধ চ্যালেঞ্জ'-এর মোকাবিলা করার উদ্দেশ্যে সমস্ত গণতান্ত্রিক দল যাতে একত্র হয়ে কাজ করতে পারে সেজন্য শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা ঐসব দলের সঙ্গে 'যতদূর সম্ভব বোঝাপড়া' করতে উদ্যোগী হবেন।

দলের পার্লামেন্টারি পার্টি ও ওয়ার্কিং কমিটি যে প্রশ্নে কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারে নি সেই প্রশ্নটি শুধু সভাপতির দায়িত্বের উপর ছেড়ে দেওয়ার অর্থ হচ্ছে আসলে প্রশ্নটি আপাতত শিকায় তুলে রাখা, পর্যবেক্ষকরা এরকমই মনে করছেন।

বিরোধী কংগ্রেস দলের মধ্যে যে বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছে তার আরও একটি প্রমাণ পাওয়া গেল লোকসভায় অনাস্থা প্রস্তাবের উপর ভোট নেওয়ার সময়। মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি কর্তৃক উত্থা-পিত এই প্রস্তাব যখন ভোটে দেওয়া হল তখন দেখা গেল, বিরোধী কংগ্রেস দলের নেতাদের অনেকে লোকসভা কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলেন আর যাঁরা রইলেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজন অনাস্থা প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দেন, অন্যরা কোনদিকেই ভোট দেন নি।

অনাস্থা প্রস্তাবটি ৩৯-১৯১ ভোটে অগ্রাহ্য হয়ে যায়। এবারকার অধিবেশনে এই প্রথম শক্তি পরীক্ষায় সরকার পক্ষের বিপুল সাফল্য শাসক কংগ্রেস দলকে উৎসাহিত করেছে।

●

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার কি উদ্দেশ্য নিয়ে পাকিস্থানকে সামরিক সম্ভার বিক্রী করছেন? এবং এই সময়ে এই সিদ্ধান্ত করার বিশেষ তাৎপর্য কি?

পাকিস্থানকে আমেরিকান অস্ত্রসম্ভার বিক্রীর সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হওয়ার পর ভারতে যে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে সেটা লক্ষ্য করে মার্কিণ সরকারের মুখপাত্ররা একথা বোঝাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন যে, আমেরিকার এই সিদ্ধান্তের ফল যাই হোক না কেন, ওয়াশিংটন কোনরকম দুষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে এই সিদ্ধান্ত করে নি; ভারতবর্ষস্থিত মার্কিন রাষ্ট্রদূত কেনেথ বি কীটিং নিজে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে সফর করে বিশেষভাবে এই কথাটাই বোঝা-বার চেষ্টা করছেন।

আমেরিকা কি ভারত সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে পাকিস্থানকে অস্ত্র সাহায্য দিচ্ছে?

রাজ্যসভায় এই প্রশ্ন উঠেছিল। জন-সঙ্ঘের শ্রীকানোয়ারলাল গুপ্ত প্রশ্ন করে-ছিলেন, আমেরিকা ও সোভিয়েট রাশিয়া, এই দুই বৃহৎ শক্তিই কাশ্মীর ও পারমাণ-বিক অস্ত্রের প্রসার রোধের ব্যাপারে ভারত সরকারের উপর চাপ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পাকি-স্থানকে সমরসম্ভার সরবরাহ করছে কিনা?

উত্তরে পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীস্বরণ সিং বলেন, 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই হোক অথবা সোভিয়েট রাশিয়াই হোক, কেউই এমন ইঙ্গিত দেয় নি যে, তারা যে সমরসম্ভার সরবরাহ করছে তার সঙ্গে এসব প্রশ্নের কোন সম্পর্ক আছে।'

আমেরিকার উদ্দেশ্য কি হতে পারে সে বিষয়ে গবেষণা করেছেন নর্দাম্প্টনের 'বিশ্ব রাজনীতি' পণ্ডিতদের সঙ্গে যুক্ত পাকিস্থান সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ ডাঃ মহম্মদ আয়ুব। তিনি সম্ভাব্য যেসব উদ্দেশ্যের কথা উল্লেখ করেছেন সেগুলি হচ্ছে : (১) আরব জগতে জর্ডান ও সৌদি আরবের মত পশ্চিম-ঘেঁষা রাষ্ট্রগুলির মনোবল বৃদ্ধি করা। (২) ইয়াহিয়া খাঁর হাত শক্ত করা। নির্বাচনের পর সামরিক শাসনের অবসান ঘটলেও তুরস্কের মতো পাকিস্থানেও সামরিক বাহিনী একটি বড় শক্তি হিসাবে থেকে যাবে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এমন একটা সিদ্ধান্তে এসে থাকতে পারে। (৩) পাকিস্থানের নির্বাচনের উপর প্রভাব বিস্তার করা। ডাঃ মহম্মদ আয়ুব দেখিয়েছেন যে, ১৯৫৪

সালে যখন আমেরিকার আর একটি সাধারণ-তন্ত্রী সরকার পাকিস্থানকে অস্ত্র যোগানোর প্রথম সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছিলেন তখনও পূর্ব পাকিস্থানে একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল। তিনি আরও খবর দেন যে, ১৯৬৫ সাল থেকে যে নিষেধ বলবৎ আছে সেটা তুলে নিয়ে পাকিস্থানকে সমরসম্ভার যোগানোর সিদ্ধান্ত আমেরিকা গত মে মাসেই করেছিল। তখন কথা ছিল পাকিস্থানে নির্বাচন হবে অক্টোবর মাসে। পরে নির্বাচন ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত পিছিয়ে দেওয়া হয়। এই কারণেই আমেরিকার সিদ্ধান্ত প্রকাশ করতেও কিছুটা সময় নেওয়া হয়।

ভারত সরকারের দেশরক্ষা বিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীমাহিদা ইতিমধ্যে এই বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে, পাকিস্থান আমেরিকা থেকে যেসব সমরসম্ভার পেয়েছে (৬টি এফ-১০৪ স্টার ফাইটার বিমান, ৭টি বি-৫৭ বোমারু বিমান, ৪টি সামুদ্রিক টহলদার বিমান ও ৩০০ সাঁজোয়া গাড়ী) সে-গুলির সাহায্যে সে ইজরায়েলের মতো চকিত আক্রমণ চালাতে পারে। শ্রীমাহিদা শুধু এই আশঙ্কা প্রকাশ করেই ক্ষান্ত হন নি, তিনি এই ধরনের সম্ভাব্য আক্রমণের মোকাবেলা করার জন্য রাজস্থান, গুজরাট প্রভৃতি সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলিতে অসামরিক প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা গড়ে তোলার উপদেশ দিয়েছেন।

ভারতীয় বিমান বাহিনীর প্রাক্তন অধিনায়ক অর্জন সিং অবশ্য বলেছেন যে, এই ধরনের চকিত আক্রমণে পাকিস্থান ভারতের বিশেষ ক্ষতি করতে পারবে না।

●

ফরাসী জাতির পরিত্রাতা ও বিশ্ব রাজনীতির অন্যতম মুখ্য নায়ক জেনারেল চার্লস আন্দ্রে জোসেফ মারি দ্য গল তাঁর নিভৃত পল্লীভবনে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। ৮০ বছর বয়সের দ্বারপ্রান্তে এসে একটি বর্ণাঢ্য ও বিতর্কিত ব্যক্তিত্বের অবসান ঘটল।

এই মৃত্যুর সংবাদ ঘোষণা করে ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী জর্জেস পম্পিদু বলেছেন, "জেনারেল দ্য গল মারা গেছেন। ফ্রান্স বিধবা হল।"

ফ্রান্স ও জেনারেল দ্য গলের নাম দীর্ঘকাল ধরে একটা আর একটার সংগে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে রয়েছে। দুটি বিশ্বযুদ্ধের মধ্য দিয়ে, ফ্রান্সের বিপুল ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য গুটিয়ে নেওয়ার মধ্য দিয়ে এবং যুদ্ধোত্তরকালে ফ্রান্সের অর্থনৈতিক পুনরভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে এই মানুষটির একমাত্র ধ্যানজ্ঞান ছিল : ফ্রান্স।

১২ বছর আগে ১৯৫৮ সালে এই মানুষ যখন ফ্রান্সের প্রেসিডেণ্ট হয়েছিলেন তখন সেদেশের অত্যন্ত দুর্দিন। তার পূর্ব-গৌরব অন্তর্হিত। উপনিবেশের সমস্যার ভারে তার রাষ্ট্রীয় কাঠামো ভেঙে পড়ছে এবং সারা দেশ একটা গৃহযুদ্ধের দিকে এগিয়ে চলেছে।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সাম্প্রতিক উপন্যাস

আবার আমি আসব ৭·০০

বলাকার মন ৫ম মুদ্রণ ৬·৫০ **মনমধুচন্দ্রিকা** ৬·৫০

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের

শ্রেষ্ঠ গল্প ৪র্থ মুদ্রণ ৫·০০ **একতলা** ২য় মুদ্রণ ২·৫০ **সন্ধ্যার সুর** ২য় মুদ্রণ ৩·০০

যজ্ঞেশ্বর রায়ের অপরূপ জীবনী-উপন্যাস

বালজাক ৫·০০

......সমকালে নিপীড়িত মানুষের পরম বান্ধব।......দুর্দান্ত প্রতিভা নিয়ে জন্মেও কী দুঃসহ দুঃখই পেয়েছেন মানুষটি, কী প্রবল দাহে উন্মাদ হয়ে পড়তে পড়তে আত্মহনন করেছেন—এ বই না পড়লে তার কিছুই বাঙালী পাঠকের জানা হোত না। —দেশ

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের রবীন্দ্র ও অকাদেমি পুরস্কার প্রাপ্ত **আরোগ্য নিকেতন** ৮ম মুদ্রণ ১০·০০

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের নতুন উপন্যাস **মন্দাক্রান্তা** শাশ্বত বাংলার অমর দুর্গাদীপ ৬·০০

শৈলেন রায়ের নতুন উপন্যাস **তরাই** দাম : ১০·০০

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের **বৃদ্ধ যাযাবর** দাম : ৮·৫০

নারায়ণ সান্যালের **নাগচম্পা** দাম : ৯·০০

সতীনাথ ভাদুড়ীর **দিগ্‌ভ্রান্ত** দাম : ৯·০০

বিমল মিত্রের **কথাচরিত মানস** নব প্রচ্ছদে ২য় মুদ্রণ ৬·৫০

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের **সমুদ্রের চূড়া** দাম : ৭·০০

জরাসন্ধ-র **ন্যায়দণ্ড** ৭ম মুদ্রণ ৭·০০ **লৌহকপাট** ৩য় খণ্ড ৮ম মুদ্রণ ৬·০০

সমরেশ বসুর **শ্রীমতি কাফে** ৩য় মুদ্রণ ৭·০০

দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাসের **মানব কল্যাণে রসায়ণ** রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত। ৭·৫০

জ্যোৎস্না গুহ-র **বজ্রবিষাণ** দাম : ৬·০০

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের

পণ্ডিতমশাই দাম : ৩·০০ **শরৎ-বিচিত্রা** দাম : ১২·০০ **মেজদিদি** দাম : ৩·০০

শ্রীকান্ত ৩য় ৫·০০, ৪র্থ ৫·৫০ **কাশীনাথ** দাম : ৫·০০ **নিষ্কৃতি** দাম : ২·০০

প্রকাশ ভবন ১৫, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

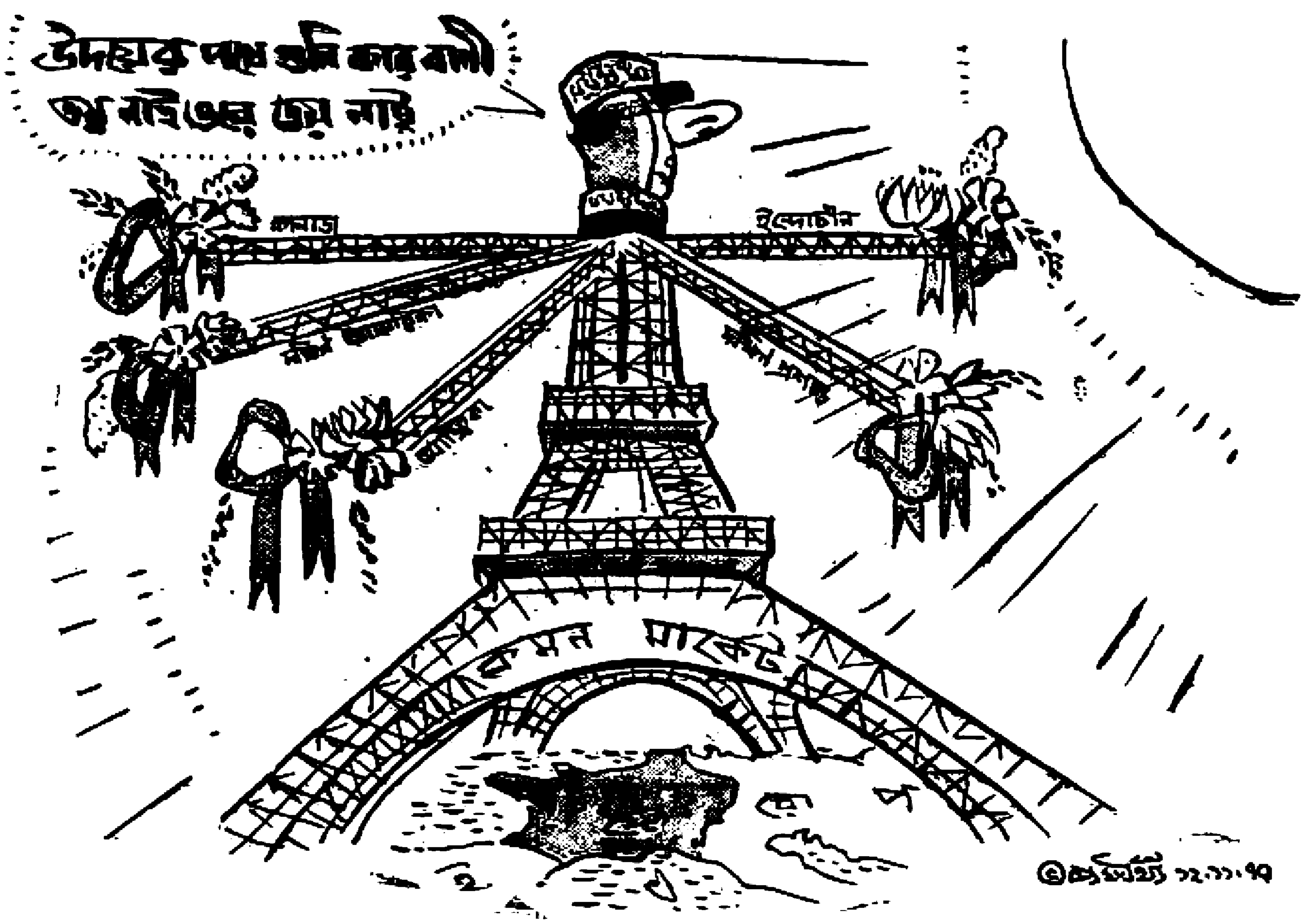

কিন্তু পাঁচ বছরের মধ্যে ইতিহাস-পুরুষ জেনারেল দ্য গল ফ্রান্সকে সেই প্রায় অবশ্যম্ভাবী বিপর্যয়ের কিনারা থেকে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন। আলজেরিয়ায় নিজেদের উপনিবেশের জালে ফ্রান্স জড়িয়ে গিয়েছিল সেখান থেকে তিনি তাকে উদ্ধার করে আনলেন, তাকে একটি পারমাণবিক শক্তিতে পরিণত করলেন এবং ইউরোপের যৌথ বাজারে ফ্রান্সকে মুখ্য ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত করলেন।

এই প্রথমবার নয়, ফ্রান্সের ইতিহাসে এর আগেও আর একবার সে দেশের পরিত্রাতা রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন জেনারেল চার্লস দ্য গল। ফ্রান্স যখন হিটলারের বিজয়ী বাহিনীর পদানত, পরাজয়ের গ্লানিতে কলঙ্কিত। সেই অন্ধকার দুর্যোগের দিনে আশার বাণী, জয়ের আহ্বান নিয়ে ফরাসী জাতির সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন জেনারেল চার্লস দ্য গল—সেই দ্য গল যিনি মিলিটারি অ্যাকাডেমি থেকে পাশ করে বেরিয়ে এসে সৈনিক বৃত্তি গ্রহণ করেছিলেন এবং ৪৯ বছর বয়সে হয়েছিলেন ফ্রান্সের বয়ঃকনিষ্ঠ জেনারেল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্রান্সের পতন হওয়ায় ১৯৪০ সালের ১৭ জুন তারিখে জেনারেল দ্য গল বিমানে লণ্ডনে যান। পরের দিনই তিনি আক্রমণকারীদের প্রতিরোধ করার আহ্বান জানালেন এবং 'স্বাধীন ফ্রান্স' আন্দোলন শুরু করলেন। ফ্রান্স পুনরুদ্ধার করায় তিনি ইংল্যান্ড, আমেরিকা ও রাশিয়া এই তিন মিত্রশক্তির সাহায্য গ্রহণ করেছেন; কিন্তু এইসব মিত্রশক্তির নেতাদের সঙ্গে আলোচনায় সময় সর্বদাই ফ্রান্সের স্বার্থ বড় করে তুলে ধরেছেন এবং সেই স্বার্থের সঙ্গে কখনই আপোষ করেন নি। সেজন্য তাঁকে এই নেতাদের অনেকেরই কাছে অপ্রীতিভাজন হতে হয়েছে। উইনস্টন চার্চিল জেনারেল দ্য গল সম্পর্কে বলেছিলেন, 'আমার যতগুলি ক্রস আছে তার মধ্যে সবচেয়ে দুর্বহ হচ্ছে লোরেনের ক্রস'। ১৯৪৪ সালের জুন মাসে মিত্রশক্তি বাহিনী ফ্রান্সের নর্মান্ডি উপকূলে অবতরণ করার এক সপ্তাহ পরে জেনারেল দ্য গল ফ্রান্সের মাটিতে পা দেন। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি মুক্তিদাতা হিসাবে ফরাসী জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন লাভ করেন। প্রায় দেড় বছর ধরে তিনি ফরাসী রিপাবলিকের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। ক্রমে ক্রমে তিনি জনসমর্থন হারাচ্ছেন, একথা উপলব্ধি করে ১৯৪৬ সালের ২৬ জানুয়ারী তিনি পদত্যাগ করে তাঁর পল্লীভবনে অবসর যাপন করতে চলে যান।

১২ বছর তিনি অবসরেই কাটিয়েছিলেন। ১৯৫৮ সালে যখন ফ্রান্স আলজেরিয়া ও ইন্দোচীনের উপনিবেশ নিয়ে ব্যতিব্যস্ত তখন আবার তাঁর ডাক পড়েছিল।

১৯৬৮ সালে ফ্রান্স আর একবার সঙ্কটের মুখে পড়ল। ছাত্র ও শ্রমিক শ্রেণীর বিদ্রোহ দেখা দিল। প্রেসিডেন্ট দ্য গল অনেক কষ্টে সেই আঘাত সামলেছিলেন। কিন্তু তিনি হয়ত বুঝতে পারছিলেন যে, তাঁর দিন ফুরিয়েছে। ১৯৬৯ সালে জেনারেল দ্য গল আর একবার গণভোটে নিলেন; সেই গণভোটে ফরাসী জনগণ তাঁদের পরিত্রাতাকে প্রত্যাখ্যান করল। তখন থেকেই জেনারেল দ্য গল তাঁর নিভৃত ভবনে অবসর জীবন যাপন করছিলেন।

আকস্মিক মৃত্যু এসে অপরাজেয় মানুষটিকে জীবনের রঙ্গমঞ্চ থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল।

১০-১১-৭০

—পুণ্ডরীক

হাওড়া কুষ্ঠ কুটীর

সর্বপ্রকার চর্মরোগ, বাতরক্ত, অসাড়তা, ফুলা, একজিমা, সোরাইসিস, দূষিত ক্ষতাদি আরোগ্যের জন্য সাক্ষাতে অথবা পত্রে ব্যবস্থা লউন। প্রতিষ্ঠাতাঃ পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা কবিরাজ, ১নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া। শাখাঃ ৩৬ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৯। ফোন : ৬৭-২৩৫৯।

সম্পাদকীয়

প্রতিবেশী, প্রতিদ্বন্দ্বী

ভারতে মার্কিন রাষ্ট্রদূত মিঃ কেনেথ বি কিটিং গত সপ্তাহে কলকাতা পরিদর্শনে এসে সাংবাদিকদের বলেন যে, পাকিস্তানকে মার্কিন অস্ত্র সাহায্য দেওয়ার ভারতে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে সে সম্পর্কে তাঁর দেশের সরকার সজাগ। সঙ্গে সঙ্গে তিনি আরও বলেছেন যে, পাকিস্তানকে অস্ত্র দেওয়া হচ্ছে শুধু রাশিয়া ও চীনের প্রভাব থেকে তাকে মুক্ত রাখার জন্য। রাষ্ট্রদূতের এই বক্তব্যের সঙ্গে আমরা একমত হতে পারছি না। আমেরিকার সঙ্গে ভারত সরকারের কোনো বিরোধ নেই। মার্কিন জনগণের সুখ ও সমৃদ্ধিতে ভারত ঈর্ষান্বিতও নয়। বহু বিষয়ে বিশেষত অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে ভারত-মার্কিন সহযোগিতাও বিদ্যমান। কিন্তু মার্কিন সামরিক নীতির সঙ্গে ভারত কোনোদিনই সায় দেয়নি। সম্ভবত মার্কিন সরকার কিছুতেই তা ভুলতে পারছেন না। পাকিস্তানকে নতুন করে অস্ত্র সাহায্য দেবার সিদ্ধান্ত সে কথাই আবার নতুন করে আমাদের মনে করিয়ে দিল।

পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকে সেখানকার সরকার ভারতকে তার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ও বৈরী ভেবে আসছে। ভারতবিভাগ হবার পর পাকিস্তান একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হবে এটা ভারতের নেতারা মেনেই নিয়েছিলেন। পাকিস্তান তার ইচ্ছানুযায়ী পররাষ্ট্র নীতি নিয়ন্ত্রণ করবে, এ বিষয়েও ভারতের কিছু বলবার নেই। কিন্তু সে নীতির মূল কথা হয় যদি ভারত বিরোধিতা তাহলে ভারতকে সে সম্পর্কে সজাগ না হয়ে উপায় নেই। মার্কিন সরকার নিশ্চয়ই জানেন, ১৯৪৭ সালে ভারত-ভাগ হবার তিন মাসের মধ্যেই পাকিস্তান হানাদার বাহিনী ও রেগুলার সৈন্য পাঠিয়ে কাশ্মীরের ওপর আক্রমণ চালায়। ভারত একদিকে সেই আক্রমণ প্রতিহত করে এবং অন্যদিকে রাষ্ট্রসঙ্ঘের দ্বারস্থ হয় সেই বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য। রাষ্ট্রসঙ্ঘের পর্যবেক্ষকরা পাকিস্তানকে আক্রমণকারী বলে ঘোষণা করলেও আজ পর্যন্ত পাকিস্তান কাশ্মীরের জবর-দখল-করা অংশ ছেড়ে দেয়নি। তখন থেকেই ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বৈরিতার সৃষ্টি এবং এই কাজ পাকিস্তান সরকারের।

এর পরবর্তীকালে পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে ভারত জোটনিরপেক্ষ হবার পথ অবলম্বন করে। ভারতের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু জাতিতে জাতিতে সহাবস্থান ও কোনো সামরিক জোটে যোগ না দেবার নীতিকে আন্তরিকভাবে অনুসরণ করে চলেন। সেই সময়ে কমিউনিস্ট শিবিরের সঙ্গে আমেরিকা ও পাশ্চাত্যের ধনতান্ত্রিক দেশগুলোর কোল্ড ওয়ার বা স্নায়ুযুদ্ধ শুরু হয়। সেই সুযোগে আমেরিকার তদানীন্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জন ফস্টার ডালেস সামরিক জোট বাঁধার নীতি গ্রহণ করেন। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল রাশিয়া ও চীনকে চারদিক থেকে ঘিরে রাখা। এই সর্বনাশা সামরিক জোট বাঁধার নীতি অনুযায়ী ইয়োরোপে গঠিত হয় উত্তর অতলান্তিক জোট বা 'নাটো', মধ্যপ্রাচ্যে গঠিত হয় 'সেন্টো' এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় গঠিত হয় 'সিয়াটো'। অর্থাৎ লন্ডন থেকে শুরু করে, প্যারিস, বন, রোম, ইস্তাম্বুল, বাগদাদ, রাওয়ালপিণ্ডি হয়ে সায়গন পর্যন্ত প্রসারিত এই লৌহদৃঢ় সামরিক বেষ্টনী পাতা হয় রাশিয়া ও চীনকে রুখবার জন্য। আমেরিকা ও তার মিত্ররা অস্ত্রশস্ত্র, সৈন্য ও অর্থ দিয়ে চুক্তিবদ্ধ দেশগুলোকে হাতের মুঠোয় এনে ফেলে। এর মধ্যে ব্যতিক্রম হল ভারত, যুগোশ্লাভিয়া, মিশর, সিংহল, বার্মা প্রভৃতি কটি দেশ। পাকিস্তান দেখল এই তার সুযোগ। সে আমেরিকার এই সামরিক জোটে যোগ দেয় প্রধানত ভারতের বিরুদ্ধে অস্ত্রশক্তি জোগাড় করার জন্য। যদিও ভারত কমিউনিস্ট দেশ নয় এবং মূলত কমিউনিস্ট দেশকে রুখবার জনাই এই চুক্তির সৃষ্টি।

পাকিস্তান এর একটি অস্ত্রও অন্য কাজে লাগায়নি। সে রাশিয়া ও চীনের সঙ্গে মৈত্রীভাব বজায় রেখে চলেছে। এবং তলে তলে বিশ্বাসঘাতকতা করে ১৯৬৫ সালে ভারত আক্রমণ করে বসে। বলা বাহুল্য ভারতের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধে পাকিস্তান যে অস্ত্র, কামান, বিমান ও ট্যাঙ্ক ব্যবহার করে তার সবগুলিই আমেরিকা, বৃটেন প্রভৃতি দেশ থেকে পাওয়া। সামরিক জোটে থাকার ফলে এই অস্ত্র আনতে তার এক পয়সাও খরচ হয়নি। প্রতিবাদ উঠলে বলা হল যে, পাকিস্তানকে আর অস্ত্র দেওয়া হবে না। কিন্তু পাঁচ বছর যেতে না যেতেই আমেরিকা আবার পাকিস্তানের অস্ত্রভাণ্ডার ভরে তুলছে। স্বভাবতই ভারত এই সংবাদে উদ্বিগ্ন। কারণ পাকিস্তানকে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করার অর্থ হচ্ছে এই উপমহাদেশে শান্তি বিঘ্নিত করা। পাকিস্তানে কোনো নির্বাচিত সরকার নেই। মিলিটারি শাসকরা এই অস্ত্রের জোরে নিজের দেশের গণতান্ত্রিক শক্তিকে যেমন দাবিয়ে রাখছে তেমনি ভারতের বিরুদ্ধে রাখছে বন্দুক উঁচিয়ে। অথচ মার্কিন রাষ্ট্রদূত বলছেন, চীন ও রাশিয়ার খপ্পরে যাতে না পড়ে সেজন্যই পাকিস্তানকে অস্ত্র দেওয়া হচ্ছে। এই ছেলেভুলানো যুক্তি কেউ বিশ্বাস করবে বলে কি মার্কিন রাষ্ট্রদূত মনে করেন? পাকিস্তান অন্ধ ভারতবিদ্বেষে ক্রমাগত তার অস্ত্রের ভাণ্ডার বাড়িয়ে তুলছে। ভারতবর্ষ চায় এই দুই দেশ বন্ধুভাবে পরস্পরের সঙ্গে বাস করুক। কিন্তু পাকিস্তানের সামরিক শাসকদের পেছনে যদি তাঁদের মার্কিন বন্ধুরা এভাবে মদত দিয়ে চলেন তাহলে ভারতকে অবশ্যই তার আত্মরক্ষার জন্য সম্ভাব্য সবল পথের কথা চিন্তা করতে হবে। শিশুর হাতে আগুন আর শয়তানের হাতে অস্ত্র দিয়ে কেই বা নিশ্চিন্তে ঘুমুতে পারে?

CENTRAL LIBRARY

শ্মশানকিশোর॥ — গণেশ বসু

না-ঘুম রাতের দীর্ঘ জ্বালা নিয়ে প্রান্তরের শ্মশানকিশোর
স্মৃতির গভীরে বন্দী, ক্রুদ্ধ অভিমান বুকে দুরন্ত আবেগ
খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে নোনা স্বাদ চায়, ফায়ারিং স্কোয়াডের ঘোর
বিস্ফোরণ নিয়ে আসে, দুঃখ ঝরে, কেটে যায় পিছুটানমেঘ
ক্রেনের মাথায়, প্রান্তরের ঘুমে।

কোনখানে ছুটে যায় ছড়ানো ছিটনো হাড় মাড়িয়ে মাড়িয়ে
সব কিছু কেড়ে কুড়ে, সুবিধা ভোগের গ্লানি, লক্ষ অপরাধ
ছিঁড়ে ফেলে, ধ্বংসের গভীরে ধ্বংস। কোন দিকে এক-পা বাড়িয়ে
সমুদ্রের দাঁত ভাঙে, ঘূর্ণির উদ্ধত চোখে ক্লান্তি অবসাদ
সরে যায়, দীর্ঘতর রক্তের কুঙ্কুমে।

না-ঘুম রাতের দীর্ঘ জ্বালা নিয়ে আন্দোলিত ক্রোধের গভীরে
বেঁচে আছি, স্বপ্ন গড়ি শব্দে ঘামে স্বরগ্রামে, প্রান্তর সীমায়,
শ্মশানকিশোর, দীর্ঘ আগুনের ছোরা খেলা, রুটি সেঁকি দামাল চিতায়!

ইদানীং রাতে॥ আরতি দাস

কয়েকটি সুন্দর: শোভন
সুচতুর মিথ্যেকথা শিয়রে সাজিয়ে
রোজ রাতে ঘুমে ডুবে যাই,
ভালবাসা, প্রীতি স্নেহ বন্ধুতার নামে,
ললিতমধুর কটি মিথ্যেকথা
লোভনীয় আখরে উজ্জ্বল।

মাঝ রাতে দাউ দাউ আগুনে
থরথর, মশারির চালে
ঘর ছেড়ে বাইরে যাবার প্রাণপণ সে মুহূর্তে
সব কটি মিথ্যেকথা,
বলার ভঙ্গীতে যার শোভনতা এবং চাতুরী
শিখা হয়ে জ্বলে,

সেই থেকে ভয়।

দারুণ সত্যের মত দাউ দাউ আগুনে
জীবন বিপন্ন বড়, একথা জেনেই
ইদানীং কোমল, লোভন
ললিতমধুর কটি মিথ্যেকথা শিয়রে সাজিয়ে
তেমন নিশ্চিন্তে আর ঘুমোতে পারি নে।

উল্টো খেয়ায় ফিরতে গেলে॥

শিশির ভট্টাচার্য

প্যাটিয়া খুলে
বেড়াই খুঁজে
জড়োকরা মুখোশ থেকে
উত্তরণে
অন্য কোন—

সময় খেয়াল
সবল দাঁড়ে
না জানিয়েই পৌঁছে দিল
গাঙের ওপার
কখন যেন—

হাতড়ে পকেট
মনে পড়ে
রঙমহলের ঠিক চাবিটা
ঘরের কোণে
পিঁজরাপোলে—

উল্টো খেয়ায়
ফিরতে গেলে
দপদপিয়ে বাতি নেভে
হঠাৎ বাজে
রেলের বাঁশী—

পরাজিত পরীক্ষা

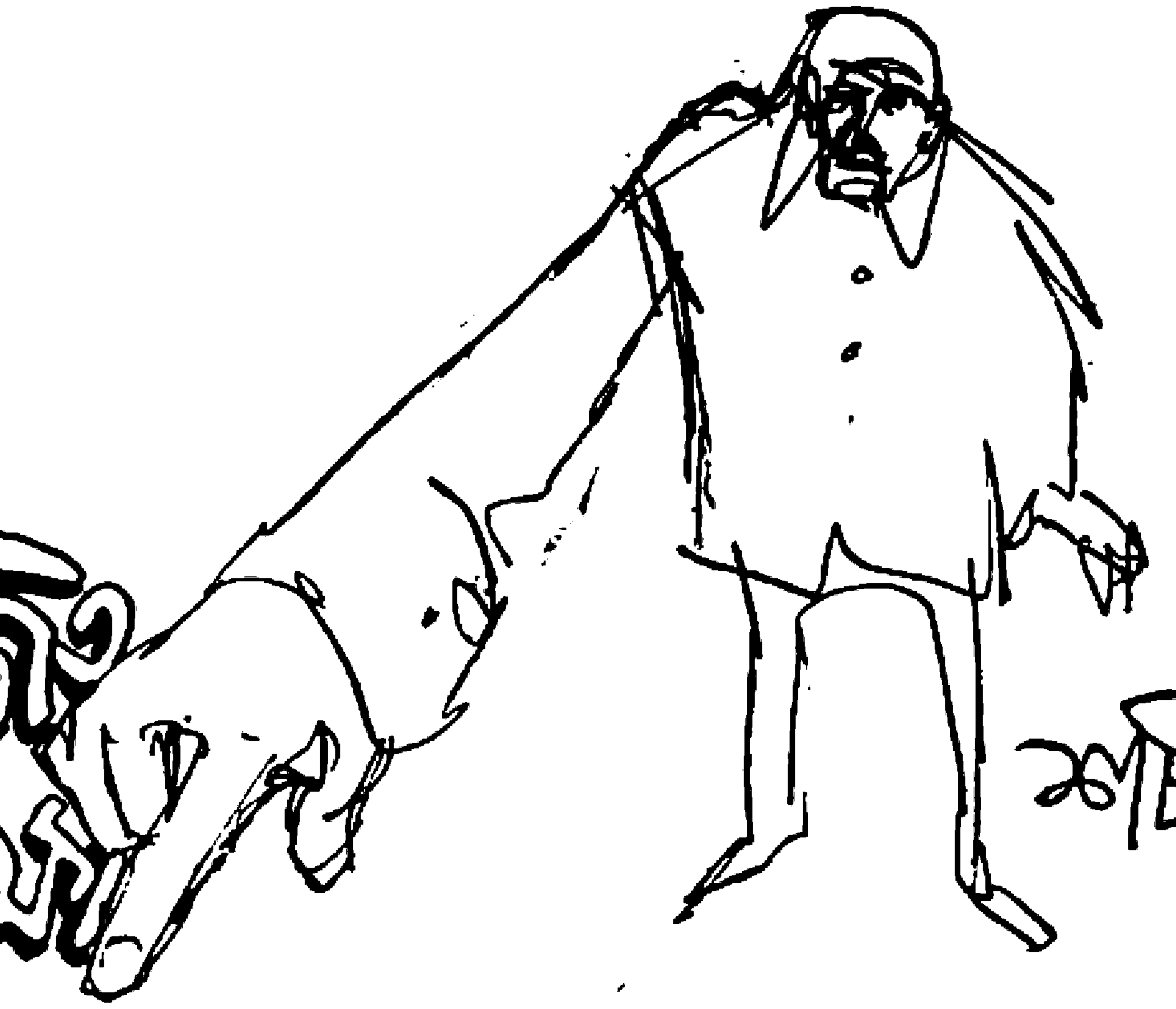

শচীন্দ্রনাথ বসু

সেদিন সকাল থেকে দিল্লীতে লোকসভায় চাপা চাঞ্চল্যের ভাব। অধিবেশনের আগে সদস্যরা এদিকে ওদিকে জটলা করে উত্তেজিত আলোচনায় ব্যস্ত। সরকারের তরফ থেকে এক বড় খবর প্রকাশ করা হবে এ বিষয়ে সকলে একমত, কিন্তু খবরটি যে কি তা কেউ জানে না, শুধু এমন একটা ধারণা বাতাসে ভাসছে যে তা খুবই ভাল। ভারতের পক্ষে তা নিঃসন্দেহে অতি আশ্চর্য ঘটনা, সুতরাং উত্তেজনার কারণ আছে বই কি।

অনুমান আর গুজবে সংসদের ঘর বারান্দা ছেয়ে গেছে। কেউ বলছে পাকিস্থান কাশ্মীর ছেড়ে দিতে রাজী হয়েছে, কারও আন্দাজ চীন ম্যাকম্যাহন লাইন মেনে নিয়েছে। ভারত মহাসাগরে আমাদের প্রথম আণবিক বোমা ফাটানো হয়েছে, রাজস্থানে মাটির নিচে বিশাল তেলের খনি আবিষ্কার হয়েছে, সরকার-পরিচালিত বিবিধ কারখানাগুলি গত বছর সব মিলিয়ে মাত্র পঞ্চাশ কোটি টাকার ক্ষতি স্বীকার করেছে ইত্যাদি গুজবও শোনা গেল।

আসলে প্রকৃত খবরটি এ সব কিছুর চেয়ে বড়—এবং তা এল স্বাস্থ্য দপ্তরের থেকে। কোয়ালিশন সরকারের মন্ত্রী মৃদুলা যোশী যখন লোকসভার কামরায় ঢুকলেন মোটা মোটা ফাইল হাতে নিয়ে তখন তাঁর চেহারা দেখে অনেকে অনুমান করলে ইনিই সে দিনের নায়িকা। শ্রীমতী যোশী কৃশাঙ্গী, মাথায় খাটো, বয়সে কিছুটা বড়—অর্থাৎ স্বাস্থ্যমন্ত্রীর স্বাস্থ্য ভাল, যদিও সদস্যরা কেউ কেউ ঠাট্টা করে তাঁর নাম দিয়েছে পৃথুলা মৃদুলা। তাপ-নিয়ন্ত্রিত ঘরেও তিনি বারে বারে ছোট্ট রুমাল দিয়ে মুখ মুছছেন, থেকে থেকে প্রধানমন্ত্রীর কাছে গিয়ে কানে কানে কি বলছেন, ফিরে এসে নথিপত্র খুলে কি লিখছেন আবার। মন্ত্রীরাও সবাই হাজির, তাঁদের মুখে মৃদু মৃদু হাসি, পরম আত্মপ্রসাদের ভাব।

শ্রীমতী যোশীই প্রথম বক্তা। তিনি জানালেন দেশে জনসংখ্যার বৃদ্ধি আশাতীতরূপে বশ মানানো সম্ভব হয়েছে। ১৯৭৬ সালেই এর কিছু নিদর্শন পাওয়া গিয়েছিল, কিন্তু গত বছর অর্থাৎ ১৯৭৭ সালের তথ্য সংগ্রহ করে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। ভারতে জন্মহার ছিল হাজারে ৩৮, ভূতপূর্ব কংগ্রেসী সরকার তা কমিয়ে করতে চেয়েছিল ২০, কিন্তু পঁচিশ বছরের চেষ্টায় এর কাছাকাছিও যেতে পারে নি। বর্তমান সরকার মাত্র পাঁচ বছরে এই লক্ষ্য অতিক্রম করে যে সংখ্যাটিতে পৌঁছেছে তা হল ১৮, এর থেকে মৃত্যুহার বাদ দিলে বৃদ্ধিহার দাঁড়াচ্ছে মাত্র পাঁচ—এতকাল তা ছিল পঁচিশের কাছাকাছি। এর তাৎপর্য এই যে দেশের লোক আরও ভাল খেতে পরতে পাবে, ফসল উৎপাদনে আর আমদানিতে ক্রমাগত বেশী অর্থ ব্যয় করে যেতে হবে না, এতকালের নিপীড়িত জনগণ মানুষের মত বাঁচবে...

ভাষণ শেষ করে শ্রীমতী যোশী নিজের আসনে বসে আবার রুমাল বার করলেন, কিন্তু ততক্ষণে তা একেবারেই অকেজো হয়ে গিয়েছে, অগত্যা শাড়ির আঁচল দিয়ে মুখ ও ঘাড় মুছলেন। পূর্ণ লোকসভা ক্ষণেকের জন্য স্তম্ভিত, তার পর শুরু হল উত্তেজিত গুঞ্জন। সবারই প্রথম চিন্তা টিকমতো কোয়ালিশন সরকার এইবার এক প্রবল অস্ত্র হাতে পেয়েছে, এদের সহজে সরানো যাবে না। সাংবাদিকরা ছুটলেন টেলিফোনের দিকে, দর্শকদের কলরব বন্ধ করতে দৌড়ে এল রক্ষী।

তার পর বেশ কয়েকদিন সবচেয়ে বড় আলোচ্য প্রসঙ্গ জনবৃদ্ধির দমন। ভারতের সাঁত্যই তা হলে সুদিন আসছে—এই আশা সবার মনে। যে লোক আছে তারা যে উধাও হয়ে যাচ্ছে না এই সত্যটি ভুলে গিয়ে অনেকে এমন কথাও ভাবলে যে আর রাস্তায় লোক ঠেলাঠেলি করে চলতে হবে না, জিনিসের দাম কমবে, প্রত্যেকে নিজের নিজের জমি পাবে, ইত্যাদি। কাগজে বড় বড় প্রবন্ধ বার হল, রেডিওর বক্তারা সরকারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল।

মৃদুলা যোশী দেশময় সভায় সভায় আস্ফালন করে বললেন তাঁর দপ্তর জন্ম-নিয়ন্ত্রণের বিবিধ পদ্ধতির উপযুক্ত প্রচার করেছেন বলেই এটা সম্ভব হয়েছে। অন্যান্য সরকারী নেতারাও নানা জায়গায় টহল দিয়ে একই সুরে গাইলেন, জানালেন এতকাল দেশের লোক শুধু বড় বড় কথা শুনে এসেছে, এবার তারা দেখছে কাজ।

জনসাধারণও তাদের দাবি মেনে নিল। রাজনীতিক দলগুলির মধ্যে এক শুধু গণসঙ্ঘের নেতা রামপ্রসাদ পান্ডে এক

সভায় বললেন, আমাদের শত্রু-দেশে লোক অবাধে বাড়ছে, ভারতের বৃদ্ধি প্রয়োজনের অতিরিক্ত কমে গেলে শেষকালে আমরা যুদ্ধ করব কি দিয়ে! কিন্তু গণসংঘের প্রতিনিধি মন্ত্রিসভায় রয়েছে, সুতরাং বেশী কিছু বলা সম্ভব নয়।

এই সময়ে দিল্লীর অর্থনীতিখ্যাত 'মিরার' পত্রিকায় এক প্রবন্ধ ছাপা হল, হিমাচল প্রদেশ থেকে লিখেছেন অর্থনীতির তরুণ অধ্যাপক কোঠারি। স্বাধীনতার পর থেকে এ যাবৎ জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে সরকারী উদ্যোগের বিশদ আলোচনা করে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন বর্তমান সরকার এমন কি নতুন পন্থা গ্রহণ করেছেন যাতে জন্মহার এতখানি কমে গেল? লুপ, বড়ি, রবার দ্রব্য, অস্ত্রোপচারে বন্ধ্যাকরণ এই সবই আগে চলছিল, এখনও চলছে। গত কয়েক বছরে বড়ির অনেক উন্নতি হয়েছে, কিন্তু এ দেশে তার প্রচার খুব বেড়েছে কি? এও সন্দেহজনক যে অন্যান্য কৌশলের ব্যবহার এতকাল পরে হঠাৎ এমন বেড়ে গেল যে বৃদ্ধিহার রাতারাতি এক-পঞ্চমাংশে নেমে এল। পরিশেষে অধ্যাপক কোঠারি ইঙ্গিত করলেন যে গদি রাখবার জন্য সরকার দেশের লোককে ভাঁওতা দিচ্ছে, আর তা যদি না হয় তবে পদ্ধতিগুলির প্রচার কি পরিমাণ বেড়েছে—বিশেষ করে গরীবদের মধ্যে—সে সম্বন্ধে সংখ্যাতত্ত্ব প্রকাশ করা হোক।

এই প্রশ্নগুলি স্বাস্থ্য দপ্তরের উপর-ওয়ালা কর্মচারীদের মনে যে উঁকিঝুঁকি দেয় নি তা নয়, কিন্তু তাঁরা ভেবেছিলেন জল ঘুলিয়ে লাভ নেই। ফল দিয়ে হল কথা, সে সম্বন্ধে তাঁরা নিঃসন্দেহ; ১৯৭৬ সালে জন্মহার দেশের সর্বত্র কমে নি, সেই কারণে তারা কিছু বলে নি—কিন্তু গত বছরের সংখ্যা প্রায় সর্বত্র হাজার প্রতি ১৬ ও ২০-র মধ্যে, সুতরাং এখন আর তাদের সন্দেহ নেই। কি উপায়ে হল তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কি হবে, দেশের লোক বাহবা দিচ্ছে...

কিন্তু এক সেক্রেটারি রবিবারের অবসর মুহূর্তে কোঠারির প্রবন্ধটি পড়লেন, তখন থেকে তাঁর মনটা খচখচ করতে থাকল। পর দিন তিনি বাছা বাছা সহকর্মীদের এক গোপন বৈঠকে ডাকলেন, তাতে সমস্ত বিষয়টা বিশদভাবে আলোচনা হল, কিন্তু প্রশ্নের কোনও নির্ভরযোগ্য জবাব পাওয়া গেল না। অতঃপর নথিপত্র সংগ্রহ করে তিনি বাড়ি নিয়ে গেলেন। সপ্তাহের পর দিন কয়েক তা ঘেঁটে দেখা গেল পূর্ববর্তী তিন বছরে জন্মনিয়ন্ত্রণের উদ্যোগ সেই চিরাগত খাতেই চলেছে এবং একই বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হয়েছে। লুপ প্রয়োগের পর নজরে রাখা হয় নি বলে উপসর্গ দেখা দিয়েছে, স্বার্থান্বেষী লোক ফিসফিস করে ভয় দেখিয়েছে ক্যানসার হবে অথবা অস্ত্রোপচারে যৌন প্রবৃত্তি কমে যাবে, গ্রামাঞ্চলে চাষী ও অন্যান্য পরিবারে এখনও পুত্র বৃদ্ধির প্রতি লোভ...

মৃদুলা দেবী তখন রাজধানীতে নেই, সফরে বেরিয়ে মাভৈঃ বাণী প্রচার করছেন। বম্বেতে সর্বভারতীয় মহিলা সমিতির সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বিবিধ পদ্ধতির গুণের কথা বলে হাত ব্যাগ খুলে লুপ বার করলেন, তার পর তা শূন্যে তুলে বললেন এই সামান্য জিনিসটিই হয়তো আমাদের সর্বনাশের মুখ থেকে বাঁচিয়েছে। তিনি দিল্লীতে ফিরলে সেক্রেটারি নাম্বুদিয়ার প্রথম সুযোগেই জানালেন নিজের ব্যক্তিগত অনুসন্ধানের কথা, দেখালেন কোঠারির প্রবন্ধ। মৃদুলা মৃদু মৃদু হেসে বললেন, আমরা যে তথ্য প্রকাশ করেছি তাতে ভুল না থাকলে এ নিয়ে এত ভাববার কি আছে, কিন্তু পরে সেক্রেটারির যুক্তি শুনে গম্ভীর হয়ে গেলেন। নাম্বুদিয়ার বললেন, পত্রিকাটি অখ্যাত হলেও কেউ না কেউ তার প্রতি কোনও না কোনও বিরোধী দলীয় সদস্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেই, সংসদের অধিবেশন আবার শুরু হলে তিনি নিশ্চয় কোঠারির সুর ধরে জানতে চাইবেন কেন জন্মহার এত কমল, সংখ্যাতত্ত্ব প্রকাশের দাবি জানাবেন—তখন সরকার কি বলবে? তা ছাড়া জন্মহার যদি দৈবক্রমে কমে থাকে তো হলে এই ধারা আবার দু দিনে বদলে যেতে পারে, তা হলে সরকার ভাঁওতার দায় কিছুতে এড়াতে পারবে না এবং দু দিনও টিঁকবে না।

মন্ত্রীমহোদয়া প্রধানমন্ত্রীকে সব কথা জানালেন, শুনে তিনি স্তম্ভিত। সরকারের কীর্তির কথা লোকসভায় প্রকাশ করতে তিনি যখন মৃদুলাকে অনুমতি দিয়েছিলেন, তখন স্বপ্নেও ভাবেন নি যে

"ভয়ঙ্কর কাজের চাপে মাঝে মাঝেই আমার ভীষণ মাথা ধরে",

বলেন, বিপিন জৈন
বোম্বাইয়ের একজন অধিবাসী।

মাথা ধরেছে? অ্যানাসিন খান
তাড়াতাড়ি আরাম এনে দেবে

বড়দের উপযোগী যথেষ্ট জোরালো
বাচ্চাদের পক্ষেও একান্ত নির্ভরযোগ্য

অ্যানাসিন জোরালো,—সারাবিশ্বে ব্যথা-বেদনার উপশমে ডাক্তাররা যে-ওষুধ সুপারিশ করেন তাই এতে বেশী করে দেওয়া আছে। অ্যানাসিন নির্ভরযোগ্য—নিরাপদ, ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্রের মত এটি নানান ভেষজের এক অপূর্ব সংমিশ্রণ। অ্যানাসিন খান—মাথাধরা, সর্দি আর ফ্লু, পিঠের ব্যথা, দাঁতের যন্ত্রণা আর পেশীর ব্যথায়।

জোরালো অথচ নির্ভরযোগ্য
অ্যানাসিন
ভারতে ব্যথা-বেদনার উপশমকারী
ওষুধগুলোর মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয়

CENTRAL LIBRARY

স্বাস্থ্য দপ্তর এর কোনও সন্তোষজনক কারণ দেখাতে পারবে না। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন প্রথম সুযোগেই মুদ্‌লার মন্ত্রিত্ব খতম করতে হবে। মুখে শুধু বললেন, সংসদ বসতে আরও তিন মাস দেরি আছে, এর মধ্যে একটা কিছু জবাব ভেবে রাখতে হবে। মুদ্‌লা যেন ঘুণাক্ষরেও কাউকে কিছু না বলে, অন্যান্য মন্ত্রীদেরও না, এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের যারা পূর্বোক্ত বৈঠকে ছিল তাদেরও মুখ বন্ধ করে দেয়।

সমস্যাটা এমন কিছু নয়, নথিপত্রে জায়গায় জায়গায় সংখ্যা কিছু বাড়িয়ে এবং কমিয়ে দিলেই হয় এমন কথা কারও কারও মনে জেগে থাকতে পারে, কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর মনে তখন ভবিষ্যতের দুঃস্বপ্ন —বর্তমান বছরে জন্মহার কি হবে...এবং তার পরের বছর? জন্মনিরোধের কারণটা না বার করে উপায় নেই...দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ভাবলেন সংসদ না থাকলে দেশ শাসন কত সহজ হত! অনেক চিন্তার পর তিনি শ্রীমতী যোশীকে নির্দেশ দিলেন দেশের যেখানে যেখানে সরকারের উপদেষ্টা দপ্তর আছে সেখান থেকে খবর সংগ্রহ করতে হবে তাদের এলাকায় কত নরনারী বিবিধ পদ্ধতি গ্রহণ করেছে, কত লোক করে নি, এবং এই দুই দলের কত কত সন্তান হয়েছে। ইতিমধ্যে তিনি মন্ত্রীদের জানালেন তাঁরা যেন জন্মনিরুদ্ধণের দাবি সম্বন্ধে আপাতত বেশী কথা না বলে।

খবরগুলি যখন নানা জায়গা থেকে প্রধানমন্ত্রীর হাতে পৌঁছাতে আরম্ভ করল তখন তিনি গভীর মনোযোগে তা পরীক্ষা করলেন এবং দুটো জিনিস লক্ষ্য করে অবাক হলেন। প্রথমত, গত বছরের আগের বছর শুধু কোনও কোনও অঞ্চলে জন্ম হঠাৎ কমে গিয়েছে, এবং অন্যান্য এলাকায় আগের তুলনায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা যায় নি। দ্বিতীয়ত, যারা জন্মনিরোধ পদ্ধতি গ্রহণ করেছে আর যারা করে নি গত বছর তাদের মধ্যে জন্মহার সমানভাবে কমেছে। স্পষ্ট বোঝা গেল এর পিছনে অন্য কোনও কারণ আছে।

এই কারণের আভাস পাওয়া গেল অপ্রত্যাশিতভাবে। সরকার এ বিষয়ে গোপনে তদন্ত করছেন জেনে পাঞ্জাব সরকারের স্বাস্থ্যবিভাগীয় এক উচ্চপদস্থ মহিলা কর্মচারী দিল্লীতে এসে শ্রীমতী যোশীর সঙ্গে দেখা করে জানালেন এক সংবাদ। জন্মনিরোধের আঞ্চলিক দপ্তর-গুলিতে স্ত্রী কর্মীদের কাছে মেয়েরা মাঝে মাঝে অভিযোগ জানাচ্ছে যে তাদের স্বামীরা এখন দূরে দূরে থাকে, তাদের যৌন স্পৃহা অনেক কমে গিয়েছে। খবরটা প্রধানমন্ত্রীর কানে গেল, তিনি দেশের অন্যান্য স্থানে বিশ্বস্ত দূত পাঠালেন— অনেক জায়গা থেকে ঐ একই খবর পাওয়া গেল।

প্রধানমন্ত্রী গভীর চিন্তায় পড়লেন। একবার মনে হল নিজেরও যেন স্বামীর প্রতি... কিন্তু সন্দেহটা দ্রুত ঝেড়ে ফেললেন। এত বড় দেশকে চালাতে গেলে মানুষের আর অন্য কিছুর অবসর বা প্রবৃত্তি থাকে না। যাই হোক, ঘন অন্ধকারে একটুখানি আলোর রেখা দেখা গেল— কিন্তু তার পর? ভেবে চিন্তে তিনি বিশেষ কয়েকজন চিকিৎসককে ডেকে পাঠালেন গোপন বৈঠকে, তাঁরা সব শুনে একটা ছাড়া আর কোনও কারণ ভাবতে পারলেন না : দেশের ফসলে এমন কোনও বস্তু দেখা দিয়েছে যাতে পুরুষদের যৌন কামনা কমে যায়; নতুন জাতের গম, ধান ইত্যাদিতে খেত ভরে গিয়েছে, রকমারি সার ব্যবহার হচ্ছে, তারই পরিণতি বোধ হয় এটা। সব ফসলের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দরকার। কিন্তু তা সময়সাপেক্ষ, এবং সরকার যে কমবৃদ্ধি বার করতে পারে না তা হল সময়।

কিছুদিন পরে কাগজে ছোট্ট করে এক খবর বার হল। কলকাতার টালা ট্যাংকের কাছে একটি যুবক গ্রেপ্তার হয়েছে, রাত্রির অন্ধকারে নিষিদ্ধ এলাকায় প্রবেশের অপরাধে। তার দুটি সঙ্গীকে ধরবার আগেই তারা পালিয়ে গিয়েছে। এ সম্বন্ধে কয়েকদিন আর কোনও খবর প্রকাশ হল না। কিন্তু যুবকটির পকেটে একটি বিশেষ ধরনের ছোট্ট শিশি পাওয়া গেল যা বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারে ব্যবহার হয়, তার মধ্যে হালকা বাদামি রঙের তরল পদার্থ। এই সব তথ্য যে দিল্লী পর্যন্ত পৌঁছাল সেখানে সতর্ক প্রহরীর জিম্মায় বন্দীকে আনিয়ে রাজনৈতিক অনুসন্ধান বিভাগ যে জেরা করলে, তাও সাধারণ লোকে জানল না।

কিন্তু অবিলম্বে সব রহস্য উদ্‌ঘাটিত হল বম্বের কোনও সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে। বিবৃতি দিয়েছেন ডঃ বরুণ মিত্র, তিনি কাজ করেন পুনার এক গবেষণাগারে, কয়েক বছর আগে হরমোন সম্বন্ধে নতুন আবিষ্কারের জন্য সরকার তাঁকে ভাটনগর পুরস্কার দিয়েছে, বিজ্ঞান জগতে অনেকেই তাঁর নাম জানে। আমরা এই বিবৃতির সারাংশ অনুবাদ করে দিচ্ছি।

"আমার মনে হয় দেশের লোককে কতগুলি গুরুতর কথা জানাবার সময় এসেছে। এই প্রয়োজন আরও বিশেষভাবে অনুভব করছি কারণ কলকাতার অধীর মুখার্জীর গ্রেপ্তারের পর পুলিশ তাঁকে শত্রু-দেশের চর সন্দেহ করে নানারকম অত্যাচার করছে। এই সন্দেহ সম্পূর্ণ মিথ্যা। ইনি দেশের যা উপকার করেছেন তার জন্য বরং এঁকে এখুনি মুক্তি দিয়ে সম্মান জানানো উচিত। তা ছাড়া এঁর কার্যকলাপের জন্য দায়ী আমি।

ভারত যখন স্বাধীনতা লাভ করে তখন মনে অনেক আশা নিয়ে আমরা ভেবেছিলাম এইবার আমাদের নানা সমস্যা নিরসনের প্রকৃত চেষ্টা হবে। সবচেয়ে বড় সমস্যা দারিদ্র্য, কিন্তু লোকসংখ্যা এত বাড়তে লাগল যে শেষ পর্যন্ত জনসাধারণের আর্থিক অবস্থার উন্নতি না হয়ে বরং অবনতি ঘটল। পরিবার ছোট রাখবার জন্য কর্তৃপক্ষ অনেক পরিকল্পনা করলেন, বড় বড় কথা বললেন, কিন্তু বছরের পর বছর বিশেষ কিছু ফল হল না। প্রথম দিকে কয়েক বছরের বহুমূল্য সময় নষ্ট হল মাসিক চক্র অনুসরণ পদ্ধতি প্রচলনের নিরর্থক চেষ্টায়।

চলতি বাস্তবিক উপায়গুলি গ্রহণ করতে করতে সমস্যা অনেক কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু এগুলিও আশানুরূপ সার্থক হল না। শিক্ষিত শহরবাসীরা সামাজিক কারণেই ছোট পরিবারের পক্ষপাতী হয়ে আসছিল, কিন্তু অগণিত অশিক্ষিত বা অপেক্ষাকৃত নির্বোধ জনতার কাছে জন্মনিরোধের আবেদন বা কলা-কৌশল ব্যাপকভাবে পৌঁছাল না। ফল হল এই যে এদের বংশ ক্রমশ তাদের স্থান দখল করতে থাকল যারা বিবেচনাশীল, যারা দেশের হিত বোঝে। এতে সাধারণ-ভাবে জাতীয় গুণ চলল অবনতির পথে। এদিকে সরকার মুখে পরিবার সংকোচনের কথা বললেও কাজের বেলায় অধিক সন্তানের জন্য আয়করের সুবিধা বজায় রাখল।

জাপানে এবং পশ্চিমের কোনও কোনও দেশে গর্ভ খালাস অনেকদিন ধরে সহজ করা হয়েছে, যদিও সংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যা আমাদের মত জরুরী নয় তাদের। নিরুপায় হয়ে ভারত সরকার শেষ পর্যন্ত অনেক-খানি জল মিশিয়ে ঐ বিষয়ে এক প্রস্তাব উত্থাপন করল সংসদে, কিন্তু আমাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা তা অগ্রাহ্য করলে— ভারতীয় নীতির পরিপন্থী বলে। এদিকে আমাদের জন্মহারের যে লক্ষ্য ধার্য হয়েছে, অনেক পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পরেও তার কাছাকাছি আমরা যেতে পারি নি।

এই লক্ষ্যে পৌঁছালেও লোকসংখ্যা বাড়তে থাকবে, যেখানে আমাদের প্রয়োজন তা কমাতে না পারলেও অন্তত স্থির রাখা। তার জন্য দরকার প্রতি দম্পতির দুটির বেশী সন্তান নয়। সব লোকের সন্তান হয় না, কারও মৃত্যু হয় সন্তান জন্মের আগেই—এইসব কারণে দুইয়ের উপর সামান্য এক ভগ্নাংশ চাপানো যেতে পারে, তার বেশী নয়। এই তত্ত্ব উপলব্ধি করতে খুব বেশী বুদ্ধির দরকার করে না। আমেরিকার মত সমৃদ্ধিশালী দেশেও কোনও কোনও বিজ্ঞানী দশ বছর আগে বলেছেন জাতীয় লক্ষ্য হওয়া উচিত জন-বৃদ্ধির সম্পূর্ণ রোধ।

দীর্ঘ পঁচিশ বছর আমাদের নেতারা বিপদের গুরুত্ব যথার্থ উপলব্ধি করলেন না, অথবা করেও এই আশায় চোখ বুজে থাকলেন যে "ভারতীয় ঐতিহ্যের" হানি

না করেও, ব্যক্তিস্বাধীনতার হাত না দিয়েও কোনও প্রকারে সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে। যখন প্রলয় আসন্ন তখন তারা খড় কুটো দিয়ে বাঁধ বানাতে ব্যস্ত। এদিকে বিশ্বের চোখে ভারত হয়ে দাঁড়াল জনস্ফীতির আদর্শ উদাহরণ।

নিজের বাড়ির ঝি চাকরের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি, বছর বছর তাদের সন্তান হয়, খেতে পরতে পায় না, অথচ সদ্‌বুদ্ধি দিতে গেলে ভান করে যে সবই ঈশ্বরের ইচ্ছা। এই বিশাল জনতার ভার মুষ্টিমেয় বিবেচনাশীল লোকে আর কতদিন বইবে? মনে হল এ দেশের কি কোনও গতি নেই? তেবে বুঝলাম সরকারী বা ব্যক্তিগত আবেদন নিবেদনে কোনও ফল হবে না, তার দিন চলে গিয়েছে, মানুষকে বাধ্য করতে হবে সন্তান উৎপাদন বন্ধ করতে। জন্ম দিতে ছাড়পত্র চাই (যেমন চাই রেডিও বা গাড়ি রাখতে), অনাথায় কঠোর শাস্তি, এমন প্রস্তাব অনেকদিন হল পৃথিবীর অন্যত্র উত্থাপিত হয়েছে, কিন্তু আমাদের সরকার বা জনমত তা গ্রহণ করবে এমন কথা স্বপ্নেও ভাবা যায় না। মানুষের যৌন প্রবৃত্তি এত প্রবল যে তা কার্যকরী হবে কিনা তাও সন্দেহ।

ভেবে বুঝলাম যে করে হোক এই প্রবৃত্তির প্রশমন করতে হবে। তা করতে হবে বৈজ্ঞানিক উপায়ে এবং অজান্তে, কারণ জেনেশুনে কম লোকেই এই ধরনের বড়ি খাবে। সবচেয়ে সহজ হল পানীয় জলের সঙ্গে কোনও প্রকারে প্রতিষেধক ওষুধটি মিশিয়ে দেওয়া। বৃহৎ ক্ষেত্রে এর সার্থকতা প্রমাণ হলে তখন হয়তো দেশ বুঝবে এ ছাড়া গতি নেই। তারপর ব্যক্তিবিশেষের প্রয়োজন অনুসারে মাত্রা ভেবে ওষুধটি ব্যবহার হবে।

কিন্তু এমন বস্তু আবিষ্কারের চেষ্টা হয় নি। সুতরাং আমিই উঠে পড়ে লাগলাম, দৈনিক কাজের শেষে নিয়মিত সন্ধ্যাবেলাটা এই নিয়ে গবেষণাগারে কাটাতাম। যৌন আকাঙ্ক্ষা নির্ভর করে দেহে কতগুলি রসের ক্ষরণের উপর, চেষ্টা করলাম এমন বস্তু বানাতে যা পুরুষের ঐ হরমোন রসকে দমন করবে। নানা রাসায়নিক দ্রব্য পরীক্ষা করলাম ইঁদুর ও খরগোশের উপর, প্রায় দু বছর পরে পেলাম এক বস্তু যা আশা জাগাল মনে; দেখি খাঁচার মধ্যে পুরুষ জন্তুগুলি সঙ্গিনীদের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন, মাদিগুলি কাছে ঘেঁষলে তারা দূরে সরে যায়। একবার সেবনের পর এই প্রতিক্রিয়া বহুদিন থাকে।

এর পর পরীক্ষা হওয়া উচিত ছিল বানর নিয়ে, কিন্তু আবেগের বশে তা চালালাম নিজেরই উপর, তার পর কয়েকটি বিশ্বস্ত বন্ধুর উপর যারা আমার উদ্দেশ্যে বিশ্বাসী, যারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ সব কিছু গোপন রাখতে। পরীক্ষার ফল হল আশাতীত ভাল। এর পরের ধাপে আমাদের দলের লোক কয়েকটি বাছা বাছা পাড়াগাঁয়ের পুকুরে মাত্রামাফিক ওষুধ ঢেলে দিয়ে এল রাত্রির অন্ধকারে। এক বছর অপেক্ষার পর দেখা গেল তার মধ্যে সন্তান হল অনেক কম, চার ভাগের এক ভাগও না। উৎসাহে উজ্জীবিত হয়ে আমরা দেশের বিভিন্ন অংশে বিশ্বস্ত কর্মীদল গড়ে তুললাম, তারা গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে পানীয় জলাশয়ে ওষুধ মেশাল। এর ফল হল দেশব্যাপী, সরকারের নজরে পড়ল তা, তারা ভাবলে শেষ পর্যন্ত অভাবনীয় ঘটেছে তাদেরই চেষ্টায়। আসলে তা নয়, কৃতিত্ব আমার এবং আমার উৎসাহী সহকর্মীদের। কিন্তু এর জন্য আমরা কোনও পুরস্কার আশা করি না, আমরা শুধু চাই আমাদের আবিষ্কার প্রকাশ্যে গৃহীত হোক, দেশের এই সর্বগ্রাসী সমস্যার নিরসন হোক।"

ডঃ মিত্রর এই অত্যাশ্চর্য বিবৃতি অবশ্য অবিলম্বে দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল, শিক্ষিত লোকের মুখে এ ছাড়া কথা নেই, যদিও তাদের নানা মত। অনেকেই নিজের নিজের সাম্প্রতিক গার্হস্থ্য অভিজ্ঞতা স্মরণ করলে, স্ত্রীরা বুঝলে স্বামীদের অদ্ভুত ব্যবহারের কারণ। কয়েকটি সভাসমিতি প্রতিবাদ জানিয়ে বিবৃতি দিল, যেমন গণসঙ্ঘ ও ধর্মীয় সংস্থা; এরা মনে করিয়ে দিল কয়েক বছর আগে ধর্মপিতা বাণী দিয়েছিলেন যে জীবনের ভোজে কাউকে বঞ্চিত করা চলবে না, যারা অনাগত তাদেরও স্বাগত জানাতে হবে।

কিন্তু আসল ঝড়টা উঠল লোকসভার বৈঠকে। রাশিয়া কোনও কালেই জন্মনিয়ন্ত্রণের পক্ষপাতী নয়, চীন মাঝে মাঝে একই সুর গায়, আবার কখনও অগণিত জনতার চাপে পড়ে উল্টো সুর ধরে। ঠিক

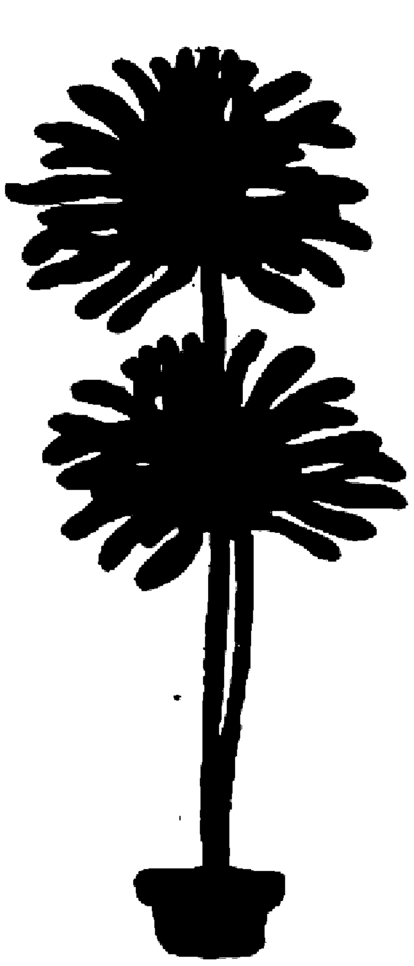

সেই সময়ে তার নীতি রাশিয়ার সঙ্গে মিলছে, সুতরাং সংসদের কমুনিস্ট সভ্যরা তীব্র প্রতিবাদ জানাল, শেষ পর্যন্ত ধর্মীয় সংস্থার সঙ্গে ভাই-ভাই হয়ে গেল এ বিষয়ে। সাধারণ মানুষের মত সদস্যরাও কেউ কেউ যৌনশক্তির আকস্মিক ভাঁটা লক্ষ্য করে ডাক্তার দেখিয়েছিলেন, যদিও তাতে বিশেষ কিছু ফল হয় নি—এঁদের উষ্মা আসলে প্রকাশ পেল ব্যক্তিগত কারণে। এ ছাড়া দু একজন শাস্ত্র উল্লেখ করে বললেন, ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ এর সবগুলিরই যথার্থ স্থান আছে হিন্দুর জীবনে, কোনওটা বাদ দেওয়া চলে না, সুতরাং জন্মনিরোধের এই পদ্ধতি কিছুতেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। এমন সূক্ষ্ম ইঙ্গিতও প্রকাশ পেল যে এতে নারীরা অন্যায়ভাবে বঞ্চিত হচ্ছে। শ্রীমতী ঘোশী ও অন্যান্য মন্ত্রীরা যে সেদিন পর্যন্ত বড় গলায় জন্মনিরোধের কৃতিত্ব সরকারের হয়ে দাবি করেছিলেন তা নিয়ে বিপক্ষদলীয়রা চোখা চোখা কথা শোনাল, পত্রিকাগুলি ব্যঙ্গচিত্র ছাপল।

অধিকাংশ সদস্যের বড় অভিযোগ ব্যক্তিগতভাবে ডঃ মিত্রর বিরুদ্ধে। দেশের লোকের উপর গোপনে এত বড় পরীক্ষা চালাবার অধিকার কোনও ব্যক্তিবিশেষের নেই, বিজ্ঞানীদের এই ক্ষমতা দিলে এর শেষ কোথায় কে জানে? খবরের কাগজগুলিও এই সুর গাইল, সাধারণ লোকে অনেকে তার প্রতিধ্বনি করলে। প্রধানমন্ত্রীর কথাবার্তায় মনে হল সরকারী মতটাও ঐ রকম।

এর প্রায় এক মাস পরে আবার খবরের কাগজের প্রথম পাতায় এক আশ্চর্য সংবাদ। ডঃ মিত্র গোপনে দেশ ছেড়েছেন, রোমের বিমানঘাঁটিতে তিনি সাংবাদিকদের যা বলেছেন তার মর্ম এই যে ভারত সরকার নিজেদের লজ্জা ঢাকবার জন্য তাঁকে শাস্তি দেবার কথা ভাবছিল, তাই তাঁকে দেশান্তরী হতে হয়েছে। মানুষের উপকারের জন্যই তিনি বিজ্ঞানকে কাজে লাগাতে চেষ্টা করেছিলেন, তার যে এমন হিতে বিপরীত পরিণতি হবে তা তিনি ভাবতেও পারেন নি। তাঁর পরীক্ষার বিরুদ্ধে যা যুক্তি দেখানো হয়েছে তার সবই বর্তমান বিপদে তুচ্ছ। এতে তাঁর এই বিশ্বাসই দৃঢ় হল যে ভারতের নেতারা সর্বনাশের সামনে দাঁড়িয়েও সত্যকে মানতে নারাজ, তাঁরা কাল্পনিক আশ্বাসের আশ্রয়েই থাকতে চান। একথা অন্য কোনও কোনও দেশ সম্বন্ধে খাটে। কিন্তু সুখের বিষয় কাগজে তাঁর বিবৃতি প্রকাশ হবার পর কয়েকটি দেশ থেকে তাঁর কাছে সরকারী ও বেসরকারী আমন্ত্রণ এসেছে। এমন এক দেশেই তিনি যাচ্ছেন, তিনি মনে করেন সেখানে তাঁর কাজের ক্ষেত্র অব্যাহত থাকবে, এবং আশা করেন ক্রমে পৃথিবীর অন্যত্র তার প্রয়োগ হবে।

CENTRAL LIBRARY

ইন্দিরা গান্ধী

সবিতা সেনগুপ্ত

এলাহাবাদ। জুন মাসের এক উত্তপ্ত রাত্রি। একটি তরুণী জনবিরল রাজপথে হেঁটে চলেছে। কোলে তার ছোট্ট শিশু। এটি তার প্রথম সন্তান, এখনো বাবাকে দেখানো হয়নি নাতির মুখ। বাবা কত উদ্গ্রীব হয়ে আছেন নাতিকে দেখার জন্য। মা ত কবেই চলে গেছেন। খবর পেয়েছে, রাত্রে বাবাকে নিয়ে যাওয়া হবে গাড়ি করে নৈনির রাস্তা দিয়ে। সেই রাস্তার এক পাশে সে দাঁড়িয়ে থাকবে ছেলে কোলে নিয়ে, যাতে গাড়িতে যেতে যেতে এক লহমার জন্য বাবা তার নাতির মুখ দেখতে পান। তাই যে পথে বাবার গাড়ি যাবে সেই পথে নিঃশঙ্কিনী একা চলেছে শিশুটিকে বুকে নিয়ে।

কে এই তরুণী? কে তাঁর পিতা? প্রিয়দর্শিনী ইন্দিরা গান্ধী তাঁর পিতাকে দেখাতে চলেছেন তার প্রথম পুত্রকে। ১৯৪২ সালের আগস্টে ভারত ছাড়ো আন্দোলনের প্রাক্কালে বন্দী নেহরু ১৯৪৫ সালের ১৫ই জুন আলমোড়া থেকে মুক্তি পান। তার আগে আহমদ নগর ফোর্ট থেকে নৈনি জেলে তাঁকে আনা হয় আলমোড়া যাবার পথে। খবরটি ইন্দিরা পান একজন সামরিক কর্মচারীর কাছে। তাই তিনি পুত্র রাজীবকে কোলে নিয়ে একা বেরিয়ে পড়লেন। পাঁচ ছয় মাইল দূরে নৈনির রাস্তা তাঁর গন্তব্যস্থল। সঙ্গে কাউকেই তিনি নিলেন না। চলতে চলতে এক গাছের নীচে এসে দাঁড়ালেন। প্রতীক্ষা করতে লাগলেন বাবার গাড়ির। রাতও কম হয়নি। মধ্যরাত্রি খুব বেশি আর দেরিও নেই। এক সময়ে দূরে দেখা গেল মোটরের হেড লাইট, বন্দী নেহরুকে নিয়ে গাড়ি এগিয়ে এল কাছে। গাছের উপর নিদ্রিত বিহংগেরা চকিত হয়ে উঠল, চকিত হয়ে উঠল নিস্তব্ধ রাজপথ, বুঝিবা তারা খচিত ওপরের আকাশও। নিদ্রান্বিত নৈনির রাজপথ অন্ধ রাত্রির আকাশ ছাড়া এ দৃশ্যের আর সাক্ষী কেউ ছিল না।

ইন্দিরাকে দেখে গাড়ির চালক কি বুঝলো কে জানে সে গাড়ির গতি কমিয়ে দিল। খুব ধীরে ধীরে চলতে লাগল গাড়ি। প্রিয়দর্শিনী নিঃশব্দে ছেলেকে একটু তুলে ধরলেন, নেহরু তাকিয়ে রইলেন প্রিয়তম কন্যা ও নাতির মুখের দিকে। তাঁর মুখেও কথা ছিল না। খুব আস্তে গাড়ি এগিয়ে গেল সামনের দিকে।

সেদিনকার সেই শঙ্কাহীনা নারী, যিনি একা আঁধার রাতে পথ চলতে ভয় পান না, যার মধ্যে ছিল সুদৃঢ় আত্মপ্রত্যয়, সেই নারী সেদিনকার প্রায় একুশ বছর পরে বিশাল ভারতের কর্ণধার হলেন। তাঁর ভিতরকার প্রচ্ছন্ন দৃঢ়তার কথা তার চারপাশের কারো যেন জানা ছিল না। সকলের ধারণা ছিল তিনি হন খালি পণ্ডিত নেহরুর আদরের বেটি। তাঁর বুকের গোলাপের কুঁড়িটির মত নরম কোমল।

মনে পড়ে একটি দৃশ্য। জওহরলাল নেহরুর দেহাবসানের সংবাদে সারা দেশ গভীর শোকসাগরে নিমজ্জিত। তিনমূর্তির বাসভবনে ভেঙে পড়েছে শুধু দিল্লী শহরই নয়, সারা দেশের নানা জায়গা থেকে আগত অগণিত শোকার্ত নরনারী ছুটে গিয়েছে তাদের শোকাশ্রু নিবেদন করতে। শ্বেত মর্মর মূর্তির মত স্থির অচল হয়ে বসে আছেন ইন্দিরা গান্ধী পিতার মৃতদেহের পাশে। এক সময়ে নেহরু পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কিত অন্তরঙ্গ বন্ধু এক ব্যক্তি এলেন সেখানে। তাঁকে দেখে প্রিয়দর্শিনী আর স্থির থাকতে পারলেন না, কেঁদে উঠলেন। অশ্রুপূর্ণ চোখে বন্ধু বল্লেন, 'বেটি, গুলাব তো মুরঝা গয়া, লেকিন মহক কভী খতম নহী হোগী। মত রো, তু গুলাব কী মহক হ্যায়।'

গোলাপ মূর্ছিত হয়ে পড়েছে ঠিকই, কিন্তু তার সুগন্ধ লুপ্ত হবে যাবদিন, কাঁদিস না বেটি, তুই ত সেই গোলাপের সৌরভ।

প্রিয়দর্শিনী ইন্দিরা গান্ধী সত্যিই সেই মূর্ছিত গোলাপের সুবাস।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই হল 'return of the rose bud' সংবাদপত্রের অলংকারিত ভাষা হল যে গোলাপ কুঁড়ির প্রত্যাবর্তন নয়, এ যেন resurrection পুনরুজ্জীবন। এই পুনরুজ্জীবনের প্রাণদ এবং সুস্থ ধারায় সারা দেশের মুক্তিস্নান হোক।

*

দেশ তখনো পরাধীন; বালিকা বয়সে Letters from father to a daughter পড়ে প্রথম মুগ্ধ হই। কেমন এই মেয়ে যার বাবা এতখানি যত্ন নিয়ে প্রাণের প্রথম বিবর্তন থেকে শুরু করে বিশ্ব ইতিহাস কারাগার থেকে লিখে মেয়েকে পাঠিয়েছেন? এ মেয়ে যেমন তেমন মেয়ে হবে না। এ মেয়ে হবেন সাহস ও দেশপ্রেমের শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্যের উত্তরসাধিকা। চাঁদ সুলতানা, রাণী দুর্গাবতী, ঝাঁসীর রাণীর উত্তরসাধিকা। ভারতবর্ষ তখনো ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের পেষণে পিষ্ট; অসহযোগ আন্দোলনে শত শত নারী নিঃশঙ্কচিত্তে ঘর ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়েছে পুরুষের পার্শ্ববর্তিনী হয়ে দেশোদ্ধার কাজে অংশ নেবার জন্য। স্বামিনীরা নর্মসহচরী থেকে কর্মসহচরী হতে সুরু করেছে বটে ঠিকই, তবু নারীর মূল্য লোকে সাধারণভাবে রান্নাঘর আর আঁতুড়ঘরের চৌহদ্দির মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রেখেছিল। নারীর পক্ষে এর বাইরে আর কিছু করণীয় বা বরণীয় থাকতে পারে, লোকে তা জানতও না মানতও না।

অত্যন্ত বিস্ময়বোধ হয়েছিল পণ্ডিত নেহরুর ছোট্ট মেয়ের কাছে লেখা চিঠির গুচ্ছ পড়ে। মধ্যবিত্ত পরিবারের সাধারণ

বাঙালী মেয়ের কথা বিশ্ববরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন,

জানি নাই ত আমি যে কি
জানি নাই এই বৃহৎ বসুন্ধরা
কি অর্থে যে ভরা।

এই এক ভারতীয় পিতা বৃহৎ বসুন্ধরা যে কি, তা চিঠির মাধ্যমে ওই ছোট মেয়েকে বোঝাতে চেয়েছেন। শুধু বোঝানই নয়, তাকে ডেকেওছেন ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে মহান এক ভূমিকা গ্রহণ করার জন্য। সেদিন নিজের চারদিককার দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীরের দিকে তাকিয়ে ওই সৌভাগ্যবতীর কথা ভেবে একটা অনন্দ ও মুক্তির স্বাদ আমার মধ্যে অনুভব করার চেষ্টা করেছি।

সেই মেয়েই আজ আমাদের এই বৃহৎ দেশের কর্ণধার।

ইন্দিরা গান্ধীর আগে সিংহলের শ্রীমাভো বন্দরনায়েক পৃথিবীর প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। তারপর ইন্দিরা গান্ধী এই বিশাল দেশের প্রধানমন্ত্রী হলেন।

আদি যুগ থেকে পৃথিবী তার ইতিহাসের চক্রাবর্তপথে আবর্তন এগিয়ে এসেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে নানা দেশে সাম্রাজ্যবাদের অবসান হয়েছে। এশিয়ার বহু রাষ্ট্র ও সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। স্বাধীনতার পর বিশ্ব ইতিহাসে ভারতের একটা বিশেষ ভূমিকা তৈরী হয়েছে। কিন্তু তার অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি আজকের মত এমন জটিল কখনই বোধ হয়নি।

এই সঙ্কটের পরিস্থিতির মধ্যে ইন্দিরা গান্ধী জাতির কর্ণধার হয়ে আছেন। তরণী কোন ঘাটে ভিড়বে, না উত্তাল সমুদ্রে পড়বে কিনা তা ইতিহাস জানে।

●

অসাধারণ ব্যক্তিত্ব এই ক্ষীণাঙ্গী নারীর।

উত্তর প্রদেশে শ্রীকমলাপতি মিশ্র জাতীয় পণ্ডিত নেহরুর আত্মজীবনী সংস্কৃতে অনুবাদ করেছেন। সংস্কৃতে অসাধারণ পাণ্ডিত্য তাঁর। তাঁকে একবার বিজয় লক্ষ্মী পণ্ডিতের কন্যা নয়নতারা সেহগল লিখেছিলেন, লেখনীতে ইন্দিরাকে চিত্রিত করা অসম্ভব। তার বহুপ্রতিভ ব্যক্তিত্বকে কলমে রূপ দেওয়া অত্যন্ত দুরূহ কাজ।

আত্মজীবনীর সংস্কৃত অনুবাদ নিয়ে কয়েকবারই শ্রীকমলাপতি মিশ্র তিনমূর্তি বাড়ীতে গেছেন। তখন অনেকবারই ইন্দিরার সঙ্গে তাঁর দেখা শোনা হয়েছে। প্রথমে মনে হয়েছে বুঝিবা প্রয়োজনের চেয়ে অতিরিক্ত অন্তর্মুখিনতা এই মেয়ের। কিন্তু ক্রমে ভুল ভেঙেছে। মনে হয়েছে এঁর চেয়ে সহজ আর সৌজন্যপূর্ণ ব্যক্তি আর কোন ভিন্ন পরিবারই সম্ভব হতে পারে না। ইন্দিরা যা কিছু বলার অল্পেই বলে থাকেন, আর যা বোঝেন তাই তাঁর কর্মকলাপে পরিস্ফুট হয়। তা মন জানেন না তিনি।

উচ্চ শ্রেণীর অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও কঠিন সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে তাঁকে [illegible] যখন প্রথম কারা-গারে যান তখন ইন্দিরার চার বছর বয়সও হয়নি। জীবনের গোড়ার দিকেই সম্পূর্ণ অনিশ্চিত অসম্বদ্ধ জীবনচক্রের মধ্য দিয়ে তাঁর কেটেছে।

জীবনের সেই কাঠখড়ের মধ্যে দিয়ে ছোট্ট ইন্দিরার ভাবী জীবনের রূপরেখা গঠিত হয়েছে। আজকের ইন্দিরা যেন বহুবিধ শক্তির অপরাজেয় আধার। এটি হয়েছে সেদিনকার সেই সময়ের গুণে।

যৌবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সময় তিনি পিতার সেবাতে উৎসর্গ করেছেন। এ আত্মত্যাগ কি কম? কোন ক্ষোভ, কোন নালিশ তাঁর ছিল না এই আত্মবলির জন্য। ইন্দিরা না থাকলে জওহরলালের এই দীর্ঘ রাষ্ট্র, সবল সুস্থতা, যুবকের মত প্রাণোচ্ছল জীবন কি সম্ভব হত? রবীন্দ্রনাথ জওহরলালকে বলেছিলেন ঋতুরাজ বসন্ত। সত্তর অতিক্রান্ত তাঁর যৌবনরক্ষের যে সবুজ জয়ধ্বজা সেটি প্রিয়দর্শিনী তপস্বিনী ইন্দিরারই।

কিশোর বয়সে ইন্দিরা গান্ধী কবিগুরুর শান্তিনিকেতনে কিছুকাল কাটিয়েছিলেন। শান্তিনিকেতন থেকে সুকুমার-কলা-প্রবৃত্তি থেকে শুরু করে অনেক কিছু হয়ত পেয়েছেন, কিন্তু প্রিয়দর্শিনী তাঁর আবাসিক হস্টেল থেকে বিদায় নেবার পর তাঁর প্রকৃত প্রশংসা করে নেহরুকে চিঠি লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। লিখেছিলেন, ইন্দিরা ঠিক যেন সোনারই প্রতিকৃতি।

শৈশবকাল থেকে ইন্দিরার বিচিত্র ও ঘটনাবহুল জীবনের মধ্য দিয়েই ইতিহাসের রথচক্র এগিয়ে চলেছে স্বাধীনতার দিকে। ইন্দিরার চোখের সামনে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতিটি ঘটনা ঘটেছে। গান্ধী, নেহরু, সরোজিনী নাইডু, আজাদ, গফফর খাঁ প্রভৃতি স্বাধীনতা যুদ্ধের নায়কগণ ইন্দিরার নিতান্ত কাছের জন ছিলেন।

তারপর আস্তে আস্তে ইন্দিরার জীবন রাষ্ট্রসীমা অতিক্রম করে আন্তর্জাতিক রঙ্গমঞ্চে পৌঁছাল।

কেনেডি, ক্রুশ্চেভ, নাসের, টিটো, দ্য গল, ম্যাকমিলন ইত্যাদি বিশ্বনেতাদের সমপর্যায়ে বসে তিনি বিশ্ব পরিস্থিতি আলোচনা করে এসেছেন।

স্বাধীনতার কালেই শুধু নয় তার আগে থেকেই ইন্দিরা একমাত্র মহিলা যিনি শাসনতন্ত্রের কোন পদ গ্রহণ না করেই এক চির সন্তুনেত্রী রাজনীতিকরূপে বিশ্বের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ দেশ ভ্রমণ করেছেন এবং একজন অভিজ্ঞতাসম্পন্ন রাজনেতার মত পরিপূর্ণ মর্যাদার সঙ্গে ভারতের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির প্রতি ওখানকার রাজনেতা ও জনপ্রতিনিধিদের সহানুভূতি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছেন।

শুধু বাইরেই নয়, এই বিশাল উপমহাদেশেই আজ একরকম তাঁর নখদর্পণে প্রতিবিম্বিত। অনলসভাবে যেন নিদ্রা ক্ষুধা সব জয় করে তিনি দেশের একপ্রান্ত থেকে অপর এক প্রান্ত ঘুরে বেড়াচ্ছেন। বিশাল জনতার সঙ্গে নিজেকে একাকার করার সাধেই যেন তিনি ব্রতী হয়েছেন।

ইন্দিরা যেন যুগযুগান্তের সজীব তপস্যা। ইন্দিরার জন্মের পর সরোজিনী নাইডু তাকে নতুন ভারত আত্মা বলে অভিনন্দিত করেছিলেন। সেই ভারত আত্মার জয় হোক।

নিজের শিক্ষাজীবন কথা বলতে ইন্দিরা বলেছেন, মার কাছেই আমি বেশি ঋণী। বাবা আমাকে দিয়েছেন আকাশে ডানা মেলার শিক্ষা, কিন্তু মা দিয়েছেন এই ধরিত্রীর বুকেই পা শক্ত করে দাঁড়িয়ে থাকার শিক্ষা।

সাধারণত দুনিয়ার অধিকাংশ তাঁকে বড় পিতার পুত্রী, বড় পিতামহের পৌত্রী ইত্যাদি বলে পরিচয় দেওয়া হয়। দুঃখে একবার তিনি বলেছিলেন, লোকে আমার বাপঠাকুরদার কথাই বলে, আমার মার কথা কেউ বলে না। আমার মার আত্মত্যাগ কোন দেশনেতার চেয়েই কম ছিল না।

সত্যিই ইন্দিরার মায়ের প্রতি গভীর ভালবাসা। মায়ের কথা স্মরণ করে একবার বলেছেন সাধু-সন্ন্যাসীর প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ছিল। কত সাধু মহাত্মা তাঁর কাছে আসত। তিনি মন্ত্র পেয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ শিষ্য মহাপুরুষ মহারাজের কাছে। বেলুড় মঠে ইন্দিরা মায়ের সঙ্গে অনেক গেছেন। গঙ্গাতীরে বসে কত সময় প্রবহমান স্রোতের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ডুবে গেছেন কিশোরী মনের চিন্তায়।

মার কাছ থেকেই ইন্দিরা পেয়েছেন সাধু-সন্ন্যাসীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবোধ।

সোভিয়েট দেশে গেছেন। নামটার প্রতি ইন্দিরার ছিল ভারী আকর্ষণ। ভেবেছিলেন নিজের ছেলে হলে নাম রাখবেন রাহুল। কিন্তু ছেলে যখন হল নেহরু তখন জেলে। সেখানে আচার্য নরেন্দ্র দেব আনন্দ প্রকাশ করলেন দৌহিত্র লাভের খবর শুনে। নেহরু বললেন, বাপু দিদিমার নাম মিলিয়ে নাম দিলেন রাজীবরতন। রাজীব মানে কমল আর রতন হল জওহর।

কাশ্মীরিদের মেয়েদের নাম অনেকেরই স্বরূপ থাকে, বিজয়লক্ষ্মীরও বিয়ের আগের নাম ছিল স্বরূপকুমারী, তাঁর মায়ের নাম স্বরূপরাণীর সঙ্গে মিলিয়ে। বিয়ের পর বিজয়লক্ষ্মীর স্বামী রঞ্জিত পণ্ডিত বললেন লোকে ডাকবে কি করে স্বরূপ বলে, নান্‌দি নাম যে। তিনিই নাম দিলেন বিজয়লক্ষ্মী।

যাই হোক, ইন্দিরার অপর ছেলের নাম রাহুল রাখা হল না। তাঁর বাবা বাঁচতে দিলেন না। দ্বিতীয় ছেলেটির ক্ষেত্রেও রাজীবের সঙ্গে মিলিয়ে নাম রাখা হল সঞ্জীব। সঞ্জীবই লোকমুখে কেমন করে হল সঞ্জয়। রাহুল নাম রাখা আর হল না। কিন্তু নামটি ইন্দিরার কত পছন্দ। রাজীবের ছেলে হল সেদিন, ইন্দিরা নাতির নাম রাখলেন রাহুল।

ইন্দিরা মার কাছে শিখেছেন মাটিতে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার শিক্ষা, তা যত ঝড়, যত বিপর্যয় আসুক না কেন।

সমস্ত দেশ মাটিতে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার প্রেরণা চাইছে আজ এই দেশনেত্রীর কাছে।

তুলসীচরিত

নমিষিব চৌধুরী

(১৪)

তুলসীর বাবা বরদাবাবুর সংগে আলাপ করে মনে হল আগে কেমন মানুষ ছিলেন তিনি—জানি না, এখন হেজেমজে গিয়েছেন। হেজেমজে যাওয়া মানে মানি বুদ্ধির ধার হারিয়ে আবার ইনস্টিংক্টে পরিণত হওয়া। রেনগেলগুলো কম্পিউটরের কাজ করে, বুদ্ধির স্বতঃস্ফূর্ত গতিকে সাহায্য করে না। সোজা কথায় বুদ্ধিমান মানুষ ধূর্ত মানুষে পরিণত হয়।

ধূর্ত মানুষ সবাইকে নিজের অভীষ্ট-সিদ্ধির যন্ত্রের মত দেখতে অভ্যস্ত হয়, মানুষকে স্টাডি করে সুযোগ-সুবিধার অন্বেষণে, অর্থাৎ কার কোন দুর্বলতা আছে আবিষ্কার করে কিছু আদায় হয় কিনা চেষ্টা করে। বরদাবাবুও এক্সপ্লোরেশন করছিলেন। একদিন খেদ প্রকাশ করে বললেন, বাজারের যে অবস্থা একলা মানুষ আর পেরে উঠছি না। ভাবছি তুলসীকে কলেজের পড়া ছাড়িয়ে টাইপিং শিখতে দেব। কিছু শিখে নিলে অফিসের কর্তাদের ধরে অফিসে ঢুকিয়ে দেব। তুলসী আপনাকে শ্রদ্ধা ভক্তি করে, প্রায় আসে আপনার কাছে। তাই আপনার পরামর্শ চাইছি।

বললাম, ভাল প্রস্তাব।

আপনি সমর্থন করছেন এ প্রস্তাব?

বললাম, তুলসীর ভাল-মন্দের কথা চিন্তা করা আপনার কর্তব্য। আপনি যা স্থির করেন তাই হবে। আমি থার্ড পার্সন।

থার্ড পার্সন বলে আপনাকে মনে করি না দাদা। আপনি তুলসীর ওয়েল উইশার।

তা বটে, কিন্তু কেবলমাত্র ওয়েল উইশার, কিছু করবার সামর্থ্য নাই।

মাসখানেক পরে একদিন তুলসী এসে সামনে বসে চোখ মুছতে লাগল। বুঝলাম অপ্রীতিকর কোন ব্যাপার নিয়ে এসেছে।

বললাম, বর্ষা নামল কেন চোখে তুলসী? বলে ফেল। কি বলবে?

ভাঙাচোরা কথা-জড় করে তুলসী যা বলল তার ভাবার্থ এই যে তার দাদার পরীক্ষার ফি যোগাড় হচ্ছে না, তাই তার বাবা তাকে ঠেলে পাঠালেন ফির টাকাটা আমার কাছে ধার করতে।

এই কথা বলতে গিয়ে কাঁদছ কেন? তুমি বললে টাকা দিতে পারি।

মাথা নেড়ে তুলসী বলল, আমি দিতে বলি না জেঠামশাই। টাকা না পেলে বাবা খুব রাগ করবেন, হয়ত আমাকে আসতে দেবেন না আপনার কাছে।

বললাম, এসো না।

আমি কি করে থাকব জেঠামশাই না এসে?

তা বটে। আমিই বা কি করে থাকব? তাহলে টাকাটা নিয়ে যাও।

না জেঠামশাই। দাদার পরীক্ষার ফি সে যে করে পারে যোগাড় করুক, যোগাড় করবেও। তার পড়বার খরচ সে চাকুরি করে চালাচ্ছে। বাবা আমাকে আপনার কাছে টাকা ধার করতে পাঠালেন কেন?

কেন পাঠালেন হয়ত নিজেই বুঝতে পারছ খানিকটা, তাই এত খারাপ লাগছে। বললাম, তাহলে তোমার বাবাকে বলো টাকা আমি দিলাম না, তোমাকে এখানে আসতে না করেছি।

তুলসীর মুখ শুকিয়ে গেল দেখলাম। ঢোক গিলে বলল, আপনি আসতে মানা করছেন?

তুমি বোকা মেয়ে নাকি? কদিন এসো না এখানে। তোমার মা জানেন তোমাকে টাকা ধার করতে পাঠিয়েছেন তোমার বাবা?

মা জানেননি, আমি বলেছি।

কি বললেন?

বললেন, টাকা চাস যদি বুঝব তুই আমার মেয়ে নস। কি হবে জেঠামশাই?

কিছু হবে না। তোমার দাদাকে একবার পাঠিয়ে দিয়ো আমার কাছে, তোমার বাবাকে বলো তাকে ডেকেছি আমি।

একটু হাসি দেখা গেল তুলসীর মুখে এতক্ষণ পরে।

বরদাবাবুর বড় ছেলে সত্যর সঙ্গে কথা হল।

তার পরীক্ষার ফির ব্যাপারে শুনে রেগে গেল সে। বলল, বি-কম পাশ করবার পর থেকে আমার সব খরচ চালাচ্ছি আমি। একবেলা অফিসের ক্যান্টিনে খাই, রাতে বাড়ীতে থাকবার ও খাবার জন্য বাবাকে খরচ দিই। আমার কোন ব্যাপারে কথা মাথা ঘামান না, হঠাৎ আমার পরীক্ষার ফি যোগাড় করবার জন্য তাঁর মাথা ব্যথা হল কেন বুঝতে পারছি না। আমার সঙ্গে কোন কথাই হয়নি এ ব্যাপার নিয়ে।

তার কাছে শুনলাম বরদাবাবু আগে ইস্ট ইন্ডিয়া কর্পোরেশনে ভাল মাইনের চাকুরি করতেন। কোম্পানী লিকুইডেশনে গেলে মিঃ ভাদুড়ীর বড় ছেলের অফিসে চাকুরি করছেন। তেমন বড় বিজনেস নয়, দুশো টাকা মাইনে দেয়। বলল, কষ্টে-সৃষ্টে চলে। কিন্তু বাবার বদভ্যাস হয়েছে, মদ নয়—কিন্তু নেশা হয় কি একটা ড্রাগ খেতে আরম্ভ করেছেন। মার সঙ্গে গোলমাল করেন শুনতে পাই।

রাগের মুখে সংসারের অনেক কথা বলে গেল। বলল, মা বললেন তুলসীর কলেজের পড়া বন্ধ করে বাবা তাকে টাইপ রাইটিং শিখিয়ে অফিসে ঢুকিয়ে দেবেন। অত ছোট মেয়েকে কেউ নাকি অফিসে চাকরি করতে পাঠায়? মা বললেন তিনি সংসার চালাবার চেষ্টা করবেন, চাকুরি দেবেন তুলসীকে কলেজে পড়াবেন। বাবা মত না দিলে মা তুলসীকে নিয়ে অন্য জায়গায় চলে যেতে পারেন মনে হল। যদি পড়া না দেন তুলসী বাড়ীতে পড়ুক, প্রাইভেট ক্যান্ডিডেট হয়ে পরীক্ষা দেবে।

দেখলাম পোশাকে বেশ পরিপাটী আছে সত্যর, কিন্তু সেজন্য বদলে মানুষ

এরপর থেকে বরদাবাবুর সঙ্গে আর মহাশয়ার কাছে আসতে দেখি না তুলসীও তার আসে না। তুলসীর আসবার পথ বরদাবাবু বন্ধ করেছেন মনে হল। মনের ভেতরে মাঝে মাঝে খচ-খচ করে। বুঝতে পারি তুলসীকে দেখতে না পেয়ে একটু কষ্ট হচ্ছে। কি আর করা যাবে?

মাস দুই পরে বরদাবাবুর সংগে একদিন রাস্তায় দেখা হল।

বললেন, এই যে দাদা, অনেকদিন দেখা নাই, কেমন আছেন বলুন।

তাকিয়ে দেখলাম পোশাকের পারিপাট্য যেন কিছু কমেছে। বললাম, এই চলে যাচ্ছে কোন রকমে।

ও কথা আমরা বলব দাদা, ভগবান আপনাদের ভালভাবে চলবার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

বাড়ীর দিকে ফিরছিলাম দুজনে কথা বলতে বলতে। নিজেই তুলসীর কথা ওঠালেন। বললেন, তুলসীকে টাইপ রাইটিং শেখাবার আইডিয়া ছেড়ে দিলাম দাদা। ক টাকা আর রোজগার করবে অফিসে টাইপিস্ট হয়ে? তেবে দেখলাম সিনেমা লাইনে গেলে তুলসীর প্রসপেকটস আছে। আমার এক শালা আছেন, মধু-চন্দন সিনেমা ডিরেক্টার প্রোডিউসারের সঙ্গে খাতির আছে, তার একখানা বই বক্স-অফিস হিট করেছিল, নাম আছে বাজারে। তার সঙ্গে কথা হয়েছে। তুলসী দেখতে ভাল, ভাল ফিগার, চেহারার স্টাইল আছে। কিছু এ্যাকটিং করতে পারে, গান কিছু জানে, চাই একটু সুযোগ মনে পড়ল

করবার লোক, আর লাক। যদি লেগে যায়— আপনি কি বলেন?

ভাল প্রস্তাব।

তুলসীর নিজের একটু ইচ্ছা আছে, বলেনি আপনাকে?

না।

আসে না বুঝি আর? মেয়েটা একটু একগুঁয়ে, একটু অবাধ্য। কতবার বলেছি দাদার কাছে যাবে আগের মত, একজন আদর্শ পুরুষ দাদা। হাতে টাকা থাকতে দেশের সনাতন গরীব চালে চলেন। সোজা কথা না কি বাড়তি টাকার কামড় সহ্য করা। এ রকম মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করলে সর্বাঙ্গীণ উন্নতি হয়। বড় হচ্ছে, হয়ত লজ্জা করে বেশী আসতে। আচ্ছা, ওকে বলব আসবার জন্য, কথা বলে দেখবেন।

আমি কি কথা বলব?

বাপের কাছে লজ্জায় মনের ইচ্ছা স্পষ্ট করে বলে না। আমার বেটার হাফ আবার একটু পিউরিটান টেস্টের মানুষ, সিনেমা-থিয়েটার পছন্দ করেন না আজকাল, কম বয়স করতেন। তুলসীর মনে উচ্চাশা জাগিয়ে দেয়া দরকার। আপনার সঙ্গে সব রকমের কথা হয়—

তাকালাম বন্দাবাবুর দিকে, বললাম, বেশ, পাঠিয়ে দেবেন তাকে।

বাড়ীর কাছ পৌঁছে বন্দাবাবুকে নমস্কার করলাম, তিনি বিদায় না নিয়ে আমার সঙ্গে আস্তে আসতে বললেন, দু-চার মিনিট বসব আপনার কাছে, দু-চারটে ভাল কথা শুনব। বাড়ীতে ফিরতে ইচ্ছা হয় না, অন্ধকার বাড়ী—

কেন আপনার স্ত্রী কোথায়?

ক'দিন হল একটা উপলক্ষে পিত্রালয় গিয়েছেন, তুলসীও গিয়েছে।

খাওয়া-দাওয়া চলছে কিভাবে?

ছোট ছেলেটা চালাচ্ছে, বুড়ো বয়সে আশ্রমের মতে—

তার বয়স চৌদ্দ-পনের হবে, সে রেঁধে খাওয়াচ্ছে আপনাকে?

বললেন, বয়স কম হলে কি হয় দাদা রান্নায় সে দ্রৌপদী বিশেষ। প্রিন্স অব ওয়েলস সত্যবাবু ছোট ভাইকে একটু সাহায্য করবার ভয়ে হোটেলে ফাউল রোস্ট বিরিয়ানি খেয়ে রাত কাবারের বাড়ী ফেরেন।

আরাম করে বসে সিগারেট টানতে টানতে অনেক কথা বললেন বন্দাবাবু, চা-বিস্কুট খেলেন, ঘণ্টাখানেক পরে অনুগ্রহ করে বিদায় নিলেন।

বন্দাবাবু চলে গেলে খানিকক্ষণ ধরে ভাবলাম। হই-ভস্ম ভাবনা। বাপের নজরে পড়েছে মেয়ে দেখতে ভাল, ভাল ফিগার, চেহারায় স্টাইল আছে, সিনেমায় নামলে, একটু খাটলে টাকা আনতে পারবে হয়ত। আশা করে আছেন সিনেমা একট্রেস মেয়ে সে টাকার কিছুটা বাপের হাতে দেবে তাঁর ইচ্ছামত খাবে বা এলকোহলে ব্যয় করবার জন্য।

এসব ভাবনা ছেড়ে ফেলে নিজের কাজে মন দিলাম। একটা নতুন অ্যান্টি-বায়োটিক দুগ্ধের কাজ প্রায় শেষ করে এনেছি। আরও কিছুদিন লাগবে এক্সপেরিমেন্ট চালাতে, ফল সন্তোষজনক হলে বাজারে ছাড়া চলবে। এক্সপেরিমেন্টের জন্য কোম্পানীর রিসার্চ লেবরেটরীতে যেতে হয় প্রায়ই।

(১৫)

কয়েকদিন পরের কথা।

সেদিন একটু বেলাবেলি ফিরে হাত-মুখ ধুয়ে মহামায়ার কাছে এক কাপ চা চেয়ে নিয়ে বারান্দার একপাশে খাঁচা ঘরে ঢুকলাম।

বললাম, খাঁচাঘর, ভাল নামও দেয়া যায়, যেমন প্রাইভেট চেম্বার। তিন ইঞ্চি সিমেন্টের দেয়াল ও কাঠ, কাঁচের ব্যাপার। একটা ছোট ঘরের সাইজ। চেয়ার, টেবিল, আরাম চেয়ার, আর-ও একটা-ওটা আছে। তার মধ্যে পড়ে তিনখানা ছবি, একখানা বুদ্ধদেব ও এক নব-দীক্ষিতা শ্রমণীর, একখানা সন্ন্যাসী চৈতন্যদেব ভিক্ষার ঝুলি তাঁর নিজের গৃহদ্বারে উপস্থিত, বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী ভিক্ষা দেবার জন্য তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন, একখানা ম্যাডোনার, শিশু যিশুর স্তন্যপান করছেন। উঁচুদরের ছবি কিনা জানি না, আমি আর্ট-রসিকজন নই। তিনখানা ছবি ছাড়া একখানা ফটো আছে, দেবীদাসের ফটো। এই ছবি ও ফটো কি করে আমার হাতে এল তার একটা ইতিহাস আছে। পরে বলব।

খাঁচাঘর হালে তৈরী হয়েছে। বাইরের কাউকে এঘরে ঢোকাই না, নিজেও যে রোজ ঢুকি তাও নয়। যেদিন খেয়াল হয়, রিসার্চের কথা ছাড়া অন্য কথা মনে আসতে থাকে, যেদিন বুঝি মন একটু ছুটি চাইছে খাঁচাঘরে গিয়ে বসি।

সেদিন চায়ের কাপ হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকলাম। চা শেষ করে কাপটা সরিয়ে রেখে আরাম চেয়ারে দেহ এলিয়ে দিলাম। দেখছিলাম নানা রকমের তত্ত্ব জিজ্ঞাসার বই কোটিবার মত অবস্থা আসছে মনে। মনকে বললাম, কেন বাজে মেহনত করবে? মানুষের জীবনের সব তত্ত্ব তথ্য হয়ে গিয়েছে, তত্ত্বের মধ্যে মিস্টির ভাব আছে একটু, তথ্যের মধ্যে কিছু নাই। বার্লিনের ম্যাক্স প্লাঙ্ক সোসাইটির গবেষকরা যে ইলেকট্রনিক মাইক্রোসকোপ তৈরী করেছেন তার সাহায্যে জীবকোষের মধ্যে মোলিকিউল এবং মোলিকিউলের মধ্যেকার এটমগুলো পর্যন্ত চোখে দেখা যাবে এরপর। তত্ত্ব কোথায় থাকবে অতঃপর? বিজ্ঞান জীবনকে ডিমিস্টিফাই করে। মানে—

চমকে উঠলাম। আমার তত্ত্বজিজ্ঞাসার তন্ময়তার সুযোগ নিয়ে জোর খুলে কে ঘরে ঢুকে বুকের ওপরে আছড়ে পড়ল।

বুঝতে দেরি হল না এই অনধিপ্রবেশকারী একটি মেয়ে। এত দুঃসাহস আর কার হবে?

বললাম, তুলসী উঠে চেয়ারে বসো।

বুকে মুখ গুঁজে তুলসী বলল, জ্যোঠামশাই!

ওঠো তুলসী, এরকম করতে নাই।

উঠে গিয়ে চেয়ারে বসে কাঁদতে লাগল।

অন্ধকার হয়ে আসছিল, উঠে আলো জেলে দিলাম। বললাম, কার সঙ্গে এলে তুমি?

মুখ একটু উঁচিয়ে বলল, একাই এসেছি।

টেবিলে মাথা রেখে তখনও কাঁদছে তুলসী। মনে মনে বললাম, এত আত্মপ্রবণ মেয়ে তুমি, দুঃখ আছে তোমার কপালে।

কাছে গিয়ে মাথায় হাত রেখে বললাম, এত কাঁদছ কেন? কি হয়েছে?

উত্তর দিল না।

বাড়ী থেকে পালিয়ে এসেছে বুঝতে পারলাম।

বললাম, এবার কান্না থামিয়ে চোখ মুছে মাথা তুলে বসো দেখি। বাপের নিষেধ না শুনে পালিয়ে আসতে হল এখানে। কি কথা আছে তোমার শুনি।

কিছু কথা নেই, একটু যেন চটে গিয়ে তুলসী বলল, তোমাকে দেখতে এসেছিলাম, কান্না পেয়ে গেল। আমি কি করব কান্না পেলে?

হেসে বললাম, খানিকটা কেঁদে নিয়েছ তো বাপু, এবার একটু হাসো তো।

আমার হাসি পাচ্ছে না।

তাহলে হেসো না। কবে ফিরলে মামাবাড়ী থেকে?

মুখ তুলে বলল, তুমি কি করে জানলে মামার বাড়ী গিয়েছিলাম? বাবা বলেছেন?

হ্যাঁ।

জ্যোঠামশাই, বাবার মাথায় একটা বড় পোকা ঢুকেছে। আমার পড়াশোনা আর হবে না, চার মাসের মাইনে বাকী পড়েছে, নাম কেটে দিয়েছে।

বললাম, তুলসী, তুমি কি সিনেমায় নামতে চাও?

হেসে বলল, বাবা মেজমামাকে বলেছেন আমার সিনেমা লাইনে যাবার খুব ইচ্ছা, তোমাকেও তাই বলেছেন বুঝি? কি হয়েছে বাবার জানিনে, এই সব বাজে কথা সবাইকে কেন বলে বেড়াচ্ছেন ধরতে পারছি না।

ধরা শক্ত নয়। তোমার নাম হবে, অনেক টাকা পাবে, তা থেকে তাঁকে কিছু দেবে আশা করছেন।

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল, গোলমাল ঢুকেছে আমাদের সংসারে। ভেবেছিলাম ডাক্তারী পড়ব, তা হবে না। তোমাকে বলব না ভেবেছিলাম, মা বাবার ওপরে রাগ করে চলে গিয়েছেন। ক'দিন মামার বাড়ীতে থেকে একটা স্কুলে চাকরি ঠিক করেছেন, মামাবাড়ীতে থেকে চাকরি করবেন। বাবা এখনও জানেন না একথা। আমার কি হবে জানি না।

তুলসী, তুমি কি সত্যি ডাক্তারী পড়তে চাও?

বলল, পড়তে তো চাই, কি ওটা আকাশ-কুসুম আমার পক্ষে। আচ্ছা জ্যোঠামশাই, আমি যদি বাবার পক্ষে বেশী ভার হয়ে থাকি, আমাকে সত্যি পড়াতে না পারেন তাহলে বিয়ে দিয়ে ভার হাল্কা

কুসুম কিন্তু আর পাঁচটা সাধারণ বনস্পতির মত নয়— কেন জানেন ?

কারণ কুসুম দিয়ে রান্না খাবার খেতে রুচি হয় ও কুসুমে তৈরী যে কোনো খাবারে খাঁটি স্বাদ-গন্ধ পাওয়া যায়। আজই এক টিন কিনে নিজে পরখ করে দেখুন।

কারণ কুসুম অন্য কোনো রান্নার তেল বা ঐ জাতীয় জিনিসের চেয়ে ঢের বেশীদিন টাটকা থাকে। রোজ কুসুম দিয়ে রেঁধে দেখুন মাসের শেষে খরচা কত কম পড়ে।

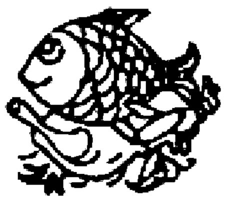

কারণ কুসুম দিয়ে রকমারি রান্না করা যায়: শাক-সবজি, মাছ-মাংস যা-ই রাঁধুন, দারুণ লোভনীয় হবে। ডাল তরকারীর স্বাদই হবে আলাদা, আর যে কোনো মিষ্টির তো কথাই নেই। কেক, বিস্কুট, ভাজাভুজি যা খুশি করুন, এমন কি চাপাটিতে মাখিয়ে বা গরম ভাতে খান—যেমন সুস্বাদু তেমনি স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো।

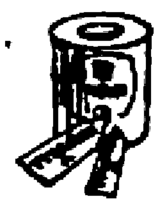

কারণ কুসুম সহজে হজম হয় আর ভারি পুষ্টিকর। প্রতি আউন্স কুসুমে ৭০০ আন্তর্জাতিক ইউনিট 'এ' ভিটামিন এবং ৫৬ আন্তর্জাতিক ইউনিট 'ডি' ভিটামিনে সমৃদ্ধ।

স্বাদে-গন্ধে সব খাবার করে তুলুন চমৎকার

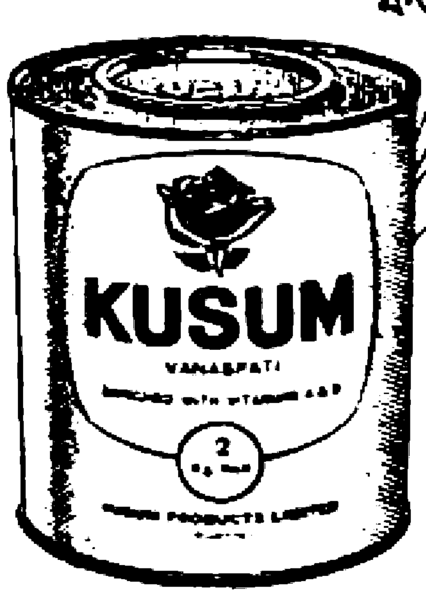

কুসুম
বনস্পতি দিয়ে
রাঁধুন

কুসুম প্রোডাক্টস লিমিটেড, কলিকাতা-১

করবার চেষ্টা করছেন না কেন? কি চান তিনি?

বললাম, এ পরামর্শ দিতে পারি কি তোমার বাবাকে?

দিতে পারো, বলবেন টাকা নাই মেয়ের বিয়ে দেবার।

যেখানে টাকা লাগবে না এমন জায়গায় চেষ্টা করা যেতে পারে। তুমি রাজি আছ বিয়ে করতে?

না, রাজি নই।

তাহলে কি করবে তুমি?

চিন্তিত মুখে বলল, জানি না।

উঠে পড়ল তুলসী, কাছে এসে কাঁধে হাত রেখে বলল, তুমি আমাকে একটু ভালবেসো জোঠামশাই, তুমি ভালবাসলে ডুবে যাব না আমি।

আমি কিছু বলবার আগে বেরিয়ে গেল।

(১৬)

তুলসী একটা ধাক্কা দিয়েছিল আমাকে। পরের দিনও তার কথা মনে আসছিল। বিকালে একখানা চিঠি পেলাম, মন অন্যদিকে ঘুরে গেল। চিঠি লিখেছে দেবাশিস।

লিখেছে, মাস্টারমশাই, ওপরে ঠিকানা দিলাম, একটা জবাব দেবেন।

আমেরিকায় প্রায় তিন বছর হয়ে এল। একটা য়ুনিভার্সিটিতে রিসার্চ শেষ করে ডকটরেট পেয়েছি। বায়োলজি, বায়োফিজিকস, বায়োকেমিস্ট্রি, সেলুলার ও মেলিকিউলার বায়োলজি পড়তে হয়েছে। ক্লিনিকেল এক্সপেরিমেন্ট শিখতে হয়েছে। তারপর কেমিকেল রিসার্চ ও কেমিকেল ইঞ্জিনীয়ারিংয়ের কাজ শিখতে বছর দেড়েক গিয়েছে। ফার্মাকোলজি, সাইটোলজি, এণ্ডোক্রিনোলজি, সিন্থেটিক ও কেমো-থিরাপিউটিক ড্রাগের কাজ শিখতে বছর খানেকের ওপরে লাগবে। আমার ইচ্ছা যতটা পারি পাকা হয়ে নিতে হবে।

আমেরিকায় আসবার পর আমার অভিজ্ঞতার কথা কিছু লিখছি।

ইংলণ্ডে যে সব জিনিস দেখেছিলুম এখানে তার অনেক জিনিস এক্সাজারেটেড চেহারায় চোখে পড়ে। মানে যেটা মডার্নিস্টিক, সেটা আরও মডার্নিস্টিক দেখায়, যেটা ন্যাকামি সেটা আরও ন্যাকামি বলে মনে হয়।

দেশে থাকতে যে ইন্টেলেকচুয়াল ও মোরাল ফোর্সে প্রকাণ্ড বস্তু বলে মনে হয়েছিল এখানে এসে কিছুদিন পরে দেখলাম সে জিনিসের আইডিয়ালজো ষ্টান্ডার্ডাইজড, প্রোসেসড হয়ে অনেকদিন হল বাজারে চালু হয়েছে। তার ফল কি হয়েছে সময়মত পরে লিখব।

যে টাকা নিয়ে আমেরিকায় এসেছিলাম তাতে বছরখানেক থাকা পরা খাওয়া চলতে পারে, আর আর কিছু করতে হলে এর মধ্যে রোজগারের ব্যবস্থা করে নিতে হবে। একাদিক্রমে ঘোরাফেরা করলাম, য়ুনিভার্সিটি মহলে ঘোরাফেরা করলাম, ভারতীয় মহলে, এণ্টারটেনমেন্টের জায়গাগুলিতে ঘোরাফেরা করলাম। মাস তিন-চার পরে একজন উৎসাহী বন্ধুর পরামর্শে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতে লাগলাম। বক্তৃতা দিতাম ইণ্ডিয়ান রিলিজিয়ন কালচার, ফিলজফি, যোগ সিস্টেম মিস্টিসিজম ইত্যাদি সম্বন্ধে, অর্থাৎ যেসব বিষয় সম্বন্ধে আমার বলবার অধিকার নাই অজ্ঞতার দরুন। কিন্তু বচনের সঙ্গে একটু হিউমার, একটু গাম্ভীর্যের, ডেপথের ভান থাকলে সব দেশের শ্রোতাদের মত এদেশের শ্রোতারাও কান খাড়িয়ে বক্তৃতা শোনে দেখলাম। আত্মপ্রত্যয় বেড়ে গেল।

মাস দু-তিন বক্তৃতা দিয়ে বেড়াবার পরে দেখা করে প্রাইভেট আলোচনা করবার জন্য দু-চারজন করে লোক আসতে লাগল। দু-চারটে নিমন্ত্রণ পেতে লাগলাম। নিমন্ত্রণ-কারীদের মধ্যে মধ্য বয়সের, শিক্ষিতা, প্রচুর অর্থশালিনী মহিলাও ছিলেন। আমি আমেরিকান লাইফ স্টাডি করতে আসিনি এখানে। এসেছি নিজের একটা ব্যবস্থা করে নিতে। আমেরিকান লাইফের ভেতরটা দেখবার যতটুকু আকস্মিক সুযোগ হয়েছে তার কথা ছাড়া আর কিছু বলতে চাইনে।

মিলিওনেয়ারদের সংখ্যা এখানে অগুনতি, তাদের মধ্যে মেয়েদের সংখ্যা অনেক। মিলিওনেয়ার মেয়েদের মধ্যে বয়সে প্রৌঢ়া, বিধবা বা ডাইভোর্সি, পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কহীনা, নিঃসঙ্গী মেয়েরাও আছেন। জানা যায় না এত টাকা ব্যাঙ্কে হাউস-হোল্ডের মত জমে পাড়ছে। বিভিন্ন কারবারে খাটছে। কোন দুশ্চিন্তা নাই। নিশ্চিন্ত মনে নানা রকমের কাজ বা অকাজ নিয়ে এঁরা নিজেদের ব্যস্ত রাখবার চেষ্টা করেন। কেউ কেউ ধর্ম ও দর্শনশাস্ত্রের বই পড়েন, পছন্দমত লোকের সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা করেন। এদের সযত্ন দেহচর্চা থেকে অনুমান করা যায় প্রৌঢ়া হলেও সেক্স হাঙ্গার যায়নি, কিন্তু বয়সের দরুন চরিত উপায় গ্রহণ করতে ইতস্তত করেন, তাছাড়া তৃতীয় ছোকরারা ধরা দিতে চায় না। সেক্স এপিলকে কাল্ট হিসেবে চর্চা করবার দীক্ষা পেয়েছেন এঁরা যৌবনের শুরু থেকে, কবরে যাবার সময়ে গোটা কয়েক টেবলরেড, রুজ, লিপস্টিক, নেল পোলিশ ব্যাগে পুরে নিয়ে যাবেন হয়ত।

সৌভাগ্যক্রমে এই ধরনের একজন মিলিওনেয়ার ভদ্রমহিলার সঙ্গে আলাপ ও কিছু ঘনিষ্ঠতা হল। হিন্দু ফিলোজফি ও যোগাভ্যাসের ভক্ত ইনি। বললেন ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতে চান তিনি, যৌগিক প্র্যাকটিসেস শিখতে চান। আলাপ হবার কিছুদিন পরে বললেন, তোমার কথাবার্তা আমাকে ইনস-পিরেশন দেয়। হাতের কাছে হায়ার টপিকস সম্বন্ধে আলোচনা করবার পছন্দমত লোক পাই না, তোমার মত একজন কম্প্যানিয়ন খুঁজছিলাম আমি। যদি আমার ফ্ল্যাটে থাকতে রাজি হও তোমার সব খরচ দেব আমি।

বললাম, তিন বছর য়ুনিভার্সিটিতে পড়বার খরচ দেবে?

রাজি হলেন। বললেন, য়ুনিভার্সিটি কোর্স শেষ হলে তোমার দেশে ফেরবার যদি ইচ্ছে হয়, যদি আমি তোমার সঙ্গে যেতে চাই—

সাথের করে নিয়ে যাব।

মিসেস কে-র দয়ায় তিন বছর কাটিয়ে দিলাম। হাতে টাকা জমেছে কিছু। মিসেস কে-বলছেন এখানে যদি স্বাধীনভাবে কাজ করতে চাও আমার অর্ধেক টাকা তোমাকে দেব।

কি করব পুরোপুরি কাজ শেখবার আগে বলে কি হবে? বললাম, তোমার কথা মনে রাখলাম।...

ওঁর ফ্ল্যাটে থাকি না এখন, আমার কাজের জায়গায় আলাদা ফ্ল্যাট নিয়ে থাকি। উনি মাঝে মাঝে এসে দু-চারদিন কাটিয়ে যান, ছুটি ছাটায় আমি ওঁর কাছে যাই। দুজনে গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে পড়ি আমেরিকা ঘুরে দেখতে। মিসেস কে—সঙ্গী হিসাবে চমৎকার মানুষ, বন্ধু হিসাবে এফেকশানেট, মার্জিত। পড়াশোনা করেছেন, অনেক খবর রাখেন। ব্রহ্মজ্ঞান চর্চা ও যৌগিক প্র্যাক-টিসেস অনুশীলনে ভাটা পড়েছে, দেশ থেকে এক সেট বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য আনিয়েছি, অনুবাদ করে শোনাই। মিসেস কে-র মতে এমন মধুর সাহিত্য কোন ভাষায় আছে জানতেন না।

এদেশে কি করে চালাচ্ছি এতদিন বললাম। এখন কোন রিসার্চ ইনস্টিটিউশনে ভাল মাইনের কাজ পেতে পারি ইচ্ছা করলে, কারবারের মধ্যে ঢুকে যেতে পারি। একটা পোজিশন হয়েছে এতদিনে, কিছু নাম হয়েছে।

আমেরিকায় এসে যা আমার ছিল না এমন একটা জিনিস পেয়েছি। সেটা হচ্ছে ফেথ, ফেথ ইন টেকনোলজি। টেকনোলজি আমেরিকার ভগবান। এই ভগবান অগাধ ঐশ্বর্য দিয়েছেন আমেরিকানদের। টাকার পাহাড় রচনা করে তার চূড়ায় বসে ডঙ্কা বাজাচ্ছে আমেরিকা।

রুশিয়ার চর্চা করছে তারা নূতন নূতন শক্তির সন্ধানে, টাকার পাহাড়কে আরও উঁচু করবার জন্য। শক্তির দাপটে পৃথিবীতে ত্রাস সৃষ্টি করতে চায় তারা।

মাস্টারমশাই, আমি জাত কাফের, নতুন কনভার্ট হয়েছি কিন্তু নিও-কনভার্টের উদ্দীপনা খুঁজে পাচ্ছি না। ষোড়শোপচারে অষ্টাদশ প্লাস অষ্টাদশ উপচার সংগৃহীত হয়েছে হাতের কাছে, বিংশ শতাব্দীর এই নয়া ভগবান, যাঁর কৃপায় বোতাম টিপলে সব সুখ ঝরে পড়ে গায়ে, তাঁর পূজার জন্য, কিন্তু মন সংশয়-গ্রস্ত, কাকে দেবার হবিষ্য বিধেয়?

টেকনোলজির পায়ে মাথা ঠুকতে থাকুক তারা যতদিন নতুন ভক্ত গায়ে জোর করে নিয়ে উঠে পড়ে চ্যালেঞ্জ না করে। সায়েন্স ও টেকনোলজির চর্চা কোন জাতির একচেটে নয়। টেকনোলজি ভগবানের নাকে-মুখে দু পোঁচ রং লাগিয়ে নতুন ভক্তরা দাবী করবে ইনি আমাদের নিজস্ব ভগবান, আমরা তাঁর পয়গম্বর, অতএব—

আজ এখানে শেষ করছি। হাতের কাজ শেষ হলে আবার চিঠি দেব। আমার প্রণাম নেবেন।

(ক্রমশঃ)

দুই বাংলার সাংস্কৃতিক যোগাযোগের সমস্যা

তারাপদ লাহিড়ী

দেউলিয়া রাজনীতি ও উন্মার্গগামী হিংস্রতার খবরে ভরা সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় কখনও কখনও এমন এক আধটা তৃপ্তিকর খবর প্রকাশিত হয়, যা কালো মেঘের কিনারে উদ্ভাসিত রজত-রেখার মত আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে দৃশ্যমান কৃষ্ণবর্ণ মেঘপুঞ্জই দুঃখকষ্টের শেষ কথা নয়, তার বুকের তলায় আলোও লুকানো আছে। সম্প্রতি প্রকাশিত এই প্রকার একটি সংবাদের প্রতি সংস্কৃতি-প্রেমিক অনেকের দৃষ্টিই হয়ত আকৃষ্ট হ'য়েছে। এ সংবাদটি হ'চ্ছে এই যে—সম্প্রতি ঢাকায় অনুষ্ঠিত 'বাংলা আকাদেমির' পঞ্চমবার্ষিক সাধারণ সভায় আকাদেমির সভাপতি জনাব সৈয়দ মুর্তজা আলি উভয় বাংলার মধ্যে বইপত্র আমদানী-রপ্তানির ব্যবস্থার অনুকূলে দাবী উত্থাপন করেন। ঐ সঙ্গেই এ সংবাদও প্রকাশিত হয়েছে যে ঢাকাস্থিত এশিয়াটিক্ সোসাইটীর বার্ষিক সভায় ঐ সভার সম্পাদক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যক্ষ প্রফেসর হাবিবুল্লাও পশ্চিমবঙ্গ থেকে পূর্ববঙ্গে বইপত্র আমদানীর উপর যে নিষেধাজ্ঞা প্রযুক্ত রয়েছে, তা প্রত্যাহারের দাবী জানান। সংবাদ পাঠে আমরা আরও জানতে পারলাম যে ঢাকাস্থিত বাংলা আকাদেমি ১৯৬৯ সালের জন্য পাঁচজন কৃতী পূর্ব পাকিস্থানী সাহিত্যিককে গবেষণা, নাটক, কবিতা প্রভৃতির ক্ষেত্রে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্য আকাদেমি পুরস্কার প্রদান করেছেন। আমাদের দুর্ভাগ্য, না লজ্জা মা কি বলব জানি না—যে আমরা বাঙালী হয়েও বঙ্গ-ভারতীর ঐ পাঁচজন নিষ্ঠাবান ও কৃতী সেবকের রচনার সঙ্গে আজও সম্যক পরিচিত হতে পারি নাই। ভাসা-ভাসাভাবে ও'দের মধ্যে দু একজনের নাম শোনা আছে মাত্র। 'এপার বাংলা ওপার বাংলা মাঝখানে চর'। এপারে বঙ্গ-ভারতীর মন্দিরে কাঁসর-ঘন্টা বাজছে, তার ক্ষীণ আওয়াজ ওপারের সেবকদের কানে পৌঁছোচ্ছে। আবার, ওপারের উপাসকদের কণ্ঠ থেকে উত্থিত আজানের ধ্বনির রেশ এপারে ভেসে আসছে—কিন্তু 'মাঝখানে চর'। এপারের পূজারীরা ওপারের সেবকগণকে জানতে পারলো না। ওপারের লোকের কাছে এপারের পূজা-উৎসব সবই রহস্যাবৃত রয়ে গেল। নিষেধের চড়া পেরিয়ে পারস্পরিক জানাজানি ঘটতে পারছে না।

উভয় দেশের রাজনৈতিক নেতৃবর্গ শুধু যে বাংলা দেশটাকেই কেটে দুখানা করেছেন তা নয়। বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিশাল প্রান্তরের মাঝখানে দেয়াল তুলে দুই অংশের মানুষের হাসি-কান্না, আনন্দ বেদনাকে দুটি পৃথক কোঠায় বন্দী ক'রে রেখেছেন। অথচ বিস্ময় এই যে, দীর্ঘদিনেও এই অমানুষিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কোন একটা জোরালো প্রতিবাদ ধ্বনিত হল না। তাই উপরে উল্লিখিত সংবাদটি পাঠ করে সত্য সত্যই একথা মনে ক'রে আনন্দ পেয়েছি যে—সবটাই মেঘ নয়, তার কিনারে আলোর ঝলকানি দেখা যাচ্ছে। এপার-ওপার দুই পারের মধ্যে সাংস্কৃতিক ব্ল্যাক-আউট সৃষ্টির পিছনে কি যুক্তি বা প্রয়োজন বা কি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিহিত আছে, তা বহু চেষ্টা করেও হৃদয়ঙ্গম করতে পারি নাই। দুনিয়ার প্রায় সব দেশ থেকে মুদ্রিত পুস্তক, সাময়িকী ও সংবাদপত্র দুই বাংলায় প্রায় অবাধে যাতায়াত করে। অথচ পাকিস্থানে প্রকাশিত পুস্তক সাময়িকী বা সংবাদপত্র ভারতের মাটিতে প্রবেশ করলে, কিংবা ভারতে প্রকাশিত পুস্তক প্রভৃতি পাকিস্থানের নাগরিকদের দ্বারা অবাধে পঠিত হ'লে—ভারত বা পাকিস্থানের রাষ্ট্রীয় স্বার্থ কিভাবে ক্ষুণ্ণ হ'তে পারে—তা আমাদের মত সাধারণ মানুষের কাছে বোধগম্য নয়। কেউ কি এই প্রকার আশঙ্কা করেন যে ভারতে প্রকাশিত বই সংবাদপত্র পাঠ করলেই পাকিস্থানী নাগরিকবৃন্দ ভারতের অনুকূল রাষ্ট্রীয় মানসিকতায় দীক্ষিত হয়ে পড়বেন? অথবা পাকিস্থানের লেখক ও সাংবাদিকগণের রচনা পাঠ করলেই কোন ভারতীয় নাগরিকের মনে পাকিস্থানের প্রতি রাষ্ট্রীয় আনুগত্য জন্মাবে? ইংরেজ যেভাবে ভাষা, শিক্ষা ও সংস্কৃতির মাধ্যমে 'সাংস্কৃতিক বিজয়' অর্জন ক'রে ইংরেজ শাসনের প্রতি ভারতবাসীর মানসিক আনুকূল্য উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছিল, বর্তমান যুগে ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে সেরূপ কিছু ঘটবার কোন সম্ভাবনাই নাই। বর্তমানকালে পৃথিবীর প্রায় সব দেশের লোকই তীব্ররূপে জাতীয়তা-সচেতন। দ্বিতীয়ত ইংরাজের তাৎকালিক কালচারাল কনকোয়েস্টের ভিত্তিভূমি ছিল, ইংলণ্ড ও ভারতের মধ্যে আর্থিক ব্যবস্থার স্তরভেদ। অবক্ষয়জীর্ণ ভূস্বামীতান্ত্রিক সমাজের উপর প্রাগ্রসরমান পুঁজিবাদী সভ্যতার জয়। পাশ্চাত্য দেশের তৎকালীন প্রাগ্রসরমান পুঁজিবাদী ভাবধারা ভারতের অবক্ষয়জীর্ণ ফিউডাল মানসকে পরাজিত করেছিল। ইংরেজ উপলক্ষ মাত্র। তারপর দুটো শতাব্দী অতীত হ'য়েছে। সারা দুনিয়ার চিন্তাধারা ওলট-পালট হয়ে গিয়েছে। বর্তমান যুগে দুটি পাশাপাশি অবস্থিত রাষ্ট্রের পক্ষে একের দ্বারা অপরের 'সাংস্কৃতিক বিজয়' সম্ভব নয়।

একই ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্রোড়ে লালিত দুই দেশের মধ্যে এই প্রকার সাংস্কৃতিক ব্ল্যাক-আউট উভয় দেশের পক্ষেই ক্ষতিকর। দেশ বিভাগ উচিত কি অনুচিত হয়েছে—কার স্বার্থে হয়েছে—ইত্যাদি বিতর্কমূলক প্রশ্নের আলোচনার দিন আজ নাই। ভালো হোক, মন্দ হোক বহুজনের আকাঙ্ক্ষার ছাপ নিয়ে যা ঘটে গিয়েছে তাকে খোলা মনেই গ্রহণ করতে হবে। দু ভাইয়ের হাঁড়ি পৃথক হয়েছে। মাঝখানে দেয়াল তুলে একটা পারিবারিক বাসস্থানকে দুটো পৃথক বাড়ীতে পরিণত করা হয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে, তার পরে আমরা দুই বাড়ীর লোকেরা কি ভাবে চলবো? আরও স্পষ্ট করে বলতে হলে, কিভাবে চলা উভয় পরিবারের লোকের পক্ষেই হিতকর হবে? যদি পৃথক হয়েই পাশাপাশি বাস করাটা অবধারিত হয়, তা হলে দুই পরিবারের মধ্যে মুখ দেখাদেখি বন্ধ রাখলেই উভয়ের মঙ্গল হবে? না, পারস্পরিক মেলামেশা ও সহযোগিতার দ্বারা দুপক্ষই এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে সেটা বেশী মঙ্গলদায়ক হবে? পৃথক হওয়ার সময়ে হৃদ্যতাপূর্ণ মিলন চাঁড় খেয়েছিল, স্বাভাবিকভাবেই পারস্পরিক বিদ্বেষ অবিশ্বাস ও সন্দেহের আবহাওয়ায় দুপক্ষেরই মন কলুষিত হয়েছিল। কিন্তু সেই কলুষকে বিদূরিত করে পৃথক থেকেও পারস্পরিক সৌহার্দ্যের পটভূমি রচনা করতে না পারলে কোনপক্ষই কল্যাণ অর্জন করতে পারবো না—এটা উপলব্ধি করা দরকার। এবং এটা অনস্বীকার্য যে এই সৌহার্দ্যের সেতু রচনার ব্যাপারে দুই দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগাযোগকে ক্রমাগত বর্ধিত করা এক অপরিহার্য উপায়। পশ্চিম বাংলার মানুষের ধ্যান, ধারণা, মনের গতি, তাদের চিন্তা, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ব বাংলার ভাইবোনেরা জানুন। আমরাও অনুরূপভাবে তাঁদের ধ্যান-ধারণা প্রভৃতির সঙ্গে যথাযথরূপে পরিচিত হই। —এইভাবেই উভয়ের মনের কলুষ বিদূরিত হয়ে আমরা পরস্পর পরস্পরের নিকটবর্তী হতে পারব। যদি উভয়ের মধ্যে কোন ভুল বোঝাবুঝি থাকে, বা একের সম্পর্কে অপরে কোন ক্ষতিকর ধারণা পোষণ করে থাকে, তা হলেও খোলাখুলি বাদ-প্রতিবাদ ও জানাজানির মধ্য দিয়েই সেই অবাঞ্ছিত অবস্থার প্রতিকার হওয়া সম্ভব।

এই কারণেই দুই বাংলার মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ দৃঢ়তর ও ঘনিষ্ঠতর করে তোলা দুই পারের লোকেরই একটা প্রধান দায়িত্ব। আর সে দায়িত্ব উদযাপনের পক্ষে রাজনীতিকগণের দ্বারা সৃষ্ট এই সাংস্কৃতিক ব্ল্যাক-আউট হল প্রবলতর বাধা।

দেশের স্বাধীনতা লাভের পর প্রায় তেইশ বৎসর অতীত হয়েছে। ইতোমধ্যে উভয় বাংলায় নূতন তরুণ সমাজের উদ্ভব ঘটেছে। পূর্ব বাংলার তরুণ সম্প্রদায় বাংলা ভাষার সম্মানরক্ষা ও শ্রীবৃদ্ধি সাধনের জন্য শুধু যে নিষ্ঠার সঙ্গে সাধনা করে যাচ্ছেন তাই নয়, তাঁরা এই সাধনায় শাসকশক্তির হস্তে প্রচণ্ড লাঞ্ছনা বরণ করেছেন, এবং উজ্জ্বল আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। পূর্ব বাংলার মুক্তিকাম তরুণেরা 'তোমার বাংলা — আমার বাংলা' শ্লোগানের মাধ্যমে এক নূতন ভাবধারার পত্তন করেছেন। যে সাম্প্রদায়িকতার দূষিত বায়ু এককালে দেশের উভয় অংশকে আচ্ছন্ন করেছিল, উভয় বাংলার তরুণদের নূতন জাগৃতির ফলে সেই সাম্প্রদায়িকতা আজ প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছে। যুবজনের মনোভঙ্গীর এই গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের ফল সুদূর প্রসারী। গত তেইশ বছর ধরে পূর্ব বাংলার সাহিত্যকর্মিগণ বঙ্গ-ভারতীর ভাণ্ডারে যে সকল উজ্জ্বল সম্পদের সংযোজন করেছেন, আমরা এপারের পাঠকবৃন্দ তার কণামাত্র আস্বাদ গ্রহণের সুযোগ পাচ্ছি না। তেমনি গত ২৩ বৎসরকালের মধ্যে আমাদের এপারেও বাংলা সাহিত্যের সেবকবৃন্দ নব নব সৃষ্টির দ্বারা বঙ্গ-ভারতীর ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন। নূতন মনোভঙ্গী, নূতন শৈলী, আঙ্গিক ও নূতন নূতন রূপে এপারের সাহিত্যকর্মও প্রতিদিন সমৃদ্ধ হয়ে উঠছে। অথচ আমাদের ওপারের ভাইবোনদের কাছে আমাদের নব নব সৃষ্টির রস আমরা পরিবেশন করতে পারছি না। বঙ্গ-ভারতী যেন উভয়তই হোমইন্টানড। এ এক অসহনীয় অবস্থা। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে আমাদের দেশে যদিও প্রতিনিয়ত নানা আন্দোলনের ধুম-ধাড়াক্কা লেগেই আছে—তথাপি উভয় বাংলায় ঘনিষ্ঠ সাংস্কৃতিক যোগাযোগের পথে যে রাজনীতি-সৃষ্ট বাধা রয়েছে তার অপসারণের জন্য আমরা এযাবৎ কোন উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টায় ব্রতী হই নাই।

কিছুদিন পূর্বে আমাদের পরমশ্রদ্ধেয় মহারাজ যখন এপারে এসেছিলেন, তখন আমি তাঁর কাছে এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করি। তিনি শুধু যে সুবিখ্যাত বিপ্লবী ছিলেন তাই নয়, আদর্শনিষ্ঠা ও চরিত্রগুণে তিনি উভয় বাংলার প্রগতিশীল জনমণ্ডলীর কাছে তুল্যভাবে সমাদৃত ছিলেন। সেই জন্য আমি তাঁর এককালীন শিষ্য হিসাবে তাঁকে অনুরোধ করি যে দুই বাংলার মধ্যকার এই অবাঞ্ছিত সাংস্কৃতিক ব্ল্যাক-আউটের অপসারণের জন্য উভয়ত জনমত সৃষ্টির ব্যাপারে তিনি যেন সচেষ্ট হন। তিনি আমার প্রস্তাব অনুমোদন করে বলেছিলেন—'তুমি খুব সঙ্গত প্রস্তাব করেছ কিন্তু এদেশে বা ওদেশে কোথাও শাসকগোষ্ঠীর কাছ থেকে আপাতত এ বিষয়ে কোন রেসপন্স পাব বলে আমার মনে হয় না।' আমি বলেছিলাম, 'শাসকগোষ্ঠীর তরফ থেকে কোন রেসপন্স যদি আপাতত না-ও পাওয়া যায় তবু উভয় দেশের সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষেরা এই বিষয়ে আন্দোলন সৃষ্টি করলে আজ না হোক কালে হয়ত সুফল পাওয়া যাবে। এবং এই প্রকার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আমরা উভয় দেশের সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষেরা পরস্পরের সান্নিধ্য অর্জন করতে পারব।' তিনি বলেছিলেন যে, এ বিষয়ে তিনি উদ্যোগী হবেন। কিন্তু তারপর কয়েকদিনের মধ্যেই তাঁর পরপারের ডাক এসে গেল। দেশের জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিদের কাছে আমাদের দাবী, তাঁরা এই অবশ্য প্রয়োজনীয় কাজে অগ্রণী হোন।

আমরা বিভিন্ন সংস্কৃতি সমিতি করেছিলাম। কিন্তু তেইশ বছরের মধ্যেও একটা ভারত-পাকিস্থান সংস্কৃতি সমিতি কিংবা অন্ততঃপক্ষে দুই বাংলার সাংস্কৃতিক যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যম হিসাবে যে কোন একটি কার্যকর সংস্থা স্থাপনের দিকে আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হয় নাই। এটা পরম পরিতাপের বিষয়। নানা দেশে সাংস্কৃতিক মিশন পাঠানো হচ্ছে। কিন্তু উভয় বাংলার সাংস্কৃতিক ভাববিনিময়ের ব্যবস্থা হিসাবে সাংস্কৃতিক মিশন প্রেরণ বা আমন্ত্রণের দিকেও এ যাবৎ কোন উল্লেখযোগ্য কাজ হয় নাই। আমাদের মনে হয়, সরকারী এবং বে-সরকারী পর্যায়েও প্রতি বৎসর উভয় বাংলার মধ্যে সাংস্কৃতিক মিশন বিনিময়ের ব্যবস্থা হওয়া উচিত।

দু ভাইয়ের হাঁড়ি পৃথক হয়েছে। সেটা মেনে নিয়েই আসুন আমরা দুই পরিবারের জীবনধারাকে সহজ স্বাভাবিক ও সুন্দর করে তুলি। এ বাড়ীতে রাঁধা অন্নব্যঞ্জনের ভাগ ওবাড়ীতে আসুক, ওবাড়ীর এবাড়ীর লোকের রসনাতৃপ্তি ঘটাক। উঠান ভাগ হয়েছে বলে উৎসবের কোলাকুলিটাও বন্ধ হবে?

ব্রণ
দূর করবার জন্য
লিচেনসা

● ১০৮ টি দেশে ডাক্তাররা প্রেস্ক্রিপশন করেছেন।
● যে কোন শহরে ওষুধের দোকানেই পাওয়া যায়।

মুখের মেলা

আঁধারের প্রাণীরা

চারটে আন্ডা বেচে এক টাকা দিয়ে এক কেজি আটা কিনে এনে জল দিয়ে গুলে নিয়ে খোলাচি পিঠে করতে বসেছিল শের আলীর বউ লতিমন বিবি। প্রায় সামত্ত হয়ে-ওঠা মেয়েটা পাড়ার পাঁচজনের বাঁশবাগান থেকে বাঁশের খোল কুড়িয়ে এনে রেখেছিল ঝাঁকা ভর্তি করে— তাই দিয়ে উনুনে জ্বাল দিচ্ছিল সে। কালো কোকিলের মতন মেয়ে—'ভাবোন' করে কলকাতার মেয়েদের পানা কোঁচা দিয়ে কাপড় পরেছে। পেট-বার-করা বগলী একটা 'বেলাউজ' গায়ে দিয়েছে, কপালে এঁকেছে একটা শুকতারা, মুখে ঘষেছে মায়ের গম বেচে কিনে-আনা হিমানী-পাউডার। মেয়েটার নাম তোতামন। তোতামন এত সাজগোজ করলেও ঠোঁট দুটো শুকিয়ে তার কুল-আঁটি। কাল সকাল থেকে তো কারো কিছু পেটে পড়ে নি। কাল সকালে ড্যাড্ডোস ভাতে দুটি ভাত খেয়ে লতিমন পাঁচ কেজি চালের বুচকি নিয়ে শহরে গিয়েছিল। গ্রামের হাট থেকে একটু কম দামে চাল কিনে এনে শহরে বেশি দামে বিক্রি করে সেই টাকায় খিদিরপুরের ডক এলাকা থেকে চোরাই গম কিনে এনে গাঁয়ের মানুষের কাছে বেশি দামে বিক্রি করে সে। সঙ্গে যায় তার ছোট জা নুরখাতুনও। নুরখাতুন ধড়িবাজ মেয়ে, মুখের বচন শুনলে কাঁচা কাঠে আগুন ধরে যায়। তার চোখের চাউনি দেখলে আর বাসের কন্ডাকটররা ভাড়া চায় না। লাস্ট বাসে ফেরার সময় যখন সমস্ত যাত্রীরা উপশহরটাতে নেমে যায় গ্রামের অন্ধকার নির্জন পথে, কন্ডাকটররা বড্ড জ্বালাতন করে গাড়ির সব আলো নিভিয়ে দিয়ে মায় হেড লাইটটা জেলে রেখে। ডালকুত্তার মতন যেন ছিঁড়ে খায় মদ্দগুলো মন্দমানুষগুলো। ভাড়ার ক-আনা পয়সার জন্যে শুধু নয়, চাল-গমটা তুলে ছাদে—কিম্বা সীটের তলায় বক্সর ভেতরে।

ছটা ছেলে-মেয়ে যেন কাকের মতন হা-হা করে, মা'র পাশে বসে। কাল থেকে খায় নি সব। কড়া থেকে তুলতে না তুলতে 'আমাকে দে মা—আমাকে দে মা, উ-শালা মোলো তো ঘোষেদের নারকোল চুরি করে খেয়েছ্যালো—অকে দিবি কেন বেশি? তোরা তো রহমানদের চার কলসী পানি বয়ে এনে দিয়ে চাট্টি খুদ-চচ্চাড় খেয়ে এয়েছ্যালো—মোরা কচি ছেলে কাল থিনে শুকে আছি—খালি আঁজলা -আঁজলা করে পানি খেইছি—দে মা আর একখানা পিঠে, তোর পায়ে ধরি।'

'খা, তোরাই খা, আমার আর প্যাটে কিছু পড়ার দরকার নেই!' ঠুকে সব বসিয়ে দেয় লতিমন। পরণে তার একখানা মাত্র সায়া। গায়ে একখানা ছেঁড়া মশারীর টুকরো ফেলে বুকটা নামমাত্র আড়াল করা।

ছোট জা শঙ্ক-কাটা করাত চালানো গলায় তার কুঁড়ের দাওয়া থেকে বলে, 'অ্যা! ছোঁড়াগুলো যেন ভাগাড়ের শকুনি—গরু পড়েছে যেন। একটু আর সবুর সয়নে। মানুষটা কাল থেকে পুলুস গুহোর ব্যাটাদের খপ্পড়ে পড়ে তাদের কাছে রাত গুজরান করে এলো—একটু থাক—জিরোক—না, খেঁকামোক!'

মোসো তার ছোট চাচীকে বললে, 'তুই শালী চুপমার! তুই বকিল দিস?'

'ছোঁড়ার মুখ দ্যাখ! মুই তোর শালী?

'হাঁ, তুই শালী, তোর মা শালী, তোর বাপ শালী!'

হা-হা—হি-হি করে ছোড়-চাচী হাসতে লাগল।

শের আলী খোঁড়া পা-খানাকে আদর করে কোলে তুলে নিয়ে সন্ধ্যার বাঁশবন-ঢাকা অন্ধকারে ভূঁইকুড়ের দাওয়ার খুঁটি

হেলান দিয়ে বসে রেডিওর গান শুনছিল আর ওদের রকম দেখছিল। তার কোনো কিছু বলার ছিল না। বউ তাকে 'বাপ' বলেছে তিন-তিনবার। কাজেই নাকি তালাক হয়ে গেছে। সে আলাদা থাকে। আলাদা শোয়। কিছু চাল-ডাল জোগাড় করে আনলে মেয়েটা রান্না করে দিত আগে—লতিমনের তাও বারণ হয়ে গেছে। বঁটি দিয়ে কুচোবে নাকি তাহলে মেয়েকে।

শের আলী কাঁচা বয়সেই চটকলের সারভিস ছুঁড়ে দিয়ে দিন-কতক খুব খেলে-মেলে বউ ছেলে-মেয়েকে নিয়ে ফুর্তি করে। মাছ গোস্ত দুবেলা ভাত রমারম চলল। দোকানের দেনা শোধ হল। মদ আর তাড়ি গিলে এসে মারামারি করে খুন-জখম হল পাশের বাড়ির ডাকাত চেহারার লোক সাহাদত আলীর হাতে। সাহাদত ছুটে এসে কপালে গাছ-কাটারী মারলে শের আলীর। ছুটে গিয়ে পুকুরে না পড়ে গেলে জবাই করে দিত। অথচ সামান্য ব্যাপার নিয়ে বচসা বাধল। ছোট বউ নাকি ঘোষ-দের কাটা ধানের গাই থেকে এক চুবড়ি ধানের শীষ কেটে এনেছিল। ঘোষেরা সাহাদতদের ক্ষেতের ধান দেখতে বসে গেছে। তাদের বাস্তুর নিচেই জমি। ধান চুরির কথা বলতেই নুরখাতুন গালাগালি শুরু করলে। 'কুন আঁটকুড়ির বেটি বলে র‍্যা—মুই ঘোষেদের ধান চুরি করিচি! ঘোষেরা কি তাদের ভাতার হয়, না 'নাঙ' (নাগর) হয়?' তারপর দু বাড়ির মেয়েতে মেয়েতে প্রচণ্ড গালাগালি—পুরুষেরাও লেগে গেল। কুৎসিত চিৎকার, অশ্লীল কলহ।

শের আলী তাড়ি গিলে ঘরে ফিরে বললে, 'হাঁরা শালা, সাহাদত, তুই বেটা সাধু লোক হবি তবে তোর মাগকে মির্জাপুরের মেলা থেকে একসঙ্গে 'ফটক' (ফটো) তুলে ছেলি কেন রে শালা? লজ্জা করে না? মোর ভাই তোর বাপ হয় শালা—নইলে না তোকে গাছ-কাটারী দিয়ে কুচোবো আজ।'

কপড়ার পরিণতি খুন-খারাবী। হাস-পাতাল থেকে ফিরে মাত্র কোর্টে দুই মামলা হবার পরই হঠাৎ গাঁয়ের মোড়লের পোষা গুণ্ডা সাহাদত একশো টাকা দিয়ে আপোষ-মীমাংসা করে নিলে। কারণ মোড়লকে এর মধ্যে জড়াবার জন্যে মস্ত এক দালাল ঢুকেছিল।

সেই টাকায় ঘরের খোলা কিনলে শের আলী। সারভিসের টাকা ফুরোতে আবার ঘরের খোলা বেচে দিলে সে। ঘরের চাল ফাঁকা, বর্ষাকালে ভিজে-ভিজে হঠাৎ এক দিন নিজ-কাজ পাবার লোভে ইউনিয়নের বিপক্ষে কোম্পানীর দালালদের প্ররোচনায় পড়ে মার খেয়ে সে ঠ্যাং ভেঙে এসে পড়ল একেবারে 'হায় বাবা' হয়ে লতিমনের কোলে। ঘর ফাঁকা, দিয়ালে না বাঘরোলে কোলের তিন মাসের ছেলেটাকে রাত্রে তুলে নিয়ে পালাল। ঘর ফাঁকা, পেটেও দানাপানি নেই। কতদিন আর পেটের জ্বালা সহ্য হয়? শের আলীর ছোট ভাই কদম আলী গাছ-ছাড়ানো কাজ করে, নারকোল পাড়ে—তারও কাজ নেই সব দিন। এক রাত্রে বাবু-জান কলালদের গাছ থেকে নারকোল চুরি করার সময় ধরা পড়ে কদম বেদম মার খেয়ে জেল-হাজতে চলে গেল। নুর-খাতুনেরও কোলে তিন-তিনটে ছানাপোনা। দু জায়ে যুক্তি করলে চাল বেচতে যাবে শহরে। নইলে বাল-বাচ্চাগুলো মারা যাবে ভুখে। হাঁস-মুরগী আর বকরী খাড়ী বেচে টাকা নিয়ে চাল কিনে কর্ডন পুলিশের চোখ এড়িয়ে তারা শহরে যেতে-আসতে লাগল। তাদের চলন-বলন পালটালো। পাড়ার মেয়েরা হাঁ করে তাদের কথা শোনে। শহরে নাকি কেউ কারু ধার ধারে না। মেয়েরা যাকে ইচ্ছে নিয়ে হাত ধরে ঘুরে বেড়ায়! অন্ধকার বলে কিছু নেই সেখানে।

তারা মাঝে-মাঝে আপেল বেদানা কিনে আনে। মাংস কিনে আনে। নুর-খাতুনের গয়না হল। তার স্বামী জেল থেকে ফিরে এসে কিছুই আর করে না, শুধু ছেলেগুলোকে কাঁধে-কাঁখে করে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। তাদের সারাদিন দেখা-শোনা করে। সকাল বেলাতেই গরম ভাত চাট্টি খেয়ে নুরখাতুন আর তার বড়জা লতিমন বিবি ভাল রঙদার শাড়ি-'ব্লাউজ' পরে, মুখে পাউডার হিমানী ঘষে, স্যাণ্ডেল পায়ে দিয়ে চালের খুচকি নিয়ে চলে যায়।

তারা পেশাদার হয়ে যাবার পর আর চাল-গমের পুঁজিও দরকার হয় না নাকি।

হঠাৎ সংবাদ ছড়ায় পাড়ার মানুষদের কাছে, লতিমন বিবি নাকি শহরের বাস স্টপের কাছে একটা মনিব্যাগ কুড়িয়ে পেয়ে-ছিল। তাতে একশো টাকা ছিল। সেই টাকা দিয়ে লতিমন বিবি একটা লোকাল ট্রান-জিসটর সেট রেডিও কিনে এনেছে। নুর-খাতুনের চেহারা ভাল, পাতলা সাধুর মতন দেখতে। তার কাছেই নাকি চাল-গমের খদ্দের লাগে বেশি। তাই ঘোষেদের দোকানে তার সোনার হার, পেটি, দুল বন্ধক যায় মাঝে-মধ্যে।

নুরখাতুন বলে, 'রাজারও হাতটানা পড়লে হাতী বন্ধক দেয়!'

গতকাল আর নুরখাতুন যায় নি তত জার সঙ্গে। তার শরীর খারাপ। পেটে ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছে। আরো কি সব নাকি ভয়ানক রোগ দেখা দিয়েছে। সুঁই ফুঁড়ে গেছেন ডাক্তার মানিক ভদ্র। সাবধান করে গেছেন যেন নুরখাতুনের ছোঁওয়া জিনিস কেউ ব্যবহার না করে—কেউ যেন এঁটো-কাটা না খায়।

লতিমন নুরখাতুনের গোপন ব্যাধির কথা শুনে মনে-মনে শঙ্কিত হয়। দু-তিন বছরের কুৎসিত অন্ধকারের চিত্রগুলো তার মনের মধ্যে ডিগবাজি খেয়ে যায়। দীর্ঘ-শ্বাস ফেলে। কিন্তু পেট যে মহাকাল, সে যে কিছুই শোনে না।

উনুন নিভিয়ে এসে লম্ফের তেল শুকিয়ে গেছে বলে অন্ধকারে বসে থাকে খাওয়া-দাওয়া সেরে। জোনাকিরা আলোর জাল বোনে বাঁশবনের মধ্যে। কদম গাছটার ডালে অসংখ্য ফুল ফুটেছে—তার গন্ধে ম-ম করে চারদিক। ডাহুক ডাকছে ডোবা-টার ওপারের বন থেকে। ছেলেরা কলহ করছে। বাদাবাদি করে কিনে আনা তাদের রেডিওটাতে কদম জোর দিয়ে বিবিধ ভারতীর ক্যোহা লক্কড় বিক্রির গান আর বিজ্ঞাপন বাজাতে থাকলে লতিমন নিজের রেডিওটা বন্ধ করে দেয়।

মেয়ে হোতামন মায়ের গায়ের ঘামাচি মারতে- মারতে শুধোয়, 'কাল কোথা রাত ছেলি হা মা?'

'গুহোর বেটা এক ব্যাটা ধরে তার 'কটোরে' (কোয়ার্টারে) নিয়ে গেল। মোর চালকটা নিয়ে রান্না করতে বললে। খাসীর গোস্ত আনলে মোকে ঘরে চাবি দিয়ে রেখে যেয়ে। লোকটার বুকের পাহাড়-পানা গতর। ইয়া বড়-বড় কাটার পানা গোঁফ!'

বলে খিল-খিল করে হাসতে থাকে লতিমন। লতিমনের খাটো পাতলা চেহারা। সাত-আটটা ছেলের মা তাকে দেখলে কেউই বুঝতে পারে না। যৌবন এখনো অটুট। মেয়েও মায়ের কথায় হাসে। একটা অন্ধকার কালো সড়ক তার চোখে পড়ে যেন। মা তাহলে টাকা বাগিয়ে এনেছে লোকটার কাছ থেকে। তাকে গাঁয়ের মোড়ল টাকা দেয় দুটো একটা করে। আর লোকটা তাকে...

লতিমন বলে, 'লোকটা হিন্দুস্থানী। বললে দেশ-গাঁয়ে বউ-ছেলে জমি-জিরাত আছে। বলে শহরে কষ্ট করে জীবনটা

ঘিরধাই গেল। তার তক্তাপোষে কি ছার-পোকা রে বাবা। সারা রাত কি জ্বালালে!'

শের আলী বলে উঠল, 'ভাল! ভাল। 'নোকির' (পুলোর) কাজ হচ্ছে!'

'তুই চুপ কর। তোর কথার কে ধার ধারে র‍্যা শোলাম! মুই কি অ্যাহন তোর কোলের খাল আছি যে শাসাবি? মোকে তুই খাওয়াস, না 'পেন্দাস' (পিন্ধন) যে বাঁড়িয়া-বাঁড়িয়া বাত মারবি, এইসা দিন গুজার গিয়া! আমাকে কি তুই 'তাম্বাক' (তামাক) দিবি, তোকে মুই তামাক দিইচি 'বাপ' বলে—সাক্ষী রেখে। একেবারে তিন তামাক—তুই আর এখন বাপ 'লগপাড়ো'র—বাপের শালা চুপ করে থাক। তামুক টান ছুড়ুক-ছুড়ুক করে—দাড়ো-হাবড়ার মতন!'

'বেড়া মাগী তবে আমার ভিটে থেকে? এটা কি তোর বাপকেলে ভিটে!'

'বাপকেলে নয়? তুই তো মোর বাপ. তোর মারে বাপ্পু!' বলেই হি-হি করে হাসতে থাকলে নূরখাতুনও লতিফনের হাসিতে যোগ দেয়।

'বাপ বলা তোর আজ ঘোচাবো রাতের বেলা, দাঁড়া!'

'আমিন না থাকে, তোর পায়ের লাথি মেরে তোর 'চাবাজি' (গাঁজের পার্টি) দেখিয়ে দোব তাহলে মুই।'

'আচ্ছা!' শের আলী উঠে খোঁড়াতে-খোঁড়াতে অন্ধকারে নেমে গেল। আস্ত অন্ধকারের প্রাণী যেন সে একটা।

খানিকটা পরে কি যেন হাতে করে এনে বসে-বসে খেতে লাগল অন্ধকারেই: চাবুম-চাবুম শব্দ করে! পাকা কলার গন্ধ বার হচ্ছে।

ছেলেগুলো সচকিত হয়ে ওঠে। মেজো মায়ের কানে-কানে বলে, 'আলা, পাকা কেলা খাচ্ছে—একেবারে এক কাঁদি এনেছে। চোর হয়ে মোল্লাদের বাগান থেকে কাঁচা কেটে এনে খড়-কোপের মধ্যে লুকিয়ে রেখে-ছ্যালো। আজ পাকতে এসে আমাদের লুকিয়ে-লুকিয়ে খাচ্ছে। প্যাটে শালার 'পান্দুল' হবে।'

মেজোটা কাছে এসে তার পেট কাপড়ের ভেতর থেকে একটা পিঠে বার করে নিয়ে বাপের হাতে গুঁজে দিলে শের আলী খুশী হয়। এক ছড়া কলা পট করে ছিঁড়ে নিয়ে তার হাতে দেয়।

সে কলাটা এনে মাকে দেখায়। মা বলে, 'ফেলে দে। অত কলা খেলে প্যাটে 'গাইকর' ব্যামো হবে। তিন-চার দিন প্যাটে অত কিছু পড়ে নে—মুরোদী বিবির কাছ থেকে 'আসাম' (ফেন) চেয়ে খেয়ে এসেছে—আর প্যাট জ্বলে যাক!'

আরো দু ছড়া কলা অন্ধকারে ছুঁড়ে দেয় শের আলী ওদের গায়ের ওপরে। ছেলেরা কাড়াকাড়ি করে খেয়ে নেয় কাঁত-কোঁত করে।

তারপর সকলে শুয়ে পড়ে ভাঙা খেজুর পাতার চাটাই মেলে—ময়লা কাঁথা বিছিয়ে।

মশার শের আলী সারা রাত ঘুমোতে পারে না। বসে-বসে গা চুলকোয়।

মশারীর ছেঁড়া জায়গাগুলো বাটা কাটি গুঁজে সেলাই করে তার মধ্যে শুয়ে ওরা সবাই অকাতরে ঘুমুচ্ছে।

শের আলী রোজ ভাবে, রেডিওটা নিয়ে পালাবে সে—বেচে দেবে কাউকে পঁচিশ টাকা দিয়ে। পঁচিশ দিন কোথাও কাটাবে—দিব্যি হো পঁচিশ দিন একটু খেয়ে-দেয়ে বাঁচা যাবে!

কিন্তু লতিফন গানটাকে মাথার কাছে নিয়ে শুয়ে আছে।

এক ছড়া কলা রেখেছে শের আলী লতিফনের জন্যে। অনেক লোভ সামলে, মনে একটা লোভ আছে আজ তাকে পাবার।

সবাই ঘুমোচ্ছে এখন অকাতরে।

ছোট বউ শুধু জাগছে মাঝে মধ্যে।

যদি লতিফনেরও ঐ রকম হয়? কাউকে বলে হাসপাতালে কাজ করি, কাউকে বলে চাল বেচতে যাই—আসলে ওরা দুজনে বেহালায় এক কামরা ঠিক ঘর ভাড়া নিয়ে রেখেছে। ভাড়া ঠিক নয়। কমিশন ব্যবস্থা আছে মাসির সঙ্গে। খদ্দের আসলেই তার এক টাকা। আর খদ্দেরের কাছ থেকে বখশিস আদায় করে নেয় কাকুতি-মিনতি করে। মদ খাইয়ে বেশি টাকা নেয়। কুলী-কাবাড়েরা নাকি টাকা দিতে না পেরে মার খেয়ে অপমান হয়ে চলে যায় প্রায়ই। সারা দিন ওরা শিকারের খোঁজে এখানে সেখানে বেড়ায়। ফেরার মুখে চাল গম মাছ আনাজ কিনে আনে। লতিফনের কোমরের গেঁজেতে বাঁধা আছে অনেক টাকা। কুড়ি-পঁচিশ টাকা পর্যন্ত।

আজ কী হয় হবে—লতিফনের কোমর থেকে হয় টাকা খুলে নেবে—নয়তো রেডিওটা। তারপর সে চম্পট কারখানার দিকে। খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে হাঁপাতে-হাঁপাতে কোনোক্রমে দৌড়তে হবে অন্ধকারে। ধরতে পারলে বেদম মারবে ওরা। লতিফন বুকে বসে গলা টিপে ধরবে আর মোটোটা শুধু মুখের ওপরে খুঁচি চালাবে। একবার একটা মুরগী চুরি করে নিয়ে খেয়ে চাট করে পাশের গাঁয়ে থেকে ডাকি দেয়ে আসতেই তাকে ধরে অমনি করে মেরে দাঁত ভেঙে দিতে সে রাগে-ক্ষোভে খুন হতে কেস করতে গেল পঞ্চায়েতের প্রধানের কাছে।

পঞ্চায়েতের বাবুরা তার কথা শুনে সবাই হাসতে লাগল। কেস নিলে না। বললে, বউ দাঁত ভেঙে দিলে কেস হয় না শের আলী। মাথা কেটে দিলে কেস করো সেও—বিচার করে দোব!'

শালাদের কথা শোন! মানুষ না বেজন্ম সব।

শের আলী গুঁড়ি মেরে গুঁড়ি মেরে লতি-ফনের বিছানার মধ্যে এগুতে শুরু করলে। লতিফনের কোমরের গেঁজেতে হাত দিতেই সে জেগে উঠে খপ করে হাতটা চেপে ধরলে। বললে, 'কে তুই!'

'মুই রে, তোর শের আলী! এক ছড়া পাকা কলা তোর জন্যে রেখেছি—খাবি? জেগাস নি, আল্লার কসম, তোর পায়ে ধরি!'

কলাটা নিয়ে মাথার কাছে রাখলে লতিফন। পাশ ফিরে শুয়ে বললে, চলে যাও, কেউ জানলে 'গোনা'র (পাপের) কাজ হবে।'

'কে আর দেখছেরে এখন! পায়ে নাকি বাবা, তোর পা টিপে দোব!'

লতিফন আপত্তি করলে না। এই দুর্বল অসহায় পাগল-ছাগল লোকটাকে তিরস্কার করতে এখন মন চাইল না। তার যেন কেমন এক রকম দয়া হতে লাগল আজ। পেটের দায়ওটা ছেলেটার মতন যেন অনুনয় করতে এসেছে।

শের আলী লতিফনের বুকে মুখ গুঁজে-গুঁজে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

ছোট বউ নূরখাতুন অসহায় কল্পনায় তখন কারবালার মাঠ পেরিয়ে শের আলির পিঠের ওপরে যেন আসমানের হাত বুলোতে থাকে লতিফন।

তক্ষক ডাকতে থাকে গভীরে—কহুহুহু — তোয়াক তোয়াক — তোয়াক তোয়াক!

—আবদুল জব্বার

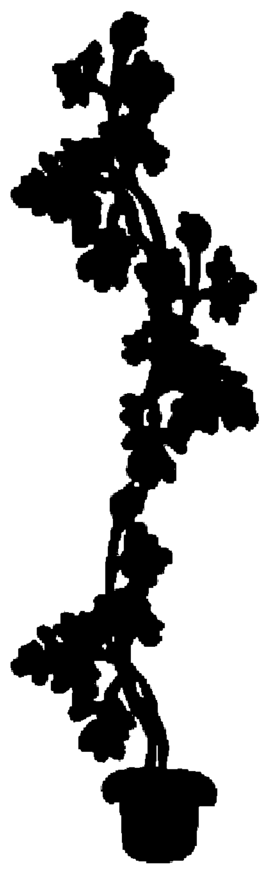

নারায়ন গঙ্গোপাধ্যায় স্মরণে

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে একটি স্মরণীয় নাম। যে স্বল্প কিছু মানুষের স্বাক্ষর তাঁদের প্রতিভায় মহিমায় স্বাক্ষর হয়ে ওঠে, নারায়ণ তাঁদেরই একজন। নারায়ণ অকালে মাত্র তিপান্ন বৎসর বয়সে নিতান্ত আকস্মিকভাবে আমাদের মধ্য থেকে চলে গেলেন। বাংলার সাহিত্য-ক্ষেত্রে একটি হাহাকার যেন সামুদ্রিক ঝড়ের মত উঠে সমস্ত বঙ্গভূমিকে অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ এবং পূর্ব পাকিস্তানকে মথিত করে দিয়ে চলে গেল।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় আর নেই। এ এক মর্মান্তিক দুঃসংবাদ। সমগ্র বঙ্গে—পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিমবঙ্গ চট্টলের প্রান্তভূমি থেকে বালেশ্বরের সমুদ্রতট পর্যন্ত—উত্তরবঙ্গ থেকে আসাম পর্যন্ত নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বাংলা ভাষাভাষীদের পরম প্রিয়জন ছিলেন। তিপান্ন বছর বয়সেই জনগণ মানসের এক অসাধারণ প্রীতির অধিকার অর্জন করেছিলেন।

বাংলা ছোটগল্পে, উপন্যাসে, সমালোচনা সাহিত্যে, রস রচনায়, রম্য রচনায় সার্বভৌমিকতা সাহিত্যে বলতে গেলে সাহিত্য-ক্ষেত্রের প্রায় সকল বিভাগেই নিপুণ দক্ষতা ও ঐকান্তিক নিষ্ঠার সঙ্গে বিচরণ করেছেন। জয়-পরাজয়ের কোন প্রশ্ন এখানে অবান্তর হলেও সকল বিজয় গৌরবে তিনি স্বকীয় মর্যাদায় রথ-চালনা করেছেন। যাঁরা সব্যসাচী তিনি তাঁদেরই অন্যতম জন। বিনয় তিনি চিরকাল; কিন্তু, মর্যাদার ক্ষেত্রে, সম্পদ বা পদাধিকারে নয়, স্বকীয় গুণ ও তপস্যা বলে একটি উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। নাটকও তিনি লিখেছেন—রামমোহন তাঁর সুন্দর এবং সার্থক নাটক। এখানেও তিনি পিছনের মানুষ নন।

আবির্ভাব তাঁর ১৯৩৮।৩৯ সালে। ছোটগল্প 'নিশীথের মায়া'ই বোধ করি প্রথম গল্প, বের হয়েছিল দেশ পত্রিকায়। এই সময়েই তিনি বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ থেকে বি-এ পাশ করে কলকাতায় এসে বিশ্ববিদ্যালয়ে এম-এতে ভর্তি হন। সে কালের শনিবারের চিঠি বর্তমানে প্রতাপপ্রতিপত্তিতে সাহিত্য-সাধনার সুমহৎ তপস্যায় সে এক আশ্চর্য খ্যাতিতে অধিষ্ঠিত। শনিবারের চিঠির আক্রমণাত্মক সমালোচনার ধারার সঙ্গে তার সৃষ্টিমূলক সাহিত্য বাংলা সাহিত্যে একটি অধ্যায় সৃষ্টি করেছে। সম্পাদক সজনীকান্ত সাহিত্যে এক বিক্রমশালী পুরুষ। আচার্য মোহিতলালও তখন সজনীকান্তের অগ্রজ বা অভিভাবকের মত তাঁর সঙ্গে যুক্ত। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও সংশ্লিষ্ট ছিলেন। বনফুল বিভূতি মুখোপাধ্যায় প্রমথনাথ বিশী পরিমল গোস্বামী স্বর্গত ডঃ সুশীল দে বর্তমান প্রবন্ধের লেখক—সকলেই শনিবারের চিঠির সঙ্গে কোন না কোন ভাবে যুক্ত। এই শনিবারের চিঠিতেও আশ্চর্য স্নেহ সমাদরের সঙ্গে গৃহীত হয়েছিলেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। সাহিত্যকে যদি মণি মাণিক্য হীরা পান্নার সঙ্গে তুলনা করা যায় তাহলে সজনীকান্তকে বলব অভ্রান্ত জহুরী। নারায়ণকে এক-দৃষ্টিতেই চিনেছিলেন এবং তাঁর আসরে স্থান দিয়েছিলেন। এখানে বাংলা সাহিত্যে অন্যতম পণ্ডিত সমালোচক ও কবি জগদীশ ভট্টাচার্যের নাম করতে হবে। নারানের সঙ্গে আমাদের বয়সের পার্থক্যের সঙ্কোচ তিনিই কমিয়েছিলেন। নারায়ণ সসম্ভ্রমে আসন গ্রহণ করেছিল কিন্তু শনিবারের চিঠির মারাত্মক সমালোচনা ধারার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে নি। সে-কথা থাক। এখানে আমি আমার সঙ্গে নারানের সম্পর্ক গড়ে ওঠার কথা বলি। না, সেও আপাতত থাক, তার আগে বলে নি যে, সেটা সেই ১৯৪০।৪১ সাল আর আজ হল ১৯৭০ সাল, পরিমাপে তিরিশ বৎসর দীর্ঘ একটি কাল—এই দীর্ঘকাল নারায়ণ ক্রমান্বয়ে এক ঊর্ধ্বগ গতিতে গতিশীল ও নিরন্তর চলমান। আজ ১৯৭০ সালে নারায়ণের তিরোধান দিবসে পিছনের দিকে তাকিয়ে দেখছি এই তিরিশ বৎসর কালে নারায়ণে গতিপথের রেখা ঊর্ধ্বমুখী হয়েই চলেছিল, কোথাও নেমেছে এমন একটি ঢাল বা খাদ তো চোখে পড়ছে না। নারায়ণ জীবিত থাকলে তার সাহিত্য কীর্তির একটি শৃঙ্গে উপনীত হতে পারলে সে শৃঙ্গে সূর্যোদয় সূর্যাস্তের ছটা পড়ে নূতন কোন কিরীট সৃষ্টি করত তাতে সন্দেহ নেই।

একদিকে তিরিশ বৎসর উপরের দিকেই উঠেছে যার পথ এবং যার যাত্রা সমাপ্ত হবার আগেই পথিমধ্যে যাকে গৌরবের মুকুট অঙ্গের বর্ম দিয়ে চির-বিশ্রাম গ্রহণ করতে হল তার তুলনা মহাভারতের সব্যসাচীর মহাপ্রস্থানের পথে পতনের সঙ্গে তুলনা করলে কিছু অতিশয় প্রকাশ করা হবে এটা সত্য—কিন্তু তা হোক তবুও এই তুলনাটিই বারবার মনে আসছে। এবং তাই আমি ব্যবহার করছি। পার্থক্য অনেকই আছে। আবার সাদৃশ্যও আছে। পার্থক্যের একটা কথা বেশী করে মনে হচ্ছে লেখার সময়। মৌষল পর্বে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের অভাবে গাণ্ডীব তুলতে অক্ষম হয়ে লাঞ্ছিত হয়েছিলেন; কেননা ভেঙে পড়েছিলেন, নারায়ণ তা পড়েন নি। তা ছাড়া পার্থক্য তো অনেক, নারায়ণ দেবতাশ্রিত জন নন, নারায়ণ রাজপুত্র নন, নারায়ণ অনেক কিছু নন অর্জুনের মত। তা না হন। কিন্তু শৃঙ্গে নারায়ণের তুলনা অনায়াসে মহাভারতের চিরনবীন নায়কটির সঙ্গে দিতে পারি। বিংশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন; বাঙালী ঘরের সরকারী চাকুরে পিতার সন্তান তথাপি তিনি বিংশ শতাব্দীর ভারতজীবনের স্বাধীনতার আবেগ এবং কামনাকে বুকে করে নিজের জীবন তরীকে ভাসিয়েছিলেন; "কন্যরের কাল হল শেষ" বলে যে আদেশ ধ্বনিত হয়েছিল সে আদেশ তিনি শুনেছিলেন। যখন সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করেন তখন সমগ্র পৃথিবীতেই মানুষের মুক্তিকামী জীবনধারা আপনাপন দেশের গণ্ডী অতিক্রম করে সমগ্র বিশ্বের এক প্রান্তরের সমতলে নেমে এসে মিলিত হয়ে বিশ্বমানবের মুক্তি-গঙ্গায় পরিণত হতে চলেছিল। যার সম্মুখে ছিল সাগর সঙ্গমের মত এক মহাতীর্থের স্বপ্ন বন্দনে স্বপ্ন পরিকল্পনা বন্দনে পরিকল্পনা। নারায়ণের জীবনের ভাবভাবনার পালে এই বাতাসের টান এসে লেগেছিল এবং সেই দিকেই মুখ ফিরিয়েছিল। ১৯১৮ সালের নভেম্বর থেকে ১৯৪০-৪১ সাল পর্যন্ত ভারতের সকল মুক্তিকামী সাধকই এই সর্বমানব মুক্তির আদর্শকে—ভারতবর্ষের পরাধীনতা মোচনের আদর্শ ও তপস্যার সঙ্গে এক করে নিতেই চেয়েছিলেন। তরুণ লেখক নারায়ণ সারস্বত মন্দির প্রাঙ্গণে প্রবেশ মুখে সেই বাতাসে নিশ্বাস নিয়ে জীবন-ভাবনাকে ওই মুখী করে নিয়েছিলেন।

শনিবারের চিঠি সাহিত্যে রাজনৈতিক চিন্তা বা তত্ত্ববাদকে প্রশ্রয় দিত না এটুকু সর্বজনবিদিত। বিশেষ করে কমিউনিজম তত্ত্ববাদসম্মত মতবাদ। নারায়ণ এখানে যখন এল এবং এই

পত্রিকার মধ্যে যখন সাময়ে গৃহীত হল তখন থেকে সজনীকান্তের জীবনের শেষদিন পর্যন্ত কোনদিন কোন একটি ক্ষেত্রেও নারায়ণের সঙ্গে এ বিষয়ে কোন বিতর্ক বা বিচ্ছেদ দেখা দেয় নি। তার প্রতিটি রচনাই সর্বমানব মুক্তির আদর্শে অনুপ্রাণিত ছিল; (কম্যুনিস্ট আদর্শ ইচ্ছা করে বলছি না) তথাপি শনিবারের চিঠিতে তাঁর রচনা প্রকাশিত হবার পথে কোন বাধা দেখা দেয় নি।

বাংলা সাহিত্যে এ দিক দিয়ে বিচার করলে অনায়াসে তিন ভাগ করা যায়—এক যাঁরা সাহিত্যে কোন রাজনৈতিক মতবাদকে স্থান দেন না, দিতে চান না। দুই যাঁরা দিতে চান, তিন যাঁরা এই স্থান দেওয়ার বিরোধী। নারান প্রত্যক্ষেই তাঁর ওই মতে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন কিন্তু কোনদিনই কোন দলের সঙ্গে কোন বিরোধ তাঁর হয়নি। শনিবারের চিঠি আসর থেকে প্রগতিবাদী সাহিত্যিক দল পর্যন্ত তাঁর গতি ছিল অবাধ এবং স্বচ্ছন্দ। মন্বন্তর এবং মহাযুদ্ধের পরিবেশের মধ্যে মানব ভাগ্যের চরমতম লাঞ্ছনার কালে তাঁর আবির্ভাব। তাঁর পক্ষে নিছক রসবাদী হওয়া সম্ভবপর ছিল না। প্রগতির পথই ছিল তাঁর বিধি নির্দিষ্ট পথ।

আমার সঙ্গে দেখা হওয়ার প্রথম দিন থেকে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত আমরা উভয়ে একটি পরম নিবিড় স্নেহ ও প্রীতির সম্পর্কে আবদ্ধ ছিলাম। আমার জীবনের গতিপথ তার জীবনের গতিপথকে বার বার ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেছে। কিছুকাল একসঙ্গেই এক পথে চলেছি।

অ্যান্টিফ্যাসিস্ট রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশন একটি ঐতিহাসিক নাম ও প্রতিষ্ঠান। এর সঙ্গে আমি ১৯৪২ সালে যুক্ত হয়েছিলাম এ কথা সকল জনের জানা। মনে পড়ছে সে আমাকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়েছিল জলপাইগুড়ি। তখন সেখানে সে অধ্যাপনার সবে ব্রতী হয়েছে। সেখানেই জানতে পারি সে সাম্রাজ্যবাদ ধনতন্ত্রবাদ সামন্ততন্ত্রবাদ প্রভৃতির বিরোধী এবং সকল মানুষের সমান অধিকারে সে বিশ্বাসী। তার সাহিত্যে সে সেই আশ্বাসের সৃষ্টি করবার স্বপ্ন দেখে। হ্যাজিতে পার্কে (বোধ হয় ১৯৪৪ সালে) অ্যান্টিফ্যাসিস্ট প্রতিষ্ঠানটি নাম বদল করলে। প্রগ্রেসিভ রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশন নাম দিতে চাইলে। তখন বহুজনের মনে দ্বন্দ্বকালে এই সংঘের কিছু আচরণের জন্য প্রতিবাদ জেগেছে সন্দেহ জেগেছে। আমার মনেও জেগেছে। হ্যাজিতে পার্কে সংঘের প্রকাশ্য সম্মেলনে আমি আমার প্রতিবাদ ও মত জানিয়ে বেরিয়ে এলাম। নারায়ণের সঙ্গে দেখা হয়েছিল সেদিন। বিমর্ষ মুখে সে দাঁড়িয়েছিল আমার পাশে। কয়েকটি কথা বলে চলে গিয়েছিল। পথ ভিন্ন হয়ে গিয়েছিল, মতপার্থক্য তো ঘটেই ছিল কিন্তু মনের মধ্যে প্রীতির সূর্য মুহূর্তের জন্যও রাহুগ্রস্ত হয় নি। এবং এই যে একটি পরম আকাঙ্ক্ষিত এবং বিস্ময়জনক সত্য অর্থাৎ মতভেদ হল পথ ভিন্ন হল তবু মনের মধ্যে মালিন্যের বিচ্ছেদের কোন ছায়া বা দাগ পড়ল না—এর জন্য সকল উদারতা একক নারায়ণের নিজস্ব। সুদর্শন যৌবনসমুজ্জ্বল যুবক, একটি আশ্চর্য প্রসন্নতায় প্রসন্ন, রসকৌতুক বোধে সুদীপ্ত, নম্রতায় বিনম্র, মর্যাদায় অলঙ্ঘনীয় রুচিতে সুমার্জিত, এক আশ্চর্য ব্যক্তিত্ব নারায়ণ। তার কণ্ঠস্বরে সঙ্গীতের সুরের মিষ্টতা ছিল, বাকভঙ্গিতে সুরভিত মালার ছন্দ ছিল—বাক্যবিন্যাসে মণিমালা রচনার শিল্প ও সৌন্দর্যবোধ ছিল। পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিল সে অসামান্য। বুদ্ধি ছিল তার সূক্ষ্মতম সূচের মত। বাগ্মিতায় তার তুল্য উজ্জ্বল কেউ ছিলেন না আমাদের বাঙালী সাহিত্যিকদের মধ্যে। তার হাসিটি আগে ছিল কিছু সলজ্জ। হাসলেই মুখের সামনে হাতের তালুর আড়াল দিত। এমন শালীনতা বোধ নেই দেখি নি সাহিত্যিক সমাজে। যাঁরাই তাঁর জ্যেষ্ঠ ছিলেন তাঁদের সকলকেই তিনি দাদা বলতেন। এবং সম্বোধনের স্বরের মধ্যে একটি আন্তরিকতা আপনা-আপনি যেন উৎসারিত হয়ে স্পর্শ করত।

নারায়ণ সব মিলিয়ে অসাধারণ এবং সারস্বত মন্দিরে আরতির থালার কর্পূরের আরতি শিখার মত পরমাকাঙ্ক্ষিত আলোকশিখা। অকস্মাৎ নিভে গেল।

এক সময় চার পাঁচটি তরুণ আমার কাছে আসত; প্রায় প্রতিদিনতই আসত। তার মধ্যে চারজনকে "আমার কালের কথা" নামক বইখানি উৎসর্গ করা আছে। বইখানি লিখেছিলাম বিশেষ করে নারানেরই তাগিদে। তার বিবরণ বইখানির মধ্যেই আছে। আশ্চর্যের কথা;—না; আশ্চর্য কেন? একটু বিচিত্র সংঘটন; যে তিনজনের নাম তিন অক্ষর দিয়ে রচিত এবং একই অক্ষর দিয়ে নির্দিষ্ট। ন র এবং ন। নারায়ণ বা নারান, নরেন ও নীরেন। আর একজন ছিল সন্তোষ ঘোষ। আনন্দ চ্যাটার্জি লেনের সামনের ঘরে বসে কত আনন্দময় প্রহর যাপন করেছি। ডাঃ নীহার গুপ্ত সেও নারায়ণের অন্যতম প্রিয় বন্ধু, তাকেও আমার কাছে নারায়ণই এনেছিল। ব্যক্তিতে সে সকল জনের পরমবাঞ্ছিত জন। এমন জন—এ-মানুষ বহু সহস্রের মধ্যে একজন। শতের গণনায় নারানের মত মানুষকে ধরা যায় না। বাংলা সাহিত্য তাঁকে নিয়ে অহঙ্কার করতে পারত। কিন্তু নিজের অহঙ্কার তাঁর ছিল না। অহঙ্কার তাঁর পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত হয়েছে। রসের বিজ্ঞানে তিনি ছিলেন সিদ্ধ শিল্পী। তিনি ছিলেন রসিক। তিনি এসেছিলেন আমার কুড়ি বছর পরে, চলে গেলেন আমাকে পিছনে রেখে। তাঁর অভাবে বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প-উপন্যাস-নাটক-রসরচনা রম্যরচনা গবেষণা সাহিত্য সমালোচনা সাহিত্য প্রভৃতি প্রায় সকল দিকে ও দিগন্তে একটি করে গুরুত্বপূর্ণ শূন্যতার সৃষ্টি হল। এ শূন্যতা সহজে পূর্ণ হবে না। শুধু তো বর্তমানের অভাবই নেই এ শূন্যতার মধ্যে ভবিষ্যতের বৃহৎ প্রত্যাশাও যে ছিল নারায়ণের মধ্যে। সেই তো ছিল নূতন যুগের নূতন সমাজের কল্পনার রূপকার। নূতন যুগ সবে রূপ নিতে শুরু করেছে। ভাঙাগড়ার বিরাম নেই অন্ত নেই। বেদনা মর্মান্তিক—উল্লাস ও উৎকণ্ঠারও শেষ নেই। নারায়ণের দৃষ্টি ছিল সচেতন এবং সুদীপ্ত। পঞ্চাশ পার হয়ে সে জীবনের মধ্যাহ্নকে পূর্ণ যৌবনে উপনীত হয়েছিল। জীবনে পরিপক্কতার সঞ্চার শুরু হয়েছিল। মহৎ সৃষ্টির এই তো ছিল প্রকৃষ্ট লগ্ন। কিন্তু হল না। নারায়ণ চলে গেলেন। বাংলা সাহিত্যের আকাশে একটি অতি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ককে মধ্যপথে রাহুর মত মৃত্যু এসে গ্রাস করলে। আমরা যারা তার অনেক আগে জীবনের যাত্রা শুরু করে প্রায় আয়ুর শেষ প্রান্তে এসে পড়েছি, তারা মর্মান্তিক বিচ্ছেদে কাতর হয়েছি। এই প্রস্থানের পথে অতি অকস্মাৎ সে আমাদের পিছনে রেখে অগ্রগামী হয়ে চলে গেলো। আজ সস্নেহে এবং গভীর শ্রদ্ধায় তোমাকে পরলোকে জ্যেষ্ঠের অধিকার না দিয়ে উপায় কি? সেই বিশ্বাসে আমি তাকে প্রণতি জানাই।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

জীবনের প্রতিচ্ছবি

ফরাসী দেশ সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নিত্য নতুন পথের উদ্ভাবক। ফরাসী দেশের সাহিত্য ও শিল্পে যেসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয় আজকেই পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে তার ঢেউ লাগে। ফরাসী-ভাষায় সদ্য-রচিত উপন্যাস শৈলী নিয়ে আজ সর্বত্র আলোচনা হচ্ছে এবং তার প্রভাব অন্য দেশের সাহিত্যেও পড়েছে। সম্প্রতি মাদাম সারোৎ এসেছিলেন এই দেশে, তাঁর সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা বর্তমান ফরাসী উপন্যাসের রূপ ও প্রকৃতি বিষয়ে যেটুকু জেনেছি সেই বিষয় এক সময় বিস্তারিত আলোচনার বাসনা আছে।

এইবারকার আলোচনায় যে আশ্চর্য উপন্যাসটি উপস্থিত হচ্ছে তার লেখিকার নাম—'ভায়োলেৎ লেদ্যুক'। এই লেখিকা জন্মসূত্রে অবৈধ সন্তান। এঁর পিতৃ-পরিচয় অজ্ঞাত। নিদারুণ দারিদ্র্যে শৈশব ও যৌবনের অনেকগুলি দিন কেটেছে। তাঁর নিজস্ব শারীরিক আকর্ষহীনতা এবং শারীরিক দৈন্য আবিষ্কার করে তিনি শিউরে উঠেছেন। আর সেই সব কথাই লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর আত্মজীবনীমূলক "La Batarde" নামক বহুল আলোচিত উপন্যাসে। এই নবীন প্রতিভাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন কামু, ককতো, জাঁ জিনে, সার্ত্র। দ্য বোভোয়া প্রমুখ ফরাসী সাহিত্যের প্রথম সারির লেখক-লেখিকাবৃন্দ।

এই উপন্যাসটির ভূমিকাও লিখেছেন মাদাম সীমঁ দ্য বোভোয়া। তিনি বলেছেন—'১৯৪৫-এর গোড়ার দিকে লেদ্যুকের একটি পাণ্ডুলিপি পাঠ করে আমি তার যৌবনের, মনোভঙ্গী ও রচনাশৈলীতে সচকিত হয়েছি। কামু লেদ্যুকের "L'Asphyxie" তৎক্ষণাৎ তাঁর সাময়িকপত্রে প্রকাশ করলেন। জিনে, সার্ত্র প্রমুখ এই নতুন লেখিকার আবির্ভাব অভিনন্দিত করলেন। লেখিকার পরবর্তী বইগুলি প্রকাশিত হওয়ার পর দেখা গেল যে, মনীষী লেখকবৃন্দের প্রত্যাশা পূর্ণ হয়েছে। কঠোর সমালোচক-বৃন্দ প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন। তথাপি এত সাফল্য সত্ত্বেও ভায়োলেৎ লেদ্যুক প্রচ্ছন্ন হয়ে গেলেন। শোনা যায় এখন আর কোনো লেখকই অপরিচিত থাকেন না, কারণ যে কোনো কাহিনীই তাঁর গ্রন্থ প্রকাশ করতে পারেন। এইখানেই বিপদ। এর ফলে বাজারি ধরনের লেখকরাই প্রতিপত্তি লাভ করেন, উত্তম বইও আগাছায় আবদ্ধ হয়ে পড়ে। তাছাড়া অধিক ক্ষেত্রে সাফল্য ভাগ্যের উপর অনেকটা নির্ভর করে। আবার দুর্ভাগ্যেরও হেতু থাকে। ভায়োলেৎ লেদ্যুক পাঠকের মনোরঞ্জনে প্রয়াসী নন, বরং পাঠক আতঙ্কিত হয়ে ওঠে, তাঁর গ্রন্থাবলীর নাম

"L' Asphyxie" "L' Affamee" "Ravage"—

এই সব নাম আনন্দের বিপরীত। এইসব গ্রন্থের পাতা ওল্টালে আপনারা পাবেন ক্রন্দন আর উত্তাপ, যেখানে প্রেমের নাম অনেক ক্ষেত্রে ঘৃণা, জীবনের উচ্ছ্বাস হতাশার ক্রন্দনে বিস্ফোরিত। নিঃসঙ্গতার অভিশাপে সমগ্র জগৎ একেবারে আচ্ছাদিত, দূর থেকে দেখলে মনে হবে সমস্ত গ্রন্থ নিঃশেষিত এক শুষ্ক মরুপ্রান্তর।

ভায়োলেৎ লেদ্যুক মাদাম সীমঁ দ্য বোভোয়াকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন—'আমি এক রসহীন মরু, আত্মকথনে মগ্ন।' মাদামের মতে তা সত্য নয়। লেদ্যুকের রচনায় তিনি সৌন্দর্যের সন্ধান পেয়েছেন, শুধু হৃদয় মরু নয়, মরু পার হয়ে সৌন্দর্যের মুখোমুখি এসে পৌঁছেছেন। মাদাম সীমঁ দ্য বোভোয়া এই গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন—

> 'And whoever speaks to us from the depths of his loneliness speaks to us of ourselves. Even the most worldly or the most active man alive has his dense thickets, where no one ventures not even himself, but which are there: the darkness of childhood, the failures, the self-denials, the sudden distress as cloud in the sky."

এই উপন্যাসটিও তাই বাস্তবে রূপায়িত হয়ে উঠেছে। জীবনের গোপন রহস্যলোকের গভীরে নেমে একটি নারী যে আশ্চর্য জগতের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে আমাদের কাছে সে ঘোষণা করছে সেই অন্তর্লোকের বার্তা। কেন কেউ শুনেছে না সেই কথা, শুধু আন্তরিকতা পরিপূর্ণ এই ধারা-[illegible] পরিবেশিত হচ্ছে।

গ্রন্থারম্ভেই লেখিকা বলেছেন—

> "My case is not unique; I am afraid of dying and distressed at being in this world I haven't worked, I haven't studied, I have wept, I have cried out in protest. These fears and cries have taken up a great deal of my time."

এই কথাগুলির মধ্যেই লেখিকার অন্তর্বেদনার পরিচয় পাওয়া যাবে। তিনি জানেন যেমনটি এসেছি তেমনই চলে যাবো শুধু যেসব অসম্পূর্ণতা আমাকে উৎপীড়িত করেছে সারাজীবন সেই অসম্পূর্ণতার পূর্ণ হয়ে থাকব। মনে হচ্ছে তিনি যেন পাথরের মূর্তি হয়ে অন্ধকারে জীবনের অপূর্ণতা, অসাফল্য ত্রুটি-বিচ্যুতি সারাজীবন আমাদের অন্তরকে দহন করে, সেই মর্মজ্বালা মনে নিয়েই আমরা এই জগৎ থেকে একদিন অন্য পারে পাড়ি দিই, কিন্তু প্রস্তরীভূত প্রতিমার ত' কোনো অনুভব নেই, জ্বালা নেই।

লেখিকা বলছেন—

"Virtues, good qualities, courage, meditation, culture. With arms crossed on my breast I have broken myself against those words."

এইভাবে আরম্ভ করে লেখিকা অতিশয় অন্তরঙ্গ ভঙ্গীতে জীবন-নাট্যের এক-একটি পাতা উল্টিয়ে গেছেন।

"I am the unrecognized daughter of a son of good family."

বড়ঘরে ছেলের বিবাহবন্ধনের বাইরে জন্মানো এই মেয়েটির জীবনে অনেক কষ্ট। লেখিকা বলছেন, আমাদের ঘরখানি প্রায় ধ্বংসোন্মুখ, আমাদের প্রস্তাবের পাত্রটি তোজনদান, সুন্দরী মাথার আধার প্রকাশো তার এই রূপান্তর। ভ্যানিটি অব ভ্যানিটিস। আমার মা আর দিদিমা বুদ্ধিমতী—তাদের চরিত্র আছে। কুড়ি বছর বয়সেই তাঁরা জীবনের চাপে নিষ্পেষিত, আর সমস্ত দুর্ভাগা তাঁরা তাবিজ মাদুলি পরে কাটানোর চেষ্টা করছেন তাঁদের এই ছোট্ট মেয়েটির মাথায় রিবন বাঁধার কাজে এই তাদের অভিব্যক্তি। সাধারণ পার্কটি ও'দের রুক্ষের। এইখানে ও'দের এই বাচ্চা মেয়েটি যেন বড়ঘরের উত্তম, জেহা-পেয় তোজী ছেলেমেয়েদের হারিয়ে দিতে পারে। আর এক জায়গায় লেখিকা তাঁর প্রতিদিনের কাজকর্মের হিসাব নিকাশে করেছেন—

'প্রতিদিন প্রত্যূষে আমি উনানের ছাই পরিষ্কার করতাম। আমার শারীরিক আকৃতি সৌষ্ঠবহীন হয়ে গিয়েছিল, একেবারে যান্ত্রিক হয়ে গেছি। এই উনানের ছাইগুলির মত আমি শাস্তির হয়ে পড়ি কাজ সবু করতে না করতেই।'

এরপর আছে এক বিখ্যাত পুস্তক প্রকাশনে চাকরী লাভের কথা। সেখানে অনেক মনীষী লেখকবৃন্দের আসা-যাওয়া চলে, তারোপরেও তা লক্ষ্য করেন।

এই সময় তাঁর মার আবার বিবাহ হয়েছে। নতুন সৎ-পিতা তাঁকে ঠিক স্নেহের দৃষ্টিতে দেখেন না। সে আর এক বিপদ।

গাব্রিয়েলকে সে ভালোবাসে। সে তার শারীরিক অপূর্ণতা সম্বন্ধে সচেতন। একটি বহুমুখী বিপণীতে গিয়ে কয়েকটি প্রসাধন দ্রব্য চুরি করে ধরা পড়ে যায়।

এরপর জীবনে আসে বিচিত্র মানুষ। কত বিচিত্র নারী আর পুরুষ, তাদের রেখাচিত্র এঁকেছেন লেখিকা অতিশয় স্পষ্টাস্পষ্টি।

গ্রন্থশেষে ১৯৬০-র ২১ আগস্টের কথা বলেছেন লেখিকা—

"This August day, reader is a rose window glowing with heat I make you a gift of it. It is yours."

বাল্যজীবনের কাহিনী যেখানে শেষ হয়েছে সেইখানেই লেখিকা তাঁর আত্মজীবনীমূলক কাহিনী শেষ করেছেন— এ এক আশ্চর্য শিল্পবস্তু। লেখিকা এক বাস্তব জীবনের কাহিনী বর্ণনা করেছেন বিচিত্র আঙ্গিকে কাব্যধর্মী ভাষায় এবং অতিশয় ইনটিমেট বা অন্তরঙ্গ ভঙ্গীতে, পাঠককে তিনি কাহিনী বলতে বসেছেন তাই পাঠকের কাছ থেকে কিছুই লুকানোর চেষ্টা করেননি।

সাম্প্রতিক ফরাসী উপন্যাসের নমুনা হিসাবে এই অসামান্য উপন্যাসটি বিশ্ব-সাহিত্যে আগ্রহী পাঠকের অবশ্য পঠিতব্য।

—অভয়ঙ্কর

LA BATARDE — (An Autobiography) by Violette Leduc. Translated by Derek Colman : Published by Peter Owen Ld Great Britain. Price—135-6d. only

সাহিত্যের খবর

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

সমকালীন বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী এবং বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় পরলোকগমন করেছেন। তাঁর এই আকস্মিক মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যানুরাগী জনসাধারণের মনে এক গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে। সেদিনই হাসপাতালে তাঁকে শেষবারের মত দেখবার জন্য বন্ধু-বান্ধব, সাহিত্যিক এবং অনুরাগী ছুটে যান।

পরের দিন, ১০ই নভেম্বর সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে কেওড়াতলায় তাঁর অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এমন শোক-বিহ্বল অনুরাগীর সমাগম কদাচিৎ দেখা যায়। সকলের চোখই যেন অশ্রুসজল। যেন প্রিয়জন-বিরহে কাতর। লক্ষ করেছি, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় কত প্রিয় ছিলেন সকলের। সুখলাল কারনানী হাসপাতালে সকাল আটটায় মোর্গ্যস কর্নারে তাঁর মৃতদেহ রাখা হয় সকলের শেষবারের মত দর্শনের জন্য। সে কি করুণ দৃশ্য! লক্ষ করেছি ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, অধ্যাপক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, চিত্র-তারকা, চিত্র-পরিচালক আর অগণিত ভক্ত পাঠক শোকে মুহ্যমান। সেখান থেকে তাঁর মৃতদেহ কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে উপাচার্য শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে পুষ্পার্ঘ নিবেদন করেন। নারায়ণবাবু ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের রিডার। সেখান থেকে শোক-মিছিল সিটি কলেজ হয়ে তাঁর পুরোনো বাড়িতে যায়। সেখান থেকে শিয়ালদা হয়ে দক্ষিণ কলকাতায় মনোজ বসুর বাড়ির সামনে থামে। সেখানে ছিলেন তাঁর পত্নী আশা দেবী। এরপর রাসবিহারী এভিনিউ হয়ে মৃতদেহ আনা হয় কেওড়াতলায়। সেখানে এক বিরাট জনতা অনেক আগে থেকেই অপেক্ষা করছিল। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে মাল্যদান করা হয়। এরপর পুত্র অরিজিৎ প্রথামত মুখাগ্নি করেন। সব শেষ। আর কোনদিন তিনি ফিরে আসবেন না। কিন্তু তবু তাঁর নাম বাংলার প্রতিটি সাহিত্যানুরাগীর মনে চিরকাল উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

হাসপাতালে, শ্মশানে এবং পরি-পার্শ্বে যাঁরা উপস্থিত হয়ে সাশ্রুনত

শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করেছেন। তাঁদের মধ্যে যাঁদের উপস্থিতি লক্ষ্য করেছি, তাঁরা হলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিষ্ণু দে, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মন্মথ রায়, আশুতোষ ভট্টাচার্য, অজিত ঘোষ, পুলিনবিহারী সেন, দক্ষিণারঞ্জন বসু, সন্তোষকুমার ঘোষ, বিমল মুখোপাধ্যায়, হরীন্দ্র রায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, মনোজ বসু, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, আশিস সান্যাল, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, সুরথনাথ ঘোষ, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, দিনেশ দাস, আলোক সরকার, শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, গজেন্দ্রনাথ মিত্র, শঙ্করীপ্রসাদ বসু, সবিতাব্রত দত্ত, ধনঞ্জয় দাশ, দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায় দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিয় মুখোপাধ্যায়, পুলকেশ দে-সরকার, প্রসূন বসু, নীহার মুন্সী, নারায়ণ চৌধুরী, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, গীতা মুখোপাধ্যায়, শান্তনু দাস, প্রমুখ আরো শত শত মুগ্ধ পাঠক এবং সাহিত্যিক।

বিভিন্ন শোকসভায় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করা হয়। এই সব শোকসভার মধ্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, আফ্রো-এশীয় লেখক সম্মেলন ও পশ্চিমবঙ্গ শান্তি সংসদ কর্তৃক যুগ্মভাবে আয়োজিত শোকসভাগুলি উল্লেখ্য। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আয়োজিত শোকসভায় শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করেন বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, আশুতোষ ভট্টাচার্য, অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে হরপ্রসাদ মিত্রের সভাপতিত্বে এক সভায় তাঁর অমর আত্মার শান্তি কামনা করা হয়। ১২ তারিখ সন্ধ্যায় কলকাতার স্টুডেন্ট্‌স্ হলে আফ্রো-এশীয় লেখক সম্মেলন ও পশ্চিমবঙ্গ শান্তি সংসদের উদ্যোগে এক শোকসভা আয়োজিত হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। সভায় ডঃ ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন—'নারায়ণ আমাদের চেয়ে বয়সে অনেক ছোট ছিল। তাঁর শোকসভায় আমাকে ভাষণ দিতে হবে, তা ভাবিনি। নারায়ণ এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী। বাংলা সাহিত্য চিরকাল তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে।' দক্ষিণারঞ্জন বসু বলেন—'নারায়ণবাবুর মৃত্যু সত্যি মর্মান্তিক। এত অল্পবয়সে তাঁর মৃত্যু হবে, এ কল্পনা করাও ছিল আমাদের পক্ষে কঠিন। প্রসঙ্গতঃ তিনি দুঃখের সঙ্গে বলেন যে, কেউ কেউ নারায়ণবাবু যথেষ্ট প্রগতিশীল ছিলেন না, বলে উল্লেখ করেছেন। এটা খুবই পরিতাপের বিষয়। সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখকে তিনি যেভাবে তুলে ধরেছেন তা একালের ক'জন সাহিত্যিক পেরেছেন, তা জানা নেই।' অরুণ সান্যাল 'পরিচয়' পত্রিকার সঙ্গে দীর্ঘ ঘনিষ্ঠতার কথা উল্লেখ করে বলেন—'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় একালের অন্যতম বিশিষ্ট প্রগতি-কথাশিল্পী। তিনি সাহিত্যে যে সমবেদনার সঙ্গে মানুষের দুঃখ-বেদনাকে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাই তাঁর প্রগতিশীলতা প্রমাণ করে।' প্রসঙ্গতঃ বালজাক সম্বন্ধে এঙ্গেলসের উক্তি তিনি উল্লেখ করেন। হরীন্দ্র রায় তাঁর সঙ্গে নারায়ণবাবুর দীর্ঘ পরিচয়ের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন—'মাত্র কয়েকদিন আগে একই সঙ্গে গ্রামোফোন কোম্পানীতে একটা রেকর্ডিং-এ আমরা গিয়েছিলাম। তখন একবারও ভাবিনি, তিনি এত তাড়াতাড়ি আমাদের কাছ থেকে বিদায় নেবেন। তাঁর সাহিত্যে একালের সাধারণ মানুষের দুঃখ-বেদনা ফুটে উঠেছে।' মিহির সেন ও ধনঞ্জয় দাশও সভায় শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করে বলেন—'তিনি এত লিখেছেন, যা ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। অনেকে রবীন্দ্রনাথের অজস্র লেখনীর কথা বলে থাকেন, নারায়ণবাবুকে তাঁর সঙ্গে তুলনা না দিয়েও বলতে পারি, রচনার দিক থেকে তিনিও কম নন। আমরা একালে তাঁর যথার্থ অবদান নির্ণয় করতে পারবো না। কিন্তু ভবিষ্যৎ একদিন তাঁকে যোগ্যস্থানে বরণ করে নেবে।'

সভায় একটি শোক প্রস্তাব গ্রহণ করে তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিজনের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়।

—চার্বাক

নতুন বই

রবীন্দ্রসঙ্গীত (আলোচনা) — প্রিয়ব্রত চৌধুরী। জেনারেল প্রিণ্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। ১১৯ ধর্মতলা স্ট্রীট। কলকাতা-১৩। দাম—বারো টাকা।

রবীন্দ্রপ্রতিভার বহুমুখী বৈচিত্র্য নিয়ে আজো আলোচনার শেষ নেই। কবি, সঙ্গীতশিল্পী, গীতিকার, সুরকার, নট ও নাট্যকার, ঔপন্যাসিক, ছোটগল্পকার, প্রবন্ধকার, শিল্পী, দার্শনিক কত রূপেই না তাঁর পরিচয়। কোনটি স্বতন্ত্র নয়—সবই যেন যুক্ত একই সূত্রে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতচিন্তা সম্পূর্ণ নিজস্ব এবং বিশিষ্ট ধরনের। রবীন্দ্রসঙ্গীত দেশীয় ঐতিহ্যকে অবলম্বন করেই সৃজনকর্মে নিয়োজিত হয়েছিল। গীতগোবিন্দ, কৃষ্ণকর্ণামৃত, কৃষ্ণকীর্তন, ব্রজবুলি পদকীর্তন, বিদ্যাপতি, রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, রাজা রামকৃষ্ণের শ্যামাসঙ্গীত, বাউল, ভাটিয়ালী, জারি, সারি, গম্ভীরা, টপ্পা, খেয়াল, টপকীর্তন, রামায়ণগান, কথকতা—বাঙলাদেশে প্রচলিত বিভিন্ন গীতশ্রেণী থেকে রবীন্দ্রসঙ্গীত স্বকীয়তায় উজ্জ্বল, কাব্যসৌন্দর্যে অনন্য। শান্তিদেব ঘোষ বলেছেন, "বাণী ও সুরের মিলনের পথে এ গান বহুবিধ নতুন নতুন পথের সন্ধান দিয়েছে। এর গভীরতা এবং বিশালতা গুরুদেবের অন্যান্য সমগ্র কর্মকীর্তি থেকে কোনদিক দিয়ে নূ্যন নয়। গুরুদেবের গান কেবল সঙ্গীতগুণীর বা সঙ্গীতজ্ঞের সুর-বিস্তার নয়, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কবি সাহিত্যিক দার্শনিকের মননসমৃদ্ধ দূরবগাহী চিন্তাধারার বিশিষ্ট ছাপ। সাহিত্যরসের অবদানে এই সঙ্গীত অতুলনীয়।" সুতরাং রবীন্দ্রসঙ্গীতের মর্মমূলে পৌঁছতে হলে দরকার নিরলস শ্রম এবং পরিচ্ছন্ন সঙ্গীতচিন্তা।

ডঃ প্রিয়ব্রত চৌধুরী উনিশ বিশ শতকের বিরাট পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের সুগভীর এবং সুবিস্তৃত সঙ্গীতচিন্তা ও সঙ্গীতরচনার পরিপ্রেক্ষণ করেছেন। তাঁর অনলস অধ্যবসায় ও ঐকান্তিক নিষ্ঠার ফলশ্রুতি 'রবীন্দ্রসঙ্গীত' গ্রন্থখানির জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ডিফিল উপাধিতে সম্মানিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতচিন্তা ও সঙ্গীতসৃষ্টির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পক্ষে এই বইখানি অপরিহার্য। বিরাট প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিস্তার এবং তৎকালীন সঙ্গীতসংস্কৃতির আলেখ্য হিসাবে বইখানি মূল্যবান বিবেচিত হবে।

সংকলন ও পত্র-পত্রিকা

সাহিত্য ও সংস্কৃতি (শ্রাবণ-আশ্বিন)— সম্পাদক : সঞ্জীবকুমার বসু। চব্বিশ পরগণা জেলা সংস্কৃতি পরিষদ। ১০ হেস্টিংস স্ট্রীট। কলকাতা—১। দাম—চার টাকা।

সুবৃহৎ আকারের এই বিশেষ সংখ্যাটি আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের গবেষক এবং জিজ্ঞাসু পাঠকমাত্রেরই প্রয়োজন মেটাবে। সংখ্যাটিতে পঞ্চাশ বছরের ঊর্দ্ধবয়স্ক প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকদের রচনাবলীর ওপর আলোচনা, গ্রন্থপঞ্জী এবং আলোকচিত্র সংকলিত হয়েছে। অনেকেই বাদ পড়েছেন। সম্পাদক জানিয়েছেন আগামী কোন এক সংখ্যায় তাঁদের ওপর আলোচনা থাকবে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্নদাশঙ্কর রায়, বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রমথনাথ বিশী, সুবোধ ঘোষ, প্রবোধকুমার সান্যাল, সুশীল রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিমল মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, মনোজ বসু,

CENTRAL LIBRARY

আশাপূর্ণা দেবী, অমিয় চক্রবর্তী, সুভাষ মুখোপাধ্যায় এবং বিষ্ণু দের ওপর আলোচনা করেছেন যথাক্রমে সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রণয়কুমার কুণ্ডু, কৃষ্ণলাল মুখোপাধ্যায়, বিজিতকুমার দত্ত, অসীমা মৈত্র, সৌমেন্দ্রনাথ সরকার, গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, ভবতোষ দত্ত, দেবদাস জোয়ারদার, আশিস মজুমদার, উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, দীপক চন্দ, মানবেন্দ্র পাল, জগন্নাথ চক্রবর্তী, অলোক রায় এবং সুব্রত রায়। সম্পাদনায় সম্পাদকের সুরুচি এবং দক্ষতার পরিচয় স্পষ্ট। জীবিত সাহিত্যিকদের দু' একজনের ওপর মাঝে মাঝে আলোচনা চোখে পড়লেও, বিস্তৃতভাবে তাঁদের সম্পর্কে লেখা হয়েছে কমই। সাম্প্রতিক বাঙলা সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি উপলব্ধিতে সাহিত্য ও সংস্কৃতির বর্তমান সংখ্যাটির ভূমিকা হবে গুরুত্বপূর্ণ।

আশীর্বাদ—সম্পাদক : অমিতকুমার দে। পাবনা কলোনী। চাকদহ। নদীয়া। দাম—পঞ্চাশ পয়সা।

এই সংখ্যায় লিখেছেন শিবরাম চক্রবর্তী, নচিকেতা ভরদ্বাজ, প্রভাতকুমার ঘোষ, বিজনকুমার ঘোষ, সুব্রত মহলানবিশ, রথীন্দ্রনাথ দেবরায়, অমিতকুমার দে এবং আরো অনেকে। সম্পাদক নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন।

আরক্ষা (ষষ্ঠ-সপ্তম সংখ্যা)—সম্পাদক : সলিলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়। সহঃ সম্পাদক : বিমলচন্দ্র রায়। ১৭ লেক এভিনিউ, কলকাতা২৬। দাম : আড়াই টাকা।

আরক্ষা বাংলা ভাষায় প্রকাশিত বাস্তবভিত্তিক অপরাধ, পুলিশী তদন্ত, বিচার কাহিনী ও সামাজিক সমস্যাবিষয়ক আলোচনার একমাত্র ত্রৈমাসিক পত্রিকা। এ সংখ্যার সম্পাদকীয় নিবন্ধটি মূল্যবান। যৌন সাহিত্যের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সময়োপযোগী মন্তব্য করা হয়েছে। অন্যান্য আলোচনার মধ্যে বি এন মল্লিকের 'জনসাধারণ ও পুলিশের পারস্পরিক সম্বন্ধ', সরোজেন্দ্রমোহন ঘোষের 'পানদোষ' এবং সরোজ মজুমদারের 'অপরাধের মনস্তাত্ত্বিক প্রকারভেদ' শীর্ষক প্রবন্ধ কয়টি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণযোগ্য। তাছাড়া লিখেছেন সলিলকুমার চট্টোপাধ্যায়, চণ্ডী সেনগুপ্ত, বি সিরাস, ধর্মবীর জাতক, শশী রায়, প্রদীপ চাটার্জি, সৌরেন বন্দ্যোপাধ্যায়, ফিণ্টু দাশগুপ্ত, স্মৃতি চট্টোপাধ্যায় এবং আরো দু' একজন। পত্রিকাটি জনপ্রিয় হলে আমরা খুশী হবো।

নবকল্লোল (৭ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা)—সম্পাদিকা মৈত্রেয়ী দেবী। ১৩।১, পাম এভিনিউ, কলকাতা—১৯। এক টাকা।

প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প, উপন্যাসে সংখ্যাটি সমৃদ্ধ। লিখেছেন গিরীন্দ্রনাথ দাস, ইভান আলুফ, বরুণ ধর, জীবন সরকার, দুর্গাদাস সরকার আবুল কাসেম রহিমউদ্দীন, কবিরুল ইসলাম, শঙ্কর মিত্র, নারায়ণ চৌধুরী, শীতল জোয়ারদার, মৈত্রেয়ী দেবী এবং আরো অনেকে। কয়েকটি অনুবাদ ও পূর্ব বাংলার ওপরে একটি আলোচনা পত্রিকাটিকে সংগ্রহযোগ্য করে তুলেছে।

রাঙামাটি (কার্তিক ১৩৭৭)—নগেন্দ্র দাশ। ৪।৭০, নেতাজী নগর, কলকাতা—৪০। এক টাকা।

রাঙামাটি সাধারণত বেরোয় হালকা চেহারায়। এ-সংখ্যাটি তুলনায় বড় হয়েছে। বোধহয় বিশেষ বার্ষিক সংকলন হিসেবে প্রকাশের জন্যই কিছুটা স্থূলতায়। ছাপা হয়েছে কবিতা বিষয়ে সাতটি প্রবন্ধ ও আলোচনা এবং বাটজন তরুণ কবির কবিতা। লিখেছেন নগেন্দ্র দাশ, মানিক চক্রবর্তী, কণিভূষণ আচার্য, শামসুর রহমান, আজিজুল হক, আবদুল রশিদ খান, সাজ্জাদ কাদির, আবু কায়সার, অজয় সেন এবং আরো অনেকে। পত্রিকাটির ছাপা ও অঙ্গসজ্জা ভালো।

দরবারী : সম্পাদক : কল্যাণ চক্রবর্তী। ৩০ লেনিন সরণি, কলকাতা ১৪। দাম : দু টাকা।

প্রচ্ছদ শোভনতায় ও অঙ্গবৈচিত্র্যে দরবারী সাহিত্য বরাবরই আকর্ষণীয়। এ সংখ্যার সূত্রপাতে বন্যাপীড়িত বাংলা দেশের উদ্দেশ্যে সম্পাদকীয় মন্তব্য করা হয়েছে : "মানুষের জীবনে যে সংকট দেখা দিয়েছে, আমরা বিশ্বাস রাখি—প্লাবনের পর যেমন পলি জমে, তেমনি এই বিপদের মধ্য থেকেই প্রকৃত সুস্থ পরিবেশ সৃষ্টি হবে।" কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে আছেন বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তরুণ সান্যাল, রণজিৎ দেব, সত্য গুহ, অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, শিবেন চট্টোপাধ্যায়, সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুণ সেন, তুলসী মুখোপাধ্যায়, রঞ্জিত রায়চৌধুরী, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, স্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রণব সেন, দিলীপ সেনগুপ্ত, ও কল্যাণ চক্রবর্তী প্রমুখ। তন্মধ্যে দিলীপ সেনগুপ্ত ও কল্যাণ চক্রবর্তীর গল্প দুটি ভিন্ন স্বাদের ও আকর্ষণীয়।

প্রেক্ষণ : সম্পাদক : স্বপ্নেন্দু ভৌমিক। ১০ কৃষ্ট দাস পাল লেন, কলকাতা—৬। দু' টাকা।

পত্রিকাটির প্রধান সম্পদ তার ছবিগুলি। অনেক মূল্যবান আর্ট প্লেট ছাপা হয়েছে আর্ট পেপারে। শিল্পীদের মধ্যে আছেন চিন্তামণি কর, অনিল ঘোষ, নিমাই দাস, নিরঞ্জন প্রধান, বিনোদ সাহা ও দেবব্রত চক্রবর্তী। যোগেনকালের কয়েকটি অপ্রকাশিত চিঠি ছাপা হয়েছে পত্রিকারম্ভে। আলোচনা ও সমালোচনা লিখেছেন বিধুভূষণ কুণ্ডু, শিশির ভট্টাচার্য, তনুশ্রী তালুকদার ও গৌরাঙ্গ ভৌমিক। জেবার দ নেরভাল-এর একটি রচনার অনুবাদ করেছেন কমলকুমার মজুমদার। অন্যান্য লেখকদের মধ্যে আছেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়, অমিতাভ দাশগুপ্ত, অরু মুখোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্র আচার্য, তুষারাভ রায়চৌধুরী, পর্বানন্দ দাস, অরুণা চট্টোপাধ্যায়, তীর্থজ্যোতি ভাদুড়ী প্রমুখ।

গঙ্গোত্রী (অক্টোবর ১৯৭০)—সম্পাদক : শান্তনু দাস। ৪।১, আফতাব মস্ক লেন, কলকাতা—২৭। দাম : এক টাকা।

গঙ্গোত্রী তার পুরনো শরীর বদল করেছে নতুনতর অঙ্গসজ্জায়। অসাধারণ ছাপা। যেন প্রতিটি পৃষ্ঠায় ঝকমক করছে উজ্জ্বল হরফ। এ সংখ্যায় উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রবন্ধ ও আলোচনা লিখেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র (কবিতা সত্য), মণীন্দ্র রায় (কেন এই মোহিনী আড়াল), অমিয়কুমার সেন (রবীন্দ্রনাথ ও কুমারস্বামী), হরপ্রসাদ ঘোষ (কবিতা ও কার্ল মার্কস), জগন্নাথ চক্রবর্তী, সুশীল রায়, অমিতাভ দাশগুপ্ত ও স্বাতী চক্রবর্তী। 'কান্তে' কবিতা সম্পর্কে দীনেশ দাসের সঙ্গে অনিমেষ সেনের সাক্ষাৎকারটি মূল্যবান। কবিতা লিখেছেন বিষ্ণু দে, দীনেশ দাস, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণ ধর, রাম বসু, দক্ষিণারঞ্জন বসু, তরুণ সান্যাল, দুর্গাদাস সরকার, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, আশিস সান্যাল, তুলসী মুখোপাধ্যায়, তরুণ সেন, মৃণেন্দু সরকার, পূর্ণেন্দু ভরদ্বাজ, শান্তনু দাস এবং আরো অনেকে। প্রচ্ছদ চমৎকার। সম্পাদকীয় রুচি এবং কবিতার নির্বাচন উন্নত মনের। পাঠকের পক্ষে একটি সংগ্রহযোগ্য সংকলন।

কিশলয় : সম্পাদক নিখিলেন্দু চক্রবর্তী। নব ব্যারাকপুর, ২৪ পরগণা।

কিশলয় সব পেরোছির আসরের মুখপত্র। লিখেছেন শিশিরকুমার সাঁতরা, বিষ্ণুপ্রিয়, অনিল চক্রবর্তী, নিখিলরঞ্জন চক্রবর্তী, আনস বিশ্বাস, স্বপনবুড়ো এবং আরো অনেকে।

CENTRAL LIBRARY

অন্ধকারে আলোর ঝলক

দক্ষিণারঞ্জন বসু

'উদ্‌ভ্রান্ত সেই আদিম যুগে
স্রষ্টা যখন নিজের প্রতি অসন্তোষে
নতুন সৃষ্টিকে বার বার
করছিলেন বিধ্বস্ত,
তাঁর সেই অধৈর্যে ঘন ঘন
মাথা নাড়ার দিনে
রুদ্র সমুদ্রের বাহু
প্রাচী ধরিত্রীর বুকের থেকে
ছিনিয়ে নিয়ে গেল তোমাকে,
আফ্রিকা—'
—রবীন্দ্রনাথ

সেই আফ্রিকাকে বলা হতো 'ডার্ক কন্টিনেন্ট' বা 'অন্ধকার মহাদেশ'। শুধু কালো আদমির দেশ বলেই নয়, আফ্রিকা অন্ধকার মহাদেশ বলে অভিহিত এই কারণে, এ মহাদেশের সঙ্গে দীর্ঘকাল সভ্য পৃথিবীর পরিচয় ছিল না। জানিনি বলেই অন্ধকার। সেই অর্থেই আফ্রিকা এতকাল ধরে প্রচারিত ছিল অন্ধকার মহাদেশ বলে।

সভ্য পৃথিবীর সঙ্গে পরিচয় হয় নি বলেই যে আফ্রিকা অসভ্য ছিল তা নয়; সভ্য পৃথিবীর সঙ্গে পরিচিত হবার অনেক আগে থেকেই আফ্রিকার নিজস্ব একটি সভ্যতার ধারা, নিজস্ব একটি সংস্কৃতি ছিল। আফ্রিকার যে লোকসংস্কৃতি তার লোকসাহিত্য ও লোকশিল্পের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে এসেছে তার প্রাচীনত্ব এমন কি খৃস্টপূর্ব যুগের বলে আবিষ্কৃত হয়েছে। সেই স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক পরিবেশে আফ্রিকা এই বিশ্বের আর দশটা সভ্য দেশের মতোই একটা বিবর্তনের ধারা ধরে এগিয়ে চলেছে। সেই বিশেষ ধারাটির সঙ্গে আমাদের পরিচয় থাকা দরকার।

সে ধারা আফ্রিকার নিজস্ব প্রাণরসে পুষ্ট। সে ধন তার বাইরে থেকে ধার-করা ধন নয়, সে ধন তার ফসলের মতোই তার মাটি থেকে পাওয়া। প্রাকৃতিক প্রতিবেশে আপনা থেকেই তা গড়ে উঠেছে, বাইরে থেকে গিয়ে তার ঘাড়ে চেপে বসেনি।

কিন্তু অবস্থা চিরদিন সমান থাকেনি, আর তা থাকা সম্ভবও নয়। মানুষের লোভ, মানুষের অনুসন্ধিৎসা একদিন মধ্য এশিয়া ও য়ুরোপের মানুষকে টেনে নিয়েছে অন্ধকার আফ্রিকার অভ্যন্তরে। আফ্রিকার অন্ধকার ঘরের দরজা খুলে গেছে সভ্য পৃথিবীর কাছে। গেছে মধ্য এশিয়ার মুসলমান শক্তি, পরে য়ুরোপের খৃস্টানরা। মধ্য এশিয়ার মুসলমান শক্তি উত্তর আফ্রিকার এক বৃহদংশ দখল করেছে, দখলে রেখেছে এবং শেষ পর্যন্ত তারা সেখানকার অধিবাসীই বনে গেছে।

কিন্তু য়ুরোপের খৃস্টানদের বেলায় তা হয়নি। য়ুরোপের খৃস্টান মিশনারীরা ধর্মের আড়াল করে ডেকে নিয়েছে খৃস্টান রাজশক্তিকে, যে শক্তি প্রমত্ত, সাম্রাজ্যের ভিৎ গাঁথবার দুরন্ত নেশা যার মনে। ভিৎ তারা গেঁথেছে, সাম্রাজ্য তারা গড়েছে। অন্ধকার আফ্রিকার পায়ে সভ্য য়ুরোপের লৌহ-শৃঙ্খল পড়েছে।

এ বন্ধন-যন্ত্রণা অন্ধকার আফ্রিকা সয়েছে বহুকাল। যুগের পর যুগ, শতাব্দীর পর শতাব্দী। উত্তর আফ্রিকার কোন কোন দেশে মধ্য এশিয়ার মুসলমান শক্তি স্থায়ীভাবে বসে গিয়েছিল। কাজেই খাঁটি আফ্রিকাবাসীর সঙ্গে তাদের চলেছিল ভাবের বিনিময়। এই দেওয়া-নেওয়া, আদান-প্রদানের পথেই উত্তর আফ্রিকায় ঘটেছিল দুটি সংস্কৃতির সমন্বয়। মধ্য এশীয় মুসলমান সংস্কৃতির ও খাঁটি আফ্রিকান সংস্কৃতির।

উত্তর আফ্রিকার এই সমন্বিত সংস্কৃতির ভেতর খাঁটি আফ্রিকান খুঁজে পাওয়া যাবে না। খাঁটি আফ্রিকান সংস্কৃতির সন্ধান পাওয়া যাবে আফ্রিকার খাঁটি অধিবাসীদের মধ্যে। মধ্য আফ্রিকার ও পশ্চিম আফ্রিকার।

অবশ্য আফ্রিকান সংস্কৃতিকে তার এই স্বাতন্ত্র্য, এই স্বধর্ম বজায় রাখতে কম প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়নি। মুসলমান সংস্কৃতির ভূমিকা সেখানে গৌণ, মুখ্য হলো খৃস্টান সংস্কৃতি। খৃস্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে খৃস্টান মিশনারীরা আফ্রিকানদের ভেতর যেয়ে ঘর বাঁধলেন, গির্জার ভিৎ গাঁথলেন। য়ুরোপীয় খৃস্টান মিশনারীদের সংস্পর্শে এসে আফ্রিকানদের ধীরে-বহা সমাজ-জীবনে য়ুরোপীয় যন্ত্রের বেগের সঞ্চার হয়েছিল। কিন্তু এ বেগ বাইরের, সমাজ-জীবনের। সমাজ-জীবনের চৌহদ্দি পেরিয়ে এ বেগ আফ্রিকাবাসীর আন্তর-জীবনে সঞ্চারিত হতে পারেনি। সেখানে সে তাকে প্রতিরোধ করেছে। প্রতিহত করেছে। সেখানে সে আপন ভাবমণ্ডলের, আপন ধ্যান-ধারণাকে, ভাবনা-চিন্তাকে দোরগোড়া পেরিয়ে ভেতরে প্রবেশ করতে দিতে রাজি নয়। আপন ভাবনাকে নাড়া দিতে রাজি নয়। কারণ এ ভাবনা তার রক্তপ্রবাহে বাহিত, তার হৃদ্‌-স্পন্দনের সঙ্গে জড়িত। এ ভাবনাকে ছাড়লে সে নিজেই থাকে না, নিজেই বাঁচে না। এই ভাবনাই তার আফ্রিকানত্ব। এ ভাবনা থেকেই তার নিজস্ব জীবনদৃষ্টির জন্ম। এ ভাবনা তার নিজস্ব সংস্কৃতির উৎসমুখ।

আফ্রিকাবাসীর এই বিশেষ ভাবনাটি কি? বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীটি কি?

এ সম্পর্কে ডঃ পারিন্ডার তাঁর 'West African Psychology' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন :

'Force, power, energy, vitality, life, dynamism, these are the operative notions behind prayers to God, invocations of divinities, offerings to ancestors, everything that may be termed religion, including therein what we are pleased to designate 'magic' or 'medicine'. The aim of all these practices being to strengthen and affirm life....

All things in the visible and invisible worlds possess some degree or type of force, whether we call it 'soul' or not, animate or inanimate.

It is evident, then, that the whole tone of the philosophy of most African peoples is distinctly lifeaffairming. Here is no pessimism or other worldy of negation.'

সর্বভূতে এই জীবনারোপ, এই জীবন-তৃষ্ণাই আফ্রিকান দৃষ্টিভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য। এ জীবনদৃষ্টিতে নৈরাশ্যের, হতাশার স্থান নেই, আছে আশা, আছে শক্তি আর জীবনের জয়গান। জীবনকে অস্বীকার করে, শক্তিকে, জীবনবেগকে পাশ কাটিয়ে এ দৃষ্টি অন্যদিকে যেতে রাজি নয়। য়ুরোপীয় দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে এ জীবনদৃষ্টির পার্থক্যটা কোথায়?

এ সম্পর্কে ডঃ পারিন্ডার উপরোক্ত গ্রন্থেই মন্তব্য করেছেন :

'It might be said that European philosophy assumes that the universe is inanimate, following the presuppositions of meterialistic science, whereas African philosophy assumes that there is life, or at least power, in all things, being thereby to the modern conception of all pervading energy.'

আফ্রিকান দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে য়ুরোপীয় দৃষ্টিভঙ্গীর এখানেই পার্থক্য। বিজ্ঞানের বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে য়ুরোপ সৃষ্টির সকল কিছুতে জীবন-সত্তার লীলাকে স্বীকার করে নিতে রাজি নয়। কিন্তু আফ্রিকানবাসীর জীবনদৃষ্টি বা জীবনদর্শন হলো ঠিক এর উল্টো। সে বলে, সৃষ্টির সকল বস্তুতে জীবন-রাখাল অহরহ তার বাঁশী বাজিয়ে চলেছে। সেই বাঁশীর সুরেই সৃষ্টির সকল কিছু কম্পিত ও স্পন্দিত। আমাদের চারপাশের এই যে প্রকৃতি একটি সুশৃঙ্খল নিয়মের ভেতর দিয়ে প্রতিদিন কাজ করে যাচ্ছে, এর ভেতর জীবনের ছন্দ ও শক্তির উত্তাপ না থাকলে তার পক্ষে এ কাজ করা সম্ভব হতো না। কাজেই জীবন সত্য। এ সত্য, এ সত্তা সৃষ্টির সর্বজীবে, সর্বভূতে বর্তমান।

বইকুণ্ঠের খাতা

সময়ের ডাক

ভারতে এখন রাজা নেই। রাজপুত্রও নেই। আছে রাজকীয় শাসনের স্মৃতি।

অথচ এমন একটা দিন ছিল, যখন অসংখ্য ছোটবড় রাজার ছেয়ে ছিল দেশটা। বড় বড় জমিদাররা 'রাজা' উপাধি ধারণ করে আঞ্চলিক শাসনের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়ে বসতেন। কখনো তাদের উপরওয়ালা থাকতো, কখনো থাকতো না।

তখন তাঁদের আশ্রয়ে গড়ে উঠেছিল একেকটি জনপদ—তার সমাজ ও সামাজিক রীতিনীতি—বিচার-ব্যবস্থা ও জীবনযাপনের পদ্ধতি। গ্রামের মানুষ একই সঙ্গে তাঁদের ভয় করেছে, ভালোবেসেছে, শ্রদ্ধা করেছে, ঘৃণা করেছে। হয়তো দীর্ঘকাল-ব্যাপী এই সামন্ততান্ত্রিক আভিজাত্যের অন্তরালে ছিল বহু অনাচার আর অত্যাচারের কাহিনী।

আবার তাঁদের কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল বহু 'মিথ'। বহু অলৌকিক গল্পের উৎস হয়ে উঠেছিল একেকটি পরিবার।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা পালটেছেন।

অদল-বদল হয়েছে সামাজিক ব্যবহারও।

যে-ইতিহাস একদিন তাঁদের রাজা বানিয়েছিল, সেই ইতিহাসই অবশেষে তাঁদের রাজ্যহারা করেছে।

রাজকীয় স্মৃতি ও পরিবর্তনশীল সময়

সম্প্রতি আমার হাতে একটি বই এসেছে। সুসং-এর মহারাজা শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রচন্দ্র সিংহের 'চেঞ্জিং টাইমস' নামে একটি মূল্যবান গ্রন্থ। বইটির প্রকাশক 'অ্যানথ্রোপোলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া'।

প্রচলিত অর্থে হয়তো একে গবেষণা-মূলক রচনা বলা যাবে না। বলা উচিত, পারিবারিক স্মৃতি-মূলক রচনা। কেননা, লেখকের উদ্দেশ্য আর যাই থাক, উপলক্ষ তাঁর নিজের ও একটি অভিজাত পরিবারের ঐতিহ্য। ব্যক্তিগত স্মৃতির পাশাপাশি জায়গা পেয়েছে বহু লোকায়ত জনশ্রুতি। আঞ্চলিক বিশ্বাসের দ্বারা সেগুলি লালিত হয়ে এসেছে দীর্ঘকাল।

ঐতিহাসিকেরা তাই নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি করতে পারেন।

তবু সমাজতাত্ত্বিকের কাছে এইসব স্মৃতি, শ্রুতির মূল্য কম নয়। ব্যক্তির সীমানা ছাড়িয়ে এই গ্রন্থ হয়ে উঠেছে একটি সময় ও সমাজের ইতিহাস। আমার মতে, একটি অঞ্চল ও অধিবাসীদের পরিবর্তনশীল জীবনযাত্রার ধারাবিবরণী।

আমি বইটির পাতা উলটে যাচ্ছিলাম।

অনুভব করছিলাম, বিষয়ের সঙ্গে বিষয়ীর আন্তরিক যোগাযোগের সূত্রটি। প্রথম অধ্যায়েই মহারাজ ভূপেন্দ্রচন্দ্র বাল্য-স্মৃতির পুনরুদ্ধার করেছেন সহজ অন্তরঙ্গতায়। কখনো তাঁর ভাষা মন্থর, কখনো তন্ময়, কখনো লক্ষ্য করা গেছে উত্তর-রীতির বৈশিষ্ট্য।

সুসং-এ মহারাজ ভূপেন্দ্রচন্দ্রের জন্ম উনিশ শতকের শেষের দিকে—১৮৯৮ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর। তার মাত্র এক বছর তিন মাস আগে, ১৮৯৭ সালের ১২ জুন, এক প্রলয়ঙ্কর ভূমিকম্প হয়ে গেছে সুসং-এ। পুরনো রাজ প্রাসাদের সঙ্গে মাটির নিচে চাপা পড়েছে প্রাচীন ভাস্কর্যের সমস্ত নিদর্শন।

মহারাজ ভূপেন্দ্রচন্দ্র এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী নন, পরোক্ষ ফলভোগী।

একটি পারিবারিক ঐতিহ্যের পতন ও অন্য একটি চেতনার অনিবার্য উত্থানকে তিনি উপলব্ধি করেছেন জীবনভর। ঐ প্রলয়ঙ্কর ভূমিকম্প যেন তাকে তাঁর পারিবারিক ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে তিনি একালের মানুষে পরিণত হয়েছেন।

তাঁর ভাষায় : 'দি আর্থকোয়েক অব এইটিন নাইনটি সেভেন, লাইক ইন এ ড্রামাটিক ওয়ে, সেট দি স্টেজ ফর দি ডিজইনটেগ্রেশান হুইচ আই ওয়াজ ডেস্টাইনড টু উইটনেস অল থ্রু মাই লাইফ।'

যেন একটি বিগত স্বপ্নের বিষাদ থেকে এ গ্রন্থের প্রতিটি পংক্তি লেখা। অথচ, যা আসন্ন এবং অনিবার্য, তার অভ্যর্থনায় এতটুকু ত্রুটি কিংবা দ্বিধা নেই। সময়ের আহ্বান এবং ইঙ্গিতকে তিনি উপলব্ধি করেছেন বারবার।

পরিশিষ্টে প্রদত্ত বংশপঞ্জী থেকে জানা যায়, সুসং রাজ পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা সোমেশ্বর পাঠক ছিলেন ভরদ্বাজ গোত্রীয় একজন ব্রাহ্মণ। কান্যকুব্জ থেকে তিনি সুসং-এ আসেন ১২৮০ সালে। অর্থাৎ প্রায় সাড়ে ছশো বছর ধরে তাঁর উত্তর পুরুষেরা রাজত্ব করে এসেছেন কখনো মুঘল সম্রাটদের অধীনে, কখনো ইংরেজ সরকারের অধীনে।

সেজন্যেই, বারবার তাঁদের খেতাব বদল হয়েছে।

কেউবা পেয়েছেন 'খান' পদবী, কেউবা পেয়েছেন 'মল্লিক'। অবশেষে স্থায়ী হয়েছে 'সিং' বা 'সিংহ' পদবী।

ষষ্ঠ পুরুষ রাজা রঘুনাথ সিংহ প্রথম মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের অধীনে বশ্যতা স্বীকার করেন। সম্ভবত 'রাজা' পদবীটা সেই স্বীকৃতিরই পুরস্কার। পূর্ববর্তী আর কারুর নামের আগে ভূপেন্দ্রচন্দ্র 'রাজা' ব্যবহার করেননি।

ঐ একই বংশপঞ্জী থেকে জানা যায়, গত তিন পুরুষের মধ্যে রাজ পরিবারের কোন সদস্য কিরূপ শিক্ষালাভ করেছেন। মনে হয়, তার আগে ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণের কোনো প্রয়োজন বোধ করেননি কেউ-ই। এই সময়ে অনেকেই পারিবারিক ঐতিহ্যের আশ্রয় ত্যাগ করে চলে এসেছেন বাইরের জগতে। অনেকে গ্রহণ করেছেন নানাবিধ সরকারী বেসরকারী চাকুরী, কেউবা যোগ দিয়েছেন স্বদেশী আন্দোলনে। অনেকে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন শিক্ষকতা, কেরানীগিরি, ওকালতি প্রভৃতি কাজে।

হয়তো এছাড়া তাঁদের উপায় ছিল না। সময় তাঁদের অতি সাধারণ স্তরে টেনে নামিয়ে এনেছে। মহারাজ ভূপেন্দ্রচন্দ্র উদাসীন দর্শকের মতো এই দৃশ্য দেখেছেন। তথ্য পরিবেশনে এতটুকু কারচুপি করেননি।

ছেলেবেলার স্বপ্ন ও অন্দর-বাহির

হয়তো বিগত স্বপ্নের মতো মহারাজ ভূপেন্দ্রচন্দ্রের মনে পড়ে ছেলেবেলার দিনগুলির কথা। তাঁর বাল্যকাল কেটেছে মেয়েদের সঙ্গে, অন্দর মহলে। বর্ধমান কিংবা কোচবিহারের মহারাজার মতো ইট, পাথরের প্রাসাদ ছিল না সুসংয়ের। অন্দর মহলে ছিল বারো প্যাটার্নের প্রকাণ্ড চারটে আটচালা। প্রতিটি আটচালার সঙ্গে ছিল বাথরুম, হলঘর ইত্যাদি।

এইসব বাড়ী তৈরীর উপযুক্ত বাঁশ, বেত, কাঠ প্রভৃতি আসতো স্থানীয় বন-জঙ্গল কিংবা নিকটবর্তী গারো পাহাড় থেকে।

তাছাড়া এই অন্দরের সংলগ্ন ছিল আরো কয়েকটি বাড়ী। ছিল রান্নাঘর, ঠাকুরঘর, ভাঁড়ার ঘর, বিধবা পিসির জন্য বিশেষভাবে তৈরী টিনের ছাউনী দেওয়া একটি মাঝারি আয়তনের ঘর। অর্থাৎ একটি অভিজাত হিন্দু পরিবারের স্বচ্ছল ছবি। আত্মীয়-স্বজন, অতিথি অভ্যাগতের ভিড়ে জম-জমাট। ছিল ঢেঁকিশাল, হাতীশাল, চাকর-চাকরাণী, ছেলেমেয়েদের কোলাহল।

বাঁশ, কাঠের সুউচ্চ দেয়াল দিয়ে ঘেরা ছিল অন্দর মহল।

ভেতরের লোক বিনা-উপলক্ষে বাইরে যেতে পারতো না। বন্দুক পুরুষেরা অন্দর মহলে ঢোকার আগে চাকর-চাকরাণীদের কেউ উচ্চৈস্বরে কর্তার উপস্থিতির কথা ঘোষণা করে দিতো পূর্বাহ্ণে। মেয়েরা বড় বড় ঘোমটা টেনে যে-যার বাংলোয় ঢুকে পড়তেন। এমন কি অন্দর মহলে বাড়ীর বিবাহিতা মেয়েরা বিনা ঘোমটায় চলাফেরা করতে পারতেন না।

কেবল বাড়ীর বউরেরা এ ব্যাপারে কিছুটা স্বাধীন ছিলেন। শাশুড়ী এবং স্বামীর বড় বোনের সামনে তাঁদের ঘোমটা দিতে হতো।

মহারাজ ভূপেন্দ্রচন্দ্রের এই শৈশব-স্মৃতির সময়-কাল বিশ শতকের প্রথম কয়েক বছর। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ছায়া পড়েনি তখনো বাংলাদেশে। য়ুরোপের সমাজ-মানসে তার গোপন প্রস্তুতি চলছিল হয়তো। তিনি স্মরণ করেছেন খর গ্রীষ্মের দিনগুলির কথা।

প্রায়ই আগুন লাগতো চষীদের কুঁড়ে ঘরে, খড়ের গাদায়। মাঝে মাঝে আগুন লাগতো দূরের পাহাড়ে। রাজবাড়ীর অন্দর মহল থেকে দেখা যেতো সেই আগুনের শিখা।

ছোট ছেলেমেয়েদের কাছে ঐ পাহাড়-গুলি ছিল স্বর্গীয় পরীদের বিচরণভূমি। তারা বলাবলি করতো, বন মধ্যে কোনো পাপ নেই, কেবল সে-ই দেখতে পায় পরীদের।

অন্দর মহলের সীমানা ছাড়িয়ে সহজে কোনো শিশুই বড়বাড়ী, মধ্যমবাড়ী কিংবা রংমহলে যেতে পারতো না। চাকর-চাকরাণী-দের হাতবদল হয়ে ছোট ছেলেরা বাইরে খেলাধুলো করতে যেতো বিকেলের দিকে। ধীরে ধীরে রপ্ত করতো ঘোড়ায় চড়ার কৌশল।

সান্ধ্য-প্রার্থনার পর বড়রা পুরনো দিনের গল্প করতেন,—ভূমিকম্প কিংবা হাতী ধরার কাহিনী। সকলেই সেসব কথা বিস্ময়ের সঙ্গে শুনতেন।

মহারাজ ভূপেন্দ্রচন্দ্র এই পরিবেশে ক্রমাগত শিক্ষিত হয়ে উঠতে থাকেন। সৌজন্যবোধ, শিষ্টাচার, রাজকীয় আচার-আচরণ শেখাবার জন্য তাঁকে মাঝে মাঝে রাজদরবারে নিয়ে আসা হতো।

এভাবে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ—ব্যবসায়ী খাজাঞ্চি, প্রজা ও অভিজাত প্রায় প্রতিটি মানুষের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটতে থাকে দিনের পর দিন। অন্দরের প্রাচীর পেরিয়ে তিনি ক্রমশ এগোতে শুরু করেন বৃহত্তর মানব সমাজের অভিমুখে। শিকার করতে গেছেন হাতীর পিঠে চড়ে—বনে-জঙ্গলে, সোমেশ্বরীর ধারে। কখনো করেছেন বাঘ শিকার, কখনো করেছেন হাতী শিকার পরিচিত হয়েছেন লোকালয়ত মানব-সমাজ আদিবাসী ও নিম্নশ্রেণীর অতি সাধারণ মানুষের সঙ্গে।

রূপকথা, উপকথার দেশ এই সুসং। মৈমনসিং গীতিকার অন্যতম উৎসভূমি। মহারাজ ভূপেন্দ্রচন্দ্র লৌকিক বিশ্বাসের নানা কাহিনীকে উল্লেখ করেছেন ঘটনাক্রমে।

সময়ের ডাক

কিন্তু সময় থেমে থাকে না। ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছাতেই হোক—সকলকেই তার আহ্বানে সাড়া দিতে হয়। যে কারণে সুসংয়ের রাজকুমারেরা নগরমুখী হয়েছেন, ঠিক সেই কারণেই প্রজারা ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠেছে। দেশের মানুষ পেয়েছে ভিন্নতর চেতনার আলো। জাগরণ ঘটেছে ভেতরে-বাইরে।

১৯১৬ খৃঃ প্রেসিডেন্সী কলেজে আই-এ পড়ার সময় ভূপেন্দ্রচন্দ্রের পিতা মহারাজ কুমুদচন্দ্র মারা যান। রাজপদে অভিষিক্ত হলেন ভূপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ।

চারদিক থেকে ডাক আসতে লাগলো।

রাতারাতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বে পরিণত হলেন। সরকারী গেজেটে তাঁর নাম ছাপা হলো সুসংয়ের মহারাজা হিসেবে। উত্তরসূরী হিসেবে পিতার গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলিতে তাঁর ডাক পড়তে লাগলো। হয়তো বা কিছুটা বিমূঢ় বোধ করছিলেন তিনি। ধারণা ছিল না সুসংয়ের রাজকীয় মন-সৌজন্যের পরিমাণ সম্পর্কে। কলকাতার হাই-সোসাইটির মানুষ তিনি। সুতরাং নানারকম সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংস্থার সদস্য কিংবা সভাপতি কিংবা প্রধান উপদেষ্টা।

একজন অপ্রস্তুত মানুষের মতো বার-বার তাঁর ওপরে আরোপিত এই সম্মান ও নেতৃত্বের জন্য তিনি বিব্রত বোধ করতে থাকেন। এমন কি কলেজের ছাত্র, অধ্যাপকেরা পর্যন্ত তাঁকে আলাদাভাবে দেখতে শুরু করেন। তাঁর আত্মিক মন ও [illegible]

বেঙ্গল কেমিক্যালের
পারফেক্টেড্
কোল্ড ক্রীম অব রোজেস
ল্যানোলিন সংযুক্ত
সকল ঋতুতে ত্বক অম্লান ও নিরাপদ রাখে
টিউব এবং
সুদৃশ্য আধারে পাওয়া যায়
বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা • বোম্বাই • কানপুর • দিল্লী
Progressive/BC

উপলব্ধি করেন বারবার। অধিকতর সহজ জীবন ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে এইসব মিথ্যে সম্মানকে তিনি প্রতিবন্ধক বলেই মনে করেন।

ঐ সময়ে উপলব্ধি করেন, পূর্ববঙ্গীয় জমিদারদের সঙ্গে কলকাতার অভিজাত সম্প্রদায়ের একটি প্রচ্ছন্ন বিরোধ চলছে ভেতরে ভেতরে। ইংরেজ সরকার হয়তো বা তাকে প্রশ্রয়ই দিচ্ছিলেন। তাঁরা চাইতেন সামন্ততান্ত্রিক আভিজাত্যের বদলে ধনতান্ত্রিক আধিপত্য।

১৯২২ সালে মহারাজ ভূপেন্দ্রচন্দ্রের বিয়ে হয় উত্তর বাংলার এক জমিদার কন্যার সঙ্গে। কন্যার বয়স এগারো। দাদাশ্বশুর প্রভু কিশোরীলাল গোস্বামীর ছেলে কুমার তুলসীচরণ গোস্বামী ছিলেন তাঁর সহপাঠী। ভদ্রলোক সেই সময়ে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন সামাজিক জীবনে। বিলিতি শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে তিনি প্রথাভঙ্গ করে লর্ড এস পি সিনহার মেয়েকে বিয়ে করে বসেন।

বাংলাদেশের 'ব্রাহ্মণ সভা'র সভাপতি ছিলেন তখন মহারাজ ভূপেন্দ্রচন্দ্র। সনাতনী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও অন্যান্য সদস্যদের তাই নিয়ে দেখা দেয় তীব্র মতবাদ। অনেকে তুলসীচরণকে একঘরে করার পক্ষপাতী ছিলেন। মহারাজ ভূপেন্দ্রচন্দ্রের তা ভালো লাগেনি। ব্রাহ্মণ সভার সভাপতির পদ থেকে অব্যাহতি পেলেই যেন বাঁচেন—এমনি অবস্থা। অনেকে লর্ড এস পি সিংহের নামে পর্যন্ত কুৎসা ছড়াতে শুরু করেন।

তিনি লক্ষ্য করেন, প্রগতিশীল চিন্তাধারার সঙ্গে এই সভার সদস্যদের কোনো যোগাযোগ নেই। শাস্ত্রের চেয়ে সংস্কার তাঁদের কাছে বড়। ফলে, ক্রমশই ব্রাহ্মণ সভা প্রতিক্রিয়াশীল ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী কিছু মানুষের একটি আড্ডাকেন্দ্রে পরিণত হয়।

তাঁর এই মানসিকতার উৎস খুঁজতে গেলে হয়তো সবার আগে তাঁর বাবার নাম মনে পড়বে।

তিনি লিখেছেন যে, তাঁর বাবা যদিও সামন্ত ঐতিহ্যে লালিত, সুসংয়ের জনপ্রিয় মহারাজা ছিলেন। তবুও তিনি চাইতেন ভূপেন্দ্রচন্দ্রকে সামন্ততান্ত্রিক পরিবেশ থেকে দূরে রাখতে। কেবল গ্রীষ্মের ছুটি ছাড়া কখনো তিনি তাঁকে সুসং-এ যেতে দিতেন না। রাজ দরবারের সামন্ততান্ত্রিক রীতি-নীতি সম্পর্কে কোনো ধারণা তাঁর হোক—এটা বোধহয় চাইতেন না তিনি। সেজন্য তাঁর বাবা তাঁকে উৎসাহ দিতেন নানারকমের সামাজিক অনুষ্ঠান এবং সাংস্কৃতিক উৎসবে যোগ দেবার জন্যে। যৌবনের দিনগুলিতে তিনি দেখেছেন, তাঁর পিতার অন্তরঙ্গ বান্ধবদের—মহারাজ ... কলকাতার বাড়ীতে ... প্রায়ই ...

বাড়ীতে প্রায়ই আড্ডা বসতো নানারকম আলোচনার উদ্দেশ্যে। তাতে প্রায়ই আসতেন স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্যার বিজয়চাঁদ মহতাব, মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, সুরেশ সমাজপতি, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, জগদীশচন্দ্র বসু প্রমুখ প্রখ্যাত ব্যক্তিরা।

বিচিত্র স্মৃতির মালা তৈরী করে মহারাজ ভূপেন্দ্রচন্দ্র সেদিনের ঘটনাবলী বর্ণনা করেছেন অন্তরঙ্গভাবায়। সামন্ততান্ত্রিক সংস্কারকে অস্বীকার হয়তো করতে পারেননি তিনি। অভিজাত একটি পরিবারের ঐতিহ্যকে এড়িয়ে যাবেনই বা কি করে?

তবু পরিবর্তনশীল সময়ের আহ্বান এসেছে তাঁর কাছে। তিনি হৃদয় দিয়ে তা উপলব্ধি করেছেন। এগিয়ে এসেছেন জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের কাছে। অংশ গ্রহণ করেছেন, অসহযোগ আন্দোলনে। রাজপরিবারের আভ্যন্তরীণ জীবনও তখন বিপর্যয়ের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। ঢুকেছে মামলা-মোকদ্দমা, শরিকদের মধ্যে মনোমালিন্য।

তার ছায়া পড়েছে প্রজাদের ওপর।

রাজার বিবাদে তারা বিরক্ত। অনেকে জাগছে নতুন চেতনা নিয়ে। কেউ যোগ দিয়েছে মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনে। কেউবা বিপ্লবী হয়ে উঠেছে সন্ত্রাসবাদী সংগ্রামের ব্যাপারে। ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে আদিবাসী ও স্থানীয় জনসাধারণ।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে তিনি গিয়েছিলেন সুসং পরগণার অভ্যন্তরে, গারো পাহাড়ে। দেখেছেন অন্যরকম দৃশ্য। কৃষক এবং আদিবাসীদের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে সাম্যবাদী চিন্তাধারা। সরকারী উদাসীনতার ও ক্ষমতার অপব্যবহারে অসন্তুষ্ট প্রজারা সমবেত হচ্ছে কমিউনিজমের ছায়াতলে। বিশেষ করে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষের দিকে কমিউনিস্ট আন্দোলন সাফল্যলাভও করেছিল।

কেন এই গ্রন্থ, কি তার প্রয়োজন?

পাঠকের দিক থেকে প্রশ্ন উঠতে পারে, বিগতকালের এই কাহিনী শুনে আমাদের কি লাভ? মহারাজের রাজত্ব গেছে কালের নিয়মে। আমরা তাই নিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলবো কেন?

কিন্তু ইতিহাস তাকে ভোলে না। আগামীকালের মানুষকে পথ চলতে সাহায্য করে।

মহারাজা ভূপেন্দ্রচন্দ্র নিজের জীবন ও পারিবারিক ঐতিহ্যের স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে সমকালীন সমাজের কথা বিস্মৃত

হননি। হয়তো অনেকের কাছে তব সমস্তটাই গ্রহণযোগ্য হবে না। কিন্তু একজন অনুসন্ধিৎসুর কাছে তার বিবরণ মূল্যবান বলে বিবেচিত হবে।

বইটির দ্বিতীয় অংশে লেখক সুসংয়ের ভৌগোলিক এবং ঐতিহাসিক পটভূমির পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন। জায়গাটি মৈমনসিং জেলার নেত্রকোনা মহকুমার অন্তর্গত দুর্গাপুর থানার অধীন। উত্তরে গারো পাহাড় পর্যন্ত তার সীমানা বিস্তৃত। প্রাকৃতিক কারণে সদর মৈমনসিং থেকে কিছুটা বিচ্ছিন্ন। নিকটবর্তী রেল স্টেশন জারিয়া-ঝাঞ্জাইল থেকে নৌকোয় যেতে হলে সময় লাগে প্রায় পঞ্চাশ ঘন্টা।

স্বভাবতই এই অঞ্চলের মানুষ সম্পর্কে সমাজতাত্ত্বিকের কৌতূহল অপরিসীম।

প্রচণ্ড মৌসুমী বৃষ্টির দেশ এই সুসং। বছরে বৃষ্টিপাত শত দুশো ইঞ্চি। তার মাত্র সত্তর মাইল উত্তরে পৃথিবীর সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাতের জায়গা চেরাপুঞ্জি অবস্থিত। ফলে, হাওয়া কখনো তেমন উত্তপ্ত হয়ে ওঠে না। শীতের সময়ে প্রচণ্ড শীত। একেবারে হাড় কাঁপিয়ে দেয়। প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যে মনোরম।

বলা যায়, নিসর্গ আশ্রিত এখানকার মানুষ—তার সমাজ ও সামাজিক ব্যবস্থা। বৃহত্তর বাংলা তথা ভারতবর্ষের সঙ্গে এখানকার যোগাযোগ প্রত্যক্ষ নয়, পরোক্ষ। শিক্ষা-দীক্ষার প্রসার ঘটেছে অত্যন্ত মন্থর গতিতে। কিছুটা মিশনারীদের প্রভাবে। ফলে, ধর্ম, ঈশ্বর বিশ্বাস, রাজানুগত্য প্রভৃতি মূল্যবোধগুলির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আদিবাসী সংস্কার ও রীতিনীতি—পীর, গাজীদের শিক্ষা ও লোকায়ত আচার-আচরণ।

এই গ্রন্থে সেই সমাজের সমস্ত বৈশিষ্ট্য উদ্ঘাটিত না হলেও, মহারাজ ভূপেন্দ্রচন্দ্র প্রসঙ্গক্রমে তার মূল সূত্রগুলির প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। প্রথম অংশে তিনি লিখেছেন সমকালীন সুসংয়ের ঘটনাবলী এবং স্মৃতিচিত্র। দ্বিতীয় অংশে দিয়েছেন সাংস্কৃতিক পটভূমির পরিচয়।

মুখবন্ধে নির্মলকুমার বসু লিখেছেন, বইটি কেবল চমৎকার পাঠযোগ্য আত্মজীবনী নয়, সহানুভূতির সঙ্গে চিত্রিত পরিবর্তনশীল ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির ঘটনাবহুল বিবরণ।

সাধারণ পাঠকের পক্ষেও বইটি মূল্যবান। তাঁরা উপলব্ধি করবেন, শতাব্দীকালের বহুধাবিস্তৃত একটি সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার পতন ও পরিবর্তনের ইঙ্গিতগুলি। শুনতে পাবেন, দীর্ঘশ্বাসের মধ্যেই জন্ম নিচ্ছে নতুনতর মানব সমাজ। পুনরুক্তি করে বলতে ইচ্ছে হয়, এই গ্রন্থ একটি সময় ও সমাজের ইতিহাস।

—গ্রন্থদর্শী

সর্দি-কাশিতে শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে— আর পাঁচরকম রোগে ধরে

স্বাস্থ্য
ও শক্তির জন্য
ওয়াটারবেরিজ কম্পাউণ্ড

সর্দি-কাশি হলে আপনার রোগনিরোধক শক্তি কমে যায়, শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে এবং অন্যান্য সংক্রামণের ভয় থাকে। তাই নিয়মিতভাবে ওয়াটারবেরিজ কম্পাউণ্ড খাবেন। ওয়াটারবেরিজে নানা স্বাস্থ্যপ্রদ উপাদান রয়েছে যাতে জীবনীশক্তি ফিরিয়ে আনে, খিদে বাড়িয়ে তোলে, শরীরে প্রতিরোধক্ষমতা গড়ে তোলে। 'ক্রিওজোট' আর 'গুয়াকল' থাকায় এতে সর্দি-কাশির উপশম হয়।

ওয়াটারবেরিজ কম্পাউণ্ড - সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য টনিক

ওয়ার্নার-হিন্দুস্তান লিমিটেড

নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

(৩২)

তখন ভালবাসার যৌবন হরণ করিয়া নেয় আকালুদ্দিন। আন্নু ঘরের ভিতর। ফেলু বাছুর নিয়ে মাঠে গেছে।

ফেলু মাঠে নেমেই দেখল দুটো ঘোড়া পুকুর পাড়ে গোলাপজাম গাছটায় কারা বেঁধে রেখেছে। অনেক লোকজন ছুটে যাচ্ছে ঠাকুরবাড়ি। বড়োকর্তার শরীর খারাপ হতে পারে। ঘোড়া তারিণী কবিরাজের হবে। ঘোড়ায় চড়ে শ্বাসকষ্ট নিরাময় করতে এসেছেন। অন্য ঘোড়া মতি মাস্টের হবে। ওরা বড়োকর্তার বড় যজমান। কিন্তু তখনই ফেলু দেখল কজন পুলিশ পুকুর পাড়ে কি খুঁজছে। নীল পাগড়ি মাথায় দুজন মানুষ ঘোড়া দুটোকে কি খেতে দিচ্ছে। বুঝি থলের ভিতর চানা দিয়ে মুখে বেঁধে দিয়েছে। সে দূর থেকে ঠিক ঠাওর করতে পারছে না। হাতে চানা খাওয়াচ্ছে, না থলের ভিতর চানা। দফাদারের হাত চেটে দিচ্ছে না পিঠ চেটে দিচ্ছে তাও বোঝা যাচ্ছে না। শুধু দুই ঘোড়া গাছের নিচে দাঁড়িয়ে কিছু একটা করছে বোঝা যাচ্ছে।

আকালুদ্দিন বাঁশঝাড়ের নিচে টেনে এনেছে বিবিকে। লোকজন ছুটছে হিন্দুপাড়াতে, ছোট ঠাকুরকে পুলিশে ধরে নিয়ে যাচ্ছে এমন একটা সোরগোল শুনেই আন্নু বাড়ি থেকে বের হতে যাবে তখন আকালুদ্দিন সামনে। আতর মেখে দাড়িতে হাজির। সারা রাত আজকাল আর আন্নু ঘর থেকে বের হতে পারে না। ফেলু মটকা মেরে পড়ে থাকে। ঘুমায় না। হাতের কষ্টে সে সারারাত ছটফট করে। কিন্তু আন্নুর মনে হয় ওটা হাতের কষ্ট নয়—যাম ভিতরে সেই সন্দেহের কোড়া পাখিটা কুরে কুরে খায়। ঘুম আসে না মিঞার চোখে। আকালুদ্দিন মিঞা তার ঘুম হরণ করিয়া নিছে। আকালুদ্দিন সামুর পরই এ-অঞ্চলে লীগের বড় নেতা। সামু গাঁয়ে বড় আসে না, এলেও দু একদিন থাকে তারপরই চলে যায়। আকালুদ্দিনের উপর সব ভার এখন। সে মুসলমান গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে মানুষজনকে তার দলে টানছে। কারণ আবার নির্বাচন আসছে, যা শোনা যাচ্ছে এবারে পৃথক নির্বাচন হবে; কোন সালে হবে কে জানে। হক সাহেবের তেমন আর রবরবা নেই। আকালুদ্দিন মাঠে নেমে যাবার সময় খালি বাড়ি পেয়ে এক লাফে ঘরের ভিতর। বিবিকে টানতে টানতে একেবারে বাঁশবনের ভিতরে। —আরে মিঞা কর কি, কর কি! সময় অসময় নাই!

—তুই চুপ কর বিবি! ঐ দ্যাখ মরদ তর মাঠে। ঘোড়া মুরগের মত হাইটা যায়।

আন্নু কাপড় তুলে উঁকি দিয়ে দেখল, সত্যি ফেলু মিঞা খোয়াব বসে গেছে।

আকালু তখন আন্নুকে একটা জবরজঙ্গ মুরগী বানিয়ে ফেলল। মুরগী বানিয়ে আকালু আন্নুকে নাস্তানাবুদ করে দিচ্ছে। সে সেই আবছা মতো জায়গায় দাঁড়িয়ে হেসে উঠল, আমার মরদ লাথি মারে মিঞা! মালিশ দিতে দিতে সে আমারে বার বার একটা দুষ্টু মুরগী বলে যাচ্ছে। আকালু দাঁড় বসে ঝিমুচ্ছিল যাড়ে। বড় আরাম বোধ হচ্ছে দুজনার।

সামান্য এক বাছুরও নাস্তানাবুদ বানিয়ে দিচ্ছে ফেলুকে। বাছুর লেজ তুলে ছুটছে ফেলুকে নিয়ে।

আকালু দাড়ির আতর তখন বিবির মুখে ঘসে দিচ্ছে। পিঠে হাত রেখে ঘাড় চেটে দিচ্ছিল। তারপর যা হয়, পরের বিবিকে বিসমিল্লা রহমানে রহিম বলে বনে জঙ্গলে ভোগ করে একেবারে তাজা মানুষ আকালু। অথবা যেন সে মোল্লা বনে যায়। পান খায়, গুয়া খায় এবং বারে বারে নদীর পাড় দিয়া হাইটা যায়।

পরের বিবিকে মুরগী বানিয়ে আকালু হাঁটছে নদীর পাড়ে। সেও দেখতে পেল দুটো ঘোড়া গাছের নিচে বাঁধা। সে মনে মনে কপট হাসল। কারণ তখন ফেলুর বাছুরটা লেজ তুলে মাঠের দিকে না নেমে বাড়িমুখো উঠে যাচ্ছে।

কে যেন বলে, ফেলু তর মরণ! তর বিবির শরীরে আতরের গন্ধ। তুই আতরের গন্ধ টের পাবি বলে, তোকে বাড়িমুখো উঠে যেতে দেখলে বিবি তর ঝাঁপ দিবে পুকুরে। আর আছে বড় হাজি সাহেবের। সে তারে রেখেছে তাই দেখায় চষা মাঠের উপর দাঁড়িয়ে। তর যে কি হবে ফেলু! তুই কি তালাক দিবি বিবিকে! ফেলু মনে মনে হাসে। সে আজকাল একা থাকলেই মনে মনে কথা বলে! ওর এটা ক্রমে স্বভাব জন্মে গেছে। তখনই তার মাইজলা বিবির জন্য মনটা টন টন করতে থাকে। —আমার আল্লাডা কি আল্লা! সে এক হাত উপরে তুলে নসিবের কথা আল্লাকে জানাতে চাইলে দেখতে পায় আকালুদ্দিন মিঞা নদীর পাড়ে হাঁটতে যায়। মিঞা যাবে বক্তৃতা দিতে। পরাপরদীর হাটে লীগের সভা। সকাল সকাল দলবল নিয়ে চলে যাবে। এখন গাঁয়ে গাঁয়ে সে চাষী মানুষ যোগাড় করতে যাচ্ছে। তারও ইচ্ছা হাটে সে যাবে একবার। তার এই লম্বা কথা শুনতে ভাল লাগে। গলে কাঁটা দেয় যখন আকালুদ্দিন বলে, দ্যাখেন মিঞারা, চক্ষু তুইলা দ্যাখেন: কি আল্লাডা আপনেগ! খানা নাই পিনা নাই, জানে নাই খুশ, হিন্দুরা সব চুরি কইরা নিছে। তখন মনেই হয় না—অ-হালা হারামজাদা তার বিবির তালাকের জন্য বসে আছে। দশ কুড়ি দশ টাকার লোভ দেখাচ্ছে। তালাকনামা কবে দিলেই সে তার মজুরী পেয়ে যাবে। তালাকনামা পেলে বিবি মল বাজিয়ে উঠে আসবে আকালুর উঠানে।

ক্রমশ

ফেলু তখন হাসে! সেই এক নিষ্ঠুর হাসি। —আরে মিঞা এডা কি কও। বিবির দাম মিঞা থাবলা থাবলা জমির মতন। তারে কম মূল্যে বিচা দাও তা কি কও ম্যাহি! যতদিন আছে তাইন, আমি আছি ততদিন। আমার মুরোদ তোমার কাছে আছে। দশ কুড়ি দশ টাহা একডা টাহা! টাকা পয়সা সব জলে, বিবি যদি চলে যায় তবে ফেলুর থাকে কি! আমি যে মিঞা ফেলু শেখ, আমার হাত ভাইঙ্গা দিছে পাগল ঠাকুর। ঠাকুর তুমি আর এক খণ্ড। তিন খণ্ডের মোকাবিলা করতে পারি আমি এক ফেলু! এক খণ্ড হাজি সাহেবের খোলাই বাড়ি, অন্য খণ্ড মিঞা আকালুদ্দিন, আর হাত ভেঙে দিয়ে পাগল ঠাকুর হয়ে গেছে তিন খণ্ডের এক খণ্ড। সে ফাঁক পেলেই এখন কোরবানীর চাকুতে ধার দিচ্ছে। কার গলা ফাঁক করবে তার আল্লা জানে!

তা যা আছে কপালে! দেবে পাড়ি একদিন মুড়াপাড়া। হাতের এই বাগি বাছুর কোরবাণী দিয়ে আসবে ভাঙা মসজিদের বেদিতে। মুড়াপাড়ার বাবুরা সাতটা মসজিদের খরচ দেয়, কাচারি বাড়ি থেকে খরচ যায়. তবু তোমরা মিঞা মা আনন্দময়ীর পাশে এই যে বন এক ভাঙা মসজিদ আছে. বন জঙ্গল আছে সেখানে নামাজ পড়তে পারে না। মিঞা আকালুদ্দিন এই নিয়ে এ-অঞ্চলে বক্তৃতা করে বেড়াচ্ছে। মৌলভি সাব বাজারের, মুড়াপাড়ার বাজারে যার সুতার কারবার আছে সে এসেছিল একবার, সে এসে বলে গেছে, আল্লার দুনিয়ায় কাফের থাকুক, আল্লা তা চান না। বিধর্মী নিধন হউক। ইনসান আল্লা—পরবে পরবে জিগির দাও, দেশ চাই পাকিস্তান। হিন্দুগ দেবী দুই ঠ্যাং ফাঁক কইরা কি যে কাণ্ড একখান—সোনার মুণ্ডমালা গলায় চোয়চা চখে চাইয়া থাকে। পারেন না মিঞা কোরবাণী দিতে আল্লার নামে নিজের জান। নামাজ পড়তে পারেন না মিঞা ভাঙা মসজিদে! আপনেরা যদি আল্লার দরবারে জেহাদ মুখে পড়েন, কি জবাবডা দিবেন কন দিহি। আপনেরা আবার কন আল্লার বান্দা!

ফেলু মনে মনে কবুল করল, সাঁচা আল্লার বান্দা এই নামে তবে কাম কি। তা তুমি মিঞা আকালুদ্দিন এত কথা কও, খুশে উইঠা নাচন কোদিন কর, তুমি মিঞা তবে জিগির দাওনা ধর্মযুদ্ধের—কে আছরে মিঞা কোন গাঁয়ে কারা আছ, আল্লার বান্দা দুনিয়াতে আইসা তবে কায়দা কি, তা চল যুদ্ধে, ধর্মযুদ্ধে, হাতে বল্লম, সড়কি, বাঁশের লাঠি এবং তোমার যা আছে, যদি না থাকে তবে সুপারির শলা। দাও ইবারে আল্লা-হু-আকবর বলে ধ্বনি একখানা!

কিন্তু তখনই মনে হল ধ্বনি উঠছে ঠাকুর বাড়ি। সবাই মিলে ধ্বনি দিচ্ছে—বন্দেমাতরম। কি কারণ এ-ধ্বনির! কারণ সন্দেহে দারোগা ছোট ঠাকুরকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। এসেছিল রঞ্জিতকে ধরতে, কিন্তু তাকে পেল না। নিজ বলে দারোগা সাহেব শমন ধাড়া করে ধরে নিয়ে যাচ্ছে ছোট ঠাকুরকে। শশীভূষণ ধ্বনি দিচ্ছে, বন্দে-মাতরম! ধ্বনি দিচ্ছে, শচীন্দ্রনাথ কি, জয়! ধ্বনি দিচ্ছে, ভারতমাতা কি জয়! দেশের কাজে মানুষ জেলে যায়। ফেলু দুবার জেল খেটেছে। খুনের দায়ে জেল খেটেছে। আর শচী ঠাকুর খাটবে স্বদেশীর জন্য। সেও একবার এ-ভাবে জেলে যেতে চায়। ওদের দেখাদেখি সেও মাঠের এ-পাড়ে দাঁড়িয়ে হাঁক দিল, আল্লা-হু-আকবর। হিন্দুরা কিছুতেই ওদের জন্য দেশটা আলাদা করে দিচ্ছে না। পায়ের তলায় রেখে কেবল মজা দেখতে চায়। হালার হালা কাওয়া! হালার হালা কাফের!

কিন্তু ফেলুর হাঁক এত আস্তে হল যে সে যেন নিজেই শুনতে পেল না। তবে কি ওর গলা বসে গেছে! গতকাল সে চিল্লা-চিল্লি করেছে বিবির সঙ্গে। বিবি তার দুই কাঠা ধান এনেছে। ধান এনেছে গতর খেটে। সে একবার বিল থেকে বড় মাছ ধরে এনেছিল—কারণ বিবি তার সব পারে, সব চুরি করে আনতে পারে, এই চুরি করার নামে বিবি তার মাঠে যায়—আর কতদিন পাহারা দিয়ে রাখবে। মাঝে মাঝে তার মনে হয়, বিবির খাইস মিটে না, পাল-খাওয়া গরুর মতো লাফায়, চোখ সাদা করে রাখে। তখন ওর ইচ্ছা হয় মাজায় একটা দুম করে লাথি মারে। লাথি মারলেই পাল থেকে যাবে, থেকে গেলেই গরু তার গাভিন, আর লাফাতে পারবে না। এত আর শরীরে তখন মোহব্বত থাকবে না। চোখ মুখ সাদা ফ্যাকাশে—আন্নু একটা উরাট জমির মতো খালি পড়ে থাকবে। আবাদ করতে কেউ আসবে না।

তখন হালার বাছুর একেবারে উঠানে। বাছুরটার পেছনে ফেলু ঠিক ছুটে আসবে। গায়ে মুখে আন্নুর আতরের গন্ধ। সে তাড়াতাড়ি বাছুর উঠানে দেখেই মুখ ধুয়ে ফেলল। কিন্তু পিঠে, ঘাড়ে গন্ধটা লেগে আছে। ফেলু কাছে এলেই টের পাবে। বাছুরটা যত নষ্টের গোড়া। সে ভাবল উঠানে নেমে ফেলু উঠে আসতে না আসতে আবার মাঠে তাড়িয়ে দেবে কিনা। এখন এটা না হলে মানুষটা আসত দুপুরে। যখন মাথার উপর সূর্য তখন ফেলু উঠে আসে। ঘাড়ে গলায় সামান্য পেঁয়াজ রসুনের গন্ধ মেখে রাখে আন্নু। ফেলু টের পায় না আকালু বিবিকে ভোগ করে গেছে।

এখন আন্নু তাড়াতাড়ি কি যে করবে! আর তখনই হিন্দুপাড়াতে আবার সেই ধ্বনি। সে যেন অনেকদিন পর এমন ধ্বনি শুনতে পাচ্ছে। সে এতক্ষণ আকালুর সঙ্গে গোপনে পীরিত করছিল বলে খেয়াল করেনি। কিন্তু আকালু চলে যেতেই একে একে হুঁস ফিরে আসায়. নতো সে শুনতে পাচ্ছে—হিন্দুপাড়াতে জয়ধ্বনি উঠছে। দলে দলে লোক যাচ্ছে হিন্দু পাড়ার দিকে। সে ঈশম এবং মনজুরকে চিনতে পারছে। মনে হল ছোট ঠাকুরকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে কারা। পুলিশের লোক! ওর বুকটা ধড়াস করে উঠল। ফেলুটা মাঠে দাঁড়িয়ে আছে। ওর যান পরানে ডর ভয় নাই। ছোট ঠাকুর মাঝখানে। আগে সামনে পুলিশ। সোনা লালটু পলটু অর্জুন গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে আছে। পাগল মানুষ তরমুজের জমিতে দাঁড়িয়ে আছেন। নরেন দাস আভারানি মাঠে এসে নেমেছে। গৌর সরকার, জেলেপাড়ার সব লোক নেমে এসেছে।

একটা ফড়িঙ এ-সময় আন্নুর মাথার উপর এসে বসল। সে ফড়িঙটা উড়িয়ে দেবার সময়ই দেখল ফেলু উঠে আসছে। একেবারে কাছে এসে গেছে। এবার সে আতরের গন্ধ পেয়ে যাবে। কি করে! কি করে! সামনে ছিল হাজিদের পুকুর। সে পুকুরে ঝাঁপ দিল এবং জলে ডুবে গেল। ফড়িঙটা আন্নুর মাথার উপর বসার জন্য জল পর্যন্ত উড়ে উড়ে এসেছিল, জলের উপর ঘুরে ঘুরে গেল। কিন্তু আন্নু জলের নিচে ডুবে গেলে কোথায় পাবে তারে। ফড়িঙটা আন্নুকে খুঁজে পেল না বলে আবার মাঠে উড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। ফেলু পাড়ে দাঁড়িয়ে ফড়িঙের মজা দেখবে না বিবিকে ডাকবে—কি যে করবে ভেবে পেল না। সে একটা হাবা মানুষের মতো পুকুর পাড়ে দাঁড়িয়ে বিবি কখন জল থেকে ভেসে উঠবে সে আশায় দাঁড়িয়ে থাকল।

হঠাৎ আন্নু মাঝ-পুকুরে একটা চিতল মাছের মতো ভেসে উঠল।

ফেলু হাঁকল, আমার বিবিরে।

বিবি ফের ডুব দিল জলে।

—বিবিরে পানির নিচে তর কি হারাইছে?

জলের নিচ থেকে তখন বুড়বুড়ি উঠছে।

পানির নিচে কার কি যে হারায়। আন্নু ডুবসাঁতারে এখন পুকুর পার হয়ে যাচ্ছে। ফেলু, বিবির ডুবসাঁতার দেখছে। ওর জলের উপর ভেসে ওঠা দেখছে। আন্নুর শরীর জলে ভিজে থাকলে ফেলুর বড় কষ্ট হয়। টানা টানা চোখ। খোরশার অন্তরালে সে এমন খুবসুরত বিবিকে রাখতে পারল না। ওর হাত না ভাঙলে বিবির কপালে কত সুখ ছিল। সে বিবির জন্য বাবুরহাটের শাড়ি কিনে আনত, আটচালা ঘর, এবং একটা ময়না পাখি কিনে দিতে পারত। পায়ে মল, হাতে বাজু এবং কপালে টিকলি আর গলায় বিছা হার। কোমরে রুপোর পইছি রোদে চকচক করত। এমন পুষ্ট শরীরে এসব থাকলে বিবি তার বেগম বনে যেত। হায় তার নসিবে এত দুঃখ। সে বলল, হালার কাওয়া! হালার পাগল ঠাকুর।

হুপ! আবার চিতল মাছটা জলে শরীর ভাসিয়ে দিল। এবং পাখনা খেলিয়ে, চিৎ হয়ে অথবা কাত হয়ে সাঁতার কাটলে আমু এক যেন রূপালি মাছ। এই পুকুরের জলে একটা রূপোলি মোহ চোখের সামনে নাচছে। ওরও সাঁতার কাটতে ইচ্ছা হচ্ছে, জলের নিচে মাছ হয়ে আমুকে ছুঁতে ইচ্ছা হচ্ছে। কিন্তু সে পারছে না। তার হাত ভাঙা। হালার কাওয়া। সে ডাকল, আমু তুই উঠ দিনি। বাছুরডা ছুইটা গ্যাছে। ধরতে পারতেছিনা।

আর কোন কোন দিন যখন সাঁজ নামে, যখন কুয়াশায় এই অঞ্চল ঢেকে যায়, যখন শীতের ঠাণ্ডায় পুকুরের মাছ, বিলের মাছ, নদী নালার মাছ এবং জলের তাবৎ জীব চুপ হয়ে থাকে তখন আমু যায় চুপি চুপি, পিছনে যায় ফালু। সামনে শুধু মাঠ, মাঠে নাড়া এবং সর্ষে ফুল ফুটে থাকে। সর্ষে ফুল, বোঝা বোঝা নাড়া এবং ধনে-পাতা—এইসব মাঠময় পড়ে থাকলে বিবি আর সে রাতে চুপি চুপি তুলে আনে। এমনভাবে আনে, যেন সে বেছে বেছে আনছে। এক জায়গা থেকে সব তুলে নেয় না। ফাঁকে ফাঁকে তুলে আনে। জমি যার, সে আলে দাঁড়ালে টেরই পাবে না, ফাঁকে ফাঁকে কেউ ফসল চুরি করে নিয়ে গেছে।

অথচ এই অসময়ে জলে সাঁতার আমুর! ফেলুর মাথা গরম হয়ে যাচ্ছে। বাছুরটা খন্দ দেখে দড়ি ছিঁড়ে পালিয়েছে। কার জমিতে গিয়ে মুখ দেবে এখন! একমাত্র আমু সম্বল। সে বাছুরটা ধরে আনতে পারে। আর বাছুর যখন মাঠের উপর দিয়ে দৌড়ায়, পিছনে আমু, কাপড় সামলাতে পারে না—বলিহারি যাই, আমু একেবারে তখন বনদেবী। সে হাঁকল, হালার কাওয়া! তর গরম বাইর কইরা দিমু।

আমু যেন টের পেল জলের নিচে, ফেলু হাঁক পাঁক করছে পাড়ে। সে উঠে বলল, কোনখানে?

ফেলু হাত তুলে দিলে আমু ছুটল। বাছুরটা অনেক দূরে। আমু দ্রুত ছুটছে। ভিজা কাপড়ে ছুটছে। চুল ভিজা, কাপড় ভিজা, সব লেপ্টে আছে গায়ে। শাড়িটা হাঁটুর উপর উঠে গেছে—সামনে সেই এক ধানের মাঠ, আমু ছুটছে সেই মাঠের উপর দিয়ে। বিবিকে দেখে বাছুরটাও ছুটছে আর দূরে ছুটছে আকালুদ্দিন। নামাজের সময় হয়ে যাচ্ছে। নামাজের আগে পরাপরদির মসজিদে পৌঁছাতে হবে। নামাজ শেষে সে সব তার জাত-ভাইদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলবে, আল্লা-হু-আকবর।

কিছুদিন আগে এই দেশে ছোট ঠাকুর বড় এক সভা করেছিল। নেতা মানুষটির মাথায় গান্ধী টুপি। কালো বেঁটে মানুষ। আগুনের মতো তার জ্বালাময়ী বক্তৃতা। ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সে এমন সব কথা বলছিল যে ক্ষণে ক্ষণে হাততালি পড়েছে। বক্তৃতার শেষে নেতা [illegible]

বললেন, আমরা এক অখণ্ড দেশ চাই। সে দেশের নাম ভারতবর্ষ। এক দেশ, এক জাতি, হিন্দু মুসলমানের এক পরিচয় আমরা ভারতবাসী। আকালুদ্দিন গিয়েছিল সভাতে, কত লোক, কি রকম বক্তৃতা, সে মাঠের এক কোণে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা শুনতে শুনতে মনে মনে হেসেছিল—এক জাতি, এক পরিচয়—আমরা ভারতবাসী!

আর তখন ঈশম গোপাট পর্যন্ত নেমে এল। কারণ সে বৌশিনুর যেতে পারছে না। সে গেলে বাড়ি ঘর কে দেখাশোনা করবে। পাওনা গণ্ডা কে বুঝে নেবে! সে না থাকলে, এই যে এক পরিবার থাকল, পাগল মানুষ থাকল, এবং বুড়ো মানুষটি—যিনি যে কোনদিন আপন নিবাস থেকে ঈশ্বরের নিবাসে গমন করতে পারেন, তাদের এখন দেখে শুনে রাখার সব দায় এই মানুষের। সোনা, লালটু, পলটু অর্জুন গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে কাঁদছে। বড়বৌ ধনবৌ পুবের ঘরের জানালায় দাঁড়িয়ে কাঁদছে। শশীমাস্টার অর্জুন গাছটার নিচে ওদের হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে এবং নানা-রকম বোধ প্রবোধ দিচ্ছে—দূর বোকা কাঁদে নাকি। কত বড় সম্মান। দেশের কাজ করছে বলে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। আমাদের দেশ স্বাধীন হবে। আমাদের কোন দুঃখ থাকবে না। কত সম্পদ আমাদের। সব ইংরেজরা এখন সাগরপাড়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে। ওদের তাড়িয়ে দিলে কোন মানুষ না খেয়ে থাকবে না। দুর্ভিক্ষে মানুষ মারা যাবে না। আমাদের দেশ কত বড়, আর কি মহান এই দেশ। আমরা এই মহান দেশের মানুষ। আমাদের গর্বের শেষ নেই।

সোনা শশীমাস্টারের এমন সব কথা শুনে কান্না থামিয়ে দিল। সে চোখ মুছে বলল, কবে স্বাধীন হইব?

—তা আর দেরি নেই মনে হয়।

সোনার মনে হল স্বাধীন হলেই সব হয়ে যাবে। যেমন জালালি যে খেতে পেত না, স্বাধীন হলে খেতে পেত। জলে ডুবে মরতে হত না। ওর খুব কষ্ট হচ্ছিল জালালির জন্য। সে আর দুটো দিন দেরি করতে পারল না। স্বাধীন দেশের মানুষ সে তবে হতে পারত। তার মনে হল এখন, ঠাকুরদাও একদিন মরে যাবে। তিনি আগে মরবেন, না পরে মরবেন, যদি মরলে সে একদিন ঠাকুর-দাকে তরমুজ খেত পর্যন্ত হাঁটিয়ে নিয়ে যাবে। বলবে, ঠাকুরদা আপনি ত সারা জীবন

পরাধীন দেশের উপর দিয়ে হেঁটে গেছেন, এবার স্বাধীন দেশের মাটির উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন। আপনার ভাল লাগছে না! বাতাসটা পাতলা মনে হচ্ছে না! বুক ভরে নিতে পারছেন না! মনে হচ্ছে না এবার আপনি আরও বেশি দিন বাঁচবেন!

ঠাকুরদা নিশ্চয়ই সোনার মাথায় হাত রেখে বলবেন তখন, তোরা কত ভাগ্যবান। তোরা স্বাধীন দেশের মানুষ। কত সংগ্রামের পর এ স্বাধীনতা, জালিয়ানওয়ালাবাগ, ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকি, দেশবন্ধু ওদের কথা সব সময় মনে রাখবি। ওদের জন্য এই স্বাধীনতা। ওদের ভুলে যাবি না। তোরা কতকাল বাঁচবিরে। আহা স্বাধীন, স্বাধীনতা এই শব্দ কি এক আশ্চর্য সুষমামণ্ডিত কথা। সোনার চোখ বুজে আসছিল।

তখন শশীমাস্টার দেখল, ধানের জমির উপর দিয়ে এক যুবতী মেয়ে ছুটছে। কে যায়! ওঃ, সেই ফেলুর ডানাকাটা পরী যায়। কার গলা হাত কর ধরে আনা বিবি। বাছুরটিকে ধরে ফেলেছে। ফেলু দাঁড়িয়ে আছে জালালির কবরের পাশে। কবরের সাদা কাশ ফুল দুলছে বাতাসে। কবরটার উপর সবুজ ঘাস। বৃষ্টিতে বর্ষায় কবরটা আর কবর নেই। সমান মাঠ হয়ে গেছে। সেখানে আবার নতুন জীবনের উন্মেষ হচ্ছে।

আকালুদ্দিনের পরাপরদি পৌঁছতে পৌঁছতে বেলা হয়ে গেছে। সে ফজরের নামাজে হাজির হতে পারে নি। জোহরের নামাজ সে সকলের সঙ্গে পড়তে পারবে। দূর দেশ থেকে বহুজন এসেছে। মসজিদের পাশে মাদ্রাসা। মাদ্রাসার সামনে বড় মাঠ, মাঠে শামিয়ানা টানানো। নিশান উড়ছে। সেই কবে একবার তার গাঁয়ের পাশে সামু-ভাই জালসা করেছিল, মিনির জন্য ওমার কত বড় জো আর তখন মুড়াপাড়ার হাতী এসে সব তছনছ করে দিয়েছিল—জালসা হতে পারে নি, কিন্তু এখানে কার হিম্মত আছে জালসা ভেঙে দেয়। সাহাদের ঘাট নদীর অপর পাড়ে—নদীর নাম ব্রহ্মপুত্র, তার পাশে পুরোনো ভাঙা সব বাড়ি, এক সময় এ-গঞ্জের মতো জায়গায় সাহাদের প্রতিপত্তি ছিল কত! এখন সাহারা নারায়ণগঞ্জে তেজারতির কারবার করে বড় বাবসা ফেঁদেছে। গাঁয়ের পুরানো ভাঙা বাড়ি ফেলে চলে গেছে তারা। বড় বড় সব অশ্বত্থ গাছ জন্মেছে পাঁচিলে। আর শুধু চার পাশে মুসলমান গ্রাম এবং নদী পার হলে এই মাদ্রাসা মৌলানা সাবের প্রাণ। এখান

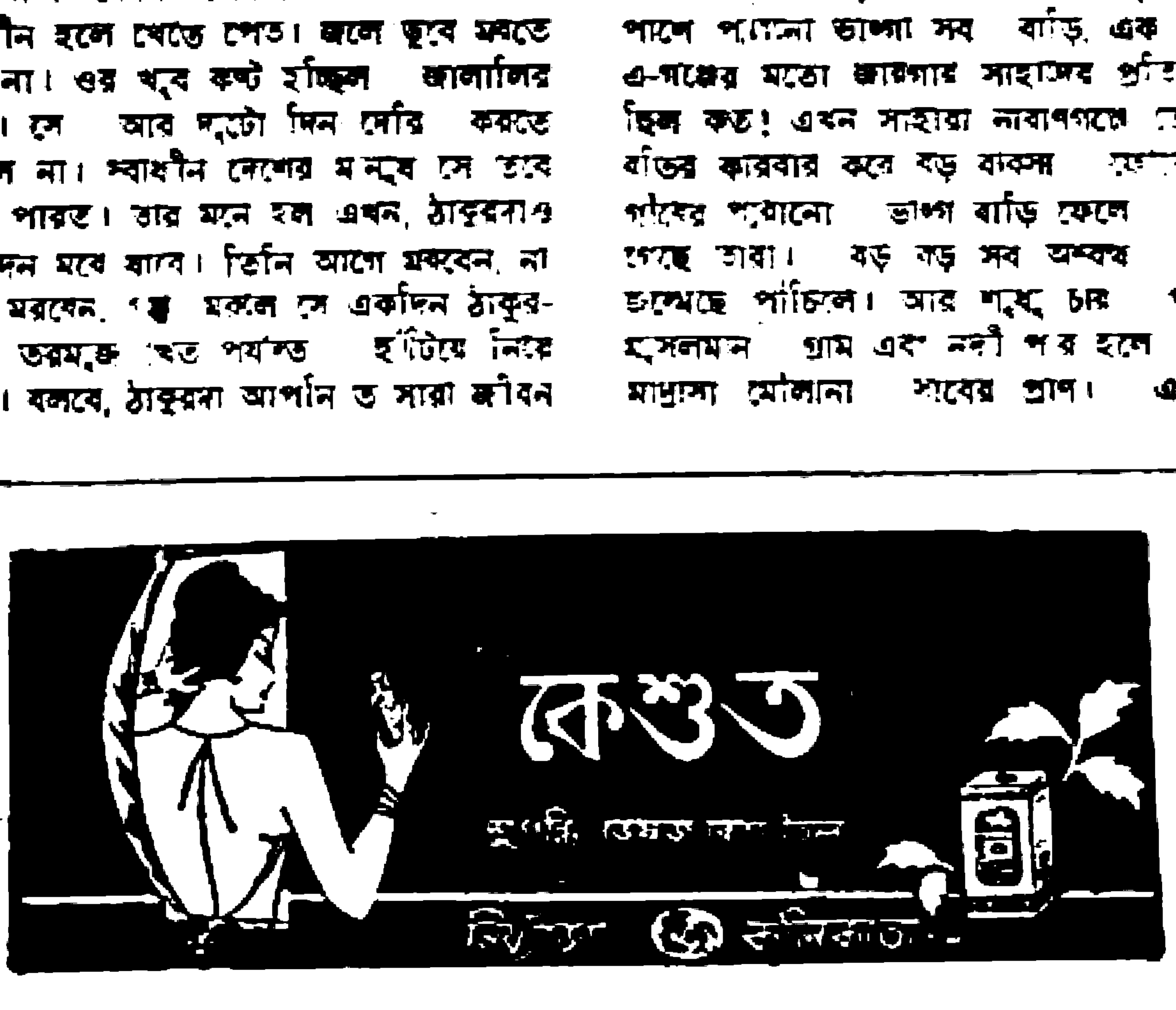

কলকাতা থেকে জনাব আলি সাহেব এসে-ছেন। তিনি যখন বক্তৃতা করেন কাঁচের গ্লাসে চুক্ চাক্ জল খান। আকালু ভাবল সেও জল খাবে কাচের গ্লাসে। তাহলে গলা শুকোবে না। কারণ এইসব নামী মানুষের সঙ্গে আকালুদ্দিন আজ মঞ্চে দাঁড়িয়ে প্রথম বক্তৃতা করবে। জল খেলে মাথায় বুদ্ধি আসে বুদ্ধি। সামু ভাইও জল খান বারে-বারে। মঞ্চে দাঁড়িয়ে জল খাওয়া বড় নেতার স্বভাব। সে এইসব নামী মানুষের সামনে কি আর করবে: ভাবল, কি আর বলা যায়, শুধু প্রথমে বলা ইনসান আল্লা, তারপর কিছু হিন্দু বিদ্বেষের কথা বলে মঞ্চ থেকে নেমে পড়া।

সে চারদিকে দেখল নিশান উড়ছে। কোথাও ইস্তাহারে লেখা আছে নারায়ে তকবির অথবা লাল নীল সবুজ রঙের ফেস্টুন, বাঙালির প্রতি অবজ্ঞা, হিন্দু বিধবা রমণীর মুসলমান দমনে ঘৃণা মুখ, অশ্লীল তার কঠিন দৃশ্য এবং কার কত জমি হিন্দুর শতকরা কতজন হিন্দু কত আয় করে, সেখানে অন্তত বিশেষে কত মুসলমান, তার আয় কত—এসব পরিসংখ্যা। সহসা দেখলে মনে হবে—শ্রেণী সংগ্রামের ডাক দিয়েছে ওরা।

এমন করে প্রথম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়, যারা করেছেন তাদের ছবি। বিখ্যাত সব মসজিদের ফটো খয়েরি সবুজ নীল মোটা কাগজের উপর সাঁটা। এবং হজ্ব সেরে যে-সব ছবি সংগ্রহ করে এনেছে হাজি সাহেবেরা মক্কা অথবা মদিনার—যেমন কাবা মস-জিদের দৃশ্য, নানা রকমের দৃশ্য ঝুলিয়ে এইসব পবিত্র ইসলামের বাণী বহন করছে এই সভা। শামিয়ানার নিচে এইসব দৃশ্যের ভিতর দিয়ে আকালুদ্দিন মোড়লের মতো হেঁটে যাচ্ছিল। সে মানী-গুণীদের আদাব দিল। সালেম- আলাইকুম, ওয়ালেকুম সালাম এইসব উচ্চারিত হচ্ছিল। শামিয়ানার দক্ষিণ দিকে বড় বড় উনুনে ডাবর ডেগ। যারা মানী-গুণীজন তাদের খাবার ব্যবস্থা। সে এখানে এসেই প্রথম খোঁজ করল সামসুদ্দিনের। সামুভাই থাকলে সে গলা ছেড়ে বলতে পারবে। সে মনে বল পাবে। সামুভাই যে কোন দিকে! কেউ বলল, উনি গোসল করতে গেছেন। কেউ বলল, তিনি আলি সাহেবকে নিয়ে মাঠে নেমে গেছেন। এবং এইসব গ্রাম দেশের কি অসহায় দারিদ্র তাই দেখাতে নিয়ে গেছেন।

ওরা এবার সকলে খানা হলেই আহার করতে বসবে। তারপর জোহরের নামাজ। নামাজে কে ইমাম হবে আজ! আকালুদ্দিনের কতকালের খোয়াব সে এমন এক বড় মাঠের জমায়েতে ইমাম হবে। সামুভাই থাকলে সে একবার অন্তত মনের ইচ্ছাটা প্রকাশ করতে পারত।

সে হন্যে হয়ে সামুভাইকে খুঁজছিল। আর খুঁজতে খুঁজতেই পেয়ে গেল। সামু সেই লম্বা সাদা পাজামা পাঞ্জাবি, মাথায় ফেজটুপি পরে মাঠ থেকে উঠে আসছে। পায়ে বুট জুতো। মোজা নেই। সঙ্গে এক দঙ্গল লোক। রোদে ওদের সকলের মুখ পুড়ে গেছে। জল তেষ্টা পেতে পারে বলে বদনা হাতে পাঁচ-সাতজন লোক সঙ্গে সঙ্গে হাঁটছে। ওরা এবার সকলে খেতে বসে গেল। পাটির উপর পাঁচ-সাতজন গোল হয়ে বসে গেল। বড় থালায় ভাত। পাঁচ-সাতজন এক একটা থালার চারপাশে বসেছে। থালার মাঝে মঠের মতো ভাত সাজানো। কিনার থেকে যে যার মতো ভাত ভেঙে ডাল নিয়ে চেটে চেটে ভাত-ডাল গোস্ত খাচ্ছে। সামু, আকালু এক গাঁয়ের লোক। এবং যারা কাছাকাছি তারা পাশা-পাশি বসে খাচ্ছে। যে যার মতো একই থালায় ভাত ভেঙে খেয়ে উঠে মুখ ধুলো। নদীর ঘাটে অজু করে এল। একসঙ্গে সার বেঁধে নামাজ পড়ল। মনো-বাঞ্ছা পূর্ণ হয়েছে আকালুদ্দিনের। সে ইমামের কাজ করেছে। তারপর মঞ্চে উঠে যে যার মতো বসে গেল। সবাই প্রায় কথায় কথায় হিন্দু সাম্রাজ্যবাদের কথা বলল। মাঠের দিকে হাত তুলে দেখাল। বলল, দু-চার বিঘা জমি বাদে, সব জমি কার?

—হিন্দুর।

—[illegible] কারা?

—[illegible]।

—উকিল [illegible] কারা?

—হিন্দুরা।

—শিক্ষা-দীক্ষা কাদের জন্য?

—হিন্দুর জন্য।

—ওসব জমিতে খাটেন আপনি খান, আপনার নাম মুসলমান।

এবারে হাততালি পড়ল।

সামসুদ্দিন কিন্তু খুব যুক্তি এবং তথ্যের সাহায্যে—এই যে আমরা মুসলমানেরা আলাদা একটা দেশ চাই—তার যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা রাখল। সে একটা সালের উল্লেখ করে বাংলাদেশে ফজলুলহকের পরিস্থিতির কথা বলল। হিন্দু-মুসলমান একই রাষ্ট্রে একই পতাকার নিচে বসবাস করতে পারে না, তার কারণ ব্যাখ্যা করল। সে বলল, আপনেরা জানেন মিঞাভাইরা, আমার নিজের চাইতে আপন পীড়িতের মানুষেরা, আপনেরা জানেন ১৯৩৭ সালের কথা। ফজলুলহকের কৃষক প্রজা দল যেহেতু মুসলিম প্রধান দল, তাকে নিয়ে কংগ্রেস যৌথ সরকার গঠন করলেন না। আপনারা জানেন উত্তর-প্রদেশের মুসলিম লীগ দাবি করেছিল যৌথ সরকারের—নেহেরুজী তা বানচাল করে দিলেন। আপনারা জানেন ফজলুলহকের দল কোন সাম্প্রদায়িক দল নয়, সাধারণ মেহনতি মানুষ নিয়ে এই দল, কৃষক প্রজা নিয়ে এই আন্দোলন অথচ হিন্দুদের এমন মুসলিম বিদ্বেষ যে তারা কিছুতেই যৌথ সরকার গঠন করলেন না। বরং কংগ্রেস হক-সাহেবের মত প্রগতিশীল মানুষের বিরুদ্ধা-চরণ করতে থাকল। হকসাহেব এখন বুঝতে পারছেন তাঁর তখৎ-ই-তাউস পথ্যা, মেঝেয়, ধুড়িগাদায় ভেঙে পড়েছে। বলে সাম-সুদ্দিন একটু থামল। এক গ্লাস জল খেল। চারদিকে তাকিয়ে দেখল কেমন ভিড় হয়েছে। তারপর ফের বলতে থাকল, আপনা-দের কাছে আমি এখন পত্রিকার রিপোর্ট ধরে তুলব। কি প্রকট এই মুসলিম-বিদ্বেষ! কি অমানুষিক অত্যাচার! তাজা খুনের হোলি খেলেছে তারা। আপনার আমার খুনে ওরা গোসল করেছে। সে এ-সব বলে আবার জল খাবার সময় কি যেন এক ছবি, ছবিতে মালতীর মুখ, সেই কদমে মুখ, তুই সামু এটা কি করলি, সঙ্গে সঙ্গে তার কেমন গলা শুকিয়ে গেল। কোন রকমে তারপর বলল, আপনাদের ভিন্ন দেশ বাদে গতি নাই। সে নিজেকে বলল এবার, যে সংজ্ঞা এছাড়া এ-জাতির উদ্ধার নাই।

কি ভাবল সামান্য সময় ফের সামু। এমন ভিড়ে সে যে কেন বার বার সেই কদমের মুখ দেখতে পাচ্ছে বুঝতে পারছে না। কেন কেবল যেন মালতী তার হারানো হাঁসটা খুঁজছে। এবং সে মালতীকে নিয়ে ধান-খেতের আলে আলে হাঁস খুঁজছে। মালতীর হাঁসটা খুঁজে পেলেই সে তাকে নিয়ে আসবে বাড়িতে।

এ সব সাময়িক দুর্বলতা। এতগুলি মানুষ তার মুখ থেকে আরও কিছু শুনতে চাইছে। সে এত কম বললে নিজের জাতির প্রতি বেইমানী করবে। সে গলা সাফ করে বলল, উত্তরপ্রদেশের খালিকুজ্জমান সাহেবের কি অনুনয় বিনয়, আমাদের সরকার পরি-চালনায় সামান্য স্থান দিন। কে কার কথা শোনে। বল্লভভাই প্যাটেল সব অনুনয় বিনয়ের জলে ভাসিয়ে দিলেন। সে এবার ঘড়ি দেখল। পকেট থেকে ঘড়িটা বের করে সময় দেখে বলল, আমার পরবর্তী অনেক বক্তা আছেন। তাঁরাও তাঁদের বক্তব্য রাখবেন আপনাদের কাছে। কেবল মেহেরবাণী করে আপনারা যাবার আগে মোতাহার সাহেবের কাছ থেকে একটা করে বই নিয়ে যাবেন। তারপর সাঁঝে যখন আজান শুনতে পাবেন, কুপির আলোতে পড়বেন এই রিপোর্ট। মুসলিম নিপীড়নের খুঁটিনাটি তথ্য পড়লে আপনাদের খুন টগবগ করে ফুটবে। সে বড় সহজ ভঙ্গীতে এবার হাতটা মুখের উপর একবার বুলিয়ে দিল।

আকালুদ্দিন বড় নিবিষ্ট মনে শুনছে এবং সামুর অবয়বে কি কি রেখা ফুটে উঠছে সে লক্ষ্য রাখছে। সেও এমনভাবে মুখের রেখায় আশা, তার ক্রোধ, উত্তেজনা এবং অর্থনৈতিক বৈষম্যের কথা সকলের ভিতর ছড়িয়ে দেবে। শেষে সামু যেভাবে কথা শেষ করে হাত ঘুরিয়ে এনেছে মুষ্টিভঙ্গীতে, সেও আপ্রাণভাবে নকল করতে গিয়ে কেমন সকলের কাছে ধরা পড়ে গেল। সে তাড়াতাড়ি বক্তৃতা শেষ হতেই সকলে চেঁচিয়ে উঠল, আল্লা-হু-আকবর।

জনাব আলি সাহেব বললেন, দেশটা [illegible] ইংরেজদের হাত থেকে নিয়েছিল।

আশা করব যাবার সময় ইংরেজ শাসনভার আমাদের হাতে দিয়ে যাবেন। গোলামের জাত কেন শাসনের বোঝে কি।

সবাই হাততালি দিচ্ছে একসঙ্গে।

বড় মজার কথা বলেছেন সাহেব। ওরা খুব খুশী এমন কথায়।

বিকেলবেলা আকালু মসজিদের নিচু জমিটাতে দাঁড়িয়েছিল। ক্রমে সূর্য অস্ত যাচ্ছিল। এক এক করে এবার বিদায় নিচ্ছে সবাই। গয়না নৌকায় আজই সামুভাই নারায়ণগঞ্জে যাবে। কাল ঢাকা চলে যাবে। সে একটু সুবিধা মতো সামসুদ্দিনকে একা পাবার ইচ্ছাতে আছে। আলি সাহেব দুদিন থাকবেন মৌলানাসাবের বাড়িতে। এখন সবাই চলে গেলে কেবল থাকে সামুভাই। সামুর অঞ্চল এটা। সেই সবাইকে বিদায় দিচ্ছে। বিদায় দিয়ে সামু এদিকে উঠে আসছে। দুজন লোক পিছনে। ওরা সামসুদ্দিনকে সামিয়ানার নিচে পৌঁছে দিয়ে চলে যাচ্ছে। এই সময়। সে তাড়াতাড়ি কাছে গিয়ে বলল, যাদি যখন আইলেন, বাড়ি একবার ঘুইরা যাইবেন না!

—সময় খুব কম। কাইল আবার বন্দরে সভা আছে।

আকালু এবার সামুকে চুপি চুপি বলল, ছোট ঠাকুররে ধইরা নিয়া গ্যাছে।

কেমন বিস্ময়ের গলায় বলল, ছোট কর্তারে!

—হ, ছোট কর্তারে।

—কবে?

—আইজ। আইছিল ধরতে রঞ্জিতরে। পাইল না। ধইরা নিয়া গেল ছোট কর্তারে।

—রঞ্জিত কই গ্যাছে।

—রঞ্জিত মালতীরে নিয়া পালাইছে।

সামসুদ্দিনের মুখটা অদ্ভুত বিষণ্ণ দেখাচ্ছে। সে আর কিছু বলতে পারল না।

আকালু কত কাজের, লীগের জন্য সে কতটা জীবন পাত করছে এমন দেখানোর জন্য বলল, দিলাম খবর থানায়। কইলাম একজন রাজনৈতিক কর্মী আত্মগোপন কইরা আছে।

—তর কি দরকার ছিল আকালু। তুই এমন করতে গেলি ক্যান!

—কাফেরের যত বিনষ্ট হয় তত ভাল না।

—না।

এমন চোখ মুখ দেখবে সামসুদ্দিনের সে আশাই করতে পারে নি। সামু আবার চুপ হয়ে গেল। সামিয়ানার নিচে হ্যাজাকের আলো। সে এক দরগায় যুবক, অথবা এক ফকির বায়, তার হাতে লণ্ঠন, কত দূর যে সে এভাবে যাবে কেউ যেন বলতে পারে না। সামু শেষে বলল, আর কিছু কইবি?

সে কেমন থতমত খেয়ে গেল। সে যা বলবে ভেবেছিল সামসুদ্দিনের মুখ দেখে সেসব ভুলে গেল।

পীরের মাজারে জোটন তখন সব করবী ফুল পরিষ্কার করছে। সে সাঁঝ লাগলেই মোমবাতি জ্বালায়। এবং মাজারের উপর গত সন্ধ্যা থেকে যে সব ফুল ঝরে পড়েছে সে সব ফেলে দিচ্ছে। তকতকে মাজার। চারপাশে সবুজ ঘাস। নিচে ফকিরসাব শুয়ে আছেন। আর উপরে এই করবী ফুলের গাছ। নির্দিষ্ট ফুল ছড়িয়ে দিচ্ছে। সে মোমবাতি জ্বালিয়ে তার ঘরটার দিকে উঠে যাবে এবার। এখনও ভাল করে অন্ধকার হয় নি। কিসের শব্দে সে শরবনের দিকে তাকাতেই দেখল, বাতাসে শরবন কাঁপছে। এবং শরবন ফাঁক করে কেউ এদিকে উঠে আসছে।

এই অসময়ে মানুষ। এক মিঞা মানুষ। কিন্তু একি! পিছনে বোরখা পরে এক বিবি। এমন একটা অঞ্চলে এই মিঞা বিবি। সে কেমন বিস্মিত চোখে মাজারের পাশে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা দেখছে!

রঞ্জিত কাছে গেলেও জোটন কোন কথা বলতে পারল না। অপরিচিত মানুষজন আসে, সকালের দিক আসে, পীরের মাজারে বাতাসা অথবা ফুল দিয়ে যায় কেউ। কেউ আসে জড়ি বুটি নিতে। সন্তান-সন্ততি না হলে কেউ আসে। আর আসে মানুষ দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগলে। কেউ তার গাছের প্রথম লাউ, কুমড়ো মাজারে দিতে আসে। ফকিরসাবের সব জড়ি-বুটির গুণাগুণ জোটন জেনে নিয়েছে। এই করেই জোটনের সংসার। সেও ক্রমে এই অঞ্চলের পীরানি হয়ে যাচ্ছে। এমন একটা বিবর্জিত জায়গায় একা থাকলেই, সে আর মানুষ থাকতে পারে না, জীন পরী হয়ে যেতে পারে অথবা পীর পয়গম্বর। ফলে জোটনের কিছু জমি হয়েছে। কেউ ফসল দিয়ে যায়। কেউ মুরগী দিয়ে যায়। সে মুরগী বেচে, ফসল বেচে তেল নুন নিয়ে আসে তিন ক্রোশ দূর থেকে। এক হাট আছে। হাটবারে এই দরগা ছুঁয়ে মাইলখানেক দূরেই দেখা হাটের পথ, হাটের মানুষেরা সে পথে যায়। যারা যায় তাদের হাতে সে মুরগী দিয়ে দেয়, ফসল দিয়ে দেয়। ওরা এসব বিক্রি করে তেল নুন ডাল এসব দিয়ে যায়। আজ হাটবার নয়। সে কাউকে মুরগী দেয় নি যে বেচে তাকে তেল নুন দিয়ে যাবে, এই সূর্যাস্তের সময় কেউ এমন নেই অঞ্চল বিবি নিয়ে এখানে চলে আসে। সুতরাং জোটন কি যে বলবে এই অপরিচিত মিঞাসাবকে বুঝতে পারল না। কেবল ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল।

রঞ্জিত দাঁড়ি গোঁফ তুলে বলল, আমাকে চিনতে পারছিস না জোটন!

চিনতে পারবে না জোটন। যে মানুষ খুদ কুঁড়ো পেলেই কি খুশী, সে যে এখন পীরানি তা রঞ্জিত জানবে কি করে! কেবল জোটন বুঝতে পারল, এই মানুষ এসেছে তার বাপের দেশ থেকে। নতুবা তার নাম ধরে কে ডাকতে সাহস পাবে। বোরখার নিচে দিদি মুখ লুকিয়ে রেখেছে। কলমে কত ছোট এই মানুষ, তার হাঁটুর সমান কলমী। সে বলল, কোন খাঁ দরকার।

—আমি রঞ্জিত। গ্রাম বাইনাদী।

—আপনে রঞ্জিত ঠাকুর! আমা একা কি কন তাইন। বোরখার নিচে কারে আনছেন? আপনে কত বড় হইয়া গ্যাছেন।

—মালতীরে।

—আরে একা কি কন! মালতীরে! কই আছে।

মালতী বোরখা খুলে ফেলল।

জোটন মালতীর মুখ চোখ দেখে ভয় পেয়ে গেল। কি শীর্ণ চেহারা! চোখ কোটরাগত। কঙ্কালসার। কি যুবতী কি হয়ে গেছে! জোটন বলল, ভিতরে আয় মালতী। কর্তা আসেন।

রঞ্জিত কি বলতে গেলে জোটন বাধা দিল। বলল, কর্তা ব্যাখ্যা লাগব না। পীরের থানে যখন আইসা পড়ছেন আর ভয় নাই।

এই জোটন নিবাসী এই বনে, এক বনের ভিতর এক রহস্য আছে। সেই রহস্যে সে ডুবে গেছে। এই দরগার ঝোপ-জঙ্গল, কড়ুই গাছ, ফুলের গোটার গাছ ফেলে সে আর এখন কোথাও যেতে চায় না। বনবাদাড়ে অন্ধকারে একটা করবী গাছের নিচে কবরের পাশে বসে থাকলে মনেই হয় না মাটি কার? মাটি হিন্দু না মুসলমানের। সে এতদিন পর দুজন বাপের দেশের মানুষ দেখে খুশীতে ঝলমল করে উঠল, বলল, অ পীরসাহেব দ্যাখেন আপনার দরগায় কেডা আইছে! বলে সে দুই অতিথি নিয়ে হাঁটতে থাকল।

(ক্রমশ)

সকল ঋতুতে অপরিবর্তিত ও অপরিহার্য পানীয়

চা

কেনবার সময় 'অলকানন্দার' এই সব বিক্রয় কেন্দ্রে আসবেন

অলকানন্দা টি হাউস

৭, পোলক স্ট্রীট কলিকাতা-১

২, লালবাজার স্ট্রীট কলিকাতা-১

৫৩, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ কলিকাতা-১২

॥ পাইকারী ও খুচরা ক্রেতাদের অন্যতম বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান ॥

নিকটেই আছে

ক্লিনিকে একটি বিকেল

দোকানের ফোন নম্বরটা চেনা-জানা প্রায় সবাইকে দিয়ে রেখেছে বিনয়। নিজের ফোন নেই—নেই মানে, বাসার ফোনটাই নেই আসলে। অথচ ওটা ছাড়া আজকাল চলাই মুস্কিল। ইউনিয়নের পান্ডা হওয়া ইস্তক ব্যাপারটার গুরুত্ব আবিষ্কার করেছে বিনয়। অফিসের ফোনটা ইচ্ছেমত ব্যবহার করা, অসুবিধে কিছু নেই তাতে। অসুবিধে এই যে অফিসটা মাত্র আট ঘন্টার। তারপর এপাশে ওপাশে যে আরো আট, আট ষোল ঘন্টা পড়ে আছে, সে সময় ফোনটা পাবে কোথায়? ছোট ইউনিয়ন, সামর্থ্য নেই যে একটা ফোন করে নেবে। ফোন দূরের কথা, একটা ঘরই নেই ইউনিয়নের। অফিসের শেষে ক্যান্টিনে বসেই রাজাপাট চালায়। কিন্তু তারপরেও থেকে যায় নানান ঝামেলা—

বাড়ীর উল্টোদিকেই ভজন রায়ের দোকান। সিমেন্ট, লোহার রড, অ্যাসবেস্টস সব মিলিয়ে দোকানটা বেশ বড়। আট-দশজন কর্মচারী, জনা তিনেক কুলি-মজুর সর্বদাই খাটছে দোকানে। আর খাটছে ফোনটা। বিপদে আপদে, প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে ফোন করার সুযোগ দিয়েছেন ভজন রায় বিনয়কে। শুধু যে কোন কারণেই দিয়েছেন তাই না, যেদিন বিনয়ের বাসায় খোদ মন্ত্রীমশাই এলেন, দু-চারজন পুলিশ বাসাটার সামনে বেশ কিছুক্ষণ ধরে গোঁফে তা দিয়ে গাড়ী-ঘোড়ার মান সামলাল, সেদিন থেকে ভজন রায় বিনয়কে ঢালাও পারমিশন দিলেন—আপনি কাজের আদমী। কত বড় বড় লোক আসে আপনার কাছে। যদি দরকার হোয় নম্বরটা জানিয়ে দেবেন ফোন এলেই আমার লোক ডেকে দিবে আপনাকে।

সেদিন থেকেই একটা নতুন সম্পর্ক গড়ে উঠেছে ভজন রায়ের সঙ্গে। ইউনিয়নের পান্ডাগিরি ছুটেছেও, সম্পর্কটা টিকেই গেছে। আজকাল অচেনা না চেনারা হুট ফোন করে না। করে সব পুরোনো দিনের বন্ধু-বান্ধবরা। ভজন রায় স্বয়ং ডেকে দেন। কোনদিন হলে নতুন মন্ত্রী বাওয়ান। দেশের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করেন। আলোচনা ঠিক নয়—বিনয়ের মতামতটাই জানতে চান। এরপর বীর আরো কিছুদিন ইন্দিরা গান্ধী থাকলে তো বেওসাপত্তর সব গোটাতে হবে। আর জ্যোতিবাবুর চলবে মনে হয় হাসনাবাদ।

বিনয় বসে বসে খবর বিলি করে যোগাযোগ। আসলে কারবারী ভজন রায়। তার বড় ছেলে-পুঁটিকে এ-হাটে কিনে ও-হাটে বেচে অর্থনীতি আয়ত্ত রাখেন। হঠাৎ বিনয় 'নির্বাচিত' আদমী, একসময় পোস্টারে নেতাও বলে গিয়েছিল ভজনবাবুদের বাজারে, তাই খাতির করে ভজন রায় বাবুর মতামত জানতে চান। ঝাপ্পি-টাপ্পি মেরে দেখেছে, ভজন রায় সবই বোঝে, কিন্তু অজুহাত খাড়া রেখে কিছু বলে না, চুপ করে শুনে যায়। বিনয় নিজেই কি ছাই সব বোঝে, না বুঝতে পারে, যে এই ষাট বছরের বুড়ো নায়কোলককে সাপের খাজ বোঝাবে।

তাই আলোচনার মোড় ঘোরানোর জন্য ভজনবাবুর স্বাস্থ্যের হাল-হকিকৎ জানতে চায় বিনয়। তেইশ বছর লোকটাকে দেখছে। খুলনা ছেড়ে আসা অবধি কলকাতায় এই পাড়াতেই এসে যে বাসা নিয়েছিল, তারপর আর বদলাবার সুযোগ আসেনি। ক্রমশঃ বর্ধিষ্ণু হয়ে মফস্বলে দাঁড়িয়ে গেছেন। পাঁচ ভাই-এর মধ্যে এখন ও একাই এই বাসাতে আছে। তেইশ বছরে অনেক পরিবর্তন হয়েছে পাড়াটায়। রাস্তার পাশের আলোর জায়গায় এসেছে কর্পোরেশনের ইলেকট্রিক লাইট। পানি-কাদাতে ঘোলাটে পায়ের মত খোয়া-বেরুনো এবড়ো-খেবড়ো রাস্তাটা পিচ-ঢালাই হয়ে এখন চকচকে মসৃণ। আর মসৃণ হয়েছে ভজন রায়ের চেহারাটা। ছোট্ট একফালি দোকান থেকে এখন দু-দুটো লরী, একটা জিপ, টালিগঞ্জ আর পাঁড়ুয়ায় দুখানা বাড়ী প্যান দেখে, মানে হাপরায় কোনো না কয়েকখানা বিঘা জমি সবই হয়েছে। সেই সঙ্গে লম্বা ছিম-ছিমে রোগা কাঠামোটার ওপর মেদ চাপিয়ে চর্বির পলেস্তারা পড়েছে। এখন হাঁটতে চলতে রীতিমত কষ্ট হয়। বুকে হাঁপ ধরে। রাতে ঘুম হয় না। সারাদিন বসে বসে ঝিমুতে ইচ্ছে করে। কি করি বলুন তো বাবু? সেই মন্বন্তরের সময় একবার 'রাজরোগ' হয়েছিল সে তো ভগবানবাবু ইলাজ দিয়ে সারিয়ে দিলেন, কিন্তু এবার তো কিছুতেই সুখ হোচ্ছে না।

আপনি কেন বড় ডাক্তারকে দেখান না—গাম্ভীর্যভাবে পরামর্শ দেয় বিনয়।

উত্তরটা ভজন রায়ের হয়ে দিল তাঁর বাঙ্গালী কর্মচারী গোবিন্দ চৌধুরীই দিল—একটা বড় ডাক্তারও আর বাকী নাই বিলকুল, কেবল ডাক্তারই পাল্টেছেন বাবু। হইল না তো কিছু। হয়েল এখন ঘোষ ডাক্তার দেখতাছে। তাও প্রায় পাঁচ মাস হইল—কিন্তু সারে নাই এখনও।

চৌধুরীকে মনে হোল খুবই চিন্তিত তো বটেই। কারণ ভজন রায়ের কিছু হোলে, সম্পত্তি-টম্পত্তি ব্যবসাপত্তর সব পাবে ওর— ভাগনেরা। ভজন রায় ব্যবসা করতে করতে বিয়ের কথাই ভুলে গিয়েছিলেন। ভাগনেরা খুব সুবিধের লোক নয়। মামার ভয়ে এখন মুখ না খুললেও চৌধুরীর আশঙ্কা, ভবিষ্যতে সব বাঙ্গালী কর্মচারীকেই—ওরা তাড়িয়ে দেবে, দেশোয়ালী ভাই-বেরাদরদের এনে বসাবে দোকানে। তখন এদের কি হবে? চৌধুরী, ক্ষেত্র সাহা, বিনু ঘোষ, কার্তিক বাড়ুজ্যে, বিপিন মণ্ডল, তারানাথ ঘটক, অচিন্ত্য গোঁসাই, রমণী সাধুখাঁ, কানু সাপুই—সব যাবে কোথায়? ওরা এক-একজন পঁচিশ-তিরিশ বছর এই দোকানে। বয়স হয়ে গেছে। অন্য কোন কাজ জানে না। টাকা নেই যে দোকান দেবে কোনো। একমাত্র ভরসা ঐ ভজন রায়। লোকটাকে যে কদিন টিকিয়ে রাখা যায়, সে দিনই নিশ্চিন্ত। তারপর?—ভাবতেও বোধহয় সাহস পায় না চৌধুরীরা।

দোকানের সব ক'জন কর্মচারী তাকিয়ে বিনয়ের দিকে। ভজন রায়ের বড় ভাগ্নেও জুলজুল করে তাকিয়ে আছে। আর স্বয়ং ভজন রায় থলথলে চর্বির পাহাড়ের মত আলাভোলা বাবাজীর চেলা হয়ে বসে আছেন। বিনয় অনেক ভেবে-চিন্তে মুখ খুলতে যাচ্ছিল, তার আগেই শুনতে পেল চর্বির পাহাড় গর্জন করছে—আপনার তো অনেক জান-পহেচান আছে। আমার একটা ইলাজের বন্দোবস্ত করিয়ে দিন না বাবু।

কয়েকদিন আগে এক বন্ধুর মুখে সরকারী ক্লিনিকের কথা শুনেছিল বিনয়। কাজকর্ম নাকি বেশ ভাল। ঠিক করল, ভজন রায়কে একবার ওখানকার ডাক্তারকে দিয়েই দেখাবে।

ফোনে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে শুক্রবার ভজন রায়কে নিয়ে বিনয় গেল ক্লিনিকে। বড় ভাগ্নেও, মামার ইলাজের দেখাশোনায় ঠিকেদারী যাতে হাতছাড়া না হয়, তাই সঙ্গে গেল।

গভর্নমেন্ট হাসপাতালের বড় ডাক্তারদের প্রাইভেট প্র্যাকটিস করার সুযোগ নেই। সরকারী দেড় দু হাজারী মাসোহারা বাইরে আইনমত তাঁদের আয়ের কোন বিকল্প রাস্তা নেই। ডাক্তাররা গুমরোচ্ছিলেন। তাই সদাশয় সরকারমশাই দয়া করে ক'জন আমাদের এই ঢালাও কারবার খুলে দিয়েছেন। সকালে মিনিমাগনা রুগী দেখবেন ডাক্তাররা হাসপাতালে। বিকেলে ছ টাকা ফিয়ে বসে মর্যাদাবানদের রোগের জন্যই বসবেন তাঁরাই এই সব ক্লিনিকে। তবে সব ক'টা ক্লিনিক নেই প্রায়

না। প্রত্যেক শিফটে থেকে যায় নার্স—আয়া। করে শিফট। গড়ে এক-একজন ডাক্তার মেডিক্যাল শিফটে শিফট পান। এক-এক শিফটে পঁচিশজনের বেশী রুগী দেখার নিয়ম নেই। অর্থাৎ এক শিফট খেটেই পঁচাত্তর টাকা আদায়ের বন্দোবস্ত। তিনটে শিফটে রুগী দেখলে সপ্তাহেই আয় কম করেও সাড়ে চারশো টাকা। মাসে আঠারোশ টাকা।

অমন অজন বড় ডাক্তার কি মাসে মাইনে ছাড়াও এতগুলো একস্ট্রা টাকা কামিয়ে নিচ্ছেন। কিন্তু রুগী কি পাচ্ছে? কি পাচ্ছে যে তো নিজে নিজেই চোখেই দেখেছে।

দুটোর সময় ক্লিনিকে গিয়ে লাইন লাগান। বিকেলপনের চতুর্থাংশ ম্লানেই শুধু প্রবেশ যোগ্য। চরন বাবের নামটি মহিলার নিয়ে ভারতপন বাবুকে নিজের গাড়িতলা বিশাল বাড়ীটার ওপরের চারটে তলা জুড়ে সরকারী ব্যাঙ্কগুলি মিনি মানিব্যাগ। তেতলার নার্সিংহোমের আউটডোর। ডাক্তারদের চেম্বার। চেম্বারে নার্স এবং পুলিসের ভাবখানা তফাত রয়েছে বেশের দরজায় একটা এক নম্বরী একমাত্র লাইন খাতায় এক নাম ধরে ডেকে নিয়ে নাম লিখে—টাকাটা আট নম্বরে জমা দিয়ে আসুন।

সেই টাকা জমা দিতে গিয়েই মন ঠেকে গেল দিনের কাবেরার কি সুন্দর চেহারা। কাউন্টারের সামনে তিনটে লাইন। একটার

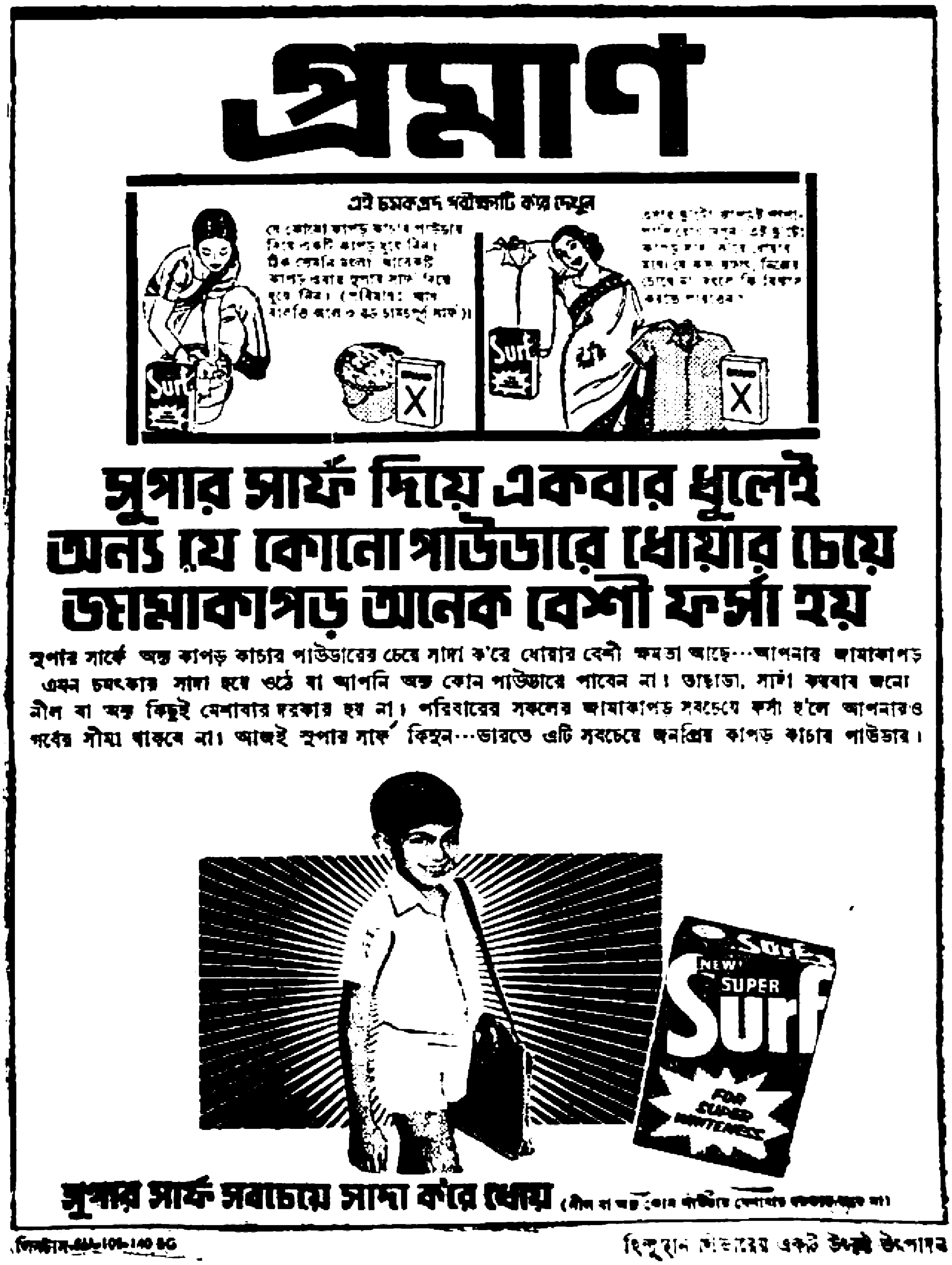

লিনটাস-SSL-109-140 BG
হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

পুরোনো আর নতুন সব রুগীরই নাম রেজিস্ট্রি করানো হচ্ছে। আর সুজোরে ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ টাকা জমা দিচ্ছে সবাই। প্রথম চারবার দেখানোর দক্ষিণা ছ টাকা করে। পরের চারবার রেটটা কমে গিয়ে অর্ধেক হয়ে যাবে। তারপরও যদি রুগীকে আসতে হয় তাহলে আবার দাও ছ টাকা করে।

রেজিস্ট্রেশনের লম্বা লাইনটা পাড়ি দিয়ে যখন কাউন্টারের সামনে এসে হাজির হোল বিনয় তখন ঘড়িতে বাজে প্রায় তিনটা। ডাক্তার আসার সময় হয়ে গেছে। অনেকেই কখন টিকিট জমা দিয়েছে কে জানে। জমা দিতে যত দেরী হবে তত পরে ডাক্তারের ডাক আসবে। হয়তো পাঁচটার আগে ডাকই পড়বে না। কাউন্টারের গ্রিলের ভেতর দিয়ে খাতাটা বাড়িয়ে দিল সামনে বিনয়।

রেজিস্ট্রেশন ক্লার্ক বিনয়ের খাতাটা উল্টে-পাল্টে দেখে ফেরত দিয়ে বলল—আজ হবে না। ডাক্তার সেনের অলরেডি নতুন পুরোনো মিলিয়ে পঁচিশটা টিকিট আজ জমা পড়েছে। পঁচিশের বেশী পেসেন্ট আইনমত উনি দেখতে পারেন না। আপনি সরুন, পেছনের লোককে আসতে দিন।

তার মানে?—চমকে উঠল বিনয়।—আমি অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে এসেছি। জুনিয়র ডাক্তার নিজে সব দেখেশুনে এই টিকিট লিখে দিলেন। আর আপনি বলছেন যে আজ আর হবে না।

হ্যাঁ। তাই তো বলছি। আইনে যা আছে তাই বলছি। একজন ডাক্তার একটা সিফটে পঁচিশজনের বেশী রুগী দেখতে পারেন না। ডাক্তার সেনের কোটা ফুরিয়ে গেছে—তাই আপনার নাম আজ আর রেজিস্ট্রি হবে না।

বেশী বয়স নয় ক্লার্কটির। পাতলা ছুঁচালো গোঁফ আর লম্বা জুলপিতে মুখটার একটা মিলো মিলো ছাপ। লাইনে দাঁড়ানো মেয়ে-পুরুষদের শুনিয়ে শুনিয়েই বলল—আপনারাই তো ডাক্তারদের লাই দিচ্ছেন। এটা হাসপাতাল না। পয়সা দিয়ে দেখাচ্ছেন। পয়সা দিয়ে যখন দেখাবেন তখন একটু বেশী সময় নিয়ে ডাক্তার দেখুক তাই কি আপনারা চান না? বলুন তিন ঘণ্টায় মধ্যে পঁচিশজনের বেশী পেসেন্ট একজন ডাক্তার দেখে কি করে? তাহলে হাসপাতাল আর ক্লিনিকে পার্থক্য আর রইল কোথায়?

যুক্তিগুলো একটাও অস্বীকার করতে পারল না বিনয়। কিন্তু একথাগুলো কি নার্স বা জুনিয়র ডাক্তার জানে না। তারা কি করে জেনেশুনেও টিকিট বানিয়ে দিয়ে বলল, যান টাকা জমা দিয়ে আসুন? তবে আর অ্যাপয়েন্টমেন্ট করানোই বা দরকার কি? পাশে তাকিয়ে দেখল হাকলাম মত ভজন রায় ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছেন। বড় ছেলেটা কান খাড়া করে শুনছে সব। ওর মুখে-চোখে একটা শেয়াল-শেয়াল হাসি। মাথাটা গরম হয়ে উঠল বিনয়ের। লাইন ছেড়ে বেরিয়ে এল। ভজন রায়কে করিডোরে সাজানো সোফায় বসতে বলে ছুটল আবার ডাক্তার সেনের চেম্বারে।

কি হল?—টাকা জমা দিয়েছেন?—জুনিয়র ডাক্তারের প্রশ্ন দুটো শুনেই বিনয়ের সন্দেহ হল, টাকা যে বিনয় জমা দিতে পারেনি, বা পারবে না তা ভদ্রলোক জানেন। ওর মত আরো দশ-বারোজন ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে ডাক্তারের টেবিলের সামনে। মিনিটে মিনিটে ভিড়টা বেড়েই চলেছে। দেখেশুনে, বিনয়ের মনে হল আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘরটা ভরে যাবে ফিরিয়ে দেওয়া রুগীর ভিড়ে। বড় ডাক্তারকে দেখাবে সবাই চড় রোগ সারাতে। অথচ আইন সে পথটাও মেরে রেখেছে। বাইরে এত সস্তায় এসব ডাক্তারের টিকিও মেলে না। তাই এখানে এত ভিড়। পাশের ঘরে ততক্ষণে রুগীর ডাক পড়তে শুরু করেছে। কানে এল—বিমল বিশ্বাস। ডাক্তার সাহেবের খোদ আর্দালী টিকিট দেখে নাম ডাকছে। আর একজন হতভাগা টিকিটের টাকা জমা দিতে না পেরে মুখ কালো করে দাঁড়িয়ে আছে এই ঘরে, জুনিয়র ডাক্তারের সামনে।

দাঁড়ান। আপনাদের জন্য একটা ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করব। ডাক্তারবাবু কাউকেই ফেরাতে চান না। কিন্তু কি করব বলুন, আফিসটা এত গোঁয়ারা হয়েছে।—বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালেন জুনিয়র ডাক্তার। পাশের ঘরের সবুজ ভারী পর্দা ফুঁড়ে তখন টুকরো টুকরো প্রশ্ন-উত্তর এঘরে ভেসে আসছে—'কদিন ভুগছেন?'—'এই তো তিন মাস ডাক্তারবাবু।'

খানিক বাদেই ডাক্তারবাবুর খোদ আর্দালীটি এসে হাজির হল এই ঘরে। জুনিয়র ডাক্তার আসেননি। একেই পাঠিয়ে দিয়েছে। কালো জামা, পাজামার ওপর একটা হাফ সার্ট গায়ে, চেহারাটা খুব চতুর চতুর ছোকরার। একপলকে গোটা ঘরটার চেহারা দেখে নিয়ে ফিসফিস করে বলল—টাকা জমা নেয়নি তো কি হয়েছে? আমি ডাক্তারবাবুকে দিয়ে সবাইকে দেখিয়ে দেব। তবে হ্যাঁ, টাকাটা আমার কাছে জমা দিন। কাউকেই তাহলে আর ফেরৎ যেতে হবে না।

পঁচিশজনের ওপরে সেদিন বড় ডাক্তার আরো প্রায় বাড়তি চল্লিশটি রুগী দেখলেন। ভজন রায়ও বাদ গেল না। টাকাও জমা পড়ল। তবে গভর্নমেন্টের ঘরে নয়, আর্দালীর তহবিলে। এই টাকাটার কোন হিসাব কোথাও লেখা হবে না। এর হিসাব আছে ঐ আর্দালীর কাছে। রুগী পিছু ওর রেট এক টাকা। জুনিয়র আর নার্স পাবে দুটো টাকা। বাকীটা বড় ডাক্তারের। আর তিন ঘণ্টায় পঁচিশজনের বদলে পঁয়ষট্টিজনকে দেখে দেড়শো প্লাস এগার কিল, মোটমাট পৌনে তিনশো টাকা ফাউ এক বিকেলেই আদায় করে ডাক্তার চলে গেলেন।

ভজন রায় খুব খুশী। চৌষট্টি টাকার জায়গায় মাত্র ছটা টাকায় সব হয়ে গেল। এর শুধু বিনয়বাবুর কৃপায়। চৌধুরীরাও সুখী। তাদের কর্তার সুচিকিৎসা হচ্ছে। ডাক্তার বলেছেন মাস দুয়েকেই সব সেরে যাবে। ভজন রায় একদম ফিট হয়ে যাবেন। কিন্তু বিনয় কেমন অশান্তি বোধ করছে। নিজে একসময় ইউনিয়ন করত। অন্যায়ের প্রতিবাদে কতবার ডেমনেস্ট্রেশন করেছে। অথচ এখানে কেমন বোবা বুরবাক বনে গেল। ভজন রায়ের বড় ছেলেটা সবই দেখেছে, শুনেছে। আজকাল ফোন করতে গেলে হাসতে হাসতে বলে—'বিনয়বাবু আপনি তো ইউনিয়ন করতেন। এসবের এগেনস্টে কিছু করবেন না?' শান্তির বজায় রাখার জন্য বিনয় বোকা বোকা মুখে শুধু হাসে, কোন জবাব দেয় না। দেবেই বা কি? ওর একার কিই বা ক্ষমতা?

—রবিশঙ্কর

মনের কথা

অভিচার বিভ্রম

তারক ও কৃতান্ত

ডিলিউশনের রোগীর ভ্রান্তির বিশিষ্টতা তার শিক্ষাদীক্ষা ও সুস্থ অবস্থার ধ্যান-ধারণার সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পর্কিত। অভিচারের ডিলিউশন যার মধ্যে দেখা যায়, সুস্থ অবস্থাতেও তার অভিচারে বিশ্বাস ছিল। মারণ উচাটন বশীকরণ ইত্যাদি প্রক্রিয়ার সাহায্যে মানুষ মানুষের ক্ষতি সাধন করতে পারে, এই ধরনের বিশ্বাস যতই ভ্রান্ত বা যুক্তিহীন হোক না কেন, ডিলিউশন বা রোগের পর্যায়ে পড়ে না। বহু সুস্থ ব্যক্তি মনে মনে এই রকমের ভুল ধারণা পোষণ করে থাকেন। আমাদের দেশে শুধু নয়, পাশ্চাত্যদেশেও ডাইনীবিদ্যা বা উইচক্রাফটে বিশ্বাসী লোকের অভাব নেই। অবশ্য, এই রকম মানুষের সংখ্যা বিজ্ঞান-ভিত্তিক শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ কমে আসছে। তন্ত্রমন্ত্র যাগযজ্ঞের বদলে এখন ডিলিউশন অনেক রোগীর বেলায় যন্ত্রভিত্তিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ এক ধরনের যন্ত্রের সাহায্যে ক বাবু আমাকে প্রভাবিত করছেন অথবা খ বাবু আমার মনের কথা জেনে নিচ্ছেন এবং আমাকে খারাপ কাজে উৎসাহিত করছেন:—এই রকম ধরনের অভিযোগ অনেক রোগীর মুখে শোনা যায়। এই সব ধারণা আভিচারিক ডিলিউশনের সমগোত্র। তন্ত্রমন্ত্রের বা যন্ত্রের সাহায্যে মানুষের ক্ষতি করা যায় এই বিশ্বাস না থাকলে এসব নিয়ে ডিলিউশনের সৃষ্টি হতে পারে না। যখন এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে গ বাবু কোনো ব্যক্তি বা দলবিশেষ তাঁর ক্ষতি করছে মনে করেন এবং কোনো রকম যুক্তিতর্ক দিয়ে তাঁর ভ্রান্তি দূর করা যায় না; তখন এই অবস্থাকে মোহ বা ডিলিউশন বলে আমরা মনে করি। গ বাবু প্যারানইয়া রোগে ভুগছেন, বলতে পারি। আত্মীয়স্বজন অনেক দিন পর্যন্ত গ বাবুর ধারণাকে সত্য ধারণা বলে মনে করতে পারেন। সে রকম ক্ষেত্রে চিকিৎসার ফল পাওয়া কঠিন। তারকনাথকে নিয়ে এই রকম মুশকিলে পড়েছিলাম।

তারকনাথের বয়স পঁয়ত্রিশ, বিবাহিত, তিনটি সন্তানের পিতা। কোলকাতার উপকণ্ঠে এক ছোট শহরের বাসিন্দা, সেই শহরের এক শিল্প-প্রতিষ্ঠানের অদক্ষ শ্রমিক। স্কুলের নীচু ক্লাশ অবধি পড়েছেন। বছরখানেক ধরে অসুস্থ। উপসর্গের মধ্যে সব লক্ষণই প্রায় বিদ্যমান। ঘুম নেই, ক্ষিদে নেই, শরীরে একেবারে শক্তি নেই, কয়েক মাস কাজে যাচ্ছেন না। কোনো কিছুতেই উৎসাহ নেই। নিরাসক্ত, নিস্পৃহ ও নিষ্প্রভ। প্রথম দিনে নিউরাসথিনিয়া বলে মনে হল। ওষুধের ব্যবস্থাপত্র দিয়ে পনেরো দিন পরে আসতে বললাম। নির্দিষ্ট দিনে তারকনাথের দেখা পাওয়া গেল না। আরো এক সপ্তাহ বাদে তারকের দাদা এক রকম জোর করে তারকনাথকে নিয়ে এলেন। তাঁর মুখে শুনলাম যে এতটা পথ জোর করে ট্যাক্সিতে আনতে হয়েছে। কিছুতেই আসতে চায় না। আগের দিনে ট্রেন থেকে নেমে বাড়ী ফিরে গেছে। দাদা থাকেন অন্য এক জায়গায়; খবর পেয়ে চলে এসেছেন। দাদার আগ্রহেই চিকিৎসার চেষ্টা করা হচ্ছে। তিনি ছাড়া বাড়ীর আর সকলেরই ধারণা যে তারকনাথকে প্রতিবেশী কৃতান্ত বাণ মেরেছে। ডাক্তারী-চিকিৎসায় কোন ফল হবে না। এই এক বছর ধরে অনেক দেবস্থানে মানত করা হয়েছে, একজন সন্ন্যাসীকে দিয়ে এক মাস ধরে হোম করা হয়েছে, কোনো এক শ্মশানচারীকে কাটানমন্ত্র পড়ানো হয়েছে। কিন্তু কৃতান্তের বাণের ক্রিয়া কেউই খতম করতে পারেন নি। দাদা কলেজে পড়েছেন, কোনো এক কারখানার ফোরম্যান। ওসব বুজরুকিতে বিশ্বাস করেন না। এখন থেকে রোগীকে নিয়মিত হাজির করার ভার তিনিই গ্রহণ করলেন।

তারকনাথের সঙ্গে কথাবার্তার কিছুটা অংশ সরাসরি তুলে দিচ্ছি।

—সেদিন আসেন নি কেন?—আসতে দিল না?—কে?—কে আবার? যে এতদিন ধরে কষ্ট দিচ্ছে সে। ট্রেন থেকে জোর করে নামিয়ে দিল।—লোকটার নাম কি? ট্রেনে আপনার ভাইপো ছিল, আরো লোক ছিল, তাদের মাঝখানে জোর-জবরদস্তি করতে সাহস পেল কি করে?—সামনে এলে তো তাকে আটকানো যেত। সে কি আর সামনে আসে? ঘরে বসে পুরশ্চরণ করছে, বাণ মারছে। বাতাসের ধাক্কায় আমি ছিটকে ট্রেনের বাইরে পড়ে গেলাম।—আজ আটকালো না কেন? আজ এলেন কি করে? —আজ ও ঘুমিয়ে পড়েছে তাই আসা গেছে। কিন্তু এর ফল ভাল হবে না। আরো বেশী করে কষ্ট দেবে। হয়তো এবার ছেলেটাকে বাণ মারবে। মহিমঠাকুরের দেওয়া তাবিজ ছেলেটার হাতে আছে, তাই রক্ষে।—আপনার ওপর রাগের কারণ কি? আপনার ক্ষতি করে ওর লাভ কি? আমি যে দেখে ফেলেছি।—কি দেখে ফেলেছেন?

তারকনাথ মুখ বন্ধ করলেন। অনেক সাধাসাধনা করেও জবাব পাওয়া গেল না। দাদার ধমকাধমকিতেও কাজ হল না। দাদাকে ঘর থেকে বাইরে যেতে বললাম। ভাবলাম হয়তো দাদার অসাক্ষাতে কিছু গোপন কথা বলতে পারেন, দাদার সামনে বোধহয় লজ্জা পাচ্ছেন। কোনো ফল হল না। শুধু একটি কথা শুনলাম। কি দেখেছেন কিছুতেই বলা চলবে না। বললে ও'র সর্বনাশ হবে। আর বলার শক্তি ও'র নেই। বলতে গেলেই কৃতান্ত বাণ মেরে ওর মুখ বন্ধ করে দেবে।

দাদা জানালেন, তারকনাথ এ যাবৎ ওষুধ-পত্র কিছু খান নি। তারকনাথের মা, স্ত্রী এবং তিনি নিজে মনে করেন এটা চিকিৎসার ব্যাপার নয়। বাড়ীতে থাকলে চিকিৎসা হবে না, আবার হাসপাতালে দেবার মত পয়সাও ও'দের নেই। এ অবস্থায় কি করা যায়?

তারকনাথকে সম্মোহিত করার চেষ্টা করতে গিয়ে বিফল হলাম। ঘর অন্ধকার হতেই বিছানা থেকে উঠে পড়লেন। কৃতান্তের বাণ কোলকাতা অবধি ধাওয়া করতে পারে কিনা, জানতে চাইলেন।

—আপনি ঠিক কোথায় আছেন জানতে না পারলে কৃতান্ত বাণ ছুঁড়বে কি করে? আপনাকে নিশানা করে তো বাণ ছোঁড়া দরকার।

আশ্বস্ত হলেন কিন্তু বিছানায় কিছুতেই শুতে রাজী হলেন না। গত্যন্তর না দেখে দাদাকে বললাম তাঁর বাসায় নিয়ে ভাইকে রাখার বন্দোবস্ত করুন। আর এই কথা আর কেউ যেন না জানে। কৃতান্তকে

কিছুতেই তারকবাবুর ঠিকানা জানতে দেওয়া হবে না। অভিচারিকরা অধিষ্ঠান-বাসস্থানের সন্ধান না পেলে কোনো ক্ষতি করতে পারে না। আর তাছাড়া কৃতান্ত যদি বুঝতে পারে তারকবাবু তার ভয়ে বাড়ীছাড়া হয়েছেন তবে সে তার অভিচার বন্ধও রাখতে পারে। শত্রু মৃত বা পরাজিত হলে, তার বিরুদ্ধে সাধারণত এরা কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করে না।

তারকবাবুর সামনেই এইসব কথা হল। প্রথমটায় দাদা একটু ইতস্ততঃ করে গেলেও পরে আমার কথার তাৎপর্য ধরতে পারলেন। তারকবাবু আরো একটু বেশি আশ্বস্ত হলেন। বাণ মারা, কাটান দেওয়া ইত্যাদি সম্পর্কে অনেক কিছু জ্ঞান আমার আছে, এটা বুঝতে পেরে আমার প্রতি তাঁর বোধ হয় ভক্তির উদ্রেক হল। একটা প্রণাম করে বিদায় নিলেন। যাবার সময় বলে গেলেন, আমার কথামত ওষুধ খেতে রাজী আছেন।

দিন সাতেক পরে দাদা টেলিফোনে জানালেন যে, ভাই নিয়মিত ওষুধ খেয়ে যাচ্ছেন এবং নিজে থেকে আমার কাছে আসার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

তারকনাথ এলেন। আগেকার নিরাসক্ত নির্বিকার ভাবটা কমেছে। ঘুম হচ্ছে। খিদে কিছুটা বেড়েছে, কিন্তু শরীরের শক্তি একটুও বাড়ে নি। চলতে ফিরতে কষ্ট, দাঁড়াতে কষ্ট, এমন কি বসে থাকতেও কষ্ট হয়। কৃতান্ত নতুন কোনো কিছু হয়ত করছে না, কিন্তু পুরনো বাণের ক্রিয়া এখনও চলছে। তেজ শক্তি সামর্থ্য সব চলে গেছে। মন জলের চেয়েও পাতলা, নাকাডাঙাটুকু পর্যন্ত নেই। আমার ওষুধে শক্তি ফিরে পাবার কোনো সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। তারকনাথ কাল রাত্রে সহসা বুঝতে পেরেছেন যে বাণ কাটানোর প্রক্রিয়া আমার জানা আছে। তিনি বিছানার শুয়ে আমার কথামত ঘুমিয়ে পড়তে রাজী হলেন। আমি ইচ্ছে করলে কাউন্টার করে কৃতান্তের বাণের বিক্রিয়া দূর করে দিতে পারব; এই বিশ্বাস তাঁর হয়েছে।

অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই ভদ্রলোক সম্মোহননিদ্রায় অভিভূত হলেন। প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে অভিভাবক (সাজেশান) দিলাম। কৃতান্তের বাণ তারকনাথকে আর পীড়িত করবে না। কৃতান্তের বিক্রিয়া-আমার অভিভাবনে দূর হয়ে যাবে। শীগগিরই তারকনাথ তাঁর হৃতশক্তি ফিরে পাবেন এবং নিয়মিত কাজকর্ম করতে পারবেন। ইত্যাদি, ইত্যাদি। অনেকটা নিশ্চিন্ত মনে তারকনাথ দাদার সঙ্গে বাড়ী ফিরলেন।

এক সপ্তাহ পর তারকনাথ একা এলেন। দাদাকে বিশেষ কাজে দুর্গাপুরে যেতে হয়েছে, দু'সপ্তাহ বাদে ফিরবেন। তারকনাথ নিজের বাসায় ফিরে গেছেন। তবু খুব বেশী বিচলিত মনে হল না। এই দিনে তাঁর রোগইতিহাস আরো বিস্তার করে বললেন। দাদা আগেই আমাকে কিছুটা জানিয়েছিলেন।

তাঁর দাদামশাই-এর বেশ কিছু জমিজমা ছিল। আর ছিল লাঠির জোর এবং মনের সাহস। লাঠিবাজি করে অনেক জমি দখল করেছিলেন ও মামলা-মোকদ্দমা করে অনেককে সর্বস্বান্ত করে ছেড়েছিলেন। তাঁর শত্রুরা তাঁকে ভয়ভক্তি দুই-ই করত। শত্রু বলতে জাঠতুতো-খুড়তুতো ভাইরা। তারা গায়ের জোরে কিছু না করতে পেরে এক তান্ত্রিকের শরণাপন্ন হয়। তিনমাস ধরে মারণকর্ম চালায় তান্ত্রিক। ফলে রক্তবমি করতে করতে দাদামশায় মারা যান। তখন তারকনাথের বয়স সাত কি আট। মায়ের কাছে এই কাহিনী তিনি অনেকবার শুনেছেন। সেই থেকে তন্ত্রমন্ত্র, তুকতাকের ভয় পেয়ে আসছেন। সর্বস্বান্ত হয়ে বছর কুড়ি আগে তাঁরা পূর্ববাংলা ছেড়ে কোলকাতায় আসেন। দুঃখকষ্টে পড়ে তন্ত্রমন্ত্রের উপর ভয়ভক্তি আরো বাড়তে থাকে। স্কুল পালিয়ে শ্মশানে গিয়ে তান্ত্রিকের খোঁজ করতেন। তন্ত্রমন্ত্র শিখে নিজেদের অবস্থা বদলে ফেলার বাসনা নিয়ে শহরতলীর পথে পথে ঘুরে বেড়াতেন। স্কুলে সুবিধা করতে পারছেন না দেখে দাদা তাকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে কারখানায় ভর্তি করে দেয়। কারখানার খাটুনি ভাল লাগত না। কোথাও কোনো নতুন সাধু এসেছেন, কোথাও কোনো সন্ন্যাসী আড্ডা গেড়েছেন, খবর পেলেই তারকনাথ সেখানে হাজির হতেন। প্রতিবেশী কৃতান্তবাবুও পাকিস্থান থেকে আসেন মাত্র বছর দশেক আগে। এর মধ্যে তিনি দোতলা বাড়ী তুলেছেন, জমিজমা করেছেন, ধুমধাম করে মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন। তিনিও এসেছিলেন কপর্দকশূন্য অবস্থায়। কিভাবে এত তাড়াতাড়ি অবস্থার পরিবর্তন ঘটালেন, এ নিয়ে প্রতিবেশীদের কৌতূহলের সীমা ছিল না। একটা ছোট দোকান থেকে আর কত রোজগার হতে পারে? তারকনাথের মা বলতেন কৃতান্ত তন্ত্রমন্ত্র জানে। লক্ষ্মী-বাঁধন, কুবেরবাঁধন মন্ত্র নাকি দাদামশাইও জানতেন। কৃতান্তের বাড়ীতে যাওয়া আসা এ বাড়ির সকলেরই ছিল। কৃতান্তকে পূজো-আর্চা করতে কেউ দেখে নি। কিন্তু একটা ঘরে দেশ থেকে আনা বিগ্রহ থাকত, আর সেই ঘরটা দিনরাতই বন্ধ থাকত; এই থেকে তারকনাথের ধারণা হয়েছিল ঐ ঘরেই আছে কৃতান্তের হঠাৎ ধনী হবার চাবিকাঠি। ঐ বাড়ীর এক বাচ্চা চাকরের কাছে তারকনাথ শুনেছিলেন যে গভীর রাতে ঐ ঘরের বাইরের দিকের দরোজা খোলা হয়, অন্ধকারে গাঢাকা দিয়ে অনেক লোক যাতায়াত করে। রাস্তার ধারে গাড়ী থামে, গাড়ী থেকে বস্তা নামে, গাড়ীতে বস্তা ওঠে। 'কেলাকেলা' ব্যাপার। কালো রাত, কালো পোশাক পরা লোকজন, কালো কাপড়ে মোড়া বস্তা। এই সময় তারকবাবুদের কারখানায় একটা গন্ডগোল বাধে। দুই ইউনিয়নের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে কিছু লোক আহত হয়। তারকবাবু খুব ভয় পান। কারখানা কিছু দিন বন্ধ থাকার ফলে ভয় আরো বেড়ে যায়। কারখানা খুললেও তিনি যেতে চান না। শরীর এই সময় থেকে খারাপ হতে থাকে। দাদা এসে বকাবকি করাতে কয়েক দিন গিয়ে আবার যাতায়াত বন্ধ করে দিলেন। সারা দুপুর দরোজা বন্ধ করে শুয়ে থাকতেন, সন্ধ্যায় পর বেরিয়ে এদিক ওদিক ঘুরতেন। এক রাত্রে কোলকাতা থেকে ফিরতে খুব দেরী হল, বোধ হয় ট্রেনের বিভ্রাটে। রাস্তার মোড়ে একটা কালো রং-এর গাড়ী থেকে কৃতান্তবাবুকে নামতে দেখলেন। গা ছম-ছম করে উঠল তারকনাথের। তিনি একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখলেন গাড়ী থেকে একটা কালো বস্তা নামিয়ে নিল দুজন লোক। গাড়ীটা নিঃশব্দে চলে গেল। সেই রহস্যভরা ঘরের দরোজাটা খুলে যেতে এক ঝলক আলো এসে রাস্তায় পড়ল, বস্তাটা ইতিমধ্যে ঘরে চালান হয়ে গেছে। দরোজাটা বন্ধ হল। দুজন লোক (ওরাই বোধ হয় বস্তাটা নামিয়েছিল) কথা বলতে বলতে তারকনাথের পাশ দিয়ে চলে গেল। তাদের কথাবার্তার দু-এক টুকরো কানে যেতে তারকনাথ ভয়ে কাঁটা হয়ে গেলেন। কৌতূহল ভয়কে ছাপিয়ে গেল। পা টিপে টিপে তাদের পিছু নিলেন তিনি। তারা পাঁচমাথার শ্মশানের অবধূতের কথা আলোচনা করছিল। আগামী অমাবস্যায় খড় মুড়ে আলাদা করে অবধূত বস্তাবন্দী করে গাড়ীতে তুলে দেবেন। কৃতান্তের পিছনে যেউ লেগেছিল, তাকে সাবড় করে দিয়েছে অবধূত। আর শুনতে পারলেন না তারকনাথ। পা টিপে-টিপে রুদ্ধশ্বাসে নিজের বাড়ীতে ফিরে এসে শয্যা নিলেন। স্ত্রী এবং মা অনেক সাধ্য-সাধনা করেও তাকে জলস্পর্শ করাতে পারলেন না। পরদিন থেকে বাড়ীর লোকে জানাল তারকনাথকে বাণবিদ্ধ করা হয়েছে। তারকনাথের দৃঢ়বিশ্বাস গভীর রাত্রে গেরুয়া রং-এর পোশাক পরে কৃতান্ত অবধূতের সঙ্গে মারণকর্ম করে। নানারকম শান্তি-স্বস্ত্যয়ন, জপতপ, মাদুলীকবচ দিয়ে বাণ কাটানোর চেষ্টা চলছে সে থেকে। ফল পাওয়া যায় নি।

সেই রাত্রের ঘটনা অবশ্য তারকনাথ এই রকম খোলাখুলি আমাকে জানাননি। মা ও তারকবাবুর স্ত্রীর কাছ থেকে জেনে তাঁর দাদা আমাকে খানিকটা আভাস দিয়েছিলেন, খানিকটা কৌশলে জানতে হয়েছে। ভয়ার্ত তারকবাবুর বিবরণের সত্যাসত্য যাচাই করার কোনো উপায় নেই। কবে থেকে ভদ্র-লোক হ্যালুসিনেশনে ভুগছিল? তিনি যা দেখেছেন ও শুনেছেন সেসব হ্যালুসিনেশন কিনা? এইসব প্রশ্নের সঠিক উত্তর না জানা পর্যন্ত তারকনাথের চিকিৎসায় ফল পাওয়ার আশা কম। এইসব প্রশ্নের মীমাংসার আগেই তারকনাথের চিকিৎসা বন্ধ হয়ে যায়। দাদা বাইরে থাকাতে নিজের বাসায় চলে যান। সেখান থেকে মাত্র একদিন আমার কাছে এসেছিলেন, তাও ভাইপোর পীড়াপীড়িতে। মা এবং স্ত্রীর কোনো রকম উৎসাহ ছিল না, কাজেই ওষুধ খাওয়া ছেড়ে দু সপ্তাহের মধ্যেই তিনি আগের অবস্থায় ফিরে গেলেন। দাদা জামসেদপুরেই থেকে যেতে বাধ্য হন। কাজেই পাঁচমাথার শ্মশানের এবং অন্যান্য জায়গার অবধূত তান্ত্রিকের চিকিৎসা চলতে থাকে। মাসখানেক পর দাদা একবার এসে-

ছিলেন। আমার পরামর্শে অন্যলোপায় হয়ে তাঁকে হাসপাতালে পাঠান। তার পরের খবর আমার জানা নেই।

এবার তারকনাথের অসুস্থতার কারণ নির্ণয় ও বিকারতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের চেষ্টা করা যাক।

জ্ঞান-বুদ্ধি তারকনাথের সীমিত। দাদামশাইয়ের মৃত্যু-ইতিহাস এবং মায়ের ব্যাখ্যা তাঁর মস্তিষ্কে দৃঢ়ভাবে মুদ্রিত। যুক্তি-তর্ক দিয়ে মারণ-উচাটন প্রভৃতির প্রভাব থেকে মুক্ত হবার চেষ্টা কোনোদিন করেন নি। শৈশব থেকে সাধু-সন্ন্যাসীর কৃপায় বরাত খোলবার চেষ্টায় নানাদিকে ঘুরে বেড়িয়েছেন। তন্ত্রমন্ত্রের উপর জন্মেছে যেমন ভয় তেমনি শ্রদ্ধা। যে কোনো অঘটন বা আকস্মিকতার মূলে আছে তন্ত্রমন্ত্রের প্রভাব, এই ধারণা তাঁর মনে বদ্ধমূল। কৃতান্তবাবুর আকস্মিক ধনলাভের মূলে এই রকম কোনো প্রভাব বিদ্যমান; এ চিন্তা থেকে তিনি মুক্ত হতে পারেন নি। কৃতান্তবাবু কয়েক বছরের মধ্যে মান-সম্ভ্রমের অধিকারী হয়েছেন, তারকনাথ জীবনে ব্যর্থ হয়েছেন। কৃতান্তকে মনে-মনে হিংসা করেছেন। কৃতান্তের ব্যবহার ছিল সহৃদয়, আপদে-বিপদে পাড়া-প্রতিবেশীকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করতেন, তারকনাথকে দেশের লোক বলে বিশেষ খাতির দেখাতেন, তারকনাথের দাদামশাইয়ের নাম উল্লেখ করে শ্রদ্ধাভরে প্রণাম জানাতেন। এই সব কারণে কৃতান্তকে ভাল না বেসেও পারতেন না তারকনাথ। তার অবস্থার জন্যে তাকে হিংসা করতেন, তার ক্ষমতার জন্যে তাকে ভয় করতেন, তার ব্যবহারের জন্যে তাকে ভালবাসতেন। কৃতান্ত আর তন্ত্রমন্ত্র: এই দুই চিন্তা নিয়েই তারকনাথের মন সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকত। নিজের অবস্থার উন্নতির চেয়ে কৃতান্তের অবস্থা-বিপর্যয় ঘটলেই তিনি বেশী আনন্দ পাবেন; শেষের দিকে এই রকমই মনে হত। কারখানার গণ্ডগোলের মূলে কৃতান্তের হাত আছে, এরকম সন্দেহ তাঁর মনে জেগেছিল। কারখানায় কৃতান্ত কিছু-কিছু জিনিস সাপ্লাই করতেন। কৃতান্তকে মাঝে-মাঝে দাদামশাই-এর মত শক্তিশালী মনে হত। শক্তিশালীকে লোকে ভয় পায়, তার ধ্বংসের জন্যে চেষ্টা করে। কৃতান্ত-নিধন যজ্ঞ হয়তো কেউ কোথাও করছে। একদিন হয়তো কৃতান্তবাবুর গলা দিয়ে রক্ত উঠবে। কেওড়াতলায় নতুন এক সন্ন্যাসী এসেছে শুনে তারকনাথ যেদিন তার সন্ধানে যায়, সেই রাতেই ফেরবার সময় কালো গাড়ী থেকে কৃতান্তকে নামতে দেখেন। সন্ন্যাসীকে হোম করবার জন্যে কিছু টাকা দিয়েছিলেন। এর পর থেকেই তাঁর মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মায় যে, কৃতান্ত তারক-নিধন যজ্ঞ শুরু করেছেন। ঘরের মধ্যে হোমাগ্নি জ্বালিয়ে আহুতি দিচ্ছেন। অন্ধকার রাত্রির কাহিনীর কতটা কাল্পনিক, কতটা সত্যি? আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। কৃতান্তবাবু কালো-কারবারী এবং গাঁজা-আফিমের চোরা ব্যবসায়ে লিপ্ত আছেন, এ সন্দেহ স্থানীয় অনেক লোকেই করে থাকেন। পাঁচমারীর শ্মশানে এক অবধূতকে কেন্দ্র করে কয়েক মাস ধরে এক গাঁজিকাসেবীদের আসর বসেছিল, এ খবর ও'র দাদা আমাকে দিয়েছিলেন। কয়েকজন হিপিকেও সেই আসরে দেখা যেত। একটা খুন হবার পর আসরটা ভেঙে যায়। সেই খুনের সঙ্গে চোরাকারবারের কোনো সম্পর্ক ছিল কিনা জানি না। তবে খবরটা তারকনাথ জানতেন, ঐ অবধূতের কাছে তাঁর যাতায়াত ছিল, হয়ত কিছু পয়সা-কড়িও তাকে দিয়ে থাকবেন।

মোটামুটি আমরা ভেবে নিতে পারি যে, অল্পবুদ্ধি দুর্বলচিত্ত তারকনাথের মস্তিষ্কে মারণ-উচাটন সম্পর্কিত কয়েকটি আতঙ্ক প্রভাবিত, অনড় কেন্দ্র ছিল; কারখানার দাঙ্গায় বিশেষ ভয় পাবার ফলে মস্তিষ্কে অ্যাকিউট-প্যারাডক্সিক্যাল পর্ব দেখা দেয়। কৃতান্ত-নিধন যজ্ঞ আত্মনিধন যজ্ঞে রূপান্তরিত হয়, কৃতান্তের কালো পোশাক গেরুয়া হয়ে যায়, কালো বস্তা প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ড হয়ে ওঠে। প্যারানইয়ার অন্যান্য যে সব রোগীকে আরো ভালভাবে জানবার ও বোঝবার সুযোগ হয়েছে, তা থেকে মনে হয় তারকনাথ সম্পর্কে আমার বিকারতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ একেবারে দূরকাল্পনিক হয় নি।

প্যারানইয়ার সামাজিক গুরুত্ব অপরিসীম। তারকনাথ দুর্বল প্রকৃতি, 'ইনহিবিটরী' বা নিস্তেজনাপ্রধান মস্তিষ্কের অধিকারী। তার মস্তিষ্কে যদি উত্তেজনার আধিক্য থাকত, (যাকে আমরা 'কোলেরিক' টাইপ বলি), তবে এই নির্যাতনমূলক ডিলিউশন তাকে খুন-খারাবিতে প্রবৃত্ত করতে পারত। মাঝে-মাঝেই সংবাদপত্রে হঠাৎ খুন, অকারণ খুনের খবর বের হয়। একজন হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে পাঁচ-সাত-দশ জনকে খুন করে ফেলে। কোনো সময় শোনা যায় কোনো ভদ্রলোক নিজের স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছে। এই সব কেসগুলো যথাযথ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে তারা প্যারানইয়ায় ভুগছিল। অন্যে তাকে আক্রমণ করবে, এই ভয়ে অন্যকে আঘাত করে বসেছে। এতো গেল বিচ্ছিন্ন ঘটনার কথা। সাম্প্রদায়িক ও দলগত হাঙ্গামার সময়ে আমরা জানি, অনেক সময় বিনা উত্তেজনায় ব্যক্তিগত আক্রোশ না থাকা সত্ত্বেও, মানুষের বুকে ছুরি বসিয়ে দিতে পারে। এখানে সাময়িকভাবে সম্প্রদায় ও দলভুক্ত সকলেই প্যারানইয়াতে আক্রান্ত হয়েছে, মনে হয়। বহুদিনের বন্ধু, পরিচিত প্রতিবেশী কিম্বা একেবারে অজানা-অচেনা লোককে হত্যা করতে এ সময় সম্প্রদায় ও দলের নিয়মনিষ্ঠ সভ্যরা একটুও কুণ্ঠিত বোধ করে না। যুক্তি-বুদ্ধি পাণ্ডিত্য দিয়ে ডিলিউশন থেকে মুক্ত হতে পারে না। 'অন্য দল বা সম্প্রদায় আমার দলকে উচ্ছেদ করার ষড়যন্ত্র করছে, আমার নিজের ও আমার দলের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে ওদের আঘাত আমি করবই!' এই ধরনের চিন্তা এদের পেয়ে বসে। এদের মৌলিক নিরাপত্তা দল বা সম্প্রদায়ের নিরাপত্তার সঙ্গে এক হয়ে যায়। এই অবস্থায় অন্য দল বা সম্প্রদায়ের মানুষকে মানুষ মনে হয় না। সব দেশে মাঝে-মাঝেই এই ধরনের সামাজিক প্যারানইয়ার প্রাদুর্ভাব ঘটে। দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিশেষ অবস্থা সামাজিক প্যারানইয়ার জন্য দায়ী। এই অবস্থাতেও, মনে রাখা দরকার, সকলে হত্যাকারীর ভূমিকা নিতে পারে না। বিশেষ টাইপের মস্তিষ্কের অধিকারীরা প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে আর অন্যান্যরা তাদের মসিহদূত মনে করে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা কৃতজ্ঞতায় বিগলিত হয়ে যায়। এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে সমাজদ্রোহী অবাঞ্ছিত কিছু লোক সম্প্রদায়ের, দলের, এমন কি দেশেরও নেতৃত্ব গ্রহণ করে থাকে। সামাজিক, রাজনৈতিক বিশেষ পরিবেশ এবং তারকনাথের মত কুসংস্কারাচ্ছন্ন অজ্ঞ মানুষের একত্র সমাবেশ ঘটলেই বিপত্তির সম্ভাবনা।

—অন্বেষিব

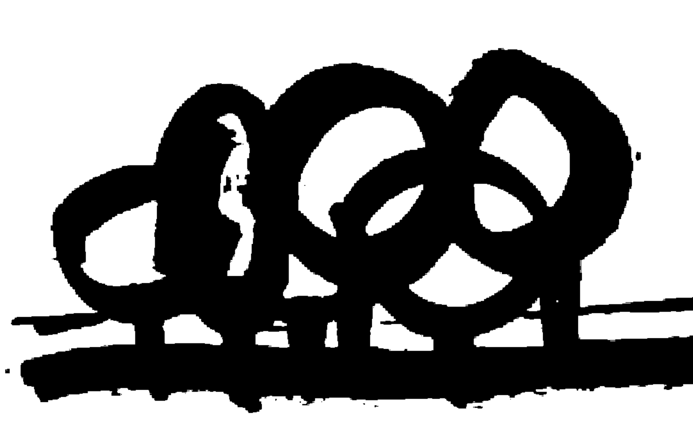

নিজেরে হারায়ে খুঁজি

অহীন্দ্র চৌধুরী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

মন্দিরে পূজো দিয়ে আমরা ফিরে এলাম হোটেলে। দুপুরে আহারাদির পর বিশ্রাম নেবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু হলো না। রাজস্থানের ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী জয়নারায়ণ ব্যাস আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। সঙ্গে একজন বাঙালী ভদ্রলোক। বাঙালী ভদ্রলোক একজন ডাক্তার, কিষেণগড়ে ওঁর চেম্বার। ব্যাসজীর সঙ্গে আমার অনেক দিন আগেই পরিচয় হয়েছিল কলকাতায়। নিউ এম্পায়ার মঞ্চে একটি হিন্দী নাটকের অভিনয় কালেই এই পরিচয় হয়।

বিশ্রাম আর হলো না। ওঁদের সঙ্গে চললাম কিষেণগড়ে বেড়াতে।

কিষেণগড়ের যা কিছু দর্শনীয় দেখলাম। জয়নারায়ণ ব্যাস এবং ডাঃ এস কে বসুর সঙ্গেই ঘুরেছি। দেখা-শোনার পর ব্যাসজীর বাড়িতে এলাম। সেখানে এক দফা আপ্যায়নের পালা।

সেদিন গেল। পরদিন চিশতীর দরগা দেখতে যাওয়ার পালা। সঙ্গে আছেন মিস্টার এন এন সেন।

দরগার সামনে বৃহৎ তোরণ। দরজাটি সোনার পাতে মোড়া। রামপুরের নবাবের দানে এই স্বর্ণমণ্ডিত নির্মিত। দরগার কাছেই মুসাফিরখানা। সেখানে প্রবেশ পথে রয়েছে পোলাও ভর্তি দুটি বিরাট আকারের ডেকচি। সে পোলাও তীর্থযাত্রীদের জন্যে পরিবেশিত হয়।

খালি মস্তকে দরগায় প্রবেশ নিষিদ্ধ। অগত্যা আমরা মাথায় রুমাল বেঁধে নিলাম।

দরগা দর্শন করে গেলাম 'আড়াই দিন কা ঝোপড়া' দেখতে। এটি আগে হিন্দু মন্দির ছিল। মুহম্মদ ঘোরী এটিকে মসজিদে রূপান্তরিত করেন। এটি নাকি নির্মিত হয়েছিল আড়াই দিনে। তাই এই নাম।

এক-এক করে দর্শনীয় স্থান পরিক্রমা করে চলেছি। তবে পাহাড়ের ওপর উঠতে গেলে হাঁপাতে উঠি। এবারে উঠলাম তারাগড় পাহাড়ে। এখানে দেখলাম প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ।

এর পর আনাসাগর হ্রদ দর্শন করে ফিরে এলাম হোটেলে। আনাসাগরের মার্বেল পাথরের সোপান দেওয়া ঘাট এবং সংলগ্ন উদ্যান নাকি সম্রাট শাজাহান তৈরী করেছিলেন। সম্রাট শাজাহান যে সৌন্দর্যের পূজারী ছিলেন সেকথা অনস্বীকার্য।

সম্রাট আকবরের স্মৃতিবিজড়িত দুর্গটি আজ মিউজিয়মে পরিণত। এখানকার সংগ্রহও দেখবার মতো। মিউজিয়মের কিউরেটর একজন বাঙালী, নাম অমূল্য ভট্টাচার্য। তাঁর কাছ থেকেই নানা তথ্য সংগ্রহ করলাম।

তারপর এলাম মেয়ো কলেজে। এই কলেজটি নানা দিক থেকে দৃষ্টান্তস্বরূপ। শিক্ষার সর্বাঙ্গীণ ব্যবস্থা এখানে। একমাত্র নাটক শিক্ষার কোন ব্যবস্থা এখনো পর্যন্ত নেই। এই কলেজে কয়েকজন বাঙালী অধ্যাপনায় নিযুক্ত আছেন।

যাই হোক, কদিনের ভ্রমণে যা কিছু দেখেছি, ভালোই লেগেছে। এবারে আমাদের জয়পুর যাওয়ার পালা।

জয়পুরে এসে ঐতিহাসিক 'অম্বর প্রাসাদ' দেখতে এলাম প্রথম দিনে। এর আগে ১৯০৪ সালে একবার জয়পুর এসেছিলাম, কিন্তু সেদিনের জয়পুর দেখার স্মৃতি

মন থেকে প্রায় মুছে গিয়েছিল। এবারে নতুন করে সেদিনের স্মৃতিটাকে মনের মধ্যে পাকাপোক্ত করে নিলাম।

ঐতিহাসিক প্রাসাদ দেখলাম, কিন্তু দুর্গে যাওয়া হলো না। দুর্গে প্রবেশ নিষিদ্ধ। তবুও বাইরে থেকে দেখলাম।

এরপর মানস প্রাসাদে এলাম। এখানেও নানা ইতিহাসের স্মৃতি জড়ানো। এলাম চন্দ্রলেখা প্রাসাদ—সেখানে বৃন্দাবন থেকে আনীত বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত সেটিও দেখলাম।

জয়পুর শহরে প্রাচীনত্বের ছাপ সর্বত্র। কিন্তু প্রাচীন জয়পুরের ওপর পড়েছে আধুনিকতার প্রলেপ।

এবারে একটু অন্য প্রসঙ্গে বলি, জয়পুরে যে হোটেলটিতে ছিলাম, সে হোটেলটি স্থানীয় মানুষের। কিন্তু ম্যানেজার ছিলেন একজন ইউরোপীয়ান। হোটেলটিতে আমাকে খুব যত্ন করে রাখা হয়েছিল। আমি এবং আমার স্ত্রী যখন খেতে বসতাম, তখন প্রধান পাচক আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতো। একদিন তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি এমন করে দাঁড়িয়ে থাকো কেন—আর এতো যত্ন করোই বা কেন।

ইংরেজীতে কথা বললাম। কিন্তু উত্তর পেলাম বাংলায়। লোকটি জানালো সে বাঙালী। দেশ-বিভাগের পর পূর্ব বাংলা থেকে এখানে চাকরী নিয়ে এসেছে। তা ছাড়া আরো বললে, সে আমাকে চেনে এবং জানে।

পরে আরো শুনলাম, সে আমার সম্পর্কে হোটেলের ম্যানেজারকে এমন করে বলেছে, যে ম্যানেজারও তাতে আমার ওপর বিশেষ দৃষ্টি না দিয়ে পারেনি।

হোটেলের প্রতিটি কর্মচারী আমার সঙ্গে যে ব্যবহার করতো তা কোনদিন ভুলবো না। আমার দ্বিতীয় দফায় জয়পুর ভ্রমণে এদের কাছ থেকে নানাভাবে সাহায্য পেয়েছিলাম।

এবারে দেওয়ালী উৎসবের রাতটি জয়পুরেই রইলাম। দেওয়ালী উৎসবের দিনে যে আলোকসজ্জা দেখলাম—তার স্মৃতি আমার কাছে চিরদিনের।

জয়পুর শহরের যা কিছু দর্শনীয় দেখা শেষ করে নিলাম কদিনে। বাকি ছিল গলতা এবং রামবাগ দেখা। তাও দেখলাম।

গলতা জায়গাটি সুন্দর এবং মনোরম। পাহাড়ের উপরে সূর্য মন্দিরটি দেখবার মতো। আর এখানে-ওখানে ছোট ছোট গম্বুজাকৃতি ছত্রীগুলিও পথিক-মানুষকে আকর্ষণ করে। ১৯০৭ সালে এখানে এসে এই ছত্রীতে বিশ্রাম নিয়েছি কতো সময়।

কিন্তু রামবাগে যে ঐতিহাসিক পোলো গ্রাউণ্ড রয়েছে, এটি নাকি পৃথিবীর বিখ্যাত এবং সুবৃহৎ পোলো গ্রাউণ্ড। রামবাগের উদ্যানটিও দর্শনীয়।

কদিনের জয়পুর ভ্রমণের অভিজ্ঞতা আমার চিরদিন মনে থাকবে। জয়পুরের সঙ্গে জড়িয়ে আছে দু'জন বাঙালীর নাম, যাঁদের একজন হলেন বিদ্যাধর ভট্টাচার্য, যিনি জয়পুরের রাজা 'সওয়াই' জয়সিংহের আমলে জয়পুর শহরের পরিকল্পনা

করেছিলেন। তাঁরই পরিকল্পনা মতো গড়ে ওঠে জয়পুর। সেটা আজকের কথা নয়। পরবর্তী আর একজন বাঙালী, সংসারচন্দ্র সেন যিনি রাজার দেওয়ান ছিলেন। এই শহরে তাঁরও অবদান কম নয়। আর এই দুই বাঙালীর কথা স্মরণ করে, জয়পুরে বাঙালীরা সকলেই প্রিয়। পরবর্তীকালে অর্থাৎ বর্তমানেও জয়পুর এবং বাংলার মধ্যে কিছুটা আত্মীয়তার বন্ধন জড়িয়ে আছে বৈকি। বর্তমান মহারাণীও তো একজন বাঙালী মহিলা।

এবারে আবার ফিরে যাওয়ার পালা। জয়পুর থেকে আবার একদিন কলকাতার পথে রওনা হলাম।

কিন্তু পথে আমি আগ্রায় না নেমে পারলাম না, কী জানি কেন, আগ্রা আমাকে অহরহ আকর্ষণ করে। যখনই এপথে আসা যাওয়া করেছি, তাজমহল আমার দেখেছি। হয়তো জীবনে শাজাহান চরিত্রে অভিনয় করেই বোধহয় তাজমহলের ওপর এই দুর্বলতা।

আবার সেই পুরোনো পরিবেশে ফিরে এলাম। তবুও কদিন বাইরে কাটিয়ে মনটা যেন আগের চেয়ে অনেক হালকা হয়েছে।

এখন কর্মজগতের সঙ্গে চিন্তার জগৎ-টাই অনেক বদলে গেছে। অভিনয় জীবন থেকে প্রায় অবসর নিয়েছি। যে কটি ছবির কাজ বাকি আছে, সেগুলি শেষ করলে ছবির জগৎ থেকে ছুটি। আর মঞ্চ? মঞ্চের মায়াও প্রায় কাটিয়েছি। এখন শুধু ছুটির খোলসটুকু বাকি।

চিন্তা এখন আকাদমি নিয়ে। ২৮ নভেম্বর আকাদমির ক্লাস উদ্বোধন হলো। আমিই উদ্বোধনী বক্তৃতা দিলাম। আরো যাঁরা শিক্ষাদানে ব্রতী হয়েছেন, তাঁরা হলেন ডঃ সাধন ভট্টাচার্য, সত্যু সেন এবং সুধাংশু সান্যাল। এ ছাড়া উনিশ জন ছাত্রকেও আমরা পেয়েছি।

পরদিন ২৯ নভেম্বর। ঐ দিনটি নানা দিক থেকে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। সোভিয়েত দেশের দুই প্রধান রাষ্ট্রনায়ক, মার্শাল বুলগানিন এবং ক্রুশ্চেভ ঐ দিন পশ্চিম বাংলায় পদার্পণ করলেন। ঐ দুই রাষ্ট্রনায়ককে বাংলাদেশের মানুষ যেভাবে সম্বর্ধনা জানিয়েছিল, তা পূর্ববর্তী সমস্ত রেকর্ডকে ম্লান করে দিয়েছিল। ঐদিন সম্মানিত অতিথিদের রাজভবনে যে অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার কথা ছিল, সেটি বাতিল হয়ে যায়, কারণ অতিথিরা সেদিন ক্লান্ত ছিলেন।

বাঙলার এই দুই রাষ্ট্রনায়ককে কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ডে যে অভিনন্দন জানানো হয়, সেটিও নানা কারণে ঐতিহাসিক। সেদিনের বিপুল জনসমাবেশে এই দুই রাষ্ট্রনায়কও অভিভূত না হয়ে পারেন নি।

সেদিন যে জনসমাবেশ হয়েছিল, সে রেকর্ড বোধ হয় আজো ভঙ্গ হয়নি।

এখন ব্যস্ত আছি আকাদমি এবং সভাসমিতি নিয়ে। ৩ ডিসেম্বর নেপালের রাজা এবং রানী একেম আকাদমি পরিদর্শন করতে। আকাদমির পক্ষ থেকে আমরা তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করলাম। আকাদমি দর্শন করে তাঁরা খুশীই হলেন।

কদিন বাদেই কৃষ্ণনগরের এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গেলাম।

এর মধ্যে আর এক ব্যাপারে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। উজবেক নৃত্য শিল্পী দল কলকাতায় আসছেন—তাঁদের অভ্যর্থনার জন্যে এ ব্যস্ততা। একটি অভ্যর্থনা কমিটি গঠিত হলো লেডী রাণু মুখার্জিকে নিয়ে।

বছরের কটি দিন বাকি ছিল। দেখতে দেখতে কেটে গেল। এর মধ্যে যেটুকু চিন্তা, তা এক আকাদমি নিয়ে।

জীবনে অবসর চেয়েছিলাম, অবসর পেলাম না। ছিঃ আর মঞ্চ ছাড়লে কী হবে, আকাদমী তো আছে, আমাকে এখন এই নিয়েই থাকতে হবে।

আমার জীবনে এ-ও এক নতুন অভিজ্ঞতা। শিক্ষার্থীর মন নিয়ে এতদিন নাটকের সেবা করেছি, এবার আমাকে করতে হবে শিক্ষকতা।

এক জগৎ থেকে আর এক জগতে এলাম। জানি না, এর পর আমার কি কাজের দায়িত্ব এসে পড়বে আমার ওপর।

উনিশ শ ছাপান্ন সালের প্রথম দিনটিতে এলাম পুণ্যপীঠ দক্ষিণেশ্বরে। কল্পতরু উৎসবের সঙ্গে সেদিন দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে অজস্র নর-নারীর শুভাগমন হয়েছে। আমিও এসেছি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করার কথা ছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নির্মল সিদ্ধান্তের। কিন্তু তিনি এলেন না। অগত্যা আমাকে পৌরোহিত্য করতে হলো।

বছরে প্রথম দিনটিতে দক্ষিণেশ্বরে এসে ভালোই লাগলো। মনে হলো, হয়তো এটা কোন শুভ সূচনার ইঙ্গিত করছে।

আমার জীবনে নতুন বছর শুরু হলো।

রবি রায় আমাদেরই সমসাময়িক। অভিনেতা হিসাবে সে বিখ্যাত। শুধু তাই নয়, মানুষ হিসেবেও তার একটা স্বতন্ত্র পরিচয় ছিল।

তেসরাই জানুয়ারী সকালে কলকাতার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রবি রায়ের মৃত্যু হয়, রোগটা ছিল করোনারী থ্রম্বোসিস।

কালীশ মুখার্জির কাছ থেকে ফোনে খবর পেয়ে তখনই ট্যাক্সী নিয়ে স্টার থিয়েটারে গেলাম। সেখানে রবি রায়ের মরদেহ শায়িত রয়েছে ফুলের সমারোহে।

রবি রায়ের মরদেহ নিয়ে যাওয়া হোল নিমতলা মহাশ্মশানে। শবানুগমন করলেন মঞ্চ ও চিত্র জগতের খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ। তাঁদের মধ্যে ছিলেন মল্লিক, সেন্মারাজ শুভেন্দু, মনোজ সিংহ, জহর গাঙ্গুলী, শ্যাম

লাহা, সুশীল মজুমদার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

ব্যক্তিগত জীবনে রবি রায় ছিল আমার একান্ত অন্তরঙ্গ। যদিও আমরা সাধারণভাবে একদলে ছিলাম না। ১৯২০ সাল থেকে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তার সঙ্গে আমার সম্পর্কের বন্ধনটা অটুট ছিল।

চোখের সামনে দিয়ে এক এক করে কতোজন চলে গেল যারা ছিল আমার কালের পথিক। মনে হয়, হয়তো আমাকে সাথীহীন হয়ে আরো অনেক পথ পরিক্রমা করতে হবে।

উজবেকী নৃত্যশিল্পী দল হাওড়া স্টেশনে পৌঁছলো ১৬ জানুয়ারী। তাদের স্বাগত জানাতে আমাকেও যেতে হলো হাওড়া স্টেশনে।

আজকাল বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার ব্যাপার তো আছেই, এছাড়া আছে আকাদমির কাজ। আকাদমির সম্পর্কে ভাবতে হয়। আমি একা নই, আমরা যাঁরা আছেন, তাঁরাও চিন্তা করেন। কীভাবে আকাদমি চলবে। কী হবে তার কার্যক্রমের ব্যাপার। এছাড়া এর আয়োজনের সঙ্গে প্রয়োজনের দিকটাও দেখতে হবে। আকাদমি নিয়ে তাই প্রায়ই আলোচনা করতে হয়।

শ্রীরঙ্গম বলতে শিশিরবাবুকেই বোঝাতো। শ্রীরঙ্গম আর শিশির ভাদুড়ী—এই দুটি নাম এক সঙ্গে জড়িয়ে। শ্রীরঙ্গমে 'প্রফুল্ল' চলছিল। বন্ধ হলো এবারে। আর বোধ হয় চালাতে পারবেন না শিশিরবাবু।

জীবনে কম নাটক তো দেখিনি। কিন্তু বিখ্যাত চীনা সাহিত্যিক লু সুনের কাহিনী নিয়ে তুলসী লাহিড়ী একটি একাংক নাটক লিখলেন, নাম নব বর্ষা। নাটকটির পরিচালনার দায়িত্ব এসেছিল আমার ওপর। অনেক দিন পর একটি সার্থক একাংক অভিনীত হলো। সেদিনে অভিনয়ে ছিলেন অনেক গুণী অভিনেতা-অভিনেত্রী। সবিতাব্রত দত্ত, নিবেদিতা দাশ, তৃপ্তি মিত্র—এঁরা ছিলেন নাটকে। তুলসীবাবুও একটি চরিত্রে রূপ দিয়েছিলেন।

বিদেশী অতিথিরাও সেদিন নাটক দেখে আমাদেরকে অভিনন্দন দিয়ে শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন।

বাংলাদেশের বরেণ্য সন্তান ডঃ মেঘনাদ সাহা। বিশ্বজোড়া খ্যাতির আসনে বসেছিলেন এই বাঙালী বিজ্ঞানী। তাঁর মৃত্যু যেমন আকস্মিক, তেমনি মর্মস্পর্শী। দিল্লীতে একটি সভায় যোগ দেওয়ার সময় ট্যাক্সী থেকে ফুটপাথে নেমে চলতে চলতে তাঁর মৃত্যু হয়। ডঃ সাহার এই আকস্মিক মৃত্যুতে বাংলাদেশ তথা ভারত জুড়ে নামলো শোকের ছায়া। ১৬ই ফেব্রুয়ারী ডঃ সাহার লোকান্তর গমনের তারিখ। পরদিন কলকাতায় তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হলো। ডঃ সাহার পরিবার অনেক

CENTRAL LIBRARY

একজন বিজ্ঞানী হিসাবে নয়, তিনি ছিলেন মানবপ্রেমিক।

২৫শে মার্চ থেকে সঙ্গীত নাটক আকাদেমির উদ্যোগে রাজধানী দিল্লীতে নাটক সেমিনার আরম্ভ হবে। এই সেমিনারে যোগ দিতেই ২২ মার্চ কলকাতা থেকে দিল্লীর পথে রওনা হওয়া।

দিল্লীর সপ্রু হাউসে ডঃ রাধাকৃষ্ণন সেমিনারের উদ্বোধন করেন। সেদিন মিসেস যোশীর অনুরোধে ডঃ রাধাকৃষ্ণনের সঙ্গে উপস্থিত অতিথিদের পরিচয় করিয়ে দিতে হলো আমাকে।

আটাশে মার্চ রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের সঙ্গে আমরা সাক্ষাৎ করলাম।

সেমিনারে আমার বক্তৃতার বিষয় ছিল কলকাতার পেশাদারী মঞ্চ সম্পর্কে। আমি ভাষণ তৈরী করেছিলাম, যাতে প্রমোদকর এবং নাটক আইনের বিরুদ্ধে কিছু মন্তব্য ছিল।

সেমিনারের দিনগুলিতে নানাভাবে আমাকে কর্মব্যস্ত থাকতে হয়েছিল। সেমিনার শেষ হয় উনতিরিশে মার্চ। ঐদিনেই প্রেমচন্দ্রের কাহিনী নিয়ে লেখা হিন্দীতে 'গো-দান' নাটকটির অভিনয় দেখলাম সপ্রু হাউসে।

সেদিন রাত একটায় ক্লান্ত হয়ে ফিরেছিলাম নির্দিষ্ট আশ্রয়ে।

একবার বাইরে আসার সুযোগ পেলে হয়, ফিরে যাবার কথা মনে থাকে না। দিল্লী থেকে সিমলা যাবো এ চিন্তা আগে ছিল না। কিন্তু সিমলায় এলাম, ভাবলাম এসেছি যখন কটা দিন ঘুরে যাই। আমার স্ত্রী সুধীরারও তাই ইচ্ছে।

সিমলায় এসে একটি অভিজাত হোটেলে উঠলাম। হোটেল থেকে দেখতে পেলাম সিমলার প্রাকৃতিক দৃশ্যপটের বিস্তৃত পটভূমিকা।

এপ্রিলের প্রথম দিনেই আমরা গেলাম চৈল পাহাড়ের উদ্দেশ্যে।......বাংলোয় দাঁড়িয়ে আমরা দেখলাম, আপেলের বাগান, ঝোবাণী বৃক্ষ, দেখলাম সরলবর্গীয় বৃক্ষের সবুজ শোভা। সেখান থেকে রওনা হলাম চেল-এর দুর্গম পথে। সতেরো মাইলের মত পথ অতিক্রম করে আমরা গন্তব্য স্থানে এসে পৌঁছলাম। এখানে 'পাতিয়ালা প্যালেস।' এবং সংলগ্ন মনোরম উদ্যান, ঝর্ণা, আর বিচিত্র ফুলের বর্ণাঢ্য সমারোহ দেখে মুগ্ধ হলাম।

দেখতে গেলাম ক্রিকেট গ্রাউন্ড। পৃথিবীর মধ্যে আর কোথাও সমতল থেকে এতো ওপরে ক্রিকেট গ্রাউন্ড নেই।

চেল দেখা শেষ করে হোটেলে ফিরেছি বিকেল সাড়ে পাঁচটায়। তারপর আর বেরোই নি।

পরদিন। জাকো হিলসের দিকে যাবো। যাওয়ার পথেই দেখলাম বাঙালীদের কালীবাড়ি, দেখলাম বিখ্যাত ফুটবল ময়দান, রাষ্ট্রপতি ভবন। তারপর আরো কিছু দর্শনীয়, দেখা শেষ করে হোটেলে ফিরলাম।

বাইরে এলে আমার মন এক জায়গায় স্থির থাকে না। নারকোন্ডায় দূরত্ব সিমলা থেকে চল্লিশ মাইলের মত। তিব্বত সীমান্তের এই জায়গাটি সাগর পৃষ্ঠ থেকে ৯১০০ ফুট ওপরে। এই পথটুকু যেমন সুন্দর, তেমনই মনোরম। কখন যে পেরিয়ে এলাম, বুঝতে পারলাম না। যেন সমস্ত পথটা আমরা সম্মোহিত হয়েছিলাম।

যতোবার আমি পাহাড় দেশে এসেছি ততোবার মনের মধ্যে আমার একটি চিন্তাই এসেছে, যদি কখনো নিশ্চিন্ত অবসর পাই, তাহলে আমি আসবো এই পাহাড় দেশে। কোন নির্জন বাংলোয় বসে জীবনের বাকি দিনগুলো কাটাবো।

কিন্তু সে স্বপ্ন আমার কল্পনার মধ্যেই মিশে রইলো।

ফিরে এসেছি কলকাতায়। আবার সেই কাজের মধ্যে মিশে থাকা।

মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় সঙ্গীত-নাটক-নৃত্য আকাদমীর নিজস্ব ভবনের ভিত্তি স্থাপনা করলেন ১৪ মে। এইদিন যে অনুষ্ঠান হয়েছিল, তাতে শহরের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

দিনগুলো চলছে একরকম। এই চল্লিশ দিনের মধ্যে ১৩ জুন আমাকে প্রিয়জন বিয়োগ ব্যথা পেতে হল। ডঃ শচীন বসু মারা গেলেন এই দিন। ইনি আমার কন্যা মীরার শ্বশুর।

আত্মীয় বিয়োগে ব্যথা পাওয়াই তো স্বাভাবিক, তারপর এমন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। তবুও এ ব্যথা বুক পেতে নিতে হয়।

শচীনবাবু মারা গেলেন ১৩ জুন, আর ২০ জুন গেল সুপ্রভা মুখার্জি। অভিনেত্রী সুপ্রভা মুখার্জির পরিচয় নতুন করে দেবার নেই।

শ্রীরঙ্গমের মৃত্যু কোন ব্যক্তির মৃত্যু নয়—তবু একটি নামের মৃত্যু। যদিও আমার নিশ্চিত বিশ্বাস শ্রীরঙ্গম বাংলা দেশের নাট্যশালার ইতিহাসে একটি অবিনশ্বর নাম। আর এই মঞ্চের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল যে মানুষটি, তিনি তো আর কেউ নন, শিশির ভাদুড়ী। যিনি বাংলা দেশের নাট্যমঞ্চের ক্ষেত্রে এক অপ্রতিহত পুরুষ।

শ্রীরঙ্গম নামটি উঠে গেল। নতুন নামের ফলক সেখানে যুক্ত হলো। সে নাম 'বিশ্বরূপা'। বিশ্বরূপার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের তারিখ ২২ জুলাই।

এই তো কিছুদিন আগে শ্রীরঙ্গমে শিশিরবাবুর সঙ্গে রাতের পর রাত অভিনয় করেছি। আজ সেই নামটাই হারিয়ে গেল।

পৃথ্বীরাজ কাপুর ভারতের একজন জনপ্রিয় অভিনেতা। পৃথ্বীরাজ কলকাতায় এলেন। ২৬ জুলাই তাঁকে এবং সঙ্গের অভিনেত্রীদের আপ্যায়িত করা হল থিয়েটার সেন্টারে।

অনেকদিন পর কলকাতার নিউ এম্পায়ারে পৃথ্বীরাজ তাঁর নাটক অভিনয়ের আয়োজন করলেন ২৭ জুলাই। পৃথ্বীরাজ কলকাতার নাট্যামোদীদের কাছে একটি প্রিয় নাম।

বেতারে নাটক প্রচারে এতোদিন যে ব্যবস্থা চালু ছিল, সে ব্যবস্থা তো আছেই, এবারে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে নাটক প্রচারের ব্যবস্থা হোল। এই ব্যবস্থার প্রথম নাটক 'প্রফুল্ল'। এর সঙ্গে একটি মুখবন্ধও যুক্ত হয়েছিল। সেটি ছিল আমারই। বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় এটি প্রচারিত হয়েছিল।

এই দীর্ঘ স্মৃতিচারণে, আমার জন্মদিন নিয়ে কিছু বলেছি বলে মনে হয় না। আমার জন্মদিন একুশে শ্রাবণ। এই দিনটিকে স্মরণ করেছি আমার ব্যক্তিগত পরিবেশে। জন্মদিন নিয়ে মনের মধ্যে এমন কোন দুর্বলতা আমার নেই, যেটাও ঘটাও করে ভাবতে হবে। প্রতিদিনের মতো জন্মদিনও ভাবতে আবার চলে যায়।

কিন্তু এবারে এই দিনটিও আকাদেমীর ছাত্র-ছাত্রীরা আমাকে নিয়ে ঘরোয়া একটা অনুষ্ঠান করবে। এটি ছিল আমার ৬০তম জন্মদিন।

নাটকের মানুষ আমি, কতো বদলে গিয়েছি। মনের দিক থেকে সত্যিই আমি সরে এসেছি মঞ্চ-চিত্রের মায়া ত্যাগ করে। তবু একথা বলবো না, আমি মঞ্চের বাইরের মানুষ। মনে-প্রাণে আজও আমি মঞ্চের অভিনেতা। এ যোগসূত্রটা অনেক পুরোনো। ছিন্ন হবার নয়।

নানা অনুষ্ঠানে আমাকে যোগ দিতে হয়, সেকথা তো আগেই বলেছি।

অভিনেতৃ সঙ্ঘ দুই পুরুষ অভিনয়ের আয়োজন করেছিলেন রঙমহল মঞ্চে। তারিখটা ছিল ৭ আগস্ট। অভিনয়ের আগেই একটি দুঃসংবাদ এলো। রাজ্যপাল ডঃ হরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের পরলোকগমন।

বাংলা দেশের মানুষের কাছে ডঃ মুখোপাধ্যায়ের পরিচয় কেবল সরকারী প্রধান হিসেবে নয়—তাঁর আসল পরিচয়, একজন আদর্শ শিক্ষাব্রতী হিসাবে। যে মানুষ শিক্ষার জন্যে জীবনকে উৎসর্গ করেছেন। আজীবন শিক্ষাব্রতী, এই মানুষটি বিরল ব্যক্তিত্বের অধিকারী। নিজেকে সম্পূর্ণভাবে বিলিয়ে দেবার মধ্যে যদি কিছু গৌরব থাকে, তবে সে গৌরবের অধিকারী ছিলেন স্বর্গত মুখোপাধ্যায়।

যাই হোক, অভিনেতৃ সঙ্ঘের নাটক সেদিন অভিনীত হয়েছিল, তবে স্বর্গত মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতির প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন সেদিনের শিল্পী এবং দর্শকেরা। এই প্রসঙ্গে বলি, রাজ্যপালের মৃত্যুসংবাদ শুনে দর্শকদের একটি অংশ আসনে বসেই ছিলেন। আর এক দল সংবাদ শুনেই উঠে চলে গিয়েছিলেন। আমি সঙ্ঘের পক্ষ থেকে বলেছিলাম, দর্শকরা যদি চান অভিনয় বন্ধ হবে, আর যদি না চান তাহলে অভিনয় হবে।

(ক্রমশঃ)

ট্যাক্সিতে যেতে যেতে চেরী যে মাঝে মাঝে বেশ আনমনা ঠেকছিল। ওর ঠিক বাঁ-পাশে কুশল আর ডান পাশে সুখেন্দু বসেছিল ঘেঁসাঘেঁসি করে। সত্যজিৎ বসেছিল সামনের সিটে ড্রাইভারের পাশে। ওদের ট্যাক্সি যাত্রায় বরাবর এই নিয়ম বাঁধা। কুশল যেমন অনর্গল কথা বলে আর নিজেই নিজের রসিকতায় হেসে গড়াগড়ি দেয়, তেমনি চালিয়ে যাচ্ছিল। সুখেন্দু মুখিয়ে বসেছিল তার কথার খুঁট ধরে বাঁকা টিকা-টিপ্পনী কাটবার জন্য। সত্যজিৎ মাঝে মাঝে পিছন ফিরে, মাঝে মাঝে ড্রাইভারের সামনে ঝোলান আয়নায় ওদের মুখ দেখে নিচ্ছিল। দেখছিল চেরী যেন কি একটা ভাবছে আপন মনে।

রেস কোর্সের পাশ দিয়ে যেতে যেতে কুশল চোখ বড় বড় করে বলে উঠল—আমরা তিনজন যেন ঐ রেসের মাঠের ঘোড়া। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটেছি একটিমাত্র বাজীকে সামনে রেখে, তার নাম শ্রীমতী চেরী। তফাৎটা শুধু এই ওগুলো হল চতুষ্পদ জন্তু ঘোড়া। আর আমরা হলাম—

—দ্বিপদ ও গাধা। —ফুট করে টিপ্পনী কাটল সুখেন্দু। সত্যজিৎ পিছনে না ফিরেই হো-হো করে হেসে উঠল।

চেরী তার ভাবনা থেকে জেগে উঠে বললে—তুমি বড় যা তা বল সুখেন্দু।

সুখেন্দু নিতান্ত ভাল মানুষের মতো মুখ করে বললে—আমি কুশলের মনের কথাটা মুখে জুগিয়ে দিলাম। তাই না কুশল?

কুশল গজ-গজ করে বলল—ড্যাম লায়ার।

চেরী এবার হেসে ফেলল। হাসতে হাসতেই বললে—তোমাদের এই ছেলেমানুষী ঝগড়া আর জীবনে গেল না।

সুখেন্দু চিবিয়ে চিবিয়ে বললে—তুমি যতদিন দ্বিধায় রইবে, ততদিন তো নয়ই চেরী। তুমি একমুখী হও, দেখবে এই তিনটি নায়কের মুখে রাতারাতি গোঁফ-দাড়ি গজিয়ে যাবে।

কথাগুলো বলতে বলতে সুখেন্দু আড়-চোখে চাইতে লাগল চেরীর মুখের দিকে। চেরী যেন কথাগুলো শুনেও শুনল না। সামনে সত্যজিতের দিকে ঝুঁকে বললে—জিৎ, তুমি সুখেন্দুর মাথা থেকে ভূতটাকে নামাতে পার? ইদানীং ভূতটা বড় জ্বালাচ্ছে।

সুখেন্দু এবার উচ্চৈর শব্দ পদায় বললে—ভূত যদি সুখেন্দুর মাথায় সত্যি সত্যি থাকে, তবে জিৎকে দেখলে সেটা আরও বেশী লাফাবে।

বাঁ দিক থেকে কুশল চেরীর হাতটা তুলে নিয়ে আলতোভাবে তার গালের ওপর বোলাতে বোলাতে নরম গলায় শুধাল—তুমি কি স্থির করলে চেরী?

চেরী আগের মতোই হাসতে হাসতে বললে—এবার তুমিও শুরু করলে? জিৎ

তুমিই বা বাদ যাও কেন? ও আমি বোধ হয় এবার পাগল হয়ে যাব।

বাকে তার মুখে কপালে এসে পড়া বয়েকো বয়েকো চুলের গোছাগুলো দু'হাত দিয়ে সরিয়ে দিতে লাগল।

—আমার পোস্টিং হচ্ছে সামনের আগস্টে অ্যাসিস্ট্যান্ট কলেক্টর হিসাবে। এই টাগ-অব-ওয়ার-এ হেরে গেলে আমি পোস্টিং নেব আন্দামানে, নির্ঘাৎ।

কুণালের কথায় এখন আর কিন্তু আগের ছেলেমানুষী নেই। আঁচিতে গম্ভীর হয়ে উঠেছে তার গলার আওয়াজ।

সুখেন্দু নির্বিকার চিত্তে বললে—তা আন্দামান তো আজকাল ভাল জায়গা। পলিটিক্যাল হাঙ্গামা ওখানে অনেক কম। অ্যাডমিনিস্ট্রেশন চালান তোমার পক্ষে ওখানে সহজ হবে।

সত্যজিৎ সামনের দিকে ওদের দুজনের নৈরাশ্য অবস্থাটা উপভোগ করছিল। আর আয়নার ভিতর দিয়ে মাঝে মাঝে দেখছিল চেরীর মুখটা। এক ঝলকের মতো সে দেখতে পেল চেরীর সিঁদুরে মতো সলজ্জ উজ্জ্বল মুখের ওপর বেদনার ছায়া নেমে আসছে।

চেরী বললে—আচ্ছা তোমাদের কি বয়েস বাড়ল না? স্কুল ছেড়ে কলেজে ঢোকা থেকে আমরা চারজন এক হয়ে আছি দুটি বছর। দুনিয়ার লোকের হিসেবে বুড়িয়েছি, বদনাম কুড়িয়েছি তবু আমাদের বন্ধুত্ব আজও অটুট। এম-এর সময় আমরা ক'জনে একসঙ্গে বসে কিভাবে পড়াশোনা করেছি এই এক বছরের মধ্যে তা নিশ্চয়ই ভুলে যাবার কথা নয়। ইদানীং মনে হচ্ছে সেই বন্ধুত্বে কেন চিড় ধরেছে। তোমরা আর আগের মতো হাস না। ঠাট্টা, তামাশা যা কর তা বাঁকা বাঁকা। আর একসঙ্গে বসে আড্ডা-গল্প-গান তোমরা তো উঠিয়েই দিয়েছ। চারজন একসঙ্গে হলেই এই কথাস ধরে শুনছি কেবল ঐ এক কথা।

চেরীর গলা ভারী হয়ে এল। সে বলতে লাগল—হয়তো কালই আমরা কে কোথায় ছিটকে পড়তে পারি তার ঠিক নেই। যে কটা দিন একত্র আছি, এসোনা একটু ভাল করে আড্ডা দিয়ে নিই। এই তো সবার সঙ্গে দেখা হল না, তাই মাথ পড়ে।

সুখেন্দু হাইকোর্টের জজের মতো তাকিয়ে নিরাসক্ত গলায় বললে—এই হচ্ছে একমাত্র দেখেই তো বিপদটা বেধেছে। তিনজনের দাবী সমান সমান হয়ে উঠেছে।

সুখেন্দুর গলায় ভারী আওয়াজ অবাক করাই চেরী কোথায় উঠল—দাবী? কিসের দাবী?

—এই তোমাকে পাওয়ার দাবী।—বলিয়ে জবাব দিল সুখেন্দু নরম গলায়। সুখেন্দুর কথায় চং এ সত্যজিতের ভিতরটা রি-রি করে উঠল। কিন্তু সে জানে একেত্রে কথাটি বলা চলবে না। কোন একটা সুর পেলেই সুখেন্দু তার ওপর বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রস্তুত। ওদিক থেকে কুণাল কি একটা বলতে যেতেই সুখেন্দু তাকে হাত দিয়ে থামিয়ে চেরীকে বললে—আমরা তিনজনেই তোমাকে জীবনসঙ্গিনী হিসাবে চাইছি তাই। মহাভারতের যুগে হলে এক দ্রৌপদীতেই পাঁচজনের কাজ চলত। এখন তো আর তা হয় না। কাজেই তোমাকে ঠিক করতে হবে আমাদের তিনজনের মধ্যে কাকে তুমি বেছে নেবে।

কুণাল সুখেন্দুর সঙ্গে একমত হল। বললে—ঠিক কথা। তুমি চেরী, ওয়াননস অন ঠিক করে ফেল আমাদের তিনজনের কার ঘরে তুমি যাবে। কার জীবনসঙ্গিনী তুমি হবে?

সত্যজিৎ আবার দুর্বার খেয়ে আয়নার ভিতর চেরীর মুখখানা দেখে নিল। রক্ত-রাঙা, থমথমে হয়ে উঠেছে সে মুখ। গলার স্বরেতে বিরক্তি এনে চেরী বললে—জীবন-সঙ্গিনী না ছাই। তোমরা চাইছ—

সুখেন্দু আগের মতোই নির্লিপ্ত গলায় বললে—জীবনসঙ্গিনী হতে হলে শয্যা-সঙ্গিনীও হতে হবে বৈকি! সচিব, সখী, প্রিয়শিষ্যা এবং সেই সঙ্গে সন্তানের জননীও।

চেরী দু কানে আঙুল দিয়ে বললে—ছি-ছি। রীতিমতো অশ্লীল।

ব্যাপারটা ঘোরাল হয়ে উঠছে দেখে সত্যজিৎ এবার পিছনে মুখ ফেরাল। বাধা দিয়ে বললে—আপাততঃ ও প্রশ্নটা স্থগিত থাক না। বেশ কয়েক মাস পরে চারজনে একত্র হয়েছি। এমন বসন্তের সন্ধ্যাটা কথার কচকচিতে কাটিয়ে দিলে পরে আফসোস করতে হবে। কুণাল তুমি বরং একটা গান গাও।

সুখেন্দু পণ্ডিতের মতো গো ধরে বললে— কলকাতা থেকে বেশ অনেকটা দূরে জংগলে ঝাড়খণ্ড কলেজের অধ্যাপনা করি। তোমাদের মতো চেরী তো আমার পক্ষে আজকাল অত সহজলভ্য নয়। কাজেই কথাটা আপাততঃ ফেলে রাখলেও, যদি তোমাদের সবার সামনে এই ব্যাপারটার ফয়সালা হয়ে যায় তবে আমি নিশ্চিন্ত মনে চলে যাব সেই জংগলে। আঙুর ফলের দিকে তাকিয়ে বসে থেকে শেয়ালের আর দিবা-রাত আমার মুহূর্ত গুনতে হবে না।

একটু থেমে বললে— কিন্তু চেরীর বলতে বাধা কোথায়?

বাধা যে কোথায় সেটা ওরা তিনজনে অল্পবিস্তর যে না জানে এমন নয়। সুখেন্দুর এই চাপাচাপির কারণটাও সত্যজিৎ আর কুণাল ভালভাবে জানে। সুখেন্দু পড়াশোনায় চিরদিন ইউনিভার্সিটির এক নম্বর ছেলে। চেরী প্রত্যেকবারেই থাকে তার পিছনে পিছনে। সেই চেরীকে সুখেন্দু এম-এতে ফার্স্ট জায়গা ছেড়ে দিয়েছিল তার নিজের বহু পরিশ্রম করে তৈরী করা নোটগুলো দিয়ে। নিজের তার সবাই অবাক হয়েছিল। কুণাল আর সত্যজিৎ বিপদ গনেছিল মনে মনে। ভেবেছিল এই এক চোটে সুখেন্দু টেক্কা মেরে দেবে ওদের দুজনের ওপর।

চেরীদের অবস্থা মোটেই ভাল নয়। সত্যজিতের বাবার বন্ধুর মেয়ে সে। বাবা পেনশন নেওয়া ডেপুটি। পয়সা কড়ি সব ফেলে রেখে পালিয়ে এসেছিলেন চেরীর বাবা। এ দেশে এসেও বিশেষ কিছু করতে পারেননি। সত্যজিতের বাবা বেঁচে থাকতে যতদিন ওরা তাকিয়েছেন চেরীদের। তিনি মারা যাবার পর চেরী আর তার মায়ের হাত পাতবার জায়গা হল সত্যজিতের মা। যদিও মা-মেয়েতে ছেলেমেয়ে পড়িয়ে কোন রকমে সংসার চালায়, তবু পরীক্ষার ফি জমা দেবার সময়, কি বড় একটা কিছু খরচের ধাক্কা এলেই চেরীর মাকে গিয়ে দাঁড়াতে হয় সত্যজিতের মায়ের কাছে। চেরীরা টাকা নেয় ধার হিসাবে। সত্যজিতের মারও দিতে কোন আপত্তি ছিল না। কারণ মনে মনে তিনি ধরেই নিয়েছিলেন কর্তার বিপুল সম্পত্তি একদিন চেরীই ভোগ করবে জিতের বৌ হয়ে। ইদানীং চেরী রিসার্চ স্কলারশিপ পাবার পর তাদের হাতপাতাটা অনেক কমে গিয়েছিল। তবু সত্যজিৎ মনে মনে হিসাব করত চেরী যে রিসার্চটা এখন নিয়ে আছে, সেটা শেষ হলে পরে সে বিলেত যেতেই চায় তবে তার জন্যেও অন্ততঃ তার কাছে, কিম্বা তার মার কাছে আসতেই হবে। আর যদি চেরী সেই সুযোগটা জিতের কাছ থেকে না নেয়—

এইটুকু ভেবেই জিতের মনে হত—না না চেরী কোনদিন এতটা বোকামী করতে পারে না।

কুণালের কথাটা সুখেন্দু কিম্বা সত্যজিৎ কেউই ধর্তব্যের মধ্যে আনত না। যদিও ওদের তিনজনের মধ্যে কুণালই হচ্ছে সবচেয়ে সুপুরুষ। লম্বা ছিপছিপে চেহারা। স্বভাবে একটু মেয়েলী ধরনের। বেশ খানিকটা ছেলেমানুষী মাখান। কুণাল তার ওপর আবার কবি। ওরা দুজনে বেশ ভাল করেই জানে চেরীর মায়ের স্নেহটা তলায় তলায় অনেক বেশী করে যায় কুণালের ওপর। তার কারণও আছে। কুণালের মতো এমন রোগীর সেবা অনেক ডাক্তার নার্স দিয়েও সম্ভব নয়। একবার চেরীর বাবা বাসায় থাকতে ওরা মা মেয়েতে শয্যাশায়ী হয়ে ছিল টাইফয়েডে। সুখেন্দু, সত্যজিৎ যাতায়াত করে দুজনে যথেষ্ট সাহায্য দিয়েছিল। জিতের বাবা চিকিৎসার বন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন, আর সেবা করেছিল কুণাল নিজে। কিন্তু ওরা জানে একমাত্র সেবার গুণ দিয়ে তো আর রমণীর মন, বিশেষ করে চেরীর মতো মেয়ের মন জয় করা যায় না। কুণাল ওদের তিনজনের ভিতর সবচেয়ে সেন্টিমেন্টাল। চেরীর মতো মেয়ে ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব করলেও ওকে যে স্বামী হিসাবে পছন্দ করতে পারে না, তা একটা অন্ধ লোকও টের পাবে। সুখেন্দু আর সত্যজিৎ দুজনেই ওকে এলেবেলে বলে মনে করে। কিন্তু তবুও বলা যায়তে দুঃশং কথাটা যদি এতটুকুও সত্য হয়। বলা তো যায় না।

সুখেন্দু আবার বলতে শুরু করল—আমি দীর্ঘদিন ধরে প্রতীক্ষা করে আছি এই দিনটার জন্য। আমাদের তিনজনের মধ্যে একদিন মুখে মুখে যে চুক্তিটা হয়েছিল, শুধু তার সম্মান রাখবার জন্যই আমি চেরীকে এতদিন কিছু বলিনি। আজ তার একটা ফয়সালা হয়ে যাক।

—কিসের চুক্তি? গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করল চেরী।

বছর তিনেক আগে সুখেন্দু আর কুণালের ব্যবহার দেখে সত্যজিৎ নিজেই

উজিয়ে এসে চুক্তিটা করিয়ে নিয়েছিল। সে বললে—আমরা এতদিন চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলাম এম-এ পাশ করে জীবনে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া অবধি আমরা কেউই তোমার কাছে বিয়ের কথা তুলব না।

সত্যজিতের মনের ভিতর কিন্তু অন্য কথা তোলপাড় করছিল। যদিও সে নিজে থেকেই এ চুক্তিটা করিয়ে নিয়েছিল, তবু সে এটাকে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার বলে মনে করেনি। শুধু সুখেন্দু আর কুশলকে ঠেকিয়ে রাখবার জন্য এটা ছিল ওর একটা ছল। আর এ ছলটুকু সেদিনকার স্টুডেন্টস ইউনিয়নের সেক্রেটারী, ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক নেতা সত্যজিতের কাছে খুব একটা সাংঘাতিক কিছু ছিল না। ডিপ্লোম্যাসিকে খেলা বলে মনে করত।

সেবার ইউনিয়নের সেক্রেটারী হিসাবে সত্যজিৎ ছাত্র শিক্ষকদের নিয়ে বাইরে বেড়াতে যাবার বন্দোবস্ত করেছিল। পাড়ি লম্বা, খরচও বেশী। সুতরাং স্বভাবই অবশ্য হটে গিয়েছিল খরচের দায়ে। হটে গিয়েছিল কুশল সুখেন্দুও। চেরীও যেতে রাজী হয়নি। সত্যজিৎ তার মাথা খেয়ে চেরীর জন্য খরচের ব্যবস্থা নিজেই করে দিয়েছিল।

কাশ্মীরের এক নির্জন পাহাড় চূড়ায় একদিন তারা দুজনে রাজী হয়ে উঠে গিয়েছিল। (এটাও সত্যজিতের কৌশল)। চূড়োর উপর উঠে সত্যজিৎ চেরীকে দুহাতে বুকে জড়িয়ে ধরে তার মুখে চুমু খেয়ে নিয়েছিল। মুখ তুলে নিজেই চেরী তার শাড়ীর আঁচল দিয়ে মুখটা ভালভাবে মুছে ফেলে, পাশের ঝর্ণার জলে কয়েকটা কুলকুচো করে এসে খিলখিল করে হাসতে হাসতে বলেছিল—জিৎ তুমি কি হ্যাংলা। রাক্ষসের মতো হাঁ করে এমন চুমু খাচ্ছিলে—ম্যাগো :—

সত্যজিৎ জিজ্ঞাসা করেছিল—সেকি! তোমায় আদর করলাম, তোমার ভাল লাগল না?

—ভাল লাগবে? দূর দূর! ছি-ছি। আমার মুখটা তুমি এঁটো করে দিলে। তোমার এঁটো আমি জীবনে খাইনি। টেনফ্যাক্ট কারুর এঁটো খেতে আমার গা ঘিন ঘিন করে। আর তা ছাড়া কী বিশ্রী সিগারেটের গন্ধ তোমার মুখে! বমি পাচ্ছে।

থুথু করে থুতু ফেলতে আরম্ভ করেছিল চেরী। সত্যজিৎ ক্ষুণ্ণ হয়েছিল, তার আত্মাভিমানে ঘা লেগেছিল। সে প্রশ্ন করেছিল—তুমি কি আমায় ভালবাস না?

—তুমি আমার বন্ধু। তোমাকে ভালবাসি কিনা তা কি নতুন করে বলতে হবে? আর সেই সুবাদে কি তোমার চুমু খাওয়াটাও আমাকে ভাল লাগাতে হবে?

সত্যজিৎ চটে গিয়েছিল মনে মনে দারুণ ভাবে। তীক্ষ্ণ স্বরে প্রশ্ন করেছিল—সুখেন্দু কি কুশলের চুমুগুলো নিশ্চয়ই আমার মতো তেতো নয়।। সুখেন্দু তো দিনে পাঁচ প্যাকেট চারমিনার খায়।

—ইউ ডার্টি ভালগার। জিৎ তুমি এতো বড় ছোটো হয়ে গেছ?—চটে উঠেছিল চেরীও। চড়া মেজাজেই বলেছিল— সুখেন্দু, কুশল, তোমার মতোই আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তোমার মতোই আমি তাদের ভালবাসি। তারা তো তোমারও বন্ধু জিৎ। কেমন করে তুমি তাদের সম্বন্ধে এমন কথা বলতে পারলে?

চেরীর চড়া মেজাজ দেখে সত্যজিৎ ঘুচকে গিয়েছিল। তবু সে সেদিন মরীয়া হয়ে প্রশ্ন করেছিল—আমাদের তিনজনের মধ্যে সবচেয়ে তুমি বেশী ভালবাস কাকে?

—তিনজনই আমার সমান বন্ধু। বেশী ভালবাসাবাসির কথা উঠছে কেন? সত্যজিৎ বলেছিল—আমি যেমনভাবে তোমাকে পেতে চাইছি, কুশল কি সুখেন্দু কি তোমাকে তেমনিভাবে পেতে চেয়েছে কোনদিন? তোমাকে না হলে যে আমার সারা জীবন বৃথা চেরী। আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই—

এবার চেরী মুখ ভরে ফুল ফুল করে হেসে উঠেছিল (চেরী খুব বেশীক্ষণ রাগ করে থাকতে পারে না, এটাই তার স্বভাব)। বলেছিল—সুখেন্দু কি কুশলের তো আর তোমার মতো মাথা খারাপ হয়নি। জিৎ তুমি ভাল করে একবার ডাক্তার দেখাও, সাইকোপ্যাথলজিস্ট। তোমার মাথার কোথাও কিছু গড়বড় হয়েছে।

—নাঃ, ব্যাপারটা অত সহজে হেসে উড়িয়ে দিতে চেও না। আমি তোমার কাছে এই মুহূর্তেই একটা কথা চাই।

—বিয়ের কথা তো? সে সম্বন্ধে আমি তোমাকে কোন কথাই এখন দিতে পারব না। ও সম্বন্ধে আমি কিছু ভাবিই নি।

—আমার মা যে তোমাকে ঘরে আনবার জন্য অনেকদিন ধরে ইচ্ছে করে আছেন।

—উনি আমার কাকীমা। আমার মায়ের মতো। তাঁর সঙ্গে বোঝাপড়া আমি করব। তোমাকে ভাবতে হবে না।

—আচ্ছা বেশ, অন্ততঃ তুমি আমাকে অন্তত এই কথাটা দাও, যদি কোনদিন বিয়ে করতে তোমার ইচ্ছে হয় তবে প্রথমেই আমার কথা ভাববে। আমি তোমার জন্য অনন্তকাল অপেক্ষা করে থাকব।

চেরী সত্যজিতের মুখের ওপর একটা বিদ্রুপের হাসি হেনে বলেছিল—আরে বাসরে, একেবারে অনন্তকাল। বল কি জিৎ। আচ্ছা এসব নাটুকে ঢং কবে থেকে শিখলে তুমি জিৎ। ইদানীং তোমার সঙ্গীগুলো বোধ হয় ভাল জুটছে না। তুমি ইউনিয়ন ছেড়ে দাও।

একটু চুপ করে থেকে বলেছিল—তুমি আজ আমাকে একটা কথা দাও। অবশ্য বন্ধু হিসাবেই তোমাকে আমি অনুরোধটা করছি। তুমি আমাকে এ নিয়ে আর বিরক্ত কোরো না, কেমন। কিছু যদি স্থির করি তো আমি নিজেই তোমার কাছে আসব।

—কথা দিলাম।

কথাগুলো মনে পড়ে সত্যজিতের কান লাল হয়ে উঠেছিল। যদি এই মুহূর্তে চেরী সেই সব কথাগুলো সুখেন্দু আর কুশলকে বলে ফেলে। মনে মনে একটা অস্বস্তি তাকে পীড়িত করছিল বার বার।

ট্যাক্সিটা ইতিমধ্যে গঙ্গার ধারে এসে পড়েছিল। শীতের শেষের মরা গঙ্গার ওপরে লাল সূর্যটা কলকারখানার ধোঁয়ার সমুদ্রে আস্তে আস্তে ডুবে যেতে লাগল। সুখেন্দু শুধোল—জানতে পারি আমরা কোথায় যাচ্ছি?

—আঃ, প্রশ্ন কর কেন? চেরী আজ যেখানে নিয়ে যাবে মুখ বুজিয়ে চল। বললে কুশল।

—যদি নরকে নিয়ে যায়?—ফোড়ন কাটল সুখেন্দু।

—আমি সঙ্গে যেতে রাজী। —উত্তর দিল কুশল।

—তাহলে এ্যাসিস্ট্যান্ট কলেক্টরের পোস্টটা মাঠে মারা যাবে। —সুখেন্দু আবার টিপ্পনী কাটল।

সত্যজিৎ এতক্ষণে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল মনে মনে। চেরী আর পুরোন কথার কোন উল্লেখ করল না দেখে। এবারে সে গলাটা ঝেড়ে জিজ্ঞেস করল—তা স্বর্গই হোক বা নরকই হোক, কোথায় আমরা যাচ্ছি চেরী?

অবশ্য ওরা তিনজনেই খুব ভাল করে জানে এ প্রশ্ন করা বৃথা। কারণ তিনজনেই জানে হাড়ে হাড়ে কি অসম্ভব খেয়ালী মেয়ে চেরী। এখুনি হয়ত বলতে পারে—সর্দারজী চালাও ডায়মণ্ডহারবার। কি কাকদ্বীপ। কি দূর পাল্লার আর কোথাও। কিম্বা হয়তো কিছুই না বলে সটান যেতে পারে হাওড়া স্টেশনে, সেখান থেকে টিকিট কিনে ট্রেনে চেপে বসবে—বোম্বে কি দিল্লী, কি আর কোন জায়গায়। ট্রেন ছাড়বার আগে হয়তো বলবে—কুশল মাকে বলে দিও আমি চললাম পেয়াজুদে সোনা মাসীর ওখানে। এক সপ্তা পরে ফিরব। ও মেয়ে সব পারে। বাইরে বার হয়ে কখনও বলবে না কোথায় যাবে। জিজ্ঞাসা করলেই জবাব—ঠিকানা নেই।

ওরা একবার রাজী হয়েছিল তিনজনে। চেরীর ডাকে ওরা সেবার গঙ্গার ধারে কাটিয়েছিল কলেজ পালিয়ে। ভর দুপুর বেলায়। চারজনে বেশ কিছুক্ষণ আড্ডা মারার পর চেরী লাফিয়ে উঠে পড়ল। —বাদাম ভাজা কিনে আনি।

একটু দূরেই বসেছিল বাদামওয়ালা। চেরী গেল বাদাম কিনতে। সেই সুযোগে আমরা রাজী হলাম।

—বল এবার মহারাণীর কি হুকুম হবে।

কুশল বললে—কি আবার; লাইট হাউসে যে নতুন বইটা এসেছে তার জন্যে গিয়ে লাইনে দাঁড়াতে হবে। পকেট হাতড়ে দেখ রেস্তর কি অবস্থা।

সুখেন্দু বললে—আরে না-না। স্টীমারে বোটানিক্সে যাবার মতলবে আছে।

সত্যজিৎ বললে—নৌকোয় গঙ্গাবক্ষে ভ্রমণ।

একটু পরেই চেরী ফিরে এল। এক আঁচল বাদাম হাতে করে, কয়েকটা দাঁত দিয়ে পিষতে পিষতে এসে উত্তেজিতভাবে বললে—চল চল, এখুনি উঠে পড়, একটা অদ্ভুত জিনিস দেখে আসি।

বলেই উর্দ্ধশ্বাসে দৌড় দিল জগন্নাথ-ঘাটের দিকে। সেখানে গিয়ে হুড়োহুড়ি করে টিকিট কিনে আমাদের প্রায় হিড়হিড় করে টানতে টানতে এনে তুলেছিল একটা প্রায় ঝাড় ঝাড় স্টীমারে। উঠতেই স্টীমারটা ছাড়ল। আমরা হাঁপাতে হাঁপাতে প্রশ্ন করলাম—যাচ্ছি কোথায়? বোটানিক্সে?

—না। —একমনে বাদাম ভাঙা করতে করতে জবাব দিয়েছিল চেরী।

—বকখালি ?

—না। —বেশ ধীর সুস্থে তাকিয়ে স্টীমারের ডেকে বসতে বসতে জবাব দিয়েছিল চেরী।

—ডায়মণ্ডহারবার ?

—না, তাও না। আমরা আপাতত যাচ্ছি রাজগঞ্জে।

—রাজগঞ্জ ? —আমরা তিনজনেই বিস্মিত প্রশ্ন করেছিলাম।

—হাঁ রাজগঞ্জ। এইমাত্র খবর পেলাম সেখানে একটা অদ্ভুত তালগাছ আবিষ্কার হয়েছে। সেটা সকালবেলা পুকুরের ওপর শুয়ে থাকে। কিন্তু বেলা চড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেটা দিন-ভোর উঠে দাঁড়াতে থাকে। সন্ধ্যা-বেলা একেবারে সোজা হয়ে যায়। অদ্ভুত নয় ?

—তা এই অদ্ভুত তালগাছটির সন্ধান তোমাকে দিল কে ?

বাদামওয়ালার কাছে দুটো লোক দাঁড়িয়ে বলাবলি করছিল। ওরা নিজেরা দেখে এসেছে। আমি কান পেতে ঠিকানাটা পর্যন্ত শুনে নিয়েছি। চক্রবর্তীদের ইটখোলার পুকুর। রাজগঞ্জ স্টীমারঘাট থেকে দক্ষিণ-মুখো আধ ঘণ্টার রাস্তা।

—কিন্তু এখন আমরা যাচ্ছি কোথায় ?

প্রশ্নটা করে ওরা তিনজনেই তাকিয়েছিল চেরীর মুখের দিকে একসঙ্গে ট্যাক্সির ভিতর।

—ঠিকানা নেই। বল তো।—চেরী বললে মৃদু হেসে।

—তা এখন তুমি যেখানেই যাও, আজকে ঠিক করতেই হবে তোমাকে তোমার ভবিষ্যৎ ঠিকানা। কার ঘরে তুমি যাবে ? —ওরা তিনজনে একসঙ্গে চেপে ধরল চেরীকে।

পরে সুখেন্দু হেসো গলায় বললে—যদি এই নাবালক তিনটি শিশুকে নিয়ে কানামাছি খেলার আনন্দটাকে বড় বলে মনে না কর।

চেরীর মুখের ওপর এবার প্রগাঢ় একটা বেদনার ছাপ পড়ল। মৃদুস্বরে বললে—এতো তাড়া কেন ? আমি যে স্ত্রী হবার জন্য, মা হবার জন্য এতটুকু তৈরী হইনি।

কুশল মিন মিন করে বললে—তা হলে না হয় আজকে থাক। কিন্তু [illegible] এ সম্বন্ধে—

সত্যজিৎ প্রায় ধমক দিয়ে উঠল কুশলকে। —না কুশল, চেরীর মন চেরী নিজেই জানে না। স্ত্রী হবার জন্য, মা হবার জন্য বাইশ বছরের কোন মেয়েকে নতুন করে তৈরী হতে হয় না। সে তৈরী হয়েই থাকে।

সুখেন্দু সায় দিল—সত্যি তো। নেচারকে তো অস্বীকার করা যায় না।

চেরী নিশ্চুপ। গভীর চিন্তার মধ্যে তলিয়ে গেছে সে।

সুখেন্দু আবার বলে উঠল—এ ব্যাপারে তুমি যতই সময় নেবে চেরী, দেখবে তুমি কিছুতেই মনস্থির করে উঠতে পারছ না। একটা ভয়, একটা দ্বিধা এসে তোমাকে বার বার সিদ্ধান্ত থেকে টলিয়ে দেবে। গুড স্পিনস্টারদের যা হয় আর কি!

কুশল এবার একটু গলা উঁচিয়ে বললে—আর কিছু সময় দিতে দোষ কি ? চেরী যদি এখনও না ফুটে থাকে।—

সুখেন্দু মাতব্বরের মতো বলে উঠল—নেভার মাইণ্ড, বুকের তাপ দিয়ে আমি ফুটিয়ে নেব।

সত্যজিৎ বলে উঠল—দেহের উত্তাপ না পাওয়া অবধি চেরী বোধ হয় ফুটবে না। তাছাড়া ফোটবার আগের মুহূর্তটিতে পর্যন্ত কলি কি বুঝতে পারে তার পাপড়ী মেলার সময় হয়েছে ?

ট্যাক্সিটা এতক্ষণে আউট্রাম ঘাটের কাছে এসে পড়েছিল।

চেরী ঝুঁকে পড়ে বললে—সর্দারজী ওয়াপস্ চলিয়ে। পরক্ষণেই তিনজনের দিকে ফিরে বললে—তোমাদের আজ যে কথা বলব বলে নিয়ে এলাম তা আমাকে তোমরা বলতেই দিচ্ছ না।

তার কথার আওয়াজে ঝাঁঝ ফুটে বার হয়ে এল। পাঞ্জাবী ট্যাক্সি ড্রাইভার গাড়িটা পঞ্চম জর্জের স্ট্যাচুর পাশ দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে গঙ্গার ধারে এসে পড়ল আবার। ওরা যে পথ দিয়ে এসেছিল, সেই পথেই ফিরে চলল।

ইতিমধ্যে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। গঙ্গার ওপর জাহাজগুলোতে আলো জ্বলে উঠেছে। রাস্তাটায় আলো অনেক কম, অন্ধকারই বেশী। নিঃশব্দে ওরা কজন বসে আছে ট্যাক্সির মধ্যে। কুশল, সত্যজিৎ আর সুখেন্দু বোধ হয় অপেক্ষা করছে চেরী কি বলে তাই শোনবার জন্য। চেরীর মনটা ঘনিয়ে উঠেছে দারুণভাবে। তবু সে যে কথাটা ওদের বলবার জন্য তৈরী হয়ে এসেছিল, তা আর বলে উঠতে পারছে না। ওর মনের মধ্যে ওদের তর্ক-বিতর্কের রেশটা এখনও বেশ জোরেই বাজছে। ওরা একে অপরের মুখগুলো অস্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে মাত্র। এক একটা লাইট পোস্টের কাছে সেগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠছে, আবার অস্পষ্ট।

গঙ্গার ঘাটে লোকজনের ভীড় খুব বেশী নয়। ইদানীং সহরে খুন, রাহাজানি, স্ত্রীলোকদের ওপর হামলা হঠাৎ বেড়ে যাওয়াতে এই সব জায়গাগুলোতে সান্ধ্য বায়ুসেবীদের ভীড় আর হচ্ছে না। নানা দিকে নানা কথা শোনা যাচ্ছে, তাই বিশেষ করে মহিলারা এই সব জায়গায় সন্ধ্যার পর যাতায়াত একদম বন্ধ করে দিয়েছেন। কিছু ফুচকা আর আইসক্রীম ওয়ালারা নিতান্ত পেটের দায়ে এখানে ওখানে বসে আছে। খদ্দের নেই। এটা হল আউট্রামঘাট আর ম্যান-অব-ওয়ার জেটীর কাছাকাছি।

ট্যাক্সি যতই দক্ষিণে এগোতে লাগল ততই জনমানবশূন্য থমথমে অন্ধকার যেন সব কিছুকে গ্রাস করে বসে আছে মনে হল। শুধু এখানে সেখানে দু-একখানা প্রাইভেট কার নিঃশব্দে এসে দাঁড়াতে দেখা যেতে লাগল। আবার কোন রহস্যময় কারণে নিঃশব্দে তাদের চলে যেতেও দেখা যেতে লাগল অল্পক্ষণের মধ্যেই।

ওরা প্রিন্সেপস ঘাটের কিছু দূরে এসে পড়ল। চেরী আদেশ করল—সর্দারজী ইঁহা রোক দিজিয়ে।

ট্যাক্সি থেমে গেল। গলা বাড়িয়ে টাকার অংকটা দেখে নিয়ে হাতের ব্যাগটা খুলে চেরীই গাড়ী ভাড়াটা মিটিয়ে দিল। তিনজনের দিকে তাকিয়ে বললে—নাম এখানে।

কুশল একটু ইতস্তত করে বললে—এখানে এই নির্জন জায়গায়—

সুখেন্দু বলে উঠল—দিনকাল খুব ভাল নয়। আজকাল—

সত্যজিৎ বললে—অন্য কোথাও গেলে হত না ?

চেরী প্রায় ধমকের সুরেই বললে—কিসের ভয়, তোমরা তো তিনজন রয়েছ।

ওরা নেমে দাঁড়াল রাস্তার পাশে ঘাসের জমির ওপর। ট্যাক্সিটা হুস করে চলে গেল। চেরী ওদের তিনজনকে নিয়ে গঙ্গার পাড়ের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। ওকে বড় গম্ভীর বলে মনে হচ্ছিল। জাহাজ থেকে এসে পড়া আলোতে ওর মুখখানা চার-পাশের অন্ধকারের মতোই থমথমে লাগছিল।

ওরা চারজনে এসে গঙ্গার ঢালু পাড়ের ওপর বসল। দুপাশ থেকে সত্যজিৎ আর কুশল চেরীর দুখানা হাত টেনে নিয়ে শুধল—তুমি কি চটলে চেরী ?

অত্যন্ত শান্ত নিস্পৃহ গলায় চেরী বললে—তোমাদের কথা শুনে প্রথমে খুবই চটেছিলাম। পরে ভেবে দেখলাম তোমাদের সঙ্গে কতকগুলো প্রশ্নের মীমাংসা করা দরকার। নৈলে ভুল বোঝাবুঝি আরও বাড়তে থাকবে। তোমরা তো জান, কারুর সঙ্গে একটুক মনোমালিন্য আমার সহ্য হয় না। বিশেষ করে তোমরা তিনজন। তোমরা হলে আমার সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু বোধ হয় সবচেয়ে বেশীদিন ধরে। আপাততঃ আমার একটা প্রশ্নের জবাব দেবে তোমরা ?

—কি বল ?

—ছেলেতে মেয়েতে যৌন সম্পর্ক বাদ দিয়ে কি নিছক বন্ধুত্ব হতে পারে না ? সুখেন্দু তুমি কি বল ?

সুখেন্দুর জবাবটা ছিলে ছেঁড়া তীরের মতো বার হয়ে এল—হয়তো হতে পারে, কিন্তু তাতে আমার আস্থা নেই।

—জিৎ, তোমারও কি ওই মত ?

—ছেলে মেয়ের মধ্যে সে জাতীয় বন্ধুত্ব হওয়া অসম্ভব। যৌন সম্পর্ক তাতে থাকবেই।

—কুশল, তোমারও কি ওই একই কথা ?

—দেখ চেরী, বন্ধুত্ব মানেই হল একটা আকর্ষণ। আর দুনিয়াতে আকর্ষণের যে কটা বস্তু আছে তাদের গোড়ার কথাটাই তো হল সেক্স। তবে ইতর প্রাণী বা গাছেদের বেলায় যা হয় সেটা হল নিছক তাদের বংশ বৃদ্ধির তাড়না। মানুষের বেলায় তার এসথেটিক সেন্স একটা বড় অংশ নিলেও সেক্সই তো সব কিছুরই মূলে। সুতরাং—

—বুঝলাম। কিন্তু আমার কথা কি জান ? তোমাদের তিনজনকে আমি ভাল-

CENTRAL LIBRARY

রেখেছি নিছক বন্ধুর মতো। এই দীর্ঘ ক' বছরের মধ্যে একবারও তোমাদের কারুর সম্বন্ধে আমার মনে যৌন আকর্ষণ বোধ করিনি আমি। নাওয়া-খাওয়ার মতো তোমাদের সঙ্গে আড্ডা দিতে, বেড়াতে নিত্য অভ্যস্ত হয়ে গেছি আমি। এক মুহূর্তের জন্যেও আমি সন্দেহ করিনি যে তোমাদের মনের মধ্যে তোমরা আমার সম্বন্ধে একটা আসক্তি এত সংগোপনভাবে লালন পালন করে চলেছ এতদিন ধরে। অবশ্য একবার কাশ্মীরে—

সত্যজিৎ মনে মনে শিউরে উঠল।

একটু কি ভেবে নিয়ে চেরী বললে—যাক গে, সেকথা এখানে নাই বললুম। তবে সেটা এমন কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার বলেও আমার মনে হয়নি। কিন্তু তোমাদের এই আসক্তিটা—

—ছিঃ ওটাকে আসক্তি বললে আমি খুবই দুঃখ পাব। ভালবাসা আর আসক্তি এক নয়। —বললে কুশল আহত স্বরে।

চেরী তার মুখের দিকে তাকিয়ে একটা অদ্ভুত হাসি হাসল।

সত্যজিৎ এবার সাহস সঞ্চয় করে বলে উঠল—কিন্তু চেরী তোমাকে তো একসময় স্থির করতেই হবে। বিয়ে না করে তো তুমি থাকতে পারবে না। বিয়ে তো তোমাকে করতেই হবে।

—মাস্ট আই?

—অফকোর্স, নৈলে আমি কি আমার আমার সমস্ত ভবিষ্যৎ জলাঞ্জলি দিয়ে তোমাকে এম-এতে জায়গা ছেড়ে দিলাম? আমার নিশ্চিত স্কলারশিপ, রিসার্চের সুযোগ সব ছেড়ে দিয়ে আজ কলেজে দাস বর্ষাছি কি জন্যে?—ফুঁসতে ফুঁসতে বললে সুখেন্দু।

—সেকথা যদি বল তো চেরীর জন্য আমিও কিছু কম করিনি। লাফিয়ে উঠল কুশল অপর দিক থেকে।

চেরী যেন ঘুমিয়ে পড়েছে। আবহাওয়া মুহূর্তের মধ্যে নিদারুণ থমথমে হয়ে উঠেছে। সামনে গঙ্গার বুকে দাঁড়িয়ে থাকা জাহাজটা অকস্মাৎ একটা গম্ভীর আওয়াজ তুলে ভোঁ দিল। পরক্ষণেই জায়গাটা আবার নিস্তব্ধতায় ভরে গেল।

চেরীর গলা থেকে একটা ক্লান্ত আওয়াজ বার হয়ে এল। —কিন্তু, এবার তুমিও তো তোমাদের কাছে আমাদের খণের হিসাবটা দাখিল করবে—

সু সু সু শি-ই-ই। পিছন থেকে একটা লম্বা সরু তীক্ষ্ণ শিষের আওয়াজে চেরীর কথাগুলো কেটে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। ওরা চমকে পিছন ফিরে তাকাল। কালো কালো গুটিতিনেক মূর্তি ওদের পিছনে দাঁড়িয়ে শিষ মারছে। সহরের চ্যাংড়া ছেলেদের দল একটা।

কুশল বললে—চেরীর মেজাজটা আজ তেমন ভাল বোধ হচ্ছে না। চল এখান থেকে সকলে যাওয়া যাক।

সুখেন্দু নীচু গলায় বললে—ছেলে-গুলোর মতলব খুব ভাল বলে বোধ হচ্ছে না। চল চেরী অন্য কোথাও যাই।

চেরী জিদ ধরে বসল—না, আমি এখান থেকে উঠব না।

—আরে সেই ঢংদার চিংড়িটা এখানে রে। তিন ব্যাটা চিংড়িটাকে নিয়ে ফষ্টি করতে এসেছে। —একটা ছোকরা চেঁচিয়ে উঠল।

কথাগুলো স্পষ্ট ওদের কানে এসে বাজল। সত্যজিৎ দাঁতে দাঁত দিয়ে বললে—ইস্ কেমন বদমায়েসের দল। চেরী ওঠ। এখানে আর এক মুহূর্তও বসা চলবে না।

—না, আমি উঠব না। তোমাদের সাহস থাকে তো ওদের এখান থেকে দূর করে তাড়িয়ে দাও।

—চেরী ছেলেমানুষের মতো কথা বোলো না। জান, ওরা আজকাল প্রায়ই ছুরি ছোরা পকেটে রাখে। রাখে বোমা। পিস্তল, রিভলবার থাকাও বিচিত্র নয়। কাগজে আজকাল দেখছ তো। চল ওঠো।

—না।

ছোকরাদের দলে আরও গোটাকতক চোঙা প্যান্ট পরা চ্যাংড়া এসে জুটল। অকথ্য ভাষায় তারা টিটকারী কাটতে লাগল একটু দূর থেকে।

সত্যজিতের বোধ হয় এবার ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। চেঁচিয়ে বললে—তোমরা এখান থেকে যাবে না, আমরা পুলিশ ডাকব।

—ওরে শালা, পুলিশের ভয় দেখায় রে! —খ্যা খ্যা করে হাসতে লাগল ছোকরারা।

—তোদের পেঁদিয়ে লাট করে দিলেও কোন পুলিশ বাবা তোদের উদ্ধার করতে আসবে না। আমরা ওয়াটগঞ্জের ছেলে। আমাদের নামে পুলিশ ভয়ে কাঁপে।

ছোকরাগুলো নিজেদের ভিতর কি সব বলাবলি করতে লাগল। কুশল এই ফাঁকে দৌড়ে চলে গেল রাস্তার দিকে। বলে গেল—আমি একটা ট্যাক্সি ধরি। সত্যজিৎ আর সুখেন্দু কাঠ হয়ে বসে রইল।

ছোকরাগুলো আরও কয়েক পা এগিয়ে এল ওদের দিকে।

—এই শালী, ব্যবসা ফাঁদবার আর জায়গা পাসনি? দলের মস্তানটা কটূক্তি করল। চেরী দু' কানে আঙ্গুল গুঁজে দিল। ছোকরার দল আবার খ্যা-খ্যা করে হাসতে লাগল।

হঠাৎ চেরী ছিটকে উঠে দাঁড়াল। প্রায় এক লাফে এসে পড়ল মস্তানটার মুখো-মুখি।—তোমরা কী চাও? অসভ্য শয়-তানের দল।

মস্তানটা চেরীর এই হঠাৎ আক্রমণে এক মিনিটের জন্য থমকে গিয়েছিল। পর মুহূর্তেই দাঁত বার করে হাসতে হাসতে বললে—পাগলী খেপেছে রে। ধর ক্যাপটে।

—একপা এগোলে আমি গঙ্গায় ঝাঁপ দেব। আর যদি পয়সাকড়ি চাস তো এই নে। বলে হাতের ব্যাগটা ছুঁড়ে দে মারল মস্তানটার মুখে।

মস্তানটা ব্যাগটা দু'হাতে আঁকড়ে ধরে দৌড় মারল রাস্তার দিকে। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দলটা তার পিছন পিছন ছুটল।—খোলা শালা সব নিয়ে ভাগল রে, ধর ধর শালাকে।

কুশল রাস্তায় একটা চলন্ত গাড়ী ধরে ফেলেছিল। সুখেন্দু আর সত্যজিৎও ইতি-মধ্যে গুটি গুটি এসে দাঁড়িয়েছিল চেরীর পাশে। চেরী আস্তে আস্তে রাস্তার দিকে হেঁটে চলল। সঙ্গে সঙ্গে চলল সত্যজিৎ আর সুখেন্দু। ওদের কারুর মুখে কথা নেই।

গাড়ীটার কাছে এসে নীচু অথচ দৃঢ় গলায় চেরী বললে—ওঠ। ওরা একটু ইতস্তত করছে দেখে আবার বললে—ওঠ।

ওরা তিনজনে পিছনের সীটে উঠে বসল। সামনে ড্রাইভারের পাশে চেরী।

—চলিয়ে এসপ্ল্যানেড।—গাড়ী চলতে শুরু করল।

চেরী মুখ না ফিরিয়েই বললে—তোমাদের কাছে বিদায় নিতে এসেছিলাম। আসছে কাল সকালের প্লেনে আমি দিল্লী যাচ্ছি। সেখান থেকে লণ্ডন আমেরিকা। ইয়েলের রিসার্চ স্কলারশিপটা হঠাৎ পেয়ে গেলাম। আজ সকালে কেবল পেয়েছি। তোমাদের জানাবার আগে সময় হয়নি। কাশ্মীরকে বলবার আগে প্রণাম করে যাব, তুমি একটু বলে রেখ জিৎ। আজ রাতে আর যাবার সময় হবে না, গোছাতেই সময় লাগবে অনেকটা।

আবার নিজের মধ্যে তলিয়ে গেল চেরী।

গাড়ী এল এসপ্ল্যানেডে। ড্রাইভারকে থামতে বলে চেরী সামনের দরজা খুলে টুপ করে নেমে পড়ল। ওরাও নামতে যাচ্ছিল। চেরী বাধা দিল।—আমাকে এখন একবার মার্কেটে যেতে হবে। তোমরা যাও। জানি আমি

এক মুহূর্ত থেমে সে বললে—যাবার তোমাদের বন্ধু হিসাবে একটা পরামর্শ দিয়ে যাই। তোমরা কারুর স্বামী হতে চেও না জীবনে। আমার কথাটা মনে রেখ। পিছন ফিরে চেরী জনতাতে মিশিয়ে গেল।

বিজ্ঞানের কথা

পৃথিবীর কক্ষপথের মঞ্চ

পৃথিবীর কক্ষপথে একটি স্টেশন বা মঞ্চ স্থাপন করার জন্যে সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা বেশ কয়েকটি পরীক্ষাকার্য চালিয়েছেন। সয়ুজ চার ও পাঁচ ব্যোমযান একটির সঙ্গে অন্যটি যুক্ত হয়ে এমনি একটি মঞ্চ তৈরি হবার মহড়াও হয়ে গিয়েছে। প্রস্তুতির পর্বটি মোটামুটি শেষ বলা চলে। এই লেখার সঙ্গে যে ছবিটি ছাপা হল তা এমনি একটি স্টেশন বা মঞ্চের। পৃথিবীর কক্ষে এই মঞ্চটি পাক খেয়ে চলবে। মনুষ্যবাসের উপযোগী করে এটি তৈরী। সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের পরিকল্পনা অনুসারে, এই মঞ্চে নভশ্চররা পালা করে অবস্থান করবেন এবং নানা পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা চালাবেন।

পৃথিবীর কক্ষে একটি মঞ্চ স্থাপন করার ওপরে সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা যে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন তার কারণও আছে। তাঁরা মনে করেন মহাবিশ্ব মহাকাশ এবং আমাদের এই পৃথিবী সম্পর্কেও আরো বেশি জানতে হলে, এখনো পর্যন্ত এমনি একটি কক্ষীয় মঞ্চই মানুষের সবচেয়ে বড়ো সহায় হতে পারে।

প্রথমে দেখা যাক এমনি একটি মঞ্চ থেকে পৃথিবী সম্পর্কে আরো বেশি কী জানা যেতে পারে।

পৃথিবীর মাটিতে দাঁড়িয়ে ভূপৃষ্ঠে কতটুকু আমরা দেখতে পাই? বিমান থেকেই বা কতটুকু? একটি কক্ষীয় মঞ্চ থেকে গোটা পৃথিবীটাকেই চোখের ওপরে রাখা যেতে পারে। তার সবচেয়ে বড়ো লাভ—ভূপৃষ্ঠের বিন্যাসটি আরো ভালোভাবে বুঝতে পারার সুযোগ পাওয়া; কোথায় জমি, কোথায় নদী, কোথায় অরণ্য, কোথায় সমুদ্র তা গোটা একটি ছবিতে একসঙ্গে দেখতে পাওয়া। নদীর গতিপথ কোথাও বদলাচ্ছে কিনা, জলের স্তর ওঠানামা করছে কিনা, কোথাও জঙ্গলে আগুন লেগেছে কিনা, কোথাও ধস নামছে কিনা, ফসলের ফলন কেমন, মাটির নিচে খনিজ সম্পদ পাওয়ার সম্ভাবনা কতখানি—এসব খবর কক্ষীয় মঞ্চ থেকে সংগ্রহ করা যাবে গোটা একটি ছবির মতো পুরোপুরিভাবে।

খবরগুলো সামান্য নয়। সমুদ্রের কথাই ধরা যাক। কক্ষীয় মঞ্চ থেকে সমুদ্রকে যতো সম্পূর্ণভাবে পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে ভূপৃষ্ঠ থেকে তা সম্ভব নয়। সমুদ্রের বিপুল সম্পদ আহরণ করার উপায়ের সন্ধান যাঁরা করছেন তাঁদের গবেষণা চালাবার সবচেয়ে উপযুক্ত স্থান হচ্ছে কক্ষীয় মঞ্চ।

এমনি একটি মঞ্চের সাহায্য পেলে বিশেষ করে ভূ-বিজ্ঞানীদের কাজ অনেক সহজ হয়ে উঠবে। যে-সব খবর সংগ্রহ করতে কয়েক বছর লাগার কথা তা এমনি একটি কক্ষীয় মঞ্চ থেকে কয়েক দিনের মধ্যেই হস্তগত হবার সম্ভাবনা।

জীববিজ্ঞানীদের বেলাতেও সুবিধে নিতান্ত কম নয়। কক্ষ-পরিক্রমার ভারশূন্য অবস্থায় জীবকে শরীর যতো অনায়াসে কাটাছেঁড়া করা যায় ভূপৃষ্ঠে তা আদৌ সম্ভব নয়। কক্ষীয় মঞ্চে জীববিজ্ঞানীও অনেক সহজে অনেক বেশি জ্ঞান লাভ করতে পারেন।

আর শুধু পৃথিবীই বা কেন, কক্ষীয় মঞ্চ থেকে পর্যবেক্ষণের বিষয় হবে মহাকাশ ও মহাবিশ্বও। ভূপৃষ্ঠ থেকে বায়ুমণ্ডলের ভিতর দিয়ে তাকিয়ে আমরা আমাদের এই বিশ্ব সম্পর্কেই বা কতটুকু জানতে পারি, মহাকাশ ও মহাবিশ্ব সম্পর্কে তো প্রায় কিছুই নয়। এমনি একটি কক্ষীয় মঞ্চ থেকে দৃষ্টিপাত করার সুযোগ পেলে এই জানা-র সূত্রপাত হবে আশা করা যায়। ভূপৃষ্ঠ থেকে তাকিয়ে এতদিন আমরা যা দেখেছি তা আসল দেখা কিনা বায়ুমণ্ডলের বাইরে মহাশূন্য থেকে তাকিয়ে না দেখা পর্যন্ত সে সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত ছিলাম না। কোন কোন তারকা থেকে প্রচণ্ড তেজ নিঃসৃত হয়ে থাকে, ভূপৃষ্ঠের এই অভিজ্ঞতার মধ্যে না-জানা না-বোঝা দিক অনেক, কক্ষীয় মঞ্চ থেকে সেটা না থাকারই সম্ভাবনা। এমনকি তখন হয়তো এই তেজ-নিঃসরণের রহস্যটুকুও পরিষ্কার হয়ে যেতে পারে। তাহলে তো তেজের ক্রমবর্ধমান চাহিদার এই পৃথিবীতে অনেক সমস্যারই সমাধান হয়ে যায়।

এগুলো হচ্ছে মঞ্চ তৈরি করার সরাসরি সুবিধে। কিন্তু আনুষঙ্গিক সুবিধেও বড়ো কম নয়। তাও মাত্র তের বছরের মধ্যে।

নভশ্চারণা সম্ভব করার জন্যে দুটি বড়ো রকমের কাজ সম্পন্ন করার দরকার ছিল। একটি ব্যোমযানকে পৃথিবীর মাটি থেকে আকাশে তোলা, পুনরায় সেই ব্যোমযানটিকে আকাশ থেকে পৃথিবীর মাটিতে নামিয়ে আনা। এ দুটি ছিল মূল কাজ, নভশ্চরের স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তার জন্যে অবশ্যই আরো অনেক অনেক কিছু। মাত্র তের বছরের মধ্যে মূল কাজ দুটি নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করা যাচ্ছে, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

সঙ্গে সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতে হয়েছে আনুষঙ্গিক শিল্পকেও। আর অল্প সময়ের মধ্যে অতি দ্রুত। আমাদের সবচেয়ে বড়ো লাভ হয়েছে অতি উন্নত ধরনের ইলেকট্রনিক কম্পিউটার, যে-যন্ত্রটির সাহায্য ছাড়া ব্যোমযানকে আকাশে তোলা, নির্দিষ্ট পথে চালিত করা ও পুনরায় পৃথিবীর মাটিতে ফিরিয়ে আনার কাজটি কিছুতেই সম্পন্ন হতে পারত না। বিজ্ঞানীরা বলে থাকেন, আমাদের এই যুগটি হচ্ছে ইলেকট্রনিক কম্পিউটার, পরমাণু-শক্তি ও মহাশূন্য-অভিযানের যুগ। এই তিনটি ব্যাপার পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়। এবং এই তিনটি ব্যাপারের মিলিত ফল যে কী আশ্চর্য ব্যাপার সৃষ্টি করতে পারে বিজ্ঞানীরা তারও কিছু কিছু আভাস দিয়েছেন।

আনুষঙ্গিক লাভ হিসেবে অতঃপর উল্লেখ করা চলে প্রচণ্ড তাপ সহ্য করার ক্ষমতা বিশিষ্ট মিশ্রধাতুর, প্রচণ্ড চাপ সহ্য করার ক্ষমতা বিশিষ্ট উপকরণের। যদিও মহাকাশ-অভিযানের প্রয়োজনে তৈরী কিন্তু এই মিশ্রধাতু ও উপকরণ পৃথিবীর মাটির বহু শিল্পেও কাজে লাগছে।

CENTRAL LIBRARY

এমনি দৃষ্টান্ত আরো অনেক। মাত্র তের বছরের মধ্যে এত বিভিন্ন দিকে এত দ্রুত উন্নতি হচ্ছে যে আমরা অনেকে ধরে নিয়েছি এমনটি হবেই। কিন্তু মহাকাশ-অভিযানের তাগিদ যে এক্ষেত্রে একটি বড়ো রকমের তাগিদ তা মনে রাখা দরকার।

এক যুগের খতিয়ান—

চাঁদের দিকে অভিযান শুরু হয়েছে ১৯৫৯ সালের গোড়ার দিক থেকে। লুনা-১ থেকে লুনা-১৬ পর্যন্ত প্রায় এক যুগের ইতিহাস। এই প্রথমটি ও শেষটির দিকে তাকিয়েও বারো বছরে অগ্রগতির একটা পরিমাপ পাওয়া সম্ভব।

লুনা-১ চাঁদের পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল, কয়েক হাজার কিলোমিটার দূর দিয়ে। লুনা-১৬ প্রায় নির্ধারিত স্থানে চাঁদের মাটিতে আলতোভাবে নেমেছে। চাঁদের মাটি সংগ্রহ করেছে, পুনরায় পৃথিবীর মাটিতে প্রায় নির্ধারিত স্থানে ফিরে এসেছে। মাত্র বারো বছরের মধ্যে মাত্র ষোলটি লুনার অভিযানে কৃতিত্বের কতখানি পার্থক্য।

লুনা-২ একই বছরের শরৎকালে। এই অভিযানটি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় নি। সোভিয়েতের একটি প্রতীক-চিহ্ন সমেত লুনা-২ চাঁদের মাটিতে আছড়ে পড়ে।

আরো তিন মাস পরে লুনা-৩। এই অভিযানের কৃতিত্ব অসাধারণ। লুনা-৩ চাঁদের অদেখা দিকের আলোকচিত্র তুলে আনে। পৃথিবীর মানুষের কাছে চাঁদের অ-দেখা দিকের ছবি এই প্রথম।

জোন্দ-৩ (জুলাই, ১৯৬৫) অভিযানের একই সাফল্য, চাঁদের অ-দেখা দিকের ছবি তুলে আনা।

চাঁদের মাটিতে প্রথম আলতোভাবে নামতে পেরেছিল লুনা-৯। এটিও এক অসাধারণ ঘটনা। মানুষের তৈরী বস্তু অন্য একটি জ্যোতিষ্কে আলতোভাবে অবতরণ করছে—এমন ঘটনা আগে কখনো ঘটে নি। লুনা-৯-এর চোখ দিয়ে মানুষ এই প্রথম চাঁদের উপরিতলের গড়নের দিকে তাকিয়ে দেখার সুযোগ পেল। স্বয়ংক্রিয় অভিযান চালিয়ে বিশ্ব সম্পর্কে খবর সংগ্রহ করার যে প্রয়াস শুরু হয়েছে লুনা-৯-কে বলা চলে তার সূত্রপাত।

লুনা সম্পর্কে—

লুনা-১০ ও লুনা-১২ চাঁদের চারদিকে কক্ষপথে পাক খেয়েছিল। এই দুটি অভিযান থেকে চাঁদের জমি সম্পর্কে অনেক খবর জানা গিয়েছিল।

লুনা-১৩ আলতোভাবে চাঁদের মাটিতে অবতরণ করে ও চাঁদের মাটির গড়ন সম্পর্কে অনেক তথ্য পৃথিবীতে পাঠায়।

মনুষ্যবাহী মহাকাশ স্টেশন

সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা কেন মানুষকে চাঁদের মাটিতে নামানোর চেষ্টা করেন নি বা তাঁদের কাছাকাছি এলাকায় পাক খাইয়ে আনেন নি। এ-কাজ সম্পন্ন করেছিলেন মার্কিন বিজ্ঞানীরা। অ্যাপোলো-১১ ও অ্যাপোলো-১২— পরপর দুটি অভিযানে মার্কিন নভশ্চররা চাঁদের মাটিতে পা দিয়ে ঘুরে বেড়ালেন, চাঁদের মাটি সংগ্রহ করলেন, তারপর আবার নিরাপদে পৃথিবীতে ফিরে এলেন। মহাকাশ-অভিযানের ইতিহাসে সবচেয়ে আশ্চর্য কৃতিত্বের সাক্ষ্য এই দুটি ঘটনা।

কিন্তু এখনো পর্যন্ত চাঁদের রহস্য রহস্য-ই থেকে গিয়েছে। চাঁদের ধুলো আর পাথর হাতে পাবার পরেও বিজ্ঞানীরা এখনো পর্যন্ত চাঁদের জন্ম সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেন নি, চাঁদের বয়স ও চাঁদের গড়ন সম্পর্কেও নয়। এখনো তাঁদের বিভিন্ন এলাকা থেকে পাথর ও ধুলো সংগ্রহ করার প্রয়োজন আছে।

সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা মনে করেন বর্তমান অবস্থায় মনুষ্যবিহীন অভিযানের মাধ্যমেই এই সংগ্রহকার্যটি চলা উচিত। মনুষ্যবিহীন অভিযানের ঝুঁকি ও খরচ কম, অথচ সাফল্য বিন্দুমাত্র কম নয়। কথাটা যে কত সত্য লুনা-১৬ হাতেকলমে উপস্থিত করে তাঁরা প্রমাণ উপস্থিত করেছেন।

বারো বছরে যদি লুনা-১ থেকে লুনা-১৬ পর্যন্ত হয়ে থাকে তাহলে আগামী বারো বছরে যে কী হবে তা ভাবতেও কল্পনা হার মানে।

লুনা-১৭

এই লেখা প্রেসে যাবার সময়ে খবর পাওয়া গেল লুনা-১৭ চাঁদের দিকে যাত্রা করেছে। মনুষ্যবিহীন স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রচালিত লুনা-১৭ চাঁদের মাটি ও চাঁদের আকাশ সম্পর্কে খবর সংগ্রহ করবে এবং সম্ভবত আবার পৃথিবীতেই ফিরে আসবে।

—[illegible]

গোয়েন্দা কবি পরাশর • প্রেমেন্দ্র মিত্র রচিত শৈল চক্রবর্তী চিত্রিত

অঙ্গনা

সাইক্লিস্ট শিখা সেন

ইনিয়ে বিনিয়ে দীর্ঘ ভনিতার আড়ালে আসল বক্তব্য চাপা দেওয়ার চেয়ে অকপটে বলাই ভাল যে, খেলাধুলায় আমরা বড় পিছিয়ে আছি। প্রতি বছর এই বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতাই আমাদের সম্বল। এরই মধ্যে এদিক-ওদিক ছিটকে দু'একটি ব্যতিক্রম যখন নজরে পড়ে তখন বিস্ময়ের আর সীমা থাকে না। পরিচিত উক্তিতার তাঁদের ধরতে পারি না। বড় অচেনা অচেনা ঠেকে। অথচ ওঁরা আমাদের আপনজন। এই বাংলাদেশেরই জল-হাওয়ার মানুষ।

শিখা সেন এমনই ব্যতিক্রম। মাত্র বার বছরের মেয়ে। এরই মধ্যে খেলাধুলার সে একজন সর্বভারতীয় প্রতিভা। বাংলাদেশের প্রায় প্রতিদ্বন্দ্বীহীন সাইক্লিংয়ে শিখা নিজের চেষ্টায় আমাদের মুখ উজ্জ্বল করেছে অনন্য সাফল্যে। এতদিন পর্যন্ত সোনার মেডেল পাওয়া মেয়ে সাইক্লিস্টের মুখ দেখতে পারেনি বাংলাদেশ। শিখা সে সাধ এবং অভাব পূরণ করেছে শুধু নয় ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়নশিপে অনেককে তাক লাগিয়ে দিয়েছে একবার নয় একাধিকবার।

জলের পোকা শিখা। সাঁতার কাটতেই ভালবাসতো। এখানেও তার জন্য অপেক্ষা করেছিল অনেক সম্মান। দু' একবার সে সাঁতার প্রতিযোগিতায় ভাল ফলাফল দেখাতেও কসুর করেনি। তাই সবাই ভেবেছিল, সাঁতারেই শিখা নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবে। হয়তো শিখাও তাই ভাবতো। কিন্তু শিখার বাবার মন তাতে সায় দিল না। তিনি বিশিষ্ট ক্রীড়ানুরাগী। নিজে খেলাধুলায় বড় বেশি একটা অংশ গ্রহণ করেননি। কিন্তু উৎসাহ খুব। খেলাধুলায় যে একদম অংশ নেননি একথা বলা যায় না। রবীনবাবু বাস্কেট এবং ভলি বেশ ভালই খেলতেন। হকিতেও কিছুকাল সঙ্গেই অংশ নিয়েছেন। এতো গেল বাবার দিক। মায়ের দিক থেকেও শিখা সহজাত কৃতিত্বের উত্তরাধিকারী। তার মা শ্রীমতী অমিয়া সেন এককালে খেলাধুলায় বেশ নামকরা মহিলা ছিলেন। তিনি ছিলেন বাংলাদেশের মহিলা হার্ডলস চ্যাম্পিয়ন। সেই আগ্রহ তাঁর এখনো আছে। শুধু নিজের মেয়েকে নয় আরো অনেক মেয়েকেই তিনি নিয়মিত খেলাধুলায় উৎসাহ দিয়ে চলেছেন। প্রখ্যাত ক্রীড়া সংস্থা 'শিশুমঙ্গল'-এর এঁরা স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই যুক্ত। এককালের খ্যাতনামা হার্ডলার শ্রীমতী নীলিমা ঘোষও এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেই যুক্ত ছিলেন। বর্তমানে এ বিষয়ে এবং ক্রীড়া সম্পর্কে সচেতন আছেন এঁরা স্বামী-স্ত্রী। সংস্কারের সেই জাল ছেড়ে পারিবারিক বেড়াজালে এ উদার প্রাঙ্গণে তাঁরা সকলকে নিয়ে নতুন জগৎ রচনায় ব্যস্ত।

কি যে হয়ে গেল শিখাও ঠিক বুঝে উঠতে পারেনি। বাবা-মা বললেন, 'শিখা সাঁতার ছেড়ে সাইকেল শিখুক। সেখানেই তার সম্ভাবনা বেশি।' জলের মেয়ে উঠে এলো ডাঙায়। সেটা ১৯৬৮ সালের জানুয়ারী মাস। শিখার সাইকেলে হাতে খড়ি হলো। সবই বাবার তত্ত্বাবধানে। নিয়মিত অনুশীলন। কোন ছুটি নেই। একটুও ফাঁকির সুযোগ নেই। শিখা মন-প্রাণ ঢেলে দিল। ঘড়ি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন রবীনবাবু। সময়ের হিসেব নিচ্ছেন। দু'এক মিনিট এদিক সেদিক হলেই অস্থির হয়ে পড়েন। পরের কথা ভেবে তিনি স্থির থাকতে পারেন না। এমনি একদিনের ঘটনা রবীনবাবুর বেশ স্পষ্ট মনে আছে। ওঁরা কয়েকজন স্টার্ট নিয়েছে। ঘড়ি হাতে সময় দেখছেন তিনি। সময় পেরিয়ে গেল। অস্থির রবীনবাবু বেরিয়ে পড়লেন ওঁদের খোঁজে। সেদিন বৃষ্টির জন্য ওঁরা সবাই এক জায়গায় আশ্রয় নিয়েছে। অথচ

মত রোডে তখন বৃষ্টি নেই। এমন সময়ে দুর্ঘটনার কথাই বেশি করে মনে পড়ে। একবার দুর্ঘটনায় পড়তেও হয়েছিল শিখাকে। যথারীতি অভ্যাস করছিল রেড রোডে। এমন সময় অতর্কিতে ধাক্কা। অবশ্যই গাড়ির। আঘাত খুব একটা গুরুতর নয়। কিন্তু সারা শরীরে। এজন্য ভুগতে ওকে হয়েছিল অনেকদিন। তাই টাইমিং-এর এদিক সেদিক হলে রবীন্দ্রবাবুর মন দুশ্চিন্তায় ভরে ওঠে।

বাংলাদেশের সাইক্লিস্টদের অনুশীলনের কোন নির্দিষ্ট জায়গা নেই। তাই রেড রোড ধরেই ওঁরা অনুশীলন করেন। দলে সবাই পুরুষ শিখাই একমাত্র মেয়ে। অথচ সে হুঁশ কারো নেই। শিখার অভিযোগ, সকালে রেড রোডে গাড়ির দুরন্ত গতি না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। নতুন গাড়ি চালাতে শিখছেন যাঁরা তাঁরাও এসে ভিড় করেন এখানে। আবার সকালের দিকে রেড রোড সব ধরনের যান-বাহনের জন্য উন্মুক্ত। অবশ্যই এটা অবাঞ্ছিত বিধান। কিন্তু আমাদের অনুশীলনের জন্য কারো কোন মাথাব্যথা নেই। এই রেড রোডেই অনুশীলন করতে গিয়ে প্রাণ হারান সাইকেলে বাংলাদেশের বিরাট আশা জিয়াউল রহমান। এতেও কিন্তু ওদের শাস্তি হয়নি। সকালের রেড রোডে গাড়ি এখনো উদ্দাম গতিতেই ছোটে। আর একটি অনুশীলনের জায়গা আছে রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়াম। মধ্য কলকাতায় থেকে শিখার পক্ষে তার দূরত্ব অনেকটা। তবু রোজ বিকেলে সে যায় সেখানে। এভাবেই চলে সকাল-বিকাল অনুশীলন। প্রায় সারা বছর ধরে।

জানুয়ারী মাসে হাতে খড়ি। আর নভেম্বরেই প্রতিযোগিতার আমন্ত্রণ এসে পৌঁছল শিখার কাছে। ১৯৬৮ সালে কেরলের ত্রিবান্দ্রামে জুনিয়ার ন্যাশনাল সাইকেল কম্পিটিশন। এখানে তার যোগদান খুব একটা সহজ হয়নি। অনেক কষ্ট করে তবেই তাকে প্রতিযোগিতার যোগদানের ছাড়পত্র সংগ্রহ করতে হয়েছে। কারণ, মহিলা প্রতিযোগীবিহীন ছিল এতদিন বাংলাদেশ। বেঙ্গল সাইক্লিস্ট অ্যাসোসিয়েশনও এ সম্বন্ধে নিস্পৃহই ছিল। হঠাৎ শিখার আবির্ভাবে ওঁরা তেমন উৎসাহবোধ করেননি। যাহোক, চেষ্টাচরিত্র করে শিখা ত্রিবান্দ্রামে চললো প্রতিযোগিতায় যোগদানের উদ্দেশ্যে।

শিখার এক বছর পুরো না হতেই প্রতিযোগিতা। এবং বৃহৎ প্রতিযোগিতা। শিখা একটিমাত্র ইভেন্টে যোগদান করলো। ফলাফল প্রথম যোগদানের তুলনায় অম্লান। শিখা চতুর্থ হলো। কোন পদক তার গলায় দুললো না। দাঁড়ানো হলো না বিজয়স্তম্ভে। প্রথম প্রতিযোগিতায় বিজয়লক্ষ্মী সুপ্রসন্ন হলেন না। হয়তো এটাও শিখার পরীক্ষা। অনেক পদক তার জন্য অপেক্ষা করে আছে। দূরত্বে পড়লে তা হাতছাড়া হয়ে যাবে। ধৈর্য ধরে, লড়াই করে তা ছিনিয়ে নিতে হবে।

বিশ্বের খাদ্য প্রদর্শনীর একটি উৎসব হলো 'লেফা ৭০'। এ বছর হামবুর্গে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ৩৬টি দেশের ১০০০ প্রতিষ্ঠান এতে অংশগ্রহণ করে। এই উপলক্ষে ভারতসহ সাতটি দেশের পক্ষ থেকে একযোগে স্ব স্ব দেশের খাদ্য-দ্রব্যের একটি প্রদর্শনী হয়। এই প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণকারীরা সবাই যে যার দেশের পোশাকে সজ্জিত।

এজন্য শিখাকে অপেক্ষা করতে হলো আরো কিছুদিন। পরের বছর অর্থাৎ ১৯৬৯ সালের জানুয়ারী মাসে দিল্লীতে অল ইণ্ডিয়া সাইক্লিং চ্যাম্পিয়নশিপের লড়াই। শিখা যোগদান করলো। ফলাফল আশানুরূপ হলো না। একটি প্রতিযোগিতায় সে যোগদান করলো। তৃতীয় স্থান। বিজয়স্তম্ভে দাঁড়ানো আর পদক লাভের বাসনা সফল হলো। এবারে বিজয়-স্তম্ভ না হলেও এটুকু আকাঙ্ক্ষা তো শিখার নয়। তাই কিছুটা হতাশা নিয়েই ফিরে এলো।

এসেই আবার অনুশীলন। পুরোদমে। সকাল-সন্ধ্যা। সাইকেলই শিখার ধ্যান-জ্ঞান। এবার সর্বোচ্চ সাফল্য চাই। এবার কটকের বারাবাটি স্টেডিয়ামে জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। শিখা সেন হাজির। দু-দুটি বিরাট প্রতিযোগিতার অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ প্রতিজ্ঞা-ভাস্কর। এবার প্রতিযোগিতার একটা বৈশিষ্ট্য শিখাকে অনুপ্রাণিত করলো আরো বেশি। সকল প্রতিযোগীর মধ্যে অংশ নিলেন শ্রীমতী অলকা মিত্র। সেবারই এ ঘটনা প্রথম। শিখা এতে আরো সাহস পায়। মনে মনে ভাবে এমন দিন আরো আসতে পারে।

সেবার প্রতিযোগিতায় শিখা সংকল্প-বদ্ধ। লড়াইয়ে বাজিমাৎ করতে হবে। তা সে লড়াই যতই কঠোর হোক না কেন। হলোও তাই। তীব্র প্রতিযোগিতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে শিখা বাজী জিতে নিলো। দুটি প্রতিযোগিতায় সোনার মেডেল। বিজয়স্তম্ভের সর্বোচ্চ শিখা। অনেকদিনের সাধ আর সাধনা তার পূর্ণ হলো। সেই

সঙ্গে বাংলাদেশের মুখ উজ্জ্বল হলো সাইক্লিস্টের প্রতিনিধিত্বে। এবং তা সাফল্যে অম্লান। শিখার মনোবল আরো বাড়লো।

কটক থেকে ফিরে আবার অনুশীলন। কিন্তু হঠাৎ জলের নেশা পেয়ে বসলো তাকে। সারাটা বর্ষা সাঁতার কেটেই কাটালো। সাইকেল নিয়ে খুব একটা মাতামাতি করে না। কীর্তির আসল অধ্যায়টা সে যেন ভুলে বসলো। সহসা পাটিয়ালা শিখার ডাক পড়লো আগরতলায়। বাংলার প্রতিনিধিত্বের জন্য। এদিন সময়ে হায়দ্রাবাদে অনুষ্ঠিত হতে চললো সাইক্লিং চ্যাম্পিয়নশিপের অনুষ্ঠান। শিখা এবং ওর মা-বাবা ঠিক করতে পারছেননা কোনটা ফেলে কোনটা রাখবে। ইতিমধ্যে সাইকেলের অনুশীলন আরম্ভ হলো। অবশেষে ঠিক হলো, শিখা হায়দ্রাবাদ যাবে, আগরতলা নয়। সাঁতারের প্রথম বঞ্চনার তিক্ততা সে ভুলতে পারেনি। তাই সাইক্লিং-এর আসরেই সে যোগদান করতে ছুটলো।

হায়দ্রাবাদে তার একটা বিরাট আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হলো। সকল প্রতিযোগীর হয়ে শিখা শপথ নিল। তারপর আরম্ভ হলো প্রতিযোগিতা। সবশুদ্ধ সাতটি ইভেন্ট। ছটিতে যোগদান করলো শিখা। অতিরিক্ত পরিশ্রমের জন্য আর একটিতে অংশ নিতে পারলো না। প্রথম দুটিতে রৌপ্য পদক। একটু দমে গেল শিখা। এবার সংকল্প আরো তীব্র হলো। পরের চারটিতে স্বর্ণ পদক। শিখা হলো স্বর্ণশিখা। ইণ্টার-জোনাল এবং জুনিয়র সব মিলিয়ে শিখা ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ান। শুধু তাই নয়, এবারে ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ান পেনাণ্ট [illegible]।

আনন্দে ডগমগ শিখা এবার চলেছে বোম্বেতে। আসছে ফেব্রুয়ারী মাসে সেই প্রতিযোগিতা। এখানে শিখার অনেক আশা। আমাদেরও তাই। শুধু স্বর্ণপদক বা চ্যাম্পিয়নশিপ না এবারে রেকর্ড। দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ এবং সহজ সুন্দর এই কিশোরীর কাছে এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

শিখাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, সাইক্লিংয়ে বাংলাদেশের মেয়েদের উৎসাহ কেমন? শিখা উত্তর দিয়েছিল, একদম সংস্কার কাটেনি। আশা করবো, শিখার দৃষ্টান্তেই সে সংস্কার দূর হয়ে যাবে। অসংখ্য উৎসাহী অনুরাগীদের বাংলার মহিলা সাইক্লিস্টের স্থানলাভ প্রতিষ্ঠিত করবে। —[illegible]

সংবাদ

২৩নং গৌরীমাতা সরণী (কলিকাতা—৪) অবস্থিত শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রমের প্রতিষ্ঠা করেন ঠাকুর রামকৃষ্ণের স্নেহভাজন যোগিনী শ্রীশ্রীগৌরীমাতা। তাঁর পালিতা কন্যা মাতা দুর্গাপুরী দেবী শ্রীশ্রীমায়ের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এই আশ্রমকে পূর্ণতা দান করেছেন। মাতা দুর্গাপুরী দেবী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট এবং সংস্কৃতে সাংখ্য বেদান্ত-তীর্থ। মাত্র আট বছর বয়সে মাতৃ কৃপা-লাভান্তে তের বছর বয়সে একমাত্র তিনিই সারদা মাতার নিকট থেকে সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করেন। পরমহংসদেবের মতে ঈশ্বর অনুরাগ ব্যতীত সমাজকল্যাণ ব্রত সঠিক পালিত হতে পারে না। সেবার মূলমন্ত্র এই যে, প্রতিটি নরনারীকে ঈশ্বরের প্রতি-নিধিরূপে জ্ঞান করতে হবে। অন্যথায় আত্মকেন্দ্রিক হয়ে সেবাকার্য ব্যাহত হবে। আজন্ম ব্রহ্মচারিণী সাধিকা দুর্গামাতা ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের অত্যন্ত প্রিয় ও অনুরাগিণী। স্বামীজী দুর্গামাতার পাশ্চাত্য শিক্ষার ব্যবস্থা করেন কিন্তু নানা কারণে তা সম্ভব হয় নি। স্বামীজীর আদর্শ অনুসারে স্বার্থজ্ঞানশূন্য হয়ে সেবাব্রত দুর্গাপুরী দেবী ও সারদেশ্বরী আশ্রম অনুসরণ করেছেন।

সাধারণের অর্থে বিনা আড়ম্বরে আশ্রম পরিচালিত হয়। সরকারী ও বেসরকারী সাহায্য বা প্রচার নেই। এই আশ্রমের তিনটি শাখা আছে—[illegible], কলকাতা ও নবদ্বীপে। আশ্রমের বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের প্রাচীন ভারতের আদর্শভিত্তিক আধুনিক শিক্ষা দেওয়া হয়। দুঃস্থ ও তীর্থাশ্রমেও শিক্ষাদানের বন্দোবস্ত আছে। দুর্গামাতা ও গৌরীমাতা আশ্রম বালিকাদের ঈশ্বর

দুর্গাপুরী দেবী

জ্ঞানে সেবা করেছেন। এই নীতি আজ পর্যন্ত অনুসৃত হচ্ছে। এইরূপে আধ্যাত্মিক শিক্ষার মাধ্যমে কন্যাদের আদর্শ মাতা, গৃহিণী বা ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসিনীরূপে গঠিত করে এইরূপ সেবাকার্যে মাতা দুর্গাপুরী দেবী প্রকৃত নারী শিক্ষা উন্নয়নে সাহায্য করেছেন। মাতৃভাবময়ী এই সন্ন্যাসিনীর সান্নিধ্য যাঁরা পেয়েছেন অনুগামী মাতা সারদা দেবীর অপরূপ চরিত্র অনুধাবনে সমর্থ হন।

পুষ্প পাল

কেরালার গ্রামসেবিকা শ্রীমতী সীমন্তি

কেরালার ঘরে ঘরে আজ শ্রীমতী সীমন্তির নাম। ১৯৬৯-৭০ সনে কেরালার শ্রেষ্ঠ গ্রামসেবিকারূপে তিনি ৭৫০ টাকা পুরস্কার পেয়েছেন। কাজাকুটমের জাতীয় সম্প্রসারণ ব্লকের এই গ্রামসেবিকাটি গ্রামে গ্রামে মহিলা সমিতি গঠন করে ঐ সকল সংঘের মাধ্যমে মেয়েদের সব্জী বাগান, আর্তের সেবা, পচাই সার উৎপাদন এবং হাঁস-মুরগী পালন শিক্ষা দিয়েছেন। তাঁরই উপযুক্ত শিক্ষার জন্য আজ কাজাকুটম ব্লকের প্রত্যেক গৃহে ১০ থেকে ১৫টি হাঁস-মুরগী পালন করা হচ্ছে। তা ছাড়া ২৫০টি বাড়ীতে সব্জীর চাষ চলেছে এবং প্রায় ২০০ পচাই সারের আধার তৈরী হয়েছে।

শ্রীমতী সীমন্তির উৎসাহে গ্রামবাসীরা ডাকঘরে ৩৭৩টি সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউন্ট খুলেছেন। তাঁর পরামর্শে গ্রামের ৪০০টি গৃহে উন্নত ধরনের পায়খানা নির্মিত হয়েছে। সহজলভ্য কোন্ কোন্ খাদ্য গ্রহণ করলে স্বাস্থ্য ভাল থাকে গ্রামবাসীরা তাও ঐ গ্রামসেবিকার নিকট থেকে জেনে নিয়েছেন।

শ্রীমতী সীমন্তি ৯ বছর ধরে কাজা-কুটম ব্লকে কাজ করছেন। তিনি একজন নিম্ন বিত্তশালী কৃষক পরিবারের মেয়ে; তার বিয়েও হয়েছে এক কৃষকেরই সঙ্গে। ৩৮ বছর বয়স্ক এই গ্রামসেবিকাটি বর্তমানে সমস্ত ব্লকের 'প্রিয়' বা বড়দিদি।

কেরালার কাজাকুটম ব্লকটি ত্রিবান্দ্রম শহরে ১৮ কি মি দূরে অবস্থিত। ৫০ বর্গমাইল আয়তনের এই ব্লকটির জনসংখ্যা ১ লক্ষ ২৫ হাজার। ৭টি পঞ্চায়েতে বিভক্ত এই ব্লকে ১৯৫৫ সন থেকে সর্বাঙ্গীণ উন্নয়ন কাজ শুরু হয়। শ্রীমতী সীমন্তি ৭টি পঞ্চায়েতের মধ্যে ৪টির কাজ দেখাশোনা করেন। তিনি প্রত্যেক পঞ্চায়েতে দুটি করে মহিলা সমাজ গড়ে তুলেছেন যার মধ্যে দুটি এ পর্যন্ত তাঁদের সরকারের নিকট থেকে ৪০০ টাকা করে উদ্দীপনী পুরস্কার লাভ করেছে।

নিজের জীবনে যা করা সম্ভব তাই শ্রীমতী সীমন্তি অপরকে শিক্ষা দিয়ে থাকেন। তাঁরও বাড়িতে একটি সব্জীর বাগান ও হাঁস-মুরগী রয়েছে। স্বামী ও দুটি সন্তান নিয়ে তাঁর ছোট্ট সংসার খুবই সুখের।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

হঠাৎ পল্টু কেঁদে উঠল। মীরা তাড়াতাড়ি ওর মুখ চেপে ধরল। কিন্তু এতে লাভ হলো না কিছু। পল্টু এবার জোরে কেঁদে উঠল। মীরা লজ্জিতভাবে রজতের দিকে তাকায়। ইতিমধ্যে আশেপাশের কিছু মন্তব্য ছিটকে আসে।

—আমি ওকে নিয়ে বাইরে যাচ্ছি। বলে মীরা অবস্থা অন্ধকারে প্যাসেজ ধরে অগ্রসর হয়। ভেবেছিল রজত নিজেই উঠে পল্টুকে নিয়ে বাইরে যাবে। আশ্চর্য! স্বার্থপরের মত দিব্যি বসে ছবি দেখছে।

সারি সারি চেয়ার পাতা রয়েছে। মীরা একটাতে বসল। পল্টুর কান্না বন্ধ। কেমন টুলটুল করে চারদিক দেখছে। ওর কান মলিনা মচকে মীরা অস্ফুটস্বরে বলল, দুষ্টু ছেলে কোথাকার! তোর জন্যে কী শান্তিতে সিনেমা দেখতে পারবো না? পল্টু কী বুঝল কে জানে। ওর গালদুটি ফুলে ওঠে। কান্নার পূর্বাভাস। মীরা ওর অভিমানী মুখটা বুকের উপর চেপে ধরে। মনে মনে বলে, লক্ষ্মী সোনামানিক! কেঁদ না।

হলের ভিতর ঢুকবে কিনা ভাবছিল মীরা। কেননা পল্টু এখন শান্ত। বহুদিন পর ছবি দেখতে এসেছে। ইদানীং বাইরে যাবার নাম করতো না রজত। বরং বরাবর নানা অজুহাতে এড়িয়ে চলতো। ওর অনিচ্ছা দেখে সে পীড়াপীড়ি করতো না।

—থেমেছে ওর কান্না?

কোন জবাব দিল না মীরা। ওর নিজেরই কান্না পাচ্ছিলো। এতক্ষণে বান্ধবীর মনে পড়ল ওদের কথা। আড়চোখে একবার তাকাল। মনে হলো রজত অন্যমনস্কভাবে কী যেন ভাবছে।

—তুমি উঠে এলে কেন! মীরা আঘাত দিতে চায়, তাড়াতাড়ি ফিরে যাও। আনন্দ গুলি সিন দেখতে পাবে না।

রজত কী বুঝল কে জানে। বলল তুমিও চল। দাও পল্টুকে আমার কাছে।

—না। মীরা একটু পিছিয়ে যায় আমার ভাল লাগছে না। বাড়ি যাব। তোমার ইচ্ছে হলে ছবি দেখতে পার। আমি চলে যাই।

—থাক। চল ফিরে যাই। আমি বাংলা ছবি বেশি দেখি না। শুধু তোমার জন্যে আসা।

রাস্তায় বেশ ভিড়। কিছুক্ষণ আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে। রাস্তায় জল জমেছে। ট্রাম-বাস বোঝাই মানুষ বাদুড়ঝোলা হয়ে ফিরছে। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে একটা ট্যাক্সি পেল।

সীটের কোণে সরে বসেছে রজত। বাইরের দিকে তাকিয়ে সিগারেট ধরাল। সাঁ সাঁ করে দোকান, পথচারী, যানবাহন, সিনেমার পোস্টার, আরও কত কী দ্রুত অপসারিত হচ্ছে। একবার ওর ইচ্ছে হলো গাড়ি থামিয়ে নেমে পড়ে। আবার বাড়ি ফিরে পরিচিত গম্ভীর, মীরার বিস্ফারিত চোখ-মুখ, ড্রেসিং টেবিল, খাট, আলনা—রজত অস্থিরভাবে চুলে আঙুল চালায়।

কয়েকদিনের মধ্যে রজত হাঁপিয়ে উঠল। এভাবে রোজ অফিসে যাওয়া আর সন্ধেবেলায় বাড়ি ফিরে মীরার মুখোমুখি বসে গল্প করা, ব্যাপারটা ক্রমশ ডিসগাস্টিং হয়ে উঠল। মনে হলো শান্তি ফিরে পেয়েছে মীরা। কথায় কথায় হাসি আর সর্বশরীরে খুশীর আমেজ ছড়িয়ে যখন তখন ঘরময় পায়চারী, কখনো আদরে গলে যাওয়া, পল্টুর ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে অজস্র কথা বলা—খুব বেশিদিন এসব তার ভাল লাগলো না। ইতিমধ্যে অফিসে ফোন আসছে, বন্ধুবান্ধবীরা খোঁজ করতে শুরু করেছে—রজত আর কত মিথ্যা বানিয়ে বলতে পারে। ওর মনে হলো এর পর সবাই ওরা অফিসে এসে হাজির হবে। এমন কি বাড়িতে পর্যন্ত। বিশেষ করে রুবি।

অথচ মধ্যবয়সে পৌঁছে সে চেয়েছিল নীরব গৃহকোণ। আর মীরার মত একটি নরম মেয়ে। বিয়ে করেছিল স্বেচ্ছায় পছন্দ করেই। হৈ চৈ তো জীবনে কম করেনি। ভালবাসার খেলাও কম হয়নি। তবে সে কী চায়! তবে কী সে নীড় গ্রহণ করতে ভয় পায়? আজ শুধু মীরা একা নয়, পল্টুও রয়েছে। আস্তে আস্তে বড় হবে। সন্তানের প্রতি নির্ধারিত কর্তব্য তো তাকে পালন করতে হবে।

ছোট্ট সংসার, মীরা আর পল্টু—এদের নিয়েই তার সুখী হওয়া উচিত। কিন্তু পারছে না। অনবরত নেশার পিছনে ছুটেছে। কীসের অতৃপ্ত তার?

দূর ছাই! রজত চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। পায়ে পায়ে এগিয়ে এল জানালার কাছে। শীতের নরম রোদ গালে অনুভব করল। বাইরে ব্যস্ততা। অসংখ্য গাড়ি আর মানুষজন ছোটাছুটি করছে। কেউ থেমে নেই। সেদিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। কাজ করতে ইচ্ছে করছে না। কিন্তু কোথায় যাবে? বাড়ি ফিরবে কী? মনে পড়ল মীরা সেজেগুজে অপেক্ষা করবে। আজ যেন কোথায় যাবার কথা। মনে পড়ছে না। তাড়াতাড়ি ফিরতে বলেছে মীরা।

কিছু না ভেবে রজত কোট গায়ে চাপিয়ে সুইংডোর ঠেলে বাইরে আসে। ওকে দেখে বেয়ারা উঠে দাঁড়িয়ে সেলাম জানাল।

—বড়বাবুকে বলো আমি একটা কাজে বেরুচ্ছি।

বেয়ারা ঘাড় কাৎ করে পুনরায় সেলাম ঠুকল। রজত আর কিছু বলা প্রয়োজন মনে করল না। লিফট দ্রুত নীচে নামছে। এ সময় গোটা শরীর শিরশির করে ওঠে। ওর মালিক মিঃ হনুমান প্রসাদ বুদ্ধিমান। তিনি কাজ চান। অযথা কোন ব্যাপারে মাথা গলান না। কাজকর্মের ব্যাপারে রজতের স্বাধীনতায় পারতপক্ষে হস্তক্ষেপ করেন না। রজত জানে সে তার কাজের দ্বারা কর্তৃপক্ষের সুনজরে আছে।

উদ্দেশ্যহীনভাবে রজত ফুটপাতে ঘেঁষে হাঁটতে থাকে। মন্থর ওর গতি। অন্যমনস্কভাবে সিগারেট ধরায়। দুপাশ দিয়ে স্রোতের মত নরনারী যাওয়া আসা করছে। কারুর মুখের দিকে তাকাচ্ছিল না। সে অন্য কিছু ভাবছিল। মীরার হাসিমুখ। পল্টু ভোরবেলা ওর চুল ধরে টানাটানি করে ঘুম ভাঙিয়ে দেয়। রেগে ধমক দিলে খলখল করে হেসে ওঠে। এইটুকু বাচ্চা, কিছু বোঝে না। হঠাৎ সে চমকে ওঠে একটা বাচ্চা ভিখিরির আনুনাসিক কণ্ঠস্বর শুনে। প্রথমে কেমন বিরক্ত হয়ে উঠে ধমক দিতে গিয়েও থেমে যায়। এমনটি দেখা যায় না। রোগা চেহারার মধ্যে চোখদুটি বড় সরল আর অসহায়তা মাখানো। সে কোটের পকেট থেকে কিছু খুচরো বের করে ওর প্রসারিত হাতের ওপর ফেলে দেয়।

সামনে অভিজাত একটা রেস্তোরাঁ দেখে ঢুকে যায় রজত। ঘরময় নরম আলো। মাঝখানে সরু প্যাসেজ। দুধারে চেয়ার টেবিল। রজত একটা চেয়ারে বসল। একবার তাকাল চারিদিকে। মনে হলো কোনো পানশালায় এসে ঢুকেছে। না, এখন ড্রিঙ্ক করবার কোন বাসনা নেই। তাছাড়া বেশ কিছুদিন ছোঁয় না। ভেবেছে একেবারে ছেড়ে দেবে। কী হবে ওসব গিলে। শুধু উত্তেজনা ছাড়া আর কী আছে ওতে!

বেয়ারা কাছে এসে দাঁড়াতেই রজত একটা কোল্ড ড্রিঙ্কের অর্ডার দেয়।

মুচকি হেসে বেয়ারা জানাল, শুধু কোল্ড ড্রিঙ্ক তো বিক্রী হয় না। লিকার নিতে হবে। কি দেব বাবু? হুইস্কী না রাম? নাকি ককটেল খাবেন?

—কিছু না। রজত উঠে দাঁড়ায়। লক্ষ্য করল বেয়ারার মুখে চাপা বিদ্রুপের হাসি। ওর সর্বশরীর রী রী করে ওঠে। নিজেকে ভীষণ অপমানিত মনে হয়। ওর মনে হলো আশেপাশের অনেক কৌতূহলী চোখ ওর দিকে তাকিয়ে। কেমন দুর্বল ও নার্ভাস হয়ে ওঠে সে।

মিহি সুরে ইংরেজী গানের রেকর্ড বাজছে। বেশ জমাট সুর। রজত পায়ে পায়ে এগিয়ে পর্দাঘেরা একটা কেবিনে ঢুকল। ওর পিছন পিছন বেয়ারা আসছে টের পেল।

—সুপেগ রাম। রজত তাচ্ছিল্যের সুরে অর্ডার দেয়। পর্দা টেনে বেয়ারা চলে যায়। রজত একটা সিগারেট ধরাল। হারামীর বাচ্চা! তাকে কী কাপুরুষ ভেবেছে! জোরে জোরে সিগারেট টানল। আস্তে আস্তে উত্তেজনা কমতে থাকে। বাস সুপেগ টেনেই বেরিয়ে পড়বে। তারপর? মনে পড়ল মীরা ওর অপেক্ষায় থাকবে। বাড়ি ফিরে তাকে আদর্শ স্বামীর ভূমিকায় অভিনয় করতে হবে।

বাইরে হৈহল্লা একটু একটু করে বাড়ছে। হাতঘড়ি দেখল : পাঁচটা বেজে দশ। একটু পরে রাত শুরু হবে। তখন প্রকাণ্ড হলঘর জুড়ে শুরু হবে মদ্যপানের দিলখোলা হাসি, কথাবার্তা, নাচ গান, কেবিনে ফিসফাস আর গোপন ষড়যন্ত্র। মদ আর মেয়েমানুষের কেনাবেচা চলবে। সারারাত।

টেবিলের উপর ঠক্ করে গ্লাস নামিয়ে বেয়ারা চলে যায়।

এক চুমুকে অনেকটা পান করে রজত। বেশি সময় এখানে থাকতে চায় না। একটু রাত বাড়লে হৈ চৈ আরও বেশি করে শুরু হবে। তবে এসব জিনিস আস্তে আস্তে খেয়ে মজা। আর একটা সিগারেট ধরাল। এখন বেশ লাগছে। আস্তে আস্তে চুমুক দেয় গ্লাসে। হঠাৎ বিনয়ের কথা মনে পড়ল। বহুদিন দেখা সাক্ষাৎ নেই। ওকে আর সহ্য করতে পারে না বিনয়। কারণ কী তা সে জানে। বিনয়টা আসলে নিছক ভাবপ্রবণ একটি বঙ্গসন্তান! সে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এটা বিনয়ের ধারণা। 'তুমি কী আমার গার্জিয়ান এলে!' মনে মনে কথাটা উচ্চারণ করল রজত। এম-এ পাশ করে, তাও বঙ্গভাষায়, শেষকালে মফস্বলে স্কুল মাস্টারী করছে। কোন উচ্চাশা নেই। নিম্নমধ্যবিত্তসুলভ সংস্কার আর অহংকারে ভুগছে। গোল্লায় যাক ছোকরা!

—আমি একটু বসতে পারি?

চমকে উঠল রজত। সস্তা প্রসাধনের হালকা গন্ধ। মেয়েটি ইতিমধ্যে তার উল্টোদিকের চেয়ারে বসেছে। একনজরে দেখে নিল সে। পঁচিশ থেকে তিরিশের মধ্যে বয়স। ফর্সা গায়ের রঙ। বেশ উদ্ধত বুক। বারবার শাড়ির আঁচল দিয়ে বুক ঢাকছে। চোখমুখের চেহারা প্রসাধনের জন্যেই বোধহয় সুশ্রী মনে হচ্ছে।

—কী চাই? রুক্ষকণ্ঠে রজত বলল, আমি এখন উঠবো।

হাসল মেয়েটি। নিঃশব্দে। শুভ্র দাঁত ঝকঝক করছে। কালো দুটি বড় বড় চোখও যেন হেসে উঠল। আস্তে আস্তে বলল, একটু বীয়ার খাওয়াবেন? বলে এবার চোখে কটাক্ষ হেনে রজতের পাশে এসে বসার চেষ্টা করল।

আঃ কী বিপদে পড়া গেল! রজত বেশ বিরক্ত। ভেবেছিল এইসব মেয়েদের আনাগোনা শুরু হবার আগেই রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে পড়তে পারবে। কিন্তু পারল না। টের পেল মেয়েটি ওর গা ঘেঁষে বসেছে। ওর গ্লাস শূন্য। অল্প অল্প নেশা হয়েছে। কঠোর হতে গিয়েও পারছে না। মিষ্টি একটা গন্ধ মেয়েটির শরীর থেকে ভেসে আসছে। গন্ধটা কীসের বুঝতে পারল না।

আবার বেয়ারাটিও এসে হাজির। পায়ের শব্দ শুনে মেয়েটি একটু সরে বসেছে। এ রকম সময় বেয়ারাদের আসতে ভুল হয় না। সব ব্যাপারটাই রজতের বেশ পরিচিত লাগছে।

—দুপেগ রাম আর এক বোতল বিয়ার।

এবার সেলাম জানাল বেয়ারা। মৃদু হেসে পর্দা ভালভাবে টেনে বেরিয়ে যায়। একটু পরে ফিরে আসে। টেবিলের উপর গ্লাস রেখে ওদের দিকে তেরা চাহনি দিয়ে অদৃশ্য হয়।

মেয়েটি নীরবে বিয়ারের গ্লাসে চুমুক দেয়। আর মাঝে মাঝে তাকায় রজতের দিকে। সে যেন প্রতি মুহূর্তে কোন কিছুর প্রত্যাশা করছিল। রজত চুপচাপ। মাঝে মাঝে গ্লাসে চুমুক দিচ্ছিল। টের পাচ্ছিল পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসা নরম নারীদেহের উত্তপ্ত স্পর্শ। মেয়েটাকে একটু চেখে দেখবে কিনা ভাবল রজত।

—কোথায় যাবেন? গঙ্গার ধারে?

—কেন?

রজত সব বুঝতে পারছিল। মেয়েটির মুখ দেখে মনে হলো ও ভীষণ হতাশ হয়ে উঠেছে। ভেবেছিল রজতই প্রথম বাইরে যাবার কথা তুলবে। মনে মনে হাসল রজত। ওর সম্পর্কে মেয়েটি কী ভাবছে আন্দাজ করতে পারল।

—তোমার নাম কী?

—রাধা। বলে মেয়েটি শুভ্র দাঁত বের করে হাসল। হয়তো ওর মনে আশার সঞ্চার হয়েছে। কোন কিছুর প্রাপ্তি আশা না করে কাজ কেউ মদ খাওয়ায়! বিশেষ করে ওদের মত মেয়েদের।

কথা বলতে রজতের ভাল লাগছিল না। রাধার সঙ্গে কী ধরনের আলাপ করতে পারে। একটাও সত্য কথা বলবে না। তারচেয়ে চুপচাপ পাশে বসে মদ্যপান করা

CENTRAL LIBRARY

তেম ভাব। কিন্তু রাতটা কেমন ভার ভার ঠেকছে। একটু বিশুদ্ধ বাতাসের দরকার। মন কি গঙ্গার ধারে রাধাকে সঙ্গে করে বেড়ালো। খানিকটা ঘুরে বিদায় দেবে মেয়েটিকে।

বাইরে মদির রাত্রি। ট্যাক্সীর ভিতর স্বল্প আলো। ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপটায় রজত স্বস্তি পায়। ওর কাঁধে মাথা রেখে রাধা চোখ বুজে। হাঁ, সেই মিষ্টি গন্ধটা ভাসছে চুলের। সে রাধার ব্লাউজের ভিতর হাত ঢুকিয়ে নরম স্তন মুঠোয় চেপে ধরল।

গঙ্গার ধারে এসে ট্যাক্সী থামল। রজত মৃদু ঠেলা দিয়ে রাধাকে বলল, ঘুমিয়ে পড়েছিলে বুঝি? নামো।

খানিকটা হাঁটল রজত। পাশে রাধা। বার বার হাই তুলছে। আর অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে রজতের দিকে।

—ঘুম পেয়েছে ?

—না। আর কত হাঁটবেন। চলুন ঐ দিকটায় বসা যায়।

হাঁ, জায়গাটি নিভৃত আলাপের পক্ষে মনোরম বটে। গাছের নীচে পাথরের একটা বেদি। এদিকটা আবছায়া অন্ধকার। সামনে বিশাল গঙ্গা।

পাশাপাশি ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে দুজনে। রজত গরম তেলেভাজা কিনে এনেছে। রাধা একটু ইতস্তত করে খেতে শুরু করে। রজত সামনের দিকে তাকিয়ে ঢেউ দ্যাখে। ছোট ছোট শব্দে জাহাজ পার হচ্ছে। ওপারে শহরের আলো মালার মত মনে হচ্ছে। হঠাৎ সে পাশে বসা রাধার উপস্থিতি টের পায়। কী চায় মেয়েটা? গোটা দশেক টাকা দিয়ে বিদায় করে দেব। নাকি ওর দেহটাকে একটু [illegible] দেখবে। মন্দ হয় না আজ রাতটা ওর সঙ্গে শুয়ে থাকতে। কিন্তু মীরা, পল্টু......। আজ ওর তাড়াতাড়ি ফিরবার কথা ছিল। মীরা সেজেগুজে নিশ্চয়ই অপেক্ষা করছে। কোথায় যেন যাবার কথা ছিল। কোথায়? মনে পড়ছে না। গোল্লায় যাক সব। রজত অস্ফুটে চিৎকার করে উঠল।

—রাধা।

—কী ?

—চল অন্য কোথাও যাই। এখানে ভাল লাগছে না।

—কোথায় ?

—তুমি যেখানে থাকো।

সঙ্গে সঙ্গে রাধা উঠে দাঁড়াল। অনুচ্চস্বরে তীক্ষ্ণ গলায় বলল, আমার টাকা দিন। আমি এখনি চলে যাব।

—তার মানে......। রজত দাঁড়িয়ে রাধার হাত শক্ত মুঠোয় চেপে কঠিন গলায় বলল, টাকা সস্তা। চল আমার সঙ্গে।

রাধা কয়েকবার চেষ্টা করে হাত ছাড়িয়ে নিতে। পারে না। রজত কাঁপছিল খুব তাই। হঠাৎ রাস্তা বিদ্যুৎগতিতে গাড়ি হাঁকিয়ে আলোয় যেন ছড়িয়ে চলে যাচ্ছে। সেই সাময়িক আলোতে রাধার মুখচোখ লক্ষ্য করল রজত। তাতে ভয়ের কোন চিহ্ন নেই।

—হাত ছাড়ুন। মজা লুটবেন—টাকা দেবেন না।

কোথায় আর স্ফূর্তি করলাম। সেই জন্যেই তো বলছি চল একটু স্ফূর্তি করা যাক। তবে সেই তোমার প্রাপ্য টাকা পাবে।

—না। দেরী হয়ে গেছে বাড়ি ফিরতে হবে।

—এত তাড়াতাড়ি। ব্যঙ্গের হাসিতে রজত বলল, আমাকে বুঝি নতুন লোক ঠাওরেছো। তোমার মত মেয়েদেরকে আমি চিনি। দ্যাখ, ঝামেলা করো না। যা বলছি শোন, চল একটা হোটেলে। আজ রাতে তোমাকে নিয়ে শুতে বড্ড ইচ্ছে করছে।

—কত টাকা দেবেন ?

—কত চাও ?

—পঞ্চাশ।

—বল কী! সুযোগ পেয়ে খুব দর হাঁকাচ্ছ বুঝি। নিজেকে কী খুব সুন্দরী ভাব ?

রাধা রেগে যায়, আঃ হাত ছাড়ুন! এখুনি লোকজন জড়ো হয়ে যাবে। নইলে আমাকে যেতে দিন। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরা দরকার। দুপুরে বেরোবার সময় দেখে এসেছি বাবার জ্বর।

হো হো করে হেসে উঠল রজত। এবার সে হাত ছেড়ে দেয় রাধার।

—হাসছেন কেন? রাধা বিস্মিত গলায় বলল, জানি বিশ্বাস করবেন না।

রজত বলল, থাক ওসব কথা। হাঁ, টাকা পাবে। যা চেয়েছো তাই।

আবার ওরা ট্যাক্সীতে উঠল। রজত গম্ভীর মুখে বাইরের দিকে তাকিয়ে। নিয়নের বিজ্ঞাপন। চোখঝলসানো লাল সিগনাল দেখে গাড়ি থেমেছে। অসংখ্য গাড়ি পর পর দাঁড়িয়ে। রজত বাঁ দিকে তাকিয়ে রাধাকে দেখল। চোখ বুজে রয়েছে। আঁকা ভ্রু। রক্তিম ঠোঁট।......মজা করবেন টাকা দেবেন না......বাবার জ্বর। দেখে এসেছি......মীরা সেজেগুজে দাঁড়িয়ে......।

একটা মৃদু ঝাঁকুনি দিয়ে পুনরায় গাড়ি চলতে শুরু করল।

বিচিত্র ধরনের শব্দ। অসংখ্য নর-নারী, হকার, ভিখিরি, দালাল, চোর, পকেটমার, বেশ্যা পাশাপাশি হেঁটে চলেছে। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে রজতের চোখ জ্বালা করে উঠল। বড্ড ঘুম পেয়েছে। কোথায় যাচ্ছে কে?

—সর্দারজী বাঁয়া রোখকে।

মৃদু শব্দ করে ফুটপাত ঘেঁষে গাড়ি থামে। রাধা প্রথমে নেমে দাঁড়ায়। তাকায় রজতের দিকে। কী ব্যাপার? নামছে না কেন। ওর সন্দেহ হয়। লোকটা কী পালিয়ে যাবে টাকা না দিয়ে?

অন্যদিকের দরজা বন্ধ করে দেয় রজত। তারপর কয়েকটা দশ টাকার নোট রাধার দিকে ছুঁড়ে দরাজ গলায় ড্রাইভারকে গাড়ি ছাড়তে নির্দেশ দেয়।

পিছন ফিরে রজত দেখল রাধা পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে। একটু পরে নীচু হলো ওর দেহ। হয়তো ফুটপাত থেকে নোট কুড়িয়ে নিচ্ছে।

—কিধার যানা বাবুজী?

—জাহান্নামে!

সর্দারজী দু'একবার ফিরে তাকাল। অবাক হলো না। এসব বাবুদের সে ভাল করে চেনে। তাই সে নীরবে গাড়ি চালায়।

রজত ঘুমঘোরে বাড়ি পৌঁছে যায়। ভাড়া মিটিয়ে অগ্রসর হয়। এমন কিছু রাত হয়নি। সত্যি কী মেয়েটির বাবা অসুস্থ? সিঁড়ি ভাঙতে ক্লান্ত লাগছে। মীরাকে সে কোন কৈফিয়ৎ দেবে?

কড়া নাড়ার শব্দে রজত নিজেই চমকে ওঠে। একটু পরে দরোজা খুলে যায়। রজত ভিতরে ঢোকে। মুখোমুখি হয় মীরার। চোখাচোখি হওয়ার ভয়ে ও মাথা নীচু করে পালিয়ে আসে পাশের ঘরে। এ ঘরে সে ঘুমোয়। বেশ কিছুদিন হলো তাদের পৃথক শয্যার বন্দোবস্ত হয়েছে। পল্টু হওয়ার পর থেকেই বোধ করি।

পোশাক বদলাবার সময় রজত প্রতি মুহূর্তে আশা করছিল ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকে মীরা একরাশ প্রশ্ন ওর দিকে ছুঁড়ে মারবে। কিন্তু না, কোন সাড়া শব্দ নেই। বরং পাশের ঘর অন্ধকার। রজত বাথরুমে ঢোকে। চোখে জলের ঝাপটা দেয়। ঘর সংলগ্ন বাথরুম। বাথরুমের আলো নিভিয়ে দরজা বন্ধ করে। হালকা পোশাক পরে সোজা বিছানায় দেহ এলিয়ে দেয়। অবসাদ আর ক্লান্তি। চুপচাপ শুয়ে থাকে কিছুক্ষণ। সবুজ আলোর ডিসটেম্পার করা দেওয়াল, আধুনিক চিত্রকরের আঁকা ছবি ওদের প্রথম বিবাহবার্ষিকী উপলক্ষে তোলা যৌথ ছবি, অলস দৃষ্টিতে এসব দেখতে থাকে সে। তাহলে খুব রেগেছে মীরা। নাকি অভিমান। থাকগে আর সে কিছু ভাবছে না। মেয়েটার কী যেন নাম হাঁ রাধা, এতক্ষণে নিশ্চয়ই ওষুধ কিনে বাড়ি পৌঁছে গেছে। বাবার জন্য। সত্যিও হতে পারে। দূর! সব বাজে ব্যাপার। সব ছলনা। ঐ সব মেয়েদের কথা একদম বিশ্বাস করতে নেই। না, কোন গ্লানি নেই। যথেষ্ট নারীসঙ্গ ভোগ করেছে। রাধার চেয়ে ঢের সুন্দরী মেয়ে, চোখ বুজলে কয়েকজনের মুখ মনে পড়ে, তারা সব কোথায় গেল!

বেশ বেলায় ঘুম ভাঙল রজতের। দুই ঘরের মাঝখানের দরজা খোলা। কোন সাড়া শব্দ নেই। অন্যদিন পল্টু এসে আধ আধ সুরে মাথার চুল টেনে ঘুম ভাঙিয়ে দেয়। ওরা সব গেল কোথায়?

রজত একটু জোরে ডাক দিল, পল্টু, পল্টু।

ওর চিৎকারের ধ্বনি প্রতিধ্বনি দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে ওর দিকেই ফিরে আসে। একটু অপেক্ষা করে আবার সে ডাকল। এবার মীরার নাম ধরে। কোন সাড়া নেই। এক লাফে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রজত।

(ক্রমশঃ)

পরলোকে প্রখ্যাত গায়ক কালীপদ পাঠক

বাংলা এবং উত্তর ভারতের টপ্পা গানের অনন্য সাধক, কালীপদ পাঠক একাশি বছর বয়সে পরলোকগমন করেছেন। তাঁর মৃত্যুতে টপ্পা গানের শেষ উজ্জ্বল শিখাটি অন্তর্হিত হল।

হাওড়া জেলার বাটিরার মদন রায় লেনে তাঁদের অনেককালের বাস। হাওড়া জেলায় তাঁর জন্মস্থান। তাঁর শরীর ছিল বেশ মজবুত, শরীর খারাপ হওয়া প্রায় একরূপ বারণ ছিল। যৌবনে তিনি কুস্তি লড়তেন, লাঠি খেলতেন। সারাজীবন তিনি মা-কালীর পূজো করে গেছেন। মেদিনীপুরে বিদ্যাসাগর জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠানে একবার তিনি রবীন্দ্রনাথকে টপ্পা গান শুনিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গান শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন। তাঁর কৃতী ছাত্রদের মধ্যে চণ্ডীদাস মাল, মায়া রায়, রাজেশ্বর মিত্র, ভূপাল চট্টোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য।

কালীপদ পাঠকের সঙ্গীত শিক্ষা শুরু হয় একটু বেশী বয়সেই—প্রায় সতের-আঠার বছর বয়সে। বাড়ীতে গানবাজনার কোনো পরিবেশ ছিলো না। একদিন পাঠশালার ক্লাসে একা বসে বসে যাত্রার একটা গান আপন মনে গেয়ে চলেছেন। এদিকে গুরুমশাই জিজ্ঞাসা করলেন, কি গান? উত্তর এল, যাত্রার গান। উত্তর শুনে গুরুমশাই রেগে আগুন—পিঠে বেশ কয়েক ঘা বেত বসিয়ে দিলেন। কাঁদতে কাঁদতে বাড়ী ফিরে এলেন। দাদামশাই সেদিন থেকেই গান শেখার ব্যবস্থা করে দিলেন।

কালীপদবাবু প্রথমে গান শেখা শুরু করেন গোবিন্দচন্দ্র নাগের কাছে। পরে বিষ্ণুপুরের প্রখ্যাত গায়ক রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এঁদের দুজনের কাছেই তিনি ধ্রুপদ শিখতে থাকেন কিন্তু তাতেও মনের আশা মিটলো না। অবশেষে হাজির হলেন বিখ্যাত টপ্পা গায়ক রামজান খাঁ-র কাছে। সহজাত প্রতিভাবলে বালক কালীপদ অল্প কিছুদিনের মধ্যেই রামজান খাঁর কেবলমাত্র প্রিয় শিষ্যই হয়ে উঠলেন না, হয়ে উঠলেন পরম আপনজন।

একথা স্বীকৃত যে, নিধুবাবুর টপ্পা এবং বড় মিঞার টপ্পায় সারা ভারতেই ছিল তাঁর অনন্য খ্যাতি। শিবপুরের নিকুঞ্জবিহারী দত্তের (নিকুঞ্জবাবুর) কাছ থেকে তিনি নিধুবাবুর টপ্পার তালিম নিয়েছিলেন। আকাশবাণীর নিয়মিত শিল্পী ছিলেন কালীপদবাবু। ১৯৬৬ খৃঃ 'সদারঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলন'এ টপ্পা গান করেন। সঙ্গীত সম্মেলনে এই তাঁর প্রথম সঙ্গীত পরিবেশন। যে-গান গেয়েছিলেন, তা হচ্ছে, 'কে তোমারে শিখায়েছে প্রেম ছলনা' ও 'তোমারেই তুলনা তুমি এ মহা-মহামণ্ডলে'। এর পরে বিভিন্ন আসরে তাঁর গান শোনার সুযোগ বাংলার শ্রোতাদের হয়েছে। বঙ্গ সংস্কৃতি অনুষ্ঠানে তিনি নিয়মিত শিল্পী ছিলেন।

এইচ এম ভি থেকে 'ভালো-বাসি বলে ভালোবাসিনে' এবং 'মনোহরা নয়ন তোমার' এই দুটি গানের রেকর্ড বাজারে বছরখানেক আগে বেরিয়েছে। এছাড়া তাঁর আর কোনো রেকর্ড নেই।

কালীপদ পাঠকের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বাংলার সঙ্গীত-ধারার একটি যুগের অবসান হোলো।

জলসা

সঙ্গীতাচার্য ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের জন্মোৎসব: গত ৮ নভেম্বর অবিভক্ত বাংলার যশস্বী কণ্ঠশিল্পী শ্রীভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের ৬১তম জন্মোৎসব উপলক্ষে এক সুচিসুন্দর সঙ্গীতোৎসবের আয়োজন করেছিলেন তাঁর শিষ্য ও অনুরাগীবৃন্দ। বিশিষ্ট শিল্পী শ্রীরাধিকামোহন মৈত্র এবং শ্রীকানাইচাঁদ যথাক্রমে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন।

প্রভাতী আসর সুরু হয় সমবেত কণ্ঠে গীত, বেদগান ও কাজী নজরুল ইসলামের 'সাজিয়াছ যোগী বল কার লাগি' গানটি দিয়ে। তারপরই পৌরসভার স্থানীয় প্রতিনিধি শ্রীকৃষ্ণ কুণ্ডু এক সংক্ষিপ্ত সুন্দর ভাষণে শিল্পীর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও সংস্থার পক্ষ হতে ভীষ্মদেবকে মাল্যদানের পরই সুরু হয় মনোজ্ঞ সঙ্গীত আসর। সকালের অনুষ্ঠানে যোগদানকারী শিল্পীরা হলেন সর্বশ্রী ডি জি যোগ, জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, তৃপ্তি চক্রবর্তী। তবলাসঙ্গতে ছিলেন কানাই ভট্টাচার্য, তুষারকান্তি মজুমদার ও গণপতি মজুমদার। সান্ধ্য আসরের শিল্পীরা হলেন সর্বশ্রী বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, মাণিক্য কানন, অনীতা মজুমদার। সারেঙ্গী ও তবলা সঙ্গতে ছিলেন যথাক্রমে মহেশপ্রসাদ মিশ্র, কেদারনাথ মিশ্র, চন্দ্রভান ও দুলাল চক্রবর্তী। আর একটি উল্লেখযোগ্য সংবাদ হোল এই যে সমবেত শ্রোতাদের অনুরোধে দুটি অধিবেশনেই ভীষ্মদেব তাঁর অননুকরণীয় আঙ্গিকে অন্তর্মুখীনভাবধর্মী সঙ্গীতের দ্বারা উৎসব সার্থক করে তোলেন।

এই উৎসবের জন্য ধন্যবাদার্হ হলেন সর্বশ্রী বিমান ঘোষ, কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কুমার মুখোপাধ্যায়, কল্যাণ চক্রবর্তী, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, মণিকা মিত্র, নীলমণি চক্রবর্তী ও স্থানীয় যুবক সংস্থা।

সৌরভের মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান: ২ অকটোবর মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিন উপলক্ষে কলামন্দিরে মঞ্চস্থ এক চিত্তাকর্ষী অনুষ্ঠান সঙ্গীত প্রতিষ্ঠান 'সৌরভ'-এর সুনাম অক্ষুন্ন রেখেছে। অনুষ্ঠান সুরু হয় সমবেত কণ্ঠে বেশ কয়েকটি ভজন গান দিয়ে। শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ এবং ললিতা ঘোষ পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের ৭০ জন ছাত্রী গীত এই ব্যাপক ভজনের অনুষ্ঠানে প্রীত হয়ে শ্রীআর কে ভৌমিক শ্রীমতী ঘোষের হাতে ২৫১ টাকার একটি তোড়া উপহার দেন। এরপর শ্রীমতী নমিতা চট্টোপাধ্যায় প্রযোজিত এবং পরিচালিত 'মীরাবাঈ' নৃত্যনাট্যে ৮০ জন ছাত্রী অংশ গ্রহণ করেন। এতগুলি ছাত্রীকে একাধারে নৃত্য শিক্ষাদান ও চরিত্র রূপায়ণে ব্রতী করা সহজ নয়। কিন্তু এই কঠিন কাজ কঠিন পরিশ্রমই সম্পন্ন করে কলারসিক মহলের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেছেন শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায়। দলগত সাফল্য ছাড়াও বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখেন নামভূমিকায় পূর্ণিমা চট্টোপাধ্যায় ও মাধুরী কেশ-বেকার।

প্রধান অতিথি ডাঃ রমা চৌধুরী এবং সভাপতি প্রেমেন্দ্র মিত্র সৌরভের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলির মার্জিত রুচি ও প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন তাঁদের কাব্যসুন্দর ভাষায়। প্রতিষ্ঠান কর্তা জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ অতিথিদের স্বাগত সম্ভাষণ জানান এবং অনুষ্ঠান বিরতিকালে সহ-সভাপতি শ্রীঅমিয়া মুখোপাধ্যায় নাক

ঠিক সিদ্ধান্ত ব্যাপারটি সুচারুরূপে সম্পন্ন করেন। অনুষ্ঠান পুস্তিকা বিক্রয়ের ৩৫০ টাকা বন্যাত্রাণ তহবিলে দান করা হয়।

ত্রিবেণী-র রাত্রি : রবীন্দ্র সদনে সম্প্রতি রাবীন্দ্রিক অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে 'ত্রিবেণীর রাত্রি' এক ভাবসমৃদ্ধ সঙ্গীতোৎসব। কবিগুরুর নিজস্ব নৃত্যনাট্য ছাড়াও তাঁর সঙ্গীত অবলম্বনে নানা রূপের ভাবাভিব্যক্তির পরীক্ষা-নিরীক্ষা গত দু-এক বছর ধরে চলছে। ত্রিবেণীরই প্রযোজিত সুরের আকাশ 'দিনান্তের গান' 'মেঘের পরে মেঘ' এই ধরনের প্রচেষ্টা রসিকজনের আনন্দের কারণ হয়েছে। এই তালিকায় নতুন সংযোজনা 'রাত্রি।' সুমিত্রা সেনের পরিচালনায়— রবীন্দ্রসঙ্গীতের জনপ্রিয় শিল্পীদের কণ্ঠে সুনির্বাচিত গানে রাত্রির এক নিবিড় গভীর রূপ কখনও রহস্যে, রোমান্সে, কখনও বেদনায়, কখনও বিরহে, কখনও বা মিলনের আর্তিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। রাত্রির বিভিন্ন রূপ-কল্পনার ভিত্তিতে সঙ্গীত নির্বাচনের কৃতিত্ব ভাস্কর বসুর। মঞ্চ সজ্জা, সংগঠন ও সংস্থাপনার জন্য ধন্যবাদার্হ শুচিব্রত দেব, সুধীর পাল, অনিল সেন, প্রদ্যুৎ সেন ও প্রভাত চন্দ্র। যোগদানকারী শিল্পীরা হলেন দেবব্রত বিশ্বাস। সুচিত্রা মিত্র, চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমিত্রা সেন, দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়াও আরো ৬০ জন কলাকার। যন্ত্রসঙ্গীতে ছিলেন সলিল মিত্র, বিশ্বজিৎ মণ্ডল, নির্মল বিশ্বাস, শেখর চট্টোপাধ্যায় ও রবীন গঙ্গুলী।

বিটোফেনের জন্ম শতবর্ষ: বিশ্বের সঙ্গীত জগতে লুডভিগ ভন বিটোফেনের নাম কোন স্থানে তা সঙ্গীতরসিকদের তো অজানা নয়ই, সাধারণ লোকেরাও না। এই মহান মনীষীর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে পূর্ব জার্মানী সারা বার্লিন শহরের বিভিন্ন স্থানে বিটোফেন সঙ্গীতের এক ব্যাপক প্রযোজনার আয়োজন করেছেন। আগামী ১০ থেকে ১৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত জার্মান স্টেট অপেরা ও কমিক অপেরা বর্তমান জার্মানীর খ্যাতনামা সঙ্গীতজ্ঞের সহযোগিতায় এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন। যাঁরা অংশ নিচ্ছেন তাঁদের মধ্যে আয়রস ওত্মার সুইটনার, কুর্ট মাসুর, পিটার শ্রিয়ার, কুর্ট স্যান্ডারলিং, লাইপজিগের একটি অর্কেস্ট্রা দল, বার্লিন সিম্ফনি অর্কেস্ট্রা, ড্রেসডেন স্টেট অর্কেস্ট্রা, লেনিনগ্রাদ ফিলহারমোনিক অর্কেস্ট্রা, বার্লিন রেডিও সিম্ফনি অর্কেস্ট্রা।

বিটোফেনের জন্ম-শতবার্ষিকী উৎসবের অন্যতম অঙ্গ হিসাবে জার্মানী থেকে বিখ্যাত কয়েকটি দল এ মাসেই কলকাতায় আসছে। নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে পূর্ব জার্মানী দূতাবাসের সহযোগিতায় এক বিটোফেনের সঙ্গীত আসর বসবে কলকাতায়।

সম্বর্ধনা-সভায় ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়

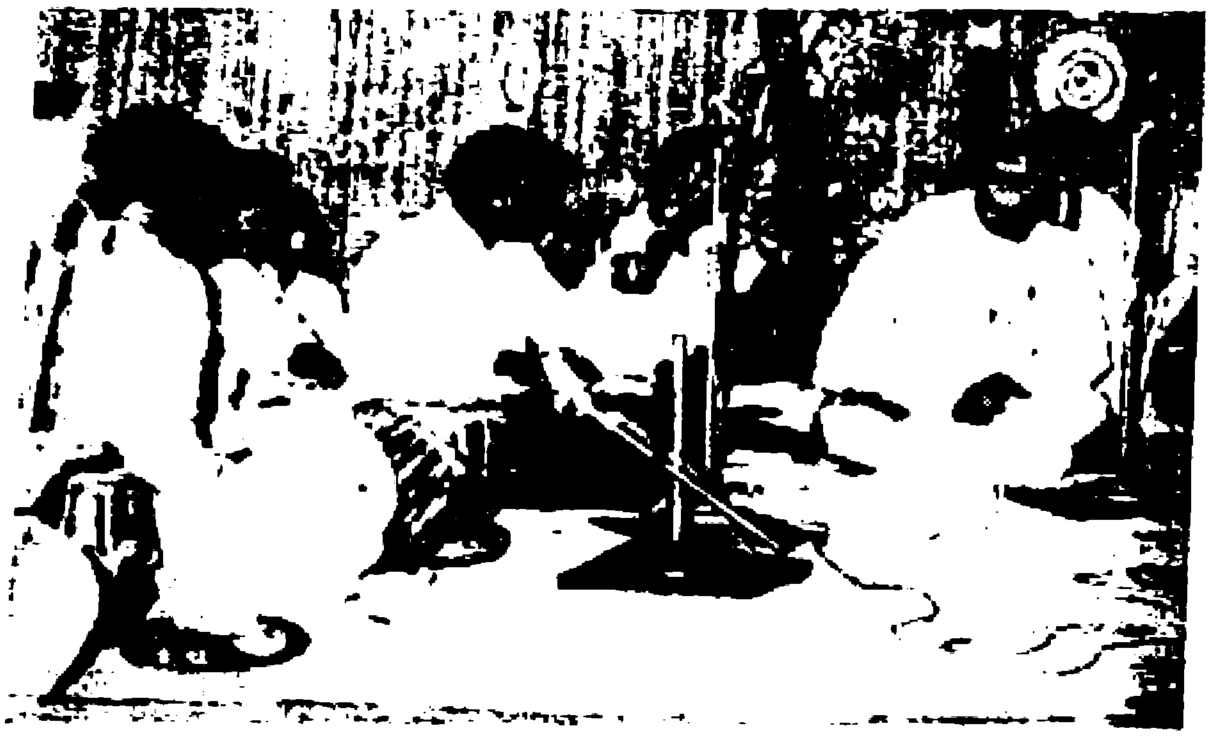

অষ্টবিংশ নিখিল ভারত মুরারি স্মৃতি সঙ্গীত প্রতিযোগিতা : উক্ত সঙ্গীত প্রতিযোগিতা আগামী ২৪ ডিসেম্বর থেকে আরম্ভ হবে। যোগদানের শেষ তারিখ ১০ ডিসেম্বর, ১৯৭০। বিষয়ঃ ১। কণ্ঠ-সঙ্গীত—ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুংরি, ভজন গীত, রাগ-প্রধান, আধুনিক, রবীন্দ্রসঙ্গীত শ্যামাসঙ্গীত, অতুলপ্রসাদ, নজরুল গীতি, পল্লীগীতি, কীর্তন। ২। যন্ত্রসঙ্গীত—সেতার, এস্রাজ, সরোদ, বেহালা গীটার তবলা, পাখোয়াজ। ৩। নৃত্য—কথাকলি, ভারতনাট্যম, কত্থক, মণিপুরী, মডার্ণ ফোক, রাবীন্দ্রিক। নিম্নলিখিত স্থানে প্রবেশপত্র পাওয়া যাবে ও পাঠাতে হবে। ১। কার্যালয়—৯সি, দ্বারকানাথ ঘোষ লেন, কলিঃ—২৭। ২। এস চন্দ্র অ্যান্ড কোং, ৪নং ওয়েলেসলী স্ট্রীট, কলিঃ—১০। ৩। রাধাকৃষ্ণ শর্মা অ্যান্ড কোং, ৫৮নং বিবেকানন্দ রোড কলিঃ—৬।

ভারতী রেকর্ড কোম্পানীর শারদ অর্ঘ্য: শারদোৎসবে ভারতী রেকর্ড কোম্পানীর পক্ষ থেকে প্রকাশিত আধুনিক গান ছাড়াও কয়েকটি রবীন্দ্রসঙ্গীত রসিক-চিত্তে চির আনন্দের উৎস হয়ে থাকবে। প্রথমেই মনে আসে সমর গুপ্তের গম্ভীর মধুর কণ্ঠের দুটি গান 'এবার সখী সোনার মৃগ' এবং 'মম দুঃখ মুকুলদলে এসো'—একটিতে প্রেম-কৌতুক, অন্যটিতে তিমির-তলে গৌরবময়ের আহ্বান কাতরতা শক্তির ঐশ্বর্যে এবং বিনতির মাধুর্যে উৎসারিত। সমর গুপ্তেরই পরিচালনায় সুদীপ্ত সেনের কণ্ঠে দুটি ভক্তিভাবের গান 'নিবিড়-ঘন আঁধারে' এবং 'মোরে ডাকি লয়ে যাও' গান দুটি মন দিয়ে শোনবার মতই। এছাড়া সুজিত দাসের 'অধরা মাধুরী' ও 'জীবন যখন ছিল'—দুটি সুন্দর চয়ন। আধুনিক গান হিমাংশু বিশ্বাসের সুর ও সঙ্গীত পরিচালনায় রেকর্ড করেছেন পুষ্পিতা চট্টোপাধ্যায়, জয়ন্তী সেন, প্রভাতভূষণ, কিরূপদ রায়, গুল মহম্মদ। কথার ভাবের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সুর রচনার কারিগরী তারিফ করবার মত। সবগুলি গানই সুন্দর, তবে বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে পুষ্পিতা চট্টোপাধ্যায় ও জয়ন্তী সেন।

অলোকনাথ দের ও নিজস্ব সুরে দুটি গান গেয়েছেন মানসকুমার—'আজকে এমন মিষ্টি রাতে' ও 'কাল রাতে'। মানস কুমারের সুরে শিপ্রা দে গেয়েছেন 'প্রজাপতি, প্রজাপতি মন আমার' ও 'ঠিন ঠিন, ঠিন ঠিন জলচুড়ি কার।' সুকুমার মিত্রের সুরে বিজন শেঠ-এর দুটি গান 'তুমি এসেছিলে সেকি' ও 'চোখে যার নেই বরষা', মানস-কুমারের সুরে পাপিয়া দের 'তোমার স্মৃতিটি' ও 'আজকে শুধু বৃষ্টি ঝরে' ছায়া মুখোপাধ্যায়ের 'সাগর সাগর ডাগর চোখে' ও 'পথে যেতে দেখা হলো', 'বকুল বকুল ফুলবনে' ও 'কিছু কথা কানে কানে' প্রত্যেকটি গানই শুনতে ভালো লাগে।

তরুণ সুরকার গৌরাচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের সুরে গেয়েছেন কমল চক্রবর্তী ও বিদ্যুৎ দত্ত। গানগুলি হোলো 'পলাশের রং দেখে', 'বড় দেরী করে এলে', 'ফাগুন রজনী তুমি', 'দূর থেকে দেখে।' প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ও শঙ্কর বসুর সুরে সলিল-চয়নের দ্বৈত-সঙ্গীত ও সজনী রায়ের 'নয়ন নয়ন রেখে' ও 'ছায়া ছায়া পথ যেতে—গানগুলিও সুগীত। এ সিরিজের রেকর্ড সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য সংবাদ হোল এই যে প্রতিষ্ঠিত সুরকারদের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিভাবান তরুণ সুরকার প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌরাচাঁদ মুখোপাধ্যায়, শঙ্কর বসুকে তাঁদের যোগ্যতা প্রদর্শনের বিস্তৃত অবকাশ দেওয়া এবং এঁরা তার যথোচিত মর্যাদাও রেখেছেন।

গীতিকারবৃন্দের মধ্যে আছেন—পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, লক্ষ্মীকান্ত রায়, সন্ধ্যা দে, অমিতাভ নাহা, জিতেন্দ্র বিশ্বাস, অশোক বসু, মণীন্দ্র ঘোষ। মজার রহস্য—'আমি যদি মন্ত্রী হই' ও 'কেলেঙ্কারীর আসর' কৌতুক নকশা এবং ইলেকট্রিক গীটারে মানস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাজানো দুটি হিন্দী গানের সুর বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছে।

CENTRAL LIBRARY

সঙ্গীত প্রতিযোগিতা : সারা বাংলার অপেশাদার সঙ্গীতশিল্পীদের জন্য সোদপুর শিল্পী সংস্থা সারা বাংলা অপেশাদার সঙ্গীতশিল্পীদের জন্যে সঙ্গীতের বিবিধ ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছেন। নাম তালিকাভুক্ত করার শেষ তারিখ ১৫ ডিসেম্বর। যোগাযোগের ঠিকানা : শ্রীতপন চৌধুরী, 'মৌচাক', স্টেশন রোড, সোদপুর রেল স্টেশনের পূর্বদিক।

সঙ্গীত সংসদের প্রথম অনুষ্ঠান :— সঙ্গীত সমাজের সুপরিচিত সংগঠক শ্রীজগদীশ চট্টোপাধ্যায়ের নতুন অবদান সঙ্গীত-সমাজের প্রথম সঙ্গীতোৎসব নিবেদিত হয় বালিগঞ্জ শিক্ষাসদন হলে। উদ্বোধনে সংস্থার উদ্দেশ্য আলোচনা প্রসঙ্গে জগদীশ চট্টোপাধ্যায় জানান বিরাট ঐতিহ্য-সম্পন্ন ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ধারাকে প্রবাহিত রাখাই তাঁদের লক্ষ্য এবং এই উদ্দেশ্যে বর্তমানকালের সঙ্গীতনায়কদের সঙ্গে সমান্তরাল ধারায় প্রতিভাবান তরুণ শিল্পীদের সঙ্গীতাসরে উপস্থিত করা এবং সাংবাদিক মহলের সহযোগিতায় তাঁদের দেশবাসীর সঙ্গে পরিচিত করার সংকল্পে এঁরা ব্রতী। অন্যান্য দেশের শিল্পীদের আসরে নিমন্ত্রণ এবং বাংলাদেশের শিল্পীদের অন্যান্য দেশে প্রেরণ। মাঝে মাঝে নৃত্য ও সঙ্গীতানুষ্ঠানের মাধ্যমে 'শো-ম্যান-সিপের' আর্ট রপ্ত করা। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের সঙ্গীতধারার প্রতি পরস্পরকে শ্রদ্ধান্বিত করা। ভারতীয় সঙ্গীত ও নৃত্যের ওপর তথ্যচিত্র নির্মাণ ও প্রদর্শন এবং সঙ্গীত-বিষয়ক গ্রন্থাগার স্থাপনার্থে অর্থ সংগ্রহের কাজে এঁরা আগ্রহী।

প্রধান অতিথি জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ অধুনাকালে বিদেশে ভারতীয় সঙ্গীতের সমাদরের উল্লেখ করে আনন্দ প্রকাশ করেন।

সভাপতি কাওয়াসজী মেহ্‌তা সংস্থার এই উদ্দেশ্যকে অভিনন্দন জানান।

রাজা ধীরেন্দ্রনারায়ণ রাও সঙ্গীতসেবার এই আদর্শকে সাধুবাদ জ্ঞাপন করেন।

তরুণ শিল্পীদের উৎসাহদানার্থে প্রথম থেকে শেষ অবধি গানের আসরের সুবিখ্যাত শ্রোতা পাহাড়ী সান্যাল উপস্থিত ছিলেন এবং এটা যে নেহাৎ নিমন্ত্রণ রক্ষার উপস্থিতি নয় সে কথা বোঝা গেল শেষ অনুষ্ঠান অবধি তাঁর উচ্ছ্বসিত আনন্দে শিল্পীর তারিফ করণ দেখে।

তরুণ শিল্পীগোষ্ঠির এই আসরে আশান্বিত হবার মত অনুষ্ঠানই পেশ করা হয়েছে এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে সংস্থাসম্পাদকের উদ্যম নিশ্চয় সার্থক।

প্রথমে দ্বৈত তবলালহরা বাজিয়ে শোনান মানিক পালের সুযোগ্য শিষ্যদ্বয় অসিত পাল ও দীপক চট্টোপাধ্যায়। গৎ, কায়দা, টুকরা, রেলায়—উভয়েরই সুশিক্ষা ও দক্ষতার পরিচয় ছিলো।

ভীমসেন যোশীর শিষ্য বিশ্বনাথ দাস পূরিয়া-কল্যাণ রাগে কণ্ঠসঙ্গীত পরিবেশন করেন। শিল্পীর কণ্ঠ সুন্দর। গুরুর গায়কীর প্রতি আনুগত্যও তাঁর পরিবেশনা পদ্ধতিতে সুপরিলক্ষিত। তানের অঙ্গ মাঝে মাঝে চমকপ্রদ কিন্তু শিল্পীর লক্ষ্য যতটা উঁচুতে—ঠিক সেখানে পৌঁছবার মত ক্ষমতা এখনও অর্জন করেননি। তাই মাঝে মাঝে ধারণার সঙ্গে পরিবেশনার অসামঞ্জস্য দেখা গেছে। এঁর সঙ্গে তবলা সহযোগিতায় ছিলেন বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সেতারে পণ্ডিত রবিশঙ্করের শিষ্য দীপক চৌধুরীর একটি টোকাই জানিয়ে দিল কতবড় ঘরানার উত্তরসাধক এই উদীয়মান শিল্পী। ইনি বাজান 'বেহাগ'। —আলাপ, জোড়, ঝালায় সুশৃংখল ক্রমবিস্তারে চিন্তার ছাপ ছিলো। গতের সঙ্গেও তান-লয়-ছন্দ-সৌন্দর্য প্রশংসনীয় দক্ষতা প্রদর্শিত। —তবে আড়াচৌতালে বাজানো দ্রুত গৎ দীর্ঘ বিলম্বিতের কারণে অনেক অনাবশ্যক পুনরাবৃত্তি এসে গেছে যা না আসাই বাঞ্ছনীয়।

শিল্পীর সঙ্গে সমপর্যায়ে সঙ্গত করেছেন কিষণ মহারাজের শিষ্য অনিল পালিত। ঠেকা সাথ সঙ্গত ও সওয়াল জবাবে বলিষ্ঠ বেনারসী মেজাজ এক আনন্দ-ভরা পরিবেশ রচনা করেছে।

সর্বশেষ অনুষ্ঠানে 'ছায়ানট' রাগে খেয়াল গেয়ে শোনান আগ্রা ঘরানার সুপরিচিত শিল্পী শ্রীমতী অপর্ণা চক্রবর্তী। এ অনুষ্ঠান রাগ গাম্ভীর্য, সুষ্ঠু পরিবেশনা ও দক্ষতা শ্রোতাদের আনন্দ দিয়েছে। 'পগ্ন কালাংড়া রাগাশ্রিত একটি সুন্দর ঠুংরী দিয়ে শ্রীমতী চক্রবর্তী অনুষ্ঠান সমাপ্ত করেন।

শিল্পীসকাশে বৈজ্ঞানিক : বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে ব্রজেন্দ্রকিশোর সঙ্গীত-সংসদের এক অধিবেশনে প্রাচীন ধ্রুপদী যন্ত্র শোনবার জন্য উপস্থিত হলেন বৈজ্ঞানিক সত্যেন্দ্রনাথ বসু।

শ্রী রায় চৌধুরী বীণ বাজান দরবারী কানাড়া' ও ঝিনঝোটি' রাগ। ধ্রুপদী অঙ্গে বিলম্বিত, বিস্তার, লড়ী জোড়, গমক জোড়, ঠোক, ঝালা তারপরণ এবং সেনী ঘরানার নানান বন্দজের গৎ বাজিয়ে শোনান। 'এসব জিনিষ আজকাল শোনা যায় না কিন্তু আমার বড় ভালো লাগে'—বললেন আচার্য সত্যেন বসু। তারপর তিনি নিজেও ধ্রুপদী চালের গান সুরু করে দিলেন। শ্রী বসু মার্গসঙ্গীতের এক অনুরাগী শ্রোতা এ খবর জানা ছিল। কিন্তু তিনি যে ধ্রুপদী সঙ্গীত এমন সযত্নে আয়ত্ব করেছেন এবং এখনও গাইতে পারেন এ কথা জেনে মনটা যেন আরো খুসী হয়ে উঠল। আপনভোলা বৈজ্ঞানিক আত্মভোলা শিশুর মত গান গেয়ে চলেছেন তার সঙ্গে বীণ সঙ্গত করছেন ধীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী এ এক দেখবার মত দৃশ্য বটে। মনে হোল অতীত যেন সম্মুখে আভিজাত্যে যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

লোকগীতি ও লোকনৃত্য : শিল্পী সংঘের প্রযোজনায় ও শ্রীশংকর চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় সম্প্রতি ইছাপুর এ.টি.এস হলে 'আন্তর্জাতিক লোকগীতি ও লোকনৃত্য' উৎসব পালিত হয়। সংঘের শিল্পীবৃন্দ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের লোক-সংগীত ও রাশিয়া, অস্ট্রেলিয়া ও আমেরিকার লোকসংগীত পরিবেশন করেন। বিভিন্ন লোকগীতি সহযোগে নৃত্য পরিবেশন করেন। নৃত্য শিল্পী সাধন গুহ, পলি গুহ, শম্ভু ভট্টাচার্য ও সম্প্রদায়। কণ্ঠসংগীতে অংশ গ্রহণকারী সংঘের শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন শ্রীদিলীপনারায়ণ বিশ্বাস, দীপা দত্ত মজুমদার, সমীর বসু, দিলীপ রায়, সনৎ চ্যাটার্জী, কাজল চক্রবর্তী, প্রশান্ত ব্যানার্জী, মানিকলাল ব্যানার্জী, ভারতী চক্রবর্তী, ভারতী দে, কবিতা মুখার্জী, রমা মুখার্জী, কৃষ্ণা দত্ত, স্বপ্না দত্ত, রেখা ব্যানার্জী, ও অন্যান্যরা। অনুষ্ঠান পরিচালনায় শ্রীশংকর চট্টোপাধ্যায়ের প্রয়াস প্রশংসনীয়।

পিয়ানো এ্যাকোর্ডিয়ান শিল্পী : তরুণ পিয়ানো এ্যাকোর্ডিয়ান শিল্পী প্রশান্ত মুখোপাধ্যায় সম্প্রতি বাংলা ও বাংলার বাইরে বহু বিচিত্রানুষ্ঠানে যন্ত্রসঙ্গীত পরিবেশন করে সুখ্যাতি অর্জন করেছেন। গত ১০ নভেম্বর দমদমের একটি বিচিত্রানুষ্ঠানে যন্ত্রসঙ্গীত পরিবেশন করে দর্শকদের অকুণ্ঠ অভিনন্দন লাভ করেন। ইনি সম্প্রতি বেতারেও কয়েকটি নাটকে আবহসঙ্গীতে অংশ নেন।

বাউল শিল্পী কার্তিক দাস : সম্প্রতি কার্তিক দাস বাউল ছোট-বড় বহু বিচিত্রানুষ্ঠানে পল্লীগীতি ও বাউল সংগীত পরিবেশন করে ক্রমশঃই জনপ্রিয় হয়ে উঠছেন। কয়েক মাস আগে ইনি উত্তরবঙ্গের একাধিক সাংস্কৃতিক মঞ্চে পল্লীগীতি ও বাউল সঙ্গীত শুনিয়ে শ্রোতাদের অকুণ্ঠ অভিনন্দন লাভ করেন। শ্রীকার্তিক দাসের পরিবেশিত গানগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে 'ও জবে-দাদির মা' 'প্রেম প্রেম করোনা রে ভাই' 'রামকৃষ্ণ পরমহংসে সাক্ষাৎ সে দেবের অংশ' প্রভৃতি।

বিজয়া সম্মিলনী : সম্প্রতি বাটানীগর ডাহিগোড়া পূজা সমিতির পরিবেশনায় এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে যন্ত্রসঙ্গীত ও সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করেন সর্বশ্রী কল্যাণ মুখার্জী, পলাশ মুখার্জী, মাণিক সেনগুপ্ত, রবীন ব্যানার্জী রতনলাল মুখী, মনোজ রাউত, প্রণব চক্রবর্তী, পরিতোষ চক্রবর্তী, বুলবুল চক্রবর্তী ও মিনতি চ্যাটার্জী। পরিশেষে বিভূতি স্মৃতি গ্রন্থাগারের সভ্য সভ্যাবৃন্দ শ্রীশচীন ভট্টাচার্যের 'সোনার [illegible]

শ্রীরবীন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর নির্দেশনায় অভিনয় করেন সর্বশ্রী কাজল চ্যাটার্জী, কালী ব্যানার্জী, সুব্রত গুহ, তাপস ঘোষ, অরুণ চৌধুরী, কল্যাণ ভট্টাচার্য, মৃণাল সোম, শান্তিকান্তি নাথ এবং শ্বেতার ভূমিকায় শুক্লা ধরের অভিনয় বিশেষ প্রশংসনীয়।

বিজয়া সম্মেলন : গত ২৬ অক্টোবর আর আই সি রিক্রিয়েশন ক্লাবের সদস্যগণ কি সুন্দর পরিবেশে বিজয়া সম্মেলন পালন করলেন। সংস্থার সাধারণ সম্পাদক তুষার গঙ্গোপাধ্যায় সংস্থার উদ্দেশ্যর কথা ব্যক্ত করার পর প্রখ্যাত রবীন্দ্রসঙ্গীতশিল্পী সুপ্রণ গুপ্ত পর পর কয়েকটি রবীন্দ্র সঙ্গীত পরিবেশন করেন। আর আই সি-র কর্মী এবং সংস্থার সদস্য অসিত চক্রবর্তী, কালীপদ পাল, অসিত মুখার্জি, চন্দন ব্যানার্জি, কানাই গাঙ্গুলী, সঙ্গীত ও আবৃত্তি পরিবেশন করার পর রিক্রিয়েশন ক্লাবের সদস্যগণ অভিনয় করলেন শ্রীশরদিন্দু বাবুর হাসির নাটক 'চিকিৎসা সংকট' নাটকটি। পরিচালনা করেন সন্তোষ চক্রবর্তী। সাংস্কৃতিক সম্পাদক শ্রীদাম সাহার অক্লান্ত পরিশ্রমে অনুষ্ঠানটি সর্বাঙ্গীন সুন্দর হয়ে ওঠে।

—চিত্রাঙ্গদা

রাশিয়ার ডাক

যাত্রার ইতিহাসে এই প্রথম আন্তর্জাতিক পুরস্কার
তরুণ অপেরা সোভিয়েত যাত্রার আমন্ত্রণ পেলেন

সারা দেশের অযুত দর্শকের অতি প্রিয়

তরুণ অপেরা। লেনিন

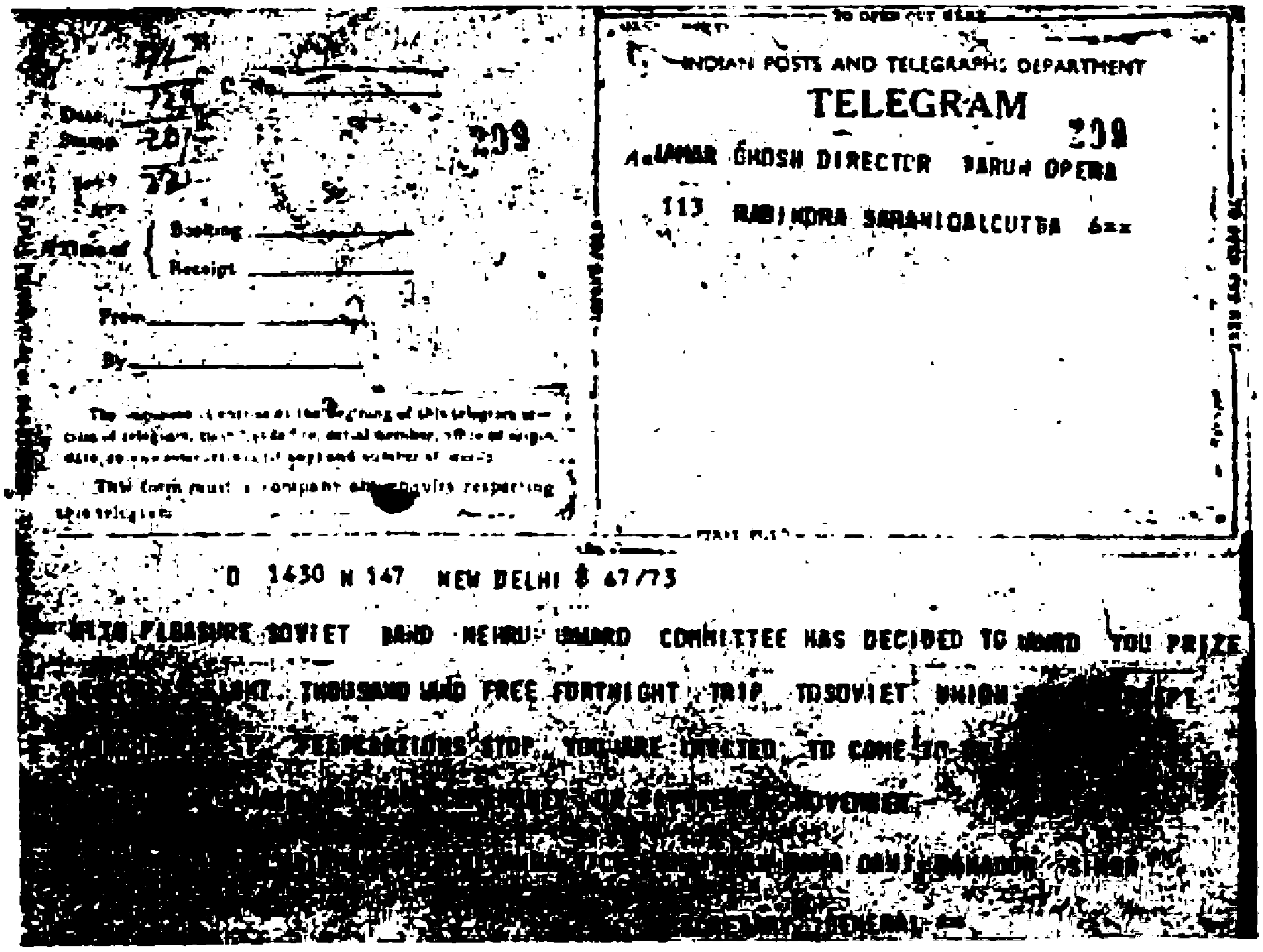

আরও তিনটি অসামান্য উপহার

নেপোলিয়ান : রমলা সার্কাস : হিটলার

১১৩ রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা-৬। ফোন—৫৫৭১২১

নটসূর্যের নাট্যগ্রন্থশালা

১৯২০ সালের জুন মাসের রঙ্গ-মঞ্চায় সাধ্যায় যে অহীন্দ্র চৌধুরী অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় রচিত 'কর্ণার্জুন' নাটকে অর্জুনের ভূমিকায় নাট্যরসিক দর্শকবৃন্দকে প্রথম অভি-বাদন করেছিলেন, তিনি আর আজ ১৯৭০ সালের ২০ নভেম্বর অহীন্দ্র চৌধুরীর মধ্যে পার্থক্য অনেক। সেদিনের যুবক অহীন্দ্র চৌধুরী দর্শকসমাজকে কিছুটা সিনেমাধর্মী অভিনয়ের মাধ্যমে চমক সৃষ্টি করে বাহবা লাভের লোভে ছিলেন যত্নবান। কিন্তু ক্রমে তিনি বুঝেছিলেন, অভিনয়ে যদি সিদ্ধিলাভ করতে হয়, বাংলা রঙ্গমঞ্চের যশস্বী শিল্পীদের মধ্যে যদি স্থায়ী আসন লাভ করতে হয়, তাহলে অভিনয়কে সাধনাস্বরূপ গ্রহণ করতে হবে এবং তার জন্যে প্রয়োজন জ্ঞানার্জনের। শুরু হল তাঁর নিয়মিত-ভাবে বই কেনা; প্রথম বই তিনি কিনলেন : হ্যান্ডবুক অব অ্যাক্টিং। আমরা তাঁকে দেখেছি কলেজ স্ট্রীটের সেন ব্রাদার্স ও বুক কোম্পানী থেকে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর ধরে নিয়মিতভাবে বই কিনতে। কথায় আছে ধনবানে কেনে বই, জ্ঞানবানে পড়ে। অহীন্দ্র চৌধুরী কিন্তু বই কিনেই ক্ষান্ত হতেন না; প্রতিটি বই যত্নের সঙ্গে পড়তেন এবং প্রয়োজন মত 'মার্জিনাল' নোটও লিখতেন। এমনই ভাবে গড়ে উঠল তাঁর ব্যক্তিগত লাইব্রেরী। যাঁরা শ্রীচৌধুরীর গোপাল-নগর রোডস্থ বাড়ীতে তাঁর লাইব্রেরীটি স্বচক্ষে দেখবার সৌভাগ্য অর্জন করে-ছেন, তাঁরাই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করবেন, কি আশ্চর্য সুন্দর ও পরিপাটিভাবে সাজানো তাঁর লাইব্রেরী; প্রতিটি বইয়ের প্রতি তাঁর কি যত্ন! বর্তমানে এই লাইব্রেরীতে আছে ন্যূনকল্পে সাড়ে তিন হাজার গ্রন্থ এবং এর মধ্যে প্রায় দু' হাজারই বিদেশী গ্রন্থ।

প্রথমে পশ্চিমবঙ্গ সঙ্গীত নৃত্য-নাটক আকাদেমীর নাট্য বিভাগের প্রধানরূপে এবং পরে রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটক বিভাগের ডীন-রূপে তিনি নাটকের পঠন-পাঠন সম্পর্কে যে পুঁথিগত ও ব্যবহারিক (থিয়োরেটিক্যাল ও প্র্যাকটিক্যাল) পাঠ-ক্রম রচনা করে দিয়েছেন, তা থেকেই নাট্য বিষয়ে তাঁর প্রগাঢ় জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। সাহিত্যের কঠিনতম শাখা হল নাট্য শাখা; তাই নাটককে পঞ্চম বেদ বলা হয়েছে। এই নাটক বিষয়ে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করতে হলে মানুষকে সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস সমাজতত্ত্ব, সঙ্গীত, অঙ্কন ও ভাস্কর্য-বিদ্যা প্রভৃতি বহু শাস্ত্রে সুশিক্ষিত হতে হয়। নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী এই রকম বহু শাস্ত্রে সুশিক্ষিত হয়েই নাট্য-বিশারদ হতে পেরেছেন। আজ তিনি বিত্তশালী, বিদ্যাব্রতী বাণীর একনিষ্ঠ ভক্ত। ৭৫ বছরের এই জ্ঞানতপস্বী স্থির করেছেন, তিনি তাঁর ব্যক্তিগত নাট্য গ্রন্থাগারটি নাটক বিষয়ে উচ্চ শিক্ষালাভার্থী বা গবেষকদের জন্যে উন্মুক্ত করে দেবেন। আপাতত রীডিং রুমে এক সঙ্গে বারোজন পর্যন্ত পাঠার্থীর স্থান হবে। গ্রন্থাগারটি বর্তমানে তাঁর আবাসগৃহের দ্বিতলে চারটি কক্ষ জুড়ে বিস্তৃত। কিন্তু ক্রমে যাতে সমস্ত বাড়ীটাই গ্রন্থাগারে রূপান্তরিত হতে পারে, এর জন্যে প্রয়োজনীয় দলিলাদি তিনি ইতিমধ্যেই রেজেস্ট্রী করেছেন। শুধু তাই নয়, লাইব্রেরীটির সুষ্ঠু পরিচালনা এবং ভবিষ্যৎ উন্নতি বিধানের জন্যে যে অর্থের প্রয়োজন হবে, তার জন্যে তিনি কলিকাতাস্থ তাঁর অপর দুখানি বাড়ীর আয় এই লাইব্রেরীর অছিবৃন্দের অনুকূলে দান করেছেন। শোনা যাচ্ছে, শীঘ্রই এই লাইব্রেরীর দ্বারোদ্ঘাটন করা হবে। সার্থক নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরীর নাট্যসাধনা।

প্রেক্ষাগৃহ

[illegible]

টাইয়ের 'নট' বাঁধাটা কিছুতেই ঠিক হচ্ছিল না; তাও শেষ পর্যন্ত ছোট বোনের সাহায্যে কোন রকম হয়ে ওঠবার যোগাড় হল। কিন্তু সুটের অভাবে টাই বাঁধার দরকারই হল না। বন্ধুগিন্নীর ধর্ম-ঘটের দরুণ নিজের সুটের আশা ত্যাগই করতে হল; বাপের বেশী বয়সের প্যান্টটি প্রায় জোকারের আকার; 'কোথায় সুট পাওয়া যায়, কোথায় সুট পাওয়া যায়' ক'রে হন্যে হয়ে ঘোরার পরে যদিবা এক বন্ধুর সুট প্রায়-চমৎকারভাবে গায়ে মানানসই হল, কিন্তু চোখের সামনে একজন পকেটমারকে হাতে-নাতে ধরে ফেলে থানা পর্যন্ত যাবার ফাঁকে কখন যে নিজের হাত থেকে ঐ সুটের প্যাকেটটি উবে গেল, তার হদিস মিলল না কোনো মতেই। —কাজেই রঞ্জুকে—[illegible] [illegible] ঘটনাচক্রে বাধ্য হয়েই ইন্দো-ব্রিটিশ ফার্মের সেলস্-এর এক মন-মাতানো, চোখ-ধাঁধানো' চাকরীর ইন্টারভিউ দিতে যেতে হল নেহাতই ভেতো বাঙালীর মতো ধুতি-পাঞ্জাবী পরে। ফল যা হবার তাই হল—চাকরীটি হ'ল না।

রঞ্জুর জীবনের এই একটি চরম ব্যর্থতার দিনের আগাগোড়া ছবি নিপুণভাবে তুলে ধরেছেন মৃণাল সেন তাঁর নব নির্মিত সম্পূর্ণ চিত্র 'ইন্টারভিউ'-এর মাধ্যমে। রঞ্জু যখন তার সেখরদার (শেখরদাই ছিল এই দুর্-চাকরীর ব্যাপারে তার মুরুব্বি) মুখে শুনল চাকরীটা সে পাবে না কেবল ধুতি-চাদর পরে যাবার অপরাধে, তখন তার মানসিক প্রতিক্রিয়া ও তার বহিঃপ্রকাশকেও রূপায়িত ও শব্দায়িত করতে ভোলেন নি শ্রীসেন। উনিশ শো সত্তরের কলকাতার যুব-সম্প্রদায়ের প্রতীক রঞ্জু প্রচণ্ড ক্রোধে ফেটে পড়ে শোকেস-এর কাচকে পাথরের টুকরো ছুঁড়ে খান খান ক'রে ভেঙেছে, যে-সুট পরার অভাবে সে তার আকাঙ্ক্ষিত চাকরী পায় নি, সেই-রকম দামী কাঠের পুতুলের গা থেকে সেই সুটকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো ক'রে দূরে ফেলে তাকে 'নগ্ন' ক'রে তৃপ্তি পেয়েছে।

'ইন্টারভিউ' ছবির মাধ্যমে মৃণাল সেন বর্তমান কলকাতার শিক্ষিত যুব-সম্প্রদায়ের বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার প্রতি নিদারুণ আক্রমণের কারণ কি, তারই একটা সঙ্গত উত্তর জানার প্রয়াস পেয়েছেন এবং এই প্রয়াসে তিনি সিনেমা-ভেরাইট বা ডিরেক্ট সিনেমার পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন।

রঞ্জু মল্লিকের জীবনের একটি বিশেষ দিনে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত যেমন যেমন ঘটনা ঘটেছিল অর্থাৎ যতটা সম্ভব ছিল, তাকেই তিনি চলচ্চিত্রে বিশেষ ভাষার মাধ্যমে ধরে রেখেছেন। তিনি যে তাঁর ক্যামেরাম্যান ও তাঁর দলের অন্যান্যদের সহযোগিতায় রঞ্জুর জীবনের একটি দিনের

মঞ্জরী অপেরা/পরিচালনা : অগ্রদূত

সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়

উত্তমকুমার

জ্যোৎস্না বিশ্বাস

বিভিন্ন ঘটনাকে যথাসম্ভব চিত্রায়িত করে তাদেরই শব্দ ও যন্ত্রসংগীতের সংগে সমন্বিত করে তাঁর মনের মতো করে সাজিয়ে দর্শকদের উপহার দিয়েছেন এবং সেটি যে প্রায় তথ্যচিত্রের আকারে, দর্শকদের এ-কথা তিনি বারংবার মনে করিয়ে দিয়েছেন। তাঁর ছবির নায়ক রঞ্জন মল্লিক দর্শকদের দিকে সোজা তাকিয়ে বলেছে : মশাই, আমি একটা সাপ্তাহিক কাগজ চালাই, লেখা যোগাড় করা থেকে শুরু করে প্রুফ দেখা, বিজ্ঞাপনের টাকা আদায় করা পর্যন্ত সব কাজই করি; হঠাৎ 'কেবলনা' একটা বিদেশী ফার্মে খুব একটা মোটা মাইনের চাকরী পাবার জন্যে একটা ইন্টারভিউ-এর সম্মুখীন হবার আগে 'ভদ্রভাবে ছোটাছুটি করতে হচ্ছে এবং এই ব্যাপারটাকে সসম্প্রদায় মৃণাল সেন ছবির মাধ্যমে ধরে রাখবার জন্যে আমাকে সকাল থেকে ধাওয়া করে চলেছেন। —এই বলার ফলে ছবিটি যে ছবিমাত্র নয়, বাস্তব জীবনের প্রতিচ্ছবি মাত্র—কলকাতার সমকালীন জীবনের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি, তা নিশ্চয়ই দর্শক বুঝেছেন। তাই বক্তব্য বিচিত্র কলকাতায় দেখা যায়, পথঘাট থেকে বিদেশী শাসকদের প্রতিমূর্তিগুলি স্থানচ্যুত হয়ে লরী করে অপসৃত হচ্ছে, আদিবাসীরা তীর ধনুক বাদ্য নিয়ে পথ-অভিযান করছে, উগ্রপন্থী যুবকেরা বোমাবর্ষণ করে পুলিশের সংগে যুদ্ধ করছে।

ছবিটিতে সমকালীনতা ফুটেছে, সিনেমা ভেরাইট বা ডিরেক্ট সিনেমার পদ্ধতিও পরিস্ফুট হয়েছে এবং ছবি আসলে কাহিনী-চিত্র হওয়া সত্ত্বেও কিছুটা তথ্যচিত্রের রূপ পরিগ্রহ করেছে। কিন্তু একই সংগে বিভিন্ন মূর্তিতে রঞ্জনের প্রেমিকাকে এবং বিভিন্ন দৃশ্যকে পর্দায় উপস্থাপিত করা এবং আরো অনেক বিজ্ঞাপন ও তথ্যচিত্রে অনুসৃত আধুনিক চমকপ্রদ পদ্ধতির প্রয়োগ ছবিটিতে কিছুটা কৃত্রিমতার স্বাদ এনেছে এবং মনে হয়েছে অপ্রয়োজনেই শুধু কিছুটা বাহাদুরী দেখাবার লোভে। ছবির কলাকৌশল ছবির বক্তব্যকে ছাপিয়ে যাবে না এটিটুকু কাম্য হওয়া উচিত। তা ছাড়া ডিরেক্ট সিনেমার সংগে এই ধরনের কলাকৌশল কতটা খাপ খায়, তাও বিবেচ্য।

ছবির নায়কের ভূমিকা অভিনয়কারী রঞ্জন মল্লিক যদিও বলেছেন, তিনি অভিনেতা নন, তবু বলব, তিনি মৃণাল সেনের একটি উজ্জ্বল আবিষ্কার। এমন সহজ, সাবলীলভাবে তিনি তাঁর চরিত্রটি চিত্রিত করেছেন যে, মনেই হয় না তিনি অভিনয় করছেন। তার ওপর চোখ মুখও যথেষ্ট চলচ্চিত্রের উপযোগী, যাকে বলি ফোটোজেনিক। কিন্তু নায়কের প্রেমিকার ভূমিকাভিনেত্রী বুলবুল মুখোপাধ্যায় সম্বন্ধে সমান কথা বলতে পারলুম না। তিনি ভূমিকার সংগে নিজেকে মিলিয়ে ফেলতে পারেন নি কোথাও; সব সময়েই মনে হয়েছে, তিনি সংলাপগুলিকে কোনো ক্রমে বলে ফেলে নিশ্চিন্ত হতে চান। নায়কের ভগ্নী বেশে মমতা চট্টোপাধ্যায় অত্যন্ত স্বচ্ছন্দের সংগে চরিত্রটিকে বাস্তব করে তুলেছেন; তিনি যে অভিনয় করছেন, এ-কথা মনেই হয় নি। নায়কের মায়ের চরিত্রটি সার্থকভাবে চিত্রিত করেছেন 'পথের পাঁচালী'-খ্যাত করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়। শেখর চট্টোপাধ্যায় শেখরবাবুর ভূমিকায় তাঁর সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। অন্যান্য যাঁরা এই ছবিতে দেখা দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে সকলেই এমন সুন্দরভাবে নিজেদের তুলে ধরেছেন যে, মনে হয়েছে তাঁরা বাস্তব জগতের নিউজ রীলে ধরা পড়েছেন, সাজা অভিনেতা বলে তাঁদের কাউকে মনে হয় না।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে চিত্রগ্রহণে সংবাদ চিত্রগ্রহণের রীতি অনুসরণ করা হয়েছে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে। ক্ষিপ্র হস্তের কাঁচি ছবির ঘটনাকে অবস্থানুযায়ী গতিতে এগিয়ে নিয়ে গেছে। সাধারণভাবে জাঁকজমক বিমুক্ত কণ্ঠসংগীতের প্রয়োগ ছবির বাস্তবধর্মিতাকে বর্ধিত করেছে। কিন্তু প্রধানত পিয়ানো-বাজানো যন্ত্রের সাহায্যে রচিত আবহসংগীত বহু স্থানেই অকারণে উচ্চ আওয়াজপূর্ণ বলে মনে হয়েছে।

দয়াশঙ্কর সুলতানিয়া নিবেদিত মৃণাল সেনের 'ইন্টারভিউ' এমন একটি পরীক্ষামূলক সমকালীন চিত্র, যা চিন্তাশীল দর্শককে তাঁর পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে অধিকতর সচেতন করবে। —নান্দীকর

ষ্টার
[শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত নাট্যশালা]

৪০০তম অভিনয় অতিক্রান্ত

শর্মিলা

অভিনব নাটকের অপূর্ব রূপায়ণ
প্রতি বৃহস্পতি ও শনিবার : ৬॥টায়
প্রতি রবিবার ও ছুটির দিন : ৩টা ও ৬॥টায়

॥ রচনা ও পরিচালনা ॥
দেবনারায়ণ গুপ্ত

:: রূপায়ণে ::
অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, অপর্ণা দেবী, নীলিমা দাস, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, সতীন্দ্র ভট্টাচার্য, কালীরাম গাঙ্গুলী, দীপিকা দাস, শ্যাম লাহা, প্রেমাংশু বসু, বাসন্তী চট্টোপাধ্যায়, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, গীতা দে ও বঙ্কিম ঘোষ।

আজব শহর/মীনা মুখোপাধ্যায় ও নৃপতি চট্টোপাধ্যায়

তরুণ অপেরার নেপোলিয়ান/
নামভূমিকায় শান্তিগোপাল

স্টুডিও থেকে

রূপসী-র শুভমুক্তি : অরুণ রায়-চৌধুরী প্রযোজিত ও পরিবেশিত এ আর সি প্রোডাকসন্সের দ্বিতীয় ছবি রূপসী ৪ ডিসেম্বর রাধা, পূর্ণ ও অন্যান্য মুক্তিলাভ করবে। কাহিনী ও চিত্রনাট্যকার অজিত গাঙ্গুলী এই ছবির পরিচালক। ছবিটিকে জনপ্রিয় করে গড়ে তুলতে পরিচালক শ্রীগাঙ্গুলী পরিশ্রমের কোন ত্রুটিই করেন নি। সন্ধ্যা রায়, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, তপেন চট্টোপাধ্যায়, রবি ঘোষ, বঙ্কিম ঘোষ, চিন্ময় রায়, অরুণ চৌধুরী, অনুভা ঘোষ, সুলতা চৌধুরী, সুতপা চক্রবর্তী, মুক্তি বন্দ্যোপাধ্যায় ও শান্তি ভক্ত ছবির প্রধান চরিত্রলিপিতে আছেন। গান লিখেছেন গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। অনিল বাগচীর সুরে কণ্ঠ দিয়েছেন—মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র, অনুপ ঘোষাল, অরিজিৎ মুখোপাধ্যায়, অধীর বাগচী, সুবোধ রায় প্রভৃতি। হাসিরসপ্রধান এই ছবিটি কাহিনী বৈচিত্র্যে আর ঘুঙুরের নাচে-গানে, কবির লড়াই, চাটিয়ালী গানে দর্শক মনে এক নতুন রসের স্বাদ দেবে।

•

সানফ্রান্সিস্কো উৎসবের কর্তৃপক্ষ এবার শ্রীসত্যজিৎ রায়কে সিনেমা জগতে তাঁর প্রতিভার ও কর্মের অস্বাভাবিক অবদানের জন্য এক বিশেষ সম্মানদানের ব্যবস্থা করেছিলেন। ব্যক্তিগতভাবে শ্রীরায়কে সানফ্রান্সিস্কোতে যাবার আমন্ত্রণ জানিয়েছিল উৎসব কর্তৃপক্ষ। সত্যজিৎবাবুও যাবেন ঠিক ছিল। কালীপূজোর আগের দিন রওনা হবেন জানতাম। সেই মত 'প্রতিদ্বন্দ্বী'র প্রেস-শো করা হল মঙ্গলবার। সেদিন সত্যজিৎবাবু আমাকে জানিয়েছিলেন 'পরশু যাচ্ছি।'

কিন্তু শেষ মুহূর্তে যাওয়া বাতিল করেছেন তিনি। একটি প্লেনের অ্যাক্সিডেন্টের জন্যই শেষ মুহূর্তে যাওয়া ক্যান্সেল করতে হোল। সত্যজিৎবাবু বললেন—'ভেবেছিলাম ঐ ফ্লাইটটা না পেলে সানফ্রান্সিস্কোতে মাত্র একদিন থাকতে পাওয়া যাবে। অতদূর একদিনের জন্য গিয়ে ফিরে আসার মানে হয় না। তাই আর গেলাম না।' পরবর্তী ছবির প্ল্যান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করায় বললেন—'এখনও ঠিক করিনি। দেখি এটার (প্রতিদ্বন্দ্বী) ওপরই নির্ভর করছে অনেকটা।'

—শুনেছিলাম ঘরে বাইরের কথা।

: না। এখন ও-ছবি করার কোনো যুক্তি নেই. সময় তো অনেক গেছে। নেক্সট ছবি আরম্ভ করতে জানুয়ারী হয়ে যাবে। আর কি করব তাও ঠিক নেই।

রঙ্গনা
বিবেকানন্দ সরণীর
সার্কুলার রোডের মোড়

নান্দীকার
২১শে শনিবার ৬৷টায়
২২শে রবিবার ৩টে ও ৬৷টায়
তিন পয়সার পালা
২৬শে নভেম্বর বৃহস্পতিবার ৬৷টায়
নাট্যকারের সন্ধানে ছ'টি চরিত্র
নির্দেশনা: অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়
॥ রঙ্গনায় (৫৫-১৮৪৬) টিকিট পাবেন ॥

জননী/পরিচালনা অজিত গঙ্গোপাধ্যায়। সুলোচনা চট্টোপাধ্যায়, রুমা গুহঠাকুরতা এবং শমিত ভঞ্জ। —ফটো : অমৃত

এখন সংলাপ-সংযোগ, মিক্সিং-এর ওপর যে তত্ত্বাবধান করেছেন, তার এডিটিং করছেন। তারপর রি-রেকর্ডিং ইত্যাদি অনেক কাজ বাকি। তারপর ফিচার ফিল্মের কথা।

এখানে প্রেক্ষার একদল মানুষের বেঁচে থাকার বাঁচার সংগ্রামকে কেন্দ্র করে অজিত লাহিড়ীর নতুন ছবি 'আটত্রিশ দিন পরের কাহিনী' নির্মাণ করেছেন মৃগাঙ্কশেখর রায়। চিত্রনাট্যও শ্রীরায়ের লেখা। একটানা বেশ কিছুদিন ইন্দ্রপুরীতে চিত্রগ্রহণের পর ছবির কাজ প্রায় শেষ বলা চলে। কালীপদ সেনের সংগীত পরিচালনায় এ ছবির বিভিন্ন চরিত্রে অংশ নিয়েছেন শমিত ভঞ্জ, অনুপকুমার, রুমা গুহঠাকুরতা, চিন্ময় রায়, ভাস্কর চৌধুরী, সত্যব্রত সিংহ, গৌতম চ্যাটার্জি, অলোক চৌধুরী, ইন্দ্রজিৎ সেন, ভারতী দেবী, সুরুচি সেনগুপ্ত, চন্দ্রাবতী দেবী, নীরেন্দ্র সরকার প্রমুখ।

•

তরুণ মজুমদারের রাহগীরের পরবর্তী ছবি 'কুহেলী' এখনও মুক্তি পায়নি, এখনও দেরী আছে। তবু নতুন ছবি 'নিমন্ত্রণ'-এর কাজ চলছে পুরোদমে। পুজোর মধ্যেই তিনি হাওড়ার কয়েক জায়গায় বহির্দৃশ্যের কাজ করেছেন। এ ছবির নায়ক নায়িকা হলেন অনুপকুমার ও সন্ধ্যা রায়। আগের ছবি 'কুহেলী'র নায়িকাও সন্ধ্যা রায়, নায়ক বিশ্বজিৎ। সুখী স্বচ্ছল শান্ত সাধারণ একটি মেয়ে অপর্ণা। প্রেমাস্পদ স্বামীকে নিয়ে একটি সুখী গৃহকোণ যে চেয়েছিল, আর কিছু নয়। কিন্তু প্রকৃতি ও সংসারের অমোঘ কুটিল চক্রে তাও তার পাওয়া হোলো

শুভমুক্তি শুক্রবার ২০শে নভেম্বর !

এই দশকের সেরা ছবি!!

উত্তরা — পূরবী — উজ্জ্বলা — আলোছায়া — পদ্মশ্রী

দুর্গালিনী - অশোকা - শ্যামাশ্রী - মায়াপুরী - মায়া - নিউ তরুণ - গৌরী - প্রফুল্ল - মানসী - দুলালী - প্রভা - নৈহাটী সিনেমা
অনুরাধা (দুর্গাপুর)

CENTRAL LIBRARY

রূপসী/বঙ্কিম ঘোষ এবং সন্ধ্যা রায়

না। অকস্মাৎ এ জগৎ থেকে তাকে সরিয়ে দেওয়া হোল। কিন্তু সরাল কে? কেন? —এসব প্রশ্নেরই জবাব দেবে তরুণ মজুমদারের নতুন ছবি 'কুহেলী'।

•

চিত্রযুগের ব্যানারে দিলীপ মুখার্জির পরিচালনায় 'এখানে পিঞ্জরের' সব কাজ শেষ হয়েগেছে বেশ কিছুদিন আগে। এখনও মুক্তি পায়নি, কবে পাবে তারও স্থিরতা নেই এখনও। ইতিমধ্যে তাঁরা নতুন ছবির কাজ শুরু করার প্রস্তুতি চালাচ্ছেন। অরবিন্দ মুখার্জির পরিচালনায় সে ছবির নাম 'মায়াজাল'। 'নিশিপদ্মের' অস্বাভাবিক আর্থিক সাফল্যের পর অরবিন্দ মুখার্জির বাজার এখন তুঙ্গে। একটার পর একটা ছবি করে যাচ্ছেন। এখন তার হাতে রয়েছে 'ধন্যি মেয়ে'। আগামী সপ্তাহে এন-টিতে ছবির দৃশ্য গ্রহণ হবে আবার। সেই ফাঁকে তিনি গ্রামাঞ্চলে চলে গেছেন বহির্দৃশ্য গ্রহণের জন্য। এ ছবির প্রধান দুটি চরিত্রে আছেন পার্থ মুখার্জি ও জয়া ভাদুড়ী এবং একটি বিশিষ্ট চরিত্রে আছেন উত্তমকুমার।

এক মিনিটের চলচ্চিত্র

কতো রকমেরই না পরীক্ষানিরীক্ষা চলেছে পৃথিবীর প্রান্ত থেকে প্রান্তে, তার কতটুকুই বা খবর আমরা রাখি। এই কলকাতাতেই বসে ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের উৎসাহী কর্মী অজয়কুমার বসু বর্তমান কালকে অবলম্বন করে যে একটি মাত্র একমিনিট দীর্ঘ পরীক্ষামূলক ছবি তৈরী করেছেন, তা তিনি নিজেই আমাদের না জানালে আমরা জানতেও পারতুম না।

ছবির বক্তব্য যে বেশ জোরালো, তা এর বিষয়বস্তু থেকেই উপলব্ধি করা যায়। একজন শিল্পী কিছু আঁকবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন; নেপথ্যে চলেছে ছন্দোময় তবলা-বাদ্য। যেমন তাঁর ব্রাশ ক্যানভাসটিকে ছুঁতে যাবে, অমনই তবলা পরিণত হল রণ-বাদ্যে। আর সঙ্গে সঙ্গে ব্রাশের ছোঁয়ায় ক্যানভাসটি গেল কেটে। ক্ষণেকের জন্যে শিল্পী বিমূঢ়। আবার যেমন সে ব্রাশ তুলে ক্যানভাসের সামনে ধরেছে, অমনি কোথা থেকে আচম্বিতে বোমার আওয়াজ। ক্যানভাস আবার যেন ছুরির আঘাতে ফেটে গেল। কেউ যেন পাগলের মতো হাসছে। এবার দৃঢ়হস্তে শিল্পী তাঁর ব্রাশ দিয়ে নিজেকেই আঘাত করলেন—ঠিক যেমন করে লোকে আত্মহত্যা করে। শিল্পীর মুখে ফুটে উঠল মৃত্যুযন্ত্রণা এবং ক্যানভাস থেকে ঝরতে লাগল ফোঁটা ফোঁটা রক্ত। কোনো কথা নেই; শুধু নেপথ্য-ধ্বনি ও বাঙ্ময় ছবির সহযোগিতায় বক্তব্যকে ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস। এবং কিছুটা সাফল্যপূর্ণও বটে।

এ ছবির একমাত্র শিল্পী হলেন চিত্রশিল্পী শ্রীনিতাই ঘোষ। ইনি বর্তমানে 'অমৃত' পত্রিকার অন্যতম অলংকরণশিল্পীও বটে।

বিবিধ সংবাদ

প্রতিযোগিতা : গত ২৬ অকটোবর পার্ক সার্কাস বেনিয়াপুকুর সংযুক্ত পূজা কমিটি আয়োজিত (পার্কসার্কাস ময়দানে) নাটক প্রতিযোগিতায় ১ম স্থান অধিকার করেন 'আমরা খেয়ালী' কর্তৃক 'প্রতিচ্ছবি', ২য় স্থান অধিকার করেন রূপারূপ কর্তৃক 'কুলী কে?' ও ৩য় স্থান অধিকার করেন যুবগোষ্ঠী কর্তৃক 'স্বর্গের সিঁড়ি'। অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন গ্রহণ ও পুরস্কার বিতরণ করেন শ্রীশ্যামলাল ঘোষাল মহাশয়।

মহিলা শিল্পী মহলের নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহক সমিতি : বাৎসরিক সাধারণ নির্বাচনের পর মহিলা শিল্পী মহলের কার্যনির্বাহক সভা গঠিত হয়েছে এইভাবে—সভাপতি—শ্রীমতী মলিনা দেবী, সহ-সভাপতি—শ্রীমতী চন্দ্রাবতী দেবী ও ভারতী দেবী সাধারণ সম্পাদিকা—শ্রীমতী মঞ্জু দে, সহ-সম্পাদিকা—শ্রীমতী নমিতা সিংহ ও আরতি দাস, কোষাধ্যক্ষা—শ্রীমতী কানন দেবী, ব্যবস্থাপক সভার সভ্যাবৃন্দ—সর্বশ্রী ছন্দা দেবী, বন্দনা বড়ুয়া, নীলিমা দাস, সাধনা রায়চৌধুরী, গৌরী মিত্র, তপতী দেবী, সবিতা বন্দ্যোপাধ্যায় সুলতা চৌধুরী।

গোবিন্দপুরঘাট, চাতরা, শ্রীশ্রীশ্যামাপূজা কমিটির বিচিত্রানুষ্ঠান : গত ৭ নভেম্বর চাতরা গোবিন্দপুরঘাট শ্যামাপূজা কমিটির

বেঙ্গল মোশন পিকচার্স ডায়রী
বর্ধিত কলেবরে
নবতর রূপে
"ইণ্ডিয়ান
মোশন পিকচার
অ্যালমানাক্"
(নতুন নামে)
প্রকাশিত হতে চলেছে
চলচ্চিত্র শিল্প সম্পর্কিত সংস্থা ও কর্মিবর্গ স্ব-স্ব নতুন ঠিকানা ও ঠিকানা পরিবর্তন ও আত্মক বিবরণ ৩০শে নভেম্বরের মধ্যে নীচের ঠিকানায় পাঠান।
বি, আর, শর্ট পাবলিকেশন্স
৩-বি, মাডান স্ট্রীট, কলি : ১৩
২৩-৫১৪৫

এখনই পরিচালনা : তপন সিংহ। অপর্ণা ও হারাই। —ফটো : অমৃত

উদ্যোগে বিপুল দর্শকমণ্ডলীর উপস্থিতিতে এক মনোজ্ঞ বিচিত্রানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় প্রতিটি শিল্পীর অনুষ্ঠান উচ্চাঙ্গের হয়। শ্রীমতী অঞ্জন বসু, শ্রীমতী ঈশা সরকার ও শ্রীমতী নীলিমা চক্রবর্তীর সংগীতানুষ্ঠান ভূয়সী প্রশংসার দাবী রাখে। পিন্টু বসুর বাদ্য-গীতি এই অনুষ্ঠানকে আরো আকর্ষণীয় করে তোলে। শিল্পীর গীত রচনা ও পরিবেশনা সমাদরযোগ্য। শ্রীসুশীল চক্রবর্তীর হাস্যকৌতুক সুন্দর। শ্রীগোবাচাঁদ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীদিলীপ চক্রবর্তীর সংগীতানুষ্ঠান ও শ্রীমধুকান্ত আবৃত্তি উচ্চাঙ্গের হয়। মাস্টার স্বরূপকান্তি ঘোষের গীটার বাদন উচ্চপ্রশংসিত হয়। এ-ধরনের সুন্দর অনুষ্ঠানের জন্য উদ্যোক্তারা সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীর প্রশংসা অর্জন করেন।

জোহানীয়ির চৌধুরী পরিবার :— কলকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই ক্যাশ ডিপার্টমেন্ট রিক্রিয়েশন ক্লাব গত ২৭ অক্টোবর ষ্টারে প্রফেসর বিজয় জোহানীয়ির চৌধুরী পরিবার অভিনয় করেন। সুপরিচালক সুবীর মুস্তাফীর পরিচালনায় নাটকটি সকলের কাছে উপভোগ্য হয়। নাটকটির অভিনয়ে শিল্পীরা সুন্দর বোধ অভিনয়ের নজীর রাখেন এবং প্রতিটি শিল্পীই তার নিজের নিজের ভূমিকায় নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার পরিচয় দেন। তপন বসুর 'বেণা' চরিত্র সমকালীন অভিনয়ে এক বিরল দৃষ্টান্ত। তার চরিত্র এত বলিষ্ঠ প্রাণবন্ত, সচ্ছল অথচ শিল্পময় হতে পারে তার অভিনয় সে কথা প্রমাণ করেছে। এর পর 'পরন্তপ রায়' চরিত্রে প্রশংসনীয় অভিনয় করেন নীহার মুখার্জী। প্রদীপ ঘোষের 'উদয়নারায়ণ' চরিত্র প্রশংসার যোগ্য। এছাড়া নারীচরিত্রে মমতা, চম্পা, ইন্দ্রাণী ও ভুবনমতী চরিত্রে যথাক্রমে প্রতিমা পাল, শিখা ভট্টাচার্য, আরতি ঘোষ ও চিত্রিতা মণ্ডল সুঅভিনয় করেন। এছাড়া উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন প্রেমাংশু বসু, গোষ্ঠ ব্যানার্জী, দীপক বসু, নবীন দে, ভূপতি সরকার, রজগোপাল মিত্র, ভবানী ধর ও অনিল সেনগুপ্ত।

শুভময়ের অভিনয় : বিশেষ করে বাংলাদেশে আজকের দিনে নাট্য আন্দোলনের ক্ষেত্রে একটা সুনির্দিষ্ট চিন্তাধারা এবং দৃষ্টিভঙ্গীকে সামনে রেখে যখন কয়েকটি চিহ্নিত দল এই দুরূহ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তখন সম্প্রতি মুক্ত অঙ্গনে 'শুভময়' প্রযোজিত দুটি একাঙ্কিকার নির্বাচন এবং অভিনয় দেখে কোন দ্বিধাই যে তাঁরা প্রচলিত গড্ডলগতিকতার সীমারেখা অতিক্রম করতে পারেননি সেটাই প্রমাণিত হোল। ভিয়েতনাম বক্তব্যধর্মী ঐতিহাসিক বিপ্লবের বিক্ষিপ্ত একটি ঘটনার মাধ্যমে বিপ্লবী চরিত্র, বৈপ্লবিক পরিস্থিতি এবং জনমানসে সংগ্রামী সচেতনতা একাঙ্ক নাটকে উপস্থিত করতে গেলে নাট্যকারের যে পরিমাণ দক্ষতা বা নিপুণতার প্রয়োজন 'ক্যারিবিয়ান সাগরের বুকে' নাটকে তা সম্পূর্ণ অবর্তমান। তত্ত্বকেন্দ্রিক এবং সংলাপসর্বস্ব নাটক দর্শককে কখনও ভাবায় না, নাড়া দেয় না। ঠিক সেই কারণেই প্রথম একাঙ্কিকাটি রসোত্তীর্ণ হয়নি। দ্বিতীয় নাটক প্রথম দিকে 'আলো নেই' হতাশাগ্রস্ত অবক্ষয়ী সমাজের আংশিক ছবি। অভিনয়াংশে গোয়েন্দা অফিসার হিসাবে পবিত্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রকৃতি কুটিল বুদ্ধিটি যে পরিমাণে সূচিত সে তুলনায় সংলাপ কিঞ্চিৎ বিস্তৃত। রূপচিৎ পাগলীর পাগল হয়তো সত্যনিষ্ঠ, ব্যালকোনা ঠিক হয়তো সুপ্রতিষ্ঠিত নয়। অবশ্য তাঁর স্বরক্ষেপণ হওয়ার জন্যই মনে হয় এই বিপর্যয়। শচীন মুখার্জীর বৃদ্ধ মনোগ্রাহী। অশোক দাসের অভিনয় অতি অভিনয়ে দুষ্ট। বাদ্যকার চরিত্রে শৈলেন দাস সজীব। অন্যান্য চরিত্রগুলি মোটামুটি চলনসই। সামগ্রিকভাবে বিচার করতে গেলে নির্দেশক অঞ্জন দাশগুপ্তের নিজস্ব স্বকীয়তার নিদর্শন মেলেনি বরং অভিনয় ও প্রয়োগ পর্যায়ে অনুকরণ প্রবণতার স্বাক্ষর মিলেছে। আলোকসম্পাত ও মঞ্চসজ্জা উল্লেখযোগ্য না হলেও যথাযথ। আবহসঙ্গীত সর্বাঙ্গপূর্ণ নয়। সব শেষে একটি কথাই কেবল মনে হয়েছে যে, এ নাটক দুটি প্রযোজনার যৌক্তিকতা বা সার্থকতা কোথায়?

ইউথ পাপেট থিয়েটার, ইন্ডিয়া

গেল ২৪ অক্টোবর, '৭০ বালিগঞ্জ শিক্ষা সদনে ইউথ পাপেট থিয়েটার পুতুল নাচের মাধ্যমে তাদের সপ্তম বার্ষিক উৎসব পালন করেন। প্রধান অতিথি সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও যুগান্তর বার্তা-সম্পাদক দক্ষিণারঞ্জন বসু পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের পুতুল নাচের ইতিকথা বিবৃত করেন এবং নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করে আমাদের দেশে ইউথ পাপেট থিয়েটার এই সংস্কৃতি রক্ষা করার যে প্রাণপণ চেষ্টা করছেন, তার অকুণ্ঠ প্রশংসা করেন। প্রখ্যাত লেখক হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও ভাষণ দেন।

প্লাস্টিক পাপেট সিলহুয়েট পুতুল নাচ দিয়ে অনুষ্ঠানের শুরু। পরে, ম্যারিওনেটস পুতুল নাচের মাধ্যমে ফুল, প্রজাপতি পাখী ইত্যাদির যে জীবন ছন্দ পাপেট ফ্যানটাসিতে দেখান হয়, তা অপূর্ব। সবশেষে গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'ভোঁদড় বাহাদুর' পুতুল নাচ অভিনীত হয়। পুতুলগুলির সময়োচিত অঙ্গভঙ্গী, বর্ণাঢ্য সাজসজ্জা, মধুর ও ছন্দোময় সুর-সংযোজনা দর্শকদের মুগ্ধ করে।

পুতুল নাচ সম্পর্কে ইউথ পাপেট থিয়েটার, ইন্ডিয়ার পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও এই ধরনের অনুষ্ঠান ভারতের অতীত ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারের প্রাণবন্ত প্রচেষ্টা বলে অবশ্যই প্রশংসনীয়।

খেলার কথা

ক্ষেত্রনাথ রায়

ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট সমীক্ষা

ইংল্যান্ডের প্রখ্যাত ক্রিকেট ক্লাব—এম সি সি (মেরীলিবন ক্রিকেট ক্লাব) তাদের ১৯৭০-৭১ সালের অস্ট্রেলিয়া সফরের প্রথম শ্রেণীর খেলা গত ৩০শে অক্টোবর উদ্বোধন করেছে। তারা ইংল্যান্ডের নাম নিয়ে এই সফরের প্রথম টেস্ট ক্রিকেট ম্যাচ খেলতে নামবে আগামী ২৮শে নভেম্বর। ১৯৭০-৭১ সালের টেস্ট সিরিজটি হবে ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার ৫০তম টেস্ট সিরিজ। অপর দিকে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে এই দুই দেশের ২৮তম টেস্ট সিরিজ। আন্তর্জাতিক টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট ক্রিকেট খেলা নানা দিক থেকে নজির হয়ে থাকবে। যেমন ১৮৭৭ সালের ১৫ই মার্চ অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ণ মাঠে ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার যে টেস্ট খেলা শুরু হয় তা দুই দেশের ১ম টেস্ট ক্রিকেট খেলা এবং পৃথিবীর মাটিতে টেস্ট খেলার উদ্বোধন এই সূত্রেই। এর অনেক পর টেস্ট ক্রিকেট খেলার আসরে প্রথম খেলতে নেমেছে দক্ষিণ আফ্রিকা ১৮৮৯ সালের ১২ই মার্চ (ইংল্যান্ডের বিপক্ষে), ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ১৯২৮ সালের ২৩শে জুন (ইংল্যান্ডের বিপক্ষে), নিউজিল্যান্ড ১৯৩০ সালের ১০ই জানুয়ারী (ইংল্যান্ডের বিপক্ষে), ভারতবর্ষ ১৯৩২ সালের ২৫শে জুন (ইংল্যান্ডের বিপক্ষে লর্ডস মাঠে) এবং পাকিস্তান ১৯৫২-৫৩ সালে (ভারতবর্ষের বিপক্ষে)।

ডন ব্র্যাডম্যান (অস্ট্রেলিয়া)

ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়া—এই দুই দেশের মধ্যে এ পর্যন্ত ২০০টি টেস্ট ক্রিকেট খেলা হয়েছে। এই দুই দেশের টেস্ট ক্রিকেট খেলা ছাড়া অপর কোন দুই দেশের টেস্ট ক্রিকেট খেলা আজও ২০০তম সংখ্যায় পূর্ণতা লাভ করে নি। আন্তর্জাতিক টেস্ট ক্রিকেট মহলে ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট ক্রিকেট খেলার আকর্ষণই আলাদা। সারা পৃথিবীর ক্রিকেটঅনুরাগীরা অদম্য উৎসাহ, উত্তেজনা এবং উদ্বেগের সঙ্গে ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট ক্রিকেট খেলা অনুধাবন করেন। বিরাট ঐতিহ্যমণ্ডিত ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট ক্রিকেট খেলার আর এক নাম 'ফাইট ফর দি এ্যাসেজ' অর্থাৎ ছাই নিয়ে যুদ্ধ'। ১৯৭০-৭১ সালের টেস্ট ক্রিকেট খেলার প্রাক্কালে ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার ২০০টি টেস্ট ক্রিকেট খেলার সূত্রে যে উল্লেখযোগ্য রেকর্ড সৃষ্টি হয়েছে তা নীচে দেওয়া হল।

টেস্ট খেলার রেকর্ড

১৮৭৭ (মার্চ ১৫) থেকে ১৯৭০ (নভেম্বর ২৭)

টেস্ট খেলার ফলাফল

স্থান	খেলা	ইংল্যান্ড জয়ী	অস্ট্রেলিয়া জয়ী	ড্র
ইংল্যান্ড	৯৬	২৬	২৫	৪৫
অস্ট্রেলিয়া	১০৭	৪০	৫৫	১২
মোট :	২০০	৬৬	৮০	৫৭

ওয়াল্টার হ্যামণ্ড (ইংল্যান্ড)

টেস্ট সিরিজের ফলাফল

স্থান	খেলা	ইংল্যান্ড জয়ী	অস্ট্রেলিয়া জয়ী	ড্র
ইংল্যান্ড	২৪	১২	১০	২
অস্ট্রেলিয়া	২৫	৯	১২	৪
মোট :	৪৯	২১	২২	৬

এক ইনিংসে দলগত সর্বোচ্চ রান

ইংল্যান্ড : ৯০৩ (৭ উইঃ ডিক্লেঃ) ওভাল ১৯৩৮ (আজও বিশ্বরেকর্ড)

অস্ট্রেলিয়া : ৭২৯ (৬ উইঃ ডিক্লেঃ), লর্ডস ১৯৩০

এক ইনিংসে দলগত সর্বনিম্ন রান

(পুরো ইনিংসের খেলা)

ইংল্যান্ড : ৪৫, সিডনি, ১৮৮৬-৮৭

অস্ট্রেলিয়া : ৩৬, বার্মিংহাম, ১৯০২

এক ইনিংসে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রান

ইংল্যান্ড : ৩৬৪ রান—লেন হাটন, ওভাল, ১৯৩৮

অস্ট্রেলিয়া : ৩৩৪ রান—ডন ব্র্যাডম্যান, লিডস, ১৯৩০

একটি সিরিজে সর্বাধিক মোট রান

(ব্যক্তিগত রানের সমষ্টি)

অস্ট্রেলিয়া : ৯৭৪ (গড় ১৩৯-১৪)—ডন ব্র্যাডম্যান, ১৯৩০

ইংল্যান্ড : ৯০৫ (গড় ১১৩-১২) ওয়াল্টার হ্যামণ্ড, ১৯২৮-২৯

সর্বাধিক ব্যক্তিগত সেঞ্চুরী

অস্ট্রেলিয়া : ১৯টি—ডন ব্র্যাডম্যান
ইংল্যান্ড : ১২টি—জ্যাক হবস

একটি সিরিজে সর্বাধিক সেঞ্চুরী

১৭টি (অস্ট্রেলিয়া ৯ এবং ইংল্যান্ড ৮). স্থান—অস্ট্রেলিয়া, ১৯২৮-২৯

খেলায় উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরী

ইংল্যান্ডের পক্ষে

১৭৬ ও ১২৭—হার্বার্ট সার্টক্লিফ, মেলবোর্ণ, ১৯২৪-২৫

১৯৬৮ সালে কেনিংটন ওভাল মাঠে আয়োজিত ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার শেষ পঞ্চম টেস্ট ক্রিকেট খেলার একটি উত্তেজনা-পূর্ণ মুহূর্তে : অস্ট্রেলিয়ার জন ইনভেরারিটি তাঁর ৫৬ রানের মাথায় ইংল্যান্ডের ডেরেক আন্ডারউডের বলে এল-বি-ডব্লু হয়েছেন। ইংল্যান্ডের খেলোয়াড়দের সমবেত আবেদন আম্পায়ার মঞ্জুর করেছেন। খেলা ভাঙার নির্দিষ্ট সময়ের মাত্র ৬ মিনিট আগে ইংল্যান্ড নাটকীয়ভাবে অস্ট্রেলিয়াকে ২২৬ রানে পরাজিত করে শেষ টেস্ট পর্যন্ত টেস্ট সিরিজ ড্র রাখে।

১১৯* ও ১৭৭—ওয়াল্টার হ্যামন্ড, এডিলেড, ১৯২৮-২৯

১৪৭ ও ১০৩*—ডেনিস কম্পটন, এডিলেড ১৯৪৬-৪৭

অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে

১৩৬ ও ১৩০—ওয়ার্ডউইক বার্ডস্‌লে, ওভাল, ১৯০৯

১২২ ও ১২৪*—আর্থার মরিস, এডিলেড, ১৯৪৬-৪৭

* নট আউট

দলগত সেঞ্চুরী

অস্ট্রেলিয়া : ১৫৩টি

ইংল্যান্ড : ১৬৩টি

লাঞ্চের পূর্বে সেঞ্চুরী

অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে (৩ জন) : ভি টি ট্রাম্পার (১০৪ রান), ম্যাঞ্চেস্টার, ১৯০২; সি জি ম্যাকার্টনি (১৩১ রান), লিডস, ১৯৩০; ডন ব্র্যাডম্যান (৩৩৪), লিডস, ১৯৩০

দ্রষ্টব্য : যে রান তুলে খেলোয়াড় আউট হন তা বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হয়েছে।

ইংল্যান্ডের পক্ষে : লাঞ্চের পূর্বে কেউ সেঞ্চুরী করেন নি

একটি খেলায় সর্বাধিক সেঞ্চুরী

৭টি (ইংল্যান্ড ৪ ও অস্ট্রেলিয়া ৩), নটিং-হাম, ১৯৩৮

এক ইনিংসে সর্বাধিক সেঞ্চুরী

৪টি—ইংল্যান্ড (ই পেন্টার ২১৬ নট-আউট, সি জে বার্নেট ১২৬, ডেনিস কম্পটন ১০২ এবং লেন হাটন ১০০) নটিং-হাম, ১৯৩৮

ফ্রেডী ট্রুম্যান (ইংল্যান্ড)

ব্যক্তিগত ৩০০ রানের ইনিংস

অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে : (১) ডন ব্র্যাডম্যান ৩৩৪ রান (লিডস, ১৯৩০) এবং ৩০৪ রান (লিডস, ১৯৩৪); (২) বব সিম্পসন ৩১১ রান (ম্যাঞ্চেস্টার, ১৯৬৪); (৩) বব কাউপার ৩০৭ রান (মেলবোর্ণ, ১৯৬৫-৬৬)

ইংল্যান্ডের পক্ষে : লেন হাটন ৩৬৪ রান (ওভাল, ১৯৩৮)

এক দিনের খেলায় সর্বাধিক রান

(ব্যক্তিগত রান)

৩০৯ রান—ডন ব্র্যাডম্যান (অস্ট্রেলিয়া), লিডস, ১৯৩০ (আজও 'বিশ্বরেকর্ড' হিসাবে গণ্য)

দ্রষ্টব্য : প্রথম দিনের ৩৪০ মিনিটের খেলায় অস্ট্রেলিয়ার মোট ৪৫৮ রানের মধ্যে ব্র্যাডম্যানের ছিল নট-আউট ৩০৯ রান। প্রথম দিনে লাঞ্চের আগেই ব্র্যাডম্যান সেঞ্চুরী করেন।

লাঞ্চের সময় তাঁর রান ছিল ১০৫।

এক দিনে সর্বাধিক রান

(দলগত রান)

৪৭৫ রান (২ উইকেটে)—অস্ট্রেলিয়া, প্রথম দিন, ওভাল, ১৯৩৪

এক সিরিজে সর্বাধিক উইকেট

ইংল্যান্ড : ৪৬টি (গড় ৯.৬০)—জিম লেকার, ১৯৫৬

অস্ট্রেলিয়া : ৩৬টি গড় (২৬.২৭)—এ মেইলী, ১৯২০-২১

একটি খেলায় সর্বাধিক উইকেট

ইংল্যান্ড : ১৯টি (৩৭ রানে ৯ ও ৫৩ রানে ১০)—জিম লেকার, ম্যাঞ্চেস্টার, ১৯৫৬ (আজও বিশ্বরেকর্ড)

অস্ট্রেলিয়া : ১৪টি (৪৬ রানে ৭ ও ৪৪ রানে ৭)—এফ আর স্পোফোর্থ, ওভাল, ১৮৮২

এক ইনিংসে সর্বাধিক উইকেট

ইংল্যান্ড : ১০টি (৫৩ রানে)—জিম লেকার, ম্যাঞ্চেস্টার, ১৯৫৬ (আজও বিশ্বরেকর্ড)

অস্ট্রেলিয়া : ৯টি (১২১ রানে)—এ মেইলী, মেলবোর্ণ, ১৯২০-২১

হ্যাটট্রিক

ইংল্যান্ড : ডব্লিউ বেটস (মেলবোর্ণ, ১৮৮২-৮৩); জে ব্রিগস (সিডনি, ১৮৯১-৯২) এবং জে টি হিয়ার্ণ (লিডস, ১৮৯৯)

অস্ট্রেলিয়া : এফ আর স্পফোর্থ (মেলবোর্ণ, ১৮৭৮-৭৯), এইচ ট্রাম্বল (মেলবোর্ণ, ১৯০১-২) এবং এইচ ট্রাম্বল মেলবোর্ণ, ১৯০৩-৪)

টেস্ট সিরিজের পাঁচটি খেলায় জয়

অস্ট্রেলিয়া ১৯২০-২১ সালের টেস্ট সিরিজে ৫—০ খেলায় ইংল্যান্ডকে পরাজিত করে এই দুর্লভ সম্মান প্রথম লাভ করে। এখানে উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে একটি টেস্ট সিরিজের পাঁচটি খেলায় জয়লাভের নজির মাত্র চারটি আছে। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ইংল্যান্ডের এই রকম জয়ের নজির নেই।

দুই দিনে জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি

অস্ট্রেলিয়া ১৯২১ সালে নটিংহামের প্রথম টেস্টের দ্বিতীয় দিনে ৩টোয় মধ্যে ইংল্যান্ডকে ১০ উইকেটে পরাজিত করে।

রব্ কাউপার (অস্ট্রেলিয়া)

জিম লেকার (ইংল্যান্ড)

অসাধারণ জয়

১৯৪৮ সালে লিডস মাঠের ৪র্থ টেস্টে ইংল্যান্ড দ্বিতীয় ইনিংসের ৩৬৫ রানের মাথায় (৮ উইকেটে) খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করার পর অস্ট্রেলিয়া তাদের দ্বিতীয় ইনিংসে ৪০৪ রান (৩ উইকেটে) সংগ্রহ করে শেষ পর্যন্ত ৭ উইকেটে জয়ী হয়। এখানে উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে এক দলের দ্বিতীয় ইনিংস সমাপ্তি ঘোষণার পর তাদের বিপক্ষ দল শেষ পর্যন্ত খেলায় জয়লাভ করেছে এমন নজির মাত্র চারটি আছে।

লেন হাটন (ইংল্যান্ড)

রিচি বেনো (অস্ট্রেলিয়া)

প্রথম নজির

ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট ক্রিকেট খেলার বিভিন্ন বিষয়ে যে-সব প্রথম নজির সৃষ্টি হয়েছে তারই কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নজির নীচে দেওয়া হল।

প্রথম বাটিং, প্রথম রান, প্রথম বাউন্ডারী এবং প্রথম সেঞ্চুরী — চার্লস ব্যানারম্যান (অস্ট্রেলিয়া), মেলবোর্ণ মার্চ ১৫, ১৮৭৭

প্রথম 'ডবল' সেঞ্চুরী—২১১ রান—ডব্লিউ মার্ডক (অস্ট্রেলিয়া) ওভাল, ১৮৮৪

প্রথম 'ট্রিপল' সেঞ্চুরী—৩৩৪ : ডন ব্র্যাডম্যান (অস্ট্রেলিয়া) লিডস, ১৯৩০

প্রথম 'হ্যাটট্রিক'—এফ আর স্পোফোর্থ (অস্ট্রেলিয়া), মেলবোর্ণ ১৮৭৯

প্রথম এক ইনিংসে ৫০০ রান : ৫৫১—অস্ট্রেলিয়া, ওভাল, ১৮৮৪

CENTRAL LIBRARY

খেলাধুলা

দর্শক

কোচবিহার ট্রফি

দিল্লীর ফিরোজ শা কোটলা মাঠে আয়োজিত ১৯৭০ সালের সর্বভারতীয় আন্তঃআঞ্চলিক স্কুল ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফাইনালে পশ্চিমাঞ্চল স্কুল দল ৭১ রানে উত্তরাঞ্চল স্কুল দলকে পরাজিত করে কোচবিহার ট্রফি জয়ী হয়েছে। পশ্চিমাঞ্চল স্কুল দল শেষ ট্রফি জয়ী হয়েছিল ১৯৬৬ সালে। সেমি-ফাইনালে পূর্বাঞ্চল দল প্রতিযোগিতা থেকে নাম প্রত্যাহার করায় পশ্চিমাঞ্চল দল ওয়াক-ওভার পায়। অপর দিকে সেমি-ফাইনাল খেলায় উত্তরাঞ্চল ৬১ রানে গত বছরের চ্যাম্পিয়ান দক্ষিণাঞ্চলকে পরাজিত করে ফাইনালে উঠেছিল।

ফাইনাল খেলার প্রথম দিনে পশ্চিমাঞ্চল দলের প্রথম ইনিংস ১১৭ রানের মাথায় শেষ হলে উত্তরাঞ্চল দল ৫ উইকেটের বিনিময়ে ১১৩ রান সংগ্রহ করে। ফলে উত্তরাঞ্চল দল মাত্র ৪ রানের ব্যবধানে পিছিয়ে থাকে, হাতে জমা থাকে প্রথম ইনিংসের ৫টা উইকেট। পশ্চিমাঞ্চল দলের প্রথম ইনিংস অল্প রানে শেষ হলেও উত্তরাঞ্চল দলকে গোড়ারদিকে বেশ বিপর্যয়ের মুখে পড়তে হয়েছিল। মাত্র ১৪ রানের মাথায় তাদের ৪র্থ উইকেট পড়ে যায়। শেষ পর্যন্ত ৫ম উইকেটের জুটিতে অধিনায়ক পার্থিভন ওবেরয় (৫২ রান) এবং অনিল মাথুর ৯৭ রান তুলে দলকে সংকট থেকে উদ্ধার করেন। অনিল মাথুর প্রথমদিনে ৩১ রান সংগ্রহ করে অপরাজিত থাকেন। উভয় দলের পক্ষে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রান করেন পার্থিভন ওবেরয়। তাঁর ৫২ রানে ছিল ৬টা বাউন্ডারী এবং একটা ওভার-বাউন্ডারী।

দ্বিতীয় দিনে উত্তরাঞ্চল দলের প্রথম ইনিংস ১৪৯ রানের মাথায় শেষ হলে তারা ৩২ রানে অগ্রগামী হয়। অনিল মাথুর ৫১ রান করে আউট হন। পশ্চিমাঞ্চল দল ৩২ রানের পিছনে পড়ে দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নামে এবং ৭টা উইকেট খুইয়ে ১৬৯ রান সংগ্রহ করে। তাদের দ্বিতীয় ইনিংসের ৮৪ রানের মাথায় ৫ম উইকেট পড়ে যায়। ৭ম এবং অসমাপ্ত ৮ম উইকেটে জুটি মোট ৭৯ রান (যথাক্রম ৩৭ ও ৪২ রান) তুলে দেয়। দ্বিতীয় দিনের খেলার শেষে দেখা গেল পশ্চিমাঞ্চল দল ১৩৭ রানে অগ্রগামী এবং তাদের হাতে জমা ৩টে উইকেট।

তৃতীয় দিনে পশ্চিমাঞ্চল দলের দ্বিতীয় ইনিংস ১৯৮ রানের মাথায় শেষ হয়। জয়লাভের প্রয়োজনীয় ১৬৭ রান তুলতে উত্তরাঞ্চল দল দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নামে। কিন্তু তাদের দ্বিতীয় ইনিংস মাত্র ৮৭ রানের মাথায় শেষ হলে পশ্চিমাঞ্চল দল ৭১ রানে জয়ী হয়।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

পশ্চিমাঞ্চল দল: ১১৭ রান (জগদীশ ভগতকার ৩৪ রান। পার্থিভন ওবেরয় ১১ রানে ৫ এবং অরবিন্দ মাথুর ২৬ রানে ৪ উইকেট)

● ১৯৮ রান (রমেশ বোরদে ৩৬, এইচ কে শাহ ৩৪ এবং মহম্মদ ইকবাল ৪৭ নট আউট। অনিল মাথুর ৪৮ রানে ৪ উইকেট)

উত্তরাঞ্চল দল: ১৪৯ রান (পার্থিভন ওবেরয় ৫২ এবং অনিল মাথুর ৫১ রান। হানিফ কাপ্রু ৩২ রানে ৪ এবং বাকরানিয়া ৩৩ রানে ৩ উইকেট)।

● ৮৭ রান (বাকরানিয়া ২৪ রানে ৪ এবং বাকরার ৯ রানে ৩ উইকেট)

জাপানের জাতীয় টেনিস প্রতিযোগিতা

জাপানের জাতীয় টেনিস প্রতিযোগিতার পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনালে ১নং বাছাই মার্টিন মালিগান (ইতালী), মহিলাদের সিঙ্গলস ফাইনালে ১নং বাছাই ক্যাথি হার্টার (আমেরিকা) এবং পুরুষদের ডাবলসের ফাইনালে জাপানের ডেভিস কাপ জুটি জুনকেশী কোউরা এবং কাওয়ামোরী চ্যাম্পিয়ান হয়েছেন। পুরুষদের সিঙ্গলসের কোয়ার্টার ফাইনালে জাপানের বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র জুন কোন্দী অপ্রত্যাশিতভাবে ৬-৩, ৭-৫ ও ৮-৬ গেমে ভারতের প্রখ্যাত প্রবীণ খেলোয়াড় রমানাথন কৃষ্ণানকে পরাজিত করে শেষ পর্যন্ত ফাইনালে উঠেছিলেন। পুরুষদের ডাবলসের সেমি-ফাইনালে ভারতীয় জুটি কৃষ্ণান এবং শিব প্রকাশ মিশ্র ৬-৮, ৩-৬ ও ৬-৮ গেমে জাপানের কোউরা এবং কাওয়ামোরীর কাছে হেরে যান।

ডি সি এম ট্রফি

দিল্লীর কর্পোরেশন স্টেডিয়ামে ১৯৭০ সালের দিল্লী ক্লথ মিলস ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে ইরানের তাজ ক্লাব ৩—১ গোলে অন্ধ্র প্রদেশ পুলিশ দলকে পরাজিত করে উপর্যুপরি দু বছর ডি সি এম ট্রফি জয়ের গৌরব লাভ করেছে। খেলার ৪৭ মিনিটের মাথায় অন্ধ্র প্রদেশ পুলিশ দল গোল দিয়ে ১—০ গোলে এগিয়ে যায়। খেলার শেষদিকে ৯ মিনিটের মধ্যে (৭৭, ৮১ ও ৮৬ মিনিটের মাথায়) তাজ দল পর পর তিনটি গোল দেয়। তাজ দলের পক্ষে রক্ষণভাগের খেলোয়াড় পার্সিভল দুটি গোল করেন।

সেমি-ফাইনালে তাজ ক্লাব ৪—৩ গোলে ইণ্ডিয়ান এয়ার ফোর্স এবং অন্ধ্র প্রদেশ পুলিশ ২—১ গোলে নেপালের কাটামণ্ডু একাদশ দলকে পরাজিত করে ফাইনালে উঠেছিল।

এশিয়ান মহিলা বাস্কেটবল প্রতিযোগিতা

কুয়ালালামপুরে আয়োজিত তৃতীয় এশিয়ান মহিলা বাস্কেটবল প্রতিযোগিতায় গতবারের রাণার্স-আপ জাপান অপরাজিত অবস্থায় চ্যাম্পিয়ান হয়েছে। মোট ৯টি খেলায় জাপানের জয় ৯ এবং পয়েন্ট ১৮। জাপান ৫৮—৫৫ পয়েন্টে গতবারের চ্যাম্পিয়ান দক্ষিণ কোরিয়াকে পরাজিত করে। এখানে উল্লেখ্য, ১৯৬৫ সালের প্রথম এবং ১৯৬৮ সালের দ্বিতীয় এশিয়ান মহিলা বাস্কেটবল প্রতিযোগিতায় কোরিয়া চ্যাম্পিয়ান এবং জাপান রাণার্স-আপ হয়েছিল। এবারের প্রতিযোগিতায় মোট ১০টি দেশ যোগদান করেছিল। চূড়ান্ত লীগ তালিকায় সর্বশেষ স্থান পেয়েছে ভারতবর্ষ—সমস্ত খেলাতেই তাদের হার হয়েছে।

এখানে উল্লেখ্য এই তৃতীয় এশিয়ান বাস্কেটবল প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ান হওয়ার সুবাদে জাপান আগামী বছর ব্রেজিলে আয়োজিত বিশ্ব মহিলা বাস্কেটবল প্রতিযোগিতায় এশিয়া মহাদেশের পক্ষে যোগদানের যোগ্যতা লাভ করেছে।

প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়ের সম্মানলাভ করেছেন জাপানের তাকাকো আরাকাকী। যোগ্যতার বিচারে বাছাই তালিকায় যে ১০ জনকে স্থান দেওয়া হয়েছে তাদের মধ্যে জাপানের ৩ জন, দক্ষিণ কোরিয়ার ৩জন, তাইওয়ানের ২ জন, মালয়েশিয়ার ১ জন এবং ইন্দোনেশিয়ার ১ জন খেলোয়াড় আছেন।

চূড়ান্ত লীগ তালিকা

	খেলা	জয়	হার	পয়েন্ট
জাপান	৯	৯	০	১৮
দঃ কোরিয়া	৯	৮	১	১৭
তাইওয়ান	৯	৭	২	১৬
মালয়েশিয়া	৯	৬	৩	১৫
ইন্দোনেশিয়া	৯	৫	৪	১৪
থাইল্যাণ্ড	৯	৪	৫	১৩
সিঙ্গাপুর	৯	৩	৬	১২
হংকং	৯	২	৭	১১
ভিয়েৎনাম	৯	১	৮	১০
ভারতবর্ষ	৯	০	৯	০

এশিয়ান মোটর দৌড়

ইরানের তেহেরাণ থেকে পূর্ব পাকিস্তানের ঢাকা পর্যন্ত—৬,৭০০ কিলোমিটার (৪,২৫০ মাইল) দ্বিতীয় এশিয়ান মোটর দৌড় প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষের প্রতিযোগী নাসির হোসেন (বোম্বাই) প্রথম স্থান লাভ করেছেন। দ্বিতীয় স্থান পেয়েছেন লাওসিয়ান দল এবং তৃতীয় স্থান পশ্চিম পাকিস্তানের মহম্মদ সানাউল্লা। প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণকারী ৬২টি গাড়ীর মধ্যে ৪১টি গাড়ি গন্তব্যস্থলে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছিল।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩
হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

অসাধারণ রচনা অসাধারণ লেখক

সাহানা দেবীর
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের স্মৃতিকথা

মৃত্যুহীন প্রাণ ৪॥

কাজী নজরুল ইসলামের
শেষ সঞ্চয়

সন্ধ্যা মালতী ৪৲

লীলা মজুমদারের জীবনস্মৃতি

আর কোনখানে ৫৲
সুকুমার রায় ৪৲

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের
উপন্যাস

মক্ষীরাণী ৫॥ কাঞ্চনময়ী ৫॥

আশাপূর্ণা দেবীর

নয়ছয় ৫॥ রঙের তাস ৭৲

বিমল মিত্রের

কুমারী ব্রত ৫৲ সখী সমাচার ৬৲

কমল মিত্রের ভ্রমণ কাহিনী

কাশ্মীর থেকে কুমারীকা ৭৲

শঙ্কু মহারাজের ভ্রমণ কাহিনী

গঙ্গাসাগর ৮৲

প্রবোধকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভ্রমণ কাহিনী

যমুনোত্তরী হতে গঙ্গোত্তরী ও গোমুখ ৫৲

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ভ্রমণ কাহিনী

হিমালয়ের পথে পথে ৭৲
গঙ্গাবতরণ ৫৲

ডঃ সুকুমার সেনের ভূমিকা সম্বলিত ও
ডঃ ভবতারণ দত্ত সম্পাদিত
বিপুল ছড়ার সঙ্কলন

বাংলা দেশের ছড়া ১০৲

বিভূতি-রচনাবলী

১ম খণ্ড, ২য় খণ্ড, ৩য় খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে।
প্রতি খণ্ড ১৪৲ টাকা করিয়া

॥ কয়েকটি কিশোর সাহিত্য ॥

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের

কিশোর গ্রন্থাবলী ৪॥

সুখলতা রাওয়ের

কিশোর গ্রন্থাবলী ৪॥
গল্প আর গল্প ৪॥
নানানদেশের রূপকথা ৩৲

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

কিশোর গ্রন্থাবলী ৪॥

সুমথনাথ ঘোষের

কিশোর গ্রন্থাবলী ৪॥

লীলা মজুমদারের

নেপোর বই ৩॥

প্রভাতরঞ্জন রায়ের

তুষার মানবের সন্ধানে ৩৲

আশাপূর্ণা দেবীর

সেই সব গল্প ৬॥

॥ জরাসন্ধ ॥

ছায়াতীর ৫৲ পসারিনী ৪৲ লৌহকপাট ৭৲
পরশমণি ৫৲ ছবি ৪৲ জায়গা আছে ৪৲
লৌহকপাট (সম্পূর্ণ) ২০৲ বন্যা ৫৲

॥ প্রশান্ত চৌধুরী ॥

আলোকের বন্দরে ৪॥ ডাকো নতুন নামে ৪৲
কান পেতে শুনি ৫৲ ঘণ্টাকণ্টক ৪৲
নদী থেকে সাগরে ৮৲ গোধূলি রঙীন ৫৲
সেই মেয়ে সুজাতা ৭৲

মিত্র ও ঘোষ :: ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২ ফোন : ৩৪-৮৭৯১—৩৪-৩৪৯২

CHARMINAR
THE VAZIR SULTAN TOBACCO CO. LTD.
HYDERABAD DECCAN
৩৩ পয়সায় ১০টি
একটু জিরিয়ে নিন!
একটা চারমিনার খান
এতে পাবেন টোস্ট-করা
খাঁটি তামাকের স্বাদ।
চারমিনারের স্বাদের জন্যেই আজ এর
বিক্রী ভারতের মধ্যে সব চেয়ে বেশী!

CMVS.7-233

পিটার রঙ্গনাথমের

সাদা শিকারী কালো শিকার

[দাম নয় টাকা]

মদগর্বী শ্বেতাঙ্গ সাম্রাজ্যবাদীদের অসহায় কালো মানুষদের উপর বর্বরোচিত অত্যাচারের কাহিনী। বহু দুষ্প্রাপ্য ছবি সমেত

ওয়ার্ল্ড কাপের বই

নীলিমেশ রায়চৌধুরী

জুলে রিমের নেপথ্যে

[দাম চার টাকা]

১৯৭০ সালের মেক্সিকো আসরের তথ্যপূর্ণ বই। বহু ফটো দেওয়া আছে।

জ্ঞানতীর্থ

১, বিধান সরণী, কলিকাতা—১২

১০ম বর্ষ
৩য় খণ্ড

অমৃত

৩১ সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday 27th November, 1970 শুক্রবার, ১১ই অগ্রহায়ণ, ১৩৭৭ 40 Paise

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা		বিষয়	লেখক
২৪৪	চিঠিপত্র		
২৪৬	সাদা চোখে		—শ্রীসমদর্শী
২৪৮	দেশেবিদেশে		—শ্রীপুণ্ডরীক
২৫০	ব্যঙ্গচিত্র		—শ্রীকাফী খাঁ
২৫১	সম্পাদকীয়		
২৫২	পরলোকে রমন		
২৫৩	ফাঁদ	(গল্প)	—শ্রীপ্রলয় সেন
২৫৭	এই আমাদের দেশ		—শ্রীনন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
২৫৯	তুলসীচরিত	(উপন্যাস)	—শ্রীননীমাধব চৌধুরী
২৬৪	দুখের মেলা		—আবদুল জব্বার
২৬৬	সাহিত্য ও সংস্কৃতি		—শ্রীঅভয়ঙ্কর
২৬৯	বইকুণ্ঠের খাতা		—শ্রীগ্রন্থদর্শী
২৭০	পুরোন শহরের পুরোন কাহিনী		—শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ
২৭৭	নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে	(উপন্যাস	—শ্রীঅতীন বন্দ্যোপাধ্যায়
২৮০	নিকটেই আছে		—শ্রীসন্ধিৎসু
২৮৫	মনের কথা		—শ্রীমনোবিদ
২৮৮	জোয়াই	(কবিতা)	—শ্রীসুরজিত দাশগুপ্ত
২৮৮	হঠাৎ হঠাৎ স্পষ্ট	(কবিতা)	—শ্রীঅশোককুমার চট্টোপাধ্যায়
২৮৮	সুহৃদ্‌বরাসু	(কবিতা)	—শ্রীপরমেশ মজুমদার
২৮৯	নিজেরে হারায়ে খুঁজি	(স্মৃতিচিত্রণ)	—শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী
২৯৩	পোষা টিয়া	(গল্প)	—শ্রীমীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়
২৯৬	বিজ্ঞানের কথা		—শ্রীঅয়স্কান্ত
২৯৯	পিঞ্জর	(বড় গল্প)	—শ্রীসুভাষ সিংহ
৩০৬	অঙ্গনা		—শ্রীপ্রমীলা
৩০৭	গোয়েন্দা কবি পরাশর		—শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র রচিত
			—শ্রীশৈল চক্রবর্তী চি
৩০৮	জলসা		—শ্রীচিত্রাঙ্গদা
৩১০	প্রেক্ষাগৃহ		—শ্রীনান্দীকর
৩১৩	খেলার কথা		—শ্রীকমল ভট্টাচার্য
৩১৫	খেলাধুলা		—শ্রীদর্শক
৩১৭	ত্রৈমাসিক সূচীপত্র		

প্রচ্ছদ : শ্রীমনোজ বিশ্বাস

CENTRAL LIBRARY

চিঠিপত্র

'সজনের সকাল' প্রসংগে

বাংলা সাহিত্যে স্বাদ বদলের ক্ষেত্রে অর্থাৎ নতুন কিছু দেবার ব্যাপারে 'অমৃত' চিরদিনই সর্বাগ্রগণ্য। একনাই 'অমৃত' পাঠক সমাজে এত সমাদৃত। এর পরিচ্ছন্নতা, বিষয় নির্বাচন এবং মৌলিকত্ব আমাকে মুগ্ধ করে। সম্প্রতি আপনারা আরেকটি গল্প উপহার দিয়ে আমাদের চমকিত করেছেন। শ্রীচণ্ডী মণ্ডলের 'সজনের সকাল'-এর কথা বলছি, অস্বাভাবিক বন্যতার এর প্রতিটি সংখ্যাই আমি পড়েছি। সত্যি কথা বলতে কি এমন মৌলিক বাস্তবধর্মী বলিষ্ঠ মননশীল গল্প অনেকদিন আমি পড়িনি। বর্তমানকালের অধিকাংশ গল্পই পড়ে শেষ করার পর আর মনে থাকে না, কিছু চিন্তা করারও থাকে না। কিন্তু বর্তমান গল্পটি পাঠকের মনকে সজোরে নাড়া দেয়। লেখক যেভাবে জীবন-দ্বন্দ্বের কথা বলেছেন, বর্তমানের এত হতাশার মধ্যেও যে আশার দীপাবলী জ্বালিয়েছেন তা সত্যিই প্রশংসার যোগ্য।

জীবন-রসিক লেখকের জীবন-উপলব্ধি অপূর্ব। যেমন এক জায়গায়, '......মানুষের জীবন সকলে সমুদ্র মধ্যবর্তী এক-একটি দ্বীপের মত। মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছা কামনা-বাসনাগুলি হল ঐ দ্বীপবাসী পাখীগুলির মত।......ঐ পাখীগুলিকে ফিরে যেতে হবে...অসীম শূন্যতায়...মানুষের কামনা বাসনাগুলি ইচ্ছাগুলির পরিণাম ঐ পাখীগুলির পরিণামের মত।' তারপর আর এক জায়গায় বলছেন, 'জীবন ও মৃত্যু' এর মধ্যে 'মৃত্যু ভয়ঙ্কর সত্য হলেও তাকে অবহেলা করলে কোন ক্ষতি নেই। বরং অনেক লাভ। জীবনই একমাত্র সত্য হয়ে উঠবে।' লেখকের কাছে 'জীবনের সব রস মাটিতে, আকাশ শূন্য মায়া ছলনা।' সজন যেন আমাদেরই চারপাশে রয়েছে। রাত্রিকে ভালবেসে সে জীবনকে উপলব্ধি করেছে সম্পূর্ণ বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গিতে। এবুও কিন্তু সজনের জীবনে ট্রাজেডি এসেছে। ললিত আর লাবণ্যকে বিয়ে করেছে কিন্তু তাদের সুখী করতে পারে নি। হতাশায় ভেঙে পড়েছে। জীবন-দ্বন্দ্বের সার্থকতা খুঁজেছে। মুক্তির সন্ধান করেছে। এবং একদিন সমস্ত হতাশার সকালও হয়েছে। কিন্তু বড়ো দেরীতে। গল্পটি মার্জিত ভাষা, সুললিত গাঁথুনি এবং সর্বোপরি সমাপ্তটাও অপূর্ব। এমন মননশীল বাস্তব-জীবনধর্মী গল্প আমাদের উপহার দেবার জন্য শ্রীমণ্ডলের সংগে সম্পাদক মহাশয়কেও আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

—শ্যামসুন্দর ঘোষ
বাটানগর, স্টেশন রোড।

(২)

'অমৃত'-এ 'সজনের সকাল' পড়লাম। পড়েই অবাক হয়েছি—অতি তরুণ লেখক শ্রীচণ্ডী মণ্ডলের সুন্দর উত্তরণে। চণ্ডী মণ্ডলের 'মৃত্যুর পথে দুঃখ' ও 'ধান কাটার পর গল্প'—ছোটগল্প দুটি বেশ ভালো লেগেছিল, অবশ্য অন্য পত্রিকায়। 'অমৃত' সাপ্তাহিকে 'সজনের সকাল' মারফৎ তাঁর সংগে আবার সাক্ষাৎ। সামান্য কিছু ত্রুটি বাদে 'সজনের সকাল' একরকমের সুন্দর। আশা করছি, এই তরুণ লেখক একদিন সত্যিই সার্থক হবেন।

—আহসান জামিল
মুর্শিদাবাদ

শারদ সাহিত্য পরিক্রমা

বিগত কয়েক সংখ্যা থেকে অমৃতে 'শারদ-সাহিত্য পরিক্রমা' মনযোগ দিয়ে পড়েছি। বিশেষতঃ মফঃস্বলের লিটল ম্যাগাজিন পর্যায়ে প্রথমদর্শীর লেখাটি আমার কাছে অসম্ভব ভাল লেগেছে। ভাল লাগার কারণগুলি এই : (ক) প্রথমতঃ লেখক মফঃস্বল ও শহর এই দুইটি অঞ্চল সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে একে অপরের নির্ভরতা ও অবহেলার কথা নির্দ্বিধায় উল্লেখ করার উদার দৃষ্টিভঙ্গী। (খ) দ্বিতীয়তঃ তাঁর সহজ, অনাড়ম্বর, বাক্‌চাতুর্যহীন ঝরঝরে ভাষা। (গ) তৃতীয়তঃ মফঃস্বলের লিটল্‌ ম্যাগাজিনগুলোর প্রশংসা কথা তুলে ধরার অপরিসীম আন্তরিকতা। (ঘ) চতুর্থতঃ অবহেলিত মফঃস্বল সম্পর্কে লিখতে বসে খুঁটিনাটি তথ্য সংগ্রহে অসম্ভব পরিশ্রম।

কিন্তু পর্যবেক্ষক যখন কবি ও কবিতা বিষয়ক আলোচনা করতে গিয়ে মফঃস্বল ও বহির্বঙ্গের কথা বেমালুম ভুলে গেলেন, তখন তাঁর প্রতি অশ্রদ্ধা হওয়া অস্বাভাবিক নয় কি? এই আলোচনায় দেখা যায়, পাবক, অভিযান, উত্তরদিগন্ত, ত্রিভুজ, সপ্তর্ষীপা, সীমান্তিক, প্রান্তরেখা, মন্ত্রণা, তরাইদের কমোল এই সকল পত্রিকার লেখক-গোষ্ঠীর কারও সম্পর্কেই কোন আলোচনা বা মন্তব্য করা হয়নি। যদিও বা 'ত্রিবৃত্তকে' মনস্তুষ্টি করার জন্য উল্লেখ করা হয়েছে, তবুও এটুকু পরিষ্কার যে ঐ পত্রিকা-গোষ্ঠীর বিশেষতঃ উত্তর বাংলার লেখক-বৃন্দের কথা উল্লিখিত হয়নি। এই লেখায় (শারদ-সাহিত্য পরিক্রমা পর্যায়) উত্তর বাংলার লেখক এবং বহির্বঙ্গের লেখকরা স্থান পেলেন না কেন? তবে কি এই পূজোয় এ-সকল অঞ্চল থেকে কেউই ভাল লেখেন নি, কিংবা লিখতে পারেন না? আমার মনে হয় ঠিক তা নয়। মফঃস্বলের সবগুলো কাগজ লেখকের চোখের আওতায় আসেনি।

এই প্রসংগে উল্লেখ্য উত্তর বাংলার রণজিৎ দেব, সমীর চট্টোপাধ্যায়, নীরদ রায়, পুণ্যশ্লোক দাশগুপ্ত, অরুণেশ ঘোষ, দেবাশীষ চৌধুরী প্রমুখ তরুণতর কবি ইতস্ততঃ ভাল লিখে থাকেন। এবং আমি যতদূর জানি, রণজিৎ দেব ও নীরদ রায় এবার পূজোয় বিভিন্ন পত্রিকায় প্রচুর ভাল কবিতা লিখেছেন। অমৃতে এই পর্যায়ে এই দুইজন কবির নাম উল্লেখ না দেখে বিস্ময়ে হতবাক হলাম।

—অধী ঘোষ
তুফানগঞ্জ

(২)

আপনাদের 'শারদ-সাহিত্য পরিক্রমা' আমার খুব ভাল লাগছে। সাহিত্যের প্রতিটি বিভাগ নিয়ে শারদ-সাহিত্য প্রসংগে এরকম পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা আর কোন পত্রিকায় চোখে পড়ে না।

এই প্রসংগে একটা কথা বলতে চাই। কথাটা কবিতা-বিষয়ক। কবিতার আলোচনাটি খুবই সুচিন্তিত হয়েছে—অনেক পরিচিত অপরিচিত নাম দেখলাম। একটা নাম বোধহয় লেখার ভীড়ে আপনাদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে—সাধনা মুখোপাধ্যায়। যুগান্তর, অমৃত, একাকীন, নহবৎ, গঙ্গোত্রী আনন্দবাজার, দেশ, শনিবারের চিঠি, একক, উত্তরণ, গল্প-কবিতা প্রভৃতি কুড়ি-একুশ জায়গায় তাঁর কবিতা দেখলাম—প্রতিটি কবিতাই ছন্দের সৌকর্যে ও ভাবের আন্তরিকতায় নিটোল। অন্যান্য লেখার মধ্যে তাঁর লেখার স্বাতন্ত্র্য স্বতই চোখে পড়ে। বিশেষত যখন তিনি বলেন,

'তীরে বসে শুধু হল ছন্দের ঢেউ গোণাগুণি
নিষেধ পবার আর মন্দাক্রান্তা ভুজঙ্গপ্রয়াত
শব্দ-নিথর সমুদ্রে মত্তাহীন চারুতার মজে
দেওয়াই হলো না আজও সফল ও
দুর্নিবার ঝাঁপ...
(আত্মবাণী—গঙ্গোত্রী)

চিঠিপত্র

কিম্বা—

...'নর্মদা প্রত্যঙ্গগুলো তাইতো কূর্ম হয়ে
অসাড় বর্মে ফিরে আসে।...'
(রাত্রির শর্বাদিন—অনন্ত)

শ্রীমতী মায়া রায়,
কলিকাতা—৩৩

(৩)

অমৃতের (১০ম বর্ষ, ৩য় খণ্ড, ২৭শ সংখ্যা) 'শারদ সাহিত্য পরিক্রমা' বিভাগে কবিতা সম্পর্কিত আলোচনায় কয়েকজন তরুণ কবির উল্লেখ দেখলাম। এছাড়া গেল কয়েকজন তরুণ কবি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় উল্লেখযোগ্য কবিতা লিখেছেন—একথা অস্বীকার করা যায় না। যেমন অমিতাভ গুপ্ত (কল্পবাণী, কল্পক) এবং নিশীথ ভড়ের (প্রতিভা, দুই বাংলার কবিতা) কবিতার অন্তর্গত পাঠকমনকে স্পর্শ করে। 'বিশ্বাসই পৌঁছে দেয় শিখর পথে।' সুস্পষ্ট বক্তব্য দিয়ে পাঠককে ভাবিত করেন আপন ভাবনায় সমরেন্দ্রনাথ দাস (কল্পবাণী) সাম্প্রতিক পরিস্থিতি কল্যাণ চট্টোপাধ্যায়কে বিচলিত করে, তাই তিনি বলে ওঠেন—"এসো আমরা এবার পুরোনো বোধগুলো একবার ঝলসে নিই বিদ্রোহের আগুনে" (গাঙ্গোত্রী)। গৌতম মুখোপাধ্যায়ের কয়েকটি গীত-গন্ধ কবিতা ভাল লাগল। তুষার চৌধুরীর (রাঙামাটি, সপ্তর্ষির কবিতা) নিজস্ব বাকভঙ্গী গড়ে উঠছে। নিখিল বসু (কল্পবাণী), তপন মুখোপাধ্যায় (সপ্তর্ষির কবিতা) এবং গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়ের (কল্পক) কবিতায় আন্তরিকতা এবং গভীরতার চিহ্ন সুস্পষ্ট।

অঞ্জন সেন
কোলকাতা—২৯

'দৃশ্যপট সামনে' প্রসঙ্গে

'অমৃত' ১০ বর্ষ, ২৭ সংখ্যায় শ্রীদেবল দেববর্মার 'দৃশ্যপট সামনে' গল্পটি পড়ে অত্যন্ত আনন্দিত হলাম। লেখক এত সহজ ও সুন্দর ভাষায় গল্পটি লিখে অমৃত পত্রিকার পাঠক-পাঠিকাদের সত্যিই মুগ্ধ করেছেন। এই গল্পে সমীরণ ও নিশিকান্তর মধ্যে যে গভীর বন্ধুত্বের পরিচয় তা-ও সমাজ-জীবনে একটা রেখা টেনে দেয়। অপরদিকে মধ্যবিত্ত সমাজে চাকুরি না পেলে যে জীবন-যন্ত্রণা ও মথিত প্রাণের ব্যথা ফুটে উঠেছে জীবেন ও নর্মদার চরিত্রে, আজকের সমাজে পাশ করার পর চাকুরির জীবনে যে ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে এবং একটা ছেলে চাকুরি না পেলে কতটা বিপথগামী হয়ে পড়ে লেখক তা সুনিপুণ ভাবে বর্ণনা করেছেন। পরিশেষে, গল্পে নর্মদার চরিত্রটিও প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। কত সহজ ও সরলভাবে তিনি একজন অচেনা ব্যক্তিকে কাছে টেনে নিয়েছেন। নর্মদার মত মেয়েরা আজও আমাদের সমাজে, বাড়ীতে, রান্নার কাজ ছাড়া অধিক কিছু জোটে না। নর্মদার জীবনে চাকুরি না পাবার হতাশাই বেশী দেখা দিয়েছে। 'চাকরি হবে আমার'!—এই অংশটুকু পড়ে আমরা তাই মনে করতে পারি। শ্রীদেববর্মা বলিষ্ঠ শিল্পসত্তার গুণে গল্পের চরিত্র অঙ্কনে যে নতুন ভাবধারা নিয়ে পট-ভূমিকা রচনা করেছেন তা সত্যিই প্রশংসনীয়। এই ধরনের গল্প প্রকাশের জন্য সম্পাদক মহাশয়কে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও লেখককে জানাই অভিনন্দন।

স্বপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
শালবনী, মেদিনীপুর।

'নিকটেই আছে' প্রসঙ্গে

'সার্বসিভ পার্বলিশিং' আদর্শের ধ্বজাধারী এইসব ভণ্ড পুস্তক প্রকাশকদের সম্বন্ধে আমাদের কাছে যে সমস্ত সংবাদ আছে তা এই পত্রে জানাচ্ছি। যথা—এইসব অনামী অসাধু পুস্তক প্রকাশকেরা (বলা বাহুল্য কোনও নামী প্রকাশক নয়) লেখক-লেখিকা সংগ্রহের জন্যে মাঝে মাঝে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকেন। এবং বিজ্ঞাপনের উত্তরে শুধু কলকাতা নয়; দিল্লী-বোম্বাই, লক্ষ্ণৌ এলাহাবাদ প্রভৃতি সুদূর প্রবাস থেকেও আগ্রহী লেখক-লেখিকাদের উত্তর আসে। এদের মধ্যে কয়েকটি প্রকাশক আবার বিভিন্ন ভাষাভাষী নবাগত লেখক-লেখিকাদের রচিত ইংরাজী উপন্যাস-গল্প কবিতা, প্রবন্ধ ইত্যাদির পুস্তকও প্রকাশ করে থাকেন।

তারপর কিভাবে সেই সব তরুণ লেখক-লেখিকাদের প্রতারিত করে পথে বসানো হয় তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায়ের পত্রেই ব্যক্ত হয়েছে। এদের ফাঁদে পড়ে বহু তরুণ লেখক-লেখিকা নিয়তই প্রতারিত এবং প্রবঞ্চিত হচ্ছেন; আর সেই সব অনামী অখ্যাত পুস্তক প্রকাশকেরা অর্থ-প্রাচুর্যে দিন-দিন কেমন ফুলে-ফেঁপে উঠছে। অথচ তরুণ লেখক-লেখিকারা বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে থাকায় এই 'প্রতারণার ব্যাপারটা' একরকম লোকচক্ষুর অন্তরালেই থেকে যাচ্ছে।

অমিতরঞ্জন বসু,
বিষ্ণুপ্রিয়া বসু,
চন্দননগর, হুগলী।

'অমৃত' প্রসঙ্গে

কয়েকটি রমনীয় সংযোজনে 'অমৃত' অভিনব ও অনন্য। শ্রদ্ধেয় শ্রীনলিনীমাধব চৌধুরী মহাশয়ের লেখা 'তুলসীচরিত' স্বগুণে সুন্দর, অতুলনীয়। আপনাদের কৃতজ্ঞতা জানাই। শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের স্মৃতিচিত্রণ আমার মতো পুরোন স্মৃতিকথা শুনতে ও শোনাতে ভালবাসেন এমন পাঠকদের পক্ষে আনন্দদায়ক। 'এই আমাদের দেশ' প্রদর্শনীর জন্য শ্রীনন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। এবারের প্রসঙ্গে (২৭ কার্তিক সংখ্যা) গান্ধাদা তথা জিয়াগঞ্জ সম্বন্ধে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়—জিয়াগঞ্জের অধিবাসীরা দেশবন্ধু স্মৃতি তহবিলে সর্বাধিক দান করেছিলেন—স্বয়ং মহাত্মা গান্ধী দান সংগ্রহে এসেছিলেন এখানে। এখানকার বিশিষ্ট অধিবাসী ছিলেন বিদ্যাসাগর-জামাতা সূর্যকুমার অধিকারী, বিদ্যাসাগর কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ। তাঁর পৌত্র অধ্যাপক শ্রীসন্তোষকুমার অধিকারী বিশিষ্ট কবি ও প্রাবন্ধিকরূপে সুপরিচিত। খ্যাতনামা বিপ্লবী ও কবি শ্রদ্ধেয় শ্রীজগদানন্দ বাজপেয়ী মহাশয় জিয়াগঞ্জের স্থায়ী অধিবাসী। বহু মনস্বী পুরুষ ও বিপ্লবী দেশব্রতীর জন্মভূমি জিয়াগঞ্জ।

জোয়াকীম মিত্র,
কলকাতা—৩।

ত্রুটি স্বীকার

গত ২৮ সংখ্যায় অমৃতে প্রকাশিত 'ঠিকানা নেই' গল্পের লেখকের নাম হবে বোধিসত্ত্ব মৈত্রেয়। অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্যে আন্তরিক দুঃখিত।

শাদা চোখে

খুনোখুনি কলকাতার প্রাত্যহিক ঘটনা। শুধু খুন নয়, পরীক্ষা ভন্ডুলের কিম্বা স্কুল-কলেজে হামলার খবরও এই রোজ-নামচার অন্তর্ভুক্ত। হিংসাত্মক কাজকর্ম বেড়ে যাচ্ছে বলে প্রত্যেক প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলের নেতৃবর্গ বিশেষ চিন্তিত বোধ করছেন এবং অনেকেই ইতিমধ্যে সুস্পষ্ট বিবৃতির মাধ্যমে 'টেররিজম' যে প্রকৃত বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডকে স্তব্ধ করে দিয়ে ফ্যাসিবাদের পথ প্রশস্ত করে দেয় সে সম্পর্কে হুঁশিয়ারও করে দিয়েছেন। বামপন্থী দলগুলির নেতাদের কাছ থেকেই এই তত্ত্বগত বক্তব্য এসেছে। এবং তাঁরা 'নকশালপন্থীদের' গণআন্দোলনে অংশ গ্রহণ করুন জনাও আহ্বান জানিয়েছেন। অন্যদিকে কলকাতা ও শহরতলীর অগণিত অভিভাবক প্রতিনিয়ত এক উদ্বেগজনক অবস্থার মধ্যে সময় অতিবাহিত করছেন। শিক্ষায়তনসমূহে আক্রমণের ফলে শিক্ষা-ব্যবস্থা খানচাল হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। বিব্রত অভিভাবকরা তাঁদের পুত্র-কন্যাদের ভবিষ্যৎ ভেবে শঙ্কিত হয়ে উঠেছেন। এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণের পথ কি—এই প্রশ্নই আজ সকলের মনকে আচ্ছন্ন করেছে।

রাজ্য শাসনের দায়িত্ব যাঁদের হাতে তাঁরা মনে করছেন আইনের অপ্রতুলতা বা বিশেষ ক্ষমতা সম্পন্ন আইন হাতে না থাকার ফলে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ যথাযথভাবে 'দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন' করতে পারছেন না। তাই পুলিশের হাতে আরও ক্ষমতা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা উপলব্ধি করে এবং বিপন্ন পশ্চিম বাংলার 'আইন-শৃঙ্খলা' ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে জননিরাপত্তা বিল ও আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য আর একটি বিল আনয়নের চেষ্টা চলছে। দেখা যাচ্ছে — বিল দুটি লোকসভায় বামপন্থী দলগুলির বিরোধিতার ফলে উত্থাপন করা যাচ্ছে না। তাই কেন্দ্রীয় সরকার রাষ্ট্রপতির স্বীকৃতি নিয়ে অর্ডিন্যান্স হিসাবে বিল দুটি কার্যকর করার চেষ্টা করছেন।

ঐ বিল দুটির উপযোগিতা সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বে কলকাতায় প্রতিনিয়ত যা ঘটছে অর্থাৎ যে খুনোখুনি চলছে সে সম্পর্কে একটু আলোচনা করা দরকার। কারণ, ঘটনার পারিপার্শ্বিক ও গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা না থাকলে প্রশাসনিক যন্ত্রকে আরও অধিক ক্ষমতা দেওয়ার আদৌ প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা—তা যাচাই করা কঠিন হবে। একথা সত্য যে, কলকাতার রাস্তায় পুলিশ খুন হচ্ছে। এমন কি ইতিমধ্যে একজন সেক্রেটারী পর্যায়ের উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী খুন হয়েছেন। সাধারণ নাগরিক হিসাবে দেখলে এই সমস্ত ঘটনা স্বভাবতই আতঙ্কিত করে তোলে। সঙ্গে-সঙ্গে আবার একথাও ভাবা দরকার যে, পুলিশের গুলীতেও ত অনেক তরুণ প্রাণ হারাচ্ছেন। দোষী-নির্দোষীর প্রশ্ন না তুলেও বলা যায় অনেক মানুষই ত মরছে। এবং এটাই হচ্ছে ঘটনা। কখন কিভাবে পুলিশ গুলী চালাচ্ছে সেই তর্কের মধ্যে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। মৃত্যুর খতিয়ানই প্রমাণ করছে কারা প্রাণ হারাচ্ছে।

এমতাবস্থায় এটা পরিষ্কার প্রণিধান করা যায় যে, পুলিশের হাতে এখনও প্রচুর ক্ষমতা আছে। আত্মরক্ষার্থে হোক বা অন্য কোন কারণেই হোক, দেখা যাচ্ছে পুলিশ গুলী চালাতে পারেন। ফলে, অনেকে প্রাণও হারাচ্ছেন। এরপরও যদি মনে করা হয় পর্যাপ্ত ক্ষমতা প্রশাসনের হাতে নেই তবে একটু বেশী বলা হয় নাকি? পি ডি আইন অনুসারে বিনা-বিচারে বন্দী রাখা যেত। বর্তমানে যে সমস্ত ব্যক্তিকে সন্দেহবশতঃ ধরা হচ্ছে, তাঁদের আটকে রাখা যাচ্ছে না বলেই নতুন আইন করে ক্ষমতা দেওয়ার জন্য দাবী জানানো হয়েছে। যাহোক, অর্ডিন্যান্স হয়ে বিলগুলি আইনের রূপ নিলে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ নাকি বর্তমান অবস্থার অবসান ঘটাতে পারবেন বলে আশা রাখেন।

বামপন্থীদের উদ্বেগ এই কারণে যে, আইন দুটি কার্যকর হলে রাজনৈতিক দলগুলির বিরুদ্ধে প্রকারভেদ না করেই ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হবে। ফলে, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে যাবে। এবং পুলিশের হাতে আরও ব্যাপক ক্ষমতা দেওয়া হলে তাঁরা নাকি অধিকতর প্রমত্ত হয়ে সন্ত্রাসের রাজত্ব চালাবেন। এই আশঙ্কাও অমূলক না হতে পারে।

বামপন্থীরা এর বিরোধিতা করছেন বটে। কিন্তু রাজ্যপাল শ্রীশান্তিস্বরূপ ধাওয়ান তাঁদের আন্তরিকতা সম্পর্কে সন্দিহান। শ্রীধাওয়ান কয়েকদিন পূর্বেই অষ্টবামের প্রতিনিধিবৃন্দকে বলেন যে, যুক্তফ্রন্টের আমলের পি ডি অ্যাক্ট পশ্চিমবঙ্গে পুনরায় চালু করার জন্য যুক্তফ্রন্ট সরকারের পক্ষ থেকেই অভিমত দেওয়া হয়েছিল। শ্রীধাওয়ানের কথা শুনে অষ্টবামের প্রতিনিধিদের নাকি চেহারা পাল্টে গিয়েছিল, তর—হাটে হাঁড়ি ভাঙলো বলে। কিন্তু বুদ্ধিমান বামপন্থী নেতারা নাকি তখনই বলেছিলেন যে, যদি কোন মন্ত্রী নিজ দায়িত্বে আটক আইন পুনরায় চালু করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়ে থাকেন, তবে সে-দায়িত্ব যুক্তফ্রন্টের নয়। কারণ ফ্রন্টের তরফ থেকে ঐরকম প্রস্তাব রাখা হয়নি। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, তদানীন্তন যুক্তফ্রন্টের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু মহাশয়ই পি ডি অ্যাক্টের স্বপক্ষে মত প্রকাশ করেছিলেন। পি ডি অ্যাক্ট স্বরূপ সমদর্শী কখনও বলেনি, এখনও বলছে না। সমাজবিরোধীদের শায়েস্তা করার জন্য এ হেন আইনের প্রয়োজনীয়তা নিশ্চয় আছে। তবে এর দোষ-ত্রুটি নির্ভর করে তাঁদের ওপর যাঁরা এই আইনকে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করবেন। পি ডি অ্যাক্টের কোথাও লেখা নেই গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক আন্দোলন যাঁরা করবেন, তাঁদের বিরুদ্ধে এই আইনের কঠিন ধারাগুলি প্রয়োগ করা হবে। বামপন্থীরা ভয় করছেন এই কারণেই যে, অতীতে তাঁদের বিরুদ্ধে আইনটি প্রয়োগ করা হয়েছিল। কাজেই এমন কোন গ্যারান্টি নেই যে, আবার তাঁরা এই আইনের শিকার হবেন না।

যাহোক, আইনদুটির বিরোধিতা তাঁরা করলেও বর্তমান অবস্থার প্রতিষেধক কি বা তার বিকল্পই বা কি এ-সম্পর্কে কেউ কোন সুস্পষ্ট বক্তব্য রাখেননি। পশ্চিমবাংলার মুখ্য রাজনৈতিক দল সি পি এম নকশালপন্থীদের সমাজবিরোধী বলে আখ্যা দিচ্ছেন। আগে নকশালপন্থীদের সম্পর্কে তাঁদের বক্তব্য ছিল যে, রাজনৈতিক উপায়ে জনসাধারণের কাছ থেকে উগ্রপন্থীদের বিচ্ছিন্ন করতে হবে। কিন্তু বর্তমানে ঐ কৌশল সম্পর্কে সি পি এম মোটেই সোচ্চার নন। বরং উগ্রপন্থীদের সমাজবিরোধী আখ্যা দিয়ে আইন-শৃঙ্খলার বিষয়বস্তু করে তুলেছেন। অর্থাৎ পরোক্ষে পুলিশ একশানের কথা বলছেন। অন্যদিকে আবার পরীক্ষা চলুক এবং বিদ্যায়তনে হামলা বন্ধ করতে হবে ইত্যাদি কথাও বলছেন। কিন্তু দলের তরফ থেকে কি কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তা অদ্যাবধি জানানো হয় নি। মুখে বললেও উগ্রপন্থীদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অন্ততঃপক্ষে এই ইস্যু নিয়ে নামতে নিমরাজী বলে মনে হয়।

ডানপন্থী কম্যুনিস্টরা উগ্রপন্থীদের এক দফা উপদেশ দিয়েছেন। তাঁরা উগ্রপন্থীদের এই সমস্ত কাজ থেকে বিরত হয়ে গণ-আন্দোলনে মদত করবার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। আর এস পি, ফরওয়ার্ড ব্লক, এস এস পি, এস ইউ সি, সকল দলই বিদ্যায়তনে হামলা ও ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদের নিন্দা করেছেন দ্ব্যর্থহীন ভাষায়। আর জনসাধারণকে বলেছেন যে, এ সমস্ত হঠকারিতার প্রশ্রয় দেওয়া আদপে উচিত নয়। কিন্তু তাঁদের দলের তরফ থেকে কোথাও কোন প্রত্যক্ষ প্রতিরোধ গড়ে তুলবার জন্য নেতৃত্ব দিয়েছেন বলে শুনা যায় নি। যেখানে প্রতিরোধ ঘটেছে তাও দলীয় নীতির ফলশ্রুতি নয়। দলের ব্যক্তিবিশেষ ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে পড়লে সেটা রাজনৈতিক রূপ পরিগ্রহ করে।

গণতান্ত্রিক দল হিসাবে একমাত্র বাংলা কংগ্রেস উগ্রপন্থী কার্যকলাপ দমনের জন্য একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। অবশ্য, সব রকম খুন-জখমেরই তাঁরা বিরোধী।

চাষী-জোতদার সংঘর্ষে যদি জোতদারও নিহত হয় তাহলে তাকে তাঁরা গণতান্ত্রিক আন্দোলন বলে আখ্যা দিতে নারাজ। বাংলা কংগ্রেসের বক্তব্য হচ্ছে, হিংসা ও খুনের রাজনীতি সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করতে হবে। কাজেই উগ্রপন্থীদের নিরস্ত করবার উদ্দেশ্যে তাঁরা যে প্রতিরোধ গড়ে তুলবেন এটাও স্বাভাবিক। বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে বিদ্রোহী পি এস পি, শাসক কংগ্রেস এবং এস এস পির কয়েকজন নেতা (এস এস পি সন্ত্রাসবাদের নিন্দা করলেও সরকারীভাবে বাংলা কংগ্রেসের আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হতে নারাজ) এই আন্দোলনে সামিল হয়েছেন, বাংলা কংগ্রেসের প্রচেষ্টায় কি পরিণতি হবে জানি না—তবে একথা সত্য যে, তাঁরা যা বলছেন সাধ্যমত তা কার্যে রূপান্তরিত করবার চেষ্টা করছেন। হয়তঃ বাংলা কংগ্রেসকে একলা একটি বড় রকমের ঝুঁকি নিতে হচ্ছে। কিন্তু রাজনৈতিক-ভাবে উগ্রপন্থীদের বিচ্ছিন্ন করতে হলে গণ-প্রতিরোধ ত গড়ে তুলতেই হয়। নতুবা পুলিশের হাতে নিরাপত্তার ভার অর্পণ করে নিশ্চেষ্ট থাকতে হয়। অন্য উপায় কি আছে? তবে প্রশ্ন হচ্ছে যেখানে কি বামপন্থী বা কি দক্ষিণপন্থী সকলেই একমত—সেখানেও দেখা যাচ্ছে মিলিতভাবে কাজ করতে অনেক দলই নারাজ। শ্রীসুশীল ধাড়ার আমন্ত্রণের প্রত্যুত্তরে শ্রীঅশোক ঘোষ বলেছেন, বিদ্যা-য়তনে হামলা বন্ধ করার জন্য বেছে বেছে রাজনৈতিক দলকে ডাকলে চলবে না। মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টিসহ সকল দলকেই আহ্বান জানাতে হবে। এই প্রস্তাবে কি প্রতিক্রিয়া ঘটেছে জানা যায় নি। তবে একথা সুস্পষ্টভাবে বলা যায়, যে কোন কায়দায় জোট বাধার জন্য দলগুলি আঁকুপাঁকু করছেন। ফলে, ইস্যুর প্রতি সিনসিয়ারিটির অভাব দেখা যাচ্ছে। এই প্রসঙ্গে আরও একটা উদাহরণের উল্লেখ করা যেতে পারে। কিছুদিন আগে ওয়ার্কার্স পার্টির তরফ থেকে এক-জন প্রতিনিধি সমস্ত বামপন্থী দলগুলির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে কিভাবে শরিকী সংঘর্ষ ও রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড বন্ধ করা যায় তার জন্য একটি গোল টেবিল বৈঠকের আবেদন জানান। এই প্রস্তাবের মূলেও ছিল কিভাবে সি পি এম ও অন্যান্য বামপন্থী দলগুলিকে পুনরায় এক জায়গায় মিলিত করে আবার আলাপ-আলোচনায় রাজী করানো যায়। ওয়ার্কার্স পার্টি সি পি এম জোটভুক্ত। সি পি এম বর্তমানে যে বিচ্ছিন্নতাময় পরিবেশে ভুগ-ছেন তা কাটানোর জন্য ঐ প্রস্তাব রচিত হয়েছিল বলে অনেকেই মন্তব্য করেছেন। নতুবা যে ইস্যুকে কেন্দ্র করে যুক্তফ্রন্ট সরকারের অকাল-মৃত্যু ঘটল সেই সমস্যা নিয়ে হঠাৎ এ রকম বৈরীভাবাপন্ন দল-গুলির মধ্যে মিলনের চেষ্টা চালাবার তাৎপর্য কি? আসল ব্যাপার হচ্ছে জোট বাঁধবার জন্য পরিবেশ সৃষ্টির পরিকল্পনা রচনা করা, অন্য কিছু নয়।

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে যে কোন সমস্যা নিয়ে মত বিনিময় বা আন্দোলনের কথা বলা হোক না কেন, সব কিছুরই উদ্দেশ্য হচ্ছে সেই এক—জোটে টান, শক্তি বাড়াও। তাতে যা ঘটুক না কেন, একমাত্র ব্যতি-ক্রম দেখা যাচ্ছে, শুধু পি ডি এ্যাক্ট ও জন-নিরাপত্তা বিলের সমর্থনের ব্যাপারে। প্রতিটি দল নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গী এই ব্যাপারে বজায় রাখার চেষ্টা করছেন। পি ডি এ্যাক্টের বিরোধিতার ব্যাপারে কেউ কাউকে আগে থেকে অনুরোধ করেন নি। ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে যেমন ভয় পায় তেমনিই বামপন্থী দলগুলি পেয়ে এক ঘাটে নৌকা ভিড়িয়েছে। বাংলা কংগ্রেসের সেই ভয় নেই। আর বামপন্থী হলেও পি এস পি মনে করে পশ্চিম বাংলায় বর্তমানে যে অবস্থার উদ্ভব হয়েছে তাতে এ ধরণের আইনের প্রয়োজনীয়তা আছে। নতুবা ইন্দিরাজী যে সমাজবাদের কর্মসূচী নিয়ে অগ্রসর হচ্ছেন তা ব্যাহত হতে বাধ্য। শাসক কংগ্রেসের প্রগতিশীল কর্মসূচী রূপায়ণ করতে হলে দলকে শক্ত হাতেই আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হবে। এ যুক্তি অস্বীকার করবার নেই। কিন্তু দুঃখ হয় সি পি আই-এর জন্য। তাঁরা কি করে ইন্দিরাজীর হাত শক্ত না করে বিরোধীদের সঙ্গে গাটছড়া বাঁধলেন, তা বোঝা কঠিন। অবশ্য সি পি আই-এর একটি মোক্ষম যুক্তি আছে। সেটা হচ্ছে তাঁদের নীতি হল প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে ইন্দিরাজীকে শক্ত, সবল করা। এখন সেই প্রতিক্রিয়াশীলরা আদি কংগ্রেস, স্বতন্ত্র ও জনসংঘই যখন ইন্দিরাজীকে সমর্থন করছেন তখন সি পি আই-এর বিরোধী দলভুক্ত হওয়া ছাড়া গত্যন্তর কি? তাই বলছিলাম নিজ নিজ দলীয় কারণেই ভূমিকার ব্যতিক্রম ঘটছে। কাজেই বেকায়দায় পড়ে এক ঘাটে ভিড়লেও কিম্বা একসঙ্গে বাম-ডান করলেও জোট-বন্দীর কথা এই মিল দু'টিকে উপলক্ষ করে উঠবে না। কারণ, অন্তরে অন্তরে সকলেই চান সতীনের ছেলেকে দিয়ে সাপ খেলাতে। নিজের ছেলের উপর নিজের যে [illegible] বলছেন, পশ্চিমবঙ্গে ৭৮ [illegible] করে ইন্দিরাজীর এবং তাঁর সরকারের [illegible] যেন অপকর্মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবেন।

—সমদর্শী

বর্তমান যুগের সর্বাধুনিক উপন্যাস—আপনাদের লাইব্রেরীতে রাখুন

সমুদ্রের হাওয়া—সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় ৫৲

সূর্যের সন্তান—শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৲

পশু ও প্রেমিক—দীপক চৌধুরী ৫৲

খড়িমাটির স্বর্গ—দীপক চৌধুরী ৭৲

অরণ্য বহ্নি—তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৷৷৹

জবাব দিহি—সুভাষ চক্রবর্তী ৪৲

রাঙ্গামাটির পাহাড়ে—শৈলেশ দে ৩৷৷৹

অগ্নিকন্যা—ধনঞ্জয় বৈরাগী ৭৲

দুশ্চিন্তাহীন নতুন জীবন—ডেল কার্নেগী ৩৷৷৹

নাটক—ফেরারী ফৌজ—উৎপল দত্ত ৩৲

ধনঞ্জয় বৈরাগী

এক পেয়ালা কফি—৩৲ আর হবেনা দেরী—২৷৷৹

ফরিয়াদ—দীপক চৌধুরী ৩৲

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

অখণ্ড অমিয় শ্রীগৌরাঙ্গ ১ম—৮৷৷৹, ২য়—৮৲

পৃথিবীর ইতিহাস—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ১৬৲

গ্রন্থবিকাশ, ২২/১, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬

দেশে বিদেশে

ভাঙ্গা কংগ্রেস কি আবার জোড়া লাগবে ?

শাসক কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীজগজীবন রাম বলছেন, 'আমাদের দরজা তো খোলাই আছে।'

বিরোধী কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা বলছেন, তাঁর দলের তরফ থেকে দুই কংগ্রেসের পুনর্মিলনে উদ্যোগী হওয়ার কথাই ওঠে না। আর দুই কংগ্রেসের ঐক্যসাধনে সহায়তা করার জন্য তাঁর দলের কারও রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করারও প্রশ্ন উঠতে পারে না। 'আসল প্রশ্নটা হচ্ছে, শ্রীমতী গান্ধী এখন পর্যন্ত যা করেছেন তার জন্য তিনি দুঃখপ্রকাশ করবেন কিনা এবং তাঁর সমগ্র রাজনৈতিক মনোভাব বদলাবেন কিনা।'

দুই তরফের নেতাদের কথা শুনলে অন্তত মনে হবে যে, এক পক্ষ দাঁতে খড় ধরে আত্মসমর্পণ না করলে ভাঙ্গা কংগ্রেস আর জোড়া লাগবে না।

কিন্তু বিরোধী কংগ্রেস দলের কয়েকজন সদস্য ব্যাপারটাকে এখোনি অবাস্তব বলে মনে করছেন না। করলে ওঁরা দুই কংগ্রেসের মিলনের জন্য এভাবে প্রস্তাব দিতেন না। শুধু যে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে তাই নয়, এই প্রস্তাবের ভিত্তিতে বিরোধী কংগ্রেস দলের মধ্যে রীতিমত একটা আন্দোলন গড়ে উঠতে পারে, এমন সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছে।

এই ঐক্য প্রস্তাব কয়েকটি কারণে সবিশেষ গুরুত্ব লাভ করছে। কারণগুলি হল : ১। যাঁরা এই প্রস্তাব দিচ্ছেন তাঁরা নিতান্ত মামুলি সদস্য নন। এ'দের মধ্যে পার্লামেন্টের সদস্য আছেন, এমন কি লোকসভায় বিরোধী কংগ্রেস দলের চীফ হুইপও আছেন। তাছাড়া মহীশূরের দুজন মন্ত্রীও দুই কংগ্রেসের ঐক্যের প্রস্তাব দিয়েছেন। ২। এই ঐক্যপ্রয়াসের পিছনে বিরোধী কংগ্রেস দলের কয়েকজন উপরতলার নেতার হাতও যেন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। গুজরাটে ঐক্যপন্থী বিরোধী কংগ্রেসীরা প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি শ্রীইউ এন ঢেবরকে তাঁদের নেতা হিসাবে পেয়েছেন বলে খবর পাওয়া গেছে। লোকসভায় বিরোধী কংগ্রেস দলের নেতা ডাঃ রাম-সুভগ সিং ও উত্তরপ্রদেশের বিরোধী কংগ্রেস নেতা শ্রীচন্দ্রভান গুপ্তের প্রচ্ছন্ন সমর্থন আছে বলে কোন কোন মহল অনুমান করছেন। ঐক্যপ্রস্তাবে অন্যতম স্বাক্ষরকারী লোকসভায় বিরোধী কংগ্রেস দলের চীফ হুইপ শ্রীশিউনারায়ণ নিজে শ্রীচন্দ্রভান গুপ্তের বিশেষ অনুগত। তিনি দুই কংগ্রেসের ঐক্যের আহ্বান জানানোতে ওয়ার্কিং কমিটি অখুশী হয়েছেন। তা সত্ত্বেও তিনি আর একটি বিবৃতি দিয়ে দুই কংগ্রেসের ঐক্যের জন্য কাজ করে যাবেন বলে জানিয়েছেন। শুধু তাই নয়, শ্রীশিউনারায়ণ নাকি ইতিমধ্যে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করে এসেছেন এবং এই সাক্ষাৎকারের সময় শ্রীমতী গান্ধী নাকি শ্রীচন্দ্রভান গুপ্তের খুব প্রশংসা করেছেন। ৩। শাসক কংগ্রেসের কয়েকজন সদস্য ইতিমধ্যে এই ঐক্যপ্রস্তাবে সাড়া দিয়েছেন এবং দুই তরফের ঐক্যপন্থীদের নিয়ে একটি সর্বভারতীয় সম্মেলন আহ্বানেরও প্রস্তুতি চলছে বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে।

গত এক বছরের মধ্যে কয়েকবার দুই কংগ্রেসের পুনর্মিলনের কথা উঠেছে। কিন্তু সে সব কথা কখনই খুব বেশী দূর এগোয় নি। এবারও যে এটা কথার কথাই হয়ে থাকবে না তা বলা যায় না। যদিও ব্যাপারটা এবার অনেক দূর গড়িয়েছে।

কংগ্রেসের ইতিহাসের বিয়োগান্ত পরিণতিটিকে মিলনান্ত পরিণতি দেবার এই চেষ্টা এখন নূতন করে শুরু হল কিনা তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে কিছু কিছু জল্পনা-কল্পনা চলছে। একটি গবেষণা হল এই যে, দুই কংগ্রেসের রাজনীতি যে খাতে বয়ে চলেছে তাতে দুই তরফেরই কিছু কিছু সদস্য উদ্বেগ বোধ করেছেন। কংগ্রেসকে কম্যুনিস্টদের সমর্থনের উপর নির্ভর করতে হোক এটা যেমন এক তরফের সদস্যরা চাইছেন না, তেমনি অন্য তরফের সদস্যরা চাইছেন না যে, কংগ্রেস, জনসঙ্ঘ ও স্বতন্ত্র পার্টির মুঠোর মধ্যে গিয়ে পড়ুক। এই দুই বিপরীত প্রবণতা থেকে উদ্ধার করে কংগ্রেসকে মধ্যপথে রাখার আগ্রহেই হয়ত ঐক্যপন্থীরা আসরে নেমেছেন। দ্বিতীয় আর একটি অনুমান হচ্ছে, এই সব ঐক্যের কথা বলার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে দুই কংগ্রেসের সম্ভাব্য বন্ধুদের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করা। দুধে-জলে মিশে গেলে অন্যপন্থ আঁটি পড়ে থাকতে পারে—এই ভাবনায় সি পি আই, জনসঙ্ঘ, স্বতন্ত্র পার্টি ইত্যাদি সকলেই বেসামাল হয়ে উঠতে পারে, এই অঙ্ক কষেই হয়ত দুই কংগ্রেসের ঐক্যের কথা চালু করা হচ্ছে। তৃতীয় আর একটি অনুমান এই যে, বিরোধী কংগ্রেস দলের সাধারণ সদস্যরা অনেকেই দলের কোন ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছেন না এবং তাঁরা সময় থাকতে থাকতে শাসক কংগ্রেসে ভিড়ে পড়বার সুযোগ নিতে চাইছেন। তাঁদের ঐক্যপ্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা হলে তাঁরা শাসক কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার অজুহাত পাবেন।

*

এখন এটা ক্রমে পরিষ্কার হয়ে আসছে যে, পূর্ব পাকিস্থানের সমুদ্রকূলবর্তী জেলাগুলির উপর দিয়ে যে প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস বয়ে গেছে সেটা মানবেতিহাসের না হলেও, বিংশ শতাব্দীর ভয়ঙ্করতম প্রাকৃতিক বিপর্যয়। খুলনা, নোয়াখালি, বরিশাল, চট্টগ্রাম প্রভৃতি জেলায় প্রকৃতির রুদ্ররোষ মহাপ্রলয়ের ধ্বংসস্বাক্ষর রেখে গেছে। কত গ্রাম যে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, কত মানুষ যে মারা গেছে তার কোন নির্ভরযোগ্য হিসাব এখন পর্যন্ত তৈরী হয় নি। সর্বশেষ সরকারী হিসাবে বলা হচ্ছে, মৃত্যুর সংখ্যা ৪১ হাজার, কিন্তু বেসরকারী হিসাবে মৃত্যুর সংখ্যা পনের লক্ষের বেশী হতে পারে বলে বলা হয়েছে। যাঁরা জীবিত আছেন তাঁরাও চারিদিকে গলিত মৃতদেহের মধ্যে বুভুক্ষায়, রোগে, মহামারীতে মৃত্যুর দিন গুনছেন।

এই ঘূর্ণিঝড়ের অব্যবহিত পরে বিধ্বস্ত এলাকার উপর দিয়ে উড়ে গিয়ে একজন বিমানচালক সংবাদ দেন যে, বিধ্বস্ত এলাকার আয়তন হাজার বর্গমাইল এবং কতকগুলি অঞ্চলে জীবনের চিহ্নমাত্র নেই।

এই ভয়ঙ্কর দুর্যোগের খবর পাওয়া মাত্র ভারতের রাষ্ট্রপতি শ্রীভি ভি গিরি ও প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী দুঃখ ও সহানুভূতি প্রকাশ করে পাকিস্থানে বাণী পাঠিয়েছেন। দুর্গতদের মধ্যে ত্রাণকার্যের জন্য ভারত সরকার প্রথমে পাঁচ লক্ষ টাকা সাহায্য দেওয়ার কথা ঘোষণা

করেছিলেন, পরে সাহায্যের পরিমাণ বাড়িয়ে এক কোটি টাকা করা হয়েছে।

ঘটনার চারদিন পরে সাংবাদিক সম্মেলনে একটি বিবৃতি দিয়ে পূর্ব পাকিস্থানের রিলিফ কমিশনার বলেন যে, মোহানা এলাকার দ্বীপগুলিতে যে সব ত্রাণকর্মীর দল গিয়ে পৌঁছেছেন তাঁদের প্রথম কাজই হচ্ছে হাজার হাজার মৃতদেহ কবর দেওয়া। পচা-গলা লাশের দুর্গন্ধের মধ্য দিয়ে এবং বাঁশ ও গাছপালায় বোঝাই জলপথের উপর দিয়ে পাকিস্থানী সেনাবাহিনীর হেলিকপ্টার উড়ে যাচ্ছে এবং নৌবাহিনীর জাহাজগুলি ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই বিপর্যয়ে যে সব অঞ্চল সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেগুলির মধ্যে অন্যতম হচ্ছে হাতিয়া দ্বীপ। ঘূর্ণিঝড়ের চারদিন পরে তিনখানি জাহাজ ওষুধপত্র ও অন্যান্য সাহায্য নিয়ে ঐ দ্বীপে ভিড়বার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু দ্বীপের চারদিকে সমুদ্রের ঘূর্ণিপাক এখনও এমন প্রবল যে, জাহাজগুলি তাদের মাল খালাস করতে পারে নি।

পাকিস্থান বেতারের একটি খবরে বলা হয়েছে যে, ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে বিধ্বস্ত সমুদ্রোপকূলবর্তী ২৮৩৮ বর্গমাইল এলাকায় ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৩৮ কোটি টাকা। চট্টগ্রাম বন্দরের অদূরে ১৩টি দ্বীপে একজনও বেঁচে নেই। ভোলা দ্বীপের উপর বিমানে উড়ে গিয়ে দেখা গেছে, দশ লক্ষ অধিবাসীর এই দ্বীপের প্রায় সবকিছুই বিধ্বস্ত হয়েছে, গোটা দ্বীপটাই বিস্তীর্ণ জলরাশিতে পরিণত হয়েছে, ঐ জলরাশির মধ্যে এখানে-সেখানে শুধু দুই-এক টুকরো জমির আভাষ পাওয়া যাচ্ছে।

মানপাড়া নামক দ্বীপে প্রথম ত্রাণকর্মী গিয়ে পৌঁছলে যে মানুষগুলি বেঁচে গেছেন তাঁরা ভেজা, ছেঁড়া জামাকাপড় পরে এসে খাবার ও বিশুদ্ধ পানীয় জলের জন্য কাকুতি-মিনতি জানাতে থাকেন। শবের লাশে সমস্ত জলাশয়ের জল দূষিত হয়ে গেছে। সর্বশেষ খবরে প্রকাশ, এই দূষিত জল ব্যবহার করে বিধ্বস্ত অঞ্চলের মানুষগুলি কলেরায় আক্রান্ত হচ্ছেন।

বিশ্ব ব্যাঙ্কের ১৪ জন প্রতিনিধির একটি দল এই বিপর্যয়ের সময় পূর্ব পাকিস্থানের উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলিতে সফর করছিলেন। প্রথমে কয়েকদিন তাঁদের কোন খবর না পাওয়া যাওয়ায় তাঁদের সম্পর্কে উদ্বেগ দেখা দিচ্ছিল। পরে জানা গেল, তাঁরা অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছেন।

এই প্রতিনিধি দলের নেতা মিঃ এইচ পি ডুগান সেই ভয়ঙ্কর দুর্যোগ থেকে উদ্ধার পেয়ে ঢাকায় ফিরে এসে বলেছেন যে, তাঁরা যখন পাথরঘাট এলাকায় একটি বাঁধের কাজ পরিদর্শন করছিলেন (সমুদ্রোপকূলে এই বাঁধ নির্মাণে বিশ্ব ব্যাঙ্ক সাহায্য দিচ্ছেন) তখনই ঘূর্ণিঝড়ের লক্ষণগুলি প্রবল হয়ে উঠতে থাকে। রেডিও শুনে আমরা বুঝতে পারি যে, দারুণ একটা কিছু হতে চলেছে।

মিঃ ডুগান বলেন যে, ঐ এলাকায় বন্যা নিয়ন্ত্রণের কাজ শুরু হয়েছিল তাই রক্ষা। ঝড়ের সময় তাঁরা নিকটবর্তী একটি বাংলোতে গিয়ে আশ্রয় নিলেন।

তারপর ক্রমে ক্রমে বাংলোর একতলায় যখন কয়েকফুট জল দাঁড়িয়ে গেল তখন প্রতিনিধি দলের ১৪ জন (এঁদের মধ্যে বৃটেন, হল্যান্ড, স্পেন ও কানাডার মানুষ আছেন) বাংলোর দোতলায় উঠে গিয়েছিলেন।

পূর্ব পাকিস্থানের এই উপকূলবর্তী জেলাগুলির উপর দিয়ে গত কয়েক বছর যাবৎ বারবার এই ধরণের বিধ্বংসী ঝড় বয়ে যাচ্ছে। ১৯৬০ সাল থেকে এই নিয়ে দশবার ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক বান হল।

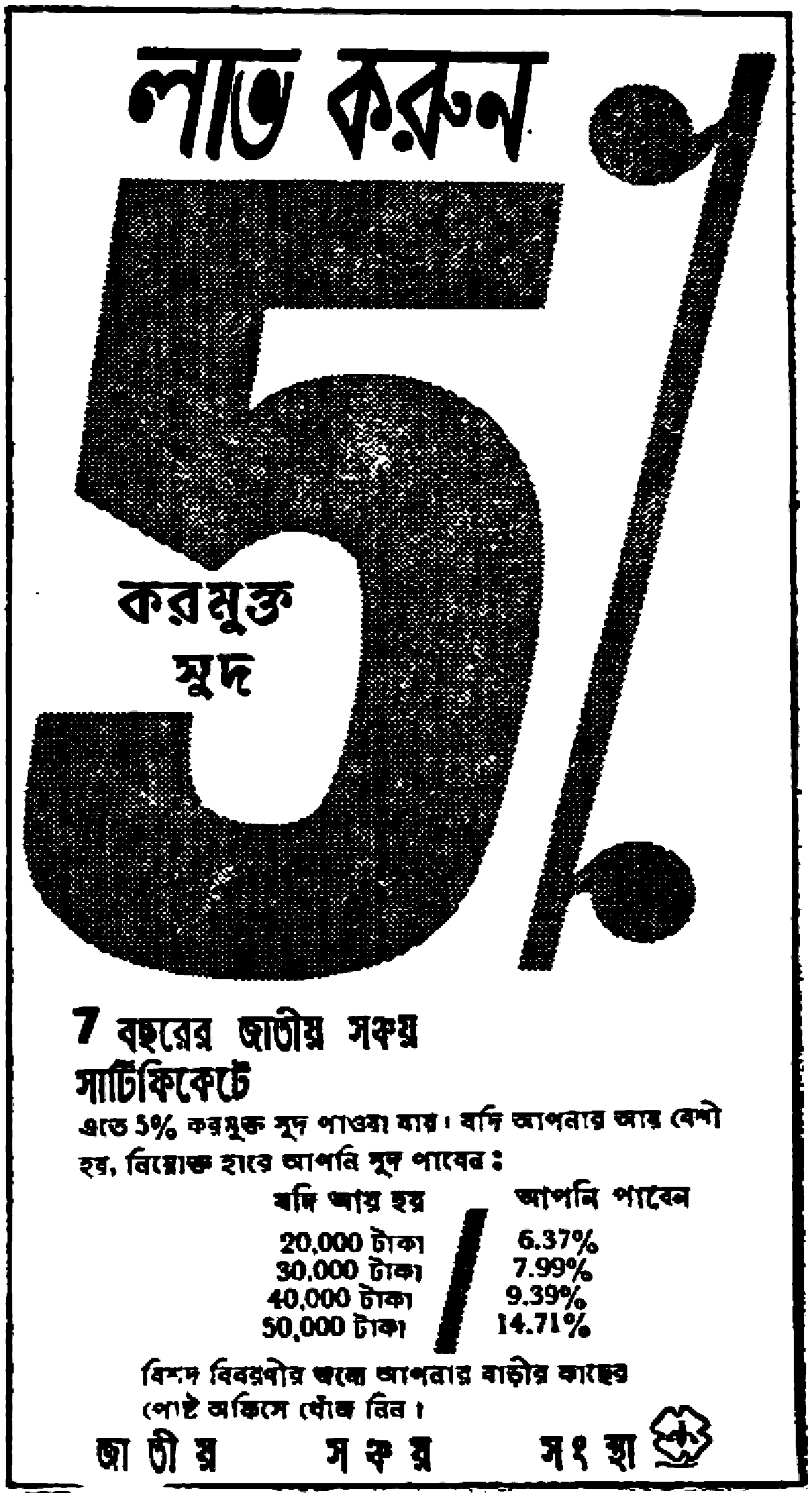

davp 70/305

এর আগের নবটি বন্যার সবন্ধে মোট ৫৫ হাজার জনের প্রাণহানি হয়েছিল।

এই অঞ্চলে ঝড় ও বানের সবচেয়ে পুরাতন উল্লেখ আছে 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে। সেটা ১৫৮৪ সালের ঘটনা।

পাকিস্তানের এই প্রলয়ঙ্কর বিপর্যয়ে তাকে সাহায্য করার জন্য পৃথিবীর ছোট-বড় নানা দেশ থেকে টাকা-পয়সা ও ত্রাণ-সামগ্রী এসে পৌঁছচ্ছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের সেক্রেটারী জেনারেল উ থান্ট ও প্রেসিডেন্ট এডওয়ার্ড হামব্রো সমস্ত সদস্য-রাষ্ট্রের প্রতি সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন। আন্তর্জাতিক রেডক্রস, ইউনেস্কো, বিশ্ব ব্যাঙ্ক প্রভৃতি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানও সাহায্যসম্ভার নিয়ে এগিয়ে এসেছেন।

এই সব সাহায্যসম্ভার ঢাকায় এসে জমা হলেও সেগুলি বিধ্বস্ত অঞ্চলে পৌঁছে দেওয়ার ব্যাপারে পাকিস্তান কর্তৃপক্ষকে কতকটা অসুবিধার মধ্যে পড়তে হচ্ছে। তার কারণ, যথেষ্ট সংখ্যক বিমান ও হেলিকপ্টার নেই। বিমান ও হেলিকপ্টার দিয়ে সাহায্য করার জন্য পাকিস্তান বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে আবেদন জানিয়েছে।

*

দক্ষিণ সমুদ্রের অভ্যন্তর থেকে উত্থিত এই ঝড় যখন পূর্ব পাকিস্তানের উপকূলকে আঘাত করেছিল তখন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁ ছিলেন পিকিং-এ।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের চীন সফরের শেষে যে যুক্ত বিবৃতি প্রকাশ করা হয়েছে সেটি একটি কারণে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সেই কারণটি হল এই যে, এই ইস্তাহারের কোথাও নাম করে ভারতের উল্লেখ করা হয় নি। অন্যান্য বারের মত এবারও চীন কাশ্মীরের জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার করে নিয়েছে এবং তদুপরি এবার আরও এক-পা বাড়িয়ে বলেছে যে, কাশ্মীর থেকে সৈন্য অপসারণ করার জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁ যে প্রস্তাব দিয়েছেন সেটা 'সকল দেশের সমর্থন পাওয়ার যোগ্য'। কিন্তু তাহলে ভারতবর্ষের নাম যে ইস্তাহারে উল্লেখ করা হয় নি এটা অনেকে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন।

আর একটি লক্ষ্য করার বিষয় হল এই যে, গঙ্গার জল সংক্রান্ত বিরোধে চীন সরাসরি পাকিস্তানের মত সমর্থন না করে শুধু এইটুকু বলেছে যে, পাকিস্তান যে শান্তিপূর্ণভাবে এই বিরোধের মীমাংসা করতে চাইছে চীন তার তারিফ করে। ইস্তাহারে একথাও স্পষ্ট করে বলে দেওয়া আছে যে, গঙ্গাজল সংক্রান্ত বিরোধের প্রসঙ্গটি উত্থাপন করেছিল পাকিস্তান।

কোন কোন পর্যবেক্ষক মনে করেন, এবারকার চীন-পাকিস্তান যুক্ত ইস্তাহারে এই বাকসংযম দেখান হয়েছে ভারতের কথাটা মনে রেখেই। চীন ভারতের সঙ্গে নিকটতর সম্পর্ক স্থাপন করতে চায় বলে যে ধারণার সৃষ্টি হয়েছে সেই ধারণা চীন নষ্ট করতে ইচ্ছুক নয়। সেই কথাটাই সম্ভবত সে এই ইস্তাহারের মধ্য দিয়ে প্রকারান্তরে জানিয়ে দিল।

২০-১১-৭০

—পুণ্ডরীক

সম্পাদকীয়

ইতিহাসের বৃহত্তম দুর্যোগ

পূর্ব পাকিস্তানের মানুষদের জন্য আমরা আজ গভীর বেদনা বোধ করছি। প্রায় প্রতি বছরই সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় আর জলোচ্ছ্বাসে পূর্ব পাকিস্তানের সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলসমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু এবারে তার ক্ষতির কোনো তুলনা নেই। মানব ইতিহাসে একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগে এত লোক একসঙ্গে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে কিনা সন্দেহ। মৃত্যু তার নখরচিহ্ন রেখে গেছে সর্বত্র। ভোলা, হাতিয়া, চরজব্বর ইত্যাদি অঞ্চলে প্রাণের চিহ্ন নেই বললেই চলে। যারাও জীবিত আছে সময়মত সাহায্যের অভাবে, ক্ষুধায়, তৃষ্ণায় এবং রোগে তাদের মৃত্যু অনিবার্য।

পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের এই মর্মান্তিক দুঃসময়ে আমরা ভারতবর্ষের ও এই বাংলার মানুষ তাদের সর্বপ্রকার সহযোগিতার জন্য প্রস্তুত। মানুষের দুর্দিনে মানুষ তার পাশে গিয়ে দাঁড়ায় এতেই মনুষ্যত্বের পরিচয়। আজ শুধু ভারত নয়, পৃথিবীর সকল দেশই এগিয়ে এসেছে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের সহায়তায়। ভারত তার সাধ্যমত সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। সংবাদ পাবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রধানমন্ত্রী পাঁচ লক্ষ টাকার সাহায্য ঘোষণা করেছিলেন। পরে দুর্যোগের ক্ষয়-ক্ষতির ভয়াবহতার বিবরণ জানবার পর এক কোটি টাকার সাহায্য ঘোষণা করেছেন। প্রয়োজনের তুলনায় এ অঙ্ক নিতান্তই সামান্য। কিন্তু এর দ্বারা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের প্রতি ভারতের জনগণের প্রীতি ও সৌহার্দ্যবোধই প্রকাশিত হয়েছে।

তাছাড়া পাকিস্তানে বিমানযোগে সাহায্য পৌঁছুতে হলে ভারতের ওপর দিয়ে বিমান চলাচলের ক্ষেত্রে নিয়ম-কানুন ভারত সরকার শিথিল করে দিয়েছেন। অথচ দুঃখের কথা এই যে, পাক-ভারত মৈত্রীবোধ ক্ষুণ্ণ করার উদ্দেশ্যে লণ্ডনের বি বি সি একটা মিথ্যা সংবাদ প্রচার করেছিল যে, ভারত পাকিস্তানগামী ইরানীয় বিমান ভারতের ওপর দিয়ে যেতে দিতে অযথা বিলম্ব করেছে। এই সংবাদ নিতান্তই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। ভারত সরকার নির্দেশ দিয়েছেন যে, পাকিস্তানগামী সমস্ত রিলিফ বিমানকে ভারতের ওপর দিয়ে যাবার সময় যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অনুমতি দেওয়া হবে। তার জন্য আন্তর্জাতিক বিমান চলাচলের নিয়মের কড়াকড়ি প্রযোজ্য হবে না।

মানুষের দুঃখের দিনেও রাজনৈতিক অপপ্রচারের এই প্রচেষ্টা অত্যন্ত নিন্দনীয়। আমরা আশা করি যে, পাকিস্তান সরকার বিদেশীদের এই অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হবেন না। এবং ভারত সরকারের কাছে খোঁজ না নিয়ে পাক-বেতারে এ ধরনের ভারত-বিরোধী সংবাদ প্রচার করতে দেবেন না।

পাকিস্তান দুই প্রান্তে বিভক্ত হওয়ায় পাকিস্তান সরকারের পক্ষেও ত্রাণকার্য ত্বরান্বিত করা কঠিন হয়ে পড়েছে। ঝড়-বিধ্বস্ত এলাকায় ত্রাণকার্য চালাবার জন্য দরকার হেলিকপ্টারের। মার্কিন সরকার ছটি হেলিকপ্টার পাঠিয়েছেন। কিন্তু পাকিস্তান সরকারের নিজস্ব হেলিকপ্টার পশ্চিম পাকিস্তানে থাকায় তা সময়মত সেখানে তাঁরা পাঠাতে পারলেন না। প্রত্যক্ষদর্শীর যে-বিবরণ ঢাকার সংবাদপত্রাদিতে প্রকাশিত হয়েছে তাতে জানা যায় যে, ঘূর্ণিঝড়ের এক সপ্তাহ পরেও বিধ্বস্ত এলাকায় হাজার হাজার মৃতদেহ সমাধিস্থ করার কোনো ব্যবস্থা হয় নি। তার ফলে গলিত শবদেহের দুর্গন্ধে বাতাস ও জল বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। যারা জীবিত আছে তাদের কাছে রিলিফ কর্মীরা পৌঁছুতেই পারছেন না। জীবিতরা খাদ্যের অভাবে এবং ওষুধের অভাবে মারা যাবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

সরকার মাত্র দেড় লক্ষ মৃতের সংখ্যা গণনা করতে পেরেছেন। ঢাকার সংবাদপত্রাদিতে মৃতের সংখ্যা দশ থেকে কুড়ি লক্ষ হবে বলে আশঙ্কা করা হয়েছে। বরিশাল, পটুয়াখালি, খুলনা ও দ্বীপগুলোর অবস্থা শোচনীয়। জীবিতরা বিবস্ত্র হয়ে পড়ায় মৃতদেহ থেকে কাপড়-জামা টেনে নিয়ে প্রাণরক্ষার চেষ্টা করছে। এদের উদ্ধারকার্যের জন্য যে-জনবল ও প্রশাসনিক দক্ষতা দরকার তা পাকিস্তান সরকার দেখাতে পারছেন না বলে অনেকে অভিযোগ করেছেন। সামরিক বাহিনী কেন প্রয়োজনীয় বিমান সরবরাহ করতে পারে নি, পাকিস্তানের রিলিফ কমিশনার সে-সম্পর্কে কোনো সন্তোষজনক উত্তর সাংবাদিকদের দিতে পারেন নি।

গত ২০ নভেম্বর পাকিস্তানের সর্বত্র ঘূর্ণিঝড়ে নিহতদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য জাতীয় শোকদিবস পালন করা হয়েছে। পাকিস্তানের এই দুর্দিনে আমরাও অন্তরের সমবেদনা জানাই। এ প্রসঙ্গে আমাদের প্রস্তাব এই যে, দুঃস্থ, আর্ত পূর্ববঙ্গবাসীদের সেবার জন্য ভারতের পক্ষ থেকে স্বেচ্ছাসেবীদল প্রেরণ করা হোক। পাকিস্তান সরকার যদি ভারতীয় রিলিফকর্মীদের পাকিস্তানে যাবার সুযোগ দেন তাহলে আমরা আশা করি এদেশ থেকে অনেক স্বেচ্ছাসেবী ও সেবা প্রতিষ্ঠান দুর্গত পূর্ব বাংলায় গিয়ে আর্ত মানবতার সেবায় আত্মনিয়োগ করতে পারবেন। পাক-ভারত মৈত্রীর এই সুযোগ যেন আমরা না হারাই। দুঃস্থের সেবাই মানবধর্ম। রাজনীতির প্রাচীর যেন সেই মানবধর্মের পথ রোধ করে না দাঁড়ায়।

পরলোকে রামন

বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ডঃ সি ভি রামন গত ২১ নভেম্বর বাংগালোরে মারা গেছেন। পদার্থবিদ্যায় তাঁর অবদান তাঁকে সর্বোচ্চ আন্তর্জাতিক খ্যাতি এনে দিয়েছিল। ভারতীয় সংস্কৃতির আকাশে তিনি ছিলেন উজ্জ্বলতম নক্ষত্র। শেষদিনটি পর্যন্ত বিজ্ঞানের অগ্রগতির অদম্য প্রচেষ্টায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন এবং তরুণদের মনে গবেষণা ও অনুসন্ধানের উৎসাহ জাগিয়েছিলেন। কিছুদিন আগে তিনি বলেছিলেন, 'বিজ্ঞানই আমার ধর্ম এবং আমি এর শেষ পর্যন্ত অনুসন্ধান করতে চাই।' তাঁর মৃত্যু যে আমাদের দেশের পক্ষে কি নিদারুণ ক্ষতি, তা অপরিমেয়। জাতীয় অধ্যাপক ও বিশিষ্ট পদার্থবিজ্ঞানী ডঃ সত্যেন বসু বলেছেন, রামনের মৃত্যু, 'এক বিরাট জাতীয় ক্ষতি এবং এর দ্বারা যে শূন্যতা সৃষ্টি হল তা পূরণ করা কঠিন।'

চন্দ্রশেখর ভেঙ্কটরামন ১৮৮৮ খৃঃ ৭ নভেম্বর তামিলনাড়ুর তিরুচিরাপল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা বিদ্যাধাপত্তনম-এর হিন্দু কলেজের গণিত ও পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক। শ্রীরামন সর্বোচ্চ ডিস্টিংসেনসহ ব্যাচেলার্স ও মাস্টার্স ডিগ্রী লাভ করেন। ১৮ বছর রামন শব্দবিজ্ঞান এবং আলোকবিজ্ঞানে মৌল গবেষণা শুরু করেন। ১৯০৬ খৃঃ 'নেচার' ও ফিলজফিক্যাল ম্যাগাজিনে তাঁর গবেষণার ফলাফল প্রকাশিত হয়। তখন রামনের বয়স মাত্র ১৮ বছর।

১৯০৭ খৃঃ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় রামন ভারতীয় অর্থ বিভাগে গেজেটেড অফিসার হিসাবে নিযুক্ত হন। এরপর দশ বছর তিনি ১৯১৭ খৃঃ পর্যন্ত ভারত সরকারের অফিসার হিসাবে কাজ করেন। কর্মস্থল বেশীরভাগ সময়ই ছিল কলকাতা। ১৯০৭ খৃঃ থেকেই রামন নেচার, ফিলজফিক্যাল ম্যাগাজিন এবং ফিজিক্যাল রিভিউ-এ বিজ্ঞান সংক্রান্ত গবেষণামূলক রচনা প্রকাশ করতে থাকেন।

১৯১৭ খৃঃ ভারতের বিদগ্ধ মহলের দৃষ্টি পড়ে রামনের প্রতিভার ওপর। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় নবসৃষ্ট পালিত চেয়ারের (পদার্থ) জন্য একজন যোগ্য ব্যক্তি খুঁজছিলেন। তিনি ডঃ রামনের সংগে যোগাযোগ করে উক্ত পদ গ্রহণের প্রস্তাব দেন। ডঃ রামন সাগ্রহে এ প্রস্তাবে সম্মতি দেন। ডঃ রামনকে পালিত অধ্যাপকের পদ দেওয়া হয়। সরকারী চাকুরীর মোহ ছেড়ে ডঃ রামন অধ্যাপনার কাজ গ্রহণ করেন। ১৯৩০ খৃঃ পর্যন্ত তিনি এই পদে নিযুক্ত থাকেন। এই সময় তিনি ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কাল্টিভেশন অব সায়েন্স-এর সেক্রেটারীও ছিলেন। কলকাতায় ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের গবেষণাগারেই ডঃ রামন তাঁর অধিকাংশ পরীক্ষামূলক কাজ সম্পাদন করেন।

১৯২১ সালে পালিত অধ্যাপক হিসেবে ডঃ রামন ইওরোপে যান অক্সফোর্ডে বৃটিশ সাম্রাজ্যাধীন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কংগ্রেসে যোগদানের উদ্দেশ্যে।

এই সময়ই এক ঘটনায় ডঃ রামন তাঁর যুগান্তকারী আবিষ্কারের সূত্র পান। জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে সমুদ্র দেখতে দেখতে হঠাৎ তাঁর মনে প্রশ্ন জাগে আকাশ ও সমুদ্র দুয়েরই রং নীল কেন? এই কৌতূহল ও জিজ্ঞাসারই পরিণতি হয় তাঁর আবিষ্কারে, যা 'রমণ এফেক্ট' নামে খ্যাত। এ বছরই ডঃ রামন আলোর প্রক্ষেপণ সম্পর্কে কাজ শুরু করেন এবং ১৯২৪ সালের মধ্যে তিনি এ বিষয়ে অনন্যসাধারণ খ্যাতি অর্জন করেন। কানাডায় অনুষ্ঠিত বিজ্ঞান সম্পর্কিত আলোচনাচক্র উদ্বোধনের জন্য আমন্ত্রিত হন।

১৯৩০ খৃঃ ডাঃ রামন নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। বৃটিশ সরকার তাঁকে নাইট উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি বৃটেনের রয়্যাল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হন। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডকটরেট ডিগ্রী দেন। ডঃ রামন নোবেল পুরস্কার বিজয়ী দ্বিতীয় ভারতীয়। তাঁর আগে এই পুরস্কার পান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯১৩ সালে।

বেশ কিছুকাল রামন তাঁর শিক্ষায়তন ও গবেষণাগার ডঃ রামনস্ ইনস্টিটিউটে বসবাস করতেন। গত একমাস তিনি তাঁর গবেষণা কাজ বন্ধ রেখেছিলেন। রামনস ইনস্টিটিউটের সামনের তুলাচ্ছাদিত প্রাঙ্গণে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে ডঃ রামনের মরদেহের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

—সংবাদিক

ফাঁদ

প্রলয় সেন

ছেলের দল রতনকে আবিষ্কার করেছিল শেষবেলায়। ওরা শহরতলীর দক্ষিণের মাঠে ফুটবল খেলছিল। মাঠের পুব-পশ্চিমে আড়াআড়ি, এদিকের রেললাইন থেকে দূরের বাসরাস্তা অব্দি মস্ত এক গড়খাই। বহুকাল হল সংস্কারের অভাবে অপরিচ্ছন্ন। তারপর বেশ কিছু উঁচুমতো জায়গা। কয়েকটা বাজেপোড়া মাথাভাঙা তালগাছ কালকাসুন্দে আশ্‌শ্যাওড়া কাঁটাঝোপ আর ইতস্তত জংলা গাছ-গাছালিতে দুর্গম। তারও পাশে নাবাল জমি, বর্ষায় জলছবি, নিষ্ফলা, আদিগন্ত ধু-ধু। ওখানো জঙ্গলে এক শিরীষগাছে রতন ঝুলেছিল।

রতন ঠিক কখন ওখানে গিয়েছিল বলা মুশকিল। শিরীষগাছের [illegible] দিক-কার এক পুরুষ্টু ডাল [illegible] ফাঁসো পাকিয়ে পাকিয়ে মোটা করে ফাঁসটা বেঁধেছিল রতন। তারপর [illegible] [illegible] পড়েছিল। এসব [illegible] সন্দেহ করেছিল। কেননা, [illegible] এতই নির্জন যে আত্মঘাতী হতে তাড়াহুড়োর কোন দরকার ছিল না। এদিকটায় লোকজন বড় একটা আসে না। শেয়ালের পাল দিনদুপুরেও ঘুরে বেড়ায়। বাতাসের সাড়া পেয়ে গোক্ষুর গর্ত থেকে বেরিয়ে ফণা তুলে হিসহিস শব্দ করে। কদাচিৎ এধারে যারা আসে তারা পেশায় মুদ্দাফরাস। এ অঞ্চলটা বহুকাল হল বেআইনী ভাগাড় হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসে। ওরা হাড়গোড়ের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়। তাছাড়া, শীতের দিকে কিছু কাঠকুড়োনীকেও দেখা যায়। অন্য বৃষ্টির দিনে কেউ এদিক মাড়াবে না—রতন জানত।

কণ্ঠনালীর মূল থেকে ফাঁসটা ওপাশের শিরদাঁড়ার গোড়া অব্দি চেপে বসেছিল। সময়টা শ্রাবণের শেষ। মেঘলা আকাশ। মাঝে মাঝে বৃষ্টি এসে রতনের [illegible] [illegible] অজস্র নদীনালা এঁকে [illegible] [illegible] জমি থেকে [illegible] ঝাপটা থেকে থেকে ছুটে এসে সারাটা দুপুর রতনকে নাড়িয়ে [illegible] করে দেওয়ার চক্রান্ত করেছে। দুপা নেড়া গাছের পাতা গোড়ালি থেকে ফলার মত ঢাল হয়ে নেমে। চুলের ডগা কানের নাচে নাগালে ধারা থুতনি এবং হাত পায়ের কুঁড়িটা আঙুল থেকে মটরদানার মত বৃষ্টিবিন্দু টুপটাপ করে পড়ে নিচের ডাটিগুলোকে চঞ্চল করে তুলেছিল। দুচোখ স্থির, অল্প নীল, ঈষৎ আয়ত দৃষ্টি যেন ভেতরের দিকে গোটানো। জিভের খানিকটা অংশ বাইরে বেরিয়ে যেন কেউ ইচ্ছের বিরুদ্ধে অদৃশ্য হাতে ভেতর থেকে টেনে বের করেছে। ঠোঁটের দুপাশে গাঁজলা, বৃষ্টিধারায় ধুয়ে দুপাশে রেখার মত চিবুক অব্দি নেমে এসেছে। পরনে খাকির প্যান্ট, আদুল গা, কোমরের ঘুনসিতে একটা ফুটো পয়সা। বাঁ-হাতে মস্ত একটা উল্কি। চোকো বুকের হাঁসুলিটা ফাঁসের নিচে কণ্ঠার দুই হাড়ের মাঝখানের গর্তে চেপে বসে। কিছু ডেঁয়ো পিঁপড়ে রতনের

শরীরের আনাচেকানাচে ইতস্তত ছোটাছুটি করছিল। বৃষ্টি ধরে আসতে একবার একজোড়া মাছরাঙা গড়খাইয়ের পানাশাক থেকে উঠে এসে রতনের কাঁধে বসে শরীর কাঁপিয়ে ডানা থেকে জল ঝেড়েছিল। তারপর ওর কণ্ঠার হাড়ে বারকয়েক ঠোঁট ঘসে জলকুরি নবাব বাঁধের দিকে উড়ে গিয়েছিল। রতনের মাথায় বৃষ্টির জলের সঙ্গে কিছু কুটো পাখির খসা পালক পড়ে চুলে জড়িয়ে ছিল। মাঝে মাঝে বৃষ্টি থেমে মেঘের কপাট ভেঙে সূর্যের আলো মাথার ওপরকার ছাতার মত প্রকাণ্ড সোনাকরা শিরীষগাছের পাতায় জাফরি ভেদ করে রতনের জলে ভেজা মসৃণ শরীরে ঝোপ ঝোপ আগুনের ফুলকির মত জ্বলছিল।

রতনদের আস্তানা এখান থেকে বেশ কিছুটা দূরে। রেলস্টেশনে উঠে উত্তরদিকে মুখ করে দাঁড়ালে বাঁদিকে বাজিও দাঁড়িয়ে দৃষ্টি প্রসারিত করলে রেললাইনের ধার ঘেঁসে সারিসারি দরমাচটা প্লাইউডে বেড়া খুপরি চোখে পড়বে। তারই একটায় রতন থাকত। রতনের বাপ নেই মা আছে। ওর যখন বয়েস বছর দুই কি তিন বাপ বিনোদ গড়াই নন্দরাণী আর তাকে নিয়ে দূরে কোন এক বনভাসি গাঁ থেকে হটে এসে এখানে ঠাঁই নিয়েছিল। বিনোদ গড়াই ট্রেনে মনোহারি বেচত। অনেক বছর আগেকার কথা, রতনের বয়েস তখন বড়জোর আট কি নয়, এ লাইনে ইলেকট্রিক ট্রেন চালু হয়নি, কামরা বদল করতে গিয়ে পা হড়কে চলন্ত গাড়ির তলায় পড়ে কেটে দুভাগ হয়ে গিয়েছিল। স্বামীর মৃত্যুর পর দিনকয়েক আছাড়ি-পিছাড়ি করে শেষমেশ নন্দরাণী গোবিন্দ মণ্ডল নামে এক মাতালকে ঘরে তুলতে বাধ্য হয়েছিল। বিনোদ গড়াই যখন মারা যায় নন্দরাণী তখন ভরাট বয়সের মেয়েমানুষ। সারা শরীরে যৌবন দপদপ করছে। সন্ধ্যের পর সেবস্তপাড়ার ছিঁচকেবাজ ছেলে-ছোকরারা বরাবর এই সব খুপরির আশেপাশে ঘুরঘুর করে। অন্ধকারটা একটু গেঁথে উঠলে খুপরি থেকে বেরিয়ে আসে কিছু বাহারের লোক। তারপর, অনেক রাত পর্যন্ত রেললাইনের ধারে বসে ওরা মাটির খুরিতে মিশি মদ ঢেলে মোচ্ছব বসায়। ওদেরই এক বখে যাওয়া ছোকরার দৃষ্টি পড়েছিল নন্দরাণীর ওপর। শুধু রাতের অন্ধকারেই নয়, দিনদুপুরেও রতনদের খুপরির চারপাশে ঘোরাফেরা করত। সুযোগ পেলে চোখ ঠেরে শিস দিয়ে অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করে নন্দরাণীকে ব্যতিব্যস্ত করত। উপায়ান্তর না দেখে শেষটায় গোবিন্দ মণ্ডলকে জুটিয়েছিল। গোবিন্দ কশাই চেহারায় জোয়ান মরদ। রীতিমত রাশভারি পালোয়ান মানুষ।

ছেলের দল রতনের হদিশই পেত না, যদি না একজন বলটা বেঁকা গোলপোস্ট ছাড়িয়ে গড়খাইয়ের কচুরীপানার জঙ্গলে যেত। তাদেরই মধ্যে একজন, হঠাৎ হঠাৎ বৃষ্টি নেমে মাঠ জলকাদায় পিছল হয়ে ওঠায় খেলা তেমন জমছিল না বলে মনমরা ছিল। দুঃসাহসিক বল ওঠার মত একটা মওকা পেয়ে সে তীরের বেগে গড়খাইয়ের দিকে ছুটে গিয়েছিল। হাঁটুজলে নেমে এদিক-সেদিক কচুরীপানার ভেতর দুলোমাছের মত দাপাদাপি করার সময় হঠাৎ ওধারের শিরীষ গাছে ঝুলন্ত রতনকে দেখতে পেয়েছিল। কিছুক্ষণ বাদে ডাঙায় উঠে বলটা মাঠের দিকে আনতাবড়ি শট করে বিকট চেঁচিয়ে উঠেছিল, কিল্-টু, কিল্টু,—

বিনোদ গড়াই মারা যাবার পর থেকেই রতন ক্রমশ বিগড়ে যেতে শুরু করল। ঘরে মন বসত না। সারাদিন বাইরে বাইরে [illegible] থাকত। গোবিন্দর অসাক্ষাতে নন্দরাণী ছেলেকে ধমকধামক দিত। তাতে ফয়দা হয়নি কিছুই। বরং দিনকে দিন কুসঙ্গে পড়ে রতন নষ্ট হয়ে যেতে লাগল। চায়ের দোকানে বয়ের কাজ, বাজারের মোড়ে খবরের কাগজ বিক্রি, ছোটখাটো মোট বওয়া ইত্যাদি থেকে শুরু করে লেকটার পয়সার লালচ বেড়ে যাওয়ায় তেরো বছরের ছেলে রতন দুর্দান্ত হয়ে উঠল। দলে ভিড়ে চোরা গোপ্তা ছিনতাই টুকটাক চুরি এমন কি পকেট কাটতে শিখে গেল। কানাঘুষোয় এসব কথা নন্দরাণী জানতে পারলেও গোবিন্দর কানে তুলত না কখনো। লোকটা এমনিতে চুপচাপ, সাতপাঁচ ঝুটঝামেলায় নেই, কিন্তু রেগে গেলে চণ্ডাল। তখন নন্দরাণীকেও থাপ্পড় বসাতে কসুর করে না। নন্দরাণী রতনের কুকীর্তি ঢেকে রাখবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করলেও কখনো-সখনো তার আড়াল টপকে কিছু কিছু গোবিন্দর কানে পৌঁছত। তখন ক্ষেপে গিয়ে গোবিন্দ রতনকে বেধড়ক পিটত। ছেলের হয়ে নীরবে চোখের জল মোছা ছাড়া আর কিছুই করার থাকত না নন্দরাণীর। প্রথম দিকটায় গোবিন্দ যে রতনের ওপর অকরুণ ছিল এমন নয়। বরং ছেলেটা অন্যের হলেও একদা নন্দরাণী ওকে পেটে ধরেছে এই ভেবে রতনকে সে সহজভাবেই গ্রহণ করেছিল। তাছাড়া, গোবিন্দর প্রতি নানাকারণেই নন্দরাণী কৃতজ্ঞ ছিল। নন্দরাণীর ব্যাপারে লোকটার টানভালবাসা ছিল যথেষ্ট। তাছাড়া, সুখশান্তি বলতে যা বোঝায় সেটুকু ওই লোকটার দৌলতেই সে খানিকটা পেয়েছিল। গোবিন্দ পাকা হাতের মিস্ত্রি, ভাল আয়। বিনোদ গড়াইও লোক খারাপ ছিল না। তবে; তার রোজগারে সংসারের আসান হত না। নন্দরাণীকে আশপাশের ভদ্রবাড়িতে ঠিকে ঝির কাজ করে সামাল দিতে হত। গোবিন্দর আমল থেকে ওসবের খাটুনি কমল। বাইরে বেরুতে হত না। যদিবা একটু সুখের মুখ দেখতে শুরু করেছিল নন্দরাণী, গেরো বাঁধল অন্যদিক থেকে। পেটের ছেলে শত্রুর হয়ে তাকে কাঁদাতে লাগল।

ছেলেটির আকাশফাটানো চিৎকারে খেলুড়েরা সচকিত হয়ে উঠল। কিল্টু,—যে দলের পাণ্ডা, ভীষণ একটা কিছু ঘটে গেছে ভেবে, সকলকে ঠেলেঠুলে গড়খাইয়ের দিকে ছুটে এল। বলল, কি হলরে ফুচী, চেঁচালি কেন। সাপেটাপে কামড়াল নিতো?—ফুচী দম নিতে গিয়ে বাক্যস্ফূর্তি না হওয়ায় দূর দাঁড়িয়ে ওধারের শিরীষ গাছটার দিকে হাত তুলল। ততক্ষণে মাঠের ছেলেরা পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। কিল্টু চোখ বড় করে বলে উঠল, তাই তো। একটা মানুষ মনে হচ্ছে—। সঙ্গে সঙ্গে পেছনের সবাই একযোগে গলা ছাড়ল, মানুষ! মানুষ!

কিল্টু লম্বা করে শিস কেটে একটা সিদ্ধান্তে আসতে চাইল। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে একটি ছেলেকে বলল, স্যাণ্টো, তুই বলটা নিয়ে আয়—।—কথা শেষ করেই ছুটে এক লাফে রেললাইনে উঠল। ছেলের দল হই হই করে দলপতির পিছু নিল। গড়খাইটা গজ তিরিশেক হবে। রেললাইনে উঠে ওধারে যেতে আরো কিছুটা বেশি হবে। ছেলের দল নিমেষে রেললাইনের পথটুকু কাবার করে ওধারে পৌঁছল।

রতনকে আজ নন্দরাণী শেষবারের মত দেখেছিল বেলা বারোটা নাগাদ। এর কিছুক্ষণ আগে রেললাইন আর নয়ানজুলির মাঝখানের ঘাসজমিতে তুলকালাম কাণ্ড ঘটে গেছে। গোবিন্দ বেরোয় ভোর ভোর। ফেরে মাঝবেলায়। তিলজলার এক কাঠগোলায় করাতের কাজ করে। এসে নাকেমুখে [illegible] দুটো গুঁজে ফের ছোটে। সকাল থেকেই রতন ওর জন্য অপেক্ষা করছিল। রতনকে এতটা মরীয়া হয়ে উঠতে নন্দরাণী এর আগে কখনো দেখেনি। গোবিন্দ আসতেই ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ও। গোবিন্দ অবলীলায় ওকে মাটিতে শুইয়ে ফেলে বুকের ওপর চেপে বসে বেদম পিটিয়েছে। তারপর ঘরে এসে ভাতের থালা কাছে টেনে গম্ভীর মুখে বলেছে, দেখলে তো তোমার গুণধর ছেলের কাণ্ডটা। এরপরেও ওকে ঘরে জায়গা দিতে চাও?—নন্দরাণী রা কাড়েনি। রান্নাঘরে গিয়ে তরকারির বাটি নিয়ে আসবার ফাঁকে ছিটেবেড়ার ফাঁক দিয়ে একপলক বাইরে তাকিয়েছে। রতন ঘাসজমিতে দাঁড়িয়ে বুকটা হাপরের মত দমকে দমকে ফুলিয়ে গোবিন্দকে উদ্দেশ করে তখন অশ্রাব্য গালি পাড়ছিল। ওর চোখের কোনা কেটে খানিকটা রক্ত চুঁইয়ে পড়ছিল। ধস্তাধস্তিতে ডানপায়ের হাঁটুর মুড়োর বেশ খানিকটা ছড়ে গিয়েছিল। রতন তারস্বরে চেঁচাচ্ছিল, অত জ্বালা দেখিয়ে। লজ্জা করে না শুয়োর আমার জিনিসে হাত দাও—

ঘরে ফিরে নন্দরাণী গোবিন্দর পাতে ডাল দিয়েছে। আজকের ঘটনাটার জন্য রতনের পক্ষ নিয়ে নন্দরাণী গোবিন্দকে দুকথা শোনাতে পারত। দুদিন আগে, যখন রতন বাড়িতে নেই, নন্দরাণীর নিষেধ কানে না তুলে,—কিছুটা গোঁয়ার্তুমি করেই গোবিন্দ অমন কাণ্ডটা ঘটিয়ে না বসত আজকে এমন একটা বিশ্রী দৃশ্যের অবতারণা ঘটত না। কিন্তু, তবু নন্দরাণীর মুখে কথা ফোটেনি। এমনিতেই দিনকয়েক হল শরীরটা বেচাল ঠেকছে। উপরন্তু, কিছুক্ষণ আগে গোবিন্দ যেভাবে রতনকে পিটিয়েছে তারপর ভাতের থালা সামনে রেখে দিয়ে নতুন করে প্রসঙ্গটাকে সে খুঁচিয়ে তুলতে চাইল না।

গোবিন্দ বেরিয়ে যেতে নন্দরাণী খুপরির

বাইরে এসে নিচুস্বরে বলেছিল, রতন, ঘরে আয় বাপ্। আর পাগলামি করিস না।

হাতের চেটো দিয়ে চোখের নিচের ঘাম মুছে নিয়ে রতন গর্জে উঠেছিল, আমি আর ওশালার ঘরে যাচ্ছি না। তুই বেরিয়ে আয়।

নন্দরাণী মলিন হেসে উত্তর করেছিল, যাব। তুই আগে ঘরে আয়। খেয়ে নে, তারপর—

সে কথা শুনে রতন হাত-পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে হেঁচকি তুলে বলেছিল, না! আমি কেন যাব? ও শালা আমার কে! তুই বেরিয়ে আয়। এই শুয়োরটার সঙ্গে থাকতে তোর লজ্জা করে না!

রতনের কথার জবাব দিতে গিয়ে নন্দরাণীর দম আটকে গেছে। দুই হাতে মুখ ঢেকে কান্না চাপতে গিয়ে তার ভরন্ত শরীরটা থরথরিয়ে উঠেছে।

রতন তৎক্ষণে রেললাইনে। নন্দরাণী শুনেছিল রতন বলছে, শালাকে আমি খুন করব।

শিরীষ গাছের নিচে ডাঙাপাড়ে হাঁটু ডুবিয়ে ছেলের দল গোল হয়ে দাঁড়াল। শ্রাবণের দীর্ঘতর বেলায় অন্তিম সূর্য চূর্ণ চূর্ণ হয়ে শিরীষ গাছের পাতায় ছোটাছুটি করছিল। একজন রতনকে চিনতে পেরে চেঁচিয়ে উঠল, আরে, এ যে দেখছি পকেটমার ছেলেটা!— আর একজন মাথা নাড়ল, হাঁ-হাঁ। আমিও চিনি। ছেলেটাকে বাজারে চৌধুরীর চায়ের দোকানে কাজ করতে দেখেছি।— আর একজন, অত্যুৎসাহী, একটা কুটো দিয়ে সুড়সুড়ির ভঙ্গিতে রতনের পায়ের তলা ঘসে দিয়ে বলল, কিরে, ছোকরাটা কি একেবারে টেঁসে গেল নাকি রে!— ওর রসিকতায় ছেলের দল সমবেত হেসে উঠল। চিন্তিত দলপতি,—বিল্টু, ধমকে উঠল, চুপ কর না তোরা। একটা সিরিয়াস ম্যাটার—, তারপর ঝুঁকে রতনকে এধার-ওধার থেকে ভাল করে দেখে নিয়ে আত্মগত বলে উঠল ব্যাটাছেলে, মরবার আর জায়গা পেল না।

দিনতিনেক বেপাত্তা থেকে আজ সকালে রতন ঘরে ফিরেছিল। আগে এ নিয়ে নন্দরাণীর রাতে দুচোখের পাতা জোড়া হত না। এখন গা সওয়া হয়ে গেছে। ছেলেকে নিয়ে নন্দরাণীর দুর্ভাবনার অন্ত না থাকলেও এ বিষয়ে সে নিশ্চিন্ত যে ছেলে যেখানেই থাক না কেন নিজেকে সামলাবার মত যথেষ্ট আত্মনির্ভর সে হয়ে উঠেছে।

রতন যখন ফিরল গোবিন্দ বাড়িতে ছিল না। নন্দরাণী পেছনের ডোবায়। স্নান কাচা-কুচি সেরে ঘরে এসে উনুনে বসাবে কিছুক্ষণ বাদে। ভেতরে ঢুকে রতন নিজের ঘরে চলে এল। সামনের ঘরে নন্দরাণী আর গোবিন্দ শোয়। মরমায়ে বেড়ার ওধারে রতনের মাথা গুঁজবার ঠাঁই। রতন নিজের ঘরে এসে গা থেকে তেল চিটচিটে জামাটা ছাড়িয়ে নিল। তারপর মরজার বাঁদিকে চোখ পড়তে বুকের ভেতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। পলকে রতন হাঁটু মুড়ে খাটের তলা দেখল। উঠে দাঁড়িয়ে চারপাশে চোখ বুলাল। তারপর লাফিয়ে দাওয়ায় পড়ে প্রথমে গোবিন্দ মণ্ডলের ঘর এবং পরে রান্নাঘরে ঢুকে কি যেন একটা বস্তু আঁতিপাঁতি করে খুঁজল। শেষে ঘরের পেছনের দাওয়ায় পড়ে এক লাফে ওধারের খোওয়াওঠা রাস্তায় নামল। নন্দরাণী তখন সাঁচি হেলেপার জট ছাড়িয়ে সবে ডুব দিতে যাচ্ছে। রতন ডোবার ধারে এসে চেঁচাল, মা, আমার মুরগীটা কই?

মাস কয়েক আগে কাছাকাছি কোন এক গেরস্থবাড়ি থেকে রতন একটা মুরগী চুরি করে এনেছিল। মুরগীটার তখন সবে রোঁয়া কেটে পাখা গজাচ্ছে। রতন প্রাণীটাকে দানা-পানি দিয়ে বড় করে তুলেছিল। বাইরে বেরুবার সময় ওটাকে সঙ্গে নিত। মুরগীটা রতনের কাঁধে মাথায় চলন্ত অবস্থাতেই ঘুরত ফিরত। রাতে ঘুমুবার সময় রতনের বুকের ভেতর জড়োসড়ো হয়ে বসে ওম্ দিত। কখনো-সখনো ওকে ঘরে রেখে বেরুলে রতন দরজার কাছের খুঁটিতে বেঁধে রেখে যেত। পাড়ার বেওয়ারিশ কুকুরগুলো মুরগীটিকে একা পেলেই তাড়া করত,—এই ভয়ে রতন আদর করে ওকে ডাকত মুন্না—মনিমা। মুরগীটা ঘরের মধ্যে নোংরা শুরু করলে এক-একদিন বিরক্ত হয়ে গোবিন্দ নন্দরাণীকে বলত, কি একটা আপদ ঘরের মধ্যে! একদিন ওটাকে শেষ করব। —মুরগীটাকে ঘিরে নন্দরাণীর ভেতরেও ছেলের প্রতি একটা চাপা ভালবাসা টলটল করত। সে উত্তরে অলস হেসে জবাব দিত, আহা, তুমি কেন একটা তুচ্ছ মুরগী নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছো। ছেলেমানুষ, খেয়াল হয়েছে তাই পুষেছে। কখন ও নিজেই একদিন—

নন্দরাণী স্নান সেরে ভিজে কাপড়ে পাড়ে উঠে এল। রতন সমানে ঘ্যানর ঘ্যানর করছিল, মা, আমার মুরগীটা।— নন্দরাণী ওর দিকে দৃকপাত না করে রাস্তা পেরিয়ে দাওয়ায় উঠল। তার চোখের সামনে তখন দুদিন আগেকার একটা ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর ছবি ফুটে উঠেছিল। এই দাওয়াতে বসেই গোবিন্দ মুরগীটার দুপা শক্ত করে ধরে চিৎ করে গলায় ছুরি চালিয়েছিল। অসহায় নন্দরাণী রান্নাঘরের চৌকাঠে পা রেখে কিন-কিন স্বরে বলেছিল, এ তুমি কি করলে! ছেলেটা ফিরে এলে কি বলব।—ধড় থেকে মুণ্ডুটা একটানে ছিঁড়ে রক্তমাখা হাতে পালক ছাড়াতে ছাড়াতে গোবিন্দ গমগমে গলায় বলেছিল, আহ্, তুমি থামো তো। কি আবার বলবে।

রতন ছুটে দাওয়ায় উঠে ভেতরের ঘরে ঢোকার দরজা আগলে বলেছিল, মুরগীটা কই, বলো।

বাধা পেয়ে নন্দরাণীও মুখিয়ে উঠেছিল, পথ ছাড়্। আমি কিছু জানি না। রতন পাগলের মত মাথা ঝাঁকিয়ে দুহাতের ছোড়েছিল, বল্, বল্, শিগগিরই— নন্দরাণী ভিজে আঁচল কাঁধের দিকে টেনে নিয়ে গলা চড়িয়েছিল, কি, মারবি নাকি আমাকে!

রতন বুক চিতিয়ে বলেছিল, হাঁ, মারবই তো।

নন্দরাণী হাত দিয়ে ওকে ঠেলে সরিয়ে ঘরের ভেতরে ঢুকেছিল। দড়ি থেকে একটা শুকনো কাপড় টেনে নিতে নিতে বলেছিল, হাঁ, এইটুকুই বা বাকি আছে। কি সুখে যে তোকে পেটে ধরে-ছিলাম। এর চেয়ে ছেলেবেলায় মুখে নুন দিয়ে তোকে মেরে ফেললেই ভাল হত।

রতন ভেতরে ঢুকে হাত-পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে নন্দরাণীর চারপাশে পাক খেতে লাগল, আমি জানি গোবিন্দ শালাই আমার মুরগীটাকে কেটে খেয়েছে। আমি ওর জান নেব।

নন্দরাণী তেড়ে উঠল, একথা তুই ছাড়া আর কে বলবে? এখনো ওর জোগানো ভাত যে খেয়ে পেটে মলমল করছে। নেমকহারাম, ছোটলোক! বেরো, বেরো ঘর থেকে—

রতন মাকে এতটা ক্ষিপ্ত হতে দেখে দম্ করে মিইয়ে গেল। কান্নাভেজা গলায় বলল, ঠিক আছে। আমি যাচ্ছি—। —তারপর খুপরির থেকে বেরিয়ে ওধারের ঘাস জমিতে এসে কিছুক্ষণ দম খিঁচে রইল। একসময় ফের ফোঁপানির শব্দ করল।

দিনের আলো কমে আসতে দলপতি বিল্টু বলল, চল। এখানে দাঁড়িয়ে থেকে

রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা

ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৫·৫০ দ্বারকানাথ ঠাকুরের জীবনী
ডক্টর হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় ৮·০০ রবীন্দ্র-শিল্পতত্ত্ব
সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার ৩·০০ রবীন্দ্রনাথ ও ভারতবিবেক
শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় ২·০০ দি হাউস অব্ দি টেগোরস
ডক্টর শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য ৫·০০ পদাবলীর তত্ত্বসৌন্দর্য ও কবি রবীন্দ্রনাথ
গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ১৫·০০ সঙ্গীতচন্দ্রিকা
ডক্টর প্রবাসজীবন চৌধুরী ৮·৫০ টেগোর অন্ লিটারেচার এণ্ড এস্থেটিক্স
রবীন্দ্র-রচনার উদ্ধৃতিসম্ভার ১২·০০ রবীন্দ্র-সূক্তাবলি
ডক্টর ননীলাল সেন ১৫·০০ এ ক্রিটিক্ অব্ দি থিওরিজ অব্ বিপর্যয়
শ্রীবালকৃষ্ণ মেনন ২৫·০০ ইণ্ডিয়ান ক্লাসিক্যাল ডান্সেস্
ডক্টর ধীরেন্দ্র দেবনাথ ৬·০০ রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে মৃত্যু
ডক্টর অমিতাভ মুখোপাধ্যায় ১৮·৫০ রিফর্ম অ্যাণ্ড রিজেনারেশন ইন বেঙ্গল
ডক্টর শোভনলাল মুখোপাধ্যায় ১৪·৫০ সোশিওলজি অব্ [illegible]

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। ৬/৪ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা ৭
পরিবেশক: জিজ্ঞাসা। ১এ কলেজ রো ও ১৩৩এ রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা

কি হবে। তার চেয়ে বরং পাড়ার দিকে বড়দের খবরটা দিই।—ছেলেদের দল সতর্ক পায়ে চটিহীন আশশ্যাওড়া কালকাসুন্দের ঝোপ পেরিয়ে রেললাইনে উঠে এল। তারপর, পাখির ডানার মত শূন্যে দুহাত ছড়িয়ে ওরা মুখে এক ধরনের অদ্ভুত আওয়াজ তুলে ছুটতে লাগল শহরতলীর দিকে।

একটু বাদেই আবার কালো হয়ে উঠল। এলোমেলো হাওয়া বইতে লাগল।

যখন সূর্যের রঙ বদলে গাছের ডাল থেকে দুহাত ছেড়ে দিয়ে শূন্যে নিরালম্ব ঝুলে পড়েছিল, তখন হাওয়া পর্যন্ত কিছুই ছিল না। রোদ্দুরের চারপাশ আবছা হয়েছিল। ঘাসটা মুহূর্তে শব্দ করে শিরদাঁড়ার আগার হাড়টা ছেড়ে দিয়ে এপাশে ক্রমশ কঠিন শীতে চেপে বসেছিল। দুর্গাপিকের হেরত উঁচু বড় চকচকে উঠে বহুদূরে শেয়ালের মত ওৎ পেতে ছিল। আর সে একটা অদ্ভুত মূর্ছনার মত যন্ত্রণায় বাচ্চাদের হাত পা ছড়িয়েছিল।

এখন, হঠাৎ না শহরতলীর কিছু মানুষ এখানে এসে ভিড় জমায়,— যতক্ষণ আগে নিশ্চল হয়ে গেলেও,— তার হাড়গোড় দূরের প্রান্তর থেকে ছুটে আসা বাতাসে লোকদের ঝাঁকে মাথার উপরের দিকটা পাখির পাতায় পাতায় একটা নরম মূর্ছনার প্রাণপণ পাখসাটের মত অনবরত ঝাপটা দিয়ে যাচ্ছিল।

একই ধোপে ৩ ভাবে কাজ ক'রে...

ডেট বেশী সাদা করে

—অন্য যে কোন পাউডারের তুলনায়

কেন এবং কিভাবে তা করে দেখুন

১ ডেট-এ রয়েছে বিশেষ সক্রিয় পদার্থ যা কাপড়ের ভেতরের কঠিন ধুলোময়লা সহজেই দূর করে—কাপড় চমৎকার পরিষ্কার হয়।

২ ডেট -কাপড়ের ময়লা দূর ক'রে আবার তা কাপড়ে জমতে দেয়না, কাপড় বেশী পরিষ্কার হয়, বেশী পরিষ্কার থাকে।

৩ ডেট – কাপড়ে বাড়তি সাদা যোগায়—কাপড় আগের চেয়ে অনেক বেশী সাদা ও উজ্জ্বল হয় (এতে নীল বা সাদা করবার জন্য কিছুই মেশাতে হবেনা)

আজই কিনুন—ডেট

স্বস্তিক অয়েল মিলস, বোম্বাই

SHILPI HPMA 38A/70 BEN

হাজারদুয়ারী/মুর্শিদাবাদ

এই আমাদের দেশ

মিনারে, খিলানে, প্রাসাদে প্রতিধ্বনিত প্রাচীন ঐতিহ্যের নিদর্শন মুর্শিদাবাদে

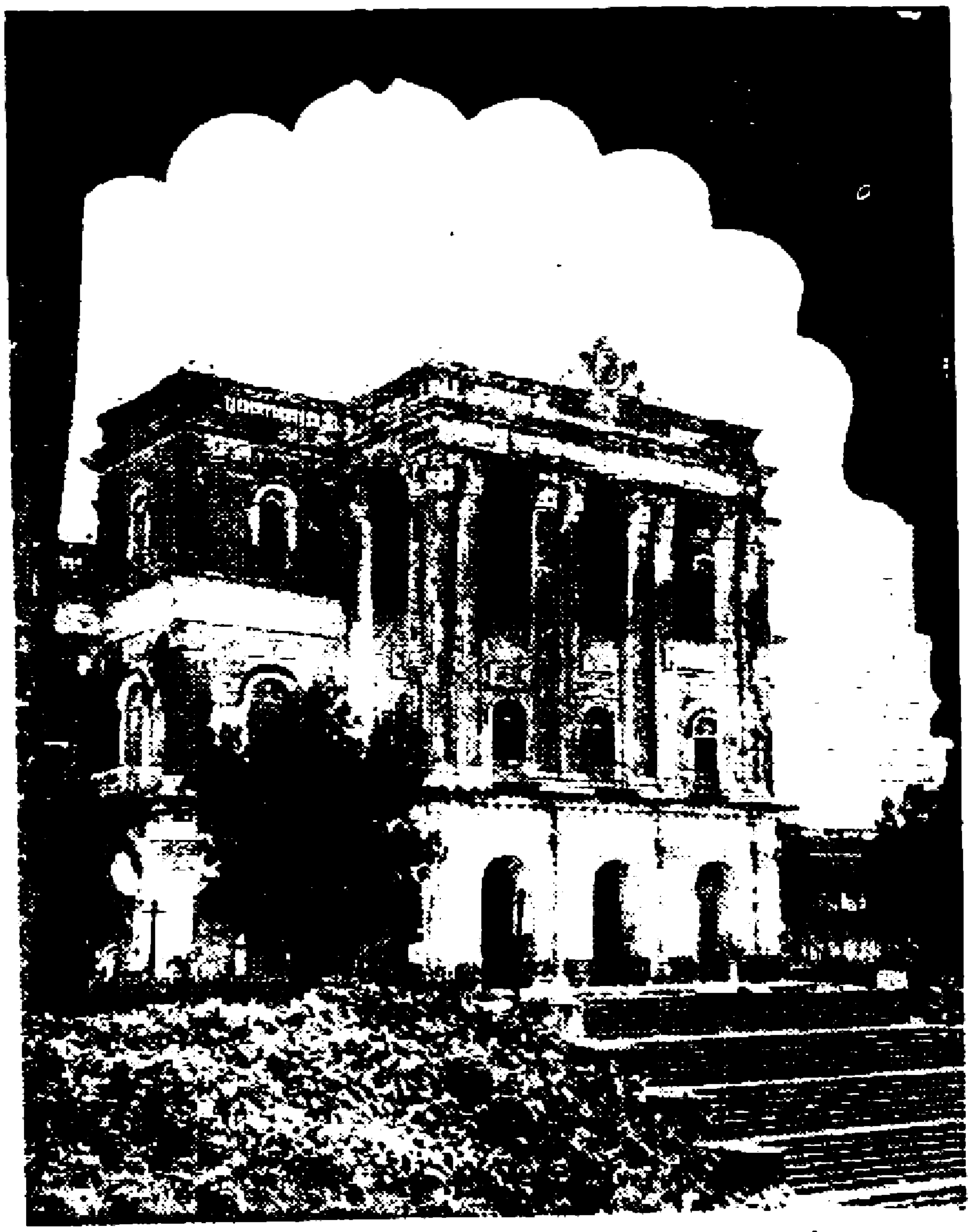

কাঠগোলার রাজবাড়ী/মুর্শিদাবাদ

জিয়াগঞ্জ থেকে বাসে গেলে পঁয়তাল্লিশ-পঞ্চাশ মিনিটের মতো। একেবারে মুর্শিদাবাদ টাউন। কলকাতা থেকে গেলে রাতের ট্রেন। ভোর নাগাদ মুর্শিদাবাদ পৌঁছে যাবেন। পুরো একটা দিন সময় লাগবে সবকিছু দেখতে। বাংলার শেষ নবাবের স্মৃতিবিজড়িত মুর্শিদাবাদ আমার তো মনে হয় প্রত্যেকটি মানুষেরই দেখে আসা দরকার। মহাকাল নিঃশেষে গ্রাস করে নিতে পারেনি বলেই এখনও কিছু স্মৃতি অবশিষ্ট আছে।

মুর্শিদকুলি খাঁ মুর্শিদাবাদকে রাজধানীর উপযুক্ত করে তৈরি করেছিলেন। বর্তমান নিজামত কেল্লা যেখানে ছিল, সেখানে তিনি প্রাসাদ, দরবারগৃহ তৈরি করেছিলেন। তাঁর দরবারগৃহে চল্লিশটি স্তম্ভ ছিল, এখন তার কোন চিহ্ন নেই। কাটরার মসজিদও তিনি নির্মাণ করেছিলেন। মুর্শিদকুলি খাঁর মৃত্যুর পর তাঁর জামাই সুজাউদ্দিন খাঁ বিহার ও ওড়িষার সুবাদারী পান। আলিবর্দি খাঁ, হাজী আহম্মদ, জগৎ শেঠ প্রভৃতি যোগ্য লোককে তিনি দেওয়ানী কাজে নিয়েছিলেন। আলিবর্দী খাঁ পরে বিহারের শাসক পদে নিযুক্ত হন। সুজা খাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সরফরাজ খাঁ এক বছরের জন্যে নবাব হয়েছিলেন, কিন্তু হাজী আহম্মদ, জগৎশেঠ, আলিবর্দীর সঙ্গে মনোমালিন্য হওয়ায় তিনি সিংহাসনচ্যুত হন ও পরে নিহত হন। এরপর আলিবর্দী মসনদে বসেন এবং দিল্লীর বাদশাহের কাছে বহু টাকার উপঢৌকন পাঠিয়ে বাংলা ও ওড়িষার নবাবী পান। আলিবর্দী খাঁর একমাত্র স্ত্রী খুব বুদ্ধিমতী ছিলেন।

রাজ্যের জটিল কোন ব্যাপারে নবাব তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করতেন। মহারাষ্ট্র-যুদ্ধে নবাবের সঙ্গে তিনিও যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়েছিলেন এবং অদ্ভুত সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন।

আলিবর্দীর মৃত্যুর পর তাঁর দৌহিত্র সিরাজদ্দৌলা বাংলা, বিহার, ওড়িষ্যার সিংহাসনে বসেন। এর কিছুদিন পরেই ইংরেজদের সঙ্গে তার বিবাদ শুরু হয়ে যায়, সিরাজদ্দৌলা কলকাতা দখল করেন। ক্লাইভ পরে কলকাতা ফিরে পান ও সিরাজের সঙ্গে সন্ধি হয়। কিন্তু সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করার জন্য মিরজাফর, জগৎশেঠ, উমিচাঁদ ও ক্লাইভের মধ্যে ষড়যন্ত্র হয়, সিরাজ ক্ষমতাচ্যুত হয়ে বন্দী হন। অবশেষে জাফরাজের বাড়িতে সিরাজ নিহত হন। যে-জায়গায় সিরাজকে হত্যা করা হয়েছিল, সেটি প্রাচীর দিয়ে ঘেরা আছে, এটি নিমকহারাম দেউড়ি নামে পরিচিত।

এবার মুর্শিদাবাদের ঐতিহাসিক জায়গাগুলো ঘুরে নেওয়া যাক। রেলস্টেশন থেকে জেলখানার কাছে এসে পূর্ব দিকের রাস্তা ধরে মাইলখানেক গেলেই কাটরার মসজিদ পড়বে। এটি মুর্শিদকুলী খাঁ জীবতকালেই নিজের সমাধিস্থান হিসেবে দু বছরের মধ্যে তৈরি করান। মসজিদে ঢোকবার সিঁড়ির নিচে একটি ঘর ছিল, শোনা যায় মৃত্যুর কয়েকঘণ্টা পূর্বেই নাকি তিনি ঘরে প্রবেশ করেন। মক্কার সুপ্রসিদ্ধ মসজিদের অনুকরণে এই মসজিদ তৈরি হয়। দু পাশে ৭০ ফুট উঁচু দুটি মিনার এখনও ভাঙাচোরা অবস্থায় দেখা যায়। আগে গম্বুজে উঠলে পাঁচ-ছ মাইল দূর পর্যন্ত দেখা যেত।

মুর্শিদাবাদে প্রচুর অট্টালিকা তৈরি করার জন্যে যে সমস্ত খাদের সৃষ্টি হয়, নৌজেস মহম্মদ সেগুলিকে একত্র করে প্রিয়তমা পত্নী মেহেরুন্নিসার বসবাসের জন্য সুরক্ষিত অট্টালিকা তৈরি করান। এটিই মতিঝিল নামে খ্যাত। দৈর্ঘ্যে ৬৬ ফুট, প্রস্থে ২৪ ফুট ও ১২ ফুট উঁচু দরজা জানলাবিহীন ইঁটের একটি ঘর মতিঝিলের বিস্ময়ের জিনিস। অনেকে বলেন, এটি ঘসেটি বেগমের ধনভাণ্ডার ছিল, আবার অন্যমতে সিরাজ মতিঝিল লুঠ করে ঘসেটি বেগমকে নিজের হারেমে যখন নিয়ে যান, সেই যুদ্ধকালীন সময়ে নিহত অন্তঃপুর সহচরীদের এখানে কবর দেওয়া হয়।

স্টেশন থেকে সিরাজদ্দৌলা বাজারের মধ্যে দিয়ে মাইলখানেক গেলেই পড়বে হাজারদুয়ারী। প্রায় এক হাজারের মত দরজা আছে বলেই হাজারদুয়ারী নাম। হাজারদুয়ারী দৈর্ঘ্যে ৪২৫ ফিট, প্রস্থে ২০০ ফিট, একশো ফিটের মত উঁচু। ইতালীয় স্থাপত্য শিল্পের প্রভাব এতে রয়েছে। দোতলায় উঠতে ৩৭ ফুট লম্বা ১৫টি, ২৫ ফুট লম্বা ৩০টি সিঁড়ি ভাঙতে হয়। ভারতের দীর্ঘতম সিঁড়ির এটি নাকি অন্যতম। দেওয়ালের কারুকাজ দেখবার মত। প্রথম শ্রেণীর মার্বেল পাথর এতে ব্যবহার করা হয়েছে। চিত্রশালায় রয়েছে র‍্যাফেল, মার্শাল, টিশিয়ান প্রভৃতি বিখ্যাত শিল্পীদের ছবি। পাশের পাঠাগারটি এককালে নাকি প্রচুর দুষ্প্রাপ্য বইপত্রে ভর্তি ছিল। আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরীর পাণ্ডুলিপি, প্রাচীন ফরাসী ও উর্দু পাণ্ডুলিপি এখনও অবশ্য রয়েছে। নীচের তলায় অস্ত্রাগার। পলাশীর প্রান্তরে যে কামানটি ফেটে মীরমদন মারা যায়, সেটিও এখানে আছে। তাছাড়া আলিবর্দী ও সিরাজের ব্যবহৃত তলোয়ার, সম্রাট নাদির শাহের ঢাল, বর্শা ও লোহজালও নাকি রাখা হয়েছে। তাছাড়া পাথরের কাজ-করা ডাইনিং রুম, দরবার হল ও বিশেষ ধরনের কাঁচের তৈরি খাবার ডিশও আছে। খাবারে বিষ মেশানো থাকলে এই ডিশের রং নাকি বদলে যেত।

হাজারদুয়ারীর সামনেই ইমামবাড়া। সিরাজ নির্মাণ করেছিলেন কাঠের ইমামবাড়ি, আগুনে পুড়ে তা নষ্ট হয়ে গেলে নাজিম মনসুর আলি খাঁ বর্তমানের ইমামবাড়া তৈরি করান। তখনকার দিনে ৭ লক্ষ টাকা খরচে এক বছরের মধ্যে এটি তৈরি হয়। মহরমের শেষ দিন এখনও এখানে জাঁকজমকে অনুষ্ঠান হয়। ইমামবাড়া ও হাজারদুয়ারীর মাঝখানে মদিনা। এটি তৈরি করান সিরাজদ্দৌলা। মদিনা তৈরির সময় সিরাজ নিজে নাকি কারবালা প্রান্তর থেকে পবিত্র মাটি মাথায় করে এনে এর ভিত্তি স্থাপন করেন।

কাটরার মসজিদ/মুর্শিদাবাদ

ফটো : ডাঃ শীতাংশু মিত্র

লালবাগ খেয়াঘাট পার হয়ে মাইলখানেক গেলেই খোসবাগ। এটি আলিবর্দীর সমাধি। খোসবাগে আলিবর্দী, সিরাজ, লুৎফা সকলেরই সমাধি। সিরাজের মৃত্যুর পর দীর্ঘকাল ঢাকায় নির্বাসিত অবস্থায় ছিলেন লুৎফা, পরে তিনি খোসবাগ তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পান মাসিক কিছু টাকা মুজুরিতে।

চকবাজার থেকে উত্তরে নসীপুর থেকে কিছু দূরে বিরাট বাগানবাড়ি, পরেশনাথের মন্দির। এটিই কাঠগোলার বাগান। এককালে এই বাগানে বহু মূল্যবান ফুলের গাছ এনে বসানো হয়েছিল। এখন এটির প্রায় শেষ অবস্থা। রাজবাড়িটি এখনও দেখবার মত অবস্থায় রয়েছে। কাটরা মসজিদের কাছেই তোপখানা। মুর্শিদকুলী খাঁ এখানে তাঁর অস্ত্রাগার নির্মাণ করান। এখানেই বিখ্যাত জাহানকোষা কামান রয়েছে। মুর্শিদকুলী খাঁ ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে আসার সময় কামানটি এখানে নিয়ে আসেন। ঢাকার জনার্দন কর্মকার এটি তৈরি করেন। দৈর্ঘ্যে ১৮ ফুট, বেড় প্রায় ৪ ফুট, দুশো মনের মত ওজন। এতে প্রতিবারে ২১ সের বারুদ লাগত। ছোটখাট দেখবার মতো আরও অনেক কিছু আছে। যেখানেই যাবেন ইতিহাস আপনাকে আঁকড়ে ধরবে। মিনারে, মসজিদে, খিলানে, প্রাসাদে শুধু স্মৃতি আর স্মৃতি, দিনান্তের শেষ আলো কবরখানার ওপর দিয়ে বয়ে যাবার সময় কান পাতলে এখনও অনুভব করতে পারবেন হাজারো মানুষের তপ্ত দীর্ঘশ্বাস।

—নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

তুলসীচরিত

নীমবিব চৌধুরী

(১৭)

অশোকের পঞ্চম ইনস্টলমেন্ট।

ভাবলাম মাস্টারমশাই সত্যি চিনতে পারলেন না, না, না চেনার ভান করলেন? তখুনি মনে হল না চেনবার ভান করতে যাবেন কেন? এক সময় আমার দুঃস্থ অবস্থার কথা শুনে আমার পরম উপকার করেছিলেন। কল্পনাও করতে পারি নি মিঃ ভাদুড়ীর মত বড়লোক তাঁর কথার এত দাম দেবেন। আবার যে আমি উঠে দাঁড়িয়েছি, দুটো পয়সা করছি এ সবের মূলে রয়েছে মাস্টারমশায়ের স্নেহ। নির্লোভ, সাধু প্রকৃতির মানুষ তিনি, সত্যিকার জ্ঞানীমানুষ। অনেক দিন দেখেন নি, চিনতে পারলেন না তাই।

মিনিট দশেক হাঁটবার পরে একটা বাড়ীর ফটকের কাছে দাঁড়ালেন তিনি, এক মিনিট কি কথা হল নাতনীর সঙ্গে, তারপর দুজনে বাড়ীর মধ্যে চলে গেলেন।

দাঁড়ালাম ফটকের কাছে। বাড়ীটা চিনে নিলাম। এখুনি গিয়ে দেখা করে একটা প্রণাম করে আসব, না অন্য সময়ে আসব ভাবতে লাগলাম। ফটক পেরিয়ে ভেতরে চলতে লাগলাম ভেবে কিছু ঠিক করতে না পেরে।

ফটক থেকে খানিকটা দূরে বাড়ীটা। কিছু দূর যেতে দেখলাম মাস্টারমশায়ের নাতনী ফিরে আসছে।

দাঁড়াল আমার সামনে, কাকে চান আপনি?

মাস্টারমশাইকে।

মাস্টারমশাই? মাস্টারমশাই কে?

প্রোঃ প্রমথ গাঙ্গুলী।

ও, জেঠামশাই? আপনি বুঝি তাঁর ছাত্র ছিলেন? আচ্ছা, একটু আগে আপনাকে পথে দেখেছি না?

হাঁ। অনেক দিন দেখা নেই, মাস্টারমশাই চিনতে পারলেন না।

কোথা থেকে আসছেন।

থাকি কোলকাতায়। আসছি এখান থেকে।

এখান থেকে আসছেন মানে কি? আচ্ছা শুনুন, যদি দেখা করে কিছুক্ষণ কথা বলতে চান সকালের দিকে আসতে পারেন না? জেঠামশাই কি সব-কাগজপত্র নিয়ে এসেছেন, লেবরেটরীতে ঢুকলেন, আমাকে বসতে দিলেন না।

বললাম, আপনি এ বাড়ীতে থাকেন না?

না, শ্রীগঙ্গা কারখানার কাছে আমাদের বাড়ী।

আচ্ছা, আজ আর মাস্টারমশাইকে বিরক্ত করব না। চলুন, আমিও কারখানার দিকে যাব।

আপনি এখানে কোথায় থাকেন?

এখনও থাকি না এখানে, কারখানাতে আসি।

কারখানাতে কাজ করেন বুঝি?

হ্যাঁ, কাজ করি কাজ দেখিও। কারখানাটা আমার।

আপনি কারখানার মালিক? তাহলে তো বড়লোক আপনি?

হাসলাম। চলুন।

চলুন। কিন্তু আপনি হাঁটছেন কেন? গাড়ী কই?

গাড়ী কারখানায় আছে। আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে ভাল হল। কারখানার কাছে একটা বাড়ী করব ভাবছি।

তাই নাকি? জেঠামশাই খুশী হবেন শুনে তাঁর ছাত্র বাড়ী করছেন এখানে।

আচ্ছা, আপনি কি মাস্টারমশায়ের ছোট ভায়ের মেয়ে? কলকাতায় তো মাস্টারমশায়ের পৈতৃক বাড়ী আছে, আপনি এখানে থাকেন কেন?

কোন সম্পর্ক নেই, এমনি ওঁকে জ্যাঠামশাই বলি।

হাঁটতে হাঁটতে আরও আলাপ হল। নাম, বাবার নাম, পরিবারের কথা কিছু শুনলাম। আমাকেও বলতে হল আমার পরিবারের কথা।

কারখানার কাছে এসে দাঁড়াল, বলল, সন্ধ্যা হয়ে এল, সময় থাকলে আপনার কারখানায় কি কাজ হয়—দেখতাম।

বললাম, রবিবারে কাজ বন্ধ থাকে, অন্য দিন যখন ইচ্ছা দুপুরে, বিকেলে আসলে দেখা যাবে।

আপনি থাকবেন তো?

না থাকলেও অসুবিধে হবে না, আমার ছেলেদের বলে রাখব, সঙ্গে করে সব দেখাবে। কবে আসবেন বলুন, আমি থাকবার চেষ্টা করব।

কবে? যেদিন জেঠামশায়ের সঙ্গে দেখা করবেন।

আচ্ছা। চলুন বাড়ী পর্যন্ত এগিয়ে দিই।

কোন দরকার নেই, ঐ যে বাড়ী। আচ্ছা, নমস্কার।

চলে গেল পা চালিয়ে।

তাকিয়ে রইলাম সেদিকে। শিক্ষিত, কালচার্ড পরিবারের মেয়ে, বেশ ফরোয়ার্ড। কি পড়ছে শোনা হল না, নামটি কি শোনা হল না।

পরের পরের দিন সকাল সাড়ে আটটায় মাস্টারমশায়ের বাড়ীতে উপস্থিত হয়ে দেখলাম বাইরের বারান্দায় বসে তিনি —কাগজ পড়ছেন।

প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিলাম।

মুখের দিকে একটু তাকিয়ে থেকে বললেন, অশোক নাকি? বসো, বসো। আমাকে খুঁজে বের করলে কি করে?

পরশু আপনাকে রাস্তায় দেখেছিলাম, বাড়ীটা চিনে গিয়েছিলাম।

কি করছ এখন? মিঃ ভাদুড়ীর ওখানে কাজ করছিলে জানি—

হাতে এক কাপ চা নিয়ে পরশুর চেনা সেই মেয়েটি বেরিয়ে এল ভেতর থেকে। বলল, ও আপনি এসেছেন? চা খাবেন? বসুন, এনে দিচ্ছি।

মাস্টারমশাই বললেন, তুলসীকে কি করে চিনলে অশোক?

তুলসীর সঙ্গে আলাপের কথা, কারখানার কথা, বাড়ী করবার ইচ্ছার কথা বললাম।

আমাকে চা বিস্কুট দিয়ে নিজে চা খেতে খেতে শুনছিল তুলসী।

মাস্টারমশাই বললেন, তুলসীর বাবা বরদাবাবু, বরদা ভটচাজ, ইস্ট ইন্ডিয়া করপোরেশনে কাজ করতেন। চেনো না কি তাঁকে?

চিনলাম। বললাম, চিনি। এখন মিঃ ভাদুড়ীর বড়ছেলের অফিসে কাজ করছেন শুনেছি।

মিঃ ভাদুড়ীর কোন খবর জানো?

গুরুদেবের সঙ্গে তিনি সস্ত্রীক হৃষিকেশের ওদিকে কোন আশ্রমে চলে গিয়েছেন শুনেছি, আর কিছু জানি না।

তাঁর বাড়ীটা?

মামলা চলছে। এখন গুরুভাইয়ের দখলে রয়েছে শুনেছি।

বড় ভাল কথা সমস্ত মত তুমি নিজের একটা কারবার গড়ে তুলতে পেরেছ। তোমার কারখানায় কি কাজ হয়।

ফার্নিচার কাজ হয় বেশীর ভাগ। তেমন বড় নয়, মাঝারি কারখানা।

খুব ভাল কথা। যাব একদিন তোমার কারখানা দেখতে।

হাত থেকে চায়ের কাপ মাটিতে নামিয়ে রেখে তুলসী বলল, তা যাবে, আমি দেখে এসে রিপোর্ট দিই আগে।

তুই কি দেখতে যাবি? মাস্টারমশাই প্রশ্ন করলেন।

ঘুরে ফিরে দেখে জেনে নেব আমার কোন প্রসপেকট আছে কি না কারখানায়।

বিস্মিত হয়ে তাকালাম তুলসীর দিকে। বললাম, তুমি কি দুঃখে কারখানার মিস্ত্রি হতে যাবে? তুমি তো পড়ছ।

বলল, কি দুঃখে মিস্ত্রি হতে যাব? আমি খুব সুখে আছি মনে করছেন?

মাস্টারমশাই ধমকালেন, জ্যাঠামি করো না তুলসী।

বকো, যত পারো।

উঠে দাঁড়াল তুলসী, বলল, আপনার কথা সেরে নিন আমি আসছি। আপনার সঙ্গে যাব। হাতে সময় থাকলে কারখানার কাজ দেখাবেন কিছুক্ষণ।

কাপ-ডিশগুলো তুলে নিয়ে ভেতরে গেল।

মাস্টারমশায়ের দিকে তাকালাম, হাসছিলেন তিনি।

বললাম, বরদাবাবুর মেয়ে তুলসী, একটু ছিট—

বললেন, কথায় একটু আছে, মাথায় নেই। বরদবাবুর মাথায় ছিট আছে নাকি?

বললাম, কী জ সুনাম ছিল আগে। টাকা করবার জন্য নানা রকম প্ল্যান করতেন। ঘনিষ্ঠতা হয় নি, দেখা-সাক্ষাৎ নাই, অনেক দিন।

মাস্টারমশাই বললেন, মেয়েটি ভাল। বি এসসি পড়ছে। ডাক্তারী পড়বার ইচ্ছা। বাপ খরচ দিতে পারবেন না, তাই নিজে রোজগারের উপায় খুঁজছে।

তাই বলে কারখানার মিস্ত্রি—

হেসে বললেন ওটা বাজে কথা। কারখানার কাজ দেখতে চায়। কি করে কি হচ্ছে। জানবার শেখবার কৌতূহল আছে।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছিলাম, আপনার অনুগ্রহে—

বাধা দিয়ে বললেন, অনুগ্রহ করবার আমি কে অশোক? তুমি আমার ছাত্র ছিলে, দুরবস্থায় পড়েছিল স্ত্রী-পুত্র নিয়ে, খুব সুখের কথা নিজের চেষ্টায় উঠে দাঁড়িয়েছ। উদাম, কাজের বুদ্ধি না থাকলে সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারতে না। তোমরা আরও উন্নতি হোক, অনেক লোকের অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা হোক তোমার হাত দিয়ে—

প্রণাম করে বললাম, আশীর্বাদ করুন—

তুলসী এল।

মাস্টারমশাই বললেন, যারা কর্মী, কিছু করতে চেষ্টা করে তাদের সকলের মঙ্গল কামনা করি আমি।

তুলসী বলল, আমিও কিছু করতে চাই—

বললেন, তোমারও মঙ্গল কামনা করি।

থ্যাঙ্ক য়্যু জেঠামশাই। আমার দিকে চেয়ে বলল, চলুন।

মাস্টারমশাই বললেন, অশোক, সময় পেলে মাঝে মাঝে এসো এই রকম সময়ে।

আসব মাস্টারমশাই।

ঘণ্টাখানেক ঘুরে ফিরে কারখানার কাজ দেখল তুলসী। এই এক ঘণ্টার মধ্যে আমাকে বসতে দেয়নি, চুপ করে থাকতে দেয়নি, প্রশ্নের পর প্রশ্ন করেছে, উত্তর তার সন্তোষজনক না হলে জেরা করেছে। আমার বড় ছেলে সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছিল, মিনিট দশ পরে তাকে বলল, আপনার বাবা সঙ্গে আছেন, আপনার সাহায্য দরকার হবে না, নিজের কাজে যেতে পারেন।

তাই যেতে হল। তার মুখের অপ্রস্তুত ভাব দেখে মনে মনে হাসলাম। যাবার আগে এক কাপ চা খেয়ে যেতে বললাম। রাজি হল না, বলল, অনেক বেলা হয়েছে। নমস্কার করে, ধন্যবাদ দিয়ে চলে গেল।

যাবার পরেও কিছুক্ষণ ভাবলাম মেয়েটির কথা। বরদা ভটচায, যে ফাঁকি দিয়ে টাকা করবার কথা ভাবে শুধু তার মেয়ে এই তুলসী।

(১৮)

আমার পঞ্চম ইনস্টলমেন্ট।

শহর ছেড়ে, পরিবারপরিজন ছেড়ে বানপ্রস্থ নিয়ে শহরতলীতে এসে ছিলাম। ভরত মুনির গল্প মনে পড়ে, এক হরিণশিশুর মায়ায় আবদ্ধ হয়ে তাঁর ব্রহ্মচিন্তা ঘুচে গেল। একটি মেয়ের মায়ায় আবদ্ধ হয়ে আমার তৃতীয় আশ্রমিক উদাসীনতা ঘুচে গেল।

যতটা পারি দূরত্ব রক্ষা করে চলছিলাম এতদিন। তাই চালাতে পারতাম মেয়েটা যদি একটা একগুঁয়ে না হয়ে একটু সুবোধ প্রকৃতির হত, বাপের খামখেয়ালিপনা মানিয়ে চলতে পারত। বলছি বটে এই কথা কিন্তু জানতাম সে পারবে না।

একদিন বলেছিলাম, তুলসী, তুমি মেয়ে হয়ে জন্মেছ, ছেলে নও যে বাপের ওপরে রাগ করে কোথাও পালিয়ে যাবে। খানিকটা পরাধীনতা, পরাবলম্বন তোমাকে মেনে নিতে হবে। একটু নরম হতে শেখো।

দাঁড়িয়েছিল ধপ করে বসে পড়ে পায়ের ওপরে মাথা ঘসতে লাগল, বলল, আমাকে লাথি মারো জেঠামশাই, আমি তোমার পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছি। তুমিও বলো না আমাকে, সংসারে আমি কত বকুনি খাচ্ছি, লাঞ্ছনা, অপমান সহ্য করছি জানো না।

চমকে উঠলাম, লাঞ্ছনা, অপমান সহ্য করছ!

উঠিয়ে চেয়ারে বসিয়ে দিলাম, বললাম, কে তোমাকে অপমান করল বলো তো?

মাথা নামিয়ে চুপ করে বসে রইল। কিছু বলতে চায় না মনে হল।

কিছুক্ষণ বসে থেকে চলে গেল।

এরপর থেকে তুলসীর আসা বন্ধ হয়ে গেল। আগে মাঝে মাঝে এসে পাঁচ দশ মিনিট কাটিয়ে চলে যেত, তাও আর আসে না। কলেজে যায় না আর, শুনেছি, তার মা বাপের বাড়ী থেকে ফিরেছেন কিনা জানি না। বুঝতে পারলাম না তুলসী আসা বন্ধ করল কেন, বাড়ীতে কি হচ্ছে।

মাস তিন কেটে গেল। তারপর একদিন বেরিয়ে পড়লাম খোঁজ নেবার জন্য।

বরদাবাবুর বাড়ীর কাছে তার ছোট ছেলে ফণীর সঙ্গে দেখা হল। আমাকে দেখে সে পালাবার চেষ্টা করছিল হাত ধরে আটকালাম। বললাম, এসো আমার সঙ্গে।

বলল, ছেড়ে দিন, বাবা দেখতে পেলে মার লাগাবে।

তাহলে চলে এসো আমার সঙ্গে।

বাড়ীতে এনে বসালাম ফণীকে। প্রশ্ন করে করে অনেক খবর পাওয়া গেল।

দিদির সঙ্গে ফণীর ঝগড়া চলছে। স্কুলে ফণীর মাইনে বাকী পড়েছিল কমাসের, নাম কেটে দিয়েছে। প্রি-টেস্ট পরীক্ষা দিতে পারবে না। দিদি মার কাছ থেকে টাকা এনে তাকে দিতে এসেছিল, বাকী মাইনে শোধ করে দিয়ে পরীক্ষা দিতে বলেছিল, নেয়নি। সে জানত দিদিরও নাম কেটে দিয়েছে।

বলল, ছমাস পরে দিদির পরীক্ষা, ও নিশ্চয় পাশ করবে পরীক্ষা দিলে। তখন একটা চাকুরি যোগাড় করতে পারবে, তখন আমি আবার পড়ব। স্কুল ফাইন্যাল পাশ করে আমি কি কাজ পাব? কেন যে দিদি বোঝে না সোজা কথাটা জানি না। রেগে আমার সঙ্গে কথা বন্ধ করেছে।

তোমার বাবা স্কুলের মাইনে দেন না!

না। বলেন টাকা নাই।

তোমার দাদার কাছে চাও না কেন?

দাদা চাকুরি নিয়ে বাইরে চলে গিয়েছে। তিশ টাকা করে পাঠায় দিদির নামে, বাবা সে টাকা কেড়ে নেয় দিদির কাছ থেকে। একদিন আমি আটকাতে গিয়েছিলাম। ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল মাটিতে। দিদিকে, আমাকে যাচ্ছেতাই গালাগালি করে দিনরাত।

ব্রণ
দূর করবার জন্য
লিচেনসা

● ১০৮ টি দেশে ডাক্তাররা প্রেসক্রিপশন করেছেন।
● যে কোন বাবসায়ী ওষুধের দোকানেই পাওয়া যায়।

পুরো ভরসা রেখে আপনার ট্র্যানজিস্টারে লাগিয়ে নিন এভারেডী নং 1050

ট্র্যানজিস্টারকে ক্ষয়ক্ষতি থেকে বাঁচিয়ে শক্তি যোগানোর জন্যে বিশেষভাবে তৈরী রাউণ্ড ব্যাটারী।

* বহুক্ষণ ধরে চালু থাকার একটানা শক্তি যোগায়।
* ট্র্যানজিস্টারের যন্ত্রপাতির ক্ষতি-নিরোধ করাই এর বিশেষত্ব।
* এই ব্যাটারী লাগিয়ে বরাবর পরিষ্কার ও নিখুঁত আওয়াজ পাবেন।
* যেমন এর কর্মকুশলতা তেমনি দীর্ঘ এর স্থায়িত্ব।

'এভারেডী' নং ১০৫০ লাগিয়ে আপনার ট্র্যানজিস্টার থেকে সবচেয়ে সুন্দর কাজ পাবেন।

১ টাকা ৮০ পঃ

সমস্ত রকম ট্র্যানজিস্টার রেডিওর জন্যই 'এভারেডী' ব্যাটারী পাবেন।

CENTRAL LIBRARY

তোমার মা কি এখনও বাপের বাড়ীতে রয়েছেন?

হাঁ। এখানে আসবে না আর। দিদি গিয়ে ত্রিশ টাকা করে নিয়ে আসত ওর কাছ থেকে। এ মাসে যায়নি।

তোমার বাবা অফিসে যান কখন?

আজ দু'মাস হল বেরোয় না, বোধ হয় চাকুরি নাই। আফিং মিকশ্চার খেয়ে সারাদিন শুয়ে থাকে।

তারপর নিজেই বলল, মাসখানেক আগে বাবা একজনের বাড়ীতে গিয়ে টাকা ধার করে আনতে বলেছিল দিদিকে। লোকটা খারাপ বলে দিদি যেতে চায়নি। ভীষণ রেগে গিয়ে দিদিকে যা তা কথা বলে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। তিনদিন পরে পাড়ার এক বুড়ী—তাকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে গেল, বাবাকে খুব গালাগালি করল। তারপর থেকে দিদি খাওয়া প্রায় বন্ধ করেছে। বাড়ী থেকে বেরোয় না। আমাকে একদিন বলেছিল গলায় দড়ি দিয়ে মরবে সে। পাড়ার মেয়েদের স্কুলে একটা চাকুরির খবরের কথা শুনে তাকে দরখাস্ত দিতে বলেছিলাম এই সময়ে। সে গেল না, বলল পাড়ায় মুখ দেখাতে পারব না আমি।

আফিং মিকশ্চার? গাঙ্গুলী এলিক্সির নয়তো?

একটু থেমে ফণী বলল, দিদিটা মরে যাবে। দিন পনেরো আগে খুব জ্বর হয়েছিল, কিছু খেত না। আমি এক বন্ধুর কাছে পয়সা ধার করে বার্লি এনে দিয়েছিলাম খালি জল খেয়ে রয়েছে দেখে, বার্লি খায়নি। শুয়ে থাকে সারাদিন, খুব কাশি হয়েছে। কদিন আগে গায়ে হাত দিয়ে দেখলাম আবার জ্বর হয়েছে। তাই নিয়ে রান্না করছিল। বাবা নিজে সারাদিন শুয়ে থেকে চেঁচিয়ে গালাগালি করে দিদিকে। একদিন ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিল উঠানে, হাত হাঁটু, মাথা ফুলে গিয়েছিল। আমাকে বলল পড়ে গিয়েছিলাম। গরম জল করে সেঁক দিলাম। চার পাঁচ দিন হল আমি রান্না করছি, দিদি পারে না। খুব রোগা হয়ে গিয়েছে জ্বরে ভুগে ভুগে, না খেয়ে না খেয়ে। দিদি মরে যাবে মনে হয়।

এত কান্ড এই তিন চার মাসের মধ্যে!

দেখলাম বানপ্রস্থীর মনে ক্রোধ রিপুর উদয় হয়েছে। হতভাগা, একগুঁয়ে মেয়েটা বেশ জানে সে যা খুশী চাইলে আমার না করবার উপায় নাই, শুধু তার বাড়ীর প্রকৃত অবস্থার আভাস একদিনও দেয়নি। নিজে রোজগার করে পড়া চালাবার কথাটা বলেছে আগেও, সেটাকে বাজে বলে উড়িয়ে দিয়েছি আমি।

বরদাবাবুর ব্যাপারটা কি বুঝলাম না। সত্যিই কি চাকুরি গিয়েছে? খাওয়া চলে কিভাবে?

ফণী বসেছিল। হাত ধরে তাকে ভেতরে নিয়ে গিয়ে মহামায়াকে বললাম, ফণীকে কিছু খেতে দাও। তুলসীর খুব জ্বর হয়েছিল, তাকে একবার দেখে আসতে পারবে?

ফণী বাধা দিয়ে বলল, না-না, আপনি যাবেন না আমাদের বাড়ীতে, বাবা দেখতে পেলে যা-তা বলবে হয়ত।

বললাম, তাহলে থাক, আমি যাব।

ফণী বলল, আপনি যাবেন না, আপনার ওপরে বাবার খুব রাগ।

কি করবেন তোমার বাবা? অপমান আমার গায়ে লাগে না।

না, না যাবেন না, ভারি বিশ্রী সব কথা বলতে পারে।

চিন্তিত হলাম। কি করা যায় তাহলে?

বললাম, তোমাকে একটা কথা বলব। খেয়ে নিয়ে আমার কাছে একটু বসবে বাড়ী যাবার আগে।

ফণী আসবার আগে আমার ভাবনা শেষ হয়েছিল।

ফণী আসলে বললাম, তোমার দিদিকে তুমি সত্যি ভালবাস ফণী?

হাসল ফণী, আর কি বলবেন?

বললাম, আজ তাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসতে পারবে এখানে? বলো, জ্যেঠা-মশায়ের খুব অসুখ, দেখতে চেয়েছেন।

ফণী বলল, বাবা জানতে পারলে খুন করবে আমাকে। দিদি আসবে না। এতদূর হাঁটিতেও পারবে না।

রিকসায় চাপিয়ে নিয়ে আসবে।

যদি আসে তাহলে জানতে পারবে আমি মিথ্যা কথা বলে তাকে এনেছি।

তা জানুক। সে আসলে তোমাকে মামাবাড়ীতে রেখে আসতে হবে তাকে।

ফণী বলল, আমার বড় মামী থাকতে দেবে না তাকে। কোন কথা বললে মাকেও তাড়িয়ে দেবে। মা অনেক কষ্টে রয়েছে সেখানে। তা না হলে বাবা যখন বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল দিদিকে, সেখানে তাকে নিয়ে যেতাম আমি।

আবার ভাবতে হল।

বললাম, বাড়ীতে থাকলে তোমার দিদি মরে যাবে বলছিলে। দিদি মরে যাক চাও কি?

এমন কথা কেন বলছেন?

তাহলে আজ দুপুরে তোমার বাবা যখন ঘুমোন তোমার দিদিকে আমার অসুখের কথা বলে এখানে নিয়ে আসবে রিকসায় করে। তারপর কি হবে নিজে দেখতে পাবে।

খানিকটা ইতস্তত করে রাজি হয়ে ফণী বাড়ী গেল।

দেখলাম বানপ্রস্থীর মনে ক্রোধ রিপুর তার বৈরাগ্য ও ঔদাসীন্য কাপটা খেয়ে সরে যাচ্ছে।

সাড়ে দশটায় সময় অশোকের কারখানায় গেলাম।

অশোক উঠে এসে অভ্যর্থনা করল, আসুন মাস্টারমশাই।

বসব না অশোক, একটু কাজে এসেছি। তোমার ফোনটা কোথায়?

ফোনে পাঁচ মিনিট কথা হল। কথা সেরে অশোককে বাইরে নিয়ে গিয়ে জানালাম দুপুরের পরে তার গাড়ীটা চাই ঘণ্টা-দুয়েকের জন্য, তাকেও চাই। দু'টো নাগাদ আমার বাড়ীতে যাবার কথা বলে বাড়ী ফিরলাম। বললাম, কেন গাড়ী নিচ্ছি পরে শুনবে।

খাওয়া-দাওয়া সেরে বারান্দায় এসে বসলাম। অনেক রকমের কথা মাথায় আসছিল। তাদের কেমন কোনটার চেহারা দেখে নিজের মনে হাসছিলাম।

দেড়টার কিছু পরে ফটকে রিকসার শব্দ পেয়ে ভেতরে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লাম, একটা চাদর টেনে গায়ে দিলাম।

চোখ বুজেছিলাম পায়ের শব্দ পেয়ে। খাটে বসে বুকে মাথা রাখল তুলসী, বলল, তোমার এত অসুখ—

পাশ ফিরে মিট মিট করে বললাম, খবর নিতে নাই একটু?

চুপ করে মাথায় হাত বুলোতে লাগল, মনে হল কাঁদছে। কাঁদুক হতভাগা, এক-গুঁয়ে মেয়ে।

বালিশের নীচে থেকে পয়সা নিয়ে ফণীকে বললাম, ভাড়া দিয়ে রিকসা ছেড়ে দাও।

মহামায়া ঘরে এল। তুলসীর চেহারা দেখে সে চমকে উঠল মনে হল। ওকে আগে সব বলেছিলাম। তুলসীকে জড়িয়ে ধরে বলল, আয় আমার সঙ্গে। ওকে খানিকটা গরম দুধ খাইয়ে দিতে বললাম। বললাম, সহজে না খায়, জোর করে খাইয়ে দেবে।

কিছুক্ষণ পরে গাড়ীর শব্দ পেলাম। ফণীকে বললাম, দেখো তো অশোক এল কিনা।

অশোককে বাইরে বসিয়ে ফণী খবর দিল। তাকে বললাম, তোমার দিদিকে নিয়ে এসো।

বাইরে এসে অশোককে বললাম, একটি অসুস্থা মেয়েকে নিয়ে যেতে হবে, মেয়েটি তুলসী।

মহামায়া পাশের দোর দিয়ে বেরিয়ে এল তুলসীকে নিয়ে, গাড়ীতে বসিয়ে দিয়ে বলল, ডাক্তার দেখাতে হবে, দাদা আসছেন।

জ্যেঠামশায়ের যে অসুখ শিগগির।

মহামায়া বলল, তোকে দেখে তাঁর অসুখ ভাল হয়ে গিয়েছে।

ফণীকে তুলসীর পাশে বসিয়ে দিয়ে নিজে বসলাম, বললাম, এবার চলো অশোক।

সে নিজে গাড়ী চালাচ্ছিল।

বরদাবাবুর স্ত্রীকে বাড়ীতে পাওয়া গেল না, স্কুলে যেতে হল, আধ ঘন্টা অপেক্ষা করতে হল।

তাঁকে আসতে দেখে পথে আটকালাম, সংক্ষেপে সব অবস্থা এবং কি করতে চাই জানালাম। বললাম, আপনার কোন আপত্তি থাকে তো বলেন তুলসীকে বাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে যাই।

মৃদু কণ্ঠে বললেন, আপনার হাতে তুলসীকে দিলাম দাদা।

গাড়ীতে মেয়ের কাছে এসে তাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদলেন কিছুক্ষণ, কানে কানে কি বললেন। তারপর আমাকে প্রণাম করে ফিরে গেলেন স্কুলে।

চলো অশোক।

যে কেমিক্যেল ও ফার্মাসিউটিক্যেল কোম্পানীতে কাজ করতাম তার বড় কর্তার বাড়ীতে পৌঁছে খবর দিতে নিজে নেমে এলেন, সংগে তাঁর বড় মেয়ে।

মেয়েটি তুলসীকে নামিয়ে নিয়ে ভেতরে চলে গেল।

অশোককে বললাম, এবার তুমি ফিরে যাও। ফণী, তুমিও যাও। তোমার দিদি ক'দিন এখানে থাকবে, ডাক্তার দেখাতে হবে। বাবাকে বলো, তাকে মামাবাড়ীতে রেখে এসেছ। আমার যেতে একটু দেরী হবে।

এটা কাদের বাড়ী? ফণী প্রশ্ন করল।

বড়কর্তা হেসে বললেন, শুনলে না তোমার মামার বাড়ী।

দিদিকে দেখবেন আপনারা?

নিশ্চয় দেখব, তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ী যাও। যখন ইচ্ছা এসে দিদিকে দেখে যেয়ো।

আচ্ছা।

অশোক আমার ছাত্র। আমাদের ওদিকে একটা কারখানার মালিক।

নমস্কার বিনিময় করে বললেন, পরে আলাপ হবে, আসুন প্রোঃ গাঙ্গুলী।

অশোক ফণীকে নিয়ে চলে গেল।

(১১)

বরদাবাবুর বড় ছেলে সত্যকে সব অবস্থা জানিয়ে চিঠি দিয়েছিলাম, ক'দিন পরে সে চিঠির জবাব হল।

লিখেছে, আপনার, মার, বাবার চিঠি পেয়েছি। তিনখানা চিঠি পড়ে কি হয়েছিল, কেন আপনি আমাদের পারিবারিক ব্যাপারের মধ্যে এভাবে হস্তক্ষেপ করলেন, বুঝতে পারলাম না। মা জানিয়েছেন আপনি তুলসীর ভার নিয়েছেন, বাবার অভিযোগ গুরুতর। তিনি আদালতে যাবেন লিখেছেন। আমি নূতন চাকুরিতে ঢুকেছি, ছুটি পাবার সম্ভাবনা নাই। নইলে নিজে গিয়ে তুলসীকে বাড়ীতে ফিরিয়ে আনতাম। আপনার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা আছে শুনেছি, বয়সও যথেষ্ট হয়েছে, তুলসীকে বিয়ে করা আপনার পক্ষে সম্ভব নয়, আপনি নিজে জানেন। কেন তাহলে তাকে এ-ভাবে কলংকের ভাগী করছেন? আমার অনুরোধ তুলসীর সুনামের কথা, তার ভবিষ্যতের কথা ভেবে তাকে বাবার কাছে ফিরিয়ে দেবেন।

তুলসীর পড়াশোনা আর হবে না বুঝতে পেরেছি। বাবাকে লিখছি, তুলসীকে যে টাকা পাঠাই ফণীর পড়াশোনার জন্য সে টাকা এখন থেকে ফণীর জন্য খরচ হবে।

সত্যর চিঠি পাবার আগে বরদাবাবু একদিন রুদ্রমূর্তি ধরে হানা দিয়েছিলেন আমার বাড়ীতে, তার আগে শ্বশুর-বাড়ীতে গিয়ে স্ত্রীর সংগে সাক্ষাৎ করেছিলেন তাঁর কথা থেকে জানতে পারলাম। এবডাকশান চার্জের আসামী করে আমাকে শ্রীঘরে পাঠাবেন, গুণ্ডা লাগিয়ে পাড়া থেকে আমাকে তাড়াবেন ইত্যাদি যা কিছু বলবার ছিল তাঁর, বলে গেলেন।

চুপ করে শুনে গেলাম। তাঁর উত্তেজনা দেখে ভয় হ'ল স্ট্রোক হতে পারে। স্বাস্থ্যের অবনতি হয়েছে লক্ষ্য করলাম। নমস্কার করে বললাম, আপনার হার্ট এটাকের লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি, ঘন্টাখানেক চুপ করে শুয়ে থাকুন বাড়ী গিয়ে। আর চেঁচালে মামলা-মোকদ্দমা করবার সুযোগ পাবেন না।

কিছুক্ষণ হাঁ করে আমার দিকে চেয়ে রইলেন, তারপর উপযুক্ত মুখভঙ্গী সহযোগে একটা অশ্লীল গাল দিয়ে উঠে পড়লেন।

সত্যর কাছে হয়ত কিছু সহানুভূতির প্রত্যাশা করেছিলাম। সে নিজে এসে সব কথা শুনে যদি তুলসীর ভার নিতে চাইত, তার হাতে তুলসীকে ছেড়ে দিয়ে এই গোলমেলে ব্যাপার থেকে সরে দাঁড়াতাম। হয়ত না খেতে পেয়ে, অসুখে, নির্যাতনের ফলে তুলসীর অকালে মৃত্যু হত। তাতে কি ক্ষতি হত তাতে? তার ছেলে, তার মেয়েরা কি অকালে মরছে না? তুলসী মরে যেত, তার সব যন্ত্রণা শেষ হত, পুজোর মাস মনে মনে দাহ, আহা করে ভুলে যেতাম তার কথা। কিছুদিন চোখ বুজে কানে তুলো দিয়ে মনকে রেফ্রিজারেটরে পুরে রাখতে পারলে নিশ্চিন্ত হবার দিন এগিয়ে আসত, কারণ শুধু টিউবওয়েলের জলের ওপরে চলছিল তুলসী কিছুদিন ধরে।

এখন যা দেখছি, তুলসী হয়ে দাঁড়িয়েছে গলার কাঁটা। এ কাঁটা গলা থেকে তুলে নিজেকে বাঁচাই কি করে?

কয়েকদিন পরের কথা। তুলসীর চিকিৎসা চলছিল। তার অবস্থা ভালর দিকে, কোম্পানীর লেবরেটরীতে কাজ করছিলাম, বড়কর্তা এসে তাদের নূতন এসিস্টান্ট যারা তখনও বাড়ী যাননি, তাদের বাগিয়ে নিয়ে বললেন, চলুন মশাই আপনার তুলসীর কাছে। কথা দিয়েছি তাকে আজ আপনাকে ধরে আনব। বুড়ো বয়সে কি বশ মন্ত্র খাটিয়েছেন জেঠামশাই বলতে অজ্ঞান, চোখে জল। মন্ত্রটাকে ফর-মুলায় ফেলে যদি একটা কিছু বের করতে পারেন লাল হয়ে যাবে কোম্পানী তা বেচে।

তাঁর বাড়ীতে যেতে হল তাঁর সঙ্গে।

(ক্রমশঃ)

বেনারসী শাড়ী
ইণ্ডিয়ান সিল্ক-হাউস
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা
।। আমাদের কোন ব্রাঞ্চ নাই ।।

মনুখের মেলা

বৃদ্ধের তরুণী ভার্যা

মহা রসের বুড়ো মহাদেব সাউ।

বুড়ো বয়সে আবার টোপর মাথায় দিয়ে বিশ বছরের নব-তা যুবতী মেয়েকে বউ করে এনেছে। বউটাকে দেখতে নাকি পরীর মতন।

পাড়ার বঙ্কিম সাধুখাঁ মহাদেবের এক গেলাসের ইয়ার। চাল্লিশ বছর 'নাংলা' করেছে এক সঙ্গে। দুজনে খানবাড়ির জলে পাড় মাতাল হয়ে সারা রাত পাক খেয়েছে, মারামারি করেছে, মামলা করেছে, আবার ভাব হয়ে গেছে, দুজন বিবির বাজারের একই বিবির কাছে গেছে কিন্তু বিয়ের ব্যাপারটা মহাদেব সাউ গোপন করলে কেন তাকে? মহাদেবের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হতেই সাধুখাঁ বললে, 'কি হে সুমুন্দি, খুব যে টেরি বাগিয়ে, কোঁচা দুলিয়ে, পাঞ্জাবি পরে, পান চিবিয়ে ঠোঁট রাঙা করে চা-দোকানের মোড়ে সন্ধের আড্ডা জমাতে চলেছ? বলি মাল-টাল আজ টানা হবে?'

মহাদেব হেসে গালটা অনেকখানি ফেলে রইল। তারপর বললে, 'টাকা নেই!'

'কেন, নতুন বউ কি টাকার ভাঁড়ারটা দখল করে ফেলেছে?'

মাইরি! আমাকে দুদ্দু!'

'হা-হা-হা! টইটুম্বুর! গায়ে সেন্টের গন্ধ! আবার পায়ে আলতা?'

'দুপুরে ঘুমাচ্ছিলুম, পায়ে লাগিয়ে দিয়েছে, শালীটা বড় দুষ্টু! আর কালি দিয়ে আমার রাবণের মতন গোঁফ করে দিয়েছিল। বাইরে বেরুতে বড় গিন্নী জ্বলে উঠল : মরণ। গলায় দড়ি জোটে না! রাবণ সাজিয়েছে বুড়ো বলে? তবু কত আদিখ্যেতা!' —আয়না দিয়ে দেখি—তাই তো! মিথ্যে রাগ দেখিয়ে হাঁকলুম, বেদানা! একি করেছ? আমি কি তোমার ঠাকুদ্দা যে মস্করা করেছ? বেদানা হেসে খুন! বড়গিন্নী চোখ বার করলে তাকে পাঁজা করে ধরে কোলে তুলে নাচাতে থাকে। সেও হেসে ফেলে। ভারী মজার মেয়ে!'

দুজনে কার্তিক মাসের শেষে ধান পাকা মাঠের মাঝ দিয়ে হাঁটিতে থাকে।

সাধুখাঁ গম্ভীরভাবে বললে, 'ভাল কাজ করলি না। ঐ জোয়ান মেয়ের যৌবনের ভোগ দিবি কি করে এখন তুই? তোর এখন ষাট্‌ষট্টি বছর বয়েস। চুল পেকেছে। ভুঁড়ি গজিয়েছে। হাঁটুতে গেঁটে বাত। দুদিন বাদে কোমর আঁকড়ে ধরবে। সোমত্ত মেয়ে ঘরে, বড় ছেলে লেদ মেশিনের বড় মিস্ত্রি — ছ'শো টাকা মাইনে — তাদের বিয়ে দিবি কোথায় না নিজে বিয়ে করে আনলি? ঐ মেয়েটার সঙ্গেই তো তোর ছেলের বিয়ে দিতে পারতিস!'

'তাই তো দিতে চেয়েছিলুম হে। কনে দেখতে গেলুম আমার বাদল মাষ্টারের সঙ্গে। বাদল কনেটার দাদা-মশায়। কনে আমাকে দেখে হাসতে লাগল। বাদল বললে, 'ও নাতনী ঐ রকম, সদাই হাসে! ওকে কনে সাজানো হয়েছে, তাই মজা পেয়ে হাসছে। ওকে তুমি-ই না হয় বিয়ে কর। দশ বিঘে জমি লিখে

দিবি খালি ওর নামে। তোর বুড়ী দেড়েল বউ নিয়ে সারা জীবনটা সুন্দরী মেয়ের পাঁজরের ফিকের কাল কেটেছে। ছেলের বউ হবে, আরো অনেক মেয়ে আছে। তাছাড়া বেদানা লেখাপড়া জানে না — তোর ছেলে ওকে নাকচ করে দেবে।' শালা, মাথা

এমন 'ঘ্ইরে' দিলে, আর মনে হয় পানের মধ্যে বশীকরণের ওষুধ দিয়ে আমাকে খাইয়ে দিয়েছিল। দলিল লিখিয়ে টিপসই করিয়ে একেবারে বিয়ে দিয়ে কনে সমেত ঘরে তুলে দিয়ে গেল। বড় বউ আমাকে মারবে বলে গাছ-কোমর বেঁধে তেড়ে এলো, 'তবে রে ওনামুখো মিনসে, তোমার বিয়ের নিকুচি করেছে', তেড়ে এসে আমার গলা টিপে ধরলে, আঁচড়ে-কামড়ে অস্থির করে শেষবেলা শালা হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গেল! মেয়ে কাঁদতে লাগল, মাথায় জল চাপড়াতে লাগলুম। ওর হার্টের ব্যামো। ছেলেটা ব্যাগ হাতে নিয়ে 'যাচ্ছি বাবা' বলে কলকাতায় চলে গেল। দু সপ্তা আর বাড়িতে এলো না। এখন সব ঠিক হয়ে গেছে। বেদানার সংগে সব্বাইয়ের ভাব। সংসার আনন্দে মাত করে রেখেছে। আমার ছেলের সংগে ক্যারাম খেলে—লুডো খেলে। তাকে খাওয়ায়—মাথা আঁচড়ে দেয়।'

'হুঁ। চল মাল খেতে যাই আজ।'

'বেদানার মানা। তাছাড়া টাকা নেই।'

'তোর টাকা নেই কোন সুমুন্দিও বিশ্বাস করবে না। পাঁচিশ বিঘে জমি। ধান খড় পাট আখ বাঁশ উলু পান কলাই—কত জিনিস বিক্রি করিস। ঘি দুধ খাস। ফরসা শরীল টসটস করছে। খালি এখন চোখ দুটো কোটরে ঢুকে গেছে। কদিন আর বাঁচবি ভাই সাউ মশায়, আজ মাল না খাওয়ালে—এই'...

'এই—মাইরি—না না—তোর পায়ে ধরি'...লাফ দিয়ে একেবারে পথের নিচে নেমে যায় মহাদেব সাউ। সন্ত্রস্তভাবে হাত দুখানা কাঁপাতে থাকে। কাতুকুতুকে তার ভীষণ ভয়। সাধুখাঁ সবে তার পাঁজরে একটু কড়ে দিয়েছে—তো সে এক লাফ।

সাধুখাঁ খুব মজা পায়। আঙুল বাড়িয়ে ভয় দেখিয়ে বলে, 'এই দিলুম, এই'—

'এই শালা! না মাইরি!'

'এই'—

'এই ভাই না, মরে যাব মাইরি, তোরে পায়ে ধরি, তোকে জোড়হাত করি।'—ধান বনের কাদায় জুতো সমেত নেমে যায় মহাদেব। একবার কচু-বনের মধ্যে ফেলেছিল সে ওকে। একেবারে লাফ দিয়ে পড়েছিল জলে। ভাঙা কাঠে পা কেটে গেল। অর্ধেকে ব্রজ বার হতে লাগল উঠে আসতে। সাতটা দিব্যি গালতে তবে জল থেকে ওঠে। পা বেঁধে দিতে চাইলেও মহাদেব নারাজ। ভয়, আবার যদি কাতুকুতু দেয়।

মহাদেব কাতরভাবে বলে, 'তোর নামে দিব্যি, অমন করিস নি। গালাগালি করব।'

ছেলেরা ছুটে এলো মজা দেখতে। হৈ-হৈ কাণ্ড!

সাধুখাঁ আরো নেমে গেল। তখন চিৎকার গালাগালি—মুর্খখিস্তি।

সাধুখাঁ বলে, 'ওরে শালা, তোর নতুন বৌয়ের সংগে এত পীরিত—তার কথা শুনবোনা। আমি দুকুড়ি বচ্ছরের ইয়ার—এখন মদ খাওয়াবে না? এবার নেমে শালাকে ধানবনের মধ্যে ফেলে বুকে চেপে খুব করে কুরকুরানি দোব তোর বগলে আর পাঁজরে। তোর শ্বশু বার করে দোব। বলে সত্যিই বঙ্কিম সাধু খাঁ ধানবনের কাদায় নেমে যেতেই মহাদেব বললে, 'ওরে শালা, ওরে আমার সোনাই, চল তোকে মাল খাইয়ে আনছি।'

'আয় তবে।' হাত ধরে টেনে তুলে আনলে তাকে সাধু খাঁ। হাত-পা ধুয়ে বাসে উঠে চলে গেল মদ-দোকানে। দুজনে শালা পানি টেনে রঙিন হয়ে এসে টলতে টলতে রিকসা থেকে নামল রাত ন'টার সময়। নেমেই টলে পড়ে গেল মহাদেব। তাকে তুলতে গিয়ে তার গায়ের ওপরে হুমড়ি খেয়ে পড়ল বঙ্কিম। মোড়ের লোকজন তাদের রগড় দেখতে লাগল। কেউ কেউ ছি-ছি করতে লাগল। ফারুকুল হোসেন, অঞ্চলপ্রধান বাছ এসে বললে, মহাদেববাবু, মান-ইজ্জৎ ডোবাবেন?'

'মান-ইজ্জৎ! কেন বাবা? জীবনটাকে উপভোগ করা কি অন্যায়? আমি তো শালা সাধু না? গেরস্থ!'

বঙ্কিম বলে, 'হাঁ গেরস্থ। একদম সাধু না।'

'নেশা আপনাদের খুব ভাল করে জমেনি। মাতলামি করছেন ইচ্ছে করে।' ফারুকুল চলে গেল।

টলতে টলতে নাচতে নাচতে হাতের তালি মেরে উড়ানো গলায় গান গাইতে গাইতে বাড়ির দিকে চলে আসবার সময় দুজনেই পড়ে গেল। সাধু খাঁ কোনোক্রমে কুঁতিয়ে কুঁতিয়ে উঠে মহাদেবকে টানাটানি করতে গেলে সে হড়হড় করে বমি করতে থাকে।

বঙ্কিম বলে, মর শালা, আমি চললুম। নেশার বারোটা বাজিয়ে দিলে—বমি হল তো সব 'ফুইরে' গেল!'

শীত পড়ে গেছে। গাঁয়ের উদোম হাওয়া ভরা মাঠে শুধু অন্ধকার আর আকাশে তারার দেওয়ালী। দোকানপাট বন্ধ হয়ে গেছে। খানিকটা দূরের মুদি-খানার চাতালে এসে শুয়ে পড়ে থাকে বঙ্কিম সাধু খাঁ। আর বকতে থাকে।

মহাদেব তখন পথের পাশে পড়ে আছে। কুকুরে তার মুখ চাটছে। খবর শুনে মহাদেবের ছেলে পরাশর আর ছোট বউ বেদানা এলো অন্ধকারে টর্চ হাতে নিয়ে।

কুকুরটা মুখ চাটতে থাকলে তার গলা জড়িয়ে ধরতে যায় মহাদেব বুড়ো। আর বলে, 'বেদানা—আমার বে-দা-না—! তোমার দানা নেই। বীজ নেই। অপসরা!...'

কুকুরটাকে লাথি মেরে তাড়িয়ে দেয় পরাশর।

বেদানা বসে পড়ে আঁচল দিয়ে স্বামীর মুখ মোছাতে থাকে। বলে, 'তুমি না মদ খাবে না বলেছিলে হ্যাগো? মদ তুমি খেয়েছ, না, মদ তোমাকে খেয়েছে? চলো, ওঠো, বাড়ি যাবে।'

'কে বটে!' টলতে টলতে সাধু খাঁ এগিয়ে এল।

বেদানা আর পরাশর দুদিকের নড়া ধরে মহাদেব সাউকে টানতে টানতে নিয়ে এল বাড়িতে।

বড়গিন্নী বললে, 'ছেরন! মিনসের মুখে নুড়ো জেলে দে।'

পরাশর রাত্রে দোর বন্ধ করে নিয়ে শুয়ে পড়ল। বেদানা, বাসন্তী, তার মা তরলা ডাকাডাকি করলেও সে আর দোর খুললে না। সকালে সুটকেশ হাতে নিয়ে কলকাতায় চলে গেল।

বেদানা চোখ মুছতে লাগল।

মহাদেব হুঁকো টানে আর ভাবে, ছেলেটা বোধহয় আর ফিরবে না। ক্ষেতে জন লাগবে, লোকজন ডাকা দরকার, বেরুতে পারে না, কোমর আঁকড়ে ধরেছে, সোজা হয়ে চলতে পারে না। পানের বরোজ পড়ে গেছে।

তরলা বলে, 'লাঠি ধরো না। বাই কতো বুড়োর। এখন ক্ষেতের ধান ইঁদুরে বাঁদরে, চোরে-ছ্যাঁচোড়ে খাবে।'

তারপর মহাদেব সাউ হঠাৎ একদিন মারা গেল। বেদানার ঘরে, বিছানায় শুয়ে শুয়েই। কেন তা কে জানে, সকালবেলা পর্যন্ত বিছানায় পড়েছিল—ঐ পর্যন্ত—বেদানা নাকি কিছু জানে না।

—আবদুল জব্বার

সকল ঋতুতে অপরিবর্তিত ও অপরিহার্য পানীয়

চা

কেনবার সময় 'অলকানন্দার' এই সব বিক্রয় কেন্দ্রে আসবেন

অলকানন্দা টি হাউস

৭, পোলক স্ট্রীট কলিকাতা-১

২, লালবাজার স্ট্রীট কলিকাতা-১

৫০, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ কলিকাতা-১২

॥ পাইকারী ও খুচরা ক্রেতাদের অন্যতম বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান ॥

ইনকারা কি লিখতে পারতো

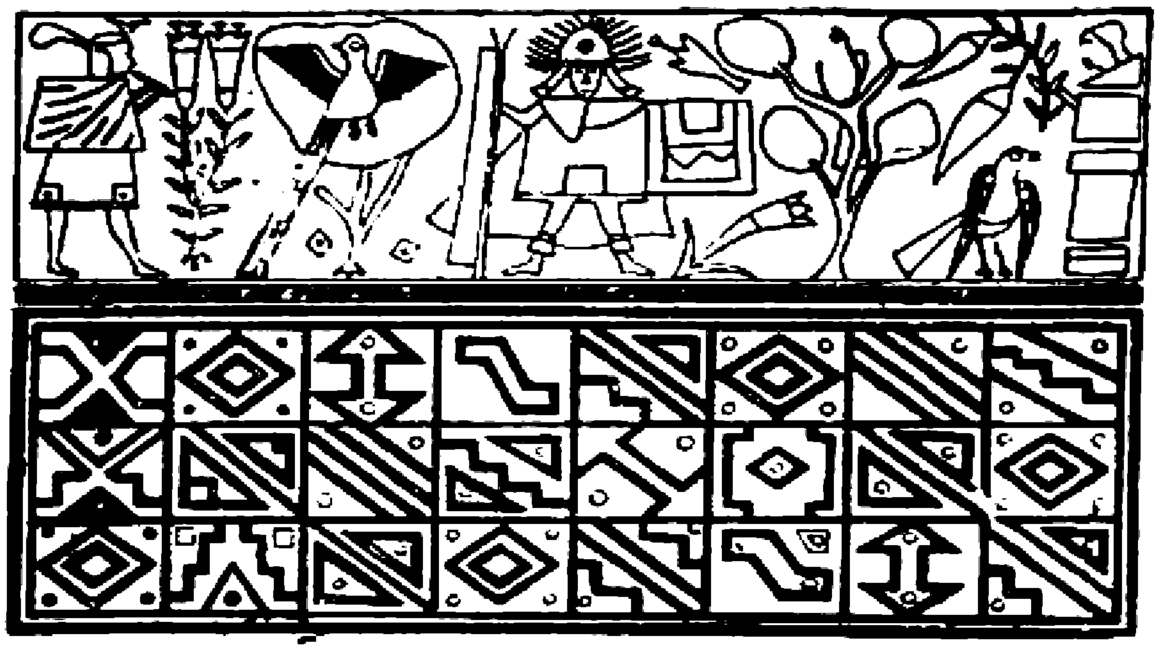

বহুকাল আগে দক্ষিণ আমেরিকার পেরু ছিল ইনকাদের শাসনে। এতোকাল মানুষের বিশ্বাস ছিল যে, এই সুসভ্য জাতি লিখতে জানতো না। প্রাচীন লিপি বিশেষজ্ঞ জার্মান বিদুষী শ্রীমতী বার্থেল ইনকাদের পরিধেয় বস্ত্রে জ্যামিতিক অলংকরণ এবং পুজোর ব্যবহৃত ঘটের ওপর আল্পনা থেকে মায়া লিপির মর্মোদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছেন। বর্তমানে তিনি চারশো চিত্রের মধ্যে পঞ্চাশটির ব্যাখ্যা দিতে পারেন এবং চব্বিশটি পড়তে পারেন।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

প্রতিবাদের সীমারেখা

পাশ্চাত্য খণ্ডে পয়সার অভাব নেই, খাদ্যদ্রব্য, ভোগ্যপণ্য সবই প্রচুর, অথচ এই স্বচ্ছলতা সত্ত্বেও সেখানকার ছাত্র সম্প্রদায় আজ মারমুখী। তারা বিদ্রোহের পথে নেমেছে। স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে আমাদের দেশে ছাত্র অসন্তোষ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, কিন্তু এদেশের ছাত্রদের মনোভঙ্গীর সঙ্গে ওদেশের ছাত্রদের উদ্দামতার মধ্যে মৌল-পার্থক্য অনেক দিক থেকে।

আমাদের ছাত্রদের বিদ্রোহের কারণ অজস্র, যথা — মরচে-ধরা শিক্ষা-পদ্ধতি, বেকারীর বিভীষিকা, সামাজিক কাঠামোর ভিতর যথোচিত মর্যাদার দাবী এবং গোঁড়া সমাজব্যবস্থার সঙ্গে সংঘাত, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ইত্যাদি। এছাড়া আরও অসংখ্য কারণ রয়েছে। মোটকথা সামাজিক অব্যবস্থা এবং রাজনৈতিক অনিশ্চয়তাই আসল কারণ। একমাত্র উৎকট চরমপন্থী ভিন্ন 'এস্টাব্লিস-মেন্ট' বা 'সিসটেম' নামক নয়া-দুর্যমনের তেমন বিরোধী নন। বরং এই 'এস্টাব্লিস-মেন্ট' নামক ভৈরবীচক্রের পাঁচজনের মধ্যে একজন হয়ে মোড়লী করার সাধ অনেকেরই। আর না-পাওয়ার বেদনাই অনেককে হতাশার সাগরে ভাসিয়েছে। বিভ্রান্তিজনিত অসন্তোষ ছাত্রদের কাঁধে বিদ্রোহীর পতাকা তুলে দেওয়ার কাজে সাহায্য করেছে।

ওদেশের ছাত্র প্রতিবাদের প্রকৃতি ভিন্ন। সেসব দেশের 'এস্টাব্লিসমেন্ট' বা 'সিসটেম' ছাত্র সমাজের জন্য কিছু পরিমাণে কল্যাণ-ধর্মী কর্ম করেছেন যথা—ছাত্র সমাজের বহুবিধ সুখ-সুবিধা বিধান, পাঠগ্রহণ পর্ব শেষ হলে সুনিশ্চিত কর্মসংস্থান এবং নানা-বিধ হিতকরী (ওয়েলফেয়ার) ব্যবস্থা। ছাত্রদের সন্তুষ্ট রাখার জন্য পশ্চিমের রাষ্ট্র-প্রধানরা বদ্ধপরিকর।

কিন্তু শুধু রুটিতেই ত মানুষ বাঁচে না, তদতিরিক্ত কিছু চাই। ওদেশের ছাত্র-সমাজ অসন্তুষ্ট কারণ এই 'সিসটেম' সেখানে পাপগ্রহ সমতুল। প্রতিযোগিতা-মূলক জড়বাদী নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত এই সিসটেম দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ধারাকে নরকে রূপান্তরিত করেছে। জীবনের বিকাশ, তার উৎকর্ষতা হ্রাস পেয়েছে, জীবন-যাত্রার মান বাড়লেও জীবনধারা উন্নত হয় নি। সেখানে মানুষ 'কনসিউমার' নামক স্বয়ংক্রিয় পদার্থে রূপান্তরিত। রাষ্ট্রকর্তারা এক কাঞ্চন-কুলীন মুষ্টিমেয় গোষ্ঠীর হাতে ক্রীড়নক মাত্র। নরনারীর জীবন সেখানে এক শ্রেণীর 'পাওয়ার এলিট' বা শক্তিমান ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর তাঁবে। ব্যুরোক্রাসির এঁরা চালক, জনসংযোগ ব্যবস্থার চাবিকাঠি এঁদের হাতে, আর যাবতীয় ভোগ্যপণ্যের বিক্রেতা এই 'পাওয়ার এলিট' গোষ্ঠী।

অনেকে জানতে চাইবেন এ কি সত্য? কতটুকু সত্য। বামপন্থী র‍্যাডিক্যালরা কি অতিমাত্রায় অতিরঞ্জন করছেন না? তাঁদের বুক্তিগুলি অভিপ্রায়মূলক নয় কি?

প্রমাণ জানতে আগ্রহ যাঁদের আছে তাঁদের পিটার বাকম্যান রচিত 'দি লিমিটস অব প্রোটেসট' নামক সদ্য-প্রকাশিত গ্রন্থটি পাঠ করার জন্য অনুরোধ করি। 'নিউ র‍্যাডিক্যালিজম' বা নয়া-রূপান্তরবাদ নামক আন্দোলনের উদ্ভব এবং ক্রমবিকাশ, জন-মানসে এই আন্দোলনের প্রতিফলন, ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা, শক্তি এবং সীমারেখা প্রভৃতি সকল দৃষ্টিকোণের বিচার করা হয়েছে বাকম্যানের এই গ্রন্থটিতে।

'র‍্যাডিক্যালিজম' বস্তুটির বক্তব্য কি, কিম্বা কি জাতীয় 'সিসটেম'কে বদলে করা র‍্যাডিক্যালদের অভিপ্রায়?

রবার্ট হাইলব্রোণার 'দি ফিউচার এজ হিস্টরী' (১৯৫৯) মার্কিন সমাজের কথা প্রসঙ্গে বলেছেন :

"Among the 150 supercorporations, there are perhaps as many as 1,000 or 2,000 operational top managers, but as few as 200 to 300 families own blocks of stock that ultimately control these corporation".

বারম্যান বলেছেন ১৯৬০ খৃস্টাব্দে রপ্তানী দ্রব্যের এক-পঞ্চমাংশ উৎপন্ন হয়েছে মাত্র বারোটি ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানে।

হল্যাণ্ডে মাত্র তিনটি প্রতিষ্ঠান মোট রপ্তানীর ৩৫ ভাগ রপ্তানী করেছে, তারাই আবার ঐ দেশের মোট শিল্প ব্যবস্থায় বিনিয়োগ করেছে এক-তৃতীয়াংশ ভাগ এবং শতকরা বারো ভাগ লোকদের কর্মসংস্থান করেছে। জার্মানীতে একশটি বড়দরের বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান দেশের সমগ্র শ্রমিক শ্রেণীর এক-তৃতীয়াংশের নিয়োগকর্তা এবং মোট উৎপাদনের এক-পঞ্চমাংশের জন্য দায়ী। দৃষ্টান্ত এইভাবে আরো বাড়ান যায়।

বড় ব্যবসাদার বা বিগ বিজনেসের সঙ্গে শাসক গোষ্ঠীর একটা সুদৃঢ় গাঁট-ছড়া বাঁধা আছে।

"Of eight Secretaries of State (in the US) since 1932, five have been listed in the SOCIAL REGISTER, while three of the five were corporation Lawyers. Of 13 Secretaries of Defence or of War since 1932, eight find a mention in the SOCIAL REGISTER, while the other five have been bankers or Corporation executives."

অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশগুলিতে 'পাওয়ার-এলিটে'র কাঠামো মোটামুটি একই রকমের। দৃষ্টান্তস্বরূপ ইংলণ্ডের উঁচুতলার পাব্লিক স্কুল—অকসব্রীজ-ইন্ডাস্ট্রি এবং হোয়াইট হলের যোগসাজস সর্বজনবিদিত।

পাওয়ার-এলিটের অক্টোপাসসদৃশ বিস্তারিত বাহু শাসকগোষ্ঠী ছাড়াও আরো অনেক দূর পর্যন্ত প্রসারিত। ব্যবস্থা পরিষদে ওদের দলবল বেশ শক্তিমান—এঁরাই পাওয়ারফুল লবী গড়ে তোলেন। মাসমিডিয়া বা জনসংযোগের যন্ত্র যথা সংবাদপত্র, টেলিভিশন প্রভৃতি এঁদের কুক্ষিগত। এছাড়া এই অদৃশ্য শক্তি চিন্তাশীল সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। এই সব চিন্তাশীল মানুষদের বহুমূল্য গবেষণার ব্যয়ভার বহন করেন এই সব সমাজের-গোষ্ঠী। এর জন্য ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করা হয়, স্কুল, কলেজ ও য়ুনিভার্সিটি হরিহরছত্রের মত চারদিকে প্রতিষ্ঠিত হয়।

এর পরও অনেকে প্রশ্ন করবেন—বেশ ত এসব হয়ে থাকে ত কি হয়েছে? সাধারণ মানুষের সমৃদ্ধি ঘটে যদি তাহলে কে তার মূলধন যোগাচ্ছে সেই কথা চিন্তা করে কি লাভ?

এই প্রশ্নই র‍্যাডিক্যালদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে প্রচণ্ড বাধা। উপস্থিত এর একটি জবাব হল এই যে, অতিমাত্রায় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তি যদি প্লুটোক্রেসী বা কাঞ্চনকুলীন সম্প্রদায়ের হাতের মুঠোয় থাকে, (প্রতিযোগিতামূলক ধনতন্ত্রে এই জাতীয় জমায়েত অনিবার্য) তাহলে প্রকৃতপক্ষে জনগণকে আধা-সরকারী অপর এক চক্রের তাঁবেদার হয়ে থাকতে হয়, যাঁদের ওপর জনগণের কোন নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা নেই, আর এই আধা-সরকারীচক্রের জনগণকে তাঁদের কীর্তিকলাপের জন্য জবাবদিহির দায়িত্ব নেই। এই চক্র প্রতিনিধিমূলক নয়, এদের নির্বাচনে জনগণের কোন অংশ নেই, অথচ এই শক্তিচক্রের অবাধে জনগণের ওপর যা-কিছু বোঝা চাপিয়ে দেওয়ার স্বাধীনতা আছে; সাধারণভাবে সমাজকে এবং বিশেষভাবে রাষ্ট্রকে চক্রের নিজস্ব অভিসন্ধি পূরণের কাজে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করা হয়।

ক্যাপিটালিস্ট ডেমোক্রেসী বা পুঁজিবাদী ধনতন্ত্রে বড় গলায় গর্ব করে বলে থাকেন যে, তাঁরা কমুনিস্ট সরকারের চেয়ে অনেক মহৎ; কারণ তাঁরা জনগণকে অবাধ স্বাধীনতা এবং নির্বাচনী ক্ষমতা দিতে পেরেছেন। অবাধ প্রতিযোগিতার সুযোগ দিয়ে আঁতরেপ্রেনোর বা উদ্যোক্তাদের যথাসাধ্য করার সুযোগ দেওয়া হয় আর এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে সাধারণ খরিদ্দার বা কনজিউমার লাভবান হতে পারেন; (আমাদের দেশে সাবান শিল্প এবং তার আনুষঙ্গিক কোজমেটিক্স দ্রব্যের ক্ষেত্রে কিন্তু এই উদ্দেশ্য বানচাল হয়ে গেছে; কারণ এই সব ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদকরা এসোসিয়েশন গড়ে তাঁদের উৎপন্ন দ্রব্যাদির জন্য একটা নির্দিষ্ট দাম বেঁধে দিয়েছেন। ফলে খরিদ্দার বা কনজিউমার প্রতিযোগিতা-জনিত কোন সুবিধার অংশীদার হতে পারেন না)।

এই সব শক্তিগোষ্ঠী অজস্র পার্টি গজিয়ে উঠতে সাহায্য করেন, কারণ এই সব পার্টি নানা ধরনের কার্যসূচী ভোটদাতাগণের সামনে ধরেন যার মধ্য থেকে পছন্দমত একটি পার্টি বেছে নিয়ে তাকে ভোট দেওয়া যায়; তাছাড়া চিন্তার স্বাধীনতা, নিজস্ব বিশ্বাসের স্বাধীনতা, মানবিক অধিকার এবং জনগণের একটি অংশ না হয়ে ব্যক্তিবিশেষ হয়ে দাঁড়াবার সুযোগ দিয়ে থাকে।

থিয়োরীর দিক থেকে খাতায়-কলমে এসব কথা ঠিক; কিন্তু বর্তমান জগতে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতার প্রায় সবটুকুই একচ্ছত্র অধিকারে রাখার ফলে, জনসংযোগ যন্ত্র বা সংবাদপত্র প্রভৃতি নিয়ন্ত্রিত থাকায় কার্যক্ষেত্রে জনগণের মানসিকতাও নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। এই শেষোক্ত বস্তুটির শক্তিবৃদ্ধির ফলে ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর পক্ষে এক বৃহত্তর সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হয়েছে। জার্মানীর তৃতীয় রাইখ এই ব্যবস্থার এক উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটানো যদি কাম্য না হয় তাহলে শক্তি কেন্দ্রীভূত না করে শক্তির বিকেন্দ্রীকরণ অধিকতর প্রয়োজন। এই জাতীয় কেন্দ্রীভূত শক্তি সঞ্চয়ের ফলে সরকার জনগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ না হয়ে ক্রমশ দূরে সরে যান। সুতরাং সরকার একখানি নৈর্ব্যক্তিক না হয়ে যদি শক্তির বিকেন্দ্রীকরণ ঘটিয়ে জনসাধারণকে প্রত্যক্ষভাব সরকারী কাজে সংযুক্ত হতে উৎসাহিত করেন এবং জনগণের প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপন করতে পারেন তাহলে তার ফল ভাল হবে।

র‍্যাডিক্যালদের চোখে এই সমগ্র ব্যবস্থা একেবারে জরাজীর্ণ। এই জাতীয় একচেটিয়া অধিকার বা কাঞ্চনকৌলীন্যের প্রবণতা যে ক্ষমতার অপব্যবহার তাঁরা একথা স্বীকার করেন। এই ব্যবস্থার পরিবর্তন করলে যে সব ঠিক হয়ে যাবে একথাও তাঁরা মেনে নিতে রাজী নন। এঁরা নিছক সংস্কারবাদী নন, তাঁদের বিশ্বাস প্রচলিত পদ্ধতির এই ত্রুটি অন্তর্নিহিত সুতরাং তাকে সমূলে ধ্বংস করাই কর্তব্য, আর তাহলেই সমাজের কল্যাণ সম্ভব। এই ব্যবস্থার পরিবর্তে অধিকতর মানবিক এবং আত্মস্বার্থহীন শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলা প্রয়োজন। র‍্যাডিক্যালরা কম্যুনিস্ট রাষ্ট্র সম্পর্কে যেমন পক্ষপাতিত্ব নন, যেমন বুর্জোয়া-ক্যাপিটালিস্ট গোষ্ঠীর প্রতিও তাঁরা অনুকূল নন। প্রথমোক্ত ব্যবস্থায় কুৎসিত প্রতিযোগিতা নেই কিন্তু অল্পসংখ্যক মানুষের হাতে সমস্ত ক্ষমতা পুঞ্জীভূত, এই অল্পসংখ্যক মানুষেরই নাম পার্টি। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার চেয়ে এইখানেই ক্ষমতা অধিক পরিমাণে কুক্ষিগত করে রাখা হয়েছে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণ অনুপস্থিত এবং এই ব্যবস্থায়—

"the men are required to be conforming members of a monolithic mass rather than individuals".

আর সম্ভবত ফ্রী ওয়ার্লডের সরকার-এর চাইতেও কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রের সরকার জনগণের কাছ থেকে অনেকখানি দূরে সরে আছেন।

তাহলে র‍্যাডিক্যালরা কি অপরূপ বস্তু নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন? এই প্রশ্নের লেখক বারম্যানের ভাষাতেই শোনা যাক—

"The kind of social organisation radicals would like to see is clear. Basically organised on socialist lines, with the means of production, distribution and exchange in the hands of those who work, the new state would put technology to the service of its inhabitants rather than the reverse. Communities would be autonomous, on the principle of self

determination, and would be small enough to enable everyone in them to participate in the making of all decisions. The tyranny of minority over majority and majority over minority will be abolished. There would be no foreign wars. Ideally, there would be police force, no laws limiting personal freedom, and no censorship."

এ এক উদ্ভট পরিকল্পনা, কিন্তু বিরুদ্ধ যুক্তি হিসাবে তা প্রয়োগ করা যাবে না। আদর্শবাদ কোন সময়েই অবজ্ঞার বস্তু নয় এবং এই আদর্শবাদ ভিন্ন কোন প্রকার কল্যাণকর পরিবর্তন সাধন করাও সম্ভব নয়।

যাই হোক, শ্রমিকের স্বপক্ষে সম্পূর্ণভাবে না টানতে পারলে এই জাতীয় আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে পুনর্গঠন সম্ভব নয়। শ্রমিকদের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল করাতে হবে যে, বর্তমান ব্যবস্থা অমঙ্গলকর এবং মানবাত্মাকে নিষ্পেষিত করে, অন্ততঃ র‍্যাডিক্যালরা এই কথাই বলতে চান। কিন্তু যে 'সিসটেম' শ্রমিকদের একটি করে গাড়ী, রেফ্রিজারেটার এবং টি ভি সেট দিতে পারে সেই সিসটেমকে সহসা দুর্দমন করে তোলা সহজ নয়।

মিঃ বাকম্যান ১৯৬৮-র মে-জুন মাসের উত্তাল দিনগুলিতে ফ্রান্সের নান্তে কম্যুনে যা ঘটেছিল তার প্রতি নির্দেশ করে বলেছেন—

"The only concrete example demonstrating the possibility of a government of the workers based on the direct management of the economy by those who produce."

এই একবার শ্রমিক আর ছাত্র সমাজ একমত হতে পেরেছিল এবং একতাবদ্ধ হয়েছিল। কম্যুনের সাফল্য অবশ্য স্বল্পস্থায়ী হয়েছিল, কারণ তার অবস্থা ছিল নিরন্তর অবরোধের। সর্বগ্রাসী বিপদের মুখে একতাবদ্ধ হওয়া সহজ। স্বাভাবিক অবস্থায় এই একতা কতক্ষণ স্থায়ী হবে? শ্রমিক ও ছাত্রদের কমরেডত্ব কতক্ষণ অটুট থাকবে?

মিঃ বাকম্যান যুক্তরাষ্ট্রের কিছু-কিছু পরীক্ষামূলক ব্যবস্থার সমর্থন করেছেন যথা, ফ্রী স্কুলস, ফ্রী ইউনিভার্সিটিস, মুক্তাঞ্চল প্রভৃতি। এর মধ্যে কিছু গোষ্ঠীকে ফকিরের গোষ্ঠী বলা যায়, তারা আবার নির্ভরশীল দাতব্য ব্যবস্থায়, কিছু লোকের দান করার সামর্থ্য আছে তারা তাই কোন রকমে টিঁকে আছে।

এই সব প্রতিষ্ঠানের টিঁকে থাকার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন সিসটেমের পরগাছা হিসাবে ঝুলে না থেকে যথেষ্ট স্বাতন্ত্র্য অর্জন করা।

মিঃ বাকম্যান স্বীকার করেছেন র‍্যাডিকাল আন্দোলন নিজেদের মধ্যে দ্বিধা-বিভক্ত, ঐক্য সেখানে একটা চোখ-ভুলানো বস্তু। র‍্যাডিক্যালদের সর্বপ্রধান শত্রু সিসটেম নয়, তাদের শত্রু মানব-প্রকৃতি। এই নয়া-র‍্যাডিক্যালরা তাঁদের পূর্বসূরী আরো অনেক ইউটোপিয়ান গোষ্ঠীর মত একটা 'ব্রেভ নিউ ওয়ার্লড' গড়ে তুলতে পারবেন মনে হয় না, কারণ মানব-প্রকৃতির রূপান্তর সাধনে তাঁরা অক্ষম।

—অভয়ঙ্কর

THE LIMITS OF PROTEST : BY PETER BUCKMAN
Published by VICTOR GOALLANEZ (1970) Price—50 shillings only.

নতুন বই

আধুনিক ভারতীয় কাব্য পরিক্রমা—অনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায়। মোহন লাইব্রেরী; ৩৫এ, সূর্য সেন স্ট্রীট, কলকাতা-৯। দাম—পাঁচ টাকা।

১৯৫৬ সাল থেকে শুরু করে প্রতি বছর ২৫শে জানুয়ারী দিল্লীর আকাশবাণী কর্তৃপক্ষ সর্বভাষা কবি সম্মেলনের ব্যবস্থা করে আসছেন। এই সম্মেলনে ভারতের প্রতিটি সংবিধান-স্বীকৃত আঞ্চলিক ভাষার একজন করে প্রতিষ্ঠিত কবিকে কবিতা-পাঠের জন্যে আমন্ত্রণ করা হয়। আলোচ্য সংকলনটি হল আকাশবাণীর এই ধরনের কয়েকটি কবি-সম্মেলন সম্পর্কে আলোচনার সংগ্রহ। লেখক এই সব সম্মেলন নিয়ে নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও বিচারশক্তির উপর নির্ভর করে বিভিন্ন সময়ে ঐ আলোচনাগুলো করেছিলেন।

সুখের কথা, প্রতিটি আলোচনাই অতি সুন্দর সাহিত্য-সমালোচনার নিদর্শন। এরা সুন্দর হয়ে ওঠার কারণ, লেখক স্বভাবতঃ একজন কাব্যরসিক। এছাড়া, আকাশবাণীর সাহিত্য-বিভাগের সঙ্গে যুক্ত থাকায় মূল কবিতাগুলো সংগ্রহ করা তাঁর পক্ষে সহজ-লভ্য হয়েছে।

আধুনিক ভারতীয় কবিতা সম্পর্কে যাঁরা আগ্রহী, এ-বইটি পড়ে তাঁরা লাভবান হবেন। কারণ, এখানে উদ্ধৃতিসহযোগে বিভিন্ন কবিতার মর্মোদ্ধারের সঙ্গে সঙ্গে যে তুলনামূলক নির্ভীক আলোচনা করা হয়েছে, তা বাংলা কাব্য-সমালোচনার ইতিহাসে সম্পূর্ণ অভিনব। ভারতের বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার কবিতায় বাংলার কবিদের প্রভাব-নির্ণয়ের প্রচেষ্টাও বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে। এবং সেই সঙ্গে আশাও জাগে এই কারণে যে, শুধুমাত্র রবীন্দ্রনাথ নন, রবীন্দ্র-পরবর্তী কোনো কোনো বাঙ্গালী কবিও অবাঙ্গালী সাহিত্যরসিক সমাজে বহুল পঠিত।

আলোচ্য কাব্যসমালোচনা-গ্রন্থটি সুধী-সমাজে সমাদৃত হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখিত ভূমিকাটি সংক্ষিপ্ত হলেও বিশেষ মূল্যবান।

মণিদীপা সেন (কাব্যগ্রন্থ)—দিলীপকুমার সাহা।। করুণা স্মৃতি প্রকাশনী।। ২২২।১এ, বাগমারী রোড, কলকাতা-৫৪।। দাম সাত টাকা।।

বইটি সম্পর্কে প্রেমেন্দ্র মিত্র লিখেছেন : "শ্রীদিলীপকুমার সাহার 'মণিদীপা সেন' নামে কবিতার বই-এর অনেকগুলি কবিতা পড়ে দেখলাম। কবিতা লেখার অধিকার সকলের আছে, কিন্তু অধিকার আর যোগ্যতা এক জিনিষ নয়। শ্রীসাহাকে তাঁর লেখা কবিতাগুলি বই আকারে ছাপতে যাঁরা উৎসাহ দিয়েছেন, তাঁরা যোগ্যতার বিচার করেননি একথা পাঠক-সাধারণ আশাকরি বলবেন না।" এই কাব্য-গ্রন্থের বিভিন্ন কবিতায় কবির যৌবন, জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতাবোধ, প্রেম ও রোম্যান্টিক আর্তি প্রকাশিত হয়েছে।

সংকলন ও পত্র-পত্রিকা

আবহ : অসিত গুপ্ত। ১২বি অহিরীপুকুর রোড, কলকাতা—১৯। দাম : এক টাকা।

গল্প-কবিতার কাগজ। সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে গল্পগুলি লেখা। লিখেছেন বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কালীকৃষ্ণ গুহ, শিপ্রা ঘোষ, অরুণ বসু, হরিজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মল চট্টোপাধ্যায়, সুবিমল বসাক, নগেন্দ্র দাশ, সুব্রত রাহা, বিমান চট্টোপাধ্যায়, বারীন ঘোষাল, অজয় সেন এবং আরও অনেকে। সম্পাদকের রুচিবোধ প্রশংসার্হ।

চারুবাক : সম্পাদক রণজিৎ দাশ। টাটা ইন্ডাস্ট্রিজ স্পোর্টস ক্লাব। ৪৩ চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা—১৬।

পত্রিকাটি একটি বিশেষ সংস্থার মুখপত্র। কিন্তু লেখক-লেখিকারা অনেকেই তার সঙ্গে যুক্ত নয়, অনেকেই আমন্ত্রিত। এ সংখ্যায় একটি মূল্যবান প্রবন্ধ লিখেছেন সূর্য মুখোপাধ্যায় (আগামী কালের কাব্য-কাহিনী : লেনিন পর্যায়)। কবিতা লিখেছেন কৃষ্ণ ধর, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, শঙ্করানন্দ মুখোপাধ্যায়, নিশিনাথ সেন প্রমুখ। গল্পকারদের মধ্যে আছেন চিত্ত তরফদার, আশানন্দ চৌধুরী, সুধীন ঘোষ ও কার্তিক গুহরায়। পত্রিকাটির প্রচ্ছদ রুচিসম্মত এবং লেখাগুলি পাঠযোগ্য। অনেকের কাছে মূল্যবান বলে মনে হবে।

বইকুণ্ঠের খাতা

কবি, কবিতা ও কবি-ভাষ্য

কবিদের উদ্দেশ্যে অভিবাদন জানিয়ে শেলী তাঁদের সম্বোধন করেছিলেন, 'আনএকনলেজড লেজিস্লেটর্স' অব দি ওয়ার্লড বলে। কবিতার গুণাগুণ বিচার করে অবশ্য তিনি সে সম্বোধন করেননি। নানা শ্রেণীর কবিতা ও কবি-মানসিকতার বৈচিত্র্যই তাঁকে মুগ্ধ করেছিল।

তিনি লক্ষ্য করেছিলেন, সারা পৃথিবীর কবিকণ্ঠের উচ্চারণ কী বিপুল—সুন্দর কী বিস্ময়কর এক ঐকতানের স্রষ্টা! কী সুন্দর, কী বিস্ময়কর এক ঐকতানের স্রষ্টা!

কিন্তু একজন সম্পাদক, যিনি কবিতার সঙ্কলন সম্পাদনা করেন, তিনি কাকে দেখবেন সবার আগে? কবিকে? না, কবিতাকে?

এ প্রশ্নের কোনো সরল উত্তর নেই। সার্বজনীন উত্তর হলো, কবি তুচ্ছ, কবিতাই একমাত্র বিচার্য। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায়, ঘটনা অন্যরকম। কবিতার ওপরে প্রাধান্য লাভ করে কবির নাম। খ্যাতিমান কবির প্রতিষ্ঠা ও পরিচিত প্রায়শ সম্পাদকের উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায়কে সীমাবদ্ধ করে—তাঁর বিচারবোধকে আচ্ছন্ন করে।

আমি এমন দু'একটা ঘটনার কথা জানি, সঙ্কলনের উপযোগী লেখা সংগ্রহের জন্য সম্পাদকরা বারবার খ্যাতিমান কবিদের কাছে ধর্ণা দিয়েছেন এবং নতুন করে কবিতা লিখিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছেন। কেননা, তাঁদের লেখা বাদ দিলে সঙ্কলনের মর্যাদাই শুধু ক্ষুণ্ণ হয় না, ব্যবসায়িক সাফল্যে বাধা পড়ে, পাঠকের মনে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।

তবু যদি কোনো দুঃসাহসী সম্পাদক এই সব বাধাকে অতিক্রম করে কবিতার নির্বাচনে নির্মম হয়ে উঠতে চান, তাহলেও তাঁর সামনে দেখা দেয় আরো কিছু নতুন প্রশ্ন, আরো কিছু নতুন সমস্যা। সম্পাদক যাকে শ্রেষ্ঠ কবিতা বলে সঙ্কলনভুক্ত করেন, পাঠকের বিচারে অনেক সময়ই তা উৎকৃষ্ট বলে বিবেচিত হয় না। এমনকি লেখকের কাছেও তা কখনো কখনো অস্বস্তির কারণ হয়ে ওঠে।

সম্পাদক ভেদে রুচির অদলবদল হয়, কবিতার নির্বাচনে তারতম্য ঘটে।

সম্প্রতি এই বিতর্ক এবং বিরোধের দায়ভাগ থেকে অব্যাহতি পাবার একটি সহজ উপায় আবিষ্কার করেছেন শান্তনু দাস ও সুখেন্দু সরকার। তাঁরা কাব্যসঙ্কলনের সম্পাদক হয়েছেন, কিন্তু কবিতা নির্বাচনের দায়িত্ব নেননি। কবিদের অনুরোধ করেছেন, স্বরচিত 'প্রিয়' কবিতাটি চিহ্নিত করে দেবার জন্য। বোধ হয়, সেজন্যেই তাঁরা তাঁদের সম্পাদিত সঙ্কলনের নাম রেখেছেন স্বনির্বাচিত।

প্রকাশের আগে, পরে

কয়েকদিন আগে বইটি আমার হাতে এসেছে। উল্টেপাল্টে দেখছিলাম। সম্পাদক দুজন কাছেই ছিলেন।

বললাম, কবিতার নির্বাচন তো নিজেরা করেননি দেখতেই পাচ্ছি, কবির নির্বাচনটা কি আপনারাই করেছেন? এবং সেটা কোন যুক্তিতে? কবিতা নির্বাচনের দায়িত্বই বা নেননি কেন?

উত্তর দিয়েছিলেন শান্তনু দাস। বললেন, যে-দায়িত্ব নিয়েছি, তাকে এড়িয়ে যাবার কোনো অভিপ্রায়ই আমাদের নেই। কবি নির্বাচন করেছি আমরাই। কেননা, কবিতার চেয়ে কবি নির্বাচনের কাজটা আরো দুরূহ। রবীন্দ্রনাথের পর বহু কবি কবিতা লিখেছেন, জনপ্রিয় হয়েছেন। আমরা সেই জনপ্রিয়তার মানদণ্ডটিকে প্রধান বলে মানতে পারিনি। রবীন্দ্রোত্তরকালে বিভিন্ন সময়-পরিধির মধ্যে যে সব কবির মধ্যে আধুনিক জীবন চেতনার সর্বাধিক প্রকাশ লক্ষ্য করেছি, তাঁরাই এ সঙ্কলনের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। যাঁরা বাদ পড়েছেন, তাঁদের রচনা সম্পর্কে আমরা কোনো অশ্রদ্ধা পোষণ করি না। বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসুর সঙ্কলনে তাঁরা আছেন। কবিতা নির্বাচন করিনি দুটো কারণে। প্রথমত, আমরা এমন একটি সঙ্কলন প্রকাশ করতে চেয়েছিলাম, যার মধ্যে কবির ব্যক্তিগত ইচ্ছার প্রতিফলন পড়বে আগাগোড়া। দ্বিতীয় কারণটি ঐতিহাসিক। একালের সমালোচক ও আগামীকালের গবেষকরা এই গ্রন্থ থেকে এমন সব তথ্য পাবেন, যা স্বয়ং কবির দ্বারা স্বীকৃত এবং অনুমোদিত। ফলে, এই সঙ্কলন হয়ে উঠবে একটি দলিল গ্রন্থের সঙ্গে সমমর্যাদাসম্পন্ন।

বললাম, এ ছাড়া কি আর কোনো উদ্দেশ্য ছিল না?

শান্তনু দাস বললেন, ছিল। আরো গুরুতর এবং গভীরতর একটা উদ্দেশ্য। অতীতে বাংলা কবিতার একাধিক প্রামাণ্য সঙ্কলন বেরিয়েছে, কিন্তু কবির সঙ্গে কবিতার যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে, তা কেউ ভেবে দেখেননি। আমরা ঔপন্যাসিকদের ব্যক্তিগত জীবনের অনেক খবরাখবর রাখি, চিত্রতারকার অসুস্থতায় উদ্বিগ্ন হই। অথচ, কবিরা কে, কি করছেন,—কি ভাবছেন—সে সম্পর্কে আদৌ ঔৎসুক্যবোধ করি না। আমরা কবিতার সঙ্গে কবিকে সমান গুরুত্বে প্রতিষ্ঠা দিতে চেয়েছি।

মনে পড়ে, প্রায় বছরখানেক আগেকার কথা।

একদিন শান্তনু দাস আমার সঙ্গে দেখা করেছিলেন, একটা ছাপানো কাগজ নিয়ে। তখন বলেছিলেন, বাংলাদেশের জীবিত পঞ্চাশজন কবির কবিতা নিয়ে একটা কাব্য-

সঙ্কলন প্রকাশের ব্যাপারে তিনি দারুণ ব্যস্ত। সরস্বতী পুজোর আগেই বইটি বের করতে হবে। আমরা প্রয়োজনের সময় কোনো কবির একটা ফটোগ্রাফ পর্যন্ত খুঁজে পাই না, পাঠক চেনেন না তাঁর প্রিয় কবির মুখ। সেজন্যে প্রত্যেক কবিতার সঙ্গে থাকবে কবির একটি চমৎকার ফটোগ্রাফ।

সেদিন, তাঁর পরিকল্পনা ছিল ছ' মাত কবির মধ্যে সঙ্কলনটি সীমাবদ্ধ থাকবে।

কিন্তু ইচ্ছে থাকলে উপায় হয়। মহেন্দ্র সরকারের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় তাঁর সে ইচ্ছা পূর্ণাঙ্গ রূপ নিতে শুরু করলো। কবির সংখ্যা পঞ্চাশ থেকে বেড়ে হলো ছেষট্টি। ফলে, নির্ধারিত সময়ে বই বেরুলো না। পঁচিশে বৈশাখ পেরিয়ে গেলো উদ্যোগ আয়োজন শেষ হতে না হতেই।

'স্বনির্বাচিত' বেরুলো শরৎকালে। পুজোর সামান্য আগে।

শান্তনু দাসকে জিজ্ঞেস করলাম, বই প্রকাশে এই বিলম্বের কি স্পষ্ট কারণ আছে?

—পরিকল্পনাটা যখন মাথায় এলো তখন সব দিক ভেবে দেখিনি। কাজে নেমে দেখলাম, নানা বাধাবিপত্তি। কবিদের কাছে লেখা চেয়ে ঠিক সময়ে লেখা পাইনি। আবার যখন লেখা পেলাম, তখন দেখি অনেকেই ছবি পাঠাতে দেরী করছেন। কিছু প্রশ্নের উত্তর চেয়ে পাঠিয়েছিলাম কবিদের কাছে। তাও ঠিক সময়ে পাইনি। একজন পাঠিয়েছেন তো, অন্যজন নীরব। ফলে, চিঠিপত্র যোগাযোগ, বাড়ীতে যাতায়াত করতে করতে অনেক সময় লেগে গেছে। তার ওপর আছে প্রেসের সমস্যা। এমন একটি সঙ্কলন যে-কোনো প্রেসে ছাপতে দিতে মন সায় দেয় না। সরস্বতী প্রেসে দিলাম। সাধারণ একটি প্রেসে ছাপলে যা খরচ পড়তো তার দ্বিগুণ খরচ করে ছাপাতে হলো লাইনো হরফে। ফলে, সতর্কতা অবলম্বন না করে পারিনি। যেখানে সম্ভব হয়েছে, কবিদের দিয়ে প্রুফ সংশোধন করে নিয়েছি।

একটু থেমে বললেন, এই দীর্ঘ প্রসঙ্গের মধ্য দিয়ে সাত্যিকারের একটি প্রামাণ্য বই বের করতে হলে কি রকম আনুষঙ্গিক পরিশ্রম করতে হয়—তা তো বুঝতেই পারছেন। তাছাড়া বইটির আমরা সব চাইতে রুচি-সম্মতভাবে প্রকাশের ওপরেও জোর দিয়েছিলাম কম নয়। অন্তত যেখানে চেয়েছিলাম, শুধু সম্পাদনার ব্যাপারে নয়—প্রকাশনার জগতেও এটি একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

ভূমিকা ও প্রশংসা

আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন: 'বর্তমানকালের বাঙালী কবিদের স্বনির্বাচিত কবিতার এই সঙ্কলন-গ্রন্থের পরিকল্পনা দেখে বেশ ভালো লাগলো। এ পরিকল্পনা অভিনব।'

তিনি আধুনিক কবিতার পাঠক নন। মূলত ভাষাতাত্ত্বিক। ভূমিকায় তিনি সে কথা সুস্পষ্টভাবে স্বীকার করে লিখেছেন: 'যা বলে আধুনিক কবিতা, আধুনিক লেখকদের রচনা—এ সবকে 'ন-স্যাৎ' করে উড়িয়ে দিতে পারি না। যদিও সবক্ষেত্রে ভারতের প্রাচীন কবিদের মত, ইহুদী ভাববাদীদের মত, সেক্সপিয়রের মত, রবীন্দ্রনাথের মত বিরাট ভূমাস্পর্শী কল্পনা বা অভিজ্ঞতা এঁদের মধ্যে দুর্লভ—তবুও একথা মানতেই হবে, এঁরা 'আধুনিক', এঁদের পিছনে আছে আমাদের সাহিত্যক্ষেত্রে পূর্বজ আর পথিকৃতদের অভিজ্ঞতা-উপলব্ধি ধ্যান-ধারণা চিন্তা-বিচার, যার একটা বিশ্বজনীনতা একটা চিরন্তনতা আছে বলেই মনে করি। আর এই চিরন্তনতা, এই শাশ্বত মূল্য সম্বন্ধে একটা সাম্প্রতিক তথাকথিত 'মনীষা'—কেবল পঞ্চভূত-নির্মিত নির্মিত দেহকেই আঁকড়ে থাকে, আর তার বাইরের কোন কিছুর সম্বন্ধে উদাসীন অথবা অবজ্ঞাপূর্ণ, উপরন্তু যাঁরা আধুনিক কালের নানা মানসিক অস্থিরতার প্রকাশকে সাহিত্যক্ষেত্রে দেখে সেটাকেই আধুনিক সাহিত্যের প্রাণবস্তু ভেবে, চিরন্তনকে ত্যাগ করে বা অস্বীকার করে নিজেদেরই বিড়ম্বিত করেছেন, যাঁদের দৃষ্টি বা মনন এই ধরনের, তাঁদের মধ্যেই সীমিত। মানব সমাজের কাম্যের রীতিনীতি, ধনসম্পদ, উদ্দাম উদ্দেশ্যহীন 'প্রগতি' আর সুখ-দুঃখের মধ্যেই বিশ্বপ্রপঞ্চের গতিরেখা নিহিত,—তার বাইরে স্থিতিশীল বা গতিশীল আর কিছুই নেই, একথা বলি কি করে?'

এ সঙ্কলনের কবিতাগুলি সম্পর্কে তাঁর মতামত প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন: 'আজ যা আধুনিক আর প্রগতিশীল হয়ে দেখা দিচ্ছে, আগামীকাল তা পুরাতন আর প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে পড়বে,—মানুষের মন আর সমাজের গতি এত তাড়াতাড়ি বদলাচ্ছে। এই আধুনিককালের মধ্যেই আমরা রয়েছি, এই হেতু এর সম্বন্ধে চরম বিচার, সাহিত্য আদালতের ডিক্রি-ডিসমিস করে মত দেওয়া, আমাদের শক্তির বাইরে।'

বইটির 'প্রশংসা'-প্রসঙ্গে বিশ্বভারতীর শ্রীযুক্ত অমিয়কুমার সেন লিখেছেন: 'একটি অভিনবত্ব গ্রন্থের নামের মধ্যেই আছে। স্বনির্বাচিত একক কবির সঙ্কলন এর পূর্বেও প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু বহু কবির একটি করে স্বনির্বাচিত কবিতার সঙ্কলন এর পূর্বে আর বেরিয়েছে বলে আমার জানা নেই। প্রত্যেক কবিকেই তাঁর বিবেচনায় নিজের শ্রেষ্ঠ কবিতাটি নির্বাচন করার অনুরোধ জানানো হয়েছিল। এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে কবির মানসিকতাটি পাঠকের কাছে স্পষ্ট হবে। উপরন্তু কবিরা তাঁদের যে আত্মপরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন তাতে যেমন একদিকে তাঁদের বহিরঙ্গ পরিচয় আছে, তেমনি অন্তরঙ্গ পরিচয়ও আছে। জন্ম সময় এবং স্থান থেকে আরম্ভ করে কবিতা রচনায় প্রেরণা, অন্য কবির প্রভাব ইত্যাদি বিষয়ে কবির নিজের জবানিতে আমরা অনেক কথা শুনতে পাব। তাঁর ভালো লাগা, মন্দ লাগার জগতেরও পরিচয় পাব। সাংস্কৃতিক অগ্রগতিতে কবির ভূমিকা এবং বর্তমান বাংলা সাহিত্যে কবিদের বিশিষ্ট দান সম্বন্ধে তাঁদের মতামতও সংগৃহীত হয়েছে। এই মতামত প্রকাশে কেউ স্বল্পবাক, কেউ আবার বাক বিস্তারে কার্পণ্য করেননি। এরকম করে কবিদের মনকে পাঠক সাধারণের কাছে উন্মোচিত করে দেবার প্রয়াস এর আগের কোনো সঙ্কলনে হয়েছে বলে আমার জানা নেই। কবিদের একটি করে প্রতিকৃতিও গ্রন্থে সংযোজিত হয়েছে।...... কবিসত্তাকে বুঝতে যদি কোনো বিশেষ কবির কবিতা বোঝার সহায়তা হয়, তবে এই সঙ্কলনটি বাংলা সাহিত্যে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করবে বলে আমার বিশ্বাস।'

পরিশেষে তিনি মন্তব্য করেছেন: 'সব মিলিয়ে এই সঙ্কলনটিকে আমার একটি শোভাযাত্রার মতো মনে হয়েছে। শোভাযাত্রার পুরো ভাগে যাঁরা আছেন, তাঁরা নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যে প্রতিষ্ঠিত। অন্যদের স্বকীয়তার আদলটি তেমন পরিস্ফুট নয়। এই পরবর্তী কবিরা যেন শোভাযাত্রার মধ্যে ঘেঁষাঘেঁষি করে আছেন, দূর থেকে তাঁদের স্বকীয়তা তেমন করে চোখে পড়ে না। হয়তো অচিরেই তাঁদের অনেকে নিজস্ব মহিমায় শোভাযাত্রার পুরোভাগে অগ্রবর্তী হয়ে আসবেন।'

পাঠকের প্রতিক্রিয়া, সম্পাদকের সাফাই

বইটি বেরুবার পর পাঠকমহলে দেখা দিয়েছে মিশ্র প্রতিক্রিয়া। কেউ খুশি হয়েছে,

রসুই
গুঁড়া মশলা
ফোন: ৫৫ ২৪৪১, ৩৩-১৪৭১
রসুই প্রোডাক্টস্
১৭ তারা জি কর রোড, কালকাতা-৪ :: ২০১ মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা-৭

কেউ অসন্তুষ্ট। কেউবা এ ব্যাপারে নীরব থাকতে চান।

সেদিন জনৈক তরুণ কবিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, কেমন লেগেছে 'স্বনির্বাচিত'? আপনার মতামত কি?

ভদ্রলোক প্রায় ক্ষেপে উঠেছিলেন তৎক্ষণাৎ। বললেন, কিস্‌সু হয়নি। ও একটা পিঠ চাপড়ানো সঙ্কলন। দেখতে শুনতে ভালো হয়েছে। ভেতরে কবিদের কাটামুণ্ডু, চোখ, মুখ, হাত, পা ছাপা হয়েছে—ভালোই। কিন্তু কি উদ্দেশ্যে এ সবের আয়োজন? ঐতিহাসিক বিতর্কের সূত্রপাত করা? না সম্পাদকদের আত্ম-প্রতিষ্ঠা?

আমি প্রতিবাদ করে বললাম, সংকলনটির উদ্দেশ্য কিন্তু সকলকে নির্বিচারে জায়গা দেওয়া নয়। নির্বাচিত কবিদের স্বনির্বাচিত কবিতার সঙ্গে তাঁদের ব্যক্তি-জীবনের কিছুটা পরিচয় প্রদান। সে উদ্দেশ্য কি সিদ্ধ হয়নি?

কিছুটা শান্ত হয়ে তিনি বললেন, তা হলে আমার কোনো বক্তব্য নেই। আমি বড়ো কবি নই, কবিতা পড়ি এবং কবিতার বই কিনি। সঙ্কলনটি হাতে নিয়ে আমি আরো কয়েকজনকে প্রত্যাশা করেছিলাম। বিশেষ করে, যাঁদের লেখা এ সঙ্কলনে স্থান পেয়েছে, তাঁদের পাশাপাশি আরো অনেকের লেখাই থাকতে পারতো।

অন্য একজন জিজ্ঞেস করলেন, স্বনির্বাচিত নাম রাখা হয়েছে কেন?

কিছু রঙরূপ এমনও আছে সময় হার মানে যার কাছে!

পিয়ার্স সময়ের ছায়া পড়তে না দিয়ে আপনার ত্বকের তারুণ্য আর কমনীয়তা বজায় রাখে।

পিয়ার্স—আসল গ্লিসারিন সাবান

লিনটাস-PS. 26/140 BG

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন,

জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, সুকান্ত ভট্টাচার্য কি মরণোত্তরকালে সম্পাদকদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করে কবিতা নির্বাচনে সাহায্য করেছেন? ওঁদের বাদ দিলে আপত্তি ছিল কি?

আমি প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তর দিতে পারিনি। শান্তনু দাস বললেন, রবীন্দ্রোত্তরকালে আধুনিকতার লক্ষণগুলি তাঁদের মধ্যে অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আমরা সেজন্যেই তাঁদের বাদ দিইনি। ইচ্ছে থাকলেও বোধ হয় দিতে পারতাম না' আমরা তাঁদের কবিতা নির্বাচনের দায়িত্ব নিয়েছি ঠিকই, তা বলে পাঠকের বিচারবোধকে আঘাত দিইনি। কবিদের জীবিতকালে গৃহীত কবিতাগুলি যথেষ্ট জনপ্রিয় ছিল। জীবনানন্দের 'বনলতা সেন' এবং সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'উটপাখী' কবিতা দুটি আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল কবিমহলে। আমাদের ধারণা, তাঁরা বেঁচে থাকলেও এই কবিতাগুলিই নির্বাচন করতেন।

বললাম, জীবিত কবিদের কাছে আপনারা যে প্রশ্নগুলি করেছেন, তার উত্তর পরলোকগতদের কাছ থেকে কিভাবে আদায় করেছেন?

শান্তনু দাস বললেন, তারও প্রামাণ্য ভিত্তি আছে বইকি! কবিরা কবিতা সম্পর্কে যে-সব লেখা লিখে গেছেন, আমাদের প্রশ্নের উত্তর মিলেছে, সে সব সূত্র থেকেই। একটি শব্দও আমরা পাল্টাইনি বা অদলবদল করিনি।

বললাম, পূর্ব বাংলার প্রতিনিধিস্থানীয় কবি কি শুধু চারজন? কেন?

—আমরা চারজনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পেরেছি। আরো কবি আছেন। কিন্তু সীমান্তের ব্যবধানটার জন্য কারো কাছ থেকেই লেখা কিংবা প্রত্যাশিত জিজ্ঞাসার উত্তর সংগ্রহ করতে পারিনি। চেষ্টা করছি। যাতে পরবর্তী সঙ্কলনে প্রতিনিধি স্থানীয় সব কবিকেই অন্তর্ভুক্ত করতে পারি।

একটু থেমে, দুঃখের সঙ্গে বললেন, সব সঙ্কলনেরই কিছু কিছু দুর্বলতা শেষ পর্যন্ত থেকে যায়। ইচ্ছাকৃতভাবে আমরা কোনো ভুলই করিনি।

সবিনয় নিবেদনে সম্পাদক দুজন লিখেছেন: অনেক উপযুক্ত কবিকেই স্থানাভাবে আমরা আমাদের এই সঙ্কলনে অন্তর্ভুক্ত করতে পারলাম না। এর জন্য তাঁদের পাঠকদের চেয়ে আমরাও কম মর্মাহত নই।......এপার বাংলা ওপার বাংলার কবিদের এই সঙ্কলনটি তামাম বিশ্বের যত বাংলা ভাষার পাঠক আছেন, তাঁদের সকলের কাছে যাতে তুলে দেওয়া যায়, তার জন্যে অক্লান্ত পরিশ্রম এবং প্রচুর অর্থব্যয়, অর্থনৈতিক লাভের দিকটা না ভেবে এই প্রামাণ্য গ্রন্থটিকে আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী করার চেষ্টা করেছি।'

জিজ্ঞেস করলাম, বিক্রী-টিক্রি কেমন হচ্ছে?

উজ্জ্বল মুখে জবাব দিলেন শান্তনু দাস, খুব ভালো। এই মন্দার বাজারেও ক্রেতার আগ্রহ আমাদের বিস্মিত করেছে। আশা করছি, বাইরের অর্ডার পাবো। কবিরা অনেকেই বইটি হাতে পেয়ে খুশি হয়েছেন। তাতেই আমরা তৃপ্ত।

আধুনিক কবিতার ভবিষ্যৎ ও অন্যান্য

আমি বইটি হাতে নিয়ে বিস্মিত হয়েছি, তার প্রচ্ছদ ও অঙ্গশোভনতায়। কবিতার চেয়েও মূল্যবান মনে হয়েছে, সম্পাদকদের প্রশ্নের উত্তরে কবিদের উত্তরগুলি। আধুনিক কবিতার ভবিষ্যৎ প্রসঙ্গে প্রেমেন্দ্র মিত্র বলেছেন, সৎ কবিতা হলে উজ্জ্বল, নইলে অন্ধকার।' বুদ্ধদেব বসুর মতে, 'আধুনিক কবিতার ভবিষ্যৎ, ভবিষ্যতে জানা যাবে।' বিষ্ণু দে দিয়েছেন এড়িয়ে যাওয়া জবাব: 'আধুনিক সাহিত্যের মতোই।'

কিন্তু সকলেই সাঙ্কেতিক ভাষায় কথা বলেননি। বিস্তৃতভাবে বলেছেন কেউ কেউ।।

অরুণ মিত্র লিখেছেন: কবিতা বলতে আমরা এখন যা, বুঝি, তার ভবিষ্যৎ অন্ধকার, আধুনিক বা অনাধুনিক যাই হোক। কোনো সমাজক্রিয়ার অথবা অন্য কোনো শিল্পের আশ্রয়ে হয়তো তার একটা ভূমিকা ভবিষ্যতে তৈরী হবে। নইলে কবিরা এবং তাঁদের কিছু বন্ধুবান্ধব ছাড়া আর কেউ কবিতা নিয়ে মাথা ঘামাবে বলে মনে হয় না। যাঁরা বই পড়তে পারেন, তাঁদের মধ্যে কয়েকজন কয়েকজন বাদে বাকীরা যদি কবিতা পড়তে না চান, তাহলে কি বলব? পাঠকদের গলদ, না, কবিদের? সব দোষ পাঠকদের ঘাড়ে চাপিয়ে স্বস্তিবোধ করতে আমি অসমর্থ। গাঁয়ে যখন মানছে না, তখন আপনি মোড়ল সেজে লাভটা কি? কবিদের ভরসা পাবার একমাত্র কারণ তো আপাতত এই দেখছি যে, কোনো একদিন কলেজের মাস্টারমশাইরা হয়তো তাঁদের কবিতা ক্লাসে ব্যাখ্যা করে বোঝাবেন।'

মণীন্দ্র রায়ের মতে: আধুনিক কবিতার ভবিষ্যৎ, 'সীমাহীন—প্রায় মানবজীবনের মতো। কারণ আধুনিক কবিতা জীবনেরই সহযাত্রী।'

এই বিস্ময়কর উত্তরগুলি কবি-মানসিকতার অন্তঃস্থল থেকে উৎসারিত। পাঠক হিসেবে আমি কেবল কবিকে পাইনি, কবিতার রহস্যজনক অতীত ভবিষ্যতেরও একটা আভাষ পেয়েছি। সম্পাদকরা অপরিসীম পরিশ্রম করে কিছু কবিতার আদি-ইতিহাস সংগ্রহ করেছেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'কুক্কুট' কবিতাটির কথা।

শোনা যায়, যুদ্ধোত্তর আধুনিক ইংরেজী কবিতার বিষয় ও বৈচিত্র্য নিয়ে সুধীন দত্তের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ বিতর্ক উপস্থিত হয়। রবীন্দ্রনাথ সকৌতুকে তাঁকে বললেন, তাহলে মোরগের ওপর একটা কবিতা লিখে দেখাও, দেখি কি রকম উৎরোয়।

সুধীন্দ্রনাথ সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেন, লিখবো। এবং সে কবিতা আপনার বিচারে উত্তীর্ণ হবে এমন আশা রাখি।

রবীন্দ্রনাথের বিচারে কবিতাটি উত্তীর্ণ হলো। 'কুক্কুট' নামে সেই কবিতা ছাপা হয়েছিল প্রবাসীতে। যতদূর জানা যায়, এটিই তাঁর প্রথম প্রকাশিত কবিতা।

এমনি অনেক তত্ত্ব, তথ্য ও ঘটনার বিবরণে সঙ্কলনটি বর্তমান সময়ের একটি আকর্ষণীয় গ্রন্থে পরিণত হয়েছে। ইতিহাস তাকে উপেক্ষা করবে না। হয়তো দূর ভবিষ্যতে একটি দলিল-গ্রন্থ বলে বিবেচিত হবে। আধুনিক কবিতার সঙ্কলন শুরু হতো এতদিন রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে। শান্তনু দাস ও মৃগেন্দু সরকার তাঁকে বর্জন করেছেন, কিন্তু সময়-সীমাকে বাড়িয়ে দিয়েছেন বর্তমানের দিকে। বোধ হয় এর আগে ষাটের কবিরা আর কোনো সঙ্কলনে এমন গুরুত্বের সঙ্গে উপস্থাপিত হননি।

—গ্রন্থদর্শী

CENTRAL LIBRARY

পুরোন শহরের পুরোন কাহিনী

গঙ্গার ধারে কোর্টের কাছে চন্দর পালের মুদির দোকান। চন্দর পালের মৃত্যুর সন-তারিখ কেউ রাখেনি। তার মৃত্যুর পর দোকানটা যে কতদিন চলেছিলো তাও কেউ জানে না। অম্বরী তামাকের লোভে সাহেব ছোঁড়াড়া মৌচাকে ঝাঁপিয়ে পড়া মৌমাছির মতো চাঁদ পালের দোকানে ভিড় জমাতো। এটা ইংরেজ আমলের গোড়াপত্তনের সময়। চাঁদ পালের নাম নিয়ে সেই ঘাটটা এখনও টিকছে।

চাঁদপাল ঘাট। বিলেতের পাল-তোলা জাহাজগুলো এখানেই ভেড়ে। ছোট ছোট নৌকা—বড় বড় বজরা তক্তা আঁটা ঘাটে বাঁধার সুযোগ পেলে কৌলিন্যের পংক্তিতে চড়ে বেতো। বিলেত থেকে কলকাতায় জাহাজ পৌঁছতে লাগতো প্রায় একটি বছর। ভাস্কো-ডা-গামার পথই তখন ভারতের পথ। আসতে হতো আফ্রিকা ঘুরে। ঢেউ-এর সঙ্গে নেচে উঠতো হাঙরের দল। কাল-কেতুর মত তীর-ধনুক নিয়ে সমুদ্রের তীরে ঘুরে বেড়াতো শিকারের লোভে অর্ধ-নগ্ন কালো কালো মানুষ। তাদের মাথায় পালক আঁটা। সুবিধে থাকলেও জাহাজ ভেড়াবার উপায় ছিল না। কলকাতায় আসা ছিল অত্যন্ত দুরূহ কষ্টকর। জব চার্ণকের কলকাতা তখন সবেমাত্র গড়ে উঠছে। চৌরঙ্গী পর্যন্ত সাহেবদের ছিল বাড়ীঘর আর অফিস। এটা ছিল হোয়াইট টাউন। এর পূবে নেটিভ টাউন—মারহাট্টা ডীচ তার শেষ সীমানা। রাস্তায় হাঁটু-ভোর কাদা থকথক করছে আশেপাশে আসশেওড়া আর কেয়া-কাশের ঝোপ। বট আর বকুল রোদের ছাতা। তাদের বড় বড় ছড়ান ডালপালায় মুখ নিচু করে ঝুলতো অগণিত বাদুড়। এদের বিরামহীন চীৎকার অতিষ্ঠ করে তুলতো। চৌরঙ্গীর ধারের কাছে তেঁতুল গাছে শাখামৃগের উল্লম্ফন। এই ছিল তখনকারের কলকাতার রূপ। খানা ডোবা, জলা-জঙ্গলে ভরা নেটিভ টাউনে সাহেবরা বড় একটা কেউ আসতো না। ফিরিঙ্গীদের বাবা চিকচিকে বুট পিট কাটা জামা পরে নেটিভ বাজারে আসতো ডিম-মুরগী কিনতে সাহেবপাড়ার বাবুর্চি-দের নেকনজরে চড়া দামে বেচার লোভে। চাঁদপাল ঘাটে জাহাজ ভিড়বে—এ-খবর কোলকাতায় পৌঁছলে সাহেব পাড়াটা চনচনে হয়ে উঠতো। ক্যাডেটদের বেরুবার উপায় ছিল না—কোর্ট মার্শাল হবে। রাইটার্সরা বেপরোয়া। কাজকর্ম ফেলে চেয়ার ঘুরিয়ে গঙ্গার দিকে চেয়ে থাকতো যদিও সেখান থেকে গঙ্গা নজরে আসার এতটুকু সম্ভাবনা ছিল না। জাহাজ আসার দিন যতই ঘনিয়ে আসে, রাইটার্সরা আরও বেশী বেপরোয়া হয়ে ওঠে। অন্য অফিসের সাহেবরা আশা-আকাঙ্ক্ষায় উৎসাহী ছিল বটে কিন্তু তাদের উদ্দীপনা কেউ ধরতে পারতো না। একটু বয়স্ক লোক, রাইটার্স-দের মতো হৈ হৈ করা তাদের রুচির বাইরে ছিল কিন্তু তারাও বউ খুঁজতে চাঁদপাল ঘাটে চক্কর দিতো।

কলকাতায় জাহাজ আসার খবর এসেছে। সকাল না হতেই রাইটার্সরা চাঁদ-পাল ঘাটে। ওপারের গঙ্গার ধারের গাছ-গুলোর মাথায় তখনও জমাট-বাঁধা ধোঁয়ার মেঘলা প্রভাতী সূর্যের নিষ্করুণ আক্রমণের আশঙ্কায় কিছুটা যেন চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

বেলা বেড়ে উঠলো। এখনও জাহাজের পাত্তা নেই। গঙ্গার ভাপসা হাওয়ায় সকলে যেন অস্থির হয়ে উঠলো। মেহগনীর সরু ছাওয়ায় কেউ কেউ মাথা বাঁচিয়ে দাঁড়ালো।

হেমচন্দ্র ঘোষ

'ছোট হাজারী' কখন হজম হয়ে গেছে। চনচনে খিদে—তবু তারা দাঁড়িয়ে—আশা যদি বিলিতী বিবি মেলে! চন্দরের দোকানের শুকনো মুড়ি চিবুতে চিবুতে কেউ কেউ গঙ্গার ধারে পায়চারী করছে।

—হুররে! জাহাজ—জাহাজ! গড—মাই লর্ড!

ছুটলো সবাই ঘাটের দিকে। জাহাজ তখনও কিন্তু গঙ্গার মাঝ-বুকে।

—এই রাস্কেল! তুই এখানে—ফিরিঙ্গী।

জ্যাকো মুখখানা কাচুমাচু করে এক পাশে সরে দাঁড়ালো।

—নিকোলো!

রাইটার্সদের একজন ছুটতে ছুটতে এসে একটা লাথি দিয়ে বললে—নিকালো! রাস্কেল ফিরিঙ্গী! ঘাটে এসেছো বিবি খুঁজতে!

আবার এক লাথি। জ্যাকো আর সেখানে রইলো না।

গঙ্গায় তখন ভাটা। জল কেটে জাহাজটা আর এগুতে পারলো না। ডিঙ্গী দিয়ে ডাঙ্গায় ওঠার ব্যবস্থা হলো।

—আহা! ছিঃ পড়ে গেলে। হাঁটু পর্যন্ত কাদায় বসে গেল যে!

স্মিথ তার দিকে শুধু একবার তাকালো।

—সারি! সাহায্য করতে পারলাম না—লোক সব ডাঙ্গায় উঠতে আরম্ভ করেছে।

কপালে গাঁটের একটা টোকা দিয়ে স্মিথ উঠে পড়লো—নাঃ, এ অবস্থায় কোন লেডির সামনে যাওয়া চলে না। এ-জাহাজটা ফস্কে গেল!

প্রায় সবাই নেমেছে। তাদের মুখে স্বস্তির ভাব। প্রায় একটি বছর টাল-মাটাল—ঢেউ-এর সঙ্গে যুঝে দেহের হাড়-গোড় যেন যথার নরম গেছে। সবার শেষে নামলো একটা আধা-বয়সী মেয়ে। চুলগুলো কটাশে ভোমরান গালের দুপাশ সোনার সুতোর মত ঝুলছে। ডাঙ্গায় উঠে চারদিকে একবার চোখটা ঘুরিয়ে নিল। রাইটার্সদের মধ্যে যারা এগিয়ে এসেছিল, তারা আর রইল না। মেয়েটির ছিরিছাঁদ দেখে তারা সরে পড়লো।

জন একটা মার্চেন্ট আপিসের দালাল। সে এলো এগিয়ে।

—গুড মর্ণিং মিসেস!

মেয়েটির ডান চোখটা ছোট। সেটাকে আরও একটু ছোট করে বলল—আমি মিসেস নই—মিস লার্কিণ!

—স্যা রি এক্সকিউজ মি মিস্!

মিস লার্কিন ছোট চোখটার কোণে একটু হাসি টেনে বললো—শুনেছি ইন্ডিয়া একটা অদ্ভুত দেশ, তার ওপর আবার কোলকাতা। রেসের ঘোড়ার মত মনটা আমার ছুটে দিল। এসে পড়লাম। এখানে একটা মেট হো চাই—খাওয়াবে—হাওয়া করবে! কিন্তু মিস্টার—আপনাকে যেন বড্ড বুড়ো বুড়ো মনে হচ্ছে!

জন যেন একটা অস্বস্তির মধ্যে পড়ে গেল। রুমাল দিয়ে মুখটা মুছে বললো—এটা যে গরম দেশ! চুলগুলো দেখতে দেখতে উঠে গেল—কি ছিল না ছিল আমার মিস্ লার্কিন। আর দেহটা! রোদের ঝাঁজে শুকিয়ে হলো যেন পাঁকাটি। তবু মিস লার্কিন, এখনও কিন্তু আমি খুব এফিসিয়েন্ট।

মিস লার্কিনের তোবড়ানো গালে একটু হাসি বেরুলো।

—হ্যালো জন!

জন ফিরে তাকালো।

—এটা তোমার কিন্তু খুবই অন্যায় পিটার। লেডির সঙ্গে কথা বলছি, বাধা দেওয়াটা খুব অভদ্রোচিত।

পিটার একটু হাসলো।

—ভদ্রতাটা তোমার কাছে নাই বা শিখলাম জন!

পিটার প্যান্টের পকেট হতে পিস্তলটা বার করলো।

—ভয় দেখিও না, পিটার। ওটা আমারও আছে।

—একদিন তাহলে ডুয়েলটা সেরে ফেলি কি বল!

পিটার একেবারে যুবক না হলেও স্বাস্থ্যবান ও জনের চেয়েও কমবয়েসী—জোয়ান।

লারকিন এগিয়ে এলো পিটারের কাছে।

—জনটা একটা লোফার কিংবা রোজ-গার, একটা মার্চেন্টের দালাল!

—আর তুমি?

—আমি! আমি তো একটা মেরিন কোম্পানীর ইঞ্জিনীয়ার। এদের জাহাজ সারা পৃথিবী ঘোরে।

মিস্ লারাকিন পিটারের হাতটা ধরলো।

—তাহলে কোথায় উঠবো ডার্লিং?

জন অপমানে দিশেহারা। আক্রোশে তার শুকনো দেহটা কেঁপে উঠলো। রাগে ফুলে-পড়া জন পিটারের দিকে কড়া চোখে বললো—ডুয়েলের কথাটা যেন স্মরণ থাকে পিটার! সেদিন দেখা যাবে।

পিটার হেসে বললো—প্রস্তুত! বন্ধু! সব সময়েই প্রস্তুত।

স্পেন্সারস হোটেল —চৌরঙ্গীতে।

দুটো ছাতা ভাড়া করলো পিটার। ছাতাওয়ালারা স্পেন্সারে তাদের পৌঁছে দিল।

—এখানে কোন গাড়ি মেলে না, পিটার? বেড়াবার। হোমে কত রকমের গাড়ি। কতরো গাড়ী করে ঘুরে ঘুরে বেড়িয়ে আনতো!

—গাড়ি মেলে, মিস লারকিন, তবে কিনা চাহিদার তুলনায় অনেক কম।

—লণ্ডনের হাইড পার্ক!

লারকিন চোখটা বুজল, বলল—কি সুন্দর! হাইড পার্ক কখন দেখেছো, পিটার!

পিটার কখন হোমে যায়নি—তার জন্ম এদেশে।

একটু সুর টেনে বললো—হাঁ, দেখেছি বৈকি, তবে এত ছোট বয়েসে এখন তার আর কিছু মনে নেই।

—হাইড পার্ক! সেটা যেন একটা স্বর্গ! একবার দেখলে আর ভোলা যায় না।

জিভ দিয়ে একটা শব্দ করে মিস্ লারকিন পিটারের দিকে তাকালো।

—সুন্দর কেয়ারী-করা ঝোপ। শত শত গোলাপ, শত শত টিউলিপ যেন আলো করে আছে। সন্ধ্যা হলেই মেয়ে-পুরুষ দলে দলে চক্কর দিচ্ছে। ঝোপের আড়াল থেকে কত রকমের হাসি। হাইড পার্ক—সুন্দর হাইড পার্ক—স্ত্রী জন্তর পীঠস্থান। গেটের ধারে কতদিন স্মার্ট হয়ে রইলাম। কখন জোরে জোরে, কখন ধীরে ধীরে চক্কর দিলাম। কিন্তু কেউ আমায় নিল না। ভাবলাম গলদ আছে—বোধহয় তাই। ইণ্ডিয়ায় এলাম ভাগ্যটাকে যাচাই করতে। ডার্লিং—মাই ডার্লিং পিটার! ইউরেকা!

মিঃ স্পেন্সার তর তর করে সিঁড়ি দিয়ে নামলো।

হ্যালো পিটার।

একটু থেমে বলল—এই লেডীটিকে তো চিনলাম না?

একটু হেসে পিটার বলল—সবেমাত্র আজই ল্যাণ্ড করেছেন।

মিস্ লারকিনের দিকে তাকিয়ে স্পেন্সার বলল—হোমের কথা শুনতে বড় ভাল লাগে—যেন পাগল হয়ে যাই। কতদিন যে দেশছাড়া! কিন্তু মিস্ আমি বড্ড দুশ্চিন্তায় আছি—মিসেস স্পেন্সার গুরু-তর অসুস্থ। মনে হয় চৌরঙ্গীর আশে-পাশের ডোবাগুলোর পোকামাকড়ের কামড়েই অসুখটা হয়েছে। বয়েস তো আর বেশী নয়—মাত্তর তেত্রিশ।

লারকিন একটু হেসে বলল—দেখছি আমার চেয়েও তিন বছরের ছোট।

স্পেন্সার তাড়াতাড়ি চলে গেল।

পিটার লারকিনের হাতটা একটু নাড়া দিয়ে বলল—কলকাতায় কারো সঙ্গে বেশী মেলামেশা না করাই ভাল। শীতের দেশে জন্ম—এ-দেশে একটু কড়া হুইস্কি না খেলে কি শরীর রাখা যায়।

—মাত্তর তেত্রিশ! এরই মধ্যে শরীরটা ভেঙে গেল! তাহলে বেশীদিন আর থাকছি না এখানে!

লারকিনের মুখে হতাশার ছাপ। লারকিন মনে মনে বলল—

—তাই তো যাবই বা কোথায়!

—পিটার!

—ডার্লিং!

মিঃ স্পেন্সার কি খুব বড়লোক?

—কিসের বড়লোক! আমরা আছি তাই কোনরকমে হোটেলটা চলছে।

এ্যাণ্টি চেম্বারে তখন ব্যাণ্ড বাজছে।

লারকিন দাঁড়িয়ে উঠলো।

—কি চমৎকার! বিলিতী নোট—খাস বিলিতী! হা-হা। নাচতে ইচ্ছে করছে।

লারকিনের হাতটা জোরে টেনে ধরে পিটার বলল—বোসো—করছো কি! জেন্টুরা দেখলে ঘাড় বেঁকিয়ে হাসবে। আমরা রাজার জাত, আমাদের খুব সতর্ক হয়ে চলতে হয়। এটা তো আর হোম নয় যে খুশিমতো চলবে।

লারকিন ঘাড় বেঁকিয়ে বলল—কেন? এদেশে কি কেউ নাচে না?

—জেন্টুদের ঘরে যারা নাচে, তারা সবাই সমাজের বাইরে। তুমি তো জানো না জেন্টুরা সন্ধ্যার পর হোয়াইট টাউনে ঢুকতে পায় না। যদি দৈবাৎ কেউ ঢুকে পড়ে, তাহলে হলওয়েল আমাদের হুইপিং-এ তার চামড়া শাদা করে দেবে।

—নেটিভরা কি তাহলে শেতু?

—তা না তো কি? তবে কিনা ওদের হাতে রাখতে হয়।

আঙুল ঘুরিয়ে পিটার বলল—এই যে তামাম আপিসগুলো দেখছো এগুলো সবই নেটিভদের পয়সায়।

বিস্মিত লারকিন তাকিয়ে রইল পিটারের মুখের দিকে।

—বড্ড আশ্চর্য মনে হচ্ছে—না?

—ওরা এত বোকা! টাকা দিয়ে তোমাদের বড়লোক করে দিচ্ছে।

—দেবে না তো কি! এদেশে এখন আমরা নবাব! উমিচাঁদ—একটা মুটকো ঘাড়ে-গর্দানে সমান প্রায় অচল—সেটা একটা টাকার কুমীর। তার শালা হুজরী-মল—ঐ বৌবাজারে থাকে—সেও একটা যক্ষী! এদের টাকাতেই তো ব্যবসা-বাণিজ্য. —দু-পাঁচ বছরে এক-একটা নবাব।

মিস্ লারকিন পিটারের দিকে তাকাল। তার মুখখানা আশার আলোয় চিকচিক করছে।

—ঐ যে দুটো নাম করলে—ওদের সঙ্গে দেখা করা যায় না?

গম্ভীর হয়ে পিটার বলল—উঁহু।

ভবিষ্যতে সে কোন্ পথ ধরবে বহু চিন্তা করেও লারকিন ঠিক করে উঠতে পারেনি। উমিচাঁদের মতো লোকের সংস্রবে আসলে হয়তো তার একটা সুরাহা হতো কিন্তু তাতো হবার নয়—পিটার তো বলেই দিল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে লারকিন বলল—চলো, গঙ্গার ধারে একটু বেড়িয়ে আসি!

লারকিন নামলো পিটারের হাত ধরে।

সিঁড়ির শেষে ফুটপাথ। কাছে ইলাইজা ইম্পের পার্ক। তার বাড়ীর ধারে জঙ্গলে বাঘ লুকিয়ে থাকে। সন্ধ্যার পর বড় একটা কেউ রাস্তায় নামে না। স্পেন্সারের সামনে ফুটপাথের ওপর দাঁড়িয়ে জন। হাতে তার উদ্যত পিস্তল।

—হ্যালো পিটার! মনে আছে?

পিটার হেসে উঠলো।

ডুয়েল! তাই না! কিন্তু এই লেডির সামনে। এতে দুজনেরই ক্ষতি!

জন জোরে হেসে উঠলো।

—থাক্ লেডির দোহাই দিয়ে পেছিয়ে গেলে। আমি কিন্তু ছাড়ছি না।

জনের কথাটা ভাবিয়ে তুললো ওরা।

—কথা দিয়েছো—আমিও দিয়েছি তখন হয় এসপার না হয় ওসপার। জীবন গেলেও কথা নড়বে না। বেশ—তাহলে কাল—এই সময়ে, এইখানে, কি বলো?

জোর করে হাসি টেনে পিটার বলল—আমি তো চ্যালেঞ্জ নিয়েছি—এখনও নিচ্ছি।

পরদিন লারকিন পিটারকে বলল—আজ তো জনের সঙ্গে দেখা করার কথা।

একটু ভ্রূ কুঁচকে পিটার বলল—তুমি কি চাও আমার ক্ষতি হোক!

—কথা যে দিলে!

—হুঃ, ওর সঙ্গে আবার ডুয়েল। একটা লোফার। দুদিন পড়ে থাকলে ওর আহা বলার কেউ নেই। আর আমার! এখন অফিসে যে কি চাপ তা তোমায় কি বলবো! নিঃশেষ ফেলার সময় নেই। তিন-চারখানা জাহাজ সব রেডি। তার ওপর তুমি!

মার্সিকা একটু হাসলো।

—ভাবনা আমার জন্যে! সাত-সমুদ্দুর তেরো নদী পার হয়ে এসেছি। পথ আমার কাছে এগিয়ে আসবে।

পিটার গম্ভীর হয়ে গেল।

—মিস্ মার্সিকা, আমাদের এই সম্পর্কটা কি তাহলে নিছক জুয়োখেলা?

—আমার যেটুকু দরকার তার বেশী কোনদিনই না। আমার কাছে আশা করো না।

পিটার চিন্তায় পড়ে গেল। মার্সিকার কথাগুলো পিটারের মনটাকে কাঁটার খোঁচার মতো ছিঁড়ে দিল। তার চিন্তা—নারীর মন সত্যিই কি বিধাতারও অজ্ঞাত?

উভয়েই নীরব।

—রাগ করলে?

পিটারের হাতটা ধরে মার্সিকা একটু নাড়া দিল।

—বড্ড গরম ঠেকছে। চল না একটু গঙ্গার হাওয়া খেয়ে আসি?

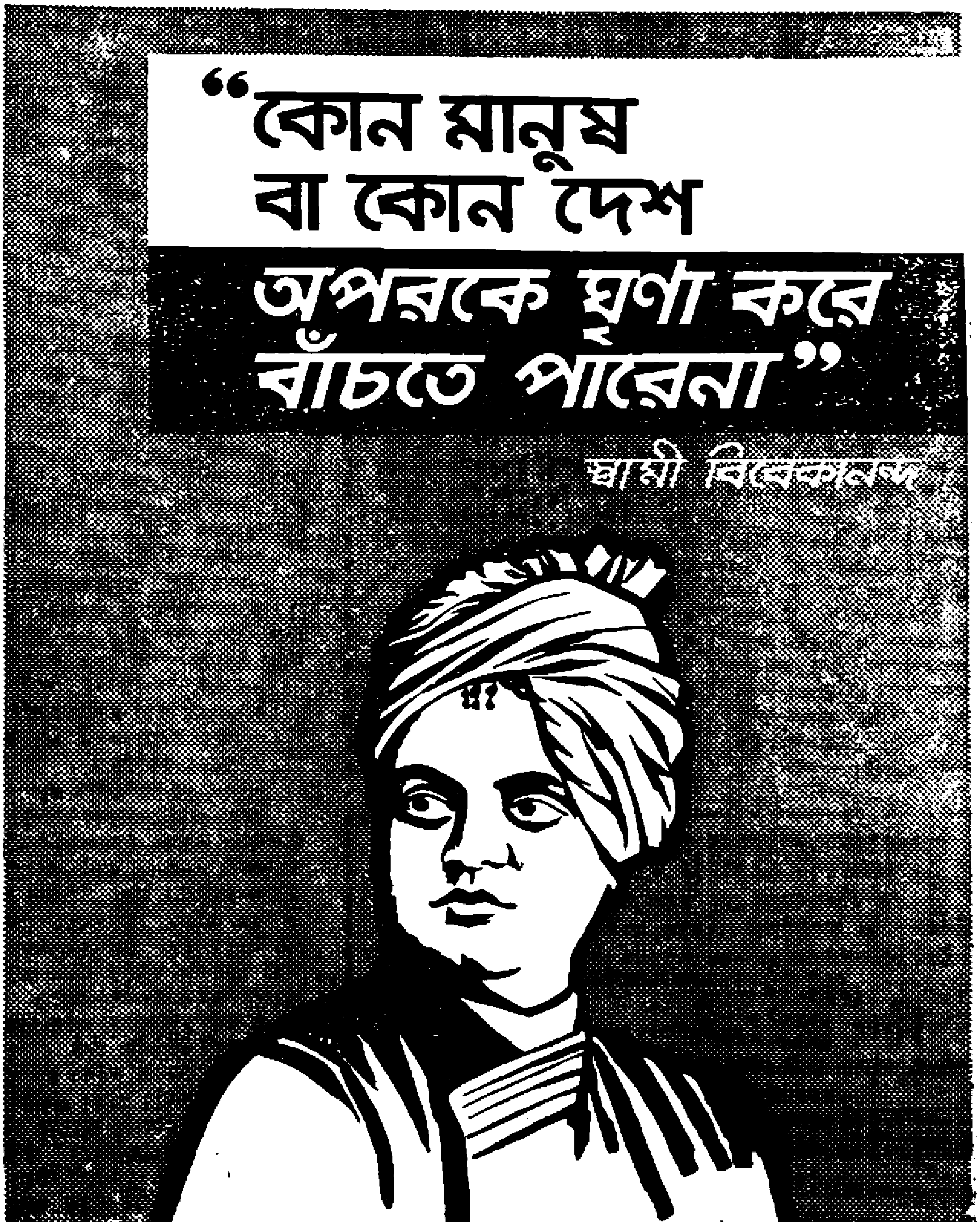

পিটার নীরবে লারকিনের সঙ্গ নিয়ে চলল।

গোধূলি বেলা—তার সোনালি রঙ চারিদিকটা রাঙিয়ে তুলছে।

গঙ্গার ঢেউগুলো পড়ন্ত সূর্যের রক্তাভ গোলক নিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটছে। নতুন বৌ-এর মতো আষাঢ়ের ঈপ্সিত অভিসার তখন সবেমাত্র শুরু হয়েছে। সবুজ ঘাসের ওপর তারা বসে পড়ল। লারকিন পিটারের পা ঘেঁষে বসল।

—পিটার ! মাই ডার্লিং রাগ করলে ? জানো তোমায় আমি কত ভালবাসি!

—রাগ! কার ওপর করব লারকিন! তুমি—তুমি যে আমার জীবনসঙ্গিনী!

ভানদিকের ছোট চোখটা আরও ছোট করে লারকিন শুধু একটু হাসলো।

—আজ আর স্পেন্সারে নয়।

—তবে?

—রাণী মৃদিনীর গলি!

—রানী মৃডি! সে আবার কোথায়? কোলকাতায় তো! আমি কিন্তু কোলকাতার বাইরে যাচ্ছি না।

—স্পেন্সারের কাছাকাছি! ওখানে হুইস্কি খুব ভেজাল, দামও সস্তা।

—বিলেতে খুব অভ্যেস ছিল। এখানে স্পেন্সারে যতই খাওনা কেন, গা আর গরম হয় না। র‍্যানি—র‍্যানী—সেই ভালো। চীৎকার করে উঠল লারকিন।

গ্যালো-গ্যালো নৌকোটা ডুবলো।

গঙ্গার দিকে দৃষ্টি দিয়ে পিটার একটু হেসে বললো,—ওরা, ওরা ডুববে না! ইণ্ডিয়ার মাঝিরা খুব তুখড়। দেখ না ঠিক বাঁচিয়ে নেবে।

লারকিন তখনও গঙ্গার দিকে তাকিয়ে। —পিটার শোন! ব্রাইটনের ঢেউগুলো ঠিক এমনিতর। চোখটা বন্ধ করে লারকিন বলল, ব্রাইটন সুন্দর, ব্রাইটন মার্ভেল! পিটারের গলাটা কোলের দিকে টেনে নিয়ে বললো—সেখানকার ডিঙ্গীগুলো ঢেউ-এর সঙ্গে কেন ডান্স করে! সে ছবি কিন্তু ভুলতে পারছি না, পিটার! তুমি কখন গেছো। পিটার চুপ করে রইল। তার তো জন্ম এই দেশে—কলকাতায়।

—যাই নি। তবে ভিক্টোরিয়ায় করে তোমায় নিয়ে ব্রাইটনে থাকার ব্যবস্থা করবো।

লারকিন হাসলো।

ফিটনের বড্ড ভাড়া। একটা ঘোড়ার গাড়ী ডাকলো পিটার।

—শুধু শুধু বেশী ভাড়া দি কেন? ঐ পয়সায় আরও দু পেগ!

লারকিণ বলল, তা না তো কি।

রাণী মৃদিনীর গলি—সরু লম্বা সুরকীর পথ—গাড়ী ঢোকে না। গলির মুখে গাড়ীগুলো আশেপাশে রাখতে হয়। ভিতরে সারি সারি দোকান। সন্ধ্যা হলে তখন লোক চলাচল বাড়ে। শহুরেবাবু আর অ্যাংলো ফিরিঙ্গীর দলই বেশী। গলির মুখ মাড়ালেই দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে ডালিমচানো ছোকরাদের মত হোটেল বয় তৎপর হয়ে ওঠে, সেলাম দেয়।

—মেমসাব! সরাপ বহুৎ আচ্ছি হয়।

লারকিণ একটা ছেলের দিকে তাকিয়ে বলল,—এঃ, এ-দেশের লোকগুলো কি নোংরা। চিমটি কাটলে ময়লা ওঠে। কোথায় আনলে পিটার।

পিটার উত্তর দিল না।

রাস্তায় আলো নেই। ঘুটঘুটে অন্ধকার তখন বড় একটা কেউ রাস্তায় বেরুতো না। বাঘ-ভাল্লুক, চোর-ডাকাতের ভয় তো ছিলই। চিৎপুর থেকে কালিঘাটের রাস্তা—দুপাশে মুণ্ডহীন দেহ প্রায়ই দেখা যেতো। বেপরোয়া লোক এরাই ছিল তখনকার দিনে নৈশ কোলকাতার পথের অভিযাত্রী। সন্ধ্যের পর একমাত্র রাণী মৃদিনীর গলি জম-জমাট হয়ে উঠতো। জেন্টুরাজার হোটেল—খাওয়া-দাওয়া খুব সস্তা। লোকের ভীড়ও বেশী। খুপরী-খুপরী ঘরগুলো সন্ধ্যের সঙ্গে সঙ্গে জুয়াড়ী আর মাতালে ভরে ওঠে। চিৎকার আর হল্লা উচ্ছৃঙ্খলতার মূর্তি। ম্যানেজার ফিরিঙ্গী। মোটাসোটা কালো মিশমিশে লোক। কপালের ওপর লম্বালম্বি একটা বিরাট কাটা দাগ। এটা নাকি প্রহারের চিহ্ন। প্যান্টের দু-পকেটে হাত ঢুকিয়ে বুক চিতিয়ে ম্যানেজার বলল, চিৎকার হল্লা রাজাবাহাদুর পছন্দ করেন না। আপনারা—টেবিল চাপড়ে লোকগুলো হো-হো করে চিৎকার করে উঠলো—জেন্টু রাজা! জেন্টুরাজাকে বোলো আমাদের চেয়ে সভ্য লোক আর মিলবে না—এক-এক জনে দু বোতল, তাতে আবার অর্ধেক জল মিশানো! নগদ দাম তো দি! এসো-এসে ম্যানেজার দেখে যাও! ম্যানেজারের আর একবার সাহস রইল না।

পিটার আর লারকিণ একটা টেবিলে। লারকিণ নাক সিঁটকে বলল, এঃ কি নোংরা—টেবিল-ক্লথটায় ঝোলের ছোপ।

পাশের টেবিলের একটা ছোকরা লারকিনের কথাগুলো শুনলো। তার দিকে আড়চোখে চেয়ে বলল,—এ আবার কি বিবি। গালটা গর্তে ডোবা, কোন কাজেরই না।

কথাটা পিটারের কানে গেল। সে আস্তিন গুটিয়ে চীৎকার করে বলল—ওহে ছোকরা! একজন লেডি সম্প্রতি বিলেত থেকে এসেছেন তাঁর সম্বন্ধে এই কটূক্তি! —একটা ভদ্রতা তো আছে।

যান যান মশাই! লেডি! লেডি কি আর রাণী মৃদিনীর গলিতে আসে। আস্ফালনটা পকেটে রাখুন —পকেটে। বুঝেছেন।

সামনের টেবিলে তখনও চিৎকার-হল্লা চলছে।

—এই বয়! এই রাস্কেল। এদিকে আয়, তোর মাথাটা গুঁড়িয়ে দি! এটা কি?

একটা চিংড়ি উঁচু করে ধরল।

—পচা। এর দাম পাবি না।

—খটাং! ধোৎ, এই ছাতাপড়া বিলিয়ার্ডটা আর চলে না। আরে এই যে ম্যানেজার। কাল যদি টেবিল-ক্লথ না বদলাও তো তোমায় দেখে নেবো।

ম্যানেজার এগিয়ে এল।

—সাত দিনের মধ্যে সব ব্যবস্থাই করা হবে। রাজাবাহাদুরের হুকুম। হোটেলটা নতুন করে সাজানো হবে। হারমারিকের মতো ইহুদি মেয়েরা ব্যান্ড বাজাবে।

—হুররে, জেন্টুরাজ। হুররে!

লারকিণের ভাল লাগছিল না।

—পিটার চলো, এখানে আর না।

—আর দু-এক পেগ।

—না-না, এ নরকে আর না!

এলো তারা হোটেলের বাইরে। রাস্তায় দু-চারজন লোকের আনাগোনা সুরু হয়েছে। মধ্যবয়েসী একজন লোক—মাথায় তার উড়ুনি জড়ানো। তার কিরকম পা দুটি নির্ভরতা হারিয়ে ফেলেছে, জড়িতকণ্ঠে বললো—কে তুমি? লাল-লাল পাগড়ী! এই রাণী মৃদিনীর গলিতে লা-আ-ল পাগড়ি বরদাস্ত করবো না—সরে পড়ো।

দু-হাত তুলে কনেস্টবলটার সামনে এসে বলল,—রাণী মৃদিনীর গলি

সরাবের দোকান খালি। হঃ হাঃ হাঃ।

রাণী মৃদিনীর গলি। একদিন কোলকাতার সৌখীন বাবুদের —অ্যাংলো ফিরিঙ্গীদের অন্দর-বিহারের ভার নিয়েছিল। কিন্তু আজ এ নামের রাস্তা কলকাতার ডাইরেক্টরীতে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

• অ্যালকালেক্স টনিক • কিংস হেমোটোন
• কিংকোর আর্নিকা হেয়ার অয়েল
• ক্যাসিনা সিরাপ • ইউট্রোটোন
কিং এণ্ড কোম্পানীর নিজস্ব গবেষণায় প্রস্তুত ঔষধগুলি
এখন আপনার সেবায় নিয়োজিত।
প্রস্তুতকারক :
কিং এণ্ড কোং
১০/৬এ, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭
ল্যাবরেটরী :
৯০বি, গান্ধী বাগান লেন, কলিকাতা-৯
GRACE/K/30/70
কিং এণ্ড কোম্পানীর সকল শাখায় এবং বিভাগ প্রতিদিন সকাল ৮টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত খোলা থাকে

নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

(৩৩)

সেদিনই শশী মাস্টার খবর নিয়ে গেল মুড়াপাড়া। শচীন্দ্রনাথকে সন্দেহে দারোগা ধরে নিয়ে গেছে। কিছু খোঁজ-খবর পেতে চায় রঞ্জিত সম্পর্কে। এবং শচীন্দ্রনাথের এখন কাজের সময়। কিছু কিছু রাজনৈতিক কর্মী এখানে ওখানে ধরা পড়ছে। জেলে নিয়ে যাচ্ছে। শচীন্দ্রনাথ, উমানাথ সেনের মতো বড় কর্মী নয়। সাধারণ সদস্য সে। সে যতটা না কর্মী তার চেয়ে বেশি সৎ এবং সাহসী মানুষ। এই অসময়ে ওকে ধরে নেবার কোন অর্থ হয় না। একমাত্র অর্থ থাকতে পারে সব কংগ্রেস কর্মীদের যখন জেলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তখন ফাঁক বোঝে শচীন্দ্রনাথকেও একটু ঘুরিয়ে আনা। ওরা শচীন্দ্রনাথকে আগামীকাল নারাণগঞ্জে চালান করে দেবে। এবং ভূপেন্দ্রনাথ যদি সহরে গঞ্জে গিয়ে উকিল ধরে জামিনে খালাস করে আনতে পারে—এমন উদ্দেশ্য নিয়ে শশী মাস্টার মুড়াপাড়া রওনা হয়ে গেল।

ছোট কাকা বাড়ি না থাকায় বাড়িটা খালি লাগছে। মাস্টারমশাই দুপুরে রওনা হয়ে গেলেন। এখন একমাত্র বাড়িতে পুরুষ বলতে ঈশম আর পাগল জ্যাঠামশাই। ঠাকুর পুজো কে করবে। জ্যাঠিমা বড়দাকে পশ্চিমপাড়া যেতে বলেছে। সেখানে আর এক ঘর ব্রাহ্মণ পরিবার আছে। গোলক চক্রবর্তী খবর পেয়েই চলে এসেছে। ঠাকুমা পুজোর আয়োজন করে দিয়েছেন। শ্বেত চন্দন রক্ত চন্দন ঘেটে এবং কোষাকুষি ঠিক করে, ফুল ফল সাজিয়ে তিনি বসে আছেন। সোনা ঠাকুরঘরের দাওয়ায় বসে রয়েছে। ছোট কাকা বাড়ি নেই। কাজ-কর্ম দেখে-শুনে করতে হবে। সে ঠাকুমা কি আনতে বলবে, কখন কি আদেশ করবে, সেজন্য বসে রয়েছে। ঠাকুমা আয়োজন করার সময় সারাক্ষণ স্তব পড়ছিলেন। এই মন্ত্র পাঠ সোনাকে যাকে মধ্যে বড় বেশি মুগ্ধ করে রাখে। জ্যাঠিমা আজ রান্নাঘরে। মার শরীর ভাল যাচ্ছে না। কদিন থেকে শুয়ে আছে কেবল। এবং ছোটকাকাকে ধরে নিয়ে যাবার পর থেকেই কিমন এক বিষন্নতা সারা পরিবারে ছড়িয়ে আছে।

ঈশম গরুগুলি গোপাটে দিয়ে এসেছে। সে জমিতে তরমুজের লতা লাগিয়ে দিয়েছে। এখন এই হেমন্ত পার হলে, শীতকাল আসবে, শীত পার হলেই বসন্ত। বসন্তের সেই বড় বড় তরমুজ। খড় রোদ, কাঠফাটা রোদে তরমুজের রস। এখন থেকে লতার যত্ন না নিলে গাছ বড় হবে না, লতা বাড়বে না। সে গাছ, লতা এবং মূলের প্রতি যত্ন নেবার জন্য মাথায় করে একটা ছই—যেমন নৌকায় ছই দেয়া থাকে তেমনি— সেই ছই চরের বুকে নিয়ে ফেলবে। কারণ বর্ষার আগে সে ছইটা তুলে এনেছিল ডাঙ্গাতে, এখন জল নেমে গেছে চর থেকে, সে চরের বুকে আবার মাথায় করে ছই নিয়ে যাচ্ছে। ছোট কর্তা বাড়ি নেই বলে ঈশম বড় বেশি লক্ষ রেখে কাজকর্ম করছে।

সোনা দেখল ছই মাথায় ঈশমদাদা নদীর চরে নেমে যাচ্ছে। কত যে কাজ সংসারে। সারাক্ষণ মানুষটা কোন না কোন কাজের ভিতর ডুবে থাকে। ছোটকাকা বাড়ি নেই বলে তার যেন আরও বেশি কাজ। সে আর সোনাকে দেখা হলেও কথা বলছে না। এ-বছর মামাবাড়ি যাবে। পরীক্ষা হয়ে গেলেই মামাবাড়ি যাবার কথা। করে যাবে, সেও জানে ঈশম। সেই খবর আনবে, ফাউসার খাল থেকে জল নেমে গেছে কিনা। জল না নামলে ধনবৌ বাপের বাড়ি যেতে পারে না। বৌ মানুষ খালের জল ভাঙ্গে কি করে। এখনও বেহারা যারা আসে বিহার অথবা পূর্ণিয়া থেকে তারা আসেনি। ওরা আসবে পৌষে। ঈশমই খবর নিয়ে আসবে ওরা দক্ষিণ-পাড়াতে এসেছে কিনা। কিন্তু এবার খবর নিয়ে এলেও ওরা যেতে পারছে না। ছোটকাকা বাড়ি নেই। তিনি বাড়ি না থাকলে যাবার অনুমতি কে দেবে। সোনা কি ভেবে ছুটে গেল পুকুরের পাড়ে।

সে অর্জুন গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে ছিল। সে ক্রমে বড় হয়ে যাচ্ছে। সে মুড়াপাড়া থেকে চলে এল এবং সেই ফানুট বাজনা, অমলা কমলার মুখ সব মনে পড়লেই এই অর্জুন গাছটার নিচে এসে দাঁড়িয়ে থাকে, সে একা। গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছে। সামনে ভিটা জমি ফসলবিহীন। ফতিমা চলে গেছে ঢাকায়। সে বাড়ি থাকলে ওকে দেখতে পেত। দেখতে পেলেই চলে আসত চুপি চুপি। একা একা সে নানা-রকম গাছ-পালার ভিতর দিয়ে পালিয়ে চলে আসত। মনের ভিতর সেই রহস্যটা জেগে গেল। অমলা রহস্যের স্পর্শ নিয়ে সহসা উধাও। কমলা কি করছে এখন। কলকাতায় বড় বাড়ি, কি প্রাচুর্য—এসব মনে হলেই ওর রাতের কথা মনে হয়, লুকোচুরি খেলার কথা মনে হয়, ছাদের কথা মনে হয়। আর মনে হয় এমন যে মাঠ সামনে পড়ে আছে—অমলা কমলা যদি একবার এ-দেশে আসত! সে তাকে নিয়ে যেত নদীর চরে। তরমুজের খেতে দাঁড়িয়ে থাকত, বড় মিঞার দুই বিবি, বোরখা শরীরে—সেই যেন এক দুর্গা ঠাকুরের মুখ, এবং কেন জানি তেমন বাসনা, মনে হয় অমলা কমলা দুই বোরখা পরলে এবং সহসা কোন নির্জন মাঠে যদি পালকিতে ওরা বোরখা তুলে উঁকি দেয় তবে, যেন মনে হবে—সেই বড় মিঞার দুই বিবির মতো, যা সে দেখে এক শৈশবে প্রথম গ্রামের বাইরে এসে ভয় পেয়ে পালিয়েছিল।

অথবা মনে হয় সেই মালিনী মাছ—সে নদী থেকে একটা মাছ এনে তরমুজের খেতে বালিতে গর্ত করে নদীর জলে মাছ ছেড়েছিল। মাছটা বাঁচল না। সে মাছটাকে একটা তরমুজ পাতা দিয়ে ঢেকে দিয়ে একা দাঁড়িয়ে ছিল মাঠে। তখনই দেখি যাচ্ছিল দুই বিবি। বড় মিঞার দুই বিবি, বোরখা পরে যাচ্ছিল। সোনা বড় ভয় পেয়েছিল সেদিন। ওর কাছে ওরা মানুষ ছিল না। সে একা মাঠে এবং দূরে ছই-এর নিচে ঈশম। ঈশম ওদের দেখে কেমন লম্বা পা ফেলে বের হয়ে এসেছে। সে কোথায় ভয় পাবে তা না, সে ডেকে ওদের সঙ্গে কথা বলেছিল। সোনা ঈশমের পিছনে ভয়ে-ভয়ে দেখেছে দুই বিবিকে। দুই পদ্মকলির মতো মুখ। সোনা ভয় পাচ্ছে ওরা টের পেলে, ওকে মুখ থেকে বোরখা ফেলে বলেছিল, কর্তা কোলে উঠবেন।

সবই মনে হচ্ছিল তার। সামনের মাঠে তার নেমে যেতে ইচ্ছা হচ্ছে। কারণ মার শরীর ভাল না। ওর কেন জানি কিছু ভাল লাগছে না। অথচ এই গাছের নিচে এসে দাঁড়ালেই তার মনের ভিতর অদ্ভুত একটা আশা জাগে। কেউ যেন কোথাও ওর মতো বড় হচ্ছে। কোথাও কেউ ওর মতো ছুটছে। এবং নিত্যদিনের এই যে গাছপালা, সবাই তাকে ভালবাসছে। সোনার এভাবে এক মায়া বেড়ে যাচ্ছে। মায়ায়-মায়ায় সে গাছপালার ভিতর বড় হয়ে গেলে তাকে কোন নদীর পাড়ে চলে যেতে হবে

বুঝি। যেমন বাবা গেছেন দূর দেশে। না মাসে ছ' মাসে আসেন। মা কেমন অসহায় চোখ তুলে ওকে দেখছিল সারা দিন। সে যে কি করবে!

তখনই কেমন হন-হন করে কে মাঠ ভেঙে এগিয়ে আসছে। কাছে আসতেই বুঝল সেই পোস্টম্যান মানুষটি। যে এ-গাঁয়ে আসে। রোজ আসে না। সপ্তায় এক-দিন। সদর মহকুমা শহর থেকে বাড়ি-বাড়ি চিঠি দিয়ে যায়। বাবার চিঠি, জ্যাঠা-মশাইর চিঠি। কখনও-কখনও মামাবাড়ি থেকে চিঠি আসে। সে চিঠি পাবে বলে ছুটে গেল লোকটার কাছে। বলল, চিঠি আছে? চিঠি।

বলল সে, আছে।

তারপর একটা চিঠি। নীল খামে চিঠি। সে বলল, কার চিঠি! কারণ সে বিশ্বাস করতে পারছিল না এ-চিঠি কার! নীল খামে সুন্দর হস্তাক্ষরে কে লিখেছে, অতীশ দীপঙ্কর ভৌমিক। কেয়ার অব শ্রীমহীন্দ্রনাথ ভৌমিক। তার নামে চিঠি! তার নামে চিঠি কে দিল! মানুষটি বলল, অতীশ দীপঙ্কর কার নাম?

—আমার। যেন অপরাধ করে ফেলেছে সেলা। সে যে কি করে হাত বাড়িয়ে চিঠিটা নেবে বুঝতে পারছে না। তার নামে চিঠি। ছোটকাকা এসে শুনলে কি ভাববে। মা, জ্যাঠিমা কি ভাববে! সে যদি চিঠিতে সেই কথা লিখে থাকে! ওর বুকটা কেমন কেঁপে উঠল।

তখন কবর ভূমিতে জোটনের ভিতরটাও কেঁপে উঠল। সে বলল, কর্তা কি কইলেন।

—যা বললাম জোটন তা সত্যি। তুই মালতীর মুখ দেখলেই টের পাবি। মালতীকে জব্বর জননী বানিয়ে গেছে।

জোটন আর কোন কথা বলতে পারল না। তার মুখ ভীষণ কাতর দেখাচ্ছে। মালতী কাছে নেই। বোধহয় ফকির সাবের কবরের পাশে সেই করবী ফুল গাছটার নিচে বসে রয়েছে। রঞ্জিত সামনে, একটা হোগলার আসনে বসে রয়েছে। ওর মাথার উপর ডাহুক গাছের ছায়া। গাছে ফল নেই। পাতা ঝরে যাচ্ছে। গাছটা নেড়া-নেড়া। সূর্য এসে মাঠের ও-পাশে অস্ত যাচ্ছে। জোটন সব নির্বাক ভেবে বলল, তাইলে কি করবেন এখন?

—তাই ভাবছি। নরেন দাসের কাছে মুখে আসতে সাহস পেলাম না। হিন্দু বাড়ি, বিধবা যুবতীর পেটে জারজ সন্তান, সন্তানের বাপ যে কে, সুতরাং বুঝতেই পারছিস মালতীর অবস্থা। একবার কলসী বেঁধে ডুবে মরতে গেল, আমরা তাকে মরতে দিলাম না। সে আবার মরতে যাবে, তুই ত দেখেছিস ওদের বাড়ির নিচে বড় গাব-গাছটা, সারাটা দিন মালতী সেখানে বসে থাকত। বিড়-বিড় করে বকত।

ওরা দুজনই আবার কিছুক্ষণ চুপ থাকল। রঞ্জিতের মুখে এখন দাড়ি-গোঁফ নেই বলে এই সমস্যায় সে কতটা চিন্তিত বুঝা যায়। জোটন বুঝতে পারল, মানুষটি মালতীকে বড় ভালবাসে। সেই শৈশবে সে দেখেছে মালতী এই মানুষের সঙ্গে কত দিন দালানবাড়ি থেকে স্থলপদ্ম চুরি করে এনেছে। কত দিন নৌকায় ঘোর বর্ষায় মাঠে ছিপ দিয়ে দুজনে মাছ ধরেছে। গ্রীষ্মের দিনে ঝড়ের বিকেলে এই দুইজন, সঙ্গে থাকত সামু, তিনজন মিলে বাগের পিছনে বড় সিন্দুরে গাছের আম কুড়াতে গেছে। এই দুজন আবাল্য এক সঙ্গে বড় হয়ে উঠেছে, তারপরে এই বড় মানুষের শালকাঠি নিরুদ্দেশে চলে গিয়েছিল। এবং কবে ফিরে এসেছে সে তা জানে না। এখন মালতীর দুর্দিনে সে আবার ফিরে এসেছে। সে যে একবার, সেই প্রথম যখন ফকির সাব ওর বাড়িতে গিয়েছিল, সে না খেয়ে ফকির সাবকে সব কটা ভাত খাইয়েছিল, কি যে প্রাণের আবেগ, এই এক আবেগ সে এখন রঞ্জিতের মুখে ধরতে পারছে। সে দেখে-ছিল সেদিন বিধবা মালতী চুপচাপ ঘাটে তার হাঁসগুলি ছেড়ে দিচ্ছে। এবং হাঁসের কেলি, অথবা বলা যায় যৌনলীলা সে ঘাটে বসে চুপচাপ চুরি করে দেখছে। ওর কেবল মনে হয়েছিল—হায় খোদা, এমন যুবতী-শরীর বিফলে যায়। আল্লায় মাশুল তুলছে না মালতী। বড় কষ্ট হয়েছিল তার। সে আর সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে নি। সেই মালতী আবার এমনভাবে উঠে এল—কি বলবে এখন, কি করবে এখন জোটন বুঝতে পারছে না।

জোটনের দর্জিতে এই এক কবর ভূমি। মানুষজন দেখাই যায় না। দূরে হোগলার বন পার হলে অথবা শরবনের পর যে মাঠ, মাঠে কিছু গরু-বাছুর দেখা যাচ্ছে। খুব ছোট এবং অস্পষ্ট ছায়ার মতো গরু-বাছুর। এটা টিলার মতো জায়গা বলে অনেক দূর দেখা যায়। এবং মনে হয় জোটন তার নিবাস দেখে-শুনেই সবচেয়ে উঁচু ভূমিতে তৈরী করেছে। এবং খুব দূরে দু-একজন চাষী মানুষ দেখা যাচ্ছে অথবা এই যে অঞ্চল, অঞ্চলের চার পাশে শুধু বেনা ঘাস, হোগলার বন, শরের জঙ্গল সব পার হয়ে মানুষের আসা খুব কঠিন। অগম্য স্থান। এমন একটা অঞ্চলে জোটন থাকে। সে শেষ পর্যন্ত এই অঞ্চলে ঢুকে গেছে, সুতরাং আর কোন ভয় নেই, মুখে-চোখে সেই নিশ্চিন্ত ভাবটাও কাজ করছে রঞ্জিতের। জুটির এখন আর সেই খেটে-খাওয়া চেহারা নেই। পীরের নিবাসে বাস করে ওর মুখে-চোখে কেমন পীরানি-পীরানি ভাব। সে শরীরটা ডাহুক গাছের গুঁড়িতে এলিয়ে দিল। সে যে এসব বলছে, মালতী শুনতে পাচ্ছে কিনা আবার এই ভেবে চারদিকে তাকাতেই দেখল মালতী দূরে কবরের নিচে করবী গাছের ফুল তুলছে কোঁচড়ে।

জোটন আবার কথা আরম্ভ করল। —পানি আইনা দেই। গোসল করেন। ছাগলের দুধ আছে, আতপ চাউল আছে, সীম আছে। সিন্ধ হাতে খান। আর খাইতে দ্যান। পরে ভাইবা যা হয় কিছু ঠিক করতে হইব।

জোটন এবার কবরের কাছে গেল। রঞ্জিত পিছনে-পিছনে হাঁটছে। একটা লাউ-এর টাল, সেটা অতিক্রম করে যেতে হয়। ওরা দুজনই টালের নিচে গুঁড়ি মেরে ওপারে উঠে গেল। জোটনের শীত-শীত করছে। সে ওর কাপড় দিয়ে শরীর ভাল করে ঢেকে নিল। ওরা দেখল কবরের ওপাশে দু পা ছড়িয়ে এখন মালতী বসে রয়েছে। কোঁচড়ে করবী ফুল। সে ফুলগুলির ভিতর হাত ঢুকিয়ে কেবল কি খুঁজছে যেন। বুঝি সে তার যা হারিয়েছে তা ফিরে পেতে পারে কিনা, ফুলের ভিতর হাত রেখে তার অনু-সন্ধান। এখানে উঠে এসেই তার ফের মনে পড়েছে পেটের ভিতর এক বৃশ্চিক বাড়ছে দিনে-দিনে। লেজে হুল, মুখে কাঁটা, দু পায়ে সাঁড়াশি। মাঝে-মাঝে এটা ওর চোখের সামনে এত বড় হয়ে যায় যে, যেন সেই নির্জন মাঠের উপর দিয়ে অতিকায় এক বৃশ্চিক, যার পা যোজন প্রমাণ, যার হুল আকাশে উঠে গেছে প্রায় হাতির সামিল এক জীব ওকে মলে-পিষে মেরে ফেলার জন্য ছুটে আসছে। অথবা সাঁড়াশি দিয়ে গলা টিপে মারবে। সে তখনই হাঁসফাঁস করতে থাকে। সে পাগলের মতো চিৎকার করতে থাকে—না-না-না। যেন সেই হুল ভিতরে বারে-বারে দংশন করছে। আতঙ্কে সে শিউরে উঠছে। তার সান্ত্বনা আর নেই। সেও মরে যাচ্ছে বুঝি। আগামী শীতে ওভাবে বাঁচলে সেও মরে যাবে।

জোটনের চোখ-মুখ ফেটে জল আসছিল। কি সুন্দর মুখ কি হয়ে গেছে! জোটন যতটা পারলো পায়ের কাছে গিয়ে বসল, ওঠ মালতি।

রঞ্জিত দেখল জোটনের কথায় মালতী উঠে দাঁড়িয়েছে। এবং জোটনের সঙ্গে-সঙ্গে হাঁটছে। সেও হাঁটছিল। কোন কথা নেই। পায়ের নীচে ঘাস এবং শুকনো পাতা। ওরা আবার লাউ গাছের টাল অতিক্রম করে এল। ডাহুক গাছটা পার হলেই জোটনের চাটি। চাটির ভিতর ঢুকতে জোটন বলল, হাত-পা পানিতে ধুইয়া নে। কর্তা দুধ গরম কইরা দাওক, তুই খা। খাইলে শরীরটা ভাল লাগব।

জোটন হাতল দুয়ে দিল। নতুন মাটির-হাঁড়িতে দুধ। সে তিনটে কচার ডাল কেটে আনল। তিনটে খোঁটার মতো পুঁতে উপরে দুধের হাঁড়ি রেখে সে বলল রঞ্জিতকে, ইবারে আগুনডা জ্বালেন।

শুকনো ঘাস পাতা এনে দিয়েছে জোটন। এত বড় বনে জ্বালানির অভাব নেই। সে ঘর থেকে টিন বের করেছে। চিড়া বের করে দিয়েছে হাঁড়িতে।

মালতীকে জল আনতে বলেছে কুয়ো থেকে। জোটন সব কিছু বের করে দেবার সময় কত কথা বলছিল, এত-এত খাইছি ঠাকুরবাড়ি। ধনমামী বড়মামী কি না খাওয়াইছে। ঠাইনদি ভাল যা কিছু হইছে আমারে না দিয়া খায় নাই। অর্থাৎ এসব বলে জোটন পুরোনো দিনের স্মৃতি স্মরণ করছে। সে কি করতে পারে তার মেমান-দের জন্য! এই মেমান এসেছে ঠাকুরবাড়ি থেকে। ঠাকুরবাড়িতে সে অভাবে অনটনে খেয়ে গেছে। খুদকুড়া যা কিছু উদ্বৃত্ত থাকত, বড়মামী জোটনকে ডেকে দিয়ে দিত। সে যে এটুকু ওদের জন্য করতে পারছে সে যেন সবই আল্লার মেহেরবানি।

ওরা জোটনের অতিথি। জোটন এখন দু-চার-দশজনকে, ইচ্ছা করলে দু-দশ মাস ধরে খাওয়াতে পারে। যখন মেলা হয়েছিল, মানুষজন এসেছিল কত। দোকান-পসরা, লাল নীল বেলুন, তালপাতার বাঁশি, পীরের মাজারে কত পয়সা, বাতাসার থালায় কত চৌয়ানি টাকা। সে সবই পীরানির প্রাপ্য। সে এভাবে দু বিঘা ধানের ভুঁই—কারণ মোরলের বেটা হয় নি, পীরের মাজারে মানত করে বেটা হয়েছে, সে দুই বিঘা ভুঁই লিখে দিয়ে গেছে জোটনকে। সকাল-সকাল কেউ-কেউ আসে, ব্যারামি নাচারি মানুষ ধরাধরি করে তুলে নিয়ে আসে। জড়ি বুটি যা কিছু ছিল ফকির সাবের সে অসুখে-বিসুখে সে-সব ব্যবহার করে। কেউ এলেই দরগায় অনেক নিচ দাঁড়িয়ে হাঁক দেয়, পীরের দরগায় মানুষ উইঠা যায়। হাঁক পেলেই জোটন তাড়াতাড়ি চটিতে উঠে যায়—কারণ জোটনের কাছে এই বন উদাসী এক জগৎ। ওর চোখে-মুখে পীরানি-পীরানি ভাব। বনের দিকে তাকালে মনে হয় আল্লা কিছুই দিয়ে পাঠায় নি কাউকে। শরীরের বসন-ভূষণ অধিক মনে হয়। লজ্জা নিবারণের কি আছে এত বড় বনে। বনের ভিতর একা-একা জ্যোৎস্নায় তার হিন্দুদের দেবীর মতো হেঁটে বেড়াতে ইচ্ছা হয়। সে শরীরে বাস রাখে না। খালি অঙ্গে সে ঘুরে বেড়ায় বনে, মানুষ দরগায় উঠে এলেই বেনা ঘাসের অন্তরালে উঁকি দেয়। তারপর হাঁকে—মানুষ উইঠা যায়। কেয়ামতের দিন কবে জানতে চায়। কে জাগে দরগায়?

—পীরানি তাড়াতাড়ি তখন জোটন হয়ে যায়। বসন-ভূষণ পরে গলায় মালা-তাবিজ পরে সে তাড়াতাড়ি পীর সাহেবের ছইটার নিচে গিয়ে বসে থাকে। তারপর হাঁকে পীরানি জাগে। তখনই মানুষটা দরগায় উঠে আসতে সাহস পায়। নতুবা সে যতক্ষণ হাঁক না দেবে পীরানি জাগে—ততক্ষণ সেই জড়ি-বুটির জন্য যারা আসবে ঘাসের অন্তরালে বসে প্রতীক্ষা করবে। কখন বনের ভিতর থেকে ডাকটা ভেসে আসছে—পীরানি জাগে। পীর মুর্শিদ নিয়ে রঙ্গরস করা যায় না। চুরি করে তাদের লীলাখেলা দেখা পাপ। সুতরাং সোজাসুজি কেউ দরগায় উঠে আসতে সাহস পায় না। কেবল বছরে যেদিন আশ্বিনের অষ্টমী তিথিতে মেলা বসবে সেদিন হাঁক দেবার নিয়ম নেই। সোজা তুমি দরগায় উঠে আসবে — এমন একটা নিয়ম এ কমাসেই চালু হয়ে গেছে।

জোটন মনে-মনে বড় প্রসন্ন। সে এই দুজন মেমান পেয়ে মালতী যে গর্ভবতী এবং রঞ্জিত যে পলাতক—ওরা দুজন পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে যে পালিয়ে এসেছে—সে সব ভুলে কোথায় কি পাওয়া যাবে এখন, যেমন সীমের মাচানে সীম, লাউয়ের মাচানে লাউ সে তুলে বেড়াচ্ছে। অতিথিদের রাতের খাবার ব্যবস্থা করছে। সে মালতীকে ডাকল, আয় দেইখা যা। সে তার হাতে লাগানো সীমের মাচান, লাউয়ের মাচান এবং পুঁই মাচায় হলুদ রঙের উচ্ছে ফুল দেখাল। সে যে এখন পীরানি, তার নসিব পাল্টে গেছে এবং বড় মায়ায় চারি-দিকে সে তপোবনের মতো আশ্রম গড়ে তুলছে সে-সবও দেখাল মালতীকে।

রাত হলে আর ভয় থাকে না জোটনের। কবর দিতে আসে যারা তারা পর্যন্ত পীরের দরগায় কিছু দিয়ে যায় অথবা মোমবাতি জ্বালাতে আসে কেউ। সে তখন প্রসন্ন গোটার তেলে প্রদীপ জ্বেলে, গলায় মালা-তাবিজ পরে এবং মুর্শিদাবাদের লম্ফ জ্বালিয়ে অন্ধকারে চোখ রক্তবর্ণ করে বসে থাকে। মানুষের এক ভয়, মৃত্যুভয়। যম দুয়ারে দিয়া কাঁটা আমার ভাইয়েরে দিলাম ফোঁটা। জোটন যেন ভাইফোঁটার মতো বিড়-বিড় করে কি বলছে তখন। মানুষেরা অনেক দূরে হাঁটু মুড়ে বসে থাকে। মানুষেরা তার কাছে পর্যন্ত আসতে সাহস পায় না তখন।

জোটন বলল, ডর কোনে অসুবিধা হইব না মালতী। ল, তুই স্নান করবি।

রঞ্জিত মালতীকে দুধ গরম করে খেতে দিল। দুধটা খেয়ে মালতী স্নানের জন্য বসে থাকল। ছাগলটা আনতে গেছে জোটন। সে ছাগলগুলো বেঁধে রাখল ডাকল গাছে। বলল, ল যাই। সান করলে শরীর ঠান্ডা হইব।

জোটনের আছে বলতে এক ছই। আর চটিতে আছে দুটো ঘর। ভাঙা ইঁটের পাঁচিল। সে ঘর দুটোর একটাতে ছাগল-গরু এসব রাখবে বলে করেছে। অন্য ঘরটা করেছে মেলার সময় তার বাপের দেশ থেকে কেউ এলে থাকবে। তার সারাটা দিন বনে-বনে কেটে যায়। কখনও সে ছইটার নিচে বসে নামাজ পড়ে, অথবা মালা-তাবিজের ভিতর পা মুড়ে কেমন মাথা নিচু করে বসে থাকে। ঘর দুটো তার ব্যবহারের দরকার হয় না।

যেটাতে এলে বাপের দেশের মানুষ থাকার কথা সে-ঘরে এখন চুপচাপ রঞ্জিত একটা কাঠের জলচৌকিতে বসে রয়েছে। জোটন মালতীকে স্নান করাতে নিয়ে যাচ্ছে। ঘরে থাকে না বলে কেমন এক বন্য স্বভাব জোটনের। রঞ্জিত এসেই যেন সেটা টের পেয়ে গেছে। সে রাতে ছইয়ের ভিতর থাকে এবং বাইরে প্রসন্ন গোটার গাছে মুর্শিদাবাদের লম্ফটা সারা রাত জ্বলে। সে নির্ভয়ে ঘুম যেতে পারে।

জোটন কবর পার হয়ে এলেই কেন জানি মালতীকে একটু থামতে বলে আবার ডাকল গাছটার নিচে চলে গেল। বলল, কর্তা মালতীর কাপড়টা ঘাটের সিঁড়িতে রাইখা আসেন।

রঞ্জিত মালতীর পোঁটলা থেকে সাদা এক থান বের করল। জোটন ওদের কিছুই ধরছে না। হিন্দুর ধর্মাধর্ম এই। অন্য জাতি ছুঁলে জাত থাকে না। সে ছুঁয়ে দিলে মালতী সারা রাত না খেয়ে থাকবে। এমন কি সে যে সীম, বরবটি, লাউ এবং দুটো পেঁপে পেড়েছে — সব এক সঙ্গে আলাদা রেখে দিয়েছে। জোটন রান্না করার জায়গাটা গোবর দিয়ে লেপে নিয়েছে। গোবরে লেপে দিলেই সব পবিত্র হয়ে যায়। চার পাশটা গোবর ছড়া দিয়ে জায়গাটাকে একজন হিন্দু বিধবা রমণীর উপযুক্ত করে তুলেছে। অথচ পেটে মালতীর জাতক। গাছপালায় বাতাসের শন-শন শব্দ—জোটন নিরামিশাষী, ফকির সাবের মৃত্যুর পর সে মাছ-মাংস আহার করে না—যেন ফকির সাবের মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গেই মাছ-মাংস বলতে যে সম্পর্ক বোঝায় তা তার উবে গেছে। সে আর আল্লার মাশুল তুলছে না ভেবে বলে না, আল্লারে একটা পুরান-কুরান যা হয় ঠিক কইরা দান। কিন্তু মালতীর এমন কাঁচা বয়স, রঞ্জিতের এমন সুন্দর মুখ এক ঘরে এক বিছানায়—মালতী এবং রঞ্জিতকে জোটন এক জোড়া হাঁসের মতো জলের উপর ভাসতে দেখল।

শাড়ীর মেলা
ফোন. ৩৪ ৬৬৬৩
নিউ বেনারসী হাউস
কলেজ স্ট্রীট [illegible] কলিকাতা-৭

মালতী তার মেমান। রঞ্জিতও। ওর দিদি কতবার দিনে কত যত্ন নিয়ে খাইয়েছে তাকে। সে সব মনে পড়লে কৃতজ্ঞতায় চোখে জল আসে। সে রঞ্জিতকে বলল, সিঁড়িতে রাইখা দ্যান। মালতী কাপড় ছোঁবে না। জোটন একটা গাছে বিচিত্র নীল রংয়ের ফুল দেখবার সময় মালতীকে ছুঁয়ে দিয়েছে। স্নান না করা পর্যন্ত মালতী পবিত্র হবে না। সে মালতীকে এক সরোবরে নিয়ে যাচ্ছে। চার পাশে সব বড়-বড় ঝাউ গাছ। গাছের নিচে কত সব বিচিত্র ঘাস ফুল। কাঠবিড়াল গণ্ডায়-গণ্ডায়। সাদা রংয়ের ডাহুক। ডাহুকের ছানা।

রঞ্জিত হাতে কাপড় নিয়ে ওদের সঙ্গে হেঁটে গেল। জোটন আগে, মালতী মাঝে এবং রঞ্জিত পিছনে। ওরা টিলা থেকে নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে। এই পথেই জোটন সারা দিন মরা ডাল, শুকনো পাতা, গাছের ফল কুড়িয়ে বেড়ায়—সে এই পথেই নেমে যাচ্ছে। সূর্যাস্তের আলো পাতার ফাঁকে ওদের মুখে পড়ছে। সেই সব গাছ বড় গযান গাছ, গজারি গাছ, রসুন গোটার গাছ—নিচে তিন মানুষ, এবং ক্রমে শুধু নেমে যাওয়া। যেন জোটন এবং রঞ্জিত এক বন্দিনী বনদেবীকে খোলা মাঠে বেড়াতে নিয়ে যাচ্ছে। দূরের বিল থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে হাঁস উড়ে আসে এ-সময়। কচ্ছপেরা উঠে আসে ডিম পাড়ার জন্য। এখানে সব জীবজন্তু এমন কি কচ্ছপেরা জোটনকে ভয় পায় না। জোটন তাদের মতো জলে-জঙ্গলে থাকে বলে বনের জীব হয়ে গেছে। রঞ্জিত হেঁটে-হেঁটে দেখল দুটো কচ্ছপ খালের পাড়ে উঠে রোদ পোহাচ্ছে। রোদ পোহাচ্ছে কি ডিম পাড়ছে বোঝা যাচ্ছে না। ওরা রঞ্জিত এবং মালতীকে দেখেই জলে নেমে গেল। একা থাকলে ভয় পেত না। সে ব্যাপারটা বুঝতে পেরেই কেমন ডেকে বাবার মতো বলে গেল, আমার মেমান। ভয় নাই জীবেরা। তোমাগ কেউ অনিষ্ট করব না।

অদ্ভুত এক ছায়াচ্ছন্ন সরোবর। আস্তানা সাবের দরগা এটা। মাঝে একটা জল-টুঙ্গি। সেখানে আস্তানা সাবের কবর। পাশে ফাকর সাবের দরগা। এক সময় আস্তানা সাবের হুকুমে এই সরোবর কাটা হয়েছিল এবং কথিত আছে এই সরোবরের ঠিক মাঝখানে জলের উপর বসে আস্তানা সাব নামাজ পড়তেন, খড়ম পায়ে জল পার হয়ে যেতেন. মৃত্যুর আগে তিনি মধ্যবক্ষে জল-টুঙ্গি বানিয়ে গেলেন একটা। সেই জলে-স্থলে তাকে সমাহিত করা হল। জোটন আস্তানা সাবের দরগায় ঢুকেই বলল, পীর সাহেব আপনের সরোবরে স্নান করাইতে আনছি মালতীরে। ওরে শুদ্ধ কইরা দ্যান।

সিঁড়িতে উঠে রঞ্জিত মালতীর কাপড় রেখে দিল।

জোটন বলল, ডুব দেওয়নের সময় মনের বাসনা আস্তানা সাবের কাছে কইস।

মালতী ধীরে ধীরে সিঁড়ি ভেঙে জলে নেমে গেল।

—তর যা বাসনা, তুই যদি সরোবরে ডুব দিয়া কস তবে বিফলে যাইব না।

জলে দাঁড়িয়ে মালতী কি ভাবছে। জলটা নাড়ছে। কি কাচের মত স্বচ্ছ জল! দুটো একটা মাছ ওর পায়ের কাছে এসে ঘোরাফেরা করছে। সে জলের নিচে এই সব ছোট ছোট মৌরলা মাছ দেখে জীবন এভাবে কতদিন আর, এমন ভাবছিল।

জোটন দেখল মালতী জলে ডুব দিচ্ছে না। সে পিছনে দাঁড়িয়ে দেখল রঞ্জিত দাঁড়িয়ে আছে। জোটন কাছে এসে বলল, আপনে যান। মালতীর স্নান হইলে আমি নিয়া যামু।

রঞ্জিত হেঁটে হেঁটে চলে এল। এই অন্তর্ভূমিতেই ঈশ্বর মালতীর পিছনে ছুটেছিল। আর সেই লোকগুলি। মালতী বলেছিল, সে তিন চারজনের মুখ এক সঙ্গে পায়ের কাছে ভেসে উঠতে দেখেছিল। তিন চারজন মিলে সারারাত ওর উপর পাশবিক অত্যাচার করেছে। এই যে সন্তান জন্ম নিচ্ছে, সে কে! তার অবস্থা এখন কি! এ কোন দেবতার আশীর্বাদ! জন্ম নিলে তার পরিচয় কি হবে! জোটন কি এই অশুভ দেবতার হাত থেকে মালতীকে রক্ষা করতে পারবে না! সেত পীরানি। জড়ি-বুটি আছে তার। সে কি বলবে, জোটন এখন তুমি দ্যাখো কি করতে পার। একে তুমি রক্ষা কর।

তখন জলে ডুব দিল মালতী। যেন একটা মাছরাঙা পাখি জলের নিচে ডুবে অদৃশ্য হয়ে গেল। কত বড় সরোবর। পাড়ে পাড়ে বিচিত্র সব গাছপালা। একটা অপরিচিত পাখি বার বার একই স্বরে ডেকে চলেছে। জোটন পাড়ে দাঁড়িয়ে আছে। মালতী কেবল ডুব দিচ্ছে। জোটন বলল, উইঠা আয় মালতী। তর বাসনার কথা কইতে কিন্তু ভুইলা যাইস না।

জোটনের কথামতো ডুব দিয়ে তার বাসনার কথা বলল। —আমারে আস্তানা সাহেব মুক্তি দ্যান। যেন বলার ইচ্ছা—আমাকে আগের মালতী, পবিত্র এবং সুখী মালতী করে দিন। আমি আবার নদীর পাড়ে পাড়ে হাঁটি।

মালতী স্নান করে উঠে একেই বড় পবিত্র লাগছে মুখ চোখ। জোটন বলল, কি কইলি!

জল ভরা চোখে মালতী বলল, আমারে মুক্তি দিতে কইছি।

জোটন আর তাকাতে পারছে না মালতীর দিকে। সে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকল। বোধ হয় জোটন আর মালতীর সঙ্গে কথাও বলতে পারত না।

যদি না মালতী হেসে বলত, বুড়ি তর একলা ডর করে না?

—না।

মালতীর এই হাসি জোটনকে কেমন সাহসী করে তুলল। বলল, আমার লগে আয়। তর কোন ডর নাই।

—কত বড় বন! আগের বার চোখ খুইলা সব দ্যাখতে পারি নাই।

—এই বনে ঢুইকা গ্যালে আর যাইতে ইচ্ছা হয় না।

ওরা ফিরে এলে রঞ্জিত দেখল মালতী খুব স্বাভাবিক হয়ে গেছে। এমনকি মালতী ওকে স্নান করে নিতে বলেছে। এতটা পথের কষ্ট, স্নান করলেই দূর হয়ে যাবে এমনও বলেছে। মালতী আবার যেন বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখছে। কিন্তু সে কতক্ষণ! এই বন, নির্জনতা, এবং জোটনের কাছে সাময়িক আশ্রয়, জোটনের অতিথি-পরায়ণতা কিছুক্ষণের জন্য ওকে মুগ্ধ করে রেখেছে। পেটে যে একটা আজব জীব বাড়ছে এবং রক্তের অন্তরালে যে জীবটা, অতিকায় নৃশংস এক জীব, মুখ কেবল ব্যাদান করে আছে—সেই মুখ স্মৃতিতে ভাসলেই মালতী আবার অধার্মিক হয়ে যাবে। ভ্রূণ হত্যার জন্য সে নিজের শরীরের ভেতরে অন্য একটা শরীর খুঁজে বেড়াবে।

শুধু এই ভয় রঞ্জিতের। সে এই যুবতীকে নিয়ে যায় কোথায়। কারণ, এই অঞ্চল থেকে তার সরে পড়ার একমাত্র পথ নারাণগঞ্জে উঠে যাওয়া। এবং সেখান থেকে রেল অথবা স্টিমারে দূরে দেশে সরে পড়া। কিন্তু সে জানে তাকে ধরার জন্য জাল পাতা আছে সহরে গঞ্জে। ওর সব বয়সের ছবি আছে পুলিশের ঘরে। সে একা থাকলে ভয় পেত না। কিন্তু এই যুবতী মেয়ে—পেটে হাত পড়লেই হিক্কা এবং বমির মতো ভাব, চারিদিকে তখন পাগলের মতো থুতু ছিটাতে থাকে।

রঞ্জিতের ইচ্ছা এই সন্তান নাশের ব্যাপারে একটা পরামর্শ চায় বুড়ির কাছে। মালতী দলামলা হিং খেয়েছে। আতারাণী এনে খাইয়েছে। কিছুই হয়নি। মূল এবং গাছের শেকড়-বাকড় আছে, তা ব্যবহার করা হয়নি। আতারাণী সাহস পায়নি এটা দু কান হতে। নরেন দাস যত বকি করুক মালতী তত ভাল মানুষ হয়ে যাচ্ছিল। এখন বুড়িকে বলার সময় নয়। দু চারদিন থাকার পর কথাটা সে তুলবে। আপাতত এই এক জোটন যে তাদের রক্ষার দায়িত্ব নিয়ে আছে। প্রায় সে আত্ম-সমর্পণের মতোই এখানে এসে উঠেছে। এবং জোটনের এই আশ্রমের মতো জায়গায় মালতীর যদি একটা ব্যবস্থা করা যায়! সে নিজে কথাটা পাড়তে পারছে না। জোটন এই নিয়ে কথা তুললেই সব পরিষ্কার করে খুলে বলতে হবে। তুই কিছুদিন ওকে রাখ জোটন। অন্তত সন্তান প্রসবের দিন কটা পর্যন্ত। তারপর আমি ওর আস্তানা

ঠিক করে নিয়ে যাব। আর তার আগে যদি গর্ভপাত হয়ে যায়, তবে ত কথাই নেই। আমি আর ও কোনদিকে চলে যাব। ঘর বাঁধব।

রঞ্জিতের দিকে তাকিয়ে জোটন বলল, এত ভাবছেন কি! বলে সে হা হা করে হাসল। বলে সে হাঁড়ি পাতিল সব বের করে দিল। সবই নূতন। কিছু খাল পাথর। মেলা থেকে সে কিনেছে। খালা পাথর সে কোনটা কত দিয়ে কিনেছে, তা এক এক করে বলছে। রঞ্জিত বসে বসে দেখছে সব। ওর শৈশবের কথা মনে পড়ছে। এই জাতি কচ্ছপের ডিম পেলে, হিন্দু গ্রাম উঠে যেত। সে শাকপাতা, যেমন গীমাশাক এবং গন্ধপাদাল, বেতের নরম ডগা কেটে দিত, বাড়ি উঠে কচ্ছপের ডিম, শাকপাতা দিয়ে খুদকুঁড়া চেয়ে নিত। ধান ভেনে চিঁড়া কুটে তার আহার সংগ্রহ। ওর স্বামী তালাক দিলেই আবেদালির কাছে চলে আসা। আবেদালির কথা মনে হতেই রঞ্জিত বলল, আবেদালির নমা দিন এখন ওকে ঠিকমতো খেতে দেয় না। মন জোটন ইচ্ছা করলে আবেদালিকে কাছে এনে রাখতে পারে।

জোটনের মুখ বড় কাতর দেখাল। সে এটা পারে না। সে পারেনি। পারেনির তার ভালবাসা থাকতে নাই। সংসার এর

লিনটাস-SS. 11-140 BG
হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

আপনজন থাকতে নাই। তার আপনজন সকলে।

—এই যে আমরা আইলাম।

—সকলে আমার আপনজন কর্তা। কিন্তু কোন মায়া নাই। অর্থাৎ কোন মায়ায় আর জড়িয়ে পড়তে চায় না জুটি। সে একা। কেবল একা থাকতে চায়। আর আল্লা অথবা নবীদের নামে সে মনের ভিতর ডুবে থাকে। রাত বাড়লেই ছইএর নিচে ঢুকে কালো রঙের আলখেল্লা পরবে ফকিরসাহেব। গলায় মালা তাবিজ ঝোলাবে এবং কোরানের পর পর বয়াত মুখস্ত করবে মুর্সিকলাশানের লম্ফের দিকে চোখ রেখে।

রঞ্জিতকে মালতী রান্না করতে দিল না। জোটন ভাজা মুগের ডাল বের করে দিল। গরুর দুধের ঘি। তেল শিশিতে। তেল দিতে দোষ নেই। বাটনা বাটার শীলনোড়া আছে। ওটা জোটন ব্যবহার করতে বলে দিল না। কোনরকমে রাতের রান্না আজ সেরে ফেললে কাল জোটন সব ব্যবস্থা করে ফেলবে। মালতী হলুদ এক টুকরো আস্ত ডালে ফেলে দিল। হলুদ না দিলে রান্নার রুচি থেকে যায়। হলুদ দিতেই হয়। কোথায় এখন বাটা হলুদ পাবে। সে আস্ত হলুদ ফেলে দিল গরম ডালে। মেথি মৌরি তেজপাতা সম্ভারে মুগের ডাল, বেগুন ভাজা, পেপে এবং সীম সেদ্ধ। আতপ চাউলের ফেনা ভাত। বড় কলা-পাতা কেটে এনেছিল জোটন। ওরা খেলে পর যা থাকবে, একপাশে আলগা হয়ে সে খেয়ে নেবে। সে নিজের জন্যও একটা কলাপাতা কেটে রেখেছে।

জোটন খেতে বসে মালতীকে অপলক দেখছিল। জব্বর এই যুবতীকে বিনষ্ট করেছে। মালতী বছরের পর বছর আমার মানুষ না ভুলে আছে কি করে। অথচ জব্বর জোরজার করে এক পবিত্র যুবতীকে অশুচি করে দিল। জোটনের নিজেরই কেমন শরীর গোলাচ্ছে। সে জব্বরকে শিশু বয়স থেকে বড় করেছে। জব্বর এই কাজ করেছে! অপরাধের দায়ভাগ জোটনের। সে ভিতরে ভিতরে জব্বরকে কাছে পেলে কেন গলা টিপে ধরত, এমন চোখ মুখ এখন। মালতী রঞ্জিতকে খাইয়ে আলাদা পাতায় বসিয়ে সঙ্গে ভাত এবং ডাল বেড়ে দিয়ে দিল জোটনকে। মালতী রঞ্জিতের পাতায় ভাত বেড়ে দিয়েছিল। ওরা আলগা হয়ে একটু দূরে বসে পরস্পর নিশ্চিন্ত মনে খাচ্ছে। কিন্তু জোটন খেতে পারছে না। সে অপলক চুরি করে মালতীকে দেখছে। যেন সেই ঠাকুর-বাড়িতে বসে সে খাচ্ছে। সে খেতে খেতে মালতীর রান্নার খুব তারিফ করল।

রঞ্জিত পাশে দাঁড়িয়েছিল। অন্ধকার রাত। লম্ফের আলোতে দুই মায়া মূর্তি বনের ভিতর চুপচাপ খাচ্ছে। এক সময় জোটন বলল, মামা-মামীরা কেমন আছে?

—ভাল। কতদিন সন্ন্যাসিনীর পর এই খাওয়া, একটু ঘি, সীমসিদ্ধ, বেগুন সিদ্ধ ভাত এবং মুগের ডাল বেগুন ভাজা অমৃতের সামিল। আর মালতীর এতদিন পর স্বপ্ন তার সফল হচ্ছে, সে তার প্রিয়-জনকে দুটো রান্না করে দিতে পারছে, তার পাতে খেতে পেরেছে, পেটের ভিতর যে এমন একটা দানব দিনে দিনে বাড়ছে চন্দ্র-কলার মতো, সে আদৌ ভ্রূক্ষেপ করছে না—ঘরে লম্ফ জেলে রেখে এসেছি জোটন—একই ঘরে আজ রঞ্জিত আর মালতী থাকবে। জুটি সেই কবে থেকে প্রায় বলা যায় মালতীর জন্ম থেকে বড় হওয়া, ওর বিয়ে সব সে চোখের উপর দেখেছে। স্বামীর মৃত্যু এবং মৃত্যুর পর মালতীর ফিরে আসা। সেই শোক বিহ্বল চেহারা জোটন যেন ইচ্ছা করলে এখনও মনে করতে পারে—তারপর দীর্ঘকাল মালতী একা একা একটা গাছের নিচে সারাদিন বসে থাকত, কেউ এল না হাত ধরে নিয়ে যেতে—নদীর পাড়ে যাবার ইচ্ছা তার যায় বার। কিন্তু সে একা। একটা গাছের পাতা কেবল সারা মাসকাল ওর মাথার উপর ঝরে পড়েছে। গাছের নিচে আজ তার আর একটা মানুষ এসে দাঁড়িয়েছে। মালতী আজ কিছুতেই রঞ্জিতের দিকে তাকাতে পারছে না। কেবল ফুঁপিয়ে কাঁদছে। উচ্ছিষ্ট এক যুবতী সে। সোনার মতো মানুষ, তার কাছে দেবতার সামিল রঞ্জিত এখন ঘরে চুপচাপ হোগলার উপর শুয়ে আছে। সে গেলে মানুষটা আলো নিভিয়ে দেবে। অথচ ডাকতে সাহস পাচ্ছে না। সে তার কাছে কিছুতেই যেতে সাহস পাচ্ছে না। তার হাত পা কাঁপছে।

এখানে থাকলে মালতী ঘরের ভিতর ঢুকবে না। জোটন সেজন্য তাড়াতাড়ি ছইএর নিচে ঢুকে যাবার জন্য কবর পার হয়ে চলে গেল। পিছনের দিকে তাকাল না। কেবল মনে মনে হাসল। মালতী তুই মনে করস আমি কিছু বুঝি না। তুই বিধবা কইন্যা তর বুঝি কিছু ইচ্ছা থাকতে নাই। মাচানে উঠেই জোটনের মনে হল সরোবরে আজ দুটো মাছ সারাদিন জলের নিচে ঘুরে বেড়াবে। সরোবরে দীর্ঘদিন একটা মাছ ছিল। জোয়ারের জলে আর একটা মাছ ভেসে আসতেই সরোবরের মাছটা লাফিয়ে জলে ভেসে উঠল। ওর কাছে সরোবরের মাছ মালতী। কি যে দুঃখ মেয়ে মানুষের স্বামী বিহনে জীবনযাপন—সে মর্মে মর্মে তা জেনেছে। জোটন মুর্সিকলাশানের আলোতে এবার নিজের মুখ দেখল। সে কেমন তান্ত্রিক সন্ন্যাসিনীর মতো হয়ে যাচ্ছে। এক সুদূর আলোর রেখাক্রমে বড় হতে হতে গাছপালা ভেদ করে উপরে উঠে যাচ্ছে। মালতী ক্ষুধায় পীড়িত। একটা মানুষ তাকে আজ কি যে আনন্দ দিচ্ছে! আহা বসুন্ধরার মতো, অথবা আমাদের মতো, ফসলের জমি খালি ফেলে রাখতে নেই। আজ, আজ রাতে দারুণ গ্রীষ্মের দাবদাহের পর আকাশ ভেঙে ঢল নামবে। ওর আরামে চোখ বুজে এল। সে ফকির সাবের উদ্দেশ্যে মাথা নিচু করে এবার বসে থাকল। মনে হচ্ছে সামনে সেই সোনালি বালির চর—আকাশ ভেঙে ঢল নেমেছে। একটা সাদা বিনষ্ট পবিত্র ফুল সেই জলে চুপিচুপি ভিজছে। সে এবার মনে মনে উচ্চারণ করল, খুদা মেহেরবান। সে বিনষ্ট হতে দেবে না ফুলকে। আবার পরিচ্ছন্ন করে তুলবে সব। মালতীর পেটে জারজ সন্তান। জারজ সন্তান পেটে রেখে সে কিছুতেই এমন নিষ্পাপ যুবতীকে বিনষ্ট হতে দেবে না। হাতে তার কত তন্ত্রমন্ত্র আছে, গাছ-গাছালি আছে—সে কি না পারে! কাছে তার নিজের মানুষ ফকিরসাব। মরার আগে সব তন্ত্রমন্ত্র ঝাড় ফুঁক ওকে দিয়ে গেছে। সে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল। সারা-জীবন ধরে যে মাদুলি আল্লার নিবার কথা, আজ সে তাই বিনষ্ট করতে যাচ্ছে। সে তার লাখেটিয়া চিক সেই মাশুলের উপর ছুড়ে দেবে। তবু মালতী আবার পবিত্র হোক, নিষ্পাপ হোক, সুখী হোক। সে মুর্সিকলাশানের লম্ফ নিয়ে চুপিচুপি উঠে এল। এসে দেখল মালতী তখনও একা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছে। রঞ্জিত পরি-শ্রান্ত। সে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। সে ডাকল, এই মালতী! মালতী কাছে গেলে বলল, ভিতরে যাস নাই।

—না।

—পানি আন।

মালতী ভেবে পেল না, কেন এ-সব! সে তবু জোটনের এমন দৃঢ় চোখ মুখ এবং পরিমান পীরানি ভাবটা দেখে কেমন আবিষ্টের মতো এক বড়া জল নিয়ে এল। বলল, নে, হাত পাত। পানিতে পিরা খা। জলটা খেয়ে ফেললে বলল, যা ভিতরে। আর ডর নাই। বলেই সে যেমন এসেছিল সহসা তেমনি ছইয়ের ভিতর লাফ দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। সে ছইয়ের নিচে বসে এই মুহূর্তে হাজার হাজার অথবা লক্ষ লক্ষ শয়তানের বিরুদ্ধে কুরআন বাজাল। সে যে গোনা করল অর্থাৎ মহাপাপ, ভ্রূণ হত্যার মহাপাপ, সে জোরে জোরে হাঁকল, ফকিরসাব কবরে আইছেন— আছেন? সে চিৎকার করে বলল, খুদা আমারে বেহেস্তে পাঠাইব না দোযখে পাঠাইব? কনত কি হইবে জবাবডা! বলেই সে লক্ষ লক্ষ সয়তানকে কলা দেখিয়ে কাঁথা-বালিশ টেনে শুয়ে পড়ল। তারপর খুব ফিস-ফিস গলায়, যেন ফকিরসাব কবরে নেই, মাচানে এসে তার পাশে শুয়েছে—জোটন এমনভাবে নালিশ দিচ্ছে—কি জবাবডা দ্যান! কিন্তু ফকিরসাব কিছু বল-ছেন না। পাশ ফিরে শুলেন। এবার তার যেন বলার ইচ্ছা, এই ভ্রূণ হত্যার জন্য দায়ী কে। আমি, মালতী, আপনি, না জব্বর! কেডা হইব কন। সে দু হাতে বুক চাপড়ে মাচানে পড়ে তার এই মহা-পাপের জন্য কাঁদতে থাকল।

(ক্রমশঃ)

নির্লিপ্তই আছে

প।প

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা।।

যিনি আসক্তি বিসর্জন করিয়া ও ঈশ্বরে কর্মফল অর্পণ করিয়া কর্মানুষ্ঠান করেন, পদ্মপত্রস্থ জলবিন্দুবৎ কর্মফল তাঁহাকে পাপ লিপ্ত হয় না।—পর পর দুবার এই শ্লোকটি আওড়ালেন পদ্ম মিত্র। আসক্তি বিসর্জন করিয়া, কৈ আর কোন আসক্তি আজ আছে বলে তো মনে হয় না। বিয়ে করেন নি, ছেলেপুলের বালাই নেই। ঈশ্বরে ভক্তি কোনদিনও টলে নি। লোকে বলে কর্মযোগী। এই ষাট বছরেও নিত্য ভোর পাঁচটায় বিছানা ত্যাগ করেন। পুরোনো ব্যারামপুষ্ট যন্ত্রটা যাতে তেল-জল ঠিকমত খায় তাই ভোরে উঠেই রাস্তায় বেরিয়ে পড়েন। হন হন করে মাইল দুয়েক হেঁটে আসেন। ফেরার সময় এই শীতেও ঘাম ঝরতে থাকে। আলোয়ানটা গা থেকে খুলে নিয়ে দলা পাকিয়ে বগলদাবা করেন। তারপর নিত্য কর্মপদ্ধতির ক্রিয়া-কর্মগুলো একে একে সারেন। বাথরুম, স্নান, চা-জলখাবার সঙ্গে একটা দৈনিক কাগজ। সব সারতে সারতে আটটা বেজে যায়। সাড়ে আটটা থেকে লোক আসতে শুরু করে। তার আগে পুবের বারান্দায় ইজি চেয়ারে হেলান দিয়ে মাঝে মাঝে আলট্রা-ভায়োলেট রে-তে গা ডুবিয়ে গীতার মনোমত অধ্যায়গুলি পড়েন। পঞ্চম অধ্যায়টা সবচেয়ে প্রিয়। চমকে উঠলেন পদ্ম মিত্র। গীতাপাঠে তাঁর আসক্তি—আসক্তি তো তিনি বিসর্জন দিতে পারেন নি। ভাল লাগে পড়তে। কেন? তবে কি তিনি গোলোক খোঁজেন? নিশ্চয়ই তাই। নইলে বারবার ফিরে ফিরে কেন গীতার মধ্যেই নিজেকে ডুবিয়ে দিতে চান। তাঁহাকে পাপ লিপ্ত হয় না। কাহাকে? তবে কি তিনি পাপকে ভয় করেন?

বারান্দায় সাজানো বাগানে নয়নতারার গাছটা ছেড়ে ফুলগুলো ঠাণ্ডা শিরশিরে বাতাসে তির তির করে কাঁপছে। গাঁদা গাছটা যেরূপ বেড়ে উঠেছে। ওতে আর ফুল ধরবে বলে তো মনে হয় না। জবা গাছটায় একটাও কুঁড়ি ধরেনি। বারান্দায় প্লাস্টিকের দড়িতে শিবু চন্দনার খাঁচাটা ঝুলিয়ে দিয়েছে। পাখীটার বোধহয় শীত লাগে। শিবু পাখীটাকে ভালবাসে। তাই রোজ ওর নিজের খাকী ইউনিফর্ম দিয়ে পাখীর খাঁচাটা রাত্রিবেলা ঢেকে রাখে। পাখীটা ঠুকরে ঠুকরে ওর জামাটা ফুটো করে দিয়েছে। শিবুর কোন রাগ নেই। বললে, হাসে। ওর শরীরে ঠাণ্ডা লাগে বাবু—পাখীটার ওপর শিবুর খুব মায়া।

মায়া মানেই তো আসক্তি। ছোকরাটা ক্রমশ জড়িয়ে পড়ছে পাখীটার ব্যাপারে। এরপর যদি কোনদিন পাখীটা মরে যায়—একটা পাগল। ঠাণ্ডায় গোটা গা শিউরে উঠল পদ্ম মিত্রের। মারা তো আমিও যাব। তবে কেন এখনো এই বয়সে টিউবওয়েলের কন্ট্রাক্ট পাবার জন্য ছোটাছুটি করছি? বিশ বছরের কন্ট্রাকটরীতে তো কম কামাই নি। তবে কি আমিও আসক্ত? আরো কন্ট্রাক্ট, আরো টাকা, আরো কনট্রাক্ট। দূর—এসব কি ভাবছি। আজ দশটায় ডি-এম-এর ঘরে মিটিং। জেলার সব কজন বি-ডি-ও আসবে। শীতের মরসুমে ক্যানালে জল থাকে না। চাষীদের ভরসা ডিপ টিউবওয়েল। একটা টিউবওয়েল ধরাতে পারলেই নীট হাজার সাতেক ঘরে আসবে। ছটা টিউবওয়েল বসবে এই লটে। মানে কম করেও প্রায় হাজার চল্লিশেক এক ধাক্কাতেই ঘরে তুলে নেওয়া যাবে। তিন চারটে কোম্পানী ঘুর ঘুর করছে। কিন্তু পদ্ম মিত্র ঘুঘু লোক। হাসি পেল—ঘুঘু তো একটা পাখী। মানুষ কি করে পাখী হয়, না কি হতে পারে। শিবু চন্দনাটাকে ভালবাসে। ভালবাসলেই তো আর ও পাখী হয়ে যাচ্ছে না। ওর হাত পাগুলো গুটিয়ে ডানা হয়ে যাবে না। তবে পদ্ম মিত্র কি করে ঘুঘু হবে?

লোকে বলে। পয়লা নম্বরের ঘুঘু পদ্ম মিত্র। পুরোনো পাম্প রং চং করে বিক্রি করাই নাকি তাঁর ব্যবসা। বলুক গে। ওসব কথায় কান দিলে চলে না। আর যদি ঘুঘুই হব তাহলে নানা কাণ্ডে যখন তখন হাজার দু হাজার যে দান করছি—তার হিসেব রাখে কোন শালা!

ছি ছি—মন উত্তেজিত করলে চলবে না। এই বয়সে উত্তেজিত হওয়াটা ভাল দেখায় না। তাছাড়া মাল গছানোর ব্যবসায় উত্তেজনা-টুত্তেজনা যতটা সম্ভব বাদ-ছাদ দেওয়াই দরকার। টুং টাং টুং টাং...ড্রইং রুমের দেওয়ালে ঘড়িটা নড়ে চড়ে উঠল। এখন সাড়ে আটটা। এখুনি বেরিয়ে পড়া দরকার। যেতে হবে প্রায় ছাব্বিশ মাইল। একবার ফ্যাক্টরীটাও পথে ঘুরে যেতে হবে।

গাড়ীতে স্টার্ট দেওয়ালেন পদ্ম মিত্র। বাড়ীতে রইল মিত্র কোম্পানীর মালিকের খাস বেয়ারা শিবু আর তার পোষা চন্দনা। শিবুর মাইনেটা কোম্পানী বেয়ার করে। শিবুকে অফিস বা ফ্যাক্টরীতে যেতে হয় না এখনও। মাইনে কাপড়-জামা সমস্তই কোম্পানীর দরোয়ান এসে বাড়ীতেই দিয়ে যায়। সব ব্যবস্থা পাকা করে রেখেছেন পদ্ম মিত্র।

গড়িয়াহাটার মোড়ে এসে ড্রাইভার জিজ্ঞাসা করল—কোনদিকে যাব? একটু যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন মিত্র সাহেব। গীতা-টীতা ভাল বই, তবে বড় ভাবিয়ে তোলে। এত ভাবনা-চিন্তা ভাল নয়। বেশী ভাবলে, এই বয়সে, মাথার রগটাই ছিঁড়ে যেতে পারে। হাজার ঝামেলা, ফ্যাক্টরীর, অফিসের, বিডিওদের, গভর্ণমেন্টের, প্লাস লোকাল উটকো ঝামেলাও নেহাৎ কম নয়। এর পর নিজের কাজের ব্যাখ্যা খুঁজতে গেলে যে মাথার ঘায়ে পাগলা হয়ে যেতে হবে। নতুন কাজের ফাইলটা কোলের ওপরেই খোলা পড়ে আছে। এতক্ষণ খেয়াল হল একটি অক্ষরও উনি দেখেন নি। ঘড়ির দিকে তাকালেন—নটা দশ। ফ্যাক্টরী হয়ে গেলে দেরী হয়ে যেতে পারে। ডি. এম-টি অল্পবয়সী—মেজাজ মর্জি একটু সাহেবী ধরনের। টাইম না রাখলে চটে যায়। পথের যা অবস্থা। যখন তখন ট্রাফিক জ্যাম হয়ে যেতে পারে। জেলার সদর অফিসের ঠিকানা বাতলালেন মিত্র সাহেব।

কম করেও চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ মিনিট লাগবে। এর মধ্যে ফাইলটায় একবার চোখ বুলিয়ে নেওয়া দরকার। অজয়কে যে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন, ছেলেটা নির্ভুল কাজটা করেছে। ওর একটা ইনক্রিমেন্ট ডিউ হল। পাঁচটা কোম্পানী কোটেশন পাঠিয়েছে। খামগুলো আজই খোলা হবে। সব কটা কোম্পানীকেই ডেকে পাঠিয়েছেন ডি. এম। আড়াই লাখ টাকার কাজ।

কাগজে কলমে প্রফিট চল্লিশ হাজার—ফোর্টি থাউজেণ্ড। কাগজ কলমের বাইরে?

চোখ বন্ধ করে গদির তোয়ালের গায়ে মাথা ছাড়িয়ে দিলেন মিত্র সাহেব। আজ পদ্ম মিত্তিরকে লোকে সামনে সাহেব বলে পদ্ম-বাবু, মিত্র সাহেব, মিস্টার মিত্র, কত কি? অথচ পার্টিশনের সময় মা, ভাই, বোন, আর বাবার মড়া দেহটা নিয়ে যখন বরিশাল এক্সপ্রেস থেকে শেয়ালদায় নেমেছিলেন তখন কেউ চিনতো তাঁকে এই অচেনা অজানা বড় শহরটায়? স্কুল মাস্টার পদ্ম মিত্রকে কেউ সেদিন একটা চাকরী দিয়েছিল? কেউ ডেকে জিজ্ঞাসা করেছিল—কোথা থেকে এলেন? কোথায় উঠবেন? কি করবেন? খাবেন কি। তবে যদি আজ ইধার কা মাল উধার করে দু'পয়সা কামান তাতে লোকের এত চোখ টাটায় কেন? আর এই শহরটা তো কোনদিন তাকে আপন করে নেয় নি। বাবার মরা দেহটা যখন পচে গলে মাটিতে থক থক করছিল তখন সৎকার সমিতির লোকেরা এসে মরা কুকুরের মত চ্যাংদোলা করে ছুঁড়ে দিয়েছিল গাড়ীর ভেতর। মা খেতে না পেয়েই এক রকম মারা গেলেন। বোন দু'টো খিদের জ্বালা সইতে না পেরে কোথায় যে চলে গেল। ভাইটা গেল পাগল হয়ে। কেউ, কেউ দেখেনি সেদিন। তবে কেন আজ সুযোগ পেয়ে একহাত নেবেন না। এটা তো তাঁর দেশ নয়। দেশ তো পড়ে আছে কেন্দ্যেসারের উল্টোপিঠে।

সাব—আ গিয়া। ড্রাইভারের সম্ভ্রম ডাকে চোখ মেলে তাকালেন মিত্র সাহেব। সামনেই ডি, এম-এর কুঠি। ঘড়িতে দেখলেন সাত মিনিট বাকী দশটা বাজতে। তাড়াতাড়ি নেমে এলেন। ড্রাইভার বাঙালী। তবু হিন্দীতে কথা বলে। মিত্র সাহেব দিশী উচ্চারণে আদেশ দিলেন—ক্যারিয়ারসে মাল উতারো। সাবকো অন্দরমে ভেজ দেও। এক পেটি স্কচ হুইস্কী ঘাড়ে বয়ে ড্রাইভার ভেতরে চলে গেল। মিনিট দুয়েক বাদে ফিরে এল খালি হাতে। পদ্ম মিত্র তখন গাড়ীর ভেতরে যোগাসনে ধ্যানস্থ। গাড়ী এবার চলল অফিসের দিকে।

সন্ধ্যে হতে আর বাকী নেই বেশী। ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় আকাশটা ছেয়ে গেছে। দম কেমন বন্ধ হয়ে আসে। একটু জোরে গাড়ীটা ছোটাতে পারলে হাওয়া আসত। কিন্তু ট্রাফিকের যা অবস্থা। সামনেই লাল আলোর সতর্ক পাহারা। একটা থুত্থুড়ে বুড়ো কাশতে কাশতে ট্রাম রাস্তা পার হচ্ছে। পেছনে সার দিয়ে লরীর পাল। কখন শেষ হবে কে জানে?

যাক্ এখন আর কোন চিন্তা নেই। ডি, এম-এর অফিস থেকেই ফোনে ফ্যাক্টরীতে খবরটা পাঠিয়েছেন। আড়াই লাখ টাকার কাজ। এক মাসের মধ্যে ইনস্টল করে চালিয়ে দেখাতে হবে। অক্ষয়ের কাজ চমৎকার। দশো টাকাতেই সব শেষ করেছে। পুরোনো কোটেশনের জায়গায় নতুন কোটেশন চালিয়ে দিয়েছে। খোদ কর্তার অফিস থেকেই অন্য কোম্পানীগুলোর দামটাম সব বেরিয়ে এসেছে। মিত্র কোম্পানীর পুরোনো কোটেশনে রেটটা একটু চড়া ছিল। কম্পিটিশনে টিকত না। কিন্তু ফাইন ম্যানেজ করেছে অক্ষয়।

এখন বাকী দায়িত্ব ফ্যাক্টরীর। হরিয়ানা যে টিউবওয়েলগুলো রিজেক্ট করেছে অকেজো বলে সেগুলোকেই ঝালাই ঝাড়াই করে চালিয়ে দিতে হবে। সব ঠিকঠাক মত হলে, চল্লিশ হাজারের ওপর কম করেও আরো তিন হাজার টেনে তোলা যাবে। অবিশ্যি টাকা তোলা যত সহজ এই টিউবওয়েলে, জল তত সহজে উঠবে না। রদ্দি মাল—ওপরের চেকনাইটা যা শুধু আছে। ভেতরের পার্টস-টার্টসগুলো পুরোনো লোহার দামেও বিকোবে কি না সন্দেহ। হাসি পেল মিত্র সাহেবের। ডি, এম, খুব একচোট হম্বি তম্বি দেখালেন—টিউবওয়েলের ব্যাপারে একটু হেরফের হলে বিল একদম আটকে দেবেন। চেষ্টা করবেন যাতে ভবিষ্যতে কোম্পানী আর কোন গভর্ণমেন্ট কন্ট্রাক্ট না পায়। হুঃ। তুমি বাবা সেদিনের ছেলে। এখনো নাক টিপলে দুধ গলে। যাও বাড়ী গিয়ে কাঁচা হুইস্কী গিলে ক্লার্কগুলোকে ধমকাও। পদ্ম মিত্র তোমাকে এক হাটে কিনে অন্য হাটে বেচে দিতে পারে। শালা দেশপ্রেম দেখাচ্ছে। চাষীদের দুঃখে চোখে আর জল ধরে না! তবে শালা মাল খাওয়ার এত বায়না কেন? তোমার ক্লার্ক কেন ঘুষ নেয়? ন্যাকা!

ক্যা সাব। হামকো কুছ বোলা—গাড়ী চালাতে চালাতে ড্রাইভার মুখ না ঘুরিয়েই সম্ভ্রম জানাল মিত্র সাহেবকে। একটু লজ্জিত হোলেন পদ্ম মিত্র। আলটপকা মুখ ফসকে শব্দটা বেরিয়ে পড়েছে। না, না, কুছ নেহি, তুম চালাও।

গেট, খুলে দ'পাশে ঠেলে সরিয়ে দিল দরোয়ান। সেলাম ঠুকল। গাড়ী ধোঁয়ায় বিছানো পথে কাঁকর ছিটোতে ছিটোতে পোর্চে এসে দাঁড়াল। আস্তে নেমে এলেন পদ্ম মিত্র। ড্রাইভার গাড়ী নিয়ে চলে গেল গ্যারেজে। শিবুর হাতে ফাইল তুলে দিলেন। তারপর একটা একটা করে সিঁড়ি ভেঙে উঠে এলেন একতলা বাংলোবাড়ীর বারান্দায়। সামনেই ড্রইং রুম। ঘরে ঘরে আলো জ্বলছে। ঘরে ঢুকতে গিয়েই থমকে দাঁড়ালেন পদ্ম মিত্র। শিবুটা একটা ইডিয়ট। সকালে ইজিচেয়ারে বসে পড়তে পড়তে গীতাটা ফেলে রেখে উঠে গিয়েছিলেন। সেটা সেইভাবেই পড়ে আছে। তোলেনি। বইটা চেয়ারের হাতলে উল্টে রেখে গিয়েছিলেন। তুলে নিলেন। তুলতেই দু'টি লাইন চোখের সামনে জ্বল জ্বল করে উঠল—

ব্রহ্মণ্যধায় কর্মাণিসঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা।।

পাপে তিনি লিপ্ত হন নি। কারণ তাঁর তো কোন আসক্তি নেই। বইটা মুড়ে নিলেন। শিবু তখন এক হাতে ফাইল আর অন্য হাতে পাখির খাঁচাটা নিয়ে ঘরে ঢুকছে। ছোঁড়াটা পাখীটাকে সত্যিই ভালবাসে। সারাদিন ছোলা খাইয়েছে। এবার ওর জামা দিয়ে খাঁচাটা ঢেকে দেবে, যাতে শীত না লাগে। বাটা একেবারে আসক্ত। পাপ ওর হবেই। ঠোঁটের কোণে চাপা হাসির টুকরো চেপে ধরে মাথা পাড়ে বারান্দা ছেড়ে ঘরের ভেতরে চলে গেলেন পদ্ম মিত্র।

—শশিভূষণ

CENTRAL LIBRARY

মনের কথা

ডগমা ও ডিলিউশন
সীতা-সংবাদ

অবসেশগ্রস্ত (অবসেশন) মানুষ তার অবসেশন সম্পর্কে প্রায়শ সজাগ। তাই সে অবসেশন থেকে মুক্ত হবার চেষ্টা করে অথবা অবসেশনের পক্ষে যুক্তি খোঁজে। তার মনে সর্বদাই দ্বন্দ্ববিরোধ বিদ্যমান। মোহগ্রস্তের (ডিলিউশন) বিশ্বাস বা মোহ নিয়ে তার মনে দ্বন্দ্বের ভাব খুব কমই দেখা যায়। তার ডিলিউশন তার কাছে অভ্রান্ত সত্য। যুক্তিতর্ক দিয়ে যারা তার ভ্রান্তি দূর করবার চেষ্টা করে, তাদের সে শত্রু মনে করে।

ভ্রান্তি বা ডিলিউশন সারাজীবন পোষণ করেও অনেকে সুস্থ বা স্বাভাবিক বলে পরিগণিত হতে পারেন। প্যারানইয়া রোগের প্রধান লক্ষণ ডিলিউশন, তা বলে ডিলিউশন থাকা মানেই প্যারানইয়া জাতীয় রোগাক্রান্ত হওয়া নয়। অন্ধ বিশ্বাস বা ডগমা অনেকের মনেই কমবেশী কায়েমী-ভাবে বিরাজ করে, ফলে তাদের বাস্তব বিশ্লেষণ ও উপলব্ধি ব্যাহত হয় বটে কিন্তু কাজকর্মের কোনো অসুবিধা নাও হতে পারে। ডগমা ও ডিলিউশনের শারীরবৃত্ত (ফিজিওলজি) অনেকটা একই রকম, এই ধারণা বোধ হয় একেবারে কল্পনাভিত্তিক নয়। বিকারতত্ত্বের দিক থেকে ডিলিউশন ও ডগমার মধ্যে পার্থক্য থাকলেও, আপাতবিচারে সমাজতাত্ত্বিকের কাছে এ দুয়ের তাৎপর্য প্রায় একই। দল-কেন্দ্রিক, সম্প্রদায়-কেন্দ্রিক, জাতি-কেন্দ্রিক, মনোবৃত্তির তীব্রতা ও সংকীর্ণতা ডগমার জন্মদাতা। বেশীর ভাগ মানুষই কোনো না কোনো দল বা সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত না হয়ে টিকে থাকতে পারে না। এই অন্তর্ভুক্তির ফলে অন্য দল বা সম্প্রদায় থেকে ব্যক্তি অল্পবিস্তর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে বাধ্য। নিরাপত্তাবোধের প্রয়োজনীয়তা যত অধিক হবে দলীয় বা সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি তত বৃদ্ধি পাবে, অন্য দল ও সম্প্রদায়কে পর মনে হবে। নিজের দল বা গ্রুপের সংগে অবিচ্ছেদ্য অংগীভবনের ফলে অন্য দল বা গ্রুপের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হয়ে পড়া কিছু অস্বাভাবিক নয়। এই অবস্থায় নিজের দলের সংগে অভিন্ন একাত্মভাব বজায় রাখার প্রয়োজনে নিজের দল সম্পর্কে অনেক রকমের অলীক উচ্চ ধারণা ব্যক্তির মনে সঞ্চারিত হতে পারে, অন্য দল সম্পর্কে ঘৃণা বিদ্বেষের ভাব বৃদ্ধি পেতে পারে। ভিন্ন আদর্শে অনুপ্রাণিত পৃথক সংস্কৃতি-সম্পন্ন দলের বিরুদ্ধে মানুষ সংবদ্ধ। মতবাদের ডগমা ক্রমশ ডিলিউশনে পরিণত হয়ে বিপর্যয় ঘটাতে পারে। নিজের দল সম্বন্ধে মহিমান্বিত ধারণার আতিশয্য ডিলিউশন অফ গ্র্যাণ্ডিয়রেরই অনুরূপ। এই ডিলিউশন ক্রমশ নির্যাতনের ডিলিউশনে (অন্য দল আমাদের উচ্ছেদ করার জন্য ষড়যন্ত্র করছে—এই ভয়) গিয়ে দাঁড়ায়। আত্মরক্ষামূলক হিংসাত্মক কার্যকলাপে এরা লিপ্ত হয়ে পড়ে। তবুও এরা প্যারানইয়া রোগাক্রান্ত হয়েছে, একথা বলা হয় না। বলা হয়, ডগমা এদের যুক্তিবিচারহীন করে তুলেছে। সমাজ-বিজ্ঞানীর ভাষায় এরা 'এথনোসেন্ট্রিস্ট' হয়ে গেছে। অন্তর্দলীয় (ইন-গ্রুপ) দরদ ও বহির্দলীয় বিরোধের মনোভাবে আচ্ছন্ন হয়েছে।

একটি সম্প্রদায় বা দল যখন অন্তর্বিরোধের ফলে দ্বিধাবিভক্ত হয়, তখন কিন্তু বিভক্ত দল দুটির পারস্পরিক সম্পর্ক অনেক বেশী জটিল হয়ে ওঠে। এদের সংঘর্ষ প্রায়ই নিষ্ঠুর রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে পরিণত হয়। কিছুদিন আগেও যারা গুরু-ভাই বা সাথী ছিল, তাদেরই মনে হয় ঘৃণ্য নিকৃষ্টতম জীব। একই আদর্শে অনুপ্রাণিত একই আচরণে অভ্যস্ত মানুষগুলোর মধ্যে অহিনকুলের সম্পর্ক দেখা দিয়েছে। এই সেদিন যারা অন্তর্দলীয় দরদের বশবর্তী হয়ে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে বহির্দলীয়দের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে, তারাই এখন পরস্পরের শত্রু। রাতারাতি এই মানসিকতা পরিবর্তনের কারণ কি? সিয়া-সুন্নী, ক্যাথলিক-প্রটেস্টান্ট, হীনযানী-মহাযানী-দের বিরোধের ব্যাখ্যায় তৎকালীন ইতিহাসের অবজেকটিভ কারণগুলো নিঃসন্দেহে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু তা দিয়ে কি আমরা যুযুধানদের, প্রায় সমধর্মী ভ্রাতৃসম ব্যক্তিদের পরস্পরের প্রতি বিশেষ বিরূপ মনোভাবের কারণ বুঝতে পারি? মস্তিষ্কের আলট্রা-প্যারাডক্সিক্যাল পর্বের কল্পনা ছাড়া ভ্রাতৃঘাতী নিষ্ঠুরতার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। ব্যাপকভাবে সন্দেহ অবিশ্বাস ও যুক্তিহীন হিংসার প্রাদুর্ভাবের মৌলিক কারণ যাই হোক না কেন, ব্যক্তি-মানসে সাময়িক অসুস্থতার অস্তিত্বকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না। প্যারানইয়ার সংগে এই অসুস্থতার তুলনা করা চলে।

সমাজ ছেড়ে আবার ব্যক্তিমনের কথায় আসা যাক।

রাজেনবাবুর একমাত্র সন্তান সীতা। সীতাকে নিয়ে তিনি মুশকিলে পড়েছেন। সীতা সুন্দরী, সীতা সুগায়িকা, সীতা শিক্ষিতা ও নানা গুণান্বিতা। সীতাকে নিয়েই রাজেনবাবুর সংসার। রাজেনবাবু অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী, বয়স প্রায় সত্তর। নানা রকম অসুখে ভুগছেন, বুঝেছেন আর বেশীদিন বাঁচবেন না। সীতাকে পাত্রস্থ করে যেতে চান, কিন্তু সীতা কিছুতেই বিয়েতে মত দিচ্ছে না। বয়স পঁয়ত্রিশ পার হতে চলেছে। এরপর কেই বা ওকে বিয়ে করতে চাইবে আর বিয়ে করে নতুন জীবনের সংগে মানিয়ে বা নেবে কি করে? এ ব্যাপারে আমি কোনো সাহায্য করতে পারি কিনা জানতে চাইলেন।

—আমার তো মনে হয় না আমি কোনোভাবে আপনার সাহায্যে আসতে পারি। রোগের চিকিৎসা আমার কাজ। সেই সূত্রে হয়ত রোগীদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, মতামতকে খানিকটা প্রভাবিত করতে পারি। এর বেশি ক্ষমতা আমার নেই।

—মিসেস পাল বলছিলেন তাঁর ছেলেকে আপনি বিবাহ করাতে রাজি করিয়েছিলেন। ছেলেটি এখন পুত্রপরিবার নিয়ে বেশ সুখেই আছে।

—ছেলেটি নিজে থেকে চিকিৎসার জন্যে এসেছিল, চিকিৎসা করতে গিয়ে বুঝেছিলাম বিবাহ ছাড়া পুরোপুরি সুস্থ হওয়া সম্ভব নয়। কাজেই তার অনিচ্ছা দূর করতে পেরেছিলাম। তাছাড়া রাজেনবাবু, একটা কেসের সংগে অন্য কেসের তুলনা করা চলে না। আপনার মেয়ে যদি মানসিক বিশৃঙ্খলার জন্যে আমার সাহায্য চায়, আর আমি যদি বুঝতে পারি তার মানসিক বিশৃঙ্খলা বিয়ে না হলে যাবে না, তবেই হয়ত তাকে বিয়েতে রাজী করাতে পারি।

ভদ্রলোক হতাশ হলেন, কিন্তু হাল ছাড়লেন না। আমার উৎসাহের অভাব বুঝেও অনেক কথা বলে গেলেন। আমাকে আদ্যোপান্ত শুনতে হল।

—ওর বয়স তখন একুশ বাইশ। পোস্ট গ্র্যাজুয়েটের ছাত্রী। ওর মার কাছে শুনলাম সীতা এতদিনে একজনকে পছন্দ করেছে। এবার বিয়ের আয়োজন করা যেতে পারে। পূর্ত বিভাগের ইঞ্জিনীয়ার আমি। কোলকাতা, বর্ধমান, হুগলী নানা জায়গায় পোস্টেড হতাম। সীতাকে নিয়ে ওর মা কোলকাতাতেই থাকতেন। সীতার খবরাখবর রাখা সব সময় আমার পক্ষে সম্ভব হোতো না। শুধু ছুটীর দিনে দেখতাম সীতার অনেক বন্ধু, অনেক বান্ধবী। ওর মার কাছে তাদের পরিচয় পেতাম। ওর মা ভাবতেন ওরা সীতার গুণমুগ্ধ। আমার অন্য রকম মনে হোতো। ছেলেগুলো সীতার রূপযৌবনে আকৃষ্ট হয়ে আমাদের বাড়ীতে যাতায়াত করত। স্কুল ফাইন্যাল পাশ করার পর আমি বিয়ের কথা বলেছিলাম। ওর মা আমার কথা কানে তোলেননি। আজকাল অত কচি বয়সে অমন কেনো মেয়ে বিয়ে করে নাকি? সীতাকে তিনি রামচন্দ্রের মত আদর্শ পুরুষের হাতে তুলে দেবেন, ভেবেছিলেন। অবশ্য একটি শর্ত। অগ্নি-পরীক্ষা বা বনবাস দেওয়া চলবে না। ছেলেদের নিয়ে এত হৈচৈ, এত মেলামেশা আমার ভাল লাগত না। ওর মা এর মধ্যে দোষের কিছু দেখতেন না। উল্টে আমাকে সন্দেহপ্রবণতার জন্যে বিদ্রূপ করতেন। যাই হোক, প্রণবকে পুরোপুরি অবতার মনে না করলেও, তিনি মেয়ের প্রেমাবেগে বাধার সৃষ্টি করলেন না। সীতার সতীর্থকে তিনি ভাবী জামাতা কল্পনা করে যথোচিত আদর আপ্যায়ন করতে লাগলেন। প্রণবের সংগে সীতা ক্লু, বটানিক্স, সিনেমাতে যেত, অনেক রাতে বাড়ী ফিরত। আমি এসব খবর রাখবার অবকাশ পেতাম না, প্রয়োজন বোধও করতাম না। সীতা ও তার মায়ের ওপর সব দায়-দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলাম। বিয়ের আয়োজনে চেক কাটা ছাড়া আমার আর বিশেষ কিছু করতে হবে না, জানতাম। কিন্তু চেক কাটতে হল না। আমাকে সীতার চার্জ বুঝিয়ে দিয়ে সীতার মা বিদায় নিলেন। তিন দিনের বেশি ভুগলেন না। চিকিৎসার সুযোগও দিলেন না। মৃত্যুর আগে বা দু-চারটে কথা বললেন, তা থেকে বুঝলাম সীতার ওপর তিনি বিশ্বাস হারিয়েছেন। সীতাকে অবাধ মেলামেশার সুযোগ দিয়ে তিনি ভুল করেছেন। ওকে নার্সিং হোমে রেখে একটা ব্যবস্থা করতে হবে। প্রণব বোধ হয় বুঝতে পেরেই সরে পড়েছে। যেমন করে হোক মেয়েটার একটা গতি না করলে, আত্মহত্যা ছাড়া তার উপায় থাকবে না।

এক মিনিট চুপ করে থেকে ভদ্রলোক আবার বলে চললেন।

—সেই মুহূর্তে আমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছিল, পায়ের তলায় মাটি সরে গিয়েছিল। সাংসারিক সব ব্যাপারেই আমি অনভিজ্ঞ। লজ্জা ঘৃণায় কয়েকদিন সীতার মুখের দিকে তাকাতে পারিনি।...আপনার অনেক সময় নষ্ট করলাম, এবার সংক্ষেপে বলছি। কয়েকদিনের মধ্যেই বোঝা গেল সীতার মা যা সন্দেহ করেছিলেন, সেটা ঠিক নয়। সীতার এক বান্ধবীকে লেখা চিঠি পড়ে জানলাম, প্রণব জোরজবরদস্তি করার ফলে তার সংগে সীতার ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। সব ছেলেই নাকি ভাব করে ঐ একই উদ্দেশ্য নিয়ে। অনেক ভাল ভাল কথা, রোমান্টিক আলোচনা শেষ পর্যন্ত দেহক্ষুধা মেটাবার কাজে তারা লাগাতে চায়। প্রণবকে একটু বেশী প্রশ্রয় দেওয়াতে সে অনেক দূর অবধি এগুতে সাহস পেয়েছিল। পুরুষের ওপর সীতা বিশ্বাস হারিয়েছে। সীতার বান্ধবী আমাকে জানাল, আমি যেন সীতার বিয়ে নিয়ে পীড়াপীড়ি না করি। পাঁচ সাত বছর আমি বিয়ে নিয়ে আর চিন্তা করিনি। সীতা পাশ করেছে, কলেজে পড়াবার চাকরী নিয়েছে। আমি অবসর নিয়ে বাড়ী বসে আছি।

—ঐ রকম আঘাতের পর অনেক মেয়েই বিয়ে করে না। বিয়ে করলেও সুখী হয় না। আপনি কেন মেয়ের বিয়ে নিয়ে এত ভাবছেন? পুরুষ সংসর্গ ওরা সহ্য করতে পারে না।

ভদ্রলোক আমার কথায় আশ্বস্ত হলেন না।

একটু চুপ করে থেকে রাজেনবাবু আবার মুখ খুললেন।

—যদি নিশ্চিতভাবে বুঝতাম ওর জীবনে পুরুষের প্রয়োজন নেই, ও পুরুষ সংসর্গ চায় না, তবে নিশ্চিন্ত হয়ে শেষ কটা দিন কাটিয়ে দিতে পারতাম। কিন্তু আমি যে দেখছি পুরুষকে আকৃষ্ট করা ওর স্বভাবে দাঁড়িয়েছে। ঐ ঘটনার পর প্রথম পাঁচ সাত বছর কোনো ছেলের সংগে ওকে ঘনিষ্ঠ হতে দেখিনি, কিন্তু তার পর থেকে এই সাত আট বছরে, অন্তত পাঁচটি ছেলের সংগে ওকে অবাধ মেলামেশা করতে দেখেছি। একটা গানের স্কুলে কাজ নিয়েছে, সেই সূত্রে আমার মনে হয়, অনেক অবাঞ্ছিত ছেলে ওর বন্ধু হয়েছে। এক একটি ছেলে বন্ধু ওর জীবনে আসে, আর আমি আশা করতে থাকি এইবার বুঝি ছেলেটির তরফ থেকে বিয়ের প্রস্তাব আসবে। খোঁজ খবর নিয়ে দেখি, ছেলেটি বিবাহিত অথবা যাকে বলে একেবারে ক্রনিক কনফার্মড ব্যাচেলর। হতাশায় ভেঙে পড়ি। কিছুদিন পরে রঙ্গমঞ্চে নতুন পুরুষের আবির্ভাব হয়, পুরনোটি চিরতরে প্রস্থান করে। আবার আশা জাগে, আবার নিরাশ হই। সোজাসুজি এসব নিয়ে ওর সঙ্গে কোনো আলোচনা করতে আমার লজ্জা হয়। যে ছেলের সংগে যখন ভাব হয়, তাকে নিয়ে ও উন্মত্ত হয়ে ওঠে। সেই ক্লু, বটানিক্স, সিনেমা, স্টিমার পার্টি। বিবাহিত ছেলেদের প্রেজেন্ট ও অতি সহজে গ্রহণ করে। আমার কাছ থেকে উপহার-দাতার পরিচয় গোপন করে না। কিছু-দিন পরেই তার নাম ও মুখে আনে না। কি ঘটে গেল, আমি জানতে পারি না, বুঝতেও পারি না। বিবাহ করা ওর পক্ষে বিশেষ দরকার। অন্তত আমি সেই রকম মনে করি।

মেয়েটি নিশ্চয়ই অসুস্থ। অসুস্থতা তাকে উন্মার্গগামিনী করেছে। এ অস্বাভাবিক আচরণের মূলে হয়তো প্রণবের ব্যবহার। কিন্তু আমি রাজেনবাবুকে সাহায্য করতে পারব না। যে নিজের অসুস্থতা বজায় রাখতে চায়, যা নিজে বুঝতে পারে না যে সে অসুস্থ, তার রোগ সারাবার কোনো উপায় নেই। চিকিৎসার জন্যে এলেও যে আমি তাকে সুস্থ করে তুলতে পারব, তাও মনে হয় না। অসুস্থতাকে প্রশ্রয় দিয়ে সে স্বভাবে পরিণত করেছে। এ স্বভাব বদলানো বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই চিকিৎসকের সাধ্যের বাইরে।

—আমি আপনাকে কোনো পরামর্শ দিতে পারছি না, রাজেনবাবু। ভাল করে ব্যাপারটা বুঝতেও পারিনি। ওর কোনো অন্তরঙ্গ বান্ধবীর সাহায্য পেলে হয়তো ব্যাপারটা কিছুটা বোঝা যেত। কিন্তু তাহলেও ওকে বদলানো যেত কিনা সন্দেহ।

রাজেনবাবু যেন অন্ধকারের মধ্যে কিঞ্চিৎ আলো দেখতে পেলেন।

—বাসবীকে বলে দেখতে পারি। যে বান্ধবীকে প্রণবের ব্যাপারটা চিঠি লিখে জানিয়েছিল, তার নামই বাসবী। খুবই অন্তরঙ্গ ছিল একসময়। এখন বোধ হয় তত ভাব নেই। বছরখানেক আমাদের বাড়ীতে আসে না। বাসবীকে বলব কি আপনার সংগে দেখা করতে? খুবই ইন্টেলিজেন্ট মেয়ে।

রাজী হলাম রাজেনবাবুর প্রস্তাবে। বাসবী এলেন। মোটাসোটা গোলগাল চেহারা। স্কুলে চাকরী করেন। স্বামী ডাক্তার। স্বামীকে নিয়েই বাসবী আমার সংগে দেখা করলেন। দুজনেই সীতার সব ইতিহাস জানেন। দুজনেই সীতাকে ভালবাসেন, তার মঙ্গলাকাংক্ষী। বাসবীর স্বামীই কথাবার্তা চালালেন। বাসবী মধ্যে মধ্যে দু-একটি কথা বলে স্বামীর ভুল-ত্রুটিগুলো শুধরে দিলেন।

—এ আপনারই কেস। কিন্তু খোলাখুলি বলা চলে। সীতা পুরোপুরি মর্বিড্। ওর ভাল করা কারুর পক্ষে সম্ভব নয়। চিকিৎসার জন্যে আসা তো দূরের কথা, পরামর্শের জন্যেও সে কোনো লোকের

হাওড়া কুষ্ঠ কুটীর

সর্বপ্রকার চর্মরোগ, বাতরক্ত, অসাড়তা, ফুলা, একজিমা, সোরাইসিস, দূষিত ক্ষতাদি আরোগ্যের জন্য সাক্ষাতে অথবা পত্রে ব্যবস্থা লউন। প্রতিষ্ঠাতা: পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা কবিরাজ, ১নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া। শাখা: ৩৬ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৯। ফোন: ৬৭-২৩৫৯।

কাছে যাবে না। —একমাত্র বাসবীর কাছে নিজের সব কথা খুলে বলত, তাও আজকাল বলে না। আমাকে নিয়েই বাসবীর সংগে ঝগড়া হয়ে গেছে। এখন বাসবীকে বিশ্বাস করে না, আমাকে শত্রু মনে করে। আমাদের অপরাধ আমরা ওর বিয়ের চেষ্টা করেছিলাম। আমার ছোট ভাইয়ের এক বন্ধু আমাদের বাড়ীতে ওর চেহারা দেখে, গান শুনে মুগ্ধ হয়। বছর দুয়েক আগের কথা। মেয়েটিকে আপনি দেখেননি? সত্যিই চার্মিং। দেখলে মনে হবে না সীতার বয়স পঁচিশের থেকে বেশী। শান্তনু, আমার ছোট ভাইয়ের বন্ধু, কয়েক বছর বিলেত থেকে ফিরেছে। প্রাকটিস ভাল জমিয়েছে, বাপের পয়সাও আছে। শান্তনু ভারী ভালো ছেলে, যেমন স্মার্ট তেমনি এলিগ্যান্ট। বাসবী শান্তনুর হয়ে নেগোশিয়েট করতে রাজী হয়নি। সীতাকে ও ভালবাসে, কিন্তু চেনাশোনা কারুর সংগে সীতার বিয়ে হোক, এ ও চায় না। কারণ কি? কারণ সীতা মর্বিড, সীতা এ্যাবনরম্যাল। আপনি আরো ভাল বুঝবেন। আমাদের কাছে ও একটা হেঁয়ালী। ছেলেরা প্রেম নিবেদন করলে, সব মেয়েই বোধ হয় খুসী হয়। কিন্তু সীতার খুসী হওয়াটা একটু উৎকট ধরণের। কোনো ছেলে ওর দেহের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে, পুরুষের আদিম লিপ্সা জাগাতে পেরেছে জানলে ও খুসী হয় কিন্তু কেউ ওর রূপে গুণে আকৃষ্ট হয়ে ওকে রোমান্টিক প্রেম নিবেদন করলে, ওকে নিয়ে প্রেমের কবিতা লিখলে, কিম্বা ওকে বিয়ের প্রস্তাব দিলে, ও একেবারে তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে। এক কবি ওর গান শুনে মুগ্ধ হয়ে ওকে নিয়ে একটা কবিতা লিখেছিল। সীতা আমাদের সামনেই তাকে অপমানিত করে কাঁদিয়ে ছেড়েছিল। দু-চারটে ছোকরা অধ্যাপক অন্তরঙ্গতার সুযোগ নিয়ে বিয়ের প্রস্তাব দেওয়াতে, তাদের সংগে ওর মুখ দেখাদেখি বন্ধ। অবিবাহিত ছেলেদের সংগে মিশতে চায় না। তারা কবিতা লেখে অথবা বিয়ের কথা তোলে। তাই ওর যা কিছু মেলামেশা অন্তরঙ্গতা সেই লোলুপ বিবাহিত পুরুষের সংগে। আপনি হয়তো ভাবছেন, সীতা বুঝি একটা কামার্ত পলিগ্যানড্রাস টাইপের ঘৃণ্য স্বভাবের মেয়ে। না। মোটেই না। তাহলে বাসবী বা আমি ওকে ভালবাসা তো দূরের কথা, ওর সংগে কোনো সম্পর্কই রাখতাম না। পুরুষকে ও একটা নির্দিষ্ট সীমা অবধি এগুতে দেয়। এমনকি সেই নির্দিষ্ট সীমা লঙ্ঘন করার জন্যে তাকে প্ররোচিতও করে। উৎসাহ দেয়। তারপর পুরুষের মধ্যে যখন পশুটা পুরোপুরি জেগে ওঠে, সীতার দেহটা এখুনি আয়ত্তে আসবে মনে করে যখন সে হাত বাড়ায়, তখন সীতার কাছ থেকে আসে শীতল রূঢ় প্রত্যাখান। অচিন্তনীয় সীতার সেই মূর্তি। রতিদেবী সহসা মার্জারিনী হয়ে যান। সেই নায়কের সেই দিন থেকে ঘটে অন্তর্ধান। দু-এক মাসের মধ্যে নতুন নায়কের আবির্ভাব। এই রকম এক প্রত্যাখ্যাত নায়কের নিজের মুখ থেকে ব্যপারটা না শুনলে আমি বিশ্বাস করতে পারতাম না এসব কথা, আর আপনাকে বলতেও সাহস পেতাম না। সীতা তাপসীকে নিজের মনের কথা অনেকদিন শুনিয়েছে। সেই সব শুনলে হয়তো আপনি ওর এই বিসদৃশ আচরণের, এই এ্যাবনরম্যালিটির ব্যাখ্যা খুঁজে পাবেন। সত্যিই অদ্ভুত নয় কি? ও বলে, সব পুরুষই কামার্ত পশু। সেই পশুটাকে যারা ছদ্মবেশে ঢেকে রাখে, তাদের ও অনুকম্পা করতে পারে, ভালবাসতে পারে না। তারা মনের স্বাস্থ্য নষ্ট করে। যারা সোজাসুজি তাদের কামনা জানায় তাদের ও পছন্দ করে। তারা অসৎ নয়, ছদ্মবেশী নয়। তারা নাকি পুরুষ জাতিরই রিপ্রেজেন্টেটিভ! বাসবীর প্রশ্নের উত্তরে সীতা সোজাসুজি স্বীকার করেছে যে সে পুরুষকে প্ররোচিত করে, উৎসাহিত করে। সে চায় আসল প্রস্তাবটা তাড়াতাড়ি করুক পুরুষ। যে পুরুষ শয্যাসঙ্গিনী হবার প্রস্তাব করতে দেরী করে, তাকে সে অবহেলায় পরিত্যাগ করে। যখন প্রেমিক উৎসাহিত হয়ে প্রস্তাব করে, তখন একদিকে জয়ের গর্বে ও গর্বিত, অন্যদিকে পুরুষ জাতির প্রতি ঘৃণায় সংকুচিত বিশিষ্ট। এতদিন ধরে যাকে ভালবেসে শুনাভাবে প্রেম জানিয়ে এসেছে, যার মৃদু স্পর্শে ওর দেহ রোমাঞ্চিত হয়েছে, তার দেহগন্ধে তখন ওর নাকি বমি উঠে আসে।

ভাতার এই বলে খানকয়েক চিঠি আমার হাতে দিলেন। সেই প্রত্যাখ্যাত নায়ককে লেখা সীতার প্রেমপত্র।

—এই প্রেমপত্রগুলো পড়ে দেখবেন। সীতার প্রত্যাখ্যান আর নিমন্ত্রণের মধ্যে আপনি নিশ্চয়ই কোনো সাইকোলজিক্যাল কারণ খুঁজে পাবেন। আমরা তো শুধু এ্যাবনরম্যাল বলেই খালাস। কেন এ্যাবনরম্যাল? কি জন্যে এ্যাবনরম্যাল? সেটা আপনিই বুঝবেন। হ্যাঁ, যা বলছিলাম। আমি কেন শত্রু হলাম? শান্তনুর হয়ে বিয়ের প্রপোজালটা যখন দিতে যাই, তখন কলেজের গভর্ণিং বডির এক বিবাহিত সভ্যকে নিয়ে ও মেতে উঠেছে। তার গাড়ীতে তখন ওকে নানা জায়গায় দেখা যেত। আমার অপরাধ, আমি এই ব্যাপারটা বন্ধ করতে বলেছিলাম, অন্তত লোক-জানাজানি যাতে না হয় এই অনুরোধ জানিয়েছিলাম। বাসবীর কাছে শুনেছিলাম কলেজে এ নিয়ে কথা উঠেছে। আর সঙ্গিনে শান্তনুর প্রস্তাবটা পেশ করে তার হয়ে কিঞ্চিৎ ওকালতি করেছিলাম। ভাক্তার হয়ে ওকালতি করাটা আহাম্মুকির কাজ হয়েছিল, পরে বুঝলাম। এই সব ক্ষেত্রে যেটা স্বাভাবিক আমি সেই মতই চলেছিলাম। সীতার মন ভেজাবার জন্যে শান্তনুর রূপ গুণের সংগে ওর রূপ গুণেরও প্রশংসা করে ফেলেছিলাম।

সীতা মনে করল আমি ওর প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছি। কেননা ওর প্রতি আমি আকৃষ্ট। শান্তনুর কথাটা সব বাজে। আসলে শান্তনুর নাম দিয়ে আমার প্রেমের অভিলাষই নাকি ওকে আমি জানিয়েছি। বাসবী আর একটু বোকা মেয়ে হলে আমাদের দাম্পত্যজীবন বিষময় হয়ে উঠত। এখন আমরা ওর পরম শত্রু।

প্রেমপত্রগুলো পড়লাম। কাব্যময়ী পত্র। যে মেয়ে অন্যের কাব্য করাটা অপছন্দ করে, সে তার নায়ককে দিব্যি কাব্য করে চিঠি লিখেছে। চিঠি পড়ে বোঝা যায় ওরা খানিক দূর এগিয়েছে। মেয়েটি প্যাস ফার আন্ড নো ফারদার বলে পুরুষকে আরো অগ্রসর হবার জন্যে বেশ পরোক্ষ সাজেশান দিচ্ছে।

বাসবী আর তার স্বামীর সংগে কথা বলে বুঝলাম সীতা সত্যিই অসুস্থ। আমি যতটা ভেবেছিলাম, তার থেকেও বেশী অসুস্থ। অথচ এ-অসুস্থতা সমাজের অধিকাংশ লোক ধরতে পারবে না। পুরুষের প্রতি আকর্ষণ ও বিদ্বেষের মূল কারণ সীতার কাছে অনুদ্ঘাটিত থেকে যাবে। তার সখা, তার বান্ধবী জানবেন সে এ্যাবনর্মাল। কিছুই করবার নেই। সীতা ডিনিউশনে ভুগছে। ডিনিউশন অব গ্র্যাঞ্জার ও ডিলিউশন অব পারসিকিউশন একই সংগে তাকে প্রভাবিত করছে।

—মনোবিদ

হঠাৎ হঠাৎ সপাট ॥

আলোককুমার চট্টোপাধ্যায়

হঠাৎ হঠাৎ সপাট হাওয়ায়
আমার কপাট ভেঙে যায়
এবং আমার ঘরের মধ্যেই
ক্রমশ আমূল বদলে যাই আমি।
নিজের মুক্তি ভুলে
সেই দিনগুলোকে খুঁজি
যে দিনগুলো সেজের খেয়ালী আলোর মত
অসংখ্য ছবি সৃষ্টি করেছিল
আমাদের মনের দেয়ালে।

আমার ঘরের মধ্যেই
আমার পৃথিবী ধরে যায় তখন
পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের খোলা দ্বারপথে
কিছু আত্মিক যোগ ঘটে
সেই অতীন্দ্রিয় ঈশ্বরের সঙ্গে;
যে আমার মৃতদেহ আজ পর্যন্ত
সৎকার না করে অবিকৃত রেখেছে।

হঠাৎ হঠাৎ সপাট হাওয়ায়
আমার কপাট ভেঙে ফেলে
আমার ঘরে প্রবেশ করে
পুরোনো দিনগুলো
আমার মালা পরিয়ে দেয়:
আমায় ডাকে আর ডাকে…।
অবৈধ প্রেমের, নির্বন্ধ পত্নীর
সুরবাহার, ঘুঙুর-ঘাগরার ঘূর্ণনে
চকিতে পৃথিবীর আর এক গোলার্ধে
আমি ঘনপিনদ্ধ হয়ে পড়ি
আমার সঙ্গে তার সঙ্গে।

ভোরাই ॥

সুরজিৎ দাশগুপ্ত

পাঁচ দিন পাঁচ রাত্রি ধরে
মেঘেরা ফেলেছে তাঁবু গগনের
সমস্ত বিশাল তরে।

বুক কাঁপে ভয়ে সারাক্ষণ
তুমুল বৃষ্টিতে চলে সমুদ্রের
লাগাতার আক্রমণ।

যেন খ্যাপা মহিষেরা আসে
দলে, দলে বিদ্যুতের হল্কা ছোটে
তাদের গর্জিত শ্বাসে।

যখন সূর্যের চিতা বাঘ
নিঃশব্দে পেছন থেকে ক্ষিপ্র ওঠে,
ভোরে লাগে রক্ত-দাগ।

সুদূরতমাসু ॥

পরমেশ মজুমদার

এর চেয়ে সাপের মুখেও
চুমু খাওয়া ঢের জানি সোজা :
সঙ্গে নেই সম্মানের বোঝা,
অঙ্গেও দূষিত পরিধেয়ের।

হয়তো-বা তুচ্ছ বুঝি আরো :
ক্ষোভে-দুঃখে অন্ধ-রাগে দূরে
আমাকেও মারো, ছুঁড়ে মারো,—
যতদূরে ছুঁড়তে তুমি পারো!

অভ্যাসে সমস্ত নাকি বশ :
বজ্রপাতও তুচ্ছ মনে হয়।
তবু মিথ্যে দুর্নামের ভয়
ডেকে আনে বৃষ্টি-বন্যা-ধস।

তাই বুঝি দু'চোখে তোমার
নিঃশব্দে তর্জনী তুলে রাখো?
কেন দীর্ঘ জীর্ণ সেই সাঁকো,
সাধ্য নেই এগিয়ে যাবার!

সাধ্য নেই? আছে, তা-ও আছে :
ইচ্ছে হলে ভয়ংকর চাপ
ফুৎকারে উড়িয়ে, সেই সাপ
টেনে আনতে পারি খুব কাছে!

কিন্তু সেই আদি রমণীর
ঘৃণার বিষাক্ত চুম্বনের
মধ্যে যে তুমিও পাবে টের
ধমক মানে না ধমনীতে।।

নিজেরে হারায়ে খুঁজি

অহীন্দ্র চৌধুরী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বলেছি তো, আমার জন্মদিন এবারেই প্রথম উদযাপিত হলো। ১২ আগস্ট তারিখে 'চিত্রবাণী'ও রঙমহল 'অহীন্দ্র জয়ন্তী' উদযাপিত করলো রঙমহল মঞ্চে। সে অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেছিলেন ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। চিত্রবাণী পত্রিকা আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মনোজ বসু, তারাশঙ্কর, দেবকী বসু, শচীন সেনগুপ্ত, হরেন মুখার্জি ছাড়াও আরো অনেকে। এই অনুষ্ঠানে আমাকে অভিনন্দন জানিয়ে ভাষণ দিয়েছিলেন বীরেন ভদ্র, ফণী বিদ্যাবিনোদ প্রমুখ। ব্যক্তিগতভাবে অনেকেই আমাকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। আমার অনেক সহশিল্পী এবং সহযোগী বন্ধু-বান্ধবের হাত থেকে ফুলের মালা নিতে সেদিন সত্যি আমি অভিভূত হয়েছিলাম। সেদিন সত্যি মনে হয়েছিল, আমি যদি কিছু পেয়ে থাকি, তবে তা হলো বন্ধুজনের ভালো-বাসা। আর এইটাই তো জীবনের পরম পাওয়া।

সেদিনের অনুষ্ঠানে অতীনলালের নৃত্যনাট্য 'কুমার সম্ভবম' পরিবেশিত হয়েছিল।

জীবনে অনেক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছি, কিন্তু সেদিনের অনুষ্ঠান ছিল স্বতন্ত্র। যেখানে উপলক্ষ্য আমি।

কিন্তু এতো চাইনি। অথচ এসব কি আরম্ভ হলো আমাকে নিয়ে।

কদিন যেতে না যেতে আবার এমনি আর এক অনুষ্ঠানে আমাকে সম্বর্ধনা জানান হয়। অনুষ্ঠানটি ছিল প্রদেশ কংগ্রেসের। কংগ্রেস তাদের 'গুণীজন সম্বর্ধনা' পর্যায়ের অনুষ্ঠানে আমাকে সম্বর্ধনা জানায়। চৌরঙ্গীতে কংগ্রেসের মণ্ডপে অজস্রের ভিড়ে আমাকে সম্বর্ধনা জানান হয়।

জানি না কেন, আমি যেন বিব্রত বোধ করতাম এই জাতীয় অনুষ্ঠানে, যেখানে কেন্দ্র-বিন্দুতে আমার নাম।

দিন কাটছে প্রত্যহের নিয়মে। এর মধ্যে আবার বাইরে যাবার ভাবনা আছে। ভাবছি, অক্টোবরে যাবো। কলকাতার বাইরে।

কিন্তু অক্টোবর আসতে তখনো দেরী।

ছেলের খবরের জন্যে মাঝে মাঝে ব্যস্ত হতাম। খবর পেলাম, সে সুইজারল্যাণ্ড থেকে লণ্ডন হয়ে নিউইয়র্ক রওনা হয়েছে। দূর থেকেই শুভ কামনা করলাম। সে যেন নির্বিঘ্নে পৌঁছয় নিউইয়র্ক।

প্রিয়নাথ গাঙ্গুলী চলচ্চিত্র শিল্পের নির্বাক যুগের একজন। চলচ্চিত্র শিল্পে এই মানুষটির অবদান কম নয়। যাঁকে আমরা 'গাঙ্গুলী মহাশয়' বলতাম। ইনি মারা গেলেন ১২ সেপ্টেম্বর। তার কিছুদিন বাদেই অক্টোবরের প্রথম দিকে বিখ্যাত কৌতুক-শিল্পী আশু বোসও লোকান্তর গমন করলেন। আশু বোস চরিত্রগুণে সবারই প্রিয় ছিলেন। আমার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল নিবিড়।

এক এক করে কতো জন চলে যাচ্ছে আমার সামনে থেকে। অথচ আমি আছি—হয়তো এখনো অনেকদিন থাকতে হবে। যে কদিনের মেয়াদ নিয়ে এসেছি সে কদিন থাকতে হবে পৃথিবীতে। এইটাই তো প্রকৃতির নিয়ম।

আবার বাইরে যবার দিন এসে গেল। অক্টোবরের ৯ তারিখে কলকাতা ছাড়লাম। এবারে যাবো ভূপালের দিকে।

পুজোর আগেই চলেছি কলকাতা ছেড়ে। বোম্বে মেলযোগে আমরা রওনা হয়েছি।

যাত্রাপথে একটি বিচিত্র চরিত্রের মুখোমুখি হয়েছিলাম মোগলসরাই স্টেশনে। চরিত্রটি একটি বিবাহিতা তরুণীর। জানি না সে কেমন করে আমার সন্ধান পেয়েছে। এসেই জানালো, সে কলকাতার সঙ্গীত-নাটক-আকাদমিতে ভর্তি হতে চায়। এখানে সে থাকবে না।

মেয়েটিকে বললাম, তুমি এমন চিন্তা করছো কেন? বরং এখানে থেকেই চর্চা করো। জীবনে নতুন ঘর বেঁধেছো, এখন কি এসব শোভা পায়।

তবুও মেয়েটি শুনতে চায় না। শেষ পর্যন্ত আমি বলতে বাধ্য হলাম, এসব চিন্তা ছাড়ো।

জানিনা মেয়েটি আমার সম্পর্কে কী ধারণা করেছিল।

ভূপালের পথে ইটারসি এসে পৌঁছলাম। একটু দেরীতেই পৌঁছেছে আমাদের ট্রেন। ভূপালগামী ট্রেন স্টেশনেই অপেক্ষা করছিল।

ভূপালে এসে ঘটনাচক্রে একটা বাজে হোটেলে এসে উঠতে হলো। গাইড জানালো, সার্কিট হাউসে জায়গা নেই। সরকারী লোকদের নিয়ে সার্কিট হাউস পূর্ণ। সুতরাং এই রদ্দি হোটেলই ভরসা।

যাই হোক, আপাততঃ এখানে থেকেই ভূপাল দেখতে বাধ্য হলাম। একটা গাড়ী ঠিক করলাম শহর পরিক্রমার জন্যে। শহর, শহরতলী, পাহাড়ী পরিবেশ, হ্রদ—সব কিছুর ওপর দৃষ্টিপাত করা গেল এই পর্যন্ত। আরো কিছু সময় ঘোরার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু হলো না। আকাশে তখন জমাট-বাঁধা মেঘ।

পরদিন ১২ অক্টোবর টাঙ্গাযোগে বিখ্যাত সাঁচী স্তূপ দেখতে এলাম। যে সাঁচী স্তূপের প্রধান তোরণটি স্থাপত্য শিল্পের একটি দৃষ্টান্ত-সেটি এবারে প্রত্যক্ষ করলাম। বিরাট স্তূপটির সঙ্গে অতীতের সুন্দর ইতিহাস জড়িয়ে আছে। চারদিকে চারটি প্রবেশ-পথ—স্থাপত্য শিল্পের অন্যতম নিদর্শন। নিকটে যাদুঘর দেখলাম। ভালো লাগলো।

ভোজ রাজাদের প্রাসাদ নেই, আছে তার ধ্বংসাবশেষ। সেই ধ্বংস চিহ্ন থেকে অতীতকে খুঁজে বার করা যাক, না যাক—আজ একথা ঠিকই, এসব দেখেই মনে হয়—ভারতবর্ষের ইতিহাসে অনেক সম্পদই আছে।

কিন্তু সাতপুরার মিছিল আমাকে সত্যিকারে বিস্মিত করলো। এই লৌকিক শোভাযাত্রা দেখবার মতো।

ভূপাল থেকে উজ্জয়িনী। উজ্জয়িনী দেখা আমার অনেক দিনের বাসনা।

উজ্জয়িনী নামের মধ্যে একটা সুগন্ধী সুর লুকিয়ে আছে। জানি না এই নগরীর নামকরণ কে করেছিল, তবে এটা ঠিকই যে, এমন নামকরণ যার, নিশ্চয়ই তার মধ্যে কবি-মনের অস্তিত্ব ছিল।

কাব্য-গাথায় পড়েছি শিপ্রা নদীতটে উজ্জয়িনীর কথা, পড়েছি সেই মহাকাল মন্দিরের কথা। রবীন্দ্রনাথের কবিতার কটি লাইন তো মনের মধ্যে অপূর্ব এক মূর্ছনা জাগাতো। সেই শিপ্রা নদীতটে মহাকাল মন্দিরের মাঝে সে শঙ্খ-ঘণ্টা বাজতো—সেই সুর অহরহ আমার মনের মধ্যে বেজেছে।

আজ চোখে দেখলাম শিপ্রানদীর তীরে উজ্জয়িনীর সেই মহাকাল মন্দির। শুনলাম—আরতির শঙ্খ-ঘণ্টাধ্বনি। কিন্তু কোথায় সেই স্বপ্নের প্রেয়সী মালবিকা!

উজ্জয়িনীর আরো কতো মন্দির, আরো কতো দেবতা—সর্বত্রই একটা ধূপেলী পরিবেশ। সর্বত্রই একটা প্রাচীনত্বের ছাপ। যতো দেখি, ততোই বিস্ময় জাগে। মনে হয়, এই তো আমাদের ভারতবর্ষ, এই তো আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির পুণ্য পীঠ।

দেখলাম, ঐতিহাসিক গোয়ালিয়র, প্রাসাদ, যেখানে বিচিত্রভাবে বাঁক নিয়েছে শিপ্রা। দেখলাম, অকর বট, তোজ গুম্ফা, দেখলাম কালিকা মন্দির—আর অতীতের আরো কতো স্মারক। উজ্জয়িনীর টাংগাগুলোর মধ্যেও কতো বৈচিত্র্য। মনে হয় যেন পুরনো যুগের রথের কোন সংস্করণ।

দিনের সঙ্গে কতো বদলে গেছে। নতুন করে শহর আর জনপদের পত্তন হয়েছে এই সব জায়গায়। ভূপাল তো এখন মধ্যপ্রদেশের রাজধানী। কিন্তু প্রাচীন ইন্দোর শহর—যেখানকার নগর-জীবনের ধারাটি প্রাচীন হলেও সুন্দর। রক্ষণশীলতার মধ্যেও প্রগতিশীলতা থাকে—ইন্দোর না দেখলে সে কথা বিশ্বাস করা যায় না।

ইন্দোর থেকে ধর, আবার ধর থেকে মাণ্ডু—সর্বত্রই গেলাম দুটি খোলা চোখ নিয়ে। মনের দরজাও খুলে রেখেছি—যদি কিছু পাই মনের মধ্যে ভরে রাখবো।

পথে যখন আসি, তখন কাঙালের মন নিয়ে আসি। যা কিছু পাই, মনের মধ্যে সঞ্চয় করে রাখি। ভাবি, এই তো আমার ভবিষ্যতের পাথেয়। এই নিয়েই আমার দিন কাটবে।

কতোদিন হয়ে গেছে, কিন্তু এখনো দু' চোখ বন্ধ করলে দেখতে পাই, শিপ্রা নদীতটে ঘাটে ঘাটে পদচারণা করছি আমি। সেই রাম ঘাট, গন্ধা ঘাট, ভর্তৃ ঘাট—সেই পাথরের সোপান বেয়ে শিপ্রার জল স্পর্শ করা।

যেমন নামের মাধুর্যে উজ্জয়িনীর, তেমনি শিপ্রা নামের মধ্যে একটি রূপেলী মধুরতা লুকিয়ে আছে।

শিপ্রা আমার কাছে স্বপ্নের নদী।

নানা দিক থেকে ধর এবং মাণ্ডু আমাদের কাছে আকর্ষণীয় মনে হয়। ইতিহাসের নানা স্মৃতি এখানে ছড়িয়ে আছে। আলমগীর গেটের কাছে দাঁড়ালে মনে হতো কালের সঙ্গে ইতিহাসের ধারা কতো বদলে গেছে। পাহাড় আর নিবিড় অরণ্য স্পর্শে জায়গাটির প্রাকৃতিক শোভাও অপরূপ হয়ে ধরা দেয়। কিন্তু জাহাজ মহল, আর দুর্গ, কিংবা আলমগীর গেট—যাই দেখি না সব দেখার স্মৃতি মন থেকে হারিয়ে যায়, যখন শুনি রূপমতী আর বাজবাহাদুরের কথা। যে প্রেমের বিয়োগান্তক কাহিনী আজও শ্রোতার মনকে অভিভূত করে।

ইতিহাসের আরো কতো কাহিনী-স্মৃতির স্বাক্ষর এখানে ছড়িয়ে আছে। রানা কুম্ভ, সম্রাট আকবর, হোসেন শা—এই সব ঐতিহাসিক চরিত্রের জীবনের কতো কথা এখানকার মানুষের মুখে মুখে ফেরে।

কদিনের ভ্রমণে একটু দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম। শরীরটা তেমন ভালো চলছিল না। বেশ বুঝতে পারি, পথের এই ধকল আর দেহ সহ্য করতে পারে না। শুধু মনের জোরেই চলি।

এই দুর্বল শরীরেই উজ্জয়িনী ত্যাগ করলাম ১৭ অক্টোবর।

চলতি পথে ট্রেনে বেশ অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছিলাম। সুধীরা আমার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। বললাম, চিন্তা কোরো না। দুদিন বিশ্রাম নিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

উজ্জয়িনী থেকে এবারে চলেছি বম্বের দিকে। বম্বেতে কদিন বিশ্রাম নেবো ভেবেছি।

বম্বে সেন্ট্রাল স্টেশনে পৌঁছেই অজিত বিশ্বাসকে পেলাম। অজিত একসময় আমার ছোট ভাই পঙ্কজের সহকর্মী ছিল। এয়ার লাইনসের হোটেলে যাবার সময় সে আমাদের সঙ্গেই ছিল।

শরীর আরো দুর্বল মনে হলো। সেই সঙ্গে মনটাও। ডাক্তার এলেন। পরীক্ষা করে ব্যবস্থাপত্র দিলেন। এদিকে সুধীরাও বলতে লাগলো, শরীর খারাপ হয়েছে, দুদিনেই সেরে যাবে। মনের জোর হারিও না।

তবুও যেন মনের জোর ফিরে পাই না। মনে হয়, এবারে সত্যিই হয়তো অসুস্থ হয়ে পড়বো।

এই অবস্থার মধ্যেও একেবারে চুপচাপ বসে থাকতে পারিনি। নানা কাজের চিন্তাও ছিল মনের মধ্যে। এসেছি আকাদমীর কাজে। যে সব ছাত্র-ছাত্রী বৃত্তি পাবে, তাদের ইন্টারভিউ নেওয়াই হলো কাজ। আমি ছাড়া অন্যের অভিনেতা বন্দ্যো কনক বিশ্বাসও এসেছিলেন।

ডাক্তারের নির্দেশ, তাড়াতাড়ি কলকাতায় ফিরে যাওয়ার। তবুও কলকাতায় যাওয়ার আগে একবার মাথেরান যেতে হলো। রেলপথটি পাহাড়ের পাকদণ্ডী পথে উঠেছে।

পাহাড়ের ওপর মনোরম পরিবেশে বেশ কয়েকটি বাংলো, কিছু বাড়ি-ঘর। আমরা উঠেছি রাগবী হোটেলে। এখানে তিন-চার দিন থাকবো। যদি কিছু দেখার থাকে, দেখবো। তারপর বম্বে হয়ে কলকাতায় ফিরে যাবো এই ইচ্ছে।

এখানে যদি সুন্দর কিছু দেখে থাকি, তবে তা হলো ক্যাথিড্রাল হিল। দেখতে বড়ো সুন্দর লাগে। ঠিক যেন একটি ক্যাথিড্রাল।...... হ্রদটিও সুন্দর। এখান থেকে জল সরবরাহ করা হয়।

তবে পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে সূর্যাস্ত দেখার মুহূর্তটা অবিস্মরণীয়। সূর্যের অস্ত যাবার সঙ্গে চারদিকের দৃশ্যপট এক অপরূপ শোভা নেয়—যা শুধু দুটি চোখকে নয়, মনকেও ভরিয়ে দেয়।

দুর্বল-অশক্ত শরীর নিয়েও মনের এ খুশীটুকু আমি অপূর্ণ রাখিনি।

আবার ফিরে এসেছি বম্বের তাজমহল হোটেলে। এখনো কদিন থাকতে হবে। কিন্তু থিয়েটার সম্মেলনে যোগ দিতে হবে আমাকে। শরীর দুর্বল হলেও যোগ দিলাম। বিদেশী প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলাপ বিনিময় হলো।

এরই মধ্যে একদিন বলবন্ত রাও গার্গী, কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়ের অনুরোধ এসেছিল আমাকে কিছু বক্তব্য রাখবার জন্য। আমার বক্তব্যও আমি সেমিনারে পাঠ করেছিলাম।

এই সেমিনারে ভারতের অনেক বিদগ্ধজনের সান্নিধ্য এসেছিলাম। এবং কদিন বেশ ভালোই কেটেছিল। যদিও শরীর আমার তেমন ভালো ছিল না।

নভেম্বরের প্রথম দিনে আমরা বম্বে থেকে নাগপুরের পথ ধরে কলকাতার পথে রওনা হলাম।

কলকাতায় ফিরে আগে যেমন সিনেমা, থিয়েটারের চিন্তাটা বড়ো হয়ে উঠতো, এখন আর তা নয়। এখন চিন্তা আকাদমি নিয়ে।

জীবনের পটভূমিকা কতো বদলে গেছে। ছিলাম অভিনেতা, হলাম আচার্য। এক জীবন থেকে আর এক জীবনে আসা।

তবুও মাঝে মাঝে অভিনয় যে করিনি, তা নয়। কিছু ছবির কাজ বাকি ছিল, সেগুলো করতে হচ্ছে। এগুলো শেষ হলে একেবারে ছুটি।

আকাদমি তো আছেই। তারপর আর একটি কাজ সভা-সমিতি এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া।

চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন-লাই কলকাতায় এলে তাঁকে পরিষদ ভবনের প্রাঙ্গণে যে সম্বর্ধনা জানানো হয়েছিল, তাতেও যোগ দিলাম। প্রজাতান্ত্রিক চীনের বিপ্লবী নায়ককে দেখলাম।

আবার এর কদিন বাদেই চেকোশ্লোভাকিয়া থেকে আগত প্রতিনিধিদের সম্বর্ধনা সভাতেও যেতে হলো।

আমার জীবনের পটভূমিকা বিস্তৃত কিনা জানিনা, তবে এইটুকু বলতে পারি—জীবনে আমি একটা বিরাট পৃথিবীকে প্রত্যক্ষ করেছি। যেখানে, যে পৃথিবীতে আমি একজন সাধারণ মানুষ ছাড়া আর কিছু নই।

দেখতে দেখতে কতো বছর পেরিয়ে এলাম। সেই জন্মের দিন থেকে আজ—দীর্ঘকাল জীবনের পথ-পরিক্রমা করেছি। কী পেয়েছি, হিসেব করে দেখিনি, কী পাইনি, তা-ও জানি না। চাওয়া-পাওয়ার হিসেব তো একদিনেই মিটে যাবে—জীবনের শেষের দিনটিতে। কিন্তু তার আগে তো ঋণ মুক্ত হবার চিন্তা। পৃথিবীর কাছে অনেক ঋণ করেছি আমি—যা থেকে মুক্ত হতে চাই। পরক্ষণে ভাবি, থাক না এই ঋণ। হয়তো এরই জন্যে আবার আমাকে এই সুন্দর পৃথিবীতে আসতে হবে। এই মাটি, জলের সুন্দর পৃথিবীতে।

কতো ঘটনা স্মৃতি মনে পড়ে পিছনের দিকে তাকালে। সেই ঘটনার মধ্যে থেকে নিজের পুরোনো দিনগুলোকে আবিষ্কার করতে চেষ্টা করি। ভাবি, যে আমি বাবার কাছে 'বাঁশী কিনে দাও' বলে আবদার করেছিলাম, সেই আমি এখনো যেন এই আমার মধ্যে বাসা বেঁধে আছে।

এ কথাগুলো চিন্তা করছিলাম, সেদিন ছিল আমার বাবার জন্মশতবার্ষিকী। বাবা নেই—পৃথিবীর বন্ধন কাটিয়ে চলে গেছেন অমর ধামে। কিন্তু আমার অস্তিত্বের মধ্যে আমি তাঁকে প্রত্যক্ষ করি।

পিতৃদেবের শতবার্ষিকীর দিনে আমার মধ্যে সেই পুরোনো শিশুটা ফিরে এসেছিল। বলেছিলাম অনুচ্চারিত কণ্ঠে, 'আমার একটা বাঁশী কিনে দেবে বাবা?'

মুহূর্তের চিন্তা, মুহূর্তেই শেষ হয়ে গিয়েছিল।

শেষ হলো উনিশ শ' সত্তর সাল। এক এক করে জীবনের ওপর দিয়ে কতগুলো বছর পার হয়ে গেল। ভাবলাম, এমনি করে জীবনের আয়তনটাও সীমিত হয়ে আসছে।

তবুও চিরকালের নিয়মে স্বাগত জানালাম, নতুন বৎসরটিকে। স্বাগত উনিশ শ' সাতাত্তর।

আজ প্রায় অবসর নিয়েছি বলতে গেলে। কয়েকটি ছবির কাজ হাতে ছিল, সেগুলো করছি। হয়তো মঞ্চ ছেড়েই দিয়েছি প্রায়। তবুও অভিনয়ের কথা ভাবি, নাটকের কথা ভাবি।

দিনপঞ্জীর পৃষ্ঠাও শূন্য থাকে না। প্রতিদিনের যা কিছু লিখে রাখি। স্টার থিয়েটার শীতাতপনিয়ন্ত্রিত হলো, সে কথাও লিখতে ভুলি নি। তাছাড়া বাংলা দেশের মঞ্চের কাছে এটা তো গর্বের বিষয়। একটি মঞ্চ সুন্দর হলো—একটি মঞ্চ দর্শক-সাধারণের স্বাচ্ছন্দ্যের সব রকমের ব্যবস্থা করলো, এর চেয়ে ভালো কথা মঞ্চ-প্রেমিকদের কাছে আর কি আছে।

আজকাল নাটকে অংশ নেওয়া প্রায় ছেড়েই দিয়েছি। তবু অংশ নিলাম, বেতার নাটক 'শাজাহান'। যে নাটকটি আজকাল আর শোনানো হয় না। নাটকটি রেকর্ড করা হলো, ৯ জানুয়ারী। আমি অংশ নিয়েছিলাম নাম ভূমিকায়, ঔরঙ্গজীবের ভূমিকায় ছিলেন নীতিশ মুখোপাধ্যায়। এছাড়া নরেশ মিত্র, সন্তোষ সিংহ, জহর বোস, সরযূবালা প্রমুখ বিশিষ্ট অভিনেতা-অভিনেত্রীগণ নাটকে অংশ নিয়েছিলেন।

আগেই বলেছি, আজকাল আমাকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে হয়। এই তো সেদিন সোভিয়েট চিত্র প্রতিনিধিদের সাদর অভ্যর্থনা জানাতে দমদম বিমান বন্দরে যেতে হলো। সেখানে উপাচার্য নির্মল সিদ্ধান্ত, বি এন সরকার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

এদিনের একটা বিশেষ অনুষ্ঠান, বেংগল মোশান পিকচার্স এ্যাসোসিয়েশনের রজত-জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানটি হয়েছিল সাউথ ক্লাবে। বাংলা দেশের চিত্র-শিল্পের সঙ্গে জড়িত বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উৎসবে অংশ নিয়েছিলেন। সেদিন অনেক সহকর্মী, সহধর্মীর সঙ্গে দেখা হলো। আনন্দ পেলাম। মনে আছে, সেদিন অনুষ্ঠান শেষে বিখ্যাত পরিচালক জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে পুরোনো দিনের কথা বলতে বলতে পথ হেঁটে এসেছিলাম চৌরঙ্গী পর্যন্ত। উদ্দেশ্য ছিল একটা ট্যাক্সী ধরা। ঐ দিনই কথা প্রসঙ্গে জ্যোতিষবাবুর কাছে শুনলাম, বাবুলিয়া হাউসের বিনোদগোপাল মুখোপাধ্যায় পরলোক গমন করেছেন কাশীধামে। শুনে মনটা খারাপ হলো।

কিন্তু তবু তো জীবন থেমে যায় না। এক-জীবনে কতো পরিচিত মানুষকে চোখের সামনে দিয়ে চলে যেতে দেখলাম। কী হবে, এসব কথা ভেবে। আজ আমি আছি, একদিন আমিও থাকবো না—এর চেয়ে সত্যি আর কিছু নেই।

অবসর চেয়েছিলাম। পেয়েছি। আর সেই উচ্চগ্রামে বাঁধা জীবন নয়—এখন পুরোনো দিনের স্মৃতি নিয়ে এগিয়ে চলা।

আমার অভিনীত চিত্রের মধ্যে 'নীলাচলে মহাপ্রভু' শেষ ছবি। এরপর আর কোন ছবিতে অভিনয় করিনি। সংকল্প করেছিলাম, আর নতুন করে কোন ছবিতে অভিনয় করবো না। নীলাচলে মহাপ্রভু মুক্তিলাভ করলো ২৮ জুন।

জীবনে প্রথম ছবি বলে চিহ্নিত হয় 'আছ্‌সোল অব এ স্লেভ'। আর শেষ ছবি 'নীলাচলে মহাপ্রভু'।

এবারে পুরোপুরি মন দিয়েছি আকাদেমির কাজে। আকাদেমি নিয়ে যতো চিন্তা। ভাবি, যদি কিছু ছাত্রকে তৈরি করে যেতে পারি, যদি কালে আগামী দিনের নাট্যমঞ্চের কিছু কাজ হয়। অথচ পড়ানোর পথে নানা বাধা। না আছে তেমন পাঠক্রম, না আছে পাঠ্যপুস্তক। এ-ব্যাপারে অনেক বই ঘাটাঘাটি করতে হচ্ছে। দেশ-বিদেশের নানা ধরনের বই। মনে আছে, একদিন একটা বই পড়ছিলাম, বইটার নাম বোধহয় 'থিয়েটার অব দি ইস্ট'। বইটাতে অনেক তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে। তারমধ্যে এক জায়গায় দেখলাম, বাংলা দেশের থিয়েটার সম্পর্কে মন্তব্য। অবাস্তব, আর বিসদৃশ মনে হলো। গিরিশচন্দ্র সম্পর্কে অনেকখানি বলা হয়েছে, শিশিরবাবুর সম্পর্কে। আমার নামেও বেশ কয়েকটি ছত্র রয়েছে। আর অভিনেত্রীর কথা। দুটি নাটকের কথাও বলা হয়েছে, একটি শ্যামলী অপরটি রামপ্রসাদ।

বইখানি পড়ার পর মনে হয়, এ ধরনের বই পড়ে বাংলা দেশের নাট্যমঞ্চ সম্পর্কে বিদেশীদের কী ধারণা হবে না-জানি।

যাইহোক, এই রকম ধরনের অজস্র বই আমাকে পড়তে হচ্ছিল আকাদেমির জন্যে।

এমনি করে দিনগুলো চলছে। নতুন জীবন, নতুন পরিবেশ। আকাদেমির জীবন সত্যি আমার মনে নতুন করে সৃষ্টির উন্মাদনা এনে দিয়েছে।

তবুও এক-একবার পিছন ফিরে চাই। এই তো সেদিন আমি মঞ্চের পাদ-প্রদীপের আলোর দাঁড়িয়ে অভিনয় করেছি, এই তো সেদিন নিজের রূপটাই বদলে দিয়েছি বিচিত্র রূপসজ্জায়। আর আজ আমি কতো স্বাভাবিক। মুখে কোন রঙের প্রলেপ নেই, পোশাকের সে রাজকীয় আড়ম্বর নেই, নেই আমার সামনে নানা-রঙের আলোর ইশারা, নেই সেই বিমুগ্ধ দর্শকের ভিড়।

এখন আমার পরিচয় আমি শিক্ষক, আমি ছাত্র পড়াই। রবীন্দ্রভারতীর সেই ক্লাশরুমে শিক্ষকের ভূমিকায় আমি, আর সামনে কয়েকজন ছাত্র। যারা নিবিষ্টমনে শোনে আমার কথা। আর আমি যাদের মুখের দিকে চেয়ে ভাবি, এরা আমার ছাত্র। এরা বড়ো হোক, এদের মধ্যেই আমি আমার ভাবীকালকে খুঁজে পাবো।

এরই মধ্যে একদিন এলো। সেদিন আমার জীবনের স্মরণীয় দিন।

মনে আছে একদিন অভিনেত্রী সংঘের সভায় আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল জহর গাঙ্গুলী ও আরো অনেকের সঙ্গে। জহরবাবু আমাকে বলেছিলেন, দাদা—এ কী রকম হলো, একেবারে নিঃশব্দে অভিনয় ছেড়ে দিলেন?

বলেছিলাম, আর পারি না। তাছাড়া আমি তো নিঃশব্দেই অভিনয় জগতে এসেছিলাম, আবার নিঃশব্দেই মঞ্চ থেকেই প্রস্থান করলাম।

জহরবাবু বলেছিলেন, সে হবে না। হতে দেব না। অন্তত একদিন আমাদের সঙ্গে অভিনয় করুন—আপনার কাছে না হোক, আমাদের কাছে সেইদিনটার অনেক দাম।

জহরবাবুর মুখেরদিকে চেয়েছিলাম।

তারপর আরো পরিচিত জনের কাছ থেকে একই অনুরোধ এলো। অভিনেত্রী সরযূবালাও সেই একই অনুরোধ করলো।

এবারে আর 'না' করতে পারিনি। অনেক ভাবনাচিন্তার শেষে বলেছিলাম, বেশ—তবে তাই হোক। একটা দিন তোমাদের সঙ্গে অভিনয় করি।

এরপর কথা হলো নাটক নিয়ে। কথা হলো প্রথমে মিশরকুমারী নিয়ে। কিন্তু জহর আর সরযূকে বললাম, দ্যাখো—মিশরকুমারীতে আবনের অভিনয় করার ক্ষমতা আর আমার নেই। তার চেয়ে শাজাহান করতে পারো—চেষ্টা করলে শাজাহান হয়তো করতে পারবো।

জহর গাংগুলী, সরযূবালা, ওরা তাতেই রাজী হলো। জহর বললে, আপনার যে নাটক ইচ্ছে তাই হবে।

—কিন্তু একটা কথা, আমি কিন্তু তোমাদের মুখ থেকে শুনতে চাই, যে আর আমাকে অভিনয়ের জন্যে অনুরোধ করবে না।

তাই হবে।

শুধু জহর নয়, সরযূও কথা দিলে যে ওরা আমাকে আর অনুরোধ করবে না অভিনয়ের জন্যে।

ঠিক হলো শাজাহানই হবে। আর একথাও ঘোষণা করা হবে এই আমার শেষ অভিনয়।

শেষ অভিনয়!

কথাটা ভাবতেই বিস্মিত হলাম। এরই মধ্যে শেষ!

কিন্তু আজ এই মুহূর্তে এর চেয়ে সত্যি কিছু নেই। সত্যি আজ আমি ক্লান্ত, অবসন্ন। সত্যিই আমি অমিত-যৌবনের দিন পেরিয়ে এসেছি। পেরিয়ে এসেছি জীবনের সূর্য-করা পথ। এবারে অপরাহ্নের পালা। সায়াহ্নের সূর্যের জন্যে প্রতীক্ষা করা।

শেষ অভিনয়ের দিন এগিয়ে এলো। এগারোই সেপ্টেম্বর।

সেদিন দিন শুরু হলো এক বিচিত্র অবসাদের মধ্যে। মনে হলো, অশক্ত আমি। বয়সের ভারে নুয়ে পড়া একটি মানুষ। আমি কি পারবো আজ মঞ্চের পাদ-প্রদীপের আলোয় দাঁড়িয়ে বৃদ্ধ শাজাহানের চরিত্র-কে রূপ দিতে।

যে বিশ্বাস নিয়ে জীবন আরম্ভ করেছিলাম, আজও সেই বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করলাম।

যথাসময়ে মিনার্ভায় এসে পৌঁছেছি। মঞ্চের ভিতরে বাইরে তখন অগণিত নর-নারীর ভিড়। বহু দর্শক টিকিট না পেয়ে হতাশ হয়েছে।

আমি তো জানি, টিকিটের জন্যে আজ আমাকেই কতোজনকে সুপারিশ করতে হয়েছে। যাঁরা ভালোবাসেন আমার অভিনয় যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে আমার অভিনয় দেখে আসছেন—তাঁরা যখন আমার কাছে আমার অভিনয় দেখার জন্যে টিকিট চাইতে এসেছেন, তখন আমি কি সুপারিশ না করে পারি। কিন্তু তবুও কি সবার অনুরোধ রাখতে পেরেছি! আর তা সম্ভবও নয়।

যাই হোক, মিনার্ভায় আসতে দেখলাম, মঞ্চের বাইরে অজস্র মানুষ ভিড় করে আছে। আর ভিড় সামলাতে পুলিশদলও বেষ্টনী সৃষ্টি করে রেখেছে।

নিঃশব্দে সাজঘরে এসেছি। বসেছি দর্পণের সামনে। দেখছি আপন প্রতিবিম্ব।

সেই আমি—আমার নাম অহীন্দ্র চৌধুরী। পরিচয়—অভিনেতা।

কতোদিন হয়ে গেল, মঞ্চে এসেছিলাম; দেখতে দেখতে কতো দিন পেরিয়ে গেল। বছর, যুগ—দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে কতো পরিবর্তন! কিন্তু তার মধ্যে অভিজ্ঞতার জীবন যেন অপরিবর্তিত। সেদিনেও যার পরিচয় ছিল অভিনেতা, আজও সে সেই পরিচয় নিয়ে মিনার্ভার সাজঘরে।

সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপিত হয়েছে আজকের অভিনয়ের কথা। কিন্তু একটি বাড়তি কথা যুক্ত হয়েছে সেখানে। আজ আমার শেষ অভিনয়। এর পর পরিচিত অভিনেতাকে আর মঞ্চে দেখা যাবে না।

সাজ-ঘরে বসে আছি, একটু যেন উন্মনা।

শাজাহানের রূপসজ্জায় আমি। দর্পণের সামনে দাঁড়ালাম। এখন আমি আর অহীন্দ্র চৌধুরী নামে চিহ্নিত একজন মানুষ নই—আমি ভারত-সম্রাট শাজাহান।

এই মুহূর্তে নিজেকে কেমন দুর্বল মনে হলো। মনে হয়, হয়তো আজ আমি হেরে যাবো।

কিন্তু না।

সোজা হয়ে দাঁড়ালাম। মনটাকে ফিরিয়ে আনলাম। বিশ্বাসের মধ্যে। দৃঢ় আত্ম-বিশ্বাস। যে বিশ্বাস নিয়ে একদিন মঞ্চের পাদ-প্রদীপের আলোয় এসে দাঁড়িয়ে ছিলাম।

সময় হয়ে এলো।

মঞ্চের পর্দা উঠলো। সম্রাট শাজাহান শায়িত। দারা পদপ্রান্তে দণ্ডায়মান।

তাই তো এ-বড়ো দুঃসংবাদ দারা' নাটকের প্রথম সংলাপ উচ্চারণ করলো সম্রাট শাজাহান। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালাম।

না—শাজাহান অশক্ত নয়, এখনো মনে তার অমিত শক্তি।

শুরু থেকে শেষ। জানি না, কখন শেষ হলো। জানি না, কখন যবনিকা পড়লো।

যবনিকা পড়লো আমার অভিনয়-জীবনের। শাজাহানের রূপসজ্জা থেকে আসল মানুষটা বেরিয়ে এলো। যার মুখের ওপর এখনো রংয়ের অস্পষ্ট রেখা।

আজ অভিনয়ের আগে একটি সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠান হয়েছিল। যে অনুষ্ঠানে পৌরো-হিত্য করেন মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়। এ-ছাড়া বিমলচন্দ্র সিংহ প্রমুখ আরো কয়েকজন উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে সেদিন একজন নাট্যোৎসাহী বক্তা আমার কথা বলতে, বলেছিলেন—এবারে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। নটসূর্য বিদায় নিচ্ছেন মঞ্চ থেকে। ডাক্তার রায় বলেছিলেন, সূর্য কখনো অস্ত যায় না। পৃথিবীর এক গোলার্ধে তার অস্ত, অন্য গোলার্ধে তার উদয়। নট-সূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী অভিনয়-জীবন থেকে বিদায় নিলেন, কিন্তু আর এক ক্ষেত্রে পদ-সঞ্চার করছেন তিনি। এখন তিনি নাট্যজগতের আচার্য—আকাদেমি তাঁর ক্ষেত্র।

সাজঘরে দাঁড়িয়ে আরো ভাবছিলাম। ভাবছিলাম, অগণিত দর্শকের কথা। যাঁরা আমার শেষ অভিনয়ের সাক্ষী হয়ে রইলেন।

সাজঘরের আয়নায় শেষবারের মতো নিজেকে দেখলাম। বড় ভালো লাগলো। নিজেকে এমন করে কোনদিন তো দেখিনি।

তারপর হঠাৎ যেন নিজেকে ফিরে পেলাম। তাড়াতাড়ি সরে এলাম আয়নার সামনে থেকে।

এবারে শেষ বিদায়ের মুহূর্ত। সহ-অভিনেতা, মঞ্চের কলা-কুশলী—সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মঞ্চের বাইরে এলাম।

বাইরে তখন অগণিত জনতার ভিড়। অভিনেতা অহীন্দ্র চৌধুরীকে বিদায়-অভিনন্দন জানাতে এসেছে।

রঙ্গালয়ের বাইরের উজ্জ্বল আলো-গুলো তখন নিবে গেছে। এ-দিকটা কেমন যেন অন্ধকার। নীরবে বন্ধ-চালিতের মতো আসছি বাইরে। দু'ধারে অগণিত নর-নারী দাঁড়িয়ে আছে। আমি এগিয়ে যেতে হঠাৎ তারা হাততালি দিয়ে উঠলো। হাত জোড় করে তাদের অভিনন্দন গ্রহণ করলাম।

রাস্তার কাছে এসে দেখলাম, বিপরীত ফুটপাথে আধো-অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে অসংখ্য দর্শক। স্পষ্ট দেখছি না, তবুও স্পষ্ট। ওরা দাঁড়িয়ে আছে আমার জন্যে। হয়তো শেষবারের মতো অভি-নেতা-কে দেখতে চায়।

হাত জোড় করে নমস্কার জানাই দর্শকদের উদ্দেশ্যে। কামনা করি আশী-র্বাদ। যেন আমি জীবনের বাকি দিন-গুলো শান্তিতে কাটাতে পারি। ঈপ্সিত শান্তি।

নীরবে গাড়ীতে এসে উঠলাম। এখনো আমার দৃষ্টিটা অপেক্ষমান জনতাকে স্পর্শ করছে।

দেখতে দেখতে অপসৃয়মান ছায়ার মতো সব কিছু সরে গেল।

গাড়ী বিডন স্ট্রীট পেরিয়ে চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ-এ পড়লো।

আমার মনের মধ্যে তখন একটি সুরই জেগে চলেছে। মঞ্চ থেকে বিদায়ের সুর।

জীবনে চেয়েছিলাম, অভিনেতা হবো। হয়েছি। অভিনয় করেছি কতো না চরিত্রে। তার মধ্যে শাজাহান যেন আমার সব কিছু।

শাজাহান আমাকে অনেক দিয়েছে। মানুষ যা চায়—সব। খ্যাতি, প্রতিপত্তি, অর্থ—সব কিছুই পেয়েছি আমি। কিন্তু আজ এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে, আমি যেন কিছুই করতে পারিনি। চেষ্টা করলে হয়তো আরো সার্থক রূপ দিতে পারতাম শাজাহানের। শুধু শাজাহান কেন—হয়তো আমার অভিনীত চরিত্রগুলির জন্যে অভি-নেতা হিসাবে আরো কিছু করতে পারতাম যা আমি পারিনি।

চিন্তাটা আবার শাজাহানে ফিরে এলো। আমার জীবন-মন যেন মিশে আছে ওই ঐতিহাসিক চরিত্রটির সঙ্গে।

শাজাহান আমাকে এতো দিয়েছে, কিন্তু আমি কি দিলাম।

কখন যেন চোখের জল, বিন্দু হয়ে ঝরে পড়লো।

শাজাহানের জন্যে এই দু' ফোঁটা চোখের জল দিলাম। আর অস্ফুটে কণ্ঠে উচ্চারণ করলাম, 'গুড নাইট সুইট প্রিন্স'।

তবু একবার পিছনে ফিরে চাইলাম। যে পথ পিছনে রেখে এলাম।

কিন্তু পরমুহূর্তে দৃষ্টি প্রসারিত করি সম্মুখের পথে। সামনে ছড়িয়ে আছে চৌরঙ্গীর আলোক-সরণি।

যে আলোক সরণি ধরে আমি বিদায় নিয়ে চলেছি, সেই পথ ধরে আসবে আগামী কালের পথিক অভিনেতা।

(সমাপ্ত)

প্রেম প্রিয়ে

মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়

আমার স্বামী দুপুরবেলা খাবার পর শিশি থেকে ভাজা মশলা বার করে চিবোতে চিবোতে কাজে ফিরে গেলেন। কিন্তু আমি অন্য রোজকার মত খবরের কাগজটা নিয়ে বিছানায় লম্বা হতে পারলাম না। বেশি নার্ভাস হলে আমার পেটটা আবার অল্প একটু ব্যথা করে। ঘাবড়ে গেলে কোন কাজে মন বসাতেও পারি না। তবু জোর করে কাগজটার ওপর চোখ বুলিয়ে গেলাম, কারণ মিসেস মিত্র বলেন খবরের কাগজ অনেকটা ধারাবাহিক উপন্যাসের মত। এক-দিন বাদ পড়লেই সব খবরের খেই হারিয়ে যাবে। হয়ও আমার তাই। দুদিন ঝি কামাই করেছে কি খোকার সর্দিজ্বর হয়েছে ওমনি তারপর আর কাগজ পড়ে কিছুই বুঝতে পারি না। ইতিমধ্যে কোন কোন দলে জোট বেঁধে কোথায় সরকার গঠন করে ফেললো, কোন রাজ্যে কি কারণে হরতাল শুরু হবে, সমস্ত এতোদিনে গুলিয়ে গেছে। বুঝতে বুঝতে আবার সাত দিনের ধাক্কা। তাদ্দিনে হয়তো আবার পিশশাশুড়ীর নাতির অন্নপ্রাশনের দিন এসে গেছে— সেখানে গিয়ে দুদিন থেকে আসতে হবে। কি করে যে বিশ্বশুদ্ধ লোক খবরের কাগজের খুঁটিনাটি নখদর্পণে রাখে তা বোঝা আমার সাধ্যের বাইরে।

আজকে কিন্তু খালি কাগজের ওপর চোখই বুলিয়ে যাচ্ছি। একটা কথাও মাথায় ঢুকছে না। মনের মধ্যে খালি ওই এক চিন্তা। উনি ওরকম একটা কথা বললেন কেন? আমের আঁটি চুষতে চুষতে কথাটা তো উনি বলেই খালাস। এর ফলে আমার কি অবস্থা সেটা দেখবার ওঁর সময় কোথায়! এই যদি আমি ইংরাজি সাহিত্যের কোন চরিত্র হতাম, তাহলে আমার প্রত্যেকটি ভ্রূভঙ্গী ওঁর খাতায় নোট করা হয়ে যেত। আমার মন মেজাজের সব বর্ণনা সাইক্লোস্টাইল করা কাগজে ছেপে এতদিনে ছাত্রদের হাতে হাতে ঘুরতো। সেরকম তো আর - জগৎ নয়—সেক্স্‌পীয়ারের নায়িকা না হয়ে হচ্ছি নেহাতই রক্ত-মাংসের মানুষ, তাও আবার নিতান্তই নিজের বৌ, কাজেই আজকের সমস্যাটা আমায় নিজেই সমাধান করতে হবে। বড়জোর পাশের বাড়ি গিন্নি একটু, মিসেস মিত্রের সাহায্য চাওয়া যেতে পারে।

অস্ট্রেলিয়ানরা কি খায় কে জানে। রান্না করতে তো আমি গররাজি নই—এক ঘন্টার নোটিসেও দশটা লোককে রেঁধে-বেড়ে খাইয়ে দেবো। কিন্তু এই সাহেব-টাহেবদের নেমন্তন্ন করেই উনি আমায় বিপদে ফেলেন। আয়ারল্যান্ডে শুনেছি খুব আলু খায়, ইংলন্ডের লোকেরা সেদ্ধ-পক্ক খায় সেটুকু বুঝি আজকাল। ওঁকে জিজ্ঞেস করলে রেগে উঠে বলবেন তুমি যে কখনো বি-এ পাশ করেছিলে তা কেউ বিশ্বাস করবে না। কিন্তু বি-এ পাশের কোনো বইয়ে অস্ট্রেলিয়ানরা ভাত খায়, না পাঁউরুটি, মশলা খায় না আলুনি, এসব বুঝতে লেখা নেই সে কথা এ ভদ্রলোককে কে বোঝাবে। প্রতিবারেই এক কান্ড হয় এ নিয়ে প্রতিবারেই ভয়ে সিঁটিয়ে থাকি। একটা ফাঁড়া পার হতে একটু নিঃশ্বাস নিতে না নিতেই আবার একটা। যেমন আজ শাকভাজা দিয়ে ভাত মাখতে মাখতে ভুলে যাওয়া কথা হঠাৎ মনে পড়ার মত করে বললেন, 'ও, প্রফেসর সীমন্সদের আজ রাত্রে খেতে বলেছি। বলেছিলাম না অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি থেকে পাঁচজন এসেছিল। আটটা নাগাদ ব্যবস্থা করে রেখো।' ব্যস হয়ে গেল দুপুরের ঘুম, হয়ে গেল খবরের কাগজ পড়া, আলিস্যি করা। কিন্তু তারপর খাওয়া শেষ হবার মুখে যে কথাটা বললেন তাতে যেন আরো ভাবনা বেড়ে গেল। কেন বললেন বুঝতে পারছি না।

ভাবনা কি একটা। রান্না না হয় হোলো, তাঁরা এলে তাঁদের বসাতে হবে,

দুটো কথা বলতে হবে। মিসেস মিত্র বললেন, দু'য় লোকের সংগে কথা বলতে ভয় পাও কেন—এই আমার সামনে যেমনি ঘরকন্না সুখ-দুঃখের কথা বললে তেমনি বলে যাবে আজকে কি রকম গরম পড়েছে, ঝড়-বৃষ্টির জন্য দিল্লীর ট্রেন কাল সাত ঘণ্টা লেট ছিল, কাগজে লেখেছে ইটালিয়ান এক মহিলার নাকি সাতাশটি ছেলেমেয়ে হয়েছে—এমনি করে যা মনে হবে বলে যাবে। একবার শুরু করলে দেখবে আর ভাবতে হচ্ছে না, বেশ কথার পিঠে কথা জুগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কার্যকালে আমার একটা কথাও মনে পড়ে না। এই গত শনিবার বরং তাও একটু কথাবার্তা বলতে পেরেছিলাম, কিন্তু সেও সবার সংগে নয়। সেদিন এসেছিলেন তিনজন:—একজন বুড়োমতো সাহেব, তিনিই বোধ হয় আসল লোক। কী যেন নামটা বলেছিল, প্রফেসার ম্যাক না কিছু একটা। সঙ্গে একটি মাঝবয়সী আমেরিকান মহিলা এসেছিলেন। প্রথমে ভেবেছিলাম ওঁর স্ত্রী বুঝি। নাম শুনে বুঝলাম তিনি আলাদা—তিনিও বুঝি প্রফেসর একজন। আর অন্যটি কমবয়সী। এক গাদা চুলদাড়ি দিয়ে মুখখানা জঙ্গল করে রেখেছে, কিন্তু চোখ দুটো দেখলেই বোঝা যায় আসলে ছেলেমানুষ। তার নামটা মনে আছে। সে ছেলেটি নাকি কবি। রেডিওতে আর টেলিভিশনে কবিতা পড়ে শোনায়। তাছাড়া কি কাগজে কাজ করে। ও নিজেই এসব গল্প বললো। এই প্রথম একজন বিদেশী লোকের সব কথা বেশ বুঝতে পারলাম। উনি নিশ্চয় লক্ষ্য করে খুশি হয়ে থাকবেন ও ছেলেটির কথার জবাবে আমি কি রকম পরিষ্কার জবাব দিতে পারছিলাম। বললেন না অবশ্য কিছু, ভালো কথা বলা ওঁর স্বভাবই নয়। দেখছি তো দু বছর ধরে।

উনি বরাবর বলেন, বি-এ টাতো পাশ করেছিলে—ইংরিজি বলতে পারো না একটু গুছিয়ে? বিয়ের আগে কোনদিন বলার দরকার হয়নি অবশ্য—তবু, চেষ্টা করলে দুচার কথা যে বলতে পারি না তা নয়। মিসেস মিত্রও তালিম দিয়েছেন খানিকটা। কিন্তু উনি যে সব বাঘা সাহেবদের নেমন্তন্ন করে আনেন তাদের কথা বোঝা আমার বি-এ পাশ বিদ্যার কর্ম নয়। সেই প্রফেসর ম্যাক কি যেন—তিনি আলাপ হতে না হতে থাবার মত মস্ত হাত বাড়িয়ে দিলেন, দেখেই ভয় করে। তবে এসব শিখে গেছি আজকাল। ঠান্ডা, গাছের গুঁড়ির মত হাতের মোটা ভদ্রলোকের—ভদ্রমহিলার হাতটা মখমলের উলটোদিকের মত খসখসে। ডন আর্নল্ড, দাড়িওয়ালা কবি, তার হাতটা একটু গরম, ভিজে ভিজে। এমনকি মিসেস মিত্রর শিক্ষামত 'আপনাদের সঙ্গে আলাপ হয়ে খুশি হলাম' এটাও এক নিঃশ্বাসে বলে ফেললাম। তারপরই হোলো বিপদ। প্রফেসর হৈ হৈ করে অনেক কথা বলে গেলেন, তার একটা অক্ষরও বুঝলাম না। ভদ্রমহিলাও নাকীসুরে ইশারাও কিরাও করে কি কি বললেন। যতদূর মনে হোলো এঁরা আমার সম্বন্ধে ভালো ভালো কথাই বলছেন, ভদ্রতার কথা। আমিও ভদ্রতার হাসি মুখে সোজা দাঁড়িয়ে রইলাম। বোকার মত দাঁড়িয়ে রইলাম বললেই ঠিক হয়। শুধু ডন আর্নল্ড কিছু বললো না। একটু দূরে থেকে চুপ করে আমাকে দেখতে লাগলো। কী কালো চোখ। সাহেবদের ওই রকম কালো চুল বা চোখ কখনো দেখিনি। অবশ্য সাহেব দেখেছিই বা কটা বিয়ের আগে।

উনি বিলেত-টিলেতে থেকেছেন অনেক কাল। এদের সঙ্গে যা গল্প করেন, তার অর্ধেকই এমন লোকেদের কথা যাদের আমি চিনি না। অমুকে ওই বইটা লিখলো, তমুকে লেকচার দিতে ইওরোপ যাচ্ছে হেন তেন। এমনিতে ওঁর ইংরিজি আমি বেশ বুঝতে পারি—কিন্তু বিদেশী লোক-টোক এলে ওঁর ইংরিজিটাও যেন কেমন বদলে যায়। পড়াশুনোর গল্পও হোলো সেদিন অনেক। আগের দিনের মীটিংএ কে নাকি একটা কথা ভুল বলেছে তার আলোচনা। তার মাঝখানে আমি কখনই বা বলবো কি গরম পড়েছে। ট্রেন লেট হবার খবর বা ইটালিয়ান মহিলার ছেলেপিলের কথা বললেই বা কেমন শোনাবে। তাই চুপচাপ উঠে একে একে ঠান্ডা করা টোমাটোর রস এগিয়ে দিতে লাগলাম আর একটু করে হাসলাম। অনেকে বলে হাসলে আমাকে ভালো দেখায়। উনিও বিয়ের পর প্রথম প্রথম গালের টোল নিয়ে অনেক কিছু বলতেন। অবশ্য এখন ভালো দেখাবার জন্য হাসলাম তা নয়। কারু সংগে কথা বলতে পারি না, বুঝতেও পারি না, কিছু তো একটা করতে হবে।

ডন আর্নল্ড ট্রে থেকে গেলাসটা ওঠালো। অনেকক্ষণ ধরে, সমানে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে। ঠোঁটের কোণে এমন অল্প একটু [illegible]লো যেন আমার সংগে ওর কোন গোপন [illegible] আছে। 'আপনার গ্লাসটা কোথায়?' জিজ্ঞেস করলো নীচু আর ভারী গলায়। আমি গ্লাস গেলাসটা তুলে নিয়ে ট্রেটা রেখে সাবধানে ভদ্রমহিলার পাশে গিয়ে বসলাম। এবার অন্তত গ্লাসটা নাড়াচাড়া করে খানিকটা সময় কাটবে। ঘরের একদিকে আমার স্বামী আর প্রফেসার ম্যাক ঘনিষ্ঠ হয়ে বসেছেন। অন্যদিকের লম্বা সোফায় এক হাতে সিগারেট অন্য হাতে গেলাস নিয়ে ওই মহিলা—ধরে নিচ্ছি তাঁর নাম মিসেস বীচার। (আসলে অবশ্য মিসেস বীচার ওঁর নাম নয় এখনকার এক বিদেশী কাউন্সিলের প্রতিষ্ঠানে এক ভদ্রলোক এসেছিলেন একবার, তাঁর নাম)। মিসেস বীচারের পাশে জড়সড় হয়ে আমি। ডন আর্নল্ড ঘরের তৃতীয় দিকে একলা একটা চেয়ারে বসেছিল। হঠাৎ উঠে এসে আমার পাশে একটা মোড়া টেনে বসলো। মিসেস বীচার ভদ্রলোকদের সঙ্গে একটা আলোচনায় ব্যস্ত ছিলেন—ডন নীচু গলায় আমার সংগে আলাপ শুরু করলো। ভারতবর্ষে কি কি দেখেছে, কতদিন থাকবে, দেশে ও কি কাজ করে এই সব গল্প। বললো ভারতবর্ষের মেয়েদের মত চোখ ও কোথাও দেখেনি। আর কী আশ্চর্য এই প্রথমবার কোন সাহেবের কথা বুঝতে আমার অসুবিধে হোলো না, এমনকি বেশি না ভাবতে দু-একটা কথার জবাবও দিলাম ঠিকঠাক। আড় চোখে আমার স্বামীর দিকে চেয়ে দেখলাম উনি লক্ষ্য করছেন কিনা। আমি সহজভাবে গল্প করছি দেখলে খুশি হবেন। দেওয়ালে খোকার ছবি দেখে ডন জিজ্ঞেস করলো কত বয়স। আট মাস শুনে খুব খুশি হয়ে উঠলো। ওরও নাকি একটি আট মাসের মেয়ে আছে। পকেট থেকে মানিব্যাগ বার করে ছবি দেখালো বৌ আর মেয়ের। জিজ্ঞেস করলো বাচ্চা কি ঘুমোচ্ছে? আহা, যেন নিজের বাচ্চাটির জন্য বড্ড মন কেমন করছে মনে হোলো। তাই বললাম দেখবেন আসুন না। ওকে খোকার ঘরে নিয়ে গেলাম।

সেদিন কি কি রান্না করেছিলাম মনে করে দেখি। রান্নাটা কি সেদিন সুবিধের হয়নি? মাংসটা বোধ হয় শক্ত ছিল—তা না হলে আজ উনি অমন কথা বললেন কেন? আর তো কিছু ভুলচুক হয়েছিল বলে মনে পড়ে না। শেষকালে জনে জনে শুভরাত্রি জানিয়েছিলাম—ওঁরা আসাতে আমার বড় আনন্দ হয়েছে তাও নিয়মমাফিক বলে-ছিলাম। একটা অবশ্য ভুল হয়েছিল এখন মনে পড়ছে। খেয়েদেয়ে উঠে ওরা কফি খেলেন। কফিটা ওঁদের সামনে না ঢেলে রান্নাঘর থেকে বানিয়ে নিয়ে এসেছিলাম। তারপর শুনি ওরা নাকি কফিতে দুধ খায় না। তখন আবার সেই কফি ফেলে কালো কালো কফি বানিয়ে আনি। একটু দেরি হয়েছিল বানাতে। সেই কথা হয়তো উনি মনে রেখেছেন। আরো দেরি হোতো যদি না ডন আর্নল্ড রান্নাঘরে ঢুকে গিয়ে আমাকে সাহায্য করতো। আমি বারণ করেছিলাম প্রথমে। অতিথিকে দিয়ে কি কেউ কাজ করায়। কিন্তু ও বললো ওদের দেশে সবাই এসব কাজ করে। ওর বৌ নাকি রান্না করে আর ও রোজ বাসন ধোয়। ওই দাঁড়িগোঁফ-ওয়ালা ইয়া জোয়ান ছেলে কাপ ধুচ্ছে সে এক মজাদার দৃশ্য। আমি তো হেসে বাঁচি না। হাসির শব্দ শুনে উনি উঠে এলেন। ততক্ষণে কফি করে ফেলেছি। উনি বললেন, আমি নাকি চটপট গুছিয়ে কাজকর্ম করতে পারি না। সেদিন ওরকম গোছানো কাজ দেখে অবাক হয়ে গিয়ে-ছিলেন নিশ্চয়ই। ডন আর্নল্ড যে কাপ ধুয়ে দিয়েছিল সেটা উনি দেখেননি।

খাওয়া-দাওয়া সবই ঠিকঠাক হোলো—কথাবার্তাও যথাসাধ্য বললাম, তাহলে আজ উনি ওরকম বললেন কেন কিছুতেই বুঝতে পারছি না। আজ খেতে খেতে বললেন, দেখো যেন আবার সেদিনের মত কাণ্ড কোরো না আজ।' বলেই আবার চুপ। কিসের কাণ্ড কি বৃত্তান্ত সেটা তো মানুষে একটু বুঝিয়ে বলে। তা না শুধু শুধু আমাকে ভাবালো। কাণ্ড কোথায়, আমি তো ওঁর পছন্দমত সবকটা কাজই করেছি সেদিন। ডন আর্নল্ডের সংগে খোকার ঘরে গিয়ে কতক্ষণ দিব্যি আলাপ চালিয়ে গেলাম। ও আবার ব্যাগ থেকে ওর

নিজের কবিতার বই একটা বই করে দিল। নিজে হাতে আমার নাম লিখে দিল। হাতের লেখাটা কি রকম সুন্দর বাঁকিয়ে বেঁকানো। ধন্যবাদ জানিয়েছি তাকে, সেদিক দিয়ে কোন ত্রুটি নেই। উনি বলেন, অতিথিরা যে ভাষা বোঝে না সেই ভাষায় তাদের সামনে কোন কথা বলতে নেই। সেইজন্যে এই সব লোকজন এলে উনি আমার সঙ্গেও ইংরিজি বলেন। আমি কখনো ওঁর সঙ্গে ইংরিজি বলতে পারিনি, বড় লজ্জা করতো। সেদিন কিন্তু আমি তাও বলেছি। ভিনিগারের শিশির ছিপিটা এমন এঁটে গিয়েছিল কিছুতেই খুলতে পারছিলাম না। তখন ওঁকে এসে ইংরিজিতে বললাম খুলে দিতে। তাতেও ওঁর খুশি হবার কথা। এই দু' বছরে আমি কত কি শিখলাম নিজেই অবাক হই।

ছিপিটা অবশ্য সত্যিই বেজায় এঁটেছিল। উনিও খুলতে পারলেন না। শেষপর্যন্ত ভন আর্নিম খুললেন। ওদের সব বাড়ির মাংস-খাওয়া স্বাস্থ্য তো। মিসেস বীচার আমার তৈরি খাবারের কত প্রশংসা করলেন। প্রফেসার ম্যাক মাছের ফ্রাইটা দুবার চেয়ে নিলেন। তবু যে কোথায় গণ্ডগোল হোলো বুঝতে পারছি না। হয়েছে নিশ্চয় একটা কিছু, তা না হলে ওঁর মত মানুষ একথা বলে? ভাবতে গেলে কত কি ছোটখাটো দোষ মনে পড়ে যাচ্ছে। উনি কোনটার কথা বললেন কে জানে। অ্যাশট্রেগুলো ঠিক জায়গায় রাখিনি—ফলে মিসেস বীচারকে মুখ ফুটে অ্যাশট্রে চাইতে হোলো। বাথরুমে ধোপার-বাড়ির ইস্ত্রি-করা তোয়ালে রাখতে ভুলে গিয়েছিলাম। খাবার টেবিলের ফুলদানীটা খালিই পড়েছিল। কাঁটা-চামচগুলো সেদিন পালিশ করিনি। এর সবগুলোকেই কাণ্ড বলা যেতে পারে। এখন ভেবে লজ্জা করছে।

ভাবনার কোন শেষ নেই। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হোলো, খবরের কাগজটা পাট করে উঠলাম রান্নার জোগাড় করতে। বিছানাটা ঝাড়তে গিয়ে চোখে পড়লো ভন আর্নিমের কবিতার বইটা। কদিন থেকে মাথার বালিশের তলায় রেখেছি। কমলা রঙের সবুজ সুন্দর বইটা—নামটা বেশ মজার—'পোষা টিয়া ও অন্যান্য।' কখনো বইটা পড়ে দেখতে হবে। কিন্তু আজকে প্রথমে ছুরি-কাঁটাগুলো পালিশ করে ফেলি। বাথরুমে পরিষ্কার তোয়ালে দিই। যাতে উনি আজকের অতিথিসৎকারে কোনো দোষ না খুঁজে পান। আর একটু বিকেল হলে মিসেস মিত্র কাছে গিয়ে ইংরিজি কথাবার্তাগুলো একটু ঝালিয়ে আসতে হবে।

ক্রীড়া ও বিনোদন সংখ্যা ১৩৭৭

সাময়িক পত্রিকার জগতে অমৃতই সর্বপ্রথম এই ধরণের বিনোদন সংখ্যা প্রকাশ শুরু করে। তারপর প্রতি বছরই বড়দিনের সময় এই সংখ্যাটি প্রকাশ করা হচ্ছে। এবারও বেরোবে আগামী ২৫ ডিসেম্বর।

চলচ্চিত্র, নাট্যমঞ্চ, ফ্যাশান, খেলা-ধুলা, সঙ্গীত এবং অন্যান্য বিষয়।

গল্প

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্ডী মন্ডল এবং যশোদাজীবন ভট্টাচার্য।

চলচ্চিত্র, নাট্যমঞ্চ, ফ্যাশান এবং সঙ্গীত

সত্যজিৎ রায়, শম্ভু মিত্র, ঋত্বিককুমার ঘটক, চিদানন্দ দাশগুপ্ত, শান্তিগোপাল, অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, এন কে জি, পশুপতি চট্টোপাধ্যায়, নির্মল ধর, দিলীপ মৌলিক, দক্ষিণারঞ্জন বসু, ভবতোষ সাহা, সন্ধ্যা সেন।

ফেলে-আসা দিনের স্মৃতি আলেখ্য

নানা রঙয়ের দিনগুলি
কানন দেবী

বাঙলা চলচ্চিত্রের বিস্মৃত যুগের এক রমণীয় কাহিনী। অনেকের কাছে যা অজানা, নিজের জীবন থেকে তারই চলচ্চিত্র উদ্ধার করেছেন সেকালের জনপ্রিয় অভিনেত্রী।

বিশেষ আকর্ষণ
খেলাধুলা

পরবর্তী সংখ্যায় পূর্ণ বিবরণ দেখুন।

চাঁদের মাটিতে গাড়ী : আট চাকার যে গাড়ীটি চাঁদের মাটিতে চলেছে শিল্পীর তুলিতে তারই কাল্পনিক চিত্র। সরকারী রুশ নিউজ এজেন্সী তাস এই ছবি প্রচার করেছে। এই স্বয়ংক্রিয় গাড়ীটির নাম দেওয়া হয়েছে লুনোখোদ —১। লুনোখোদ শব্দের অর্থ চাঁদের গাড়ী। চাঁদে এই সর্বপ্রথম এই ধরনের যন্ত্র নামানো হয়েছে।

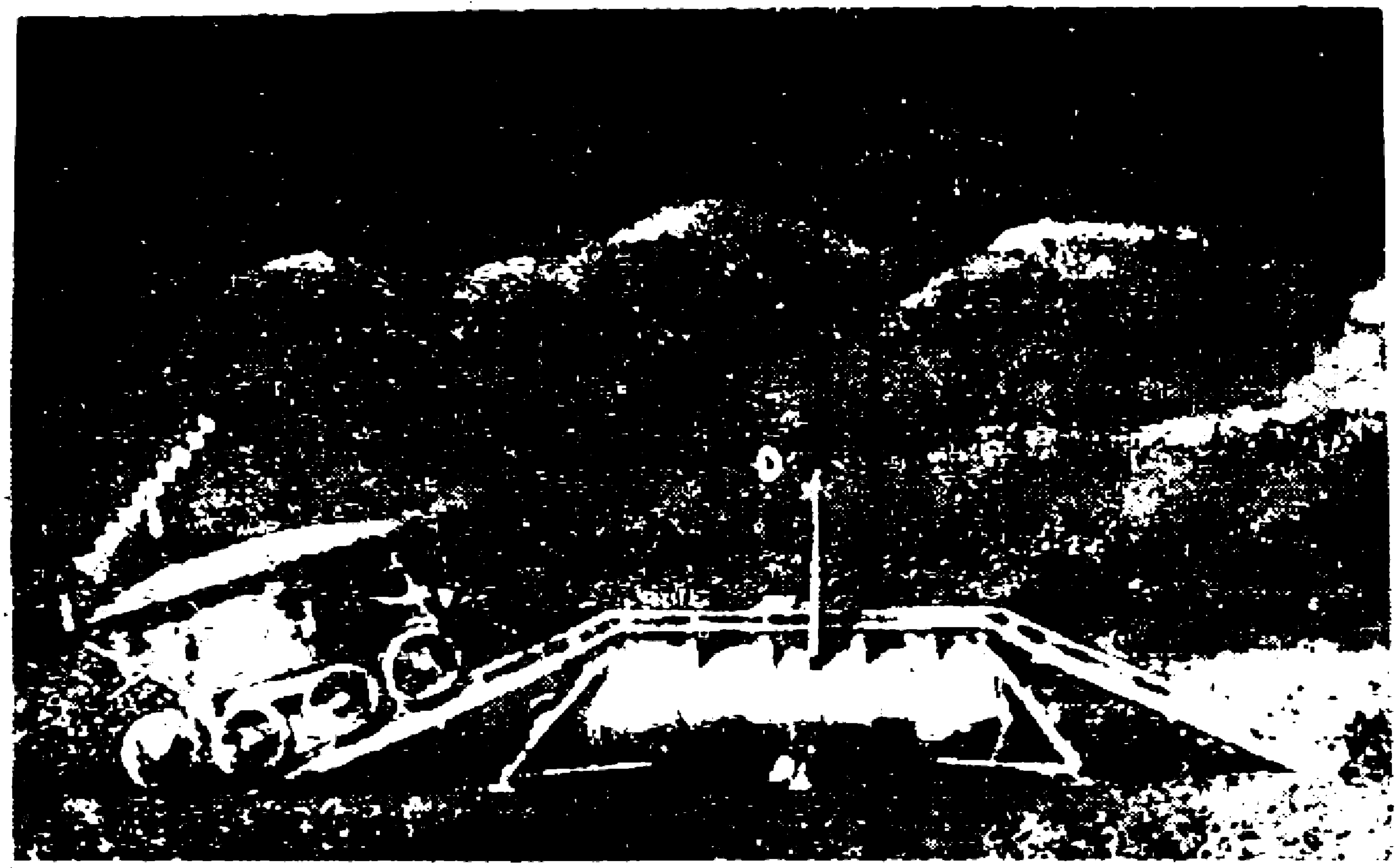

বিজ্ঞানের কথা

উপগ্রহের মাধ্যমে যোগাযোগ-ব্যবস্থা

দৈনিক কাগজে খবর বেরিয়েছে আগামী ফেব্রুয়ারী মাস থেকে ভারতে কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে সারা বিশ্বের সংগে যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হতে চলেছে। সকলেই জানেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ও সোভিয়েট ইউনিয়নে কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে যোগাযোগ-ব্যবস্থা অনেক দিন থেকেই চালু। এ-ব্যবস্থার সুবিধা এত বেশি যে, বিজ্ঞানীদের ধারণা আগামী কয়েক বছরের মধ্যে গোটা বিশ্ব এই ব্যবস্থার আওতায় এসে যাবে। ভারতও আসছে, তাতে অবাক হবার কিছু নেই।

উপগ্রহের মাধ্যমে যোগাযোগ-ব্যবস্থা চালু করার সবচেয়ে বড় সুবিধে কী সে সম্পর্কে কয়েকটি গোড়ার কথা প্রথমে বলে নিতে চাই। বিষয়টি বুঝতে তাহলে সুবিধে হবে।

সকলেই জানেন টেলিভিশনের প্রোগ্রাম প্রচার করার জন্যে একটি টাওয়ার বা উঁচু স্তম্ভ তৈরি করা হয়। কেননা টেলিভিশনের প্রোগ্রাম যেখান থেকে প্রচার করা হয় তা ভূপৃষ্ঠের যতোদূর পর্যন্ত দৃশ্যমান ততোদূর পর্যন্তই ধরা সম্ভব। স্তম্ভ যতো উঁচুই করা যাক না কেন ভূপৃষ্ঠেও বক্রতা আছে, ফলে একটা দূরত্বের পরে সেই স্তম্ভ আর চোখে পড়ে না। টেলিভিশন প্রোগ্রাম বহু দূর পর্যন্ত ছড়াতে হলে নির্দিষ্ট দূরত্ব পরে-পরে পুনঃ-সম্প্রচারের ব্যবস্থা করতে হয়। এতে খরচ ও জটিলতা দুই-ই বাড়ে। কিন্তু একটি উপগ্রহ থেকে যদি টেলিভিশন প্রোগ্রাম প্রচার করার ব্যবস্থা করা হয়? তাহলে সেই উপগ্রহ থেকে ভূপৃষ্ঠের যতোখানি এলাকা দৃশ্যমান ততোখানি এলাকায় সেই প্রোগ্রাম অনায়াসেই প্রচার করা সম্ভব, পুনঃ-সম্প্রচারের ব্যবস্থা ছাড়াই।

এখানে টেলিভিশনের প্রচারকে একটি দৃষ্টান্ত হিসেবে ধরা হয়েছে মাত্র, কেননা টেলিভিশনের প্রচারই সবচেয়ে জটিল। এই দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যাচ্ছে, উপগ্রহের সাহায্যে যোগাযোগ-ব্যবস্থা বজায় রাখার সুবিধে কতখানি।

CENTRAL LIBRARY

কিন্তু উপগ্রহকে পৃথিবীর একটি নির্দিষ্ট কক্ষপথে পাক খেতে হয়। গাগারিন যে বিশেষ কক্ষে পৃথিবীকে একটি পাক দিয়েছিলেন তাতে তাঁর সময় লেগেছিল নব্বুই মিনিট। কক্ষপথ পৃথিবীর যতো কাছাকাছি, পৃথিবীকে পুরো একটি পাক দিতে উপগ্রহের সময় লাগে ততো কম। কক্ষপথ পৃথিবী থেকে যতো দূরে, পুরো একটি পাক দেবার সময় ততো বেশি। কক্ষপথ যদি পৃথিবী থেকে বাইশ হাজার মাইল দূরে হয় তাহলে সেই বিশেষ কক্ষপথে পৃথিবীকে পুরো একটি পাক দিতে উপগ্রহের সময় লাগে চব্বিশ ঘণ্টা। আমাদের পৃথিবীও এই একই সময়ে অর্থাৎ চব্বিশ ঘণ্টায়, পুরো একটি পাক খেয়ে থাকে। তাহলে ব্যাপারটা কী দাঁড়ায়? পৃথিবী যে সময়ে একবার পাক খাচ্ছে উপগ্রহও সেই একই সময়ে একবার পাক খায়। এ অবস্থায় পৃথিবী থেকে তাকিয়ে মনে হয় উপগ্রহটি যেন আকাশের বিশেষ একটি বিন্দুতে স্থির। উপগ্রহের মাধ্যমে যোগাযোগ-ব্যবস্থা স্থাপন করতে হলে গোড়াতেই চাই এমনি 'স্থির' উপগ্রহ। কেননা ভূপৃষ্ঠের নির্দিষ্ট একটি এলাকার কাছে এই 'স্থির' উপগ্রহটি সব সময়েই দৃশ্যমান।

একটি উপগ্রহ যখন পৃথিবীকে পাক খাচ্ছে তখন কতখানি দূরত্ব পার হচ্ছে তার একটা মাপ কিলোমিটারে অবশ্যই হতে পারে। কিন্তু পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে যদি তাকিয়ে দেখি তাহলে এমন কথাও বলা চলে, পুরো একটি পাক খেতে উপগ্রহটিকে পার হতে হচ্ছে ৩৬০ ডিগ্রি। এই ৩৬০ ডিগ্রিকে সমান তিনটি ভাগে ভাগ করা যাক—এক-এক ভাগে ১২০ ডিগ্রি। এবারে এমন তিনটি 'স্থির' উপগ্রহ তৈরি করা যাক যাদের অবস্থান ১২০ ডিগ্রি তফাতে তফাতে। তাহলে? তাহলে মাত্র তিনটি 'স্থির' উপগ্রহের মাধ্যমেই সমগ্র ভূপৃষ্ঠ দৃশ্যমান। অর্থাৎ মাত্র তিনটি স্থির উপগ্রহের মাধ্যমেই বিশ্বব্যাপী যোগাযোগ-ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব।

তিনটি মাত্র উপগ্রহের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী যোগাযোগ-ব্যবস্থা? এটা তখনই সম্ভব যখন বিশ্বের আবহাওয়াটিও সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের হবে। নইলে বিশ্বব্যাপী যোগাযোগ-ব্যবস্থার সুবিধে দেবার নামে এই উপগ্রহকেই করে তোলা যেতে পারে প্রভাব বিস্তার, ভীতি প্রদর্শন ইত্যাদির মাধ্যম। এ আলোচনায় পরে আসছি। এখানে শুধু এই কথাটি বুঝে নেওয়া দরকার যে, উপগ্রহের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার সমস্যাটি শুধু বৈজ্ঞানিক ও টেকনিকাল নয়, রাজনৈতিকও। বরং, বলেটা না বৈজ্ঞানিক ও টেকনিকাল, তার চেয়ে বেশি রাজনৈতিক। ভারতের ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম হবার কথা নয়।

যে-খবর আগে বলছি, উপগ্রহের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী যোগাযোগ-ব্যবস্থার আওতায় ভারত এসে যাচ্ছে আগামী ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যেই। খবরটি জানিয়েছেন ভারতের কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্টের যোগাযোগ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী অধ্যাপক শের সিং। তাঁর বিবরণ থেকে জানা যায়, ভারত মহাসাগরের আকাশে যে 'স্থির' উপগ্রহ থেকে ভারতের বিশ্বব্যাপী যোগাযোগ-ব্যবস্থা গড়ে উঠছে তার নাম ইনটেলসাট-৩। সেটি ইতিমধ্যেই যথাস্থানে অবস্থান করছে। এখনো ভারতের মাটিতে থাকা চাই একটি গ্রাহক-যন্ত্রের কেন্দ্র, যাকে বলা হয় আর্থ স্টেশন। ভারতের এই আর্থ স্টেশনটি নির্মিত হচ্ছে আরভি-তে, ৭.৮৬ কোটি টাকা ব্যয়ে। বোম্বাইয়ের বিদেশ সঞ্চার ভবনের সঙ্গে আরভির এই আর্থ স্টেশনের যোগাযোগ স্থাপিত হবে মাইক্রো-ওয়েভ ব্যবস্থায়।

আরভি স্টেশনে থাকবে ৪৮টি কথা-বলার চ্যানেল, বলা বাহুল্য, টেলিভিশনও। এই ব্যবস্থায় উপগ্রহের মাধ্যমে সারা বিশ্বের টেলিভিশন প্রোগ্রাম ভারতের সর্বত্র প্রচারিত হবে।

উত্তর ভারতের কোনো এক স্থানে, সম্ভবত দেরাদুনে স্থাপিত হবে ভারতের দ্বিতীয় আর্থ স্টেশন, ৬.৭৮ কোটি টাকা ব্যয়ে। এই নির্মাণকার্য শেষ হবে ১৯৭৪ সালের মধ্যে।

নিজস্ব উপগ্রহ তৈরি করে নেবার ক্ষমতা বিশ্বের সকল দেশের নেই। কাজেই উপগ্রহ তৈরি করার ক্ষমতা যে-সব দেশের আছে তাদের ওপরেই নির্ভরশীল হতে হয়। অথচ বিশ্বব্যাপী যোগাযোগ-ব্যবস্থা গড়ে তোলার আগ্রহ রয়েছে সকল দেশের।। এই অবস্থাতেই কতকগুলো আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। যে-কোনো দেশ এই ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে উপগ্রহের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী যোগাযোগ-ব্যবস্থার সুযোগ নিতে পারে। ভারত এমনি একটি ব্যবস্থায় সামিল।

ভারত যে উপগ্রহটির সাহায্য নিতে চলেছে তার অবস্থান ভারত মহাসাগরের আকাশে। এটি ইনটেলসাট-৩। এই ব্যবস্থারই অন্তর্ভুক্ত আরো একটি উপগ্রহ তোলা হচ্ছে আটলান্টিক মহাসাগরের আকাশে—ইনটেলসাট- ৪। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, তিনটি মাত্র উপগ্রহের সাহায্যে বিশ্বব্যাপী যোগাযোগ-ব্যবস্থা প্রবর্তনের যে বৈজ্ঞানিক ও টেকনিকাল জ্ঞান মানুষের আয়ত্তাধীন বাস্তবে তার প্রয়োগ সম্ভব হয়নি। শুধু তিনটি নয়। যোগাযোগ- ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্যে অনেকগুলো উপগ্রহই তৈরি হয়ে গিয়েছে, আরো হবে।

এমনটি হওয়াই স্বাভাবিক। যোগাযোগ-ব্যবস্থা কব্জায় থাকলে আর কম্‌ যায় শুধু মোটা টাকা নয়, ক্ষমতাও। সেই প্রাচীন কাল থেকেই সবলের হাতে দুর্বলের ওপরে আধিপত্য করার একটি উপায় হচ্ছে যোগাযোগ-ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ।

অতএব, যেখানে লক্ষণ দেখে বোঝা যাচ্ছে আগামী এক যুগের মধ্যে যোগাযোগ-ব্যবস্থার প্রধান মাধ্যম হবে উপগ্রহ, সেখানে উপগ্রহকে অবশ্যই এমনভাবে ব্যবহার করার চেষ্টা থাকবে যাতে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি হতে পারে। আপাতদৃষ্টে নিরীহ ও নির্দোষ চুক্তির মাধ্যমেই হয়তো তা করা হবে।

বিশ্বব্যাপী যোগাযোগ-ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্যে উপগ্রহ যদি থাকত মাত্র তিনটি এবং বিশ্বের আবহাওয়াটি হত সম্প্রীতির ও সৌহার্দ্যের—তাহলে এসব প্রশ্ন নিশ্চয়ই উঠত না। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, বিশ্ব দূরে থাক, এক আটলান্টিকের আকাশেই একাধিক উপগ্রহের স্থান হবার সম্ভাবনা।

মনে করা যাক আটলান্টিকের আকাশে উপগ্রহ রয়েছে দুটি। তাহলে দুটি উপগ্রহের এলাকাও ভাগ করে নেওয়া দরকার। অনেক ভাবে তা করা যায়। উত্তর থেকে দক্ষিণ একটি লাইন টানা যেতে পারে। লাইনের পূর্বদিকের সমস্ত স্টেশন অন্তর্ভুক্ত হবে একটি উপগ্রহের, লাইনের পশ্চিমদিকের সমস্ত স্টেশন অন্য উপগ্রহের। কিংবা, লাইন টানা যেতে পারে পূব থেকে পশ্চিমে। কিংবা, এমন ব্যবস্থা হতে পারে যে অতি-ব্যস্ত আর্থ স্টেশনগুলো একটি উপগ্রহের অন্তর্ভুক্ত হোক, কম-ব্যস্ত আর্থ স্টেশনগুলো অন্য উপগ্রহের।

মনে হতে পারে, ভাগাভাগির ব্যাপারটা বুঝি এতই সাধারণ।

মোটেই নয়। ধরা যাক লাইনটি টানা হয়েছে উত্তর থেকে দক্ষিণে। একেত্র বিশ্বের অন্য অংশের সঙ্গে আফ্রিকার দেশগুলির যোগাযোগ-ব্যবস্থা স্থাপিত হবে ইউরোপের একটি আর্থ স্টেশনের মাধ্যমে। অর্থাৎ ইউরোপের এই আর্থ স্টেশন থেকে যে-কোনো সময়ে আফ্রিকাকে বিশ্বের অন্য অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব। তেমনি দক্ষিণ আমেরিকার যোগাযোগ-ব্যবস্থার মাধ্যম হবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্টেশন। ইউরোপীয়রা স্বভাবতই চাইবে লাইনটি এমনিভাবে টানা হোক যাতে আফ্রিকা থেকে যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগালের বাইরে। কিন্তু এই ব্যবস্থা বিদুতেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভিপ্রেত হতে পারে না।

কাজেই বিষয়টি সম্পর্কে সজাগ থাকা দরকার। উপগ্রহের মাধ্যমে যোগাযোগ-ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্যে কোন দেশের সঙ্গে কোন দেশের কী ধরনের চুক্তি সম্পন্ন হচ্ছে সে-দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা দরকার।

আশা করা চলে, ভারত সরকার সজাগ ও সতর্ক থেকেই বিশ্বব্যাপী যোগাযোগের উপগ্রহ-ব্যবস্থায় সামিল হচ্ছেন।

CENTRAL LIBRARY

নিউক্লিয়ার শক্তি উৎপাদনে পাকিস্তান

জাপান ও ভারতের পরে পাকিস্তানও শক্তি-উৎপাদনে নিউক্লিয়ার হতে চলেছে। করাচি থেকে ১৫ মাইল পশ্চিমে আরব সাগরের কূলে স্থাপিত হচ্ছে পাকিস্তানের প্রথম নিউক্লিয়ার প্লান্ট। নির্মাণকার্য শেষ হবার মুখে। আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই এই প্লান্ট থেকে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ শুরু হয়ে যাবে। উৎপাদনের ক্ষমতা ১৩৭ মেগাওয়াট, নির্মাণের খরচ ৪০ কোটি টাকা, নির্মিত হচ্ছে কানাডার সহায়তায়। বিদ্যুৎ উৎপাদনের খরচ পড়বে প্রতি কিলোওয়াট ঘণ্টায় সাড়ে-চার পয়সা। জ্বালানী হবে ইউরেনিয়ম অক্সাইড।

১৯৭৫ সালের মধ্যে আরো একটি নিউক্লিয় প্লান্ট নির্মিত হতে চলেছে পূর্ব পাকিস্তানের রূপপুরে। এই প্লান্টের জন্যে চুল্লী সরবরাহ করছে বেলজিয়ামের একটি সংস্থা, খরচ দিচ্ছে বেলজিয়ামের কয়েকটি ব্যাঙ্ক। বৈদেশিক মুদ্রায় নির্মাণ-কার্যের খরচ পাঁচ থেকে সাড়ে-পাঁচ কোটি ডলার। হিসেব অনুসারে রূপপুর প্লান্টে বিদ্যুৎ-উৎপাদনের খরচ পড়বে কিলোওয়াট-ঘণ্টায় মাত্র সাড়ে-তিন পয়সা।

নিউক্লিয়ার শক্তির সাহায্যে সমুদ্রের নোনা জলকে মিষ্টি জলে পরিণত করার জন্যেও পাকিস্তান আগ্রহী। যুক্তরাষ্ট্রের পরমাণু শক্তি কর্তৃপক্ষের সহায়তায় ব্যাপারটি পর্যালোচনা করে দেখা যাচ্ছে। করাচির আশেপাশের এলাকায় এমনিতেই জলের অভাব, তার ওপরে যে-হারে বসতি ও কলকারখানা বাড়ছে তাতে জলের রীতি-মতো আকাল দেখা দেবার সম্ভাবনা। করাচির কাছে এমন এলাকাও আছে যেখানে এখনও করাচি থেকে বাইরে করে জল আসে আর তার জন্যে দাম দিতে হয় প্রতি হাজার গ্যালনে পাঁচশো টাকা। এই চাহিদার কথা মনে রেখেই সমুদ্রের জল থেকে পানীয় জল পাবার জন্যে করাচির কাছে একটি ৬০০ মেগাওয়াটের নিউক্লিয়ার প্লান্ট নির্মাণের কথা হচ্ছে।

পাকিস্তানে এখনো পর্যন্ত শক্তি উৎপন্ন হচ্ছে প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে, (পশ্চিম পাকিস্তানে) জল-বিদ্যুতের কেন্দ্র থেকে, কয়লা ও তেল থেকে। পূর্ব পাকিস্তানে প্রধানত নির্ভর করতে হয় কয়লা ও তেলের ওপরে। পূর্ব পাকিস্তানের সমতল জমির জন্যে জল-বিদ্যুতের কেন্দ্র না-থাকার মতো। শক্তি উৎপাদনের জন্যে তেল ও কয়লা উভয় পাকিস্তানেই প্রচুর পরিমাণে আমদানী করতে হয়।

পাকিস্তানে প্রাকৃতিক গ্যাস মজুদ আছে মোট ২২ মিলিয়ন ঘনফুট (পশ্চিম পাকিস্তানে ১৬-৪, পূর্ব পাকিস্তানে ৫-৫), কয়লা মজুদ আছে প্রায় ১২০০ মিলিয়ন টন। জল-বিদ্যুতের উৎস প্রায় সবটাই পশ্চিম পাকিস্তানে প্রায় ২৫,০০০ মেগাওয়াট। পূর্ব পাকিস্তানে আড়াই-শো মেগাওয়াটেরও কম। তেল পাওয়া যায় শুধু পশ্চিম পাকিস্তানে অতি সামান্য পরিমাণে—বছরে ৩-৫ মিলিয়ন ব্যারেল।

হিসেব করে দেখা হয়েছে যদি প্রচলিত পদ্ধতিতেই বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়ে চলে তাহলে বর্তমান শতক শেষ হবার মুখে পশ্চিম পাকিস্তানে বিদ্যুতের ঘাটতি পড়বে ১৬,৮০০ মেগাওয়াট, পূর্ব পাকিস্তানে ১২,০০০ মেগাওয়াট। নিউক্লিয়ার শক্তি এই ঘাটতি পূরণ করবে আশা করা চলে।

তুলনা করলে ভারতের ছবিটি সম্পূর্ণ ভিন্ন। ভারতে রয়েছে প্রচুর মজুদ কয়লা, প্রচুর তেল ও প্রচুর জলবিদ্যুতের উৎস। ভারতের নিউক্লিয়ার শক্তি উৎপাদনের কর্মসূচীটিও বিরাট। ১৯৬৯ সালের জুলাই মাসে তারাপুরে ৪০০ মেগাওয়াটের নিউক্লিয়ার স্টেশনটি পুরোপুরি চালু হয়েছে। একই উৎপাদন-ক্ষমতায় আরো দুটি নির্মিত হচ্ছে—একটি রাজস্থান, অপরটি মাদ্রাজে।

একটি ধাঁধা

'নিউ সায়েন্টিস্ট' পত্রিকার ৫ নভেম্বরের সংখ্যা থেকে একটি ধাঁধা পাঠকদের কাছে উপস্থিত করছি। সঠিক জবাব ভেবে রাখুন।

বিচিত্র সাজপোশাক পরে ছয় ছেলে-মেয়ে একটি আসরে উপস্থিত। সাজ-পোশাকের এমনই চটক যে কে ছেলে আর কে মেয়ে তা বোঝা যাচ্ছে না। খানিকটা বিরক্ত হয়ে পরস্পরের প্রায় অপরিচিত ছটি মানুষ আসর থেকে বেরিয়ে একটু ফাঁকায় এসে দাঁড়াল। মনে করা যাক এই ছজন মানুষ হচ্ছে ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ। কিছুক্ষণ পরে শোনা গেল তারা নিজেদের মধ্যে কথা বলছে।

ক (চ-কে) : খ মেয়ে

খ (গ-কে) : ঙ আর চ হয় দুজনেই ছেলে কিংবা দুজনেই মেয়ে।

গ (ক-কে) : তুমি যদি ছেলে হও খ মেয়ে, তুমি যদি মেয়ে হও খ ছেলে।

ঘ (ঙ-কে) : এই তো সম্প্রতি ১৮০ মিটার হার্ডলস-এ খ অলিম্পিক ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছে।

ঙ (খ-কে) : গ মেয়ে

চ (ঘ-কে) : মিক্সড ডবলস খেলায় আমার রোজকার পার্টনার যদি ছেলে হয় তো গ ছেলে, আমার পার্টনার যদি মেয়ে হয় তো গ মেয়ে।

এই ছজনের মধ্যে কোনো মেয়ে যখন কোনো মেয়ের সঙ্গে কথা বলেছে, বা কোনো ছেলে ছেলের সঙ্গে, তখন সত্যি কথা বলেছে। নইলে বলেনি।

এবার ভেবে বলুন এই ছজনের মধ্যে কে কী? পরের সংখ্যা 'নিউ সায়েন্টিস্ট' পত্রিকা কলকাতায় পৌঁছলেই সঠিক জবাবটি জানিয়ে দেব।

—[illegible]

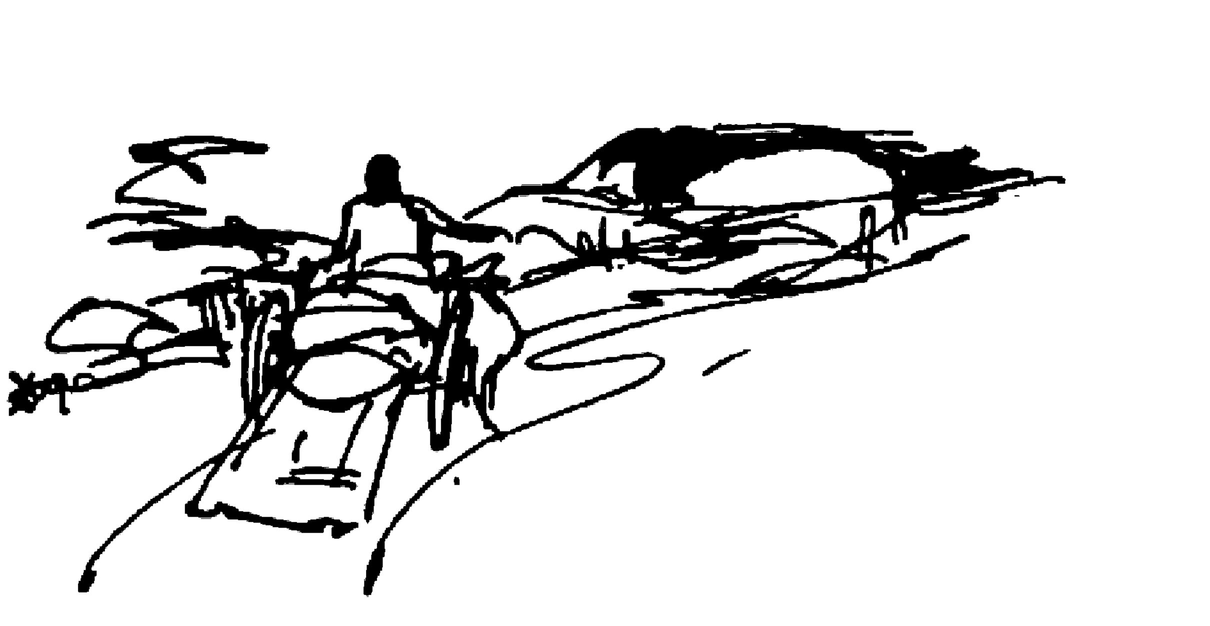

(পূর্বে প্রকাশিতের পর)

পাশের ঘর ফাঁকা। এদিক-ওদিক তাকাল রজত। ঘরের মধ্যে অস্বোন বোন। বিছানা খালি। আলনা খালি। চোখে পড়ল ড্রেসিং টেবিলের উপর একটা খাম। তাড়াতাড়ি এসে খামটা খুলে এক নিশ্বাসে চিঠিটা পড়ে। 'আমার খোঁজ করো না। মার কাছে ফিরে যাচ্ছি। যেখানে সম্মান নিয়ে বসবাস করা যাবে না, দিনের পর দিন সেখানে থাকা সম্ভব হলো না। নিজের জন্যে ভাবি না। পল্টু বড় হচ্ছে। ওর কথা ভেবে এই পথ গ্রহণ করতে হলো। ইতি মীরা।'

রজত টলতে-টলতে নিজের ঘরে ফিরে যায়। ধপ করে বিছানায় বসে। একটানা অনেকক্ষণ বসে থাকে। এ কী সম্ভব? এভাবে মীরা চলে যেতে পারে! এত সাহস হল কোত্থেকে। এ যে দেখছি রীতিমত নাটক। পুরনো পচা নাটক। সম্মান নিয়ে বসবাস সম্ভব হলো না! তাই গৃহত্যাগ। খুব হাসি পেল রজতের। যত সব ন্যাকামি!

ঠিক আছে। দেখা যাবে কতদিন থাকতে পারে। রজত কোনরকম নার্ভাসবোধ করল না। ধীরে-সুস্থে সিগারেট টানল। দাড়ি কাটল। হিটার জেলে চা আর ডিম সেদ্ধ খেয়ে জামা-কাপড় পরে ঘরে তালা লাগিয়ে বাইরে বেরোল। আজ ছুটি। কোথায় যাওয়া যেতে পারে, শিস দিল আপনমনে, সিঁড়ি ভেঙে নীচে অবতরণের সময় মনে হল : অতঃপর যা খুশী সে করে বেড়াতে পারবে, কোন জবাবদিহি থাকবে না, কোন চোখের জল, পিছুটান, সামাজিকতা, পারিবারিক ভদ্রতা ইত্যাদি। ভালই হলো। আবার আগের জীবন সে ফিরে পাবে। রাস্তায় পা দিয়ে বহু দিন পর ওর নিজেকে খুব হাল্কা মনে হলো।

।। তিন ।।

স্লিপ জমা দিয়ে বিনয় লম্বা-লম্বা পা ফেলে বাইরে এল। সিঁড়ি ভেঙে নীচে নামতে থাকে। সামনে বিরাট সবুজ মাঠ। একটা চারমিনার ধরিয়ে এগোয়। ক্যান্টিনে গিয়ে এক কাপ চা খাবে। মাথা ঝিমঝিম করছে। জাতীয় অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। একটা কালো রঙের গাড়ি, পিছনের সিটে বসে এক মহিলা, সুদৃশ্য প্যাকেটে মোড়া খাবার, বোধহয় গ্রেট ইস্টার্ন হোটেল থেকে, একবার তাকিয়ে সে চোখ ফিরিয়ে নিল। চারিদিকে সবুজের বাহার। সবুজ রঙ নাকি চোখের পক্ষে ভাল। ন্যাশনাল লাইব্রেরী সম্পর্কে, ক্যান্টিনে ঢুকে এক কাপ চা এনে টেবিলের উপর রেখে, চারিদিকে তাকিয়ে বিনয় ভাবল, আর কোন মোহ নেই। অনেক টাকা জমা রেখেও বই পাওয়া যায় না। হয় আউট অফ প্রিন্ট অথবা দাম এত বেশী যে, তার পক্ষে নেওয়া সম্ভব হয় না। ডিভ্যালুয়েশনের পর বই-এর দাম আকাশছোঁয়া। কারেন্ট বই তো পাওয়াই যায় না। তবে কী লাভ পয়সা খরচ করে এতদূর আসার!

সে যা ভেবেছে তাই হলো অর্থাৎ মীরা তার বাচ্চাকে নিয়ে চলে এসেছে। শেষ পর্যন্ত থাকতে পারল না। মা কান্নাকাটি করেন। কেঁদে কী হবে। বিনয় জোরে সিগারেটে টান দেয়। চারপাশে আড়চোখে তাকায়। না, পরিচিত কোন মুখ দেখছে না। দু-একজন পরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে এখানে এলে দেখা-সাক্ষাৎ হয়। তারা আবার সাহিত্য-ফাহিত্য নিয়ে কচকচি করে। ভাল লাগে না সাহিত্য শিল্প নিয়ে কচকচি করতে। অন্তত এখন, এই সময়ে, যখন সে একটা গুরুতর চিন্তায় মগ্ন। হ্যাঁ, কেঁদে কী হবে। তুমি চোখের জল ফেললেই কী মা সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে! মীরাকে ফিরে যেতে বলেন মা। মীরা স্পষ্ট জানিয়েছে যাবে না। খুলে কিছু বলতে চায় না। মা জেরার ভঙ্গিতে প্রশ্ন করেন। বিরক্তির সঙ্গে জবাব দেয় মীরা। বিনয় কোন প্রশ্ন করে নি। সব তার জানা। আশ্চর্য! তার ধারণাই অবশেষে বাস্তবে পরিণত হলো।

একটা ব্যাপার দেখে বিনয় খুশি। মীরার কোন গ্লানি নেই। নেই ছটফটানি। স্বাভাবিক তার ব্যবহার। ভুলেও রজতদার নাম করে না। নিন্দা বা অভিযোগ কোন কিছু না। যেন তার জীবনে রজতদা বলে কোন ব্যক্তি ছিল না কোনদিন। সম্পূর্ণ

নিরাভিমান আচরণ মীরার। বলে না, আমাকে দয়া কর। আমি বিতাড়িত, প্রত্যাখ্যাতা। বরং মাথা উঁচু করে জানায় মীরা, আবার সে চাকরী করবে, শুরু করবে নতুনভাবে জীবনকে।

হ্যাঁ, তাই করুক মীরা। নিজের পায়ে দাঁড়াক। সসম্মানে বাঁচতে চেষ্টা করুক। পল্টু রয়েছে, ওর কথাও তো ভাবতে হবে। বিনয় সব রকম সাহায্য করবে। ইতিমধ্যে মীরা আবার টাইপ স্কুলে ভর্তি হয়েছে। এবার শুধু টাইপ নয়, সঙ্গে সর্টহ্যান্ডও। আজকাল লেডিজ টাইপিস্ট-স্টেনোর বেসরকারী অফিসে, ভাল স্পীড হলে, চেহারাটা ছিমছাম হওয়া চাই, মোটামুটি ভদ্র মাইনের একটা চাকরী পাওয়া খুব অসম্ভব ব্যাপার হবে না। পেয়ে যাবে চাকরী। ধৈর্য আর অধ্যবসায় থাকলে কেন হবে না। সবচেয়ে বড় কথা বল মনের জোর। তাহলেই হবে।

ছদ্মবেশী প্রবঞ্চক প্রতারক! প্রথম থেকেই তার সম্মতি ছিল না। কেউ শোনে নি তার কথা। না মা না মীরা। সে চিনত হরেনদাকে। তাই ভয় ছিল তারই সবচেয়ে বেশী। হাসপাতালে থাকার সময় অসহায়ভাবে সে লক্ষ্য করেছে কিভাবে মা আর মীরা, একটু-একটু করে সম্মোহিতের মতো, যেমন করে হরিণ অজগরের নিঃশ্বাসে এগোয়, রক্তচোষার মুঠোর মধ্যে ধরা পড়েছিল। সে কোন বাধা দিতে পারে নি। শুধু নীরব আক্রোশে ফেটে পড়েছে। তখন মা অস্বাভাবিকভাবে বদলে গিয়েছিলেন। মীরাও। তাকে ওরা সহ্য করত না। ভাবত সে ওদের সুখের অন্তরায়। আজ কী মনে হয় তোমাদের? আমাকে তো তোমরা মোটে পাত্তাই দিত না। বরং শত্রু ভাবতো। কিছুই ভুলি নি।

আজ তোমাদের কী মনে হয়? মৃদু হাসল বিনয়। সেদিন আমার কথা খুব কর্কশ ঠেকেছে, তাই না? খুব সামান্য ব্যাপার নয়। তুচ্ছ কারণে মীরা এতো রিস্ক নিত না। নিশ্চয়ই বিরোধটা চরম পর্যায়ে গিয়ে উঠেছিল। শেষকালে আর ঘর করতে পারল না, ছেলে কোলে করে এল পালিয়ে। সেই তো পালিয়ে এলি বাপের বাড়ি! কোন ভদ্র মেয়ে ঐ রকম একটা চরিত্রহীন লোকের সঙ্গে বেশীদিন ঘর করতে পারে না। আর তিনেক কিভাবে কাটাল মীরা, তাই ভেবে সে আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছে। দুশ্চরিত্র একটা মাতালের সঙ্গে!

চারধারে বিচিত্র ধরনের শব্দ। বিনয় একটু কান খাড়া করে শোনার চেষ্টা করল। কেউ জোরে কথা বলছে, কেউ আস্তে। কেউ মিহিসুরে হাসছে, কেউ উচ্চকণ্ঠে। সবকিছুই বিচ্ছিন্ন দুর্বোধ্য মনে হলো। আসলে শব্দের কোন মানে নেই। কেমন অর্থহীন হয়ে উঠছে সবকিছু। বিনয় চারিদিকে তাকায় অথচ কোন মুখ স্পষ্ট দেখতে পায় না। কোন মুখ বিশিষ্ট হয়ে ওঠে না ওর কাছে! দেখতে পায় টেবিলের ওপর কম্পিত আঙুলে। সিগারেট আর ধোঁয়া। এ কার আঙুলে!

চামড়া পোড়ার গন্ধে চমকে উঠল বিনয়। বিকৃত মুখে চোখের সামনে আঙুল নিয়ে আসে। বারুদের গন্ধ। বমি আসে ওর। দম বন্ধ করে রইল কিছুক্ষণ। তারপর পায়ে-পায়ে এগিয়ে কাউন্টারের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। সুপুরির কয়েকটা ছোট্ট টুকরো মুখে পুরে বেরোতে যাবে, সেই সময় 'বিনয়দা', ভারী মিষ্টি কণ্ঠস্বর, হাসি, উদ্ভাসিত চোখ-মুখে শেফালী দাঁড়িয়ে, সঙ্গে আরো দুটি মেয়ে, বোধহয় ওর সহপাঠিনী।

—কখন এলে? বিনয় শেফালীর উদ্দেশ্যে সামান্য হেসে বলল, তুমি লাইব্রেরীর মেম্বার কোনদিন বলো নি।

—এ আর এমন কি খবর। আসুন পরিচয় করিয়ে দি। বলে অন্য দুটি মেয়ের দিকে তাকিয়ে ইঙ্গিত করল। এর নাম নীতা। আর ওর নাম লতিকা। আমার ক্লাসমেট।

তারপর নীতার দিকে একটু ঝুঁকে কিছু বলল শেফালী। বিনয় শুনতে পেল না। ওর সম্পর্কে কিছু বলছে। ওর পরিচয় দিচ্ছে। কী রকম পরিচয় দিল শেফালী?

বিনয় চলে যাবে কিনা ভাবছিল। এখন সে একটু একা থাকতে চায়। শেফালীর বান্ধবীরা আড়চোখে ওকে দেখছিল। একবার ওদের সঙ্গে চোখাচোখি হয়। সে চোখ ঘুরিয়ে নিল।

—চলুন বিনয়দা। এক কাপ চা খান। নাকি আপনার তাড়া আছে?

—তাড়া কীসের। তবে একটু তাড়াতাড়ি যাওয়া দরকার। পাঁচটায় লাইব্রেরী বন্ধ হবে। বই পেলে হয়। তুমি কী রিডিং-রুমের মেম্বার?

—হ্যাঁ। শেফালী তার বান্ধবীদের উদ্দেশে বলল, যা না চার কাপ চায়ের অর্ডার দে।

চা খেতে-খেতে আলাপ করে বিনয়। শেফালীর সঙ্গেই কথা বলছিল বেশি। মাঝে-মাঝে নীতা আর লতিকার সঙ্গে। বেশ সপ্রতিভ ওদের ব্যবহার। কোন জড়তা নেই। সাধারণ চেহারা মেয়ে দুটির। উল্লেখ করার মত বিশেষত্ব কিছু নেই।

একটু পরে ওরা বাইরে এল। বিকেলের রোদ ম্লান হয়ে আসছে। শীতের বিকেল। নীরবে ওরা হাঁটছিল। শেফালীর পাশাপাশি বিনয়। নীতা আর লতিকা নিজেদের মধ্যে মৃদু স্বরে কিসব বলছিল। বিনয় একবার আড়চোখে তাকাল শেফালীর দিকে। এখন রোদের রঙ গোলাপী। বেশ সুন্দর দেখাচ্ছিল শেফালীকে।

—তুমি এখন কোথায় যাবে? বিনয় স্পষ্ট চোখে তাকাল শেফালীর দিকে, তোমার বান্ধবীদের বিদেয় করে দাও।

—তারপর? শেফালীর মুখে মৃদু হাসি, ওরা কী ভাববে বলুন তো।

—কী আবার ভাববে। বিনয় মৃদুস্বরে বলল, আমার বেশিক্ষণ লাগবে না। মিনিট পনেরো কি কুড়ি। তারপর দুজনে ফেরা যাবে।

শেফালী কোন উত্তর দিল না। ও একটু দ্রুত হেঁটে এগোয়। বান্ধবীদের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ায়। বিনয় আস্তে-আস্তে হাঁটে। শেফালী যদি তার সঙ্গে যেতে অসম্মতি জানায়, সে হবে বড় অপমানজনক, কোনদিন চোখ তুলে তাকাতে পারবে না। কী দরকার ছিল ওকে এসব বলার? যেমন প্রতিদিন একা কুয়াশা ভেদ করে বাড়ি ফেরে, পায়চারী করে ঘরে, বই পড়ে, এলোমেলো চিন্তায় সময় কেটে যায়; এরকম জীবনযাত্রায় ক্রমশ অভ্যস্ত, তবে হঠাৎ কেন আজ শেফালীর প্রয়োজন হলো! সে কী একঘেয়েমি থেকে কিছুক্ষণের জন্যে...।

পছন্দ মত বই পেল না বিনয়। হঠাৎ তার বিরক্তি আর রাগে রী-রী করে উঠল সমস্ত শরীর। একটু দূরে ওরা দাঁড়িয়ে। এবার সে বিদায় নেবে। সারি-সারি চেয়ার। প্রকাণ্ড লম্বা হলঘর। মনোযোগের সঙ্গে অধ্যয়নরত নরনারী। যুবক-যুবতীদের সংখ্যা বেশি। অলস দৃষ্টিতে সে চারিদিকে তাকাচ্ছিল। ওদের আর কত দেরী। শেফালী যাবে কিনা স্পষ্ট করে কিছু বলছে না।

—দেরী হবে কি বেশী? বিনয় সোজা শেফালীর চোখের দিকে তাকাল।

—না। আর পাঁচ মিনিট। একসঙ্গে বেরোব।

একটু দূরে সরে দাঁড়াল বিনয়। কী ভাবল শেফালী কে জানে। একটু অবাক হয়েছে বোধহয়। কোনদিন বলে নি, যদিও তাদের মধ্যে সম্পর্কটা বেশ সহজ, আর পরস্পরকে চেনে কম দিন হলো না—বলে নি, 'চল একটা সিনেমা দেখে আসি অথবা বেড়িয়ে আসি।' বলবে কি, বাইরে পরস্পরের দেখা হয়েছে কম, আর দেখা হলে একটু হাসি, দু-চারটে কথাবার্তা, এর বেশি কিছু নয়। কারণ বিনয় খুব একটা উৎসাহবোধ করে নি। তার ভয়, পরিচয় একটু গভীর হলে, সে শেফালীকে নিশ্চয়ই বিছানায় পেতে চাইবে, আর কে না জানে বিছানা মানে ধর্মসাক্ষী করে পবিত্র বিবাহ! শেফালী আর যাই হোক সেই ধরনের মেয়ে নয় যাদের কিছু অর্থের বিনিময়ে বিছানায় টেনে তোলা যায়।

—চলুন।

বাসস্টপে পৌঁছে শেফালীকে তার বান্ধবীরা বিদায় জানায়। হাত তুলে ওদের নমস্কার করল বিনয়। এসব ফর্মালিটি ভাল লাগে না। ওরা অনেকটা দূর এগিয়ে গেছে। ওদের মুখের চাপা হাসি টের পেয়েছে বিনয়। আস্তে-আস্তে বাঁদিকের মোড়ে নীতা আর লতিকা অদৃশ্য হয়ে যায়।

শেফালীর দিকে তাকাল বিনয়। অন্য দিকে তাকিয়ে। হাতে একটা বই। পরনে ছাপা শাড়ি। হলুদ রঙের ব্লাউজ। ফর্সা রঙে যা পরে তাই মানায়। আজ একটু বিশেষ কায়দায় মাথায় চুল বেঁধেছে। দু

চাহ গালি। শুধু ডান হাতে ঘড়ি। দু কানে রিং। কথা বলার সময় দোলে। এক নজরে এসব চোখে পড়ল বিনয়ের। এসেছে সময়ে শেফালী। শুধু খানিকটা সময় ওকে অনিশ্চিততে ফেলেছিল।

—দেখুন কী ভিড় বিনয়দা।

গল-গল করে ধোঁয়া ছেড়ে দৌড়ায় বাসটা। আরো অনেকে দাঁড়িয়ে। একটু পর অফিস ছুটি হবে। পিঁপড়ের মত নরনারী ছুটে আসবে, ঠেলাঠেলি, চিৎকার, কলহ...।

চিৎকার করে ডাকল বিনয়, ট্যাকসী:

একটু দূরে গিয়ে ট্যাকসীটা থামে। 'তাড়াতাড়ি চলো শেফালী। নইলে অন্য কেউ...।' বিনয় একরকম ছুটে গিয়ে খপ করে হাতল ধরে। তারপর শেফালী সীটে বসলে সে সামনের সীটে বসবে না পিছনের সীটে বসবে এই সব দ্রুত চিন্তা, ড্রাইভারের মিটার ঘোরানোর স্প্রিং শব্দে সামান্য চমকে এবং চরম সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেছে এমনি চোখ-মুখের ভাব ও হাসি-হাসি, ভিতরে ঢুকে নরম গদির উপর দেহ এলিয়ে মিনিট খানেক চোখ বুজে রইল।

—বিনয়দা।

—কি? চোখ খুলল বিনয়। না, কোন সংকোচ অথবা ভীতির কিছু নেই। নেই কোন জড়তা। সহজ তাকানো। সত্যি, এখন মনে হচ্ছে, শেফালীকে নিয়ে কোথায় সে ঘুরবে। কোথায় সে যেতে পারে? হোটেল অথবা রেস্টুরেন্টে কি কোন পার্কে, গাছের নীচে আবছায়া অন্ধকারে পাশাপাশি বসা, চীনেবাদাম ভাঙার পট-পট শব্দ, শিস আর অশ্লীল হাসি অথবা অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহে বাহুতে বাহু স্পর্শ...। ধোৎ। এসব সে কিছুই চায় না। ভাল লাগে না। তবে কেন মিছিমিছি আটকে রাখল শেফালীকে।

—কোথায় যাবেন? শেফালী বাইরের দিকে একবার তাকায়।

—তুমিই বলো।

—বাঃ আমি কী বলবো! একটু ভেবে নিল শেফালী। তারপর হাসল, বাড়ি চলুন। দেরী হলে আপনার মা হয়তো ভাববেন।

—ভাববেন না। বলবো তোমার সঙ্গে ছিলুম। তোমাকে মা খুব ভালবাসেন।

—জানি।

—আর কী জান? বিনয় সোজা হয়ে বসে একটা সিগারেট ধরাল। ধোঁয়া বাইরে ছুড়ে দিল। গাড়ি সবেগে ছুটে চলেছে। বাঁদিকে আলোকের মালা। গ্রান্ড হোটেল। এখন মনে হচ্ছে সে যেন লণ্ডনের রাজপথে। এমনি চোখ ঝলসানো আলো অথবা এর চেয়ে বেশি এমনি সারি-সারি মোটর যান। সুসজ্জিত নরনারীর মিছিল, হোটেল, বার নাচ-গান: হৈ-হুল্লোড়।

বিনয় বলল, জান শেফালী, মা তোমার খুব প্রশংসা করেন। মনে হয় তোমাকে চিরদিন কাছে পেলে মা সুখী হবেন। আর মাকে সুখী দেখলে আর কিছু চাই না আমি। অনেক দুঃখ পেয়েছেন—আর কদিনই বা বাঁচবেন।

কোন কিছু ভেবে একথা বলে নি বিনয়। হঠাৎ মনে হতেই মুখ ফসকে যেন কথাটা বেরিয়ে যায়। শেফালী বাইরে তাকিয়ে। ওর কথার অন্য রকম অর্থ করল না তো? মুখ দেখে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। একটা কিছু উত্তরের প্রত্যাশা সে করেছিল বোধকরি। কিন্তু শেফালী নীরব। কি ভাবছে মনে-মনে কে জানে।

দ্রুত একটা কথা মনে পড়ল বিনয়ের। শেফালীকে বিয়ে করলে কেমন হয়। মা সুখী হবেন। আর সে নিজে? শেফালীর মনোভাব আন্দাজ করতে পারে। বোধহয় আপত্তি করবে না। কারণ ও কি আর কিছুই টের পায় নি? ওর মা-বাবার অভিপ্রায় নিশ্চয়ই জানে। এত সব জানার পর, অসম্মত থাকলে, ঘন-ঘন ওদের ঘরে আসতো না, ওর সঙ্গে মেলামেশা বন্ধ করতো। যদিও তারা পরস্পরকে ভাষার মাধ্যমে কখনো প্রেম নিবেদন করে নি, তবু এটা ঠিক একে অন্যকে পছন্দ করে, মিলিত হতে চায়। এ কী তার কল্পনা? যদি তার ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়? যদি ইতিমধ্যেই শেফালী অন্য কাউকে...।

—ঘুমিয়ে পড়লেন না কি বিনয়দা?

—না। একটা কথা ভাবছিলাম।

—আপনি যে ভাবুক তা জানি। কী ভাবছিলেন বলবো?

মুচকি হাসল শেফালী। বিনয়দা গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে। চোখাচোখি হতে সে এই প্রথম সামান্য সঙ্কোচ আর লজ্জায় মাথা নীচু করল।

—বলো, কী ভাবছিলাম শেফালী। দেখি তুমি থটরীডিং জান কিনা।

—ভাবছিলেন একটা সাধারণ মেয়ের সঙ্গে অনেকটা সময় নষ্ট হয়ে গেল।

বিনয় একটু জোরে হাসল, যাঃ কি যে বলো! পারলে না বলতে। আমাকে কী ভাব শেফালী, জানি না। তোমার ঠাট্টাও চমৎকার। যাক এবার বল, তোমার পড়াশুনা কেমন চলছে।

—খুব ভাল নয়। চেষ্টা তো কম করছি না। ভাল রেজাল্ট করতে পারব কিনা জানি না।

—তুমি মাঝে-মাঝে সন্ধ্যায় দিকে আসবে। যতটা পারি সাহায্য করব।

শেফালীর মুখ পলকে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ও হঠাৎ একটা হাত চেপে ধরে বিনয়ের, আপনি একটু সাহায্য করলে অনেক ভরসা পাই।

বিনয় মৃদু হাসল। এভাবে কোন দিন কেউ তার উপর নির্ভরশীল হতে চায় নি। না পুরুষ না রমণী। আর শেফালী তো জলজ্যান্ত তন্বী এক যুবতী। চুপচাপ বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল সে অনেকক্ষণ।

গলির মুখে ট্যাকসী থামলে মিটার দেখে ভাড়া মিটিয়ে দেয় বিনয়। একটু দূরে শেফালী দাঁড়িয়ে। ঘড়ি দেখল সে। প্রায় আটটা। একটু দূরত্ব বজায় রেখে শেফালী হাঁটছে। গ্যাসের মৃদু আলোয় শেফালীর মুখ দেখার চেষ্টা করল বিনয়। দূর থেকে জাহাজের সিটি শুনতে পেল। এখন একটু গঙ্গার ঘাটে গেলে কেমন হয়। পাশাপাশি শেফালীর সঙ্গে বসবে। দেখবে পূর্ণিমার চাঁদ কিভাবে চুইয়ে-চুইয়ে নদীর জলে মিশে যাচ্ছে। দেখবে রুপোলী ঢেউ। ছোট-ছোট নৌকো দুলে-দুলে চলছে। মাঝিদের উদার কণ্ঠে গান। ঝিরঝির করে হাওয়া।

—চলি বিনয়দা।

চমকে তাকাল বিনয়। শেফালী দ্রুত পায়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠলে। সে এক পলক দেখল। তারপর মন্থরভাবে সিঁড়ি ভাঙতে শুরু করল। বিরাট বাড়ি। অসংখ্য ফ্ল্যাট। অসংখ্য মানুষের চিৎকার, গান, হৈ-হুল্লোড়। কোনকিছু স্পষ্ট নয়। সব তালগোল পাকানো। বিশৃংখল। কোথায় শৃংখলতা? কোথায় নির্জনতা?

॥ চার ॥

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চোখে কাজল টানে মীরা। পাউডারের পাফটা ঘাড়ে গলায় বুকে ঘষে। চিরুনির উল্টো পিঠ দিয়ে সিঁথির মাঝখানে সামান্য সিঁদুরের স্পর্শ লাগাতে গিয়ে থমকে গেল। খানিকক্ষণ আপন মনে কি যেন ভাবল। তারপর হাত নেমে আসে। পিছন ফিরে তাকাল। পল্টু ঘুমিয়ে। হাতঘড়ি দেখল। প্রায় দুটো। আর দেরী করা যায় না। অড়াইটে থেকে ক্লাস। সাড়ে চারটা পর্যন্ত। ঘর ছেড়ে বেরোবার আগে ঝুঁকে পল্টুর কপালে চুমু খেল।

রান্নাঘরের চৌকাঠের বাইরে দাঁড়িয়ে মীরা আস্তে-আস্তে বলল, যাচ্ছি মা।

নীহার এক পলক তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে যান। অর্ধস্ফুট চোখে তাকিয়ে থাকেন অনেকক্ষণ। এ কী অনাসৃষ্টি! কোনকিছু তাঁর নজর এড়ায় নি। অনেক দিন যাবৎ লক্ষ্য করছিলেন। একটু-একটু করে সিঁথির সিঁদুর অস্পষ্ট হয়ে আসছিল; মীরার আচার-আচরণকে কিছুতেই তিনি সমর্থন করতে পারেন নি। এখনও পারছেন না। কিন্তু কেউ তাঁকে গ্রাহ্য করে না। তাঁর ভূমিকা কী শুধু নীরব দর্শকের?

—শোন। এভাবে পথে বেরোস না। তোরা কী কিছুই মানিস না? ধর্ম-অধর্ম বলে কিছু কী নেই? ছি-ছি-ছি! নীহারের মুখ ঘৃণায় বিকৃত হয়ে ওঠে।

মীরার মুখ কঠিন হয়ে ওঠে। আস্তে অথচ দৃঢ়স্বরে বলল, মিথ্যা একটা সম্পর্কের বোঝা টেনে লাভ কি মা! তুমি এ নিয়ে বেশি ভেবো না।

—তা ভাববো কেন? তোমরা ছেলে-মেয়ে যে যা খুশি করে বেড়াবে, চোখের সামনে সব দেখেও অন্ধের মত থাকবো। তোরা কী আমাকে মানুষ হিসেবে দেখিস না?

—আর চুপ করো মা! মীরা সামলা বিবাহের সঙ্গে কলহ আমরা বড় হয়েছি। আমাদের আর কতদিন তুমি আগলে রাখবে। এখন আর কেন কথা শুনবে না! দেরী হয়ে যাচ্ছে।

—এভাবে বেরোবি? মার হঠাৎ ওর গলা দেখা হয়ে যায়।

—কী আর হবে। সব সম্পর্ক তো চুকিয়ে এসেছি মা। সেইই তোমার চুপ করো! তুমি যদি এভাবে প্রত্যেকটি কাজে আমাকে বাধা দাও, তাহলে অন্য জায়গায় চলে যেতে হবে। তুমি যা চাইছো কিছুতেই তা হতে পারে না। কতদিন বলেছি এসব কথা তোমাকে। কেন আমার পিছনে লেগে আছ?

চোখের জল কোনমতে চেপে মীরা ঘরের থেকে বেরিয়ে আসে তরতর করে সিঁড়ি ভেঙে নীচে নামে। বড় চত্বর পেরিয়ে রাস্তায় পা দেয়। হন-হন করে হাঁটতে থাকে। কোনদিকে তাকায় না।

এখানে আসার পর থেকেই রোজ-রোজ এক কথা শুনতে-শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে গেল মীরার। মার মুখে এখনও [illegible] প্রশংসা লেগে রয়েছে। তবে হাসি পেল মীরার। মার ধারণা সব দোষ তার। সেই মানিয়ে চলতে পারে নি। অত তেজ দেখিয়ে চলে আসা উচিত হয় নি। 'পতি পরম গুরু,' অতএব তার চরম অত্যাচার সহ্য করেও পায়ের নীচে পড়ে থাকতে হবে। কারণ তাই ধর্ম। মেয়েদের সহ্য

করতে হয়। কেন সীতাকে কী পরীক্ষা দিতে হয় নি? আদর্শ সীতা সাবিত্রী। বহুদিন এসব শুনিয়েছেন মা।

হাতঘড়ি দেখল মীরা। এখনো দশ মিনিট আছে। ইস লেট হয়ে যাবে! গোড়াবাজারের মোড়ে পৌঁছে ট্রামের জন্যে অপেক্ষা করতে হলো না। সঙ্গে-সঙ্গে পেয়ে গেল। সীটে বসে বটুয়া থেকে রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছল। টিকিট চাইলে মান্থলী আছে জানাল। তবু দেখতে চাইল কণ্ডাকটটার। এই দ্যাখ বাপু। চোখের সামনে তর্জনীর সঙ্গে মেলে ধরল সে। হ্যাঁ, যার সঙ্গে খিটমিট লেগেই রয়েছে। দেখতে-দেখতে কয়েকটা মাস পেরিয়ে গেছে। পন্টু এই সামনের মাসে তিন বছরে পড়বে। বড় কথা শিখেছে ছেলেটা। মাঝে-মাঝে রজতের কথা বলে। তখন অস্বস্তি বোধ করে মীরা। ছিঃ দুষ্টুমী করে না। তোমার বাবা অনেক দূরে গেছে। লক্ষ্মী সোনা আমার। এই তো আমি। বুকে চেপে ধরলেও কাঁপুনি কী সহজে থামে!

প্রথম প্রথম অস্পষ্ট এক ধরনের আশঙ্কায় মুষড়ে থাকত মীরা। রাস্তায় ভীড়ের মধ্যে হাঁটার সময় সন্তর্পণে এদিক-ওদিক তাকাত। হঠাৎ হয়ত রজত সামনে এসে দাঁড়াতে পারে। প্রশ্ন করতে পারে: কেন চলে এসেছো মীরা? ফিরে চল। বলে হয়ত হাত চেপে ধরতে পারে। লোকজন জড়ো হয়ে যেত। নানারকম প্রশ্ন, বিরক্তিকর মন্তব্য, এসব ভেবে অনেকদিন গায়ে কাঁটা দিয়েছে মীরার। অন্য আর এক ধরনের সম্ভাবনার কথাও সে ভেবেছে। ফট করে রজত তাদের বাড়ি চলে আসতে পারে। মার কাছে গিয়ে নালিশ জানাতে পারে: দেখুন, আপনার মেয়ে না বলে চলে এসেছে। ওকে বলুন ফিরে যেতে।

না, এসব কিছুই হয়নি। রজত আসেনি। আসবে কিনা তা সে জানে না। কৌতূহলও নেই। আসলেও সে তো আর যেত না। হাড়ে হাড়ে চিনেছে রজতকে। ছদ্মবেশী প্রবঞ্চক শয়তান! নিছক দয়া বা করুণার ওপর সে বাঁচতে চায় না। মিথ্যে স্বামী-স্ত্রীর ভান করে একত্রে বসবাস করা কেন! তার চেয়ে সেপারেশন ভাল। তুমি থাক তোমার পছন্দমত জীবন নিয়ে। যত খুশি বেলেল্লাপনা মদ্যপান কর। রমণীদের নিয়ে স্ফূর্তি কর। আমার তাতে কিছু যায় আসে না। তোমার সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক নেই। তোমার অস্তিত্বকে আমি অস্বীকার করি।

তবুও সব সম্পর্ক তো শেষ হয়নি। আইনের চোখে এখনও ঐ লোকটা তার স্বামী। আইনের জোরে যদি রজত অধিকার খাটাতে আসে। তখন? এদিকটাও ভেবেছে মীরা। বেশ, এসে দ্যাখ, মজাটা টের পাবে। তোমার বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ আনবো আদালতে। সব কীর্তি ফাঁস করে দেব। ভেবেছো কিছুই জানি না। সব জানি। তোমার সব কীর্তিকলাপের খবর রাখি। অতএব জোর-জুলুম করে লাভ হবে না কিছু।

হাতিবাগানের মোড়ে ট্রাম থেকে নেমে মীরা দ্রুত হাঁটতে থাকে। কেন যে এসব বাজে চিন্তায় ভেবে মরছে। তার সামনে কত কাজ। শিগগির একটা চাকরী জোটাতে হবে। যা কিছু ভবিষ্যৎ পন্টুকে ঘিরে। একটু একটু করে বড় হবে তার ছেলে। মানুষ করতে হবে।

আর কতদিন সে চাকরীর জন্যে অপেক্ষা করবে? টাইপের স্পীডও প্রায় চল্লিশ। আসলে শুধু টাইপে হবে না, শর্ট-হ্যাণ্ডটা ভালভাবে আয়ত্ত করতে হবে। এখন ডিকটেশন নিচ্ছে। ছমাসে আশি স্পীড। চাকরী পেতে হলে অন্তত একশ স্পীড দরকার। আরও বেশি হলে ভাল। বিশেষ করে বেসরকারী অফিসে বেশি স্পীড চায়। ইংরেজী জানা দরকার। অনর্গল বলার অভ্যেস থাকা চাই।

দাদা বলে, 'কিছু ভাবিস না মীরা। দেখবি সব ঠিক হয়ে যাবে। ইংরেজী খবর কাগজ নিয়মিত পড়। আমি মাঝে মাঝে ডিকটেশন দেব।'

কিন্নরের আশ্বাস অনেকখানি মীরার কাছে। পন্টুকে খুব ভালবাসে দাদা। এখনও বিয়ে করল না। ঐ মেয়েটা আজকাল প্রায় রোজ সন্ধের দিকে আসে। তিনতলার ফ্ল্যাটে থাকে। কী যেন নাম। হ্যাঁ, মনে পড়ছে। নামটা বেশ মিষ্টি। শেফালী। শুধু কী নাম। চেহারাটাও মিষ্টি। শিক্ষিতা মেয়ে। সামনের বছর এম-এ পরীক্ষা দেবে। প্রেম-ট্রেম কিনা বুঝতে পারছে না। বিয়ে করুক না মেয়েটিকে দাদা। একদিন সুযোগও তুলতে হবে কথাটা। দাদার মনোভাব কী বোঝা যাবে। বয়স তো কম হল না। আর কতদিন এমন ছন্নছাড়া জীবন কাটাবে?

সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠল মীরা। ঘরে ঢোকার আগে জানালা দিয়ে একবার উঁকি মেরে দেখল। হ্যাঁ, মাস্টারমশাই ডিকটেশন দিচ্ছেন। জনা পাঁচ-ছয় ছেলে-মেয়ে ঘাড় নীচু করে খাতার ওপর ঝুঁকে।

সসঙ্কোচে একটা মেয়ের পাশে বেঞ্চির ওপর বসল মীরা। মাস্টার ইসারায় তাকে ডিকটেশন নিতে বললেন। পাশের কলা মেয়েটি, ফর্সা চশমা পরা, বছর কুড়ি-বাইশ হবে, নামটা মনে পড়ল: রত্না—মুখ তুলে মুচকি হাসল। মেয়েটির সঙ্গে অল্প কয়েকদিন হল আলাপ হয়েছে। এখানে আসার আগে অন্য একটি স্কুলে শর্টহ্যাণ্ড শিখত রত্না।

—অত তন্ময় হয়ে কী ভাবছেন মীরাদি? চোখ-মুখের এক বিশেষ ভঙ্গী করে রত্না হাসল। বলল, আসুন একটু চা খাওয়া যাক।

এক কথায় মীরা রাজী। এর আগেও কয়েকদিন রত্না অনুরোধ করেছে। সে কৌশলে এড়িয়ে গেছে। সব রকম ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থাকতে চায়। রত্নার কৌতূহলী দৃষ্টি সে লক্ষ্য করল। বারবার সিঁথির দিকে তাকাচ্ছে।

পর্দা ঘেরা কেবিনে ওরা মুখোমুখি বসল। চা খেতে খেতে টুকটাক কথাবার্তা হয় দুজনের মধ্যে। কথা বলছিল রত্নাই বেশি। সাবধানে জবাব দিচ্ছিল মীরা। বলা যায় না কখন অসতর্ক মুহূর্তে মুখ ফসকে রজতের কথা বলে ফেলে।

তাই এখন বেশি পরিচিত হতে চায় না মীরা। নিতান্ত সৌজন্য প্রকাশ, দেখা হলে দু-একটি কথার বিনিময়। এর বেশি অগ্রসর হয় না। অতীতকে সে ভুলতে চায়। তার সামনে এখন নতুন জীবন। অতএব নতুন-ভাবেই তার পরিচয় সুরু হোক।

রত্নার কাছ থেকে তাড়াতাড়ি বিদায় নিয়ে মীরা ট্রামে ওঠে। ভীড় ঠেলে এগিয়ে যায়। অফিস ফেরত যাত্রী বোঝাই সমস্ত ট্রাম। লেডিজ সিটের সামনে গিয়ে দেখল একটাও খালি নেই। পুরুষের ছোঁয়া বাঁচিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তাকে দেখে কে বলবে তিন বছরের বাচ্চার মা! ভাববে পরিপূর্ণ যৌবনের অধিকারী এক সুন্দরী যুবতী। যে যা খুশী ভাবুক। ফিক করে হাসল মীরা। রীতিমত রোমাঞ্চ। যেন সে ছদ্মবেশ ধারণ করে গোপন জীবনযাপন করছে!

গন্তব্য স্থানে পৌঁছে ট্রাম থেকে নেমে পড়ল মীরা। রাস্তায় দোকানে, সর্বত্র আলোর মালা। তাড়াতাড়ি হাঁটতে থাকে সে। একটা স্টেশনারী দোকানের সামনে থমকে দাঁড়ায়। বিস্কুট আর চকোলেট কিনল। রোজ নিয়ে যেতে হয়। দোকানীকে পয়সা দিয়ে চলতে সুরু করে। ফিরলেই পন্টু কান্নাকাটি সুরু করবে। তখন বিস্কুট চকোলেট এগিয়ে ধরলে কান্না থেমে যায়। সব চালাকি! আপনমনে ফিক করে হাসল মীরা। তারপর গোপনে এদিক-ওদিক তাকাল। কেউ তাকে দেখছে না।

এখানে আসার পর একটা টিউশোনী সুরু করেছে। তিনতলায় থাকে ছাত্রী। সকালের দিকে ঘন্টা দেড়েক পড়ায়। অনেক স্বস্তি পেয়েছে টিউশোনী পেয়ে। দোতলা থেকে তিনতলা উঠতে যেটুকু সময় লাগে। এছাড়া নির্ঝঞ্ঝাট সংসার। স্বামী-স্ত্রী আর একটি মেয়ে।

কারু মুখাপেক্ষী সে হতে চায় না। সে ভাই হোক আর স্বামী হোক। একটা চাকরী জোগাড় করতে পারলে তার আর পন্টুর খরচ সে কিন্নরের হাতে তুলে দেবে। দাদা নিতে না চাইলেও সে জোর করে দেবে। কোন অনুগ্রহ নয়, সসম্মানে বাঁচতে চায়।

সিঁড়ি বেয়ে উপরে ওঠার সময় মীরা টের পেল এই বিরাট বাড়ির খাঁচার মধ্যে দাঁড়িয়ে—চারিদিকে মিশ্রিত কোলাহলের ক্ষীণ রেশ ভেসে আসছে। এক মুহূর্ত মাত্র থমকে দাঁড়িয়েছিল। তারপর পদশব্দে চমকে

CENTRAL LIBRARY

উঠে হড়বড় করে সিঁড়ি ভেঙে দরোজার কাছে এসে কড়া নাড়ল।

প্রতিদিনের মত আজও মা দরোজা খুলে দেন। আজ তাঁর মুখ গম্ভীর ও থমথমে। একবার মীরার দিকে তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করে রান্নাঘরে গিয়ে ঢোকেন।

মনে মনে হাসল মীরা। তারপর দাদার ঘরের দিকে এগোয়। ভিতরে ঢোকবার আগে আপনা থেকেই শ্লথ হয়ে আসে তার গতি। টেবিল ল্যাম্প জ্বলছে। টেবিলের দুদিকে দাদা আর শেফালী মাথা নীচু করে বসে। শেফালীর পিঠ ঘেঁষে পল্টু দাঁড়ানো। বড় বড় চোখে ওদের দিক তাকিয়ে।

চটি জুতোর সামান্য শব্দ করে মীরা মৃদু স্বরে ডাকল, পল্টু সোনা! দ্যাখ, তোমার জন্যে কী এনেছি।

শেফালী পিছন ফিরে তাকাল। একটু সলজ্জ ছাপ চোখ মুখে। আড়চোখে একবার বিনয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, আসুন মীরাদি। জানেন, আজ পল্টু একটুও দুষ্টুমী করেনি। আমার কথা খুব শোনে।

তৎক্ষণাৎ পল্টু ছুটে এসে মীরাকে জড়িয়ে ধরেছে। মীরা পল্টুকে কোলে তুলে নেয়। বিস্কুট চকোলেট দেয়। তারপর হেসে বলে, একটু ভয় খা মামাকেই। দাদা, চা খাবে?

—নিয়ে আয় তাড়াতাড়ি। বিনয় মৃদু হাসল, মা খুব রেগে আছেন মনে হলো। কী করেছিস?

—ও কিছু নয়। যাই চা নিয়ে আসি।

সরে আসে মীরা। দাদার কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই। শেফালীর সামনে সংসারের ঘরোয়া ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করতে তার ভীষণ আপত্তি। যতই অন্তরঙ্গতা থাক দাদার সঙ্গে, তবু শেফালী এখনও বাইরের লোক। ওরা দুজনে মাথা নীচু করে কী ভাবছিল? নাকি নীরব ভাষায় পরস্পরকে প্রেম নিবেদন করছিল?

পল্টু অনর্গল কথা বলছিল। মাঝে মাঝে চিৎকার। মীরা ধমকের সুরে বলে, ফের দুষ্টুমী সুরু করেছো! চুপ করো। তোমার কোন কথা শুনবো না। দুষ্টু কোথাকার!

কেঁদে উঠলে ছেলেকে বুকে চেপে ধরে মীরা। তারপর রান্নাঘরের দিকে এগোয়। মা চিরটা কাল কী নিজের জেদের বশে চলবেন? তাঁর মনোমত কোনকিছু না হলেই মুখ থমথমে হয়ে ওঠে। কথা বন্ধ। ফলে অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি।

কিছু ভাল লাগে না। ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে মীরা। পল্টুর ফোঁপানী থেমেছে। দুচোখ বুজে আসছে। ওকে বিছানায় শুইয়ে দিল। পরে ডেকে খাওয়াবে। হাঙ্গামা হবে আর কি।

কতদিন বলেছে মাকে, 'তুমি বিশ্রাম কর। রান্নাবান্না সব আমিই দেখবো।' কিন্তু শুনতে চান না মা। যেন রান্নাঘর তাঁর সাম্রাজ্য। সেখানে অন্য কারুর প্রবেশাধিকার সহ্য করবেন না। এছাড়া কী! তুমি মা, আগের দিন ভুলে যাও। এখন তোমার অন্যায় আব্দার মানবো না।

—মা!

পর পর কয়েকবার ডাকল মীরা। মা উনুনের সামনে চুপচাপ বসে। একবার পিছন ফিরে মেয়েকে দেখলেন। পরক্ষণেই চোখ ঘুরিয়ে নেন। তীব্র বিদ্বেষে মনটা বিষিয়ে ওঠে মীরার। এমন করলে কতদিন এখানে থাকতে পারবে তা সে জানে না। ধৈর্যের একটা সীমা আছে। তাও টগবগ করে ফুটছে। সেদিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল সে। আর টের পেল বুকের ভিতর ঢিবঢিব শব্দ। এবং একটা অসহ্য জ্বালা।

—তুমি ওঠ মা। আমি রান্না করছি।

—থাক! আর দরদ দেখিয়ে কাজ নেই।

—মা! মীরা আহতকণ্ঠে বলল, কেন এমন ব্যবহার করছো আমার সঙ্গে। কী অপরাধ করেছি?

—তোমরা সবাই ভাল। মন্দ শুধু আমি।

আর কথা বাড়াবার প্রবৃত্তি হলো না মীরার। এখন কথা বলা মানে পরস্পরকে আক্রমণ করা। কুৎসিত ঝগড়া শুরু হয়ে যাবে। শেফালী শুনলে ভাববে কী!

—দাদা চা-এর কথা বলেছে। মীরা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আসে। সোজা গিয়ে ঢোকে শোবার ঘরে। পল্টুর পাশে শুয়ে পড়ে। শাড়ি-ব্লাউজ পাল্টাবার কথা ভুলে বিক্ষিপ্ত মেজাজ নিয়ে সে চুপচাপ শুয়ে থাকে।

নীহার দুকাপ চা টেবিলের উপর রেখে বেরিয়ে আসছিলেন। বিনয় বলল, মীরা কোথায়?

—জানি না। নিস্পৃহ উত্তর দিয়ে তাড়াতাড়ি চলে যান।

বিনয় হেসে তাকাল শেফালীর দিকে, চা খাও। এখনো মার রাগ কমেনি।

—কার উপর রাগলেন? বলে পরক্ষণেই শেফালী ভাবল তার হয়তো কথাটা জিজ্ঞেস করা উচিত হয়নি।

—কখনো আমার উপর রাগেন, কখনো মীরা। কারণ কী জিজ্ঞেস করো না। অধিকাংশ সময়ই কোন নির্দিষ্ট কারণ থাকে না। মা যুক্তি মানেন না। আবেগকে আশ্রয় করে চলেন। ফলে গণ্ডগোল। তুলকালাম কাণ্ড ঘটে যায়।

শেফালী নীরবে শুনল। এদের পারিবারিক ব্যাপারে তার বলবার কিছু নেই। বলাও উচিত নয়।

সে কিছুটা শুনেছে। স্বামীর সঙ্গে মীরার বিচ্ছেদ, ছেলেকে সঙ্গে করে এখানে চলে আসা, টাইপ সর্ট-হ্যাণ্ড শেখো, চাকরীর চেষ্টা করা ইত্যাদি। বিনয়দা বলেছে। শুনতে চায়নি সে। এসব শুনতে তার ভাল লাগে না। মাঝে মাঝে ভাবে কেন এমন হয়? সংসারে এত অন্যায়, এত অবিচার কেন? সুখে থাকার জন্যে এত চেষ্টা নরনারীর, তবু তাদের বিচ্ছেদ হয়, তারা নিজেদের অসুখী মনে করে। ব্যাপারটা রীতিমত জটিল তার কাছে।

—কী ভাবছো শেফালী?

—কিছু না। সোজাসুজি তাকাল বিনয়দার দিকে। বিনয়দা যখন পড়ায়, সে নতচোখে শোনে। তবু সে টের পায় তার মুখের দিকে অপলকভাবে তাকিয়ে থাকা দুটি ব্যগ্র চোখের অস্তিত্ব। তখন সে অনুভব করে মৃদু কম্পন সমস্ত শরীরে। মনে হয় পায়ের নীচে মাটি কাঁপছে। বুকে ঢিবঢিব শব্দ। স্বীকার করতে লজ্জা হয়। তবু মনে হয় বিনয়দাকে সে......। ছি!

—চলো একটু গঙ্গার ধার থেকে ঘুরে আসি।

—এখন? শেফালী অবাক দৃষ্টিতে তাকায়, ছি! মাসিমা কী ভাববেন বলুন তো।

খানিকক্ষণ দেখল বিনয়দাকে। মুখে মৃদু হাসি। মাঝে মাঝে অদ্ভুত ঠেকে ওর ব্যবহার। ইদানীং কথাবার্তার ভাবভঙ্গিতে যে আভাষ সে দেখতে পেয়েছে, তাতে আর কোন সন্দেহ নেই। ভাবতেই শেফালীর সমস্ত দেহে ভূমিকম্প ঘটে যায়!

টেবিলের তলা দিয়ে কোলের উপর রাখা শেফালীর একটা হাত বিনয় মুঠোর মধ্যে জড়িয়ে নিল। টের পেল থর থর করে কাঁপছে শেফালীর হাত। হেসে বলল, মা কিছু ভাববেন না। বরং খুশি হবেন।

—কেন? ভান করল শেফালী। সব সে জানে। জানে মা-বাবার মনোভাব। জানে মাসীমা কী চান। ইদানীং অনুভব করছে বিনয়দারও কিছু চাওয়ার আছে। সে কী এসব চায় না? যেন ঘুমের মধ্যে কে তাকে ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে দিল। ফলে বিভ্রান্ত সে।

চাপাকণ্ঠে শেফালী বলল, হাত ছাড়ুন বিনয়দা। মাসিমা এসে পড়তে পারেন।

—আসুক। বিনয়ের তেমনি হাসিমুখ, দেখে তাঁর রাত্রের ঘুম আরও ভাল হবে।

—কেন? নিরীহকণ্ঠে শেফালী প্রশ্ন করল। বেশ ভাল লাগছে এরকম ছলনার আড়ালে লুকিয়ে থাকতে। এত তাড়াতাড়ি সবকিছু স্পষ্ট হওয়া ভাল নয়। তাই বিনয়দা যখন আকার-ইঙ্গিতে অনেক কথা বলতে চায়, সে না-বোঝার ভান করে। যদিও ভালভাবে জানে তার এই ছলনা বা ভান সব টের পায় বিনয়দা।

(ক্রমশ)

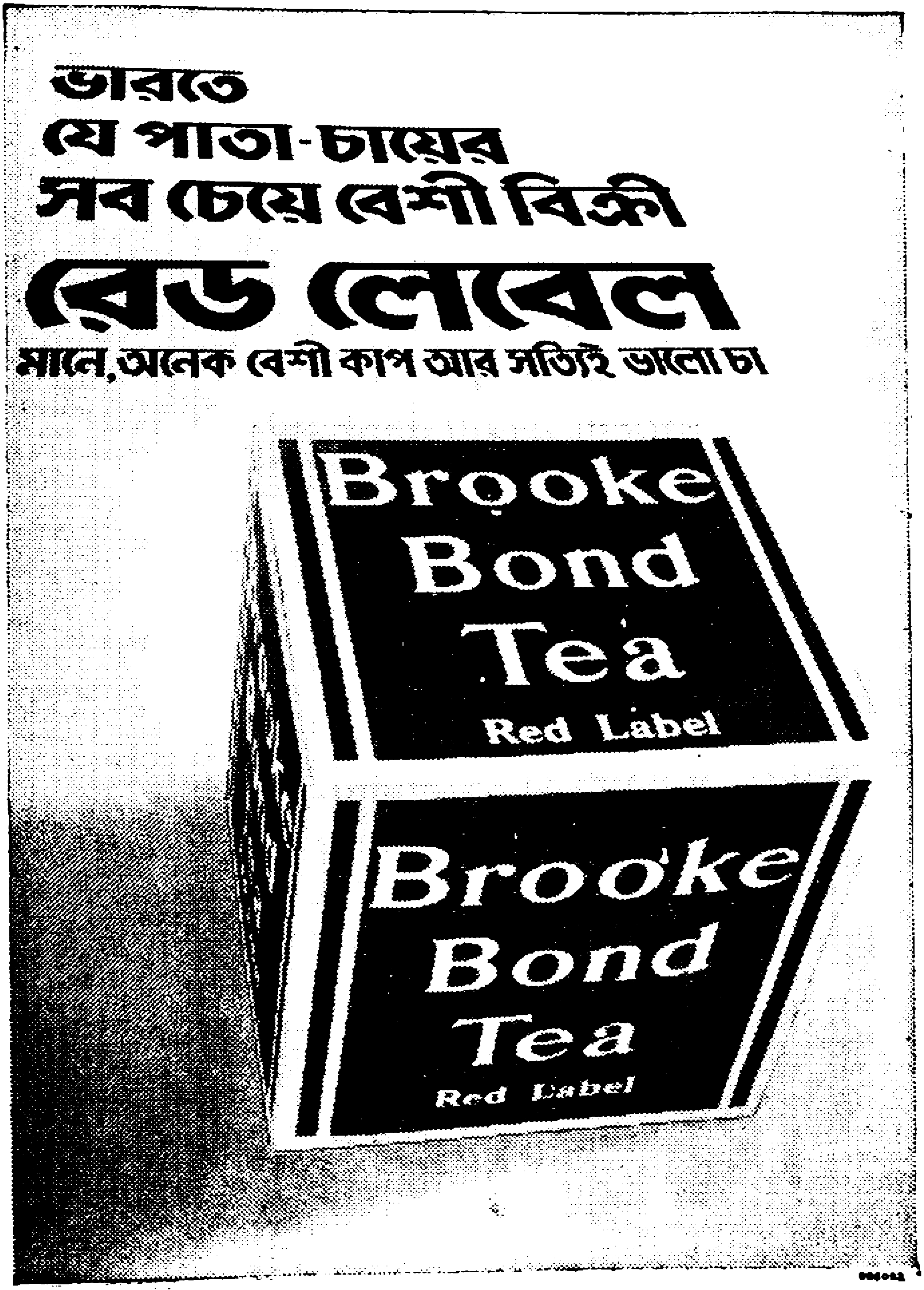
ভারতে
যে পাতা-চায়ের
সব চেয়ে বেশী বিক্রী
রেড লেবেল
মানে, অনেক বেশী কাপ আর সত্যিই ভালো চা
Brooke
Bond
Tea
Red Label
Brooke
Bond
Tea
Red Label

CENTRAL LIBRARY

অঙ্গনা

যখন শিশুরা খেতে চায় না

মায়ের আকাঙ্ক্ষা, সুস্থ-সবল এবং বলিষ্ঠ সন্তান। সন্তান ধারণের পর থেকেই হবু মায়ের মনে এই চিন্তা ঘোরাফেরা করে। যতদিন না সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় ততদিন একই ভাবনা। ঘরের দেওয়ালে টাঙানো ক্যালেন্ডারে কেমন বেবিফুডের বিজ্ঞাপনে নাদুস-নুদুস শিশুকে দেখে তিনি মনে মনে কল্পনা করেন, এমনি সন্তান তার ঘরও আলো করবে। সন্তানবতী রমণীর এছাড়া দ্বিতীয় চিন্তা নেই।

পরিপূর্ণ লগ্নে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর মায়ের চেয়ে সুখী বোধ হয় আর কেউ নেই। এবারে তাঁর ভাবনা মোড় নেয়। সন্তান দেখে চোখ জুড়িয়েছে। সন্তানকে মানুষ করে তোলাই এখন প্রশ্ন। সেই প্রশ্নেরও তিনি একটা সমাধান করে ফেলেন মনে মনে। এসব তাঁকে খুব একটা শিখিয়ে দিতে হয় না। সন্তান পেটে আসার পর থেকেই একে ঘিরে তার স্বপ্নের আনাগোনা। আর এখন তো পুরোপুরির মাতৃত্বের মহিমা। নিজের সন্তানকে মানুষ করার আনন্দে তিনি মশগুল। তদুপরি ঠেকাতে বুড়ী শাশুড়ী তো আছেনই।

রুটিন ঠিক হয়ে গেছে। সন্তান পরিচর্যার দায়িত্ব মায়ের নিজের হাতেই। নিয়মিত চান। ঘড়ি ধরে খাওয়ানো। রুটি-বিচ্যুতির বিন্দুমাত্র ফাঁকফোকর নেই। শিশু দিব্যি হেসে খেলে বড় হচ্ছে। মায়ের আনন্দ আর ধরে না। দু-দিন পরেই শিশু পৃথিবীর পাঠশালায় হাঁটি-হাঁটি পা-পা করে অবাধে নিজের জায়গা করে নেবে। একান্ত সুস্থির হয়ে চোখ বুজলে মা সেই স্বপ্ন স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করেন। আর আনন্দে আত্মহারা হয়ে সবাইকে অংশীদার করেন।

কিন্তু মাঝে মাঝে বড় গোল বাধে। সময় মতো চলা। ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে মিলিয়ে। তবু খাবার সময় সে বড় বেঁকে বসে। খেতে চায় না। তার হাজার বায়না মা পূরণ করতে রাজি। এমন কি আকাশের চাঁদ ধরে দিতেও পেছপা নন। শিশু তাতেও বাগ মানে না। সে যেন জেদ ধরেছে, কিছুতেই খাবে না এবার মাও প্রসঙ্গ বদলান। রাজপুত্র, কোটালপুত্র আর পক্ষীরাজ ঘোড়া এসে উপস্থিত হল। শিশুকে গল্পে গল্পে নিয়ে হাজির করেন অচিনদেশের রাজকুমারীর কাছে। সেখানে রাক্ষস-খোক্কস। এবার শিশুর মন গলে। খেতে রাজী হয়। অথবা মায়ের চালাকির কাছে হেরে গিয়ে দেখে যে সবটুকু খাবার কখন শেষ হয়ে গিয়েছে।

এক-একদিন সব চেষ্টাই ব্যর্থ। মায়ের কোন কারসাজিই আর খাটে না। সে খেতে একদম নারাজ। মা কিন্তু হারবার পাত্র নন। মিষ্টিকথায় কাজ না হলে তিনি আসল ওষুধে হাত বাড়ান। এক ঘা বসিয়ে দেন শিশুর পিঠে। ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে কাঁদতে কাঁদতে পাড়া মাথায় করে খেয়ে নেয়। আর সে তো খাওয়া নয় জোর করে গেলানো।

মায়ের জেদ জিতে যায়। খেয়ে তবে নিষ্কৃতি। খাওয়া দেখলেই অরুচি প্রকাশ করার কোন উপায় নেই। কারণ, মায়ের মনে তো সেই বেবি ফুডের বিজ্ঞাপনওয়ালা ক্যালেন্ডারের শিশুটির কথাই ভাসছে। তাঁর শিশু যদি না খায় তবে ওরকম চেহারা হবে কি করে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে পড়ে যায় আশেপাশের বাড়ির হৃষ্টপুষ্ট বাচ্চাদের কথা। তাঁর শিশুও তেমনটি হোক। রোগা হাড়-জিরজিরে শরীর নিয়ে ওদের পাশে দাঁড়ালে সে কোন রকমে এঁটে উঠতে পারবে না। ওরকম না হলে কেউ আদর করে তাঁর শিশুকে কোলেও করবে না। সবাই দূরে-দূরে রাখতে চাইবে। তাতে মায়ের অপমান। ওবাড়ির বাচ্চাটিকে সবাই কি রকম কোলে নিয়ে আদর করে। ওর মায়ের কত গর্ব। তিনিই বা পিছিয়ে থাকবেন কেন?

এই নিয়মের যাঁতায় পড়ে অনেক শিশুরই প্রাণ আইঢাই। শিশু অনিচ্ছা প্রকাশ করে। জোর-জবরদস্তির সামনে গিলেও নেয়। মা কিন্তু কোন দিনই শিশুর এই খাওয়া না খাওয়ার গোপন রহস্যটুকু ভেদ করার চেষ্টা করেন না। তাঁর কাছে এক কথা। সোজা কথায় তিনি যা বোঝেন, খেতে হবে। আর না খেলে শরীর হবে কি করে। তাই তিনি নিজের কাজ করে যান। সেই রুটিন ওয়ার্ক। একবারও তিনি বুঝলেন না যে, যার জন্য এত করা এতে আখেরে তার কোন লাভই হচ্ছে না। কিন্তু দু'দিন পরেই তিনি এর পরিণাম হাড়ে হাড়ে টের পাবেন। শিশুর অবস্থা হবে সেদিন থলথলে চর্বির বস্তা। তখন মা কতটা খুশি হবেন বলা শক্ত।

শিশুদের জোর করে খাওয়ানোর প্রচেষ্টা আমাদের দেশে চলে আসছে দীর্ঘদিন। সম্প্রতি একটি ডাক্তারী পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, শিশুদের জোর করে খাওয়ানো অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। এতে শিশুর ভালর চেয়ে খারাপই হয় বেশি। শিশুরা যখন খেতে চাইবে না তখন ধরে নিতে হবে এখন খাওয়ালে তা হবে তাদের পক্ষে প্রয়োজনাতিরিক্ত। এবং এর কুফল অবশ্যই। এই অভিমত হলো পশ্চিম জার্মানীর পুষ্টি বিশেষজ্ঞ ও শিশু চিকিৎসক ডঃ ভারনার ড্রোয়েসের। তিনি বেশ কিছুদিন ধরে শিশুদের খাদ্যাভ্যাস নিয়ে গবেষণা করছেন। ডঃ ড্রোয়েস ডর্টমুণ্ডে শিশুদের পুষ্টি বিষয়ক রিসার্চ ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর। সারা পৃথিবীতে এ ধরনের প্রতিষ্ঠান একটি। শিশুদের কি খাওয়া উচিত বা তারা যা খায় তাতে তাদের অর্গানিজমে কি রকম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়, সেই বিষয়ে মূলগত গবেষণা এখানে করা হয়।

তাঁর মতে, অত্যধিক আশাবাদী মায়েরা শিশুদের প্রয়োজনাতিরিক্ত খাওয়ান। মনে ভাবেন, শিশুরা মোটাসোটা হলেই স্বাস্থ্যবান হবে। তাহলে অসুস্থতা তাদের ধারে-কাছে ঘেঁষতে পারবে না। রোগা শিশুদের কি রকম সন্দেহের চোখেই না দেখা হয়। মনে করা হয়, হতভাগা বাচ্চাটা বোধহয় প্রায়ই অসুস্থ থাকে। তা সত্ত্বেও কম খায় যেসব শিশু তারা মোটেই সমস্যাবহ হয়ে ওঠে না। বরং তাদের আচরণ থাকে পুরোপুরি স্বাভাবিক। সবকিছু মুখে দেয় সেসব শিশুই যাদের ভালভাবে শিক্ষা দেওয়া হয় না।

ডর্টমুণ্ডের পরীক্ষাধীন বাচ্চারা তাদের ইচ্ছে অনুযায়ী কোন দিন কম বা কোন দিন বেশি খায়। ডঃ ড্রোয়েসের বিশিষ্ট নীতি হলো, শিশুরা খেতে পারে। তার জন্য সব সময়ই তাকে খাওয়াতে হবে এর কোন মানে নেই। সেখানে শিশুদের সব সময় রাখা হয় নিয়ন্ত্রণাধীনে। নিয়মিত মাপ ও ওজন করা হয়। এই অভিযানের লক্ষ্য হলো: প্রায় ২০ হাজার এরকম মাপ-জোখ ও ওজনের পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে একটি ফলপ্রসূ খাদ্য পরিকল্পনা ও শিশুর পরিপূর্ণ বাড়নের জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর উপাদান সমন্বিত নতুন পথ্য তৈরী করা হবে। খাওয়ার ব্যাপারে সমস্যা সৃষ্টিকারী শিশুদের নিয়ে বিব্রত পৃথিবীর সব জায়গার মায়েদের সাহায্য করার জন্য ডর্টমুণ্ডের শিশু চিকিৎসকদের কতগুলি ভাল উপদেশ এবং নির্দেশ আছে।

তাঁরা বলেছেন, দুর্বল স্নায়ু বিশিষ্ট স্কুল শিশুদের জলখাবার খাওয়ার জন্য জোর না করাই উচিত। শিশুকে একলা খেতে না দিয়ে মা-বাবার উচিত তাদের সঙ্গে একত্রে খাওয়া। শিশুদের থালাটি কানায় কানায় ভরে দেওয়া ঠিক নয়—সে আরও চাইতে পারে এমন সুস্বাদু এবং সুদৃশ্য খাদ্য দেওয়া উচিত। বিবেচনা করে পরিমাণ মত খাদ্য দেওয়াই ভাল। কখনো খাওয়ার জন্য জোর করা খুবই ভুল। শরীরে অত্যধিক চর্বি হওয়া শিশুর স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। আর মাঝে মাঝে শিশুর যে অরুচি লাগে তা একান্তই স্বাভাবিক এবং প্রায় প্রত্যেক শিশুর ক্ষেত্রেই এটা দেখা যায়।

—প্রমীলা

গোয়েন্দা কবি পরাশর • প্রেমেন্দ্র মিত্র রচিত শৈল চক্রবর্তী চিত্রিত

ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্য

জলসা

স্রষ্টা উদয়শঙ্কর স্বয়ং নেই। মঞ্চনৃত্য ছাড়াও শঙ্করের রাজকীয় মর্যাদাপ্রাপ্ত 'রামলীলা', বর্ণসমৃদ্ধ 'বুদ্ধজীবনী' কবিগুরুর 'সামান্য ক্ষতি' ও 'প্রকৃতি অনন্দ' শুধু ভারতেরই নয়, সারা জগতের কলারসিক মহলে সমাদৃত হয়েছে। শিল্পী উদয়শঙ্কর ঐ সাফল্যে তৃপ্ত, কিন্তু স্রষ্টা উদয়শঙ্কর? তিনিও কি পূর্ণতার পৌঁছনর আনন্দে মগ্ন? তারই উত্তর পাওয়া গেল গত সপ্তাহে অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসে উদয়শঙ্কর আহূত সাংবাদিক সম্মেলনে। কীর্তিমান তাঁর কীর্তিস্তূপের সামনে দাঁড়িয়ে অতৃপ্ত ক্ষোভের সঙ্গে বারবার চিন্তা করছেন—এমনকি অভিনব শিল্পসৃষ্টি করা যায় যা কারো স্বপ্নে, কারো কল্পনাতেও স্থান পায়নি?

'গত কুড়ি বছর ধরে আমি শুধু ভেবেছি আর ভেবেছি। তারপর হঠাৎই একদিন মনে এল—মঞ্চ, পর্দা ও ম্যাজিকের সমন্বয়ে এই শিল্পকল্পনা—শঙ্করস্কোপ। যখন ভেবেছিলাম, তখন সারা পৃথিবীতে কোথাও-ই এর বাস্তব রূপায়ণ ঘটেনি। কিন্তু আমি অক্ষম, অর্থাভাবে যা পারিনি এখন কোনো কোনো দেশ (চেকোস্লোভাকিয়া, রাশিয়া) এ-কল্পনার বাস্তব রূপ দিয়েছে। তবে সান্ত্বনা এই আমাদের দেশে আমিই প্রথম এই চলচ্চিত্র ও নাট্যরূপের সমন্বয় সম্পন্ন করছি'—অসুস্থতা ও বয়সের বাধা অতিক্রম করে শঙ্করের দুই চোখে যেন তারুণ্যের দীপ্ত আলো জ্বলে উঠল। আবেগভরে তিনি বলে চলেন, 'এ শুধু স্টান্ট নয়। এর মধ্যে শিক্ষণীয় এবং সংস্কৃতিবান রসিক চিত্তের অনুধাবনীয় বহু বিষয় থাকবে।'

চলচ্চিত্র ও মঞ্চের মিলন কিভাবে ঘটবে?—সমবেতের প্রতিনিধির এই প্রশ্নের জবাবে শঙ্কর বললেন—'আমার এখনও নাচতে ইচ্ছে করে এবং এখনও পারি। কিন্তু ডাক্তারের নিষেধ, তাই 'কল্পনা' চিত্র থেকে নেওয়া আমার একটি নাচ পর্দায় দেখানো হবে আর স্টেজে নাচবেন আমার সম্প্রদায়ের শিল্পীরা। এইভাবে সমান্তরাল ভাবে পর্দা ও মঞ্চনৃত্য চলবে, একটি অন্যের পরিপূরক হবে।'

'আপনার কোন্ নাচ? জগদ্বিখ্যাত 'কার্তিকের নৃত্য' নয়তো?'

আমাদের প্রশ্নের উত্তরে শিশুর মত সরল হেসে শঙ্কর বললেন, 'সেইটিই'।

'আর ম্যাজিকের ব্যাপারটা?'

'যেমন ধরুন, প্রথমে যৌবনোচ্ছল সুন্দরী তরুণীদের রূপ ফুলের মত পর্দার বুকে ফুটে উঠল, তারপর যৌবন-অন্তে তাঁরা প্রৌঢ়া হয়ে মঞ্চের বুকে দাঁড়িয়ে পর্দার ছবির দিকে চেয়ে দীর্ঘশ্বাসে গাইছেন 'আমরা ছিলাম সবাই সুন্দরী'—অথবা স্ত্রী স্বামীকে বলছেন 'আরে আরে টুপি না পরে বেরোচ্ছ যে?' বলে স্ক্রীনের স্ত্রী মঞ্চে দাঁড়ানো স্বামীকে টুপি পরিয়ে দিলেন। ছবির টুপি রিয়েল টুপি হয়ে স্বামীর মাথায় চলে এল।—এইরকম নানান মুহূর্ত।

শঙ্করস্কোপের নামকরণ প্রসঙ্গে জানা গেল বহু বছর আগে 'রামলীলা' দেখার পর অমৃতবাজার পত্রিকার স্তম্ভলেখক পরলোকগত রায়জী উদয়শঙ্করের সঙ্গে দেখা করে বলেন 'মিঃ শঙ্কর যা দেখলাম অপূর্ব। কিন্তু একটু ভুল হয়ে গেছে। এর নাম হওয়া উচিত ছিল 'শঙ্করস্কোপ'। আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধুর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধানিবেদনের জন্যই আমার নতুন প্রোডাকসনের নাম রেখেছি 'শঙ্করস্কোপ।' উজ্জ্বল মুখে শঙ্কর বললেন।

শঙ্কর স্কোপের সংগীত পরিচালনায় আছেন উদয়শঙ্করেরই বহু বছরের আন্তর্জাতিক খ্যাতিমান শিল্পী কমলেশ মিত্র। গান রচনা করেছেন গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। তাছাড়া সচ্চিদানন্দন পান্ডে [illegible] গান নেওয়া হয়েছে। 'যাব [illegible] অনেক অসুবিধা সত্ত্বেও যে এ [illegible] পারি করতে পেরেছি তারজন্য আমি রাজ্যসরকার

কর্কারিতার অর্থানুকূল্যের কাছে ঋণী। তা ছাড়া আমার গ্রুপের প্রতিটি শিল্পী তাঁদের পরিশ্রম, নিষ্ঠা ও আনুগত্য দিয়ে আমায় সাহায্য করেছেন।

বিদেশ সফরান্তে ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্য : ওস্তাদ আলি আকবর খাঁর সঙ্গে আমেরিকায় তাঁর 'আলি আকবর কলেজ অফ মিউজিক'-এ শিক্ষকতা করবার সহায়ার্থে গিয়েছিলেন তিমিরবরণের সুযোগ্য পুত্র—তরুণ সেতারবাদক ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্য। গত শুক্রবার রকসি সিনেমাচারে আহূত এক সাংবাদিক সম্মেলনে ইন্দ্রনীল তাঁর বিদেশের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। তিনি প্রায় ৪৫ মিনিটের অনুষ্ঠানে সেতার বাজিয়ে শোনালেন। সঙ্গে তবলাসঙ্গতে ছিলেন অমর দে। ইনি প্রথমে বাজালেন ইমন কল্যাণ। কল্যাণ ঠাটে আরম্ভটি সুন্দর এবং সময়োপযোগী। সংক্ষিপ্ত আলাপনে রূপাভাসের পর ইনি বিলম্বিত ও দ্রুত গৎ বাজালেন তিন তালে। সময় সংক্ষিপ্ততার কারণেই বোধহয় শিল্পী বিস্তারের চেয়ে তানের অঙ্গেই মন দিয়েছেন বেশী এবং সফলও হয়েছেন। নানা ছাঁদের ছুট তানের চমক, সাপট-তান ও ঝটকার শিল্পীর কঠিন রেওয়াজ-জাত হাতের অনায়াসদক্ষতা ছাড়াও যে-বস্তু বিদ্যুৎ-ঝলকের মত উঁকি দিল, সে হোল বর্ণপিয়াসী মনের রঙিন কল্পনা। ইমন কল্যাণের উপস্থাপন-পদ্ধতিতে বিলায়েৎ খাঁর রীতির প্রভাব-ই সর্বাধিক এবং ধ্রুপদাঙ্গের চেয়ে খেয়ালের অঙ্গিক বেশী। কিন্তু উপসংহারীর 'কাফি' যেন প্রথম থেকেই রবিশঙ্করের কল্পনার আলোয় উজ্জ্বল। মীড়ের সূক্ষ্ম কাজ, রং-বাহারের জমজমা ও কৃন্তন অঙ্গের মাধুর্যে কাফির রোমান্টিক উজ্জ্বলতা যেন শতধারে উৎসারিত হয়েছে। জমজমা-সমৃদ্ধ টপ্পা অঙ্গে বাজানোর দরুণই বোধহয় কাফির যথার্থ রসরূপটি ফুটে ওঠে। অমর দে-র তবলাসঙ্গত যথাযোগ্য।

নানা সুরের মেলায় : মেগাফোনের এস পি রেকর্ডে সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের দুটি গানে শিল্পীর সঙ্গীতভাবনার এক বর্ণোজ্জ্বল রূপ যেন ফুটে উঠেছে। একটি হোল 'যদি সহেনা আমায়'—গানটিতে মিশ্র মান্দ-এর পাহাড়ী ধুনে একাধারে বিষণ্ণতা ও ছন্দের নাটকীয়তায় শিল্পীর কারিগরীর এক নতুন দিক উদ্ভাসিত। 'না বলে কেন চলে যাও'-তে ভৈরবী ও চন্দ্রকোষের মিলনে একাধারে কারুণ্য ও মাধুর্যের আস্বাদ মেলে। গানদুটি লিখেছেন পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়। শিল্পীজায়া উৎপলা সেন (মুখার্জি) সতীনাথের সুরে গেয়েছেন বিরহ-উদাসতায় 'তুমি কত সহজে ভুলে গিয়েছ আমায়' এবং নচিকেতা ঘোষের সুরে 'কিংশুক ফুল হিসেবে জানি'। শেষের গানটির ছন্দবৈচিত্র্য ও সহজ কথার শিল্প-সুন্দর প্রয়োগ মন টানে। শিল্পীর সুরেলা কণ্ঠে পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত গানদুটি অত্যন্ত উপভোগ্য হয়েছে। হিমাংশু বিশ্বাস রচিত একটি গানের সুর মনকে যেন দুলিয়ে দেয়। গানটি হোল তরুণ শিল্পী শ্যামাশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠের 'চুপিচুপি কাছে ডাকো, ভ্রমরী গো তোমায় ছাড়া' সুরটিতে হিমাংশুবাবুর রসাভাসের বৈচিত্র্যসৃষ্টি লক্ষ্য করবার মত। গান-রচয়িতা লক্ষ্মীকান্ত বসুরায়। এছাড়া বেশ কয়েকজন তরুণ শিল্পীকে এঁরা সুযোগ দিয়েছেন এবং তাঁদের মধ্যে প্রতিশ্রুতির আভাস আনন্দদায়ক। এঁরা হলেন অরুণ ঠাকুর ('দুচোখে কি এত কথা' ও 'আমায় অমন করে ডেকো না' ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'এমন করেও তুমি বাহুবন্ধে রেখো')। রঞ্জিত বসু (চারুলতা বনলতা ও বহুদিন পরে)। অমলেন্দু চক্রবর্তী (ময়ূরপঙ্খী নৌকা আমার ও তোমায় নিয়ে যাব ওগো) ছায়া মুখোপাধ্যায় ('আমার এ কাবা' ও 'যদি আমি হতাম ওগো')—রচয়িতা ও সুরকার হিসাবেও অনেক নতুন নাম চোখে পড়ল। এ-প্রচেষ্টা অভিনন্দনীয় নিশ্চয়। ই, পি রেকর্ডে, কানন দেবী-র অতুলনীয় কণ্ঠের চারটি চিত্রগীতি এক অমূল্য সম্পদ। কথা ও সুরের মিলন শিল্পীর পরিশীলিত উচ্চারণ যেন কথার অন্তরে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে প্রতিটি শব্দকে জীবন্ত করে তোলে। এর সঙ্গে মিলেছে তাঁর রঙিন মনের আবেগ ও স্বর-মাধুর্য। এতগুলি বস্তুর সমন্বয় বিরল বলেই মনে এমন দাগ কাটে তাঁর 'আমি বনফুল গো' 'যদি আপনার মনে', 'যদি ভাল না লাগে' ও শাহজাহানের 'প্রেম যেন' তথা—শেষ উত্তর ও যোগাযোগের চারটি গান। রবীন মজুমদারের চারটি চিত্রগীতি সংকলন 'আমার আঁধার ঘরে প্রদীপ' 'মোর প্রেমগান' 'এই কি গো শেষ দান' তারে চিনি চিনি' তাঁর গৌরবোজ্জ্বল দিনের স্মারকরূপে বিশেষ মূল্যের অধিকারী।

পরলোকগত ভবানী দাসের ৪টি শ্যামাসঙ্গীত সংগ্রহে সঙ্গীত ও শিল্পী উভয়ের প্রতিই যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শিত। ইলেকট্রিক গীটারে বাজানো বটুক নন্দীর ৪টি রবীন্দ্রসঙ্গীত শ্রুতিমধুর।

আর এক উল্লেখযোগ্য বস্তু হোল জহর রায়ের কৌতুকনকশা 'ঘেরাও'। হাসির ভঙ্গীতে বর্তমান যুগের একটি সমস্যার প্রতি কৌতুক-করুণ আলোকপাতে জহর রায়ের চিন্তাশীল মনটি ব্যক্ত। এঁর সঙ্গে যথোপযুক্ত সহায়তা করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

সুরসভা : গত ১০ নভেম্বর বালিগঞ্জ-স্থিত রবিতীর্থ ভবনে দক্ষিণ কলিকাতার সাংস্কৃতিক সংস্থা সুরসভার বিজয়া সম্মেলন শ্রীমতী অনিমা সরকারের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে আয়োজিত সঙ্গীতানুষ্ঠানে রবীন্দ্রসঙ্গীত, নজরুলগীতি, হিমাংশুগীতি, শ্যামাসঙ্গীত, ভজন প্রভৃতি পরিবেশিত হয়। এতে অংশ নেন সুস্মিতা রায়চৌধুরী, মণিদীপা শ্যাম, হাসি দত্ত, দীপ্তি রায়, প্রবীতা শীল, ইন্দিরা গুপ্ত, অমিতা গুপ্ত, শীলা সেনগুপ্ত, চিত্রা সিনহা, তোড়া সরকার, অদিতি বসু, কৃষ্ণা দাশগুপ্ত, রত্না রায়, কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়, চৈতালী ঘোষ ও উর্বশী নিয়োগী। সবশেষে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসরে প্রথমে মালকোষ রাগে খেয়াল গেয়ে শোনান বাণিত মিত্র। এর পর গৌরবসাক নারায়ণী রাগে খেয়াল পরিবেশন করে উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর আনন্দ বর্ধন করেন। এঁদের সঙ্গে তবলায় ও হারমোনিয়ামে সহযোগিতা করেন দুলাল ভট্টাচার্য, কিশোর নন্দী, শম্ভু পাল, স্বপন মুখোপাধ্যায় ও রথীন চৌধুরী। হরিদাস দত্ত কর্তৃক ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পর অনুষ্ঠানটি শেষ হয়।

বিচিত্রানুষ্ঠান : গত ১৩ নভেম্বর শুক্রবার সন্ধ্যায় নবজাগরণের পরিচালনায় লালাবাগান ময়দানে একটি সারারাত্রিব্যাপী বিচিত্রানুষ্ঠান সুসম্পন্ন হয়। অনুষ্ঠানে যে-সব শিল্পী অংশগ্রহণ করেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন শান্তি মিত্র চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, অনুপ ঘোষাল, ইলা বসু, মাধুরী চট্টোপাধ্যায়, মীরা বিশ্বাস ও বুবাই বিশ্বাস, পিন্টু ভট্টাচার্য, লক্ষণ হাজরা, বনশ্রী সেনগুপ্ত, বাসুদেব ঘোষদস্তিদার, অধ্যাপক দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, মাঃ তপন দেব, মৃণাল মুখার্জি ও দেবব্রত বিশ্বাস। এছাড়া কৌতুক-গীতিতে মিন্টু দাশগুপ্ত, হরবোলা—শৈলেন সাহা, মূকাভিনয়ে তপন দত্ত, যন্ত্রসঙ্গীতে লিটল বিটলস। অনুষ্ঠান পরিচালনায় ছিলেন সুপ্রকাশ বসু এবং ঐদিনের বিশেষ আকর্ষণ ছিল অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ভারতের প্রখ্যাত সুরকার সলিল চৌধুরী।

সাংস্কৃতিকী আগামী ২১ নভেম্বর সত্যব্রত ভট্টাচার্যের বাড়ী, ১৬১, শাস্ত্রী নরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী রোড, হাওড়া-৪ সন্ধ্যায় ঘরোয়া অনুষ্ঠানে অতুলপ্রসাদের গান আলোচনাসহযোগে পরিবেশন করবেন শ্রীসুশীল চট্টোপাধ্যায়।

—চিত্রাঙ্গদা

ষ্টারে
[শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত নাট্যশালা]

শ্যামলী

নাটকীয় সংঘাতে ও আঙ্গিক-মাধুর্যে অনুপম!

প্রতি বৃহস্পতি ও শনিবার : ৬টায়
প্রতি রবিবার ও ছুটির দিন : ২॥টা ও ৬টায়

॥ রচনা ও পরিচালনা ॥
দেবনারায়ণ গুপ্ত

॥ রূপায়ণে ॥
অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, অপর্ণা দেবী, নীলিমা দাস, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, সতীন্দ্র ভট্টাচার্য, দীপিকা দাস, শ্যাম লাহা, প্রেমাংশু বসু, বাসন্তী চট্টোপাধ্যায়, কালিদাস সান্যাল, গীতা দে ও বঙ্কিম ঘোষ।

প্রেক্ষাগৃহ

গীত / রাজেন্দ্রকুমার, মালা সিনহা

আর একটি বাংলা ডাবিং-করা পৌরাণিক চিত্র

মাদ্রাজ প্রভৃতি ভারতের দক্ষিণাঞ্চলে প্রস্তুত বহু রামায়ণ ও মহাভারতনির্ভর পৌরাণিক কাহিনী-চিত্র মূল তামিল বা তেলেগু ভাষাকে বাদ দিয়ে ডাবিং-করা সংলাপ ও গান যুক্ত হয়ে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন চিত্রগৃহে বাঙালী দর্শকদের সামনে প্রদর্শিত হয়ে থাকে। পৌরাণিক সাজ-সজ্জাধারী দক্ষিণী শিল্পীদের অভিনয়-ভঙ্গী যে সবসময়ে বাঙালী দর্শকদের মনঃপূত হয়ে থাকে, এমন কথা বলা যায় না। তার ওপর মূল ভাষাটিকে সরিয়ে দিয়ে বিভিন্ন শিল্পীর ঠোঁটনাড়ার সংগে মিলিয়ে ডাবিং-করার জন্যে লিখিত বাংলা সংলাপ ও গান লেখকের স্বাধীনতাকে যে যথেষ্ট ক্ষুন্ন করে, তারও প্রমাণ পাওয়া যায় প্রতি পদে পদে। মনে হয়, সংলাপ ও গানের ভাষাটি ঠিক যেমন হওয়া উচিত ছিল, তেমনটি হয়নি; যেন বেশী মধু, যেন বাকগঠনে কেমন যেন আড়ষ্টতা, স্বাভাবিকতার অভাব।

কিন্তু এই ত্রুটি সত্ত্বেও ছবিগুলি যে মোটের ওপর ভালো লাগে, তার কারণ প্রযোজনায় একান্ত নিষ্ঠার ফলে ছবিগুলিতে বেশ একটি পৌরাণিক আবহাওয়া সঞ্চারিত হয়, যা অধুনা বাংলা পৌরাণিক চিত্রে কচিৎ দেখতে পাওয়া যেত। তার ওপর পৌরাণিক চিত্র সাফল্য অর্জন করতে গেলে কলাকৌশলের, বিশেষ করে চিত্রগ্রহণে যে চমৎকারিত্ব সৃষ্টির প্রয়োজন—যাকে বলি, ট্রিক-ফোটোগ্রাফী, তার নিখুঁত পরাকাষ্ঠা দেখা যায় এই দক্ষিণী ছবিগুলিতে। এরই সংগে উপযুক্ত সুর সংযোজনার ফলে গানগুলি যদি শ্রুতি-মধুর হয়, তাহলে তো কথাই নেই।

এমনই একটি ডাবিং-করা ছবি হচ্ছে আলেয়া, রূপম, পূরবী প্রভৃতি চিত্রগৃহে ২০ নভেম্বরে মুক্তিপ্রাপ্ত শ্রীসুজাতা মুভীজ-এর নিবেদন এবং রমেশ নাইডু প্রযোজিত ও সুরারোপিত 'দক্ষযজ্ঞ'। ছবিটিতে যেসব দক্ষিণী শিল্পী অবতীর্ণ হয়েছেন, তাদের নামের সংগে আমাদের পরিচয় নেই। কিন্তু যিনি শিবের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন, তাঁকে তারিফ না করে উপায় নেই। শিবের রূপ সম্পর্কে আমাদের মনে যে-ছবি আঁকা আছে, তিনি হুবহু তাই এবং একথা বলছি একটুও অতিরঞ্জন না করেই। এবং তাঁর অঙ্গভঙ্গী ও সামগ্রিক অভিনয়ও হয়েছে অত্যন্ত চরিত্রোচিত, স্বাভাবিক ও বাস্তবধর্মী। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও চন্দ্র চরিত্রের অভিনেতারাও বাহ্যাকৃতির দিক দিয়ে ভূমিকা উপযোগী। শিব চরিত্রটির সংলাপ অত্যন্ত সার্থকভাবে বলেছেন সত্য বন্দোপাধ্যায়, দৃপ্ত তপস্বীর ছদ্মবেশে তাঁর সংলাপ বিশেষভাবে মনে রাখবার মতো। দক্ষের দৃপ্ত ভূমিকার সংলাপ বলানো হয়েছে শেখর চট্টোপাধ্যায়কে দিয়ে। অনেক স্থানে অযথা দ্রুত এবং অযথা ঝোঁক-দেওয়া সংলাপ তিনি বোধহয় বলতে বাধ্য হয়েছেন। সতী ও দক্ষপত্নী প্রসূতির সংলাপ সুন্দরভাবে বলেছেন যথাক্রমে মিতা চট্টোপাধ্যায় ও সাধনা রায়চৌধুরী।

শ্রীমদ্ভাগবত, মহাভারত, হরিবংশ এবং পুরাণে দক্ষ প্রজাপতির কাহিনী ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বর্ণিত আছে। এর মধ্যে প্রধানত মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবতের কাহিনীর উপর নির্ভর করেই ছবির কাহিনীটি রচিত হয়েছে। সতীতীর্থ প্রসঙ্গে কাহিনীটির অবতারণা করা হয়েছে এবং আবার সতীতীর্থেই শেষ করা হয়েছে। কাহিনীর অগ্রগতি সরল ও ঋজু। দক্ষযজ্ঞে পতিনিন্দায় সতীর দেহত্যাগ এবং সেই সংবাদ শ্রবণে শিবের রুদ্রমূর্তি ধারণ ও সতীদেহ স্কন্ধে নিয়ে তাণ্ডবলীলায় পৃথিবীকে ধ্বংস করবার উপক্রম করায় বিষ্ণুর চক্র দ্বারা সতীদেহকে কর্তন করে শিবের ক্রমে শান্তভাব ধারণে ছবির কাহিনীর সমাপ্তি। অবশ্য সতীদেহ কর্তনের দৃশ্যটি ছবিতে অনুপস্থিত; এ ঘটনাটি নেপথ্য কণ্ঠে গান দ্বারা বর্ণিত।

ছবিটির বিশেষ আকর্ষণীয় অংশ হল সতীদেহ কাঁধে নিয়ে শিবতাণ্ডবের রঙীন দৃশ্যাবলী—এতে আশ্চর্য রঙের খেলা আছে। বাংলা সংস্করণে সংলাপ ও গান রচনা করেছেন অরুণ রায় ও শ্যামল গুপ্ত এবং এর পরিচালনা করেছেন মঙ্গল মিত্র।

আবার সেই অসামান্যা অভিনেত্রী ক্যাথারিণ হেপবার্ণ-কে দেখলুম

যা আর কোনো অভিনেত্রীর ভাগ্যে আজ পর্যন্ত ঘটেনি, সেই তৃতীয়বার শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রীরূপে আকাডেমী আওয়ার্ড পাওয়ার সুযোগ পেয়েছেন ক্যাথারিণ হেপবার্ণ '**দি লায়ন ইন উইণ্টার**' ছবিতে রাজা দ্বিতীয় হেনরীর স্ত্রী ইলিয়েনর-এর ভূমিকায় অভিনয় করে। দ্বাদশ শতাব্দীর ইংলণ্ড-এর পটভূমিকায় দ্বিতীয় হেনরীর উত্তরাধিকারী নিয়োগকে উপলক্ষ করে হেনরীর সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর (যাঁকে সচরাচর কারারুদ্ধ অবস্থায় কাটাতে হয়) যে মতবিরোধ হয়, তারই পরিপ্রেক্ষিতে গড়ে তুলেছেন এই ছবি প্রযোজক জোসেপ ই লেভিন। আন্টনী হার্ভে পরিচালিত এই ছবিটি প্রায় শেক্সপীরিয় নাটকের ভঙ্গীতে অভিনয়কলা প্রদর্শনের সুযোগ করে দিয়েছে। এর বিভিন্ন ভূমিকার শিল্পীদের, যাদের মধ্যে প্রধান হলেন ক্যাথারিণ হেপবার্ণ ও পিটার ওটুল। আশ্চর্য নাট-নৈপুণ্যের নমুনা এই ছবির প্রতিটি দৃশ্যকে উজ্জ্বল করে তুলেছে।

স্টুডিও থেকে

শপথ নিলাম : ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় যাঁদের আত্মত্যাগের অবিস্মরণীয় কীর্তি চিরভাস্বর, সেই মুক্তিযোদ্ধা বীর সন্তানদের কর্মসাধনার কাহিনী 'শপথ নিলাম' মুক্তি-প্রতীক্ষায়। শৈলেশ দে-র কাহিনী অবলম্বনে ছবিটি প্রযোজনা করেছেন কৃষ্ণা মল্লিক। শচীন অধিকারী পরিচালিত ও সুকুমার মিত্র সুরারোপিত এ-ছবির গীত রচয়িতা অমিতাভ নাহা। কয়েকজন বিশিষ্ট বিপ্লবী চরিত্রে রূপদান করেছেন : শমিত ভঞ্জ, সাবিত্রী চ্যাটার্জি, শুভেন্দু চ্যাটার্জি দিলীপ রায়, মঞ্জনা দেবী, শেখর চ্যাটার্জি, শমিতা বিশ্বাস, ভাস্কর চৌধুরী, মন্মথ, মৃণাল, নির্মল, বলাই মুখার্জি ও নবাগতা সুনন্দা দাশগুপ্তা। পরিবেশনায়—ইস্টার্ন ফিল্ম এক্সচেঞ্জ।

জননী : রাধেমল কাঙ্কারিয়া প্রযোজিত অজিত গাঙ্গুলী পরিচালিত 'জননী'র চিত্রগ্রহণ কাজ প্রায় সমাপ্তির পথে। জননীর কাহিনী ও চিত্রনাট্য রচনা করেছেন পরিচালক শ্রীগাঙ্গুলী স্বয়ং। জননী তাঁর স্নেহ-মমতা দিয়ে নিজের দুঃখ-কষ্ট অবহেলা করে যে সন্তান-সন্ততিদের চিরকাল আগলে রাখেন, তাদের সুখেই তাঁর সুখ, তাদের মঙ্গল দেখেই তাঁর আনন্দ। এই স্নেহময়ী মায়ের চরিত্রে আছেন সুলোচনা চ্যাটার্জি। তাঁকে ঘিরে আর যাঁরা রয়েছেন তাঁরা হলেন সুলতা চৌধুরী, দীপ্তি চক্রবর্তী, অপর্ণা দেবী, কালী ব্যানার্জি, সত্য ব্যানার্জি, অজিত চ্যাটার্জি, তরুণকুমার, অজয় গাঙ্গুলী, শমিত ভঞ্জ ও জয়া ভাদুড়ী প্রভৃতি। শ্যামল মিত্র এই ছবির সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন। অজয় মিত্র ও শিবসাধন ভট্টাচার্য যথাক্রমে এই ছবির চিত্রগ্রহণ ও সম্পাদনার ভার নিয়েছেন। শ্রীরঞ্জিৎ পিকচার্স প্রাঃ লিঃ এই ছবির পরিবেশক।

অপর্ণা : সরকার প্রোডাকসন্স প্রাঃ লিঃ নির্বেদিত জরাসন্ধের কাহিনী অবলম্বনে 'অপর্ণা'র চিত্রগ্রহণ কাজ সলিল সেনের পরিচালনায় দ্রুত সমাপ্তির পথে এগিয়ে চলেছে। ছবিখানির চিত্রনাট্য পরিচালনা করেছেন শ্রীসেন নিজে। সুর দিয়েছেন রবীন চট্টোপাধ্যায়। এই ছবির দুটি বিশেষ প্রধান চরিত্রে রূপদান করছেন তনুজা ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। অরুণ মুখার্জি, গঙ্গাপদ বসু, গীতা নাগ, গীতা দে, কল্যাণ, অরুণ চৌধুরী, তপতী ঘোষ, মাস্টার অরিন্দম প্রভৃতি অন্যান্য চরিত্রে আছেন। শ্রীরঞ্জিৎ পিকচার্স প্রাঃ লিঃ ছবিটির পরিবেশক।

সংসার : নর্মদা পিকচার্সের ছবি মঞ্চ-সফল স্বীকৃত নাটকের চিত্ররূপ 'সংসার'-এর চিত্রগ্রহণ কাজ সলিল সেনের পরিচালনায় শেষ হয়ে এখন মুক্তির অপেক্ষায় আছে। কাহিনী ও চিত্রনাট্য রচনা করেছেন শ্রীসেন স্বয়ং। সুর দিয়েছেন—হেমন্ত মুখার্জি, গান লিখেছেন—গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। ছবির প্রধান চরিত্রাংশে আছেন : সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যারানী, নন্দিনী মালিয়া, বসন্ত চৌধুরী, শেখর চট্টোপাধ্যায়, জহর রায়, নির্মলকুমার, অজয় গাঙ্গুলী, অমরনাথ, মৃণাল মুখোপাধ্যায়, হরিধন, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, শমিতা বিশ্বাস, মিন্টু প্রভৃতি। হেমন্ত ব্যানার্জি ও নির্মল ব্যানার্জি প্রযোজিত 'সংসার' কাহিনী-বৈশিষ্ট্যে বাংলার সর্বজন চিত্ররসিকদের অন্তর জয় করবে বলে দৃঢ় বিশ্বাস। নর্মদা চিত্র ছবিখানির পরিবেশন দায়িত্ব নিয়েছেন।

শুভারম্ভ শুক্রবার ২৭ নভেম্বর !

অসামান্য রূপ-লাবণ্য ও দুকুল ছাপানো যৌবনের বন্যায় উদ্ভাসিতা এক রূপসীর সুমধুর চিত্র-কাব্য.....

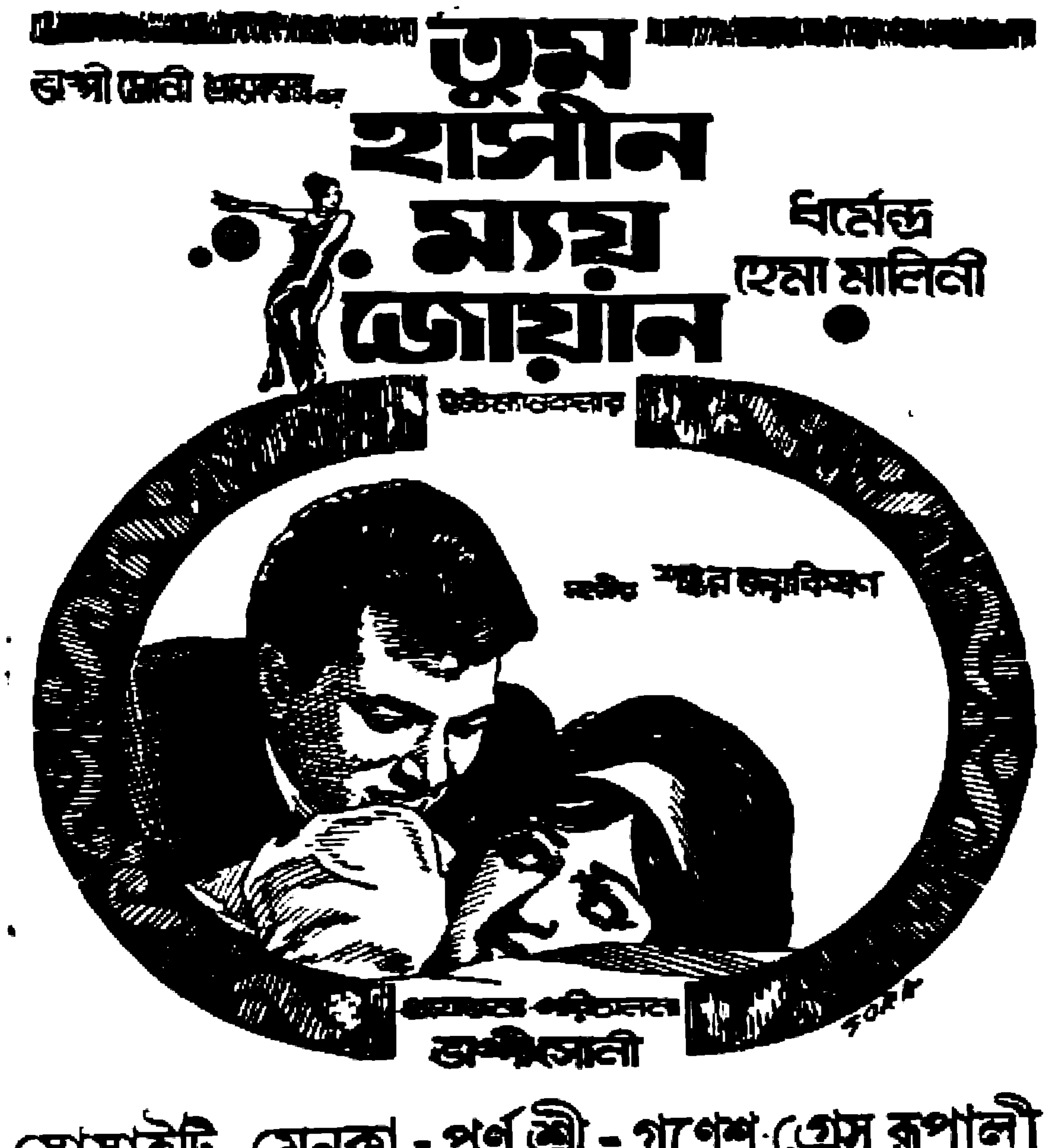

সোসাইটি - মেনকা - পূর্ণশ্রী - গণেশ - গ্রেস রূপালী

ইণ্টালী - পার্কশো

মায়াপুরী - ইন্দুবন্ধু - জ্যোতি (চন্দননগর) - বিভা - রাজকৃষ্ণ - আরতি (বর্ধমান)

অনুরাধা (দুর্গাপুর) - সোমনাথ (আসানসোল) - মিলনী (খড়গপুর) - বিহার (বাঁকুড়া)

রাজেনবাবু বর্তমানে বাড়ে তাঁরে আসছেন তাঁর সংসার সীমান্তের কাজ নিয়ে। নায়িকা চরিত্রে বহু নতুন শিল্পীর ইণ্টারভিউ নিয়েও যখন মনোমতো কাউকে পেলেন না, তখন ঠিক করেছেন মাধবী মুখার্জিকেই নেবেন। আর নায়ক চরিত্রে থাকবেন (নামটা বলতে পারছি না) কল-

রঞ্জনা
বিবেকানন্দ রোডের মোড়
নান্দীকার
২৮শে শনিবার ৬টায়
২৯শে রবিবার ২॥টে ও ৬টায়
তিন পয়সার পালা
১লা ডিসেম্বর মঙ্গলবার ২॥টে ও ৬টায়
শের আফগান
নির্দেশনা : অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়
রঞ্জনায় (৫৫-১৯৫৬) টিকিট পাবেন ॥
অনিবার্যকারণে ৩রা ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার রঞ্জনায় নান্দীকারের অভিনয় হবে না।

কাতার এক প্রখ্যাত নাট্য সংস্থার একজন তরুণ শিল্পী। বিশেষ সূত্রে প্রকাশ শিগগিরই তাঁরে আসছেন রাজেনবাবু।

বিবিধ সংবাদ

গত ২৯ অক্টোবর সন্ধ্যায় বেলতে-ডরার (আলিপুর) কেন্দ্রীয় সরকারী অফিসার্স কোয়ার্টার্স বেলভেডিয়ার এস্টেট প্লে কমিটির উদ্যোগে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের চন্দ্রগুপ্ত নাটকটি অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ হয়। এখানকার এই কলোনীর আবাসিকদের সমবেত প্রচেষ্টায় এই ধরনের নাট্যানুষ্ঠান এই প্রথম। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অজয়কুমার মুখোপাধ্যায় একটি পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই নাট্য-উৎসবের উদ্বোধন করেন।

সকলের সমবেত প্রচেষ্টায় এবং সহযোগিতায়, বিশেষ করে ডাঃ বি সি সান্যাল মহাশয়ের একান্ত উৎসাহে, উদ্যোগে এবং অক্লান্ত কর্মপ্রয়াসে কলোনীর এই প্রথম নাট্যানুষ্ঠান অভূতপূর্ব সাফল্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে। সঙ্গীত সেনগুপ্তের পরিচালনাগুণে নাটকটি বলিষ্ঠ অভিনয়ের নৈপুণ্যে সজীব ও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। আবহসংগীত অনেক সময় দৃশ্যানুগ না হলেও একটি সামগ্রিক অপরূপ উজ্জ্বল প্রবহমানতায় দর্শকেরা মুগ্ধ বিস্ময়ে তন্ময় হয়ে থেকেছে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত। সার্থক চরিত্র রূপায়ণের মাধ্যমে সকলেই নাটকটিকে সাফল্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। বিভিন্ন ভূমিকায় যাঁরা অভিনয় করেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন : নচিকেতা ভরদ্বাজ (মহারাজ নন্দ), সুকান্ত চক্রবর্তী (চন্দ্রগুপ্ত), ডাঃ বি সি সান্যাল (চাণক্য), বি লাহিড়ী (কাত্যায়ন), সুশীল সরকার (চন্দ্রকেতু), বিনায়ক ভট্টাচার্য (আলেকজাণ্ডার), বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায় (সেলুকাস), শিবু সেন (আণ্টিগোনাস), শঙ্কর চক্রবর্তী (বাচাল), কবির মুখোপাধ্যায় (ভিক্ষুক), বুমা চৌধুরী (হেলেন), সুনন্দা ঘোষ (মুরা), সান্ত্বনা বন্দ্যোপাধ্যায় (ছায়া), গীতাঞ্জলি লাহিড়ী (আত্রেয়ী)।

কৌশিকী : আগামী ২ ডিসেম্বর কৌশিকী তাঁদের নতুন নাটক 'আত্মপরাজয়' বিশ্বরূপায় মঞ্চস্থ করবেন। নতুন আঙ্গিকে এই মনস্তত্ত্বমূলক নাটকটি পরিচালনা করবেন বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়। অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের মধ্যে আছেন আরতি ঘোষ, মণ্টু চক্রবর্তী, অরবিন্দ সেনগুপ্ত, নিহীন বিশ্বাস, শিশির মুখার্জি, নাণ্টু গাঙ্গুলী, সাগর সেন, গোতম মুখোপাধ্যায়, শঙ্কর চক্রবর্তী ও অমল মণ্ডল।

ক্যাপ্টেন হুররা : উত্তর কলকাতার প্রখ্যাত নাট্যসংস্থা 'নক্ষত্র' আসছে ৪ ডিসেম্বর মুক্ত অঙ্গনে তাঁদের নতুন নাটক 'ক্যাপ্টেন হুররা' মঞ্চস্থ করার আয়োজন করেছেন। মোহিত চট্টোপাধ্যায় বিরচিত এই নাটকে মঞ্চস্থাপত্যের দায়িত্ব নিয়েছেন পূর্ণেন্দু পত্রী এবং প্রয়োগপ্রধান শ্যামল ঘোষ। বিভিন্ন ভূমিকায় অংশগ্রহণ করবেন শর্মিষ্ঠা ঘোষ, অমল চক্রবর্তী, নিতাই দে, দিলীপ ঘোষ, শ্যামল চক্রবর্তী, নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত, অসিত দে ও শ্যামল ঘোষ।

কোমল গান্ধার-এর 'ফাঁস'—গত কয়েক সপ্তাহ আগে উত্তর শহরতলীর এক নতুন নাট্যসংস্থা 'কোমল গান্ধার' স্থানীয় ক্ষীরোদ মিত্র পার্কে পিনাকু নিয়োগীর 'ফাঁস' নাটকটি মঞ্চস্থ করেন। নাট্যরূপায়ণে প্রশংসনীয় দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তরুণ পরিচালকদ্বয় দিলীপ মুখোপাধ্যায় ও সুশান্ত মুখোপাধ্যায়। অভিনয়ে যোগদানকারী উল্লেখযোগ্য শিল্পী হলেন দিলীপ মুখোপাধ্যায় সুকুমার বসু, অজয় বণিক, আনন্দ ভট্টাচার্য।

শুভমুক্তি শুক্রবার, ২৭শে নভেম্বর !
মরমপ্রাণ মাতোয়ারা এক গ্রাম্য বংশীবাদকের সংগীতমধুর প্রেমকাব্য

হিন্দ - বসুশ্রী - কৃষ্ণা - জেম - বীণা
খান্না - তসবীরমহল - নাগনগর : বাণীমহল
বঙ্গবাসী : পারিজাত
পূর্ণশ্রী : জয়া : সন্ধ্যা : রজনী : রামকৃষ্ণ : শ্রীকৃষ্ণ : শ্রীরামপুর টকীজ
অপর্ণা : অন্নপূর্ণা (বেলুড়) : চিত্রালয় (দুর্গাপুর) : চিত্রা (আসানসোল)
রূপকথা (আসানসোল) : দেশবন্ধু (ঝরিয়া)
: অগ্রিম আসন সংগ্রহ করুন :

বোম্বাইয়ে বাংলার জুনিয়র ক্রিকেট দল এবং মহীন্দ্র স্পোর্টস ক্লাবের সম্মিলিত খেলোয়াড়বৃন্দ।

খেলার কথা

বাংলার তরুণ ক্রিকেট দলের সফর

কমল ভট্টাচার্য

বাংলা যেমন ফুটবলের পীঠস্থান, তেমনি ক্রিকেটের পীঠস্থান বোম্বে। ফুটবল বা ক্রিকেটের কথা উঠলে প্রথমেই দৃষ্টি গিয়ে পড়ে বাংলা এবং বোম্বের ওপর।

বাংলার ক্রিকেট এসোসিয়েশন (সি এ বি) কিছুদিন আগে ভারতীয় ক্রিকেটের পীঠস্থান এই বোম্বেতে একটি জুনিয়র ক্রিকেট দলকে সফরে পাঠিয়েছিল। ১৬ই অক্টোবর যাত্রা করে এই দল একুশদিনের সফর শেষ করে গত ১০ নভেম্বর কলকাতায় ফিরে এসেছে। সফর শেষ হয়েছে। এখন লাভ-ক্ষতির হিসাব-নিকাশের পালা। সফর ছোটবড় যেমনই হোক না কেন, খরচ আছেই। বিশেষকরে একুশদিনের লম্বা সফরে বেশ খরচ হয়েছে। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, এত টাকা খরচ করে যে সফর, তা থেকে আমরা কি পেলুম ?

এই প্রশ্নের উত্তরটা আমাকেই দিতে হবে। কারণ, এই জুনিয়র দলের 'ম্যানেজার' হিসেবে সমস্ত দায়িত্বই আমার ওপরে ছিল। এর আগেও আমি বাংলা দলের ম্যানেজার হয়ে কয়েকবার ক্রিকেট সফর করেছি। কিন্তু এবারের সফরের সঙ্গে আগের সফরের বেশ পার্থক্য আছে। কারণ বাংলা দলের নিয়মিত খেলোয়াড়রা বেশকিছুটা অভিজ্ঞ। যে-কোন পরিস্থিতিতে নিজেকে দলের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার ক্ষমতা তাঁদের আছে। কিন্তু এবারকার সফরে বেশীর ভাগ খেলোয়াড়ই খুবই তরুণ। কলকাতার ময়দান ছাড়া তাঁদের নাম নেই। পরিচিত মুখের মধ্যে যাঁরা ছিলেন তাঁরা হলেন অম্বর রায়, টি কে ব্যানার্জি, দেবু মিত্র, গোপাল বোস। বাকি যাঁরা ছিলেন তাঁরা স্কুল-কলেজের ছাত্র। তাই খুবই দুশ্চিন্তা ছিল দলে এতগুলি নানা বয়সের খেলোয়াড়, তাঁরা পরস্পরের ভাবভঙ্গী, চালচলন, চিন্তাধারার সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারবেন কিনা। কিম্বা দলের নিয়মশৃঙ্খলা মেনে চলতে পারবেন কিনা। কেননা, এগুলি মানিয়ে নিতে বা মেনে চলতে না পারলে স্বভাবতঃই সমস্ত দলের সংহতি ও সম্মান ক্ষুন্ন হবে। শুধু দলের সম্মান নয়, এর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিল সি এ বি তথা সারা বাংলা দেশের সম্মান। এসব ছাড়া যে ব্যাপারে সব থেকে বেশী চিন্তিত ছিলাম তা হল আমাদের এই নবীন খেলোয়াড়রা বোম্বের বাঘা বাঘা খেলোয়াড়দের সামনে দুর্বল হয়ে পড়বে না তো?

সফর শেষ হয়েছে। আজ আর বলতে দ্বিধা নেই, আমাদের ছেলেরা দল এবং বাংলার সম্মান অক্ষুন্ন রেখে ঘরে ফিরেছেন। এবং এজন্য সকলের সঙ্গে দলের ম্যানেজার হিসেবে আমিও নিশ্চয়ই যথেষ্ট গর্ব অনুভব করতে পারি।

যে পরীক্ষামূলক উদ্দেশ্য নিয়ে এই সফরের ব্যবস্থা হয়েছিল, তা হল তরুণ খেলোয়াড়দের মন থেকে অনভিজ্ঞতার পর্যন্ত দূর করা। শুধু তাই নয়, নামী ও দামী দলগুলোর সঙ্গে খেলতে গিয়ে তরুণদের মনে যে ভীতি বা জড়তা আসে তা কাটানোরও উদ্দেশ্য ছিল। সেদিক থেকে আমাদের সফর যে সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

যেমন ধরা যাক, আমরা একুশদিনের সফরে মোট এগারোটা ম্যাচ খেলেছি। তার মধ্যে জিতেছি পাঁচটা খেলায়, আর ছটি খেলা ড্র হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায়, আমরা ওদের মত শক্তিশালী দলের বিপক্ষে যথেষ্ট কৃতিত্বের সঙ্গে পাল্লা দিতে পেরেছি। কিন্তু স্কোর বোর্ডই কি সাফল্যের একমাত্র মানদণ্ড ? তা নয়—। শুধুমাত্র জয়-পরাজয়ই কোন সফরের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়।

সফরের শুরুতেই আমরা মহীন্দ্র স্পোর্টস ক্লাবের সঙ্গে খেলি। ক্রিকেট দল হিসেবে এদের খুব বেশী নামডাক নেই। তাই ধরে নিয়েছিলাম খুব একটা শক্তিশালী দল হবে না। কিছুটা আশ্বস্ত হয়েছিলাম এই ভেবে যে, সফরের শুরুতেই একটা মাঝারি দলের সঙ্গে খেলে ছেলেরা যদি পাল্লা দিতে পারেন তাহলে পরে নামী খেলোয়াড়দের সঙ্গে খেলতে তাঁরা যথেষ্ট সাহস পাবেন। এবং স্বভাবতঃই অসুবিধায় পড়তে হবে না। কিন্তু ব্যাপারটা একটু অন্যরকম হল। দুদিনের এই খেলাটা

CENTRAL LIBRARY

অমীমাংসিতভাবে শেষ করতে আমাদের ছেলেদের যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল।

আমরা বোম্বেতে যে দলগুলির সঙ্গে খেলেছি তার মধ্যে দু'একটা বাদ দিলে প্রায় সবগুলিই অফিস ক্লাব। খেলার মানের দিক থেকে এরা কিন্তু কেউ কারও থেকে কম যায় না। বোম্বে সত্যিই ক্রিকেটের পীঠস্থান। কেননা, ইচ্ছে করলে রণজি ট্রফিতে খেলবার মত উপযুক্ত আরও দু-তিনটে দল গঠন করতে পারে। এদের খেলা দেখে মনে হয়, ক্রিকেটটা যেন ওদের জাতীয় খেলা।

বোম্বেতে ঘেরা মাঠ আছে দুটো। একটা 'ক্রিকেট ক্লাব অব ইন্ডিয়ার', অপরটা বোম্বে জিমখানার। আবার সি সি আই-এর মাঠে টেস্ট, আঞ্চলিক এবং প্রাদেশিক খেলা ছাড়া অন্য খেলা হয় না। ক্রিকেট খেলার জন্যে বোম্বের খেলোয়াড়রা বছরে সাত থেকে আট মাস সময় পান। শুধু তাই নয়, গ্রীষ্মকালে সন্ধ্যা সাতটাতেও বোম্বেতে খেলার উপযোগী যথেষ্ট দিনের আলো পাওয়া যায়। এসব দিকে ভাগ্যদেবী ও'দের ওপর বেশ সুপ্রসন্না। ও'রা কিন্তু সময়ের সদ্ব্যবহার ঠিকই করেন।

বোম্বে ক্রিকেট এসোসিয়েশন হলো বোম্বাইয়ের একমাত্র ক্রিকেট নিয়ন্ত্রণ সংস্থা। এই সংস্থা সবশুদ্ধ ছেচল্লিশটা টুর্ণামেন্ট একই সঙ্গে পরিচালনা করেন। প্রদর্শনী খেলা ওখানে নেই বললেই চলে। যা-কিছু অনুশীলন তা এই প্রতিযোগিতামূলক খেলাগুলির মাধ্যমেই হয়।

ক্রস ময়দান বা শিবাজী পার্কে এত পাশাপাশি খেলার আসর পাতা হয় যে তা না দেখলে বিশ্বাস হয় না। এক দলের স্লিপ ফিল্ডারের গা-ঘেঁসে পাশের একদলের বোলার রাণ-আপ নিচ্ছে। মাঝে মাঝে দু-দলের ফিল্ডাররাই এ ওর বল কুড়িয়ে দিচ্ছে। সব থেকে লক্ষ্য করার বিষয়, এই অসুবিধা সত্ত্বেও ওদের কিন্তু কারও নিজেদের খেলায় মনোযোগের অভাব নেই।

কি টেস্ট খেলোয়াড়, কি স্কুল টিমের খেলোয়াড়—ছোট থেকে বড় সকলেই টুর্ণামেন্টগুলিতে অংশ নিয়ে থাকেন। প্রত্যেকে একই সঙ্গে খেলছেন। সকলেই নিজেদের খেলা নিয়ে ব্যস্ত। নামকরা খেলোয়াড়দের সঙ্গে খেলার সুযোগ পাওয়ার ফলেই ছোটদের মনে কোন ভয় বা জড়তা থাকে না। আর এই অভ্যাসই প্রতিভা বিকাশের পথ প্রশস্ত করে। অথচ বাংলার শ্রেষ্ঠ নামকরা খেলোয়াড় তো দূরের কথা, একটি প্রথম ডিভিসন দলের সঙ্গে একটি দ্বিতীয় ডিভিসন দলের বছরে একবারও খেলা হয় কিনা সন্দেহ।

এর পরই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে ওখানকার মাঠের পিচ। ক্রিকেট খেলার পিচই আসল। ক্রিকেট খেলার মান অনেকটা নির্ভর করে এই পিচের ওপর। পিচ সম্পর্কে বোম্বের খেলোয়াড়রা যথেষ্ট সচেতন। বোম্বাইয়ের প্রায় সব ক্রিকেট মাঠই ঘুরে দেখেছি; প্রত্যেকটি উইকেট বা পিচ অত্যন্ত নিখুঁত। আউট ফিল্ড নিয়ে তাঁদের তেমন মাথাব্যথা নেই। কোন কোন জায়গায় বড় বড় ঘাস, কোথাও বা মাটি উঁচুনিচু। কিন্তু উইকেট, প্রত্যেকটি আমাদের ইডেনের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। বোম্বের প্রত্যেক মাঠের পিচ তৈরী করে দেওয়ার দায়িত্ব বোম্বে কর্পোরেশনের। কিন্তু আমাদের এখানে?—থাক সেকথা।

এ'দের লাঞ্চ করার প্রথাটাও আমাদের থেকে আলাদা। কোন দলই কোন দলকে লাঞ্চের নিমন্ত্রণ করে না। আবার কোন কোন মাঠে দেখলাম খেলোয়াড়রা যে যার লাঞ্চ সঙ্গে করে এনেছেন। সফরকারী দলের বেলায় অবশ্য আলাদা ব্যবস্থা। আমাদের সফরের শেষ-দিকে এই লাঞ্চ নিয়ে বেশ একটা মজার ব্যাপার ঘটেছিল। বোরদেদের দলের সঙ্গে পুণাতে খেলা। প্রখ্যাত টেস্ট খেলোয়াড় চান্দু বোরদে হলেন আমাদের বিপক্ষ দলের অধিনায়ক। খেলায় একসময় লাঞ্চের বিরতি হল। আমরা অতিথি, তাই অপেক্ষা করে আছি কখন খাওয়ার ডাক পড়বে। এর আগে সব খেলাতেই আমরা নিমন্ত্রণ পেয়ে এসেছি।

অনেক সময় কেটে গেল অথচ খাওয়ার জন্যে কেউ ডাকতে এলেন না। দেখলাম ওদের সবশেষ খেলোয়াড়টিও দূরের রেস্টুরেন্টের দিকে চলে গেলেন। দুপুরবেলা। আমার দলের খেলোয়াড়দের মুখ দেখে বুঝতে কষ্ট হল না যে তারা খিদেতে বেশ কাহিল হয়ে পড়েছেন। আমি আর থাকতে না পেরে বারবার উঁকি মেরে আসছিলাম। কিন্তু হায়! হঠাৎ বোরদেকে ছুটতে ছুটতে আসতে দেখলাম।—কি ব্যাপার? তোমরা এলে না? তোমাদের ডাকতে এসে দেখি দরজা বন্ধ, ভাবলাম আগেই চলে গেছ। আর দেরি না—চল।'

ব্যাপারটা আমি আগেই বুঝেছিলাম। বিপক্ষ দলকে লাঞ্চে নেমতন্ন করার রেওয়াজ ওদেশে নেই। সম্ভবত তাই এ ভুল। এ ব্যাপারে তাঁরা আদৌ কুণ্ঠিত নন। কারণ তাঁরা খেলাটাকেই বড় করে দেখছেন, লাঞ্চটাকে নয়। খেলার প্রতি ও'দের এই নিষ্ঠা আমাদের মুগ্ধ করেছে।

বোম্বের আরও একটা বিশেষ প্রশংসনীয়—ও'দের আম্পায়ারিং। একুশদিন ধরে একুশটা খেলা দেখলাম, কিন্তু কোনদিন কি আমাদের, কি বিপক্ষ দলের কোন খেলোয়াড় আম্পায়ারের সিদ্ধান্তে মনঃক্ষুন্ন হননি।

বোম্বের খেলা শেষ করে আমরা মহারাষ্ট্রের আর একটি শহর পুণায় সফর করেছিলাম। সেখানে কয়েকটি ম্যাচ খেলবার কথা ছিল। আশ্চর্য, পুণাতে কিন্তু আমাদের ছেলেরা বোম্বের থেকে অনেক ভাল খেলেছিলেন। অর্থাৎ বলা যায়, যত দিন গেছে ততই আমাদের ছেলেদের খেলার মান বেড়েছে: এখানে মনে রাখতে হবে বাংলাদেশের ক্রিকেট মরশুম শুরু হওয়ার আগেই আমরা সফরে বেরিয়েছিলাম। ফলে কোন খেলোয়াড়ই প্রয়োজনমত অনুশীলন করতে পারেননি।

আমার মতে, বাইরে ক্রিকেট দল পাঠাবার আগেই দলকে শক্তিশালী করতে খেলোয়াড়দের অনুশীলনের যথেষ্ট সুযোগ দিতে হবে।

আমাদের এই ক্রিকেট সফরের উদ্দেশ্য শুনে ভারতীয় ক্রিকেট দলের চান্দু বোরদে বাংলার ক্রিকেট এসোসিয়েশনের কর্মকর্তাদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, '—একথা অনস্বীকার্য, শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে না খেললে কোন দলেরই উন্নতি হতে পারে না। আমার খুব আনন্দ হচ্ছে এই দেখে যে, তোমরা শক্তিশালী খেলোয়াড়দের বাদ দিয়ে তরুণদের নিয়ে এসেছ। এই তরুণ খেলোয়াড়রাই দেশের ভবিষ্যৎ।'

শ্রীবোরদে আরও বললেন—'তোমরা যদি প্রতি বছর সফরে যাও তবে বছর পাঁচেকের মধ্যে দেখবে তোমাদের খেলার মান কত বেড়ে গেছে।'

আমাদের ছেলেদের উদ্দেশ্য করে শ্রীবোরদে বলেন, 'খ্যাতিমান খেলোয়াড়দের শক্তিকে নিশ্চয়ই শ্রদ্ধা করবে, কিন্তু কখনো তাঁদের ভয় করবে না।'

শুধু বোরদেই নন, হিন্দু মানকড়, অশোক মানকড়, সোলকার, সেলিম দুরাণী প্রভৃতি খেলোয়াড়রা আমাদের সফরের উদ্দেশ্যকে সাধুবাদ জানিয়ে আমাদের উৎসাহিত করেছিলেন।

আমি লিখি, তাই যাঁরা লেখেন তাঁদের কথা দিয়েই আমার এই লেখা শেষ করবো। সফরের প্রথমেই কয়েকজন বিশিষ্ট সাংবাদিক আমার কাছে এসেছিলেন। আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁরা বলেছিলেন, 'আপনারা এই ধরণের জুনিয়র দল নিয়ে বোম্বেতে খেলতে এসেছেন, খুব ভাল কথা, কিন্তু জানেন তো আমাদের খেলার মান অনেক উন্নত' উত্তরে আমি একটা কথাই বলেছিলাম, 'সেই জন্যেই ত এসেছি।' আমাদের উদ্দেশ্য হারজিত নয়, খেলার মান বাড়ানো।

সফর শেষে তাঁরাই আমায় বলেছিলেন—'বেশ খেলেছে আপনার দলের ছেলেরা। সত্যি বলতে কি, আমরা কিন্তু এতখানি আশা করিনি।'

খেলাধুলা

দর্শক

ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট ক্রিকেট

অস্ট্রেলিয়ার ব্রিসবেন ক্রিকেট মাঠে ২৭শে নভেম্বর ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার ৪১তম টেস্ট ক্রিকেট সিরিজের পাঁচদিন-ব্যাপী প্রথম টেস্ট খেলার আসর বসছে। এই খেলাটি উভয় দেশের ২০৪তম টেস্ট খেলা। অর্থাৎ ইতিপূর্বে ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে ২০৩টি টেস্ট ক্রিকেট খেলা হয়ে গেছে, যার ফলাফল দাঁড়িয়েছে অস্ট্রেলিয়ার জয় ৮০, ইংল্যান্ডের জয় ৬৬ এবং খেলা ড্র ৫৭। ১৯৬৪ সালের টেস্ট সিরিজে অস্ট্রেলিয়া ১-০ খেলায় (ড্র ৪) 'রাবার' জয়ী হয়ে যে কাল্পনিক 'এ্যাসেজ' খেতাব পেয়েছিল তা আজও তাদের হাতেই থেকে গেছে, যেহেতু পরবর্তী ১৯৬৫-৬৬ এবং ১৯৬৮ সালের টেস্ট সিরিজের ফলাফল সমান দাঁড়ায়।

ব্রিসবেনের আলোচ্য প্রথম টেস্ট খেলার অস্ট্রেলিয়া দলে যে ১২জন খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে নবাগত খেলোয়াড় এই চারজন—ভিক্টোরিয়া জলদ পেস বোলার এ্যালান টমসন, ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়ার উইকেটকীপার রড মার্শ, দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার স্পিন বোলার টেরী জেনার এবং দলের সহ-অধিনায়ক আয়ান চ্যাপেলের সহোদর গ্রেগ চ্যাপেল। অস্ট্রেলিয়া সফররত এম সি সি দলকে গত ৯ই নভেম্বর ভিক্টোরিয়া দল যে ৬ উইকেটে হারিয়েছিল তার মূলে ছিলেন এ্যালান টমসন, যিনি খেলায় ৮০ রানে ৬টা এবং ১০১ রানে ৩টে উইকেট পেয়েছিলেন। এই সাফল্যের পরিপ্রেক্ষিতে টমসন যে ব্রিসবেনের প্রথম টেস্ট খেলায় দলভুক্ত হবেন তা সকলেই জানতেন। কিন্তু ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়ার রড মার্শ উইকেট-কিপার হিসাবে যে দলে স্থান পাবেন তা কেউ কল্পনাও করেন নি। যদিও কুইন্সল্যান্ডের বিপক্ষে শেফিল্ড শীল্ড খেলায় মার্শ চারজনকে চমৎকারভাবে আউট করেছেন কিন্তু নিউ সাউথ ওয়েলস দলের অধিনায়ক টেস্ট উইকেট-কিপার ব্রায়ান টেবের সক্রিয় থাকতে মার্শের দলভুক্তি সকলকে বিস্মিত করেছে। ব্রিসবেনের প্রথম টেস্টে অস্ট্রেলিয়া দলে স্থান না পাওয়াতে টেবের খুবই ভেঙে পড়েছেন। তিনি যে দলে স্থান পাননি এ সত্য বিশ্বাসই করতে পারেন নি। এখানে উল্লেখ্য, ক্রিকেট খেলায় টেবেরের একটি বিশ্ব রেকর্ড আছে—একটি খেলায় ১২টি 'ডিসমিস্যাল'। ব্রিসবেনের প্রথম টেস্ট খেলায় অস্ট্রেলিয়া দলে যাঁরা নির্বাচিত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে দুই ভাই আছেন—আয়ান চ্যাপেল এবং গ্রেগ চ্যাপেল। একই খেলার আসরে অস্ট্রেলিয়ান টেস্ট ক্রিকেট দলে দুই ভাইকে শেষ খেলতে দেখা গেছে ১৮৯৪-৯৫ সালে। এই দুই ভাইয়ের নাম এ বি ট্রট এবং জি এইচ ট্রট। সুতরাং সুদীর্ঘকাল পর ব্রিসবেনের প্রথম টেস্ট খেলায় নির্বাচিত দুই ভাই—আয়ান চ্যাপেল এবং গ্রেগ চ্যাপেল ক্রিকেট অনুরাগী মহলে আজ যথেষ্ট আগ্রহ বৃদ্ধি করেছেন।

নির্বাচিত খেলোয়াড়বৃন্দ

ব্রিসবেনের প্রথম টেস্ট খেলায় অস্ট্রেলিয়া দলে নীচের যে ১২জন খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে ভিক্টোরিয়া দলের ৫জন, দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া দলের ৩ জন, পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া দলের ২জন এবং নিউ সাউথ ওয়েলস দলের ২জন খেলোয়াড় আছেন।

ভিক্টোরিয়া দলের—বিল লরী (অধিনায়ক), রেডপাথ, শিহান, স্টাকপোল এবং টমসন (নবাগত); দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া দলের—আয়ান চ্যাপেল (সহঃ অধিনায়ক), গ্রেগ চ্যাপেল (নবাগত) এবং টেরী জেনার (নবাগত); পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া দলের ম্যাকেঞ্জী এবং উইকেটকিপার রড মার্শ (নবাগত); নিউ সাউথ ওয়েলসের—গ্লিসন এবং ওয়াল্টার্স।

অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে টেস্ট খেলা

অস্ট্রেলিয়ার চারটি মাঠে এ পর্যন্ত ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার যে ১০৭টি টেস্ট

দেশবন্ধুর পুণ্য জন্মশতবার্ষিকী
উপলক্ষে
প্রকাশন বিভাগের অর্ঘ্য
সদ্য প্রকাশিত জীবনী-গ্রন্থ
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ
হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ৫ টাকা ৫০ পঃ
আমাদের প্রকাশিত অন্যান্য গ্রন্থ

মহাত্মা গান্ধী (অ্যালবাম)	১০ টাকা
ভারতের গৌরব (প্রথম খণ্ড) (মহাপুরুষের জীবনী সংগ্রহ)	৩ টাকা ৫০ পঃ
প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ধর্মসাধিকা	৪ টাকা ৫০ পঃ
জ্বালামুখী (উপন্যাস)—অনন্তগোপাল শিকড়	২ টাকা ৫০ পঃ
মহাপরিনির্বাণের কথা—সুকুমার দত্ত	১ টাকা ২০ পঃ
বিজ্ঞান বিচিত্রা—সি ভি. রমন	০. " ৭৫ পঃ
ঈশ্বরের চোখে সকলেই সমান (মহাত্মা গান্ধীর রচনা থেকে সঙ্কলিত)	১ টাকা ৫০ পঃ
আমাদের পতাকা	১ টাকা
কল্কি অথবা সভ্যতার ভবিষ্যৎ—এস. রাধাকৃষ্ণণ	০·৭৫ পঃ
বঙ্কিমচন্দ্র : জীবন ও সাহিত্য—প্রেমেন্দ্র মিত্র	০·৭৫ পঃ
ভারত—আজ ও আগামীকাল—জওহরলাল নেহেরু	০·৭৫ পঃ
আমাদের রাষ্ট্রীয় প্রতীক—সি. শিবরাম মূর্তি	০·৫০ পঃ

ডাকমাশুল লাগবে না। তিন টাকা ও তদূর্ধ্ব মূল্যের বই ভি. পি. পি. যোগেও পাঠানো হবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও লাইব্রেরীর ক্ষেত্রে শতকরা ১০ টাকা হারে কমিশন দেওয়া হবে। ইংরেজী, হিন্দী ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত আমাদের সম্পূর্ণ পুস্তক তালিকার জন্য লিখুন :

ডিরেক্টর, পাব্লিকেশন্স ডিভিশন
পাতিয়ালা হাউস, নতুন দিল্লী—১
কলিকাতার ঠিকানা : আকাশবাণী ভবন, কলিকাতা—১

ডি, এ, ভি, পি ৭০/৫১৭

কুমারী এ্যাঞ্জেলিকা কর্ন (পশ্চিম জার্মানী)। এঁর নয়নাভিরাম দৈহিক সৌষ্ঠব এবং কৌশল প্রদর্শন করে গত বিশ্ব জিম-ন্যাস্টিক প্রতিযোগিতায় পশ্চিম জার্মানী দলে নির্বাচিত হয়েছিলেন।

ক্রিকেট খেলা হয়েছে তার ফলাফল নীচে দেওয়া হল।

মোট ইংল্যান্ডের অস্ট্রেলিয়ায় খেলা

মাঠ	খেলা	জয়	হার	ড্র
মেলবোর্ন	৪০	১৫	২০	৫
সিডনি	৩১	১৬	২০	০
এডিলেড	১১	৬	১১	২
ব্রিসবেন	১	৩	৪	২
মোট:	১০৭	৪০	৫৫	১২

বিশ্ব গল্‌ফ প্রতিযোগিতা

আর্জেন্টিনার বুইনোস এয়ারেজে আয়োজিত বিশ্ব গল্‌ফ প্রতিযোগিতার দলগত বিভাগে (অতীতের কানাডা কাপ) অস্ট্রেলিয়া দলগত এবং আর্জেন্টিনা রানার্স-আপ খেতাব জয়ী হয়েছে। ব্যক্তি-গত বিভাগের খেতাব পেয়েছেন আর্জে-ন্টিনার রবার্টো ডাইসেনজো। এবারের প্রতি-যোগিতায় ৪৩টি দেশ যোগদান করেছিল। এখানে উল্লেখ্য, পূর্বের ১৭টি টুর্নামেন্টে আমেরিকা ১০ বার দলগত খেতাব জয়ী হয়ে সর্বাধিক দলগত খেতাব জয়ের যে রেকর্ড করেছিল তা আজও অক্ষুন্ন আছে।

কলিঙ্গ ফুটবল কাপ

উড়িষ্যার বারবটী স্টেডিয়ামে আয়োজিত কলিঙ্গ ফুটবল কাপ প্রতি-যোগিতার ফাইনাল খেলা অমীমাংসিত হওয়াতে কলকাতার বি এন আর দল এবং রাজস্থান দলকে শেষ পর্যন্ত যুগ্ম বিজয়ী ঘোষণা করা হয়েছে। অতিরিক্ত সময়ের খেলাতেও ১—১ গোলে খেলাটি ড্র যায়। এমন কি নতুন নিয়মে পাঁচটি পেনাল্টি কিকের ব্যবস্থা করেও জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়নি। সেমি-ফাইনালে বি এন আর দল ৩—১ ও ২—১ গোলে কলকাতার বাটা স্পোর্টস ক্লাবকে পরাজিত করে ফাইনালে ওঠে। অপরদিকের সেমি-ফাইনালের প্রথম খেলায় রাজস্থান ২—১ গোলে মহমেডান স্পোর্টিংকে পরাজিত করে। কিন্তু দ্বিতীয় সেমি-ফাইনাল খেলায় মহমেডান স্পোর্টিং ৩—২ গোলে জয়ী হলে খেলার ফলাফল সমান দাঁড়ায়। শেষ পর্যন্ত পেনাল্টি কিকে জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়।

হাইজাম্পে বিশ্ব রেকর্ড

নিউ চায়না নিউজ এজেন্সীর এক খবরে প্রকাশ, চীনের নী চীন-চীন হাই-জাম্পে ২·২৯ মিটার উচ্চতা (৭ ফিট ৬½ ইঞ্চি) অতিক্রম করে রাশিয়ার ভ্যালেরি ব্রুমেল প্রতিষ্ঠিত ২·২৮ মিটারের (৭ ফিট ৫¾ ইঞ্চি) বিশ্ব রেকর্ড ভেঙেছেন। হাই-জাম্পের বিশ্ব রেকর্ড স্রষ্টা এবং ১৯৬৮ সালের অলিম্পিক হাইজাম্পের স্বর্ণপদক বিজয়ী ব্রুমেল এই খবর পড়ে মন্তব্য করেছেন, 'এই ঘটনা বিশ্বাস করতে হলে আমাকে আগে স্বচক্ষে তা দেখাতে হবে।' নী চীন-চীনকে প্যারিস অথবা লস্ এ্যাঞ্জেলসে গিয়ে তাঁর এই দক্ষতা প্রমাণের জন্য ব্রুমেল প্রস্তাব করেছেন। যেহেতু আন্তর্জাতিক অ্যাথলেটিক ফেডারেশনের সঙ্গে চীনের বর্তমানে কোন সম্পর্ক নেই সেই কারণে হাইজাম্পে নী চীন-চীনের এই ২·২৯ মিটার উচ্চতা অতিক্রমের ঘটনাটি সরকারীভাবে গৃহীত হবে না।

বিশ্ব মুষ্টি যুদ্ধ

জো ফ্রেজার দ্বিতীয় রাউণ্ডের ৪৯ সেকেণ্ডের মাথায় স্বজাতীয় নিগ্রো মুষ্টি-যোদ্ধা বব্ ফোস্টারকে নক্ আউট করে হেভীওয়েট বিভাগে তাঁর বিশ্ব খেতাব অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। আগামী ৭ই ডিসেম্বরের লড়াইয়ে ক্যাসিয়াস ক্লে (বর্তমান নাম মহম্মদ আলী) যদি আর্জেন্টিনার ওস্কার বোনাভেনাকে পরাজিত করেন তাহলে ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে জো ফ্রেজারের সঙ্গে ক্যাসিয়াস ক্লের লড়াই হবে।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

পরিবারের সকলকে
সবল ও সুস্থ রাখতে
ফসফোমিন
ফসফোমিন
• শরীরে শক্তি যোগায়
• ক্ষিদে বাড়ায়
• কাজ করার ক্ষমতা যোগায়
• সহজে রোগে কাবু হ'তে দেয়না
Phosfomin
SARABHAI CHEMICALS
• ই. আর. স্কুইব এণ্ড সন্স ইনকর্পোরেটেডের রেজিষ্টার্ড ট্রেডমার্ক ব্যবহারকারী লাইসেন্স প্রাপ্ত প্রতিনিধি করমচাঁদ প্রেমচাঁদ প্রাইভেট লিমিটেড।
ফসফোমিন—
ফলের গন্ধে ভরা সবুজ
রং-এর ভিটামিন টনিক।
HPMA-35A/70 Ben

নিরাপত্তা দেয় নিশ্চিন্ত আরাম
নিরাপত্তা যোগায় সঞ্চয়—ব্যাঙ্ক অফ বরোদায়

ব্যাঙ্কে টাকা থাকলে আপনি বেশ নিশ্চিন্ত বোধ করেন —কারণ দরকার হলেই আপনি টাকা পেতে পারেন। আজই সঞ্চয় করতে শুরু করুন—ব্যাঙ্ক অফ বরোদায়।

সেভিংস অ্যাকাউন্ট। ফিক্সড ও টার্ম ডিপজিট অ্যাকাউন্ট। মাইনর্স সেভিংস অ্যাকাউন্ট। আপনার পছন্দমত কায়দে টাকা বাঁচান—ব্যাঙ্ক অফ বরোদায়···সেই সঙ্গে ভাল সুদও পাবেন।

BANK OF BARODA

ব্যাঙ্ক অফ বরোদা

Shilpi-BOB-10/70 bao

১০ম বর্ষ
৩য় খণ্ড

অমৃত

৩৩ সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday 4th December, 1970 শুক্রবার, ১৮ই অগ্রহায়ণ, ১৩৭৭ 40 Paise

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
৩২৪	চিঠিপত্র		
৩২৬	সাদা চোখে		—শ্রীসমদর্শী
৩২৮	দেশেবিদেশে		—শ্রীপুণ্ডরীক
৩৩০	ব্যঙ্গচিত্র		—শ্রীকাফী খাঁ
৩৩১	সম্পাদকীয়		
৩৩২	এঙ্গেলস স্মরণে		—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
৩৩৪	যে নাম বলে দিল	(কবিতা)	—শ্রীশ্যামসুন্দর দে
৩৩৫	হারিয়ে গেছে	(গল্প)	—শ্রীশক্তিপদ রাজগুরু
৩৪০	এই আমাদের দেশ		—শ্রীনন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
৩৪২	পূর্ববঙ্গের সংগৃহীত পালা গান		—শ্রীব্যোমকেশ মজুমদার
৩৪৩	তোমাকে	(উপন্যাস)	—শ্রীনিমাই ভট্টাচার্য
৩৫৬	মুখের মেলা		—আবদুল জব্বর
৩৫০	সাহিত্য ও সংস্কৃতি		—শ্রীঅভয়ঙ্কর
৩৫৪	বইকুণ্ঠের খাতা		—শ্রীপুস্তকদর্শী
৩৫৭	নেপালী পূজা-পার্বণ		—শ্রীহরেন ঘোষ
৩৫৯	নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে	(উপন্যাস)	—শ্রীঅতীন বন্দ্যোপাধ্যায়
৩৬৪	নিকটেই আছে		—শ্রীসন্ধিৎসু
৩৬৭	তুলসীচরিত	(উপন্যাস)	—শ্রীনীলমাধব চৌধুরী
৩৭২	চতুর্থ আফ্রো-এশীয় লেখক সম্মেলন		—শ্রীচার্বাক
৩৭৫	মনের কথা		—শ্রীমনোবিদ
৩৭৮	বিজ্ঞানের কথা		—শ্রীঅয়স্কান্ত
৩৮১	শিকার	(বড় গল্প)	—শ্রীসুভাষ সিংহ
৩৮৫	প্রদর্শনী পরিক্রমা		—শ্রীচিত্ররসিক
৩৮৬	গোয়েন্দা কবি পরাশর		—শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র রচিত —শ্রীশৈল চক্রবর্তী চিত্রিত
৩৮৭	অঙ্গনা		—শ্রীপ্রমীলা
৩৮৯	হাল্কা থাকুন	(গল্প)	—শ্রীসুধীর করণ
৩৯৩	জলসা		—শ্রীচিত্রাঙ্গদা
৩৯৪	কোন একটি সুবর্ণ জয়ন্তীতে	(কবিতা)	—শ্রীহরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
৩৯৫	প্রেক্ষাগৃহ		—শ্রীনান্দীকর
৩৯৮	খেলার কথা		—শ্রীঅজয় বসু
৩৯৯	খেলাধুলা		—শ্রীদর্শক

প্রচ্ছদ : শ্রীমধুকর

পিটার রঙ্গনাথমের

সাদা শিকারী কালো শিকার

[দাম নয় টাকা]

মদগর্বী শ্বেতাঙ্গ সাম্রাজ্যবাদীদের অসহায় কালো মানুষদের উপর বর্বরোচিত অত্যাচারের কাহিনী। বহু দুষ্প্রাপ্য ছবি সমেত

ওয়ার্ল্ড কাপের বই

নীলিমেশ রায়চৌধুরী

জুলে রিমের নেপথ্যে

[দাম চার টাকা]

১৯৭০ সালের মেক্সিকো আসরের তথ্যপূর্ণ বই। বহু ফটো দেওয়া আছে।

জ্ঞানতীর্থ

১, বিধান সরণী, কলিকাতা—১২

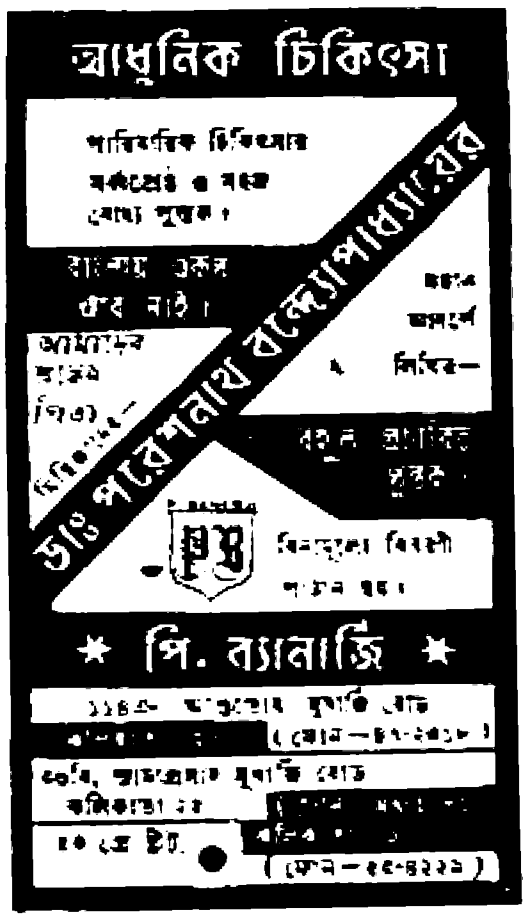

আমার পরম শ্রদ্ধেয় পিতা মিহিজামের

ডাঃ পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

আবিষ্কৃত ধারানুযায়ী প্রস্তুত সমস্ত ঔষধ এবং সেই আদর্শে লিখিত পুস্তকাদির মূল বিক্রয় কেন্দ্র আমাদের নিজস্ব ডাক্তারখানায় এবং অফিসে—

আধুনিক চিকিৎসা

ডাঃ প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায়

লিখিত পারিবারিক চিকিৎসার সর্বশ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে সহজ বই !!

চিঠিপত্র

আমার প্রিয় অধ্যাপক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

হঠাৎ রেডিওতে সেই দুঃসংবাদটা ছড়িয়ে গেল। মনে হল, এই তো সেদিন দেখা হোল। আর এরই মধ্যে—!

সেই স্কুল জীবনেই তাঁর ছোট গল্পের এক অনুরাগী পাঠক ছিলাম। তারপর সিটি কলেজে তাঁর আকর্ষণেই ভর্তি হয়েছি। তাঁর কাছে এসে, তাঁকে আরও ভালবেসেছি। সুন্দর দেখতে ছিলেন। একটা অদ্ভুত হাসি সর্বদাই মুখে আটকে থাকত। কখনও কারও নিন্দে শুনি নি তাঁর মুখে। শুনি নি তাঁর নিজের লেখা কোন বই-এর নাম। নিরহঙ্কার পুরুষ ছিলেন।

পানিত্রাসে শরৎচন্দ্রের বাড়ি দেখতে গিয়েছিলেন একবার। সেই সময় তাঁর মনের একটি গোপন বাসনার কথা বলেছিলেন আমাকে। তাঁর ইচ্ছা ছিল য়ুরোপ মহাদেশে যাওয়া। এ-ইচ্ছা তাঁর সফল হয় নি। সফল না-হওয়ার পিছনে তিনি নিজেই দায়ী। তিনি ভীষণ স্পষ্টভাষী ছিলেন। মনে হয় সেই জন্যে অনেকের বিরাগভাজন হয়েছিলেন। যেখানে তিনি কাজ করতেন, তার দোষ-ত্রুটি অকপটে তুলে ধরতেন। তাঁর চকচকে খেতাবটি সম্ভবত পরিহার করার নিগূঢ় কারণটি সকলেরই জানা। স্মৃতিশক্তি খুব প্রখর ছিল। এমন কিছু 'আহামরি' ছাত্র ছিলাম না। তবু দীর্ঘ দশ বছর পর দেখা হতে তিনি বললেন, এই যে সমর, কেমন আছো? এছাড়া সিটি কলেজে বহু অধ্যাপককে তাঁর শরণাপন্ন হতে দেখেছি। কবির নাম, কবিতার নাম বা কবিতার পরের লাইনটিতে কি আছে তিনি সহাস্যে তখনই বলে দিতেন। শেষে বলে দিতেন, তবু ঠিক আছে নাকি একটু দেখে নেবেন। তাঁর সহকর্মীরা জানতেন, বই খুলে দেখার প্রয়োজন হবে না।

সিটি কলেজ থেকেই অধ্যাপক হিসাবে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ল। আশ-পাশের কলেজ থেকে ছেলেরা আসত তাঁর ক্লাস করতে। কথার মধ্যে একটা জাদু ছিল। নিখুঁত, নিটোল ছিল তাঁর বক্তৃতা। ক্লাসকে সজীব করে রাখতেন তিনি। টুকরো-টুকরো হাসি দিয়ে বিষয়বস্তুকে আকর্ষণীয় করে তুলতেন। যিনি অধ্যাপক হিসাবে এত নাম করেছিলেন, তাঁর প্রথম অধ্যাপনা জীবনের একটি ছোট্ট ঘটনা আমাদের বলেছিলেন।

এম-এ পরীক্ষায় পাশ করে জলপাইগুড়ি কলেজে প্রথম অধ্যাপনার কাজ পেলেন। মেয়েদের ক্লাস। মঞ্চে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিচ্ছেন। অস্বস্তি ছিল—তার সঙ্গে প্রথম অধ্যাপনার ভয়ও খুব হয়েছিল। বক্তৃতার মধ্যে, বোধহয় তিনি একটি কথা বার-বার বলেছিলেন। বলেছিলেন, তোমরা যখন আরও বড় হবে, তখন বিষয়টা ভাল করে বুঝতে পারবে। সাহিত্যের ক্লাস। হঠাৎ তিনি দেখলেন পিছনের বেঞ্চি থেকে একটি মেয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। তাঁর বক্তৃতা থেমে গেল। মেয়েটি সরাসরি প্রশ্ন করল—স্যার আপনার বয়স কত?

ব্যাপারটা এমন চকিতে ঘটে গিয়েছিল যে, তিনি একেবারে অবাক। ক্লাস ভর্তি ছাত্রীর দল। প্রথম অধ্যাপনার জড়তা ইত্যাদি মিলিয়ে তিনি খুব সঙ্কোচগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। মেয়েটি সম্ভবত উত্তরের আশায় দাঁড়িয়ে ছিল। তিনি সভয়ে বললেন, আমার বয়স বা—ইশ।

'আমার সাতাশ' বলেই মেয়েটি দুম করে বসে পড়ল।

এমনি সহজ সরলভাবে নিজের জীবনের টুকরো ঘটনা পরিবেশন করতেন। আর আমরাও তাঁর কাছে অত্যন্ত সহজ বোধ করতাম।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে তিনি ভীষণ ভালবাসতেন। তাঁর মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তে আমরা নারায়ণবাবুকে ধরে বসলাম কিছু বলতে। ছোট্ট ক্লাস। মোহিত চট্টোপাধ্যায়, ফণিভূষণ আচার্য, রমা বাগচী, এই রকম মাত্র কয়েকজন ছিলাম ক্লাসে। তিনি বিভূতিবাবুর সরলতা, আন্তরিকতা—সব জড়িয়ে তাঁর উদাসীনতার কথা এমন সুন্দরভাবে দীর্ঘ সময় ধরে বলে চললেন যে, আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মত বসে রইলাম। আমরা যেন সেই ছাতা হাতে, খাটো কাপড়-পরা মানুষটিকে আমহার্স্ট স্ট্রীট আর হ্যারিসন রোডের মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখছি। তাঁর বলার মধ্যে এমনই একটা জাদু ছিল। কিন্তু বিভূতিবাবু সম্পর্কে জানতে চেয়ে পরে আমরাই বাঁচিত হয়েছিলাম। যখন তাঁর বলা প্রায় শেষ তখন দেখি সেই চশমার পুরু লেন্সের মধ্যে চকচকে দু ফোঁটা অশ্রুবিন্দু। আমরা তাঁকে সেই একদিন মাত্র শোকে অভিভূত হতে দেখেছিলাম। আশ্চর্য হলাম, চশমাটা খুলে, রুমাল দিয়ে চোখ মুছতে গিয়ে তাঁর ঠোঁটে সেই অদ্ভুত হাসিটাকেই যখন আবার প্রত্যক্ষ করলাম।

এমনি কত শত ছোটখাট ঘটনা সিটি কলেজে পড়ার সময় ঘটেছিল। সব আজ বিস্মৃতির মধ্যে হারিয়ে গেছে। তারই যে কয়েকটা আছে সেগুলোই এখানে লেখার চেষ্টা করলাম।

সমর দত্ত
কলকাতা—৬

রাগ ভৈরব

আমি একজন 'অমৃতে'র নিয়মিত পাঠক। চলতি বছরের শারদীয়া সংখ্যা 'অমৃত'তে বিমল মিত্রের লেখা উপন্যাস 'রাগভৈরব' পড়লাম। উপন্যাসটি সত্যিই খুব চমৎকার লাগল। বিশেষ করে উপন্যাসটিতে 'প্রভা'র উক্তিগুলি চমৎকার লাগল। এই উপন্যাসটি নির্বাচন করার জন্য আমি আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি সম্পাদক মহাশয়কে এবং লেখক মহাশয়কে।

—অরূপ কুণ্ডু
ডায়মন্ডহারবার,
২৪-পরগণা।

একক প্রদর্শনী

আমি অমৃত পত্রিকা নিয়মিত পাঠ করি। শারদীয় অমৃত প্রসঙ্গে এ পর্যন্ত প্রকাশিত চিঠিগুলির মধ্যে একটিতেও সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের 'একক প্রদর্শনী' উপন্যাসটির উল্লেখ নেই দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি। আমার ব্যক্তিগত ধারণা যে, শুধু শারদীয় অমৃত কেন এ বছর পূজা উপলক্ষে প্রকাশিত সকল উপন্যাসের মধ্যে এটি সচেতন পাঠকের বিশেষ মনোযোগ দাবী করে। অন্যান্য রচনাকে আমি ছোট করতে চাই না। কিন্তু 'একক প্রদর্শনী' নিশ্চয়ই আধুনিক বাঙলা উপন্যাসকে একটি নতুন ডায়মেনশন দিয়েছে আমি মনে করি।

গল্পটি, সকাল ১১টা থেকে বেলা ৪টের পৌঁছবার জন্যে নায়ক অমলের প্রাণপণ চেষ্টা। অবশ্য শেষ পর্যন্ত তাকে রাত ৯টা অবধি যেতে হয়। এ ঠিক স্থান থেকে স্থানে যাওয়া নয়। বা ক্লাসিকসমূহের বিখ্যাত টাইম-স্পেস সমস্যাই এখানে। তাকে বাধা দিচ্ছে বাল্যবন্ধু বেণুর কিসক্রাই থেকে মিছিল। বস্তুত গোটা পরিবেশই তাকে বাধা দিচ্ছে। সে শুনি,

চিঠিপত্র

কাঁদানে গ্যাস ও আগুনের মধ্যে দিয়ে লাশ ডিঙিয়ে ছুটতে-ছুটতে নারসিং হোমের রাত ৯টার দিকে শেষহীন ছুটে চলেছে। অন্যদিকে পাঠককে বাধা দিচ্ছে তার আজন্ম জীবন ও স্মৃতি। কেননা আজ সকাল ১১টায় অরুণের বাবা শুরু হলেও সে কিছু ভুঁইফোঁড় নয়। সে জন্যেই পাঠককে বার-বার নিয়ে যাওয়া হয়েছে তার ফেলে-আসা জীবনের কাটা-ছেঁড়া ছবির মধ্যে। এভাবে পাঠককে বাধা দেওয়া হয়েছে। গোটা রচনাটি এককথায় অরুণের অতীত ও বর্তমানের ক্রমাগত ইণ্টার-অ্যাকশান ঠিক যেন একটি 'কোলাজ'। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, সে লাহিড়ীকে দুবার মারছে, একবার দিবাস্বপ্নে ও একবার সত্যি-সত্যি। এই অংশটি বারংবার মন দিয়ে (পড়া দরকার) পড়ে বুঝেছি যে, লাহিড়ী প্রতীকমাত্র। বাস্তবিক উপন্যাসের শেষে মিছিলের 'নিপাত যাক ঃ নিপাত যাক। নিপাত যাক!' — এই ধ্বনি দিতে-দিতেই সে লাহিড়ীকে মারছে। এটা লক্ষণীয়।' সুতরাং লাহিড়ীকে সে-ই আবার হাসপাতালের গেটে ফেলে আসে। অদৃষ্ট-পূর্ব নতুন ভাষায় মাত্র ৪৫ কলামের উপন্যাসটি পড়ে আমি তৃপ্ত হয়েছি জানবেন। নমস্কার। ইতি, ভবদীয়,

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
কলকাতা—৫৭

'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' প্রসঙ্গে

শ্রীঅতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নীলকণ্ঠ পাখীর খোঁজে' উপন্যাসের আশ্বিন মাসের ধারাবাহিক পর্যায়ে শিশুদের যৌনাচারের আভাসের মধ্যে শ্রীগৌরগোবিন্দ চক্রবর্তী 'অশ্লীলতা' আবিষ্কার করেছেন জেনে (২৭শ সংখ্যা, ২৭শে কার্তিক, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ) বিস্মিত হলাম।

সহজাত মানবিক প্রবৃত্তিকে আমাদের দেশে এখনও আলো-আঁধারিতে রেখে দেবার প্রবণতা অনেক ক্ষেত্রেই লক্ষ করা যায়। শিশুদের যৌনশিক্ষা(sex-education) সুষ্ঠুভাবে না দেবার অনিচ্ছার মধ্যেই তা প্রতিফলিত। সুতরাং অদম্য কৌতূহল যদি কখনও বিকৃতিকে perversion ত্বরান্বিত করে, তবে সেটাকে স্বাভাবিক ব'লে মেনে নেওয়াই মঙ্গল।

যৌবনোন্মেষের ইঙ্গিত 'সর্বজনগ্রাহ্য' সাহিত্যে থাকলেই তা 'অশ্লীল' হয়ে যায়, এ-ধরনের শিশুসুলভ যুক্তি কি গ্রহণযোগ্য? একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। কয়েক মাস আগে একটি 'সর্বজনগ্রাহ্য' সংবাদ পৃথিবীর সমস্ত খবরের কাগজ ফলাও ক'রে প্রচার করেছিল: 'সাউথ এন্ড, ইংলান্ড, ২৩ আগস্ট—কনের নাম শ্রীমতী ফ্রেড—দুটি নারী গত বৃহস্পতিবার এখানকার বিবাহ-রেজিস্ট্রারের অফিসে গিয়ে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হয়েছেন।' এই সংবাদের অন্তঃসার—সমকামিতার চূড়ান্ত পরিণতি—কি 'সর্বজনগ্রাহ্য' হয়নি? কিন্তু কেহই 'গেল-গেল' রব তোলেননি বা 'অশ্লীল' সংবাদ প্রচারের অপরাধে কোনো সম্পাদকই অভিযুক্ত হননি। কারণ, সমাজ-বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে যাঁরাই ঘটনাকে বিশ্লেষণ করেছেন, তাঁরাই ধরে নিয়েছেন যে কোনো কিছু Lesbianism ব'লে মানব-সমাজে যদি থাকে, তাহলে এ-ধরনের ঘটনা ঘটা অস্বাভাবিক নয়।—চক্রবর্তী মশায়কে scandalized হওয়ার আগে এই ধরনের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ব্যাপারটা অনুধাবন করতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

ইচ্ছাকৃত মাত্রাধিক্য ঘটিয়ে (শিল্পের প্রয়োজন ছাপিয়ে) সাহিত্যের শুচিশুভ্র নন্দন-কাননকে যৌন-বর্ণনার স্তূপীকৃত জঞ্জাল দিয়ে পূতিগন্ধময় করা হচ্ছে কি না—সাহিত্যে অশ্লীলতা নিরূপণের এই নিরিখে 'নীলকণ্ঠ পাখীর খোঁজে' উপন্যাসে শ্রীচক্রবর্তী নির্দেশিত জায়গাটুকু 'অশ্লীল' ব'লে ধরে নিতে আমি অন্তত রাজী নই।

চন্দন ভট্টাচার্য
গৌহাটি, (আসাম)।

মফঃস্বলের লিটল ম্যাগাজিন

বহুল প্রচারিত সৎ-সাহিত্যের মুখপত্র 'অমৃতে' কার্তিকের ২০ তারিখে প্রকাশিত মফঃস্বলের লিটল ম্যাগাজিন প্রসঙ্গে 'গ্রন্থদর্শী'র সাক্ষাৎকার আলোচনাটি মনোযোগসহকারে পড়েছি। পড়েছি অঘ্রাণের ৪ তারিখে প্রকাশিত তরুণ গল্পকার মনসারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের সময়োপযোগী চিঠিটি।

এ প্রসঙ্গে মফঃস্বলের একজন তরুণ অখ্যাত সাহিত্যসেবীরূপে কিছু বক্তব্য রাখতে চাই। আমাদের সুখ-দুঃখের কথা শত-সহস্র পাঠক-পাঠিকার সামনে তুলে ধরার জন্য সম্পাদক (অমৃত), গ্রন্থদর্শী, ও পত্রলেখক মনসাবাবুকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ এবং অভিনন্দন।

গভীর দুঃখ এবং বুকভরা ব্যথা নিয়েই আজ বলতে হচ্ছে যে, আমরা যারা মফঃস্বলে থেকে সাহিত্যসেবায় ব্রতী হয়েছি, তাদের জন্য রাজধানী কলকাতার বড়-বড় পত্রিকা কার্যালয়ের দরজা বন্ধ। মফঃস্বল থেকে প্রকাশিত দু-একটি পত্রিকায় মাঝে-মধ্যে তাদের লেখা মুদ্রিত আকারে বেরোয় মাত্র। কিন্তু যদি যোগ্যতার মানদণ্ডে কলকাতার পত্রিকাগুলোতে তারা স্থান পান তাহলে বুকভরা উৎসাহ নিয়ে স্পন্দিত হৃদয়ে সাহিত্যের তীর্থপথে এগিয়ে যেতে সাহস পান।

আশা করি মাননীয় সম্পাদকবৃন্দ এবং কর্মকর্তাবৃন্দ আমাদের এই ব্যথায় ব্যথী সহানুভূতির সঙ্গে বিচারে প্রবৃত্ত হয়ে আগামী দিনে দু হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসবেন সোনার ফসলের সন্ধানে।

অশোককুমার সাহা
মল্লারপুর, বীরভূম

শারদ সাহিত্য পরিক্রমা

বিগত 'অমৃতে'র কয়েক সংখ্যা থেকে 'শারদ সাহিত্য পরিক্রমা' এই শিরোনামে প্রকাশিত রচনা আমার খুব ভাল লেগেছে। পর্যবেক্ষককে এজন্য ধন্যবাদ।

আমরা যারা মফঃস্বলে থাকি, বিশেষত সাহিত্যানুরাগী, তাদের পক্ষে কলকাতার সব পত্রিকা সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না। পর্যবেক্ষক পরিশ্রমসহকারে পত্রিকার নামোল্লেখসহ আলোচনা করে আমাদের মত যোগাযোগবিচ্ছিন্ন উত্তরবঙ্গবাসীদের শারদ সাহিত্য সংগ্রহের নির্বাচনে আরো এক ধাপ এগিয়ে দিলেন। শারদ সাহিত্য পরিক্রমা শিরোনামে গল্প, কবিতা, ছোট গল্প-উপন্যাস এবং মফঃস্বলের লিটল ম্যাগাজিন বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। আমি ভেবেছিলুম প্রবন্ধ বিষয়েও আলোচনা হবে। কিন্তু বিগত সংখ্যায় উক্ত বিষয়ে আলোচনা না হওয়ায় আমার দৃঢ়বদ্ধ ধারণা হয়েছে এ পর্যায়ে আগামীতে আর কোন রচনাই প্রকাশিত হবে না। আমার বিনীত অনুরোধ, প্রবন্ধ (শারদ সাহিত্যের) বিষয়ে একটি রচনা প্রকাশ করে আমাদের অনালোকিত জ্ঞানের আলোকোজ্জ্বল ভাবসমাহিতের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে উৎসাহিত করলে আনন্দিতই হবো।

রঞ্জিৎ দেব
কোচবিহার

শাদা চোখে

বেকারসমস্যা নিয়ে বর্তমানে দেশব্যাপী খুব হৈ চৈ চলছে। এই সমস্যাকে কেন্দ্র করে কোথাও কোথাও আন্দোলন গড়ে তুলবার চেষ্টাও হচ্ছে। কিন্তু স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর থেকে অদ্যাবধি এই সমস্যা নিরসনকল্পে কোন প্রত্যক্ষ আন্দোলন গড়ে ওঠেনি। বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দ কি রাজ্য আইন সভা কি লোকসভায় দুচারজন ছাড়া অন্যদের মত এই সমস্যাটাকে একটি ইস্যু হিসাবে ব্যবহার করেছেন মাত্র। নিদেন পক্ষে একটি মিছিল, এর বেশী কিছু কোনদিন করেছেন বলে মনে পড়ে না। হ্যাঁ, মাঝে মাঝে তাঁদের অন্যান্য দাবীর সঙ্গে বেকারদের কাজ চাই শ্লোগানটা জুড়ে দিয়ে নিজেদের জনপ্রিয়তা বজায় রাখবার চেষ্টা করেন নি এমন নয়। অপরদিকে যাঁরা গদীয়ান অর্থাৎ দেশের অর্থভাণ্ডারের চাবিকাঠি যাঁদের হাতে তাঁরও যে বারংবার আশার বাণী পরিবেশন করেন নি এমন নয়। এক একবার পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে আর সঙ্গে সঙ্গে দেশবাসী শুনেছেন অমুক পরিকল্পনার শেষে কত বেকার সাকার হবে, আর জাতীয় আয় বেড়ে দেশের অর্থনৈতিক চেহারা পাল্টে যাবে। অতএব মাভৈঃ! বর্তমানের অমানিশা কেটে গিয়ে স্বর্ণ-প্রভাত আসন্ন প্রায়! কিন্তু বাস্তব অবস্থা হচ্ছে, বেকারী ক্রমেই বেড়ে চলেছে। মানুষের চাহিদার সঙ্গে সরবরাহের যে দুস্তর ব্যবধান ক্রমেই বেড়ে উঠছে তার প্রত্যক্ষ ফল হিসাবে সমাজে অশান্তির আগুন জ্বলে উঠছে। আর এই অশান্তির মাত্রা বেড়ে উঠে যখন হিংসাকে আশ্রয় করে লঙ্কাকাণ্ডের সৃষ্টি হয় তখন আবার রাজনৈতিক নেতাদের টনক নড়ে। গবেষণা সুরু হয় কি করে এই সমস্যার সমাধান করা যায়। দেশপ্রেমের সুললিত বাণী দিয়ে বেকারের জঠর জ্বালাকে উপশম করার ব্যর্থ প্রয়াস দেখা দেয়। যখন তীব্রতা কমে তখন আবার প্রচেষ্টায় ভাটা পড়ে। নেতারা সমস্যার কোলে ঘুমিয়ে পড়েন।

হালফিল ডান কম্যুনিস্ট পার্টি দেশব্যাপী বিক্ষোভের মাধ্যমে পুনরায় বেকার সমস্যার তীব্রতা সম্পর্কে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করেছেন। এবং শুধু তাই নয়—আন্দোলনে গতিবেগ সঞ্চার করার জন্য আইন অমান্য করতেও দ্বিধা করেন নি। এমন কি কোলকাতায় [illegible] বাড়ীর সামনেও অনেক সময় যুবক বেকারের চাকুরীর দাবীতে এবং লে-অফ, ছাঁটাই ইত্যাদি বন্ধের আহ্বান জানিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন। কালনায় একটি বেকারী বিরোধী সম্মেলনও হয়ে গেছে। সেই সম্মেলনের প্রধান অতিথি হিসাবে এস এম পির শ্রীকাশীকান্ত মৈত্র বর্তমানে বেতন বৃদ্ধি স্থগিত রেখে সেই মূলধন নয়া উদ্যোগে নিয়োজিত করে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়াবার আবেদন জানিয়েছেন। দক্ষিণপন্থী কম্যুনিস্ট পার্টি সমর্থিত গণতান্ত্রিক যুব সংস্থার বিক্ষোভকারীদের বক্তব্য প্রণিধান করে স্বয়ং শ্রী বি এম বিড়লা বলেছেন যে তিনি নাকি ১৫ মাস পূর্বেই বেকারদের চাকুরী সংস্থানের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে সরকারী নীতির পুনর্বিবেচনা করার দাবী তুলেছিলেন। বিশেষ করে মূলধন বিনিয়োগের প্রশ্নে, উৎপাদন ক্ষেত্র এবং সম্ভোগের ব্যাপারে নয়া নীতি গ্রহণের কথা বলছিলেন। শ্রী বি এম বিড়লার মতে বিগত ২৫ বছরে দেশে বিশ কোটি লোক বেড়েছে কিন্তু চাকুরীর সংস্থান হয়েছে মাত্র ২০ লক্ষ লোকের।

দেখা যাচ্ছে সরকার, রাজনৈতিক দল এমন কি শিল্পপতিরা পর্যন্ত বেকার সমস্যার ভয়াবহতা সম্পর্কে সজাগ এবং প্রত্যেকেই সমাধানের জন্য নানারকম পরিকল্পনাও পেশ করছেন। কিন্তু অবস্থা যে তিমিরে সেই তিমিরে। এবং শুধু তাই নয়, সমস্যাটা যেন ক্রমশ আরও তীব্রতর হচ্ছে। পশ্চিম বাংলার বর্তমান ঘটনাবলীকে এর সঙ্গে জুড়ে দিয়ে অনেকে সঙ্কটের পরিধিটা যে ক্রমেই ব্যাপ্তি লাভ করছে তা বুঝাবার চেষ্টা করছেন। রাজ্যের বর্তমান অবস্থা বেকারীর আংশিক প্রতিফলন মাত্র। সম্পূর্ণ ছবি নয়। যে অশান্তি পশ্চিম বাংলায় চলছে তা রাজনৈতিক আদর্শের সংঘাত জনিত ফলশ্রুতিও বটে।

যা হোক, এখন ভাবা যাক কি করে এই সমস্যা ক্রমেই জটিলতর হয়ে উঠছে এবং এই দৈত্যের হাত থেকে মুক্তি পাবার উপায়ই বা কি? ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক অবস্থাকে উন্নত মানে টেনে তুলবার জন্য বা দেশকে আধুনিকীকরণের জন্য অদ্যাবধি যে প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে তা শুধু এক একটি 'সেক্টরকে' সমৃদ্ধ করার প্রচেষ্টা মাত্র। সমগ্র দেশকে অর্থাৎ সমস্ত মানুষকে একই সঙ্গে একটি জীবন-মানের স্তরে উন্নীত করবার চেষ্টা এখনো হয়নি। আরও বিশদ করে বললে এই দাঁড়ায় যে দেশের মধ্যে ছোট ছোট 'লণ্ডন' গড়ে এক শ্রেণীর মানুষের জীবন মান উন্নত করবার প্রচেষ্টাই এতদিন চলেছে, এবং এখনও চলছে। ফলে কখনও এদেশে অভাব হয়েছে কারিগরের। আবার বর্তমানে কারিগর হচ্ছে বেকার। ভারতবর্ষ ও পাশ্চাত্য দেশগুলির মধ্যে জীবন মানের যে পার্থক্য রয়েছে সেই পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তা করে দেশকে স্থির করতে হবে, সমগ্র জাতিকে একই সঙ্গে দারিদ্র্যমুক্ত করবার চেষ্টা করা হবে না অংশ বিশেষকে পাশ্চাত্য জীবন মান আহরণে সাহায্য করবে। যদি সমগ্র জাতিকে একই সঙ্গে টেনে তুলবার প্রচেষ্টা না চালানো হয়, একটি অংশকে সব সময়েই বেকারীর তীব্র জ্বালা অনুভব করতেই হবে। এর থেকে পরিত্রাণ পাবার কোন উপায় নেই।

এক শ্রেণীর নাগরিকের ভোগ্যপণ্যের যোগানের দিকে নজর দিয়ে অর্থনীতি গড়া হচ্ছে কিনা একটু তলিয়ে দেখলেই বুঝতে পারা যায়। যে দেশে মানুষ বাদুড়-ঝোলা হয়ে বাসে ট্রেনে যাতায়াত করে এবং পয়সার অভাবে অনেকেই পদযুগলের উপর নির্ভর করতে হয় কিম্বা যে দেশে মানুষের প্রতিদিনের গড়পড়তা আয় 'তিন আনার বেশী নয়' সেই দেশে টেলিভিশন প্রচলনের পরিকল্পনা কাদের ঘরে হাসি ফোটাবার জন্য? নিশ্চয় ভারতের শতকরা ৭৫ ভাগ লোক যারা সাধারণ চাষী তাদের সম্ভোগের জন্য নয়? কিম্বা মুটে মজুরের জন্যও নয়। কাজেই বলছিলাম সমগ্র দেশকে একসঙ্গে টেনে তোলার চেষ্টা করতে হবে এবং পরিকল্পনাও সেভাবে ঢেলে সাজাতে হবে। এমন কি স্বয়ং বিড়লাজীও সম্ভোগের সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছেন। কথাটা অতীব খাঁটি। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করতে চাই, সোভিয়েত দেশে বিপ্লব হবার এত বৎসর পরও বিলাস সামগ্রী যথা মোটরগাড়ী পর্যন্ত নির্দিষ্ট হারে উৎপন্ন হয়ে থাকে। ভারতের সরকারের সমস্ত মন্ত্রীই সমাজবাদের কথা বলে থাকেন, কিন্তু অর্থনীতির এই দিকটা আদৌ তাঁরা অনুধাবন করার চেষ্টা করেন নি বলেই মনে হয়।

মাত্র কয়েক মাস আগে থেকেই ভূমি সমস্যা সমাধানের কথা বলা হচ্ছে এবং কৃষিভিত্তিক শিল্প সংগঠনের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু এ প্রচেষ্টার পিছনেও আন্তরিকতার যে সন্দেহ অভাব আছে তা

বেশ বোঝা যায়। এদেশের অর্থনীতির বনিয়াদ কৃষির উপরই ভিত্তি করে চলে আসছে, অথচ সেই দিকেই বিশেষ করে নজর দেওয়া হয়নি। ফলে নয়া উদ্যোগের ক্ষেত্র সীমিত হয়ে আছে। কাজেই বেকারের অন্ন সংস্থানের সুযোগও বাড়ে নি। উপরন্তু, শিল্পের সম্প্রসারণের ক্ষেত্রেও মন্দাভাব দেখা দেওয়ার ফলে—এতদিন যেভাবে প্রাণপণ বাস্তুকার ও কারিগর হওয়ার জন্য জীবন পণ করে যুবকরা ছুটে যাচ্ছিলেন তাতেও ভাটা পড়ছে। কেননা ঐ ক্ষেত্রেও বেকারীর অশুভ ছায়া দীর্ঘায়িত হয়ে উঠেছে।

অনুন্নত দেশের অর্থনৈতিক মান উন্নয়নে মূলধনের সমস্যা ভয়ঙ্করভাবেই দেখা দেয়। এবং মূলধন জোগাড় হলেও তার বিনিয়োগ করলে জাতীয় অর্থনীতির সর্বাঙ্গীন উন্নতি হবে এবং সমগ্র জনগণের কল্যাণ হবে তা নির্ভর করে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত সরকারের শ্রেণী চরিত্রের উপর। ভারতে এই প্রশ্নটা এখনও অমীমাংসিত রয়ে গেছে। ফলে, যে মূলধন অদ্যাবধি বিনিয়োগ করা হয়েছে তার আকাঙ্ক্ষিত ফল লাভ সম্ভব হয় নি। এবং শুধু তাই নয়, নয়া মূলধন সৃষ্টির ব্যাপারেও উৎপাদনের সাহায্য পাওয়া যায়নি। শ্রমিক অসন্তোষ সেখানে প্রধান অন্তরায় হয়ে উঠেছে, এবং এই অসন্তোষ যে শুধু একটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থেকে উদ্ভূত এমন নয়। কারণ সম্ভোগের বৈষম্য অহরহ মানুষের মনে যে ঈর্ষা ও অসূয়ার ভাব সৃষ্টি করছে সেটা আখেরে সংগতি রূপ পরিগ্রহ করে বিক্ষোভে ফেটে পড়ত বাধ্য। জনতার জাগৃতি ক্রমেই বাড়ছে, এবং দেশ বিদেশের খবরাখবর পেয়ে তা আরও সচেতন হয়ে উঠছে। এমতাবস্থায় সম্ভোগের বৈষম্য যদি ক্রমেই আকাশচুম্বী হতে থাকে তবে বিক্ষোভের দাবানল যে জ্বলে উঠবে তাতে আর সন্দেহ কি? আর তার প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি হবে উৎপাদনের ঘাটতি। উৎপাদন ব্যাহত হওয়ার অর্থ হচ্ছে শুধু নয়া পুঁজি সৃষ্টিতে বাধা নয়, অধিকন্তু বিনিয়োগীকৃত মূলধনের সঙ্কোচন। অবশ্যম্ভাবী ফল ঃ বেকার সমস্যার সৃষ্টি। সাক্ষরদেরও বেকারত্ব প্রাপ্তি ঘটবে এতে।

টাকার মূল্যমান কমার সঙ্গে সঙ্গে জিনিষপত্রের দাম ঊর্ধ্বমুখী হতে থাকে। এটাই হচ্ছে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একটি স্বাভাবিক নিয়ম। আর জিনিষের দাম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দাবী উঠে মাগগীভাতা বৃদ্ধির কিম্বা বেতন বৃদ্ধির। বামপন্থী দলগুলি, যাঁরা শ্রেণী সংগঠন করেন বা মজদুর আন্দোলন করেন তাঁরা অনতিবিলম্বে এই সমস্ত ইস্যুকে কেন্দ্র করে আন্দোলন ও ধর্মঘট করতে পেছপা হন না। আবার এমনও দেখা যাচ্ছে, এক এক শিল্পে বেতনের প্রচুর তারতম্য থাকা সত্ত্বেও একই হারে বেতন মান নির্ধারণের আন্দোলন আসে না। যাঁদের বেশী বেতন তাঁরা আরও বেতন বৃদ্ধির জন্য জোরদার আন্দোলনে প্রবৃত্ত হন। তখন কেউ বেকার সমস্যার কথা ভাবেন না। সেই কথা না ভাবাটাই তাঁদের পক্ষে স্বাভাবিক। কারণ, তাঁরা বিরোধী দল—সরকারের পতনই তাঁদের কাম্য। কিন্তু সরকারের এই বিষয়ে ও ওয়াকিফহাল থাকা উচিত। তাঁরা যদি সরকারী ও বেসরকারী সর্ব ক্ষেত্রেই একই বেতন হার প্রবর্তনের উদ্যোগী হতেন, অবশ্য কর্ম অনুসারে পার্থক্য নিশ্চয়ই থাকবে, তাহলে দেশব্যাপী এত গুঞ্জন উঠত না। এমন কি, বেতন বৃদ্ধির ব্যাপারে মরোটোরিয়াম ঘোষণা করে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখতেন তবে এত অসন্তোষ সৃষ্টির সুযোগ হত না। অন্যদিকে বেতন বৃদ্ধির মাধ্যমে যে অর্থ বিনিয়োগ হচ্ছে তা কোন পুঁজির সৃষ্টি করছে না। কাজেই সেই অর্থকে যদি মূলধন সৃষ্টির কাজে বিনিয়োগ করা যেত তবে যে তীব্র বেকার সমস্যা আছে তার হয়ত কিঞ্চিৎ সুরাহা হতে পারতো। বামপন্থীরাও এই বক্তব্যকে সামনে রেখে আন্দোলন করলে মনে হয় জনতার আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত হবেন না, শুধু বেতন বাড়াবার দাবী নিয়ে বিশেষ করে কোন সংগঠিত শ্রেণীর—আন্দোলন করলে সেটাও সরকার যে এক শ্রেণীর ব্যক্তির জীবন মান উন্নয়নে ব্রতী হয়েছেন তার মতই মনে হয়। পার্থক্য খুব কমই থাকে।

বর্তমান অশান্ত অবস্থার হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য কেউ কেউ আরও একটা কিছু করার ওপর বিশেষ জোর দেওয়ার চেষ্টা করছেন। যে কোন একটা পরিকল্পনা নিয়ে নেমে পড়লেই কিছু লোক ত চাকরী পাবে। তাঁদের ধারণা এই চাকুরী পেলেই সব রোগ সেরে যাবে। এসব সমস্যাকে এড়িয়ে গিয়ে কোন রকমে নিজের অস্তিত্বকে পরপারের ডাক না আসা পর্যন্ত নির্বিঘ্নে টিকিয়ে রাখা। নিজে পরিত্রাণ পেলেও এতে জাত বাঁচতে পারে না। একটা উন্নয়নমূলক কাজ শেষ হলেই আবার বেকার আসবে। এখনও এমন অনেক নজীর আছে। ফারাক্কা একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

কাজেই জোড়াতালি দিয়ে কিছু করলে সুফল পাওয়া যাবে না। কেউ কেউ এমন কি বামপন্থী দলগুলিও বেকার ভাতার দাবী করে থাকেন। সমদর্শী বেকার ভাতার বিরোধী। জাতকে এবং উদীয়মান তরুণকে বেকার ভাতা দিয়ে পঙ্গু করার মত প্রস্তাব সমীচীন বলে মানা যায় না। সমগ্র দেশের মানুষকে একসঙ্গে টেনে তুলবার জন্য নয়া অর্থনীতি গ্রহণ করতে হবে। তার জন্য চিন্তা করতে হবে উৎপাদনের কৌশল পরিবর্তন করে কি ভাবে সমস্ত লোককে কাজে লাগানো যায়। যে পদ্ধতিতে এদেশে উৎপাদন হচ্ছে সেই পদ্ধতির সুফল ফলে সেসব দেশে, যেখানে জনসংখ্যার চেয়ে সম্পদ অনেক বেশী। ভারতের মত দেশে নয়। কাজেই গোটা দেশে বিস্ফোরণ ঘটবার আগে রাষ্ট্রকর্ণধারদের অবিলম্বে ভাবা উচিত কি পদ্ধতি অবলম্বন করলে সমস্ত মনুষ্যকে বিরাট কর্মসংঘের অংশীদার করা যায়। শুধু একটি রাজ্যের সমস্যা বলে এড়িয়ে গেলে চলবে না। জাতীয় অর্থনীতির সঙ্গে এই সমস্যা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। অতএব জাতীয় সমস্যা হিসাবে অগ্রাধিকার দিয়ে দলমত নির্বিশেষে এর সমাধান খুঁজে বার করা দরকার। যদি বামপন্থীরা মনে করেন যে তাঁরা গদীতে এলেই সমস্যা সমাধান করে দিতে পারবেন—সে আশা দুরাশা। লক্ষ লক্ষ লোককে অসীম দারিদ্র্যে রেখেই তাঁদের তখত-এ-তাউস বজায় রাখতে হবে। আর যদি সরকার নয়া নীতি গ্রহণে অনিচ্ছুক হন তবে শুধু পূজা পার্বণ অনুষ্ঠানের মত সময়ে সময়ে বেকারদের জন্য অশ্রুমোচন করলে চলবে না, মত, পথ ভুলে একাত্ম হয়ে বেকারদের বাঁচবার পথ খুঁজতে হবে।

—সমদর্শী

দেশে বিদেশে

পূর্ব পাকিস্থানের ঘূর্ণিবাত্যাবিধ্বস্ত সমুদ্রোপকূলবর্তী অঞ্চলগুলিতে সাহায্য পৌঁছে দেওয়ার ব্যাপারে পাকিস্থানের মিলিটারি সরকার যে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন তার বিরুদ্ধে সেখানকার জনমত সোচ্চার হয়ে উঠেছে। ঢাকায় রোজ হাজার হাজার লোক মিছিল বার করে ইয়াহিয়া শাহি সরকারকে ধিক্কার দিচ্ছেন। 'স্বাধীন পূর্ব পাকিস্থান জিন্দাবাদ' বলে সেখানে ধ্বনি উঠেছে।

অথচ পাকিস্থানের মিলিটারী শাসকদের দৃষ্টিভঙ্গী এমনই সঙ্কীর্ণ যে, তাঁরা ভারতের সাহায্য নিতে রাজী হচ্ছেন না।

সেই প্রলয়ঙ্কর ঝড় ও বন্যার পর বারো দিন কেটে গেল। বিধ্বস্ত অঞ্চলগুলি থেকে যেসব খবর আসছে তাতে দেখা যাচ্ছে, এখনও সব জায়গা থেকে লাশই সরান হয় নি, যারা জীবিত আছে তাদের খাদ্যবস্তু, ঔষধ ইত্যাদি পৌঁছে দেওয়া তো দূরের কথা। প্রকৃতির হাতে মার খেয়ে যারা মরেছে তারা তো মরেছেই, যারা বেঁচে গেছে তাদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য এই ভয়ঙ্কর বিপদের দিনে অন্য মানুষদের তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়াবার দরকার ছিল। সারা পৃথিবীর মানুষ পাকিস্থানের এই দুর্যোগে ওদের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। এমন দেশ, এমন আন্তর্জাতিক সংগঠন বোধহয় নেই বললেই চলে যারা কোন না কোনভাবে এই প্রায় আধ কোটি দুর্গত মানুষকে সাহায্য করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে নি। বিদেশ থেকে আগত অনেকগুলি সাহায্যকারী ও উদ্ধারকারী দল ইতিমধ্যে ঐসব অঞ্চলে কাজ আরম্ভও করে দিয়েছেন। আমেরিকান সেনাবাহিনীর হেলিকপ্টার ত্রাণসামগ্রী পৌঁছে দিচ্ছে। কিন্তু এই বিপদ থেকে মানুষগুলিকে উদ্ধার করার মুখ্য দায়িত্ব যাঁদের সেই পাকিস্থান সরকার কি করছেন? ইসলামাবাদের কর্তৃপক্ষের কাছে সামরিক বাহিনীর গোটা কয়েক হেলিকপ্টার চাওয়া হয়েছিল যাতে দুর্গত মানুষগুলির কাছে সাহায্য নিয়ে যাওয়া যায়। কিন্তু হেলিকপ্টার পাওয়া যায় নি। এই অভিযোগ করেছেন স্বয়ং পূর্ব পাকিস্থানের গভর্নর ভাইস-এ্যাডমিরাল এ এম আহ্‌সান। নিতান্তই একটা যোগাযোগ ঘটে গিয়েছিল বলে পিকিং থেকে ইসলামাবাদে ফেরার পথে ইয়াহিয়া খাঁ ঢাকায় একদিন থেকে রিলিফের ব্যবস্থা সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়েছিলেন। তারপর দশদিনের মধ্যে পাকিস্থানের আর কোন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ঢাকামুখো হন নি। ইতিমধ্যে কয়েক লক্ষ মানুষ, যারা ঝড়-জল থেকে বেঁচে গেছে, তারা ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও অসুখের বিরুদ্ধে অসহায়ভাবে লড়াই করতে করতে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

ইসলামাবাদ "দূর অস্ত্"। পূর্ব পাকিস্থানের মানুষ মরে-হেজে গেলে পশ্চিম-পাকিস্থানের পাঞ্জাবী-পাঠান শাসকদের কি আসে যায়? পূর্ব পাকিস্থানের মানুষ বুঝেছেন যে, পশ্চিম পাকিস্থানের শাসকরা তাঁদের প্রদেশটির প্রতি বরাবর যে অবহেলা দেখিয়ে এসেছেন আজ এই ভয়ঙ্কর বিপদের দিনেও সেই অবহেলার মনোভাব তাঁরা ছাড়তে পারছেন না। পূর্ব পাকিস্থানের হতভাগ্য মানুষগুলিকে সাহায্য করার জন্য পাকিস্থানের জঙ্গী সরকার তাঁদের মিলিটারি বন্দোবস্ত নড়চড় করতে, সামরিক বাহিনীকে ত্রাণের কাজে নামাতে অথবা এমনকি সামরিক বিমান বা হেলিকপ্টারগুলি পশ্চিম পাকিস্থান থেকে পূর্ব পাকিস্থানে পাঠাতে প্রস্তুত নন। পূর্ব পাকিস্থানের মানুষ এই কারণেই এত ক্ষুব্ধ এবং ঢাকায় রোজ মিছিল বেরোচ্ছে।

পূর্ব পাকিস্থানের মানুষ এটাও দেখতে পাচ্ছে যে, এই দুর্দৈবের মধ্যেও পাকিস্থান সরকার তাদের কাছে ভারতবর্ষের সাহায্য পৌঁছতে দিচ্ছেন না। ভারতবর্ষের সরকার দুর্গত অঞ্চলে দুটি ভ্রাম্যমাণ হাসপাতাল পাঠাতে চেয়েছিলেন। একটি হাসপাতালের লোকজন ও যন্ত্রপাতি সীমান্তের কাছে তৈরী হয়ে আছে; কিন্তু পাকিস্থান সরকারের অনুমতি পাওয়া যাচ্ছে না। ভারত সরকার বলেছিলেন তাঁরা মাঝিমাল্লা সমেত জলযান পাঠাবেন। পাকিস্থান সরকার তারও অনুমতি দেন নি। ভারতের বিমান ও হেলিকপ্টারও পাকিস্থান নিতে চাইছেন না। এমনকি ভারত থেকে যে বিমানে করে ত্রাণসামগ্রী পূর্ব পাকিস্থানে পাঠানো হবে তার বৈমানিকদের ভিসা মঞ্জুর করতেও পাকিস্থান সরকার রাজী হন নি।

অথচ নয়াদিল্লী পূর্ব পাকিস্থানের এই মহাবিপদের দিনে স্বাভাবিক মানবিকতার ডাকে সাড়া দিয়ে এগিয়ে এসেছে। ভারত সরকার শুধু যে এক কোটি টাকা সাহায্য মঞ্জুর করেছেন তাই নয়, পাকিস্থানের পশ্চিম অংশ থেকে ত্রাণসামগ্রী নিয়ে পূর্ব পাকিস্থানে যাওয়ার জন্য ভারতের আকাশপথ ব্যবহার করার ঢালাও অনুমতি দিয়েছেন।

আর কয়েক দিনের মধ্যেই পাকিস্থানে নির্বাচন হওয়ার কথা। যদি নির্ধারিত সময়মত নির্বাচন হয় তাহলে এই ঝড়জলের অভিজ্ঞতা ও ইসলামাবাদের এই নির্মমতা সেই নির্বাচনকে প্রভাবিত করবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

*

অন্ধ্র প্রদেশের সিদ্দিপেট কেন্দ্রে যে উপনির্বাচন হয়ে গেল তার ফলাফল তেলেঙ্গানার আন্দোলনকারীদের দারুণভাবে উৎসাহিত করবে। তেলেঙ্গানা প্রজা সমিতির প্রার্থী শ্রী এ মদনমোহন এই নির্বাচনে শাসক কংগ্রেস ও সি-পি-আই প্রার্থীকে বিপুল ভোটে পরাজিত করেছেন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী, শাসক কংগ্রেসের প্রার্থী পি পি রাজেশ্বর রাওয়ের সঙ্গে তাঁর ভোটের ব্যবধান প্রায় ২০ হাজার এবং কম্যুনিস্ট প্রার্থী, যিনি প্রথম সাধারণ নির্বা-

চনে এই কেন্দ্র থেকে বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন, তাঁর জামানৎ বাজেয়াপ্ত হয়ে গেছে।

তেলেঙ্গানা প্রজা সমিতি পৃথক তেলেঙ্গানা রাজ্যের জন্য আন্দোলন চালাচ্ছে এবং পৃথক তেলেঙ্গানা রাজ্য গঠনের দাবীই এই উপনির্বাচনে প্রধান প্রশ্ন ছিল।

পাঁচ মাসের মধ্যে তেলেঙ্গানা প্রজা সমিতির এই দ্বিতীয় নির্বাচনী সাফল্য। এর আগে গত জুন মাসে সমিতির প্রার্থী হায়দরাবাদ শহরের খয়রাতাবাদ কেন্দ্র থেকে লড়ে জয়ী হয়েছিলেন। খয়রাতাবাদ ছিল শহরাঞ্চলের নির্বাচকমণ্ডলী আর সিদ্দিপেট হচ্ছে গ্রাম্য নির্বাচনকেন্দ্র। অর্থাৎ তেলেঙ্গানা প্রজা সমিতি এটা প্রমাণ করতে সমর্থ হয়েছে যে, তেলেঙ্গানার শহর ও গ্রাম, দুয়ের অধিবাসীরাই পৃথক তেলেঙ্গানার দাবী সমর্থন করছেন।

তেলেঙ্গানা আঞ্চলিক কমিটির চেয়ারম্যান শ্রী জে চোক্কারাও এই নির্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেছেন, "এটাই দেখা গেল যে, তেলেঙ্গানা সমস্যার নিরসন করার জন্য প্রধানমন্ত্রী গত বছর আগস্ট মাসে যে আট দফা কর্মসূচী ঘোষণা করেছিলেন তাতে মানুষ খুশী নয়, তারা আরও বেশ কিছু চায়।"

অন্ধ্র প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীব্রহ্মানন্দ রেড্ডি কিন্তু এই ভোটাছুটি থেকে সে ধরনের কোন শিক্ষা নিচ্ছেন না। তাঁর বক্তব্য হল, অন্ধ্র রাজ্য ভেঙে টুকরো হবে কিনা সেটা শুধু তেলেঙ্গানা অঞ্চলের অধিবাসীদের রায়ে স্থির হবে না, ভারতের সংবিধান অনুসারে এই প্রশ্ন পার্লামেন্টের বিবেচ্য।

সিদ্দিপেট কেন্দ্রে তাঁর দলের প্রার্থীর পরাজয়ের কারণ সম্পর্কে শ্রীরেড্ডি বলেছেন যে, সি-পি-আই নিজেদের প্রার্থী দাঁড় করিয়ে সমিতির সুবিধা করে দিয়েছে। ভোটের ফলাফলে অবশ্য একথা প্রমাণ হয় না। কারণ শাসক কংগ্রেস আর কম্যুনিস্ট পার্টির মিলিত ভোটসংখ্যা যেখানে ১৯,২৯৩ সেখানে তেলেঙ্গানা প্রজা সমিতির প্রার্থী পেয়েছেন ৩১,৬৩০ ভোট।

শাসক কংগ্রেস এই উপনির্বাচনের উপর যথেষ্ট জোর দিয়েছিল। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রী জে বেঙ্গলরাও থেকে আরম্ভ করে রাজ্য মন্ত্রিসভার অন্তত পাঁচজন সদস্য এই নির্বাচনকেন্দ্রে উপস্থিত থেকে ভোটদ্বন্দ্ব পরিচালনা করেছেন। অবশ্য, খবরে প্রকাশ যে, ঐ এলাকায় তেলেঙ্গানা প্রজা সমিতির এমন বিপুল প্রভাব যে, মন্ত্রীরা কেউ তাঁদের ডাক বাংলো ছেড়ে বেরোতে পারেন নি। প্রজা সমিতির চেয়ারম্যান ডাঃ এম চান্না রেড্ডি অভিযোগ করেছেন যে, ভোটারদের উপর প্রভাব বিস্তার করার উদ্দেশ্য নিয়ে শাসক কংগ্রেস দল ঐ এলাকায় টাকা ছড়িয়েছে এবং রাজ্য সরকার রাতারাতি নির্বাচনী এলাকার ২০টি গ্রামে বৈদ্যুতিক ট্রান্সফর্মার বসিয়েছেন।

এই উপ-নির্বাচনে সি-পি-আই প্রার্থীর পরাজয় আরও শোচনীয়। মহারাষ্ট্রের

ক্রীড়া ও বিনোদন সংখ্যা ১৩৭৭

সাময়িক পত্রিকার জগতে অমৃতই সর্বপ্রথম এই ধরণের বিনোদন সংখ্যা প্রকাশ শুরু করে। তারপর প্রতি বছরই বড়দিনের সময় এই সংখ্যাটি প্রকাশ করা হচ্ছে। এবারও বেরোবে আগামী ২৫ ডিসেম্বর।

অসংখ্য ছবি

চলচ্চিত্র, নাট্যমঞ্চ, ফ্যাশান, খেলা-ধুলা, সঙ্গীত এবং অন্যান্য বিষয়।

গল্প

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, ছবি বসু, চণ্ডী মণ্ডল এবং যশোদাজীবন ভট্টাচার্য।

চলচ্চিত্র, নাট্যমঞ্চ, ভ্রমণ, ফ্যাশান এবং সঙ্গীত

সত্যজিৎ রায়, শম্ভু মিত্র, ঋত্বিককুমার ঘটক, চিদানন্দ দাশগুপ্ত, শান্তিগোপাল, অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, এন কে জি, পশুপতি চট্টোপাধ্যায়, নির্মল ধর, দিলীপ মৌলিক, দক্ষিণারঞ্জন বসু, ভবতোষ সাহা, বিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য, নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্ধ্যা সেন।

ফেলে-আসা দিনের স্মৃতি আলেখ্য

নানা রঙয়ের দিনগুলি
কানন দেবী

খেলাধুলা

অজয় বসু, আরবি, মতি নন্দী, দিলীপ দত্ত, অজয় হোম, গজানন্দ বোড়ে, অমল দাশগুপ্ত, কমল ভট্টাচার্য, ক্ষেত্রনাথ রায় এবং কয়েকজন।

পরবর্তী সংখ্যায় পূর্ণ বিবরণ দেখুন।

প্যারেল কেন্দ্রের উপনির্বাচনে পরাজয়ের অব্যবহিত পরেই আবার এই পরাজয় ঐ পার্টির পক্ষে একটা বড় আঘাত। প্রথম সাধারণ নির্বাচনে সিদ্দিপেট কেন্দ্র থেকে যে কম্যুনিস্ট প্রার্থী নির্বাচিত হয়েছিলেন এবার তিনি সেই কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেই জামানত হারিয়েছেন। অথচ, এই ভোটযুদ্ধের আগে কম্যুনিস্ট পার্টি ঐ কেন্দ্রে নিজেদের শক্তি সম্পর্কে অত্যন্ত আস্থাবান ছিল, এমনকি শাসক কংগ্রেস দলও প্রথম প্রথম ভেবেছিল যে, ঐ কেন্দ্রে প্রজা সমিতির প্রার্থীর বিরুদ্ধে তারা কোন প্রার্থী না দিয়ে কম্যুনিস্ট প্রার্থীকেই সমর্থন করবে। কিন্তু তারপর প্রজা সমিতির ভিতরকার গোলযোগের দরুন ঐ অঞ্চলে সমিতির কিছু কর্মী সমিতি থেকে বেরিয়ে আসেন এবং শাসক কংগ্রেস নেতাকে বলেন যে, সিদ্দিপেট উপ-নির্বাচনে শাসক কংগ্রেস প্রার্থী দিলে তাঁরা সেই প্রার্থীকে সমর্থন করবেন। তখনই শাসক কংগ্রেস দল মত পরিবর্তন করে সিদ্দিপেটে প্রার্থী দাঁড় করাবার সিদ্ধান্ত নেয়।.

মানচিত্রে ভারত মহাসাগরের বুকের উপর দিয়ে একটি সরল রেখা এঁকে যদি সিংহল দ্বীপকে মরিশাস দ্বীপের সংগে যুক্ত করা যায় তাহলে ঐ সরলরেখার প্রায় মধ্যস্থলে একটি ক্ষুদ্র বিন্দুর আকারের দ্বীপ নজরে পড়বে। সেই দ্বীপটির নাম ডিয়েগো গার্সিয়া। আয়তন মাত্র ১১ বর্গ-মাইল। অর্থাৎ কলকাতা কর্পোরেশন এলাকার মধ্যে তিনটিও বেশী ডিয়েগো গার্সিয়া ধরে যাবে।

ঐ ক্ষুদে প্রবাল দ্বীপটি চাগোস দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্ভুক্ত। আর গোটা চাগোস দ্বীপপুঞ্জই এক সময়ে মরিশাস দ্বীপের এক্তিয়ারভুক্ত বলে গণ্য হত। বৃটিশ সরকার যখন মরিশাসকে স্বাধীনতা দেন তখন সংগে সংগে এই সর্ত আরোপ করেন যে, চাগোস দ্বীপপুঞ্জটি ছেড়ে দিতে হবে। বৃটেন তিন লক্ষ পাউন্ড দিয়ে মরিশাসের কাছ থেকে দ্বীপপুঞ্জটি ইজারা নেয়।

এই দ্বীপপুঞ্জ নিজের হাতে রাখার পিছনে যে বৃটিশ সরকারের একটা বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল সেটা এখন পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। কারণ, খবর হচ্ছে এই যে, ডিয়েগো গার্সিয়া দ্বীপে বৃটিশ ও আমেরিকার একটি যুক্ত নৌঘাঁটি হচ্ছে। বৃটেন ও আমেরিকা দুই দেশই ভারত মহাসাগরে পা রাখার জন্য কিছুকাল যাবৎ যে চেষ্টা করেছে এটা সেই চেষ্টার পথেই একটি পদক্ষেপ।

ভারত সরকার এই নৌঘাঁটি তৈরীর পরিকল্পনায় আপত্তি জানিয়েছেন এবং ভারত সহ গোষ্ঠীনিরপেক্ষ দেশগুলি ভারত মহাসাগরকে যুদ্ধমুক্ত এলাকা হিসাবে গণ্য করার জন্য যে আবেদন জানিয়েছে সেকথা বৃটেন ও আমেরিকাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। ভারত মহাসাগরে রুশ নৌবহরের তৎপরতা বেড়ে গেছে বলেই বৃটেন ও আমেরিকার নৌঘাঁটি তৈরী করতে হচ্ছে, এই যুক্তি মানতেও ভারত সরকার প্রস্তুত নন। কেননা, ভারত মহাসাগরে সোভিয়েট রাশিয়া কোন নৌঘাঁটি স্থাপন করেছে বলে নয়াদিল্লীতে খবর নেই।

২৮-১১-৭০ —পুণ্ডরীক

সম্পাদকীয়

পরীক্ষা বাঁচাবার সংকল্প

নভেম্বর-ডিসেম্বর মাস এলেই ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের চিন্তা শুরু হয় বার্ষিক পরীক্ষা, টেস্ট পরীক্ষা ইত্যাদি নিয়ে। বাংলাদেশে গত কয়েক বৎসর ধরে পরীক্ষা নিয়ে রীতিমত একটা দুশ্চিন্তা দেখা দিয়েছে। পরীক্ষার বিভীষিকা বলে একটা কথা চালু আছে। আমাদের পরীক্ষাপদ্ধতিটা আসলে মুখস্তবিদ্যা বা স্মৃতিশক্তির যাচাই পদ্ধতি বলেও অনেকে মনে করেন। সে-কারণে পরীক্ষার ধারা পাল্টাবার কথাও শোনা যাচ্ছে। শিক্ষা নিয়ে যাঁরা ভাবেন তাঁরা একথাও বলছেন যে, পরীক্ষা দেওয়াই শুধু নয়, পরীক্ষা নেওয়াটাও স্কুলের বা কলেজের কর্তৃপক্ষদের রীতিমত একটা পরীক্ষা।

এবারে আবার নতুন দুশ্চিন্তা পরীক্ষা পরিচালনা নিয়ে। এক রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্য দিয়ে দেশ যাচ্ছে। ছাত্রসমাজেও এই অস্থিরতার স্পর্শ লেগেছে। পরীক্ষায় টোকাটুকি, প্রশ্নপত্রের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ইত্যাদি ঘটনা তো চলছেই ক'বছর ধরে। কিন্তু আমরা ধরে নিতে পারি যে, এখনও অধিকাংশ ছেলেই পরীক্ষা দিতে চায়। আজ যদি পরীক্ষা পণ্ড হয়ে যায় তাহলে ছাত্ররাই হবে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত।

আসলে পরীক্ষা পণ্ডের হুমকি কারা দিচ্ছে, কেন দিচ্ছে তা খুব স্পষ্ট নয়। বেশ কিছু ক্ষেত্রে উড়ো চিঠিতে প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ভয় দেখানো হচ্ছে। কোথাও বা হামলাও হয়েছে। স্বভাবতই এই অবস্থায় পরীক্ষা নেবার এবং দেবার একটা ঝুঁকি আছে। তাই সর্বত্র একটা অনিশ্চয়তার ভাব। অথচ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ সোজা জানিয়ে দিয়েছেন যে, পরীক্ষা না নিয়ে কোনো ছাত্রছাত্রীকে প্রমোশন দেওয়া বা হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষার্থী হিসাবে পাঠানো চলবে না। এই গোলমালে মুড়ি মিছরি একদর হয়ে না পড়ে, ফাঁকি দিয়ে প্রমোশন পাক এটা কেউ চান না। ছাত্রদের মেধা বিচারের অন্য পদ্ধতি যখন আবিষ্কৃত হয়নি, বর্তমান পরীক্ষাকেও তখন বাতিল করা যায় কি?

কিন্তু অভিভাবকরাই বা এই অশান্তির মধ্যে ছেলেমেয়েদের পরীক্ষার হলে পাঠাবেন কোন্ ভরসায়? কে ভরসা দিচ্ছেন যে, পরীক্ষা শান্তিপূর্ণভাবে হবে? অনেক স্কুলে ছাত্রদের সহযোগিতায় পরীক্ষা হয়েছে। কিন্তু সর্বত্র তা সম্ভব না হলে পরীক্ষায় পাহারা দেবার দায়িত্ব কে নেবেন? পুলিশের ভরসায় পরীক্ষা দিতে গেলে হিতে বিপরীত হবার আশঙ্কা। এদিকে শিরে-সংক্রান্তি। বাংলাদেশে এত রাজনৈতিক দল থাকতে—যাঁরা নাকি মানুষের ভাল করার জন্য দিনরাত্রি চিন্তা করেন—আজ সামান্য পরীক্ষাকার্যটি নির্বিঘ্নে হতে পারছে না কেন? এ তো নির্বাচন নয় যে, একে অপরকে পরাস্ত করতে পারলেই জিৎ। শিক্ষায়তনে গলদ অনেকদিন থেকেই ঢুকেছে। তার বিরুদ্ধে আন্দোলন করে শিক্ষাকে কলুষমুক্ত করতে পারলে একটা কাজের কাজ হয়। কিন্তু তা না করে ছেলেদের পরীক্ষা থেকে নিবৃত্ত করে লাভটা হচ্ছে কার? ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎই জাতির ভবিষ্যৎ—একথা যখন বলা হয় তখন শুধু আপ্তবাক্যের মতই তা উচ্চারিত হয় না। তাদের কল্যাণেই জাতির কল্যাণ, তাদের শুভবুদ্ধির ওপরেই জাতির আত্মিক ও বৈষয়িক বিকাশ। এই সত্য উপলব্ধি করেই আমাদের এগোতে হবে। গোটা জাতিকে এগিয়ে দিতে হলে এমন পথ বার করতে হবে যেখান দিয়ে সকলের আনাগোনা সহজ ও স্বচ্ছন্দ হয়। এ কাজে তরুণদের বিবেচনা সকলেরই কাম্য। তাদের জীবনের পথে যাতে বাধা না আসে এবং তারা যাতে পরম নির্ভরতার সঙ্গে জীবনের লক্ষ্যে উপনীত হতে পারে, সে-কাজই এখনকার বড় কাজ। রাজনৈতিক বিরোধ আর মতান্তর যেন কোমলমতি ছাত্রছাত্রীদের জীবনে অনিশ্চয়তা ডেকে না আনে।

এঙ্গেলস্ স্মরণে

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

দেড়শো বছর আগে, ১৮২০ সালের ২৮শে নভেম্বর তারিখে, জার্মানীর বারমেন শহরে ফ্রেডারিক এঙ্গেলস্-এর জন্ম হয়েছিল। মার্কসবাদ বলে অভিহিত যে বিশ্ববীক্ষা আধুনিক জগতে যুগান্ত এনেছে, তার মূল প্রবক্তা রূপে কার্ল মার্কস্-এর সঙ্গে এঙ্গেলস্-এর নাম অবিচ্ছেদ্যভাবে নিত্যকাল ধরে কীর্তিত হবে।

কার কাছে যেন শুনেছিলাম এঙ্গেলস্ সম্বন্ধে, যে তিনি হলেন যেন 'কাব্যের উপেক্ষিতা'। মার্কস্-এর নামে জগৎ জুড়ে যে জয়জয়কার, তার ছিটেফোঁটা মাত্র নাকি এঙ্গেলস্-এর ভাগ্যে জুটে থাকে, অথচ মার্কসবাদ বিশ্বজনের সামনে উত্থাপনা ব্যাপারে এঙ্গেলস্-এর ভূমিকা বিরাট।

কথাটা পুরোপুরি ঠিক নয়। এঙ্গেলস্ নিজেই শেষজীবনে এক চিঠিতে (১৪ জুলাই ১৮৯২) এ-ধরনের কথার সুন্দর জবাব দিয়ে গেছেন। বন্ধু মেহ্‌রিংকে তিনি লেখেন যে, 'আমার কৃতিত্বের প্রাপ্য যে প্রশংসা তার বেশি' দিলে তিনি ক্ষুণ্ণ হয়ে থাকেন। চিঠিতে আরও রয়েছে : 'চল্লিশ বছর ধরে মার্কস্-এর মতো মানুষের সঙ্গে কাজ করার সৌভাগ্য ঘটলে নিজের জীবনকালে কেউ যতটা স্বীকৃতি পাওনা মনে করতে পারেন তা না পাওয়াই স্বাভাবিক। তারপর মহত্তর মানুষটির তিরোভাব যখন ঘটে, তখন স্বল্পতর ব্যক্তিটি সহজেই অতিরিক্ত সুখ্যাতি পেয়ে থাকেন। বর্তমানে আমার ক্ষেত্রে এই ব্যাপারই ঘটছে। তবে জানি যে অবশেষে ইতিহাস সবকিছু ঠিক করে দেবে, আর তখন ঘটে যাবে ব্যক্তির পঞ্চত্বপ্রাপ্তি। কোনো বিষয়ে কোনো কিছুই তখন আর জানার উপায় থাকবে না।"

শুধু স্বভাবসিদ্ধ বিনয়প্রবণ হয়ে নয়, প্রকৃত সত্যানুগামী ছিলেন বলেই এঙ্গেলস্ এমন কথা বলতে পেরেছিলেন। আত্মচিন্তা তাঁর কখনও ছিল না, নিজের মর্যাদাটুকুও তিনি চান নি। দেহাবশেষ ভস্ম করে সমুদ্রের জলে ছড়িয়ে দেবার ইচ্ছাই তিনি বন্ধুদের কাছে প্রকাশ করে গিয়েছিলেন। 'কোনো বিষয়ে কোনো কিছু জানার' বাইরে তিনি চলে গেছেন। কিন্তু পৃথিবীর মানুষ কখনও তাঁকে ভুলবে না। মার্কস্-এর মহত্তর প্রতিভার কথা তাঁর মতো অকুণ্ঠে কেউ কখনও বলেনি, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও অবিসম্বাদিত যে মার্কসবাদের জনক তাঁরা উভয়েই। এজন্যেই এঙ্গেলস্-এর মুখে নিয়তই বেরিয়েছিল মার্কসবাদ সম্বন্ধে একটি কথা— "Our doctrine" ('আমাদের তত্ত্ব')—যার প্রথম প্রবচন ও যথাযথ রূপায়ণের প্রয়াস করেছিলেন ঐ দুই মহাপুরুষ মিলে।

CENTRAL LIBRARY

দীর্ঘসময়ের সৌহার্দ্য ও সাহচর্য ও সহকারিতার যে উদাহরণ মার্ক্স ও এঙ্গেল্স-এর জীবনে মেলে তার তুলনা ইতিহাসে নেই। মার্ক্স জন্মাবার দুই বৎসর পরে এঙ্গেল্স জন্মেছিলেন। প্রথম যৌবনে উভয়ের শিক্ষার ধারা প্রায় একই খাতে প্রবাহিত হয়েছিল। হেগেল-এর প্রভাবে পড়া এবং তা থেকে বেরিয়ে আসা, ফরাসী বিপ্লবের পরবর্তী ঐতিহাসিক অধ্যায়ের সঙ্গে একাত্মতা অর্জন, সাহিত্য শিল্প এবং মনীষার সর্ববিধ ব্যঞ্জনায় অপার আগ্রহ, যে সমাজ সত্তা 'সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ' তাকে জানার একাগ্র আকুলতা, উভয় মনস্বীর জীবনে লক্ষ্য করা গিয়েছিল। প্রথম যৌবনেই উভয়ের পরিচয়, ১৮৪৪ সাল থেকে সর্বকর্মে উভয়ের অন্তরঙ্গ সহযোগিতা, তৎকালীন জার্মানীর খণ্ড-বিপ্লবে উভয়ের অংশগ্রহণ, ক্রমশ হেগেল-এর তত্ত্বকে অতিক্রম করে নূতন জগজ্জয়ী চিন্তার উন্মেষ, সংগঠন ব্যাপারে ক্লান্তিহীন চিন্তা ও সিদ্ধান্তে উপনয়নের ঐকান্তিক প্রয়াস ছিল উভয় মনস্বীর প্রথম জীবনের বৈশিষ্ট্য। পিতার কর্মব্যপদেশে ইংলণ্ডে অবস্থান এঙ্গেল্সকে বিপ্লবী কর্মধারা থেকে তিলমাত্র বিচ্যুত করতে পারে নি— ২৪।২৫ বৎসর বয়সে ইংলণ্ডের শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা সম্বন্ধে প্রামাণিক তথ্য-সমৃদ্ধ তত্ত্বালোকিত গ্রন্থে শ্রেণীসংঘর্ষ ও তার অবসান-সংঘটনের আলেখ্য তিনি এঁকেছিলেন। অসামান্য পাণ্ডিত্যের সঙ্গে তীক্ষ্ণ ও অক্লান্ত লেখনীধারণের ক্ষমতা তাঁকে প্রথম জীবনেই জার্মান সাম্যবাদ চিন্তার নির্ধারণ ও প্রচারে পুরোধারূপে দাঁড় করিয়েছিল। ১৮৪৭-৪৮ সালে যে 'কমিউনিস্ট ইশ্‌তেহার' তৎকালীন দুনিয়াতে বজ্রনির্ঘোষের মতো শোনা গিয়েছিল, যার রচনায় ছত্রে ছত্রে কার্ল মার্ক্স-এর অগ্নিগর্ভ ভাতি সুস্পষ্ট, তার ভিত্তিভূমি স্থাপিত হয়েছিল এঙ্গেল্স-কৃত খসড়ায় "The German Ideology"-র মতো পূর্বতন রচনায়, যেমন, তেমনিই 'কমিউনিস্ট ইশ্‌তেহারে' তার রচয়িতা হিসাবে নাম রয়েছে উভয় মনীষীর—কার্ল মার্ক্স এবং ফ্রেডরিক এঙ্গেল্স। দুজনাই হলেন ইতিহাসের নবপর্যায়ে যুগ্ম পথিকৃৎ।

মার্ক্স তাঁর মহাগ্রন্থ 'ক্যাপিটাল'-এর প্রথম ও সবচেয়ে মহার্ঘ খণ্ড সমাপ্ত করে বন্ধুকে লিখেছিলেন : 'এইমাত্র পাণ্ডুলিপি শেষ করলাম। তোমাকে আলিঙ্গন জানাই, কারণ তোমার সহায়তা বিনা একাজ সম্পূর্ণ হতো না।' বিপ্লবী মার্ক্স-কে দেশ থেকে দেশান্তরে আশ্রয়ের সন্ধানে ঘুরে অবশেষে ইংলণ্ডে বসবাস করতে হয়েছিল। কিন্তু প্রথম জীবনে স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে বাস করার পর তাঁকে কালাতিপাত করতে হয়েছিল অবর্ণনীয় দারিদ্র্যে, পত্নী অভিজাতকন্যা হয়েও হাসিমুখে স্বামীর সহধর্মিণী হয়ে সকল কষ্ট তুচ্ছ করেছিলেন, পুত্রকন্যাকে চোখের সামনে চিকিৎসা ও পথ্যের অভাবে মরতে দেখতে হয়েছিল তাঁদের, দৈনন্দিন জীবননির্বাহের বিড়ম্বনার অবধি ছিল না। তবুও যে মার্ক্স হার মানতে বাধ্য হন নি, তার হেতু হল বন্ধু এঙ্গেল্স-এর নিয়ত সহায়তা। শুধু অর্থ দিয়ে নয়, সর্বতোভাবে মার্ক্স-এর একাত্ম হয়ে সহকারিতায় তিনি নিরন্তর লিপ্ত ছিলেন। উভয় বন্ধুর পরস্পরলিখিত পত্রগুলি যেন এক মহাকাব্যের উপাদান—তাতে আছে জীবনযাত্রা বিষয়ে টুকরো টুকরো খবর, আর অনেক বেশী আছে দুই মনীষীর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিয়ে যে চিন্তা, মানুষের সমাজজীবনে মৌলিক পরিবর্তন আনার যে আগ্রহ এবং মনীষাদীপ্ত যে প্রজ্ঞান তার চমৎকার প্রতিকৃতি।

সাম্যবাদের প্রচারে নিয়ত নিযুক্ত ছিলেন এঙ্গেল্স—সঙ্গে সঙ্গে মূলগত তত্ত্ব নির্ধারণ ব্যাপারে মার্ক্স-এর সহযোগীরূপে তাঁর ভূমিকা ছিল এত স্পষ্ট যে বহির্জগতের চোখে প্রায়ই এঙ্গেল্সকে উভয়ের মধ্যে অগ্রণী বলেই মনে হওয়া অসঙ্গত ছিল না। যুদ্ধবিদ্যা বিষয়ে তিনি গভীর অধ্যয়ন করেছিলেন; বন্ধুমহলে তাঁর ডাকনাম ছিল 'জেনারেল', তাছাড়া মার্কিন বিশ্বকোষের মতো গ্রন্থে সামরিক বিষয়ে লেখার আহ্বানও তাঁর কাছে আসত। কৃষিসমস্যা সম্বন্ধে মূলগত মার্ক্সবাদী চিন্তার প্রথম প্রকাশ তাঁর রচনায়। মার্ক্স-এর বহু অমূল্য চিন্তাফল যখন সাধারণ পাঠকের নাগালের প্রায় বাইরে, তখন সেই গভীর চিন্তার জটিল জাল কিছু পরিমাণে সরিয়ে, বক্তব্যের প্রখরতাকে অক্ষুণ্ণ রেখে অথচ যথাসম্ভব সরল ভাষায় তত্ত্বের ব্যাখ্যা করেছিলেন এঙ্গেল্স তাঁর 'অ্যান্টি ড্যুরিং' গ্রন্থে, (১৮৭৮), যার সংক্ষিপ্ত সংস্করণ 'বৈজ্ঞানিক ও আকাশচারী সমাজবাদ' নিয়েই অধিকাংশ মার্ক্সবাদীর হাতেখড়ি ঘটেছে। পরিবার, ব্যক্তিগত স্বত্ব ও রাষ্ট্রের উদ্ভব বিষয়ে তাঁর গ্রন্থ মার্ক্সবাদী চিন্তার সমুজ্জ্বল রত্নবিশেষ। বিজ্ঞান বিষয়ে তাঁর জ্ঞান ও আগ্রহ দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের ভিত্তিতে বৈজ্ঞানিক বিকাশের সম্যক্ উপলব্ধিতে সহায়তা করার সর্বশ্রেষ্ঠ সহায়। তাঁর লিখিত বিভিন্ন পত্রাবলীতে যে মনীষার দীপ্তি তা ইতিহাসে অম্লান থাকবে।

১৮৭০ সাল থেকে ম্যাঞ্চেস্টারে কাজকর্ম ছেড়ে সম্পূর্ণ সময় বিপ্লবী প্রচেষ্টায় নিয়োগ করা এবং মার্ক্স-এর সান্নিধ্যে থাকার উদ্দেশ্যে এঙ্গেল্স লণ্ডনে বসবাস আরম্ভ করেন। পূর্ব হতেই সর্বব্যাপারে তিনি ছিলেন মার্ক্স-এর দক্ষিণহস্ত; 'প্রথম আন্তর্জাতিক' গঠন ও পরিচালনে তাঁর অবদান ছিল বিপুল। বিশ্বের দেশে দেশে সাম্যবাদের বারতা তখন বিস্তৃত হতে চলেছে। ভারতবর্ষ থেকে 'প্রথম আন্তর্জাতিক'-এর দফতরে চিঠি গেছে ১৮৭১ সালে। মার্ক্স-এর মতোই এঙ্গেল্স ভারতবর্ষ নিয়ে বহু আলোচনা করেছেন, লিখেছেন, ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ সম্বন্ধে প্রবন্ধাদি লিখেছেন, পরে আশা প্রকাশ করেছেন ভারতবর্ষে আসন্ন বিপ্লব নিয়ে। সাম্যবাদীর ঐ দুই মহান্ প্রবক্তা বিপ্লবকে কখনও পাশ্চাত্যের সংকীর্ণ গণ্ডীতে বেঁধে রাখেন নি, তাঁরা চেয়েছেন জনসাধারণের মুক্তি, আজীবন অক্লান্ত কাজ তদুদ্দেশ্যেই করে চলেছেন।

১৮৮৩ সালে মার্ক্স-এর মৃত্যুর পর এঙ্গেল্স হলেন সাম্যবাদী সংগ্রামের অবিসংবাদী অধিনায়ক। তাঁর ব্রত হল মার্ক্স-এর অপ্রকাশিত রচনাবলী অবিকৃতভাবে (অথচ বোধগম্য অবস্থায় সজ্জিত করে) প্রকাশ করা। তাঁর লক্ষ্য হল মার্ক্সবাদের বিপ্লবী চরিত্রকে বিকৃত করে ফেলার যে প্রবৃত্তি বহু বিদ্বান অথচ অদূরদর্শী কিম্বা সুবিধাবাদী নেতার মধ্যে দেখা দিয়েছিল, তাকে রোধ এবং পরাস্ত করা। জীবনের শেষ অধ্যায়ে মর্মন্তুদ অভিজ্ঞতা তাঁকে পেতে হয়েছিল। যখন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত বলে খ্যাত কাউট্স্কি পর্যন্ত জার্মান সমাজবাদীদের মধ্যে যে দুর্বলতা দেখা দিয়েছিল তারই ফলে মার্ক্স-এর ঐতিহাসিক রচনার কদর্থ করার চেষ্টা হলে এঙ্গেল্স-এর নিজস্ব প্রবন্ধেরই অংশবিশেষ ইচ্ছাকৃতভাবে বাদ দেওয়া হল, মার্ক্সবাদের বিপ্লবী সত্তাকে ক্রমশ নিস্তেজ করে দেওয়ার অপচেষ্টা দেখা গেল। মৃত্যুশয্যা থেকেই এঙ্গেল্স এই অপকর্মের প্রতিবাদ তেজস্বীদের অনুগামীদের জানিয়েছিলেন। কিন্তু বহুদিন পর্যন্ত জার্মান সমাজবাদী মহলে এই বিকৃতির ভয়াবহ কলঙ্কময় ইতিহাসকে লক্ষ্য করতে হয়েছে।

মার্ক্স-এর মতোই এঙ্গেল্স-এর অন্তরে সাহিত্যবোধ শিল্পপিপাসু একটি মানুষ সর্বদা ছিল। জনহিতে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন তাঁরা; সর্বমানবের সর্ববিধ অনুভূতি নিয়েই তাঁদের আগ্রহ তাই দেখা গেছে। সাহিত্য শিল্প বিষয়ে এঙ্গেল্স-এর বক্তব্য নিয়ে স্বতন্ত্র প্রবন্ধ সমুচিত। এখানে তার আলোচনা সম্ভব নয়।

"আমাদের মধ্যে মার্ক্স ছিলেন একমাত্র সর্বাগ্রগণ্য প্রতিভা, তুলনায় আমরা সবাই নিষ্প্রভ"— একথা বলেছিলেন এঙ্গেল্স। এ নিয়ে বিতর্ক অবান্তর। মার্ক্স ছিলেন প্রকৃতই অলোকসামান্য মানুষ। কিন্তু তাঁর অভিন্নহৃদয় বন্ধু ও সহযোগী এঙ্গেল্স-এর যে সুবিপুল কীর্তি, তার দীপ্তি কখনও ম্লান হবে না।

যে নাম বলে দিল ॥

শ্যামসুন্দর দে

সারাটা পৃথিবী জুড়ে বিজয়ের যাত্রা
হাতে পায়ে যুগান্তের শেকল জড়ানো
সেগুলোই হারিয়ে যাবে শুধু খুলে খুলে
হারাবার নেই আর কিছু।
হাতুড়ি লাঙলে ধরা অনেক অনেক কড়া হাতে
সারাটা পৃথিবী জোড়া জয়ের নিশান।

আমরা নিপুণ যোদ্ধা
বিদ্যুতের রেখা জ্বলে ওঠে
মনন আকাশ থেকে যখন বিদায় নিল
সংশয় ও কল্পনার মেঘ।
সময়ের নুড়িগুলো পেরোতে পেরোতে
আমরা আগুন জ্বালি
পাথরের হাতিয়ার ছেড়ে ছুটে যাই মহাকাশে
শেকল ভাঙার গান গাই লাওস ভিয়েতনামে
আমার বাংলার ঘরে ঘরে
বিদ্রোহী ভাবনাগুলো,
উদ্ধত বাসনা হাতছানি দিল আকাশকে
নক্ষত্রের সঙ্গে মিতালির স্পর্ধা...
ইতিহাসের পাতায় দুইটি মানুষ
একক নামের বন্ধনে
যুগের একান্ত প্রিয় নাম
কার্লমার্কস আর এঙ্গেলস
বলে দিল পৃথিবীকে জয় করা বাকি।

হারিয়ে গেছে

শান্তিপদ রাজগুরু

ছবিটা ময়লা বিবর্ণ হয়ে গেছে। কাগজে দাগ পড়েছে। অনেকদিন আগেকার তোলা ওই ছবিটাকে তবু একনজরেই চেনা যায়; অনেক স্মৃতি-জড়ানো ছবিটা দীর্ঘ এতগুলো বছর আর এতো ঘুরপাক খাওয়া ওই রং-চটা সুটকেশের এক কোণে পড়েছিল। হাতে নিয়ে চমকে উঠেছি। ম্লান আবছা আলোয় ছবির বুকে ফুটে উঠেছে একটি কিশোরের মুখ; ডাগর চোখদুটোয় প্রথম ছবি তোলবার উত্তেজনা, সরল চাহনিতে রয়েছে ভয় আর কৌতূহল মেশানো। পিছনে একটা বকুলগাছ—ওদিকে খড়ের চালাঘর—তাতে উঠেছে সবুজ কুমড়োডগা—সাধারণ হাফ প্যান্ট আর হাফ শার্ট পরা একটি ছেলে খালি পায়ে দাঁড়িয়ে আছে।

—দুম্ ম দুম্ ম! অন্ধকারে প্রচণ্ড শব্দ উঠছে। কোথায় বোমা ফাটলো, একটা—একটার পর একটা। কাঁপছে মহা-নগরীর আকাশ-বাতাস, আমার বর্তমানের আশ্রয় জীর্ণ ঘাটকোঠার বাড়িটাও। মানুষগুলো কি ভয়ে মুখ বুজে চুপ করে আছে। কাদের উত্তেজিত কণ্ঠের চীৎকার—গর্জন শোনা যায়।

প্রায়ই এমনি কাণ্ড বাধে। সন্ধ্যার অন্ধকার নামবার আগেই মহানগরীর মানুষগুলো যে-যার আস্তানায় ফেরার চেষ্টা করে। গোলমাল-হাঙ্গামা আছেই, ট্রাম-বাস বন্ধ হয়ে যাবে।

এই জীবনের মাঝে হঠাৎ এই ছবিটা একটা সাড়া আনে। গ্রামের ছাপ আঁকা ওই শিশুকে আমি চিনি—একদিন অমনি শান্ত সুন্দর সবুজ জগতে ওকে নিবিড়ভাবে চিনেছিলাম। এ যেন আমার অন্য সত্তা—ওই ছবির কিশোরকে আজ চিনি না; হঠাৎ এই পরিবেশে ওকে দেখে তাই চমকে উঠেছি।

খোলা একটু জানলা দিয়ে ওপাশে কোন শেঠজীর বাগানের ফুলগন্ধমাখা হাওয়ায় মিশেছে ধোঁয়া আর বারুদের পোড়া গন্ধ। তবু এই ঘাটকোঠার বন্ধ ঘরে ওই হাওয়ার ঝাপটাই সম্বল, কারণ বিজলী নেই, পাখা কেনার কথা স্বপ্ন। তাই ওই শেঠজীর বাগানের ওই বাতাস-টুকুই আমার সম্বল—তাও বিষবাষ্পে বিষিয়ে উঠেছে। বোধহয় টিয়ারগ্যাস ছেড়েছে পুলিশ, চোখ ছাপিয়ে জল নামে—জ্বালা করছে।

তবু এই পরিবেশে ওই বাগানের গাছের পত্রাবরণের মাঝে কোকিল ডাকছে। শীত ফুরিয়ে বসন্ত আসছে, তারই খবর নিয়ে এসেছে পাখীটা। ঠিকানা-হারানো আজকের আমি ওই ছবিটার দিকে চেয়ে থাকি। সেইদিনের ওই ছবির জগতে মনটা উধাও হয়ে যায়। আজকের বোমাফাটা আণবিক যুগ থেকে অনেক পিছনে।

সেদিন সেখানে ছিল সবুজ পাখী-ডাকা ফুলগন্ধভরা একটি জগৎ। অনেক-দিন আগে সেই রাজ্য থেকে হারিয়ে গেছি। তবু ভুলিনি আজও।

বাতাসে আমবোলের মধুঝরা তীব্র মদির সুবাস, মৌমাছিগুলো গুনগুন করে উড়ে ফেরে, বাগানের নীচে কলাপাতায় পা দিয়ে ছুটে চলেছে ছেলেটি রঙীন একটা প্রজাপতির সন্ধানে। আমলেওতার সবুজ

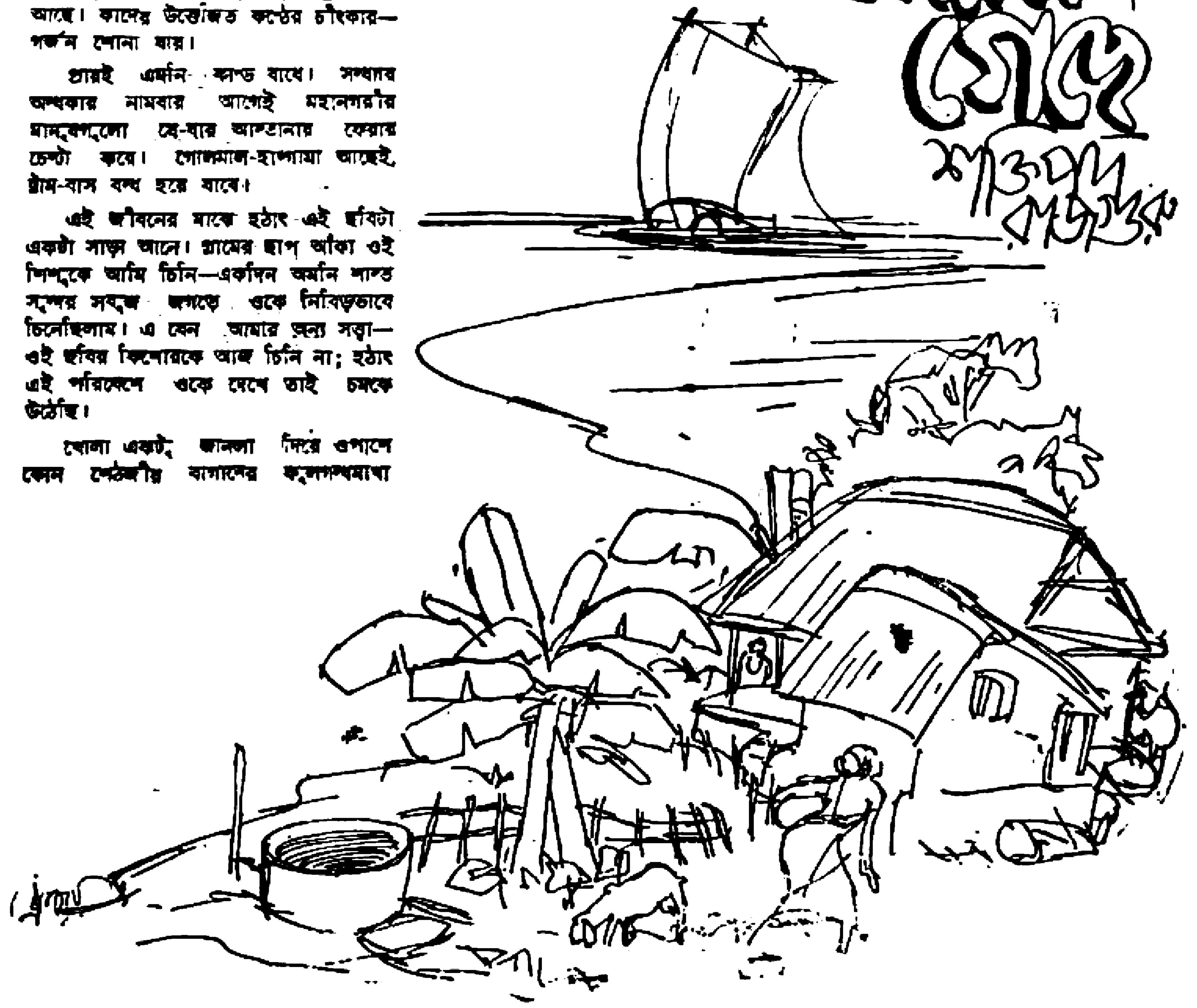

পাতার আড়ালে থোকা থোকা লাল সাদা ফুলগুলো ফুটেছে—সোঁদা ফুলের ঝাঁ ঝাঁ গন্ধমাখা বাতাসে ভর করে দৌড়চ্ছে ছেলেটা। শুকনো পাতার মর্মর ওঠে।

হঠাৎ বাগানের বাইরে সবুজ মাঠে এসে থমকে দাঁড়াল। শুধু গাঢ় হলুদের স্তূপে পড়েছে বৈকালের সোনা রোদ। গাঢ় হলুদ রং-এ ওর চোখ ধাঁধিয়ে গেছে। এ-দৃশ্য সে আগে দেখেনি। দোপাটিফোটা মাঠে একটা নীলকণ্ঠ পাখী আকাশের উপরে ডেকে ডেকে হারিয়ে গেল। প্রজাপতিটাও যেন হারিয়ে গেছে।

একটা অপরূপ সুন্দরী এলোচুল মেয়ে মাঠের মাথায় দাঁড়িয়ে আছে, ওকে ডাকছে বাতাসের ফিসফিসানির সুরে।

কাছাকাছি কেউ নেই। দূরে আখ-ক্ষেতের ওপাশে কাদের টুকরো কথার শব্দ ভেসে আসে। পাখীগুলো কিচমিচ করছে। শান্ত এই জনহীন অরণ্যসবুজে ওই রূপসী তাকে ডাকছে। ভয়ে গা কাঁটা দিয়ে ওঠে। ঠাকুমার কাছে সে গল্প শুনেছে—কোন রাক্ষসী নাকি নানা রূপ ধরে ছেলেদের ভুলিয়ে নিয়ে যায়। তারপর ঘাড় মটকে সব রক্ত খেয়ে ফেলে। আর খালের ধারে ঝিকু বুড়ি নাকি ডাইনি। ও অনেক সময় ছেলে-দের ভুলিয়ে নিয়ে যায়।

উজ্জ্বল হলুদ রং-এর মসৃণ লতা-গুলো গাছটার সারা গা ঢেকে ফেলেছে।... ওরই আড়ালে কে যেন হাতছানি দিয়ে ডাকে।...

—ক ও-কু।... ক ও-কু।...

ঝাড়ের দিক থেকে সাদা বকগুলো সাদা রেখার মত আকাশে উড়ে চলেছে। ছেলেটার মনে হয় কার যেন গলা টিপে ধরেছে। ভয়ে ঘেমে নেয়ে উঠেছে।

দৌড়ল সে বাড়ির দিকে।

—খোকা—ও খোকা! কাদের ছেলে গ' তুমি!

ছেলেটা একদৌড়ে মাঠ পার হয়ে বাগান-বাঁশবন ছাড়িয়ে ধুলো-ঢাকা রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছে। হাঁপাচ্ছে সে। ডাগর দুচোখে ভয়ের চিহ্ন, কেমন ভয় ভয় চাহনি। মাথার চুলগুলোর দু-চারটে চোখের উপর এসে পড়েছে। ঘামে জড়িয়ে আছে কপালের উপর।

ওর ডাকে চাইল। তখন গাছে গাছে আবছা আঁধার নেমেছে, বাঁশবনের ঘন ছায়ায় সেই আঁধার জড়ানো। হলুদ শুকনো পাতাভরা বাঁশবনের নীচে কারা আগুন দিয়ে জড়-করা বাঁশপাতা পোড়াচ্ছে ওই ছাই-এ সার হবে। ধোঁয়াগুলো জট পাকিয়ে উঠছে।

...কাদের বাড়ির গ?

বুড়ির দিকে চাইল ছেলেটা। পাকা শনদড়ির মত চুলগুলো। চোখের চাহনিতে একটা মিষ্টি মিষ্টি ভাব।

কিশোর ওইদিকে চাইল। বুড়ির হাতে একটা নোনা আতা। গাঢ় লাল রং-এর মসৃণ ফলটা ওর দিকে এগিয়ে দেয়।

—খাবে? নাও—ভয় কি!

কিশোর এগিয়ে আসে ওর দিকে। বলে—

—বামুনপাড়ায় বাড়ি আমাদের।

—নবুর ছেলে তুমি, না?

ওর বাবার নামই নবকৃষ্ণ। তাই কিশোর মাথা নাড়ে। বুড়ি বলে—

—বনে-বাদাড়ে এ-সময় যেতে নাই গোপাল। সোজা সড়ক ধরে বাড়ি চলে যাও। মা-বাবা ভাববে।

ছেলেটা দৌড় দিল। মনে হয় এই ফুলগন্ধভরা বাগানে ওই ধুলোভরা পথটায় কোথায় কারা যেন মুখ লুকিয়ে আছে। ঝোপের মধ্যে একটা গাছ দেখে দাঁড়ালো। হলুদ-শুকনো পাতাভরা গাছগুলোর মধ্যে ওই গাছটায় এসেছে নোতুন পাতার বান, কাঁচ পাতাগুলোর গাঢ় বেগুনী রং। ওই গাছটার সারা গায়ে কে যেন রং-এর পোচড়া বুলিয়ে দিয়েছে।

বাঁশচাঁচির কালো-সবুজ বেড়াঘেরা পথে এসে দাঁড়াল ছেলেটা। তার এটা চলাপথ, পাঠশালে যায় এই পথেই। একটু এগোলে বকুলগাছতলা পার হলে তাদের মাটির বাড়িটা দেখা যায়। ঘাসে ঘাসে ছড়িয়ে আছে ঝরা বকুল ফুলগুলো। বাতাস তারই গন্ধে মৌ মৌ করছে।

কিশোর এগিয়ে গেল বাড়ির দিকে। আকাশের উঠানে তখন দু-একটা তারা জ্বল জ্বল করছে। বাবা ততক্ষণে হাট থেকে ফিরেছে। সেখানে পাটের মহাজনের গদিতে খাতাপত্র লেখার কাজ করে, মা এগিয়ে এসে বলে—

—এতক্ষণ কোথায় ছিলি রে? বলেছি বনে-বাদাড়ে যাবি না—।

কিশোরের হাতে নোনা আতা দেখে মা বলে—কার গাছ থেকে আনলি? মা বোধহয় ভেবেছে কাদের গাছ থেকে তুলে এনেছে সে। কিশোর বলে—

—একটা বুড়ি দিল। দুজনে মা—দেখতে ঠিক ঠাকুমার মত। এমনি পাকা চুল—সাদা কাপড়পরা।

মা তবু বলে—না-না। এমনি করে যাসনে যেখানে-সেখানে এই ভরসন্ধে-বেলায়। যা পড়তে বসগে।

হ্যারিকেনের আলো জেলে সন্ধ্যার অন্ধকারে পড়তে বসে সে। মাঝে মাঝে মন কোথায় হারিয়ে যায়। সেই আম-বাগানের ছায়ায় ছায়ায় বাতাসের মিষ্টি গন্ধ—পাখীর ডাক—হলুদ একটা বিরাট গাছের গোল ছাতার মত রূপ—নোতুন পাতা-আসা গাবগাছটা—সব তার মনের পরতে কেমন ঘুম ঘুম ভাব আনে। শান্ত-সুন্দর তার জগৎ! এই জগতের ধুলো-ভরা পথে পা ফেলে ফেলে কে যেন এগিয়ে আসে। সেই শিশুকে সে চেনে।

—খোকন! অ খোকন! দেখেছো পড়তে বসেই ছেলের ঘুম!

বাবার ডাকে ওর ঘুম ভাঙল। চোখ মেলে চেয়ে দেখে কিশোর বই খোলা—স্লেট পড়ে আছে আর সে ঘুমোচ্ছে তার বিচিত্র নোতুন দেখা জগতের স্বপন নিয়ে।

তবু এই জগতটা সুন্দর-শান্ত আর বৈচিত্র্যময়। সেদিন হাটে গেছে কিশোর। এর আগে এদিকে আসেনি। ধুলো-ভরা পথটা দিয়ে গ্রামের সীমা পার হয়েই খালের ধারের রাস্তা ধরে চলেছে ওরা। খাল নয়—ছোটখাটো বিলই বলা যায়।

অশ্বত্থ গাছে নোতুন পাতা এসেছে—খালের জলে ফুটে আছে পদ্মফুল—সবুজ পাতার ভিড়ে লাল ফুলগুলো সিঁদুর মত ছড়িয়ে আছে। তার ওদিকে গভীর কালো জল সীমার ওপারে গ্রামগুলো দেখা যায়। গম-যবের ক্ষেতে হলুদ রং লেগেছে কুসুম ফুল—সাদা সাদা মৌরীফুলে ছেয়ে-ওঠা ক্ষেতের ধার দিয়ে চলেছে রাস্তাটা।

হাটের লোকজন মালপত্র, তরি-তরকারী নিয়ে চলেছে, গরুর গাড়িগুলো কাঁকিয়ে শব্দ তোলে। বাবা বলে—চাকায় তেল না দিলে অমনি শব্দ হয়।

গরুগুলো ল্যাজ ঝাপটে মাছি তাড়িয়ে যাচ্ছে।

—হাটে চললেন নাকি অ চাটুয্যে মশায়?

কিশোর চেয়ে থাকে ওদের দিকে। বাবাকে ওরা চেনে। কোথায় কামারশালে হাপরের টানে ফোঁস ফোঁস করে হাওয়া বের হচ্ছে—কয়লাগুলো গনগনে হয়ে ওঠে। একটা লোক দুমদাম করে তাতানো লাল লোহাটাকে পিটছে, তার থেকে ছিটিয়ে পড়ে লোহার লাল ফুলঝুরি।

বাবা বলে—ওর থেকে কোদাল কাস্তে তৈরী হয় খোকন!

অবাক হয়ে দেখছে কিশোর। তার এমন খবর জানা ছিল না। হাটাহাটা পথে কোথায় কলরব ভেসে আসে।

হাটতলার কাছে এসে পড়েছি; এত লোকজন দোকানপসার এর আগে আমি দেখিনি। তরিতরকারী মাছ চাল আরও কিসব গাদা করে বিক্রী করছে। কেনবারও লোকের অভাব নেই। আমি তখন নাগরদোলা, বাঁশীর কথা ভাবছি। ওসব না দেখে শুধোই—

—বাবা এসব মেলায় নাগরদোলা, তালপাতার বাঁশী নাই?

বাবা হাসল। বলে—এটা মেলা নয়, এ তো হাট। হপ্তায় দুদিন বসে। জিনিসপত্র কেনাবেচা হয়।

হাট-এর লোকজনদের দিকে চেয়ে দেখি। বাবা একটা ধামায় তরকারি চাল কিনে তালপাতার শিকে একটা মাছ গেঁথে ঝুলিয়ে নিয়ে ফিরছে। আমিও মাথায় একটা কুমড়ো নিয়ে ফিরছি। সেদিন এক পয়সার বঁইচি পাকা কিনেছিলাম। পাকা টুসটুসে গাঢ় লাল বেগুনী রং-এর ফলগুলো মিষ্টি। চুষতে চুষতে সেই ফলের গন্ধভরা পাতাঝরা পথ দিয়ে বাড়ি ফিরলাম।

হাটের গল্পই মাকে শোনাই কদিন ধরে।

—রথের মেলার চেয়েও অনেক বেশী লোক সেখানে।

পাঠশালায় পরীক্ষা হবে, এবার দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে তৃতীয় শ্রেণীতে উঠবো।

বাবা বলে ভালো করে পড় খোকা। ফার্স্ট হতে হবে। লেখাপড়া শিখবি—শহরের স্কুলে যাবি পড়তে।

অনেক স্বপ্নই দেখি। শহরটা বোধহয় অনেক বড়। আমাদের গ্রামের মত এতো গাছ—এতো বড় মাঠ—জলভরা পদ্মফুল ঢাকা জলা নেই। জোনাকি জ্বলে না সেখানে, নীলকণ্ঠ, বাজবৌরি, বউকথাকওও, ময়না পাখীর ডাক শোনা যাবে না।

হরি বোস্টমের গানও সেখানে পৌঁছে না। ভোরের আলো ফোটার আগেই পাখীর ডাকে সুর মিলিয়ে হরি বোস্টমের গলা ভেসে আসে। ওই সুরটা আমার খুব চেনা।

—রাই জাগো, রাই জাগো বলে শুক-সারী ডাকে।

ইছলাল গ্রামের ওই শিশির-জমা পথে ঘুমভাঙানো গান গেয়ে যায়।

বকুলতলির আমড়া গাছের পাশে মাধবীলতার ফুল ফোটা বেড়াঘেরা একটি আশ্রম। ওখানে ওঠে ধূপের মিষ্টি গন্ধ। কত সন্ধ্যার অন্ধকারে সেখানেও সুর শুনেছি। খঞ্জনীর তালে তালে গাইছে সে।

—কিশোর যে! এাঁ নওল কিশোর! এসো—এসো।

ওর ডাক শুনে এগিয়ে যাই। ছোট রেকাবিতে করে নারকেল খণ্ড, শশাকুচি এগিয়ে দেয়।

—নাও, পেসাদ নাও।

মন্দির বলতে ওই চালাঘর; দত্তদের ঠাকুরবাড়ির মত বাঁধানো নাটমন্দির ঠাকুরদালান নেই। লোকজন জুটিয়ে ঘটা করে নেচে নেচে আরতিও করা হয় না এখানে। তবু শান্ত মধুর একটি স্বপ্নময় পবিত্র পরিবেশ।

হরিদার হাসিটুকুও অমনি সুন্দর। তাই মাঝে মাঝে মা-বাবাকে না বলে পালিয়ে আসি। মনের অশান্তরে শুধোই হরিদাকে।

—তোমার ঠাকুর খুব জাগ্রত নয়?

হাসে হরিদা—ঠাকুর আমাদের দয়াময়। কেন গো?

—আমাকে পরীক্ষায় ফার্স্ট করে দিতে পারে তোমার ঠাকুর? সত্যি!

হরিদা চাইল আমার দিকে। বলি—ফার্স্ট হতে হবে। বাবা বলেছে—আরও অনেক দূরে পড়তে পাবে। শহরে যাবে—

হাসে হরিদা—পড়বে বৈকি! ঠাকুর ঠিক দয়া করবেন গো।

সেদিন প্রণাম করেছিলাম ঠাকুরকে।

গুপীনাথ বলেছিল—ছিকু বুড়ির ওখানে যাসনে! বুড়ি ডাইনী!

ভয় লাগে ওর কথায়। গুপী এসব অনেক কিছুই জানে। সে নাকি বনে ওস্তাদের কাছে বাণমন্তর শিখছে। গুপী বলে।

—দেখিস, ওই ছিকু বুড়ির পাগুলো উল্টো দিকে ফেরানো। ও-বুড়ি যদি কোন ভালো ছেলেকে দেখে, অমনি গিলে নেবে।

—গিলে ফেলবে? ভয়ে ভয়ে শুধোই।

গুপী বলে—ধ্যাৎ! গিলবে নাকি? ছেলেটা শুকিয়ে যাবে দড়ির মত, না-হয় মুখ দিয়ে রক্ত উঠে মরে যাবে।

ছিকু বুড়িকে দেখিনি। তবু মনে হয় সাংঘাতিক একটা কিছু, জীব সে।

তাই সেদিন পদ্মদীঘির ধারে গিয়ে থাবড়ে গেছলাম—গুপী, আমি আর নেতেন। গুপীই বলেছিল—ওখানে ছিপে মাছ খাচ্ছে

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

থৃবে। অনেক দল যাচ্ছে দীঘিতে মাছ ধরতে। তাই আমরা গিয়েছিলাম। কিন্তু কোথায় মাছ, কোথায় বা মাছ-শিকারী। ছায়া ছায়া আঁধার নেমেছে চারদিকে। মেঘ জমেছে আকাশে, কালো জমাট মেঘ।

থমথম করছে বড় বড় শিরীষ গাছ-গুলো—ওদের ছায়া পড়েছে দীঘির গহন কালো জলে। ভয় ভয় করে। সোঁ সোঁ শব্দ ওঠে কোথাও।

—দুগী!

তখন তার সময় নেই। আকাশ ছেয়ে কালো মেঘ জমেছে। কে যেন একটা লোহারের কালি ঢেলে দিয়েছে আকাশের গায়। আর বিলের ওপারের গাছগুলো তখন মাথা নুইয়ে ঝড়ো হাওয়ার দাপটে নাচন জুড়েছে। গর্জন ওঠে—সোঁ...ও...ও...

সেই দৈত্যটা আস্ফালনে ভর করে এগিয়ে আসছে, ওই জলসীমা পার হয়ে এপারে চটকা-শিরীষ-অশথ গাছগুলোর উপর ঝাঁপিয়ে পড়বার উন্মত্ত আক্রোশে।

তিনজনে তখন দৌড়চ্ছি। কোথায় বড় বড় শব্দে একটা জীর্ণ ডাল খসে পড়ল—বৃষ্টি নেমেছে। বৃষ্টির সেই ফোঁটাগুলো চাবুক-ঘায়ের মত বিঁধছে সারা গায়ে-মুখে।

সামনে গাছের একটু তফাতে একটু কুঁড়েঘর দেখে এগিয়ে গেলুম। চালটা মড় মড় করছে। শুধু মাটির দাওয়ায় উঠে দাঁড়ালাম।

—কে রে গোপালরা? অ খোকন তুমি!

দুগী কাঠ হয়ে গেছে। লোটনও বোধহয় সেরে পালাতো নেহাৎ বৃষ্টি আর ঝড়ের জন্যেই আটকে পড়েছে। ওই বুড়িকে আমি চিনি। ও আমাকে সেদিন দীঘিতে দেখেছিল—আতা পাকা দিয়ে বলেছিল সন্ধ্যার সময় বনবাদাড়ে না ঘুরতে।

তাই ওকে দেখে বলি—মাছ ধরতে এসেছিলাম।

—ওমা! তুমি ধরবে ওই দীঘিতে মাছ? এক-একটা মাছই তো তোমার মতো! ডিঙে খোকা হয়ে গেছো! অ দুগেও আছিস দেখছি? এ তোরই কাজ। যতো সব অনাছিষ্টি কাজ তোরই।

বুড়িই একটা ছোট টুকরিতে মুড়ি আর কাঁচালঙ্কা এনে দেয়।

—খাও বাবা গোপাল, ততক্ষণ দু মুঠো মুড়ি চিবোও কাঁচালঙ্কা দিয়ে, ঝাল লাগলে জল আর লাগবে না।

খিদেও পেয়েছিলো খুব। মুড়িগুলো চিবোতে থাকি।

—খা রে?

দুগী-লোটন কি ভাবছে। আমাকে খেতে দেখে ওরাও খেতে শুরু করে। ওদেরও খিদে পেয়েছে। কোন সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়েছে। আর কিছুই খায়নি।

বৃষ্টি কমে আসছে। আমরা ফিরছি বাড়ির দিকে। মাটির বুক থেকে সোঁদা ভিজে গন্ধ উঠছে। গাছগুলোর পাতার পাতায় জমা জল দমকা বাতাসে ঝরঝরিয়ে ঝরে পড়ে। পথের ধারের নয়ানজুলি দিয়ে কলকলিয়ে জল বয়ে চলেছে। ঝরা বকুল ফুলগুলো ভেসে চলেছে সেই স্রোতে। মেঘভাঙা আকাশে সূর্য উঠেছে—নিভু নিভু আলোয় ওই বর্ষণক্লান্ত গাঢ় সবুজ গ্রামপথ—গাছগাছালি সব কেমন বিচিত্র সুন্দর আর স্বপ্নময় বলে মনে হয়।

এই অপরূপ জগতের পথে কিশোরটি কোথায় হারিয়ে গেছে।

দুগী বলে—বুড়ির ঘরে গেলি কেন ওখানে? ওই ডাইনীর বাড়িতে? ওর দিকে চাইলাম। ওই ওদের ছিকু বুড়ি। ভয়ানক একটা জীব। আমার কাছে ও তেমন কিছু নয়। সাধারণ একটি মানুষ। ওর পাকা চুল—সৌম্য চেহারা দেখে ভয় আদৌ করেনি। বলি—

—ও কেন ডাইনী হবে?

ওরা বলে—তোকেও ও ভেড়া বানিয়েছে। দেখিস, কাঠের কাঠিখোর মতই তোকেও ভেড়া বানিয়ে দেবে।

—ধ্যাৎ! আমি আদৌ বিশ্বাস করি না ওর কথা। মনে হয় ছিকু বুড়ি অনেকের চেয়েই ভালো। অনেক ভালো।

সব গাছগাছালি—পাখির ডাক—এই গাঁ-গঞ্জের দিনগুলো—হাটের জগৎ—পল্লী-গাঁয়ের ছায়াঘন পরিবেশ ছাড়াও অনেক লোভ আছে এইখানে।

যেদিনকে দেখেছি মনে হয়েছে এর বহু বিচিত্র রূপ আর মনে এসেছে কি আনন্দ! সেদিন নদীর বুকে নৌকোয় করে গোবিন্দপুরে ঝুলনের মেলা দেখতে যাবার সময় কথাটা মনে হয়েছিল।

বাবার কোন জানাশোনা মস্ত লোকের বাড়ি সেখানে। কলকাতায় তাঁর যাতায়াত—বাবা নাকি এখানে থাকতে চাইছে না, অন্য কোথায়, ভালো চাকরীর সন্ধান করছে। কথাটা বাবা মাকে বলে।

নৌকাটা ভেসে চলেছে বর্ষার ভরা নদীর বুকে। দুদিকে সবুজ বট-অশথ-তেঁতুল গাছের জটলা। কোথাও লতাগুলো জড়িয়ে আছে ঘন সবুজ বেত গাছের দীঘল পাতাগুলোকে, লাল-লাল ফুল ফুটেছে, ওদিকে চরের বুকে জল—বাবলা গাছগুলো দলবেঁধে বুক ডুবিয়ে ওই জলে যেন চান করতে নেমেছে। নৌকার দাঁড়ের শব্দে কোথায় বসে থাকা পানকৌড়ি বারকতক ডুব দিয়ে সরে গেল।

—মা একটা পানকৌড়ি!

মা অন্য কি ভাবছে। আমার কাছে ওই সুন্দর জগতটা কি বিচিত্র রূপে দেখা দেয়। চরে কোথায় সোনারং আউশ ধান-গুলো সিঁড়ি সিঁড়ি ধান ক্ষেতে দাঁড়িয়ে আছে। নীল আকাশে উড়ে ফেরে ফুটকির মত দু একটা চিল। নদীর জলে মাছের সন্ধান করে ফেরে রঙীন মাছরাঙা পাখী।

ঝুলনের মেলায় আলো দেখা যায়—আরও দুচারটে নৌকা চলেছে মেলার দিকে। বাবা বলে।

—এই নদী কোথায় গেছে জানিস খোকা?

ভূগোলে পড়েছি, তাই জবাব দিই—নদী গিয়ে পড়েছে সাগরে। সাগরের কল্পনা আমার নেই। মনে হয় ধু ধু নীল আর নীল চারিদিকে। সেই-খানের অসীম শূন্যতার মাঝে আমাদের সবুজ তীর ঢাকা ছোট নদীটা কোথায় হারিয়ে গেছে।

বাঁশী বাজছে—ভেঁপু—ব্যান্ডের শব্দ আসে। মেলায় সার্কাস এসেছে। তাঁবুটো দেখা যায়। বাবা বলে

—সার্কাস দেখে ফিরবো কিন্তু।

খুশী হই—তাই ভালো বাবা। বাঘ আছে—না?

বাবা কেমন হাসিখুশী হয়ে গেছে। মা কি ভাবছে।

—রাত হবে যে ফিরতে?

—এই তো পথ। দিব্যি চলে যাবো। বাবা বলে।

যখন ফিরলাম তখন তারা জ্বলা রাত্রি। নদীর স্থির জলে ওদের ঝিকমিক ওঠে। কোথায় গানের সুর ভেসে আসে। উদাসী কণ্ঠে কোন মাঝি দিশহারা নৌকা থেকে গাইছে ওই গান—কোথায় অকূল গাঙে সে যেন পথ হারিয়ে ফেলেছে। উধাও হয়ে চলেছে জীবন নদীতে সে ভুল পথে। রাতের আঁধারে ঢেউগুলো নৌকার নীচে লাগছে ছপ্ ছপ্ ছপ! ওই সুরটায় যেন তাল দিচ্ছে, মনে হয় কোথায় একটা নিবিড় দুঃখ আর বেদনা রয়ে গেছে, এত কিছুর মধ্যেও!

মানুষ পথ হারিয়ে গেলে বোধহয় এমনি আঁধারে হারিয়ে যায়—তার কণ্ঠে জাগে এমনি হুতাশ কান্নার সুর।

—খোকন!

বাবার ডাকে উঠলাম। আমরা ঘাটে এসে গেছি। দত্তবাড়ির আলোটা দেখা যায়। ওদের দেউড়িতে সারারাত আলো জ্বলে। একটি দিন ঝুলনের সেই চাঁদনী রাত অকূল নদীতে ভেসে যাওয়ার স্মৃতি নিয়ে ফিরে এলাম। এ যেন কোন স্বপ্ন! বাঁশীর সুর ব্যান্ডের শব্দ সার্কাসের তাঁবুতে ক্লাউনের মুখে রং মাখা পোশাকে পরে নাচ, চাঁদনী রাতে নদীর বুকে সেই হারিয়ে যাবার বেদনার গান সব মিলে আমার মনে একটি বিচিত্র জগতের সৃষ্টি করেছে। এর সঠিক রূপ আমি জানি না; টুকরো টুকরো সেই ঘটনাগুলো আমার চোখে—মনে কি নোতুন অদেখা একটি জগতকে বিচিত্র অনুভূতিতে রূপায়িত করেছে।

এবার শীত আসছে। পদ্মদীঘির বাঁদিকে যাই—ছিকু বুড়িকে দেখেছি কতো-দিন, হরিসভার আখড়ায় মালতী গাছে নোতুন সাদা ফুল ফুটেছে—সবুজ লতা ছেয়ে। পাখিগুলো কলরব করে। মাঠে মাঠে সোনা ফসলে ধান মাথা দোলাতে দিয়েছে, তিরে

ফিরে বহুবর্ণ পাখীর দল ঝাঁক বেঁধে কলরব করে, বাতাসে ওঠে খেজুর রসের মাতানো গন্ধ। গাছির কলসী কলসী খেজুর রস ঢেলে জ্বাল দিচ্ছে—রস ফোটার মিষ্টি সুবাস বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। পথে পথে মাঠ থেকে গরুর গাড়ি বোঝাই পাকা ধান আসছে—ধুলো ঢাকা পথে সেই ধানের শিষ লুটিয়ে আসে। খামারে খামারে ধান এর স্তূপ।

হরিদার আখড়ার ঠাকুরের মাহাত্ম্য আছে। সেবার আমি ফার্স্ট হয়েছিলাম স্কুলের পরীক্ষায়। বাবা বলে—এবার ভালো ইস্কুলে পড়তে যাবি কিশোর।

আমিও স্বপ্ন দেখি গ্রামের, ওদিকে হাটতলার কাছে বাগানঘেরা বড় বাড়িটার—ওইটাই বড় ইস্কুল, ঘণ্টা বাজে ঢং ঢং ঢং বাতাসে সেই শব্দটা বিলের জল ছুঁয়ে ছুঁয়ে ভেসে আসে। কতো ছেলে পড়ে সেখানে। আমিও বড় হয়ে উঠেছি। এবার একাই পদ্মদীঘিতে মাছ ধরতে যাবো। নৌকায় চড়ে নদীর ওপারের সাঁইবাবলার ফুল ফোটা চরে বেড়াতে যাবো মৌরীফুল আনতে। একাই সেই স্বর্ণলতার বেড়া ঘেরা গাঢ় হলুদ গাছের নীচে উঁকি দিয়ে দেখবো তার আলোমাখা রূপটাকে। আম বাগানে ঝড়ের বৈকালে একাই আম কুড়োতে যাবো। ওই ধুলোঢাকা রাস্তা ধরে খেয়া পার হয়ে খালের ধার দিয়ে ঝুলনের মেলার বাজি সার্কাস দেখতে যাবো, তালপাতার বাঁশিতে আর সখ নেই। পিতলের শিকল, বাঁশী কিনবো এক টাকা দু আনা দিয়ে। পয়সা জমাতে শুরু করেছি একটা ভাঁড়ে, অনেক পয়সা জমে গেছে। চড়কের মেলায় এবার বাঁশী কিনবো।

আমার এই জগত অনেক বেড়ে গেছে পরিধিতে। পাখী ডাকা আলোভরা বিচিত্র ফুলগন্ধভরা এই সবুজ সুন্দর পৃথিবী-টুকুকে আপন করে চিনেছি। এরই বৈচিত্র্যের মাঝে নিজেকে খুঁজে খুঁজে ফিরেছি। ক্ষণিক দেখা আলোর শান্ত এই পৃথিবীতে একটি কিশোর কি পরম তৃপ্তির স্বাদে পূর্ণ হয়ে উঠেছে।

বাবা হঠাৎ সেদিন বৈকালে হাটের পাট গুদাম থেকে ফিরছে খুশী খুশী ভাব আজ। হাতে মাটির ভাঁড়ে আনা রসগোল্লা। মা দুটো আমার হাতে দিয়ে বলে—খেয়ে দেখ। এখনও গরম রয়েছে। বাবা দাওয়ায় বসে গল্প করছে—বুঝলে, দর অনেক বেশী নিচ্ছে গোপাল ময়রা। ছ' আনা সের।

রসগোল্লা বড় একটা খাই না। সেবার খেয়েছিলাম ঝুলনের মেলায় আর দত্ত-বাবুদের বাড়িতে ওদের ছেলের বৌভাতে। মিষ্টি ওর স্বাদ।

বাবা বলে—তাহলে এবার সব গোছ-গাছ করে নাও বড়বৌ। ঠাকুর এতদিনে মুখ তুলে চেয়েছেন। উঃ কি দিনগুলো গেল।

বাবা অভাব আর কষ্টের কথা বলছে। কিন্তু আমার কাছে এটা কষ্ট বলেই বোধ হয়নি। ভাতের সঙ্গে কলমীশাকের ঝোল, কোনদিন ঝিঙুড়ি আর বুনো কাঁকরোল ভাজা—রাতে একবাটি মুড়ি। তবু আমি যেন অনেক কিছু পেয়েছিলাম। পেয়েছিলাম মুক্ত উদার ভালো লাগা সবুজ মাটির সান্নিধ্য, পাখী ডাকা ফুলগন্ধভরা একটি জগৎ। হরিদার সুর—ছিকু বুড়ির ভালোবাসা—আরও কত মানুষকে।

বাবা কোলিয়ারীর দিকে চাকরী পেয়েছে, আমাদের নিয়ে চলে যাচ্ছে সেখানে। গ্রামে কথাটা ছড়িয়ে পড়ে। মণি দাদুও আসে। বুড়ো হুঁকো টানে আর কাশে, ও বলে—ভালো করেছো নবু, ছেলেকে মানুষ করতে পারবে, দুটো পয়সার মুখ দেখবে। কি হবে অজ পাড়াগাঁয়ে পড়ে থেকে?

হরিদাকে দেখেছিলাম, সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে ওর আখড়ার ঠাকুরকে প্রণাম করতে গিয়েছিলাম। লোকটার সুর থেমে গেছে, বলি—আমরা চলে যাচ্ছি হরিদা!

মাধবী মালতীর গন্ধওঠা আশ্রম, ওই সুরময় জগৎটাকে আজ নোতুন করে চিনতে পারি। হরিদা জড়িয়ে ধরে বলে আবার এসো নওলকিশোর। আবার এসো তুমি।

ছিকু বুড়ির দুচোখে জল নেমেছিল, পদ্মদীঘির কালো জলের বুকে হাওয়া লেগে কাঁপছে পাপড়িগুলো, ঝরে ঝরে পড়ছে শীতের ছোঁয়ায় ওদের শেষ চিহ্ন। আমার জীবন থেকেও যেন সেই দিনগুলো ঝরে ঝরে খসে গেল—হারিয়ে গেল।

পাথুরে কালো মাটির জগৎ, শূন্য রিক্ত প্রান্তর। এখানে পদ্মদীঘি নেই সবুজ স্বপ্ন জড়ানো আমবাগান বাঁশবন ঘেঁটু ফুলফোটা মাঠ—পাখী ডাকা জগৎ নেই। এখানে আমার সব হারিয়ে গেছে।

এ মাটির বুক শুধু ক্ষত ভর্তি। গর্ত—লম্বা আঁকাবাঁকা খাদ—ধসে যাওয়া বিবর্ণ পৃথিবী। বাবা এইখানে এসে কি শান্তি পেয়েছে জানি না।

ছোট দুখানা ঘরের একটু খোপমত, আর গায়ে গায়ে বস্তি—মানুষ। অনেককে দেখেছি সন্ধ্যার অন্ধকারে মদ খেয়ে টলতে টলতে ফিরতে। খিস্তি করে মারামারি করে গালাগালি দেয় ছেলেমেয়েদের কুৎসিত ভাষায়। কে চীৎকার করে কাঁদছে।

এমনি সন্ধ্যায় মনে পড়ে মাধবী মালতীর গন্ধভরা সুর ওঠা হরিদার আশ্রম-টুকুকে। সেখানে সন্ধ্যা নেমেছে—আম-বাগানে এসেছে মঞ্জরী—তার মিষ্টি গন্ধ মেশে বাতাসে, নদীর বুকে তারাগুলো দোল খায়; পদ্মদীঘির কালো গহিন অতল জলে আবার ফিরে এসেছে হারিয়ে যাওয়া পদ্মফুলগুলো।

...ী-নকুল-বৃন্দাবন-গদাই আরও অনেকে মাছ ধরতে যায় সেখানে। আমি নেই আজ—।

CUTTA

বাবা এখান থেকে ধানবাদের দিকে কোথায় গেছে তারপর আরও কোথায়। যাযাবরের মত ঘুরতে ঘুরতে একদিন একটা ছোট ধাওড়ার ঘরে শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছিল। মনে হয়েছে তার সব স্বপ্ন ব্যর্থ হয়ে গেছে। তার আগেই আমাদের দেশের বাড়ি-বাগান-সামান্য জমিটুকুও বিক্রী হয়ে গেছে দত্তবাবুদের কাছে দেনার দায়ে।

সেখানে ফেরারও পথ নেই।
রাত হয়ে গেছে।
বুম-ম্...

একটা আলোর ঝলক ওঠে। প্রচণ্ড শব্দে কোথায় ওদিককার বস্তির ধারে বোমা ফাটছে। ওপাশের রেল লাইনে কাদের কলরব শোনা যায়। রাতের আদিম অন্ধকারে মানুষ যেন প্রাগৈতিহাসিক যুগে ফিরে গেছে।

সেই দিনগুলো কোথায় হারিয়ে গেছে। তবু এই ছবিটা দেখে মনে পড়ে হারানো অতীতের কথা। সবুজ ছায়াস্নিগ্ধ ধুলোঢাকা পথে বাঁশঝাড়ের বেড়াঘেরা একটি জগৎ, পদ্মবনের বুকে মৌমাছির গুনগুন করে ফেরে—আলোকলতার ভালোবাসা জড়ানো হলুদমাখা গাছগুলোর পাশ দিয়ে ঘাসে ঢাকা তৃণপুষ্পের মাঠে আজও কোন কিশোর দুচোখে বিস্ময় চাহনি মেলে নীল আকাশে পাখীদের যানাগোনার পথে মনকে উধাও করে দেয়।

সোনাধানের দিগন্তপ্রসারী ক্ষেতে এখনও বাতাসে ধানভারাবনত মঞ্জরীর শিহর জাগে, ভরা নদীর রূপালী জল-ধারায় তারার ঝিকিমিকি আলোয় কোন ভেসে যাওয়া নৌকার মাঝির গানের সুর ওঠে কি বেদনা নিয়ে। আঁধার নামে বাঁশবন গাছগাছালি ঘেরা গ্রামের আকাশে।

এমনি শান্ত সবুজ জগতের সন্ধান আমি পেয়েছিলাম, পেয়েছিল ওই ছবির দেখা সেদিনের কিশোর। ওর ডাগর দু চোখের চাহনিতে সেই সুর—প্রকৃতির নিবিড় সান্নিধ্যের সারল্য আর স্বপ্নরেশ।

সেই শিশিরভেজা ধুলোঢাকা গ্রামপথে কোন ঘরছাড়া বাউলের সুর—ভুলে যাওয়া নাম না জানা ফুলের সুরভির রাজ্য থেকে আমি হারিয়ে গেছি আজ কোন হিংস্র আদিম অন্ধকার আর নিষ্ঠুরতার জগতে।

সেই স্বপ্নভরা সুন্দর জগত থেকে আমি নির্বাসিত—সেই হারানো আমিকে আজকের মানুষ আর ফিরে পায়নি।

প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দে জীর্ণ নড়বড়ে মাঠকোঠার টিং-এর ঘরটা নড়বড় করছে। বাতাসে ওঠে ধোঁয়া আর বারুদের বিশ্রী তীব্র গন্ধ। মনে হয় মাঠকোঠার এই আশ্রয়টুকুও ধসে পড়বে। ভীতত্রস্ত একটা মানুষ ওই অন্ধকারে কি সর্বনাশ আর ধ্বংসকে প্রত্যক্ষ করেছে আজ।

বাসুদেব মন্দির

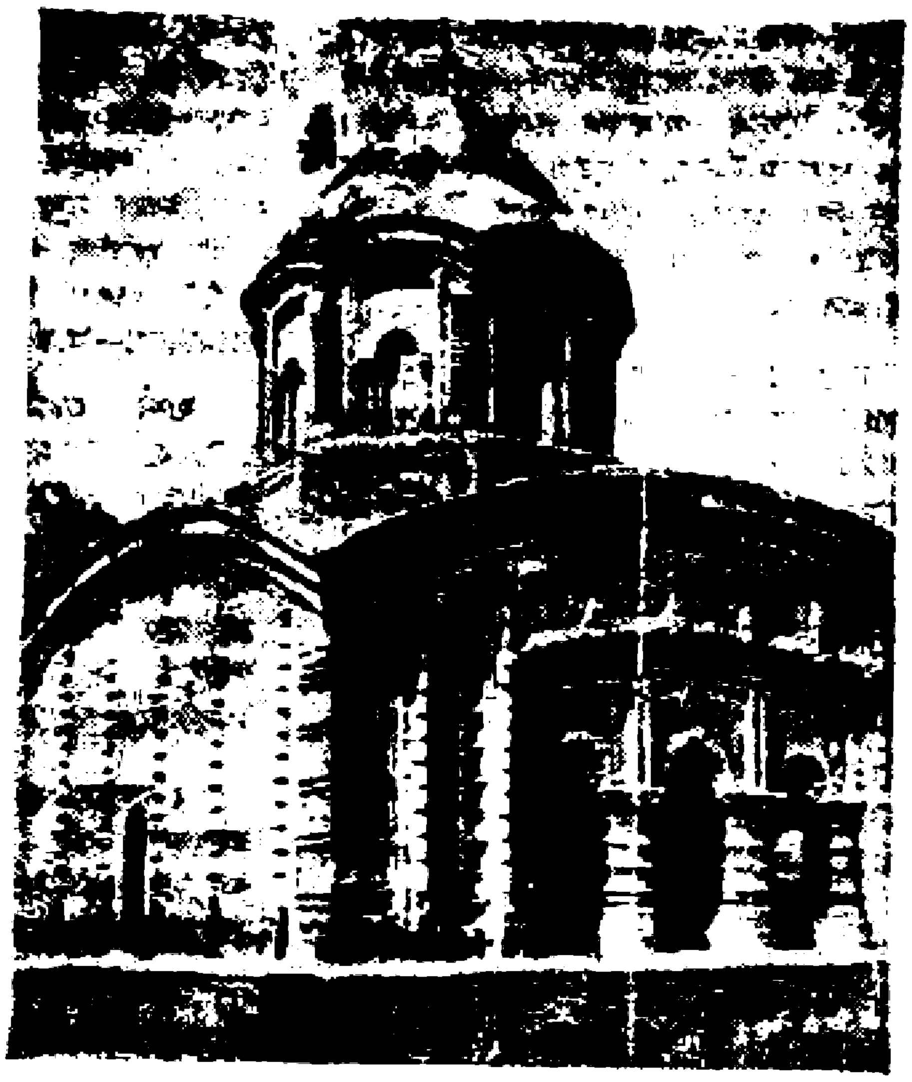

এই আমাদের দেশ

বাঁশবেড়িয়া ও মুক্তবেণী—

ত্রিবেণী চলুন

হংসেশ্বরী মন্দির

শীতটা জাঁকিয়ে না হলেও মোটামুটি পড়েছে। ঘোরা বেড়ানো শীতকালে একদিকে যেমন সুবিধে, অন্যদিকে অসুবিধেও আছে। সুবিধেটা হোল বেশিক্ষণ হাঁটাহাঁটি করলেও ক্লান্তি আসে না, অসুবিধে প্রয়োজনীয় গরমের জামা না থাকা। গরমকালে পাতার একটা চাদর থাকলেই যত্রতত্র ঘুমিয়ে নেওয়া যায়, শীতে সেটা চলে না।

এবারের ট্রিপটা একেবারে বাড়ির কাছেই। কোন গোছগাছের বালাই নেই, এমন কি পয়সাকড়ি সামান্য কিছু পকেটে থাকলেই চলে যায়। হাওড়া স্টেশন থেকে ট্রেনে চাপলে মাত্র ২৮ মাইলের রাস্তা, ব্যাণ্ডেল থেকে মাইল তিনেক— বাঁশবেড়িয়া। চলতি নাম বাঁশবেড়ে, পোশাকী নাম বংশবাটী। বেশ খোলামেলা জায়গা, আধবেলার সময় হাতে থাকলেই খেপ দেওয়া যায়। বাঁশবেড়ে তখনকার দিনে বেশ বর্ধিষ্ণু জায়গা ছিল। রায় মহাশয় উপাধিধারী প্রাচীন জমিদারবংশের জন্যেই এখানের প্রসিদ্ধি ছিল। এই বংশের আদিপুরুষ রামেশ্বর রায়চৌধুরী।

রামেশ্বর রায়চৌধুরী সম্রাট আওরঙ্গজেবের কাছ থেকে 'রাজা মহাশয়' উপাধি পেয়েছিলেন। রাজা মহাশয়দের পুরো বাড়ি গড় দিয়ে ঘেরা। এই গড়ের মধ্যেই বাসুদেব স্বয়ম্ভরা কালী, হংসেশ্বরী ও চতুর্দশেশ্বরের মন্দির। হংসেশ্বরীর মন্দির স্থাপত্যের দিক থেকে অতুলনীয়। বাংলাদেশে এই ধরনের কারুকার্যমণ্ডিত মন্দির আর নেই। ছতলা ও তেরোটি চূড়াবিশিষ্ট ৭০ ফুট উঁচু এই মন্দিরটি বারানসীর স্থাপত্যশিল্পের আদর্শে তৈরী। এর গঠনপ্রণালীতে যৌগিক ষটচক্রভেদের রহস্য উদ্ঘাটিত হয়েছে। মানুষের দেহে যেমন ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না, বজ্রাক্ষ ও চিত্রিনী নামে পাঁচটি নাড়ি আছে এই মন্দিরে তেমনি এদের প্রতীক পাঁচটি সিঁড়ি আছে এবং হংসেশ্বরী দেবী কুলকুণ্ডলিনী রূপে অবস্থিতা।

বাঁশবেড়ের রাজা নৃসিংহদেব এই মন্দির তৈরী আরম্ভ করেন এবং পরে তাঁর স্ত্রী রাণী শঙ্করী দেবী এটি শেষ করেন। তখনকার দিনে প্রায় ৫ লক্ষ টাকা খরচ হয়। শাস্ত্রালোচনা ও যোগসাধনার ফলে নৃসিংহদেবের বিষয়বাসনা মন থেকে চলে যায় এবং গচ্ছিত যা কিছু টাকা মামলা-মোকদ্দমায় খরচ না করে হংসেশ্বরী দেবীর মন্দির তৈরীতে খরচ করেন। হংসেশ্বরীর মূর্তি নিম কাঠের তৈরী, দেবীর বর্ণ নীল, শবরূপী শিবের নাভিপদ্মের ওপর উপবিষ্টা। মন্দিরের দক্ষিণ অর্থাৎ সামনে দিকের বারান্দায় ১২টি কারুকার্যখচিত খিলান। মাঝখানের চূড়াটি প্রায় ৭০ ফুট উঁচু। মন্দিরের ছাদে ওঠবার জন্যেও তিনটি সিঁড়ি আছে। ছাদে উঠলে কাছেই গঙ্গা। বিকেলের দিকে মন্দির-গঙ্গা মিলিয়ে এক ধরনের ছবি মনের মধ্যে তৈরী হয়ে যায়। বাসুদেবের মন্দিরটি বাঁশবেড়ের মধ্যে প্রাচীন। মন্দিরের ছাদে একটি বড় গম্বুজ আছে। সামনের দেওয়ালে ইঁটের ওপর প্রচুর পৌরাণিক ছবি উৎকীর্ণ আছে। এটিও শিল্পসুষমার দিক থেকে উল্লেখ্য।

বাঁশবেড়ে এক সময় সংস্কৃত চর্চার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। নীলের চাষও হত। দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণে যে নীলকুঠির বর্ণনা আছে তা বাঁশবেড়ের ছিল। কলকাতার তত্ত্ববোধিনী সভা এখানে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। পরে দেখা গেল ছাত্ররা বেদান্ত পড়ার দিকে বেশি মন দিচ্ছে, এতে অভিভাবকরা সন্তুষ্ট না হয়ে ছেলেদের স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নেন। ফলে স্কুলটি উঠে যায়।

বহু পূর্বে বাঁশবেড়েয় একটি গির্জা ছিল, এর আচার্য ছিলেন ইংরেজি, ফরাসী পর্তুগীজ ভাষাবিদ তারাচাঁদ নামে একজন দেশীয় লোক। কেউ বলেন এই গির্জাটিই বাংলাদেশের প্রথম গির্জা।

বাঁশবেড়ে সেরে ত্রিবেণীতে ঘুরে নিতে পারেন। ব্যাণ্ডেল থেকে পাঁচ মাইল দূর। প্রয়াগে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী একধারায় মিলিত হওয়ার পর এখানে এসে আলাদা হয়ে গেছে বলে লোকের বিশ্বাস। এজন্য ত্রিবেণীকে মুক্তবেণী বলে। আগেকার দিনে পালপার্বনের সময় ত্রিবেণীতে স্নান করার জন্যে বহু দূর থেকে পুণ্যার্থীরা আসতেন, এখনও মাঘীপূর্ণিমা, মকরসংক্রান্তিতে বেশ ভিড় হয়। ঐতিহাসিকরা একে ফিরোজাবাদ বলে থাকেন। ফিরোজ সাহ এখানে কিছুকাল বাস করেছিলেন।

সপ্তগ্রাম বিজেতা জাফর খাঁ ভাগীরথী ও সরস্বতীর সঙ্গমস্থলে একটি পুরাতন প্রস্তর মন্দিরের মধ্যে সমাহিত হয়েছিলেন। নবদ্বীপের মত ত্রিবেণীও এককালে সংস্কৃত চর্চার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ত্রিবেণীর অধিবাসী ছিলেন। অসাধারণ স্মৃতিশক্তি ছিল তাঁর। গল্প আছে, একদিন তিনি গঙ্গার ঘাটে বসে আহ্নিক করছিলেন, দুজন গোরা প্রচুর চিৎকার করে মারামারি করে। তিনি আদৌ ইংরেজি জানতেন না, কিন্তু আদালতে সাক্ষী দেবার সময় হুবহু তাদের বাদানুবাদ বলে দিতে পেরেছিলেন।

পুণ্যার্জনের মন নিয়ে না গেলেও ত্রিবেণীর সুন্দর কিন্তু গঙ্গার ঘাট বেশ ভালই লাগে।

নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রকাশিত হল:—
অজিতকুমার মুখোপাধ্যায়ের
হিমালয়ের টানে
যে তীর্থস্থানগুলি আজও দুর্গম কিন্তু অনির্বচনীয় সুষমা ও অপার্থিব মহিমার আধার—রম্য রচনার আঙ্গিকে লেখা সেই যমুনোত্রী, গঙ্গোত্রী, কেদার ও বদরীর মনোজ্ঞ বিবরণ। বারোখানি চিত্র ও সুদৃশ্য প্রচ্ছদপট।
দাম—৬,
পরিবেশক—
বাক সাহিত্য প্রাইভেট লিমিটেড
৩৩, কলেজ রো কলিকাতা-৯

একটি আলোচনা

পূর্ববঙ্গের সংগৃহীত পালা গান

ময়মনসিংহের 'সৌরভ' পত্রিকার সম্পাদক সাহিত্য-সাধক কেদারনাথ মজুমদারের নির্দেশে ও উৎসাহে প্রায় একই সময়ে নেত্রকোণার চন্দ্রকুমার দে এবং কিশোরগঞ্জের পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য ময়মনসিংহের লুপ্তপ্রায় লোকসংগীত উদ্ধার ও সংগ্রহ করতে থাকেন। চন্দ্রকুমারের সৌভাগ্য অথবা দুর্ভাগ্যবশতঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের অভিজ্ঞ দৃষ্টি পতিত হয় চন্দ্রকুমারের নামে প্রকাশিত সৌরভ পত্রিকার পালাগানগুলির ওপর। কেদারনাথের মাধ্যমে এবং ময়মনসিংহের গৌরীপুরের প্রখ্যাত কবি শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্যের সহায়তায় দরিদ্র চন্দ্রকুমারকে দীনেশচন্দ্র অতি সহজেই আপন প্রভাবাধীনে আনতে সক্ষম হন।

দুর্ভাগ্য যাঁরা অনন্ত তিমিরলোক থেকে মহামূল্য হীরক যারা সংগ্রহ করে আনে, তারা অখ্যাত ও অজ্ঞাত শ্রমিক মাত্র। সংগৃহীত হীরকের ব্যবহারে যেমন তাদের অধিকার থাকে না, তেমনই ঐ কাজের সংগ্রাহকরূপেও তাদের নাম কখনও কেউ মনে করে রাখে না। ধনতান্ত্রিক্জগতে, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, তারা 'সভ্যতার পিলসুজ' মাত্র। শুনতে রূঢ় হলেও একথা সত্য যে, চন্দ্রকুমারও সাহিত্য-খনির 'শ্রমিক', এবং অদৃষ্টের পরিহাসে ময়মনসিংহ গীতিকায় তাঁর ভূমিকাও ঐ পিলসুজের চেয়ে বেশি আর কিছু নয়!

চন্দ্রকুমারকে সোপান-স্বরূপ ব্যবহার করে দীনেশচন্দ্র যশের তুঙ্গ শৃঙ্গে আরোহণ করলেন বটে, কিন্তু চন্দ্রকুমার যে তিমিরে সেই তিমিরেই রয়ে গেলেন। তাঁর না হলো আপনরূপে যশ, না এলো অর্থ।

পালাগান সংগ্রহে চন্দ্রকুমার নিযুক্ত হয়েছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক, আর পূর্ণচন্দ্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা। পূর্ণচন্দ্রের সংগ্রহে অন্য আর কোনও বিশেষজ্ঞের হস্তাবলেপ ঘটেনি বলে মৌলিকতা ঠিক-ঠিক বজায় রইলো। তাঁর সংগৃহীত পালার নামও তাই—'বাঘমনীর গান বা নয়াঠাকুর ও বাঘাহোঁড় মেওয়া সুন্দরী'।

পুস্তকের নামকরণেই একেবারে পূর্ব-ময়মনসিংহের মুখের ভাষার অমার্জিত ও অপরিবর্তিত লৌকিক রূপ! সংগ্রাহক পূর্ণচন্দ্রের সৎ সাহসের জয়-জয়কার এখানেই। ভাষাবিকারের দুর্ভোগী রুচিবাগীশদের মতে পূর্ণচন্দ্র হয়তো এক্ষেত্রে অপরাধী বটে, কিন্তু সত্যকে অবিকৃত রাখতে হলে যথার্থ গবেষকের পক্ষে অপরাধী হওয়া ছাড়া গত্যন্তরই বা কি?

দীনেশচন্দ্রের পালার ভিতর কত-কত বিভিন্ন শব্দের অপ-প্রয়োগ ও অর্থের অসংগতির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচারে আপাতত না গিয়ে বর্তমান আলোচনায় কেবল তার প্রধান প্রধান ত্রুটিগুলির প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবো। দীনেশচন্দ্রের সংগে পূর্ণচন্দ্রের মৌল পার্থক্য কোথায় এবং কতখানি—এর থেকে তা বোধহয় কতকটা হৃদয়ঙ্গম হবে।

এসম্পর্কে পূর্ণচন্দ্র কি বলেন, তাঁর নিজের ভাষায় 'বাঘমনীর গান'-এর 'সংগ্রাহকের নিবেদন' থেকে উদ্ধৃত করি:—

'শ্রীমান্ চন্দ্রকুমার মাটি কাটিয়া কোহিনূর উদ্ধার করিয়া দিলেন, আর জহুরী রায়বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন তাহা কাটিয়া ছাঁটিয়া ঘোষ-মুক্ত করিলেন। তাঁহার মত সুসাহিত্যিকের হাতে পড়িয়া পালাগানের চেহারা বদল হইল,—নামটাও ভদ্রসমাজের যোগ্য হইয়া গেল। 'বাঘাহোঁড়' 'মেওয়াই' রুচিজনোচিত 'মহুয়া' নাম লইয়া সভ্য সমাজের দরবারে বাহবা পাইয়া নৃত্য করিল।...মহুয়া শব্দটা এদেশের আধুনিক শিক্ষিতের বাবা-দাদারাও জানিতেন না,—বাজে লোকের তো কথাই নাই। এই পালা-গানে 'মেওয়া না সুন্দরী' প্রভৃতির উল্লেখ আছে। মেওয়ার বাপ আমাদের পাড়ায় অনেক। মহুয়া কোনদিন ছিল না।—আজও নাই।...তারপর 'হোমরা বেদে'। হোমরা-চামরা পশ্চিমবঙ্গ হইতে রেলে স্টীমারে এ-দেশের শিক্ষিত ঘরে আসিয়াছে। গ্রামে ঘর নাই। উমর, উমরা, উমরী নাম আমাদের গ্রামে-গ্রামে অনেক পাওয়া যায়। উমুরা বাদ্যার নামটা বেমালুম বদল করিয়া দীনেশবাবু বেচারাকে পদস্থায় করিয়া দিয়াছেন।'

বাঘমনীর গানের আবিষ্কার সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে পূর্ণচন্দ্র বলেন, ময়মনসিংহ জেলার ইতিহাস-প্রসিদ্ধ গ্রাম, বাংলার বার-ভূঁইয়ার অন্যতম ঈশা খাঁর রাজধানী, জঙ্গলবাড়ী বা তার পার্শ্ববর্তী কোনও স্থান হওয়াই সম্ভব। ঈশা খাঁর অধস্তন বংশের দেওয়ান আজিজ দাদ খান সাহেব ছিলেন এই গানের পৃষ্ঠপোষক। যতদূর জানা যায়, তাঁরই নেতৃত্বে শেখ কাঙ্গালী চৌকীদার জঙ্গলবাড়ী অঞ্চলে বাঘমনীর গান সর্বপ্রথম প্রচার করেন। পালাটির রচয়িতা হিসাবে দ্বিজ কানাই বলে এক ব্যক্তির নাম শোনা যায়; কিন্তু তিনি কে, কি তাঁর পরিচয়—সে সম্পর্কে সঠিক কোনও তথ্য পাওয়া যায় না।

পূর্ণচন্দ্রের মতে বাঘমনীর গানের প্রথম প্রচারকাল অনুমান ১২৬৫—৭৫ বঙ্গাব্দ। পূর্ণচন্দ্র স্বয়ং কাঙ্গালীকে দেখেছেন এবং তার নাচ শুনেছেন। সেটা ১২৯৪—৯৫ সালের কথা। 'কাঙ্গালী ছিলেন ভারী সৌখীন, বাবরী ছাঁটা চুল, মোটা দাড়ি—মাদলের তালে তালে হাঁটা—গৃহটিকরক দাঁত সম্বল বদনমণ্ডল,—দীর্ঘ দেহকান্তি।'

'বাঘমনীর গান অভিনয় করতে বিশেষ সাজ-সরঞ্জামের দরকার হয় না। একটা বন্দুক, লাঠি, বর্শা—হাতিয়ার। মাথায় রুপালি ছোট পাগড়ী। পরনে মালকোঁচা মারা ধুতি। আলো-মশাল। বাদ্য—ঢোল বা ঢোলক, মন্দিরা, বাঁশের বাঁশি, বেহালা। মেয়েদের লম্বা চুল। মোটা কাপড় বা খেটে শাড়ী। কাঁসা ও পিতলের গহনা। বাঁশ, দড়ি ইত্যাদি।'

১৩২১-২২ সালে পূর্ণচন্দ্র ঐ পালা-গানটি সম্পূর্ণ সংগ্রহ করেন এবং ১নং কলেজ স্কোয়ার, কলকাতায় থাম মিত্র কর্তৃক তা ছাপা হয়। বর্তমানে 'বাঘমনীর গান' দুষ্প্রাপ্য। বহু চেষ্টা করেও এর কোনও কপি আমি সংগ্রহ করতে পারিনি। অবশেষে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কার্য-নির্বাহক সমিতির সদস্য, সাহিত্যরসিক শ্রীচণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়ের সৌজন্যে, তাঁর পারিবারিক গ্রন্থাগার থেকে পুস্তকখানার এক জীর্ণ ও কীটদষ্ট কপি আবিষ্কৃত হয়। বর্তমান আলোচনার অবলম্বন সেটি।

পুস্তকখানার পৃষ্ঠা সংখ্যা—৮+৭৯। আখ্যাপত্র এইরূপ:—

"ময়মনসিংহের গীত-সাহিত্য

বাঘমনীর গান

বা

নয়াঠাকুর ও বাঘা হোঁড়

মেওয়া সুন্দরী

(জঙ্গলবাড়ীর দেওয়ান সোহবান দাদখান সাহেবের নেতৃত্বে প্রথম গীত ও শেখ কাঙ্গালী চৌকিদার কর্তৃক নানাস্থানে প্রচারিত। অনুমান ১২৬৫—৭৫ সন।)

সংগ্রাহক—

শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য, বিদ্যাবিনোদ

মশোয়া।"

শ্রীক্ষিতীশ মৌলিক 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা' নামে যে পুস্তক সম্প্রতি প্রকাশ করেছেন, এবং যাতে 'ময়মনসিংহ গীতিকার মৌলিকতা পরিহারের প্রশ্ন নিয়ে দীনেশ-চন্দ্রপ্রতিকূলে অভিযোগ উত্থাপনকরেছেন আশা করি, উপরিউক্ত আলোচনায় তার সমর্থন পাওয়া যাবে, এবং সেই সঙ্গে একথাও প্রমাণিত হবে যে, ময়মনসিংহ গীতিকার পুনর্মূল্যায়নের ক্ষেত্রে পূর্ণ-চন্দ্রই প্রথম পথপ্রদর্শক।

ব্যোমকেশ মজুমদার

১। বোনের মুরুব্বী।

২। এই মা কন্যা কোলে লইয়া উন্দরা বাদ্যার নারী।

বাচ্চা পুত্রা নাম থইল মেওয়া না সুন্দরী।।

—বাঘমনীর গান (পৃঃ ১২)

৩। ১ আশ্বিনের 'অমৃত' পত্রিকায় 'বৈকুণ্ঠের খাতায়' রূপদর্শীর আলোচনা দ্রষ্টব্য।

CENTRAL LIBRARY

তোমাকে

নিমাই ভট্টাচার্য

।। এক ।।

এই পাইন গাছের আলোর-ছায়ায় ঘুরে ঘুরেই কেটে গেল সারাটা দিন। কেটে গেল পাখীর ডাক শুনে আর দূরের শিবালিক পাহাড় দেখে।

বেশ লাগল। অনেকদিন পর মনটা সত্যি খুশীতে ভরে গেল। বেশ হালকা মনে হলো নিজেকে।

এই পৃথিবী বড় বিচিত্র। তিন ভাগ জল থাকা সত্ত্বেও বড় নিষ্ঠুর। বড় নির্মম। সব কিছু থেকেও কোথায় যেন একটু ফাঁক থেকে গেছে। সেই অদৃশ্য অজ্ঞাত ছিদ্র দিয়েই মানুষকে হারাতে হয় কত কিছু। মাঝে মাঝে ভাল লাগলেও সুর কেটে যায় বড় বেশী। রঙীন বসন্তের পিছনেই শীতের জড়তা।

আজ কিন্তু বেশ লাগছে। গণ্ডীবদ্ধ সংসারের বাইরে উদার সবুজ প্রকৃতির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বেশ লাগছে। এই মৌন প্রকৃতি যেন সিদ্ধপুরুষ। সর্বত্যাগী মহাসন্ন্যাসী। সুখ-দুঃখ ভাল-মন্দের জোয়ার-ভাঁটা তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। একটা মিষ্টি পরিতৃপ্তিতে আমার মনটা ভরে গেল।

বোটানিক্সের পাশ দিয়ে ঘুরতে বেশ লাগছিল। একটা কাঠবেড়ালী সামনে এসে দাঁড়াল। হঠাৎ। একেবারে আমার মুখোমুখি। হয়ত আগন্তুক দেখে খবর নিতে এসেছে। একবার যেন হাসল। লেজ নাড়াতে নাড়াতে হাসল। বিদ্রূপের হাসি নাকি? ঠিক বুঝতে পারলাম না। আমিও হাসলাম। ব্যস! কাঠবেড়ালীটা সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে পালাল বনের মধ্যে।

আমি বিস্মিত হয়ে দাঁড়িয়েই রইলাম। অপলক দৃষ্টিতে ওর পথের দিকে চেয়ে রইলাম। ছোট্ট একটা জীব। কতটুকুই বা ওর প্রাণ! তবু কত প্রাণচঞ্চল। কত হাসিখুশী। বিদ্যা-বুদ্ধি-বিবেচনা থাকা সত্ত্বেও আমরা কি অত প্রাণচঞ্চল হতে পারি? অত সহজ সরল?

আশপাশের গাছপালা আর ঐ দূরের শিবালিক পাহাড়কে আরো ভাল লাগল। ভাল লাগল নিজেকেও। পর পর কয়েকবার জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিয়ে সারা বুকটা ভরিয়ে নিলাম।

কাঠবেড়ালীটার পথ চেয়ে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম জানি না। হয়ত কয়েক মিনিট, হয়ত আরো বেশী। পিছন থেকে একটা গাড়ীর হর্ন শুনে সরে দাঁড়ালাম। গাড়ীটা চলে গেল। আমিও হাঁটতে শুরু করলাম।

বোটানিক্স পিছনে ফেলে এলাম বিরাট সবুজ মাঠের মাঝে। দূরে এফ-আর-আই-এর মেন বিল্ডিং। পাষাণে গাঁথা অত বড় বিল্ডিংটাকেও খারাপ লাগল না। বেসুরো মনে হলো না। মনে হলো এই বিরাট সবুজ প্রান্তর আর চারপাশের অজস্র বনানীর স্মারকস্তম্ভ।

পিচের রাস্তা ছেড়ে ঘাসের উপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কখন যে এফ-আর-আই'এর মেন বিল্ডিংকে ডানদিকে রেখে এসেছি টের পাইনি। সামনেই বোধহয় হোস্টেল। আবার দাঁড়ালাম। ছোট্ট রাস্তা কিন্তু ভারী সুন্দর। দু' পাশে ক্রিসমাস ট্রির মত গাছগুলি সাজান। সন্ধ্যায় অন্ধকার নেমে আসছে। সারাদিনের শেষে পাখীর দল ফিরে এসেছে নিজেদের আস্তানায়। ওদের উত্তেজনায় কলগুঞ্জন ভেসে এলো গাছের ফাঁক থেকে।

কতদিন পর পাখীর কিচির-মিচির শুনলাম? বেশ লাগল।

গেস্ট হাউসে ফিরে এলাম। লাউঞ্জ পার হয়ে ডানদিকের কোণার ঘরে চলে গেলাম। চেয়ারে বসে টেবিলের 'পর পা তুলে দিয়ে সিগারেট ধরালাম। সিগারেট টানতে টানতেই ডানদিকে তাকাতেই ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় নিজেকে দেখতে পেলাম। বার বার দেখলাম। ভাল লাগল।

সিগারেটটা শেষ করে উঠে গেলাম ড্রেসিং টেবিলের সামনে। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। একবার হাসলাম। বাঃ! বেশ লাগছে তো!

দরজায় নক্ করে বেয়ারাটা ঘরে আসতেই ঘুরে দাঁড়ালাম।

'সাব চায়।'

চায়ের ট্রে টেবিলের উপর রেখে বেয়ারা চলে গেল।

আমি আবার আয়নার সামনে ফিরে এলাম। মনে হলো বহুদিন পর নিজেকে দেখছি। বেশ ভালই লাগল।

আয়নার সামনে কয়েক মিনিট থাকার পরই বুঝলাম, আমার বেশ পরিবর্তন হয়েছে। সেই দুশ্চিন্তা আর হাহাকার ভাব নেই কোথাও। চোখ দুটো আবার জীবন্ত হয়ে উঠেছে। একটু এদিক-ওদিক ঘুরে ঘুরে নিজেকে দেখলাম। বিউটি কনটেস্টের মেয়েদের মত ঘুরতে ঘুরতে নিজেকেই নিজে পরীক্ষা করলাম।

আরো ভাল লাগল নিজেকে। ভাল করে বাঁচার নেশায় হঠাৎ আমি পাগল হয়ে উঠলাম। হব না? কত দীর্ঘদিন ধরে নিজেকে অবহেলা করেছি। দেহ-মনের প্রতি অবিচার আর অত্যাচার করেছি বছরের পর বছর! পথভ্রষ্ট পথিকের মত অন্ধকার অরণ্যে ঘুরে বেড়িয়েছি। মাথাটাও কি ঠিক ছিল? সব কিছু গোলমাল হয়েছিল। ওলট-পালট হয়েছিল সব হিসাব-নিকাশ। ভেবেছিলাম ঘটনার স্রোতে ভেসে যাব, বিলীন হয়ে যাব। এতদিন কিভাবে বেঁচে ছিলাম জানি না। জানি না কিভাবে এই অন্ধকার দিনগুলো কাটালাম। আজ এই আয়নায় নিজেকে দেখে বুঝলাম সেই অন্ধকার অরণ্যে বিচরণ করেও বেঁচে আছি।

অনেকদিন নিজেকে ভালবাসিনি বলে আজ সত্যি নিজেকে বড় ভাল লাগল। নিজেকে ছাড়া আর কাকেই বা ভালবাসব এই দুনিয়ায়? মানুষকে তো একটা কিছু নিয়ে বাঁচতে হবে। আমি ছাড়া আমার আর কে আছে?

আজ নয়, অনেকদিন আগে একবার মনে হয়েছিল বাঁচব কি? বাঁচার কোন উত্তর খুঁজে পাইনি। শুধু এইটুকু জেনেছি মৃত্যু হলেই পরাজয় হবে। সর্বকিছুর পরাজয়। তাইতো মরতে চাইনি, মরতে পারিনি। মরতে আমি চাই না, মরতে আমি পারব না। পরাজয়ের গ্লানি মুছে ফেলার আগে মৃত্যু? অসম্ভব।

দরজায় নক্ করার আওয়াজ হলো। ঘুরে দাঁড়ালাম।

'সাব, চায় পি-লিয়া?'

'নেই।'

একটু লজ্জিত হয়ে তাড়াতাড়ি চা খেতে গেলাম। বেয়ারাটা চলে গেল।

চা খেয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে কি যেন ভাবছিলাম এমন সময় চৌকিদার এসে বলো, সাব, আপকা টেলিফোন।

আমার টেলিফোন? অবাক হলাম। 'হামারা টেলিফোন?'

'হা সাব।' চৌকিদার একটু থেমে বলল, দো-নম্বার সাব আপকো বুলায়া।

'দো নাম্বার সাব কোন্ হ্যায়?'

'বাঙালী রয় সাব।'

আর কথা না বাড়িয়ে উঠে গেলাম। টেলিফোন তুলে বললাম, হ্যালো!

'নমস্কার। আমি রয় কথা বলছি...।

'নমস্কার।'

'আমি ঠিক সন্ধ্যার আগে আগেই আপনার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। আপনি বোধহয় একটু ঘুরতে বেরিয়েছিলেন......

'আপনি এসেছিলেন?'

'হ্যাঁ। ইন ফ্যাক্ট আই সুড হ্যাভ মেট ইউ আর্লিয়ার বাট.....

অত্যন্ত লজ্জিত বোধ করলাম। যাঁর

সাহায্যে ও সহযোগিতায় আমাকে এখানে কাজ করতে হবে, আমারই আগে তাঁর সঙ্গে দেখা করা কর্তব্য ছিল কিন্তু...

ছিঃ, ছিঃ, আপনাকে এত কষ্ট দিলাম...

ভেবেছিলাম মার্জনা চাইব কিন্তু সেকথা বলার আগেই মিঃ রায় বললেন, ইফ্ ইউ আর নট বিজি চলে আসুন না আমার এখানে। মোটে তো সাড়ে ছটা বাজে!

'না, না, বিজি আর কি! তবে ছুটির দিনে আপনাকে বিরক্ত করব?'

ডেরাডুন রওনা হবার আগে প্ল্যানিং কমিশনের ডক্টর চৌবে বলেছিলেন, ডোণ্ট ওরি। ইউ উইল মিট অ্যান এক্সেলেণ্ট জেণ্টলম্যান টু হেল্প ইউ।

শুধু একজনের মুখে রাই-রয় শুনেছিলাম। কিন্তু তিনি পাঞ্জাবী না ক্রিশ্চিয়ান বুঝতে পারিনি। এত দূরদেশে এসে যে বাঙালী মিঃ রয়কে পাব, তা সত্যি আশা করিনি। তাছাড়া জানব কেমন করে বাঙালীকে সর্বত্র পাওয়া যায়? ছোটবেলা থেকে তো শুনে আসছি বাঙালী মাত্রেই মায়ের আঁচলের তলায় লুকিয়ে থাকে, সে গান গায়, কবিতা লেখে, বিপ্লবী হয়, কেরানী হয়, জেলে যায়, ফাঁসিতে চড়ে কিন্তু ঘর ছেড়ে নড়তে চায় না।

মুসৌরী এক্সপ্রেসে আজ সকালেই

সকল ঋতুতে অপরিবর্তিত ও অপরিহার্য পানীয়

চা

কেনবার সময় 'অলকানন্দার' এই সব বিক্রয় কেন্দ্রে আসবেন

অলকানন্দা টি হাউস

৭, পোলক স্ট্রীট কলিকাতা-১

২, লালবাজার স্ট্রীট কলিকাতা-১

৫৬, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ কলিকাতা-১২

॥ পাইকারী ও খুচরা ক্রেতাদের অন্যতম বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান ॥

এসেছি। রবিবার। ছুটির দিন। নিজের খুশী মত ঘুরে বেড়িয়েছি। ছুটির দিনে খোঁজখবর করে কোন অফিসারকে বিরক্ত করতে সাহস হয়নি, মনও চায়নি। কিন্তু আগে থেকে যদি জানতাম উনি বাঙালী তাহলে হয়ত একবার ঘুরে আসতাম। আবার না যেয়েও পারতাম। একে প্রবাসী বাঙালী, তারপর অফিসার। কি বিচিত্র তাঁর মনোবৃত্তি তা জানা অসম্ভব। প্রবাসী বাঙালী খুব বেশী দুর্বোধ্য। যতটুকু দেখেছি তাতে মনে হয়েছে ওরা হয় পুরো সাহেব নয়ত বাংলাদেশের বাঙালীর চাইতেও খাঁটি বাঙালী। মাদ্রাজী আই-সি-এস'এর বাড়ীতে মাদুরে বসে গল্প করা হয় কিন্তু বাঙালী এল-ডি-সি ডাইনিং টেবিলে চর্চ্চড়ি না খেলে লজ্জায় সমাজে মিশতে ভয় পায়। ব্যতিক্রম আছে বৈকি! কিন্তু মিঃ রায় যে ব্যতিক্রম, তা জানব কেমন করে?

দূর ছাই! একলা একলা থেকে শুধু আজে-বাজে আনতু-বানতু চিন্তা করতে শিখেছি। মানুষের ভীড়ের মধ্যে থাকলে এত আজে-বাজের চিন্তার অবকাশ থাকে না। তাছাড়া প্রাণ খুলে কথা বলার কাউকে পেলে নিজের মনের মধ্যে অপ্রয়োজনীয় চিন্তা-ভাবনা জমতে পারে না। কতকাল প্রাণ খুলে কথা বলি না!

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল! দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়বে না? শোকচন্দ্রিকাতেই তো নাটক সমাপ্ত হলো।

বুশ সার্টটা চেঞ্জ করে নিলাম। অবিন্যস্ত চুলের 'পর দিয়ে চিরুনিটাকে টেনে নিলাম। তবুও যেন ঠিক হলো না। দুটো হাত দিয়ে ঠিক করলাম। তোয়ালে নিয়ে মুখটাকে ভাল করে পরিষ্কার করলাম। সুটকেশ থেকে একটা পরিষ্কার রুমাল বের করে প্যান্টের পকেটে পুরলাম। ফাইনাল চেক্ আপের জন্য আয়নার সামনে দাঁড়াতে গিয়েই হাতের ঘড়িটার নজর পড়ল। চমকে উঠলাম। আর এক মুহূর্ত দেরী না করে বেরিয়ে পড়লাম।

সুন্দর পিচের রাস্তা। কিছু দূরে দূরে ইলেকট্রিক আলো। তবুও রাস্তাগুলো বেশ অন্ধকার। দু'পাশেই গাছপালা। মাঝে মাঝে অফিসারদের বাংলো। কাচের জানলায় পর্দা দেওয়া সত্ত্বেও একটু একটু আলো দেখা যায়। নতুন কনে-বৌ'এর মত আলোগুলো যেন ঘোমটা দিয়ে ঢাকা। এত গাছপালার মাঝে নিজেকে আত্মপ্রকাশ করাতে দ্বিধা করছে।

এমন রাস্তা দিয়েও কেউ বেড়াতে চায় না? এই আবছা আলো, এই পরিবেশে কি দুজনে মিলে বেড়াতে কারুর ইচ্ছা করে না? এখানে কি কোন মেয়ে নেই, যে গান গাইতে পারে, ভালবাসতে পারে? একলা গিয়ে পুরীর জগন্নাথ দর্শন করা যায় কিন্তু চৌপাটির সুবিস্তীর্ণ সমুদ্র-সৈকতে কি একলা বেড়ান যায়?

এফ-আর-আই'এর এই রাস্তা দিয়েও ঠিক একলা হাঁটতে ভাল লাগে না। বড় বেমানান, বড় বেসুরো মনে হয় নিজেকে। আমারও মনে হলো। কিন্তু আমি তো অসহায়। আমার শূন্যতা তো পূর্ণ হবার নয়। তা তো জানি। তবুও এই মুহূর্তে এই সুন্দর আবছা অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মন চাইল পূর্ণ হতে।

জানি যে পূর্ণতা আমি চাই, তা কোনদিন পাব না। পেতে পারি না। যে অন্ধ, যে দৃষ্টিহীন, সে তো জানে এই রঙীন পৃথিবীর কিছুই সে দেখতে পাবে না, পেতে পারে না। তবুও ইচ্ছা তো হয়। মনে মনে স্বপ্ন তো দেখে। চিরদিন চিরকালের জন্য না হোক, একবার একটি মুহূর্তের জন্যও যদি সে রঙীন পৃথিবীর দেখা পেত তবুও তার সান্ত্বনা থাকত। কলকাতার ফুটপাতের পাশে ছেঁড়া ন্যাকড়া মুড়ি দিয়ে যারা জীবন কাটায়, তারা যদি মাত্র একটি রাত্রের জন্যও ঐ মনুমেণ্টের সমান বড় বড় প্রাসাদ বাড়ীতে ঘুমুতে পারত! আহাহা! জীবন সার্থক হতো! জন্ম সার্থক হতো!

আমি তা চাই না। চাইতে পারি না। তবুও মনে হলো এই মুহূর্তে যদি কেউ পাশে থাকত, যদি একটু হাসত, হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ত আমার বুকের 'পর। অথবা? অথবা শুধু আমার হাতটা ধরে হাঁটতে হাঁটতে গুন গুন করে গাইত......

ন্যায়-অন্যায়, সম্ভব-অসম্ভব সব বুঝি। সবাই বোঝে। তবুও মানুষের মন তো! সে তো মুক্ত বিহঙ্গ! উড়ে বেড়ায় মহাকাশের কোলে। কোন শাসন নেই, কোন নিয়ম নেই, যথেচ্ছ তার বিচরণ। তাইতো পুত্রশোকাতুরা জননী স্বপ্ন দেখে যদি তার প্রাণের দুলাল একটিবার, মাত্র একটি বারের জন্য দেখা দিত, মা বলে ডাকত। শোকাতুরার মত আমিও কি যা তা ভাবছি?

সামনের বিরাট বারান্দাতেই মিঃ রায় আমাকে অভ্যর্থনা করলেন, আসুন, আসুন।

বারান্দার ডান দিকে মিঃ রায়ের স্টাডি। সে ঘরেই আমরা গেলাম। ঘরে ঢুকতে ঢুকতেই একবার চার পাশে চোখ বুলিয়ে নিলাম। দেওয়ালের চারপাশ বইতে ভর্তি। সেক্রেটারিয়েট টেবিলেও অনেক কাগজ-পত্তর বই-টই রয়েছে। দুটো-একটা

ছবিও নজরে পড়ল। স্বদেশের নয়, বিদেশের।

মিঃ রায় টেবিলের সামনের চেয়ারে বসলেন। আমাকেও বসতে বললেন। আমি না বসে একবার ঘরের চারপাশ ঘুরে বই-পত্তর দেখে নিলাম। ইংরেজি-বাংলা সাহিত্যের বইও প্রচুর। ছবি কটাও দেখলাম। একটা নন্দলালের বুঝতে অসুবিধা হলো না। চেহারা দেখেই বুঝলাম ছাত্র-জীবনের ছবি। বুঝলাম আমার মত শিলচর গুরুচরণ কলেজ আর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েই ওর শিক্ষাজীবন শেষ হয়নি।

'আরে বসুন বসুন। কি দেখছেন?'

'বাঃ! আপনার তো ভারী সুন্দর কালেকশন।'

'কি আর কালেকশন করেছি একসেপ্ট সাম বুকস্ অ্যান্ড এ ডিভোটেড ওয়াইফ......

মিঃ রায় হো হো করে হেসে উঠলেন। আমিও না হেসে পারলাম না। ভারী মজার লোক তো! আমাদের দেশে সাধারণত বিদ্বান-পণ্ডিতরা রসিক হন না, আবার রসিকেরা বিদ্বান হন না। যারা জীবন উপভোগ করতে পারেন, রসিকতা তাদেরই। তাইতো পশ্চিমের পণ্ডিতরাও রসিক। আমাদের দেশের পণ্ডিতরা হাসতেও দ্বিধা করেন।

'আপনি তো বেশ হাসতে পারেন।'

হাসতে হাসতেই মিঃ রায় বললেন, 'হাসব না কেন?'

'আমাদের দেশের গুণীজ্ঞানীরা ঠিক হাসতে জানেন না।'

'আমি তো গুণীজ্ঞানী নই।'

'শুধু গুণীজ্ঞানী কেন, আমাদের দেশে যারা জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত তারাও হাসতে জানেন না।'

হাসি হাসি মুখেই মিঃ রায় জানতে চাইলেন, আমাকে কি খুব গুণীজ্ঞানী বা সুপ্রতিষ্ঠিত বলে মনে হচ্ছে?

'নিশ্চয়ই।'

'মাই গড!' মিঃ রায় আবার হাসতে শুরু করলেন।

আমিও হাসলাম।

একটু পরে উনি আবার বললেন, পঁচিশ বছর চাকরির পর ষোল শ' পঞ্চাশ টাকা মাইনে পেলেই সুপ্রতিষ্ঠিত?

আজকের যুগে আমেরিকান বা রাশিয়ান আর্মির গোপনতম খবর সংগ্রহ সম্ভব, কিন্তু পুরুষের মাইনে বা মেয়েদের বয়স জানা প্রায় অসম্ভবই থেকে গেছে। যে পুরুষ বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ না করে নিজের মাইনে বলতে পারেন, তার চাইতে সরল মানুষ আর পাওয়া দুষ্কর। বুঝলাম, মিঃ রায় শুধু হাসতেই জানেন না, প্রাণ খুলে কথাও বলতে পারেন।

আমি হাসতে হাসতে বললাম, আপনার এখানে এসে মনে হচ্ছে সত্যি আমার বৃহস্পতির দশা শুরু হলো।

'কেন বলুন তো?'

'সময়টা ... ঘটবে বলে মনে হচ্ছে...'

'কেন এর আগে কি রাহুর দশা ছিল?'

'আপনি জ্যোতিষীও জানেন নাকি?'

মিঃ রায় হেসে ফেললেন। 'আপনি দেখছি নামকরা ক্রিমিনাল ল' ইয়ারের মত প্যাঁচালো প্রশ্ন করে আমার সব সিক্রেট জেনে ফেলার চেষ্টা করছেন।'

বিস্ময়ের সঙ্গে বেশ মজা লাগল ওর কথা শুনে। 'তার মানে?'

ঘাড় ঘুরিয়ে ভিতরের দিকে মুখ ফিরিয়ে মিঃ রায় একটু জোরে কাশি দিলেন, শুনছ!

কোন সাড়াশব্দ নেই। আমরা দুজনেই চুপ করে রইলাম।

ছোটবেলায় মিনার্ভা-স্টারমঞ্চে থিয়েটার দেখার কথা মনে পড়ল। রাজপ্রাসাদের দৃশ্য। মন্ত্রী, সেনাপতি থেকে শুরু করে নর্তকীর দল পর্যন্ত স্টেজে রেডি হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। অতগুলো মানুষ দাঁড়িয়ে আছেন অথচ কারুর মুখে একটি শব্দ নেই। এমনকি কেউ হাত-পা পর্যন্ত নাড়ছেন না। চোখের পাতাও পড়ছে না কারুর। কোন মহানায়কের প্রত্যাশায় ওরা সবাই মন্ত্রমুগ্ধ। শুধু কি তাই? ব্যাক-গ্রাউন্ড থেকে বেহালার একটু ক্ষীণ শব্দও শুনতে পেতাম না। মনে হতো কুমারটুলির কোন শিল্পীর তৈরী রাজ-দরবারের দৃশ্য দেখছি। তারপর হঠাৎ রাজবেশে ছবি রায় বা নির্মলেন্দু লাহিড়ী অথবা রাজমহিষীর বেশে সরযূবালার প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত রাজদরবার প্রাণ-চঞ্চল হয়ে উঠত, পিছন থেকে ভেসে আসত সুমধুর সঙ্গীত। শুরু হতো নাটক।

মিসেস রায়ের আগমন হতেই আমরা দুজনে চঞ্চল হয়ে উঠলাম।

আনন্দ-খুশীতে হাসি মুখে মিঃ রায় বললেন, আমার স্ত্রী........

আমি তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে নমস্কার করে বললাম, আমি সাগর চট্টোপাধ্যায়।

মিঃ রায়ের মত মিসেস রায় বড়টা ফর্সা না হলেও বেশ সুন্দরী। বয়স চল্লিশের ঘরের শেষের দিকে হলেও দেহে কেমন একটা বাঁধুনী আছে, মুখে লালিত্য আছে। তার চাইতেও বড় কথা চোখের কোণায় ঠোঁটের পাশে তৃপ্তির হাসি ছড়িয়ে আছে। মাধুর্য আর গাম্ভীর্য মিলে মিসেস রায়কে প্রথম দর্শনে বেশ লাগল।

মিসেস রায় হাত তুলে নমস্কার করে বললেন, আপনার নামটি তো ভারী সুন্দর।

আমি মাথা নীচু করে একটু মুচকি হাসলাম। বললাম, দোকানের সুনাম না থাকলেই সাইনবোর্ডটা একটু বড় আর জমকালো করতে হয়।

মিসেস রায় হাসলেন।

মিঃ রায় বললেন, মার্ভেল!

মিসেস রায় জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার নাম কে রেখেছিলেন?

'আমার মা।'

'হঠাৎ সাগর নাম রাখলেন?'

আমি একটু হাসলাম। দুঃখের হাসি কিন্তু ওরা ঠিক বুঝলেন না। অনেক দিন কোন সন্তান না হওয়ায় মা খুব মুষড়ে পড়েছিলেন। তারপর কোন এক সাধু নাকি ওকে বলেছিলেন পৌষ সংক্রান্তিতে সাগর মেলায় গিয়ে পুজো দিতে.........

মিঃ রায় মাঝপথে জানতে চাইলেন, আপনার মা গিয়েছিলেন?

'হ্যাঁ। ঠিক পরের বছর পৌষ সংক্রান্তির ভোরেই আমার জন্ম......

আমার কথা শেষ হয়নি। পরের কাহিনীটুকু বলবার আগেই মিসেস রায় একটা ছোট্ট দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, কি আশ্চর্য!

মিঃ রায় বললেন, রিয়েলি?

'হ্যাঁ।' এক মুহূর্ত থেমে একবার নিঃশ্বাস নিয়ে বললাম, আর সেই পৌষ-সংক্রান্তির সন্ধ্যাতেই আমার মা মারা গেলেন।

স্বামী-স্ত্রী দুজনে প্রায় একসঙ্গে বলে উঠলেন, সে কি?

(ক্রমশঃ)

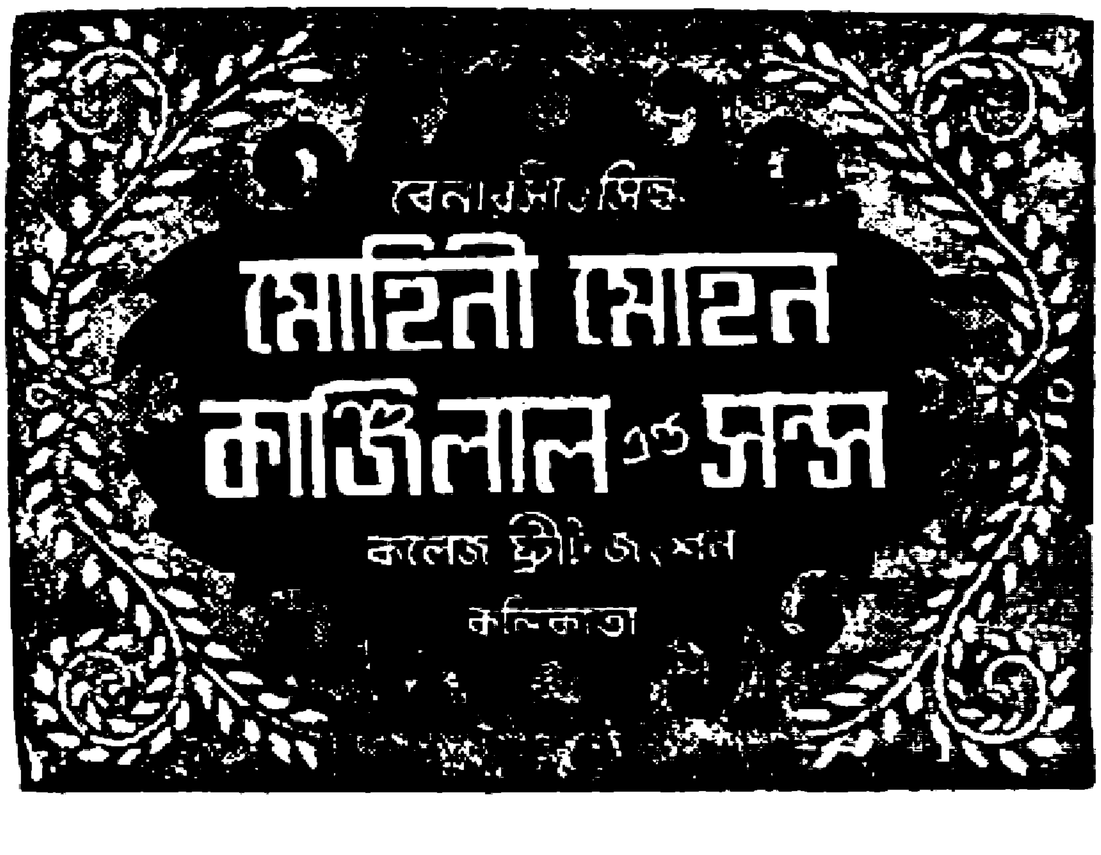

সুখের মেলা

* এবং খড় কাস্তে আলীমদ্দি *

ধানের 'কাঁড়ি' ভাঙা হয়েছে, দশটা জন লেগেছে, ভোর-বেলাতেই হালিমা বালতিতে করে গোবর গুলে খামারে গোবর-জল দিয়ে নিকিয়ে দিতেই আলীমদ্দি বাঁশের বাখারী বোনা আগড় ফেলে ধানের কাঁড়িতে উঠে বিচালীগুলো নামিয়ে দিয়েছে। বীজধানের আঁটিগুলো আলাদা করে ফেলে দিতে পাতলা কাঁথা মুড়ি দিয়ে পিঁড়ি পেতে বসে বীজধান বাছতে বসেছে আলীমদ্দির মা দুলালী বিবি। প্রত্যেকটা ধানের আঁটি পায়ের কাছে মাটিতে রেখে শীষগুলো মেলে ধরে মিশেল ধানগুলোর শীষ হাত দিয়ে টুঁটে বাছিয়ে নিতে হয়। সাদা পাটনাই ধান 'চেঙন' বা বীজ থাকবে। তার সঙ্গে লাল মউলো ধান এসে মিশেছে বীজ ছড়াবার সময় 'তলাপোড়ে' থেকে। লাল কালো ধানগুলো সহজেই চোখে পড়ে কিন্তু সাদা ধানের সঙ্গে অন্য সাদা ধান মিশলে তাও বেছে বার করতে হয়। আলীমদ্দির ডাগর মেয়ে সোঁরিনা ধান বাছতে বসে ঠিক চিনতে না পারলে বুড়ী চেঁচামেচি করে : 'বে' দিলে মাগীর দুটো ছেলে হয়ে গেল, এখনো তুমি ধান চেন না? এটা কি ধান, সরু? কলমকাটি আর এটা দুধ-কলম। দুধ-কলম ধানও সাদা, মাথায় কালো ছোট্ট একটু টিপ আছে। সরে যা তুই ধান বাছলে জমির বীজধানের মধ্যে সব 'ভেল' হয়ে যাবে।'

'হলেই বা ক্ষতি কি! সবেই তো ভাত বা মুড়ি হবে।'

'তোর মাথা! পাটনাই ধান যে-জমিতে হবে, সেই জমিতে কলমকাটি হবে কেন? পাটনাই একটু নাবি জমিতে হয়, কলম-কাটি হয় চড়াতে। ভাত তো সব ধানেরই হয়, তার মধ্যে মুড়ির ধান মোটা, ডহর জমিতে হয়, চড়া জমিতে আলো ভাল হবে না। সরু ধানে মুড়ি হয় না। ভাত চিঁড়ে হয়। অবার ধর, নাজানি ধান —মুড়ি ভাত দু-ই হয়। মাকাতি ধানে দু'রকমই হয়।'

'কে জানে বাবা, অতো 'বিধেন' আমি জানি না।'

'তুই ইস্কুলের পড়া পড় গেবে। তোর দাদাটা এম-এ পাশ করেছে, সে একটা ধানও চেনে না।'

শাল মুড়ি দিয়ে মুখের মধ্যে ডাল ঘষতে ঘষতে হাঁস্কদের চকচকে জুতো পায়ে দিয়ে লুঙ্গি পরে এসে দাঁড়ায় খয়রুল বাসার। বলে, 'কি বলছ দাদি, আমি ধান চিনি না?'

'চিনিস?' হাসলে বুড়ী দুলালী বিবি। 'বল তো এটা কি ধান?'

খয়রুল ঠাকুরমার কাছে গিয়ে বসে ধানটা হাতে নিয়ে চিনবার চেষ্টা করতে থাকলে তার বাপ হাসে, জনেরা হাসতে থাকে আগড়ের ওপরে ধানের আঁটি কাছড়াতে কাছড়াতে। পাড়া মাং করে পটাস পটাস শব্দ উঠছে।

খয়রুল বাসার বলে 'এটা আছুরলাল ধান।'

বুড়ী খলখল করে হাসতে থাকে।

খয়রুল গম্ভীর হয়ে বুড়ীর হাসি দেখে।

সোঁরিনা বলে, 'বুড়ী এবার একটা মিথ্যে কিছু বলে দেবে।'

বুড়ী চোখ বার করে। 'দূর হারামী! লক্ষ্মীর নামে মিথ্যে বলে লোক? এটা হল গয়াবালি ধান।'

শীষটা কেটে নিয়ে সোঁরিনা তার বাপকে দেখিয়ে শুধোয়, 'এটা গয়াবালি ধান হাঁ বাবাজী?'

আলীমদ্দি বলে, মা ঠিক ধান চেনে। ওটা গয়াবালি ধানই।'

বুড়ী আত্মপ্রসাদের হাসি হেসে বলে, 'তোর বাপকেই বা ধান চেনালে কে? লোকে শিখেয়েছে তোদের দাদু।'

কলেজে-পড়া দুটো মেয়ে—মঞ্জুশ্রী আর হেমলতা পড়তে এসেছে খয়রুলের কাছে। মুখে জল নিয়ে চা খেয়ে নিয়ে গিয়ে পড়াতে বসার তাদের খয়রুল পাকা বৈঠকখানাটার মধ্যে।

বাড়ির মধ্যে রেডিও চলছে।

অনেক মোরগ-মুরগী ধান খুঁটে বেড়াচ্ছে।

গোয়াল থেকে গাই-বাছুর, ছেলে-গরু চারটেকে বাইরের রোদে বার করে বেঁধে দেয় আলীমদ্দি।

চারটে লোক পান গুছোতে বসেছে বৈঠকখানার দাওয়ায় একদিকে।

প্যাকাটির খদ্দের এলে আলীমদ্দি তাদের মাল দেখায়, দরদস্তুর নিয়ে কচলাকচলি করে। শেষে দামমত ঠিক হলে লোকগুলো প্যাকাটিগুলো গুনে নিতে থাকে। পাটের খদ্দের আসে, আটাশ টাকায় চল্লিশ কেজি। আলীমদ্দি রাজি হয়। না হয়ে উপায় নেই। দুলালী বিবি হাত ইসারায় কাছে ডেকে বলে দেয়, 'নিয়ে নে বাবা, ইঁদুরে পাট কেটে নষ্ট করে ফেলছে।'

'ঢলন' সমেত একশো মণ পাট দিয়ে দেয় আলীমদ্দি। কাঁটা করে মেপে বেঁধে নিয়ে টাকা দিয়ে চলে যায় লোকগুলো। পাঁচশো আশী টাকা। প্যাকাটি বেচায় দাম পায় দুশো টাকা।

সুপারি, নারকোল, বাঁশ, উলু, খড়, কেশে, কলা, আখ—এসব বেচা টাকা আসে অনেক—কিন্তু রোজ পনেরো-ষোলোটা জনের রোজ যায় মাথাপিছু তিন টাকা করে। তাদের বিড়ি-বিড়ি আছে। জমি চাষের খরচ আছে। পঞ্চাশ বিঘে জমি। একটা ছেলে এম-এ পাশ করে প্রফেসারি করছে। আর একটা মেয়ে ক্লাশ টেনে পড়ছে। টেস্টে ফার্স্ট হয়েছে—সব সময়েই মেয়েটা ফার্স্ট হয়। পাশ করে যাবে। দেখতেও পরীর মতন। ওদের মাকে যে দেখতে অপূর্ব সুন্দরী। বিশটা গ্রাম খুঁজে শতখানেক মেয়ে দেখার পর দুলালী বুড়ী বউ করে এনেছিল। যেমন নাকের গড়ন, তেমনি দুটো চোখ। গায়ের রঙ একেবারে যাকে বলে দুধে-আলতা গোলা।

বউমা এক গ্লাস গরম দুধ এনে দেয় শাশুড়ীকে—সর-পড়া ঘন মিষ্টি দুধ। বুড়ী খেয়ে নিয়ে বলে, 'খয়রুলকে আর একটু বেশি করে দুধ দাও বউমা, ও কেন যেন দিন-দিন কাহিলপানা হয়ে যাচ্ছে। গাই-গরুটার দুধ কমে গেছে। মুলতানী গাই, অতো টাকা খরচা করে আনা হল। ছ' কেজি দুধ দিতে দিতে পাঁচ কেজিতে নাবলো।'

বউমা হালিমা মাথার কাপড়টা একটু তুলে দিয়ে বাটো গলায় শুধোয়, 'আজ কি রান্না হবে হাঁ মা? মাছ-গোস্ত কিছু নেই।'

বুড়ী হাঁ করে বউমার দিকে তাকায়। হামান দিস্তেতে ছেঁচে-আনা পান-গুপানের গুঁড়োগুলো গালে ফেলে বলে, 'খয়রুল তো খেয়ে কলেজে যাবে! এই ইনসান, জাল ফেলে মাছ ধরে দে বাবা—তোর ধানকাড়া এখন থাক।'

ইনসান বললে, 'পানি বা 'কালা' কি-মা!' বলে সে গামছার গা ঝেড়ে ফেলে বাড়ির মধ্যে চলে গেল। একটা বালতি আর খেপলা জাল নিয়ে বিলের দিকে মাছ ধরতে চলে গেল।

ঘণ্টাখানেক পরে ইনসান মাছ নিয়ে এলো। আলীমদ্দি মাছ দেখে খুশী হল। একটা ভেটকি মাছ পড়েছে কেজিতিনেক। অনেকগুলো বাটা মাছ পড়েছে। তারা বর্ষায় মানুষের পুকুর ভেসে গিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে পোনা মাছ এসে জড়ো হয়েছে তাদের মাঠের বিলে।

আলীমদ্দি খেতে এসে বসে বসে টাকা গুনছে থাকলে তার বউ বলে, 'খোকা বলছিল টাকা সব ব্যাঙ্কে রাখতে, চুরি-ডাকাতি হলে সব যাবে।'

আলীমদ্দি বললে, 'চোর তো এক-জনই আছে।'

হালিমা লজ্জা দেখিয়ে দাঁতে মাথার কাপড়ের পাড়টা কামড়ে কটাক্ষ হেনে বললে, 'সে-চোর বুঝি হালিমা?'

দুটো ডিম সিদ্ধ, খানিকটা হালুয়া, লুচি আর নারকোল নাড়ু খেতে দেয় হালিমা। এক গ্লাস দুধ এনে দেয়।

'কত টাকা জমিয়েছ বউ, শুনি?

হালিমা বলে, 'কোথা গো! আমার কাছে কিছু নেই। মেয়ে আর ছেলে কি টাকা আমার কাছে রাখে?

'হুঁ! শালা, মেয়েমানুষে কখনো কি তার গোপন ভাঁড়ারের খবর দেয়। কই আমার মাথায় হাত দিয়ে বলো দিকিনি একটা টাকাও নেই আমার কাছে।'

'বললে তোমার মাথায় আর একটাও চুল থাকবে না। মিথ্যে কথা বললে চুল সব উঠে মাথা ওল হয়ে যাবে।' হি হি করে হাসতে থাকে হালিমা।

'এই শোন'—হাতটা ধরে কাছে টেনে আদর করে আলীমদ্দি। বলে, 'কত আছে বল না, মেয়ের বিয়ে দিতে টাকা লাগবে না? হাজার-পাঁচেক হবে তো?'

'হাজার-পাঁচেক! এক লাখ বলো! বাড়ি করবার সময় তুমি আমার সাত হাজার টাকা নিলে, নারকোল পাতা, ঘুঁটে, খড়, মাছ, কঞ্চি-বেচা টাকা, আমার বাপ দুশো দিয়েছিল—সব গেল—সে-টাকা দিতে হবে, হাঁ।'

'এই যে দোতলা পাকা বাড়িতে বাস করছ, এটা কার? তোমার না?'

'এই দেখ রসড়, আমার ঠোঁট কেটে গেছে, দিলে তো রক্ত বার করে। গালে ... কর কেন? দাগ বসে যায়—মেয়েটা এসে পড়ে যদি জিগেস করে মা তোমার গালে এমন লাল দাগ কেন?'

'কেন, সত্যি কথাই বলবে!'

'মরণ! বুড়ো বেলার ঢং!'

'এই—বল না কত টাকা আছে?'

'কেন?'

'খয়রুলের বিয়ে দোব। মেয়ে দেখা ঠিকঠাক।'

'তোমার সব মিথ্যে গুলপট্টি। জানো, সতীসাধ্বী অবলা বউকে মিথ্যে কথা বললে পাপ হয়!'

'হয় বৈকি! তবে যে-বউ টাকা চুরি করে তাকে সত্যি কথা বলাও পাপ। সত্যিই খোকার বিয়ে দোব এ-বছর। হাজী কবিরুল গাজির মেয়ের সঙ্গে। বি-এ পাশ করেছে। দেখতেও মন্দ নয়।'

'থোও ! আমি সে-মেয়েকে দেখেছি কালো। ও-মেয়ে আমি ঘরে তুলবো না বলে দিচ্ছি।'

'কালো না হাতি! ওকে কালো বলে না!'

'ছেলের বিয়ে থাক, বরং মেয়ের বিয়ে দাও—বড্ড ডাগর হয়ে গেছে।'

'দেব দোব। কথা তো একরকম হয়েই আছে। ভাগ্নে বলে নয়, মনসুর ভাল ছেলে, বি-এ পাশ করে মাস্টারী করে—জমি-জিরেতটাই যা বড্ড কম।'

'তা হোক। এই শোন, মনসুর না সেদিন এসেছিল, আর সিঁড়ি-ঘরের নিচে হঠাৎ দেখি দুজনে—'

'কি!' সচকিত হাসিতে শুধোয় আলীমদ্দি।

'এই!' বলে চুম্বন করে দেখায় হালিমা।

'ওঃ!' হাসলে আলীমদ্দি।

'তরকারী পুড়ে যাবে' বলে হালিমা রান্নাঘরের মধ্যে চলে গেল। টাকা তার কাছে কত আছে আর জানা হল না আলীমদ্দির। একটা হার্মোনিয়ম মেশিন কিনবে বলে ভাবছিল সে।

মেয়েদের পড়িয়ে এসে জামা-কাপড় খুলে সাবান-তোয়ালে হাতে নিয়ে খয়রুল বলে, 'মা, তোমার ভাত হল?'

হালিমা কাছে এসে ছেলেকে বসিয়ে তার মাথার চুলে একপলা তিলের তেল ঘষে দিতে দিতে বলে, 'মাছটা হয়ে যাক। 'গোসল' (স্নান) করে আসতে আসতেই হয়ে যাবে।'

খয়রুল মায়ের মুখে চমৎকার টিপ-টিপে লাল দাগ দেখে কৌতুক এক চোখ তাকালে। তারপর বললে, 'শীতকালের চল ... কাকের মতন পড়ব আর উঠব, উঃ! ... কী ঠাণ্ডা লাগে। হাড় যেন কনকন করে।'

'আন দুফোঁটা তোর কি ধুলো-ময়লা বাবা! মুখেই খালি সাবান ঘষিস! আর ... নখগুলো কত বড় বড় হয়েছে রে তোর। কমাস পর পর নখ কাটিস...

'জানো মা, একটা ছেলে না বাবো হাঁসের মতন নখ রেখেছে—হাত মুঠো করতে পারে না! নখে আবার 'চিত্তির' করে রঙ দিয়েছে। বলে পয়সা দিন! অধাক্কার করে নখ রেখেছি। আমার দেখলে ঘেন্না করে—গা শিউরে ওঠে। আর পায়ের আকারে এতখানি করে জুল্‌পি!'

হালিমা হাসতে থাকে। বলে। 'কেউ দাঁড়ি রাখছে, কেউ জুল্‌পি রাখছে, কেউ নখ রাখছে—তুই বেন বাবা এসব কর্‌সনি—তোকে এমনিতেই দেখতে ভাল—বা গা ধুয়ে আয়।'

সেরিনা এসে বলে, 'মা আমার মাথায় উকুন!'

'উকুন!'

'হাঁ! একটা অমুক্তোক! এত বড়!'

'কোথা থেকে এলো?'

'অজুর চুল দেখছিলুম সেদিন। তার চুলে রাজ্যের উকুন। সবাই ঘরের ঘরের ঘরে।'।

'বেশ করেছিস, তোর মাথার নড়ো অনেক দেব। একবার উকুন হল মাথার খাঁড়ি বেড়ে, তোর মাথা কাছে পড়ে। কত কষ্টে দিয়ে ভাল করলুম। চুল ভাল করে আঁচড়া বেরে। আজ বাদে কাল তোর বে' হবে।'

'বে' হবে?'

'হাঁ। বে' হবে। মেয়েছেলে—ঘরে কি ফেলো থাকবি। তোর জন্যে ছেলে দেখা হয়ে গেছে। বর্ধমানে। এক জোতদার ধনী লোকের ছেলে।'

'মিথ্যে!'

'মিথ্যে কিরে!' মা অবাক হয়।

সেরিনা বলে, 'তাহলে মনসুর গাছি আমার জন্যে গলায় দড়ি দিয়ে মরবে!'

'আর তুই?'

'আমি? আমি গলায় কলসী বেঁধে ডুবে মরব!'

'মরণ! পড়ুকে মেয়ে! পাঁচিতে দেখেছে। বেশি বাড়াবাড়ি করলে কাটার বাড়ি দেব। সিঁড়ি উলায় সেদিন তোরা কি করছিলি শুনি? অমন বিয়ের আগে দেখতে নেই। গুনা (পাপ) হয়।'

'অকালে সোনাটা একটু পাতলা হয়ে গেল মা। ভেবেছিলুম সময়ে ঘন কালো হবে। এই পাতলা রঙটা আবার বিশ বছর হয়ে একেবারে ফর্সা হয়ে যাবে।'

'শালা হতভাগী, মায়ের সঙ্গে কথা বলিস, না নানী দাদির সঙ্গে?'

'মা মেয়েতে যা কথা হয় মা, বাপ-ছেলেতে তার শতাংশের একাংশ হয় না। ভাই বোনে যা হয়, তারে ভায়ে হয় না—হয় না মা?'

'আমি জানি না। ওটা স্বভাব। জ্ঞান-বৃদ্ধির ব্যাপার। যা, জনেদের মুড়ি দিয়ে আয়। তোর দাদিকে খেতে ডাক। বুড়ি হলে টিপে টিপে কথা শোনাবে!'

আলীমদ্দি বাড়িতে এসে হাঁকাহাঁকি শুরু করলে: 'কই গো, খয়রুলের বউ (বউ-মা), দেখ, কতখানি হাত কেটে ফেলল, বর্ষিয়ে শালা কাউ (রক্ত) বেরুচ্ছে!'

হালিমা ছুটে বেরিয়ে এসে দৃশ্য দেখে বললে, 'ওমা! ই-কি কাণ্ড করেছ! হুঁস করে একটু কাজ করবে তো। দাঁড়াও, চুন দিয়ে বেঁধে দিই।'

বুড়ী ছুটে এসে আঙুলটা চিপে ধরে নিজের আঁচলে রক্ত মুছে একাকার করে বলতে থাকে, 'হাঁ রা হতভাগা, তোকে কে ধারালো কাটারী নিয়ে পাকা হাড় কামিনী কাঠ কেটে গরুর খুঁটো বানাতেই হবে বলে মাথার দিব্যি দিয়েছিলো! জনেদের বললে কি তারা করে দিতে পারতো না?'

খয়রুল স্নান করে এসে বাপের কাটা হাতে চুন লাগাতে যেতে দেখে বললে, 'না মা, চুন দিও না। দাঁড়াও আমি ডেটল দিয়ে বেঁধে দিচ্ছি।'

হাতটা বেঁধে দেবার পরই আলীমদ্দি চলে গেল জনেদের কাছে। স্থির হয়ে একটু বসে থাকবার বান্দা সে নয়। রাত দুটোর সময় যদি হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায় তো টর্চ হাতে নিয়ে উঠে গিয়ে গরুর গোয়ালে যাবে। খড়কুটি আছে কিনা দেখবে। কুকুর ডাকলেই টর্চের আলো ফেলে ফেলে চারদিক দেখবে চোর-ডাকাত কেউ এলো কিনা।

দুপুরে জনেরা চলে গেলে খেয়ে-দেয়ে নিয়ে শুয়ে-শুয়ে জনেদের হিসেব লেখে সে।

পাড়ার তিনটে সখির সঙ্গে সেরিনা ক্যারাম খেলে কোলাহল করতে করতে। হালিমা কতক্ষণ রেডিও শোনায়। তারপর স্বামীর পাশে শুয়ে পড়ে ঘুমোতে থাকে।

বিকালে জনেরা এসে খড়ের 'তড়পা' বেঁধে ফেললে আলীমদ্দি নিজেই 'টাল' দিয়ে দেয়। জনেরা কুলোর হাওয়া মেরে 'ধান সাবুটে' থাকলে আলীমদ্দি বলে, 'কি করে তোদের তিন টাকা জনের দাম দোব বল? সারাদিন দশ পণ বিচালী বেঁধেছিস মোটে। আহিম্মদ বারো পণ। শুধু পূর্ণ সরদার এক কাহন বিচালী বেঁধেছে। সাতবার খোঁক মারবি সব। আর এ বছর ধান যা হল গায়ে জ্বর! বিঘে প্রতি ছ' মণ হলে কপাল মনে করব! দু'বার বড়-পানিতে পচপচে গেল। তবু সাতবিঘেটাতে দু' নবী ধানার ময়লা সার দেওয়া ছিল বলে ফসটা একটু ভাল হয়েছে যা। খড়ের দাম এ বছর আগুন হবে। কত পোয়াল হয়েছে দেখ না!

পাটি থেকে সব ছেড়ে গেছে। আর ঐ কলে পানি-ভেজা দাগওলা খড় গরু খাবে কি? আমার গরুগুলো শালা সৌখিন জীব হয়ে গেছে—খৈল-ভুষি না দিলে মাচলার মুখ ঠেকাবেই না!'

জনেদের ধান 'সারা' হলে একজন বলে, 'আলীমদ্দি চাচা। ধান মাপবে কে? তোমার তো হাত কাটা।'

'সারাদিন না হয় পূর্ণ সরদার মাপ!'

সারাদিন বলে, 'মোর বড় পিঠের চাল কনকন করে। 'হেঁটো' ধরে যায়। পূর্ণ তুই মাপ ভাই।'

পূর্ণ ধান মাপতে বসে পাঁচ সেরি পাল্লা নিয়ে। বস্তায় করে ধান বয়ে নিয়ে জনেরা গোলায় ঢেলে দিয়ে আসে। রাত হয় কাজ শেষ হতে।

দুলালী বুড়ী জনেদের বাটিভরা গরম চা এনে খাওয়ায়। তেল মাখানো মুড়ি খেতে দেয়।

খয়রুল ফিরে আসে, সঙ্গে মনসুর। তার মামাতো ভাই। যার সঙ্গে সেরিনার বিয়ে হবার কথা আছে।

সালাম করতে হেসে প্রতি সালাম করলে আলীমদ্দি। কিন্তু হঠাৎ সে যেন চমকে গেল। মনসুরের কথার মধ্যে কেমন যেন জড়তা। অস্বাভাবিক হাসি বা ভোয়াক্ক করার ভঙ্গি। মদ গিলেছে নাকি?

খয়রুল বললে, 'বাইরে বস মনসুর। আসছি আমি!'

'বাইরে কেন 'খওরা'!'

'ঠিক! বাইরে মানে আমার পড়ার ঘরে। তুই মাল টেনেছিস, মা-দিদা-আব্বাজী জানলে মুশকিল হবে!'

'ও সরি! 'ধার্মিকরা 'হেট' করবে! বেহেশ্‌তে গেলে মজা মিলবে, কিন্তু দুনিয়াতেই শালা অচল!'

খয়রুল বাড়ির মধ্যে এসে ডাকলে, 'মা!'

হালিমা ছেলের ঘরে ঢুকল।

খয়রুল বললে, 'মনসুর এসেছে। বাইরের ঘরে তাকে বসতে বলে এসেছি।'

'কেন, বাইরে কেন বাবা?'

'ওকে ভূতে ধরেছে।'

সেরিনা কাছে এসে তার বেণীটা ধরে পাক দিয়ে আদর করে খয়রুল বলে, 'মনসুর মদ খেয়ে এসেছে। বলে, 'অন্তরে অনেক জ্বালা! বাবা বুড়ো বয়েসে নিকে করে আনলে, তার তিনটে ছেলে, শরীক ভাগ করে নিচ্ছে। খুব ঝগড়া করেছে। ওকে নাকি বলেছে, বাড়ি থেকে বেরিয়ে যা।

'তা মদ খেতে গেল কেন?'

'ও খায় তো!'

'তা কি তুই কোনোদিন বলেছিলি?'

'ভেবেছিলুম শুধরে যেকাতে পারব। ও যে এখন এখানে কিছুদিন থাকতে চায়!'

সেরিনা একটা হারিকেন নিয়ে বাইরের পড়ার ঘরে এলে মনসুর বলে ওঠে, 'হাল্লো, ডার্লিং! হাউ নাইস! বিউটি!'

'কি খেয়েছ?' রুক্ষ হয়ে শুধোয় সেরিনা।

'এই সামান্য, একটু মদ টেনে ফেলেছি। কিছুতেই যাব না, শালা?'

খাপ জীবন দিয়েছে সেছে। হারাম জিনিস খাও তুমি! তুমি এক্ষুনি চলে যাও। আর আমার সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে না!"

সৌরিন চোখ মুছতে মুছতে এসে দোকানের ধারে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।

আশীর্বাদ একটা উচিত কথা শুনিয়ে ছোঁড়াটাকে ঘাড় ধরে তাড়িয়ে দেবে বলে ভেতর থেকে বাইরে আসতে গিয়ে হঠাৎ মেয়েকে দোকানের ধারে দাঁড়িয়ে কাঁদতে দেখলে। সে ইচ্ছেই করলো একটু। তারপর লাগল। তারপর খবরের পড়ার ঘরের দিকে তাকে আসতে দেখেই মনসুর হারিকেনের আলোটা নিভিয়ে দিল। আশীর্বাদ নীরবে সেই ঘরের দোরে তালা চাবি এঁটে দিয়ে গেল।

সারা রাত আর কেউ এল না। অন্ধকার। চুপি চুপি চুরি করে একটা কম্বল জানালা গলিয়ে দিয়ে রেখেছিল সৌরিনা—কিন্তু আশীর্বাদ তা চোখে পড়তেই কম্বলটা কেড়ে নিলে।

আশীর্বাদ বললো, মনসুর এবং তোমাকে দাঁড়িয়ে দিয়ে তবে তৈরি করতে হবে— যদি খাঁটি মনসুর হয় তবে এখানেই থাকবে—আমার সম্পত্তি পাবে।"

বাপের কথা শুনে সারা মুখটা কেন আলো হয়ে গেল সৌরিনার।

—আবদুল জব্বার

কুকস্ ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড, বোম্বে-২৫

বিনামূল্যে! —আপনার বিনামূল্যের সুন্দর পুস্তিকার জন্যে
আজই লিখুন—ডিপার্ট-৩, পোঃ বক্স ৬৪৫২, বোম্বাই-১৮

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

ধ্রুপদী সাহিত্যের অনুবাদ

বাংলা অনুবাদ সাহিত্য একদা যেমন সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল, এখন আর সে অবস্থা নেই। এর কারণ অক্ষম অনুবাদ, পাঠকের আগ্রহের অভাব এবং সর্বোপরি প্রকাশকবর্গের উৎসাহ স্রোতে ভাটা পড়া। এছাড়া আরো কারণ থাকা সম্ভব।

একদা প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যিকরা অনুবাদের কাজকে হেয় মনে করতেন না এবং সেই কারণেই বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, শক্তি গঙ্গোপাধ্যায়, প্রবোধকুমার সান্যাল প্রভৃতি সাহিত্যিকগণ অজস্র অনুবাদ করেছেন। এ যুগের সাহিত্যিকদের অনুবাদ করার কোনো ঝোঁক আছে মনে হয় না। গিরীশচন্দ্র ঘোষ একদা 'ম্যাকবেথ' অনুবাদ করেছিলেন এবং সেই অনুবাদ আজো পণ্ডিতমহলে বিশেষ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর অজস্র বিদেশী গ্রন্থের অনুবাদ হয়েছে সন্দেহ নেই, অনুমানপুষ্ট এই সব অনুবাদ গ্রন্থের মূল্যও অনেক কম, কিন্তু সেই সব অনুবাদ গ্রন্থাবলীর অনুবাদক যাঁরা সুনির্বাচিত না হওয়ায় অনুবাদের মূল্য হ্রাস পেয়েছে।

সাহিত্যের নিজস্ব প্রয়োজনে বিদেশী সাহিত্যের অনুবাদ প্রয়োজন। ফরাসী ভাষাতে যে সব গ্রন্থ প্রকাশিত হয় সেই সব গ্রন্থ প্রায় একই সময়ে ইংরেজী ভাষায় অনূদিত হয়ে ইংরাজীভাষীদের জন্য প্রকাশিত হয়। বলাবাহুল্য এই অনুবাদের ফলে অনূদিত ভাষাই পুষ্টি লাভ করে সমৃদ্ধ হয় ওঠে।

সুখের বিষয় সাহিত্য অকাদেমী পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় রচিত ক্লাসিক সাহিত্যকে ভারতীয় ভাষার মাধ্যমে ভারতীয় পাঠক সাধারণের কাছে পরিবেশনের একটি কার্যক্রম স্থির করেছেন এবং সেই পরিকল্পনানুসারে কিছু কিছু ধ্রুপদী সাহিত্য ভারতীয় ভাষায় অনূদিত হয়েছে। আমরা ইতিপূর্বে 'ওথেলো'র বঙ্গানুবাদ সম্পর্কে আলোচনা করেছি।

সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে ভলতেয়ারের বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ 'কাঁদিদ' ও জাঁ জাক রুশোর 'সামাজিক চুক্তি'। এই দুটি গ্রন্থই মূল ফরাসী ভাষা থেকে অনূদিত এবং যথাক্রমে অনুবাদ করেছেন প্রখ্যাত কবি অরুণ মিত্র ও প্রখ্যাত সাহিত্যিক মনীমাধব চৌধুরী।

ভলতেয়ার (১৬৯৪—১৭৭৮) ও রুশো দুজনেরই লেখনী ছিল তরবারির ক্ষুরধার। মানব সমাজের সমস্যার কথা চিন্তা করেছেন এই দুই মনীষী এবং তার সমাধানের পথ নির্দেশ করে নতুন সমাজ গড়ে তোলার প্রেরণাও সঞ্চার করেছেন। ফরাসী জাতীয় জাগরণে যে মূল প্রেরণা ও বর্তমান যুগের সমাজবাদের আদর্শ যে প্রেরণায় চালিত তার মূলে এই দুজন মহান প্রাণ ফরাসী মনীষীর অবদান অবিস্মরণীয়।

ভলতেয়ারের প্রকৃত নাম ফ্রাঁ-মারি আরুয়ে। এই নামটিকে নানাভাবে রূপান্তরিত করে ভলতেয়ার এই নামকরণ তিনি নিজেই করে নেন। প্যারিসের একটি মধ্যবিত্ত সংসারে জন্মেছিলেন ভলতেয়ার এবং আইন ব্যবসায় না গ্রহণ করে সাহিত্যকে তিনি আশ্রয় করেছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর এই মহান চিন্তা নায়ক সমস্ত দেশের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ভাবনার মূর্ত প্রতীক। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের রূপায়ণ যেন ফরাসী বিপ্লব।

কাব্য, নাটক এই দুই জাতীয় রচনায় হাত পাকিয়েছিলেন ভলতেয়ার। এদিক থেকে যথেষ্ট প্রশংসা কুড়িয়েছেন কিন্তু সেখানেই তিনি থামেননি। অন্যায় এবং অবিচার তাঁকে ব্যথিত করে তুলতো। এই সময় নাবালক রাজা পঞ্চদশ লুই-এর অভিভাবকদের বিদ্রূপ করে দুটি নাটক রচিত হয়। নাম না থাকলেও এই নাটক যে ভলতেয়ার রচিত এমন সন্দেহ করা হল এবং তার ফলে ১৭১৬-তে তিনি নির্বাসিত হলেন আবার চতুর্দশ লুই-এর রাজত্বকালে একটি শ্লেষ ব্যঙ্গ কবিতার রচয়িতা সন্দেহে তাঁকে কুখ্যাত বাস্তিল কারাগারে বন্দী করে রাখা হল।

সারা জীবন তিনি যন্ত্রণা ভোগ করেছেন। জীবনেও যেমন, মরণেও তেমনি অবজ্ঞা পেয়েছেন রাজ সরকারের হাতে। প্যারিসের সমাধিক্ষেত্রে তাঁকে সমাধিস্থ করার অনুমতি দেওয়া হয়নি।

ষোড়শ লুই-এর আমলে তাঁর নাম উচ্চারণ করাও দণ্ডনীয় ছিল।

ভলতেয়ার ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে লিখিত একটি চিঠিতে লিখেছিলেন—

"আমি যা সব দেখছি তা সমস্তই এক বিপ্লবের সূচনা। এ বিপ্লব অনিবার্য তবে আমার চোখে তা দেখা হবে না। যাঁদের বয়স অল্প তাঁরা ভাগ্যবান, অনেক আশ্চর্য ও চমকপ্রদ ঘটনা তাঁরা দেখতে পাবেন।"

ভলতেয়ারের সেই আশা পূর্ণ হয়েছে। ফরাসী বিপ্লবের পর তাঁর মরদেহ আবার পূর্ণ মর্যাদায় প্যারিসে এনে পাঁতেয়োঁতে সমাহিত করা হয়।

ভলতেয়ার বলতেন—'আমি চাই সমস্ত অবিচারের কাহিনী সমস্ত মানুষের কানে সব সময় প্রতিধ্বনিত হোক—'

কাঁদিদ'র প্রথম প্রকাশ ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে জেনিভায়। জার্মান দার্শনিক লাইবনিৎস-এর কথা—এই জগৎ সব চেয়ে উত্তম এবং এখানকার সব কিছুই বিধাতার ইচ্ছায় আমাদের কল্যাণের জন্য ঘটছে। এই তত্ত্বটি ভলতেয়ার পছন্দ করেননি। এই তত্ত্বটির মধ্যে যে আশাবাদ প্রচ্ছন্ন আছে তিনি তার বিরোধী এবং সেই মতবাদকে আক্রমণ করে এই গ্রন্থ রচনা করেন। ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে লিসবন শহরে প্রচণ্ড ভূমিকম্প হয়, এই ভূমিকম্পে বিধাতার ভূমিকা নিয়ে রুশোর সঙ্গে তাঁর বিতর্ক হয়। সেই তর্ক থেকেই এই গ্রন্থের উৎপত্তি। অবিচার ভরা পৃথিবীর অসামঞ্জস্য ও অসাম্যের ছবি তিনি এই গ্রন্থে রূপায়িত করেছেন।

কাঁদিদ প্রথম প্রকাশ কালে গ্রন্থকারের নাম ছিল না। গ্রন্থটি সেই সময় কাল্পনিক এক জার্মান লেখক ডকটর রালফের মূল গ্রন্থের অনুবাদ হিসাবে প্রকাশিত হয়। তবে এই গ্রন্থের আসল লেখককে সহজেই চেনা গেল।

'কাঁদিদ' ইতিপূর্বে ইংরাজী অনুবাদ থেকে বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন অশোক গুহ। ডক্টর অরুণ মিত্র ফরাসী বিদ এবং বাংলা সাহিত্যের একজন সম্মানিত লেখক, তাঁর অনুবাদে কাঁদিদে'র মূল বক্তব্য বাঙালী পাঠক মূল কাহিনীর মতই উপভোগ করবেন। ডক্টর মিত্রের ভূমিকাটুকু বিশেষ মূল্যবান। এই ভূমিকায় ভলতেয়ারের জীবন ও সাহিত্য বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে। এই অনুবাদ যে বাংলা অনুবাদ সাহিত্যের মর্যাদা বৃদ্ধি করবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

ফরাসী গণজাগরণে রুশোর 'কঁত্রা সোসিয়েল' এক মহাগ্রন্থ। এই গ্রন্থে রুশো রাষ্ট্রীয় অধিকারের মূলকথা বিশদভাবে তুলে ধরেছিলেন। এই গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ 'সামাজিক চুক্তি বা রাষ্ট্রীয় অধিকারের মূল কথা' নামে প্রকাশ করেছেন সাহিত্য অকাদেমী। মূল ফরাসী থেকে অনুবাদ করেছেন প্রবীণ সাহিত্যিক ননীমাধব চৌধুরী। অনুবাদক এই গ্রন্থটির সূচনায় লিখেছেন—

"সাহিত্যাচার্য প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের বাসভবনে তখন বাংলার সুপরিচিত সবুজ-পত্র গোষ্ঠীর সাপ্তাহিক বৈঠক বসিত। বৈঠকে শাসন সংস্কার সম্বন্ধে আলোচনা-প্রসঙ্গে একদিন কথা উঠিল দেশে পলিটি-ক্যাল দর্শন ও বিজ্ঞানের বইয়ের অভাব আছে। এই আলোচনা পরবর্তী কয়েকটি বৈঠকেও চলিল এবং স্থির হইল তিনখানি বিখ্যাত গ্রন্থের, আরিস্ততলের politike, মাকিয়াভেল্লির Dal Principe এবং রুশোর Contrat Social মূল ভাষা হইতে বাংলায় অনুবাদ করিবার ব্যবস্থা করা হইবে।"

সেইকালে অতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় অনুরোধ করেন শ্রীযুক্ত চৌধুরীকে রুশোর ফরাসী গ্রন্থটির বঙ্গানুবাদের। এই গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ অনুবাদক স্বয়ং প্রকাশ করেছিলেন অনেকদিন পূর্বে।

'কঁত্রা সোসিয়াল' দুরূহ রাষ্ট্রদর্শনের বই এবং আজ থেকে অনেক বছর আগে এই গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ বাঙালী মনীষার উপযুক্ত একথা স্বীকার করা কর্তব্য।

শ্রীযুক্ত চৌধুরী অসাধারণ নিষ্ঠায় এই দুরূহ কর্ম সম্পাদন করেছিলেন এবং সমকালীন বাঙালী চিন্তানায়কদের কাছে তার জন্য প্রশংসা অর্জন করেছিলেন আজ সেই গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ নিঃসন্দেহে আনন্দ সংবাদ।

দুটি গ্রন্থই সুমুদ্রিত।

—অভয়ঙ্কর

(১) কাঁদিদ-ভলতেয়ার—অনুবাদ অরুণ মিত্র।

(২) সামাজিক চুক্তি—জাঁ জাক রুশো—অনুবাদ ননীমাধব চৌধুরী।

প্রকাশক — সাহিত্য অকাদেমি—নিউ-দিল্লী (ব্লক ৫বি, রবীন্দ্র স্টেডিয়াম, কলি:-২৯)। মূল্য যথাক্রমে পাঁচ টাকা এবং ছয় টাকা।

কটা ভাষা শেখা দরকার ?

বিদেশী ভাষায় দখল সংস্কৃতির দিগন্তকে অসম্ভব প্রসারিত করে। বুল-গারিয়ানদের মধ্যে একটি প্রবাদের চল আছে, একটি বিদেশী ভাষা জানা মানে আরেকটি আত্মার মালিক হওয়া। প্রত্যেকটি নতুন ভাষা শিক্ষা যে জীবন-সংগ্রামে আরেকটি হাতিয়ার হস্তগত করার সামিল, মার্কস এ-কথাটা বারবার আবৃত্তি করে আনন্দ পেতেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, মার্কস স্বয়ং তাঁর ডিপ্লোমার জন্যে থিসিস লিখেছিলেন লাতিন ভাষায়। তাঁর 'দর্শনের দারিদ্র্য' প্রবন্ধ ফরাসীতে, 'ক্যাপিটাল' জার্মান ভাষায় এবং বহু প্রবন্ধ ইংরেজিতে লেখা। সবশুদ্ধ তিনি জানতেন দশটির মতো ভাষা। ফ্রেডারিক এঙ্গেলস্ কুড়িটি ভাষা জানতেন। সবকটি ভাষাতেই প্রচণ্ড বিরক্তি প্রকাশ করতে পারতেন। এমনকি উচ্চারণের টান, মুদ্রাদোষ, আঞ্চলিক প্রবণতা খুব কড়া সহকারে তিনি শিখতেন। সূক্ষ্মতম রসিকতা পর্যন্ত করতে পারতেন, এইসব ভাষায়। শোনা যায়, ভারতে ভাষাতত্ত্ব শিক্ষা-বিজ্ঞানের পথিকৃৎ হরিনাথ দে জানতেন ইউরোপের কুড়িটি এবং ভারতের চোদ্দটি ভাষা। পৃথিবীর বিভিন্ন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সর্বমোট আঠারোটি ভাষায় সসম্মানে এম-এ পাশ করেছিলেন তিনি। এঁর লাইব্রেরীতে ছিল প্রায় ষাট হাজার বই। রুশ-লেখক আলেকজান্দর গ্রিবোয়েদভ ছিলেন মোট এগারটি ভাষায় পারদর্শী। একদা তিনি মন্তব্য করেন, 'একজন লোক যত বেশি বিদেশী ভাষায় শিক্ষিত হবেন, তত বেশি তিনি স্বদেশের সেবায় কাজে লাগবেন।'

ভোলত্যার বলেছিলেন, 'পৃথিবীতে বিভিন্ন ভাষার অস্তিত্ব মনুষ্যজাতির অন্যতম চরম দুর্ভাগ্যের সূচক।' বিশেষজ্ঞদের মতে, বর্তমানে পৃথিবীতে ভাষার সংখ্যা মোট ২,৭৯৬ এবং উপভাষা বা কথ্যভাষার সংখ্যা ৩,০০০। তাছাড়া আছে লাতিন, প্রাচীন গ্রীক, হিত্তাইত, আরামিক প্রভৃতি মৃত ভাষা। একজন লোকের পক্ষে এই সবকটি ভাষা শেখা সম্ভব নয়, তার প্রয়োজনও নেই। এদের মধ্যে 'প্রধান' ভাষা মোট তেরোটি (এদের প্রত্যেকটি ভাষাভাষীর সংখ্যা অন্ততপক্ষে ৫ কোটির উপর)। এই তেরোটি ভাষাভাষী জনসংখ্যা : চীনা ৭০ কোটি, হিন্দী ও উর্দু ২৮ কোটি, ইংরেজি ২৫ কোটি, স্প্যানিশ ১৫ কোটি, রুশী ১৩ কোটি, জার্মান ১০ কোটি, জাপানী ১০ কোটি, ফরাসী ৮ কোটি, ইন্দোনেশীয় ৮ কোটি, পোর্তুগীজ ৮ কোটি, আরবী ৭ কোটি, বাংলা ৬ কোটি, ইতালীয় ৬ কোটি। কেউ যদি মাত্র এই তেরোটি ভাষা জানেন, তাহলেই বিশ্বের জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশের সঙ্গে ভাব-বিনিময়ে সমর্থ হবেন। এই তেরোটি ভাষা প্রায় পঁচাত্তরটি দেশের রাষ্ট্রভাষা। বিজ্ঞান, শিল্পকলা, কূটনীতি আর ব্যবসা-বাণিজ্যের ভাষাও ওরা।

মাত্র তেরোটি ভাষা। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভাষা কোন্‌টি? সংখ্যা দেখে মনে হতে পারে, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভাষা বুঝি চীনা। পৃথিবীর প্রতি চারজনে এক-জন এই ভাষায় কথা বলে। তার পরে স্থান পেতে পারে হিন্দীভাষা, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

চট্ করে সিদ্ধান্ত নেওয়া ভুল। কোন ভাষার গুরুত্ব ও কার্যকারিতা অনেক ব্যাপারের ওপর নির্ভরশীল, সেই ভাষায় কত লোক কথা বলে, তার সংখ্যা ঐসব ব্যাপারের মধ্যে একটি। সেই ভাষায় রচিত সাহিত্যের পরিমাণ এবং ভাষাটি কতখানি তথ্য বহনে সক্ষম, তাও বড় কম গুরুত্বপূর্ণ

নয়। আমরা বিদেশী ভাষা শিখি বিদেশীদের সঙ্গে কথা বলার উদ্দেশ্যে ততটা নয়, যতটা অন্যান্য দেশের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা, সাহিত্য ও শিল্পকলা এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক বিকাশের ঘটনাবলীর অনুধাবন ও উপলব্ধির জন্যে। এইদিক থেকে বিচার করলে কোন্ ভাষার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি? ১৯৫৬ খৃঃ হিসাব থেকে জানা যাচ্ছে : দৈনিক সংবাদপত্রের মোট সংখ্যা : ইংরেজি ২,৪০০, স্প্যানিশ ১,০০০, জার্মান ৬৭০, চীনা ৫৫০, ভারতীয় বিভিন্ন ভাষা ৫০০, ফরাসী ২৭০, পোর্তুগীজ ২৬০, রুশী ২৫০, জাপানী ১৬০, ওলন্দাজ ১৪০, ইতালীয় ১০০। সংবাদপত্রের মোট প্রচারসংখ্যা : ইংরেজি ৯ কোটি ৮০ লক্ষ, জাপানী ৩ কোটি ৬০ লক্ষ, রুশী ৩ কোটি, জার্মান ২ কোটি, ফরাসী ১ কোটি ৪০ লক্ষ, স্প্যানিশ ১ কোটি ১০ লক্ষ, চীনা ৭২ লক্ষ, ইতালীয় ৫৭ লক্ষ, ওলন্দাজ ৪৫ লক্ষ, পোর্তুগীজ ৩৫ লক্ষ, ভারতীয় ভাষাসমূহ ৩৫ লক্ষ।

এখন দেখা যাক, বিভিন্ন ভাষায় ছাপা বইয়ের সংখ্যা কত। ১৯৫৯ খৃঃ পরিসংখ্যান অনুযায়ী বইয়ের সংখ্যা : রুশী ৫৮,১০০, ইংরেজি ৪২,০০০, জার্মান ৩৩,৫০০ জাপানী ২৫,০০০, ফরাসী ১৬,০০০, স্প্যানিস ১৫,০০০, ইতালীয় ১০,০০০, পোর্তুগীজ ৮,০০০, সুইডিশ ৬,০০০, রুমানিয়ান ৫,৬০০, অন্যান্য ভাষার ৩০,৯৭০। অতএব দেখা যাচ্ছে, রুশ ভাষাতেই সর্বোচ্চ সংখ্যক বই বেরোয়। এ-ব্যাপারে দ্বিতীয় স্থান ইংরেজি ভাষার। জাপানী ভাষায় ছাপা বইয়ের সংখ্যাও উল্লেখযোগ্য। প্রযোগবিদ্যা ও যথাযথ বিজ্ঞান-বিষয়ক বইয়ের প্রকাশ-সংখ্যা : রুশী ২৮,০০০, ইংরেজি ৯,২০০, জার্মান ৬,২০০, জাপানী ৪,০০০, ইতালীয় ২,০০০, ফরাসী ২,২০০, স্প্যানিস ১,৮০০।

কোনো ভাষার 'কার্যকারিতা' সাধারণভাবে তার চাহিদা' দিয়ে নির্ধারিত হয়। অর্থাৎ সেই ভাষা থেকে পৃথিবীর অন্যান্য ভাষায় তর্জমা করা বইয়ের সংখ্যা দিয়েই ঐ কার্যকারিতা ঠিক করা হয়। প্রতি বছর সারা পৃথিবীতে প্রায় ৩০,০০০ বইয়ের তর্জমা প্রকাশিত হয়ে থাকে। এই সংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ অনূদিত হয় ইংরেজি থেকে, শতকরা ১৫ ভাগ রুশ থেকে এবং ফরাসী ও জার্মান থেকে যথাক্রমে শতকরা ১৩ ভাগ ও ১০ ভাগ। যত বেশী অনুবাদের কাজ চলুক না কেন, পৃথিবীর যাবতীয় লিখিত রচনার তর্জমা কি সম্ভব? পরিসংখ্যান বলে, পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে যে-সব উল্লেখযোগ্য বই লেখা হচ্ছে, তার শতকরা ১·৫ ভাগও অন্য ভাষায় অনূদিত হচ্ছে কিনা সন্দেহ।

কোনো ভাষার গুরুত্ব বিচার করতে হলে ভৌগোলিক দিক থেকে তার বিস্তৃতিও বিচার্য। প্রথম যে-ভাষা তার মাতৃভূমির সীমানা ছাড়িয়ে দূর-দূরান্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল, সে হল স্প্যানিস বুলি। কলম্বাসের হাল্কা দ্রুতগামী জাহাজ ও অভিযাত্রীদের তরোয়াল বিভিন্ন দেশে ভাষাটিকে রপ্তানী করে। অপরপক্ষে, ইংরেজি রাষ্ট্রভাষা কিংবা অন্যভাবে পনেরোটি ভিন্ন ভিন্ন দেশে ছড়িয়ে আছে। আরবী ছড়িয়ে আছে তেরোটি, ফরাসী নটি এবং জার্মান তিনটি বিভিন্ন দেশে।

দেখা যাচ্ছে, পৃথিবীর ৬০টি বিভিন্ন দেশের অধিবাসীদের সঙ্গে দোভাষীর সাহায্য ছাড়া কথা বলতে গেলে মাত্র পাঁচটি ভাষা শিখতে হবে। আলোচনা শুরু হয়েছিল ২,৭৯৬টি ভাষা নিয়ে, তারপর তালিকাটিকে ছেঁটেকেটে ১০টি ভাষায় দাঁড়ায়। আর শেষপর্যন্ত এসে পৌঁছান গেল চারটি, কি বড়জোর পাঁচটি, ভাষায় দোরে। কাজেই বোঝা যাচ্ছে, নানা দেশের হাই স্কুলে যে প্রধানত এই চার-পাঁচটি ভাষাই শেখানো হয়, এটা আকস্মিক কোনো ঘটনা নয়। এই পাঁচটি ভাষা আয়ত্ত করতে পারলে যে-কেউ পৃথিবীর জনসংখ্যার শতকরা ৩০ ভাগের সঙ্গে কথাবার্তা চালাতে পারে এবং দুনিয়ায় যত বই, খবরের কাগজ ও অন্যান্য পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে বা হচ্ছে, তার শতকরা ৮০ ভাগই পড়তে পারে। তাছাড়া এর মধ্যে প্রত্যেকটি ভাষাই যেহেতু কিছু-না-কিছু পরিমাণে আন্তর্জাতিক ভাষার চেহারা নিয়েছে, তাই কথা বলা বা পড়াশুনোর সুযোগ-সুবিধা উপরের হিসেব ছাপিয়ে আরও বিস্তৃত হতে পারে।

—সংবাদিক

নতুন বই

হাউসকিপিং অফ রেভলুশন ইন রাশিয়া অ্যান্ড ইন্ডিয়া—(আলোচনা) গোবিন্দলাল ব্যানার্জী।—ফার্মা কে এল মুখোপাধ্যায়। ৬।১এ, ধীরেন ধর সরণি। কলকাতা-১২।

নামটাই বিচিত্র বিপ্লবের গৃহকর্ম। উক্তিটি লেনিনের এবং অক্টোবর বিপ্লবের পরবর্তী অধ্যায়ে রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের পরিপ্রেক্ষিতে গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। বিবাহের দ্বারা একটি গার্হস্থ্য জীবনের সূচনা হয়। কিন্তু সেই জীবনের সার্থকতা নির্ভর করে সুষ্ঠু গৃহকর্মের ওপর। লেনিনও রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে সার্থক করার জন্য এক সুপরিকল্পিত অর্থনৈতিক ও সমাজিক সংস্কারের সমাজতান্ত্রিক প্রয়োগপদ্ধতির রূপায়ণ করেছিলেন এবং সেই প্রচেষ্টায় জনগণের ব্যাপক সহযোগিতাকেই ভিত্তিরূপে গ্রহণ করেছিলেন। লেনিনের মতে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার পুনর্নির্মাণের মূলে সর্তগুলি হল—জনগণের সাংস্কৃতিক বিকাশ ও প্রগতি, ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার শ্রমের উৎপাদন ক্ষমতার যে হার তার দ্রুত বৃদ্ধি এবং রাষ্ট্রব্যবস্থায় জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণ। কিন্তু বিজ্ঞানের নির্বাধ প্রয়োগ ব্যতীত এই প্রচেষ্টা অর্থহীন। বিজ্ঞানই সেই অবস্থা সৃষ্টি করে, যার অনিবার্য ফলশ্রুতি স্বরূপ সমাজব্যবস্থার দ্রুত পরিবর্তন সম্ভব হয়।

বর্তমান গ্রন্থের লেখক বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা গঠনের কর্মপ্রচেষ্টার বিস্তৃত আলোচনা করেছেন এবং এই প্রসঙ্গে লেনিনের নিউ ইকনমিক পলিসির চেহারাটিকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। ফলে লেনিনকে একজন সংস্কারপন্থী গৃহকর্তার ভূমিকায় দাঁড় করান হয়েছে যার বিনি রাশিয়ার সামাজিক অবস্থাগুলির প্রতি বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গী রেখে এক অর্থনৈতিক পরিকল্পনার রূপায়ণ করেছেন এবং প্রয়োজনানুসারে অনেক ক্ষেত্রেই মার্কসীয় সমাজতন্ত্রের বহু ঘোষিত অর্থনৈতিক ও সামাজিক নীতি ও পদ্ধতি থেকে দূরে সরে গেছেন।

পরবর্তী অধ্যায়ে স্বাধীন ভারতের সামাজিক পুনর্গঠনের কার্যপদ্ধতির পর্যালোচনা করা হয়েছে। অবশ্য আগেই কংগ্রেস পরিচালিত ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনকে বিস্তৃত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে এবং লেনিনের নেতৃত্বে রাশিয়ার বিপ্লব-প্রচেষ্টা এবং গান্ধীজীর নেতৃত্বে ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্যে আকার এবং চরিত্রগত ভিন্নতা স্বীকার করেও লক্ষ্যের দিক থেকে উভয়ের মধ্যে মূলগত ঐক্যের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

বর্তমান গ্রন্থের সব থেকে আকর্ষণীয় অধ্যায় The Weapon of Non-violence. লেখক গান্ধীজীর অহিংস

আন্দোলনের যাথার্থ প্রমাণ করতে গিয়ে লেনিনের সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করেছেন এবং এই প্রসঙ্গে লেনিনের বহু উক্তির উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

লেখকের মতে, গান্ধীজি যেমন এক অহিংস রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখেছিলেন, লেনিনও সেইরূপ এক শ্রেণীহীন সমাজব্যবস্থার কথা বলেছেন। লেখকের শেষ সিদ্ধান্ত, গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলনের আদ্য এবং অন্তিম লক্ষের সঙ্গে লেনিনের কোন মূলগত বিরোধ নেই। শুধু ভারতবর্ষের সামাজিক অবস্থার বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতে এদেশে সমাজবিপ্লবের আন্দোলন অহিংসে পথে চলেছে। স্বাধীনতা লাভের পর কংগ্রেস-পরিচালিত ভারত সরকার যে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের কাজ শুরু করেছেন,—লেখক সেই কর্মপ্রচেষ্টার একটি মোটামুটি চেহারা তুলে ধরেছেন। এবং বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায় সোদিন পরিচালিত কম্যুনিস্ট সরকারের নয়া অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও নীতির সঙ্গে ভারত সরকারের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ভিত্তিগত সাদৃশ্য অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা করেছেন।

গ্রন্থটিকে ফলিত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটি দুরূহ পরীক্ষা হিসেবে যথেষ্ট আকর্ষণীয় বলা যায়।

কিন্তু তাঁর সিদ্ধান্তগুলি সম্পর্কে ঐকামত হওয়া অসম্ভব। কারণ, এই ধরণের পরীক্ষার সবচাইতে বা অসুবিধা, তা হল অবৈজ্ঞানিক সামান্যীকরণের সমস্যা। ফলে সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে তথ্য এবং উৎপত্তি ভ্রান্তির অবকাশ থেকেই যায়।

তাই বর্তমান গ্রন্থে লেনিনের যে চেহারা ও চরিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, তা একদিকে যেমন মার্কসবাদ-লেনিনবাদে বিশ্বাসী পাঠকদের মনে লেনিনের ভয়াবহ বিকৃতির আশঙ্কা ঘনীভূত করবে, তেমনি অপরদিকে যাঁরা গান্ধীজীর অহিংস মতবাদে বিশ্বাসী, তাঁরা গান্ধীজীর অহিংস-তত্ত্বের বিকৃত ব্যাখ্যায় ক্ষুব্ধ হবেন।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন (জীবনী)—হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। প্রকাশন বিভাগ। তথ্য ও বেতার মন্ত্রক। ভারত সরকার। পাতিয়ালা হাউস। নতুন দিল্লী—১। দাম ছ' টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

স্বাধীনতা সংগ্রামের মহান যোদ্ধা, উজ্জ্বল আদর্শবাদী রাজনীতিবিদ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের জন্মবার্ষিকী পালিত হোচ্ছে দেশব্যাপী। তাঁর মত বিচক্ষণ ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাজনীতিবিদ সতাই বিরল। তাঁর বিরাট সাহস ও অধ্যবসায়, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, অলাপ আলোচনার দক্ষতা ভারতীয় রাজনীতিকে করেছিল উচ্চ পর্যায়ে উন্নীত। মাত্র ছ' বছর সক্রিয় রাজনীতিতে জড়িত থাকলেও, ভারতীয় জনগণের মনে দেশবন্ধুর দৃঢ় প্রভাব, আজও বিস্ময়ের উদ্রেক করে। ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য তাঁর প্রয়াসের হেতু ছিল, এই পথেই স্বাধীনতা লাভ সম্ভব। চিত্তরঞ্জন একজন কবি ও সাহিত্যিক ছিলেন। ভারতীয় কৃষ্টি রক্ষা ও শ্রীবৃদ্ধি এবং পাশ্চাত্য প্রভাব থেকে মুক্তিই ছিল তাঁর সাহিত্য সাধনার লক্ষ্য। দেশবন্ধুর এই চরিত্রখানাই বর্ণনা করেছেন ডঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। ডঃ দাশগুপ্ত ছিলেন দেশবন্ধুর অন্যতম সহচর ও বন্ধু। এই সংক্ষিপ্ত জীবনকথায় প্রকাশ পেয়েছে লেখকের শ্রদ্ধা, ভক্তি ও বিশ্বাস। দেশবন্ধুর বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত ভাষণগুলি সংযোজিত হওয়ায় বইটির প্রয়োজনীয়তা বেড়েছে।

অমৃতের পথে (আলোচনা)—সত্যসাধক ব্রহ্মচারী মুরলীধর। পরিবেশক : দাশগুপ্ত এন্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড। ৫৪।৩ কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা—১২। দশ টাকা।

বইটির উদ্দেশ্য মহৎ। লেখকের ভাষায়: "ভব-কল্যাণ ও জগৎ-কল্যাণের মুক্ত মহাজীবনে সমাহিত—আদর্শ গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, সাম্যতন্ত্রের সমাজধর্মে অনুপ্রাণিত জাতীয় চরিত্রধর্মের উদ্বোধন এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য।" মনে হয়, দীর্ঘকাল ধরে লেখক এ বইটি লেখার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। এবং বিশ শতকের যুগসঙ্কটে নিজের চিন্তাভাবনাকে শাণিত করে মানবমুক্তির পথসন্ধান করেছেন। বিষয়ের সঙ্গে বিবরণীর যোগ হওয়ায় বইটি আরো আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। তাঁর মতে, ভারত ধর্ম বলতে বোঝে 'শাশ্বত ধর্ম'। এই ধর্মের বাণী ভারতের শাস্ত্র ও সাহিত্যের পাতায় পাতায় উচ্চারিত হয়েছে। গৃহে, সমাজে, রাষ্ট্রে ছিল তার অপরিমেয় প্রভাব। এটাই ছিল তার আন্তর্জাতিক নীতিও। কোনো রকমের ধর্মীয় মতবাদ এখানে বড় কথা নয়। প্রাচীন ইতিহাসের সাক্ষ্য গ্রহণ করে, রাজনীতি ও অর্থনীতির ঘটনাশ্রয়ী উদাহরণ সহযোগে, তিনি সেই চিরন্তন সত্যের মর্মোদ্ধার করেছেন। বইটি অনেকের কাছে ভালো লাগবে।

মানবলিপি (কাব্যগ্রন্থ)— পরেশ মণ্ডল। অবাক, ৪২ গড়পার রোড, কলকাতা-৯। দাম : দু' টাকা।

ষাটের কবিদের মধ্যে পরেশ মণ্ডল সম্ভবত সবচেয়ে সংবেতবাক্ ইঙ্গিতময় কবি। কবিতার শরীর নির্মাণে তিনি এমন সব শব্দ এবং পংক্তি ব্যবহার করেন, যার সঙ্গে দ্বিতীয় কারোর তুলনা চলে না। অনুভবের গোপন অন্তঃপুর থেকে মুখ বাড়িয়ে তিনি কথা বলেন। কোন কোনো কথাই শেষ নয়। একেকটি পংক্তির মধ্যে বহু না-বলা কথা থেকে যায়। বহু কবিতা ইঙ্গিতেই সমাপ্ত।

প্রথম কবিতার বই 'অন্তরে জলের শব্দে' পরেশ মণ্ডল এতটা সাংকেতিক ভাষায় কথা বলেন নি। 'প্রতিবিম্ব' থেকে তিনি পাল্টে গেছেন। অনেক সময় তিনি পাঠককে উপহার দেন অসম্পূর্ণ ছবি, অর্ধসমাপ্ত ইমেজ। পংক্তি সাজাবার বিশিষ্টতায় তিনি পাঠককে চমকে দেন।

শহর কলকাতা (কাব্যগ্রন্থ)—মৃণাল বসু চৌধুরী। অবাক, ৪২ গড়পার রোড, কলকাতা—৯। দাম : দু' টাকা।

মৃণাল বসু চৌধুরী নম্র সুরের কবি। লৌকিক ও অলৌকিকের আলো-ছায়ার বিষয়। জীবনের গভীরতর প্রবাহের ধ্বনি-স্পন্দন তিনি জানেন। আর জানেন বলেই, অপরিচয়ের জগৎকে তিনি আবিষ্কার করেন পরিচয়ের পরিধিতে। কখনো সরলতম বিশ্বাসে বলে ওঠেন: "এখানেই ছোট হবে নদী / জেগে উঠবে বালুচর রাজপাট সাজো ও মন্দির।"

কোনো রকম কঠিন শব্দের ব্যবহার নেই তাঁর কবিতায়। যেন নিজের সঙ্গে আলাপ করেন। এবং সেই আলাপের ভাষা তীক্ষ্ণতাবীজ ত. আত্মমগ্নতায় রহস্যময়। দুঃসাহসের সঙ্গে তিনি অস্বীকার করেছেন কবিতার প্রচলিত বিধিবিধানকে—হয়তো বা সময়ের আহ্বান এবং আমন্ত্রণকেও। তীব্রতর মানসিক অস্থিরতার মুহূর্তে তাঁর ভাষা কিছুটা শাণিত হয়ে ওঠে। বুঝতে পারেন: "দরোজা খুললেই অন্ধকারের শব্দ মিলিয়ে যায়।"

'শহর কলকাতায় কোনো কবিতায় যতিচিহ্নের ব্যবহার নেই। একেকটি কবিতায় কবির অনুভব যেন কয়েকটি শব্দ ও পংক্তিকে আশ্রয় করে প্রবহমান—সঙ্গীতের মতো অনিঃশেষ। মাঝে মাঝে তিনি এমন সব চিত্র উপহার দিয়েছেন, যা পাঠকের বিস্ময়কে বহুগুণ বর্ধিত করে।

অধিকাংশ কবিতাই সংকেত অন্তর্মুখী ও প্রতীকধর্মী।

বইয়ের প্রচ্ছদ এঁকেছেন স্বপনলাল ধর। চমৎকার রুচিসম্মত মুদ্রণ ও অঙ্গসজ্জায় আকর্ষণীয়।

সংকলন ও পত্র-পত্রিকা

বেয়ারা—সম্পাদক শুভেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়।। ১৯।৪, ঈশ্বর গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা-২৬।। এক টাকা।।

প্রেমেন্দ্র মিত্র ও লীলা মজুমদারের উৎসাহে পত্রিকাটি বের করে ক্ষুদে সম্পাদকেরা। প্রথম দুটো সংখ্যা বেরিয়েছিল ছোট আকারে। এবারের সাইজ বড়। ছবিসহ 'শহীদ মিনারের কথা' লিখেছেন কাজী খাঁ। অন্যান্য লেখকদের মধ্যে আছেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্নদাশঙ্কর রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, আশিস সান্যাল, সত্যজিৎ রায়, সৌমেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়, সতীকান্ত গুহ, মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরো অনেকে। দেখতে শুনতে ভালো। পড়তে মজা। কয়েকটা লেখা সচিত্র।

বইকুণ্ঠের খাতা

বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন ও পূর্ব পাকিস্তানের প্রবন্ধ সংগ্রহ

সীমান্তের বন্ধ দরজাটা এখনো খোলেনি, কিন্তু তার কড়াকড়ি হ্রাস পেয়েছে। প্রহরীর চোখ এড়িয়ে আসছে, ওপার থেকে দু একটা বই। এপারের খবরাখবরও মাঝে মাঝে ওপারে পৌঁছুচ্ছে। হয়তো, দুই বাংলার মধ্যে সহজ সম্পর্কের রাস্তা গড়ে উঠবে এভাবেই।

আমরা তার আভাস পেয়েছি। এবং সেই আভাসই অনুমানকে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করা যায় না। যদিও জানি, রাজনৈতিক প্রাচীর তুলে দুই রাষ্ট্রের মধ্যে সাময়িক বিচ্ছেদ ঘটানো যায়, অন্তরের যোগাযোগকে রুদ্ধ করা যায় না।

সদর বন্ধ দেখলে, মানুষ খিড়কি দুয়ারে ভিড় করে।

১৯৬৫-র পর দুই বাংলার মানুষের সঙ্গে চলছে তেমনি এক ঘুরপথের খেলা। দেশভাগের পরেও যে-সম্পর্কটা ছিল সহজ, ছিল সাংস্কৃতিক যোগাযোগের ব্যবস্থা—ভারত-পাকিস্তানের যুদ্ধ সেই সম্পর্কটাকে ঘোলাটে করে দিয়ে গেছে। দীর্ঘ ছয় বছরেও রাষ্ট্রীয় ব্যবধানের কোনো মৌলিক পরিবর্তন হলো না। দুই বাংলার মানুষ ভেতরে ভেতরে অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে তাই নিয়ে। ঢাকার পাঠক কলকাতার বই পড়তে চান; পশ্চিমবাংলার মানুষ চান পূর্ববাংলার কণ্ঠস্বর শুনতে।

বছর দেড়েক আগে, 'ইত্তেফাক'-এর স্টাফ রিপোর্টার এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতির বিবরণ দিতে গিয়ে লিখেছেন: ঢাকার বাজার আবার পুনর্মুদ্রিত ভারতীয় বইয়ে ছেয়ে গেছে। এর আগে, ভারতসহ যে-কোনো বিদেশী বইয়ের পুনর্মুদ্রণ বিশেষ অনুমতি ছাড়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, প্রতিদিনই অজ্ঞাত জায়গা থেকে ছাপা হয়ে ভারতীয় বইগুলি বাজারে বিক্রয়ের জন্য চলে আসছে। বর্তমানে ঢাকার ফুটপাথে, রেল স্টেশনে, ও লঞ্চ ঘাটে বইগুলি বিক্রী হয়। বিক্রীর কৌশলও অভিনব। প্লাস্টিকের ঝুড়িতে বই নিয়ে বিক্রেতারা ফেরি করে। যে-বইয়ের দাম স্বাভাবিক অবস্থায় এক টাকার বেশী হতে পারে না, সেসব বইয়ের দাম লেখা থাকে আড়াই কিংবা তিন টাকা। ক্রেতাদের কাছে ৩৩।৪০ পার্সেন্ট কমিশনে—কোনো কোনো ক্ষেত্রে অর্ধেক দামে বই বিক্রী করা হয়। ক্রেতারা মনে করেন, একে তো ভারতীয় বই, যা পাওয়াই যায় না, দ্বিতীয়ত অর্ধেক দাম—তাই তাঁরা এক সঙ্গে অনেকগুলি করে কিনে ফেলেন।'

এই সাংবাদিকের ধারণা, 'পুনর্মুদ্রকদের সঙ্ঘবদ্ধ দল আছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা মফস্বল শহরের প্রেসে বই ছাপিয়ে লাহোর, করাচী বা ঢাকার কোনো ছাপাখানার নাম দিয়ে বের করে। বইগুলির মধ্যে অজস্র ছাপার ভুল। মাঝে মাঝে লাইনের পর লাইন নেই। এভাবে ক্রেতারা জাল প্রকাশকের বই কিনে নিয়মিত ঠকে আসছেন।'

তার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে স্টাফ রিপোর্টার লিখেছেন: '১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসের আগে পর্যন্ত ভারতীয় বইয়ের পুনর্মুদ্রণ পূর্ববাংলায় নিষিদ্ধ ছিল না। তারা যে-বই এখনো গোপনে বের করছে, তাতেও সেজন্যেই ১৯৬৪।৬৫ সালকে প্রকাশের তারিখ হিসেবে উল্লেখ করছে। অধিকাংশ পুনর্মুদ্রিত পুস্তকে যে-ঠিকানা থাকে, তা অসম্পূর্ণ। এমন কি ১৯৬৮ সালে পশ্চিমবাংলায় প্রকাশিত বইগুলি পর্যন্ত ১৯৬৫ সালের তারিখ দিয়ে পূর্ববাংলায় বেরিয়ে যাচ্ছে।'

কলকাতার প্রকাশকরা অবশ্য এখনো এই দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেননি। কিন্তু এই অবস্থা দীর্ঘকাল চলতে থাকলে, কেউ যে সেই অসাধু উপায় অবলম্বন করবেন না, তাই-বা কে বলতে পারে? এখানকার কবি সাহিত্যিকরা নানাভাবে লেখা সংগ্রহ করে গল্প-কবিতার দু একটি সঙ্কলন প্রকাশ করেছেন মাত্র।

পূর্ব পাকিস্তানের প্রবন্ধ সংগ্রহ

সম্প্রতি মৈত্রেয়ী দেবীর সম্পাদনায় বেরিয়েছে 'পূর্ব পাকিস্তানের প্রবন্ধ সংগ্রহ'। উদ্দেশ্য একটাই, ওপারের মানুষকে জানা, অন্তরের সত্য উপলব্ধি করা। তিনি লক্ষ্য করেছেন, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন পূর্ববাংলায় মানুষকে নতুনতর জীবনচেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছে। কিন্তু তার যথার্থ রূপটি আমরা বুঝে উঠতে পারিনি তখন।

সেদিনের কথা বলতে গিয়ে মৈত্রেয়ী দেবী লিখেছেন: 'সাম্প্রদায়িক বুদ্ধিকে পরিষ্কার করার কাজে লেগে সহসা পূর্ব পাকিস্তানের পত্র-পত্রিকা হাতে পেয়ে সেদিন অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। ১৯৫২ সালে ২১শে ফেব্রুয়ারীর ভাষা আন্দোলনের সংবাদ সামান্য সামান্য এ দেশের পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হলেও তার যথার্থ রূপটি এবং তার ভিতরের অর্থটি আমার কাছে এবং আমার মত বহু ভারতীয় বাঙালীর কাছেই অজ্ঞাত ছিল।'

এজন্যে তিনি অভিযোগ করে লিখেছেন: 'যাঁরা সংবাদ সরবরাহ ও সংগ্রহ করেন, তাঁরা জানতেন না—একথা বিশ্বাস হয় না, পূর্ববঙ্গের অগ্রসর সমাজের চিন্তার বিবর্তন অবশ্যই ওয়াকিবহাল মহলের জানা ছিল। কিন্তু যে কারণেই হোক, সেটা এদেশের জনসাধারণের কাছে প্রকাশ হয়নি। ফলে, এদেশের অধিকাংশ লোকের মনে বিশ বছর আগেকার পাকিস্তান আন্দোলনের ছবিটিই স্থির ছিল, এবং পাকিস্তান সরকার ও তার জনগণের মধ্যে যে পার্থক্য ক্রমেই প্রসারিত হয়ে দুই পক্ষের দৃষ্টিভঙ্গি বিপরীতমুখী হচ্ছে, সে সত্য একেবারেই আবৃত ছিল।...অন্তরালের মধ্যে...ধীরে ধীরে সেতুবন্ধের ভিত্তি গড়ে উঠল।'

ফলে, এই সঙ্কলনের প্রবন্ধগুলিও ঐ একই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সংগৃহীত। পূর্ববাংলার মানুষ যে আজ উপলব্ধি করছেন—হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে প্রত্যেক বাঙালীই মূলত একই মাটির সন্তান, অন্তর্নিহিত ঐক্যে বঙ্গ সংস্কৃতির ধারক ও বাহক— তাই যেন মনে পড়ে বিভিন্ন লেখকের লেখা পড়ে। হয়তো, সম্পাদিকা ঐতিহাসিক পারম্পর্য রক্ষা করে প্রবন্ধগুলি নির্বাচনের সুযোগ পাননি।

ভূমিকায় শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায় মন্তব্য করেছেন: 'পূর্ব পাকিস্তানের বুদ্ধিজীবী মহল এখনো দ্বিধাবিভক্ত।

CENTRAL LIBRARY

আমরা এ গ্রন্থে একভাগের বক্তব্যই শুনতে পাচ্ছি। অবিমিশ্র ইসলামী গোষ্ঠীর কণ্ঠস্বর অনুপস্থিত বলে কিছু কম সত্য নয়। পূর্ব পাকিস্তানের সংকট এখনো কাটেনি। দাঙ্গা বাধানো হচ্ছে না বলে কেউ যেন সিদ্ধান্ত না করেন যে রাষ্ট্র কিম্বা দেশ কিংবা জনগণ সেকুলার হয়ে গেছে। বদরুদ্দীন উমরের বই ইতিমধ্যেই নিষিদ্ধ করা হয়েছে।'

পূর্ব ইতিহাসের মজীর টেনে তিনি মূল্যবান আলোচনা করেছেন। উদ্ধৃতি দীর্ঘতর হলেও তা উল্লেখ করা প্রয়োজন। শ্রীযুক্ত রায় লিখেছেন।

চার হাজার বছরের পুরনো সভ্যতা ইরানের। কেন যে ইসলামের খাতিরে কেবল সপ্তম শতাব্দীর পর থেকে তার সংস্কৃতির রেখা টানবে, তার পূর্ববর্তী আড়াই হাজার বছরকে বাতিল করবে, এর কোনো ন্যায়সঙ্গত কারণ নেই। তেমনি পাঁচ হাজার বছরের প্রাচীন সভ্যতা মিশরের। সেই-বা তার সংস্কৃতির সাড়ে তিন হাজার বছরকে বিসর্জন দিয়ে তেরশো বছরকেই সম্বল করবে কেন? সীরিয়া সম্বন্ধেও সেই কথা বলা চলে।'

'পাকিস্তানের মুসলমানদের মধ্যে এই নিয়ে এখন দুমত। ইসলামের আগমনের পূর্বে থেকে যা আছে, তাকে যাঁরা আমল দিতে চান না, তাঁরা একদিকে। তেমনি অন্যদিকে যাঁরা সমগ্র ইতিহাসকে তথা ভূগোলকে যথাযোগ্য গুরুত্ব দিয়ে ইসলামের পুনর্মূল্যায়ন করতে চান। ইউরোপেও এর নজির মেলে। পাঁচশো বছর আগে প্রাক-খৃষ্টান সম্বন্ধেও অনুরূপ দ্বিমত দেখা যায়। একদল খৃষ্টের পূর্ববর্তী গ্রীক ও রোমক উত্তরাধিকারকে আপনার বলে স্বীকার করবে না। আরেক দল তাকেও মহামূল্য মনে করবেন।...এতদিনে এই দ্বিতীয় দলটিই জিতেছেন। কিন্তু একদিনে জেতেননি। খৃষ্টশিষ্যরা বাধা দিয়েছেন।'

পাকিস্তান সৃষ্টির অব্যবহিত আগে-পরে পূর্ববাংলার মুসলমানদের মনে এমনি একটা সংকট দেখা দিয়েছিল হয়তো। পরে, প্রাথমিক উত্তেজনার পর্ব শেষ হলে বুদ্ধিজীবী মহলে, নানা প্রশ্ন দেখা দেয়। এখন: 'ধর্মভিত্তিক সংস্কৃতির মোহ যদিও কারো কারো মন জুড়ে রয়েছে, তবু তার সেই একচ্ছত্র দাপট আর নেই। দেশভিত্তিক লোকভিত্তিক সংস্কৃতির দিকেও সাধারণের দৃষ্টি পড়ছে।' অন্নদাশঙ্কর রায় লিখেছেন:

'পূর্ব পাকিস্তানের সবচেয়ে জনপ্রিয় পালার নাম 'রূপবান'। রেকর্ডে ও ফিল্মে ওর সমকক্ষ নেই। অথচ ওর কথাবস্তু আরব পারস্য থেকে আসেনি, আসেনি উর্দু থেকে। ওটা মুঘল দরবারেরও কিসসা নয়। আমাদেরই চিরপরিচিত মালঞ্চমালা।' অনেকদিন 'ঠাকুমার ঝুলি'র সব কটা কাহিনীই রূপান্তরিত হয়ে গেছে।...সবই পূর্ব বাংলার মাটির ফসল।'

'পূর্ব পাকিস্তানে এই যে ব্যাপারটা চলছে, এটাও একপ্রকার রেনেসাঁস। এর সেকেই আসবে একপ্রকার রেফরমেশান: ইসলামের তথা ইসলামী শাস্ত্রাদির পুনর্মূল্যায়ন। ওই স্টেজটা এখনো আসেনি, তবে এর ক্ষেত্র প্রস্তুত হচ্ছে কোরান শরিফের তর্জমা দিয়ে। যেমন জার্মানীতে হয়েছিল বাইবেলের অনুবাদ দিয়ে। পবিত্র ভাষা আরবী সম্বন্ধেও মোহভঙ্গ হয়েছে। বাংলার উপর টান এখন তার চেয়েও বেশী। লোকে বাংলার জন্য জান দিতে পেরেছে ও পারে। আরবীর জন্য একটি মানুষও মৃত্যু বরণ করবে না।'

ধর্মনিরপেক্ষতা ও বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন

মাস কয়েক আগে, কাজী আবদুল ওদুদ সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায় আমাকে বলেছিলেন, বাঙালী হিন্দুদের মধ্যে বুদ্ধির মুক্তি সম্পর্কে চেতনা এসেছে অনেক আগে, কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে আসেনি। ওঁর সম্পর্কে লিখুন। বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে প্রথম বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের সূত্রপাত যাঁরা করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ওদুদ সাহেব অন্যতম।

আমি তাঁর সঙ্গে দ্বিতীয়বার দেখা করার সুযোগ পাইনি। অল্প কয়েকদিন পরেই ওদুদ সাহেব মারা যান। এ সংকলনের প্রবন্ধগুলি পড়তে পড়তে কেবল তাঁর কথাই মনে পড়ছে। 'বাঙালী সংস্কৃতির সঙ্কট প্রসঙ্গে বদরুদ্দীন উমর লিখেছেন:

'বাঙালীর এবং মুসলমানের মধ্যে বিরোধের কল্পনা সম্পূর্ণভাবে সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্ট। ঊনিশ ও বিশ শতকে সমগ্র ভারতবর্ষে, বিশেষত বাংলাদেশে, সম্প্রদায়গত বিরোধ যত তিক্ত এবং তীব্র হলো, মুসলমানরা ততই সরে আসার চেষ্টা করলো বাংলার সংস্কৃতি থেকে। তাদের কাছে বাংলার সংস্কৃতি মনে হলো বিধর্মী, কাজেই বিজাতীয়। বাংলাদেশের হিন্দুরা যেহেতু নিঃসন্দেহে বাঙালী এবং মুসলমানেরা যেহেতু হিন্দুর থেকে পৃথক জাতি, সেহেতু তারা বাঙালী হিসেবে নিজেদের পরিচয় দিতে পারে না। সে পরিচয় দিতে সক্ষম হলে বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলমান বিরোধ কখনই তীব্র আকার ধারণ করতো না।...কিন্তু সেটা না হয়ে সাম্প্রদায়িকতার প্রভাবে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ গুরুতর আকার ধারণ করলো এবং তার ফলে মুসলমানেরা বাঙালী বলে নিজেদের পরিচয় দিতে দ্বিধা এবং সঙ্কোচই নয়, অনেক ক্ষেত্রে ঘৃণাও বোধ করলো।'

বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বদরুদ্দীন উমর লিখেছেন: ঊনিশ শতকে হিন্দু মধ্যবিত্তের সমাজে দেশজ এবং পাশ্চাত্য সংস্কৃতির যোগাযোগ স্থাপনের ফলে সৃষ্টি হয় অনেক সাংস্কৃতিক আন্দোলনের, যেগুলির দ্বারা বাংলার সংস্কৃতি হয়ে ওঠে অনেক সমৃদ্ধ এবং বৈচিত্র্যময়। মুসলমানদের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য প্রভাব কিন্তু তাদের সাংস্কৃতিক চেতনার ক্ষেত্রে তেমন কার্যকরী অথবা ফলপ্রসূ হলো না। এর প্রধান কারণ, একদিকে তাদের ইংরেজ বিদ্বেষ, এবং অন্যদের প্রতি বিরূপতা। মুসলমান নবাব বাদশা ও আমীর ওমরাহদের পতনের পর অভিজাত এবং উঠতি বাঙালী মুসলমান সমাজের মধ্যে এ সময় অস্থিরতার লক্ষণ দেখা দেয়। এর ফলে তারা হয়ে ওঠে একদিকে ইংরেজ এবং অন্যদিকে হিন্দু বিদ্বেষী। ইংরেজ বিদ্বেষের ফলে তারা পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষার প্রতি অনেক ক্ষেত্রে হয় বিরূপ মনোভাবাপন্ন। আবার হিন্দু বিদ্বেষের ফলে তারা ভারতীয় সংস্কৃতি এবং বাংলার সংস্কৃতি থেকেও নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করে। পাশ্চাত্য এবং বাঙালী সংস্কৃতিকে প্রায় অস্বীকার করে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা গঠন করতে উদ্যত হয় তাদের স্বতন্ত্র ধর্মীয় এবং সাম্প্রদায়িক সংস্কৃতি। এ প্রচেষ্টা যে কৃত্রিম এবং অস্বাভাবিক, সেটা তার ব্যর্থতার দ্বারাই অনেকাংশে প্রমাণিত হয়।'

অবশেষে তিনি একটি কঠিন প্রশ্ন উত্থাপন করে এই সঙ্কটের চরিত্র বিশ্লেষণ করেছেন, 'আমরা বাঙালী না মুসলমান?' তাঁর মতে অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক কারণে হিন্দুদের থেকে নিজেদের পৃথক করে দেখার মধ্যেই এ প্রশ্নের উদ্ভব এবং সাম্প্রদায়িক আবহাওয়ার মধ্যেই এ চিন্তার বিকাশ।

বিভাগোত্তর কালে বাঙালী মুসলমানের জীবনচেতনায় এই পরিবর্তন যে আসবে বা আসা-সম্ভব, তা আমার কাছে ছিল একদা অ-ভাবিত। যেন চূড়ান্ত এক পরিবর্তনের সন্ধিক্ষণে এখন দাঁড়িয়ে আছেন পূর্ববাংলার বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়। এই জাগরণের মূলে কোনো ধর্ম-অধর্ম নেই, পূর্বার্জিত কোনো সংস্কারবোধ নেই, আছে জীবনকে পুনর্মূল্যায়নের সুগভীর আকাঙ্ক্ষা। সেজন্যই আবু সয়ীদ চৌধুরী রবীন্দ্র প্রসঙ্গে লিখতে পারেন: 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতীয় মুসলমানদের সম্বন্ধে যে দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন, তেমনটি কোন বাঙালী মুসলমান দিতে পারেননি। এমন কি স্বয়ং মুহম্মদ আলী জিন্নাহও নন, অন্তত সে

সময় তো নয়ই। যে-পরিমাণে কাজী নজরুল ইসলাম, যিনি এখনো ভারতীয় নাগরিক, যিনি ভারতীয় মুসলমানের রাজনৈতিক আন্দোলনে মুসলমানদের স্বার্থের ক্ষেত্রে বিস্ময়করভাবে উদাসীন, তাঁকে নিয়ে আমাদের মমত্ববোধের কারণ বোধ করি তিনি মুসলমান। রবীন্দ্র বর্জনে উৎসাহী সাহিত্য ও সমাজসেবক এই বিচারে তেমন আগ্রহী নন। নজরুলের প্রতি অসম্মানজ্ঞাপন বা ভুল তথ্য পরিবেশনের দায়িত্ব না নিয়েও আমরা বলব, রবীন্দ্রনাথের প্রতি বোধ করি এতদিন সুবিচার করিনি। বিশ বছরের জাতীয় শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও যদি আমাদের মনোভাবের বিন্দুমাত্র পরিবর্তন না হয়—সে দোষ 'সাম্প্রদায়িক', রবীন্দ্রনাথের নয়।'

অর্থাৎ একটি সার্বিক মূল্যবোধের পরিবর্তন দেখা দিয়েছে পূর্ববাংলার বাঙালী মুসলমানের জীবনে, চিন্তায় ও দৃষ্টিভঙ্গিতে। না হলে, মূর্তিপূজা বিরোধী মুসলমান লেখকের কলম দিয়ে বেরুতো না সুন্দরবনের প্রাচীন মন্দিরের ওপর আলোচনা। এই সঙ্কলনে গৃহীত হয়েছে 'প্রাচীন বরেন্দ্রীর মা ও শিশু মূর্তি'র ওপরে লেখা মুখলেসুর রহমানের একটি প্রবন্ধ।

আবুল ফজল ঘোষণা করেছেন: 'রক্ষণশীলতার আয়ু কোনো সময়ই দীর্ঘ নয়।... বেঁচে থাকতে হলে সংস্কৃতিকে জীবন্ত হতে হবে, হতে হবে লিভিং। দৈনন্দিন আচার-আচরণে আর বিশ্বাসে তা যদি বাস্তবায়িত না হয়, তেমন সংস্কৃতির মৃত্যু কিছুতেই ঠেকানো যাবে না।'

অন্যান্য রচনা ও সঙ্কলনের সার্থকতা

এই সঙ্কলনে ছাপা হয়েছে মোট ১৩টি প্রবন্ধ। প্রতিটিই বিভিন্ন দিক থেকে মূল্যবান। কিন্তু আলোচনার সুযোগ কম বলে আমি এখানে সব কটি প্রবন্ধেরই নাম উল্লেখ করছি মাত্র। বিষয়ের বৈচিত্র্যে পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করবে বলে আমার মনে হয়।

১। আমাদের বাংলা উচ্চারণ: মুহম্মদ আবদুল হাই।

২। বাঙালী সংস্কৃতির সঙ্কট: বদরুদ্দীন উমর।

৩। সংস্কৃতি, আমাদের উত্তরাধিকার: আবুল ফজল।

৪। রবীন্দ্রনাথ ও মুসলমান সমাজ: আসাদ চৌধুরী।

৫। পঁচিশে বৈশাখ: ডক্টর আহমদ শরীফ।

৬। প্রাচীন বরেন্দ্রীর মা ও শিশুমূর্তি: মুখলেসুর রহমান।

৭। ইয়েটস ও রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গ: সারওয়ার মুর্শিদ।

৮। ইংরেজীর ভবিষ্যৎ: জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী।

৯। সাহিত্যে ব্যক্তিত্ব: কাজী মোতাহার হোসেন।

১০। উর্দু ইতিহাস-সাহিত্য: আব্দু মহামেদ হবিবুল্লাহ।

১১। প্রতিভাবানের প্রতীকার: আবুল কাসেম ফজলুল হক।

১২। লালন শাহের জীবনকথা: এস এম লুৎফর রহমান।

১৩। সাম্প্রদায়িকতা ও সংস্কৃতি: ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ।

পরিশিষ্টে প্রদত্ত লেখক-পরিচিতির পৃষ্ঠাগুলি পর্যন্ত মূল্যবান।

মৈত্রেয়ী দেবী এ সংকলনের অসম্পূর্ণতা সম্পর্কে অচেতন নন। ভূমিকায় তিনি উল্লেখ করেছেন: 'বর্তমান সঙ্কলনে আমরা যথেষ্ট বাছাই করার সুযোগ পাইনি। হাতের কাছে যা এসে পড়েছে, তার থেকেই নির্বাচন করতে হয়েছে।' আমি কিন্তু সাম্প্রতিক পূর্ববাংলার গল্প, কবিতা ও উপন্যাসের ওপর কিছু আলোচনা আশা করেছিলাম। দুর্ভাগ্যক্রমে, তেমন একটি প্রবন্ধও সম্পাদিকা সংগ্রহ করে উঠতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তিনটি প্রবন্ধ না ছাপলেও চলতো।

পড়ার পর সমস্ত ক্ষোভ নিঃশেষিত। পূর্ববাংলার বুদ্ধিজীবী মানুষের যে কণ্ঠস্বর শুনেতে পেয়েছি, তা অন্য দিগন্তের উন্মোচন ঘটিয়ে চলেছে এখন। আর এই প্রবন্ধগুলি যেন সেই জাগরণের প্রথম ঘোষণাপত্র। এপারের পাঠক গ্রন্থটিকে সমকালীন পূর্ববাংলার 'বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন'-এর একটি দলিল-সঙ্কলন বলে গ্রহণ করতে পারেন।

—গ্রন্থদর্শী

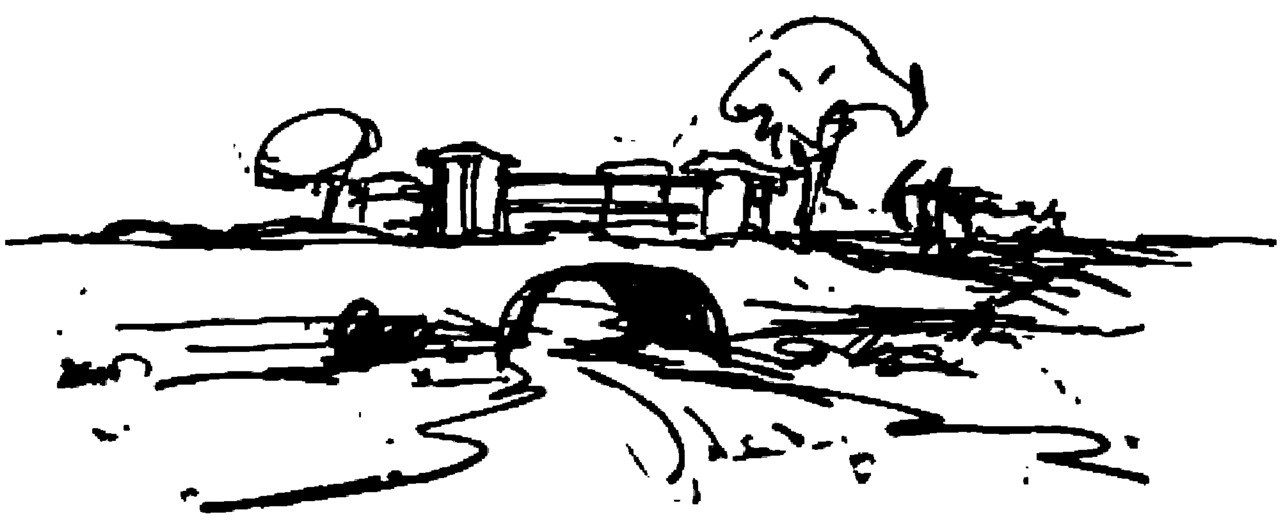

নেপালী পূজাপার্বণ

দার্জিলিং, কার্শিয়াং, কালিম্পঙ পার্বত্য অঞ্চল। এই অঞ্চলের অধিবাসীদের অধিকাংশই নেপালী ভাষাভাষী। দার্জিলিং জেলার পার্বত্য অঞ্চলে মিশ্র সংস্কৃতির ধারা প্রবাহিত। তিব্বতী, ভুটিয়া, সিকিমী সংস্কৃতির সঙ্গে রয়েছে ভারতের নানা প্রান্তের সংস্কৃতি; বিশেষ করে বঙ্গ সংস্কৃতির সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। দার্জিলিং-এর নেপালী ভাষাভাষীদের পূজোপার্বণের ওপর মূল নেপালের পূজা-পার্বণের প্রভাব ছাড়াও রয়েছে কিছু বৌদ্ধ প্রভাব ও বাঙালী পূজোপার্বণ উৎসবের প্রভাব।

বাঙলাদেশে বারো মাসে তেরো পার্বণ প্রবাদটি সুপরিচিত। নেপালীদের ক্ষেত্রে বলতে হয় বারো মাসে চোদ্দ পার্বণ। আরো একধাপ বেশি। নেপালীরা উৎসব-প্রিয় জাতি। যে কোন উপলক্ষে আনন্দ উৎসবে মেতে উঠতে পারলেই হল। এখনো এরা ধর্মপ্রাণ ঈশ্বরবিশ্বাসী, প্রকৃতির অনেক কাছের, আপনজন। পূজোপার্বণ, ব্রতকথা, তুকতাক, মন্ত্রপাঠ, প্রায় প্রতিটি নেপালী পরিবারের অন্তরঙ্গ চিত্র। ধর্মে অবিচল নিষ্ঠা, ঈশ্বরভক্তি আছে বলেই শত কর্ম, দুঃখ, দুর্দশার মধ্যেও পূজো-পার্বণকে এরা জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী-ভাবে জড়িয়ে নিয়েছে। ঈশ্বরভক্তির সঙ্গে সঙ্গে সামাজিকতা, মানবপ্রেম দুটি উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হচ্ছে।

বৈশাখ সংক্রান্তি বা মেষ সংক্রান্তি একটি উল্লেখযোগ্য উৎসব। অতি প্রত্যূষে ঘুম থেকে উঠে স্নান সেরে পরিষ্কার বেশভূষা পরে বিভিন্ন দেবদেবী দর্শন, পূজোপাঠ ইত্যাদি করা হয়। শ্রীসত্য-নারায়ণের পূজো করা হয় ঐদিন। অনেকে উপবাস করেন। বৈশাখ মাসের শুক্লা তৃতীয়ার দিন অক্ষয় তৃতীয়া উৎসব। ওদের কাছে এটি অত্যন্ত পবিত্র দিন। এইদিনে জপ, হোম, যাগযজ্ঞ, পূজোপাঠ, দান ইত্যাদি যা কিছু করা হয় তার ফল অক্ষয়। অনেকে এইদিনটিকে 'যুগারম্ভ' বলে থাকেন। কথিত আছে, এই অক্ষয় তৃতীয়ার দিন থেকে সত্য যুগের আরম্ভ হয়েছিল। ভবিষ্যপুরাণে উল্লেখ আছে, অক্ষয় তৃতীয়ার দিন নারায়ণ পূজো করে জলপূর্ণ কলস দান করলে অক্ষয় পুণ্যলাভ হয় এবং সূর্যলোকে পৌঁছান যায়।

বৈশাখ মাসের অমাবস্যায় পালিত হয় 'মাতৃ-আর্তীস' বা মাতৃদিবস। বৌদ্ধগ্রন্থ 'স্বয়ম্ভোর বচনম্'এ এই উৎসবের উল্লেখ আছে। এইদিনে ছেলেমেয়েরা মাতৃপূজো করে, মায়ের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শন করে।

সিঠী চাড় জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষের ষষ্ঠীর দিন অনুষ্ঠিত হয়। কথিত আছে এইদিনই মহাদেবের জ্যেষ্ঠপুত্র কার্তিকের জন্ম হয়।

প্রত্যেক মাসের সংক্রান্তির দিনটিকে পুণ্যদিন হিসেবে দেখা হয় এবং ঐদিন স্নান, দান, দেবমূর্তি দর্শন, দেবালয় পরিভ্রমণ করার রীতি আছে। শ্রাবণ-সংক্রান্তি বা শাউকে সংক্রান্তি বা কর্কট সংক্রান্তি আর একটি উল্লেখযোগ্য পার্বণ।

শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণচতুর্দশীর দিন ঘণ্টাকর্ণ পূজো করা হয়। এরা বলে 'গ'ঠামুগল'।

শ্রাবণ মাসের শুক্লপঞ্চমী তিথিতে 'নাগপঞ্চমী' পালিত হয়। এইদিনে প্রতি গৃহের দরজার ওপর নাগের ছবি টাঙান হয়। গোবর দিয়ে এই ছবি টাঙান হয়।

হরেন ঘোষ

এরপর দুপুরে, দুধ ও দূর্বা দিয়ে পূজো করা হয়। এইভাবে পূজো করলে এক বছর পর্যন্ত সর্পভয় থাকে না।

ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ থেকে অষ্টমী পর্যন্ত আটদিনব্যাপী চলে গাই-যাত্রা। কোন বাড়ির মৃত ব্যক্তিকে স্মরণ করে গাভী নিয়ে বা তার প্রতিকৃতি নিয়ে বেরোয় মিছিল।

পঞ্চদান উৎসবে বৌদ্ধ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ভাদ্র মাসের কৃষ্ণ-ত্রয়োদশীতে এই উৎসব উদযাপিত হয়। বুদ্ধদেবের প্রতি সকলেই শ্রদ্ধা নিবেদন করে এইদিন।

ভাদ্র মাসের কৃষ্ণ-অমাবস্যায় ব্রাহ্মণরা পবিত্র কুশ পূজো করেন এবং এই কুশ বাড়ির দরজার ওপর রেখে দেন। যে কোন পবিত্র কর্মে কুশের প্রয়োজন হয়, তখন এই কুশ নেওয়া হয়। এই উৎসবকে 'কুশে আর্তীস' বা 'গোকর্ণ আর্তীস' বলা হয়।

ব্রতার্ক নামক ধর্মগ্রন্থে হরিতালিকা বা তীজ উৎসবের উল্লেখ আছে। পার্বতীর বিবাহের জন্যে পিতা হিমালয় বিষ্ণুকে পাত্র মনোনীত করেন কিন্তু পার্বতী পতিরূপে পেতে চান মহাদেবকে। মহাদেবকে পার্বতীর পতিরূপে কামনা করাই হল তীজ উৎসবের উদ্দেশ্য।

ভাদ্র মাসের শুক্লা চতুর্থীর দিন গণেশ পূজো করা হয়। এই পূজা গণেশ-চতুর্থী বা চথা নামে পরিচিত। স্কন্দ-পুরাণ 'পীযূষধারায়' গণেশ পূজার রীতি-নীতি ব্যাখ্যা করা আছে। অতি প্রত্যূষে ঘুম থেকে উঠে স্নান করে মিষ্টান্ন ও দূর্বা ইত্যাদি উপাচার সহযোগে এই পূজো করা হয়। এইদিন সন্ধ্যায় যদি গায়ে চাঁদের কিরণ লাগে তাহলে সারা বছর চোর অপবাদ সইতে হয়। সেজন্যে সন্ধ্যার আগে থেকেই সকলে দরজা বন্ধ করে রাখে। আবার এই রাত্রে যদি চোরেরা অসফল হয় তাহলে সারা বছর অসফল হয়। বিশেষ করে বাগানের শশা কুমড়ো ইত্যাদি চুরি করা হয় এই রাত্রে।

ঋষিপঞ্চমী মহিলাদের উল্লেখযোগ্য ব্রত। ঋষিদের মহাদেবকে পূজো করেন মহিলারা। তাঁরা এই দিন ব্রাহ্মণভোজন করান।

এরপর আসে 'দশৈ'। সারা বছর সকলে আকুল আগ্রহে 'দশৈ'-এর প্রতীক্ষা করে। প্রায় প্রত্যেকেই সারারাত কিছু না কিছু সঞ্চয় করে রাখে এই সময় মনের ফূর্তিতে দরাজ হাতে খরচ করবে বলে। দূরের মানুষ ঘরে ফেরে। সবাই কাজ ছেড়ে ছুটির আনন্দে মেতে উঠতে চায়। 'দশৈ'-মহোৎসব। আশ্বিন মাসের প্রতিপদ থেকে দশমী পর্যন্ত এই দশদিনব্যাপী এই উৎসব উদযাপিত হয় বলে এর নাম 'দশৈ'। দশমীর দিন অযোধ্যার রাজা দশরথের জ্যেষ্ঠপুত্র রামচন্দ্র স্বীয় পত্নী অপহরণকারী লঙ্কাপতি রাবণকে জয় করেন এবং অসুর-শক্তি বিনাশ করেন। এইদিন বিজয়া-উৎসব। এই দিনটিকে 'টীকা-উৎসব'ও বলা হয়। বাবা, মা ও অন্যান্য গুরুজন দই ও চালের ফোঁটা দেন ছোটদের কপাল জুড়ে। এই বিজয়-তিলক পরে মনের আনন্দে সবাই ঘুরে বেড়ায়। এইদিন শত্রু-মিত্রের ভেদ থাকে না, সবাই আপন হয়ে যায়। বর্তমানে বাঙালী প্রভাবে দুর্গা পূজাও অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

এরপর আসে যমপঞ্চক বা তিহার উৎসব। তিহারের সময় যমরাজা পাঁচদিন নিজের সব কাজকর্ম বন্ধ রেখে নিজের ছোট বোন যমুনার বাড়িতে অবসরযাপন করেন। সকলে আগে থেকে বাড়িঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রাখে, রঙ লাগায়, গাঁদা ফুলের মালা, পাতাবাহার দিয়ে ঘর সাজায়। দরজায় কলাগাছ বসায়। এরপর প্রদীপ জেলে দেয় অজস্র।

তিহার উৎসবকে কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। প্রথমে আশ্বিন কৃষ্ণ দ্বাদশীর দিন গণেশ পূজো, ত্রয়োদশীর দিন কাক পূজো, চতুর্দশীর দিন কুকুর পূজো ও স্বাতীনক্ষত্র সংযুক্ত অমাবস্যার দিন সকালে গাভী পূজো করা হয়। এই রাত্রে হয় লক্ষ্মীপূজো। তারপর কার্তিক মাসের শুক্ল-প্রতিপদের দিন সকালে গোবর্ধন বা বলী পূজো করা হয়। দ্বিতীয়ার দিন,

তিনি ছোট ভাইকে এবং ছোট বোন দাদার কপালে ফোঁটা দেয়। এরপর পালন হয় তিহার উৎসব। এরপর আসে ধান্য পূর্ণিমা। নবান্ন উৎসবের সঙ্গে এই অনুষ্ঠানের মিল আছে। তারপর মকর-সংক্রান্তি। এইদিন তিলের নাড়ু ও ঘৃত-জাত সুখাদ্য প্রসাদ হিসেবে নৈবেদ্য দেওয়া হয়। শ্রীপঞ্চমী বা বসন্ত পঞ্চমীতে দেবী সরস্বতীর আরাধনা করা হয়। শিবরাত্রি একটি পবিত্র পুণ্য পর্ব। নেপালীরা মহাদেবকে নানা নামে আরাধনা করে থাকে। শিব, রুদ্র, মহেশ ছাড়া এদের কাছে জনপ্রিয় নাম পশুপতিনাথ।

ফাল্গুন মাসের শুক্লপক্ষের অষ্টমী থেকে পূর্ণিমা পর্যন্ত ফাল্গুনে মহোৎসব বা হোলি-উৎসব পালিত হয়। এরপর আসে ঘোড়েযাত্রা ও পিশাচ চতুর্দশী। বছরের শেষ উৎসব চৈত্র দশৈ ও রামনবমী।

বুদ্ধ পূর্ণিমায় অনুষ্ঠিত লাখে নাচ বা মুখোশ নৃত্য ইদানীং খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। বৈদিক দেবদেবীর পাশাপাশি লৌকিক দেবদেবীর প্রতিও শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শন করেন নেপালীরা। সারা বছরেই চলে নানা পূজা-পার্বণ উৎসব।

পূজা-পার্বণ ও ব্রত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দৈনন্দিন গতানুগতিক জীবন থেকে মুক্তি পেতে চায় সকলে, হতে চায় কলুষ-মুক্ত। উত্তরবঙ্গের পার্বত্য অঞ্চলের নেপালীরাও সারা বছর নানা পূজা-পার্বণ, ব্রত-অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করে থাকেন।

একই ধোপে ৩ ভাবে কাজ ক'রে...

ডেট বেশী সাদা করে
—অন্য যে কোন পাউডারের তুলনায়

কেন এবং কিভাবে তা করে দেখুন
১ ডেট-এ রয়েছে বিশেষ সক্রিয় পদার্থ যা কাপড়ের ভেতরের কঠিন ধুলোময়লা সহজেই দূর করে—কাপড় চমৎকার পরিষ্কার হয়।
২ ডেট-কাপড়ের ময়লা বার ক'রে আবার তা কাপড়ে বসতে দেয়না, কাপড় বেশী পরিষ্কার হয়, বেশী পরিষ্কার থাকে।
৩ ডেট—কাপড়ে বাড়তি সাদা যোগায়—কাপড় আগের চেয়ে অনেক বেশী সাদা ও উজ্জ্বল হয় (এতে নীল বা সাদা বাড়াবার অন্য কিছুই মেশাতে হয়না)

আজই কিনুন—ডেট

স্বস্তিক অয়েল মিলস, বোম্বাই
SWADS MPMA 39A/80 BEN

নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

(৩৪)

গাছ পাতার ফাঁকে সূর্যের আলো—ছায়া ছায়া ভাব, হেমন্তের শীত। সোনা চিঠি হাতে অর্জুন গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছে। শীত এসে যাচ্ছে বলে সকাল সকাল দিন শেষ হয়ে যাচ্ছে। চিঠিটা অমলা লিখেছে। নতুবা কে তাকে চিঠি দেবে! অমলার কথা মনে হলেই সে নীল রঙের আবছা আলো, পুরানো পাঁচিলের গন্ধ টের পায়। সেই ভাঙা কুঠির অন্ধকার এবং অমলার মুখ, চোখ, শরীরের সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চোখের উপর ভেসে ওঠে। তার ভিতরে কেমন একটা অনুভূতি হয়—মনে হয় জ্বর আসছে কম্প দিয়ে। শীত করছে। সে, ভিতরে, ভিতরে মায়ের মুখ মনে ভাবলে শক্ত হয়ে যায়। সে একটা পাপ কাজ করে এসেছে। মা বুঝি টের পেয়েছে। মুড়াপাড়া থেকে ফিরে আসার পরই মা ভালভাবে কথা বলে না। মা যেমন ওর সামান্য অসুখ করলে মুখ দেখে টের পায়, তেমনি টের পেয়ে গেছে। গায়ের গন্ধ শুঁকে মা টের পাচ্ছে বুঝি আর সোনা পবিত্র নেই। সোনা মুড়াপাড়া থেকে নতুন একটা অসুখ বাঁধিয়ে এসেছে।

সোনা বাড়ির দিকে হাঁটতে থাকল। আজ সে খেলতে গেল না পর্যন্ত। প্রতাপ-চন্দের মাঠে ভলিবল নেমেছে। সোনা খেলে না। বোধহয় আগামীবার সে খেলতে পারবে। এখনও সে মাঠ থেকে বল কুড়িয়ে দেয়। এবং খেলা শেষ হলে ওর মতো সমবয়সীরা মাঠে নেমে কিছুক্ষণ বল নিয়ে লাফালাফি করে—সেই লাফালাফির নেশাও কম নয় তার। বিকেল হলেই সে ছুটবে। কিন্তু এই চিঠি সারাক্ষণ তাকে নানাভাবে বিব্রত করছে। সে কোথাও এমন গোপন জায়গা খুঁজছে যেখানে দাঁড়িয়ে চিঠিটা পড়লে কেউ টের পাবে না। সে চিঠি পড়ে অমলাকে লিখবে, তুমি আমাকে আর চিঠি দিও না। কারণ সোনার ভয়, অমলা হয়ত লিখবে, তুই কাউকে বলে দিসনি তো! এসব কথা কিন্তু কেউ কখনও বলে দেয় না। বলতে নেই। শুধু আমি তুই জানি। আবার যখন তুই মুড়াপাড়া আসবি তখন আমরা আরও বড় হয়ে যাব। কি মজা হবে না তখন!

সোনা শোবার ঘরে ঢুকে আয়নায় নিজের মুখ দেখল। সে মাঝে মাঝে আজ-কাল চুরি করে আয়নায় মুখ দেখছে। আয়না ধরলেই মা জ্যাঠিমা রাগ করেন। জ্যাঠিমা বলবেন, কি এত মুখ দেখা! এমন ছোট বয়সে এত বেশি মুখ দেখতে নেই। কখনও বলবেন, আয়না ধরবে না সোনা। তোমাদের জ্বালায় কিছু রাখা যায় না। সব ভেঙে ফেলছ। সে চুরি করে মুখ দেখছে। মা বিছানায় শুয়ে আছেন। সোনা টেবিলের ধারে কি খুট খুট করছে। ধনবৌ মাথা তুলে দেখল, সোনা নিবিষ্ট মনে আয়নাটা মুখের কাছে এনে দেখছে। নানা-ভাবে দেখছে মুখ: চোখ বড় করে, কপাল টান টান করে দেখছে। টেবিল থেকে চুরি করে মার স্নো মাখছে। সুন্দর করে চুল আঁচড়ে সে বিছানার দিকে তাকাতেই মায়ের চোখে চোখ পড়ে গেল। ভারি লজ্জা পেল সোনা। ধনবৌ ছেলের সাজগোজ দেখে কাছে ডাকল। সোনা কাছে গেলে চুলটা আরও ভালো করে পাট করে দিল। স্নো যেখানে মুখের সঙ্গে মিশে যায়নি, সেটা সুন্দর নরম হাতে মিলিয়ে দিল। বড়বৌ এসেছে দেশলাই নিতে। এসে দেখল মা ছেলেকে সাজিয়ে দিচ্ছে। এই অবেলায় সোনা কোথায় যাবে! অন্যদিন এ-সময়ে খেলার জন্য ওকে কিছুতেই আটকে রাখা যায় না বাড়িতে। সে জামা কাপড় না পাল্টেই ছুটতে থাকে মাঠের দিকে। তাকে ধরে রাখা যায় না গোপাটে নেমে গেলে বড়বৌ ডাকবে, সোনা, লক্ষ্মী আমার, কাপড় জামা পরে যা। ঠাণ্ডা লাগলে জ্বর হবে। কে কার কথা শোনে। সে ছুটে মাঠে নেমে যায়।

অথচ আজ সোনা খেলার মাঠে যায়নি। বড়বৌ সামান্য বিস্মিত হল। বড়বৌ বলল, কিরে সোনা, মাঠে খেলতে গেলি না।

সোনা মাকে, জ্যাঠিমাকে দেখল। সে কিছু বলল না। সন্তর্পণে পকেটে হাত রাখল। নীল রঙের খামটা ওর পকেটে। সে তাড়াতাড়ি এ-ঘর থেকে পালাতে চায়। সোনা বের হবার মুখে শুনল, জ্যাঠিমা বলছেন, সোনা তোমার মাকে এক গ্লাস জল এনে দাও।

সোনার ভারি রাগ হল মায়ের উপর। মা ফাঁক পেলেই শুয়ে থাকে। শরীর খারাপ। কি যে অসুখ মায়ের সে বুঝতে পারে না। অন্য অন্যদিন সে চুরি করে আয়নায় মুখ দেখলে মা তাকে কাছে ডাকে, তাকে সাজিয়ে দিতে চায়। সে কাছে যায় না। গেলেই ধরা পড়ে যাবে এমন ভয়ে সে দূরে থাকে। নিজেই মাথার চুলটা ঠিক করে নেয়। মা রোগা হয়ে যাচ্ছে। ভাত খেতে চায় না। বড় জ্যাঠিমা সাধা সাধনা করে দুমুঠো ভাত খাওয়ান। মার সেই খাবার দৃশ্য দেখলে সোনার কান্না পায়। খেতে খেতে কোনদিন মা মালসাতে বমি করে ফেলেন। মার জন্য সে যে কি করবে ভেবে পায় না। অথচ আজ এই জল আনতে বলায় মার উপর ওর ভীষণ রাগ হচ্ছে। কি দরকার ছিল বলা জ্যাঠিমাকে, জল দিতে। জ্যাঠিমার হাতে গৃহস্থের কাজ। সেজন্য তিনি সোনাকে জল দিতে বলছেন। সে বের হয়ে যাবার পর কেন মা জল চাইল না। সে এখন পালা বাড়ির পুকুর পাড়ে চলে যাবে। পাড়ে পাড়ে কত ঝাউবন গাছ। ছোট ছোট গাছের ডাল সে অনায়াসে বেয়ে উপরে উঠে যেতে পারে। এত ঝোপ জঙ্গলপাতা খাবার যে সে যদি কোন ঝোপের

ভিতর বসে চিঠিটা পড়ে তবে কেউ টের পাবে না।

তার এখন তাড়াতাড়ি চলে যেতে হবে। সাঁজ নামলে সে দূরে কোথাও যেতে পারে না। ভয় হয়। আর এসময় মা বলছেন জল দিতে। সে জল না দিয়েই চলে যেত, কিন্তু ঈশম বলেছে, জল না দিলে পরের জন্মে মাছরাঙা হয়। সে কিছুতেই মাছরাঙা হতে চায় না। সে মাছরাঙা হবার ভয়ে মার শিয়রে জল এনে রেখে দিল।

দরজার মুখে এলেই ধনবৌ অম্নি ডাকল, সোনা।

সোনা পিছন ফিরে তাকালে ধনবৌ বলল, কৈ যাবি?

সোনা বলল, কোনখানে যামু না।

—আমার শিয়রে একটু বসবি? আমারে বাতাস দিবি? শরীরটা আমার ভাল না।

একথা শুনে সোনার রাগ বাড়ছে। সে সব সময়ই মায়ের অনুগত। মেজদার মতো সে নয়। মেজদাকে মা কোন কিছু করতে বললেই পারবে না বলে চলে যায়। মা নিরীহ স্বভাবের। মেজদা শুধু ছোট কাকাকে ভয় পায়। সোনাই মার ফুট ফরমাস খেটে দেয়। অথচ আজ তার এমন কথায় রাগে কান্না পাচ্ছে।

এবং এখন এই যে এত কথা মা তাকে বলছে, সে শিয়রে বসে থাকলে মায়ের খুব ভাল লাগবে, মার একা-একা ভাল লাগছে না, বাবাকে মা রাতে চিঠি লিখেছে, এই নিয়ে সে তিনটে চিঠি ডাকবাক্সে ফেলে এসেছে—অথচ বাবা একটা চিঠির জবাব দেয়নি, ওর কিছুক্ষণ মার কাছে থাকলেই জানবে হারে সোনা পিয়ন আইছিল?

বাবার চিঠি এলেই মা সেদিন খুব সুন্দর সাজে। ভাল কাপড় পরে। লাল বড় সিঁদুরের টিপ কপালে এবং চুলে নানারকম ক্লিপ এঁটে মা বাবার জন্য কেবল কি প্রার্থনা করে।

সে আর মায়ের কাছে গেল না। কাছে গেলেই সে ধরা পড়ে যাবে। তার পকেটে একটা নীল খামের চিঠি। সে বলল, আমার ভাল লাগে না। সে মায়ের সঙ্গে এই প্রথম মিথ্যা কথা বলল, আমি মাঠে খেলতে যামু মা।

ধনবৌ এবার উঠে বসল। মুখে খুব অরুচি। কিছু খেতে ভাল লাগে না। আমলকি খেলে জীভের স্বাদ ফিরে আসতে পারে। সে বলল, সোনা আমারে দুইটা আমলকি আনবি? মাঝি বাড়ির আমলকি গাছে খুব আমলকি হইছে।

মাঝিদের বাড়িতে আমলকি গাছ। সোনা গাছটা চেনে। সময় অসময়ে গাছটার ফল ধরে থাকে। সে ভাবল মার জন্য দুটো আমলকি চেয়ে নেবে। সে কতদিন আমলকি ফল খেয়ে জল খেয়েছে। আমলকি খেয়ে জল খেলেই মিষ্টি মিষ্টি লাগে জলটা। সে একটা আমলকি খেত, এবং এক ঢোক জল খেত।

এতক্ষণ মা তাকে এই অন্ধকার ঘরে আটকে রাখতে চেয়েছিল, যেমন অমলা তাকে একটা অন্ধকার ঘরে টেনে নিয়ে গিয়েছিল—তখন উঠোনের কদম ফুল ফোটে, কদম ফুল ফুটলেই গাছের নিচে দাঁড়িয়ে থাকতে ইচ্ছা হয়—কেমন যেন একটা নতুন অসুখের জন্ম হচ্ছে শরীরে। ভালোবাসা, ভালো লাগার—কি একটা ব্যাপার, সে বুঝতে পারছে না, ছুঁতে পারছে না নিজেকে—কেবল ঘুরে ঘুরে লটকনের ডালে ডালে সে একটা নিরিবিলি ঝোপ পেতেই চিৎ হয়ে ডালের উপর শুয়ে পড়ল। কেউ গাছের নিচে হাঁটছে। সে তাড়াতাড়ি আবার চিঠিটা লুকিয়ে ফেলল। তারপর মুখ নিচু করে দেখল, না কেউ নেই। গাছের মাথায় একটা সাদা বক এসে বসেছে। সে যে এক বালক, অমলার চিঠি নিয়ে এখানে পালিয়ে এসেছে বকটা টের পায়নি। সূর্যের মুখে মুখ করে বসে আছে। কুক কুক শব্দ করছে।

সোনা খুব যত্নের সঙ্গে নীল খামটা খুলল। জায়গাটা যথার্থই নির্জন। গ্রামের এটা উত্তর দিক। শীতকালে ভালো রোদ পায় না। পালেদের বাঁশবাগান সামনে। পশ্চিমে ছোট একটা নালা। এখনও জল আছে নালাতে। কত রকমের সব হেলাঞ্চা কলমি লতা এবং জল সেঁচি আর কত সব ফড়িঙ বিচিত্র বর্ণের। হেমন্তের পরই শীত আসবে। শীত শেষ হলে নালাতে জল থাকবে না। তখন সোনা এবং সকলে খাল পার হয়ে খেলার মাঠে যাবে।

এই খালটার জল আছে বলে এখনও এ-পথে মানুষ নেমে আসে না। সোনা পাড়ে পাড়ে সব লটকন গাছ দেখতে পাচ্ছে। গাছে গাছে নীলকণ্ঠ পাখি উড়ে আসবে—কতবার শীতের শেষে ওরা গাছের নিচে বসে থাকত নীলকণ্ঠ পাখি দেখবে বলে। কিন্তু পাখি এল না। সূর্যাস্ত হল। কোন কোনদিন সাদা জ্যোৎস্নায় সে ঈশমের হাত ধরে ফের হত। জ্যাঠামশাই সঙ্গে থাকতেন। তালি বাজাতেন হাতে। সোনা ভেবেছিল তিনি তালি বাজালেই ওরা কোন দূরের সরোবর থেকে অথবা পাহাড় থেকে নেমে আসবে। সে নীল খামটা খুলতে গিয়ে একটা পাখির চোখ দেখতে পেল। পাখিটা কি তবে সেই তার নীলকণ্ঠ। যা সে খুঁজে বেড়াচ্ছে, জ্যাঠামশাই খুঁজে বেড়াচ্ছেন। চোখে ভুল কি বুঝি! সে দেখল পাখিটা সেই পাখি, সাদা পাখি—একটা সাদা বক, সে কক কক করছে। সে খামটা এবার ছিঁড়ে ফেলল।

মোটা মোটা অক্ষরে লেখা। যেন বড় বড় করে লিখেছে অমলা। ধরে ধরে লিখেছে সোনাকে। সোনার মুখে এসে শেষ হেমন্তের রোদ পড়ছে পাতার ফাঁকে। মা তার শুয়ে আছে ঘরে। মার অসুখ। সে নিতান্ত বালক। সে চিঠিটা পড়ার জন্য এমন একটা গোপন জায়গায় চলে এসেছে।

সুন্দর হস্তাক্ষরে লেখা—প্রিয় সোনা। আশা করি তুই ভাল আছিস। কেমন বড় মানুষের মতো লিখেছে অমলা। কলকাতার মেয়ে। তার তো সবই তাড়াতাড়ি জানার কথা। সে সুন্দর ভাষায় চিঠি তো লিখবেই। প্রিয় সোনা এই কথা ভাবতেই ওর মুখটা লজ্জায় মহিমময় হয়ে গেল। তোর জন্য আমাদের খুব মন খারাপ। কিছু ভাল লাগে নারে। বড় একঘেয়ে। সকালে স্কুল, বিকেলে দুজনে আমরা টেবিল টেনিস খেলি আর রাতে মাস্টারমশাই আসেন। এখানে আসার পর থেকেই বাবা আমাদের সঙ্গে বেশি কথা বলেন না। তারপর কিছু শব্দ অমলা কেটে দিয়েছে। এমনভাবে কেটেছে যে সোনা বুঝতে পারল না। আমরা আসার সময় তোর সঙ্গে দেখা করে আসতে পারিনি। সারা রাস্তায় আমরা কেঁদেছি। কারণ আগামী শীতে শুনেছি মা মরে যাবে। তার আগে আমরা চলে এসেছি। এসে দেখি মা একটা সাদা বিছানায় শুয়ে আছেন। আমাদের চিনতে পারছেন না। সাদা চাদরের নিচে মায়ের নীল রঙের পা কি সুন্দর দেখাচ্ছিল। আমি, কমল মায়ের সুন্দর পা ছুঁতেই দক্ষিণের দিকের জানালাটা খুলে গেল। দেখি সেখানে কারা একটা সিকড়ায় ওক লাগিয়ে রেখেছে।

কি যে হয়েছে মায়ের!

চিঠিটা পড়তে পড়তে সোনার যেন নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে।

মা এখন আমার জানালায় শুয়ে থাকেন। দক্ষিণের জানালাটা কারা খুলে রাখে। দুর্গের রেমপার্ট সেখানে থেকে স্পষ্ট। মনে হয় বাবা আর মাকে কেন কষ্ট দিতে চান না। মা যা ভালবাসেন বাবা তাই করছেন। সারাদিন শুয়ে থাকেন। ওঠার ক্ষমতা নেই। গভীর রাতে রেকর্ড বাজে কিছু ধর্মীয় সঙ্গীত বাজান, আমরা তখন ঘুমিয়ে থাকি। কোন কোন দিন ঘুম ভেঙে গেলে এসব টের পাই।

সকাল বেলাতে বাবা মাকে পাঁজাকোলে বারান্দায় নিয়ে আসেন। নার্সরা তখন কাছে থাকে না। রেলিঙের ধারে বসে থাকেন তিনি। যতক্ষণ না সিলাতায় ওকে রোদ এসে নামবে ততক্ষণ বসে থাকবেন। তারপর কাঠটায় রোদ এসে পড়লেই বাবা আবার মাকে খাটে শুইয়ে দেন। যেদিন কলকাতার আকাশে রোদ থাকে না—সেদিন মায়ের যে কি কষ্ট ! মার মুখ দেখলেই মনে হয় যখন আজ অথবা কাল তিনি মরে যাবেন।

কেন যে এমন হল সোনা !

মা মরে গেলে আমরা কার কাছে থাকব সোনা।

আমরা স্কুল থেকে এসে কিছুক্ষণ মায়ের পাশে বসি। বৃন্দাবনী মাকে সাজিয়ে

সের রোজ। মা এখন আর বব চুল কাটে না। চুল বড় হয়ে যাচ্ছে বড় চুলে মাকে যে কি সুন্দর লাগে। মা আর প্যান্ট পরে না। সাদা বাংলা সিল্ক, লাল পাড়ের সিল্ক, মা সিল্ক পরে সারাদিন বড় খাটে প্রার্থনার ভঙ্গীতে শুয়ে থাকেন। আমরা ডাকি, মা মা! মা আমাদের সঙ্গে কোন কথা বলেন না। বুকে শুধু, বুকের রেমপার্টে একটা নীল রঙের পাখি খোঁজেন।

মা বড় করে সিঁদুরের টিপ পরেন। কিটসের কবিতা মায়ের খুব পছন্দ। আমরা পায়ের কাছে বসে হাঁটু মুড়ে কিটসের কবিতা আবৃত্তি করি। মা শুনতে পান কিনা জানি না। বাবা বলতেন, তোমাদের মা যা ভালবাসতেন তাই করবে। আমরা মাকে আবৃত্তি করে কবিতা শোনাই। সেই সব শব্দ যা মা'র খুব পছন্দ। বাবা সময়ে সময়ে বাই বলেন, সবাই মাকে কেন্দ্র করে, বাবার সঙ্গে কার্তিকের কোন পার্কে মার প্রথম দেখা, বাবা মাকে কি বলতেন, বাবা ভদ্রঘরের মানুষ, বড়লোক, কলকাতায় তাদের বাড়ি, বাবা প্রথম মাকে এমনই বলেছিলেন। বাবা বলেন, জানি না কেন মা কলকাতা বললেই কেমন বিষণ্ণ চোখে তাকাত।

যেমন সেই শব্দে—

I made a garland for her head,
And bracelets too, and fragrant zone. She looked at me as she did love, And made sweet moan

কসমেটিক ডিভিসন বেঙ্গল কেমিক্যাল কলিকাতা • বোম্বাই • কানপুর দিল্লী • মাদ্রাজ • পাটনা

কখনও কখনও বাবা পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে গল্প করেন।

সোনা কবিতার কোন অর্থ বুঝতে পারল না। সে বার বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পড়ল। সোনার স্মৃতিশক্তি প্রবল। সে দুবার পড়তে না পড়তেই কবিতাটা মুখস্ত করে ফেলল।

চিঠিটা পড়তে পড়তে এক সময় সোনা নিজেই কেমন একটা পাখি হয়ে গেল। তার মনে হচ্ছে সে স্থবির হয়ে যাচ্ছে। কারণ তার মা বিছানায়। মার অসুখ। কিছু খায় না। আগামী শীতে কি তার মাও মরে যাবে! অমলা আমি কি করি। আমিও কি মার পায়ের কাছে বসে থাকব। সেই অন্ধকার ঘরে, অমলার সাপ্টে ধরা, ওর ভাল লাগা, এবং নদীর কাছে গিয়েও পাপ কাজের কথা বলতে না পারা, বলতে পারলে নদী, অর্থাৎ এই জল, জল মানেই জীবন, জীবন হচ্ছে প্রাণের দেবতা, সে তাকে অভি-শাপ দিত না। অমলারে তুমি সোনা নদীর পাড়ে হেঁটে গেলে। বন্যা এসে তোমাকে ধুয়ে মুছে দিয়ে যাবে। সোনা নিচে নেমে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকল। সে বুকতে পারছে ভিতরে ভিতরে তার বড় কষ্ট হচ্ছে। ভয় হচ্ছে, মার পায়ের কাছে বসে কমলা অমলা আবৃত্তি করছে। সে কি করবে! মা বলেছে তাকে আমলকি ফল নিতে। সে খালি পায় এসে প্যান্ট খুলে ফেলল। তারপর খালি পায় হয়ে কেন প্যান্ট পরে ছুটল। দেরি হলে রাত হয়ে যাবে। সে খালি পায় হয়ে সোজা ঢুকে গেল ঝাকি ঝাকি। কিছু আমলকি ফল নিয়ে পাতার পথে বাড়ির দিকে ছুটে চলল।

সে ঘরে ঢুকেই মায়ের শিয়রে দাঁড়াল। সে খুব হাঁপাচ্ছে। যেন ভয় পেয়ে সে ঘরে ঢুকেছে। অথবা কেউ ওকে পেছনে তাড়া করেছে।

ধনবৌ ছেলের কাতর মুখ দেখে বলল, তর কি হইছে?

সোনা কিছু বলল না। সূর্য অস্ত যাচ্ছে খেলার মাঠে। জানালাগুলো খোলা। দিনের আলো মরে আসছে। সে ফল-গুলো মায়ের হাতে দিল।

ধনবৌ ভেবেছিল, সোনা আমলকি না বলে এনেছে। মাঠিকের কেউ ওকে কিছু বলতে পারে। সে তাই ছুটে পালিয়ে এসেছে। সে ভই বলল, অরা কিছু কইছে তরে!

—না মা। কিছু কয় নাই।

কিন্তু অদ্ভুত, সোনা কিছুতেই ফল হাতে দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছে না। মায়ের শিয়রে চুপচাপ বসে রয়েছে। ধনবৌ অপলক ছেলের মুখ দেখছে। সোনা যেন কিছু বললেই কেঁদে ফেলবে। ধনবৌ মাথায় হাত রেখে বলল, কিরে তুই কথা কস না ক্যান। কথা না কইলে আমারে ডর লাগে।

এ-সময় বড়বৌ এসে ঘরে ঢুকল। সোনা শিয়রে বসে রয়েছে। চুপচাপ। মাথা গোঁজ করে হাঁটুর ভিতর মুখ রেখে বসে রয়েছে।

—ধন তুমি রাতে কি খাবে?

—কিছু খামুনা বড়দি।

—কিছু না খেলে চলবে কেন। তোমার জন্য পাতলা করে কই মাছের ঝোল করে দিচ্ছি। দুটো বেলপাতার ভর্তা করে দেব। খেতে ভাল লাগবে। শিয়রে লেবু পাতা রেখে গেলাম। ওক উঠলেই পাতা শুঁকবে। তারপর সোনার দিকে তাকিয়ে বলল, সোনা তুমি খেলতে গেলে না।

সোনা এবারেও জবাব দিল না। সে মাথা গুঁজে একগুঁয়ে বালকের মতো বসে থাকল।

বড়বৌ ধনবৌকে বলল, ওর হয়েছে কি!

—কি কই কন। চুপচাপ বইসা আছে। কথা কইলে জবাব দেয় না।

—তুই ওকে বকেছিস?

—না দিদি।

—তবে ও এমন মন হয়ে বসে আছে কেন?

—জানি না।

সোনা এস। বলে বড়বৌ ওকে টেনে তুলতে চাইল। কিন্তু সে মায়ের শিয়র থেকে কিছুতেই উঠল না।

বড়বৌ বলল, ছোটকাকাকে ধরে নিয়ে গেছে। তাতে কি হল। ওরা কিছু করতে পারবে না, জবার চলে আসবে।

কিন্তু সোনা একইভাবে বসে থাকল।

বড়বৌ ভাবল, তবে কি রঞ্জিত নেই বলে! সে বলল, তোর মামাকে ধরে সাধ্য কার। ধরা পড়লে ত ওর ফাঁসি হবে। বলতেই বুকটা কেঁপে উঠল বড়বৌর।

এবং সোনার প্রতি বড়বৌ আরও কোমল হয়ে গেল। চল বাইরে। দেখ ত তোর জ্যাঠামশাই কোনদিকে গেছে। খুঁজে আনতে পারিস কিনা।

সোনার ভ্রূক্ষেপ নেই। সে উঠল না।

বড়বৌ কেমন বিরস গলায় বলল, কি হয়েছে সোনা, কেউ তোমাকে কিছু বলেছে!

সোনা বলল, না।

—তবে এভাবে বসে আছ কেন! খেলতে যাওনি কেন! শরীর খারাপ।

সোনা ফের নির্বাক। এই অসময়ে সোনা ঘরের ভিতর মায়ের শিয়রে চুপ-চাপ বসে রয়েছে। এভাবে বসে থাকা ভাল না। এবার বড়বৌ বলল, দ্যাখ তো সোনা তোর ঈশম দাদা তরমুজের খেত থেকে উঠে এসেছে কিনা।

কিছুতেই কিছু সে শুনল না। সে যেমন মায়ের শিয়রে বসেছিল, তেমনি বসে থাকল। মার কপালে ওর হাত। কি ঠাণ্ডা মার কপাল, শরীর! মা তার নিশিদিন বমি করে কেন! মধ্যে মাঝে সে দেখেছে বমি করতে করতে মার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। সে কোন কোনদিন শিয়রে দাঁড়িয়ে মুখে বাতাস করেছে। বড় জ্যাঠিমা দুধ গরম করে দিয়েছেন। দুধ খেয়েই মা হড় হড় করে সব ফের তুলে দিয়েছে। একবার গোপাল ডাক্তার এসে-ছিল। মায়ের অসুখ দেখে জ্যাঠিমাকে হাসতে হাসতে কি বলে গেছে। তখন মনে হয়েছিল তার, চুরি করে ডাক্তারের সাই-কেল পানচার করে দেবে। সোনাকে এমন শান্ত থাকতে দেখে ধনবৌ পর্যন্ত উঠে বসেছে। মা তার সব টের পায়। মা বলল, আমার কিছু হয় নাই সোনা। এই যেই না বলা সোনা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

—আমলকি ফল খাইলেই ভাল হইয়া উঠমু।

বড়বৌ এবার হাসতে হাসতে বলল, সোনাবাবুর সে জন্য কান্না। হ্যাঁরে তোর মার কিছু হয়নি। তোর এবার দেখবি বোন হবে একটা। বোকা। বলে সোনাকে জোর-জার করে চৌকি থেকে তুলে আনল। বোকা কোথাকার! তা তুমি বলবে তো ধন। সোনার দিকে তাকিয়ে বলল, সেজন্য তুই মার কাছে বসে আছিস। আয়। বড়বৌ সোনাকে বাইরে নিয়ে গেল। সে জ্যাঠিমার দিকে তাকিয়ে আছে। চোখ টল টল করছে।

—বিশ্বাস হচ্ছে না!

ঈশম এতক্ষণে চলে এসেছে। সে বলল, তাই নাকি। এর লাইগা কান্দন!

কি যেন এক পুলক শরীরে। আনন্দে সোনার ভিতরটা সহসা আকাশের নিচে খেলা করে বেড়াতে চাইল। সে ঈশমের কথায় ফিক্ করে হেসে ছুটে পালিয়ে গেল।

ঈশমও ছুটে গেল সোনার পিছনে। সে এসে ওকে নদীর চরে আবিষ্কার করল। কিছু খড়কুটো পাতার দরকার ছইয়ের নিচে। সে হাঁটতে হাঁটতে ছইয়ের দিকে গেল। সোনা কর্তাকে কিছু বলল না। ছোট্ট বাবুটি এখন নদীর চরে ঘাসের উপর বসে আছে। আনমনা নদী জল আকাশ দেখছে।

শীত পড়তে পড়তেই চন্দ্রনাথ চলে এল বাড়িতে। ভূপেন্দ্রনাথ আসবে মাঘ মাসের সতেরো তারিখে। কারণ সেই তারিখে শচীন্দ্রনাথ ছাড়া পাচ্ছে। কোর্ট-কাছারি অথবা কি করে কি যে হয়েছিল সোনা জানে না। ছোটকাকা ফিরে আসছেন। ছোট কাকা ছাড়া পাচ্ছে এটাই একটা এখন সুখবর। ওরা শীতের মাঠে কেন পিঠে দিয়ে জোরে জোরে পড়েছিল।

এই শীতকালটা পড়ার চাপ কম। নতুন বই, নতুন চাদরের মতো, গায়ে দিলেই কি রকম একটা গন্ধ যেন, সোনা নতুন বই পড়তে পড়তে নাকের কাছে এনে গন্ধটা শোঁকে। নতুন বই এলেই শীতের ভোরে পিঠে রোদ দিয়ে গাছের নিচে পড়তে বসে ওরা। অর্জুন গাছের নিচে বড় একটা সতরঞ্চ পেতে দিয়ে যায় ইন্দর। সকাল হলেই রোদ এসে নামে গাছটার নিচে। খুব ঘন পাতা বলে গাছের নিচে তেমন শিশির পড়ে না। ওরা সকলে মাস্টারমশাইকে ঘিরে পড়তে বসে। তখন ঠাকুমা ডালায় করে গরম মুড়ি তেলে মেখে রেখে পাঠিয়ে দেন। গাছের নিচে নরেন দাসের পেঁয়াজ খেত। লালটু কোন কোন দিন চুপি চুপি পেঁয়াজ কলি তুলে আনে। মাস্টারমশাই যেন জানতে না পারে সে এমনভাবে যায়। কোনদিন পলটু যায় মাঠে। শিশিরে পা ভিজে যায়। সে খেত থেকে ধনে-পাতা তুলে আনে। পেঁয়াজ কলি কুচি, ধনেপাতা কুচি তেলেমাখা গরম মুড়ি, কাঁচালঙ্কা. হুসহাস ঝালের শব্দ আর পিঠে শীতের রোদ্দুর—সামনে নতুন বই, নতুন ছবি এসব মিলে সোনার এক ঐশ্বর্যভরা জগত। তিনজন তখন জোরে জোরে পড়ে। পড়ে না কাঁসর-ঘণ্টা বাজায় বোঝা দায়। কারণ অনেক দূর থেকে মনে হয় শীতের ভোরে কয়েকটা মোরগ লড়াই করছে।

সেই শীতের সকালে চন্দ্রনাথ বাপের পায়ের কাছে বসেছিল। সে বাপের পা টিপে দিচ্ছে। শীত এলেই বুড়ো মানুষটার শ্বাসকষ্ট বাড়ে। কফের টানে এ-সময় তিনি খুব কষ্ট পান। হাত পা মাথা সব গরম কাপড়ে ঢাকা থাকে। ফ্লানেলের লম্বা টুকরো দিয়ে বুকে পিঠে যেন ব্যান্ডেজ বাঁধা। কাছে এলেই কেমন কর্পূরের গন্ধ। এবং কফের গন্ধ। গলায় গরম উলের মাফলার, পায়ে গরম মোজা এবং মাথায় ফেটি বাঁধা। শ্বাসকষ্ট এত প্রবল যে জানালায় শীতের রোদ, গাছে কমরাঙা ফুল, ফুলে মধু মধু খেতে এসেছে পাখিরা—সে-সব কিছুই টের পাচ্ছেন না। লেপ কম্বলে শরীর ঢেকেও শীত থেকে রক্ষা পাচ্ছেন না। পৃথিবীর সর্বত্র বুঝি তুষারপাত আরম্ভ হয়ে গেছে। পৃথিবীর শেষ উত্তাপ, শেষ সুখ সব বুঝি কেউ হরণ করে নিচ্ছে। নতুবা সারা রাত তিনি শীতে এত কষ্ট পাবেন কেন। সারা রাত উত্তাপের জন্য আর্তনাদ করবেন কেন! খাটের নিচে পাতিলে তুষের আগুন সারা রাত তুষের আগুন জ্বালিয়ে রেখেছে বড় বৌ। তবু মানুষটা উত্তাপ পাননি। হাত-পা কি যে ঠান্ডা! সূর্য কি তবে পলাতক বালকের মতো সৌরজগতের অন্য কোথাও অদৃশ্য হয়ে গেছে। পৃথিবীতে সে সামান্য উত্তাপটুকু পর্যন্ত দিতে পারছে না। কবে একবার সূর্যোদয় দেখবেন বলে বের হয়েছিলেন আর বের হতে পারেন নি। এখন যে একবার বলবেন, অথবা তার যে বলার ইচ্ছা, পৃথিবীতে কি আর সূর্যোদয় হবে না! আমাকে তোমরা গাছের নিচে দাঁড় করিয়ে সূর্যোদয় দেখাবে না! আমি কি সত্যি এভাবে ঠান্ডায় মরে যাব! তিনি বলতে পারছেন না। বললেই যেন তাঁর সন্তানেরা পায়ের কাছে এসে বসবে, কেমন এখন বসে রয়েছে চন্দ্রনাথ, বলবে সবুজ বনে মৃত মুক হয়ে বেঁচে আর কি লাভ। এবারে চন্দ্রায়নটা তবে করে ফেলি। এবং এ সময়েই তিনি শুনতে পেলেন তাঁর তিন নাতি জোরে জোরে পড়ে চলেছে। নতুন বই এলেই ওরা এভাবে পড়ে। কঠিন যা কিছু শব্দ আছে ঘুরে ফিরে বার বার পড়ে। পড়ে বুঝি জানায়, এই যে আমরা বালকেরা আছি, আমরা কত কিছু শিখে ফেলছি, আমরা পৃথিবীর কত খবর এনে দিচ্ছি তোমাদের। তোমরা কিছু জান না। আর নতুন বই পুরানো হলেই শরীরের মতো জরাজীর্ণ অবস্থা। —আর কতকাল পৃথিবীর জায়গা আপনি আটকে রাখবেন। এবারে চন্দ্রায়নটা করে ফেলি। তারপর বল হরি হরি বোল বলে আপনাকে আমরা নিজ হাতে আপনি যে গাছ রোপণ করেছেন তার নিচে দাহ করি। আর কতকাল। শতবর্ষ পার হতে আর বাকি কি।

ফলে মহেন্দ্রনাথ গলার কাছে যে কাশিটা উঠে আসছে তা আটকে রেখে-ছেন। তিনি কিছুতেই ধরা পড়বেন না, ভাল নেই তিনি, ভীষণ কাশি, শরীর দুর্বল, হাত-পা ঠান্ডা। যেন তার যথার্থই কোন কষ্টবোধ নেই। পায়ের কাছে ছেলে তাঁর বসে আছে। তিনি কত সবল দেখানোর জন্যই যেন লেপের ভিতর থেকে শীর্ণ হাতটা বের করার চেষ্টা করলেন। হাওয়ার উপর দুলিয়ে দেখাতে চাইলেন, তিনি কত সবল আছেন, সুস্থ আছেন। চন্দ্রায়নের সময় তাঁর এখনও হয়নি।

চন্দ্রনাথ বাপের এ-সব বোঝে। মনে মনে সে হাসল। কষ্ট আর চোখে দেখা যায় না। চন্দ্রনাথ হাতটা আবার লেপের তলায় ঢুকিয়ে দিয়ে বলল, আমি চন্দ্র-নাথ বাবা।

—তুমি যে চন্দ্রনাথ, তা বুঝি আমি টের পাই নাই মনে কর?

একেবারে বালক হয়ে গেছেন তিনি। পাছে চন্দ্রনাথ চন্দ্রায়নের কথা বলে, তবে এমন বলছেন মানুষটা। সে এবার বলল, সোনা, লালটু, পলটুর উপনয়ন দিতে চাই। মাঘ ফাল্গুনে দিন আছে।

—তা ভাল। বলেই যে কাশিটা এতক্ষণ গলার কাছে আটকে ছিল এবার সেটা মুখে তুলে আনলেন। তারপর ঢোক করে গিলে ফেললেন কফটা। চন্দ্রায়ন করতে বলবে এই ভয়ে তিনি শরীর শক্ত করে রেখেছিলেন এতক্ষণ। কিন্তু ছেলে যখন বলছে উপনয়নের কথা তখন একবার উঠে বসা যায় কিনা চেষ্টা করা যাক।

—আমারে চন্দ একটু ধর। উঠইতা বসতে পারি কিনা দ্যাখ।

চন্দ্রনাথ বলল, বারান্দায় রোদ আসুক, আপনেরে নিয়া যামু বারান্দায়।

বুড়ো মানুষটা এবার যথার্থই প্রাণ ফিরে পেলেন হাতে। হাসি হাসি মুখে বললেন, জানোমার দিকে লক্ষ রাইখ। সন্তানাদি পেটে। সন্তানাদি কথাটা বল-লেন এই জন্য যে, পৃথিবীতে এই যে একটা জগত যা জননীরা গর্ভের ভিতর সৃষ্টি করে রাখে, সেই জগত সম্পর্কে এখন তার শিশুর মতো পুলক অথবা কৌতূহল, ক্রমে ছোট হতে হতে একে-বারে অণুর মতো হয়ে যাওয়া, এবং সেই সৃষ্টির আধারে প্রবেশ করা, প্রবেশ করার আগে অন্ধকারের ভয়। একবারে প্রবেশ করে গেলে ভয় থাকে না। সেই জগত, যেখানে তিনি কিছুকালের জন্য বিচরণ করবেন। অনন্ত নীহারিকাপুঞ্জে তার অস্তিত্ব কণে কণে নক্ষত্রের মতো আকাশের গায় জ্বলতে থাকবে। তারপর তিনি শিশিরপাতের মতো কোন বিন্দুকের অন্ধকারে টুপ করে একলা ঝরে পড়বেন পৃথিবীর মাটিতে। তার জন্ম হবে আবার। আবার সেই শৈশবের খেলা আরম্ভ হয়ে যাবে এই বৃক্ষের নিচে। সেই আদি অন্তহীন আধারের প্রতি সম্মানসূচক শব্দ ব্যবহার না করে পারলেন না। প্রায় যেন মৌলিক বহুবচনের মতো। সুতরাং তিনি সন্তান না বলে সন্তানাদি কথাটা ব্যবহার করলেন।

চন্দ্রনাথ বসে বসে বাবার মুখ দেখল। একবার সেই মহিমান্বিত চেহারার সাদৃশ্য এই মানুষের মুখে কোথাও খুঁজে পেল না। কতকাল থেকে তিনি এই বিছানায় কালাতিপাত করছেন। এবং এই কালাতি-পাতের সময় তার শরীর ক্রমে ছোট হয়ে যাচ্ছে। হাল্কা হয়ে যাচ্ছে। এত হাল্কা যে চন্দ্রনাথ কত অল্প আয়াসে তাকে একটা জলপুতুলের মতো পাঁজাকোলে তুলে নিয়ে এল বারান্দায়। বারান্দার যেখানে রোদ এসে নেমেছে সেখানে দুপাশে বালিশ দিয়ে এক ছোট্ট পুতুলের মতো বসিয়ে দিল। বসতে পারেন না, তবু দুহাত সামনে বিছিয়ে যেমন শিশুদের ছবি তোলা হয় তেমনি তাকে চারপাশের বালিশে রেখে দেওয়া হল। দাঁত নেই। চোখ অন্ধ। এক বীর্যবান মানুষ এই সংসারে শতবর্ষের অন্তরে আবার সেই আধারে ভ্রূণের মতো প্রবেশ করবেন। ক্রমে ভ্রূণ থেকে কীটে এবং তারপর সেই পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে গেলে পৃথিবীর শস্যভরা মাঠে নতুন আলোক বর্ষিত হবে। তখন সাদা জোৎস্নায় উপ-নয়নের বালক সন্ন্যাসীরা মাথা নেড়া করে নদীর জলে দাঁড়িয়ে থাকবে। হাতের অঞ্জলিতে নদীর জল। পূর্বপুরুষকে জলদান করবে। বাপের জরাজীর্ণ মুখ দেখে চন্দ্রনাথের এমনই মনে হল।

(ক্রমশঃ)

নিকটেই আছে

লোকটা ভীষণ সাধারণ

তা টাকা কি আমি বাড়ী বয়ে দিয়ে আসব? সময় মত আসেননি কেন? বরং এখন এ জি বেঙ্গলে যান—সেখানে গিয়ে বরং খোঁজ নিন, কবে পাবেন। যত্ত সব। —বলতে বলতে একটা কষে-টান চড়ালেন হাতে-ধরা সিগারেটের গোড়ায় পেশকারবাবু। একই সঙ্গে গলগল করে খানিকটা ধোঁয়া আর কাশি উগরে দিয়ে, সন্দিগ্ধ হয়ে বাইফোকালের আড়াল থেকে তেরচা চাহনিতে নিশ্চিত বধ্য শিকারটিকে আপাদমস্তক একবার সার্ভে করে নিলেন। 'আপাদ' কথাটা বোধহয় ঠিক নয়, কারণ টেবিলে টাল দিয়ে সাজানো ফাইলের পাহাড় মানুষটার কোমর ডিঙিয়ে বুক পকেটে এসে ঠেকেছে। পকেটটা লেপ্টে আছে—টুকরো কাগজ, মানিব্যাগ বা অন্যকিছুই যে ওখানে নেই সেটা বুঝতে মুহূর্তও লাগেনি ল্যান্ড অ্যাকুইজিশনের ঝানু পেশকার অনিল মুৎসুদ্দীর। নিরেট গবেট। কবে পেমেন্ট অর্ডার বেরিয়ে গেছে, আজ এসেছে কিনা খোঁজ নিতে। খোঁজ নেওয়াচ্ছি। কড়া দু মাস ঘুরিয়ে তবে শুধু এ জি বেঙ্গল বলেই। তারপর দেখাব নাজির সেকশন। পেশকারের সঙ্গে কথা বলতে গেলে যে আগে টু পাইস টেবিলের তলা দিয়ে বাড়িয়ে দিতে হয় তাও শালার উজবুক এই গবেটটাকে শেখায় নি। যত্ত সব। হুঁ—টুসকি দিয়ে ধোঁয়ার ডগায় জমা ছাই-টুকু ঝেড়ে ফেলে নথির পাতায় পিন বসাতে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন পেশকারবাবু।

আবার কবে আসব পেশকারবাবু? —লোকটা তাহলে যায় নি এখনো, ঠায় দাঁড়িয়ে। মুখ না তুলেই জবাব ছুঁড়ে মারলেন অনিল মুৎসুদ্দী, কি করে বলব। আপনার উকিলকে বলবেন মাঝে মাঝে খোঁজ নিতে। আর পারেন যদি এ জি-তে গিয়ে তদবির করুন। পেমেন্ট দেননি। অর্ডার ফিরে গেছে। সময় লাগবে।

চটি ঘসটানির আওয়াজ শুনেই পেশকারবাবু টের পেলেন গবেটটা এবার বিদায় নিচ্ছে। বান্দার মাথায় কিসসু নেই। এতক্ষণ দাঁড়াল, এতকথা জিজ্ঞাসা করল অথচ যা করলে দু মিনিটেই কাজটা হয়ে যেত, সেধে দিয়েও গেল না। বুঝুক ব্যাটা, যত পারে বুঝুক। কোর্টে ঘুরেছে তেরো বছর, এখানেও ঘুরিয়ে দেব বছর-খানেক। তাতে যদি একটু হুঁশ হয়। এসব লোকের কিসসু হবে না।

পেশকারবাবু যখন নথি আর ফাইল, মক্কেল আর উকিল সামলাচ্ছেন, তখন লোকটা চটি ঘসটাতে ঘসটাতে সেরেস্তাখানা পেরিয়ে, ডাইনে বাঁয়ে ট্যাক্সি আর মানুষের ভিড় কাটাতে কাটাতে এসে মোড়ের মাথায় ঝড়ে-উপড়ে পড়া ঘোড়ানিমের শুকনো ডালপালার আড়ালে দাঁড়াল। উল্টোদিকে চায়ের দোকানে এক একটা টেবিলে এক একটা কালো কোটের সঙ্গে মাছির মত লেপটে আছে গন্ডা গন্ডা মানুষ। ওদেরও নিশ্চয় এই হালই হবে। তবু আশা কেউ ছাড়ে না। হাসি পেল লোকটার। হাসলে অদ্ভুত দেখায়। পান খাওয়া দাঁতগুলো কালোকুষ্টি, খোঁচা খোঁচা দাড়ি রোগা গালে ঠিক ধান কাটা মাঠের মত সারি দিয়ে দাঁড়ানো। পরনের ধুতিটা ধুলোয়, ঘেঁষায় কেমন কালচে মেরে গেছে। খয়েরী র‍্যাপারটা টুকুর মা রিফু করতে দিয়েছে কাচির দোকানে। শুধু সার্টে নভেম্বরের শীত ঠেকানো যায় না। অন্যমনস্কের মত একবার বুক পকেটে হাত দিয়েই টের পেল পয়সাকটা ঝুল পকেটে আছে। ঠিক বাড়ী ফেরার ভাড়া। অথচ উকিলবাবুকে সব বলা দরকার। মনে মনে হিসাব করে দেখল পথ বড় জোর আড়াই মাইল। এটুকু হেঁটে গেলেই চলবে। গত সপ্তাহে দেখে এসেছে উকিলবাবু বাতে বিছানায় পড়ে আছেন। উঠবার ক্ষমতা নেই। মানুষটা বড় দয়ালু। প্রাণখোলা দাদা। এক পয়সাও নেননি এই মামলার জন্য। শুধু বলেছেন, জিতলে পাঁচ বা দশ কিছু দিও। জিতিয়ে তো দিয়েছেন। জজ রায় দিয়েছেন ওর পক্ষে—গভর্নমেন্ট টাকাও দিতে রাজী। পেশকারটা শুধু শুধু ঘোরাচ্ছে। টাকাটা পেলে সুবোধদাকে অন্তত পাঁচশো টাকা দেবে মনে মনে ঠিক করে রেখেছে লোকটা। সুবোধদা সেদিন পাশে না দাঁড়ালে কিই বা আর করতে পারত সে।

পাঁচশো? অত দিলে হাতে আর থাকবে কি। পেমেন্ট পাবে তো মোটে আড়াই হাজার। পাঁচশো দিলে যে টুকুর বিয়েটা আটকে যাবে। চলতে চলতে লোকটা একটু থমকে দাঁড়াল। স্যান্ডেলটার একটা পেরেক বেরিয়ে এসেছে। ঠিক গোড়ালির তলায় ফুটছে বার বার। কার্জনপার্কে কোথাও মুচি নেই একটাও যে পেরেকটা একটু ঠুকিয়ে নেবে। কোর্টের মুখেই একটা বসে, কিন্তু তখন খেয়াল হয়নি। সামনেই বড় মোড়। চারদিক তাল করে দেখল, নাহ্ কোথাও নেই। আজকাল মুচিরা আর রাস্তায় বসে না। কোথায় বসে?

যেখানে খুশী বসুক, চওড়া রাস্তা ছেড়ে ফুটপাথে উঠে এল লোকটা। পেচ্ছাবখানার পাশে কয়েকটা আধলা পড়ে আছে। সব কটাই জলে ভেজা। একটা শুধু একটুখানি শুকনো তার মধ্যে। সেটা দিয়ে স্যান্ডেলের পেরেকটা ঠুকে মাথাটা বেঁকিয়ে দিল। যদি পেশকারটার মাথাটা এভাবে ঠুকে ঠুকে ফাটিয়ে দেওয়া যেত—ইটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আবার উঠে দাঁড়াল লোকটা।

কজনের মাথা ফাটাবে? টুকুকে যারা পছন্দ করে গেল তাদের মাথা—ছি ছি। এসব সে কি ভাবছে। এমন কিছু তো বেশী চায় নি ওরা। ছেলে উপযুক্ত। সেলসম্যান, মাস গেলে ওভারটাইম-টাইম ধরে কম করেও আড়াইশো টাকা রোজগার। ছেলের বাপের অবস্থা ভাল। একটা বাড়ী আছে। তাছাড়া ধানি জমিও কিছুটা আছে। হাজার টাকা পণ তো চাইতেই পারে। খাট-বাট চায় না। ওসব রাখার জায়গা নাকি ওদের নেই। মেয়েকে যা দেবার তা দেবেন, ছেলেকে বরাভরণ আদায় হিসাবে দিতে হবে একটা ঘড়ি, সোনার আংটি আর বোতাম। এরপর আছে খাওয়ানো দাওয়ানো। টুকুর মার সঙ্গে হিসেব করে দেখেছে কম করেও সাড়ে চার পাঁচ হাজার লাগবে। অথচ জমির দাম বাবদ গভর্নমেন্ট তো দেবে মোটে আড়াই হাজার। উকিলকে পাঁচশো দিলে আর থাকবে কি? আর বাকী টাকাটাই বা পাবে কোথায়? ওদিকে তো বিনোদ বিশ্বাসকে একরকম কথাই দিয়ে দিয়েছে সে—অঘ্রাণেই টুকুর বিয়ে—হাজার টাকাই বরপণ দেবে। প্রভিডেন্ড ফান্ডের লোনের জন্য দরখাস্ত করে রেখেছে। হাজার দেড়েক ওখান থেকে পাওয়া যাবে। তার

সঙ্গে এই টাকাটা জুড়ে কোনরকমে কাজটা সে সেরে ফেলবে। ফেলবে তো কিন্তু পেশকারটা যা ব্যাগড়া দিচ্ছে তাতে আর কোন ভরসা পাচ্ছে না।

তেরো বছর মামলা ঝুলে রইল। সুবোধদা যদি ফি চাইতেন তাহলে তো পেমেন্টের সব টাকাই তার প্রাপ্য। নেহাৎ ভালবাসেন তাকে, পয়সারও অভাব নেই কোন সুবোধদার তাই দয়া করে তরিয়ে দিলেন। শুধু যে স্বপ্নটা আজ তেত্রিশ বছর ধরে লুকিয়ে লুকিয়ে নিজের মনের আয়নায় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে শুনে পাগলা সে হয়ে যেত সেটাই গেল শেষ হয়ে—বাড়ী, নিজের বাড়ী আর কখনো হবে না।

অথচ জমিটা কেনার সময় সবই কত সহজ স্বাচ্ছন্দ্য মনে হয়েছিল। মাত্র পঞ্চাশের টাকা করে কাঠা। যুদ্ধ তখনো বাধেনি। ম্যাট্রিক পাশ করেই চাকরীতে ঢুকেছিল সে। বাবা মা সবাই তখন বেঁচে। চাকরীতে বসতে না বসতেই ও'রা জোর করে ধরে বেঁধে বিয়ে দিয়ে দিলেন। তখনো কার্তিক হয় নি। এক ব্যাটা দালাল খোঁজ নিয়ে এসেছিল অফিসে। কলকাতার গায়েই জলের দরে জায়গা বিকোচ্ছে। কিনতে হয় তো এখুনি। পরে হাজার টাকা দাম উঠবে। অনেকেই কিনল। কেউ পাঁচ, কেউ সাত, কেউ কেউ দশ কাঠা পর্যন্ত। সেও নিল চার কাঠা। ঠিক ছিল সুযোগ সুবিধা মত যে যার বাড়ী করবে। একই অফিসের লোক এক জায়গায় থাকবে—সবই নিজেদের মধ্যে।

সব প্ল্যান কিন্তু আপসেট হয়ে গেল। যুদ্ধ, দাঙ্গা, পার্টিশন, উদ্বাস্তু। লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল গোটা দেশটা। যা ভেবেছিল কিছুই তার হোল না—সব কেমন ওলট পালট হয়ে গেল। তবু সে হাল ছাড়ে নি। জানত দু দুটো ছেলে তার বড় হয়ে উঠছে। জমিটা সে কিনে ছিল। বাড়ী যদি সে বানাতেও না পারে, ওরাই বানাবে। আর একটা মাত্র ছোট বোন, তার বিয়ে তো ওরাই দেবে। অফিসে সবাই বলত—তার মত সুখী কে আর আছে।

হাসি পেল। সুখ! সে বস্তুটা তো লটারীর টিকিট। কোথায় কার কপালে যে জুটবে কে বলতে পারে। অন্তত আজ সে বলতে পারে, পেনসন থেকে মাত্র দু বছরের তফাতে দাঁড়িয়ে, তার কপালে ও-বস্তু নেই। কার্তিককে সে মানুষ করেছিল। এম এস সি পড়িয়েছিল ম্যাট্রিক পাশ জন্ম কেরানী বাপ তার বড় ছেলেকে। সে এখন কলেজে পড়ায়। অধ্যাপক! —বুকটা যেমার বেঁকে গেল লোকটার। কি পড়ায় ও ছেলেদের? বুড়ো বাপ যাকে দেখাটা অন্যায়। তাঁর কার্তিক আজ প্রফেসর কে সি পাল। সিঁথিতে গবমেণ্ট ফ্ল্যাটে থাকে। বিয়ে করেছে এক ছাত্রীকে। ছেলে-মেয়েও না কি হয়েছে। লোকজন মুখে মুখে

সব খবরই সে পেয়েছে। মেজ রতনটা মানুষ হল না। পাড়ায় খুব নামডাক ওর। বছরের অর্ধেক দিনই বাইরে বাইরে কাটায়। পড়াশুনাও করল না, চাকরীও করল না। জানে বাপ তো আর ফেলে দিতে পারবে না। বাসায় খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়ে ফিরছিল এতদিন, এখন পুলিশের হুলিয়ার ভয়ে কোথায় যে গা ঢাকা দিয়ে আছে কে জানে। এখুনি যদি পেমেন্টটা হাতে আসে তো বেঁচে যায় সে। নইলে অপদার্থটা ঘরে ফিরে যদি টের পায় বাবা জমি বেচার টাকা পেয়েছে তাহলে খাবলে-খুবলে যা পারবে আদায় করে নেবে। তাতে বোনের বিয়ে হল কি হল না কি যায় আসে তার।

যাক ভগবান যা করেন, মঙ্গলের জন্যই। তবু তো টুকুর বিয়েটা দিয়ে যেতে পারবেন। ভাগ্যিস সেদিন জমিটা ওরা জবরদখল করেছিল। তেরো বছর আগে মানুষ তেরো বছর পরের কথা তো ভাবতে পারে না যে কি হবে। ওরা যারা জমি নিয়েছিল একসঙ্গে, সবাই মামলা ঠুকল। কথা ছিল সবাই একসঙ্গে মামলা লড়বে। খরচ ভাগাভাগি করে নেবে। তার ভাগে মাসে পঁচিশ টাকা পড়েছিল। কোথায় পাবে অত টাকা। দেড়শো টাকা মাইনের তিন তিনটে ছেলেমেয়ে মানুষ করে জমি বাঁচানোর মামলা লড়া কি চাট্টিখানি কথা। নিরুপায় হয়ে যখন হালই সে ছেড়ে দিয়েছিল তখন একদিন কোর্টেই দেখা হয়ে গেল সুবোধদার সঙ্গে। সব শুনে হাসতে হাসতে আশ্বাস দিয়ে দাদা বললেন—তুই আমার গ্রামের ছেলে। যা, ভাবিস না, সব ব্যবস্থা আমি করব।

তা করলেন। দু বছরেই তার কেসের ফয়সলা হয়ে গেল। জজ অ্যাওয়ার্ড দিলেন—জমি সে ফেরত পাবে। কিন্তু যারা দখল করে বসেছিল তারা এসে বলল—কোথায় যামু আমরা? একবার দেশ ছাইড়া আইসি। একটু সময় দ্যান। দেখেন আপনার জমি আমরা নিশ্চয় ছাইড়া দিমু।

বিশ্বাস সে করেছিল। তাই আর থানা পুলিশ করে নি। জোর করে নিজের জমির দখল সে নিতে যায় নি। তার ফল তো হোল এই। ছ মাসও ঘুরল না গবমেণ্ট সব জমি অ্যাকুয়ার করে নিয়ে ওদেরই দানপত্র লিখে দিল।

সেদিন যদি সুবোধদা পাশে না থাকত, ভাবাও যায় না। তারপর দশ বছর ধরে চলেছে মামলা। সে ভেবেছে অনেকবার কি হবে মামলা লড়ে। গবরমেন্টের বিরুদ্ধে কি আর সে জিততে পারবে? বিশেষ যখন, কার্তিক বিয়ে করে আলাদা হয়ে গেল। রতনটা তখন জেলে। সংসার আর চলে না। ধীরে ধীরে তলিয়ে গেছে সে। তবু সুবোধদা ছাড়ে নি। কিছু বলতে গেলে ধমকে উঠেছেন—এ কি মামদোবাজি। ওসব হবে টবে না। তুই বাড়ী যা, ওসব আমি

দেখব। —একথার ওপর আর কি কিছু বলা যায়?

বলা যায় না। অফিসেও সে পায় নি। বলবার সুযোগও আর রাখেন নি সুবোধ। বোঝা লোক। বাজনা দিতে নিজের কথা ভেবেছেন। বড় মাঠে ঘর তৈরিয়েছে। গবর্মেন্ট কম্পেনসেশন দিতে চায়। চার কাঠার জন্য আড়াই হাজার টাকা।

কিন্তু টাকাটা আদায় করতে গিয়ে জেরবার হয়ে গেল সে। সুবোধদাকে আর বার বলা যায় না। বাতে বাতব্যাধি। কষ্ট কেন তাঁর হাতে। আবার বয়স হয়েছে। আগের মত ছোটাছুটি করতে পারেন না। তার ওপর বাতে একেবারে পঙ্গু করে দিয়েছে। তাই সে নিজেই খোঁজ নিচ্ছে।

হাজ বেরোনোর পরদিনই সমস্ত অ্যাকুইজিশন অফিসের সেকেন্ডার নির্দেশ। এই কাটা পেশকার সেদিন আইনটা খুঁজিয়ে উঠল—বলি এটা কি বিলেত না আমেরিকা। কাল যায় বেরোল, আজই পেমেন্ট অর্ডার চান। মাস মাস মাস পড়ে থাকে আগে আজকেন।

এক মাস বাদে গিয়ে শুনল তার ফাইল পড়ে আছে মাপির সেকশনে। সেখানেও খোঁজ নিয়েছিল। তারা বলল—চিন্তা করবেন না। সময় হলেই আমরা পাঠিয়ে দেব।

সেই সময় আর আজও হল না। এতদিন ছোটাছুটির পর পেশকার বললেন, ফাইল এসেছে ঠিকই, তবে পেমেন্ট অর্ডার ফিরে গেছে এ জি বেঙ্গলে। কারণ কেউ পেমেন্ট নিতে নাকি আসে নি। এ কি কথা! কি মাস সে বলে নিতে এসেছে। ছুটোছুটিতেই তাকে ওরা বলছে ফাইল আসে নি। আর এখন দিব্যি বলছে যে, ফাইল এসেছে, পেমেন্ট নেওয়ার লোকের অভাবে অর্ডারটা কোথায় চলে গেছে! সুবোধদা বলে দিয়েছিলেন, তুই খোঁজ নিয়ে দেখিস। অর্ডারটা এলে পর আমি সই করে আদায় নেব। তারপর ট্রেজারীতে গিয়ে ভাঙিয়ে আস্ত টাকা পাইয়ে দেব তোকে। সেই ভরসাতেই কাল দুনে চকুর দিয়ের দিন সে স্থির করেছে—অথচ পেমেন্টের কোন পাত্তা নেই!

ব্যাপার কি বলুন তো সুবোধদা?—আড়াই মাইল পথ হেঁটে এসে কেমন হাঁফ ধরে গেছে। নাঁসা মোটা বুড়োলটার কপালে বসছে ঘাম, ঘাড়, গলার জমা ধুলো ঘাম মুছতে মুছতে হাঁফাতে হাঁফাতে সে জিজ্ঞাসা করে।

দুর্বল না—প্রবীণ উকীল খাটে শুয়ে শুয়েই বুঝিয়ে দেন ব্যাপারটা—কিছু চায়। না দিলে বার বার এ জি বেঙ্গল আর ন্যাশনাল সেকশন দেখাবে। আমি তো বাতে একরকম শয্যাশায়ী। এক মাস বিছানাতেই পড়ে আছি। তুই বরং কোন দালাল টালাল ধর। পেমেন্টের ফাইভ পারসেন্ট ছেড়ে দে, দেখবি তোকে আর কোথাও যেতে হবে না। অর্ডার-টর্ডার সবই বেরোবে। এ জি বেঙ্গলেও না, কোথাও না, অর্ডার ঐ সেকেন্ডখানাতেই আছে।

ফাইভ পারসেন্ট! —লোকটা কেন পিছিয়ে উঠল প্রস্তাব শুনে।

কি করবি বল। যে দেবতার পুজোর যে নিয়ম। না দিয়ে পার পাবি না। অনিল মুৎসুদ্দী খোঁজেন লোক। টাকা না দিয়ে ওর কাছ থেকে কাজ আদায় করতে স্বয়ং ভগবানও পারেন না তো আমরা কোন ছার। —বলতে বলতে বৃদ্ধ মানুষটার মুখে কেমন একটা হাসি ফুটে উঠল। তারপর জোর দিয়ে বললেন—তুই আর দালাল পাবি কোথায়? কাল আসিস। আমার মুহুরীকে বলে সব ঠিক করে রাখব। টাকা নিয়ে আসিস। দেখবি সব হয়ে যাবে।

সব হয়ে যাবে শুনে, উকীলবাবুকে প্রণাম জানিয়ে নীচে নেমে উঠে আসছিল লোকটা। সুবোধদার ডাক শুনে চৌকাঠে থমকে দাঁড়াল—হ্যাঁরে, এবার তো পেমেন্ট পাচ্ছিস। আমাকে কত দিবি? চমকে উঠল সে। কানে এল সুবোধদা বলছেন—এতদিন একা লড়লাম। তুই তো হাল ছেড়ে দিয়েছিলি। আমিই তো তোকে আড়াই হাজার টাকা পাইয়ে দিলাম। খরচ খরচা যা আমার কিছু লাগছে না, সে তুই দিতে পারবি না। শ পাঁচেক দিস তাতেই আমি খুশী হব।

ফাইভ পারসেন্ট মানে সোয়াশো টাকা পাঁচশো হল দিয়ে সোয়া ছশ। হাতে পাবে তাহলে পৌনে আঠারো শ। প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে দেড় হাজারের বেশী পাবে না। টেনেটুনে খরচা কম করেও লাগে চার হাজার। বাকীটা সে কোথায় পাবে? একবার কার্তিককে বললে না কি?

না, থাক। এতদিন সে একলাই টেনেছে, বাকীটুকুর জন্য মিথ্যেমিথ্যি কেন ভার চাপাবেন। কার্তিক যদি দুঃখের ওপর না বলে দেয়। পাত্রপক্ষ ওদিকে রেডি হয়ে আছে। যে করেই হোক কালদুয়েই বিয়েটা সে দেওয়াবে।

তার আগে সোয়াশ টাকা এখন কোথা থেকে জোগাড় করবে সে? কাল আসতে বলে দিয়েছেন সুবোধদা। মুহুরী দালাল ঠিক করে রাখবে। কার কাছে যাবে? কে দেবে ধার? ধারে ধারে মাথাটা বিকিয়ে গেছে। এখন বললে কি কেউ বিশ্বাস করবে যে চার কাঠা জমির দাম বাবদ আড়াই হাজার সরকারী পেমেন্ট পেয়ে সে শোধ দেবে। লোকে মনে করবে গল্প কথা। ধাপ্পা। পাশে আজ আর কেউ নেই যে দাঁড়াবে। বউমাটাও নেই। হাঁটতে হাঁটতে সে টের পেল পেরেকটা আবার মাথা চাড়িয়ে উঠেছে। বাঁকিয়ে হয়ে যাচ্ছে গোড়ালি। সবই তো ফুটো হয়ে গেল, একটু ফুটলেই বা। কিছু তো করার নেই। আর ঠিক তখুনি পান-দোকানের আয়নায় নিজেকে সে আবিষ্কার করল—কি অসম্ভব সাধারণ একটা লোক সে। সব চুল উঠে গেছে, চোখের কোণে কালি, গাল বসে গেছে, খোঁচা খোঁচা দাড়ি মুখময়। অথচ তেত্রিশ বছর আগে এই মুখটাই ছিল কি জীবন উজ্জ্বল, প্রাণবন্ত। স্বপ্ন দেখত তাঁর জেলার, বাড়ী করার—ছেলেমেয়ে বড় হবে। তারপর তাদের নিয়ে এক আলাদা আশ্চর্য জগৎ। আর আজ? —সব শেষ।

—অমিয়নন্দ

তুলসীচরিত

মনীষবিব চৌধুরী

(২০)

বরদাবাবুর খবর কিছু পাওয়া গেল অশোকের কাছে। মাথা খারাপ হয়েছে বলে অফিসের কর্তারা ছাড়িয়ে দিয়েছেন, একটা ব্যবস্থা করে। পুরনো লোক বলে হাজার তিনেক টাকা গ্র্যাচুইটি দিয়েছেন, তবে এক সঙ্গে দেননি, মাসে পঞ্চাশ টাকা করে দিতেন। ঐ টাকা বাদে আর ষাটটি টাকা আসত বড় ছেলে ও স্ত্রীর চাকুরি থেকে। ছেলেমেয়ের পড়াশোনা দূরের কথা পেট চলতে পারে না এই টাকায়। নেশার খরচ কিছু যেত এই টাকা থেকে, কাজেই অবস্থা অচল হয়ে উঠেছিল।

ফণীকে তার কারখানার ক্যান্টিনে কাজ দিয়েছিল অশোক। মাস দুই পরে ফণীর কাছে খবর পেলাম বরদাবাবুর অসুখ হয়েছে। বলল, বিছানা ছেড়ে উঠতে পারে না, দুধ আর আফিং ছিবড়ার খায়।

বললাম, চলো, তোমার বাবাকে দেখে আসি কি অসুখ হয়েছে। ওষুধপত্র খাওয়ানো দরকার।

ফণী বলল, না, আপনি যাবেন না আপনি গেলে লাঠি নিয়ে মারতে চাইবে। বাবার মাথা খারাপ হয়েছে। বিছানায় লাঠি রাখে, বলে আপনাকে মারবে, দিদিকে মারবে, মাকে মারবে। আমি বিছানার কাছে গেলে লাঠি তোলে মারবার জন্য, আমি সরে যাই।

বললাম, তোমার দাদাকে লেখো বাবার অবস্থা জানিয়ে।

লিখেছিলাম, পঁচিশ টাকা পাঠিয়ে লিখেছে ওষুধ কিনে দিয়ো।

পাড়ার ডাক্তারকে আজ বলব আমি, তাঁকে নিয়ে গিয়ে বাবাকে দেখাও, ওষুধ যা বলেন কিনে খাইয়ো, টাকা আমি দেব।

আপনি দেবেন কেন? বাবা জানতে পারলে—

বলো না বাবাকে, বলো ডাক্তার বাকীতে ওষুধ দিলেন।

ফণী আরও বলল, দিদির কাছে গিয়েছিলাম দুদিন আগে। বাবার অসুখের কথা শুনে আসতে চাইল।

বললাম, তোমার বাবার অসুখ বেড়ে যাবে দিদিকে আনলে, লাঠি হাতে তাড়িয়ে দেবেন হয়ত।

সে কথা বলেছিলাম আমি, তবু আসতে চাইল।

তোমার মা কি এসেছেন বাড়ীতে?

কাল এসে দেখে গিয়েছে। বাবা ঘুমোচ্ছিল, জানতে পারেনি।

কদিন পরে ফণীর কাছে খবর পেলাম ওষুধপত্র খেয়ে একটু ভাল আছেন বরদাবাবু।

একদিন ফণী বলল, ওষুধের দামটাম আপনি আর দেবেন না।

কেন বলো তো?

বাবার হাতে টাকা হয়েছে, আমাকে বেদানা, কমলালেবু কেনবার পয়সা দেয়, পেনসনের টাকা চাইলে মারতে আসে।

কোথা থেকে টাকা এল? তোমার দাদা পাঠিয়েছে?

দাদা সেই পঁচিশ টাকা পাঠিয়েছে, আর কিছু পাঠায়নি। মনে হয় ধার করেছে। দুজন লোক কদিন ধরে বাবার কাছে যাওয়া আসা করছিল।

তোমার দিদিকে দেখতে গিয়েছিলে? কেমন আছে?

ভাল আছে। পড়াশোনা করছে পরীক্ষা দেবে বলে।

বাড়ীতে আসতে চাইল না?

না। বাবার অসুখ ভাল হয়েছে, আপনি ওষুধের, ডাক্তারের টাকা দিচ্ছেন বলেছি।

দিন কেটে যেতে লাগল। নিজের কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকি, মাঝে মাঝে তুলসীকে দেখে আসি। না গেলে কান্নাকাটি করে, কর্তার মেয়েরা জানিয়ে দেয়। মনে একটু চিন্তা রয়েছে, পরীক্ষাটা হয়ে গেলে তুলসীকে কোথায় রাখব?

তুলসীর পরীক্ষার আর একমাস বাকী বরদাবাবুর মৃত্যু হল। স্ট্রোক হয়েছিল। দুদিন বেঁচে ছিলেন অজ্ঞান অবস্থায়। ফণীর কাছে শুনলাম বরদাবাবু বিছানায় বসে নোট গুণছিলেন। ফণী কি কাজে ঘরে ঢুকেছিল। লাঠি নিয়ে তাকে তাড়া করতে গিয়ে পড়ে যান।

ফণীকে পাঠিয়ে তার স্ত্রীকে আনতে হল, তুলসীকে নিজে নিয়ে এলাম। সত্যককে টেলিগ্রাম করলাম ফণীকে দিয়ে।

অদ্ভুত ব্যাপার, বরদাবাবুর বালিশের নীচে দুহাজারের মত টাকা পাওয়া গেল।

সত্য শ্রাদ্ধের আগের দিন পৌঁছল।

তার আগেই টাকার রহস্য পরিষ্কার হয়েছিল দুজন পাওনাদারের আবির্ভাবে। টাকা পাওয়া গিয়েছিল বাড়ীটা দ্বিতীয়বার বাঁধা দিয়ে। শোনা গেল দুজনের দাবি সুদে আসলে প্রায় আট হাজার।

সত্য শ্রাদ্ধ সেরে বাপের টাকার দেরাজ নিয়ে চলে গেল, বলল, দেনা শোধ দিয়ে বাড়ী রাখবার সাধ্য নাই তার, বেচবার চেষ্টায় নষ্ট করার মত সময়ও নাই।

এত সব ব্যাপারের পরেও সে পরীক্ষা দেবে তুলসী জানাল। বললাম, ফল খারাপ হবে, এবার নাই বা দিলে।

বলল অনার্স পেপার খারাপ হলে দেব না।

পরীক্ষা দিল, তার আগে আমাকে কদিন খুব খাটিয়ে নিল।

বাড়ী নিয়ে গোলমাল শুরু হল দুই পাওনাদারের মধ্যে। বাড়ীটা যাবে তাতে কোন সন্দেহ নাই, যে কদিন বরদাবাবুর স্ত্রী ছেলেমেয়েদের নিয়ে থাকতে পারেন থাকবেন। তারপর কি করবেন সে ভাবনা তাঁদের।

(২১)

অশোকের বন্ড ইমপ্লিমেন্ট।

আমার বাড়ীটা শেষ হয়ে এসেছে, এক-মাস পরে গৃহপ্রবেশ করব ভাবছি।

মাস্টারমশাইকে নিমন্ত্রণ করব, বরদা-বাবুর স্ত্রী, ছেলেমেয়ে দুটিকে বলব, আর কারখানার লোকজন সবাইকে বলব ঠিক করেছি।

একটা কথা মাথায় ঘোরাফেরা করছে অনেকদিন ধরে। আমার দুটি ছেলেই লায়েক হয়েছে, তারাই চালাচ্ছে কারখানার কাজ-কারবার। তাঁদের কাজে হস্তক্ষেপ করি না। করবার প্রয়োজনও হয় না। যেখানে আমার পরামর্শ নেবার দরকার তারা পরামর্শ নেয়। তাহলে আমার মধ্যে যে কর্মশক্তি রয়েছে তাকে অকেজো করে রাখছি কেন, নতুন একটা কাজে হাত দিতে পারি, এই হল আমার মনের কথা।

মাস্টারমশাইকে কথাটা বলব ভাবছি। তাঁর কাছে গিয়ে বসি মাঝে মাঝে। নানা রকমের কথা হয়। তাঁর কথা শুনতে ভাল লাগে। শুধু পণ্ডিত নন, জ্ঞানী লোক তিনি, হৃদয়বান মানুষ।

তুলসীকে মাঝেমাঝে দেখতে পাই তাঁর বাড়ীতে। আমি গেলে বলে, আসুন বড়বাবু, বসুন। একটু চা করে আনি আপনার জন্য। চা, বিস্কুট দিয়ে আসে। তুলসী ডাক্তারি পড়ছে। খরচ দিচ্ছেন মাস্টারমশাই। তুলসীর ছোট ভাই ক্যান্টিনে কাজ করছিল, তাকে কারখানার কাজে ঢুকিয়ে দিয়েছি বেশ চটপটে, চালাক ছেলে।

কথায় কথায় একদিন মাস্টারমশাই বললেন, দেখো অশোক, তুমি আমার ছাত্র ছিলে এখন বন্ধু হয়েছ। মন খুলে কথা বলা যায় তোমার সঙ্গে।

চুপ করে রইলেন কিছুক্ষণ, তারপরে বললেন, আমি একটা বিপদে পড়েছি।

বললাম, কি বিপদ বলুন, যদি আমাকে দিয়ে—

হেসে বললেন, ব্যস্ত হয়ো না আমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করবার জন্য। আমার বিপদ স্বখাত সলিলে পড়েছি। বেশীর ভাগ মানুষে তাই পড়ে, নতুন ব্যাপার কিছু নয়। সংসারের দায়দায়িত্ব আমার যাহোক মিটিয়ে দিয়ে আমাদের শাস্ত্রের ভাষায় বানপ্রস্থ নিয়েছি। সাদা কথায় রিটায়ার করেছি। হোম স্যাংচুয়ারী যাকে বলে পাওয়া শক্ত দেখে শহর থেকে সরে এসে এখানে মাথা গোঁজবার একটু জায়গা করতে হয়েছিল। ভুল করেছিলাম আজ হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছি। এই তুলসী মেয়েটি আমাকে ডুবিয়েছে।

বললাম, তুলসী তো খুব ভাল মেয়ে, আপনাকে ভক্তিশ্রদ্ধা করে।

বললেন, ভক্তি-শ্রদ্ধার ওপরে কোন লোভ নাই আমার। আমি সংসারত্যাগী মানুষ। একটা বোনকে কাঁধে নিতে হয়েছে তার কোন উপায় নাই দেখে। তুলসী কেন এসে জুটল? ওর জন্য বুড়ো বয়সে অনেক দুর্ভোগ পোয়াচ্ছি, আরও পোয়াতে হবে মনে হচ্ছে। বরদাবাবুর বাড়ীটা পাওনা-দারদের হাতে গেলে মা ভাইকে নিয়ে ও যাবে কোথায়? বরদাবাবুর বড় ছেলে যে ওদের ভার নেবে মনে হয় না আমার কাঁধে এসে চাপবে না কি তুলসী? তুমি আমাকে অনেক দিন থেকে জানো ঝঞ্ঝাট পছন্দ করি না আমি। কি গেরোর মধ্যে পড়ে গেলাম দেখছ না?

হেসে বললাম, তুলসীকে আপনি খুব ভালবাসেন মাস্টারমশাই। তুলসীর ভার আপনার ভার বলে মনে হবার কথা নয়। তুলসী আপনার কাছে থাকতে পারে। ওর মা, ভায়ের জন্য একটা ব্যবস্থা হয়ে যায় হয়ত।

কি ব্যবস্থা হবে?

ভেবে দেখি, তারপর বলব আপনাকে।

হেসে বললেন, তুলসীর ছোঁয়াচ তোমাকে লাগল নাকি অশোক?

বললাম, না, আমার চোখ রয়েছে ওর ছোট ভায়ের ওপরে, কাজের ছেলে হবে মণী।

বললেন, বেশ, ভেবে যা বলবে শোনবার অপেক্ষায় থাকব।

একটা সারপ্রাইজ দেব মাস্টারমশাইকে গৃহ প্রবেশের দিন। আমার স্ত্রী ছাড়া আর কেউ জানে না যে বরদাবাবুর বাড়ীটা আমি পাওনাদারদের দাবি মিটিয়ে কিনে নেব স্থির করেছি। একজনের টাকা দেয়া হয়েছে, দ্বিতীয় পাওনাদারকে কাল টাকা দেবার কথা আছে। অনেকটা জমি আছে, ছাড়তে পারলাম না। জমিটা আমি কাজে লাগাতে পারব, বরদাবাবুর পরিবার থাকবে বাড়ীতে।

(২২)

আমার বড় ইনস্টলমেন্ট।

কলেজ থেকে ফিরে আমাকে চা দিয়ে সামনে বসে চা খাচ্ছিল তুলসী, বকাবকি করছিলাম, বুড়ো জেঠামশাইকে খাওয়াবার জন্য টফি কিনে এনেছে ক'টা।

এমনি করে পয়সা নষ্ট করছিস, পয়সা আসে কোথা থেকে বল তো?

তোমার কাছ থেকে। একটু হেসে, কেমন এক রকম চোখের ভাব করে বলল।

দেখো বাপু—

অধর একখানা খাম এনে হাতে দিল। দেখলাম বিদেশী স্ট্যাম্প লাগানো, হাতের লেখা দেখে বুঝলাম দেবাশিস লিখেছে।

আমার হাত থেকে চিঠিখানা নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখল তুলসী, বলল, আমেরিকা থেকে কে তোমাকে চিঠি লিখেছে জেঠামণি, ডি ভাদুড়ী কে?

বললাম, খাঁচা ঘরে যে ছেলেটির ছবি রয়েছে সেটা ডি ভাদুড়ীর, মানে দেবাশিসের।

এখানে বলা দরকার এই ছবি ও আরও তিনখানা ছবি অশোকের কারখানার গুদাম ঘরে পড়ে থাকতে দেখে আমি চেয়ে নিয়েছিলাম। ছবিগুলো মিঃ ভাদুড়ীর বাড়ী থেকে সংগৃহীত হয়েছিল অশোক বলেছিল।

বললাম, দেবাশিস ভাদুড়ী আমার ছাত্র ছিল। সাত আট বছর বিদেশে রয়েছে ও।

সাত আট বছর? কি করছেন এতদিন?

ভাল মন্দ অনেক কিছু করছে, বেশীর ভাগ মন্দ।

তার মানে কি হল? বিদেশে পড়াশোনা করতে যাননি?

সবাই কি বিদেশে পড়াশোনা করতে যায়? বেড়াতে যায়, স্ফূর্তি করতে যায়, চাকরি করতে যায়। দেবাশিস পালিয়ে গিয়েছিল।

সে কি? পালালেন কেন?

সে অনেক কথা তুলসী, এখন থাক। কি লিখেছে এতদিন পরে পড়ে দেখি।

আচ্ছা, তুমি চিঠি পড়ো, আমি উঠলাম।

উঠলাম মানে মহামায়ার কাছে গিয়ে বসবে, গল্প করবে।

দেবাশিস লিখেছে, মাস্টারমশাই, আমার প্রণাম নেবেন।

আমার এখানকার কাজ এক রকম শেষ হয়েছে। বাকীটা দু'চার মাসের মধ্যে শেষ করে আনতে পারব আশা করছি।

একটা ফ্যাক্টরী ও রিসার্চ লেবরেটরীর ড্রাফট প্ল্যান শেষ করেছি, অভিজ্ঞ লোকদের সেটা দেখিয়ে, তাদের সঙ্গে আলোচনা করে সেটা পাকা করে নিতে হবে। এঞ্জিনীয়ারিং, টেকনোলজি, রিসার্চ, লেবর, প্রোডাকশন, এডভারটাইজিং, মার্কেটিং সব দিক দিয়ে স্টাডি করতে চাই জিনিসটাকে আমেরিকান এক্সপার্টদের সাহায্য নিয়ে।

ক্যাপিটালের কথাও ভাবছি। অনেক টাকার দরকার। এদেশের টাকাওয়ালাদের কিছু অংশ প্রাইভেট সেক্টরের আন্ডার-টেকিংয়ে টাকা খাটাতে অনিচ্ছুক নয়, পার্টির বোনাফাইডিজ সম্বন্ধে সন্দেহমুক্ত হলে। একটা জায়গায় আমার চেষ্টা সফল হয়েছে। মিসেস কে—মোটা টাকা দিতে রাজি হয়েছেন শেয়ারহোল্ডার হিসাবে, সর্ত দরকারী মালমশলার অন্তত অর্ধেকটা আমেরিকা থেকে কিনতে হবে। মানে আমেরিকার টাকার খানিকটা যেন আমেরিকায় ফিরে যায়। আশ্বাস দিয়েছেন আরও টাকা তুলে দেবেন তিনি।

আমাকে বললেন, আমি প্রথমে ভেবেছিলাম তুমি একটি হ্যানসম, চালবোল-ওয়ালা ইয়ং ইন্ডিয়ান, আমার কিছু টাকা খসিয়ে পালাবে, বুড়ী সঙ্গিনীকে কতদিন আর সঙ্গ দেয়া যায়? তুমি য়ুনিভার্সিটিতে পড়তে শুরু করা থেকে নজর রেখেছি তোমার ওপরে। ক্রমে বুঝলাম তোমার অভিপ্রায় এদেশ থেকে শিক্ষায় পাকা হয়ে দেশে ফিরে গিয়ে কিছু করতে চাও। তুমি স্ফূর্তিবাজ ছেলে বাট উইথ এ প্রিন্সিপল। তোমার মধ্যে ডেপথ আছে, তোমার একটা ক্যারেক্টার আছে, ভাল মাথা আছে, কেজো লোকদের স্বভাবসিদ্ধ একগুঁয়েমি আছে। যে পথে চলতে চাইছ তুমি আমি জানতাম সেই পথে চলবে।

স্বচ্ছন্দে আমার কাছে কাটাতে পারতে যতদিন খুশী, দু' চারটে কম বয়সের গার্ল ফ্রেন্ডদের সঙ্গে মেলামেশায় আপত্তি করতাম না, ওড়াবার জন্য টাকা চাইলে দিতাম। তুমি চেহারায় সুন্দর, তোমার আলাপ-আলোচনা খুব ভাল, ইন্টারেস্টিং, এক্সাইটিং, প্রোফাউন্ড উইজডমের কথা বলে ফেলো মাঝে মাঝে। আমি কৃতজ্ঞ তোমার কাছে।

বললেন, গো এহেড মাই বয়, তোমার কাজের জন্যে টাকা দেব, টাকা তুলে দেব, যতটা পারি সাহায্য করব।

একদিন একটা মজার কথা বললেন। কথাটা এই রকমের, তোমার সাহায্যে ইন্ডিয়াকে জানবার সুযোগ দেবার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি, আমার সাহায্যে আমেরিকাকে জানবার সুযোগ দেবার জন্য আমাকে ধন্যবাদ দাও তুমি।

দরকারী মাল সম্বন্ধে কথাবার্তা পাকা করে রওনা হতে আরও কিছু সময় লাগবে মনে হয়। আপনাকে একটা অনুরোধ করছি। ফ্যাক্টরী কোথায় করা যায় একটু খোঁজ খবর নেবেন। আপনার এখন কি-ভাবে চলছে জানি না। আপনি ভাল আছেন, আমাকে সাহায্য করবার জন্য ভাল থাকবেন বিশ্বাস করি মনে মনে।

নিজেরও কথা অল্প কিছু বলছি কাজের কথার পরে। নিজের কথা মানে আমার মধ্যে যে পরিবর্তন ঘটছে তার কথা। আমার বুদ্ধি সব জিনিসের আবরণ ছিঁড়ে কেটে তার ভেতরটা দেখতে চেয়েছে। সেক্স-মোরালিটি কোনদিন মানিনি তবে মোরাল কোড অব কনডাক্ট মেনেছি। সেক্স মোরালিটি না মানলেও ওয়াইল্ড লাইফের মধ্যে কখনও যাইনি, জিনিসটা অত্যন্ত ভালগার লেগেছে। এখন দেখছি একটা রেজিস্টান্স গড়ে উঠছে ভেতরে সেক্স

এপিলের বিদ্রূপে। মিসেস কে—চোখ কপালে তুলে প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে বার বার চান আমার দিকে আমার জন্য ইয়ং গার্ল ফ্রেন্ড আমদানি করবার চেষ্টায় আপত্তি জানালে। আপত্তির কারণ বোঝবার মত মাথা তাঁর নাই।

রওনা হবার ব্যবস্থা হয়ে গেলে খবর দেব।

(২০)

অশোকের সপ্তম ইনস্টলমেন্ট।

ক'দিন একটা ফালতু কাজে ব্যস্ত ছিলাম। মাস্টারমশাইকে আমার নতুন কাজের কথাটা খুব সংক্ষেপে বলেছি মাত্র, ভাল করে বুঝিয়ে বলে পরামর্শ চাইব ভাবছি ক'দিন থেকে, সময় করে উঠতে পারিনি।

ফালতু কাজ হচ্ছে পাড়ায় যে ছোট মেয়েদের স্কুল সেটাকে কিছু বড় করে স্কুল ফাইন্যাল পর্যন্ত পড়াবার ব্যবস্থা করবার কাজ। বারো বছর পর্যন্ত ছেলেরাও পড়বে। শ্রীমতী অপরাজিতা দেবী, বি-এ, বি-টি স্কুলের হেড মিসট্রেস নিযুক্ত হয়েছেন। ইনি বরদাবাবুর বিধবা। গেল বছর বি-টি পাশ করে কলকাতার একটা মেয়ে স্কুলে চাকুরি করছিলেন। বেতন চেষ্টা করেও দেড়শো টাকার বেশী দেয়া চলে না এখন, পরে দেয়া যাবে হয়ত।

আমার স্ত্রী বললেন, নিয়োগপত্র পেয়ে ভদ্রমহিলা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। তাঁকে বলেছেন আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাবেন আপনার স্বামীকে, নিজের মুখে বলতে লজ্জা করবে তাই আপনাকে বলছি।

স্কুলের জন্য আর দু'টো ঘর দরকার, ফার্নিচার দরকার, লাইব্রেরী দরকার। গভর্নিং বডির মেম্বারদের সঙ্গে মিলে এগুলোর ব্যবস্থা করছিলাম।

রবিবার সকালে চা খেতে খেতে ভাবছিলাম আজ মাস্টারমশায়ের কাছে যাব। তুলসী আসছে দেখলাম।

আমার বসবার ঘরের পাশে একটা ছোট বাগান আছে, ক'টা গোলাপ গাছ আছে বাগানে। আসতে আসতে বাগানের পাশে দাঁড়াল তুলসী, আমার দিকে তাকাল, তারপর বাগানে ঢুকে মার্শাল নীলের ঝাড় থেকে একটা ফুল ছিঁড়ে নাকের কাছে ধরল।

ফুল হাতে আমার সামনে এসে বসল, বলল, বড়বাবু, একটা ফুল চুরি করলাম আপনার বাগান থেকে।

বললাম, আমি তাকিয়ে দেখছিলাম, একে চুরি করা বলে না।

হেসে বলল, কি বলে তাহলে?

বলো ফুল নেয়া।

হাসতে লাগল।

বললাম, বসো তুলসী চা খাও।

যাব ভেতরে গিয়ে, আপনাকে একটা কথা জানাতে এলাম। জেঠামণি আপনার খোঁজ করছিলেন। পারলে, আজ যাবেন।

বললাম, আমিও ভাবছিলাম আজ যাব। তিনি ভাল আছেন?

ভাল আছেন। কোন একটা ব্যাপার নিয়ে ভাবছেন ক'দিন থেকে দেখছি।

আধ ঘণ্টার মধ্যে আমি যাচ্ছি কাজ সেরে। তুলসী, অনেক অব্যবস্থার মধ্যে স্কুলের কাজ চালাতে তোমার যার হয়ত কিছু অসুবিধা হচ্ছে—

বড়বাবু, ও সব কথা বলবেন না। আপনার মত ভাল লোক হয় না, জেঠামণির ছাত্র কিনা আপনি। মা খুব খুশী হয়েছেন এই কাজ পেয়ে, কাজ করতে ভালবাসেন তিনি। আপনার অনেক প্রশংসা করেছে জেঠামণির কাছে, আপনাকে কি বলব বলুন।

বললাম, কিছু বলতে হবে না, ভেতরে যাও তুমি।

তুলসী ভেতরে গেল, কিছুক্ষণ পরে আমিও মাস্টারমশায়ের বাড়ীর দিকে রওনা হলাম।

নতুন খবর দিলেন মাস্টারমশাই।

বললেন, ইস্ট ইন্ডিয়া করপোরেশনের মিঃ ভাদুড়ীর ছোট ছেলে দেবাশিসকে চিনতে তুমি?

বললাম, আমি কাজে যোগ দেবার আগে তিনি বাইরে চলে গিয়েছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে দু'চারটা কথা লোকের মুখে শুনেছি। তেমন কমপ্লিমেন্টারী নয়।

হাসলেন মাস্টারমশাই, বললেন, তা জানি। প্রায় তিন বছর দেবাশিসের প্রাইভেট টিউটর ছিলাম আমি। আমার কাছে পড়তে পড়তে সে বিলাতে চলে যায়।

সাত আট বছর বাইরে ঘুরছে। শেষ পাঁচ বছর আমেরিকায় পড়াশোনা করছে। ভাল দু'চারটে ডিগ্রি পেয়েছে, চাকুরি করছে য়ুনিভার্সিটির রিসার্চ বিভাগে। তার পড়াশোনার বিষয় ড্রাগস, কেমিকেলস, ফার্মাসিউটিস ইত্যাদি। দেশে ফিরে একটা ফ্যাক্টরী ও রিসার্চ লেবরেটরী করবে জানিয়েছে। প্ল্যান তৈরী করেছে ওখানকার এক্সপার্টদের সঙ্গে পরামর্শ করে, ক্যাপিটেল সংগ্রহ করবার চেষ্টা করছে। ও যা ছেলে মাথায় যখন এই স্কীম ঢুকেছে কিছু একটা করবে।

তাই ভাবছিলাম ওর চিঠি পাবার পর থেকে। আর তিন চার মাসের মধ্যে দেশে ফিরে আসবে।

কিছুক্ষণ চুপ করে ভাবলেন, তারপর বললেন, তোমার নুতন কাজের কথা যা বলেছ সেটাও ঐ। তোমার ব্যবসায়ের অভিজ্ঞতা আছে, ড্রাগস, কেমিকেলস্ নিয়ে কাজ করবার অভিজ্ঞতা নাই। দেবাশিস থিওরেটিকেল ও প্র্যাকটিকেল জ্ঞান সংগ্রহ করেছে আমেরিকার মত অতি এডভান্সড্ দেশে। আমি বলি কি ও না ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করলে তোমার চলবে কি? দেশে ফিরলে কথাবার্তা হোক তোমাদের মধ্যে, ভালো মনে করো যদি যোগ দেবে ওর সঙ্গে, নইলে স্বাধীনভাবে নিজে কাজ আরম্ভ করবে।

বললাম, তিনি কি যোগ দিতে বলবেন আমাকে?

সে কথা বলব তাকে। না বলবার কোন কারণ এখন চোখে পড়ছে না। না বলে তো তোমার কাজের স্বাধীনতা তো যাচ্ছে না।

বললাম, আচ্ছা, আমি অপেক্ষা করতে রাজি আছি।

চা খাবে অশোক? তুলসী, ও তুলসী!

দেখে বললাম, তুলসীকে আমার বাড়ীতে দেখলাম। সে খবর দিল আপনি ডেকেছেন।

বললেন, রবিবারে সকালে তুলসী আসে, সারাদিন থাকে। ভুলে গিয়েছিলাম আজ আসেনি। বসো একটু, আমি বলে আসছি।

চা খেয়ে এসেছি মাস্টারমশাই।

তা হোক, আর একবার খাও।

মাস্টারমশাই উঠছেন দেখা গেল তুলসী ঘরে ঢুকছে। বসলেন তিনি।

বারান্দায় উঠে এল তুলসী, হাতে ক'টা গোলাপ। আমার দিকে চেয়ে হাসল। দু'টো ফুল মাস্টারমশায়ের পায়ের কাছে রেখে প্রণাম করল, বলল, এ দু'টো দিদিমাকে দিয়ে আসছি।

মাস্টারমশাই গম্ভীর মুখে বললেন, আমাকে ঠাকুর বানিয়ো না তুলসী ঠাকরুন, আমি মানুষ।

ঠাকুরকে মানুষের মধ্যে পাওয়া যায় তুমি জানো না কি জেঠামণি?

তুমি বললে তাই জানলাম।

বাজে কথা। তুমি তো বলেছ যার মধ্যে যতটুকু ভাল আছে সেই ভালটুকু আশ্রয় করে ঠাকুর থাকেন।

মনে নাই বলেছি। এখন এক কাপ চা এনে দাও তো অশোককে।

আমার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে তুলসী ভেতরে গেল।

মাস্টারমশাই বললেন, দেবাশিসের কথা আর একটু শোন। কয়েকটি বছর প্রাইভেট টিউটরী করেছিলাম জানো বোধ হয়। অদ্ভুত রকমের মন্দ ছাত্রছাত্রী জুটেছে বরাতে। মন্দ কথাটা না বলে উদভ্রান্ত বলা যায়। কিসের জন্য কি এরা করছে সে বোধ ছিল না। যদি মন্দ কথাটা ব্যবহার করতে চাও তাহলে বলব এদের মধ্যে দেবাশিস ছিল সেরা মন্দ। অথচ ভাল হবার প্রচুর উপকরণ তার মধ্যে ছিল। আমার কাছে পড়তে পড়তে সে যোগ্যতর মন্দ হয়ে ওঠে, তার কুকাজের কথা মুখে আনা যায় না। কোনদিন উপদেশ দিইনি তাকে, কিছু ফল হত না জানতাম। আমার বিশ্বাস ছিল সাময়িক উদভ্রান্তি কাটিয়ে একদিন সে সুস্থ মানুষ হয়ে উঠবে হয়ত। তা যদি হয় তাহলে ও-ছেলের জুড়ি মিলবে না সহজে, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিতে, অধীত বিদ্যার পাণ্ডিত্যে, কর্মনিষ্ঠায়, সাধুতায়। আমার বিশ্বাস কতদূর ঠিক বলতে পারছি না। তবে চিঠিপত্র থেকে মনে হয় জীবনে হয়ত পথ খুঁজে পেয়েছে দেবাশিস।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বললেন, সে এসে পড়লে আমি বুঝতে পারব অবশ্য, তোমার অসুবিধে হতে পারে এমন কোন—

বাধা দিয়ে বললাম, আমার মনে কোন ইতস্তত ভাব নাই মাস্টারমশাই আপনার পরামর্শ আমি সর্বান্তঃকরণে মেনে নিয়েছি।

হেসে বললেন, বেশ।

তুলসী চায়ের কাপ হাতে নিয়ে আমাদের আলাপ শুনছিল। কথা থামতে এগিয়ে এসে চা দিল আমাকে। মাস্টারমশায়ের দিকে ফিরে বলল, তোমার সেই আর্টিকেল ছাপা হয়ে আসছেন নাকি?

তাই তো লিখছে মাস্টারমশাই বললেন।

তুলসী বলল, ভেতরে চিঠি লিখেছিল জবর মত হয়েছে তাই নিয়ে পড়তে বসে রান্না করতে যাচ্ছিলেন, আমি লুকিয়ে দিয়ে এলাম। তোমার জন্য তুমারের খোঁজ ছাড়া আর কি খবর বলো।

তুলুদের কোনটাও তোমার হাতে ছাড়াও উচিত হবে না, তুলসী আর কি করবে? অন্য পাড়ার থেকে কি আনন্দ দেখি চাকরী।

তাও তোমাকে দেওয়া হবে না। তোমাকে কিছু বলতে যাওয়া ভুল হয়েছে।

হাসলেন মাস্টারমশাই, জবাব দিলেন না।

তুলসী ভেতরে চলে গেল। একটু পরে বিদায় নিলাম তাঁকে প্রণাম করে।

(২৪)

আমার সপ্তম ইনস্টলমেন্ট।

মহামায়া খবর দিল তুলসীর মা এসেছেন, কিছু বলতে চান।

ভেতরে যেতে প্রণাম করে তুলসীর মা আমার কাছে দাঁড়িয়ে বসলেন। বললেন, দুটো কথা জানাবার জন্য এসেছি।

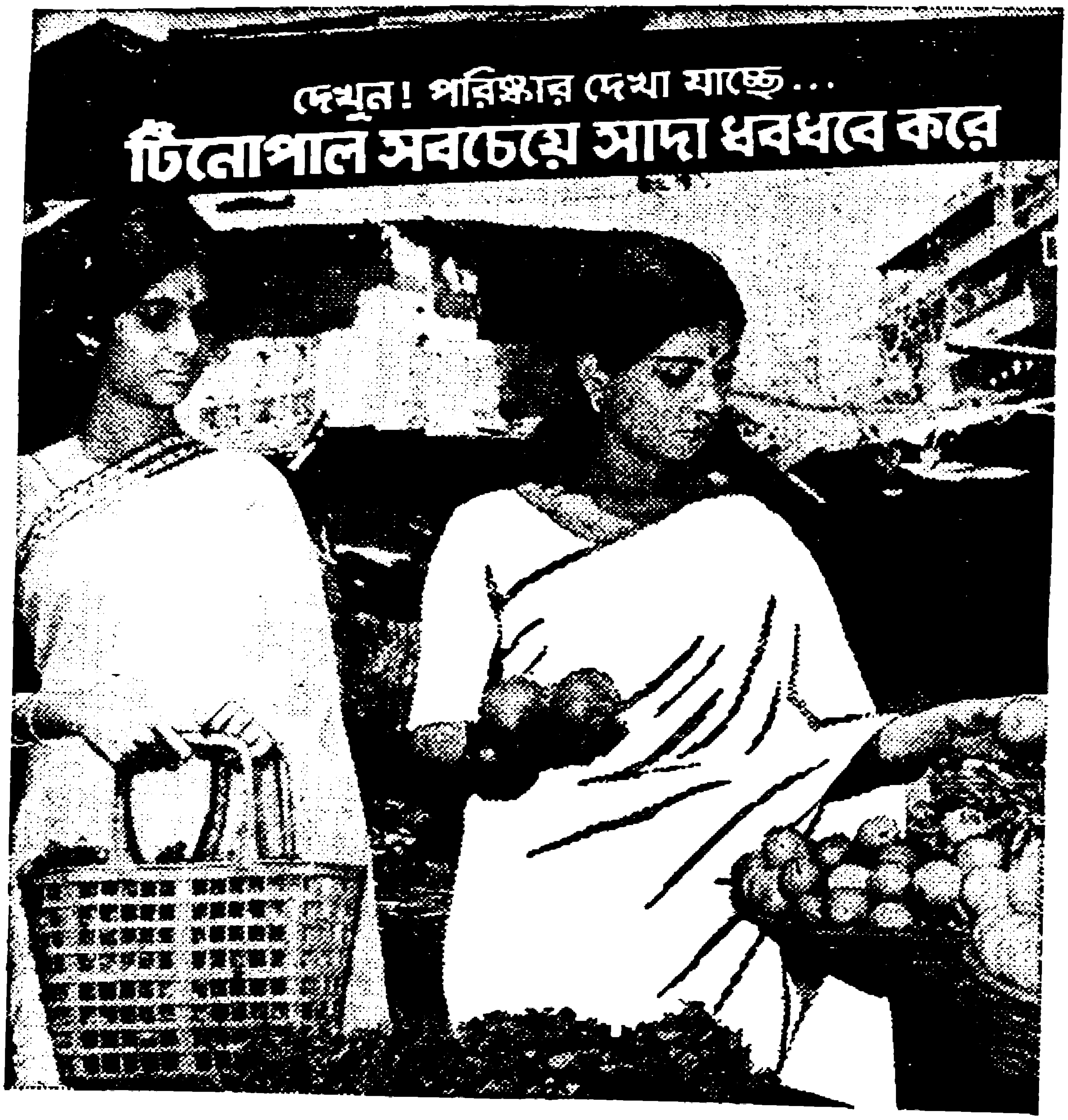

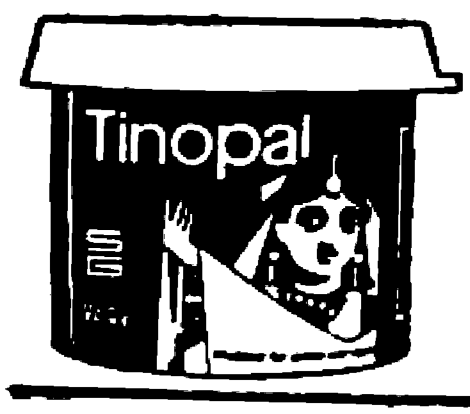

পরীক্ষা করে দেখা গেছে! সামান্য একটু টিনোপাল শেষবার ধোবার সময় দিলেই কি চমৎকার ধবধবে সাদা হয়— এমন সাদা শুধু টিনোপালেই সম্ভব। আপনার শার্ট, শাড়ী, বিছানার চাদর, তোয়ালে—সব ধবধবে!

আর, তার খরচ? কাপড়পিছু এক পয়সারও কম! টিনোপাল কিনুন —রেগুলার প্যাক, ইকনমি প্যাক, কিংবা "এক বালতির জন্যে এক প্যাকেট"!

Ⓡ টিনোপাল—সে আর গাইগি এস এ, বাসল, সুইজারল্যান্ড-এর রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক।

সুহৃদ গাইগী লিঃ, পোষ্ট ব্যাগ বক্স ১১০৫০, বোম্বাই ২০ বি. আর.

HPMA

বলুন।

সতার একটা চিঠি পেয়েছি। লিখেছে, এই মাসের শেষের দিকে আমি বিয়ে করছি। খবরটা দিলাম শুধু, এ বিয়েতে তোমাদের আসতে বলতে পারছি না নানা কারণে। তুলসীর ব্যবহারে খুব আঘাত পেয়েছিলাম মনে। আমার বিশ্বাস বাবার অকালমৃত্যুর জন্য তুলসী খানিকটা দায়ী।

তারপর লিখেছে, খবর পেলাম বাড়ীটা নেলামে হয়েছে এবং তোমরা বাড়ীতে বাস করছ। বাড়ীতে আমারও অংশ আছে। আমি আমার অংশ বিক্রি করতে ইচ্ছুক। তোমরা যদি কিনতে ইচ্ছা করো কি দাম দিতে তোমরা প্রস্তুত আমাকে জানালে ভাল হয়। তোমরা কিনতে ইচ্ছুক না হলে অন্য খদ্দেরের খোঁজ করতে হবে।

বললাম, আর কিছু লিখেছে?

মাথা নেড়ে জানালেন না।

কিছুক্ষণ ভাবলাম। তারপর বললাম, সতাকে লিখে দিন বাড়ী সম্বন্ধে ভুল খবর পেয়েছ তুমি। দেনার দায়ে বাড়ী বিক্রি হয়েছে, যিনি কিনেছেন দয়া করে তিনি কিছুদিন থাকতে দিয়েছেন, যখন বলবেন বাড়ীর দখল ছেড়ে দিতে হবে।

আর একটা কথা আছে, তুলসীর মা বললেন। তুলসীর বিয়ের বয়স হয়ে গিয়েছে। টাকা নাই আর আপনার দয়ায় ডাক্তারি পড়ছে, তাই এতদিন এ কথা ভাবিনি। একজন ডাক্তার, সরকারী চাকুরি করেন, নিজের বাড়ী আছে, তুলসীকে বিয়ে করতে চান। তুলসী তাঁর ছাত্রী বলে তুলসীকে কোন কথা বলেননি, আমার কাছে লোক পাঠিয়েছিলেন। লোকটি জানাল এক পয়সা লাগবে না।

বললাম, আপনি তুলসীর মা, আপনার ভাল মনে হলে চেষ্টা করতে পারেন।

বললেন, আপনার মত না পেলে—

হেসে বললাম, তুলসীর মত বলুন। তার সঙ্গে কথা বলুন, সে রাজি হলেই হল।

আপনি যদি একটু বলেন তুলসীকে—

আমার বলবার সময় আসেনি। তুলসীর মত জানুন, ডাক্তারি পাশ করবার আগে ভাল, অবস্থাপন্ন ছেলে পাওয়া গেলে সে বিয়ে করতে রাজি আছে কিনা। সে রাজি থাকলে আমি ছেলেটির সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নিয়ে আপনাকে জানাব, দরকার হলে তুলসীকে বলব।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি বললেন, আচ্ছা তুলসীকে বলব।

আমায় প্রণাম করে উঠে মহামায়ার ঘরে গেলেন।

ভাবতে ভাবতে বাইরে এসে বসলাম। তুলসীর বিয়ের কথা এই প্রথম উঠল। আগেই উঠতে পারত, কারণ মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে মা'র একটা বড় কথা। জানি না কোনরূপে ভোলাবে বিয়ের কথা তুলসীর মাথায় আসে কিনা। তার নিজের বাড়ীর অভিজ্ঞতা ভাল নয়, কেরিয়ার হিসাবে বিয়েকে একটা পথ মনে করে দেখবার অনুকূল নয়। সে জন্য ডাক্তারি পাশ করে আর্থিক স্বাধীনতা লাভ করতে চায়। তার চরিত্রে খানিকটা স্বাধীনতা-প্রিয়তা আছে। মা বিয়ে দিয়ে মেয়ের সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হতে চাইতে পারেন, এটা স্বাভাবিক, কিন্তু তুলসী কি চট করে রাজি হবে? মনে হয় না।

একটা জিনিস আছে তুলসীর স্বভাবে। স্বভাব ও চরিত্র এক জিনিস নয়। ইমোশনাল টাইপের মেয়ে তুলসী, ভালবাসতে চায়, ভালবাসা পেতে চায়। এ চাহিদা মেটবার আশ্বাস যেখানে আছে সেখানে সে কি করবে বলা শক্ত।

তুলসীর বিয়ে এখুনি যে হচ্ছে তা নয়, তবু একটা কথা মনে এল। ধরো তুলসীর পছন্দমত বিয়ে হল, সে স্বামীর ঘর করতে গেল, এখানে এসে দু' এক সপ্তাহ পরে পরেও দেখা দিয়ে যাওয়া সম্ভব হল না, ধীরে ধীরে তার মধ্যে পরিবর্তন ঘটতে লাগল, তার জেঠামণি ডাকের মধ্যে যে মধু আছে ডাইলিউটেড হয়ে হয়ে টিউবওয়েলের জলের মত হয়ে আসল, তার আদর কাড়বার প্রক্রিয়াগুলো আড়ষ্ট অভিনয়ের পর্যায়ে নামতে নামতে যবনিকার অন্তরালে চলে গেল, তার—

হেসে উঠলাম নিজের মনে। এই কথা? তা হলে বলো, তুলসী ছোটই থাকুক, দুঃখ পেলে তোমার কোলে মাথা রেখে কাঁদবে, আনন্দ হলে গলা জড়িয়ে ধরে ঘাড়ে পিঠে চুমো খাবে। তোমার জামা-কাপড় গুছিয়ে রাখবে। জুতোগুলোর ব্রাশ চালিয়ে পরিস্কার করবে, টেবিলের, সেলফের বইয়ের ধুলো ঝেড়ে, ফুলদানিতে ফুল গুছিয়ে রাখবে, শরীর ভাল নয় শুনলে মাথা টিপে, পা টিপে দেবে, ইলেকট্রিক পাখার ঠাণ্ডা লাগবে বলে হাতপাখা চালাবে—

হ্যাঁ, বলো তাহলে ও তুলসী, আর বড় হোসনে, যতটা বড় হয়েছিস সেটা বেশ বাড়াবাড়ি হয়ে গিয়েছে, কিছুটা বোকে, অনেকটা বোকে না এ রকম বয়স তোকে ভাল মানায়। কেন সেই বয়সের খুঁটি আঁকড়ে রইলি না?

বয়স হলে, ডাক্তারি পড়লে কি হবে, তুলসীর বুদ্ধি পাকেনি, ডাসাও হয়নি।

এক শনিবার বিকেলে এসে বলল, এখানে থাকব রাতে মাকে বলে এসেছি।

সন্ধ্যার পরে গল্প হচ্ছিল তিনজনের মধ্যে, আমি, মহামায়া, তুলসী।

গল্পের মধ্যে তুলসী এক সময়ে বলল, পিসীমা, রুণী আমার ছোট কিন্তু খুব কাজের, খুব ভারিক্কি হয়েছে, রাতের বেলাতেও তার গল্প করবার সময় হয় না। আমি যদি মন্তর জানতাম জেঠামণিকে ছোট খোকা বানিয়ে দিতাম, আমি ছোট খুকি হতাম। সারাদিন দুজনে ছুটোছুটি খেলা করতাম, গাছে চড়ে পেয়ারা পেড়ে খেতাম, তোমাকে লুকিয়ে পশ্চিম দিকের ডোবায় সাঁতার কাটতাম। আড়ি হত, ভাব হত দিনের মধ্যে দশ কুড়ি বার। রাতে গল্প করতে করতে তোমার দু'পাশে দুজন শুয়ে ঘুমোতাম।

বললাম, খোকা বড় হতে থাকলে?

আমিও বড় হতাম। দুজনে এক সঙ্গে স্কুলে যেতাম, বাড়ী ফিরে এক সঙ্গে খেলা করতাম, খেতাম।

আড়ি ও ভাব হত না?

সে তো হতই। ঝগড়া হলে পিসীমার কাছে নালিশ করতাম। সে করত, আমিও করতাম।

আরও বড় হলে?

তখন দুজনে কলেজে পড়তাম। সে আমার কলেজের গেটের পাশে দাঁড়িয়ে থাকত, আমাকে নিয়ে বাড়ী আসবার জন্য। ডালমুট কিনত সে, খেতে খেতে বাড়ী ফিরতাম।

মহামায়া বলল, তারপর তোর বিয়ে হয়ে গেল, দুজনের ছাড়াছাড়ি হত তো?

হেসে তুলসী বলল, ছাড়াছাড়ি হবে কেন? আমি ওকে ভালবাসতাম, ওকেই বিয়ে করতাম।

হেসে মহামায়া বলল, এমন মন্তর কোথায় পাবি তুলসী?

তারপর বলল, তুই বড় হয়েছিস, এবার তোর বিয়ে দিতে হবে। তোর মা একটি ডাক্তার ছেলের খবর পেয়েছেন—

মুখ গম্ভীর হল তুলসীর। একটু পরে হাসতে লাগল। বলল, ভারি মজার লোক পিসীমা এই ডাক্তারবাবু। ইন্টারেষ্টিং করে তাকান বার বার ক্লাসে পড়াবার সময়, বাইরে দেখা হলে।

জেঠামণির দিকে তাকিয়ে পিসীমাকে দেখাল কি রকম ইন্টারেষ্টিং করে ডাক্তারবাবু তার দিকে তাকান।

মহামায়া বলল, তোর পছন্দ হয়েছে মনে হচ্ছে। তোর মাকে বলব সম্বন্ধ করতে?

জেঠামণি টাকা খরচ করে ডাক্তারি পড়াচ্ছেন ডাক্তারিটা পাশ করতে দাও। নিজে এত কষ্ট পেয়েছেন মা তবু বুদ্ধি হল না। দাঁড়াবার জায়গা নাই, যা পান তাতে পেট চলে না এ বাজারে।

বললাম, রুণী তো রোজগার করছে।

বলল, হ্যাঁ, রোজগার করছে, দাদাও রোজগার করছে। রুণীর রোজগার একটু ভাল হলে দাদার মত সরবে দেখো। মার বয়স হচ্ছে, স্কুলের চাকুরি গেলে একমুঠো ভাত জুটবে না। আমি ডাক্তার হয়ে বেরোলে মার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হব। আমার সম্বন্ধেও। তোমার কাছে পড়বার খরচ নিচ্ছি এমনি এমনি নাকি?

বুঝলাম, তুলসীর বুদ্ধি একদিকে পাকেনি অন্যদিকে পাক ধরেছে।

বাইশ বছর বয়সে তুলসীর বুদ্ধি এ রকম কাঁচা-পাকা রয়েছে। হয়ত এইটে স্বাভাবিক ঐ বয়সে। তবু মনে হয় তুলসীর স্বভাবে কাঁচার ভাগটা বেশী।

(ক্রমশঃ)

টো হো আই (ভিয়েতনাম)

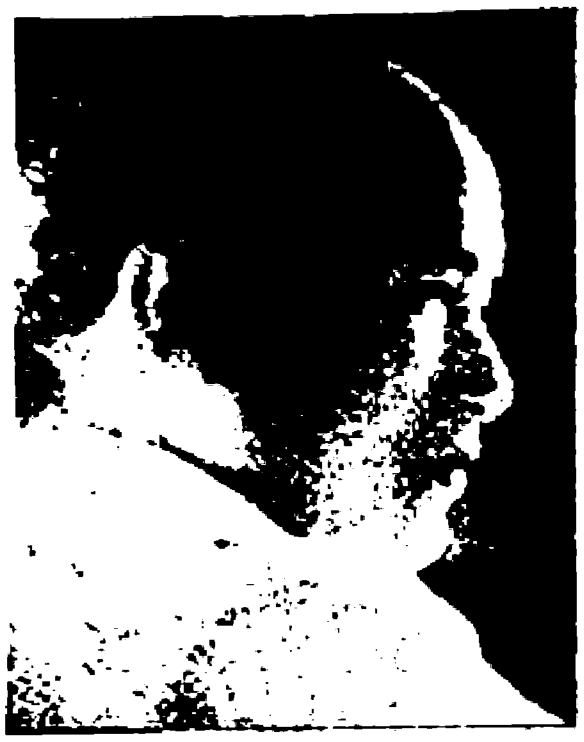

ডঃ নগেন্দ্র (ভারত)

ডঃ আগস্টিনো নেটো (অ্যাঙ্গোলা)

চতুর্থ আফ্রো-এশীয় লেখক সম্মেলন

এশিয়া এবং আফ্রিকা—পৃথিবীর দুই বৃহত্তম প্রতিবেশী দেশ। প্রাচীনতম ঐতিহ্যকে ধারণ করেও এই দুই মহাদেশ ঔপনিবেশিকতার শিকারে পরিণত হয়েছিল একদিন। বিগত চারশত বছরের এই ঔপনিবেশিক লুণ্ঠনের ইতিহাস। কিন্তু আজ এশিয়া ও আফ্রিকার অধিকাংশ দেশই সেই ঔপনিবেশিক শোষণের শৃংখল ছিন্ন করে এগিয়ে এসেছে। আর কোথাও কোথাও চলছে তাকে ছিন্ন করার সংগ্রাম। একদিক থেকে মানবিকতার এই বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে অবস্থান করা সত্বেও এই দুই মহাদেশের মানুষদের মধ্যে যোগাযোগ তেমন উল্লেখ্য নয়। আমরা ইউরোপ বা আমেরিকার শিল্প-সাহিত্য সম্বন্ধে যত জানি, তার সামান্য অংশও এশিয়া এবং আফ্রিকার বিভিন্ন সাহিত্য, ভাষা শিল্প ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে জানি না। এই অবস্থা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে এবং আফ্রো-এশীয় সংহতিকে দৃঢ়তর করবার মানসে আফ্রো-এশীয় লেখক সম্মেলনের আয়োজন। এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। গত ১৬ থেকে ২০ নভেম্বর নতুন দিল্লির বিজ্ঞানভবনে অনুষ্ঠিত হল চতুর্থ আফ্রো-এশীয় লেখক সম্মেলন। এত বড় সাহিত্য সম্মেলন এর আগে ভারতে হয়নি। এশিয়া ও আফ্রিকার প্রায় চারশত লেখক এই সম্মেলনে যোগদান করেন। এছাড়াও ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি কয়েকটি দেশ থেকেও কয়েকজন লেখক উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া যোগ দিয়েছিলেন ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে প্রায় তিনশতাধিক কবি-লেখক।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

সম্মেলনের আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন হয় ১৬ নভেম্বর সকাল ৯টায় বিজ্ঞানভবনে। উদ্বোধন করেন সাহিত্য আকাদেমির সভাপতি ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

অ্যালেক্স লাগুমা (দক্ষিণ আফ্রিকা)

মাদাম জুলফিয়া (সোভিয়েত)

মাহমুদ দারবিশ (প্যালেস্টাইন)

CENTRAL LIBRARY

তাঁর সুদীর্ঘ ভাষণে তিনি বলেন—"এই সম্মেলনের সঙ্গে আমার যোগাযোগ দীর্ঘদিনের। পূর্ববর্তী দুটো সম্মেলনে আমি যোগ দিয়েছি। আমার এই আগ্রহের কারণ, এই সম্মেলন এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের জাতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির উন্নয়নে বদ্ধপরিকর।' ভারতীয় কার্যকরী সমিতির সম্পাদক ডঃ মুল্করাজ আনন্দ সাংগঠনিক বিবৃতি দিয়ে বলেন—"একদিকে থেকে আমরা গর্বিত এই কারণে যে, এই সম্মেলনের সূত্রপাত এই ভারতেরই যমুনা-তীরে। ১৯৫৬ খৃঃ যে এশীয় লেখক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল এখানে, তাই আজ বিরাট মহীরুহ হয়ে চতুর্দিকে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করেছে।" সম্মেলনের মূল সম্পাদক মিশরের প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক ইউসুফ এল সেবাই বেইরুটে অনুষ্ঠিত সম্মেলন থেকে এই সম্মেলন পর্যন্ত সময়ের বিভিন্ন সাংগঠনিক দিক পর্যালোচনা করে ভাষণ দেন। তিনি বলেন—"ঔপনিবেশিক শোষণ ক্রমশঃ ক্ষীণতর হচ্ছে। এশিয়া ও আফ্রিকার লেখকদের এই সময়-চেতনাকে তাঁদের লেখার মধ্যে ফুটিয়ে তুলতে হবে। লেখকদের দায়িত্ব মুক্তিযোদ্ধাদের চেয়ে কম নয়।"

সম্মেলনের শুভ কামনা করে ভারতের রাষ্ট্রপতি শ্রী ভি ভি গিরি, রাশিয়ার কম্যুনিস্ট পার্টির সম্পাদক লিওনিদ ব্রেজনেভ, মিশরের রাষ্ট্রপ্রধান ডঃ আনোয়ার সাদাত প্রমুখ সুদীর্ঘ বাণী পাঠান। সম্মেলনে এগুলি পাঠ করা হয়।

লোটাস পুরস্কার বিতরণ

ঐদিন সন্ধ্যায় এক মনোজ্ঞ পরিবেশে ১৯৬৯ খৃঃ ও লোটাস পুরস্কার বিজয়ীদের পুরস্কার প্রদান করা হয়। পুরস্কারপ্রাপ্তদের মধ্যে উত্তর ভিয়েতনামের প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক তো হোয়াই, দক্ষিণ আফ্রিকার লেখক আলেক্স লাগুমা, প্যালেস্টাইনের কবি মহমুদ দারবিস, রাশিয়ার প্রখ্যাত মহিলা কবি জুলফিয়া এবং ভারতের বচন উপস্থিত ছিলেন। অ্যাঙ্গোলার কবি ও নেতা আগস্টিনো নেটো উপস্থিত থাকতে পারেন নি। পুরস্কার প্রদান করেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। শ্রীমতী গান্ধী এক অসাধারণ ভাষণে এশিয়া এবং আফ্রিকার মধ্যে শিল্পী সাহিত্যিকদের আরো নিকটতর হবার গুরুত্বের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন—"এখনও এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে ইংরেজ, আমেরিকান বা ফ্রেঞ্চ লেখকদের বই পঠিত হয়। সেগুলি যত বস্তুনির্ভরই হোক না কেন, তাঁদের জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গী থেকে মুক্ত নয়।" তিনি সোজাসুজি প্রশ্ন করেন, এই দুই মহাদেশের ব্যাপারে তৃতীয় গোষ্ঠীর অনুপ্রবেশ সুস্থ পরিবেশের কি কখনও সহায়ক হতে পারে? লুসাকায় সম্প্রতি অনুষ্ঠিত নির্জোট সম্মেলনের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, তখন তিনি সেখান থেকে যেসব বার্তা ভারতে পাঠিয়েছেন, তা লণ্ডন হয়ে ভারতে এসেছে। "আমাদের উভয় মহাদেশের মধ্যে সোজাসুজি সংযোগ স্থাপনের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে।" এর মধ্যে তৃতীয় গোষ্ঠীর প্রভাব যতদিন থাকবে, ততদিন ঔপনিবেশিক শক্তিগুলির অশুভ কীর্তিকলাপ চলবে। তিনি এই দুই মহাদেশের মধ্যে নিজস্ব সংবাদ সংস্থা স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। উপসংহারে তিনি বলেন—"বুদ্ধিজীবীদের সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া কোন স্বাধীনতাই পূর্ণ হতে পারেনা। এশিয়া এবং আফ্রিকার লেখক সমাজ তা উপলব্ধি করে নিজ নিজ দেশে এগিয়ে আসবেন বলে আশা করি।" তিনি অনুষ্ঠানের পর উপস্থিত বিদেশী লেখকদের সাথে করমর্দন করেন। অনুষ্ঠান মঞ্চ ছেড়ে যাবার আগে তিনি সহসা বৃদ্ধ কবি জুলফিয়ার কাছে যান। পরিচয় তাঁদের আগেই ছিল। বহুদিন পরে দেখা হওয়ার আনন্দে উভয়ে উভয়কে গভীরভাবে আলিঙ্গন করেন। সমস্ত অনুষ্ঠানটিতে এক অপূর্ব আনন্দ ছড়িয়ে পড়ে।

প্রতিনিধি দলের নেতাদের ভাষণ

১৭ ও ১৮ নভেম্বর এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ থেকে আগত লেখক প্রতিনিধি দলের নেতারা তাঁদের নিজ নিজ সাহিত্যের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে বলেন। তাঁদের ভাষণ থেকে এশিয়া ও আফ্রিকার সাহিত্য সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানা গেল। দক্ষিণ ভিয়েতনামের লেখক থান ড্যু তাঁর দীর্ঘ বক্তৃতায় দক্ষিণ ভিয়েতনামে সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের সুদীর্ঘ ইতিহাস তুলে ধরেন। তিনি বলেন—"আমাদের ভিয়েতনামের লেখকরা খুব ভালভাবেই জানেন যে, আমাদের স্বাধীনতালাভের সঙ্গে জীবন ও অস্তিত্ব জড়িত। আমি একথা বলতে গিয়ে গর্ববোধ করছি যে, দেশের এই পরিস্থিতিকে লেখকরা যথার্থভাবেই আমাদের সাহিত্যে তুলে ধরছেন। ১৯৬৪ খৃঃ থেকে ৭০ খৃঃ মধ্যে প্রায় ৫০টি বই আমরা প্রকাশ করতে সমর্থ হয়েছি।" তিনি তাঁর ভাষণের উপসংহারে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে রবীন্দ্রনাথের রচনার একটি উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন—"তাঁর রচনা আমাদের উদ্দীপ্ত করে।" উত্তর ভিয়েতনামের নেতা তো হোয়াইও তাঁর ভাষণে সেখানকার সাহিত্যের বর্তমান অবস্থা বর্ণনা করেন এবং রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি আফ্রিকার উপর রবীন্দ্রনাথের কবিতার কথাও বলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার লেখক আলেক্স লাগুমা বলেন যে, দক্ষিণ আফ্রিকায় থাককালীন তাঁর কোন রচনাই প্রকাশিত হয়নি। বর্ণবিদ্বেষ সেখানে এত তীব্র। দীর্ঘ পাঁচ বছর তিনি নিজ গৃহে বন্দী ছিলেন। পরে বন্ধুদের পরামর্শে তিনি লণ্ডনে চলে আসেন এবং তখন তাঁর বই প্রকাশিত হতে থাকে। 'সেভেন সিজ' থেকে তাঁর কয়েকটি বই প্রকাশিত হয়েছে। কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর বই এখন পঠিত হয়। লেবাননের কবি সোহেল ইদ্রিস জানান যে, সাহিত্য সেখানে অত নতুনভাবে পল্লবিত হয়ে উঠছে। সেনেগালের প্রখ্যাত সমালোচক মা মেইরি বলেন—"যদিও তাঁর দেশের রাষ্ট্রপ্রধান একজন কবি, তবু সেখানে লেখকদের স্বাধীনতা নেই। সরকারের অনুমতি ছাড়া বই প্রকাশ বন্ধ। সরকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যাদের কিছুটা যোগাযোগ আছে, তারাই বিভিন্ন সুযোগ পান এবং তাঁদের লেখাই বিদেশে প্রচারিত হয়। সেনেগালে অনেক প্রতিভাবান লেখক অবহেলিত অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন।" মালির ডিওয়ারে ম্যোস, বলেন—"মালির এখনও শতকরা ৮০ জন অশিক্ষিত। সৃজনশীল সাহিত্য রচনাতেও অনেক অসুবিধা আছে। তবে এখন অনেক নতুন নতুন লেখক এগিয়ে আসছেন।" ঘানার আপ্রোম্পিড জোয়া এরিক সেখানকার লেখকদের বিভিন্ন অসুবিধার কথা বলেন। গিনি বিসাউ মহিলা প্রতিনিধি ভুলেস আলমাদা দুয়ার্তে সেখানকার লেখকদের সংগ্রামী ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন। এ ছাড়াও জাপানের জোশাই হোতা, সিরিয়ার মহম্মদ এল আহম্মদ, জাম্বিয়ার সি, এল, ব্যান কংগোর টাটি লওটার্ফ, গাম্বিয়ার ডিক্সন কোলে, কেনিয়ার জনাথন কারিয়ারা, মঙ্গোলিয়ার এল, টুডেব, সুদানের আবদুল্লা আলি ইব্রাহিম প্রমুখও উল্লেখযোগ্য ভাষণ দেন। এইসব ভাষণ থেকে এশিয়া ও আফ্রিকার সাহিত্যের একটি পূর্ণাঙ্গ ছবি ফুটে ওঠে।

আলোচনা সভা

সম্মেলনে বোধকরি আলোচনা সভাগুলিই হয়েছিল সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। তিন ভাগে এই আলোচনাকে ভাগ করা হয় — সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক। সাংস্কৃতিক বিভাগে আলোচ্য বিষয় ছিল দুটি। প্রথমটির বিষয় ছিল—'আফ্রো-এশীয় লেখক ও যোগাযোগ সমস্যা'। দ্বিতীয়টির বিষয় ছিল—'ঐতিহ্য ও নবীকরণ'।

আফ্রো-এশীয় লেখক ও যোগাযোগ সমস্যা

এই আলোচনা সভাটি খুবই চিত্তাকর্ষক হয়ে ওঠে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের লেখকরা এত সুন্দরভাবে বিষয়টি তুলে ধরেছেন, যা ইদানিংকালে ভারতে আর হয়নি। এই আলোচনা সভার মূল সভাপতি ছিলেন লেবাননের প্রখ্যাত লেখক ডঃ সোহেল ইদ্রিস। সহসভাপতি ছিলেন টাটি লওটার্ফ (কঙ্গো) এবং ডিওয়ারে ম্যোস (মালি)। রিপোর্টার ছিলেন রামার্সিকিবো আরসেনি।

প্রথমে সভাপতি আলোচ্য বিষয়টি ব্যাখ্যা করেন। এরপর আমিন শামাল বিষয়টির উপর অংশ গ্রহণ করে কয়েকটি

গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গের উপস্থাপনা করেন। তিনি বলেন—"এশিয়া এবং আফ্রিকার লেখক আমরা যদিও জানি যে, আমাদের সাহিত্য জনগণের সমস্যা তুলে ধরে, তবু কিন্তু আমরা সকলের সাহিত্য ঠিক জানি না। এর প্রধান প্রতিবন্ধকতা ভাষা। এমন কোন ভাষা নেই যা এশিয়া ও আফ্রিকার সর্বত্র প্রচলিত আছে। তাই ইংরেজি বা অন্য কোন ভাষায় অনূদিত রচনা পাঠ করেই আমরা তাঁদের সাহিত্য সম্বন্ধে ধারণা গড়ে তুলি। কিন্তু এর ফলে আমাদের নিজেদের দৃষ্টিতে আফ্রো-এশিয়ার সাহিত্য বিচার করতে পারি না। অন্যের দেখা দৃষ্টি থেকেই ধারণা গঠন করি। ফলে একটা বিরাট অসঙ্গতি থেকে যায়। এর সমাধান প্রয়োজন।" তিনি সাতটি প্রস্তাবে এই সমস্যা দূরীকরণে পেশ করেন। মিশরের লেখক তাহা তাহের বলেন—"আমি আমার ভারতীয় বন্ধুর সঙ্গে এ ব্যাপারে একমত। আমার মনে হয়, প্রতি-দেশের লেখক সংঘের এ ব্যাপারে তৎপর হওয়া উচিত। অবশ্য লেখক সংঘ গঠিত হওয়া উচিত খুব গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে। রুশ কবি শারিপভ এক সুদীর্ঘ ভাষণে রাশিয়ায় এ ব্যাপারে কি কি করা হয়ে থাকে, তা বর্ণনা করেন। সেনেগালের জাঁ মেইরি বলেন—"এই সমস্যাটি আমাদের দেশেও খুব প্রকট। এছাড়া আছে আমাদের অন্য সমস্যা। আমাদের দেশে অশিক্ষিতের হার খুব বেশি। সাহিত্য পড়তেই পারে না দেশের অধিকাংশ লোক। সেখানে চলচ্চিত্র, টেলিভিশন ইত্যাদির প্রভাব বেশি। কিন্তু তাতে তথাকথিত যৌনতারই প্রাধান্য বেশি। আমার মনে হয়, প্রতি দেশেই লেখকদের এ ব্যাপারে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।' মাদাগাস্কারের রাষ্ট্রাধিকারিরা আমর্লেন বলেন—"আমার মনে হয়, কেবল চলচ্চিত্র বা টেলিভিশন এই সমস্যার সমাধান করবে না। আফ্রো-এশীয় দৃষ্টি-ভঙ্গিতে দেখলে অর্থাৎ সংহতির কথা ভাবলে সাহিত্যের স্থান অনেক ঊর্ধ্বে। আমিও আমার ভারতীয় বন্ধু সান্যালের সঙ্গে একমত যে, অনুবাদের দিকে আরো দৃষ্টি দিতে হবে।" সিদ্ধেশ্বর সেন বলেন—"মধ্যপ্রাচ্যে কিছু কিছু ভারতীয় ছবি প্রচারিত হয় বটে, কিন্তু সেইসব ছবির অধিকাংশেতেই ভারতীয় জীবনের কোন পরিচয় থাকে না। যেসব ছবির মধ্যে ভারতীয় জীবনের কথা আছে, তার প্রচার হয় কম।" এ ছাড়াও শ্রীসেন একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করেন।

এই আলোচনা সভা প্রায় কুড়িটি প্রস্তাব কার্যকরী করবার জন্য মূল কমিটির কাছে সুপারিশ করে। এইসব সুপারিশের মধ্যে আছে নিজস্ব সংবাদ সংস্থা গঠন, এশিয়া ও আফ্রিকার বইয়ের প্রচার ও অনুবাদ, সাংস্কৃতিক উৎসব, আফ্রো-এশীয় বইয়ের প্রদর্শনী, নিয়মিত আলোচনা সভা অনুষ্ঠান ইত্যাদি।

ঐতিহ্য ও নবীকরণ

এই সভায় যুক্ত সভাপতি ছিলেন গিনির মউসা সাবান গ্রোস। সহঃ সভাপতি ছিলেন সাহোমের প্রুডেন্সিও ইউস্টাকে ও লেকোষ্ট টজ (আপার ভল্টা)।

আলোচনায় স্বয়ংক্রিয়ভাবে যা স্বীকৃত হয়েছে তা হল, সাহিত্যে দীর্ঘদিন ধরেই কমিটেড সাহিত্য এবং সাহিত্য সাহিত্যের জন্য—এ দুটি তত্ত্ব চলে আসছে। কিন্তু এশিয়া বা আফ্রিকার সাহিত্যে কমিটমেন্ট কিছুটা থাকবেই। কারণ, এই দুই মহাদেশের সাহিত্যিকরা এখনও স্বাধীনতা ও প্রগতির জন্য সংগ্রাম করে চলেছে। এশিয়া ও আফ্রিকার সব দেশের সাহিত্যের প্রকাশভঙ্গি তাই বলে একই রকম নয়। কারণ দেশে দেশে রয়েছে ঐতিহ্যগত পার্থক্য।

এই সমস্ত আলোচনায় যাঁরা অংশ গ্রহণ করেন, তাঁদের মধ্যে অমৃত রায়, ঋত্বিক ভোরা, মানিক মুখার্জী এবং কয়েকজন বিদেশী লেখক।

লেনিন শতবার্ষিকী

১৯ তারিখ সন্ধ্যায় মণ্ডলাস্কর হলে লেনিন শতবার্ষিকী উৎসব উদযাপিত হয়। এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন শ্রী কে. পি. এস. মেনন। শ্রীমেনন তাঁর ভাষণে বলেন—'এশিয়া ও আফ্রিকার লেখকদের লেনিনের প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার যোগ্য কারণ আছে। লেনিন নিজেও লেখক ছিলেন এবং তিনি ছিলেন আফ্রো-এশীয় দেশগুলির পরম বন্ধু।" তাঁর ভাষণের পর সভার কাজ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন রুশ প্রতিনিধি দলের নেতা কামিল য়াসেন। তিনি প্রথমে লেনিনের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন।

এর পর লেনিনকে নিবেদিত কবিতা পাঠ করেন ভিয়েতনামের তো হোয়াই। লেনিনের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে ভাষণ দেন মিশরের ইউসুফ এল. সেবাই, দক্ষিণ আফ্রিকার আলেক্স লাগুমা, রাশিয়ার শারিপভ ও ভারতের মুলক রাজ আনন্দ ও বক্তন। অনুষ্ঠানে লেনিনকে নিবেদিত কবিতা পাঠ করেন রাশিয়ার মিখাইল দুদেরোভিন, প্যালেস্টাইনের মোইন বেসিসো, মঙ্গোলিয়ার বাতোকোলান, রাশিয়ার তুরসুনজেড, প্যালেস্টাইনের মাহমুদ দারউইশ প্রমুখ। মঙ্গোলিয়ার পক্ষ থেকে লেনিনকে নিবেদিত একটি কবিতা সংকলন সভাপতিকে উপহার দেওয়া হয়।

আগামী সম্মেলন

উক্ত অধিবেশনে আরো স্থিরীকৃত হয় যে, পঞ্চম আফ্রো-এশীয় লেখক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে কাজাখিস্থানের আলমা আতা শহরে ১৯৭০ খৃঃ। এ ছাড়াও ১৯৭১ খৃঃ ডিসেম্বরে সেনেগালের ডাকারে একটি আফ্রো-এশীয় কবিতা সেমিনার অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়। অন্যান্য উল্লেখ্য সিদ্ধান্তের মধ্যে আছে, সম্মেলনের মুখপত্র লোটাস পত্রিকার প্রচার, আফ্রো-এশীয় সিরিজে বই প্রকাশ, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার স্থাপন ইত্যাদি।

সম্মেলনে বাংলাদেশ

এই সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রতিনিধিরা খুব সুসংগঠিত মনোভাবের পরিচয় দেন। এত সুন্দর, সংহবদ্ধ আর কোন ভারতীয় প্রতিনিধি দলকে দেখা যায়নি। তাঁদের আচরণ যেমন ছিল সংহবদ্ধ, তেমনি যেসব আলোচনায় তাঁরা অংশ গ্রহণ করেছেন, সেখানেই কুড়িয়েছেন অকুণ্ঠ প্রশংসা।

বাংলা প্রতিনিধি দলের নেতা সুভাষ মুখোপাধ্যায় সর্বসম্মতিক্রমে ভারতীয় দলের নেতা নির্বাচিত হন। কার্যকরী সমিতিতে সুভাষ মুখোপাধ্যায় ছাড়া আর নির্বাচিত হয়েছেন মণীন্দ্র রায়। জাতীয় পরিষদে বাংলাদেশ ও ত্রিপুরা থেকে নির্বাচিত হয়েছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, মনোজ বসু, দক্ষিণারঞ্জন বসু, চিন্মোহন সেহানবিশ, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, গোপাল হালদার, তরুণ সান্যাল, দেবেশ রায়, দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, মিহির সেন, ধনঞ্জয় দাস, নিখিল সেন, মানিক মুখার্জি, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, প্রসূন বসু, বিষ্ণু দে, আশিস সান্যাল, বজ্রেশ্বর সাহা, সিদ্ধেশ্বর সেন প্রমুখ। বাংলাদেশ থেকে সম্মেলনের জন্য 'স্পোকসম্যান' হিসেবে যে পাঁচজনকে নির্বাচিত করা হয়, তাঁরা হলেন মনোজ বসু, মণীন্দ্র রায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, মানিক মুখার্জি ও দেবেশ রায়।

বইয়ের প্রদর্শনী

সম্মেলন উপলক্ষে ভারতীয় ভাষায় এশিয়া ও আফ্রিকার সাহিত্যের উপর অথবা সাহিত্যের অনুবাদ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, সেইসব গ্রন্থের একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়। এতে ভারতের কোন কোন ভাষায় আফ্রো-এশীয় দেশগুলির কি রকম চর্চা হয়েছে, তার একটা আভাস পাওয়া গেল। প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন ডঃ নীহাররঞ্জন রায়।

—চার্বাক

CENTRAL LIBRARY

মনের কথা

ডগমা ও ডিলিউশন
সীতা-সংবাদ

সাময়িক উন্মত্ততা (টেমপোরারি ইন-স্যানিটি) কথাটি সাধারণের মধ্যে খুব চালু। বড়দরের কোনো মানসিক আঘাত সহসা মানুষকে অসুস্থ করে দিতে পারে। এই অবস্থায় রোগীর চিন্তাভাবনা আচরণের অস্বাভাবিকতার মধ্যে ডিলিউশন, হ্যালু-সিনেশনের উপসর্গ দেখা যায়। সামাজিক প্যারানইয়া ও গণহিস্টিরিয়ার স্বরূপ বুঝতে হলে ব্যক্তির এই আকস্মিক মানসিক বিপর্যয়ের বিকারতাত্ত্বিক ও সার্বসংস্থিত ব্যাখ্যা জানা দরকার। বিনা চিকিৎসায় বা শুধু ঘুমের ওষুধের চিকিৎসায় এরা অনেক সময় দু' চার সপ্তাহের মধ্যেই ভাল হয়ে ওঠে। সন্ধ্যালোকের মত স্বল্পস্থায়ী বলে এই অবস্থার নাম দেওয়া হয়েছে, 'সাইকোজেনিক টোআইলাইট স্টেট'। চিকিৎসার চেয়ে এই অবস্থা প্রতিরোধ করার দিকে বেশী দৃষ্টি দেওয়া দরকার।

এই 'টোআইলাইট স্টেটের' বৈশিষ্ট্য এই যে, রোগের প্রধান কারণের বিপরীত ধারণা দ্বারা রোগী প্রভাবিত হয়। বিপজ্জনক বা অস্বস্তিকর বাস্তব পরিস্থিতি থেকে পালিয়ে রোগী কাল্পনিক নিরাপদ পরি-বেশের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করতে চায়। এই রকম দু'একটি প্রায়-নাটকীয় রোগ-ইতিহাসের সংগে পাঠকদের পরিচিত করাচ্ছি।

মিসেস মিল: স্বামী দু' বছর পর যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বাড়ী ফিরবেন। দু সপ্তাহ ছুটী। বীরত্বের জন্যে এর মধ্যে তাঁকে সম্মানিত করা হয়েছে। নির্দিষ্ট তারিখের দুদিন আগে খবর এল মিঃ মিল নিহত হয়েছেন। খবর পেয়ে কয়েক মিনিট মিসেস মিল স্তব্ধ হয়ে থেকে উত্তেজিতভাবে উঠে দাঁড়ালেন। আধ ঘণ্টার মধ্যে তাঁর সব থেকে ভাল পোশাকটা পরে নিলেন, বাচ্চা দুটিকে সুন্দর করে সাজালেন। ঘরদোর ধুয়েমুছে ঝকঝক করে তুললেন। বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়স্বজনের বাড়ী বাড়ী গিয়ে ডিনারের নেমন্তন্ন জানালেন। রাতে ডিনার টেবিলে প্রায় দশবারোজন লোক। মিসেস মিল খুশীতে ফেটে পড়ছেন। পুরনো খবরের কাগজের পাতা থেকে স্বামীর বীরত্ব কাহিনী পড়ে শোনাচ্ছেন সকলকে। প্রায় আধ ঘণ্টা হল ট্রেনটা স্টেশনে এসেছে। মিঃ মিল আর দু মিনিটের মধ্যে এসে পড়বেন। ঐ ত' কলিং বেল বাজল! এসেছেন, নিশ্চয়ই সে এসেছে। ছুটে বাইরে গেলেন। ঘরে ঢুকলেন একা, কিন্তু তাঁর কল্পনায় স্বামী সংগে রয়েছেন। ছেলে দুটো কেন বাবাকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে না? অতিথিরা অমন চুপচাপ বসে কেন? করমর্দনের জন্যে কেউ হাত বাড়াচ্ছে না কেন? মিসেস মিল অবাক হয়ে গেলেন।

এই ইতিহাসটি এক বিদেশী মহিলার। এক সোভিয়েত চিকিৎসকের কেস-রিপোর্ট।

নিজের অভিজ্ঞতা থেকে অনুরূপ দুটি ঘটনা বলছি।

সুধীরের মৃত্যু হল স্ত্রীর চোখের সামনে। প্রায় মাসখানেক ধরে কল্পনা স্বামীর রোগশয্যার পাশে বসে রাত কাটিয়েছে। বছর সাতেক ওদের বিয়ে হয়েছে। স্বামী-স্ত্রী দুটী সন্তান, এই নিয়েই সংসার। রাইটার্স বিল্ডিংএর প্রাক-স্বাধীনতা যুগের কেরাণী সুধীর। একখানা ঘর ও একফালি বারান্দার মধ্যে ওদের জগৎ। যতদূর মনে পড়ে, স্বামী-স্ত্রী দুজনেরই তিনকুলে আপনার বলতে কেউ ছিল না। সুধীরের সংগে দুবছর এক কলেজে পড়েছি। বেশ সদ্ভাব ছিল; যাতায়াতও ছিল। অসুখের খবর পেয়ে দু'একদিন দেখতেও গেছি। মৃত্যুর সময় আমি উপস্থিত ছিলাম। ডাক্তার হিসেবে নয়, বন্ধু হিসেবে। মৃত্যুর পর কল্পনা শোকে অধীর হয়ে যাবে, কি বলে তাকে সান্ত্বনা দেব? তাকে সামলানো খুবই কঠিন ব্যাপার হবে। সারাটা দিন এই সব কথা ভেবে খুবই অস্বস্তি বোধ করছিলাম। সকাল থেকেই বোঝা যাচ্ছিল, আর কোনো আশা নেই। কিন্তু কল্পনা কোনো অসুবিধার সৃষ্টি করল না। সুধীরের মৃতদেহের উপর আছড়ে পড়ে বিলাপ না করে শান্তভাবে উঠে গিয়ে সুটকেস গোছাতে লাগল। অন্য ডাক্তারেরা ওর দিকে নজর দিতে আমরা অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করলাম। পরদিন গিয়ে দেখি কল্পনা মেঝেতে মাদুরের ওপর বসে সেতার বাজাচ্ছে। দরজার কাছে কয়েক-জন মহিলা দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে ওকে দেখছেন। ছেলে দুটো কেঁদে কেঁদে বোধ হয় হাঁপিয়ে গিয়ে চুপ করেছে। আমাকে দেখে ফুঁপিয়ে আবার কেঁদে উঠল। প্রতিবেশীদের কাছে শুনলাম কল্পনা নাকি পাগল হয়ে গেছে। ছেলে-দের চিনতে পারছে না, প্রতিবেশীদের অনেককেও চিনতে পারছে না। আমাকে দেখে লাজুক হেসে অভ্যর্থনা জানাল। সেতার বাজানো ছাড়ল না, মোড়া থেকেও উঠল না। সবে পাশ করে বেরিয়েছি, মনের রোগ সম্বন্ধে কোনো জ্ঞান নেই। কাজেই খুবই অবাক হয়ে গেলাম। যতো অবাক হলাম, দুঃখ পেলাম তার থেকে অনেক বেশী। একখানা কোঁচকানো জীর্ণ সিল্কের শাড়ী দিয়ে দেহটাকে কোনো মতে আবৃত করেছে, গায়ে বোধ হয় ব্লাউজ নেই। মুখে সস্তা পাউডার মেখেছে, কপালে চন্দনের টিপ; সিঁথিতে ডগডগে করে সিঁদুর। বাজনা থামিয়ে মধ্যে মাঝে যে দু একটা কথা বলছে, তার সংগে বর্তমানের কোনো সম্পর্ক নেই। আজই ওকে গানটা তুলে নিতে হবে। কোন গানটা? 'আজ শ্রাবণের পূর্ণিমাতে', ঐ গানটা নাকি সুধীর বাসরঘরে গেয়েছিল। কল্পনা সাত বছর আগেকার একটি সন্ধ্যায় ফিরে গেছে, এই-টুকুই শুধু বুঝলাম। সে সময় এর বেশী কিছু বুঝবার বা ভাববার মত মানসিক অবস্থা ও বিদ্যাবুদ্ধি ছিল না। কল্পনা চায় না আমি ওখানে থাকি। সুধীর ফুল কিনতে বাজারে গেছে। সে ফিরে এল বলে!

সেই মর্মান্তিক করুণ দৃশ্য এখনও আমার মনে আছে। খুঁটিনাটি সমেত। এখন বুঝতে পারি ওটা 'টোআইলাইট স্টেট'। সহায়সম্পদহীন মেয়েটী স্বামীর মৃত্যুকে সত্য বলে মেনে নিতে পারেনি। ভয়াবহ বাস্তবের মুখোমুখি হবার শক্তি তার নেই। তাই সে বর্তমানকে অস্বীকার করে অতীতের আনন্দময় একটি মুহূর্তকে

আঁকড়ে ধরতে চাইবে। একেই বলা হয় 'ফ্লাইট ইন্টু ভিক্তি'। 'অপোকিং অফ্ অ্যান ইমাজিনারি সিচুয়েশন টু এ ডিসট্রেসিং রিয়ালিটি।'

উপরের দুটো কেসই হিস্টিরিয়ার টোয়াই লাইট স্টেট। দুটিতেই ডিলিউশন ও হ্যাল্যুসিনেশনের উপসর্গ আছে।

অনেক সময় বিপদের মুখে পড়ে বয়স্ক লোকেরা শিশুসুলভ আচরণ করে। এই 'পিউরিলিজম' স্কিজোফ্রেনিয়া রোগেও দেখা দিয়ে থাকে, তবে অন্যান্য লক্ষণ সেখানে আলাদা। এক ভদ্রলোক কোনো কারণে অফিসের ক্যাশ থেকে কিছু টাকা নিতে বাধ্য হন। আশা ছিল মাসকাবারে অন্য জায়গা থেকে টাকা সংগ্রহ করে হিসেব মিলিয়ে দিতে পারবেন। দুর্ভাগ্যবশত টাকা সংগ্রহ হল না। তাঁর স্ত্রীর ফোন পেয়ে গিয়ে দেখি ভদ্রলোক শুধু আন্ডার-ওয়্যার পরে হাতের মাথা 'বেস বেল' খেলছেন। কু-উ-উ, ড্যাম ড্যাম চাপ্পা— কখনো ঘরের তিন দৌড়াদৌড়ি করে বেড়াচ্ছেন। মেয়েরা শিশুসুলভ আচরণ করে পুতুল খেলা, ধরোমারি নিয়ে মাতামাতি করে। অন্য সবদিক থেকেই তাদের আচরণ শিশুর মতন হয়ে যায়। শিশুর মত আচরণ করে এরা শৈশবে ফিরে যেতে চায়। কোনো দায়দায়িত্ব থাকবে না, নিজের জন্য কোনো চিন্তা ভাবনা থাকবে না। বয়স্করা সব আপদবিপদ থেকে রক্ষা করবে। সোনার শৈশবে মাঝে মাঝে অন্তত কিছুক্ষণের জন্যে পালিয়ে যেতে আমরা সবাই বোধ হয় চাই।

অনেক 'টোয়াই লাইট স্টেটে' রোগীদের পাগোপদ্রবি চিত্তভ্রংশ হয়েছে বলে মনে হয়। ডান হাত তুলতে বললে এরা বাঁ হাত উঁচু করে, সাধারণ যোগ ভাগ করতে ভুল করে, সব রকম প্রশ্নেরই গোলমেলে উত্তর দিয়ে থাকে।

যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, তোমার নাম কি? রোগী হয়ত বলবে, আপনার চশমাটি ভারী সুন্দর। আমি কে বলতে পারো? এই প্রশ্নের জবাবে বলে বসবে, সকাল থেকে কিছুই খাওয়া হয়নি। এই ধরনের 'টোয়াই-লাইট স্টেটকে' বলা হয় 'সিউডোডিমেনশিয়া।' এই চিত্তভ্রংশ বা ডিমেনশিয়া স্বল্পকাল স্থায়ী, তাই বোধ হয় সিউডো মানে নকল ডিমেনশিয়া। দেখা যাচ্ছে, মৃত্যু শোক, জেলে যাবার ভয়, অন্যান্য নানা রকমের অবাঞ্ছিত মানসিক আঘাত ব্যক্তিকে মোহ-গ্রস্ত, বিমূঢ়, বুদ্ধিভ্রংশ করে দিতে পারে। রুঢ় বাস্তব থেকে ব্যক্তি পালিয়ে গিয়ে কল্পনার দুর্গে আশ্রয় নেবার চেষ্টা করে। বর্তমান থেকে অতীতে যাবার চেষ্টা ও কল্পনার স্বর্গরাজ্য গড়ে সেখানে নিজেকে স্থাপিত করার চেষ্টা, একই ধরনের 'ফ্লাইট ফ্রম রিয়ালিটি'। সামাজিক অবস্থা যখন অনেকের পক্ষে দুর্বিসহ ভয়াবহ হয়ে ওঠে, তখন অনেক মানুষ একই সংগে এই 'টোয়াই-লাইট' স্টেটের প্রভাবাধীন হয়ে 'ইউটো-পিয়ার' আশায় শিশুসুলভ বিশৃংখল আচরণে মেতে উঠতে পারে। যাদের মস্তিষ্কের উত্তেজনার আধিক্য বেশী, কোশলী অভিভাবনের বশে, ধ্বংসাত্মক কাজ-কর্মের সাহায্যে সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে তৎপর হয়ে ওঠা, তাদের পক্ষে বিচিত্র নয়। আমরা জানি, সংকীর্ণ 'এথনোসেন্ট্রিজম' (দল বা সম্প্রদায়কেন্দ্রিক মনোবৃত্তি)-এর মধ্যে গ্ল্যামার (জাঁকজমক) ও পারসিকিউশন (নির্যাতন) দু রকমের ডিলিউশনের অঙ্কুর বিদ্যমান। সামাজিক টেনশন যত বাড়তে থাকে; ইনগ্রুপ, আউট-গ্রুপ মনোবৃত্তি ততই পরস্পর বিরোধী ও বিদ্বেষভাবাপন্ন হয়। এই সময় সামাজিক অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সুযোগ নিয়ে শাসকগোষ্ঠীর অক্ষমতা, বিরোধী নেতৃত্বের ক্লীব-সুলভ আচরণ ইত্যাদির জোর এক-তরফা প্রোপাগান্ডা ও প্রচার জনসাধারণের মনে নিরাশা ও ভয়ের প্রক্ষোভ সঞ্চার করে তাদের মোহগ্রস্ত বিমূঢ় ও বুদ্ধিভ্রংশ করে তুলতে পারে। তবে দিশেহারা হয়ে বিশৃংখল আচরণ করা খুবই স্বাভাবিক।

শোক, রোগ, হতাশা, ভয় ইত্যাদি নঙর্থক প্রক্ষোভ যেমন ব্যক্তি মস্তিষ্ককে প্রভাবিত করে উন্মত্ততা আনতে পারে; তেমনি সদর্থক প্রক্ষোভ ও দু' এক সময় ব্যক্তিমানসে আলোড়ন এনে 'টোয়াই-লাইট' অবস্থা সৃষ্টি করতে পারে। লটারীতে একসঙ্গে অনেক টাকা পেয়ে কেউ কেউ পাগল হয়ে যায়। আকস্মিক শোক-সংবাদের মত আনন্দ সংবাদ ও অনেক সময় মস্তিষ্কের সাময়িক বিশৃঙ্খলা নিয়ে আসে। আর্কিমিডিস্ যখন 'ইউরেকা' 'ইউরেকা' বলে চীৎকার করছিলেন, তখন তিনি সুস্থ বা স্বাভাবিক মানসিক অবস্থায় ছিলেন না।

আশাতীত সাফল্যে সাময়িক উন্মত্ততার, 'টোয়াইলাইট স্টেটের' ঘটনার সঙ্গে সকলেই বোধহয় অল্পবিস্তর পরিচিত। এইরকম দুটি রোগ ইতিহাস এখানে বিবৃত করা চলতে পারে। প্রথমটি আমার এক পরিচিত ডাক্তারের কেস দ্বিতীয়টি আমার।

ঐ ডাক্তারের জবানীতেই বলি। পুরনো ঘটনা।

গভীর রাতে টেলিফোন বেজে উঠল। শহরতলীর এক থানা থেকে ফোন করছেন অফিসার-ইন-চার্জ। আমার বিশেষ বন্ধু দীনেশ মত্তাবস্থায় দাঙ্গাহাঙ্গামা করার অভিযোগে থানার ফাটকে আছে। আমার সঙ্গে অবিলম্বে দেখা করতে চায়। আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুদের মধ্যে দীনেশ একজন। একসঙ্গেই পাশ করেছি। রাগ ও বিরক্তি দমন করেই থানায় ছুটতে হল। দীনেশ একটু আধটু মদ খায় বটে, কিন্তু দাঙ্গা-হাঙ্গামা করার মত স্বভাব তার নয়। তাছাড়া সন্ধ্যের পর সে আমার ডিসপেন-সারি থেকে উঠেছে। তার বাড়ী উত্তর কলকাতায়। ফোন এসেছে দক্ষিণের এক থানা থেকে। সবটাই কেমন গোলমেলে। এইসব ভাবতে ভাবতে থানায় এসে উপস্থিত। অফিসার খুব সদয় ব্যবহার করলেন। লক্-আপ থেকে বন্ধুকে বাইরে এনে আমার সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি দিলেন। বন্ধুকে দেখে আমি তো বিস্ময়ে হতবাক। চোখ ফোলা, গালে ক্ষতচিহ্ন, পোশাক অবিন্যস্ত ও অনেক জায়গায় ছেঁড়া। ধস্তাধস্তির চিহ্ন বন্ধুর সর্বাঙ্গে। আমাকে দেখে একগাল হাসি। আমি ওর চেহারা দেখে হতবাক হইনি। অবাক হয়েছি দীনেশের বদলে বন্ধু পরমেশকে দেখে। পরমেশের মুখে মদের গন্ধ! পরমেশ মদ খেয়ে মারামারি করেছে! চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতে পারতাম না। চরম-পিউরিটান ভালো মানুষ পরমেশের এ কি অধঃপতন! পরমেশকে ইণ্টারমিডিয়েট পড়ার সময় থেকে চিনি। সেই সময় থেকে বন্ধুত্ব। অতি দরিদ্র পরিবারের ছেলে, বন্ধুদের আর্থিক সাহায্য না পেলে ওর ওকালতি পাশ করা সম্ভব হত না। আমরা সকলেই ওকে ভালবাসতাম। সাহায্য মুখ ফুটে ও কারুর কাছে চাইত না। আমরা অনেক কৌশলে সাহায্য করার সুযোগ তৈরী করতাম। টিউশনী করে, আধপেটা খেয়ে কোনো রকমে পড়া চালিয়েছে। চরম দারিদ্র্যের মধ্যে দিন কেটেছে। ওকালতীতে পসার করতে পারা খুবই কঠিন ব্যাপার। বিশেষ করে ওর মত দরিদ্র ও অতি-নীতিবাদীদের পক্ষে। মনটা খারাপ হয়ে গেল। দীনেশ ওকে খুব ভালবাসে। দীনেশের অবস্থা ভাল। মাঝে মাঝে দীনেশের সাহায্য গ্রহণে বাধ্য হয় পরমেশ। হালে পরমেশের অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। মুন্সেফ মনোনীত হয়েছে। বাইরে আছে তাই ওর সঙ্গে কয়েক মাস দেখা হয়নি। পরমেশের সঙ্গে কথা বলে বুঝলাম ও পাগল হয়ে গেছে। অর্থহীন প্রলাপ ও হাসি শুনে আমি কিছু পরে বিদায় নিলাম।

হাওড়া কুষ্ঠ কুটীর

সর্বপ্রকার চর্মরোগ, বাতরক্ত অসাড়তা, ফুলা, একজিমা, সোরাইসিস, দূষিত ক্ষতাদি আরোগ্যের জন্য সাক্ষাতে অথবা পত্রে ব্যবস্থা লউন। প্রতিষ্ঠাতাঃ পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা কবিরাজ, ১নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া। শাখাঃ ৩৬, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৯। ফোন : ৬৭-২০৫৯।

পরের দিন লালবাজার থেকে ওকে জামিনে ছাড়িয়ে আনা হল। দীনেশের বাড়ীতে রেখে ওর চিকিৎসা চলতে লাগল। সে সময় 'রয়াপিলা' ছাড়া উন্মাদরোগের আর কোনো ওষুধ ছিল না। এই সময় দীনেশকে কয়েকবার ও গলা টিপে ধরেছে। আমরা পাঁচ ছজন মিলে ওকে আয়ত্তে রাখতে পারতাম না। দীনেশের নামে ঐ মত্তাবস্থায় কুৎসা রটাত আর সব বড়-লোককে ও খুন করবে বলে শাসাত। তিন সপ্তাহের মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠল।

এই পরমেশবাবু টোয়াইলাইট অবস্থার হিস্টিরিয়ায় ভুগেছেন। কয়েক বছর হল রিটায়ার করেছেন। পরমেশবাবুর কাছে মুনসেফী চাকরি লটারীতে টাকা পাওয়ার মত না হলেও, একটা মস্তবড় ব্যাপার। তার অসংলগ্ন প্রলাপের সাহায্যে তার রোগের কারণগুলো জানা গিয়েছিল। একটানা অভাব অনটনের মধ্যে দিন কাটানোর ফলে হতাশায় যখন ভেঙে পড়তে যাচ্ছে তখন বিধাতার আশীর্বাদের মত এল নিয়োগপত্র। এ চাকরী পাবার ব্যাপারে দীনেশের দাদার অনেকখানি হাত ছিল। শুধু এ্যাকাডেমিক কোয়ালিফিকেশনসের জোর চাকরী হয়নি। দীনেশকে পরমেশ ভালবাসত ও মনে মনে তার প্রতি কৃতজ্ঞ ছিল। প্রথম যেদিন মাইনের অনেকগুলো টাকা একসঙ্গে হাতে এল, পরমেশ বাড়ী এসে টেবল ল্যাম্পটা ভেঙে ফেলেছিল। ধীরে ধীরে মানসিক পরিবর্তন ঘটছিল। কয়েক মাস পরে যখন কোলকাতায় আসার সুযোগ পেল, সেদিন ওর পক্ষে একটা বিশেষ দিন। প্রায় হাজার টাকার বাণ্ডিল পকেটে নিয়ে কোলকাতায় যাবে। ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট কিনবে, ট্যাক্সি করে প্রথমেই দীনেশের সঙ্গে দেখা করবে। তার চোখের সামনে কড়কড়ে নোটগুলো মেলে ধরবে। সবার ঋণ শোধ করবে। সকলকে টাকা দেবে। 'টোয়াইলাইট' অবস্থা চরমে উঠলো কয়েক পেগ মদ পেটে যাবার পর। পাঞ্জাবী ট্যাক্সিওয়ালাকে বাঙালী মুনসেফবাবুর কেরামতি দেখাতে গিয়ে তার কাছে পেল উত্তম মধ্যম সম্বর্ধনা। তারপর হাবই লৌহতে হাজতবাস।

আমার রোগীটির ঘটনাও প্রায় একই রকমের। এক লাখ টাকা খরচ করে বাড়ী তৈরী করেছেন। ঐ তল্লাটে অত সুন্দর বাড়ী আর নেই। কিন্তু কি দুর্ভাগ্য। গৃহপ্রবেশের কয়েকদিন পরই বনমালী পাগল হয়ে গেছেন। বনমালীকে ধরে রাখা যায় না। রাস্তা দিয়ে যে যাচ্ছে, তাকে নতুন বাড়ীতে পায়ের ধুলো দিতে ডাকছেন। সে রাজী না হলে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করছেন, তর্জনগর্জন করছেন। শ্বশুরবাড়ীর লোকেরা ধরে বেঁধে আমার কাছে হাজির করল। বনমালী আমার কাছে এসেই চোখ রাঙিয়ে ধমকাতে লাগলেন। আমার বাড়ীতে কখানা ঘর, কিরকম ফ্লোরিং, কত টাকা খরচ পড়েছে জানতে চাইলেন। অবশ্য ধমকের সুরে। আমার বাড়ী নেই, ভাড়াটে বাড়ীতে থাকি, শুনে কৃপাপরবশ হয়ে আমাকে তাঁর বাড়ীতে থাকতে দেবেন বললেন তার পরই কেঁদে ফেললেন। তাঁর শ্যালকগোষ্ঠী তাঁকে বাড়ী ছাড়া করবে মতলব করেছে। পুলিশে খবর দিতে বললেন আমাকে।

এখানেও 'টোআইলাইট' স্টেটের কারণ হঠাৎ অবস্থান্তর। নানা কৌশলে, সাধু অসাধু নানা উপায়ে বাড়ী তৈরী করেছেন ভদ্রলোক। খুবই অল্প মাইনের চাকুরে। আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব কারুর নিজের বাড়ী নেই। বাড়ী তৈরীর কাজকর্ম সবই করেছে শ্বশুরবাড়ীর লোকেরা। উনি শুধু টাকা পাঠিয়েছেন। কোলকাতার বাইরে চাকরী। চাকরীতে ছুটি নেই। গৃহপ্রবেশের দিন কোলকাতায় পৌঁছেছেন। বাড়ীর ব্লুপ্রিন্ট দেখা ছিল, কল্পনাতে ও বাড়ীটাকে সত্যিকারের তাঁর নিজের বাড়ী হয়েছে, এ কেন বিশ্বাস করতে পারছেন না। স্ত্রীকে বললেন—এটাতো আমার বাড়ী। শ্যালককে বললেন, এইটেই তো আমার আমার বাড়ী। তারপর তাদেরই ডেকে ডেকে ঘর মেঝে পালিশ ইত্যাদি দেখাতে লাগলেন। তারা প্রথমটায় মনে করলেন বনমালী বোধ হয় রসিকতা করছেন। কিছুক্ষণ পরেই বুঝলেন কোথাও কোনো গণ্ডগোল ঘটেছে। বিশেষ করে যখন বনমালী রাস্তা থেকে লোক ডেকে বাড়ী দেখাতে শুরু করলেন, তখন আত্মীয়-স্বজনরা বেশ ভয় পেয়ে গেলেন।

ডিলিউশনের একটা বিশিষ্টতা লক্ষ্য করলাম বনমালীর মধ্যে। বাড়ীর মালিকানা স্বত্ব সম্পর্কে তাঁর সন্দেহের কারণ আছে। বাড়ী জমি সবই স্ত্রীর নামে। টাকা যদিও তাঁর, খাটাখাটুনি করেছেন তো স্ত্রী ও শ্যালক। বাড়ীটা ওঁদের হবেই বা না কেন? সব থেকে ভাল ঘরটা বনমালীকে থাকতে দিয়েছেন কেন? শ্বশুরবাড়ীর লোকেরা নিজেদের বাসায় রয়েছে কেন? তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে তাঁকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে, এই ভয়ের সঙ্গে সঙ্গে বনমালী চিন্তা করছেন যে ওরা যেহেতু পরিশ্রম করেছে, বাড়ীতে ওদের দাবী আছে। প্যারানইয়া রোগীর মত ডিলিউশন দৃঢ় ও পাকাপোক্ত নয়। এর পরদিন ভদ্রলোককে খুবই আতঙ্কিত দেখলাম। তাঁর সাদা নতুন বাড়ীর গায়ে আলকাতরা দিয়ে কি সব লেখা হয়ে গেছে। তিনি আমাকে উকীল ডাকতে বললেন। বাড়ীটা যারা তৈরী করেছে, সত্যিকারের খাটাখাটনি করেছে, সেইসব মিস্ত্রী মজুর-দের নামে তিনি উইল করে দেবেন বাড়ীটা। পরক্ষণেই হাহাকার করে উঠলেন। তাঁর স্ত্রী কোথায় থাকবে তিনি কোথায় থাকবেন? বাড়ীটা ভেঙেচুরে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দেওয়াই ভাল। কোনো ট্রাংকুই-লাইজার দিয়ে ফল পাওয়া গেল না। সপ্তাহ ছয়েক বাড়ী ছেড়ে বেনারসে গিয়ে থাকলেন বনমালী। ফিরে আসার পর দেখলাম সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেছেন। তিন বছর কেটে গেছে, এখনও ভাল আছেন। সুস্থ শরীরে, বহাল তবিয়তে নিজের লাখ-টাকার বাড়ীতেই অবস্থান করছেন।

এটিও সাময়িক উন্মত্ততা বা টো-আই-লাইট অবস্থা।

—মনোবিদ

কয়েকজন নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত বিজ্ঞানী : (বাম দিক থেকে) সি ভি রামন (পদার্থবিদ্যা), ফিশার (রসায়ন), সেইগবন (পদার্থবিদ্যা—১৯২৪), আইনস্টাইন (পদার্থবিদ্যা), ডলেন (পদার্থবিদ্যা—১৯১২), সিনক্লেয়ার লুইস (সাহিত্য—১৯৩০) এবং সেলমা লাগেরলফ (১৯০৯)। নীচে সুইডেনের রাজা।

বিজ্ঞানের কথা

ডঃ সি ভি রামন

বিরাশি বছর বয়সে মৃত্যু সাধারণ বিচারে নিশ্চয়ই অকালমৃত্যু নয়। কিন্তু ডঃ সি ভি রামন মৃত্যুর আগে পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক গবেষণায় যে কর্মনিষ্ঠ জীবন কাটিয়ে গিয়েছেন তা ছিল তারুণ্যমণ্ডিত। বিরাশি বছর বয়সের এই তরুণ বিজ্ঞানীর মৃত্যুতে যে শূন্যতা সৃষ্টি হল তা পূরণ হবার নয়। যিনি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক পুরস্কারে ভূষিত, বিশ্বের প্রায় প্রতিটি অগ্রসর দেশের সর্বোচ্চ বৈজ্ঞানিক সংগঠনগুলির সদস্যপদে বৃত, অজস্র পদকে ও অজস্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেটে সম্মানিত, যিনি দেশের সেরা বিজ্ঞানীদের গুরু, বিরাট এক বৈজ্ঞানিক সংগঠনের অধ্যক্ষ—তিনি যদি শেষ জীবনে নিজের হাতে গবেষণা নাও করতেন, শুধু ভাষণ দিয়ে, শুভেচ্ছা বিতরণ করে, দেশ-বিদেশের সম্বর্ধনা-সভায় স্মিত হাসি হেসে নিশ্চিন্ত আয়েসের মধ্যে ডুব দিতেন তাহলেও তাঁর সম্মানের আসন বিন্দুমাত্র টলত না। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, আমাদের এই দেশের আবহাওয়াতে মানুষ হয়েও তিনি তা করেন নি। ডঃ রামন কত বড়ো বিজ্ঞানী ছিলেন, কত কৃতী বিজ্ঞানী তৈরি করে গিয়েছেন, কত দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বৈজ্ঞানিক সংগঠন গড়ে তুলেছেন সে-বিচার যোগ্যতর ব্যক্তিরা করবেন। কিন্তু এই মুহূর্তে ডঃ রামন সম্পর্কে একটি কথা বিশেষ জোরের সঙ্গে বলা দরকার যে, আজকের দিনে গোটা ভারতের কোনো একজন মানুষকে যদি আমাদের এই বিক্ষিপ্ত ও সন্ত্রস্ত জীবনের সামনে আদর্শ হিসেবে খাড়া করতে হয় তবে সেই মানুষটি হচ্ছেন তিনি। বৈজ্ঞানিক গবেষণার কথা ছেড়ে দিলেও নিরলস পরিশ্রমের এমন দৃষ্টান্ত আজকের দিনে পাওয়া শক্ত।

তুলনা করতে হলে, যাঁদের আমি চোখের সামনে দেখেছি তাঁদের মধ্যে একজনের কথাই মনে পড়ে : অধ্যাপক জে বি এস হলডেন। এই দুজন বিজ্ঞানীর বিচরণক্ষেত্র ভিন্ন কিন্তু অন্য একটি ব্যাপারে দুজনের মধ্যে আশ্চর্য মিল। দুজনেই মনে করতেন, বৈজ্ঞানিক নিষ্ঠা, সততা ও একাগ্রতা যদি থাকে তাহলে অনেক কিছু বৈজ্ঞানিক যন্ত্র-সরঞ্জাম ছাড়াও বৈজ্ঞানিক গবেষণা সম্ভব। এ শুধু মুখের কথা নয়, এই দুজন বিজ্ঞানীর সারা জীবনের বৈজ্ঞানিক গবেষণায় তার অজস্র প্রমাণ রয়ে গিয়েছে।

নিষ্ঠা, সততা, একাগ্রতা—এসব শব্দগুলোও অপাত্রে প্রযুক্ত হতে হতে আজ-

কাল অনেকটা খেলো হয়ে গিয়েছে। ডঃ রামন বা অধ্যাপক হলডেনের মতো বিজ্ঞানীর জীবনের দিকে তাকালে বোঝা যায় নিষ্ঠা কাকে বলে, সততার পরিচয় কী, একাগ্রতা কি রকম। অর্থ দপ্তরের বড়ো চাকুরে গাঁটের পয়সা খরচ করে নিজস্ব গবেষণাগার তৈরি করেছেন আর অবসর সময়ে এমন সমস্ত গবেষণা নিয়ে মেতে আছেন যার কোনো অর্থকরী ভবিষ্যৎ নেই, আবার সুযোগ পাওয়া মাত্রই প্রভিডেন্ট ফান্ড, পেনসন ইত্যাদির চিন্তামাত্র না করে অধ্যাপনার পদ নিচ্ছেন, এমনি আরো অজস্র ঘটনা, পাগলামি বলে মনে হলেও নিষ্ঠা, সততা ও একাগ্রতার প্রকাশ খুঁজতে হলে এমনিধারা ঘটনার ওপরেই হাত রাখতে হয়। ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অফ সায়েন্স বলতেই ভবাতেন সেই বৌবাজারের বাড়িটির কথা, যেখানকার গবেষণালব্ধ ফল থেকে রামন এফেক্ট আবিষ্কার ও নোবেল পুরস্কার লাভ—জীবনের অনেক প্রয়াস ও প্রাপ্তির সঙ্গে বিজড়িত একটি স্মৃতি। ১৯৫০ সালে ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন উঠে গেল যাদবপুরের বিরাট আয়তনের বাড়িতে, তাঁর খুশি হবারই কথা, যে অ্যাসোসিয়েশন ধরতে গেলে তাঁর হাতেই বড়ো হওয়া, তাঁর কৃতিত্বেই বিশ্বের মানচিত্রে নামের অধিকারী—অথচ ঠিকানা বদলের সঙ্গে সঙ্গে তার সঙ্গে তিনি আর কোন সম্পর্কই রাখলেন না। এই ঘটনার মধ্যেও তাঁর একটি বিশেষ পরিচয় রয়ে গিয়েছে।

ব্যাঙ্গালোরে রামন ইনস্টিটিউটের সামনে একটি সাইনবোর্ডে লেখা : আগন্তুকদের জন্য নয়, দয়া করে আমাদের বিরক্ত করবেন না। অনুরোধ বা ধমক যাই হোক, দেশের মানুষ মেনে নিয়েছিল। আশা করেছিল এই চিরতরুণ বিজ্ঞানীর আরো অনেক কিছু দেবার আছে, হয়তো তিনিও মাদাম কুরীর মতো দু-দুবার নোবেল পুরস্কার অর্জন করে ইতিহাস সৃষ্টি করবেন।

কিন্তু মৃত্যু এসে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য, ডঃ রামনের শূন্যাসন পূরণ করতে পারেন এমন কাউকে চোখের সামনে দেখা যাচ্ছে না।

বৈজ্ঞানিক গবেষণায় আরো বেশি কৃতিত্ব অর্জন করবেন এমন বিজ্ঞানীর অভাব হবার কথা নয়, আমাদের দেশেও। কিন্তু, জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন বসু যে-কথা বলেছেন, আমাদের দেশের বহু বিজ্ঞানীর মৌলিক গবেষণায় হাতেখড়ি ডঃ রামনের কাছে। পদার্থবিদ্যায় বিশ্বের মানচিত্রে ভারতের স্থান যে তুচ্ছ করার মতো নয়, তার মূলে ডঃ রামনের এই বৈজ্ঞানিক সংগঠনের অবদান অনেকখানি।

আমাদের দেশে আয়োজন ও সংস্থান থাকা সত্ত্বেও এই বৈজ্ঞানিক সংগঠনটি এখনো পুরোপুরি গড়ে ওঠেনি। মৌলিক গবেষণায় আগ্রহ যথেষ্ট উৎসাহ পায় না। অধিকাংশ গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠানের কাঠামোই এমন যে, বিজ্ঞানীদের সেখানে স্ব-স্ব পদে আসীন থাকতে পারার জন্যে ও উচ্চতর পদে উন্নীত হবার জন্যে যতোখানি তৎপরতার প্রয়োজন হয় তারপরে আর বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্যে ততোখানি অবকাশ থাকে না। অধ্যাপক হলডেন এদেশে এসে সবচেয়ে বেশি অবাক হয়েছিলেন অ-বৈজ্ঞানিক কাজে বিজ্ঞানীদের এত বেশি সময়ের অপচয় হতে দেখে। দয়া করে আমাদের বিরক্ত করবেন না—এই কথগুলো সাইনবোর্ডে তো লিখতে পারে যে কোনো লিপিকর, কিন্তু বিজ্ঞানীকে তাঁর আচরণে ও তাঁর কাজে তার প্রমাণ দিতে হয়।

ডঃ রামনের মৃত্যুতে ভারত অবশ্যই দরিদ্র হল, শুধু এই মুহূর্তের জন্যে নয়, আগামী বেশ কিছুকালের জন্যে। ডঃ রামন ছিলেন একজন প্রকৃত বিজ্ঞানী—শুধু ব্যক্তিগতভাবে নয়, প্রতিষ্ঠানগতভাবেও।

সবাই জানেন ডঃ সি ভি রামন নোবেল পুরস্কার পান এমন একটি ব্যাপার আবিষ্কারের জন্যে, তাঁর নামের সঙ্গে যুক্ত করে যাকে বলা হয় 'রামন এফেক্ট'। ব্যাপারটি কি? সাধারণের বোধগম্য ভাষায় বোঝবার চেষ্টা করা যাক।

একগুচ্ছ একরঙা আলো স্বচ্ছ একটি বস্তুর ভিতর দিয়ে চলে যাচ্ছে—আলোর গুচ্ছ বস্তুর ভিতরে প্রবেশ করার সময়ে যা, বস্তু থেকে বেরিয়ে আসার সময়েও কি তাই? ডঃ রামন আবিষ্কার করলেন, না, তা নয়, মূল আলোর গুচ্ছের পথ থেকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আরো কিছু ভিন্ন ধরনের আলো। কোন দিক থেকে ভিন্ন ধরনের? তরঙ্গদৈর্ঘ্যের দিক থেকে। স্বচ্ছ বস্তুতে প্রবেশের আগে মূল আলোর গুচ্ছের তরঙ্গদৈর্ঘ্যের যা মাপ, স্বচ্ছ বস্তু থেকে বেরিয়ে আসার পরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়া কিছু আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের মাপ তার চেয়ে বড়ো। ডঃ রামন এই ব্যাপারটিই আবিষ্কার করেছিলেন ১৯২৮ সালে। তাঁর নামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এই ব্যাপারটিরই নাম 'রামন এফেক্ট'। এই আবিষ্কারের জন্যেই ১৯৩০ সালে পদার্থবিদ্যায় তিনি নোবেল পুরস্কার পান।

এই আবিষ্কারের সঙ্গে একটি গল্পও জড়িত আছে। ১৯২৫ সালে রুশী বিজ্ঞান আকাদেমির আমন্ত্রণে আকাদেমির দ্বিশততম বার্ষিকী উৎসবে যোগ দেবার জন্যে তিনি মস্কো ও লেনিনগ্রাদে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে ভারতে ফেরার পথে সমুদ্রে পাড়ি দেবার সময়ে জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে ছিলেন সমুদ্রের দিকে। নীল আকাশ আর নীল সমুদ্র—আকাশের নীল প্রতিফলিত হয়ে নীল সমুদ্র, কিন্তু আশ্চর্য, সমুদ্রের রংটা তো আকাশের নীলের হুবহু প্রতিফলন নয়, সমুদ্রের রং ক্ষণে ক্ষণে এত বদলাচ্ছে কেন? ব্যাপারটা তাঁর কাছে বিভ্রান্তিকর মনে হল। দেশে ফিরেই তিনি গবেষণা শুরু করে দিলেন।

একটি স্বচ্ছ পদার্থের ভিতর দিয়ে একরঙা আলোর একটি গুচ্ছ পার হয়ে যাচ্ছে, পার হয়ে আসার পরে বিচ্ছুরিত কিছু আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য যাচ্ছে বদলে—এ ব্যাপারটি কি চোখে দেখা সম্ভব? সম্ভব যদি স্বচ্ছ পদার্থটি হয় বেশ বড়োসড়ো—ধরা যাক বেনজিন ভর্তি প্রকাণ্ড একটি কাচের গোলক বা বাল্ব—আর এই বাল্বের ওপরে তির্যকভাবে আলো এসে পড়ুক একটি মার্কারি আর্ক ল্যাম্প থেকে। এবারে স্পেকট্রোস্কোপ যন্ত্রের সাহায্যে বিচ্ছুরিত আলোর বর্ণালী নিলে কতকগুলো বাড়তি রেখার অস্তিত্ব ধরা পড়বে। স্বচ্ছ পদার্থে প্রবেশের আগে যে আলোর গুচ্ছ, তার বর্ণালীতে কিন্তু এই রেখাগুলো নেই। তার মানে এই বিচ্ছুরিত আলো মূল আলো থেকে ভিন্ন। গবেষণার সুবিধের জন্যে সাধারণত এই বর্ণালীর ছবি ফটোগ্রাফে ধরে রাখা হয়, তাতে পর্যবেক্ষণের যেমন সুবিধে, সঠিক মাপজোকেরও।

এখানে মনে রাখা দরকার আলোর বিচ্ছুরণ এমনিতেও ঘটে থাকে এবং বেশ বেশি মাত্রাতেই, তরঙ্গদৈর্ঘ্যে কোনো বদল ছাড়াই।

কিন্তু রামন এফেক্ট ঘটার সময়ে যেখানে তরঙ্গদৈর্ঘ্য বদলাচ্ছে সেখানে নিশ্চয়ই প্রশ্ন উঠবে—কেন বদলাচ্ছে? জবাবে বলা হচ্ছে বিচ্ছুরণকারী বস্তুর (অর্থাৎ যে স্বচ্ছ পদার্থের ভিতর দিয়ে আলো পার হচ্ছে সেই বস্তুর) অণুর গতিবিধির দরুন। এখানে মনে রাখা দরকার, কি গ্যাসীয়, কি তরল, কি কঠিন—কোনো পদার্থেই অণুগুলো স্থির অনড় নয়। গ্যাসীয় পদার্থে অণুগুলোর সঞ্চরণশীলতা সবচেয়ে বেশি, ফলে বিচ্ছুরিত আলোর বর্ণালীতে বাড়তি রেখার অস্তিত্বও অনেক বেশি প্রকট। আর তরল পদার্থের বেলায় বর্ণালীর চেহারাটিই এমন যে, বোঝা যায় অণুর সঙ্গে অণুর সংঘর্ষের দরুন অণুর আবর্তন কিছুটা বাধাগ্রস্ত।

ব্যাপারটির সঠিক ব্যাখ্যা হতে পারে একমাত্র কোয়ান্টাম তত্ত্বের ভিত্তিতে। বিবরণটি জটিল। খুব সরলভাবে প্রকাশ করতে হলে এইভাবে বলা যায় : আলোর কোয়ান্টা আর যে পদার্থটির ওপরে আলো আছড়ে পড়ছে সেই পদার্থের অণুর মধ্যে তেজ-বিনিময়ের ফল হচ্ছে এই ব্যাপারটি। সহজ ভাষায় এটুকু বুঝে নেওয়া যেতে পারে, স্বচ্ছ পদার্থ থেকে বেরিয়ে আসার পরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়া আলো যে ভিন্ন ধরনের হচ্ছে তার কারণ, তার আগেই সেই আলো আর সেই স্বচ্ছ পদার্থের মধ্যে

CENTRAL LIBRARY

একটা দেওয়া-নেওয়ার ব্যাপার ঘটে গিয়েছে।

অবশ্যই ব্যাপারটি এত সহজ ও সরল নয়। অণুর অপটিক্যাল ধর্ম, অণুর আবর্তনের ও কম্পনের শক্তিযোগগত তত্ত্বও এই সঙ্গে বিচার্য।

'রামন এফেক্ট'-এর প্রয়োগ কিন্তু ঘটেছে বহু ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে। কয়েকটি ক্ষেত্রে এই কারণে যে, বর্ণালীর ধরনটি নির্ভর করছে অণুর প্রকৃতির ওপরে, তা থেকে অণুর গড়ন সম্পর্কেও ধারণা পাওয়া যেতে পারে। ফলে, রাসায়নিক বিশ্লেষণের প্রচলিত পদ্ধতিতে বস্তু সম্পর্কে যে-সব খবর বার করতে অনেক সময় লাগে, বা একেবারেই বার করা যায় না, বর্ণালীর বিশ্লেষণ থেকে তা পাওয়া সম্ভব।

বিশেষ করে হীরে, পাথর ইত্যাদি স্ফটিক থেকে বিচ্ছুরিত আলোর বর্ণালী বিশ্লেষণ করলে বস্তুর কঠিন অবস্থার প্রকৃতি ও ধর্ম সম্পর্কে অনেক কিছুই জানা যায়। বিষয়টি খুবই কৌতূহলোদ্দীপক। ডঃ রামন নোবেল পুরস্কারের প্রায় সমস্ত টাকা খরচ করেছেন হীরে-মুক্তোপাথর কেনার জন্যে এবং স্ফটিকের গড়ন সম্পর্কে অনেক নতুন তথ্যও আবিষ্কার করেছেন।

লুনা-১৭ ও লুনাখোদ-১

চাঁদের মাটিতে আট চাকার একটি গাড়ি চালিয়ে সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা আরো একবার প্রথম হবার কৃতিত্ব অর্জন করলেন। স্পুৎনিক-এককে আকাশে তুলে ও কক্ষপথে পাক খাইয়ে তাঁরাই প্রথম পৃথিবীর একটি কৃত্রিম উপগ্রহ সৃষ্টি করেছিলেন। পরবর্তীকালের মহাকাশ গবেষণার ও অভিযানে আরো অনেক ব্যাপারেই তাঁরা প্রথম—যেমন, চাঁদের বিপরীত দিকের আলোকচিত্র, পৃথিবীর কক্ষপথে মানুষ, চাঁদের মাটিতে আলগাভাবে অবতরণ, চাঁদ থেকে টেলিভিশন বার্তা ও ছবি, নভশ্চরদের দলবদ্ধ শূন্য-পরিক্রমা, মহিলা নভশ্চর, শূন্যে অবস্থান কালে ব্যোমযান থেকে নিষ্ক্রমণ, পৃথিবীর কক্ষপথের গবেষণাগার। উল্লিখিত প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা পথ-প্রদর্শক।

এবারে এই তালিকায় আরো একটি কৃতিত্ব যুক্ত হল : লুনোখোদ—১।

সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা বারবার ঘোষণা করেছেন, মহাকাশ গবেষণায় বর্তমান অবস্থায় অভিযান হওয়া উচিত মনুষ্য-বিহীন। তাতে খরচ অনেক কম, ঝুঁকি বিন্দুমাত্র নেই, তথ্য-সংগ্রহের সম্ভাবনা প্রচুর। এখনকার অবস্থায় মহাকাশে মানুষ নিজে যেটুকু করতে পারে, যন্ত্র তার চেয়ে কম নয়, বরং অনেক হিসেবে বেশি। মহাকাশে মানুষ পাঠানোর জটিলতা তো আছেই, তাছাড়া এখনো পর্যন্ত রকেট-বিদ্যা যতোদূর অগ্রসর তাতে বড়ো জোর শুক্র বা মঙ্গল পর্যন্ত মানুষের পক্ষে পাড়ি দেওয়া সম্ভব—অন্তত কাগজে-কলমে। কিন্তু মহাকাশ তো আর পৃথিবী আর তার ঘরের কাছের দুটি গ্রহ নয়। আমাদের এই সৌরমন্ডলই বা আমাদের এই বিশ্বের কতটুকু অংশ? আমাদের এই বিশ্ব গোটা মহাবিশ্বের? এত বিরাট ব্যাপারের মধ্যে না গিয়েও এটুকু বলা চলে যে, আমাদের এই সৌরমন্ডলের গ্রহ গুলোতে পাড়ি দেওয়াও মানুষের আয়ুষ্কালের মধ্যে সম্ভব নয়।

অতএব সামান্য এই সৌরমন্ডল সম্পর্কে খবর জানতে হলেও স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের ওপরে নির্ভর করতেই হয়। সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা সঠিক দিকেই চলেছেন। আর চাঁদের-মাটিতে যদি একটি আট-চাকার গাড়ি চালানো সম্ভব হয়ে থাকে তাহলে মঙ্গল বা শুক্রগ্রহের মাটিতে কেন হবে না? বা আরো দূরের কোনো গ্রহে? নিশ্চয়ই সম্ভব। লুনোখোদ—১ থেকেই এই আশ্চর্য সম্ভাবনার সূত্রপাত।

লুনা-১৭ আকাশে উঠেছিল ১০ই নভেম্বর তারিখে। ১৫ই নভেম্বর চাঁদের এলাকায় গিয়ে পৌঁছয় ও চাঁদের কক্ষপথে পাক খেতে শুরু করে। ১৭ই নভেম্বর আলতোভাবে চাঁদের মাটিতে নামে। এ পর্যন্ত নতুন কিছু নয়, সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা আগেও করেছেন। কিন্তু তারপরে যা ঘটেছে তা নতুন। ব্যোমযান থেকে চাঁদের মাটিতে নেমে আসে একটি গ্যাংওয়ে আর সেই গ্যাংওয়ে দিয়ে গড়িয়ে মাটিতে নেমে আসে আট-চাকার গাড়ি লুনোখোদ—১। আর সমস্ত ব্যাপারটাই ঘটানো হয় পৃথিবী থেকে দূর-নিয়ন্ত্রিত যন্ত্রের সাহায্যে।

তারপরে আরো আশ্চর্য ব্যাপার। চাঁদের মাটির ওপরে সেই আট-চাকার গাড়ি চলতে শুরু করে। পথ চিনে চিনে চলে, কোথাও গর্তে পড়ে গিয়ে বা পাথরে-ঢিবিতে ঠেকে গিয়ে আটকে যায় না। এই পথ চেনবার কাজটিও সম্পন্ন করা হয় পৃথিবী থেকে।

পাঠকরা নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছেন, ব্যাপারটা যতো সহজে লেখা যাচ্ছে ততো সহজে ঘটানো যায়নি। সত্যিকারের গাড়িটি চাঁদের দিকে পাঠাবার আগে এই পৃথিবীর মাটিতেই অজস্র রকমের গাড়ি বানিয়ে দেখতে হয়েছে কোনটি সবচেয়ে উপযোগী, নকল চাঁদের মাটি বানিয়ে পরখ করতে হয়েছে কেমন-ভাবে গাড়ি চলবে, ইত্যাদি। সঙ্গে সঙ্গে আরো একটি বড়ো অসুবিধের কথা মনে রাখতে হয়েছে। চাঁদের মাটির ছবি টেলি-ভিশনে পৃথিবীতে পৌঁছতে সময় লাগছে দেড় সেকেন্ড, সেই ছবি দেখে পৃথিবী থেকে লুনোখোদকে চলার যে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে তা বেতারে পৌঁছতে সময় লাগছে আরো দেড় সেকেন্ড। মোট এই তিন সেকেন্ড সময় কিন্তু লুনোখোদ থেমে থাকে নি। এমনও হতে পারে, এই তিন সেকেন্ড সময়ের মধ্যেই এমন একটা বাধা লুনোখোদের সামনে পড়ে গেল যে লুনোখোদ অচল। গাড়ি চলছে চাঁদের মাটিতে, চালক বসে আছে পৃথিবীতে, রাস্তা দেখতে আর হুকুম পাঠাতে সময় লাগছে তিন সেকেন্ড, তাছাড়া চাঁদের জমি এখনো পর্যন্ত পৃথিবীর মানুষের কাছে এমন কিছু পরিচিত জায়গা নয় যে, চোখ বুজে গাড়ি চালানো চলে—অন্য সব ছেড়ে দিয়ে শুধু এই ব্যাপারটুকু মনে রাখলেও ধারণা করা যাবে চাঁদের মাটিতে আট-চাকার গাড়িটি চালানো ও চালু অবস্থায় রাখা কতখানি কৃতিত্বের পরিচয়।

আর গাড়ি চালাতে পারলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধি, তা তো নয়। গাড়ি চালানো হচ্ছে বৈজ্ঞানিক গবেষণা চালাবার জন্যে, সে জন্যে হাজারো যন্ত্রপাতি রয়েছে গাড়ির মধ্যে। গাড়ি চলবার সঙ্গে সঙ্গে এইসব যন্ত্রপাতিও ঠিক-ঠিক চলা চাই।

সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের ঘোষণা অনুযায়ী বিশ্বাস করতে হয় যে, সব কিছুই ঠিক-ঠিক চলেছে। অর্থাৎ লুনা—১৭ থেকে শুরু হল চাঁদ নিয়ে গবেষণার নতুন একটি পর্ব। লুনা—২ চাঁদের মাটিতে আছড়ে পড়েছিল, লুনা—৯ ও লুনা—১৩ চাঁদের মাটিতে আলতোভাবে নেমেছিল কিন্তু তারপরে আর নড়াচড়া করে নি, লুনা—১৭ বিস্তৃত এলাকা জুড়ে নড়াচড়া করেছে একটি আট-চাকার গাড়ি নামিয়ে দিয়ে।

আর এতসব কান্ড ঘটল মাত্র এগারো বছরের মধ্যে—১৯৫৯ থেকে ১৯৭০। আগামী এগারো বছরে যে কী ঘটবে তা কল্পনা করাও শক্ত।

ধাঁধার জবাব

গ ও খ এই দুজনের একজন ছেলে একজন মেয়ে, গ ও ঘ এই দুজনের বেলাতেও তাই। অতএব ঙ ও চ একজন ছেলে একজন মেয়ে, খ ও ঘ দুজনেই ছেলে বা দুজনেই মেয়ে। তার মানে, হয় খ ঘ ও ঙ ছেলে এবং গ ও চ মেয়ে, কিংবা, খ ঘ ও চ মেয়ে এবং গ ও ঙ ছেলে। অলিম্পিক ১০০ মিঃ হার্ডল প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারে শুধু মেয়েরা। অতএব সঠিক জবাব হচ্ছে—

গ ও ঙ ছেলে

ক, খ, ঘ ও চ মেয়ে।

—অয়স্কান্ত

ভ্রম-সংশোধন

গত সংখ্যায় ছাপা হয়েছে পাকিস্তানে প্রাকৃতিক গ্যাস মজুত আছে ২২ মিলিয়ন ঘনফুট, হবে ২২ মিলিয়ন মিলিয়ন ঘনফুট।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কোনরকম আত্মরক্ষার সুযোগ না দিয়ে আচমকা বিনয় চেয়ার ছেড়ে উঠে পিছন থেকে শেফালীকে জড়িয়ে ধরল। তারপর কাঁধের উপর পর পর কয়েকবার চুম্বন করল। শেফালী প্রথম কয়েক মুহূর্ত হত-ভম্বের মত স্থির হয়ে থাকে। ধীরে ধীরে টের পায় শরীরে অসহ্য শিহরণ। কাঁধের উপর গরম নিঃশ্বাস। সে এক ঝটকায় সরিয়ে দিতে চায় বিনয়দাকে। পারে না। দু'চোখ ছাপিয়ে জল আসে। অবরুদ্ধ কান্না চাপে ভাঙা গলায় বলল, ছি! ছেড়ে দিন।

তারপর আলিঙ্গন শিথিল হলে ক্ষিপ্র-বেগে বুকের কাপড় ঠিকঠাক করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়।

কিছুক্ষণ চুপচাপ কী যেন ভাবল বিনয়। একটা সিগারেট ধরিয়ে হাসল আপনমনে। সত্যি, বেশ ঘাবড়ে গেছে মেয়েটা। দেখা যাক ফলাফলটা কি রকম হয়। শেফালী রেগে গেল না তো? দূর ছাই! ফালতু কেন এসব ভাবছে। আর দু'দিন পর একসঙ্গে শুতে হবে। হ্যাঁ, শিগ্‌গির জানিয়ে দেবে মাকে, শুভদিন করে দাও উৎসব। মা, তোমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হোক। এখন না করলে আর কবে করবে বিয়ে। তার যখন ইচ্ছে করছে শেফালীকে পেতে আর কোন কথা থাকতে পারে না। এবার সে দেখবে নারীর ভালবাসায় জীবন পূর্ণ হয় কিনা।

ছাইদানীর মধ্যে সিগারেটের শেষাংশ গুঁজে ঘর ছেড়ে বারান্দায় আসে বিনয়। মীরা কী ঘুমিয়েছে?

হ্যাঁ, স্নায়ুযুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছে মা আর মীরার মধ্যে। এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। খুব স্বাভাবিক, মীরার জীবনধারা বা অকস্মাৎ রক্তদাকে ত্যাগ করে এখানে চলে আসা ও স্বাধীনভাবে রোজগার তথা বেঁচে থাকার চেষ্টা—এতটা হজম করে উদার মনোভাবের পরিচয় দেওয়া মার পক্ষে বেশ কঠিন। তবে কী পরোক্ষে বলা যায় মা অনুদার ও তাঁর মনোভাব সঙ্কীর্ণ? না, তা নয়। অগাধ ভালোবাসা স্নেহ আছে মার বুকে। সময়বিশেষে তা উজাড় করে দেন। সুতরাং রাগ বা অভিমানের কথা বললে এমনকি তিরস্কার পর্যন্ত—সমগ্র পরিস্থিতি বিবেচনা করে মীরার উচিত ধৈর্য ধরা। নইলে কপালে অশেষ দুঃখ। মীরার এসব বোঝা উচিত।

ঘড়ি দেখল বিনয়। প্রায় আটটা বাজে। শেফালীর জন্য সাধের টিউশনীটা বদলে সকালের দিকে করে নিয়েছে। এ-ব্যবস্থা সাময়িক। শেফালীর মা পরোক্ষে টাকা দেবার কথা বলেছিলেন। ভদ্রমহিলার হাসি মুখের দিকে তাকিয়ে মেজাজ আর একটু হলেই বিগড়ে যেত। অতিকষ্টে সংযত করেছে নিজেকে।

রান্নাঘরে যাওয়ার সময় এ-ঘরে এক-বার উঁকি দিল বিনয়। বাপ্পার পাশে মীরা শুয়ে।

—মা। বিনয় হাঁটু ভেঙে নীহারের পাশে বসল, তোমার পুজোর সময় পেরিয়ে গেল। কখন বসবে?

—রান্না শেষ না হলে যাই কিভাবে।

—মীরাকে ডাক। রাতের রান্না ওই তো করাতে পারে। ও শুয়ে রয়েছে কেন এমন অসময়ে?

নীহার অদ্ভুত মুখভঙ্গী করে বললেন, কে জানে! তোদের কখন কি খেয়াল হয়, মেজাজ কখন কি রকম থাকে, আমি এসব বুঝিনে বাবা। আর কতদিন চোখের সামনে এসব অনাছিষ্টি দেখে যেতে হবে ভগবান জানে! কিন্তু আর বেশীদিন বোধহয় আমি বাঁচবো না। আমাকে তুই কাশী পাঠিয়ে দে।

মার গলা জড়িয়ে বিনয় হাসল, তুমি রাগলে বা অভিমান করে দূরে সরে গেলে আমরা কোথায় যাই মা। তুমি ছাড়া আমাদের আর কে আছে! এভাবে বাধা দিয়ে মীরার ভাল করতে পারবে না। বরং ওকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে দাও। শোন একটা কথা। ও কিন্তু ভীষণ জেদী মেয়ে। বেশি শাসন করাতে গেলে উল্টো ফল হবে। অত ভেব না। দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে। ওঠ তুমি মা। কোন কথা শুনবো না। পুজোয় বসবে। মীরাকে ডেকে দিচ্ছি।

কিছুক্ষণ পর দেখা যায় একটা মোড়ায় বসে বিনয়। মীরা কড়ার খুন্তি নাড়তে নাড়তে মাঝে মাঝে মুখ ফিরিয়ে কথার জবাব দিচ্ছিল।

—একটা রেডিয়ো কিনবে দাদা? তোমার তো কোন সখ নেই দেখছি।

বিনয় সশব্দে একটা হাঁচি দেয়, উঃ একেই বলে বাঙালের রান্না। খালি ঝাল দেবে সব জিনিসে। কী বললি একটু আগে ঃ সখের কথা বলছিলি বোধ করি। সখ বল, ফ্যাসান বল, আনন্দ স্ফূর্তি সব —পয়সার মক্কায় খেলাটি।

একটা সিগারেট ধরিয়ে বেশ জোরে কয়েকবার টানল বিনয়। মীরার মুখের দিকে অনবন তাকাল।

"অথচ ভেবে দ্যাখ মীরা, শহরের এদিক-সেদিক ঘুরলে, বিশেষ করে সন্ধ্যার পর, একবার গিয়ে যদি দাঁড়াস পার্ক স্ট্রীটে; হাঁ করে দেখবি নিয়নের বিজ্ঞাপন, মদের দোকানের সামনে গাড়ির ভিড়, সুসজ্জিত নরনারীর ঘন ঘন আনাগোনা, ভিখিরি বালিকার জোড়হাতে গাড়ির সামনে দাঁড়ানো। অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্যে ভুলাতে পারবি তোদের নিম্নমধ্যবিত্তসুলভ ফোলো অহংকার। আমাদের আর কী আছে বল শুধু দাঁত খিঁচিয়ে পরস্পরের দিকে তেড়ে যাওয়া ছাড়া!"

মীরা হাসল, অসংলগ্ন কথা বলছো দাদা। আমি জানি আসলে তুমি কী বলতে চেয়েছো। পয়সার অভাবে একটা রেডিয়ো কিনতে পারছো না অথচ এ-বাসনাটুকু তোমার স্বাভাবিক। অন্যদিকে কী বিপুল অর্থের অপচয় মদ ও নানারকম বিলাসে। কারা করছে? মুষ্টিমেয় কিছু লোক। এদের প্রতি তোমার ঘৃণা প্রকাশ করা উচিত দাদা। তা না করে স্ব সমাজের নিন্দা করছো। বেশ স্বার্থপর তুমি!

—আমি বিশেষ কোনও সমাজের অংশীদার হিসেবে নিজেকে ভাবি না। বলতে বলতে বিনয়ের মুখ গম্ভীর হয়ে ওঠে। আর কোন কথা না বলে উঠে দাঁড়াল। ফিরে এল নিজের ঘরে। একবার চেয়ারে বসতে গিয়ে কি ভেবে সবুজ আলো জেলে বিছানায় শুয়ে পড়ল। দপদপ করছে কপালের দুদিকের রগ। অশরীরী একটা তীব্র জ্বালা অনুভব করছে। সে কী স্বার্থপর? সে কী স্ব-সমাজের কথা মোটেও ভাবে না? মীরার অভিযোগ কতদূর সত্য?

অনেকক্ষণ এলোমেলো চিন্তায় সময় কেটে যায়। শুধু টেবিল ঘড়িটার একঘেয়ে টিকটিক শব্দ কানে এসে আঘাত করছে। বিনয় চিৎ হয়ে শুয়ে সবুজ আলো দেখল কিছুক্ষণ। মীরা জানে না কিছু। ও জানে না স্ব-সমাজের অস্তিত্ব এখন আর নেই। সব তালগোল পাকিয়ে জগাখিচুড়ি বনে গেছে। আর স্বার্থপরতার কথা ওঠে না। সে প্রতিদিন চলাফেরায়, মানুষের সঙ্গে তাদের আদান-প্রদানে, নিমন্ত্রণ বা অনুষ্ঠানে, লক্ষ করেছে চরম অসামাজিকতা, নির্বিকার মনোভাব, স্রোতের সঙ্গে গা ভাসিয়ে চলা। লক্ষ করেছে সামান্য কারণে, যা অনায়াসে অগ্রাহ্য করা যায়, বিস্ফোরণ ঘটে যায়। সাধারণ মানুষদের কথাই সে বলছে। তার মত সাধারণ একজন নিম্নমধ্যবিত্তের পক্ষে অ-সাধারণদের জানার কথা নয়। অ-সাধারণ অর্থে বিত্তবানদের কথাই বোঝাতে চায়।

—বিনু!

মাথায় নরম স্পর্শ। বিনয় আবছায়া আলোয় মার মুখ দেখার চেষ্টা করল। কাতর আবেদন কী মার কণ্ঠস্বরে? যেন বহু দূর থেকে ভেসে আসছে। বিশেষ কোনও আর্জি নিয়ে এসেছেন মা। স্বস্তিবোধ করল সে। নইলে একাকী চিন্তার হাতে নিজেকে সঁপে দিতে হোত। চুলচেরা বিশ্লেষণ করতে-করতে এক সময় ক্লান্ত হতাশ হয়ে উঠতো। বাস্তবিক অত খুঁটিয়ে ভাবলে সহজভাবে নিঃশ্বাস ফেলাই যে কষ্টকর হয়ে উঠবে। বরং একটু কম ভেবে কাজের মধ্যে ডুবে থাকা ভাল। অলস চিন্তার মত কষ্টকর আর কিছু নেই।

মার কোলে মাথা রাখে বিনয়। নরম গলায় বলে, খিদে পেয়েছে মা। ভাল লাগছে না। তাড়াতাড়ি খেয়ে শুয়ে পড়বো।

—চল তাহলে রান্নাঘরে। মুখে বললেও ওঠবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না নীহারের হাবভাবে। বরং তিনি আরও গুছিয়ে বসলেন।

বিনয় মনে-মনে হাসল। মা নিজেকে প্রস্তুত করছেন। প্রথমেই আসল কথাটি বলবেন না। কিছুক্ষণ নানা রকম গল্প করবেন। মাঝে-মাঝে তাকিয়ে দেখবেন ছেলের মুখ-চোখ। যদি দেখেন খোস মেজাজ এখন আসল কথাটি প্রকাশ করবেন।

—শেফালীর লেখাপড়ায় মাথাটা কেমন বিনু। পাশ-টাশ করতে পারবে তো?

—ভালভাবে পড়লে কেন পারবে না।

—শোন বিনু। নীহার কিছুক্ষণ চুপ করে বলেন, ওরা খুব তাগাদা দিচ্ছে। ভাল লাগে না বাপু, ইচ্ছে হলে মত দে। নইলে ওদের স্পষ্ট জানিয়ে দি আপনারা অন্য ছেলে দেখুন।

সঙ্গে-সঙ্গে কোন উত্তর দেয় না বিনয়। চট করে রাজী হয়ে গেলে মা ভড়কে যাবেন। হ্যাঁ, এ নিয়ে আর চিন্তা করার নেই। ইচ্ছে করছে বিবাহিত জীবনকে একটু চেটে-চুটে দেখতে। কেমন তার স্বাদ। কেমন তার গন্ধ বর্ণ ঘ্রাণ। অতএব শুভস্য শীঘ্রম।

—বেশ তোমার যা ইচ্ছে মা। উদাসীন-ভাবে মার দিকে তাকাল বিনয়।

এর পর অনেক কথা বললেন নীহার। অনেক উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেন। মনে-মনে ভাবলেন শেফালী জাদু জানে। বিনয়কে বশ করতে পেরেছে। খুশী হলেন তিনি। বয়স হয়ে যাচ্ছিল ছেলের অথচ বিয়ে-থা করে সংসারী হবার আগ্রহ নেই। শুধু বই আর বই। স্কুল আর টিউশোনী করতে যা বাইরে বেরোয়, বাকী সময় বই মুখে গুঁজে পড়ে থাকে। বেড়ানো কি বন্ধু-বান্ধব নিয়ে গল্প-গুজব করা, ওর বয়সী আর পাঁচটা ছেলে যেভাবে সময় কাটায়—এসবের ধারে-কাছ দিয়ে ও যাবে না। যাক বাঁচা গেল। এখন শেফালী এসে ছেলের মুখে হাসি ফোটাক। ছেলেপুলে হোক। শিশুর কল-হাস্যে মুখরিত হোক এই ঘর। প্রাণ জেগে উঠুক এই ঘরে। নিষ্প্রাণ নিষ্প্রভ বিনয় যেন নতুন উৎসাহে হাসি মুখে বাঁচতে পারে। ছেলের সুখই তাঁর সব!

—ঘুমোলি নাকি বিনু? নীহার সস্নেহে চুল ধরে টান দেন এই বললি খিদে পেয়েছে। ওঠ দুষ্টু ছেলে।

বিনয় আড়মোড়া ভেঙে উঠতে থাকে, চল। মীরা মীরা! চিৎকার করে ডাকে, খেতে দিবি না মুখপুড়ি! এতক্ষণ ধরে এত কী রাঁধছিস।

—চেঁচিয়ো না দাদা। মীরা হাসি লুকিয়ে বলল, এটা কী হোটেল পেয়েছো।

—দ্যাখ মা। বিনয় কপট ক্রোধে বলল, তোমার মেয়ে আমার একটা কথাও শোনে না। আবার মেজাজ দেখাচ্ছে।

কয়েক মিনিটের মধ্যে বিনয় চারখানা রুটি খেয়ে নিল। সঙ্গে ছোলার ডাল আর আলুর দম। প্রথম দিকে রুটি দেখলে গায়ে জ্বর আসত। এখন বেশ অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে। বরং রাত্রে রুটি না হলে রীতিমত অস্বস্তিবোধ করে।

মীরার মুখ অনেকটা গম্ভীর। একবার আড়চোখে সেদিকে তাকাল বিনয়। গুমোট ভাবটা সম্পূর্ণ কাটে নি। যদিও যথাসাধ্য চেষ্টা সে করেছে। হাসি-গল্প-ঠাট্টায় সহজ আবহাওয়ার সৃষ্টি করতে চেয়েছে। এখন মনে হচ্ছে সে ব্যর্থ। মা বা মীরা উভয়েই আপন-আপন জেদ বজায় রাখতে সচেষ্ট। ফলে যত গণ্ডগোল। অন্ততঃ একজন নরম হলে আর কথা ছিল না।

—কবে হচ্ছে বিয়েটা? মীরা গম্ভীর গলায় বলল, শেষ পর্যন্ত হবে তো, না ভেস্তে যাবে।

—ভেস্তে যাবে! বিনয় হাসল, অভি-শাপ দিচ্ছিস?

—বাজে বকো না দাদা। বিয়ে করছো, এতে সবচেয়ে খুশি আমি।

নিঃশব্দে খেয়ে যায় বিনয়। খাওয়া শেষ হলে ওঠার আগে বলল, তোর শর্ট-হ্যাণ্ডের স্পীড কত হলো? এখন থেকেই চাকরীর জন্যে দরখাস্ত কর। বলা যায় না লেগে যেতে পারে।

মীরা আস্তে-আস্তে কী বলল শুনতে পেল না। বারান্দায় চৌকির উপর বসে মা রাতের জলযোগ সারছিলেন। হাল্কা খাবার। বিনয় সেদিকে এক পলক তাকিয়ে ঘরে ঢুকল। দরোজা বন্ধ করে লাইট নিভিয়ে শুয়ে পড়ল। একটু পরে শুনল কান্না। পল্টুর গলা। সঙ্গে-সঙ্গে ভেসে উঠল আর একটি মুখ। তন্দ্রার মধ্যে, বিনয় অস্ফুটস্বরে চিৎকার করে উঠল। ঘুম ভেঙে গেলে টের পেল কপালে ঘাম।

বালিশেরতলা থেকে সিগারেট বের করে ধরাল। কী স্বপ্ন যেন দেখছিল? এখন মনে পড়ছে। হাঁ, বিশ্রী অস্বস্তিকর স্বপ্নটা। রজতদা রিভলবার হাতে ছুটে আসছে। সে ছুটছে প্রাণভয়ে ভীত জন্তুর মত। এর পর ঘুম ভেঙ্গে যায়।

মশারি তুলে বিনয় দরোজা খুলে বাইরে যায়।

।। পাঁচ ।।

চেয়ারের উপর থেকে কোটটা নিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে পরতে থাকে রজত। কব্জী উল্টে ঘড়ি দেখল। সাড়ে চার। আবার আয়নার দিকে চোখ পড়ল। মসৃণভাবে গাল কামানো। উল্টে চুল আঁচড়ানো। দু চোখের নীচে কেমন ফোলা-ফোলা। বাইরে থেকে দেখলে বেশ তৃপ্ত মনে হবে। সুখী লোকদের চেহারা বোধহয় এরকমই। তা হবে।

ক্রিং-ক্রিং করে টেলিফোন বাজছে। সেদিকে কোন মনোযোগ দিল না প্রথমটা রজত। একমনে টাই বাঁধল বেশ কিছুক্ষণ। কিন্তু পলায়নের কোন উপায় নেই। ক্রিং-ক্রিং করে টেলিফোন বেজেই চলেছে। সম্মোহিতের মত সেদিকে টেনে নিয়ে গেল তাকে। রিসিভার তুলে যান্ত্রিক সুরে বলল, আমি রজত সোম কথা বলছি। কে বলছেন? আচ্ছা, কেমন আছেন? না, অত্যন্ত দুঃখিত। আজ আমার একটা জরুরী অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। কী বললেন? সে পরে ঠিক করা যাবে। পরে রিং করবেন। বাই-বাই!

বেশ শব্দ করে রিসিভার রেখে দিল রজত। তারপর টেবিলের উপর থেকে কিছু দরকারী কাগজপত্র ড্রয়ারে বন্ধ করে সুইং-ডোর ঠেলে বাইরে আসে। বেয়ারা উঠে সেলাম জানায়। কোনদিকে না তাকিয়ে, অধস্তন কর্মচারীদের চোখের দিকে সাধারণত সে তাকায় না, লিফটের দরোজার সামনে এসে দাঁড়াল।

জনস্রোত ঠেলে রজত হাঁটতে থাকে। পিলপিল করে আশে-পাশের বাড়িগুলো থেকে লোক বেরুচ্ছে। আর ছুটছে বাস-ট্রামের দিকে। মিঃ সেনন টেলিফোন করছিল। একটা আধা-বিলিতি কোম্পানীর পারচেজিং অফিসার। ভাল মাইনে। তার-চেয়ে বেশী পায় এদিক-সেদিক, করে। অনুরোধ করছিল আজ সন্ধ্যাটা ওর সঙ্গে কাটাতে। রজত অতিকষ্টে এড়াতে পেরেছে। রোজ অফিসের পর ঐসব লোকদের সাহচর্য ভাল লাগে না। আজ বাড়ি ফিরবে তাড়া-তাড়ি। বিশ্রাম করবে।

বাড়ির কাছাকাছি গলির মুখে ট্যাক্সী থেকে নামল রজত। মিটার দেখে ভাড়া দেবার সময় পিছন ফিরে তাকিয়ে অবাক। বেশ কিছুটা দূরে একটা গাড়ি বারান্দার নীচে কয়েকজন বসে। হঠাৎ একজন সেখান থেকে উঠে দৌড়ে পালাল। স্পষ্ট দেখল ছুটছে রামু। কী করছিল ওখানে? এদের কাউকে চেনে না সে। কস্তুত এ পাড়ায় বহুদিন থাকলেও একরকম সে অপরিচিত। পাশ দিয়ে যাবার সময় ছড়ানো তাস, পয়সা, ইতস্তত বিড়ির টুকরো, ওল্টানো মাটির ভাঁড় লক্ষ করল। আচ্ছা, রামু তাহলে ইদানীং জুয়ো খেলতে শিখেছে। জানতো বিড়ি খায়। ঠোঁট দেখলেই বোঝা যায়।

ঘরে ঢুকে রজত সোফার উপর বসল। একটা সিগারেট ধরিয়ে হেলান দিয়ে চোখ বুজে রইল। রান্নাঘর থেকে পেয়ালা-পিরীচের ঠুংঠাং শব্দ ভেসে আসছে। অনেকক্ষণ পর আলো জ্বলতে চোখ মেলল সে। টেবিলের উপর ধূমায়িত কফি আর বিস্কুট। মাথা নীচু করে রামু দাঁড়িয়ে। ব্যাটা, খুব লায়েক হয়ে উঠেছিস! ভেবে-ছিল আচ্ছা করে ধমকে দেবে। এখন মনে হচ্ছে কোন প্রয়োজন নেই। যা খুশি করে বেড়াক রামু সেজন্যে সে ধমকাতে যাবে না। ঠিকমত আমার কাজ করো। আর কিছু চাই নে। তারপর তোমার জীবন তোমার। ডু এনিথিং ইউ লাইক।

ইসারায় ওকে যেতে বলে কফিতে চুমুক দিল সে। ড্রেসিং টেবিলের উপর ফটো। তার আর মীরার বৌথ ছবি। অনেকক্ষণ তাকিয়ে দেখল। কী তেজ মহিলার! স্বাধীনভাবে থাকবে বলে চলে গেল। ক' মাস হলো চলে গিয়েছে মনে পড়ছে না। এখানে কী মীরা পরাধীনতার মধ্যে ছিল? জানে না সে। যাক চলে গিয়ে ভালই হয়েছে। রোজ ঝগড়া করার চেয়ে আলাদা থাকা ভাল। মীরা ফেমিনিস্ট ওর মাফ-মাফিক সে চলবে। হাউ ফানি? একটা চিটকাঁদুনে মেয়ে। অফিস যাও বাড়ি ফিরে আস, মুখের কাছে মুখ এনে গল্প কর, বাজার যাও, রাত্রে পাশে শুয়ে যৌন খিদে মেটাও— ওরকমভাবে চলা কী তার পক্ষে সম্ভব? হাঁ, স্বাভাবিকভাবেই চলতে পারে নি। তারপর নানারকম বিধি-নিষেধ। এরকম স্ত্রীলোকের সঙ্গে তিন-চার বছর কিভাবে কাটিয়েছে, আজ ভাবলে রীতিমত মাথা ঘুরে যায়!

মীরার সব খবর সে রাখে। না, কোন ইন্টারেস্ট নেই। নিছক কৌতূহল। বেশ আরামেই তো ছিলে। এখন হাড়ে-হাড়ে টের পাবে অভাব-অনটনের মধ্যে থাকার মজা আছে কিনা। সব জানে। আবার চাকরী করবে তারই প্রস্তুতি নিচ্ছে মীরা। বেশ তো চাকরী-বাকরী করে নিজের পায়ে দাঁড়াও। সেদিন এই অহঙ্কার কোথায় ছিল? হাস-পাতালে ভাই শয্যাশায়ী, ঘরে দুবেলা খাবার মত অবস্থা নেই, নিজে দুখের থিয়েটারে নেমেছো। তখন এই শর্মা বাঁচিয়েছে তোমাদের সকলকে। তুমি নষ্ট হয়ে যেতে। শকুনে ছিঁড়ে খেত তোমার নধর শরীর! আজ পরিবর্তিত অবস্থায় তোমরা সব ভুলে গিয়েছো। স্বার্থপর নেমকহারামের দল! রজত উত্তেজনায় পকেটে দু হাত দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

আলমারী খুলে মদের বোতল বের করল রজত। গ্লাসে খানিকটা ঢেলে বোতলটা ফের যথাস্থানে রেখে দিল। আলমারী বন্ধ করল না। তারপর আলতো-ভাবে হেঁটে ড্রেসিং টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল। এক চুমুকে সবটা পান করল সে। আয়নার ভিতর একটি মুখ। চুল এলো-মেলো। ঘর্মাক্ত। টাই-এর নট আলগা। কাঁধের কাছে জামা কোঁচকানো। সেদিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে হঠাৎ হো-হো করে হেসে উঠল রজত। তারপর গ্লাসের নীচের তলানিটুকু ছুঁড়ে মারল ফ্রেমে বাঁধানো ফটোর দিকে। ভালবাসা ঢেকে গেল তরল মদে!

একটু পরে রজত সোফায় দেহ এলিয়ে দেয়। আঙ্গুলের ফাঁক থেকে সিগারেট খসে পড়ে। টের পায় রামু নীচু হয়ে কুড়িয়ে জুতো খুলছে। তারপর রামুর কাঁধে ভর দিয়ে এগোয়। পাশের ঘরে এসে বিছানায় শুয়ে পড়ে! ওর দু পা ধরে টেনে রামু সোজা করে রাখে। বালিশ ঠিকঠাক করে। মাথা উঁচু করে বালিশের মাঝখানে চোখ আলো নিভিয়ে আস্তে-আস্তে বেরিয়ে যায়।

ঘন্টা খানেক পর রজত জেগে উঠল। বিছানা ছেড়ে মেঝেয় নেমে আলো জ্বেলে সোজা বাথরুমে গিয়ে ঢুকল। চোখে জলের ঝাপটা দিল অনেকক্ষণ। তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছে বাথরুমের আলো নিভিয়ে ঘরে এল। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াল বেশ মনোযোগ দিয়ে। চোখ-মুখ ফোলা-ফোলা। রান্নাঘর থেকে সুন্দর একটা গন্ধ ভেসে আসছে। খাসা রাঁধে রামু!

মীরার রান্না তার পছন্দ হোত না। আঃ ফের কেন মনে পড়ছে! অস্থির পদ-শব্দ করে পাশের ঘরে আসে। সব জিনিস ঠিক তেমনি সাজানো। রামু রোজ সাজিয়ে রাখে। ড্রেসিং টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল। খানিকক্ষণ ফটো দেখল। ধীরে-ধীরে মুখে হাসির রেখা ফুটল। তারপর রজত হাত দিয়ে খিমচে ধরল ফটো। ড্রয়ার খুলে ফটো রেখে বন্ধ করল। ঘরের চারিদিকে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখল। খালি আলনা। খালি বিছানা। শূন্য তক্তপোষ। খাঁ-খাঁ করছে চারিদিক। শুধু মৃদুভাবে শোনা যাচ্ছে শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ। রজত ঘরের মাঝখানে শূন্যদৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে রইল অনেকক্ষণ।

তখন পর-পর কয়েকবার কলিং বেল বেজে উঠল। চমকে উঠল রজত। ঘরের চারিদিকে ঘুরল অস্থিরভাবে। চারিদিকে দেখল। ওঘরে ছুটে গেল। তবু কানে আসছে কলিং বেলের অমোঘ শব্দ। দু হাতে কান চেপে ধরল। তবু সে স্পষ্ট শুনল তেমনি বেজে চলেছে কলিং বেল। তার পাশ দিয়ে দ্রুতগতিতে বেরিয়ে যায় রামু। রজত দরোজা খোলার শব্দ শুনতে পেল। অসহায় দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক তাকিয়ে বাথরুমে ঢুকে ছিটকিনি-আঁটে

ছিল সে। অন্ধকারের মধ্যে নিশ্চল মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল।

দামী একটা সেন্টের গন্ধ ভেসে আসছে। কে এলো? সে রামুর অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর শুনতে পেল। সেই সঙ্গে লোভকাতর মিহিসুরে রমণী কণ্ঠস্বর। ঠিক চিনতে পারছে না। মনে পড়ছে, পড়ছে না। লতা কী?

পদশব্দ এগিয়ে আসছে। আরও কাছে এগিয়ে এল। রামু মৃদু কণ্ঠে ডাকল, সাব! আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান এক ভদ্রমহিলা। পাশের ঘরে বসিয়েছি তাঁকে।

রজত কোন উত্তর দিল না। দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ। পদশব্দ দূরে মিলিয়ে যায়। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর সন্তর্পণে ছিটকিনি খুলে উঁকি মেরে দেখল। পা টিপে-টিপে বাইরে এল। সিগারেটের সুন্দর গন্ধ ভেসে আসছে।

কপালের দু পাশের রগ চেপে পাশের ঘরে এল সে। সোফায় আধশোয়াঅবস্থায় বসে লতা মুখার্জি। বাঁহাতে রং-করা নখের ফাঁকে সিগারেট। শ্যাম্পু-করা চুল কাঁধ পর্যন্ত। দু চোখের পাতার উপর কাজল: বেশ বড় টানা চোখ। নাক-চোখ-চিবুক-ঠোঁট সব মানানসই। বয়স তিরিশের ঊর্ধ্বে। হাঁটকেট সুন্দরী মহিলা। ছোহারা গড়ন। বেশ লম্বা। সোফার হাতলের উপর দুটো নগ্ন বাহু এলিয়ে রয়েছে। গাত্রবর্ণের সঙ্গে মিলিয়ে শাড়ি-ব্লাউজ পরেছে।

—এতক্ষণ কোথায় ছিলে রজত? বিরক্তির সঙ্গে লতা বলল, সেই কখন থেকে বসে আছি। ঘনঘন সিগারেটে টানল। কানের দুল জোড়া কথা বলার সময় দুলছে। মাঝে-মাঝে বিদ্যুৎ চমকের মত আলো বিকিরণ করছে।

বিরক্ত চোখ-মুখে রজত উত্তর দিল, ভীষণ মাথা ধরেছে। অফিস থেকে তাড়াতাড়ি চলে এসেছি। এই মনোরম সন্ধ্যায় হঠাৎ পথ ভুলে এখানে কেন লতা!

ছাইদানীর মধ্যে লতা সিগারেটের টুকরো গুঁজে রজতের হাত ধরে টেনে পাশে বসাল। বলল, ন্যাকামী না করে চুপচাপ বসো। ঠিক কোথায় মাথা ধরেছে। অ্যানাসিন কি ট্যাবলেট আছে? নেই বুঝি। না থাকাই স্বাভাবিক। আই ফিল পিটি ফর ইউ পুওর বয়!

ঠোঁট চেপে অস্ফুট এক ধরনের চুক-চুক শব্দ করে লতা। সরু-সরু আঙুল দিয়ে কপালের রগ টিপতে থাকে। পরম উপভোগ করছে রজত। ডোন্ট বি নটি রজত। গুড বয়ের মত চুপচাপ থাক কিছুক্ষণ। দেখবে একটু পরে সব ঠিক হয়ে যাবে।

—ছাড় লতা! রজত জোর করে হাত সরিয়ে উঠে উল্টো দিকের সোফায় বসল, রামু যখন-তখন চলে আসতে পারে।

—সো হোয়াট? লতা খিলখিল করে হেসে সোফার উপর গড়িয়ে পড়ল। রেশমের মত নরম চুল চোখ-মুখের উপর এসে পড়েছে। বেশবাস অসম্বৃত হয়ে উঠল। সেদিকে কোন খেয়াল নেই ওর। হাসির বেগে শরীরটা দুলে-দুলে উঠছে।

স্থির চোখে লতাকে দেখল রজত। এখন রামু এসে পড়লে ভারী বিব্রত অবস্থায় পড়বে সে। এখানে এর আগেও কয়েকবার এসেছে লতা। প্রতিবার রজত বাড়িতে ছিল। লতার হাসি থেমেছে। চোখাচোখি হতে সে শরীরে এক ধরনের শিরশিরানি অনুভব করল। লতার চোখে কিসের ইসারা?

—কী খাবে? চা না কফি।

—বাঃ সুন্দর গন্ধ আসছে। বলে লতা উঠে দাঁড়াল, দেখে আসি রামু কি রাঁধছে। সেই সঙ্গে কফির অর্ডার দিয়ে আসি। শোন, মাথা ধরা কমেছে। নাকি রামুকে পাঠাব দুটো অ্যানাসিন নিয়ে আসতে।

—থাক লতা। একটু বিশ্রাম করলে মনে হয় ঠিক হয়ে যাবে।

তারপর একটু ইতস্তত করে রজত বলল, আমার একটু শোয়া দরকার। দ্যাখ তো, এমন সময় এলে যখন আমি ঠিক সুস্থ নই।

—ওসব শুনছি না। আমি বাপু সহজে নড়ছি না। কতদিন দেখা হয় না, বলতো! এক মিনিট রজত। বলে লতা। নাচের ভঙ্গিতে সমস্ত শরীর দুলিয়ে ভিতরে চলে যায়।

বাঃ ব্যাপারটা মন্দ নয়। যেন এ বাড়ির সব কিছুর উপর লতার অবাধ অধিকার। কত স্বচ্ছন্দগতিতে চলাফেরা। মীরাও এমন সহজভাবে চলতে-ফিরতে পারত না। কিন্তু লতার উদ্দেশ্য কী? আজও কী রাতটা এখানে কাটাবে? ভাবতেই বিরক্তিতে সমস্ত মুখ কুঁচকে উঠল রজতের।

একটা সিগারেট ধরাল সে। না, সে একা থাকতে চাইলেও পারবে না। কেউ না কেউ আসবেই। এড়াতে পারবে না। তার পরিচিতের সংখ্যা অনেক। লতার সঙ্গে এক পার্টিতে আলাপ। আলাপ থেকে ক্রমশ ঘনিষ্ঠতা। প্রাইভেট গার্ল। তবে ইদানীং রজত ছাড়া অন্য কাউকে এন্টারটেইন করে না। অবশ্য এটা লতারই স্বীকারোক্তি। সত্য-মিথ্যা সে জানে না। জানার কৌতূহলও নেই। বিশেষ মুহূর্তে লতার সঙ্গ ভাল লাগে। এর বেশি অন্য কিছু নয়। লতার হাবভাবে মনে হয় সে যেন প্রেমে পড়েছে। ভেবে মৃদু হাসল রজত। আর প্রেম-ট্রেম নয়। বরং যখন প্রয়োজন হবে, মাঝে-মাঝে হয় বৈকি, তখন লতা বা অন্য কাউকে পেলেই চলবে।

—সব ঠিক করে এলাম। বলতে-বলতে লতা ঘরে ঢুকল। পিছনে রামু কফি নিয়ে। টেবিলের উপর কাপ রেখে রামু চলে যায়। লতা বেশ ঘনিষ্ঠভাবে পাশে বসল রজতের। বলল, শুরু করো। বেশ ফ্রেস লাগবে।

কফিতে চুমুক দিয়ে রজত বলল, সব কী ঠিক করলে।

—যথাসময়ে দেখবে। লতা মুচকি হাসতে থাকে। মাঝে-মাঝে মাথা ঝাঁকিয়ে চোখের সামনে থেকে চুল পিছনে সরিয়ে দিল। প্যাকেট খুলে নিজে একটা সিগারেট ধরিয়ে অফার করল রজতকে। রজত দু আঙুল দিয়ে সিগারেট টেনে নিল একটা। বাহুতে বাহু ঠেকছে। উষ্ণতে উষ্ণ। উষ্ণ ও নরম। দৃঢ়ভাবে নিজেকে সংযত করল রজত। আজ নয়। আজ এসব সে চায় না।

—কী ভাবছো তুমি সেই তখন থেকে। মাথা নেড়ে লতা বলল, বৌ-এর কথা মনে পড়ছে বুঝি? ছেলের কথা? যাই বলো না কেন মুখে, তোমার মন জুড়ে ওরা রয়েছে। এভাবে মন খারাপ না করে বরং ওদের ফিরিয়ে নিয়ে এসো।

—থাক ওসব কথা। রজতের মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল, তুমি আমার সেন্টিমেন্টে আঘাত দিতে চাও কেন! যা ভাবছো তা নই লতা। আমাকে দুর্বল ভাবলে ভুল করবে।

—রাগ করো না রজত। তোমাকে মনমরা দেখলে ভীষণ কষ্ট পাই। লতা সারা শরীরে ঢেউ তুলে হাসল, যেমন বীরপুরুষ তুমি জানা আছে। কী আশ্চর্য! অনেকক্ষণ এসেছি এখনও তুমি ড্রিঙ্ক অফার করছো না। এসো একটু গলাটা ভিজিয়ে নি।

রজত আঙুল দিয়ে আলমারী দেখাল, ওখানে রয়েছে। প্লীজ আমাকে দিয়ো না।

লতা কোন কথা না বলে আলমারী খুলে দুটো গ্লাসে দু পেগ ভরে রাম ঢেলে নিল। তারপর আলমারী বন্ধ করে গ্লাস হাতে রজতের মুখোমুখি বসল। টেবিলের উপর দুটো গ্লাস রেখে হেসে তাকাল রজতের দিকে।

—ধরো। ও কি রজত! ডোন্ট বিহেভ লাইক এ চাইল্ড।

রজত চিৎকার করে বলতে চাইল, চলে যাও লতা। আমাকে বিরক্ত করো না। আমাকে একটু একা থাকতে দাও। দোহাই আমাকে নিষ্কৃতি দাও।

(ক্রমশঃ)

শিল্পী ডি. এ. ক্লোটাডেএর কাগজের মণ্ডের কাজ

প্রদর্শনী পরিক্রমা

বিড়লা অ্যাকাডেমিতে ক্যালকাটা পেন্টার্স গত ৩ থেকে ৮ নভেম্বর তাঁদের গোষ্ঠীর একটি সুসজ্জিত প্রদর্শনী করলেন। সাতজন শিল্পীর পঁয়ত্রিশখানি ছবির মধ্যে এবারে নন-ফিগারেটিভ কাজের নিদর্শন একটু কম দেখা গেল। অনীতা রায়চৌধুরীর ফ্যাকাশে ক্যানভাসগুলি ছাড়া রবীন মণ্ডলের কয়েকটি ক্যানভাসে এই রীতির নমুনা রাখা হয়। বাকী সকলের কাজেই একটা সমকালীন জীবনের কোন না কোন দিককে প্রতিফলিত করবার একটা ব্যাকুলতা দেখা গেল।

যোগেশ চৌধুরীর রঙীন ড্রয়িংগুলিতে স্টিল লাইফকে কতকটা সুর-রিয়ালিস্টিক ভঙ্গীতে দেখানোর চেষ্টা আছে। ড্রীম সিরিজের এই ছবিগুলিতে ফুল, প্রজাপতি, চায়ের পেয়ালা আর মানুষের হাতের একটা অস্বস্তিকর সমাবেশ করা হয়েছে। এই স্বপ্নের জগৎটা মোটেই সুখকর নয়। ড্রয়িংগুলি খুঁটিয়ে করা।

ঈশা মহম্মদের বড় ক্যানভাসগুলির রং বেশ উচ্চগ্রামে বাঁধা। সাময়িককালের অনেক অসংগতি ও অবিচারের দিকে কিছু কিছু ইঙ্গিত কোথাও কোথাও আছে। বিশেষ করে তাঁর 'ইনোসেন্ট বয়' এবং 'ম্যান এন্ড মেশিনের' নাম করতে হয়।

অমিতাভ সেনগুপ্ত কতকটা হাল্কা চালে কাজ করেছেন। টুকরো টুকরো রঙের ছোপের ওপর নকশা বা ফিগার বসিয়ে কিছুটা ড্রাফ বা কিছুটা পানিকরের ধরনের ছবি তৈরী হয়েছে। ছোট মাপের 'রাপসডি' ছবির রঙের বণ্টন প্রশংসনীয়।

দিলীপ কুণ্ডুর ক্যাপটিভ বার্ড সিরিজটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। খাঁচায় বন্ধ পাখির স্বাধীনতার ব্যাকুলতা ছবিগুলিতে বলিষ্ঠভাবে উপস্থিত করা হয়। বিশেষ করে তাঁর ২৬, ২৯ এবং ৩০ নম্বরের ছবিগুলি চোখে লাগে। ছোট ছবি এবং বাহুল্যবর্জিত রং ও কম্পোজিশন। কোথাও অতিশয়োক্তি দোষ নেই।

প্রকাশ কর্মকার কলকাতার বর্তমান সামাজিক পরিস্থিতির ওপর বড় বড় ক্যানভাস উপস্থিত করেছেন। তাঁর ছবির রং বা কম্পোজিশন খুব আগ্রহ জাগাতে পেরেছে বলে মনে হয় না। বড় ক্যানভাসেও শুধু চিত্রের মাধ্যম ছাড়া লেখার মাধ্যমেরও সাহায্য তাঁকে নিতে হয়েছে কিন্তু বক্তব্য ঠিক পরিস্ফুট হয়ে ওঠেনি। ফলে ছবিগুলি ভাল পোস্টার বা সুঅঙ্কিত পেন্টিং ঠিক কোনটাই যেন হয়ে ওঠেনি।

●

৬ নম্বর সদর স্ট্রীট প্লেসের গ্যালারী ইউনিকে এম সিনহার আঁকা ভারতীয় রাগের চিত্ররূপের একটি আলো অন্ধকার ও শব্দের প্রদর্শনী ৮ থেকে ১৩ নভেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হল। শ্রীসিনহা সঙ্গীত-বিশারদ তবে এই তাঁর প্রথম চিত্রক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ। গোটা পনেরো ছোট মাপের ছবি কালো কাগজে দেওয়াল মুড়ে তার ওপর সাজিয়ে রাখা হয়। ছবিগুলির জমিও কালো। অন্ধকার ঘরে প্রতিটি ছবির ওপর একটি করে আলো ক্রমান্বয়ে জ্বলতে ও নিবতে থাকে। তার সঙ্গে টেপ রেকর্ডে বিভিন্ন রাগ-রাগিণীর আলাপ শোনা যায়। প্রতিটি ছবিই বিমূর্তরূপী। সোনালী, সাদা, নীল, ধূসর ইত্যাদি বর্ণের সাহায্যে মেঘের মত ডিজাইন। একটি ঘোর রঙের কাজ প্রায় অদৃশ্য। এই মৌলিক শিল্প প্রদর্শনীর আয়োজনের কৃতিত্ব ম্যাক্সমুলার ভবনের।

●

অল ইন্ডিয়া হ্যান্ডিক্রাফট বোর্ড-এর উদ্যোগে ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রীটের রিজিওনাল ডিজাইন সেন্টারে মণিপুর সরকারের সহায়তায় মণিপুরের হস্তশিল্পের একটি প্রদর্শনী হল। ৭ থেকে ১৬ নভেম্বর ধরে অনুষ্ঠিত এই প্রদর্শনীতে প্রধানত বিভিন্ন রকমের বয়ন শিল্পের নমুনা দেখানো হয়। শাড়ি, চাদর, লাইসাম্বি প্রভৃতির নমুনাগুলির সরল ডিজাইন ও উজ্জ্বল রং সহজেই মনোহরণ করে। এছাড়া, হুপার গহনা এবং মাদুর ও বেতের কাজ তার বৈচিত্র্য ও ব্যবহার্যতার দরুন জনপ্রিয়তা অর্জন করে। মণিপুরী নাচের ভঙ্গীতে করা কতকগুলি পুতুল আকর্ষণীয় হয়েছিল।

ফরাসী সোভিয়েট সাংস্কৃতিক বিনিময় প্রকল্পে সোভিয়েট সংস্কৃতি দপ্তর একটি সোভিয়েট লোকশিল্প প্রদর্শনী এদেশে পাঠাতে মনস্থ করেছেন।

প্রদর্শনীতে তিনশর মত দ্রষ্টব্য বস্তু থাকবে। সেরামিকস, কাঠ ও হাড়ের কাজ, রূপোর কাজ, কার্পেট, মাটির পুতুল ও গ্রামবাসীদের নিত্যব্যবহার্য বিভিন্ন জিনিস প্রদর্শনীতে দেখানো হবে। যেসব লোক-শিল্পীরা তাঁদের কাজের জন্যে স্বদেশে খ্যাতি ও সম্মান লাভ করেছেন তাঁদের অনেকের কাজ এই প্রদর্শনীতে দেখা যাবে।

শঙ্কর গুহ অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে ৮ থেকে ১৭ নভেম্বর তাঁর চল্লিশখানি ক্যানভাস প্রদর্শিত করলেন। প্রধানত অ্যাবস্ট্রাক্ট ও আধা ফিগারেটিভ কাজ, কতকটা সতোন ঘোষাল প্রভাবিত ছবি।

●

বিড়লা অ্যাকাডেমির পাঁচ তলায় ১২ নভেম্বর সমকালীন শিল্পের একটি নতুন গ্যালারি খোলা হল। সংগ্রহটি আমেরিকা থেকে করা হয়েছে তবে আমেরিকান ছাড়া অন্যান্য অনেক দেশের শিল্পীর ছবি, ড্রয়িং ভাস্কর্য ও গ্রাফিক কাজ এখানে সংরক্ষিত হওয়ায় মোটামুটি একটা আন্তর্জাতিক চেহারা দেখা যায়।

আধুনিক শিল্পরীতির পেন্টিং-এর মধ্যে নন-ফিগারেটিভ কাজের সংখ্যাই সর্বাধিক। হার্ড এজ অ্যাবস্ট্রাকশন থেকে অটোমাটিক পেন্টিং পর্যন্ত নানারকম কাজের নিদর্শন এখানে দেখা যাবে। সালিবা দুরাই, জোস দোর্তিও, আন্দ্রে ম্যাসন কিম্বা মরিস জোসেফ স্টেলা প্রমুখ শিল্পীদের নমুনা পাওয়া যাবে। ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে কনস্টান্টিনো নিভোলার কয়েকটি ছোট টেরাকোটা মূর্তির বিশেষ আবেদন রয়েছে। ড্রয়িং ও গ্রাফিকের ক্ষেত্রেও উন্নত ধরনের কাজ দেখবার সুযোগ এখানে পাওয়া যাবে। প্রদর্শনীর সময় সাতটার মধ্যে বন্ধ হওয়ার ফলে দর্শকদের কিছুটা অসুবিধা হতে পারে।

—চিত্রাঙ্গিক

গোয়েন্দা কবি পরাশর

প্রেমেন্দ্র মিত্র রচিত
শৈল চক্রবর্তী চিত্রিত

CENTRAL LIBRARY

বিশ্বসুন্দরী প্রতিযোগিতার মিস গ্রেনাডার (জেনিফার হোস্টেন) চারপাশে বাগার্স-অ্যাপের সুন্দরীরা এসে সমবেত হয়েছেন। কমেডিয়ান বব হোপ মিস গ্রেনাডার মাথায় মুকুট ধরে আছেন। ডানে পার্ল জানসেন (মিস দঃ আফ্রিকা) দ্বিতীয় এবং বাঁদিক থেকে দ্বিতীয় স্থানে অবস্থিত মিস ইস্রায়েল (ইরিন নাভি) তৃতীয় স্থান অধিকার করেন।

অঙ্গনা

বিশ্বসুন্দরী প্রতিযোগিতার একদিক

এবারে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত বিশ্ব সুন্দরী প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করেন ওয়েস্ট ইণ্ডিজের মিস জেনিফার হস্টেন। তাঁর জয়লাভকে কেন্দ্র করে এখানে খুব হৈচৈ শুরু হয়ে যায়। এর অন্তর্নিহিত রহস্যটুকু হলো বর্ণবৈষম্য। অবশ্য প্রতিযোগীদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া ভিন্ন। তাঁদের মতে, রূপের চেয়ে সামাই বড়।

এর চেয়েও এবারকার বিশ্ব সুন্দরী প্রতিযোগিতার বড় খবর হলো যে, দক্ষিণ আফ্রিকার দুজন প্রতিনিধি এতে এই প্রথম অংশ নিলেন। সব দেশের প্রতিনিধি ছিলেন একজন করে। শুধু দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে আসেন দুজন। এই দুজনের মধ্যে একজন শ্বেতকায়া এবং অপরজন বর্ণসংকর। তবে এতেও দক্ষিণ আফ্রিকার সঠিক প্রতিনিধিত্ব হয়নি। এজন্য প্রয়োজন ছিল তিনজনের। প্রতিযোগী দুজনের মিস জিলিয়ান জেসাপ শ্বেতকায়া এবং মিস পার্ল জান্সেন বর্ণসংকর। যথার্থ দক্ষিণ আফ্রিকার প্রতিনিধি প্রতিযোগিতায় অনুপস্থিত।

১৯৫১ সালে এই প্রতিযোগিতার শুরু। উদ্যোক্তা শ্রীমতী জুলিয়া মোর্লি এই প্রতিযোগিতার গোড়ায় বলেছিলেন, সব দেশের প্রতিনিধিকে সমান মর্যাদা দেওয়া হবে। কোনরকম রাজনীতির অনুপ্রবেশ চলবে না। যে কেউ প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারবেন।

এই দুজন দক্ষিণ আফ্রিকার সুন্দরী লণ্ডনে এমনভাবে মেলামেশা করেন যেটা ওদের দেশে সম্ভব নয়। দুজন একসঙ্গে ঘুরেছেন, ফিরেছেন। ফটোগ্রাফাররা এই সুযোগ হাতছাড়া করেননি। তাঁরা ওঁদের ফটো তুলেছেন। এবং তা খবরের কাগজে ছাপিয়েছেন। ওঁরা যেন বলতে চাইছেন, দেখ, আমরা দুজন একসঙ্গে। এটা কিন্তু ওঁদের দেশে সম্ভব নয়। ওদের বর্ণভেদই এজন্য দায়ী। তাই এই ফটো দেশে দেখাতে পারবে না। তা হবে আইন বহির্ভূত।

যদি ঘটনাক্রমে মিস পার্ল জানসেন নয়-জন জুরীর বিচারে বিশ্বসুন্দরী নির্বাচিত হতেন তাহলে বর্ণবৈষম্য নীতি প্রচণ্ড ঘা খেত। সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে শ্বেতকায়া তুলনায় অশ্বেতকায়াদের চেয়ে উন্নত—এই ধারণা ভ্রান্ত প্রমাণিত হতো। কিন্তু মিস জানসেন এই প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় হন।

হঠাৎ কর্তৃপক্ষ এহেন একটি প্রতিযোগিতার আসরে মিস জানসেনকে আসার ছাড়পত্র মঞ্জুর করলেন কেন এ প্রশ্ন অনেকের মনেই ঘোরাফেরা করছে। কেউ কেউ বলছেন, সবাই ভেবেছিল প্রতিযোগিতায় জয়লাভ তো দূরের কথা তিনি পাত্তাই পাবেন না। তাছাড়া এতে দক্ষিণ আফ্রিকার পক্ষে প্রচারকার্য চালানোও সুবিধে হবে। ১৯৫১ সালের পর থেকে এ পর্যন্ত এই খেতাব লাভ করেছেন উনিশজন। তন্মধ্যে কৃষ্ণকায়া কেউ নেই। যদিও ১৯৬৬ সালে ভারতের রীতা ফারিয়া এই সম্মান লাভ করেন।

সবুজ বিপ্লব

জনসংখ্যার স্ফীতি এক বিরাট সমস্যা। সবকিছুর মধ্যেই এই সমস্যাটি মাথা চাড়া দিয়ে দাঁড়ায়। খাদ্য, গৃহ, বাসস্থান, কর্মসংস্থান—জনসংখ্যা বৃদ্ধির তীব্রতায় সবাই কাহিল। দিনকে দিন অবস্থা এমন দাঁড়াচ্ছে যে, বিনামূল্যে পাওয়া আলো-বাতাসও রেশনের শামিল। প্রায় রোজই বরাদ্দ হ্রাস পাচ্ছে। শেষে অবস্থা এমন সঙ্গীন হওয়াও অসম্ভব নয় যে, এরই জন্য নিজেদের মধ্যে শুরু হয়ে যাবে লড়ালড়ি। এমন দিনের আশঙ্কাই এখন প্রবল। জনসংখ্যার এই ক্রমোচ্ছ্বাস যদি কোন উপায়ে নিয়ন্ত্রিত না করা যায় তবে সবাই আমরা একদিন ভেসে যাব।

জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে সব কিছুতেই টান পড়ছে। কোন একটা নির্দিষ্ট কিছুর মধ্যে তা সীমিত থাকছে না। প্রকৃতির দেওয়া আলো-হাওয়ার কথা না হয় ছেড়ে দেওয়াই গেল। সে অভাব এখনও এমনকিছু তীব্র হয়নি। তাই এ নিয়ে হানাহানি করার দিন বেশ দূরেই আছে বলে মনে হয়।

CENTRAL LIBRARY

আবার সর্বকিছুই নির্ভর করছে মানুষের শুভবুদ্ধির উপর। সুস্থ জীবনবোধে মানুষ যদি উদ্দীপিত হয় তাহলে এ সমস্যা কোনদিন না দেখা দেওয়ার সম্ভাবনাও বেশ উজ্জ্বল।

সে যা হোক, এখনকার ভাবনাটা কিন্তু তা নয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধির আশু ফল যা আমরা হাতে হাতে পাচ্ছি তা হলো, বাসস্থান এবং কর্মসংস্থান সমস্যা। দেশে লোক বাড়ছে। তাদের মাথা গোঁজার ঠাঁই চাই। দুবেলা দু' মুঠো অন্ন বা অন্য যে ধরনের খাদ্য উপযোগী তার সুব্যবস্থা চাই। সেজন্য প্রয়োজন যোগাতে অনুযায়ী কাজ। এই দুটি সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে দেশে শিল্পের সম্প্রসারণ অবশ্যম্ভাবী। নতুন নতুন শিল্প সংস্থাপনার মধ্য দিয়ে নতুন পরিকল্পনায় যেমন ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যার সমাধান করতে হবে। আবার মাথা গোঁজার ঠাঁইয়ের জন্য চাই সুপ্রচুর বাসস্থানের ব্যবস্থা। ঘরবাড়ি না করলে মানুষ থাকবে কোথায়? গুহাবাসের দিন তো কবে ফুরিয়েছে। সেদিন মানুষ কম ছিল। খুব একটা সমস্যা ছিল না। এখন মানুষের সংখ্যা যেমন বেড়েছে সংস্কার-সংস্কৃতিতেও তারা অনেক বলীয়ান। এখন তাই উন্নত গৃহব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজন।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, এই দুটোর মাধ্যমেই জমির উপর হাত পড়ছে। চাষের জমির বরাদ্দ প্রতিবারই হ্রাস পাচ্ছে। আর এছাড়া বাসস্থান এবং কর্মসংস্থান সমস্যার সমাধান তো সম্ভব নয়। জনসংখ্যা যত বাড়ছে এই সমস্যা ততই তীব্র হচ্ছে। প্রতিবারই জমির আয়তন হ্রাস পাচ্ছে। যদি এই অবস্থা অব্যাহত থাকে তাহলে একদিন যে অচিন্তনীয় অবস্থার উদ্ভব হবে তা কল্পনাও করা যায় না। সেদিন সমস্ত সভ্যতা, কৃষ্টি এবং ঐতিহ্যের নাভিশ্বাস উঠবে। পণ্ডিতদের অনুমান, মানুষ ক্ষুধার তাড়নায় মানুষের মাংস ছিঁড়ে খাবে। এরকম বীভৎস অবস্থার কল্পনায় হৃদয়মন ভীষণভাবে আহত হয়। তাই অনাগত দিনের এই প্রসঙ্গকে যথাসম্ভব হ্রস্ব করাই ভাল। কিন্তু উপায় তো নেই। খুবই দুঃসময়ের কাছাকাছি আমরা। অচিরেই হয়তো মুখোমুখি সংঘাত ঘটে যেতে পারে।

—আজ তাই অচিরে এই সমস্যা মোকাবেলা করার একটা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। চাষের জমিতে টান পড়ছে। অথচ ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার মুখে দুবেলা দুটো গুঁজে দেবার ব্যবস্থা চাই। এর একমাত্র ব্যবস্থা স্বল্প জমিতে অধিক উৎপাদন। রাশিয়ার সুবিখ্যাত ফসল-অঞ্চল ইউক্রেন-এর আয়তন আগের তুলনায় অনেক হ্রাস পেয়েছে। কৃষকদের বাসস্থান, আর স্কুল-হাসপাতাল এবং নাগরিক জীবনের অন্যান্য স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করতে গিয়ে প্রচুর জমি খেয়ে গেছে। কিন্তু উৎপাদন সর্বদাই ঊর্ধ্বমুখী। খাটতে হলেই দুর্ভিক্ষ। শুধু রাশিয়া নয়, পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে আজ এই একই অবস্থা। স্বল্প জমিতে বেশি ফলন সবদেশের লক্ষ্য। না হলে চলতি দুনিয়ার সঙ্গে তাল রেখে চলা যাবে না।

আমাদের দেশে জনসংখ্যার তার সম্পর্কে নতুন পরিসংখ্যান যোগ করা নেহাতই ধৃষ্টতা। একথা সত্যি যে, আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে খাদ্যশস্য উৎপাদনের দিকে বেশি নজর দেওয়া বাঞ্ছনীয়। অর্থাৎ অন্যান্য সর্বকিছুর মতোই। বিশেষ, চাষের জমিতে যখন টান পড়ছে। দেশের খাদ্য সমস্যা দূর করার জন্য সবুজের অভিযানই আমাদের পক্ষে একমাত্র পথ।

দেশে যে হারে জনসংখ্যা বেড়ে চলেছে সে তুলনায় শস্যের উৎপাদন খুব একটা পর্যাপ্ত নয়। এদিকে চাষের জমির আয়তনও ক্রমেই সীমিত হয়ে আসছে। তাই এই সীমিত জমিকে অবলম্বন করেই ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর মুখে অন্ন যোগাতে হবে। সীমিত জমি থেকে সর্বাধিক ফলন পেতে হলে উন্নত জাতের বীজ, সার ও সেচের যেমন দরকার তেমনি সারা বছরই বিভিন্ন ফসলের চাষ করে জমি ও সময়ের পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার করা দরকার। সময়ের উপযুক্ত ব্যবহার করতে হলে জমিকে কোন সময়ই অকেজো ফেলে রাখা চলবে না। কারণ, পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, একই জমি খণ্ড থেকে পর পর তিন চারটি ফসল তুললে সময়ের অপচয় বন্ধ হয়ে ফসলের মাত্রা বহুগুণ বেড়ে ওঠে। একই জমিতে বহু ফসল চাষ পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য হলো, দিনপ্রতি শস্যের উৎপাদন সর্বাধিক বাড়িয়ে সম্বৎসরের মোট উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করা।

চতুর্থ পাঁচশালা পরিকল্পনায় প্রায় ৩৭-৫০ মিলিয়ন একর জমিতে বহু ফসল চাষের একটি কার্যসূচী গৃহীত হয়েছে। উন্নত প্রথায় চাষ করে পর্যাপ্ত ফলন পেতে আমাদের চাষীরাও আজ যথেষ্ট উৎসাহী। একই জমিতে একাধিক ফসল বা পালাক্রমে ফসল চাষ অত্যন্ত লাভজনক হওয়ায় বিভিন্ন প্রদেশে এর জনপ্রিয়তা বেড়েই চলেছে। চাষীরা তাই একই জমি থেকে তিন বা চারটি ফসল তোলা শুরু করেছে। ভারতের দক্ষিণে এই কার্যসূচী দ্রুত এগিয়ে চলেছে। উত্তর ভারতও খুব একটা পিছিয়ে নেই। একই জমিতে বহু ফসল চাষের ফলে হেক্টর প্রতি এখন আগের থেকে চার হাজার টাকা বেশি লাভ হচ্ছে।

শস্যের এই নিবিড় চাষ কৃষিক্ষেত্রে নতুন নয়। জাপান সহ এশিয়ার কয়েকটি দেশে এই প্রথায় চাষবাস বহুদিন থেকেই প্রচলিত। বহু ফসল চাষের কার্যসূচীতে প্রতি একরে মোট উৎপাদনের বদলে দৈনিক কি পরিমাণ শস্য উৎপন্ন হচ্ছে তার উপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। কারণ, যত অল্প সময়ে ফলনের পরিমাণ বেশি হবে, কৃষকেরা তত বেশি লাভবান হবেন।

ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে চাষ করে একই জমি থেকে মুগ, ভুট্টা, আলু, গম প্রভৃতি চারটি ফসল তুলেছেন। ১৯৬৯-৭০ সালে ৩০৪ দিনে মোট জমি থেকে প্রায় ১৫-২ টন খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয়েছে। হিসেবে দেখা গেছে যে, এভাবে ফসল হওয়াতে প্রতি হেক্টারে দৈনিক ফসলের পরিমাণ হয়েছে প্রায় ৪২-৪ কিলোগ্রাম। ১৯৪০ সালে এক বছর অন্তর গম চাষ এবং ১৯৫০ সালে পর্যায়ক্রমে ভুট্টা ও গম চাষ কার্যসূচীর সঙ্গে তুলনামূলক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, নতুন পদ্ধতিতে একই জমিতে বহু ফসল চাষ করে লাভের মাত্রা যথাক্রমে ৫ গুণ এবং ৩ গুণ বেশি হয়েছে। কৃষি বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে অপর্যাপ্ত সূর্যকিরণে চাষের উপযোগী উচ্চ ফলনশীল বেঁটে জাতের ধান, গম, ভুট্টা, বাজরা, ডাল এবং আলুর উদ্ভাবন করে বহু ফসল চাষের কার্যসূচীকে বাস্তবে রূপায়িত করতে সহজ করে দিয়েছেন। এর ফলে, সব ঋতুতেই এখন চাহিদামতো ফসল চাষ করা যায়। নিবিড় চাষের কার্যসূচীতে বহু ফসল চাষ এবং পালাক্রমে চাষ দুইই সমান গুরুত্বপূর্ণ। পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, পালাক্রমে চাষে মুগ বৈশাখী বর্ষার বদলে গ্রীষ্মে চাষ করেও প্রতি হেক্টারে ১০ কুইন্টাল ফলন পাওয়া গেছে, সে তুলনায় বর্ষায় চাষ করে ফলন হয়েছে মাত্র ২-৫ কুইন্টাল। আবার রবিখন্দে শঙ্কর ভুট্টা চাষ করায় হেক্টর প্রতি ফলন হয়েছে প্রায় ৭৩ কুইন্টাল। ভুট্টার পর পরবর্তী সোনালো গম (ডিসেম্বর থেকে এপ্রিল) চাষ করলে প্রতি হেক্টারে প্রায় ৮৬-৫ কুইন্টাল ফলন তোলা সম্ভব। ভারতীয় কৃষি গবেষণা সংস্থার মতে, পালাক্রম চাষে জমি চাষের জন্য খরচ লাগে না বললেই চলে। এখানে একটি প্রদর্শন ক্ষেত্রে ১৯৬৬ থেকে ১৯৬৭ সালে পালাক্রমে তিনটি ফসল মুগ-ভুট্টা-গম বুনেও জমি কর্ষণের জন্য কোন খরচ হয়নি।

বিভিন্ন অঞ্চলে পালাক্রম চাষের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ফসল উপযুক্ত। এই চাষের জন্য এমন শস্য বেছে নিতে হবে যারা একই প্রকৃতির রোগ ও পোকা দ্বারা সহজে আক্রান্ত হয় না। তাছাড়া প্রথম শস্যটির মূল যদি গভীর হয় তবে দ্বিতীয় শস্যটির মূল অগভীর হওয়া দরকার। এর ফলে মাটির প্রত্যেকটি স্তরেরই উর্বরতার সদ্ব্যবহার হয়ে থাকে। আবার মাটির উর্বরা শক্তি বাড়াতে বছরে অন্তত একটি শুঁটি জাতীয় ফসল চাষ করা উচিত।

দেশের সেচ ব্যবস্থার আরো উন্নতি হলে বহু ফসল চাষের কার্যসূচী খুবই লাভজনক হবে। ভারতীয় কৃষি গবেষণা সংস্থার পরিচালকের মতে, খরা প্রতিরোধী জলদি জাতের উচ্চ ফলনশীল বীজই 'বহু ফসল' চাষের পক্ষে ভাল। তিনি বলেন, মুগ, বাজরা, চীনাবাদাম, রোঁড়, বেঁটে জাতের গম, ভুট্টা প্রভৃতি নিবিড় চাষের অন্তর্গত বহু ফসল চাষের জন্য বিশেষভাবে উপযুক্ত।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যাও রোধ হবে এই অধিক ফলনের সুপ্রয়োগে। —প্রবীণা

হাব্বা খাতুন

সুধীর করণ

[কাশ্মীরের সিংহাসনে তখন চক বংশীয় ইউসুফ শাহ অধিষ্ঠিত। এঁর হাত থেকেই মোগল সম্রাট আকবর কাশ্মীর কেড়ে নেন। ইউসুফ শাহ রাজা হলেও রাজকার্যে মনোনিবেশ করতেন না। তিনি আসলে ছিলেন কলা-বিলাসী। শিল্প-সংগীতের চর্চায় নিজেকে নিযুক্ত রাখতেন ।।

শরৎকালের একটি বিকেল আকাশে তখন রক্তিম প্রশান্তি। পামপুরের মাঠে জাফরান ফুল। সোনালী-লালচে রঙ। পাইনবনের কাছে পাহাড়গুলোতে রঙ-বৈচিত্র্য। ইউসুফ শাহ ঘোড়ায় চড়ে জাফরান ক্ষেতের ভেতর দিয়ে ঢালু পথ ধরে নামছিলেন—। সামনেই দেবদারু আর পাইন গাছের বন।

একপাল ভেড়া বনের ধারে, কাঁচ-কলা-পাতা রঙের ঘাসের আস্তরণে মুখ দিয়ে চরে বেড়াচ্ছিল। দূরে কয়েকটা চেনার গাছ এখানে-ওখানে এককভাবে দাঁড়িয়ে। হঠাৎ ঘোড়ার রাশ টেনে সেই নির্জন প্রান্তরে থমকে দাঁড়ালেন তিনি। কেউ কোথাও গান গাইছে। পাখির গানও হতে পারে; কিংবা ছোট-ছোট নুড়ি পাথরের ওপর দিয়ে লাফিয়ে পড়া ঝর্ণাধারার জলতরঙ্গও হতে পারে। কিন্তু—এ-গান মানুষেরই। সুরের চেনার গাছের আড়াল থেকে ভেসে আসছে। গানের প্রতিটি শব্দ এখন তিনি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছেন।

ইউসুফ শাহ উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগলেন। এমন অপূর্ব কণ্ঠস্বর তিনি এর আগে কোনদিন শোনেননি। তাঁরই কাশ্মীরে এমন সংগীতের মূর্ছনা আছে—যার সামান্যতম স্পর্শে নাকি পৃথিবী স্বর্গ হয়ে যেতে পারে, এ ধারণা তাঁর ছিল না। পামপুরের সন্নিকটে জুন নামে কোন এক অপূর্ব লাবণ্যবতী তরুণী ভালো গান গায়, একথা কে যেন একবার তাঁকে বলেছিল,—কিন্তু সে কথার উপর তেমন গুরুত্ব দেন নি তখন। সেই জুনের গান কিনা কে জানে! গানের সুরে বিরহের তীব্র যন্ত্রণা ফেটে পড়ছে যেন।

ইউসুফ শাহ-র অন্তস্তলে সেই বেদনা সঞ্চারিত হয়ে গেল মুহূর্তের মধ্যে। এক অলৌকিক অজানে তিনি বিভোর হয়ে গেলেন। তারপর এগিয়ে গেলেন গ্রামের দিকে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দীর্ঘ পাইনবনের ভেতর দিয়ে ছোট্ট একটি ট্রেইলে ঘুরের পাশ দিয়ে কয়েকটি কুঁড়ে ঘরের কাছে পৌঁছে গেলেন। যার সঙ্গে তাঁর প্রথম দেখা হল, তার নাম আবদুল্লা। রাজাকে কোনদিন সে দেখেনি। কিন্তু ইনি যে একজন অসাধারণ ব্যক্তি, তা সে চেহারা দেখেই বুঝতে পেরেছিল। ইউসুফ ওকে দেখে ঘোড়া থেকে নামলেন। আবদুল্লা বিনীতভাবে সেলাম জানিয়ে বললো, মেহের-বান কি শহর থেকে আসছেন? ইউসুফ বললেন—ঠিক ধরেছ। এদিকে বেড়াতে এসেছি। তোমাদের গ্রামটি সত্যি ভারী সুন্দর।

আবদুল্লার ভালো লেগে গেল ইউসুফের কথাবার্তা। উনি আজ গাঁয়ের মেহমান। কিন্তু কোথায় বসাবো ওঁকে আমার কুঁড়ে ঘরে।—আবদুল্লা ভাবছিল। নিজের শ্রীহীন মলিন পোষাকে দারিদ্র্যের স্পষ্টছাপ—ইউসুফের কুর্তা ঝলমল করছে। বেশ কুণ্ঠিত হয়ে পড়লো আবদুল্লা। একজন খানদানী ব্যক্তির সামনে।

ইউসুফ বললেন—তোমার নাম কি?

আবদুল্লা বললো—আবদুল্লা হুজুর। লোকে আব্দি বলে ডাকে।

ইউসুফ বললেন—তোমাদের গ্রামে কেউ গান গায়—পাখির মত মিষ্টি গলায়—? আসবার সময় মনে হল, চেনার গাছের আড়ালে বসে কেউ যেন গান গাইছে। এমন ভালো গান এর আগে কোনদিন শুনিনি।...

আবদুল্লার চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। বললো : আমার মেয়ের গান শুনেছেন আপনি। ওর নাম জুন। খুব ভালো গাইতে পারে। ওই দিকে ভেড়া চরাতে গেছে। ও ছাড়া আর কেউ গান গায় না এখানে।

ইউসুফ ঘোড়া থেকে ততক্ষণে নেমে পড়েছেন। আবদুল্লার কথা শুনে বললেন—ওয়াহ্ ওয়াহ্—এমন মেয়ের বাপ তুমি। খুব ভাগ্যবান তুমি।

আবদুল্লার পিতৃহৃদয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। কিন্তু সংগে সংগেই মলিন হয়ে গেল তার মুখ। গভীর দীর্ঘনিশ্বাসকে সে আর চেপে রাখতে পারলো না। বললো,—সবই আল্লার মর্জি হুজুর। মেয়ে আমার সুখী নয়। ওর সাদী দিয়েছিলাম, কিন্তু সবই তকদির। মেয়ে সেখানে থাকতে পারলো না।

ইউসুফ বললেন কেন?

আবদুল্লা বললো,—মেয়ে গান গাইতো, দামাদ গান ভালোবাসতো না। দিনরাত গাধার মত খাটিয়ে মারতো। বন থেকে কাঠ কেটে আনতে হতো জুনকেই; রান্নাবান্না জল-আনার কথা তো ছেড়েই দিলাম হুজুর, মেয়েকে ক্ষেতে গিয়ে ঢেলা ভাঙতে বলতো। খেতেও দিতো না ভালো করে। একদিন এসে জুন আমার ভেঙে পড়লো হুজুর আমার বুকে। বললো,—বাপজান, আমায় এনে দাও; মেয়ে মরি। এমন জানোয়ারের মত জিন্দগী আমি চাই না বাপজান।...সেইদিন থেকে আমাদের কাছেই আছে হুজুর। তিন বছর হল। সতেরো বছর বয়সে ওর সাদী দিয়েছিলাম—

আবদুল্লার চোখদুটো ছলছল করে উঠলো।

আকাশে তখন সূর্যাস্তের শেষ রশ্মি। চারদিকে অপরূপ লাবণ্য। ইউসুফের উজ্জ্বল গৌরবর্ণ শরীরে রক্ত-সন্ধ্যার আভাস। ইউসুফ একটু আনমনা হয়েছিলেন।

হঠাৎ একপাল ভেড়ার কর্কশ ডাকে তাঁর ধ্যান ভাঙলো। কোন এক স্বপ্নহীন জগৎ থেকে বাস্তবের মাটিতে নেমে এলেন তিনি।

আবদুল্লা বললো : এই যে আমার মেয়ে হুজুর।

জুন বেশ সপ্রতিভ হয়েই এগিয়ে এসে ইউসুফের দিকে তাকালো। ইউসুফ বিস্মিত।

জুন হঠাৎ আরক্ত হল; তারপর চোখ নামিয়ে নিল।

আবদুল্লা বললো, বেটি—ইনি শহর থেকে এসেছেন। তোমার গান শুনতে পেয়েছেন। তাই—

ইউসুফ বললেন—খু-উ-ব ভালো লেগেছে।

জুনের মনে হল,—এমন কথা সে এর আগে কোনদিন শোনেনি।

জুন বললো,—বাপজান আমি যাই, দুম্বাগুলো চলে যাচ্ছে।

জুন চলে গেল।

ইউসুফ এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলেন। রূপের লাবণ্যে কাশ্মীর-কন্যাদের তুলনা হয় না; কিন্তু জুনের লাবণ্যকে কারুর সংগেই তুলনা করা যায় না। জুনের আঙরাখা, ঘাঘরায়, দারিদ্র্য, কিন্তু তার দেহের মহিমায় দারিদ্র্য পরাহত হয়েছে।

ইউসুফের সংগে আবদুল্লার কি কথা-বার্তা হল, কেউ জানে না।

কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যে পাইনবন-বিহারিণী জুন পামপুরের জাফরান ক্ষেত পেরিয়ে শ্রীনগরে রাজ-প্রাসাদে এসে ইউসুফ শা' চকের প্রিয়তমা পত্নীতে রূপান্তরিতা হল। তার নাম হল হাব্বা খাতুন।

হাব্বা খাতুন, হাব্বা খাতুন। এই নামই খ্যাতি লাভ করলো সর্বত্র। জুনের নাম ভুলে গেল সবাই।

এবারে গানে গানে ঝংকৃত হয়ে উঠলো ঝিলম নদী; শ্রীনগরের প্রাসাদ। সারা কাশ্মীরে হাব্বা খাতুন হলেন শিল্প-সৌন্দর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। গানের পর গান রচনা করতে লাগলেন হাব্বা খাতুন, সুরের পর সুর সৃষ্টি করলেন হাব্বা খাতুন। রাজপ্রাসাদ ছাড়িয়ে সেই গান ভূস্বর্গ কাশ্মীরের চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। ঝিলম নদীর উপর রাজকীয় শিকারায়—গভীর রাতে হাব্বা খাতুনের গান নদীর জলে ঢেউ তুলেছে। পদ্ম পদ্ম ফেনায় নদীর জল ফুলে ফুলে উঠেছে।—ইউসুফ শা' ওকে অবাধ অধিকার দিয়েছেন—স্বাধীনতা দিয়েছেন। বিশ্বাসে, প্রেমে হাব্বা খাতুনকে তিনি অসামান্যা করেছেন। হাব্বা খাতুনের সারস্বত প্রতিভা এবং অলৌকিক লাবণ্য এতদিনে তার যোগ্য আবাস লাভ করেছে। হাব্বা খাতুন চরিতার্থ হয়েছেন। রাণী হয়েছেন বলে নয়, ইউসুফের মত গুণবান রূপবান সংগীতানুরাগীর পত্নী হয়েছেন বলে। এ সৌভাগ্য তাঁর কল্পনাতীত ছিল। কেবলমাত্র রূপকথার জগতেই এ-ধরনের ব্যাপার ঘটে। ঘুঁটেকুড়োনী হয় রাজমহিষী। হাব্বা খাতুনের বুদ্ধিদীপ্তি ও হৃদয়বত্তার নানা কাহিনীও ক্রমশঃ ছড়িয়ে পড়লো কাশ্মীরে।

কলাবিলাসী ইউসুফ এমনিতেই রাজকার্যে মনোযোগী ছিলেন না; হাব্বা খাতুনকে পেয়ে তিনি ভুলেই গেলেন যে তিনি রাজা ইউসুফ শাহ্ চক। তাঁর মনের মধ্যে একটি মাত্র ধারণা ভ্রমরগুঞ্জনের মত গুন-গুন করে উঠতে লাগলো—যে তিনি হাব্বা খাতুনের প্রেমের দেবতা। হাব্বা খাতুনের সংগে সারা কাশ্মীরের স্বর্গভূমিতে তিনি লাবণ্যবিহারে ডুবে গেলেন। গুলমার্গের আর শোনমার্গের প্রাকৃতিক পরিবেশে আহাবলের আর আহরাবলের পাহাড়ে কন্দরে হাব্বা খাতুন গান গাইতে লাগলেন। তাঁর গানের সুরে পাখির কাকলী নদীর কল্লোল, ঝর্ণার জলতরঙ্গ, বাতাসের গতি আর পর্বতের গাম্ভীর্য সৃষ্টি হল সারা কাশ্মীরের পার্বতীনিকেতনে ইউসুফ আলি হাব্বা খাতুনকে নিয়ে ঘুরে বেড়ালেন।

একদিন শ্রীনগরের রাজ-অন্তঃপুরের ঝরোখা দিয়ে ঝিলমের বাঁকা স্রোত দেখতে দেখতে নোতুন একটি সুরের সৃষ্টি করেছিলেন হাব্বা খাতুন; নির্জন কক্ষে। হঠাৎ মৃদু পদশব্দে তিনি উৎকণ্ঠিত হলেন। সম্ভবতঃ ইউসুফ! চোখ ফিরিয়ে দেখেন—তাঁর প্রিয় বাঁদি সায়রা। এ ক'দিন ভালো ক'রে লক্ষ্য করেননি। দেখে মনে হল, সায়রার চোখের কোণে কালি জমেছে। মুখে গভীর দুশ্চিন্তার ছাপ। সায়রাও সুন্দরী, কিন্তু এখন যেন স্তিমিত প্রদীপের মত মনে হচ্ছে। সায়রাকে খুব ভালোবাসেন হাব্বা খাতুন। মাত্র কয়েক মাস হল রাজ-অন্তঃপুরের কাজে নিযুক্ত হয়েছিল। এর মধ্যেই সেবায়, প্রেমে, আচারে-আচরণে নিপুণতা দেখিয়ে হাব্বা খাতুনের অন্তরঙ্গ বাঁদিই হতে পেরেছে। সায়রার স্বামী থাকে শহরের এক প্রান্তে। স্বামীর কাছে কয়েক-দিন যেতে পারেনি বলেই হয়তো—

হাব্বা খাতুন মনে মনে দুষ্টুমি করার লোভ সামলাতে পারলেন না। ঈষৎ হেসে ওর দিকে তাকালেন। সায়রা হঠাৎ হাব্বা খাতুনের পায়ের কাছে মাথা লুটিয়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলো। করুণায়, স্নেহে বিগলিত হলেন হাব্বা খাতুন। সায়রার মাথায় হাত দিয়ে বললেন—কি হয়েছে, সায়রা? বাড়ীর জন্য মন কেমন করছে?

সায়রা ধীরে ধীরে মাথা তুলে হাব্বা খাতুনের দিকে তাকালো। দেখলো তার সামনে লোভনোগ্য লাবণ্য। মনে মনে বললো—অসম্ভব, অসম্ভব। এ সৌন্দর্যকে দূর থেকে দেখতে হয়। কোন উন্মাদের জন্য এ সৌন্দর্যের আবির্ভাব হয়নি।—

হাব্বা খাতুন বললেন—কি দেখছিস্ এমন করে? আমাকে আগে দেখিসনি?

সায়রা বললো : আমাকে প্রাণদণ্ড দিন বেগমসাহেবা। আমাকে ডালকুত্তা দিয়ে—বলেই আবার তাঁর পায়ের কাছে মাথা লুটিয়ে দিল সে।

হাব্বা খাতুন বিস্মিত হয়ে বললেন : কারণটা বলবি তো?

সায়রার অবস্থা তখন উন্মাদের মত। বললো,—সবাই বলবে হুজুরাইন। বলার জন্য তৈরী হয়েই এসেছি। শোনার পরই আপনি আমাকে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলতে আদেশ দেবেন, তা-ও জানি। শুধু একটি মাত্র প্রার্থনা আমার দোহাই—ওর কোন ক্ষতি করবেন না বেগম সাহেবা ; ওর কোন দোষ নেই। আমি ওকে ভালোবাসি। আমি—

আর কোন রহস্যের মধ্যে থাকতে চাইলেন না হাম্বা খাতুন। দৃঢ় কণ্ঠে বললেন,—এবারে বলে ফেল।

সায়রা কোনরূপে কয়েকটি শব্দ উচ্চারণ করলো। মাত্র চারটি পাঁচটি শব্দের একটি কথা। বলার পর, সায়রা দারুণ আতঙ্কে দেখলো—এক নিমেষের মধ্যে হাম্বা খাতুনের আর এক রূপ। রুদ্রাণী হাম্বা খাতুনকে এ'র আগে কোনদিন সে দেখেনি।

হাম্বা খাতুনের মনে হল তাঁর সারা দেহে আগুনের শিখা। সে আগুনে শুধু সায়রা নয়, সারা কাশ্মীর পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। ঘৃণায় ক্রোধে হাম্বা খাতুন মুহূর্তের মধ্যে দানবী হয়ে উঠলেন। তাঁর দুটো চোখে বাঘিনীর হিংস্রতা। তাঁর হাতের আঙুলগুলো নাগিনীর ফণার মত সায়রার গলার দিকে এগিয়ে যেতে লাগলো। আর এক মুহূর্তের মধ্যেই সায়রার নিষ্প্রাণ শরীর লুটিয়ে পড়বে তাঁর পায়ের তলায়। হাম্বা খাতুন চীৎকার করে কি যেন বলতে গেলেন। কিন্তু এই অবস্থায় তাঁকে বেশীক্ষণ থাকতে হয়নি। সম্ভবতঃ সায়রার চোখের দিকে তাঁর হিংস্র চোখের দৃষ্টি পড়ে থাকবে। সায়রার চোখের মধ্যে তিনি আবিষ্কার করলেন অলৌকিক ভালোবাসার দীপালোক। হাম্বা খাতুনের মনে হল—সায়রার অস্বাভাবিক প্রেমই তাকে দুঃসাহসী করে তুলেছে।

হাম্বা খাতুন চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকলেন কিছুক্ষণ। সেই অবস্থায় তাঁর মনে হল,—দুনিয়াতে প্রেমের চেয়ে বড় আর কিছু নেই। সায়রার ভালোবাসাকে ক্রোধের আগুনে জ্বালিয়ে দেবার বাসনা থেকে তিনি বিরত হলেন।

সায়রা সম্পূর্ণ নির্বাক। শুধু তাই নয়, কেমন করে তার আতঙ্কও তখন তিরোহিত। মৃত্যুকে সহজভাবে বরণ করার জন্য সে তখন প্রস্তুত।

হাম্বা খাতুন ভাবতে পারলেন—স্বামীকে কত গভীরভাবে ভালোবাসলে, এমন দুঃসাহসী হওয়া যায়। নৈলে এমন প্রাণঘাতী কথা সে কিছুতেই উচ্চারণ করতে পারতো না।

সায়রা কিছু বে-অকুফ রমণী নয়, সে বুদ্ধিমতী। একথা তার অজানা থাকার কথা নয় যে হাম্বা খাতুনের শরীর স্পর্শ করার অধিকার বেগমদেরও নেই ; একমাত্র ইউসুফই তার দেহের অধীশ্বর। সায়রা নিশ্চয়ই জানে, তার স্বামী উন্মাদের মত আকাশের চাঁদ চাইছে। উন্মাদ না হ'লে হাম্বা খাতুনকে একটি রাতের জন্য শয্যা-সঙ্গিনী করার বাসনা তা'র হয় কি করে? আর বাসনা হলেও সেই বাসনাকে এমন ভাবে প্রকাশ করতে পারে একমাত্র বাতুলই। সায়রা সেই বাতুলকেই প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে।

হাম্বা খাতুন তাঁর আশ্চর্য কুহকে নিজেকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে নিলেন। তারপর হাসলেন। সায়রা এবারে বিস্মিত হল। তার মনে হল, বেগমসাহেবা তাকে ক্ষমা করেছেন ; সম্ভবত তার স্বামীকে ক্ষমা করবেন।

হাম্বা খাতুন বললেন, সায়রা, তোর ভয় নেই। তবে এমন কথা আর কোনদিন বলিস না।

সায়রা কাঁদছিল। মাথা নেড়ে জানালো এমন কথা আর কোনদিন সে বলবে না।

হাম্বা খাতুন ওর পিঠে হাত বুলিয়ে দিলেন। বললেন,—তুই কি ওকে এতই—ভালোবাসিস যে, অন্য কোন রমণীকে শয্যা-সঙ্গিনী করতে চাইলেও বাধা দিবি না?

সায়রা ধীরে ধীরে বললো,—অনেক চেষ্টা করেছি বেগম সাহেবা। কিন্তু কি যে হল ওর। আপনার কথা ভাবতে ভাবতে নাওয়া-খাওয়া ভুলে গেল। শুধু তাই নয়, এক অসহ্য বেদনায় প্রতিদিন পুড়তে পুড়তে আমার স্বামী এখন মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ওকে আমি আর বাঁচাতে পারবো না বেগমসাহেবা। ও মরে গেলে আমিও একদণ্ড বাঁচবো না। আমি তাই—। আর কিছু বলতে পারলো না সায়রা। চোখের জলে সে বুক ভেজাতে লাগলো।

হাম্বা খাতুন একবার ঘরের মধ্যে লঘু-পদক্ষেপে ঘুরে বেড়ালেন। তারপর ঝরোখার দিকে ঝিলমের স্রোত দেখতে দেখতে গুন-গুন করে গান গাইতে লাগলেন—প্রেম তুমি আসমানের তারার চেয়েও উঁচুতে,—তোমায় ছুঁতে পারি এমন সাধ্য নেই।

হঠাৎ এসে বললেন—সায়রা তোকে আমি ভালোবাসি। তাই এমন অভাবা কথা শুনেও তোকে ক্ষমা করলুম। তোর প্রেমের হিসেব করার সাধ্য আমার নেই। তুই এখন যা।

দিন কয়েক পরে সায়রাকে দেখতে পেলেন তিনি। এ ক'দিন সায়রা ও'র কাছে আসেনি : দেখলেন, কয়েকদিনের মধ্যেই বিশীর্ণা পাহাড়ী নদীর মত সে ঝিমিয়ে পড়েছে। তার গালের হাড় দুটো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মুখের লাবণ্য নিঃশেষে ঝরে গেছে।

বললেন—এস, সায়রা,—শোন!

সায়রা কাছে আসতেই বললেন,—তোর খসম কেমন আছে!

সায়রা বললো—ও আর বাঁচবে না বেগমসাহেবা।

হাম্বা খাতুন বেশ রহস্যময় হাসি ছড়িয়ে দিলেন। বললেন, তা' হলে তুইও তো বাঁচবি না!

সায়রা বললো—সবই খোদার ইচ্ছে বেগমসাহেবা। নৈলে ওকে আমি কেন বোঝাতে পারিনি যে আকাশের চাঁদ চাইলে পাওয়া যায় না!—ওর জন্য মরতে আমার কোন কষ্ট হবে না বেগমসাহেবা।

হাম্বা খাতুন ঈষৎ হাসলেন। বললেন,—তাহ'লে তো তোকে বাঁচাবার চেষ্টা করতেই হয় আমাকে। তুই আমার পেয়ারের বাঁদি, তুই মরে গেলে আমার উপায় কি হবে!

সায়রা বললো—খোদা মেহেরবান। তিনি আপনাকে বাঁচিয়ে রাখবেন বেগম-সাহেবা।

হাম্বা খাতুন বললেন—শোন সায়রা। এদিকে আয়। তারপর অনুচ্চকণ্ঠে রহস্যময় ভাবে বললেন—ওকে নিয়ে আসিস আমার কাছে, কেমন?

সায়রার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হল। হতচকিত হয়ে বললো,—না—না—বেগম-সাহেবা—। না—না,

হাম্বা খাতুন বললেন, কোন ভয় নেই। বলেই কিরকম হাসির লাবণ্যে সায়রাকে আচ্ছন্ন করে ফেললেন। বললেন—হা' বলে রাতের বেলায় নয়, দিনের বেলাতেই—কেমন?

সায়রা তখন তার বোধশক্তি হারিয়ে ফেলেছে। 'এ-ও কি সম্ভব! বেগমসাহেবা তার উন্মাদ স্বামীকে নিয়ে আসতে বললেন—না-কি আমিই পাগল হয়েছি!'

এরপর এক নির্জন কক্ষে হাম্বা খাতুনের কাছে সায়রার স্বামীকে দেখা গেল। হাম্বা খাতুনের দিকে উজ্জ্বল দৃষ্টিতে একটিবার তাকাবার চেষ্টা করেই চোখ নামিয়ে নিল। হাম্বা খাতুন দেখলেন লোকটি কাঁপছে। লোকটি আগে সুপুরুষ ছিল, কিন্তু এখন তার শরীর একেবারেই ভেঙে পড়েছে। দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকলে যেমনটি হয়।

স্নিগ্ধ কণ্ঠে হাম্বা খাতুন বললেন, তোমার সব কথা আমি শুনেছি।

লোকটি আর একবার তাকালো হাম্বা খাতুনের দিকে। সে দৃষ্টিতে শ্রদ্ধা, প্রেম, বিস্ময়, একাকার। হাম্বা খাতুন বুঝতে পারলেন, লোকটি উন্মাদ নয়। হাম্বা খাতুনের রূপে গুণে, মুগ্ধ এবং বিমূঢ় এই যুবক। ভালোবাসাকে দেহের ঊর্ধ্বে নিয়ে যেতে পারেনি বলেই এই নিদারুণ যন্ত্রণায় সে আত্মহত্যা করছে।

হাম্বা খাতুনের করুণা হল। লোকটিকে বাঁচাবার ইচ্ছে হল তাঁর : সায়রাকে-ও তো বাঁচাতে হবে। লোকটি কিন্তু কোন কথাই বললো না। মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে ছিল। হঠাৎ নিজের কানকে সে বিশ্বাস করতে চাইলো না। সে শুনলো—হাম্বা খাতুন বলছেন, : তুমি আজ রাতে আমার শয়ন-কক্ষে এসো।

লোকটির গলা দিয়ে অস্ফুট একটি শব্দ নির্গত হল।

হাম্বা খাতুন বললেন—তবে সর্ত থাকলো। একথা তুমি কোনদিন কাউকে বলবে না,—ঘর সম্পূর্ণ অন্ধকার থাকবে; আর—তোমার সঙ্গে আমার কোনরূপ বাক্যালাপ হবে না।

লোকটি আনন্দে চীৎকার করতে চাইলো। তার বুক ফেটে চৌচির হয়ে গেল বুঝি! একি স্বপ্ন, না মায়া; নাকি তার মনের গুমরানো কথা-ই তার কানের মধ্যে ধ্বনিত হচ্ছে! লোকটি থরথর করে কাঁপতে লাগলো। সম্বিৎ ফিরে পেয়ে দেখলো—তার সম্মুখে সায়রা।

সায়রার মুখের দীপ্তি তখন তার নজরে পড়বার কথা নয়।

সায়রা ওর হাত ধরে রাজপ্রাসাদের বাইরে নিয়ে গেল।

সেই প্রত্যাশিত রূপকথার অপরূপ রাত্রি কখন আসবে! লোকটি গোটা দিন ঝিলম নদীর ধারে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। তার সেই অসুস্থতার ভাব কেটে গেছে; তার চোখে নোতুন আলোকরশ্মি।

গভীর রাতে, সায়রা ওকে রাজপুরীতে নিয়ে গেল, গোপন পথে। তারপর অন্ধকার পথ দিয়ে ওকে একটি ঘরের মধ্যে নিয়ে গেল। ঘরের মধ্যে একটি প্রদীপ জ্বলছিল। সায়রা ফিসফিস করে বললো—এই ঘরটি হাম্বা খাতুনের শয়নকক্ষ। এখানেই তুমি যাবে। তার আগে, এস তোমাকে সাজিয়ে দিই।

লোকটি নির্বাক আনন্দে মগ্ন। সায়রা তার নিজের ঘরে ওকে নিয়ে গেল। স্বামীকে মূল্যবান মহার্ঘ বসনে শোভিত করলো। সর্বাঙ্গে ছিটিয়ে দিল আতর। চোখের কোণে এঁকে দিল সুর্মা। পা ধুইয়ে, পরিয়ে দিল কারুমণ্ডিত পাদুকা। তারপর মুগ্ধ হয়ে স্বামীর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলো। তারপর ওকে নিয়ে গেল সেই রূপকথার রাজকন্যার শয়নকক্ষে।

স্তিমিত প্রদীপের আলোকে লোকটি বিস্মিত হয়ে দেখলো—এক অলৌকিক ইন্দ্রপুরীর মধ্যে সে পৌঁচেছে। সুসজ্জিত কক্ষে বিরাট পালঙ্ক; মখমলের শয্যা, কাশ্মিরী পশমের গালিচা; কস্তুরীর সুবাস—

লোকটি সম্পূর্ণরূপে মোহাচ্ছন্ন হয়ে গেল।

সারা অত্যন্ত সুন্দর করে হাসলো। স্বামীর কপালে চুমু খেলো। তারপর ফিসফিস করে বললো—এই ঘরেই তিনি আসবেন। আমি, আলো নিবিয়ে দরজা বন্ধ করে চলে যাচ্ছি। এই মখমলের পালঙ্কে তুমি অপেক্ষা করো। এখানে আসবার আর একটি গোপন দরজা আছে; তা কোথায় আমিও জানি না। সেই পথেই উনি আসবেন। গভীর রাতে। কিন্তু সাবধান সমস্ত শর্ত যেন মনে থাকে; নৈলে তোমার আমার দুজনেরই মৃত্যু ঘটবে। —আলো নিবিয়ে সায়রা চলে গেল। দরজা বন্ধ করার শব্দ শুনতে পেল তার স্বামী।

পৃথিবীর যত অন্ধকার কি এই ঘরের মধ্যে বাসা বাঁধলো। লোকটি ভালো করে দেখবার চেষ্টা করলো, কিছুই দেখা গেল না। তার হৃৎস্পন্দন বেড়ে গেল। ঘন ঘন উষ্ণশ্বাসের মধ্যে ওর দেহের তাপমাত্রা বাড়তে লাগলো। কস্তুরীর সুবাসে তার শরীর ঝিমঝিম করতে লাগলো। মনে হল, তার সর্বাঙ্গে মাদকতার নেশা। শুনতে পেল,—কোথাও টুংটাং করে জলতরঙ্গ বাজছে। কোথেকে গানের মৃদু রেশ ভেসে আসছে! কোথাও যেন পাখি ডাকছে সুরতরঙ্গে—মৃদু অথচ স্পষ্ট সেই সংগীত। লোকটি পালঙ্কের উপর বসেছিল। তার চেতনা বিলুপ্ত হতে যাচ্ছিল—, হয়তো বা এইখানেই তার হৃৎস্পন্দন চিরকালের মত থেমে যাবে!

কিন্তু আর কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে! কতক্ষণ ধরে সে অপেক্ষা করে আছে! অনন্তকাল ধরেই আছে। অনন্তকাল ধরেই থাকতে হবে!

লোকটি তার চোখ দুটোকে দীপশিখার মত উজ্জ্বল করে অন্ধকার ভেদ করে দেখতে চাইলো। গৃহশয্যার অস্পষ্ট চেহারা কিছুটা অনুমান করতে পারলো, কিন্তু কিছুই দেখতে পেল না।

এমনিভাবে কতক্ষণ কেটেছে, সে জানে না। ঘুমিয়ে পড়েছিল কি না, তাও সে জানে না। কিন্তু তার মনে হল রাত গভীর হয়েছে। পৃথিবীতে কেউ কোথাও জেগে নেই। হঠাৎ মৃদু পদক্ষেপের শব্দে সে উৎকর্ণ হয়ে উঠলো হরিণের মত। ঘনকৃষ্ণ অন্ধকারে সে দেখার চেষ্টা করলো; তার সমস্ত ইন্দ্রিয় একসঙ্গে সজাগ হয়ে উঠলো। স্পষ্ট দেখতে না পেলেও তার অনুমানের মধ্যে ধরা পড়লো,—সেই অনুপমাবণ্যবতী অপ্সরা, হীরামুক্তাখচিত বেশবাসে সজ্জিত হয়ে, সেই পালঙ্কের দিকে এগিয়ে আসছেন। তার হৃৎস্পন্দন দ্রুততর হল। সে আবার মোহাচ্ছন্ন হয়ে গেল। তারপর এক সময় বুঝতে পারলো, সে স্বপ্ন দেখছে না। সেই রাজকীয় পালঙ্কের মনোহর শয্যায় সে একা নয়। আরও একজন রমণী। হাম্বা খাতুন। তার সমস্ত যৌবনের অসুস্থ কামনার দেবী। কামনা পূর্ণ করার জন্য সে আর কালবিলম্ব করলো না; তারপর সেই মখমলের শয্যায় গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে গেল।

রাত তখনো বাকী। ঘুম ভাঙার পর লোকটি দেখলো বিছানাতে সে একা। তার মনের মধ্যে কিন্তু স্বর্গীয় আনন্দ। লোকটি আর অপরিপূর্ণ নয়।

ভোর হবার অনেক আগেই খোলা দরজা দিয়ে, পূর্বনির্দিষ্ট পথে লোকটি রাজপুরী ত্যাগ করে গেল। সবাই তখনো ঘুমিয়ে আছে। শেষরাতে ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। ঝিলমের জলে অতিকায় পাখির মতো শিকারা। কয়েকটা জলজন্তুর ভারা ঝিলমের জলে ভাসছে। আনন্দের আতিশয্যে সে পাখির মত হালকা হয়ে, ঝিলমের সেতু অতিক্রম করে নিজের কুটিরে পৌঁছে গেল।

ভোরবেলায়, মহার্ঘ বসনে সজ্জিতা সেই রাতের অপ্সরী হাম্বা খাতুনকে কুর্নিশ করে তাঁর সামনে সলজ্জ ভঙ্গীতে মাথা নীচু করে দাঁড়ালো। হাম্বা খাতুন হেসে বললেন : ধরা পড়িস নি তো?

সারা পৃথিবীর লজ্জায় আপেলের মত আরক্ত হয়ে উঠলো সায়রা। মাথা নেড়ে জানালো, ধরা পড়ে নি। আনন্দের আতিশয্যে তার চোখ থেকে জলের ধারা গড়িয়ে এল। রুদ্ধ কণ্ঠে বললো—আমার স্বামীকে বাঁচিয়ে দিলেন বেগমসাহেবা; আমাকেও বাঁচিয়ে দিলেন বেগমসাহেবা—আমি আপনার—বলেই উন্মাদের মত হাম্বা খাতুনের পায়ে চুম্বন করতে লাগলো।

হাম্বা খাতুন বললেন,—এস্ সায়রা,—এ কি হচ্ছে, ছাড় ছাড় পা ছাড়।

সায়রা মুখ তুলে বললো,—ও কিন্তু চিরকালই জানবে বেগমসাহেবা, আপনার শয্যায়—সে আপনাকেই—

রহস্যময় ভঙ্গীতে হাম্বা খাতুন নিজের মুখে তর্জনী ঠেকিয়ে চোখ বন্ধ করলেন।

জলসা

দিল্লী বিমানবন্দরে মেনুহিনকে সম্বর্ধনা জানাচ্ছেন গ্রামোফোন কোম্পানীর মিঃ দুবে এবং মিঃ গৌতম

লতা মঙ্গেশকারের কণ্ঠে ভাগবত গীতা : শ্রীমতী লতা মঙ্গেশকরের কণ্ঠে ভক্তিমূলক গান আগেও শুনেছি তাঁর লং-প্লেয়িং ডিস্কে। কিন্তু সেদিন লতার সঙ্গীতজীবনের পঁচিশ বছর পূর্তি উৎসব উপলক্ষে দু'বছর আগে বোম্বেতে তাঁকে গ্রামোফোন কোম্পানী প্রদত্ত অভ্যর্থনা সভার টেপ-ধৃত রেকর্ড শুনতে গিয়ে উপরি-পাওনা হিসেবে শোনা গেল লং-প্লেয়িং ডিস্কে লতার কণ্ঠে শ্রীমদ্ভাগবত গীতার নবম ও একাদশ শ্লোক। শুনে মুগ্ধ না হয়ে পারলাম না এই কারণে যে, প্লে-ব্যাক ক্ষেত্রের সম্রাজ্ঞী লতা ছায়াচিত্রের চটুল ও প্রাণধর্মী গান গেয়েই জনচিত্ত জয় করে নিয়েছেন। এ সত্য সবারই জানা। কিন্তু গভীর রসের রসিক যাঁরা তাঁদেরও যে শ্রীমতী মঙ্গেশকারের কাছে অনেক কিছু পাবার আছে এবং সে বিষয়ে শিল্পী যাতে উদাসীন না থাকেন—সে সম্বন্ধে তাঁর কাছে অনুরোধ প্রতিনিধি আবেদন জানান—গত-বছরের আগের বছর 'ক্রীড়া-বিনোদন' সংখ্যার সাক্ষাৎকারের সময়। শ্রীমতী লতা আশ্বাস দিয়েছিলেন— এদিকে তিনি অবশ্যই মন দেবেন। সে অনুরোধের মর্যাদা যে তিনি রেখেছেন তারই প্রমাণ সম্প্রতি প্রকাশিত লং-প্লেয়িং ডিস্কে তাঁর গাওয়া ভগবদ্গীতার দুটি পরিচ্ছেদ। নবম পরিচ্ছেদে—অর্জুনের প্রশ্নের জবাবে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন শরণাগতকে তিনি সকল কষ্ট ও বিপদ থেকে রক্ষা করে থাকেন। ভক্তের ভক্তি ও ভালবাসাই ভগবানের কাম্য এবং তার বিনিময়ে ভক্তকে অদেয় তাঁর কিছুই নেই। দ্বাদশ অধ্যায়ে অর্জুনের প্রশ্ন সতত যোগযুক্ত হয়ে যাঁরা ভগবৎ উপাসনা করেন এবং অব্যক্ত অক্ষরের উপাসনাকারী, উভয়ের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ?

উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যেই নিত্য যোগী-গণ, পরমশ্রদ্ধায় আমাতেই মন নিবিষ্ট করে আমার ভজনা করেন—আমার মতে তাঁরাই শ্রেষ্ঠ যোগী।

ঈশ্বরের জ্ঞান-গভীর বাণী লতার ভক্তিদৃপ্ত পরিবেশনায়, অপরূপ কণ্ঠের ব্যঞ্জনায় এবং ভাবতন্ময়ী অন্তরের নিষ্ঠায় যেন পূজোর অঞ্জলি হয়ে উঠেছে। গান শেষ হয়ে যাবার পরও শিল্পীর আত্মনিবেদনের ব্যাকুলতা মনের মধ্যে অনুরণিত হয়—

তেষামহং সমুদ্ধর্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যা-বশিত
চেতসাম্।

এই অমূল্য ডিস্ক চিরকালের সম্পদ হয়ে থাকবে।

উত্তরা : নবগঠিত অতুলপ্রসাদ স্মারক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র 'উত্তরা'র উদ্যোগে গত রবিবার ১৫ নভেম্বর সন্ধ্যায় একটি সুন্দর একক গানের অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। শিল্পী শ্রীসুশীল চট্টোপাধ্যায় সেদিন অতুলপ্রসাদের ১০খানি গান পরিবেশন করেন। সবগুলি গানই সুগীত, বিশেষ করে 'মধুকালে এলো হোলি', 'আমার বাগানে এত ফুল', 'বঁধু তুমি গাওয়াও গান' প্রভৃতি আরও দু-চারটি গান শ্রোতাদের অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করে। শিল্পীর সঙ্গে তবলায় সহযোগিতা করেন শ্রীকালোবরণ দাস। সংস্থার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা শ্রীঅরুণ সরকার তাঁর ভাষণে বলেন, উত্তরা শুধু অতুল-প্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, নজরুল প্রভৃতি বিশিষ্ট বাঙালী গীতিকারদের রচিত গানই প্রচার করবেন না, এর কর্ম-সূচীর মধ্যে এসব গানের শিক্ষাদানের ব্যাপারটিও আছে।

সুশীলবাবুর গানের শেষে, শ্রোতাদের বিশেষ অনুরোধে, বিশিষ্ট শিল্পী শ্রীমতী মঞ্জু গুপ্ত তাঁর ভাবমাধুর্যভরা অনবদ্য কণ্ঠে দুখানি অপ্রচলিত অতুলপ্রসাদের গান পরিবেশন করেন।

পাঁচটি অতুলপ্রসাদের এবং ছয়টি দ্বিজেন্দ্রলালের মোট এগারখানি গান গত ২৫ নভেম্বর সন্ধ্যায় পরিবেশন করলেন প্রখ্যাত শিল্পী শ্রীমতী কৃষ্ণা রায় (চট্টো-পাধ্যায়)। আসরটি নবগঠিত অতুলপ্রসাদ স্মারক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র 'উত্তরা'র প্রযোজিত দ্বিতীয় গানের অনুষ্ঠান। শিল্পী অতুল-প্রসাদ রচিত 'পাগলা মনটারে তুই বাঁধ'—ভৈরবী সুরে বাঁধা প্রসিদ্ধ গানটি দিয়ে অনুষ্ঠান সুরু করে পরপর গাইলেন মনায় আসিয়া করে গেছে গেয়ে সে-দিনের গানের অনুষ্ঠান শেষ হয়। তাঁর সঙ্গে তবলায় সহযোগিতা করেন শ্রীহরেন মান্না। অনুষ্ঠানের পূর্বে 'উত্তরা' কর্মাধ্যক্ষ শ্রীসোমেন গুপ্ত সকলকে স্বাগত জানান। উত্তরার সহযোগীদের মধ্যে রয়েছেন সর্বশ্রী সাহানা দেবী, রেণুকা দাশ-গুপ্ত, মঞ্জু গুপ্ত, পাহাড়ী সান্যাল এবং অতুলপ্রসাদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়বর্গ।

অনুষ্ঠানের শেষে উত্তরার পক্ষ থেকে শ্রীসন্তোষ সেন শিল্পী, নিমন্ত্রিত ও গৃহ-কর্ত্রীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। উপস্থিত মণ্ডলীর মধ্যে সর্বশ্রী হরেন চট্টোপাধ্যায় (শিল্পীর পিতা), পাহাড়ী সান্যাল, দিলীপ রায় প্রভৃতির নাম উল্লেখ-যোগ্য।

অগ্নিবীণার বার্ষিক উৎসবে : গত ১১ নভেম্বর বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক সংস্থা 'অগ্নিবীণা'র বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে এক সঙ্গীতানুষ্ঠান নিবেদিত হয় রবীন্দ্রসদন মঞ্চে। নজরুল সন্ধ্যা'র এই বাৎসরিক অধি-বেশনে কবির মানসলোকের বিভিন্ন রূপ-কল্পনার সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পাওয়া যায়। এই পরিপ্রেক্ষিতে এ উৎসবের একটি বিশেষ মূল্য আছে। সেদিনের একক সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করেন ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায় ও সম্প্রদায়, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুপ ঘোষাল, শিবকুমার চট্টোপাধ্যায়, ইলা বসু, শঙ্করলাল মুখো-পাধ্যায়, জীনা সাহা, রূপালি, সুমিত দে, প্রদীপ ঘোষ, শ্রাবন্তী মজুমদার। এছাড়া গীতিআলেখ্য পরিবেশন করেন বালি শাখার অগ্নিবীণা ও দাঁজপাড়ার শিশুসংঘ। এদের অনুষ্ঠান অকারণ দীর্ঘসূত্রতার কারণে বেশ কয়েকজন শিল্পীর অনুষ্ঠান থেকে আমরা বঞ্চিত হলাম। এ অব্যবস্থাপনায় ত্রুটি

অমার্জনীয়। সেদিনের সংগীতসভার বিশেষ উল্লেখযোগ্য শিল্পী হলেন শিবকুমার চট্টোপাধ্যায়, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, অনুপ ঘোষাল, শঙ্করলাল মুখোপাধ্যায়, শেফালী ঘোষ, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়। উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে নজরুলগীতি বলতে অনেকেই শুধু গজল-ভাঙ্গা গানকে বুঝে থাকেন। বাংলা গানে গজল নজরুলের অন্যতম অবদান নিশ্চয়ই। কিন্তু এছাড়াও নজরুলের স্বদেশী গান, শ্যামাসংগীত, কৃষ্ণের রাগ-প্রধান কাব্যগীতি—এক সময় বাংলার আকাশ বাতাস মুখরিত করেছিল এবং জনগণের গান হয়ে উঠেছিল—একথা ভোলা অন্যায় এবং রসিকজনদের আজও যে এসব গান নবযৌবন ... থাকে সেদিন এইসব শিল্পীরাই তা প্রমাণ করলেন তাঁদের প্রাণবন্ত পরিবেশনা দিয়ে। শ্রোতাদের বিশেষ অনুরোধে কবির হাসির কবিতা আবৃত্তি করেন কাজী সব্যসাচী এবং গীটারে নজরুল গীতির সুর বাজিয়ে শোনান কাজী অনিরুদ্ধ।

'নজরুল সন্ধ্যা' উপলক্ষে স্মারক পুস্তিকায় কবির একটি অপ্রচলিত রচনা এ উৎসবের বিশেষ সম্পদ।

মহেন্দ্র-আনন্দা স্মরণিকা সভায় : শ্রীমতী বীণাদেবী সেন পরিচালিত গত সপ্তাহে দক্ষিণ কলকাতায় জনকল্যাণমূলক সংস্থা মহেন্দ্র-আনন্দা স্মরণিকা-র বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে শ্রীমতী আরতি শ্রীমলের বাসগৃহে এক সংগীতোৎসবের আয়োজন করা হয়। শ্রীমতী চন্দ্রাবতী দেবীর পৌরোহিত্যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সুরু হয় সুনীল ঘোষ ও নবনীতা ঘোষের 'বন্দেমাতরম' গান দিয়ে। সুনীল ঘোষের কাছে জানা গেল বন্দেমাতরম সঙ্গীতের বহুপ্রকার সুরের মধ্যে তাঁর অগ্রজ পান্নালাল ঘোষের দেওয়া 'মল্লার' রাগে এবং ত্রিতালে এই গান তাঁরা পরিবেশন করবেন। সুরের মধ্যে নতুনত্ব ছিল এবং মল্লার-এর করুণ গাম্ভীর্য বজায় রেখে সু-পরিবেশিত হওয়ায় যথাযোগ্য পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

এরপর দীপ্তি ভট্টাচার্যের কণ্ঠের দুটি শ্যামাসংগীত শিল্পীর ভক্তিভাব, সুরেলা কণ্ঠ ও উচ্চারণ স্পষ্টতায় খুবই চিত্তস্পর্শী হয়। বিশেষ করে প্রথম গানটি 'পূরবী' রাগাশ্রিত হওয়ায় একাধারে সময়োপযোগী হয়ে গানের অন্তর্নিহিত উদাসভাবকে মূর্ত করে তুলেছিল। সুপ্রীতি ঘোষ ভক্তিমূলক ও রবীন্দ্রসংগীতে আপন সুনামে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ডাঃ অজিত মুখোপাধ্যায় প্রথমে কবি নজরুলের একটি শ্যামাসংগীত পরে বিশেষ অনুরোধে সেই সর্ববিখ্যাত 'উড়িয়ে দে তোর মন-ঘুড়িটা'—গেয়ে শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন। প্রাণবন্ত গায়কী, আবেগ ও পরিশীলিত কণ্ঠের মাধ্যমে গানের ভাববস্তু হৃদয়গ্রাহী হয়ে ওঠে। দীপক মিত্র কবি নজরুলের দুটি কবিতা আবৃত্তি করে সমবেত সুধীবৃন্দকে আনন্দ দিয়েছেন। এ প্রতিষ্ঠানের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আপন চেষ্টায় নিরন্তর পরিশ্রমে অর্থ সংগ্রহ করে শ্রীমতী বীণাদেবী সেন তাঁর পিতা সর্ববিখ্যাত ডাক্তার ও কল্যাণব্রতী মহেন্দ্রচন্দ্র দাসগুপ্ত এবং তাঁর সুযোগ্যা পত্নী আনন্দা দেবীর নামে এই প্রতিষ্ঠান করেছেন অভাবগ্রস্তা মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েদের সাহায্যার্থে।

শ্রীরবিজ্যোতি ঘোষ 'ইমন কল্যাণ' রাগে সেতার বাজিয়ে শোনান। তবলাসঙ্গতে ছিলেন শুভজ্যোতি ঘোষ। শ্রীমতী বীণাদেবী সেন 'হাস্য কৌতুকে নকশা' পরিবেশন করে আসর মাতিয়ে তোলেন।

—চিত্রাঙ্গদা

কোন একটি সুবর্ণ জয়ন্তীতে ॥

হেমেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

জটায়ু কুণ্ডল থেকে থমকে বেরিয়ে,
আরণ্যক বিভীষিকা চমকে পেরিয়ে
রোদ্দুরে জ্বলজ্বলে সাংগীতিক নদী—
দুরন্ত প্রাণভরা হাসি যেন বলকায়
বহু যুগ আগে দেখা বিলুপ্ত অলকায়।

তুমি আজ কাছে শুধু থাকতে যদি!

কেটেছে, প্রহর বহু ভয়ে ঘোর নীল,
ক্ষুধার্ত বাঘের চোখ। হায়নার হাসি।
বাদুড়ের কালো পাখা
ঘিরে বিশ্বেষে মাথা :
সবচেয়ে বড়ো পাপ : আমি ভালোবাসি?

নেমে এলো লাখে লাখ চামচিকে পেঁচা।
জোনাকিরও আলো নেই। ঝিল্লীর সুর নেই।
বিতন্দ্র কোকিলের নেই কোনো স্বর।
পায়ে জোঁক, কাঁটা ফোটে।
হিসহিসে কেউটে জোটে।
আসে তেড়ে খসখসে সাত অজগর।

তখনো সাবিত্রী হয়ে থাকতে যদি।

আজ জানি সৃষ্টি মায়া, শুধু প্রতিভায়।
আশা আর ভালোবাসা—সেইতো নিঃশ্বাস।
ভয়ে হোলোনাক ক্ষয়। যেহেতু শ্বাপদ
বিবশ স্নায়ুর সৃষ্টি। কল্পিত আপদ
সাংকেতিক চলচ্ছিত্রে নায়কের দুঃস্বপ্ন-চারণ,
পরিচালকের যেন চালাকী প্রয়াসে।

তখনো নায়িকা হয়ে থাকতে যদি।

অরণ্যের বিভীষিকা অরণ্যেই থাক।
স্নায়বিক জঞ্জাল, স্মরণের বিকৃত মরণ,
কাল্পনিক পাপ-পুণ্য, লেজারের হিসেব-নিকেশ
— আজ হোলো শেষ।

সম্মুখে স্বাগত নদী। দীপ্ত দিন। শ্যামলের প্রাণ।
কলমলে রোদ্দুরে দিগন্তের গান।
ছোট এই স্বপ্ন আর ছোট্ট ভালোবাসা
সঞ্চারিত বিশ্বে বাঁধে বাসা।
সঞ্জীবিত অহল্যার প্রাণ।
ধন্য আমি। ধন্য হোলো ক্ষুধিত পাষাণ।

এখনো ঘোমটা টেনে বলবে : 'যদি?'।

প্রেক্ষাগৃহ

বেশ কয়েক মাস বাদে তনুজাকে দেখলাম ফ্লোরে। রাজকুমারীর কয়েক একটি দৃশ্য শেষ কাজ করেই তিনি বিদায় নিয়েছিলেন কলকাতা থেকে। আমেরিকায় ওঁর ভাই পড়াশুনো করেন। সেখানে গিয়েছিলেন কিছুদিনের জন্য। ফিরেই আবার সোজা চলে এসেছিলেন কলকাতায় সলিল সেনের **অপর্ণার** স্যুটিংয়ে অংশ নিতে। যাবার আগে সলিলবাবুর সঙ্গে পাকাপাকি কথা হয়েছিল। সেইমত সব ব্যবস্থা পাকাপাকি। তনুজা এসেই একদিন বিশ্রামান্তে কাজ শুরু করেছেন।

দেয়া নেয়া, তিন ভুবনের পারে, এন্টনী ফিরিঙ্গী, রাজকুমারী, প্রথম কদম ফুল—তনুজার এই পাঁচখানা ছবি দেখার পর স্বাভাবিকভাবেই ধারণা হতে পারে এখন তনুজার বাংলা ভাষায় বেশ দখল এসেছে। অথচ আসল ব্যাপারটা তা নয়। **অপর্ণার** সেটেও দেখলাম আগের মতই ডায়ালগগুলোকে ইংরেজী অক্ষরে লিখে দিতে হচ্ছে। অথচ বাংলা কিন্তু খারাপ বলেন না। শুনলাম উনি এখন বাংলা শিখছেন।

—হিন্দী আপনার অতি পরিচিত ভাষা, আর বাংলা তো আপনার দেশীয় হলেও অজানা ভাষা। আপনার তো বেশী হিন্দী ছবিতে কাজ করা উচিত, অথচ ব্যাপারটা উল্টো হয়ে যাচ্ছে তাই না?

: এখন আর বাংলা ভাষা আমার কাছে মোটেই অজানা ভাষা নয়! প্রথম যখন সুনীলবাবুর ছবিতে কাজ করতে এসেছিলুম, তখন সত্যিকথা বলতে কি একটু ভয়-ই ছিল মনে। উত্তমবাবু-সুনীলবাবু ও অন্য সকলের সহযোগিতায় সেই ভয়টা চলে গিয়েছিল অল্প কদিন বাদেই। তারপর থেকেই শুধুমাত্র বাংলা ছবি নয়, টালিগঞ্জের মায়ায় বেশ পড়ে গেলাম। এখানকার পরিবেশ, এখানকার মানুষ আমাকে আকর্ষণ করল খুব। তাই এখনো আছি। থাকতেও চাই।

—**অপর্ণা** ছাড়া আর কোনো ছবি হাতে আছে নাকি?

: সাইন করিনি এখনও। কথাবার্তা চলছে, দেখি কি হয়! তবে সুনীলবাবুর (সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়) ছবিতে (যমুনা কে তীর) সম্ভবতঃ কাজ করব।

—আর বম্বেতে ছবি নেই?

: হ্যাঁ—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আছে। খান চার-পাঁচেক। এখান থেকে গিয়েই তো আবার ওখানে কাজ শুরু করব। তবে আবার কবে কলকাতায় ফেরার দিনটা আসবে সেই দিনটার অপেক্ষা। বিশ্বাস করুন বা না করুন এখানে এলে যেন রিলিফ পাই।'

হীরেন নাগ **বিমলিত কন্যা জাহ্নবী যমুনার** একটানা প্রায় এক মাসের আউটডোর সিডিউল শেষ করেই পাড়ি জমিয়েছিলেন বিহারের নেতারহাটে **অথ অতীত** ছবির জন্য। সেখানেও বেশ কয়েকদিন চিত্রগ্রহণের পর সম্প্রতি ফিরেছেন কলকাতায়। এ মাসের শেষ দিকে কদিনের ইনডোরের কাজ আছে জানালেন হীরেনবাবু। একই সঙ্গে দুটো ছবির কাজ করছেন, কোনো অসুবিধে হয় না—জিজ্ঞেস করায় বললেন—না, অসুবিধে কিসের? একমাত্র শরীরের ওপর যা একটু চাপ বেশী পড়ে। তবে আনন্দ আছে তো কাজে, ভাই পেরে উঠি।'

তুম হসীন ম্যায় জওয়ান/ধর্মেন্দ্র এবং হেমা মালিনী

নেকস্ট ভেঞ্চারের কথা তুলতেই বললেন'—দাঁড়ান মশাই, আগে কাঁধ থেকে এ দুটো ছবি নামাই তারপর অন্য কথা।'

—উত্তর ভারত সফর কেমন হোল? প্রশ্ন করতে শ্রীনাগ বললেন—'সফর বলছেন! তাতো বলবেনই। কি প্রচন্ড স্পিডে যে কাজ হয়েছে তা আপনি ভাবতে পারবেন না। দু-একবারের রিহার্সাল, তারপরেই টেক্, বেশীর ভাগই একবারে ও-কে। শমিতা, শুভেন্দুকে জিজ্ঞেস করবেন। স্টুডিওতে অমন কাজ ভাবাই যায় না।'

—কোথায় কোথায় কাজ করলেন?

: হৃষিকেশ থেকে উত্তরকাশী যাবার পথে বহু জায়গায় কাজ করেছি, সব জায়গার নাম এখন মনেই নেই। তবে গোমুখ পর্যন্ত আমরা গিয়েছিলাম। কয়েকটা নাম বলি, তাহলে জায়গাটা যে কত দুর্গম অনুমান করতে পারবেন। যেমন লছমনঝোলা, যমুনোত্রী, গঙ্গোত্রী, পথে কুতনোর, হনুমানচটি, ফুলচোটি, ভৈরবঘাটি, চিরবাসা ও অন্য অনেক জায়গায়।'

বাংলা ছবির এমন দীর্ঘ আউটডোর স্যুটিং অমন দুর্গম জায়গায় [illegible]

বৃদ্ধি হয়নি। হীরেনবাবু সে ব্যাপারে পাইওনীয়ার বলা যায়।

নেতারহাটের অপ অর্ডার-এর আউট-ডোর স্যুটিংয়ে অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন উত্তমকুমার, স্বরূপ দত্ত, সুপ্রিয়া দেবী ও নতুন মেয়ে সেবন্তী হাজরা। ছবিখানি প্রযোজনা করছেন অসীম সরকার।

ইন্টারভিউ মুক্তি পাবার আগে থেকেই মৃণালবাবু 'গোত্রান্তর'এর কাজ শুরু করে দিয়েছেন। এ ছবির প্রযোজক মৃণালবাবু নন। বম্বের অরুণ কৌশিক প্রোডাকসন্সের ব্যানারে নির্মিত হচ্ছে এ ছবি। ডিসেম্বর মাসে দল রওনা হবেন উত্তরপ্রদেশে। সেখানেই ছবির প্রায় সব কাজ শেষ হবে। প্রথমে যা শোনা গিয়েছিল যে বম্বের অমিতাভ বচ্চন প্রধান চরিত্রে অভিনয় করবেন—এখন বোধহয় শেষ মুহূর্তে বদল হয়ে গেল শিল্পী। প্রধান দুটি চরিত্রে কাজ করবে কলকাতারই বিবেক চ্যাটার্জি ও অর্পিতা ভট্টাচার্য।

রঙ্গনা
বিশ্বরূপার রাস্তায় সাকুলার রোডের মোড়ে
নান্দীকার
৩ই শনিবার ৬টায়
৯ই রবিবার ২-৩০টা ও ৬টায়
তিন পয়সার পালা
১০ই ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার ৬টায়
মঞ্জরী আমের মঞ্জরী
নির্দেশনা : অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়
॥ দূরভাষ (৫৫-৮৪৯৯) টিকিট পাবেন ॥

স্টার
[শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত নাট্যশালা]
শর্মিলা
নাটকীয় সংঘাতে ও অভিনয়-মাধুর্যে অনুপম!
প্রতি বৃহস্পতি ও শনিবার : ৬টায়
প্রতি রবিবার ও ছুটির দিন : ২॥টা ও ৬টায়
॥ রচনা ও পরিচালনা ॥
দেবনারায়ণ গুপ্ত
:: রূপায়ণে ::
অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, অপর্ণা দেবী, নীলিমা দাস, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, সতীন্দ্র ভট্টাচার্য, দীপিকা দাস, শ্যাম লাহা, প্রেমাংশু বসু, বাসন্তী চট্টোপাধ্যায়, কালিদাস গাঙ্গুলী, গীতা দে ও বঙ্কিম ঘোষ।

স্বর্ণ শিখর প্রাঙ্গণে/দিলীপ রায় এবং মাধবী

বিবিধ সংবাদ

অভিনয় : অভিনয় পত্রিকা ১ম বর্ষ পূর্তি উৎসব উপলক্ষে আগামী জানুয়ারী মাসের শেষ সপ্তাহে উনিশশো সত্তরের শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা, নাট্যকার, পরিচালক, অভিনেতা, অভিনেত্রী, মঞ্চশিল্পী এবং যে মফস্বল সংস্থা ঐ বছরে সর্বাধিকবার অভিনয় করেছেন এবং যার নাটক সর্বাধিক অভিনীত হয়েছে তাঁদের সম্বর্ধনা জানাবেন ও পুরস্কৃত করবেন।

অন্ন চাই প্রাণ চাই : অন্নের সাথে প্রাণের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। আর এই অন্ন নিয়েই সারা দেশ জুড়ে চলছে নানা সংঘাত। এই সংঘাত নিয়েই নাটক রচনা করেছেন উমানাথ ভট্টাচার্য 'অন্ন চাই—প্রাণ চাই'। গত ১১ই নভেম্বর বিশ্বরূপা রঙ্গমঞ্চে এই নাটকটির অভিনয় করলেন ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া বহুবাজার ব্রাঞ্চ এমপ্লয়িজ রিক্রিয়েশন ক্লাবের সভ্যরা। অভিনয়াংশে মিলন মুখার্জি, কান্দময় পাল, দিলীপ চ্যাটার্জি, প্রদীপ সুর, শৈলেন ঘোষের নাম উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য চরিত্রে রূপদান করেন কানাই বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিত মুখোপাধ্যায়, তিলক চক্রবর্তী ও নিত্যরঞ্জন রায়চৌধুরী, বিশ্বনাথ শীল, সমরদেব চট্টোপাধ্যায়, দেবব্রত দাস, নরেন্দ্রনাথ দত্ত, প্রণব মুখার্জি, শিখা ভট্টাচার্য ও বেলা রায়। নাটকটি পরিচালনা করেন বিশু চট্টোপাধ্যায়।

শেষ কোথায়? : সুপরিচিত নাট্য-সম্প্রদায় 'অভ্যুদয়' তাঁদের নতুন নাট্য-প্রযোজনার যে নামটি ঘোষণা করেছেন সেটি হলো 'শেষ কোথায়?' রচনা ও পরিচালনা : কিরণ মৈত্র। বর্তমান মধ্যবিত্ত জীবন নাটকটির উপজীব্য। প্রথম অভিনয় রঙ্গনায় আগামী ১১ ডিসেম্বর সন্ধ্যায়।

দীপাবলী উৎসব : গত শনিবার ২১ নভেম্বর গরফা রোডে দীপাবলী উৎসব উপলক্ষে একটি মনোরম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন উদ্দীপনীর (পার্কসার্কাস) কালীপুজো কমিটি। ঐ অনুষ্ঠানে বিভিন্ন শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, নির্মলেন্দু চৌধুরী, অনুপ ঘোষাল, মণ্টু ভট্টাচার্য (হরবোলা), ললিতা ধরচৌধুরী, নুই বেচারা এবং কয়েকজন স্থানীয় শিল্পী। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন শ্রীবাচ্চু রহমান।

'অল ফর ইওর ডিলাইট' : দুটি নাটক সন্ধ্যা : ব্রিটিশ বাসে শিল্পী মুণালের সফল কলকাতা সফরের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ কাউন্সিল আগামী ৯ ও ১০ ডিসেম্বর কলকাতার কলা মন্দিরে শেকসপীয়র নাটকের নির্বাচিত দৃশ্যাবলীর এই অনুষ্ঠান নিবেদন করবেন লণ্ডন শেকসপীয়র গ্রুপ।

ব্রিটিশ থিয়েটারের বিশিষ্ট ব্যক্তি পিটার পটারের নির্দেশনায় এই নাট্যগোষ্ঠীর 'অল ফর ইওর ডিলাইট' নামের নাটক সন্ধ্যা দুটিতে শেকসপীয়রের 'মার্চেন্ট অব ভেনিস', 'উইন্টারস টেল', 'ওথেলো', 'হ্যামলেট' ও 'টুয়েলফথ নাইট' থেকে নির্বাচিত দৃশ্যাবলী পরিবেশিত হবে।

নাট্যগোষ্ঠীটির সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন: মারিয়া এ্যাটকিন্স, হেলেন ডন-ওয়ার্ড, টম ক্রিডল, ব্রায়ান রবিনসন ও রবার্ট সোয়ান। সকলেই অভিজ্ঞ শেকসপীয়র নাট্যশিল্পী এবং কয়েকজন চলচ্চিত্র বা টেলিভিশন শিল্পী হিসাবেও সুপরিচিত।

পিটার পটার একদা সুবিখ্যাত ওল্ড ভিক নাট্য দলের হয়ে লণ্ডনে নাট্য প্রযোজনা করেছেন। কোভেন্ট গার্ডেনের রয়াল অপেরা হাউস-এরও তিনি নৃ

শহরের জন্য আবাসিক প্রযোজক ছিলেন। অতি সম্প্রতি তাঁরই প্রযোজনায় কোভেন্ট গার্ডেনে 'দি রিং' ও ভার্দির 'এইডা' পরিবেশিত হয়ে গেল। ১৯৬৯-৭০ সালে পটার গ্রাণাডা টেলিভিশনের হয়ে ১০টি নাটকের এক সিরিজ প্রযোজনা করেন।

লণ্ডন শেক্সপীয়র গ্রুপ গত দশ বছর ধরে সফরকারী দল হিসাবে মাঝে মাঝেই বিশ্ব পরিক্রমায় বার হয়েছেন। বর্তমান সফরে তাঁরা জাপান, কোরিয়া, হংকং, থাইল্যাণ্ড পরিক্রমার পর কলকাতায় আসবেন ও এখান থেকে মাদ্রাজ ও দিল্লী যাবেন।

মুক্তিপথে অন্য মাটি অন্য রং: রামকৃষ্ণ পিকচার্স নিবেদিত রমাপ্রসাদ চক্রবর্তী পরিচালিত 'অন্য মাটি অন্য রং' ছবিটি সেন্সর কর্তৃপক্ষের ছাড়পত্র পেয়ে বর্তমানে মুক্তির অপেক্ষা করছে। গ্রাম-বাংলার জীবনযাত্রার সঙ্গে শহরের যান্ত্রিক জীবনসংঘাতের এক বাস্তবধর্মী কাহিনী নিয়ে এই ছবির চিত্রনাট্যের বিস্তার। বিভিন্ন চরিত্রে আছেন—অনুপকুমার, সুব্রতা সান্যাল, জ্ঞানেশ মুখার্জী, রুদ্র রায়, গীতা দে, শিবানী বসু, অবনীশ ব্যানার্জী, সম্মথ রায়, শিশু ভাওয়াল, ক্যাপ্টেন ঘোষ ও অন্যান্য শিল্পীবৃন্দ। সংগীত পরিচালনা হৃদয় কুশারী।

জনতা আদালত সমাপ্ত প্রায়: জনতা ফিল্মস কর্পোরেশন নিবেদিত মধুকর ইউনিট পরিচালিত জনতার আদালত ছবিটির চিত্রগ্রহণ ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। আর মাত্র ৩ দিনের বহির্দৃশ্য গ্রহণ হলেই ছবির কাজ শেষ হয়ে যাবে। জোতদার উচ্ছেদ প্রথা কৃষক আন্দোলনের পটভূমিতে এই কাহিনীর বিস্তার। চিত্রনাট্য রচনা করছেন—অনিল কুমার। বিভিন্ন চরিত্রে আছেন—শুভেন্দু চ্যাটার্জী, রত্না ঘোষাল, সন্ধ্যারাণী, অসিতবরণ, জুঁই ব্যানার্জী, বঙ্কিম ঘোষ, সুখেন দাস, গঙ্গাপদ বসু, অশোক মৈত্র, রসরাজ চক্রবর্তী, নির্মল ঘোষ, সুধীর দে এবং নবাগতা চৈতালী দত্ত।

স্মরণ উৎসব: 'সংবাকা সংকর্ম সং-চিন্তার প্রবক্তা স্বামী ঈশানন্দ ব্রহ্মচারী পরমহংস ২৪ পরগণা জেলার ফুলবাড়ি অঞ্চলে তাঁর স্ব-প্রতিষ্ঠিত শিবাশ্রমে সম্প্রতি দেহরক্ষা করেছেন। দুই বাংলায় ছড়িয়ে থাকা তাঁর শিষ্য ভক্ত অনুগামীরা তাঁকে ঘিরে আগামী ৬ ডিসেম্বর '৭০ (২০ অগ্রহায়ণ) রবিবার থেকে তিনদিন-ব্যাপী এক স্মরণ-উৎসব-এর আয়োজন করেছেন উক্ত আশ্রমে। শ্রীবিমল বসু এই স্মরণ উৎসব'-এর উদ্বোধন করবেন।

জুলাই ১৯৭১-এ মস্কোতে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব: সপ্তম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব ১৯ জুলাই থেকে ২ আগস্ট, ১৯৭১ পর্যন্ত মস্কোতে অনুষ্ঠিত হবে। একথা জানিয়েছেন সোভিয়েত ইউনিয়নের চলচ্চিত্র কমিটি ও সোভিয়েত চলচ্চিত্র কর্মী ইউনিয়ন। উৎসবটি অনুষ্ঠিত হবে ক্রেমলিন কংগ্রেস প্রাসাদে।

বিজয়া সম্মিলনী: ১৫ নভেম্বর সন্ধ্যায় মহাজাতি সদনে বাটা স্পোর্টস ক্লাবের বিজয়া সম্মিলনী উপলক্ষে এক মনোজ্ঞ বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন—বাটা স্পোর্টস ক্লাবের সহ-সভাপতি শ্রী জে এস গোপাল মহাশয়। নৃত্যাদির, নীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের নির্দেশনায় ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দিরের কৃষ্ণা রায়ের ভারতনাট্যম (আলারিপ্পু, নটরাজবন্দনা), মায়া ভট্টাচার্য, বন্দনা সেন, অরুণা দে, রিঙ্কু ভাদুড়ী, তন্দ্রা রায়, অনিন্দ্য ঘোষের সাঁওতালী, অলকানন্দা, চিত্রলেখা সরকার রাজস্থানী লোকনৃত্য, শুক্লা সেনগুপ্তা, অর্পণিমা সেন, শান্তি চৌধুরী কৃষ্ণ রায়ের নাগা, সোমাসুর রায়, শিপ্রা সেনের শিব-পার্বতী, নীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও বিদুষী বসুর তারকাসুর বধ (কথাকলি), অনুপ-শঙ্কর, সুতপা দত্ত, বনানী চৌধুরী, মিত্রা পালের অন্যান্য নৃত্যে দর্শকবৃন্দের প্রশংসা অর্জন করে। বিভিন্ন লোকনৃত্যের সঙ্গে লোকসঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীমতী বন্দনা সেনগুপ্তা ও অরবিন্দ মিত্র। সঙ্গীত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন শ্যামল মিত্র বনশ্রী সেনগুপ্ত, সলিল মিত্র ও মানস-কুমার। ঐকতানে অংশগ্রহণ করেন ইকো-ভি-শা।

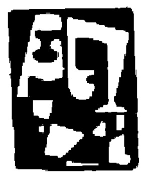
রবি ৬ ডিসেম্বর ৬টা
রবীন্দ্র সরোবর মঞ্চ
শতাব্দীর হাসির নাটক
ভূতপুরের রূপকথা
রচনা ও নির্দেশনা : বাদল সরকার
টিকিট ১ থেকে ৩ হাজরাতী ৫০ প্র
অভিনয়ের দিন হলে বেলা ১টা থেকে

শুক্রবার ৪ঠা ডিসেম্বর শুভারম্ভ!
* এক অভিনেত্রীর জীবনের হাসি-কান্নাকে নিয়ে অন্তরঙ্গ ছবি *

প্রযোজনা ও পরিচালনা সুবোধ মুখার্জী • সঙ্গীত লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলাল
প্যারাডাইস : প্রভাত : মিত্রা : প্রিয়া : ছায়া : রূপালী : ভবানী
ন্যাশনাল : শৈলশ্রী : অজন্তা : কল্পনা : পিকাডিলি : নবরূপম
লীলা : জয়শ্রী : চলচ্চিত্রম : মুক্তি : নীলা : কুইন : শ্রীলক্ষ্মী
শ্রীদুর্গা (চন্দননগর) ও অন্যত্র।

খেলার কথা

পরপর দুবার

অজয় বসু

পর-পর দুবার। এশীয় ক্রীড়ার অনুষ্ঠান উপর্যুপরি দুবারই হলো থাই-ল্যাণ্ডের রাজধানী ব্যাঙ্ককে। নজীর হিসেবে এটি অনন্য। কারণ, এশীয় ক্রীড়া অথবা বিশ্ব অলিম্পিক বা ওই জাতীয় কোনো প্রতিনিধিমূলক আন্তর্জাতিক ক্রীড়া পর-পর দুবার সংগঠনের অধিকার আর কোনো শহর পেয়েছে বলে জানা নেই।

বিশ্ব অলিম্পিক ক্রীড়া বা এশীয় ক্রীড়ার আসর ঘুরে-ফিরে নানা অঞ্চলে বসানো হয়ে থাকে। এক-একটি অঞ্চলকে এক-একটি অনুষ্ঠান সংগঠনের ভার দেওয়া হয়। মূল অনুষ্ঠানের এই ঘোরাঘুরির পরিকল্পনার পেছনে একটি যুক্তি রয়েছে, যে যুক্তি সর্বজন সমর্থনীয়। যুক্তি এই যে, আন্তর্জাতিক ক্রীড়ানুষ্ঠানের উদ্দেশ্যই হলো দেশে-দেশে, মানুষে-মানুষে প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তোলা। অনুষ্ঠান যদি বিভিন্ন অঞ্চলে হয় তাহলে বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের সঙ্গে অন্যান্য দেশ আগত ক্রীড়া প্রতিনিধি-দের মেলামেশার ও শুভেচ্ছা বিনিময়ের সুযোগ ঘটে। কাজেই পর-পর দুবার ব্যাঙ্ককে এশীয় ক্রীড়াকেন্দ্র হিসেবে মনোনীত হওয়ায় এত দিনে অনুসৃত রীতি ও নীতি থেকে এশীয় ক্রীড়া সংস্থাকে সরে আসতে হয়েছে। কাজটা হয়তো অনেকের পছন্দ মাফিক হয় নি। কিন্তু ব্যাঙ্ককে পর-পর দুবার এশীয় ক্রীড়া সংগঠনের অধিকার দিয়ে দেওয়া ছাড়া এশীয় ক্রীড়া ফেডারেশনের অন্য উপায়ও ছিল না।

আর দ্বিতীয়বার এই আন্তর্জাতিক ক্রীড়ার ব্যবস্থাপনার ভার নিতে ব্যাঙ্ককও স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসে নি। ভারটা ওই শহরের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে।

১৯৬৬ সালের ডিসেম্বরে ব্যাঙ্ককে এশীয় ক্রীড়ার পঞ্চম অনুষ্ঠান চালু থাকার সময়েই এশীয় ক্রীড়া ফেডারেশনের কার্য-করী সমিতির সভায় স্থির হয় যে, চার বছর পর এশীয় ক্রীড়ার পরবর্তী অনুষ্ঠান হবে দক্ষিণ কোরিয়ার সিওলে। সাংগঠনিক অধিকার সিওলের হাতে দেবার জন্যে ওই শহরের পক্ষ থেকে যে আবেদনপত্র পেশ করা হয়েছিল, তারই পরিপ্রেক্ষিতে এশীয় গেমস ফেডারেশন সিওলের অনুকূলে ঐ সিদ্ধান্ত নেয়।

ফেডারেশনের এই সিদ্ধান্ত জানার সঙ্গে সঙ্গেই সেদিন ব্যাঙ্ককে সমাগত দক্ষিণ কোরিয়ার ক্রীড়া প্রতিনিধি মহলে আনন্দ ও উচ্ছ্বাসের জোয়ার বয়ে গিয়ে-ছিল। উৎসাহের আতিশয্যে দক্ষিণ কোরিয়ার সাংবাদিক বন্ধুরা একদিন রাত্রে ব্যাঙ্ককের প্রেস সেন্টারে অন্যান্য দেশের সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে একটি পার্টিই দিয়ে বসলেন।

সেই পার্টির ঘরোয়া পরিবেশে ঘণ্টা দুয়েক কাটাবার ফাঁকে সিওল আগত দুজন কোরীয় সাংবাদিককে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "সাংগঠনিক সাফল্যের সূত্রে আপনারা থাইদের টেক্কা দিতে পারবেন তো? টেক্কা দিতে নাও যদি পারেন তাহলেও কিন্তু এঁদের মতো নিখুঁত আয়োজনের নায়ক হতে হবেই। নইলে দক্ষিণ কোরিয়ার (ওঁরা অবশ্য শুধু কোরিয়াই বলে থাকেন) বদনাম হয়ে যাবে কিন্তু।"

মন্তব্য শুনে ওঁরা কিছুক্ষণ চুপ করে ভাবেন। তারপর ভাঙা ভাঙা ইংরেজীতে আস্তে আস্তে বলেন, "তা ঠিকই বলেছেন। এঁরা কিন্তু সব কাজ বেশ গুছিয়েই করতে পেরেছেন। ওঁদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া কঠিন। তবু তার যখন নির্বাচিত তখন আমা-দের পারতেই হবে।"

পারতেই হবে, ওঁরা যতো জোরেই শব্দ দুটি উচ্চারণ করে থাকুন না কেন, দেখা গেল যে, শেষ পর্যন্ত সিওল এশীয় ক্রীড়া সংগঠনের জোয়ালটিকে কাঁধ থেকে নামিয়েই দিল। লক্ষ লক্ষ ডলার খরচ করতে হয়, বিদেশীদের কাছ থেকে সুনাম পাওয়ার আশায় সংগঠকদের কর্মোদ্যমে গা ভাসাতে হয়। নইলে অ[illegible]ভাবে আন্তর্জাতিক ক্রীড়ার আয়োজন ঘটিয়ে লাভ নেই। এতো সব কাজ করে তোলা বেসরকারী কর্মো-দ্যোগের পক্ষে সম্ভব নয়। সরকারকে পাশে না পেলে টাকাকে এই জাতীয় আন্তর্জাতিক ক্রীড়ার ব্যবস্থা করা অনেকের পক্ষেই অসম্ভব।

দক্ষিণ কোরিয়ার পক্ষেও এই কাজ দুঃসাধ্য হয়ে পড়ায় তারা একদিন ষষ্ঠ ক্রীড়া সংগঠনের দায়িত্ব ছেড়েই দেয়। ফলে এশীয় ক্রীড়া ফেডারেশন অসুবিধের পড়ে। এই অসুবিধে আরও বাড়ে যখন দক্ষিণ-কোরিয়ার অসমাপ্ত কাজের দায়িত্ব এশীয় অঞ্চলের আর কোনো দেশই ঘাড় পেতে নিতে চায় না। ষষ্ঠ ক্রীড়া সংগঠনের ভার নেবার অনুরোধ জানিয়ে এশীয় ক্রীড়া ফেডারেশন এক সময় প্রায় সব দেশের দোরে দোরে ঘুরেছিল। কিন্তু সে অনুরোধ রক্ষার সাড়া পাওয়া যায় নি। ফলে এক সময় ষষ্ঠ ক্রীড়া বাতিল হয়ে যাওয়ারই উপক্রম ঘটেছিল। অনুরোধ, উপরোধে ব্যাঙ্কক যদি আবার ঘাড় পাততে রাজী না হোতো তাহলে হয়তো ষষ্ঠ ক্রীড়া সময়ে অনুষ্ঠিতই হোতো না। ব্যাঙ্কক অবশ্য একবারে নিঃশর্ত রাজী হয় নি। ষষ্ঠ ক্রীড়া সংগঠনে যে টাকা খরচ হবে তার মোট অংশ ব্যাঙ্ককের সংগঠকেরা এশীয় ক্রীড়া সংস্থার সদস্য দেশগুলির কাছ থেকে পাবে। খরচ হবে সাড়ে সাত লক্ষ ডলারেরও বেশি। ব্যাঙ্কক অন্যান্য দেশের কাছ থেকে সাহায্য হিসেবে পেয়েছে কিঞ্চিদধিক চার লক্ষ ডলার।

আন্তর্জাতিক ক্রীড়া সংগঠনে ব্যাঙ্ককের অভিজ্ঞতা পরিণত। তাছাড়া ১৯৬৬ সালে এশীয় ক্রীড়ার ব্যবস্থাপনায় হাত দিয়ে ব্যাঙ্কক অনেকগুলি নতুন ক্রীড়াঙ্গন নির্মাণ করে-ছিল। গড়া জিনিস হাতে থাকার বাড়তি সুবিধেও রয়েছে এবার। বছর চার-পাঁচ আগে গড়ে তোলা ব্যাঙ্ককের একটি ক্রীড়া-ঙ্গনের কথা তো আজও ভোলা যায় নি।

এই ক্রীড়াঙ্গন হলো হুয়া মাকের ইন-ডোর স্টেডিয়াম, প্রধানমন্ত্রীর নামানুসারে ক্রীড়াঙ্গনটির নামকরণ হয়েছে কিট্টিকাচর্ণ স্টেডিয়াম। আধুনিক স্থাপত্যকলার এক নির্ভেজাল নিদর্শন এই ইনডোর স্টেডি-য়ামটি। ওপর থেকে স্টেডিয়ামের ছাদটিকে পাপড়ি মেলা এক পদ্মফুলের মতো দেখায়। স্টেডিয়ামের ভেতর বিশ হাজার দর্শক সমাসন আছে। বেশির ভাগ আসনই গদী-আঁটা। স্টেডিয়ামের অভ্যন্তরে একতলা ও দোতলায় বড় বড় দরজার সংখ্যা এতো বেশি যে ওই সব দরজা গলে মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই হাজার বিশেক দর্শক বাইরে চলে আসতে পারে। বাইরের আঙিনাতেও গাড়ী রাখার পর্যাপ্ত জায়গা। তাছাড়া শীততাপ নিয়ন্ত্রিত জিমন্যাসিয়াম, সাইক্লিং ভেলোড্রম, চান্সারি এবং রামা রোডে গুটিকয়েক ছোট-খাটো ক্রীড়াঙ্গন সমেত জাতীয় স্টেডিয়ামও নয়নাভিরাম।

হুয়া মাকের এই ইনডোর স্টেডিয়ামটি রামা রোডের ন্যাশনাল স্টেডিয়াম বা ব্যাঙ্কক শহরের কেন্দ্রস্থল থেকে চল্লিশ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। ওখানে পঞ্চম এশীয় ক্রীড়ার মুষ্টিযুদ্ধের ফাইনাল দেখতে গিয়ে আমি থাই আতিথেয়তার যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি তা সত্যিই বলার মতো।

যে রাত্রে হেভিওয়েট ফাইনালে ভারতের হাওয়া সিং জিতলেন অভিজ্ঞতা সেই রাতেরই। হেভিওয়েট ফাইনালই ছিল সেই রাতের সর্বশেষ অনুষ্ঠান। হাওয়া সিং জেতার পর তাঁকে নিয়ে ভারতীয় দর্শক-মহলে স্বাভাবিক কারণেই নাচানাচি শুরু হয়ে গিয়েছিল। মাতামাতি থামার পর হাওয়ার বিবৃতি যোগাড় করতে গিয়ে আমার বেশ দেরীই হয়ে যায়। এতো দেরী যে হলের বাইরে এসে দেখি শহরের মাঝখানে এবং ক্রীড়াগ্রামে যাবার জন্যে যেসব ভ্যান ও মোটর ছিল তা কখন ঐ অঞ্চল ছেড়ে চলে গেছে।

তখন রাত্রি প্রায় বারোটা। এতো রাত্রে শহরে ফিরি কি করে। রাস্তাঘাটও অচেনা। ভারী মুশকিলেই পড়া গেল যা হোক। কিন্তু মুশকিল আসানের জন্যে থাই আতিথেয়তা যে সদাই প্রস্তুত ছিল তা কি আমি আগে জানতে পেরেছিলাম। পারলে এক মুহূর্তের জন্যেও ঘরে ফেরার দুশ্চিন্তায় ভুগতে হোত না।

কিন্তু থাই আতিথেয়তার রীতিনীতির আদ্যোপান্ত জানা না থাকায় কিছুক্ষণের জন্যে দুশ্চিন্তায় ভুগতেই হলো। সেই দুশ্চিন্তা নিয়েই পথে এসে দাঁড়ালাম। রাত বারোটা বেজে গেলেও হয়া মাক অঞ্চলে তখন গাড়ীতে গাড়ীতে সরগরম। ওই অঞ্চলেই সেবার এক আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী বসেছিল। প্রদর্শনী দেখে থাইল্যাণ্ডের অধিবাসীদের অনেকেই সেদিন গাড়ীতে গৃহে ফিরছেন।

সারি সারি গাড়ী চলেছে। হঠাৎ একটি গাড়ী এসে আমার পাশেই থমকে দাঁড়ালো। গাড়ীর ড্রাইভার এক থাই মহিলা, আরোহীও একজন আছেন। মহিলাটিই জিজ্ঞেস করলেন এতো রাতে শহরতলীর পথে আমি একলা দাঁড়িয়ে আছি কেন? কারণটি আমি জানালাম। যেই না জানা অমনি প্রায় টেনে-হিঁচড়েই আমায় গাড়ীতে তুলে নিয়ে বললেন, 'আগে বলতে হয়, আপনি এশিয়ান গেমসের জন্য আমাদের দেশে এসেছেন! জানেন, ব্যাঙ্ককের প্রত্যেক গাড়ীর মালিক ও ড্রাইভারের ওপর নির্দেশ রয়েছে যে, এশিয়ান গেমস সংশ্লিষ্ট কোনো বিদেশীকে পথে দেখলেই তাঁকে লিফট দিতে হবে। না দিলে সরকারের পক্ষ থেকে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' শুনে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

এবং আরও বুঝলাম যে, এশীয় ক্রীড়া উপলক্ষে ব্যাঙ্ককের বাবস্থাদির সুষ্ঠু ইমেজ বিদেশীদের সামনে তুলে ধরতেই থাইল্যাণ্ডের অধিবাসীরা ছিলেন যথার্থই সন্নিষ্ঠ। এই আন্তরিকতা ছাত্র-ছাত্রী মহলেও প্রসারিত হয়েছিল বলেই থাই ছাত্র-ছাত্রীরা পঞ্চম এশীয় ক্রীড়াকালে ক্রীড়াগ্রামে, প্রেস ভবনে, বিভিন্ন হোটেলে অতিথি সংকারে স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করেছিলেন। সবারই লক্ষ্য ছিল মাতৃভূমির অনুকূলে বিদেশীদের কাছ থেকে শুভেচ্ছা ও সুনাম পাওয়া। সেই সুনাম ও কুণ্ঠাহীন প্রশংসা ব্যাঙ্কক আদায় করে নিতে পেরেছে চার বছর আগেই। চার বছর পর এবারে পাওয়া আর এক অভাবনীয় সুযোগে ব্যাঙ্কক যে অর্জিত শুভেচ্ছা ও সুনামের পুঁজি যে আরও অনেক বাড়িয়ে ফেলতে পারবে, তাতে কোনো সন্দেহই নেই। এশীয় ক্রীড়ার মতো বৃহৎ ব্যাপার সংগঠনের ঝক্কি যে দেশ পরপর দুবার ঘাড় পেতে নিতে পারে সে দেশের প্রাপ্যও বাড়তি অনেক কিছুই। তাই না?

খেলাধুলা

দর্শক

৬ষ্ঠ এশিয়ান গেমস্

আগামী ৯ই ডিসেম্বর থাইল্যাণ্ডের ব্যাঙ্ককে ৬ষ্ঠ এশিয়ান গেমসের উদ্বোধন হবে। প্রতিযোগিতা শেষ হবে ২০শে ডিসেম্বর। চার বছর আগে এই ব্যাঙ্কক শহরে ৯ই ডিসেম্বর তারিখেই ৫ম এশিয়ান গেমসের উদ্বোধন হয়েছিল। এখানে উল্লেখ্য, থাইল্যান্ড ছাড়া অপর কোন দেশে দুবার এশিয়ান গেমসের আসর বসেনি। ইতিপূর্বে এশিয়ান গেমসের আসর বসেছে ১৯৫১ সালে ভারতবর্ষে, ১৯৫৪ সালে ফিলিপাইনে, ১৯৫৮ সালে জাপানে, ১৯৬২ সালে ইন্দোনেশিয়াতে এবং ১৯৬৬ সালে থাইল্যাণ্ডে।

প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করবে ১৮টি দেশ। থাইল্যাণ্ডের প্রতিযোগী সংখ্যা সব থেকে বেশী হবে। তারপরই জাপানের স্থান। ১৯৬৬ সালে ৫ম এশিয়ান গেমসে সর্বাধিক পদক সংগ্রহের সূত্রে পদক জয়ের তালিকায় প্রথম স্থান পেয়েছিল জাপান এবং দক্ষিণ কোরিয়া দ্বিতীয় স্থান পেয়েছিল। বিশেষজ্ঞ মহলের ধারণা আসন্ন ৬ষ্ঠ এশিয়ান গেমসে জাপান এবং দক্ষিণ কোরিয়া গতবারের থেকে বেশি সংখ্যক পদক জয়ী হবে।

ব্যাঙ্ককের আসন্ন ৬ষ্ঠ এশিয়ান গেমসের ১৩টি খেলাতেই ভারতবর্ষের যোগদানের কথা ছিল। কিন্তু খবরে প্রকাশ, ব্যাডমিণ্টন এবং ভলিবল—এই দুটি খেলায় ভারতবর্ষ যোগদান করবে না। এই দুটি দলের খেলোয়াড় নির্বাচনের পর এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়েছে। ব্যাডমিণ্টন দলের না-যাওয়ার কারণ, নিম্ন ক্রীড়ামান। অপরদিকে ভারতীয় অলিম্পিক এসোসিয়েশনের সভাপতি ভলিবল দলের নির্বাচিত খেলোয়াড়দের নাম অনুমোদন করেননি। ফলে তাঁর এই পক্ষপাতিত্ব এবং স্বেচ্ছাচার আচরণের প্রতিবাদে জাতীয় ভলিবল ফেডারেশনের সভাপতি এশিয়ান গেমসে দল পাঠাবেন না ঘোষণা করেছেন।

ভারতীয় ফুটবল দলে নির্বাচিত যে ২০ জন খেলোয়াড়ের নাম সম্প্রতি ঘোষণা করা হয়েছে তাঁদের মধ্যে আছেন বাংলার ১১ জন, বোম্বাইয়ের ৪ জন, মহীশূরের ২ জন, পাঞ্জাবের ১ জন এবং রাজস্থানের ২ জন খেলোয়াড়। বাংলাদেশ থেকে নির্বাচিত হয়েছেন এই ১১ জন খেলোয়াড়: মোহনবাগানের চারজন—চন্দ্রশেখর প্রসাদ, কল্যাণকুমার সাহা, সুভাষ ভৌমিক ও সুকল্যাণ ঘোষদস্তিদার; ইস্টবেঙ্গল দলের চারজন—সুধীর কর্মকার, সৈয়দ নঈম (অধিনায়ক), মহম্মদ হবিব এবং শ্যাম সিং থাপা; মহমেডান স্পোর্টিং দলের ২ জন—আলতাফ আমেদ এবং আবদুল লতিফ; বি এন আর দলের নির্মল সেনগুপ্ত।

অ্যাথলেটিকসে বিশেষ আকর্ষণ হবেন প্রজাতন্ত্র চীনের কুমারী চী চেং। তাঁর বর্তমান বয়স ২৬। ১০০ গজ, ২০০ গজ এবং ২০০ মিটার দৌড়ে তাঁর বিশ্ব রেকর্ড আজও অক্ষুণ্ণ আছে। তাছাড়া ১০০ মিটার দৌড়ের বিশ্ব রেকর্ডে তিনি একজন ভাগীদার। বিশেষজ্ঞ মহলের ধারণা, আসন্ন এশিয়ান গেমসের ১০০ মিটার দৌড়ে তিনি তাঁর ১১ সেকেণ্ড সময়ের বিশ্ব রেকর্ড ভাঙতে সক্ষম হবেন।

যোগদানকারী দেশ

ভারতবর্ষ, নেপাল, পাকিস্তান, সিংহল, ব্রহ্মদেশ, ইরান, ইস্রায়েল, হংকং, ইন্দোনেশিয়া, কাম্বোডিয়া, মালয়েশিয়া, জাপান, প্রজাতন্ত্র চীন, ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ কোরিয়া, দক্ষিণ ভিয়েতনাম এবং থাইল্যাণ্ড।

প্রতিযোগিতার নির্ঘণ্ট

ব্যাডমিণ্টন : ১০—১৯; বাস্কেটবল : ১০—১৯; ভলিবল : ১০—১৯; ফুটবল : ১০—২০; হকি : ১০—১৯; বক্সিং : ১০—১৬; সাইক্লিং : ১০—১৯; সাঁতার : ১২—১৬; ভারোত্তোলন : ১০—১৭; কুস্তি : ১০—১০; নৌচালনা : ১১—১৬; অ্যাথলেটিক্স : ১০—১৫ এবং সুটিং : ১০—১৯।

১৯৬৬ সালের ৫ম এশিয়ান গেমসের পদক জয়ের তালিকায় জাপান বিপুল সংখ্যায় স্বর্ণ, রৌপ্য এবং ব্রোঞ্জ পদক জয়ী হয়ে শীর্ষস্থান লাভ করেছিল। দ্বিতীয় স্থান অধিকারী দক্ষিণ কোরিয়া, তৃতীয় স্থান অধিকারী থাইল্যাণ্ড এবং চতুর্থ স্থান অধিকারী ভারত—এই তিনটি দেশের মোট পদক সংখ্যা যেখানে ছিল ১০৯, সেখানে জাপান একাই পেয়েছিল মোট ১৬১টি পদক (স্বর্ণ ৭৮, রৌপ্য ৫৮ ও ব্রোঞ্জ ৩০)। কি বিরাট ব্যবধান! শিক্ষা, শিল্প-বাণিজ্য এবং খেলাধুলায় জাপান এশিয়া মহাদেশের শ্রেষ্ঠ দেশ।

৫ম এশিয়ান গেমসের পদক তালিকা

(প্রথম চারটি দেশ)

	স্বর্ণ	রৌপ্য	ব্রোঞ্জ
জাপান	৭৮	৫৮	৩০
দঃ কোরিয়া	১২	১৮	২১
থাইল্যাণ্ড	১২	১৪	১১
ভারতবর্ষ	৭	৩	১১

টেবল টেনিসে প্রজাতন্ত্রী চীন

সম্প্রতি সুইডেনের স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান টেবল টেনিস প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইনালে প্রজাতন্ত্রী চীন অপ্রত্যাশিতভাবে ২-৩ খেলায় হাঙ্গেরীর কাছে হেরে গেছে। ১৯৬৬ সালের পর প্রজাতন্ত্রী চীনের টেবল টেনিস খেলোয়াড়দের এই প্রথম ইউরোপ সফর তথা আন্তর্জাতিক খেলায় প্রথম যোগদান।

এখানে উল্লেখ্য, জাপানের পরই বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় প্রজাতন্ত্রী চীনের খেলোয়াড়রা এক সময় দারুণ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় তাঁদের প্রথম যোগদান ১৯৫৩ সালে। বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় মোট খেতাবের সংখ্যা ৭টি—দলগত বিভাগের দুটি এবং ব্যক্তিগত বিভাগের পাঁচটি। প্রজাতন্ত্রী চীন বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় তাদের চারবারের যোগদানে এইভাবে ১২টি খেতাব জয়ী হয়েছিল—১৯৫৯ সালে ১টি, ১৯৬১ সালে ৩টি, ১৯৬৩ সালে ৩টি এবং ১৯৬৫ সালে ৫টি। ১৯৬৫ সালের ২৮তম বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় জাপান এবং প্রজাতন্ত্রী চীন সাতটি বিভাগেরই ফাইনালে খেলে এশিয়া মহাদেশের নিরঙ্কুশ প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। প্রজাতন্ত্রী চীনের নতুন খেলোয়াড়—চুয়াং সে-তুং এবং লি ফু-জুং যে পরস্পর উপর্যুপরি তিনবার পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনালে খেলেছিল তা আজও একমাত্র নজির হয়ে আছে। তাঁদের মত আর কোন একটি দেশের দুজন খেলোয়াড় এইভাবে পরস্পরের সঙ্গে উপর্যুপরি তিনবার পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনালে মিলিত হননি। ১৯৬৫ সালের পর রাজনৈতিক কারণে প্রজাতন্ত্রী চীন বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতার পরবর্তী দুটি আসরে (১৯৬৭ ও ১৯৬৯) অংশ গ্রহণ না করায় জাপানের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী বলতে আর কোন দেশ ছিল না।

টেনিসে 'গ্র্যাণ্ড প্রিক্স'

ইণ্টারন্যাশনাল লন টেনিস ফেডারেশন কর্তৃক নির্দিষ্ট আন্তর্জাতিক টেনিস প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে আমেরিকার ক্লিফ রিচে সর্বাধিক পয়েণ্ট অর্জনের সূত্রে ফেডারেশনের 'গ্র্যাণ্ড প্রিক্স' পুরস্কার লাভ করেছেন। এই পুরস্কারের মূল্য নগদ ১০,২৫০ স্টার্লিং। ক্লিফ রিচে 'গ্র্যাণ্ড প্রিক্স' পুরস্কার পর্যায়ের শেষ প্রতিযোগিতা—স্টকহোম টেনিস প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় রাউণ্ডের খেলায় জয়ী হয়ে মোট ৩৮ পয়েণ্ট সংগ্রহ করেন এবং সেই সূত্রেই তাঁর এই পুরস্কার লাভ। এই প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইনালে স্বদেশের নিগ্রো খেলোয়াড় আর্থার অ্যাসের কাছে তাঁর পরাজয়ের সঙ্গে প্রথম পুরস্কার লাভের কোন সম্পর্ক ছিল না। এই ১০,২৫০ স্টার্লিংয়ের প্রথম পুরস্কার লাভের পথে এক সময় তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন দুজন—আমেরিকার নিগ্রো খেলোয়াড় আর্থার অ্যাশ এবং অস্ট্রেলিয়ার কেন রোজওয়াল, যাঁরা যথাক্রমে ২য় এবং ৩য় স্থান পেয়েছেন। অস্ট্রেলিয়ার প্রখ্যাত রড লেভার পেয়েছেন ৪র্থ স্থান।

কাউড্রের রেকর্ড রাণ

বৈদেশিক সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রেরিত ইংল্যাণ্ড-অস্ট্রেলিয়ার চলতি প্রথম টেস্ট ক্রিকেট খেলার তৃতীয় দিনের যে বিবরণ বিভিন্ন দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে, তার মধ্যে বলা হয়েছে, কলিন কাউড্রে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ব্রিসবেনের ১ম টেস্টের ১ম ইনিংসে ২৮ রান করে টেস্ট খেলায় তাঁর ব্যক্তিগত মোট ৭২৫৩ রান সংগ্রহ করেছেন এবং এই সূত্রে ইংল্যাণ্ডের ওয়ালটার হ্যামণ্ড প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিগত সর্বাধিক মোট রানের রেকর্ড (৭২৪৯) রান ভেঙেছেন। ন্যায়ের কষ্টিপাথরে কাউড্রের এই ৭২৫৩ রান পরীক্ষা করলে বেশ কিছুটা খাদ পাওয়া যাবে। কাউড্রের এই ৭২৫৩ রানের মধ্যে ১৯৬৫ সালে তিনি যে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে তিনটি বে-সরকারী টেস্ট ম্যাচ খেলেছিলেন, তার রানও ধরা হয়েছে। এইভাবে সরকারী এবং বে-সরকারী টেস্ট খেলার সংগৃহীত রান একত্রিত করা নিশ্চয় সঙ্গত নয়। এবং এ ব্যাপারে আপত্তির কারণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

দক্ষিণ আফ্রিকা যে-দিন থেকে কমনওয়েলথ গোষ্ঠীর সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ত্যাগ করেছে, সেই দিন থেকেই তাদের ইম্পিরিয়াল ক্রিকেট কনফারেন্সের (বর্তমানে ইণ্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কনফারেন্স) সদস্য পদও বাতিল হয়ে গেছে। সুতরাং ১৯৬১ সাল থেকে দক্ষিণ আফ্রিকা বিভিন্ন দেশের সঙ্গে (ভারতবর্ষ, পাকিস্তান ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বাদে) যে-সব টেস্ট ক্রিকেট ম্যাচ খেলেছে তার সঙ্গে ইম্পিরিয়াল ক্রিকেট কনফারেন্সের কোন সম্পর্ক নেই। সুতরাং দক্ষিণ আফ্রিকার এইসব টেস্ট ক্রিকেট খেলাগুলি বেসরকারী খেলা হিসাবেই গণ্য। এখানে উল্লেখ্য, ক্রিকেট খেলার প্রখ্যাত গ্রন্থপঞ্জী 'লেকেস্টারস ক্রিকেট এ্যানুয়েল' প্রথম দিকে দক্ষিণ আফ্রিকার ১৯৬০ সালের পরবর্তী টেস্ট খেলাগুলিকে বেসরকারী হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। এ সম্পর্কে এক গুরুত্বপূর্ণ বিবৃতি দিয়ে তাঁরা টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়দের ব্যক্তিগত ব্যাটিং, বোলিং প্রভৃতি পরিসংখ্যানের সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকার বেসরকারী টেস্ট খেলার ফলাফল একত্রিত করেন নি।

অর্বাচীন ১৯৬৬ সালের সংস্করণ থেকে তাঁরা কোন রকম বিবৃতি না দিয়েই দক্ষিণ আফ্রিকার বেসরকারী টেস্ট খেলার সঙ্গে সরকারী টেস্ট খেলার ফলাফল যোগ করে চলেছেন। প্রখ্যাত প্রামাণ্য গ্রন্থপঞ্জী 'উইসডেন' প্রথম থেকেই সম্পূর্ণ অনুমানের উপর ভরসা করে দক্ষিণ আফ্রিকার বেসরকারী এবং সরকারী টেস্ট খেলার ফলাফল যোগ করে যাচ্ছেন। তাঁদের বক্তব্য, দক্ষিণ আফ্রিকা ভবিষ্যতে ইম্পিরিয়াল তথা ইণ্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কনফারেন্সের সদস্য পদ লাভ করে তাদের ১৯৬০ সালের পরবর্তী বেসরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলাগুলি হয়ত সরকারী টেস্ট খেলা হিসাবে অনুমোদন করিয়ে নিতে সক্ষম হবে।

সুতরাং ঘটনার বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে দক্ষিণ আফ্রিকার টেস্ট ক্রিকেট খেলা বেসরকারী হিসাবেই ধরা উচিত এবং সরকারী টেস্ট খেলার ফলাফলের সঙ্গে তা যোগ করা ন্যায়সঙ্গত নয়।

রোভার্স কাপ

পশ্চিম ভারতের শ্রেষ্ঠ রোভার্স কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা গত ১লা ডিসেম্বর থেকে সুরু হয়েছে। ১৯৭০ সালের প্রতিযোগিতায় ৪০টি দল অংশ গ্রহণ করেছে। কলকাতা থেকে ৬টি দল খেলবে—প্রথম রাউণ্ডে বি এন রেলওয়ে, বাটা স্পোর্টস ক্লাব ও এরিয়ান্স এবং সরাসরি ৪র্থ রাউণ্ড থেকে খেলবে গত বছরের বিজয়ী ইস্টবেঙ্গল, রানার্স-আপ মোহনবাগান ও মহমেডান স্পোর্টিং। গত বছরের ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল ৩-০ গোলে মোহনবাগানকে পরাজিত করেছিল।

সন্তরণ প্রতিযোগিতা

রাজ্য সংস্থা অনুমোদিত চাতরা সুইমিং ক্লাবের পরিচালনায় গঙ্গায় চার মাইল সাঁতার প্রতিযোগিতা আগামী ৬ই ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হবে।

এই ঠিকানায় খবর পাওয়া যাবে—সম্পাদক, চাতরা সুইমিং ক্লাব, ৬৭নং এ. পি. ঘোষ রোড, চাতরা, শ্রীরামপুর, জেলা হুগলী।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ [illegible] হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

॥ বাংলা সাহিত্যের নূতন ও সেরা গ্রন্থ ॥

প্রমথনাথ বিশীর উপন্যাস
বিপুল সুদূর তুমি যে ৭॥

বিমল করের উপন্যাস
বাড়িবদল ৪্

আশাপূর্ণা দেবীর উপন্যাস
বিজয়ী বসন্ত ৬্

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস
নতুন তোরণ ৪॥

নীহাররঞ্জন গুপ্তের
কাজললতা ৬্

প্রফুল্ল রায়ের উপন্যাস
অন্যভুবন ৪॥

শঙ্কু মহারাজের ভ্রমণকাহিনী
উত্তরস্যাং দিশি ১০্

বিমল মিত্রের
কলকাতা থেকে বলছি ৬্

মহাশ্বেতা দেবীর
সুভগা বসন্ত ৪্

প্রমথনাথ বিশীর কাব্যগ্রন্থ
প্রাচীণ পারসিক
॥ সাড়ে পাঁচ টাকা ॥

ডঃ রাধাকৃষ্ণণের
হইতে ধর্ম ও সমাজ
॥ দশ টাকা ॥

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের
কিশোর গ্রন্থাবলী
॥ সাড়ে চার টাকা ॥

॥ নাটক ॥

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

বিধিলিপি	৩্

নীহাররঞ্জন গুপ্তের উপন্যাস

উল্কা	৩্
চক্র	৩্
মায়ামৃগ	৩্
রাত্রি শেষ	৩্

॥ অনুবাদ ॥

টলস্টয়ের

আনা কারেনিনা		৩॥০
ওআর এণ্ড পীস	১ম	৬্
ঐ	২য়	৫্
ঐ	৩য়	৪॥০

ডস্টয়েভস্কির

ক্রাইম এণ্ড পানিশমেণ্ট	৩্

॥ প্রবন্ধ ॥

মহাত্মা গান্ধীর

সত্যাগ্রহ	৫্
আমার ধ্যানের ভারত	৪॥০
আমার ধর্ম	৫্
ছাত্রদের প্রতি	৫্

শশিভূষণ দাশগুপ্তের

টলস্টয় গান্ধী রবীন্দ্রনাথ	৫॥০

নীরদচন্দ্র চৌধুরীর আলোড়ন সৃষ্টিকারী প্রথম বাংলা গ্রন্থ

বাঙালী জীবনে রমণী ১০্

প্রবোধকুমার সান্যালের উপন্যাস
নগরে অনেক রাত (২য় মুঃ) ৬॥০

রমাপদ চৌধুরীর উপন্যাস
জরির আঁচল (২য় মুঃ) ৪্

জরাসন্ধের উপন্যাস
বন্যা ৬্

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের সুবৃহৎ উপন্যাস
অন্য দেশ অন্য দাহ ১৫্

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ভ্রমণকাহিনী
কুয়ারী গিরি পথে ৫॥

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের উপন্যাস
এক প্রহরের খেলা ৫্

সুমথনাথ ঘোষের উপন্যাস
জলধিতরঙ্গ ৪॥

বিমল করের উপন্যাস
যাদুকর ৫॥

লীলা মজুমদারের
আর কোনোখানে ৫্

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস
আঁধি ৭॥

তারাশঙ্করের উপন্যাস
রাধা ৮্

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস
অলকা তিলকা (৩য় মুঃ) ৫্

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের উপন্যাস
মৃগমদ (২য় মুঃ) ৮॥

মিত্র ও ঘোষ : ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২ ॥ ফোন : ৩৪-৩৪৯২, ৩৪-৮৭৯১

CENTRAL LIBRARY

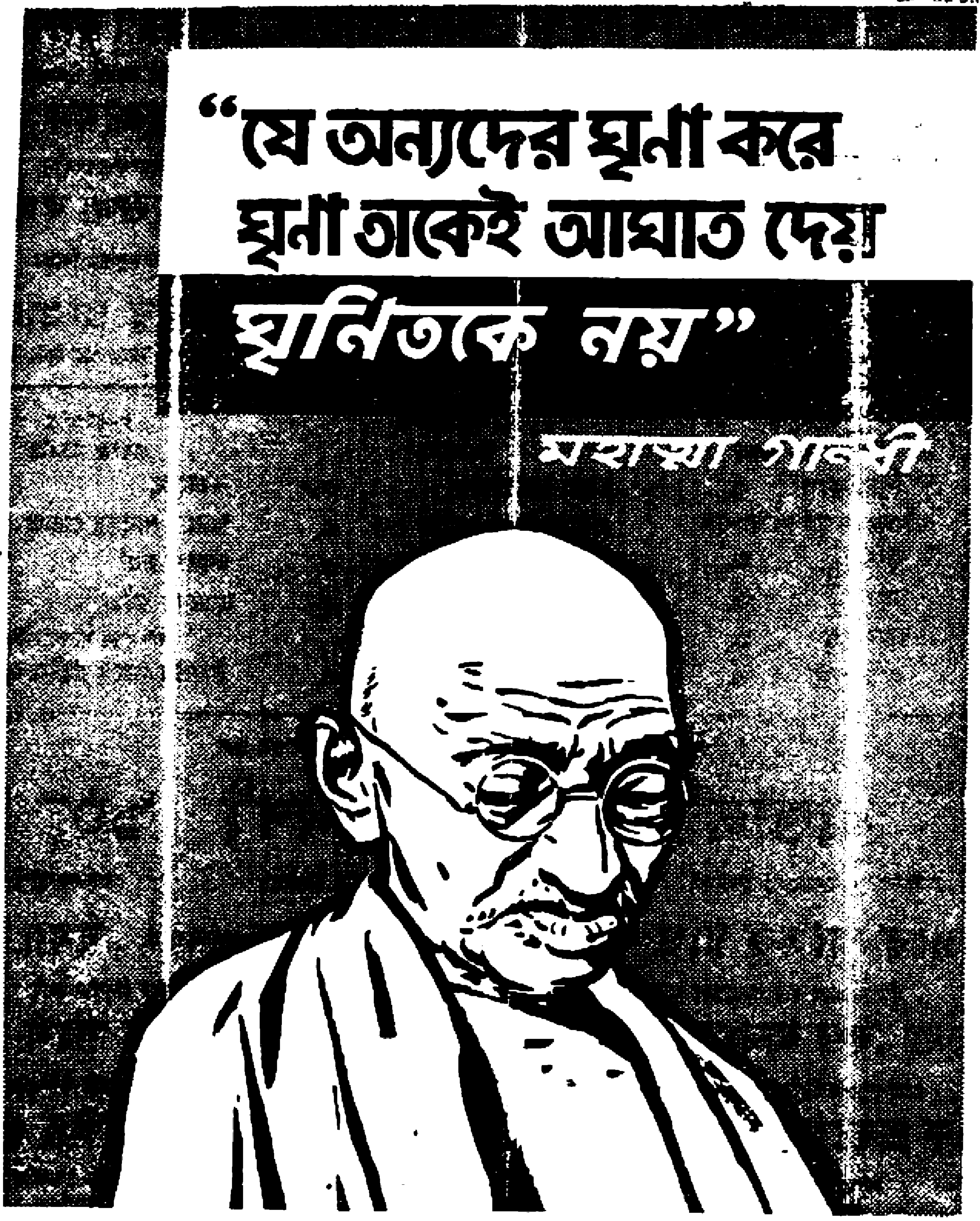

১০ম বর্ষ
৩য় খণ্ড

অমৃত

৩২শ সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday 11th December, 1970 শুক্রবার, ২৫শে অগ্রহায়ণ, ১৩৭৭ **40 Paise**

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে অমৃতে প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য অমৃতের কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে অমৃতের কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পিতে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে অমৃতের কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

		কলিকাতা		মফস্বল
বার্ষিক	টাকা	২০-০০	টাকা	২২-০০
ষাণ্মাসিক	টাকা	১০-০০	টাকা	১১-০০
ত্রৈমাসিক	টাকা	৫-০০	টাকা	৫-৫০

'অমৃত' কার্যালয়
১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোন : ৫৫-৫২০১ (১৪ লাইন)

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
৪০৪	চিঠিপত্র		
৪০৬	সাদাচোখে		—শ্রীসঞ্জয়
৪০৮	দেশেবিদেশে		—শ্রীপুণ্ডরীক
৪১০	পরলোকে জীবনলাল চট্টোপাধ্যায়		
৪১২	যেদিন চিঠি থাকে না	(কবিতা)	
৪১১	সম্পাদকীয়		—শ্রীসমরেন্দ্র সেনগুপ্ত
৪১২	সুখের মতন কিন্তু	(কবিতা)	—শ্রীহেনা হালদার
৪১২	পাতা ঝরে, ঝরবে পাতা	(কবিতা)	—শ্রীসনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়
৪১৩	পূর্বরাগ	(গল্প)	—শ্রীপ্রমোদ দত্ত
৪১৯	মুখের মেলা		—আবদুল জব্বার
৪২১	কুলসীচরিত	(উপন্যাস)	—শ্রীনন্দীমাধব চৌধুরী
৪২৫	এই আমাদের দেশ		—শ্রীনন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
৪২৭	জন্মশতবার্ষিকী স্মরণে : যদুনাথ সরকার		—শ্রীগৌরগোপাল সেনগুপ্ত
৪২৮	সাহিত্য ও সংস্কৃতি		—শ্রীঅভয়ঙ্কর
৪৩৩	নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে	(উপন্যাস)	—শ্রীঅতীন বন্দ্যোপাধ্যায়
৪৩৯	কন্যাবিদায়		—শ্রীঅমিয় দত্ত
৪৪৪	নিকটেই আছে		—শ্রীসন্ধিৎসু
৪৪৭	তোমাকে	(উপন্যাস)	—শ্রীনিমাই ভট্টাচার্য
৪৫০	মনের কথা		—শ্রীমনোবিদ
৪৫৩	স্টেশনমাস্টারের ডায়েরী	(গল্প)	—শ্রীজগৎ বন্দ্যোপাধ্যায়
৪৫৭	বিজ্ঞানের কথা		—শ্রীঅয়স্কান্ত
৪৫৯	পিঞ্জর	(বড় গল্প)	—শ্রীসুভাষ সিংহ
৪৬২	গোয়েন্দা কবি পরাশর		—শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র রচিত —শ্রীশৈল চক্রবর্তী চিত্রিত
৪৬৩	অঙ্গনা		—শ্রীপ্রমীলা
৪৬৪	প্রদর্শনী পরিক্রমা		—শ্রীচিত্ররসিক
৪৭১	জলসা		—শ্রীচিত্রাঙ্গদা
৪৭৩	প্রেক্ষাগৃহ		—শ্রীনান্দীকর
৪৭৭	খেলার কথা		—শ্রীশঙ্করবিজয় মিত্র
৪৭৯	খেলাধুলো		—শ্রীদর্শক

প্রচ্ছদ : শ্রীগৌতম দত্ত রায়

CENTRAL LIBRARY

চিঠিপত্র

'নিকটেই আছে' ও 'মুখের মেলা' প্রসঙ্গে

শ্রীসঞ্জয় গুহঠাকুরতা (অমৃত-চিঠিপত্র, ৪ঠা অগ্রহায়ণ, ১০৭৭) বলেছেন—কতকগুলো জায়গায় মুখের মেলা'র তুলনায় 'নিকটেই আছে'-র চরিত্রের কাহিনী অনেক বাস্তবতার ছোঁয়া এনেছে। তাঁর কাছে 'মুখের মেলায় ঘটনা অপেক্ষা 'নিকটেই আছে' অনেক বাস্তব মনে হয়। কোন জিনিস 'ভালো লাগা' বিভিন্ন মানুষের ব্যক্তিগত মানসিকতার উপর নির্ভর করে। এ বিষয়ে তর্ক অর্থহীন।

'মুখের মেলা' ও 'নিকটেই আছে' 'অমৃত'-র নিয়মিত দুটি ফিচার। একটিতে গ্রামবাংলার বিচিত্র জনজীবনের এক একটি চরিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরে। আর একটিতে সমাজ-জীবনের তথাকথিত ছদ্মবেশধারী ঠগ-প্রতারকদের চরিত্র আমাদের কাছে পৌঁছে দেয়। 'নিকটেই আছে' ফীচার ফিচারে বাস্তবতার ছোঁয়াচ নিশ্চয়ই আছে। লেখক শ্রীসন্দীপন অবশ্যই ধন্যবাদার্হ। কিন্তু তার জন্য মুখের মেলা'র লেখক আবদুল জব্বারের লেখায় বাস্তবতার অভাব ঘটেছে বলতে যাওয়া কিঞ্চিৎ ভুল নয় কি?

পাগল শশীকান্ত রায়কে নিছক গল্পে বলা চরিত্র বলতে আমার ইচ্ছে করে না। চলমান জীবনের বহু ঘটনাই গল্পের চেয়ে অদ্ভুত—আপাতদৃষ্টিতে অবাস্তব। গ্রামীণ জীবনের সোঁদা মাটি মাখা বহু চরিত্রই আমাদের অজানা। একালের গ্রামবাংলার চরিত্র শিল্পীকার সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, আবদুল জব্বার প্রভৃতিরা অবশ্যই আমাদের অভিনন্দন পাবেন—অবহেলিত মুখগুলোকে গাছের জলে ধুয়ে মুছে আমাদের সামনে আনার জন্য।

কামাল হোসেন,
বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ।

(২)

গত ২৭ কার্তিক, ১০৭৭ 'অমৃত' পত্রিকার 'চিঠি-পত্র' স্তম্ভে মুদ্রিত অর্পণা চ্যাটার্জির 'নিকটেই আছে' প্রসঙ্গে বিবরণটি পাঠালাম।

লেখিকা যে অসৎ-অসাধু পুস্তক প্রকাশকদের (কোনও নামী প্রকাশক নন) সংবাদ তুলে ধরেছেন তা সম্পূর্ণরূপে সত্য। আমার জানাশোনা এমন অনেক তরুণ লেখক-লেখিকা আছেন; যাঁরা এইসব অসৎ-অসাধু-অনামী পুস্তক প্রকাশকদের কবলে পড়ে সর্বস্বান্ত হয়েছেন। তাই আজ এ'দের অসাধুতা ও প্রতারণার মুখোশ সর্বসমক্ষে খুলে দেওয়ার বিশেষ প্রয়োজন অনুভব করছি। শুধু খুলে দেওয়া নয়; এ'দের বিরুদ্ধে তরুণ লেখক-লেখিকাদের সম্মবদ্ধ একটা আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে, যাতে এইসব অসৎ-অসাধু-অনামী প্রতারকদের বংশ নির্মূল করা যায়।

এইসব অসৎ পুস্তক প্রকাশকেরা তরুণ লেখক-লেখিকাদের প্রথমে কতই না প্রলোভন দেখান। এ'দের সঙ্গে 'কনট্রাক্ট' করলে তরুণ লেখক-লেখিকারা যে অতি অল্পদিনের মধ্যেই প্রখ্যাত লেখক বা লেখিকা হিসাবে প্রতিষ্ঠালাভ করতে পারবেন, সে সম্বন্ধেও অনেক 'মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা' এ'রা করে থাকেন। অধিকাংশ ঠগ্ বা প্রতারকদের যে 'সাইকোলজি' বা 'মনস্তত্ত্ব' সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান থাকে তা কিছুদিন আগে এক প্রখ্যাত 'অপরাধ বিশেষজ্ঞের' লেখায় পড়েছিলাম। কিন্তু তা যে আজ বাস্তবে এমন করে সত্য হয়ে উঠবে, একথা কোনও দিন ভাবিনি।

আপনাদের অমৃতে 'নিকটেই আছে'-'মনের কথা'-'মুখের মেলা' প্রভৃতি এমন কয়েকটি বিভাগ আছে যা প্রকৃতপক্ষে অনেক অজ্ঞাত জগৎ ও অপরিচিত ব্যক্তিদের আমাদের চিনিয়ে দিতে বিশেষভাবে সাহায্য করে থাকে। এর জন্য আমি 'অমৃতের' একজন গুণগ্রাহী পাঠক হিসাবে আপনাদের সম্পাদনা বিভাগকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করি।

দেবজিৎ মজুমদার,
কলিকাতা—৪১।

বিহারীলালের "সারদা-মঙ্গল" কাব্যের নামকরণ

নামকরণ একটি বিরাট সমস্যা। কিছুদিন আগে 'অমৃত' সাপ্তাহিক পত্রিকায় 'শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন'এর নামকরণ নিয়ে পর পর দুটি মনোজ্ঞ আলোচনা প্রকাশিত হয়েছিল। এ বিষয়ে 'অমৃতে' সাহিত্য-রসিকদের মন হরণ করে অগ্রণী হয়েছে। অনেক দিনের ইচ্ছা, সারদা মঙ্গলএর নামকরণ নিয়ে একটি প্রবন্ধ লিখব। কাব্য আলোচনায় অনেক বই প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু বিহারীলালের 'সারদা মঙ্গল'এর নামকরণ নিয়ে বিশেষ আলোচনা নেই। পূজনীয় সুকুমার সেন মহাশয় তাঁর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ডে কিছুটা আলোচনা করেছেন। আমি 'সারদা-মঙ্গল' কাব্যটি পড়ে যা ধারণা করেছি তা পাঠক সাধারণের কাছে দিতে পারলে খুশী হব। অবশ্য বিচারের ফল যা হবে তা অবশ্য 'অমৃত'এর সম্পাদক মহাশয় প্রকাশ করবেন।

'সারদা-মঙ্গল' নামটি শুনলেই মধ্য যুগের মঙ্গল কাব্যের কথা সহজই মনে পড়ে যায়। কিন্তু বিষয়বস্তুর দিক থেকে আলোচনা করলে এর অসারতাই প্রমাণিত হবে, আর পাঠকরা বিভ্রান্ত হবেন। 'মঙ্গল কাব্য' সাধারণত গীতি বহুল আখ্যানমূলক দেব-দেবী নির্দেশিত কাব্য। এর মূলে দেবদেবীর মাহাত্ম্য প্রচার। কিন্তু বিহারীলালের 'সারদা-মঙ্গল' এর ধারে-কাছেও যায়নি। অবশ্য পাঁচটি সর্গই গীত আকারে লিখিত। কিন্তু সর্গ পরম্পরায় কোন যোগসূত্র নাই। অত্যন্ত রহস্যলোকে প্রবেশ করলে একটি অস্পষ্ট ক্ষীণ আখ্যান পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু তাও নিতান্ত বস্তুহীন। প্রথম সর্গে উষাদেবী, সারদার বন্দনা গান; দ্বিতীয় সর্গে হারানো আনন্দলক্ষ্মীর উদ্দেশে কবি-চিত্তের অভিসার। কবি-চিত্ত যেন সতীহারা শিব। দীর্ঘ বিরহের হতাশা। তৃতীয় সর্গে কবি-চিত্তের সংশয়। হারানো আনন্দময়ের অন্বেষণে হয়রাণ হয়ে কবি দ্বিগুণ বাধিত। চতুর্থ সর্গে হিমালয়ের উদার প্রশান্তির মধ্যে কবিচিত্তের আশ্বাস-অন্বেষণ। পঞ্চম সর্গে সেই পুণ্যভূমিতে আকাঙ্ক্ষিত আনন্দ উপলব্ধি (বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, সুকুমার সেন, ২য় খণ্ড)।

কবি সৌন্দর্যকে আকণ্ঠ উপলব্ধি করেছেন, কিন্তু তার প্রকাশে তিনি ব্যর্থ। রূপকে অরূপের মধ্যে ধরে রাখতে পারেন নি। কবি কাব্য রচনাকালে সংযমের কোন বাঁধ বাঁধতে পারেননি। তাঁর পক্ষে সম্ভবও ছিল না, কারণ তাঁর আর্টের কোন সংযম ছিল না। তাই তাঁর কাব্যটি হয়েছে আত্মসর্বস্বতায় ভরা। তাই বলছিলাম বিষয়বস্তুটি মঙ্গল কাব্যের পক্ষে মূল্যহীন। কবি সারদার বিরহেই পীড়িত, সারদাকে নিয়েই তাঁর কাজ, সারদাকে বাদ দিয়ে কবির কল্পনা, শুধু লুকোচুরি খেলা।

বিহারীলাল ঐতিহ্যের অনুবর্তন করতে চেয়েছিলেন কিনা জানা যায় না, তবে কাব্যটির 'নামকরণ' দেখলেই বোঝা যায় হয়ত তাই। ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন—'সারদা-মঙ্গল' নামকরণে কবি বাংলা-প্রাচীন পাঁচালী কাব্যের রীতি অনুসরণ করেছেন। কাব্যটি গীতি-প্রণোদিত এবং গীতিময়, সুতরাং আধুনিক ও প্রাচীন এই

চিঠিপত্র

অর্থেই গীতি-কাব্য। কাব্যের বিষয় দেবী-মাহাত্ম্য, তবে লোক উপাস্য দেবী নয়—কাব্য সরস্বতী (বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড)। এই কি নামকরণের যৌক্তিকতা? আমার মনে হয় ডঃ সেন মহাশয় এড়িয়ে গেছেন।

কাব্যটি প্রথমে অসম্পূর্ণ ছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পত্নীর অনুরোধে বিহারীলাল সম্পূর্ণ করেন। তিনি একথা তাঁর 'সাধের আসন' কাব্যে স্বীকার করে গেছেন। তবে কি বলা যায় কবির প্রেরণাদাত্রী জ্যোতিরিন্দ্র ঠাকুরের স্ত্রীই সারদারূপে কবির কাছে ধরা পড়েছেন। নিশ্চয়ই কাব্যটির লেখার আগে কবির সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। তিনি কখনও সারদাকে 'মা' বলেছেন, কখনও বা প্রেয়সী, প্রেমিকা। কবির আসল কল্পনা যখন প্রজ্ঞার গণ্ডি পেরিয়ে গেছে তখন হয়ত লোকচক্ষুর ভয়ে 'মা' বা দেবী বলেছেন। অন্যাটিকা মেয়ে বলতে কি বুঝায়? এত বিশেষণের প্রয়োজন কি ছিল? 'মা'কে নিয়ে কি কখনও রোমান্টিক কবিতা লেখা যায়? তবে ভেবে দেখা দরকার কবির সারদা কে।

কবির মানসী সারদা, জীবন-মরণের সাথী। তাঁর বিরহে কবি কাঁদেন, তাঁকে কাছে পেলে কবির উচ্ছ্বাস বাড়ে। প্রেমিক বা দয়িত তাঁর প্রেমিকা বা দয়িতার সকল সময় মঙ্গল কামনা করবেন এতে আর বিচিত্র কি। কবির সঙ্গে সারদার সম্পর্ক, বলতে বাধা নেই, অতি আধুনিক যুগে 'ভালবাসা' যাকে বলা যায় সেইরূপ। কবি তাঁর সারদার মঙ্গল চেয়েছেন অর্থাৎ কুশল কামনা করেন। তাঁর সুখে কবির সুখ। তবে কি বলা যায় না, 'সারদা-মঙ্গল' নামটির পেছনে এই আইডিয়া প্রচ্ছন্ন থাকা বিচিত্র নয়। আমার মতে হয়ত তাই আছে।

কবি পঞ্চ সর্গের শেষে লিখেছেন—

'বিহঙ্গম! খুলে প্রাণ
ধর রে পঞ্চম তান।
সারদা-মঙ্গল-গান গাও কুতূহলে',

এই দেখেই কি 'মঙ্গল-কাব্যের' পর্যায়ে ফেলা যায়? মোটেই তা যায় না, যুগ কবিকে সৃষ্টি করে, কবি যুগের প্রতিনিধিত্ব করবেন এটাই স্বাভাবিক। তার গণ্ডির বাইরে যাবার ক্ষমতা কবির নেই। তাই উনবিংশ শতাব্দীতে মঙ্গল-কাব্য লেখা কোন ক্রমেই সম্ভব নয়।

নামটি দেখলে ঐতিহ্যের অনুবর্তন মনে হতে পারে, কিন্তু বিষয়বস্তুর দিক থেকে কাব্যটি প্রাচীনত্বের দাবী করতে পারে না। এটা আধুনিক খণ্ড খণ্ড গীতি-কবিতা মাত্র, যা আত্মসর্বস্বতায় পূর্ণ।

কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়,
(বাংলা বিভাগ),
উত্তর বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়,
দার্জিলিং।

মফঃস্বলের সাহিত্য পত্রিকা

আপনার বহুল প্রচারিত 'অমৃতের' একজন নিয়মিত পাঠিকা। আপনার পত্রিকায় 'গ্রন্থদর্শী' মফস্বল সাহিত্যিক এবং পত্রিকার দুরাবস্থার উপরে যে আলোচনা করেছেন তা আমার মনে আঘাত করেছে। সম্প্রতি দেখলুম, মফঃস্বলের একটি শারদীয়া সংখ্যা (আর্য, বর্ধমান) ২ খানি উপন্যাস, কিছু গল্প, কিছু কবিতা এবং বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন অধ্যাপকের প্রবন্ধের সমষ্টি, যেটাকে কলকাতার যে কোন শারদ সংকলন বা পত্রিকার সমতুল্য বলা যেতে পারে। (দেশ, অমৃত, যুগান্তর, আনন্দবাজার ইত্যাদি কয়েকটি ব্যতিরেকে।) এর মধ্যে একটি উপন্যাস চোখে পড়লো, লেখকের নাম রাধাদামোদর মিত্র। উপন্যাসের নাম 'সর্বহারা কুমুর।' লেখকের লেখা ইতিপূর্বে পড়িনি। কিন্তু এই উপন্যাসটি পড়বার পর আমার মনে দাগ কেটে গেল। ঐতিহাসিক কুমুরকে নিয়ে লেখক কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, চার্বাকের শাস্ত্র, দামোদরের সঙ্গীত বাণী ইত্যাদির মাধ্যমে একটি সুন্দর উপন্যাস তৈরী করেছেন যা কলকাতার পত্রিকায় বেরোন উচিত ছিল। অমৃত, দেশ, যুগান্তর, আনন্দবাজার প্রভৃতিতে শারদ সংখ্যায় খ্যাতনামা লেখকেরা লেখেন, একথা অনস্বীকার্য, কিন্তু কলকাতায় আরো যে সমস্ত পত্রিকা আছে যাঁরা অত্যন্ত বাজে লেখা ছাপেন, তাঁরা মফঃস্বলের এই সমস্ত লেখকদের অভ্যর্থনা জানাতে পারেন না? লেখাটি ইতিহাস নিয়ে পড়া ছাত্রছাত্রীদের উপকারে আসবে. কিন্তু বড় কথা হলো, আমাদের ছাত্রছাত্রীরা মফস্বলের ঐ পত্রিকা পাবে কোথা থেকে? গ্রন্থদর্শীর এই সমালোচনা আমার অভিনন্দন পাবে।

রীণা দত্ত,
(ছাত্রী, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)
কলকাতা—২৮।

(২)

উপরোক্ত শিরোনামায় গত ২০শে নভেম্বরের 'অমৃতের' চিঠিপত্র স্তম্ভে মনসারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের চিঠিটি পড়লাম। পত্রলেখক মফস্বলের কবি-সাহিত্যিকগণের আত্মপ্রকাশের সমস্যা সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। আমার মনে হয়, লেখক হওয়ার সমস্যা কোন স্থান বিশেষের কবি-সাহিত্যিকদের সমস্যা নয়। প্রায় সকল নবীন কবি-সাহিত্যিকগণের আত্মপ্রকাশের পথ বর্তমানে রুদ্ধ। কোনরূপ অনুসন্ধান না করেই বলতে চাই তথাকথিত প্রখ্যাত সাহিত্যিকগণ নামকরা পত্র-পত্রিকার অধিকাংশ পৃষ্ঠা দখল করে থাকায়, তরুণেরা বঞ্চিত হচ্ছেন। তাই শুধু মফস্বল নয়, শহরের তরুণ কবি-সাহিত্যিকগণও আত্মপ্রকাশের তাগিদে নিজেদের চেষ্টায় পত্রিকা প্রকাশ করছেন, না হয় প্রখ্যাত পত্র-পত্রিকা কর্তৃক বার বার প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পরে অগত্যা লেখা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হচ্ছেন। এছাড়া আর কি পথ আছে? আমার দীর্ঘ বার বছরের লেখক-জীবনে এ-ব্যাপারে অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে। কিন্তু এই স্বল্প-পরিসরে তা ব্যক্ত করা সম্ভব নয়।

অজিতকুমার দাস,
হাওড়া।

টপ্পা গায়কের লোকান্তর প্রসঙ্গে

বর্তমান সংখ্যা [১০ম বর্ষ, ৩য় খণ্ড, ২৮শ সংখ্যা] অমৃতে প্রখ্যাত টপ্পা গায়ক কালীপদ পাঠকের লোকান্তরগমনে একটি শোকবার্তা ছাপা হয়েছে, তার শেষের দিকে উল্লেখ আছে, "এইচ এম ভি থেকে 'ভালোবাসি বলে ভালোবাসিনি' এবং 'মনোহরা নয়ন তোমার' এই দুটি গানের রেকর্ড বাজারে বহুবছর আগে বেরিয়েছে। এছাড়া তাঁর আর কোন রেকর্ড নেই।" এই তথ্যটি সম্পূর্ণ নয়। আমার পুরোনো রেকর্ড সংগ্রহে দেখতে পাচ্ছি কালীপদ পাঠকের একখানি রেকর্ড আছে। তার [এন ৩৫১৭] এক পিঠে আছে, 'আমার প্রেম রাখা দায় হল', ও অপর পিঠে, 'আমারে কাঁদায়ে যাবে যদি যাও'।

পুরোনো রেকর্ড সঙ্গীতে দেখছি আরো দুখানি রেকর্ডের উল্লেখ আছে। একখানির [পি ১৬৬৭] গান দুটি হল, 'আমি পূজিব পিরীতি প্রেম আজ প্রতিমা করে নির্মাণ', ও 'বিবাদ হইল আমার মন ও নয়নে।' অন্যটির [পি ১১৭৭] এক পিঠে, 'দূরে থাক, কাছে এস না,' ও অন্য পিঠে, 'মনহরা নয়ন তোমার প্রাণ।' তবে এইসব রেকর্ড এখন বাজারে প্রচলিত নেই।

করুণাময় বসু,
টাকী, ২৪ পরগণা।

CENTRAL LIBRARY

শাদা চোখে

রাজনৈতিক অস্থিরতা উন্নয়নমূলক কর্মসূচি রূপায়ণে দুস্তর বাধা সৃষ্টি করে। এ কথা যেমন সত্য তেমনি গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা সক্রিয় না থাকলে অনাস্থ রাজনীতির প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি হিসাবে গড়ে ওঠে সঙ্কীর্ণ মনোভাব। পশ্চিমবঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে যে রাজনৈতিক টানাপোড়েন চলছে তার ফলে এই রাজ্যের দুই প্রান্তে অদ্ভুত মনোভাব ক্রমেই দানা বেঁধে উঠছে। আদর্শের আবেদন ক্রমেই ব্যর্থ হয়ে আঞ্চলিক মনোভাব মাথা চাড়া দিচ্ছে।

আমি 'উত্তরাখণ্ড' ও 'ঝাড়খণ্ড' আন্দোলনের কথাই বলছি। "উত্তরা খণ্ড" আন্দোলনের কথা সংবাদপত্রের সংবাদ পরিবেশনায় এখনো পর্যন্ত তেমন গুরুত্ব লাভ করে নি। ফলে এই আন্দোলন যে কতখানি দানা বেঁধে উঠেছে তার সম্বন্ধে সাধারণের ওয়াকিবহাল হওয়ার কথা নয়। কিন্তু উত্তরবঙ্গের মানুষের সঙ্গে আলাপ করলেই তাঁদের ক্ষোভের ও দুঃখের কারণ খুঁজে পাওয়া যায়। আর এই ক্ষোভ ও দুঃখ এত গভীর যে তাঁরা মুক্তির জন্য আত্মনিয়ন্ত্রণের কথা ভাবতেও দ্বিধা-বোধ করছেন না। এবং ক্রমেই এই আত্ম-নিয়ন্ত্রণ বা স্বাতন্ত্র্যের প্রস্তাব উত্তরবঙ্গ-বাসীর মনে গভীর নাড়া দিচ্ছে, ইতিমধ্যেই অনেক সভা-সমিতি হয়েছে। উত্তরাখণ্ড আন্দোলনের প্রবক্তাদের অভিযোগ কোলকাতার বিরুদ্ধে।

কোলকাতা বলতে শহর কোলকাতা নয়। কোলকাতায় অবস্থিত পশ্চিম বাংলার ভাগ্যনিয়ন্তা মহাকরণবাসীদের বিরুদ্ধেই তাঁদের এই অভিযোগ। উত্তরবঙ্গবাসী মনে করেন কোলকাতা তাঁদের প্রতি যথাযথ দৃষ্টি দেয় না। তাঁরা অবহেলিত, অবজ্ঞাত। স্বাধীনতার ফল ভোগ তাঁরা করতে পারছেন না—তাঁরা বঞ্চিত। যত উন্নয়নমূলক কর্মসূচী স্বাধীনোত্তর যুগে রূপায়িত হয়েছে, তার বেশীর ভাগই কোলকাতাকে শ্রীমণ্ডিত করবার জন্য এদিকে করা হয়েছে। ওদিকে কেবল প্রসাদ কণিকা মাত্র।

তাঁদের এই অন্তর্গূঢ় বিক্ষোভের আকার ধারণ করেছে খুব বেশী দিন আগে নয়। এই সেদিন যখন প্রকৃতির রুদ্ররোষে উত্তর-বঙ্গের জলপাইগুড়ি শহর সহ অনেকগুলি জায়গা মহাপ্লাবনের শিকার হয়েছিল, তখন। স্মরণ থাকতে পারে যে ঐ হঠাৎ-আসা প্লাবনে প্রায় ১৫ হাজার মানুষ প্রাণ হারিয়েছিল। এবং শুধু তাই নয়—অজস্র মানুষ সেদিন গৃহহারা হয়েছিল, সর্বস্বান্ত হয়ে গিয়েছিল। এই দুঃখের দিনে উত্তর-বঙ্গবাসী অনেক আশার বাণী শুনেছিলেন। তখনও ছিল পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতির শাসন—শ্রীধর্মবীরের রাজত্বকাল। কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে স্বয়ং ইন্দিরাজী পর্যন্ত সেই বন্যাগ্রস্ত এলাকায় মানুষের কাছে স্বয়ং উপস্থিত হয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে সর্বনাশা তিস্তাকে শান্ত করবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করবেন না। তাঁদের অভিযোগ হচ্ছে, এখনও পর্যন্ত কতকগুলি নিয়মমাফিক বাঁধ মেরামতের কাজ ব্যতীত আর কিছুই হয় নি। আর সেই '৬৭ সালের ভয়ঙ্কর দিনগুলোর পরও যে তিস্তা ক্ষমারূপ ধারণ করে নি এমন নয়, কিন্তু প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য অদ্যাবধি কোন প্রচেষ্টাই হয় নি।

শুধু সর্বনাশা সেই প্লাবনের পরই যে তিস্তাকে শায়েস্তা করার কথা চিন্তা করা হচ্ছে এমন নয়। যখন এই রাজ্যে কংগ্রেস ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল তখনই উত্তরবঙ্গের পাঁচটি জেলা যথাক্রমে দার্জিলিং, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, পশ্চিম দিনাজপুর ও মালদহের সর্বাঙ্গীন উন্নতিকল্পে একটি "মাস্টার প্ল্যান" তৈরী করা হয়েছিল। এই প্ল্যানে শুধু প্লাবন রোধের পরিকল্পনা ছিল না। ছিল—সিঁচাই-এর কার্যক্রম, নয়া নয়া সড়ক নির্মাণের প্রতিশ্রুতি এবং আরও অনেক উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর রূপরেখা। ১৯৬৫ সালে রচিত এই মহাপরিকল্পনার ব্যয় ধরা হয়েছিল আনুমানিক ১৮৬-২৭ কোটি টাকা। কেন্দ্রীয় সরকারের বিবেচনাধীন এই পরিকল্পনা অদ্যাবধি অনুমোদন লাভ করে নি। এই প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে বলা হয়েছে যে, এত বিপুল পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। উত্তরবঙ্গবাসীদের তরফ থেকে অনেকবার কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের কাছে ডেপুটেশান দিয়ে বলা হয়েছে যে অন্ততপক্ষে, এক দফায় সম্ভব না হলে, পর্যায়ক্রমে এই মাস্টার প্ল্যানকে রূপদান করা হোক। কিন্তু তাঁদের আবেদন এখনও পর্যন্ত ফলপ্রসূ হয়নি। অথচ এক একবার বন্যার তাণ্ডবের পরই প্রতিশ্রুতি এসেছে। আর সেই প্রতিশ্রুতি প্রতিশ্রুতিই রয়ে গেছে। কার্যক্ষেত্রে কিছুই হয় নি।

এই বিপুল পরিমাণ অর্থের বিনিয়োগের অক্ষমতার কথা চিন্তা করে নতুনভাবে কিছু করা যায় কিনা তা নিয়ে পরিকল্পনা রচনার জন্য একমাত্র বিশেষজ্ঞদের নিয়ে "নরসিং রাও" কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটিও পর্যায়ক্রমে দুটি রিপোর্ট পেশ করে অবশেষে বিগত ফেব্রুয়ারী মাসে তাঁদের চূড়ান্ত পরিকল্পনা পেশ করেন। কতকগুলি আশুকরণীয় স্বল্পমেয়াদী কর্মসূচীর কথা এই পরিকল্পনায় স্থান পেয়েছে, এবং ঐ সমস্ত কর্মকাণ্ডের সমাধানের ব্যয় ধরা হয়েছে মাত্র ৮০ কোটি টাকা। কিন্তু এই সুপারিশসমূহেরও কি দশা হবে তা ভেবে উত্তরবঙ্গবাসীরা আতঙ্কিত বোধ করছেন। দীর্ঘসূত্রতা যদি এই পরিকল্পনা রূপায়ণের পথে অন্তরায় হয়ে ওঠে তবে স্বাভাবিকভাবেই উত্তরবঙ্গবাসী বিক্ষুব্ধ হতে পারেন। তাঁদের দাবী, অবিলম্বে অন্তত তিস্তাকে শায়েস্তা করার কাজে হাত দেওয়া হোক। তিস্তা-মহানন্দা প্রোজেক্টের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হোক। বন্যার পর যে সমস্ত রেলপথ বন্ধ করে রাখা হয়েছে তা পুনরায় চালু করা হোক, এবং মৃত্তিকা সংরক্ষণের কাজ আরম্ভ করা হোক। বিশেষজ্ঞরা নাকি বলেছেন যে, বনসম্পদ দ্রুত বিনষ্ট হওয়ার ফলে মৃত্তিকার অবক্ষয় বার বার বিপর্যয় ডেকে আনছে। কাজেই বৃক্ষ ইত্যাদি রোপণের মাধ্যমে বনভূমি সৃষ্টির কাজ ত্বরান্বিত না করলে যতই তিস্তায় বাঁধ দেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হোক না কেন—সেই বাঁধের দ্বারা তীক্ষ্ণ স্রোতা তিস্তার বন্যাদুর্গতকে নাস্তানাবুদ করে উত্তর-বঙ্গবাসীর সম্পদ আহরণে সহায়তা করা যাবে না।

এ সমস্ত দাবী-দাওয়াকে কেন্দ্র করে আন্দোলন দানা বেঁধে উঠছে। এবং উত্তরবঙ্গবাসী মনে করেন যে, যেহেতু লাল-দীঘির চত্বরে তাঁদের প্রতিনিধি নেই তাই "কোলকাতা তাদের অবজ্ঞা করে চলেছে—কাজে গড়িমসী করছে।" উত্তরবঙ্গের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা বলেন, ঐ অঞ্চলের চা ও পাট—ভারত সরকারের বিদেশী মুদ্রার যোগান দিচ্ছে। অথচ যাঁরা এই মহাযজ্ঞের পুরোহিত তাঁরাই দুর্গমপীড়িত বেদনায় আজ ও ভারাক্রান্ত। এই দুর্দশার অবিলম্বে অবসান হওয়া উচিত। ইতিমধ্যে নয়াদিল্লীতে দরবার করতে গণডেপুটেশান গেছে। যদি তার কোন সফল পরিণতি না ঘটে তবে অনেকেই ভয় করবেন "উত্তরাখণ্ড" আন্দোলনের নেতাদের হাতই মজবুত হবে না।

অনুরূপভাবে পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীরাও বিক্ষুব্ধ। তাঁদের ভাষা—নেপালী ভাষা—এখনও স্বীকৃতি লাভ না করায় তাঁদের মধ্যেও বিক্ষোভ আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করেছে। অথচ, এই সকল পার্বত্য-বাসীদেরও বারংবার একই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। আবার কোন শিল্প গড়ে না ওঠায় বা সেখানকার কুটীরশিল্প পর্যন্ত সহযোগিতা না পাওয়ায় ফলে তাঁদের মধ্যেও স্বয়ং শাসিত ইউনিট গড়ে তুলবার মনোভাব বেশ জোরালো হয়ে উঠছে।

এবার চলে আসা যাক পশ্চিমবঙ্গের বিহার-উড়িষ্যা সীমান্তের ঝাড়গ্রাম-পুরুলিয়া অঞ্চলের আদিবাসীদের মধ্যে। এই প্রকৃতির সন্তানদেরও জীবনযাত্রার মান বলতে কিছুই নেই। এঁদের মধ্যে লোধা নামক যে উপজাতি আছে তা প্রায় মুছে যেতে বসেছে। বর্তমানে ২০।২২ ঘর মাত্র অবশিষ্ট আছে। পারিপার্শ্বিকের চাপে পড়ে এখনও এরা সভ্যজগতের আওতায় এসে পৌঁছুতে পারেন নি। জঙ্গলের ফলমূল আহরণ করে, কাঠ কেটে বা কোনও 'মুনীষ' খেটে মুনীষ অর্থ দিন মজুর—সংসার-রথ টেনে চলেছেন। জীবনে বস্তুতপক্ষে চাহিদা বলতে কিছুই নেই। এদের মধ্যে যাঁরা কিছু

কিছু জমিজমা ভাগে অথবা অন্য উপায়ে চাষ আবাদ করেন তাঁরা হয়ত দু'বেলা অন্ন সংস্থান করতে পারেন। অন্যদের ত এক-বেলার খাওয়ার জোগাড় করতেই প্রাণান্ত। একটানা অবজ্ঞাত হওয়ার ফলে কিছু শিক্ষিত আদিবাসী—সেও বিদেশী মিশনারীর অনুকম্পায়—একদিন যে পৃথক ঝাড়খণ্ড রাজ্য গড়ার শপথ নিয়েছিল সেই আন্দোলনের এখন সমর্থন আসছে গোটা ছোটনাগপুর অঞ্চল থেকে। আর তার ঢেউ লেগে কাঁপন ধরেছে ঝাড়গ্রামের শালবনে। তাঁদের মধ্যেও পৃথক ঝাড়খণ্ড আন্দোলন সাড়া জাগিয়েছে। আর অভিযোগ সেই এক। কোলকাতা তাঁদের অবজ্ঞা করছে। তাঁরা যদি নিজেদের কর্তৃত্ব নিজেরা হাতে নিতে পারেন তবে সমান তালে জীবন মান উন্নয়নের যুদ্ধে তাঁরাও এগিয়ে যেতে পারবেন। তাঁদের প্রতি অবহেলার জবাব দিতে পারবেন।

জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গীর কষ্টিপাথরে যাচাই করলে মনে হবে এ ধরনের অনভূত জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী এবং এই সমস্ত পাক-পাকনুষ্ট আন্দোলন জাতীয় ঐক্যের বিঘ্ন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ সব অবহেলিত মানুষের বিক্ষোভের কারণগুলিও সহৃদয়তার সঙ্গে ভেবে দেখতে হবে। যাঁদের মধ্যে কেন এই ঐক্যবিরোধী মনোভাব বা "Separatist tendency" ক্রমেই দানা বেঁধে উঠছে তার কারণগুলি যথাযথভাবে আন্তরিকতার সঙ্গে আশু বিবেচনা করা দরকার। বলতে গেলে পরিকল্পনা যে এই সমস্ত অঞ্চলের মানুষের উন্নতিকল্পে গৃহীত হয় নি এমন নয়। কংগ্রেসের আমলে অনেক কর্মসূচী গৃহীত হয়েছিল এবং কিছু কিছু কাজও হয়েছিল। অবশ্য তা প্রয়োজনের তুলনায় সামান্যই। তারপর পশ্চিমবঙ্গে যে রাজনৈতিক অস্থিরতা শুরু হয়েছে তার ফলে বস্তুতপক্ষে ১৯৬৭ সাল থেকে অদ্যাবধি কোন গণকল্যাণমূলক কাজেই কেউ হাত লাগাতে সমর্থ হন নি। এমন কি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রচনায় ব্যাপারেও পশ্চিমবঙ্গের বক্তব্য যথাযথভাবে রাখা সম্ভবপর হয় নি। কে এই রাজ্যের হাল ধরবে তার ফয়সালা না হওয়ার ফলে এই রাজ্যের ক্ষেত্রে বার বার পরিকল্পনার রূপ অদল বদল হয়েছে। নির্বাচিত প্রতি-নিধি থাকলে তিনি তাঁর এলাকার কথা যত দরদ দিয়ে বলতে পারবেন বা তাঁর এলাকার উন্নয়নকল্পে যে আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করবেন, অন্য কারো পক্ষে তা করা মোটেই সম্ভব নয়। এবং এটা সর্বজনস্বীকৃত বক্তব্য। কাজেই এই যে অশুভ আন্দোলনের সৃষ্টি হচ্ছে তাকে অঙ্কুরেই বিনাশ করা দরকার। যদি তা না করা হয় তবে এই ধূমায়িত বিক্ষোভ যখন লেলিহান হুতা-শনের রূপ পরিগ্রহ করবে তখন এই ক্ষুদ্র বংগদেশ আরও ভাঙনের দিকে এগিয়ে যাবে। শুধু তার ভৌগলিক অবক্ষয় ঘটবে তা নয়। ম্রিয়মান অর্থনীতির উপর এমন চাপ আসবে যে সেই পঙ্গু অর্থনীতি নিয়ে রাজ্যের কোন মঙ্গল সাধনই সম্ভবপর হবে না। শোনা যাচ্ছে, দার্জী. পুরণ না হলে উত্তরবঙ্গবাসী খাজনা বন্ধ আন্দোলন শুরু করবেন। এর পরিণাম ভয়াবহ হতে বাধ্য। কেননা কোন দলগত ব্যাপার এটা নয়; কিম্বা কোন বিশেষ রাজনৈতিক দলের উদ্দেশ্য সাধনের কৌশলও এটা নয়। কোন আদর্শের হক বাঁধা কথাও এদের নিরস্ত করতে পারবে বলে মনে হয় না। সার্বিকভাবে উত্তর-বঙ্গের জনসাধারণের এই আন্দোলনে যোগ নেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। দলগত পথ ভুলে তাঁরা তাঁদের এলাকার উন্নয়নের প্রশ্নে একজোট হওয়ার সম্ভাবনা সর্বাধিক। অনু-রূপভাবে জোট বাঁধছে সেই ঝাড়গ্রাম-পুরুলিয়ার প্রকৃতির সন্তানেরা।

বিপদ সামনে। একথা যদি নেতৃবৃন্দ ভুলে যান তবে সমস্যা সঙ্কুল পশ্চিমবঙ্গ আরও সঙ্কটের আবর্তে পড়বে। পরিত্রাণের কোন উপায় থাকবে না। কাজেই রাজ-[illegible] অস্থিরতা অবিলম্বে অবসান করা [illegible]। নিকৃষ্ট অঞ্চলের অধিবাসীদের প্রতিনিধি মারফৎ তাঁদের দুঃখ দুর্দশা দূরীকরণের আশু চেষ্টা না করা হলে স্বার্থদুষ্ট আন্দোলনের হাত জোরদার হবে। শুধু দমী-দাওয়া আদায়ের ভিত্তিতে এই আন্দোলনগুলি সংগঠিত হলে হয়ত কেবল প্রশাসনিক উপায়ে নিরসন করা সম্ভব হত। এর সঙ্গে পৃথক সংস্থা গড়ে তুলবার অর্থাৎ নয়া রাজ্য গড়বার মনোভাব সংশ্লিষ্ট থাকার ফলেই সমস্যাটা আরও ভয়ঙ্কর রূপে দেখা দিয়েছে। অতএব, সময় থাকতেই সাবধান হওয়া উচিত। —সমদর্শী

পাঠক-পাঠিকাদের প্রচুর চাহিদা থাকা সত্ত্বেও কাগজের দুষ্প্রাপ্যতার জন্য একপক্ষকাল আমরা 'এপার বাংলা ওপার বাংলা' সরবরাহ করতে পারিনি। অনিচ্ছাকৃত এই ত্রুটির জন্য আমরা দুঃখিত।

শংকর-এর
এপার বাংলা ওপার বাংলা
৭ মাসে ৭ম মুদ্রণ　১০·০০

সার্থক জনম　চৌরঙ্গী　মানচিত্র
৪র্থ মুদ্রণ ৫·৫০　২২শ মুদ্রণ ১২·৫০　১৮শ মুদ্রণ ৬·০০

সুভাষ সমাজদারের নতুন বই
আবগারী দারোগার ডায়েরী
লেখকের নানা অভিজ্ঞতাপূর্ণ বিচিত্র কাহিনী ৫·০০

নিরঞ্জন চক্রবর্তীর
শেষ বসন্ত
নতুন উপন্যাস ৮·০০

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের নতুন উপন্যাস
তাঞ্জাম
'কাঞ্চনমূল্য'-র পরবর্তী কাহিনী ৪·৫০

শ্রীদিলীপকুমার রায়ের
ধর্মবিজ্ঞান ও শ্রীঅরবিন্দ
দাম : ১২·০০

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের নতুন উপন্যাস
আলোকপর্ণা
দাম : ১০·০০

কুমারেশ ঘোষের নতুন উপন্যাস
এ ; বর অনেক কনে
দাম : ১০·০০

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের
নাগিনী
৯ম মুদ্রণ ৪·৫০

এর নাম সংসার
৫ম মুদ্রণ ৮·৫০

বিমল মিত্রের
গল্প সম্ভার
দাম : ১০·০০

বনফুলের
অধিকলাল
২য় মুদ্রণ ৪·৫০

জরাসন্ধ-র
স্বীকৃতি
দাম : ৫·০০

চাণক্য সেনের
শুধু কথা
দাম : ৩·৫০

শৈলেন রায়ের
তরাই
দাম : ১০·০০

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের
নতুন তুলির টান
৩য় মুদ্রণ ৭·০০ 'মনশ্রাণ' নামে চিত্র দেখান হবে।

ওঙ্কার গুপ্তের
ব্যাপার বহুতর
সচিত্র ব্যঙ্গরচনা ৫·০০

বাক্-সাহিত্য প্রাইভেট্ লিমিটেড্　৩৩, কলেজ রো, কলকাতা—৯

দেশে বিদেশে

লোকসভা ভেঙে দিয়ে অন্তর্বর্তী নির্বাচন ডাকা হতে পারে, সংবাদ পর্যালোচকদেরও রাজনৈতিক মহলের এই গবেষণা যেন 'মরিয়া না মরে রাম।' সকলেই একজন মানুষের মন পড়বার চেষ্টা করছেন। তিনি হলেন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। শ্রীমতী গান্ধী কি বলেন, সেটা বড় কথা নয় গবেষকদের কাছে, তিনি কি ভাবছেন বা ভাবতে পারেন, সেটাই তাঁদের কাছে বড় কথা।

শ্রীমতী গান্ধী লোকসভা ভেঙে দিলেন বলে, এমন গবেষণা এর আগে মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। যাঁরা বলেছিলেন যে, লোকসভার শীতকালীন অধিবেশন বসার আগেই নির্বাচনের ডাক আসবে তাঁদের কথা থাকেনি। ইতিমধ্যে লোকসভার শীতকালীন অধিবেশন শেষ হওয়ার সময় হয়ে এল।

এখনকার সর্বশেষ গবেষণা হচ্ছে, ডিসেম্বর মাসের শেষাশেষি নাগাদ যদি লোকসভা ভেঙে দেওয়া না হয় তাহলে বুঝতে হবে, অন্তর্বর্তী নির্বাচন হবে না, ১৯৭২ সালে যথানির্দিষ্ট সময়ে লোকসভার পঞ্চম সাধারণ নির্বাচন হবে। যাঁরা এই মত প্রকাশ করছেন তাঁদের যুক্তি হল, ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে যদি লোকসভার নির্বাচন করতে হয় তাহলে ডিসেম্বর মাসের পর আর অপেক্ষা করা চলে না। আর ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে যদি নির্বাচন না হয় তাহলে ঐ বছর সেপ্টেম্বর-অক্টোবরের আগে নির্বাচন সম্ভব নয়। কিন্তু ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারী-মার্চেই যখন স্বাভাবিকভাবে নির্বাচন হওয়ার কথা তখন কয়েক মাসের জন্য আগেভাগে লোকসভা ভেঙে দেওয়ার যুক্তি থাকবে না। সুতরাং ১৯৭০ সাল শেষ হওয়ার আগেই পরিষ্কার হয়ে যাবে, বর্তমান লোকসভা কি তার নির্দিষ্ট পরমায়ু ভোগ করতে পারবে, অথবা তার কপালে অকাল সংহারই লেখা আছে।

মাদ্রাজের 'হিন্দু' পত্রিকার দিল্লী সংবাদদাতা শ্রীজি কে রেড্ডি লিখেছেন, 'প্রধানমন্ত্রী এখন (অন্তর্বর্তী নির্বাচনের) সপক্ষ ও বিপক্ষের যুক্তিগুলি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিচার করছেন বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে। কেননা, যদি ঝাঁপ দিতে হয় তাহলে সময় বড় বেশী নেই।'

আর একটি সর্বশেষ গবেষণা এই যে, অন্তর্বর্তী নির্বাচন হবে কি হবে না তা অনেকটা নির্ভর করছে প্রাক্তন রাজন্যদের ভাতা সম্পর্কে সুপ্রীম কোর্টের মামলার রায়ের উপর। এই মামলার শুনানী হয়ে গেছে এবং ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি এই বিষয়ে সুপ্রীম কোর্টের রায় প্রকাশিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। আদালতের রায় যদি ভারত সরকারের বিরুদ্ধে যায় তাহলে শ্রীমতী গান্ধী লোকসভা ভেঙে দেওয়ার জন্য রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দিয়ে নির্বাচকমণ্ডলীর সম্মুখীন হওয়ার সিদ্ধান্ত করতে পারেন, এই হচ্ছে বর্তমান জল্পনা-কল্পনা।

কিছু কিছু লক্ষণ দেখা যাচ্ছে যাতে মনে হচ্ছে, প্রাক্তন রাজন্যরাও কেউ কেউ তৈরী হচ্ছেন। তাঁদের ভাতা ও অন্যান্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধার প্রশ্নটা আগামী নির্বাচনের অন্যতম ইস্যুতে পরিণত হতে পারে একথা উপলব্ধি করে তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ রাজনীতিতে (ও নির্বাচনে) নামার জন্য তোড়জোড় করছেন। মধ্যপ্রদেশে গোয়ালিয়রের মহারাজ (রাজমাতা বিজয়া রাজে সিন্ধিয়ার ছেলে) বিভিন্ন নির্বাচনমণ্ডলীতে সফর করে বেড়াচ্ছেন। তিনি অন্যান্য রাজামহারাজাদের কাছে চিঠি পাঠিয়ে তাঁদের সক্রিয় রাজনীতিতে নামার পরামর্শ দিয়েছেন। আগামী নির্বাচনের জন্য প্রার্থী হিসাবে যেসব রাজা-মহারাজের নাম শোনা যাচ্ছে তাঁদের মধ্যে আছেন বিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড় ও চিত্রাভিনেত্রী শর্মিলা ঠাকুর ওরফে আয়েশা সুলতানার স্বামী পতৌদির নবাব।

কংগ্রেস ভাগ হওয়ার পর দেশের বিভিন্ন স্থানে যেসব উপনির্বাচন হয়েছে সেগুলির ফলাফল শাসক কংগ্রেস দলের দপ্তর থেকে বিশ্লেষণ করে দেখা হয়েছে। এই বিশ্লেষণে যে হিসাব পাওয়া গেছে সেটা দলের পক্ষে উৎসাহজনক। কংগ্রেস ভাগ হওয়ার পর বিধানসভার মোট যে ৩২টি আসনে নির্বাচন হয়েছে তার মধ্যে ২৪টি আসনে প্রার্থী দাঁড় করিয়ে শাসক কংগ্রেস ১৮টি আসন লাভ করেছে। অপরপক্ষে বিরোধী কংগ্রেস ১৮টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ১১টিতে জামানত হারিয়েছে ও মাত্র চারটিতে জয়ী হয়েছে। লোকসভার যে নয়টি আসনে উপনির্বাচন হয়েছে তার মধ্যে পাঁচটিই শাসক কংগ্রেসের হাতে এসেছে। শুধু তাই নয়, এই কেন্দ্রগুলির নির্বাচনে ১৯৬৭ সালে অবিভক্ত কংগ্রেস শতকরা যে হারে ভোট পেয়েছিল উপনির্বাচনে শাসক কংগ্রেস ভোট পেয়েছে তা থেকে ৭-১২ শতাংশ অধিক হারে। কেরলে গত সাধারণ নির্বাচনের সময় অখণ্ড কংগ্রেস পেয়েছিল মোট ভোটের ৩৩-৪০ শতাংশ। আর গত মধ্যবর্তী নির্বাচনে সেখানে শাসক কংগ্রেস পেয়েছে মোট ভোটের ৪৪-৫ শতাংশ।

শ্রীমতী গান্ধীর সিদ্ধান্ত এই হিসাবের দ্বারা প্রভাবিত হবে কিনা বলা যাচ্ছে না। তবে, এই হিসাব যে শাসক কংগ্রেস দলের পক্ষে আশাজনক তাতে সন্দেহ নেই।

ইতিমধ্যে বিহার নিয়ে শাসক কংগ্রেস দলের উদ্বেগ কাটছেই না। জনাব ফকরুদ্দিন আলি আহমেদ ও শ্রীওয়াই বি চ্যবন, পর পর এই দুই নেতা মীমাংসার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তাঁদের দুজনের চেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে। দলের নেতৃত্ব থেকে শ্রীদারোগাপ্রসাদ রায়কে সরতে হবে, এই দাবীতে বিধানসভার শাসক কংগ্রেস দলের একাংশ অনড় রয়েছেন। পি-এস-পির একাংশও বেঁকে বসেছেন এবং সর্বশেষ খবর হল, সি-পি-আইয়ের দাবী মেনে নেওয়া না হলে তারাও কোয়ালিশন থেকে তাঁদের সমর্থন প্রত্যাহার করে নেবে।

অবস্থা এখন যা দাঁড়িয়েছে তাতে এটা প্রায় নিশ্চিত যে, শ্রীদারোগাপ্রসাদ রায়ের বদলে অন্য কোন একজন গ্রহণযোগ্য নেতা পাওয়া গেলেই শ্রীরায়কে বিহারের মুখ্যমন্ত্রিত্ব থেকে সরে দাঁড়াতে হবে। এর বিকল্প হচ্ছে বিহারে আর এক দফা রাষ্ট্রপতির শাসন।

বিহারের বিপরীত পরিস্থিতি উত্তরপ্রদেশে। সেখানে ৫৩ জন মন্ত্রীর একটি স্ফীতকায় মন্ত্রিসভা নিয়েও মুখ্যমন্ত্রী শ্রীটি এন সিংহ তাঁর সমর্থকদের সামলিয়ে রাখতে পারছেন না। মন্ত্রিসভার আয়তন আরও বাড়ান হতে পারে বলে ঘোষণা করা হয়েছে। ইতিমধ্যে ভারতীয় ক্রান্তি দলের নয়জন সদস্য সংযুক্ত বিধায়ক দলের প্রতি তাঁদের সমর্থন প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। উত্তরপ্রদেশ বিধানসভার সচিবালয়ে যে সংবাদ আছে তাতে দেখা যায় যে, গত দু মাসে বিধানসভার ৪২ জন সদস্য দলত্যাগ করেছেন, তাঁদের মধ্যে ৮ জন দুবার দলত্যাগ করেছেন। সবচেয়ে বেশী সংখ্যায় সদস্য হারিয়েছে ভারতীয় ক্রান্তি দল—মোট ২২ জন। সংগঠন কংগ্রেস দল হারিয়েছে ১৪ জন সদস্য। সরকারী হিসাবে অবশ্য— বিধানসভার কার্যকালীন সংযুক্ত বিধায়ক দলের — স্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে—৪২৬ জন সদস্যের বিধানসভায় ২০৬ জন।

ভারতের সেনাপতিরা এক বছর অন্তর অন্তর একটি সম্মেলনে মিলিত হয়ে দেশের প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা পর্যালোচনা করে দেখেন। এবার দিল্লীতে সেই সম্মেলন হয়ে গেল। গত পাঁচ বছরে পাকিস্থানের সামরিক শক্তি দ্বিগুণ হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে এবারকার সম্মেলন বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছিল।

এই সম্মেলন উপলক্ষে ভারত ও পাকিস্থানের সামরিক শক্তির একটি তুলনামূলক হিসাব প্রকাশিত হয়েছে।

এই হিসাবে দেখা যাচ্ছে, পাকিস্থানের সশস্ত্র বাহিনীতে এখন সাড়ে তিন লক্ষ লোক আছে এবং সেদেশের প্রতিরক্ষা বাহিনীর দরুন সালিয়ানা প্রায় ৩০০ কোটি টাকা খরচ করা হচ্ছে। ভারতের সশস্ত্র বাহিনীতে আছেন প্রায় দশ লক্ষ মানুষ এবং তার বাৎসরিক প্রতিরক্ষা ব্যয় ১১০০ কোটি টাকা।

১৯৬৫ সালে পাকিস্থানের ছয়টি ইনফ্যানট্রি ও দুটি সাঁজোয়া ডিভিসন ছিল। এই ডিভিসনগুলির সাজ-সরঞ্জাম যোগাত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। সেসময়ে তার ১০ স্কোয়াড্রন জঙ্গী বিমান ও এক স্কোয়াড্রন বোমারু বিমান ছিল আর তার জলযানের নৌবহরে ছিল দয়েকটি ডেস্ট্রয়ার ও ফ্রিগেট এবং একটি সাবমেরিন। ১৯৬৫ সালের পর পাকিস্থান চীনের কাছ থেকে সাজ-সরঞ্জাম পেয়ে তিনটি নতুন ইনফ্যানট্রি ডিভিসন গড়ে তোলে। তাছাড়া সে চীনের কাছ থেকে পাঁচ স্কোয়াড্রন মিগ-১৯ বিমান ও এক স্কোয়াড্রন আই-এল-২৮ বোমারু বিমান, কিছু টি-৫৯ ট্যাঙ্ক, কামান ও পরিবহনের সাজ-সরঞ্জাম পেয়েছিল। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্থানকে ২৫০ টি-৫৪ ও টি-৫৫ ট্যাঙ্ক এবং কিছু ১৩৫ মিলিমিটার বন্দুক রেডার ও বিমানের যন্ত্রাংশ দিয়েছে। (প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম অবশ্য লোকসভায় এক প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন যে, সোভিয়েট রাশিয়া পাকিস্থানকে টি-৩৪ ট্যাঙ্ক অথবা ১৩৫ মিলিমিটার বন্দুক দিয়েছে বলে তাঁদের কাছে কোন খবর নেই)। ইরাণের মারফৎ পাকিস্থান পেয়েছে প্রায় ৯০টি এফ-৮৬ স্যাবার জেট বিমান আর ন্যাটো সূত্র থেকে সে পেয়েছে শতখানেক মেরামত করা পুরানো প্যাটন ট্যাঙ্ক। নগদ অর্থ দিয়ে পাকিস্থান ফ্রান্সের কাছ থেকে কিনে দুই স্কোয়াড্রন মিরাজ জঙ্গী—বোমারু বিমান, এক স্কোয়াড্রন আলুয়েৎ হেলিকপ্টার ও চারটি ডাফনে শ্রেণীর সাবমেরিন।

অর্থাৎ পাকিস্থান গত পাঁচ বছরে তার সামরিক শক্তি বাড়িয়ে কার্যত দ্বিগুণ করেছে। তার স্থল সৈন্য বাহিনীতে এখন রয়েছে ১২টি ইনফ্যানট্রি ডিভিসন, আমেরিকান, সোভিয়েট ও চীনা ট্যাঙ্ক ও কামান-বন্দুকে সজ্জিত চারটি সাঁজোয়া ব্রিগেড। তার বিমানবাহিনীতে আছে ১৮ থেকে ২০ স্কোয়াড্রন বিমান, যার মধ্যে আছে ছয় স্কোয়াড্রন এফ-৮৬ স্যাবার, পাঁচ স্কোয়াড্রন মিগ-১৯, দুই স্কোয়াড্রন মিরাজ, এক স্কোয়াড্রন এফ -১০৪, দুই স্কোয়াড্রন আই-এল-২৮ বোমারু বিমান। এছাড়া আছে কয়েক স্কোয়াড্রন হেলিকপ্টার।

এর সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে ভারতবর্ষের সামরিক শক্তির। ভারতের এখন ২৩টি ইনফ্যানট্রি ডিভিসন আছে, (এই ২৩টির মধ্যে ১০টিই পার্বত্য ডিভিসন)। আর আছে দুটি সাঁজোয়া ডিভিসন, একটি পৃথক সাঁজোয়া ব্রিগেড, ছয়টি পৃথক ইনফ্যানট্রি ব্রিগেড ও দুটি প্যারাস্যুট ব্রিগেড। ভারতীয় বিমানবাহিনীতে রয়েছে ৪৫ স্কোয়াড্রন বিমান যার মধ্যে আছে আটটি মিগ-২১ স্কোয়াড্রন, আটটি ন্যাট স্কোয়াড্রন ছয়টি হান্টার স্কোয়াড্রন, একটি মিস্টেয়ার স্কোয়াড্রন, তিনটি ক্যানবেরা বোমারু স্কোয়াড্রন ও ১৫টি অন্যান্য পরিবহন ও যোগাযোগরক্ষী বিমানের স্কোয়াড্রন।

ভারতীয় নৌবহর পাকিস্তানী নৌ-বহরের চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী। একটি বিমানবাহী জাহাজ, দুটি ক্রুইজার, তিনটি ডেস্ট্রয়ার, চারটি সাবমেরিন, ... ফ্রিগেট, দুটি টহলদার জাহাজ এবং ৪০টি অন্যান্য ছোটখাট জাহাজ নিয়ে গঠিত ভারতীয় নৌবাহিনী আর পাকিস্তানের নৌবাহিনীতে রয়েছে মাত্র একটি ক্রুইজার, দুটি ডেস্ট্রয়ার, চারটি সাবমেরিন, দুটি ডেস্ট্রয়ার এসকর্ট, দুটি ফ্রিগেট, আটটি মাইনবিধ্বংসী জাহাজ এবং চারটি টহলদার জাহাজ।

দুই দেশের এই তুলনামূলক সামরিক শক্তির বিস্তারিত পর্যালোচনা করেছেন ভারতীয় সেনাপতিরা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে পাকিস্তান সম্প্রতি যেসব অস্ত্রশস্ত্র পাচ্ছে সেগুলিও ভারতীয় সেনাপতিরা গণনার মধ্যে এনেছেন। প্রকাশ যে, ভারতীয় সেনাপতিরা মোটামুটি এবিষয়ে নিশ্চিত হয়েছেন যে, পাকিস্তানের মোকাবেলা করার মতো যথেষ্ট ক্ষমতা ভারতবর্ষের আছে। তবে পূর্বাঞ্চলে চীনা সীমান্তবর্তী ও পাকিস্তান সীমান্তবর্তী এলাকার অসামরিক অধিবাসীদের মধ্যে যে অশান্তি দেখা দিচ্ছে তাতে ভারতীয় সমরনায়কেরা নাকি উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তাঁরা মনে করেন যে, পশ্চিম অঞ্চলে সেনাবাহিনীর পক্ষে স্থানীয় অসামরিক জনগণের সহযোগিতা লাভ যতখানি সহজ হচ্ছে পূর্ব অঞ্চলে তা হচ্ছে না।

•

'আমার কথা শুনুন। চার বছর ধরে আমি আপনাদের জন্য ব্যর্থ প্রতীক্ষা করে রয়েছি। আমি প্রতীক্ষা করে আছি সেই-দিনের জন্য যেদিন আপনারা সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটাবেন। আপনারা কি যোদ্ধা? যদি তাই হয় তাহলে আপনারা কেন সেই সংবিধানকেই রক্ষা করার চেষ্টা করছেন, যে সংবিধান আপনাদের বাহিনীর অস্তিত্বের কারণটাই অস্বীকার করছে? কেন আপনারা বুঝতে পারছেন না যে, সংবিধান যতদিন আছে ততদিন আপনাদের রক্ষা নেই? আপনাদের মধ্যে এমন কি কেউ নেই যিনি সেই সংবিধানের বিরুদ্ধে নিজের দেহকে ছুঁড়ে ফেলতে পারেন, যে সংবিধান জাপানকে মেরুদণ্ডহীন করে তুলেছে। আসুন, আমরা মাথা তুলে দাঁড়াই, এক-সঙ্গে বাঁচি এবং একসঙ্গে মরি এমন একটা কিছুর জন্য যা আমাদের জীবনের চেয়ে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। সেটা স্বাধীনতা বা গণতন্ত্র নয়, সেটা হচ্ছে জাপান, যার মূল্য আমাদের কাছে অন্য সব কিছুর চেয়ে বেশী।'

টোকিওর পশ্চিমাংশে ইচিগায়া হিলের উপর অবস্থিত একটি সেনাবাহিনীর সদর দপ্তরে যে প্রায় ১২০০ জাপানী সৈনিক সেই রৌদ্রোজ্জ্বল সকালে ৪৫ বছর বয়স্ক সুপরিচিত জাপানী সাহিত্যিক, চিত্রা-ভিনেতা, চিত্র পরিচালক, নায়ক,—য়ুকিও মিশিমার ঐ বক্তৃতা শুনেছিলেন তাঁরা তাঁর কথার উদ্দেশ্যে হর্ষ, উপরন্তু এগুলিকে একজন মূর্খের প্রলাপোক্তি বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন।

কিন্তু মিশিমার শ্রোতারা জানতেন না যে, আর কয়েক মুহূর্ত পরেই অভিনেতা মিশিমা তাঁর জীবনের শেষ বাস্তব নাটক দেখাতে চলেছেন। 'তেন্নো হাইকা বানজাই' (সম্রাট দীর্ঘজীবী হোন) ধ্বনি দিয়ে মিশিমা তাঁর শ্রোতাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গেলেন। ঐ সেনাবাহিনীর সেনাপতি জেনারেল কানেতোশি মাশিতার ঘরে তিনি ঢুকলেন। জেনারেল মাশিতা তখন তাঁর চেয়ারের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। মিশিমার অনুগামী চারজন ছাত্র আগেই জেনারেল মাশিতাকে বেঁধে রেখেছিলেন। মিশিমা জামা খুললেন, জেনারেল মাশিতার চেয়ার থেকে কয়েক ইঞ্চি দূরে মেঝের উপর বসে নিজের পেটের উপর একটি ছুরি ধরলেন, তারপর সেই ছুরি সজোরে পেটের উপর চেপে ধরলেন। তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে ২৫ বছর বয়সের ছাত্র মাসাকাৎসু মোরিতা তরোয়ালের এক কোপে মিশিমার মাথা কেটে মেঝের উপর ফেলে দিলেন। তারপর মোরিতা নিজের পেটে ছুরি চালালেন আর তাঁর আর একজন সঙ্গী তাঁর মাথা কেটে ফেললেন।

এইভাবে জাপানের প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক মিশিমা ও তাঁর একজন অনুগামীর জীবনাবসান ঘটল জাপানের প্রাচীন সামুরাই প্রথায়। আর এইভাবে মিশিমার নিজেরই লেখা একটি ছোট গল্পের কাহিনী যেন বাস্তব রূপ পেল। তাঁর সেই গল্পের নায়ক সেনাবাহিনীর একজন তরুণ লেফটেন্যান্ট হারাকিরি করেছিলেন। ১৯৬৫ সালে তাঁর এই গল্প অবলম্বন করে যে ছায়াচিত্র তোলা হয়েছিল তাতে ঐ তরুণ সামরিক অফিসারের ভূমিকা গ্রহণ করে মিশিমা হারাকিরির অভিনয় করেছিলেন। সেদিন যা ছিল অভিনয়, পাঁচ বছর পরে তাই হয়ে দাঁড়াল নিদারুণ বাস্তব।

মিশিমা পুরোনো জাপানকে ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন। আজকের জাপান মিশিমার পছন্দ নয়। এই জাপান বড় বেশী বাস্তববাদী, বড় বেশী পশ্চিম-ঘেঁষা, এই জাপান তার পুরোনো ঐতিহ্যকে ভুলে গেছে, আমেরিকার চাপানো সংবিধান যুদ্ধ করার সার্বভৌম অধিকার কেড়ে নিয়ে তাকে মেরুদণ্ডহীন করে তুলেছে। মিশিমা চেয়েছিলেন, সেনাবাহিনী মাথা চাড়া দিয়ে উঠুক, আমেরিকান সংবিধান ছুঁড়ে ফেলুক এবং সম্রাটকে তাঁর পুরোনো আধিপত্য দিয়ে জাপানের রাজতন্ত্রী সংবিধান ফিরিয়ে আনুক। তাঁর এই ভাবধারা প্রসারের জন্য তিনি 'শীল্ড সোসাইটি' নামে একটি সংস্থা গড়েছিলেন।

সামরিক বাহিনীর অভ্যুত্থান ঘটাবার শেষ মরিয়া চেষ্টা করার জন্যই মিশিমা চারজন অনুগামীকে নিয়ে সেদিন ইচিগায়া হিলে গিয়েছিলেন। তাঁর ব্যর্থতার কাহিনী লেখা হয়ে গেল রক্তের স্রোতে।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, মিশিমার এই মৃত্যু জাপানের জঙ্গী জাতীয়তাবাদী অতি দক্ষিণপন্থী সংগঠনগুলিকে কতখানি প্রভাবিত করবে? এই ধরনের প্রায় চার শত সংগঠন রয়েছে। এই সংগঠনগুলি ইতি-মধ্যেই জাপানের নূতন গণতন্ত্রের পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। জঙ্গী জাতীয়তা-বাদী সংগঠনগুলি যদি মিশিমার আত্ম-হত্যার উদ্বুদ্ধ হয় তাহলে তারা গভীরতর বিপদের সৃষ্টি করতে পারে।

৪-১২-৭০ —পুণ্ডরীক

পরলোকে জীবনলাল চট্টোপাধ্যায়

এককালের খ্যাতনামা বিপ্লবী এবং ভারতীয় ওয়ার্কার্স পার্টির চেয়ারম্যান শ্রীজীবনলাল চট্টোপাধ্যায় দীর্ঘকাল রোগ-ভোগের পর একাশি বছর বয়সে মারা গেছেন ৩০ নভেম্বর।

শ্রীচট্টোপাধ্যায় তাঁর জীবনের কুড়ি বছরেরও বেশী সময় জেলে কাটিয়েছেন। ১৯০৭ খৃঃ ঢাকা জেল থেকে মুক্তিলাভের পর তিনি বাঘা যতীন প্রভৃতির সংস্পর্শে আসেন এবং ১৯১৩ খৃঃ বরিশাল ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে পাঁচ বছরের জন্য দণ্ডিত হন। পরবর্তীকালে তিনি

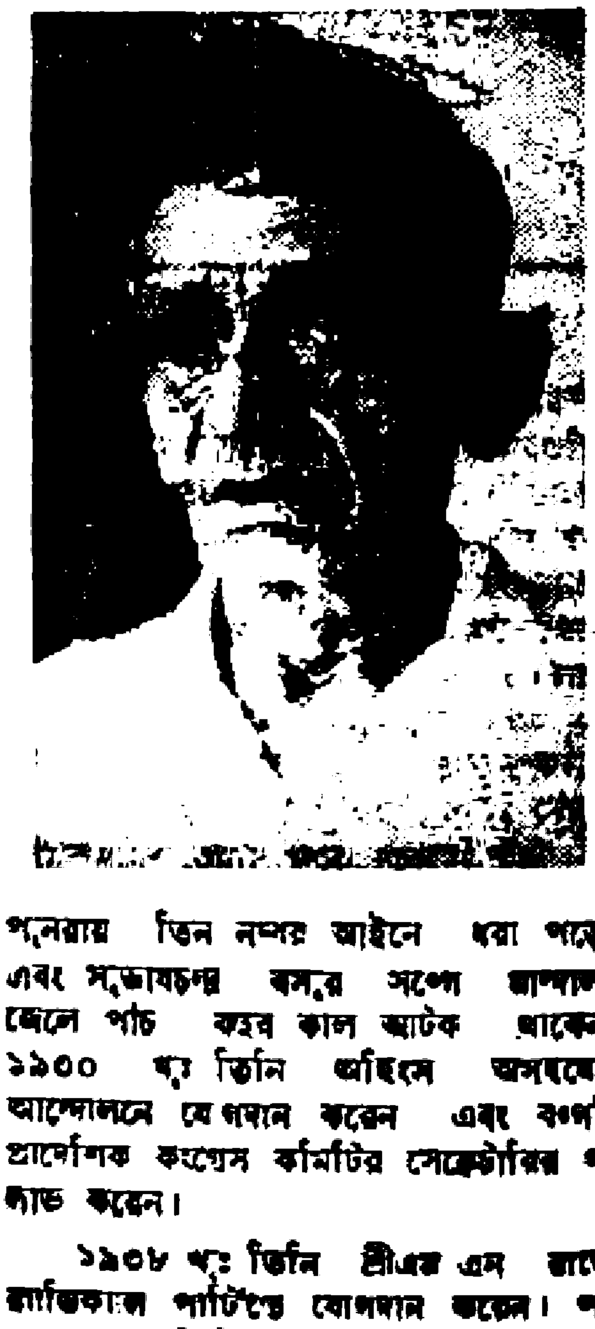

পুনরায় তিন নম্বর আইনে ধরা পড়েন এবং সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে মান্দালয় জেলে পাঁচ বছর কাল আটক থাকেন। ১৯২০ খৃঃ তিনি অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারির পদ লাভ করেন।

১৯৩৮ খৃঃ তিনি শ্রীএম এন রায়ের র‍্যাডিক্যাল পার্টিতে যোগদান করেন। পাঁচ বছর পরে তিনি র‍্যাডিক্যাল পার্টি ত্যাগ করে ডেমোক্র্যাটিক ভ্যানগার্ড পার্টি সংগঠন করেন। পরে ১৯৫০ খৃঃ ডেমোক্র্যাটিক ভ্যানগার্ড ওয়ার্কার্স পার্টিতে রূপান্তরিত হয়।

সম্পাদকীয়

বেকারদের কথা ভাবুন

গত সপ্তাহে সংসদে ভারতের ক্রমবর্ধমান বেকারদের সমস্যা নিয়ে আরেক দফা আলোচনা হয়ে গেছে। তাতে সমস্যার তীব্রতা প্রকাশ পেলেও সরকার পক্ষ থেকে এই সমস্যা সমাধানের সুনির্দিষ্ট কোনো পরিকল্পনার ইঙ্গিত পাওয়া যায় নি। তিনটি অর্থনৈতিক পরিকল্পনা শেষ করে চতুর্থ পরিকল্পনার মুখে দাঁড়িয়ে ভারতবর্ষ এক অভূতপূর্ব বেকার সমস্যায় আজ বিব্রত। এর প্রতিকারের পথ বার করতে না পারলে গোটা সমাজেরই বিপদের আশঙ্কা। সংসদ সদস্যারা সেদিকেই সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

জীবিকার অধিকারকে মৌলিক নাগরিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত করার দাবী আজ অনেক দিনের। জীবিকাহীন নাগরিকদের কাছে অন্য মৌলিক অধিকার অর্থহীন হয়ে পড়ে এবং সমাজের সর্বাঙ্গীণ অগ্রগতির পথেও তারা হয়ে ওঠে প্রবল প্রতিবন্ধকস্বরূপ। আজকের সমাজের দিকে তাকালে এ সত্য আমাদের কাছে দিনের আলোকের মতো স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

কর্মসংস্থানের দুটি প্রধান ক্ষেত্র—কৃষিকার্য ও শিল্পসংস্থা। কৃষিপ্রধান দেশ ভারতে কৃষিকার্যকে শিল্পায়িত করার প্রয়োজনীয়তাও আজ অনুভূত হচ্ছে। মান্ধাতার আমলের গরু-লাঙ্গলের দ্বারা কৃষিকার্য না করে এতে ট্র্যাক্টর নিয়োগ এবং আধুনিক পদ্ধতিতে সমবায় খামার বা যৌথ উদ্যোগে চাষের ব্যবস্থা করতে পারলে উৎপাদনও বাড়বে এবং শিক্ষিত ব্যক্তিদেরও এতে নিয়োগ করা সম্ভব হবে। কৃষি সমীক্ষায় দেখা যায় যে, আমাদের দেশে কৃষিকার্যে নিযুক্ত লোকের সংখ্যা দশ কোটির মতো হবে। সরকারী ও বেসরকারী শিল্পসংস্থায় কর্মনিযুক্ত লোকের সংখ্যা দেড় কোটির মতো। যে-দেশে কর্মক্ষম লোকের সংখ্যা হবে অন্তত কুড়ি কোটি সেখানে তার বিপুল সংখ্যক হয় বেকার বা পরাশ্রিত হয়ে বসে আছে। এভাবে কোনো দেশের বৈষয়িক উন্নতি হতে পারে না। তার সামাজিক শান্তিও এর দ্বারা বিঘ্নিত হবার সম্ভাবনা।

কেন্দ্রীয় সরকার আশা প্রকাশ করেছিলেন যে, চতুর্থ পরিকল্পনার শেষে সাধারণ মানুষের ন্যূনতম চাহিদা অর্থাৎ ডাল-ভাতের সমস্যা সমাধান করতে পারবেন। সে গুড়ে এখন বালি পড়বে বলে মনে হয়। কারণ, চতুর্থ পরিকল্পনার ছাঁটকাট শুরু হয়েছে। আশার আমলকীটি আর জনসাধারণের করায়ত্ত হবে না। প্রধানমন্ত্রী নিরাশার সুরে বলেছেন যে, ১৯৭৫ সালের মধ্যে জনসাধারণের ন্যূনতম প্রয়োজন মেটানো সরকারের পক্ষে সম্ভব হবে না। এদিকে বছর-বছর কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে গ্রাজুয়েট, ইনজিনিয়ার, টেকনিশিয়ান বেরুচ্ছেন। তাঁদের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মসংস্থানের কোনো পথ নেই। সরকারকে আজ এঁদের কথা ভাবতে হবে। রাজ্যসভার প্রবীণ সদস্যারা বার-বার সরকারকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, অর্থনৈতিক পরিকল্পনার পুনর্বিন্যাস ছাড়া এই তীব্র বেকার সমস্যার হাত থেকে মুক্তির কোনো পথ নেই। আমাদের দেশে মিশ্র অর্থনীতি প্রচলিত। সরকারের হাতে সমস্ত অর্থনৈতিক সম্পদ নেই। বেসরকারী শিল্পপতিদেরও এ বিষয়ে তাঁদের কর্তব্য করতে হবে। পাশ্চাত্যের উন্নত দেশগুলোতেও সরকারী ও বেসরকারী শক্তি সম্মিলিত হয়ে দেশের তরুণদের জন্য কর্মসংস্থান করে থাকেন। এদেশে সেই সহযোগিতার আজ নিতান্ত অভাব। বৃহৎ শিল্পকারখানার দিকে ঝোঁক দিয়ে আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দেশের কর্মপ্রার্থীদের কর্মসংস্থান সুগম হয়েছে কিনা তা নিয়েও যথেষ্ট দ্বিমত আছে। সরকারী সাহায্যে শিক্ষিত বেকাররা ছোট-ছোট শিল্পসংস্থা গড়ে তুলে নিজেদের জন্য কর্মসংস্থান করতে পারে। এ দিকেও আজ সরকারকে বিশেষ করে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কসমূহকে নজর দিতে হবে। কেরলে সম্প্রতি বেকার ইনজিনিয়ার ও টেকনিসিয়ানরা সমবায় ভিত্তিতে একটি স্কুটার কারখানা নির্মাণ করে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। স্বল্প ব্যয়ে এবং সম্পূর্ণভাবে ভারতে-তৈরী যন্ত্রপাতি দিয়ে তাঁরা আড়াই হাজার টাকার মধ্যে স্কুটার নির্মাণ করে প্রধানমন্ত্রীকে দেখিয়েছেন। এই দৃষ্টান্ত দেশের অন্যান্য বেকার যুবকেরাও অনুসরণ করতে পারেন যদি সরকার এঁদের সঙ্গে সহযোগিতা করেন।

সত্তরের দশকটিকে পৃথিবীর উন্নত দেশগুলো সম্ভাবনার দশক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। ভারতবর্ষের জনবল ও প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগাতে পারলে আমরাই বা কেন এই দশকে দেশের মানুষের জন্য পূর্ণ কর্মসংস্থান করতে পারব না? এই প্রশ্ন আজ দেখা দিয়েছে। বেকার যুবকদের জীবিকার প্রশ্নটিই আজ অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত। একে অবহেলা করার অর্থ হবে ধূমন্ত আগ্নেয়গিরির ওপরে বসে থাকা।

যেদিন চিঠি থাকে না॥

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

যেদিন চিঠি থাকে না আমি স্টেশনের দিকে বেড়াতে যাই। ইঞ্জিন, বগী বাক্স, সানটিং, কেবলই এক লাইন থেকে অন্য লাইনে চলে যাওয়া দেখতে দেখতে ভাবি অন্তত আজকে আর আমার কোনো সঙ্গী নেই; অশোকস্তম্ভের ভিতরে জমানো এক-একটা অক্ষর থেকে ছিটকে আসা স্নেহ বা ঘৃণার উত্তর আমাকে আজ লিখতে হবে না। শ্রদ্ধাস্পদেষু, শ্রীচরণেষু থেকে ছুটি।

স্টেশন খুব ভাল লাগে। এমন আত্মভুক নিকেতন আর নেই। মানুষ ওঠে, মানুষ বগী থেকে নেমে যায়। প্রত্যেকের মুখে ভিন্ন ভিন্ন দ্রাঘিমার জলবায়ু। কেউ টিফিন-ক্যারিয়ারে ব্যস্ত, কেউ 'আরে ভুবন না!' চীৎকার করে খুশীর বুদবুদে ফেটে যেতে যেতে বলছে 'আমি এ ট্রেনেই এলাম আর তুমি ফিরে যাচ্ছো, হাঃ হাঃ!' অর্থাৎ বিপরীতমুখী দুই বন্ধুর দেখা হল। কখনো চোখে পড়ে মফস্বল প্ল্যাটফর্মে ধূসর কোম্পানীকোর্তা গায়ে দাঁড়িয়ে আছে চেকার। সে প্রতি মানুষের প্রবাস মিলিয়ে দেখছে টিকিটের সঙ্গে। এক হাতে নীল অন্য হাতে লাল নিয়ে ব্যস্ত গার্ডবাবু, বারবার কব্জিতে দেখছেন সময়। লাইন বদলাবার সংকেত—বাঁশরী মুখে তিনি খুবই গম্ভীর এবং বাবু। আমার কাছের কেউ নেই, যেদিন চিঠি থাকে না আমি দূরের মানুষের কাছে আসা দেখি। তাদের মুখের বিভিন্ন আলো ও অন্ধকারের মধ্যে এক সাময়িক সুসময় আমাকে মূর্তির মতো বসিয়ে রাখে, বসিয়ে রাখে, বসিয়ে রাখে ....রাখে,

যেদিন চিঠি থাকে না।।

সুখের মতন কিন্তু॥

হেনা হালদার

সুখের মতন অনুভূতি কিন্তু
সুখ নয়। অথচ দুঃখের সঙ্গে কোনো মিল নেই।
সিনেমা হলের মধ্যে আলো-আঁধারিতে
ইংটার্ভালের সাঁকো। সংক্ষিপ্ত ভাষায়
এ-ও হয়, ও-ও হতে পারে।

একে তাই বড় জোর বলা যায় সুখের মতন
কিন্তু সুখ নয়। দুঃখের মতন কিন্তু

দুঃখ নয়। মস্তিষ্কের হৃদয়ের মাঝামাঝি
বিন্দুটা যে আলো নয় অন্ধকারও নয়।
প্রেম নয় ঘৃণা নয়। সহানুভূতির মত
ধূসরাভ। যেন ডিমের মধ্যের প্রাণ......

যাকে দাবী করছে না আকাশ
অথবা মাটির স্নেহ। অবয়বহীন শরীরের
স্মৃতি নেই ভবিষ্যৎও নেই।

বর্তমানও অনিশ্চিত। যেন দুই মহাদেশ
জোড়া দেওয়া ক্ষুদ্র যোজক

যে-কোনো দিকেই চলে যেতে পারে অকস্মাৎ
যে-কোনো সুযোগে।

পাতা ঝরে, ঝরবে পাতা॥

সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

দূরের আকাশ ছুঁয়ে উত্থিত শিমুল শাখে
ইচ্ছেগুলি যেন সব ফুল ফুল কৃষ্ণচূড়া
মাছ-রাঙা ঠোঁটে নাচে জীবনের স্বাদ
ফোটে রক্ত-রঙ্গন যৌবন
মুগ্ধ চোখে তার ভাসে আলো

অপার আনন্দ আহা, রঙিন আহ্লাদ
তারপর একদিন স্খলিত বৃন্তের মুখে
টুপ টাপ বৃষ্টি ফুল, ফুল বৃষ্টি
সময় প্রবীণ হয় নিভে যায় আলো
এই সত্য, এই ভাবে নিঙড়ে আয়ু
বহমান অস্তিত্ব জীবন

বিদ্যুৎ চমক দিলে অন্ধকারে তবু
দুরন্ত মারীচ ছোটে
অভিযাত্রী চোখে নাচে স্বর্ণ আলো

সেই আলো,

সেই পদচিহ্ন ধরে তার পথ চলা
যেতে যেতে বার বার ফিরে ফিরে দেখা
ভালোবাসা বড় দায়

সব ভালোলাগা আজ
কড়ি দিয়ে কিনে নিতে হয়
নেচে নেচে যে খঞ্জনা
পাখিটি তোমার কাছে এলো
সেও দেখ একদিন উড়ে চলে গেলো।

সব জানা, এই হয়
পাতা ঝরে ঝরবে পাতা
তবু ঝরার শব্দে তার বড় ভয়—
ভালোবাসা, উদাম, সংশয়।

অতসী ধীর পায়ে খোলা জানলার ধারে এসে দাঁড়াল নিঃশব্দে। তার জীবনটা এখন বোধ করি দোলাচ্ছে। এটা নারী-জীবনের একটা বিশেষ পর্ব, একটা প্রচন্ড রকমের আলোড়ন। সুখেন এখনও ঘরে ঢোকেনি। এবারে নিশ্চয় ঢুকবে। খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকেছে অনেকক্ষণ। পরশুদিন বিয়ে গেছে, আজ বউভাত গেল। শেষ দলের খাওয়াদাওয়া মিটতে রাত বারোটা বেজে গেল। এতক্ষণ সমস্ত বাড়িটা উত্তাল রংগরসে ছিল ভরপুর। এখন বেশ ঝিমিয়ে আসছে। মেলা ভাঙ্গার নিস্তেজ নিরানন্দময় ক্ষণটুকুর মতই। অতসীর বাবা মা আর ছোট বোনটা সন্ধ্যের পর পরই এসে খেয়ে গেছে। সঙ্গে আরও লোক ছিল—পাড়াপড়শী আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব। দেরি করেনি তারা। টিপটিপ করে

পূর্বরাগ

প্রদোষ দেও

সারাদিন বৃষ্টি হয়েছে। আকাশটা তখন ধরেছিল। শ্রাবণের শেষ লগ্ন গেল এটা। তাই যা হোক করে বিয়েটা সারতেই হোল এই লগ্নে অতসীর বাবাকে। এমন অবস্থায় দাঁড়িয়েছিল—অতসীর বিয়ে না দিলেই নয়। শ্রাবণে না হলে আবার তিন মাস ভরসা-হীন অনিশ্চিত অপেক্ষায় থাকতে হোত। এমনটি বহুবারই ঘটেছে। বাবা মা বোনের সঙ্গে বেশিক্ষণ কথা হয়নি অতসীর, অথচ বলা উচিত ছিল। যতটা সময় কথা বলেছে তার বেশি সময় কেঁদেছে সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে, নয় হয় গম্ভীর হয়ে থেকেছে বিষণ্ণ মনে। অতসীর বন্ধুবান্ধব যারা এসেছিল তারা কেউ খেল কিনা খেয়ালই করেনি সে ভাল করে।

গোটা ঘরখানা ফুলে ফুলে ছড়ান। রজনীগন্ধা, বেল, জুঁই, চন্দ্রমল্লিকা, চাঁপা, করবী। অতসীকেও এরা ফুল আর চন্দন দিয়ে সাজিয়েছে। রজনীগন্ধা দিয়ে তৈরী সিঁথিময়ূরটা এখনও চড়ান রয়েছে কপালে। ফুলের গহনা হাতে, মালা গলায়। ক্রিমসন লাল রংয়ের ওপর জরি বসান একখানা বেনারসী পরেছে অতসী। গায়ের ব্লাউজটাও একই কাপড়ের। সিঁথিতে জ্বলজ্বল করছে রাঙা সিঁদুর। হাতে লাল শাঁখা, নোয়া, সোনার চুড়ি, কঙ্কণ। হাত দিয়ে জানলার গরাদ ধরে বাইরের দিকে চোখ মেলে দাঁড়িয়ে থাকল অতসী একনিমেষে চেয়ে। কদিন ধরে বিয়েবাড়ির এতো হাঁকডাক লোকের কোলাহল ব্যস্ততা সবই যেন শূন্যগর্ভ বলেই মনে হচ্ছে তার কাছে। কোথা দিয়ে কেমন করে কিসের এ কটা দিন কেটে গেল তা এতটুকুও তার ভাবনায় আসেনি। কলের পুতুলের মত যে যা বলেছে করে গেছে সে। আজ এই মুহূর্তে কেবলি মনে হচ্ছে অতসীর পৃথিবীতে বেঁচে থাকাটাই একটা দুরারোগ্য ভয়ঙ্কর ব্যাধির মতই।

এপাশের খোলা জানলা দিয়ে বাইরে তাকালে চোখে পড়ে একটা ডোবা, সেই সঙ্গে ঝোপ-ঝাড় আর নানান আগাছার জঙ্গল—কিছুদূরে একটা বড় পুকুর। জোলো হাওয়া এসে ঘরে ঢুকছে। অতসীর ফিনফিনে লাল বেনারসী শাড়িতে ঢেউ খেলছে সে হাওয়া। হাওয়াটুকু এখন ভাল লাগছে অতসীর কাছে। সারা সকাল ধরে একটানা বৃষ্টি হয়েও দুপুরে আর বিকেলের দিকেও বিরাম ছিল না, সমানে চলেছিল টিপ-টিপ-টিপ। সন্ধ্যের দিকে থেমেছিল সে বৃষ্টি। তারপর থেকে আর হয়নি। বাইরের আকাশটা তেমন পরিষ্কার নয়। শুক্লাতিথির ভরাট চাঁদটার দিকে চোখ পড়ল অতসীর। চাঁদটা কেমন যেন ঘোলাটে। ধূসর অস্বচ্ছ জ্যোৎস্না। তবুও বাইরের সবকিছুই পরিষ্কার চোখে পড়ছে। কিছু দূরে বৃষ্টির জলে টইটুম্বুর ডোবাটার ধারে এই রাত রাতেই চোখে পড়ল অতসীর—একজন মেছো, হাঁটু পর্যন্ত কাপড় তুলে কোমরে গামছা বেঁধে খালি গায়ে ত্রিশূলের মত একখানা কোঁচ হাতে মাছ মারতে বেরিয়েছে। হাতে একটা টিম-টিমে লণ্ঠন। সুযোগ বুঝে আশ্চর্য তাক করে ডোবার জলে কোঁচ মারছে মেছোটা।

মেছো লোকটাকে দেখে এক নিস্পন্দ চেতনা থেকে এক মধুর অতীতে ফিরে যেতে চেষ্টা করল অতসী। মনের মধ্যে শীতাংশুর সুন্দর মুখখানা আন্দোলিত হোল। অতসী তখন জলপাইগুড়িতে থাকে তার কাকার কাছে। তার কাকা ছিল অ্যাসিসট্যান্ট স্টেশন মাস্টার। রেলের কোয়ার্টারে থাকত তারা। স্টেশন থেকে বেরিয়ে দক্ষিণ বরাবর তিস্তার বাজারের দিকে সোজা পিচের রাস্তাটা চলে গেছে। বাজারের কাছাকাছি বড় রাস্তার ধারেই একটা দোতলা বাড়িতে থাকত শীতাংশুরা। শীতাংশুদের অবস্থা খুবই ভাল। বাবা অ্যালোপ্যাথ ডাক্তার। জলপাইগুড়ি শহরে বাবার ডিসপেনসারি। আবার শহরের নীচে তিস্তার বাজারে একটা বড় ওষুধের দোকান। অতসীর কাকার সঙ্গে শীতাংশুর বাবার ঘনিষ্ঠ আলাপ ছিল। কাকার কোন সন্তান ছিল না বলে অতসীকে নিয়ে তিনি মানুষ করেছিলেন। নির্ঝঞ্ঝাট সংসার। কাকা কাকী আর অতসী।

বেশ মনে পড়ছে অতসীর প্রায় বছর চারেক আগে একবার শীতাংশুর সঙ্গে পিকনিক করতে গিয়েছিল সে। শীতাংশু তখন সবেমাত্র প্রি-মেডিক্যাল পাশ করে কলকাতায় আর জি কর হাসপাতালে ডাক্তারি পড়তে শুরু করেছে। হস্টেলে থাকতে হোত তাকে। মাঝে মাঝে ছুটি নিয়ে চলে আসত জলপাইগুড়িতে। অতসী তখন ওখানকার স্কুল থেকে পাশ করে জলপাইগুড়ির কলেজে পড়াশোনা করছে। পিকনিক করতে গিয়েছিল জলপাইগুড়ি থেকে বেশ কিছুটা দূরে—একটা ছোটখাটো পাহাড়ের নীচে করলা নদীর কাছাকাছি জায়গায়। অতসীদের পাড়ার এবং কলেজের জনাকয়েক ছিল সঙ্গে। পাহাড় বললে ভুল হবে। নুড়ি পাথর আর মাটির উঁচু ঢিপি। টিলার মত। ওপরটা অনেকখানি জায়গা জুড়ে সমতলভূমি। আশপাশে শিমুল শাল সেগুন আমলকী আর হরিতকীর গাছ। টিলার গা ঘেঁষে প্রায় একশো ফুট নীচে নেমে গেছে গভীর খাদ। টিলাটার নীচে একটা বড় বাদাম গাছ। বাদাম গাছের গোড়ায় আস্তানা নিয়েছিল অতসীদের দল। দক্ষিণ দিক বরাবর বেশ কিছুটা দূরে করলা নদী বয়ে চলেছে।

তখন খাওয়া-দাওয়া সেরে অতসীদের দল উঠে এসেছে টিলাটার ওপরে, শীতের বিকেলের রং-এ হরিৎ ছায়া কাঁপছে বিশৃঙ্খল ডালপালা ঊর্ধ্বমুখে তুলে। চারদিকে যেন আদিম নিস্তব্ধতা। দিনান্তের রক্তরাগ ছড়িয়েছে পশ্চিম আকাশ। শীতের বেলা শেষে পাইন আর ফার্ণের মর্মরিত বিলাপ শুনতে পেল অতসী। টিলাটার ওপর থেকে দেখতে পেল অতসী তিস্তার একফালি চর। দূরে দূরে ধান ক্ষেত, চায়ের বাগান। করলা নদীর এপারে শহর—দীনবাজার, পান্ডাপাড়া, নিউ টাউন-পাড়া, বেগুনটারি এবং ওপারে রায়কতপাড়া, ওয়াকারগঞ্জ, হাসপাতালপাড়া, সেনপাড়া। খাদের দিকে চোখ ফেরাল অতসী। বুকটা কেঁপে উঠল। কাছেই নাকি ডুয়ার্সের গভীর অরণ্য. শীতাংশু আর অতসী খাদের কাছাকাছি সরে এসেছে দল ছেড়ে। জঙ্গলের দিকে চোখ মেলে নরম গলায় বলে উঠল অতসী—ওরা কি বলে জান?

শীতাংশুর চোখেমুখে কৌতূহল ফুটে উঠল, শুধাল—কি?

—এই জঙ্গলে নাকি চিতাবাঘ থাকে, ডুয়ার্সের বন থেকে আসে। আচ্ছা মনে কর, এই মুহূর্তে একটা চিতাবাঘ যদি আমার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে—তবে তুমি কি করবে?

খানিকটা উচ্ছলভাবে হেসে উঠল শীতাংশু অতসীর কথায়। পরে স্বাভাবিক সুরে বলল—কোনই সন্দেহ নেই, চিতা-বাঘের কবল থেকে তোমাকে উদ্ধার করতে ঝাঁপিয়ে পড়ব তক্ষুনি।

—ইশ, এ তোমার ডাক্তারি ছুরি কাঁচি নিয়ে মড়া কাটা নয়—এ একেবারে মানুষ খেকো জ্যান্ত বাঘ—অতখানি বুকের পাটা তোমার নেই।

—বাঘের কবলে পড়েই দেখ না—বুকের পাটা আছে কি নেই তখনই বুঝতে পারবে।

—থাক থাক হয়েছে।

—কি আশ্চর্য—

শীতাংশু তার কথা শেষ করল না। অতসী তার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল অস্তমিত সূর্যের দিকে। সূর্যের ম্লান রক্তাভ গোলক-পিন্ডটি তখন দিকচক্রবালের অন্তরালে অদৃশ্য হচ্ছে ধীরে ধীরে। তার শেষ রশ্মিটা কতকটা রামধনুর মতই কখন গোলাপী কখন কমলালেবু, কখন পীতাভ রঙের আকার ধারণ করে মেঘের পরতে পরতে ছড়িয়ে দিচ্ছিল। সন্ধ্যে নামবার সাড়া পেয়ে সাদা আর পাশাপাশে ঝাঁক বেঁধে বকগুলো মালার মত উড়ে চলেছে নরম আকাশের গায়ে।

পিকনিক পার্টির আরো একটা দল উঠে এলো টিলাটার ওপরে। এরা অতসীদের পরে এসেছে। এদের খাওয়াদাওয়া এত-ক্ষণে শেষ হোল। যারা ওপরে উঠে এলো তাদের মধ্যে কাউকে কাউকে চেনা বলে মনে হোল অতসীর। সে এদের দেখে কেমন যেন একটু বিব্রত বোধ করল। এখানে শীতাংশুর সঙ্গে এমনি যথেচ্ছভাবে ঘুরতে ফিরতে গল্প করতে দেখলে নিশ্চয় কিছু সন্দেহ করতে পারে তারা। কারণ, সুখেনের সঙ্গে তার বিয়ে প্রায় পাকাপাকি হয়ে রয়েছে। সুখেনদেরই জানাশোনা লোক রয়েছে এদের মধ্যে, হয়তো কেউ কেউ আত্মীয়ও থাকতে পারে। সন্দেহ করে করুক, ব্যাপারটা আরও জানাজানি হোক, ছড়িয়ে পড়ুক, সেইটেই চায় অতসী, সুখেনের সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধটা ভেঙ্গে যাবে তাহলে। সুখেনরা থাকে কলকাতায়। সুখেনের মামা-মামী থাকেন জলপাই-গুড়িতে। কলকাতা থেকে অতসীর বাবাই ঠিক করেছেন এ বিয়ে। এ খবর চেনা মহলে পড়েছে ছড়িয়ে। অথচ অতসীর কাকা-কাকীর আন্তরিক ইচ্ছে শীতাংশুর সঙ্গেই বিয়ে হোক অতসীর। শীতাংশু আর অতসীর অবাধ মেলামেশা দেখে এখানকার পাড়া-পড়শী আর অন্যান্য পরিচিত মহল অনেক জল্পনা কল্পনাই করেছে তাদের দুজনকে নিয়ে। শীতাংশুর সঙ্গে অতসীর বিয়ে না হওয়াটা তাদের কাছে এখন একটা অত্যন্ত অবৈধ ও চিন্তার দুর্বোধগম্য ব্যাপার। শীতাংশু হঠাৎ চাপা হেসে বলে উঠল—আচ্ছা অতসী তুমি কি করবে—আমি যদি হঠাৎ স্লিপ খেয়ে গভীর খাদে পড়ে যাই? অতসী হাসল না। অতি সহজ ভঙ্গিতে রুমালটা দু হাতে পাক দিতে দিতে বলল—আমিও সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপ দেব—এখানে নয় একেবারে স্বর্গে গিয়ে মিলব দুজনে—বেশ মজা হবে।

—যাই বল অতসী, অতখানি বিশ্বাস বা ধৈর্য আমার নেই।

অতসী এবারে সোজাসুজি তাকাল শীতাংশুর দিকে। শীতাংশুর অনিন্দ্য-সুন্দর চেহারাটা বেলাশেষের পড়ন্ত আলোকে আরও উজ্জ্বল মনে হোল। বড় বড় দুচোখের তারায় তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ছাপ। নাক কান মাথার চুল কপাল নিখুঁতভাবে কামান নীলাভ দুই গাল রক্তাভ দুই ঠোঁট চিবুক খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে ইচ্ছে করে। বহুক্ষণ তাকিয়ে থেকেও আশ মেটে না। অথচ এমন ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিতে তার বাবা রাজী নয়। তার বাবা অপরেশ-বাবু জলপাইগুড়িতে এসে শীতাংশুকে কয়েকবার দেখেও গেছেন। অপরেশবাবু বহু আগে থেকেই সুখেনের সঙ্গে অতসীর বিয়ের ব্যাপারটা প্রায় ঠিক করেই রেখে-ছিলেন মনে মনে। তিনি ব্যবসাদার লোক। চালাইয়ের কারখানা রয়েছে। সুখেনের বাবার সঙ্গে অপরেশবাবুর বহুদিনের বন্ধুত্ব। শহরতলির দিকে দুখানা সিনেমা হলের মালিক সুখেনের বাবা বেশ কিছু জমিজমাও রয়েছে। ধান পাট বিক্রি করে মোটা টাকা আসে ঘরে। কলকাতায় এক-খানা বাড়ি, দেশের দিকে একখানা বাড়ি।

সুখেন বি-এ পর্যন্ত পড়েছে। এখন সিনেমা হল দত্তোর দেখাশোনার ভার তার ওপরেই।

শীতাংশুকে হারাবার ভয়ে অতসী নিজেই নিজের মৃত্যুকামনা করেছে কতবার কল্পনায় কল্পনায়। প্রচণ্ড অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিয়ে করতে হবে সুখেনকে। শীতাংশু সরে যাবে তার জীবন থেকে—একথা ভাবলেও একটা দুর্দমনীয় বাথার শিহরণ খেলে যায় অতসীর বুকের মধ্যে। অপরেশবাবু যখন সুখেনের সঙ্গে তার মেয়ের বিয়ে দেবেনই, সেখানে কারোর কোন যুক্তি বা যতই বাধ টিকবে না, সেক্ষেত্রে অতসীর পালিয়ে গিয়ে শীতাংশুর সঙ্গে বিয়ে করা ছাড়া অন্য পথও নেই—একথা বহুবার ভেবেছে অতসী। শীতাংশুকে কয়েকবার পালিয়ে যাবার প্রস্তাব দিয়েছিল সে। কিন্তু শীতাংশু পালিয়ে গিয়ে গোপনে বিয়ে করতে নারাজ। সেখানে তার ঘোর আপত্তি।

তার মতে বিয়ে যদি করতেই হয়, অনুষ্ঠান করে সকলের আশীর্বাদ আর শুভেচ্ছা কুড়িয়ে সে ঘরে এনে তুলবে অতসীকে। জীবনের এটা একটা প্রচণ্ড রকমের আনন্দের ব্যাপার। এই মত পোষণের জন্যে তাকে যদি কেউ ধর্ম সম্বন্ধে অচেতন বা কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলে তা মানতে রাজী আছে শীতাংশু। তবুও এ মতকে সে হাজার যুক্তি দিয়েও ফেলতে পারবে না। এরপর অতসী আর কোন কথা বলতে সাহস করেনি। আর কোন প্রস্তাবও রাখেনি। অথচ শীতাংশু অহেতুক অতসীর বাবার সম্মতির অপেক্ষায় থেকেছে। অতসীর কাকা-কাকীও অপরেশবাবুকে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন তাদের যথাসাধ্য। কিন্তু কোন ফলই হয়নি। অতসীকে, অতসীর কাকা-কাকীকে বহু উপায়ে চাপ দিয়েছে শীতাংশু অপরেশবাবুর মত পাওয়ার জন্যে। এর ফলে অশান্তিই হয়েছে কাকা-কাকীর সঙ্গে অপরেশবাবুর। এখন অপরেশবাবু নাকি আর তার মেয়েকে রাখতে চান না এখানে। শুধু এখানে রাখাই নয়—বিয়ে না দিয়ে পড়াতেও আর চান না তিনি।

অতসী দেখল, কথায় কথায় সাঁতাই টিলাটার একেবারে কিনারায় চলে এসেছে শীতাংশু। কিনারায় দাঁড়িয়ে মিটমিট করে হাসছে সে। পা নাচাচ্ছে থেকে থেকে। লাফিয়ে নীচে পড়বার ভান করছে। ভয় দেখাচ্ছে অতসীকে। অতসী নীচের দিকে আর একবার তাকাল—গভীর খাদ। বুনো গাছ-পাছড়া আর জঙ্গলে ভর্তি। তাকালে মাথাটা ঘুরে যায়। তার নিজেরই মনে হচ্ছে এখুনি পড়ে যাবে সে। শীতাংশু মাঝে মাঝে এই রকমের ছেলেমানুষি দুঃসাহসিকতা দেখায়। সেবারে পুরীতে গিয়ে সমুদ্রের জলে চান করতে নেমে সাঁতরে চলে গিয়েছিল বহুদূর। এই মুহূর্তে বেশ মনে পড়ছে সেই ঘটনা। এখনও শিউরে ওঠে অতসী সে ঘটনার কথা ভাবলে। ঘটনা তো নয়—একটা মারাত্মক দুর্ঘটনা।

—দেখবে অতসী সমুদ্রের ঢেউ ভেঙে সাঁতার কতদূর যেতে পারি?

স্বর্গদ্বার ঘাটের কাছে দাঁড়িয়ে বলেছিল শীতাংশু অতসীকে। অতসীর কাকীর অসুখ করেছিল। অসুখ ভাল হলে কাকা কাকী অতসী বেড়াতে এসেছিল পুরীতে। এদের সঙ্গে শীতাংশুও এসেছিল সেবারে। বহুদূরে সাঁতরে চলে গিয়েছিল শীতাংশু। কাকা কাকী অতসী এবং আরও অনেকে নিষেধ করেছিল তাকে। সমুদ্রের ঢেউকে বিশ্বাস নেই। কোথা দিয়ে কেমনভাবে তুলে নিয়ে কোথায় ফেলবে তার ঠিকঠিকানা নেই। হোলও ঠিক তাই। বহুদূরে চলে যাওয়ার পর বেশ কয়েক মিনিট শীতাংশুকে কারোরই আর চোখে পড়ল না। সকলেই শঙ্কিত হোল। অতসীর কাকা কাকী এবং পাড়ের অন্যান্য পরিচিত লোকেরা মরিয়া হয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করল। হাঁক পাড়ল সকলে থেকে থেকে। কিন্তু কোন চিহ্ন পাওয়া গেল না শীতাংশুর। শেষে নুলিয়াদের ধরল তারা অসহায়ের মত। এমন ঘটনা সমুদ্রে চান করতে এসে হামেশাই হয়ে থাকে। অতসীর মনে হোল শীতাংশুর এটা যেন গোঁয়ার্তুমি। রাগও হোল মনে মনে। কারোর কথাই শুনল না শীতাংশু? তার কথা না হয় না শুনতে পারে—কাকা-কাকীর কথা? এমনই অবস্থা, কিছু করবারও নেই। আতঙ্কে মন তোলপাড় করে উঠল। কাকা-কাকী বিহ্বল দিশেহারা। কয়েকজন নুলিয়া জেলেডিঙি নিয়ে খুঁজতে বেরিয়ে পড়ল তক্ষুনি। আশ্চর্যরকমভাবে কিছুক্ষণ পরে তাদের ঘাট থেকে বেশ কিছুটা দূরে হঠাৎ শীতাংশু হাত তুলে ইঙ্গিত করল সকলকে। হৈ-হৈ করে উঠল সকলে। পরে নুলিয়ারা গিয়ে তুলে আনল তাকে। পাড়ে যখন এলো, দেখে মনে হোল ঢেউয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করে বেশ কাবু হয়ে পড়েছে সে। হাত-পা সব ফ্যাকাশে হয়ে হয়ে গেছে। মুখখানা জীবনহানির আতঙ্কে অস্বাভাবিক রকমের পাল্টেই মেরে গেছে। প্রচণ্ড শক্তিতে দম নিতে লাগল শীতাংশু। শীতল অনাক্রোশে দুচোখের ঘোলাটে দৃষ্টি মেলে তাকাল সে অতসীর দিকে। অতসীর মন জুড়ে তখন আনন্দের ঢেউ উত্তাল হয়ে উঠেছে। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছে সে। শীতাংশু ফিরে এসেছে অনাহত অক্ষত অবস্থায়।

সে ঘটনা এখনও ভাসছে চোখের সামনে।

অতসী এবারে তাড়াতাড়ি কাছে এসে হাত দুটো বাড়িয়ে দিল শীতাংশুর দিকে। শীতাংশু অতসীর দুটো হাতই শক্ত মুঠোয় ধরে আরও খানিকটা নিজের কাছে টেনে আনবার চেষ্টা করল তাকে। শীতাংশু বলল—অতসী এবারে যদি ফিল খেয়ে পড়ি, দুজনেই মরব।

—হ্যাঁ, বেশ মজা হবে, পরের দিন কাগজে অন্তত ছোট্ট করেও ঘটনাটা থাকবে।

—অর্থাৎ, পিকনিক করতে এসে কেচ্ছাটা ভাল করেই প্রকাশ পাবে।

—কেচ্ছাই বল আর যাই বল—ব্যাপারটা তাই। কেচ্ছাকে অত ভয় পাও কেন? তাহলে পড়ব, তবুও গোড়া মিলবে না?

অতসী হঠাৎ শীতাংশুর হাত ছাড়িয়ে টিলাটার একেবারে ধারে চলে এলো। তার চোখে পড়ল টিলার গা ঘেঁষে একটা বড় গুলঞ্চফুলের গাছ দাঁড়িয়ে। সে তাড়াতাড়ি করে হাত বাড়িয়ে একটা ডাল ধরবার চেষ্টা করল। শীতাংশু কাছে এসে বাধা দিল। হাত ধরে টেনে সরিয়ে আনল অতসীকে। ডালটার অনেকগুলো গুলঞ্চফুল ফুটে রয়েছে। অতসী উৎফুল্ল হয়ে বলে উঠল—কি সুন্দর ফুলগুলো ফুটে রয়েছে—পারবে শীতাংশু ছিঁড়ে আনতে?

শীতাংশু ব্যস্ত হয়ে একবার নিজে চেষ্টা করল। কিন্তু ডালটার নাগাল পেল না। এবার একটু ঝুঁকে পড়ল। তাও নাগালে এলো না। দেহের খানিকটা অংশ খাদের দিকে শূন্যে বাড়িয়ে দিল। পেছন থেকে অতসী চিৎকার করে উঠল—বেশি বাহাদুরি দেখাতে যেও না শীতাংশু—থাক থাক হয়েছে।

অতসী আবার হাত বাড়িয়ে দিল। শীতাংশু ফের অতসীর হাত ধরল এগিয়ে এসে, বলল—এতোই যদি ভালবাস আমাকে, সুখেনকে বিয়ে করে সুখী হতে পারবে?

—উপায় কি বল?

—কেন, বিয়ে না করে থাকতে পারবে না?

—কেন পারব না—ভাল যখন বেসেছি একজনকে—অন্য কাউকে বিয়ে করার সেখানে প্রশ্নই উঠতে পারে না। কিন্তু—

—কিন্তু কি?

—এটা কেন বুঝছ না—তোমরা ছেলে, আর আমরা মেয়ে। মেয়েদের যন্ত্রণা নানান রকমের নানান চেহারায় রূপ নেয়। এখন যা অবস্থা দাঁড়িয়েছে, বিয়ে হলেও যন্ত্রণা—বিয়ে না হলেও যন্ত্রণা। বিয়ে না করে থাকলে তোমার-আমার মধ্যে কি কোনদিন এমন সময় আসবে না যে বিয়ে না করে থাকার যন্ত্রণা থেকে কিভাবে আমরা দুজনেই রেহাই পেতে পারি তা নিয়ে গভীরভাবে ভাবতে হবে? দিন যত যাবে সে চিন্তা ততই প্রকট হবে—কারণ কি জান?

—কি?

—তোমাকেও এসব কথা বুঝিয়ে বলতে হবে শীতাংশু?

—বলই না। তোমার মুখে কথাগুলো শুনতে বেশ ভালই লাগছে।

আর একটিবারের জন্যে অস্তায়মান সূর্যের দিকে তাকাল অতসী। তুলাসের গভীর অরণ্যের ভয়ালতা যেন ঘনিয়ে আসছে। কয়না নদীর তীরে টিন আর কাঠের চাল ছাওয়া কুঁড়ে কুঁড়ে বাড়িগুলো চোখে পড়ল। অস্পষ্ট আবছা হয়ে আসছে দূরের দৃশ্য। অতসী মুখ ফিরিয়ে নিল শীতাংশুর দিকে। বিচক্ষণ ভঙ্গীতে বলে

উঠল সে—মানুষ সব সময়ই চায়, তার সীমিত গণ্ডি থেকে বেরিয়ে আসতে। নিজের মধ্যে সে চায় বিস্মৃতি—এই বিস্মৃতির জন্যেই মানুষ লেখাপড়া শিখছে, বিয়ে করছে, সন্তান কামনা করছে, সংসার করছে, সংসারের মঙ্গল চাইছে। এর মধ্যে কোন ভুল নেই শীতাংশু। কেউ অবচেতন মনে চাইছে, কেউ সচেতন মনে চাইছে। তুমিও কি চাইবে না ভাবছ? তুমিও—শীতাংশু—ও-কি ছেলেমানুষি করছ শীতাংশু।

শীতাংশু হঠাৎ অতসীর হাতখানা ছেড়ে দিয়ে টিলাটার একেবারে ধারে গিয়ে দাঁড়িয়ে নিজের সমস্ত দেহটাকে গুলঞ্চ-গাছের দিকে হেলিয়ে দিয়েছে গুলঞ্চের ডাল ভাঙবার জন্যে। সেই মুহূর্তে কেমন করে পা-টা পাথরের টুকরোয় হড়কে গিয়ে দেহের টাল না রাখতে পেরে একেবারে সোজা তীরবেগে প্রায় একশো ফুট নীচে খাদের জঙ্গলে গিয়ে পড়ল শীতাংশু। অতসীর চোখের সামনে নিমেষের মধ্যে ঘটে গেল ব্যাপারটা। উল্কাপাত ঘটল অতসীর শরীরে। সমস্ত দেহের ভেতর দিয়ে রক্তের হিমশীতল প্রবাহ বয়ে গেল। সে আস্ত বেকুফ সেজে বোবার মত বিকট চিৎকার করে উঠল সঙ্গে সঙ্গে—শী—তাং-শু!

অতসীর অসহায় আতঙ্কগ্রস্ত চিৎকারে পিকনিক করতে যারা এসেছিল তারা হন্ত-দন্ত হয়ে ছুটে এলো কাছে। তারা সকলেই অপ্রস্তুত হয়ে ভীত দৃষ্টি মেলে দেখল তাকিয়ে নীচের দিকে—একজোড়া অসহায় নিরস্ত্র হাত ছটফট করছে শূন্যে, গাছপালার গভীরে শীতাংশুর দেহের অংশটা চাপা পড়ে গেছে। তলাকার ডালপালা নড়ছে।

অতসী সোজা নীচের দিকে তাকাল। তার মাথাটা ঘুরছে—তীব্রভাবে ঘুরছে। মনে হোল সে যেন আরও গভীর খাদে তলিয়ে যাচ্ছে। শীতাংশু কি ইচ্ছে করেই এমন কাজ করল? সে নিজেও এখুনি ঝাঁপ দেবে—মরণ-ঝাঁপ—কেউ ঠেকাতে পারবে না এরা। মৃত্যু কত সোজা। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সব শেষ হয়ে যাবে। শীতাংশু গেছে। সুখেনকে বিয়ে করতে হবে না। শীতাংশুর এই দুর্ঘটনা যত আকস্মিকই হোক, কতকটা নিজের দোষ ছাড়া আর কী? বড় বেশি গোঁয়ার্তুমি করছিল। সে অবশ্য বলেছিল ফুল ছিঁড়ে আনতে, কিন্তু সম্ভব না হলে জোর-জবরদস্তি করেনি কিছু অতসী। জীবন বিপন্ন করে ফুল ছিঁড়তে যাওয়ার দরকার কি ছিল তার? অতসীকে খুশি করতে চেয়েছিল সে? নাকি এ আত্মহনন পূর্ব পরিকল্পিত? অতসী এই মুহূর্তে নিজে কেন পারছে না ঝাঁপ দিতে? সে কি তবে শীতাংশুকে ভালবাসতে পারেনি? শীতাংশু যেমন সামান্য কারণে নিজের জীবনকে বিপন্ন করতে পারল, তুচ্ছ করতে পারল, তার কিসের এতো দ্বিধা? এতক্ষণে শীতাংশুর দেহটা হয়তো বিকৃত হয়েছে। ক্ষত-বিক্ষত দেহটাকে হয়তো হাজার চেষ্টাতেও আর প্রাণ ফেরান সম্ভব হবে না। শীতাংশু মারা গেছে, একথা ভাবতেই পারল না অতসী। দুই গণ্ড বেয়ে চোখের জল ঝরতে লাগল। ভাবল সে, শীতাংশুর মৃত্যুর কৈফিয়ৎ তাকেই দিতে হবে সকলের কাছে—পুলিশ আত্মীয়-স্বজন যে যেখানে আছে। ঘটনাটা নিশ্চয় কাগজেও বেরোবে। স্রোতের মত রাষ্ট্র হয়ে পড়বে সমস্ত ঘটনা। মৃত শীতাংশু আর তাকে ঘিরে নানান গল্প লোকের মুখে মুখে ফিরবে। মনের মধ্যে শীতাংশুর বিকৃত মৃত মুখখানা কল্পনা করবার চেষ্টা করল। ডুকরে ডুকরে কাঁদতে ইচ্ছে করল অতসীর। এই হিমেল আমেজ সন্ধ্যায় নিজের অস্তিত্বটাকে ঠিকমত মালুম করতে পারল না সে। পাহাড় আর জঙ্গলের পরিবেশ জুড়ে তার নিরেট নিরবলম্ব ব্যথাতুর মনটা খোড়ো বাতাসে দোল খাওয়া একটা প্রকাণ্ড ক্যানভাসের মতই দুলতে লাগল। অতসীর মনে হোল ছায়ার মত নড়ছে টিলার ওপরের মানুষ-গুলো। অসহায়ভাবে ব্যস্ত পদচারণা করে ফিরছে সকলে। বেকুবের মত হাঁক পাড়ছে তারা খাদের নীচে কাকে উদ্দেশ করে। সেখানে মৃত শীতাংশুর দেহ ছাড়া আর কি থাকতে পারে?

অতসী এতক্ষণে ভাল করে দেখেওনি—খাদটা সত্যিই খাদ কি না? কতখানি গভীর? সেখানে বুনো গাছপালা ছাড়া আর কি আছে? একেবারে তলার দিকে ভালকরে তাকিয়ে দেখল—অতি তাজ্জব ভাবে শীতাংশুর অবিকৃত অক্ষত দেহটা এবারে দু-হাতের শক্ত মুঠোয় গাছের ডাল ধরে ঝুলছে। আরো তলায় একজন মেছো একগাছা মোটা দড়ি শীতাংশুর দিকে ছোড়বার চেষ্টা করছে প্রাণপণে। কিছু সময় পরখ করে দেখল অতসী। দেখল, নামেই খাদ, বেশি গভীর নয়। ঘন গাছ-পালায় ঢাকা চতুর্দিক। গাছগুলোর ফাঁক দিয়ে নজরে গেল ঝিলমত রয়েছে নীচে। মেছোটা তারই কাছাকাছি দাঁড়িয়ে। খাদটাকে যতটা গভীর গহন আর ভয়াবহ ভেবেছিল অতসী এখন দেখে মনে হচ্ছে অতটা নয়। মেছোটাকে চেনে সে। তাকে তাদের কোয়ার্টারের কাছাকাছি একটা ঝিলের ধারে বর্ষাকালে খোঁচ নিয়ে মাছ মারতে কতবার দেখেছে। দেখেছে তাকে স্কুলে যাওয়া-আসার পথে, কোয়ার্টারের আশপাশের জঙ্গলে, স্টেশনের প্ল্যাটফরমে। সে শুধু মাছই মারে না, কখন কখন টিয়া ময়না হরিয়াল পাখি ধরে ধরে বেড়ায়। পাখি ধরে বিক্রি করে। এ অঞ্চলের অনেকেই চেনে মেছোটাকে। মুহ্যমান টিলার লোকগুলো ফেটে পড়ল মেছোটাকে দেখে। এই মুহূর্তে অতসীর মনের মধ্যে যে বিপর্যস্ত দুর্যোগ ছায়াপাত ঘটেছিল তা যেন ধীরে ধীরে সরে যেতে লাগল। অতি অবাস্তব আর অসম্ভব ব্যাপারই ঘটে গেল। অবিশ্বাসী চোখে দেখল সে—মেছোটা দড়ি ছুঁড়ে ঠিকমত গাছের ডালের সংগে কি করে আটকে দিল এক অলৌকিক কায়দায়। অক্ষত শীতাংশু দড়ি বেয়ে সড়সড় করে নেমে পড়ল নীচে। ওই দারুণ শীতেও অতসীর মুখমণ্ডলে আর দুই করতলে ঘাম জমে উঠেছিল ভয়ে আর আনন্দে। সারা মুখে ক্লান্তির ছায়া উঠেছিল ফুটে। একটা দুঃস্বপ্ন দেখার মতই কয়েকটা অশুভ মুহূর্ত কেটে গিয়েছিল সেবার।

এরপর আর একটা দিনের জন্যে দেখা হয়েছিল তার শীতাংশুর সঙ্গে। দেখা হয়েছিল শীতাংশুর বাড়িতে। অতসী নিজেই গিয়েছিল শীতাংশুকে দেখতে। শীতাংশু একলাই ছিল তার ঘরে। মন মনে পড়েছিল সে চেয়ারে বসে। টেবিলের ওপরে একখানা মোটা ডাক্তারি বই খোলা ছিল, আর একটা মড়ার খুলি নিয়ে নাড়া-চাড়া করছিল সে। শীতাংশু সেদিন মোটেই কথা বলেনি। অতসী লঘু পায়ে তার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই শীতাংশু চোখ তুলে একটি বারের জন্যে তাকিয়েছিল অতসীর দিকে। কিন্তু পরক্ষণেই মড়ার মাথার খুলিটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে শুরু করে দিয়েছিল। অতসী নিজে থেকেই আগে কথা বলেছিল তুমি যে সেদিন অতবড় বিপদ থেকে বেঁচে ফিরে আসবে, একথা ভাবতেই পারিনি শীতাংশু—আর যা কিছু ঘটেছিল সে-তো আমারই জন্যে।

শীতাংশু সেই মুহূর্তে অতসীর মুখের দিকে তাকিয়েছিল শুধু। অতসী হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে কেঁদে শীতাংশুর পায়ে লুটিয়ে পড়ে বলেছিল—আমায় ক্ষমা করো শীতাংশু।

শীতাংশু তক্ষুনি চেয়ার ছেড়ে উঠে তার দু-বাহুর বিপুল শক্তিতে অতসীকে নিজের বুকের কাছে টেনে এনেছিল। অতসী সেদিন মনে মনে ভেবেছিল—শীতাংশু তাকে তার দু-বাহু দিয়ে আরো বিপুল শক্তিতে দলে মুচড়ে পিষ্ট করে ফেলুক। বেহুঁস করুক দু-হাতের চাপে। শীতাংশুর দেহের সঙ্গে মিশে যেতে চেয়েছিল একান্ত হয়ে। যেন অনেক কালের অতৃপ্ত কামনা ফুলে ফুঁসে উঠেছিল সেদিন। অস্থির মুহূর্তগুলোর মধ্যে কেঁপে কেঁপে উঠেছিল তারা দুজনেই। অতসীর মনে হয়েছিল তার বুক ঠেলে উঠছে ফেনায়িত অশ্রু। কেঁদে কেঁদে ভাসিয়ে দিতে ইচ্ছে করছিল শীতাংশুর বুকখানা। অনাস্বাদিত স্পর্শ গন্ধ আর স্মৃতির আবেগে মথিত হচ্ছিল সমস্ত চেতনা।

এ ঘটনা আজ থেকে প্রায় চার বছর আগেকার। তারপর থেকে অতসীর বিয়ের ব্যাপারে নিয়ে বহু অশান্তিই গিয়েছে সংসারে। অপরেশবাবু এবারে আর দেরি না করে সুখেনের সঙ্গে অতসীর বিয়ের ব্যাপারটা পাকাপাকি করে ফেললেন। তড়ি-ঘড়িতে শ্রাবণের শেষ লগ্নেই পার করলেন মেয়েকে।

অতসী দেখল, আকাশের ম্রিয়মাণ চাঁদটা আবার পশ্চিম দিকে হেলে পড়েছে। মেছোটা তখনও লণ্ঠন হাতে বড় পুকুরের ধারটায় ঘুরঘুর করছে লোলদৃষ্টি মেলে।

CENTRAL LIBRARY

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল অতসী। খুট করে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করার শব্দ এলো কানে। পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখল, সুখেন দরজাটা বন্ধ করে হাসি-হাসি মুখে এগিয়ে আসছে তার দিকে। একেবারে তার গা ঘেঁষে এসে দাঁড়িয়ে একখানা হাত ধরে জিগ্যেস করল সে—জানলা দিয়ে এতক্ষণ ধরে কি দেখছিলে?

অতসীর সারা দেহ, থরথর করে কেঁপে উঠল। তাড়াতাড়ি বেনারসীর আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছে কাঁপা-কাঁপা বিকৃত গলায় বলল—মেছোটাকে।

অবাক কণ্ঠে শুধোল সুখেন—মেছো?

অতসী নির্বাক রইল। সুখেন জানলা দিয়ে ভাল করে তাকিয়ে হেসে বলে উঠল——ও নিরাপদ জেলেকে! নিরাপদ ওই রকম—রাত-বিরেত নেই—সময়-অসময় নেই পাগলের মত মাছ ধরে ধরে বেড়ায়। জান, নিরাপদর একটা টুকটুকে বউ ছিল—কে যেন তাকে ফুসলিয়ে নিয়ে পালিয়ে গেছে। তারপর থেকে নিরাপদ আরও ওইরকম হয়ে গেছে।

ঘরে নিওনের আলো জ্বলছে। সুখেনকে এর আগে ভাল করে দেখেনি অতসী। সেই আলোয় লক্ষ্য করল, সুখেনের চেহারাটা বেঁটে নাদুস-নুদুস। গায়ের রঙটা তীব্র কটাশে, রস-কষহীন, চোখে পীড়াদায়ক ঠেকে, বিতৃষ্ণা জাগায়। কেমন যেন রক্তবর্ণ চোখ দুটো। সুখেন এবারে অতসীর দু-হাত ধরে জোর করে কাছে টানতে গেল এবং সেই সঙ্গে বলে উঠল—একে শ্রাবণের প্যাচপেচে বর্ষা, তার ওপর গাঁয়েতে বিয়ের ব্যবস্থা, আমি নিষেধই করেছিলাম এই সময়টাতে, তোমার বাবা আর আমার বাবা মিলেই তো—

অতসী তীব্রভাবে বাধা দিয়ে মুক্ত করে নিল নিজেকে। হঠাৎ মদের তীব্র কটু গন্ধ নাকে গেল তার। ভয়ে কুঁচকে গেল তার দু-চোখ, হিম হয়ে গেল শরীর। অতসী মদ কখনও চোখে দেখেনি, মদের গন্ধ কেমন তাও ঠিকমত জানে না সে, তবে আন্দাজে বুঝতে কষ্ট হল না—এ গন্ধ মদেরই গন্ধ। এমন গন্ধ স্বাভাবিক মানুষের মুখ দিয়ে বেরোয় না। ভক্ করে নাকে গেল। গা-টা ঘিন-ঘিন করে উঠল। নাকে বেনারসী শাড়ীর আঁচলটা চাপা দিল। মুখ নীচু করে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল অতসী। খাটের বাজু ধরে বসে থাকল অস্বস্তিকর ভগ্ন মন নিয়ে। কেমন যেন অশরীরী একটা রহস্যময় পরিবেশে আসতে লাগল সে।

পাঞ্জাবির পকেট থেকে দামী সিগারেট কেস বার করে সিগারেট ধরাল সুখেন। অতসীকে ভীষণ রকম গম্ভীর আর বিষণ্ণ দেখে সে অবশ্য বিচলিত হল না কিছুমাত্র। কেন অতসী অমন করে নাকে আঁচল চাপা দিয়ে সরে গেল তাও জানে সুখেন। তবুও কতকটা না বোঝার ভান করে শুধোল সে—অমন করে সরে গেলে যে? নাকে আঁচল চাপা দেবার কি হল?

অতসী কোন কথাই বলল না। নির্বিকার বসে রইল খাটের এক কোণায়। বেশ কিছুক্ষণ কেটে যাবার পর অতসীর কাছ থেকে যখন কোন জবাবই এল না, তখন ব্যাপারটাকে সহজ করে নেবার চেষ্টাতেই সরলভাবে বলে উঠল সুখেন—বুঝেছি—গন্ধ গেছে নাকে।

মুহূর্ত কয়েক নীরব রইল সে। পরে সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বলল—মনে কিছু করো না—এটা আমার অনেকদিনের অভ্যেস—তাই আজকের দিনেও না খেয়ে থাকতে পারলুম না—জানি একদিন তো তুমি জানতেই পারবে—তাই লুকোছাপা করে আর লাভ কি? বিশ্বাস কর, বেশি না, অল্প একটু খেয়েছি।

সুখেন এবারে ফুল ছড়ান খাটের এক পাশে টান-টান হয়ে শুয়ে পড়ল। শুয়ে শুয়ে সিগারেট টানতে লাগল। অতসী এতটুকু নড়ল না। মাঝরাত্রি পার হয়ে গেছে। অতসী যেন তার অনিদ্রিত দু-চোখে কালবেলার মহাচ্ছায়ার ছবি স্পষ্ট দেখতে পেল। জানলার বাইরে জঙ্গলের ভেতর থেকে একটা কালপেঁচা ডেকে উঠল বিশ্রী কর্কশ কণ্ঠে। অনড় অচল বসে থাকল অতসী সুখেনের পায়ের দিকে খাটের বাজু ধরে। সুখেনের অনেক চেষ্টাতেও অতসী গেল না তার কাছে বা ফুলশয্যার বিছানাতে গা ঠেকাল না।

ভাবতে লাগল অতসী, ইচ্ছা বা রুচির বিরুদ্ধে অপরিচিত একজনকে সহজে মেনে নিতে গিয়ে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে সে এ' কদিনে।

শুধু নেশা করাই নয়, নেশার পরিচয় সে আগেই পেয়েছে. সুখেনের চাল-চলন, কথাবার্তা আর ব্যবহারের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য খুঁজে পারনি সে, বড়ই অসংগত আর অমার্জিত মনে হয়েছে। এও ভেবেছে অতসী, সুখেনের সঙ্গে বিয়ে হওয়ার ব্যাপারে সুখেনের যদি কিছু অপরাধ থেকে থাকে, তার থেকে ঢের বেশি অপরাধ রয়েছে তার নিজের বাবা অপরেশবাবুর। অপরেশবাবুর অদম্য ইচ্ছেতেই এ বিয়েটা ঘটে গেল। এর পেছনে কোন উপযুক্ত কারণ বা যুক্তি খুঁজে পায়নি অতসী। অপরেশবাবুর একটা খেয়ালী ইচ্ছেই সেখানে দুর্দমনীয় প্রবল মনে হয়েছিল। তাই বিয়ের পর থেকেই আত্মীয়-অনাত্মীয় কারোর সঙ্গে ভাল করে কথা বলেনি অতসী। একটা বিশ্রী নিঃসঙ্গতায় কেটে যাচ্ছে দিনগুলো। এ-যেন তিলে-তিলে দগ্ধ হওয়া। এখন অতসীর যা মনের অবস্থা, যে কোন উপায়ে হঠাৎ আত্মহত্যা করা ছাড়া এই দুর্বহ জীবন থেকে তার রেহাই নেই।

অতসী বুঝতে পারল, সুখেন নিজে থেকেই ঘরের ডিম-লাইটটা জেলে নির্বোধ অসহায়ের মত শুয়ে পড়েছে খাটে। হয়তো এতক্ষণে তন্দ্রাও এসেছে। ঘরের শূন্যতা কেঁপে উঠল অতসীর কাছে। খোলা জানলা দিয়ে খানিকটা উদোম জলো-বাতাস খেলে গেল ঘরের ভেতর। অতসীর গা-টা সির-সির করে উঠল। জানলার ফাঁক দিয়ে দু-চোখ চালিয়ে দিলে মধ্যরাতের সমস্ত আকাশটাই দুলে ওঠে অতসীর কাছে। হা-হা বুকে কান্নার প্রপাত ভেঙে পড়তে চাইল। বুকের মধ্যে গুড়গুড় করে উঠল অলৌকিক এক রাতজাগা পাখির ডাকে। কেমন যেন একটা বুক দুরুদুরু অজানা আশঙ্কা ঘিরে ধরল। ফেলে আসা জীবনের সবল স্মৃতিটা মগজে দংশন করতে লাগল। শীতাংশুও তো বাড়ির অমতে তাকে বিয়ে করতে রাজি হয়নি। সুখেনের হাত থেকে রেহাই পাবার কি উপায়ই বা তার ছিল? দুঃসাহসের সঙ্গে জাত-কুল হারিয়ে সে তো শীতাংশুর হাত ধরে বেরিয়ে আসতেই চেয়েছিল। কিন্তু নির্বিকার, নিস্পৃহ থেকেছে শীতাংশু। এই মুহূর্তে শীতাংশুকে প্রচণ্ড রকমের একটা ফেরেব্বাজ বলেই মনে হচ্ছে তার। অথচ শীতাংশু ডাক্তারি পড়ে। মড়া কাটে। তার দায়িত্ববোধ নির্ভরযোগ্য। দুদিন পরে পাশ করে বেরিয়ে এলে মানুষের জীবন-মরণের গুরু দায়িত্ব তার ওপরে এসেই বর্তাবে। অতসীর ভবিষ্যৎ ভেবে এতটুকুও কি সে বিচলিত হয়নি? তার পড়াশোনায় মন বসবে? লাশকাটা ঘরে মড়ার ওপরে ছুরি চালাতে গিয়ে তার এতটুকুও হাত কেঁপে উঠবে না? ঘুমে তার দু-চোখের পাতা ভারী হয়ে এল। আশ্চর্য নিঃশেষে শেষবারের মত এবার সে তলিয়ে যেতে লাগল। অতসীর দু-চোখের সামনে অজস্র মাকড়সার জাল বিস্তার করল। এখন এই মুহূর্তে প্রায় নিরালা ঘরে একটা দমবন্ধ হাহাকার চারিদিক থেকে উৎক্ষিপ্ত হতে লাগল। তন্দ্রা-জড়িত ক্লান্ত দু-চোখের পাতায় দুঃস্বপ্ন নাচতে লাগল।

অতসী দেখতে পেল কিসের একটা পার্বণ উপলক্ষে দলে দলে উপোসী মেয়ে-পুরুষেরা চলেছে গঙ্গাস্নানে। পথে-ঘাটে

অসম্ভব ভিড়। ভিড় ঠেলে অতসী তার মা অভয়া দেবীর সঙ্গে চলেছে গঙ্গা-ঘাটের দিকে। কোনমতে ভিড় ঠেলে ঘাটে এসে পৌঁছল তারা। অতসীর চোখে পড়ল, গঙ্গার ঘাটে-ঘাটে বিচিত্র লীলা। জলস্রোত থেকে উঠছে হাজারো নর-নারীর অবগাহন স্নানে। ঘাটেতে অজস্র কাকলি মেয়ে-পুরুষের। যৌবনোচ্ছলা তরুণ-তরুণীর দলও রয়েছে। মধ্যবয়স্ক গেরস্থ মেয়েদের কোলে-কাঁখে সন্তান। কারোর দেহ ভেঙে পড়েছে উপোসে আর ক্লান্তিতে। অধীর প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে রয়েছে পুণ্যার্থীরা ঘাটে ঘাটে। চারিদিকে কত রঙ-বেরঙের ফুল, বেলপাতা। ছোট-বড় ছেলে-মেয়েরা মুখে নিচ্ছে শ্বেত আর রক্তচন্দনের ছাপ। পাড়েতে বিস্তর মানুষের দল, জলেতে তরঙ্গায়িত বেতালা সুর। গঙ্গার জলটা আরও ঘোলাটে হয়ে উঠেছে। সেগুলো জলের ঢেউয়ের তালে মানুষের ছায়াগুলো কাঁপছে। ছোট-বড় ঢেউ ভেসে উঠে ভেঙে ভেঙে পড়ছে পাড়ে। গাং-চিলগুলো উড়ছে পাক খেয়ে খেয়ে।

অভয়াদেবী চান সেরে ঘাটে উঠে এসে-ছেন। অতসী এবারে এগিয়ে গেল ঘাটের কিনারে, জলের ধারে। অতসী জলে নেমে গিয়ে শুনতে পেল কোলাহল মুখরিত বাতাসে সোঁ-সোঁ শব্দ। জলেতে দাপাদাপি। অতসী আরও খানিকটা নেমে গেল, প্রায় বুক জলে। ডুব দিতে যাবে, অকস্মাৎ কিসের একটা ঘণ্টা বেজে উঠল। তার কানে গেল, ঘাটের জনতা সমস্বরে চিৎকার জুড়ে দিয়েছে—বান আসছে, বান!

যে যার আত্মীয়স্বজনকে ডেকে বলতে শুরু করেছে সবাই—ওরে ঘাটে উঠে আয় শীগ্গির, বান আসছে!

অতসীর কানে এল তার মায়ের আর্ত কণ্ঠস্বর—অতু শীগ্গির আয় মা, বান আসছে। ঘণ্টা পড়ে গেছে, জলে আর থাকিসনে।

অতসী তখনও কি যে ভাবছিল তন্ময় হয়ে। মায়ের কথা সে ভ্রূক্ষেপ করল না। বান ডাকল হু-হু শব্দে। অতসী বেশ বুঝতে পারছে, সবাই উঠে যাচ্ছে পাড়ে হুড়োহুড়ি করে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে সবাই প্রবল জলোচ্ছ্বাসের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। কেন যেন তীব্র যন্ত্রণা আর নিরাশতার প্রতিনিধি হয়ে থাকতে চাইল না সে। স্পন্দহীন ব্যস্ত চরাচরে নিজের নিরাশার ক্লান্তিটাকে ফুৎকারে বিলিয়ে দিতে চাইল সে নীরবে। একটা দুস্তর কঠিন জলের চাপ অনুভব করল সারা দেহে।

অতসী বুঝতে পারল, মুমূর্ষু অবস্থায় উদ্ধার পেয়েছে সে দুটির নৌকোর মাঝিদের হাতে। তক্ষুনি তারা তাকে পাঠিয়ে দিল হাসপাতালে। হাসপাতালের ডাক্তার, নার্স ব্যস্ত হয়ে অতসীকে পরীক্ষা করে দেখলেন বারবার, কিন্তু অতসীর জীবন সম্পর্কে তারা কোন আশা-ভরসা দিতে পারলেন না। বহু ইনজেকশন ওষুধ পড়ল। ঘন-ঘন নাড়ী দেখলেন ডাক্তার, কিন্তু অতসীর নাড়ীর কোন স্পন্দন পেলেন পেলেন কিনা তিনি, বোঝা গেল না। ডাক্তারের মুখখানা গম্ভীর তার আকাশে মনে হল। স্থির নিশ্চল হয়ে গেল সব-কিছু। অতসী অনুভব করল, সে মরে গেছে। অনড় নিঃস্পন্দ তার দেহ। তার নাম-ঠিকানার কোন হদিসই পেল না কেউ। হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ তার মৃতদেহটাকে রেখে দিল সনাক্ত করবার জন্যে। কিন্তু কেউই এল না অতসীর মৃতদেহটাকে সনাক্ত করতে।

অতসীর মনে হল, তার মৃতদেহটা যেখানে থাকবার কথা সেখানে নেই। তার হিমশীতল বাসী লাশটা চিৎ করে শোয়ান হয়েছে হাসপাতালের অ্যানাটমিক্যাল হলের টেবিলের ওপর। অ্যানাটমিক্যাল হলটা কেমন যেন শান্ত নিস্তব্ধ। ছেলে-মেয়েরা একমনে ডিসেকশন করে চলেছে। একজন প্রবীণ ডাক্তার অ্যাপ্রন পরে তদারক করছেন। থেকে থেকে এ-টেবিল সে-টেবিল ঘুরে ঘুরে দেখছেন—ঠিকমত ডিসেকশন হচ্ছে কি না! ছেলেমেয়েদের চোখেমুখে বিস্ময়ের চিহ্ন, কিছুটা অজ্ঞাত আনন্দ আর ভীতি-বিহ্বলতা। ছেলেমেয়েদের মধ্যে শীতাংশুকে চোখে পড়ল অতসীর। শীতাংশু কেমন যেন নিষ্পৃহভাবে দাঁড়িয়েছিল। অ্যাপ্রন পরা প্রবীণ ডাক্তার শীতাংশুকে বিমর্ষ দেখে জিগ্যেস করে উঠলেন—হ্যালো শীতাংশু, হোয়াই ডু ইউ লুক স্যাড?

শীতাংশু তার দাড়ি না কামান শুকনো মুখখানা কোনমতে ডাক্তারের দিকে তুলে নিজের বিমর্ষভাবটাকে চাপা দেবার চেষ্টায় বলে উঠল—ও কিছু না, কি ডিসেকট করব আজ স্যার?

ডাক্তার কি ভেবে নিয়ে জিগ্যেস করলেন—থোর্যাক্স হয়ে গেছে?

—হ্যাঁ স্যার।

—তবে আজ থেকে অ্যাবডোমেন হবে। ছ-নম্বর টেবিলে চলে যাও।

অতসী শিউরে উঠল। ছ-নম্বর টেবিলে তারই মৃতদেহ রয়েছে শায়িত অবস্থায়। অতসী শীতাংশুকে চিৎকার করে ডাকবার চেষ্টা করল, দৃষ্টি আকর্ষণ করবার বহু-প্রকার চেষ্টা করল, কিন্তু কিছুই হল না। মনে হল সে যেন নিঃসীম শূন্যে দিশা-হারা, ঘুরিয়ে তলিয়ে যাচ্ছে। শীতাংশু কিন্তু ধীরে ধীরে ছ-নম্বর টেবিলের কাছে এসে দাঁড়াল। কতকটা যন্ত্রচালিতের মতই ডাক্তারির বাক্স থেকে স্ক্যালপেল, ফর-সেপ, ছুরি, কাঁচি বার করল। স্ক্যালপেল হাতে করে ছ-নম্বর টেবিলের মৃতদেহটার দিকে এবারে তাকাল শীতাংশু। অতসী দেখতে পেল, স্ক্যালপেল দিয়ে অ্যাবডোমেন চিরতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতই নিশ্চল অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল শীতাংশু, কয়েক মুহূর্তের জন্যে। অবিশ্বাস্য এক নির্মম কঠিন দৃশ্য দেখছে নাকি সে? শুধুই কি ছ-নম্বর টেবিলের শান্ত শীতল এক যুবতীর মৃতদেহ? না, তার প্রতীক্ষিত এক নিষ্প্রাণ প্রিয়তমা অতৃপ্ত অস্পর্শে আকাঙ্ক্ষিত জীবন? টেবিলের ওপরে গভীরে নিথর নিষ্প্রাণ বিকৃত অতসীর দেহটাকে বুঝতে পারল নাকি শীতাংশু? হয়তো কোনমতেই বিশ্বাস করতে পারছে না শীতাংশু। ভাল করে পরখ করবার চেষ্টা করল সে। অতসী তার নিজের মৃত লাশটাকে চেনবার চেষ্টা করল। দেহ যেন কিছুটা বিকৃত হয়ে গেছে। মাথায় তার একটিও চুল নেই। ঘোলাটে চোখ দুটো ঈষৎ বোজা। অল্প একটু হাঁ-করা মুখটা যেন শেষ নিশ্বাসটুকু নেবার আপ্রাণ চেষ্টায় ব্যর্থ। সমস্ত শরীরে তার জারকরস মাখান। বহু পরিচিত লোকেরও এক নজরে চিনে ওঠা সম্ভব হবে না। আশ্চর্য, অতসী নিজেই তার মৃত লাশটাকে চিনে উঠতে পারল না। মুহূর্তকয়েক নিস্পন্দ নির্বাক নিথরের মত স্ক্যালপেল হাতে করে দাঁড়িয়ে থাকল শীতাংশু, পরক্ষণেই তার মুখখানা কেমন যেন ভয়াল-কঠিন হয়ে উঠল। গোটা মুখের মাংসপেশী যথাসম্ভব শক্ত করে তেমনি যন্ত্রচালিতের মতই স্ক্যাল-পেল দিয়ে অতসীর পেট চিরতে এগিয়ে এল শীতাংশু। অতসী প্রচণ্ড বিস্ময়ে শীতাংশুর ওপর বিশ্বাস হারাল যেন। শীতাংশুকে কেন যেন এই মুহূর্তে একটা নির্মম কঠিন পাষাণ মূর্তি মনে হল। মুহূর্ত মধ্যে প্রচণ্ড একটা তথার্ত চিৎকারে নড়ে উঠল অতসী—না, না, না।

দম আটকে এসেছিল তার। বুক ভরে নিশ্বাস নিতে কষ্ট হল। একটা প্রবল আবে-ষ্টনীর উষ্ণ চাপ অনুভব করল সে। আবর্তিত হল অতসী। আর একবার তীব্র আর্তনাদে ফেটে পড়তে চাইলেও পারল না। কে যেন তার সমস্ত শরীরটাকে আষ্টে-পৃষ্ঠে দুবাহুর বেষ্টনে পাঁজাকোলা করে তুলে ধরেছে শূন্যে, জড়িয়ে নিয়েছে বুকের কাছে। খুবই দুর্বল মনে হল নিজেকে মুক্ত করতে। তবুও কষ্ট করেই ভয়ে ভয়ে স্বপ্নোত্থিত অতসী দুচোখ মেলে তাকাল, দেখল—উদগ্রীব লালসাতুর আর একজোড়া চোখ গিলছে তাকে। একেবারে মুখো-মুখি—রাতজাগা উষ্ণ মাতাল নিশ্বাস অনু-ভব করল মুখের ওপর। লক্ষ্য করল, ঘরের ডিম লাইটটা নেবান। তবুও শেষরাতের অবসন্ন নক্ষত্রের আলোয় চিনতে তাকে কষ্ট হল না। অতসী কোন বাধাই দিল না। তার যা কিছু একান্ত গোপন, অতীতের যা কিছু নিরুদ্দিষ্ট এবং বর্তমানের ভয়-ভীতি-ঘৃণা তলিয়ে গেল এই মুহূর্তে।

সুখের মেলা

ধুনুরী হোসেন মিয়া এবং রাহিলা

'কি নাম তোমার?'

'মহম্মদ আলী হোসেন রিয়াজউদ্দিন খান।'

'বাপস্। এত বড় নাম একজন ধুনুরীর হয় না। অত বড় নাম নামজাদা লোকেরা ব্যবহার করেন। তোমার আসল নাম কোনটা?'

'হোসেন।'

'কোথায় বাড়ি?'

'বিহারে, ছাপরা জেলায়।'

'কতদিন আছ বাংলাদেশে?'

'চব্বিশ বছর হবে।'

'তাহলে তো বাঙালী হয়ে গেছ।'

'আজ্ঞে হাঁ, তা পেরায়।'

'এক নম্বর তুলো কত দরে কেজি?'

'সাড়ে চার টাকা। কলকাতায় খুচরো নয় পাঁচ টাকা।'

'কোথা থেকে কেনো?'

'হাওড়ার সালকিয়া থেকে।'

'এটা কোন দেশের তুলো?'

'পাঞ্জাবের বোধহয়।'

'লেপে তুলো জমে যায় কেন?'

'এক নম্বর তুলো হলে জমবে না। দু নম্বর তিন নম্বর তুলো হলে জমবে।'

'এক নম্বর তুলো কতটা লাগবে একখানা লেপের মধ্যে?'

'সাড়ে তিন কেজি। চার কেজি দিলে একটু বেশি মোটা হবে। এইসব একটু সস্তা ছাপা কাপড়ের খোলে দু কেজি করে তুলো দিয়েও হিন্দুস্থানীরা লেপ বানাচ্ছে। ওরা চটকলে, তেলের ডিপোতে কাজ করে। ভাল ছাপা কাপড়ও আছে। এটাতে করলে পঁয়তাল্লিশ টাকা পড়বে।'

'লাল সালুতে করলে?'

'পঞ্চাশ টাকার কম নয়।'

'খেরোতে।'

'সাতাশ আটাশ। আপনি পঁয়তাল্লিশ টাকাতেই করুন।'

'আচ্ছা করো। কিন্তু শোনো, খুব ধনী মানুষদের লেপ রোদে দিতে দেখেছি, সাটিন কাপড় দেওয়া—সেসব কত পড়ে।'

'হুজুর, যত গুড় দেবেন ততই মিষ্টি হবে। সাটিন দিলে পেয়ায় দুশো টাকা পড়ে যাবে।'

'তোমার বউ ছেলেমেয়েরা কি দেশে থাকে?'

'না, এখানেই আছে। দেশে মা বাবা আছে। এখানে আমার আরো দু'ভাই থাকে। তাদের দোকান নেই। পাড়ায় ঘুরে ঘুরে কাজ করে। এখন 'সীজেন' পড়েছে, রোজ খান কুড়ি করে লেপ হয়, ভাইরা বা যত ধুনুরী আছে আমার লেপ সেলাই করে দিচ্ছে। সাড়ে তিন টাকা লেপ-সেলাই নেবে ওরা। আপনাকে যেটা পঁয়তাল্লিশে দিলাম, সেটা চল্লিশ বিয়াল্লিশে বেচি।'

'প্রতি লেপে কত লাভ পাও?'

'টাকা পাঁচেক করে?'

'ওরে বাস্—কুড়িটা লেপে তাহলে তো দিনে একশো টাকা পেয়ে যাবে।'

'এই শীতকালের কটা দিন পাব বাবু। তারপর সারা বছর বসে থাকতে হয়। ঐ বালিশ তোষক বাড়ি টুকটাক করে।'

'জমি বা বাড়ি দেশে কি করেছ?'

'জমি কিনেছি বিশ বিঘে আর একতলা চার কামরা পাকা বাড়ি করেছি। দুটো বোন আছে। তাদের হুকুমে বাপের নামে, ছোট দুটো ভাইয়ের নামে জমি কিনেছিলাম। কথা ছিল খোরাকী বাদে যা জমবে সে টাকা আমাকে দেবে আর আমি সেই টাকায় এখানে খানিকটা জায়গা কিনে বাড়ি বা দোকান বাঁধব। তা বাবু, বাপও যে বিশ্বাসঘাতক হয় কে জানত! বাপ এখন খুব মদ খায়—ছোট ভাইরা বলে, কিসের টাকা? তারা ঝগড়া করলে, ভীষণ কাণ্ড হল, পিঠ বাঁচিয়ে চলে এলুম। আর কখনো দেশে যাব না।'

'এ দোকানবাড়িটা কি ভাড়ার?'

'হ্যাঁ। কুড়ি টাকা মাসে ভাড়া আমার। বাদ, এই লেপের খোলে ধুনে তুলো দিয়ে যাচ্ছে, আপনি সেলাই বা ধুনুরীদের কাজ দেখুন যেয়ে ওদিকের মাঠটাতে। সেখানে আমার বাসা আছে। বউ ছেলেদের দেখতে পাবেন।'

আমি একজন নামকরা লোকের নাম বলে জিজ্ঞাসা করলাম, চেন তাঁকে। তিনি আমার বন্ধু। অবশ্য তিনি বাংলা জানেন না। তিনিও একজন গরিব ধুনুরীর ছেলে।'

'জানি। ধুনুরীরা সবাই প্রায় বিহারের মুসলমান। মেদিনীপুরের কিছু বাঙালী চর্মকার আছে—যারা ধুনুরীর কাজ করে।'

রাস্তার পশ্চিম পারের লাইন ঘরের পিছনে এসে দেখলাম পিলপিল মা দুকোণেই মাঠের মাঝখানে গোটা চারেক লেপ মেলে সেলাই করছে কতগুলো হিন্দুস্থানী।

একজন কানে আতো পরা পেশোয়ারী, একজন কাবুলী, দুজন দেহাতি শ্রমিক, দুজন চটকল শ্রমিক বসে আছে তাদের লেপের জন্যে।

একজন ধুনুরী আমার তুলোগুলো প্রথমে বাঁখারীর ছড়ি মেরে মেরে কোঁকা ছাড়িয়ে নিলে চালাঘরটাতে বসে। তারপরে তাদের তাঁতের টংকার তুলে 'জিন্দা' মেরে তুলো ধুনতে বসল।

শুধোলাম, 'এই ধুনে-যন্তরগুলো এদেশে তৈরি হয় কি?'

'না বাবু। দেশ থেকে আনি।'

বাতাস বইছিল। পেঁজা তুলোর আঁশ উড়ে এসে নিঃশ্বাসের আকর্ষণে নাকের মধ্যে ঢুকছিল। গায়ের জামা-কাপড়ে জড়াচ্ছিল। মাঠের কোণে চলে গেলাম। ছেলেরা ঘুড়ি ওড়াচ্ছে।

হোসেনের বউ এসে দু' মগ লাল চা আর রুটি দিয়ে গেল দুজনকে। বাসাটার সামনে অনেক খুঁটি ঠেস দেওয়া। খাটটা ঝুঁকে আছে সামনের দিকে। ছোট ছোট ছেলেমেয়ে দুটি তিনটি খেলনা হাঁড়ি পাতিল নিয়ে খেলছে 'ঝুমকা' বনটার পাশে। সামনে একটা কাশিমোলা গাছ। লাউগাছ উঠেছে বাসার চালে। মাঠের দুপাশে দুটো ডোবা। কচুরী পানায় ভরে আছে। চমৎকার সুন্দর হালকা বেগুনী রঙের ফুল ফুটে আছে পানাগুলোর। কসাইখানার হাড়-গোড়গুলো হাতে করে বাজারের পিছনের দিকের নোংরা নাবাল জমিটাতে ফেলে দিতে এল একটা লোক—তার মাথার ওপর দিয়ে কাকের পাল উড়ে চলেছে। সুযোগ খুঁজছে গোটা চারেক নেড়ি কুত্তা। পশ্চিম দিকের ডোবাটার বাঁশ-ঘিরে-পানা-আটকানো-কালো-মতন জলে চান করে উঠে ভিজে কাপড়ের ওপরে যেভাবে সায়া বা শাড়ি পরছে, বহুগুলি পুরুষ চারপাশে ছিল সবাই হাঁ করে তাকিয়ে দেখছিল তাকে। তার কাপড় ছাড়ার 'বাহার' দেখে মনে হল মেয়েটি স্বাধীন এবং তার বিনা মূলধনের 'ব্যবসা' আছে। আর খদ্দেরও তার কাক-চিলের মতন প্রচুর—যেমন কসাইখানার বাতিল চামড়া বা হাড়গোড়ের ওপরে আছে ইতর জীবদের লোলুপ বুভুক্ষা।

ওমা! একটি নয়, দুটো নয়, পালকে পাল বেউলো হাঁসেরা একে একে জলে নামছে। জলকেলি শুরু করেছে। এপারের আধুনিক প্যাটার্নের দোতলা বাড়িটার ইজিচেয়ারে শুয়ে শুয়ে যে বুড়ো মানুষটি খবরের কাগজের তলায় চাপা পড়েছিলেন তিনিও মেরুদণ্ড খাড়া করে বসে জল-পরীদের দেখতে লাগলেন। পুরুষ মানুষের যত বয়স আর দিন যাচ্ছে তত চিত্ত রসসিক্ত হয়।

টাঁপ-টাঁপ করে সূঁচের শব্দ তুলে লেপ সেলাই করছে লোকগুলো।

হোসেন এসে দাঁড়িয়েছিল এর মধ্যে। তাকে বললাম,

'হোসেন মিয়া, তুমি কি লেখাপড়া জানো?'

'খানিকটা জানি বাবু, বাংলা বইটই পড়ি। আর আমরা সবাই যাকে বলে 'কাজ সালাম।'

'আচ্ছা!'

'দেশে আমরা হিন্দু মুসলমান এক সঙ্গে চিরকাল গায়ে গায়েই ছিলাম। ধান-কাটা, গম চাষ করা এইসব একসঙ্গেই চলত। আমাদের দরিদ্রদের শিক্ষা-ব্যবস্থার কিছু হল না, অর্থনৈতিক উন্নতিও হল না! পেটের ধান্ধায়, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে কত মার খেলাম আমরা। জমিজিরেত হারা হলাম। মোট কথা নিচের তলার জীব হয়ে পড়তে লাগলুম। সে পড়ানো এখনো চলেছে। নেই শিক্ষা, জমি, ঘর বাড়ি, মান-ইজ্জত, চাকরী-বাকরী। এই আমরা ধুনুরী হয়ে তাঁত চালাই। মেদিনীপুরের হিন্দু 'চর্মকাররা' যেমন চালায়—বোধহয় ওরাই আমাদের পূর্বপুরুষ। ...ধর্ম একটাই, মনুষ্যত্ব অর্জন—বহু সম্প্রদায়ে বহু ব্যাখ্যা দিয়ে তার চেহারা অচেনা করে ফেলেছে। শিক্ষা না পেলে ধর্ম করাই কঠিন।'

'থাক ওসব তত্ত্বকথা। অনেক জানো দেখছি তুমি।'

হোসেন মিয়া লজ্জা পেয়ে জিভ কাটলে। বললে, 'ছিছি, আমি কিছুই জানি না। তবে একটা মজার কথা বাবু, আমার যে বাপ জল খায়, যে ভাইরা আমার রক্ত-জল-করা টাকায় কেনা জমির হারাম ফসল খাচ্ছে আমাকে বঞ্চিত করে, ওরা এমনিতে খুব জ্ঞানী মানুষ!

বললাম, 'ঈদের দিন বাড়ি যাও—বউ ছেলেমেয়েদের নিয়ে যাও—আনন্দ করে এসো—আর বাপের কাছে, ভাইয়ের কাছে টাকা চাও ফিরিয়ে দিতে। তারা এতদিনে নিজেদের ব্যবহারে অনুতপ্ত হয়েছে নিশ্চয়ই। তোমার ছেলে-বউ নিয়ে এই দুর্বাড়ি-খাওয়া-ঘরে থাকা চলে না। হঠাৎ হুড়মুড় করে ঘরটা পড়ে যাবে একদিন।'

কুরুশ-কাঁটা, পদ্ম-গোলাপ, কত রকম সেলাই দেখছি লেপের।

হোসেন মিয়া হঠাৎ চোখের জল মুছতে লাগল। 'বাবু আমার কত কষ্টের টাকা! সব গেল। ছেলে-মেয়েদের এই শীতের সময় জামা কাপড় দিতে পারছি না।'

হোসেন মিয়ার বউ হঠাৎ চিৎকার করে উঠল : 'কাহে রে, রোতা কাহে! আওরত কা মাফিক রোতা কাহে? বাবু, উ-পাজী লোক বহুৎ হারামী আছে। ত্যাখন আমার খাট পুনো নেই। ওহো! আমার বাপ! আমার মা! বাংলা কিতাব পড়হা-লিখা করে শালার দীলটা বড় সিধা হয়েছিল। ভদ্দর মানুষ হয়ে গেছিল গো! এখন রোজা কিসের গা! ওগো মদ্দমানুষ!'

অস্ফুট প্রাণবন্ত এবং মাটির কে পলা হোসেনের বউয়ের। সে কথা বলতে বলতে এসে বসে থাকা স্বামীকে পাঁজা করে ধরে তুলে 'ওগো মদ্দমানুষ' বলে একটা ঝাঁকানী দিয়ে আবার ঠুকে বসিয়ে দিতেই সবাই হা হা করে হেসে উঠল।

হোসেন মিয়া খেঁকিয়ে উঠল : 'আরে পিযাড় জানানা!'

মেয়েটি তখন তার সামনে এসে নাচের ভঙ্গিতে বার চারেক কোমর দোলাল। তার ভারি পাছাটা চমৎকার ভাবে দোল খেলো। তারপর সাপের ফণার মতন হাত দেখিয়ে হেসে পাক খেয়ে অঙ্গভঙ্গি করে বাসার দিকে চলে গেল।

আমার লেপটা হয়ে গেলে হোসেন মিয়া সেটা বগলদাবায় নিয়ে দোকানে এল। আমি টাকা দিয়ে লেপ নিয়ে চলে আসছি যখন হোসেন মিয়া বললে, 'রাহিলা মানে আমার বউটা, আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে বাবু। ও বলে, যা গেছে তার কথা ভেবে কি জোয়ান বয়সেই বুড়ো হয়ে যাবে? মনটা বুড়ো করেছ, এবার দেহটাও বুড়ো করলে আমি কি নিয়ে থাকব? ...আবার সব হবে—কেঁদো না।... আবার আমাদের সব হবে।'

বললাম, 'ঠিকই তো। রাহিলা ঠিকই বলেছে।'

'কিন্তু বাবু ও-শালীও কাঁদে। ছেলেদের কষ্টে ওর বুক ফেটে যায়। যেন ঝড়ের সময় দরিয়ায় নৌকো বেয়ে চলেছে আমাদের নিয়ে আঁধার রাতে। ও বড় ভাল মেয়ে। ওর জন্যে আমাকে আমার বাঁচতে হবে।'

—আবদুল জব্বার

CENTRAL LIBRARY

তুলসীচরিত

নীষিব চৌধুরী

(২৫)

মাস্টারমশাই খবর পাঠিয়েছেন আগামী পরশু মিঃ ভাদুড়ীর ছোট ছেলে মিঃ ডি ভাদুড়ী দমদমে পৌঁছবেন, যদি অসুবিধা না হয় আমি গেলে ভাল হয়।

নির্দিষ্ট সময়ে তাঁকে গাড়ীতে তুলে নিয়ে দমদম রওনা হলাম।

মাস্টারমশাই বললেন, কোথায় উঠবে দেবাশিস জানি না। নিজের বাড়ী তো বেহাত। দাদাদের খবর দিয়েছে কিনা জেনেনি। দমদমে তাদের কেউ আসলে জানা যাবে। যদি কেউ না আসে হোটেলে উঠবে, পৌঁছে দিতে হবে হয়ত।

বললাম, বেশ, পৌঁছে দেব।

বললেন, আট বছর পরে ফিরছে, কতটা সাহেব হয়ে ফিরছে বুঝতে পারছি না।

বললাম, আপনার ছাত্র, ভক্তিশ্রদ্ধা করেন আপনাকে, আপনার কাছে কেন সাহেবিয়ানা করতে যাবেন?

না, সে কথা বলছি না। ওখানে একরকম ভাবে থাকত—

বললাম, দামী হোটেলে এখানেও সেইরকমভাবে থাকতে পাবেন।

দমদমে পৌঁছে মিঃ ভাদুড়ীর বড়ছেলেদের কাউকে দেখা গেল না।

মাস্টারমশাই বললেন, হয়ত ঠিক সময়ে এসে যাবে। যদি না আসে—আচ্ছা, কোন হোটেলে জায়গা পাওয়া যাবে ফোন করে দেখবে না কি অশোক?

বললাম, আমি খোঁজ নিচ্ছি। বড় বড় হোটেলের টাউটরা ঘোরাফেরা করছে এখানে।

খোঁজ নিলাম। বড় হোটেলের এজেন্টরা আছে, কিন্তু মক্কেল ধরবার জন্য নয়, মক্কেলদের রিসিভ করবার জন্য, জায়গা আগেই বুক করা হয়েছে। একটা হোটেলে জায়গা আছে খবর পেলাম, তেমন ভাল নয় সেটা। মাস্টারমশাইকে খবর জানিয়ে বললাম, এখনকার মত উঠতে পারেন, তারপর দেখেশুনে অন্য জায়গায় যাবেন।

নির্দিষ্ট সময়ের কিছু পরে প্যান-আমেরিকান প্লেন পৌঁছল।

মাস্টারমশাই আমার কাছে সন্দেহ প্রকাশ করলেন দেবাশিসকে চিনতে পারবেন কি তিনি। গিয়েছিল কুড়ি-একুশ বছর বয়সের ছোকরা—

বললাম, আপনাকে চিনতে পারবেন নিশ্চয়। চুলগুলো পেকেছে, অন্য পরিবর্তন বিশেষ হয়নি।

মিঃ ভাদুড়ীর বড় ছেলেদের কাউকে দেখা গেল না।

যাত্রীরা বেরোতে লাগলেন, অধিকাংশ অভারতীয়। আরও কিছুক্ষণ পরে হাতে একটা এটাচি কেশ ও একটা সুটকেশ নিয়ে এক ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। অতি সুপুরুষ, দামী পোশাক। য়ুরোপীয় বলে মনে হয়, কিন্তু মুখের ভাবে, গায়ের রঙে একটু সন্দেহ হয়।

সন্দেহ প্রকাশ করলাম মাস্টারমশায়ের কাছে।

ভাল করে চেয়ে দেখে বললেন, দেবাশিস বলে মনে হচ্ছে। এগিয়ে গেলেন।

ভদ্রলোকের চোখ পড়ল তাঁর দিকে। দেখলাম মুখের গম্ভীর, অনামনস্ক ভাব বদলে গেল, দ্রুতপদে এগিয়ে এসে হাতের জিনিস নামিয়ে রেখে প্রণাম করলেন।

অশোক, অশোক, চেঁচিয়ে ডাকলেন মাস্টারমশাই।

পরিচয় হল মিঃ ভাদুড়ীর সঙ্গে।

এই স্বাস্থ্যবান, সুদর্শন, গম্ভীর যুবক মিঃ এন সি ভাদুড়ীর কুখ্যাত ছোট ছেলে যে বাড়ী থেকে পালিয়েছিল। যে মাস্টারমশাইকে ভোলেনি, মাস্টারমশাইও যাকে ভোলেননি? এক নজরে মনে হয় পার্সোনালিটিওয়ালা বড় দরের অফিস এক্জিকিউটিভ।

হাঁটতে হাঁটতে মাস্টারমশাই বললেন, তোমার দাদাদের কাউকে দেখলাম না, খবর দাওনি কাউকে?

একটু হেসে মাথা নাড়লেন।

কোন হোটেল ঠিক করেছ কি?

আবার মাথা নাড়লেন।

বললেন, অশোক খবর নিয়েছে একটা হোটেলে জায়গা আছে। অশোক, তাড়াতাড়ি জায়গাটা বুক করে আসলে ভাল হয়।

চোখের ইঙ্গিতে মিঃ ভাদুড়ী আমাকে যেতে বারণ করে বললেন, এখন চলুন তো আপনার বাড়ীতে, তারপর দেখা যাবে।

ঘাবড়ে গেলেন মাস্টারমশাই মনে হল, বললেন, তুমি আমার বাড়ীতে যেতে চাচ্ছ সুখের কথা কিন্তু তোমার যে অনেক অসুবিধা হবে।

মিঃ ভাদুড়ী বললেন, সে দেখা যাবে।

আমার দিকে তাকালেন মাস্টারমশাই, দৃষ্টির অর্থ কি করব বলো তো অশোক?

উৎসাহ দিয়ে তাকালাম তাঁর দিকে, বললাম, চলুন।

শহরের দক্ষিণ পাড়ায় বাঙালীপাড়ার কাপড়ের বড় একটা দোকানের সামনে এসে একটু দাঁড়াতে বলে নেমে গেলেন। প্রায় আধ ঘন্টা পরে দোকান থেকে বেরিয়ে এলেন দুটো প্যাকেট হাতে নিয়ে।

গাড়ীতে মাঝে মাঝে কথা চলছিল, আমি ও মাস্টারমশাই বেশী কথা বলছিলাম, মিঃ ভাদুড়ী চুপ করে শুনছিলেন, কোন প্রশ্ন করলে সংক্ষিপ্ত, পরিষ্কার জবাব দিচ্ছিলেন। মাস্টারমশাই খানিকটা নার্ভাস হয়ে পড়েছেন দেখলাম।

একটু হবার কথা। তাঁর জীবনযাত্রা সবরকম বাহুল্যবর্জিত, একটু ঢিলেঢালা গোছের, যেমন মধ্যবিত্ত স্কুল, কলেজের চাকুরিওয়ালাদের হয়। রাঁধবার লোক নাই, বিধবা ভগ্নী রান্না করেন, কাজেই নিরামিষ চলে। সংসারের কাজের জন্য একটা ঝি, বাইরের কাজ অধর একা সব করে। এরকম সংসারে সদ্য আমেরিকা-ফেরং পয়সাওয়ালা অতিথিকে নিয়ে তিনি কি করবেন বুড়োমানুষ চিন্তার কথা বটে।

অতিথি কিন্তু কোন চিন্তা বা ইতস্তত না করে কাঁধ চেপে চলে এলেন য়ুরোপীয় বা আমেরিকান কায়দায় নয়, একেবারে ভারতীয় কায়দায়।

পথের মধ্যে একবার জিজ্ঞেস করলেন, আপনার নতুন বাড়ীতে সংসার দেখে কে?

মাস্টারমশাই বললেন, সংসার নাই, দেখবে কি? সংসার ছেড়ে পালিয়েছি। এক বিধবা ভগ্নী আমার কাছে থাকেন, দুবেলা দুটি খেতে দেন।

বাড়ী পৌঁছে মাস্টারমশাই বললেন, অশোক, একটু বসো।

আমাদের বারান্দায় বসিয়ে রেখে ভেতরে গেলেন। নিস্তব্ধতা ভেঙে আমার দিকে চেয়ে একটু হেসে মিঃ ভাদুড়ী বললেন, মাস্টারমশাই একটু বিব্রত হয়েছেন। আপনার বাড়ীটা কতদূরে?

হেঁটে গেলে মিনিট দশের পথ।

বললেন, বাবার বাড়ীটা কি অবস্থায় আছে এখন বলতে পারেন?

পারি। আপনি অনেক দূরে থেকে আসছেন, ক্লান্ত, দুদিন পরে শুনবেন।

আরও দু' চারটে কথা চলছে আমাদের মধ্যে মাস্টারমশাই এলেন, বললেন, আমার ভগ্নী মহামায়া তোমাকে ডাকছেন।

আমাকে বললেন, অশোক, তুমি বাড়ী যাও এখন, ওবেলা যদি সময় হয় একবার এসো।

মিঃ ভাদুড়ীকে নমস্কার করে বেরিয়ে বাড়ীর দিকে যাবার সময় পথে দেখলাম একটা মোটা বই ও খাতা নিয়ে তুলসী

কলেজে যাচ্ছে। গাড়ী থামিয়ে তাকে ডাকলাম। মিঃ ভাদুড়ীর কথা জানিয়ে বললাম, মাস্টারমশাই একটু নার্ভাস হয়ে পড়েছেন তাঁর অতিথিকে নিয়ে মনে হল। হাতে সময় থাকলে পাঁচ দশ মিনিট তাঁর সঙ্গে কথা বলে যেও।

তুলসী বলল, এ কেমন ধারা জেঠামণির? একটু ভেবে দেখলেন না একা বুড়ো মানুষের কত অসুবিধা হবে? আচ্ছা, আমি কলেজ থেকে ফেরবার সময় যাব, এখন সময় নাই।

তুলসী চলে গেলে, আমি বাড়ীর পথ ধরলাম।

(২৬)

আমরা অন্তিম ইনস্টলমেন্ট।

পৌঁছবার পরদিন দিল্লী চলে গেল দেবাশিস, কথাবার্তা বিশেষ কিছু হল না। সাত দিন পরে দিল্লী থেকে ফিরে এল, সেই দিন নতুন কেনা গাড়ী এল তার জন্য। পরদিন গাড়ী করে আমাকে নিয়ে গেল একটা বাড়ী দেখতে। আমার বাড়ী থেকে মাইল খানেক দূরে। শহরের কোল ঘেঁসে দোতলা নতুন বাড়ী, এখনও কাজ চলছে। বাড়ীর ভেতরে ঘরে ফিরে দেখিয়ে বলল, বাড়ীটা দশ বছরের জন্য লিজ নিয়েছে। একতলায় অফিস বসবে, দোতলায় সে থাকবে। দুজন আমেরিকান এক্সপার্ট আসছেন আসছে মাসে, তাঁরাও থাকবেন। কিছু অদলবদল করে নিতে হবে বাড়ীর ব্যবস্থায়, নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

পরদিন সকালে চা খেয়ে কারখানা করবার জন্য যে জমিটার কথা বলেছিলাম, সেটা দেখতে চলল আমাকে নিয়ে। জমি দেখা হলে অশোকের বাড়ীতে গেল। এটাচি কেস থেকে কতকগুলো নকসা বের করে আধ ঘণ্টাখানেক সময় বোঝাল তার স্কীম কি। তারপর বলল, আমি কাল রাতে বেরিয়ে যাচ্ছি, ফিরতে ক'দিন দেরি হবে। আপনি যদি আজ সন্ধ্যার পরে সময় করতে পারেন মাস্টারমশায়ের বাড়ীতে আসবেন--

অশোক রাজি হল। তাকে বলল, চলুন আপনার কারখানা একটু দেখে যাই যদি আপনার অসুবিধা না হয়।

অশোকের সঙ্গে খানিকটা সময় কারখানা ঘুরে ফিরে দেখল, নানা রকম প্রশ্ন করল। এই ফাঁকে আমি অশোকের নতুন কাজের আইডিয়ার কথা দেবাশিসকে বললাম, তার না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পরামর্শ দিয়েছি জানালাম। চুপ করে শুনল আমার কথা। আমার বক্তব্য শেষ হতে অশোককে ক'টা প্রশ্ন করল। তারপর বলল, আচ্ছা, সন্ধ্যার পরে কথাবার্তা হবে।

সন্ধ্যার পরে অশোক তার দু' ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে আসল। দেবাশিস বাইরে গিয়েছিল, বলে গিয়েছিল সাড়ে সাতটায় ফিরবে। এই অবসরে অশোককে জিজ্ঞেস করলাম, কিছু ধরতে পারলে কি দেবাশিসের প্ল্যান?

হেসে অশোক বলল, বৃহৎ ব্যাপার মনে হচ্ছে যার মনে হচ্ছে একটা নতুন আমেরিকান ইন্ডাস্ট্রি আরম্ভ হচ্ছে এখানে। ক্যাপিটেল আমেরিকান, আমেরিকান এক্সপার্টরা এসে পড়বে।

দেবাশিসের নিজের পোজিশান কি রকম হবে মনে হয়?

বলল, আমেরিকান এক্সপার্ট বোর্ডও ম্যানেজিং ডাইরেক্টর। কথাবার্তা থেকে বোঝা যায় মাথা খুব পরিষ্কার, সব কিছু নখদর্পণে, বেশ পার্সোনালিটি আছে, তবে বিজনেস ব্যাপারে টাকা যার শেষ কথাও তার। আমেরিকান এক্সপার্টদের সঙ্গে মত বিরোধ ঘটলে—

একটু চিন্তা করে বলল, আমার নিজের এই লাইনে নতুন কাজ আরম্ভ করা সম্বন্ধে দ্বিধার মধ্যে পড়েছি।

বললাম, দেবাশিসের সঙ্গে কথা হোক আগে, তোমার দ্বিধার কারণ পরে শুনব। আলাদা কাজ করবার কথা মাথায় আছে তাই কম্পিটিশনের কথা ভাবছ।

দেবাশিস ফিরে এল।

অশোক তার ছেলেদের সঙ্গে দেবাশিসের পরিচয় করে দিচ্ছিল তুলসী ভেতর থেকে বাইরে এসে বলল, আপনারা সবাই চা খাবেন কি?

অশোক বলল, আমরা খেয়ে এসেছি।

দেবাশিস বলল, আমি চা খাব, সঙ্গে দুখানা বিস্কুট দেবেন। দুটো প্যাকেট হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল।

প্যাকেট দুটো হাতে নিয়ে তুলসী বলল, দু'টোতেই বিস্কুট?

দেবাশিস বলল, একটাতে চকোলেট আছে, আপনার, আপনার জেঠামণির জন্য।

প্যাকেট দুটো নিয়ে তুলসী ভেতরে চলে গেল।

কথা চলছে তুলসী থালায় করে চা, বিস্কুট, চকোলেট নিয়ে এল।

অশোকের দিকে তাকিয়ে দেবাশিস বলল, আপনার ছেলেদের সঙ্গে পরিচিত হতে আনন্দিত হলাম। একটা অনুরোধ করছি তাঁদের। একটু পরিশ্রম করে খোঁজ খবর নিয়ে দেখুন আপনাদের কাজ কোনদিকে বাড়ানো যায় কিনা, তাতে কত টাকা পড়বে, লাভের সম্ভাবনা কতটা। এখানকার চালু মাঝারি কার্ডিন্স ইন্ডাস্ট্রি সম্বন্ধে যতটা পারেন খবর সংগ্রহ করুন। আমি ফিরে এসে এ সম্বন্ধে আলোচনা করব। অশোকবাবু আপনার প্ল্যান কাগজে-কলমে দাঁড় করালে আমার বোঝবার সুবিধে হবে।

একটু চুপ করে থেকে বলল, আমি কাল ফ্যাক্ট-ফাইন্ডিংয়ের কাজে বেরোচ্ছি; মানে ক'টা জায়গায় প্লাসস, কেমিক্যালস, কার্বন-সিন্থেটিকসের কারখানা। দেখতে হবে, খোঁজ খবর নিতে হবে। অসুবিধা না হলে আমার সঙ্গে বেরোতে পারেন। খানিকটা অভিজ্ঞতা হবে যখন একাজে নামবার ইচ্ছা আছে। খরচপত্র আমার কারণ আমি একজন সঙ্গী খুঁজছিলাম।

অশোক জানতে চাইল কোথায় কোথায় যাওয়া হবে।

বলল, তালিকা তৈরী আছে, পরিচয়-পত্রও আছে কর্তাদের নামে। দশ বারো দিন লাগতে পারে। তার বেশী লাগলে আপনাকে ছেড়ে দেব।

অশোক রাজি হল।

কিছুক্ষণ পরে অশোক ছেলেদের নিয়ে বিদায় নিল। বলল, তুলসী বাড়ী গেলে তাকে পৌঁছে দিতে পারি।

ভেতরে গিয়ে খবর নিলাম। তুলসী জানাল সে মাকে বলে এসেছে রাতে এখানে থাকবে।

অশোকরা চলে গেলে দেবাশিস খাঁচা-ঘরে ঢুকল। তার ব্যবহারের জন্য সেটা ছেড়ে দিয়েছিলাম।

(২৭)

দেবাশিস ও অশোক ফিরে আসবার দু'দিন পরে দেবাশিস তল্প তাড়া করা বাড়ীতে চলে গেল। তার কাছে খবর পেলাম অশোকের শরীর কিছু খারাপ হয়েছে।

দেবাশিস চলে যাবার পরে অশোককে দেখতে গেলাম। বিশেষ কিছু নয়, অতিরিক্ত পরিশ্রম ও অনিয়মের ফলে একটু স্বাস্থ্যহানি হয়েছে।

বলল, কাল আমি যেতাম, আপনি কেন কষ্ট করে এলেন?

আধ ঘণ্টা মত সময় নানা রকম কথা হল। তার কথা থেকে বুঝলাম নতুন কাজের আইডিয়া সে এক রকম ছেড়ে দিয়েছে। খাটবার শক্তি কমে গিয়েছে। বড় কিছু করবার মত টাকা নাই, ছোটখাটো কিছু করা যায় হয়ত, কিন্তু তা থেকে লাভ টানা যাবে না। তার চেয়ে ফাউণ্ড্রির কাজ বাড়াবার দিকে সে টাকা খরচ করলে লাভ পাওয়া যাবে মনে হয়।

বললাম, দেবাশিসের সঙ্গে যোগ দিতে চাও না?

বলল, তাঁর ক্যাপিটেলের অভাব আছে মনে হয় না, কুঁড়ি লাখের ওপরে আমেরিকা থেকে তুলেছেন। আর তাঁর কাজে সাহায্য করা আমার সাধ্যের বাইরে। মিঃ ভাদুড়ীর কাজের উন্নতি কামনা করা ছাড়া আমার কিছু করবার আছে মনে হয় না।

দেবাশিসের সম্বন্ধে অনেক কথা বলল, প্রশংসা করে। শেষে বলল, বড় জিনিস গড়ে তোলবার শক্তি ওঁর আছে এতে কোন সন্দেহ নাই আমার মনে। যেমন মাথা তেমনি কঠোর পরিশ্রম করবার শক্তি। কাজ তাঁর ধ্যানজ্ঞান। পনের দিন ঘুরে বেড়ালাম এক সঙ্গে, একটা বাজে কথা মুখ ফসকে বেরোতে শুনলাম না। তাই আশ্চর্য লেগেছে আমার।

বাড়ী ফেরবার পথে ভাবছিলাম একটা পুরনো কথা। ব্যারেস্ট মরবে না মনস্টার মরবে দেবাশিসের সঙ্গে পরিচয় হবার পরে এই ছিল আমার প্রশ্ন, আমার উৎকণ্ঠার বিষয়। মনস্টার মরেছে কি? না মার খেয়ে মরবার মত হয়ে পড়ে রয়েছে?

দেবাশিস খুব ব্যস্ত, তার আমেরিকান এক্সপার্টরা এসে গিয়েছেন, কারখানার বাড়ীঘর উঠছে, নানা রকমের মাল আসছে আমেরিকা থেকে। পাঁচ সাত দিন পরে

পরে দশ পনের মিনিটের জন্য আমার সংগে দেখা করে যায়।

মাস কয়েক কেটে গেল।

দিন পনের দেবাশিসের সংগে দেখা নাই, শুনেছিলাম সে বাইরে গিয়েছে। তারপর একদিন সকালে সাইকেলে নিয়ে একটি লোক এসে একখানা চিঠি দিল। দেবাশিসের চিঠি। লিখেছে, মাস্টারমশাই, পিসীমাকে বলবেন আজ দুপুরে আমার জন্য যেন দুটি ভাত রাখেন। বারোটা নাগাদ যাব।

মহামায়াকে চিঠির কথা বললাম।

বাইরে ফিরে এসে খবরের কাগজটা হাতে নিয়েছি গাড়ীর শব্দ পেলাম। অশোকের বড় ছেলে রমেন বারান্দায় উঠে এসে বলল, আপনি একবার আসুন। ফণীর মা মারা গিয়েছেন, বাবা ও বাড়ীতে রয়েছেন।

চমকে উঠলাম, তুলসীর মা মারা গিয়েছেন?

মহামায়াকে খবর জানিয়ে তাকে সংগে নিয়ে অশোকের গাড়ীতে তুলসীদের বাড়ীতে পৌঁছলাম। আমাদের নামিয়ে দিয়ে রমেন গাড়ী নিয়ে বাড়ীতে গেল তার মাকে আনবার জন্য।

দেখলাম কয়েকজন প্রতিবেশী এসেছেন, অশোক পায়চারি করছে উঠোনে। মহামায়া ঘরে গেল। অশোক আমার কাছে এসে বলল, কাল রাত থেকে রক্ত দাস্ত ও বমি আরম্ভ হয়েছিল। ডাক্তার ডেকেছিল ফণী। ওষুধ দেয়া হয়েছিল, তুলসী ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করে কটা ইনজেকশান দিয়েছিল, কোন উপকার হয়নি। ভোরবেলা ফণী আমাকে ডাকতে গিয়েছিল, আমি এসে গাড়ী পাঠিয়ে ডাক্তারকে এনেছিলাম। তিনি পৌঁছবার কিছুক্ষণ পরে শেষ হয়ে গেল। ডাক্তার পরীক্ষা করে বললেন হার্ট ফেল করেছে।

ঘরে ঢুকে দেখলাম মেঝেতে খান দুই ডাক্তারী বই, ইনজেকশানের সরঞ্জাম, ওষুধের শিশি, তুলসী মায়ের বুকে ওপর মাথা রেখে দুহাতে তাকে আঁকড়ে ধরে রয়েছে।

অশোকের ছেলেরা ও প্রতিবেশীরা সব ব্যবস্থা করছিলেন। মহামায়া তুলসীকে জড়িয়ে ধরে বাইরে নিয়ে এল। অশোক তার ছোট ছেলেকে বলল, তাদের দুজনকে আমার বাড়ীতে নিয়ে যেতে। তুলসী মহামায়ার হাত ছাড়িয়ে ছুটে এসে আমাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল, আমার কি হল জেঠামণি, কোথায় যাব আমি মাকে ছেড়ে?

একখানা গাড়ী এসে দাঁড়াল বাড়ীর সামনে, দেবাশিস নেমে এসে কাছে দাঁড়াল।

তুলসীকে বললাম, আমার কাছে থাকবি তুই, চল।

তাকে ধরে নিয়ে অশোকের গাড়ীর দিকে এগোতে দেবাশিস বলল, আমার গাড়ীতে উঠুন, অশোকবাবুর গাড়ীটা দরকার হতে পারে।

মহামায়া ও তুলসীকে দেবাশিসের গাড়ীতে বসিয়ে অশোককে বললাম, ঘরগুলোয় তালা দিয়ো, কাজ শেষ হলে ফণীকে আমার বাড়ীতে পৌঁছে দিতে বলো রমেন বা সুরেনকে, সেখানে তার হবিষ্যের ব্যবস্থা হবে।

মৃতদেহ বাইরে আনা হল। তুলসী গাড়ী থেকে নেমে ছুটে গিয়ে মায়ের পায়ে মাথা রেখে পড়ে রইল কিছুক্ষণ। তাকে তুলে আনতে হল।

বরদাবাবুর বড় ছেলেকে খবর দেয়া হয়েছিল, সে এল না, ফণীকে মায়ের শ্রাদ্ধ করতে হল।

ফণীর ব্যবস্থা অশোক করল। সে বাড়ীতে রইল, কারখানার দুজন লোকও বাড়ীতে স্থান পেল, তুলসীর একা ও বাড়ীতে থাকা চলে না, সে আমার কাছে রইল।

মাসখানেক যেতে তুলসী পড়াশোনা আরম্ভ করল। আরও মাস দুই যেতে লক্ষ্য করলাম তুলসীর মধ্যে একটা পরিবর্তন ঘটেছে। পরিবর্তনের মানে কি বুঝতে একটু সময় লাগল। পরিবর্তনের একটা লক্ষণ দেখলাম সে বুঝি জেঠাইমণির ওপরে আরও নির্ভরশীল হয়েছে, আবার তার অভিভাবিকা পদে ওঠবার চেষ্টাও করছে। আগেও করত ছোটখাট ব্যাপার নিয়ে মাঝে মাঝে। আরেকটা লক্ষণ দেখলাম সকাল বেলা ও সন্ধ্যাবেলা কিছুটা সময় মহামায়ার সংগে তার পুজোর ঘরে, মানে তার শোবার ঘরের এক কোণে যেখানে তার দেবদেবীর ছবি, পুজো করবার দুচারটে তৈজসপত্র থাকে সেখানে কাটাতে আরম্ভ করেছে। তারপর দেখলাম ভেতরের আঙিনায় তুলসী গাছ লাগিয়ে তুলসীমঞ্চ তৈরী করেছিল মহামায়া সকালে সেটা গোবর জল দিয়ে নিকোতে, সন্ধ্যার সময় বাড়ী থাকলে সেখানে প্রদীপ দিয়ে শাঁখ বাজাতে আরম্ভ করল। প্রদীপ দেবার সময় মহামায়ার তসরের থান পরত, কদিন পরে দেখলাম লাল পাড় তসরের শাড়ি উঠেছে অংগে। সম্ভবত মহামায়ার হস্তক্ষেপের ফলে এটা ঘটল।

ডাক্তারি পড়ছে যে বছর তেইশের মেয়ে আড়াল থেকে তার এই কাণ্ড দেখে কৌতুক বোধ করতাম, ভালও লাগত। আমাকে দেখে লজ্জা পেতে পারে মনে করে সামনে যেতাম না। তারপর দেখলাম এটা ভুল, লজ্জা পাবার কোন লক্ষণই প্রকাশ করল না দু একদিন বারান্দায় আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে। একদিন ডাকলাম প্রদীপ দিয়ে শাঁখ বাজিয়ে ফেরবার সময়ে। কাছে এসে দাঁড়াল হাসিমুখে। দাঁড়াবার ভংগীটা নতুন লাগল। বললাম, একটা সেমিজ কি ব্লাউজ পরিস।

মুখ তুলে বলল, কেন? তোমাকে লজ্জা করব কি জেঠামণি?

বললাম, আমাকে লজ্জা করবি কেন? বাইরের কেউ হঠাৎ এসে পড়লে—

কেউ আসবে না।

গলায় ওটা কি পরেছিস? এতদিন তো গলা খালি দেখেছি।

একটু হেসে বলল, তুলসীর মালা। পিসীমা দিয়েছেন।

আচ্ছা, যা এবার।

এরপর মাস দুই খুব ব্যস্ত রইল তুলসী তার পরীক্ষা নিয়ে। রাত জেগে পড়তে লাগল। ঘরে আলো জেলে পড়লে মহামায়ার ঘুম হবে না বলে খাঁচাঘরে বসে পড়তে লাগল। তার ফলে আমাকে বারান্দায় র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে আরাম চেয়ারে শুয়ে থাকতে দেখে বলল, ওটা তোমার কি হচ্ছে জেঠামণি? বুড়ো মানুষ, রাতে ঘুমুতে না পারলে—

বললাম, কি করতে হবে আমাকে তাহলে?

নিজের ঘরে শুয়ে আরাম করে ঘুমুবে। আমার ঘুম পেলে ঘর বন্ধ করে ভেতরে চলে যাব।

যদি পড়তে পড়তে খাঁচাঘরে ঘুমিয়ে পড়িস।

হাসতে লাগল, সে চান্স নাই বলা যায় না।

বললাম, কাল একটা টেবিল ল্যাম্প কিনে আনিস। সেটা জেলে পড়লে মহামায়ার চোখে আলো লাগবে না।

শেষ পরীক্ষার দিন তুলসীর ফিরতে দেরি হচ্ছিল। ও মেয়ে তো দেরি করে না বাড়ী ফিরতে। একটু চিন্তায় ভাব এল মনে সন্ধ্যা হয়ে আসছে দেখে।

অশোক এল।

কদিন তাকে দেখিনি; তার নিজের, বাড়ীর সকলের কুশল প্রশ্ন করলাম, কাজ কর্মের কথা জিজ্ঞেস করলাম। কাজ বাড়াচ্ছে অশোকের ছেলেরা, কারখানা বড় করছে বলছিল অশোক। সাইকেল রিকশার বেল বাজল।

তুলসী এল বোধ হয়, উঠে দাঁড়ালাম।

তুলসী বারান্দায় উঠতে বললাম, এত

রসুই

গুঁড়া মশলা

ফোন : ৫৫-২৪৪১, ৩৩-১৪৭১

রসুই প্রোডাক্টস্

১৭ আর জি কর রোড, কলিকাতা-৪ ॥ ২০১ মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা-৭

দেরি কেন তোর? পরীক্ষা ভালভাবে হয়েছে তো?

বলল, বাড়ী গিয়েছিলাম বন্ধীর সঙ্গে দেখা করতে। খিদে পেয়েছে, পেট ঠাণ্ডা হলে কথা বলব।

অশোককে দেখে বলল, ভাল আছেন বড়বাবু? বসুন, চা করে আনছি।

ভেতরে যাবার আগে বলল, একটু দেরি হলে উঠে পড়বেন না যেন।

মিনিট পনের পরে ফিরে এল, কাপড় বদলে, দু হাতে দুটো ডিশ নিয়ে।

বললাম, খিদে পেয়েছে বললি, এ সব করতে গেলি কেন?

বলল, পিসীমা সব ঠিক করে রেখে-ছিলেন, ভেজে দিলেন। আমাকে ক'খানা খাইয়ে দিয়েছেন, আরও ভাজছেন।

ভেতরে গিয়ে একটু পরে চা নিয়ে এল, বলল, বড়বাবু খান। আবার ভেতর গেল।

চা খেয়ে কিছুক্ষণ গল্প করে ওঠবার সময় অশোক বলল, কাল মিঃ ভাদুড়ীর সঙ্গে দেখা হল, তাঁর বাড়ীর সামনে। বেরোচ্ছিলেন, সঙ্গে দুজন সাহেব। দু একটা কথা হল।

বললাম, ব্যস্ত আছে কাজে, আমার সঙ্গে সাত আট দিন দেখা হয় না।

অশোক চলে গেলে ভেতরে গিয়ে তুলসীকে ডাকলাম। মহামায়ার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলল, এখন পিসীমার ঘরে একটু বসছি, এরপর কিছুক্ষণের জন্য রান্না-ঘরে যাব। খাবার পরে গল্প করব। পরীক্ষায় পাশ করতে পারি বলে মনে হয়।

রাতের খাওয়া শেষ হলে তুলসী বলল, আজ পিসীমার ঘরে বসে গল্প হবে, তুমি এসো। অধরকে বলছি সব বন্ধ করে শুতে যাবে।

ঘরের মেঝেতে মাদুর পেতে গল্পের আসর বসল। তুলসী নিজের বালিশ দুটো আমাকে দিয়ে বলল, ঠেস দিয়ে বসো আরাম করে, একখানা চাদর দিয়ে পা ঢেকে দিল।

বললাম, কি গল্প হবে? আমাকেই শোনাতে হবে না কি?

বলল, আমি গল্প বলব, তোমরা শুনবে।
বললাম, ভাল প্রস্তাব।

তুলসী বলল, আজ বাড়ীতে গিয়েছিলাম বন্ধীর সঙ্গে দেখা করতে বলেছি। ঠিক তা নয়, দু চারটে জিনিস আনতে গিয়েছিলাম। বন্ধীকে বলে জিনিসগুলো আনলাম, নইলে কিছু মনে করত হয়ত। জিনিসগুলো কি শোন। মার একখানা গীতা, একটা ছোট রুপোর কৌটো, তাতে কেদারনাথ ও বদ্রি-নাথের নির্মাল্য থাকত, তাঁর এক কাকার কাছে মা এই নির্মাল্য পেয়েছিলেন শুনেছি, বিয়ের পরে বাবার সঙ্গে তোলা মার একখানা কাচ ভাঙা ফটো আর লাল রেশমি সুতোয় মার হাতে আমার নাম লেখা একখানা ছোট বৃন্দাবনী ছাপা শাড়ি। মার পিঁড়িটা আনবার ইচ্ছা ছিল, নষ্ট হয়ে গিয়েছে অযত্নে পড়ে থেকে, আনলাম না।

মা দেখতে বেশ ভাল ছিলেন, বড়লোকের মেয়ে, বি-এ পাশ। অনেক ভাল বিয়ে হতে পারত তাঁর, হয়নি। ভালবাসার বিয়ে হয়েছিল তাঁর। বাবা আমার এক মামার বন্ধু ছিলেন, ও বাড়ীতে যাতায়াত ছিল তাঁর। চেহারা ভাল, শৌখিন পোশাক পরিচ্ছদ, লেখাপড়া জানেন, অল্প বয়সে ভাল চাকুরি করতেন, দেশে বাড়ীঘর, জমিজমা ছিল। দাদুর আপত্তি সত্ত্বেও মার ইচ্ছা ও মামার চেষ্টায় বিয়ে হয়ে গেল।

সেই ভালবাসার বিয়ের কি পরিণতি হল তোমরা দুজনে জানো। ক'টা বছর হয়ত সুখেই কেটেছিল মার। বেশ শৌখিন মানুষ ছিলেন মা, ঠাণ্ডা স্বভাবের মানুষ, ঠাকুর দেবতায় গভীর ভক্তি ছিল। বাড়ীটা তৈরী হলে নিজের হাতে ফুলের বাগান করেছিলেন পুজো করবার ফুলের জন্য, সুন্দর তুলসীমঞ্চ করেছিলেন। তুলসীমঞ্চ নিজের হাতে নিকোতেন, সন্ধ্যাবেলা মঞ্চে প্রদীপ দিয়ে প্রণাম করতেন, শাঁখ বাজাতেন। ছেলেবেলা থেকে দেখেছি, আমার বেশ মনে আছে। এ জিনিসটা পেয়েছিলেন তাঁর মার কাছে। বড়লোকের বাড়ীর কর্ত্রী, পুরনো আগের নিয়ম মেনে চলতেন। দিদিমার তৈরী তুলসীমঞ্চটা আর নাই, মামারা বাড়ী ভাগ করবার সময়ে সেটা ভেঙে পার্টিশান দেয়াল তুলেছেন।

ইস্ট ইন্ডিয়া কর্পোরেশনে চাকুরী করতেন বাবা, শুনেছি একটা সেকশানের কর্তার পদে উঠেছিলেন। কোম্পানী ফেল করল। সে চাকুরি গেল, একটা ছোট চাকুরির যোগাড় হল। তার আগে থেকে বাড়ীতে অশান্তি আরম্ভ হয়েছিল।

একদিন ভালবেসে যাঁকে বিয়ে করে-ছিলেন মা, চরম তাচ্ছিল্য, অপমান, লাঞ্ছনা পেয়ে তাঁকে ত্যাগ করে সরে যেতে হল। দারিদ্র্যের কষ্টে ভয় পেতেন না মা, অসম্ভব খাটতে পারতেন। অপমান গায়ে মাখতেন না, মাতাল, নেশাখোর, অর্থলোভী স্বামীর প্রতিহিংসাতে ভয় পেয়ে চলে গেলেন, নিজে রোজগার করে আমার পড়বার খরচ চালাবেন প্রতিজ্ঞা করে। তিনি জানতেন না তাঁর দেয়া টাকা বাবা কেড়ে নিতেন, আমার পড়াশোনা আগেই বন্ধ হয়েছিল।

সংসারে আটানব্বই জন লোক তো দরিদ্র, তাই না জেঠামণি? দরিদ্র হলেই কি উচ্ছন্নে যায় মানুষ? তাহলে মানুষ কোথায় পাব দেশে? দারিদ্র্যের সঙ্গে অসম্ভব লোভ এসেছিল বলে বাবা পাগল হয়ে গিয়ে-ছিলেন, অতি স্বার্থপর, নিষ্ঠুর, অত্যাচারী হয়েছিলেন।

মার সমস্ত জীবনটা একটা গল্পের মত মনের মধ্যে বাসা করে রয়েছে। সুন্দর ছিল তাঁর বাইরের রূপ। আরও সুন্দর ছিল তাঁর ভেতরের রূপ। উন্নত আদর্শ ছিল তাঁর মনে পতিব্রতা স্ত্রীর, কর্মকুশলা গৃহিণীর, স্নেহময়ী মায়ের। কোন কাজে লাগল কি তাঁর আদর্শবাদ?

জেঠামণির দয়ায়, অশোকবাবুর দয়ায় শেষের ক'দিন একটু শান্তি পেয়ে-ছিলেন মা। বলেছিলেন, আমার ভাবনা আর নেই, দুটো অন্নের সংস্থান হয়েছে, স্বামীর ভিটায় বাস করতে পারছেন, এতেই সুখী হয়েছিলেন তিনি। একটা ভাবনা ছিল মনে আমার জন্য। তাঁকে বুঝিয়ে বলেছিলাম আমার ভার তো জেঠা-মণি নিয়েছেন, তুমি একটুকুও ভেবো না আমার জন্য। নিজের পায়ে না দাঁড়িয়ে আমার বিয়ে করা যে কোনমতে উচিত নয় মা একথা কি বুঝতে পারছ না? বুঝতে পেরেছিলেন তিনি। বলেছিলেন, দেবতার পায়ে তোকে দিয়ে দিয়েছি, তুই তাঁর, আমি আর ভাবব না।

অকালে বিনা চিকিৎসায় মা মারা গেলেন জেঠামণি। তোমার কাছে থেকে পড়াশোনার মধ্যে থেকে তাঁর কথা ভুলতে পারি না, মনে হয় তাঁকে সুখী করতে পারলাম না, একটা সুন্দর জীবন দুঃখ পেয়ে অকালে বিদায় নিল সংসার থেকে। কত ভাল হত যদি তার মুখে হাসিতে ভরে দিতে পারতাম। এটা অবশ্য আমার কথা। জানতাম ভগবানকে বুকের মধ্যে রেখে মা লড়াই করেছেন সংসারের সঙ্গে, অদৃষ্টের নিষ্ঠুর মার খেয়ে হার স্বীকার করেননি।

মাঝে মাঝে কেমন হয়ে যায় মন, কান্না চাপতে পারি না। তাঁর স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে দু-তিনটে জিনিস নিয়ে এলাম আজ বাড়ীতে গিয়ে। আমার চোখের সামনে থাকবে তাঁর গীতা তাঁর নির্মাল্যের কৌটো, তাঁর দুঃখের জীবনে এক সময়ে সুখের স্মৃতি কাচভাঙা ফটোখানা।

তুলসী চুপ করল। মহামায়ার দিকে তাকালাম, তার দু চোখ থেকে জল পড়ছিল। তুলসী থামতে দু হাত বাড়িয়ে তাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরল।

তুলসীর কথা শুনে বুঝলাম আমার একটু ভুল হয়েছিল। মহামায়ার দৃষ্টান্ত দেখে নয়, তার মার কথা মনে রেখে তুলসী-মঞ্চ নিকোতে, প্রদীপ দিয়ে শাঁখ বাজাতে শুরু করেছিল তুলসী। আরও বুঝলাম বাইরে থেকে দেখতে এই চটপটে, ঝকঝকে মেয়েটির মনে পুরনো দিনের আদর্শ, পুরনো দিনের ভাবভক্তি মূল বিস্তার করেছে ছোটবেলা থেকে। তার আবেগপ্রবণ স্বভাবের সব সরলতা এই আদর্শ ও ভক্তিকে আরও উজ্জ্বলতা দিয়েছে সে বড় হবার পরে।

যে বস্তুর ইঙ্গিত পেয়েছিলাম তুলসীর সঙ্গে প্রথম আলাপের পরে তার সন্ধান পাওয়া গেল।

তুলসীর মাথায় হাত রেখে বললাম, তোর গল্প শুনে ভাল লাগল, এবার দোর বন্ধ করে বিছানায় যা, আমি যাচ্ছি।
হ্যাঁ, শুতে যাও তুমি, তুলসী বলল।

(ক্রমশঃ)

এই আমাদের দেশ

গঙ্গার কোল ঘেঁসে ঘণ্টাধ্বনি-মুখর ব্যাণ্ডেল ঘুরে আসুন

গির্জার ঘণ্টাধ্বনির মধ্যে একটা করুণ অথচ প্রত্যাশিত সুর ভেসে বেড়ায়। কেমন যেন মনে হয় চোখে না দেখা অনুষ্ঠানের উচ্চারিত মন্ত্র যদি শুধু কানে আসতো কিংবা দূরের গির্জার ঘণ্টাধ্বনি যদি অবসর মুহূর্তগুলি ভরিয়ে দিত তবে তার নিস্তরঙ্গ আনন্দ উপভোগ করা যেত বুক ডুবিয়ে। খুব ভোরে খোলা মাঠের অন্তর পেরিয়ে আজানের সুর যে কোন মানুষকে নতুন দিনের সন্ধান দিতে পারে।

ব্যাণ্ডেল চার্চে গিয়ে প্রাঙ্গনটা ঘুরে আসার পর প্রার্থনা-ঘণ্টা বেজে উঠল। শীতের মিষ্টি রোদ্দুর এসে পড়েছে সমস্ত চত্বরটায়, রোদে পিঠ দিয়ে প্রার্থনা দেখছিলাম। সারি সারি মানুষ নিবিষ্ট চিত্তে যিশু-মেরির সামনে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা জানাচ্ছেন। দীপাধারে মোমবাতির স্নিগ্ধ আলো গিয়ে পড়েছে যিশু-মেরির মূর্তির ওপর। সমস্বরে উচ্চারিত হচ্ছে এক একটি লাইন। সব মিলিয়ে প্রার্থনা ঘরটি মনোরম পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল।

হাওড়া স্টেশন থেকে ব্যাণ্ডেল মাইল পঁচিশেক দূরে। ব্যাণ্ডেল থেকে চার্চ সামান্য দূরে, হেঁটে বা রিকসায় যেতে পারেন। চার্চটিই ব্যাণ্ডেলের একমাত্র আকর্ষণ। পর্তুগীজরা চার্চটি নির্মাণ করেন ১৫৫৯ খৃঃ। অনেকের মতে এটিই বাংলাদেশের খৃস্টানদের আদি উপাসনা মন্দির। গির্জার ভেতরে দেওয়ালের গায়ে প্রচুর ছবি খোদাই করা আছে। প্রত্যেকটি ঘরই ঝকঝকে তকতকে। ছোট্ট বাগানের ভেতর দিয়ে ছাদে ওঠার সিঁড়ি। ছাদের ওপর দাঁড়িয়ে সামনের গঙ্গা, গঙ্গার ওপারের অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়।

অনেকবারই গির্জাটি যুদ্ধবিগ্রহে ধ্বংস ও ভস্মিভূত হয়েছে। ১৬৩১ সালে মোগলদের কাছে পর্তুগীজরা পরাজিত হয়। হুগলী অধিকার করার সময় পর্তুগীজদের দুর্গ ও এই গির্জা ভেঙে দেওয়া হয়েছিল। সে সময় বহু খৃস্টানকে বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল আগ্রায়। এ নিয়ে সুন্দর একটা প্রবাদ আছে। সম্রাট জাহাঙ্গীর আদেশ দিলেন বন্দী পাদ্রী দা' ক্রুজকে উন্মত্ত হাতির পায়ের সামনে ফেলে দাও। হলও তাই। কিন্তু মত্ত হাতি দা' ক্রুজকে পদদলিত করার বদলে শুঁড় দিয়ে তুলে আদর করতে লাগল। এতে সম্রাট বিস্মিত হলেন, মনে মনে ভয়ও পেলেন। দা' ক্রুজকে অব্যাহতি দিলেন। দা' ক্রুজের অনুরোধেই ব্যাণ্ডেলের গির্জা আবার তৈরী করার অনুমতি দিলেন। গির্জা নির্মাণের খরচ বাবদ বহু নিষ্কর জমি দিয়ে দিলেন। উন্মত্ত হাতির পায়ের তলা থেকে দা' ক্রুজের আশ্চর্যভাবে রক্ষা পাওয়ার ঘটনাটি স্মরণ করে এখনও এই গির্জায় 'ডোমিংগো দা' ক্রুজ' নামে এক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

আরও একটি প্রবাদ জড়িয়ে আছে এর সঙ্গে। মা মেরির যে মূর্তিটি এখন গির্জায় আছে সেটি আগে হুগলীর সেনা-নিবাসে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই মূর্তিটি পাদ্রী ক্রুজের খুব ভাল লেগেছিল। ক্রুজের এক বন্ধুও মূর্তিটির অনুরক্ত ছিলেন। মোগল পর্তুগীজ সংঘর্ষের সময় মূর্তিটি বিনষ্ট হবার আশঙ্কায় বন্ধুটি মূর্তিটিকে নিয়ে নদীর জলে ঝাঁপ দিয়েছিলেন, পরে আর মূর্তিটির কোন হদিশ পাওয়া যায়নি। পাদ্রী ক্রুজ এই ঘটনায় খুব আঘাত পেয়ে-ছিলেন এবং বন্ধু ও মূর্তিটি ফিরে পাওয়ার জন্যে রাতদিন প্রার্থনা জানিয়েছিলেন। আগ্রা থেকে মুক্তি পাবার পর ভারতবর্ষ ও সিংহলের খৃস্টানদের কাছে আবেদন জানিয়ে-ছিলেন গির্জা সংস্কারের অর্থ সাহায্যের জন্যে। অবশেষে তিনি গির্জা সংস্কারের কাজে লেগে যান। সংস্কারের কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে এমন সময় একদিন জোৎস্না রাতে তিনি দেখলেন গির্জার সামনের নদীর জল ভীষণভাবে আছাড় খাচ্ছে। জলের শব্দে ক্রুজের ঘুম ভেঙে গেল। তিনি শুনতে পেলেন জলের মধ্য থেকে বহুদিন পূর্বের হারানো মূর্তি

ক্রীড়া ও বিনোদন সংখ্যা ১৩৭৭

সাময়িক পত্রিকার জগতে অমৃতই সর্বপ্রথম এই ধরণের বিনোদন সংখ্যা প্রকাশ শুরু করে। তারপর প্রতি বছরই বড়দিনের সময় এই সংখ্যাটি প্রকাশ করা হচ্ছে। এবারও বেরোবে আগামী ২৫ ডিসেম্বর।

অসংখ্য ছবি

চলচ্চিত্র, নাট্যমঞ্চ, ফ্যাশান, খেলা-ধুলা, সঙ্গীত এবং অন্যান্য বিষয়।

গল্প

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, ছবি বসু, চণ্ডী মণ্ডল এবং যশোদাজীবন ভট্টাচার্য।

চলচ্চিত্র, নাট্যমঞ্চ, ভ্রমণ, ফ্যাশান এবং সঙ্গীত

সত্যজিৎ রায়, শম্ভু মিত্র, ঋত্বিককুমার ঘটক, চিদানন্দ দাশগুপ্ত, শান্তিগোপাল, অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, এন কে জি, পশুপতি চট্টোপাধ্যায়, নির্মল ধর, দিলীপ মৌলিক, দক্ষিণারঞ্জন বসু, ভবতোষ সাহা, বিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য, নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্ধ্যা সেন।

ফেলে-আসা দিনের স্মৃতি আলেখ্য

নানা রঙয়ের দিনগুলি
কানন দেবী

খেলাধুলো

অজয় বসু, আরবি, মতি নন্দী, দিলীপ দত্ত, অজয় হোম, গজানন্দ বোড়ে, অমল দাশগুপ্ত, কমল ভট্টাচার্য, ক্ষেত্রনাথ রায় এবং কয়েকজন।

পরবর্তী সংখ্যায় পূর্ণ বিবরণ দেখুন।

তাঁকে ডাকছেন। জানলা দিয়ে দেখতে পেলেন ধবধবে জ্যোৎস্নায় নদীর একটা দিক ঝলমল করছে আর জ্যোৎস্না পেরিয়ে একটি লোক তাঁর দিকে আসছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সমস্ত কেমন নিস্তব্ধ হয়ে গেল, জ্যোৎস্না মিলিয়ে গেল। পরের দিন ভোরে ঘুম ভাঙার পর দা' ক্রুজ দেখলেন প্রচুর লোক গির্জার সামনে জমায়েত হয়ে বলাবলি করছে 'গুরুমো এসেছেন'। দা' ক্রুজ চমকে উঠলেন, একটু এগিয়ে যেতেই দেখলেন মেরীর মূর্তিটি ফিরে এসেছে। আনন্দে উল্লাস করে উঠলেন দা' ক্রুজ, তাঁর অত্যন্ত প্রিয় মূর্তিটি আর কখনও যে ফিরে পাবেন এ আশা ছিল না। গত রাত্রের স্বপ্নের কথা মনে পড়ল, প্রিয় বন্ধুটির জন্যে কষ্ট বোধ করলেন দা' ক্রুজ। তারপর খুব ধুমধাম করে মেরীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করলেন তিনি।

গির্জার দক্ষিণে কয়েকটি সমাধির মধ্যে দেখতে পাবেন জাহাজের একটি মাস্তুল পোঁতা রয়েছে। এটি নিয়েও অদ্ভুত ধরনের এক কাহিনী আছে। যেদিন মেরীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়, সেদিনই হঠাৎ একটি জাহাজ এসে সামনের ঘাটে ভিড়ল। জাহাজ থেকে নেমে এলেন ক্যাপটেন। বললেন, জাহাজটি বঙ্গোপসাগরে ভীষণ ঝড়ের মধ্যে পড়ে। পরিত্রাণের কোন পথ না পেয়ে তিনি মাতা মেরীর কাছে বারবার প্রার্থনা করতে থাকেন জাহাজটিকে নিরাপদ কোন বন্দরে পৌঁছে দেবার জন্যে। ঝড় থেমে গেলে সহসা ক্যাপটেন দেখতে পান তিনি জাহাজ সমেত এই গির্জার ঘাটে এসে পৌঁছেছেন।

নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাবার পর জাহাজের নাবিকরা মেরীর প্রতিষ্ঠা উৎসবে যোগ দিলেন খুশিমনে আর মানত রক্ষার জন্যে ক্যাপটেন জাহাজ থেকে একটি মাস্তুল নিয়ে গির্জায় উপহার দিলেন। সেই থেকেই মাস্তুলটি পোঁতা রয়েছে প্রাঙ্গণে।

গির্জার সামনে বিস্তৃত মাঠ, মাঠের পরে গঙ্গা। প্রাঙ্গণে কিছু গাছপালা, শীতের দিনে রোদছায়া প্রাঙ্গণে গাছের নীচে গল্প-গুজব করতে ভাল লাগবে। যে কোন একটা দিনের ছুটিতে সকালে বেরিয়ে সন্ধ্যের মধ্যে ফিরে আসার কোন অসুবিধে নেই। এমনকি কিছু জিনিষপত্র কেনাকাটা করে নিয়ে পিকনিক করাও যেতে পারে পাশাপাশি গাছপালা-ওলা মাঠে। শীতকালের পিকনিক স্পট হিসেবে ব্যান্ডেল আপনি অনায়াসেই বেছে নিতে পারেন। গঙ্গা সৌনিক থেকে প্রচুর সহায়তা করবে। পিকনিক সেরে গঙ্গায় নৌকো চড়ার ইচ্ছে করলেও পেয়ে যাবেন ভাড়াটে নৌকো। ফেরোতে সে আপনাকে বেশ খানিকদূর ঘুরিয়ে আনবে, ওপারেও যেতে পারেন। দাঁড় বাইতে জানলে বা উৎসাহী হলে নৌকা ভ্রমণ বেশ উপভোগ্য হয়ে উঠবে।

—নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

যদুনাথ সরকার

গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

জীবনব্যাপী ইতিহাস চর্চায় যদুনাথ সরকার, সতের শতক থেকে উনিশ শতক পর্যন্ত, ভারতের এই দুশ বছরের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ইতিহাস নতুনভাবে আবিষ্কার করে গেছেন। শাজাহান আওরঙ্গজেবের আমল থেকে দ্বিতীয় শাহ আলম, শিবাজী থেকে তাঁর উত্তরাধিকারী পেশোয়াদের আমল নানান তথ্যে ও প্রমাণে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। পেশোয়াদের সময়ে মারাঠা জাতির চারিত্র-শৈথিল্য ও অন্তর্দ্বন্দ্বই এই জাতিকে মোগল সাম্রাজ্যের ওপর অধিকার বিস্তারে অক্ষম করেছিল—তাই দেশপ্রেমিক যদুনাথ ক্ষোভ করেছিলেন আন্তরিকভাবে, বহু রচনায় তা নানাভাবে পরিস্ফুট। যদুনাথের মতে মুঘল সাম্রাজ্য পতনের কালে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে ভারতবাসীর চরিত্রহীনতা রাষ্ট্র-ব্যবস্থা ও সমাজ-ব্যবস্থাকে বিকৃত করে তুলেছিল। এই রন্ধ্রপথে ঘটে ইংরেজের অনুপ্রবেশ। শেষ জীবনে যদুনাথ তাঁর রচিত ভারতের সামরিক ইতিহাসে বিভিন্ন যুদ্ধে ভারতবাসীর পরাজয়ের কারণ বিশ্লেষণ করে দেখান। এই গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য ছিল স্বাধীন ভারতের রক্ষাব্যবস্থা যাতে সুদৃঢ় করা হয় এবং অতীতের ভুলগুলির পুনরাবৃত্তি না ঘটে। যদুনাথের ইতিহাস সাধনার বৈশিষ্ট্য ছিল যে, সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তি ছাড়া তিনি একপদও অগ্রসর হন নি। ফরাসী, পর্তুগীজ, হিন্দী, মারাঠী, রাজস্থানী, গুজরাটি, গুরুমুখী, অসমীয়া প্রভৃতি ভাষা তিনি সযত্নে শেখেন ঐতিহাসিক নথিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ, পাণ্ডুলিপি প্রভৃতি নিজে পড়ে জ্ঞানলাভের জন্য। ঐ সব ভাষায় লিখিত তথ্যাবলী নিজের রচনায় ব্যবহার করেন। ঐতিহাসিক উপকরণ ও ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান ও যুদ্ধক্ষেত্রগুলি দেখার উদ্দেশ্য নিয়ে যদুনাথ কমপক্ষে ৪০ বার উত্তর ও দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ করেছিলেন।

১৮৭০ খৃঃ ১০ ডিসেম্বর অবিভক্ত বাঙলার রাজশাহী জেলার করচমারিয়া গ্রামে এক বিশিষ্ট জমিদার পরিবারে যদুনাথের জন্ম। বিদ্যোৎসাহী পিতার বহু পুস্তকপূর্ণ পাঠাগারে বসে অল্প বয়সেই যদুনাথ ইতিহাস ও সাহিত্য সংক্রান্ত বহু বই পড়েছিলেন। প্রবেশিকা ও ফার্স্ট আর্টস পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীর বৃত্তি পেয়ে যদুনাথ কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে ইংরাজী ও ইতিহাসে প্রথম শ্রেণীর অনার্স নিয়ে ১৮৯১ খৃঃ বি-এ পাশ করেন। ১৮৯২ খৃঃ ইংরাজীতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে যদুনাথ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ ডিগ্রী পান। তারপর কয়েক বছর রিপন কলেজ ও মেট্রোপলিটন কলেজে ইংরাজী ও ইতিহাসের অধ্যাপনা করেন। ১৮৯৭ খৃঃ মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময় ভারতের অবস্থা সম্বন্ধে গবেষণামূলক নিবন্ধ লিখে যদুনাথ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি পান। ১৮৯৭ খৃঃ থেকে ১৯২৬ খৃঃ পর্যন্ত সরকারী শিক্ষা বিভাগ থেকে কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজ, পাটনা কলেজ ও কটকের র‍্যাভেনশ কলেজে প্রথমে ইংরাজী ও পরে ইতিহাসের অধ্যাপকরূপে কাজ করেন। এরই মধ্যে দুই বৎসর কাল তিনি বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়েও ইতিহাসে অধ্যাপনা করেছিলেন। যদুনাথের কর্মজীবনের অধিকাংশ সময় অবশ্য পাটনাতেই অতিবাহিত হয়। ১৯১৭ খৃঃ থেকে ১৯২৬ খৃঃ অবসর গ্রহণ কাল পর্যন্ত যদুনাথ আই-ই-এস পর্যায়ভুক্ত ছিলেন। ১৯২৬ খৃঃ সরকারী কাজ থেকে অবসর নিয়ে দুই বৎসর কাল যদুনাথ (১৯২৬—২৮) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার নিযুক্ত হন। এ সময় তিনি বিশ্ববিদ্যালয়কে জড়তা ও দুর্নীতিমুক্ত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। নিজের ঐতিহাসিক গবেষণা ও অধ্যয়নের পক্ষে বিঘ্নকর মনে করে যদুনাথ প্রথমবারের কার্যকাল শেষ হওয়া মাত্র উপাচার্যের পদ থেকে অবসর নেন। অনুরুদ্ধ হয়েও দ্বিতীয়বার এই পদ গ্রহণ করেন নি। ১৯২৬ খৃঃ যদুনাথকে সরকার 'সি-আই-ই' উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯২৯ খৃঃ তিনি নাইট (স্যার) উপাধি পান। ঢাকা ও পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি-লিট উপাধি দিয়েছিলেন। এ ছাড়া দেশ-বিদেশের নানা বিদ্বৎ সংস্থা যদুনাথকে নানাভাবে সম্মানিত করেন। যদুনাথ ইণ্ডিয়ান হিস্টোরিক্যাল কমিশনের অন্যতম সদস্য ছিলেন। কয়েক বৎসর এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি পদের দায়িত্বও বহন করেন।

১৮৯৭ খৃঃ থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত যদুনাথ ইংরাজীতে প্রায় পঁচিশটি বই লিখেছিলেন। এর মধ্যে আছে :—

India of Aurangzib (1901), Economics of British India (1909), History of Aurangzib (5 vols, 1912-1924), short History of Aurangzib (1930), studies in Aurangzib's Reign (1933), Mughal Administration (1925), Shivaji and his times (1919), House of Shivaji (1940), Shivaji —a study in leadership (1950), fall of the Mughal Empire (4 vols, 1932-1950), India through the ages (1928), Chaitanya's Life & teachings (1913, 1919), Military History of India (1950)

প্রভৃতি। যদুনাথ মুসলমান ঐতিহাসিকদের দ্বারা লিখিত কয়েকটি ফার্সী গ্রন্থ এবং মারাঠী ও ফার্সীতে লিখিত দলিলপত্র ইংরাজীতে অনুবাদ বা সম্পাদনা করেছিলেন।

Ain-i-Akbari, Massir-i-Alamgiri, Persian Records of Maratha History, Poona Residency Correspondence.

প্রভৃতি। সুপ্রসিদ্ধ কেম্ব্রিজ হিস্ট্রি অব ইণ্ডিয়ার চারটি অধ্যায় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত (হিস্ট্রি অব বেঙ্গল ২) গ্রন্থের প্রায় এগারটি অধ্যায় (১২০০ খৃঃ—১৭৫৭ খৃঃ) যদুনাথ রচনা করেছিলেন। শেষোক্ত গ্রন্থটির যদুনাথ ছিলেন সম্পাদক। রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির আগেই যদুনাথ রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি প্রবন্ধ ও গল্পের অনুবাদ 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রে প্রকাশ করে ইংরাজী পাঠক সমাজের কাছে তাঁকে পরিচিত করান। 'শিবাজী' (১৯২৯ খৃঃ) ও 'মারাঠা জাতীয় বিকাশ' (১৯৩৬ খৃঃ) যদুনাথ রচিত এই দুটি ইতিহাস গ্রন্থ বাঙলা ভাষার মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে।

দেশের স্বাধীনতা লাভের পর নির্ভীকভাবে সরকারী ও সামাজিক স্তরের অকর্মণ্যতা ও শৈথিল্যের সমালোচনামূলক প্রবন্ধ লিখে তিনি দেশ ও জাতির সেবা করে গেছেন। শেষ বয়স পর্যন্ত বিশ্বের সাহিত্য-সংস্কৃতি-রাজনীতি ও বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি সম্বন্ধে তাঁর কৌতূহল ও অধ্যয়ন অব্যাহত ছিল। এই সময় দেশে তিনি শিক্ষা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কুলপতি বলে বিবেচিত হতেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে যদুনাথ দীর্ঘকাল সভাপতিরূপে যুক্ত ছিলেন। বহু সাহিত্যসেবী ও গবেষক তাঁর অকুণ্ঠ সহায়তা ও উৎসাহে বিদ্যাচর্চা করে খ্যাতিমান হন। গবেষক ছাত্রদের জন্য তাঁর মূল্যবান পাঠাগারের দ্বার অবারিত ছিল।

মৃত্যুর পূর্বে ২০,০০০ বহু মূল্যবান পুস্তক, পুস্তিকা, পাণ্ডুলিপি, নথিপত্র-সমন্বিত বহু অর্থ ব্যয়ে গঠিত নিজস্ব গ্রন্থাগারটি যদুনাথ জাতির সেবায় উৎসর্গ করে গেছেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর গ্রন্থ সাতহাটি কলকাতা জাতীয় পাঠাগারকে দান করা হয়েছে। ১৯৫৮ খৃঃ ১৯ মে যদুনাথ তাঁর কলকাতার বালীগঞ্জ পল্লীস্থ বাসভবনে প্রায় ৮৮ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন।

CENTRAL LIBRARY

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

ম্যাকসওয়েলী থিসিস

১৯৬২-তে চীন-ভারত সীমান্ত নিয়ে যে সংঘর্ষ ঘটেছিল স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের ইতিহাসে তা এক গুরুত্বপূর্ণ পর্ব। এই সংঘর্ষের 'অকথিত কাহিনী' অনেকে অনেক রকম ভঙ্গীতে ইতিমধ্যেই বলেছেন। যাঁরা এই সব গ্রন্থ লিখেছেন তাঁরা প্রত্যক্ষভাবে সংঘর্ষের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

নেভিল ম্যাকসওয়েল একজন সাংবাদিক, তিনি 'টাইমস' পত্রিকার সাউথ এশিয়া করসপণ্ডেন্ট ছিলেন। ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯৬৭-র জুলাই পর্যন্ত তিনি নয়াদিল্লীতে ছিলেন, সুতরাং এদেশের অনেক অকথা কাহিনী তিনি সহজেই সংগ্রহ করেছেন। এমন কি যে হেনডারসন ব্রুকসের রিপোর্ট ভারত সরকারের সম্পত্তি তারও পূর্ণাঙ্গ বিবরণ ম্যাকসওয়েলের কুক্ষীগত। এছাড়া কত রকমের তথ্য এবং দলিলপত্র যে তিনি সংগ্রহ করেছেন তার ইয়ত্তা নেই। ম্যাকসওয়েল রচিত 'ইণ্ডিয়াস চায়না-ওয়ার' নামক গ্রন্থটি তাই তথ্য-সমৃদ্ধ। এছাড়া তিনি লণ্ডন স্কুল অব ওরিয়েন্টাল অ্যাণ্ড আফ্রিকান স্টাডিজে দীর্ঘকাল গবেষণা করে অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছেন। ম্যাকসওয়েল তথ্য প্রমাণাদি প্রয়োগ করে একটি প্রচলিত ধারণা খণ্ডনের জন্য প্রয়াস করেছেন। ভারত সম্পর্কে সাধারণত একটা ধারণা আছে যে, এই দেশ শান্তিপ্রিয় এবং কোনোরূপ উত্তেজনা-না-থাকলেও সে একটা সীমান্ত সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েছে। ম্যাকসওয়েল সেই ধারণা যে ভিত্তিহীন তা প্রমাণের চেষ্টা করেছেন। অবশ্য এই সূত্রে পক্ষপাতহীন নিরাসক্ত দৃষ্টিতে রচিত নয়। তিনি ভারতবিদ্বেষী না হলেও ভারত প্রেমিক নন এবং ভারতবর্ষকে দোষী প্রমাণিত করার দিকেই তার চিত্ত সমাসক্ত।

এই গ্রন্থটি ভারতবর্ষে প্রকাশিত হয়েছে যে-কালে, সেইকালেই চীন-ভারত সম্পর্ক কিছুটা সহজ হওয়ার সম্ভাবনা ঘটেছে, অর্থাৎ কোনো এক রাষ্ট্রদূত চীন কর্তৃপক্ষের মুখে হাসি লক্ষ্য করেছেন। এছাড়া স্বদেশে চীন-ভারত সম্পর্ক স্বাভাবিক করে তোলার জন্য একটা দাবী স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রকৃতপক্ষে যদি এই দুই মহাদেশের সম্পর্কে যে ফাটল ধরেছিল তা জোড়া [illegible] এশিয়া ভূখণ্ডেই [illegible] সমগ্র মনুষ্যই [illegible]।

এই পরিপ্রেক্ষিতে স্বভাবতই প্রশ্ন উঠবে, আমাদের ত ভাই-ভাই সম্পর্ক ছিল, সে সম্পর্কটা এত তিক্ত হল কি করে। ম্যাকসওয়েল এই প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। তিনি ভারত সরকারের পররাষ্ট্র দপ্তরের দলিলপত্র, সামরিক গুপ্ত তথ্য ইত্যাদি নানাবিধ প্রমাণ (!) প্রয়োগ করে দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে সীমান্ত নিয়ে কোনো রকম একটা মীমাংসা করার ব্যাপারে ভারত নাকি একটা বিরাট ভুল করেছে, এবং সেই ভুলটুকু সংশোধনের কোনো চেষ্টা না করে তাকে নাকি আঁকড়ে রাখারই চেষ্টা হয়েছে। এই বক্তব্যের সপক্ষে ম্যাকসওয়েল অনেক তথ্য হাজির করার চেষ্টা করেছেন, এবং যদিও তিনি বলেছেন কোনো পক্ষকেই দোষী সাব্যস্ত করা তাঁর অভিপ্রায় নয় তথাপি গ্রন্থটির নামকরণের মধ্যেই তিনি ভারতকে অভিযুক্ত করেছেন। ম্যাকসওয়েলের বক্তব্য সাজালে ব্যাপারটা এই রকম দাঁড়ায়—

সীমান্ত বিরোধ যে বিশেষ গুরুতর ছিল তা মনে করার কারণ নেই। ১৯৫৯-এর সেপ্টেম্বর মাসে চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই স্বয়ং ঘোষণা করেছিলেন:

> "There was no territorial dis pute or controversy between India and China".

তিনি যখন এই কথা উচ্চারণ করেন তার কয়েক মাস পূর্বে ১৯৫০-এর নভেম্বর মাসে লোকসভায় জওহরলাল নেহরু ঘোষণা করেন—

> "Our Maps show the MacMa honline is our boundary map or no map. That fact remains and we stand by that boundary, and we will not let anybody come ac-ross that boundary".

ম্যাকসওয়েল লিখেছেন যে, সীমান্ত বিরোধের সব সময়েই বিশ্বজনীন মনোভাব ভারতের প্রতি অনুকূল ছিল। শুধু পশ্চিম নয়, সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং পূর্ব ইয়োরোপের ধারণাও তাই ছিল। সকলে মনে করেছিলেন যে, এই ক্ষেত্রে নিরপরাধ ভারতকে চীন যেন বিপন্ন করছে। প্রকৃত ঘটনা (ম্যাকসওয়েলের মতে) বিপরীত, এবং এই গ্রন্থে সেই বক্তব্য তিনি প্রমাণের জন্য বুক ঠুকে লেগেছেন।

তিনি বলতে চান যে, ব্রিটিশ ভারতের হাতে রাজ্যভার সমর্পণ করার সময় সীমানা মোটেই ঠিকমত নির্ধারণ করেনি। সীমানার সত্য এবং প্রকৃতও স্পষ্ট ছিল না। ভারতের দাবীর ভিত্তিমূল দুর্বল।

১৯১৪-তে ম্যাকমোহন লাইন তিব্বতী প্রতিনিধিদের সঙ্গে গোপনে আলোচিত হয়ে সিমলার অনুষ্ঠিত কনফারেন্সে এই সীমানা কোনোদিনই জাতীয়তাবাদী বা কম্যুনিস্ট চীনা রাষ্ট্র মেনে নেয়নি।

এমন কি তিব্বতও প্রকৃতপক্ষে উপেক্ষা করেছে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের অবস্থা আরো জটিল। কারাকোরাম পর্বত থেকে রাশিয়াকে দূরে রাখার জন্য ব্রিটিশ উদগ্রীব ছিল, চীনাদের কথা চিন্তা করেনি। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে ব্রিটিশ চীনের কাছে যে সীমানা প্রস্তাব দিয়েছিল তার ফলে আকসাই চীনকে দুভাগে বিভক্ত করা যেত, চীনের দেওয়া হত তিব্বত সিংকিয়াং অংশ আর চিপ-চাপ নদী থাকত ভারতের ভাগে। পরে ব্রিটিশ মত বদলায়, কারণ সিংকিয়াঙে চীনা প্রভুত্ব হ্রাস পায়। স্বাধীন ভারত উত্তরকালে যে সীমানার দাবী করেছে সেই সীমানার স্বপক্ষেই ব্রিটিশ বরাবর কথা বলে এসেছে।

ম্যাকসওয়েলের দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে, ভারত আকসাই চীন নিয়ে কোনো কথা বলা চলবে না এই মত গ্রহণ করায় সংঘর্ষের মুখে সে নাকি স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসেছে। এই পর্বের নামকরণ করা হয়েছে 'কলিশন কোর্স'। ম্যাকসওয়েলের তৃতীয় বক্তব্য 'ফরওয়ার্ড পলিসি' বা ভারতের অগ্রগামীনীতি। ম্যাকসওয়েলের দৃঢ় ধারণা যে, এই ফরওয়ার্ড পলিসিই চীন-ভারত সংঘর্ষের জন্য মুখ্য দায়ী।

সোজা কথা এই যে, ম্যাকসওয়েল বলতে চান—নয়াদিল্লীর উচিত ছিল পিকিং-এর সঙ্গে এক টেবিলে বসে দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি করে সীমানা নিয়ে একটা মীমাংসায় পৌঁছানো, কারণ ব্রিটিশ নির্ধারিত সীমানা স্থিরীকরণের ব্যাপারে চীন গভর্ণমেন্টের কোনো হাত ছিল না। আর তা যখন হয়নি, ম্যাকসওয়েলের মতে, ভারতের উচিত ছিল চীনারা যা চাইছে তা নীরবে মেনে নিয়ে চীনকে আকসাই চীনে অবস্থান করতে দেওয়া এবং তাহলে চীনও পাল্টা-পাল্টি ব্যবস্থায় ম্যাকমোহন লাইন মেনে নিত। ভারত কর্তৃক তাওয়াং অঞ্চল অধিকার সংক্রান্ত ব্যাপারে তারা কথা বলতো না।

ভারত যখন তাওয়াং অধিকার করে নেয় তখন চীনারা কোনো প্রতিবাদ করেনি। এই নীরবতার এই অর্থ করা যায় যে,

চীনারা ম্যাকমোহন লাইন মেনে নিয়েছিল। ম্যাকসওয়েল বলছেন যে, ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে স্যার গিরিজাশঙ্কর বাজপেয়ী ভারত সরকারের বৈদেশিক দপ্তরকে একটি চিঠি লিখে অনুরোধ করেছিলেন যে, চীনা সরকারের সঙ্গে কথাবার্তা বলে ভারত যেন ম্যাকমোহন লাইনের প্রশ্নটির মীমাংসা করে নেয়।

তখন সর্দার কে এম পানিক্কর ছিলেন পিকিং-এ রাষ্ট্রদূত, তিনি স্যার গিরিজা-শঙ্করের উপদেশে কর্ণপাত করলেন না। তাঁর মতে ভারত যখন তার অধিকার সম্পর্কে ঘোষণা করেছে তখন তার জবাব দেওয়ার দায়িত্ব চীনা সরকারের।

স্যার গিরিজাশঙ্কর এই কথা শুনে শুধু মন্তব্য করেন—

"Naturally, they have no intention of raising it until it suits their convenience"

ম্যাকসওয়েল বলেন, পরবর্তী ঘটনায় নাকি প্রমাণিত হয়েছে প্রবীণ চিন্তানায়ক স্যার গিরিজাশঙ্করের কথাই ঠিক।

১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে যখন 'পঞ্চশীল' চুক্তি স্বাক্ষরিত হল তখন হয়ত এই ব্যাপারে একটা মীমাংসা করে নেওয়ার উপযুক্ত অবসর মিলেছিল, কিন্তু তা হয়নি।—এও ম্যাকসওয়েলের মত।

চীন ভারত সম্পর্কের সবচেয়ে গুরুত্ব-পূর্ণ পর্ব ১৯৫৪ এবং ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দের নেহরু-চৌ আলোচনা। ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দের অক্টোবরে তিনি পিকিং গিয়েছিলেন এবং পরে চৌ-এন-লাইকে তিনি একটি পত্র জানান—আমাদের আলোচনার সময় আমি আপনাকে সংক্ষেপে জানিয়েছিলাম যে, চীন থেকে সম্প্রতি প্রকাশিত কয়েকটি ম্যাপে আমাদের দুটি দেশের সীমানা ত্রুটিপূর্ণভাবে দেখানো হয়েছে। আমার মনে হয়েছিল এটা ভুল হয়ে থাকবে এবং আপনাকে বলেছিলাম, আমাদের সীমানা ত' নির্ধারিত হয়েই আছে, এ নিয়ে আর কোনো বিতর্কের অবকাশ নেই। আপনিও বলেছেন যে, এসব ম্যাপ লিবারেশনের পূর্ব-কালের ম্যাপ ও তার রিভাইজ করার সময় পাওয়া যায়নি। আপনাদের হাতে অনেক কাজ তাই হয়ত রিভিশন সম্ভব হয় নি এইবার আশা করি অচিরাৎ সংশোধন করা হবে।'

সেই বছরই ভারত একটি সরকারী মানচিত্র প্রকাশ করে পূর্বাঞ্চলে ম্যাকমোহন লাইনকেই সীমানা হিসাবে দেখালো, চীন কোনোরকম প্রতিবাদ জানালো না। পরে কিন্তু চীনা প্রধানমন্ত্রী বললেন, এই সর্ব-প্রথম দেখলাম চীনা ভূখণ্ডের ওপর ভারতের দাবী সরকারী মানচিত্রে প্রকাশিত হল।

ভারত নাকি এরপর নিশ্চিন্ত নিরাপত্তায় চুপ করে রইল, কেননা ম্যাকসওয়েল বলেছেন, ভারতের ধারণা হল যে, চীনারা এই সব প্রকাশিত মানচিত্র মেনে নিয়েছেন। কিন্তু ঠিক এই অবসরে ১৯৫৫ থেকে ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে চীনারা আকসাই চীনের ভিতর পথ তৈরী করে ফেলল।

চীন সম্বন্ধে লেখক ডিক উইলসন লিখেছেন—

"While the Chinese Premier was talking to Nehru Chinese Engineers were busy building a road across the desolate Aksai Chin, triangle"

নেহরু যে এই ঘটনাটি পুরোপুরি ভারতীয় বলেই দাবী করেন সে কথা চৌ এন-লাই ভালো করে জানতেন। তবে তিনি নেহরুকে এই পথ নির্মাণের কথা কিছু বলেননি। এই গ্রন্থের লেখক ম্যাকসওয়েল ভারতের দাবীর ভিত্তি সম্পূর্ণ চোখ বুজিয়ে রেখেছেন, চীনারা যে ভারতের অনেকখানি জায়গা গ্রাস করে তাদের দখলে নিয়েছে ... এই দিকটা তিনি উপেক্ষা করে গেছেন। স্বদেশের সীমানা রক্ষার প্রয়োজনে গৃহীত নীতিকে 'ফরওয়ার্ড পলিসি' বলে উল্লেখ করা অনুচিত হয়েছে, এবং এর জন্য ভারতকে অনেকখানি মূল্য দিতে হয়েছে।

—বজ্রদণ্ড

INDIA'S CHINA WAR: By NEVILLE MAXWELL. Published by JAICO PBLISHING HOUSE. BOMBAY Price Rupees Thirty only.

রেকর্ডে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় নামটি বাংলা কথাশিল্পের সঙ্গে চিরদিনের জন্য স্বর্ণ-সূত্রে জড়িত হয়ে আছে। তাঁর আকস্মিক এবং অকাল বিয়োগে বিমূঢ় জাতির কাছে তাঁর আর একটি পরিচয় তুলে ধরবার জন্য এই নিবন্ধের আয়োজন।

কি ছোট গল্প কি উপন্যাসে ভাষার চমৎকারিত্বে এবং ভাবের গভীরতায় এবং আন্তরিকতায় ক্ষণে ক্ষণে যে সব মুগ্ধকল্প পাঠকদের চমকিত করে, বিমোহিত করে, তাতে একথা বুঝতে বিলম্ব হয় না, মুখ্যত গদ্যলেখক হলেও নারায়ণবাবুর মনটা ছিল কবির মন, দৃষ্টিটাও ছিল কবির দৃষ্টি। তাই তাঁর অনেক রচনাকে সহজেই গদ্য কবিতার মতোই মনে হয়।

কিন্তু কবিতার মধ্য দিয়েই তাঁর প্রতি-ভার স্ফুরণ ঘটতে আমরা দেখেছি। আমরা যাঁরা তাঁর সমবয়সী এবং সহযাত্রী তাদের অনেকেই যখন ছোটগল্প লিখছি তখনও তিনি কবিতাতেই মনের আবেগ প্রকাশে তৎপর ছিলেন। তাঁর 'খোলা চিঠি' নামক দীর্ঘ কবিতা (বিচিত্রা, ফাল্গুন, ১৩৪৪) একটি নির্ভেজাল সুন্দর প্রেমের ছোটগল্প হলে অত্যুক্তি হবে না। ঐ বিচিত্রাতেই যখন তাঁর নাগকেশরের ফুল বেরিয়েছিল—তার সুগন্ধে সৌন্দর্যে তখন আমরা বিমুগ্ধ হয়েছিলুম।

পরে যখন ছোটগল্পের ক্ষেত্রে এবং উপন্যাসে তাঁর প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি পেল— তিনি কবিতাকে ক্ষেত্র হতে ইচ্ছা করেই যেন নির্বাসন দিয়েছিলেন। কিন্তু কলম ধরলেই যে তিনি অবলীলাক্রমে বিশুদ্ধ ছন্দে চমৎকার কবিতা এবং গান রচনা করতে পারতেন তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি।

নারায়ণবাবু আমারই মত পূর্ববঙ্গের লোক। পাশাপাশি জেলায় বাড়ি, সমবয়সী এবং কলকাতাতেও পঁচিশ বছরের বেশি একেবারে কাছাকাছি বাস করবার দরুন প্রায় নিত্য দেখ.শোনার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। ফলে বিচিত্রার আসরে সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের বৈঠকে আমাদের যে সৌহার্দ্য গড়ে উঠেছিল-তা দিনে দিনে নিতান্ত ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক সম্বন্ধে পর্যবসিত হয়েছিল। তিনি তাঁর দুই দুখানি গ্রন্থ আমায় উৎসর্গ করে আমাকে চিরঋণী করে রেখে গেছেন।

এই বন্ধুত্বের দাবীতেই তাঁর কাছে প্রস্তাব করেছিলাম তাঁর কণ্ঠে তাঁরই রচনা আবৃত্তি রেকর্ড করবার। হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানীর মধুসূদন নাটকখানি যখন বেরোয় তাতে বহু বিখ্যাত সাহিত্যিক অংশ গ্রহণ করেছিলেন। নারায়ণ সেখানেও ছিলেন। তাঁর নিজের নাটক 'ভাড়াটে চাই' অভিনয়ে এবং সাহিত্যিকদের অন্যান্য অভিনয়েও তিনি অংশ গ্রহণ করেছেন। কিন্তু পুরোপুরি আবৃত্তির রেকর্ডিং বোধহয় রেডিওতেও করেন নি। রেডিওতে তাঁর অগণিত ছোট-গল্প, বক্তৃতা, আলোচনা প্রভৃতির রেকর্ড আছে। এমন কি কি করে সাহিত্যিক হলাম' এই পর্যায়ে তাঁর কাহিনীটিও কবিতার মতই হৃদয়গ্রাহী। কিন্তু সাহিত্যিকের কবিতা নিজে আবৃত্তি করতে স্বীকৃত হলেন গ্রামোফোন কোম্পানীর জন্য। এই কোম্পানীতে আমারই মত তাঁর আরও অনেক বন্ধু এবং গুণগ্রাহী আছেন। এমন কি রেকর্ডিং বিভাগেরই তদানীন্তন অধিকর্তা মিঃ রায়চৌধুরী নারায়ণবাবুর সহপাঠী। সুতরাং আমাদের দাবী মানতে তাঁকে বিশেষভাবে কলম নিয়ে বসতেই হল। আর সেই ঐতিহাসিক দিন এই নভেম্বরের ছয় তারিখ শুক্রবার তিনি সমস্ত

[গি]য়েছিলেন রেকর্ড করতে। ঐ দিন কবি-রবীন্দ্র [সঙ্গী]তে স্বরচিত কবিতা রেকর্ড করেন।

সকলে যথাভাব কিছু পরে তাঁর [রে]কর্ডিং হলে তিনি দমদম থেকে সোজা [সন্তো]ষবিদ্যালয়ে চলে যান, সেখান থেকে [বা]ড়ি। সেই রাতেই তিনি অসুস্থ হয়ে [হা]সপাতালে যান, মাত্র মাত্র শনিবারে, [র]বিবারে তাঁর জীবনদীপ নির্বাপিত হয়। [হি]জ মাস্টার্স ভয়েস গ্রামোফোন কোম্পানীর স্টুডিওর [অ]ভ্যন্তরে তিনি সেদিন যে আবৃত্তি করে-[ছি]লেন তাই তাঁর শেষ ভাষণ—দেশের কাছে, [জা]তির কাছে তাঁর সর্বশেষ দান। এ [দি]ক থেকেও এই আবৃত্তির বিশেষ ঐতিহাসিক [মূ]ল্য আছে।

ঐদিন তিনি 'স্বপ্ন' আর 'রবীন্দ্রনাথকে' [না]মক দুটি স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি ক[রেন]। [স্ব]প্ন কবিতাটিতে মৃত্যুর পদসঞ্চার যেন [শু]নতে পাওয়া যায়। আর রবীন্দ্রনাথকে [য]ে তিনি কি গভীরভাবে গ্রহণ করেছিলেন তারই প্রমাণ এই শেষ কবিতায় রেখে গেছেন। এখানে নারায়ণের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে আমরা সেই 'রবীন্দ্রনাথকে' কবিতাটিই তুলে দিচ্ছি। যখন এই আবৃত্তি রেকর্ডে বেরুবে তখন তা নিশ্চয় যুগপৎ রবীন্দ্র-নাথ ও নারায়ণের স্মারক হয়ে থাকবে।

রবীন্দ্রনাথকে

রোদের সেতারে বাজে
 বিদ্যুতের সুর।
গৈরিক গঙ্গায় বোট চলে
তিন পাহাড়ের ছায়া
 সন্ধ্যার তারাকে ছুঁতে চায়
দিয়াড়ার ঘরে ঘরে
 প্রদীপের শিখাগুলি কাঁপে
'নিরুদ্দেশ যাত্রা' পড়ি
 কৈশোরের বিমুগ্ধ আবেগে
তোমাকে প্রথম পাই
 রঙ-আলো তরঙ্গিত জলে।
যৌবনের রাত্রি আসে
 চৈত্রশেষে বিধুর উদাস:
কোথায় নিঃসঙ্গ বাঁশী বাজে:
যখন তুমি বাঁধিছলে তার
 সে কী বিষম বাথা—
অগণ্য নক্ষত্রপটে
 অসীম সত্তায় পরিণাম
আমার জীবনছন্দে
 হে বিরাট, তোমার সন্ধান।

উদ্বেল প্রাণের বন্য
 —নির্বিরের উত্তাল জনতা:
বাধা-বন্ধ-মৃত্যু ভাঙে
 ইতিহাসে অমোঘ স্বাক্ষরে—
আমার রক্তের তালে
 গন্দ্র গন্দ্র তোমার বাণিরা:
'ওরে ভীরু, ওরে মূঢ়,
 ঊর্ধ্বে তোলো শির।'

—সন্তোষকুমার দে

সাহিত্যের খবর

কলকাতায় প্রাক্তন বিচারপতি পি বি চক্রবর্তীর সঙ্গে আলোচনারত মিশিমা

মিশিমার হারাকিরি ।। য়ুকিয়ো মিশিমা আর নেই। গত ২৫ নভেম্বর একটি সামরিক দপ্তর দখল করতে গিয়ে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে হারাকিরি করে মৃত্যুবরণ করেন। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ মিশিমা এবং অ্যাসোসিয়েশন অব শিল্ডসের কয়েকজন সদস্য টোকিওতে অবস্থিত পূর্বাঞ্চলীয় সেনাবাহিনীর জেনারেল কম্যান্ডার-এর অফিসে ঝড়ের বেগে ঢুকে তাঁকে বন্দী করে ফেলেন এবং জাপানী সংবিধান সংশোধন করে সামরিক শক্তি বৃদ্ধির দাবী জানান। তিনি বলেন—'জাপানের বর্তমান রাজ-নীতি দুর্নীতিতে পরিপূর্ণ।' তিনি জাপানী সেনাবাহিনীর পুরোনো ধ্বনি তেন্নো বানজাই অর্থাৎ সম্রাট দীর্ঘজীবী হোন, এই বলে তাঁর বক্তৃতা শেষ করেন। এর পরেই তিনি এই বাড়ির ভেতরে অদৃশ্য হয়ে যান এবং একটি খালি ঘরে গিয়ে নিজের পেটের মধ্যে ছুরি বসিয়ে দেন। এরপর তাঁর একজন অনুগত তরবারির আঘাতে দেহ থেকে মুণ্ড ছিন্ন করে দেয়। সামুরাই প্রথানুসারে এই হল হারাকিরি। এভাবে পেট চিরে শিরচ্ছেদ করে মৃত্যুবরণ সামুরাই যোদ্ধাদের গৌরবের মৃত্যু বলে বিবেচিত হয়। তাঁর একজন অনুগতও অনুরূপভাবে মৃত্যুবরণ করেন।

য়ুকিয়ো মিশিমা জাপানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক। তাঁর নাম নোবেল পুরস্কারের জন্যও উঠেছিল। অবশ্য তিনি নোবেল পুরস্কার পাননি। তাঁর বহু রচনা ইংরেজিতে অনূদিত হয়েছে। ১৯৪৪ খৃঃ তিনি যখন টোকিওর রাজকীয় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ব্যবহারশাস্ত্রের ছাত্র, তখনই তাঁর প্রথম গ্রন্থ দি ফোরেস্ট ইন ফুল ব্লুম প্রকাশিত হয়। সেই থেকে এ পর্যন্ত ১০০টির উপর তাঁর গল্প, উপন্যাসের বই প্রকাশিত হয়েছে। জাপানের জেলেদের জীবনকে নিয়ে লিখিত ওয়েভ অব গেলোড পৃথিবীর বহু ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

১৯৬৭ খৃঃ মিশিমা এসেছিলেন ভারতে। ভারতের বিভিন্ন স্থান পরি-দর্শনের পর তিনি এসেছিলেন কলকাতায়। তখন তাঁর সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ আমাদের হয়েছিল। অমৃত পত্রিকায় তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের একটি বিবরণও প্রকাশ করা হয়েছিল তখন। পার্ক হোটেলে এক সম্বর্ধনা সভায় তিনি বলেছিলেন যে, নিউ ইয়র্কের জীবনের চেয়ে কলকাতার জীবন তাঁর কাছে আকর্ষণীয়। দুর্গোৎসবের অষ্টমীর দিন তাঁকে নিয়ে বের হয়েছিলাম পুজো দেখতে। প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছিল সে-দিন। তবু কি অসীম উৎসাহ নিয়ে তিনি দক্ষিণ কলকাতার একাধিক পূজামণ্ডপে ঘুরে বেড়িয়েছেন, তা অন্য কোন বিদেশীর ক্ষেত্রে দেখা যায় না। তিনি বলেছিলেন—'দক্ষিণেশ্বরের উপর তিনি একটি উপন্যাস লিখবেন। এজন্য আবার তাঁকে আসতে হবে ভারতে।' কিন্তু সে সুযোগ আর তিনি কোনদিন পাবেন না। কিন্তু তাঁর স্মৃতি চিরকাল উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা থাকবে আমাদের মনে।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় স্মরণ-সভা ।। কোচবিহারের হিন্দু গোষ্ঠীর উদ্যোগে প্রখ্যাত সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের

স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রণজিৎ সেন, তপনবিকাশ রায়, সমীর চট্টোপাধ্যায় পলাশ পাল, পরেশ সোম, চিন্ময় রায়, তপন সমাদ্দার, আশিস ভট্টাচার্য প্রমুখ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সাহিত্যিক কৃতিত্বের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে ভাষণ দেন। জানা গেছে, 'উত্তর বাংলার গল্প' নামে যে সংকলনটির কাজ চলছে, তার জন্য উত্তর বাংলার বন্যার পটভূমিকায় লেখা 'দোসর' গল্পটি তিনি দিয়েছিলেন। বইটির প্রকাশ তিনি দেখে যেতে পারেননি।

ডঃ রাধাগোবিন্দ নাথ পরলোকে

বৈষ্ণব শাস্ত্র ও সাহিত্যের পণ্ডিত বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডঃ রাধাগোবিন্দ নাথ ৯৪ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেছেন। মাত্র কয়েকদিন পূর্বে তিনি বার্ধক্যজনিত রোগে শয্যাশায়ী হন। তাঁর মৃত্যুতে বৈষ্ণব শাস্ত্র ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক অপরিসীম ক্ষতি সাধিত হলো। দীর্ঘ অর্ধশতাব্দীরও অধিককাল ধরে নিরলস ঐকান্তিক সাধনার দ্বারা এক দিকে যেমন তিনি বৈষ্ণব সাহিত্য ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধশালী করেছিলেন, তেমনি অপরদিকে অকুণ্ঠভাবে তিনি তাঁর জ্ঞান বিতরণ করে মানব জাতির কল্যাণ সাধন করেছেন।

অনন্যসাধারণ মেধাসম্পন্ন দীর্ঘ ৯৪ বছরের বৈচিত্র্যময় জীবনের অধিকারী ডঃ নাথের জন্ম ১৮৭৯ খৃঃ। পূর্ব পাকিস্থানের অন্তর্গত নোয়াখালীর বসুদুহিতা তাঁর জন্মস্থান। গ্রাম্য পাঠশালা, উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় এবং কলেজের পাঠ শেষ করে ১৯০৫ খৃঃ তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণিত শাস্ত্রে এম-এ পাশ করেন। ভারতের জাতীয় জীবনের সেই পুনর্জাগরণে তিনিও উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিলেন। তাই পরবর্তী জীবনে চট্টগ্রাম সরকারী অধ্যাপকের রাজ সম্মান প্রত্যাখ্যান করে তিনি কুমিল্লা বেসরকারী কলেজের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন।

এই সময় থেকেই শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুদ্র বৃহৎ জাতিগঠনমূলক প্রতিষ্ঠান ও সংস্থায় তিনি নিজেকে যুক্ত করেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ও অপর কয়েকটি যৌথ প্রতিষ্ঠানের প্রারম্ভিক গঠন সম্ভব হয়েছিল।

বহুবিধ কর্মের মধ্যে যৌবনের অফুরন্ত উদ্যম নিয়োজিত করলেও তিনি নিরলসভাবে সুপ্রাচীন সংস্কৃতি সাহিত্য ও বঙ্গভাষার সেবায় বেশী সময় আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

বৈষ্ণব শাস্ত্র ও সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত তাত্ত্বিক, রসজ্ঞ পণ্ডিত ডঃ নাথের রচিত 'শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত' গ্রন্থ বাঙ্গালী তথা ভারতবাসীর নিকট এক উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। তাঁর ভাগবত, গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন (৫ম খণ্ড) গ্রন্থও সকলের কাছে সমানভাবেই সমাদৃত।

তাঁর অপরিসীম পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতি হিসাবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে

রাধাগোবিন্দ নাথ

সরোজিনী বসু স্বর্ণ পদক ও ডি-লিট উপাধি দ্বারা ভূষিত করেন। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ও তাঁকে ডি-লিট উপাধিতে সম্মানিত করেন। বৈষ্ণবশাস্ত্রে অতুলনীয় পাণ্ডিত্যের জন্য বৃন্দাবন বৈষ্ণব থিয়লজিক্যাল ইউনিভার্সিটিও তাঁকে ডি-লিট উপাধি দেন। নবদ্বীপের বৈষ্ণব সমাজ তাঁকে 'বিদ্যাবাচস্পতি' ও নিখিল বৈষ্ণব সম্মিলনী তাঁকে 'ভাগবতভূষণ' উপাধিতে ভূষিত করেন। সম্প্রতি তিনি রবীন্দ্র পুরস্কারও লাভ করেন। অসাধারণ তত্ত্বজ্ঞান সমৃদ্ধ হয়েও তিনি ব্যবহারে প্রকৃত বৈষ্ণব ছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত 'শ্রীমদ্ভাগবৎ'-টিকা রচনার কাজে তিনি আত্মনিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু তিনি তা সম্পূর্ণ করে যেতে পারেননি।

পত্রিকা প্রদর্শনী ।। কোচবিহার জেলা প্রদর্শনী উপলক্ষে ২৬ জানুয়ারী থেকে ৬ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত এক পত্র-পত্রিকা প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। এর উদ্যোক্তা 'ত্রিবৃত্ত' গোষ্ঠী। প্রদর্শনীটি হবে রাসমেলার মাঠে। উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন পত্রিকা সম্পাদকের কাছে দুই কপি করে পত্রিকা পাঠাবার জন্য আবেদন জানান হয়েছে। পাঠাবার ঠিকানা: ত্রিবৃত্ত।১ ত্রিবৃত্ত সরণী, কুচবিহার।

জ্ঞানপীঠ পুরস্কার বিতরণ ।। এবার 'জ্ঞানপীঠ পুরস্কার' পেয়েছেন প্রখ্যাত উর্দু কবি ফিরাক গোরখপুরী তাঁর 'গুল-এ-নাগমা' গ্রন্থটির জন্য। গত ২৬ নভেম্বর দিল্লীতে এক অনুষ্ঠানে তাঁকে এই পুরস্কারটি প্রদান করা হয়। পুরস্কার প্রদান করেন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। সভায় বিশিষ্ট লেখকরা উপস্থিত ছিলেন।

ইউসুফ এল সেবাইয়ের সঙ্গে ।। আজকের মিশরের সবচেয়ে খ্যাতিমান সাহিত্যিক ইউসুফ এল সেবাই। সমস্ত মধ্যপ্রাচ্যে তাঁর মত শক্তিশালী সাহিত্যিক আর নেই। গল্প, উপন্যাস, নাটক এবং সমালোচনার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান মিশরীয় সাহিত্যে চিরকাল লেখা থাকবে। এ পর্যন্ত তাঁর পঞ্চাশের উপর গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। কয়েকটি বই অনূদিত হয়েছে ইংরেজি, ফ্রেঞ্চ, রুশ ও জর্মন ভাষায়। তিনি আফ্রো-এশীয় লেখক সম্মেলনের সম্পাদক। সম্প্রতি দিল্লীতে যে চতুর্থ আফ্রো-এশীয় লেখক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল, সেই সময় তাঁর সঙ্গে পরিচিত হবার সামান্য সুযোগ হল। খুব ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি তাঁর সাহিত্য জীবনের কিছু কথা বললেন আমাদের প্রশ্নের উত্তরে।

সাহিত্য বিষয়ে আগ্রহ তিনি কিছুটা পারিবারিক সূত্রেই লাভ করেছেন। তাঁর পিতাও ছিলেন মিশরের একজন বিশিষ্ট লেখক। এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন, 'আমার বয়স যখন দশ বছরের মত, তখনই আমার বাবা তাঁর সমস্ত লেখার প্রুফ আমাকে দিয়ে পড়াতেন। সেই থেকেই সাহিত্যের প্রতি আমার একটা অনুরাগ জন্মায়। সাহিত্যই আমার জীবন এবং সাহিত্য ছাড়া আমার চলা সম্ভব নয়।' মিশরের বর্তমান সাহিত্যের অবস্থা জানাতে গিয়ে তিনি বললেন—'মিশরে সাহিত্য রচনার অনুকূল সময় বলা যায় সাম্প্রতিক কালেই সৃষ্টি হয়েছে। কবিতা, গল্প, উপন্যাস রচনায় তরুণরা খুবই সার্থকতার পরিচয় দিচ্ছেন।' আর একটি প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন—'তাঁর রচিত কয়েকটি উপন্যাসই এর মধ্যে চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়েছে। এর মধ্যে আছে ঐতিহাসিক উপন্যাস 'চিত্তের প্রত্যাবর্তন' জল সরবরাহকারী এখন মৃত' ইত্যাদি।' সম্প্রতি একজন মিশরবাসীর জীবন নিয়ে দুই খণ্ডে তিনি একটি দীর্ঘ উপন্যাস রচনায় ব্যস্ত আছেন।

সাহিত্য কৃতিত্বের জন্য তিনি দেশ ও বিদেশ থেকে অনেক পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন। এর মধ্যে সর্বশেষ যে পুরস্কারটি পেয়েছেন, তা হল ওর্গানিয়াক। ১৯৫৮ খৃঃ শ্রেষ্ঠ গল্পকার হিসেবে তিনি এই পুরস্কার লাভ করেছেন। সাহিত্য ছাড়া সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান কম নয়। মিশরের বিখ্যাত দৈনিক 'আল গামারিয়া' পত্রিকার সাহিত্য বিভাগের সম্পাদনা করেন কিছুদিন। এছাড়াও 'আখের সা' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকার তিনি সম্পাদক। জিজ্ঞেস করেছিলাম : 'এসবের জন্য সাহিত্য রচনায় কি কিছু অসুবিধা হয় না।' তিনি উত্তর দিয়েছিলেন—'না। প্রায় প্রতিটি মিশরীয় লেখক এক অর্থে সাংবাদিকও বটে। কারণ, অনেকেই সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছেন।'

ইউসুফ এল সেবাই এক সময়ে মিলিটারি আকাদমির ছাত্র ছিলেন। প্রেসিডেন্ট নাসের ছিলেন তাঁর বিশিষ্ট বন্ধু। কিন্তু সেবাই পরে মিলিটারী জীবন ত্যাগ করে সাহিত্য সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন।

নতুন বই

দি অ্যান্ডারসন টেপস।—লরেন্স স্যান্ডার্স। অনুবাদ এইচ এন্ডেন অ্যান্ড কোম্পানী লিমিটেড। প্রাপ্তিস্থান : রূপা অ্যান্ড কোম্পানী, ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-১২। দাম তিন শিলিং।

রহস্য উপন্যাসের বনিয়াদ হলো জোরালো কাহিনী। জোলো কাহিনী নিয়ে ভালো রহস্য গল্প হয় না। লরেন্স স্যান্ডার্সের লেখা অ্যান্ডারসন টেপস বইটির কল্পাংশ রীতিমত তীক্ষ্ণ এবং জোরালো। কিন্তু শুধু এইটুকু বললে বইটির সম্বন্ধে প্রায় কিছুই বলা হল না। এর বিশেষত্ব অন্য কিছু। অ্যান্ডারসন টেপস নতুন রীতিতে লেখা এক বিস্ময়কর রহস্য কাহিনী এবং আনন্দের কথা, এই নতুন আঙ্গিকের পরীক্ষায় লেখক আশ্চর্য সফল। বইটির সার্থকতা সেখানেই।

একদিনে আগস্ট রাত্রে নিউ ইয়র্কের ৪৫৫ নং ইস্ট সেভেন্টি থর্ড স্ট্রীটের বাড়িতে একটি বড় রকমের চুরি হয়ে গেল। অনেকেরই বহু মূল্যবান জিনিস অপহৃত। খবর পেয়ে পুলিশ এল অনুসন্ধান করতে। বলা বাহুল্য নিউ ইয়র্কের পুলিশ। তাদের তদন্তের কৌশলই ভিন্ন। আগে থেকেই টেপের সাহায্যে কথাবার্তা তুলে নেওয়ার ব্যবস্থা ওদেশে আছে। সেই বাসরঘরে আড়ি পাতার মতন কৌশল। ইলেকট্রনিক সার্ভেলেন্স যন্ত্রের সাহায্যে এই টেপ ঘরের মধ্যে, ফোনের পাশে, এমন কি পার্কের গাছেও লাগানো। প্রায় সমস্ত কাহিনীটাই টেপ বাজিয়ে বলা হচ্ছে। বিভিন্ন স্থান থেকে টেপে তোলা কণ্ঠস্বর শুনে অপরাধ রহস্যও ধীরে ধীরে পরিষ্কার হচ্ছে।

গল্পের নায়ক অ্যান্ডারসন। 'আইন মানে বুজরুকি, অপরাধ হল সত্য।' এই তার জীবনদর্শন। লোকটা ছোটবেলা থেকেই অবহেলিত। শৈশবে ভালো শিক্ষা পায় নি। বড় হয়ে অপরাধের পথই সে বেছে নিয়েছে। কিন্তু তার অসাধারণ ব্যক্তিত্ব এবং সংগঠন শক্তি অন্যান্যদেরও প্রশংসা পেয়েছে।

এই উপন্যাস প্রসঙ্গে একটি চরিত্রের উল্লেখ করা প্রয়োজন। একজন পঙ্গু বালকের কথা বলছি। ঘটনার দিন রাত্রে দুর্বৃত্তরা তার প্রতি নজর দেয় নি। ছেলেটি সকলের অজ্ঞাতে একটি ঘরোয়া শর্ট ওয়েভ ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে এই রাহাজানির কথা বারবার ঘোষণা করছিল। শহর থেকে অনেক মাইল দূরে কোনো স্থানে এই বেতারঘোষণা কেউ কেউ পায়। সম্ভবত এই ওয়েভ-লেংথ যারা ধরেছিল, বলা বাহুল্য তারা নিউ ইয়র্কের পুলিশ বিভাগকে এই [illegible] ঘোষণার কথা জানাতে দেরি করে নি। বইটি ধীরে ধীরে [illegible] পড়লে রুদ্ধশ্বাস কাহিনীর স্বাদ কিছুতেই পাওয়া সম্ভব নয়।

লরেন্স স্যান্ডার্সের এই রহস্য কাহিনী সাসপেন্সের দিক থেকে সুন্দর, বিন্যাসে বিচিত্র এবং কলাকৌশলের প্রয়োগে অনুপম এবং চমকপ্রদ।

শতকাল আজ এবং আমি (কাব্যগ্রন্থ)—মৃত্যুঞ্জয় হাজরা।। দাম—তিন টাকা, পরিবেশক, সিগনেট বুক শপ, কলি-১২।

'শতকাল আজ এবং আমি' মৃত্যুঞ্জয় হাজরার চতুর্থ কাব্যগ্রন্থ। এর আগেই 'লোকায়ত অলৌকিক' এবং 'অনবদ্য' মৃত্যুঞ্জয়কে কবিতানুরাগীদের কাছে প্রিয় করে তুলেছে, কারণ মৃত্যুঞ্জয়ের নিজস্ব মেজাজ এই কাব্য দুটির বহু কবিতায় অত্যন্ত সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে। আলোচ্য গ্রন্থে সে পরিচয় আরও উজ্জ্বল; একজন কবি স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত। যে বিশেষ কারণে মৃত্যুঞ্জয় বিশিষ্টতা অর্জন করেছেন, তা হল : তাঁর কবিতার নিজস্ব চরিত্র; কী বক্তব্য, কী কবিতার আঙ্গিক বৈশিষ্ট্যে, যা প্রকাশ চেতনায়। 'শতকাল আজ এবং আমি'-র 'সম্রাজ্ঞী' 'হসেধ্বনি' মনে পড়ে 'হব' 'অনান্তরে'—এই সব কবিতা পড়লে সহজেই বোঝা যায় তিনি তাঁর স্বতন্ত্র কণ্ঠস্বর খুঁজে পেয়েছেন, আর তাই কবিতায় বহিরাঙ্গিক চমক, চতুর কথন বা কাব্যোক্তিকে অনায়াসে বর্জন করে তিনি আমাদের অনুভবকে আলোড়িত করে তুলতে পারেন। কবিও সহজেই আমাদের বিশ্বাসের দিগন্তকে ছুঁয়ে যেতে পারেন। মৃত্যুঞ্জয়ের চলমান মানুষের মৌল বিষাদ, নিঃসঙ্গতা বা অস্তিত্বের শূন্যতাবোধ মূর্ত হয়ে ওঠে, যখন তিনি বলেন :

> বয়স মানে আয়ু মানে কিছুটা সময়
> একটা পরিধিতে
> হেঁটে পার হওয়া চলে
> দৌড় কিংবা—
> মনে গতি বেড়ে যায়
> বাড়ে মানে কমতে থাকে কিছু
> দুরত্ব অথবা দুঃখ—

অথবা যখন কবি বলেন :

> 'আমার পথের শেষে অন্য আমি
> পথের শেষে
>
> অন্য পথ—
> বিশ্বাস পড়ে উঠতে উঠতে ভেঙে যায়'

তখন টের পাই দুঃখ বা লৌকিক বিষাদ নয়, এক অনির্দেশ্য বেদনা কবির অস্তিত্বকে আলোড়িত করে। আবার সুন্দর পরিমিততা বলা দিয়ে বলতে শুনতে পাই :

> 'কৈশোর পেরিয়ে যায় বয়স
> তারা বসে
> আমি সরে দাঁড়াই—

'না এলে' 'একবার আমাকে' 'কেউ না কেউ সঙ্গে থাকেই' 'আবরণ' 'অবরোহী'—এই সব কবিতা পড়লে সন্দেহ থাকে না বাংলা কবিতার পালা বদলের ইতিহাসে মৃত্যুঞ্জয় অত্যন্ত উজ্জ্বল ব্যক্তি; বিশ্বাস করা যায় যে তিনি হাঁটছেন; আঁচরেই পৌঁছবেন হয়তো পরিণত শিল্পসত্তাবে।।

সংকলন ও পত্র-পত্রিকা

প্রগতি—(ঈদ সংখ্যা)—সম্পাদক মহম্মদ আলি।। আকড়া মাদ্রাসা বাজার, মটানগর, ২৪ পরগণা।। এক টাকা।।

প্রচুর বিজ্ঞাপন নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে 'প্রগতি'র ঈদ সংখ্যাটি। প্রবন্ধ লিখেছেন অন্নদাশঙ্কর রায়, মৈত্রেয়ী দেবী, মৌলানা ফজলুল আবেদীন, মহম্মদ মনুসালিম, খাজিমউদ্দীন আহমেদ এবং মহম্মদ আলী খান্দার। তাছাড়া লিখেছেন গৌরাঙ্গ ভৌমিক, বীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, নরুল ইসলাম মোল্লা, মোঃ লুৎফর রহমান খাঁ, শিবশম্ভু পাল এবং আরো অনেকে।

শ্লোক (শেক্সপীয়র সংখ্যা)—সম্পাদক শিপ্রা ঘোষ ও মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।। এল পি ১১৭ শ্রীমা পল্লী, বেহালা, কলকাতা ৬০।। দাম : দু টাকা।।

বিশেষ সম্পাদকীয় নিবন্ধে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন সম্পাদক। আধুনিক কবিতার ওপরে লেখা মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধের অংশ বিশেষ ছাপা হয়েছে এ-সংখ্যায়। কবিতা লিখেছেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, মণীন্দ্র রায়, বিমলচন্দ্র ঘোষ, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, জগন্নাথ চক্রবর্তী, শুভেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়, গৌরাঙ্গ ভৌমিক প্রমুখ। তাছাড়া ছাপা হয়েছে দীর্ঘ কবিতা, কাব্যোপন্যাস, নাটিকা ও একটি কবিতার সুজনশক্তি সম্পর্কে আলোচনা। লিখেছেন কৃষ্ণ ধর, গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়, শিপ্রা ঘোষ। পত্রিকাটির প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা চমৎকার। ছাপা ভালো। সম্পাদকীয় দৃষ্টি উল্লেখযোগ্য।

নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

(৩৫)

আবার সেই বাদ্য বাজছিল। ঢাক-ঢোল সানাই বাজছে। জল ভরতে গেছে মেয়েরা। মাথা নেড়া করছে সোনা লালটু পলটু। উৎসবের বাড়ি, কত আত্মীয় কুটুম্ব। তাদের সন্তান-সন্ততি। সব ছেলেপুলে চারপাশে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে। ওরা যেন তামাশা দেখছে—এমন এক ভাব চোখে-মুখে। ওরা কেউ কেউ ঠাট্টা তামাসা করছে। সোনা শক্ত হয়ে বসে আছে, সে মাথা নেড়া করবে না। তাদের তাড়িয়ে না দিলে মাথা নেড়া করবে না। যারা হাসছিল তাদের তাড়িয়ে দিল ঈশম। এবার মাথা পেতে দিয়েছে সোনা। ঈশমের এমন খুচরো কাজ কত। ঈশম অবসর পাচ্ছে না। সে এইমাত্র নয়াপাড়া থেকে ঘুরে এসেছে। আবার তাকে বিশ্বাস পাড়া যেতে হবে। যাবার আগে সে গাছে উঠে আমের শুকনো ডাল, বেলপাতা, পল্লব, হোমের জন্য পেড়ে রেখে দিয়েছে।

রান্নাঘরের পাশে কাল সারাদিন খেটে ঈশম একটা নতুন চালাঘর তুলেছে। বড় বড় ডেগ, হাঁড়ি, পেতলের বালতি, মালসা চালার নিচে। ফুল কপি, বাঁধা কপি কাটছে হারান পালের বৌ। বড় মাছ কাটছে দীনবন্ধুর দুই বউ। বড় ডেগে গরম হচ্ছে দুধ। মুসলমান পাড়া থেকে সবাই দুধ দিয়ে যাচ্ছে। শচি সব দুধ মেপে রাখছে।

এই উৎসবের বাড়িতে একমাত্র ধনবৌ কিছু করতে পারছে না। পেটে তার সন্তান। সন্তান পেটে নিয়ে শুভকর্মে হাত দিতে নেই। ধনবৌ চুপচাপ বারান্দার এক কোণে বসে শুধু পানের খিলি বানাচ্ছে। সুতরাং বড়বৌর উপরই চাপ বেশি। বড়বৌ এই শীতেও ঘেমে গেছে। খুব ভোরে উঠে স্নান করেছে বড়বৌ। লালপেড়ে গরদ পরেছে। আত্মীয়স্বজনদের জন্য সকালের জলখাবার ঠিক করতে হয়েছে। দক্ষিণের ঘরে ফরাস পাতা হয়েছে। পঞ্চমীঘাট এবং ভাটপাড়া থেকে সব বড় বড় পণ্ডিত এসেছেন। ওঁরা ধর্মাধর্মের তর্কে ডুবে আছেন। ওঁদের জন্য বাটিতে গরম দুধ এবং মুড়ি, দুটো সন্দেশ জলখাবার গেছে। সন্ধ্যা আহ্নিকের জন্য ঘাটের পাড়ে স্থান সাফ করে দেওয়া হয়েছে। সারা সকাল পণ্ডিতেরা সেখানে বসে আহ্নিক করেছেন।

যারা দূর থেকে আসছে তাদের চন্দ্রনাথ দেখাশোনা করছে। ভূপেন্দ্রনাথ টাকা-পয়সা এবং কোথায় কি প্রয়োজন হবে সারাক্ষণ তাই দেখাশোনা করছে। কেউ বেশিক্ষণ এক জায়গায় দাঁড়াতে পারছে না। শশিভূষণ বৈঠকখানায় পণ্ডিতদের সঙ্গে ন্যায়নীতির গল্পে ডুবে গেছে।

মাঝে মাঝে ভূপেন্দ্রনাথ কাজ ফেলে পণ্ডিত প্রবরদের সামনে করজোড়ে দাঁড়িয়ে থাকছে। কোন ত্রুটি যদি হয়ে থাকে—মার্জনা ভিক্ষার মতো মুখ—আমাদের এই পরিবারে আপনাদের আগমন প্রায় তীর্থযাত্রার সামিল। এভাবে সে ঘুরে ঘুরে সবার কাছে পরিবারের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে। আপনাদের আগমনেই এই উৎসব সফল, এমন নিবেদন করছে।

শচীন্দ্রনাথ তখন শশীবালার কাছে গিয়ে বলল, মা তোমার আর কি লাগবে?

শশীবালা আলু, বাঁধাকপি, পটল, কুমড়ো এসবের ভিতর ডুবে ছিল। যত লোক খাবে তার হিসাব মতো সব বের করে দিচ্ছে শশীবালা। মায়ের পাশে শচীন্দ্রনাথ দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। সুলতানসাদির বাজারে আর বারদীর হাট থেকে মাছ এসেছে। তবু মাছে কম হবে কিনা, একবার দেখা দরকার। পুকুরে জাল ফেলা যদি দরকার হয়, সেজন্য গগনা জেলে জাল নিয়ে পুকুর পাড়ে বসে রয়েছে। সে গগনা জেলেকে কিছু মাছ তুলে দিতে বলল।

তাছাড়া শচীর পকেটে ঘড়ি, সে মাঝে মাঝে ঘড়ি দেখে কখন বৃদ্ধিতে বসার সময়, কটার ভিতর স্নান দেওয়া হবে এবং হোম কটা থেকে কটার ভিতর শেষ করা দরকার, আহ্নিক স্নানের আগে না পরে করাতে হবে এসব সে হিসাব রাখছে বলে ভূপেন্দ্রনাথ আর তাকে অন্য কোন কাজের ভার দেয়নি।

সে তাড়াতাড়ি পুকুর পাড়ে এসে দেখল এখনও কামান হয়নি। সোনার মাথার অর্ধেকটা চাঁচা হয়েছে। নাপিত ধরে মাথা, পিঠে ঘাড়ে চুল, শীতে সোনা কাঁপছে। সোনা জবুথবু হয়ে বসে রয়েছে। কান ফুটো করা হবে এই বলে সকলে ওকে ভয় দেখাচ্ছে। সে ভয়ে শক্ত হয়ে আছে। ভূপেন্দ্রনাথ ব্যাপারটা বুঝতে পেরে বলল, না কান তোমার কেউ ফুটো করবে না। ভূপেন্দ্রনাথ সোনার পাশে দাঁড়িয়ে থাকল। যারা পুকুরে জল ভরতে গেছে ওরা ফিরে এলেই স্নান। হলুদে রাঙানো কাপড় পরেছে সোনা। হলুদ মেখে স্নান করানো হবে। স্নানের শেষে ওরা নতুন কাপড় পরবে। সোনার মাথা নেড়া হলে ভূপেন্দ্রনাথ মাথায় হাত রাখল। ছোট্ট একটা শিখা ঝুলছে। সোনা বারবার শিখাতে হাত রেখে কেমন পুলক বোধ করল।

এবং তখন গান হচ্ছিল পুকুর পাড়ে। যারা জল ভরতে গেছে তারা গান গাইছে। সুর ধরে অদ্ভুত সব গান। সোনা লালটু পলটুর মঙ্গল কামনায় গান গাইছে ওরা। এই সংসারে বড় হচ্ছে। বড় হতে হতে ওরা এক ধর্ম প্রচারে ডুবে যাবে—সে ধর্মের নাম হিন্দু ধর্ম। নানাবিধ ক্রিয়াকলাপের ভিতর তুমি মহাভারতের মানুষ এমন যেন এক বোধ গড়ে দিতে চাইছে তারা।

সোনা যেমন একবার নদীর পাড়ে ল্যান্ডোতে ফিরতে ফিরতে ভেবেছিল—সে রূপ উপকথার নায়ক হয়ে যাচ্ছে, আজও সে তেমনি নায়ক তার জন্য কি সব জাঁকজমক। এদিনে ফাতিমা কাছে নেই। থাকলে কি না সে খুশী হত।

কিন্তু নতুন কাপড় পরার সময়ই যত গণ্ডগোল দেখা গেল। পিসিমার ছোট ননদের মেয়ে দীপালি দাঁড়িয়ে আছে। শীতের রোদে ওদের স্নান করানো হচ্ছে। সেই ঢাক-ঢোল বাজছে, সানাই বাজছে। শুভকার্যে উলুধ্বনি, ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি ওড়ার মতো যেন ওদের মাথায় পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহের আশীর্বাদ বর্ষিত হচ্ছে। কিন্তু সোনা কাপড় পরে না, পরার অভ্যাস নেই। সে কাপড় পাল্টাবার সময় দেখল ভিড়ের ভিতর থেকে দীপালি তাকিয়ে আছে। ওর ভীষণ লজ্জা লাগছিল। সে দুহাতে দশহাতি কাপড়, কাপড়টা এত বড় দেবার কি দরকার, দশহাতি কাপড় সে কোমরে জড়িয়ে রেখেছে, ছাড়তে পারছে না। ছেড়ে দিলেই সে নেংটো হয়ে যাবে। নেংটো হয়ে গেলে দীপালি ওর সব দেখে ফেলবে—সে শীতের ভিতর হিহি করে কাঁপছে অথচ কাপড় ছাড়ছে না। সোনা এ-সময় তার জ্যাঠিমাকে খুঁজছিল।

পিসিমা বললেন কাপড়টা ছাড়

সে কাপড় ধরে দাঁড়িয়ে থাকল।

CENTRAL LIBRARY

মেসোমশাই এসে বললেন, কি সোনা, নীতে কষ্ট পাইতাছ বাপ? কাপড় ছাড়।

সোনা আবার তাকাল।

লালটু বলল, কি আদর আমার। জ্যাঠিমা না আইলে তিনি কাপড় ছাড়তে পারতাছে না।

তখন এল বড়বৌ।—কি হয়েছে সোনা। এখনও তুমি ভিজে কাপড়ে দাঁড়িয়ে আছ।

সোনা এবার চারপাশের ছোট ছোট মেয়েদের দিকে চোখ তুলে তাকাল।

বড়বৌ বলল, ও তার জন্য। আর। বলে সে সোনার হাঁটুর কাছে পা ভাঁজ করে বসল।—আমার কত কাজ সোনা। তোরা যদি এমন করিস তবে কাজের বাড়িতে চলে?

সোনা কিছু শুনছে না যেন হাত উপরে তুলে দাঁড়িয়ে আছে।

বড়বৌ শুকনো কাপড়টা আলগা করে আড়াল দিয়ে ভিজা কাপড়টা খুলে ফেলল। তারপর সুন্দর করে ধুতিটা কুঁচি দিয়ে পরিয়ে দিল। কাপড়টা সোনার মাপ মতো নয়। বড় বলে কিছুটা জবুথবু অবস্থা সোনার। সে নিজের কাপড়ে প্যাঁচ খেয়ে যখনও উল্টে পড়ে যেতে পারে। সেজন্য বড়বৌ কাপড়ের কোঁচটা কোমরে গুঁজে দিল।

এবার ওরা গিয়ে বসল আচার্যদেবের সামনে। আচার্যের আসনে বসে আছেন পণ্ডিত সূর্যকান্ত। তিনি দীর্ঘ এক পুরুষ এবং সূর্যের মতোই আজ তাঁর দীপ্ত চোখ-মুখ।

তিনি যেন তিন বালককে, কঠোর চোখে দেখতে থাকলেন। হে বালকেরা, তোমাদের পুনর্জীবন হচ্ছে, এমন চোখে তাদের দেখছেন। বালকদের মুখ দেখে তিনি বুঝতে পারছেন, এত বেলা হয়ে গেছে, এখনও সামান্য জলটুকু পর্যন্ত ওরা খেতে পায় নি। ফলে চোখমুখ শুকিয়ে গেছে। এবার তিনি হাঁক দিয়ে জানতে চাইলেন, ষোড়শ মাতৃকার কতদূর, বুঝি শেষ হল কিনা, না হলে এই ফাঁকে চন্দনের কাজ সেরে নেওয়া যেতে পারে।

পাল্কিতে বসার সময় সোনা দেখল দীপালি ওর ও-পাশে চুপচাপ উঠে বসে আছে। সোনার গলায় পদ্মফুলের মালা। কপালে চন্দনের তিলক। গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবি, হরিণের চামড়ার উপর সে বসে রয়েছে। আর কত রকমের ফুল ছড়ানো সেই হরিণের চামড়ার উপর। তিনটে পাল্কি যাত্রা করবে। ওরা যতদূর প্রতিদিন গ্রাম মাঠ ভেঙে নদীর পাড়ে যায় ততদূরে এই পাল্কিতে ওরা চলে যাবে।

সোনা দীপালিকে পছন্দ করে না। কারণ দীপালি ঢাকা শহরে থাকে। সে বড় বড় কথা বলে সোনাকে অযথা ছোট করতে চায়। আজ সে দেখছে সেই দীপালি সব সময় তার কাছে কাছে থাকতে চাইছে।

সোনা প্রায় ভিতরে ঘরের বেগে বসেছিল। সে দীপালির দিকে তাকাচ্ছে না। বরং পাল্কিটা দুলছে। ওর ভয় ভয় করছিল। একবার চলতে থাকলে ওর আর ভয় ভয় করল না। পিছনে বাজনা বাজছে। সানাই বাজছে। প্রতিবেশীরা সকলে নেমে এসেছে। ওরা নরেন দাসের মাঠে এসে নামল। তারপর গোপাটে। গোপাট ধরে অশ্বত্থ তলা পার হবার সময় মনে হল পাল্কি চৌতার বাগের কাছে এসে গেছে।

দীপালি বলল, সোনা তুই আমারে দ্যাখ।

—কি দ্যাখমু।

—আমি কি সুন্দর ফ্রক পরেছি।

সোনা বলল, বাজে ফ্রক।

দীপালি বলল, তুই কিছু জানিস না।

সোনা উঁকি দিল এবার। আর তখন সে আশ্চর্য হয়ে গেল। দেখল মজুমদার মিঞার বড় বটগাছের নিচে অনেকের সঙ্গে ফতিমা দাঁড়িয়ে আছে। সে পাল্কিতে সোনাবাবু যায় দেখতে এসেছে।

বক দ্রুত বাড়িল বেহারা। নিমেষে মুখটা মিলিয়ে গেল। সোনা উঁকি দিয়েও মুখটাকে ভিড়ের ভিতর আর খুঁজে পেল না।

পাল্কিটা পাশ কাটিয়ে গেল ফতিমার। কি সব সুগন্ধি ফুলের সুবাস ছড়িয়ে গেল। ভুর-ভুর গন্ধে চারপাশটা ভরে গেল। সোনাবাবু ফুলের উপর বসে আছে। প্রায় যেন রাজপুত্রের সামিল। পাশে কে একটি মেয়ে। ফতিমার মনটা কেমন খারাপ হয়ে গেল। অভিমানে ওর চোখ ফেটে জল আসছে। সে সোনাবাবুর সঙ্গে একটা কথা বলতে পারল না।

সামুর মা সাদা পাথরের রেকাবিতে তিনটে তাঁতের চাদর এবং তিনটে আতাফল রেখে দিয়েছে। ওর কোমরের ব্যথা আবার বেড়েছে। মাঝে কিছুদিন বিছানায় পড়েছিল, এখন সে লাঠি ঠুকে চলাফেরা করতে পারছে। ঠাকুরবাড়িতে উপনয়ন। সে বাবুর হাট থেকে তিনটে তাঁতের চাদর আনিয়ে রেখেছে। এ-সব নিয়ে তার যাবার কথা। কিন্তু এই শরীরে সে যাবে কি করে। সামুর স্ত্রী আলিজানও চিন্তিত। এই উপনয়নে অথবা বিবাহে, যখন যা কিছু হয়, সামুর বাপ বেঁচে থাকতে কিছু না কিছু দিয়েছে। এবং সামুর বিয়েতেও বড়ো কর্তা নারানগঞ্জ থেকে পাছা পেড়ে শাড়ি আনিয়ে দিয়েছিলেন।

এমন শুভ দিনে, এমন উৎসবের সময়ে ফতিমা সোনাবাবুর সঙ্গে কথা বলতে পারল না—ওর ভিতরে ভিতরে কষ্ট হচ্ছিল খুব। সে দেখল মা একটা সাদা পাথরের রেকাবি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কাকে দিয়ে যে পাঠাবে ফতিমা বলল, মা আমি নিয়া যামু। দাও আমারে।

তখন সেই পণ্ডিত সূর্যকান্ত, আচার্যদেব, রুক্ষ চেহারা যে মানুষের, বয়সের ভার যাকে এতটুকু অথর্ব করতে পারেনি, নামাবলী গায়ে, সাদা গরদ পরণে এবং শিখাতে জবাফুল বাঁধা—তিনি জোরে জোরে মন্ত্র উচ্চারণ করছিলেন এবং সাথে সাথে নানারকম নির্দেশাদি সহ ঃ মানবক ক্ষৌরাদিকার্য সমাপনপূর্বক স্নান করিয়া গৈরিকাদিরঞ্জিত বস্ত্র পরিধান করিবে। পৈতা উপলেপনাদি যেরূপ সংস্কারান্ত কর্ম করিয়া যথাবিধি চরু শ্রপণ করিবেন, যথা—সদসস্পতয়ে জুষ্টং গৃহামি, এই বলে তিনি আঃ আঃ আঃ যেন অগ্নেয় স্বাহা আঃ আঃ অনেক দূরে দূরে এই উচ্চারণ প্রতিনিয়ত বাতাসে ধ্বনি তুলে গ্রামে মাঠে ছড়িয়ে পড়ছে। ফতিমা গ্রাম থেকে নেমে গোপাটে পড়তেই সেই গম্ভীর শব্দ শুনতে পেল। যেন কোন মহাঋষি হাজার হাজার হোমের কাষ্ঠ জেলে কলসী কলসী ঘি ঢেলে দিচ্ছেন। তেমন এক পূত পবিত্র ধ্বনি ফতিমাকে আপ্লুত করছে। সে মাথায় রেকাবি আর কোমরে আতাফল নিয়ে ছুটতে থাকল।

অতঃপর আচার্যদেব বলিলেন, সমস্ত কার্য সমাপনপূর্বক একটি যজ্ঞোপবীত দক্ষিণ স্কন্ধাবলম্বন ভাবে কুমারের বাম স্কন্ধে দিবে। মন্ত্রক যথা—ওঁ যজ্ঞোপবীতং পরমং পবিত্রং.....এমন সব মন্ত্র সূর্যের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বলিতে লাগিলেন।

সোনা আচার্যদেবের সামনে এবার অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে বলল, ওং উপনয়ন্তু মাং ব্রহ্মং পারাঃ।

আচার্যদেব বলিলেন, ওং উপনেষ্যামি ভবন্তম। অনন্তর আচার্য অগ্নির উত্তর-দেশে গমনপূর্বক চারিটি ঘৃতাহুতি প্রদান করিলেন। তাহার পর আচার্যদেব অগ্নির দক্ষিণ দিকে দণ্ডায়মান হইলেন।

সোনার সম্মুখে যজ্ঞের কাষ্ঠ প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল। উজ্জ্বল অগ্নি-শিখায় তাহার মুখমণ্ডল কম্পমান হইতেছে। মনে হইতেছে মুখমণ্ডলে কে তাহার দেবীগর্জন লেপন করিয়াছে। মাথায় কিরণ পড়িতেছে। সেই আদিত্যের কিরণ। ক্ষুধায় কাতর। মুখমণ্ডল বড় বিষণ্ণ। ক্লান্ত। সে দণ্ডায়মান থাকিতে পারিতেছে না। তাহার উরু কাঁপিতেছে। সে তবু আচার্যদেবের সম্মুখভাগে করপুটে দণ্ডায়মান। যজ্ঞ হইতে ধূম উত্থিত হইতেছে। চক্ষু জ্বালা করিতেছে। ওর চক্ষুদ্বয় সহসা লাল অগ্নিবর্ণ ধারণ করিতেছে এবং সুবাসিত হোমের যজ্ঞকাষ্ঠ হইতে মন্ত্রের মতো এক অপরিচিত বোধ ও বুদ্ধি উদয় হইবার সময়ে ভিতরে কি যেন গুড়ুগুড়ু করিয়া বাজিতেছে। সোনার বলিতে ইচ্ছা হইতেছে, আমি তৃষ্ণার্ত, জলপান নিমিত্ত তৃষ্ণার্ত।

আচার্যদেব হাসিলেন। হাসিতে বিষাদ ফুটিয়া উঠিল। কৃচ্ছ্রসাধন নিমিত্ত এই উপবাস অথবা বলিতে পার সন্ন্যাস জীবন-যাপন। তিনি এইবার ধীরে ধীরে ওর অঞ্জলিতে জল সিঞ্চন করিলেন। অতঃপর সেই অঞ্জলিতে স্বীয় অঙ্গুলি মিশ্রিত-পূর্বক কহিলেন, বশিষ্ঠ ঋষিস্তিষ্টুপ ছন্দোঽগ্নির্দেবতা জলাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগ। তিনি কুমারকে অভিষেক করিলেন।

অনন্তর আচার্য মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক সূর্য দর্শন করাইলেন এবং জিজ্ঞাসিলেন, কিং নামাসি?

—শ্রীঅতীশ দীপঙ্কর দেবশর্মাহং ভোঃ!

আচার্যদেবের পুনরায় প্রশ্ন, কস্য ব্রহ্মচার্যাসি?

এবার আচার্যদেব খুব আস্তে আস্তে কিছু মন্ত্র পাঠ করিলেন। সে তাহার বিন্দু বিসর্গ বুঝিতে পারিল না। সে সেই মুখের প্রতি অবলোকনপূর্বক অধোবদনে নিবিষ্ট হইল।

এ-ভাবে সোনা যেন ক্রমে অন্য এক জগতে পৌঁছে যাচ্ছে। যা সে এতদিন দেখেছে এবং শুনেছে—এই জগত সম্পর্কে তার থেকে আলাদা। সে সকালে উঠে যে সোনা ছিল, এখন আর সে সোনা নেই। সে অন্য সোনা, সে পূত এবং পবিত্র। চারপাশে তার পবিত্রতার বর্ম পরানো হচ্ছে। মন্ত্র সে ঠিক ঠিক উচ্চারণ করতে পারছে না, না পারলে চুপচাপ আচার্যদেবের দিকে তাকিয়ে থাকছে। কারণ আচার্যদেব এত দ্রুত মন্ত্র পাঠ করছিলেন যে সোনার পক্ষে অনুসরণ করা কিছুতেই সম্ভব হচ্ছে না। সে শুধু তখন মুখের দিকে তাকিয়ে বসে থাকছে। হরিণের চামড়ার উপর সে বসেছিল। সামনে কোষাকুষি, গঙ্গাজল, হাতে কুশের আংটি এবং বিচিত্র বর্ণের সব ফুল, দূর্বা, বেলপাতা, তিল তুলসি।

আচার্যদেব কহিলেন, আচমন কর। সোনা আচমন করিল।

আচার্যদেব কহিলেন, কুশের দ্বারা মাথায় জল সিঞ্চন কর।

সে মাথায় জল সিঞ্চন করিল।

মন্ত্র পাঠের পর আচার্যদেব সন্ধ্যা পাঠের নিগূঢ় অর্থ প্রকাশ করিলেন।

তিনি কহিলেন, একদা সন্দেহ নামক মহা বলিষ্ঠ ত্রিংশতকোটি রাক্ষস মিলিত হইয়া সূর্যের সংহারার্থে উপস্থিত হইয়াছিল। তখন দেবগণ ও ঋষিগণ সমবেত হইয়া জলাঞ্জলি গ্রহণপূর্বক সন্ধ্যার উপাসনাকরতঃ সেই সন্ধ্যোপাসনাকৃত বজ্রভূত জল প্রক্ষেপ দ্বারা সমস্ত দৈত্যের বিনাশ সাধন করেন। এইজন্য বিপ্রগণ নিত্য সন্ধ্যোপাসনা করিয়া থাকেন। তারপরই তিনি কহিলেন, ওম্ শন্ন আপো ধন্বন্যা শমন সন্তু নূপ্যা......মরুদেশোদ্ভব জল আমাদের কল্যাণ করুক, অনূপদেশজাত জল আমাদিগের মঙ্গলপ্রদ হউক, সাগর বারি আমাদিগের শ্রেয় বিধান করুক, এবং কূপজল আমাদিগের শুভদায়ী হউক। স্বেদাক্ত ব্যক্তি তরুমূলে থাকিয়া যে প্রকার ক্লেদ হইতে মুক্তিলাভ করে, স্নাত ব্যক্তি যেইরূপ শারীরিক মল হইতে মুক্ত হয়, জল আমাকে তদ্রূপ পাপ হইতে পরিত্রাণ করুক। হে জলসকল তোমরা পরম সুখপ্রদ: অতএব ইহকালে আমাদিগের অন্ন সংস্থান করিয়া দাও এবং পরলোকে সুদর্শন পরম ব্রহ্মের সহিত আমাদিগের সম্মিলন করাইয়া দাও। স্নেহময়ী জননী যেমন স্বীয় স্তনো দুগ্ধ পান করাইয়া পুত্রের কল্যাণবিধান করেন, হে জলসমূহ, তোমরাও তদ্রূপ ইহলোকে আমাদিগকে কল্যাণময় রসের দ্বারা পরিতৃপ্ত কর। হে বারিসমূহ, তোমরা যে রস দ্বারা জগতের তৃপ্তি করিতেছ, সেই রস দ্বারা আমাদিগের যেন তৃপ্তি জন্মে। তোমরা আমাদিগের সেই রসভোগের অধিকার প্রদান কর।

মন্ত্রপাঠের দ্বারা সোনার মুখমণ্ডল নানা বর্ণে রঞ্জিত হইতেছিল। মাথার উপর দ্বিপ্রহরের রোদ্র। সম্মুখে সেই হোমাগ্নি। এবং কোষাকুষিতে তাহার হাত। আর আচার্যদেব যেন নিরন্তর তাহার নাভি হইতে মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক তাহার অর্থ ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। সোনা এইসব ক্রিয়া-কর্মাদির ভিতর এক দুর্জ্ঞেয় রহস্যে প্রোথিত হইতেছিল।

তিনি কহিলেন, মহাপ্রলয় কালে কেবল ব্রহ্মা বিরাজমান ছিলেন। তখন সমস্ত অন্ধকারাবৃত ছিল। তদনন্তর সৃষ্টির প্রাক্কালে অদৃষ্টবশে সলিলপূরিত সাগর সমুৎপন্ন হইল। সেই সাগর-বারি হইতে জগত-সৃষ্টিকারী বিধাতা সঞ্জাত হইলেন। সেই বিধাতাই দিবা প্রকাশক সূর্য ও নিশা প্রকাশক চন্দ্র সৃষ্টি করিয়া বৎসরের কল্পনা করেন অর্থাৎ সেই সময় হইতে দিবারাত্রি, ঋতু, অয়ন, বৎসর প্রভৃতি যথা-নিয়মে প্রতিষ্ঠিত হইল।

সোনা ভাবিল, তাহার নাম শ্রীঅতীশ দীপঙ্কর দেবশর্মা। দেবশর্মা ভোঃ। ভোঃ শব্দ উচ্চারণে তাহার মনে হাসির উদ্রেক হইল। সে তাড়াতাড়ি হাসি নিবারণার্থে কহিল, সূর্যশ্চ মেতি মন্যুসা ব্রহ্ম-ঋষি...

আচার্যদেব কহিলেন, সূর্যশ্চ মা মন্ত্রের ঋষি ব্রহ্মা। প্রকৃতি ইহার ছন্দ। জল—দেবতা, এবং আচমন কর্মে ইহার প্রয়োগ হয়।... সূর্য, যজ্ঞ ও যজ্ঞপতি ইন্দ্রাদি অমরগণ অসম্পূর্ণ যজ্ঞজনিত পাপ হইতে আমাকে উদ্ধার করুন। আমি রাত্রিকালে মন, বাক্য, হস্ত, পদ, জঠর ও শিশ্ন দ্বারা যে পাপ করিয়াছি দিবা তাহা বিনষ্ট করুন। আমাতে যে পাপ

রচনাবলী সিরিজ

গিরিশ রচনাবলী

গিরিশচন্দ্র ঘোষের সমগ্র রচনা চার খণ্ডে প্রকাশিত হচ্ছে। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে [টাঃ ২০]; এতে আছে ২১টি নাটক ও ৭টি গদ্য রচনা। সম্পাদনা করেছেন ডঃ রথীন রায় ও ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য। দ্বিতীয় খণ্ডের প্রকাশন আসন্ন।

দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সমগ্র রচনা দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ। [১ম খণ্ড টাঃ ১২·৫০, ২য় খণ্ড টাঃ ১৫·০০]; ডঃ রথীন রায় সম্পাদিত।

রমেশ রচনাবলী

রমেশচন্দ্র দত্তের সমগ্র উপন্যাস (মোট ৬টি) এক খণ্ডে। শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল সম্পাদিত। [টাঃ ১০·০০]।

দীনবন্ধু রচনাবলী

দীনবন্ধু মিত্রের সমগ্র রচনা একখণ্ডে। ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত। [টাঃ ১০·০০]।

মধুসূদন রচনাবলী

মধুসূদন দত্তের ইংরেজিসহ সমগ্র রচনা একখণ্ডে। ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত। [টাঃ ১৫·০০]।

বঙ্কিম রচনাবলী

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সমগ্র উপন্যাস একখণ্ডে (যন্ত্রস্থ)। দ্বিতীয় খণ্ডে সমগ্র সাহিত্য অংশ [টাঃ ১৭·৫০]। তৃতীয় খণ্ডে সমগ্র ইংরেজি একত্রে [টাঃ ১৫·০০]। শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল সম্পাদিত।

প্রতি রচনাবলীতে জীবনী ও সাহিত্যকীর্তি আলোচিত।

সাহিত্য সংসদ　৩২এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা—৯ (৩৫-৭৬৬৯)

আছে উৎসমন্ত এই সলিলে সংক্ষোভিত করিবে, এই পাপময় সলিল হৃৎপদ্ম মধ্যগত অমৃতজ্যোতি জ্যোতির্ময় সূর্যে সমর্পণ করিলাম। উহা নিঃশেষে ভস্মীভূত হউক।

সোনা আর পারছে না। ওর তেষ্টা পাচ্ছে। সে যেখানে দাঁড়িয়ে আছে—ফতিমা মাকুবরের পাশে দাঁড়িয়ে দেখছে। সে আলাদাভাবে দাঁড়িয়ে আছে। একা। সে নাকে নথ পরেনি। পায়ে মল পরে আসেনি। ওর লম্বা ফ্রক ঝলমল করছে এবং ওড়না দিয়ে মাথায় ঘোমটা। সোনা জানে না ওর ঠিক পিছনে এক বালিকা চুপচাপ বসে সোনাবাবুর মন্ত্রপাঠ শুনছে। যত শুনছে তত বিস্মিত হয়ে যাচ্ছে। সে এইসব শব্দ সংস্কৃত শব্দ জানে। সে কোন অর্থ বুঝতে পারছে না। অথচ কেমন এক ভাবগম্ভীর আওয়াজ এই উৎসবকে মহিমামণ্ডিত করছে। বাবু যে দাঁড়াতে পারছে না, পা কাঁপছে, সে শেফালি গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে টা টের পাচ্ছিল।

সূর্যকান্ত বুঝতে পারলেন উপবাসে সোনা কাতর। তিনি তাকে এক গ্লাস জল খাবার অনুমতি দিলেন। সে এক নিঃশ্বাসে জলটুকু খেয়ে ফেলল। ফতিমার মনে হল এবার সোনাবাবু ওর দিকে তাকাবে। সে তিনটে চাদর তিনটে আতাফল এবং তিনটে আমলকি নিয়ে এসেছে। বড়বৌ এগুলো সে মাটিতে রেখে দিলে গঙ্গাজল ছিটিয়ে ঘরে নিয়ে গেছে। গঙ্গাজল বড় দুর্লভ বস্তু। একঘটি জল এনে সেই জল মিশিয়ে কড় বাড়ি বাড়ি এবং এক কলসি জলে এক ফোঁটা হোমিওপ্যাথি ওষুধের মতো ব্যবহার। ফতিমা জানে এ-ভাবে না নিলে এই উৎসব ওদের পবিত্র থাকবে না। বড়বৌ ওকে গাছটার নিচে বসতে বলে গেছে। সে বলে না গেলেও বসে থাকত। এত কাছে এসে সে সোনাবাবুর পৈতা হচ্ছে না দেখে চলে যেতে পারত না। সোনাবাবু কখন ওকে একবার ঘাড় ঘুরিয়ে দেখবে সেই আশায় অপলক তাকিয়ে আছে।

এবার ওরা পুবের ঘরে ঢুকে যাবে। এই ঘরে ঢুকলে ওরা আর তিনদিন বের হতে পারবে না। চন্দ্র সূর্য দেখতে পাবে না। এই তিনদিনের অজ্ঞাতবাস সোনা অথবা লালটু পলটুর কাছে প্রায় বনবাসের মতো। ওরা ঘরে ঢুকে গেল। এবং দরজা বন্ধ হয়ে গেল। ফতিমার দিকে সোনাবাবু একবার তাকাল না।

ওরা তিনজন পাশাপাশি দাঁড়াল। হাতে বিল্বদণ্ড। কাঁধে ভিক্ষার ঝুলি, গৈরিক রঙের একখণ্ড কাপড় কোমরে জড়ানো। প্রথম ধনবৌ এবং বড়বৌ এল ডালা সাজিয়ে। ওরা তিনজনকে তিনটে সোনার আংটি দিল।

সোনা মায়ের দিকে তাকিয়ে বলল, ভবতু ভিক্ষাং দেহি।

ভিক্ষা দিতে গিয়ে সোনার মুখ দেখে ধনবৌ অন্যমনস্ক হয়ে গেল। একেবারে ঋষি বালকের মুখ। যেন কোন অরণ্যের ছোট্ট বিহারে ভিক্ষু, বিহারের জন্য দাঁড়িয়ে আছে। এমন মুখ দেখলেই ধনবৌর ভয় হয়। পাগল মানুষের কথা মনে হয়। বংশের কেউ না কেউ কোন না কোনদিন নিরুদ্দেশে চলে যাবে। সোনার মুখ ঠিক ওর পাগল জ্যাঠামশাইর মতো। সোনা মাকে দেখছে। ধনবৌ ছেলের মুখের দিকে আর তাকাতে পারছে না। যেন এক্ষুনি জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলবে। লালটুর জন্য ধনবৌর এত কষ্ট হয় না। সে মায়ের পাশে শোয় না। সে আলাদা শোয়। নিজের দায়িত্ব যেন নিজেই নিতে পেরেছে। ধনবৌ সোনাকে ভিক্ষা দিয়েই তাড়াতাড়ি বের হয়ে গেল।

বড়বৌ তখন এক ছোট্ট হাঁড়িতে নানা রকমের মিষ্টি সাজাচ্ছিল। খুব যত্নের সঙ্গে কলাপাতা দিয়ে মুখটা বেঁধে দিয়েছে। ঈশম এত লোকজন যে পা ফেলতে পারছে না। কখন কাকে ছুঁয়ে দেবে এই ভয়। সে ফতিমাকে নিয়ে এল। বড়বৌ ঈশমের পছন্দ বিবির জন্য আলাদা একটা থালে কটা মিষ্টি তুলে রাখল। ফতিমাকে বলল, এটা নিয়ে যা। তোর নানীকে বলবি, শরীর ভাল হলে যেন একবার আসে। কতদিন দেখি না।

ফতিমা ঘাড় নাড়ল।

—তোর বাবা এসেছে?

ফতিমা বলল, না।

—নিয়ে যেতে পারবি ত? না ঈশম দিয়ে আসবে।

ফতিমা বলল, পারব।

—ফেলে দিস না কিন্তু।

ঈশম মিষ্টির হাঁড়িটা ওর হাতে দিল। কিন্তু হাতে নিতে অসুবিধা। ফতিমা হাঁড়িটা অর্জুন গাছটার নিচে এসেই মাথায় তুলে নিল। তারপর যেমন সে গোপাটে নেমে এসেছিল সাদা পাথরের থালাতে তিনটে তাঁতের চাদর নিয়ে, আতাফল নিয়ে, তেমনি সে এখন মিষ্টির হাঁড়ি নিয়ে ছুটছে। ছুটছে আর সেই সোনাবাবু তার দিকে তাকাল না, সে কতক্ষণ থেকে শেফালি গাছটার নিচে বসেছিল—একবার অন্তত দেখুক সোনাবাবু, সে এসেছে, সুন্দর ফ্রক পরে সে এসেছে, সে তার সবচেয়ে ভাল ফ্রক গায়ে দিয়ে এসেছে। সে কত কথা বলবে বলে এসেছিল, অথচ সোনাবাবু একবার চোখ তুলে তাকাল না। ফতিমা এখন অভিমানে ফেটে পড়ছে। আর তখন দেখল হাজি সাহেবের সেই খোদাই ষাঁড়টা। টের পেয়েছে ছোট্ট এক বালিকা হাঁড়িতে মিষ্টি নিয়ে যাচ্ছে। ষাঁড় ত এখন আর জীব নেই। ধর্মের ষণ্ড হয়ে গেছে। সে ফতিমাকে দেখেই শিঙ বাগিয়ে ছুটে আসছিল।

ফতিমার প্রাণ তখন উড়ে যাচ্ছে। এক চোখ কানা ষণ্ডটা ওকে দেখে ছুটে আসছে। পাগলের মতো, উন্মত্ত প্রায় ছুটে আসছে। কে কাকে রক্ষা করে—তাবৎ জীবের উপর রোষ তার। মুখের একটা দিক পুড়ে বীভৎস। চামড়া ঝুলে গেছে। ষণ্ডের সঙ্গে লড়াই করতে হলে যেদিকে চোখটা নেই, সেদিকে লড়াই আরম্ভ করতে হয়। মেয়েটা হা হা করে চিৎকার করতে করতে ছুটছে। লেজ তুলে ধর্মের ষণ্ড ছুটছে। পাগল মানুষ অশ্বত্থের ডালে বসে মজা দেখছেন। মেয়েটাকে মেরে ফেলবে। এই দুপুরে সহসা এই চিৎকার শুনতে পাচ্ছে না কেউ। সামনে শীতের মাঠ। মেয়েটা কিছুতেই মিষ্টির হাঁড়িটা ফেলে দিচ্ছে না। প্রাণপণ সে চেষ্টা করছে গ্রামে উঠে যাবার। কিন্তু পেছনে তাকাতেই সে আর নড়তে পারল না। ষণ্ডটা ক্ষেপা ষাঁড়ের মতো ওকে ফালা ফালা করে দেবে। ফতিমা চোখ বুজে ফেলল।

আর কি এক যাদুর মায়া, পাগল মানুষ যেন সব জানেন, বোঝেন, তিনি সেই গাছের ডালে বসে বুঝে শুনে কোন কৌশলে থেকে ষাঁড়ের সঙ্গে লড়াই চালানো যায়, এই ভাবতেই মনে হল, গাছের ডাল নিচু—অনেকদূর পর্যন্ত শাখা-প্রশাখা ঝুলিয়ে চলে গেছে। সে ডালে বসে হাত বাড়ালেই মেয়েটাকে তুলে নিতে পারবে। এক চোখ কানা জীব টের পাবে না কোথায় গেল সামনের মেয়েটা। ক্ষেপা ষাঁড়ের মতো ষণ্ডটা কেউ না এসে পড়ল তিনি হাতে আলগোছে যেমন এক দৈত্য ছোট্ট পুতুল তুলে নেয়, তেমনি তুলে নিয়ে ডালে বসিয়ে দিলেন ফতিমাকে আর হা হা করে হাসতে থাকলেন। ষণ্ডটা জীমূতে কামড়ালে যেমন এক ... ঘুরে ঘুরে ছুটে ... থাকল। আর পাগল মানুষ ... ষণ্ডটাকে নিচে দোলাতে থাকলেন।

সকল ঋতুতে অপরিবর্তিত ও অপরিহার্য পানীয়

চা

কেনবার সময় 'অলকানন্দায়' এই সব বিক্রয় কেন্দ্রে আসবেন

অলকানন্দা টি হাউস

৭, পোলক স্ট্রীট কলিকাতা-১

২, লালবাজার স্ট্রীট কলিকাতা-১

৫৬, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ কলিকাতা-১২

॥ পাইকারী ও খুচরা ক্রেতাদের অন্যতম বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান ॥

যেন তিনি এই বাণ্ডুল সঙ্গে লড়াইয়ে নেমেছেন। তার হাতের কাছে ফাতিমা। কাঁপছে। চোখ বুজে আছে। মৃত্যুভয়ে চোখ খুলতে পারছে না। আর তখন মণীন্দ্রনাথ ষণ্ডটাকে নিয়ে খেলায় মেতে গেছেন। সে পা দিয়ে জামাটা দোলালেই ওটা ক্ষেপে যায়, তেড়ে আসে। সে জামাটা উপরে তুলে নিলে ষণ্ডটা সামনের একটা কাঁঠাল গাছে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। বার বার এমন হচ্ছে। এক সময় ফাতিমা চোখ খুলল। দেখছে সব। আর ষণ্ডের মুখ ভোঁতা হয়ে যাচ্ছে, শিং দিয়ে রক্ত পড়ছে। আর পাগল মানুষের সঙ্গে ফাতিমাও খেলাটা বড় মজায় ভেবে গাছের ডালে বসে উঁকি দিয়ে দেখছিল।

ষণ্ডটা এক সময় বোকা বনে মাঠের দিকে চলে গেল।

ফাতিমা এখন গাছের ডাল থেকে ইচ্ছা করলে লাফ দিয়ে নামতে পারে। কিন্তু ষণ্ডটা কিছুদূরে গিয়ে শক্তভাবে দাঁড়িয়ে আছে। কোনদিকে তাকাচ্ছে না। শুধু বড় অশ্বত্থ গাছটার দিকে তাকিয়ে আছে।

এখন গাছের ডালে ওরা দুজন পা ঝুলিয়ে বসে আছে। দুজনের মাঝখানে মিষ্টির হাঁড়ি। মণীন্দ্রনাথ হাঁড়িতে কি আছে দেখার জন্য উঁকি দিলেন। ছেঁড়া কলাপাতার ভেতর থেকে তিনি দেখতে পেলেন, সব রকমের মিষ্টি একসঙ্গে মিশে গেছে। ফাতিমা হাত দিয়ে একটা মিষ্টি বের করে মণীন্দ্রনাথের মুখের কাছে নিয়ে গেল। বলল, খাবেন?

মণীন্দ্রনাথ হাঁ করল।

ফাতিমা প্রথম একটা দিল। তারপর একটা। আবার একটা। দিচ্ছে আর খাচ্ছে। ফাতিমার কি যে ভাল লাগছে। কৌতূহল ফাতিমার এই মানুষ, পাগল মানুষ, পীর না হয়ে যায় না—যেন কথা ছিল এই দিনে ফাতিমা যখন গাছে উঠে যাবে তখন এক ধর্মের ষণ্ড তাড়া করবে। মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে হবে—এই পীর মানুষ যেন জানতেন। তিনি আগেভাগে এসে অশ্বত্থের ডালে বসে আছেন। সে দেখল এবার আর একটা মিষ্টিও নেই। ফাতিমা বলল, আর কি দিমু খাইতে?

মণীন্দ্রনাথ এবার হাঁড়িটা তুলে যে রসটুকু পড়েছিল চুমুক দিয়ে খেয়ে ফেললেন।

ফাতিমা বলল, বাড়িতে নিয়া যাবু কি।

মণীন্দ্রনাথ এবার লাফ দিয়ে গাছ থেকে নেমে পড়লেন। তারপর মেয়েটাকে কাঁধে তুলে খালি হাঁড়িটা হাতে নিয়ে গোপাট ধরে হাঁটতে থাকলেন।

বাড়িতে উঠে মণীন্দ্রনাথ অর্জুন গাছটার নিচে খালি হাঁড়ি নিয়ে ফাতিমার সঙ্গে বসে থাকলেন। ওরা দুজন যেন এ-বাড়িতে অনেক দূরদেশ থেকে উৎসবের খবর পেয়ে চলে এসেছে। সবাই খেয়ে গেলে যা কিছু উদ্বৃত্ত থাকবে—ওরা পাত পেতে খাবে।

ঈশম খালি হাঁড়ি দেখে অবাক হয়ে গেল। ফাতিমা এবং পাগল মানুষ উভয়ের ভিতর যেন বহুকালের আত্মীয় সম্পর্ক! ফাতিমা মণীন্দ্রনাথকে ছেড়ে যেতে সাহস পাচ্ছে না। কারণ ষণ্ডটা ঠিক সেই এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে।

ঈশম বলল, তুই বাড়ি যাস নাই?

—না।

—বড়কর্তার লগে তর কি কাম।

ফাতিমা দুষ্টুমি করে বলল, তাইন আমার সব মিষ্টি খাইয়া ফেলছে।

এই না যেই শোনা, ভূপেন্দ্রনাথ ছুটে এল। কি যে হবে! আবার মানুষটার পাগলামি বেড়ে গেল! ঈশমকে বলল, আবার একটা হাঁড়ি নিয়া আয় মিষ্টির। হাঁড়িটা ঈশম তুই নিয়া আয়।

মণীন্দ্রনাথ বলল, গ্যাৎচোরেৎ শালা!

ফাতিমা বলল, তাইন মিষ্টি খাইতে চায় নাই। আমি তাইনরে খাওয়াইছি।

ঈশমের মাথায় বজ্রাঘাত। সে তেড়ে গেল। —খাইয়া তুই আর খাওয়ানের মানুষ পাইলি না। কি একটা অপরাধ হয়ে গেল. সে বলল, মাইজা মামা, পোলাপান মানুষ, বোঝে না কিছু।

ভূপেন্দ্রনাথ কিছু বলল না। বড়বৌ মিষ্টির হাঁড়ি আবার পাঠিয়েছে। ঈশম ওটা নিয়ে যাচ্ছে। পাগল মানুষ মণীন্দ্রনাথ ফাতিমাকে নিয়ে ঈশমের পিছনে হাঁটছেন। তিনি ফাতিমাকে বাড়ি পৌঁছে দেবেন। বাড়ি পৌঁছে না দিলে ষণ্ডটা আবার ঈশম এবং ফাতিমা উভয়কে তেড়ে আসতে পারে। তিনি ষণ্ডটাকে ভয় দেখাবার জন্য অর্জুনের ডাল ভেঙে নিলেন। পাতা ছিঁড়ে ডালটা মাথার উপর পাইক খেলার মতো বার বার ঘোরাতে থাকলেন।

তখন রান্নাঘরে সব সোনা একটু কাঁচা দুধ, গন্ডুষ করে দই এবং কিছু মণ্ড আহার করছে।

বড়বৌ ওদের দেখাশোনা করছে যে আর দেরি হবে না। পাথরের বাটিতে কাঁচা দুধ ভিজিয়ে রেখেছে। নানা রকমের ফল, তরমুজ ফালি সব একটা পাথরে কেটে রেখেছে বড়বৌ।

লালটু হাপুস হুপুস দই খাচ্ছে। কাঁচা দুধ খেতে গিয়ে সোনার ওক উঠে আসছে। সে মধু খেল সামান্য। বেলের সরবত খেল। আর খেল দু টুকরো ফালি। আর কিছু সে কিছুতেই খেতে চাইছে না।

বড়বৌ নানাভাবে ওকে খাওয়ানোর চেষ্টা করছে। তার কম বয়সে পৈতা। এত ছোট বয়সে পৈতা হচ্ছে বলে ওর আগ্রহ বেশি। লালটু দু তিনবার খেঁকিয়ে উঠেছে। বড়বৌ তখন ধমক দিয়েছে ওকে। তোমার এত মাথা ব্যথা কেন। আমি তো খাওয়াচ্ছি ওকে। বলে দুটো কাঁচা দুধ ওর মুখের কাছে নিয়ে গেল। সোনা আর কিছুতেই খেল না।

বড়বৌ বলল রাতে চরু হবে। খেতে বেশি ভাল লাগবে।

সোনা উঠে পড়ল। সে দরজায় উঁকি দিয়ে দেখল সবাই খাচ্ছে।

বড়বৌ বলল, এই কি হচ্ছে তোমার। এ-সব দেখতে নেই। দরজা বন্ধ করে দাও।

সোনা দরজা বন্ধ করে ফের এসে জেঠিমার পায়ের কাছে বসল। সে ভেবেছিল, ক্ষুধার জন্য পেট ভরে খেতে পারবে, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে সে আর কিছুই খেতে পারবে না। পেটে যেমন ক্ষুধা ছিল তেমনি আছে। উঠানে সবাই খাচ্ছে, সে কিছু খেতে পারছে না. মাছ এবং বাঁধা-কপির তরকারির গন্ধ আসছে। ক্ষুধার

বেনারসী শাড়ী
ইণ্ডিয়ান
সিল্ক হাউস
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা
আমাদের কোন ব্রাঞ্চ নাই

CENTRAL LIBRARY

সময় ভিতরে জল চলে আসছিল। যত জল চলে আসছিল তত সবার উপর তার রাগ বাড়ছে। সকাল থেকে তাকে নিয়ে যে কি সব হচ্ছে!

বড়বৌ বলল, তুই সোনা যদি এটুকু খেয়ে নিস তবে একটা আতাফল পাবি।

সে আতাফল খেতে ভালবাসে। সে বলল, কৈ দাখি।

বড়বৌ তিনটা আতাই দেখাল। —তুই যদি আর একটু খাস তবে দেব।

সোনা খেবার চেষ্টা করল, কাঁচা মুগের সঙ্গে নারকেল দিয়ে খেতে চেষ্টা করল। কোনরকমে পায়েসের সবটুকু খেয়ে হাত পাতল।

বড়বৌ একটা আতা দিল সোনাকে। সে তিনদিনে তিনটা আতা পাবে। এই আতাফলের লোভে যেন সোনা অনায়াসে তিনদিন এই ঘরে বনবাসী হয়ে কাটিয়ে দেবে। অথবা প্রায় সবটা ওর অজ্ঞাতবাসের মতো। ওর সমবয়সী আত্মীয়স্বজনেরা এসে গোল হয়ে বসেছে। দীপালি আসছে বার বার। কেউ কেউ গল্প জুড়ে দিয়েছে এবং এক সময় রাত গভীর হলে বড়বৌ একপাশে, মাঝে সোনা লালটু পলটু এবং সব শেষে পাগল মানুষ খড়ের উপর কম্বল পেতে শুয়ে পড়বে।

ঠিক জানালার নিচে মাটির গাছা। তার উপর প্রদীপ। তিনদিন অনির্বাণ এই প্রদীপ শিখা ওদের শিয়রে জ্বলবে। বড়বৌ রাতে ঘুম যেতে পারবে না ভাল করে। সলতে তুলে না দিলে কখন সলতে প্রদীপের বুকে এসে একসময় নিভে যাবে—নিভে গেলেই অমঙ্গল হবে ওদের—বড়বৌর প্রায় সারারাত জেগে থাকার মতো, লক্ষ্য রাখা প্রদীপ না নিভে যায়। প্রদীপ নিভে যাবার আশংকাতে কিছুতেই ঘুম আসে না চোখে।

তখন স্মৃতির ভিতর বড়বৌকে ডুবে যেতে হয়। বালিকা বয়সের কথা মনে হয়। যেন কোন কনভেন্টের সবুজ মাঠে সে ছুটছে। পাশে গীর্জা, গীর্জার চূড়োয় সোনালি রোদ, এবং তার ছায়ায় লম্বা আলখেল্লা পরে ফাদার দাঁড়িয়ে আছেন। মুখে স্মিত হাসি। সব কিছু দেখছেন। গীর্জার ছায়ায় তার অবয়ব কেন জানি বড়বৌর বড় দীর্ঘ মনে হত। তিনি বলতেন, আদিতে ঈশ্বর, আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি করিলেন। পৃথিবী ঘোর শূন্য ছিল তখন। এবং অন্ধকার জলধির উপর ভাসমান এই জগতে ঈশ্বর কহিলেন, দীপ্তি হউক, তাহাতে দীপ্তি হইল। ঈশ্বর, দীপ্তির নাম দিবস এবং অন্ধকারের নাম রাত্রি রাখিলেন। তখন বড় বেশি বালিকা বড়বৌ, বড় বেশি চঞ্চল, অথচ ফাদার গীর্জার বেদিতে উঠে দাঁড়ালেই সে কেমন গভীর মনোযোগ দিয়ে সেই ঈশ্বর প্রতিম মানুষের কথা শুনতে শুনতে মুগ্ধ হয়ে যেত। বাইবেলের প্রাচীন মানব মানবীর ভিতর হারিয়ে যাবার ইচ্ছা হত। অথবা কোন কোন রাতে কেন জানি মনে হত সেই প্রাচীন মানব মানবী আর কেউ নয়, সে নিজে। এবং অন্য একজন মানুষ কোথাও নিষিদ্ধ ফল খাবার জন্য ছুটে বেড়াচ্ছে তখন। সে মাঝে মাঝে স্বপ্নে সেই মানুষের সঙ্গে নিষিদ্ধ ফল খাবার লোভে ঘুরে বেড়ালে মনে হত সামনে এক নিঃসঙ্গ জলের নদী, নদীর পাড়ে সে এবং তার প্রিয় পুরুষটি। ফাদার গাছের নিচে দাঁড়িয়ে ওদের দেখছেন। যেন তিনি আর ফাদার নন। একেবারে দেবদূত। তিনি বলতেন হাত তুলে, দেয়ার ইজ লাইট। এমন কথায় কোন গীর্জার সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে বড়বৌর ঘণ্টা বাজাবার ইচ্ছা হত। সংসারে সবাই পাগল মানুষকে ভালো করার জন্য সব কিছু করেছে, কেবল কেউ তাকে গীর্জায় নিয়ে যায়নি। বলতে পারেনি কেউ, দেয়ার ইজ লাইট। সিঁড়িতে উঠে গীর্জার সেই সুন্দর পবিত্র ধ্বনি শুনলে হয়ত তিনি আর পাগল মানুষ থাকতেন না। গীর্জার ছায়ায় দাঁড়িয়ে ফাদারের মতো প্রীচ করতেন। তিনি ভালো হয়ে যেতেন। তিনিও বলতেন, দেয়ার ইজ লাইট।

আবার এও মনে হয় বড়বৌর, মানুষটা এ-পৃথিবীর মানুষ নয়। অন্য সৌরলোকের মানুষ তিনি। তাঁকে বুঝে ওঠার ক্ষমতা কারো নেই। সংসার থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন এই মানুষ নদীর পাড়ে পাড়ে বেঁচে থাকার রহস্য খুঁজে বেড়াচ্ছেন বুঝি।

এখন সেই মানুষ ঘুমোচ্ছে না জেগে আছে টের পাওয়া যাচ্ছে না। ওর জন্য দুটো আলাদা বালিশ রেখেছিল বড়বৌ। কিন্তু তিন বালক শুয়ে আছে, শিয়রে ওদের কোন বালিশ নেই, শক্ত খড়কুটোর উপর, কম্বলের উপর শুয়ে আছে এবং ওদের গায়ে কম্বল, আর কিছু নেই, নেই মানে থাকতে নেই, তাদের এই কৃচ্ছ্রতার প্রতি সমবেদনা জানানো বুঝি তার ইচ্ছা, তিনি বালিশে মাথা রাখেন নি। আলগা শুয়েছেন। ওদের মতো কম্বল গায়ে শুয়েছেন। বড়বৌ কতবার শিয়রে বালিশ নিয়ে এসেছে ততবার তিনি তা সরিয়ে দিয়েছেন।

সোনা ঘুমের ভিতর গায়ে কম্বল রাখছে না। সে দুপুরবেলায় কাপড় ছাড়ার সময় লজ্জায় ম্রিয়মাণ ছিল। এখন তার গৈরিক কাপড় খুলে কোথায় সরে গেছে। একেবারে সেই আদি মানব। বড়বৌ কম্বলটা ফের তুলে ওর শরীর ঢেকে দিল। এইসব কাজ ওর এখন এই ঘরে। কে বালিশ রাখছে না মাথায়, কার হাত কম্বলের বাইরে এবং প্রদীপের আলো কমে গেলে বাড়িয়ে দিতে হবে—এসব কাজের ভিতর তার রাত কেটে যাচ্ছে। পাগল মানুষ, ঘি-এর প্রদীপ, ফলমূলের গন্ধ আর রাতের নির্জনতা এবং পাখিদের ডাক তাকে বার বার অন্যমনস্ক করছে। মালতী নির্বোধ। রঞ্জিত এখন কোথায়? ওর মনে হল তখন রাত পোহাতে বেশি আর দেরি নেই। সে এবার পুবের জানালাটা খুলে দিল। সে দেখল অনেক দূরে মাঠের উপর দিয়ে লণ্ঠন হাতে কেউ এদিকে উঠে আসছে। যেন অর্জুন গাছটার নিচে উঠে আসার জন্য প্রাণপণ হাঁটছে। কে মানুষটা? সবাই যখন এ-পৃথিবীতে ঘুমিয়ে পড়েছে এমন কি কীটপতঙ্গ, তখনও একজন মানুষের কাজ থাকে। তার কাজ ফুরোয় না। এতক্ষণে মনে হল, এ নিশ্চয়ই ঈশম হবে। সূর্যকান্ত পণ্ডিতকে বারদির স্টিমার ঘাটে তুলে দিয়ে ফিরে আসছে। এসে লণ্ঠন রাখবে দক্ষিণের ঘরে। হাত পা ধোবে। নামাজ পড়বে। তারপর বালির চরে নেমে তরমুজ খেত পাহারা দেবে।

ঈশম বলেছিল, সাদা জ্যোৎস্নায় যখন বালির চরে পাতার ভিতর তরমুজ ভেসে থাকে এবং নদীতে যখন রাতের পাখিরা নামতে শুরু করে, দূরের মসজিদে আজান শুনলে তখন তার দুহাত উপরে তুলে কেমন দাঁড়িয়ে থাকতে ইচ্ছা করে। তার ঘুম আসে না চোখে। সে সেই এক জগতের মায়ায় জড়িয়ে যায়। নির্জন মাঠে তার তখন কেবল মনে হয়, আল্লা এক, তার কোন শরিক নেই।

বড়বৌ বলেছিল, আমায় একবার নিয়ে যাবে? সাদা জ্যোৎস্নায় আমি তোমার তরমুজ খেত দেখব। তোমার আল্লার করুণা দেখব।

ঈশম বলেছিল, গেলে আর ফিরতে ইচ্ছা হবে না।

বড়বৌ বলেছিল, কেন আমি কি সেই মায়ায় জড়িয়ে যাব!

সাদা জ্যোৎস্না, নদীর চর এবং তরমুজ খেত আর নির্জন রাতের কোন এক দূরবর্তী আলোর মায়া বড়বৌকে টানে। কে জানত এই মায়ার টানে যথার্থই বড়বৌ এক রাতে পাগল মানুষের পিছু পিছু প্রায় সেই আদম ইভের মতো নদীর চরে নেমে যাবে।

সেটা এক বসন্তকালের ঘটনা।

(ক্রমশঃ)

হাওড়া কুষ্ঠ কুটীর

সর্বপ্রকার চর্মরোগ, বাতরক্ত, অসাড়তা, ফুলা, একজিমা, সোরাইসিস, দূষিত ক্ষতাদি আরোগ্যের জন্য সাক্ষাতে অথবা পত্রে ব্যবস্থা লউন। প্রতিষ্ঠাতা: পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা কবিরাজ, ১নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া। শাখা: ৩৬, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৯। ফোন: ৬৭-২০৫৯।

CENTRAL LIBRARY

কন্যাবিদায়

অমিয় দত্ত

আছি এখন বাংলাদেশের একপ্রান্তে। দক্ষিণে আর ডাঙা নেই,—আন্দোলিত বিশাল মহাসমুদ্র—বঙ্গোপসাগর। পশ্চিমে কয়েক মাইলের মধ্যে উড়িষ্যার সীমানা। তাই এখানকার গ্রামীণ মানুষের প্রাত্যহিক জীবন-যাত্রায় উৎকলবাসীদের সামাজিক জীবন-চর্যার ছাপ পড়েছে অনেক ক্ষেত্রেই। এদের কথায়-বার্তায়, হেলায়-দোলায় এবং চলায়-বলায় কেমন যেন উৎকলীয় টান। এখানকার অনেকের পূর্বপুরুষদের বাসস্থানের খোঁজ করলে অতীত ইতিহাসের পাতা ঘেঁটে উড়িষ্যা-যাত্রা করতে হয়। এখনো বাংলা ও উড়িষ্যা—এই দুই রাজ্যের সীমান্তবর্তী অধিবাসীদের মধ্যে আদান-প্রদান চলেছে সংস্কৃতি ও আত্মীয়তার। পারস্পরিক পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়ে পড়ছে বঙ্গীয় ও উৎকলীয় দেহ-মন। ফলে গাঙ্গেয় ও নাবা বাংলার পূর্ব সীমান্তের মানুষের জীবন-যাত্রার সঙ্গে সমুদ্রাঞ্চলের এই সীমান্ত বাংলার অধিবাসীদের জীবনযাত্রার মিল নেই তেমন। এখানকার গ্রামীণ জনজীবনের চলমানতায় যে সুর ও ছন্দ বাজে তার অনেকটাই উৎকলীয়।

একটা গ্রামে গিয়েছিলাম একবার। সুবর্ণরেখা নদীর ধারে গ্রামটি; আমাদেরই বাংলাদেশের সীমারেখার মধ্যে। তখন শীত ফুরিয়েছে। দক্ষিণের হাওয়া দূর সমুদ্রের বুক ছুঁয়ে এসে লুটোপুটি খাচ্ছে গাছ-পাতায়—গায়ে-মাথায়। ফাগুনের আগুন ছড়িয়ে পড়েছে পুষ্পিত পলাশের ডালে ডালে। সোনালী বালুচরের বুকে শীর্ণকায়া সুবর্ণরেখা তার স্ফটিকস্বচ্ছ জলধারার কুল-কুল ধ্বনি-তরঙ্গ তুলে মৃদু স্রোতের চঞ্চলতা নিয়ে ছুটে চলেছে। তার সঙ্গে মিলছে এসে হাজারো পাখির কিচির-মিচির ডাক। আমরা—জন চারেকের একটা ছোট দল তখন নরম বালুচরের মধ্যে পা ডুবিয়ে ডুবিয়ে হাঁটছি। সামান্য দূরেই যে গ্রামটা দেখা যাচ্ছে, আমরা যাব ওখানেই। সকালের মৃদু আলোর প্রসন্নতা আর পারিপার্শ্বিক প্রাকৃতিক পরিবেশের ঐশ্বর্যময় চেতনারা আমাদের মধ্যে খুশির স্রোত তুলেছে। মিষ্টি, মিষ্টি, মিষ্টি—সব কিছুই মিষ্টি; আমরা অনুভব করছিলাম আমরা কত সুখী—আমরা বসন্তের সখা। আমাদের প্রত্যেকের হাতে যেন ধরা ছিল খুশির ফানুস।

ঠিক এই সময়েই—এই নিরবচ্ছিন্ন আনন্দঘন সময়—সমুদ্রের বুকে হঠাৎ যেন বেদনার ঢেউ এসে আছড়ে পড়লো। আকাশ-বাতাস, গাছ-পালা, পাখি, নদী ও মানুষের কলহাস্য মুখরিত প্রসন্ন পরিবেশের বুকে হঠাৎ কোথা থেকে কান্নায় করুণ সুরের একটা তীক্ষ্ণ তীর এসে বিঁধলো। আমরা থমকে দাঁড়ালাম। আমাদের খুশির ফানুসগুলো চুপসে গেল। বালুচরের ঠাণ্ডা ও নরম পলিমাটির মধ্যে পা ডুবে যেতে লাগলো। আমরা স্তব্ধ—আমরা মর্মাহত। এমন ছন্দোময় আনন্দ-যাত্রায় কেন এই ছন্দপতন? এই সুন্দরের লীলাক্ষেত্রে কেমনভাবে ঘটলো অসুন্দরের আবির্ভাব? শান্তি ও সুখের প্রশান্ত হিল্লোলের মধ্যে কোথা থেকে এল বেদনার প্লাবন? মন আকুল হল। আহা! কে এমন হতভাগ্য, যে এই মধুর প্রভাতেও বিধুর কান্নায় ভেঙে পড়ছে? কান পেতে ভালো করে শুনতে চেষ্টা করলাম। কথা বুঝতে পারলাম না। কেবল মেয়েলী গলায় কান্নার করুণ সুর একটা এসে বুকের ভেতর আঘাত হানতে লাগলো। মনে হল আমাদের উদ্দিষ্ট গ্রামের মধ্য থেকেই কান্নাটা ভেসে আসছে। আমরা ব্যথিত চিত্তে গ্রামের দিকে পা চালালাম।

কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রবেশ করলাম গ্রামের মধ্যে। ঘন গাছ-পালায় ঘেরা গ্রাম। ছায়ায় ঢাকা মেঠো পথ তখনো রোদের হাসি বুকে ধরেনি। পথের দুদিকে মাটির বাড়ী। কান্নার উৎসের নিকটবর্তী হচ্ছি আমরা ক্রমশ। এখন কেবল সুর নয়, কথাও কানে বাজছে। তবে সব বোধগম্য নয়। চারদিক ঘিরে কেমন যেন নিস্তব্ধতা। একটা থমকানো এবং চাপা ভাব। এই নৈঃশব্দের বুকে সপাং সপাং করে চাবুকের ঘায়ের মত এসে লাগছে নারী কণ্ঠের একটানা কান্নার রেশটা। একটা বাড়ীর কাছে এসে আমরা দাঁড়িয়ে গেলাম। এই বাড়ীর ভেতর থেকে কান্নাটা ভেসে আসছে। আমরা দাঁড়িয়েছি, আর ঠিক সেই মুহূর্তেই বাড়ীর মধ্য থেকে বেরিয়ে এলেন এক ব্যক্তি। আমাদের রাস্তার ওপরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন—কাকে চাই?

আমরা থতমত—কিছুটা অপ্রস্তুতও। একটা অপরিচিত বাড়ীর সামনে হুট করে এসে দাঁড়িয়ে পড়াটা যে ভদ্রতা-বিরুদ্ধ তা মনে হল। কিন্তু না দাঁড়িয়ে আমাদের উপায় ছিল না। কান্নাটাই আমাদের দাঁড় করিয়েছিল—তার কথা এবং সুরের অভিনবত্ব আমাদের আকর্ষণ করেছিল। একটা নরম কণ্ঠোদ্ভূত করুণ সুরের কান্না যে ভাষার মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হচ্ছিল তা বাংলা নয় মোটেই;—তা ওড়িয়া। স্বাভাবিকভাবেই তাই কান্নার সুরের ভেতরে কিছুটা বৈচিত্র্যময়তার টান লেগেছিলো বাড়ীটার সামনে এসে এইজন্যে দাঁড়িয়েছিলাম। আমাদের কানে এসে তখন বাজছিল:

হলুদ মোহর কাটি যাউছি মা গো।
আঁখি কাঁদিবার সাঁঝ যাউছু মা গো।।
দশ মাস দশ দিন গর্ভর মা গো।
শীতল বিলাও কোলে কন্টর মা গো।।
নিজ ন খাইত খুআউ থিল মা গো।
স্নেহ কর্ম বাপ পালে রাখিল মা গো।।

ঠিক এই সময়েই ভদ্রলোক বেরিয়ে এসে বললেন—কাকে চাই? অপ্রস্তুত অবস্থা থেকে আমাদেরই একজন সঙ্গী বাঁচিয়ে দিল। বললে—আচ্ছা, শীতল প্রধানের বাড়ী কোনটা বলতে পারেন?

—কে? শীতল প্রধান? ও হো—আপনারা আমাদের নতুর কথা বলছেন? আরে সে তো এই বাড়ীই! দাঁড়ান একটু আপনারা—আমি এখুনি তাকে ডেকে দিচ্ছি।

ভদ্রলোক আমাদের কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই বাড়ীর ভেতরে ঢুকে গেলেন। আমরা আর একবার হতভম্ব হলাম। সত্যিই আমরা আজ শীতল প্রধানের বাড়ী যাবার উদ্দেশ্যেই বেরিয়েছিলাম সাত-সকালে। গতকাল সন্ধ্যার সময় সুবর্ণরেখার চরে বেড়াতে বেড়াতে ওর সঙ্গে আলাপ। লেখা-পড়া বেশিদূর করেনি শীতল। চাষীর ঘরের ছেলে চাষবাস নিয়েই থাকে। আর আছে দুঃখের বাক্সা। বেশ সরল, দিলখোলা এবং আমুদে যুবক। অল্প সময়ের মধ্যেই তাই আলাপ জমে উঠেছিল। বিদায়কালে বারংবার আমন্ত্রণ জানিয়েছিল—কাল সকালে আসুন না আমাদের বাড়ী। ঐ তো সামনের গ্রামেই থাকি। এইখান দিয়ে নদী পেরিয়ে যে রাস্তা পাবেন সে রাস্তা ধরে গ্রামে ঢুকেই জিজ্ঞাসা করলে আমাদের বাড়ী পেয়ে যাবেন। গ্রাম দেখতে যখন বেরিয়েছেন তখন আমাদের গ্রামটাও দেখে যান একবার।

শীতলের কথায় টান ছিল—আঞ্চলিকতার প্রভাব ছিল; কিন্তু আন্তরিকতার অভাব ছিল না। তার সরল আমন্ত্রণ উপেক্ষা করতে না পেরে আজ তাই বেরিয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু কী অশুভক্ষণেই না যাত্রা আমাদের। আনন্দ লুটতে বেরিয়ে এ কী বিব্রত অবস্থার মধ্যেই না পড়লাম! নিশ্চয়ই কোন বিপদ ঘটেছে আজ শীতলদের বাড়ীতে। বিপদের বাড়ীতে স্ফূর্তি করার মন নিয়ে আকস্মিক আগমন বড় বেমা

বেদনাদায়ক। সব আনন্দ মাটি হয়ে গেল। এইটাই শীতলদের বাড়ী জানলে রাস্তা থেকেই আমরা ফিরে যেতাম—এমন অপ্রস্তুত হতাম না। একদম ভালো লাগছে না। শীতলকে কি অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যেই না ফেলতে চলেছি কে জানে? নিজেদের অপ্রস্তুত ঘটনার নায়ক মনে ক'রে মরমে মরে যেতে লাগলাম। আমরা পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে তাকাচ্ছি: কি করবো না করবো ভেবে পাচ্ছি না। কান্নাটাও আবার হঠাৎ থেমে গেল। নিজেদের শোক প্রকাশের বাধা-স্বরূপ ভেবে ভারী অপরাধী মনে হতে লাগলো।

এই রকম যখন অবস্থা—আমরা সকলেই যখন নির্বাক—ঠিক তখনই ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে এল শীতল। খালি পা। কোঁচাটা কোমরে বেড় দিয়ে কষে বাঁধা। হাঁটুর নিচে কাপড় নামে নি। অবাক চোখে তাকিয়ে দেখি—বড় তাজ্জব ব্যাপার—শোকের চিহ্নমাত্র নেই শীতলের মুখে! ছায়ার অন্ধকার নেই—তার বদলে ঝলমলে রোদ্দুর—মুখভর্তি হাসি। টগবগে যৌবন যেন খুশির উচ্ছলতায় টলোমল। আনন্দের ফোয়ারা ছুটিয়ে সে সাদর আহ্বান জানালো—আসুন, আসুন। এখন তো হলো—না?

আমাদের বিস্ময়ের ঘোর তবু কাটেনি। কিছুক্ষণ আগে আমরা যে আশঙ্কা ক'রছিলাম তা কি অমূলক? কিন্তু কি করে হবে? আমরা স্বকর্ণে যে কান্না শুনেছি! শীতলদের বাড়ীর ভেতর থেকেই যে তা ভেসে আসছিল!!

আমাদের আড়ষ্ট হ'য়ে থাকতে দেখে শীতল তাগাদা দিল—কই, আসছেন না কেন আপনারা? আসুন বাড়ীর মধ্যে?

আর বোকার মত নিশ্চুপ থাকা উচিত নয় বিবেচনা করে আমি বললাম—না, আজ থাক ভাই। আজ আমরা ফিরেই যাই। এবার বিস্মিত হবার পালা শীতলের। বললো—সে কি, দোরগোড়ায় এসে ফিরে যাবেন কেন?

বিষন্ন গলায় ব'ললাম—না ভাই, তোমাদের বড় অসুবিধের ফেলেছি আজ এসে। একটা কিছু ঘটেছে তোমাদের বাড়ীতে।

—কৈ, না তো! —ফ্যাল্-ফ্যাল্ ক'রে তাকিয়ে থাকে শীতল।

—কিন্তু কে যেন কাঁদছিল? আমরা নদীর চর থেকেই সে কান্না—আমার কথা শেষ হ'ল না। নিমেষে শীতলের মুখের [illegible] গেল। হো-হো করে হেসে উঠলো সে। দমকে দমকে হাসি। [illegible] আমার [illegible] [illegible]

হাসি থামিয়ে শীতল তার ডাগর ডাগর হাসি-উপচানো চোখ নিয়ে এগিয়ে এসে আমার হাত ধরলো। বললো—আসুন।

তবু আমাদের পা ওঠে না। মনে একটা দ্বন্দ্ব। ছেলেটা কি পাগল? আমার কথা শুনে এমন করেই বা হাসলো কেন? শীতল বোধহয় টের পেল মনের কথা। তাই সহাস্যে হাঁক দিল আবার—আরে আসুন আপনারা! কিছু ভাবনা নেই আপনাদের। যে কান্না শুনেছেন তা তেমন কিছুই নয়। ঘরে আসুন আগে, তারপর সব বলছি।

তার কথায় আশ্বস্ত হ'লাম। হাসির আলোয় ভরা শীতলের মুখ-চোখ ও ভাবভঙ্গি দেখে বুঝলাম আমরা কোথাও একটা মস্ত ভুল করে ব'সে আছি। তার মনের প্রসন্নতা আমাদের মন ছুঁলো। তাকে অনুসরণ করে তাদের ঘরে ঢুকলাম। ঢোকার আগে পিছন ফিরে দেখি, ইতিমধ্যে কখন ছায়া সরে গিয়ে গ্রামের রাস্তার ওপরে ঝলমলে রোদ্দুর এসে পড়েছে।

একটা ঘরের মধ্যে এনে মাদুর বিছিয়ে বসালো আমাদের শীতল। মাটির দেওয়াল। খড়ের ছাউনি। দরজা-জানালা ছোট। কিন্তু কী পরিষ্কার! গোবর ও মাটি দিয়ে নিকানোর জন্যে দেওয়াল ও মেঝে ঝক্‌ঝকে-তক্‌তকে। আমাদের আপ্যায়নের জন্যে শীতল ব্যস্ত হ'য়ে উঠলো। আমরা তাকে বাধা দিলাম। হাত ধরে জোর করে আমাদের মধ্যে বসালাম। সে হাঁ-হাঁ করে বাধা দিতে গেল। ব'ললাম—ওসব পরে হবে। এখন আসল ব্যাপারটা খুলে বলতো দেখি? বাড়ীর ভেতরে কান্না—তোমার মুখে হাসি—আমরা যে বড় ফ্যাকাসায় পড়েছি হে!

আর একবার হি-হি করে হাসির পালা। তারপর শীতল যা বললো, তাতে আমাদের চক্ষুস্থির। হাসবো না কাঁদবো কিছু ঠিক ক'রতে পারলাম না। এমন বিস্ময়, বেদনা ও সরস কৌতুকও যে আমাদের জন্যে অপেক্ষা ক'রছিল তা কে জানতো? শীতলের কাছ থেকে জানতে পারলাম, কিছুক্ষণ আগে আমরা যার কান্না শুনেছি সে শীতলেরই বোন। বয়স চোদ্দ-পনেরো। নাম সরলা। করুণ কান্নার সেই মেয়েটিই এতক্ষণ ভেঙে প'ড়ছিল। না, না—বিষন্ন হবেন না আপনারা। সবটা শুনুন আগে। সরলার বিয়ে ঠিক হ'য়ে গেছে। আর দিন পনেরো বাদেই দোল দোল চতুর্দোলায় চেপে বর আসবে। তাকে চলে যেতে হবে। নিজের মা-বাবা, আপনার ভাই-বোন, [illegible] আত্মীয়-স্বজন, পরিচিত সমাজ-সংসার, তার এতদিনের অতি আপনার [illegible]—এই সব কিছু ছেড়ে [illegible] চলে যেতে হবে। সুতরাং যাবার [illegible] এই ব্যাপক বিচ্ছেদ-[illegible] বাস করবে কিছুক্ষণ [illegible] তারই মহড়া দিচ্ছিল। শুনে [illegible]? তা অবাক হবারই

কথা। আমরাও হ'য়েছিলাম। অভিনয়, বক্তৃতা বা মিথ্যে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্যেই মহড়ার প্রয়োজন হয় জানতাম। কিন্তু পাড়াগাঁয়ে বাল্যকালে অবলা সরলাবালার দুঃখ-বেদনার অভিব্যক্তির প্রয়োজনেও যে 'রিহার্সালে'র দরকার তা স্বপ্নেও কখনো ভাবিনি। কিন্তু কি ক'রবেন বলুন? এখানের রীতিই যে এই। অন্তত শীতল আমাদের সে কথাই ব'ললো। বিয়ের দিনের বেশ কিছু আগে থেকেই নাকি কনে সময়ে সময়ে কাঁদতে বসে যায়;—যাবার দিনটিতে যাতে সহজে কাঁদতে পারে তারই অভ্যাস করে। কান্নার কথাগুলো বিয়ের কনেরা নিজেরা বানায় কি না? না, না—ওর ভাষা তৈরীই আছে। কোন্ এক আদিকালে কোন এক বিয়ের কনে হয়তো কেঁদে উঠেছিল আপন আবেগে। সে কান্না প্রকাশের ভাষা ছিল তার সম্পূর্ণ নিজস্ব। তারপর থেকে বিয়ের কনের সেই একই ভাষায় কেঁদে চলার রীতি বোধহয় গড়ে উঠেছে। তবে কালক্রমে গ্রাম্য কবিদের কল্পনার ছোঁয়ায় এই কান্নার কথা যুগের কায়া-স্ফীতি ঘটেছে ব'লে মনে হয়। সে যাই হোক না কেন, কান্নার ভাষা এখন আর নতুন করে বানাতে হয় না। কেবল আবৃত্তি ক'রে ক'রে মুখস্থ করা আর একই বাঁধা বুলিকে হৃদয়ের বেদনায় সকরুণ রাগরঞ্জিত করে মর্মস্পর্শী ক'রে তোলা—এই হ'ল বিয়ের কনের কাজ। শীতলের বোন সরলা এতক্ষণ এই মহৎ দায়িত্ব পালনের কাজেই প্রাণপণে ব্যস্ত ছিল। সুতরাং দুর্ভাবনার কিছু কারণ নেই। আমরাও যেন না ভাবি।

আমরা পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করি। আমাদের চোখে-মুখে খুশির রং লাগে। আমাদেরই বাংলাদেশে কন্যাবিদায়ের এমন অভিনব পালা যে সংঘটিত হয় তাতো আমাদের—তথাকথিত সভ্যতার চোখ-ধাঁধানো আলোকোজ্জ্বল অংশের অধিবাসীদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। বাংলাদেশের এমন কত কিছুই না অজানা থেকে যাচ্ছে—ঘটে চলেছে আমাদের দৃষ্টির বাইরে। অথচ আমরা 'সংস্কৃতি' ও 'ঐতিহ্য' শব্দ দুটো নিয়ে বুক ফুলিয়ে কত লোফালুফিই না করি! আমরা নিজেদের সভ্য ও সংস্কৃতিবান ভাবি—সব জান্তার ভানে ভরপুর থাকি। এই ধরনের আত্মপ্রবঞ্চনামূলক অসারত্ব কল্পনা করা যায় ইঁট, কাঠ, পাথর ও চোখ ঝলসানো আলোর শহর ছেড়ে গ্রাম বাংলার নিভৃত শান্ত বুকের মধ্যে এসে দাঁড়ালেই। গ্রামের মধ্যে চলে আসুন। দেখুন কী বিচিত্র এই বাংলাদেশ। এক জেলার ভাষার সঙ্গে অন্য জেলার ভাষার কী দুস্তর ব্যবধান। এক অঞ্চলের রীতি-নীতির সঙ্গে অন্য অঞ্চলের—এপাশের সঙ্গে ও পাশের অনেক ক্ষেত্রেই আসমান জমিন ফারাক। এই ধরুন না কেন, আজ এখানে না এসে পড়লে বাংলার দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তের এমন পরমাশ্চর্য কন্যা বিদায়ের রীতি-নীতি কি আমাদের

গোচরীভূত হ'তো না এমনভাবে আমাদের মনে বিস্ময় ও কৌতুকের তরঙ্গ-হিল্লোল জাগতো?

যাই হোক, আমরা অবাক হয়ে কল্পনা করি। সবাই মিলে শীতলকে ধরে বসি—তার বোন সরলার গলায় কান্নার মহড়া শুনতে চাই। আমাদের অনুরোধ জানাতে শীতল অন্দরে যায়। সরলা কিন্তু সফল হয় না। শীতল ফিরে আসে। মিটি-মিটি হেসে বলে, তার বোন লজ্জা পেয়েছে। আপন আবেগে কিছুক্ষণ আগে সাতপাড়া জাগিয়ে কান্নার যে সুর সে সাধছিল সে সুরের তাল আমাদের মত অপরিচিত কয়েকজন বাবুর আগমনজনিত লজ্জায় গেছে কেটে। এখন শত চেষ্টাতেও তা জোড়া লাগবে না। সুতরাং আমরা হতাশার দীর্ঘশ্বাস ছাড়ি। কিন্তু একেবারে হাল ছাড়ি না। শীতলকে বলি—তুমি শোনাও তবে। সে তো হেসেই খুন। বলে—ও মা, আমি পুরুষ মানুষ—আমার গলায় খেলবে কেন ও সুর? আমরা জানাই, সুরের দরকার নেই—ভাষা হ'লেই হবে। কান্নার কথাগুলোই কেবল আমরা জানতে চাই।

—ও, এই কথা? আচ্ছা আপনারা একটু বসুন। এই বলে আমাদের আশ্বস্ত করে খুশি হয়েই শীতল পাশের ঘরে গেল। ফিরে এল একটা খাতা হাতে নিয়ে। বাড়িয়ে দিল আমাদের দিকে। বললে—এই নিন। এর ভেতরেই কান্নার সব কথা লেখা আছে। লাল বালির কাগজের একটা খাতা খবরের কাগজ দিয়ে মলাট করা। উল্টে-পাল্টে দেখি আর বিস্মিত হই। মলাটের পর ভেতরের প্রথম পাতায় একেবারে ওপরে লেখা আছে ছোট অক্ষরে 'ওঁ তৎ সৎ।' তার নিচেই বড় বড় অক্ষরে লেখা 'গেহলা-কিঅ' কথাটায় সহজেই চোখ আটকায়। তারপর পাতা তিনেক জুড়ে পুরনো ধাঁচের আঁকা-বাঁকা কাঁচা বাংলা হরফে গানের আকারে অনেক কিছু লেখা। পড়তে গিয়ে ঠেক খাই। আসলে হরফ বাংলা হ'লে কি হবে ভাষা ওড়িয়া। কিছু আগে শোনা সরলার কান্নার ওড়িয়া কথাও কিছু কিছু মনে পড়ে যায়। বিদায়ী বাঙালী কন্যার কান্নার ভাষাটা পুরোপুরি ওড়িয়া হওয়ার কারণের কথাটা ভাবতে গিয়ে মনে হ'ল, বাংলা ও উড়িষ্যা এক সময়ে এক ছিল। তাছাড়া বাংলাদেশের এই সীমান্তের মানুষদের ওপর উৎকলীয় প্রভাব যে খুব বেশি করেই পড়েছে তাতো আগেই বলেছি। আসলে উৎকলীয় বিবাহ-রীতিই এতদঞ্চলে প্রচলিত হয়েছে।

শীতলকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারি যে, খাতাটা অনেক দিন ধরে তাদের বাড়ীতে আছে। জ্ঞান হওয়ার সময় থেকেই দেখে আসছে সে। সম্ভবত তার ঠাকুরদার হাতের স্পর্শ আছে ঐ খাতায়। জিজ্ঞাসা করলাম—গেহলা কিঅ মানে কি বিয়ের কনে?

আমার অজ্ঞতায় খিলখিলিয়ে হাসে শীতল। বলে—না, না। 'গেহলা কিঅ' মানে আদুরে মেয়ে—যাকে আপনারা বলেন আহ্লাদী। ওড়িয়া ভাষার সঙ্গে তখনো কিঞ্চিন্মাত্র পরিচয় ঘটেনি আমার। খাতাটার সম্বন্ধে কৌতূহল বাড়লো। নিজের কাছেই রাখলাম ওটা। ইতিমধ্যে মুখ, মুড়ি আর পাটালি এসে হাজির হয়েছিল। শীতলের পৌনঃপুনিক অনুরোধে সবাই মিলে সেগুলোর সদ্গতি করলাম। তারপর বিদায় নেবার সময় খাতাটা নাড়াচাড়া করে পরদিন ফিরিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

খাতাটা ফিরিয়ে দেবার আগে নতুন একটা খাতায় তুলে নিয়েছিলাম সব লেখাটুকু। তারপর ধীরে ধীরে অর্থোদ্ধার করেছি 'গেহলা-কিঅ'-র। অর্থ জানার পর বিশ্বাস জন্মেছে, লেখাটার অধিকাংশই অজ্ঞাত এক (বা একাধিক) গ্রাম্য কবির সহানুভূতিশীল ও সমবেদনা-কাতর সরল হৃদয়েরই ফসল। পিতৃ-মাতৃহীন দেশের বিয়ের কনের বিচ্ছেদ-বেদনাকাতর হৃদয়ের কথা সম্ভবত স্পর্শ করেছিল এই গ্রাম্য কবির অন্তর। তিনি তাঁর আকুলিত হৃদয়কে আলোকে মুক্ত করে দিয়েছেন 'গেহলা-কিঅ'-র রোদন-সঙ্গীতের মধ্যে। 'রোদন-সঙ্গীত' বলছি এ-জন্যে—এ কান্নার মধ্যে লোকগীতির একটানা সুর যেন বেজে ওঠে। তাছাড়া এ কবিতার মত করে লেখা বলে এর সুর-ছন্দে গীতি-ময়তার ছোঁয়াচ লেগেছে। লেখাটার অনেক জায়গাতেই কল্পনার রামধনু-রং লেগে রমণীয় বর্ণ-বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয়েছে।

আবার কোথাও বা তথাকথিত গ্রাম্যতা লেখাটির মধ্যে স্থান পেয়ে অল্প-শিক্ষিত গ্রামীণ কবির অকপট সরল হৃদয়টিকেও মেলে ধরেছে। এখন লেখাটির সঙ্গে পরিচিত হওয়া যাক।

'গেহলা কিঅ'-র প্রথম অংশে আছে বিদায়ী বিয়ের কনের মায়ের কাছে কান্না, নাম দেওয়া হয়েছে তাই : মাতাঙ্ক পাশে রোদন। আশীর্বাদী কন্যার বিয়ে হয়ে গেছে। বিদায়-কালটি এসে হাজির হয়েছে। বাইরে সাজানো পাল্কি দাঁড়িয়ে। বিচ্ছিন্নতার স্রোতে ভাসিয়ে এই পাল্কিই মেয়েটিকে তার অজানা কোন এক সংসার-দ্বীপে নিয়ে গিয়ে তুলবে কে জানে? বাঁধ ভাঙা বন্যার মত চোখের দু-কূল ছাপিয়ে জলের ঢল নেমেছে মেয়ের চোখে। জানা জগৎ তার চোখের সামনে থেকে সরে সরে যেতে থাকবে আর কয়েক মুহূর্ত পরেই। চেনা মানুষ হয়ে যাবে ক্রমশ পর—তাদের সঙ্গে তার নিত্য সম্পর্ক যাবে ঘুচে। এ অসহনীয় বিচ্ছিন্নতার যন্ত্রণা সে সইবে কেমন করে? তার বেদনা-ব্যাকুল হৃদয় মায়ের কাছে তাই কান্নায় ভেঙে পড়ে :

উঠিলে সবারি বসিব নাহি মা গো।
ছাড়ি চাঁহিলেত দিশিব নাহি মা গো।।
গাঁ পহরিলে নাহ দেখিব মা গো।
ঢেকা ছাড়িলেত যাই দেখিব মা গো।।

অর্থাৎ,—মা গো, পাল্কি চলতে আরম্ভ করলে তো আর থামবে না। ঘুরে তাকালে তো আমি কিছুই দেখতে পাব না। মা, গাঁ পেরিয়ে গেলেই আমার

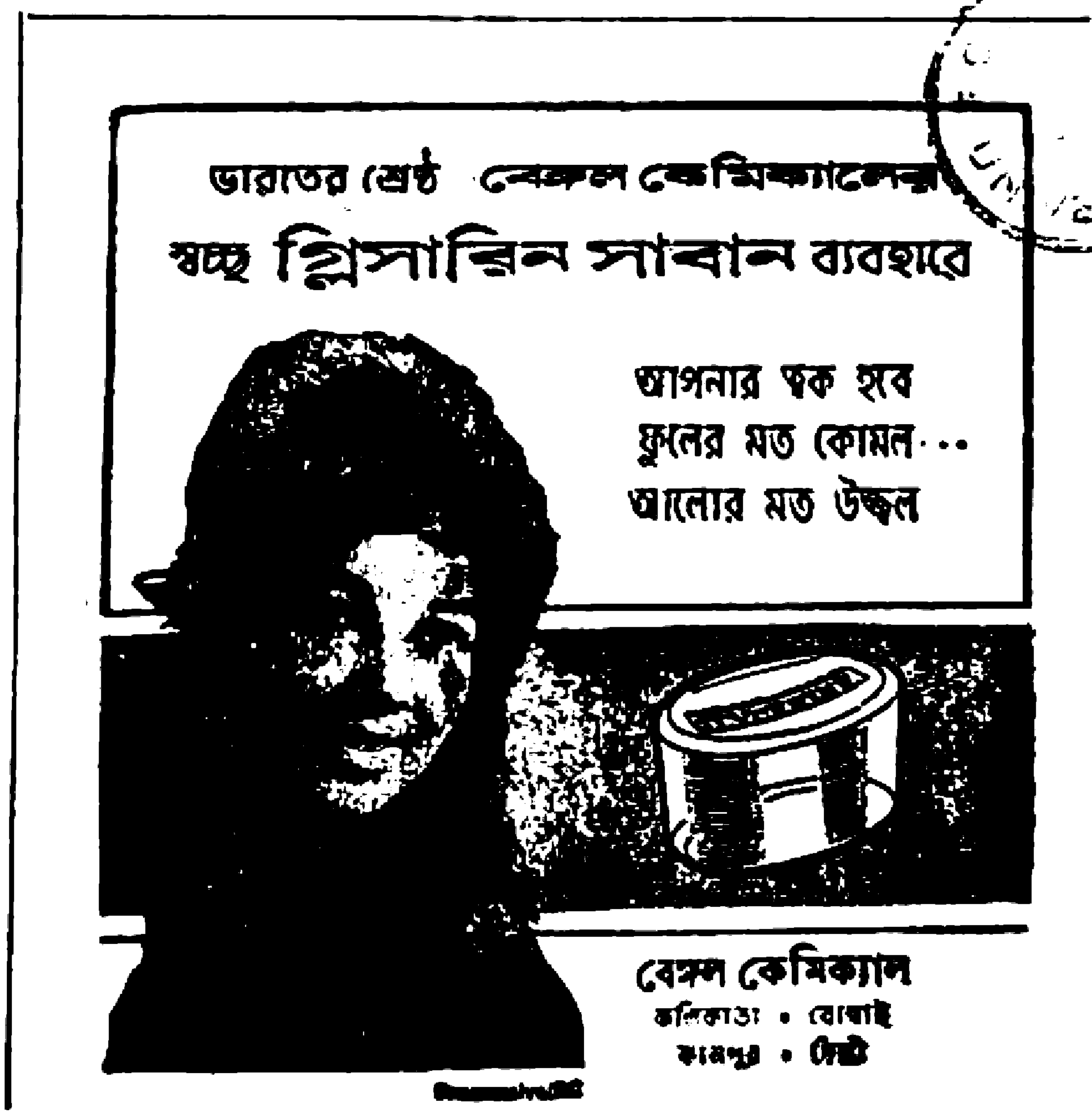

শব্দ যাবে মনে। কোনখানে কাটা মাটি ছুঁড়লে মালা যাবে বন্ধ হবে (শেষ পংক্তিটি গভীর অর্থবহ। কোদালে কাটা মাটির চাপকে যেমন স্থানচ্যুত করে দূরে ছুঁড়ে নালা বন্ধ করা হয় তেমনি মেয়েকে পিতা-মাতা অনেক দূরে বিয়ে দিয়ে বাপের বাড়ীর সঙ্গে তার সব আত্মীয়-সম্পর্কের পথকে রুদ্ধ করে দিচ্ছেন।)।

এই ছবি অবশ্য আমাদের কাছে একেবারে অপরিচিত নয়। বাংলা দেশের প্রায় সব জায়গাতেই বিয়ের পর নববধূকে শ্বশুর ঘর করতে যেতে হয়। সেই যাত্রা-মুহূর্তটি বড় করুণ। কত আত্মীয়-অনাত্মীয়ের বিয়ের স্মৃতিই তো চোখের সামনে ভাসছে। বিশেষ করে সেই সময়ের ছবি, যখন মেয়ে মা-বাপ ও পরিচিতজনদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পা তুলতে চলেছে অপেক্ষমান পালকি বা গাড়ীতে। পা আর কিছুতেই ওঠে না মেয়ের। মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে কান্নার আবেগে থরথরিয়ে কাঁপছে। বেদনার অব্যক্ত ধ্বনি উথাল-পাথাল হৃদয় থেকে যেন উৎক্ষিপ্ত হয়ে গলা চিরে আসছে বেরিয়ে। মায়ের অবস্থাও মেয়ের মত। বাবা চোখ মুছছেন কোঁচার খুঁটে। ছোঁয়াচে রোগের মত সংক্রমিত হয়ে পড়ছে এই কান্না আশে-পাশের জমায়েত নরনারীর মধ্যে। সকলের চোখেই জল—ছলোছলো ভাব। ছেলেবেলায় ভাবী অবাক হতাম এই অবস্থায় মধ্যে সকলের কাঁদতে দেখে। ঠিক দুর্বোধ্য গম্ভীর রাশভারী যাকে মনে হত সেই মানুষকেই যখন কন্যা-বিদায়কালে ফুঁপিয়ে কাঁদতে দেখতাম তখন খুব বিস্ময় আর কেমন এক রকমের অস্বস্তি জাগতো মনে। যাই হোক এই সীমান্ত বাংলার কন্যা-বিদায়ের সময়েও সেই একই পালার পুনরাবৃত্তি ঘটে চলেছে; তবে একটু তফাৎ আছে। কন্যা-বিদায়-কালে আমরা যে কান্নার সঙ্গে পরিচিত সে কান্নার কোন বাঁধা ভাষা নেই; কিন্তু এখানকার কান্নার আছে। মেয়ে, মা, বাবা ও আত্মীয়স্বজনদের ঐ বিশেষ সময়ের কান্নার বাঁধা ভাষাই 'সেহলা বিব'-র রূপ নিয়েছে। অবশ্য খোঁজ নিয়ে জেনেছি, 'সেহলা-বিব'-র বিভিন্ন পালা জুড়ে যে দীর্ঘ কান্না-কথা আছে তার সবটাই পতিগৃহ-যাত্রাকালে মা-মেয়ে ইত্যাদির কান্নায় ব্যবহৃত হয় না—অংশবিশেষ মাত্র ব্যবহৃত হয়।

এতক্ষণে অনেক পাঠকই হয়তো ঠোঁট টিপে হাসছেন আর ভাবছেন এই অভিনব কান্নার কথা। হয়তো মনে করছেন, বিচ্ছেদ-বেদনায় আন্তরিক সুরে এই বানানো কান্নার ফুটে ওঠে না। ও কান্না কৃত্রিম। ওতে বরং কৌতুক জাগায় বেশি। কিন্তু আমি সবিনয়ে বলি—এমন করে কি এক-কথায় নাকচ করে দেওয়া যায়! আমাদের জীবনের ক্ষেত্রে কত সময়েই তো আমরা হৃদয়ের সুগভীর অকৃত্রিম অনুভূতিকে—সে সুখেরই হোক আর দুঃখেরই হোক—বাঁধা কথার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করে থাকি। কতকাল ধরে লক্ষ-কোটি প্রেমিক-প্রেমিকাই তো পরস্পরকে—'আমি তোমায় ভালবাসি' বলে প্রেম নিবেদন করে আসছে; প্রায় সব মা-ইতো সন্তানের মৃত্যুতে "ওরে বাবারে (বা মারে)—কোথা গেলি রে" বলে কেঁদে মৃত্যুশোক প্রকাশ করছেন; কিন্তু এই ধরনের বাঁধা গতে সুখ ও দুঃখানুভব-গুলিকে প্রকাশ করার সময় কই একবারও তো তা কৃত্রিম বলে মনে হয় না? সুতরাং দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলার কন্যা-বিদায়কালীন এই কান্না বানানো হলেও তাই কৃত্রিম হয়ে ওঠে না বলেই আমাদের ধারণা। আমরা স্বকর্ণে পাত্রীদের বোন সরলার কণ্ঠে কান্নার মহড়া শুনেছি যে! তা আমাদের হৃদয়কে যে গভীরভাবেই নাড়া দিয়েছিল সে কথাতো আগেই বলেছি।

এ প্রসঙ্গে আর একটা কথাও মনে রাখতে হবে। ফাঁকা কথা দিয়ে তো আর এই কান্নার ভাষা তৈরী হয়নি। বাঙ্গিত হৃদয়ের শাশ্বত সত্য অনুভূতিগুলি যে অনুভূতি সর্বজনীন—বাণীরূপের মধ্য দিয়ে 'সেহলা-বিব'-রূপ রোদনসঙ্গীতে প্রকাশিত হয়েছে। তাই শাক্ত-সঙ্গীতের 'বিজয়া'-গীতির মতই এ সত্য, অকৃত্রিম এবং এর আবেদনও সর্বব্যাপ্ত হতে বাধ্য। সেদিন সরলার কান্নার যে অংশটুকু ("হৃদয় মোহর কাটি যাইছি...") আমাদের কানে বেজেছিল তা তো সহজেই আগমনী কন্যার অন্তর্ভূত মর্মান্তিক হৃদয়-বেদনারই বহিঃপ্রকাশ মাত্র:—মা গো, আমার হৃদয় কেটে যাচ্ছে; আদর করার লোক চলে যাচ্ছে। মা, আমায় দশ মাস দশ দিন গর্ভে ধরে কত কষ্টই না পেয়েছিলে। ষোল বছর ধরে আমায় পাশে রেখেছিলে।"

প্রথম শ্বশুরবাড়ী যাচ্ছে এমন কোন মেয়ের মনের মধ্যেই এই ধরনের কথা উঁকি দিয়ে ব্যথার কাঁটা না ফোটায়? এই রকম একটা নয়। হৃদয়ের অসংখ্য গভীর দুঃখময় অনুভূতির কথাই 'সেহলা-বিব'-র মধ্যে অভিব্যক্ত হয়েছে। তারই কিছু প্রমাণ রাখছি।

বিবাহিতা নারীজাতি পরাধীনা—বিশেষ করে ভারতবর্ষে—গ্রামজীবনে। ছেলে মানুষ করা, রান্না-বান্না আর ছেঁসেল-হাঁড়া-বাসন্তি নিয়েই তার দিন যায়। শ্বশুর-বাড়ী যাবার প্রাক্কালে মেয়ে তাই মায়ের কাছে পরাধীনতার বেদনা ব্যক্ত করে কেঁদে বলে:

> কংশাড়ী বুলাই কলক ভাকে মা গো।
> মুত্ত কাঁধাঁথাঁথি সোনাই পালে মাগো ।।

—'কংশাড়ী কলক ভাকে কোলে; আমি শুনবো রান্নাশালায়।' এই বলেই থামে না মেয়ে। তার কান্নার মধ্যে এই কথাগুলোও বাজতে থাকে:

তোমার পায়ে আমি কি দোষ করেছি মা যে, আমায় দূর দেশে পাঠিয়ে দিচ্ছ। মা গো, তোমার মনে যদি এই ছিল তা হলে জন্মকালে আমায় গলা টিপে মেরে ফেললে না কেন? শ্বশুরে ঘর যমের ঘরের সমান—বিনা দোষে আমাকে দণ্ড দেবে। মাথা হেঁট করে সব সময়ে পরাধীন হয়ে চলতে হবে। সব সময় মাথায় ঘোমটা টেনে ঘরের কোণে আমায় থাকতে হবে। মা গো, পাখী যেমন কর্মের দোষে বন্দী হয়ে খাঁচার ভেতরে থাকে, আমাকেও সেইভাবে বন্দী করে রা এবং ননদের দল আমার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখবে। কাকে আমি 'মা' বলে ডাকবো? তোমার সমান কি কেউ হবে? যার দিকেই তাকাই মা কেবল, সবাই তো পর। আমাকে স্নেহ-আদর করবে কে?"

বিদায়ী কন্যার এই কান্নার মধ্যে তার অভিমানক্ষুব্ধ ও বেদনা-কাতর শঙ্কিত হৃদয়ের ছবি অকৃত্রিম হয়েই ফুটে উঠেছে। একটি অসাধারণ ব্যঞ্জনা-সমৃদ্ধ কথাচিত্রও আমরা এই অংশে পেয়েছি। আমাদের চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ছবিটা: স্বাধীন কুমারী জীবনের অবসানে বিদায়ী কন্যার মনের তটে ব্যথার ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে বারংবার—যেন খাঁচায় আবদ্ধ মুক্তি-ব্যাকুল চঞ্চল একটি পাখি পাখা ঝাপটে চলেছে অবিরাম। যাত্রাক্ষ পালে রোদনের একটি অংশে অভিমানিনী কন্যা তার পিতার অর্থ-লোভের প্রতি কটাক্ষ করে দোষারোপ করতেও ছাড়েনি। সে বলেছে, যখনই তার বাবা ধবধবে টাকা দেখলেন তখনই তার বাবার লোভ জন্মালো:

> ধপ্ ধপ্ টাকা ধুব দিশি লা মা গো।
> তখ্ তখ্ বাপার লোভ বাঁসলা মা গো।।

এখানে ধবধবে টাকা বলতে রৌপ্য-মুদ্রাকেই হয়তো বোঝানো হয়েছে। এই পংক্তি থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার কন্যা-বিদায় সম্পর্কে নতুন কটা তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। সাধারণত, পণ-প্রথার নিষ্ঠুর কবলে বাংলাদেশের কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা বা অভিভাবকদেরই পড়তে হয়। শুধু মেয়ে দিয়েই নিস্তার নেই তাঁদের। পাত্রের হাতে মেয়ে সমর্পণ করার সময় দানে-যৌতুকে আশীর্বাদে মোটা পরিমাণের টাকার তোড়াও একটা তুলে দিতে হয়। কিন্তু এখানের রীতি তার বিপরীত। 'সেহলা-বিব'-র কান্নার মধ্য থেকেই পাচ্ছি যে, বর পক্ষই বিয়ের সময় কনের বাপের হাতে টাকা তুলে দিয়ে মেয়ে ঘরে নিয়ে যাচ্ছে।

একসময় মেয়ে থামলেও কান্না থামছে না। মেয়ের পর মায়ের পালা। নাম দেওয়া হয়েছে: 'মাতাদের উপদেশ'। মেয়েকে বিদায় দিতে গিয়ে মাতৃ-হৃদয় থেকে উৎসারিত বাৎসল্য-প্রেম গভীর আবেগে বেদনাময় রূপ নিয়ে থরথরিয়ে যেন কেঁপে উঠেছে:

সুনা পাখি বিব পর ঘরু গেছিললে।

—'সোনার মত মেয়ে আমার পরের ঘরে চলে যাচ্ছিস।' —এই বলে কান্না আরম্ভ করেছেন মা। দীর্ঘ কান্না। তার মধ্যে বেশির ভাগ অংশে জুড়ে রয়েছে উপদেশ দান। শ্বশুরবাড়ীতে যাবার পর মেয়ের আচরণ কিরকম হবে সে সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ সুমন্ত্রণা-সুনির্দেশ। মেয়েকে পাটের দিঁদি সেজে থাকতে বলেছেন মা। গৃহস্থ ঘরের লক্ষ্মী বধূ হবার উপদেশই দিয়েছেন। বলেছেন, শ্বশুর-শাশুড়ীকে

দেবতা মনে করে তাঁর কাছে; খুব সকাল-সকাল উঠতে। তারপর কি করতে হবে? গৃহ-প্রাঙ্গণে গোবর-জল ছড়া দেবে—এঁটো বাসন-কোসন হাত-মুখ ধোবার নালার কাছে নিয়ে গিয়ে পরিষ্কার করবে—ঘর-দোর ন্যাতা দেবে এবং স্নান সেরে এসে হাঁড়ি ধরে রান্না চাপাবে মন দিয়ে। রান্না শেষে অন্ন-ব্যঞ্জন বেড়ে সকলকে সমানভাবে যেন পরিবেশন করে। এ প্রসঙ্গে মায়ের উপদেশের অবিকৃত রূপ একটু শোনা যাক:

গোবর ছিটিক জলে দোষ নেই।
ছিটিবু বাড়ি অপকারে নেই।।
... ...
চলান্তি বাসন যেয়ে পুখুরে।
সেইন মাজিবু নানা মুহুরে।।
ঘর বাহার সর্ব দেবু ঝাঁন্তু।
স্নান সারি আসি থোইবু হাঁণ্ডি।।
... ...
তৎপরে বাঢ়িবু অন্ন-ব্যঞ্জন।
সমস্তটকু বাঢ়ি দেবু সমান।।

এইখানেই মেয়ের কর্তব্য শেষ নয়। পড়াশোনাও সে করবে। কিন্তু কি পড়বে—আধুনিক নাটক নভেল কি? না, পড়বে সীতা-সাবিত্রীর পূত-পবিত্র কাহিনী:

সীতা দময়ন্তী সাবিত্রী সতী।
শৈব্যা চিন্তারাণী সে দুর্গাবতী।।
কাহিনী পঢ়িবু বই ধরিণ।
হিত কথামান শিখু বুঝিণ।।

এতে করে পতি-মাহাত্ম্য বুঝতে পারবে মেয়ে। অনুভব করবে পতিই নারীর পরম গতি। মা মেয়েকে সাবধান করছেন:

পাঁ জা ভুআবুণী আসিলে কেহি।
তা সঙ্গে টাপরা করিবু নাহি।।

—'গ্রামের কোন সম্ভ্রান্ত মহিলা এলে তাঁর সঙ্গে রঙ্গ-রসিকতা করবি না।' কারণ?

ধীর ধীর কথা ধীর চলন।
বহু ভুআবুণী পক্ষে শোভন।।

এরপর মা বলেছেন, সন্ধ্যা হলে মেয়ে যেন গৃহে সন্ধ্যা-দীপ জ্বালে এবং ঈশ্বরের পায়ে যেন প্রণাম নিবেদন করে সকল সময়। মায়ের এই হিত-বাণী মনে রাখলে মেয়ে যে সুখী হবে সে ব্যাপারে তিনি নিশ্চিন্ত।

'শেহলা-বিভা'-র এই অংশে প্রাচীন সমাজের কন্যা-বিদায়ের রীতি-নীতির ছাপই বেশি পড়েছে মনে হয়। এপ্রসঙ্গে কালিদাসের শকুন্তলা নাটকে বর্ণিত শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রাকালে মহর্ষি কণ্ব ও মা গৌতমীর শকুন্তলাকে উপদেশ দানের কথাই বেশি করে মনে পড়ে।

এরপর মায়ের কাছ থেকে মেয়ে গেছে পিতার কাছে। করুণ সুরে কেঁদে কেঁদে বলেছে:

সজনা গাছকে ছাড়িলা দুই বাপা গো।
ফুন্দর কোলকু ছাড়িলে মরিহ বাপা গো।।

—'সজনা গাছ থেকে ফুল খসে পড়লো। বাবা গো, আমি তোমার কোল ছেড়ে গেলাম।'

এখানে গাছ থেকে ফুল ঝরে পড়ার সঙ্গে পিতার স্নেহ-কোমল আশ্রয় ত্যাগ করে মেয়ের শ্বশুরবাড়ী যাবার তুলনাটি চমৎকার। জল-ভরা ছলছলে চোখ নিয়ে এই মেয়েই আবার পিতৃ-হৃদয়ের নিষ্ঠুরতার প্রশ্ন তুলে কাঁদার পিতা সম্পর্কে তার মনোভাবের মধ্যে সুন্দর বৈপরীত্যের সৃষ্টি হয়েছে:

টিকিয়ে দয়া মনে ন রখিল।
গরীব ঘরকু মোতে ফিঙ্গিল।।

—'তোমার মনে এতটুকু দয়া হল না। আমাকে গরীবের ঘরে দিয়ে দিলে।'

স্বাভাবিকভাবেই তারপর পিতার কিছু বলবার থাকতে পারে। এখানেও পিতা তাঁর কন্যাকে উপদেশ দিয়েছেন প্রথম দার্শনিকের মত:

কি পাই কান্দুছ মা মোহর।
এহি নিয়ম জড় জগতর।।
ঝিঅ জন্ম হেলে পর ঘরকু।
পুত্র জন্মি পালে পিতা মাতাকু।।

—'মা আমার কাঁদছো কেন? জড় জগতের এই নিয়ম। মেয়ে জন্ম পরের ঘরের জন্যে, আর পুত্র জন্মে পিতা-মাতাকে পালন করে।'

তারপর পিতা খুব বড় করে তাঁর কন্যার শ্বশুর-বংশের গুণগান গেয়েছেন। বংশ-মর্যাদা ও সম্মান-সম্ভ্রমের দিক থেকে অমন পরিবার যে কোটিকে গুটিক মেলে—বিত্ত ও বিদ্যা দুই-ই যে এই বংশের সকলের করায়ত্ত—সে কথা পিতা খুব বড় গলায় মেয়েকে শুনিয়েছেন। বলেছেন, তাঁর কন্যার শ্বশুরকুলের কেউ ম্যাজিস্ট্রেট, কেউ ডাক্তার, কেউ উকিল, আবার কেউ বা কমিশনার। 'শেহলা বিভা'-র এই অংশের কিছুটা বেশ মজার। এক জায়গায় আছে:

বি-এ বি-টি পড়ি তো দেড়ঘর।
মেডিকেল কলেজরু ডাক্তার।।
আ, এস পড়িণ স্বামী তোহর।
মুনসফ হেলে বালেশ্বর।।

এখানে রচয়িতার অজ্ঞ ও সরল গ্রাম্য মনটি বিচিত্র ও ভ্রান্ত ধারণার মধ্য দিয়ে অভিব্যক্ত হয়েছে। বি-এ, বি-টি পাশ করে যে কারো পক্ষে ডাক্তার হওয়া সম্ভব নয়, অথবা আই-এস-সি পড়ে যে কেউ মুন্সেফী করতে পারে না—এটুকু জ্ঞান রচয়িতার না থাকলেও উঁচু ধরনের অবাধ কল্পনায় তাঁর সরল কবি মনটি কিন্তু পিছিয়ে থাকে নি!

বিদায়-পর্ব সমাপ্ত হতে এখনো কিছুটা বাকি। পিতার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মেয়ে তারপর পর্যায়ক্রমে বড় ভাই, বড় ভাজ, কাকীমা, কাকা, ঠাকুরমা ও সেজ বোনের কাছে কেঁদেছে এবং তারাও একের পর এক উপদেশ দিয়েছে (সেজ বোন বাদে)। এদের মধ্যে ননদ-ভাজের উক্তি-প্রত্যুক্তিই চিত্তাকর্ষক। ননদ যখন কেঁদে বলেছে—'কাল তোমার সঙ্গে বিদায় বৌদি গো, আর আজ আমি যাচ্ছি যম-মন্দিরে। তোমার স্নেহ-ভালোবাসার কথা মনে পড়বে প্রতি মুহূর্তে। কে আর আমার সিঁদুর ঝাঁপির দেবে? কার সঙ্গেই বা ফুঁপিয়ে মায়ের কথা কইবো? কার সঙ্গেই বা নদীতে যাব না ধুতে? কার পাশে বসে পড়ুয়া পড়বো—আমার শীত ঘরার সাথীই বা হবে কে?' —রসিকা বৌদি তখন রঙ্গ করে উত্তর দিয়েছে অলংকারে:

বাহারিক শান্দুর জামিন্দ কাস
ফুল গো।
স্বামী সঙ্গে রঙ্গে হাইবু খসী
ফুল গো।।
দেহে ভাব সদৃ হেব পানের
ফুল গো।
ক্ষান্ত হেব একা পলার হার ফুল গো।।
পাইবু সুন্দর রসিক বর ফুল গো।
সঙ্গে থাঁস ছিব দিবা নিশির
ফুল গো।।

—'তুমি তো ফুলের কুঁড়ি গো, কাঁদছো কেন? স্বামীর সঙ্গে রঙ্গে খুশি হবে। মন ভাব-ভালোবাসা এখানকার সব ভুলে যাবে; এখ্যা কান্নাই হবে গলার হার। সুন্দর রসিক বর পেয়েছো। দিন-রাত্রি কাছে বসে থাকবে।'

ননদ-ভাজের মিষ্টি-মধুর সম্পর্কের ছবিটাই এখানে সুন্দর ফুটেছে। অনেক বিচ্ছেদের উতরোল কান্না রঙ্গ-কৌতুকের ঝঙ্কারে পাপড়ির আড়ালে যেন অদৃশ্য থেকেছে।

এই হল মোটামুটি 'শেহলা বিভা'-সংবাদ। তবে বলে রাখা ভালো কন্যা-বিদায়ের এই রীতি অধুনা দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলার প্রতিটি গৃহে সর্বতোভাবে আর অনুসৃত হচ্ছে না। কারণ নাগরিক শিক্ষা-সংস্কৃতির সভ্যতার আলো এসে ঢুকরে পড়েছে গ্রাম ঘরেই। ফলে আধুনিক ও নাগরিক মনোভাবাপন্ন হয়ে উঠেছে ও উঠছে ছেলে-মেয়েদের দল। আজকের দিনের নবীনা বিদুষীরা চীৎকার করে কান্নার লজ্জা পায় ভীষণ। আগেকার দিনের সহজ আবেগের উচ্চ প্রকাশভঙ্গির মধ্যে গ্রাম্যতা ও স্থূলতা ধরা পড়ছে আজকের দিনের আধুনিকাদের মার্জিত রুচির মাপন-যন্ত্রে। সেই জন্যেই রুচি-মার্জনের প্রয়োজনে বর্জনের নীতিকে তারা গ্রহণ করছে প্রাণপণে। গোটা বাংলাদেশের সর্বত্রই লোকসংস্কৃতির অনেক কিছুই এখন পুরানো ও স্থূল আখ্যায় অভিহিত হয়ে লোক-লোচনের অগোচরে থেকে অবলুপ্তির অন্ধকারে ডুবতে বসেছে। পণ্ডিতদের পরিবারের মত দু-একটা পরিবারই এখনো অনাধুনিক (?) থেকে পুরনো প্রথা ও রীতি-নীতিকে পালন করে বাংলা লোক-সংস্কৃতির বাহক হয়ে রয়েছে। কিন্তু সে আর কতদিন? নগর সভ্যতার আলোক-বন্যায় ভাসলো বলে সব! কারণ আলোর গতি যে সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশী হাজার মাইল!!

নিকটেই আছে

অপারেশনের পর

হাসপাতালে পা দিলেই মনটা কেমন বিষণ্ণ হয়ে যায়। লম্বা চওড়া বাড়ীগুলো পাশাপাশি ঠেসাঠেসি দাঁড়িয়ে আছে পাশাপাশি। কাঁকালো একটা কটু গন্ধে সব যেন আচ্ছন্ন। ভারী ভারী লাগে হাত-পা সব; জোরে নিঃশ্বাস ছাড়তে পর্যন্ত ভয় হয়। লম্বা লম্বা এক-একটা করিডোর, চওড়া-চ্যাটালো সব সিঁড়ি, খাকী ইউনিফর্ম পরা দরোয়ান কোলাপসিবেল গেটের মুখে টুল পেতে বসে। একটু মুখটা ঘুরিয়ে ওপরের দিকে তাকালেই চোখে পড়বে ও-টি—এখন ঝিম ধরে পড়ে আছে। অথচ একটু আগেও একচোখো দানবের রক্তচক্ষু-লাল চোখটা স্থির হয়ে জ্বলছিল—ডক্টর বাড়ুরী তখন তারকের জামাইবাবুর পেট চিরে গ্ল্যাডার-ট্যাডার সব কেটেকুটে সাফ-সুতরো করছিলেন। সোয়া তিনটের জামাইবাবুকে সাজিয়ে-গুজিয়ে ঘুম পাড়িয়ে বিছানায় শুইয়ে ঠেলাগাড়ীতে চাপিয়ে ভিতরে নিয়ে গেল, ফেরৎ পাঠাল সেই সাড়ে পাঁচটায়। তারক দেখেছে জামাইবাবু চোখ খুলে ছিলেন, তবে নিশ্চয় জ্ঞান ফিরেছে। নার্স কথা বলতে দিল না কাউকে। স্যালাইনের বোতলটা একহাতে ধরে বিছানার পাশ ঘেঁষে চলতে চলতে সবাইকে বারণ করে দিল রুগীকে যেন ডিসটার্ব না করে কেউ।

দিদি একটি কথাও বলেনি। বলার ক্ষমতাই ছিল না কোনো। তিন দিন ধরে মনে মনে যা ঝড় চলেছে, বুঝতেই পারে তারক। এতক্ষণ তবু দাঁড়িয়েছিল, ও-টি থেকে বিছানা বেরোতেই তারকের কেন জানি মনে হল দিদির বোধহয় শরীরটা ভাল নেই। তক্ষুনি ছুটে গিয়ে না ধরলে হয়তো পড়েই যেত। টেনসন তো নয় হাইপার টেনসন।

পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন তালইমশাই। তারক ফিসফিস করে বলল, তাইমশাই আপনি বরং দিদিকে নিয়ে বাসায় চলে যান। আমি একটা ট্যাক্সি ডেকে দিচ্ছি। আমি ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলে বা-বা করার সব করে ঘন্টাখানেক বাদেই যাব।

বৃদ্ধ কামাখ্যা গাঙ্গুলী যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। এসেছেন সেই কাক-ডাকা ভোরে। সারাদিন নাওয়া-খাওয়া কিছুই হয়নি। ঠায় পুত্র-বধূর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। তারক বলতেই ভাঙা গলায় জিজ্ঞাসা করলেন—রাম ভালো আছে তো বাবা?

হ্যাঁ, তাইমশাই। দেখলেন না জামাইবাবু চোখ মেলে রয়েছেন। মানে জ্ঞান ফিরে এসেছে। এখন ওরা কাউকেই কাছে যেতে দেবে না। আপনারা আর মিছি-মিছি দাঁড়িয়ে কেন কষ্ট পাবেন। এবার বাসায় গিয়ে একটু জলটল খান। এদিকে যা করার আমিই সব করব।

তারক ট্যাক্সি ডেকে তাইমশাই, দিদিকে উঠিয়ে দিয়ে আবার ফিরে এল ওয়ার্ডে। ঘড়িতে দেখল ছটা বাজে। যারা রুগী দেখতে এসেছিল, সবাই যাচ্ছে ফিরে। স্কার্ফ সোয়েটার কোট, র‍্যাপার, মাংকি ক্যাপ দলে দলে যেন বিল্ডিংয়ের কোলাপসিবেল গেট থেকে বেরোচ্ছে। ঘরে ঘরে, করিডোরে, সিঁড়িতে, রাস্তায়, এমার্জেন্সিতে আলো জ্বলে উঠছে। গাড়ি বারান্দার এধারে ওধারে খান চার-পাঁচেক গাড়ি দাঁড়িয়ে। এখনি একবার ডক্টর বাড়ুরীর সঙ্গে দেখা করা দরকার। মন বলছে অপারেশন সাকসেসফুল, তবুও ডাক্তারের মুখ থেকে না শুনলে যেন নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না।

নার্সিং ভিড়ের পাশ কাটিয়ে একটু একটু করে ওপরে উঠতে লাগল। কাল বিকেলে স্টাফ নার্স যে প্রেসক্রিপসনখানা দিয়েছিল, তার সব কটা ওষুধই যোগাড় করেছে তারক। শুধু একটা কোথাও পেল না। সিং সাহেব, টাকস, দত্তজ, মসকস, গুপ্তী, স্যাকারাম—কলকাতার কোন দোকানই বাদ দেয়নি। সব জায়গাতেই একই উত্তর পেয়েছে—নেই, আপনি বরং ওদের ওখানে চেষ্টা করে দেখুন। আমাদের যা ছিল অনেকদিন ফুরিয়ে গেছে। ওদের লাইসেন্স আছে, হয়তো দু-চারটা ইনজেকশন থাকতেও পারে।

যে সব দোকানে ভিড় বেশী, তারাতো চোখ বুলিয়েই জবাব দিয়ে দিয়েছে, না নেই। কোনো দোকানের দোকানী ওষুধের ক্যাটালগ খুলে মিলিয়ে দেখেও চালান এসেছে না কি কোন। তারপর ঘাড় নেড়ে বলেছে—এ ওষুধটা আজকাল বড় কেউ প্রেসক্রাইব করে না। উনি কেন করলেন তাতো বুঝতে পারছি না। আমরা তো আর আনিনি।

কেন ওষুধটো কি আউট অব মার্কেট? উদ্বিগ্ন তারক চটপট জিজ্ঞাসা করেছে।

হাসির গুড়ো মাখানো উত্তরে শুনেছে—ঠিক তা নয়। ব্যাপারটা কি জানেন এত হাজার রকমের পেইন-কিলিং ড্রাগ বেরিয়েছে যে আজকাল এটা কেউ ইউজ করেন না। অপারেশনের পর কাটাছেঁড়ার যন্ত্রণাটা ভুলিয়ে দেওয়ার জন্যই এসব ইনজেকশন দেওয়া হয়। তবে এই ইনজেকশনটার বিরুদ্ধে মস্ত অভিযোগ—এতে ড্রাগিং টেনডেন্সি দেখা দেয়। আর খাম পেলে পেসেন্টের ক্ষতি, বুঝতেই পারছেন।

বুঝতে তো পারছেই কিন্তু তারক কি করবে। ডাক্তার প্রেসক্রিপসন করেন, যত ঝামেলা রুগীর। আমরা তো সাধারণ মানুষ, ডাক্তারীর কি জানি। কেন ডাক্তারবাবু কোন ওষুধ প্রেসক্রাইব করেন, তার কারণ তো এক ডাক্তারবাবুই বলতে পারেন। কম করেও তিনটা দোকান, মানে গোটা কলকাতাটাই চষে বেড়িয়েছে তারক। কোথাও পায়নি।

কোথাও না পেয়ে রাত দশটার সময় বাকী ওষুধ কটা আর তেইশ বোতল স্যালাইনের বাকসটা নিয়ে হাসপাতালে এসে খোঁজ করেছে ডাক্তারের। স্টাফ নার্স সব ওষুধপত্তর বুঝে নিয়ে ভ্রূ জোড়া নাচিয়ে জিজ্ঞাসা করেছেন—এটা আনেননি?

আজ্ঞে না, কোথাও পাইনি—ভয়ে ভয়ে উত্তর দিয়েছে তারক। বড়-ছোট কোন দোকানই বাদ দিইনি। এটা তো অপারেশনের সময়ই লাগছে না। পরে লাগবে। আমি কাল আর একবার চেষ্টা করব। দরকার

হলে বাগড়ি মারকেটে যাব। দেখবেন ঠিক খ‍ুজে এনে দেব।

তারকের কথায় বোধহয় আশঙ্কা, উত্তেজনা, সিনসিয়ারিটি সব কিছু জমা পাকিয়ে উঠেছিল। দিদি, ওর ওপরেই সব ছেড়ে ছুড়ে নিশ্চিন্ত হয়ে আছে। জাইমশাই বুড়ো মানুষ। চোখে ভাল দেখেন না। সত্তরের ওপর বয়স। এই বয়সে চল্লিশ বছরের একমাত্র উপযুক্ত ছেলের মেজর অপারেশনের কথা শুনেই কেমন বোবা হয়ে গেছেন। এখন সব নির্ভর করছে তারকের ওপর। ওরা জানেন তারক তার ডিউটি ঠিকই করবে। সবই করেছে তারক। হঠাৎ পুজোর মাঝামাঝি দিদির বাসার চাকর এসে খবর দিল জামাইবাবুর শরীর ভাল না, আপনারে দিদি ডাকতাসে। সেই থেকেই সব ঝামেলা একসঙ্গে জট পাকাল। পাড়ার ডাক্তার দেখেশুনে বললেন, গতিক ভাল না। আপনারা একবার ডক্টর বাড়ুরীকে দেখান। উনি স্পেশালিস্ট। আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি।

তিনবার ষোল টাকা ভিজিট দিয়েছে ডক্টর বাড়ুরীকে। অনেক টাকা খরচ করে পেটের এক্স-রে করিয়েছে। তারপরেই ব্যথাটার আসল কারণ জানা গেল—গল ব্লাডার। আসল রোগটার নাম ডাক্তারবাবু প্রেসক্রিপসনে যা লিখেছিলেন তা বানান বা উচ্চারণ করার ক্ষমতা নেই তারকের। বাইশ তেইশটা ওয়ার্ড বর্ণমালা থেকে তুলে এনে পাশাপাশি বসালে যা হয় তাই।

রোগ জানা গেল। প্রতিকারের পথও বাতলালেন ডক্টর বাড়ুরী—অপারেশন। দেরী হলে ক্ষতি হবে।

ক্ষতি তো হবে, কিন্তু বাড়ুরী সাহেবের আন্ডারে কোন বেড খালি নেই। দিনের পর দিন আর এস, সুপারিন্টেন্ডেন্ট, সবার কাছে ধর্ণা দিয়েছে তারক। সবারই মুখে একই উত্তর—বেড, কেবিন কিছু খালি নেই। ওদিকে পেটের যন্ত্রণায় বাসায় পড়ে পড়ে জামাইবাবু ব্যথা ভুলবার জন্য গাদা গাদা ওষুধ গিলেছেন। অফিস থেকে ছুটি নিয়ে বিছানায় পড়ে থেকেছেন। শেষ পর্যন্ত তারক অফিসের এক কলিগকে ধরে ব্যবস্থা করেছে। কলিগের মামা স্বাস্থ্য দপ্তরের ডিপার্টমেন্টের একজন মাথকসাই কর্তা। তাঁর একটা ফোনেই বেড জুটে গেল।

জামাইবাবু ভর্তি হলেন শুক্রবার, অপারেশন হল সোমবার। সব হল অথচ একটা ওষুধের জন্যই তারকের মনটা কেমন খচ-খচ করছে। কোথাও পেল না। না পেয়েই নার্সকে জানাতে এসেছে—দরকার হলে বাগড়ি মারকেটে যাব। দেখবেন ঠিক খুজে এনে দেব।

তারকের কথা শুনে হেসে ফেললেন নার্স। সিসটার্স রুমের কোণের টেবিলে বসে যে নার্সটি এতক্ষণ একমনে খাতায় কি সব লিখছিলেন তিনিও চোখ মেলে তাকালেন—কি ব্যাপার রে টুটুদি? কি ওষুধ?

ঠোঁটের কোণে টুকরো হাসির রেখা জাগিয়ে টুটুদি বললেন—একটা পেইন-কিলিং ড্রাগ। ভদ্রলোক সারা শহর খুজেও পাননি।

নার্সের কথার সুরে যেন একটা চাপা অবিশ্বাস, আর সন্দেহের আভাস খুজে পেল তারক। তবে কি উনি বিশ্বাস করছেন না? সন্ধ্যা ছটা থেকে রাত দশটা অবধি ট্রামে-বাসে, ট্যাক্সিতে শহরের এ প্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত যে তারক চষে বেড়িয়েছে একটা ওষুধের জন্য তা কি উনি অবিশ্বাস করছেন? রাগে থর-থর করে কাঁপে তারকের সারা শরীর। অনেক কষ্টে ভেতরটা ঠাণ্ডা রেখে কাঠ কাঠ গলায় তারক বলে, দেখুন সত্যিই আমি খুজেছি। পেশেন্ট তো আমারই। মাথাব্যথা তো আমারই হবে।

নার্স দুজনের একজনও বোধহয় ওর কথায় কান দেওয়া প্রয়োজন মনে করল না। কোণে বসা নার্সটি হাসতে হাসতে কৌতুকের ফোড়ন মিশিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—কার প্রেসক্রিপসন রে টুটুদি?

কার আবার, ডক্টর বাড়ুরীর হাউস সার্জেন সুভাষ ঘোষ।—জবাব দিলেন টুটুদি।

এবার কৌতুকের বদলে প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গের কয়েকটা সরু মোটা রেখা জেগে উঠল অপেক্ষমাণ নার্সটির মুখে। অ—শুধু এই-টুকু বলেই আবার সে খাতায় ডুব দিল।

টুটুদি ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন—ঠিক আছে, কাল এনে দিলেও চলবে। বলেই তুলা ওষুধপত্রের প্যাকেট ও স্যালাইনের বাকসটার একবার চোখ বুলিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন। তারক ফস করে জিজ্ঞাসা করল—আচ্ছা ডাক্তারবাবুকে বলে এটার কোন সাবস্টিটিউট পাওয়া যায় না।

থমকে দাঁড়ালেন স্টাফ নার্স। তারপর খুব রুক্ষভাবে কথা কটা বলেই ঘর ছেড়ে ওয়ার্ডে চলে গেলেন—কোথায় পাবেন ডক্টর ঘোষকে? উনি তো কোয়ার্টারে থাকেন না। আর কাল সকালে ওঁর দেখাই পাবেন না। ডক্টর বাড়ুরীর কাল পাঁচটা অপারেশন। ডক্টর ঘোষ এসেই অপারেশন থিয়েটারে ঢুকে যাবেন।

তেতলার ওয়ার্ডের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওয়ার্ড বয়, নার্স হাউস সার্জনদের ব্যস্ততা দেখছিল তারক। ওষুধটা আজও যোগাড় করতে পারেনি। দিদিকে এসব কিছু বলেনি। একেই অপারেশনের ভয়

CENTRAL LIBRARY

আধমরা হয়ে আছে, তার ওপর ওষুধ পাওয়া যায়নি শুনলে হয় তো অজ্ঞান হয়ে যাবে। ভাইমশাই তারকের ওপরেই সব ভার ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে আছেন। আর যার প্রয়োজন সে তো এখন ওয়ার্ডের এক কোণে লাল কম্বলের আড়ালে বিছানায় শুয়ে ঝিমোচ্ছে, জানেই না তার কি দরকার বা প্রয়োজন। প্রচণ্ড অস্বস্তি, ভয়ে এই শীতেও তারকের কান-মাথা সব গরম হয়ে উঠেছে। একবার রুমাল দিয়ে কপাল, ঘাড়, গলা মুছে নিল। তার মত আরো জনকয়েক দাঁড়িয়ে ওয়ার্ডের সামনে। হয়তো এদেরও রুগীর অপারেশন-টেশন হয়েছে আজ বা পরশুকাল বা হবে আগামীকাল। ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কথা বলবার জন্য অপেক্ষা করছে। তারকের মনে হল লোকেটারটা খুঁজে বের করতে পারলে ভাল হত।

কি রে তারু না?—প্রশ্ন ও সমান জোরে একটা চড় এসে পিঠে পড়তেই তারক ঘুরে দাঁড়াল। অবিনাশ। ইউনিভার্সিটি লাইফের বন্ধু অবিনাশ স্যুট-বুট পরে ঝকঝকে চামড়ার একটা পেটমোটা ব্যাগ হাতে ঝুলিয়ে পাশে দাঁড়িয়ে হাসছে। কি ব্যাপার? তুই এখানে কেন রে তারক?

ভগবান-টগবান বিশ্বাস করে না তারক এখনিতে। এখন করতে ইচ্ছে হল। পুরোনো ক্লাসমেট অবিনাশ। মেডিক্যাল রিপ্রেজেন-টেটিভ। ও চেষ্টা করলে হয়তো একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

আমার জামাইবাবুর আজ অপারেশন হল, বলতে বলতে প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিল প্রেসক্রিপসনখানার জন্য।

—তাই নাকি, কি অপারেশন?

—গল ব্লাডার।

—কে করল?

—ডাক্তার বাড়ুরী।

—কেমন, এখন ভাল আছেন তো?

—হাঁরে দেখে তো তাই মনে হল, তবে একটা ব্যাপারে খুব ঝামেলায় পড়েছি রে অবিনাশ। কাগজখানা পকেট থেকে বার করে তাই খুলতে লাগল তারক।

—কি ঝামেলা রে?

—বাব না। এই ওষুধটা কোথাও পাচ্ছি না।

—দেখি দেখি, কি ওষুধ। ব্যাগটা মাটিতে নামিয়ে রেখে কাগজখানার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল অবিনাশ। অস্ফুটে বলল—কোনটা পাসনি? এইটা?

—হাঁ। কম করে তিনটে দোকান ঘুরেছি। কলকাতার কোন বড় দোকান বাদ রাখিনি। কিন্তু কোথাও পেলাম না।

—পাবি কি করে। গম্ভীর গলায় এক-হাতে প্রেসক্রিপসনখানা ধরে অন্য হাতে চশমাটা অ্যাডজাস্ট করতে করতে বলল অবিনাশ, এটা আজকাল কেউ প্রেসক্রাইব করে না। তোর কপাল খারাপ। ডক্টর ঘোষের খপ্পড়ে পড়েছিস। শালা এক নম্বরের ঘুষখোর।

খুব আস্তে চাপা গলায় কথা কটা বললেও তারক শুনতে ভুল করেনি। চমকে উঠল—তার মানে?

—মানে পরে বলব। দাঁড়া এর একটা সাবস্টিটিউট আমি ডাক্তারকে দিয়ে লিখিয়ে নিই। তুই একটু দাঁড়া, বলতে বলতে মাটি থেকে ব্যাগটা তুলে নিয়ে কাগজখানা সমেত ডাক্তারদের ঘরে ঢুকে পড়ল অবিনাশ।

মিনিট পাঁচেক বাদে বেরিয়ে এল। কাছে এসে বলল, চ আমার সঙ্গে চ। সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে।

তারক চুপচাপ ওকে অনুসরণ করল। হাসপাতাল ছাড়িয়ে বড় রাস্তার মোড়ে এসে একটা ডিসপেন্সারীতে ঢুকে বলল—আমার তিনটে পেথিড্রিন দিন তো।

ইনজেকশনকটা নার্সকে বুঝিয়ে দিয়ে তারক আবার ফিরে এল সেই ডিসপেন-সারীতে। এসে দেখল অবিনাশ ছুটিয়ে দোকানদারের সঙ্গে আড্ডা মারছে। কানে এল দোকানদার বলছেন,—হ্যাঁ এরকম একটা ওষুধ চাইতে বোধ হয় আপনার বন্ধুই আজ সকালে এসেছিলেন। আনকমন বলেই মনে আছে। ডক্টর ঘোষরাই প্রকেশনটার নাম ডোবাবেন। আজকাল কেউ এ সব ওষুধ দেয়! বুঝতেই তো পারছেন টমসন ফ্রাই-এর রিপ্রেজেনটেটিভ মোটা টাকা খাইয়েছে।

সে আর বলতে, অবিনাশ খেই ধরল, তিন বছর যে ওষুধ চলছে না, সেটাই আবার ধরাতে চায় আর কি? আর তারক আর। বস।

তারক দোকানদার, অবিনাশের কোনা-কুনি টুলটায় বসল। দোকানদার ওকে ভালভাবে দেখে নিয়ে জিজ্ঞাসা করল—আজ সকালে আপনি এসেছিলেন না?

—আজ্ঞে হাঁ। সংক্ষিপ্ত জবাব দিল তারক।

—ব্যাপারটা কি জানিস তারক, আমা-দের প্রফেশনে আজকাল নানা গাঁড়াকল ঢুকেছে। ঐ লোকে যে ওষুধটা ডক্টর ঘোষ দিয়েছিলেন ওটা আজকাল চলে না। ঐ গ্রুপের ওষুধ বাজার ছেয়ে গেছে। কে আর জেনে-শুনে ঐ ওষুধ কিনবে—ওর আফটার এফেক্ট খারাপ হতে পারে। কোম্পানী তা শুনবে কেন? ওদের হয়তো, হয়তো কেন টমসন-ফ্রাইএর অবস্থা তো আমি জানি, ঐটা ছাড়া ভাল কোন ড্রাগ আর হাতে নেই। তাই রিপ্রেজেনটেটিভ ডাক্তারকে কাপেট ধরেছে। মোটা টাকা খাইয়েছে, খানকয়েক প্রেসক্রিপসনে ওটার নাম ঢোকানোর জন্য। ধর তুই নিজেই তো বললি তিনটা দোকান ঘুরেছিস। এরকম যদি আরো কয়েকজন ঐ ওষুধের জন্য দোকানে দোকানে ঘোরে, তাহলে দোকান-দাররা জানিবে বাজারে ওষুধটার ডিম্যান্ড হয়েছে। তখন তারাও কোম্পানীতে অর্ডার পাঠাবে। আর সেই সুযোগে ডক্টর ঘোষকে পাঁচশো হাজার খাইয়ে কোম্পানী চল্লিশ পঞ্চাশ হাজারের ব্যবস্থা করে নেবে। বুঝতে পারলি?

ঘাড় নেড়ে তারক জানাল, বুঝতে সে পেরেছে। মুখে বলল—তবে যে বললি এ ওষুধটার আফটার এফেক্ট খারাপ, সেটা জেনেও—।

তারকের কথাকটা শেষ করতে না দিয়েই অবিনাশ মাঝপথে মুখ খুলল—কাঁচা হলে তোর পেশেন্টের হবে। ডাক্তারের কি। আর তোরা মনে করিস সেই ডাক্তার এত বড় যার ওষুধ দোকান-বাজারে চরেও মেলে না। বল ঠিক তাই কিনা?

এর জবাবে তারক আর কি বলবে? গত রাত্রি আর আজ সারাদিনের একটানা ঘোরার ফলে যে অবসাদ এসেছে শরীরে, এখন একটু বিশ্রাম ওর প্রয়োজন। বাড়ী ফেরা দরকার। কিন্তু জানে এখুনি ফেরা যাবে না। দিদি, ভাইমশাই, বোনেরা সুদ্ধ সব ওর জন্য বসে আছে। জামাইবাবু যে ভাল আছেন, সে কথাটা ওদের বলে তবে বাসায় ফিরতে পারবে।

কানে এল অবিনাশ বলছে—চ, তোকে খুব টায়ার্ড দেখাচ্ছে। চলি ভাই ব্যানার্জী। কাল একবার আসব। যদি নতুন ওষুধটা চাও তো কালই অর্ডার দিও। এরপর আর পাবে না। হট কেকের মত বিকোচ্ছে।

অবিনাশ ট্যাক্সিতে উঠে বলল, কোথায় যাবি?

—আলীপুর।

ট্যাক্সি ছুটে চলল। দুপাশের কাঁচ তোলা। ট্যাক্সির গদিতে শুয়ে চোখটা বুজল তারক। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে ঝক-ঝকে সুন্দর চেহারার একটা মানুষ লম্বা করিডোর দিয়ে হাঁটছে। বয়স বেশী নয়। বড় জোর সাতাশ আটাশ। নিষ্পাপ উজ্জ্বল মুখ। ঐ লোকটার হাতেই এখন জামাইবাবুর জীবন। অথচ—।

বাঁয়া রাস্তায়ে চলিয়ে সর্দারজী, অবিনাশের ভারী গলার আওয়াজে তারকের চিন্তার জট ছিঁড়ে গেল, তাকিয়ে দেখে ট্যাক্সি পোটোপাড়ার ভেতর দিয়ে জোরে ছুটে চলেছে।

—নন্দিনেন্দু

তোমাকে

নিমাই ভট্টাচার্য

(দুই)

ঘরের থমথমে আবহাওয়া কাটতে একটু সময় লাগল।

মিসেস রায় আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, চা খাবেন না কফি?

'যা হয়।'

'কোনটা পছন্দ করেন?'

পছন্দ? একটু না হেসে পারলাম না। 'ঠিক পছন্দ-অপছন্দ করতে তো শিখিনি।'

'যে কদিন এখানে আছেন সে কদিন অন্ততঃ পছন্দ-অপছন্দের পূর্ণ অধিকার রইল আপনার।'

আমি মাথা নীচু করেই আছি। মিসেস রায় আবার জানতে চাইলেন, চা আনব না কফি?

'কফি।' আমি ছোট্ট উত্তর দিয়ে আবার মাথা নীচু করে চুপ করে রইলাম। বুঝলাম মিসেস রায় ভিতরে চলে গেলেন।

কিছুক্ষণ মিঃ রায়ও চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, আপনার বয়স কত?

'পঁচিশ।'

'পঁচিশ? আপনি তাহলে ঠিক আমার ছেলের বয়সী।'

'তাই নাকি?'

বুঝলাম মিঃ রায়ের ছেলে আছে কিন্তু এই বাংলো বাড়ীর শান্ত আবহাওয়া দেখে মনে হলো এখানে ওরা দুজনেই থাকেন।

মিঃ রায় এবার আমার কাজকর্মের খবর নিলেন। 'প্ল্যানিং কমিশনে কতদিন আছেন?'

'মাত্র ছ' মাস।'

'ছ' মাস?'

'হ্যাঁ।'

'তার আগে কি করতেন?'

'টুকটাক ছোটখাট অনেক চাকরি-বাকরি করেছি।'

'প্ল্যানিং কমিশনে ঢুকলেন কি করে?'

'আমার এক পুরান অধ্যাপক একবার প্ল্যানিং কমিশনের অনুরোধে কলকাতার একটা সোসিও-ইকনমিক সার্ভে করেন; তখন আমিও ওঁর সঙ্গে কাজ করেছিলাম। সেই অধ্যাপকের সুপারিশেই প্ল্যানিং কমিশনে ঢুকেছি।'

মিঃ রায় চশমাটা ঠিক করে আবার প্রশ্ন করলেন, 'তা আপনাদের সোসিও-ইকনমিক স্পেশ্যাল সার্ভে ইউনিটের কাজ কি?'

'পঞ্চাশজনকে নিয়ে এই ইউনিট। আমরা এক একজনে দুটো-তিনটে বা চারটে এরিয়ায় কাজ করব। প্রথমে দেখব এই এক একটা এরিয়ায় গত দশ বছরে কি ধরনের পরিবর্তন হয়েছে অর্থাৎ প্ল্যানের ইমপ্যাক্ট কি হয়েছে, কি হতে পারত এবং ভবিষ্যতে কি হওয়া দরকার।'

'তাহলে তো বেশ দায়িত্বপূর্ণ ও ইন্টারেস্টিং কাজ।'

আমি হেসে বললাম, 'ঐ যা বলেন আর কি?'

'আপনি কোন কোন এরিয়ায় কাজ করবেন?'

'এই ইউ পি'র ডেরাডুন বেল্ট ছাড়া মহারাষ্ট্রের মহাবালেশ্বর—সাঁতারা—প্রতাপগড় এরিয়ায়।'

'আর কোথাও?'

'তারপর বোধহয় উড়িষ্যায়।'

'এই এরিয়াগুলো আপনি নিলেন কেন?'

মিসেস রায় ঘরে ঢুকলেন। পিছনে পিছনে দুই হাতে চাকর। টেবিলে কফি আর মিষ্টির প্লেট নামিয়ে রাখলেন।

আমি মিঃ রায়কে বললাম, 'এই এরিয়াগুলোতে নানা ধরনের লোক পাব বলে।'

'যেমন?'

'ডেরাডুন ইজ অ্যান ইমপর্ট্যান্ট বিজনেস সেন্টার। বড় বড় ব্যবসায়ীর পাব। মিলিটারী একাডেমীর জন্য হাই অ্যান্ড লো মিলিটারী অফিসার পাব, আপনাদের এফ-আর-আই আর পাশের অয়েল অ্যান্ড ন্যাচারাল গ্যাস কমিশনে টেকনিসিয়ান্স, সাইনটিস্টস আর অ্যাডমিনিস্ট্রেটর পাব। তাছাড়া সাধারণ অফিস কর্মচারী ছাড়াও ভ্যালী, প্লেন ও হিল এরিয়ার বহু লোক পাব।'

'দ্যাটস্ রাইট।'

চারণকবি নজরুলের বর্ণবহুল জীবনের পূর্ণাঙ্গ জীবনালেখ্য

আবদুল আজীজ আল্-আমানের

নজরুল পরিক্রমা

পনের টাকা

অন্যান্য গ্রন্থ : সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের উপন্যাস হিজলকন্যা—৩·৫০ ॥ পিঞ্জর সোহাগিনী —২·৫০ ॥ প্রেমের প্রথম পাঠ—৩, ॥ শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের আমার বন্ধু নজরুল—৮, ॥ ইবনে ইমামের উপন্যাস পুতুল নাচ—৮, ॥ সরাইখানার যাত্রী—১০, ॥ দিলীপকুমার ভট্টাচার্যের জীবন-শিল্পী সত্যজিৎ রায়—৯, ॥ আবদুল আজীজ আল্-আমান সম্পাদিত নজরুল রচনা-সম্ভার (১ম, ২য়, ৩য় খণ্ড) প্রতি খণ্ড ১৫, ।

হরফ প্রকাশনী ॥ এ-১২৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট ॥ কলকাতা-১২.

মিসেস রায় কফি আর মিষ্টির প্লেট আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'এই নিন।'

প্লেটে চারটে বড় বড় রসগোল্লা দেখে বললাম, 'এখন এত মিষ্টি খাব না।'

'মোটেই এত না।'

মিঃ রায় এগিয়ে এলেন স্ত্রীকে সাপোর্ট করতে, 'ওকে খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে কখনো না বলবেন না। সব কিছু নিজের হাতে তৈরী। সুতরাং না বললেই মোস্পান অফ নো কনফিডেন্স বলে মনে করবে।

আমি কি বলব? শুধু হাসলাম। আমি আর মিঃ রায় খেতে শুরু করলাম।

মিসেস রায় টেবিলের এক পাশে একটা চেয়ারে বসলেন। আমাদের মিষ্টি খাওয়া হলে কফি এগিয়ে দিতে দিতে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি এখানে কতদিন থাকবেন?'

'তিন-চার মাস।'

'গেস্ট হাউসেই থাকবেন?'

'হ্যাঁ, তাইতো ব্যবস্থা হয়েছে।'

কফি খাওয়াও শেষ হলো।

মিসেস রায় এবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনাকে নাকি অনেক ঘোরাঘুরি করতে হবে।'

'বেশী দূরে যেতে হবে না। তবে কাছাকাছির মধ্যে কিছু ঘোরাঘুরি করে অনেক লোকজনের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে হবে।'

মিঃ রায় জানতে চাইলেন, মেয়েদেরও ইন্টারভিউ করবেন?

'নিশ্চয়ই।'

'পুরুষদের সঙ্গে কথা বললেই তো ফ্যামিলীর আয়-ব্যয় বা স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিং-এর সব খবর জানতে পারবেন। তাহলে মেয়েদের সঙ্গে কথা বলার কি দরকার?'

'নানা কারণে দরকার। পুরুষের যে ইনকামই হোক না কেন, অ্যাকচুয়াল স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিং—আই মীন অফ দি ফ্যামিলী—জানতে হলে মেয়েদের সঙ্গে কথা বলা দরকার। তাছাড়া পুরুষের পুরো ইনকাম ফ্যামিলীতে নাও আসতে পারে'......

মিসেস রায় বললেন, 'তার মানে?'

'আয় বেশী হবার সঙ্গে সঙ্গে পুরুষদের খরচের রাস্তাও বাড়তে পারে। তারা ফ্যামিলীতে খরচ না করে সিনেমা দেখতে পারে, মদ খেতে পারে, চরিত্রহীন হতে পারে, দামী জামাকাপড় পরতে পারে বা আরো অনেক কিছু হতে পারে'......

মিসেস রায় সমর্থন জানালেন আমার বক্তব্যকে, ঠিক বলেছেন।

'তাছাড়া আরো অনেক কারণে মেয়েদের সঙ্গে কথা বলা দরকার।'

মিসেস রায়ই প্রশ্ন করলেন, 'আর কি কারণ?'

'হেলথ, চাইল্ড ওয়েলফেয়ার, ফুড হ্যাবিট বা ফ্যামিলী প্ল্যানিং নিয়েও মেয়েদের সঙ্গে কথা বলার দরকার।'

মিঃ রায় জানতে চাইলেন, কিন্তু মেয়েরা কি আপনাকে এসব কথা বলবে?

'সবাই নিশ্চয়ই বলবেন না। তবে লোক্যাল দোকানদার, কেমিস্ট শপ, ডাক্তার-নার্স-হাসপাতাল, স্কুল, রিকসাওয়ালা, ট্যাকসির ড্রাইভার, পুলিশ স্টেশন থেকেও অনেক কিছু জানা যাবে।'

ওরা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই হাসলেন। মিসেস রায় মন্তব্য করলেন, আপনি তো দেখছি অনেকের অনেক গোপন খবর জেনে যাবেন।

'গোপন খবর ঠিক নয়, ফ্যামিলী প্যাটার্ন কিছুটা জানব। অফিসে গিয়ে খোঁজ করলেই জানা যায় কার কত মাইনে, কে কত লোন বা অ্যাডভান্স নিয়েছেন। দোকানে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেই জানা যায়, কে কত টাকার জিনিস কেনেন বা কে ধারে, কে নগদে কেনেন। সব মিলিয়ে লোকের প্যাটার্ন অফ লিভিং জানা যাবে, জানা যাবে গত দশ বছরে কোন ধরনের লোকের ভাল হয়েছে বা মন্দ হয়েছে।'

মিঃ রায় এবার জানতে চাইলেন, আপনি কি ম্যারেড ছেলেমেয়ে বা যারা চাকরিবাকরি করেন তাঁদেরই ইনফরমেশন জোগাড় করবেন?

না, না, তা কেন করব? ছোট ছোট ছেলেমেয়ে থেকে শুরু করে যোল আপ ছেলেমেয়েদের খবরই বরং বেশী দরকার।'

ডান হাতের 'পর মুখের ভর রেখে মিসেস রায় বললেন, 'কেন?'

'ভবিষ্যতের সব পরিকল্পনাই তো মুখ্যত ওদের নিয়েই হবে।'

মিঃ রায় এবার ওর স্ত্রীর দিকে ফিরে বললেন, 'হ্যাগো, আর এক কাপ কফি দেবে নাকি?'

আমি তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, 'না, না, আর কফির দরকার নেই। এবার আমি উঠি। আপনাদের অনেক দেরী করে দিলাম।'

মিঃ রায় হাসলেন। মিসেস রায় বললেন, 'কথা না বলে বলে আমরা তো বোবা হবার উপক্রম।'

'কেন? এখানে তো বহু লোক আছেন।'

মিঃ রায় বললেন, 'তা ঠিক। তবে অধিকাংশই ইনক্রিমেন্ট, ডিয়ারনেস অ্যালাউন্স আর প্রোমোশনের গল্প করতেই পছন্দ করেন। তাই লোক্যাল কলিগস্ বা ফ্রেন্ডদের সঙ্গে কথা বলে ঠিক আনন্দ পাই না।'

আমি হাসতে হাসতে বললাম, 'সব সরকারী বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল কলোনীরই এই দোষ। দুর্গাপুরে রবীন্দ্র-জয়ন্তী বা মিউজিক কনফারেন্সেও জেনারেল ম্যানেজার সভাপতিত্ব করবেনই।'

'ঠিক বলেছেন', মন্তব্য করলেন মিঃ রায় আর হাসি হাসি মুখে সমর্থন জানালেন ওর ডেডিকেটেড ওয়াইফ।

মিসেস রায় চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'বসুন। আর এক কাপ কফি খেয়ে যান।'

আর এক কাপ কফি খেয়েই উঠলাম। বিদায় নেবার সময় মিঃ রায়কে বললাম, 'সকালেই আপনার অফিসে আসছি।'

'আমিই বরং অফিস যাবার পথে আপনাকে তুলে নেব।'

'আপনি আবার কেন ঘুরতে যাবেন?'

মিসেস রায় হেসে ফেললেন, 'রোজ দেড় মাইল করে গাড়ী চললে তো ব্যাটারীর চার্জ থাকে না, তাই সুযোগ পেলেই......

মিঃ রায় শত্রু বিমানকে বাধা দেবার জন্য তাড়াতাড়ি ফাইটার নিয়ে উড়লেন। 'কেন? গাড়ী নিয়ে কি শুধু অফিস যাতায়াতই করি? তোমাকে নিয়ে বেরুই না?'

'আমাকে না নিয়ে বেরুলে তোমার গাড়ী ধাক্কা দেবে কে?'

বারান্দার শেষ প্রান্তে এসে আমি বিধানসভা—লোকসভার স্পীকারের মত গম্ভীর হয়ে ঘোষণা করলাম, হাউস অ্যাডজর্নস্ টিল টুমরো ইভনিং।

মিসেস রায় হাসলেন। মিঃ রায় প্রায় চীৎকার করে বললেন, থ্যাঙ্ক ইউ! থ্যাঙ্ক ইউ! গুড নাইট!

'গুড নাইট!'

হাত জোড় করে মিসেস রায়কে নমস্কার জানিয়ে বললাম, 'চলি।'

'আসুন।'

যে পথ দিয়ে গিয়েছিলাম, সেই পথ দিয়েই ফিরে এলাম। সেই আবছা অন্ধকার রাস্তা, সেই নির্জনতা, সেই শান্ত পরিবেশ। দু' পাশে সেই গাছপালা। কত শত পাখী আছে এইসব গাছের ডালে ডালে কিন্তু সবাই মহাশান্তিতে বিশ্রাম করছে। যেন কারুর কোন অভিযোগ নেই, কারুর জীবনে কোন হাহাকার নেই।

আমি শুধু একা একা হেঁটে চলেছি। হয়ত ওদের সবার শান্তি নষ্ট করছি।

তাছাড়া বড় বেমানান মনে হলো নিজেকে। নিঃসঙ্গতার যেন কোন স্থান নেই এই পরিবেশে, এই দুনিয়ায়।

অফিসারদের বাংলোর আলো আরো কমে গেছে। দুটো একটা জানলাতেই আলো দেখা যাচ্ছে। তাও বেশ কম আলো। পর্দার মধ্যে দিয়ে ঠিক ধরতে পারছি না। তবে মনে হলো অনেকের ঘরে রঙীন আলো জ্বলছে। যারা সারাদিন ডিয়ারনেস-ইনক্রিমেন্টের নেশায় পাগল ছিল, তারাও বোধহয় এখন রঙীন নেশায় মশগুল।

ঐ আলো দেখতে দেখতে আমি আস্তে আস্তে চলেছিলাম গেস্ট হাউসের দিকে। বেশ লাগছিল ঐ বাংলোগুলোর বেডরুমের আলো দেখতে।

এই পথ দিয়ে যখন গিয়েছিলাম তখন সবে সন্ধ্যা হয়েছে। আর এখন বেশ রাত হয়েছে। ল্যাম্প পোস্টের আলোর পাওয়ার কমে যায়নি কিন্তু রাত্রির অন্ধকার আরো গাঢ় হয়েছে। তাই রাস্তাতেও আরো বেশী অন্ধকার মনে হচ্ছে। যখন এই রাস্তা দিয়ে গিয়েছিলাম তখন বিশেষ কোন মানুষ দেখিনি, এখনও দেখছি না। তখনও কোন হৈ হুল্লোড় ছিল না, এখনও নেই। তবু মনে হলো রাত্রি গভীর হবার সঙ্গে সঙ্গে আরো শান্তি, প্রশান্তি অনুভব করতে পারছি। আমি একলা একলা হাঁটছি। আর কাউকেই দেখতে পারছি না। আমি নিজেকে আরো ভাল করে দেখতে পারছি। ড্রেসিং টেবিলের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে যতটা দেখতে পেয়েছি, তার চাইতে যেন আরো ভাল করে নিজেকে দেখতে পাচ্ছি। আরো স্পষ্ট করে নিজের হৃদয় স্পন্দন শুনতে পাচ্ছি। আমি কথা বলছি না, তবুও মনে হচ্ছে আমার অন্তর থেকে কিছু কথা, কিছু বেদনা শুনতে পাচ্ছি। বেশ স্পষ্ট, বেশ জোরে জোরেই যেন শুনতে পাচ্ছি। শুধু বেদনা কেন? আমার মনের মধ্যে কত অব্যক্ত আকাঙ্ক্ষা বোধহয় চাপা পড়েছিল। এই রাত্রির অন্ধকারে আমাকে একা পেয়ে সেইসব আকাঙ্ক্ষা যেন আমার হৃদয় ফুঁড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে।

কি আশ্চর্য! ঐ আবছা আবছা রঙীন আলোগুলো যেন আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

হঠাৎ গেস্ট হাউসের কথা মনে হলো। মনে হলো, বেয়ারাটা নিশ্চয়ই খাবার নিয়ে বসে আছে। গেস্ট হাউস তো ফাঁকা। আমার ডিনার খাওয়া না হলে তো ওর মুক্তি নেই।

একটু তাড়াতাড়ি হাঁটতে চেষ্টা করলাম কিন্তু পারলাম না। রাত্রির এই নিবিড়তার মধ্যে হারিয়ে যেতে ইচ্ছা করল আমার। এমন মুক্তির আনন্দ, এমন শান্তি যেন জীবনে অনুভব করিনি। মায়ের স্নেহের মত রাত্রির অন্ধকার আমার চারদিকে ঘিরে রয়েছে। এতদিন মানুষের ভীড়ের মধ্যে থেকেও ভয় করেছে কিন্তু আজ এই রাত্রিতে, এই অন্ধকারে কোন ভয়, কোন সঙ্কোচ নেই আমার।

মানুষ নিঃসন্দেহে সব চাইতে নিজেকে বেশী ভালবাসে। এই গভীর রাত্রির অন্ধকারে আমি শুধু আমাকেই কাছে পাচ্ছি। সমাজ সংসারের অসংখ্য পরিচিত-অপরিচিতরা আমার কাছে ভীড় করে নেই, আমার দৃষ্টিকে ঝাপসা করে দিচ্ছে না, আমার মনের সূক্ষ্ম অনুভূতিকে আহত করছে না, আমার অন্তরের ভাবসম্পত্তিকে বেসুরো করতে পারছে না। সম্পূর্ণভাবে আমি এখন নিঃসঙ্গ হলেও পরিপূর্ণ।

আস্তে আস্তে হাঁটছি। মুখ দিয়ে কোন গান গাইছি না কিন্তু একটা মিষ্টি সুর শুনতে পাচ্ছি। কিন্তু একি? সুরটা যেন অনেক দূরে থেকে ভেসে আসছে! ঐ যে পাহাড়ের উপরের লাল লাল রক্তবর্ণ স্যান্ডস্টোনে মোড়া ফতেপুর সিক্রী বা আগ্রা ফোর্টের মধ্যে থেকে যেমন দরবারী কানাড়ার মিহি মিষ্টি সুর ভেসে আসত দূরের গ্রামে-গ্রামান্তরে, যমুনার পাড়ে, ঠিক তেমনি একটা সুর যেন বহুদূর থেকে আমার বুকের মধ্যে খোঁচা মারছে।

খোঁচা মারছে? তবে কি? এখন তো আমি একা। সব কিছু বুঝতে পারছি। বুঝতে পারছি আমার সব আছে, প্রাণ আছে, মন আছে, অনুভূতি আছে, আকাঙ্ক্ষাও আছে। সুরটা যেন হারিয়ে গেছে। না, না, হারিয়ে যাবে কেন? আমি নিজেই তো বেসুরো হয়ে পড়েছিলাম। তাইতো সুর দূরে গেছে, ক্ষীণ হয়ে গেছে।

রায়-দম্পতিকে দেখে এই শান্ত, পবিত্র অন্ধকার রাত্রিতে ঐ দূরের বাংলোর আবছা রঙীন আলো দেখে আমাকে যেন সুরের নেশায় মাতাল করে তুললো। যে সুরের মূর্ছনায় আমি পাগল হয়েছি সে সুরের স্বাদ কি আর পাব?

জানি না। সে সব কিছু জানি না, জানতে আমি পারি না, পারব না। গুরুচরণ কলেজে পড়ার সময় বরাক নদীর ধারে বহু দূরের অরণ্যচলে য়ে সুর শুনেছি, শিখেছি, ভালবেসেছি, সেই সুরটি কি আজ শুনতে পাচ্ছি?

আরো কিছুদূর এগুলাম। গেস্ট হাউসের আলো দেখতে পাচ্ছি। এইত আর একটু গেলেই গেস্ট হাউসের কম্পাউণ্ডে ঢুকব। কিন্তু এখনও বুঝতে পারলাম না, এ সেই সুর নাকি অন্য কোন সুর?

গেস্ট হাউসে ঢুকে পড়েছি। পোর্টিকোর পাওয়ারফুল আলোটা বড় বেশী চোখে লাগছে। আর ভাবতে পারছি না। তাছাড়া আমি যেন আমাকেই হারাচ্ছি। হারাব না? আমি তো এখানে একা নই।

চৌকিদার সেলাম দিল। দৌড়ে গিয়ে আমার ঘরের দরজা খুলে আলো জ্বেলে দিল। আমি যে অন্ধকারের মানুষ অন্ধকারই ভালবাসি, তা তো ও জানে না।

কোথা থেকে বেয়ারাটাও হাজির হয়ে সেলাম দিল। "সাব খানা তৈয়ার।"

আমি কোন জবাব না দিয়ে সোজা ওকে অনুসরণ করে ডাইনিং রুমে গেলাম। খেলাম। সামান্য কিছুই খেলাম।

ফিরে এলাম ঐ ডান দিকের কোণার ঘরে। একটা সিগরেট খেলাম। তারপর জামা-কাপড় বদলে একটা পায়জামা-পাঞ্জাবি পরলাম। আবার চেয়ারে বসে একটা সিগারেট খেলাম। সারাদিন অনেক ঘুরেছি। বেশ ক্লান্ত লাগল। উঠে গিয়ে আলো অফ করে শুয়ে পড়লাম।

আবার চারদিক অন্ধকার। একেবারে সূচীভেদ্য অন্ধকার। কিছু দেখা যাচ্ছে না। হঠাৎ জানলা দিয়ে বাইরের দিকে নজর পড়ল। দূরের অন্ধকার শিবালিক পাহাড়ের গলায় মুসৌরীর মালা দেখলাম। মনে হলো অন্ধকার শিবালিক পাহাড় যেন আমাকে নর্তকী সেজে ডাকছে। ইসারা করছে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই শিবালিক পাহাড় বশীকরণ করে ফেললো। আমি জানতেই পারলাম না ঐগুলো মুসৌরীর আলো।

(ক্রমশঃ)

কলকাতার খুব কাছেই

কিন্তু তার অসহ্য ভিড়, আবর্জনা আর হৈ হট্টগোল থেকে অনেক দূরে—দুর্গাপুর শিল্পনগরীর সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর খোলামেলা পরিবেশে আধুনিক নগরজীবনের আশানুরূপ স্বাচ্ছন্দ্য ও সুবিধা নিয়ে গড়ে উঠছে বিধাননগর পল্লী। জীবনবীমা ঋণদান প্রকল্পের সুবিধা নিয়ে আপনিও এখানে জমি কিনতে পারেন! আজই বিস্তারিত বিবরণের জন্য চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার, দুর্গাপুর ডেভেলপমেন্ট অথরিটি, দুর্গাপুর-১১, এই ঠিকানায় ৩, টাকা পাঠিয়ে যোগাযোগ করুন।

মনের কথা

সুরাশক্তির মনস্তত্ত্ব

শ্রীকুমার ও মাখনলাল

সুরাসক্তি (এ্যালকোহলিজম) সম্পর্কে মনস্তাত্ত্বিক সমাজতাত্ত্বিকদের অনুসন্ধিৎসা ও গবেষণার ফলে প্রচুর তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। পুরনো দিনের মনের ডাক্তাররা সুরা বা এ্যালকোহলকে নানা ধরণের মনের অসুখের জন্য দায়ী করতেন। আজকাল রোগনির্ণয় পদ্ধতির উন্নতির ফলে সুরাপান-জনিত উন্মাদ রোগের অনেকগুলোই অন্য জাতের উন্মত্ততা বলে পরিগণিত। সুরাসক্তি মনের রোগের কারণ এত ক্ষেত্রে, তার থেকে বেশি ক্ষেত্রে রোগের ফল বা উপসর্গ।

সুরাসক্তির মানসিকতাবিচারের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। সমাজবিরোধী ক্রিয়াকলাপের (হত্যা, রাহাজানি, বলাৎকার ইত্যাদি) সঙ্গে সুরাসক্তির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সর্বজনবিদিত। অনেক দেশের রাষ্ট্র ও সমাজের কর্ণধাররা সুরাপান নিষিদ্ধ করে অপরাধ নিরসনের চেষ্টা করে থাকেন। সমাজের অন্তর্নিহিত গলদগুলোর দিকে নজর না দিয়ে সুরাপান নিষিদ্ধ করলে অভিলষিত ফল পাওয়া সম্ভব নয়।

সুরাসক্তির কারণ ও সুরাসক্তির ফল আমরা এক সঙ্গেই আলোচনা করব। আলোচনার সূত্রপাত করা যাক কবি শ্রীকুমারকে দিয়ে।

কবি শ্রীকুমারকে দেখে আমি চমৎকৃত হয়েছিলাম। অনেক দিন আগের কথা। এর আগে খুব কাছ থেকে কোনো কবিকে দেখার সৌভাগ্য হয় নি। আমি তখন কলেজে পড়ি, শ্রীকুমার পড়াশুনোর ইস্তফা দিয়ে কবিতা লেখে। গায়ের রং, বাবরি চুল, এলোমেলো পোশাক শ্রীকুমারকে দেখে মনে হয়েছিল যে, কবিতা লেখা এই চেহারাতেই সাজে। একটা সাহিত্যের মাসিক পত্রিকা বের করবার তোড়জোড় চলছিল, সেই সূত্রে শ্রীকুমারের আবির্ভাব। পত্রিকার প্রথম সংখ্যাতে শ্রীকুমারের 'সুরা' কবিতা প্রকাশিত হল। কয়েকটা লাইন এখনো মনে আছে।

> হে সুরা, বিস্মৃতি দাও
>
> জীবনের দুর্বহ্নিজ্বালায়
>
> যে কত দুঃখ সহে
>
> বেদনার কণ্টকজালায়
>
> কত তারে প্রশমিত
>
> তব সুখ স্পর্শের প্রলেপে।
>
> যে শান্তি প্লাবন ওঠে
>
> মানসপ্রান্তরে কেঁপে কেঁপে,
>
> কিসে তার বর্ণনা।.....

> সুরা তুমি বিচিত্রের সুর,
>
> তুমি যেন বীণাধ্বনি
>
> জেগে ওঠা মানসমধুর
>
> মোর কল্পলোকে।

হয়তো মাত্রাজ্ঞানের গোলমাল হল, কিন্তু কথাগুলো বোধহয় ঠিক আছে। সুরা নিয়ে নানা ভাষায় নানা কবি কবিতা লিখেছেন, সুরা-প্রশস্তি আরো অনেক পড়েছি। কিন্তু এত অকপটভাবে সুরাপানের ব্যক্তিগত কারণ বোধ হয় আর কেউ বিধৃত করেন নি। গোটা কবিতার মধ্যে শ্রীকুমারের জীবনের দুঃখস্বপ্ন-জ্বালার পরিচয়। আত্মীয়-স্বজন তাকে পরিত্যাগ করেছে, বন্ধুবান্ধব নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছে, হৃদয়বীণা ভগ্ন হয়ে গেছে, অবিচার অত্যাচারে সে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে, তাই সে সুরাশ্রয়ী। সুরা তার আত্মীয়, সুরা তার বন্ধু, সুরা তার প্রেয়সী।

দুদিনের মধ্যে এই বাউণ্ডুলে কবির সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়ে গেল। তার জীবন ইতিহাস জানতে পারলাম।

পূর্ববঙ্গের অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে। বিমাতা পরিবারের কর্ত্রী। বাড়ী থেকে কোনো রকম অর্থ সাহায্য আসে না। কারণ সে বোহেমিয়ান, সে নন-কনফরমিস্ট। এক আবাসিক বিদ্যালয় থেকে নিয়ম-শৃঙ্খলা ভঙ্গের অপরাধে বিতাড়িত, এক কো-এডুকেশন কলেজের কর্তৃপক্ষের অভিযোগে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত। জীবিকার জন্যে বন্ধুবান্ধব ও মাসিক পত্রিকার মালিকদের উপর নির্ভরশীল। সে সময় কবিতার জন্য দক্ষিণা দেওয়ার রেওয়াজ ছিল না, কিন্তু শ্রীকুমারকে বিমুখ করা যেত না। অন্তত পাঁচ টাকা না পেলে সে কম্পোজিটারদের টুল ছেড়ে উঠতো না। অবস্থান ধর্মঘট চালাতো।

ওর সুন্দর চেহারা, অকপট সারল্য আর আন্তরিকতার জোরেতে অনেকের প্রিয়পাত্র ছিল। আবার বেশিক্ষণ ওর সঙ্গী হতেও কেউ চাইতো না। কেন না, অমিতসাহিত্য ওর কথাবার্তা বেশীক্ষণ সহ্য করা দুঃসাধ্য হত। স্থানকালপাত্র নিয়ে ওর কোনো রকম মাথাব্যথা ছিল না। দুঃখগুলো নির্বিশেষে ওর বোহেমিয়ান মতামত নির্বিচারে প্রকাশ করতে ইতস্তত করত না। ফলে বয়স্ক ও গম্ভীর প্রকৃতির লোকের দেখা পেলেই এক বোতল বিয়ারের দাম চেয়ে বসত। বেশি নয় দশ আনা। জাপানী বিয়ার তখন ঐ দামেই পাওয়া যেত।

আমার সঙ্গে পরিচয় হবার পর জানলাম, ওর কোনো থাকবার জায়গা নেই। সারাদিন রাস্তায় ঘোরে, স্টেশনে বা বন্ধুদের মেসে গিয়ে আড্ডা [illegible] হোটেলের টেবিলের উল্টোপিঠে কবিতা লেখে। পকেটে পয়সা থাকলে খাওয়া-দাওয়া করে, না হলে উপবাস। খাবারের থেকে পানীয়ের প্রতি ওর অনেক বেশি আসক্তি। এক সঙ্গে দু' আনার বেশী পয়সা পেলেই এক গেলাস বিয়ার খাবে, ভাত খাবে না। রাত বারোটা একটার পর নিষিদ্ধপল্লীর একটি মেয়ের ঘরে আশ্রয় মেলে।

ওকে যারা ভালবাসত, তারাও ওকে মা-বোনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিত না, পরিবারের স্নেহ-গণ্ডীর মধ্যে ডেকে আনতে পারত না। কারণ আগেই বলেছি। ওর মুখে কোনো লাগাম ছিল না। সামাজিক সব মূল্যবোধকে নস্যাৎ করে দেওয়াই ছিল ওর কথাবার্তায় একমাত্র উদ্দেশ্য। এখন বুঝি, অ্যালকোহলের প্রভাবে ওর উচ্চমস্তিষ্ক ক্রমশ নিস্তেজিত হয়ে আসছিল, তাই ইচ্ছে করলেও নিজেকে সংযত করতে পারত না। আত্মীয়, বন্ধু, সমাজ, সবার ওপরেই ওর ক্ষোভ ছিল, সবার বিরুদ্ধেই ওর ক্রোধ ছিল। সেই ক্ষোভ ক্রোধ চেপে শালীনতা ও শোভনতা বজায় রাখবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিল শ্রীকুমার। ব্যক্তিগত বিক্ষোভকে নৈর্ব্যক্তিক স্তরে তুলতে পারলে মহান সৃষ্টির সম্ভাবনা। তার জন্য সময়ের প্রয়োজন। সেই সময় আসবার আগেই আমার সঙ্গে আলাপের দু'বছরের মধ্যেই হাসপাতালে অবহেলিত এই তরুণ কবির মৃত্যু হয়। সে কথা থাক।

আমাদের আলোচ্য শ্রীকুমারের সুরাসক্তির কারণ ও সুরাসক্তির ফল। প্রথমে সামাজিক দিকটির কথা ভাবা যাক। তিরিশের দশকের সুরু। আইন-অমান্য আন্দোলন, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, মীরাট ষড়যন্ত্রের মামলা, এবং মেদিনীপুরে বিপ্লবীদের অসমসাহসিক কার্যকলাপে রাজনৈতিক আবহাওয়া সরগরম। যুব সমাজের সামনে সশস্ত্র বিপ্লব, অহিংস আন্দোলন ও সাম্যবাদী আদর্শের ডাক। গ্রামাঞ্চলে অর্থনৈতিক অবস্থা বিপর্যস্ত। শ্রীকুমারদের মত মধ্যবিত্ত পরিবারের আয়ের উৎস শুষ্কপ্রায়। চাষীদের দারিদ্র্য চরমে পৌঁছেছে। তাদের বাঁতাকলে ফেলে অনেক শোষণ করলেও আর রস

বেরুচ্ছে না। যৌথ আয়ের মাত্রা যত কমছে যৌথ পরিবারও তত ভেঙে পড়ছে। পল্লী-সভ্যতা ধ্বংসোন্মুখ, সামাজিক শাসন অচল। গুরুজন-আনুগত্য কমতির মুখে। নাগরিক জীবনে উন্মাদনা আছে, শৃংখলা নেই। শ্রীকুমারের মত কবিমন বিপরীতধর্মী সামাজিক উদ্দীপনায় অস্থির চঞ্চল। দেশীয় সংস্কৃতি সভ্যতা মূল্যবোধ ও বিদেশী ভাবধারার সংমিশ্রণে এক নতুন ধরনের আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছে। প্রচলিত ও স্থাণু রীতিনীতির বিরুদ্ধে তরুণমনে বিদ্রোহ ধূমায়িত হচ্ছে। শ্রীকুমার পরিবারভিত্তিক স্নেহ-ভালবাসা পাচ্ছে না, আবার কোনো বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদ গ্রহণ করে নির্দিষ্ট কোনো পথে চলবার প্রেরণাও পাচ্ছে না। ঘর ও বাহির দুদিকের দুয়ারই তার কাছে রুদ্ধ। না পারছে দুয়ার ভেঙে পুরোপুরি বাইরে যেতে, না পারছে ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে ঘরে ফিরতে। এই রুদ্ধ হবার কারণ অবশ্য ব্যক্তিগত। পরিবারের প্রথম সন্তান শ্রীকুমার অতিমাত্রায় আদর ও প্রশ্রয় পেয়ে বড় হয়েছে। কিশোর বয়স থেকে তার সুশ্রী চেহারা অনেককে আকৃষ্ট করেছে। তার খুব অল্প বয়সে লেখা কবিতা পড়ে গুণীজন মুগ্ধ হয়েছেন। অনেকের প্রশংসা পেতে পেতে আত্মকেন্দ্রিক হয়ে উঠেছে নিজের অজ্ঞাতসারে। প্রথম যৌবনে এক বয়স্ক মহিলা কর্তৃক প্রলুব্ধ হয়ে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছে। মায়ের মৃত্যুর পর বাবা এক অল্পবয়সী মেয়েকে বিয়ে করাতে বাপের প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়েছে। প্রেম স্নেহ ইত্যাদি সুকুমার মনোবৃত্তিগুলো প্রস্ফুটিত হবার আগেই অঙ্কুরে বিনষ্ট হয়েছে। বয়স্ক ঐ নারীর ব্যবহার ও পিতার তরুণী ভার্যা গ্রহণের ফলে তার ধারণা হয়েছে মানুষ মাত্রেই লালসার দাস। আবাসিক বিদ্যালয়ে ও কো-এডুকেশন কলেজে তাই সে মেয়েদের সঙ্গে অনায়াসে অশালীন ব্যবহার করতে সাহস পেয়েছে। ছোট বয়স থেকে বাবাকে সুরাপান করতে দেখেছে, কাজেই কলেজে এসে তার পদাঙ্ক অনুসরণ করতে একটুও দ্বিধা হয় নি। অতিমাত্রায় পান করার সুযোগ পেলেই বাবাকে অশোভন কটূক্তি ভরা চিঠি লিখেছে। বিমাতার নামে নানা রকমের মনগড়া কুৎসা রটনা করেছে। শ্রীকুমারের ব্যক্তিত্বে প্রথম সাংকেতিক স্তরের অতি প্রাধান্য, যুক্তি তর্ক তার কাছে তাই অর্থহীন। আমি যখন তাকে দেখেছি তখন সে ক্রনিক অ্যালকোহলিক। অর্থের অভাবে সুসংযত পানসুখে বঞ্চিত। কিন্তু খাদ্যাভাব ও আনুষঙ্গিক নানা কারণে অল্পমাত্রায় অ্যালকোহল তাকে অভিভূত ও মোহগ্রস্ত করে ফেলছে। অনেক সময় ড্রেনে আশ্রয় গ্রহণ করতে হচ্ছে। এই অবস্থাকে রূপায়িত করেছিল 'ড্রেন' কবিতায়। 'অদৃশ্য প্রদেশ হতে লাভ তব দুর্গন্ধ সংকেত। চুম্বকের জাদু সব নেমে আসে পাতালের প্রেত।' নিজের জীবন দিয়ে তার ভাষায় সে জুয়া খেলে চলেছে।

আমার মনে হয় স্নায়ুতন্ত্রের ইন-স্টেবিলিটি, অস্থিরতা থেকে তার সুরাসক্তি। অ্যালকোহল আবার উচ্চ মস্তিষ্কের দুর্বলতা ঘটিয়ে এই অস্থিরতাকে বাড়িয়ে দিয়েছে। যাদের মস্তিষ্কের দুই স্তরে সমপরিমিতি, যাকে বলি, 'ওয়েল ব্যালান্সড', তারা পিতার দ্বিতীয় বিবাহকে অতটা গুরুত্ব দিত না। আঘাত পেলেও সামলে উঠতে পারত। সমাজের সঙ্গে নিজেকে সংযুক্ত রাখতে পারত, বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত না।

আর একটি ঘটনার কথা উল্লেখ না করলে শ্রীকুমারের মনস্তত্ত্ব সঠিক বোঝা যাবে না। ঘটনাটি অন্যের কাছে শোনা। সত্যাসত্য যাচাই করে দেখা হয়নি। আবাসিক বিদ্যালয়ের হোস্টেলে বসে শ্রীকুমার কবিতা লিখছিল, এমন সময় অদূরবর্তী পাশের ঘরে আগুন লাগে। সব ছেলে ছুটে বাইরে চলে যায়, জল আনতে, আগুন নেভাতে ব্যস্ত। শ্রীকুমার আগুনের ধ্বংসলীলা দেখে নাকি সেই সময় উল্লাসে নৃত্য করছিল। মতান্তরে, সে কিছুই টের পায়নি, কবিতার মধ্যে নাকি একেবারে ডুবে গিয়েছিল। এ-সময় শ্রীকুমার সুরাপানে অভ্যস্ত হয়নি। ওর এই আচরণ কিভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে? স্কিজোফ্রেনিয়া তার মধ্যে বোধহয় সুপ্ত ছিল, অথবা সবে উপক্রান্ত হতে চলেছে (যাকে বলা হয় 'ইনসিপিয়েন্ট স্টেট'); এই গল্প থেকে সেইরকম ভাবাই স্বাভাবিক।

এবার একেবারে বিপরীত চরিত্রের একটি রোগীর কথা বলব। রোগীর নাম মাখনলাল। একে চিকিৎসার জন্য এনেছিল এ'র বন্ধুরা। ছোটবেলা থেকে দুঃখকষ্টের মধ্যে বড় হয়েছেন। বর্তমানে এক কলেজে অধ্যাপনা করেন। বিজ্ঞান পড়ান। নানারকমের সংগঠন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত। একটি ঘর নিয়ে একলা থাকেন। সেখানে সন্ধ্যার পর বয়স্ক লোকদের নিরক্ষরতা দূর করেন ও সহজ ভাষায় বিজ্ঞান শেখাবার চেষ্টা করেন। যা রোজগার করেন সবই এই ধরনের সমাজকল্যাণে ব্যয় করেন। গত কয়েক মাস ধরে তাঁর মধ্যে পরিবর্তন দেখা যাচ্ছিল। সন্ধ্যার পর নাইট স্কুলের ছাত্ররা তাঁকে দেখতে পেত না। বন্ধ দরজার সামনে কয়েকদিন অপেক্ষা করে তাঁর ছাত্ররা হতাশ হয়ে পড়ল। বন্ধুরা লক্ষ্য করল রোজ রাত এগারোটার পর মাতাল হয়ে টলতে টলতে তিনি বাড়ী ফিরছেন। অন্তরঙ্গ বন্ধু অবিনাশ একদিন এ নিয়ে কথা তুলতে মাখনলাল প্রথমটায় রেগে উঠলেন, তারপর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে অনবরত কান্না। পরদিন সকালে অনেকটা প্রকৃতিস্থ অবস্থায় পেয়ে অবিনাশ চেপে ধরলেন। বলতেই হবে কি হয়েছে। কেন সে নাইটস্কুল তুলে দিল? কেন সে ক্লাব আড্ডা ছেড়ে দিল? কেন সে অনিয়মিতভাবে কলেজে যাতায়াত করছে? তার নামে বদনাম রটেছে, তাকে নিয়ে লোকে নানা কথা বলছে। সে কি জানে না? ও জানে সবই, কিন্তু কিছুই ওর করবার নেই। নিজের ওপর কর্তৃত্ব হারিয়ে ফেলেছে। একদিন সব বলবে, আজকে ওকে রেহাই দিক অবিনাশ। অবিনাশ ওর বন্ধু ও সহকর্মী। বেশীদিন রেহাই দিতে পারলেন না। কেননা, এরপর একদিন মাখনবাবু মত্তাবস্থায় কলেজে আসাতে [illegible] অধ্যাপকমহলে। তার পরদিনই কয়েকজন বন্ধু মিলে মাখনলালকে আমার কাছে নিয়ে এলেন।

মাখনবাবু সহযোগিতা করলেন। নিজের ইতিহাস ব্যক্ত করলেন। —কেউ জানে না যে আমি কলেজ থেকেই অ্যালকোহলে আসক্ত। ল্যাবরেটরি থেকে অ্যাবসলুট অ্যালকোহল নিয়ে এসে জল মিশিয়ে রোজ রাত্রে খেতাম। অবশ্য খুব অল্পমাত্রায়। মাঝে মাঝে ল্যাবরেটরিতে কাজ করতে করতে রাত হয়ে যেত। অন্য কেউ না থাকলে আমি অ্যালকোহল খেতাম। অ্যালকোহল না খেলে আমার ঘুম হত না। কাজে মন বসত না। একলা বেশিক্ষণ থাকলে আমার শিরদাঁড়া বেয়ে একটা বিদ্যুৎতরঙ্গ মাথার দিকে উঠতে থাকত। বিশেষ করে সন্ধ্যার পর। আমি অস্থির হয়ে পড়তাম। হাতের কাছে যা থাকত, তাই ভাঙতে ইচ্ছে হত। অ্যালকোহল, বেশি নয়, আউন্সখানেক খেলেই আমার স্নায়ুগুলো বশে আসত। কি চিন্তা আমাকে উদ্ভ্রান্ত করত? সুইসাইডের চিন্তা। ল্যাবরেটরিতে নানা রকমের বিষ নিয়ে কাজ করতে হত। খুব লোভ হত। কেন সুইসাইড করব? ঠিক বলতে পারব না। আমি জীবনকে ভালবাসি, মানুষকে ভালবাসি। আমার মা-বাবা ভাই-বোন কেউ নেই বটে, কিন্তু আমি তো অন্য মানুষকে ভালবাসি। আমি তো [illegible] নই। তা বলে সব মানুষকে ভালবাসি না। একটি মানুষকে খুন করার চিন্তা আমি সযত্নে লালন করে এসেছি এতদিন। এই প্রথম আপনাকে জানাচ্ছি। সেই মানুষটি আজ কয়েকমাস কলকাতায় এসেছে। আমার পাড়াতেই থাকে। কয়েকদিন পর পর সন্ধ্যার পর আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। তার ভয়ে আমি সন্ধ্যায় বাড়ী থাকি না। বেরিয়ে গিয়ে বারে আশ্রয় নেই। কি ভয়? তাকে দেখলেই আমার শিরদাঁড়া দিয়ে একটা ঢেউ মাথার দিকে উঠতে থাকে। সব ভাবনাচিন্তা জট পাকিয়ে যায়। মনে হয় দুহাত দিয়ে ওর গলাটা টিপে ধরি। ষাট বছরের জরাজীর্ণ বৃদ্ধ আমার আক্রমণ রোধ করতে পারবে না। যদি এই ইচ্ছা কাজে পরিণত হয়, তাহলে কি হবে? আমি কামুর 'আউট সাইডার' পড়েছি। কামুর সেই নাটকটাও পড়েছি, যার মধ্যে মা তার বোর্ডিং-এ নিজের ছেলেকে হত্যা করেছিল। মা অবশ্য নিজের ছেলেকে চিনতে পারেনি। চিনতে পারলেও হত্যা করত। হত্যা করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না তার। আমি কিন্তু আমার শিকারকে চিনি। ঐ বৃদ্ধ, অত্যাচারী, [illegible] আমার শিকার। খুন করি। [illegible] আউট-সাইডারের প্রশ্রয় নয়। বরং উল্টো বলা

চলে। আমি নিজের দেহকে, আমাকে, আমার বিশ্রী ভিপ্পামো জড়তাকে ঘৃণা করি। ঐ বৃদ্ধকে হয়তো ঘৃণা করি, তার থেকেও বেশি ঘৃণা করি। কেন? যতদিন পড়াশুনো করেছি, আমার নামে মাসে মাসে পঞ্চাশটা করে টাকা উনি পাঠিয়েছেন। অবশ্য বেনামীতে। আমি জানতাম কার টাকা। তবুও সে টাকা নিয়েছি, সেই টাকায় খাবার কিনেছি, বই কিনেছি, বেঁচে থেকেছি। আজ পাঁচ বছর টাকা আসছে না, পাঁচ বছর আমি চাকরী করছি। লোকটাকে ভুলে যাচ্ছিলাম, হয়তো ক্ষমা করেই ফেলতাম। কিন্তু হঠাৎ দুষ্ট গ্রহের মত আমার জীবনে ও আবার উদিত হল কেন? প্রথম যেদিন আমার সঙ্গে দেখা করতে এল, আমি টের পেলাম ওর চোখ দিয়ে স্নেহ ঝরছে। স্নেহমমতার জিভ বের করে ও আমাকে চাটছে। আমি শিউরে উঠলাম। ঘৃণায় আমার অন্তরাত্মা রিরিয়ে উঠল। ও কি করেছে? কেন আমি ওকে বিষনজরে দেখেছি। বলছি শুনুন।

মাখনবাবুর মুখ থেকে জানলাম যে এই বৃদ্ধের নাম পরেশ। এঁর দাক্ষিণ্যে তিনি নিজের পায়ে দাঁড়াতে পেরেছেন। মাখনবাবুদের গ্রামে পরেশবাবুর আশ্রম। পরেশবাবুর আশ্রমে চরখায় কাটা সুতো বেচতেন ওঁর মা। পরেশবাবু জেলখাটা পর শেষ করে এই আশ্রম খুলে অনাথা বিধবাদের জীবিকার্জনের একটা পথ দেখাতে চেয়েছিলেন। নানারকমের কুটীরশিল্প, তাঁত, ঘানি ইত্যাদিতে গ্রামের অনেক বেকার যুবকের কর্মসংস্থান হয়েছিল। পরেশবাবুর অনেক ত্যাগ, অনেক মাহাত্ম্য। ব্রাহ্মণের সন্তান হয়ে নিজের হাতে তাঁত বুনতেন, করাত চালাতেন, দরকার হলে হালবলদ নিয়ে মাঠেও নেমে পড়তেন। মাখনের মার প্রতি তাঁর করুণাকে গ্রামের লোকেরা কিন্তু ভাল চোখে দেখে নি। অল্প বয়সের এই বিধবাকে বিশেষভাবে সাহায্য না করলে মাখনকে তিনি মানুষ করাতে পারতেন না। স্কুলের কয়েকজন ছেলে মাখনলালকে এ নিয়ে টিটকারী দেওয়াতে মাখনলাল স্কুলে পড়তে অস্বীকার করে। পরেশবাবুর চেষ্টাতে জেলা স্কুলে স্থান পায় মাখন। খরচাপত্তর মা-ই জোগাতেন: কি করে জোগাতেন মাখন জানতো না। মাঝে মাঝে গ্রামের সেই কুৎসিত গুজবটা তার সত্যি মনে হত, আর তখনই, স্কুলে থাকতেই তার শিরদাঁড়া বেয়ে একটা বিদ্যুতের ঝলক মাথা অবধি উঠে আসত। নদীর ধার দিয়ে হনহন করে একলা পায়চারী করতে থাকত মাখন। কলেজে ভর্তি হতেই মা মারা যান। পড়া হবে না ভেবে যখন হতাশ হয়ে পড়েছে, তখন প্রিন্সিপাল ডেকে বলেন যে তার এক নিকটাত্মীয় তার পড়াশুনোর খরচা বাবদ বিদেশ থেকে মাসে মাসে পঞ্চাশ টাকা করে পাঠাবেন। সে নিশ্চিত মনে পড়াশুনো চালিয়ে যাক। প্রিন্সিপাল পরেশবাবুর বিশেষ বন্ধু, এ খবর মাখনবাবুর অজানা ছিল না। তখন সন্দেহ হয়, ক্রমে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে এ টাকা পরেশবাবুই দিচ্ছেন। পরেশবাবুর সঙ্গে মায়ের সম্পর্ক নিয়ে কুৎসা, তার এখন থেকে, সত্যি বলে মনে হতে থাকে। এর মধ্যে গ্রামের দু-একজন হিতৈষী দেখা করতে এসে আকারে ইঙ্গিতে এইরকম আভাসই দিয়ে যান। ঘৃণায় বিদ্বেষে মাঝে মাঝে মাখনবাবুর সর্বশরীর জ্বালা করে উঠত, নিজেকে ও পরেশবাবুকে শেষ করে দেবার তীব্র বাসনা জন্মাত, আর সেই জ্বালা বুকে রেখে, সেই বাসনা চেপে, পরেশ বাবুর টাকায় মাখনবাবু খাবার কিনতেন, বই কিনতেন, বেঁচে থাকতেন। এই অস্বাভাবিক মনের অবস্থা নিয়ে দীর্ঘ ন' দশ বছর কাটাবার পর চাকরী হয়। টাকা আসা বন্ধ হয়। কিন্তু পরেশবাবু এতদিন পরে মাখনবাবুকে দেখা দেওয়ায় পুরনো সন্দেহ ঘৃণা তীব্র হয়ে উঠেছে। অ্যালকোহলের মাত্রা বাড়াতে হচ্ছে। তবু চিন্তা যাচ্ছে না। শান্তি পাচ্ছেন না।

সুরাতৃষ্ণা ও সুরাসক্তির মূলে এখানেও মানসিক অসুস্থতা। পরেশবাবু সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়ে জেনেছি যে এইরকম অযাচিত সাহায্য তিনি আরো অনেককে করেছেন। অনাথারা তরুণী না হলেও তাঁর দাক্ষিণ্য থেকে বঞ্চিত হয়নি। পিতার মৃত্যুর পর পাড়াপড়শীর লাঞ্ছনা, মায়ের প্রতি তাদের লালসার দৃষ্টি, দারিদ্র্যের কশাঘাত, সব মিলে মাখনবাবুকে অসুস্থ করে তুলেছে। তাঁর মস্তিষ্কে দ্বিতীয় সাংকেতিক স্তরের প্রাধান্য। শৈশবে তাঁর মনে গ্রামের লোকেরা সন্দেহের যে বিষ ঢুকিয়ে দিয়েছে তাই আজ তাঁর সমস্ত মনে ছড়িয়ে পড়েছে। অবিশ্বাসের অঙ্কুর আজ মহীরুহে পরিণত হয়েছে। বিজ্ঞানধর্মী মস্তিষ্কের বৈশিষ্ট্যই সন্দেহ করা, মার্কস বলেছেন সন্দেহ থেকে শুরু কর—এইরকম অনেক কথা মাখনবাবু আমাকে সেদিন শুনিয়েছিলেন।

অ্যালকোহলের ক্ষতিকর প্রভাবে বর্তমানে যুক্তিচিন্তার ক্ষমতাই হারিয়ে ফেলেছেন মাখনবাবু। মনের অসুখ থেকে সুরাসক্তি, সুরাসক্তি থেকে রোগবৃদ্ধি।

তবে মনে রাখা দরকার যে, মাখনবাবুর কাছে অ্যালকোহল সহজপ্রাপ্য হবার ফলে তাঁর পক্ষে সুরাসক্ত হবার সুযোগ অনেকখানি বেশী হয়েছে। প্রথম থেকেই প্রকাশ্যে সুরাপান করার সাহস তাঁর ছিল না। ঐশুমারের মত 'ননকনফর্মিস্ট' বোহেমিয়ান তিনি নন। দলে মিশে পার্টির ভিড়ে সুরাপান করে মাসে এক-আধদিন হৈ-হল্লা করার মত মানসিকতা মাখনবাবুর নয়। দলের মধ্যে অনেকের সঙ্গে মিলে মিশে মদ্যপান করাটা অবশ্য কনফর্মিজম; এতে সাহসের প্রয়োজন হয় না। এই ধরনের সুযোগ বা নিমন্ত্রণ মাখনবাবুর হয়তো আসেনি। আসলেও বোধহয় সে সুযোগ তিনি নিতেন না। বন্ধুদের সাধুবাদ ও ছাত্রদের শ্রদ্ধাকে তিনি গুরুত্ব দিতেন।

মনের কথা প্রসঙ্গে ধীরেন্দ্রনাথ কর

২৪শ সংখ্যার অমৃত কোনো কারণে আমার হাতে দেরীতে আসে। কাজেই ধীরেন্দ্রনাথ কর মহাশয়ের চিঠিটির উত্তর দিতে দেরী হল। এখনো আমি সত্যিই দুঃখিত। ভয় হওয়া মেয়ের জ্বলন্ত কয়লা হাতে নিয়ে ফোস্কা না পড়ার মত আরো দু-চারটি ঘটনার বিবরণ শ্রদ্ধেয় পত্রলেখক মহাশয় জানিয়েছেন। আমরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

হিস্টিরিয়ার শারীরবৃত্ত ও বিকারতত্ত্ব নিয়েই 'মনের কথা' লিখতে শুরু করি। এই বছরের প্রথম দিককার পাঁচটি সংখ্যায় (যতদূর মনে পড়ে), হিস্টিরিয়ার দরুণ অবেদন ও স্মৃতিলোপের (এ্যানেসথেসিয়া ও এ্যামনেসিয়া) বিশদ ব্যাখ্যা আছে। অনুগ্রহ করে শ্রদ্ধেয় পত্রলেখক যদি সংখ্যাগুলো একবার উল্টে দেখেন তো বিশেষ বাধিত হব। এরপর যদি কোনো কিছু জিজ্ঞাসা থাকে তবে দয়া করে অমৃত পত্রিকার কেয়ারে আমাকে চিঠি লিখলে আমি যথাসাধ্য ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করব।

—মনোবিদ

স্টেশন মাস্টারের ডায়েরী

জগৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

রাতের শেষ লোকাল প্ল্যাটফর্মে এসে ঢুকতেই মাঝপথে বেহালার ছড় থেমে গেল। স্টেশনমাস্টার অতুলশশী চোখ খুলে তাকালেন প্ল্যাটফর্মের দিকে। বেহালা তখনো কাঁধের ওপর। নিরুত্তাপ নিস্পৃহ চোখে তিনি তাকিয়ে রইলেন। সে-দৃষ্টির সীমানা যেন আদি-অন্তহীন। এমনিতে অতুলশশীর চোখ দুটি একটু বড় এবং টানা-টানা। সমস্ত মুখের মধ্যে ও দুটিই প্রথম চোখে পড়বে মানুষের। আর যখন তিনি গভীর-ভাবে তাকান, তখন যে কোনো মানুষের মনে হবে যেন সমুদ্রে ডুব দিচ্ছি। যে-কোনো মানুষ সে চোখের মধ্যে নিরাপদ আশ্রয়ের স্বাদ খুঁজে বার করতে পারবে। কিন্তু এখন এত রাত্রে সেসব কথা ওঠে না, ট্রেন থেকে নেমে যে যার বাড়ি ঢুকতে পারলে বাঁচে। তাই গাড়ি প্ল্যাটফর্মে লাগতে না লাগতে ঘরমুখো ট্রেন-প্যাসেঞ্জার, ব্যাপারীরা গাড়ি খালি করে একে একে নেমে গেল লম্বা ডাউন প্ল্যাটফর্মের শেষ কিনার দিয়ে। যেখানে একলা বোঝাই মাল-গাড়ি প্রায়শঃই দাঁড়িয়ে হাঁপাতে থাকে, তার ঠিক পিছন দিয়ে বাজারে পড়বার খোয়াওঠা সড়ক নেমে কে কোথায় মিলিয়ে গেল। অতুলশশী বধির দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ অবধি শূন্য প্ল্যাটফর্মে তাকিয়ে রইলেন। গার্ড-সাহেব হাতবাতি হাতে নিয়ে ঘোষের সরু রাস্তা পেরিয়ে রানিয়াগ্রামের দিকে চলে গেল। এবং তা অতুলশশীর চোখের নিচে দিয়ে গলে, তা তিনি টেরই পেলেন না। সবশেষে সেই ছায়ামূর্তি। চোখ বুজেই সে মূর্তির পূর্ণ অবয়ব দেখতে পেলেন অতুলশশী। কোয়ার্টারের সামনেকার টিমটিমে আলোতেও ঝলমলে শাড়ির আঁচল খসে খসে পড়ছে। বুকের আনন্দধ্বনি অবধি অর্ধ-বৃত্তাকারে কাটা ফিরোজা রঙের ব্লাউজের ভিতর পুষ্ট স্নেহাংশ রাতের বিশ্রাম চাইছে। একটা দমকা হাওয়ার মতো ছায়ামূর্তি পাশ কাটিয়ে ঢুকে পড়লো কোয়ার্টারের দরজা ঠেলে। যেন অতুলশশীর কাঁধে শোয়ানো বেহালাখানার সব তার ছিঁড়েখুঁড়ে বাজনাটা মিলিয়ে গেল। মেয়েওঠা প্রসাধনের কড়া বাসী গন্ধ তখনো বাতাসে ঘুরপাক খাচ্ছে বেশ বুঝতে পার-ছিলেন অতুলশশী।

কতকগুলো অসংলগ্ন ভাবনা কে নিয়ে অনেকক্ষণ অবধি চুপচাপ বসে রইলেন স্টেশনমাস্টার অতুলশশী। কতকগুলো শুকনো ... পা ... দুকে ফেলতে লাগলেন। তারপর এক সময় বেহ সাধনা বাকসে ঢুকো হয়ে তুলে রাখলেন। ... হবার আগে রোজকার মতো স্টেশন ঘরের পিছন বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। ... ঠিক ঠিক ... কিনা, ... এ এস এম ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে শেষ পর্যন্ত হয়তো সুইচ বোর্ডেই মাথা রেখে ঘুমিয়ে গেছে, একবার লক্ষ্য করে যাবে নাকি। এখনকার সব লোকজনই জানা স্টাফ, পরিজ্ঞান কতদূর টনটনে তা জানা আছে তাঁর। কথায় কথায় কেবল মাইনে না পাই বাড়ছে এই হিংসে—এইসব নাকানাড়ানি শুনে শুনে কানে তালা ধরে গেছে অতুলশশীর। স্টেশন ঘরে আর ঢুকলেন না তিনি। ঘুরে সামনের দিকে গিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়ালেন। বারান্দার কোণে আলমারি ওজন মেশিনটা একবার দেখলেন। মেশিনের হাতলে সিঁদুর দিয়ে আঁকা গণেশ মূর্তিটা অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না। যাবার কথাও না। রাতে এ বন্ধ থাকে। যা কিছু প্রসাদ আশীর্বাদ এ থেকে পাওয়া যায়, আফিমের মোড়কের মতো ভাগ তৈরি হয়—সবই দিনের বেলা। ভেন্ডারদের বখরা জমে জমে পাহাড় হয় চারদিক। বুকিং ক্লার্ক গার্ড ও এস এম সবার দৃষ্টিই একমুখো। সবাই যেন ঘুরে ঘুরে একই বন্দনা গায় গলা মিলিয়ে। ছাব্বিশ বছরের চাকরিতে এসব এখন পুরোনো হয়ে গেছে অতুলশশীর। তিনি নিজে এ সবের বাইরে এটুকুই যথেষ্ট। তবু এই বাইরে থাকাটাই তাঁর সমস্ত অস্তিত্বকে দেউলিয়া করে কানা-কড়ির পর্যায়ে দাঁড় করিয়েছে। তথাপি ঐ একটা জোরেই সম্ভবত অতুলশশী নিজেকে নিজে বাঁচিয়ে রাখতে পারছে। কিন্তু নিজেই তো সব না, লীলার কথা না হয় বাদ যাক, বাকি পাঁচটা ছেলেমেয়ে। সংসারে প্রবেশ করার আগে অনাগত ভবিষ্যৎ নিয়ে লীলার সাথে যে চুক্তি হয়েছিল...। ওভারব্রীজের প্রথম ধাপের কাছে এসে থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন অতুলশশী। এতক্ষণ খেয়ালই হয়নি ভাবতে ভাবতে কখন প্ল্যাটফর্মে উঠেছেন, তারপর পায়ে পায়ে একেবারে ওভারব্রীজের ওপরে না উঠে পারলেন না তিনি।

প্রতিদিনের প্রতিক্ষণের পরিচিত প্ল্যাটফর্ম। একেবারে ঘরবাড়ি বলা যায়। তথাপি এই নিশুতি রাতে তা যেন সম্পূর্ণ আলাদা। কর্ড লাইনের জলা জায়গা বলে স্বভাবতই একটা স্যাঁতসেঁতে ভাব মাটিতে। দুদিকে যতদূর চোখ চলে নাবাল জমি। পটপটি আর আগাছার জঙ্গলে রাতকে আরো ঘোরালো করে তুলেছে। বাঁদিকে ইস্ট কেবিনের ধার বরাবর কিছু পিটুলি দেবদারু ও বুনো ঝাউয়ের জটলা। কুয়াশার সময় সমগ্র বিস্তীর্ণ জায়গা জুড়ে যেন এক জটিল রহস্যের খেলা চলে। ফল সিগনাল লাগাতে গিয়ে পটাকা-ম্যান সহদেও মাঝে মাঝে থ' হয়ে লাইনের ওপর বসে থাকে। যেন নিশিতে পাওয়া মানুষ তখন সহদেও। কিন্তু এই মুহূর্তে অতুলশশী ওভারব্রীজের ওপর দাঁড়িয়ে যেন এক নতুন আস্বাদ অনুভব করলেন। এইসব জটলার মধ্যে দিনে সূর্যের আলো ঢুকতে পারে কিনা কে আর দেখেছে, কিন্তু রাতে যে চাঁদের নরম আলো এখানকার মাটি পর্যন্ত ছুঁতে পারে তা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হচ্ছিল অতুলশশীর। তার চেয়ে ভাল লাগছে নিজেকে এই গোপন আশ্রয়ে একান্ত করে কাছে পাবার আনন্দে। খাগড়া-ঘাটের সেই নড়বড়ে ওভারব্রীজটা এতদিনে লীলা সম্ভবত ভুলে গেছে। মৃতের শোক বুকে আঁকড়ে বছরের পর বছর হা-হুতাশ করে কাটানো লীলার ধাতে সয় না, জানেন অতুলশশী। আর তা তিনি চানও না। কিন্তু তেইশ বছর পিছনকার সেই চঞ্চল কিশোরীর প্রেমিকের বুকে মুখ লুকিয়ে স্বপ্ন ও প্রতিজ্ঞার রাতটা আজ অতুলশশীর কাছে দুঃস্বপ্নের রাত্রি হয়ে ক্রমাগত বুকে হাতুড়ি পিটিয়ে থাকলে তা তিনি বুঝবেন কেমন করে! ছবিটা আজও যে স্পষ্ট।

ব্রীজের একদিকে আবছা অন্ধকারে বুকের মধ্যে একেবারে লেপটে থেকে লীলা কাঁপছিল থরথর করে। দূরে ডিসট্যান্ট সিগনাল পিছনে রেখে একটি যুগলমূর্তি দ্রুত নিঃশ্বাসের মধ্যে পরস্পর একে অন্যের উষ্ণতা আকণ্ঠ পান করছে। দীপ্তিধোয়া আকাশের গায়ে ফালি চাঁদের নিচে তারা প্রতিজ্ঞায় তরপুর—প্রতিজ্ঞা জীবনের, প্রতিজ্ঞা প্রেমের। মাঝে মাঝে নিজের দিকে তাকিয়ে লীলা শিউরে উঠছিল। অতুলশশী অভয় দিচ্ছেন, বার বার ধরে পথ বাতলে-ছেন দুর্ঘটনা থেকে মুক্তি পাবার। মুক্ত হবার পর তাঁরা প্রবেশ করবেন নতুন জীবনে। কিন্তু রাজী হয়নি লীলা। অসাধারণ প্রত্যয়ে লীলা বলছে, 'না'। কোনোও অন্যায় নেই এর মধ্যে—যে আসছে আসুক। আর সকলে মেনে না নিলেও আমাদের কাছে সে তো মিথ্যে নয়! বরং এই প্রথম আশীর্বাদ......। লীলার গলা বুজে এসেছিল, আর কথা বলতে পারেনি সে। দুচোখে জলের ধারা! সম্ভবত পরিপূর্ণ তৃপ্তির আনন্দাশ্রু।

এরপর অতুলশশীর হাতে মাত্র কদিনের সময় ছিল ভাববার। ভাবনার আর কিছুই নয়, ভবিষ্যৎ জীবন ছাড়া। লীলার ভালবাসায় হয়তো খাদ নেই বিশ্বাস করেন তিনি। নইলে বিপদের কথা জেনেও সে নিজেকে এমনি করে অতুলশশীর কাছে ঠেলে দিত না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে স্টেশনমাস্টার রঘুবাবুর রক্তের ধারাকেও অস্বীকার করার উপায় নেই। খাগড়ার এ এস এম-এর ডিউটির মধ্যে অতুলশশী রাঘববাবুর প্রতিদিনের জীবনটাকে দেখেছেন। দু-এক পয়সা ভাগার জন্যেও মানুষটা কতো নীচে নামতে পারে, কত হীনতম কাজ অনায়াসে করতে পারে তা যে নিজের চোখে দেখেছেন অতুলশশী। লীলা এ রক্তের বাহক, এটা কোনো মতেই ভুলতে পারছিলেন না তিনি।

কিন্তু না। নিজের শক্তিকে বিশ্বাস করেন অতুলশশী। প্রেমের শক্তি দিয়ে লীলাকে তার পৌত্তলিকতা থেকে মুক্ত করবেনই। লীলার চোখে-মুখেও সেদিন এ প্রতিজ্ঞা উচ্চারিত হয়েছিল। সুস্থ জীবন যাপনের অঙ্গীকার নিয়ে লীলা নিজেকে সমর্পণ করেছিল অতুলশশীর কাছে।

খাগড়ার সেই জরাজীর্ণ ওভারব্রীজ এতদিনে হয়তো ভেঙেচুরে নতুন করে তৈরি হয়েছে। ব্রীজের ওপর পাতা যে স্লিপার কাঠের ওপর দাঁড়িয়ে সেদিনের সেই যুগল-মূর্তি জীবনের প্রতিজ্ঞা নিয়েছিল, সেগুলো রাত জাগায় কত দিন পরে পোর্টাররা পুড়িয়ে ছাই করে ফেলেছে, তা কখনও আগে পর্যন্ত জানতে ইচ্ছে করতো অতুলশশীর। যেমন ইচ্ছে করতো রাঘববাবুর মেয়ের সেই ভয়াবহ দিনগুলির কথা জানতে। বাবার সেই শোচনীয় দিনের কথা বলতে বলতে এক একদিন কান্নায় ভেঙে পড়েছে লীলা। অতুলশশী মাঝ পথেই থামিয়ে দিয়ে আর শুনতে চান নি। আজও সেই আধাশোনা ঘটনা তেমনি অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। কিন্তু সম্পূর্ণ ছবিটা ভাবতে গিয়ে গলা পর্যন্ত শুকিয়ে আসে অতুলশশীর। পাঁচটি ছেলে-মেয়ে সমেত নিজের সংসারের কর্তা হিসেবে তিনিও চাকরির অপরাহ্নে হাজির হতে চলেছেন। যদিও সুদীর্ঘ চাকরিজীবনে কোনো অন্যায়ই তিনি করেন নি।

বিনা অস্ত্রোপচারে
অর্শ থেকে
আরাম পাবার
জন্য
হ্যাডেনসা
ব্যবহার করুন!

মাথার ওপর দিয়ে দু-একটা নিশাচর পাখি জলা জায়গাটিতে উড়ে গেল। অতুলশশী অনেকক্ষণ বাদে যেন সম্বিৎ ফিরে পেলেন। সম্ভবত এখন দুটো-আড়াইটা রাত হবে। কোয়ার্টারের দরজা নিশ্চয়ই খোলা আছে। লীলা জানবে তিনি সামনেই আছেন, দরজা বন্ধ না করে ভেজিয়ে রাখবে। অতুলশশী দ্রুত পা চালালেন ওভারব্রীজ থেকে নেমেই। কিন্তু খাগড়ার সেই নড়বড়ে ওভারব্রীজ যেন তাঁকে পিছু পিছু তাড়া করতে থাকলো।

অতুলশশীর রাত্রি ও দিনের মধ্যে কোনো সামঞ্জস্য আছে একথা আজ আর কোয়ার্টারের কোনো মানুষই বিশ্বাস করবে না। সকাল থেকেই মানুষটা যেন ভেঙেচুরে নতুন করে তৈরি হয়। লম্বা চওড়া দশাশয়ী চেহারার মানুষটি এই মুহূর্তে হয়তো গুডসের রসিদ কাটছেন, পরক্ষণেই দেখা যাবে কোয়ার্টারের পিছন দিকে গোয়ালঘরে গরুর জাব মাখছেন। সকাল নটা বাজার সঙ্গে সঙ্গেই বেনারসীকে হাঁকডাক। ক্যাশ বাঁধতে হবে। বেনারসী গুনে গেঁথে না দিলে ক্যাশ বাঁধাই হবে না হয়তো, এমনি ভাব। তারপর রানিং রুমের জিনিসপত্রের হিসেব মেলানো। এটা সপ্তাহে একবার হলেও বেনারসী ছাড়া যেন কেউ নেই তাঁর। তবে দরাজগলার হাসিটা কিছুদিন থেকে ঝিমিয়ে এসেছে অতুলশশীর। সংসার এমনি জিনিস, মানুষকে কোনো সময়ই হালকা হয়ে কাটাতে দেয় না। অথচ চোখের সামনে তিনজন এ এস এম—যেন ফুরফুরে হাওয়ায় সব সময়ই উড়ছে। এবেলা ওবেলা মাছ মাংসের হল্লা, নতুন নতুন গয়নার ডিজাইন গিন্নীদের গায়ে—অতুলশশীর যেন কোনো কিছুতেই আসে যায় না। লীলা বলে, শুয়োরের গোঁ। সাধু সন্নিসি হবে তো পাঁচ-পাঁচটা পোষা সংসারে আনলে কেন? আন্ডারের সবাই যে যার গুছিয়ে নিচ্ছে, আর উনি...। কথা শেষ করার আগেই লীলা এক দলা থুতু ফেলে রান্নাঘরে চলে যায়। অথচ আজও অতুলশশী নিজের সততায় অটল। ঐ একটি জোরই এখনো পর্যন্ত সম্ভবত বাঁচিয়ে রেখেছে তাঁকে।

কিন্তু তাতে কি। রেলের সেই পুরোনো রক্তের ধারাকে তিনি কি মুছতে পেরেছেন সংসার থেকে। মুক্ত রাখতে পেরেছেন নিজের আত্মজদের। সারাটা দিনের মধ্যে এক-একটা গাড়ি ঢোকে প্ল্যাটফর্মে, আর অসহায় চোখে তাকিয়ে থাকেন অতুলশশী। প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরোনোর পথে লাইন বেঁধে যারা হাত পেতে দাঁড়িয়ে থাক, তাদের মধ্যে পিন্টু-মিন্টু-নিন্টু যে নিশ্চয়ই থাকবে এটা অবধারিত। এ এস এম-দের ছেলেমেয়ে কেউ কেউ দাঁড়ায় হয়তো, কিন্তু নিছকই তা ভাগের ভাগ আদায় নিতে। সব কটি পোর্টার তো বটেই। ফলে টি সি মল্লিকবাবুর কাছে কথা শুনতে হয় হামেশাই। অর্থাৎ যার যা এক্তিয়ার, সে তা পাবে না কেন? আর গাড়ি প্ল্যাটফর্মে ঢোকা থেকে সেই যে দরজায় দাঁড়িয়ে থাকে লীলা, ছেলেরা আদায় নিয়ে ফিরে না আসা পর্যন্ত এক পাও নড়ে না। কখনো কখনো ছোট মেয়ে সর্বাণীকেও প্ল্যাটফর্মে পাঠায় লীলা দাদাদের সঙ্গে।

প্ল্যাটফর্মের মুখে মুখে জানালার ধারে ধারে শুয়ে পাশ ফিরে তাকিয়ে থাকেন অতুলশশী, তাঁর নির্বিকল্প সমাধি যেন। হাত-পা বেঁধে তাঁকে যেন ক্রমাগত কে চাবুক কষিয়ে চলেছে। অতুলশশী পংগু নিশ্চল তাঁর নির্মম অদৃষ্টের কাছে। কোনো একজনের এক পুরুষের সঞ্চিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত তাঁকেও এমনি করে করতে হবে তা কি স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছিলেন অতুলশশী।

বিষের ক্রিয়া অনিবার্য গতি নেবে, তাকে ঠেকিয়ে রাখার হাজার চেষ্টা করেও অতুলশশী হার মেনেছেন। যেদিন ক্যাশ বাঁধার সময় বড় ছেলে মিন্টুকে দাঁড়াতে বলে তিনি কোয়ার্টারে কি যেন নিতে এসেছিলেন,—সেদিনের ঘটনা থেকেই অতুলশশী যেন নির্বিকার হয়ে গেছেন বেশী মাত্রায়। ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়েছিল দিন দুই পরে যেদিন ক্যাশ ব্যাগের মধ্যে একশো টাকার কৈফিয়ৎ মেমো-খানা পেয়ে। এতদিনের চাকরিতে থেকে একশো টাকার শর্ট সেই প্রথম অতুলশশীর। মুহূর্ত বিলম্ব হয়নি ব্যাপারটা বুঝে নিতে। কিন্তু লীলার জন্যে মিন্টুকে কিছু বলতে পারেননি সেদিন। তাছাড়া, এর ওপর লীলার কাছ থেকে উপরি পাওনা—সেই পুরোনো কাসুন্দি ঘাঁটতে আর ইচ্ছে হয়নি অতুলশশীর। আর বলে লাভই বা কী!

পরিবর্তে বিকেলের দিকে সেদিন সকাল করে বাজনায় বসে গিয়েছিলেন অতুলশশী। কোয়ার্টারের সামনে যথারীতি মাদুর বিছিয়ে ডাকহাঁক করেছিলেন পাশের কোয়ার্টারে। পাশের কোয়ার্টার থেকে এ এস এম বিনয় হালদার তবলা নিয়ে বেরিয়ে না আসা পর্যন্ত অতুলশশী মাদুর থেকে পা দুটো ঘাসের ওপর ছড়িয়ে চোখ বুজে বসেছিলেন। বড় মতো হাঁ করে মুক্ত বাতাস নিচ্ছিলেন কিছুক্ষণ অবধি। তারপর তবলায় বোল উঠতে বেহালার ছড়ে টান দিয়ে সুর তুলেছিলেন। এবং একের পর এক রাগ-রাগিণীর মূর্ছনায় অনেক রাত পর্যন্ত বিভোর হয়েছিলেন। নিত্যকার বরাদ্দমতো প্রসাধনের জৌলুষে এঁকে লীলা কখন বেরিয়ে গেছে সামনে দিয়ে বড় মেয়ে কল্যাণী রান্না শেষ করে কখন সিঁড়িতে এসে বসেছে বাজনা শুনতে, কিছুই খেয়াল করেননি অতুলশশী।

একটা রাগ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই কল্যাণীর ডাকে চোখ খুলে তাকান অতুলশশী। —ও, বিনয় কখন উঠে গেছে বুঝতেই পারিনি। তো রাত্তি হয়েছে নারে? কল্যাণী বিষণ্ণ করুণ দুটি চোখে বাবাকে দেখছে। হতভাগ্য জন্মদাতার যাবতীয় দুঃখ, সবটুকু যন্ত্রণা যেন সে নীলকণ্ঠের মতো গ্রহণ করতে চায়। তাই সম্ভবত জ্ঞান হবার পর থেকেই কল্যাণীর দুচোখের দৃষ্টিতে বাবার অশ্রু যেন টলমল করে। অতুলশশী তা বোঝেন। জীবনের এই প্রথম ফসলকেই তিনি একমাত্র উপড়ে ফেলতে চেয়েছিলেন। আজ ভাবলেও কেমন কাঁটা দেয় গায়ে। নিজের ওপর এই এক জায়গায় অশ্রদ্ধা জন্মায়। অতুলশশী মাঝে মাঝে হাতড়াতে থাকেন, লীলার চরিত্রের সঙ্গে এর বিন্দুমাত্র মিল আছে কিনা। না। কল্যাণী একক এবং অনন্যা।

বেহালাখানা বাক্সে তুলতে গিয়ে অতুলশশীর চোখ পড়লো হরেনের দিকে। গার্ড হরেন দাশগুপ্ত। ছিমছাম চেহারার বছর তিরিশের যুবক। মাঝে মাঝে অফ থাকলে সে বাজনার আসরে যোগ দেয় শ্রোতা হিসেবে। দক্ষিণের একটা কোয়ার্টার হরেন দখল করে আছে। অতুলশশী জানেন, বাজনার টানই হরেনের একমাত্র টান না এখানে, তা ছাড়াও আছে কিছু। কল্যাণীর চোখ দেখে অতুলশশী একদিন বুঝতে পেরেছিলেন ব্যাপারটা। কিন্তু কল্যাণীর ওপর বিশ্বাস ছিল তাঁর। সত্যিকার খাঁটি সোনা চিনে নিতে সে ভুল করবে না। ছেঁড়া তারেও সুরের মূর্ছনা তুলতে কল্যাণী অদ্বিতীয়া হবে। এবং সেইটাই সম্ভবত অতুলশশীর জীবনে চরমতম আনন্দের দিন হয়ে দেখা দেবে।

এমনি একটা অস্ফুট আনন্দের কম্পন অতুলশশীকে মাঝে মাঝে নাড়া দিচ্ছিল আজকাল। তারই মাঝে একদিন তিনি আবিষ্কার করলেন, লীলার পরিবর্তনটা। বোধহয় কল্যাণীর ব্যাপার বুঝতে পেরেই ইদানীং কিছুটা সংযত হতে চাইছে সে। নিত্যকার সেই নৈশ ভ্রমণের কলকাতাকে এখন খানিক পাশ কাটিয়ে চলছে লীলা। প্রায় চল্লিশের শিথিল যৌবনকে এখনো সে বাঁধতে চায় প্রসাধনের বাঁধনে ঠিকই, কিন্তু হয়তো তার বেশী কিছু না। অনেকদিনের তিল-তিল গড়ে ওঠা অভ্যাস লীলা একেবারে ছেঁটে বাদ দেবে কেমন করে। অবশ্য এ সব নিয়ে মাথা ঘামাতে আর আর কোনো উৎসাহ নেই অতুলশশীর। অনেককাল আগেই লীলার সঙ্গে সবকিছু বোঝাপড়া তিনি শেষ করে দিয়েছেন।

অতুলশশী তাঁর কথা রেখেছেন। লীলার কোনো ইচ্ছা অনিচ্ছার ওপর তিনি হস্তক্ষেপ করেননি কখনো। একান্ত অসহ্য হলে আগে আগে মৃদুভাবে প্রতিবাদ জানাতেন [illegible] লীলার পরিবর্তনটা অতুলশশীকে যেন ফিরে ভাববার জন্যে অনুরোধ করছিল। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। কার্যত তাঁর কোনো উদ্যোগ দেখা যায়নি।

সেদিন রাতে খাওয়ার পর্ব কিছু আগেই শেষ হয়েছে। পিছনদিকের দরজা খুলতে গিয়ে গোয়ালের আড়ালে চাপা ফিসফিসানি শুনতে পেয়ে অতুলশশী নিজের ঘরে ফিরে এলেন। জিনিসটা অনুমান করে কিছুটা ভালও লাগছে তাঁর। সারাটা দিন পরিশ্রমের পর মেয়েটা এতক্ষণে বিশ্রাম পেয়েছে। মনটা উন্মুক্ত করতে তাই সন্তর্পণে বাইরে গেছে। অতুলশশী কদাচিৎ কখনো এ সময় বেহালা নিয়ে বসেন। কিন্তু আজ বসলেন বাইরের সেই নির্দিষ্ট জায়গায় মাদুর বিছিয়ে। তারের ওপর ছড় টেনে সুর তুললেন একের পর এক। রাগ-রাগিণীর মূর্ছনার মধ্যে অবশেষে একসময় বিভোর হয়ে ডুবে গেলেন। আনন্দে অতুলশশীর গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে দু'চোখের ধারা। মানুষটা যেন নিশ্চল পাথর মূর্তি। কেবল ছড়টা ওঠানামা করছে তারের ওপর।

রাত কতো হয়েছে খেয়াল নেই অতুলশশীর। চারদিক নিস্তব্ধ থমথমে। কোয়ার্টারে তাঁর শোবার ঘরের দরজা দু'হাট করে খোলা। একসময় ঘুম ভেঙে কল্যাণী বাইরে আসে। একা। মানুষটা সারা রাত্রি ধরে বেহালা বাজিয়ে যাবে নাকি! ছন্ন মূর্তির মতো বাবার সামনে এসে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে কল্যাণী। অতুলশশীর চোখ মন দুই বোজা। কে এল গেল, কিছুই তাঁর জানবার কথা নয়। কল্যাণী বাবার মাথায় হাত রাখলো।—রাত্রি অনেক হয়েছে যে, শোবে না! যেন স্বাভাবিকভাবেই ফিরে তাকালেন অতুলশশী। বেহালা থামলো।—তোদের খাওয়া হয়েছে? রাত্রি?

অস্ফুটে কল্যাণী বললে, আমরা তো তোমার পরেই খেয়েছি। ওরা যে যার ঘুমোচ্ছে। কিন্তু...

—কিন্তু কী? অতুলশশী গূঢ়ীর চোখে মেয়ের দিকে তাকালেন।

—মা এখনো ফেরেনি। এখন রাত্রি একটা বাজে, লাস্ট লোকাল তো অনেক আগেই...।

কল্যাণীর কথা শেষ হবার আগেই মেয়ের দিকে আর একবার তাকালেন অতুলশশী। সে-দৃষ্টির মধ্যে অভলতা ছিল ঠিকই, কিছু একটা জিজ্ঞাসার কথাও বুঝতে পারলো কল্যাণী।

—মা সন্ধ্যা থেকে আজ ঘরেই ছিল। হরেনবাবু এসেছিলেন।

—হরেন! তারপর?

—পিছন দিকের দরজা খুলে বাইরে গিয়ে কথা বলছিল। তুমি বাজাবার ঠিক আগেই তো!

—হুঁ, তুই কোথায় ছিলি? অতুলশশীর চোয়াল দুটো ক্রমেই শক্ত হয়ে উঠছে।

—ঘরে। তারপর খেয়ে শুয়ে পড়েছি।

—হুঁ। তারপর?

কল্যাণী উত্তর না দিয়ে অসহায়ভাবে কেবল তাকিয়ে রইলো।

—বল্ না, তারপর?...তারপর, তারপর কী?

নিজের উদভ্রান্ততায় নিজেই কেমন লজ্জা পেয়ে চুপ করে গেলেন অতুলশশী। তারপর অনেকক্ষণ অবধি পাথরের মতো নিশ্চল রইলেন। এতক্ষণে বুঝতে পারলেন গোয়ালের পিছনে অন্ধকারে সেই ফিস-ফিসানি গলা কার বা কাদের? এ এমন কিছু না, তাই বলে হরেনের সঙ্গে...।

অতুলশশী ফিরে তাকালেন। কিন্তু তার আগেই খোলা দরজার ভিতর চলে গেছে কল্যাণী। তার শান্ত করুণ দুটি চোখ মনে পড়তেই বেহালাটা তৎক্ষণাৎ কাঁধের ওপর টেনে নিলেন অতুলশশী। তাঁর তিরিশ বছরের সুখ-দুঃখের সঙ্গী, [illegible] মতো বিবর্ণ বেহালাটিকে কাঁধের ওপর জোর করে চেপে ধরলেন। তারপর সেই ভোর অবধি কটা তারের ওপর ছড় টেনে চললেন।

আশপাশের মানুষজন যে যখন জেগে উঠেছে একটানা করুণ সুর শুনতে পেয়েছে। স্টেশনরুমে সুইচ বোর্ডের সামনে বসা অন-ডিউটি এ এস এম ধরবাবু সুরের মধ্যে ডুব দিয়ে পাথর হয়ে বসে থেকেছে ভোর পর্যন্ত। আশ্চর্য! মানুষটা সুরের নেশায় মরিয়া হয়ে উঠলো নাকি! এখন থেকে জীবনভোর এমনি এক-ভাবে বসে থেকে বোধহয় ক্রমাগত বেহালা বাজিয়ে যাবেন অতুলশশী। সন্ধেরাতে এই মানুষের হাতেই সুর উঠেছিল, সে অন্য সুর। দুটি লজ্জানম্র প্রেমিক-প্রেমিকার আসন্ন-মিলন-লগ্নের কথা স্মরণ করে বেহালায় সুর তুলেছিলেন তিনি সমস্ত হৃদয় উজাড় করে। ফোঁটা-ফোঁটা আনন্দাশ্রু চোখে নিয়ে অতুলশশী তন্ময় হয়ে বিচরণ করছিলেন সুরের জগতে। আর ঠিক তখনই তাঁর চোখের ওপর বাতাসের ঝটকা মেরে পক্ষীরাজের গতিতে বেরিয়ে গেছে বোম্বাই মেল, দুটি অসমবয়সী প্রেমিক-প্রেমিকাকে আঁচলে ঢাকা দিয়ে। এ কথা স্টেশন মাস্টার অতুলশশীর জানার কথা না। কেননা তাঁরই আজ্ঞাবহ ডিসট্যান্ট সিগন্যালের লাল আলো একবারও বাধা দেয়নি। কোনো একটিও নিশাচর পাখি বাবেকের জন্যেও ডানা ঝাপটিয়ে ডেকে ওঠেনি। কেবল ঝড়ে ডানাভাঙ্গা পাখির মতো মূর্তিমতী কল্যাণী নিঃশব্দে পা ফেলে বাবার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। রাত গভীর হওয়ার সংবাদ বয়ে নিয়ে জন্মদাতার পাশে অপেক্ষা করছিল।

বিজ্ঞানের কথা

মস্কো সোভিয়েতের চান্দ্রযান লুনোখোদ থেকে টেলিভিশন যোগে এই ছবি পৃথিবীতে পৌঁছেছে লুনোখোদ চাঁদে নামার পর যখন স্বয়ংক্রিয় যান চলতে আরম্ভ করে তখন চন্দ্রপৃষ্ঠে তার চাকার দাগ ফুটিয়ে দেখা যাচ্ছে।

চোখের চাউনি

কথা বলার দরকার নেই, একজন মানুষ শুধু তার চোখের চাউনি দিয়েই অপর একজন মানুষ সম্পর্কে তার মনোভাব বুঝিয়ে দিতে পারে। এমনকি মনোভাব গোপন করতে চাইলেও অনেক সময়ে চোখের চাউনিতে তা ধরা পড়ে যায়। মানুষের চোখের চাউনি হচ্ছে জগতের একটি সবচেয়ে আশ্চর্য ঘটনা।

কবি, ঔপন্যাসিক ও দার্শনিকদের কাছে মানুষের চোখের চাউনির স্থান খুবই উঁচুতে।

দুটি চোখের চাউনির সঙ্গে দুটি চোখের চাউনির মিলন হল, এ এক অপার রহস্য। কবি, ঔপন্যাসিক ও দার্শনিকরা তাবৎ দুনিয়ার ব্যাখ্যা উপস্থিত করেছেন, কিন্তু চার চোখের চাউনির রহস্য পুরোপুরি জেনে উঠতে পারেননি।

একজন মানুষ, যখন অপর একজন মানুষের দিকে তার চাউনি মেলে ধরে তখন সেই চাউনির মধ্যেই প্রকাশ পায় তার ব্যক্তিত্ব তার চেতনা, তার অভিপ্রায়। অর্থাৎ একজন মানুষ সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে হলে তার চাউনির সঙ্গে পরিচয় থাকা দরকার।

একজন মানুষ বই পড়ছে। এই মানুষটির চোখের দিকে যদি তাকাই তাহলে মনে হবে চোখ দুটি যেন দুটি পদার্থ, লাইন থেকে লাইনে নড়াচড়া করছে। তারপরে মানুষটি আমার চোখের দিকে তাকাল। চোখ দুটি তখন আর পদার্থ নয়, সেই চোখের দিকে তাকিয়ে তখন দেখতে পাচ্ছি মানুষটিকেই। চোখের চাউনির মধ্যে দিয়েই মানুষটির প্রকাশ।

আবার, শুধু আমিই দেখতে পাচ্ছি তা নয়, আমি নিজেকেও দেখাচ্ছি। একতরফা দেওয়া বা একতরফা নেওয়া নয়, একই সঙ্গে দেওয়া ও নেওয়া। চোখের ধর্মই তাই। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে চার চোখের মিলন হচ্ছে একটি নিখুঁত দেওয়া-নেওয়ার ব্যাপার। দুটি মানুষ পরস্পরের দিকে পরিপূর্ণ চোখে তাকাচ্ছে, এ-ঘটনায় মানুষটির সম্পর্কের সবখানিই প্রকাশ হয়ে পড়ে।

সম্ভবত এ-কারণেই আমরা অপরিচিত মানুষের চোখে চোখ রাখতে চাই না, অপরিচিত মানুষের চাউনি এড়িয়ে চলি। ট্রামে, বাসে, ট্রেনে এত মানুষের ভিড়, কিন্তু

আমরা পারতপক্ষে কারও চোখের দিকে তাকাই না। যদি কখনো তাকাই (যখন কেউ আমার পা মাড়িয়ে দিয়েছে, তখন) নিজের খানিকটা প্রকাশ করতেই হয়, অপরের খানিকটা টের পেতেই হয়।

বাংলায় একটা কথা আছে, চোখ দেওয়া। অনুরূপ কথা পৃথিবীর প্রত্যেকটি ভাষাতেই আছে। কথাটার মানে, চোখের চাউনি থেকে অনিষ্ট হওয়া। শনির দৃষ্টিতে গণেশের মাথা উড়ে যাওয়ার মতো। সজ্ঞানে হোক, অজ্ঞানে হোক অনিষ্টকর চাউনি থেকে নিজেকে ও নিজের প্রিয়জনদের বাঁচিয়ে চলার চেষ্টা আমরা আরেকই করে থাকি। আমাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির মান যেমনই হোক, এই সংস্কার থেকে মুক্ত হতে পারি না, কেননা সেই পুরাণ কাল থেকে আজ পর্যন্ত এই সংস্কারটি নানাভাবে প্রশ্রয় পেয়ে এসেছে। কিছুকাল আগে এমনকি একজন পোপ সম্পর্কেও ধারণা তৈরি হয়েছিল যে, তাঁর চোখের চাউনি অনিষ্টকর। ১৮৪৬ সালে তিনি পোপ হয়েছিলেন, পোপ হবার পরে তাকিয়েছিলেন একটি নার্সের দিকে। নার্সের কোলে ছিল একটি শিশু, শিশুটি কোল থেকে পড়ে গিয়ে মারা গিয়েছিল।

অপরের চোখের চাউনি আমরা অনিষ্টকর মনে করি বা না-করি, অপরের চোখের চাউনি এড়িয়ে চলার চেষ্টা কিন্তু আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই অত্যন্ত প্রবল। কোনো একটি কামরায় আমরা জনকয়েক লোক যদি এক সঙ্গে থাকি (ডাক্তারের চেম্বারে, স্টেশনের ওয়েটিং-রুমে বা অন্যত্র) তাহলে কিছুতেই অপরের চোখের দিকে তাকাই না। পাছে চোখ পড়ে যায় সেজন্যে খবরের কাগজে চোখ ঢাকি। চিন্তার দিক থেকে আমরা যতোই আধুনিক হই, শিক্ষার দিক থেকে যতোই অগ্রসর হই, আমাদের রক্তমজ্জায় এই সংস্কার মিশে আছে।

কিংবা যদি উলটো ব্যাপারটি ঘটে? ঘরের মধ্যে আমরা যে-কজন আছি, প্রত্যেকেই প্রত্যেকের দিকে সরাসরি ও পুরোপুরি তাকিয়ে আছি, তাহলে? এমন

একটা অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে পড়তে হবে যে, আমরা প্রত্যেকেই পালিয়ে বাঁচতে চাইব।

এমনই ক্ষমতা চোখের চাউনির।

পরীক্ষামূলক মনস্তত্ত্বের বিজ্ঞানীরাও গত দশ বছর ধরে মানুষের চোখের চাউনি নিয়ে গবেষণা করছেন। চোখের চাউনি সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের গবেষণার সঙ্গে লেখকদের বর্ণনায় অনেক মিল পাওয়া যাচ্ছে।

দৃষ্টান্ত হিসেবে শেক্সপীয়রের একটি কবিতার উল্লেখ করা হয়। কবিতায় রাজার ছেলে শুধু তার মুখ চোখের চাউনি দিয়েই এক নিষ্পাপ সরলার হৃদয় জয় করেছিল। তারপরে যা হবার তাই হয়ে যাবার পরে মেয়েটি ভাবে, মানুষের চোখের চাউনিতে এত ছলাকলা, এ শুধু পুরুষের পক্ষেই সম্ভব, মেয়েরা পারে না! তারপরে বুকে ছুরি বসিয়ে আত্মহত্যা করে, কেননা বেঁচে থাকলে তার চোখের চাউনিতেই পাপ প্রকাশ হয়ে পড়ত।

এই কবিতায় চোখের চাউনি সম্পর্কে বেশ কিছু জানার কথা আছে। চোখের চাউনি যদি পারস্পরিক হয় তাহলে মোহ সৃষ্টি হতে পারে। মোহ যাতে সৃষ্টি না হয়, সেজন্যে চোখের চাউনি এড়িয়ে চলার শিক্ষা থাকা দরকার, যে শিক্ষা সামাজিকভাবে আয়ত্ত করতে হয়। মনের মধ্যে পাপ নিয়েও কেউ কেউ সাহসের সঙ্গে দুনিয়ার দিকে তাকাতে পারে, কেউ কেউ পারে না।

এবারে বিজ্ঞানীদের চোখ দিয়ে বিষয়টির দিকে তাকানো যাক।

বিজ্ঞানীদের অধিকাংশ পর্যবেক্ষণ—চোখের চাউনি এড়িয়ে যাওয়া সম্পর্কে এবং অন্য মানুষের চোখের দিকে তাকাতে না পারা সম্পর্কে। মস্তিষ্ক যাদের স্বাভাবিক নয়, এমন বিশেষ বিশেষ রোগীর ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা গিয়েছে, প্রসঙ্গটি যদি ব্যক্তিগত হয়, তাহলে রোগী কিছুতেই চিকিৎসকের চোখের দিকে তাকাতে পারে না।

এই রোগীদের মধ্যে তিন ধরনের চাউনি লক্ষ্য করেছেন চিকিৎসকরা : নাটকীয় চাউনি (একটানা তাকিয়ে থাকা), সতর্ক চাউনি ও চোখ-পিটপিট-করা চাউনি।

রোগীদের কথা থাক, সাধারণ মানুষের চাউনিতেও কি অস্বাভাবিকতা কিছু নেই? দুজন মানুষ যখন সামনাসামনি বসে কথা বলে তখন তাদের চাউনি কি রকমের হয়ে থাকে?

গবেষণাগারে একটি পরীক্ষাকার্য চালিয়ে বিজ্ঞানীরা এ-সম্পর্কে কিছুটা ধারণা করেছেন। পরীক্ষাকার্যটি এই রকম :

দুজন মানুষকে একটি টেবিলের দু-দিকে মুখোমুখি বসিয়ে দেওয়া হয়। আড়াল থেকে দুজন আলাদা আলাদাভাবে এই দুটি মানুষের ওপরে নজর রাখে। মানুষটি উল্টোদিকের মানুষটির চোখের দিকে তাকালেই একটি বোতাম টেপা হয়। চোখ ফিরিয়ে নিলেই বোতাম ছেড়ে দেওয়া হয়। বোতাম টিপলেই একটি চলন্ত কাগজের ওপরে কলমের সাহায্যে দাগ পড়তে শুরু করে, বোতাম ছেড়ে দিলেই দাগ বন্ধ। কিংবা বোতাম টেপার সঙ্গে সঙ্গে ইলেকট্রনিক গণক চালু করেও সময়ের হিসেব রাখা যেতে পারে। মাইক্রোফোনও ব্যবহার করা যেতে পারে। কথা বলতে বলতে মানুষটি কতক্ষণ ধরে শ্রোতার চোখের দিকে তাকাচ্ছে, কিম্বা কথা শুনতে শুনতে কতক্ষণ বক্তার চোখের দিকে—তার একটা হিসেব এভাবে নেওয়া সম্ভব।

দুটি মানুষ : ক ও খ। ক যদি খ-কে পছন্দ করে, তাদের সম্পর্ক যদি হয় সহযোগিতার, প্রতিযোগিতার নয়, তাহলে ক আরো বেশিক্ষণ ধরে খ-এর চোখের দিকে তাকাবে। ক যদি সম্প্রতিকালে খ-কে প্রতারিত করে থাকে তাহলে তার চোখের দিকে বড়ো একটা তাকাতে চাইবে না। তাছাড়া মেয়ে-পুরুষ ভেদও আছে। দুজন পুরুষের চেয়ে দুজন মেয়ে পরস্পরের দিকে অনেক বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকে। ব্যক্তিগত বা অন্তরঙ্গ প্রশ্ন করলে কি মেয়ে কি পুরুষ চোখের দিকে কেউ বড়ো একটা তাকাতে চায় না।

একটা প্রচলিত ধারণা আছে, অপরাধীরা নাকি চোখের দিকে চোখ রেখে কথা বলতে পারে না। কথাটা সবসময়ে সত্যি নয়। বিজ্ঞানীরা এমন ব্যাপারও লক্ষ্য করেছেন, যে যতো বড়ো অপরাধী সে ততো দুর্বিনীতভাবে তাকায়। এমনকি মেয়ে অপরাধীরাও। শেক্সপীয়রের নায়িকা ভেবেছিল, ভিতরে যদি পাপবোধ থাকে তাহলে মেয়েদের চোখের চাউনিতে তা প্রকাশ হয়ে পড়বেই। কিন্তু বিজ্ঞানীদের পর্যবেক্ষণ থেকে জানা গিয়েছে, ভিতরে পাপবোধ নিয়েও বহু মেয়ে চোখের চাউনিতে নিষ্পাপ ও সরলা।

অতএব চোখের চাউনির নানা রকমের অর্থ। কখনো তা আমন্ত্রণ, কখনো তা প্রত্যাখ্যান। অপরের চোখের দিকে আমরা তখনই তাকাই যখন কিছু জানতে চাই, স্নেহমমতা ইত্যাদির বশেও তাকিয়ে থাকি। কিন্তু বেশিক্ষণ একটানা তাকিয়ে থাকলে সবক্ষেত্রেই তা অস্বস্তিকর। ঘনিষ্ঠতম সম্পর্কের দুটি মানুষের মধ্যেও একথাটি সত্যি। এক্ষেত্রে, বিজ্ঞানীদের ধারণা, শেষপর্যন্ত একটি ভারসাম্য গড়ে ওঠে। কিছুটা চাউনি, কিছুটা শারীরিক সান্নিধ্য, কিছুটা অন্তরঙ্গ কথা, কিছুটা হাসি—সব মিলিয়ে। একটিতে বাড়াবাড়ি হলে অন্য একটিতে বা একাধিকে টান পড়ে, একটিতে টান পড়লে অন্য একটিতে বা একাধিকে বাড়াবাড়ি। যেমন, লক্ষ্য করা গেছে, দুটি মানুষের সান্নিধ্য যতো বেশি, পরস্পরের চোখের দিকে, তাদের চাউনি ততো কম। আর যে-কথা আগে বলা হয়েছে, ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ উঠলে চোখের দিকে চোখের চাউনি কমবেই। অন্তত একটি পরীক্ষাকার্যে দেখা গেছে, মেয়েটি যতো বেশি ঘেঁসেছে ছেলেটি ততো বেশি চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে। অর্থাৎ সব মিলিয়ে ভারসাম্য বজায় থাকা।

বলা বাহুল্য, পরিবেশও অবশ্যই বিবেচ্য। একটি ছেলে ও একটি মেয়ে নাইট-ক্লাবে গিয়ে যতো বেশিক্ষণ ধরে পরস্পরের চোখের দিকে তাকাবে, যতো প্রচণ্ডভাবে হাসবে, বিজ্ঞানীর গবেষণাগারে এসে দাঁড়ালে তা নিশ্চয়ই পারবে না।

দুজন মানুষ যখন কথা বলে তখন তাদের মধ্যে চোখের চাউনি ইত্যাদি ছাড়াও আরো একটা ব্যাপার এসে যায়। তা হচ্ছে মাথা নাড়া। এই অঙ্গভঙ্গীটি কথোপকথনকে একটানা চলতে দিতে সাহায্য করে। চলচ্চিত্রের টেকনিক প্রয়োগ করে বিজ্ঞানীরা দুটি মানুষের কথোপকথন লক্ষ্য করেছেন। বক্তা তার কথা শেষ করবার আগে শ্রোতার চোখের দিকে তাকাবেই, অর্থাৎ যেন বলতে চায়—'আমি শেষ করলাম, এবার তুমি বলো।' শ্রোতা কিন্তু চোখ ফিরিয়ে নিতে চায়—'এবার আমার কথা বলার পালা।' বক্তা ও শ্রোতার মধ্যে শ্রোতাই অপেক্ষাকৃত বেশিক্ষণ বক্তার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকে, অর্থাৎ বলতে চায়—'আমি শুনছি তুমি বলে যাও।' বক্তা যদি থেমে যায় তো শ্রোতা মাথা নাড়ে, অর্থাৎ বলতে চায়—'এরপরে তুমি কী বলবে বলো, আমি অপেক্ষা করছি।' এমনি আরো নানাবিধ সূক্ষ্ম সঙ্কেত আছে যার সাহায্যে দুজন মানুষের কথোপকথন নির্বিঘ্নে চলতে পারে। কোনো একটিতে ছেদ পড়লে কথোপকথনেও ছেদ পড়ার সম্ভাবনা।

চোখের চাউনিতে কখনো প্রকাশ পায় আধিপত্য, কখনো বশ্যতা। একটি পরীক্ষাকার্যে দশজন মানুষকে জোড়ায় জোড়ায় মুখোমুখি করা হয়েছিল। মাঝখানের পর্দা উঠিয়ে দেবার পরে দু-জোড়া চোখের চাউনি পরস্পরের দিকে নিবদ্ধ হল। একজনকে প্রথমে চোখ ফিরিয়ে নিতেই হয়। এখানে কি আধিপত্য ও বশ্যতার কোনো ব্যাপার আছে?

মুরগির ছানারা সবাই সবাইকে ঠোকরায় না, ওদের বংশধারায় একটা ক্রম আছে। যে যেখানে তার চেয়ে নিচের ছানাগুলোকে ঠুকরিয়ে থাকে। ওপরের পরীক্ষাকার্যেও বিজ্ঞানীরা এমনি একটি ক্রমের সন্ধান পেয়েছেন। যারা বশ্যতা স্বীকার করে তারাই আগে চোখ ফিরিয়ে নেয়।

এমনি আরো পরীক্ষাকার্য চালিয়ে চোখের চাউনির ব্যাপারটিকে বিজ্ঞানীরা খোলসা করে ফেলতে চাইছেন। তবুও সম্ভবত চোখের চাউনির অপার রহস্য থেকেই যাবে, মানুষ যতোদিন থাকবে। আজ থেকে একশো বছর পরে জীবনযাত্রা যখন একেবারেই অন্য রকম, বিজ্ঞান যখন অনেক অনেক উন্নত, তখনো কিন্তু একজন মানুষের চোখের চাউনি দেখেই আরেকজন মানুষ বুঝতে পারবে, সে ভালোবাসে না ঘৃণা করে। চোখের ঠুলি না আঁটলে মনের ভাব গোপন করা যাবে না, আজ নয়, ভবিষ্যতেও নয়।

—অয়স্কান্ত

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

রজত গ্লাস হাতে বসে রইল। কানের মধ্যে বেজে চলেছে অবিশ্রান্ত উৎকট শব্দ। এদিক-ওদিক তাকাল। চারিদিকে দেয়াল। দরোজা-জানালা বন্ধ। লতা টলছে। বুকের কাপড় সরে গিয়েছে। ঠোঁটে জ্বলন্ত সিগারেট। লতা বুক কোমর বেঁকিয়ে সারা ঘর জুড়ে নাচছে। মাঝে মাঝে দুটো হাত ওপরে তুলে বাজনার সঙ্গে তাল মিলিয়ে হাততালি দিচ্ছে। এরই মধ্যে একবার আলমারী খুলে বোতল থেকে গ্লাসে মদ ঢেলেছে। লতা নাচতে নাচতে হঠাৎ একবার থমকে দাঁড়িয়ে রজতের দিকে তাকাল। রজতের হাতে ধরা গ্লাসের দিকে। কিছু-ক্ষণ তাকিয়ে দেখল। তারপর ঝপ্ করে রজতের পাশে বসে ওর গলা এক হাতে জড়িয়ে অন্য হাতে গ্লাস ঠোঁটের ওপর চেপে ধরল। রজতের মনে হল তার দমবন্ধ হয়ে আসছে। লতার মুখ কাছে এগিয়ে আসছে। এলকোহলের তীব্র গন্ধ। মাথা ঝিমঝিম করে উঠল তার। শরীরে তীব্র জ্বালা। গলার ভিতর জ্বলে যাচ্ছে। কানের কাছে গরম নিঃশ্বাস। জড়িত কণ্ঠস্বর। ইংরেজী গানের টুকরো সংলাপ। আলো বড় বেশি উজ্জ্বল। দু'চোখ জ্বালা করে উঠল। আমাকে ছেড়ে দাও লতা! সে জোর গলায় কিছু বলতে যায়। কিন্তু অবরুদ্ধ কণ্ঠস্বর।

বোঝা যাচ্ছে কোন নিষ্কৃতি নেই। রজত দু'হাত দিয়ে ঠেলে দিল লতাকে। লতা পায়ের সঙ্গে জেপটে। দূর থেকে শব্দকে ভেসে আসছে। লতা সরে বসে। বুকের উপর কাপড়টা আলগোছে তুলে দেয়।

এক ধরনের বিভ্রম আর রহস্যময় কুয়াশার মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিল রজত। সব সে দেখছে। ভাল লাগছে না। প্রতিবাদ করবার ক্ষমতা নেই। কথা বলার স্পৃহা নেই। মাতাল সে হয়নি। দু'-চার পেগ টেনে মাতাল হওয়ার পাত্র সে নয়।

—ওটা বন্ধ করে দাও। রজত দু'হাতে কান চেপে ধরে। মুখ বিকৃত করে তাকায় লতার দিকে।

লতা কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু রামুকে আসতে দেখে থেমে যায়। রামু নিস্পৃহ দৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকায়। তারপর মাথা নীচু করে বলল, খাবার রেডি। এখানে আনবো?

—হ্যাঁ। লতা উঠে দাঁড়াল। টলতে টলতে রামুর পাশ কাটিয়ে ও-ঘরে যায়।

রজত একটু পরে শুনল ছপছপ্ শব্দ। রামু টেবিলের উপর খাবার সাজিয়ে রেখে চলে যায়। আজ ও বাইরে শোবে। সায়েবের ঘরে রাতে মেয়েছেলে থাকলে বাইরে রাত কাটায়।

চোখেমুখে জলের কণা চিকচিক করছে। লতা পাশে বসে মৃদু হাসল. ভীষণ খিদে পেয়েছে। নাও শুরু করো। আমি কিন্তু আরম্ভ করলাম।

রজত চুপচাপ খেতে থাকে। আড়চোখে তাকায় লতার দিকে। মুরগীর একটা ঠ্যাং কামড়ে ধরেছে। বিশ্রী খাওয়ার ভঙ্গী। ওর মতলবটা কী? খেয়ে বিদেয় হও বাপু। আজ আর ওসব নয়।

—আমার এক বন্ধু তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চায়।

—তোমার বন্ধু। কে? ভুরু কুঁচকে তাকাল লতা।

—মিঃ মেনন। বেশ নিকলিয়া কেরালার লোক বড় অফিসার। বাঙালী সমাজের সঙ্গে মিশতে চায়। আমাদের চিন্তাভাবনা, শিক্ষা-সংস্কৃতি জানতে চায়।

—বেশ তো মিস্টার। তা আমার সঙ্গে কেন! বলে চোখ বড় বড় করে তাকাল রজতের দিকে, সত্যি বল তো রজত, আমার সম্পর্কে কী বলেছো।

—ভয় নেই। রজত খাওয়া শেষ করল দ্রুত। তোয়ালে দিয়ে হাত মুছতে মুছতে বলল, তোমার প্রশংসা করেছি। বলেছি চার্মিং লেডি। কালচার্ড।

ন্যাপকিনে হাত মুছে লতা একটা সিগারেট ধরাল। দৃষ্টিতে সোফায় এলিয়ে খানিকক্ষণ দেখল রজতকে। তারপর সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে ঘরময় পায়চারী করল কিছুক্ষণ। মৃদুস্বরে একটা বাজনা বেজে চলেছে। লতা ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে ঘুরেফিরে দেখল। কৌটো খুলে পাউডারের পাফ মুখে আলতোভাবে বুলোয়। তারপর কৌটো বন্ধ করে ড্রয়ার খুলে রাখতে যায়। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। ধীরে ধীরে সমস্ত মুখে হাসি

ঢেউ-এর আকারে ছড়িয়ে পড়ে। বউয়া রেখে দু'হাত দিয়ে ফটো তুলে ধরে। চোখের সামনে নিয়ে আসে।

হঠাৎ কাঁধে অসম্ভব চাপ অনুভব করল লতা। মুখ ফিরিয়ে দেখল দু'চোখ জ্বলছে রজতের। ভয় পেয়ে যায় সে। উন্মাদের দৃষ্টিতে রজত তাকিয়ে। এক হাত দিয়ে ফটো ছিনিয়ে রজত কঠিন গলায় বলল, এই মুহূর্তে চলে যাও লতা। হাঁ করে দেখছো কী! যাও, দেরী করো না।

ওর ডান হাতের মুঠোয় বউয়া গুঁজে দিল রজত।

রজতের ব্যবহারে রীতিমত হতভম্ব লতা। এমন কী অপরাধ সে করল যে তাড়িয়ে দিচ্ছে! নাকি ভদ্রলোক স্বার্থ লোকে, যে-রকম অশিক্ষিতসুলভ আচরণ, কোন ভদ্রমহিলা দীর্ঘকাল এর সংগে ঘর করতে পারে না। একরম বদ্ধ উন্মাদ বনে গিয়েছে! ঘড়ির দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল লতা। প্রায় বারটা। এতক্ষণ কিভাবে কেটে গেল টের পাইনি আমি। কীভাবে ঘরে ফিরবো? একটা ট্যাকসীও মিলবে না। তাছাড়া এত রাত্রে একা পেয়ে গুণ্ডা বদমাস পিছনে লাগতে পারে। রজত কী এতই নিষ্ঠুর হৃদয়হীন হতে পারে?

যেন কিছু হয়নি এমনি নিরীহ চোখ-মুখে লতা বলল, অযথা মেজাজ গরম করো না। তোমার না শরীর খারাপ। চল শোবে।

চোখের পলকে এগিয়ে এসে রজতের হাত জড়িয়ে ধরল। রজতের চোখদুটো বাঘের মত জ্বলছে। কোনপ্রকার প্রস্তুতি না দিয়ে কোমল দু'হাত দিয়ে গলা জড়িয়ে সমস্ত মুখে চুম্বন করল অসংখ্যবার। রজত প্রথমদিকে দু' একবার চেষ্টা করল লতাকে সরিয়ে দিতে। কিন্তু লতা প্রাণপণে আঁকড়ে ধরেছে। লতার নরম শরীর তার দেহে যেন আগুন ছড়িয়ে দিল।

—চল শোবে ডার্লিং! আবেগবিহ্বল কণ্ঠস্বর লতার। রজতকে এক হাত দিয়ে জড়িয়ে শোবার ঘরের দিকে নিয়ে যায়। কোন বাধা দিল না রজত। বাধ্য ছেলের মত এসে বিছানায় শুয়ে পড়ল।

লতা কপালের উপর কয়েকবার চুম্বন করে বলল, তুমি বড্ড দুষ্ট হয়েছো রজত। চুপচাপ শুয়ে থাক। এখুনি আসছি।

পাশের ঘরে মৃদু চটিচলার শব্দ। একটু পরে মিষ্টি একটা গন্ধ ভেসে আসে। রজত দু' চোখ বন্ধ করে ভাবনা-হীন হতে চায়। স্মৃতিহীন হতে চায়। অন্যমনস্কভাবে মনে হয় খুব কাছে হালকা পায়ে কে যেন চলাফেরা করছে। মনে পড়ে বহুদিন সূর্যোদয় দেখেনি। এ ঘরে দিনের কলকণ্ঠ শোনা যায় না শীতদিন। তার কানের কাছে মুখ এনে ভোরবেলা আধ আধ সুরে ডেকে ঘুম ভাঙায় না কেউ। এখন যখনি সে একা থাকে এ ঘরে বই পড়ার সময় হঠাৎ মনে হয়, পিছনে কে যেন দাঁড়িয়ে চাপা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ছে। সেইসব মুহূর্তে চমকে পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখেছে কেউ নেই। শূন্য ঘরে সে একা।

—ঘুমোলে নাকি রজত!

চোখ খুলে তাকাল সে। ঘরে সবুজ আলো। অ্যালকোহলের তীব্র গন্ধ। লতার চোখমুখ উজ্জ্বল। সেন্টের গন্ধ ভেসে আসছে।

মুখের কাছে গ্লাস এনে লতা আদুরে গলায় বলল, প্লীজ!

যন্ত্রচালিতের মত হাঁ করল রজত। এক নিঃশ্বাসে সবটা গিলে বিকৃত মুখে বলল, আমার বড্ড ঘুম পেয়েছে লতা।

—তোমার শুধু ঘুম আর ঘুম। লতা শেষ চুমুক দিয়ে গ্লাসটা রেখে ওর পাশে শুয়ে পড়ল। রজতকে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে মুখের কাছে মুখ এনে বলল, প্লীজ!

লতার উষ্ণ দেহের উত্তাপে ডুবে যায় রজত। সম্পূর্ণভাবে নিজেকে সঁপে দিল। তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়ল টের পেল না সে।

পরদিন ভোরবেলা ঘুম ভেঙে রজত গতরাত্রির সব কিছু মনে পড়তেই তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল। নরম রোদ ঘরে। লতা নেই। পাশের ঘরে এল। চারিদিকে তাকিয়ে দেখল কোথাও এতটুকু বিশৃঙ্খলা নেই। রান্নাঘর থেকে পেয়ালা পিরিচের ঠুং ঠাং শব্দ ভেসে আসছে। ঘড়ির দিক তাকিয়ে চমকে উঠল। ইস কত বেলা হয়ে গিয়েছে! তাড়াতাড়ি বাথরুমে ঢুকে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে প্রথমে দাড়ি কামাল। বাঁ গালে একটা জায়গায় লাল হয়ে উঠেছে। সেদিকে তাকিয়ে হেসে উঠল সে। গুনগুন করে একটা গানের সুর ভাঁজল। এমনিতে লতা ভাল। নাইস ফিগার। আনন্দ দিতে জানে। কিন্তু ঐ প্রেম ভালবাসা জাতীয় কথাবার্তা, ওসব শুনলে গা জ্বালা করে। লতারও কী হৃদয়ের এক কোণে নীড় বাঁধবার গোপন কোন আকাঙ্ক্ষা লুকিয়ে আছে? 'রজত, তোমাকে আমার খুব ভাল লাগে। আই অ্যাম টায়ার্ড রজত! আমি একটু স্থির হয়ে কোথাও বসতে চাই।' শুনলে হাসি পায় তার। একটা সীমা আছে! মিঃ সেনের শুনে খুব ইন্টারেস্টেড হয়ে উঠেছে। দেখলে মাথা ঘুরে যাবে। আলাপ করিয়ে দেবে।

ফিটফাট সেজে রজত লাফিয়ে লাফিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামল। কাউকে সে পরোয়া করে না। কোন ধরাবাঁধা জীবনকে সে সহ্য করতে পারে না। স্বাধীনভাবে থাকতে চায়। তবে মাঝে মাঝে বিষাদ কেন তোমাকে আক্রমণ করে? নিজের দিকে প্রশ্নটা ছুঁড়ে রজত ট্রাম স্টপের দিকে এগোল।

॥ ছয় ॥

করিডোরে দাঁড়িয়ে সামান্য দ্বিধা নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল বিনয়। লম্বা করিডোর। বেয়ারা, কেরানীবাবুদের যাওয়া-আসা, কয়েকটি মেয়ে-বউ পরস্পরের মধ্যে আলোচনা করতে করতে পাশ কাটিয়ে যায়। মাঝে মাঝে লিফট থেকে দু'-চারজন নেমে হুটহাট করে এ-ঘরে সে-ঘরে ঢুকে যাচ্ছে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বুঝল এই মাত্র টিফিন শেষ হয়েছে। বিমল নিশ্চয়ই সিটে রয়েছে। এক সময়ে যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা ছিল। ইদানীং দেখা-সাক্ষাৎ নেই। বিয়ের সময় বলতে পারেনি। দু'-চারজন ছাড়া, তারাও আবার স্কুলের সহকর্মী, নিমন্ত্রণ বিশেষ কাউকে করা হয়নি। আর আত্মীয়স্বজন বলতে যারা এসেছিল তাদের সে চেনে না। কোনদিন দেখেনি। তাদের সম্পর্কে কোন উৎসাহ নেই।

এখানে একদা কাজ করেছে সে। ঘরে ঢুকলে পরিচিত মুখের সংখ্যা কম হবে না। সঙ্কুচিত হয়ে দাঁড়িয়ে বিনয় নানারকম কথা ভাবতে থাকে। বিমল যখন শুনবে বিয়ের সময় আমন্ত্রণ না জানিয়ে এখন এসেছে বাড়ি যাবার অনুরোধ জানাতে—ও কী মনে মনে ক্ষোভ প্রকাশ করবে না! তখন?

একটা সিগারেট ধরিয়ে বিনয় দরোজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল। ওই তো বিমল, ঠিক তেমনি পুরনো সিটে বসে মাথা নীচু করে রয়েছে। অসংখ্য ফাইল বন্দী র‍্যাকের পাশ দিয়ে এগোয় সে। আশেপাশে কোনদিকে তাকায় না। টের পায় অনেকের তীর্যক দৃষ্টি। কৌতূহল মাখানো। কিন্তু কেউ ডাকে না। সত্যবাবু বা অমিয়বাবু নিশ্চয়ই চোখ তুলে দেখছে তাকে। দেখুক। সবকিছু অগ্রাহ্য করে বিমলের টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল।

কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই বিমলের। মাথা গুঁজে, মাথায় এখন মাঝখানে ছোট্ট একটা টাক, চিঠির মুসাবিদা করছে। সশব্দে চেয়ার সরিয়ে বিনয় বসতেই মাথা তুলে তাকিয়ে খানিকক্ষণ কোন কথা বলতে পারল না। মুহূর্তের মধ্যে নানা ধরনের অভিব্যক্তি মুখে প্রকাশ পেল। বিনয় মৃদু হেসে সব লক্ষ্য করতে থাকে।

—এতদিন পরে মনে পড়ল! বিমল কলম বন্ধ করে এক পাশে সরিয়ে রাখল, আমরা তো একই শহরে রয়েছি, কি বল? যাকগে মান-অভিমান করবো না বিনয়। তোর কাছে ওসবের কোন দাম নেই। কী জন্যে এসেছিস শুনি?

বিনয় একটা সিগারেট এগিয়ে বলল, আগে চা-কেকের অর্ডার দে। বলছি বন্ধু। এত ব্যস্ত কীসের। কিরে তোর দেখি মাথায় টাক পড়তে শুরু করেছে। শুনি টাক পড়লে নাকি টাকা-পয়সা হয়।

—তোর মুণ্ডু হয়! বিকৃতমুখে বিমল বেয়ারা ডেকে চা আনতে বলল। তারপর কয়েক মুহূর্ত নিঃশব্দে তাকিয়ে রইল বন্ধুর দিকে। চকচক করছে বিনয়ের চোখমুখ। পোশাকের দিকে নজর গেল। দামী ধুতি পাঞ্জাবী জুতো। সোনার বোতাম। ঠিক যেন জামাইটি সেজে

বেরিয়েছে। তাহলে ব্যাটার বেশ আছে! থাকবেই তো! ঘাড়ে সংসারের চাপ নেই। ছেলে-মেয়েদের নিত্যিনতুন বায়না শুনতে হয় না। ঘরে অফিস থেকে ফিরে রুগ্না স্ত্রীর মুখঝোপা শুনতে হয় না। নির্বিকার নিরুদ্বেগ জীবন কাটাচ্ছে। ও কী জানে আজকাল চালের কিলো কত? কেরোসিন আনার জন্যে লাইনে কতক্ষণ দাঁড়াতে হয়?

বিমলের তাকানো দেখে রীতিমত অস্বস্তিবোধ করে বিনয়। কী দেখছে অমন তন্ময় হয়ে?

—একটা খবর আছে বিমল। আন্দাজ করতে পারিস?

—জানি। বিয়ে করেছিস। পোশাক দেখেই বুঝেছি।

—সামনের রোববার তুই স্ত্রী ছেলে-মেয়ে নিয়ে আমাদের বাড়ি আসবি। সকালের দিকে যাবি কিন্তু।

বিমল কিছু বলতে গিয়ে থেমে যায়। প্রথমদিকে দুচোখে উৎসাহের ঝিলিক দেখা গেলেও এখন বেশ নিষ্প্রভ মনে হচ্ছে। আস্তে আস্তে সারামুখে বিষণ্ণতা ছড়ায়। সেদিকে তাকিয়ে বিনয় ভাবল: বিমল অকাল প্রৌঢ়ত্ব লাভ করেছে। এত তাড়াতাড়ি বুড়িয়ে গেল কেন?

তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল বিমল। বলল, শেষপর্যন্ত বিয়ে করে ফেললি বিনু। আঃ ভেবে আমার যা শান্তি হচ্ছে কী বলবো মাইরি! তোর কথা প্রায়ই মনে হোত। ওরকম দাঁত বের করে হেসো না চাঁদ! বিশ্বাস কর, মনে হোত তোর কথা। কিছু করতে পারতিস তুই একটু স্বাভাবিক বুদ্ধি থাকলে। শোন, কোন কলেজে বা স্কুলে মাস্টারী করে বাঁচার কথা বলছি না। অন্য কিছু হওয়ার কথা ভেবেছিলাম। তোর তো প্রতিভা টতিভা ছিল।

একসঙ্গে এত কথা বলে বেশ হাঁফিয়ে উঠল বিমল। মুখের শিরা-উপশিরা মোটা হয়ে উঠল। ঘনঘন নিশ্বাস নিচ্ছে দেখে বিনয় গম্ভীর গলায় বলল, চা জুড়িয়ে যাচ্ছে। বলে এক কামড়ে কেকের আধখানা মুখে পুরে দুচোখ বুজে চিবুতে থাকে। একটু পরে চোখ খুলে চায়ে চুমুক দেয়। সিগারেট ধরিয়ে জোরে টান মারল কয়েক-বার। বিমল ইডিয়টের মত ওর দিকে তাকিয়ে। ওর কাছ থেকে কিছু শুনতে চায়। কী বলবার আছে?

—তাহলে রোববার যাচ্ছিস।

—তুই কী এখনই উঠবি? বিমল আহত চোখমুখ করে তাকাল, এতদিন পর পুরনো বন্ধুর কাছে এলি, একটু গল্প-গুজব কর। তারপর একটু থেমে বলল, যাওয়া হবে কিনা সন্দেহ।

বিনয় মনে মনে বেশ বিরক্ত। সোজা জবাব সে চায়। এত ভণিতা কীসের। স্পষ্ট করে বলে ফেল: ভাই অসুবিধে আছে, যেতে পারবো না। আর অসুবিধেটাই বা কীসের। অজুহাত করে যদি না যেতে চায় বলার কিছু নেই। আমি বাপু তোমার পায়ে ধরতে পারবো না।

বিমল বন্ধুর মুখভাব লক্ষ করে সামান্য হাসল, রাগ করিস না। তুই কী আমার কোন খবর রাখিস? আমার স্ত্রীর শরীর খুব খারাপ। কোথাও যাওয়া হয় না। শেষপর্যন্ত হয়তো আমাকে একাই যেতে হবে। থাক এসব কথা। এখন তোর খবর বোনা। বউ কেমন হলো? বলে অর্থ-পূর্ণদৃষ্টিতে হাসল সে।

—কেমন আর কি। বিনয়-এর ঘুম পাচ্ছিল। জোর করে চোখদুটো খুলে মুখ হাঁ করে হাই তুলে জড়ানকণ্ঠে বলল, নাম শেফালী। দেখতে মোটামুটি সুশ্রী। হস্ত-জাবার মাস্টারী ডিগ্রী নিতে চলেছে। বিয়ের আগে জানাশুনো ছিল। খুব খুব পছন্দ মেয়েটিকে। দাঁড়া, এক মিনিট ভেবে নি। আরও বলবার কিছু আছে কিনা। বলে বিনয় দুটো হাত কোল-এর উপর রেখে ঝিমোতে শুরু করে।

বিমল খুব অভ্যস্ত ওর কথা বলার ঢংয়ে। তাই সে অবাক হলো না। বন্ধুর অবস্থা দেখে মনে মনে হাসল। নতুন বিয়ে করেছে। রাতে ঘুমোতে পারে না। বছর-খানেক এরকম চলবে। পরে উন্মাদনা কমে যাবে। সেই বিনয়! বিয়ে-থাওয়ার নামে ঠোঁট উল্টে অদ্ভুত ব্যঙ্গ করতো। এখন দেখলে মনে হয় ও অনেক শান্ত সমাহিত। এই রকমই হয়। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সব ঠান্ডা হয়ে যায়।

—এই বিনু! মৃদু ঠেলা দিয়ে বিমল বেয়ারাকে ডেকে আবার দু কাপ চা আনতে বলে। চা খেলে জড়তা কেটে যাবে। ও কী এখনো ওই সব অদ্ভুত ধারণা মনে মনে পোষণ করে? এখনো সেইরকম জেদ, অহংকার বা বেপরোয়া মনোভাব বজায় আছে কী? ওই জন্যেই কিছু করতে পারল না জীবনে। মাস্টারী করে...হঠাৎ মনে পড়ল সেই বা এমন কী লোভনীয় কেরিয়ার তৈরি করতে পেরেছে! নিতান্ত দিনযাপন ছাড়া আর অবশিষ্ট কিছু আছে কী জীবনের? এইসব ভেবে সে বিমর্ষ চোখে বিনয়ের দিকে তাকাল।

চা খেয়ে বিনয় উঠে দাঁড়াল, এবার চলি। তাহলে তুই আসিস কিন্তু। অনেক-ক্ষণ আড্ডা মারলাম। তোর কাজের ক্ষতি হল।

লিফটের দরোজা পর্যন্ত এগিয়ে এল বিমল। মৃদুস্বরে কানের কাছে মুখ এনে বলল, দেখলি না তো কিভাবে তোর দিকে তাকিয়ে ছিল অমিয়বাবু।

জবাব দেবার আগে লিফটের দরোজা খুলে যায়। বিনয় দ্রুত এগিয়ে যায়। লোক-জনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কিছু বলতে গিয়ে দেখল নিঃশব্দ গতিতে লিফট নীচে নেমে যাচ্ছে। বুকের ভিতর শিরশির করছে। চোখ বন্ধ করল সে। কেমন অদ্ভুত শীতল মনে হচ্ছে। লিফটে উঠলে এরকম হয় তার। মনে হয় পাতালে চলে যাচ্ছে।

—নামুন।

বিনয় চোখ খুলে লিফটম্যানের দিকে তাকাল। তেরছা চোখে লোকটা তাকিয়ে। মনে হলো মুচকি হাসছে। সে তাড়াতাড়ি এগিয়ে যায়। পিছন ফিরে তাকায় না। সহজভাবে নিশ্বাস ফেলল রাস্তায় পা দিয়ে।

চারদিকে তাকিয়ে সে রাস্তা পার হল। ফুটপাতে উঠে দাঁড়াতেই তেলে-ভাজার গন্ধ ডাকল বিনয়কে। সারি সারি পর পর তেলেভাজার দোকান। এই চায়ের সময় এখনও কিছু সংখ্যক অফিসের বাবুরা টিফিন করছে। বেগুনি আর আলুর চপ কিনে ঠোঙা হাতে সে হাঁটতে থাকে। অনেকটা কুড়িয়েছে ভেবে খেতে শুরু করল। বিয়েটা একটা হাঙ্গামা! বিয়ের সময় বুকভরার কথা একবার মনে হয়েছিল। সেই বুকভরা! এক সময়ের হিরো অশোক-বান পুরুষ। এখন আমরা কেউ কাউকে দেখতে পারি না।

ঠোঙা রাস্তায় ছুড়ে পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছল বিনয়। এরই মধ্যে ট্রামে ভিড় শুরু হয়েছে। একটাতে উঠে পড়ল। বাড়ি ফিরবে। শেফালী বার বার বলে দিয়েছে তাড়াতাড়ি ফিরতে। সন্ধ্যার দিকে বেড়াতে বেরুবে। দিনরাত ঘরে বসে থাকা অসহ্য মনে হচ্ছে বিনয়ের। আর কয়েকটা দিন। তারপর ছুটি ফুরোবে। স্কুলে জয়েন করবে।

অফুরন্ত অবসর এত ক্লান্তিকর মনে হতে পারে আগে ভাবেনি। শেফালীর সঙ্গে সর্বদা সময় কাটানো ভালো দেখায় না। সংসারের টুকিটাকি কাজ আছে। মীরার চাকরী হয়েছে। ওর একটা গতি হল। নিজের পায়ে দাঁড়াতে পেরেছে। এতে সবচেয়ে বেশি আনন্দ তার।

গণেশ টাকির মোড়ে ট্রাম আটকে যায়। একের পর এক অনেকগুলি ট্রাম। যাত্রীদের নানারকম মন্তব্য ছিটকে আসে কানে বিনয়ের। হৈ-চৈ শব্দ ভেসে আসছে দূর থেকে। একটু পরে বোমা ফাটার আওয়াজ শুনল। অনেক যাত্রী তাড়াতাড়ি নেমে যায়। অনেকের চোখমুখে আতঙ্ক। বাচ্চারা কেঁদে ওঠে। মহিলাদের মুখ বিবর্ণ। ভয়ের চিহ্ন।

—কী হয়েছে মশাই? একজন মুখের কাছে মুখ এনে পান চিবুতে চিবুতে মিহি গলায় বলল, গুলিটুলি চলতে পারে, কী বলেন?

—জানি না। নিরাসক্তকণ্ঠে জবাব দিয়ে বিনয় একটু সরে দাঁড়াল। কিন্তু কোথায় সে যাবে? সর্বত্র এক আলোচনা। কান বন্ধ করে দাঁড়াবে সে উপায় নেই। মিনিট-দশেকের উপর ট্রাম দাঁড়িয়ে। কখন ছাড়বে শুরু করবে কে জানে। একবার সে ভাবল নেমে যায়। হেঁটেই বাড়ি পৌঁছবে। থাক, আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে দেখবে। একটু পরে সব ঠিক হয়ে যাবে।

(ক্রমশ)

গোয়েন্দা কবি পরাশর • প্রেমেন্দ্র মিত্র রচিত শৈল চক্রবর্তী চিত্রিত

CENTRAL LIBRARY

অঙ্গনা

হ্যান্ডিক্রাফট সেন্টারের সেই মেয়েটি

অনেকদিন আগে একটা হ্যান্ডিক্রাফট সেন্টারে গিয়েছিলাম। অনেক মেয়ে সেখানে হাতের কাজ শেখে। নানারকম কাজও হয়। এখানকার কাজের নাকি খুব কদর। বাজারে নাকি খুব দর। বাজারে যেতে পায় না। অনেকে এসেও অর্ডার দিয়ে যায়। আর দশটা হ্যান্ডিক্রাফট সেন্টার যেমন এর উদ্দেশ্যও তেমনি ; দুঃস্থ মেয়েদের সংস্থান করা আর অভাবের সংসারের বিরাট চাহিদার কিছু যোগান দেওয়া।

কলকাতা শহর এবং আশেপাশে এরকম প্রতিষ্ঠান অসংখ্য। সবাই সমাজ সেবার তাগিদে এক একটি হ্যান্ডিক্রাফট সেন্টার খুলে নিজের নিজের সাধ পূরণ করেছেন। এসব সেন্টারে কর্মরত অনেক মহিলার সঙ্গে আলাপ হয়েছে। তাঁরা স্বীকার করেছেন, কষ্ট স্বীকার করেও এই অর্থে তাঁরা সংসারে অনেক সমস্যার সমাধান করতে পারছেন। ছেলের লেখাপড়া, সংসারের টুকিটাকি প্রয়োজন তাঁরা এখান থেকেই মেটান। স্বামী যা আয় করেন তাতে সারা মাস চালানো খুবই দুঃসাধ্য। এদিক থেকে এসব সেন্টার তাঁদের কাছে আশীর্বাদস্বরূপ।

এধরনের কথা অনেকের মুখে শুনেছি। [illegible] জেনেছি। ভাগ্যিস এসব সেন্টার ছিল, তাই এঁরা বিপদের মুখে দাঁড়িয়েও হাল ছেড়ে দেননি। নাহলে যে কি অবস্থা হতো ভাবতেও [illegible] না। প্রত্যেক মাসে পড়ে শুধুই [illegible] থেকেন। সুস্থ জীবন হয়ে উঠতো অকল্পনীয়। কে কোথায় ভেসে যেতেন তার ঠিক-ঠিকানা নেই। আর আজকালকার দিনে একার আয়ে সংসার চালানোও অসম্ভব। তাকে আনতে বাঁকে কুলোয় না। তাই বাধ্য হয়েই অন্যকিছু ভাবতে হয়। সংসার স্বাভাবিক রাখার জন্য স্বামীর আয়ের সঙ্গে কিছু যোগান দেওয়ার উপায় চিন্তা করতে হয় স্ত্রীকে। কিন্তু আয়ের পথ [illegible]।

আবার সুনির্দিষ্ট শিক্ষাগত যোগ্যতা চাই চাকরির জন্য। ইদানীং ততটা অসুবিধা হয় না। অনেকেই লেখাপড়া জানা। যাঁরা চাকরি পেয়ে যান। অন্তত পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এমনিতেই চাকরির বাজার এখন খুব টাইট। ঢুকে পড়বার সুযোগ নেই। তবু লেখাপড়া জানা সবাই অপেক্ষা করেন চাকরির জন্য। আর তাইতো স্বাভাবিক। কিন্তু শিক্ষার প্রসার বহুল হলে অনেকেরই শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রমাণ করা সম্ভব নয়। তাদের অন্যকিছু ভাবতে হয়। তখন প্রশ্ন ওঠে হাতের কাজের। আর যে মুহূর্তে এসব হ্যান্ডিক্রাফট সেন্টার তাঁদের বড়ো সহায়। অনেকে লেখাপড়া শিখে দশটা-পাঁচটা অফিস করতে না পারার জন্য তাঁদের আক্ষেপ থাকলেও কোন অভিযোগ নেই। এখানে কাজ করে তাঁরা দুধের স্বাদ ঘোলে মেটান। সংসারে দুটো বাড়তি পয়সাও আসে। চাকরিও করা হয়। ওদিকে আবার সংসারে ছেলে-পুলের কোন অসুবিধাও হয় না।

এদিক থেকে তাঁরা অফিসের চাকুরিরা মায়েদের চেয়ে অনেক বেশি সুখী এবং স্বাধীন তো বটেই। তাঁরা ঘর-সংসারের কাজ করেন। স্বামী অফিস যায়। ছেলেমেয়ে স্কুলে। তারপর অনেকখানি অবসর। এ সময়টুকুই তাঁরা কাজে লাগান। হ্যান্ডিক্রাফট সেন্টারে গিয়ে কাজ করেন। প্রথমে সবাই শিক্ষার্থী। তারপর কাজ শেখা হয়ে গেলেই দুটো পয়সার মুখ দেখতে পান। স্বামী এবং ছেলেপুলে বাড়ি ফিরে এসে দেখেন গিন্নি এবং মা বাড়িতে হাজির। ওঁরা জানতেও পারেন না। ছেলেমেয়ে তো নয়ই। কোন কোন ক্ষেত্রে স্বামী জানেন। তাও প্রথম প্রথম নয়। বেশ কয়েক মাস গড়িয়ে যাওয়ার পর।

দশটা-পাঁচটার অফিসের চাকুরিরা মায়েদের কিন্তু এই সুবিধাটুকু নেই। তাঁদের ঠিক সময়ে অফিসে হাজিরা দিতে হয়। মা-বাবা আগেই বেরিয়ে যান। ছেলেমেয়ে পরে স্কুলে যায়। আবার ফিরে এসেও দেখে যে মা অনুপস্থিত। সবচেয়ে অসুবিধা নিতান্ত শিশুর বেলায়। অফিসের সময়টুকু তাকে আগলানোর জন্য একজন বাড়তি লোকের বন্দোবস্ত করতে হয়। তারই তত্ত্বাবধানে শিশু বেড়ে ওঠে। তার ফলে গোড়ার দিকেই হয়ে যায় গণ্ডগোল। মায়ের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানের অভাবে সে যে কি রূপ পাবে তা ভাবাও যায় না। এরকম একটি ছেলের মুখে শুনেছিলাম, মা আমার প্রতি তাঁর কর্তব্য করেননি তাই আমিও তাঁর প্রতি কোন কর্তব্য আছে বলে মনে করি না। এরকমভাবে বেড়ে ওঠা শিশুর মানসিক গঠন সম্পূর্ণতা পায় না। অথচ সে একবারও ভাবলো না যে, তাদের মানুষ করার জন্য মা এই দশটা-পাঁচটার ঘানিতে জুতে বসেছেন। না হলে কোন দরকারই ছিল না। অবশ্য যাঁরা শখের চাকুরিরা তাঁদের কথা আলাদা। এঁদের সংখ্যাও নেহাত কম নয়।

দিনে দিনে অবস্থা আরো সঙ্গীন হচ্ছে। অর্থনৈতিক দুর্গতি ক্রমেই বেড়ে চলেছে। একার আয়ের উপর কোনরকমেই আর নির্ভর করে থাকা যায় না। আর মেয়েরাও এখন লেখাপড়া শিখছেন। উচ্চশিক্ষায় তাঁরা এখন অনেক পুরুষকেও হার মানাচ্ছেন। তাই চুপচাপ ঘরে বসে থাকারও কোন অর্থ হয় না। নিজের লেখাপড়ার সদ্ব্যবহার তো চাই। তাই চাকরি আজ অবশ্যম্ভাবী।

কিন্তু আমরা প্রসঙ্গক্রমে অনেক দূরে সরে এসেছি। আমাদের প্রসঙ্গ ছিল হ্যান্ডিক্রাফট সেন্টার এবং কর্মী মেয়েরা। প্রতিটি হ্যান্ডিক্রাফট সেন্টার জন্ম নেয় সমাজসেবার দুরন্ত তাগিদ থেকে। আর মেয়েরা এবং মায়েরা এখানে আসেন ভিড় করে। বিরাট কোর্স থাকে। প্রথমে ওঁদের শিখে নিতে হয়। তারপর চাকরির প্রশ্ন। সেই স্কুল-কলেজের পরীক্ষার মতোই। কারো কারো চাকরি হয়। তাঁরা ভাগ্যবান। আর অনেকেরই চাকরি হয় না। তাঁরা প্রশ্ন করেন, আমাদের কি হবে? এ প্রশ্নের কোন উত্তর নেই।

এমনি একটি হ্যান্ডিক্রাফট সেন্টারে সেই মেয়েটির মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়েছিল। রোগা কিন্তু আত্মপ্রত্যয়ে দৃঢ়। গোটা কেন্দ্রটি ঘুরেফিরে দেখা হয়ে গেল। সেন্টারের প্রতিষ্ঠাত্রী ভদ্রমহিলা গৌরবে গদগদ হয়ে বললেন, অনেক মেয়ের আর্থিক সংস্থান হয় এখান থেকে। সকলেই কিছু না কিছু রোজগার করেন। কাউকে বঞ্চিত করা হয় না। আর আমাদের কিছু কিছু জিনিস বিদেশী প্রবাসীদের মধ্যেও জনপ্রিয়। ওঁরা দেশে যাবার সময় অনেক জামাকাপড় আমাদের এখান থেকে নিয়ে যান। ওঁদের কেউ কেউ এসে অর্ডারও দিয়ে যান। ওঁরা নাকি ওঁকে ওদেশে নিয়ে যেতে চান এরকম একটি হ্যান্ডিক্রাফট সেন্টার চালু করার জন্য। ভদ্রমহিলার চোখমুখ আনন্দের উচ্ছ্বাসে চকচক করছে।

একটি সুন্দর ধারণা হয়েছিল এই সেন্টারটি সম্বন্ধে। এবার ফেরার পালা। হঠাৎ সেই মেয়েটি এসে দাঁড়ালো সামনে। এসেই আর কোন ভনিতা না করে সরাসরি প্রশ্নটি ছুঁড়ে মারলে, একটা চাকরি দিতে পারেন? একটু হকচকিয়ে গেলাম। কোন জবাব দিতে না পেরে সেই মেয়েটির দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলাম। এমনসময় ত্রাণকর্তার ভূমিকা পালন করলেন সেই ভদ্রমহিলা। তিনি এগিয়ে এসে বললেন, ওঁকে বিরক্ত করছো কেন? উনি তোমার চাকরি দেবেন কোত্থেকে? আচ্ছা যাও। তোমার জন্য তো আমি চেষ্টা করছি।

সেদিন চলে এসেছিলাম। তারপর প্রায় গতানুগতিক জীবনে সেই মেয়েটির কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। হঠাৎ একদিন দেখা হয়ে গেল কলকাতার রাস্তায়। আমি পাশ কাটাতে চেয়েছিলাম। সেই মেয়েটি পালাতে দিলো না। এক নজর ওকে দেখলাম। সেই একইরকম চেহারা। দৃঢ়তা আরো বেড়েছে। কাঁধে একটি ব্যাগ। একথা, সেকথার পর জানতে চাইলাম এখন কি করা হচ্ছে। জবাবে মেয়েটি বললো, লটারির টিকিট বিক্রি করছি। অফিসে অফিসে। আমাদের কথা কেউ ভাবে না। আমরা নিজেরাই আমাদের পথ করে নিই।

মেয়েটি আর দাঁড়ালো না। হনহন করে এগিয়ে গেল। সেদিকে তাকিয়ে মনে হলো, ও যেন নতুন পথের দিশারী।

—প্রমীলা

CENTRAL LIBRARY

প্রদর্শনী পরিক্রমা

৫ নম্বর রমণী চ্যাটার্জি স্ট্রীটের আর্ট অ্যাকাডেমির ছোট ও বড় সদস্যদের একটি চিত্র প্রদর্শনী এবারে ২১ থেকে ২৭ নভেম্বর অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। ২৩ জন সদস্যের আঁকা ১১৭ খানি ছবির মধ্যে কনিষ্ঠদের ছবিগুলিই সব চাইতে আকর্ষণীয় হয়েছিল। ছোট ছেলেমেয়েদের আঁকা উজ্জ্বল রঙের ছবির মধ্যে তন্ময় বোসের প্যাস্টেলে আঁকা সার্কাসের বড় ছবি কর্ণালী বোসের বেলুনওয়ালা, সোমনাথ মিত্রের জলাশয়ে প্রভৃতি ছবি ছাড়াও পর্ণা বোস, সুদীপ ঘোষ, জয় বিশ্বাস ও সুজাতা ঘোষের কয়েকটি ছবি উল্লেখযোগ্য। বড়দের মধ্যে মাধুরী দাস, কৃষ্ণা চৌধুরী ও সুনীল কোহলীর তৈরী বড় মাপের কয়েকটি বাটিক পেন্টিং আঙ্গিকের কৌশলের দরুন উল্লেখের দাবী রাখে।

•

২১ থেকে ২৬ নভেম্বর অ্যাকাডেমির পশ্চিম গ্যালারীতে সঞ্জয় নন্দীর ১৮টি পেন্টিং ও কতকগুলি ড্রয়িং-এর একক প্রদর্শনী হয়ে গেল। শ্রীনন্দীর বেশীর ভাগ কাজই নন-ফিগারেটিভ এবং অনেকগুলিতে হেয়ার পিন, বোতাম ইত্যাদি লাগিয়ে জ্যামিতিক রেখা ডিজাইন তৈরী করে বর্ণাঢ্য সজ্জার একটা রূপ দাঁড় করাবার চেষ্টা করা হয়েছে। রঙ সাধারণতঃ নীলাভ ধূসর, মেটে লাল, বাদামী ইত্যাদি দেখা। ফিগারেটিভ কাজের মধ্যে 'দি বার্ড' 'দি ভীকর' এবং লোক শিল্প ঘেঁষা 'ম্যান আন্ড দি বার্ডস'এর নাম করা যায়। তবে তাঁর ছোট জল রঙের স্কেচগুলির মধ্যে নানা রঙের ডেকরেটিভ ডিজাইনের বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা গেল। এর কিছু কিছু বড় ছবির প্রস্তুতি হিসেবে করা হলেও স্বয়ং-সম্পূর্ণতার দাবী রাখে।

•

মাত্র ছ' বছরের ছেলে সিরাজ শৈলনা কোটালের ছবিতে আশ্চর্য রঙের ব্যবহার দেখা গেল। অ্যাকাডেমির দক্ষিণের গ্যালারীতে ২২ থেকে ২৮ নভেম্বর ২৪ খানি ছবিতে তার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী অনেককেই চমৎকৃত করেছে। সিরাজের ছবি খুব বেশী রকম অ্যাবস্ট্রাক্ট ঘেঁষা হলেও বেশীর ভাগ কাজেই তার বক্তব্য বিষয়কে পরিষ্কারভাবে ফুটিয়ে তুলতে দেখা গেছে। সূর্যাস্তের ছবিটি মাত্র কয়েকটি রঙের আয়তক্ষেত্রে ভাগ করা কিন্তু নকশার অত্যন্ত চমৎকার। 'পার্লস নেকলেস' এবং 'জোকার্স লিপস' ছবিতে দুধ রঙের সাহায্যে কেবলমাত্র বর্ণিত বিষয়টুকু ছাড়া আর সব কিছু সরিয়ে বাদ দিয়ে অত্যন্ত সরল ও সুন্দর ডিজাইন সৃষ্টি করা হয়েছে। এ ছাড়া বন্ধুদের পার্টি, ছোট ছেলেমেয়েদের পার্টি, নিদ্রিতা রমণী, ঘুমন্ত মোটা লোক—এইসব ছবিতে তার চোখে দেখা জগতের এক হাস্যরসময় রূপকে চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। তার নীল, বেগুনী, সবুজ, হলুদ ও লাল রঙের ব্যবহার প্রশংসনীয়।

•

অঞ্জলী এলা মেনন (পূর্ব নাম অঞ্জলি এলা দেব) এই প্রথম কলকাতায় তাঁর একক চিত্রপ্রদর্শনী করলেন। ১৯৫৪ থেকেই তিনি প্রদর্শনী করে আসছেন। বোম্বাই, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ ছাড়া ভারতের বাইরেও তাঁর প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে; সমালোচকদের প্রশংসাও পেয়েছেন প্রচুর। গত ২২ থেকে ৩০ নভেম্বর অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে অনুষ্ঠিত ৩১ খানি চিত্রসম্বলিত প্রদর্শনীতে কয়েকটি পরিণত হাতের কাজ দেখা গেল।

শ্রীমতী মেনন আধুনিক এবং প্রধানত ফিগারেটিভ শিল্পী। রঙ ব্যবহারে তাঁর নিপুণতা প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অধিকাংশ ছবিতেই খুব পাতলা করে তিনি রঙ ব্যবহার করেছেন বলে মনে হল। বিষয়বস্তু এবং বর্ণবাহুল্যে একটা গম্ভীর এবং রোমান্টিক মেজাজ পরিস্ফুট। অনেকগুলি প্যানেল গথিক পেন্টিং-এর কথা মনে করিয়ে দেয়। 'মরিয়ম' ছবিটি এদিক দিয়ে বিশেষভাবে উল্লেখনীয়। 'বার্ড' এবং 'নুড' ফিগার দুটি প্রতিকৃতিতেও তাঁর এই ধরনের কাজ। 'নাটাশা' ও 'আয়েষা' নামের দুটি প্রতিকৃতিতেও তাঁর এই ধরনের আঙ্গিক পারদর্শিতা দেখা গেল। 'ইডেন' ছবিতে নরনারীর সঙ্গে ছন্দময় ইডেনের দৃশ্যে মানানসই। তবে লাল আপেল হাতে বাদামী রঙের বিবসনা লক্ষ্মী আর যাই হোক লক্ষ্মী প্রতিমা নয়। তবে বাদামী ইভ বলা যেতে পারে। অনেকগুলি কাজে সুস্পষ্ট তারতম্য দেখা যায়। যেমন তাঁর সহজ ঘোড়া (স্পেকটার) বা ঝোঁকের দেখা 'কাউন্টেস' বা কতকটা বাইজ্যান্টাইন প্রতিকৃতি 'মাতৃমাতা' প্রভৃতি যথেষ্ট আকর্ষণীয় মনে হয়নি। তাঁর ভিন্ন স্টাইলে আঁকা 'হাউস অন দি বীচ', 'বা হাউস' এবং 'ভিলেজ' ছবির স্যাতলাময় রূপ বেশ ভাল। সুন্দর কাজ খুব বিলিতী ঘেঁষা ছবি।

শিল্পী : রামানন্দ ব্যানার্জি

রামানন্দ ব্যানার্জি পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের শিল্প শিক্ষক। কলকাতা তথ্যকেন্দ্রে ২৬ নভেম্বর থেকে ২ ডিসেম্বর তাঁর ২৬ খানি ছবি ও শখানেক স্কেচের প্রদর্শনী হয়ে গেল। শিল্পী তাঁর ছবিতে ভারতীয় প্রথাগত কাজের সঙ্গে আধুনিক রীতির একটা সিন্থেসিস করতে চেষ্টা করেছেন। কয়েকটি ছবি নব্যভারতীয় প্রথায় আঁটো জল রঙে বেশ দক্ষতার সঙ্গে আঁকা। নতুন পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্যে লোকশিল্পের প্রভাবটাই বেশী। রঙ উজ্জ্বল এবং অলংকরণ সুস্পষ্ট দেখা। সোহাগী, সন্তান, যুগল, গণেশ জননী প্রভৃতি ছবি-গুলি এদিক দিয়ে নাম করা যায়। ছোট স্কেচগুলির মধ্যে গ্রামজীবনের ক্ষণিক দৃষ্ট রূপ এবং নিসর্গ দৃশ্য সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে।

•

যোগমান জ্যোতির্মোহিত বন্দ্যোপাধ্যায় শিল্পী স্বদেশে ও প্যারিসে শিল্পশিক্ষা লাভ করেছেন। বহু দেশ ভ্রমণ করেছেন ও চিত্রপ্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করেছেন। অ্যাকা-ডেমিতে প্রদর্শিত ৩৪ খানি ছবিতে তাঁর আফগানিস্তান, ইরাণ, পাকিস্তান, নেপাল ও ভারত ভ্রমণের ডায়েরী দেখা গেল। আফগানিস্তানের ছবির মধ্যে প্রধানত বিভিন্ন বয়সের মানুষের মুখ দেখা গেল। হাল্কা জল রঙে কাজ। ইরাণে আঁকা তেল রঙের কাজের মধ্যে কাগজের ঠোঙা থেকে লুটিয়ে পড়া স্ট্রবেরী, পুতুল বিক্রেতা, হুঁকো হাতে বোট ক্যাপ্টেন, বাজার ইত্যাদি ছবিগুলি প্রদর্শনীর বিশেষ আকর্ষণ বলে মনে হল। নেপালের বড় একটি মন্দিরের জল রঙ-এ করা ছবি এবং গয়ার একটি পুরাতন গীর্জার গম্ভীর রূপ প্রশংসার যোগ্য।

—চিত্ররসিক

ভারতের সিগারেট শিল্পে বৈদেশিক একচেটিয়া

ইণ্ডিয়া টোব্যাকোর ভিত্তিহীন অভিযোগ ও কুৎসার উত্তরে গোল্ডেন টোব্যাকো

বিরোধের পটভূমি

ইণ্ডিয়ান সিগারেট ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান হিসাবে গত ৩রা আগস্ট, ১৯৭০ তারিখের সাংবাদিক সম্মেলনে যে ভাষণ দিয়েছিলাম তাতে আমার বক্তব্য প্রধানতঃ ভারতীয় মালিকানাধীন সিগারেট প্রস্তুতকারী ইউনিটগুলোর বর্তমান দুর্যোগ ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা, সিগারেটের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মিটানোর জন্য এইসব ইউনিটকে উৎসাহদানের জন্য সরকারী নীতির প্রয়োগ এবং বৈদেশিক একচেটিয়ার কবল থেকে সামগ্রিকভাবে এই শিল্পের মুক্তি সম্পর্কেই সীমাবদ্ধ রেখেছিলাম।

তবু, ইণ্ডিয়া টোব্যাকো কোং (পূর্বতন ইম্পিরিয়াল টোব্যাকো)-এর চেয়ারম্যান মিঃ এ এন হাকসার কিন্তু আমার বক্তব্য নিয়ে আলোচনা করার বদলে গোল্ডেন টোব্যাকোর বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচারের পথ বেছে নিলেন, অথচ এই কুৎসা লক্ষণীয়ভাবে অগভীর ও কুতর্কমূলক। তাঁর বাক্‌সর্বস্ব অভিযানে যদি গোল্ডেন টোব্যাকোর বিরুদ্ধে মিথ্যা ও মানহানিকর বিবৃতি না থাকতো তবে তাকে আমি আহত নির্দোষিতার মুখোশ পরিহিত একটি বৈদেশিক একচেটিয়ার বড়রকমের প্রচার অভিযানের অবকাশসৃষ্টিকারী কৌশল বলেই উপেক্ষা করতাম। কিন্তু মিঃ হাকসারের প্রতিবাদ সত্ত্বেও আমি আবার বলছি, এই গোল্ডেন টোব্যাকো ভারতে এই ধরনের জাতীয় সংস্থার মধ্যে বৃহত্তম।

সুতরাং গত ৩১শে আগস্ট, ১৯৭০ তারিখে নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত সাংবাদিক সম্মেলনে আই টি সি-এর চেয়ারম্যান যে ভ্রমাত্মক ও মিথ্যা বিবৃতি দিয়েছেন, গোল্ডেন টোব্যাকোর পক্ষ থেকে আমি তার প্রত্যেকটির উত্তর দেবো এবং তা বিচার করবার ভার আপনাদের ওপর, সংবাদপত্র, জনসাধারণ ও সরকারের ওপর ছেড়ে দেবো।

আমি প্রস্তাব জানিয়েছিলাম যে, (ক) সরকারের উচিত কেবলমাত্র ১০০% ভারতীয় কোম্পানিগুলোকেই সম্প্রসারণ করতে দেবার জন্য তাঁদের ঘোষিত নীতি প্রয়োগ করা, (খ) সিগারেট শিল্পে একচেটিয়াকে, বিশেষ করে বৈদেশিক একচেটিয়াকে উৎসাহ দেওয়া হবে না, (গ) আগে ২৫% পর্যন্ত বর্ধিত উৎপাদনের যে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল একচেটিয়ার সেই বাড়তি উৎপাদন ১৮ই জুলাই তারিখের বিজ্ঞপ্তি অনুসারে প্রত্যাহার করে নিতে হবে, এবং (ঘ) লাইসেন্সপ্রাপ্ত ক্যাপাসিটির বাইরে একচেটিয়ার যে বাড়তি উৎপাদন হয় তা রপ্তানি করতে হবে যাতে দেশ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সক্ষম হয় এবং দেশীয় ইউনিটগুলোর যে ৭০% ক্যাপাসিটি অলস হয়ে পড়ে আছে তা কাজে লাগানো যায়—এর অর্থ বছরে ১০০০০০/১২০০০০ লক্ষ সিগারেট উৎপাদন।

আমি জানি, বৈদেশিক একচেটিয়ার এসব কথা ভালো লাগবে না, কিন্তু তাই বলে আমি এ আশাও করিনি যে, তাঁরা এতদূরে নীচে নেমে যাবেন এবং মিঃ হাকসারের বিবৃতিতে যে ভিত্তিহীন যুক্তি প্রকাশ পেয়েছে তা তাঁরা তুলবেন—একে আমি স্বাধীন ভারতে ১০০% ভারতীয় কোম্পানিকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য বিদেশী-নিয়ন্ত্রিত কোম্পানির নগ্ন প্রচেষ্টা বলেই মনে করি।

উৎপাদনের দৌড়—কার্যকরী পন্থা

আমরা সংবাদপত্রে রোজই পড়ি যে, বৈদেশিক যৌথ প্রতিষ্ঠানের সৌভাগ্যের দিন শেষ হতে চলেছে, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এখনও যা ঘটছে তা হচ্ছে, সরকারী নীতি ও আইন অনমনীয় নির্দেশ দিলেও তারা যা চাইছে তা পেয়ে যাচ্ছে। এই রকমের দুর্ঘটনা পরিহারের জন্য আমি তাদের উৎপাদন ঠেকাবার কথা বলেছিলাম, তা হলেই নির্ধারিত নীতির অপহ্নব ঘটানোর উদ্দেশ্যে যে খিড়কি-দরজার কৌশল তারা অবলম্বন করেছে তা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করা সম্ভব হবে।

যেদিন একটি সংবাদে আমি জানতে পারলাম যে, ওয়াজির সুলতান তার উৎপাদন ৮৮৮০০ লক্ষ থেকে বাড়িয়ে ২০৬২০০ লক্ষ সিগারেটে সম্প্রসারিত করার আবেদন করেছে সেদিন থেকেই এসব শুরু হয়েছে। আমি কয়েকবার চিঠি লিখেছি এবং সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় ইউনিটেই কেবল সম্প্রসারণের অনুমতি দেবার যে সরকারী নীতি রয়েছে তা, এবং ওয়াজির সুলতানের ব্যাপারটি, যে ওয়াজির সুলতান আই টি সি-এর সাথে পারস্পরিকভাবে যুক্ত এবং যারা তাদের মধ্যে দেশের সিগারেট উৎপাদনের ৭০% নিয়ন্ত্রিত করে ও একটি একচেটিয়া গড়ে তুলেছে, সেই ওয়াজির সুলতানের ব্যাপারটি মনোপলিজ কমিশনের বিচারের জন্য পাঠানো উচিত বলে আমি সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে ব্যাখ্যা করেছি।

একবার যদি ভি এস টি-এর সম্প্রসারণ মঞ্জুর করা হয় তবে দেশীয় ক্ষেত্রে সুদিনের জন্য ১০ থেকে ২০ বছর অপেক্ষা করতে হবে, অথচ এই দেশীয় ক্ষেত্র তাকে উৎসাহ দানের জন্য সরকারের বর্তমান নীতির মুখ চেয়ে আছে।

একচেটিয়া যখনই চায় তখনই তার কাজটি যেভাবে সে চায় সেই-ভাবেই হয়ে যায়। কাজেই ভি এস টি/আই টি সি-এর মঞ্জুরী লাভের জন্য, যুগ্মপ্রচেষ্টা, সময়, অর্থ ও শ্রম ব্যয় সত্ত্বেও যখন ভি এস টি-এর আবেদন পিছিয়ে গেল এবং অতীতের মত সাফল্যের বদলে ব্যর্থতা পেল তখন স্বভাবতঃই তারা আহত ও ক্ষুব্ধ হবে। ভ্রমাত্মক ধারণা সৃষ্টির জন্য ওরা সবরকমের যুক্তির অবতারণা করে যাচ্ছে, কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয়, বাস্তব ঘটনা ও পরিস্থিতির সত্যতার ওপর ভিত্তি করে এখনও অনেক প্রত্যয়সিদ্ধ পাল্টা যুক্তি আমার কাছে রয়েছে।

উচ্চপর্যায়ের তদন্তের উপযোগী একটি বিষয়

এই বিষয়টি সম্পর্কে সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগেই আমাদের বক্তব্য পেশ করার পূর্ণ সুযোগ পাবার জন্য বিষয়টি আমি মনোপলিজ কমিশনের কাছে পাঠানোর বা অনুরূপ কোন সংস্থা দ্বারা গোপন তদন্তের প্রস্তাব দিয়েছি। আই টি সি-এর চেয়ারম্যান বলেছেন যে, আই টি সি/ভি এস টি পারস্পরিক সংযুক্ত নয়। তা হলে, এই ধরনের তদন্ত যাতে না হয় তার জন্য কেন তাঁরা সবরকমের প্রভাব খাটাচ্ছেন ও চাপ দিচ্ছেন? তাঁরা অগ্রণী বিচারকদের মতামতের কথা উল্লেখ করেছেন। আমি বলতে চাই যে, তাঁদের যেসব তথ্য দেওয়া হয়েছে তার ওপর ভিত্তি করেই তাঁদের মতামত প্রকাশ পেয়েছে; কাজেই সঠিক অভিমত পেতে হলে উভয় পক্ষ থেকেই পুরো তথ্য বিচারকদের এমন একটি সংস্থার কাছে পেশ করতে হবে যা, আমি আশা করি আপনারা স্বীকার করবেন, সংশ্লিষ্ট সকলের পক্ষেই গ্রহণযোগ্য হবে। মনোপলিজ কমিশন ইতি-পূর্বেই গঠিত হয়েছে এবং তদন্তের পক্ষে এটিই সঠিক সংস্থা হবে।

আমি একথা পরিষ্কারভাবে জানিয়েছি যে, ভি এস টি-এর বিরুদ্ধে আমি নিজে সম্প্রসারণের জন্য আবেদন পেশ না করে আমি বৈদেশিক একচেটিয়াকে মোটেই কুপোকাত করতে যাচ্ছি না, এবং সরকার কাকে বাছুনি মনে করেন—৬৭% বৈদেশিক মালিকানাধীন কোম্পানিকে, না ১০০% সম্পূর্ণ ভারতীয় মালিকানাধীন কোম্পানিকে—তা নিষ্পত্তি করার ভার আমি সরকারের ওপরই ছেড়ে দেবো। গোল্ডেন টোব্যাকো একচেটিয়া হয়ে উঠবে, বৈদেশিক একচেটিয়ার এই যে আশঙ্কা তা সত্যই কৌতুককর। আজকের বাজারে ৭০% একচেটিয়া রয়েছে যাদের তাঁরা আতঙ্কিত হয়ে উঠেছেন, বাজারের মাত্র ১৪% অংশের অধিকারী একটি ক্ষুদ্র ভারতীয় কোম্পানির আগামীকাল একচেটিয়া হয়ে উঠার ভয়ে। এই একচেটিয়াটি বাজারের তাদের ৭৫% ও তারও বেশী অংশ ভোগ করায় এত অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে যে, অন্য কারুর প্রবেশকে স্বাগত জানাতে ও একটি সুষ্ঠু প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে তাঁরা যে শুধু রাজী নয় তা-ই নয়, তাঁরা একথা চিন্তা করতেও প্রস্তুত নয়।

(পর পৃষ্ঠায় দেখুন)

ইণ্ডিয়া টোব্যাকোর ভিত্তিহীন অভিযোগ ও কুৎসার উত্তরে গোল্ডেন টোব্যাকো

(পূর্ব পৃষ্ঠার পর)

সুতরাং আমি প্রস্তাব জানাচ্ছি যে, সবচেয়ে ভাল পথ হচ্ছে বৈদেশিক একচেটিয়া এবং অন্যান্য বড় বড় ভারতীয় প্রস্তুতকারক যারা সরকারের আশঙ্কাকে পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করতে পারে তাদের উৎপাদন ঠেকানো। অবশ্য সরকারের এই আশঙ্কা অযৌক্তিক ও অকারণ। এই উৎপাদন যদি ঠেকানো যায় তা হলে বেসরকারী ক্ষেত্রে এবং রাজ্য ক্ষেত্রেও নতুন নতুন অনেক উদ্যোক্তা ব্যর্থতার আশঙ্কা থেকে মুক্ত হয়ে এই শিল্পে প্রবেশ করবে।

আই টি সি নিজের বিরুদ্ধেই বক্তব্য রাখছে

জি টি সি যা কিছু বলেছে তা-ই ভুল, একথা প্রতিপন্ন করার জন্য মিঃ হাক্সার সবরকমের ও ধরনের যুক্তি ব্যবহার করেছেন, কিন্তু যার জন্য তিনি চেষ্টা করেছেন কর্তৃপক্ষকে তা প্রমাণ করতে পারেননি। নীচে আমি যে বিস্তৃত উত্তর দিয়েছি তাতেই তা পরিষ্কার হবে। তিনি যে টুকরো টুকরো তথ্য দিয়েছেন তার সম্পূর্ণ ১০০% ভারতীয় সিগারেট শিল্পের জন্য আমার দাবির সমর্থনে যেসব বক্তব্য রেখেছিলাম তারই মত। এগুলো হচ্ছে :

(১) আই টি সি একটি একচেটিয়া, কারণ তাদের উদ্বর্তপত্র অনুযায়ী ১৪৫ কোটি টাকা বিক্রয় সর্বভারতীয় অঙ্ক ২৫০ কোটি টাকার ৬০%। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রকাশিত আন্তর্জাতিক সাপ্তাহিক পত্র 'টোব্যাকো' তাদের ৩ই জুন, ১৯৭০ তারিখের সংখ্যায় বলছেন : "ভারত—উৎপাদন ক্ষেত্রে দেশেও সিগারেটের কর্তৃত্ব অত্যন্ত কড়া থাকছে : "ভারতীয় সিগারেট-বাজারে প্রভুত্ব করে একটি বৈদেশিক নিয়ন্ত্রণাধীন কোম্পানি ইম্পিরিয়াল টোব্যাকো কোং লিঃ। মোট বাজারের প্রায় তিন-চতুর্থাংশই এই কোম্পানিটির আয়ত্তে।"

(২) আই টি সি এবং ভি এস টি যদি পারস্পরিক সংযুক্তই না হবে তবে কেন তারা মনোপলিজ কমিশনে যেতে দ্বিধা করছে? তাদের উচিত এর জন্য চাপ দেওয়া এবং নিষ্কলঙ্ক সার্টিফিকেট লাভ করা তা হলেই একটি বাধা অপসৃত হবে।

পারস্পরিক সংযুক্ত আই টি সি এবং ভি এস টি

এখন আপনাদের গোচরে আনতে চাই যে, আই টি সি এবং ভি এস টি সন্দেহাতীতভাবে পরস্পর-সংযুক্ত, কারণ:

(ক) এদের সমস্ত ইতিহাসে চেয়ারম্যান, ডিরেক্টর ও পরিচালনা বিভাগের সর্বোচ্চ কর্মকর্তা উভয় কোম্পানিতে একই এবং পারস্পরিক অদলবদল; এই ব্যাপারটি যে কেউ খোঁজ নিয়ে দেখতে পারেন;

(খ) ভি এস টি প্রস্তুত করে আই টি সি-এর উইলস ব্র্যাণ্ড এবং আই টি সি তৈরী করে ভি এস টি-এর চারমিনার—আই টি সি-এর শ্লোগান 'পরস্পরের জন্য নির্মাণ'-এর প্রতি সত্যই বিশ্বস্ত। ব্লেণ্ডিং-এর পর্যায় থেকে বাজারে পাঠানোর চূড়ান্ত পর্যায় পর্যন্ত সমস্ত পর্যায়েই তারা পরস্পরের জন্য এই কাজ করে যাচ্ছে; আবার এটিও স্মরণে রাখতে হবে যে, ব্লেণ্ডিং কাজটি হচ্ছে একটি মন্ত্রগুপ্তি, এক নিজেকে ছাড়া আর কাউকেই এটি দেওয়া চলে না। অনুরূপ ধরনের কাজের অন্যান্য ক্ষেত্রে কোন প্রস্তুতকারক সিগারেট প্রস্তুতের জন, এবং অন্যের কার্টনেতে তা প্যাক করার জন্য অপরকে কেবল ব্লেণ্ড-করা রেডিমেড কাটা তামাকই দেয়, এইভাবে ব্লেণ্ডিং গোপন রাখা হয়।

(গ) আই টি সি হচ্ছে ভি এস টি-এর ব্র্যাণ্ডগুলোর সোল সেলিং এজেন্ট; এই ব্র্যাণ্ডগুলো একই দামের তাদের নিজস্ব ব্র্যাণ্ড-গুলোর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করছে। উভয়েই যদি এক না হবে তবে আপনি কি একথা চিন্তা করতে পারেন যে, কোন প্রস্তুতকারক নিজের ব্র্যাণ্ডের বদলে অন্যের ব্র্যাণ্ডের প্রচার করবে?

(ঘ) আই টি সি/ভি এস টি, উভয়েরই জনক হচ্ছে লণ্ডনের ব্রিটিশ-আমেরিকান টোব্যাকো কোং লিঃ; এই কোম্পানি অসংখ্য সদস্য নিয়ে গঠিত একটি পরিবারের কর্তা—এই সদস্যরা সকলেই পরস্পর-সম্পর্কিত এবং মাকড়সার জালের মত পরস্পরযুক্ত। একের সঙ্গে অপরের সম্পর্ক জানতে হলে আপনাদের মূলে যেতে হবে; আপনাদের অবগতির জন্য আমি এখানে মাত্র দুটি দলিলের কথা উল্লেখ করছি—একটি, ১৯৬৯ সালে প্রকাশিত ইউ কে মনোপলিজ কমিশনের রিপোর্ট, অপরটি ওয়ার্ল্ড টোব্যাকো ডিরেক্টরি।

(ঙ) এটি কাগজে-কলমে তর্কাতীত সত্য যে, অনুমোদিত সংস্থাপিত ক্যাপাসিটির বাইরে একচেটিয়ার বাড়তি উৎপাদন রয়েছে, পক্ষান্তরে বহু দেশীয় কোম্পানির ক্যাপাসিটি অলস পড়ে আছে। অন্যের ক্ষতি করে আর্থনীতিক শক্তি কেন্দ্রীভূত করার এটি একটি নির্ভেজাল ঘটনা। তা হলে, অন্যরকম প্রমাণ করবার জন্য কেন এসব যুক্তি ও অপ্রাসঙ্গিক কথা তোলা হচ্ছে? ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ টেকনিক্যাল ডেভেলপমেন্টের দলিলপত্র থেকে আপনারা প্রকৃত ঘটনা যাচাই করে নিতে পারেন।

(চ) আই টি সি দেশের একটি বোকা—কর্তাাংশ, তামাক ও অন্যান্য জিনিস আমদানী, ডিভিডেণ্ড প্রেরণের জন্য পাহাড় পাহাড় গড়ে তোলা, মূলধনে পরিণত পুঞ্জীভূত ও ট্রেডমার্ক ইত্যাদির ওপর লভ্যাংশ হিসাবে অর্থ প্রেরণ—এত সবের আকারে মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় সে ঘটাচ্ছে। এই অপচয়কে ঢাকা দেবার জন্য আই টি সি বিভ্রান্তিসৃষ্টিকারী এমন সব বিজ্ঞাপন প্রকাশ করছে যেগুলোতে নিজেকে বৈদেশিক মুদ্রার নীট অর্জনকারী বলে দেখানো হচ্ছে—দাও করা হচ্ছে নিজস্ব সামান্য ২ লক্ষ টাকা মূল্যের সিগারেট রপ্তানির সঙ্গে ১০০% একটি ব্রিটিশ কোম্পানির শাখা ইণ্ডিয়ান লীফ টোব্যাকো ডেভেলপমেন্ট কোম্পানির অর্জিত ১১৮ লক্ষ টাকা যোগ করে, যার মোট যোগফল হচ্ছে ১০ কোটি টাকা; এই কোম্পানিটিকে আবার পরিচয় দেওয়া হচ্ছে ভ্রাতৃ-কোম্পানি বলে। তুলনায় কি চমৎকার দৃষ্টান্ত!

(ছ) ভি এস টি, আমার মনে হয়, কেন্দ্র; আই টি সি এত বিচলিত হয়ে উঠছে কেন? আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি, ভি এস টি নীরব কেন, আই টি সি-ই বা তার পক্ষ হয়ে সওয়াল করছে কেন এবং আই টি সি-এর চেয়ারম্যান তার মুখপাত্র হয়ে উঠলেন কেন? এটিই কি যথেষ্ট প্রমাণ নয় যে, তারা পরস্পর সম্পর্কিত?

গোল্ডেন টোব্যাকোর বিরুদ্ধে কুৎসা

এখন আলোচনা করবো জি টি সি-এর বিরুদ্ধে আই টি সি-এর কুৎসা রটনা সম্পর্কে। বস্তুতঃপক্ষে, দুটি কোম্পানির মধ্যে তুলনা করার ব্যাপারে মিঃ হাক্সারের বক্তব্যে শুধু আমাদের ক্ষতি করার ও আমাদের ভাবমূর্তিকে কলঙ্কলেপন করার চেষ্টা ছাড়া কোন যুক্তি আমি দেখতে পাচ্ছি না। এ ব্যাপারেও তিনি সফল হয়েছেন বলে আমার সন্দেহ আছে। তবু, আমার প্রতিক্রিয়া আপনাদের জানাচ্ছি এবং কে যে কি তার বিচারের ভার আপনাদের ওপরই ছেড়ে দিচ্ছি।

১) জি টি সি চমৎকার অগ্রগতি লাভ করেছে—আই টি সি-এর চেয়ে অনেক বেশী। আপনাদের অবগতির জন্য আরও জানাচ্ছি, আমি কখনও এ তথ্যের বিরোধিতা করিনি যে, আই টি সি/ভি এস টি শতকরা হিসেবে সিগারেটের ক্রমবর্ধমান বাজারের সবটুকু দখল করে নিয়েছে। স্বাধীনতার পর থেকে বর্ধিত চাহিদার ৮০%-ই চলে গিয়েছে এই এক-চেটিয়া গোষ্ঠীর মালিকানাধীন ফ্যাক্টরিগুলোর কবজায়।

আপনার যদি ১০ টাকা মূলধন থাকে এবং কোন এক সময়কালে যদি আপনি ১০ টাকা আয় করেন তবে আপনার ১০০% বেড়ে

(পর পৃষ্ঠায় দেখুন)

ইণ্ডিয়া টোব্যাকোর ভিত্তিহীন অভিযোগ ও কুৎসার উত্তরে গোল্ডেন টোব্যাকো

(পূর্ব পৃষ্ঠার পর)

গেল। কিন্তু আপনার যদি ১০ কোটি টাকা মূলধন থাকে এবং আপনি যদি ১ কোটি টাকাও আয় করেন, তবে তা বাড়লো মাত্র ১০%। এই একই সময়কালে ১০ টাকা ও ১ কোটি টাকা আয়ের পার্থক্যটা উপলব্ধি করতে পারলেন তো? তা হলে আপনি—একই রকমভাবে যে-কোন ভারতীয়—কি চাইবেন যে, পশ্চিমবঙ্গে ভারতীয় বাজারের কল্যাণ বিদেশী বিনিয়োগকারীদের মুখ চেয়ে থাকুক? এখনই কি এসব বন্ধ করা হবে না?

(২) আমি বিস্মিত হয়ে যাচ্ছি যে, একচেটিয়া অবস্থা সত্ত্বেও বৈদেশিক একচেটিয়া জি টি সি থেকে কম লাভ দেখায়, অথচ জি টি সি-কে একসর্বাপেক্ষাঅধিক প্রতিযোগীর সঙ্গে লড়াই করতে হচ্ছে। জি টি সি-এর মুনাফার হার ১·৫%, তার সঙ্গে তুলনীয় আই টি সি-এর মুনাফা ৬·৪%, অর্থাৎ শতকরা ভিত্তিতে ৫০% বেশী। সঠিক মুনাফা দেখানো কি অপরাধ? আমরা স্বীকার করি যে, বিদেশে আমাদের ইচ্ছুক ও সহযোগিতামূলক শেয়ারহোল্ডার নেই, যারা সস্তা দরে তামাক কিনে আমাদের মুনাফার বোঝা হ্রাস করে আমাদের বাধিত করবে কিংবা এই শিল্পের সর্বক্ষেত্রে একচেটিয়া অধিকার বজায় রাখবার জন্য বহুস্তর ও মোটা বেতনভোগী কর্মচারীমণ্ডলী আমরা পুষি না। যদি তদন্ত করা যায়, তবে সমগ্র বিষয়টি চমকপ্রদ তথ্য উদ্‌ঘাটিত করবে।

ক্রমবর্ধমান সম্প্রসারণ লাভের শর্তে ভারতীয়করণ একচেটিয়ার কবজাকেও জোরদার করে তুলবে এবং বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় বাড়িয়ে দেবে। ডি এস টি ৮৮৮০০ লক্ষ থেকে ২০৬২০০ লক্ষ, অর্থাৎ ২৫০% সম্প্রসারণ লাভের জন্য বৈদেশিক শেয়ার ভারতীয় জনসাধারণের কাছে বিক্রী হবে না, বরঞ্চ ৬৭% থেকে ৪৯/ কিংবা তারও কম অর্থাৎ ১৮%-এর মত অতিরিক্ত ইকুইটি ইস্যু করে যদি বিদেশী শেয়ার মালিকানা হ্রাস করার প্রস্তাব দেয়, তবে দেশীয় সিগারেট শিল্পে তার অর্থ উপলব্ধি করা যে কারুর পক্ষে সহজ। সবটাই হচ্ছে বাজারের সামঞ্জস্যহীন বৃহত্তর লাভের উদ্দেশ্যে ভারতীয় শেয়ারমালিকানার নামমাত্র বৃদ্ধি কার্যকর করার খেলা। আই টি সি যেসব বিষয়ের উপর রহস্যের সৃষ্টি করেছে এবং আমি সেগুলো একটি-একটি করে ব্যাখ্যা করবো।

রহস্য-বনাম-ঘটনা

রহস্য-বনাম-ঘটনা

৩১শে আগস্ট, ১৯৭০ তারিখে অনুষ্ঠিত সাংবাদিক সম্মেলনে মিঃ হাকসার ইণ্ডিয়ান সিগারেট ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন এবং গোল্ডেন টোব্যাকোর বিরুদ্ধে একটি সুদৃশ্য আক্রমণ চালিয়েছেন। কুৎসা রটনার অভিযানে তিনি যেসব প্রশ্ন তুলেছেন সেগুলো সম্পর্কে আমি নীচে সত্য বিবরণ জানাচ্ছি।

ক ১। আই সি এম এ—দি সিগারেট ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশনের আছে ১০টি সদস্য, পক্ষান্তরে নবগঠিত ইণ্ডিয়ান সিগারেট ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য হচ্ছে ছয়টি সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় সংস্থার সব কয়টি। এই সংস্থাগুলোর নাম:

(১) ক্রাউন টোব্যাকো কোং,
(২) গোল্ডেন টোব্যাকো কোং প্রাইভেট লিঃ,
(৩) দি হায়দরাবাদ ডেকান সিগারেট ফ্যাক্টরি,
(৪) মাস্টার্স টোব্যাকো কোং (ইণ্ডিয়া),
(৫) এম জি আগরওয়াল,
(৬) ইউনিভার্সাল টোব্যাকো কোং।

অন্যান্যরাও পরে যোগ দিতে পারে।

২। আই সি এম এ গঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে, কারণ উৎপাদনের ২০%-এর প্রতিভূ সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় মালিকানাধীন কন্ট্রোলের কণ্ঠ কোন সময়ই শোনা যায় নি। শক্তিশালী বৈদেশিক একচেটিয়া এবং সি এম এ সহ শিল্পের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে তার সর্বব্যাপক প্রভাবের বিরুদ্ধে এই সংগঠনের বলার কিছু নেই। সি এম এ-তে আমার ভোটের অধিকারের মধ্যে কোন সমতা নেই।

আই সি এম এ গঠনের ফলে তার সমস্যা ইতোমধ্যেই সুফল পেয়েছে। গত মাসে সি এম এ-এর সভায় বৈদেশিক একচেটিয়ার প্রতিনিধিরা বেশ ভদ্রভাবেই প্রশ্ন করলেন, "ভারতীয় ক্ষেত্রে উৎপাদনে কোথায় আমরা ব্যর্থ হয়েছি এবং আমাদের কি করতে হবে?"

লৌলিনারি, কারিগরী কলাকৌশল সরবরাহ করে, সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করে ও বিপণন করে, অর্থের যোগান দিয়ে ভারতীয় সিগারেট প্রস্তুতকারকদের সাহায্য করার লোভনীয় প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। মিঃ হাকসার তাঁর ভাষণে বলেছেন, একটি কোম্পানি, যে নাকি খুঁড়িয়ে চলছিলো তাকে সাহায্যের অসম্ভব প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। ফলে পরিস্থিতির চাপে সর্বাধিক সুবিধা লাভের আশায়, দীর্ঘকাল যারা সাহায্য করে এসেছে কোম্পানিটি তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়। আমি আশা করি, আই সি এম এ বা সি এম এ-র অন্যান্য সদস্যও বৈদেশিক একচেটিয়ার কাছ থেকে নিকট ভবিষ্যতে অনুরূপ সুবিধা আদায় করবে।

খ ১। জি টি সি-এর বিরুদ্ধে আই টি সি-এর কুৎসা

আই টি সি যাকে 'কুৎসার অভিযান' বলে আখ্যাত করেছেন তা দেশীয় সিগারেট শিল্পের দুর্দশা সম্পর্কে যে পূর্ণ বিবরণ আমি জনসাধারণ ও সরকারের সমক্ষে উপস্থিত করেছি তাছাড়া আর কিছু নয়। শোষণই যাদের কাছে জীবনধারা হয়ে উঠেছে, তারা স্বভাবতঃই এতে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে। আমি এখানে বলতে চাই যে, অতীতের মত এখনও আমি আপনাদের কাছে এবং জনসাধারণের কাছে শুধুমাত্র প্রকৃত ঘটনাই উপস্থাপিত করছি। আমি এগুলো এখনও বলছি এবং সব সময়ই বলবো।

২। আমাদের কাছে এটা খুবই বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, দেশীয় সিগারেট প্রস্তুতকারকদের পক্ষ থেকে আমরা যেসব সরল বাস্তব বিষয় উত্থাপন করেছি তা আমাদের বিরুদ্ধে অসহিষ্ণু আক্রমণ চালাতে আই টি সি-এর চেয়ারম্যানকে প্ররোচিত করলো। আমরা যা বিবৃত করেছি, তা যদি কুৎসা রচনা হয়, তবে তাঁর প্রতিক্রিয়া বর্ণিত করবার মত ভাষা আমরা খুঁজে পাচ্ছি না। বহু ব্যাপারে তিনি গোল্ডেন টোব্যাকোর এবং তার ভাবমূর্তির যে ক্ষতি করেছেন তার জন্য তাঁকে জবাবদিহি করতে হবে।

৩। গোল্ডেন টোব্যাকো কোং—তার কার্যকর্ম

বিক্রয় ও উৎপাদন ব্যাপারে আমাদের সাফল্য সম্পর্কে তিনি যেসব ঘটনা ও তথ্য উপস্থাপিত করেছেন তার জন্য আমরা বস্তুতই কৃতজ্ঞ। একথা খুবই সত্যি যে, অতি সাধারণভাবে আমরা যাত্রা শুরু করেছিলাম; সমগ্র বিশ্বে ব্যবসা ও শিল্পক্ষেত্রের বহু গুরুত্বপূর্ণ সংস্থাই এইভাবে শুরু করেছিল।

গোল্ডেন টোব্যাকো যে অগ্রগতি লাভ করেছে, পরিষ্কার ভাষায় তা খুবই প্রশংসার্হ। কিন্তু তুলনামূলক বিচারে আরও ক্রমসম্প্রসারণশীল সিগারেট বাজারে গোল্ডেন টোব্যাকোর মাত্র ১৪% অংশ রয়েছে। আই টি সি-এর পরিসংখ্যানে ১৯৫৮-৭০ সালের মধ্যে জি টি সি-এর বিক্রয়/মুনাফা ১১৫০০% বেড়েছে বলে যে দেখানো হয়েছে তা যেন কচ্ছপের সেই কাহিনী—যাতির ওজন ৭ পাউণ্ড থেকে ১৪০ পাউণ্ড অর্থাৎ ২০০০% বৃদ্ধি পেয়েছে এবং নিজের ওজন করে দেখে বলে ঠাকুরমার আক্ষেপ।

পানামার বিজ্ঞাপনের সঙ্গে আপনারা পরিচিত। এই সিগারেট এখন দেশের সব জায়গাতেই পাওয়া যায়। এটি হলো এই শ্রেণীর সবচেয়ে বেশী বিক্রীত ব্র্যাণ্ড। এই লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য যে সময়, অর্থ ও শ্রম ব্যয় করতে হয়েছে তা সহজেই আপনারা অনুমান করতে পারেন। বৈদেশিক একচেটিয়ার প্রতারণার ব্যবসায়ী মহলের অনুসৃত অশোভন রীতিনীতি ও অসহযোগিতামূলক মনোভাব তাদের কাছেই অকল্পনীয়। আর অন্তুকম্পাকে দুঃখ-দুর্দশার ভিতর দিয়ে অগ্রসর হয়নি। পরা-টেপা প্রতিযোগিতাও সমান হস্তক্ষেপকারী, যেমন দেখা গিয়েছে পানামা সিগারেটের বিক্রী ছিনিয়ে নেবার জন্য বাজারে প্রবর্তিত বিভিন্ন শিল্পজাত ব্র্যাণ্ডের—যথা আমেরিকান ক্লাব, অতিরিক্ত ফিল্টার আকর্ষণযুক্ত সিজার্স, অতিরিক্ত লম্বা প্যাকেট কিংস সাইজ, উইলস ২০টির প্যাকেটে প্যাক্ড ক্যাপস্টান ব্র্যাণ্ড, ফিল্টারসহ উইলস ফ্লেক ইত্যাদি—ব্যবহার।

উপসংহারে উল্লিখিত ইত্যাকার হুমকি, বিক্রয় ও অন্যান্য অনেক বড় বড় বিষয় সম্পর্কে আমি শুধু এই কথাই বলতে চাই যে, গোল্ডেন টোব্যাকো ঠিক হাজার লক্ষ্য স্থাপন করে চলেছে মুনাফা ছাড়িয়ে। যে লাভাংশ ঘোষণা করা হয়েছে তা ৩০%-এর কম

(পর পৃষ্ঠায় দেখুন)

ইণ্ডিয়া টোব্যাকোর ভিত্তিহীন অভিযোগ ও কুৎসার উত্তরে গোল্ডেন টোব্যাকো

(পূর্ব পৃষ্ঠার পর)

এবং ৭০% নেওয়া হয়েছে রিজার্ভে। তার সঙ্গে তুলনীয় বৈদেশিক একচেটিয়া লাভাংশ ঘোষণা করে মুনাফার ৭৫% ছাড়িয়ে দিয়েছে, এবং গত বছর পর্যন্ত লাভাংশের ৯০% চিরদিনের মত দেশ থেকে চলে গেছে। তারা যদি আমাদের মত অল্প পরিমাণ লাভাংশ ঘোষণার নীতি অনুসরণ করতো তবে আরও ভাল কাজকর্ম তারা করতে পারতো এবং বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় বর্তমানের এক-তৃতীয়াংশ হতো।

ঠিক একইরকমভাবে, আমি অবাক হয়ে গেছি যে, সম্প্রতি এবং বৈদেশিক একচেটিয়ার সঙ্গে প্রতিযোগিতার বাধা সত্ত্বেও জি টি সি-এর মুনাফা-যোগ্যতা আই টি সি অপেক্ষা বেশী। এটি কিভাবে ঘটলো আপনাদের তা অনুধাবনের জন্য আমি সেসব বিষয় আপনাদের ওপরই ছেড়ে দিচ্ছি: এর কারণ কি মোটমাট অধিক হারে দাম, না এমন কোন জোরাগলি রয়েছে যার ভিতর দিয়ে অর্থ অদৃশ্য হয়ে যায়? এই টাকা কি এখনও আমাদের দেশে রয়েছে, না চিরদিনের মত দেশ থেকে চলে গেছে? এ কখনই হতে পারে না যে, বৈদেশিক একচেটিয়া অল্প লাভে সন্তুষ্ট হবে কিংবা ক্রেতাকে তার অর্থের অধিকতর মূল্য দেবে। ভারতীয় কোম্পানিই একচেটিয়ার হাতে পড়ে অসুবিধা ভোগ করছে, তার আংশিক কারণ একচেটিয়া তার আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিত ব্র্যাণ্ডের জন্য—যেসব ব্র্যাণ্ড ভারতীয় সিগারেটের সঙ্গে প্রতিযোগিতার সরাসরি বাজারে ছাড়া হয়েছে—যে প্রিমিয়াম দাবি করতে পারে তা।

৪। গোল্ডেন টোব্যাকোর সমৃদ্ধি

আই টি সি যে আমাদের কল্যাণ কামনা করেছেন তা বেশ উত্তম।

১৯৫৫-৫৬ সালের ৫ লক্ষ টাকা মূলধন এবং পরবর্তীকালে এর বৃদ্ধি সম্পর্কে বক্তব্য এই যে, আগেই বলা হয়েছে এর কারণ আমাদের মুনাফা রেখে দেওয়া ডিভিডেণ্ড দেওয়া নয়। ১৯৫৫-৫৬ সালের বদলে গোল্ডেন টোব্যাকো যে বছর স্থাপিত হয়েছে, যখন তার মূলধন ছিলো সিক্সটি-ফাইভ ৫০০০ টাকা—এও আমার ধার-করা মূলধন, সেই বছরকে যদি মিঃ হাকসার সূচক বছর হিসাবে ধরতেন তা হলে সাফল্যের ঘটনা হার হিসাবে যার বলা যেতো—এ যে অন্তর স্পর্শ করতো!

আমি জানতে চাই, আই টি সি বা তার জনক কোম্পানি বি এ টি প্রথমে যখন ভারতে এলো তখন মূলতঃ কি পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা তারা নিয়ে এসেছিলো, কত হাজার গুণ তারা ফিরিয়ে নিয়েছে এবং বর্তমানে তার চিহ্নই বা কি।

৫। আই টি সি সত্ত্বেও জি টি সি-র সমৃদ্ধি

গোল্ডেন টোব্যাকোর অগ্রগতি থেকে আই টি সি যে সিদ্ধান্ত টেনেছে তা হচ্ছে দেশীয় প্রস্তুতকারকদের অগ্রগতি বৈদেশিক একচেটিয়া দ্বারা কোনভাবেই বিঘ্নিত বা ব্যাহত হচ্ছে না। আমি বলতে চাই যে, একচেটিয়া সত্ত্বেও জি টি সি-এর অগ্রগতি হয়েছে। এই ব্যাপারে অনেক কিছুই ঘটেছে। ক্রেতারা বিবেচনার মধ্যে আনলেন বিক্রয় সামগ্রীর কোয়ালিটি ও মূল্য এবং ব্যবসায়ীরাও একচেটিয়ার অবদমনমূলক পদ্ধতি ও একচেটিয়া যে সামান্য কমিশন দিয়ে তাঁদের সন্তুষ্ট থাকতে বাধ্য করতো তার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ হিসাবে জি টি সি-কে সমর্থন করতে লাগলেন।

৬। সিগারেট শিল্পে গোল্ডেন টোব্যাকোর ভূমিকা

গোল্ডেন টোব্যাকো সবসময়ই দেশীয় ক্ষেত্রের স্বার্থ তুলে ধরেছে, ফলে বৈদেশিক একচেটিয়ার দৃষ্টি হয়েছে মর্মবেদনা ও অসন্তোষ।

আপনাদের একটি উদাহরণ দিচ্ছি—জিটি সি কর্তৃক ১৯৬০ সালে প্রকাশিত ভারতের প্রথম কয়েকটি পৃষ্ঠার দেশীয় সিগারেট শিল্পের সম্ভাবনা ও চাষবাস সম্ভাবনা, ২০০টি ফ্যাক্টরীর বন্ধ ইত্যাদির কথা বিবৃত হয়েছে। আই টি সি-এর কাছে এটি হলো চক্ষুশূল। মিঃ হাকসারের পূর্বসূরীরা এই ধরনের কাজে লিপ্ত থাকবার জন্য বহুবার অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। এ বিষয়ে তিনি তাঁর নিজের প্রতিষ্ঠানের কাগজ-পত্রেই তার প্রমাণ পাবেন।

(ক) হিট, ক্লাব ও রয়াল হিট নামে ব্রাউন সিগারেট প্রস্তুতে রত দুটি ক্ষুদ্র প্রস্তুতকারকের সঙ্গে গোল্ডেন টোব্যাকোর প্রতিযোগিতার উদ্ভব একটি সেরা সাজানো গল্প। স্বয়ং আই টি সি গোল্ডেন টোব্যাকোর ভাজ ছাপ এবং অন্য দুটি ক্ষুদ্র কোম্পানির হিট ক্লাব ও রয়াল হিট বিলুপ্ত করে দেবার উদ্দেশ্যে ব্রাউন কাগজে ও একই নামের ফেভা ও বনরাজ প্রভৃতি ব্র্যাণ্ড যে বাজারে ছেড়েছে তার কথা কিন্তু মিঃ হাকসার স্মরণে রাখবার প্রয়োজন মনে করেন নি। এও বেশ কৌতুককর যে ভাজ ছাপ প্রবর্তিত হয়েছিল ১৯৩৫ সালে এবং মিঃ হাকসার এখন যে মর্যাদা তাকে দিচ্ছেন সে মর্যাদা কিন্তু সে কখনও পায়নি।

একথা জেনে আপনারা সুখী হবেন যে, কয়েক বছর আগে আমরা সাদা কাগজে ভাজ ছাপ প্রবর্তিত করি এবং সেই সময় থেকেই আমাদের ব্রাউন ভাজ ছাপ-এর বিক্রী যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পায়, কিন্তু এর সুবিধা লাভ করে অন্যান্য সাদা কাগজের ব্র্যাণ্ড—দুটি ক্ষুদ্র প্রস্তুতকারক সে সুবিধা পায়নি, তারা এখনও ব্রাউন-কাগজের ব্র্যাণ্ড বিক্রী করছে।

(খ) একথা ঠিক যে, গোল্ডেন টোব্যাকো কোন পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি নয়, কিন্তু তাই বলে গোল্ডেন টোব্যাকোর সম্পদের ভাগীদার যে ভারতীয় জনসাধারণ নয় তা মোটেই সত্য নয়। গোল্ডেন টোব্যাকো মালিকদের মধ্যে মালিকানাযুক্ত কোম্পানি হিসাবে সব চাইতে বেশী দানে আবদ্ধ রয়ে। আমাদের শেয়ার মূলধনের প্রায় ১৭% রয়েছে একটি পাবলিক চ্যারিটেবল ট্রাস্টের হাতে এর জন্য কোন অর্থ তাকে বিনিয়োগ করতে হয়নি—এই ট্রাস্ট গঠিত হয়েছে জনহিতের উদ্দেশ্যে। এর সঙ্গে তুলনা করুন আই টি সি-এর শেয়ারের জন্য ভারতীয় শেয়ার-হোল্ডারকে শেয়ারের লিখিত মূল্য ছাড়াও ৩০% প্রিমিয়াম দিতে হয়েছে। তা সত্ত্বেও মোট মূলধনের ২৫%-এর মত শেয়ার ভারতীয়দের হাতে আছে এবং আই টি সি-র বোর্ড অব ডিরেক্টর্সে তাদের কোন প্রতিনিধি নেই।

(গ) গোল্ডেন টোব্যাকো তামাকের উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে: তামাক উৎপাদনকারী এলাকার জনসাধারণই সে কথা বলবে। এই ক্ষেত্রে আমাদের প্রবেশের ফলে তারা উপকৃতই হয়েছে, এতদিন তা ইণ্ডিয়ান লীফ টোব্যাকো ডেভেলপমেন্ট কোং-এর পূর্ণ প্রভুত্বাধীন ছিল—এই কোম্পানিটি আবার আই টি সি-এর সহযোগী এবং উভয়ের একই মূলে বি এ টি।

কাজেই এখন চাষীরা একচেটিয়ার চাইতে বেশী দাম, অধিকতর সুযোগ-সুবিধা ও অধিকতর ভাল ব্যবহার পাচ্ছে—এসব তারা আগে পেতো না।

(ঘ) ভারতীয় সিগারেটের রপ্তানি উন্নয়নের প্রশ্নে গোল্ডেন টোব্যাকো তাদের ব্র্যাণ্ডগুলো রাশিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া, আফগানিস্তান, গাম্বা কঙ্গো, ইন্দোচীন, কোরিয়া, ইউ এস এ প্রভৃতির মত পৃথিবীর কয়েকটি দেশে ব্যাপকভাবে প্রবর্তন করে এ ব্যাপারে অগ্রদূত হতে পেরেছে বলে ন্যায়সংগতভাবেই গর্ব অনুভব করে।

চেকোস্লোভাকিয়ার সঙ্গে প্রায় তিন বৎসরকাল আমরা ভাল ব্যবসা করেছিলাম। কিন্তু বৈদেশিক একচেটিয়া আমাদের উৎখাত করার জন্য যখন দামের লড়াই শুরু করলো তখন আমরা আমাদের দাম কমিয়ে দেশের মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রার ক্ষতিসাধন অপেক্ষা বরং মাঠটি আমাদের হাত থেকে চলে যেতে দেওয়াই শ্রেয় মনে করি।

তামাক রপ্তানির ক্ষেত্রেও গোল্ডেন টোব্যাকো প্রথম দুটি চীনা ও রুশ প্রতিনিধি দলের মনে এই বিশ্বাস স্থাপনের কৃতিত্ব দাবি করতে পারে যে, ভারতীয় তামাক বেশ ভাল এবং তাঁদের দেশে সিগারেট প্রস্তুতের জন্য এই তামাক ব্যবহার করা চলবে। এই দুটি দেশ আগে

(পর পৃষ্ঠায় দেখুন)

CENTRAL LIBRARY

ইণ্ডিয়া টোব্যাকোর ভিত্তিহীন অভিযোগ ও কুৎসার উত্তরে গোল্ডেন টোব্যাকো

(পূর্ব পৃষ্ঠার পর)

কখনও ভারতীয় তামাক ব্যবহার করেনি। কিন্তু এতে এই দেশগুলিতে অযথা অনেকের মনোভাবের সৃষ্টি হয়। বৈদেশিক একচেটিয়া এবং তার আন্তর্জাতিক যোগসূত্রগুলি থেকে তীব্র প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও আমরা যুক্তরাজ্য, ইউরোপের দেশগুলি ও জাপানে বছরের পর বছর আমাদের তামাক রপ্তানি বাড়াইয়া চলিয়াছি।

(ঙ) আমরা সবসময়েই বিশ্বাস করি যে, ভারত সরকার আমদানী প্রতিকল্পের নীতি সার্থকভাবে সূচিত ও প্রয়োগ করেছেন। এই নীতি এখনও অনুসৃত হচ্ছে। কিন্তু মিঃ হাক্সারের ভাষণ পাঠ করলে দেখা যায়, সিগারেট শিল্পের উন্নতির জন্য আই টি সি যেন বস্তুতপক্ষে দায়ী। বাস্তব ঘটনা হচ্ছে, গ্যারাণ্টি ও উচ্চ মূল্য দিয়ে, আমদানী প্রতিকল্পের বিকাশের নিজ নিজ সহযোগীদের আমন্ত্রণ জানিয়ে আই টি সি কেবল নিজের জন্য ও তার সহযোগীদের জন্য এই শিল্পের ওপর শীর্ষস্থ একচেটিয়ার কব্জাই সৃষ্টি করেছে। বিনষ্ট জনস্তে এটি সপ্রমাণিত হবে।

এই ধরনের আমদানী প্রতিকল্প আমাদের ওপর চাপিয়ে দেবার জন্য আমরা সময় সময় সরকারের ওপর দোষারোপ করে থাকি। কারণ, এর ফলে আমরা এমন সব মেশিনারি ও মালপত্র নিতে বাধ্য হই, গুণের দিক দিয়ে যেগুলো নীচু মানের অথচ দাম বেশী। এখন পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে, প্রকৃত অপরাধী হচ্ছে আই টি সি।

(চ) সিগারেট শিল্পের জন্য দেশীয় মেশিনারির উন্নয়ন বৈদেশিক একচেটিয়া ও তার আন্তর্জাতিক সংযোগ ও সহযোগিগণ কর্তৃক একান্তভাবে একচেটিয়া কব্জার ভিতর এনে ফেলেছে। এই ক্ষেত্রে গোল্ডেন টোব্যাকো কোন ভূমিকা পালন করেনি বলে এখন দোষ দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু এটা কি গোল্ডেনের দোষ, না একচেটিয়ার দোষ, যারা সিগারেট শিল্পের ওপর নিজেদের প্রভুত্ব বাড়াবার জন্য তাদের সহযোগীদের আমন্ত্রণ জানিয়েছে। ইম্পিরিয়াল টোব্যাকোর সৃষ্ট এই শীর্ষস্থ একচেটিয়া সম্পর্কে অবহিত হওয়া উচিত।

(ছ) মিঃ হাক্সারের ধারণা এই বলেই মনে হয় যে, পরিচালকমণ্ডলীর এবং পেশাধারী ম্যানেজারদের ট্রেনিং ও উন্নয়ন কেবল এই উদ্দেশ্যেই বিশেষভাবে স্থাপিত শিক্ষা কেন্দ্রগুলোর মাধ্যমেই সম্পন্ন হতে পারে। প্ল্যাণ্টের ভিতর এবং কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে লব্ধ ট্রেনিং-এর মারফতও ম্যানেজারিয়াল ক্যাডারদের উন্নয়ন সমানভাবে সম্ভব। ছোট ছোট প্রস্তুতকারকরা আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কেন্দ্রের বিলাসিতা বহন করতে পারে না, কারণ এগুলো অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য। কেবলমাত্র বড় বড় কোম্পানিই এগুলোর ব্যয়ভার বহন করতে সক্ষম।

যাই হোক, স্বয়ং মিঃ হাক্সারের উল্লেখিত মত গোল্ডেন টোব্যাকোর অগ্রগতিতে এই যুক্তি মেনে নিতে হয় যে, এই কোম্পানির পরিচালনা মোটেই খারাপ নয়। পেশাধারী ম্যানেজার বা শুধু ম্যানেজারই বলুন, অথবা অন্য যে-কোন আখ্যাই দিন না কেন, যে পর্যন্ত তাঁরা তাঁদের কাজে প্রীতি সমর্পিত মন থাকবেন ও সুষ্ঠুভাবে কাজ করতে সক্ষম হবেন সে পর্যন্ত নামের জন্য কিছু যায়-আসে না।

(জ) এই শিল্পে গবেষণা সম্পর্কে কিছু বলার আগে আমরা জানতে চাই আই টি সি কর্তৃক ভারতে কোন গবেষণার কাজ করা হয়েছে। আমাদের ধারণা যে, আসল গবেষণা হয় লণ্ডনে এবং এখানে তাদের যে লেবরেটরি আছে তার উদ্দেশ্য শুধু কাঁচা মালের সরবরাহ যাচাই করা।

বৈদেশিক কলাকৌশলের কোন সুবিধা আমাদের নেই। বস্তুতঃ এটি আমাদের দিতে অস্বীকার করা হয়েছে এবং সব সময় আমাদের নিজেদের উদ্ভাবনী শক্তি নিয়েই কাজ করতে হয়েছে। কিন্তু যে গবেষণাই আমরা করে থাকি না কেন তা আমাদের নিজস্ব এবং আমাদের উৎপন্ন দ্রব্যই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। জনসাধারণই বিচার করবেন, বহুকথিত এই ক্ষেত্রে আমরা পিছিয়ে পড়ে আছি কিনা।

(ঝ) তামাক-চাষীদের সাহায্যদানের ব্যাপারে গোল্ডেন টোব্যাকোর অবদানের কথা হয়তো আই টি সি-এর চেয়ারম্যানের জানা নেই। এ ব্যাপারটি চাষীদের কাছ থেকেই জানা যাবে এবং আমি এ বিষয়ে নিশ্চিত যে, তারা সবসময়েই একথা বলবে যে সাম্প্রতিক এক্ষেত্রে গোল্ডেন টোব্যাকোর আসার আগে পর্যন্ত তারা নির্মমভাবে শোষিত হতো। গোল্ডেন টোব্যাকোর ক্রমবর্ধমান চাহিদা ও অংশগ্রহণ সত্ত্বেও এখনও তারা শোষিত হচ্ছে। তামাক চাষীরা এবং রপ্তানীকারকরা এখনও আই টি সি-এর প্রাক্-প্রতিষ্ঠান আই এল টি ডি-এর প্রভুত্বাধীন এবং তাদের দ্বারা শোষিত হচ্ছে। আরও অধিক সংখ্যায় ভারতীয় সিগারেট প্রস্তুতকারী যখন উদ্ভূত হবে তখনই এই সমস্যার স্বতঃই সমাধান হয়ে যাবে। যখন পরস্পর প্রতিযোগী আরও অনেক আগ্রহী ক্রেতা দেখা দেবে, তখনই ভারতীয় চাষীরা ও তামাক-ব্যবসায়ীদের পক্ষে যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবসার সম্ভাবনা সৃষ্ট হবে।

(ঞ) মনে হচ্ছে, গোল্ডেন টোব্যাকোতে শ্রমিক ইউনিয়ন না থাকাটা আই টি সি-এর পক্ষে যন্ত্রণাদায়ক হয়ে উঠেছে। কিন্তু শ্রমিক ইউনিয়ন না থাকার অর্থ এই নয় যে, গোল্ডেন টোব্যাকোতে সমষ্টিগত দরকষাকষি নেই। আপনারা জেনে সুখী হবেন যে, জি টি সি-এর শ্রমিকদের ওয়ার্কার্স কমিটির বৈঠক বেশ নিয়মিতভাবে বসে এবং তাতে সমষ্টিগত দর-কষাকষির মনোভাব নিয়ে সমস্যাবলীর সমাধান বের করা হয়।

কোন স্বাভাবিক মানুষই এমন কথা কি চিন্তা করতে পারে যে, আজকের দিনে যে-কোন জায়গায় কোন শিল্প-শ্রমিক মিঃ হাক্সারের বর্ণিতমত বোবা হয়ে থাকে?

আগেই বলা হয়েছে গোল্ডেন টোব্যাকো যা চায় তা হচ্ছে, বৈদেশিক একচেটিয়ার ক্ষতিসাধন না করে বাজারের বিদেশী অধিকৃত ৮০% অংশ ধীরে ধীরে ও ক্রমান্বয়ে হাতে করে আসে তার জন্য অনেক আরও ভারতীয় সিগারেট ফ্যাক্টরির সৃষ্টি হোক। অবশ্য, তারা যদি দেশের আইনের বিরোধী কোন কাজ করে বা করে থাকে তার জন্য অবশ্যই শাস্তি দিতে হবে। আর তা না হলে এটাই আমরা আশা করবো ও কামনা করবো যে তারা তাদের দীর্ঘ শ্রমের ফল ভোগ করুক। কিন্তু তাই বলে এর অর্থ এই দাঁড়ায় না যে, অবাধে তাদের বেড়ে উঠতে দেওয়া হবে, এবং দেশীয় কোম্পানীগুলোর বিকাশই ব্যাহত হবে।

৭। ইতিপূর্বেই একচেটিয়া আই টি সি ভয় করছে জি টি সি-এর ভবিষ্যৎ বৃদ্ধিকে

মনে হয় যেন বৈদেশিক একচেটিয়া ভয় করছে যে, বাজারের মাত্র ১৪% অংশ নিয়ে একটি ভারতীয় কোম্পানি একচেটিয়া হয়ে উঠবে। স্বভাবতঃই নিজেদের একচেটিয়া যাতে হারাতে না হয় তার দুশ্চিন্তার জন্য তারা এতরকম কল্পনা করতে পারে, সেরকম যুক্তি উত্থাপন করছে। গোল্ডেন টোব্যাকোর একচেটিয়া হয়ে ওঠার প্রশ্নটি মনোগতিক আকুতি এবং সরকারী নীতি সাপেক্ষ। গোল্ডেন টোব্যাকো যদি কোন সময় একচেটিয়া হয়ে ওঠে তবে কার্যক্রম নিশ্চয়ই নিয়ন্ত্রিত করা হবে। কিন্তু সেরকম দিন যদি কখনও আসে হবে তা আসবে বর্তমান বৈদেশিক একচেটিয়া নিয়ন্ত্রিত করার দীর্ঘকাল পরে।

৮। আই সি এল এ-র প্রস্তাবিত প্রতিবেদ

(ক) বহু শিফটের কাজ অবশ্যই বন্ধ করতে হবে বলে আমরা যে যুক্তি দিয়েছি তা পড়তে হবে একচেটিয়া গোষ্ঠীর অননুমোদিত বাড়তি উৎপাদনের পরিপ্রেক্ষিতে; এ বিষয়ে সরকারই বিচার-বিবেচনা করবেন।

(খ) বৈদেশিক মালিকানাধীন/নিয়ন্ত্রণাধীন ইউনিটের উৎপাদন ঠেকাবার যে যুক্তি রেজিস্টার্ড ক্যাপাসিটি সম্পর্কে তার কোন

(পর পৃষ্ঠায় দেখুন)

ইণ্ডিয়া টোব্যাকোর ভিত্তিহীন অভিযোগ ও কুৎসার উত্তরে গোল্ডেন টোব্যাকো

(পূর্ব পৃষ্ঠার পর)

বক্তব্য নেই। উৎপাদন ঠেকাতে হবে, যেমন করা হয়েছিল জাতীয় স্বার্থে সরকার যে পর্যায়েই যুক্তিযুক্ত বলে মনে করেছেন সেই পর্যায়েই যেমনাই শিল্প, সাবান শিল্প ও তৈল শিল্পে।

(গ) বৈদেশিক একচেটিয়া ও পারস্পরিক সংযুক্ত সংস্থাগুলোকে আর সম্প্রসারণ করতে দেওয়া হবে না বলে আমি যে অভিমত জানিয়েছিলাম তা জানিয়েছিলাম জাতীয় স্বার্থেই। বৈদেশিক একচেটিয়াকে যদি সম্প্রসারণের অনুমতি দেওয়া হয় তবে তা শেষ পর্যন্ত একচেটিয়ার কবজা বাড়িয়ে দেবে এবং বর্ধিত মুনাফা হেতু বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় ডেকে আনবে। একচেটিয়া সৃষ্টিতে জাতীয় বিকাশ বন্ধ সুযোগ দরজার পার পাওয়া যাবে না।

(ঘ) কয়েকটি প্রস্তুতকারকের উৎপাদন হ্রাসের প্রস্তাব বস্তুতপক্ষে লাইসেন্সপ্রাপ্ত ক্যাপাসিটির বাইরে বাড়তি উৎপাদন না করতে তাদের বলা, কারণ তারা একাজ করে যাচ্ছে অন্যান্য এবং বহু প্রস্তুতকারকের ক্ষতি করে যারা তাদের মাত্র ৩০% ক্যাপাসিটির কাজ করছে, ৭০% পড়ে থেকে অলস হয়ে।

এখানে আমি কলকাতার ন্যাশনাল টোব্যাকোর জ্বলন্ত উদাহরণ দিচ্ছি। শ্রমিক বিশৃঙ্খলার জন্য ১৯৬৭ সালে এই কোম্পানিটির ব্যবসা বন্ধ হয়ে যায়; ৩½ মাস পর আবার যখন তারা ব্যবসা শুরু করলো, তখন তারা দেখতে পেলো যে, চাহিদা অন্যান্য কোম্পানিতে ছড়িয়ে গেছে এবং তারা তাদের বছরকার উৎপাদনের একমাত্র এক-চতুর্থাংশ পর্যন্ত বিক্রী করা কষ্টকর বলে দেখতে পেলো। ৩।৪ বছর কঠোর পরিশ্রমের পর এখনও তারা তাদের আগেকার বাজারের এক-তৃতীয়াংশের বেশী লাভ করতে পারলো না, অথচ দুই-তৃতীয়াংশ অলস পড়ে রইলো। শ্রমিক, পরিচালনা ও অন্যান্য খাতে খরচ হ্রাস করা যায় নি এবং এই বিশৃঙ্খলার জন্য কোম্পানিটির আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ। এই কোম্পানিটি তাদের যা ছিল ও যা হারিয়েছিল তা যদি আবার ফিরে পায় তা কি যুক্তিযুক্ত ও শোভন হবে না।

শুধু তাই নয়, যে বাংলা ক্রমবর্ধমান বিশৃঙ্খলার সম্মুখীন সেও বেশ লাভবানই উপকৃত হবে, কারণ ন্যাশনাল টোব্যাকো বাজারে তার বৃহৎ অংশ থেকে বঞ্চিত হওয়ার ফলে বাংলায় সিগারেটের উৎপাদন ৫০% কমে গেছে—ন্যাশনাল টোব্যাকোই বাংলায় সিগারেট প্রস্তুতকারী একমাত্র বৃহৎ কোম্পানি। আরও এমন অনেক প্রস্তুতকারক আছে যাদের ক্যাপাসিটি অলস পড়ে রয়েছে এবং বৈদেশিক একচেটিয়ার যে মোট ৮০০০০/১০০০০০ লক্ষ সিগারেট উৎপাদন তা যদি ছেঁটে দেওয়া যায় তা হলে তারাও উপকৃত হবে। বিদেশী/বৃহৎ ফার্ম কর্তৃক ২৫% বাড়তি উৎপাদনের নিষিদ্ধতা ১৮ই জুলাই তারিখে প্রত্যাহৃত হয়েছে বলে এই সিদ্ধান্ত যে কার্যকর করা হবে, তা তো স্বাভাবিক।

১। এইসব প্রস্তাবের অন্তর্গত

(১) বৈদেশিক কোম্পানীগুলোকে সম্প্রসারণের অনুমতি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলোর ভারতীয়করণের ফলে একচেটিয়ারও হ্রাস হবে না, বৈদেশিক মুদ্রার অপচয়ও বন্ধ হবে না। ভারতীয়করণের সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে চাহিদা বৃদ্ধির সবটাই ভারতীয় প্রস্তুতকারকদের হাতে ছেড়ে দেওয়া। চাহিদার বার্ষিক প্রত্যাশিত ৬% বৃদ্ধি যদি বৈদেশিক একচেটিয়া ব্যতীত অন্যান্য কোম্পানির হাতে যায়, তা হলে দেশীয় ক্ষেত্রের অংশ ১০ বছরে ৫০% এবং ২০ বছরে ৭৫% বেড়ে যাবে। এটিই কি সিগারেট শিল্পের ভারতীয়করণের শ্রেষ্ঠ পথ নয়? কারণ এতে শুধু ভারতীয়করণই হবে না, সকলের কল্যাণে সুস্থ প্রতিযোগিতা এনে দেবে।

(২) উৎপাদনযোগ্যতা হ্রাসানোর কোন প্রশ্ন নেই। যদি কিছু হয়ই তা হবে, উৎপাদনযোগ্যতা বৈদেশিক একচেটিয়ার হাতে কুক্ষীগত থাকার বদলে এমন অন্যান্য ফ্যাক্টরীতে ছড়িয়ে পড়বে যেগুলোতে লোক, মালপত্র ও মেশিনারি ওপরে উল্লিখিত মত অলস পড়ে আছে।

(৩) সিগারেট শিল্পে স্বল্পপ্রাণ মুনাফী সম্পদের ভীতি একচেটিয়ার মূলধন বিনিয়োগ ও তার ফলে বৈদেশিক মুদ্রার অনবরত অপচয়ের কথা বিবেচনায় নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক ও নগণ্য ব্যাপার।

(৪) মোলিনস ইণ্ডিয়া এখন যে প্ল্যান্ট ও মেশিনারি উৎপাদন করছে তা ভারতীয় ইউনিটগুলো সস্তা দরে পেতে পারে। আন্তর্জাতিক মেশিনারি সম্পর্কে বলবো, আমরা আশা করি এগুলো যাতে পাওয়া যায় শুধু তাই নয়, যুক্তিসঙ্গত দামে যাতে এগুলো পাওয়া যায় তার জন্য বৈদেশিক একচেটিয়া তাঁদের প্রভাব খাটাবেন।

(৫) বৈদেশিক একচেটিয়া ঠেকালে জনসাধারণেরই কল্যাণ হবে, কারণ এতে ক্রেতা স্বার্থে বৃহত্তর স্বার্থেরই সৃষ্টি হবে।

(৬) বর্তমান শ্রম আইনে শ্রমিক ছাঁটাই বা লে-অফের প্রশ্ন উঠে না অন্যান্য ফ্যাক্টরির যদি জন্ম হয় তবে এইসব ফ্যাক্টরি চালাবার জন্য শ্রমিক ও পরিচালনা বিভাগে কর্মীদের চাকরী হবে। তা না হওয়া পর্যন্ত বৈদেশিক একচেটিয়া তাদের চাকরিতে রেখে দিতে পারেন। এতে তাঁদের বড় জোর মুনাফা কমে যাবে, কিন্তু বৈদেশিক মুদ্রা বেঁচে যাবে সেই পরিমাণ।

(৭) পাতা তামাকের উন্নয়নের ওপর এর প্রতিক্রিয়ার কোন প্রশ্ন ওঠে না। সিগারেট যদি দেশে প্রস্তুত হয় এবং তামাক যদি ব্যবহৃত হয়, তবে সিগারেট কে তৈরী করলো, ক, খ না গ, সে প্রশ্ন অবান্তর।

(৮) রপ্তানির ভীতি যে করে যাচ্ছে তা কিন্তু উপলব্ধি করা আমার পক্ষে কষ্টকর! তামাকের বিদেশী ক্রেতারা তাদের দৃষ্টি অন্যান্য দেশের দিকে কেন যে ফেরাবে তার কোন যুক্তি নেই। তামাক নিয়ে নাড়াচাড়া করে এমন একটি পাশ্চাত্য কোম্পানি যার সহযোগীরা ও তার প্রধান কার্যালয় রয়েছে বহির্ভারতস্থ একটি দেশে।

(৯) তামাক চাষের ওপর কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হবে না। বস্তুত চাষীরা একচেটিয়ার কবল থেকে নিষ্কৃতি পাবে এবং অবাধ প্রতিযোগিতার সুফল লাভ করতে পারবে।

(১০) সিগারেট ও তামাক শিল্পে উন্নয়ন ও গবেষণা ব্যাহত হওয়ার প্রশ্ন বৈদেশিক একচেটিয়া ঠেকানোর মূল প্রশ্নে অপ্রাসঙ্গিক। অন্যকে এই ক্ষেত্রে আসতে দেবার জন্য একচেটিয়ার কেবলমাত্র ভূমিকাই নির্ধারিত করা হচ্ছে।

(১১) আনুষঙ্গিক শিল্প সম্পর্কে আমার মনে হয়, একচেটিয়ার প্রভাব যদি হ্রাস করা যায় তবে তাদের অবস্থা ভালো হয়ে উঠবে।

(১২) নিজেদের প্রিয় ব্রান্ডের প্রতি ক্রেতাদের আনুগত্য হেতু সরকারী অর্থভাণ্ডারে রাজস্বের হানি চিন্তা করার মত বিষয়, কিন্তু ন্যাশনাল টোব্যাকোর অভিজ্ঞতা ও বাজারে তার অংশ সরে যাওয়ার প্রশ্নটি মনে রাখলে এটি অসম্ভব বলেই মনে হয়।

(১৩) এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, বিকাশের নিয়ন্ত্রণ যাদের একচেটিয়া রয়েছে তাদের অসন্তুষ্ট হবে না। কিন্তু তা যদি করা না হয় তবে দেশীয় ক্ষেত্রের উন্নয়ন ঘটবে না এবং গত ২২ বছরের মতই তা ২০% বাজারেই স্থাণু হয়ে থাকবে এবং বর্ধিত চাহিদা—বর্তমানের মত এর অন্ততঃ ৮০%—বৈদেশিক ক্ষেত্রেই চলে যেতে থাকবে। বস্তুতঃ বৈদেশিক ক্ষেত্রের অংশ পার্লামেন্টে প্রদত্ত বিবৃতি অনুযায়ী ১৯৫৫ সালের ৬৮% থেকে বেড়ে ১৯৬৯ সালের ৮০% হয়ে গেছে।

(অবশিষ্টাংশ পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশিতব্য)

জলসা

অনাথ শিশুদের চিত্ত বিনোদনার্থে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সোনম মালহোত্রা

জনকল্যাণমূলক অনুষ্ঠানে মালহোত্রা ভগ্নীত্রয় : ৭নং প্রিটোরিয়া স্ট্রীটের বিরাট প্রাঙ্গণের সেই শিশু উৎসবের চিত্তহারী অনুষ্ঠান সংস্কৃতি জগতের এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কারণ এটা গতানুগতিক নৃত্য-গীতানুষ্ঠান নয়, সারা কোলকাতার সবগুলি অনাথ আশ্রম থেকে শিশুদের সংগ্রহ করে কন্যাত্রয় সোনম, গীতা ও মীরা মালহোত্রার সঙ্গীত ও নৃত্য দিয়ে তাদের চিত্ত বিনোদনের এই অভিনব প্রয়াস-এর আগে কোথাও দেখেছি বলে মনে পড়ে না। এর জন্য তাদের পিতা ও মাতা মালহোত্রা-দম্পতি ধন্যবাদার্হ। শিল্পমূল্য ছাড়াও এ অনুষ্ঠানের শিক্ষার দিকটিও চিন্তা করবার মত। জ্ঞান হয়ে অবধি যে সব দুর্ভাগা শিশুর দল আপনজনের স্নেহ-মমতা কিছুই পায় নি তাদেরই জন্য নৃত্য-গীতের আয়োজন করে এ আশ্বাসই যেন মেলে ধরা হয় যে তারা একা নয়। বছরের এই একটি দিন প্রাণ খুলে আনন্দ করবার জন্য যেন এরা উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকে। ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যবেষ্টিত হয়েও জীবনের অন্ধকার দিকটি সহায় সম্বলহীন নিরাশ্রয় শিশুর অভাববোধ সম্বন্ধে অবহিত হওয়া এবং এ অভাব পূর্ণ করবার কাজে এগিয়ে আসা, মালহোত্রা ভগ্নীত্রয়েরও শিক্ষার অঙ্গ হয়ে ওঠে। এই পরিপ্রেক্ষিতে এ উৎসবের নতুনত্ব অনস্বীকার্য।

মীরা এবং গীতা মালহোত্রা যথাক্রমে ইমন, বেহাগ ও ভজন গেয়ে গুরু এ কাননের সু-শিক্ষার পরিচয় দিয়েছেন।

পরিশেষে সোনম মালহোত্রা 'ভারত-নাট্যম'-এর আলারিপু, পদম এবং লোকনৃত্য জিপসী নৃত্যে আঙ্গিক কুশলতা, সৌন্দর্য লাবণ্যের সুষ্ঠু প্রকাশ ও লয় সুর অভিব্যক্তির মধুরতায় মুগ্ধ করে দিয়েছে।

ব্রজেন্দ্রকিশোর স্মৃতি বাসর : বাংলার সংস্কৃতি জগতের এক স্মরণীয় ব্যক্তি রাজা ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর মৃত্যু-বার্ষিকী পালনার্থে ব্রজেন্দ্রকিশোর সঙ্গীত সমিতির পক্ষ হতে সভাপতি কুমার বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ও সম্পাদক কৃষ্ণকালী ভট্টাচার্য ৫৫নং বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে এক ধ্রুপদী সঙ্গীতাসরের আয়োজন করেন।

প্রথমে সমিতির পক্ষ হতে কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীতের দুই প্রবীণ ধ্রুপদী যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ওস্তাদ ওমর খাঁকে মানপত্র দিয়ে সম্মানিত করা হয়। স্বস্তি-বাচন পাঠ করেন কৃষ্ণকালী ভট্টাচার্য।

তারপর যোগীন্দ্রবাবু ধ্রুপদী আঙ্গিকে 'পরিক্রমা' গেয়ে শোনালেন। রাগশুদ্ধতা, কণ্ঠমাধুর্য এবং আত্মসমাহিত পরিবেশনায় এক মর্যাদাগম্ভীর পরিবেশ রচিত হয়।

কৌকভ খাঁর পৌত্র ওমর খাঁ আলাপ মসিদখানি এবং রেজাখানি গৎ কৌশী-কানাড়া রাগে এবং রেজাখানি গৎ 'কাফি' রাগে বাজিয়ে শোনান। ববাবী চঙের বাজনা এক বিশেষ যুগের সঙ্গীত-চিন্তার সুষ্ঠু প্রকাশ চিন্তাশীল ছাত্র-ছাত্রীদের অনুধাবনীয় বিষয় উপহার দিয়েছে। উভয়ের সঙ্গে পাখোয়াজ ও তবলা সঙ্গতে ছিলেন যথাক্রমে প্রতাপনারায়ণ মিত্র ও অমলেশ চট্টোপাধ্যায়।

বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর শিষ্য ও শিষ্যা সম্প্রদায়ের মধ্যে মালকোষ রাগে পঞ্চানন রায়চৌধুরীর বীণ বাজান। রামকৃষ্ণ ঘোষের 'দেশ' রাগে কণ্ঠসঙ্গীত (ধ্রুপদী অঙ্গে) এবং ইরা চক্রবর্তীর সেতারবাদন শ্রোতাদের প্রশংসা পেয়েছে। আর এক উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান সর্বেশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের জার্মান শিষ্য ফিলিপ ফ্যালিয়েরের ধ্রুপদ গান।

রাজ যুব-সমিতির বিচিত্রানুষ্ঠান : গত সপ্তাহে ঐ যুব-সমিতির পক্ষ হতে রবীন্দ্র সদন মঞ্চে এক বিচিত্রানুষ্ঠানের প্রারম্ভে সম্পাদক ইন্দ্রজিৎ বাহের ভাষণে জানা গেল জাতি-ধর্ম এবং বর্ণ-নির্বিশেষে মানবিক অনুভূতির তাগিদেই এঁরা জন-কল্যাণমূলক কাজে এগিয়ে এসেছেন। ঐ বিশেষ সান্ধ্য উৎসবে সংগৃহীত অর্থ বালাভবন, মহিলা ভবন, ক্লিনিক-মিশন, সাধারণ গ্রন্থাগার ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এঁরা দুঃস্থ মানবের সেবায় ব্যয় করবেন বলে জানালেন।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের আসর শুরু হোলো অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়ের গান দিয়ে। ধ্রুপদী অঙ্গের ভক্তিমূলক গান দিয়ে অশোকতরুবাবু যেন এক শুভ্র সুন্দর পূজোর আবহাওয়া রচনা করেন। 'হৃদয়ে তোমার দয়া যেন পাই', 'আমার যা আছে', 'নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে' 'না বাঁচাবে আমায় যদি' প্রভৃতি গানেই আত্মনিবেদনের আকুতি উদ্ভাসিত।

CENTRAL LIBRARY

হেমন্ত মুখোপাধ্যায় 'দুই দেশে এসেছিল কাবে', 'যৌবন সরসী নীরে', 'যদি হায় জীবন পূরণ নাই', 'আমার মন মানে না', 'পথে যেতে ডেকেছিলে' 'আমার গোধূলি লগন', 'শুধু তোমার বাণী নয় গো' ও 'দিনের শেষে' কবির গানের নানা ভাব ও ভাবনার এক রঙিন মালা গেঁথে শ্রোতাদের উপহার দিলেন।

চিন্ময় চট্টোপাধ্যায় 'ও কি এল, ও কি এলো না', 'দায় অন্যায় জানিনে', 'সেদিন দুজনে', 'আমার মন কেমন করে' ও '[illegible] গো সজনী' তথা প্রেম-সঙ্গীতে তাঁর স্বাভাবিক আবেগ বিহ্বলতায় মেতে থেকেছেন।

সুচিত্রা মিত্র—'কার মিলন চাও', 'রাখো রাখো হে জীবনে', 'ওই উদাসী হাওয়ার পথে', 'আয় আয় রে পাগল' এবং 'কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি'তে একাধারে রবীন্দ্রসঙ্গীতের দর্শন ও আধ্যাত্মিক দিকটি ও নাটকীয় গীতি-কবিতার সরস দিকটির প্রতি আলোকপাত করেছেন।

পরিশেষে 'যৌথানিক' গোষ্ঠী '[illegible]' নাটকটি মঞ্চস্থ করেন। নাটকের প্রারম্ভটি সুন্দর। অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহে অন্তরাল থেকে ভেসে আসা স্বপন [illegible] নাটকের আসন্ন অন্তর্দ্বন্দ্ব ও সমস্যা সম্বন্ধে আমাদের সচেতন করে। দুর্বল শিল্পিবৃন্দ নাটকের মর্মবস্তুকে তার যথাযথ মর্যাদায় পরিস্ফুট করেছেন।

আমজাদ আলি খাঁর সরোদ বাদন : ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্টের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে সংস্থার সভ্যবৃন্দ আমজাদ আলি খাঁর একটি একক সরোদ বাদনের আসরের আয়োজন করেন। তবলা সঙ্গতে ছিলেন পণ্ডিত শান্তাপ্রসাদ।

তরুণ সরোদিয়া আমজাদ আলি খাঁ যন্ত্রসঙ্গীতের এক উজ্জ্বল তারকা। বর্তমান যুগের দিকপাল যন্ত্রীদের প্রভাবের আলোতেই আপন দীপ্তি খুঁজে নিয়ে তিনি যন্ত্রসঙ্গীতের আসরে আপনার স্থান করে নিতে পেরেছেন।

কিন্তু সেদিনের অনুষ্ঠানের প্রথমার্ধ আমাদের খুশী করতে পারে নি। আলি আকবরের পদ্ধতিতে অনুসারী আলাপ জোড় বাজার অংশ বিশেষ সুরের সূক্ষ্ম দ্যুতিতে, মীড় ও বাজের চমকপ্রদ সমন্বয়ে চকিত দ্যুতি সঞ্চার করেছে। কিন্তু সামগ্রিক আবেদন মনে কোনো স্থায়ী দাগ কাটতে পারে নি। 'ঝিঁঝিট'-এর মত রাগকে প্রধান রাগরূপে নির্বাচন করতে হলে যে পরিণত ধ্যান ধারণা এবং গুণপনী রীতিতে বিস্তারের অনুশীলন অবশ্য প্রয়োজনীয় তারই অভাবে অবশ্যম্ভাবী একঘেয়েমির হাত এড়ানো আমজাদের মত শিল্পীর পক্ষেও সম্ভব হয় নি। অবশ্য রাগ শুদ্ধতায় তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং উচ্চাঙ্গে সুপরিচিত পকড় সরগমপধ, পধনসা-তে পরিক্রমণে লোকসঙ্গীতের খণ্ড মাধুর্যে শ্রোতাদের মন মাঝে মাঝে ভিজিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু অলঙ্কার প্রয়োগ কৌশল প্রদর্শনের উদ্দীপনায় 'ঝিঁঝিট'-এর প্রধান লক্ষণ মন্দ্র-মধ্য-স্থানে রূপ — বিস্তার একেবারেই অবহেলিত হয়েছে। শান্তাপ্রসাদের সংযত সঙ্গতে গতের অঙ্গ মোটের ওপর উপভোগ্য। কিন্তু কালার অতিদ্রুতে গতি প্রয়াসী মন সব সময় ভারসাম্য বজায় রাখতে পারে নি। তার ফলে সঙ্গীতানভিজ্ঞ শ্রোতার করতালি তিনি পেয়েছেন তবে তা অর্জন করতে হোলো সঙ্গীতবোদ্ধা রসিকজনের ক্ষুণ্ণতার মূল্যে।

দ্বিতীয়ার্ধে তিনি বাজালেন কিরবাণী। ১৯৫০ সালে এই দক্ষিণভারতীয় রাগটিকে কোলকাতার শ্রোতাদের সঙ্গে প্রথম পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন পণ্ডিত রবিশঙ্কর। তারপর আলি আকবর ও রবিশঙ্করে ক্রমাগত বাজিয়ে এই রাগকে জনপ্রিয় করে তোলেন এবং 'কিরবাণী' আজ উত্তর ভারতের ঘরের রাগ হয়ে উঠেছে।

আলি আকবরীয় আঙ্গিকেই কিরবাণীর রূপ কল্পনায় রত হলেও আমজাদের নিজস্ব আবেগ রসবোধ ও আঙ্গিক কুশলতায় এ অনুষ্ঠান রসোত্তীর্ণ হয়ে উঠে প্রথমার্ধের অতৃপ্তির অনেকখানি ক্ষতিপূরণ ঘটিয়েছে। শান্তাপ্রসাদের তবলা সঙ্গত এ অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ।

—চিত্রাঙ্গদা

কলকাতায় ওবারহাউজেন চিত্রমেলা

ছোট-ছোট ছবি। কোনটার স্থায়িত্ব পনের মিনিট, কোনটার এগার মিনিট, কোনটার পাঁচ মিনিট আবার কোনটা এক মিনিটেই শেষ। অথচ মনে ছাপ থেকে যায় অনেক বেশী সময়ের জন্য। ছোটোর দাবী যে অনেক সময় বড়োর জগতে গাম্ভীর্যকে পাশে রেখে এগিয়ে যেতে পারে তার প্রমাণ চাক্ষুষ করা গেল গত ১-২ ডিসেম্বর ম্যাক্সমুলার ভবন (ফেডারেশন অব ফিল্ম সোসাইটিজ ছিলেন যুগ্ম আয়োজক) আয়োজিত ওবারহাউজেন চিত্রমেলার কয়েকটি স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবির বিশেষ প্রদর্শনীতে। পশ্চিম জার্মানীর এই শহরটিতে প্রতি বছরই ছোট ছবির এক মেলা বসে। মেলার সহকারী পরিচালক ট্রীউইন ওর্হোলিং উৎসবের বাছাই-করা বাইশটি ছবি নিয়ে সম্প্রতি এদেশে এসেছেন।

একসপেরিমেণ্ট বলতে যা বোঝায় স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবিতে সে কাজের সম্ভাবনা খুব বেশী। স্বল্প পরিসরে ও সময়ে পরিচালক নিজের কুশলতা ও বক্তব্যকে অত্যধিক জোরালোভাবে প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। সারা ইউরোপ জুড়ে যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বিবর্তন আসছে সে ছাপ দেশের কাহিনী-চিত্রে যেমন পড়ছে, এই সব ছোট ছবিতেও তার আঁচড় কম জোরালো নয়। বরং আরও বেশী তীক্ষ্ন, সরস ও সরলীকৃত। উৎসবে প্রদর্শিত কয়েকটি ছবির কাবিক মেজাজও লক্ষণীয়।

এগারটি দেশের বাইশটি ছবির মধ্যে চেকোশ্লোভাকিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, বৃটেন, ফ্রান্স ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ছবির সংখ্যাই বেশী। কিউবার একমাত্র ছবি 'এল-বি-জে' তিনজন উত্তর আমেরিকার রাজনৈতিক নেতার হত্যা কাহিনীর ওপর তৈরী। পরিচালক আলভারেজ কাবিকের সুরে ছবিটিকে প্রাণবন্ত করে তুলেছেন। উৎসবের সেরা ছবি দুটি হল চেকোশ্লোভাকিয়ার 'দি অ্যাপার্টমেণ্ট' (জাঁ স্ভনাকমাজের) ও বৃটেনের 'পীচেস' (মাইকেল গিল)। চার পাশের বিলাসব্যসন, অলস মানুষের পরনির্ভরশীলতা ইত্যাদি নিয়ে বিদ্রূপাত্মক ছবি 'দি অ্যাপার্টমেণ্ট'। 'পীচেস' পনের মিনিটের ছবি হলেও মেজাজে অনেকটা কাহিনীচিত্রের। একটি বড় পরিবারের এক যুবতীর একাকীত্ব ছবিটির মূল উপজীব্য। পরিচালক গিল অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে চরিত্রের মানসিকতা ফুটিয়ে তুলেছেন। শেষ দৃশ্য (যেখানে মেয়েটি প্রেমিকের পেছনে দাঁড়িয়ে নির্বিকার চাউনিতে পেঁয়াজ চিবোচ্ছে) বড় কাবিক, অস্বাভাবিক ব্যঞ্জনাময় এবং সুন্দরও সেই কারণে। জন ব্রাস্টিনের 'সানডে' (আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র) আরেকটি স্মরণীয় ছবি। ১৯৬১-তে নিউইয়র্ক পার্কে নিষিদ্ধ জমায়েতে বাধা দানের ফলে এক দল লোক-সঙ্গীত শিল্পী যে সক্রিয় প্রতিবাদ জানিয়েছিল, তারই ভিত্তিতে পরিচালক এক প্রামাণিক চিত্র তৈরী করেছেন। পোলানস্কির 'দি ফ্যাট ওয়ান এণ্ড দি থিন ওয়ান' (ফ্রান্স) আপাতদৃষ্টিতে হাস্যরসাত্মক ছবি হলেও গভীর ইঙ্গিতবহ। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদই এ ছবির মূল বক্তব্য।

জন হালাসের এক মিনিটের ছবি 'পীস' উপস্থাপনা কৌশলে অভিনব। যুগোশ্লাভিয়ার 'দি ডেজ কাম' (নেদলজকো দ্রাগিক) কার্টুন ছবিগুলির মধ্যে সব চাইতে আকর্ষণীয়। পশ্চিম জার্মানীর 'দি ফার্স্ট লেসন' (পরিচালক : জোখেন কিয়ার ও জোখেন সিরহাক) বর্তমান জনজীবনের অ্যালিয়েনেশনজনিত সমস্যাকে নিয়ে তোলা। সমষ্টিগত বোঝাপড়াই জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। এ ছবি সেই কথাই বলতে চায়।

প্রেক্ষাগৃহ

রূপসী / সন্ধ্যা রায় ও শমিত ভঞ্জ

সেতারশিল্পী ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্য

সানফ্রান্সিসকোর 'আলি আকবর কলেজ অব মিউজিক'-এর অন্যতম সেতার-শিক্ষক ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্য ১০ নভেম্বর কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করবার পরে যে সাংবাদিক সম্মেলন করেছিলেন, তাতে নানা কথার মধ্যে তিনি বলেছেন, আলি আকবর খাঁ সাহেবের প্রতিষ্ঠান থেকে ভারতীয় সঙ্গীত সম্পর্কে যাঁরা শিক্ষালাভ করেছেন এবং এখনও করছেন, ১৯৬৫ থেকে আজ পর্যন্ত তাঁদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫০০-এ। ভারতীয় সঙ্গীতকে এঁরা সকলের ঊর্ধ্বে স্থান দেয়। এবং সঙ্গীত-সাধনা সম্পর্কে এদের নিষ্ঠা অসামান্য; এক একজন দিনে আট থেকে বারো ঘণ্টা পর্যন্ত রেওয়াজ করে থাকেন।

সেতার শিক্ষা দেওয়া ছাড়া শ্রীভট্টাচার্য সানফ্রান্সিসকোর বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে, মিউজিক ক্লাব বা সঙ্গীত প্রতিষ্ঠানে একক অনুষ্ঠান করেছেন এবং সমবেত সঙ্গীতেরও আসর বসিয়েছেন। 'ফার্মাল ডগ' নামে একটি বিখ্যাত সঙ্গীতানুরাগীদের প্রতিষ্ঠানে—যে প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণভাবে 'হিপি'-দের নিয়েই গঠিত, সেখানে তিনি 'আলি আকবর কলেজ অব মিউজিক'-এর ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে পাঁচজনকে নিয়ে গঠিত একটি দলের সাহায্যে সম্পূর্ণ ভারতীয় রাগরাগিণীর অর্কেস্ট্রা বাজিয়ে অসামান্য সাফল্যলাভ করেছিলেন। ঐ অনুষ্ঠানের শেষ সমবেত যন্ত্রসঙ্গীত—যা 'আহের-ললিত'-এর উপর গড়া হয়েছিল—এমনভাবে শ্রোতাদের মুগ্ধ করেছিল যে তাঁরা ঐ একই জিনিস ফির ফিরে পাঁচবার বাজাতে বাধ্য হয়েছিলেন।

শ্রীভট্টাচার্য ব্যক্তিগত জীবনে সরোদ-বাদক ও সঙ্গীতপরিচালক তিমিরবরণের একমাত্র সন্তান। তাঁর বাবারই মতন তিনিও প্রধানত শিক্ষালাভ করেন মাইহারের বিখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী আলাউদ্দীন খাঁ সাহেবের কাছে ১৯৫৩ থেকে ৬২ সাল পর্যন্ত পুরো ন' বছর ধরে। আলি আকবর কলেজ অব মিউজিক-এর সেতার শিক্ষক-রূপে তিনি যোগ দেন ১৯৬৯-এর জুন মাসে। ওখানে এক নাগাড়ে দেড় বছর কাটাবার পর শ্রীভট্টাচার্য দেশে ফিরে এসেছেন কিছুদিনের জন্যে। আবার ১৯৭১-এর জুন মাসে উনি সানফ্রান্সিসকোতে ফিরে যাবেন। যে কমাস শ্রীভট্টাচার্য দেশে রয়েছেন, তার মধ্যে উনি সম্ভবত কিছু অর্কেস্ট্রার আসর বসাতে ইচ্ছুক এবং সুবিধা হলে দু' একটি ছবির সঙ্গীত-পরিচালনাও করতে পারেন। সাংবাদিক সম্মেলনে শ্রীভট্টাচার্যের অনুপস্থিতির জন্যে সেতার-বাদন সমবেত সকলকেই উচ্ছ্বসিত করে তুলেছিল।

আমরা শ্রীভট্টাচার্যের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি কামনা করি।

অগ্রদূতের 'মঞ্জরী অপেরা'

শ্রদ্ধেয় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখনী নিঃসন্দেহে বিচিত্র পথগামী। 'দিনের রাজা রাতের ফকির' অর্থাৎ নট-নটীদের নিয়ে তিনি লিখেছেন, 'মঞ্জরী অপেরা'। ছবির শুরুতে সেই কথা বলেছেন শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়। শুধুমাত্র শিল্পীদের সুখদুঃখ ব্যথাবেদনার কথাই তিনি লেখেননি। যাত্রাপালা যে বাংলার লোক-সংস্কৃতির অন্যতম ঐতিহ্য সে-কথাও বলেছেন।

বাংলা ছবিতে যাত্রাপালার চিত্রণ এই প্রথম নয়, তবে সম্পূর্ণরূপে যাত্রাভিত্তিক ছবি এই প্রথম। মঞ্জরী অপেরা নামের এক যাত্রা দলের শিল্পীরাই ছবির প্রধান চরিত্র। কীর্তনিয়া [illegible] মঞ্জরীর সঙ্গে [illegible] দেখা এক গানের আসরে। প্রথম দর্শনেই প্রেম। দুজনেই নীরব রইল। পরবর্তী সাক্ষাৎকারের সময় মঞ্জরী মা-হারা এবং গোরাও বিবাহিত জীবনের সূত্র ছিঁড়ে গৃহত্যাগী। তার রিক্ত জীবনে আশা নিয়ে এল মঞ্জরী। দুজনে মিলে দল তৈরী করল। নাম 'মঞ্জরী অপেরা'। দুজনে মিলে অভিনয় করে মাতিয়েছে বহু আসর। খ্যাতি, অর্থ কোনটাই কম হয়নি।

কিন্তু হাওয়া ঘুরল অন্যদিকে যখন রূপসী যুবতী অলকা এল দলে নতুন শিল্পী হয়ে। গোরা-মঞ্জরী-অলকাকে নিয়ে ত্রিভুজ প্রেমের নাটক হয়েছে এখানে। দ্বিধাচিত্ত গোরা কামনার আগুনকে সংযত রাখতে পারেনি। ঝাঁপ দিয়েছে সে আগুনে। অলকার ষড়যন্ত্রের সঙ্গে গোরাও দল ছেড়েছে। পরিচালক স্বাভাবিক পরিমিতি-বোধের সঙ্গেই এই ঘটনার চিত্রণ করেছেন। অতি-নাটকীয়তার যথেষ্ট সুযোগ থাকলেও এই অংশ বাস্তবানুগ।

ছলনাময়ী অলকার প্ররোচনায় গোরা [illegible] সিনেমার হিরো বিজয়কুমারে [illegible] অবশেষে অবশ্য গোরার ভুল [illegible] অলকার

প্রকৃত চরিত্র তখন প্রকাশ পেয়েছে তার কাছে। গোরা তাই ফিরে এসেছে মঞ্জরীর পাশে।

বিশ্বরূপার পাশেই
রঙ্গনা
সর্বজয়া রোডের মোড়ে

নান্দীকার
১২ই শনিবার ৬টায়
১৩ই রবিবার ২॥টে ও ৬টায়

তিন পয়সার পালা

১৭ই ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার ৬টায়

যখন একা

কেয়া পাল, দীপালি চক্রবর্তী, রুদ্রাজিৎ ঘোষ, শম্ভু ভট্টাচার্য, রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত অরুণ চট্টোপাধ্যায়, কবিতা বন্দ্যোপাধ্যায় অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, কালিকা শেঠ

নির্দেশনা : অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

॥ রঙ্গনায় (৫৫-২৮৫৬) টিকিট পাবেন ॥

এন্টারটেনমেন্ট ছবি করার ক্ষেত্রে অগ্রদূতের নাম উল্লেখযোগ্য। 'মঞ্জরী অপেরা' সে-সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছে। যাত্রার সুর অনুপস্থিত থাকলেও নাটককে স্বচ্ছন্দ গতিতে শেষ অবধি পৌঁছে নিয়ে যাওয়ার কাজ প্রশংসনীয়। নাটারস দু'একটি ক্ষেত্র ব্যতিক্রম ছাড়া, বাস্তবানুগ। যাত্রার আসরের চাইতে গ্রীনরুমের দৃশ্যপরিকল্পনা সুপরিকল্পিত। ব্যক্তিগত কথাবার্তার মাঝে যাত্রার ঢংয়ে সংলাপ চরিত্রগুলির মেজাজ ও পরিবেশ গঠনে যথোপযুক্ত। সুধীর হাজরাকৃত 'চন্দনাচোর আঁটসাঁট বাঁধুনী দীর্ঘ ছবিটিকে মুহূর্তের জন্যও শ্লথ হতে দেয়নি। অবশ্য এ-কাজে সম্পাদনার (বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়) কৃতিত্ব কম নয়। ক্যামেরার কাজ (বিভূতি লাহা) পরিচ্ছন্ন।

গোরাবেশী উত্তমকুমার অনবদ্য। বিজয়কুমারের বেশে তিনি স্বাভাবিক। চরিত্রের জটিলতা প্রকাশে তিনি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। মঞ্জরী চরিত্রে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় প্রাণময়। চরিত্রটির অসহায়তা, ব্যথা-বেদনা প্রতিটি অনুভূতির অভিব্যক্তি প্রকাশে তিনি সুনিপুণ। বিচ্ছেদের চরম আঘাত পাওয়ায় দৃশ্যে তিনি সংযত ও স্বাভাবিক। অলকাবেশী জ্যোৎস্না বিশ্বাস চরিত্রের প্রতি সুবিচার দিয়েছেন। চরিত্রটি তাই উপভোগ্য ও বিশ্বাস্য। যাত্রাশিল্পীর অন্য দুটি চরিত্রে সন্ধ্যা বন্দ্যোপাধ্যায় ও গীতা দে-র অভিনয় মনে রাখার মত। অন্যান্য সুঅভিনীত চরিত্রগুলিতে রূপদান করেছেন বনানী চৌধুরী, বাসন্তী চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিম ঘোষ, বেবী গুপ্তা, অজয় বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

অভিনেত্রী

'সুবোধ মুখার্জি প্রোডাকসনের ছবি চিরনতুন আমোদের খনি'—এমনতরো বিজ্ঞাপন ছবির শেষে আছে। ছবিকে আমোদের খনি করে তুলতে নাচ-গান-হাসি-মস্করা-রোমান্সের সহযোগে যে উদ্ভট বস্তু করে তুলতে হয়, সুবোধ মুখার্জির পূর্ববর্তী বহু ছবিতে সেইসকল উপাদানের প্রাধান্য ছিল। নবতম ছবি 'অভিনেত্রী' সেইসকল উদ্ভট রস ও দৃশ্যকল্পনার অনুপস্থিতিতেও যথেষ্ট আমোদের খনি এবং আনন্দের খোরাকও জোগাতে পারবে। এ-ছবিতে অযথা মারপিট নেই, ভাঁড়ামো নেই, অতিসুন্দর পরিচ্ছন্ন ছবি। হিন্দী চিত্রজগৎ যে ফর্মুলা ভেঙে নতুন ধরনের ছবি তৈরীর প্রচেষ্টা চালাচ্ছে তার প্রমাণ 'অভিনেত্রী'।

সুখ্যাত নৃত্যশিল্পী ও অভিনেত্রী অঞ্জনার সঙ্গে বিজ্ঞানীবেশী তরুণ গবেষক শেখরের পরিচয় এক বর্ষামুখর সন্ধ্যায়। মাতৃহারা অঞ্জনা প্রথম দর্শনে শুধুমাত্র শেখরের প্রতিই অনুরক্ত হয় না, শেখরের মাকেও নিজের মায়ের মত ভালোবেসে ফেলে। বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয় দুজনে। দুটি উজ্জ্বল তরুণ দম্পতির জীবন কাটে ছোটোখাটো ভুল বোঝাবুঝি আর খুনসুটির মাধ্যমে। পতিসোহাগিনী অঞ্জনার অত্যধিক উচ্ছলতা শেখরের গবেষণার কাজে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। কাজে মন দিতে পারে না সে। এই নিয়ে ভুল বোঝাবুঝি। অঞ্জনার একাকিত্বকে দূর করার জন্য এগিয়ে আসেন তাঁর নৃত্যগুরু। আবার তাকে স্টেজে নামতে অনুরোধ জানান তিনি। কিন্তু শেখর গররাজি। অথচ অঞ্জনা তার নৃত্যকলার প্রতি আকর্ষণ ছাড়িয়ে উঠতে পারে না। স্বামীর অমতেই ঘর ছেড়ে সে বেরিয়ে যায় অভিনয়ের জন্য। সবশেষে বান্ধবীর দৌত্যে ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটে দুজনায়। মিলিত হয় শেখর ও অঞ্জনা।

গল্পে কোথাও হাল্কা রস পরিবেশনের সুযোগ নেই, পরিচালক আরোপও করেননি, ফলে ছবিটি অনেকাংশে সাবলীল ও স্বচ্ছন্দ গতি পেয়েছে। ছবির দুই-তৃতীয়াংশ জুড়ে নায়ক-নায়িকার দৈনন্দিন জীবনের গতিবিধির খুঁটিনাটি পর্যায়ে

লজ্জাবতী রঙে বিহ্বল রোম্যান্স

শুক্রবার, ১১ই ডিসেম্বর!

অড্রে হেপবার্ণ অভিনীত "রোম্যান হলিডে" ও "টু ফর দ্য রোড্স"এ সঠিক ঐতিহ্যে শর্মিলা ঠাকুর পথে পথে হাস্যমুখর রম্যান্তিক ক্রীড়াময়ী

পথে পথে বিদ্রুপ, উত্তেজক ও উদ্দীপক ভ্রমণে মদনমুখর গীত মাধুর্য মুখরিত

পরিবেশিত পার্বতী পিকচার্স প্রা: লি:   সঙ্গীত লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলাল

অপেরা - নাজ - লিবার্টি - খান্না - রূপালী - পার্কশো - প্যারামাউণ্ট

নবভারত — অশোক — চিত্রপুরী — নারায়ণী — মৃণালিনী — চম্পা — রামকৃষ্ণ রজনী — শ্রীলক্ষ্মী — দীপক — চিত্রা (আসানসোল) — রে (ধানবাদ)

রূপক (পাটনা) ও অন্যান্য বিভিন্ন চিত্রগৃহে

মামানী পিকচার্স প্রাঃ লিঃ পরিবেশিত

গতি অতি শ্লথ। নূতনের ভুল বোঝাবুঝির পর নাট্যউপাদান যেখানে ঘনীভূত নিপুণ পরিবেশনকৌশলের গুণে সেই সকল দৃশ্য-পর্যায় উপভোগ্য, অপেক্ষাকৃত গতিশীলও বটে।

লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলালের সুরে সব-কটি গানই সুগীত ও আকর্ষণীয় (বিশেষভাবে কিশোরকুমার-লতা মঙ্গেশকরের দ্বৈতকণ্ঠে 'সা-রে-গা-মা-পা-পা-পা' গানটি)। বহির্দৃশ্য ও অন্তর্দৃশ্য গ্রহণে ক্যামেরার কাজ সুষ্ঠু ও সুন্দর।

প্রধান দুটি চরিত্রে শশীকাপুর ও হেমা মালিনী অপূর্ব অভিনয়-কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন। প্রেমাবেগে উচ্ছল হতে তাঁরা যেমন সক্ষম হয়েছেন, নাট্যদ্বন্দ্বের মুহূর্তেও তাঁরা সমান নিপুণতার পরিচয় দিয়েছেন। দু-একটি ক্ষেত্রে অতিউচ্ছলতা প্রকাশ পেলেও বিশেষ কয়েকটি নাট্য-মুহূর্তে তাঁরা যথেষ্ট সংযত ও বাঙ্ময়। বান্ধবীর চরিত্রে নাজিমা স্বভাবজ দক্ষতার ছাপ রেখেছেন। মায়ের চরিত্রে নিরূপা রায়, মনভোলা প্রফেসরের চরিত্রে নাজির হোসেন, ছদ্ম নারায়ণবেশী অসিত সেনের অভিনয় প্রাণবন্ত। অপর একটি বিশিষ্ট চরিত্রে অতিথিশিল্পী হিসেবে দেবু মুখার্জি ভালো কাজ করেছেন। ফিল্ম ইনস্টিটিউটের কৃতী ছাত্র পুণ্য দাসকে একটি ছোট্ট হাল্কা চরিত্রে বিসদৃশ লাগে। তিনি সম্ভবত অপব্যবহৃত।

সব মিলিয়ে সুবোধ মুখার্জির 'অভিনেত্রী' হিন্দী চিত্রজগতের প্রমোদ-উপকরণের ভিড়ে একটি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম ও সৎপ্রয়াস হিসেবে চিহ্নিত।

স্টুডিও থেকে

এই সপ্তাহে রূপসী : অরুণ রায়চৌধুরী প্রযোজিত ও পরিবেশিত এ আর সি প্রোডাকসন্সের বহির্দৃশ্য প্রধান গীতিবহুল ছবি 'রূপসী' রাধা, জ্যোতি, পূর্ণ ও অন্যত্র আজ থেকে সুরু হল। কাহিনী ও চিত্রনাট্য রচনা করেছেন পরিচালক অজিত গাঙ্গুলী। এই ছবির পরিচালনায় অজিত গাঙ্গুলীর যশ ও খ্যাতি আরো বহুগুণ যে বৃদ্ধি পাবে সে বিষয়ে কোন দ্বিমত থাকবে না। গৌরী-প্রসন্ন মজুমদারের লেখা গানের সুর দিয়েছেন সুরের যাদুকর অনিল বাগচী। ছবির প্রধান চরিত্রগুলিতে আছেন সন্ধ্যা রায়, কালী ব্যানার্জি, তপেন চ্যাটার্জি, রবি ঘোষ, চিন্ময় রায়, বঙ্কিম ঘোষ, জহর রায়, অনুভা ঘোষ, সুলতা চৌধুরী, সুতপা চক্রবর্তী, জুঁই ব্যানার্জি, সমিত ভঞ্জ। ছবির নেপথ্য কণ্ঠে আছেন মানবেন্দ্র মুখার্জী, শ্যামল মিত্র, অনুপ ঘোষাল, আরতি মুখার্জী, অধীর বাগচী, সুবোধ রায়, আরতি বর্মন প্রভৃতি। বাউল, ভজন, ঝুমুর গান সঙ্গীতের বিশেষ দিক।

প্রতিবাদ : বিশ্বজিৎ নিবেদিত ও নিমাই মিত্র প্রযোজিত আর্ট মুভিজের 'প্রতিবাদ' ছিরি পিকচার্স ও বি ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটর্সের পরিবেশনায় রাধা, পূর্ণ ও অন্যত্র আসন্ন মুক্তির পথে। চিত্রনাট্য ও কাহিনী রচনা করেছেন অজিত গাঙ্গুলী। তপেশের প্রথম এই ছবিখানির পরিচালনা করেছেন এবং নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ছবিখানির পরিচালনায় তিনি যথেষ্ট মুন্সিয়ানার পরিচয় দেবেন। যাঁরা সমাজের অপাংক্তেয় বলে পরিচিত, এই ছবির মাধ্যমে তাদের প্রতিবাদ সোচ্চার হয়ে উঠবে। ছবির প্রধান চরিত্রে বিশ্বজিৎ ও মৌসুমী চ্যাটার্জির অভিনয় যেমন দর্শকমনে এক নতুন রেখাপাত করবে, তেমনি এদের সঙ্গে অভিনয়ে আর যাঁরা পূর্ণ সহযোগিতা করেছেন তাঁরা হলেন—জুঁই ব্যানার্জি, রবি ঘোষ, অজয় গাঙ্গুলী, সুলতা চৌধুরী, অপর্ণা দেবী, পদ্মা দেবী, সুলেখা রায়, হারাধন ব্যানার্জি, মণি শ্রীমানী, গৌর সী, কার্তিক চক্রবর্তী, চিন্ময় রায়, পঞ্চানন ভট্টাচার্য ও তরুণকুমার প্রভৃতি। সুরারোপ করেছেন শ্যামল মিত্র। নেপথ্য কণ্ঠে আছেন বিশ্বজিৎ, প্রতিমা ব্যানার্জি ও বনশ্রী সেনগুপ্ত।

ষ্টারে [শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত নাট্যশালা]
অগ্নিলা
নাটকীয় সংঘাতে ও অভিনয়-মাধুর্যে অনুপম!
প্রতি বৃহস্পতি ও শনিবার : ৬টায়
প্রতি রবিবার ও ছুটির দিন : ২॥টা ও ৬টায়
।। রচনা ও পরিচালনা ।।
দেবনারায়ণ গুপ্ত
:: রূপায়ণে ::
অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, অপর্ণা দেবী, নীলিমা দাস, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, সতীন্দ্র ভট্টাচার্য, দীপিকা দাস, শ্যাম লাহা, প্রেমাংশু বসু, বাসন্তী চট্টোপাধ্যায়, কালীপদ গাঙ্গুলী, গীতা দে ও বঙ্কিম ঘোষ

শুভমুক্তি ঃ ১১ই ডিসেম্বর ঃ শুক্রবার
অরুণ রায়চৌধুরী প্রযোজিত

রাধা - পূর্ণ - জ্যোতি - পদ্মশ্রী
কল্যাণী - বীণা ও অন্যত্র

মঞ্চাভিনয়

সংগঠনীর ধর্মাভিনয় : বারাসতের প্রখ্যাত সাংস্কৃতিক সংস্থা সংগঠনীর শিল্পীরা কিছুদিন আগে ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায়ের 'একটি পয়সা' যাত্রাভিনয় করে স্থানীয় নাট্যানুরাগীদের মনে যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন। বাস্তব জীবন সমস্যাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা এই নাটকের পরিবেশনে শিল্পীরা যে স্বাতন্ত্র্যের নজীর রেখেছেন, তা সাধারণতঃ যাত্রার আসরে চোখে পড়েনা। এ ব্যাপারে পরিচালক বরুণ চট্টোপাধ্যায়ের শিল্পবোধ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। প্রায় প্রতিটি শিল্পী চরিত্রোপযোগী অভিনয় করতে পেরেছিলেন বলে সামগ্রিক প্রযোজনায় শৈথিল্য কখনো চোখে পড়েনি। অভিনয়ের ব্যাপারে অসাধারণ দক্ষতার স্বাক্ষর রাখেন দিলীপ মৌলিক, তাঁর 'রূপনারায়ণের' চরিত্র চিত্রণ প্রায় প্রতিটি দর্শককেই মুগ্ধ করেছে। 'দিবাকরের' ভূমিকায় বরুণ চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয় হয়েছে প্রাণস্পর্শী, আশুতোষ ঘোষালের 'কৃষ্ণনারায়ণ' হয়েছে দৃঢ় অথচ সংযত। 'মৌসুমী'র প্রাণচাঞ্চল্য মুখর হয়ে উঠেছে বেলা মজুমদারের সাবলীল প্রয়াসে, পূর্ণিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শবরী'ও হয়েছে কোমল ও সুন্দর। অন্যান্য কয়েকটি ভূমিকায় বৈশিষ্ট্য আরোপ করেন কিরণ চট্টোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ দে, সমরজিৎ দে, প্রীতি দে, পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় ও চন্দ্রনাথ দে। সংগীত পরিচালনায় প্রাণের স্পর্শ রাখেন প্রবীণ সরকার শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষাল। পাগলা কবি চরিত্র বাদীন চট্টোপাধ্যায়ের গান সমগ্র প্রযোজনায় একটি বিশিষ্ট সম্পদ।

শিল্পী যাযাবরের দুটি একাঙ্ক: উত্তর কলকাতার অন্যতম প্রখ্যাত নাট্যগোষ্ঠী 'শিল্পী যাযাবর' অজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের 'প্রমত্ত প্রহসন' ও বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'তাহার নামটি রঞ্জনা' একাঙ্ক দুটি মঞ্চস্থ করলেন। গত ২৪শে নভেম্বর রঙ্গনায় অভিনীত এই নাটক দুটি সুপ্রযোজিত। তুলনামূলকভাবে প্রথম নাটকটি সত্যই উচ্চমানের। অভিনয়ে শিল্পী যাযাবরের সমস্ত শিল্পীই আন্তরিক, নিষ্ঠাবান। তবু ওদের মধ্যে হীরক মুখোপাধ্যায়, জগন্নাথ বসু, দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, গৌতম বসু ও কৃষ্ণ চক্রবর্তী বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখেন। মঞ্চ ও আলোর কাজ অত্যন্ত উন্নত পর্যায়ের। পরিচালক জগন্নাথ বসু দুটি নাটকেই সার্থক।

রাহুমুক্ত : 'আত্রেথার' শিল্পীরা সম্প্রতি বীরু মুখার্জীর বাস্তবধর্মী নাটক "রাহুমুক্ত" জগদ্ধাত্রী পূজা উপলক্ষে বাবুরাম শীল লেন, বহুবাজার-এ পরিবেশন করেন। বিমল ভট্টাচার্য নাটকটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেন এবং আবহসংগীতের দায়িত্ব সার্থকভাবে বহন করেন উমাপতি শীল। সলিল চ্যাটার্জী, নিশিথ বড়াল, গৌতম মুখার্জী, বিদ্যুৎ মিত্র, লতিকা বসু, অমিয় ভট্টাচার্য, শ্যামল দে, বেবী সেনগুপ্তা, কুমারী মঞ্জু রায় প্রভৃতি শিল্পীর সুঅভিনয়ে নাটকটি বেশ সফলতা লাভ করে। অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন অমিতাভ চক্রবর্তী, উমাপ্রসাদ ব্যানার্জী, মৃণালকান্তি রায়, অশোক পাইন, সুভাষ বসু, ফটিক সেন, স্বপন ব্যানার্জী, সৌতম চ্যাটার্জী ও দিলীপ বড়াল।

বিবিধ সংবাদ

৬ষ্ঠ বার্ষিক জেলা শিক্ষাশিবির : ২৪ পরগণা জেলা জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সংঘের পরিচালনায় ইছাপুরে ৬ষ্ঠ বার্ষিক শিক্ষাশিবির আগামী ১৯ ডিসেম্বর '৭০ থেকে ২২ ডিসেম্বর '৭০ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ৫০০ জন শিক্ষার্থীকে শিবিরে গ্রহণ করা হবে। যোগাযোগ কেন্দ্র : শিবির সংগঠন-সম্পাদক, ৬।১, পঞ্চাননতলা রোড, কলিকাতা-৫৬। প্রতি মঙ্গলবার ও শনিবার সন্ধ্যা ৬-৩০টা থেকে ৮-৩০টা পর্যন্ত।

শিল্পী সংস্থা (সোদপুর, ২৪ পরগণা) আয়োজিত সারা বাংলা অপেশাদার সঙ্গীতশিল্পীদের প্রতিযোগিতায় এবার কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীতের সঙ্গে নতুন করে যুক্ত হয়েছে নৃত্য, তবলা এবং দেশাত্মবোধক গানের প্রতিযোগিতা। বয়স অনুযায়ী প্রতিযোগীদের তিনটি স্তরে ভাগ করা হয়েছে এবং সঙ্গীতজগতের প্রখ্যাতনামরা বিচারক হিসেবে সর্বপ্রকার সহযোগিতা দিতে সম্মত হয়েছেন। প্রতিযোগিতায় নাম তালিকাভুক্ত করার শেষ তারিখ : ২০ ডিসেম্বর। যোগাযোগ কেন্দ্র : তপন চৌধুরী মৌচাক, স্টেশন রোড, সোদপুর স্টেশনের পূর্বদিক ও নরেন্দ্রনাথ রায়, ১।১, শম্ভুবাবু লেন, কলকাতা-১৪

সাংস্কৃতিকী হাওড়া : কবি অতুলপ্রসাদের জন্মশতবর্ষ পূর্তির প্রাক্কালে তাঁর স্মৃতিচারণার উদ্দেশে সাংস্কৃতিকী হাওড়া একটি একক সংগীতের আসরে শ্রীসুনীল চট্টোপাধ্যায়ের গানে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন সম্প্রতি সাঁত্রাগাছির একটি ঘরোয়া আসরে। শ্রীচট্টোপাধ্যায় পনেরটি গান গেয়েছিলেন। সঙ্গে তবলা ও এসরাজ সহযোগিতা করলেন যথাক্রমে শ্রীকালোবরণ দাস ও শ্রীবারীন মৈত্র। অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল অতুলপ্রসাদের সঙ্গীত সম্পর্কে আলোচনা।

গত ১১ নভেম্বর টেকনিশিয়ান স্টুডিওতে হিট প্রডাকশনস নিবেদিত 'নব ডাকাত' ছবির শুভ মহরৎ সঙ্গীত গ্রহণের মাধ্যমে সুসম্পন্ন হয়। সঙ্গীত পরিচালনা করেন অনিল দত্ত। সঙ্গীতাংশে নেপথ্য গায়ক-গায়িকাদের মধ্যে ছিলেন যথাক্রমে শ্রীগোরাচাঁদ মুখোপাধ্যায়, বনশ্রী সেনগুপ্তা, বুলা সাহা, নবীন শিল্পী তুষার সেনগুপ্ত ও সুরকার অনিল দত্ত স্বয়ং। ছবিটির পরিচালনার দায়িত্বে আছেন শ্রীসমর চৌধুরী। আগামী মাসে ছবিটির বহির্দৃশ্য গ্রহণের মাধ্যমে নিয়মিত সুটিং শুরু হবে।

যৌবন

কুমারী বধুর জীবনে
সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর স্বীকারোক্তি
ভাষা দিয়েছেন রবি ও দীপন

বড়দিন
বিশেষ সংখ্যা
দাম : দুই টাকা

বর্তমান বাস্তব সমস্যা
মা-মেয়ে একই পথে কি করেছে?
মহাদেব ঘোষের লেখা : নরকের জন্ম

আমি ক্রিষ্টিন বলছি
প্রফুমোকে ভালবাসা আমার অপরাধ.........। তাইতো আর কাউকে.................।
বন্ধু প্রফুমোকে-আমাকে জড়িয়ে কেচ্ছা চাপতে এই দেহ আর সকলকে দিতে হচ্ছে......:
গুরুত্বপূর্ণ কোর্ট সাওয়াল লিখছেন : বীরেন ঘোষ

মম্স্ এ্যানজেলস
মেয়ে ছেলেদের নাচের প্রবন্ধ যা বর্তমানের সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক সংযোজন।

কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, হলিউড চিত্রতারকাদের মনোহারিণী লোভনীয়
ছবির বহর

শহরের শ্রেষ্ঠ সহনায়ক উপন্যাস—কলিকাতা পুলিশ আর গোয়েন্দা বিভাগের চোখে ধুলো দিয়ে যৌবনবতী এক্ট্রেসরা মেয়ে কেমন করে যৌবনের বিনিময়ে খুনের দায় থেকে মুক্ত হল। সেই শিহরিত শ্বাসরোধকারী কাহিনী লিখেছেন : রবীন সেন
বসন্ত যৌবন

এজেন্টদের অনুরোধ করা যাচ্ছে, যাঁরা এজেন্সীর দেয় ৫ টাকা জমা না পাঠালে, বই পাঠানো যাবে না। নিয়মিত বই পেতে হলে এজেন্সীর জমা বাবদ দেয় ৫ টাকা পাঠান

যৌবন / ৩, সাকলাত প্লেস / কলিকাতা—১৩

খেলার কথা

ক্রিকেটে দ্বিতীয় সোবার্স এবার মহিলা

খেলাধুলার বিভিন্ন বিষয়ে পুরুষের পাশাপাশি নারীদেরও কৃতিত্বের কাহিনী প্রায় সমান চমক লাগিয়ে চলেছে। বিশ্ব ওলিম্পিক এ্যাথলেটিকসে মেয়েদের রেকর্ডও কর্মতি যায় না। সাঁতারেও তাদের দক্ষতা পুরুষদের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। হকি, ফুটবল, টেনিস, ব্যাডমিন্টন, বাস্কেট-বল প্রভৃতিতেও মেয়েদের কৃতিত্বের কাহিনী ক্রীড়ামোদীদের অজানা নয়। কিন্তু ক্রিকেটে মেয়েদের দক্ষতার কথা খুব কমই শোনা যায়। তবে মেয়েরাও ক্রিকেট খেলে থাকে। ভারতে মেয়ে ক্রিকেটারদের নাম-ডাক শোনা না গেলেও ক্রিকেটের জন্মভূমি ইংলন্ড বা অস্ট্রেলিয়ার মেয়েদের মধ্যে ক্রিকেটের জনপ্রিয়তা অন্য কোন খেলার চেয়ে নগণ্য নয়। ইংলন্ড-অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে পুরুষদের ক্রিকেট খেলা 'ছাই'এর লড়াই নামে জগদ্বিখ্যাত। উভয় দেশের মধ্যে মেয়েদের ক্রিকেট খেলা আন্তর্জাতিক জগতে প্রসিদ্ধি লাভ না করলেও বহুকাল থেকেই (সম্ভবতঃ ১৯৩৪ সাল থেকে) চলে আসছে।

১৯৩৪ থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত ইংলন্ড ও অস্ট্রেলিয়ার মহিলা ক্রিকেট দলের দশটি সিরিজ খেলা হয়েছে, পাঁচটি ইংলন্ডে এবং পাঁচটি অস্ট্রেলিয়ায়। মেয়েদের অন্যান্য ক্রিকেট প্রতিযোগিতার আগেকার কোন রেকর্ড পাওয়া না গেলেও টেস্টম্যাচগুলির রেকর্ড পাওয়া যায়। এই দীর্ঘকালের আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার তালিকায় এমন একটি মহিলার নাম সম্প্রতি লিপিবদ্ধ হয়েছে, দক্ষতায় যিনি কোন পুরুষের চেয়ে কম যান না এবং মহিলা ক্রিকেটার হিসাবে শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়ের নাম উল্লেখ করতে হলে তাঁরই নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ্য।

এই মহিলার নাম এনিড বেকওয়েল। ১৯৬৯ সালে ইংলন্ড-অস্ট্রেলিয়ার মহিলা ক্রিকেট টেস্টে তিনি খেলোয়াড়ের আকাঙ্ক্ষিত 'ডবল' গৌরব অর্জন করেছেন অর্থাৎ এক মরশুমে এক হাজার রাণ করেছেন এবং একশো উইকেট পেয়েছেন।

এনিড ছেলেবেলা থেকেই ক্রিকেটের অনুরাগী এবং অন্যান্য খেলার চেয়ে পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে ক্রিকেট খেলতেই ভালবাসতেন। তাঁদের বাড়ীর কাছে একটা খোলা মাঠে ছেলেরা ক্রিকেট খেলত। তাদের দলে কম খেলোয়াড় হলে তাঁর ডাক পড়তো এবং ছেলেদের সঙ্গে সমান তালে ছুটোছুটি করে খেলতে পারতেন বলে ছোটদের ক্রিকেটে তাঁর সমাদর বাড়ে। এনিডের মা-বাবা উভয়ের দিক থেকে বংশে কোন ক্রিকেট খেলোয়াড় জন্মায় নি। মেয়ের উৎসাহ দেখে মা-বাবা তাঁদের একমাত্র মেয়েকে ক্রিকেট খেলার সাজ-সরঞ্জাম কিনে দিয়ে সাহায্য করতে থাকেন। তাঁদের নিউ হেড গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সমস্ত ছেলেমেয়েদের মধ্যে এনিড শ্রেষ্ঠ ক্রিকেট খেলোয়াড় হয়ে দাঁড়ালেন। অন্যান্য ছেলেরা খেলার প্রয়োজনে তাঁর ব্যাট, প্যাড বা অন্যান্য সাজ-সরঞ্জাম চেয়ে নিত।

চোদ্দ বছর বয়সে এনিড নটিংহামের মহিলা ক্রিকেট ক্লাব—নটস ক্যাজুয়েলের নিয়মিত খেলোয়াড় হিসাবে স্থান লাভ করেন। এনিড এই সময় বেশ শান্ত ও ধীর মেজাজের ওপেনিং ব্যাট হয়ে ওঠেন এবং রানের দিকে লক্ষ্য না রেখে বেশীক্ষণ টিঁকে থাকাই তাঁর লক্ষ্য হয়ে ওঠে। এইভাবে খেলতে খেলতে তাঁর ব্যাটও দ্রুত চলতে শুরু করে এবং পরিশেষে তিনি ভাল ব্যাটসম্যান হয়ে ওঠেন।

শঙ্করবিজয় মিত্র

১৯৫৭ সালে এনিডের বয়স যখন ১৬ তখন ব্যাটসম্যান হিসাবে তাঁর নাম-ডাক হয়। মেয়েদের ইন্টার-ক্লাব প্রতিযোগিতায় লিস্টারশায়ারের বিরুদ্ধে এনিড ৪০ রান করেও অপরাজিত থেকে যান। এই খেলায় তাঁর দলের মোট রান ছিল একশো এক। আবার ফিরতি খেলায় এনিড ঐ দলের বিরুদ্ধে ৫৬ রান করে নট আউট ছিলেন। তরুণী ক্রিকেটারের পক্ষে এটা কম কথা নয় এবং মহিলা ক্রিকেট জগতে তাঁর একটি স্থান হবার উপক্রম হয়। ১৯৫৯ সালে এনিড ডার্টফোর্ডের শারীর শিক্ষা কলেজ থেকে স্নাতক হন। সেই বছরেই ইংলন্ডের প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন তরুণীদের নিয়ে গঠিত উইমেন্স ক্রিকেট এসোসিয়েশন দলে স্থান পেয়ে হল্যান্ড ভ্রমণে যান। এই পর্যটনে এনিড ভালই ফল দেখান এবং ক্রিকেটের আর একটা দিকের প্রতি তাঁর আগ্রহ বাড়ে। সেটা হল বোলিং। ইংলন্ডের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্পিন বোলার টনি লকের বোলিং দেখে এনিড অনুপ্রাণিত হন এবং লকের ধরনে বোলিং শেখার চেষ্টা করেন। তাঁর ক্লাবের তরফ থেকেই এ বিষয়ে তাঁর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা হয়। এনিড একেবারে টনি লকের অনুকরণে বল করতে থাকেন। লক যে কটা স্টেপ নিয়ে বল করতেন, সেই একই সংখ্যক পদক্ষেপে এবং আম্পায়ারকে প্রায় প্রদক্ষিণ করে দৌড়ান পর্যন্ত অনুকরণ করে এনিড বাঁ হাতে স্লো বল দিতে থাকেন।

ক্রমে ক্রমে মহিলা ক্রিকেট জগতে এনিড একটা বিশেষ স্থান করতে সমর্থ হন। ১৯৫৮ সালে অস্ট্রেলিয়া পর্যটনের জন্য যে মহিলা দল বাছাই করা হয় তাতে সম্ভাব্য খেলোয়াড়ের তালিকায় এনিডের নাম ওঠে। কিন্তু বাছাই দলের তালিকায় তাঁর নাম বাদ যায়। এর পর ১৯৬৬ সালে নিউজিল্যান্ড মহিলা ক্রিকেট দল যখন ইংলন্ড পর্যটনে আসে এনিডের তখন বিয়ে হয়ে গিয়েছে এবং এনিড সন্তান-সম্ভবা। কাজেই তখনও ইংলন্ড দলে তাঁর স্থান লাভ সম্ভব হয় নি। ১৯৬৯ সালেই এনিড বেকওয়েল ইংলন্ডের টেস্ট টিমে প্রথম স্থান লাভ করেন এবং অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডে গিয়ে প্রথম সফরেই এনিড সাফল্যের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেন। এই পর্যটনে এনিড ১০৩১ রান ও ১১৮টি উইকেট সংগ্রহ করে মহিলাদের ক্রিকেটের ইতিহাসে এক অভিনব নজির রেখেছেন।

তন্বী ও খর্বকায় এনিডকে 'ফুল' ক্রিকেটার বলা হয়। খর্বকায় হলেও এ্যাথলেটিকসের সমস্ত গুণের তিনি অধিকারী। সদা সতর্ক, ক্ষিপ্রগতি এই মেয়েটি খেলতে নামলে কোন দিকে তাঁর ভ্রূক্ষেপ থাকে না। খেলার সঙ্গে একাত্ম হয়ে যান। ব্যাটিং, বোলিং, ফিল্ডিং—এই তিন বিভাগে তাঁর সমান দক্ষতা ও অফুরন্ত প্রাণশক্তি তাঁকে যে কোন দলের সম্পদরূপে পরিণত করে। অস্ট্রেলিয়া সফরে এনিড ২৯ ইনিংস খেলে ব্যাটিংয়ের গড়পড়তা রেখেছিলেন ৩৯·৬, আর বোলিংয়ে তাঁর হিসেব দাঁড়িয়েছে ৫৬৪·১-১১৫০-১১৮-৯·৭। একবার অস্ট্রেলিয়া এবং দুবার নিউজিল্যান্ডে—এই তিন দফায় এনিড এক ইনিংসে ৮টি উইকেট নিয়েছেন এবং আর ন দফায় এনিড পাঁচ বা ততোধিক উইকেট নিয়েছেন। তাছাড়া প্রথম টেস্টে আবির্ভাবে

এনিড 'সেঞ্চুরী' করার কৃতিত্বের অধিকারী হয়েছেন। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট খেলায় এনিড ১১০ রান করেন। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে পর পর দুটি টেস্টে ওপেনিং ব্যাটসম্যান হিসেবে এনিড সেঞ্চুরী করে মহিলাদের মধ্যে নতুন নজির রেখেছেন। প্রথম ও দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম ইনিংসে এনিড যথাক্রমে ১২৪ ও ১১৫ রান করেন। এই সফর পর্যটনে এনিড ছটি অর্ধশত রান করেন এবং দশটি ক্যাচ ধরেন।

প্রতি খেলাতেই এনিড তাঁর কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন এবং তাঁর এই নিরবচ্ছিন্ন সাফল্যে প্রতিপক্ষের বোলার ও ব্যাটসম্যানেরা এনিডকে সমীহ করে চলতে থাকেন। অস্ট্রেলিয়া ও ইংলন্ডের সংবাদপত্রসমূহে এনিডের দক্ষতার ভূয়সী প্রশংসা প্রকাশিত হয়। অস্ট্রেলিয়াতে ভিক্টোরিয়ার বিরুদ্ধে এনিড দলের সর্বোচ্চ রান (৫৯) করেন এবং মাত্র ২৮ রান দিয়ে সাতজন ব্যাটসম্যানকে আউট করে দেন। এডিলেডের এক সংবাদপত্র এই খেলার বিবরণ প্রসঙ্গে এনিডকে সোবার্সের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচটিকে 'বেকওয়েলের ম্যাচ' বলে অভিহিত করা হয়। এই টেস্টে ইংলন্ড সাত উইকেটে জয়ী হয়। এনিড এই ম্যাচে অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। প্রথম ইনিংসে এনিড ১১৪ রান করেন এবং ৬৮ রান দিয়ে চারটি উইকেট নেন। দ্বিতীয় ইনিংসে এনিড ৬৬ রান করে অপরাজিত থেকে যান এবং ৫৬ রান দিয়ে পাঁচটি উইকেট নেন। তাছাড়া খেলা শেষ হবার মাত্র চার মিনিট আগে এই ম্যাচে জেতার জন্য অতিপ্রয়োজনীয় একটি রান সংগ্রহ করে নিজ দলকে বিজয়ী করার গৌরবও এনিড অর্জন করেছিলেন। ১৯৫৪ সালের পর এইটিই মহিলাদের ক্রিকেটে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ইংলন্ডের প্রথম জয়। এনিডের অসাধারণ কৃতিত্বই এই বিজয়ের মূল কারণ বলে উল্লেখ করা হলে কোন ভুল হবে না। এই ম্যাচকে তাই 'বেকওয়েলের ম্যাচ' বলা হয়েছে।

অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডে সাফল্যের পর এনিড বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মহিলা অলরাউন্ডাররূপে (চোকশ) স্বীকৃতি পেয়েছেন। ক্রীড়া সমালোচকেরা তাঁর ব্যাটিং এবং বোলিংকে যে কোন শ্রেষ্ঠ পুরুষ ক্রিকেটার-এর সমতুল্য বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর আক্রমণাত্মক ব্যাটিং এবং দ্রুত রান তোলার দক্ষতা নাকি পুরুষদেরও হার মানিয়েছে। স্লো বোলিংয়ে বিপক্ষের ব্যাটসম্যানদের ঘায়েল করার ক্ষমতাও তাঁর অসাধারণ বলে তাঁরা প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন। এডিলেডের কাগজে তো তাঁকে মেয়েদের মধ্যে 'সোবার্স' বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

এ পর্যটনের অভিজ্ঞতার সঞ্চয়কে তাঁর জীবনের বিরাট সম্পদ বলে এনিড নিজেই তা স্বীকার করেন এবং টেস্ট দলে স্থান পাওয়াকে তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ ঘটনা বলে মনে করেন। নিরহঙ্কার, সাদাসিধে গৃহবধূ এনিড এই গৌরবে দেশের গৌরব বলেই অভিহিত করেছেন এবং এজন্য দলের অধিনায়িকা ও ম্যানেজারকে ধন্যবাদ দিয়েছেন।

অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড সফরান্তে এনিড স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলে নটিংহ্যাম কাউন্টি কাউন্সিল তাঁকে নাগরিক সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। এই সম্বর্ধনা সভায় নটিংহ্যামের মেয়র, অল্ডারম্যান মিসেস জোয়ান কোল, নটিংহ্যাম কাউন্টি ক্রিকেট ক্লাবের প্রেসিডেন্ট মিঃ আর এ গ্যারেট তাঁকে অভিনন্দন জানান। এনিড নানা প্রতিষ্ঠান ও গুণমুগ্ধদের কাছ থেকে নানা উপহার পান। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচে যে বলটি এনিড ব্যবহার করে নিউজিল্যান্ডের বিপর্যয় ডেকে এনেছিলেন সেই বলটি বাঁধিয়ে আবার তাঁকেই উপহার দেওয়া হয়।

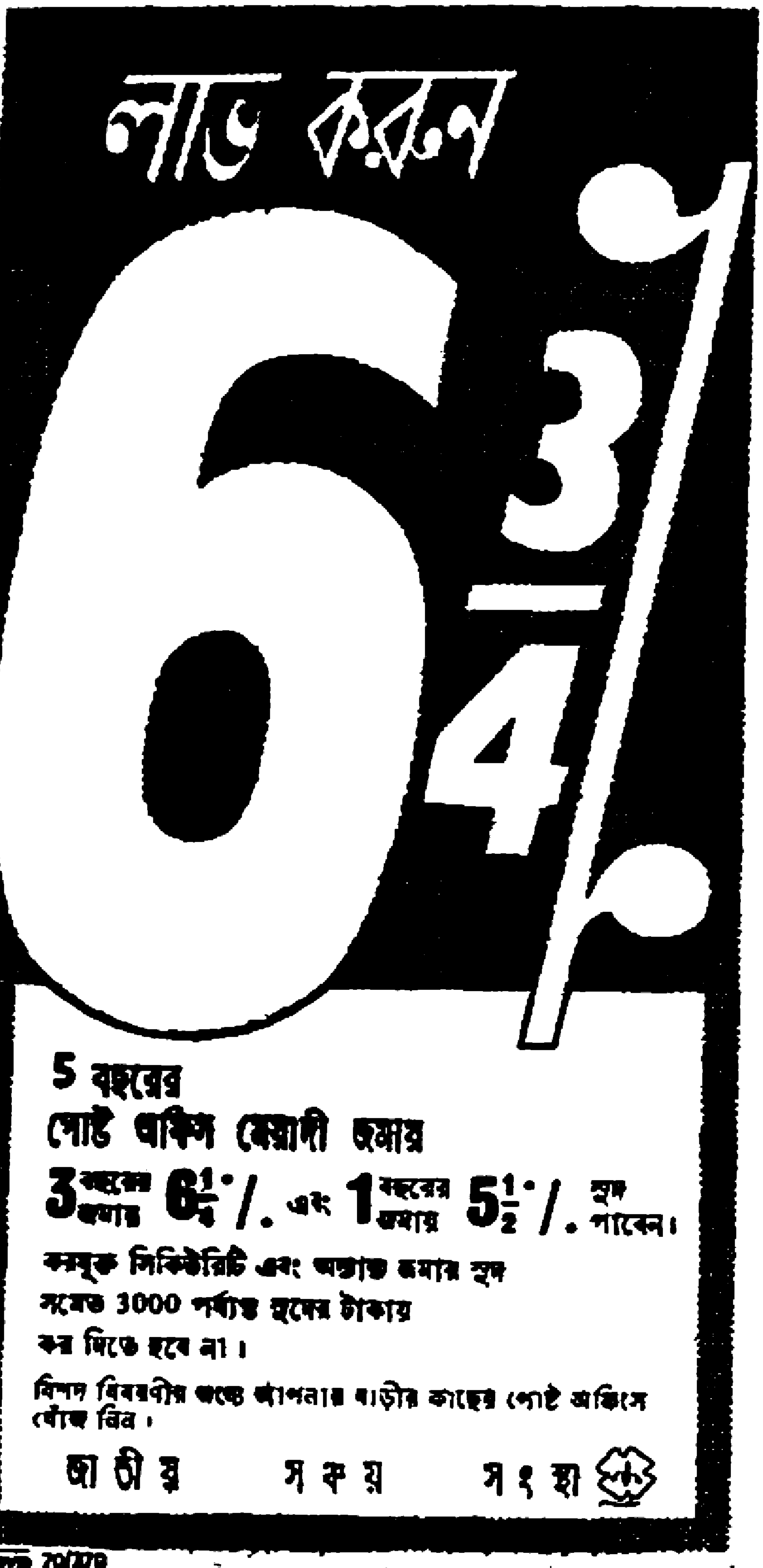

davp 70/370

ব্রিসবেন টেস্টের চতুর্থ দিনে সকালে ইংল্যান্ডের ব্যাটসম্যান ডি'ওলিভিয়েরা উইকেটের পেছনে ক্যাচ তুললে অস্ট্রেলিয়ার উইকেটরক্ষক মার্শ ঝাঁপিয়ে পড়েও শেষ পর্যন্ত বলটি ধরতে পারলেন না। ডি'ওলিভিয়েরা ঐদিন ৫৭ রান করার পর ম্যাকেঞ্জির বলে শিহানের হাতে ক্যাচ আউট হয়ে যান।

খেলাধুলা

দর্শক

ইংল্যান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়া

অস্ট্রেলিয়া: ৪৩৩ রান (কিথ স্ট্যাকপোল ২০৭, ডগ ওয়াল্টার্স ১১২ এবং ইয়ান চ্যাপেল ৫৯ রান। জন স্নো ১১৪ রানে ৬ এবং ডেরেক আন্ডারউড ১০১ রানে ৩ উইকেট)

ও ২১৪ রান (বিল লরী ৮৪ রান। শাটল-ওয়র্থ ৪৭ রানে ৫ এবং স্নো ৪৮ রানে ২ উইকেট।

ইংল্যান্ড: ৪৬৪ রান (জন এডরিচ ৭৯, ব্রায়ান লকহার্স্ট ৭৪, এ্যালান নট ৭৩ ও ডি'ওলিভিয়েরা ৫৭ রান। ওয়াল্টার্স ১২ রানে ৪ উইকেট)

ও ৩৯ রান (১ উইকেটে)।

অস্ট্রেলিয়ার ব্রিসবেনে আয়োজিত ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার প্রথম টেস্ট খেলা অমীমাংসিত থেকে গেছে। ব্রিসবেন মাঠে এই নিয়ে ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে যে ১০টি টেস্ট খেলা হল তার ফলাফল অস্ট্রেলিয়ার জয় ৪, ইংল্যান্ডের জয় ৩ এবং খেলা ড্র ৩। ব্রিসবেনের এই প্রথম টেস্ট খেলাটি ধরে ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে যে ১০৮টি টেস্ট খেলা হল তার ফলাফল: অস্ট্রেলিয়ার জয় ৫৫, ইংল্যান্ডের জয় ৪০ এবং খেলা ড্র ১৩।

প্রথম দিনের খেলায় অস্ট্রেলিয়া মাত্র দু'টি উইকেট খুইয়ে ৩০৮ রান সংগ্রহ করে। কিথ স্ট্যাকপোল ১৭৫ রান এবং ডগ ওয়াল্টার্স ৫৫ রান সংগ্রহ করে অপরাজিত থাকেন। এই নিয়ে স্ট্যাকপোল তিনটি টেস্ট সেঞ্চুরী করলেন, ইংল্যান্ডের বিপক্ষে তাঁর এই প্রথম সেঞ্চুরী। অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসের সূচনা শুভ হয়নি, মাত্র ১২ রানের মাথায় প্রথম উইকেট পড়ে যায়।

দ্বিতীয় দিনে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস ৪৩৩ রানের মাথায় শেষ হয়। কিথ স্ট্যাকপোল ৪৫৪ মিনিট খেলে তাঁর ২০৭ রানে ২৫টা বাউন্ডারী এবং একটা ওভার-বাউন্ডারী করেন। টেস্ট খেলায় তাঁর এই সর্বাধিক রান (২০৭)। ডগ ওয়াল্টার্স ১১২ রান করেন—টেস্ট খেলায় তাঁর এই ৮ম সেঞ্চুরী। তৃতীয় উইকেটের জুটিতে স্ট্যাকপোল এবং ওয়াল্টার্স দলের ২০৯ রান সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন।

দ্বিতীয় দিনে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস অপ্রত্যাশিতভাবে শেষ হয়—৪৮ মিনিটের খেলায় মাত্র ১৫ রানের বিনিময়ে অস্ট্রেলিয়ার শেষ সাতটা উইকেট পড়ে যায়। ইংল্যান্ড প্রথম ইনিংসের একটা উইকেট খুইয়ে ৯২ রান সংগ্রহ করে।

তৃতীয় দিনে ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসের রান দাঁড়ায় ৩৬৫ (৬ উইকেটে)—অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসের ৪৩৩ রানের থেকে ৬৮ রান কম। তাদের হাতে জমা ছিল ৪টে উইকেট।

চতুর্থ দিনে চা-পানের কিছু আগে ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংস ৪৬৪ রানের মাথায় শেষ হলে ইংল্যান্ড ৩১ রানে এগিয়ে যায়। খেলার বাকি ১২৭ মিনিটে অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় ইনিংসের দুটো উইকেট খুইয়ে ৫৬ রান সংগ্রহ করে।

পঞ্চম দিনে অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংস ২১৪ রানের মাথায় শেষ হলে হাতে এক ঘণ্টা খেলার সময় নিয়ে ইংল্যান্ড জয়-লাভের প্রয়োজনীয় ১৮৪ রান তুলতে দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নামে। কিন্তু এক উইকেটের বিনিময়ে ইংল্যান্ড ৩৯ রান তুলেছিল। ফলে খেলা ড্র হয়।

কাউড্রের রেকর্ড

খেলার তৃতীয় দিনে ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসের খেলায় কলিন কাউড্রে ২৮ রান করে আউট হন। বিভিন্ন দৈনিক সংবাদপত্রে কোন একটি বৈদেশিক সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের প্রেরিত সংবাদে বলা হয়েছে এই ২৮ রান করার সূত্রে কলিন কাউড্রে তাঁর ১০৫টি টেস্ট খেলায় মোট ৭২৫৬ রান সংগ্রহ করলেন এবং ইংল্যান্ডের ওয়াল্টার হ্যামন্ড প্রতিষ্ঠিত সর্বাধিক মোট রানের রেকর্ড (৭২৪৯) ভাঙলেন। কাউড্রের এই ৭২৫৬ রানের মধ্যে বেশ কারচুপি আছে। ১৯৬০ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে তিনটি বে-সরকারী টেস্ট খেলায় কাউড্রে যে ৩২৭ রান করেছিলেন তা ধরেই তাঁর এই ৭২৫৬ রান দাঁড়িয়েছে। কাউড্রের ১০২টি সরকারী টেস্ট খেলায় সংগৃহীত রান সংখ্যা ৬৯২৯। সুতরাং ওয়াল্টার হ্যামন্ডের মোট ৭২৪৯ রানের রেকর্ড ভাঙাতে কাউড্রেকে এখনও ৩২১ রান সংগ্রহ করতে হবে।

রঞ্জি ট্রফি
বাংলা বনাম উড়িষ্যা

বাংলা : ২৮৬ রান (প্রকাশ পোদ্দার ৫৮, গোপাল বসু ৭২ এবং শ্যামসুন্দর মিত্র ৯৯ নট আউট। অশোক মহান্তি ৪৯ রানে ৩ এবং স্বামী ৭৮ রানে ৩ উইকেট)

উড়িষ্যা : ৫১ রান (এইচ জিজ ১৮ নট আউট। সুব্রত গুহ ২৯ রানে ৭ উইকেট)

ও ১১০ রান (এইচ জিজ ৩৬ এবং বি দাস রাও ২৯ রান। সুব্রত গুহ ২০ রানে ৫ উইকেট)।

ইডেনের রঞ্জি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত পূর্বাঞ্চলের রঞ্জি ট্রফির খেলায় বাংলা দল এক ইনিংস ও ১২২ রানে উড়িষ্যা দলকে পরাজিত করেছে।

প্রথম দিনের খেলায় বাংলা ৭ উইকেট খুইয়ে ২৬৮ রান সংগ্রহ করে।

দ্বিতীয় দিনে বাংলার প্রথম ইনিংস ২৮৬ রানের মাথায় শেষ হয়। শ্যামসুন্দর মিত্র ৯৯ রান করে শেষ পর্যন্ত অপরাজিত থেকে যান। উড়িষ্যার প্রথম ইনিংসে মাত্র ৫১ রানের মাথায় শেষ হলে তারা বাংলার প্রথম ইনিংসের রানের থেকে ২৩৫ রানের পিছনে পড়ে দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নামে এবং ৯ উইকেট খুইয়ে ১১০ রান সংগ্রহ করে। দ্বিতীয় দিন মোট ২২টি উইকেট পড়েছিল—বাংলার প্রথম ইনিংসের ৩টে এবং উড়িষ্যার প্রথম ইনিংসের ১০টা ও দ্বিতীয় ইনিংসের ৯টা।

তৃতীয় দিনে খেলার ১৫ মিনিটের মধ্যে জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়ে যায়। এই দিনের খেলায় উড়িষ্যা একটা রানও সংগ্রহ করতে পারেনি।

বাংলার পেস বোলার সুব্রত গুহ বোলিংয়ে বিশেষ সাফল্যের পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি ৪৯ রানে ১২টা উইকেট পান—প্রথম ইনিংসের খেলায় ২৯ রানে ৭টা এবং দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় ২০ রানে ৫টা। এই সূত্রে তিনি রঞ্জি ট্রফির খেলায় মোট ১০০ উইকেট পাওয়ার গৌরব লাভ করেছেন। বর্তমানে তাঁর উইকেট পাওয়ার সংখ্যা ১০৬টি।

এশিয়ান গেমস্

ফুটবল

ফুটবল প্রতিযোগিতায় মোট ১০টি দেশ অংশ গ্রহণ করবে। এই দশটি দেশকে তিনটি গ্রুপে ভাগ করে প্রথমে লীগ প্রথায় খেলানো হবে। গতবারের চ্যাম্পিয়ান ব্রহ্মদেশ 'বি' গ্রুপে, রানার্স-আপ ইরান 'সি' গ্রুপে এবং তৃতীয় স্থান অধিকারী জাপান 'বি' গ্রুপে খেলবে।

ভারতবর্ষের খেলা পড়েছে 'এ' গ্রুপে। এশিয়ান গেমসের বিগত পাঁচটি আসরে ভারতবর্ষ মাত্র দু'বার স্বর্ণপদক পেয়েছে —১৯৫১ ও ১৯৬২ সালে।

গ্রুপ 'এ' : ভারতবর্ষ, থাইল্যান্ড এবং দক্ষিণ ভিয়েৎনাম।

গ্রুপ 'বি' : ব্রহ্মদেশ, জাপান, কম্বোডিয়া এবং মালয়েশিয়া।

গ্রুপ 'সি' : ইরান, ইন্দোনেশিয়া এবং দক্ষিণ কোরিয়া।

হকি

হকি প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী ৯টি দেশকে দু'টি গ্রুপে ভাগ করে প্রথমে লীগ প্রথায় খেলানো হবে। গতবারের স্বর্ণপদক বিজয়ী ভারতবর্ষ 'এ' গ্রুপে এবং রৌপ্যপদক বিজয়ী পাকিস্তান 'বি' গ্রুপে খেলবে। এখানে উল্লেখ্য, এশিয়ান গেমসের হকি প্রতিযোগিতায় এপর্যন্ত পাকিস্তান ২ বার (১৯৫৮ ও ১৯৬২) এবং ভারতবর্ষ ১ বার (১৯৬৬) স্বর্ণপদক বিজয়ী হয়েছে।

গ্রুপ 'এ' : ভারতবর্ষ, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, সিংহল এবং ইন্দোনেশিয়া।

গ্রুপ 'বি' : পাকিস্তান, জাপান, হংকং এবং থাইল্যান্ড।

ইস্টবেঙ্গল অ্যাথলেটিকস্

ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের বার্ষিক অ্যাথলেটিকসে এরিয়ান্স ক্লাব মহিলাদের দলগত এবং পুরুষ ও মহিলাদের ব্যক্তিগত খেতাব জয়ী হয়ে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে।

পুরুষ বিভাগ

দলগত চ্যাম্পিয়ান : ইস্টবেঙ্গল ক্লাব (৭২ পয়েন্ট)

ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ান : রজিৎ শেঠ (এরিয়ান্স) (১০ পয়েন্ট)

মহিলা বিভাগ

দলগত চ্যাম্পিয়ান : এরিয়ান্স (৩৪ পয়ঃ)

ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ান : গোপা ঘোষ ও তৃপ্তি ঘোষ (এরিয়ান্স) — ৮ পয়েন্ট

বালক বিভাগ

দলগত চ্যাম্পিয়ান : বাটা স্পোর্টস (১৭ পয়ঃ)

ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ান : তুষার পাল (কৃষ্ণনগর এ সি, নদীয়া) — ৮ পয়েন্ট।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে ভারতীয় ক্রিকেট দল

১৯৭১ সালের ক্রিকেট মরশুমে ভারতীয় ক্রিকেট দল ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে বের হবে। ইতিপূর্বে ভারতীয় ক্রিকেট দল দু'বার ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফর করেছে। আগামী ফেব্রুয়ারী মাসের ২ তারিখে ভারতীয় ক্রিকেট দলটি জামাইকায় পৌঁছবে। সফরের প্রথম ম্যাচ খেলতে নামবে ৫ই ফেব্রুয়ারী জামাইকা দলের বিপক্ষে এবং শেষ ম্যাচ শুরু করবে ১০ই এপ্রিল (কুইন্স পার্কে ৫ম অর্থাৎ শেষ টেস্ট ম্যাচ)। চারটি টেস্ট ম্যাচ ছাড়া আরও কয়েকটি প্রথম শ্রেণীর খেলায় রবিবারও খেলার দিন হিসাবে ধার্য করা হয়েছে।

টেস্ট খেলার নির্ঘণ্ট

১ম (সাবিনা পার্ক) : ফেব্রুয়ারী ১৮—২০
২য় (কুইন্স পার্ক) : মার্চ ৬—১১
৩য় (বোর্দা) : মার্চ ১৯—২৪
৪র্থ (কিংস্টন) : এপ্রিল ১— ৬
৫ম (কুইন্স পার্ক) : এপ্রিল ১৩—১৮

এখানে উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক টেস্ট ক্রিকেট আসরে ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড এবং পাকিস্তান—এই চারটি দেশের বিপক্ষে ভারতবর্ষ জয়ী হয়েছে, কিন্তু ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলকে আজও হারাতে পারেনি।

টেস্ট খেলার ফলাফল

স্থান	ওয়েস্ট ইন্ডিজ জয়ী	ভারতবর্ষ জয়ী	খেলা ড্র
ভারতবর্ষ	৬	০	৭
ওয়েস্ট ইন্ডিজ	৬	০	৪
মোট	১২	০	১১

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

everest/949d/PP bn

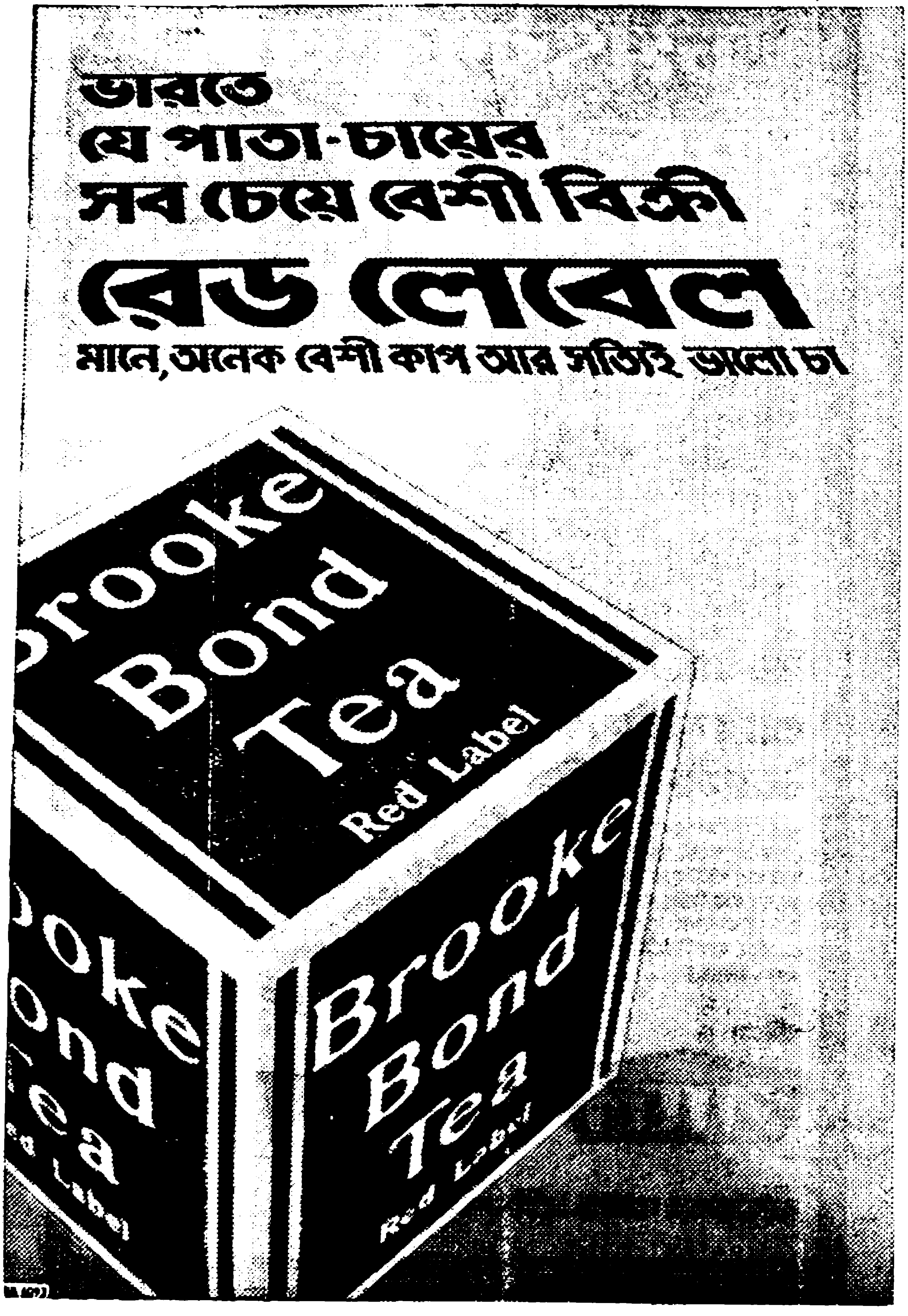
ভারতে
যে পাতা-চায়ের
সব চেয়ে বেশী বিক্রী
রেড লেবেল
মানে, অনেক বেশী কাপ আর সত্যিই ভালো চা
Brooke Bond Tea
Red Label
Brooke Bond Tea
Red Label

UNIVE

১০ম বর্ষ

৩য় খণ্ড

অমৃত

৩২শ সংখ্যা

মূল্য

৪০ পয়সা

Friday 18th December, 1970 শুক্রবার, ২রা পৌষ, ১৩৭৭ **40 Paise**

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
৪৮৪	চিঠিপত্র		
৪৮৬	সাদাচোখে		—শ্রীসমদর্শী
৪৮৮	দেশেবিদেশে		—শ্রীপুণ্ডরীক
৪৮৯	ব্যঙ্গচিত্র		—শ্রীকাফী খাঁ
৪৯১	সম্পাদকীয়		
৪৯২	পোষা বেড়াল বা কুকুরের মতো	(কবিতা)	—শ্রীকিরণরঞ্জন বসু
৪৯২	কি করি	(কবিতা)	—শ্রীসুচেতা মিত্র
৪৯২	কবিতা	(কবিতা)	—শ্রীঅমিতকুমার দে
৪৯৩	রাধা	(গল্প)	—শ্রীসতীকান্ত গুহ
৪৯৯	উইলিয়ম বাট্লার ইয়েট্স্		—শ্রীবিষ্ণু দে
৫০২	মুখের মেলা		—আবদুল জব্বার
৫০৫	ফুলশীচরিত	(উপন্যাস)	—শ্রীললিতমোহন চৌধুরী
৫১০	সাহিত্য ও সংস্কৃতি		—শ্রীঅভয়ঙ্কর
৫১৪	বইকুণ্ঠের খাতা		—শ্রীগ্রন্থদর্শী
৫১৬	মনের কথা		—শ্রীমনোবিদ
৫১৯	নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে	(উপন্যাস)	—শ্রীঅতীন বন্দ্যোপাধ্যায়
৫২৫	নিকটেই আছে		—শ্রীসন্ধিৎসু
৫৩৩	তোমাকে	(উপন্যাস)	—শ্রীনিমাই ভট্টাচার্য
৫৩৭	বিশালাক্ষী	(গল্প)	—শ্রীদিলীপ সেনগুপ্ত
৫৪২	গোয়েন্দা কবি পরাশর		—শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র রচিত —শ্রীশৈল চক্রবর্তী চিত্রিত
৫৪৩	অঙ্গনা		—শ্রীপ্রমীলা
৫৪৫	পিঞ্জর	(বড় গল্প)	—শ্রীসুভাষ সিংহ
৫৫০	জলসা		—শ্রীচিত্রাঙ্গদা
৫৫২	প্রেক্ষাগৃহ		—শ্রীনান্দীকর
৫৫৭	খেলার কথা		—শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়
৫৫৯	খেলাধুলা		—শ্রীদর্শক

প্রচ্ছদ : শ্রীপ্রদীপ দাস

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে অমৃতে প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য অমৃতের কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে অমৃতের কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পিতে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে অমৃতের কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফস্বল
বার্ষিক	টাকা ২০·০০	টাকা ২২·০০
ষান্মাসিক	টাকা ১০·০০	টাকা ১১·০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৫·০০	টাকা ৫·৫০

'অমৃত' কার্যালয়

১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,

কলিকাতা—৩

ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

চতুর্থ সংখ্যা দশম বর্ষ **রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা** কার্তিক-পৌষ ১৩৭৭

সম্পাদক রমেন্দ্রনাথ মল্লিক

লেখকসূচী : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (চিঠিপত্র), তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (নিসর্গপ্রসঙ্গে), শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (নাট্যকার গিরিশচন্দ্র), সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন), রমা চৌধুরী (রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ), হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় (রবীন্দ্রনাথের মানবিকতা), দীপককুমার বড়ুয়া (গান্ধীচিন্তায় বুদ্ধ ও বৌদ্ধসংস্কৃতি), বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় (সাহিত্যশিল্পী বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর), মহেশচন্দ্র রানা (ভবভূতির 'উত্তররামচরিতম্' ও বিদ্যাসাগরের 'সীতার বনবাস'), অজিতকুমার ঘোষ (সাধনকুমার ভট্টাচার্য স্মরণে), অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, সুধীরকুমার নন্দী, ধীরেন্দ্র দেবনাথ, দক্ষিণারঞ্জন বসু (গ্রন্থসমালোচনা)।

চিত্রসূচী : অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (নুরজাহানের সমাধি)

ত্রৈমাসিক সাহিত্যপত্র : প্রতি সংখ্যার মূল্য এক টাকা

বার্ষিক চাঁদা চার টাকা (সাধারণ ডাকে) ও সাত টাকা (রেজিস্ট্রি ডাকে)

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। ৬/৪ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা-৭

পরিবেশক : পত্রিকা সিণ্ডিকেট। ১২/১ লিণ্ডসে স্ট্রীট, কলিকাতা ১৬

চিঠিপত্র

আফ্রো-এশীয় লেখক সম্মেলন

চতুর্থ আফ্রো-এশীয় লেখক সম্মেলন হচ্ছে দিল্লীতে—এই সংবাদটি সংবাদপত্রের ভেতরের কোন পৃষ্ঠায় সংক্ষিপ্ত আকারে দেখেছিলাম। তারপর নভেম্বরের ১৬ থেকে ২০ পর্যন্ত ৫ দিন চলে গেছে; আর কি কোন সংবাদ দেখেছি? উল্লেখযোগ্য নিশ্চয়ই নয়। না, আমি হলপ করে বলতে পারি, কোন সংবাদপত্রই এজন্য কোন পৃথক পৃষ্ঠা নষ্ট করেন নি। এমন কি, কোনখানেই একটা স্বতন্ত্র প্রবন্ধ বা আলোচনাও চোখে পড়েনি। দোষটা কার, আমার জানা নেই। আমাদের একটা বৈশিষ্ট্যই বোধহয় এই যে, সম্মেলন যখন হচ্ছে—তখন লিখি সব ভাল ভাল কথা, বড় বড় পরিকল্পনা—কিন্তু অনায় আর সব নীরব। সম্মেলনের মান্যবরেরাও অনাথার নীরব। 'অমৃত' সম্পাদককে ধন্যবাদ যে, বিলম্বে হলেও এ-সম্পর্কে একটা আলোচনা প্রকাশ করলেন। চার্বাককেও আন্তরিক অভিনন্দন যে, তিনি শ্রম স্বীকার করে বিষয়টি সম্পর্কে কিছুটা বিস্তারিত জানার সুযোগ দিলেন।

চার্বাকের এই আলোচনা পড়ে মনে হলো, আফ্রো-এশীয় লেখক সম্মেলন একটা গালভরা বুলি নয়, দুই মহাদেশের একদলের জ্ঞানীগুণী বাঁরা সারস্বত সাধকদের জীবনাচরণ ও চিন্তাভাবনাকেই তাঁরা এই সম্মেলনের মাধ্যমে রূপদান করতে ইচ্ছুক। একদা রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত যে-ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন (পারস্য যাত্রী দ্রষ্টব্য), এ-কালের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা যে সে গুরুত্ব স্বীকার করেছেন সেটা সুখেরই কথা। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডঃ মুলকরাজ আনন্দ, মিশরের প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক ইউসুফ এল সেবাই, ডঃ ভিয়েতনামের তো হোয়াই, দঃ ভিয়েতনামের লেখক ফান তু, দঃ আফ্রিকার লেখক আলেক্স লেগুমা সেনেগালের সমালোচক বা যেইরি, বলার অপেক্ষা রাখে না এরকম প্রমুখ বিখ্যাত সব লেখকগণ এই সম্মেলনে উপস্থিত হয়ে সাহিত্যের পক্ষে বক্তব্য রাখেন। ভিয়েতনামের দুই প্রবক্তার প্রত্যেকেই রবীন্দ্রনাথের কথা বলেন এবং আফ্রিকার উপর তাঁর কবিতার উল্লেখ করেন। সম্মেলনের মূল সম্পাদক ইউসুফ এল সেবাই নাকি বলেছেন, 'লেখকদের শক্তি মুক্তিযোদ্ধাদের চেয়ে কম নয়।' তাঁর বক্তব্যটা ভারতের মাটিতে সম্ভবত খাটে বলা যাবে। তেমনি আমরা কি খুব তাড়াতাড়ি ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করব, দঃ ভিয়েতনামের লেখক ফান তুর বক্তব্য, 'আমাদের বিশেষ-নামের লেখকরা খুব ভালভাবেই জানেন যে, আমাদের স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে জীবন ও অস্তিত্ব জড়িত। আমি এ কথা বলতে গিয়ে গর্ববোধ করছি যে, দেশের এই পরিস্থিতিকে লেখকরা যথার্থভাবেই আমাদের সাহিত্যে তুলে ধরেছেন।'

শচীন বিশ্বাস
কৃষ্ণনগর

(২)

আপনাদের বিখ্যাত সাপ্তাহিক অমৃতে গত ১৬—২০শে নভেম্বর, '৭০ তারিখগুলিতে নোতুন দিল্লীতে অনুষ্ঠিত '৪র্থ আফ্রো-এশীয় লেখক সম্মেলন' প্রসঙ্গে প্রবন্ধ পড়ে খুব আনন্দিত হলাম। সারা ভারতের প্রগতিবাদী লেখকদের এত বড় সম্মেলন আগে আর ভারতে হয়নি। ভারতের জীবনে নবমূল্যায়নে এ-সম্মেলনের মূল্যও নোতুন। বাংলাদেশের আর কোন সুপ্রচারিত পত্রিকায় এবারের নোতুন দিল্লীর আফ্রো-এশীয় লেখক সম্মেলনের বিষয়ে এখনো কোন উল্লেখযোগ্য আলোচনা হয়নি। দুঃখের কথা।

বলা বাহুল্য, অমৃতের আলোচনাটি যথেষ্ট সময়োচিত হয়েছে। সেজন্যে লেখক এবং 'অমৃত'কে ধন্যবাদ।

বীরেন্দ্র বসু
কলিকাতা-১০

বৈকুণ্ঠের খাতা সম্পর্কে

গত ১১ই অগ্রহায়ণ শুক্রবার 'বৈকুণ্ঠের খাতা' শীর্ষনামের পুস্তক আলোচনায় গ্রন্থদর্শী কর্তৃক স্বনির্বাচিত সংকলন গ্রন্থের বিস্তৃত আলোচনার জন্যে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। কিন্তু উক্ত আলোচনায় তথ্যগত কিছু ত্রুটির মধ্যে অন্তত একটি ভ্রম সংশোধনের জন্যে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। অমৃতের অগণিত পাঠক-পাঠিকারা কাছে এই সঠিক তথ্যটি পরিবেশন করতে বাধিত থাকবো।

আলোচনায় যেখানে বলা হয়েছে যে ৫০ জন কবি নিয়ে শান্তনু দাস এ গ্রন্থটির কাজ আরম্ভ করেছিলেন পরে সুখেন্দু সরকারের সহযোগিতায় তার বৃহৎ রূপায়ণ এবং তাতে ৬৬ জন কবি সংকলিত হয়েছেন, প্রকৃত তথ্য তা নয়। কারণ সুখেন্দুবাবুই একটি কবিতা সংকলন করার অভিপ্রায় নিয়ে আমার কাছে আসেন। সংকলনের পরিকল্পনা, রূপায়ণ যোগাযোগ আমার হলেও মূল সূত্র কিন্তু তিনি। আমরা গোড়াতে পঞ্চাশ জন কবি নিয়ে কাজ সুরু করি এবং পরে পুনর্মুদ্রণে বাংলো ও 'স্মরণ' বিভাগ যোগ করে শেষ পর্যন্ত তা দাঁড়ায় ৬৬তে। পরে সংকলনের শ্রীবৃদ্ধিতে শুভানুধ্যায়ী হিসেবে আসেন ডঃ অমিয়কুমার সেন, তাছাড়া সরস্বতী প্রেসের মহেন্দ্র দত্ত, জীবপ্রিয় গুহ, বন্ধুবর মিহির দাস। বইয়ের আশাতীত সাফল্যের সোপানে দাঁড়িয়ে এঁদের কথা ভুললে চলবে কি করে? সাক্ষাৎকার রচনায় এ সব তথ্য রাখা একান্ত প্রয়োজন। আশা করি গ্রন্থালাপের ত্রুটি মার্জনা করবেন। আপনাদের পত্রিকার নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীর উপর আস্থা রেখে বক্তব্যটি পত্রস্থ করতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

শান্তনু দাস
সম্পাদক স্ব-নির্বাচিত

ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র

২২শে আশ্বিনের অমৃতে মানসী মুখোপাধ্যায়ের লেখা প্রবন্ধ 'ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র' পড়ে খুবই আনন্দ পেলাম। লেখিকাকে এ প্রবন্ধ লিখতে যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাঁর এ পরিশ্রম ও প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানাই। আজকের দিনে যখন আমরা সর্বনাশা প্রাদেশিকতায় পীড়িত, তখন তাঁর লেখা এ ধরনের প্রবন্ধ যে পারস্পরিক সম্পর্ককে সম্প্রীতিবদ্ধ করে তুলতে সাহায্য করবে তা খুবই স্বাভাবিক। লেখিকাকে এজন্য আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আশা করি 'অমৃত'-র পাতায় এ ধরনের প্রবন্ধ আমরা আরও দেখতে পাব।

পার্বতী সাহা
কুচবিহার।

রাজার শেষ ঘুম প্রসঙ্গে

আপনাদের পত্রিকায় মাঝে মাঝে বেশ ভাল গল্প বেরুচ্ছে—অনন্য, চলতি ধারার বাতায়, মৌলিক, নূতন প্রতিশ্রুতিতে ভাস্বর। গত ২০শে অক্টোবরের (১ম খণ্ড ২৪শ সংখ্যা) পত্রিকায় এমন একটি গল্প পড়লাম, মানব সান্যালের 'রাজার শেষ ঘুম'। গল্পের স্টাইলের মধ্যে নতুনত্ব, বিষয়ের মধ্যেও রয়েছে নবতর বক্তব্য, অথচ সবই স্বাভাবিক, গল্পের সাধারণ প্রকাশ। ভাষার মধ্য দিয়েই অভিব্যক্ত। কোথাও কোন চমক সৃষ্টির প্রয়াস নেই। সব মিলিয়ে গল্পটি সুন্দর। এমন গল্প আমাদের ভাবায়, এবং পড়বার পরও তার রেশ মনের মধ্যে তরঙ্গিত হতে থাকে। লেখকের আরও কিছু গল্প আপনাদের পত্রিকায় পড়েছি—চাঁদের হাট, পাপ,

চিঠিপত্র

আয়নার মুখ প্রভৃতি। সেগুলিতেও সম্ভাবনা ছিল, বর্তমান গল্পটিতে সে সম্ভাবনা আরও উজ্জ্বল। আমরা তাঁর কাছ থেকে আরও ভাল গল্প আশা করছি।

স্বরণা বসু
ব.গ.ইআটি,
কলকাতা—৫৯

(২)

১০ম বর্ষ ২য় খণ্ড ২৪ সংখ্যায় (৮ই কার্তিক, ১০৭৭ সাল) প্রকাশিত মানব সান্যালের 'রাজার শেষ ঘুম' গল্পখানি পড়লাম। ইতিপূর্বে ছোটগল্পে নর ও নারীর সম্পর্ক নিয়ে তাঁকে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা কোরতে দেখেছি। এ গল্পটি অবিশ্যি সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাদের, বাঁধাধরা পথ নেয় নি। পরমেশ সেনের গগনচুম্বী লোভ এবং তার অপরাধ-প্রবণ মনের যে বিশ্লেষণ তিনি স্বল্পপরিসরে করেছেন সেটি নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবী রাখে। আমার মতে এ গল্পটির অন্যতম আকর্ষণ পরমেশ সেনের 'psycho-analysis' এবং fantasy'র ব্যবহার। পরমেশ সেনের অন্তিম মুহূর্তের বর্ণনা এবং সেই প্রাচীন ঘড়িটার ঢং ঢং আওয়াজ 'Marlowe'র Dr. Faustus-এর শেষ soliloquy টিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। মাঝে মাঝে কতকগুলি শব্দপ্রয়োগ অবিশ্যি আসল সুরটিকে বহুলাংশে ব্যাহত করেছে। আমার মনে হয় এই বিশেষ গল্পটিতে 'শালা পরমেশের ভুঁড়ি ফাঁসিয়ে দাও', 'ব্যাঙ্কে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা' (রাশি রাশি বললে কি ক্ষতি হোত?), 'তখনই ওটার (ঘড়িটার) সারাদেহে চাঁদের মা বুড়ীর হিজিবিজি মুখ আঁকা' (হেলেমানুষী বর্ণনা বলে মনে হয় না কি?) ইত্যাদি বাক্যগুলি প্রয়োগের ব্যাপারে মানববাবু কিঞ্চিৎ সতর্কতা অবলম্বন কোরলেও পারতেন। তবে আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুর অভিনবত্বে এবং ভাষার সার্থক প্রয়োগে 'রাজার শেষ ঘুম' মানব সান্যালের একটি সার্থক রচনা।

সুহাসকুমার বিশ্বাস
উলবেড়িয়া
হাওড়া

অমৃতের স্বাদ-বিস্বাদ

অমৃত পত্রিকার আমি একজন নিয়মিত পাঠক। পাঠকদের ইচ্ছা-অনিচ্ছায় ভাল-মন্দ মন্তব্যের স্থান চিঠিপত্র দেখতে পাই বলে আমিও কিছু বক্তব্য রাখতে চেষ্টা করছি। সূচীপত্রের কিছু কিছু বিষয়ে স্বাদ পাই আবার কিছু কিছু বিষয়ে বিস্বাদ লাগে।

অমৃত পত্রিকায় আমাকে আকর্ষণ করে 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি', 'সাহিত্যের খবর', 'নতুন বই', নতুন লেখকদের গল্প ও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার সংক্ষিপ্ত আলোচনা-মূলক বিভাগগুলি। বিশেষতঃ ২৬ সংখ্যায় শারদ সাহিত্য, শারদ সাহিত্য পরিক্রমা, বইকুন্ঠের খাতায় মফঃস্বলের লিটল ম্যাগাজিন বিষয়ক লেখাগুলি পড়ে নতুন নতুন পত্র-পত্রিকার ও লেখক-লেখিকার খবরাখবর জানা যায়। তাছাড়া পুজোয় কোথায় কে কেমন লিখছেন তারও একটা ইমেজ পাওয়া যায়। বিশেষতঃ গ্রন্থদর্শী মফঃস্বলের তরুণ ও নতুন লেখক-সম্পাদকদের যে চিত্র অংকন করেছেন তা প্রশংসা ও সাহসের পরিচয় রাখে। অমৃত পত্রিকা যদি এভাবে প্রকৃত সমস্যা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে পারে তবে সাহিত্য জগতে ছোটখাট এক বিপ্লব সৃষ্টি করতে পারে। শুধু তাই নয় কলকাতা ও মফঃস্বলের নতুন নতুন পত্র-পত্রিকা ও তাদের লেখক সম্পাদকদের সংক্ষিপ্ত আলোচনায় যেমন তুলে ধরছেন তেমনি তুলে ধরলে আগামী যুগের লেখক সাহিত্যিকদের কাছে অমৃতের এক বিশেষ ভূমিকা থাকবে।

অমৃত পত্রিকায় বিস্বাদ লাগে 'এই আমাদের দেশ', 'নিকটেই আছে', 'মনের কথা' ও 'মুখের মেলা' বিভাগগুলি। বিষয়-বস্তু যাই হোক বড্ড দুর্বলভাবে উপ-স্থাপিত করা হয়। রূপদর্শী সাহেবও ডেঙ্গালে চলেছেন। তাঁর ভক্ত পাঠক হয়েও বলছি তাঁর লেখায় একঘেয়েমি, পৌনঃপুনিকতা ও নানা মুদ্রাদোষ দেখা দিয়েছে। তাছাড়া পত্র-পত্রিকায় সমালোচনাকালে কয়েকজন নামী-স্বল্পনামী লেখকদের নাম করে 'আরো অনেকে' বলে অন্যদের অবজ্ঞা করা হয় কেন? একটি নাম প্রকাশের জন্য একজন লেখকের লেখক হিসাবে প্রতিষ্ঠা বা সুযোগ পেতে কত সুবিধা হয় তা কি জানেন না? আশা করি ভবিষ্যতে এ ধরনের কৃপণতা করবেন না। শুধু অনুরোধ অমৃত পত্রিকা যেন অমৃতই পরিবেশন করে, স্বনামে সার্থক হয়ে ওঠে।

সত্যানন্দ গুহ
বঙ্কিম চাতরা,
চব্বিশ পরগণা।

'তুলসী চরিত' প্রসঙ্গে

আমরা দু'জনে বাংলাদেশের নামকরা কয়েকখানা সাপ্তাহিক ও মাসিক নিয়মিত পড়ে থাকি। কিন্তু স্বাদ বদলের ক্ষেত্রে "অমৃতে"র সঙ্গে কারুরই তুলনা হয় না। কয়েকটি রমণীর সংযোজনে "অমৃত" অপূর্ব হয়েছে। বিশেষ করে বলতে গেলে, প্রথমেই বলতে হয় শ্রীননীমাধব চৌধুরী মহাশয়ের লেখা "তুলসীচরিত"। বহুদিন এইরূপ সুন্দর লেখা বাংলা সাহিত্যে পড়ি নি। সবচেয়ে দুঃখ লাগছে এই লেখকের আরো কোন লেখা এর আগে পড়িনি ভেবে। শ্রদ্ধেয় লেখক মহাশয়কে আন্তরিক শ্রদ্ধা-নিবেদন করি।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা না জানিয়ে পারছি না, তা হোল, প্রায়ই সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলি তাদের নিজেদের লেখকগোষ্ঠীর মধ্যেই তাদের উপন্যাস, গল্প, কবিতা সীমাবদ্ধ রেখেছেন। কিন্তু "অমৃত" নিয়মিত নতুন লেখক-লেখিকাকে পাঠকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন, এবং এই সমস্ত নবাগত, নবাগতারা যথেষ্ট সাহসী এবং শক্তিমান। তাই আমরা সম্পাদক মহাশয়কে জানাই অভিনন্দন ও শ্রদ্ধা।

গোপাল বসু
অরুণ দত্তরায়
ভবানীপুর, খলপুর

(২)

আপনার সম্পাদিত 'অমৃত' পত্রিকার আমি একজন অনুরাগী। সব সময়েই আপনারা সুন্দর রচনার অর্ঘ সাজিয়ে 'অমৃত'কে জনপ্রিয় করে তুলেছেন। এবারও কিছুদিন থেকে ননীমাধব চৌধুরীর অনিন্দ্যসুন্দর উপন্যাস 'তুলসী চরিত' পড়ছি, ভাবছি, কখনো বিস্ময়ে হতবাক হচ্ছি। প্রতিবারের সংখ্যা হাতে পেলেই রুদ্ধনিশ্বাসে পড়তে শুরু করি, এমন সুন্দর রচনা তাড়াতাড়ি শেষ হবে বলে ভয়ে আস্তে আস্তে পড়ি, তবুও একসময়ে শেষ হয়ে যায়। পরবর্তী সংখ্যার দিন গুণি। সত্যিকথা বলতে কি এমন একটি মৌলিক নতুন স্বাদের বাস্তবধর্মী রচনার তুলনা হয় না বর্তমান যুগে। দেবাশিষ আমার কাছে একটি অদ্ভুত চরিত্র। লেখক দেবাশিষের মুখ থেকে জীবন অর্থাৎ লাইফ, রিলিজিয়ন, সিভিলাইজেশন, মোরালিটি সম্বন্ধে মহামূল্য কথা বলেছেন, সেগুলো সুধী পাঠকসমাজের মনে স্থায়ী ছাপ এঁকে দেবে। এমন একজন শক্তিশালী বাঙালী লেখকের জন্য বাঙালী আমরা গর্ব অনুভব করি। নমস্কার জানাই ও সেই সঙ্গে আশা করব উপন্যাসটির সুন্দর সমাপ্তি।

অশোক চক্রবর্তী
ঘটেশ্বর, নদীয়া

শাদা চোখে

একদা গান্ধীজি এই পশ্চিম বাংলার বুকেই 'লবণ সত্যাগ্রহ' করেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল বাঙালী তথা ভারতবাসীর জন্য নাগালের মধ্যে 'নুনের' সংস্থান করা। তখনকার দিনে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেন এই হতভাগ্য দেশের মানুষকে লবণ পর্যন্ত তৈরী করতে দিত না, যদিও অপর্যাপ্ত এই সম্পদ অন্যায় আমাদের মধ্যেই ছিল। ইংলণ্ড থেকে লবণ আসত, আর চড়া দামে শুধুমাত্র 'নুন-ভাতের' বাঙালী বাঙালীকে সেই লবণ খরিদ করে ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে হোত। গান্ধীজির সত্যাগ্রহ সেদিন নব-দিগন্তের দ্বার উদ্ঘাটন করেছিল—বাঙলার লবণ তৈরী শুরু হোল। সেই থেকে এই নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য শত উত্থান-পতনের মধ্যেও একই জায়গায় স্থির ছিল। কিন্তু বিগত দু' এক বৎসরের মধ্যে এর মূল্যও ক্রমাগত বাড়তির দিকে এবং আজ সেটা দাঁড়িয়েছে ২৬ পয়সা কিলো। শুধু তাই নয়, কখনও কখনও বাজারে আবার দুষ্প্রাপ্যও হয়ে ওঠে। আর সেই ফাঁকে মূল্যের ঊর্ধ্বগতি দেখা দেয়। হঠাৎ এই ঘটনা ঘটেছে।

একদিকে রাজনৈতিক অস্থিরতা আর একদিকে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির গগন-চুম্বী মূল্য বৃদ্ধি—এই দুই সমস্যার তরঙ্গাভিঘাতে বঙ্গবাসীর জীবন আজ বিপন্ন হয়ে উঠেছে। লবণের প্রসঙ্গটি প্রথমেই উত্থাপন করার কারণ হচ্ছে, প্রাত্যহিক জীবনে লবণ অপরিহার্য, কিন্তু একদিন সামান্য মূল্যের বিনিময়ে এই বস্তুটি পাওয়া যেত বলে এর তেমন কদর ছিল না। কিন্তু এর পেছনে যে রাজনৈতিক ইতিহাস আছে তার মূল্য অপরিসীম। শত শত দেশপ্রেমিকের অশ্রুসজল কাহিনী এই লবণ সত্যাগ্রহের সঙ্গে বিজড়িত। কিন্তু আজ দেশের নেতৃবর্গ ঐ ঐতিহাসিক সত্যাগ্রহের মর্যাদার স্মারক হিসাবে লবণের দর আয়ত্তে রাখতে পারলেন না বলেই দুঃখ হয়। তাই এই অতি সামান্য অথচ অতি প্রয়োজনীয় বস্তুটির কথা উল্লেখ করলাম।

রাজনৈতিক কার্যক্রমের মধ্যেই এই দুরবস্থা অবসানের উপায় নিহিত। একথা মেনে নিয়েও বলতে হয়, বর্তমান প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের দায়িত্বও এ ব্যাপারে কম নয়, কিন্তু অদ্যাবধি অনুরোধ ও আবেদন ছাড়া সক্রিয় কোন পন্থাই গ্রহণ হয় নি। ফলে, বিপর্যস্ত বাঙালী জীবনে আরও অভিশাপ নেমে এসেছে। অবস্থাও ক্রমেই ভয়াবহ হয়ে উঠছে।

ঋতু পরিক্রমার সঙ্গে সঙ্গে বাঙলার রূপ বদলায়, বাঙালী জীবনে নব নব পরিবেশের সৃষ্টি হয়। নতুন ধানে নবান্নর গানে যখন আকাশ বাতাস ধ্বনিত হয় তখন সুজলা-সুফলা বাংলার মাঠে মাঠে আবার সবুজের আস্তরণ পড়ে। নবান্ন-গন্ধের গন্ধে বাতাস মধুময় হয়—শীত তার সম্ভোগের উপকরণ নিয়ে হাজির হয়। হাটে বাজারে সবুজের মেলা বসে।

এবারও যে সে মেলা বসে নি তা নয়। কিন্তু বাঙালীর মুখে কই হাসি ত ফুটছে না। কেন এমন হল—উত্তর কে দেবে? এই মরশুমে শাক-সব্জী এবং অন্যান্য তরিতর-কারির দাম শুনলে কে না আঁৎকে ওঠে। সারা বছরের কৃচ্ছ্রসাধনের পর মানুষ এই সময়টার দিকে চাতকের মত চেয়ে থাকে। কিন্তু বাঙালী এবার দারুণ আঘাত পেয়েছে এবং ভবিষ্যতেও যে এর কোন সুরাহা হবে এমন কোন নিশ্চয়তা নেই।

আলু, কপি, কড়াইশুঁটি, বেগুন, মূলো এমন কি শাক পর্যন্ত যে দামে বিক্রি হচ্ছে, সাধারণ মানুষের তা ক্রয়ক্ষমতার বাইরে। যাঁরা 'চাকুরে' আছেন তাঁদের কিঞ্চিৎ বেতন বৃদ্ধি হয় নি এমন নয়, কিন্তু যা বৃদ্ধি হয়েছে তা কোনক্রমেই বাজারের পণ্যের মূল্যের সঙ্গে সঙ্গতি রাখার পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। এই মূল্যবৃদ্ধির জন্য অনেকে হয়ত বলবেন এবারের অকাল বর্ষা উৎপাদন ব্যাহত করেছে বলে রবি-শস্যের অনেক ক্ষতি হয়েছে। ফলে পর্যাপ্ত উৎপাদন না হওয়াতে চাহিদা পূরণে ঘাটতি পড়ায় মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে: সবক্ষেত্রে এই যুক্তি মোটেই মানতে রাজী নই। কেননা এ যুক্তির সারবত্তা নেই। প্রসঙ্গক্রমে আলুর কথাই ধরা যাক। গত বৎসর এই সময়ে আলু তিরিশ পয়সা থেকে শুরু করে পঞ্চাশ পয়সার মধ্যে বিক্রি হয়েছিল। যারা আলুর ব্যবসা করেন তাঁরা ত ২৫ পয়সা করে আলু কিনে কোল্ড স্টোরেজে ভর্তি করে রেখেছিলেন। সেই আলু এখনও পর্যাপ্ত পরিমাণে বাজারে মজুত আছে। আর ঐ ২৫ পয়সা করে কেনা আলু ঠান্ডা ঘরের মহিমায় এই সেদিন পর্যন্ত ১-৬০ পয়সায় বাজারে বিক্রি করা হয়েছে। ঐ পুরনো আলু যতক্ষণ স্টক শূন্য না হচ্ছে ততক্ষণ বাজারে নতুন আলু আমদানী সীমিত করে রাখা হবে। এটাই হচ্ছে ব্যবসার রীতি—মুনাফা শিকারের পন্থা। চাহিদা পূরণে যে ঘাটতির কথা বলা হচ্ছে তা মুনাফা লুটবার একটি প্রচার কৌশল মাত্র। এই ঠান্ডা ঘরের দৌলতে সারা বছর চড়া দামে সমস্ত মরশুমী ফসল—কোলকাতায় পাওয়া যায়। কিন্তু 'ঠান্ডা ঘরকে' ঠান্ডা করার মত কোন ব্যবস্থা অদ্যাবধি অবলম্বিত হয় নি।

কোল্ড স্টোরেজ নির্মাণ করার জন্য স্বর্গত ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের আমলে যথেষ্ট সরকারী অনুদান দেওয়া হয়েছে। উদ্দেশ্য ছিল পচনশীল উদ্বৃত্ত মরশুমী ফসল মজুত রেখে সরবরাহ অব্যাহত রাখা, এবং মানুষকে যাতে চড়া দামে মরশুমের পরেও এই সমস্ত শাকসব্জী খরিদ করতে না হয় তার ব্যবস্থা করা। কৃষকরাও যাতে 'distress sale' -এর হাত থেকে রক্ষা পায় এবং সমবায়ের মাধ্যমে ফসলের উপযুক্ত ও ন্যায্য উৎপাদন মূল্য লাভ করতে পারে সেদিকে নজর রাখা। কিন্তু ক্রমেই তাঁর সেই উদ্দেশ্যকে মুষ্টি ব্যবসায়ীরা বানচাল করে দিয়েছে এবং বর্তমানে ঐ ঠান্ডা ঘর কুক্ষিগত করে বাঙালী জনতাকে প্রায় ঠান্ডা করে ফেলেছে।

বিগত যুক্তফ্রন্টের আমলে এই 'ঠান্ডা ঘরকে' সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন করবার জন্য বিধানসভায় একটি বিল উত্থাপনের কথা হয়েছিল এবং শুধু তাই নয়, একটি খসড়াও অনুমোদিত হয়েছিল। যে কোন কারণেই হোক সে বিল আর উত্থাপিত হয় নি, ঠান্ডা ঘরেই থেকে গেছে। আর জনতার পকেট কেটে অসাধু ব্যবসায়ীরা তুড়ের নৃত্য করে চলেছে। বর্তমানের প্রশাসকগণ এত আন্দোলন ও বিক্ষোভ সত্ত্বেও এখনো পর্যন্ত সেই ঠান্ডা ঘর

নিয়ন্ত্রণকারী কিনটাকে নিয়ে মাথা ঘামাবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন নি। দুর্বামূল্য বৃদ্ধিজনিত অবস্থার মোকাবিলা করবার জন্য ক্ষণে ক্ষণে হুংকার দিচ্ছেন মাত্র, কিন্তু কাজের কাজ কিছু করছেন বলে ত মনে হয় না।

সেদিনও রাজ্যপালের মুখ্য উপদেষ্টা শ্রীবি বি ঘোষ সর্ষের তেল ব্যবসায়ীদের কাছে আবেদন জানিয়ে বলেছেন যে তাঁরা যেন অনুগ্রহ করে তেলের দামটা জনতার ক্রয় ক্ষমতার আয়ত্তের মধ্যে রাখেন। ক্রমাগত দাম বৃদ্ধিতে ঘোষ মহাশয় বিচলিত হয়ে সেদিন এক সম্মেলন বা সভা—যাই বলুন না কেন—ডেকেছিলেন, সেখানে যথারীতি ভাষণদান প্রসঙ্গে ব্যবসায়ীদের কাছে তিনি এই অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে উত্তর আসে, এই মূল্যবৃদ্ধির জন্য তাঁরা আদৌ দায়ী নন। ভিন্ন প্রদেশ থেকে সর্ষে আমদানী করতে হয়, আর সেখানেই এমন দাম চড়িয়ে দেওয়া হয়েছে যে তাঁরা কোন ক্রমেই তেলের দাম আয়ত্তে রাখতে পারছেন না। মোক্ষম যুক্তি। অতএব অনুরোধ ছাড়া গত্যন্তর কি? সঙ্গে সঙ্গে হিসাব নিকাশ হল। এই রাজ্যের চাহিদা পূরণের জন্য নাকি দরকার সাড়ে চার লক্ষ টন সর্ষের অথচ উৎপন্ন হয় মাত্র ৫৫ হাজার টন। সুতরাং সর্ষে উৎপাদনের জন্য তাহলে পরিকল্পনা রচনা করা হোক। এই পরিকল্পনা রচনার জন্য অবশ্য বিল আনার প্রয়োজন নেই, কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, কবে সেই সর্ষে উৎপাদিত হবে, এবং সেই সর্ষে বীজ থেকে তেল হবে?

সরকারী প্রচেষ্টার কথা শুনে হয়ত বঙ্গবাসী আতঙ্কিতই বোধ করবেন। ভিন্ন প্রদেশ থেকে আমদানী করতে হয় বলে সেই জায়গার কর্তৃপক্ষ যথেচ্ছ খুশী দাম নেবেন, এই বা কেমন কথা? বাংলার সর্ষের তেলের চাহিদা বেশী বলে অন্যরা খুশী মত দাম বাড়াবেন, এ ত চলতে পারে না। একই রাষ্ট্রের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চল রাজ্য যদি এই নিম্নস্তরের মুনাফাখোরী ব্যবসায়ী মনোবৃত্তি গড়ে ওঠে, তবে সেটা সমগ্র দেশের ঐক্য ও সংহতির ক্ষতিকারক নয় কি? নিতান্ত প্রাদেশিকতা ছাড়া একে আর কি বলা যায়? আর এই প্রাদেশিকতার জবাবে এই রাজ্যের মানুষ যদি ভিন্ন প্রদেশের লোকেদের চেয়ে চাকুরীতে অগ্রাধিকার দাবী করে, তখন হৈ-চৈ করবার কোন যুক্তিসংগত কারণ থাকবে কি?

আবার ব্যবসায়ীরা যে কারণ দেখিয়েছেন সেটাও পুরোপুরির সত্য বলে মেনে নেওয়া কঠিন। বাজারে প্রতিদিনই যে দাম বাড়ছে তার কারণ অন্যত্র নিহিত। প্রত্যেক নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষের দাম রোজই বেড়ে চলেছে এবং এই বৃদ্ধির মুখ্য কারণ হচ্ছে অতি মুনাফার লোভ। ব্যবসায়ীরা জানেন, সরকারী প্রশাসন যন্ত্র এখন তথাকথিত আইন শৃংখলা রক্ষার ব্যাপারেই সন্ত্রস্ত। ফলত, অন্য দিকে মাথা দেওয়ার মত ফুরসৎ নেই। ব্যবসায়ীরা অতীব ধূর্ত। তাঁরা এই সংকটের কথা বিলক্ষণ বোঝেন এবং এই সংকটকে কাজে লাগিয়ে দু' পয়সা করে নিতে তাঁরা পিছ পা হচ্ছেন না। আর এই মুনাফা শিকারের মনোবৃত্তি আজকে আর শুধু বড় ব্যবসায়ীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর কারবারি পর্যন্ত এই অতি লোভের শিকার হয়ে পড়েছেন। দাম বাড়বার হেতু জিজ্ঞাসা করলে খদ্দেরের পক্ষে অপদস্থ হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। কেননা, নানাবিধ জবাবও তারা সাজিয়ে রেখেছে।

এই ভয়াবহ অবস্থার অবসানকল্পে যথোচিত কর্মসূচী গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তার কথা আগেই উল্লেখ করেছি। সমস্ত পণ্যের এই আকাশচুম্বী মূল্য বৃদ্ধির ফলে নিম্নমধ্যবিত্ত ও সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ ক্রমেই কপর্দকহীন হয়ে পড়ছে। সঞ্চয় ত দূরের কথা, গ্রাসাচ্ছাদনই কষ্ট সাধ্য হয়ে উঠেছে। কিন্তু এই এলাকার মানুষ যদি স্বল্প পরিমাণেও সঞ্চয় করতে না পারে তবে দেশের মূলধন সৃষ্টির কাজ দারুণভাবে ব্যাহত হতে বাধ্য। আর মূলধন বৃদ্ধি না পেলে জাতীয় আয়ের মাত্রাও বৃদ্ধি পাবে না। ফলে, অর্থনৈতিক সংকট ক্রমশই তীব্রতর হতে সুরু করবে। গড়পড়তা হিসাব করে যে অংকের কেরামতি দেখানো হয় তা দেশের অর্থনৈতিক চিত্রের সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি নয়। একজনের মাসিক আয় ধরুন হাজার টাকা—আর একজনের আয় মাত্র দুশো টাকা। অতএব দু'জনের মাসিক গড়পড়তা আয় ৫৫০ টাকা। এ হিসাব আর চলে না। সাম্প্রত অবস্থার মূল্যায়নের কোন নজীর এতে থাকে না। এ শুধু চোখ দিয়ে মন ঠকাবার নামে। কাজেই প্রকৃত অবস্থার মূল্যায়ন করে সঠিক নীতি অনুসরণ করা একান্ত কর্তব্য।

অদ্যাবধি সরকার কোন দাম-নীতি ঘোষণা করেন নি। শুধু বেতন বৃদ্ধি করে পণ্যমূল্যের সঙ্গে ঘোড় দৌড় করেছেন মাত্র। কিন্তু পণ্য মূল্যের নীতি নির্ধারণ হলেই সরকারকে কিছু কিছু মৌলিক প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে। সেগুলি হচ্ছে, কৃষিনীতি ও ভূমি বন্টনের নীতি। এই সমস্ত প্রশ্নের সমাধানের জন্য বিভিন্ন প্রকারের আইন কানুন চালু করবার প্রচেষ্টা চলছে না এমন নয়, তবে সেগুলি কার্যকর করার জন্য যে আন্তরিকতা ও সদিচ্ছার প্রয়োজন, অদ্যাবধি বক্তৃতা ছাড়া তেমন কিছু লক্ষ্য করা যায় নি। যেটুকুও বা করা হচ্ছে তা সমুদ্রে বারিবিন্দুবৎ। সমস্যার তুলনায় নিতান্ত অকিঞ্চিৎ।

পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ শত বাধা সত্ত্বেও যে তড়িৎগতিতে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য দুটি আইন পাশ করিয়ে নিলেন—তার শতাংশের একাংশ চেষ্টা করেও যদি কোল্ড স্টোরেজ আইন পাশ করাবার জন্য আগ্রহী হন তবে, পশ্চিম বাংলার আপামর জনতা স্বাগতই জানাবে। কেউ বিরোধিতা করতে সাহসী হবেন বলে মনে হয় না। আর এই ঠাণ্ডা ঘর যদি নিয়ন্ত্রণাধীনে আনা যায় তবে অন্ততঃ পক্ষে আলুর সমস্যাটা সমাধানে করা যাবে, একথা স্থির নিশ্চয় বলা চলে। আলু বাঙালীর নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যের তালিকাভুক্ত। সরকার যদি আগ্রহী হয়ে সমবায়ের মারফৎ বা নিজস্ব এজেন্টের মারফৎ আলু ক্রয় করে নির্ধারিত মূল্যে বাজারে সরবরাহ করতে পারেন তবে এই তোলা কন্টুটি সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে থাকবে। এবং এই কাজ না করতে পারার কোন হেতু নেই। সব এক সঙ্গে করা হবে এ হেন প্রতিজ্ঞা নিয়ে যদি চলেন, তবে আখেরে কিছুই হবে না। একটা বিষয়ে সরকার অন্ততঃ তৎপর হোন, তাঁদের সদিচ্ছা প্রমাণ করুন, এটাই জনসাধারণের একান্ত অনুরোধ।

—সমদর্শী

দেশে বিদেশে

কংগ্রেস বিভক্ত হওয়ার পর দলের যে অংশ ক্ষমতাচ্যুত হয়ে গিয়েছিল সেই অংশটি দেখতে দেখতে আমেদাবাদ থেকে লখনৌতে, গান্ধীনগর থেকে জওহরনগরে পৌঁছে গেল। "দলের অস্তিত্বই যদি না থাকে তাহলে নীতির দাম কি থাকবে?"—শ্রীমতী তারকেশ্বরী সিংহের এই একটি প্রশ্নের মধ্য দিয়ে লখনৌতে সদ্যসমাপ্ত নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি (বিরোধী) বৈঠকের মনোভাব পরিস্ফুট হয়ে গেল।

"দল রেখে কি হবে যদি নীতিই বিসর্জন দিতে হয়?"—অল্প যে কয়জন এই পাল্টা প্রশ্ন তুলতে চেয়েছিলেন লখনৌ অধিবেশনে তাঁদের হার হয়ে গেছে। ডাঃ রামসুভগ সিং প্রশ্ন করেছিলেন—"মাত্র বছরখানেক হল তো আমরা ক্ষমতা হারিয়েছি। এখনই ক্ষমতা ফিরে পাওয়ার জন্য আমরা এত ব্যস্ত হয়েছি কেন?" এই প্রশ্নের জবাব দিলেন শ্রীমোরারজী দেশাই। তাঁর কথা হল, ক্ষমতা হাতে না পেলে দল বাঁচানো যাবে না, দেশ বাঁচানো যাবে না।"

এই ক্ষমতা ফিরে পাওয়ার জন্য বটেই, অতএব, বিরোধী কংগ্রেস দলের কমিটি স্থির করলেন যে, সমস্ত গণতান্ত্রিক দলের সঙ্গে একযোগে মিলিত কার্যক্রম গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে যতখানি সম্ভব সমঝোতা করার জন্য এবং উপযুক্ত কর্মপ্রণালী স্থির করার জন্য কংগ্রেস সভাপতিকে "অবিলম্বে ব্যবস্থা অবলম্বনের" ক্ষমতা দেওয়া হবে। কংগ্রেস সভাপতি অন্যান্য দলের সঙ্গে পরামর্শ করে "আমাদের গণতন্ত্রের সামনে যে সঙ্কট দেখা দিচ্ছে তার মধ্যে নির্বাচনী বোঝাপড়া ও একসঙ্গে কাজ করার উপযোগী ব্যবস্থা গড়ে তোলার সঙ্গে সম্পর্কিত সমস্ত প্রশ্নের বিচারও চূড়ান্ত করবেন।"

"গণতান্ত্রিক দল" বলতে কাদের বোঝাবে সেকথা প্রস্তাবে অনির্দিষ্ট রয়ে গেল, "নির্বাচনী বোঝাপড়া"র চেহারা কি হবে, এই "বোঝাপড়া" সারা দেশের ভিত্তিতে হবে অথবা স্থানীয় ভিত্তিতে এক এক জায়গায় এক এক ধরনের বোঝাপড়া হবে সেসব কথাও প্রস্তাবের মধ্যে খুলে বলা হয় নি। কম্যুনিস্ট পার্টি, স্বতন্ত্র, জনসঙ্ঘ ও মুসলিম লীগের নাম করে এই দলগুলিকে প্রস্তাবিত নির্বাচনী বোঝাপড়ার বাইরে রাখার জন্য তিনজন সদস্য একটি সংশোধন প্রস্তাব এনেছিলেন। সেই প্রস্তাবটি বিপুল ভোটাধিক্যে অগ্রাহ্য হয়ে যায়। কাদের সঙ্গে কি ধরনের বোঝাপড়া হবে, বোঝাপড়া করার জন্য দলের তরফ থেকে কারা আলোচনা করবেন সে সবই স্থির করবেন দলের সভাপতি।

এই প্রস্তাবের বিরোধীরা শেষ পর্যন্ত বিশেষ সুবিধা করতে পারেন নি। বিশেষ করে, গুজরাট, মহীশূর ও পশ্চিম বাংলার সদস্যরা এতদিন পর্যন্ত যেভাবে মহাজোট গঠনের বিরোধিতা করে এসেছেন তাতে অনুমান করা গিয়েছিল যে, অন্তত এই তিনটি রাজ্য থেকে নির্বাচিত এ-আই-সি-সি সদস্যরা একজোট হয়ে এই ধরনের একটি প্রস্তাব গ্রহণে বাধা দেবেন। কিন্তু জওহরনগরের অধিবেশন মণ্ডপে প্রস্তাবটি যখন ভোটে দেওয়া হল তখন দেখা গেল, তার বিরুদ্ধে পড়েছে মাত্র সাতটি ভোট।

নেপথ্যের সংবাদ হল, দলের হাইকমাণ্ড আশ্বাস দিয়েছেন যে, কোন রাজ্যে কোন দলের সঙ্গে নির্বাচনী আঁতাত হবে বা না হবে সে বিষয়ে বিরোধী কংগ্রেস দলের সংশ্লিষ্ট রাজ্য শাখার সঙ্গে পরামর্শ না করে এই বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়া হবে না। এই আশ্বাস পাওয়ার পর গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীহিতেন্দ্র দেশাই ও মহীশূরের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবীরেন্দ্র পাটিলসহ মহাজোট-বিরোধীদের একাংশ তাঁদের আপত্তি প্রত্যাহার করে নেন।

স্বতন্ত্র পার্টি ও জনসঙ্ঘের সঙ্গে জোট বাঁধার প্রস্তাবের আর একজন প্রধান বিরোধী ছিলেন ডাঃ রামসুভগ সিং। তিনিও শেষ পর্যন্ত প্রস্তাব গ্রহণে বাধা দেন নি কিন্তু তাঁর অসন্তোষ তিনি এখনও প্রকাশ করে চলেছেন।

এ-আই-সি-সি অধিবেশনে শ্রীমোরারজী দেশাই বলেছিলেন যে, যাঁরা "জাতীয় গণতান্ত্রিক" দলগুলির সঙ্গে সমঝোতার বিরোধী তাঁদের দল ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়াই ভাল।

আর কোথাও না হোক, অন্তত শ্রীদেশাইয়ের নিজের রাজ্য গুজরাটে এই প্রস্তাবের বেশ কিছুটা প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে বলে মনে হচ্ছে। ঐ রাজ্যে বিরোধী কংগ্রেস দলের শ্রীমনুভাই শাহ্ নিজের দলের নেতাদের কঠোর সমালোচনা করে বলেছেন যে, তাঁরা "আত্মবিনাশ এবং গণতন্ত্র ও ভারতবর্ষের ধ্বংসের জন্য" "নীতিহীন, অপবিত্র ও অকার্যকর পথ" বেছে নিয়েছেন। তিনি আরও বলেছেন যে, কংগ্রেস তার ৮০ বছরের ইতিহাসে যেসব নীতি ও আদর্শের জন্য কথা বলে এসেছে ও লড়াই করেছে সেগুলিকে সম্পূর্ণ নস্যাৎ করে দেওয়া হচ্ছে। (শ্রীশাহ্ বিরোধী কংগ্রেস দলের ওয়ার্কিং কমিটিতে স্থায়ী আমন্ত্রিত। কিন্তু তিনি এবার কমিটির অধিবেশনে যোগ দেন নি।)

গুজরাটের মন্ত্রী ও জোট-বিরোধীদের আর একজন মুখপাত্র শ্রীযশোবন্ত মেহ্‌তা দলের নেতাদের এই বলে সাবধান করে দিয়েছিলেন যে, পার্টির গুজরাট শাখা একটা আগ্নেয়গিরির উপর বসে আছে এবং জনসঙ্ঘ ও স্বতন্ত্র পার্টির সঙ্গে মিতালি করার বিরুদ্ধে যে বিক্ষোভ রয়েছে সেটা যদি নেতারা উপেক্ষা করেন তাহলে ঐ আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ ঘটবে।

সর্বশেষ খবর হচ্ছে শ্রীমেহ্‌তা ও তাঁর একজন সহকর্মী শ্রীচিমনভাই প্যাটেল গুজরাট মন্ত্রিসভা থেকে ইস্তফা দিয়েছেন।

•

এক সপ্তাহের মধ্যে দুজন সরকারী কর্মচারীক ও একজন [illegible] কাশ্মীর [illegible] পদে [illegible] দেওয়া [illegible] [illegible] নিয়ে [illegible] [illegible] একবার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] গলায় দড়ি বাঁধিয়ে ভর্ৎসনা করা হয়েছিল।

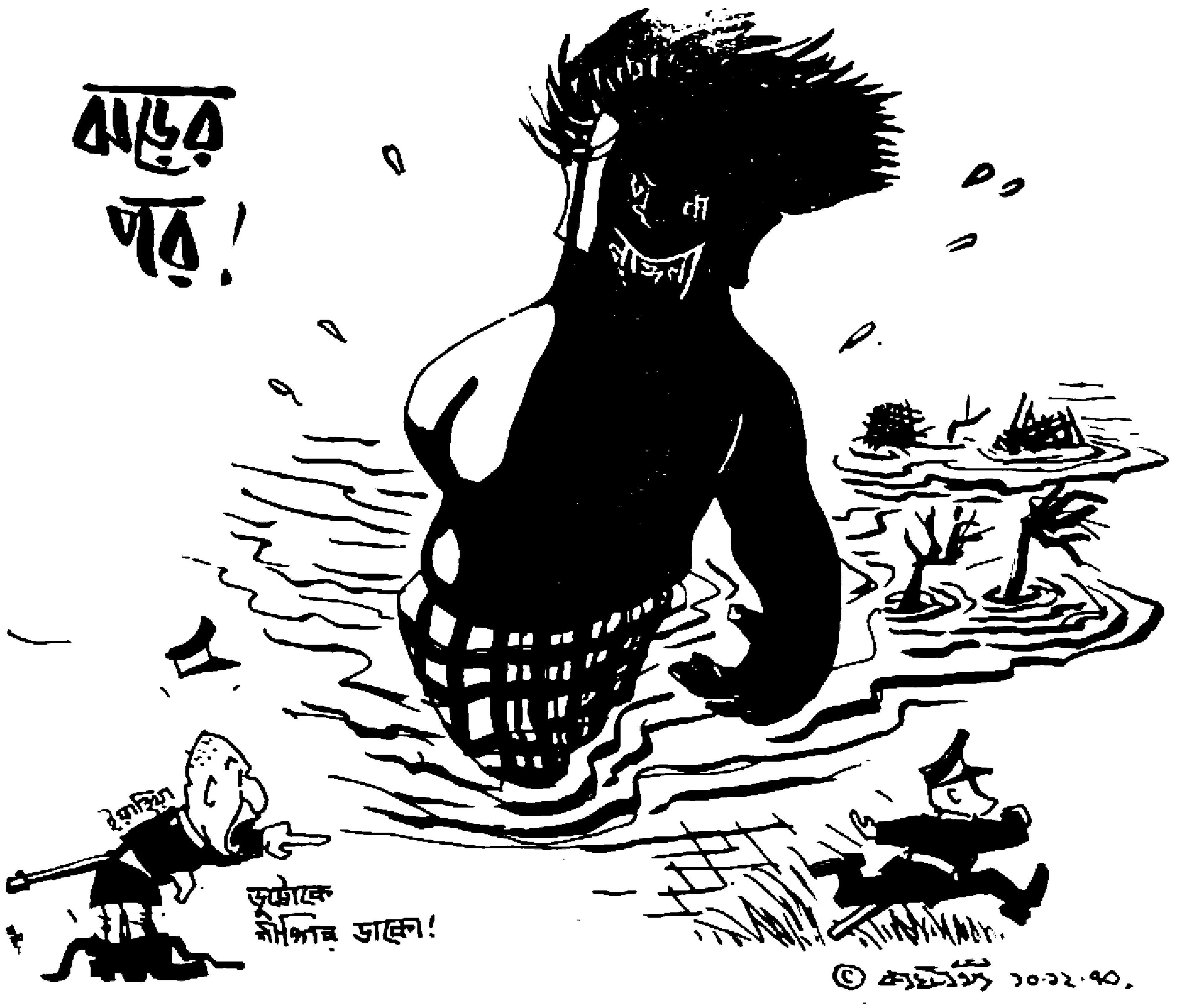

এই নয় বছরের মধ্যে আর কখনও সংসদ এভাবে বিচারালয় হিসাবে কাজ করেন নি।

ভারত সরকারের প্রাক্তন ডেপুটি আয়রণ অ্যাণ্ড স্টিল কণ্ট্রোলার শ্রী এস সি মুখার্জি সংসদের পাবলিক অ্যাকাউণ্টস কমিটিতে মিথ্যা বিবৃতি দিয়ে সংসদের অধিকারভঙ্গের অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হয়েছেন। লোকসভার স্পীকার শ্রীধীলন তাঁকে তলব করে এনে সেই কথাটা শুনিয়ে দিলেন এবং সভার পক্ষ থেকে তাঁকে সেজন্য তিরস্কার করলেন। এই মিথ্যা বিবৃতির দরুন তাঁকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে বলে সভার তরফ থেকে আগেই সরকারকে অনুরোধ জানান হয়েছে।

নাগপুরের ডেপুটি পুলিশ কমিশনার শ্রী কে পদ্মনাভন্ ও শ্রী এম পি চৌবের ক্ষেত্রে অবশ্য ব্যাপারটা ততটা সরল ছিল না। তাঁদের বিরুদ্ধে শুধু একটা অভিযোগ ছিল। অভিযোগকারী হচ্ছেন লোকসভার স্বতন্ত্র দলভুক্ত সদস্য শ্রী কে এম কৌশিক। অভিযোগের বিষয়বস্তু হচ্ছে গত ২৭ মে তারিখে নাগপুরে ঐ দুজন পুলিশ অফিসার শ্রীকৌশিককে প্রহার ও গালিগালাজ করেছেন। এই অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হয়নি, সংশ্লিষ্ট দুজন পুলিশ অফিসার অভিযোগটির সত্যতা মেনে নেন নি এবং আরও বড় কথা, কোন সংসদ সদস্য যখন সদস্য হিসাবে কাজ করছিলেন না তখন তাঁকে বাধা দিলে সেটা সংসদের বিশেষ অধিকারভঙ্গের পর্যায়ে পড়ে কিনা, এই প্রশ্নেরও মীমাংসা হয় নি।

স্পীকারের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীপদ্মনাভন ও শ্রীচৌবে শুধু এইটুকু স্বীকার করেছেন যে, যেদিন ও যেখানকার ঘটনার কথা বলা হয়েছে সেদিন সেখানে তাঁরা উপস্থিত ছিলেন। শ্রীকৌশিককে মারধর করার কথা স্বীকার বা অস্বীকার কিছুই না করে তাঁরা শুধু সেদিন যা কিছু হয়েছিল তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। সেখানেই প্রসঙ্গটির ইতি ঘটে।

পার্লামেন্টের বিশেষ অধিকারের কোন সংজ্ঞা নির্দিষ্ট নেই। কোন্ ব্যাপারটা সংসদের বিশেষ অধিকারের মধ্যে পড়ে তা স্থির করার এবং কখন সেই অধিকার ভঙ্গ হল তার বিচার করারও একমাত্র মালিক সংসদই। সংসদের বিশেষ অধিকারের সংজ্ঞা নির্দিষ্ট করে এ বিষয়ে তার হাত বেঁধে দেওয়ার জন্য আগেও দাবী উঠেছে। সম্প্রতি পর পর দুবার লোকসভা নিজেদের বিশেষ অধিকার সম্পর্কে স্পর্শকাতরতা প্রকাশ করায় ঐ দাবী আবার নূতন করে বিভিন্ন মহল থেকে উঠেছে।

*

পাকিস্তানের ২৩ বছরের জীবনের এই সর্বপ্রথম সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ফলাফল বিশ্লেষণ করে পাকিস্তান রেডিও বলেছে যে এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে দেশে একটা দ্বিদলীয় ছাঁচ গড়ে উঠল।

এই বিশ্লেষণ একদিক দিয়ে ঠিক আবার আর একদিক দিয়ে বেঠিক। এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ও পিপলস্ পার্টি ছাড়া পাকিস্তানের অন্যান্য কয়েক ডজন রাজনৈতিক দল ধরাশায়ী হয়ে গেছে। দ্বিদলীয় ছাঁচ বলতে যদি শুধু দুটি দলের আধিপত্য বোঝায় তাহলে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে অবশ্যই দ্বিদলীয় ছাঁচ তৈরী হয়েছে। কিন্তু লোকায়ত্ত শাসনব্যবস্থায় 'দ্বিদলীয় পদ্ধতি' কথাটা ভিন্ন আর একটা অর্থেও ব্যবহার করা হয়ে থাকে। সেটা হচ্ছে এই যে, এক দল আর একটির বিকল্প হিসাবে কাজ করে, যাতে এক দল ক্ষমতাচ্যুত হলে অন্য এক দল

তার স্থান নিতে পারে। যেমন, গ্রেট ব্রিটেনের রক্ষণশীল দল ও শ্রমিক দল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রিপাব্লিকান পার্টি ও ডেমোক্র্যাটিক পার্টি। এই অর্থে পাকিস্তানের নির্বাচনে যা হল তাকে স্বিদলীয় পদ্ধতির প্রবর্তন বলা যায় না। কেননা, পূর্ব পাকিস্তানে কেন্দ্রীভূত শেখ মুজিবর রহমানের আওয়ামী লীগ ও পশ্চিম পাকিস্তানে কেন্দ্রীভূত জুলফিকার আলি ভুট্টোর পিপলস্ পার্টি একে অপরের বিকল্প নয়। পাকিস্তান যেমন দুটি বিচ্ছিন্ন ভূখণ্ডের যোগফল তেমনি এই নির্বাচনের দ্বারা গঠিত জাতীয় পরিষদ হচ্ছে আঞ্চলিক দলের সমাহার।

পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ যে জিতবে সেটা আগে থেকেই অনেকে অনুমান করতে পেরেছিলেন। কিন্তু সেটা যে এত বড় জয় হবে তা অনেকেরই অনুমানের বাইরে ছিল। মুজিবর ইতিহাস তৈরী করবে।"—ঠেলেক্কা চক্রবর্তীর সেই কথাই সত্য হল। পূর্ব পাকিস্তানের সাইক্লোন-বিধ্বস্ত অঞ্চলগুলিতে যে নয়টি নির্বাচন-কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ স্থগিত আছে সেগুলি বাদ দিলে বাকী ১৫০টি নির্বাচনকেন্দ্রে ভোট নেওয়া হয়েছিল। এই ১৫০টির মধ্যে ১৫১টি আসন লাভ করে আওয়ামী লীগ ৩০০ সদস্যবিশিষ্ট জাতীয় পরিষদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে। এটা এখন নিশ্চিত যে, স্থগিত নির্বাচন-গুলি হলে এবং পূর্ব পাকিস্তানের মেয়েদের জন্য জাতীয় পরিষদে যে সাতটি আসন নির্দিষ্ট আছে সেগুলির নির্বাচন হয়ে গেলে জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগের সংখ্যাগরিষ্ঠতা আরও বাড়বে।

আয়ুব সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রী জুলফিকার আলি ভুট্টোর পিপলস্ পার্টি ৮১টি আসন লাভ করে জাতীয় পরিষদে দ্বিতীয় বৃহত্তম দল হিসাবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানের ভোটদাতাদের সমর্থন যেমন আওয়ামী লীগের সাফল্য এনে দিয়েছে তেমনি পাঞ্জাব ও সিন্ধুর ভোটদাতাদের সমর্থন পিপলস্ পার্টির সাফল্য এনে দিয়েছে।

এই নির্বাচনের ফলাফলের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল এই যে, পুরানো, অধিকতর প্রতিষ্ঠিত পার্টিগুলির এবং পুরানো আমলের অনেক নেতার পতন ঘটেছে। যে মুসলিম লীগ একদা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করেছে তার বর্তমান তিন অংশের কোনটিই সুবিধা করতে পারে নি। পুরানো আমলের যেসব নেতা হেরে গেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন মুসলিম লীগের (আয়ুব গোষ্ঠী) সভাপতি ফজলুল কাদের চৌধুরী, সিন্ধু যুক্তফ্রন্টের নেতা জি এম সৈয়দ, খুরো, নসরুল্লা খাঁ, আয়ুব খাঁর ভাই ও প্রাক্তন বিরোধী দলপতি সর্দার বাহাদুর খাঁ। দ্বিতীয়ত, ধর্মীয় গোঁড়ামির প্রবক্তা দলগুলিকে ও ভিত্তিহীন রাজনীতিকদের জনগণ প্রত্যাখ্যান করেছে। জমিয়ৎ-উল-উলেমা-ই-পাকিস্তান, জমিয়ৎ-উল-উলেমা-ই-ইসলাম ও জামাৎ-এ-ইসলামি দলগুলি ইসলামের নাম করে ভোট কুড়োবার চেষ্টা করেছিল। 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা'র আসামী মুজিবরকে ভারতের দালাল হিসাবে চিহ্নিত করে জামাৎ-এ-ইসলামি দল আসর মাৎ করার চেষ্টা করেছিল। তাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেছে। অপর দিকে, সামরিক বাহিনীর যেসব প্রাক্তন অফিসার ভোট যুদ্ধে নেমেছিলেন তাঁরা সবাই হতমান হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে আছেন বিমান বাহিনীর প্রাক্তন মার্শাল আসগর খাঁ ও তিনজন প্রাক্তন জেনারেল।

এই নির্বাচনের পর পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ একটা বিরাট প্রশ্নচিহ্নের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। জঙ্গী শাসক ইয়াহিয়া খাঁর হাত থেকে কৃপার দান হিসাবে এসেছে এই নির্বাচন। কিন্তু এই নির্বাচনের সঙ্গে সঙ্গেই ইয়াহিয়া খাঁ ও অন্যান্য জঙ্গী শাসকরা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে সোজা ব্যারাকে ফিরে যাচ্ছেন না। তা করার আগে ইয়াহিয়া খাঁ আরও কয়েকটি সর্ত পূরণ করিয়ে নেবেন। সেগুলি হচ্ছে : (১) জাতীয় পরিষদকে গণপরিষদ হিসাবে বৈঠক করে ১২০ দিনের মধ্যে একটি সংবিধান তৈরী করতে হবে। (২) এই সংবিধান ইয়াহিয়া খাঁর গ্রহণযোগ্য হতে হবে এবং (৩) পাকিস্তান হবে একটি ইসলামি প্রজাতন্ত্র, ইয়াহিয়া খাঁ কর্তৃক নির্দিষ্ট এই মূলনীতি বদলানো চলবে না।

এখন প্রশ্নটা যা দাঁড়াচ্ছে তা হল, ১২০ দিনের মধ্যে ইয়াহিয়া খাঁর গ্রহণযোগ্য একটা সংবিধান পাকিস্তানের এই নবনির্বাচিত জাতীয় পরিষদে প্রস্তুত করা যাবে কিনা।

স্পষ্টতই এজন্য সর্বপ্রথম যেটা প্রয়োজন সেটা হল আওয়ামী লীগ ও পিপলস্ পার্টির মধ্যে একটা বোঝাপড়া। এই দুই পার্টির নীতি ও কর্মসূচীর মধ্যে কিছু কিছু মিল থাকলেও গরমিলই বেশী। দুই দলই চায়, পাকিস্তান সেন্টো, সিয়াটো প্রভৃতি সামরিক জোট থেকে বেরিয়ে আসুক। দুই দলই, কিঞ্চিৎ ভিন্ন ভিন্ন ভঙ্গীতে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের কথা বলে। শেখ মুজিবর রহমানের দল চায় 'গণতন্ত্রের মধ্য দিয়ে সমাজতন্ত্র' আর ভুট্টোর কথায় 'ইসলাম, সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র হচ্ছে একই বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন দিক।'

যে জায়গায় এই দুই দলের মধ্যে সবচেয়ে বড় গরমিল এবং তাদের সহযোগিতার পথে বড় প্রতিবন্ধকতা আসার সম্ভাবনা সেটা হচ্ছে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্ত-শাসনের প্রশ্ন। শেখ মুজিবর রহমান নির্বাচনে জয়লাভ করার পরও তাঁর ছয় দফা দাবীর পুনরুক্তি করেছেন। এই ছয় দফা দাবীর মূল কথা হল, শুধু বৈদেশিক সম্পর্ক ও প্রতিরক্ষাকে কেন্দ্রীয় এক্তিয়ার-ভুক্ত বিষয়রূপে নির্দিষ্ট রেখে অন্যান্য সকল বিষয়ে পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যগুলিকে স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার দিতে হবে। জুলফিকার আলি ভুট্টো কি এই দাবী সমর্থন করবেন? সম্ভবত, না। অন্ততঃ এখন পর্যন্ত তিনি পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের অধিকারের প্রশ্নটি এড়িয়ে চলেছেন।

তাছাড়া, দৃষ্টিভঙ্গী, রুচি প্রভৃতির দিক দিয়েও পাকিস্তানের এই দুই নবীন নেতার মধ্যে ব্যবধান দেশের দুই অংশের মতোই বিরাট। ভুট্টো অভিজাত সামন্ত-তান্ত্রিক পরিবারের সন্তান, বৃটিশ ও আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিত ঘুঘোড় ব্যারিস্টার, চীন-ঘেঁষা, বামপন্থী বুলি বলেন এবং ভারতকে চিরশত্রু জ্ঞান করেন। আর শেখ মুজিবর রহমান সাধারণ বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত ঘরের মানুষ, ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের সম্পর্ক তিনি ভাল করতে চান, চীনের প্রতি তাঁর সবিশেষ প্রীতি কিছু নেই।

দুই দিকে এই দুই নেতা আর তাঁদের মাথার উপর জঙ্গীশাহীর নেতা ইয়াহিয়া—এই ত্রিভুজের মধ্যে দিয়ে এখন পাকিস্তানের রাজনীতি, আটকে রইল।

১১-১২-৭০ —পুণ্ডরীক

CENTRAL LIBRARY

সম্পাদকীয়

পাকিস্তানে নির্বাচনী বিপ্লব

গত সপ্তাহে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে দুটি দল নিঃসংশয় প্রাধান্যের পরিচয় দিয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানে শেখ মুজিবর রহমানের জাতীয় আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদে ১৫১টি আসন লাভ করে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে। পশ্চিম পাকিস্তানে প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টোর পিপলস্ পার্টি ৮১টি আসন পেয়ে দ্বিতীয় বৃহত্তম দল হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হল। আওয়ামী লীগের সব কটি আসনই পূর্ব পাকিস্তান থেকে পাওয়া। ভুট্টোর দলও পশ্চিম পাকিস্তানেই পেয়েছে এই সংখ্যাগরিষ্ঠতা। এতে প্রমাণ হল যে, পাকিস্তানে ঠিক জাতীয় দল বলতে কোনো দল নেই। প্রত্যেক দলেরই প্রাধান্য আঞ্চলিক এবং সে-অঞ্চল পূর্ব ও পশ্চিমে সুনির্দিষ্টভাবে বিভক্ত। কিন্তু যেহেতু পূর্ব পাকিস্তানে লোকসংখ্যা অনুপাতে আসনসংখ্যা বেশি সেজন্য আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পেরেছে। অর্থাৎ শেখ মুজিবর পূর্ব পাকিস্তানের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা—যদিও গোটা পাকিস্তানের নয়। তেমনি ভুট্টোর জনপ্রিয়তা পশ্চিম পাকিস্তানে। এখন এই দুই অংশের মধ্যে যোগাযোগের সেতু স্থাপন করতে পারেন এই দুইজন নেতাই।

পাকিস্তানে এই প্রথম প্রাপ্ত বয়স্কের সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল। সামরিক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁ পাকিস্তানের জনগণের এই অধিকার স্বীকার করে নিয়েছেন এটা তাঁর পক্ষে গৌরবের সন্দেহ নেই। কারণ, এর আগে এই দীর্ঘ তেইশ বছরে পাকিস্তানের মানুষ এই অধিকারের স্বীকৃতি পায়নি। পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে পূর্ব বাংলার মুসলমানদের দান অনস্বীকার্য। তাঁরা এর জন্য রক্ত দিয়েছেন বহুবার। আওয়ামী লীগের নেতা মুজিবর রহমানকে আয়ুব খাঁ জেলের বাইরে বেশিদিন থাকতে দেন নি। আয়ুব খাঁ বিদায় নেবার কিছু আগে মাত্র তিনি কারাগার থেকে ছাড়া পান। তিনি যে কত জনপ্রিয় পূর্ব বাংলার মানুষের কাছে এই নির্বাচনে ভোটাররা তার অভ্রান্ত প্রমাণ দিয়েছে।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁ তাঁর বার্তাতে মুজিবর ও ভুট্টোকে অভিনন্দিত করে বলেছেন যে, পাকিস্তানের এই সংকটকালে দেশের মানুষ এই দুই পার্টির ওপর আস্থা জ্ঞাপন করেছে। নির্বাচিত সদস্যদের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব হবে পাকিস্তানের জন্য একটি সংবিধান রচনা করা। জাতীয় পরিষদ এখন গণ-পরিষদ বা কনস্টিটুয়েন্ট এসেম্বলির দায়িত্ব পালন করবে। যেদিন থেকে গণ পরিষদের প্রথম অধিবেশন বসবে তার ১১০ দিনের মধ্যে সংবিধান প্রণয়ন করতে হবে—এ' হল প্রেসিডেন্টের নির্দেশ। সংবিধান তাঁর মনোমত হলেই অর্থাৎ যদি তিনি মনে করেন এর দ্বারা পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে সম্প্রীতি বজায় থাকবে তাহলেই তিনি তা অনুমোদন করবেন। কোনো বিষয়ে তাঁর আপত্তি থাকলে তিনি অগ্রাহ্যও করে দিতে পারেন। কারণ, পাকিস্তানে তিনি সামরিক আইন জারী করে রেখেছেন।

নির্বাচনের পর গণ পরিষদে এই দুটি প্রধান দল কীভাবে কাজ করবে তাই এখন সকলে সাগ্রহে লক্ষ্য করবেন। ভুট্টো বলেছেন যে তিনি মুজিবরের সঙ্গে আলোচনায় রাজী। মুজিবরের সঙ্গে ভুট্টোর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য সুস্পষ্ট। মুজিবর পূর্ব বাংলার সম্পূর্ণ স্বায়ত্ত শাসনের দাবী নিয়েই নির্বাচনে লড়েছেন এবং জিতেছেন। ভুট্টো তা স্বীকার করেন না। তিনি পূর্ব বাংলাকে একটি প্রাদেশিক সরকারের যতটুকু ক্ষমতা তার বেশি দিতে নারাজ। রাজনীতিতেও মুজিবর জাতীয়তাবাদী। ভুট্টো বামঘেঁষা এবং ইসলামী সমাজতন্ত্রের প্রবক্তা। মুজিবর ভারতের সঙ্গে সম্প্রীতি চান। ভুট্টো প্রচন্ড ভারত-বিরোধী। মুজিবর পশ্চিমী-ঘেঁষা এবং রাশিয়ার প্রতি সহানুভূতিশীল। ভুট্টো চীনের সঙ্গে হৃদ্যতার সম্পর্ক রাখার পক্ষপাতী। তাছাড়া পশ্চিম পাকিস্তানে তাঁর জনপ্রিয়তা রাখতে হলে ভুট্টো কিছুতেই মুজিবরের ছয়-দফা দাবী মানতে পারেন না—যা গৃহীত হলে পাকিস্তান একটি শিথিল ফেডারেশনে পরিণত হবে; পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা ছাড়া কোনো দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের থাকবে না, এমনকি কর ধার্য করার ক্ষমতা কিংবা কারেন্সি নোট বাজারে ছাড়বার ক্ষমতাও না।

এখানি মুজিবর তথা পূর্ব বাংলার নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অগ্নিপরীক্ষা। তাঁদের ছয় দফা দাবী সংবিধানে প্রতিফলিত না হলে মুজিবরের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষিত হবে না। এবং এই ছয় দফা দাবী পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক দলগুলো, বিশেষ করে ভুট্টোর পিপলস্ পার্টি মেনে নেবে কিনা এবং মেনে না নিলে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতাসম্পন্ন আওয়ামী লীগ একাই এই দাবী আদায় করবে কিনা তাই হবে পাকিস্তানের নির্বাচনোত্তর রাজনীতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

পোষা বেড়াল বা কুকুরের মতো ॥

দক্ষিণারঞ্জন বসু

সময় যেন এক পোষা বেড়াল,
পোষা বেড়াল নয়তো পোষা কুকুর।
ঠিক একটি পোষা বেড়ালের মতোই
সময় একেবারে নাছোড়বান্দা এবং
আমার একান্ত বশংবদ ও অনুগত।
ফাঁকি দিয়ে এড়িয়ে চলবো সময়কে,
তার কোনো উপায়ই নেই। প্রকৃতির
আলো-হাওয়ায় অন্ধকারে দুর্যোগে
সময় আমার সর্বক্ষণই একইভাবে
অনুসরণ করে চলেছে এবং চলবেও।
আগে আগে চলাই আমার অভ্যাস,
আর সময় তার রাগ-অনুরাগ এবং
নিন্দা-প্রশংসার ডালি নিয়ে এগোয়,
আমার পিছু নেয় এবং ছুটে চলে।
এখানেই আমার তৃপ্তি, আমার অহংকার,
কারণ আমি অনুসরণ করি না, কখনো না।
চিরকালই আমি অনুসৃত হয়ে আসছি—
সেই তো আমার গৌরব, আমার সান্ত্বনা!
সত্যি সত্যি ঠিক এক পোষা বেড়ালের মতো,
কিংবা পুরনো একটা পোষা কুকুরের মতো
সময় আমার একান্ত বশংবদ ও অনুগত
এবং সময়ের সেই আনুগত্য সম্পূর্ণ অকৃত্রিম!

কি করি ॥

সুচেতা মিত্র

কি করি সময় নিয়ে
বড্ড বেশি মাপাজোকা দিন
এখনও বিশ্রাম চাই
পাণ্ডুলিপি অসমাপ্ত আছে
এখনও চোখের কালি
কতো দিন এই পরবাস?

দক্ষিণে জানালা নেই
হাওয়া চাই বুভুক্ষু শরীরে
বড্ড বেশি মাপজোক
পরিমিত সমস্ত বিষয়
কতো দিন ছুটি পেলে
এখনও চোখের কোণে কালি।

কি করি সময় নিয়ে
এখনও বিশ্রাম বাকি আছে।

কবিতা ॥

অমিতকুমার দে

নির্জন সৈকতে বেলাভূমির তীরে
বহুদিন গেছি আমি
মন মিশে যেত সবুজ ঘাসে, নানা ঢেউয়ের
কলেবরে।

নানা যাযাবরের দেশে ভিড়ে যেতাম
জনতার মাঝে। চিনত না কেউ
হতে পারিনি কবিতা।

একদিন বিস্মৃতির অতল গহ্বরে
তলিয়ে যাবো।

তোমাদের সবাইকে ফেলে রেখে
সুন্দর শুভ্র জোছনার পরিবর্তে
মিশে যাব অমার অন্ধকারে।

অভিনয়ের অন্তে
যখন গ্রীনরুমের পর্দায় ঢাকা পড়ব
তখনো কি জ্বলে উঠবে না
কোনো ঢেউয়ের চূড়ায় ফসফরাসের চিত্রকল্প।

মায়া

শীকান্ত গুঁই

আমি চিরকুমার। এবং চরিত্রবান। একারণেই, ইউক্লিড ও জেমিনির মতে নিঃসন্দেহে নিঃসন্তান। সুতরাং আমার সংসার বলতে কিছু নেই। এছাড়া আমার জ্যেষ্ঠ মাতুল নিতান্ত খেয়ালের বশে আমার নামে কয়েক লাখ টাকা ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রেখে মানসিক সুস্থতা ফিরে পাবার আগেই ইহলোক ত্যাগ করেন। ফলে, বিশেষ করে যেহেতু কাজে আমার ছেলেবেলা থেকেই প্রবল আপত্তি, আমার ভবঘুরে হবার পথে কোন বাধাই রইল না।

বাধা হয়ে দাঁড়াল আমার চরিত্রগত আলস্য। ভবঘুরে হতে গেলে উঠে বসতে হয়, বাক্স-পেটরা গোছাতে হয়, ভেবে আমার হৃৎকম্প হত। আমার আলস্যের অকৃত্রিমতা সম্বন্ধে যাতে কেউ অনর্থক সন্দেহ পোষণ না করেন, গোড়াতেই বলে নেওয়া ভাল আমার বয়েস চল্লিশ, দেখে মনে হয় তিরিশ। এ সত্ত্বেও আমার পক্ষে হৃদয়-ঘটিত ব্যাপারে লিপ্ত হওয়া সম্ভব হয় নি। তার একমাত্র কারণ আলস্য, অচিন্ত্য অভূতপূর্ব আলস্য। যাঁরা আমার এ উক্তি পরিহাস জ্ঞান করে হাসছেন, তাঁরা আমার টেবিলের বাঁ দিকের ড্রয়ারে তরুণীদের ও তরুণী-ভাবাপন্ন প্রৌঢ়াদের চিঠির তাড়াগুলোর চোখ বুলিয়ে নিতে পারেন।

প্রাণীজগতে আমি আমার তুলনা খুঁজে পাই না। শ্লথ নামের যে জীবটির কথা এ প্রসংগে কারো-কারো মনে আসতে পারে, তার সম্বন্ধে আমার বিশেষ আপত্তি। পাতা খেতে তাকে গাছে উঠতে হয়। স্বেচ্ছায় না অনিচ্ছায়, জানি না। তবু গাছে উঠে সে আলস্যের প্রাথমিক নিয়ম ভঙ্গ করে। হয়তো খিদের জ্বালায় এবং দ্বিতীয় উপায় না থাকায়। কিন্তু যেহেতু শ্লথের আচরণ সন্দেহমুক্ত নয়, তাকে সমগোত্র হিসেবে মেনে নিতে আমার সংস্কারে ও বিবেকে বাধে। স্বীকৃত ইতিহাসে আমি অনন্য। মহাকাব্যের যুগের কুম্ভকর্ণের কথা অবশ্য থেকে-থেকেই মনে হয়। তবুও, কুম্ভকর্ণেরও পদস্খলন হয়েছিল। তিনিও একদিন, যে কারণেই হোক, লম্ফঝম্প বিলক্ষণ দাপাদাপি করে লণ্ডভণ্ড বাধিয়েছিলেন।

যাঁরা আমাকে সজীব জড়পিণ্ড ভেবে মানুষের হিসেবের খাতা থেকে আমার নামটা বাদ দেবার পক্ষপাতী, তাঁরা শুনে বিস্মিত হবেন যে আমি একটি গভীর অর্থপূর্ণ জীবন যাপন করছি। আকাশের দিকে তাকিয়ে পাথরের কল্পিত তপস্যা নয়। জীবনের সুগভীর স্তরে সন্ধানী মনের অনন্ত যাত্রা। এ যে কি এক বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা, তা খানিকটাই শুধু বোঝান সম্ভব। যাঁরা অন্তত চোখ থাকা অলস সেই মুষ্টিমেয় মানুষরাই আমার জীবন তাৎপর্য পুরোপুরি বুঝবেন। জীবন ধারণের প্রয়োজনে কয়েকটা খুঁটিনাটি কাজে দেহের শরণাপন্ন হতেই হয়। ঐ গৌণ ভূমিকায় দেহকে ব্যস্ত রেখে, মন আঁকড়ে পড়ে থাকা এবং মানুষের জীবনের সবকটা ফাঁকে উঁকি দিয়ে গুপ্ত তথ্য উদ্ধার করা যে কি এক রোমাঞ্চকর কাজ তা শুধু আমার মতো নিষ্কাম-অকাম মানুষরাই জানেন। এ প্রসঙ্গে স্থান-মহিমার বিষয় উল্লেখ না করলে এ আলোচনা অনেকটা অবাস্তব মনগড়া ঠেকবে। অনেকের মতে প্যারী যেমন ভবঘুরেদের রাজধানী, আমার মতে কলকাতা হচ্ছে কুঁড়েদের স্বর্গ। এ শহরে সাধারণ জীবনযাত্রার ব্যাপারে যত অব্যবস্থাই থাক না কেন, চারদিকে কুঁড়েমির অপরিমিত অবকাশ। এখানে কাজ করতে-করতে মানুষ তার অজ্ঞাতসারে কুঁড়েমির ডাকে সাড়া দেয়। কান পাতলে শোনা যায় কে যেন কয়েকটা পর্দার আড়ালে নীচু পর্দায় অথচ গভীর স্বরে বলে চলেছে, 'এসো-এসো। কাজ থেকে ছুটি নিয়ে আমার সঙ্গে আমার পাশে এসো।'

এই কলকাতা শহরে নির্ঝঞ্ঝাটে আমি বছরের পর বছর কাটাচ্ছি। সমাজ কুঁড়েমিকে গাল দেয়, কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় কুঁড়েকে মাথায় করে নাচে। তার কারণ, বাইরে থেকে অনেক কুঁড়েকেই বিশেষ বাস্তববোধসম্পন্ন মনে হয়। কাজের ক্ষমতা যার কিছুই আসে যায় না, তার পক্ষে একাধিক কাজে জড়িত হতে বাধা কী? যে কুঁড়ের অর্থবল আছে, সে যদি বাক্‌কুণ্ঠ না হয় এবং যাহা বলতে সমাজের মন ভুলিয়ে চলতে পারে, সমাজ তাকে মাথায় করে নাচতে দ্বিধা করে না।

আমার এত কথা বলে ভনিতা করার অর্থ এই যে, আমি একটি বিশেষ শ্রেণীর কুঁড়ে। শহরে নানা অনুষ্ঠানে আমি সভাপতি। কাগজে এখানে সেখানে মাঝারি ও ছোট হরপে আমার নাম উল্লেখ করা হয়। কালেভদ্রে আমার ছবিও ছাপা হয়। আমার বেতার ভাষণে কখনোসখনো ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তিদের কান ঝালাপালা হয়। এর অর্থ এই নয় যে, আমি সমাজকে প্রতারিত করছি। কাগজে যা ছাপা হয় এবং লোকমুখে যা শোনা যায় যদি বিশ্বাস করেন তাহলে না মেনে উপায় থাকে না যে, সমাজ আমার কাছ থেকে চতুর্বর্গ ফল পাচ্ছে।

অদৃষ্ট হয়তো একদিন আমাকে জীবনের অকস্মাতে ঠেলে নিয়ে এক কুটিল পাকে ফেলে দিল। তারপর কি হল, একথা বলার সময় এখনও নয়। কারণ এই মুহূর্তে আমি সেই পাকে পড়ে মুক্ত হবার চেষ্টা করছি। আমি বিপন্ন। আমার কুঁড়েমির ইতিহাসে মহাসঙ্কট উপস্থিত।

সন্ধ্যাটা আমি গঙ্গার ঘাটেই কাটাতাম। যেদিন বেশি স্থানাভাব হত, কোন একটা অপেক্ষাকৃত নির্জন স্থান বেছে নিয়ে কাগজ বিছিয়ে বসতাম। যখন যে কাগজের উপর আক্রোশ থাকত, তারই একটা অংশ পেতে চেপে বসতাম। শত্রুমর্দন করছি ভেবে বেশ একটা তৃপ্তি পেতাম। কারো সঙ্গে কোনদিন বাক্যালাপ হত না। আমি নিজেকে নিয়ে তন্ময় হয়ে থাকতাম। গঙ্গার ঘাটের পৃথিবীটাকে মাতৃজঠর বলে মনে হত। সন্ধ্যার অন্ধকারে নিজেকে একটি ঈষৎ স্পন্দিত ভ্রূণ কল্পনা করতে ইচ্ছা বা বুদ্ধির দিক থেকে কোন বাধা পেতাম না। আমি যেখানে সচরাচর বসতাম তারই বাঁ দিকে খানিকটা তফাতে একটা বাড়ি তৈরী হচ্ছিল। গঙ্গার ঘাটে পৌঁছে গাড়ি থেকে নেমে কোনদিকে দৃক্‌পাত না করে সোজা নিজের জায়গায় এসে বসতাম। লক্ষ্যই করি নি যে বাড়ি তৈরী শেষ হয়ে গিয়েছে। একদিন সন্ধ্যায় ওদিকে চোখ পড়তে দেখলাম বাড়িটা শুধু শেষ হয় নি। জেগে উঠেছে। টানা কাঁচের জানলার ভিতর দিয়ে দোতলার ছোট হলঘরটা দেখলাম। আলোয় ঝলমল। আরামে আলসে এধারে ওধারে একদল মানুষ। বুঝলাম ওখানে সভ্য-জীবনের এক পরিচিত কর্মকাণ্ড শুরু হয়েছে।

চা ও কফির রেস্তরাঁটা একেবারে গঙ্গার ধার ঘেঁষে উঠেছিল। তখন থেকে ঐ রেস্তরাঁয় আমি আসতে শুরু করলাম। প্রায় প্রতিদিনই আসতাম। কদাচিৎ ন' মাসে ছ' মাসে একদিন, এই রুটিনের ব্যতিক্রম ঘটত। গঙ্গার ধারে জানলা ঘেঁষে একটা টেবিলে বসতাম। আমি জানলা দিয়ে ঝুঁকে পড়ে পাড়ের ধারে স্রোতের মুখে ছোট-ছোট মাছের খেলা দেখতাম। দেখতাম নৌকো, স্টিমার ও জাহাজের পৃথিবীটার ওধারে আর একটা জগৎ জেগে উঠেছে। দিনের হাওড়া-শিবপুর কখন নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। দিনের আলোয় যে বাস্তব সত্তা বলে মনে হত, সন্ধ্যায় মনে হত তার চেয়ে বড় মিথ্যে আর নেই। আকাশে একে-একে তারা ফুটত। আমার মনে একটা স্বপ্ন শুরু হয়ে যেত— ঐ যে দূর আকাশ ও কি আমাদের ঘরের দূর না বাইরের দূর?

রেস্তরাঁ কখনো বেশ ফাঁকা থাকত। কখনো সেখানে ভিড় জমত। আমি কিন্তু আমার টেবিলে আমার কুঁড়েমির তত্ত্ব আঁকড়ে আমিরী মেজাজে বসে থাকতাম। মাঝে-মাঝে ভয় হত কেউ এসে টেবিলে মুখোমুখি না বসে পড়ে। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার এই, অন্য কোন টেবিলে জায়গা না থাকলেও আমার টেবিল সকলেই এড়িয়ে চলত। শুনেছি জন্তু-জানোয়ার, বিশেষ করে ঘোড়া, মানুষের মনের কথা টের পায়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস একা একটি মানুষের এরকম কোন ক্ষমতা না থাকলেও মানুষের ভিড়ে এই ক্ষমতা প্রতিটি মানুষের ভিতর এসে যায়। অন্য কোন টেবিলে স্থান না পেয়ে আমার টেবিলের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে কয়েক মুহূর্ত ইতস্ততঃ করে পৃষ্ঠভঙ্গ দেবার মুহূর্তে হঠাৎ কারো চোখে চোখ পড়লে স্পষ্ট বুঝতাম সে নিঃশব্দে বলছে, 'নিজেকে নিয়ে তুমি সুখে থাকো। তোমাকে ঘাঁটানোর বিন্দুমাত্র ইচ্ছে আমার নেই।' রেস্তরাঁর ম্যানেজার থেকে শুরু করে স্টুয়ার্ড, বয়, দারোয়ান সকলেই আমাকে চিনে নিয়েছিল। আমার টেবিলের কাছে এসেই তাদের চলার গতি মন্থর হয়ে যেত। কথা বলতে গিয়ে তারা গলা নামিয়ে নিত। রেস্তরাঁয় যত ভিড়ই হোক না কেন, সন্ধ্যায় গিয়ে আমার টেবিল খালি পেতাম।

শীত তখনও পড়ে নি। কিন্তু হাওয়া ঈষৎ ধারালো হয়ে উঠেছে। একটা ঠান্ডা-ঠান্ডা ভাব মাঝে-মাঝে শিশুর নরম দাঁতের মতো চামড়া কেটে বসছে। শরীরের প্রতিটি স্নায়ু ও প্রতিটি রক্তকণা এই মধুর আক্রমণে সাড়া দিচ্ছে। আমিও কুঁড়েমির সপ্তম স্বর্গে আরোহণ করে গঙ্গার ঘাটের পৃথিবীর উপর কৃপাকটাক্ষপাত করছি। রেস্তরাঁয় তখনও তেমন ভিড় জমে নি। এই সময়ে অপ্রত্যাশিতভাবে আমার কুঁড়েমির স্বর্গে আক্রমণ এসে গেল।

কফির পেয়ালা সম্মুখে নিয়ে কয়েকটা টুকো চিন্তায় আমি অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ চিন্তায় ছেদ পড়ল। অনুভূতির কোথাও একটা সূক্ষ্ম সংকেতে সজাগ হয়ে পড়লাম। পরমুহূর্তে টের পেলাম আমার টেবিলের এলাকায় অনধিকার প্রবেশ ঘটেছে। আমি মুখ তুলে তাকালাম। চোখে চোখ পড়তে আমরা উভয়েই যেন চমকে উঠলাম।

আগন্তুক আমার ভিতর কী লক্ষ করলেন বলা কঠিন, কিন্তু তাঁর ভিতর আমি আমার মনের শিকড় ধরে নাড়া দেবার মতো একটি ব্যক্তিত্ব প্রত্যক্ষ করলাম। আগন্তুক যুবতী। সুবেশা, সুরূপা। মুখের প্রতিটি রেখায় দৃঢ় চরিত্রের ছাপ। আগন্তুক যেন আটপৌরে মাপের নন। দেহের ছন্দ, দাঁড়ানোর ভঙ্গি, কণ্ঠস্বর, চক্ষের চাহনী, সবকিছুই যেন উন্নত মার্জিত জীবনের ছকে কেটে বেঁধে দেওয়া। রেস্তরাঁয় স্থানাভাব হয় নি, আমার টেবিলে হানা দেবার কোন কারণ ঘটে নি এই ইঙ্গিত দেবার চেষ্টায় আমি একবার এদিক-সেদিকে তাকালাম। আগন্তুক অপ্রস্তুত হলেন। হয়তো অপ্রস্তুত হয়েছেন এই আভাস দেবার চেষ্টা করলেন।

বললেন, 'যদি অসুবিধা না হয়, এখানেই একটু বসি।'

নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম, 'আপনি স্বচ্ছন্দে বসতে পারেন।'

হেসে বললেন, 'জানলার ধারে চমৎকার জায়গা বেছে নিয়েছেন। দূর থেকে দেখেই লোভ হয়েছিল।'

আমি উত্তরে হাসলাম।

আগন্তুক বললেন, 'কাজটা স্বার্থপরের মতো হল। জানি না কী মনে করলেন!'

সৌজন্যের খাতিরে বললাম, 'কিছুই মনে করি নি। মনে করার কী আছে?'

আগন্তুক বললেন, 'আমি হলে তো কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে দিতাম।'

আমি হেসে ফেললাম। বললাম, 'কেন বলুন তো?'

আগন্তুক হাসতে-হাসতে বললেন, 'নিশ্চিন্ত মনে সুখের চিন্তায় তন্ময় হয়ে বসেছিলেন। সেই সময়ে এসে উৎপাত করেছি। ধ্যানভঙ্গ করেছি। পুরাকালে মুনি-ঋষিরা তো এসব ক্ষেত্রে শাপ দিয়ে বসতেন।

বললাম, 'এই রকম ধ্যান চব্বিশ ঘন্টার ভিতর আমার ষোল ঘন্টা চলে। ভেঙে গেলে অনায়াসে জোড়া দেওয়া যায়।'

আগন্তুক চোখ কপালে তুলে বললেন, 'বলেন কি? ধ্যানী মানুষ, বিশেষ করে তাঁর প্রশান্ত মুখ, নিমীলিত চক্ষু আমার জীবনের স্বপ্ন। সাধে কি আপনার টেবিল দেখে লোভ হয়েছিল!'

বয় এসে সেলাম দিয়ে দাঁড়াতে আগন্তুক দু কাপ কফির ফরমাস করলেন। আমি আপত্তি করতে বললেন, 'কফি সামনে রেখে ধ্যানে বসেছিলেন। নির্ঘাৎ জুড়িয়ে গিয়েছে।' তারপর ঈষৎ হেসে বললেন, 'হঠাৎ চড়াও হয়ে আপনার টেবিলে যেভাবে জাঁকিয়ে বসেছি। যদি ভাবেন কোন দুরভি-সন্ধি নিয়ে এসেছি'—

বাধা দিয়ে বললাম, 'সে কী কথা!'

আগন্তুক বললেন, 'আশ্বস্ত হলাম। এখন পরিচয় দিয়ে আপনার সন্দেহ খানিকটা নিরসন করি। আমার নাম মহারাণী দেবী। এ শহরে নতুন। মাসখানেক এসেছি। কত দিন থাকব ঠিক করি নি। উত্তর মুলুকে থাকি। সত্যি কথা বলতে কোথাও বেশী দিন থাকি না। দেশ থেকে দেশে, শহর থেকে শহরে ঘুরে বেড়াই।'

পরিহাসছলে বললাম, 'অর্থাৎ ভব-ঘুরে।'

মহারাণী যেন আমার টিপ্পনির ভিতর একটি নতুন সত্য আবিষ্কার করলেন। অপরূপ মুখভঙ্গি করে বললেন, 'আমার মনের কথাটা ধরে ফেলেছেন। ভবঘুরে কথাটা শুনতে কেমন লাগে! কিন্তু কয়েকটা বছর তো এই কান্ডই করে বেড়াচ্ছি!'

কিছুক্ষণ পর বললেন, 'যে কাজে হাত দিয়েছি, ভবঘুরে না হয়ে উপায় কী?'

আমার মনে হল একটা অস্বস্তিকর চিন্তা যেন তাঁর মুখে ছায়া ফেলল। বিষয়টা হাল্কা করে নেওয়া দরকার। বললাম, 'আপনাকে তো ভবঘুরে বলে খালাস! এখন নিজের সম্বন্ধে কী বলি?'

মহারাণী সকৌতূহলে আমাকে দেখতে লাগলেন।

বললাম, 'আমি এ শহরের সবচেয়ে নামী ও খাঁটি কুঁড়ে। সম্প্রতি চাকরিতে পা দিয়েছি। আজ পর্যন্ত এক ছটাক কাজ করি নি।'

মহারাণীর মুখে কৌতূহল ও কৌতুকের দ্বৈরথ শুরু হল।

আমি বললাম, 'কাজ করি নি। কিন্তু ঘুমোনো ছাড়া একমুহূর্ত অপচয় করি নি।'

মহারাণীর মুখে কৌতূহল ও কৌতুক আক্রম করে প্রকাশ পেল গভীর বিস্ময়।

বললাম, 'অহর্নিশি চিন্তা করেছি। চিন্তাসমুদ্রে আমি যে পরিমাণ সাঁতার দিচ্ছি তা পৃথিবীর যে কোন দেশের সাঁতারুদের রেকর্ড।'

মহারাণী সুগভীর বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি এত চিন্তা করেন! কিসের চিন্তা?'

সাহঙ্কারে বললাম, 'তুচ্ছ কার্য-কারণের চিন্তা নয়। সঙ্কীর্ণ জীবনের কল্যাণ-অকল্যাণের, পাপ-পুণ্যের চিন্তা নয়। বিশুদ্ধ নিরপেক্ষ নিঃস্বার্থ চিন্তা। আমার চিন্তার সুবিধে মজে যেমন এ'টে রসাতলে যাওয়া যায়, স্বর্গেও ওঠা চলে।'

মহারাণী গাঢ় স্বরে বললেন, 'কোথাও যেতে চাই না। স্বর্গেও না রসাতলেও না। আপনার মতো একটি লোক পেলে চিন্তার পাড়ে বসে সারাটা দিন কাটাতে চাই।'

আমি দেখলাম মহারাণীর দুটি চোখ অলক্ষিত এক আকাশের শিশিরে ভিজে ছলছল করছে।

বয় কফি দিয়ে গিয়েছিল। একটা পেয়ালায় চিনি মিশিয়ে মহারাণী সযত্নে আমার সম্মুখে এগিয়ে দিলেন। হেসে বললেন, 'চেখে দেখুন। এক রতি কম-বেশী নয়। চিনির ব্যাপারে আমার অভ্রান্ত বিচার। কখনো ভুল হয়েছে মনে পড়ে না!'

তাঁর কথায় আমার মনের একটা নরম দিক সাড়া দিতে উন্মুখ হল। আত্ম-সম্বরণ করার আগেই বলে ফেললাম, 'চিনির ক্ষেত্রে শুধু নয়। মনে হয় তার চেয়ে অনেক দামী জিনিসের বেলায়ও।'

মহারাণী তাঁর পেয়ালায় চিনি মেশাচ্ছিলেন। আমার কথার সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর হাত কেঁপে গেল। কিছুটা কফি ছলকে পিরিচের উপর পড়ল। আমি পিরিচটা সাফ করার জন্য হাত বাড়াতে মহারাণী বাধা দিতে গেলেন। আমার হাতের উপর হাত পড়তে সরিয়ে নিলেন। কিন্তু সরাতে গিয়ে দু-তিন সেকেন্ড বিলম্ব হল। মহারাণীর সঙ্গে আমার দৃষ্টি বিনিময় হল। মহারাণী চোখ নামিয়ে নিলেন।

কিছুক্ষণ পর মহারাণী হেসে বললেন, 'আপনার ভবঘুরে কথাটা আমার মন থেকে সরতে চাইছে না। থেকে-থেকে আমাকে অন্যমনস্ক করে দিচ্ছে। আর কেউ এভাবে পিরিচে কফি ফেললে আমি আঁৎকে উঠতাম।'

স্পষ্ট বুঝলাম মহারাণী চিনির প্রসঙ্গ চাপা দেবার চেষ্টা করছেন।

বললাম, 'ভবঘুরে হবার একটা আকাঙ্ক্ষা চিরকালই আমার ছিল। কিন্তু কুঁড়ের সঙ্গে ভবঘুরের আদা-কাঁচকলা সম্পর্ক। সেজন্য যে কুঁড়ে সে কুঁড়েই থেকে গিয়েছি। তবে আপনার ক্ষেত্রে ভবঘুরে কথাটা খাটে না। আপনি নিজের কাজে কোন একটা উদ্দেশ্য নিয়ে দেশ-দেশান্তরে ঘুরছেন, আপনাকে ভবঘুরে বলি কী করে?'

কথা বলতে গিয়ে মহারাণী থেমে গেলেন। তারপর নিবিড় দৃষ্টিতে আমাকে দেখতে দেখতে বললেন, 'ঠিক বোঝাতে পারব না। বাধা আছে। কিন্তু আপনার চিন্তার সঙ্গে আমার কাজের একটা নিকট-সম্পর্ক আছে। মানুষ মাথা দিয়ে চিন্তা করে। মাথার কী দাম আপনাকে বলে বোঝাতে হবে না। ঐ মাথা, চিন্তার উৎস ও আধার, মানুষের মুকুট ঐ মাথা, আমাকে ঘরছাড়া করে দেশ-দেশান্তরে ঘুরিয়ে মারছে।'

মহারাণীর দৃষ্টি কোথায় চলে গেল? জীবনের কোন নিরন্ধ্র অন্ধকারে? সত্তাতীত আদি যুগের কোন্ অরণ্যে?

আমি বললাম, 'এতক্ষণে হেঁয়ালি পরিষ্কার হল। আপনি তাহলে একজন নৃতত্ত্ববিদ।'

মহারাণী তৎক্ষণাৎ হাঁ না বললেন না। কিছুক্ষণ পর ধীরে ধীরে বললেন, 'আপনার চিন্তার মতো আমারও কাজের লেবেল নেই। কেন নেই এই মুহূর্তে বোঝানোর উপায় নেই।' মহারাণীর মুখে একটা বিষণ্ণ হাসি ফুটল। চেয়ারের পাশে মেঝে থেকে তাঁর বিরাট ভ্যানিটি ব্যাগটা নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। মনে হল ভ্যানিটি ব্যাগটা নিয়ে চলতে তাঁকে বেশ বেগ পেতে হচ্ছে। রেস্তে-রাঁর নীচের তলায় নামবার মুহূর্তে সিঁড়ির প্রান্তে তিনি একবার থমকে দাঁড়ালেন। দেখলাম তাঁর দু চক্ষের দৃষ্টি রেস্তরাঁর সবকিছু দু পাশে সরিয়ে রেখে আমার উপর পড়েছে।

পরদিন রেস্তরাঁয় গিয়ে আমি স্তম্ভিত হলাম। মহারাণী আমার টেবিলে আমার উল্টো দিকের চেয়ারটায় বসে আছেন। পিছন থেকে দেখে বুঝলাম তিনি চিন্তা-মগ্ন। তাঁর দেহ নিস্পন্দ। কোন সাড়া নেই।

আমি টেবিলে পৌঁছে বসতে গিয়ে আমার চেয়ারটা ধরে টান দিতে তিনি চমকে উঠলেন। অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, 'কী আশ্চর্য! আপনি এসেছেন টেরই পাই নি। বসুন। বসুন।'

আমি রসিকতা করে বললাম, 'আরো আশ্চর্যের ব্যাপার, আদরে-আপ্যায়নে আপনি আমাকে অতিথি বানিয়ে ছাড়ছেন। কাল এসে হয়তো দেখব আপনার হুকুমে আমার টেবিলে আমার বসা নিষেধ হয়ে গিয়েছে।'

মহারাণী হেসে উঠলেন। যুবতীর মত, কিশোরীর তরল হাসি। তারপর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বললেন, 'আপনার সঙ্গে আলাপ করে একটা কথা বার-বার মনে হচ্ছে যে, সত্যি-সত্যি কাজ এড়াতে পারলে, হাল্কা হতে পারলে একটা সহজ সুখের রাস্তা খুঁজে পাওয়া যায়। কাজ হচ্ছে জীবনের গ্রহণ। ঐ গ্রহণমুক্ত হতে গিয়ে

মানুষকে আকাশ-পাতাল তোলপাড় করতে হয়। সে বড় হয়, ইতিহাসের পাতায় নিজের নাম লেখে। কিন্তু সুখ? কাজের পৃথিবীতে সুখ কোথায়? কাজের গা জুড়ে ছোট বড় অসংখ্য কাঁটা। ঐ কাঁটা দিয়ে অতৃপ্তি, সর্বনাশ এসে ঢোকে। সুখ-দুঃখের বোঝা হিসেবে দুঃখটাই বড় হয়ে ওঠে। দুঃখের বোঝা কাঁধে বয়ে মানুষ যখন উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করে, তখন পৃথিবীর চোখে, হয়তো নিজের চোখেও সে বড় হয়ে ওঠে। কিন্তু বড় হওয়া আর সুখী হওয়া তো এক জিনিস নয়।'

কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে মহারাণী দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'কিন্তু মুশকিল বাধে কাজ যখন নেশা হয়ে দাঁড়ায়। তখন কাজের পিছনে মানুষ ছুটে মরে। প্রতি-মুহূর্তে কাজের হাতে তিলে-তিলে মরছে জেনেও। উদ্দেশ্য আদর্শ হচ্ছে কথার কথা। আসল কারণ হচ্ছে নেশা। ঐ নেশাই কাজের পৃথিবীকে টিকিয়ে রাখে।'

মহারাণীর কাজ সম্বন্ধে এই দেবোক্তি আর্তবিলাপের মতো ঠেকল। নিশ্চয়ই কোন কারণে তাঁর মেজাজ ক্লান্ত। আমি বললাম, 'কাজ হতে হতে মরতে মরতে মানুষ কাজের ভিতর দিয়ে কীর্তি রেখে যায়।'

মহারাণী সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে আমাকে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন।

আমি বললাম, 'ব্যক্তিগত কারণে আমি কুঁড়ে। কুঁড়ের ধারণা বললে অত্যুক্তি করা হবে না। কিন্তু অনন্ত কুঁড়েদের হাতে মানুষের ইতিহাস বা চন্দ্রিকা তৈরী করার ভার দেয় নি। সে দায়িত্ব কাজের মানুষদের। বিশেষ করে কাজের নেশাখোরদের।'

আমার কথায় কান না দিয়ে মহারাণী বললেন, 'কাজের বোঝা আরো ভারী হয়ে ওঠে কখন জানেন?'

আমি নিরুত্তর।

মহারাণী তাঁর দু চক্ষের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে আমাকে বিদ্ধ করে বললেন, 'যখন কাজ মানুষের চক্ষের আড়ালে করতে হয়। যখন কাজের অর্থ এত সূক্ষ্ম, এত জটিল যে খুলে বলা চলে না। কাজ গোপনে শুরু হয়ে গোপনে শেষ হয় বলে কীর্তির বা খ্যাতির প্রশ্নই ওঠে না। একমাত্র পুরস্কার আত্মতৃপ্তি।'

আমি বললাম, 'আপনার কাজ সম্বন্ধে কৌতূহল প্রকাশ করা উচিত হবে না। বুঝতে পারছি সংগোপনে আপনি নৃতত্ত্বের একটা কঠিন বিষয় নিয়ে গবেষণা করছেন।'

মহারাণী তিক্তকণ্ঠে বললেন, 'নৃতত্ত্ব বলতে সাধারণে যা বোঝায় তার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। ফাঁকা মাথার খুলি নিয়ে গবেষণা শুধু হাস্যকর নয়, কুৎসিত।'

আমি বললাম, 'আপনি কি মাথার ফটো তুলে দেন না কুমোর বা ভাস্করকে দিয়ে প্রতিকৃতি তৈরী করান?'

আমার কথার কোন উত্তর না দিয়ে মহারাণী বললেন। 'আমার কাছে মানুষের বাকিটা দেহটার কোন দাম নেই। এমন কি হৃদয়েরও তেমন দাম নেই। গোটা মানুষের ইতিহাস বা তত্ত্ব লিখতে গেলে সব কিছুরই কম-বেশী দাম ধরতে হয়। কিন্তু আমি গোটা মানুষের তত্ত্ব নিয়ে মাথা ঘামাই না। আমার লক্ষ্যস্থল হচ্ছে তার মাথা। মাথার তত্ত্ব নয়। মাথার কবিতা। সারি-সারি অজস্র সুন্দর মাথার একটা পৃথিবী গড়ে তোলার নেশায় আমি পাগল। এখন আমার ছত্রিশ বছর চলছে। বাইশ বছর বয়সে এই আশ্চর্য কল্পনা আমার মাথায় আসে। তারপর চৌদ্দ বছর দেশ-দেশান্তরে লোকচক্ষের আড়ালে কঠোর পরিশ্রমে তিলে-তিলে কাজ এগিয়ে নিয়ে চলেছি। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কথা ভাবি নি। বিপদকে বিপদ বলে গ্রাহ্য করি নি।'

কৌতূহল চাপতে না পেরে আমি বললাম, 'আপনি নিজেই হয়তো স্কাল্পটর। সেজন্যই হয়তো একা গোপনে কাজ করতে পারছেন।'

মহারাণী আমার দিকে না তাকিয়েই বললেন, 'অনেকটা তাই। মাথার ব্যাপারে কারো উপর নির্ভর করা চলে না।'

আমি বললাম, 'আমার কুঁড়েমির বদনাম না থাকলে আমি আপনার কাজে লেগে যেতাম। আমার উপর আপনি অনায়াসে নির্ভর করতে পারতেন।'

মহারাণী গভীর দৃষ্টিতে আমাকে দেখতে-দেখতে বললেন, 'যদি জানতেন আপনাকে দিয়ে আমার কী প্রয়োজন!'

আমার শরীরে একটা শিহরণ খেলে গেল। এই অভিজ্ঞতা আমার জীবনে সম্পূর্ণ নতুন। আমি কিছুটা অভিভূত হয়েই বললাম, 'আপনার প্রয়োজনে লাগতে পারলে সুখী হব।'

মহারাণীর দুটি চোখ মুহূর্তের জন্য জ্বলে উঠে নিবে গেল। দৃঢ় কণ্ঠে তিনি বললেন, 'একটা বড় রকমের বাধা এসে দাঁড়াচ্ছে। তবু, আপনাকে আমার কাজে লাগাতেই হবে।'

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'কিসের বাধা?'

মহারাণীর মুখে একটা ম্লান হাসির আভাস দেখলাম। ক্লান্তকণ্ঠে বললেন, 'আপনাকে দেখলে বার-বার গোটা মানুষটার কথা মনে পড়ে। শুধু মাথার কথা ভাবতে গিয়ে বাধা পাই, বাধা পাই। তবু, অসাধ্য সাধন করতে হবে। আমার কাজে আপনার চিহ্ন থাকবে না, ভাবতেই পারি না।'

মহারাণী উঠতে গিয়ে বসে পড়লেন। কী একটা কথা ভেবে তাঁর মুখ হাসিতে অপরূপ হয়ে উঠল। বললেন, 'আজই কাজে ছোট রকমের একটা হোঁচট খেতে বসে-ছিলাম। একটি শিশুকে নিয়ে মুশকিলে পড়েছিলাম। এরকম সুন্দর মুখ ও নিখুঁত মাথা সচরাচর চোখে পড়ে না। র‍্যাফেল বটিচেলীর ছবির শিশু। কলকাতার বস্তিতে এ শিশু গোবরে পদ্মফুল। কিন্তু হঠাৎ বাধা এসে গেল। মা বলে ডেকে হাসতে লাগল। আমিও আত্মবিস্মৃত হয়ে তাকে আদর করতে লাগলাম। তারপর—'

মহারাণী একটু থেমে বললেন, 'কোন রকমে কাজ শেষ হল।'

আমি বললাম, 'আপনার মুখে বর্ণনা শুনে এই শিশুকে দেখতে লোভ হয়।'

মহারাণী একটা চাপা উত্তেজনায় যেন কাঁপতে লাগলেন। এদিকে-সেদিকে তাকিয়ে ভারী ভ্যানিটি ব্যাগটা তুলে নিয়ে ফিসফাস করে বললেন, 'দেখবেন?'

আমি বললাম, 'পাথরে খোদাই করার আগে প্ল্যাস্টার অব প্যারিস-এ তুলে নিয়েছেন বুঝি!'

মহারাণী যেন ঘুম থেকে জেগে উঠলেন। আমার দিকে বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। তারপর দু হাতে শক্ত করে ভ্যানিটি ব্যাগটা ধরে ভাঙ্গা গলায় বললেন, 'হাঁ। তাই। তবে—আমার যে কী হয়েছে! কী বলতে কী বলি! কোথায় মাথা আর কোথায় আমি!' বলে মহারাণী ঈষৎ হাসলেন। কিন্তু সে হাসি তাঁকে একেবারেই মানালো না।

সে সন্ধ্যায় আলোচনা আর বেশী দূর এগোল না। কোন কারণে, সম্ভবত ক্লান্তি-বশত, মহারাণী স্বল্পভাষী হয়ে পড়লেন। আমরা যে যার গাড়িতে উঠলাম। একবার মহারাণী বললেন, 'আপনার বাড়িটা দেখে গেলে ভাল হত। আপনাকে যখন কাজে লাগাবার সঙ্কল্প করেছি, আপনারও আপত্তি নেই। এ অবস্থায় যে কোন সময় আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করা দরকার হতে পারে।' তারপর কী ভেবে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আজ থাক! আজ বড় রকমের ধকল গিয়েছে। চৌদ্দ বছরের বিরাট কাজ পণ্ড হতে বসেছিল। এ কাজের এই হচ্ছে মুশকিল। কখন কোথা দিয়ে বিপদ আসে বোঝা শক্ত। কোন রকমে দুকূল রক্ষা করেছি। যা হোক, কাল দেখা হবে।' মহা-রাণীর গাড়ি কয়েক মুহূর্তে অন্ধকারে অদৃশ্য হল।

বাড়ি ফিরে এসে সাত তাড়াতাড়ি পেটে কিছু দিয়ে আমি শয্যা নিলাম। তারপর মহারাণীর সঙ্গে আমার দু দিনের আলো-চনার একটা খতিয়ান মনে-মনে খসড়া করতে লাগলাম। আমার চল্লিশ বছরের অভিজ্ঞতায় মহারাণীর তুলনা খুঁজে পেলাম না। কুঁড়ের বদনাম হলেও পড়াশোনা আমার নেহাৎ কম ছিল না। ইতিহাসে কাহিনী কিংবদন্তীতে শিল্পীদের সম্বন্ধে, বিশেষ করে ভাস্কর, কুমোর, পটুয়াদের নিয়ে লেখকদের কল্পনায় অতিরঞ্জিত অনেক আশ্চর্য-আশ্চর্য কাহিনী পড়েছি। কিন্তু মহারাণীকে কোন একটা ছকে ফেলা সম্ভব হল না। তাঁকে আগাগোড়া একটা রহস্য বলে মনে হল। হয়তো তাঁর মনের ক্রিয়া এত সূক্ষ্ম ও জটিল, উদ্দেশ্য এত অসাধারণ যে সাধারণ মানুষের কাছে তাঁর সাধনার কোন মূল্যই নেই। অকিঞ্চিৎকর, এমন কি হাস্যকর মনে হতে পারে। হয়তো এমন একটা মস্তিষ্ক নিয়ে মহারাণী জন্মেছেন যে তাঁর বিচার-বুদ্ধির সঙ্গে আমাদের

সংস্কার ও বিবেচনার স্থির হওয়া কোন প্রকারেই সম্ভব নয়। তবু, বার-বার, মনের অতল থেকে প্রশ্ন উঠতে লাগল, কাজটা কী? যে শিল্পীদের, ভাস্কর-স্থপতিদের চিনি-বুঝি, যত বড়, যত প্রতিভাবান ও কীর্তিমান হোন না কেন, যাঁদের কারো-কারো সাধনা মানুষ জাতির চিরকালের বিস্ময়, তাঁদের সঙ্গে মহারাণীর তফাৎ কী? যে কাজ, যে সৃষ্টি সম্পূর্ণ নতুন, হয়তো আগাগোড়া গোপনেই করতে হয়। কিন্তু বিপদ? মহারাণীর কাছে বিপদ কোন্ পথে আসে? কেন আসে? তার আসল চেহারাটা কি রকম? ভাবতে-ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। মহারাণীকে নিয়ে একটা অর্থহীন স্বপ্নও দেখেছিলাম। শেষ রাতে ঘুম ভেঙে গেল। দেখলাম মহারাণীর চিন্তায় মাথা আধ মণ ভারী হয়ে আছে। ভোর হতে-না-হতে উঠে পড়লাম। দুটো আস্‌পিরিন ট্যাবলেট খেয়ে নিয়ে আর এক দিনের কুঁড়েমির জন্য তৈরী হলাম।

রেস্তরাঁয় সেদিন সন্ধ্যায় আকাশ-পাতাল চিন্তা করছিলাম। উপলক্ষ্য মহারাণী। কিন্তু সেই সূত্র ধরে চিন্তা অনেক দূরে চলে গিয়েছিল। পরিচিত তত্ত্বগুলো এক-একটা নতুন অর্থ নিয়ে উপস্থিত হচ্ছিল। জানলার পাশে গঙ্গার ঘাটের সন্ধ্যা প্রতিদিনের মতো অপেক্ষায় রইল। কিন্তু তার দিকে নজর দেবার মতো মনের অবস্থা ছিল না। মনটা কানায়-কানায় রহস্যে ভরপুর হয়ে পূর্ণিমার সমুদ্রের মতো অস্থির উত্তাল হয়ে পড়েছিল।

হঠাৎ একটা অজ্ঞাত কারণে মনে হল একবার সিঁড়ির দিকে তাকালে কি রকম হয়। তাকালাম। এবং সঙ্গে-সঙ্গে বিস্ময়ের একটা প্রচণ্ড ধাক্কা খেলাম। দেখলাম মহারাণী সিঁড়ি বেয়ে উঠছেন। আমি মুখ নামিয়ে আড়চোখে তাঁকে দেখতে লাগলাম।

মহারাণী সিঁড়ির দু-তিনটে ধাপ বাকী থাকতে দাঁড়িয়ে গেলেন। নির্নিমেষে আমাকে দেখতে থাকলেন। তিনি যেন কোন আশ্চর্য দৃশ্য দেখছেন। তাঁর দৃষ্টিতে অনন্ত ক্ষুধা। দেখে-দেখে তাঁর যেন সে ক্ষুধা মিটছে না। এভাবে আজ পর্যন্ত কোন নারী আমাকে দেখে নি। এ দৃষ্টিপাত নয়। দৃষ্টি রাহুর পূর্ণগ্রাস। আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেহের প্রতিটি রক্তকণা সাড়া দিয়ে উঠল।

এভাবে হার মেনে লাভ কী? সাহস সঞ্চয় করে সম্মুখে তাকালাম। চোখে চোখ পড়তে মহারাণী একটু চমকে উঠলেন। তারপর হাসতে-হাসতে এগিয়ে এলেন।

বললেন, 'এদেশে প্রাচীন যুগের ঋষিরা কী চোখে সূর্যকে দেখেছিলেন, বেদের শ্লোকে তার আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু সবটা বুঝতে গেলে এই রকম একটা মুহূর্তে সিঁড়িতে উঠতে-উঠতে আপনাকে দেখতে হয়। দেয়াল থেকে আলো এসে আপনার মাথার উপর পড়েছে। যদি নিজেকে দেখতে পেতেন বুঝতেন চোখে দেখার জগতে আপনি আজ কী একটা আশ্চর্য ঘটনা! আমার মনে হচ্ছিল কয়েক যুগ আগের গ্রীসে মিশরে ফিরে গিয়েছি। কিংবদন্তীর জগৎ থেকে সূর্যোদয় দেখছি।'

চেয়ার টেনে বসতে-বসতে বললেন, 'দেখতে-দেখতে ভিতরটা জেগে ওঠে। অসহ্য আনন্দে কেঁদে মরে। ঐ কান্নাই তো গান।'

স্থানকাল বিস্মৃত হয়ে মহারাণী নীচু পর্দায় গান ধরলেন। আশ্চর্য কণ্ঠে আশ্চর্য গান। সুরের মদিরতায় উজ্জ্বল। রেস্তরাঁর মুখ চাওয়া চাওয়ি শুরু হয়ে গেল। কিন্তু কয়েক মুহূর্তের জন্য। স্থির হয়ে উৎকর্ণ হয়ে সবাই শুনলো। ম্যানেজার হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসেছিলেন। অর্ধপথে থেমে গেলেন। আর সকলের মতো স্তব্ধ হয়ে শুনতে লাগলেন।

গান শেষ হতে চারিদিক হাততালির শব্দে মুখর হল। ম্যানেজার এগিয়ে এসে ঈষৎ মাথা নুইয়ে বললেন, ম্যাডাম। ইওর মির্যাকিউলাস হ্যাজ এনরোবল্‌ড মাই রেস্তোরাঁ। ইউ হ্যাভ গিভন আস এ ফিউ মোমেন্টস অব রিয়্যাল হ্যাপিনেস। উই অল আর মোস্ট গ্রেটফুল টু ইউ।'

মহারাণী মাথা নুইয়ে অভিবাদন গ্রহণ করলেন। মনে হল বিগত যুগের কোন ঐতিহাসিক চিত্র থেকে তিনি বার হয়ে এসেছেন। মুগ্ধ হৃদয়ের অভিবাদন গ্রহণ যেন তাঁর কাছে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। তারপর ধীরে-ধীরে আমার চোখের সম্মুখে বাস্তবের আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটল। দেখলাম আমার পরিচিত মহারাণী আমাকে দৃষ্টি-বিদ্ধ করে আমার সম্মুখে এসে বসেছেন।

তবু আজ তাঁকে একটু স্বতন্ত্র মনে হল। তিনি যেন একটা সংকল্প করে এসেছেন। এবং একমনে সে বিষয়ে চিন্তা

"ভয়ঙ্কর কাজের চাপে মাঝে মাঝেই আমার ভীষণ মাথা ধরে",

বলেন, বিপিন জৈন
বোম্বাইয়ের একজন অফিসার।

মাথা ধরেছে? অ্যানাসিন খান
তাড়াতাড়ি আরাম এনে দেবে

বড়দের উপযোগী যথেষ্ট জোরালো
বাচ্চাদের পক্ষেও একান্ত নির্ভরযোগ্য

অ্যানাসিন জোরালো,—সারাবিশ্বে ব্যথা-বেদনার উপশমে ডাক্তাররা যে-ওষুধ সুপারিশ করেন তা'ই এতে বেশী ক'রে দেওয়া আছে। অ্যানাসিন নির্ভরযোগ্য—নিরাপদ, ডাক্তারদের ব্যবস্থাপত্রের মত এটি নানান ওষুধের এক অপূর্ব সংমিশ্রণ। অ্যানাসিন খান—মাথাধরা, সর্দি আর ফ্লু, পিঠের ব্যথা, দাঁতের যন্ত্রণা আর পেশীর ব্যথায়।

জোরালো অথচ নির্ভরযোগ্য

অ্যানাসিন
ভারতে ব্যথা-বেদনার উপশমকারী
ওষুধগুলোর মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয়

৪ ভাবে কাজ করে।

Regd. User of T.M. Geoffrey Manners & Co., Ltd.

করলেন। তাঁর মুখে একটা আনন্দ ও উত্তেজনার আভাস। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্কল্পে ঈষৎ কঠোর। আমি কিছু প্রশ্ন করতে গিয়ে বাধা পেলাম। খপ করে আমার হাতটা ধরে ফেলে বললেন, 'এখনই উঠতে হবে। সময় নেই।'

সবিস্ময়ে তাঁর দিকে তাকাতে বললেন, 'আসুন। আজ আমাদের অনেক কাজ।'

মহারাণী তাঁর গাড়িতে আমাকে টেনে তুললেন। আমার গাড়ি ফেরৎ চলে গেল। মহারাণী নিজে ড্রাইভ করলেন। স্টিয়ারিং ধরে বসলেন। আমি পাশে বসলাম।

সেদিন সন্ধ্যায়ই জমাট অন্ধকার, পথ-ঘাট নির্জন। গঙ্গার ঘাট থেকে যে রাস্তাগুলো শহরে গিয়েছে, কোনটাতেই জনমানব নেই। গাড়ি আস্তে-আস্তে চলল। এ রাস্তা থেকে ও রাস্তা, কোন তাড়া নেই, ব্যস্ততা নেই। অনেক কাজ বলে মহারাণী আমাকে টেনে নিয়ে এলেন। কিন্তু অনেক কাজের সঙ্গে গাড়ির অলসগতির কোন মিল নেই।

মহারাণী আমার মনোভাব অনুমান করে বললেন, 'আজ মন বেঁধে ফেলেছি। আজ রাতেই আপনি আমার কাজে লাগবেন। ভাবি নি এত তাড়াতাড়ি সম্ভব হবে। কিন্তু এই কদিন যা হবার নয় বলে ধারণা হয়েছিল হঠাৎ দেখছি তা না হয়ে পারে না। আমার কাজে আপনার চিহ্ন না থেকে পারে?'

মহারাণীর পাশে গাড়িতে বসে তাঁর কথা শুনতে-শুনতে আমি নিজের ভিতর বিশেষ রকমের একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করছিলাম। আমার মন আশঙ্কা ও উদ্বেগে বার-বার দুলে উঠছিল। কিন্তু মহারাণীর কাছ থেকে সরে যাবার কোন ইচ্ছাই নিজের ভিতর খুঁজে-পাচ্ছিলাম না। মহারাণী খেয়ালী অপ্রকৃতিস্থ হতে পারেন, এরকম একটা যুক্তি আমার পক্ষে খণ্ডন করা সম্ভব হচ্ছিল না। অথচ আমারই ভিতর কে আমাকে বার-বার মহারাণীর দিকে তিলে-তিলে টেনে আনছিল।

মহারাণী বললেন, 'বুঝতে পারি কখনো-কখনো আমার মানসিক সুস্থতা সম্বন্ধে আপনি সন্দিহান হয়ে পড়েন। সেটা স্বাভাবিক। কারণ আমার কথাগুলো একান্ত আমার। আমার আগে এই কথা কেউ বলেছে কিনা জানি না, কিন্তু একথা ঠিক আমার মতো করে কেউ বলে নি।'

আমি বললাম, 'অন্তত আমার অভিজ্ঞতায় আপনার কথাগুলো সম্পূর্ণ নতুন।'

মহারাণী বললেন, 'এতদিন শুধু শুনেছেন। কাজে হাত দেবার আগে কথাগুলোর ভিতর ঢুকতে হবে। অর্থ বুঝতে হবে।'

তারপর সরাসরি প্রশ্ন করলেন, 'কেন মাথা নিয়ে আমার এত মাথাব্যথা পুরো-পুরির বুঝবার চেষ্টা করেছেন?'

আমি একটা জবাব খাড়া করাবার চেষ্টা করছিলাম। আমাকে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে মহারাণী বললেন, 'একবার সৃষ্টির চারদিকে তাকালেই বুঝতে পারবেন। সবাই মাথা নিয়ে ব্যস্ত। সবাই মাথা তুলতে চায়। মানুষের কথা বাদ দিন। সে তো যখনই নিজেকে জাহির করতে চায়, মাথা তুলে দাঁড়ায়। হাতী শুঁড় তোলে, সিংহ কেশর ফুলিয়ে দাঁড়ায়। যে সাপ মাটিতে বুকে হাঁটে, সেও আস্ফালন করতে গিয়ে ফণা তোলে।'

আমি বললাম, 'আশ্চর্য!'

মহারাণী বললেন, 'প্রাণীজগতের কথা ছেড়ে বস্তুজগতে আসুন। দেখবেন পাহাড় তার চূড়োয় মাথা তোলে, সমুদ্র ঢেউয়ে, গাছ উঁচু ডালে। যার মাথা নেই সেও কোন না কোন কৌশলে মাথা তোলে। কেন জানেন?'

আমি একেবারে চুপ হয়ে গিয়েছিলাম। মহারাণী বললেন, 'তীরের ফলার মতো মাথা হচ্ছে আমাদের অস্তিত্বের তীক্ষ্ণতম প্রকাশ। সৃষ্টির আড়ালে যে সত্তা, যে শক্তি, তারই স্বরূপ হচ্ছে মাথা। মাথাই ঈশ্বর। ঈশ্বর সর্বত্র। সর্বভূতে। সেদিক থেকে প্রতিটি ধূলিকণা ঈশ্বর। কিন্তু মাথা হচ্ছে পূর্ণতম ঈশ্বর। ঈশ্বরের পরিপূর্ণ প্রকাশ।'

আমি মুগ্ধ হয়ে শুনছিলাম। অন্ধকারে ঠিক তাঁর পাশে বসে মহারাণীর কথাগুলি আমার সত্য বলে মনে হচ্ছিল।

মহারাণী বললেন, 'মূর্খের হাতে সেই মাথার লাঞ্ছনা দেখুন। মানুষের মৃত্যুর পর তার মাথা হয় কবরের তলায় পোকায় খায়, নয় শ্মশানে শেয়াল-কুকুর নিয়ে খেলা করে।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'তা যাই হোক, আমার একার শক্তিতে যেটুকু সম্ভব, করে যাবো। মাথাকে জীবনের উঁচু বেদীতে প্রতিষ্ঠিত করে যাবো। আজ আমি আপনাকে পেয়েছি। আমার আনন্দের সীমা নেই। আজ আমি ধন্য। আপনিও ধন্য।'

আমার ভিতরে হঠাৎ কোথাও একটা কপাট খুলে গিয়েছিল। যে একটা ভয় ও সংশয় এতদিন চাপা পড়ে ছিল, নিছক অশান্তি মনে করে যে ভয় ও সংশয়কে দেখেও দেখি নি, সেই মুহূর্তে খোলা কপাট দিয়ে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল। গাড়ি ইতিমধ্যে রাস্তার এক পাশে থেমে গিয়েছিল। নিদারুণ আতঙ্কে আমার দেহ-মন অসাড় হয়ে যাচ্ছিল। আমি চেঁচাতে গেলাম। আক্রমণের অপেক্ষায় না থেকে আক্রমণ করতে গেলাম। পারলাম না। আমি অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছিলাম। যেটুকু জ্ঞান অবশিষ্ট ছিল তাতে অনুভব করলাম মুখের উপর রুমাল, তীব্র গন্ধ, হাতের চাপ। জ্ঞান সম্পূর্ণ হারানোর মুহূর্তে অনুভব করলাম কণ্ঠদেশে নরম হাত ও শাণিত ইস্পাত।

দুঃস্বপ্নে দেখছিলাম একটা কুয়োয় পড়ে গিয়েছি। কিছুতেই উঠতে পারছি না। পিছল দেয়াল ধরতে গিয়ে বার-বার পড়ে যাচ্ছি। চেঁচাতে গিয়ে কথা আটকে যাচ্ছে। এই সময়ে হঠাৎ দুঃস্বপ্নের জালটা একটা ট্রাকের আওয়াজে ছেড়ে গেল। আমি এক অবসাদের গহ্বর থেকে ধীরে-ধীরে উপরে উঠতে লাগলাম। জ্ঞান ফিরে পাবার মুহূর্তে বুঝলাম অবসাদের চেয়েও আমাকে বেশী অভিভূত করছে ভয়। প্রথমেই দুটি প্রশ্ন মনে এল, আমি কোথায়? মহারাণী কোথায়?

কলকাতার ময়দানে একাধিক মাতাল রাত্রিবাস করে বাড়ি ফেরে। তাদের একজন না হয়েও তাদেরই মতো সে রাতে বাড়ি ফিরে এলাম। হাত-মুখ ধুয়ে শুতে যাবার আগে যে কারণেই হোক পকেটে হাত দিয়েছিলাম। একটা ভাঁজ-করা কাগজে হাত পড়েছিল। বার করে ভাঁজ খুলতে দেখলাম মহারাণীর চিঠি। লিখেছেন: 'গোটা মানুষটাকে বেশী ভাল লেগে গেলে বিপদ। তখন মানুষ থেকে মাথাকে আলাদা করা চলে-না। এই ভাল লাগার-ব্যাপারটা ছাড়া আজ আর কোন বাধাই ছিল না। আপনাকে যেমনটি পেয়েছিলাম তেমনটি রেখে গেলাম। আপনার মাথার কথা চিরকাল মনে থাকবে। যদি কোনদিন গোটা মানুষটার চেয়ে আপনার মাথাকে বেশী ভাল লাগা সম্ভব হয়, আবার দেখা হবে। আপাতত বিদায়।'

পরদিন যথাসময়ে রেস্তরাঁয় গিয়ে আমার টেবিলে বসলাম। ম্যানেজার ঘরের এক কোণ থেকে আমাকে লক্ষ্য করছিলেন। এগিয়ে এসে অভিবাদন করলেন। মহারাণী যে চেয়ারে বসতেন দেখিয়ে হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হুইল দিস মিস্ট্রেস এমপটি?'

আমি কাষ্ঠহাসি হেসে বললাম, 'ইয়েস। শী ইজ অ্যাওয়ে।'

ম্যানেজার কী ভেবে বললেন, 'গড ব্লেস হার।'

ম্যানেজারের এ কথায় চমকে উঠলাম। সারাটা দিন যে চিন্তা আমাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, সেই মুহূর্তে এক কঠিন প্রশ্ন নিয়ে উপস্থিত হল। মাথায় ঈশ্বরের মহিমা দেখে তাকে পেতে গিয়ে মহারাণী কোন্ বৃত্তিতে কোন্ পথে চলেছেন? আমি সত্যের দুটি মুখ, আলো ও অন্ধকার, পূর্ণিমা ও অমাবস্যা। মহারাণীর দিকে সেই সত্য কি শুধু তার ভয়ঙ্কর অন্ধকার মুখ তুলে চেয়েছে? মহারাণী আলোয় ফিরে আসুক, আমার মনের এই নিবিড় প্রার্থনা যেন শুনতে পেলাম। হয়তো একদিন আমাকে কুকীর্তির ইতিহাস শেষ করে মহারাণীর সন্ধানে জল্লাদের ভূমিকায় নামতে হবে।

উইলিয়াম বাটলার ইয়েটস্‌

বিষ্ণু দে

'ভিড়ের মাঝখানেও কবি য়েটস্‌ চাপা পড়েন না; তাঁহাকে একজন বিশেষ কেহ বলিয়া চেনা যায়। যেমন তিনি তাঁহার দীর্ঘ শরীর লইয়া মাথায় প্রায় সকলকে ছাড়াইয়া গিয়াছেন, তেমনি তাঁহাকে দেখিলে মনে হয়, ইঁহার যেন সকল বিষয়ে একটা প্রচুর্য আছে, এক জায়গায় সৃষ্টি-কর্তার সৃজনশক্তির বেগ প্রবল হইয়া ইঁহাকে যেন ফোয়ারার মতো চারিদিকের সমতলতা হইতে বিপুলভাবে উচ্ছ্বসিত করিয়া তুলিয়াছে। সেইজন্য দেহে মনে-প্রাণে ইঁহাকে এমন অজস্র বলিয়া বোধ হয়।'

এইভাবেই রবীন্দ্রনাথ ১৩১৯ সালে চব্বিশ বছর এক মাসের কনিষ্ঠ আইরিশ কবির বিষয়ে তাঁর প্রবন্ধটি আরম্ভ করেন। ইংরেজি সেই জঙ্গীর যুগেই রবীন্দ্রনাথ ভেবেছিলেন যে ইয়েটস্‌ অধিকাংশ ইংরেজ কবিদের মধ্যে এক ব্যতিক্রম, কারণ তাঁর কাব্যশক্তি আসে তিনি বাস্তব জগতের কবি বলেই, নিছক সাহিত্যিক শিক্ষার বলে নয়, যাঁরা আমাদের সংগীত জগতের অনেক ওস্তাদের মতো সংগীত চর্চা করেন সমগ্র সত্তার তাগিদে নয়, শুধুমাত্র প্রচলিত সংগীত জগতের রীতির অনুসরণেই।

১৯১২-তে রবীন্দ্রনাথের এই সংবাদ বোধি আশ্চর্য বিচারই করেছিল, বিশেষত যখন লেখা প্রবন্ধটির শেষে তিনি নিজেই বলছেন যে, তখনও এই কৃতী আইরিশ কবির লেখা তিনি কিছু পাঠ করেন নি।

বর্তমানে ইয়েটসের সমস্ত এবং বহু-বিধ রচনা পাঠকের আয়ত্তে, তার ফলে সঠিক কেন্দ্রাবৃত্ত দীর্ঘ আলোকপাতে পাঠ ও বিচার সহজ। এবং এখন আমরা দেখতে পাই কী নৈতিকভাবে মহৎ ছিল তাঁর সৃষ্টির সেই সাধ যাকে তিনি বলতেন নি ভোটের মায়ের বা আদি জননীর সান্নিধ্যে, সংস্কৃতির ঐক্যে জীবনের অখণ্ডতার প্রত্যাবর্তনের অভীপ্সা, কারণ তা হলেই লেখা সম্ভব হবে লোকসাধারণের গ্রহণ-গ্রহণের জন্যে। তিনি তো জাত-ইংরেজ ছিলেন না এবং তাঁর দৃপ্ত কীর্তি সম্ভব হয়েছিল অনেকটা তাঁর আইরিশ স্বাজাত্য এবং বস্তুগত আত্মসচেতনতার কারণে।

অবশ্য এ স্বপ্ন ছিল প্রতিভাধরের পক্ষেই, যিনি সম্পূর্ণভাবে ছিলেন এক কবি, কবিমানসের নিঃসঙ্গ কিন্তু সমস্ত ব্যক্তিকতা যাঁর স্বভাবে। কিন্তু আজকাল বোঝা যাচ্ছে, যেমন অধ্যাপক শ্রীমতী স্টক স্পষ্টই দেখিয়েছেন ইয়েটসের কবিতায় কতটা গুরুত্বপূর্ণ তাঁর স্বদেশ আয়ার-ল্যান্ড, দীনের, ক্যাথলিকের, মর্গানের, অর্সিনের আয়ার্ল্যান্ডে যা সকলে, এস্কার-সনের (পরে বাংলার লাট) বা ব্ল্যাক-এন্ড-ট্যানদের, খোলাটি নিহত মানুষের, ডাক আপিসে চড়াও আক্রমণেও 'এয়ারে' বটে। এই আয়ার্ল্যান্ডেই সেই সকল মেয়ে-মানুষটিরও দেশ, সেই এক মাতা যে গৃহ-দ্বারে দুধ, রুটির বা মসোলিন এবং যাকে অকারণে মেরে ফেলল মাতোয়ালা ইংরেজ পল্টন দল। এবং কবির উপলব্ধি যথার্থ হয়ে উঠল কিভাবে 'ভীষণ সৌন্দর্য হয় জাত'। এখন বোঝা যাচ্ছে ইয়েটসের মানসে এই সব অভিজ্ঞতা কতটা অর্থবহ হয়ে উঠেছিল, যেমন আবার হয়েছিল সেই 'কেল্টিক গোধূলি', যা মূলত তৎকালীন সীমার মধ্যে একরকম নবজাগরণই। এবং আইরিশ নাট্যআন্দোলনের সূত্র-পাত এবং সার্থকতার বিকাশও সেখান থেকেই। এই দূরাগত দৃষ্টিতে দেখা যাচ্ছে ইয়েটসকে আইরিশ ফ্রী স্টেটের সেনেটরের জাগ্রত দায়িত্বে, জনসাধারণের প্রত্যক্ষ বাস্তব জীবনের এবং সংস্কৃতি সংক্রান্ত সর্ববিষয়ে বক্তৃতা আলোচনায় আমাদেরও মুগ্ধ হতে হয়।

সত্যিই ইয়েটসের দীর্ঘ জীবন ও কর্মের সম্পূর্ণ পটে আমাদের কবির 'গীতাঞ্জলি'-অনুবাদের বইয়ের বিখ্যাত ভূমিকাটি এক নতুন অর্থ পায়, যে অনুবাদগুলির খসড়া তিনি পকেটে নিয়ে বেড়াতেন ও থেকে থেকে পড়তেন। ঐ ভূমিকায় ইয়েটস এক জায়গায় লিখেছিলেন, 'এই লিরিকগুলি', আমার ভারতীয়েরা আমায় বলেছেন, মূল বাংলায়, ছন্দস-এর বাজনাতে পূর্ণ, বর্ণনা-তার অনুবাদাতীত সূক্ষ্মতায়, পদমাত্রার বহুবিধ নকশে পরিপূর্ণ এবং এগুলিতে চিন্তায় যে জগত প্রকাশিত সারাজীবন তারই স্বপ্ন আমি দেখেছি। চূড়ান্ত এক কৈশোরের, এক সংস্কৃতির রূপকর্ম এগুলি, অথচ মনে হয়, এরা মাঠের ঘাসের মতো, জলের নলখাগড়ার মতোই সাধারণের মাটিতেই বেড়ে উঠেছে। কাব্য ও অধ্যাত্ম-ধর্ম একাকার এক ঐতিহ্য বহু শতাব্দী ধরে এই সংস্কৃতিতে চলেছে, উপমা উৎপ্রেক্ষা তথা অনুভূতি-ভাব সংগ্রহ করে বিশ্বজন তথা প্রাকৃতজনের ভাষা থেকে আবার সেই স্রোতকে নিয়ে গেছে পণ্ডিত এবং সম্ভ্রান্তজনের চিন্তার বিন্যাসে।

যদি বাংলার এই সভ্যতা, অবিকল থাকে, যদি ঐ মানসিক সাধারণ্য যা— আন্দাজ করি — সর্বব্যাপ্ত, সব বিশৃঙ্খল পরস্পর বিচ্ছিন্ন মনে টুকরো টুকরো না হয়ে যায়—'

কিন্তু ইয়েটসের 'ভারতীয়েরা' ব্যাপারটা অতিসরল করেছিলেন এবং ঐ যদিটা মস্ত-বড় যদি। রবীন্দ্রনাথের এই বাংলাদেশেও— প্রায় ইয়েটসের আয়ার্ল্যান্ডের মতোই with her great hatred and little room.—বিপুল ঘৃণায় অল্প স্থানাভাবে।

এবং ইয়েটস ১৯১০-এই লিখেছিলেন:

যা কঠিন, তারই আকর্ষণ
আমার ধমনী থেকে শুষে নেয়
সব রস-রক্ত,
দূর করে স্বতঃস্ফূর্তি, সহজ সন্তোষ
আমার হৃদয় থেকে—

তখনই ইয়েটসের কাব্যরীতি, জীবন-ছন্দ আর নির্ভীক বাচনপর্যায়ে যে একটা নতুন পেশল সংযমনীয়তা এসেছে তাতে মনে হয় যে তিনি তাঁর তারুণ্যের কেল্টিক স্বপ্ন থেকে পাকাপাকিভাবে বেরিয়ে পড়েছেন, এবং ঢুলুঢুলু চোখ ইন্দ্রিয়রাগী প্রতীকবাদ বা সাইমনসের পেটার-ছাঁচের শৌখিনতা তখনই অতিক্রান্ত। বস্তুত ইয়েটস সেই যুগেই পাউন্ড এলি-অটের মতো নবীন আধুনিকদের পুরো-ভাগে। আশ্চর্যরকম আত্মসচেতন কবি জীবনের প্রথমার্ধে নাট্যকল্পনা বা পোশাকী বা ব্যক্তিস্বরূপের সচেতন রূপ বা সন্ধানের অস্থিরতা এই কারণেই তাঁকে বিড়ম্বিত করত। কিন্তু ঐ কারণেই তাঁর ব্যাপক ও গভীর নানারকম সমালোচকমনা উপলব্ধি, শতবার্ষিকীর পরেও আমাদের মনন উদ্দীপক করে। দীর্ঘায়ু ও ক্লান্তিহীন প্রয়াসের ফলে তাঁর অপ্রাকৃতদৃষ্টিতে কল্পনাদ্রান্ত

CENTRAL LIBRARY

ও পথে পথে ভ্রাম্যমাণ চিন্তার, তথা সংলগ্ন তাঁর কাব্যের ও নাটকের বিবর্তনে একটা একসূত্রে সম্বন্ধিত আর দেখা যায়। ইয়েটসের কর্তাব্যক্তি পিতা তাঁকে ঠিকই সাবধান করে দিতেন, সত্যিই ইয়েটস দার্শনিক ছিলেন না, তিনি এক মহাকবি মাত্র, অনেক তাঁর মুখোশ, কাল্পনিকদের নানান মুখোশ এবং তথাকথিত দর্শন ও অপদর্শনের তত্ত্ব তিনি ব্যবহার করতেন বস্তুতপক্ষে তাঁর কবিতাকে অবলম্বন দেবার জন্য।

ভারতীয় বিষয়ে অধ্যাত্মবাদের চিন্তা তাঁকে টেনে দুর্দিন সাথীদের সঙ্গে বস্তু-বাদের জড়-জগতের প্রতিবাদে প্রতিক্রিয়ায় এবং হয়তো কিছুটা অসাধারণ মোহিনী চাটুজ্যের মতো ভারতীয়ের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে, সেই ১৮৮৬-তেই। প্রসঙ্গত একটি ছন্দ ভারতীয় চিন্তার বিষয়ে তাঁর এক কাঁচা বয়সের বিলাসী কবিতার সঙ্গে যে কবিতাটি তিনি পরিণত কবিরূপে তাঁর যৌবনের গুরুর বিষয়ে লেখেন তার বাক্যের নির্দিষ্টতা তুলনীয়। Kava on Himself ছাপা হয়—অবশ্য, লক্ষ করুন, ১৮৮৮তে The Vegetarian বা নিরামিষাশী নামক এক পত্রে—

Now wherefore hast thou tears innumerous?
Hast thou not known all sorrow and delight
Wandering of yore in forest s rumorous,
Beneath the flaming eyeballs of the night,

And as a slave been wakeful in the halls
Of Rajas and Maharajas beyond number?
Hast thou not ruled among the gilded walls?
Hast thou not known a Raj a's dreamless slumber?

এবং আরো দুটি সুইনবর্নীয় বিলাস-ভারাক্রান্ত চতুষ্পদীর পরে :

Then werefore fear the usury of Time,
Or Death that cometh with the next life—Key?
Why, rise and flatter her with golden rhyme,
For as things were, so shall things ever be.

মোহিনী চট্টোপাধ্যায় মশায়ের বিষয়ে কবিতাটি প্রায় একসঙ্গে লণ্ডন মর্কারিতে আর ১৯০১, ১৪ই জানুয়ারির নিউ-রিপাবলিক পত্রে Meditations Upon Death নামক দীর্ঘ কবিতার অংশরূপে ছাপা হয়। মনে আছে একদিন আমার বাবার কাছে আগত দৃষ্টিহীন মোহিনীবাবুকে সংস্কৃতভাষী বৃদ্ধ পিতৃবান্ধব কবিতাটি আমার পড়ে শোনাতে হল; এবং সাপ্তাহিকী তিনি তাঁর পত্রের জন্যে লিখেও দেন :—

উপাসনা করব আমি কিনা,
আমার এ প্রশ্নের উত্তরে
ব্রাহ্মণ বললেন আমায় :
কোরো না কিছুই প্রার্থনা
বোলো প্রতি রাত্রে বিছানায়,
আমি তো ছিলাম মহারাজ,
আমিই ছিলাম ক্রীতদাস,
দুনিয়ায় কিছু নেই আজ,
মূর্খ অত্যাচার বা মহান
আমি যা হই নি এতকাল,
অথচ আমার বক্ষপরে
(বুকখানা ঠেকেছে তো আজ?)

বালকের চণ্ড বিন্দুতে
যাতে হয় প্রশান্ত অনাস্থা,
মোহিনী চাটার্জি বললেন
ঐ যা অর্থনীতির কথা :
আমি জুড়ি টীকার ব্যাখ্যানে,
দুঃখ প্রেমিকেও পেতে পারে
কাল যা দেয় নি এতকাল—
মিটবে তাদের সাধ, তাই
কবরে কবর গাদা করে,
দুনিয়ার আত্মার জমিয়ে
চিরস্থায়ী কোটের কাওয়াজ,
জন্মের পালায় জন্ম জমে
যাতে ঐ কামান-গাগার
আওয়াজেই চিকন পাকান,
অনন্ত আনন্দ মিশে যায়,
অথবা কাঁদিয়া বা বলেন :
মানুষের নৃত্য নিত্য মৃত্যুহীন পায়।

ইয়েটস নিজেই তাঁর Commentary on Supernatural Songs—এ বলেন যে, তিনি প্রথম পর্বের খ্রীষ্টীয় আয়ার্ল্যান্ডকে ভারতের স্বগোত্র ভাবতেন এবং কৈলাস-পর্বত ও মানস সরোবরের তুল্য তিনি প্রাচীন আয়ার্ল্যান্ডে পেয়েছেন?

একালের বাস্তব আয়ার্ল্যান্ডের কথায় এলে দেখা যায়, ইয়েটসও বহু মহান আইরিশম্যানদের মতো মুষ্টিমেয় ভদ্রলোক-শ্রেণীরই মানুষ, প্রটেস্টান্ট ইংরেজের শাসনে ক্যাথলিক দেশে অল্প কয়েকজন স্বদেশপ্রেমিক প্রটেস্টান্ট সমাজের প্রতিভা-ধর ব্যক্তি। তাঁদের মনস্থির করতে হয় এবং ঘোষণা করতে হয় ইয়েটসের ভাষায় :

আমি আয়ার্ল্যান্ডেরই
পুণ্যভূমি আয়ার্ল্যান্ডেরই।

একদিকে দেশবাসীর দীর্ঘ এবং মহৎ এক দুঃখ, অন্যদিকে বিচ্ছিন্ন মননশীলের স্বকীয় গর্ব, তারই মধ্যে আইরিশ ভাষার অভাব ইয়েটসকে শান্তি সন্ধান করতে হয় নিজের সদ্য কল্পনাজাত আইরিশরীতে। এমন কি বৃদ্ধ বয়সেও তিনি তাঁর স্বদেশের তরুণ-তরুণীদের কাছে বলেন—

Cast your mind on other days
That we in coming days may be
Still the indomitable Irishry.

এই মনোভাবেই তিনি তাঁর কবর-মালা লেখেন—

Under bare Ben Bulben's head
In Drumcliff churchyard Yeats is laid.

এবং তাঁর একাধিক অবোধ্য প্রতীকের অনায়াসে, ঘোড়সওয়ার-কে ৪।১।০৮৬৩ হুকুম দিতে পারেন :

হিম চক্ষু মুহূর্তেক দাও
জীবনে, মরণে, আর
ঘোড়সওয়ার, পাশ কেটে যাও।

অবশ্যই তিনি জানতেন অস্থিসর্বস্ব বৃদ্ধ ব্যক্তি হওয়া কাকে বলে; বস্তুতপক্ষে, তিনিই বোধহয় বার্ধক্যের শ্রেষ্ঠ কবি, লরিন্সের সমালোচনার সংশোধনে এলিয়ট যে কথাটা বলেছিলেন :

এখন যে আমার সে মইটা উধাও
আমার শুরুতেই হবে সব মই শুরুই যেখানে
হৃদয়ের নোংরা ন্যাকড়া হাড়ের দোকানে।

ইয়েটসের ভাষণ-উক্ততা বা প্রকাশ্য কণ্ঠস্বর হয়তো কাব্যের নিভৃতিবাদী পাঠকের মনে হতে পারে আলঙ্কারিক আবৃত্তিতে মহাকবির সচেতন প্রয়াস to make the Centre hold কেন্দ্রকে অটুট রাখার চেষ্টা। অথচ অতি সুকুমার এক কবিমানসের ভয়ানক দৈহিক ভাষা এল তাঁরই কবিতায় যিনি বরাবর মুক্ত ব্যবসায়ী চাকুরিয়া শ্রেণীর সংস্পর্শে থেকে বঞ্চিত সর্বশ্রেণীর থেকে নয় সিঁটিয়ে থেকেছেন।' ভিক্টোরীয় ব্রিটিশ শুদ্ধতা, তা সে ধর্মাধর্ম-বিষয়েই হোক বা বিজ্ঞান-বিষয়েই হোক তাঁর সময়ের পাজিটিভিস্ট, ইউটিলিটেরিয়ান, মর্যাদাবিরোধী, ইংল্যান্ড-এর শিক্ষিত সমাজ থেকে তরুণ কবি মুক্তি খোঁজেন স্বদেশের দুর্গত জেলে চাষীদের মধ্যে, তাদের কাহিনীতে গানে তাদের ঐতিহ্যে।

ইয়েটসের সুপরিচিত কবিতা Down by the Saeby Gardens লিখতে হয়—এক গ্রাম্য বৃদ্ধার মুখে শোনা গানের অনু-প্রেরণায়, যদিচ ইয়েটস নাকি ছিলেন টোন-ডেফ অর্থাৎ শ্রুতিবোধবঞ্চিত। আর আইরিশ ভাষাও ছিল তাঁর অজানা,—যে গানটি অবলীন ফোনোগ্রাফ-গীত রেকর্ডে অনেক পরে শোনা গেছে।

তাইতো নিঃসঙ্গ মিনারের মহাকবির সাধ ছিল লোকসাধারণের গ্রন্থ প্রণয়নের, তাই তিনি ভাবতেন আর ঘুরে-ফিরে বলতেন জীবনের ও শিল্পসাহিত্যের, সংস্কৃতির অখণ্ডতার কথা। এই দীর্ঘস্থায়ী অখণ্ডতার অত্যন্ত সাধেই নিশ্চয় তার এক সময়ের রবীন্দ্র-উৎসাহের একটা কারণ ছিল।

উৎসাহের একটা কারণ ছিল। কেন তাঁর রবীন্দ্রনাথে আগ্রহ কমে গেল আর পাউন্ডের মতো তিনিও বলতে লাগলেন ড্যাম ট্যাগোর, সে আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন। তবে পরে রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্যহীন সাধুসন্তমার্কা ইংরেজি রূপে ক্লান্ত হওয়া সত্ত্বেও প্রথম দিকে তাঁর উৎসাহের একটা কারণ অবশ্য ছিল, তাঁর ধারণাটাই—বাংলার ,, সভ্যতায় ,, অপরি-

বর্তমানীয়তা এবং ঐ সাধারণব্যাপ্ত মনন। রাজনৈতিক তুলনীয়তাও নিশ্চয়ই তাঁকে উত্তেজিত করেছিল। ১৯৩৭-এও তো তিনি লেখেন :

John Bull has stood for Parliament,
A dog must have his day.
The country thinks no end of him,
For he knows how to say,
At a beanfeast or a banquet,
That all must hang their trust
Upon the British Empire,
Upon the Church Christ.

The ghost of Roger Casement
Is beating at the door.

John Bull has gone to India
And all must pay him heed,
For histories are there to prove
That none of another breed
Has had a like inheritance
Or sucked such milk as he,
And there's no luck about a house
If it lack honesty.

The ghost of Roger..etc.

ইয়েটসকে গড়তে হয়েছিল সে সময়ের বীরত্বময় আইরিশ রাজনীতি নিজেও কাব্যিক মিথ বা একটা পৌরাণিকত্ব। তাই পিয়ার্স, কনোলি ও ওরাহিলি এবং অনুরূপ অনেকে ইয়েটসের কাব্যে বলেন ইয়েটসীয় গোলাপগাছেরই কথা। বস্তুত, ইয়েটসের অতীন্দ্রিয় — কাব্যিক রোজ্ প্রোথিত হয় রক্তপাতে :

There is nothing but our own red blood
Can make a right Rose Tree.

এক হিসাবে ইয়েটস বরাবরই নানা প্রকার লিখতে চেয়েছেন :

স্বজাতির আর সত্যের তাগিদে। ১৯১৬-র এবং তার পরবর্তী ক' বছরের অভিজ্ঞতাগুলি তাঁর একেবারে অন্তিম কবিতাকলীতেও তাই ছায়া ফেলে। সেটা যে শুধুমাত্র কবিতা লেখার সুযোগের জন্যে নয়, তা বেশ বোঝা যায় মার্কিন যুবাপণ্ডিতের কষ্ট সংগৃহীত সক্রিয় সেনেটর ইয়েটসের বহু বাস্তব বিষয়ে সজাগ বক্তৃতাগুলিতে, বৃহৎ সামাজিক ও রাজনৈতিক ও সজাগ তীক্ষ্ণ ভাবলে মন্তব্যে,—যদিও সাম্যবাদে তাঁর ভয় যায় নি, বরং একটা অপরিচ্ছন্ন আকর্ষণ ছিল কিয়দপরিমাণে ফ্যাসিসমের প্রতি—অপ্রবীণতর এজরা পাউণ্ডের মতো।

অক্ষ কবিতার বিবেচনায় তিনি ঘোষণা করেছিলেন : এ কথাও বলা যায় কবিতা বা গদ্যকে যদি পুনরায় মানবিক হতে হয় তাহলে তাকে ধরতে হবে কর্কশ চড়া সুর।

প্রায় পরিণত ত্রিশ বছর ধরে তাঁর কাব্য এই প্রবল মানবিকতার সন্ধান। এমন কি খৃস্টীয় আর্তারিশ সত্বেও তিনি জানতেন যে বাসনা-কামনা আর রাগই তাঁকে গাইয়েছে। এই মেজাজেই তাঁর কবিত্বের আশ্চর্য বিকাশ। কেউ কেউ মনে করেন যে মাঝে একটা ছেদ আছে, কেউবা বলেছেন যে রীতির পরিবর্তনটা এল প্রায় পঞ্চাশ বছরে বিবাহের পরে। খানিকটা হয়তো তাই কিন্তু ইয়েটস-কাব্যের একটা ক্রমিকতাও আছে এবং ১৯১০-এর 'গ্রীন হেলমেট' উভয় দিক থেকেই এক সীমাচিহ্ন। আবার পাউণ্ড এলিঅটের মতো কিছু উদ্বাস্তু তরুণদের আধুনিক কাব্যে বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গেও ইয়েটসের প্রগতির সম্পর্ক আছে। ইয়েটসের কবি-স্বভাবই চাইত নানান মুখোশ নিজের স্টাইল অর্জন করতে। নিজেকে তিনি কি বলেন নি যে, লোক লেখকমাত্র, কর্মী নয় তার আত্মজই হচ্ছে স্টাইল (এবং একটি নামহীন কবিতায়, এক চৌপদীতে কবিই তো বলেছেন) কেন তিনি বারবার তাঁর গানগুলি পুনর্নির্মাণ করে যান—করে যান নিজেকেই পুনর্গঠিত করতে। ইয়েটসের নিজের প্রতিমূর্তি বা ব্যক্তিস্বরূপের ক্রমিক সংলগ্নতা—যার প্রমাণ আমরা এখন পাই মার্কিন পণ্ডিতের পরিশ্রমে তাঁর কবিতার ভ্যারিওরম সংগ্রহে এবং নাটক সংগ্রহে আর সমস্ত গদ্য-রচনার সংগ্রহে। তাঁর সেই বিখ্যাত পয়লা নম্বর বিশ্বযুদ্ধের বিখ্যাত কবিতা An Irish Airman foresees his Death এখন তাই তুলনা করা যায় মরণোত্তর প্রকাশিত Reprisals -এর সঙ্গে :

Some nineteen German planes they say
You had brought down before you died.
We called it a good death, Today
Can ghost or man be satisfied?

Then close your ears with dust and lie
Among the other cheated dead.

তুমি গোটা উনিশ জর্মান প্লেন, এরা বলে,
ভূমিসাৎ করেছিলে অকালে তোমার মরণের আগে,
আমরা বলেও ছিলুম, মহৎ মরণ। আজ কোন ছলে
প্রেত বা মানুষে কার মনে তৃপ্তি লাগে?
সুতরাং কান ঢেকে ধুলার মাটিতে পড়ে থাকো
প্রবঞ্চিত মৃতদের ভিড়ে।

ভাষার কর্তৃত্ব তাঁর ছিল, তিনি জানতেন নিজের কৃতিত্বের মূল্য, তাই তিনি প্রথম বয়সের কবিতাবলী পাল্টাতেন, যৌবনোচিত প্রয়াসে লজ্জিত হয়ে নয়, তাঁর গোটা কাব্যসংগ্রহের একটা সমগ্রতা আনবার জন্যেই। হ্যাঁ, ইয়েটসের ছিল বটে এক কর্তামশায়ের চরম গর্ব নিজের পছন্দ-অপছন্দে। তাই তিনি বিনাসঙ্কোচে সাড়ম্বরে স্বকীয় অক্সফোর্ড বুক অব মডার্ন ভার্সে গোগার্টিকে সতেরোটি, ডবলিউ জে টার্নারকে বারোটি, লেডি ডরথি ওয়েলেসলিকে আটটি, মাইকেল ফীল্ডকে নটি, মার্গো রুককে ছটি, এলিঅটকে মাত্র সাতটি, হার্ডিকে মাত্র চারটি, তাঁর শ্রীপুরোহিতস্বামীজিকে তিনটি এবং নিজেকে চোদ্দটি কবিতা বরাদ্দ করতে পেরেছিলেন। দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথেরও তিনি সাতটি কবিতানুবাদ নিয়েছেন।

দুর্ভাগ্যহত আয়ার্ল্যাণ্ডের মানুষ ছিলেন ইয়েটস এবং তাই কি তাঁর কীর্তিবর্ণিত ইগোটিসটিক্যাল্ সুপ্রাইম অহমনিষ্ঠ মহত্ব শেষ অবধি তাঁকে তাঁর নেগেটিভ কেপেবিলিটি অহমবিসর্জনের সমর্থক্ষমতা অর্জনে সফল হন? তিনি তাঁর ভাবাবেগকে কাব্যবলে দাঁড় করাতে পারতেন ইওরোপীয় ভূখণ্ডের প্রতীকবাদীদের চেয়ে ভ্যালেরি, রিলকে বা পাস্টেরনাক—চেয়ে বেশি সার্থকতায়, প্রাণময়তায়। তাই বৃদ্ধ ইয়েটস সোজা লিখতে পারতেন তাঁর জানলার পাশে ময়নার বাসায় বিষয়ে কবিতা :

আমরা সব অবরুদ্ধ, আমাদের অনিশ্চয়তায়
কপাটে পড়েছে চাবি, পথে ঘাটে ঘরে
কেউ বা হয়েছে খুন, কারো ঘর পুড়ে ছারখার।
অথচ নিশ্চিত তথ্য স্পষ্টও বোঝাই হল ভার।
এসো বাসা বাঁধ পরিত্যক্ত এই ময়নার কোটরে।

সেইজন্যই বৃদ্ধ কবি মৃত্যুর কিছুকাল আগেও ভাবনাচিন্তা করেন বালকবালিকাদের শিক্ষা বিষয়ে, যে প্রবন্ধেই তিনি প্রসঙ্গত লেখেন : 'ইংলণ্ড জোর করে ভারতে শিক্ষা-দীক্ষায় ইংরেজীভাষা চাপিয়েছে এবং আজও কোনো ভারতীয়ই কয়েকপুরুষ ধরে ইংরেজিশিক্ষা চালিয়েও প্রাণবন্ত ইংরেজি লিখতে বলতে পারে না এবং তাঁর মাতৃভাষাই হয়েছে তাই ঘৃণিত এবং দুর্বিত।'

সুখের মেলা

স্বর্গাদপি গরীয়সী

'আমার মা কোথা? আমার মা! আমি তার কাছে যাব। আমি মায়ের কাছে শোব। মা নেই কেন? আমারি মা কোথা?'

'তোমার মা? তুমি সোনামণি ঘুমোও। ঘুমোলেই ঠিক দেখতে পাবে। তোমার মা এসে দেখা করবে।'

'আমাকে চুমু খাবে?'

'হাঁ সোনা, তোমাকে চুমু খাবে।'

'মা কোথা গেছে?' পাঁচ বছরের খোকন সুজন হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠে শুধোয় তার বাবাকে। তিন বছরের খুকীটির কান্না আর প্রশ্নের পর প্রশ্নে বিব্রত হয়ে নির্মল সরকার নিজেও গোপনে কাঁদতে থাকে। কণ্ঠনালী তার শিশি মাছের কাঁটা মারার যন্ত্রণায় যেন ফেটে যাচ্ছে। এক বছরের কচি খোকনটি চিৎকার করে ঘণ্টা খানেক কাঁদার পর এখন ঘুমিয়ে পড়েছে। নেতিয়ে পড়েছে যেন মড়ার মতন।

খুকী কণা আবার বাবার চিবুক ধরে মায়া মাখানো আদুরে গলায় শুধোয়, ঘুমোলেই মা আসবে? মা ভাল। খোকন আমাকে মারে। মা এলেই মাকে বলে দোব। মা খুব বকে দেবে।'

হাঁ, খুব বকে দেবে।'

খোকন হঠাৎ বলে বসে, মা তো মারা গেছে! মা তো আর আসবে না। সোনালী, কাকলী, মুনাও—ওরা বলেছে, তোর মা মরে গেছে রে! সে কোন্ অন্ধকারে চলে গেছে। আর আসবে না, আর হাসবে না। তোদের আর কোলে নেবে না। চুল আঁচড়ে দেবে না। এই শীতের সময় গায়ে জামা-কাপড় দিয়ে দেবে না। তোদের কাপড় ময়লা হয়ে যাবে। গায়ে মাথায় ধুলো-কাদা জমবে। আর তোর বাবাও তোদের কান্নায়, তোদের মায়ের জন্য কেঁদে কেঁদে পাগলা হয়ে যাবে। হাঁ বাপী, তুমি পাগলা হয়ে যাবে?'

নির্মল এবার ডুকরে কেঁদে উঠল: 'মন্দিরা, মন্দিরা! তুমি আমাকে কি পাগল করতে রেখে গেলে? আমি কি করব এখন! এদের আমি কেমন করে বাঁচাব?'

বড় মেয়ে সুধার বয়স আট। সে উপুড় হয়ে পড়ে লেপের মধ্যে এতক্ষণ ফুলে ফুলে কাঁদছিল। হঠাৎ সে বলে উঠল: 'বাপী তুমি কাঁদবে না, তুমি কাঁদলে আমরা ভয় পাই!'

সুধা, সুজন, কণা, বাপ্পু—চারটি কাচ-কাচা সোনা। ওদের ফেলে রেখে হঠাৎ ওদের মা চলে গেছে। যাবার সময় সন্তানদের কথা ভেবে কেমন করে শেষ কান্না কেঁদে উঠেছিল মন্দিরা বড় বড় চোখ মেলে সে দৃশ্যটা ভুলতে পারে না নির্মল। কী নির্মম জোর ছিল তার চোখে।

ছেলেমেয়েরা কেঁদে কেটে না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়ল। কি খাবে ওরা? দুটো ভাত রেঁধেছিল নির্মল সুধার সাহায্য নিয়ে। মেয়েটা যেন গড়াতে গিয়ে হাত পোড়াল।

'কে তোকে যেন গড়াতে বললে, দুষ্টু মেয়ে!' ধমক দিল নির্মল।

সুধা মুখ লুকিয়ে কাঁদতে লাগল নিমগাছটার কাছে গিয়ে যেখানে তুলসীতলা—তার মাকে শেষ শোয়ানো হয়েছিল। যে পথে হরিবোল দিয়ে কাঁধে করে সবাই তার মাকে নিয়ে গিয়ে কোথায় সুদূর নদীর চরে পুড়িয়ে দিয়ে এসেছে সেদিকে তাকিয়ে থেকে নীরবে ফুলে ফুলে কেঁদে কেঁদে বুক ভাসায়।

কচি বাচ্চাটা কঁকিয়ে কঁকিয়ে কাঁদছে দেখে চিৎকার

বলে তাড়া দেয় নির্মল, 'সুধা, ওখানে কাঁদা হচ্ছে—যীশুকে নিতে পারিস না? আমার আর কী! এই করি: অফিস গেল, রোজগার গেল!...

ছেলেমেয়েরা এখন ঘুমিয়েছে। হ্যারিকেনটা খুব নিস্তেজ করে আলো কমিয়ে দেয় নির্মল। কচি বাচ্চা যীশু ঘুমের ঘোরে চুকচুক করে স্তন টানার মতন শব্দ করে। কচি কচি হাত দুটো দিয়ে মায়ের নরম নরম তপ্ত মধুর বুকের অমৃতাধার খুঁজে বেড়ায়।

স্বপ্ন দেখে সুজন হঠাৎ হাসতে থাকে। কথা বলতে থাকে: 'জানো মা, সোনালী বলে তুমি নাকি মরে গেছ!...বাপী আমাকে আজ মারল।...' তারপর সুজন কাঁদতে লাগল।

বাইরে হিমার্ত পৃথিবী কুয়াশার চাদর মুড়ি দিয়ে বেঘোরে পড়ে ঘুমোচ্ছে।

প্যাঁচা ডাকতে লাগল—চ্যাঁ-হ্যাঁ-হ্যাঁ স্বরে।

শিয়াল ডাকে—কাক-কাক কা—হুয়া—হুয়া! কা হুয়া, কা হুয়া!

খটাশ ডেকে ওঠে—বাফ-বাফ-বাফ—ভুব। ভুব!

রাতচরা পাখি ডাকছে—চিকুর-চিকুর-চিকুর!

—ঘরের আড়কাঠার বাঁশে একটা ঘিঁকুর পোকা কাটর কাটর শব্দ তুলে ক্রমাগত একটানা বাঁশ কুরে খাচ্ছে। হাড়ের মজ্জা কুরে খাচ্ছে যেন পোকাটা।

খাটের ওপরের বিছানাটা শূন্য পড়ে আছে। মেঝেতে ছেলেমেয়েদের নিয়ে ঠিক যেখানটাতে মন্দিরা শুয়ে থাকত আজ পাঁচদিন হল সেখানটাতে শুচ্ছে নির্মল। সারা রাত মোটেই ঘুমোতে পারে না সে। একটু তন্দ্রা ঘনিয়ে এলেই হঠাৎ মন্দিরা এসে হাজির: একি গো! তুমি মা হয়েছ নাকি! হি-হি-হি বাচ্চাটাকে দুধ খাওয়াচ্ছ? ওঠ-ওঠ—এই উঠে গিয়ে খাটে শোও! তারপর হঠাৎ সে হাঁক দেয় বল হরি হরিবোল হরি।'

উঠে বসে থাকে নির্মল।

কাচ্চা: বিছানা ভিজিয়ে ফেললেই উঠে পড়ে। কাঁথা পালটে দিতে হয়। নোংরো করলে পরিষ্কার করে দিতে হয়। সকালে সেসব ধুতে হবে। রোদে শুকোতে হবে। মন্দিরার যে অলক্ষ্যে কত কাজ ছিল সেসব করতে গিয়ে এখন চোখে পড়ে যায়।

হাসির ব্যাপার, সুধা খানিকটা গোবর কুড়িয়ে এনে মাটির ঘরের মেঝে-দাওয়া নিকিয়েছিল সকালে।

মন্দিরা ওদের জন্যে টিন ভর্তি করে মুড়ি ভেজে রাখত। মুড়ি ভাজতে পারে না নির্মল। চাল নিতে পাড়ার সোনালীর মা ভেজে দিয়ে গেছে গতকাল। সোনালীর দুষ্টু এসে ওদের কোলে নেয়, দেখে মাঝে-মধ্যে। নির্মল এসে পড়লেই পালিয়ে যায়। অষ্টাদশী কুমারী মেয়ে। মন্দিরার যেন সখীর মতন ছিল—তার গন্ধ তেল মাথায় দিত—হিমানী মুখে দিত। মন্দিরা তামাসা করে বলত 'আমি যদি মরে যাই হঠাৎ তুই আমার সতীন হবি। তুই অনাথ মেয়ে—তোর দাদাবাবু তোর বিয়ে দিচ্ছে না। দেখিস যেন আমার পুরুষটাকে দখল করিস না।'

জমিতে ধান পেকে গেছে। জন লাগাতে হবে। পাশাপাশি আটনের ধান কাটা হয়ে গেছে। অনেকের ধান উঠে গেছে মাঠ থেকে খামারে।

নির্মলের শ্বশুর আছেন। তিনি গরিব, স্কুল মাস্টার—শাশুড়ী নেই। নিজের মা-বাবা নেই। বাবা মারা যান তাঁর যখন বছর দশেকের ছেলে। মা মারা গেছেন গত বছরে। তিনি অনেক কষ্টে গ্রাজুয়েট, চাষ করিয়ে ছেলেকে বি-এ পর্যন্ত পাস করান। বিয়ের ব্যাপারটা নির্মলের লভ ম্যারেজ'। মা কিছু আপত্তি করেন নি কারণ মন্দিরা সুন্দরী ছিল দেখতে, অসামান্য সুন্দরী। আগুনের শিখার মতন। মন্দিরার রূপের প্রশংসা করলে সে বলত, বড় মেয়ের মাথা ঘোরানো তোমাদের রূপে আছে বাপু!

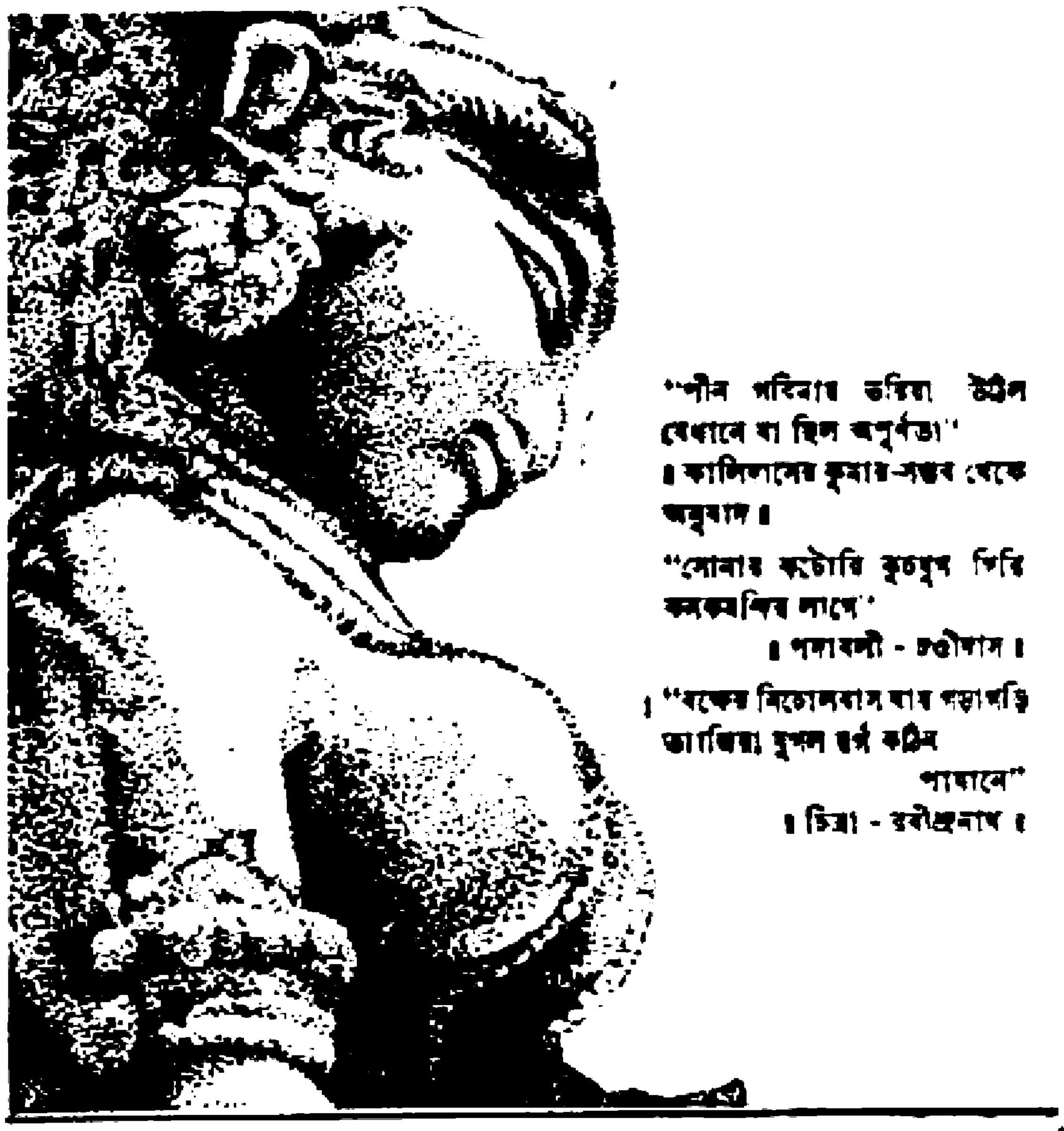

বিজ্ঞানের বিস্ময়কর আবিষ্কার!

একটি বিশেষ হর্মোন আর নানা বিশিষ্ট উপকরণে তৈরি ডার্মাকেয়ার অস্ট্রোজেনিক ডেভলপিং ক্রীম। বক্ষের শিথিলতা, অপূর্ণতা এর ছোঁয়ায় নিমেষে উধাও। বিকশিত বক্ষ-সৌষ্ঠবে গরবিনী যৌবনবতীর দিকে চেয়ে সবার বুক তখন দুরুদুরু।

ডার্মাকেয়ার
অস্ট্রোজেনিক ডেভলপিং ক্রীম
প্রস্তুতকারক : সাহেব সিং'স্

"বিউটি ইজ ইওর বার্থরাইট" পুস্তিকার জন্য এবং আপনার রূপচর্চার নানা সমস্যার উত্তরের জন্য আমাদের 'বিউটি কনসালটেন্টস্, পোষ্ট বক্স : ৪৪০, নিউদিল্লী,—এই ঠিকানায় লিখুন

SS—2/70

শত! ভালবাসা! মন্দিরার ভালবাসা! তার স্বর্ণচাঁপার কুঁড়ির মতন বুকে থোকা লবীর আজ কোথায় হারিয়ে গেল! তার দেহ! দেহের বিচিত্র গোপন চিহ্ন! তার সন্তান। চারটি সন্তান! সুধা-সুজন-কণা-বীণু..সবাই শিশু! সবাই শিশু!...

চারটি সন্তান হয়ে গেল! অফিসে সে কথা বললে বন্ধুরা বলত, তুই কোন্ যুগে বাস করছিস রা? সগররাজার মতন ষাট হাজার সন্তানের জনক হবি নাকি? সন্তান মানুষ করতে টাকা লাগবে না? বন্ধ কর বাবা—বন্ধ কর—ভগবানের নাম করে এখন ক্ষান্ত দে। বলতেও লজ্জা করে না তোর? তাছাড়া তোর সুন্দরী বউটা বুড়ী হয়ে যাবে—চুল পাকবে, দাঁত পড়বে তাড়াতাড়ি! তোর ঠাকুর-মা হয়ে যাবে!'

মন্দিরাকে এসব কথা বললে সে হাসত।

'এই না না. ইয়ার্কি না। আমি অপারেশন করে নিই।'

'না। কক্ষণো তা করবে না। করতে হয় আমি যা-হয় করব।'

করব করব করে বীণুও তো আবার এসে হাজির হল।'

মন্দিরা বললে, 'ভাগ্যি কিছু করিনি। এমন সোনার চাঁদ এল আমার কোলে!'

'ওই নিয়ে থাকো। বিশ-বাইশটা ছেলে-মেয়ে হোক তোমার। তোমাকে তো মেয়ের বিয়েতে টাকা খরচ করতে হবে না। ছেলেকে পড়াবার...

'চুপ করো। আমারই সব দোষ। তবে ডাকো কেন, ওই এসো না—আমার ঘুম আসছে না।'

শেষে হঠাৎ একদিন কর্পোরেশনের হেলথসেন্টার থেকে লুপ নিয়ে এল মন্দিরা।

প্রথম সন্তানের পর দ্বিতীয়টা এল তিন বছর পরে।

তারপরেরটা দু'বছর পরে। শেষেরটা এল মাত্র দেড় বছর পরেই। হাসের ডাক্তার মজুমদার নাকি মন্দিরাকে বলেছিলেন, একটু সাবধান হোন, ঘন ঘন সন্তান আসলে কেন না ইউটেরাস নষ্ট হয়ে যাবে?

আমারই সন্তানে আসবার আড়ম্বরেই লুপ নিয়ে এসেছিল মন্দিরা। জন্ম-নিয়ন্ত্রণের কাজ করা কল্পনা চ্যাটার্জিও তার সঙ্গে আসত, বোঝাত। লুপ না নেওয়া যে কত বোকামী তা হাসিকান্নার নাটক করে বুঝিয়ে কল্পনা মন্দিরাকে শিকার করে ফেললে।

কিন্তু মন্দিরার আর শান্তি ছিল না। না কোনো কাজে, না দেহে না মনে। অনেকবার দেহ দেখিয়ে এল। কেবলই বলত, 'ঘেন্না! ঘেন্না! লজ্জায় মরে যাই। ছি!...আমি খুলে ফেলব—আমার যন্ত্রণা হয়—রক্তপাত হয়—মাথা ঘোরে—ভ্রম হয়ে সেদিন খাটে পড়ে গেলাম—জ্ঞান ছিল না। ছেলেমেয়েরা কেঁদে-কেটে পাগল! আমাদের মা মারা গেছে।"

'খুলেই এস তাহলে! কারো কারো আবার ওসব সহ্য হয় না।'

'কিন্তু সোনালীর মা নিয়েছে, ব্রাধার মা নিয়েছে—ওদের তো কিছু হয় না! মেদায় মোটা হচ্ছে। তবে একটা মজার কথা, হাস্নুর মায়ের নাকি লুপের ওপরেই বাচ্চা হয়েছে। সেও মাথা ঘুরে পড়ে যায়। অজ্ঞান হয় মাঝে মাঝে।'

'তোমারও তাই নয় তো?'

'কে জানে!' হাসলেও মহা চিন্তিত দেখা যেত মন্দিরাকে। অত সুন্দরী মেয়ের মুখেও মেছেতা দাগ পড়তে লাগল।

তারপর মন্দিরা একদিন ভোর থেকে অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগল। মন্মথ ডাক্তার এলেন। বললেন, 'ইঞ্জেকশন দিয়ে গেলাম। সেরে যাবে।'

ঘণ্টা দুই পরে আবার যন্ত্রণা।

নির্মলের এখন মনে হয়, ইউটেরাসের লেকটা বোধহয় মন্দিরার পচে গিয়েছিল।

মন্দিরা কাটা মুরগীর মতন আছাড়-কাছাড় করতে লাগল। ছেলেদের বুকে টেনে নিয়ে কাঁদতে লাগল: 'ওরে তোদের ভাল করে মানুষ করবার জন্য আমি মরে গেলাম! আমার 'যৌবন' চলে যাবে।...আমি আত্মহত্যা করেছি!' কর্কশ দাঁতে চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বলতে লাগল সে।

'মন্দিরা!'

ছেলেমেয়ের দিকে বড় বড় চোখ মেলে দেখতে দেখতে হঠাৎ ঘাড় কাত্ হয়ে গেল মন্দিরার।

কণা জেগে ওঠে: 'মা কই? আমার মা কোথা? আমি তোমার কাছে শোব না। মা'র কাছে শোব। মায়ের বুকে মাথা রেখে শোব! মা কেন আসে না? মা—মাগো'—চিৎকার করে কাঁদতে লাগল কণা। সুজন উঠে পড়ে বসল। সেও বললে, 'মা, আমার মা কই?'

'ঘুমোও!' নির্মল তাড়া দিলে।

সুজন চিৎকার করে ওঠে: 'হাঁ খালি তুমি বলো ঘুমোও! কি করে ঘুমোবো—মা নেই।'

'তোমাদের মা আসবে।'

'কবে আসবে? কখন আসবে?'

'আচ্ছা সুজন, সোনালীর মাসীকে মা বলতে পার না? সে যদি তোমার মা হয়?'

"হ্যাঁ! মা'র মতন কেউ হয়? মা মরে গেছে বলে কি আর আসবে না? আমরা তাহলে মরে যাব!'...

কচি বাচ্চাটা উঠে ফাঁকিয়ে ফাঁকিয়ে কাঁদতে লাগল। কিছুতেই থামে না। মন্দিরা কেমন করে থামাত কে জানে! নারীর কাজ পুরুষরা পারে না। নারী হল পুরুষের চারপাশের সোনার প্রাচীর। সে প্রাচীর ভেঙে গেছে নির্মলের।

ক্ষেতে পাকা ধান পড়ে আছে, অফিসের কাজ গেল, সন্তান মানুষ হবে না, অনাহার, রাত্রি জাগরণ, দুঃস্বপ্ন। বাপ মারা গেলে মা তবু সন্তানদের মানুষ করতে পারে, বাপ পারে না। মায়ের কষ্ট বাপ সহ্য করতে পারে না।

কিন্তু সোনালীর মাসী পারুলকে যদি বিয়ে করে তবে সে কি এইসব বাচ্চাদের নিজের পেটের বাচ্চার মতন করে আর দেখবে? তার সুখ-আহলাদ নেই? তার নিজের ছেলে আসবে! আবার ছেলেমেয়ে? যার জন্যে মন্দিরা বিদায় নিলে। তার ভাষায় 'আত্মহত্যা' করলে!

ছেলেরা আবার একটু ঘুমিয়ে পড়লে মন্দিরার সঙ্গে দীর্ঘ এগার বছরের সংসার চিত্রটা কত চেনাজানা হয়ে অথচ ধরা-ছোঁওয়ার বাইরে দিয়ে ধীরে ধীরে সরে যেতে থাকে।

ভাবতে ভাবতে নির্মল হঠাৎ কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছিল একটু।

হঠাৎ মন্দিরা সেই বিয়ের দিনের আগুন রঙের শাড়িটা পরে এসে হাজির। ডেকে বললে, 'এই! ওখানে কেন?' 'মন্দিরা' মরে গেছ? মা হয়ে গেছ? ওঠ ওঠ—দেখ—আমি সেই বিয়ের পোশাক পরে এসেছি গো! শানাই বাজছে কেমন সুরে, শুনতে পাচ্ছ না?'

আশ্চর্য! ঘুম ভেঙে যেতে সত্যিই শানাইয়ের বাজনা শুনতে পেলে নির্মল সরকার।

হাসলে সে। সকাল হয়ে গেছে কখন। পাশের বাড়ি থেকে রেডিও বাজছে। রেডিও মঙ্গলধ্বনিতে শানাই বাজাচ্ছে।

কণা কেঁদে কেঁদে উঠে পড়ে বললে, আমার মা নেই কেন? হাঁ বাপী, মা কই? আমার মাকে কোথা গেলে পাব?'

আবদুল জব্বার

রসুই
গুঁড়া মশলা
ফোন : ৫৫-২৯৯১, ৩৩-১৪৭১
রসুই প্রোডাক্টস্
১৭ আর জি কর রোড, কলিকাতা-৪ ও ২০১ মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা-৭

তুলসীচরিত

ননীমবিব চৌধুরী

(২৯)

পরদিন সকালে তুলসীকে জিজ্ঞেস করলাম কি রকম পরীক্ষা দিলি বললি না তো?

বলল, থিয়োরেটিক্যালে পাশ করব হয়ত, ভাইভা ভোসিতে ফুল মার্কস পাব।

বললাম, কি করে জানলি?

এগজামিনার বার বার তাকাচ্ছিলেন, আমার মুখ দেখে নম্বর দিচ্ছিলেন মনে হল।

হাসতে লাগল।

তুলসী কলেজে গেলে বসে-বসে তার কালকার কথাগুলো ভাবছিলাম। দেবাশিস এল তার দুটি আমেরিকান বন্ধুকে নিয়ে।

জানাল কাল সকালে কারখানায় কাজ আরম্ভ হবে, আমাকে উপস্থিত থাকতে হবে। বলল, সন্ধ্যাবেলায় একটা কালচারাল ফাংশান হবে, তাতেও মিস ভট্টাচার্যকে নিয়ে যেতে হবে।

বলল, রাস্তায় দেখা হয়েছিল, বলেছি। বললেন, আপনি নিয়ে গেলে যেতে পারেন।

তার আমেরিকান বন্ধুরা খাঁচা ঘরে ঢুকলেন, ঘরের আসবাবপত্র ছবিগুলো দেখলেন। দেবাশিসের ছবির দিকে তাকিয়ে দেখলেন কিছুক্ষণ, দেবাশিসকে জিজ্ঞেস করলেন কোন বয়সের ছবি।

দেবাশিস বলল, বছর কুড়ির হবে, তখন প্রোঃ গাঙ্গুলীর ছাত্র ছিলাম।

বুদ্ধদেব ও শ্রমণী, চৈতন্য ও বিষ্ণু-প্রিয়ার ছবির মানে জিজ্ঞেস করলেন। মানে বললাম। বুদ্ধদেবের ছবি দেখিয়ে একজন বললেন, দি গার্ল হ্যাজ দি লুক অব মেরী ম্যাগডালীন।

হেসে বললাম, ইউ আর রাইট।

বার প্রতিশ্রুতি দিতে তাঁরা বিদায় নিলেন। দেবাশিস জানাল গাড়ী আসবে।

অশোকদের বলেছ? প্রশ্ন করলাম।

বলল, কাল তাঁকে বলেছি, ছেলেদের নিয়ে যাবেন বলেছেন।

কারখানা খোলার ফাংশান সকাল সাড়ে আটটায়। আটটায় গাড়ী আসলে তুলসীকে নিয়ে উঠলাম। বলল, সকাল বেলার কথা তো মিঃ ভাদুড়ী কিছু বলেন নি?

আমি বলছি। আমার বডিগার্ড হয়ে চল।

বডিগার্ড? বরং বলো মেডিক্যাল এ্যাটেন্ডেন্ট।।

বেশ, তাই।

দেখলাম বিরাট ব্যাপার। প্রচুর সরকারী, বেসরকারী অতিথি সমাগম হয়েছে, আমেরিকান কন্‌সুলেটের লোক, বিদেশী ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের লোকেরাও এসেছেন। আপত্তি করব বলে দেবাশিস আগে বলে নি, মালা গলায় দিয়ে, ফিতে কেটে, বোতাম টিপে কারখানা উদ্বোধনের কর্তব্য পালনের ভার দিল প্রোঃ পি এন গাঙ্গুলীর ওপরে।

আমেরিকান বন্ধু দুটি তুলসীর গলায় মালা দিয়ে নমস্তে জানালেন। মাইকের কাছে দাঁড়িয়ে পাঁচ মিনিটের বক্তৃতা শেষ করে হাততালি শেষ হবার আগে নিজের জায়গায় ফিরে গেলাম।

দেখলাম ছেলেদের নিয়ে অশোক একটু দূরে বসেছে। তুলসীকে নিয়ে তাদের পাশে গিয়ে বসলাম। কথাবার্তা হচ্ছে দেবাশিস এসে বলল, আপনারা কারখানা দেখবেন আসুন।

আধ ঘন্টা ঘুরে দেখবার পরে যে আমেরিকান বন্ধুটিকে দেখাবার ভার দিয়েছিল দেবাশিস তার কাছে ছুটি চাইলাম, বুড়ো মানুষ আর পারব না আজ।

অশোকদের দাঁড় করিয়ে রেখে বললেন, এখানে অপেক্ষা করুন, প্রোফেসরকে বসিয়ে দিয়ে ফিরে আসছি।

অতিথিরা দলে-দলে বিভক্ত হয়ে গাইড সঙ্গে নিয়ে কারখানা দেখে বেড়াতে লাগল। সবটা এখনও তৈরী হয় নি, কাজ চলছে। যা হয়েছে তাই প্রকাণ্ড ব্যাপার।

আধ ঘন্টা পরে তুলসী ফিরে এল দেবাশিসের সঙ্গে। বলল, মিস ভট্টাচার্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন আপনার জন্য, তাই নিয়ে এলাম।

চলে গেল ছুটতে-ছুটতে। অশোকরা ফিরে এল আরও আধ ঘন্টা পরে ক্লান্ত হয়ে। একটু পরে প্লেটে করে আইসক্রীম নিয়ে এল উর্দি-পরা বয়। তুলসী ও অশোকের ছেলেরা একটা করে তুলে নিল।

দেবাশিসকে আর দেখতে পেলাম না, খুব ব্যস্ত রয়েছে নিশ্চয়। বেরোবার সময় কারখানার ফটকের কাছে দেখা হল, বলল, চলুন গাড়ী পৌঁছে দিচ্ছি।

বললাম, অশোকের গাড়ীতে যাচ্ছি, ব্যস্ত হয়ো না তুমি।

করজোড়ে বলল, ওবেলা আসবেন আপনারা, সাড়ে ছটায়।

ছটায় অশোক ছেলেদের নিয়ে এল আমাদের তুলে নেবার জন্য। শরীরটা একটু খারাপ লাগছিল যেতে পারলাম না। তুলসী ধোঁকে বসল, বলল, বড়বাবু, আপনারা যান। বকে-ঝকে তাকে পাঠালাম অশোকদের সঙ্গে, অশোকের বড় ছেলেকে বললাম, চলে আসবার বায়না করলে পৌঁছে দিয়ে যেয়ো।

বলল, নিশ্চিন্ত থাকুন আপনি।

ছটায় বেরিয়েছে নটা বাজে, এখনও ফিরল না তুলসী। বেশ ভাল লাগছে বোধ-হয়, বিশেষ দেখে নি তো এসব জিনিস। ঘড়িটার দিকে চোখ যাচ্ছে থেকে-থেকে, আশ্বাস দিচ্ছি নিজেকে তুলসীর খুব ভাল লাগছে নাচ, গান, সিনেমা। গাড়ীর শব্দ পেলাম।

একটু পরে একটা কাগজের বাকস হাতে নিয়ে বারান্দায় উঠে এল তুলসী।

বললাম, কার সঙ্গে এলি?

কাগজের বাকস খুলে একটা কেক নিয়ে মুখের কাছে ধরল, খাও, তোমার ছাত্র দিয়েছেন।

দেবাশিস এল হাতে দুটো বড় কাগজের বাকস নিয়ে।

বললাম, তোমাকে আসতে হল দেবাশিস, অশোকরা এল না?

বলল, অশোকবাবু এসেছিলেন, বাড়ীর কাছে নেমে গেছেন। ছেলেরা শেষ পর্যন্ত থাকবেন।

তুলসী থাকল না?

একটু হেসে কমলের বাক্স দুটো নামিয়ে রেখে বলল, আমাকে দিয়ে যেতে হবে।

বাক্সে কি আছে?

ওঁকে দেখিয়েছি, দেখে একটু চটে গিয়েছেন আমার ওপরে।

প্লীজ ডি হোল্ড ইট মিঃ ভাদুড়ী। জেঠামণিকে প্রণামী দিচ্ছেন তাঁর হাত আপনি, তাই দেখে চটলাম, এ কথার কোন মানে হয়?

দেবাশিস নীচুবে বাক্সটা খুলে ধুতির জোড়, পাঞ্জাবি, দুটো বের করে আমার সামনে রেখে প্রণাম করল।

আচ্ছা, আমি এখন।

ও বাক্সটায় কি আছে?

বাক্স খুলে দামী সিল্কের শাড়ি, ব্লাউজ পিস দেখাল, বাক্সটা নামিয়ে রাখল। বুঝলাম তুলসী চটেছে শাড়ি দেখে।

তুলসী বলল, আমাকে কেন শাড়ি দেবেন আপনি?

বললাম, ওকে কেন দিতে গেলে এসব? ভারী রগচটা মেয়ে।

তুলসীর দিকে চাইল দেবাশিস, বলল, আপনাকে আলাদা করে দেখতে পারছি না আপনার জেঠামণি থেকে. তাই দিয়েছি। যদি পরতে আটকায় কাউকে দিয়ে দেবেন।

আচ্ছা চললাম, দিন দুই পরে আসব।

একখানা কেক আমার হাতে গুঁজে দিয়ে আরেকখানা ভেঙে মুখে পুরে তুলসী বাক্স দুটো রেখে ভেতরে গেল, বলল, পিসীমাকে ডেকে আনছি।

খাবার পরে আমার ঘরে বসে তুলসী অনেক গল্প করল; কি কি দেখল, কেমন লাগল নাচ, গান, ছবি ইত্যাদি। বলল, সাহেব-মেম এসেছে বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে, পাঞ্জাবী, মাড়োয়ারী, পার্শী, ভাটিয়া, গুজরাটি, সিন্ধী স্ত্রী-পুরুষ সেজে-গুজে এসেছে। অনেক টাকা খরচ হচ্ছে।

বললাম, হ্যাঁ, পাবলিসিটির জন্য আজকাল অনেক খরচ করতে হয়।

পাবলিসিটি মানে কি?

মানে লোককে জানিয়ে দেয়া আমরা এই জিনিস করছি, দেখে রাখো, শুনে রাখো, জেনে রাখো, তোমাদের দরকার হলে আমাদের কাছে এসো।

হাসতে লাগল তুলসী, বলল, পিসীমা যে পুজো করেন সেটাও এক রকমের পাবলিসিটি? ভগবানকে জানিয়ে দেয়া হচ্ছে, হে ভগবান, আমি মহামায়া দেবী, ভক্তিভরে তোমাকে ফুল, চন্দন, বাতাসা দিয়ে পুজো করছি, মুঠো খুলে যখন কৃপা বর্ষণ করবে আমার কথা ভুলো না বাবা।

মহামায়ার সেন্স অব হিউমার আছে, হাসতে লাগল তুলসীর কথা শুনে।

তুলসী গল্প করছে, শুনছি সব, ভাবছি অন্য কথা। দেবাশিস একটা চলনসই ব্যাখ্যা দিল তুলসীকে শাড়ি দেবার। ব্যাখ্যাটা এত ভাল যে তুলসীর মনে লেগেছে, বুঝতে পারলাম। কিন্তু দেয়াটা এক জিনিস, দেবার ব্যাখ্যাটা অন্য জিনিস। ব্যাখ্যা শুনে দাতার সম্বন্ধে মন নরম হলে সেই নরম মাটিতে অনেক আগাছা জন্মাতে পারে। তুলসী সতর্ক মেয়ে কিন্তু আবেগপ্রবণ স্বভাবের মেয়ে। ভাবলাম দু-একটা কথা বলে রাখব তাকে সময় মত।

পরদিন সকালে অফিসের সাইকেল পিয়ন এক গাদা বাংলা, ইংরেজি, হিন্দী খবরের কাগজ দিয়ে গেল; সঙ্গে দেবাশিসের স্লিপ, কাগজগুলো একবার চোখ বুলিয়ে দেখে রেখে দেবেন, লোক গিয়ে ওবেলা ফেরৎ আনবে। কালকার ফাংশানের বিস্তারিত বিবরণ, কারখানার বিভিন্ন অংশের ছবি, অধ্যাপক পি এন গাঙ্গুলীর ছবি দেখা গেল কাগজগুলোয়।

তুলসীকে ডাকলাম দেখবার জন্য। মেগুলো নিয়ে খাঁচা ঘরে ঢুকল। ঐ ঘরে বসে পড়াশোনা করে সে।

কিছুক্ষণ পরে অশোক এল। আধ ঘণ্টা বসে গল্প করল কালকার দু বেলার ফাংশান সম্বন্ধে। বলল, কারখানার ইস্টার্ণ ইণ্ডিয়া করপোরেশন নামটা লক্ষ্য করেছেন মাস্টারমশাই?

ফরহান্স টুথপেস্ট দিয়ে নিয়মিত ব্রাশ করলে মাড়ির গোলযোগ ও দাঁতের ক্ষয় বন্ধ হয়

ছোট বড় সকলেই ফরহান্স টুথপেস্টের অযাচিত প্রশংসায় পঞ্চমুখ কারণ মাড়ির গোলযোগ আর দাঁতের ক্ষয় রোধ করতে ফরহান্স টুথপেস্ট আশ্চর্য কাজ করেছে। এই প্রশংসাপত্রগুলি জেফ্রি ম্যানার্স এণ্ড কোং লিঃ-এর যে কোনো অফিসে দেখতে পাবেন।

"ফরহান্স টুথপেস্টের কথা এক যে ডাক্তার রোজ এই টুথপেস্ট ব্যবহার করতে বলেছিলেন তাঁর কাছে আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞ ...কারণ এখন বয়সেও এমন কি এই ৭০ বছর বয়সেও আমার সমস্ত মাড়ির সঙ্গে দাঁত খুব শক্তভাবে লেগে আছে..."
—বিভূতিভূষণ বোস, কলকাতা

"একেবারে ছেলেবেলা থেকেই আপনাদের বিশ্ববিখ্যাত টুথপেস্ট আমি নিয়মিত ব্যবহার করে আসছি। আজ আমার প্রত্যেকটি দাঁত অটুট, মজবুত! ফরহান্সকে আমি সবকিছু থেকে উপরে ঠাঁই দিই, কারণ এই টুথপেস্ট একজন দাঁতের ডাক্তারের সৃষ্টি—এই তো বড় কথা!"
—এস্ এন্ চ্যাটার্জি, কোয়েম্বাটুর

ভালোভাবে দাঁতের যত্ন নিতে হলে রোজ রাত্তিরে আর সকালে ফরহান্স টুথপেস্ট ও ফরহান্স ডবল্ অ্যাকশন টুথব্রাশ ব্যবহার করুন আর নিয়মিত আপনার দাঁতের ডাক্তারের পরামর্শ নিন।

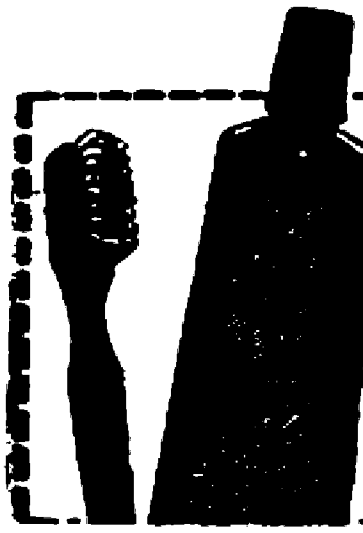

বিনামূল্যে! তথ্যপূর্ণ রঙীন পুস্তিকা,
"দাঁত ও মাড়ির যত্ন"
এই পুস্তিকা ১০টি ভাষায় পাওয়া যায়। এর জন্যে, এই কুপনের সঙ্গে ২০ পয়সার ডাকটিকিট পাঠান, এই ঠিকানায়—ম্যানার্স ডেন্টাল অ্যাডভাইসরী ব্যুরো, পোস্ট ব্যাগ নং ১০০৩১, বোম্বাই ১
নাম ______ বয়স ______
ঠিকানা ______
● অনুগ্রহ করে যে ভাষা চান তার নিচে দাগ দিন: ইংরিজি, হিন্দী, মরাঠী, গুজরাটী, উর্দু, বাংলা, তামিল, তেলুগু, মালয়ালম, কন্নড়ী।
A-7

ফরহান্স টুথপেস্ট—এক দন্তচিকিৎসকের সৃষ্টি

কাগজে দেখলাম, কাল মুখে শুনেছি, বিশেষ লক্ষ্য করবার কি আছে?

বলল, বাবার বিজনেসের নামটা একটু বদলে নিয়েছেন মিঃ ভাদুড়ী। পৈতৃক বাড়ীটাও উম্ধার করবেন মনে হয়।

এ খবর তো জানি না অশোক। কি করে বাড়ী উম্ধার করবে দেবাশিস?

হেসে বলল, টাকা ও কৌশলের জোরে। বাড়ীর ব্যাপার সম্বন্ধে আমি যতটা জানতাম শুনে নিয়েছেন আমার কাছে। তাঁর দুই দাদার সঙ্গে দেখা করেছেন, তাঁর বাবার এটর্ণির সঙ্গে দেখা করে নতুন কিছু খবর বের করেছেন মনে হয়। আদালতে জাল দলিল দেখিয়ে বাড়ী বেদখল করেছে অভিযোগে, আসবাবপত্র চুরি করবার অভিযোগে গুরুদেবের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়েছে, তাঁর নামে সমন গিয়েছে উত্তর কাশীর আশ্রমে। শুনছি শিষ্যরা ভড়কে গিয়েছে, তাদের লোক আনাগোনা করছে মিঃ ভাদুড়ীর কাছে গুরুদেবকে বাঁচাবার জন্য।

বললাম, এত কান্ড? দেবাশিস কিছু বলে নি আমাকে।

বলল, আমি মামলার একজন সাক্ষী।

তুমি সাক্ষী? দলিল যে জাল তার কোন প্রমাণ আছে?

বলল, আদালতে কি দাঁড়াবে বলতে পারি না, কিছু কানাঘুষা শুনেছিলাম মিঃ ভাদুড়ী দলিল সই করতে রাজি না হওয়ায় নার্কোটিক খাইয়ে অর্ধচেতন অবস্থায় মিসেস ভাদুড়ী হাত ধরে তাঁকে সই করিয়েছেন দলিলে, সইটা ঠিক না হওয়ায় নিজের নাম সই করেছেন স্বামীর নামের নীচে।

কার কাছে এ খবর পেলে?

মিঃ ভাদুড়ীর বাড়ীর দু-একজন পুরানো ভৃত্যের মুখে।

কি সাংঘাতিক ব্যাপার? মিঃ ভাদুড়ীর বড় দু ছেলে কিছু সন্দেহ করে নি?

বলল, তাঁরা অনেক আগে বাড়ী ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন গুরুভাইদের উপদ্রবে।

বললাম, পৈতৃক বাড়ী, দেবাশিস চেষ্টা করে উম্ধার করতে পারলে ভাল হয়।

আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে অশোক চলে গেল।

বসে-বসে ভাবছিলাম নানা কথা। আমার সামনে দিয়ে কলেজে যাবার সময় তুলসী কাছে দাঁড়াল, বলল, তোমার কিছু হয়েছে জেঠামণি? কি ভাবছ অমন করে?

বললাম, বুড়ো মানুষের মাথায় নানা রকমের কথা বাসা করে, কিছু হয় নি আমার। তোর রিক্সা এসেছে?

হ্যাঁ, ঘন্টি বাজাল, শুনতে পাও নি তুমি?

শুনতে পাই নি। আচ্ছা, তুই যা।

তুলসী চলে গেলে আমার অন্তরে লাগলাম। একটা গোলমেলে কথা মাথার মধ্যে নীচে থেকে ঠেলে উঠছিল ওপরে, মিসেস ভাদুড়ী, দেবাশিসের মা, স্বামীর সর্বনাশের জন্য দায়ী কি? স্বামীকে নার্কোটিক খাওয়ানো অভ্যাস করিয়ে হাতের মুঠোয় এনেছিলেন কি? কেন? কি মোটিভ ছিল তাঁর? দেবাশিসের মত ভদ্র, মার্জিতরুচি প্রথম শ্রেণীর মেধাবী ছেলের মধ্যে বন্য জন্তুর প্রবৃত্তি দেখা দিয়েছিল কোন সূত্রে?

নানা রকম অস্বস্তিকর চিন্তা আসছিল মাথার মধ্যে।

মহামায়া খবর পাঠাল স্নান করবার বেলা হয়েছে। উঠতে হল। উঠে স্নান করলাম, খেলাম, কিছুক্ষণ গড়িয়ে নিলাম, মনের মেঘ একেবারে কাটল না। একবার মনে হল অশোক আমাকে এত খবর না দিলেও পারত।

(৩০)

মাস খানেক কেটে গেল।

দেবাশিস মাঝে-মাঝে আসত, পাঁচ-দশ মিনিট বসে কথাবার্তা বলে চলে যেত। একদিন জানাল রিসার্চ লেবরেটরী তৈরী হয়েছে, কাল আমাকে নিয়ে যাবে।

দামী, নতুন যন্ত্রপাতি আনিয়ে রিসার্চ লেবরেটরী গড়ে তুলেছে দেখলাম। একটা ছোট কামরা দেখিয়ে বলল, এটা আপনার ঘর।

বললাম, আমার ঘর? আমাকে আসতে হবে এখানে? আমাকে দিয়ে তোমার কি কাজ হবে শুনি?

হেসে বলল, আপনার বাড়ীর লেবরেটরীর জিনিসপত্র নিয়ে আসব এখানে। আপনার পুরনো কাজের জায়গায় যেতে পাবেন না, যা করবার ইচ্ছে এখানে করবেন।

বললাম, আমাকে এত দাম দিচ্ছ কেন দেবাশিস? আমি বকেয়া হয়ে গিয়েছি।

বলল, আপনার দুটো এন্টি-বায়োটিক বাজারে চলছে। এর পর যা করবেন তা হবে ইষ্টার্ণ ইন্ডিয়ার সম্পত্তি। আপনার পছন্দ-মত সহকারী নিযুক্ত করবেন, আমিও কিছু সময় কাজ করব আপনার সঙ্গে।

রিসার্চ লেবরেটরীর ব্যবস্থা দেখে, যে ঘর আমার জন্য করেছে বলল সে ঘরের বুককেসে নানা দেশের রিসার্চ জার্ণালগুলো দেখে লোভ হল একটু, না বলতে পারলাম না। মনে-মনে বুঝলাম নুলো জগন্নাথ ঠাকুরের মত বেদীতে বসিয়ে রাখতে চায় আমাকে, আধুনিক রিসার্চের অগ্রগতি সম্বন্ধে খবর রাখবার বয়স ও বিদ্যা আমার নাই তা বোঝে না এমন নিরেট নয় দেবাশিসের মাথা।

আমার যাতায়াতের জন্য গাড়ীর ব্যবস্থা হল।

আমাকে কাজে বসিয়ে দিয়ে কলকাতার বাইরে চলে গেল দেবাশিস, বলল, পনের-কুড়ি দিন পরে ফিরবে।

তুলসী পাশ করেছে। তাকে ওয়ার্ড ডিউটি দিতে হয়। মাঝে-মাঝে রাতেও ডিউটি পড়ে। বাধ্য হয়ে কলেজের কাছে একটা মেয়েদের হোস্টেলে তার থাকবার বন্দোবস্ত করতে হল। হোস্টেলে যাবার আগের দিন তাকে বললাম, তোর বেশী কাপড়-জামা লাগবে হোস্টেলে থাকতে হলে, যা-যা দরকার কিনে নে।

বলল, ব্যস্ত হয়ো না। কিছু আছে, যখন দরকার হবে কিনে নেব। এসব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ কেন বলো তো?

বললাম, মাথা ঘামাচ্ছি এই জন্য যে, তুই একা থাকিস নি আগে, কিছু জানিস না—

থাক্ জেঠামণি, আর বকো না।

বললাম, নিজের ব্যবস্থা নিজে করে নিতে পারলে ভাল, আমি আর ক'দিন?

হেসে বলল, অনেক দিন।

অনেক দিন বাঁচবার ইচ্ছে নাই তুলসী, তুই ডাক্তারি পাশ করে বেরিয়ে এলে রোজ

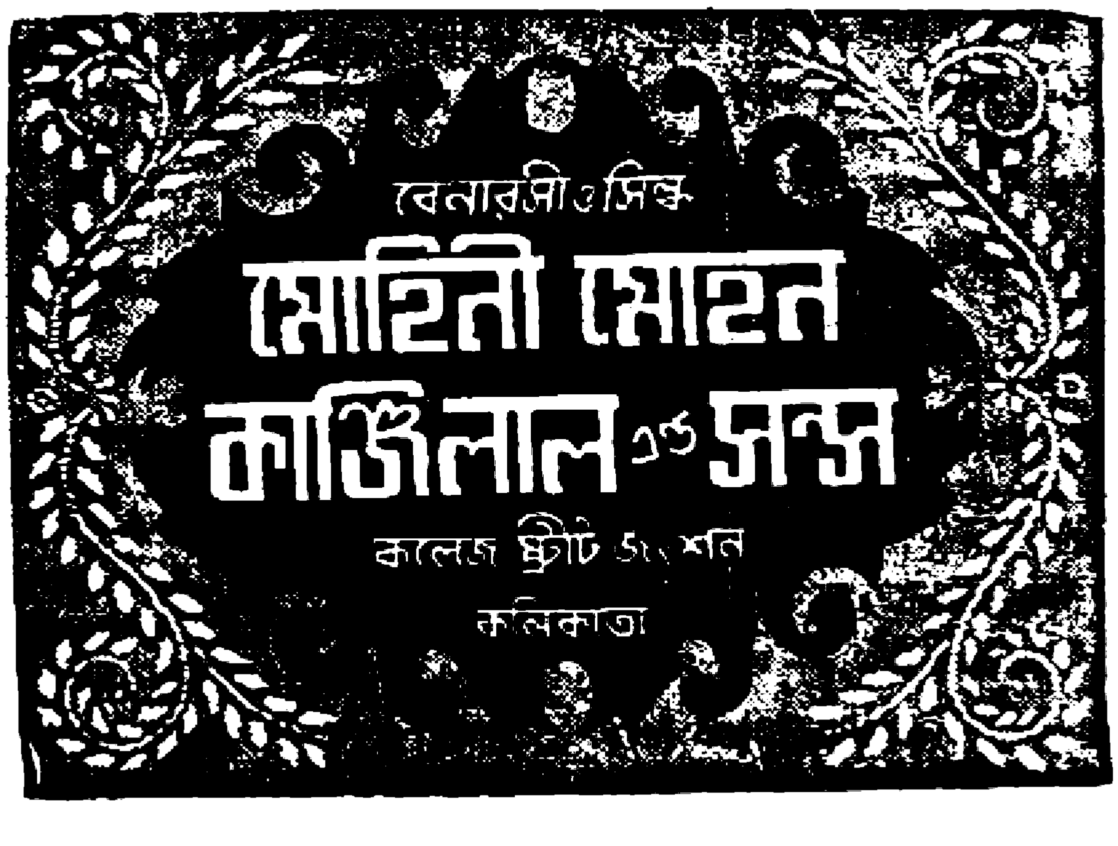

CENTRAL LIBRARY

ভগবানের কাছে প্রার্থনা করব আমাকে নাও।

চুপ করে রইল। তাকিয়ে দেখলাম চোখ ছলছল করছে।

এগিয়ে এসে আমার মাথার ওপরে গাল রেখে বলল আমি হোস্টেলে যাব না কোনোদিন। তোমার কাছে থাকব। সেই ব্যবস্থা করে দাও।

দু হাতে জড়িয়ে ধরল আমাকে, কাঁধে জলের ফোঁটা পড়ল।

বললাম, বোস সামনে, কাঁদছিস কি বলে এত বড় মেয়ে?

বসল সামনে। মুখ নামিয়ে বলল, আমি হোস্টেলে যাব না সাঁতা বলছি।

কোলে মুখ গুঁজে ফোঁপাতে লাগল।

পায়ের শব্দ পেয়ে তাকালাম। এটাচি কেস হাতে দেবাশিস ঘরে ঢুকে বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে।

বললাম, কবে ফিরলে?

কাল রাতে ফিরেছি।

বসো। পাগল মেয়ের কাণ্ড দেখ। এই তুলসী, মুখ তোল্।

মুখ তুলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল তুলসী।

খুলে বলতে হল সব। বললাম, সব ঠিক, কাল হোস্টেলে যাবে, টাকা দেয়া হয়েছে, এখন বলছে অন্য ব্যবস্থা করো, হোস্টেলে যাবে না। তাই নিয়ে কান্না। নিজের চোখে দেখলে মেয়ের কাণ্ড, লোকে শুনলে বিশ্বাস করতে চাইবে না।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে দেবাশিস বলল, আমি পরশু আমেরিকা যাচ্ছি, মিসেস কে-র খুব অসুখ, আমাকে ট্রাঙ্ক-কল করে যাবার অনুরোধ করেছেন। আমার গাড়ীটা আপনার কাছে থাকবে, উনি যাতায়াত করবেন। রাতে যেতে হলে আপনার বাড়ীর মহরকে সঙ্গে পাঠাবেন।

বললাম, তুলসী যদি রাজি হয় এ ব্যবস্থায় আমার আপত্তি নাই। তোমার ফিরতে কত দেরী হতে পারে?

বলতে পারছি না, কিছু দেরী হবে ধরে নিচ্ছি।

এখানকার সব ব্যবস্থা করেছ?

বলল, আমার আমেরিকান বন্ধুরা থাকছেন, সব ভার তাঁদের হাতে থাকবে, একটু হেসে বলল, আপনার ভার ছাড়া। আপনার ভার আপনার হাতে।

তুলসীকে ডাকি, সে কি বলে শুনি।

বলল, দরকার নাই। আপনাকে ছেড়ে হোস্টেলে না যাবার যে কোন অল্টারনেটিভ ব্যবস্থায় উনি রাজি হবেন। আপনি জানিয়ে দেবেন এই ব্যবস্থা আপনি করেছেন।

তারপর বলল, আমেরিকা যাচ্ছি খবরটা দিতে এসেছিলাম, এখন উঠি। গাড়ীটা কাল থেকে আপনার বাড়ীতে থাকবে, ড্রাইভার খাবে, শোবে আমার বাড়ীতে।

প্রণাম করে চলে গেল।

তুলসীর মতিগতি কোন পথে যাবে জানা নাই, তাকে বলতে হল দেবাশিস গাড়ীটা এখানে রেখে গেল আমার দরকার হতে পারে ভেবে, যতদিন বাইরে থাকবে সে গাড়ীটা এখানে থাকবে। যদি হোস্টেলে মন যাবার গোঁ ছাড়তে না পারিস, এই গাড়ীতে যাতায়াত কর।

তারপর কি করবে?

সে তারপর দেখা যাবে।

দেবাশিসের রিসার্চ ল্যাবরেটরীতে যাই, কাগজপত্রগুলো পড়ি, কিছু কাজ আরম্ভ করেছি। তুলসীর রাতে ডিউটি থাকলে গাড়ীতে যাতায়াত করে, অন্য সময় গাড়ী নেয় না, আগের মত চালায়। এইভাবে দিন কেটে যাচ্ছিল।

এক মাস কেটে গেল। তারপর ওর বন্ধুদের কাছে খবর পেলাম মিসেস কে-র মৃত্যু হয়েছে, ডাক্তারের ফিরতে আরও এক মাস দেরী হতে পারে।

দিন-দশ পরে দেবাশিসের চিঠি পেলাম। লিখেছে, মাস্টার মশাই, বোধহয় খবর পেয়েছেন, মিসেস কে মারা গিয়েছেন। তিনি যে গুরুতর অসুস্থ, মৃত্যু আসন্ন এখানে পৌঁছবার আগে জানতে পারি নি, কারণ আমাদের মধ্যে চিঠিপত্র চলত না। তিনি আগে কোন খবর দেন নি, মৃত্যুর আর বিলম্ব নাই জেনে ডেকে পাঠিয়েছিলেন।

দু-চারটে কাজের ভার আমার ওপরে দেবার জন্য ডেকে পাঠিয়েছেন বললেন। আমার য়ুনিভার্সিটি, আরও দুটি য়ুনি-ভার্সিটিতে টাকা দিয়েছেন টেকনোলজির ভারতীয় ছাত্র-ছাত্রীদের স্কলারশিপ দেবার জন্য। আমাদের জন্য দেশের দুটো য়ুনিভার্সিটি ও অন্য দু-তিনটি প্রতি-ষ্ঠানকে টেকনোলজি শিক্ষার উন্নতির জন্য দেবার উদ্দেশ্যে আমেরিকার ও এদেশের কটি সমাজ-কল্যাণ প্রতি-ষ্ঠানকে দেবার জন্য টাকা দিয়েছেন আমার হাতে।

তাঁর জীবনের শেষ কদিন আমি যেন তাঁর শয্যার পাশে উপস্থিত থাকি অনুরোধ করেছিলেন। খামে বন্ধ-করা অনেকগুলো চিঠি সিল্কের থলিতে ভরে আমার হাতে দিয়ে বলেছিলেন। চিঠিগুলো তোমাকে লেখা, পাঠাই নি। আমার দেহের সঙ্গে ক্রিমেটো-রিয়ামে এ থলিটা দিয়ো। একটা প্লাটি-নামের কাজ-করা রুপোর কৌটো আমার হাতে দিয়ে বলেছিলেন, এক মুঠো ছাই রেখো এটাতে, দেশে ফিরে দিয়ে পবিত্র নদী গঙ্গায় দিয়ো। কিছু টাকা রেখে গেলাম, দেশে ফিরে গরীব-দুঃখীকে একদিন পেট ভরে খাইয়ো।

মৃত্যুর দুদিন আগে আমাকে বলে-ছিলেন, দেব, তুমি আমার কাছে এসেছিলে, কিছুকাল আমার কাছে ছিলে এজন্য আমি কৃতজ্ঞ। কি সম্পর্ক ছিল এক সময়ে আমাদের মধ্যে সেটা তুচ্ছ ব্যাপার, কি স্থায়ী বস্তু তোমার কাছে পেয়েছি সেইটে বড় কথা। তোমার কাছে পেয়েছি মনের সম্বল, যাকে বলা যায় বিশ্বাস।— জীবনযাত্রার বাইরের দিকটাতে বেশী মন দিতে গিয়ে মন খালি হয়ে গিয়েছে আমাদের, মন ভরবার সব কিছুতে বিশ্বাস নষ্ট হয়েছে।

ভগবানে বিশ্বাস করি না আমরা, মানুষের সঙ্গে মানুষের স্বাভাবিক আত্মীয়তায় বিশ্বাস করি না, জীবনের সহায় অবলম্বন যে ভালবাসা তাতে বিশ্বাস করি না, সব মানুষ যে অন্তরে বাইরে এক, তাদের প্রয়োজন, তৃপ্তি যে এক জায়গায় মানি না। স্পেস ক্রাফটে চড়ে পৃথিবীর বাইরে যাচ্ছে মানুষ, কিন্তু তার মন পৃথিবীর পাঁকের মধ্যে লুটোপুটি খাচ্ছে।

দেব, মানুষের সনাতন সত্যবস্তুর সঙ্গে যদি সায়েন্স ও টেকনোলজির মিলন ঘটে কোন দিন—

কথা শেষ না করে দুর্বল হাতখানা বাড়িয়ে দিলেন, আমার হাতের মুঠো হাত-খানা নিলাম।

বললেন, দেব, তোমার স্পর্শ পাবার জন্য আমার এই যে দুর্বল হাত বাড়িয়ে দিলাম, এ হাত আর কদিন পরে থাকবে না, তোমার এই স্বাস্থ্য সবল, সুন্দর হাত-খানাও থাকবে না একদিন, কিন্তু তোমাকে স্পর্শ করবার জন্য আমার যে আকাঙ্ক্ষা সেটা মানুষের বুকে থেকে যাবে, তাই না?

তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলাম, মনে হল একটি সুন্দর, স্বাস্থ্য-সম্পন্না অল্প বয়সের মেয়ে পরম নিশ্চিন্ত, গভীর দৃষ্টি দিয়ে চেয়ে রয়েছে।

একি আমার চোখের ভুল না মনের ভুল বুঝতে পারলাম না, কারণ দৃষ্টিবিভ্রম কয়েক সেকেণ্ডের বেশী স্থায়ী হয়নি।

মাস্টারমশাই, মিসেস কে-র মৃত্যুর পরে নিজের মনের দিকে তাকিয়ে সন্দেহ হল একটা গোলমালের মত কিছু ঘটেছে সেখানে। ক্রিমেটোরিয়ামে তাঁর মৃতদেহ দাহ শেষ হলে ভস্ম নেবার সময় নিজের মনের ভাব নিজে বুঝতে পারলাম না।

মিসেস কে-র ইচ্ছানুযায়ী ব্যবস্থাগুলো শেষ করতে কিছু সময় লাগবে; তারপর দেশে ফিরব।

আমার প্রণাম নেবেন।

(ক্রমশঃ)

ইনি সুচিত্রা দেবী

পাকা গিন্নী—দুই ছেলের মা
ঘুমপাড়ানী গল্পের ঝুড়ি

"আসল জিনিষটি আমার চাই!"

বারো মাস তিরিশ দিনই সুচিত্রা ব্যস্ত—সারাদিন তার কাজ লেগেই আছে। সে বলে, শরীর-স্বাস্থ্য ভাল থাকলে সব কাজই সামলানো যায়।

তাইতো সুচিত্রা হরলিক্সের ওপর অতটা নির্ভর করে। হরলিক্সই হ'লো আসল জিনিষ। হরলিক্সের পুষ্টিকর উপাদান আর শক্তিদায়ক প্রোটিন সুচিত্রাকে সারাদিন উদ্যম আর উৎসাহ যোগায়।

হরলিক্স খাঁটি গরুর দুধ, উৎকৃষ্ট গম এবং অন্যান্য পুষ্টিকর খাদ্য দিয়ে তৈরী বলেই এর এত গুণ। আজ ৮০ বছরের ওপর ডাক্তাররা হরলিক্স খেতে নির্দেশ দিয়ে আসছেন।

রোজ হরলিক্স খেয়ে আপনার ও পরিবারের সকলের স্বাস্থ্য ও শক্তি বজায় রাখুন।

হরলিক্স মস্তিষ্কাদের পুষ্টি এবং বাড়তি শক্তি দেয়।

'হরলিক্স' হ'লো আসল জিনিষ

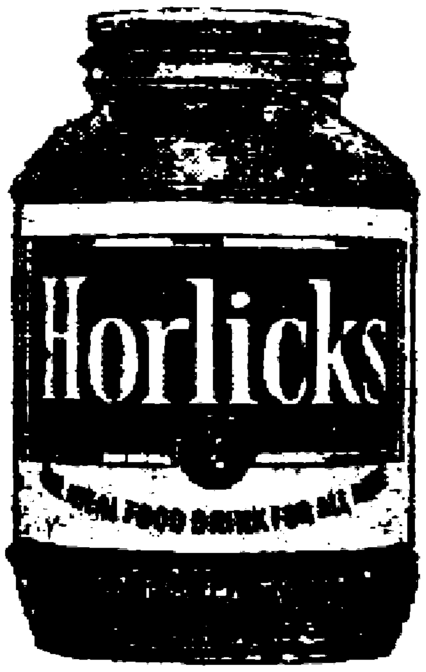

'হরলিক্স' একটি রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

বঙ্কিমচন্দ্র

বাঙ্গালীর নবজাগরণে রাজা রামমোহনের দান যেমন চিরস্মরণীয়, তেমনই বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের অবদান সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণীয়। বঙ্কিমচন্দ্র এক হিসাবে স্বচ্ছন্দে পথ নির্মাণ করেছেন। তাঁর কালে বাংলা ভাষার বাঁধা সড়ক ছিল না। আজ বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালী সাহিত্যিকের পরম শ্রদ্ধার পাত্র, বঙ্কিম সাহিত্য বাঙ্গালীর কাছে অবশ্য পাঠ্য। বঙ্কিমের সাহিত্য-কর্ম সম্পর্কে এতাবৎ অনেক আলোচনা হয়েছে। ১৮৫৬ খৃঃ থেকে ১৮৭৯ খৃঃ পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্র নানাবিধ রচনায় বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁর মোট প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর সংখ্যা চৌত্রিশ (এর মধ্যে ইংরাজীতে রচিত রাজমোহনের স্ত্রী-ও আছে)—এ ছাড়া তিনি স্বনামে ও বেনামে যে সব প্রবন্ধ ও আলোচনা লিখেছেন তার সবগুলি হয়ত সংকলিত হয়নি। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলীর মধ্যে প্রায় পনেরখানি উপন্যাস ইংরাজীতে অনূদিত হয়েছে এবং ভারতের সমস্ত ভাষায় তাঁর জনপ্রিয় উপন্যাসগুলি অনূদিত হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্র ঊনিশ শতকের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃজনশীল সাহিত্যিক। এই সাহিত্যস্রষ্টার উপন্যাসের গঠনশৈলী বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ আলোচনা গ্রন্থ সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থটির নাম "Bankim Chandra: A study of his craft". —এবং গ্রন্থটির লেখকের নাম ডঃ সুনীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় ইংরাজী সাহিত্যের একজন খ্যাতনামা অধ্যাপক। তিনি এই গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির গঠনশৈলী বিষয়ে বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা করেছেন। ইংরাজী ভাষাতেও, বিশেষ কোনো উপন্যাসিকের গঠন শৈলী নিয়ে তেমন আলোচনা হয়নি, ভারতীয় লেখকদের কথা ত' না বলাই ভালো। লেখক ভূমিকায় বলেছেন যেহেতু বঙ্কিমের উপন্যাসের গঠন শৈলী বিষয়ে তেমন আলোচনা হয়নি সেই কারণে তাঁর এই প্রয়াস একান্তভাবে নিজস্ব এবং সেই বিশেষ কারণটি পূর্ণ করার মানসে তাঁকে সমালোচনার একটি নিজস্ব ধারা সৃষ্টি করতে হয়েছে।

লেখকের এই উক্তি গ্রহণযোগ্য, কারণ তিনি এই দায়িত্ব পালনে বঙ্কিমচন্দ্রের কাল এবং সমসাময়িক পরিবেশ স্মরণে রেখেছেন এবং সেই সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালের পাশ্চাত্য সাহিত্য (বিশেষতঃ ইংরাজী সাহিত্য) কি ধারায় প্রবাহিত হয়েছে তার দিকে লক্ষ্য রেখেছেন।

লেখক বলেছেন—উপন্যাসের আনুষ্ঠানিক দৃষ্টিকোণ সম্পর্কে ইংরাজী আলোচনাগুলি আমার পথ নির্দেশকের কাজ করেছে। কিন্তু সেই কর্মে তিনি সর্বতোভাবে তাদের ওপর নির্ভর করেন নি, অনেক ক্ষেত্রে তাঁর মতপার্থক্য ঘটেছে।

ডাঃ নীহাররঞ্জন রায় এই গ্রন্থের ভূমিকা অংশে বলেছেন —

> "Dr. Banerjee seems to have a good background knowledge of the ideas, standards, and methods of contemporary criticism in the field of English Literature, which he has turned to profitable account in his work. In fact this study of the craft of fiction of an Indian Author, patterned as it is on the English methodology of recent years, is written in a style that has its 'distinctive English flavour".

ডাঃ নীহাররঞ্জন রায়ের উক্তিটি বিশেষভাবে গ্রহণযোগ্য। এই গ্রন্থের লেখক সম্পূর্ণ ইংরাজী পদ্ধতিতে গ্রন্থটি রচনা করেছেন এবং সেখানেই তাঁর কৃতিত্ব। লেখক সর্বাগ্রে বঙ্কিম আবির্ভাবের পটভূমি আলোচনা করেছেন। রাজা রামমোহন, ডিরোজিও, বিদ্যাসাগর, মাইকেল, দীনবন্ধু প্রভৃতির কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করে বলেছেন—

> "The diapason of the Indian renaissance closed full in Bankim Chandra Chatterji (1838-1894)".

বঙ্কিম বাঙ্গালী সংস্কৃতির নবজন্মের উজ্জ্বলতম পুষ্প এবং বাঙ্গালীর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের জনক। মধুসূদনের কাব্য এবং দীনবন্ধুর নাটকে যে প্যাটার্নের উদ্ভব হয়েছিল তাতে প্রাণ সঞ্চার করলেন বঙ্কিমচন্দ্র; আধুনিক উত্তরাধিকার রচনায় বঙ্কিমের অবদান অনস্বীকার্য। বঙ্কিমের গদ্য সাহিত্যের মধ্যে একটি পূর্ণাঙ্গ আকৃতির উদ্ভব ঘটে।

লেখক তাঁর ভূমিকা অংশে বিস্তারিতভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের অভ্যুদয় এবং তাঁর বৈশিষ্ট্য বিষয়ে আলোচনা করেছেন এবং ফস্টার রচিত "এ্যাসপেক্টস অব দি নভেল" (যা এরিস্টটলের 'পোয়েটিকস'-এরই বিস্তারিত আকার এবং অধিকতর সূচীভিত্তিক) গ্রন্থটির ওপর লেখক বেশী নির্ভর করেছেন।

বঙ্কিম প্রতিভার বিকাশ রোমান্সে। রোমান্টিক ভঙ্গী দীর্ঘস্থায়ী হলেও ধীরে ধীরে তা কম প্রাপ্ত হয়েছে। এই একই সঙ্গে তাঁর অন্যান্য গুণাবলীও বিকশিত হয়ে উঠেছে।

লেখক প্রথমেই 'দুর্গেশনন্দিনী' ও 'মৃণালিনী'র আলোচনা করেছেন। এই দুটি উপন্যাস যথাক্রমে ১৮৬৫ এবং ১৮৬৯-এ প্রকাশিত হয়। 'কপালকুণ্ডলা' (১৮৬৬)—এই দুটি উপন্যাসের মাঝে প্রকাশিত হলেও এই গ্রন্থের লেখক স্বেচ্ছায় সেটিকে একসঙ্গে আলোচনা করেন নি। এর কারণ এই দুটি গ্রন্থ মূলতঃ রোমান্স।

আর প্রায় সেই একই কারণে কপালকুণ্ডলা থেকে বিষবৃক্ষ (১৮৭০) চন্দ্রশেখর (১৮৭৫) এবং কৃষ্ণকান্তের উইল (১৮৭৮)

—এই চারটি গ্রন্থকে তিনি বলেছেন 'প্যাসন অরিয়েন্টেড প্যাটার্ণ'। লেখক বলেছেন যে এই উপন্যাসগুলি রচনা কালে লেখক হয়ত সুগভীর মানবিক অনুভূতিতে আপ্লুত ছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শন ১৮৭২ খৃঃ প্রথম প্রকাশিত হয় এবং এই সাময়িক পত্রের পরিকল্পনা ও প্রকাশ বঙ্গসাহিত্যে আরেকটি সুস্পষ্ট পর্যায়চিহ্ন। বঙ্গমানস এই পত্রিকার মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েছে, নতুন পথের সন্ধান পেয়েছে।

দুর্গেশনন্দিনী থেকে আনন্দ মঠে বঙ্কিমচন্দ্রের ভাবাবেগ একটি নতুন পথে প্রবাহিত। এই আঙ্গিক 'বিষবৃক্ষে'ও অনুসৃত। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার প্রথম সংখ্যা থেকে 'বিষবৃক্ষ' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য সাধনার তৃতীয় স্তরে ইন্দিরা (১৮৭৩) যুগলাঙ্গুরীয় (১৮৭৪) রাধারাণী (১৮৭৫) ও রজনী (১৮৭৭) প্রকাশিত হয়। ঠিক এর মাঝখানেই 'চন্দ্রশেখর' প্রকাশিত। চন্দ্রশেখরের মধ্যে অসাধারণ শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় আছে। পূর্বোল্লিখিত রাজসিংহ বঙ্কিমের শেষতম উপন্যাস।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের গঠনশৈলী সম্পর্কে লেখক বিস্তারিত আলোচনা করেছেন—তৃতীয় এবং চতুর্থ পরিচ্ছেদে এবং সেই কর্ম তিনি অতিশয় দক্ষতার সঙ্গে প্রতিপালন করেছেন। ইংরাজী ভাষায় বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে তেমন আলোচনা পাওয়া যায় না। ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থটি সেই অভাব পূরণে সহায়ক হবে।

—অভয়ংকর

BANKIM CHANDRA: A Study of His Craft.
By Dr. SUNILKUMAR BANERJI
Published by FIRMA. K. L. MUKHOPADAYAY. CALCUTTA.
Price Rupees Fifteen only.

সাহিত্যের খবর

প্যারিসে তামিল ভাষা বিষয়ক সেমিনার।। সম্প্রতি প্যারিসে তৃতীয় আন্তর্জাতিক তামিল ভাষা বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। এই সম্মেলনে আমেরিকা, ফ্রান্স, মস্কো, সিংহল ও ভারত থেকে তামিল ভাষাবিদরা যোগদান করেন। ডঃ আস্কো পারপোলা এক পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনায় বলেন যে, সিন্ধু উপত্যকার লিপিই প্রাচীন দ্রাবিড় লিপির নিদর্শন। তিনি তাঁর এই মন্তব্য প্রমাণের জন্য কম্পিউটারের সাহায্য গ্রহণ করেন। প্রখ্যাত তামিল ভাষাতত্ত্ববিদ ডঃ এ মহাদেবনও অনুরূপ মত প্রকাশ করেন। এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য যে, সিন্ধু উপত্যকার লিপিই প্রাচীন তামিল লিপির নিদর্শন, একথা প্রথম বলেছিলেন ফাদার হেরাস। প্যারিসের এই আলোচনা সভাতেও এই মতবাদটিই অধিকাংশ গবেষক সমর্থন করেন।

বঙ্গভাষা প্রসার সমিতির সমাবর্তন উৎসব।। নিখিল ভারত বঙ্গভাষা প্রসার সমিতি সুদীর্ঘদিন ধরে অবাঙালিদের মধ্যে বাংলা ভাষা প্রশিক্ষণ এবং প্রচলনের চেষ্টা করে আসছেন। এই প্রচেষ্টা যে ফলপ্রসূ হয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। প্রতি বছরই বহু ভারতীয় এবং বিদেশী এই প্রতিষ্ঠানে বাংলা ভাষা শিক্ষার জন্য আসেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য দরদীদের কাছ থেকে এই প্রতিষ্ঠানটি অকুণ্ঠ অভিনন্দন লাভ করবেন, এতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানটির দিকে আমাদের সরকারের দৃষ্টি খুব কম। মাঝে মাঝে মনে হয়, যদি এই প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ হিন্দি শিক্ষার প্রসার সমিতি জাতীয় কিছু একটা করতেন, তাহলে অনেক বড় বড় নিয়োগ পেতেন এতদিন। আর সমিতির কার্য পরিচালনায় বা গৃহ নির্মাণের জন্য যে আর্থিক কষ্ট ভোগ করছেন, তা হয়ত করতে হত না।

গত ৫ ডিসেম্বর কলকাতায় সমিতির ৩৪ ও ৩৫তম সমাবর্তন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। এতে সর্বভারতীয় বাংলা পরীক্ষায় প্রায় ৫০ জন ভারতীয় ও বিদেশীকে উপাধি, ডিপ্লোমা ও পদক প্রদান করা হয়। সমাবর্তনে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন শ্রীপ্রশান্তবিহারী মুখোপাধ্যায়। তিনি সভাপতির ভাষণে বলেন—"বাংলা দেশ অদ্ভুতভাবে গড়ে উঠেছে। বহু ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে। ভৌগোলিক দিক থেকে যদিও বাংলাদেশ হারিয়ে যায়, তবু বাংলা ভাষা কোনদিন বিলুপ্ত হবে না। এই ভাষার শক্তি এতই প্রবল।" অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের কনসাল জেনারেল মিঃ হার্বার্ট গর্ডন। এ বছর পরীক্ষায় সবচেয়ে বেশি কৃতিত্ব দেখান শ্রীমতী নন্দিনী ভাট। তিনি ৬টি পুরস্কার পেয়েছেন।

জাপানের নতুন লেখক সমিতি।। জাপানী লেখকদের মধ্যে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী কাওয়াবাতা এবং য়ুকিও মিশিমার নামের সঙ্গে আমাদের কিছুটা পরিচয় আছে। অনুবাদের মাধ্যমে তাঁদের কিছু কিছু লেখা পড়ার সৌভাগ্যও আমাদের হয়েছে। বস্তুতপক্ষে তাঁদের রচনা পাঠ করেই জাপানী সাহিত্যের ইদানিংকাল সম্বন্ধে আমাদের যা কিছু ধারণা। কিন্তু জাপানী লেখকদের একটা বিরাট অংশের সাহিত্য এবং তাঁদের সৃজনমূলক ক্রিয়াকলাপ এখনো আমাদের তেমন জানা নেই। শিন নিহন বুনগাকু কাই জাপানের নতুন লেখক সমিতির নাম। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জাপানের পরাজয়ের পর যখন একটা প্রচণ্ড হতাশা জাপানীদের মন অধিকার করে বসেছিল, তখন এই লেখক সমিতির সৃষ্টি। উদ্দেশ্য ছিল নতুন আশাবাদের প্রচার। তারপর দীর্ঘদিন অতিবাহিত হয়েছে। এখন এই সংস্থার উদ্দেশ্য হল, অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামী রচনা। বর্তমানে এই সমিতির সভাপতি হলেন জাপানের প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক হিরোসী নোমা। কেন্দ্রীয় কমিটিতে আছেন ১৭জন বিশিষ্ট কবি, লেখক এবং সাংবাদিক। এই সংস্থার একটি মাসিক পত্রিকাও আছে। এতে যেমন নতুন প্রতিভাবান জাপানী লেখকদের রচনা প্রকাশিত, তেমনি অন্য দেশের রচনাও জাপানী অনুবাদে নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে থাকে। বাংলা সাহিত্যেরও কিছু কিছু অনুবাদ সেখানে প্রকাশিত হয়েছে। মাসিক সাহিত্য সভার অনুষ্ঠানও এই সমিতির উল্লেখ্য কার্যক্রম।

কসমো পিটার্স বলেন।। দক্ষিণ আফ্রিকার বিশিষ্ট কবি কসমো পিটার্স। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকায় তিনি বাস করতে পারেন না। বর্ণবৈষম্য এবং রাজনৈতিক কারণে অনেক আফ্রিকান লেখকের মত তিনিও এখন লণ্ডন প্রবাসী। সেখানে একটা কলেজে ইংরেজির অধ্যাপক হিসেবে কাজ করেন। 'আফ্রিকান' পত্রিকাটির সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। তাঁর সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ হলো এবার। এসেছিলেন আফ্রো-এশীয় লেখক সম্মেলনে যোগদানের জন্য। তাঁকে আফ্রিকার বর্তমান সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি একটু ভেবে নিয়ে তারপর বললেন: ইট ইজ ওয়ান অব ডিসইলিউশানমেন্ট এণ্ড দ্যাট আই থিঙ্ক, অব ডিপ এঙ্গার এণ্ড বিটারনেস। সাধারণভাবে সমস্ত আফ্রিকান সাহিত্যিকেরই এরকম মনোভাব।

তিনি একটু জোর দিয়েই নতুন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলির সাহিত্য আন্দোলনের কথা বলছিলেন। তিনি বললেন: বঞ্চনা এবং হতাশা এসব দেশের সাহিত্যিকদের কণ্ঠ ভারাক্রান্ত করে

ফুরিয়েছে। এর কারণ, আমার মনে হয়, সেদাইওর অং দেয়ার হোপ।" যে সোনালী স্বাধীনতার আশায় তাঁরা স্বপ্ন দেখে আসছিলেন, স্বাধীনতা লাভের পর সে স্বপ্নের বাস্তব রূপ অধিকাংশ আফ্রিকার দেশেই তাঁরা দেখতে পেলেন না। স্বাধীনতার পর জনজীবনে একটা পরিবর্তন দেখবেন বলে তাঁরা আশা করেছিলেন। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা ব্যর্থ হয়েছে। এটাই হতাশার অন্যতম কারণ বলে মনে হয়।"

একটু থেমে তিনি নিজেই আবার বলে চললেন : "কিন্তু এর মানে এই নয় যে, তাঁদের লেখার শক্তি কমে গেছে কিংবা বৈচিত্র্যহীন। আসলে পরিবর্তন হয়েছে কনটেন্টের। অবশ্য এ্যাঙ্গোলা বা মোজাম্বিক এদিক দিয়ে স্বতন্ত্র। কারণ, এখনও তাঁরা ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে।"

আফ্রিকার কবিতা সম্বন্ধে জাঁ পল সার্ত বলেছিলেন : আফ্রিকান সাহিত্য আমাদের সময়ের সবচেয়ে বিপ্লবী সাহিত্য।" এই উক্তিটি উদ্ধৃত করে পিটার্সকে জিজ্ঞেস করতেই তিনি যেন কিছুটা সপ্রতিভ হয়ে উঠলেন। বললেন: 'এটা সার্ত লিখেছিলেন সেনেগালের বিখ্যাত কবি এবং বর্তমান রাষ্ট্রপতি লিওপোল্ড সেদার সেনগোরের একটি কাব্যগ্রন্থের আলোচনা করতে গিয়ে ১৯৪৭ সালে। তখনকার সেনগোর আর এখনকার সেনগোরের মধ্যে পার্থক্য অনেক। রাষ্ট্রক্ষমতায় আসার পর তাঁর সংগ্রামী চরিত্র সম্পূর্ণ বদলে গেছে।'

আর কথা না বাড়িয়ে অন্য প্রসঙ্গে গেলাম। চা খেতে খেতে পিটার্স দেখালো তাঁর স্ত্রী ও মেয়ের ছবি। মেয়ের বয়স এখন উনিশ। দেখে মনেই হয়নি পিটার্সের বয়স চল্লিশ পেরিয়ে গেছে। তাজমহলে আবার দেখা হয়েছিল তাঁর সঙ্গে। সেরকম হাসিখুশি ভরা মানুষটি, কিন্তু প্রতিটি বিষয় সম্বন্ধে জানার কি অপরিসীম আগ্রহ। বিদায়ের আগে বললেন : 'আবার ভারতে আসার ইচ্ছে রইল। এখানকার মানুষের ব্যবহার দেখে মনে হচ্ছে, যেন আমার জন্মভূমিতেই আছি।' —চার্বাক

নতুন বই

The Intimate Enemy —Dr. George R Bach and Peter Wyder.—Souvenir Press. London. To be had of Rupa and Co. 15. Bankim Chatterjee St. Cal-12. P 35s net.

"শত্রু অথচ ঘনিষ্ঠ — নামের মধ্যেই আপাতবৈপরীত্য। অথচ বই পড়বার পর উদ্দেশ্য পরিষ্কার হয়ে ওঠে। ডাঃ জর্জ. বাখ ক্যালিফোর্নিয়ার বিভারলি হিলসে ইন্‌স্টিটিউট অব গ্রুপ সাইকোলজির প্রতিষ্ঠাতা এবং পরিচালক হিসাবে একজন মনোবিজ্ঞানীর সহযোগিতায় স্বামী-স্ত্রী এবং প্রেমিক-প্রেমিকদের নানা পারস্পরিক সমস্যা নিয়ে গবেষণা করে এক নতুন তত্ত্বের উদ্ভাবন করেছেন। তত্ত্বটি হল গঠনমূলক আগ্রাসনের তত্ত্ব। বর্তমান গ্রন্থটি সেই ভিত্তিতে লেখা। মূল বক্তব্য হল—আদর্শ দম্পতি পরস্পরের সঙ্গে প্রতিনিয়ত দ্বন্দ্ব করেই বিবাহিত জীবনে স্থায়িত্ব আনতে পারে। আপাতদৃষ্টিতে এই বক্তব্যের মধ্যে একটি প্যারাডক্সের চেহারা ধরা পড়ে। কিন্তু লেখকদ্বয়ের মতে—এটা সত্যিই কোন প্যারাডক্স নয়। যে সব দম্পতি এই দ্বন্দ্বকে এড়িয়ে চলেন—তাঁরা প্রকৃতপক্ষে একটু বিপজ্জনক খেলা করেন এবং এই খেলার ফলস্বরূপ পরস্পরের মধ্যে আবেগসঞ্জাত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের অভাব প্রকট হয়ে ওঠে এবং ক্লান্তি, হতাশা ও বিচ্ছেদের ঝুঁকি বেড়ে যায়।

মুক্তিপাগল যে সব দম্পতি পরস্পরের মধ্যে লড়াই-এর পথ বেছে নেন—তাঁরাও খোলাখুলি দ্বন্দ্বে নেমে পড়েন এবং এই ধরনের দ্বন্দ্বের ফল হয় আরও মারাত্মক। স্বামী-স্ত্রী, প্রেমিক-প্রেমিকা ইত্যাদির মধ্যে উন্নতিসাধনের জন্য এক বাস্তববাদী, গঠনমূলক পরিকল্পনা বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে বইটিতে। ডাঃ বাখের মতে—যে সব অসুখী দম্পতি এবং প্রেমিকার ক্ষেত্রে তার নতুন পদ্ধতির প্রয়োগ করা হয়েছে তাদের শতকরা ৮৫ জনের ক্ষেত্রেই এই পদ্ধতির সাফল্য প্রমাণিত হয়েছে। ডাঃ বাখ দাম্পত্য দ্বন্দ্বের এমন এক নমনীয় নিয়মাবলী প্রণয়ন করেছেন—যে নিয়ম-অনুসারে স্বামী-স্ত্রী, প্রেমিক-প্রেমিকা পরস্পরের সঙ্গে দ্বন্দ্ব করে পারস্পরিক নিন্দাবাদ এবং দৈহিক ও মানসিক আঘাতের প্রবণতা থেকে মুক্ত হয়ে বোঝাপড়ার মধ্যে দিয়ে স্থায়ী ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারেন।

লেখকদ্বয়ের মতে মানুষকে যখন সর্ব-অবস্থায় লড়াই করেই বেঁচে থাকতে হয় তখন লড়াই-এর ব্যাপারটাকে সম্পূর্ণ মানবিক বলেই ধরে নেওয়া যেতে পারে এবং এটা খুবই স্বাভাবিক যে দাম্পত্য জীবনেও লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে পুরুষ এবং নারী পরস্পরের আবেগের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিবাহিত জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু এই লড়াইয়ের উপায় সৎ হওয়া চাই।

এই গ্রন্থে আছে অজস্র কেস হিস্ট্রি। লেখকরা জোরের সঙ্গে বলেছেন, যে সব অসুখী দম্পতিকে তাঁরা সৎ এবং স্বাভাবিক লড়াইয়ের পথ নির্দেশ করেছেন, তাঁরা গঠনমূলক আগ্রাসনের নিয়মানুসারে পরস্পরের সঙ্গে দ্বন্দ্ব করে অনেক বেশী ঘনিষ্ঠতা এবং সন্তোষ লাভ করেছেন।

লেখকদ্বয়ের মতে এই নতুন তত্ত্বের ভিত্তিতে অসুখী এবং কলহরত দম্পতিদের তাদের আক্রমণাত্মক শক্তিকে বিচ্ছেদ এবং অশান্তির পথে না নিয়ে গিয়ে সম্পূর্ণ গঠনমূলক ভূমিকায় রূপান্তরিত করা যেতে পারে। তবে এই গঠনমূলক আক্রমণের শিক্ষণ-পরিকল্পনা খুব সহজ নয় এবং সবার পক্ষে একে সাফল্যের সঙ্গে প্রয়োগ করা সম্ভবও নয়। তার জন্য চাই ধৈর্য, শুভেচ্ছা এবং মানসিক সমস্যাগুলিকে মোকাবিলা করার অভ্যাস পর্যন্ত বাইরে যাওয়ার মানসিক শক্তি এবং নমনীয় দৃষ্টিভঙ্গী। আর এ সবই সম্ভব যদি হৃদয় ও মন সর্বদা পরিবর্তনের জন্য আগ্রহী এবং উন্মুক্ত থাকে। ডাঃ বাখের ইনস্টিটিউটে যে সব দম্পতি শিক্ষার্থী হিসাবে আসেন এবং তার উদ্ভাবিত দ্বন্দ্বের নিয়মাবলী অনুসরণ করে দাম্পত্য জীবনে দ্বন্দ্বের শিক্ষা গ্রহণ করেন—তারা বিবাহিত জীবনের স্বাভাবিক সঙ্কট এবং হতাশা থেকে বহুলাংশে মুক্তি পান। বন্ধু-বান্ধব এবং ছেলে-মেয়েদের সামনেই স্বামী এবং স্ত্রী দ্বন্দ্বে নেমে পড়েন। বিশেষ-বিশেষ ক্ষেত্রে স্বামী এবং স্ত্রীকে যৌন-কর্মের আগে, পরে, এমন কি যৌনকর্মরত অবস্থায় দ্বন্দ্বের পরামর্শ দেওয়া হয়, এর ফলে পারস্পরিক মিথ্যাচার এবং অবদমনের প্রবণতা যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পায়। স্বামী এবং স্ত্রী বিবাহিত জীবনের প্রচলিত আচরণবিধিকে প্রয়োজনানুসারে পরিহার করতে শেখেন—ফলে তাঁদের যৌন-জীবন অনেক বেশী সৃজনশীল এবং উৎপাদনমূলক হয়ে ওঠে, তাঁদের যৌন-সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হয়, সন্তানপালনের দায়িত্বে যোগ্যতা বৃদ্ধি পায়। ফলে তাঁরা খুব সহজে ক্লান্তি, হতাশা এবং বিচ্ছেদের শিকার হন না। দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়েই তাঁরা পারস্পরিক সম্পর্কে বৈধ এবং অবৈধ দিকগুলি সম্পর্কে সচেতন হন এবং এই

সচেতনতা তাদের বিবাহিত জীবনে রক্ষা-কবচের কাজ করে।

সমগ্র গ্রন্থে একশ বারটি কেস হিস্ট্রির উল্লেখ করে ডাঃ বাখ এবং পিটার ওয়াইডেন দেখিয়েছেন — কিভাবে তাঁদের উদ্ভাবিত নিয়মাবলী অনুসরণ করে স্বামী এবং স্ত্রী পরস্পরের সঙ্গে বৈধ উপায়ে দ্বন্দ্বের দ্বারা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারেন।

লেখকদ্বয় তাঁদের এই পদ্ধতিকে যৌথ নৃত্যের সঙ্গে তুলনা করেছেন। যৌথ-নৃত্যের মত এই দ্বন্দ্বেও সহযোগিতামূলক দক্ষতার প্রয়োজন। এটা এমন একটি অস্ত্র কিম্বা জীবন-পদ্ধতি যা ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদের মধ্যে অধিকতর সমন্বয়সাধনের ভূমিকা গ্রহণ করে।

লেখকদ্বয় স্বীকার করেছেন তাঁদের এই নব-উদ্ভাবিত পদ্ধতি এখনও পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্তর ছাড়িয়ে উঠতে পারে নি। বরং এই পদ্ধতি সম্পর্কে এখনও যথেষ্ট ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ রয়েছে। তাঁরা এই বিভ্রান্তি সম্পর্কে সচেতন এবং সেজন্যই তাঁদের পদ্ধতির গুণাগুণ বিচার করতে গিয়ে স্বীকার করেছেন,—মানুষকে কোন অবস্থাতেই কতকগুলো কঠোর এবং অপরিবর্তনীয় নিয়মের শৃঙ্খলে বাঁধা যায় না।

পরিশেষে বলা যায়, লেখকদ্বয়ের পরীক্ষা-নিরীক্ষা মার্কিন সামাজিক জীবনেই সীমাবদ্ধ। আমেরিকার মত উন্নতমানের অর্থনৈতিক জীবনে যেসব জটিল সামাজিক সমস্যার উদ্ভব হয়েছে, পুরুষ এবং নারীর যৌন-জীবনেও তার প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিক ফলে বিবাহিত দম্পতির দৈহিক এবং মানসিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও নানা জটিল সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাস, সন্দেহ এবং বিচ্ছেদের প্রবণতা সমাজ-বিজ্ঞানীদের দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দেখা দিয়েছে। ওদেশের সমাজ-বিজ্ঞানীরা এই সমস্যার সমাধানের নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ব্যস্ত।

ভারতের দরিদ্র জনগণের ক্ষেত্রে এসব পরীক্ষা-নিরীক্ষার সার্থকতা আদৌ আছে কিনা তা সন্দেহের বিষয়।

বঙ্গ সংস্কৃতি কথা—প্রসিতকুমার চৌধুরী। নৈবদ্য পুস্তকালয়। ৮।১বি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা—১২। দাম চার টাকা।

বাঙলার নিজস্ব ইতিহাস, সংস্কৃতি সম্পর্কে বাঙালীদের ধারণাই সম্ভবত সবথেকে বেশী অস্বচ্ছ। বিদ্যালয়-মহাবিদ্যালয়ের গণ্ডী পেরোবার পর অনেকেই তার সংস্কৃতি চর্চায় নিজেদের না জড়িয়ে, দিন অতিবাহিত এবং সুখী ভবিষ্যতের স্বপ্নে ব্যস্ত থাকেন। তাছাড়া সহজ ভাষায় লেখা ছোট আকারের কোন বইও বিশেষ পাওয়া যায় না বাঙলা দেশের সাংস্কৃতিক জীবনের পরিচয়সমৃদ্ধ। সম্প্রতি প্রসিত-কুমার চৌধুরী 'বঙ্গ সংস্কৃতির কথা' লিখেছেন। বইটিতে পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি অঞ্চলের ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক বিবরণ আছে। হুগলী, মেদিনীপুর, বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, পুরুলিয়া, হাওড়া, কলকাতা, চব্বিশ পরগণা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর, কোচবিহার, দার্জিলিং এবং মালদহ জেলার ওপরই কয়েকটি স্বতন্ত্র আলোচনা স্থান পেয়েছে বইটিতে। গ্রন্থকারের সাধু প্রয়াস নিঃসন্দেহে স্বীকৃতি পাবে। শ্রীচৌধুরী বইটির নামকরণ করেছেন 'বঙ্গ সংস্কৃতি কথা'। কিন্তু আলোচনা করেছেন মাত্র পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে—পূর্ববঙ্গের কোন তথ্য পরিবেশন করা হয় নি। মনে রাখতে হবে দুই বঙ্গ একই সংস্কৃতির ধারাবাহী। গ্রন্থকার আশা করি ভবিষ্যৎ সংস্করণে এ বিষয়ে আলোকপাত করবেন।

অন্য স্বাদ অন্য রঙ (কাব্যগ্রন্থ) — সুষমা মৈত্র। প্রভাত কার্যালয়, ২সি নবীন কুণ্ডু লেন, কলকাতা—৯। তিন টাকা।

হৃদয়ের জটিলতায় যখন অনেক আধুনিক কবি নিজের মুখ পর্যন্ত দেখতে পান না, তখন সুষমা মৈত্র একালের যন্ত্রণা ও আবেগকে অনায়াস সারল্যে মুক্তি দেন। হয়তো অন্তঃপ্রবণতায় তিনি রোমান্টিক কবি। ষড়ঋতুর ঐশ্বর্য তাঁকে যতটা সান্ত্বনা দিতে পেরেছে, আধুনিক সভ্যতা ততটা পারে নি। তবু মানুষ সম্পর্কে অবিশ্বাসী নন। প্রথম কবিতাতেই তিনি লিখেছেন :

অন্য স্বাদ অন্য রঙ
জীবনকে স্বতন্ত্ররূপে চাখিয়ে
নেওয়া যায়।

এবং অবশেষে দুঃখ, পীড়নের নানা স্তর অতিক্রম করে উপলব্ধি করেন : 'নিশ্চিত সোচ্চার প্রত্যাশায় আন্দোলিত মন।' জীবনের গোলকধাঁধা থেকে বেরিয়ে আশার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বলেন : 'চলি আমি সোজা পথে/জীবন যেখানে সহজ সরল হবে।'

এই কাব্যগ্রন্থে সংকলিত হয়েছে ৩৮টি কবিতা। মোটামুটি একই ভাবনার বিভিন্ন বিকিরণ। সমকালীন ঘটনা-প্রবাহের ছায়া পড়েছে প্রায় সব কটি কবিতায়। আমরা কবির কাব্যিক সাফল্য কামনা করি।

সংকলন ও পত্র-পত্রিকা

কবিতা পরিচয় (বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭৭)—সম্পাদক : অমরেন্দ্র চক্রবর্তী। ৩০৬ যোধপুর পার্ক। কলকাতা—৩১। দাম দেড় টাকা।

বাঙলা ভাষার প্রতিষ্ঠিত এবং তরুণ কবিদের কাছে সম্পাদক শ্রীঅমরেন্দ্র চক্রবর্তী পৃথক-পৃথকভাবে পাঁচটি করে প্রশ্ন পাঠান। আজকের সমাজজীবন, রাজ-নৈতিক অস্থিরতা, বাঙলা দেশ, এবং আনুষঙ্গিক আরো কয়েকটি প্রসঙ্গে ছিল প্রশ্নগুলো। কয়েকজন পৃথক-পৃথকভাবে, কয়েকজন এক সঙ্গে জড়িয়ে প্রশ্নগুলির উত্তর পাঠিয়েছেন। যাঁরা উত্তর লিখেছেন : অমিয় চক্রবর্তী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, অরুণ মিত্র, মণীন্দ্র রায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, অরুণকুমার সরকার, সিদ্ধেশ্বর সেন, শঙ্খ ঘোষ, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, বিনয় মজুমদার, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, অমিতাভ দাশগুপ্ত, শান্তিকুমার ঘোষ, তরুণ সান্যাল, তুষার রায় এবং আরো কয়েকজন। সাম্প্রতিক কবিতা এবং সমাজচিত্র সম্পর্কে এঁদের বক্তব্য পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। কবিতা পাঠে সম্ভাব্য সহায়তার প্রয়াসে পরিকল্পিত ত্রৈমাসিক কবিতা সমালোচনামূলক এই সংক্ষিপ্ত পত্রিকাটি প্রকাশ করে সম্পাদক একটি দায়িত্বপূর্ণ কর্তব্য পালন করে চলেছেন।

অভিনয় (অকটোবর)—সম্পাদকমণ্ডলী সম্পাদিত। গাঙ্গুলী প্রেস। ১০১ হরিশ মুখার্জি রোড, কলকাতা—২৬। দাম এক টাকা।

বাঙলা দেশে সম্প্রতিকালে নাটক নিয়ে চলেছে পরীক্ষা-নিরীক্ষার চূড়ান্ত পর্যায়। সে সম্পর্কে অভিনয় পত্রিকা একাঙ্ক নাটক, নাটকাভিনয়ের সংবাদ, নাটক বিষয়ে নানান নিবন্ধ প্রকাশ করে একটি গুরুত্বের দায়িত্ব পালন করছেন। বর্তমান সংখ্যায় উৎপল দত্তের 'নাটকে রাজনীতি' আলোচনাটি সব থেকে উল্লেখযোগ্য। আরো কয়েকটি আলোচনা এবং কিছু ছবি আছে।

CENTRAL LIBRARY

বইকুণ্ঠের খাতা

সার্ধ-শতকে বিদ্যাসাগর

বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে কম নয়। ফর্ম, টেকনিকের বিপুল পরিবর্তন হয়েছে। হয়তো পৃথিবীর যে-কোনো সমৃদ্ধ ভাষার সঙ্গে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের তুলনা চলে। কেবল একটা বিষয়ে আমরা এখনো শিশু, আগের মতোই অনড়। জীবনী লেখার পথ এ পর্যন্ত পাল্টায়নি। সেই সাবেকী আমলের ধ্যানধারণা আর মূল্যবোধকে আশ্রয় করেই লেখা হয়ে যাচ্ছে একেকটি জীবনীগ্রন্থ।

তার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে আমি হিমশিম খেয়েছি, নানাজনকে প্রশ্ন করেছি, কিন্তু কোনো সদুত্তর পাইনি কারো কাছ থেকেই। অনেকের ধারণা : অন্যান্য মৌলিক রচনার মতো জীবনীমূলক রচনাকে অন্য সাহিত্যকর্ম বলা যায় না। অতি মাত্রায় তথ্য-সচেতন হতে হয় বলে কোনো সৃজনশীল লেখকই এ-জাতীয় রচনার ব্যাপারে আকর্ষণ বোধ করেন না তেমন। কেউবা আরো স্পষ্ট করে বলেছেন : জীবনী লেখা কোনো সাহিত্যিকের কাজ নয়, ঐতিহাসিকের আলোচ্য বিষয়।

এইসব মন্তব্যের সত্যতাকে আমি অস্বীকার করি না, কিন্তু পুরোপুরি মেনে নিতে কোথায় যেন বাধে। আমি আজ পর্যন্ত খুব কম ঔপন্যাসিককেই বলতে শুনেছি, তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলি অবাস্তব। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তাঁরা সেই বাস্তবতাকেই চ্যালেঞ্জ করে বসেন অসতর্ক মুহূর্তে।

তাই নিয়ে আমার কোনো অভিযোগ নেই।

কেবল বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করেছি, আমাদের দেশে জীবনীকারদের অধিকাংশই না-লেখক, না-ঐতিহাসিক—এমনি এক শ্রেণীর মানুষ। কেউ আলোচ্য ব্যক্তির বন্ধু কিংবা নিকট আত্মীয়, শিক্ষক কিংবা অধ্যাপক। তাঁদের মধ্যে ভাড়াটে লেখকও আছেন দু-চারজন। যে-রকম স্বচ্ছ দৃষ্টি-ভঙ্গি ও ঐতিহাসিক চেতনা থাকলে একেকটি জীবনী-গ্রন্থ প্রামাণ্য ও সজীব হয়ে উঠতে পারে— সে-রকম জীবনবোধ নেই অনেকেরই। নেই শিল্পবুদ্ধি।

একা রবীন্দ্রনাথেরই জীবনী বেরিয়েছে অনেকগুলি। প্রচ্ছদ আলাদা। গ্রন্থসজ্জা ভিন্ন রকম। কিন্তু পড়তে বসে বারবার মনে হয়, পূর্ববর্তী কোনো একটি বই যেন কপিরাইট আইন বাঁচাবার তাগিদে ভাষার সামান্য অদলবদল করে ছাপা হয়েছে অন্য লেখকের নামে, অন্য প্রকাশকের ঠিকানায়।

জানি, জীবনীকারের অসুবিধা অনেক। মূল তথ্যের তিনি পরিবর্তন ঘটাতে পারেন না। ঘটনাকে অবিকৃত রাখার দায়িত্বও তাঁর। তবু একটা কথা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না যে, লেখকের নিজস্ব বক্তব্য বা দৃষ্টিভঙ্গি না থাকলে একাধিক জীবনী-গ্রন্থ লেখার সার্থকতা কোথায়? আলোচ্য মনীষীর পুনর্মূল্যায়ন যদি না হলো, ঘটনার পুনর্বিচার যদি না হলো, তথ্যের বিভ্রান্তি যদি সমানই থেকে গেলো—তাহলে লেখকই বা কেন লিখবেন? আর, পাঠক হিসেবে, আমরাই বা তা কিনবো কেন পয়সা খরচ করে?

এ-প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করা দরকার।

কেননা, অতীতের কাছ থেকে আমরা আলো চাই—আরো আলো—যে-আলো আমাদের পথ চলতে সাহায্য করবে, ভবিষ্যতের নিশানা দেবে। আমরা আরো অভিজ্ঞ হয়ে উঠতে চাই, আরো শিক্ষিত। অন্তঃসত্তার যদি অন্তরালবর্তী সত্তাকে উপলব্ধি করতে না পারি, তাহলে জীবনী লেখা মূল্যহীন।

ঘটনার সঙ্গে তার সূক্ষ্মতম ইঙ্গিতকেও উপলব্ধি করা প্রয়োজন। বাংলা সাহিত্যের ছন্দোময় জীবনী-গ্রন্থ 'চৈতন্য চরিতামৃত' লিখতে বসে কৃষ্ণদাস কবিরাজ হয়তো সেজন্যেই তথ্যের ওপরে বেশী জোর দেননি, তত্ত্বকেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন। ককতোর আত্মজীবনী 'প্রফেসানেল সিক্রেটস'-এর উদাহরণ দেবো না। এ প্রসঙ্গে তা অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু ফ্রান্সিস স্টিগমুলারের লেখা ককতোর জীবনীটি যাঁরা পড়েছেন, তাঁরাই জানেন, বিদেশে জীবনী লেখার আদর্শ কিভাবে উপন্যাসের সম্ভাবনাকে আত্মসাৎ করে চলেছে।

সার্ধ শতকে বিদ্যাসাগর

আমার এই আক্ষেপোক্তির কারণ আর যাই থাক, উপলক্ষ্য সন্তোষকুমার অধিকারীর লেখা 'বিদ্যাসাগর' নামে একটি জীবনী-গ্রন্থ। আমি বইটির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলাম প্রধানত দুটি কারণে : প্রথমত, সন্তোষবাবু কবিমানুষ, দ্বিতীয়ত তাঁর পিতামহী বিনোদিনী দেবী ছিলেন বিদ্যাসাগরের তৃতীয়া কন্যা। স্বভাবতই আশা করেছিলাম, বইটির পাতায় পাতায় বিদ্যাসাগরের সেই নির্জন ব্যক্তিত্বের স্বগতোক্তি শুনতে পাবো। দুঃখের সঙ্গেই স্বীকার করতে হবে, আমি তা শুনতে পাইনি। প্রতি মুহূর্তেই লক্ষ করেছি, একটি বিরাট স্তম্ভের গঠনশৈলী—রবীন্দ্রনাথ যাকে তুলনা করেছিলেন, অজস্র তৃণগুল্মের মধ্যে বনস্পতির সঙ্গে।

তিনি আমাদের দুঃখমোচন করে গেছেন, আমরা তাঁর হাহাকার শুনতে পাইনি। কিংবা শুনতে পেলেও তা মুহূর্তের ঘটনাবলীর কোলাহলে ডুবে গেছে। তাঁর অন্যতম জীবনীকার চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সেদিকে অনেককাল আগেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।

হয়তো বিদ্যাসাগরের চরিত্রে স্বতো-বিরোধিতাও ছিল।

সন্তোষবাবু লিখেছেন : "১৮৬১ সালে একটি ঘটনা ঘটে।...ক্ষীরপাই গ্রামের অধিবাসী জনৈক শিক্ষক মুচিরাম বন্দ্যোপাধ্যায় বালবিধবা মনোমোহিনী দেবীকে বিয়ে করতে চান।...এদিকে ক্ষীরপাই গ্রামের হালদাররা বিদ্যাসাগরের বন্ধু। মুচিরাম হালদারদের ধর্মপুত্র। হালদাররা এসে ধরলেন বিদ্যাসাগরকে, এ বিয়ে তিনি যেন না দেন।"

"বিদ্যাসাগর চরিত্রের এ এক দুর্বোধ্য রহস্য। যিনি বিধবা বিবাহ দেওয়াকে তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় সৎকর্ম বলে মনে করেন এবং এর জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতে পর্যন্ত প্রস্তুত, তিনিই হালদারদের অনুরোধে এ বিয়ে ভেঙে দিতে রাজী হলেন।"

শেষজীবনে পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে তিনি লিখেছিলেন : "সাংসারিক বিষয়ে আমার মত হতভাগ্য আর দেখিতে পাওয়া যায় না। সকলকেই সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত প্রাণপণে যত্ন করিয়াছি, কিন্তু অবশেষে বুঝিতে পারিয়াছি—সে-বিষয়ে কোন অংশে কৃতকার্য হইতে পারি নাই। যে সকলকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা পায়, সে কাহাকেও সন্তুষ্ট করিতে পারে না।"

স্ত্রীকে লেখা একটি চিঠিও তাঁর সেই বেদনাময় জীবনের স্মৃতিকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। দীনময়ী দেবীকে লিখেছিলেন : "এক্ষণে তোমার নিকট এ-জন্মের মত বিদায় লইতেছি। এবং বিনয় বাক্যে প্রার্থনা করিতেছি, যদি কখনও কোন দোষ বা অসন্তোষের কার্য করিয়া থাকি, দয়া করিয়া আমায় ক্ষমা করিবে।"

'প্রভাবতী সম্ভাষণের' প্রায় প্রতিটি ছত্র তাঁর জীবনের এই করুণ বিষণ্ণতার দিকটাই প্রতিফলিত হয়েছে। স্ত্রী, পুত্র, ভাই, বন্ধুবান্ধব—প্রায় সকলের কাছ থেকেই তিনি শেষজীবনে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর কঠোরতার সঙ্গে তীব্রতর অভিমানবোধই হয়তো তার কারণ।

বিদ্যাসাগরের অপ্রকাশিত একটি চিঠির অংশ।

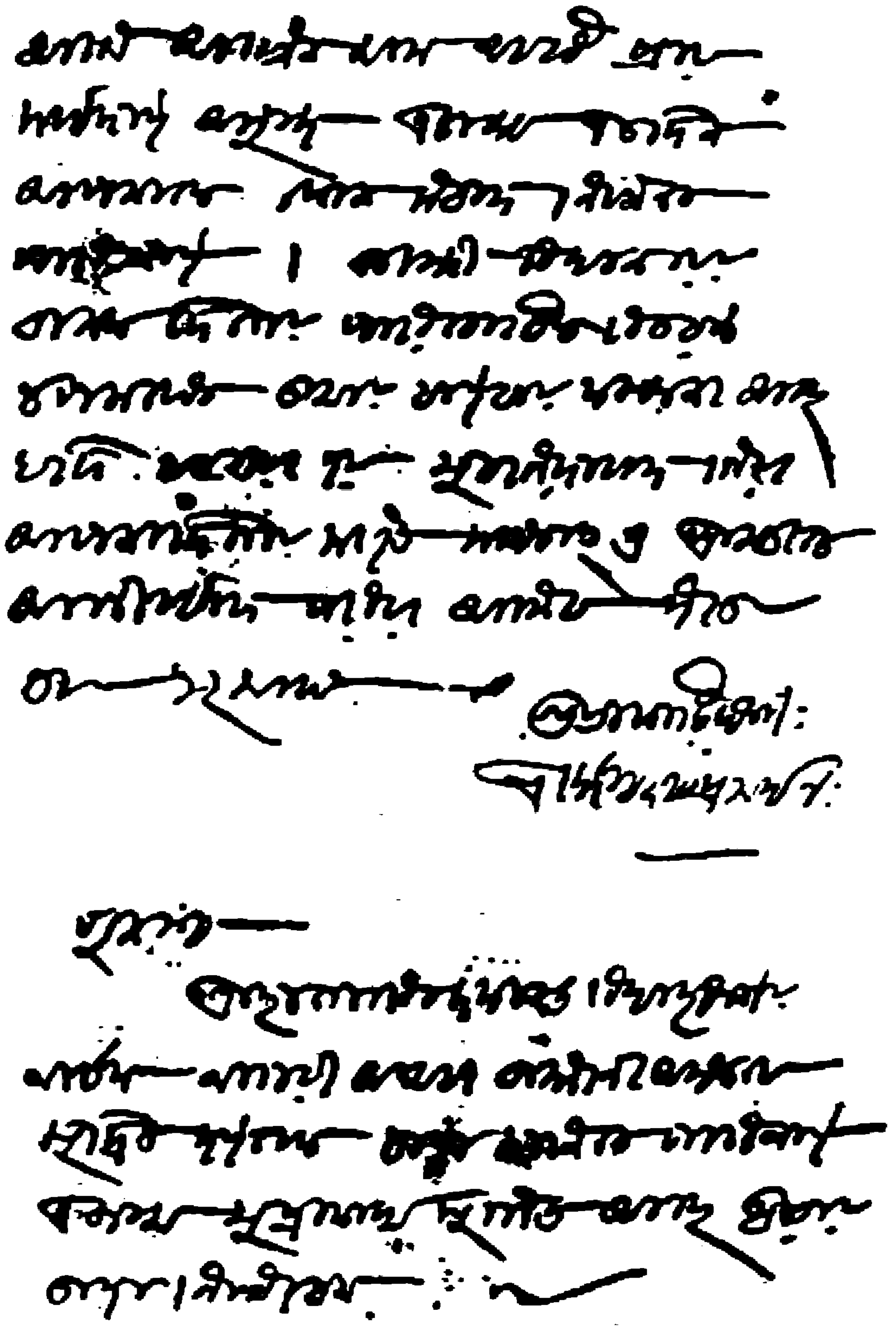

কিন্তু এই ঐন্দ্রজালিক রহস্য উদ্ঘাটন করবে কে?

অনেকেই তাঁর সার্ধ শতবার্ষিকী উপলক্ষে নানারকম প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখেছেন। বিধবা বিবাহের প্রচলন, স্ত্রী শিক্ষার বিস্তার, গদ্য সাহিত্যের উন্নয়ন, সমাজ-সংস্কার প্রভৃতি বিষয়ে পাঠকের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছে। কিন্তু মহৎ হৃদয়ের মহৎ বেদনাকেও যে উপলব্ধি করা প্রয়োজন। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ভারতচন্দ্রের জীবন নিয়ে একটা উপন্যাস লিখেছিলেন 'অমাবস্যার গান' নামে। আমার ধারণা, ঈশ্বরচন্দ্রের জীবন নিয়েও তেমনি একটা উপন্যাস লেখা যায়, বিশেষত শেষ কয়েক বছরের ঘটনাবলীকে কেন্দ্র করে।

শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র লিখেছেন: "বিদ্যাসাগরের চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব বিরাট—এখনো বহু পরিমাণে অনাবিষ্কৃত মহাদেশের মতো। তাঁকে সম্যকভাবে জানা ও বোঝার অভিযানে এখনো বহু বিস্ময় আমাদের জন্য অপেক্ষা করে আছে।"

মনে পড়ে বছরখানেক আগের কথা।

ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার বিদ্যাসাগর জীবনের অন্য একটি দিকের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমাকে বলেছিলেন: 'রামমোহন ও বিদ্যাসাগর উভয়েই সমাজ-সংস্কারক হিসেবে প্রসিদ্ধ। তবু রামমোহনের চেয়ে বিদ্যাসাগর অনেক সফল হয়েছিলেন। তার কারণ, বিদ্যাসাগর বুঝেছিলেন, সমাজের বাইরে গিয়ে সমাজ-সংস্কার করা যায় না। রামমোহন ব্রাহ্মধর্ম প্রবর্তন করে বিধর্মী হয়ে পড়েছিলেন। সেইজন্যেই তাঁকে হিন্দু সমাজ যতটা অগ্রাহ্য করতে পেরেছিল, বিদ্যাসাগরকে ততটা পারেনি।'

এখন তাঁর সার্ধ শতবার্ষিকীতে সে-কথা স্মরণ করার সময় হয়েছে।

সন্তোষকুমার অধিকারীর 'বিদ্যাসাগর'

সন্তোষবাবুর রচনাভঙ্গি অবজেক্টিভ। বিচার-বিশ্লেষণের পদ্ধতিও তাই। সংক্ষিপ্ত একটি জীবনীগ্রন্থে তিনি যে তথ্য সমাবেশ ঘটিয়েছেন, তার পরিমাণ কম নয়। পাঠক হিসেবে আমি তাইতেই সন্তুষ্ট। বইটির প্রথমদিকে একটি অপ্রকাশিত চিঠির ব্লক ও হাডসনের আঁকা প্রতিকৃতি অবলম্বনে বিদ্যাসাগরের একটি ছবি ছাপা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ে 'পটভূমিকা' বিচার-প্রসঙ্গে সন্তোষবাবু লিখেছেন: "১৮১৮ থেকে ১৮২১ যেন পৃথিবীর এক মাহেন্দ্রক্ষণ। এই চার বছরে মহৎ চিন্তানায়ক ও মানবপ্রেমী কয়েকটি বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের জন্ম। ১৮১৮-তে কার্ল মার্কস, ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে ওয়াল্ট হুইটম্যান ও জন রাস্কিন এবং ১৮২০-তে ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল, হার্বার্ট স্পেনসার ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্ম। ১৮২১ খৃষ্টাব্দ অমর কথাশিল্পী কথাসাহিত্যিক মানবতাবাদী দস্তয়েভস্কির জন্ম দিল।"

আর, ১৮২৯ সালে দূর ইউরোপের একটি দেশ গ্রীসের যে-বছর বন্ধনমুক্তি ঘটলো, ঠিক সে-বছরই ন' বছরের বালক ঈশ্বরচন্দ্র বীরসিংহ গ্রাম থেকে কলকাতায় এসেছিলেন ইংরেজী সংখ্যা গণনা শিখতে শিখতে। হয়তো এই তুচ্ছ ঘটনার মধ্যেই ছিল মহত্তর সম্ভাবনার সঙ্কেত। কলকাতায় না এলে হয়তো ঈশ্বরচন্দ্র অনাভাবেই তৈরী হতেন। ইংরেজী শিক্ষা না পেলে হয়তো তাঁর প্রতিভা অন্য দিকে বাঁক নিতো।

মনে রাখতে হবে, সময়টা ঊনিশ শতকের প্রথম দু-তিন দশক। ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা। ১৮২৪-এ স্থাপিত হয়েছিল সংস্কৃত কলেজ। রিচার্ডসন আর ডিরোজিওর ছাত্ররা তখন দুরন্ত আবেগের সৃষ্টি করেছেন। তারুণ্যের আলোড়নে তাঁরা বিপর্যস্ত করছিলেন সমাজদেহকে।

শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র বইটি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে লিখেছেন: "দেড়শত বছর আগে জন্মগ্রহণ করলেও বিদ্যাসাগরের কালাতীত প্রতিভা আমাদের সময়ের পক্ষেও যে কতখানি তাৎপর্যময় তা উপলব্ধি করতে না পারা আমাদের পক্ষে শুধু লজ্জাকর নয়, ক্ষতিকরও বটে। শ্রীসন্তোষকুমার অধিকারীর 'বিদ্যাসাগর' সেই উপলব্ধিকে সার্থক ও প্রগাঢ় করে তোলবার মত বিরল একটি বই।"

অন্তঃ প্রচ্ছদে ঘোষণা করা হয়েছে: 'দীপ্ত সূর্য ও অতলান্ত সাগরের মিলন কোথাও যদি সম্ভব হয়, তাহলে তা হয়েছে বিদ্যাসাগরের মধ্যে। অন্যায় আর অবিচারের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর রুদ্রবহ্নি। অসহায় অক্ষম আর আশ্রিতের কাছে তিনি করুণাসাগর। ...সেই বিস্ময়কর চরিত্র ও জীবনচর্যার একখানি মূল্যবান দলিলচিত্র এই গ্রন্থখানি।"

সন্তোষবাবু অবশ্য অন্যান্য উপাদানের সঙ্গে শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন, বিহারীলাল সরকার ও চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিদ্যাসাগর জীবনচরিত'র ওপর অনেকখানি নির্ভর করেছেন। সবকটি বই এখন বোধহয় পাওয়া যায় না। পাঠক সে-বইগুলি পড়বার সুযোগ পেলে আরো উপকৃত হতেন। সাধারণ পাঠকের পক্ষে অবশ্য সন্তোষবাবুর বইটিই যথেষ্ট।

—গ্রন্থদর্শী

মনের কথা

সুরাপায়ীর আচরণ, প্রিন্স মুখার্জির ডিপসোম্যানিয়া

সুরাপায়ীর প্রধানত দু ধরনের আচরণের সংগে আমরা পরিচিত। একদিকে উচ্ছৃংখল আড়ম্বরপূর্ণ আচরণ, আর অন্যদিকে বিষাদগ্রস্ত করুণ আচরণ। একদল লোক সুরাপানের পর উত্তেজিত হয়ে ওঠে; বেশী কথা বলে, বেশী হাত পা নাড়ে, বিনা-কারণে বা সামান্য কারণে হেসে গড়িয়ে পড়ে অথবা রেগে অশালীন অশোভন আচরণ করে। হৈচৈ করতে করতে হঠাৎ মারমুখী হয়ে অন্যকে আক্রমণ করে বসে। তবে বেশির ভাগ সুরাপায়ী সাধারণত বেশ সদয় সহৃদয় ব্যবহারই করে থাকে। দিলদরিয়া মেজাজে আধচেনা অচেনা লোককেও নিজের পয়সায় পান করাবার জন্য ব্যস্ত হয়, অনেক কিছু সাধু সংকল্প প্রকাশ করে, নানাবিষয়ে উদারতা দেখায়। অন্যের সংগে আন্তরিক যোগাযোগ স্থাপন করার জন্য উৎসুক বন্ধুবৎসল এই সুরাপায়ীদের প্রথমটার আপনার বেশ ভাল লাগবে। আবার এরাই যখন সামান্য কারণে চোখ লাল করে টেবিল চাপড়িয়ে নিজের মতামত জাহির করতে বোতল-গেলাস ভেঙে হৈচৈ সুরু করে দেবে, আপনি নিঃসন্দেহে ভয় পেয়ে পালাবার পথ খুঁজবেন। সাধারণত বন্ধ রেস্টুরেন্টে পরিচিত বন্ধুবান্ধবের সাহচর্যে অথবা অনেক লোকের কোনো উৎসব পার্টিতে একজাতীয় সুরাপায়ীর এই রকম অসংযত ব্যবহার দেখতে পাবেন। এই ব্যবহার অনেকটা পরিবেশ-নির্ভর। এই লোকেই যখন নিঃসঙ্গ অবস্থায় অথবা গৃহকোণের উত্তেজনাহীন পরিবেশে পান করে, তখন আবার তার অন্য রূপ। সামান্য প্রগলভ হয়ে উঠে পরক্ষণেই ঝিমিয়ে পড়বে; তার মাথার ভেতরটা ভারী হয়ে উঠবে, কাজকর্মে ঔদাসীন্য, আলস্য দেখা যাবে; তারপর সে গভীরভাবে ঘুমিয়ে পড়বে।

কিন্তু সুরাপায়ীর বিসদৃশ আচরণের সবটাই যে পরিবেশ-নির্ভর, তা বলা চলে না। আনন্দ-উৎসবের পার্টির মধ্যেও একটু লক্ষ্য করতে দেখতে পাবেন, হলঘরের বা লনের এক কোণে, নিরানন্দ নিরাসক্ত একজন পানপাত্র হাতে গম্ভীরভাবে দাঁড়িয়ে। দৃষ্টি তার অন্যলোকে, উৎসবের আলো, গান, কোলাহল, কিছুই তার কানে পৌঁছচ্ছে না—আপনি কাছে গিয়ে দাঁড়ালেও সে অভ্যর্থনা জানাবে না। রাস্তাঘাটে অফিসে তার যে মূর্তি দেখেছেন, সুরাপানের পর সে মূর্তি তার নেই। ক্লান্ত, উদাসীন, বিষন্ন।

সুরাপানের পর কে কি রকম আচরণ করবে, সেটা তার স্নায়ুতন্ত্রের টাইপের উপরও অনেকটা নির্ভরশীল। হঠকারী (কোলেরিক) স্নায়ুতন্ত্রের অধিকারী স্বভাবতই উদ্ধত আক্রমণাত্মক আচরণ করবে, আশাবাদী প্রত্যয়শীল (স্যানগুইনাস) টাইপ সহৃদয় হবে ও আত্মম্ভরিতার পরিচয় দেবে; ধীরস্থির সুস্থিত (ফ্লেগম্যাটিক) টাইপ গম্ভীর ও দার্শনিক বনে যাবে; আর বিষন্ন টাইপের (মেলানকলিক) মানুষ বিলাপ করতে থাকবে।

আগে মনে করা হত, অ্যালকোহল একটা উত্তেজক পানীয়। সেই ধারণার বশবর্তী হয়ে ডাক্তাররাও প্রায়ই ব্রান্ডী পানের নির্দেশ দিতেন। ভেষজবিজ্ঞানের কৃপায় এখন আমরা জানি অ্যালকোহল স্টিমুল্যান্ট বা উত্তেজক পানীয় নয়। অ্যালকোহল মস্তিষ্ককোষগুলো নিস্তেজিত করে। আপাতদৃষ্টিতে উত্তেজক মনে হবার কারণ প্রধানত দুটি। এক, অ্যালকোহল গাত্রচর্মের প্রান্তস্থ ছোট ছোট রক্তবাহী শিরাগুলোর সম্প্রসারণ ঘটায়; দুই, উচ্চমস্তিষ্ককে নিস্তেজিত করার ফলে নিম্নমস্তিষ্কের বাধাদানকারী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। এই দুই কারণে মনে বেশ একটা উল্লাসের ভাব আসে, মনে হয় যেন দেহমনের শক্তি, উৎসাহ বেড়ে গেছে। এই প্রাথমিক তাজা লাগার ভাবটাই সুরাসক্তির প্রধান কারণ।

এই বেপরোয়া স্ফূর্তির মনোভাব বোধ হয় সব মানুষের না হোক, অনেকেরই কাম্য, তাই অতি প্রাচীনকাল থেকে সুরাপানের প্রতি মানুষের গোপন ও প্রকাশ্য আকর্ষণ। বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালিত মানুষ হিসেব করে চলতে চায়, ভেবেচিন্তে কথা বলতে চায়, সব সময় আত্মসচেতন থাকবার চেষ্টা করে, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করে কার্যক্রম ঠিক করে। সহজপ্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভাধীন হয়ে হঠকারী কোনো কিছু করে না বসে এবিষয়ে সব মানুষই প্রায় সজাগ। নিম্নমস্তিষ্ক ও উচ্চমস্তিষ্ক, স্নায়ুতন্ত্রের পুরনো ও নতুন অংশ, সব সময়েই দ্বান্দ্বিক সম্বন্ধে ব্যাপৃত। এটা নিশ্চয়ই অনেকের পক্ষে বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার। সুরার প্রসাদে সাময়িকভাবেও যখন এই বুদ্ধিবৃত্তি, ভাবনাচিন্তা থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায়, মানুষ তখন অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করে। বেপরোয়া স্ফূর্তির ভাবকে দেহমনের শক্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যবৃদ্ধি বলে ভাবে ও অ্যালকোহলকে বিধাতার আশীর্বাদ মনে করে।

অ্যালকোহলের নিস্তেজনাক্রিয়া মস্তিষ্কের উপরতলা থেকে ক্রমশ নীচুতলায় নেমে আসে। ক্রমবিকাশের পর্যায়ে যে অংশ সবশেষে সংগঠিত, সেই অংশ প্রথমে প্রভাবিত হয়। সুরার প্রসাদে, তাই দেখতে পাই, প্রথমে ঘটে সূক্ষ্মতম ভাব-অনুভূতির হ্রাসপ্রাপ্তি, বুদ্ধিবৃত্তির অবনতি। এই অবস্থায় সুরাপায়ীকে অনেক সময় স্মার্ট ও স্পষ্ট বক্তা বলে মনে হয়। হক কথা শুনিয়ে দেবার জন্যে সে বাহবা পায়। বুদ্ধিবৃত্তি যে সব ভাবপ্রকাশের বাধা ছিল, অবলীলাক্রমে সেই সব ভাব প্রকাশ করা সহজ হয়ে যায়। উপরওয়ালার অন্যায় অবিচার, বন্ধুর সংকীর্ণতা, স্ত্রীর স্বার্থপরতা ইত্যাদি অথবা নিজের দুর্ভাগ্য নিয়ে সুরাপানের পর, অনায়াসে অভিযোগ কিম্বা হা-হুতাশ করা চলে ; যেটা স্বাভাবিক সুস্থ অবস্থায় চলছিল না। অনেকে মনে করেন, অ্যালকোহল আত্মসমালোচনার ক্ষমতা নষ্ট করে। সঠিক আত্মবিশ্লেষণ ক্ষমতা হয়তো থাকে না, কিন্তু আত্মধিক্কার ও অতিমাত্রায় নাটকীয়ভাবে আত্মসমালোচনা করতে এদের দেখা যায়। অহম্মন্যতা ও আত্মম্ভরিতা-প্রকাশের প্রবণতার মতই আত্মসমালোচনার প্রবণতা এই অবস্থায় তীব্র হয়ে ওঠে। এই প্রক্ষোভ-আধিক্য অবস্থায় আমরা সুরাপায়ীদের বেশি দেখি। দ্বিতীয় পর্যায়ে, হাত-পা নাড়া, চলাফেরায় বিশৃংখলা। যে কাজে দক্ষতা ও সূক্ষ্ম ক্রিয়াকৌশলের প্রয়োজন, সে কাজ করা এই পর্যায়ে অসম্ভব। মদের গেলাস মুখে তোলা, টেবিলে নামানো, সিগারেট ধরানোর মত সহজ সাধারণ কাজও ক্রমশ এলোমেলো এবং কথাবার্তা সামঞ্জস্যহীন হয়ে পড়ে। তারপর সুরাপায়ী বুঝতে পারে তার চলাফেরা তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। সে শুধু তাৎক্ষণিক উদ্দীপনায় সাড়া দিচ্ছে। এই অবস্থায় যদি সে একা থাকে, তবে সে স্বপ্নময় আবেশে বা ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়বে। তৃতীয় পর্যায়ে, নিস্তেজনা নিম্নমস্তিষ্কে নেমে আসে। বিচারবুদ্ধি, আত্মসমালোচনার, আত্মসংযমের ক্ষমতা একেবারেই লোপ পায়। প্রক্ষোভ স্তিমিত, নাটকীয়ভাব অন্তর্হিত। দুইয়ে মিলে এখন ঘুম শুধু ঘুম। যতক্ষণ অ্যালকোহল রক্তের মধ্যে থাকে, ততক্ষণ ঘুম ভাঙানো খুব কঠিন ব্যাপার।

অ্যালকোহলের ক্রিয়াপ্রক্রিয়ার এই সংক্ষিপ্ত আলোচনার প্রয়োজন আছে। রোগীদের সংগে কথাবার্তা বলে ধারণা হয়েছে, তাঁদের অনেকেই অ্যালকোহলকে একটা উত্তেজক পানীয় মনে করেন। বেশি মাত্রায় খেলে ক্ষতি হয়ে বটে, কিন্তু অল্পমাত্রায় সেবন করলে নাকি দেহমনের ফিটনেস বাড়ে। ওষুধের মত নির্দিষ্ট মাত্রায় পান করলে স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়, একথাও অনেকের মুখে শুনেছি। একজন নামকরা শিল্পী একদিন বলেছিলেন সুরা মহৎ শিল্পসৃষ্টির ইন্সপিরেশন। চিত্ত-বিবেচনার বুদ্ধিবৃত্তির, সচেতন তীক্ষ্ন দৃষ্টির সংগে শিল্প সৃষ্টির সম্পর্ক নেই যাঁরা মনে করেন,

CENTRAL LIBRARY

তাঁরা সৃজন-ক্ষমতাকে উদ্বুদ্ধ করতে এ্যালকোহলের সাহায্য নিয়ে থাকেন। নিজ্ঞান অনুপ্রাণিত (!) এই শিল্পী সাহিত্যিকরা সৃষ্টির মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে আধুনিক মনোবিজ্ঞানসম্মত ধারণা পোষণ করেন না। শিল্প সাহিত্যের মধ্যে সমাজ-চেতনার অভিব্যক্তিকে এ'রা প্রয়োজনীয় বলে গণ্য করেন না। এ'দের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য, এই তথাকথিত উত্তেজনাদায়ী পানীয়ের প্রভাবে অকালে নষ্ট হয়ে যায়, প্রচুর সম্ভাবনাময় শিল্পীজীবনের ঘটে করুণ ও আকস্মিক পরিসমাপ্তি। অনেক বিশ্ববিখ্যাত শিল্পী সাহিত্যিকের জীবনের নজীর টেনে আমার শিল্পীবন্ধু বলেছিলেন যে, এদের সাফল্যের মূলে আছে সুরা। এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হওয়ার দরুণ নিজের সুরাসক্তির চিকিৎসা করা তো দূরের কথা, সুরাসক্তিকে তিনি প্রশ্রয়ই দিয়েছেন। তিনি বুঝতে পারেননি যে যেসব সুরাসক্ত বরেণ্য শিল্পী-সাহিত্যিক তাঁর আদর্শ, সুরাসক্তি তাঁদের মহৎ সৃষ্টির কারণ নয়; বরং বলা চলে সুরাসক্তির জন্যে তাঁদের প্রতিভার সম্যক বিকাশ ঘটেনি, তাঁদের অসীম সম্ভাবনার পূর্ণ স্বাক্ষর তাঁরা রেখে যেতে পারেননি। সুরাসক্তির চিকিৎসা প্রসঙ্গে সুরাসক্তকে প্রথমেই বোঝানো দরকার যে, সুরা উত্তেজক পানীয় নয়, সুরা সৃজন প্রক্রিয়ার উন্মেষ ঘটায় না, সুরার আপাত উত্তেজনার পিছনে আছে অবসাদ ও নিস্তেজনা। সুরা মাদকদ্রব্য বিশেষ, ইংরিজীতে যাকে বলা হয় নারকোটিক। সুরাসক্তি মানসিক রোগের লক্ষণ ও সুরাসক্তি মানসিক রোগের কারণ। সুরার প্রভাবে পারিবারিক ও সামাজিক দায়দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাওয়া যেতে পারে, এবং ফলে শিল্পী সাময়িকভাবে অবাধে সৃষ্টি-কার্যে আত্মনিয়োগ করতে পারে। এই কারণে অনেকে এ্যালকোহলকে শিল্প সৃষ্টির সহায়ক বা শিল্পীর ইনস্পিরেশন বলে মনে করেন। বলা বাহুল্য, এ ধারণা ভুল ও ক্ষতিকর।

সুরাপানজনিত উন্মত্ততার নানা ধরনের অভিব্যক্তি দেখা যায়।

সামান্য সুরাপান করে কেউ কেউ হঠাৎ অতিমাত্রায় উত্তেজিত হয়ে উঠে মানুষ খুন করতে পারে। খুন করার ইচ্ছেটা মনের মধ্যে থাকে, অ্যালকোহলের ক্রিয়ায় বুদ্ধিবিবেচনা ও কৃতকর্মের ফলাফলের ধারণা লোপ পাওয়ার ফলে ইচ্ছাকে কার্যে পরিণত করা সহজ হয়। প্রণয়ঘটিত হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সুরা-উন্মত্ততার সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ। এই রকম বহু ঘটনার উল্লেখ আইনের কেতাবে দেখা যায়। বহু ক্ষেত্রে প্রমাণ পাওয়া যায় যে হত্যাকারী আগে থেকেই মনের রোগে ভুগছিল। এই অবস্থাকে বলে ম্যানিয়া এ্যা পটু। একটি লোক তার স্ত্রীকে ও স্ত্রীর প্রণয়ী সন্দেহে এক ব্যক্তিকে গুলী করে মারার পর ঘুমন্ত অবস্থায় পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। থানায় লক আপে গিয়েও সে অসাড়ে ঘুমুতে থাকে। পরীক্ষা করে দেখা যায় যে সে খুন করার আগে মদ খেয়েছিল। এমন কিছু বেশি-মাত্রায় নয়। তার এই অস্বাভাবিক ঘুমের কারণ মদ্যপান নয়। আসামীর পক্ষের উকিলের সাক্ষ্য প্রমাণ থেকে জানা গেল যে তার বংশে অনেকে উন্মাদরোগে ভুগেছেন। তারও সাময়িক উন্মত্ততার পূর্ব-ইতিহাস আছে। স্ত্রীর প্রতি সন্দেহ মানসিক অসুস্থতাকে বাড়িয়ে তোলে। সামান্য পরিমাণ এ্যালকোহল সেবনে সন্দেহ দৃঢ় বিশ্বাসে পরিণত হয় ও ইতস্তত ভাব দূর হয়ে যায়। তার নিস্তেজনাপ্রবণ স্নায়ুতন্ত্র সামান্য পরিমাণ এ্যালকোহলেই নিস্তেজিত হয়ে পড়ে। প্রথমে উচ্চমস্তিষ্কের নিস্তেজনার ফলে ঘৃণা ও হিংসা প্রকোপ (নিম্নমস্তিষ্কের সাময়িক উত্তেজনার ফল) তীব্রভাবে প্রকাশ পায়, পরে নিস্তেজনাবেগ সমস্ত মস্তিষ্ককে প্রভাবিত করে অস্বাভাবিক নিদ্রাচ্ছন্ন অবস্থা সৃষ্টি করে।

'ডিপসোম্যানিয়া' কথাটির সঙ্গে আপনারা অনেকেই পরিচিত. ডিপসোম্যানিয়াক'রা মাঝে মাঝে সুরাপান করে উন্মাদের মত আচরণ করে। কয়েক সপ্তাহ, কয়েক মাস, সুস্থ স্বাভাবিক জীবন, তারপর হঠাৎ কয়েক দিন বা কয়েক সপ্তাহ ধরে চলে পানোন্মত্ত অস্বাভাবিক অবস্থা। এরা সাধারণত চিকিৎসার আশায় ডাক্তারের শরণাপন্ন হয়ে থাকে। এই রকম একটি রোগীর কথা শুনুন।

রোগীর নাম প্রিন্স মুখার্জি। নিয়ে এলেন কোলকাতার এক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার। ম্যানেজার সাহেব বললেন, ওকে আমরা প্রিন্স বলে ডাকি। ওর চেহারা তো দেখছেন, প্রিন্সের মতই। আচার ব্যবহারেও প্রিন্স। ওর বাবা ছিলেন এক নেটিভ ষ্টেটের দেওয়ান। বর্তমানে ওরা মধ্যপ্রদেশের বাসিন্দা। আমাদের কোম্পানীর এজেন্সী নিয়েছে প্রিন্স। ও তল্লাটে ওর চেষ্টায় আমরাই এখন সব থেকে বেশি বিজনেস করছি। কোম্পানীর একটা মস্ত-বড় এ্যাসেট আমাদের এই প্রিন্স। ওর মত গুণী ছেলে হাজারে আপনি একটা পাবেন কিনা সন্দেহ। এই বলে ভূমিকা শেষ করলেন ম্যানেজার সাহেব।

প্রিন্স মুখার্জিকে দেখলাম। হ্যাঁ, দেখবার মতই চেহারা। যেমন চেহারা, তেমনি পোষাক। সবটাই আভিজাত্যে মোড়া। প্রিন্স চোখ নীচু করে ম্যানেজার সাহেবের ভূমিকা শুনছিলেন। এইবার মুখ তুলে তাকালেন। মুখের রং লালচে, যেন রক্ত ফুটে বেরুচ্ছে। চোখের কোণ দুটো একটু ফোলা-ফোলা, চোখ দুটো ভিজেভিজে। মুখে হাসি ফুটিয়ে বললেন, আশা করি আপনি আমাকে সাহায্য করবেন। আপনার সাহায্য পেলে বোধ হয় আমি এই ন্যাস্টি হ্যাবিট ছাড়তে পারবো। মিঃ মেহতা, আই মীন, আমাদের ম্যানেজার এই রকমই ভরসা দিয়েছেন।

—আপনার ন্যাস্টি হ্যাবিট-এর পরিচয় এখনো পাইনি মিঃ মুখার্জি।

মিঃ মেহতাই পরিচয় দিলেন। ওর এক একটা স্পেল আসে তিন মাস, চার মাস অন্তর। তিন মা[illegible] চার মাস একেবারে স্ট্রিক্ট টিটোটেলা[illegible] ন এক্টু পর্যন্ত ছোঁয় না। কিন্তু স্পেল এলে মনে হয় ওর কাঁধে বোধ হয় কোনো দৈত্য ভূত চেপেছে। ড্রিংক করতে থাকবে, পেগের পর পেগ, বোতলের পর বোতল; যতক্ষণ না ঘুমিয়ে পড়বে। ঘুম থেকে উঠে আবার চালাবে। সব খাঁটি স্কচ। শুধু স্কচ হলে হবে না, খাঁটি হোয়াইট লেবেল হওয়া চাই। চার পাঁচ দিন এমনি চলবে। এক একটা স্পেল পনেরো দিনও চলে যায়। নিজের হোম টাউনে নয়। সেখানে সবাই জানে ও খাঁটি পিউরিট্যান। ও চলে আসবে রায়পুর কি বিলাসপুরের কোনো আস্তানায়, কিম্বা এই কোলকাতার কোনো সম্ভ্রান্ত হোটেলে। হোটেলগুলোতে ওর সেলার ক্রেডিট। তারা ওকে বাধা দেবে না। যখন বিলের পরিমাণ দেড় হাজার ছাপিয়ে যাবে, তখনই ওরা ঠিক জায়গায় খবর পাঠাবে। আমাদের অফিসের ঠিকানায় খবর চলে যাবে। অফিস থেকে লোক গিয়ে বিলের টাকা শোধ করে ওকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসবে। আবার চলবে চার পাঁচ মাস একনাগাড়ে বিজনেস। তখন ও একেবারে অন্য মানুষ। আবার হঠাৎ একদিন হোমটাউন থেকে উধাও। খবর পেলেই আমরা বুঝে নেব প্রিন্স ইজ ইন হিজ স্পেল। আমার মনে হয় এটা একটা নাস্টি হ্যাবিট। এ হ্যাবিট নিশ্চয়ই আপনার ট্রিটমেন্টের ডোমেইনে পড়ে।

এর পরদিন প্রিন্স নিজের ন্যাস্টি হ্যাবিট ও প্রাইভেট লাইফের সম্পূর্ণ পরিচয় দিলেন। ছোটবেলা কোলকাতায় কেটেছে, মামার বাড়ীতে। ছুটিছাটাতে বাবার কাছে যেতেন। বাবা উড়িষ্যার একটা ছোট নেটিভ স্টেটের দেওয়ানের অধীনে সামান্য কাজ করতেন। মেহতা এবং বাইরের অনেকের কাছে তিনি দেওয়ানপুত্র বলে পরিচিত। শৈশব থেকেই এই রকমভাবে নিজেকে জাহির করার ঝোঁক। ছোটবেলা থেকেই কোলকাতায় স্কুলের ছেলেদের কাছে নিজেদের সম্বন্ধে অনেক গালগল্প বানিয়ে বলতেন। এতে বেশ প্রেস্টিজ বাড়তো। প্রেস্টিজের মোহে নানারকমের মিথ্যাভাষণ ও মিথ্যাচারে অভ্যস্ত হয়েছেন। প্রেস্টিজের প্রয়োজন ছিল। কোলকাতা থেকে বাবার কাছে গেলেই বুঝতে পারতেন তাঁদের দীনহীন অবস্থা। আমরা হোটেলের বয়কে যতটা মর্যাদা দিয়ে থাকি ততটুকু মর্যাদাও দেওয়ানজী ওঁর বাবাকে দিতেন না। সব আমলাদেরই ঐ একই অবস্থা ছিল। বাড়ীশুদ্ধ সবাইকে, মা বাবা দিদি সকলকেই দেওয়ানজীর বাড়ীর লোকজনদের ফাইফরমাশ খাটতে হত। কোলকাতা থেকে ওখানে গেলে মনে হত যেন জেলখানায় এসেছেন। চেহারার জন্যে বাইরে সকলের কাছে আদর ও সম্মান পেতেন, কিন্তু দেওয়ানজির বাড়ীর লোকদের কাছে এই চেহারাই ছিল সব থেকে ওঁর বড় শত্রু। দেওয়ানজির ছেলেমেয়েদের চেহারা মোটেই ভাল ছিল না। তারা ওঁর চেহারার জন্যে ওঁকে হিংসে করতো, ঘৃণা করতো। দেওয়ানজির বাড়ীর ছেলেমেয়েরা ওকে দেখলেই নানারকম অর্ডার করতো, তাদের সে অর্ডার তামিল না করে উপায় ছিল না। দেওয়ানজীই বিদ্রূপ করে ওর

প্রিন্স নাম দিয়েছিলেন। বাকীটুকু প্রিন্সের নিজের কথাতেই বলি। এই কথাগুলো বলবার সময় ওঁর মুখ আরো একটু বেশি আরক্ত হয়ে উঠেছিল। দুঃখ আবেগে প্রশস্ত বুক ওঠানামা করছিল। উনি বললেন,—

মুখ বুজে সব অত্যাচার, সব অপমান সহ্য করে যেতাম, কিন্তু মাঝে মাঝে বিদ্রোহও করতাম। সেদিন রাজবাড়ীতে কিসের একটা উৎসব ছিল। সেজেগুজে উৎসব দেখতে যাবো বলে তৈরী হয়েছি, এমনি সময় দেওয়ানজির বাড়ী থেকে হুকুম এলো সাইকেলে করে তিন মাইল দূরের বাজার থেকে এখুনি দেওয়ানপুত্রের জুতোর ফিতে কিনে আনতে হবে। আমি রাজী হলাম না। বাবা মা অনেক সাধ্যসাধনা জবরদস্তি করলেন। গোঁ ধরে বসে রইলাম। কিছুতেই যাবো না। শেষ পর্যন্ত বাবাকে ছুটতে হলো। আমি উৎসবেও গেলাম না। জামা কাপড় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে শয্যা নিলাম। মাথার মধ্যে একটা অসহ্য যন্ত্রণা হতে লাগলো। সারা শরীরের মধ্যে কিসের যেন কাঁপুনী। অন্ধকার ঘরের মধ্যে বন্ধ পশুর মত রাগে অপমানে নিজের হাত কামড়ে রক্ত বের করলাম। বিছানার চাদরটা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়লাম, বালিশটার তুলো বের করে ঘরময় ছড়িয়ে দিলাম। পরদিন সকালে দেওয়ানজির তত্ত্বাবধানে বাবা আমাকে শাসনের নামে বেদম প্রহার করলেন। আমি তিন চারদিন বোধ হয় অজ্ঞান হয়ে ছিলাম। সেই থেকে ছুটিগুলো যথাসম্ভব কোলকাতাতে কাটাতে লাগলাম। মা কান্নাকাটি করে চিঠি লিখলে উড়িষ্যার সেই শহরটাতে কয়েক দিনের জন্যে যেতাম। গেলেই আমার প্রায়ই ঐ ধরনের মাথার যন্ত্রণা হতো। হাতের কাছে যা পেতাম ভেঙেচুরে তছনছ করতাম। কলেজে পড়ার সময় মা মারা গেলেন। বাবা ডেকে পাঠালেন স্টেটে চাকরী নেবার জন্যে, ওঁর রিটায়ার করার সময় হয়েছে। আমি রাজী হলাম না। মামা বাবার অমতে আমাকে তাঁর বাড়ীতে ঠাঁই দিতে রাজী হলেন না। আমি বি-এ পরীক্ষা না দিয়ে ভ্রাম্যমাণ সেলস-ম্যানের চাকরী নিয়ে সংসার সমুদ্রে ভেসে পড়লাম। দেওয়ানের দেওয়া প্রিন্স নাম আর ঈশ্বরের দেওয়া চেহারা,—এই দুটোকেই আমি ঘৃণা করি; আবার এই দুটো ভাঙিয়েই আজ এই বেয়াল্লিশ বছর অবধি আমি রুজিরোজগার করে আসছি। শৈশব থেকে প্রতিদিন অনুভব করেছি নিজের দৈন্য নিজের অসহায়তা। প্রতিপদে প্রেস্টিজ খুইয়েছি, তাই প্রতিমুহূর্তে প্রেস্টিজ ফিরে পাবার জন্যে সংগ্রাম করছি। আপনারা যাকে মন্দ কাজ, অসামাজিক আচরণ বলেন, সে রকম সব কাজেই বোধ হয় আমি অভ্যস্ত! প্রেস্টিজের জন্যে সব রকম মিথ্যাচারে সব রকম শঠতা করতে আমি প্রস্তুত। তা সত্ত্বেও, আমার মনের গ্লানি যাচ্ছে না, অপমানের জ্বালা দূর হচ্ছে না। তিনচার মাস অন্তর অল্প অল্প শরীর খারাপ লাগে, তখনই বেরিয়ে পড়ি, কোনো একটা পরিচিত আস্তানায় গিয়ে ঢুকে পড়ি। মাথার যন্ত্রণা বাড়ে। তারপর চলতে থাকে ঐ অবস্থা। মেহতা যাকে বলে স্পেল। মদ খাই, মদ খাওয়াই, মেলাস, ভাঙি অন্যকে বিনাকারণে অপমান করি। সব টাকা ফুরিয়ে যায়। বিল সই করে চলি। অবস্থা চরমে উঠলে ওরা আমাকে একটা ঘরে বন্ধ করে রাখে। আমার প্রিন্সিপালকে (যখন যে কোম্পানীতে চাকরী করি, তার কর্তাব্যক্তিকে) খবর পাঠায়। তারা এসে আমাকে টাকা দিয়ে শাসেজ খালাস করার মত, আস্তানার লোকদের কাছ থেকে খালাস করে বাড়ী নিয়ে যায়। তাদের অনেক টাকা খরচ হয়, কিন্তু আমার সেলসম্যানশিপের দৌলতে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে কেতাদের খরচ সুদে-আসলে উশুল হয়ে যায়। প্রেস্টিজ রিগেইন করতে গিয়ে বারবার প্রেস্টিজ হারাই। কিন্তু আমি মনে মনে জানি শেষ পর্যন্ত আমি জিতবোই। বাবা বেঁচে নেই, বিয়ে করেছি, ছেলেমেয়েও হয়েছে। দশ বছর ধরে ওদের কাছে প্রেস্টিজ বজায় রেখে চলেছি। এই ব্যাপারে আপনার সাহায্য চাই। বাড়ীতে প্রেস্টিজ চলে গেলে বাইরে রাজকীয় সম্মানেও আমার মন ভরবে না। এবারকার স্পেলের খবর ওদের কানে পৌঁছেছে। সত্যি এই ন্যাস্টি হ্যাবিট থেকে পরিত্রাণের সত্যি সত্যি কোনো উপায় আছে কি? আমাকে যে বড় হতে হবে। হ্যাঁ, বড় আমি হবোই। প্রিন্সের মত প্রেস্টিজ পাবোই।

জিজ্ঞাসাবাদের ফলে আরো অনেক তথ্য জানা গেল। পালাপার্বণে দেওয়ানজীর বাড়ীতে সুরার স্রোত বয়ে যেতে দেখেছেন মুখার্জি। বাবা কোলকাতা থেকে পেটি পেটি মদ নিয়ে যেতেন, সবই হোয়াইট লেবেল। 'হোয়াইট লেবেল' ছাড়া দেওয়ানজী আর কিছু ছুঁতেন না। রাজা-মশাই কোন ব্র্যান্ড দিয়ে রাজকীয় প্রেস্টিজ রাখতেন, সে খবর প্রিন্স রাখেন না। বাবা মদের মধ্যে থেকেছে কিন্তু কোনোদিন গলা ভেজানোর ইচ্ছেও তাঁর হয়নি। মা মাঝে মাঝে বিষণ্ণতায় ভুগতেন। তিনচারদিন বিছানা থেকে উঠতেন না, কিছু খেতেন না, কথা বলতেন না। আবার যখন কাজ করতেন, দারুণ উৎসাহ উদ্যম দেখা যেত তাঁর মধ্যে। প্রথম সেলসম্যানের চাকরী নেবার পরই মদে তার হাতেখড়ি। মণিরাম, তদ্র সে সময়কার অন্তরঙ্গ বন্ধু, মাথার যন্ত্রণা লাঘব করতে হুইস্কি পানের উপদেশ দিয়েছিল। মণিরাম সিনেমার ঢুকে মদ্যপানে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। ট্যুর থেকে তিনমাস চারমাস অন্তর ফিরে এসে, মণিরামের সঙ্গে, মাথার যন্ত্রণা লাঘব করতে হোটেলের ঘর ভাড়া করে তিনচারদিন ধরে মদ খেত মুখার্জি। স্পেলের শেষের দিকে যখন ও উন্মাদ হয়ে উঠতো মণিরাম জোরজবরদস্তি করে ওকে ধরে নিয়ে মাথার বাড়ীর দোরগোড়ায় রেখে সরে পড়তো। এই হচ্ছে প্রিন্স মুখার্জির ন্যাস্টি হ্যাবিট ও প্রাইভেট লাইফের ইতিহাস।

এই কেসটি বিশদভাবে পর্যালোচনা করার ফলে বুঝতে পারলাম যে মুখার্জি এক ধরনের মানসিক রোগে ভুগছেন। অধিকাংশ ডিপসোম্যানিয়াকই ম্যানিয়াক-ডিপ্রেসিভ সাইকোসিস বা এপিলেপ্সীর মত কোনো রোগাক্রান্ত বলে মনে হয়। ম্যানিয়াক-ডিপ্রেসিভ (সংক্ষেপে এম ডি পি) রোগে চক্রাকারে অতি উত্তেজনা ও অতি-নিস্তেজনার অবস্থা দেখা যায়। এটা অবশ্য পুঁথির কথা। কিছুসংখ্যক রোগী কিছুদিন অত্যন্ত উত্তেজিত অবস্থায় বদ্ধ উন্মাদের মত আচরণ করে, নিস্তেজিত বা বিষণ্ণ অবস্থা তাদের দেখা যায় না। আবার কিছু রোগীর মধ্যে বিষণ্ণ অবস্থাটাই বিশেষভাবে প্রকাশ পায়; অতি-উত্তেজিত উন্মাদ অবস্থা দেখা যায় না। অন্য সময় এরা কিন্তু খুবই স্বাভাবিক ও সুস্থ। এপিলেপ্সী বা মৃগী রোগের সঙ্গে সকলেই কমবেশী পরিচিত। মৃগীর উপসর্গও এম, ডি, পির মত কিছুদিন অন্তর চক্রাকারে দেখা দিয়ে থাকে। বিশেষজ্ঞরা বলেন জন্মগত স্নায়ু-বৈশিষ্ট্য এই রোগের জন্যে দায়ী। শতকরা আটটিরও বেশী ক্ষেত্রে পিতামাতা বা পূর্ব-পুরুষদের মধ্যে এই রোগলক্ষণের ইতিহাস পাওয়া যায়। কিন্তু পরিবেশের প্রভাবকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া চলে না।

মুখার্জির মা খুব সম্ভব ডিপ্রেসনের রোগী ছিলেন। সে নিজে কিছুদিন অন্তর ম্যানিয়াক হয়ে পড়ছে। তার পিতার নেটিভ স্টেটের দেওয়ানের অমলাগিরি চাকরী নিঃসন্দেহে মায়ের অসুস্থতাকে প্রভাবিত করেছে। মুখার্জির অসুস্থতায় ইন্ধন জুগিয়েছে। সুস্থ পরিবেশের মধ্যে মানুষ হলে হয়তো মুখার্জি ডিপসোম্যানিয়াক হতো না।

মুখার্জির মানসিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করবার মত। প্রিন্স মুখার্জি অতিমাত্রায় আশাবাদী। অনেকবার অনেক চাকরী খুইয়েছেন, দেনায় আকণ্ঠ ডুবে গেছেন, নানারকমের বিপদে পড়েছেন; কিন্তু হতাশায় ভেঙে পড়েন নি। বেয়াল্লিশ বছর বয়সেও স্বপ্ন দেখছেন মানমর্যাদায়, ঐশ্বর্য-সম্পদে, দেওয়ানজীকে ছাড়িয়ে যাবেন, চেনা-শোনা সবাই তাঁকে বাহবা দেবে। সত্যিকারের রাজার মত প্রেস্টিজ হবে। মাঝে মাঝে একটা স্পেলের পরে একটু হতাশার ভাব মনে হলেও, মুষড়ে পড়তে কোনোদিনও তাঁকে দেখা যায়নি। তাঁর প্রেস্টিজলাভের কল্পনা অনেকটা আলেয়ার পেছনে ছোটার মত। তিনচার মাস অক্লান্ত পরিশ্রম করে, বাস্তবের সংগে সংগ্রাম করে যখনই অন্তরে হতাশার ভাব জাগে, তখনই তিনি প্রেস্টিজ স্বপ্নকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যই সুরার আশ্রয় গ্রহণ করেন। ক্ষোভ, হতাশা, হীনম্মন্যতাকে মদের স্রোতে ভাসিয়ে দিতে চেষ্টা করেন। নিজের শক্তি সম্বন্ধে অতিরঞ্জিত ধারণা ও বাস্তবের ভ্রান্ত মূল্যায়ন মুখার্জিকে অসুস্থ করে রেখেছে, তাঁকে সুরাসক্ত করেছে।

—মনোবিদ

ভ্রম সংশোধন

১৮ই অগ্রহায়ণ তারিখের 'মনের কথা'র সাবটাইটেলে 'সাময়িক উত্তেজনা: টোয়াইলাইট স্টেট'-এর বদলে আগের সংখ্যার সাবটাইটেলটি ছাপা হয়েছে। এই ত্রুটির জন্য দুঃখিত।

নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

(১৬)

আজ দণ্ড বিসর্জনের দিন। খুব সকালে উঠে সোনা, লালটু, পলটু আহ্নিক করল। সূর্যোদয়ের আগে ওদের আজ নদীর পাড়ে হাজির হতে হবে। আহ্নিক শেষে ওরা এসে উঠানে দাঁড়াল। তরমুজ খেত পার হলেই নদী। সেই নদীতে ওরা ডুব দিতে যাবে। নদীতে ওদের বিল্বদণ্ড, যে দণ্ড এ-তিনদিন ওদের হাতে ছিল, তা আজ বিসর্জন দিতে যাবে। ব্রহ্মচারী বালকেরা সন্ন্যাসীর এই আলখেল্লা ছেড়ে ফেলবে নদীর পাড়ে। ডুব দেবে জলে, ডুব দিলেই ফের তারা গৃহী হয়ে যাবে।

সূর্যোদয় না হতে আজ ঠাকুর বাড়ির সবাই নদীর পাড়ে নেমে যাবে—সোনাবাবুদের আজ দণ্ড বিসর্জনের দিন, সে-দিনে কি কি হয় সব-জানে সামসুদ্দিনের মা। রাতে যখন ফাতিমাকে পাশে নিয়ে শুয়ে ছিল, তখন গল্প করেছে, খুব ভোরে উঠে বাবুরা যাবে নদীতে ডুব দিতে। যা কিছু বসন ভূষণ সন্ন্যাসীর সব ছেড়ে ফেলবে। ছেড়ে সব নদীর জলে ভাসিয়ে দেবে।

ফাতিমা ভোর রাতের দিকে একটা স্বপ্ন দেখল। রাজপুরীর পাশে এক বন। বনে এক রাজপুত্র জন্ম নিচ্ছে। বৈশাখী পূর্ণিমা। এক মহামানবের জন্ম হচ্ছে। তার পরই সে স্বপ্নে দেখল—কিছু জরাগ্রস্ত মানুষ হেঁটে যাচ্ছে শহরের উপর দিয়ে, কারা যেন হাজার হাজার মৃতদেহ ফেলে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে এবং এক পাগল মানুষ সবাইকে ঘরে ফিরতে বলছে। পাগল মানুষের সংগে সেও সবাইকে ঘরে ফিরতে বলছে। কিন্তু কেউ ফিরছে না। এমন কি সোনাবাবু, ওর প্রিয় পাগল জ্যাঠামশাইকে ফেলে পালাচ্ছে। ঘুম ভেংগে গেল ফাতিমার। সে উঠে বসল। স্বপ্নটার সংগে তার বইয়ে পড়া একটা ইতিহাসের দৃশ্য কিছু কিছু মিলে যাচ্ছে। সে চুপচাপ বসে থাকল কিছুক্ষণ। তারপরই সহসা মনে হল খুব সকালে, সূর্যোদয়ের আগে, এমন কি মনে হয় যখন কেউ ঘুম থেকে জাগবেনা তখন ওরা নদীতে যাবে। ফাতিমা বাইরে এসে দাঁড়াল। মোরগগুলি ডাকছে। সে নেমে যেতেই মোরগগুলো মাঠে শস্যদানা খেতে বের হয়ে গেল। সে চুপি চুপি পেয়ারা গাছের নিচে এসে দাঁড়াল। মাঠ ফাঁকা। শস্যদানা কিছু আর এখন পড়ে নেই। সে দেখল, সোনাবাবুর নেড়া মাথা, হাতে বিল্বদণ্ড, গায়ে গৈরিক বসন। সেই মহামানবের মতো মুখ চোখ সব। যেন খুব বড় হয়ে গেছে, লম্বা হয়ে গেছে সোনাবাবু। পাগল কর্তার মতো কোনদিকে না তাকিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। সে ধীরে ধীরে একা মাঠের ভিতর নেমে গেল।

একটা মিছিল যাচ্ছে মানুষের। সবার আগে পাগল মানুষ। পরে সোনা লালটু পলটু। পিছনে অশ্বিনের কুকুর এবং চন্দ্রনাথ, শশিভূষণ, ভূপেন্দ্রনাথ এবং অন্যান্য আত্মীয় স্বজন আরও পিছনে হেঁটে হেঁটে নদীর পাড়ে যাচ্ছে। সবার শেষে যাচ্ছে ঈশম। সে ভোর রাতে জেগে গেছে, কারণ তাকে গিয়ে ডেকে তুলতে হবে সবাইকে। ভোর হয়ে গেছে, এবারে উঠতে হয়। সূর্য উঠতে দেরি নেই। সবাইকে ডেকে দেবার ভার ছিল তার।

ঈশম এই তিন ব্রহ্মচারীকে দেখবে না বলেই সকলের পিছনে আছে। দেখলে যা কিছু পুণ্য এই তিন বালক উপবীতের ঘরে অর্জন করেছে সব নষ্ট হয়ে যাবে। সে সেজন্য সবার শেষে, সবার পিছে থাকছে। ডুব দিয়ে উঠলেই আর কোন বাধা নিষেধ থাকবে না। সে ওদের সংগে কথা বলতে পর্যন্ত পারবে।

ওরা যাচ্ছিল, ওদের উপবীত গলায়। ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে। ওদের মুখ উপবাসে কাতর। তিনদিন শুধু ফলমূল আহার এবং দুপুরে চরু রান্না হয়েছিল গতকাল। খেতে বিস্বাদ। আজ পুকুরে জাল ফেলবে চন্দ্রনাথ। এবং বড় মাছ, পাবদা, কই অথবা রুই মাছের ঝালঝোল, এই নদীর জলে নেমে গেলে সেই এক খাদ্য বস্তু মনোরম গন্ধ বয়ে আনে। চন্দ্রনাথ, ওরা নদীতে ডুব দিয়ে উঠলেই পুকুরে গিয়ে জাল ফেলবে।

সোনা ধীরে ধীরে জলে নেমে গেল। পাশাপাশি দাঁড়াল তিনজন। পুবের আকাশ গাঢ় লাল। ঠাণ্ডা কনকনে শীত। মনে হচ্ছিল সমস্ত শরীর এই হিমঠাণ্ডায় বরফ হয়ে যাচ্ছে। তবু ওরা দাঁড়াল। মন্ত্রপাঠ করল। প্রথম উত্তরীয় ফেলে দিল জলে। তারপর বিল্বদণ্ড জলের নিচে গুঁজে দিল। সেই দণ্ড বিসর্জন দিয়ে আবার মন্ত্রপাঠ করল ওরা। এবার পরনে যে বাসটুকু ছিল তাও জলে ভাসিয়ে দিল। ওরা এবার সূর্য প্রণাম সেরে উঠে আসার সময় দেখল, ঈশম দাঁড়িয়ে আছে তরমুজ খেতে। ফাতিমা ঈশমের পাশে দাঁড়িয়ে বাবুর দণ্ড বিসর্জন দেখছে।

তখন পাগল মানুষ নদী সাঁতরে ও-পারে চলে যাচ্ছেন।

এ-ভাবেই ফাতিমা দাঁড়িয়ে থাকে, বড় জ্যাঠামশাই নদী পার হয়ে চলে যান। ফাতিমা কি যেন বলতে চায় তাকে, মেলাতে যাবার সময় কি একটা কথা বলেছিল, যার অর্থ সে বোঝেনি। মেলাতে ওরা একসংগে পুতুল নাচ দেখেছিল একবার। রাবণের সীতা হরণ। এ-ভাবেই বর্ষা আসার আগে পাট গাছগুলো ক্রমে বড় হতে থাকে। শীতের ছুটিতে এসে দেখে গেছে ফাতিমা ফসলবিহীন মাঠ, আর গ্রীষ্মের ছুটিতে এলে দেখতে পায় ফাতিমা পাট গাছগুলো বড় হয়ে গেছে মাঠে। পাট গাছ বড় হলেই সে চুপি চুপি অতি সহজে এ-গাঁয়ে উঠে আসতে পারে। কেউ দেখতে পায়না, শহরের এক মেয়ে প্রায় চুপি চুপি অর্জুন গাছটার নিচে এসে বসে থাকে। বাবুর জন্য সে নানারকমের জলছবি নিয়ে আসে। কখনও রাজা রাণীর, কখনও প্রজাপতির। সে বাঘ হরিণের ছবি আনে না। রাবণের সীতা হরণের ছবি আনতেও সে ভয় পায়।

এ-ভাবেই এ-দেশে নিদারুণ গ্রীষ্মের পরে বর্ষা আসে। থেকে থেকে এ অঞ্চলে ঝড় হতে থাকে, বৃষ্টি হতে থাকে। আবার কি রোদ! রোদের উত্তাপে শস্যের চারা সকল জ্বলতে থাকে।

ঈশমের শরীর ভাল ছিল না বলে মাঠে যায়নি। সে করমচা গাছটার নিচে দাঁড়িয়েছিল। সোনা পাশে দাঁড়িয়ে আছে। ওরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সামনের সবুজ মাঠ দেখছে। মাঠে মাঠে কত কামলা। ওরা রোদের ভিতরে মাথলা মাথায় জমিতে নিড়ি দিচ্ছে। এবং গান গাইছে। সোনা এবং ঈশম বুঝি সেই গান শুনছিল। বেশ জারি জারি সারি সারি গান, গমকে গমকে আকাশে বাতাসে বাজছে।

ঈশম গাছের ছায়া দেখে এখন বেলা কত, এই বেলায় বেলায় জমিতে যারা নিড়ি দিচ্ছে শেষ করতে পারবে কিনা, না পারলে আকাশের যা অবস্থা, ঈশান কোণের একটা বড় মেঘ দেখে টের পায় ঈশম ঝড় উঠবে এক্ষুনি, তাড়াতাড়ি মাঠে যা কিছু আছে, যেমন গাই বাছুর, আম পাতা সব নিয়ে আসতে হবে।

ঈশম পাশের জামরুলে গাছটার দিকে তাকাল। গাছের ডাল, বড় বড় পাতা সব জামরুলে ঢেকে গেছে। সাদা সাদা ফল, কি মনোরম দেখতে, যেন সারা অঙ্গে লাবণ্য। ঝড় উঠলেই সব ঝুর ঝুর করে পড়বে। মনে হবে কেউ যেন শুভ কাজে গাছের নিচে বড় বড় খৈ বিছিয়ে গেছে। ওর এই গাছ এবং ফলের জন্য মায়া হবে তখন।

তখন কালো রঙের মেঘটা আকাশে ছড়িয়ে পড়ছে। কেমন ঘুরে ঘুরে অথবা আসলে নিজেই একটা মেঘের সমুদ্র তৈরি করে ফেলছে। ঘুরে ঘুরে প্রচণ্ড ঢেউ তুলে মেঘগুলো ক্রমে কালো রং থেকে ছাই রং হয়ে যাচ্ছে। আকাশের অবস্থা বড় খারাপ। ঈশম বলল, চলেন কর্তা বাড়ি যাই।

কোথাও বজ্রপাতের শব্দ। দুটো একটা পাতা বাতাসে মাথার উপর দিয়ে উড়ে উড়ে গেল। দু এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়ল শরীরে। দারুণ যে গ্রীষ্ম গেছে এই বৃষ্টি অথবা ঝড়ে তা ঠান্ডা হবে। সোনার এই বৃষ্টিতে বড় ভিজতে ইচ্ছা হচ্ছে।

জমিতে যারা পাঠ ধান নিড়ি দিচ্ছিল, আগাছা বেছে দিচ্ছে জমি থেকে তারা এখনও উঠছে না। তারা বৃষ্টির ঢলে জমি কাদা না হলে উঠবে না। ওরা প্রাণপণ কাজ করছে, এবং উত্তরোলে গাইছে জারি জারি সারি সারি গান। যেন ঝড় অথবা বৃষ্টির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সমস্বরে গেয়ে চলেছে। এই শেষ সময়—আর ওরা এসে জমিতে বসতে পারবে না, নদীনালা পুকুর সব জলে ভরে আছে—বড় ঢল নামলেই নদী নালা উপচে জল জমিতে উঠে আসবে, তারপরই জোয়ারের জলে সরপুঁটি, বোয়াল মাছ। কাজ কাম তখন কম। সারাদিন বৃষ্টি। বৃষ্টিতে মাছ মারো খাও।

সারা মাঠে মাথলা মাথায় মানুষ। জমিতে জমিতে জোয়ারের জল। কোথাও হাঁটু জল, কোথাও পাটের পাতা ডোবে না। সারাদিন সারারাত বৃষ্টি। বৃষ্টি আর বৃষ্টি। মাঠে মাঠে মানুষ। মাথলা মাথায় কোচ পলো হাতে মানুষ। ওরা সকাল সন্ধ্যা কেবল মাছ মারবে। লন্ঠন হাতে, কেউ পলো হাতে ঝুপঝাপ জল ভেঙে বড় মাঠে নেমে যাবে অন্ধকারে। অন্ধকারে মাছেরা মানুষকে এ-দেশে ভয় পায় না।

সুতরাং এই যে সব মাঠ ঘাস এতক্ষণ রোদে পুড়ে যাচ্ছিল, মনে হচ্ছিল দাবদাহে পৃথিবীর শেষ রসটুকু বুঝি এবার বিধাতা শুষে নেবেন, তখন আকাশে আকাশে মেঘের খেলা। জলে জলে আবার বেশ ভরে যাবে। ওরা দুজন তখনও ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টির ভিতর কৃষকদের গান শুনছিল। কত ঘাস এবং প্রজাপতি এই মাঠে। পশুপাখির কথা মনে পড়ছে ঈশমের। আগামী হেমন্তে অথবা শীতে বুঝি তার বিবিটা মরে যাবে। ক্রমে বিবি বিছানার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। এত কাজ এই সংসারে, সময় করে দুবার বেশি যাবে তা পর্যন্ত পারে না। মনে হয় কেবল কিছু না কিছু কাজ বাকি থেকে গেল।

ঝুপ ঝুপ করে এবার ঢল আরম্ভ হল। ধান পাতা সব ভিজে যাচ্ছে। জল পড়ছে টুপটাপ। সোনা, ঈশম, পাগল জ্যাঠামশাই সবাই দক্ষিণের ঘরের জানালাতে বসে আছে। বৃষ্টির শব্দ শুনছে। ধান পাতা কেমন বর্ষার জলে ভিজে ভিজে নাচছে। কোথাও একটা গরু ডাকছে—হাম্বা। বোধ হয় ওর বাছুরটা এখনও মাঠে, বৃষ্টিতে ভিজছে।

টিনের চালে বৃষ্টি পড়ছিল—ঝুম ঝুম। সোনা দুটো হাত দু কানে চেপে রাখছে, সহসা হাত দুটো আলগা করে দিচ্ছে। দিলেই বিচিত্র এক শব্দ। কান থেকে হাত আলগা করে দিলেই, বৃষ্টির ঝমাঝম অন্দেবণের মতো এক শব্দ। বার বার কান চেপে, হাত মুদু আলগা করে—ওর এক ধরনের কানের ভিতর ঝম ঝম খেলা, বেশ মজা পেয়ে যাচ্ছে সে। সে এমন একটা মজার খবর জ্যাঠামশাইকে দেবার জন্য ইজিচেয়ারের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। জ্যাঠামশাই ইজিচেয়ারে লম্বা হয়ে শুয়ে আছেন। হাত কচলে কবিতা আবৃত্তি করছেন। সমস্বরে সেই গানের মতো। মায়া মাখানো জগতে কোথায় যে তুমি ঈশ্বর এই মাটি এবং ঘাসে কখন কিভাবে নেমে আস জানি না।

সোনা জ্যাঠামশাইর দু কানে দু হাত চেপে তালে তালে হাত খুলে দিয়ে তালি বাজাতে থাকল। টিনের চালে বৃষ্টির শব্দ শুনতে বলল জ্যাঠামশাইকে—শুনতে পাইতাছেন না! ওঁয়া ওঁয়া কইরা কাঁদাছে কারা? সে এমন বলল।

এই পৃথিবীতে নিরত কারা যেন কাঁদছে। আমরা জন্ম নেব এবার। ধনবৌ তখন বারান্দায় একটা বাঁশ ধরে দাঁড়িয়ে আছে। সেও সেই কান্না শুনতে পাচ্ছে। আমি এবারে জন্ম নেব। বাথায় মুখ নীল হয়ে যাচ্ছে ধনবৌর। উঠোনে এক হাঁটু জল। জলে বৃষ্টির ফোঁটা বড় বড়। অজস্র তারার মতো জলের উপর ফুটছে। উঠোনে অন্দর ঘর। দুকোনে কাঠ ফেলে দিয়ে গেছে ঈশম। পাঠ কাঠির বেড়া। উপরে শনের চাল। বাঁশের দরজা। ঈশম সারাদিন খেটে ঘরটা করেছে। বাথায় নীল হয়ে যাচ্ছে মুখটা। এ-ঘরে কেউ নেই। তার ডাকে কেউ সাড়া দিচ্ছে না। কারণ সারা আকাশ যেন এখন মাথার উপর ভেঙে পড়ছে। আকাশ ভেঙে প্লাবন নেমেছে। ব্যাং ডাকছে। কচুপাতায় পুতুল নাচ হচ্ছে। পাতাগুলো জলের ভারে নাচছে। রাম-রাবণের যুদ্ধ অথবা রাবণের সীতা হরণ। ধনবৌর মুখটা বাথায় নীল হয়ে যাচ্ছে। সে আর পারছে না।

বড় বৌ ভাবল, একবার খোঁজ নিয়ে যাবে। রান্নাঘরে রাতের খাবার তৈরি করতে যাবে সে। সন্ধ্যা না হতেই রাতের খাবার করবে। খিচুড়ি আর বেগুন ভাজা। খাবার সময় ধনের খবর নেবে।

সে হাঁটু জলে কাপড় তুলে রান্নাঘরে উঠে যাবার সময়ই দেখল ধন একটা বাঁশে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মুখ দেখে টের পেল, পৃথিবীতে ঈশ্বর আসছেন।

সে তাড়াতাড়ি দক্ষিণের ঘরে গিয়ে ডাকল, ঈশম একবার যাও নাপিত বাড়ি। নাপিত বৌকে ডেকে আন। ধন বড় কষ্ট পাচ্ছে ব্যথায়।

ঈশম যখন দরজায় এসে দাঁড়াল, বড় বৌ দেখল, ওর চোখ লাল।

—তোমার শরীর খারাপ!

—না মামী।

—চোখ লাল কেন?

—ইট্টু জ্বর হইছে। সাইরা যাইব।

এবার বড় বৌ বলল, লালটু কোথায়? পলটু!

—জানি না মামী।

—সোনা, এদিকে এস।

সোনা এলে বড় বৌ ছাতা খুলে দিল। —তুমি যাও। নাপিত জ্যাঠিকে ডেকে আনো।

—আমি যামুনে! ঈশম তাড়াতাড়ি গামছা মাথায় বের হয়ে এলে বড়বৌ বলল, ঈশম তোমার শরীর ভাল না, তুমি শুয়ে পড়গে। রাতে ভাত খাবে না। বার্লি খাবে। ছেলেরা সব বড় হয়েছে। তোমার যা কাজ, এবার থেকে ওরা কিছু কিছু করবে।

বড় বৌর এমন কথায়, ঈশমের চোখ জলে ভার হয়ে এল। সে বলল, শুকনা গাছের গুঁড়ি আর-ও আছে। গোদাম ঘরে থুইলা রাখছি। অসুখ ঘরে লাগলে কইয়েন। দিয়া আমু।

সোনা এমন দিনে বৃষ্টিতে ভেজার একটা কাজ পেয়ে গেছে। সে তাড়াতাড়ি নেমে এল উঠোনে। এবং ছাতা মাথায় যাবার সময় দেখল, মা একটা বাঁশে হেলান দিয়ে কেমন ঝুলে আছে যেন। মা, তার মা। কি সুন্দর আর সজীব ছিল। এখন তার মা ক্রমে কি হয়ে যাচ্ছে। ঘরের বারান্দা টিন কাঠের, দুটো খুঁটির উপর বাঁশ ঝুলেছে এবং মা এখানে অন্যদিন তার ভিজা কাপড় মেলে দেন। কিন্তু আজ কাপড় নয়, ভিজা কাঁথাও নয়, মা নিজেই কেমন ঝুলে আছেন। সোনার বড় কষ্ট হল মাকে দেখে। মাটিতে মার পা দুটো ঈষৎ ঝুলে আছে অথবা ছুঁয়ে আছে যেন মাটি। চোখ দুটো বড় বিষণ্ণ মায়ের। সে কেমন নড়তে পারছে না আর।

বড় বৌ বলল, দাঁড়িয়ে কি দেখছিস! তাড়াতাড়ি যা। বলবি, একুনি যেন চলে আসে।

সঙ্গে সঙ্গে ধনবৌ কাতর গলায় বলল, যা বাবা, নাপিত বাড়ির জ্যাঠিরে ডাইকা আন। লালটু কই গ্যাছে? অরে কখন থাইকা দ্যাখতাছি না। মার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে কথা বলতে। সে আর দাঁড়িয়ে থাকল না। সে এক দৌড়ে যাবে, এক দৌড়ে ফিরে আসবে। কোথাও কারো সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা বলবে না। গল্প করবে না।

সে ছুটল ছাতা মাথায়, জলে ভিজে ছুটল। ছাতায় জল আটকাচ্ছে না। গাছের নিচে জল পড়ছে টুপটাপ। ওর শরীর ভিজছে। কাদা জল ছলাৎ ছলাৎ ছড়াচ্ছে চারপাশে। সে মার কষ্টের মুখটা ভাবছে আর ছুটছে। পাল বাড়ির বাঁশ বাগান অতিক্রম করে সে মাঝি বাড়িতে উঠে গেল। নাপিত বাড়ির জ্যাঠা, এখানে কি একটা কাজে এসেছে। সে ডাকল জ্যাঠাকে, জ্যাঠা তুমি লও যাই। মায় কেমন করতাছে।

মাঝি বাড়ির ছোট বৌর দাঁতগুলো ভোঁতা। কি সব বলছে মার সম্পর্কে। ওর এ-সব শুনতে ভাল লাগছে না। বৌটার দাঁত কালো। মার বয়সী কি তারও বড়, মনে হয় জ্যাঠিমার বয়সী। কালো কুচকুচে দাঁত, কালমুটি কালপাহাড়ের মা! সোনা এবার উঁকি দিল ঘরে। কালপাহাড় ঘরে নেই। কালপাহাড় নিশ্চয়ই জোয়ারের জলে মাছ ধরতে গেছে। এমন দুর্দিনে সিজু সে মাঠে নেমে যেতে পারল না, জোয়ারের তাপে সে সরপুঁটি, পিতের বোয়াল ধরতে পারল না। ওর ভিতরে কষ্ট। বড়দা মেজদা হয়ত পালিয়ে চলে গেছে মাছ ধরতে। তার ভিতর থেকে এমন দিনে মাছ ধরতে না পারার কষ্ট ঠেলে ঠেলে উঠে আসছে। সে বলল, ও জ্যাঠা লও যাই! মায় কেমন করতাছে!

নাপিত জ্যাঠাকে খবর দিয়েই সোনা ছুটতে থাকল। ছুটছে আর ছুটছে। কাদা জলে ওর জামা প্যান্ট নষ্ট হচ্ছে। তবু সে

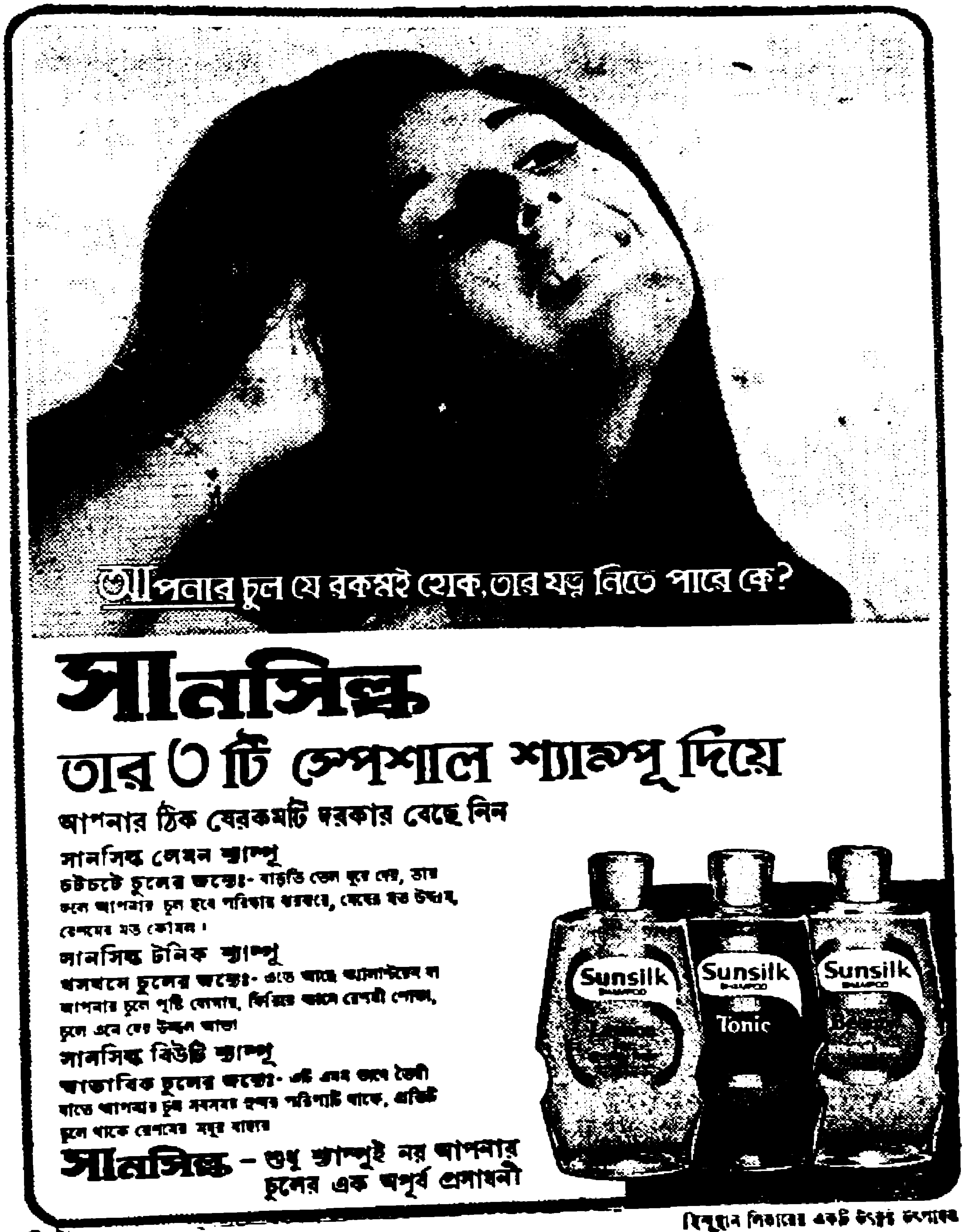

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

ছুটেছিল। কারণ এখন জল নামছে অবিশ্রান্ত ধারায়। আহা কি বৃষ্টি। কি বৃষ্টি! মাঠ জমি সব জলে ভেসে যাচ্ছে। সে এসেই খবর দিল মাকে, মা, জ্যাঠিমা কইছি। সে বড় জ্যাঠিমাকে খবর দিল, জ্যাঠিমা নাশিপত জ্যাঠি আইতাছে। বড় বৌ তখন উনুনে জল গরম করছে। আন্নারাণী এসেছে ছুটে। দীনবন্ধুর দুই বউ মানকচু পাতা মাথায় এসেছে খবর নিতে। বড় বৌ সবার সঙ্গে জল গরম করতে করতে কথা বলছে।

সোনা দেখল, মা তখন টিনকাঠের ঘরটা থেকে কেমন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ছোট ঘরটায় ঢুকে যাচ্ছে। সোনার ইচ্ছা হচ্ছিল মার মাথায় ছাতা ধরে। মার মুখ এমন নীল বর্ণ হয়ে গেছে কেন! সেই যে সে একবার নীল রঙের একটা আলো জ্বলতে দেখেছিল একটা ঘরে, নীল রঙের আলোর ভিতর সে এবং কমলা, অস্পষ্ট মুখের ছবি, মার মুখ কি কষ্টে যেন তেমন নীলবর্ণ ধারণ করছে। সে দাঁড়িয়ে দেখতে পাচ্ছে না।

ঈশম তখন বৃষ্টিতে ভিজে আরও দুটো শুকনো কাঠের গুঁড়ি ফেলে দিয়ে গেল। মা ঘরে ঢুকে গোঙাচ্ছে। সোনার ভারি কষ্ট হতে থাকল। সে ঝাঁপ খুলে মাকে বলবে ভাবল, তোমার কষ্ট হচ্ছে মা, আমি কি করতে পারি। আজ জোয়ারের জলে মাছ ধরতে যাব, বড় বড় সরপুঁটি সব জোয়ারের জলে উঠে আসছে।

আন্নারাণী বলল, বৌদি দুখটা পাইছেন।

সোনার রাগ হচ্ছিল বড় জ্যাঠিমার উপর। এখনও জ্যাঠিমা রান্না ঘরে কি করছে। বের হচ্ছে না।

বড় বৌ বলল, মুখ দেখেছি। সময় হয়নি। তুই ঘরে যা। আমি যাচ্ছি। ধনের মাথা কোলে নিয়ে বসে থাক।

সোনা রান্নাঘরে এসে দেখল বড় জ্যাঠিমা আর শোভার মার সঙ্গে ফিস ফিস করে কি কথা বলছে। সে বুঝতে পারছে না কিছু। নিরামিষ ঘরের পাশে বৃষ্টির জল বড় বড় ফোঁটায় পড়ছে। জলে দুটো ব্যাঙ লাফাচ্ছিল। এমন বৃষ্টির দিনে মার কষ্ট, অথবা ছোট ঘরটায় মার গোঙানি সে সহ্য করতে পারছে না। তাড়াতাড়ি মাঠে নেমে গেলে এ-সব শুনতে হবে না, দেখতে হবে না, সে পলোটা নিয়ে ছাতা মাথায় মাঠে নেমে গেলে জ্যাঠিমা বলল, ভাল হবে না সোনা। জলে ভিজলে জ্বর হবে।

সোনা বৃষ্টির শব্দে জ্যাঠিমার কথা শুনতে পেল না। সে ছাতাটা মাথায় দিল, এবং পা টিপে টিপে জল ভেঙে হাঁটছে। হাতে পলো। সে হাঁটছে। চার পাশে সতর্ক নজর, মাছ উঠে আসতে পারে। সে কালো জাম গাছটা পার হতেই শুনল কচুর ঝোপে কি খলবল করছে। সে উঁকি দিল ঝোপের ভিতর। মাছ। কৈ মাছ। পালেদের পুকুর থেকে নতুন জলের গন্ধ পেয়ে কৈ মাছ উঠে আসছে। সে পলো দিয়ে চাপ দিল। ভেবেছিল সব কটা কৈ পলোয় নিচে, সে হাত দিয়ে দেখল মাত্র দুটো। রান্নাঘরের দরজায় সে মাছ দুটো ছুঁড়ে দিল। বলল, জ্যাঠি দুটো কৈ। বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছে টাপুর-টুপুর। সে তখন দুটো কৈ মাছ ফেলে দিয়ে আরও মাছের জন্য মাঠের ভিতর নেমে গেল।

বৃষ্টি ফের জোর নামছে। আকাশটা ছাই রঙের। সুতরাং এসব দিনে বৃষ্টি ভিজে হাঁটু জল ভেঙে কোথাও যাওয়া অথবা ধানখেতে জোয়ারের জলে মাছ ধরা সবই সুখী ঘটনার মতো, আর ব্যাঙেরা ডাকছে চারিদিকে। ডালে বসে কাক ভিজছে। পাখিরা আকাশে উড়ছে না। ঘন মেঘ সব এখন আকাশে পাখিদের মতো ডানা মেলে ঝাপটাচ্ছে। চারিদিকে জল নামার শব্দ। পুকুরগুলো সব মাঠের জলে ভরে গেছে এবং কচুর পাতায় তখন পুতুল নাচ হচ্ছিল। বৃষ্টি পড়ছে টুপটাপ, পাতা ভিজছে, টুপটাপ বৃষ্টির ফোঁটায় কচুর পাতা নাচছে। সোনা পতুল খেলা দেখছে—রাম লক্ষ্মণ সীতা, রাবণ সুর্পনখা। এখন কচুর পাতা পুতুল নাচের মতো। জলের ফোঁটায় ওরা হাত-পা তুলে নাচছে। কখনও হোঁচট খাচ্ছে যেন। কখনও ডগাগুলো বৃষ্টির ফোঁটায় মাটির সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। কচুর ঝোপটায় সোনা অনেকক্ষণ পুতুল নাচ দেখল। ওর মন ভালো না। সে ধানখেতে নেমে একটা পাতা ছিঁড়ল ধানের। ভাবল ফতিমা ওর সঙ্গে মেলায় পুতুল নাচ দেখেছে। ফতিমা ফেরার সময় সোনাকে একটা মন্দ কথা বলেছে। এই যে ঈশ্বর তাকে একটা ভাই দেবে, মাকে ভগবান, একটা ভাই হতে পারে, বোন হতে পারে দিয়ে যাবেন—সেটা যেন ঠিক না। ফতিমা মন্দ কথা বললে সোনার মনটা কেমন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। রাস্তে মাকে চুপি-চুপি কথাটা বলে দিয়েছিল।

মা বলেছিল, ফতিমা নচ্ছাড় মেয়ে।

মা হয়ত আরও বলতে চেয়েছিল, তুমি ওর সঙ্গে যাবে না সোনা। তুমি ওর সঙ্গে কোথাও একা যাবে না।

মা সোনাকে বলেছিল, ঘরটায় ঢুকে মা বসে থাকবে, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করবে ঈশ্বর ভাইটাকে মার কাছে দিয়ে যাবে। ওর বড় জানার ইচ্ছা তখন, সে কি করে এসেছে মার কাছে?

মা বলত, ওকে কারা রাস্তায় ফেলে গিয়েছিল, মা তাকে রাস্তা থেকে তুলে এনেছে।

সোনা তখন হাউ-হাউ করে কাঁদত। কোন কোন দিন সে তার জামা-প্যান্ট নিয়ে চলে যেত গোপাটে। সে অন্ধকারে একা-একা সেখানে বসে থাকত। মা তাকে খুঁজে নিয়ে আসত। কোলে তুলে বলত সোনাকেও তার ভগবান কোন আলো করে রেখে গেছে।

এখন সোনার জানার বড় ইচ্ছা, মা এই যে আজ। ছোট্ট একটা ঘরে ঢুকে গেল, কাঠের শুকনো সব গুঁড়ি, গুঁড়িতে আগুন জ্বলানো হবে, ধূপ ফেলে মা আগুনে জেলে আরাধনা করবে, সেই এক ছোট্ট ঘরে থেকে মা তাকে নিয়ে তেমনি বের হয়েছিল কিনা।

কিন্তু কেন জানি, কি এক রহস্য এই জন্মের ভিতর, সে বুঝতে পারে না ছুঁতে পারে না রহস্যটাকে। ধানপাতাগুলি নড়ছে। টুপটাপ বৃষ্টি। সে ছাতা মাথায় অল্প জলে দাঁড়িয়ে আছে। জল আর জল, পুকুর খাল বিল ভরে জমিতে জল উঠে আসছে। ধানের গোড়া জলে ডুবে গেছে, পাতাগুলো বাতাসে নড়ছে। সে বুঝতে পারে না, ছুঁতে পারে না রহস্যটাকে। জোয়ারের জলে তার পা ডুবে যাচ্ছে। চার পাশের জমি, ধানখেত, পাটখেত জোয়ারের জলে ভেসে যাচ্ছে। মার নীলবর্ণের মুখ দেখে সেও কেমন ব্যথায় নীল হয়ে যাচ্ছে।

আর তখনই সে দেখল একটু দূরে ধানগাছগুলো তিড়িং তিড়িং করে সরল রেখায় ছুটে যাচ্ছে। আবার দূর থেকে তিড়িং তিড়িং করে ধানগাছগুলো বৃত্ত সৃষ্টি করে ক্রমাগত এক জায়গায় এসে দাঁড়াচ্ছে। খেলাটা বড় মজার। গাছগুলো প্রাণ পেয়ে যাচ্ছে। কখনও সরল রেখায়, কখনও ছোট্ট ত্রিভুজের মতো অথবা কোণ সৃষ্টি করে গাছগুলো ছুটে বেড়াচ্ছে। গাছের পাতা বৃষ্টির ফোঁটায় নড়ছে না। জলের নিচে মাছ ছুটে আসছে, খেতের ভিতর ঘুরছে—একটা দুটো নয়, অনেক কটা মাছ। জোয়ারের জলে তার পায়ের পাতা ডুবে গেছে কখন। হাঁটুর নিচে জল উঠে এসেছে। গাছের গোড়ায় জোয়ারের জলে খেলা করছে বলে ধানগাছগুলো এখন তিড়িং তিড়িং করে ছুটে বেড়াচ্ছে। সে এবার সন্তর্পণে ডাহুকের মতো পা বাড়াল। কারণ জলে বেশি শব্দ করতে নেই। বৃষ্টির শব্দ, ব্যাঙের শব্দ, ঝিঁ-ঝিঁ পোকার শব্দকে ডিঙিয়ে জলে তার পায়ের শব্দ কিছুতেই বেশি হবে না। মাটি জল শুষে নিচ্ছে বলে ফুর্‌-ফুর্‌ এক শব্দ এবং জলের উপর অজস্র ফুটকরি। জলের উপর অজস্র ফুটকরি ভেসে উঠে ভেঙে যাচ্ছে, ভেসে যাচ্ছে। এত সব শব্দের ভিতরও সোনা সন্তর্পণে পা সুচলো করে একটা ডাহুকের মতো শিকারের আশায় পা বাড়াতে থাকল।

সে মাছগুলোর পিছনে হেঁটে-হেঁটে অনেক দূর চলে এসেছে। আর দুটো জমি পার হলেই ফতিমাদের পুকুর, মোত্রাঘাসের জঙ্গল। মোত্রাঘাসের জঙ্গলের ভিতর দিয়ে জমির জলটা ওদের পুকুরে পড়ছে। মোত্রাঘাসের ভিতর ঢুকে ফতিমা নিশ্চয়ই মাগুর মাছ ধরার জন্য বড়শি ফেলেছে।

সামনের জমি উঁচু, জল কম। মাছগুলো এখনও গাছের গোড়ায় নড়ছে। কম জলে উজানে উঠে যাচ্ছে মাছ। সে মোত্রাঘাস অতিক্রম করে যেখানে ফতিমার মাছ

ধরার কথা সেখানে গিয়ে বসে থাকবে কিনা ভাবল। কারণ সে বুঝতে পারছে না, এই যে চারপাশে সব ধানগাছ দ্রুত ছুটে বেড়াচ্ছে তার নিচে কি সব মাছ আছে। মাছ হতে পারে আবার সাপও হতে পারে। জলের নিচে মাছ না সাপ সে ঠিক বুঝতে পারছে না।

তখন একটা শোল মাছ কিছুতেই ধানখেতের আল পার হতে পারছিল না। আলে এসে মাছটা আটকা পড়েছে। এবং বাধা পেয়ে মাছটা জলে লাফ দিতেই দেখল সোনা এক ছাতা মাথায় পলো হাতে দাঁড়িয়ে আছে। মাঠময় জোয়ারের জল। সবাই জোয়ারের জলে মাছ ধরার জন্য কোচ পলো নিয়ে হাঁটছে। সোনা জলে দাঁড়িয়ে কি ভাবছে। মাছটা ভয়ে-ভয়ে লেজ নেড়ে সহসা মোত্রাঘাসের জঙ্গলে অদৃশ্য হয়ে গেল। সোনা মাছটা এত সামনে পেয়েও ছুটে গেল না। সে জানত মাছটার সঙ্গে সে ছুটে পারবে না। ধীরে-ধীরে খুব সন্তর্পণে আবার ডাহুকের মতো সে ধানখেতে হাঁটতে থাকল। যদি কোথাও বোয়ালের উপর চোখ পড়ে। অথবা সোনার ইচ্ছা এখন, বৃষ্টি আরও ঘন হোক, এবং পাটখেতে ঘন অন্ধকার নামুক। আকাশ ছেয়ে মেঘ তাড়কা রাক্ষসীর মতো ছুটে বেড়াচ্ছে এবং ভয়ঙ্কর বজ্রপাতের শব্দ, পৃথিবী যেন ভেসে যাবে, মাছেরা কি নিরাপদে জলের ভিতর খেলে বেড়াচ্ছে তখন! সোনাও খুব নিরাপদে ফতিমার পাশে চুপি-চুপি দুজনে ছাতা মাথায় মাছ ধরার নামে পাশাপাশি বসে থাকবে। এক সঙ্গে বসে জল নামার শব্দ শুনবে। কোথাও তীক্ষ্ণ বিদ্যুৎ চমকালে সে আর ফতিমা পরস্পরে ভয়ে জড়িয়ে ধরবে। তারপর ছোট একটা কথা বলে ফতিমার মুখ দেখবে। মুখের রেখায় কি রং ফুটে ওঠে দেখবে।

যদি রঙটা জানপার আমগাছের সিদুরে আমের মতো হয়, যদি পাতার মতো রঙ ধরে, যদি ফতিমা রাগ করে অথবা ওদের চাকরটাকে বলে দেয়...ছিঃ-ছিঃ সোনা কি সব জোয়ারের জলে দাঁড়িয়ে ভাবছে! মার মুখটা মনে পড়ল নীলবর্ণ মুখ। ঘরের কোণে শুকনো কাঠের গুঁড়ি জ্বলছে। আগুনের চার পাশে মা, জ্যাঠিমা সকলে গোল হয়ে বসে আছে। ওরা প্রার্থনা করছে হাত তুলে। রাত হলেই ঈশ্বর নেমে আসবেন পৃথিবীতে। আগুনের পাশে এক শিশুকে শুইয়ে দেবে। সে যে কি নাম রাখবে ভাইটার! ভাই না বোন। বোন হলে ভাল হয়। আকাশে কি প্রচণ্ড মেঘের গর্জন। যেন সব দেবদূতেরা মিলে পৃথিবী থেকে সব দুঃখ তাড়িয়ে দিচ্ছে। তাড়কা রাক্ষসীকে তাড়িয়ে ওরা আকাশের অন্য প্রান্তে নিয়ে যাচ্ছে। অথবা সে যেন দেখতে পেল চারপাশে আগুন, মা মাঝখানে, জ্যাঠিমা, নাপিত জ্যাঠি, আবুর মা আগুনের চারপাশে নৃত্য করছে। ভয়ে মা বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে। শালুক পাতার মতো রক্ত মুখে। মা যদি সোনার মনের ভাবটা এখন জানতে পারত! মা, সোনার মা, জগতে একটি মাত্র মা, সোনার মা। সে মা-মা বলে ডেকে উঠল।

বিচিত্র সব চিন্তা সোনা আজকাল করতে শিখেছে। সেই অমলা ওকে কি যে শেখাল! তারপর থেকেই সে কেমন অন্যমনস্ক হয়ে যায় মাঝে-মাঝে। কি সব আজেবাজে দৃশ্য চোখের উপর ভাসতে থাকে। আঁধার রাত, গ্রামের সব কুকুর-কুকুরী এবং ধলি গাইর বাচ্চা হবার আগের ঘটনা। বাচ্চা হবার আগে, কোন গ্রীষ্মের দিনে গরুটা সারা মাঠে ছুটে বেড়াত। কেউ কাছে যেতে সাহস পেত না। কাছে গেলেই লাফাত। তারপর ঈশমদা ওটাকে কত কায়দায় ধরে আনত। ঈশমদা আর ও-পাড়ার হরিপদ গরুটাকে নিয়ে সকালে-সকালে কোথায় চলে যেত। গরুটা তখন হাম্বা করে ডাকত কেবল। হরিপদর কাঁধে দুটো বাঁশ, ঈশমদা গরুটার দড়ি ধরে রাখত। আর ফিরত রাত করে। এসেই ছোট কাকাকে কৌশলে কি বলত। সোনা কিছু বুঝতে পারত না। এই ধলি তখন গোয়ালে ঘন্টার পর ঘন্টা লম্বা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ঠাকুমা বার-বার সাবধান করে দিতেন ঈশমকে, ঈশম ধলির খাওন দেইস না, দিলে ডাক থাকব না।

ঠাকুমার কথা শুনে মনে হত গরুটা সারা দিন সারা মাঠ ছুটিয়ে মেরেছে সকলকে। তার শাস্তি দিচ্ছে ঠাকুমা। সোনা তখনই দেখল অনেকগুলো ধানগাছ নড়ে উঠছে। নিশ্চয়ই ধানগাছের গোড়ায় জলের ভিতর অনেকগুলো মাছ এক সঙ্গে খেলা করছে। সোনা এবার পলোটা চেপে বসাল মাটিতে। সে পলোর উপর উঠে দাঁড়াল। উঠতেই একেবারে সর্বনাশ—ওর চোখের তারা বড় হয়ে গেল। গোল-গোল হয়ে গেল। কি বড় সাদা বোয়াল! মাছটা চিৎ হয়ে আছে। কোটকা মাছের পেটের মতো সাদা বোয়ালের পেট জলের উপর ভাসছে। মাছটার সে সবটা এখন দেখতে পাচ্ছে। মাছটা খুশীতে, এমন জোয়ারের জলে, মেঘলা দিনে লেজ নাড়ছে।

সোনা এর আগে কোনদিন গিয়ে বোয়াল ধরে নি। ঈশমদা, চন্দরের চাকর, কালাপাহাড়, গিয়ে বোয়াল ধরেছে। এবং এমন সব গল্প সোনা ঈশমদার কাছ থেকে শুনেছে। সোনা গিয়ে বোয়াল ধরা দূরে থাকুক, সে দেখে নি পর্যন্ত। আজ প্রথম দেখল। দেখে বুঝতে পারল, এটা মেয়ে বোয়াল, ডিমে পেট উঁচু। চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। ওর কেন জানি সহসা মনে হল মা ঠিক বোয়াল মাছটার মতো অসুখ ঘরে শুয়ে আছে। আগুন জ্বলছে চারপাশে। জ্যাঠিমা ঘুরে-ঘুরে নৃত্য করছে। মার নীলবর্ণ মুখ সাদা ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে।

সোনার মনে হল জলের ভিতর এত বড় মাছটাও কাতর। ব্যথায় নীলবর্ণ না হলে এত বড় মাছটা এমন কম জলে উঠে আসবে কেন!

আবার সেই ডাহুক, ডাহুকের মতো সে হাঁটছে। কিছু সাদা বক ধানখেতের উপর উড়ে বেড়াচ্ছিল। ওরা কম জলে কুচো মাছ ধরে খাচ্ছে। সোনার ইচ্ছা হল সাদা বকেরা যেমন সন্তর্পণে পা বাড়ায় জলে সে তেমনি হাঁটবে। বকগুলো গঙ্গাফড়িং খাচ্ছে এবং ছোট-ছোট পুঁটি মাছ ধরছে। ডারকিনা মাছ ধরছে। ডারকিনা, পুঁটি শাড়ি পরেছে বর্ষার জলে। লাল চোঁখ, তসর গরদ, ঠিক যেন পুজো মণ্ডপে মার মতো। তখন কে বলবে এই মা তার একটা ছোট্ট ঘরে ঢুকে আগুন জেলে বসে থাকবে।

কালাপাহাড় হলে এতক্ষণে কোচ ফিকে দিত বোয়ালটার গায়ে। এবং বোয়ালটাকে জিমসুদ্ধ ধরে নিয়ে যেত। কিন্তু সে তা চাইল না। খেলাটা জমুক। বোয়ালের আরও কাছে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। অন্য বোয়ালগুলো যখন ওর উঁচু পেট কামড়াতে আসবে অথবা গিয়ে রাঁধবে সকলে মিলে তখন সুযোগ মতো পলোতে এক চাপ এবং সঙ্গে-সঙ্গে আট-দশটা বোয়াল পলোর নিচে। একসঙ্গে সে এতগুলো বোয়াল নিয়ে যাবে কি করে!

গাভীন বোয়ালটার কিছু দূরে দাঁড়িয়ে থাকল সোনা। ভয়, ওকে দেখে মাছটা না আবার গভীর জলে নেমে যায়। কিন্তু একটা খবর সে রাখে, গাভীন বোয়ালের ব্যথা উঠলে বেশি নড়তে পারে না। বোয়ালটার এখন নিশ্চয়ই ব্যথা উঠেছে। ডিম পাড়ার ব্যথা। মাছটার ভয়ঙ্কর কষ্ট। বৃষ্টির ফোঁটা বড় হয়ে পড়ছে না এখন। ছোট-ছোট ফোঁটা। ঝড়ো হাওয়া থেমে গেছে। কড়াৎ-কড়াৎ শুধু বজ্রপাতের শব্দ। পুটিকর অন্য বোয়াল ঘুরে বেড়াচ্ছে হয়ত মাঠে। প্রসবের এক নির্মিশ্রিত গন্ধ এই জলের ভিতর অন্য মাছদের উত্তেজিত করে তুলছে। এবং ওরা যাবে বোয়ালটার কাছে

সকল ঋতুতে অপরিবর্তিত ও অপরিহার্য পানীয়
চা
কেনবার সময় 'অলকানন্দার'
এই সব বিক্রয় কেন্দ্রে আসবেন
অলকানন্দা টি হাউস
৭, পোলক স্ট্রীট কলিকাতা-১
২, লালবাজার স্ট্রীট কলিকাতা-১
৫০, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ কলিকাতা-১২
॥ পাইকারী ও খুচরা ক্রেতাদের অন্যতম বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান ॥

আসবেই। না এলে পেট ফুটে ডিম বের হবে না। পুরুষ বোয়ালেরা, কি ওরা মেয়ে বোয়ালও হতে পারে—জোরে-জোরে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়বে পেটে, পেট থেকে ডিম বার করে দেবে। মাছটা তাই নড়তে পারছে না। চিত হয়ে পড়ে আছে। সুতরাং সোনা একটা শ্যাওড়া গাছ হয়ে গেল। সে হাতা-মাথার চুপচাপ ঠিক একটা ছোট্ট গাছের মতো মাঠের ভিতর মাছটাকে দেখতে থাকল। সে নড়ল না। উলানি পোকা পা কামড়ে ফুলিয়ে দিয়েছে। সে তবু চুলকাল না। চুলকালেই নড়তে হবে, নড়তে হবে। শ্যাওড়া গাছ ইচ্ছামতো নড়তে পারে না। সে অনেকক্ষণ নিজেকে শ্যাওড়া গাছ করে রাখল। অন্যান্য মাছেরা ডিমের গন্ধে উঠে আসুক, না আসা পর্যন্ত সে শ্যাওড়া গাছ হয়েই থাকবে। তখন কিনা একটা ছোট্ট বোয়াল ওর পা ঘেঁষে চলে গেল। কি আশ্চর্য মাছটা ওকে শ্যাওড়া গাছ ভেবে ফেলেছে। মাছটা গা ভাসিয়ে বড় মাছটার পেট কামড়ে ধরল। পেট থেকে ডিম বার হচ্ছে। জলে-জলে ডিম ভেসে স্রোতের মুখে কাগজের নৌকার মতো ভেসে গেল। সোনা সারাক্ষণ শ্যাওড়া গাছ হয়ে কাগজের বিন্দু-বিন্দু নৌকা জলের উপর ভাসতে দেখল।

জীবের এই জলরহস্য সোনাকে কিছুক্ষণ অভিভূত করে রাখল। গাছপালা পাখি নিয়ত তার চারপাশে ঘুরছে। বড় হচ্ছে আবার বিনষ্ট হচ্ছে। এই সব গাছের নিচে কত মাছ হবে আবার। বিন্দু-বিন্দু কাগজের নৌকা আবার মাছ হয়ে যাবে, বড় হয়ে যাবে, বড় হলেই জোয়ারের জলে উঠে আসবে। খেলা করবে। ডিম ফুটে বাচ্চা বের হবে। সোনা এমন মজার খেলা দেখতে-দেখতে ক্রমে কেমন প্রস্তরীভূত হয়ে যাচ্ছে। ওর হুঁস নেই যেন। তখন মনে হচ্ছে গ্রামের ভিতর থেকে তাকে কে ডাকছে—সোনাবাবু আপনের আর মাছ ধরতে হইব না। বাড়ি আসেন।

সোনা দেখল বৃষ্টি মাথায় ঈশম গাছতলা থেকে ডাকছে। সে উঠে দাঁড়াল। একটা মাছও নেই সামনে। মাছগুলো এই জলে এসেছিল সন্তানের জন্ম দিতে। ওরা জন্ম দিয়ে চলে গেছে। কেবল কিছু জল আর ধানগাছ, আর বৃষ্টি, ডাকিনী রাক্ষসীর মতো মেঘেদের ভেসে বেড়ানো, এবং এক গভীর অন্ধকার চারপাশে যেন নামছে। সোনা খালি হাতে উঠে যাচ্ছে। সে এত সামনে এমন পিরের বোয়াল পেয়েও ধরতে পারল না। কেমন এক অন্য পৃথিবী ক্রমে তার রহস্য খুলে ধরছে। যত ধরছে তত সে সোনা থাকছে না, অতীশ দীপঙ্কর হয়ে যাচ্ছে। সে ফতিমার খোঁজে তাড়াতাড়ি মোত্রাঘাসের জঙ্গলে ঢুকে গেল। দেখল ফতিমা নেই। তার মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল।

বৃষ্টির ফোঁটা এবার বড় হয়ে পড়ছে। সে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে হাঁটল। টিলা ধরে বাড়ির সীমানায় উঠে দেখল, কচুর ঝোপে আবার পুতুল নাচ হচ্ছে। রাম রাবণ সুর্পনখা। সে মুখ ভেংচে দিল সুর্পনখাকে। শুধু রাম রাবণ এখন কচুর ঝোপটার যুদ্ধের মহড়া দিচ্ছে। ওর মন ভাল নেই বলে কচুর ঝোপে বৃষ্টির ফোঁটায় রাম-রাবণের যুদ্ধ দেখতে থাকল।

ঈশম আবার ডাকল, কি করতাছেন কচুর ঝোপে!

সোনা জল ভেঙে উঠোনে উঠে এল। ঈশম দক্ষিণের ঘরে চলে গেছে। সে এখন একা। কেউ নেই চারপাশে। রান্নাঘরের শেকল তোলা। ছোট্ট ঘরটার চার পাশে কত বড়-বড় সব সোনা ব্যাঙ। ওরা মুখ তুলে কেবল ডাকছে। তুমুল আর্তনাদের মতো মনে হচ্ছে, এই বৃষ্টির শব্দ, এবং কীট-পতঙ্গের ডাক। অজস্র বেতপাতা ঘরটার চারপাশে। ঘরের ভিতর থেকে ধোঁয়ার গন্ধ বের হচ্ছে। পিরের বোয়াল গেছে, মোত্রাঘাসের জঙ্গলে ফতিমা নেই, মা ছোট ঘরটায় চুপচাপ আগুন জেলে শুয়ে আছে। ওকে আজ মেজদার সঙ্গে একা থাকতে হবে। একা থাকতে হবে ভেবে ওর এই বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে কাঁদতে ইচ্ছা হল।

তখনই মনে হল ছোট্ট ঘরটায় মা ভীষণ কষ্টে গোঙাচ্ছে। মার মুখ নীলবর্ণ বড় জ্যাঠিমার গলা সে পাচ্ছে। নাপিত বাড়ির জ্যাঠি কথা বলছে। আবুর মা হারান পালের বৌ ঘরের ভিতর কি যেন করছে। মার কষ্টের আওয়াজটা কিছুতেই থামছে না। তার মতো অথবা মেজদার মতো মা আবার একটা ভাই ভগবানের কাছ থেকে চেয়ে নিচ্ছে। সে যে এখন এখানে একা দাঁড়িয়ে কি করবে বুঝতে পারছে না। পলোটা ফেলে দিল উঠোনে। এবং মা, তার মা, পুজোমণ্ডপের মা ছোট্ট ঘরটায় কি করছে এখন! সে স্থির থাকতে পারছে না। চুপি চুপি সে ছোট ঘরটার দিকে হেঁটে যাচ্ছে। পিরের বোয়াল ধরার সময় অথবা ফতিমার পাশে বসার মতো উত্তেজনায় ও কাঁপছে। ঠিক প্রার্থনা নয়, ঠিক কষ্ট নয় ঠিক অন্য কিছু হচ্ছে এই সংসারে যা সে এতদিন জানতে পারেনি। সে চার পাশে যখন দেখল কেউ নেই, বেড়ার ফাঁকে গোপনে মুখ গুঁজে দিল।

তারপর, তারপর সোনার এই সংসার জগৎময় বিস্ময়ের পাক খেতে থাকল। সে চোখের উপর এসব কি দেখছে! সে আশ্চর্য, না কি সে ক্রমে বোবা হয়ে যাচ্ছে! তার মা, তার একমাত্র মা, জগতে যার নাই তুলনা, মরা সাপের মতো অথবা ধাড়ি বোয়ালের মতো পেট উঁচু করে পড়ে আছে। বড় জ্যাঠিমা, নাপিত বাড়ির জ্যাঠি, হারান পালের বৌ সকলে খোলা পেটের উপর উবু হয়ে আছে। ওর এবার সহসা চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছা হল—মা! গলায় রগ ফুলে উঠছে তার। পুজোর সময় বাবুদের বাড়ি পাঁঠা বলি হয়—ছাল তুলে নেওয়া বলির পাঁঠার মতো মাকে দেখতে। বীভৎস। ওর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল। এ যেন তার মা নয়, সে তার এ-মাকে চেনে না। কারণ তখন পৃথিবীতে আর এক ঈশ্বর নামছিলেন। নাপিত বাড়ির জ্যাঠি তিনবার উলু দিতে বলছে। সবাই একটা জীবের পাশে দাঁড়িয়ে উলু দিচ্ছে। সোনা সেই ঈশ্বরকে দেখল। সে ওর জন্ম দেখল এবং নিজের জন্মের কথা ভেবে সে কেমন বেদনায় মূক হয়ে গেল। জল ভেঙে সে দক্ষিণের ঘরে উঠে গেল চুপচাপ। তেমনি বৃষ্টি পড়ছে বড় বড় ফোঁটায়। ঈশম বৃষ্টির শব্দ শুনছে দরজায় বসে। পাগল জ্যাঠামশাই ইজিচেয়ারে বসে আছেন। ঝড়ো হাওয়া, বৃষ্টি এসব দেখে তিনি কেমন উদ্বিগ্ন। সোনা জলে ভিজে শীতে কাঁপছে। শশিভূষণ ওর গামছা দিয়ে শরীরের জল মুছে দিল। বলল—তোর একটা বোন হয়েছে সোনা।

সোনা কথা বলতে পারছিল না। শীতে থর থর করে কাঁপছিল। শশিভূষণ চাদর দিয়ে ওর শীত নিবারণের চেষ্টা করছে। সোনা তক্তপোষের উপর বসে সাধকের মতো চোখ মেলে তাকাল বাইরে। ভয়ঙ্কর কঠিন কিছু দেখে সে স্থবির হয়ে যাচ্ছে। জ্যাঠামশাই পর্যন্ত ওর এমন মুখ দেখে ভয় পেয়ে গেলেন।

সোনা একা জানালার পাশে চাদর গায়ে বসে থাকল। ক্রমান্বয়ে বৃষ্টি হচ্ছে। ক্রমান্বয় কচুর পাতায় পুতুল নাচ হচ্ছে। সব হয়ে যাচ্ছে একভাবে। বৃষ্টি, বজ্রপাত, পুতুল নাচ এবং জীবের জন্ম, সব একভাবে হয়ে যাচ্ছে। গাছের গুঁড়িতে কাগজের বিন্দু বিন্দু নৌকা মাছ হয়ে গেল। পুজো-মণ্ডপের মা আর মা থাকল না। কেমন একটা মরা সাপ হয়ে গেল। সে আর এই মাকে কাছে নিয়ে শুতে পারবে না। কেমন এক দুরারোগ্য ব্যাধি মানুষের শরীরে, মাকে ছুঁতে গেলেই তার এমন মনে হবে। সে এবার ভীষণ কষ্টে দু হাঁটুর ভিতর মাথা গুঁজে দিল। মার নীলবর্ণের মুখটা কিছুতেই আর মনে করতে পারল না। কেবল সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকল।

(ক্রমশঃ)

হাওড়া
কুষ্ঠ কুটীর

সর্বপ্রকার চর্মরোগ, বাতরক্ত, অসাড়তা, ফুলা, একজিমা, সোরাইসিস, দূষিত ক্ষতাদি আরোগ্যের জন্য সাক্ষাতে অথবা পত্রে ব্যবস্থা লউন। প্রতিষ্ঠাতাঃ পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা কবিরাজ, ১নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া। শাখাঃ ৩৬, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৯। ফোন ঃ ৬৭-২৩৫৯।

নিকটেই আছে

নট ট্রান্সফারেবল

স্টেশনের গায়েই কার্তিকচরণ সাহার দোকান—শ্রীদুর্গা স্টোর্স। এনামেলের হাঁড়ি-কড়াই, বাসন-কোসন, বাটি-টাটি সবই পাওয়া যায়। আর পাওয়া যায় রেলের মান্থলি। জবর ব্যবসা। দুটোই সমানে চালাচ্ছেন সাহামশাই একযুগের ওপর। হিসেবে কোন ভুলচুক নেই। সাইড বাই সাইড একই টিনের চালের তলায় দুটো ব্যবসা চললেও হিসেবের খাতা আলাদা—হিসেবকারীও আলাদা। এনামেলের বিক্রী-বাটা, হিসেব-টিসেব সব দেখে মেজভাই গণেশ। ওতে ঝামেলা কম। ঝামেলার ব্যাপারটা দেখাশোনা করেন নিজেই। এতো আর শুধু বড়বাজার থেকে সস্তায় মাল কিনে এনে দেড়াদামে বেচা নয়, এর সঙ্গে যে অনেক মানুষের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ—তাদের পাওনা ঠিক-ঠাক সময়মত মেটাতে না পারলে যে হাতে দড়ি পড়বে। গণেশ তো আর বয়সে ছোট, অনভিজ্ঞ গণেশের ঘাড়ে এ বোঝা চাপাতে পারেন না। এতে অনেক ক্যাচাং, পান থেকে চুন খসলে, ঘটি-বাটি বেচেও তখন আর নিস্তার মিলবে না। আগে এতো ঝামেলা ছিল না, এখন লাইনে অনেক প্যাঁচাকল। সুযোগ বুঝে সব শালা দাঁও মারছে।

তা মারছে মারুক। ভগবানের আশী-র্বাদে তবু যা আসছে তাই যথেষ্ট। কিন্তু ঘরের লোক যদি অবুঝ হয় তাহলে আর কার্তিকচরণ কি করবেন। ইচ্ছে করে সব শালাকে ঘাড় ধরে বিদায় করে দেন, কিন্তু উপায় নেই। উপায় নেই বলে কি রতন যা ইচ্ছে তাই করবে? চীৎকারে ফেটে পড়লেন কার্তিকচরণ—রতন, শালা হারামীর বাচ্চা কোন চুলোয় গেছে? দোকানের দোরগোড়ায় টুলের ওপর বসে গণেশ ঢুল-ছিল। লাস্ট ট্রেন পৌঁছোতে আর বাকী নেই বেশী, মিনিট দশেকের মধ্যেই এসে পড়বে। এত রাতে বেচাকেনার কোন প্রশ্নই ওঠে না। তবে দোকান খোলা না রেখেও উপায় নেই। লাস্ট ট্রেনেই বেশী মান্থলি জমা পড়ে। তাছাড়া কাল সকালের হিসেবটা এখনই বেঁধে না রাখলে সকালে আর খেই মিলবে না। কার্তিকচরণ সন্ধ্যে থেকে সেই হিসেবই কষছিলেন। কার পাওনা কত? কে কত জমা দিয়েছে? কমিশন বাদ দিয়ে দোকানের থাকল কত? আজ কোন কোন পার্টি বাকলা করে গেছে? তার ওপর পরশু মাসপয়লা। সরকারী অফিস সব ছুটি—মাইনে হবে পরের দিন। কিন্তু শ্রীদুর্গা স্টোর্সের তো আর পেমেন্ট ফেলে রাখার উপায় নেই। রাখলেই মানুষরা বেজার হবেন। বড়বাবুর পাওনা মেটুনো—উনি কোতোয়ালীর বড় কর্তা। ছোটবাবু, স্টেশন মাস্টার, তাকে দিতে হবে একশো। সব মিলেছে শুধু মেলে নি চব্বিশটা মান্থলির পাত্তা। গণেশ জানে সব, তবে বলতে পারে নি।

তখনই পই পই করে রতনকে বারণ করেছিল—সাধ যাদা টের পেলে কিন্তু আর আস্ত রাখবে না। তোর দরকার থাকে, আমি টাকা দিচ্ছি সাধুখাঁর দোকান থেকে ভাড়া নিয়ে নে। দোকানের হিসেবে হাত দেওয়া দাদা পছন্দ করে না। আর অন্য দোকানেও যখন ভাড়া পাওয়া যাচ্ছে—।

সেকথা গণেশের উপদেশ কানেই যাবে নি রতন। বিশ বছরের তাগড়া জোয়ান, বীণাপাণি স্পোর্টস ক্লাবের পার্মানেন্ট স্টপার রতন। ক্যাশবাক্সের ঢাকনা খুলে মান্থলি টিকিটের তাড়া থেকে গুণে গুণে চব্বিশখানা টিকিট তুলে নিয়ে, মেজদাকে বলেছে—দাদা তো আসবে সেই সন্ধ্যার পর। আমাদের খেলা শেষ হয়ে যাবে সাড়ে চারটের ভেতর। এখান থেকে তো মোটে চারটে স্টেশন। দেখিস ঠিক সন্ধ্যের আগেই ফিরে আসব। সন্ধ্যে গড়িয়ে রাত দুপুর হতে চলল এখনো ছেলের পাত্তা নেই। একটু বাদেই লাস্ট ট্রেন আসবে। ছেলেটা একেবারে গোল্লায় গেছে। কারো কথা শুনবে না। মা লাই দিয়ে দিয়ে একেবারে বাঁদর করেছে। কিছু বললেই বলে কোলের ছেলে, ও যদি দুষ্টুমি না করে তো কি তোরা করবি?

কার্তিকচরণ পঞ্চাশ ছুঁয়েছেন। গণেশের চুলেও পাক ধরেছে। তারপর পাঁচটি বোন। সবশেষে রতন। কিছু বললেই মার মুখ হাঁড়ি হয়ে ওঠে। ওদিকে রতন যে পাড়ার ক্লাবের মাস্তান হতে গিয়ে ব্যবসা লাটে তুলছে সে কথা তো আর মা জানে না। প্রায়ই এখানে ওখানে দল নিয়ে যাচ্ছে ফুটবল খেলতে। আর সব দায় এই দোকানের। এসব কথা দাদাও জানেন না। জানেন না মানে গণেশ বলেনি তাকে। এমনিতেই রাগী মানুষ। খেপলে আর দিশে থাকে না। তাই যতটা সম্ভব আড়াল করেই রেখেছে গণেশ এতদিন। কিন্তু আজ আর ঢাকা যাবে না।

সন্দেহ কার্তিকচরণেরও যে হয়নি, তা নয়। ভোর চারটেয় এসে দোকানে বসেন, দুপুর বারোটা দশের ট্রেন ছাড়ার পর বাড়ী যান দুটি খেতে। এর মধ্যে গণেশ বাড়ীর বাজার-টাজার শেষ করে দোকানে চলে আসে। ওকেই সব হিসেব বুঝিয়ে দিয়ে বাড়ী ফেরেন কার্তিকচরণ। খেয়ে দেয়ে, ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম করে সন্ধ্যার মুখে মুখেই দোকানে চলে আসেন। তখনি খদ্দেরদের ভিড়টা উথলে ওঠে। একা গণেশ সামলে উঠতে পারে না। কিন্তু রোজই দেখেন বিশ বাইশটা মান্থলি পড়ে থাকবে। তাড়া হয় না। মান্থলি যাদের তারা তো আর সে কথা শুনবে না। কমিশন ঠিকই তারা আদায় করে নেবে। মাঝখান থেকে লোকসান হচ্ছে দোকানের। ব্যাপারটা কি ঠিক ধরতে পারছিলেন না। গণেশকে জিজ্ঞাসা করলে হুঁ হাঁ করে কি যে জবাব দেয়, বোঝা দায়। তাই আজ বাড়ী থেকে আসার সময়ই ঠিক করে এসেছিলেন-এর একটা বিহিত করবেন। একটু আগে বাসার চাকর ধনা এসে খবর দিয়ে গেছে—ছোটবাবু এখনো ফেরেন নি। বাবু গেছেন ফুটবল খেলতে। সেই সঙ্গে বন্ধুবান্ধবদের কাছে মান বজায় রাখতে চব্বিশখানা টিকিটও নিয়ে গেছেন। আজ আসুন—ওর একদিন কি আমার একদিন। ভেতরে ভেতরে ফুঁস-ছিলেন কার্তিকচরণ, এবার সুযোগ মিলতেই ফেটে পড়লেন বোমার মত—কোথায় গেছে রে সে?

ধড়মড় করে লাফিয়ে ওঠে গণেশ। উল্টো হাতে চোখ রগড়াতে রগড়াতে গণেশ জবাব দেয়—এত করে বারণ করলাম, দাদা তবু শুনলো না।

শুনলো না, খেঁকিয়ে ওঠেন কার্তিকচরণ—আর ইদিকে আয়। দেখে যা সব। এভাবে যদি রোজ রোজ চোট যায়, তবে দোকান যে লাটে উঠবে। দু মাস ধরে দেখছি দোকানের আয় গেছে কমে। ওদিকে কারো হুঁশ নেই। বলি বন্ধ কি এক পয়সাও কমেছে না কমবে?

গণেশ জানে সবই, তবু দাদার ডাক না শুনে উপায় নেই। হাঁড়ি, কড়াই, বালতির স্তূপ ডিঙিয়ে দোকানের কোণে সামান্য উঁচু গদীটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। লম্বা পোড়া-ইট কাপড়ে বাঁধাই খেরো খাতাখানা খুলে দাদা হিসাব দেখাতে শুরু করলেন—।

দেড়শোখানা টিকিট মোটে। এর মধ্যে মাত্র দশখানা নিজস্ব। এক একখানা মান্থলির দাম উনিশ টাকা বিরাশী পয়সা। বছর বছর রেল কোম্পানী টিকিটের রেট বাড়াচ্ছে। কৈ আমরা তো আর ভাড়া বাড়াতে পারছি না। গজ গজ করতে করতে কার্তিকচরণ বকে চলেন। সবই জানে গণেশ। জানে শেয়ালদা থেকে আটচল্লিশ মাইল দূরে এই শহর। ছোট, মাঝারী কয়েক হাজার দোকানী ছাড়া শহরের অধিকাংশ বাসিন্দাই কলকাতায় যায় চাকরী করতে। একপিঠের থার্ড ক্লাস ভাড়া দু টাকা তিন পয়সা। নিত্যযাত্রীর পক্ষে রোজ টিকিট কেটে যাতায়াত সম্ভব নয়। আর নয় বলেই এই চোরাই ব্যবসার পত্তন ঘটাতে পেরেছিলেন দাদা—এক যুগ আগে।

শহরের অনেকেই কলকাতায় মেসে বা আত্মীয় বাড়ীতে থাকে সারা সপ্তাহ। শনিবার দুপুরে ছুটির পর টুকিটাকি কেনাকাটা সেরে ফিরে আসে এই শহরে। রোববারটা কাটিয়ে ফেরে সেই সোমবার ভোরের ট্রেনে। পাঁচটা দিন বেকার টিকিট পড়ে থাকে। শুধু যে অফিসবাবুদের টিকিটই বেকার পড়ে থাকে তাই নয়, মাঝারী ব্যবসায়ী যারা, তাদেরও সপ্তাহে বড় জোর দিন দুয়েক মালটাল কিনতে কলকাতায় যেতে হয়। বাদবাকী দিনগুলো মান্থলি কোন কাজেই লাগে না তাদের। বুদ্ধিটা এ তল্লাটে প্রথম এসেছিল কার্তিকচরণের মাথায়। তিনিই প্রথম খান পাঁচেক টিকিট কেটে এলাকেদের পাশাপাশি এ ব্যবসা শুরু করেন।

বড় বড় হরফে মান্থলির গায়ে লেখা থাকে নট ট্রান্সফারেবল। লেখা আছে মান্থলিধারীর নাম ও সই এবং বয়স। কিন্তু কে কার কড়ি ধারে। পঁয়তাল্লিশ বছরের গণেশ সাহার মান্থলি নিয়ে যদি নিতাই সাঁপুই কি অনিল দে কলকাতায় যায় কার সাধ্য যে চ্যালেঞ্জ করবে—এ মান্থলি তার নয়। আস্তে আস্তে একে ওকে তাকে বুঝিয়ে তাতিয়ে দাদা গণ্ডা গণ্ডা মান্থলি জোগাড় করতে লাগলেন। দশ বছর বাদে আজ শুধু শ্রীদুর্গা স্টোর্সের কাছেই আছে দেড়শোখানা মান্থলি। নিজেদের খান দশেক বাদবাকী একশো চল্লিশটা শহরের নানা ব্যবসায়ী ও চাকরীজীবির। চব্বিশ ঘণ্টার জন্য মান্থলি ভাড়া দেওয়া হয়। একদিনের রেট এক টাকা কুড়ি পয়সা। চব্বিশ ঘণ্টায় তুমি যতবার খুশী কলকাতায় যাও আর আসো—ভাড়া ঐ একই। এই শহরেই যারা থাকেন বারো মাস, স্কুল কলেজের মাস্টার, ছোটখাট সরকারী অফিসের বাবুরা যা খুব ছোট ছোট ব্যবসায়ী যাদের মাঝে মাঝে কলকাতায় যেতে হয় বা বিয়ের পার্টি বা অন্য সব পার্টি সবাই জানে কোথায় মান্থলি ভাড়া পাওয়া যায়। এক টাকা কুড়িতে যদি চার টাকা ছ পয়সা বা তার ডবল কি ডে-ডবলের ধন্ধ উশুল করা যায় তবে কে না এই সুযোগ নেবে? নিচ্ছেও শয়ে শয়ে, হাজারে হাজারে লোক। বিনিময়ে কার্তিকচরণ আদায় করছেন মোটা মুনাফা। নিজের টিকিটে এক টাকা কুড়ি পয়সাই থাকে। অপরের টিকিটে মান্থলিধারী পাবে পঁচাত্তর পয়সা কমিশন, বাকী পঁয়তাল্লিশ পয়সা দোকানের।

কমিশন, পুলিশ আর স্টেশন মাস্টারের পাওনা মিটিয়েও কম করে মাসে হাজার দুয়েক ঘরে আসে। কিন্তু রতনের সোয়াক্তিতে গত মাস থেকেই আয়টা শ দুই টাকা কমে গেছে। গোড়ায় দাদা ধরতে পারেননি না। পরে সন্দেহ করেছেন। আর আজ সেই সন্দেহ হাতে নাতে পাকা হয়ে গেছে। সন্ধ্যেবেলায় ছোঁড়ার ফেরার কথা—এখনো ফেরেনি। দাদা আর ওকে আস্ত রাখবেন না। গণেশও নিস্তার পাবে কি? ভয়ে সিঁটিয়ে চুপ করে গদীর সামনে দাঁড়িয়ে দাদার কথাগুলো শুনতে শুনতে থর থর করে কাঁপতে লাগল গণেশ। যদি কোন মারদাঙ্গায় জড়িয়ে পড়ে থাকে রতন, যদি আজ রাতে ফিরতে না পারে? কুটবল নিয়ে এসব ঘটনা তো আকছারই হয়ে থাকে। তাহলে কাল ভোরে বাক্সো মান্থলি তারা যখন কমিশন আর টিকিট নিতে আসবে তখন? ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল গণেশ। আর ঠিক তখুনি দাদার তর্জন গর্জন সব ভাসিয়ে দিয়ে শুভের ওপর লাস্ট লোক্যালের আগমনী কম কম করে বেজে উঠল। হে ভগবান, এই ট্রেনেই যেন রতন ফেরে। দোকানের ভেজানো দরজার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে সিটি বাজিয়ে দুরন্ত ঝড়ের মত ট্রেনখানা প্ল্যাটফর্মে ঢুকছে। দরজা থেকে চোখ জোড়া সরিয়ে এনে দাদার মুখে গণেশ দেখল, কার্তিকচরণও ক্যাল ক্যাল করে স্টেশনের দিকে তাকিয়ে। খেরোখাতাখানা কোলের ওপর খোলা পড়ে আছে। বোধ হয় একই আশঙ্কায় বড় তখন কঠিন কঠোর দাদার প্রাণেও তুফান তুলেছে।

—সমাপ্ত।

ভারতের সিগারেট শিল্পে বৈদেশিক একচেটিয়া

ইণ্ডিয়া টোব্যাকোর ভিত্তিহীন অভিযোগ ও কুৎসার উত্তরে গোল্ডেন টোব্যাকো

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(১৪) দেশের স্বার্থের প্রতি সচেতন থেকে সরকার বৈদেশিক বিনিয়োগের ওপর নজর রাখবেন এবং উঁহারা যখন অন্যভাবে সম্ভব হবে না কেবল তখনই তাদের সম্প্রসারণের অনুমতি দেওয়া হবে।

(১৫) ক্রেতারা যা চান না তা-ই কিনতে বাধ্য হচ্ছেন, এ বক্তব্য ঠিক নয়। বহু গণতান্ত্রিক দেশে যেখানে সরকারী একচেটিয়া সিগারেট নিয়ে নাড়াচাড়া করেন, যেমন জাপান, থাইল্যাণ্ড, নাইজেরিয়া, ইথিওপিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, ইতালি, চেকোশ্লোভাকিয়া ফ্রান্স ও অন্যান্য বহু দেশে বাছাই করার ব্যাপক সুযোগ ক্রেতাদের রয়েছে।

আজকের দিনেও ভারতের ক্রেতারা প্রাপ্তব্য ব্যাণ্ডগুলোর বাইরের জিনিস চান এবং তার ফলেই বাজারে চোরাপথে আসা ব্র্যাণ্ড দেখা যায়।

গ। আই টি সি-এর বক্তব্যে আমাদের উত্তর

বক্তব্য নং ১ : আই টি সি বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় করছে।

বিদেশী শেয়ারহোল্ডার আছে বলেই বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় হচ্ছে। আমরা, ভারতীয় সিগারেট প্রস্তুতকারকরা, একথা বরাবর বলে আসছি।

এ জিনিসটি বেশ কৌতুককর যে, গত ৩ বছরে গড়ে যে ১০ কোটি টাকার রপ্তানি হয়েছে বলে আই টি সি বিজ্ঞাপন দিয়েছে তার মধ্যে তামাকও রয়েছে, এদিকে গত বছরে সিগারেট রপ্তানি হয়েছে মাত্র ২ লক্ষ টাকার। এর অর্থ ৯৯৮ লক্ষ টাকার রপ্তানি হয়েছে তামাক। তা হলে, সিগারেট প্রস্তুতকারী হিসেবে আই টি সি তামাক রপ্তানি থেকে অর্থ অর্জনের কৃতিত্ব দাবি কি করে করতে পারে এবং ৭৫% বিদেশী শেয়ারমালিকানার জন্য লাভাংশ দিতে গিয়ে বৈদেশিক মুদ্রা অপচয়ের পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়ের কিভাবে সামঞ্জস্য ঘটাতে পারবে? ব্যাপারটি হচ্ছে যেন এস টি সি বা এম টি সিএর লৌহ-পিণ্ড রপ্তানির কৃতিত্ব হিন্দুস্তান স্টীলের কিংবা কোটি কোটি টাকার কাঁচা তুলো রপ্তানির কৃতিত্ব দাবি যেমন করতে পারে কোন টেক্সটাইল মিল।

লাভাংশ পাঠানো সম্পর্কে বক্তব্য এই যে, গত ১১ বছরের মত যদি আই টি সিকে অবাধে বেড়ে যেতে দেওয়া হয় তা হলে তবে এই লাভাংশ পাঠানো বৃদ্ধি পাবেই। ১৯৫৮ সাল থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত আই টি সিএর বিক্রয়লব্ধ অর্থ ও মুনাফা ৩০০% বেড়ে গেছে। আজ সিগারেট শিল্পের বৈদেশিক ক্ষেত্র ৪ কোটি টাকার লাভাংশ পাঠিয়ে দিচ্ছে। যদি তা অবাধে চালিয়ে যেতে দেওয়া হয় তা হলে লাভাংশ হিসাবে বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় চক্রবৃদ্ধি হারে ১২/১৪% বেড়ে যাবেই।

আই টি সি সম্পর্কে আরও একটি মজার ঘটনা আছে। আই এল টি ডি হচ্ছে একটি ১০০% ব্রিটিশ কোম্পানি; ভারতে তার শাখা আছে। আই টি সি হচ্ছে একটি ভারতীয় কোম্পানি যার অধিকাংশ শেয়ারমালিকরা বিদেশীর। মজার ব্যাপার হলো, এই আই এল টি ডিকে আই টি সিএর 'সাব-কোম্পানি' বলে আখ্যাত করা হয়েছে। এর কারণ বোধ হয় এই যে, আই টি সিএর পেশাধারী ম্যানেজাররা, যাঁরা লণ্ডনস্থ একটি বিদেশী যৌথ প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী তাঁরা, আই এল টি ডিকেও পরিচালনা করেন। এইসব পেশাধারী ম্যানেজারের কয়েকজন এখন বোর্ড অব ডিরেক্টর্স উন্নীত করা হয়েছে; তাঁরা আবার আই এল টি ডিএর স্থানীয় পরামর্শদাতা কার্যনির্বাহীও আছেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার—ডি এল টিএর সঙ্গে পারস্পরিক সংযোগের কথা আই টি সি অস্বীকার করছে; বস্তুতঃ এই ডি এল টি হচ্ছে আই টি সিএর চার-প্রতিষ্ঠান—দুল উভয়ের এক।

আই এল টি ডি—তদন্তের একটি বিষয়

আই এল টি ডিএর কাজকর্ম সম্পর্কে বক্তব্য এই যে, ব্যাপারটি উপলব্ধি করতে আমি অক্ষম, কিংবা আমি বুঝতে অক্ষম কিভাবে এর ওপর কর ধার্য করা হয়। বিক্রয়ের হিসাব যা হওয়া উচিত তার চেয়ে অনেক কম—এর কারণ হচ্ছে বৈদেশিক একচেটিয়াকে স্থানীয়ভাবে যে সরবরাহ তারা দেয় তা এবং তামাকের রপ্তানি বাণিজ্য তাদের একচেটিয়া—এই বিক্রয়ের হিসাব কিন্তু কোম্পানীসমূহের রেজিস্ট্রারের অফিসে প্রাপ্তব্য হিসাবের মধ্যে মেলে না। ইচ্ছামূলক কোন কারচুপি আছে বলে যে আমি সন্দেহ করি, তা নয়। আমি যা বলতে চাইছি তা হচ্ছে, যেভাবে এটি উপস্থাপিত করা হয়েছে তাতে আই এল টি ডির পুরো কাজকর্ম প্রতিফলিত হয় না। তাই এল টি ডিএর কাজকর্ম বোঝার জন্য সরকার কর্তৃক আরও বিশদ তদন্তের প্রয়োজন।

সরকার যেখানে বিদেশী কোম্পানীগুলোকে ভারতীয়করণে এত আগ্রহী সেখানে, বৈদেশিক একচেটিয়াদের তামাক সরবরাহের এত বড় ব্যবসা সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান আই এল টি ডি যে কোনভাবেই হোক সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহাশয়দের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। আমি আশা করি, এ ব্যাপারে নজর দেওয়া হবে, তা হলেই দেশ শুধু আয়করের দিক দিয়েই নয়, অধিক হারে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের দিক দিয়েও উপকৃত হবে; কারণ খরচ-খরচাদির সঙ্গে মুনাফা যুক্ত হবে এবং উচ্চ হারে বিক্রয়মূল্য অধিক হারে বৈদেশিক মুদ্রা আনবে।

গুডউইল ট্রেডমার্ক

একথা জানতে পেরে আমি আনন্দিত যে, আই টি সি রয়্যালটি কারিগরী কলাকৌশল বা সহযোগিতা কী হিসাবে কাউকে কিছু দেয় না। এখানেও যদি আপনারা আই টি সিএর উদ্বর্তপত্রের ওপর চোখ বুলান তবে দেখতে পাবেন যে ৪৯০ লক্ষ টাকার মত একটি অঙ্ক "গুডউইল ট্রেডমার্ক" খাতে মূলধনজাত করা হয়েছে। এর ওপর যে লাভাংশ ঘোষিত হয়েছে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে তা ৬% থেকে বেড়ে ১০% হয়েছে—এর পরিমাণ বছরে ৩০ লক্ষ থেকে ৫৫ লক্ষ টাকা। লাভাংশের নামে এটি কি রয়্যালটি পাঠানো নয়?

বক্তব্য নং ২ : আই টি সি একচেটিয়া ছাড়া আর কিছু নয়

ভারতের সিগারেট শিল্পে একটি বৈদেশিক একচেটিয়া রয়েছে।

সিগারেট শিল্পের মোট বিক্রয়লব্ধ অর্থ ২৫০ কোটি টাকার মধ্যে আই টি সিএর বিক্রির পরিমাণ তাদের উদ্বর্তপত্র অনুযায়ী ১৪৫ কোটি টাকা। এটা কি ৫০%-এর বেশী নয়? একচেটিয়ার ব্যাখ্যা কি হালে পরিবর্তিত হয়েছে? যদি না হয়ে থাকে তবে আই টি সি খাঁটি ও সঠিক একচেটিয়া ছাড়া আর কিছু নয়।

যুক্তরাজ্য থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক পত্রিকা 'টোব্যাকো'-এর ৫ই জুন তারিখের সংখ্যা থেকেও আমি উদ্ধৃতি দিচ্ছি। এতে 'ভারত' শিরোনামে "উৎপাদন যত বাড়ছে সিগারেট রপ্তানি তত কমছে" উপ-শিরোনামে উল্লেখ করা হয়েছে যে, অন্যান্য বহু উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছাড়াও "ভারতীয় সিগারেটের বাজার প্রভুত্ব করে একটি বৈদেশিক নিয়ন্ত্রণাধীন কোম্পানি—ইম্পিরিয়াল টোব্যাকো কোং লিঃ। এই কোম্পানিটি গোটা বাজারের প্রায় তিন-পঞ্চমাংশের উপর প্রভুত্ব করে।" এ দিয়ে নিশ্চয়ই প্রমাণিত হয় যে, সত্য কোথায় নিহিত।

আই টি সি এবং ডি এল টি পারস্পর সংযুক্ত

বিদেশী শেয়ারহোল্ডার সম্পর্কিত তিনটি কোম্পানির কোনটিই পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত নয়—একথা সত্য হলে হতেও পারে। কিন্তু এই বক্তব্য এই তিনটি কোম্পানি ও অন্যান্য বহু সহযোগী কোম্পানিতে

(পর পৃষ্ঠায় দেখুন)

ইণ্ডিয়া টোব্যাকোর ভিত্তিহীন অভিযোগ ও কুৎসার উত্তরে গোল্ডেন টোব্যাকো

(পূর্ব পৃষ্ঠার পর)

একই শেয়ারহোল্ডারের প্রশ্নটি উপেক্ষা করা হয়েছে। মূল কোম্পানি—লণ্ডনস্থ ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো কোং লিঃ-এর সঙ্গে সাধারণ যোগাযোগের কথাও এতে গ্রাহ্য করা হয় নি। ওয়াজির সুলতানে ইণ্ডিয়া টোব্যাকো কোং-এর কোন শেয়ারমালিকানা নেই, কিংবা নেই ইণ্ডিয়া টোব্যাকোতে ওয়াজির সুলতানের শেয়ারমালিকানা, কিন্তু ডব্লু বি এ টি-এর মাধ্যমে যে বন্ধন তা বহু যোগসূত্রের মধ্যে একটি—হয়তো সবচাইতে বেশী শক্ত—যা পরস্পরকে সংযুক্ত করেছে।

অত্যন্ত বিতর্কমূলক ও অসমর্থিত কোন বক্তব্যের সমর্থনে বিচারকদের নাম উল্লেখ করা রীতিসম্মত কিনা আমি জানি না।

প্রাক্তন বিচারকদের মতামতের উপর ন্যায়সঙ্গত অবস্থার দিক বিচার করলে, মনোপলিজ কমিশনের কাছে ডি এস টি-এর সম্প্রসারণের দরখাস্ত যাতে না যায় তার জন্য আই টি সি কেন যে তার প্রভাব খাটাচ্ছে তা আমার বোধগম্য নয়। বিচারকদের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে বক্তব্য এই যে, আই টি সি যে প্রাক্তন ব্যক্তিদের নাম উল্লেখ করেছে তাঁদের সকলের ওপরই আমার গভীর শ্রদ্ধা আছে, কিন্তু সঠিক মতামত তাঁরা যাতে দিতে পারেন তার জন্য সমস্ত তথ্য ও প্রাসঙ্গিক কাগজপত্র তাঁদের দেওয়া হবে কিনা সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। আই টি সি যা বলেছে তা সেইভাবে ধরে নিলেও শ্রেষ্ঠ পন্থা হচ্ছে সম্পূর্ণ প্রকাশ্য শুনানীর পর মনোপলিজ কমিশনে বিচারকগণ কর্তৃক প্রশ্নটি মীমাংসা করা।

এখানে আমি উল্লেখ করতে চাই যে, বিরুদ্ধ পক্ষ হচ্ছে ডি এস টি, সম্প্রসারণের জন্য তার দরখাস্তই ডি এস টি এবং আই টি সি-এর আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও তিন মাসেরও বেশী কাল পিছিয়ে পড়েছে। আই টি সি-এর চেয়ারম্যান যা বলেছেন ডি এস টি-এর চেয়ারম্যানও যদি তা-ই বলতেন তা হলে তাও বোঝা যেতো। পারস্পরিক সংযোগের এটি কি আর একটি উদাহরণ নয়?

দফা নং ৩ : আই টি সি আন্তর্জাতিক ব্রাণ্ড বিক্রী করে

আই টি সি বলেছেন যে, চোরা পথে আনা ব্রাণ্ডগুলো ছাড়া দেশে কোন আন্তর্জাতিক ব্রাণ্ড বিক্রী হয় না। আমি জানি বিভিন্ন দেশের সিগারেট শিল্পের বিভিন্ন কাছে আন্তর্জাতিক ব্রাণ্ডের ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছেন, এ নিয়ে আমি কোন বিতর্কে অবতীর্ণ হতে চাই না। আমি যা বলতে চাই তা হচ্ছে, আই টি সি-এর প্রস্তুত বিদেশী মালিকানার নামসম্বলিত ব্রাণ্ডগুলো, যেমন উইলস গোল্ড ফ্লেক, গোল্ড লীফ, এমবাসি, সিজার্স, ব্রিস্টল প্রভৃতি কোন কোন দেশে আমদানী করা হয় লণ্ডনের ইম্পিরিয়াল টোব্যাকোর কাছ থেকে বা অন্যান্য দেশে তাদের সহযোগীদের কাছ থেকে। এমন কি ভারতেও যে প্যাকেটে এগুলো বিক্রী হয় তাতে লেখা থাকে এই প্যাকেটের জিনিসগুলো ব্রিস্টল ও লণ্ডনের ডব্লিউ ডি অ্যাণ্ড এইচ ও উইলস-এর উত্তরাধিকারীদের সম্পত্তি।" এতে কি বোঝায়? লণ্ডনের ইম্পিরিয়াল টোব্যাকো বা ইণ্ডিয়া টোব্যাকো কেন এই সিগারেটগুলো ভারত থেকে রপ্তানির চেষ্টা করেন না? কেন যেখানে সরকারের রপ্তানি বাড়ানোর এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের জন্য সর্বশক্তিতে চেষ্টা করছে সেখানে সে বৈদেশিক একচেটিয়াকে তার বাড়তি উৎপাদন চালিয়ে যাবার অনুমতি দিতে পারে যদি এই বাড়তি উৎপাদন রপ্তানির জন্য নির্দিষ্ট করে রাখা হয়। বৈদেশিক একচেটিয়া যদি দেশের বাজারের জন্য উৎপাদন তার সংস্থাপিত ক্যাপাসিটির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখে এবং বাড়তি উৎপাদন রপ্তানিতে দিয়ে দেয় তা হলে কেউ তাতে আপত্তি করবে না।

কাঁচা মাল, শ্রমিক মান ইত্যাদি ব্যাপারে ভারত যেখানে সুবিধাজনক অবস্থায় অবস্থিত এবং আই সি টিস-এর সব রকমের কারিগরী কলাকৌশল অধিকারে রয়েছে সেখানে শেষ পর্যন্ত ভারত থেকে সিগারেট রপ্তানি লাভজনকই হবে। তাতে শুধু দেশী সব কোম্পানির বিদেশী শেয়ারহোল্ডাররাও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ফলে উপকৃতই হবে। এবং তামাক আমদানী, সিগারেট প্রস্তুত করা এবং তারপর তা রপ্তানি করার বদলে আমার মনে হয় বি এ টি অধিকতর লাভবান হবে যদি ভারত তার তামাক থেকে প্রস্তুত সিগারেট রপ্তানি করে।

একথা জানতে পেরে আমি আনন্দিত যে, ইণ্ডিয়া টোব্যাকো যেসব ট্রেড মার্ক ব্যবহার করে আইন ও চিরাচরিত বাবহারের ফলে সে এগুলির মালিক। একথা জানতে পেরে আমি আনন্দিত, কারণ, এই ব্রাণ্ডগুলো যেখানে ইচ্ছা রপ্তানি করার ব্যাপারে আই টি সি-এর ওপর এখন কোন বিধিনিষেধ আরোপিত নেই।

দফা নং ৪ : ২০০টি দেশীয় সিগারেট কোম্পানি বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

গত চারটি দশকে ২০০টি দেশীয় সিগারেট কোম্পানি বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

দুটি সিগারেট প্রস্তুতকারী কোম্পানি—ডি ম্যাক্রোপোলো এবং ক্রাউন টোব্যাকো কোং ৭০।১০০ বছরেরও বেশীকাল ধরে সিগারেট প্রস্তুত করে আসছে। এরা হলো অন্যতম, আই টি সি-এর আবির্ভাবের বহু আগেই এরা এই ক্ষেত্রে প্রবেশ করে। গত ৫ বছরে ডি ম্যাক্রোপোলো প্রতি বছর ৬০ থেকে ১১০ লক্ষ সিগারেট উৎপাদন করেছে, আর ক্রাউন টোব্যাকোর উৎপাদনের পরিমাণ বার্ষিক ৭০ থেকে ১১০ লক্ষ সিগারেট। কাজেই প্রতি বছর ৬০০০ লক্ষ (অর্থাৎ প্রতি মাসে ৫০০ লক্ষ) সিগারেট হচ্ছে ক্ষুদ্রতম গ্রহণযোগ্য আর্থনীতিক ইউনিট বলে মিঃ হাকসারের যে ধারণা, তা সঠিক নয়। আজ যদি তারা ৭০ লক্ষ উৎপাদন করে থাকে, তবে ৭০ বছর আগে তারা নিশ্চয়ই ৭০ লক্ষের অন্তত কিছু কম উৎপাদন করেছে। আই টি সি-এর এটি আর একটি অতিকাহিনী।

তিনি বলেছেন যে, আই টি সি ৬০ বছরের মধ্যে কোন একটি দেশীয় সংস্থাকে নিজের সঙ্গে মিশিয়ে নেয়নি বা বন্ধ করেনি বা কিনে নেয়নি। এটা সর্বসাধারণের জানা ব্যাপার যে, কলকাতার ইউনিয়ন টোব্যাকো এবং হায়দরাবাদের হিন্দু টোব্যাকো চালু প্রতিষ্ঠান হিসাবে আই. টি সি কিনে নিয়েছে। আমি আরও জানতে পেরেছি যে, রুশের আমেরিকান কোম্পানি এ জে হানি কিনে নিয়েছে আই টি সি। আই টি সি-এর বর্তমান রপ্তানি কার্যালয় এখন চলছে সেই জায়গায় যেখানে এ জে হানি ছিল। বহু সংখ্যক যে সব কোম্পানি বিলুপ্ত হয়ে গেছে এবং আরও যে বহুসংখ্যক কোম্পানিকে একচেটিয়ার ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে না, এগুলি তাদের ওপরে।

আই টি সি বলেছে যে, যে অল্প কয়েকটি সংস্থা এই শিল্পে প্রবেশ করতে চেষ্টা করেছিল, তারা ব্যর্থ হয়েছে তাদের অপ্রতুল বিনিয়োজিত সম্পত্তি বা অপ্রতুল পরিচালন ব্যবস্থা বা ক্রেতাদের দাবি মিটাতে অক্ষমতা হেতু। ভারতীয় সিগারেট শিল্পের উদ্যোক্তার পক্ষে বিনিয়োজিত সম্পত্তি বা পরিচালনব্যবস্থার ব্যাপারে বৈদেশিক একচেটিয়ার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা কষ্টকর এবং এটিই হলো তাদের উন্নতি ব্যাহত হওয়ার প্রধান কারণ। এই জন্যই আমরা বলি যে, একচেটিয়ার উৎপাদন যদি ঠেকানো না যায় তবে অন্যান্যরা বেড়ে উঠতে পারবে না, কারণ তারা বৈদেশিক একচেটিয়ার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করার উপযুক্ত নয়।

কতটি দেশীয় কোম্পানি যে চালু আছে এবং তাদের কাজকর্মে সন্তুষ্ট হওয়ার মত যথেষ্ট কারণ রয়েছে—আমার কাছে এটি একটি সংবাদ বটে। আমি যতদূর জানি, এদের মধ্যে ন্যাশনাল টোব্যাকোই হচ্ছে বৃহত্তম। এদের উদ্বর্তপত্রেই দেখা যায়, এদের কাজকর্মের কি দৈন্য-দশা। অন্যান্য কোম্পানির উদ্বর্তপত্র এখন আমার হাতের কাছে না থাকলেও এটি জানা ঘটনা যে, তাদের বিকাশ ঘটছে না। এই সব কয়টি কোম্পানীর উৎপাদন একত্র করলে মোট উৎপাদনের ১ শতাংশও হয় না।

একটি মালিকী প্রতিষ্ঠান বিকাশলাভ করছে বলে যে উল্লেখ করা হয়েছে এবং তার বিক্রয়ের পরিমাণ ৫৪ লক্ষ টাকা থেকে ৯০ লক্ষ টাকায় বেড়ে বলে যে হিসাব দেওয়া হয়েছে তা কেবল তাদেরই বিভ্রান্ত করতে পারে, যারা এই শিল্পের সঙ্গে পরিচিত নয়। বৈদেশিক একচেটিয়ার নির্মম প্রতিযোগিতার জন্য সেই কোম্পানিটি অলাভজনক দামে সিগারেট তৈরী ও বিক্রী করছে।

একটি কোম্পানির ২০ লক্ষ টাকা মূলধন ও ১-১৮ কোটি টাকা আয় আছে বলে মিঃ হাকসার যে কথা বলেছেন, তা ঠিক হতে পারে। কিন্তু আমি এমন কোন নতুন সিগারেট কোম্পানির কথা জানি না, যার নিজস্ব ব্রাণ্ডে এত মোটা টাকা আয় হয়। হয়ত কোম্পানিটি অন্য কোম্পানির জন্য কোন কোন ব্রাণ্ড তৈরী করে দেয়।

(পর পৃষ্ঠায় দেখুন)

ইণ্ডিয়া টোব্যাকোর ভিত্তিহীন অভিযোগ ও কুৎসার উত্তরে গোল্ডেন টোব্যাকো

(পূর্ব পৃষ্ঠার পর)

আমি এ বিষয়ে আনন্দিত যে, তিনি ভারতের বৃহত্তম সিগারেট ফ্যাক্টরির কথা উল্লেখ করেছেন। এবং বলেছেন, ১৯৬৭ সালে ৩/৪ মাস লক-আউটের ফলে তাদের অবস্থা ভাল নয়। একথা ঠিক যে, ক্রেতারা ৩/৪ মাসের মত সময় অপেক্ষা করে না; ফলে এই কোম্পানীটির বিক্রী অন্যান্য সিগারেট প্রস্তুতকারকের হাতে চলে গেছে। আমি খুব সুখী হব যদি আমার বাড়তি উৎপাদন রোধের প্রস্তাব এই হতভাগ্য কোম্পানিটিকে তার আয়ত্তবহির্ভূত কারণে যা হারিয়েছিল তা ফিরে পেতে সাহায্য করে। তাদের যা ছিল তা যদি তাদের ফিরিয়ে দেওয়া যায় তবে তা-ই হবে ন্যায়সঙ্গত ও শোভন।

একথা আই টি সি-এর পক্ষে বেশ মনোমত যে, যে কোম্পানীটির প্রধান ব্র্যান্ড হচ্ছে ইরক্ট ক্লাব, সে গোল্ডেন টোব্যাকোর তাজ ব্রাণ্ড-এর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে সক্ষম হয়নি। সম্প্রতি বৈদেশিক একচেটিয়ার প্রতিনিধিরা কোম্পানির, মালপত্র বিক্রয় ও বিপণনের সুযোগ-সুবিধা দানের যে প্রস্তাব কোম্পানিটিকে দিয়েছে তা পালনের দিকে আমি উৎসুক নয়নে চেয়ে আছি। আমি এ বিষয়ে নিশ্চিত যে, তা হলেই এই কোম্পানিটি গোল্ডেন টোব্যাকোর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে সক্ষম হবে। ৬০ বছর নির্মম ও অশোভন প্রতিযোগিতার পর—যে প্রতিযোগিতা, এতগুলো প্রতিষ্ঠানকে বিলুপ্ত করে দিয়েছে—ক্ষুদ্র প্রস্তুতকারকদের সাহায্যদানের ব্যাপারে বৈদেশিক একচেটিয়ার চিন্তাধারার সাম্প্রতিক পরিবর্তন সাদরে গ্রহণীয়। ইরক্ট ক্লাব প্রস্তুতকারী কোম্পানিটি এবং এই রকম আরও ছোট ছোট কোম্পানিকে যদি বৈদেশিক একচেটিয়া সাহায্য করে তবে আমার সমস্যার বেশ সুন্দর সমাধানই হয়ে যাবে। কিন্তু যাই হোক-না কেন, হৃদয়ের পরিবর্তন আবার যাতে পরিবর্তিত হয়ে না যায় তার জন্য উৎপাদন ঠেকানো অত্যন্ত আবশ্যক।

জি টি সি মোটা মুনাফা আহরণ করছে বলে মিঃ হাকসার যে বিবৃতি দিয়েছেন সে সম্পর্কে বক্তব্য এই যে, সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে টাকার অঙ্ক পড়ায় তাঁর যে অক্ষমতা তার বিচার কিভাবে করবো আমি জানি না। 'আহরণ' কথাটি ঠিক নয়, কারণ এই মুনাফা উচ্চহারে আয়কর সাপেক্ষ এবং তা জাতীয় অর্থনীতি একটি বাস্তব অবদান। কর বাদ দেবার পর যে মুনাফা থাকে তার ৯০% আবার ব্যবসাতে খাটানো হয়েছে যাতে ভারতীয় সিগারেট শিল্প বৈদেশিক একচেটিয়ার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে সক্ষম হয়।

দফা নং ৫ : অলস দেশীয় ক্যাপাসিটি রয়েছে

এই শিল্পে সম্পূর্ণ দেশীয় ক্ষেত্রে প্রচুর অলস ক্যাপাসিটি রয়েছে। এটা কোন গোপন কথা নয়। পার্লামেন্টে শিল্পমন্ত্রীর প্রদত্ত বিবৃতিতে যা কিছু বলা হয়েছে তা ছাড়াও দুটি ভারতীয় সিগারেট ফ্যাক্টরির ১৬৭৬৮০ লক্ষ সিগারেটের ক্যাপাসিটি আছে এবং তারা ৫০০০০ লক্ষের কম সিগারেট উৎপাদন করছে আর ১১০০০০ লক্ষের মত সিগারেট উৎপাদনের ক্যাপাসিটি অলস রাখতে বাধ্য হচ্ছে। তার সঙ্গে তুলনীয় বিদেশী একচেটিয়ার ৮০০০০ থেকে ১০০০০০ লক্ষ সিগারেটের বাড়তি উৎপাদন। এটা কি বাঞ্ছনীয় নয় যে, বিদেশী একচেটিয়ার বাড়তি উৎপাদন রোধ করা হোক যাতে দুটি ভারতীয় কোম্পানি যথেষ্ট কাজ পেতে পারে?

১৮ই জুলাই তারিখের নীতি বিষয়ক বিবৃতি অনুসারে ২৫% বাড়তি উৎপাদনের শিথিলতা প্রত্যাহৃত হয়েছে বিদেশী বৃহৎ কার্মের ব্যাপারেই। সিগারেট শিল্পের বিদেশী একচেটিয়াকে বিনা অনুমতিতে বা নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য কৌশলে বিকৃতি না ঘটিয়ে এটি মেনে চলতে হবে।

দফা নং ৬ : বৈদেশিক একচেটিয়া সিগারেটের বাজার নিয়ন্ত্রিত করে

বৈদেশিক মূলধন সিগারেট-বাজারের ৮০% নিয়ন্ত্রণ করে—মিঃ হাকসার একথা অস্বীকার করেন। বস্তুতঃপক্ষে আমি যে বলেছিলাম তা হচ্ছে বড় বিদেশী শেয়ারমালিকানা নিয়ে বিদেশী মালিকানাধীন কোম্পানিগুলো সিগারেট-বাজারের ৮০% নিয়ন্ত্রণ করছে। পার্লামেন্টে মন্ত্রী মহোদয় প্রদত্ত বিবৃতি অনুসারেই এটি এবং আমি সুনিশ্চিত যে, তিনি ঠিকই বলেছেন। নিজের বক্তব্যের যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠার জন্য মিঃ হাকসার যে কথা বলছেন তা এলোমেলো এবং নিজের যুক্তির উপযোগী করে অঙ্কের হিসাবও বিকৃত।

সম্প্রসারণের অনুমতি লাভের উদ্দেশ্যে বৈদেশিক শেয়ার-মালিকানায় শতকরা হার হ্রাসের যে অঙ্গীকার বৈদেশিক একচেটিয়া দিয়েছে তা জাতীয় স্বার্থে নয়, কারণ এতে একচেটিয়া যেমন হ্রাস পাবে না তেমনি হ্রাস পাবে না বৈদেশিক মুদ্রার অপচয়। এখানে আমি বলতে চাই যে, এই বৈদেশিক একচেটিয়াটি ভারতীয়করণ না করেই তার কাজকর্ম ১০০০ গুণ বাড়িয়েছে, কাজেই, সম্প্রসারণ ছাড়াই যাতে তাদের ভারতীয়করণ হয়, না হলে তারা যেখানে আছে সেখানেই থাকুক সেদিকে লক্ষ্য রাখা এবং বাজারে তাদের অংশ ধীরে ধীরে যাতে কমে যায় ও তার ফলে সত্যিকারের ভারতীয়করণ ঘটে সেদিকেও লক্ষ্য রাখা এখন সরকারের উচিত।

দফা নং ৭ : বৈদেশিক একচেটিয়া দেশীয় ক্ষেত্রের ক্ষতি করে

কয়েকটি কোম্পানির জন্য অন্যান্য কোম্পানি সমৃদ্ধ হতে পারে না তা নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রমাণিত হয়েছে দেশলাই, সাবান ও তৈল-শিল্পের ক্ষেত্রে। এই শিল্পে যে মুহূর্তে বৈদেশিক একচেটিয়ার তৎপরতা ব্যাহত করা হলো সেই মুহূর্তেই দেশীয় ইউনিটগুলি দ্রুতগতিতে বেড়ে উঠলো।

নাম—'ইণ্ডিয়া'

আমি একথা বেশ ভালভাবেই উপলব্ধি করতে পারি যে, ইণ্ডিয়া টোব্যাকো কোং-এর চেয়ারম্যান তাঁদের উৎপাদনে আসন্ন ২৫% হ্রাসের জন্য আতঙ্কিত হয়ে উঠেছেন—এই উৎপাদন লাইসেন্সপ্রাপ্ত ক্যাপাসিটি ছাড়িয়ে গেছে এবং তার ফলে শ্রমিক ও পরিচালন বিভাগের কর্মী উদ্বৃত্ত হয়ে পড়েছে, বাজারের ক্ষতি, মুনাফার ক্ষতি, মর্যাদার হানি ইত্যাদি ঘটেছে। কোন সন্দেহ নাই যে, আমি ভারত সরকারের নির্ধারিত নীতির আশ্রয় নিয়েছি এবং এইসব নীতির ফাঁকগুলির মধ্যে যা থাকা উচিত নয় তা দেখিয়ে দেবার কৃতিত্বই কেবল নিচ্ছি।

আই টি সি আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ড বিক্রী করে

আই টি সি-এর চেয়ারম্যান আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাত ইণ্ডিয়া কিংস সিগারেট প্রস্তুতের কথা উল্লেখ করেছেন। ইণ্ডিয়া কিংস সিগারেট যদি আন্তর্জাতিকভাবেই খ্যাত হয়ে থাকে তবে, কেন যে তিনি বলেন আই টি সি আন্তর্জাতিক সিগারেট তৈরী করে না তা আমি জানি না। কারণ, এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত যে, অন্যান্য যে-সব ব্র্যান্ডের কথা আমি উল্লেখ করেছি, যেমন গোল্ড ফ্লেক, এমব্যাসি, সিজার্স, ক্যাপস্টান ইত্যাদি মিঃ হাকসারের উল্লেখিত আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাত ইণ্ডিয়া কিংস সিগারেটের চাইতে বেশী বিক্রী হয়।

সিগারেটের ক্ষেত্রে 'ইণ্ডিয়া' নাম ব্যবহারের ব্যাপারে এর যৌক্তিকতার প্রশ্ন নিয়ে আমরা আমাদের নিজ নিজ মতামত গড়ে তুলবার অধিকারী। আমি জানি, অতীতে বীর চক্র নামের সিগারেট প্রস্তুত-কারীরা এই নাম প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হয়, কারণ তা দেশের আইনানুগ ছিল না কিংবা কোন কোন নামের পবিত্রতা হেতু এ ধরনের নামকরণ অনাকাঙ্ক্ষিত ছিল। শিবাজী বিড়ির ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটে। যদি আমাদের দেশের আইনে ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে নেতাদের নাম জাতীয় মনুমেন্ট ও ধর্মীয় চিহ্ন ব্যবহার নিষিদ্ধ হয় তবে দেশের নামই বা কিভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে?

ঘ। ইণ্ডিয়া টোব্যাকো ও গোল্ডেন টোব্যাকোর অবদানের মধ্যে তুলনা

অন্য দুটো কোম্পানি সম্পর্কে খোঁজখবর এখনও আমার নেওয়া হয়নি। তবে আমি জানি আই এল টি ডি ১০০% বিটিশ কোম্পানি এবং মিন্টো আন্ড ওরিয়েন্ট টোব্যাকো কোং আই টি সিএর অর্ধ সহায়াপুষ্ট। এ বিষয়ে আমার গভীর সন্দেহ আছে যে, এইসবগুলির সৃষ্টি দেশের অর্থনীতিতে সত্যিকারের কোন অবদান রাখিয়াছে কিনা, কারণ একই নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনাধীন একক অখণ্ড ব্যবসায় স বলিষ্ঠ পাঁচটি কোম্পানির বদলে মাত্র একটি কোম্পানি এই কাজ করতে পারতো।

(পর পৃষ্ঠায় দেখুন)

ইণ্ডিয়া টোব্যাকোর ভিত্তিহীন অভিযোগ ও কুৎসার উত্তরে গোল্ডেন টোব্যাকো

(পূর্ব প্রকাশিত পর)

১। রপ্তানি-আমদানি-বৈদেশিক মুদ্রা

একথা জানতে পেরে আমি আনন্দিত যে, দেশের সঙ্কটাপন্ন বৈদেশিক মুদ্রার অবস্থা সম্পর্কে আই টি সি অবহিত আছে। আমি ইতঃপূর্বেই বলেছি আই টি সি তামাক রপ্তানির কাজ বহু অন্যায়ভাবে নিজের কোলে টেনে নিচ্ছে। বস্তুতঃপক্ষে আই টি সি-এর ক্ষেত্রে যতদূর বলা যায়, বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় ঘটায়।

প্রকৃতপক্ষে ১৯৬১ ও ১৯৭০ সালের মধ্যে ইণ্ডিয়া টোব্যাকো কোং ১৫ কোটি টাকা, অর্থাৎ এই কয়টি বছরে যা হত মোট লাভাংশের ৯০% পাঠিয়ে দিয়েছে।

একথা জেনে বেশ আগ্রহ সৃষ্টি হবে যে, গোল্ডেন টোব্যাকো যদি এক্ষেত্রে না থাকতো তবে দিয়ে এর অংশ বৈদেশিক একচেটিয়ার হাতে চলে যেতো এবং তার ওপর লাভ বিদেশী শেয়ারহোল্ডারদের কাছে চলে যেতো। শুধু তা-ই নয়, যদি খুব কম প্রতিযোগিতা থাকতো তবে বৈদেশিক একচেটিয়ার মুনাফা বহুগুণে বেড়ে যেতো, কারণ কেবলমাত্র প্রতিযোগিতাই লোককে ঠেকিয়ে রেখেছে। একদিকে আই টি সি/আই এল টি ডি কর্তৃক তামাক রপ্তানিও গত তিন বছরের মধ্যে প্রত্যেক বছরেই কমে গেছে। সিগারেট রপ্তানির ক্ষেত্রেও তা-ই, এখন এর পরিমাণ বছরে মাত্র ২ লক্ষ।

রপ্তানিতে ইণ্ডিয়া টোব্যাকো কোম্পানি যে সাফল্য লাভ করেছে, নিজের স্বীকৃতি অনুসারেই তা তার বিদেশী শেয়ারহোল্ডারদের সক্রিয় সমর্থন ও সহযোগ বলে। এতে প্রমাণিত হয় যে, এই শেয়ারহোল্ডাররা শুধু শেয়ারহোল্ডারই নন, বস্তুত তাঁরা এই লাইনেরই লোক। এই বিদেশী সহযোগীরা ভারত থেকে রপ্তানি ব্যাপারে সাহায্য করতে আগ্রহী ও ঐকান্তিক। তাঁরা আমাদের দেশের কিছুটা কল্যাণ করছেন। এই সহযোগীদের নাম আমি জানতে চাই, তাহলেই জানা যাবে এই সহযোগীরা কারা এবং কিভাবে তাঁরা শুধু আই টি সি, আই এল টি ডি-ই নয়, অনুরূপ অন্যান্য কোম্পানিও নিয়ন্ত্রিত করছেন।

গোল্ডেন টোব্যাকোর রপ্তানি সম্পর্কে, আমি ইতঃপূর্বেই বিবৃত করেছি যে, আগ্রহী ও ঐতিহ্যমণ্ডিত বিদেশী মালিকানা কিম্বা বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক ব্রাণ্ড কিংবা সারা বিশ্বে বিদেশী সহযোগী না থাকা সত্ত্বেও সিগারেট রপ্তানি ব্যাপারে আমরা অনেক ভাল করেছি। আমাদের যথাসাধ্য আমরা এখনও করে যাচ্ছি।

২। ভারতীয় মূলধন—ভারতীয় ইকুইটি শেয়ারহোল্ডার

আই টি সি-র ২১৪০০ জন শেয়ারহোল্ডার আছেন—একথার প্রচারমূল্য বেশ জোরদার। কিন্তু তাঁদের যে শেয়ার আছে তার মোট শতকরা হার ২৫%-এরও কম। শেয়ারহোল্ডারদের সংখ্যা নয়, তাঁদের শেয়ারমালিকানার পরিমাণই হচ্ছে সংশ্লিষ্ট মালিকানার প্রশ্নের আসল বিবেচ্য বিষয়। গোল্ডেন টোব্যাকো সম্পর্কে জ্ঞাতব্য এই যে, এটি হচ্ছে একটি মালিকী কোম্পানি। স্বভাবতই তার শেয়ারহোল্ডারের সংখ্যা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ, কিন্তু বড় রকমের পার্থক্য হচ্ছে এই যে, এর ১০০% শেয়ারমালিকানাই ভারতীয়দের হাতে।

সুতরাং প্রশ্ন হচ্ছে বৈদেশিক মুদ্রার অপচয়, শেয়ারহোল্ডারের সংখ্যা নয়।

কোম্পানীর অধিকারবিহীন গরীব ভারতীয় শেয়ারহোল্ডারদের কাছ থেকে আদায়-করা প্রিমিয়াম এবং ডিবেঞ্চারসহ ১·১১ কোটি টাকার অঙ্ক কি করে যে কোম্পানির শেয়ার মূলধনে অংশ গ্রহণ বলে উল্লেখ করা হলো তা আমি বুঝতে পারি না। ডিবেঞ্চার আসলে বৃদ্ধি/মুনাফা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সংগৃহীত ঋণ ছাড়া আর কিছু নয়—এবং শেয়ার প্রিমিয়াম ইকুইটিও নয়।

আমি আরও বলতে চাই যে, ভারতীয় জনসাধারণ এবং এল আই সি ও ইউনিট ট্রাস্টের মত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির বিনিয়োগ সত্ত্বেও বোর্ডে এই বিনিয়োগকারীদের কোন প্রতিনিধি নাই। আমি জানি না কেন এটি করা হলো না। ভারতীয় শেয়ারহোল্ডাররা বিনিয়োগকারী হতে পেরে সুখী এবং যে পর্যন্ত তাঁরা তাঁদের বিনিয়োগের প্রতিদান পেতে থাকেন সে পর্যন্ত কোম্পানির পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করেন না বা প্রতিনিধিত্বের দাবি জানান না। দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তিত করার সময় এসে গেছে এবং আমি নিশ্চিত যে, অতি শীঘ্র এই ভারতীয় বিনিয়োগকারীরা—ব্যক্তিই হোক আর আর্থিক প্রতিষ্ঠানই হোক—বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সে তাঁদের ন্যায়সঙ্গত স্থান লাভ করবেন।

৩। পরিচালনা

ইণ্ডিয়া টোব্যাকো কোং-এর বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সের কথা বলতে গেলে বলতে হয়, তাঁরা পেশাধারী ম্যানেজার ছাড়া আর কিছু নন, বিদেশীদের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখবার জন্য তাঁদের সেখানে নিযুক্ত ও নির্দেশিত। খোলাখুলিভাবে বলতে গেলে, এটি বোর্ড অফ ডিরেক্টর্স নয়, একদল ম্যানেজার মাত্র যাঁরা বিদেশীদের স্বার্থ রক্ষার জন্য ও নিয়োগকর্তাদের কাছে ভালো ফল দেখাবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছেন এবং জাতির স্বার্থ রক্ষিত হোক আর না হোক, নিয়োগকর্তাদের কাছে এটাই প্রমাণিত করার উদ্দেশ্যে পরিচালনার সব রকম পদ্ধতিই প্রয়োগ করছেন যে, বিদেশী পূর্বসূরীদের চাইতে তাঁরা বেশী দক্ষ বা সাবধানী। বস্তুতঃপক্ষে পেশাধারী ম্যানেজারদের সঠিক স্থান হচ্ছে ম্যানেজারের স্থান, বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সের স্থান এঁদের ওপর হওয়া উচিত যাতে তাঁরা এঁদের সংযত করতে পারেন বা উৎসাহ দিতে পারেন এবং কোম্পানি যাতে কোন অশোভন বা জাতীয়তাবিরোধী কাজ না করে তার দিকে লক্ষ্য রাখতে পারেন। মুনাফা অর্জনের লক্ষ্য ও প্রেরণা ও প্রেরণা থাকলেও আর্থিক বৃদ্ধির বাইরে রয়েছে সবকিছুর ওপর তীব্র দৃষ্টি থাকা দরকার।

গোল্ডেন টোব্যাকোর পরিচালনা

মিঃ হাক্সার বলেছেন, পরিচালনা বিভাগের অধিকাংশ সদস্যই মালিকের আত্মীয়। আমাদের কোম্পানির ব্যাপারে তাঁর যে জ্ঞান আছে তার বেশী তাঁর কাছে আমি আশা করি না। আপনাদের অবগতির জন্য আমি বোর্ড অফ ডিরেক্টর্স ছাড়া ম্যানেজারবৃন্দ ও কোম্পানির দায়িত্বশীল অন্যান্য কর্মীবৃন্দের পরিচয় নীচে দিচ্ছি :

শ্রী এস কে ওঝা	... সেক্রেটারি
শ্রী এস আর সুন্দরেশ্বরী	... ম্যানেজার
শ্রী টিকে সি শাহ	... সেলস ম্যানেজার
শ্রী এস পি শাহ	... অ্যাকাউন্ট্যান্ট
শ্রী পি ডি নাগদা	... বিজনেস ম্যানেজার
শ্রী এম এস রাম	... পাবলিসিটি ম্যানেজার
শ্রী আর এল অগ্রওয়াল	... ম্যানেজার
শ্রী এ ডি মারফাতিয়া	... ম্যানেজার
শ্রী বি এইচ বাহালিয়া	... ফ্যাক্টরি ম্যানেজার
শ্রী পি এস ভেঙ্কটাচলম	... চীফ ইঞ্জিনিয়ার
শ্রী জি বি সাবন্ত	... অ্যাসিঃ চীফ ইঞ্জিনিয়ার
শ্রী কি আর চক্রপাণি	... অ্যাসিঃ চীফ ইঞ্জিনিয়ার
ডাঃ পি ডি কুরীন	... চীফ কেমিস্ট
শ্রী এস এ সাবন্ত	... পার্সোনাল অফিসার
শ্রী বি এল মাথুরিয়া	... ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ার
শ্রী এ আর কাপাডিয়া	... কোয়ালিটি কন্ট্রোল ইঞ্জিনিয়ার
শ্রী এন ডি ধাডিয়া	... চীফ ইঞ্জিনিয়ার
শ্রী ডি এন মূর্তি	... টোব্যাকো লীফ অ্যাডভাইজার
শ্রী আর ডি এন রাও	... টোব্যাকো লীফ অ্যাডভাইজার
শ্রী ই এন এম গান্ধী চৌধুরী	... ম্যানেজার
শ্রী এম স্বামীনাথন	... ম্যানেজার
শ্রী কে কে কোহলি	... স্টোর্স ম্যানেজার
শ্রী চ নারায়ণ	... ম্যানেজার
শ্রী চ ভি পি গোপাল রাও	... ম্যানেজার

এঁরা কোম্পানির ডিরেক্টরদের আত্মীয় নন। তবে, যদি পরিচালনা বিভাগের কোন বিশেষ আত্মীয় কথা উল্লেখ করার উদ্দেশ্যে তাঁর থাকে তবে তার এমন সব কারণ নিশ্চয়ই আছে যেগুলোর খুঁটিনাটি বিচার করতে তিনি ইচ্ছুক নন। কারণ এতে তিনি নিজেই বেকায়দায় পড়ে যাবেন। কাজেই এ বিষয়ে বেশী কিছু বলা বাহুল্য মাত্র।

(পর পৃষ্ঠায় দেখুন)

ইণ্ডিয়া টোব্যাকোর ভিত্তিহীন অভিযোগ ও কুৎসার উত্তরে গোল্ডেন টোব্যাকো

(পূর্ব পৃষ্ঠার পর)

৪। স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, বৈদেশিক একচেটিয়ার মুনাফা জি টি সির চাইতে অনেক বেশী। আমি ধারণাই করতে পারি না যে, যে কোম্পানির এত একচেটিয়া অধিকার রয়েছে সে কি করে কম মুনাফার যৌক্তিকতা প্রমাণ করতে পারে এবং পার্থক্য কোথায় রয়েছে বা টাকা কোথায় যাচ্ছে তা জানবার জন্য আমি খুব আগ্রহী। ছোট একটি ভারতীয় কোম্পানি টাকার অধিকতর কম মূল্য দিতে ও বৈদেশিক একচেটিয়ার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে সক্ষম—একথা বলা হাস্যকর। বস্তুতঃপক্ষে, আন্তর্জাতিকভাবে বিজ্ঞাপিত বা তিন পুরুষ ধরে বাজারে বিদ্যমান ব্রাণ্ডগুলোর ওপর থেকে বৈদেশিক একচেটিয়া যে প্রিমিয়াম আদায় করতে পারে সেগুলোর মত অন্যান্য বহু প্রতিকূলতার পরিপ্রেক্ষিতে জি টি সি সব সময়ই ক্রেতা যে দাম দেয় তার জন্য সন্তুষ্টতর প্রতিদান দিয়ে থাকে।

আই টি সি এবং জি টি সি-এর বিভিন্ন দামের পর্যায়গুলি সম্পর্কে আপনারা জানেন সবচাইতে লাভজনক লাইনকেই ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। জেনে বেশ কৌতুক অনুভব করবেন যে, ১৯৬৭/৬৯ সময়কালে আই টি সি-এর উৎপাদন বেড়েছে ৭%-এরও কম, কিন্তু মুনাফা বেড়েছে ৭০%-এরও বেশী। এর অর্থ, মুনাফার হার উৎপাদনের দশ গুণেরও বেশী। এর কারণ কি কম দামের সিগারেট, না এর বদলে ইণ্ডিয়া কিনে ভারতীয় বাজারে দাম যায় সর্বোচ্চ পর্যায়ের?

বস্তুতঃপক্ষে আমরা সব সময়ই এই ধারণা পোষণ করি যে, উচ্চতর পর্যায়ের সিগারেট আই টি সি-এর একক একচেটিয়া রয়েছে এবং তার জন্যই ব্যবসায়ীদের মুনাফার ওপর যে কমিশন দেওয়া হয় তা মাঝারি দামের সিগারেটের উপর কমিশনে এক-তৃতীয়াংশও নয়। প্রতিযোগিতা যদি না থাকে তবে আই টি সি শর্তাবলী আরোপ করে যাবেই যা মোটেই শোভন নয়। বৈদেশিক একচেটিয়ার কাছ থেকে ব্যবসায়ী মহল যেসব ঔদ্ধত্যমূলক পদ্ধতি ও দুর্ব্যবহার সহ্য করে এসেছে তার কথা না বললেও চলে। পরিবর্তন যদি কিছু হয়ে থাকে তবে তার কারণ সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কিছুটা বেশী প্রতিযোগিতা এবং মনোপলি অ্যাক্ট—বৈদেশিক একচেটিয়ার ব্যবসায়িক পদ্ধতি ও ব্যবসায়ীর প্রতি আচরণের ওপর এই আইন বাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে।

অধিকন্তু সস্তা ব্রাণ্ড, যেগুলোর কথা আই টি সি উল্লেখ করে থাকেন সেগুলো সম্পর্কে লক্ষ্য রাখা দরকার যে, ভি এস টি কেমন অধিকতর সস্তা দরের সিগারেটই—আরও পরিষ্কারভাবে বলতে চারমিনার সিগারেট প্রস্তুত করে এবং এই কোম্পানীটির মুনাফা ১৯৬৮ থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত ৫০% বেড়ে গেছে, পক্ষান্তরে উৎপাদন কিন্তু কমে গেছে। এর অর্থ কি সিগারেটের দাম বৃদ্ধি কিংবা কোয়ালিটির হানি, সংক্ষেপে নিম্নআয়বিশিষ্ট লোক যাদের অবস্থা ভাল নয় ওদের শোষণ নয়?

৫। আমদানী-প্রতিকল্প (আই টি সি এবং জি টি সি-এর মধ্যে তুলনা

এখানে আই টি সি সুস্পষ্ট কারণে বেশ সুবিধাজনকভাবেই তামাক রপ্তানির প্রসঙ্গ বাদ দিয়েছেন। আমাদের তথ্যানুযায়ী এর পরিমাণ বছরে কুড়ি লক্ষ টাকা থেকে ১২০ লক্ষ টাকা। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, সম্পূর্ণ ভারতীয় কোম্পানি বলে জি টি সি এমন সব মালপত্রের জন্য উচ্চতর হারে দাম দিতে বাধ্য হয় যা আমদানী করতে বাধ্য হয় যেগুলো আই টি সি তার সহযোগীদের মারফত আমদানী-করা মালপত্রের চাইতে বেশী ব্যয়বহুল—এমনও হতে পারে যে, এই সহযোগীরাই তামাক রপ্তানিতে সাহায্য করছে কিংবা তারাই আগ্রহী ও ঐকান্তিক অংশীদার/শেয়ারহোল্ডার। কিন্তু প্রেরিত বৈদেশিক মুদ্রার সঙ্গে যদি আমদানী-করা তামাকসহ বৈদেশিক মুদ্রার ব্যয় যোগ করা হয় তবে আই টি সি-এর হিসাবমত অঙ্ক প্রদত্ত অঙ্কের তুলনায় ৩০ গুণ বেশী হয়ে যাবে।

মেশিনারি

ইণ্ডিয়া টোব্যাকো কোং-এর অবদান আরও অনেক বেশী, কারণ মেশিনারি প্রস্তুতকারক মোলিন্স অব ইণ্ডিয়া আই টি সি-এর মূল কোম্পানির সঙ্গে পারস্পরিকভাবে সংযুক্ত, এই মূল কোম্পানীটি নিজেদের অন্যান্য হোল্ডিং কোম্পানির মারফত আই টি সি-এর শেয়ার রাখেন। এ ব্যাপারে অনুসন্ধান হওয়া উচিত এবং ইউ কে মনোপলি কমিশনের রিপোর্টে এই প্রসঙ্গে বি এ টি নামে ব্রিটিশ যৌথ কোম্পানি বা লণ্ডনের ইম্পিরিয়াল টোব্যাকোর কাজকর্মের আরও ভাল চিত্র দেবে।

এই যৌথ কোম্পানীটি যুক্তরাজ্যের একটি একচেটিয়া এবং যুক্তরাজ্য ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের বাজারে তার যথেষ্ট অংশ রয়েছে। ৫৫টি দেশে তাদের সিগারেট ফ্যাক্টরী আছে (সাম্প্রতিক বছরগুলিতে তার কোন কোনটি বন্ধ করা হয়েছে কিনা আমাদের জানা নেই)। ওয়ার্ল্ড টোব্যাকো ডিরেক্টরিতে লণ্ডনের বি এ টি এবং আই টি সি-এর সহযোগীদের যে তালিকা দেওয়া হয়েছে তা থেকে তার সত্যতা নির্ণয় করা যাবে আর, শাখাগুলোর দিকে না তাকিয়ে আরও গভীরে মূলে আমাদের যেতে হবে এবং এই শাখাগুলো একই গাছের কিনা তা নিরূপণের চেষ্টা করতে হবে। পারস্পরিক সংযুক্তি, সহায়ক প্রতিষ্ঠান, বিনিয়োগকারী কোম্পানি ইত্যাদি বলে একচেটিয়ার অনুভূমিক ও লম্বা নিয়ন্ত্রণের যে মূল ঘোষিত রয়েছে তা যদি খুঁটিনাটিভাবে আমরা অনুসন্ধান না করি তবে মেশিনারি প্রস্তুতকারক, কাঁচামালের যোগানদার প্রভৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করার ব্যাপারে তাদের ভূমিকার সত্য চিত্র বের করা অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে উঠবে। বিশেষজ্ঞ সুবিধা, কারিগরী কলাকৌশল, ব্রান্ড, বু-প্রিন্ট ইত্যাদি ব্যাপারে যে অবদানের কথাই তাঁরা বলুন না কেন, সবকিছুই অনুসন্ধান সাপেক্ষ।

এটিও বেশ আগ্রহোদ্দীপক যে, ইণ্ডিয়া টোব্যাকো বাঙ্গালোরে মেশিন প্রস্তুতকারী একটি ইউনিট স্থাপন করেছে, আমি শুধু আশা করবো যে, তাঁরা তাঁদের কাজকর্ম সম্পর্কে সরকারের অনুমোদন নিয়েছেন, কিংবা সরকারকে অন্ততঃ তা জানিয়েছেন, কারণ ডি জি টি ডি কর্তৃক প্রকাশিত দেশীয় মেশিনারী প্রস্তুতকারকদের তালিকায় এর নাম প্রকাশিত হয়নি বলে এ বিষয়ে আমরা কিছু জানি না।

সিগারেট প্রস্তুত, লীফ হ্যাণ্ডলিং, মেশিনারি প্রস্তুত ও কাঁচা মালপত্র প্রস্তুত যে বিভিন্ন ধরনের কার্যাবলীর কথা তাঁরা বর্ণনা করেছেন তার পরিপ্রেক্ষিতে আপনারা একচেটিয়ার কবজা বেশ ভালভাবেই অনুমান করতে পারেন এবং অনুমান করতে পারেন একে যদি কার্যকরভাবেই রোধ করা না হয় তবে কত সহজে সে এই কবজা আরও আঁট করে দিতে পারে।

আই টি সি স্বনির্ভরতার জন্য যে গর্ব করছেন তাতে অবাক লাগে। এটা হলো সরকারেরই আর্থনীতিক নীতি। আই টি সি যদি তাদের সহযোগীদের এবং পারস্পরিক সংযুক্ত কোম্পানিগুলোকে ডেকে না আনতেন এবং লম্বা একচেটিয়া নিজেদের আয়ত্তে না রাখতেন তা হলেই আমি তাদের কৃতিত্ব স্বীকার করতাম। এটি হলো সহজ ও সরল কথায় আত্মসমর্থন প্রচার মাত্র।

ভারতের বহু শিল্পে বৈদেশিক একচেটিয়া বা তাদের মূল কোম্পানির যে জোট সংযোগ রয়েছে বা তাদের ওপর যে প্রভুত্ব সে করে, সে সম্পর্কে আমার কোন ধারণা নেই। সরকার কর্তৃক এ বিষয়ে তদন্ত হওয়া উচিত। ইণ্ডিয়া টোব্যাকো কোম্পানির আমদানী হ্রাস প্রশংসার্হ হত যদি যোগানদারদের সঙ্গে তাদের পারস্পরিক সংযোগের একান্ত ও গোপন স্বার্থ না থাকতো—এই যোগানদারদেরই তারা অর্থ, কারিগরী কলাকৌশল জ্ঞান ইত্যাদি দিয়েছে। এসব খুঁটিনাটি বিষয় আমার জানার কথা নয়, তবে সরকারের উচিত এবিষয়ে তদন্ত করা এবং লক্ষ্য রাখা যে, বিভিন্ন কোম্পানি যে আমদানী করে তা খাঁটি। বিভিন্ন প্রস্তুতকারকের প্রয়োজনীয় আমদানীতে ইতর-বিশেষের কারণ ডি জি টি ডি কর্তৃক সাধারণত পরীক্ষিত হয় ও তা তাদের পরিজ্ঞাত, সুতরাং এ ব্যাপারে আই টি সি-এর উদ্বিগ্ন হওয়ার কারণ নেই।

আমাদের আপত্তি যেখানে তা হচ্ছে, এই কোম্পানিগুলো কর্তৃক শোষণ—এগুলো আবার উচ্চ মূল্য, পরিমাণের ডিসকাউন্ট, কেবল আই টি সি-এর জন্য বিশেষ কোয়ালিটি রিজার্ভ রাখা, বৈদেশিক একচেটিয়ার প্রয়োজনানুযায়ী প্রস্তুত-সূচীর পরিবর্তন ইত্যাদি নানা পদ্ধতিতে বৈদেশিক একচেটিয়ার প্রত্যক্ষ প্রভাবাধীন। এসব দেশীয় ক্ষেত্রে স্বার্থের বিরোধী। বহু ক্ষুদ্রায়তন শিল্প আই টি সি-এর সাহায্য

(পর পৃষ্ঠায় দেখুন)

ইণ্ডিয়া টোব্যাকোর ভিত্তিহীন অভিযোগ ও কুৎসার উত্তরে গোল্ডেন টোব্যাকো

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পেয়েছে, এই তথ্য মর্মস্পর্শ করে। এ ব্যাপারে গোল্ডেন টোব্যাকোর অবদান কিছুই নেই, একথা বলার আগে আই টি সি-এর চেয়ারম্যান জি টি সি-এর কাছে খোঁজখবর নিলে বা পরামর্শ করলে ভাল করতেন, যেমন আমি তাকে বহুবারই করেছি এবং তার স্বীকৃতি পেয়েছি—এই স্বীকৃতি জনসমক্ষে জানাতেও তিনি পশ্চাৎপদ থাকবেন না-ও জানতে পারেন।

গবেষণা ও উন্নয়ন

কোন লেবরেটরিতে নিযুক্ত লোকের সংখ্যা দিয়ে গবেষণা ও উন্নয়নের পরিমাণ করা যায় না। কোন নতুন উদ্ভাবনা ঘটেছে তা-ই আমাদের জানা দরকার, তা হলেই আমরা জানতে পারবো এটি সমগ্র শিল্পের ওপর বোঝা হয়ে রয়েছে, না কিছুটা প্রয়োজনীয়।

আমাদের গবেষণা ও উন্নয়ন সম্পর্কে বলার এই যে, ক্রেতাদের কাছে আমরা পণ্য উপস্থাপিত করি তার কোয়ালিটি ও মূল্যের ভিত্তিতেই আমাদের বিচার করা হোক, এই দাবি আমরা জানাই। এটিই হলো বস্তুনিষ্ঠ বা স্বতঃই প্রমাণিত এবং এনিয়ে কারো গর্ব করার কিছু নেই। জনসাধারণই বিচার করুক।

একচেটিয়া অধিকার যদি হ্রাস করা হয় তবে অন্যান্য কোম্পানিতেও গবেষণা ও উন্নয়ন দ্রুত ঘটতে থাকবে, কারণ তারা তখন বুঝতে পারবে উন্নয়নের ভবিষ্যৎ তাদের সামনে রয়েছে। গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কাজ বেশ ব্যয়বহুল। উৎপাদন, সম্পত্তি ও ভবিষ্যৎ উন্নয়নের সঙ্গে তার সামঞ্জস্য রক্ষা করতে হবে।

কর্মসংস্থান — কর্মচারী

জি টি সি-তে আমাদের পক্ষে সব চাইতে সন্তুষ্টির বিষয় হচ্ছে আমাদের প্রতি আমাদের কর্মীদের অবিচল আনুগত্য ও সহযোগিতা—এ আনুগত্য আর্থিক প্রশ্ন অতিক্রম করিয়া আরও গভীরে প্রবেশ করিয়াছে। এই সমর্পিত মন যদি না থাকতো তবে জি টি সি বিশেষ করে জন্মকাল থেকেই বিরাট বৈদেশিক একচেটিয়ার বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে যে অগ্রগতি লাভ করেছে তা করতে সক্ষম হতো না।

ইণ্ডিয়া টোব্যাকো কোং-এর নিয়োগাধীনে ১২০০০জন শ্রমিক আছে। তারা ভালোভাবেই কাজ করছে। কর্মচারীদেরকে চাকরির যেসব ভাল ভাল শর্ত দেওয়া হয়েছে তা সুপরিজ্ঞাত। জি টি সি-তে কাজের পারিশ্রমিক ও পরিবেশ অত্যন্ত অনুকূল এবং আই টি সি-এর সঙ্গে তুলনীয়। আই টি সি-তে উচ্চপদস্থ পেশাধারী ম্যানেজাররা যা পান তা অত্যন্ত বেশী, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এর কারণ হয়তো তাঁরা বৈদেশিক একচেটিয়ার স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখেন।

একথা জেনে সুধীবৃন্দ অবাক হবেন যে, জি টি সি কর্তৃক নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা আই টি সি-এর সঙ্গে তুলনায় উৎপাদনের প্রতি ইউনিটে কিছু কম। এর কারণ কি? এর অর্থ কি এই যে, বৈদেশিক একচেটিয়া এমন অনেক বেশী লোক নিয়োগ করে যারা উৎপাদনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত নয়, কিন্তু রাজনৈতিক ও আমলাতান্ত্রিক কাজকর্মের বিভিন্ন ক্ষেত্রে একচেটিয়া অধিকার বজায় রাখার জন্য তাদের প্রয়োজন? শ্রমিক মজুরী সম্পর্কে একথা জেনে কৌতুক অনুভব করবেন যে, জি টি সি অত্যন্ত কম মজুরী দেয় বলে যে উক্তি করা হয়েছে তা সম্পূর্ণ ঠিক নয়। জি টি সি-এর ক্ষেত্রে মাথাপিছু গড় পরিমাণ হচ্ছে ৬১০০ টাকা, আই টি সি-এর ক্ষেত্রে এই পরিমাণ ৬০৫০ টাকা। এই পরিমাণ কি খুব কম?

ইউনিয়ন নেই কিন্তু শ্রমিকও নেই

জি টি সি-তে সম্মিলিত দরকষাকষির জন্য নির্বাচিত ওয়ার্কার্স কমিটি রয়েছে এবং তা সক্রিয়ভাবে কাজও করছে। শ্রমিকরা এবং পরিচালন বিভাগের কর্মীরা একই পরিবারের সদস্যের মত ঐক্যবদ্ধ। আমরা স্বীকার করি, এটি ঈর্ষণীয়।

একথা জেনেও কৌতুক অনুভব করবেন যে, আই টি সি-এর চেয়ারম্যান জানতে পেরেছেন, জি টি সি-এর নিযুক্ত কর্মীদের অধিকাংশ—যারা "দুশো দালাল" বলে আখ্যাত—কেবল দেশের সমস্ত শ্রমিক সংগৃহীত হয়েছে। শ্রমিকদের সম্পর্কে বক্তব্য এই যে, এরা স্থানীয় এলাকা থেকেই সংগৃহীত হয়েছে, তাদের অধিকাংশই অন্ধ্রী নয়। তারা মারাঠী, গুজরাটী, বাঙালী, পার্সী, দিল—মহারাষ্ট্রের অধিবাসী সমস্ত সম্প্রদায়ের লোক।

৯। বৈদেশিক মুদ্রা—স্বয়ংসম্পূর্ণতা—রয়্যালটি

ব্যুটেইন—টোব্যাকো আই টি সি-এর উদ্বর্তপত্রে প্রদর্শিত মত মূলধনে পরিণত করা হয়েছে এবং তার ওপর প্রদত্ত লভ্যাংশ—বছরে ৬৫ লক্ষ টাকা—রয়্যালটি দানেরই সমতুল। বিদেশী মালিকানাধীন ব্র্যাণ্ড উৎপাদনের জন্য নির্ধারিত রয়্যালটি প্রদান কম ব্যয়বহুল হইবে, কারণ একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এই ধরনের ব্র্যাণ্ডের স্থান ভারতীয় ব্র্যাণ্ড ধীরে ধীরে দখল করতে পারিবে এবং তাতে মূলধনে পরিণত ব্যুটেইনের জন্য স্থায়ী দায়ের বদলে রয়্যালটি প্রদান হ্রাস পাবে। একে যদি দেশের পক্ষে সর্বাধিক অনুকূল পন্থায় মূলধন যোগান দেয় বলে আশা করা যায় তবে বৈদেশিক মুদ্রার অসঙ্গত অপচয় বন্ধ করবার জন্য একাজই তা করা উচিত।

১০। কৃষি—অর্থনীতি

সেখেন্দ্র মনে হয় বৈদেশিক একচেটিয়া যদি ভারতকে শোষণ করার জন্য এখানে আসার সিদ্ধান্ত না করতো তবে ভারতীয়রা ধোঁয়ার তামাক সেবার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারতো না। যা কিছু কল্যাণ সাধিত হয়েছে তা সব সময়ই স্বাগত। কিন্তু দেশের অর্থনীতির বৃহত্তর স্বার্থের কথা বিবেচনা করে বৈদেশিক মুদ্রার অপচয়, একচেটিয়া কর্তৃক চাষী, ব্যবসায়ী ও ক্রেতাদের শোষণ রোধ করতে হবে।

তামাকের ক্রেতা হিসাবে গোল্ডেনের অবদান এই অর্থে অনন্য যে, এই ভূমিকা একচেটিয়ার অধিকার ও তামাক-চাষীদের শোষণ হ্রাস করতে সাহায্য করেছে এবং এ ভূমিকাটি উপলব্ধি করতে হলে আপনাদের তামাক-চাষের এলাকায় যেতে হবে।

১১। রপ্তানি বাজারের জন্য ব্র্যাণ্ড

আই টি সি যখন বিশ্ব প্রতিযোগিতার সাফল্যের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে সক্ষম এমন সিগারেট তৈরী করতে পারে তখন তাদের সিগারেট রপ্তানিতে ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে বাধা কোথায় তা আমি জানি না। সিগারেট রপ্তানি করলে যে অর্থ অর্জিত হবে তা তামাক রপ্তানি থেকে অর্জিত অর্থের অন্ততঃ দ্বিগুণ। শুধু তাই নয়, শ্রমিক এবং অনুষঙ্গী ক্ষেত্রগুলিও পাবে। আমি সেইদিনের দিকে চেয়ে আছি যখন আই টি সি ১০ কোটি টাকার তামাক রপ্তানির তুল্য দাবি করার বদলে ২৫ কোটি টাকা মূল্যের সিগারেট রপ্তানি করবে।

১২। মুনাফা—সামাজিক দায়িত্ব

সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কে মিঃ হাকসারের বক্তব্য আমি লক্ষ্য করেছি। কিন্তু আমি আগেও বলেছি, আই টি সি-এর উৎপাদন যেখানে ৭ শতাংশ বেড়েছে সেখানে মুনাফা বেড়েছে ৭০ শতাংশ। তবে, মনে হয় সম্প্রসারিত কোম্পানিটিতে উৎপাদন সীমাবদ্ধ করার ভীতির সঙ্গে মুনাফা হ্রাসের ভীতি মিলে গেছে বলেই সামাজিক দায়িত্ব ও মুনাফা অর্জনের তত্ত্বকথা টেনে আনতে তাঁকে বাধ্য করেছে।

জি টি সি যে মুনাফা অর্জন করে তা তিনি যেরূপ অসামাজিক বলে মনে করেন সেরূপ নয়। অংশীদারদের শেয়ারহোল্ডার নিয়ে গঠিত কোম্পানির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সর্বোচ্চ কর প্রদানের পর মাত্র ৩০ শতাংশ লভ্যাংশ ঘোষণা করা হয়েছে, বাকি ৭০ শতাংশ বৈদেশিক একচেটিয়া হ্রাসের উদ্দেশ্যে আরও সাহায্য দানের জন্য আমাদের ব্যবসা সম্প্রসারণে নিয়োজিত করা হয়েছে। তার তুলনায় আই টি সি ১০ বছরে লভ্যাংশ হিসাবে ১৫ কোটি টাকা বিদেশে পাঠিয়েছে। আপনারা এবিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন যে, দেশের আইনবিরুদ্ধ কিছু জি টি সি করেনি।

আমি ইতিপূর্বেই আমদানী প্রতিকল্পের বৃদ্ধি সম্পর্কে আলোচনা করেছি। সিগারেট মেশিনারি, সিগারেটের কাগজ ইত্যাদি প্রস্তুত যদি আই টি সি-এর পরিকল্পিত একচেটিয়া বিরাট সংগঠনের অংশ না হয়ে থাকে, তবে আমি তার সম্বর্ধনাই জানাবো।

সর্বশেষ, ব্যাপার আপনাদের কাছে, সংবাদপত্র জনসাধারণ ও সরকারের সমক্ষে উপস্থিত করলাম। এখন আপনারাই বিচার করুন, এই বিদেশীর ভারতীয় দেশকে কিভাবে বৈদেশিক দেশের সুযোগ-সুবিধা লাভ করানো হয়েছে এবং বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থের জন্য কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত।

বিজ্ঞাপন

তোমাকে

নিমাই ভট্টাচার্য

(তিন)

পরের দিন সকালে ব্রেকফাস্ট সেরে গেস্ট হাউসের সামনের লনে ঘুরে-ঘুরে সিগারেটটা শেষ করতেই মিঃ রায় গাড়ী নিয়ে হাজির হলেন।

আমি এগিয়ে আসতে-আসতেই মিঃ রায় গাড়ী পোর্টিকোতে পার্ক করে নেমে এলেন। 'গুড মর্ণিং'।

'গুড মর্ণিং'।

'রাত্রে ঠিকমত ঘুম হয়েছিল তো?'

'প্রথমে একটু অসুবিধে হলেও পরে ঠিকই ঘুমিয়েছিলাম।'

মিঃ রায় একটু উতলা হয়ে উঠলেন. কি অসুবিধে হলো বলুন তো?

আমি হেসে বললাম, একে এত সুন্দর বাংলো, তারপর স্প্রীং-এর খাট আর ফোমড্ রাবারের গদী। এত আরামে কি ঘুম আসে?

সকাল বেলায় মিষ্টি রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে মিঃ রায়-প্রাণ খুলে হেসে উঠলেন। হাসি থামলে বললেন, ইউ আর এ ভেরী গুড টকার। ভারী মজা লাগে আপনার কথা শুনতে।

'এক্ষুনি যাবেন নাকি একটু সময় আছে?'

'কেন বলুন তো?'

'সময় থাকলে এক কাপ কফি খাওয়া যেত।'

'নিশ্চয়ই' বলে মিঃ রায় চৌকিদারকে বললেন, 'ইধার দো পেয়ালা কফি দেনে বোলো।'

চৌকিদার দৌড়ে ভিতরে গিয়ে কফির অর্ডার দিয়ে দু হাতে দুটো গার্ডেন চেয়ার নিয়ে বাইরে এলো। লনের এক ধারে দুটো চেয়ার রেখে আবার ভিতরে গেল, বেরিয়ে এলো একটা টিপাই নিয়ে। আমরা চেয়ারে বসলাম।

হঠাৎ সাইরেন বেজে উঠল। কল-কারখানায় সাইরেন বাজে কিন্তু এই ফরেস্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউটে কেন? একটু অবাক না হয়ে পারলাম না।

'এমন সুন্দর পরিবেশে সাইরেনের আওয়াজ শুনতে বিশ্রী লাগে না?'

'সকালের সাইরেন সত্যি বিশ্রী লাগে কিন্তু বিকেলে ছুটির সাইরেনটা বিসমিল্লার সানাইয়ের মত মিষ্টি লাগে।'

না হেসে পারলাম না। হাসি থামলে বললাম, অনেকের হয়ত সকালের সাইরেনই মিষ্টি লাগে।'

মিঃ রায় মাথা নেড়ে বললেন, 'ইউ আর পারফেক্টলি রাইট।'

বেয়ারা কফি দিয়ে গেল। আমি একবার চুমুক দিয়ে কাপটা নামিয়ে রাখলাম।

উনি কফির কাপে চুমুক না দিয়েই বললেন, 'জানেন মিঃ চ্যাটার্জি, ব্যর্থ বিবাহিত জীবনের চাইতে বড় ট্র্যাজেডি হতে পারে না। তাছাড়া আমাদের সোসাইটিতে তো ডিভোর্সের চলন নেই। প্রতিদিনই তিক্ততা বাড়ে, দুঃখ বাড়ে...'

'ঠিক বলেছেন।'

'বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনের মধ্যে তো দেখছি, বড় দুঃখ লাগে, বড় কষ্ট হয়।' মিঃ রায় একটু চুপ করে আবার বললেন, 'আন-হ্যাপি ম্যারেড লাইফের জন্য কত ব্রিলিয়ান্ট ছেলে-মেয়ের লাইফ যে নষ্ট হচ্ছে তার ঠিক-ঠিকানা নেই'।

ওর বক্তব্যের সঙ্গে ঠিক একমত হতে পারলাম না। 'আমার মতামত পরে বলব।'

কফির কাপ হাতে তুলে হাসতে-হাসতে বললেন, অল রাইট, অল রাইট। দি হোল ইভনিং ইজ ইয়োর্স।

আমাদের কফি খাওয়া হতে-হতেই এফ-আর-আই-এর নির্জন পথ-ঘাটের ক্ষণিক চাঞ্চল্যের পর্ব শেষ। আর কোন অফিসযাত্রীকে সাইকেল চড়ে যেতে দেখা যাচ্ছে না। আমরাও উঠে পড়লাম।

মিঃ রায় গাড়ীতে উঠলেন। আমি তখনও উঠি নি। জিজ্ঞাসা করলাম, থাক্ দেব নাকি?

গম্ভীর হয়ে উত্তর এলো, আমার স্ত্রী ছাড়া আর কারুর সে অধিকার আছে নাকি?

অফিসে এলাম কিন্তু ঠিক অফিস-অফিস মনে হলো না। লোকজনের চেঁচা-মিচি, করিডরের কোণায়-কোণায় পানের পিকের ছড়াছড়ি, ভাঙ্গা নোংরা টেবিল, শ্মশান ঘাটের পরিত্যক্ত কাঁথার মত ফাইলের স্তূপ না দেখলে ঠিক অফিস বলে মনে হয় না। এখানে সে সব কিছুই দেখলাম না। এত বড় বিল্ডিং অথচ কোথাও একটা পোস্টার নেই? দেয়ালে একটাও শ্লোগান নেই? আশ্চর্য!

তাই তো আমি বললাম, আমাদের ওদিককার লোকজন আপনাদের এই অফিস দেখলে মনে করবে এটা বোধহয় স্যানা-টোরিয়াম।

তা বটে।

আরো কিছুক্ষণ কথাবার্তা হলো নানা বিষয়ে একবার চা খাওয়াও হলো। তারপর কাজকর্মের কথা শুরু হলো।

মিঃ রায় জানতে চাইলেন, কাজকর্ম সম্পর্কে কোন প্রোগ্রাম করেছেন কি?

'না।'

'কিভাবে করবেন ভাবছেন?'

'প্রথম কয়েক দিন চারদিক একটু ঘুরেফিরে দেখব আর কিছু-কিছু লোক-জনের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করার চেষ্টা করব। তারপর অ্যাকচুয়াল কাজ শুরু করব।'

সোসিও-ইকনমিক সার্ভের রিপোর্ট লেখার জন্য দুন ভ্যালীর লোকজনের সঙ্গে খাতির-ভালবাসার সম্পর্ক দরকার হবে না, তা আমি জানতাম। জানতাম এই মুহূর্তে বেরিয়ে পড়লেই কাজ শুরু করা সম্ভব। কিন্তু মন তা চাইল না। শেষ রাত্রে বিয়ের লগ্ন হলেও বরযাত্রীরা হাজির হয় সন্ধ্যার পরই। শুধু বিয়ে করাই যদি উদ্দেশ্য হতো, তাহলে শেষ রাত্রিরে এলেও চলত। শালী-দের তির্যক চোখের চাহনি আর বন্ধুদের সরস মন্তব্যও দরকার। ভাল লাগে। পরিবেশ সৃষ্টি করে, মনকে মাতাল না করলেও মদির করে তোলে।

তাই তো আমিও চাইছিলাম এই শিবালিক পাহাড়ের কোলে শাল-পাইনের ছায়ায়-ছায়ায় ঘুরে বেড়াতে। যে কণ্ঠ-কাকলীটা সেদিন দিন-রাত্রির সন্ধিক্ষণে আবছা-আবছা আলো-ছায়ায় আমাকে দেখা দিয়ে ঐ শাল-পাইনের মধ্যে লুকিয়ে পড়ে-ছিল, তার সঙ্গে মিতালী করতে ভীষণ ইচ্ছা করছিল।

আর?

আর ঐ শাল-পাইনের বনে আলো-আঁধারের খেলা দেখতে-দেখতে যারা শৈশব-যৌবন-প্রৌঢ়ত্ব কাটাচ্ছে, তাদের একটু ভালভাবে জানতে চাইছিল আমার মন। যাদের সুখ-দুঃখের বিচার করব সংখ্যাতত্ত্ব দিয়ে, তাদের ভাল করে দেখব না?

আরো একটা কারণ ছিল। গত রাত্রির অন্ধকারে যেভাবে নিজেকে আবিষ্কার করেছি, নিজেকে ভালবেসেছি, তার স্বাদ আরও একটু ভাল করে অনুভব-উপভোগ করব না? দিনের বেলা মানুষের হাহাকারে বাতাস বিষাক্ত হয়ে ওঠে। নিশ্বাস নিলে বুকের ভেতরটা কেমন জ্বালা করে, অশান্তি লাগে। নিখিল ব্যানার্জি সেতারে কোমল রেখব আশাবরীতে আলাপ করলে মনটা যেমন অব্যক্ত ব্যথায় ভরে যায়, দিনের বেলা মনটায় ঠিক তেমনি ব্যথা অনুভব করি। কিন্তু রাত্রির অন্ধকারে? কালকের মত নির্জন নিশীথ রাতে? বুক ভরে নিশ্বাস নিতে কত ভাল লাগে, কত শান্তি, কত আরাম! আঃ! এক্ষুনি যদি সূর্য অস্ত

যেত? সারা পৃথিবীটা যদি অন্ধকারে ঢেকে যেত?

আমার প্রায় অজ্ঞাতসারেই একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়ল।

মিঃ রায় জিজ্ঞাসা করলেন, কি হলো?

না, কিছু না।'

'তাহলে দু-চার দিন একটু ঘুরে-ফিরে দেখে নিন।' একটু থেমে বললেন, সেই ভাল। কয়েক দিন একটু প্রাণ খুলে আড্ডা দিই, তারপর কাজকর্মের কথা ভাবা যাবে। কি বলেন?

মিঃ রায় কথা শেষ করে আমার দিকে তাকালেন। আমি শুধু হাসলাম। মুখে কিছু বললাম না।

'হাসছেন কেন?'

'বিশেষ কোন কারণ নেই।'

'তবুও?'

'একে আড্ডা তারপর রসগোল্লা—কাজ-কর্ম করতে ইচ্ছা করবে তো?'

মিঃ রায় হাসতে হাসতে বললেন, ঠিক আছে। নো মোর রসগোল্লা বাট ছানার জিলেপী ক্যান টু-ডে।

আমি এবার উঠে পড়লাম। এফ-আর-আই বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে একবার ভাল করে এই নিউ ফরেস্টকে দেখলাম। গাছ-পালার মধ্যে দিয়েও দুটো-একটা বাংলো নজরে পড়ল। দৃষ্টিটা ঘুরিয়ে নিতে নজর পড়ল দূরের বোটানিক্স। কাঠবিড়ালীর খেলাঘর।

বোধহয় একটু আনমনা হয়ে পড়েছিলাম। ঠিক মনে নেই। খেয়াল হতেই তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে এগিয়ে গেলাম। এগিয়ে গেলাম নিউ ফরেস্ট আর তার ছোট্ট বোটানিক্সকে পিছনে ফেলে।

চাকরাতা রোডের পর এসে একটু দাঁড়ালাম। বোধহয় কয়েক মিনিট। ভাবছিলাম কোন্ দিকে যাব—ডাইনে, না বাঁয়ে? মনে আছে গতকাল ডেরাডুন শহর থেকে আমার সময় বাঁদিক থেকে এসেছি। সেই-জনাই ডানদিকে হাঁটতে শুরু করলাম।

এফ-আর-আই আর মিলিটারী একাডেমীর প্রান্তে ছোট্ট একটা বাজার। হরেক রকম জিনিসের কয়েকটা ছোটখাট দোকানের মেলা। দোকানগুলোর আশে-পাশে চাকরাতা রোডের এপাশে-ওপাশে শাকসব্জী সাজিয়ে বসেছে আরো কিছু লোক। লোকজন বিশেষ দেখতে পেলাম না। আমি সামনের দিকে আরো এগিয়ে চললাম। কিছুদূর যাবার পর একটা নদী এলো। নদীর উপর পুল। দাঁড়ালাম। চারপাশ দেখলাম। সাদা-কালো ছোট-বড় পাথরনুড়ির জন্যে জলের ধারা প্রায় চোখেই পড়ে না। তবু ভাল লাগল। বরাকর নদীর জলের জন্যে কাছাকের মানুষকে ঘরছাড়া হতে হয়। শত-সহস্র মানুষের চোখের জল দেখে দামোদরের পাগলামী মাতলামী আরো বেড়ে যায়। ওখানে মানুষে চোর, নদীর জল আনন্দের বাড়েলাবাদ। আর এখানে?

পুল পার হয়ে নদীর বুকে নেমে পড়লাম। পাথরনুড়ি তুললাম, দেখলাম, ছুঁড়লাম। যেদিকে দু'চোখ যায়, সেদিকেই ছুঁড়লাম। ভারী মজা লাগল। কতদিন পর এমন ছেলেমানুষী করার সুযোগ পেয়ে ভারী ভাল লাগল। বহুদিন আগে বিকেল-বেলায় বরাকর নদীর পাড়ে বেড়াতে গিয়ে আমরা একদল ছেলে ইট-পাটকেল ছুঁড়তাম নদীর বুকে। কেন গুরুচরণ কলেজে ভর্তি হয়ে এমন ছেলেমানুষী করিনি?

গুরুচরণ কলেজের কথা মনে হতেই হাতের পাথরনুড়িটা আর ছুঁড়তে মন চাইল না। হাতটা যেন অবশ হয়ে এলো। সুন্দর সাদা পাথরের নুড়িটা বেশ সযত্নে নীচে নামিয়ে রাখলাম। আমি তাড়াতাড়ি নদীর বুক থেকে রাস্তায় উঠে এলাম। যে-নদীর বুকে এতক্ষণ খেলা করলাম, তার দিকে একবার পিছন ফিরেও তাকালাম না। একটা সিগরেট ধরিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে চললাম।

কতক্ষণ ধরে কতদূর হাঁটলাম, মনে নেই। হাঁটতে হাঁটতে কটা সিগরেট খেয়েছিলাম, তাও মনে নেই। মনে আছে আবার সিগরেট ধরাতে গিয়ে দেখলাম প্যাকেটে একটাও সিগরেট নেই। সামনেই একটা ছোট্ট দোকান দেখতে পেলাম। এগিয়ে গেলাম। দোকানটা ছোট হলেও বেশ ভাল। দোকান-দার বৃদ্ধ। মাথায় পাগড়ী।

দু' প্যাকেট সিগরেট নিয়ে একটা পাঁচ টাকার নোট দিলাম। বৃদ্ধ দোকানদার হিসাব-নিকাশ করে আমাকে টাকা-পয়সা ফেরত দিল। সাধারণতঃ সিগরেট-টিগরেট কিনে পয়সাকড়ি গুণে নেবার অভ্যাস আমার নেই। তবুও গুনলাম। প্রথম কথা নতুন জায়গা, তারপর সিগরেটের দামটাও জানা দরকার। আমাদের দেশে জিনিস-পত্তরের দামের কোন মাথামুণ্ড নেই। একই শহরে একই জিনিসের দশ রকম দাম। কলকাতায় যে সিগরেট খেতাম, এখনও সেই সিগরেট খাচ্ছি কিন্তু দামের কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। যে-কাজে আমি দুন ভ্যালীতে এসেছি তাতে জিনিসপত্তরের দামের প্রতি আমায় নজর রাখতে হবে। তাইতো নানা কারণে টাকা-পয়সা বেশ ভালভাবে গুনে নিলাম। কিন্তু একি? কলকাতা ছাড়ার পর তো এই দামে কোথাও সিগরেট পাইনি। দোকানদার বৃদ্ধ। হয়ত চোখে কম দেখে অথবা দোকানের মাল-পত্তরের দামের হিসাব জানা নেই বলেই কম দাম নিয়েছে।

'আপ পয়সা ঠিক লিয়া হ্যায়?'

বৃদ্ধ যেন চমকে উঠল, কিউ সাব? জাদা লে লিয়া?

না, না, জাদা লেননি না কিন্তু কম নাওনি তো?'

বৃদ্ধ হাসল। বেশ মধুর আত্মতৃপ্তির হাসি। 'না সাব! কম-বেশী নেবার অভ্যাস নেই।'

আমি অবাক না হয়ে পারলাম না। দিল্লী, মীরাট, মজঃফরনগর, রূরকি, ডেরাডুনে সিগরেট কিনেছি। কোম্পানীর দামের চাইতে প্রত্যেকে বেশী দাম নিয়েছে। কেউ পাঁচ পয়সা, কেউ আট পয়সা, কেউ আবার দশ পয়সা। ডেরাডুন শহর থেকে এত দূরে এই গ্রামের বৃদ্ধ দোকানদার আরো বেশী দাম নিলেও আমি আপত্তি করতাম না বা অসন্তুষ্ট হতাম না। বরং স্বাভাবিকই মনে হতো। কিন্তু...

হাতে টাকা-পয়সা নিয়ে বোধ করি কয়েক মিনিট চুপ করেই দাঁড়িয়েছিলাম। হাজার হোক বৃদ্ধ মানুষ। আমার চাইতে অনেক বেশী অভিজ্ঞ। তাইতো আমার মনের দ্বিধার কারণ বুঝতে পেরেছিলেন।

'আপ ইধার পহলে আয়ে হ্যায়?'

'হ্যাঁ।'

'নোকরি পেয়ে এসেছেন, নাকি বেড়াতে?'

'এখানে চাকরি করি না, তবে চাকরির কাজেই এসেছি।'

আমি প্যাকেট থেকে একটা সিগরেট বের করে ধরালাম। একটা টান দিয়ে বললাম, অনেক দিন পর একজন অনেস্ট দোকানদার দেখলাম।

বৃদ্ধ একটু ব্যস্ত হয়ে দু'হাত জোড় করে বলল, আরে সাব! এসব বলবেন না। জীবনে কত অন্যায় করলাম তার কি ঠিক আছে?

বৃদ্ধ একটু উদাস হলো। দৃষ্টিটা আমার দিক থেকে সরিয়ে কোথায় যেন নিয়ে গেল। সাধারণ দোকানদারদের শ্রদ্ধা করতে আমি শিখিনি কিন্তু এই মুহূর্তে এই বৃদ্ধকে আমি শ্রদ্ধা না করে পারলাম না।

'না, না, অন্যায় আবার কি করলেন?'

মাথার পাগড়ীটা ঠিক করে বৃদ্ধ বললো, দু'বেলা দুটুকরো রুটির জন্য প্রতি মুহূর্তেই অন্যায় করছি। বৃদ্ধ একটু চুপ করতেই ছোট্ট দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল, জানি না খুদার কি মর্জি!

আমার কোন কাজ ছিল না। দু'একজন লোকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করার উদ্দেশ্যেই বেরিয়েছি। সুতরাং আমি নিজেই পাশের একটা ভাঙা চেয়ার টেনে নিলাম।

আমাকে চেয়ার টানতে দেখেই বৃদ্ধ ভীষণ লজ্জিত হয়ে তাড়াতাড়ি চেয়ারটা পরিষ্কার করে দিতে দিতে বলল, মাপ কর না সাব। আপ মেহেমান হ্যায় কিন্তু আপনাকে বসতে পর্যন্ত বলিনি।

আমি চেয়ারে বসতেই বৃদ্ধ চীৎকার করে উঠল, কাকা, ইধার আনা।

কাকা? এর আগেও কাকা ডাক শুনেছি কিন্তু মনে ধরেনি। শহরে-নগরে [illegible]

আজকাল বেশীরভাগ বাড়ীর গিন্নিরাই
স্পা ওয়াশিং পাউডার ব্যবহার
শুরু করেছেন—কারণ কি?
এর কারণ, কাপড়চোপড় পরিষ্কার করতে স্পা অনেক বেশী শক্তিশালী। এর গাঢ় ফেনায় ময়লা কেটে যায়! যেসব ময়লা দাগ কিছুতেই উঠতে চায় না, তা'ও পরিষ্কার হয়ে যায়—এমন কি খরজলে কাচলেও।
সত্যি তাই। ঘরে ঘরে গিন্নিরা দিন-দিনই দেখছেন যে স্পা-ই একমাত্র শক্তিশালী পরিষ্কারক, যা দিয়ে খরজলে কাচলেও কাপড়চোপড় অনেক বেশী পরিষ্কার ধবধবে হয়। এর কারণ, স্পা বিশেষ উপাদানে তৈরী। তাই তো, স্পা-র ওপর সবার এত ঝোঁক! আপনিই বা বাকী থাকবেন কেন?
Spa
বিশেষ উপাদানে তৈরী
স্পা
—এই শক্তিশালী ওয়াশিং পাউডারে
জামাকাপড় সহজেই পরিষ্কার হয়ে যায়

কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারিনি। আজ তাই বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করলাম, কাকা কিয়া হ্যায়? চাচা?

বৃদ্ধ হেসে বলল, ছোট ছোট লেড়কাদের আমরা আদর করে ডাকি কাকা!

আচ্ছা!

বাড়ীর ভিতর থেকে একজন যুবক বেরিয়ে আসতেই বৃদ্ধ বলল, কাকা, চা পাঠিয়ে দাও তো।

আমি আপত্তি করলাম, না, না, চা কি হবে?

সাব, আমরা ফ্রন্টিয়ারের লোক। মেহেমানকে আমরা খুদা জান করি।'

চা খেতে খেতে শুরু হলো গল্প। বৃদ্ধের গল্প।

...আমরা পেশোয়ারের লোক। ফ্রন্টিয়ার প্রভিন্সের পাঠান।...

গল্প শুরু হতে না হতেই আমার প্রশ্ন, আপনারা কি মুসলমান?

'নেই সাব, আমরা হিন্দু।'

'তবে এর আগে কথায় কথায় খুদা বলছিলেন কেন?'

বৃদ্ধ হো-হো করে হেসে উঠল, খুদা ভী ভগবান।

সংস্কারমুক্ত বৃদ্ধের হাতে আমি যেন একটা থাপ্পড় খেলাম।

...জান সাহেব, তখন মানুষের হাতে এত পয়সা ছিল না কিন্তু শান্তি ছিল। খাওয়া-পরার অভাব ছিল না কারুর। তাছাড়া তখন মানুষ অনেক উদার, অনেক সৎ ছিল। আমাদের দেশের সাধারণ গরীব মানুষ লেখাপড়া শিখতে পারত না কিন্তু মানুষকে অবিশ্বাস করতেও শিখত না।...

বৃদ্ধ যেন কতকগুলো কেতাবী বুলি বলে গেল আমাকে। আমি হয়ত বিশ্বাস করলাম না ভেবে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আবার বলতে শুরু করল, আমি যখন বারো সালের তখন পিতাজীর সঙ্গে ফোর্ট স্যান্ডেমান গিয়ে জীবনে প্রথম তালা দেখলাম।

সে কি?

হাঁ সাব। আমাদের গাঁওতে কেউ ঘরে-দোরে তালা-চাবি লাগাত না। তালা-চাবি লাগাবার মতলব তো পড়শিদের অবিশ্বাস করা। সে কি কখনও সম্ভব?

চুরি হতো না?

চুরি? গাঁওতে? কভি নেহি। গাঁওকা সব আদমী ভাই-রিস্তাদার হতো। তারা তো চুরি করতেই পারে না...

বাইরের লোক এসেও তো চুরি করতে পারত?

বৃদ্ধ আবার হাসল। বললো, বাইরের লোকের এতনা সাহোস কাঁহাসে হোগা? তাছাড়া চোর পাকড়ালেই তো তার জান খতম!

জান খতম?

জি হাঁ সাব। গুস্সামে জরুর কেউ না কেউ মেরে দেবে। বৃদ্ধ একটু থামল। একটু ভাবল। আবার শুরু করল, পাঠান লোগ বহুত ঠাণ্ডা হয় কিন্তু গুস্সা হলে সবকিছু করতে পারে।

বৃদ্ধ অনেকক্ষণ নিজের কথাই বলে গেল। আমার কথা কিছুই শোনেনি, জানেনি। এবার বোধহয় খেয়াল হলো।

সাব, আপ কাঁহাকা রহনে বালা?

আমি একটু দ্বিধা-সঙ্কোচে বললাম, আমি বাঙালী।

আপনি নেতাজীর দেশের আদমী? আপনারা সাচ্চা ভাগ্যবান।

নেতাজীর মত আমিও বাঙালী সত্য কিন্তু শুধু সেজন্য আমার গর্ব করার অধিকার আছে কি নেই, তা ঠিক বুঝতে পারিনি। আমি চুপ করে রইলাম।

বৃদ্ধ যেন থামতে পারছিল না। বাঙালকা অওরৎ খুব শরীফ হয়। তাছাড়া পাঠানদের মত আপনারাও দুষমনকে বরদাস্ত করতে জানেন না। আপনারা অনেক পড়াই-লিখাই করেন বলে আমাদের মত গুস্সা আপনাদের নেই।'

বাঙালীকে এত শ্রদ্ধা করার কারণ আছে কিনা তা আমি জানি না। তবে এই সদ্য-পরিচিত বৃদ্ধ পাঠানের মুখে নেতাজীর প্রতি ভক্তি, বাঙালীর প্রতি শ্রদ্ধা শুনে স্তম্ভিত না হয়ে পারলাম না।

আমাদের এই কথাবার্তার মধ্যে মাত্র দু-একজন খদ্দের এসে সামান্য কিছু নিয়েই চলে গেল। বৃদ্ধ পাঠান তাদের প্রতি বিশেষ নজরও দিলেন না। আগের মুহূর্তেই আমার সঙ্গে কথা বলতে ব্যস্ত হলেন।

মনে হলো অনেক দিন কারুর সঙ্গে প্রাণ খুলে কথা বলেন না বা বলার সুযোগ পাননি। তাইতো আমার মত শ্রোতা পেয়ে বড় খুশী।

'নেতাজী আপনা লাইফ কোরবাণী দেবার জন্য সবসে পহেলে এগিয়ে এসেছিলেন। তাছাড়া দুসরা হিন্দুস্থানী নেতাদের মত বিলকুল ঝুটো মিঠা মিঠা বুলি দিতেন না। সাফ সাফ সবাইকে বলতেন আংরেজকে হটাতে হলে তোমাদের খুন দিতে হবে, কোরবাণী করতে হবে জান-প্রাণ...

এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলেই একটু থামলেন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো।

'পাঠানরা সিধা বাত বলতে ও শুনতে পসন্দ করে। তাইতো পাঠানরা নেতাজীকে পসন্দ না করে পারেনি। হাজার হাজার পাঠান আজাদ হিন্দ ফৌজে নাম লিখিয়েছিল, খুন দিয়েছিল, কোরবাণী দিয়েছিল প্রাণ।'

বৃদ্ধ পাঠানের দৃষ্টিটা হঠাৎ যেন আমার দিক থেকে অন্য দিকে ঘুরে গেল। লক্ষ্য করলাম, চোখদুটো শূন্যতায় একটু ঝাপসা হয়ে শিবালিক পাহাড়ের কোলের অন্ধকার অরণ্যে হারিয়ে গেল।

চাকরাতা রোডের নিস্তব্ধতা ভেঙে দুটো-একটা গাড়ী চলে গেল। বৃদ্ধ তার দূরের দৃষ্টিকে কাছে গুটিয়ে এনে একটু উত্তেজিত হয়েই জিজ্ঞাসা করলেন, ইম্ফলের নাম শুনেছেন?

'খুব শুনেছি।'

'কভি ইম্ফল গিয়েছেন?'

'খুব কাছেই থাকতাম কিন্তু যাওয়া হয়নি।'

'আপনি কি মণিপুরে থাকতেন?'

'না। তবে মণিপুরের পাশেই শিলচরে থেকেছি অনেকদিন।'

'তবুও ইম্ফল যাননি? বড়া আফসোসের কথা।'

আমি চুপ করেই রইলাম।

একটু পরে বৃদ্ধই ভেজা ভেজা গলায় বললেন ঐ ইম্ফলের কাছেই মৈরাং পাহাড়ে আমার ভাই জান দিয়েছিল লড়াই করতে করতে। এক বেইমান অফিসার যদি আংরেজকে খবর না দিত ওদের রাশন খতম হয়ে গেছে, তাহলে হিন্দুস্থানের কাহানী বদলে যেত।

বাড়ীর ভিতর থেকে যুবকটি বেরিয়ে আসতেই বৃদ্ধ আর এগুতে পারল না। আমারও খেয়াল হলো অনেকক্ষণ বসে আছি, হয়ত ওদের কাজের অনেক ক্ষতি করলাম।

'আচ্ছা নমস্তে। আজ চলি।'

বৃদ্ধ করজোড়ে নমস্কার করে বললো, নমস্তে সাব। মেহেরবাণী করে আবার দর্শন দেবেন।

'জরুর।'

আমি উঠতেই বৃদ্ধ বাড়ীর ভিতর চলে গেলেন।

(ক্রমশঃ)

বিশালাক্ষী

দিলীপ সেনগুপ্ত

হাত দুখানা তক্তপোষের দু প্রান্তে ছড়ানো। দুই পা একটি অন্যের সঙ্গে লাগোয়া। মাথার চুলের গোছা চাপ লেগে ফেঁপে আছে ঘাড়ের নীচে। চিত হয়ে শুয়ে। চোখজোড়া সোজাসুজি ওপরের কালি-ঝুলিপড়া কড়িকাঠে আটক। অনেকক্ষণ থেকে। এক-আধবার পাতা নড়ছে।

ঘরের চারপাশে দেখার মত চলনসই গেরস্তপনা আর কিছু নেই। তক্তপোষের শেষে পায়ের দিকে ডানদিক ঘেঁষে লম্বা-গোছের আয়নার সামনে কে যেন বসে। শোভা। চোখ কপালে তুলে কি যেন দেখল। একটা ঝুলের রেখা সেঁটে আছে দেয়ালে। অন্যমনস্কতায় দৃষ্টি আর একটু ঢৌয়িয়ে দিল বাঁপাশে। ওখানে একজন ঘুমোচ্ছে। ঠিক ঘুমোচ্ছে না। ঘুমের চেষ্টা করছে। কদিন খুব ধকল গেছে মানুষটির ওপর দিয়ে খুব ক্লান্ত। ক্লান্তই মনে হয় না শুধু, বেশ অসুস্থ লাগে। শোভার বাবা।

শোভা দিদির জন্যে অপেক্ষা করে আছে। এখনও আসছে না দিদি। নিশ্চয় গল্পে মেতে গেছে বাচ্চুদার সঙ্গে। বরাবরই দিদি খুব গল্পবাজ। শোভা তেমন নয়। গম্ভীর ধরনের। বাচ্চুদা ফাজলামি করতে এলে পাত্তা দেয় না।

-আজ শাড়ি পরেছে শোভা। অন্যদিন ফ্রক পরে।

—[illegible]

তক্তপোষের শায়িত দেহটি নড়ে উঠল। মা ডাকছে শোভাকে। তাড়াতাড়ি উঠে এল শোভা।

— ডাকছো মা?

ছড়ানো হাতখানা সামান্য উঁচু করে শোভার হাত চাইল মা। শোভা দাঁড়িয়ে দিতেই খপ করে ধরে ফেলল। বলল, কি করছিলি রে?

—কিছু না মা। খপ করে কেঁদে ফেলল শোভা।

—কাঁদছিস কেন রে?

মা ছোঁয়াচে ধরতেই সামলে নেবার চেষ্টা করল নিজেকে। তাতে আরও কান্না পেল। সেই অবস্থায়ই বলল, কাঁদি নি তো!

—হ্যাঁ কাঁদিস না। সব তো ভগবানের হাতে।

মা শোভার গালে হাত বোলাল। শোভা মার কপালের দিকে চেয়ে রইল। যে কপাল মাকে এমন দশায় ফেলেছে।

—আজ তুই কাপড় পরেছিস—নারে?

শোভার কাঁধ থেকে হাতড়াতে-হাতড়াতে আঁচল পেয়েই আলতো টান মারল মা। শোভা ঝুঁকে পড়ল মার বুকের ওপর। তাড়াতাড়ি শোভার মাথাটাকে বুকের ওপর চেপে ধরেই ফোঁস-ফোঁস করে কাঁদতে শুরু

CENTRAL LIBRARY

করল মা। শোভার ঘাড়ে লাগল। তবু উঠল না। মা না ছাড়লে মাথা তুলতে পারছে না। এবারে কিন্তু মার সঙ্গে কাঁদল না শোভা। ওর মনে হল, যতখানি দুঃখ এই কাঁদিনে পেয়ে গেছে, তারচেয়ে বেশী কষ্ট আর কিছুতে থাকতে পারে না। মা'র কান্নায়ও না। মা তো কাঁদবেই। তাঁর এখন কাঁদার কাল।

ও ফ্রক ছেড়ে শাড়ি জড়িয়েছে, সেটা এক ব্যাপার, আর মা এই যে কাঁদল, তা অন্য ব্যাপার। দুটোর মধ্যে কোন সম্পর্ক খুঁজে পেল না শোভা। অত বোঝেও না। তবে শাড়ি নিয়ে মা'র সঙ্গে কথা হয়েছে বার-কয়েক। তখন চোখ ছিল মায়ের। বলত, তোকে আর ফ্রকে মানায় না। বলেই হাসত। মা খুব ঠাট্টা-ইয়ার্কি করে মেয়েদের সঙ্গে। ছেলে নেই। বিভা আর শোভা দুই মেয়ে। বিভা চার বছরের বড়। শোভা চট করে চোখ দুটি তলায় এনে বুক বরাবর দেখে নিত। মা যে কি করে—! এমন একটা আড়ষ্ট ভাব জড়িয়ে ধরত যে পরিষ্কার গলায় আর কথা বলতে পারত না। ফুরসৎ খুঁজে সরে যেত। এমনভাবে, যেন বুঝতে না পারে মা।

দিদির একখানা শাড়ি অনায়াসে পরে নিতে পারত শোভা। কিন্তু পরি-পরি করে আর হয়ে ওঠে নি। আজ পরল। দৃষ্টি থাকতে মা'র কথায় অবহেলা, আর অন্ধ মায়ের সামনে সাজের বহর কেন? বুঝল না শোভা। তবে তৃপ্তি পেল কেমন একটা। মা যা পছন্দ করে তাই করতে পেরেছে বলে। এখন যেন বুঝতে পারছে, মার কত দাম! চোখের কত দাম!

হঠাৎই অন্ধ হয়ে গেল মা। এরকম শোনা যায় না। বাঁ চোখ প্রায়ই লাল হত। স্নানের পর আরও। অনেকক্ষণ ধরে পাড় লালচে ভাব লেগে থাকত চোখে।

—দ্যাখ্ তো—চোখটা কি লাল দেখাচ্ছে? বিভা বা শোভা যাকে কাছে পেত তাকেই জিজ্ঞেস করত মা। ওরা দেখত। বলত, হ্যাঁ মা। হাসপাতালের ডাক্তারকে দেখিয়ে আনব।

বিপিনবাবু আই-ড্রপ এনে দিলেন। তাতেও কিছু হল না। অবশ্য ব্যাপারটাকে খুব একটা গুরুত্ব দিয়েও দেখল না কেউ। চোখ অনেকেরই লাল হয়। তেমন হেরফের কিছু হয় না তাতে। ছুটির দিনও এল-গেল অনেকগুলো। গড়িমসিতে হাসপাতালেও যাওয়া হল না। আগে ছিল একটা। ক্রমশ দুটো চোখ লাল হতে শুরু করল।

ছুটি মেলে। ফুরসৎ মেলে না। মাথার যন্ত্রণায় টিঁকতে পারে না মা। ট্যাবলেটে কুলোয় না। বরাবরের সহ্যশীলা মা'ও স্থির থাকতে পারছে না। কপালসুদ্ধ মাথাটা কেটে ফেলতে ইচ্ছে করে। দাঁত-ঠোঁট চেপে থাকে কোনমতে। বিপিনবাবু ঠিক করলেন, শনিবার অফিস ছুটি নিয়ে স্ত্রীকে দেখিয়ে আনবেন। শোভা-বিভা পালা করে মাথা টেপে। গুরুত্ব দিতে শুরু করে ঘটনায়।

ফাঁকে-ফাঁকে উঠে রান্না করে মা। মেয়েরা পারে না।

বিপিনবাবু বাড়ী ছিলেন না। শোভা ছুটে এল। বিভা সদর দরজায় গল্প করছিল বাচ্চুর সঙ্গে। ওপরে চলে এল। বিকট চিৎকার শুনেই আসে। কোথা থেকে কে চেঁচাল তা বুঝতে মুহূর্ত কয়েক সময় লাগল। সব জড় হল মায়ের চারপাশে। ভাড়াটেরা সুদ্ধ। বাচ্চুও। যাঁকে একদম দেখতে পারে না মা।

হাত পা ছুঁড়ছে আর মেঝের গড়াচ্ছে মা। আর গলা-ফাটানো চিৎকার।

—ওরে আমার বাঁচা। লক্ষ্মীসোনা আমার বাঁচা—

খাওয়া-দাওয়ার পর বিছানা নিয়ে এক-দৃষ্টে আকাশ দেখছিল মা। জানালা দিয়ে। রোদ্দুর পড়ল চোখের ওপর। আলো। এত আলো একসঙ্গে আগে কখনও দেখে নি মা। আশ্চর্য! হঠাৎ দপ করে সব আলো সমস্ত শক্তি উজাড় করে মার চোখের ওপর জ্বলে উঠেই নিভে গেল। কি হল? চোখ ঘষল দু হাত দিয়ে। গোটা কয়েক মুহূর্ত কাটল। অদ্ভুত আশ্চর্যকে বোঝবার জন্যে। তার পরেই আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে আছড়াতে শুরু করল।

—কি মা? কি? এই তো আমরা বিভা-শোভা ঝুঁকে পড়ল মার বুকের ওপর। কেঁদে ফেলল শোভা। ভয়ে মাকে জড়িয়ে ধরল বিভা।

—কি হয়েছে—কি হয়েছে মা? কি হয়েছে তোমার? বাবা—বাবাকে কে খবর দেবে?

বাচ্চু দাঁড়িয়ে ছিল পেছনে। বিভা বলতেই পেছন ফিরে ছুট মারল। অফিসের নাম ওর জানা আছে। খুঁজে নিতে পারবে।

—আমার চোখে কি হল? আমার চোখ ঠিক করে দে—আমার চোখ—আর্তনাদ করছে মা।

—কি হয়েছে দিদি আপনার? কি কষ্ট? — ভাড়াটে বউরা এসে ধরল মাকে।

—আমি যে দেখতে পাচ্ছি না কিছু— ধরে রাখা যাচ্ছে না মাকে। সবার শক্তিকে হার মানিয়ে গড়াগড়ি দিচ্ছে।

কেউ বিশ্বাস করল না। একজন জল-জ্যান্ত চক্ষুষ্মতী কখনও এমনিভাবে অন্ধ হয়ে যেতে পারে না। মাথায় জল দিতে বলল কেউ। কেউ বলল, গা গরম কি না দেখতে। ডাক্তার আনতে। মাথায় বাতাস করতে।

এই তো খানিক আগে কপাল টিপে দিয়ে গেছে শোভা। দিদিকে ডেকে আনতে গিয়ে দেখেছে, ওরা ব্যস্ত। মানে বাচ্চুদা আর বিভা। ওপরে উঠে আসছিল। তক্ষুনি এই ব্যাপার।

একবার মুহূর্তকাল থামে, আবার চেঁচায় মা।

—বিভা-শোভা কোথায় গেলি? আমার কি হয়েছে দ্যাখ একটু। তোর বাবাকে খবর দে। তোরা স্বার্থপর। বল্ তোরা— কেন দেখতে পাচ্ছি না আমি—হায় ভগবান! হায় ঠাকুর! ঠোঁট দুটো ফুলে-ফুলে ওঠে আর হাউ-হাউ করে মা।

এসব কি বলছে মা? ওরা স্বার্থপর? ওদের স্নেহময়ী মা এমনভাবে বদলে গেল?

মা'কে ধরে আছে দুজনেই। আতঙ্কে ওদের সারা শরীর কাঁপছে। পাশের ঘরের বউ-মেয়েদের দিকে দিশেহারার চোখে তাকাচ্ছে। ওরা কিছুই ধরতে পারছে না।

ডাক্তার এল। কিছুই বুঝল না।

—এদিকে দেখুন—কটা আঙুল বলুন তো?

আবার কান্না। আর্তনাদ।

—হায় ভগবান—কিছু দেখতে পাচ্ছি না—এ আমার কি হল?

—হাসপাতালে নিতে হবে। কিছু ডায়াগনাইজ করতে পারছি না। সিমটম্ টু বি— আর কিছু বললেন না ডাক্তারবাবু।

বিপিনবাবু এলেন। আবার হইচই।

ট্যাক্সি চাপিয়ে বাপ-মেয়েরা আর ভাড়াটেদের এক বউ হাসপাতালে এল অস্থির রোগিনী নিয়ে।

—ওগো তুমি কোথায়—বিভা-শোভা— আমি কি দোষ করেছি ঠাকুর — এ সাজা দিলে কেন ভগবান—এ সাজা দিলে কেন? না—না, আমায় ভলো করে দাও। আমার চোখ ফিরিয়ে দাও—দোষ করে থাকি অন্য সাজা দাও ঠাকুর!

সারাটা রাত বিভা-শোভা আর বিপিন-বাবু ওয়ার্ডের বাইরে ছটফট করলেন। ভাড়াটে বউ 'আবার আসবো' বলে চলে গেছে। বাচ্চু এল একবার। বিভার রাগ হল বাচ্চুকে দেখে। কেন না, মার অপছন্দ। বাচ্চুও সেটুকু আন্দাজ করে চলে গেল।

হাঁটুতে মাথা গুঁজে কাঁদছে শোভা। দিদিকে জড়িয়ে বিভ্রান্ত। অস্ফুটে ধমক লাগালেন বিপিনবাবু, কি করছিস—চুপ কর।

ভোর রাতে খবর এল। সত্যি অন্ধ হয়ে গেছে মা। কপালের রগ দুর্বল হয়ে দৃষ্টি খোয়া গেছে। তবু দু-একদিন আরও দেখবেন ডাক্তারেরা। যদি কিছু উপায় বার করা যায়।

না না। নিশ্চয়ই অন্ধ হবে না মা। পৃথিবীতে এত লোক থাকতে ওদের মা-ই

মা অন্ধ হতে যাবে কেন? ঠিক সেরে যাবে চোখ।

সব থাড় হয়ে গেল। দৃষ্টি ঘুচল মায়ের। বাইরে নিয়ে যেতে পারলে হয় তো কিছু করা যেতে পারে। ভারত-ভূখণ্ডের বাইরে। যা ওরা কেউ ভাবতেই পারে না।

মায়ের অন্ধত্ব সম্পর্কিত দুর্ঘটনার মধ্যে আর কোন নতুনত্ব নেই। এই কদিনেই ব্যাপারটা পুরোন হয়ে গেছে। এখন আর শোভার মনে হচ্ছে না, ওর মা অন্ধ হল কেন? স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেছে যে, মা আর দেখতে পারছে না। এবং পারবেও না। শেষেরটি ভাবতে ঠোঁট ফোলে। বুকের ভেতরটা ভেঙে যায়। থেকে-থেকে চিৎকার করে উঠছে মা। শুনতে-শুনতে তা-ও সয়ে গেছে।

এই ভাবনা আর শাড়ি পরার সঙ্গে কোন মিল নেই। যেহেতু মা বলত, 'তোকে আর ফ্রকে মানায় না' সেজন্যেই কি সাজ বদল করা? কিন্তু মা তো আর বলবে না কিছু? কিসে ভালো দেখায় না দেখায় তা-ও বুঝবে না আর। এই যে ওর শাড়ি পরার সংবাদ মা ওর আঁচল টেনে কাঁদল, কিসের জন্যে? তক্ষুনি ধরতে না পারলেও একটু পরে বুঝল। শোভাকে শাড়ি পরে কেমন দেখায় তা নিজের চোখে দেখা হল না বলেই এই কান্না। মেয়ে যে তাঁর আজ দুপুর থেকে যুবতী হয়েছে, তা স্বচক্ষে দেখার আনন্দ থেকে বঞ্চিতার দুঃখই এই কান্নায় ভেঙে পড়েছে। না পরলেই পারত শোভা।

—বিভা কোথায় রে? জিজ্ঞেস করল মা।

মার চোখের কোণ দুটো আঙুলের ডগা দিয়ে মুছিয়ে দিয়ে আস্তে-আস্তে বলল শোভা, ও বাড়ী গেছে।

—কেন? গম্ভীর হল মা।

—ওরা ডেকেছে।

মা ঠোঁট চাপল। প্রাণপণে দু চোখ একবার বন্ধ করে আবার খুলল। নয় তো দৃষ্টি ফিরিয়ে আনার জন্যে মরীয়া হল একবার। শোভার হাতখানা আরও শক্ত করে পাঁচ আঙুলে আপটে আচমকা চেঁচিয়ে উঠল, ডেকে আন। এক্ষুনি ডেকে আন। আমি দেখতে পাই না বলে যা খুশি তাই করবে? ডাক এক্ষুনি।

—এক্ষুনি যাচ্ছি।

শোভা ওঠার চেষ্টা করল। দিদিকে ওরও দরকার। একা-একা থাকতে পারছে না। তক্তপোষে অন্ধ মা। মেঝের ক্লান্ত বাবা। কেমন যেন ভয়-ভয় লাগছে। তাই দিদির জন্যে বসে ছিল তখন থেকে। উঠতে গিয়ে আটকে গেল শোভা। মা ধরে আছে। রাগের মুখখানা বদলে গেছে। ঠোঁট কাঁপিয়ে জিজ্ঞেস করল, দেরী করবি না তো?

কোন দিক তাকিয়ে কথা বলছে মা? শোভা তাকিয়ে রইল। অন্ধ মা। যেন এই একটু আগে চোখ ছিল। এখন নেই। অথচ বোঝা যায় না। খোলা চোখ। ঘরের দেয়াল, কড়িকাঠ, আয়না, এমন কি খানিক তফাতে শায়িত বাবা, সকলকে দেখছে। এ তো ওরই মা। যাঁর চোখ নেই, সে অন্য কেউ।

মাথার মধ্যে ঝিম-ঝিম করছে শোভার। বুক কাঁপছে। দারুন অস্বস্তি। কি যেন—কি যেন একটা করতে হবে এখন। ও হ্যাঁ, দিদিকে ডাকতে হবে। মনে-মনে মুক্তির জন্যে উতলা হয়ে উঠল। মায়ের হাত থেকে মুক্তি। অস্বস্তির হাত থেকে মুক্তি। কখনও এই রকম সব কথা মনে আসে নি আগে। বইতে পড়েছে। যত দিন যায়, তত অভিজ্ঞতা বাড়ে। সেটাই বোধ হয় ঘটে যাচ্ছে ভেতরে-ভেতরে। শোভার বয়েস বেড়েছে। শোভা শাড়ি পরেছে।

—বলেই চলে আসবো মা। শোভা তাড়াতাড়ি উঠে গেল।

—শোভা কি চলে গেলি? মিনিট-খানেক পরে জিজ্ঞেস করল মা।

—হ্যাঁ। বিভাকে ডাকতে পাঠালে তো। বিপিনবাবু উঠে বসলেন।

অন্য মনে কি যেন ভাবল মা। আপন মনে একবার হাসল।

—হ্যাঁ গো—! কাপড় পরে শোভাকে কেমন লাগচে গো?

যাঁকে জিজ্ঞেস করল, তিনি কিন্তু চট করে কোন জবাব দিতে পারলেন না। বাইশ বছর সুখ-শান্তি, কলহ-প্রেমে ঘর করতে-করতে একি হল শেষে? ভেতরটা খাক হয়ে যাচ্ছে। নিরীহ মানুষ। মেয়ে দুটো না থাকলে হয় তো পাগল হয়ে যেতেন। বাপ হিসেবে সন্তানের মন সামলানো কর্তব্য বলেই বহু দুঃখে চেপে আছেন সব। মৃত্যু-দুর্ঘটনা সব কিছুকে ছাপিয়ে দিয়েছে স্ত্রীর এই অন্ধত্ব। মেনে নিতে কষ্ট হয়। তবু সত্য।

দুপুরে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন বোধ হয়। ঘুমের মধ্যে দেখেছেন, অন্ধ নয়। স্ত্রী তাঁর চক্ষুষ্মতী। তার পরেই দীর্ঘশ্বাসের হাওয়ায় মেঝের ধুলো সরে গেছে। শোভাকে কেমন দেখাচ্ছে, এ প্রশ্নের কি জবাব হবে বুঝতেই পারছেন না। কি বলবেন, ভালো না খারাপ?

—চুপ করে আছো যে? আবার প্রশ্ন।

উঠে এলেন বিপিনবাবু। হাত বাড়িয়ে দিল শোভা-বিভার মা। ধরতে গিয়ে থর-থর করে হাত কাঁপল বিপিনবাবুর। বললেন, বলো কি বলছিলে?

—শোভাকে ডাক না একটু! চেঁচিয়ে ডাকো—ওকে নিয়ে বড় ভয় আমার। ও বাড়ীর বাচ্চু ছেলেটা ভালো নয়। হ্যাঁ গো—কেমন দেখাচ্ছে ওকে?

—ভালো। ছোট্ট জবাব দিলেন বিপিন-বাবু।

—ও কি কথার ঢং তোমার? আর কিছু বললে না যে? আবার প্রশ্ন। দ্বিতীয়বার উত্তরের আগে শোভা ঢুকল ঘরে। পেছনে বিভা। তাড়াতাড়ি হাত ছাড়িয়ে সরে বসলেন বিপিনবাবু।

—দিদি এসেছে মা। শোভা মার মাথার কাছে বসল।

আবার একটু মুচকি হাসল মা। চোখ দুটো স্থির। শোভা-বিভা-স্বামী সকলেই কাছে আছে। অথচ অন্ধকার। আবার গম্ভীর। বিষণ্ণ।

—মা গো—আর পারি না। অস্ফুটে আর্তনাদ করল মা।

কেউ তাকে ভালবাসে না। কেউ চিন্তা করে না। সব স্বার্থপর। নিষ্ঠুর। কোথায় গেল? আলো কোথায় গেল? ছিল কোনদিন? হ্যাঁ ছিল, ছিল। এই ছিল। এই নেই। শোভাকে কেমন দেখতে? বিভাকে? শোভা-বিভার জন্মদাতাকে? ওদের একবার দেখতে ইচ্ছে করছে এখন। ভগবান! এ কি করলে? থাক। ওরা সুখে থাক। আনন্দে থাক। অন্ধের জন্যে ওদের যেন একটুও দুঃখ না হয়। ওরা হাসুক। খেলুক। যা খুশি করুক।

—বিভা-শোভা কাছে আয়। আমায় একটু তুলে বসা।

চিৎকার, তারপর কান্না। ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে। তারপর এক নাগাড়ে।

—কেঁদো না মা। আমাদের দিকে তাকিয়ে কেঁদো না।

বিভা বড় হয়েছে। গুছিয়ে কথা বলতে পারে।

—তোদের দিকে তাকাবো? কি বললি বিভা? কি বললি? আমি বেঁচে আছি কেন—ঠাকুর—একটিবার দেখাও সব। এক ঝলক দেখাও। আর কিছু চাই না।

বিপিনবাবু মুখে 'উঃ' শব্দ করে পায়চারি করতে লাগলেন ঘরময়। মা থেমে গেছে। খোকা চোখ মুছছে। বিভা আঁকড়ে ধরে আছে মাকে।

—কি করছিলি ও বাড়ীতে? শীতল প্রশ্ন করল মা।

—ওরা ডেকেছিল। বলল বিভা।

—কেন?

—তোমার কথা জিজ্ঞেস করতে। মাসীমা খুব কাঁদলো।

খানিকক্ষণ চুপ করে রইল মা। খোকা আর বিভা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। দুজনের মৃন্ময় চোখের জল গড়িয়ে শুকিয়ে আছে।

হঠাৎ ধমকে উঠল, আর কখনও ও বাড়ীতে যাবি না। কোথাও যাবি না আর বুঝেছিস? কাকে বলছে দুজনেই তা বোঝবার চেষ্টা করতে লাগল।

—বাচ্চু ভালো ছেলে নয়। খোকা অত বুঝতে পারবে না।

বিভা হতভম্ব। সে জাস্টিক মার দিকে খানিক তাকিয়ে দেখে চোখ ঘুরিয়ে নিল খোকার দিকে। খোকার বুক আর বাচ্চুদার মাঝখানের সম্পর্কটাকে কিছুতেই কোন অনিবার্য লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে পারল না। বরং বিভার শাড়ি আর বাচ্চুদার মধ্যে সম্পর্ক আছে। বাচ্চুদাকে ভাল লাগে বিভার। বাচ্চুদাও তার ভাল লাগার কথা জানিয়েছে বিভাকে। আর মা বলছে কি এসব? কেন যে মা বাচ্চুদাকে সহ্য করতে পারে না কে জানে? অথচ বাচ্চুদা বেশ ভাল ছেলে। দেখতেও ভদ্রলোকের মত।

খোকা প্রতিবাদ করছে না কেন? শাড়ি পরে চাঁদে হাত দেবার মতলব করছে না তো? আর, মা বললেই কি অসম্ভবটা সম্ভব হয়ে যাবে? কোন কাজ নেই তো, চোখ বুইয়ে আনাড়ির মত আজে-বাজে বকতে শুরু করেছে।

—কথা বলো না মা একটু শান্ত হয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করো। বিভা বলল মাকে। ফল হল উল্টো।

—কেন কথা বলবো না? এই অবেলায় ঘুমোবই-বা কেন? তোরা আমার ঘুমও খেয়েছিস। তোর বাবা যদি একটু শক্তপোক্ত হত, তবু নিশ্চিন্ত হতাম। আমি এখন কি করি? উঃ—আমায় একটু বসিয়ে দে খোকা।

কারও সাহায্য ছাড়াই উঠে বসল মা।

—তোর বাবা কই রে?

—এই তো। কিছু চাইছো? বিপিনবাবু এগিয়ে এলেন।

—শোন—না থাক। আবার চুপ।

—এখন কটা বাজলো গো? নিজের পায়ে হাত বুলিয়ে জিজ্ঞেস করল মা।

—চারটে। বিপিনবাবু বললেন।

—চারটে? বিভা চা কর না একটু।

—করছি মা।

স্টোভ ধরিয়ে একটা কথা মনে পড়ে গেল বিভার। বাচ্চুদা বলে দিয়েছে।

—খুব সাবধানে থাকবে বিভা। তোমার মা ন্যাচারাল খুব সেন্টিমেন্টাল হয়ে উঠবেন। অনাদর না করলেও কেবলই ওনার মনে হবে তোমরা অনাদর করছো। ক্লেভারলি না চলতে পারলে অশান্তি ঘটবে। সত্যি, বড় স্যাড!

বাচ্চুদা অনেক কিছু বোঝে। বিভা মিলিয়ে দেখল, ঠিকই বলেছে বাচ্চুদা। মা যেন কেমন হয়ে গেছে। যাকে বলে সেন্টিমেন্টাল।

রান্নাঘর থেকে শুনতে পেল না বিভা। খোকাকে মা জিজ্ঞেস করেছে, বাচ্চু ঘরে ছিলো?

এাঁ—না মা। মিথ্যে বলে ফেলল খোকা।

খোকাও ঠিক বোঝে না, বাচ্চুদার ওপর মার এত রাগ কেন? 'ছিল' বললেই চটে যেত। উপস্থিত বুদ্ধিতে মাকে ঠাণ্ডা করেছে খোকা। কিন্তু এতে কি দিদিকে প্রশ্রয় দেওয়া হয় না?

মা আজ দেখতে পায় না বলে দিদি মার মনের বিদ্বেষে বাচ্চুদার সঙ্গে চলা-ফেলাই বা করবে কেন? অবশ্য, আগেও করত।

বুদ্ধি খাটিয়ে বিচার করে দেখল খোকা। দিদিকে নিয়ে মার কোন ভাবনা নেই। যত ভাবনা ওকে নিয়ে। বাচ্চুদা ওকে দেখলেই ইয়ার্কি মারার চেষ্টা করে। কিন্তু দিদির সঙ্গে কথা বলার সময় বেশ গম্ভীর চাল দেখায়। যেন খোকা কচি খুকি। ফালতু একটা। দিদিকে কথাটা জিজ্ঞেস করতে হবে একবার।

বিভা চা নিয়ে এল। দু' হাতে দুটো কাপ। একটা বাবার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, ধরো বাবা। অন্য কাপটা টেবিলের ওপর রেখে, খুব আস্তে আস্তে ছোট্ট টেবিলটা তক্তপোষের কাছে এনে, মার একখানা হাত টেনে আনল। চায়ের কাপটা তুলে নিল।

—এই নাও মা চা।

—দেখিস, পড়ে না যেন। বাবা সাবধান করলেন বিভাকে।

খুব সাবধানে মার হাতে কাপ ধরিয়ে দিয়ে মুখোমুখি বসল বিভা।

—আমার চুলটা একটু বেঁধে দে তো কেউ।

সঙ্গে সঙ্গে উঠে চিরুনি আনল খোকা।

—আজ কি বার রে?

—রবিবার মা।

চিরুনির টানে মার মাথা পেছনে হেলে পড়ল একটু। গরম চা চলকে জোড়া পায়ের একখানায় কয়েক ফোঁটা পড়তেই ধমকে উঠল মা, আস্তে আঁচড়া না—।

—খোকাকে কাপড়ে কেমন লাগছে রে বিভা? হেসে এবার জিজ্ঞেস করল মা।

—আমার চেয়েও বড় লাগছে। বলল বিভা। হেসে।

অদ্ভুত দেখাল মাকে এবার। বিভার মনে পড়ল বাচ্চুদার কথাগুলো।

একটা ঠোঁট ভিজে ভিজে লাগছে মায়ের। ভিজে ঠোঁটটা মুখের ভেতরে চেপে বলল, তোকে আজ কাপড় পরতে বললো কে রে খোকা?

খোকা থমকে গেল। এই রকম একটা কথা যে উঠবে তা কল্পনাতীত ছিল। দিদির দিকে নিরুপায়ের মত তাকিয়ে রইল। চিরুনি থেমে গেল।

—কি রে—কি ভাবছিস? আবার বলল মা।

উত্তর দিতে এবারেও দেরী হল খোকার। থেমে থেমে বলল, নিজে থেকেই পরেছি মা।

বিনা অস্ত্রোপচারে
অর্শ থেকে
আরাম পাবার
জন্য
হ্যাডেনসা
ব্যবহার করুন!

—ও। আমার কথায় নয়?

বাচ্চুদার কথাই ঠিক। বিভা আবার ভাবল। বাচ্চুদার প্রতি সপ্রশংস ভাবনার দৃষ্টিটা পড়ল এসে শোভার ওপর। শিভার অন্যমনস্কতায়।

—হাসছিস কেন রে দিদি?

শোভার প্রশ্নে ঘাবড়ে গেল বিভা। কোনমতে জবাব দিল, কই? হাসলাম কখন?

বাবা পেছন ফিরে কি যেন ভাবছেন। মা গম্ভীর। কপালে ভাঁজ পড়েছে। বলা যায়, দুশ্চিন্তায়। কার জন্যে? শোভার, বিভার না বিপিনবাবুর?

—মা—! হঠাৎ ডুকরে উঠল শোভা। জড়িয়ে ধরল মা'কে। বাবা ঘুরে দাঁড়িয়ে ব্যস্তভাবে বললেন, কি হল?

—না, কিছু না। শোভা সামলে নিল আবার।

কি একটা ভাবতে ভাবতে শোভা হঠাৎ দেখল, মা চোখ ফিরে পেয়েছে। মনে হল, একটুখানির জন্যে অন্ধ হয়েছিল মা। তারপর সকলকে লক্ষ্য রেখেছে আগাগোড়া। এই কথা ভেবে প্রথমে অস্বস্তি, পরে আনন্দ হল। তারপর ঘোর কাটতেই দেখল, মা অন্ধ। চোখ নেই। আছে। তবে দৃষ্টি নেই। সঙ্গে সঙ্গে হাহাকার করে উঠল।

—কি হল রে শোভা? মা আর বিভা এক সঙ্গে প্রশ্ন করল।

শোভা জড়িয়ে আছে মাকে। এবারে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল। বলল, তুমি আর ভালো হবে না মা?

বাবা ধমক লাগাল, কি ছেলেমানুষি করছিস?

মা কেঁপে উঠতেই সব চা বিছানায় কাত হয়ে পড়ল।

শোভাটা এত বোকা! এখনও বুদ্ধি খরচ করে কথা বলতে শিখল না। কোথায় মা'কে সান্ত্বনা দেবে, না, আরও কাঁদাচ্ছে। বাচ্চুদাকে বলতে হবে সব। বিভা বড়। সামলাতে হবে ওকেই। বাবা তো মাটির পুতুল। ঘরে আছে এখন বাচ্চুদা। একবার যাবে।

—আমি একটু আসছি মা। বিভা উঠে দাঁড়াল।

—কোথায় যাচ্ছিস? মা জিজ্ঞেস করল।

—এখুনি আসবো।

—তা তো বুঝলুম। যাচ্ছিস কোথায়? ও বাড়ীতে?

—হ্যাঁ। বুকের ভেতরটা কেমন যেন করে উঠল বিভার।

—না। যেতে হবে না। এখানে বসে থাক।

বিভা বাধ্য মেয়ের মত বসে পড়ল। বাচ্চুদা এইভাবেই চলতে বলেছে।

বেশ ছিল এতদিন। এবার থেকে জ্বালিয়ে মারবে মা।

—কি রে—বস্‌লি?

—হ্যাঁ মা। এই দ্যাখো না। বলে হাতখানা মার কোলে ছুঁইয়ে দিল বিভা। বিছানার যে অংশে চা পড়ে ভিজেছে, সেখানে হাত পড়তেই মুখখানা বেঁকিয়ে মা বলল, শুকনো একটা কিছু দে তো এখানে।

বিপিনবাবু আল্‌না থেকে ভাঁজ করা একখানা কাপড় এনে ভিজে জায়গায় চেপে দিলেন। অসাবধানে পায়ে হাত লাগতেই পা দুখানা গুটিয়ে জড়সড় হয়ে বসল মা, বলল, কি করছো—পায়ে হাত লাগছে না?

বিপিনবাবু তাকালেন। বিমর্ষ চাহনি। তারপর ওইখানেই বসলেন।

—বস। আয় বিভা, এপাশে বস্।

তিনজনে তিন দিকে বসেছে। মাঝখানে মা।

—কাল তোর বাবার আপিস। তোরা গুছিয়ে নিতে পারবি তো? আমিও কাছে কাছে থাকবো।

—আমরাই পারবো মা। বিভা বলল।

—না। পারবি না। কোনদিন যদি করতিস তবু হত। মা ধমকে উঠল।

শোভা কি যেন বলতে যাচ্ছিল, আগেই আবার বলল মা, কাল কলেজ যাবি না বিভা?

—কাল ছুটি মা।

—শোভার ইস্কুলও ছুটি?

বিভা মাথা নাড়িয়ে শোভাকে 'হ্যাঁ' বলতে ইসারা করল।

—হ্যাঁ মা। শোভা দিদির ইঙ্গিত মানল।

—মিথ্যে কথা। কাল কিসের ছুটি?

এবারে কি উত্তর দেবে? দুজনেই ফাঁপরে পড়ল। বাবা মুখ নীচু করে আছেন

—কাল স্ট্রাইক। বিভা কথা খুঁজে পেল।

বিপিনবাবু এবারে মুখ তুলে বিভাকে দেখলেন। ঈষৎ ভ্রু-কুঞ্চন করলেন। তাঁর স্ত্রীকে মেয়েরা বোকা বানাবার যে চেষ্টা করছে, এর একটা প্রতিবাদ হওয়া উচিত কিনা ভাবলেন হয়তো। আবার মুখ নামালেন। যেমন ছিলেন।

—তবে চ। সবাই মিলে ঘুরে আসি। মার অকেজো চোখের তলায় নাকের পর্দ ফুলে উঠল।

—কোথায় মা? শোভা অবাক হয়ে জানতে চাইল।

—বর্ধমানে। মা বলল।

বর্ধমানে মায়ের বাপের বাড়ী। ওদের মামাবাড়ী। মা-বাবা কেউ বেঁচে নেই মার। ভাই আছে একজন। টেলিগ্রাম করা হয়েছে। এখনও পাত্তা নেই। এসেই বা করবে কি? ভাবল বিভা। এলেই যে মার চোখ ফিরে আসবে তা-ও নয়।

—তোর বাবাকে জিজ্ঞেস কর্ তো, কাল ছুটি নিতে পারবে কিনা!

বিপিনবাবু দুই মেয়েকে মনোযোগ দিয়ে দেখলেন। দুজনের মুখেই একটু করে মিহি হাসি লেগে আছে। তাড়াতাড়ি ওদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, তোমার ভাই হয় তো এসে পড়তে পারে এখানে।

—তবে থাক। যদি না আসে তো সামনের রোববার যাবো, কি বলো?

—সেই ভালো মা। শোভা-বিভা প্রায় এক সঙ্গে বলে উঠল। কঠিন রোগাক্রান্ত শিশু ভাত খেতে চাইলে বড়রা যেমন বলে, 'এই তো—কালই খাবে'; ঠিক সেইভাবে।

মাঝখানে মা। তিন দিকে তিনজন। দুজনের কারও আর বসে থাকতে ইচ্ছে করছে না। শোভা-বিভা উসখুস করছে তাই। উঠি উঠি মন। বিপিনবাবু একটা আঙুল দিয়ে গালের নরম জায়গাটা সেঁধে রেখে বসে আছেন। স্থির হয়ে।

খুব জোরে একটা নিশ্বাস টানল মা। বুক ওঠানামা করল। গম্ভীর দেখাল।

হঠাৎ হেসে ফেলল মা। একটু নড়ে-চড়ে বসল।

বলল, যাক্ গে—চোখ গেছে যাক্ তোরা তো আমার কাছে কাছেই আছিস্! তাহলেই হল।

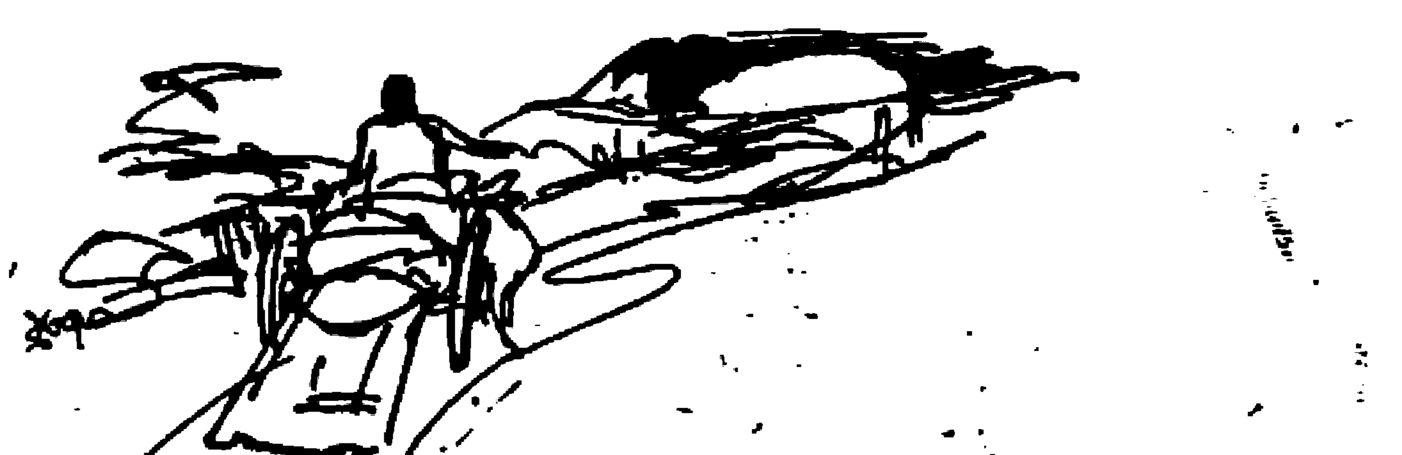

গোয়েন্দা কবি পরাশর • প্রেমেন্দ্র মিত্র রচিত
শৈল চক্রবর্তী চিত্রিত

ইলোরার দেওয়ালগাত্র থেকে

অঙ্গনা

কেশ বিন্যাস

কথায় বলে, যে মেয়ে রাঁধে সে চুলও বাঁধে। রান্না এবং চুল বাঁধায় এদেশের মেয়েদের খুব সুখ্যাতি। এত রকমফের ব্যঞ্জন তৈরি করা আর কারো পক্ষে সম্ভব নয়। যতটা খেয়ে নয় তার চেয়ে বেশি খাইয়ে আমাদের মেয়েরা আনন্দ পায়। রান্নার সুখ্যাতি ফেরে মুখে মুখে। অতিথি-অভ্যাগতদের দেশ আমাদের। যাতে সুনাম অক্ষুণ্ণ থাকে সেদিকে সকলের নজর। সবাই সতর্ক। তাই মেয়েদের দিনের বেশির ভাগটাই কেটে যায় হেঁসেলে। আর একবার হেঁসেলে ঢুকে পড়লে কখন যে ছুটি মিলবে তা কেউ হলফ করে বলতে পারে না। অনেকের সারাদিন কেটে যায়। এরই মধ্যে কিন্তু একটু অবসর চাই। এরও প্রয়োজন আছে।

সাতসকালে চান, ভিজে চুল এলিয়ে নিয়ে রান্নাঘরে ঢুকে পড়া। ভেজা চুল শুকোয় উনুনের তাপে। একদিন অবশ্য ছিল যখন কেশবতী কন্যা ধূপের ধোঁয়ায় চুল শুকিয়ে নিতো। সেই সঙ্গে নিজেও হতো সৌরভে আমোদিত। আজ আর এ নিয়মটা ঠিক চালু নেই। সেদিনও অবশ্য সকলের বেলায় এ বিলাস সম্ভব ছিল না। অনেকেই চুল রান্নাঘরে উনুনের উপরেই শুকিয়ে নিত। অন্তত সংসারের যাঁতায় এ ছাড়া বিশেষ কোন উপায়ও থাকতো না।

রান্নাঘর থেকে এক ফাঁকে বেরিয়ে গা ধুয়ে মুছে তেল, চিরুনি, আয়না নিয়ে বসতো সবাই। এখন চুল বাঁধবার পালা। সবাই সুন্দর করে চুল বাঁধতে চায়। কারো বিনুনি আবার কারো খোঁপা। অধিকাংশের পছন্দ অবশ্য খোঁপা। কেউ কেউ বিনুনির পর খোঁপা করতো। কারো বা আবার সোজা বেণী বেঁধে খোঁপা। সারাদিন চুল এলো থাকলেও সবাই দিনের শেষে চুলের যত্ন নিতো। মা-ঠাকুমারা বলতেন, সারাদিন যা হয় হোক সন্ধেবেলা চুল এলো রাখতে নেই। তাহলে গেরস্থের ঘোর অকল্যাণ। লক্ষ্মী অসন্তুষ্ট হন। মেয়েদের ওপর কুগ্রহের নজর পড়ে। তাই দিনের বেলা হাজার কাজে ব্যস্ত থাকলেও বিকেলে চুল বাঁধতেই হবে।

অবশ্য, মা-ঠাকুমার এই ধারণাটুকু নেহাতই সংস্কারপ্রসূত। আসলে অযত্ন অবহেলায় চুল নষ্ট হয়ে যেতে পারে তাই এই সতর্কতা। কারণ চুল হলো মেয়েদের সৌন্দর্যের অনেকখানি। সেই চুলই যদি নষ্ট হয়ে যায় তবে মেয়েদের আর থাকবে কি! তাই মেয়েরা সংস্কারের বশেই হোক বা সজ্ঞানেই হোক দিনের শেষে কেশপরিচর্চায় বসতো দল বেঁধে। সময় লাগতো অনেক। নিজের চুল নিজে বাঁধা এক কঠিন ব্যাপার। সকলে আবার ভাল চুল বাঁধতেও পারে না। তাই অপেক্ষা করতে হতো। চিরুনি দিয়ে সবাই নিজের চুল সমান করতো। তারপর সময় মতো নিজের খোঁপাটি বাঁধিয়ে নিতো। আয়নায় বারবার দেখে নিজের মনের মতো করে।

আর যেদিন নাপিতবৌ আসতো সেদিন কথাই ছিল না। সেদিন বাড়িতে যেন চুল বাঁধানোর ধুম পড়ে যেতো। নাপিতবৌ ঝামা নিয়ে ঘষে পা পরিষ্কার করে আলতা পরিয়ে দিতো। আলতা পরানো হয়ে গেলে চুলে চিরুনি চালাতে বসতো। গল্পে গল্পে মাথায় আজলা আঁচলা তেল পুরে দিতো। তারপর চিরুনি। এবং সবশেষে খোঁপা। সে খোঁপা কেউ কেউ মাথায় রাখতো অনেকদিন। এক দুদিন তো বটেই। কেউ কেউ আবার তারো বেশি। চুল খুলে বাঁধা এক শক্ত ব্যাপার। এই পরিশ্রমটুকু তারা এড়িয়ে যেতো। আর যখন চুল খুলতো তখন কারো শরণাপন্ন হয়ে খোঁপা বাঁধিয়ে নিতে হতো। না হলে নিজে যেমন পারতো তেমনিতেই চালিয়ে দিতো নাপিতবৌ আবার না আসা পর্যন্ত।

সে রামও নেই; সে অযোধ্যাও নেই। এখন আর নাপিতবৌ বাড়ি বাড়ি গিয়ে

পায়ে আলতা পরায় না, চুল বাঁধে না। ফিনকাল বদলে গেছে অনেক। ইতিমধ্যে গঙ্গায় অনেক জল বয়ে গেছে। নাপিত-বৌয়ের জন্য এখন কারো শুধু একটা মাথাব্যথা নেই। নিজের চুল এখন নিজেই সবাই গুছিয়ে নেয়। চুলের আয়ত্তনও কমেছে অনেক। চুলের মধ্যে বিদিশার অন্ধকার নিশার সন্ধান মেলা ভার।

রেওয়াজটা সেদিনও ছিল। শহরের মেয়েদের চুল কাঁধ অবধি এসে ঠেকলো। কেশের সমাপ্তি ঘটলো। চালু হলো ববছাঁট। ছোট চুলে তো বিনুনি বা খোঁপা হয় না। তাই সে পাট উঠেই গেল। নিজের চুল এবার নিজেই পরিচর্যা করা চলে। আর এবার তো চুল বাঁধার প্রশ্নই নেই। স্রেফ চুল আঁচড়ে নেওয়া অথবা ব্রাশ করে চুল সমান রাখা। এতদিনের মা-ঠাকুমার সংস্কার যেন নিমেষে মিথ্যে হয়ে গেল। ঘরসংসারের অকল্যাণ বা ভূতপেত্নীর ভয়ে তাঁদের বুক একটুকু কাঁপলো না। ছোট ছোট চুল খোলামেলা রেখে দিব্যি তারা চলাফেরা করতে লাগলো। আর ববছাঁটের এটাই তো বৈশিষ্ট্য।

শহরে শহরে শুরু হয় ববছাঁটের ঢেউ। আর চুলের ফ্যাশন বলতে তখন এটাই সকলের ধ্যানজ্ঞান। এতে একটা সমস্যার সমাধান হয়ে গেল, যাদের মাথায় এমনিতেই কম চুল তারা ভাবনামুক্ত হলো। আর চুল যাদের আজানুলম্বিত তারা আগলে রইল পুরনো পথ। তারা তেমনি চুল আঁচড়াতো, মাথায় তেল দিতো। সযত্নে খোঁপা বাঁধতো। কিন্তু এই রেওয়াজ ক্রমেই অপ্রচলিত হয়ে আসছিল। তাছাড়া চুলে তেল দেওয়াও যেন পুরনো ব্যাপার দাঁড়িয়ে গেল। চুল ফোলানোর জন্য ব্যবহার শুরু হলো শ্যাম্পুর। নাপিতবৌয়ের পাট একরকম চুকেই গেল।

হালফিলে ঘটনায় কিছুটা পরিবর্তন ঘটেছে। স্রোত এবার ভিন্নমুখী। ববছাঁট অন্তিম নিশ্বাস ফেলেছে বলা চলে। কাঁধের উপর চুল রাখা এখন অনেকটা সেকেলে ফ্যাশান। কেউ কেউ এ ফ্যাশানে আঁকড়ে আছে। সত্যি কিন্তু তারাও নতুন কথা ভাবছে। ইতিমধ্যেই নতুনের ধাক্কা এসেও গেছে। পশ্চিমে হিপির আবির্ভাব থেকেই নতুনের ফ্যাশানের সূচনা। চুল এবার কাঁধের কিছুটা নীচে নেমেছে। তবে চুল বাঁধাবাঁধি নয়। স্রেফ এলো করে ফেলে রাখা। অনেকেই এই ফ্যাশানে বিশ্বাসী। তারা চুল বাঁধে না। সযত্ন প্রয়াসে চুল কাঁধের নীচ পর্যন্ত ফেলে দেয়। তেলের ব্যবহার তারা পরিহার করেছে। শ্যাম্পু আর ক্রীমের প্রলেপে চকচকে করে তোলে বাহার। আয়না, চিরুনি আর ব্রাশের ব্যবহার যথারীতি আছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে এ যেন অযত্নলালিত ফসল। ক্যোয়ারলেস বিউটি। আসলে কিন্তু তা নয়। এ হলো পুরোপুরি ক্যোয়ারফুল ক্যোয়ারলেস।

এই হলো চুলের হালফ্যাশান। এরই পাশাপাশি আবার খোঁপা বাঁধার প্রবণতাও বেড়ে চলেছে। পালে, পার্বণে এবং নানা অনুষ্ঠানে এরাই আবার মাথায় বিরাট খোঁপা নিয়ে হাজির হয়। কাঁধের নীচ অবধি চুল যেন কোন মায়ামন্ত্রবলে আজানুলম্বিত হয়ে পড়ে। চুলের ফ্যাশান করতে গিয়ে এখনকার ভরসা শুধু নিজের চুল নয়। বাজারে প্রচুর পরচুলা পাওয়া যাচ্ছে। ইচ্ছেমত এবং মনোমত। এককালে শুধু যাত্রা-থিয়েটারেই পরচুলার ব্যবহার হতো, সে ধারার পরিবর্তন ঘটেছে কোন অদৃশ্য যাদুকরের মায়ামন্ত্রে। এখন তা উঠে এসেছে ফ্যাশানবিলাসীদের মাথায়।

আরো একটা সুরাহা হয়েছে যে, খোঁপা করার জন্য এখন আর নাপিতবৌ বা আর কারো দ্বারস্থ হতে হয় না। একেবারে তৈরি খোঁপাই কিনতে পাওয়া যায় বাজারে। হরেকরকম খোঁপার সমাবেশে চুল বাঁধার ভাবনাই মিটে গেছে। আর একটা লক্ষণীয় ব্যাপার যে, এসব খোঁপার মধ্যে অধিকাংশ হলো ভারতীয়। আসলে, খোঁপার ব্যাপারটাই হলো একান্ত আমাদের নিজস্ব। বিভিন্ন মন্দিরগাত্রে ছড়িয়ে আছে তার অসংখ্য নিদর্শন। অজন্তা, ইলোরায় কিছু কিছু নিদর্শন এখনো আছে। খোঁপা বাঁধার আমাদের পুরনো ঐতিহ্য এমনি করেই আবার ফিরে আসছে।

ইদানীং শহরেও গড়ে উঠেছে একাধিক কেশ বিন্যাসের প্রতিষ্ঠান। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্ত্য দুধরনের কেশবিন্যাসই তারা করে। তবে প্রাচ্য এবং সম্পূর্ণ ভারতীয় খোঁপার দিকেই সকলের ঝোঁক। এর মধ্যে কেউ কেউ আবার বিয়ের কনে সাজানোর দায়িত্ব পর্যন্ত নেয়। চুল বাঁধা থেকে শুরু করে কনের সমস্ত সাজসরঞ্জাম দায়িত্ব তাদের। তাছাড়া এমনিতেও অনেকেই এসব জায়গায় খোঁপা বাঁধাতে আসে। মাঝে মাঝে এরা কেশসজ্জার প্রদর্শনীও করে। এমনি একটি প্রদর্শনীতে হাজির ছিলাম। যেসব খোঁপা সেখানে দেখানো হলো তার সবই ভারতীয় ঐতিহ্যাশ্রিত। প্রাচীন মন্দিরগাত্র এবং স্থাপত্যনিদর্শন থেকে সংগৃহীত। কেশ-সজ্জার ব্যাখ্যায় তাঁরা জানালেন যে খোঁপার ভারতীয় ঐতিহ্যই দেশবিদেশে প্রসার লাভ করেছে এবং দেশকালের ধারায় তা কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত হয়েছে মাত্র। কিন্তু মূলে তা ভারতীয়।

কেশসজ্জা দেশের গণ্ডী পেরিয়ে বিদেশেও বেশ জনপ্রিয় হয়েছে। দশ বছর আগে লেপজিগে একটি কেশসজ্জার আসর বসে। নানা ধরনের পাশ্চাত্য খোঁপায় সে অনুষ্ঠান হয়ে ওঠে মনোরম। তারপর থেকে প্রতি বৎসর এই কেশসজ্জার আসর বসছে। পোল্যান্ড, পূর্ব জার্মান, রুমানিয়া, রাশিয়া, হাঙ্গেরী, চেকোস্লোভাকিয়া, বুলগেরিয়া এবং যুগোস্লাভিয়ার প্রতিনিধিরা এবারের অনুষ্ঠানে অংশ নেয়। কেশসজ্জার এই আসর বসে মস্কোয়। অননাসুন্দর এই প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করে মস্কো-সুন্দরী।

এভাবেই কেশবিন্যাসে খোঁপা আজ দেশবিদেশে জনপ্রিয় হচ্ছে। আশা করা যায় এই ধারা অক্ষুন্ন রেখে খোঁপার প্রচলন ক্রমেই বেড়ে যাবে। কুঁচবরণ কন্যা আবার তার মেঘবরণ চুলে দিনের শেষে তেল দেবে, চিরুনি চালাবে আর সুন্দর করে খোঁপা বেঁধে আয়নায় বারবার নিজেকে দেখবে, অনেকদিন পর আবার নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করার আনন্দে বিভোর হবে।

—প্রমীলা

এবার পুজোয়-নিউইয়র্ক

আমরা এবার শারদীয়া উৎসবের ক্ষণটুকুকে হারিয়ে যেতে দিইনি—এবার আমরা মিলেছি সবাই, মিলেছি পুজোপ্রাঙ্গণে—নিউইয়র্কে বিশ্ববিখ্যাত কলাম্বিয়া ইউনি-ভার্সিটিতে।

শারদীয়া উৎসবের ক্ষণটুকুকে হারিয়ে যেতে দিইনি—এবার আমরা মিলেছি সবাই, মিলেছি পুজোপ্রাঙ্গণে—নিউইয়র্কে বিশ্ব-বিখ্যাত কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটিতে।

পুজোতে ছুটি ছিল না এবার। কিন্তু দেখেছি বাঙালীর সেই চিরপরিচিত উন্মাদনা, সেই ছোটবেলার প্রতিমাদর্শনের যে আকর্ষণ তা দীর্ঘ প্রবাসবাসে আরও তীব্র হয়ে উঠেছে, তাই অনেক অনেক দূরের থেকেও কাজের শেষে ক্লান্ত বাঙালী এসে মিলেছে পুজোপ্রাঙ্গণে—বাক্সবন্দী ধুতি পাঞ্জাবীগুলোর এতদিনে মুক্তি মিলেছে।

অনেক মেয়েই সারাদিন উপবাসী থেকে অঞ্জলি দিয়েছে। ছোট ছোট শিশুরা কত নতুন জামাকাপড় পরে হৈচৈ করেছে। অনেকেই দেখছে তাদের জীবনের প্রথম পুজো। তারা বুঝতে পেরেছে তাদেরও একটা নিজস্ব উৎসব আছে—যেমন, হেনরীদের খ্রীষ্টমাসের মত। তারা নিজেদের গর্বিত মনে করেছে।

অনেক প্রবাসী যাঁরা প্রায় পুরো মার্কিনী হয়ে গেছেন, তাঁদেরও দেখেছি, বহুদূর থেকে পুজোয় যোগ দিতে—তাঁদের ছেলেমেয়েরা, যারা বাংলা বোঝে না, তাদের প্রতিমার রূপ বুঝিয়ে দিতে।

আমি নিউইয়র্কে থাকি না, থাকি ত্রিশ মাইল দূরে, আমি পুজোয় কিছুই করিনি—কোন সাহায্যই করতে পারিনি, কিন্তু যখন মহাষ্টমীর পুষ্পাঞ্জলে সকলের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে অঞ্জলির মন্ত্রোচ্চারণ করেছি, তখন একবারও মনে হয়নি, এ পুজো আমার নয়। —এ পুজো সমস্ত বঙ্গবাসীর—সমস্ত ভারতীয়ের।

হাজার হাজার মাইল দূরে সম্পূর্ণ বিদেশী পরিবেশের কলাম্বিয়া য়ুনি-ভার্সিটির আর্ল হল যখন ধূপের সৌরভে ভরে উঠেছে, লালপাড় শাড়ী পরে মহিলারা পুজোর কাজে ব্যস্ত, পুজোরী মন্ত্রোচ্চারণ করছেন নিষ্ঠার সঙ্গে তখন কখন অজান্তে চোখের কোনদুটো ভিজে উঠেছে বুঝতে পারিনি—জানি এ অশ্রু আনন্দের।

—দুর্গা রায়

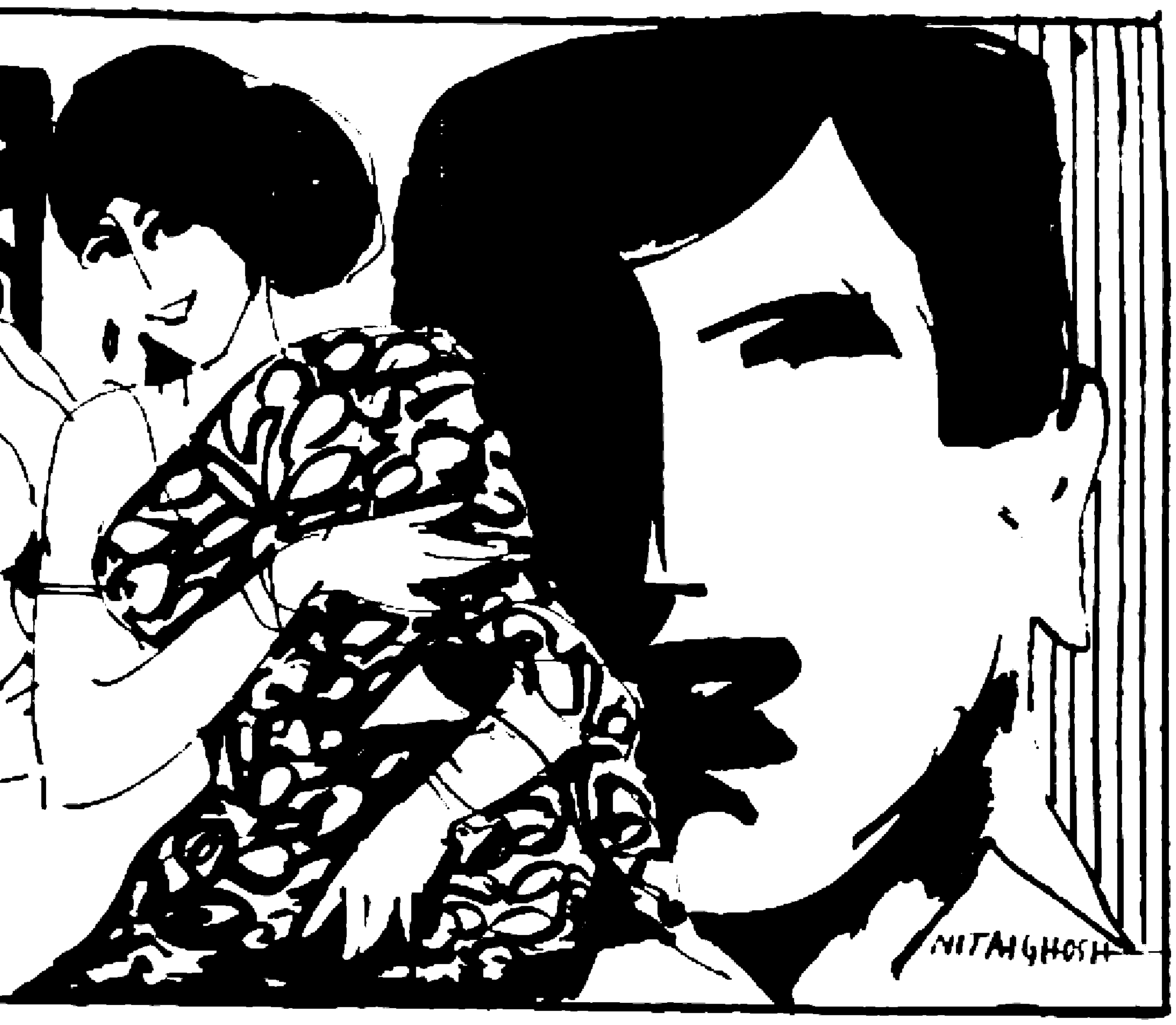

পিঞ্জর

সুভাষ সিংহ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

একটু পরে হুড়মুড় করে অনেকে উঠল। সব ক্লিয়ার হয়ে গেছে। কী হয়েছে মশাই? দুটো প্রসেশানের মধ্যে ঝগড়া বোমা কাটাকাটি। পুলিশ কিছু লোককে গ্রেপ্তার করেছে। অনেকে দৌড়ে পালিয়েছে।

বিনয় প্রায় পড়ে যাচ্ছিল। খপ করে একটা হাতল ধরে ফেললো। ট্রাম পুনরায় চলতে শুরু করেছে। ভিড়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তার দমবন্ধ হয়ে আসছিল। মিছিলের শহর কলকাতা। কে বলেছিলেন? হ্যাঁ, মনে পড়েছে, এই উক্তি একজন দেশবরেণ্য নেতার। আরও অনেক রকম উক্তি আছে কলকাতা সম্পর্কে। দূর! এসব আজেবাজে চিন্তা কেন সে করছে। শেফালীর হাসিমুখ চোখের সামনে ভেসে উঠল। ইস, দেরী হয়ে যাচ্ছে ফিরতে। বিমল, তুমি একটা আস্ত খচ্চর। আমাকে গ্যাস দিতে চেয়েছিলে। গ্যাসে ভুলছি না। বলে কিনা তুই আমাদের মত সাধারণ...। কী ভীষণ হীনমন্যতায় ভুগছে বিমল!

হঠাৎ খেয়াল হতে বিনয় দেখল ট্রাম ডানদিকে বেঁকে গ্রে স্ট্রীটে মোড় নিচ্ছে। বিনয় লোকজন ঠেলে এগোয়। কয়েকজন গরম গরম কথা বলল। কোন প্রতিবাদ না করে সে চলন্ত ট্রাম থেকে লাফ দিয়ে নেমে পড়ল। প্রায় একটা স্টপেজ পেরিয়ে এসেছে। উল্টো দিকে হাঁটতে থাকে সে। মানুষজন ক্ষেপে আছে। হঠাৎ যে-কোন বিষয় নিয়ে বিস্ফোরণ ঘটে যায়। ট্রামে বাসে ট্রেনে জনতার এই ক্ষিপ্ত চেহারা মাঝে মাঝে দেখে থাকে।

শোভাবাজারের মুখে একটা রিক্শায় চেপে বসে বিনয়। রাস্তায় গ্যাসের আলো জ্বলতে শুরু করেছে। এতক্ষণে নিশ্চয়ই শেফালী সেজেগুজে তৈরী। কোনদিকে যাওয়া যায় ওকে নিয়ে ভাবল বিনয়। গঙ্গার পাড় দিয়ে বেড়াবে। নাকি কোন সিনেমায় যাবে? ইভনিং শো পাওয়া যাবে না। নাইট শো-তে যেতে পারে। দেখা যাক শেফালীর মনোভাব কিরকম।

আশেপাশে সুসজ্জিত দোকান। আলোয় ঝলমল করছে। রিক্শা গলির মধ্যে ঢুকল। ল্যাম্পপোস্টের কৃপণ আলোয় গলিপথ ছায়াছায় ধোঁয়াটে। অনেকগুলি গুদাম পরপর। পরপর কয়েকটা লরি। মাল ওঠানামা হচ্ছে। কাঁচা পাটের গন্ধ। নাকে রুমাল চাপা দেয় বিনয়। প্রচুর হাওয়া। গঙ্গার দিক থেকে ভেসে আসছে।

বাড়ির সামনে রিক্শা থামলে ভাড়া মিটিয়ে তাড়াতাড়ি এগোয় বিনয়। তরতর করে সিঁড়ি ভেঙে উপরে ওঠে।

ভেজানো দরোজা ঠেলে বারান্দায় পা দেওয়া মাত্র পল্টুর কান্না শুনতে পেল। রান্নাঘরের দিকে একবার উঁকি মারল। পিছন ফিরে মা বসে আছেন। উনুনে ভাত টগবগ করে ফুটছে।

—মা, পল্টু কাঁদছে কেন? বিনয় চৌকাঠের সামনে দাঁড়ায়।

—বায়না ধরেছে তোমার সঙ্গে বেড়াতে যাবে। নীহার মুখ ফিরিয়ে হাসেন, ওর জন্যে কিছু ভাবিস না বিনু। আমি ওকে সামলাবো। তুই বরং বেরিয়ে পড়। এত দেরী হল কেন তোর?

মা'র হাসি মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে বিনয়। তাঁর মনোমত পাত্রীকে বিয়ে করার জন্যে খুব খুশি। পল্টু বড় দুষ্টু। মা কী পারবেন ওকে সামলাতে? নাকি পল্টুকে সঙ্গে নিয়ে বেরোবে। নীহার এতক্ষণে ফিরে আসার কথা। রোজ কটায় ফেরে মনে পড়ছে না। মা এখনও নরম হননি। নীহারকে কিছুতেই সহ্য করতে পারছেন না। দুজনের মধ্যে স্নায়ুযুদ্ধ চলছে।

গম্ভীর চোখমুখে বিনয় শোবার ঘরে ঢুকল। তাকে দেখে পল্টু কান্না থামিয়ে শেফালীর পিছনে মুখ লুকোয়।

পল্টুর মাথা নেড়ে শেফালী হাসিমুখে তাকায় বিনয়ের দিকে, কই বীরপুরুষ লুকোচ্ছে কেন! মামা কী বলে? শোন, পল্টু চলুক আমাদের সঙ্গে। তোমার এত দেরী হল কেন?

শেফালী এগিয়ে আসতে গিয়ে টের পেল শাড়িতে টান। ওরে দুষ্টু ছেলে! সে পিছন ফিরে দু হাতে নিয়ে জোর করে পল্টুর মুখ তুলে ধরে। শাড়ির আঁচল দিয়ে চোখমুখ মুছে দেয়।

—শুনে যা পল্টু। নরম হতে গিয়েও কণ্ঠস্বর শেষপর্যন্ত বিকৃত হয়ে ওঠে বিনয়ের।

আড়চোখে একবার বিনয়ের দিকে তাকায় পল্টু। এগোবে কি, ভয় পেয়ে দু'হাত দিয়ে শেফালীকে জড়িয়ে ধরে। তারপর ফুঁপিয়ে কান্না। ফুলে ফুলে ওঠে ছোট্ট নরম শরীর। বিনয়ের চোখমুখ আরও গম্ভীর হয়ে ওঠে। শেফালীর মুখের হাসি মিলিয়ে যায়। কি ভেবে সে পল্টুকে কোলে করে বাইরে যায়।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বিনয় মাথা আঁচড়াল। তারপর পোশাক পাল্টাবার কথা ভাবল একবার। থাক দরকার নেই। আলনায় শাড়ি-ব্লাউজ-ধুতি। ঘরের গন্ধ শুঁকল কিছুক্ষণ। ধবধবে বিছানা। টেবিলের উপর ফুলদানীতে একগুচ্ছ রজনীগন্ধা। ধূপ জ্বলছে। এ কী তার ঘর? এত ছিমছাম ঘরে সে কী অস্বস্তি-বোধ করছে না!

—চল এবার বেরুনো যাক। শেফালী ওর খুব কাছাকাছি এসে দাঁড়াল। কপালে ছোট্ট সিঁদুরের টিপ। চোখে কাজল। হাসি হাসি মুখ। সেদিকে তাকিয়ে সব ভুলে যায় বিনয়। দু'হাত দিয়ে শেফালীকে জড়িয়ে চোখের উপর চুম্বন করল।

শেফালী চোখ বুজে স্বামীর কাঁধে মাথা রাখে কিছুক্ষণ। তারপর ব্যস্ত হয়ে মৃদু ধাক্কা দিয়ে বলে, ছাড়ো! মা এখুনি এসে পড়বে।

রাস্তায় পা দিয়ে বিনয় তাকায় শেফালীর দিকে, কোথায় যাবে?

—নিরিবিলি কোথাও চল। কাছাকাছি ওই তো একটা জায়গা।

গঙ্গার পাড় দিয়ে হাঁটতে থাকে ওরা। ঠাণ্ডা হাওয়ায় শেফালী একবার কেঁপে উঠল। শাড়ির আঁচল দিয়ে ভালভাবে শরীর ঢেকে মুখ টিপে হাসল, রাগ করেছো?

না। ছোট্ট ও সংক্ষিপ্ত উত্তর বিনয়ের। এক পলক শেফালীর হাসিমুখ দেখল। একটা ফুচকেওয়ালা। রীতিমত খিদে পেয়েছে। 'ফুচকা খাবে?' শেফালী ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায়। দুজনের হাতে শালপাতা। গোটা আটেক খাওয়ার পর শেফালী হাত গুটিয়ে নেয়। পীড়াপীড়ি করল না বিনয়। সে পরপর খেয়ে চলে। হিসাব নেই কটা খেল। 'আর একটাও না।' ওর হাত থেকে শালপাতা ছিনিয়ে নেয় শেফালী। দাম মিটিয়ে দেয়।

অনেকটা পথ হাঁটার পর ওরা একটা গাছের নীচে পাথরের বেদীর উপর বসল। এদিকটা একটু নির্জন। আবছা অন্ধকার। গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে দুজনে। আশে-পাশে লোকজন কম। নির্জনে মিলিত হবার বাসনায় আরও কয়েক জোড়া নরনারী এদিক-সেদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসেছে। সামনে গঙ্গা। ঢেউ-এর ছলাৎ ছলাৎ শব্দ ওরা শুনতে পায়। মাঝে মাঝে সিটি বাজিয়ে স্টিমার যাওয়া-আসা করছে।

পটপট করে চীনেবাদামের খোসা ভাঙ্গার শব্দ। অন্ধকারে ঝাপসা লাগছে ওকে। কেমন অপরিচিত মনে হয়। শেফালী আরও ঘন হয়ে বসল। স্পর্শের মধ্য দিয়ে তবু টের পাওয়া যায় ওর অস্তিত্ব। নইলে কখন যে ছিটকে দূরে চলে যাবে!

শেফালীকে সামান্য কাছে টানল বিনয়। বলল, কী ভাবছো? নাকি গঙ্গার সৌন্দর্যে তন্ময় হয়ে ভুলে গেছ আমাকে।

আবছা অন্ধকারে ও দেখতে পেল কারা যেন এদিকে আসছে। শেফালী একটু সরে বসে। স্তব্ধতাকে খানখান করে ভেঙে মালবোঝাই লরি ছুটেছে। কয়েকটা লোক শিস দিতে দিতে চলে যায়। একটু পরে ওদের বিশ্রী হাসির শব্দ ভেসে আসে। তখন গাছের ডালে কয়েকটা পাখি অশান্ত-ভাবে পাখা ঝাপটায়।

—চল, বাড়ি ফিরি।

—ভয় পেলে শেফালী!

—না। মুচকি হাসল শেফালী, আমার শুধু ভয় তোমাকে!

বড় রাস্তায় আলোর মধ্যে এসে দাঁড়াল ওরা। শেফালীর দিকে আড়চোখে তাকাল বিনয়। আমাকে ভয় শেফালীর! হাসি পায় বিনয়ের। কীসের ভয়?

শেফালীর আহত কণ্ঠস্বর, তুমি সব সময় এত কী ভাব? না, হেঁয়ালী কথা-বার্তা বলো না। আমি কিছুটা বুঝতে পারি।

বিনয়ের অস্বস্তি আরও বেড়ে যায়। এত তাড়াতাড়ি সে সবকিছু বুঝতে দিতে চায় না। বেশ জোরে হেসে ওঠে সে।

—শিক্ষিতা মেয়ে, সব বুঝবে বৈকি!

বাড়ি ফেরা পর্যন্ত বাকি পথ বিনয় অনর্গল কথা বলে। শুনতে শুনতে দু' চোখ বড় হয়ে ওঠে শেফালীর। ভাড়া বাড়িতে চিরকাল থাকা যায় না। শেফালীর রেজাল্ট বেরোলে, পাশ তো নির্ঘাৎ করবে, মফস্বলে কোন স্কুলে একটা কাজ জুটে যাবে। তারপর টাকা জমিয়ে কয়েক বছর পর শহর থেকে দূরে ছোট্ট একটা বাড়ি। সুন্দর একটা বাগান। বাড়িটা হবে স্টেশনের কাছে। হুইশেলের শব্দে ভোর-বেলা ঘুম ভাঙবে। চোখ মেলে ভোরবেলা পাখির কিচিরমিচির ডাক, নরম রোদ, সবুজ গাছপালা যেন দেখা যায়। ক্রমশ কলকাতা বসবাসের অনুপযুক্ত হয়ে উঠছে। সকাল সন্ধ্যা ধোঁয়া, ছত্রিশ ফ্ল্যাটে কয়েকশো লোকের গরম নিশ্বাস, হৈ-হট্টগোল, জল তোলা নিয়ে কুৎসিত কলহ, অনেকের অযাচিত আলাপের আগ্রহ ইত্যাদি।

—থাম! মৃদু ধমক দিয়ে শেফালী অদ্ভুত মুখভঙ্গি করল, আমি মাস্টারী নেব কোন দুঃখে।

—সে কী! বিনয় হতভম্বের মত তাকায়। এতক্ষণ তবে কী বোঝাল শেফালীকে। বিয়ের আগে কতদিন বলেছে পাশ করতে পারলে চুপচাপ ঘরে বসে থাকবে না। কাজকর্ম করবে। এখন উল্টোসুরে কথা বলা কেন! বিশ্বাস হচ্ছে না ওর কথা। নিশ্চয়ই পরিহাস করছে। ব্যাপার কি? মিটমিট করে হাসছে কেন শেফালী।

ভুরু কুঁচকে বিনয় বলল, তোমার মতলব কী শেফালী। মাস্টারী করবে না, তবে করবে কী?

—কী করবো মানে! শেফালী রীতিমত অবাক, আমি ঘরের বউ। সংসারের কাজকর্ম করবো। মার সেবা করবো। কত কাজ সংসারে তুমি তার কী বুঝবে। এমন তো নয় যে, আমি কাজে না বেরুলে হাঁড়ি চড়বে না।

বিস্ফারিত চোখমুখে তাকায় বিনয়। না, রীতিমত গম্ভীর চোখমুখ শেফালীর। রাগ বা বিরক্তি কোন কিছুই অনুভব করল না সে। নীরবে সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠতে থাকে। কিছু বলার নেই। পরে আলোচনা করা যাবে। জোর জবরদস্তি চলে না। বলা যায় না তোমাকে মাস্টারীতে নামতেই হবে। সেটা হবে দৃষ্টিকটু। ওর বাবা মা অন্য রকম ভাবতে পারে। শেফালীই বা ভাববে কী।

বারান্দায় চৌকির উপর বসে নীহার চোখ বুজে জপ করছেন। মীরার ডাকে? শেফালী হাসিমুখে ওঘরে যায়। বিনয় শোবার ঘরের দিকে পা বাড়ায়। ঘরে ঢোকার আগে অস্ফুটস্বরে ডাক শুনতে পায়, বিনু!

এ কী! বিনয় বারান্দায় আবছায়া আলোয় দেখল মার চুপসে যাওয়া মুখ, শুকনো চোয়াল, দু'চোখে জলের ধারা, শব্দহীন।

—কী হলো? বিব্রত অসহায় বিনয় চৌকির একধারে বসল।

—আমাকে তুই কোন তীর্থস্থানে পাঠিয়ে দে বিনু। দিনরাত অপমানের মধ্যে আর থাকতে পারছি না!

—চুপ কর মা! দোহাই কান্না বন্ধ কর।

শোবার ঘরে পালিয়ে এল বিনয়। পোশাক পাল্টে বাথরুম থেকে মুখ ধুয়ে আসে। ওঘরে হাসি-ঠাট্টা চলছে। বারান্দায় নীরবে অশ্রুপাত করে চলেছেন মা। শেফালী স্পষ্ট জানিয়েছে পাশ করার পর মাস্টারী করবে না।

খানিকক্ষণ পায়চারী করে নানারকম চিন্তায় সময় কাটিয়ে দিল বিনয়। খাটের উপর এলোমেলোভাবে পড়ে রয়েছে ধুতি পাঞ্জাবী চাদর। শেফালীর পাত্তা নেই। এত কী গল্প! মা কী একটু মানিয়ে চলতে পারেন না? মীরা সব সম্পর্ক ত্যাগ করছে না কেন রঞ্জতদার সঙ্গে? ডিভোর্স করুক। ব্যাপারটা এভাবে কতদিন চলবে। মনের দিক থেকে শুধু অস্বীকার করলেই চলবে না। আইনের কথাও ভাবতে হয়। রঞ্জতদা ধূর্ত, বুদ্ধিমান। সহজে রেহাই দেবে না মীরাকে। দু' একদিন ভেবেছে এ সম্পর্কে রঞ্জতদার সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনা করবে। পরক্ষণেই মনে হয়েছে মীরার কথা। ওর কথাও ভাবতে হয়। অন্যের স্বাধীনতায় সে হস্তক্ষেপ করতে চায় না। কারণ যাই থাক না কেন।

—দাদা, খাবে এসো।

বিনয় নীরবে খেয়ে উঠে পড়ে। মীরার উসখুস ভাব নীরবে লক্ষ্য করেছে। অন্য-

দিন হলে হাসি-ঠাট্টা চলত। আজ ভাল লাগছে না। বারবার মার অশ্রুসজল মুখ মনে পড়ছে। কাউকে সে অপরাধী ভাবছে না। দিন দিন সংসারে বিশৃঙ্খলা প্রকটিত হয়ে চলেছে। সেটা তার ভীষণ অপছন্দ।

মার সেবা করছে শেফালী। একপলক চেয়ে দেখল সে। চোখাচোখি হতে শেফালী মুখ টিপে হাসল। কিন্তু হাসল না। বরং গম্ভীর মুখে শোবার ঘরে চলে এল।

—দাদার কী হয়েছে বল তো? গম্ভীর মুখে খেয়ে উঠে গেল। একবার আমার দিকে তাকাল না পর্যন্ত।

—কে জানে! শেফালী বেপরোয়া হতে চাইল, তোমার দাদাকে আমি ভাই ঠিক বুঝতে পারি না।

মীরা চোখ ছোট করে হাসল, তবে ভাই এতদিন কী প্রেম করলে! তোমার কপালে দেখছি অনেক দুঃখ। ওকি বৌদি! না, সেটি হবে না। সব তাতে খেঁকে তবে উঠতে পারবে। ব্যাপার কি। রেস্টুরেন্টে খুব খেয়েছো বুঝি—

—পেট ভরে খেয়ে এসেছি। বেশ জোরে হাসল শেফালী, মাইল দুয়েক গঙ্গার পাড় দিয়ে হাঁটা। ফুচকা আর চিনেবাদাম। প্রচুর গঙ্গার হাওয়া। ওই থেকেই পেট ভরেছে।

খাওয়ার পর বাসনে হাত দিতে গেলে তেড়ে এল মীরা, রেখে দাও। তুমি মুখ হাত ধুয়ে চলে যাও। নীচু গলায় বলল, মাথ

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন
লিন্টাস-PS. 28-140 BG

CENTRAL LIBRARY

সে. দাদা অশান্তভাবে খাটের এপাশ ওপাশ করছে। তাড়াতাড়ি যাও। আর ঢং করে দাঁড়িয়ে থেক না।

—কী অসভ্য! শেফালী লজ্জায় আর দাঁড়াতে পারে না। মুখে হাত সাবান দিয়ে ধুয়ে ঘরে ফিরে দেখল বিনয় টেবিল ল্যাম্পের সামনে গম্ভীর মুখে অধ্যয়নরত। সন্তর্পণে খিল এঁটে পায়ে পায়ে পিছনে এসে দু' হাত দিয়ে চোখ টিপে ধরল।

সারা ঘর নরম আলোর স্নিগ্ধ মনোরম। শেফালী অস্ফুটস্বরে ডাকল, শুনেছো। ঠিক হয়ে শুয়োও।

—লাগছে তোমার?

—না। বাইরে যাবে না?

—চল।

শেফালী দু' হাত দিয়ে মৃদু ঠেলে বিনয়কে সরাতে পারল না।

।।সাত।।

অফিসে ঢোকার মুখে ভূত দেখার মত চমকে উঠল মীরা। খানিকটা দূরে ফুটপাত ঘেঁষে একটা ট্যাক্সীর মধ্যে মুখ বের করে বসে রজত। চোখাচোখি হল একবার। মীরার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে ওঠে। কোন দিকে না তাকিয়ে প্রায় ছুটে যায় লিফটের দিকে। সেখানে দশ বারজনের পিছনে দাঁড়ায়। কিন্তু এক মুহূর্ত কি ভেবে সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠতে থাকে। চার দেয়াল ঘেরা ঘরে আশ্রয় না পাওয়া পর্যন্ত স্বস্তি নেই। কেননা পিছনে এক অবাঞ্ছিত বিভীষিকা। তাকে একা পেলে হিংস্র নখ বের করে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

ঘরে ঢুকে মীরা ধপ্ করে চেয়ারে বসে পড়ে। ঘন ঘন নিঃশ্বাস ছাড়ে। বুকের ভিতর কী প্রচন্ড কাঁপুনি! এক গ্লাস জল খেয়ে অস্ফুট স্বরে স্বগতোক্তি করল, আঃ বাঁচলাম! তারপর কাজের জন্যে প্রস্তুত হয়। মেসিন পরিস্কার করে ডিকটেশনের খাতা ওল্টায়। দু' তিনখানা ছোট চিঠি টাইপ করার আছে। ডিরেক্টার মিঃ কাপুর আসার আগে রেডি করে রাখতে হবে।

সুইং ডোর খুলে বাইরে এল সে। যে-যার কাজে ব্যস্ত। তবু কয়েকজন আড় চোখে তাকাল। অধিকাংশই পুরুষ কর্মচারী। মেয়ে করণিক মাত্র দুজন। এরই মধ্যে এদের সঙ্গে বেশ খাতির হয়ে গিয়েছে। টিফিনের সময় সবাই এক সঙ্গে ওর ঘরে এসে জমায়েত হয়। হাসি ঠাট্টা গল্পে সময়টা ভালই কাটে।

বাথরুম থেকে চোখ মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে এল মীরা। ঘরে ঢোকার আগে দেখল দূর থেকে বীথি ওর দিকে তাকিয়ে ভেংচি কাটছে। ম্লান হেসে সে সুইং-ডোর ঠেলে ভেতরে ঢোকে। মেসিনের সামনে বসে ডিকটেশনের পাতা ওল্টায়। বেশ আছে বীথি। বীথিকা মন্ডল। লম্বা ছিপছিপে একহারা চেহারা। গায়ের রং কালো। নাক চোখ মুখ প্রায় নিখুঁত। ভালই লাগে দেখতে মেয়েটাকে। ওরই সমবয়সী।

হ্যাঁ, বীথির আর কি! ভাল একটা ছেলে বাগিয়েছে—দু-দিন পর বিয়ে হয়ে যাবে। ছেলেটির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছে। যেমন স্মার্ট তেমনি সুন্দর চেহারা। একটা ব্যাঙ্কে কাজ করে। শিগগির প্রোমোশান পেয়ে স্টাফ হয়ে যাবে। ছি! নিজেকে ধমক দিল মীরা। সে কী প্রিয় বান্ধবীর সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিত?

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে মীরা চমকে উঠল। এগারোটা বেজে গিয়েছে। মিঃ কাপুর হয়তো এসে গিয়েছেন। সই করার জন্যে চিঠিগুলি দিতে না পারলে... তাড়াতাড়ি টাইপ করতে সুরু করে। নতুন চাকরী। মাইনে ভাল। এক কথায় তিনশো টাকায় রাজি হয়েছেন। মিঃ কাপুর মধ্যবয়স্ক। সুন্দর চেহারা। ভাল বাংলা জানেন। মনে পড়ল ইন্টারভিউ দিয়ে যোগ্য বিবেচিত হলে তাকে উদ্দেশ্য করে ডিরেক্টর বলেছেন, ভালভাবে যদি কাজ করেন তবে এখানে উন্নতির বেশ সুযোগ আছে। বে-সরকারী অফিস, এখানে এফিসিয়েন্সি বড় কথা মিস মিত্র।

মিস মিত্র! হ্যাঁ, এই পরিচয় তার অফিসে। সে তার পূর্ব ইতিহাস গোপন করেছে। কেউ জানে না। এমন কি বীথি পর্যন্ত। ইদানীং ভাবছে বীথিকে সব খুলে বলবে। আজকাল বীথি তার বাড়ি আসবার জন্যে যেভাবে পীড়াপীড়ি করছে ওকে সব কথা জানাতে হবেই। তাছাড়া বীথি সব দিক থেকে বিশ্বাসযোগ্য। সেও চায় এমন ঘনিষ্ঠ একজন বান্ধবী যাকে নির্ভর করা চলে, যার কাছে চোখের জল ফেলে মন প্রাণ হাল্কা করা যায়।

বারবার টাইপে ভুল হয়ে যাচ্ছে। মীরা রেগে কাগজ মেসিন থেকে তুলে দলা পাকিয়ে ছুঁড়ে মারে। আবার নতুন কাগজ মেসিনে চাপায়। খটখট শব্দে মেসিন চলে। ওই লোকটাকে দেখা পর্যন্ত কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছে না। নানা ধরনের দুশ্চিন্তা এসে উঁকি মারছে। রজতকে বিশ্বাস নেই। ওর দ্বারা সব সম্ভব। তাহলে গোপনে গোপনে সব খবর রাখছে তার। নইলে এই অফিসের ঠিকানা পেল কিভাবে। বোধ করি সর্বত্র তাকে অনুসরণ করছে। পাকা গোয়েন্দার মত পিছনে এঁটে রয়েছে। কিন্তু কেন?

কেন তার পিছনে লেগে থাকা! মীরার মুখ চোখ শুকিয়ে যায়। সে ভালভাবেই চেনে রজতকে। এত সহজে কী নিস্কৃতি দেবে? অতিষ্ঠ করে তুলবে সমস্ত জীবন। চলে আসলে কি হবে, ওই লোকটার দু' চোখে প্রতিহিংসার আগুন দেখেছে তাকে পুড়িয়ে ছারখার না করা পর্যন্ত ওর শান্তি নেই।

স্পষ্ট বুঝতে পারছে মীরা, আসলে রজত কী চায়। সে ফিরে যাক এই চায় রজত। নইলে সহজভাবে ওকে বাঁচতে দেবে না। ছায়ার মত পিছনে লেগে থাকবে। বলা যায় না কখন কোন্ দিক থেকে ওর আক্রমণ আসতে পারে। ওর নষ্টামীর সীমা নেই। এই অফিসেও হানা দিতে পারে। সবাই জেনে যাবে আসল পরিচয় সে গোপন করেছে। তার স্বামী পুত্র থাকতেও কুমারী পরিচয় দিয়ে চাকরী নিয়েছে। মিথ্যা পরিচয়ে চাকরীতে ঢুকেছে। প্রবঞ্চনা করেছে অফিসকে। ফলে নির্ঘাৎ তার চাকরী যাবে।

ঘেমে উঠল মীরা। আর সে ভাবতে পারছে না। মেসিনের উপর মাথা রেখে অবরুদ্ধ কান্নাকে প্রাণপনে চেপে রাখল। ঘরে বাইরে যুদ্ধ করতে করতে সে ক্লান্ত। মার সঙ্গে রোজ কলহ আর ভাল লাগে না। কিছু বুঝবেন না। বোঝাবার অনেক চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিয়েছে। কেউ বুঝবে না তার নিজেরও পছন্দ-অপছন্দ বলে একটা ব্যাপার আছে। রজত বোঝে নি। মা বুঝতে চান না। রজত চেয়েছিল মুখ বুজে সে সবকিছু সহ্য করবে। সব রকম বেলেল্লাপনা সহ্য করে ওর সেবায় জীবন উৎসর্গ করতে হবে! এই ছিল রজতের দাবী। এখানে ভালবাসা কোথায়? পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা কোথায়?

পল্টু সোনা মানিক আমার! আজ সকালে অফিসে আসার সময় বায়না ধরে-ছিল ওর সঙ্গে আসবে। কোন কথা শুনবে না। 'মামণি আমাকে তোমার সঙ্গে নিয়ে চল। তুমি রোজ কোথায় যাও?' আর হাঁ করে তাকিয়ে দেখেছে ওর সাজগোজ। ওর দু' চোখে অসংখ্য প্রশ্ন। কচি কচি দু' হাত দিয়ে শাড়ি আঁকড়ে ধরেছে। অফিস যাবে কি, ছেলেকে বুকে জড়িয়ে মীরা কেঁদে অস্থির। এই ছেলেকে ঘিরেই তার সমগ্র জীবন। নতুনভাবে বাঁচবার স্বপ্ন ওই ছেলের কথা ভেবে।

এখনই অনেক কিছু বুঝতে শিখেছে ছেলেটা। ওর কানে মা কী মন্ত্র দেন কে জানে। নইলে ও-সব কথা ওইটুকু ছেলে বলে কিভাবে। 'কোথায় আমার বাবা—বল মা-মণি, আমি তার কাছে যাব। তুমি একটা বিচ্ছিরি খারাপ!' আরও অনেক কথা বলে। এভাবে ছেলেটাকে বিগড়ে দিচ্ছেন মা। কেন এই শত্রুতা তার সঙ্গে? তোমার কী ক্ষতি করেছি মা! আমার ভাল তোমার দেখতে হবে না। শুধু আমাকে রেহাই দাও। তোমার দুটি পায়ে পড়ি।

—দিদিমণি। বড় সাহেব ডাকছেন।

তাড়াতাড়ি মাথা তুলে সোজা হয়ে বসল মীরা। বেয়ারার দিকে না তাকিয়ে বলল, ঠিক আছে। আমি যাচ্ছি। বলে সে ফাইলের মধ্যে চিঠিপত্র গুছিয়ে রাখে। তারপর বটুয়া খুলে ছোট্ট আয়নায় সামান্য মেকআপ করে। ঠোঁটে মৃদু লিপস্টিক ঘষে। প্রথমদিন অফিসের সাজগোজ দেখে মা চিৎকার করে উঠেছিলেন। অশ্রাব্য উক্তি করেছিলেন। সেসব ভেবে আপনমনে মৃদু হেসে সে সুইংডোর ঠেলে বাইরে আসে।

মাথা নীচু করে মিঃ কাপুর ফাইলের উপর ঝুঁকে। হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। বিরাট সেক্রেটারিয়েট টেবিল। এ ঘরে

ঢুকতে আগে গলা শুকিয়ে যেত মীরার। কিছুদিন কাজ করার পর সহজ স্বাভাবিক হ'তে পেরেছে। অবশ্য বড় সায়েবের আন্তরিক ব্যবহার তার জন্যে দায়ী। কাজকর্মে ভুল টুল হলে রূঢ় কথা না বলে বুঝিয়ে দেন। অথচ শুনেছে বড় সায়েব বেশ কড়া।

—বসুন। এক মিনিট। বলে আবার তিনি ডুবে যান ফাইলের মধ্যে।

সব রেডি আছে। শুধু একটা চিঠি টাইপ হয়নি। মীরা খানিকটা অস্বস্তিবোধ করল। হয়তো কিছু বলবেন না বড় সায়েব। তবু এ তার গাফিলতী। দেড় ঘণ্টায় তিনখানা ছোট্ট চিঠি টাইপ হওয়া উচিত ছিল। খচ্‌খচ্‌ করতে থাকে মনটা। এ অফিসটা ভাল। মেয়েদের কাজ করবার মত উপযুক্ত পরিবেশ আছে। কত কী শুনেছে। অফিসার মহল সম্পর্কে একটা ভীতির ভাব ছিল। কখন কী হয় বলা যায় না। মেয়েদের বিপদ নানাদিক থেকে। বিশেষ করে যার দেহ লোভনীয়, চেহারা সুন্দর—তাকে উত্তাক্ত করার জন্যে কী কেরাণী কী অফিসার, চেষ্টার ত্রুটি কেউ করবে না!

মনে মনে সে শ্রদ্ধা করে মিঃ কাপুরকে। অন্যরকম হলে টের পেত। লোভী পুরুষদের আচার আচরণ সহজেই ধরা পড়ে। এরকম একজন সজ্জন অফিসার পেয়ে সে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে। নইলে জ্বালা যন্ত্রণা আরও বাড়ত। একেই তো নানাভাবে জর্জরিত।

চিঠি সই করতে করতে মিঃ কাপুর একপলক তাকিয়ে ফের চোখ নত করে বলেন, আপনার শরীর কী ভাল নেই মিস মিত্র?

ফ্যাকাসে হয়ে ওঠে মীরার মুখ। তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নম্র সুরে বলল, ধন্যবাদ। আমি ভাল আছি স্যার। শুধু একটা চিঠি টাইপ হয়নি। এখুনি হয়ে যাবে!

—ডিকটেশন নিন। স্বল্পভাষী মিঃ কাপুর ফাইল দেখতে থাকেন।

পরপর অনেকগুলি ডিকটেশন নিয়ে মীরা নিজের কামরায় চলে আসে। গতকালের চিঠিটা টাইপ করতে সুরু করে। টিফিনের সময় হয়ে এল। একটু পরে ওরা এসে পড়বে। ওদের সঙ্গ আজ তার ভাল লাগবে না। সে একটু নিরিবিলি থাকতে চায়। বীথিকে একা পাওয়া দরকার। আর কাউকে নয়।

ডিরেক্টরের ঘর থেকে চিঠি সই করিয়ে নিয়ে আসে। ঘরে ঢোকামাত্র বীথি তেরছা চোখে তাকিয়ে বলল, ঘন ঘন ওঘরে যেয়ো না। কোনদিন লাফিয়ে পড়বে ঘাড়ে...ও একটা বাঘ!

—চুপ কর! বিরক্তি চাপা থাকে না মীরার কণ্ঠে, কী যা তা বলছিস। তোদের মন নোংরা হয়ে গেছে।

বীথি আর সীমা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হাসল। সীমা ওদের চেয়ে বয়সে কিছু বড়। বিবাহিতা। বছর পাঁচেকের একটা মেয়ে আছে। বৈশিষ্ট্যহীন চেহারা। ইদানীং মেদ বৃদ্ধি হচ্ছে।

ঘরে নিস্তব্ধতা। একটু পরে মীরার মনে হল হাসি মুখেই ওদের সঙ্গে কথা বলবে। নিজের অশান্তি হতই হোক বাইরে হাসিমুখে সৌজন্য প্রকাশ করতে হবে। নইলে ওরা ভাববে কী।

টিফিনের কৌটো খুলে একটা সন্দেশ এগিয়ে নিয়ে বলল, নে ধর। রাগ করিস না বীথি। মনটা বিশেষ ভাল নেই। সীমাদি, তোমাকে দুটো লুচি দেব।

—বীথিকে সন্দেশ আর আমার বেলায় আটার লুচি। হাসল সীমা, তোমার প্রাণের সই বীথি, সেটা কী এভাবে প্রকাশ করতে হয়!

—সই না ছাই! ঠোঁট উল্টে বীথি বলল, সব বাইরে বাইরে। যা চাপা মেয়ে, ভেবেছো কোন কথা বলে আমাকে।

ঝগড়া বেধে যায় দুজনের মধ্যে। সীমার মধ্যস্থতায় আবার ঝগড়া থামে। একটু পরে বেশ গাল গল্পে মেতে ওঠে ওরা। অধিকাংশ আলোচনা অফিস কর্মীদের ঘিরে। বিশেষ করে অল্প বয়স্ক দুজন যুবক সহকর্মীকে ঘিরে রসাল আলাপ। বীথির কথাবার্তার ধরন দেখে ওরা খুব হাসে। নকল করতে ওস্তাদ বীথি।

অন্যমনস্ক থাকে মীরা সব সময়। মাঝে মাঝে বীথির প্রশ্নে চমকে যায়। ও কিছু নয়। কেন মন খারাপ? এড়িয়ে যায় সে। অন্যপ্রসঙ্গ তোলে। এভাবে টিফিনের সময় পেরিয়ে যায়।

—ছুটির পর থাকিস। কথা আছে বীথি।

—আচ্ছা। ঘাড় কাৎ করে হাসে বীথি, খুব গোপনীয় বুঝি?

ওরা বেরিয়ে গেলে কাজে মন দিল মীরা। সমস্ত চিঠি আজ রেডি করে রাখতে হবে। কাজের মধ্যে আর বড় সায়েবের ঘরে ডাক পড়ে না। বীথির যা কথা। বড় সায়েব নাকি বাঘ! হাসি পেল তার। হঠাৎ একটা কথা মনে হতে সমস্ত মুখ বিবর্ণ হয়ে ওঠে। মেসিনের উপর আঙুল থেমে যায়। অফিস ছুটির পর বাড়ি ফেরার পথে যদি রজতের মুখোমুখি হয়ে পড়ে। এরকম সম্ভাবনা যে আদৌ হবে না কে বলতে পারে। ভীড়ের মধ্যে তার হাত চেপে ধরতে পারে রজত। যদি বলে, "ফিরে চল মীরা। তোমাকে ছাড়া আমার দিন কাটছে না।" তখন সে কী করবে? বীথি নিশ্চয়ই চোখ বড় বড় করে তাকাবে। বুঝতে চেষ্টা করবে ব্যাপারটা কী।

না, এতটা সাহস হবে না রজতের। হাত ধরা টরা...বলা যায় না, ওর দ্বারা সব সম্ভব। মীরা বাইরে বেরোয়। বাথরুম থেকে চোখমুখে জল ছিটিয়ে আসে। ফের চিঠি টাইপ করতে সুরু করে। এর একটা বিহিত করতে হবে। দাদাকে সব খুলে বলবে। দাদা কথা বলুক রজতের সঙ্গে। রজত কী চায় জানা দরকার। ডিভোর্সের প্রোপোজাল দাদা দেবে। এটাই ভদ্রসম্মত উপায়। রাজী হবে কী? বিশ্বাস করা শক্ত। তবে তুমি কী চাও? খুলে বল রজত। মীরা চিৎকার করতে পারে না। গলা চিরে যায়। বিশ্রী একটা শব্দ হয়। অস্ফুট আর্তনাদের মত।

ছুটির পর দুজনে রাস্তায় বেরোল। মীরা তাড়াতাড়ি হাঁটতে থাকে। বিবর্ণ মুখে চারদিকে তাকায়। বড় বড় এক একটা বাড়ি থেকে পিলপিল করে পিঁপড়ের সারির মত অসংখ্য নরনারী বেরিয়ে আসছে। বাস ট্রাম গিজগিজ করছে। কয়েকবার চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিল ওরা। সতর্ক দৃষ্টি ফেলে মীরা এগোয়। সঙ্গে বীথি রয়েছে সে খেয়াল যেন নেই।

—তুই অমন ছটফট করছিস কেন। বীথি অসহিষ্ণুভাবে ওর একটা হাত চেপে ধরল, খালি এড়িয়ে যাচ্ছিস মীরা। বল কী হয়েছে?

—কী আবার হবে। হাত ছেড়ে দে বীথি।

—এভাবে হন্তদন্ত হয়ে ছুটছিস কেন। তোর গোপনীয় কথা এবার বল।

—এখন তোর কোন কাজ আছে বীথি?

—কেন? বীথি খানিকটা অবাক। আপাতত বাড়ি ফেরাই একমাত্র কাজ।

—তবে আমাদের বাসায় চল। কথা দেখা সব হবে সেখানে।

বীথি অনেক চেষ্টা করল কিন্তু মীরা কিছুতেই মুখ খুলল না। সেই এক কথাঃ বাড়ি গিয়ে সব দেখবি জানবি। রীতিমত রহস্য। পেট ফুলে যাবার জোগাড় বীথির। ধৈর্যের পরীক্ষা দেওয়া ছাড়া এখন কোন উপায় নেই। মীরা ভীষণ জেদী মেয়ে। ওকে মেরে ফেললেও এখন কোন কথা বের করা যাবে না।

—তোর 'ইয়ের' খবর কী!

—একেবারে বদ্ধ উন্মাদ। বীথি সশব্দে হেসে ওঠে, আর ঠেকিয়ে রাখতে পারছি না। তবে হ্যাঁ, স্থির করেছি বিয়েটা তাড়াতাড়ি করে ফেলবো।

—সেই ভাল। মীরা মৃদু হাসল, হাতের কাছে খাবার অথচ খেতে পারছি না—না ভাই এরকম অবস্থায় বেশিদিন থাকা যায় না। বল, ঠিক বলেছি কিনা।

—জানি না। উঃ আর কত হাঁটবি! বীথি ক্লান্তস্বরে বলল, এখান থেকে বাসে উঠবো। ঠেলেঠুলে উঠতেই হবে।

মীরা বাধ্য হয়ে দাঁড়াল। দাঁড়াবার ইচ্ছা তার নেই। বাড়ি না ফেরা পর্যন্ত স্বস্তি নেই। কে বলতে পারে কখন কী হয়। হয়তো ভীড়ের মধ্যে বাঘের মত ওৎ পেতে লুকিয়ে রয়েছে রজত। আবার বাঘ! প্রাণপণে হাসি রোধ করে মীরা। বীথির দিকে তাকায়। সব জেনেশুনে তাজ্জব বনে যাবে। চোখ বড় বড় করে তাকাবে।

লোকজনের ধাক্কা গুঁতো খেয়ে দুজনে বাসে উঠল। রড ধরে কোনরকমে দাঁড়াল। বীথি মুচকি হাসছে। মীরার সমস্ত শরীর রী রী করে উঠল। কিছু বলার উপায় নেই। লজ্জার মাথা খেয়ে বললে হাঁ হাঁ করে তেড়ে আসবে। 'অত স্পর্শকাতর হলে এই ভীড়ে উঠেছেন কেন! আপনার গায়ের উপর কী ইচ্ছে করে এসে পড়েছি!' সেই সঙ্গে সুরু হবে আরও নানারকম রসাল মন্তব্য। অর্থাৎ অপমানের চূড়ান্ত। অতএব মুখ বুজে সহ্য করা ছাড়া উপায় কি।

(ক্রমশঃ)

১৯৭০-এর ২৫শে নভেম্বর

২৫ নভেম্বর, ১৯৭০ তারিখটি বাঙলার নাট্যজগতের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিতভাবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এইদিন সন্ধ্যায় নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী তাঁর ৩১।১এ, গোপালনগর রোডস্থ বাস-ভবনের পিছনে তাঁর যে ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা ছিল, সেগুলিকে বাঙলা-দেশের নাট্যপ্রেমীদের হাতে তুলে দিয়েছেন। এই উপলক্ষে শ্রীচৌধুরী সমবেত সুধীবৃন্দকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, 'আমার জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, বাঙলাদেশের মানুষ নাটক ভালো-বাসে। নাটকের জন্যে এ-দেশে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছে। আমি জীবনের পথপরিক্রমায় লক্ষ্য করেছি, এ-দেশের তরুণ মনে প্রত্যাশার সৃষ্টি। আরো লক্ষ্য করেছি, বাঙলার উর্বরা মাটির মতো এ-দেশের তরুণ মনে অঙ্কুরিত নাটকের নানা সম্ভাবনা। এই যে প্রত্যাশা, এই যে সম্ভাবনা, তা পূর্ণ হবার অবকাশ কোথায়? জাতীয় নাট্যশালা নেই, যেখানে গড়ে উঠবে নাট্যপীঠ। নাট্যচর্চার জন্যে আছে রবীন্দ্র ভারতী নাটক অ্যাকাডেমী, কিন্তু তার বাইরে নাট্যচর্চার আর কোন কেন্দ্র নেই। অথচ থাকা দরকার।' এই অভাববোধ দ্বারা শ্রীচৌধুরী পীড়িত হয়েছেন বলেই তিনি নাটক বিষয়ে সুষ্ঠু চর্চা ও গবেষণার জন্যে তাঁর নাট্যগ্রন্থাগারটিকে সম্পূর্ণ অবৈতনিক পাঠাগার রূপে সকলের জন্যে উন্মুক্ত করে দিলেন।

শ্রীচৌধুরী জানিয়েছেন, এই নাট্য-পাঠাগারের পরিকল্পনা ছিল তাঁর পরলোক-গতা সহধর্মিণীর। কাজিনগত তাড়নায় একদিন আমি পুস্তক থেকে আরম্ভ করে অনেক কিছুই সংগ্রহ করেছি আমার ব্যক্তিগত পাঠাগার এবং সংগ্রহশালায়। পরবর্তীকালে মনে হতো, এই সংগ্রহশালা পাঠাগারের ভবিষ্যৎ কী? আমি তো চিরদিন থাকবো না। তখনই আমার স্ত্রী বলেছিলেন, বাঙলাদেশে নাট্যপ্রেমীর অভাব নেই—এই পাঠাগার এবং সংগ্রহশালাকে ভবিষ্যৎ বাঙলাদেশের নাট্যপ্রেমীদের হাতে তুলে দিও। আজ বলতে দ্বিধা নেই—এই পাঠাগারের পিছনে রয়েছে আমার স্ত্রীর সেই অনুপ্রেরণা।'

পাঠাগারের দ্বারোদ্ঘাটন করেন ভারতের জাতীয় গ্রন্থশালার গ্রন্থাগারিক (ন্যাশনাল লাইব্রেরীর লাইব্রেরিয়ান) স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত সামান্য কেশবন। রৌপ্যনির্মিত নূতন কর্তনী (কাঁচি) দ্বারা লাল রেশমী ফিতাটিকে ছেদ করে পাঠাগারের দ্বারো-দ্ঘাটনের পরে সুসজ্জিত গ্রন্থশালাটিকে তিনি শ্রীচৌধুরীর সঙ্গে ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করেন এবং পরে বক্তৃতা প্রসঙ্গে নাটকের ক্ষেত্রে বাঙলাদেশের ঐতিহ্য এবং অগ্রবর্তিতার কথা উল্লেখ করে অভিনেতা-রূপে শ্রীচৌধুরীর অসামান্য জনপ্রিয়তা ও সাফল্যের কথা বলে বাঙলাদেশে নাট্যচর্চার জন্য তাঁর এই পরিকল্পনা ও দানকে ঐতিহাসিক বলে আখ্যাত করেন। পরে তিনি শ্রীচৌধুরীকে জানান যে, তাঁর সংগৃহীত প্রচারপত্রগুলি (হ্যাণ্ডবিল) এমনই সস্তা দরের কাগজে ছাপা, যা খুব বেশী দিন টিঁকে থাকবে না; সেই কারণে তিনি ঐ হ্যাণ্ডবিলের ফাইলগুলি তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিতে বলেন, যাতে তিনি বিশেষ রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা ওগুলির আয়ু যথেষ্ট বাড়িয়ে দিতে পারেন। শ্রীকেশবন বলেন, এই হ্যাণ্ডবিলগুলি নাট্য ইতিহাস রচনার জন্যে অমূল্য।

এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত ব্যক্তিদের মধ্যে নাট্যকার মন্মথ রায়, অধ্যাপক ডঃ অজিত ঘোষ, সাংবাদিক মনুজেন্দ্র ভঞ্জ প্রভৃতি শ্রীচৌধুরীর এই স্মরণীয় অবদানের জন্যে তাঁকে অভিনন্দিত করেন। পশুপতি চট্টোপাধ্যায় দ্বারা ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পরে এই অনুষ্ঠানটির সমাপ্তি হয়। উপস্থিত সুধীবৃন্দকে শ্রীচৌধুরী চা-জলখাবার দ্বারা আপ্যায়িত করেন। এই ঐতিহাসিক অনু-ষ্ঠানটির চলচ্চিত্র গ্রহণ করেন ভারত সরকারের ফিল্মস ডিভিশন ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ। এ ছাড়া কলিকাতা বেতারকেন্দ্র থেকেও এই অনুষ্ঠানে শ্রীচৌধুরী ও শ্রীকেশবনের বক্তব্য রেকর্ড করা হয়।

পাঠাগারটির পরিচালনার জন্যে যে 'অহীন্দ্র চৌধুরী ট্রাস্ট' গঠিত হয়েছে তাতে শ্রীচৌধুরী ছাড়া আর যে চারজন আছেন, তাঁরা হচ্ছেন শ্রীচৌধুরীর কন্যা ও জামাতা—মীরা ও সন্তোষ বসু এবং রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই অধ্যাপক—ডঃ গীতা সেনগুপ্ত ও গণেশ মুখোপাধ্যায়। এই ব্যাপারে যে দলিলটি রেজেস্ট্রী করা হয়েছে, তাতে পাঠাগার পরিচালনা ছাড়াও দুঃস্থ শিল্পী, নাট্যকার, কলাকুশলীদের সাহায্য দান প্রভৃতিকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরীর নাট্য-সাধনা ও নাট্যোন্নতির জন্যে অবদান ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকবে।

জলসা

আনন্দশঙ্কর রচিত অর্কেস্ট্রা : ইণ্ডিয়া পেন্টিং কোম্পানী পরিবেশিত বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে আনন্দশঙ্কর রচিত অর্কেস্ট্রা নতুন করে আমাদের আশ্বাস দিল যে শঙ্করসঙ্গীতের আন্তর্জাতিক শিল্পখ্যাতি তাঁদের সুযোগ্য পুত্র আনন্দ-শঙ্কর হয়ত অনাহত রাখতে পারবেন।

বিদেশ থেকে ফেরার পর আনন্দ-শঙ্করের অর্কেস্ট্রার ভিন্ন এক ধরোয়া সম্মেলনে আমাদের শোনানো হয়েছে। সেদিন মুগ্ধ হয়েছিলাম ভারতীয় রাগ-সঙ্গীতের সঙ্গে মাঝে মাঝে পপ সং এবং পরিবেশে এদেশ ও ওদেশের শিল্পী-সহযোগে 'রঘুপতি রাঘব' গান দিয়ে সকল দেশের কলারসিকবৃন্দকে ভারতীয় ঐক্য-বোধের পতাকাতলে মিলিত করবার মহৎ প্রয়াস লক্ষ্য করে।

এদেশে এসে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সম্পূর্ণ নতুন এক শিল্পীগোষ্ঠী সহযোগে এক নতুন ঐকতান সঙ্গীত সৃষ্টিতে আনন্দশঙ্করের সঙ্গীতচিন্তার আর একটি দিক প্রতিফলিত—পারি-পার্শ্বিক ও যুগচেতনা সম্বন্ধে তাঁর সজাগ এবং সক্রিয় বোধশক্তি ও শিল্পীজনোচিত প্রকাশভঙ্গী।

প্রধানতঃ ভারতীয় যন্ত্রসঙ্গীত-গঠিত এই সঙ্গীত প্রথমে বসন্তবাহারী রাগ-ভিত্তিতে ৭ মাত্রার তালে পরিবেশিত হয়। ভৈরবীর সঙ্গে দুঃখ গান্ধারের মাধুর্যে এই রাগের আবেদন শ্রোতৃচিত্তে ছড়িয়ে যেতে দেরী হয়নি। মূল ভাব তার সরস নবীন-তার পূর্ণ উদ্যমে ১৫ মাত্রার তালে এগিয়ে যেয়ে চরমে পৌঁছল উপসংহার অংশে। এখানে বর্তমান যুগের নানান সমস্যা, অস্থিরতা দিশেহারা হয়ে ছুটে চলার আবেগ—কণ্ঠসঙ্গীত সঙ্গতে সুরের ওঠা-পড়া, আলোর ঝলক ও নেশার মধ্যে যেন এক ছবির মত দৃশ্যরচনা করেছিল। অতি দ্রুত ছন্দের ধমকে চলার পরই দ্রুতগতি সারা প্রেক্ষাগৃহে এক উত্তেজনা ও রোমাঞ্চ সৃষ্টি করে জানিয়ে দিয়েছে শঙ্করের 'শো-ম্যান-শিপ'-এর যথার্থ উত্তরসাধক হয়ে উঠতে পেরেছেন তাঁর পুত্র আনন্দশঙ্কর। আর একটি অনুষ্ঠান ছিল উদয়শঙ্কর কালচারাল সেণ্টারের নৃত্যনাট্য 'চিদাম্বরম্'। শ্রীমতী

অমলাশঙ্কর রচিত ও পরিচালিত এই নৃত্যনাট্য সুরঝংকারে স্পন্দিত এক কাব্যসঙ্গীতের রূপ পরিগ্রহ করেছে।

কয়েক সপ্তাহ আগে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত কেনেথ বি কিটিং-এর সম্মানার্থে এই অর্কেস্ট্রার আয়োজন এবং অনুষ্ঠান শেষে কেনেথ আনন্দকে উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন।

দুটি উল্লেখযোগ্য প্রভাতী আসর: সম্প্রতি একক সেতারবাদনের দুটি প্রভাতী আসরের মনোরম উপস্থাপনা মনে রাখবার মত।

একটি হোলো রবীন্দ্র প্রেক্ষাগৃহে সুরদাস সঙ্গীত সম্মেলনের পক্ষ হতে নিবেদিত পদ্মশ্রী আব্দুল হালিম জাফর খাঁ ও সদাশিব পাওয়ারের সেতার ও তবলা, অন্যটি জলসাঘরের সঙ্গীতচক্র আয়োজিত আসরে মণিলাল নাগ ও পণ্ডিত কিষণ মহারাজের অনুষ্ঠান।

একজন ভারতবিখ্যাত স্বনামধন্য শিল্পী—অপরজন প্রায় প্রতিষ্ঠিত তরুণ শিল্পী মণিলাল নাগ। উভয়েই আপনাপন বৈশিষ্ট্য ও ক্ষমতার মানে প্রতিষ্ঠিত।

আব্দুল হালিম জাফর: 'জৌনপুরী' রাগ দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু করেন। কলাবন্তী আঙ্গিকে খাঁ সাহেব রাগ পরিবেশনায় ব্রতী হন এবং রাগের অন্তর্নিহিত করুণা ও বেদনা সূক্ষ্ম-মীড় আশ্‌ ও চকিত দ্রুততানের ছায়ায় এক অপূর্ব রূপব্যঞ্জনায় ধ্বনিত। মধ্য মধ্যলয়ের জোড় অত্যন্ত বেশ যেন গীতিকাব্যিক মধুরতায় রাগকল্পনাকে প্রসারিত করেছে। জোড়ের সঙ্গে নানান ঝালা ও গৎ-সমন্বয়ে শিল্পীর রঙিন মনটির উজ্জ্বল প্রতিফলন ঘটেছে।

'জৌনপুরী'র সঙ্গে ভাবসমন্বয় বজায় রেখে খাঁ সাহেবের 'ভীমপলশ্রী' রাগ-নির্বাচন অতি উচ্চাঙ্গের শিল্পবোধের নিদর্শন। ভীমপলশ্রী রাগের কান্নাবিধুর বৈরাগ্যে গভীর ঔদাস্যের সুর প্রথম থেকেই অনুভূত হয়েছিল। শিল্পীর বর্ণবোধ, স্বরবিন্যাস ও আলঙ্কারিক দক্ষতায় সঙ্গীত যেন জীবন্ত হয়ে ওঠে। তানের অঙ্গে বিলাপ মীড় ও জমজমায় রবিশঙ্করের প্রভাব পরিস্ফুট। কিন্তু এতসত্ত্বেও শিল্পীর স্বকীয়তা সদাজাগ্রত ছিলো বলেই উপভোগের ক্ষেত্র থেকে মুহূর্তকালের জন্যও আমরা বঞ্চিত হইনি। আর মার্গসঙ্গীতের বৈশিষ্ট্যে সমস্ত রীতিই সুরক্ষিত হয়েছে। সর্বশেষে ধুন শিষ্ট করে দক্ষিণ ভারতীয় রাগ 'কণকাঙ্গী' দিয়ে ইনি অনুষ্ঠান সমাপ্ত করেন।

আব্দুল হালিম জাফরের সঙ্গে তবলাসঙ্গতে ছিলেন বোম্বাই-এর সদাশিব পাওয়ার। কোলকাতায় সদাশিব পাওয়ারের অনুষ্ঠান এই প্রথম।

মণিলাল নাগ ও কিষণ মহারাজ: পণ্ডিত কণ্ঠে মহারাজের মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে রবীন্দ্র সদনে জলসাঘর সঙ্গীতচক্র নিবেদিত আসরে মণিলাল নাগ 'দেশী তোড়ি' দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু করলেন। 'দেশী' ও বেদনার্ত রাগ। তবে 'জৌনপুরী'র বেদনায় কাতরতাবোধের চাঞ্চল্য আছে। 'দেশী'র বেদনা শান্ত সংযত।

বেদনার এই সংযত রূপের ধ্যানকে অবিচলিত রেখেই তরুণ শিল্পী তাঁর রাগবিস্তার শুরু করেন সম্পূর্ণ ধ্রুপদী অঙ্গে। পিতা গোকুল নাগের বিষ্ণুপুর ঘরানার কাঠামো ত ছিলই—এই ছাঁচকে তিনি রবিশঙ্করজী, নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুসরণে সজ্জিত করে পরিবেশনাকে অত্যন্ত সরস মধুর করে তুলেছেন। আলাপের বিলম্বিত অঙ্গে শান্ত বিস্তার, জোড়ের ছন্দবৈচিত্র্য ও ঝালার ধ্বনিসম্পাতে শিল্পবোধ শিল্পীপ্রতিভার দীপ্তিতে উজ্জ্বল। জোড়ের অঙ্গের কোনো কোনো মীড়ে কানাড়া এবং দ্রুতগতের আরোহীতে কাফি অথবা সাহং-এর ভাব মাঝে মাঝে দেখা এসেছে কিন্তু মূল রাগের রূপ থেকে শিল্পী মুহূর্তকালের জন্যও সরে যাননি। এইখানেই তাঁর কৃতিত্ব।

এ অনুষ্ঠানের আর এক আকর্ষণীয় অঙ্গ ছিল পণ্ডিত কিষণ মহারাজের তবলাসঙ্গত। কি ঠেকা, কি বোলা, কি সাথসঙ্গত অথবা সওয়াল-জবাব প্রতিটি অঙ্গে শোনবার মত বাজনাই তিনি বাজিয়েছেন। আর আমরা স-গর্ব পুলকে লক্ষ করেছি তরুণ বাঙালী শিল্পীর অসাধারণ অলংকারীর দখল। ভৈরব-ঠুংরী দিয়ে বাজনা 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' হোলো।

আর এক উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান বাংলার প্রবীণ তবলিয়া নাটুবাবুর তবলা-লহরা। ত্রিতালে পরিবেশিত বোলের বাহার। তান, টুকরো, পরণ—সবতেই একনিষ্ঠ রেওয়াজ ও সুচিন্তিত পাণ্ডিত্য শ্রোতাদের শ্রদ্ধা আদায় করে নিয়েছে। এ-অনুষ্ঠানের জন্য উদ্যোক্তারা অবশ্যই ধন্যবাদার্হ।

লং প্লেয়িং ডিস্কে গুপী গাইন বাঘা বাইনের সঙ্গীত: সত্যজিৎবাবুর 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' এক বিস্ময়কর অবদান শুধুমাত্র বর্তমান চলচ্চিত্রের পরিপ্রেক্ষিতেই নয়, সঙ্গীতসৃষ্টি হিসাবেও। সম্প্রতি গ্রামোফোন কোম্পানী প্রকাশিত গুপী গাইন বাঘা বাইনের সঙ্গীতের একটি লং প্লেয়িং ডিস্ক সঙ্গীতরসিক মহলে সাড়া জাগিয়েছে। যাঁরা এই চিত্র দেখেছেন, তাঁরা রেকর্ডটি শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চোখের সামনে প্রতিটি দৃশ্যকে নতুন করে দেখার আনন্দে ডুবে যাবেন। যাঁরা দেখেননি, তাঁরাও এই সঙ্গীতসূত্র অনুসরণ করে উধাও হয়ে যাবেন কল্পনার সেই আশ্চর্য দেশে—যেখানে গায়ক গোপী এবং ঢোলবাদ্য-বাদক বাঘার সঙ্গীত-প্রতিভার একটার পর একটা অঘটন ঘটে চলেছে। বাঘার অলঙ্কার সঙ্গতে গোপীর ৪খানি গান 'ভূতের রাজা দিল বর' 'মহারাজা তোমারে সেলাম', 'এক যে ছিল রাজা' ছন্দ ও সুরের অপূর্ব সমন্বয় যেন এই লোকসঙ্গীতধর্মী গানগুলির উপরি-পাওনা। 'দেখরে নয়ন মেলে' গানটিতে চৈতন্যের উদাসী সুর তানপুরা, সেতার ও বাঁশের বাঁশীর ছায়ায় এক কাব্যসুষমার রূপ পরিগ্রহ করেছে। মাঝে মাঝে দক্ষিণ ভারতীয় রাগের ছোঁয়ায় তারানাম ও বীণ সঙ্গতে কৌতুকময় বৈচিত্র্য সৃষ্টির প্রয়োগ-কৌশল লক্ষ করবার মত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের যন্ত্র-সমন্বয়ে রচিত অর্কেস্ট্রায় কখনও ভূতের নৃত্য, যুদ্ধবিগ্রহ, রাজস্থানী লোকসঙ্গীতের আভাসে ছায়া সৌন্দর্যের সঙ্গে সঙ্গে যেন দৃশ্যলোকও সৃষ্টি করে। 'পথের পাঁচালী'র পর ফিল্মে এ-ধরনের সঙ্গীত পরিবেশনা আর দুর্যোগ মনে পড়ে না। জনপ্রিয় গানগুলি গেয়েছেন অনুপ ঘোষাল—গুপী গাইনের গান গেয়ে বাঁর ভাগ্য ফিরে গেল। সত্যজিৎ রায় রচিত অর্কেস্ট্রা পরিচালনা করেছেন অলোক দে।

—চিত্রলেখা

আনন্দশংকরের অনুষ্ঠান

প্রেক্ষাগৃহ

হেমা মালিনী　　　　ফটো : অমৃত

হৃদয় জয় করা মেয়ে

এ-আর-সি প্রোডাকসন্স-এর দ্বিতীয় নিবেদন 'রূপসী'র নায়িকা রূপসী গ্রাম বাঙলার চাষী-জোতদারের মা-হারা আদরের মেয়ে। সমবয়সী সাথীদের নিয়ে সে পরের বাগানের ফল পেড়ে, জল সেঁচে খায়, ফেলে-ছড়িয়ে নষ্ট করে। দুঃসাহসী ডাকাবুকো মেয়ে বিষধর সাপ নিয়ে নির্ভয়ে খেলা করে, অনায়াসভঙ্গীতে সাঁতার কাটে, আবার গলা ছেড়ে গানও গায়। ভয়ডরহীন মেয়েটির বাতাসের মতো অবাধগতি। গাঁ-শুদ্ধ লোক তার জ্বালায় অস্থির; কিন্তু মা-হারা মেয়েকে নবীন মাহাতো কিছু বলে না, বলতে পারে না। কারুর কারুর চোখে রূপসী চরিত্রকে কিছুটা অবান্তর ঠেকবে; কিন্তু তাদের কথা মেনে নিয়েও বলব, ভালোবাসার মতো হৃদয় জয়করা মেয়ে হচ্ছে এই রূপসী। একক্কাড়ি ঠাকুর্দার বাগানের কলার কাঁদি চুরি করতে গিয়ে হাতেনাতে যখন ধরা পড়ল রূপসী এবং ঠাকুর্দার তরফে ও কবিগান-করা নাতি বলরামের কাছে নাকাল হোলো, তখন সে প্রতিজ্ঞা করল, যে-করে হোক ঐ বলরামকে জব্দ করতেই হবে। যেমন কথা, তেমনই কাজ। কবি-গানের আসরে সে গ্রামসুদ্ধ লোকের সামনে বলরামের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামল এবং 'পানিফল' ও 'রসগোল্লা'র দ্বন্দ্বে খানিকক্ষণ হুল ধরে—বলরাম ঐ মেয়েটির হুকুমে সাময়িক সম্মানিতভাবে পরাজয় স্বীকার করে নিজের মেডেলের গোছাকে ওর হাতে সমর্পণ করে বিদায় নিল। দুজনে দুজনের মধ্যে কি দেখল, কে জানে! দুজনেই দুজনের জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠল। বলরাম গায় :

কাজল পরা ও চোখে তোর যাদু আছেরে।
আমি হারিয়ে যাব অবশেষে
তোর কাছেরে।।

অপরদিকে রূপসী গেয়ে ওঠে :

ভালোবাসার পরশ পেলাম
সেই পরশে সব হারালাম

ওদের এই প্রেমে বাধা দাঁড়ালেন একক্কাড়ি ঠাকুর্দা। রূপসীর বাবাকে তিনি স্পষ্ট বলে দিলেন : তোমার মেয়েকে আমি নাতবৌ করে ঘরে আনব না—ও অলক্ষ্মীকে ঘরে ঢুকোলে আমার এই সংসার-মন্দির ভেঙে যাবে। কিন্তু অলক্ষ্মীর এই দুর্নাম ঘুচিয়ে মঙ্গলকারিণী লক্ষ্মীতে পরিণত হবার জন্যে রূপসী যে অসাধ্যসাধন করল, তারই কাহিনী চিত্রিত হয়েছে রূপসীর শেষের হৃদয়গ্রাহী দৃশ্যগুলিতে।

মা-মরা মেয়ে রূপসীর এই কাহিনীকে কাহিনী ও চিত্রনাট্যকার-পরিচালক অজিত গাঙ্গুলী চরিত্র-চিত্রণ, বিভিন্ন রসের ঘটনার সুষ্ঠু সমাবেশ, হৃদয়গ্রাহী সংলাপ এবং মন-মাতানো ছড়া ও গানের সাহায্যে এমনভাবে দর্শকসমক্ষে তুলে ধরেছেন, যাতে তার ভূয়সী প্রশংসা না করে পারা যায় না। নির্দ্বিধায় বলতে পারি, 'রূপসী'ই হচ্ছে অজিত গাঙ্গুলীর পরিচালক জীবনের শ্রেষ্ঠতম এবং সার্থকতম নিবেদন।

ছবির নাম-ভূমিকায় সন্ধ্যা রায় বাচনে, ভঙ্গীতে যে-অসামান্য নটনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন, তা এই ভূমিকাটিকে তাঁর শিল্পিজীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বলে চিহ্নিত করে রাখবে। বস্তুত, তাঁর অনবদ্য অভিনয়ই চরিত্রটি চিত্তজয়ী করে তুলেছে। নায়ক বলরাম বেশে সমিত ভঞ্জ তাঁর শিল্প-প্রতিভার একটি নতুন দিকের সন্ধান দিয়েছেন। 'আপন জন', 'অরণ্যের দিন-রাত্রি'র সমিত ভঞ্জ যে প্রেমিক-নায়কের ভূমিকাতেও সার্থক হতে পারেন, তা বিশ্বাস করবার জন্যে রূপসীতে তাঁর বলরাম-এর ভূমিকাভিনয় দেখতে হবে। শক্তিশালী চরিত্রাভিনেতা কালী বন্দ্যোপাধ্যায় রক্ষণশীল চাষী গৃহস্থ একক্কাড়ি ঠাকুর্দার ভূমিকাটিকে প্রাণবন্ত ও বাস্তব করে তুলেছেন। রূপসীর বাবা নবীন জোতদারের ভূমিকাটি বঙ্কিম ঘোষের নটনৈপুণ্যে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। অর্থের প্রতি লোভ এবং ঈশ্বরের ন্যায়পরতার উপর আস্থা—এই বিপরীতমুখী আকর্ষণের দ্বন্দ্ব ও তারই সঙ্গে মাতৃহারা কন্যার প্রতি স্নেহকে তিনি চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। অন্যান্য ভূমিকায় সার্থক অভিনয় করেছেন জহর রায় (নিতাই গয়েন), অনুভা গুপ্তা (বড়বৌ), রবি ঘোষ (নলিন), তপেন চট্টোপাধ্যায় (মাধব), সুলতা চৌধুরী (তরলা), জুঁই বন্দ্যোপাধ্যায় (টিয়া) প্রভৃতি।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছে বহির্দৃশ্যে চিত্র গ্রহণের চমৎকারিত্ব। সারা আকাশ-জুড়ে কালো মেঘ, আর দিকচক্রবালের কতটা মেঘহীন—এই দৃশ্যটির তুলনা নেই। গ্রাম-পরিবেশ রচনায় শিল্প নির্দেশকের দক্ষতাও প্রশংসনীয়। ছবির একটি বিশেষ আকর্ষণ হচ্ছে এর গানগুলি। প্রধানত গ্রাম্য বাউল, ভাটিয়ালি প্রভৃতি সুরে গীত গানগুলি বারংবার শোনবার মতো—বাদ দে,

পানি দেব সুরকে কিছুটা পরিবর্তন করে 'ও সখি' আলো দে, ও মেঘ জল দে' গানটিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

অরুণ রায়চৌধুরী প্রযোজিত এবং অজিত গাঙ্গুলী রচিত ও পরিচালিত 'রূপসী' কাহিনীর প্রাণোজ্জ্বলতায়, অভিনয়ের অসাধারণত্বে এবং সর্বোপরি সঙ্গীতের সুষমায় ভরপুর হয়ে অসামান্য জনপ্রিয়তা লাভ করবে।

স্টুডিও থেকে

গত ২৯ নভেম্বর ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিওর কলাকুশলীদের এক জনসভায় তাদের নূন্যতম দাবী-দাওয়া নিয়ে আলোচনা হয়। এ-বছরের জুলাই মাসে স্টুডিও কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যে-চুক্তি হয়, সে অনুযায়ী তাঁরা নাকি এপর্যন্ত কোনো পাওনাই পাননি। অবিলম্বে সেই চুক্তি কার্যকরী করার দাবী জানিয়ে একটি আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করেন সর্বশ্রী সৌমিত্র চ্যাটার্জি, শুভেন্দু চ্যাটার্জি, রবি ঘোষ, মৃণাল সেন, রাজেন তরফদার, ঋত্বিক ঘটক, অনুপকুমার, জয়া ভাদুড়ী, অপর্ণা সেন, মাধবী মুখার্জি প্রমুখ।

• • •

কৌতুকাভিনেতা রবি ঘোষ নাটক রচনায় হাত দিয়েছিলেন অনেক দিন আগেই। কৌতুকরসের নাট্যরচনায় তাঁর খ্যাতি 'চলাচল', 'ঠগ' ইত্যাদি একাধিক নাটকে পাওয়া গেছে। সম্প্রতি জানা গেল, তিনি ছবির জন্য গল্পও লিখেছেন। নাম 'গোড়ায় গলদ'। চিত্রনাট্য তৈরী করেছেন শেখর চট্টোপাধ্যায়। রবি মুভিজের পতাকাতলে এ-ছবিটি পরিচালনা করবেন অজিত ব্যানার্জি। কৌতুকরসাশ্রিত এই ছবিটির চরিত্র-চিত্রণে অংশ নেবেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, রবি ঘোষ, জ্ঞানেশ মুখার্জি, অলকা সরকার, অমিতা বিশ্বাস, নীতা চ্যাটার্জি, অরুণ দত্ত প্রমুখ। সঙ্গীত-পরিচালনা করবেন খোকন চৌধুরী ও মনু চৌধুরী।

মঞ্চাভিনয়

এল. জি. এন্টারপ্রাইজের 'মা' : বিস্ময় আর সম্ভ্রম জেগেছিল তখনই যখন শুনেছিলাম যাঁরা 'ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ', 'রাণী রাসমণি', 'বিল্বমঙ্গল' প্রভৃতি নাটক পরিবেশন করে নাট্যানুরাগী বাঙালী দর্শকদের ভক্তিবহুল চিত্তকে এক অপূর্ব উন্মাদনায় আপ্লুত করে রেখেছিল, তাঁরা ম্যাক্সিম গোর্কির 'মা'র তীক্ষ্ণ জীবনসচেতনতা ও দুর্বার জীবনসংগ্রামকে মঞ্চের আলোয় পরিস্ফুট করে তুলতে ব্রতী হয়েছেন। কিন্তু একটি কৌতূহলে ভরা সন্ধ্যায় এল. জি. এন্টারপ্রাইজের শিল্পীরা সাবলীলভাবে সেই সংশয়ের অবসান

শপথ নিলাম / শমিত ভঞ্জ

চৈতালী / বিশ্বজিৎ ও তনুজা

[illegible] / [illegible] চট্টোপাধ্যায়, অপর্ণা সেন

অপর্ণা/পরিচালনা : সলিল সেন। ছন্দ জা, কল্যাণ চট্টোপাধ্যায় এবং অরুণ চৌধুরী। —ফটো : অমৃত

অবাঞ্ছিত/পরিচালনা : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। মৌসুমী ও মৃণাল মুখোপাধ্যায়। —ফটো : অমৃত

শীরে প্রমাণ করেছেন যে, যে কোন গভীরতর চিন্তার নাটককে যথার্থ শিল্প-মূল্য দিতে তাঁরা কখনো কুণ্ঠাবোধ করেন না। তাঁদের এই আন্তরিকতাই 'মা'র মঞ্চ-রূপায়ণে সাফল্য ও প্রত্যাশা এনেছে। যে নির্যাতিত কর্মী মানুষদের জীবনসংগ্রাম ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কথা 'মা'র মধ্যে সোচ্চারে ধ্বনিত হয়েছে, তার অমরণন অদ্ভুতভাবে বেজেছে এম. জি. এনটারপ্রাইজের প্রযোজনায়। এর জন্য ধন্যবাদ ও অকুণ্ঠ প্রশংসা যাঁর প্রাপ্য, তিনি হোলেন মঞ্জিলা দেবী, যাঁর পরিচিতি নতুন করে কিছু দেবার নেই। এই বাস্তবনিষ্ঠ নাটকটির পরিবেশনায় যে সংযম ও স্বাভাবিকতাকে সব সময়ে তিনি সঞ্চারিত করতে চেষ্টা করেছেন, তাতে তাঁর দীর্ঘ-দিনের শিল্পীজীবনের অভিজ্ঞতা ও গভীরতরবোধই প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ম্যাক্সিম গোর্কির 'মা' এর আগে বহুবার প্রযোজিত হয়েছে, কিন্তু তবুও সেদিনকার প্রযোজনায় সামগ্রিক স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব ছিল না। 'মা'র ভূমিকায় অসাধারণ অভিনয় করেছেন মঞ্জিলা দেবী; স্নেহের অভিব্যক্তি আর দৃঢ়তার প্রকাশে তাঁর পারদর্শিতা সবারই মন কেড়েছে। মুকুল সরকারের 'পাভেল' হয়েছে স্বচ্ছন্দ ও সংবেদনশীল। 'আন্দ্রে' চরিত্রের স্বাভাবিকতাকে সুন্দর-ভাবে প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছেন সমর চট্টোপাধ্যায়। রামকৃষ্ণ ঠাকুরের চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হয়ে মিশে গিয়েছিলেন যে গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁর 'পুলিশ অফিসার'র চরিত্রচিত্রণ আমাদের রীতি-মতো বিস্মিত করেছে। এমন একটা রিয়েলিস্টিক স্টাইল তিনি চরিত্রটির মধ্যে আরোপ করেছিলেন, যার ছোঁয়া পেয়ে ভূমিকাটি অসাধারণ আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল। রুবী মিত্র 'মারিয়া' চরিত্রের দাবী মিটিয়েছেন, কিন্তু অমরেশ দাসের 'নিকোলাই ইভানোভিচ' প্রত্যাশিত ছবি তুলে ধরতে পারেননি। বুন্দু বড়ালের 'সাশাঙ্কা'ও সপ্রতিভ হয়ে উঠতে মাঝে মাঝে বাধা পেয়েছে। অন্যান্য চরিত্রে ছিলেন অমল বিশ্বাস, হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, নির্মল রায়, অধীর মিত্র, জয়ন্ত ভট্টাচার্য, নিতাই রায়, বিশ্বনাথ সোম, প্রভাস মুখোপাধ্যায়, রাজারাম চট্টোপাধ্যায়, শিশির মিত্র, কমল ঘোষ, কমল মিত্র, অনীতা বসু, সুধা বন্দ্যোপাধ্যায়, অমূল্য চক্রবর্তী, অনুপম মুখোপাধ্যায়, দেবু চক্রবর্তী, বটকৃষ্ণ বসু, প্রদীপ মুখোপাধ্যায়। মঞ্চসজ্জায় সূক্ষ্ম শিল্পচিন্তার আভাস আছে, কিন্তু সঙ্গীত ও আবহসঙ্গীত অভিনয়ের মতো প্রাণময় হয়ে উঠতে পারেনি।

অনির্বাণের 'এক টুকরো চাঁদ' : অনির্বাণ নাট্যগোষ্ঠী সম্প্রতি যাদবপুরের আদি বারোয়ারী সমিতির মঞ্চে শচীন ভট্টাচার্যের 'এক টুকরো চাঁদ' নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে পরিবেশন করেছেন। নাটকটির বিভিন্ন চরিত্রে স্বচ্ছন্দ ও

প্রতিবাদ/প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন অভিনেতা শম্ভু ভট্টাচার্য

ফিরোজ খাঁ ও হেলেন।   ফটো : অমৃত

স্বাভাবিক অভিনয় করেন দীপেশ ব্যানার্জি, গোবিন্দ গাঙ্গুলী, হিতেন চ্যাটার্জি, জয় দাশ, গৌর সোম, পরিতোষ চক্রবর্তী, শম্ভু দে, রথীন চক্রবর্তী, চপল ভট্টাচার্য।

দূরের নাটক :

বোম্বাইয়ের চেম্বুর দুর্গোৎসব কমিটির উদ্যোগে পার্থপ্রতিম চৌধুরীর ছায়া নায়িকা' নাটকটি সম্প্রতি সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ হোল। অভিনয়ে যাঁরা প্রশংসার দাবী রাখতে পারেন তাঁরা হোলেন উৎপল সেনগুপ্ত, বিকাশ মুখার্জি, শান্তি রায়, প্রণব দাস। আলোকসম্পাতে শিল্পবোধের পরিচয় রাখেন সুনীল চক্রবর্তী।

মধ্যপ্রদেশ চিরিমিরির কুরাশিয়া কোলিয়ারি ইনস্টিটিউটের শিল্পীরা কিছুদিন আগে তাঁদের নিজস্ব মঞ্চে 'তাপসী' নাটকের সফল এক মঞ্চরূপ পরিবেশন করেন। 'তাপসী' চরিত্রে মঞ্জু রায়ের অভিনয় ও নির্মল পাল (সুকুমার) ও নীহার মাইতি (গোপেনে)র চরিত্রচিত্রণ দর্শকদের মুগ্ধ করেছে। অন্যান্য ভূমিকাভিনেতারা প্রায় সবাই চরিত্রোপযোগী অভিনয় করেছেন।

নাগপুর সিভিল লাইনস গভর্নমেন্ট কলোনীর নির্বাচিত শিল্পীরা সম্প্রতি মন্টু গাঙ্গুলীর 'স্ববর্ণ' নাটকটি মঞ্চস্থ করেছেন। অভিনয়ে দক্ষতার স্বাক্ষর রাখেন অমল রায়চৌধুরী, পরিতোষ গোস্বামী, গীতা দাশগুপ্তা, নীলা গুহঠাকুরতা, রেবা রায়, মুকুল সরকার, দিলীপ মুখার্জি, মমতা ঘোষ।

কালিন্দী অভিনয় : নাট্যজগতে সাফল্যের ইতিহাসে অফিস ক্লাব একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। গত ১৫ নভেম্বর বিশ্বরূপা রঙ্গমঞ্চে তা আর একবার নতুন করে প্রমাণ করলো এস এফ স্পোর্টস ক্লাব (ইণ্ডিয়া)। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত 'কালিন্দী' নাটক মঞ্চস্থ করে। সুনিপুণ পরিচালনা এবং দলগত অভিনয় নাটকের গতি অক্ষুণ্ণ রাখে এবং পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহের দর্শকেরা উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। আঙ্গিকের কিছু কিছু ত্রুটি পরিলক্ষিত হলেও শিল্পের সার্বিক সযত্নে রক্ষা করার প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। কয়েকটি চরিত্রে অভিনয়-কুশলতা বিশেষ নৈপুণ্যে নিটোল। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্যভাবে নাম করা যায় ইন্দু রায় এবং রাজেশ্বরের ভূমিকায় যথাক্রমে রমেশ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মুরারী সেনের নাম। অচিন্ত্যরূপী নারায়ণ চক্রবর্তী বিশেষ কৃতিত্বের দাবী রাখে এবং সেই সঙ্গে বলা যায় নায়েব দিবেন মুখার্জির নাম। অহীনের ভূমিকায় রামরঞ্জন নাথ এবং মহীনের ভূমিকায় অলোক দে প্রশংসার দাবী রাখে এবং নারী-চরিত্রে সাবীর ভূমিকায় আশা বোসের নাম উল্লেখযোগ্য। এছাড়া বিভিন্ন চরিত্রে অংশগ্রহণ করেন অরুণ মজুমদার, নীহার মুখার্জি, দীপালী ঘোষ, ছবি মিত্র ও শাশ্বতী মুখার্জি ইত্যাদি। নাটকটি পরিচালনা করেন অরুণচন্দ্র মজুমদার।

রঙ্গনা
বিশ্বরূপার রাস্তায় সার্কুলার রোডের মোড়ে (৫৫-৬৮৪৯)
নান্দীকার
১৯শে শনিবার ৬টায়
২০শে রবিবার ২॥ ও ৬টায়
তিন পয়সার পালা
২৪শে ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার ৬টায়
নাট্যকারের সন্ধানে ছ-টি চরিত্র
২৫শে শুক্রবার ২॥ ও ৬টায়
শের আফগান
নির্দেশনা : অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

স্টারে
[শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত নাট্যশালা]
শর্মিলা
নাটকীয় সংঘাতে ও অভিনয়-মাধুর্যে অনুপম।
প্রতি বৃহস্পতি ও শনিবার : ৬টায়
প্রতি রবিবার ও ছুটির দিন : ২॥টা ও ৬টায়
॥ রচনা ও পরিচালনা ॥
দেবনারায়ণ গুপ্ত
॥ রূপায়ণে ॥
অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, অপর্ণা দেবী, নীলিমা দাস, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, সতীন্দ্র ভট্টাচার্য, দীপিকা দাস, শ্যাম লাহা, প্রেমাংশু বসু, বাসন্তী চট্টোপাধ্যায়, কালিদাস গাঙ্গুলী, গীতা দে ও বঙ্কিম ঘোষ।

এল এক স্পোর্টস ক্লাবের কাদম্বরী নাটকে রামরঞ্জন নাথ, দীপালি ঘোষ এবং তরুণ দে।

এক মিনিটের ছবি : দি স্টোরি অফ অ্যান আর্টিস্ট / নায়ক : নিতাই ঘোষ

বিবিধ সংবাদ

প্রমথেশ স্মৃতিসভা : প্রমথেশ বড়ুয়া মেমোরিয়াল কমিটির উদ্যোগে গত রবিবার ২৮ নভেম্বর চিত্রাচার্য প্রমথেশ বড়ুয়ার ১১তম মৃত্যুদিবস পালিত হয় উত্তরা প্রেক্ষাগৃহে। সভানেত্রী ও প্রধান অতিথি ছিলেন যথাক্রমে চন্দ্রাবতী দেবী ও যমুনা দেবী। উদ্বোধন সঙ্গীত পরিবেশন করেন রবীন মজুমদার। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন শ্রীকালীশ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেশ মুখোপাধ্যায়। সভাশেষে বড়ুয়ার 'শেষ উত্তর' চিত্রটি দেখানো হয়।

> **ভুল সংশোধন**
>
> ইন্ডিয়ান করেসপন্ডেন্স ইন্সটিটিউট-এর গত ২০।১১।৭০ প্রকাশিত বিজ্ঞাপনটির ঠিকানা ভুল ও নিম্নলিখিত ছাত্রটির নাম বাদ পড়ায় ভুল সংশোধন করা হল।
> ২২এফ, নন্দন ঘোষ লেন, কলি—৬
> [illegible] মিত্র, ক্লাস ই ১৫৭

বারাণসীতে সাংস্কৃতিক কার্যক্রম : বারাণসী কর্পোরেশন হলে আকাশবাণী এলাহাবাদের উদ্যোগে তিনদিন ধরে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হল। প্রথম দিন তিনটি হাস্য নাটিকা মঞ্চস্থ হয়। পারে পার্লাক আউর পালনা কেশব বর্মা, বিনোদ রাস্তোগী, শান্তি মেহরোত্রার রচনা। পুষ্পরাণী মর্জ নয়া ইলাজ মলিয়ারের হিন্দি অনুবাদ। মারাঠী লেখক বসন্ত কানেটকরের প্রেমকে রব নিকালা। নাট্যপরিচালক বিজয় বসুর কৃতিত্ব প্রশংসনীয়। পুরুষ চরিত্রে বিপিন টান্ডন, জীবনকৃষ্ণ ব্যানার্জি, নারী চরিত্রে আশা গুপ্তা, অঞ্জু ভট্টাচার্য, বনিতা শেঠ দর্শকদের মুগ্ধ করেন। দ্বিতীয় দিন হয় হাস্য কবি সম্মিলন। স্থানীয় আজ পত্রিকার সাহিত্য সম্পাদক শ্রীমোহনলাল গুপ্ত বা ভাইয়াজী বেনারসীর কাব্য উচ্চ প্রশংসা অর্জন করে। শ্রীকাশীনাথ উপাধ্যায়, শ্রীকান্তানাথ পাণ্ডেয় প্রভৃতি প্রখ্যাত হিন্দি কবি এই অনুষ্ঠানে অংশ নেন। তৃতীয় দিনের অনুষ্ঠানে অংশ নেন বেহালা বাদক শ্রীবিষ্ণুগোবিন্দ যোগ। রাগ বাগেশ্রী, আলাপ, জোড়, পাল্লা, ধ্রুপদ, পাহাড়ীতে ধুন বাজান। তার সুরবিস্তারিকা শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করে। পাটনা বেতার কেন্দ্রের পণ্ডিত সীতারাম তেওয়ারী ধামার, ধ্রুপদ পরিবেশন করেন।

তৃতীয় আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসব : এই সংগঠন কর্তৃক আয়োজিত "তৃতীয় আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসব" ১৬ থেকে ২২ ডিসেম্বর দক্ষিণ কোলকাতার রবীন্দ্র সরোবর প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত হবে।

শিশু রঙমহলের বিংশতিতম বার্ষিক উৎসব

শিশু রঙমহল (সি-এল-টি) তার সুন্দর জীবনের কুড়িটি বৎসর অতিক্রম করল। এই উপলক্ষে যথাযোগ্যভাবে ২০তম বার্ষিক উৎসব পালিত হবার ব্যবস্থা করেছেন সি-এল-টির কর্তৃপক্ষ। ১৮ই ডিসেম্বর থেকে এই উৎসবের শুরু।

জয়জয়ন্তী / চন্দ্রাবতী

খেলোয়াড়দের নামে টেস্ট খেলা

খেলার কথা

ক্ষেত্রনাথ রায়

গত ২রা ডিসেম্বর অস্ট্রেলিয়ার ব্রিসবেন মাঠে ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার ১৯৭০-৭১ সালের টেস্ট সিরিজের যে প্রথম টেস্ট খেলাটি শেষ হল তা উভয় দেশের ২০৪তম সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলা। এখানে উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে একমাত্র ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট খেলাই ২০০ সংখ্যার পূর্ণতা লাভ করেছে। তাছাড়া পৃথিবীর মাটিতে টেস্ট ক্রিকেট খেলার প্রবর্তক এই দুই দেশই। ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট ক্রিকেট খেলার উদ্বোধন অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ণ মাঠে, ১৮৭৭ সালের ১৫ই মার্চ। এই দুই দেশের টেস্ট ক্রিকেট খেলার যে সুমহান ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে তার তুলনা নেই। বিগত ৯৪ বছরে (১৮৭৭-১৯৭০) ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার ২০৪টি টেস্ট খেলার মধ্যে কয়েকটি খেলা কয়েকজন খেলোয়াড়ের ব্যক্তিগত অসামান্য ক্রীড়াচাতুর্যের স্বীকৃতিতে তাঁদের নামেই উৎসর্গীত হয়েছে। যেমন ১৯০২ সালে ওভালের ৫ম টেস্ট 'জেসপের খেলা', ১৯২১ সালে লর্ডসের ২য় টেস্ট 'উলীর খেলা', ১৯৩০ সালে লিডসের ৩য় টেস্ট 'ব্র্যাডম্যানের খেলা', ১৯৩৪ সালে লর্ডসের ২য় টেস্ট 'ভেরিটির খেলা', ১৯৩৮ সালে ওভালের ৪র্থ টেস্ট 'হাটনের খেলা' এবং ১৯৫৬ সালে ম্যাঞ্চেস্টারের ৪র্থ টেস্ট 'লেকারের খেলা'—এইভাবে খেলোয়াড়দের ব্যক্তিগত নামে খেলাগুলি অমরত্ব লাভ করেছে। টেস্ট সিরিজও খেলোয়াড়দের নামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে—১৯২৮-২৯ সালের ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট সিরিজ ওয়াল্টার হ্যামন্ড এবং ১৯৩০ সালের ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট সিরিজ ডন ব্র্যাডম্যানের নামে।

জেসপের খেলা

(ওভাল, আগস্ট ১১, ১২ ও ১৩; ১৯০২। ইংল্যান্ড ১ উইকেটে জয়ী)

ক্রিকেট খেলায় দলকে সময় সময় এমন অনেক সঙ্কটে পড়তে হয় যখন খেলায় শোচনীয় পরিণতির কথা ভেবে খেলোয়াড়রা আত্মরক্ষামূলক নীতি নিয়ে খেলতে বাধ্য হন। তখন একমাত্র উদ্দেশ্য, পরাজয়ের হাত থেকে কোন রকমে দলকে রক্ষা করা। টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে এ-রকমের নজির অজস্র আছে। কিন্তু দলের অতি চরম সংকটে ব্যাটসম্যান আক্রমণাত্মক ভূমিকায় নেমে ঝড়ের গতিতে রাণ তুলে শেষ পর্যন্ত নিজ দলকে জয়যুক্ত করেছেন এমন ঘটনা বিরল। এদিক থেকে ১৯০২ সালে ওভাল মাঠে আয়োজিত ইংল্যান্ডের ব্যাটসম্যান গিলবার্ট জেসপের সার্থক ভূমিকা সর্বকালের শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে। তাঁর এই অবদানের স্বীকৃতি হিসাবে ওভালের টেস্ট খেলার নামকরণ হয়েছে 'জেসপের খেলা'।

ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার ১৯০২ সালের টেস্ট সিরিজের প্রথম ও দ্বিতীয় টেস্ট খেলা ড্র যায়। এবং অস্ট্রেলিয়া তৃতীয় ও চতুর্থ টেস্ট খেলায় জয়ী হয়। ফলে অস্ট্রেলিয়া ২-০ খেলায় এগিয়ে ওভালের শেষ পঞ্চম টেস্ট ম্যাচ খেলতে নামে। ওভালের এই পঞ্চম টেস্ট খেলায় ইংল্যান্ড দল থেকে রঞ্জিৎসিংজী, আবেল এবং টেটকে বাদ দিয়ে তাঁদের শূন্য স্থানে জেসপ, হার্স্ট এবং হেওয়ার্ডকে নেওয়া হল। এই পরিবর্তনে যথেষ্ট সুফল পাওয়া গেল, অন্তত জেসপ এবং হার্স্টের ক্ষেত্রে। জেসপ দ্বিতীয় ইনিংসে ঐতিহাসিক ১০৪ রাণ করেন এবং হার্স্ট বোলিং ও ব্যাটিংয়ে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন—প্রথম ইনিংসে ৭৭ রাণে ৫টা উইকেট এবং দ্বিতীয় ইনিংসে নট আউট ৫৮ রাণ। প্রকৃতপক্ষে জেসপ এবং হার্স্ট—এই দুজন খেলোয়াড়ই ইংল্যান্ডের জয়লাভের স্তম্ভ ছিলেন।

অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসের ৩২৪ রাণের উত্তরে ইংল্যান্ড প্রথম ইনিংসের খেলায় ১৮৩ রাণ করে,—অস্ট্রেলিয়ার থেকে ১৪১ রাণ কম। অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় ইনিংসে ১২১ রাণ সংগ্রহ করে। ফলে খেলায় জয়লাভ করতে ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় ইনিংসে ২৬৩ রাণের প্রয়োজন ছিল। তৃতীয় দিনে সকাল দিকে ইংল্যান্ড দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা হাতে পায়। সেখানে খেলায় জয়লাভের জন্য ২৬৩ রাণের প্রয়োজন, সেখানে মাত্র ৪৮ রাণের মাথায় ৫ম উইকেট পড়ে যায়। ফলে অস্ট্রেলিয়ার জয়লাভের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ইংল্যান্ড দলের এই দারুণ সঙ্কটের সময় জ্যাকসনের সঙ্গে ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটিতে খেলতে নামেন জেসপ। খুব সতর্কতার সঙ্গে তাঁরা খেলতে থাকেন। কারণ রাত্রির বৃষ্টিতে পিচ ভিজে গিয়ে খেলোয়াড়দের কবরস্থানে পরিণত হয়। লাঞ্চের সময় জ্যাকসনের ৩৯ রাণ এবং জেসপের ২৯ রাণ দাঁড়াল। লাঞ্চের পরই জেসপ সংহার মূর্তিতে খেলতে লাগলেন। জ্যাকসন ৪৯ রাণ করে আউট হন। ৬৫ মিনিটের খেলায় ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটিতে ইংল্যান্ডের ১০৯ রাণ উঠেছিল। জেসপ আউট হন দলের ১৮৭ রাণের মাথায় ব্যক্তিগত ১০৪ রাণ সংগ্রহ করে। তিনি মাত্র ৭৫ মিনিটে ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এই ১০৪ রাণ তুলেছিলেন—বাউন্ডারী ১৭টা এবং ওভার-বাউন্ডারী একটা। জেসপের রাণ তোলার গতি উপলক্ষ করেই ইংরেজী ভাষায় 'জেসোপিয়ান' নামে যে নতুন শব্দটি যোজনা হল তার মর্মার্থ—যে কোন কাজ, যা প্রচণ্ড এবং গতিসম্পন্ন।

ডন ব্র্যাডম্যান (অস্ট্রেলিয়া)

ওয়াল্টার হ্যামন্ড (ইংল্যান্ড)

লেন হাটন (ইংল্যান্ড)

জিম লেকার (ইংল্যান্ড)

সেসপের কথা এখানে শেষ করে হার্স্টের প্রসঙ্গে আসা যাক। ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় ইনিংসের ২৭৮ রানের মাথায় ৯ম উইকেট পড়ে যায়। শেষ খেলোয়াড় রোডস খেলতে নেমে হার্স্টের ১০ম উইকেটের জুটি হলেন। দুই খেলোয়াড়ই ইয়র্কশায়ার কাউন্টি দলের। তখনও ইংল্যান্ডের জয়লাভের জন্যে আরও ১৫ রান দরকার। কিংবদন্তী আছে, তাঁরা শলাপরামর্শ করছিলেন এক রান এক রান করে জয়লাভের প্রয়োজনীয় বাকি ১৫ রান সংগ্রহ করবেন। শেষ পর্যন্ত তাঁরা তাই করেছিলেন অতি সতর্কতার সঙ্গে ৪৫ মিনিট খেলে। ইংল্যান্ড শেষ পর্যন্ত ১ উইকেটে জয়ী হয়ে অস্ট্রেলিয়ার মুখের গ্রাস কেড়ে নেয়। হাজার হাজার দর্শক আনন্দে আত্মহারা হয়ে মাঠের মধ্যে নেমে পড়েন।

উলীর খেলা

(লর্ডস, জুন ১১, ১৩ ও ১৪, ১৯২১। অস্ট্রেলিয়া ৮ উইকেটে জয়ী)

অস্ট্রেলিয়ার দুই ফাস্ট বোলার গ্রেগরী এবং ম্যাকডোনাল্ড ইংল্যান্ডের খেলোয়াড়দের কোণঠাসা করেছিলেন। ইংল্যান্ডের ১ম ইনিংস ১৮৭ রান এবং ২য় ইনিংস ২৮৩ রানের মাথায় শেষ হয়। খেলার এই প্রতিকূল অবস্থায় ইংল্যান্ডের ফ্রাঙ্ক উলী ১ম ইনিংসে ৯৫ রান এবং ২য় ইনিংসে ৯৩ রান করে অল্পের জন্য উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরী করার গৌরব থেকে বঞ্চিত হন।

ব্র্যাডম্যানের খেলা

(লিডস, জুলাই ১১, ১২, ১৪ ও ১৫, ১৯৩০। খেলা ড্র)

অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস ৫৬৬ রানের মাথায় শেষ হলে ইংল্যান্ড প্রথম ইনিংসে ৩৯১ রান সংগ্রহ করে। ফলে ইংল্যান্ড ১৭৫ রানের পিছনে পড়ে 'ফলো-অন' করে দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নামে। ইংল্যান্ডের ২য় ইনিংসের ৯৫ রানের (২ উইকেটে) মাথায় খেলাটি শেষ হয়।

অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসের ৫৬৬ রানের মধ্যে ডন ব্র্যাডম্যান একাই ৩৩৪ রান করেছিলেন ৩৭৫ মিনিটের খেলায়। তাঁর এই ৩৩৪ রানে ছিল ৪৬টা বাউন্ডারী, ৬টা ওভার-বাউন্ডারী, ২ রান করে ২৬ বার এবং সিঙ্গলস ৮০টা। ব্র্যাডম্যান এই ৩৩৪ রান করার সূত্রে ১৯৩০ সালে কিংস্টন মাঠে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের বিপক্ষে ইংল্যান্ডের স্যান্ডহাম এক ইনিংসের খেলায় সর্বাধিক ব্যক্তিগত রানের যে বিশ্ব রেকর্ড (৩২৫ রান) করেছিলেন তা ভেঙে দেন।

ভেরিটির খেলা

(লর্ডস, জুন ২২, ২৩ ও ২৫, ১৯৩৪। ইংল্যান্ড এক ইনিংসে ও ৩৮ রানে জয়ী)

ইংল্যান্ডের এই জয়লাভের মূলে ছিলেন ভেরিটি। তিনি অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসে ৬১ রানে ৭টা এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ৪৩ রানে ৮টা উইকেট পান। এই খেলায় ভেরিটির বোলিং উল্লেখ করার মত। ২৫শে জুন তারিখে এক দিনের খেলাতেই তিনি ৮৩ রানে ১৪টা উইকেট পান এবং উভয় ইনিংসে মোট ১৫টা উইকেট নিয়ে ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট খেলায় রোডস যে ১৫ উইকেট পাওয়ার রেকর্ড করেছিলেন তা স্পর্শ করেন।

হাটনের খেলা

(ওভাল, আগস্ট ২০, ২২, ২৩ ও ২৪ ১৯৩৮। ইংল্যান্ড এক ইনিংসে ও ৫৭৯ রানে জয়ী)

টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে ইংল্যান্ড ছাড়া আর কোন দেশ এই রকম বিরাট ব্যবধানে (এক ইনিংসে ও ৫৭৯ রানে) জয়লাভ করতে সক্ষম হয়নি। ইংল্যান্ডের এই বিরাট জয়লাভের পথে প্রধান ভূমিকা নিয়েছিলেন লেন হাটন। ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসের ৯০৩ রানের মধ্যে (৭ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড) লেন হাটন একাই যে ৩৬৪ রান করেন তা ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত এক ইনিংসের খেলায় সর্বাধিক ব্যক্তিগত রানের বিশ্ব রেকর্ড ছিল।

লেন হাটন দীর্ঘ ১৩ ঘণ্টা ২০ মিনিট ব্যাট করে তাঁর এই ৩৬৪ রান সংগ্রহ করেন—বাউন্ডারী করেন ৩৫টা। তাছাড়া ১৫ বার তিন রান, ১৮ বার দু' রান এবং ১৩৪ বার এক রান করে সংগ্রহ করেন। এখানে উল্লেখ্য, হাটনের আগে অপর কোন পেশাদার খেলোয়াড় এক ইনিংসের খেলায় এত বেশী রান করেননি এবং ইংলিশ ক্রিকেট খেলোয়াড়দের মধ্যে যাঁরা তাঁর আগে এক ইনিংসে ৩০০ রান করেন তাঁদের মধ্যে হাটন সর্বকনিষ্ঠ।

লেকারের খেলা

১৯৫৬ সালে ম্যাঞ্চেস্টারের চতুর্থ টেস্ট খেলায় ইংল্যান্ডের জিম লেকার বোলিংয়ে যে দু'টি বিশ্ব রেকর্ড করেন তা আজও অক্ষুন্ন আছে; এমনকি তাঁর এই দুই বিশ্ব রেকর্ড কেউ স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারেন নি—এক ইনিংসে সর্বাধিক উইকেট (১০টি উইকেট ৫৩ রানে) এবং একটি খেলায় সর্বাধিক উইকেট (১৯টি উইকেট—৩৭ রানে ৯ উইকেট ও ৫৩ রানে ১০ উইকেট)। এছাড়া ১৯৫৬ সালের টেস্ট সিরিজে তাঁর মোট ৪৬টি উইকেট (৪৪২ রানে এবং গড় ৯·৬০)—ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার একটি টেস্ট সিরিজে সর্বাধিক উইকেট পাওয়ার রেকর্ড হিসাবে আজও গণ্য।

ব্র্যাডম্যানের সিরিজ

ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ১৯৩০ সালের টেস্ট সিরিজে অস্ট্রেলিয়ার ডন ব্র্যাডম্যান (পরবর্তীকালে 'স্যার') মোট ৯৭৪ রান সংগ্রহের সূত্রে একটি টেস্ট সিরিজে সর্বাধিক মোট রান করার যে বিশ্ব রেকর্ড করেন তা আজও বিশ্ব রেকর্ড হিসাবে গণ্য। শেষ পর্যন্ত তাঁর ব্যাটিং পরিসংখ্যান দাঁড়ায়: খেলা ৫, ইনিংস ৭, নট আউট ০, মোট রান ৯৭৪, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ৩৩৪, সেঞ্চুরী ৪ এবং গড় ১৩৯·১৪।

হ্যামণ্ডের সিরিজ

অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ১৯২৮-২৯ সালের টেস্ট সিরিজে ইংল্যান্ডের ওয়ালটার হ্যামণ্ড মোট ৯০৫ রান সংগ্রহ করে একটি টেস্ট সিরিজে সর্বাধিক মোট রান সংগ্রহের যে বিশ্ব রেকর্ড করেন তা পরবর্তীকালে (১৯৩০ সালে) ডন ব্র্যাডম্যান ভেঙে দিলেও আজ পর্যন্ত ডন ব্র্যাডম্যান এবং ওয়ালটার হ্যামণ্ড ছাড়া আর কেউ টেস্টের একটি সিরিজে মোট ৯০০ রান তুলতে পারেন নি। ১৯২৮-২৯ সালের টেস্ট সিরিজে হ্যামণ্ডের ব্যাটিং পরিসংখ্যান ছিল: খেলা ৫, ইনিংস ৯, নট আউট ১, মোট রান ৯০৫, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ২৫১, সেঞ্চুরী ৪ এবং গড় ১১৩·১২।

যোগীন্দর সিং (বাঁ দিকে) এবং পারভিন কুমার : ব্যাঙ্ককের ৬ষ্ঠ এশিয়ান গেমসে যোগীন্দর সিং সটপাটে নতুন এশিয়ান গেমস রেকর্ড করেছে (১৭·০২ মিটার) এবং পারভিন কুমার ডিসকাসে নতুন এশিয়ান গেমস রেকর্ড করে (৫২·৩২ মিটার) স্বর্ণপদক জয়ী হয়েছেন।

খেলাধুলা

দর্শক

স্কুল টেস্ট ক্রিকেট

ভারতীয় স্কুল : ২৫০ রান (রমেশ বোরদে ৬৭ এবং সুভাষ ফাদকার ৩৯ রান। হচার ৫২ রানে ০, বার্কলে ১৭ রানে ২ এবং রো ৩১ রানে ২ উইকেট)

● ১৬৫ রান (মুকুল দাস ৩৮ রান। বুথ ৩৮ রানে ৩ এবং বার্কলে ১০ রানে ৩ উইকেট)

ইংলিশ স্কুল : ২৪৭ রান (জিওফ মিলার ৩৮ এবং রো ৩৭ রান। প্রবীন ওবেরয় ৫৮ রানে ৪ এবং রমেশ বোরদে ৪২ রানে ৩ উইকেট)

● ১১৬ রান (৬ উইকেটে। জে এল কুপার ৫০ রান। ইকবাল ৯ রানে ২ উই:কট)

দিল্লীর ফিরোজ শাহ কোটলা মাঠে আয়োজিত ভারতীয় স্কুল বনাম ইংলিশ স্কুল দলের প্রথম টেস্ট ক্রিকেট খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে।

প্রথম দিনে ভারতীয় স্কুল দলের প্রথম ইনিংস ২৫০ রানের মাথায় শেষ হলে খেলার বাকি ২০ মিনিট সময়ে ইংলিশ স্কুল দলের প্রথম ইনিংসের এক উইকেটে ১০ রান উঠেছিল। ভারতীয় স্কুল দলের প্রথম ইনিংসের খেলায় রমেশ বোরদে উভয় দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত ৬৭ রান করেছিলেন। ফাদকার এবং মুকুল দাস (২৫ রান) ৩য় উইকেটের জুটিতে দলের ৬৬ রান তুলেছিলেন।

দ্বিতীয় দিনে ইংলিশ স্কুল দলের প্রথম ইনিংস ২৪৭ রানের মাথায় শেষ হলে ভারতীয় স্কুল দল মাত্র ৩ রানের ব্যবধানে এগিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসের দুটো উইকেট খুইয়ে ৪৪ রান সংগ্রহ করে। তাদের মাত্র ৯ রানের মাথায় ১ম এবং ১২ রানের মাথায় ২য় উইকেট পড়ে যায়। রমেশ বোরদে ইংলিশ স্কুল দলের প্রথম ইনিংসের খেলায় ৪২ রানে ৩টে উইকেট নিয়ে ব্যাটিং ও বোলিংয়ে সমান কৃতিত্বের পরিচয় দেন।

তৃতীয় দিনে ভারতীয় স্কুল দলের দ্বিতীয় ইনিংস ১৬৫ রানের মাথায় শেষ হলে খেলার বাকি ১০০ মিনিটে জয়-লাভের প্রয়োজনীয় ১৭২ রান সংগ্রহ করতে ইংলিশ স্কুল দল ২য় ইনিংসে খেলতে নামে। যেখানে তাদের দুটো উইকেট পড়ে ১৪ রান উঠেছিল সেখানে ১৪ রানেই মাথায় ৫ম উইকেট পড়ে গেল। দলের এই সংকটে তারা জয়লাভের আশা ছেড়ে দিয়ে আত্মরক্ষা নীতি গ্রহণ করে। ইংলিশ স্কুল দলের ২য় ইনিংসের ১১৬ রানের (৬ উইকেটে) মাথায় খেলাটি শেষ হয়।

এশিয়ান গেমস

গত ৯ই ডিসেম্বর ব্যাঙ্ককে ৬ষ্ঠ এশিয়ান গেমসের উদ্বোধন উৎসব মহা-সমারোহে উদযাপিত হয়েছে। খেলা আরম্ভ হয়েছে ১০ই তারিখে। গত চার দিনের (১০—১৩ ডিসেম্বর) খেলায় জাপান সর্বাধিক স্বর্ণ এবং রৌপ্যপদক জয়ের সূত্রে পদক জয়ের তালিকায় শীর্ষ-স্থান অধিকার করেছে, জাপান ৩৩টি স্বর্ণ, ২৪টি রৌপ্য এবং ৫টি ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছে। তালিকায় দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান অধিকারী ইরাণ এবং ভারতবর্ষের থেকে জাপান বিরাট ব্যবধানে এগিয়ে আছে। ভারতবর্ষের পদক জয় মোট ১৩টি—স্বর্ণ ৪, রৌপ্য ৩ এবং ব্রোঞ্জ ৮। এখনও অনেক খেলা বাকি। বিশেষজ্ঞ মহলের দৃঢ় ধারণা, জাপান অন্যান্য দেশকে বিরাট

এশিয়ান গেমসের 'স্প্রিন্ট কুইন্স' তাইওয়ানের কুমারী চি চেং। ইনি ইতিমধ্যে ১০০ মিটার দৌড় ১১·৬ সেকেন্ড সময়ে (এশিয়ান রেকর্ডের সমান) শেষ করে স্বর্ণপদক পেয়েছেন।

ব্যবধানে পিছনে রেখে পদক জয়ের তালিকায় শীর্ষস্থান পাবে।

ভারতবর্ষের পদক জয়

(১৩ই ডিসেম্বর পর্যন্ত)

স্বর্ণপদক

শটপাট : যোগিন্দর সিং স্বপ্রতিষ্ঠিত এশিয়ান গেমসের রেকর্ড (১৬·২২ মিটার) ভেঙে উপর্যুপরি দুবার (১৯৬৬ ও ১৯৭০) স্বর্ণপদক জয়ের গৌরব লাভ করেছেন। তাঁর বর্তমান এশিয়ান রেকর্ড ১৭·১ মিটার।

ডিসকাস : প্রভীন কুমার—দূরত্ব ৫২·৩২ মিটার (নতুন এশিয়ান গেমস রেকর্ড)।

৪০০ মিটার : কুমারী কমলজিৎ সান্ধু

১০০ কেজি মল্লযুদ্ধ : চাঁদগিরাম

রৌপ্যপদক

৮০০ মিটার দৌড় : শ্রীরাম সিং

৫০০০ মিটার দৌড় : এডওয়ার্ড সিকুইরা

৯০ কেজি : হিং সিং

ব্রোঞ্জ পদক

৩০০ মিটার দৌড় : সুচা সিং

লং জাম্প : লাভ সিং

৩০০০ স্টিপলচেজ : গুরমজ সিং

হাইজাম্প : ভীম সিং

৪×১০০ রীলে : ভারতবর্ষ

৬৮ কেজি : ওমপ্রকাশ

৭৪ কেজি : মুক্তিয়ার সিং

৮২ কেজি : নেত্র পাল

সুব্রত কাপ

দিল্লীর করপোরেশন স্টেডিয়মে সর্ব-ভারতীয় স্কুল ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে গত বছরের যুগ্ম-বিজয়ী গোর্খা বয়েজ কোম্পানী (দেরাদুন) ২—১ গোলে দেরাদুনেরই গোর্খা মিলিটারী স্কুল দলকে পরাজিত করে সুব্রত কাপ জয়ী হয়েছে। সেমি-ফাইনালে গোর্খা বয়েজ কোম্পানী ৮—০ গোলে বাঙ্গালোর মিলিটারী স্কুলকে এবং দেরাদুনের গোর্খা মিলিটারী স্কুল ১—০ গোলে গত বছরের যুগ্ম-বিজয়ী কার নিকোবর গভর্ণমেন্ট সেকেন্ডারী স্কুল দলকে পরাজিত করে ফাইনালে উঠেছিল।

রঞ্জি ট্রফি

নওগাঁয়ে রঞ্জি ট্রফির পূর্বাঞ্চলের লীগ খেলায় বাংলা এক ইনিংস ও ৮ রানে আসামকে পরাজিত করেছে। তিনদিনের বরাদ্দ খেলা দ্বিতীয় দিনেই শেষ হয়।

আসাম টসে জয়ী হয়ে প্রথম ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয়। প্রথম দিনেই আসামের প্রথম ইনিংস ১০৭ রানের মাথায় শেষ হয়। লাঞ্চ থেকে তারা মাত্র আধঘণ্টা খেলেছিল। বাংলার লেফট আর্ম স্পিনার দিলীপ দোশী একাই মাত্র ২৯ রানে ৭টা উইকেট পেয়েছিলেন। প্রথম দিনের বাকি সময়ের খেলায় বাংলা প্রথম ইনিংসের তিনটে উইকেট খুইয়ে ১৫৩ রান সংগ্রহ করেছিল। প্রকাশ পোদ্দার ৯২ রান করে আউট হন; তাঁর এই ৯২ রানই উভয় দলের পক্ষে সর্বোচ্চ রান।

দ্বিতীয় দিনে ২৩৬ রানের মাথায় বাংলার প্রথম ইনিংস শেষ হলে আসাম ১২৯ রানের পিছনে পড়ে দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নামে এবং ১২১ রানের মাথায় তাদের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয়।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

আসাম : ১০৭ রান (বিমল ডাবালী ৫১। দিলীপ দোশী ২৯ রানে ৭ উইকেট)। ও ১২১ রান (মেধী ২৯। দোশী ৩০ রানে ৪ এবং গোপাল বসু ৫৪ রানে ৪ উইকেট)।

বাংলা : ২৩৬ রান (প্রকাশ পোদ্দার ৯২ এবং দেবু মিত্র ৪২ রান। ঘটক ৪২ রানে ৫ এবং চৌধুরী ১৬ রানে ৪ উইকেট।)

আন্তঃ কলেজ অ্যাথলেটিক্স

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত আন্তঃ কলেজ স্পোর্টসে বিদ্যাসাগর কলেজ ছাত্র ও ছাত্রীদের দলগত এবং ব্যক্তিগত খেতাব জয়ের সূত্রে বিরাট সাফল্যের পরিচয় দিয়েছে।

দলগত খেতাব

ছাত্র বিভাগ : বিদ্যাসাগর কলেজ (সান্ধ্য) —৪৫ পঃ

ছাত্রী বিভাগ : বিদ্যাসাগর কলেজ (সকাল) —৪৮ পঃ

ব্যক্তিগত খেতাব

ছাত্র বিভাগ : তাপস পাল (বিদ্যাসাগর—রাত্রি)—১৮ পঃ

ছাত্রী বিভাগ : কুমারী শ্রীরূপা চ্যাটার্জি (বিদ্যাসাগর—সকাল)—১৫ পঃ

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

শ্রেষ্ঠ লেখক ॥ শ্রেষ্ঠ রচনা

আবদুল জব্বারের
অনন্যসাধারণ রচনা
বাংলার চালচিত্র ১০
ভূমিকা লিখেছেন—ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

ডঃ ভবতারণ দত্তের
ছড়ার বিপুল সংকলন
বাংলাদেশের ছড়া ১০
ভূমিকা লিখেছেন—ডঃ সুকুমার সেন

কমলা মিশ্রের ভ্রমণ কাহিনী
কাশ্মীর থেকে কুমারিকা ৭
ভূমিকা লিখেছেন—প্রমথনাথ বিশী

নীহাররঞ্জন গুপ্তের
সেই মরুপ্রান্তে ১১

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের
স্বয়ংবৃতা ৬
বিদেশিনী ৪

সাহানা দেবীর
স্নেহধন্য অমর স্মৃতি-কাহিনী
মৃত্যুহীন প্রাণ ৪॥

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের
ভাগবতীতনু ১০ গোপনপত্র ৪

জরাসন্ধকুমারের
অভিনেত্রী খুন ৪ নায়িকার প্রতিহিংসা ৪

প্রবোধকুমার চট্টোপাধ্যায়ের
যমুনোত্তরী হতে গঙ্গোত্রী ও গোমুখ ৫
জরাসন্ধকুমারের সাধুসঙ্গ (১ম) ৮, (২য়) ৮

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের
নতুন তোরণ ৫
কলধ্বনি ৪॥

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের
মগ্ন মৈনাক ৫

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের
নগরপারে রূপনগর ১৮
কাল, তুমি আলেয়া ১২॥

শঙ্কু মহারাজের
গঙ্গাসাগর ৮ সাতপাকে বাঁধা ৫ শিলাপটে লেখা ৮

বিমল মিত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যকৃতি
যুগান্তকারী উপন্যাস
কড়ি দিয়ে কিনলাম
প্রথম খণ্ড—২০
দ্বিতীয় খণ্ড—১৪
প্রথম খণ্ডের নূতন একাদশ মুদ্রণ প্রকাশিত প্রায়

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের
মণিমহেশ ৬॥

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের
মক্ষিরাণী ৫॥

বাংলার আউল কবি
কুমুদরঞ্জন মল্লিকের
কুমুদ কাব্যসম্ভার ১০

বিভূতি রচনাবলীর চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ড ছাপা চলিতেছে

মিত্র ও ঘোষ : ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২ ॥ ফোন : ৩৪-৩৪৯২, ৩৪-৮৭৯১

আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় পিতা মহিজামের স্বনামধন্য ডাঃ পরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মহান আদর্শে এবং আদেশে অনুপ্রাণিত হইয়া আমরা কলিকাতায় যে প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছি—সেখানে তাঁহার মহাগুণসম্পন্ন সকল ঔষধ সেই প্রদর্শিত পদ্ধতি অবলম্বনে তৈয়ারী করিতেছি। পিতার স্নেহাশির্ব্বাদ আমাদের পাথেয়।

তাঁহার বিখ্যাত চিকিৎসাধারায় লিখিত

পারিবারিক চিকিৎসার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে সহজ বই

ডাঃ প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত

আধুনিক চিকিৎসা

আধুনিক চিকিৎসা (প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায়)

বাংলায় এমন সহজ বোধ্য হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার বই আর হয় নি।

পি, ব্যানার্জী

হেড অফিস

১১৪এ, আশুতোষ মুখার্জি রোড, কলিকাতা-২৫	৫৩, গ্রে স্ট্রিট কলিকাতা-৬	৩৬বি শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-২৫

বিক্রয় কেন্দ্র	বিক্রয় কেন্দ্র	হেড অফিস
১১৪এ, আশুতোষ মুখার্জি রোড	৫৩, গ্রে স্ট্রীট	৩৬বি, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড
ফোন : ৪৭-২০১৮, ৫৭-৭১২৯	ফোন : ৫৫-৪২২৯	ফোন : ৪৭-৩০৮১

ঔষধাবলীর বিবরণী "মাইক্রো থেরাপি" বিনামূল্যে পাঠান হয়

১০ম বর্ষ
৩য় খণ্ড

অমৃত

৩৩শ সংখ্যা
মূল্য
৫০ পয়সা

Friday, 25th December, 1970 শুক্রবার, ৯ই পৌষ, ১৩৭৭ Rs. 1.00

বড়দিন উৎসবে
গ্রেট ইষ্টার্ণ
হোটেলের
এক্সমাস
স্পেশাল
কেক্
•
প্লামকেক্
•
ফ্রুটকেক্
প্যাটীস, পেসট্রীস
ক্রীমরোল
সবাকার চিত্তবিনোদনে
অপরিহার্য্য
ওয়াটারলু সেলস্ কাউন্টার
ও
হগ মার্কেট
* * *
টেলিফোনে যোগাযোগ করুন ২৩-২০০১
(বেকারি বিভাগ)
কলিকাতা-১
ভীড় বাঁচাতে হলে তাড়াতাড়ি আসুন

ক্রীড়া ও বিনোদন সংখ্যা, ১৩৭৭

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
৫৬৯	সম্পাদকীয়		
৫৭০	রত্ন	(গল্প)	—শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়
৫৭৫	সাঁকো	(গল্প)	—শ্রীহংসনারায়ণ ভট্টাচার্য
৫৭৯	জোয়ারবালি	(গল্প)	—শ্রীছাঁদ বসু
৫৮২	রুপোলী মাছ	(গল্প)	—শ্রীঅতীন বন্দ্যোপাধ্যায়
৫৮৬	কে ডাকে	(গল্প)	—সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ
৫৯১	ফাঁদ	(গল্প)	—শ্রীচণ্ডী মণ্ডল
৫৯৫	শিশিরকুমার ভাদুড়ী		—শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
৬০০	নানা রঙের দিনগুলি		—শ্রীকানন দেবী

চারণকবি নজরুলের বর্ণবহুল জীবনের পূর্ণাঙ্গ জীবনালেখ্য
আবদুল আজীজ আল্-আমানের
নজরুল
পরিক্রমা
পনের টাকা

অন্যান্য গ্রন্থ : মুস্তাফা সিরাজের উপন্যাস হিজলকন্যা—৩·৫০ ॥ পিঞ্জর সোহাগিনী —২·৫০ ॥ প্রেমের প্রথম পাঠ—৩, ॥ শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের আমার বন্ধু নজরুল—৮, ॥ হাসান ইমামের উপন্যাস পুতুল নাচ—৮, ॥ সরাইখানার যাত্রী—১০, ॥ দিলীপকুমার ভট্টাচার্যের জীবন-শিল্পী সত্যজিৎ রায়—৯, ॥ আবদুল আজীজ আল্-আমান সম্পাদিত নজরুল রচনা-সম্ভার (১ম, ২য়, ৩য় খণ্ড) প্রতি খণ্ড ১৫, ।

হরফ প্রকাশনী ॥ এ-১২৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট ॥ কলকাতা-১২

দীপক চৌধুরীর
কুমারী কন্যা ৮·০০ ॥ মন্বন্তর ৫·০০
নীহাররঞ্জন গুপ্তের
যাযাবরী ৬·০০ ॥ রাতের পাখি ৫·৫০
সুধীররঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের
লন্ডন প্যারিস ৫·০০ ॥ নীলকণ্ঠী ৫·০০
রূপদ চৌধুরীর
প্রত্যাবর্তনী ৫·০০ ॥ অন্বেষণ ৫·০০
আশাপূর্ণা দেবীর
দুই নায়িকা ৫·০০ ॥ নীলাঞ্জনা ৩·০০
জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর
সুনন্দার প্রেম ২·৫০ ॥ মনের আনন্দ ৫৲
হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের
সতী অসতী ৫·০০ ॥ সুরের পরশ ৩·০০
চিরঞ্জীব সেনের
চন্দনের আতঙ্ক ৫৲ ॥ রহস্য কুহেলী ৫৲
শ্রীহর্ষের
মজা মুশকিল ৭·০০ ॥ ফিমেল ওয়ার্ড ৭·০০
বেদুইনের
অনুবোষ্টমীর ঝাকড়া ৬·০০ ॥
রূপ রস রঙ ৭·০০
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের
আমার সাহিত্য জীবন ৬·০০ ॥
শিবানীর অদৃষ্ট ৩·০০ ॥ বিচিত্র ২·৫০
পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের
নিঃসঙ্গ পদাতিক ৮৲ ॥ দূরের আকাশ ৩৲
শৈলেশ দের
তিন অধ্যায় ৩·০০ ॥ তন্দ্রা এলো ২·০০
শিবরাম চক্রবর্তীর
দুষ্টু প্রজাপতি ২·০০ ॥ প্রজাপতয়ে ২·৫০
শ্রীপান্থের সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের
আজব নগরী ৫·০০ অলোকলতা ৮·০০
শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
আন্তর্জাতিক আন্দামান ৪·০০ ॥
কাঞ্চনকাঞ্চন ৪·০০
সুবোধ ঘোষের
গল্প মঞ্জরী ১৪৲ ॥ কৃষ্ণগোলাপ ৬৲
স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
রূপসী ৪·০০ ॥ মুখোশ ৩·০০
রবীন্দ্রনাথ দাসের
নয় শ্রীমতী ৪·০০ ॥ মিতালী মধুর ২·০০
সরোজকুমার রায়চৌধুরীর
নাগরী ৪·০০ ॥ কালোঘোড়া ৪·০০
পূর্বপাড়ার মেয়ে ৩·৫০
বনফুলের
ভুবনদর্শন ৪·০০ ॥ সীমারেখা ২·৫০
গজেন্দ্রকুমার মিত্রের
তব দক্ষিণ পাণি ২·৫০
নরেন্দ্রনাথ মিত্রের পরিতোষ মজুমদারের
চন্দ্রমল্লিকা ২·৫০ আলোর সন্ধান ৪·০০
ফণিভূষণ আচার্যের
শকুন্তলা ১২৲ ॥ পলাশ বনের গোধূলি ৫৲
অমরেশ বসুর জরাসন্ধের
উত্তরণ ৬৲ সন্তর্পণ ৪৲
নারায়ণ সান্যালের
অজের স্বপ্ন ৮৲ পাষণ্ড পণ্ডিত ৬৲

কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের

অনেক রক্ত মাড়িয়ে

সভ্যতার আলোয় আজ পৃথিবী ঝলমল করলেও স্বীকার করতেই হবে, জন্য বেশ আর মধুর ব্যবহারের আড়ালে এখনও আমাদের মনের মধ্যে আদিম প্রবৃত্তিগুলি ধক ধক করে জ্বলছে...... তাই এত হত্যা, প্রতিহিংসাপরতা আর ব্যভিচার।

স্বসককে আপনারা চেনেন। গুটিকয়েক পাশব-মনোভাবাপন্নকে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি-সম্পন্ন এই মানুষটি কিভাবে পর্যুদস্ত করেছিল, তারই শিহরণ-সংকুল বিস্তার এই আখ্যায়িকায় বর্ণিত। গোয়েন্দা-সাহিত্যের প্রখ্যাত কাহিনীকার কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের আরো একটি উল্লেখযোগ্য অবদান। মূল্য : ৯·০০

এই লেখকের অন্যান্য বই

ভোর হল বিভাবরী ৮·০০ ॥ গোধূলির কুমকুম ৮·০০
লাশ কাটা টেবিল ৬·০০ ॥ রাই শোন আজ ৬·০০
নেপোলিয়নের শেষ বিচার ৪·০০ ॥ অপনে রণাঙ্গনে ৩·০০

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের

নীলাঙ্গুরীয় ১০৲

অবগুণ্ঠন ৫·০০ ॥ অষ্টক ২·৫০ ॥ তাল বেতাল ৪·০০ ॥
নাটক নয় নভেল নয় ২·৫০ ॥ আধুনিক ৬·০০
কুশী প্রাঙ্গণের চিঠি ৫·০০

সাহিত্য একাডেমির পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখক
মণীন্দ্র রায়ের

হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ ৬৲

অমরেন্দ্র দাসের অনন্য উপন্যাস

অন্য তরঙ্গ

অমরেন্দ্র দাস বাংলা সাহিত্যে একজন সুপ্রতিষ্ঠিত লেখক। তাঁর উপন্যাসের আশায় সাহিত্য-রসিকগণ সাগ্রহ প্রতীক্ষায় থাকেন। এবারেও তিনি এমন একটি বিষয় নিয়ে লিখেছেন, যা বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ নতুন। পড়তে পড়তে মনে হয়, এ যুগে এও সম্ভব? সমাজ-বিপ্লব যে রাজনীতির চেয়েও কত ভয়ংকর এ উপন্যাসই তার প্রমাণ। দাম : আট টাকা

শক্তিপদ রাজগুরুর

মুক্তিস্নান ৬৲

যদি জানতেম ১০·০০ ॥ জনম অবধি ১০·০০ ॥ রূপবদল ৫·০০
জলসা ২·০০ ॥ অনেক বসন্ত একটি ভ্রমর ২·৫০

প্রফুল্ল রায়ের

সুধা পারাবার ৬৲

সোনালী রেখা ৪·০০ ॥ সন্ধ্যাকাল ৪·০০ ॥ ইন্দ্রধনুর রঙ ৫·৫০

রবীন্দ্র লাইব্রেরী

১৫/২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ : ফোন ৩৪-৮৩৫৬

সেরা বাংলা উপন্যাস

পিটার রঙ্গনাথম

সাদা শিকারী কালো শিকার

দাম নয় টাকা

নীলিমেশ রায়চৌধুরী

জঙ্গলেরিমের নেপথ্যে

দাম—চার টাকা

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

ফুটবল খেলার আইনকানুন ৪·০০
ক্রিকেট খেলার আইনকানুন ৪·০০
খেলার রাজা ফুটবল ৫·০০

চিরঞ্জীব

ভারতীয় ফুটবল ৩·০০
র‍্যাবোর্ন থেকেই ইডেনে ২·০০
ভারত কন্যা কেরালা ৬·০০

সুদীন চট্টোপাধ্যায়

ভারত কন্যা কেরলা ৬·০০

কৃষাণু বন্দ্যোপাধ্যায়

বরণীয় মানুষের স্মরণীয় প্রেম ১০·০০

নীললোহিত

দেখা না দেখা ৬·০০

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

সুরা নারী নগরী ৭·০০

নিগূঢ়ানন্দ

বাবু আর বিবি ১০·৫০
বক্সলদারওয়াজার নগরী ১২·০০

সুশান্তকুমার সেন

মহাকালের স্বাক্ষর ৮·০০

রমাপতি বসু

ভালবাসার রীতিনীতি ৬·০০
উর্বশীর নরক ৬·০০

তান্ত্রিকাচার্য ভৈরবানন্দ

মিলনতীর্থ সীতাকুণ্ড ১·০০

ভবেশ দেও

ভারতের সাধিকা ৬·০০

ফণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

অশান্ত মধুকর ৭·০০

জ্ঞানতীর্থ
১, বিধান সরণী, কলিকাতা-১২

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
৬০৭	চটি	(বড় গল্প)	—শ্রীসন্দীপন চট্টোপাধ্যায়
৬১৫—১৯	কবিতা		—সর্বশ্রী মণীন্দ্র রায়, কৃষ্ণ ধর, রাম বসু, তরুণ সান্যাল, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, রত্নেশ্বর হাজরা, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, শ্যামসুন্দর দে, সত্যানন্দ ভট্টাচার্য, গণেশ বসু, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, আশিস সান্যাল, সুমিত্র চক্রবর্তী, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, অনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায়।
৬২১	আন্ডারগ্রাউন্ড ছবি		—এন-কে-জি
৬২৪	দেবিকারাণী		—শ্রীবিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য
৬২৮	রবীন্দ্রসঙ্গীত		—শ্রীঅশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়
৬৩০	বাঙলা রঙ্গমঞ্চ সম্পর্কে নতুন চিন্তা		—শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায়
৬৩৪	হিন্দী নাট্য প্রচেষ্টা : একটি সমীক্ষা		—শ্রীঅজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়
৬৩৮	আমিই লেনিন		—শ্রীশান্তিগোপাল
৬৪১	নবনাট্য আন্দোলন ও একটি প্রশ্ন		—শ্রীদিলীপ মৌলিক
৬৪৩	সম্পাদকী ছবি		—শ্রীনির্মল ধর

ছোটদের জন্য একটি অসাধারণ বই

চলো দেখে আসি

কানাইলাল চক্রবর্তী

সবে যারা অক্ষর চিনেছে, এ-বইতে তাদের নিয়েই লেখক বেরিয়ে পড়েছেন—কত-কী দেখবার আছে, কত-কী শোনবার, লেখক যেন তাঁর ছোট্ট পাঠকদের সঙ্গে ক'রে সমস্তই দেখাচ্ছেন ও শোনাচ্ছেন, কথা বলছেন তাদের সঙ্গে এমন ভাষায় যা অন্যের সামান্য সহায়তায় তারা নিজেরাই পড়তে পারবে। এভাবেই তিনি ছোটদের মন টেনে রাখেন। টেনে রাখেন এতটাই যে এইসব দেখাশোনার সঙ্গে-সঙ্গে ছোটরা যে আসলে বাংলা ভাষাই দেখে ও শোনে, অন্তে-আস্তে চিনে নেয় তা পর্যন্ত তাদের খেয়াল থাকে না; ছোট-ছোট এক-একটি রচনা-টুকরো পেরিয়ে এসে এক-একটি বানানও শিখে যায় তারা, অ-কারের পর ই-কার তারপর ঈ-কার—এইভাবে ঔ-কার পেরিয়ে চন্দ্রবিন্দু পর্যন্ত। ছোটদের জন্য ছোট আর সরল ক'রে লেখা, পড়ার খুশি-ভরা একটি অসাধারণ বই। পাতায়-পাতায় রঘুনাথ গোস্বামী ও পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়ের আঁকা ছবি। তিন-রঙা মলাট। দাম : ১·২৫।

জিজ্ঞাসা

১-এ ও ৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা-৯ ফোন : ৩৪-৫৬৭৪
১৩৩-এ রাসবিহারী অ্যাভেনিউ, কলিকাতা-২৯ ফোন : ৪৭-৭৭১৫

উপন্যাস ও গল্প

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
- দত্তা ... ৩·৫০
- পথের দাবী ৬·৫০
- শেষের পরিচয় ... ৭·০০
- বিপ্রদাস ... ৫·০০

পরশুরাম
- গড্ডলিকা ৩·৫০
- কজ্জলী ... ৪·০০
- গল্প-কল্প ... ১·৫০
- হনুমানের স্বপ্ন ... ৪·০০
- ধুস্তুরীমায়া ... ৪·০০
- কৃষ্ণকলি ... ১·৫০
- নীলতারা ... ৩·০০
- আনন্দীবাই ... ৪·০০
- চমৎকুমারী ... ৪·০০

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়
- এবার প্রিয়ংবদা ... ৮·০০

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
- [illegible] ... ৩·০০

আশাপূর্ণা দেবী
- দিনান্তের রং ... ৬·৫০

প্রাণতোষ ঘটক
- রাজায় রাজায় ১·০০

বিমল মিত্র
- অনন্যরূপা ... ৫·৫০

মণীন্দ্রলাল বসু
- একদা ২·৫০

দীপক চৌধুরী
- পাতালে এক ঋতু ৮·০০
- [illegible] ৩·৫০
- এই গ্রহের ক্রন্দন ... ৮·০০
- ঝড় এলো ... ৫·০০
- [illegible] থেকে মালাবার ৩·০০
- [illegible] ... ৫·৫০

[illegible] রায়
- ত্রিনয়না ... ৪·০০

মহাশ্বেতা দেবী
- প্রেমতারা ৪·০০

সুজাতা
- দ্বিতীয় রহিত ... ৩·৫০

সুবোধ ঘোষ
- ফসিল ... ৩·৫০

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
- মেঘের উপর প্রাসাদ ৭·০০

অন্নদাশঙ্কর রায়
- অসমাপিকা ... ৩·০০
- [illegible] ... ৫·০০
- রূপের দায় ... ৩·৫০

বুদ্ধদেব বসু
- আয়নার মধ্যে একা ... ৫·০০
- শেষ পাণ্ডুলিপি ... ৫·০০
- [illegible] ... ৪·০০
- [illegible] ... ৪·০০
- একটি জীবন ও কয়েকটি মৃত্যু ৩·০০
- [illegible] আমার [illegible] ... ১২·০০

প্রেমেন্দ্র মিত্র
- [illegible] ... ৩·৫০

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
- [illegible] ৪·৫০
- [illegible] ... ৩·০০

[illegible]
- [illegible] ... ৬·৫০

জীবনী

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

বীরেশ্বর বিবেকানন্দ
- ১ম খণ্ড ... ৭·০০
- ঐ ২য় খণ্ড ... ৫·০০
- ঐ ৩য় খণ্ড ... ৭·৫০

শচীন্দ্রচন্দ্র সরকার
- আমার কাল আমার দেশ ৬·০০
- কথাগুচ্ছ ... ১২·৫০
- জীবনী অভিধান ... ৬·০০

সুলেখা সরকার
- রান্নার বই ৬·০০
- টক ও মিষ্টি রান্না ... ২·০০

ভ্রমণ

অন্নদাশঙ্কর রায়
- ফেরা ... ৫·৫০

বুদ্ধদেব বসু
- দেশান্তর ... ১০·০০

রম্যরচনা

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
- কল্লোল যুগ ... ৭·৫০

গ্রন্থাবলী

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ
১৩ খণ্ডে সম্পূর্ণ
- প্রতি খণ্ড ... ১২·০০

রাজশেখর বসু

পরশুরাম গ্রন্থাবলী
৩ খণ্ডে সম্পূর্ণ
- প্রতি খণ্ড ... ১৫·০০

কাব্যগ্রন্থ

প্রেমেন্দ্র মিত্র
- অথবা কিন্নর ... ৩·৫০

বুদ্ধদেব বসু
- যে আঁধার আলোর অধিক ৩·০০
- দময়ন্তী দ্রৌপদীর শাড়ি ৪·০০
- মিলাকের কবিতা ... ৩·৫০
- হোল্ডারলিন-এর কবিতা ৩·৫০

বিষ্ণু দে
- একুশ বাইশ ... ৮·০০
- আলেখ্য ... ২·৫০

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
- আজন্ম সুরভি ... ৩·০০

সুধীন্দ্র রায়
- সংকলিত কবিতা ... ৪·০০
- রবার্ট ফ্রস্টের কবিতা ... ৩·০০

হরপ্রসাদ মিত্র
- সাঁকো থেকে দেখা ... ৩·০০

সমালোচনা

বিশ্ব মুখোপাধ্যায়
- রবীন্দ্র সাগর সংগমে ... ১০·০০

এম, সি, সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড

১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়	লেখক
৬৪৫	বিজ্ঞাপনে ফ্যাশান	—শ্রীভবতোষ সাহা
৬৪৮	পুতুল দিয়ে ঘর সাজান	—শ্রীকল্যাণী বসু
৬৫১	ফুল সাজানোর ভারতীয় ভাব	—শ্রীউমা বসু
৬৫৩	যাত্রা আর মঞ্চ মুখোমুখি আজ	—শ্রীনন্দলাল ভট্টাচার্য
৬৫৭	এই মহানগরী, জনলগর	—শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু
৬৬১	মানুষ বনাম মেশিন	—শ্রীঅজয় বসু
৬৬৫	একদা ভারতে ওপেনিং ব্যাট্‌স্‌ম্যান ও বোলাররা ছিল	—শ্রীমতি নন্দী
৬৬৮	ভারতের প্রথম অলিম্পিয়ান	
	নর্মান প্রিচার্ড	—শ্রীঅরবিন্দ
৬৭১	রাজার খেলা	—শ্রীঅজয় হোম
৬৭৫	পঙ্কজ রায়	—শ্রীকমল ভট্টাচার্য
৬৭৯	হিরো	—শ্রীদিলীপ দত্ত
৬৮১	রাশিয়ার দাবাখেলা	
	যুগ পরিবর্তনের প্রতীক্ষা	—শ্রীগজানন্দ বোড়ে
৬৮৩	রেকর্ড ভাঙছে এবং ভাঙবে	—শ্রীঅমল দাশগুপ্ত
৬৮৫	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বনাম ভারতবর্ষ	—শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়
৬৮৯	নির্বাক ছবি	—শ্রীচিদানন্দ দাশগুপ্ত
৬৯২	সবুজ মানুষ ও কাদার ঘনশ্যাম (বড়গল্প)	—শ্রীঅদ্রীশ বর্ধন
৭০২	সুরের রাজা	—শ্রীঅরুণ চট্টোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ : শ্রীতুষার সান্যাল

CRICKET BOOKS

MUSHTAQ ALI
Foreword by
KEITH MILLER
CRICKET DELIGHTFUL
Rs. 15.00

ALAN DAVIDSON
Foreword by
SIR DONALD BRADMAN
FIFTEEN PACES Rs. 12.00

ROHAN KANHAI
BLASTING FOR RUNS
Rs. 8.00

BILL LAWRY
RUN DIGGER Rs. 18.90

BRIAN STATHAM
A SPELL AT THE TOP
Rs. 27.00

CHARLIE GRIFFITH
CHUCKED AROUND
Rs. 31.50

PHIL TRESIDDER
CAPTAIN ON A SEE-SAW
Rs. 27.00

JOHN ARLOTT Edited
CRICKET THE GREAT ONES
Rs. 20.00

JOHN ARLOTT
CRICKET THE GREAT ALL-ROUNDERS Rs. 20.00

D. BATCHELOR Edited
GREAT CRICKETERS
Rs. 40.50

GARY SOBERS
CRICKET CRUSADER
Rs. 20.00

T. S. BARKER
IN THE MAIN — WEST INDIES VERSUS M.C.C. 1968 Rs. 31.50

Rupa & Co

15 Bankim Chatterjee Street
Calcutta-12
Also at :
Allahabad-1 • Bombay-1
Delhi - 6.

The First Illustrated Guide to Batik Design & Textile Prints for beginners.

Manindra Kumar Chakravorti
&
Lalita Chatterjee

BATIK-O-TEX-PRINT

Price Rs : 8.00 P.

Published by
Firma K. L. Mukhopadhyay,
6/1A, Dhiren Sarani, Calcutta-12
or
Phone : 34-1824. 1, Bankim Chatterjee St., Cal-1.

এইচ-এম-ভি রেকর্ডে জনপ্রিয় শিল্পীদের অবিস্মরণীয় গীতি সংকলন

লং প্লেয়িং রেকর্ড

গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়

'দি বেস্ট অব সন্ধ্যা মুখার্জী'

বরণীয় শিল্পীর কণ্ঠে স্মরণীয় আধুনিক গান : আজ কেন ও চোখে লাজ কেন; প্রেম যে জীবনে একবারই আসে; যারে যা, যা ফিরে যা; ভালবাসার দিনগুলি মোর; মধুমালতী ডাকে আয়; ওই চাঁদ দোলে ॥ কথা দাও আর ফিরে নেবা; পথ ছাড়ো ওগো শ্যাম; কে গো এলে তুমি; কেন তা জানো; বন্দে বসন্ত এলো; রুপালী চাঁদ ফিরে ॥

ফিরোজা বেগম

'এ ট্রিবিউট টু কাজী নজরুল ইসলাম'

নজরুল গীতির সেরা শিল্পীর কণ্ঠে চিরস্মরণীয় গান : চৈতালী চাঁদনী রাতে; আয় বনফুল ডাকিছে মলয়; ওরে শুভ্র বসনা; আমি পূরব দেশের পুরনারী; বুলবুলি নীরব কেন নার্গিস বনে ॥ আমার ভুবন কান পেতে রয়; দৃষ্টিতে আর হয় না সৃষ্টি; ঝুম ঝুম ঝুম ঝুম ঝুম ঝুম ঝুম কে; দীপ নিভিয়াছে ঝড়ে; মুসাফির মোছ রে আঁখিজল ॥

আব্বাস উদ্দিন আহ্‌মদ

'আব্বাসউদ্দিন সিংস ফোক সংস অব বেঙ্গল'

পল্লীগীতির জনপ্রিয় শিল্পীর এক অনন্য সংকলন : সোনা বন্ধুরে কোন দোষেতে; ঐ শোন কদম্বতলায়; নদীর কূল নাই; আমার হাড় কালা করলাম; আমায় এত রাতে কেন ডাক দিলি; আমি ভাবি যারে পাই না গো তারে ॥ নাও ছাড়িয়া দে; গুরুর পদে প্রেমভক্তি; ময়ুরপঙ্খী নৌকা; ও সখের ময়না রে; বৈঠা জোরে বাওরে বন্ধু; ও মন পরে, চলরে ॥

দিলীপকুমার রায়

'দি গোল্ডেন ভয়েস অব দিলীপকুমার রায়'

সাধক শিল্পীর কণ্ঠে ভক্তিগীতি : শ্রীঅরবিন্দ স্তোত্র; মাতৃস্তোত্র; মা; স্তম্ভরী; সেই বৃন্দাবনের লীলা অভিরাম ॥ আঁধার-নিশা; বাঁশীর ডাক; শাঁখ মোর প্রাণধন; বাঁধ ভিজায় দিয়েছ; আশা-কারা ॥

'শ্রীরাধার মান-ভঞ্জন'

সঙ্গীত পরিচালনা—রবীন চট্টোপাধ্যায়

প্রণব রায় রচিত কীর্তনাঙ্গ গীতিনাট্য—শিল্পী : মান্না দে, গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, শিপ্রা বসু, নির্মলা মিশ্র, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সমরেশ রায়, সুবোধ রায়, শমিতা বিশ্বাস, তপতী ঘোষ ও দীপক মজুমদার।

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

'হেমন্ত — এ লিজেণ্ড অব গ্লোরি'

অনন্যসাধারণ শিল্পীর মধুরী কণ্ঠে গাওয়া বারোটি চিত্রগীতি-সংকলন : লিখিনু যে লিপিখানি (শ্রীতুলসীদাস); স্মরণের এই বালুকাবেলায় ('প্রিয়তমা'); কান্দো কেনে মনরে ('অসমাপ্ত'); পৃথিবীর গান আকাশ কি মনে রাখে ('গরীবের মেয়ে'); জীবনপুরের পথিক রে ভাই ('পলাতক'); যে বাঁশী ভেঙে গেছে ('স্বরলিপি') ॥ ও বাঁশীতে ডাকে সে ('সূর্যমুখী'); সুরের আকাশে তুমি ('শাপমোচন'); মুছে-যাওয়া দিনগুলি ('লুকোচুরি'); আজ দুজনার দুটি পথ ('হারানো সুর'); পথের ক্লান্তি ভুলে ('মরুতীর্থ হিংলাজ'); ও নদীরে ('নীল আকাশের নীচে') ॥

'গুপী গাইন ও বাঘা বাইন'

সত্যজিৎ রায়ের বিখ্যাত চিত্রের গান (শিল্পী—অনুপ ঘোষাল ও অন্যান্য)। সঙ্গে নির্বাচিত আবহ সঙ্গীতও রয়েছে।

'ঠাকুরমার ঝুলি'

প্রথম খণ্ড : বুদ্ধু ভুতুম

দ্বিতীয় খণ্ড : নীল কমল—লাল কমল

ছেলেমেয়েদের অপরূপ রূপকথার গীতিনাট্যরূপ। অংশ গ্রহণ করেছেন : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, কাজী সব্যসাচী, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, আরতি মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র, নির্মলেন্দু চৌধুরী, অনুপ ঘোষাল এবং আরো অনেকে।

EMI

দি গ্রামোফোন কোম্পানী অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড

(ই. এম. আই. প্রতিষ্ঠানসমূহের সদস্য)

কলিকাতা · বোম্বাই · দিল্লী · মাদ্রাজ · গৌহাটি · কানপুর

GC 6347

সম্পাদকীয়

ক্রীড়া বিনোদন ও বাংলার নিজস্বতা

অন্যান্য বারের মতো এ-বছরও আমরা অমৃতের অগণিত পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের হাতে এই ক্রীড়া ও বিনোদন সংখ্যাটি তুলে দিচ্ছি। জীবনের চারদিকে যখন হতাশার অন্ধকার, তখনি তো মানুষের সৃজনী প্রতিভার পরিচয় গ্রহণের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি। দুঃখ ও হতাশা জয় করার জন্য মানুষের চিরকালের যে-সংগ্রাম তাকেই আমরা পরিস্ফুট করে দেখতে চাই মানুষের নানা প্রশংসনীয় উদ্যমে, তার শিল্পসৃষ্টিতে, তার ক্রীড়াকুশলতায়। মানুষ যখন ঘর বাঁধতে শেখেনি, সমাজ তৈরী করেনি, তখনও গুহাগাত্রে অবসর সময়ে প্রাচীর-চিত্র উৎকীর্ণ করে সে তার উদ্বৃত্ত আনন্দের চিহ্ন রেখে গেছে উত্তরকালের মানুষের জন্য। সেই শিল্পনিদর্শন দেখে আমরা আদি মানুষের জীবন-তৃষ্ণার পরিচয় পাই। মানুষের এই শিল্পবোধ, সৃজনপ্রতিভাই তৈরী করেছে এক আনন্দের জগৎ যা শুধু অবসরের ফসল নয়, মানবজীবনেরই এক মহত্তম বিকাশ।

বাংলাদেশে এই সময়টাতে খেলাধুলা ও শিল্প-সংস্কৃতির অনুষ্ঠানের আয়োজন হয় জনসাধারণের চিত্তবিনোদনের জন্য। তরুণ সমাজের কাছে খেলাধুলার আকর্ষণ অসাধারণ। জীবন-গড়ার এমন সুযোগ দ্বিতীয় আর নেই। একদিকে যেমন জ্ঞান সঞ্চয়ন অন্যদিকে তেমনি শরীর চর্চা। তরুণ মনে ক্রীড়ানুশীলনের যে গভীর প্রভাব আছে তা সর্বজনস্বীকৃত। আমরা আমাদের দেশের তরুণদের কতটুকুই বা সে সুযোগ দিতে পারি। ঘনবসতিপূর্ণ শহরে, বিশেষ করে কলকাতায়, ছেলেরা অর্থাভাবে এবং স্থানাভাবে খেলাধুলার নিয়মিত সুযোগ থেকে বঞ্চিত। ক্রিকেটের প্রতি অনুরাগ এখন সর্বব্যাপী। অথচ মাঠের অভাবে, অর্থের অভাবে আমাদের তরুণ কিশোররা অলিতে-গলিতে, রাস্তায়-রাজপথে ক্যানভাসের বল নিয়ে ক্রিকেট খেলতে বাধ্য হয়। উপযুক্ত সুযোগ পেলে এদের মধ্যেই কতজন শ্রেষ্ঠ ক্রিকেটার হতে পারত, কে জানে? স্কুল-কলেজগুলোতে ছাত্রদেরই বসবার জায়গা হয় না। স্কুল-কলেজের নিজস্ব মাঠের কথা তো অকল্পনীয়। তা সত্ত্বেও আমাদের তরুণরা ক্রীড়াজগতের নানা ক্ষেত্রে দক্ষতার পরিচয় রাখছেন এটা আশা ও গৌরবের বিষয় নিঃসন্দেহে। সম্প্রতি ব্যাঙ্ককে অনুষ্ঠিত এশিয়ান গেমসে ভারতীয় ক্রীড়াকুশলীরা কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। আশা করি ভবিষ্যতে এই গৌরব মহত্তর বিজয়ে মহিমান্বিত হবে।

শিল্পজগতে বাংলাদেশ চিরকালই অগ্রণী। সঙ্গীত, চলচ্চিত্র, থিয়েটার এবং কাব্য-সাহিত্যে বাংলার সৃজনধর্মী মন স্বকীয়তার স্বাক্ষর রেখেছে দেশবাসীর সামনে। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত থেকে শুরু করে আধুনিক ও লোকসঙ্গীতের বিভিন্ন ধারায় গুণী শিল্পীরা যে-অনুশীলন ও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তা নিয়ে আমরা গর্ব করতে পারি। বাংলার নিজস্ব গান, টপ্পা, ধ্রুপদ, শ্যামাসঙ্গীত, বাউল, ভাটিয়ালীর আবেদন এঁদের কণ্ঠের পরিশীলিত সৌকর্যে আরও আদরনীয় হয়ে উঠেছে। বাংলার নিজস্ব মহিমার এক উজ্জ্বল বিকাশ হয়েছে রবীন্দ্রসঙ্গীতে। কবিগুরুর প্রতিভাস্পর্শে উদ্ভাসিত এই অনন্য সঙ্গীতের প্রচার আজ ঘরে ঘরে। সাধারণ মানুষের কণ্ঠেও আজ এই গানের অনুরণন শুনি। রবীন্দ্র-ঐতিহ্য আজ জাতীয় ঐতিহ্যের অঙ্গীভূত হয়ে আমাদের মননধর্মকে উজ্জ্বলতর করেছে।

চলচ্চিত্রজগতেও বাংলার দান বিশ্বের স্বীকৃতি লাভ করেছে। প্রথম যুগে প্রমথেশ বড়ুয়া, দেবকী বসুর শিল্পসৃষ্টি বাংলার চলচ্চিত্রকে যে উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করে, পরবর্তী যুগে সত্যজিৎ রায় তাকে দেন এক নতুন রূপ যার শিল্পসৌন্দর্যের সূক্ষ্মতা, অনুভূতির ব্যঞ্জনা এবং জীবনের বিশ্বস্ত রূপায়ণ আমাদের বিস্ময়ে মুগ্ধ করে দেয়। চলচ্চিত্র একটি মিশ্র শিল্পকর্ম, যদিও ফলশ্রুতির দিক দিয়ে সর্বাঙ্গীণ ও গোটা শিল্পেরই নামান্তর। বাংলার বিশ্ববন্দিত পরিচালক তার অপরূপ সৌন্দর্য আমাদের দেখিয়েছেন। বর্তমান যুগে চলচ্চিত্রই সবচেয়ে শক্তিশালী শিল্পমাধ্যম। এর সঙ্গে মিলিত হয়েছে সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত ও নাটকের সমস্ত গুণ। গুণী শিল্পীর হাতে চলচ্চিত্র কী অসাধারণ শিল্পকর্মে উন্নীত হতে পারে বাংলার তরুণ পরিচালকরাও তা দেখিয়েছেন।

রঙ্গমঞ্চেও বাংলার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য স্বীকৃত। গিরিশচন্দ্র ঘোষ থেকে শুরু করে বিশ্ববিখ্যাত নট ও পরিচালক শিশিরকুমার ভাদুড়ী তাঁদের অনন্য প্রতিভায় বাংলার রঙ্গমঞ্চকে অশেষ গৌরবে সমৃদ্ধ করে রেখেছেন। নাটক রচনা ও প্রযোজনার এই বৈশিষ্ট্যকে উত্তরোত্তর গৌরবের পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন আধুনিক নাট্যকার ও নাট্যশিল্পীরা। বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' দিয়ে বাংলাদেশে নবনাট্য আন্দোলনের সূত্রপাত। নাটকেই জীবনের সত্য অকুণ্ঠ প্রকাশের সুযোগ পায়। 'একটা জাতিকে চেনা যায় তার নাটক দিয়ে' এই গ্রীক উক্তির সত্যতা অবিসম্বাদী। বাংলাদেশে নতুন নাটকের এক আশ্চর্য পরীক্ষা চলছে গত দুই দশক ধরে। পেশাদার মঞ্চের পাশাপাশি অসংখ্য অপেশাদার নাট্যগোষ্ঠি বা গ্রুপ থিয়েটার পরীক্ষামূলক নাট্য প্রযোজনার মাধ্যমে জীবনের বহুবর্ণ জিজ্ঞাসাকে সার্থকভাবে রূপায়িত করছে।

আমরা বর্তমান সংখ্যায় বঙ্গ-সংস্কৃতির এই বিচিত্র ধারা নিয়ে আলোচনার যে আয়োজন করেছি তা থেকে পাঠকরা বাঙালীর চিন্তা ও মননের একটি পরিচয় পাবেন বলেই আশা করি। জীবন নানাদিক থেকে সন্ত্রস্ত ও বিপর্যস্ত হলেও তার ধ্রুবত্ব অপরিবর্তনীয়। সেই ধ্রুব ধ্যান ও ধারণাই মানুষের সৃজনকর্মে প্রতিফলিত ও প্রসারিত হয়। পাঠকদের যদি এই স্বল্প পরিসরে সে সম্পর্কে খানিকটা অবহিত করতে পারি, তাহলেই আমাদের প্রয়াস সার্থক বলে গণ্য করব।

রক্ত

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

আমি ডাক্তার। অনুভূতিপ্রবণতার বাড়াবাড়ি দেখলে নিঃশব্দে সেখান থেকে সরে আসি। মানুষের সুখে দুঃখে নিজেকে অনেকখানি নির্বিকার নিরাসক্ত ভাবি। কারো ভালো দেখলে ভালো লাগে, মন্দ দেখলে খারাপ লাগে, এই পর্যন্ত। অন্য প্রয়োজনের ডাক এলে সেই ভালো-মন্দের ছাপগুলো কখন মন থেকে খসে যায় নিজেই জানতে পারিনা।

জীবনের প্রৌঢ় প্রহরের এই সন্ধ্যায় অনেক দেখা সুখে-দুঃখে নির্লিপ্ত আমারই এই দুই চোখের কোণ দুটো সিরসিরা করে উঠেছিল। এর নাম অনুভূতি-প্রবণতা কিনা আমি জানি না। ছেলেটা চলে যাবার পর আমি নাকি বিড়বিড় করে কি বলছিলাম শুনলাম স্ত্রীর মুখে।...আমি কিছু বলছিলাম না, আমি প্রার্থনা করছিলাম। একটু আগে ছেলেটাকে যে চোখে দেখলাম, তার সবটুকু সত্যি হোক। সত্যি হোক, সত্যি হোক, সত্যি হোক।

দুটি ঘটনা। দুটিরই আমি প্রত্যক্ষদর্শী। দুটো ঘটনার সঙ্গেই আমি প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত। কিন্তু দুটো ঘটনার মাঝে তেইশ বছরের ফারাক। এত বড় ব্যবধান এত সহজে এক সুতোয় জোড়া যায় কি করে সেও যেন আমার কাছে এক বিস্ময় নিয়ে হাজির।

প্রথম ঘটনা, অর্থাৎ তেইশ বছর আগের ঘটনাটা বলি। একটি মেয়েকে আমার ভালো লেগেছিল। বছর উনিশ কুড়ি বয়েস হবে। নাম সুষমা। রূপসী কিছু নয়। আর পাঁচটা সাধারণ মেয়ের মতোই চেহারা। স্বাস্থ্য মোটামুটি ভালো আর বয়েসের শ্রী আছে

কিছুটা, এই পর্যন্ত। আসলে মেয়েটির ভিতরের অকপট স্বচ্ছতা আমাকে টেনেছিল।

একই পাড়ায় বাড়ি। আমার বাড়ি থেকে মিনিট চারেকের হাঁটা পথ। এ পাড়ায় আমিই নতুন তখন। সদ্য বিলেত-ফেরত ডাক্তার, ঝকঝকে নেমপ্লেট এঁটে এবং চোখে পড়ার মতো করে চিকিৎসার আসর সাজিয়ে বসেছি।

ও বাড়ি থেকে প্রথম ডাক পড়ল রাত্রি ন'টার পরে। রাতে চেম্বার আওয়ার্সের পরে রোগী দেখা রীতি নয় আমার। তাছাড়া আগে থেকে অ্যাপয়েন্টমেন্টও করা নেই। কিন্তু পাড়ার বাড়ি, আর রোগী অজ্ঞান হয়ে পড়েছে শুনে গেলাম দেখতে। যে ভদ্রলোক ডাকতে এসেছিলেন আমাকে, তিনি ও বাড়ির জামাই। এক নজর দেখেই ভদ্রলোককে বেশ অবস্থাপন্ন এবং শৌখিন মানুষ মনে হয়। হাতে সোনার ঘড়ি, গিলে-করা পাঞ্জাবীর সোনার চেন-এ হীরের বোতাম, আঙুলে জ্বলজ্বলে চুণীর আংটি। তারই শ্বশুর অসুস্থ।

বাড়িটা দেখে বাড়ির মালিককে তেমন অবস্থাপন্ন মনে হল না। সে-দিক চিন্তা না করে রোগী দেখায় মন দিলাম। আধা অজ্ঞান অবস্থায় শয্যায় মিশে আছেন। দেখে শুনে আশাপ্রদ কিছু মনে হল না। বৃদ্ধ ভদ্রলোকের সময় ঘনিয়ে এসেছে। কে চিকিৎসা করছেন শুনলাম এবং যে চিকিৎসা চলছিল তার প্রেসক্রিপশন দেখলাম। মুখ তুলতেই দু'জোড়া উদগ্রীব চোখ আমার ওপর ন্যস্ত দেখলাম। এক-জোড়া বয়স্কা রমণীর চোখ, কপালে বড় জ্বলজ্বলে সিঁদুর। রোগীর শিয়রের কাছে বসে আছেন। অন্য জোড়া মহিলাটির পাশে দাঁড়ানো উনিশ-কুড়ি বছরের একটি মেয়ের। রোগীর পায়ের দিকে আর একটি মহিলা দাঁড়িয়ে, বছর ছত্রিশ সাঁইত্রিশ বয়েস হবে—বিবাহিতা। অনুমান ইনিই রোগীর বড় মেয়ে, অর্থাৎ আমাকে যিনি ডাকতে গেছলেন তাঁর স্ত্রী। পরে জেনেছি অনুমান মিথ্যে নয়, ওরা দুই বোনই বটে, মাঝে আরো গোটাকতক ছেলেমেয়ে ছিল, তারা বিগত।

ইশারা বুঝে বড় জামাইটি আমাকে পাশের ঘরে নিয়ে এলেন। কিন্তু আলোচনায় বসার আগে হাত দুটো সাবান দিয়ে ধোয়া দরকার।

একটু জল—

ও—সুমি—সুমিই—

অবিবাহিত মেয়েটি ছুটে এলো। তারপর নির্দেশমতো জল আর সাবান নিয়ে এলো। ঘরের বাইরে নর্দমার কোণে ঝুঁকে আমি সাবানে হাত ঘষে নিলাম। মেয়েটি আমার হাতে জল ঢেলে দিতে লাগল। তখনই আর একবার আমি তার দিকে তাকালাম। সঙ্গে সঙ্গে সেই দুটো কান্না-থিতনো টানা চোখের অব্যক্ত করুণ মিনতি দেখলাম আমি।

রুমালে হাত মুছতে মুছতে সরে এলাম। জামাই ভদ্রলোককে খোলাখুলি জানালাম, বুঝতেই পারছেন অবস্থা সুবিধের

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নতুন স্বাদের নতুন উপন্যাস

আবার আমি আসব ৭·০০

বলাকার মন ৫ম মুদ্রণ ৬·৫০ **মনমধুচন্দ্রিকা** ৭·০০

হরেশ্বর রায়ের **বালজাক** অপরূপ জীবনী উপন্যাস দাম : ৫·০০

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের **একতলা** ২য় মুদ্রণ ২·৫০ **সন্ধ্যার সুর** ৩য় মুদ্রণ ৩·৫০

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের **রুদ্ধ যাযাবর** সাম্প্রতিক উপন্যাস দাম : ৮·৫০

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের **মন্দাক্রান্তা** দাম ৬·০০

নারায়ণ সান্যালের **নাগচম্পা** নতুন উপন্যাস দাম : ৯·০০

বিমল মিত্রের **কথাচরিত মানস** ২য় মুদ্রণ ৬·০০

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের **সমুদ্রের চূড়া** ৭·০০

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের **আরোগ্য নিকেতন** ৮ম মুদ্রণ ১০·০০

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের **মহাশ্বেতা** ১১শ মুদ্রণ ৬·০০ **বরযাত্রী** ৭ম মুদ্রণ ৩·৫০

বনফুলের **জঙ্গম** ২য় খণ্ড ৭ম মুদ্রণ ৫·৫০ **সে ও আমি** ৫ম মুদ্রণ ৩·০০

জরাসন্ধ-র **লৌহকপাট** ৩য় ৭ম মুদ্রণ ৩·৫০ **ন্যায়দণ্ড** ৭ম মুদ্রণ ৭·০০

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের

শ্রীকান্ত ৩য় ও ৪র্থ ৫·৫০ **শরৎ-বিচিত্রা** দাম : ১২·০০ **কাশীনাথ** দাম : ৫·০০

পন্ডিতমশাই ৩·০০ **নিষ্কৃতি** ২·০০ **মেজদিদি** ৩·০০

দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাসের **মানব কল্যানে রসায়ন** ১৯৬৯ সালে রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত ৭·৫০

জ্যোৎস্না গুহ-র নতুন উপন্যাস **বজ্রবিষাণ** দাম : ৬·০০

চতুর্থ বর্ষ **কালি ও কলম** চতুর্থ সংখ্যা

অগ্রহায়ণ — নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের স্মৃতিসংখ্যা

স্মৃতিতর্পণ করেছেন : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, বনফুল, প্রেমেন্দ্র মিত্র, প্রমথনাথ বিশী, গোপাল হালদার, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, মনোজ বসু, ডঃ বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, ডঃ অমলেন্দু বসু, সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, ভবানী মুখোপাধ্যায়, দক্ষিণারঞ্জন বসু, সন্তোষকুমার ঘোষ, ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, প্রণবরঞ্জন ঘোষ, চিন্মোহন সেহানবীশ, ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র, মণীন্দ্র রায়, কৃষ্ণ ধর, ডঃ নীহাররঞ্জন গুপ্ত, বিশু মুখোপাধ্যায়, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, সন্তোষকুমার দে, ওঙ্কার গুপ্ত, বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রী, জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী, ডঃ শঙ্করীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, নিরঞ্জন চক্রবর্তী, প্রলয় শূর, অরুণকুমার সেনগুপ্ত, নবেন্দু ঘোষ, সুধাংশু ঘোষ, অচ্যুৎ গোস্বামী, গণেশ বসু, সরোজ দত্ত, অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়, বাণীব্রত চক্রবর্তী

বিঃ দ্রঃ— এই মূল্যবান সংখ্যাটি অবিলম্বে সংগ্রহ করুন।

প্রকাশ ভবন, ১৫, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২ ফোন : ৩৪-৩৮২৫ ...

নয়, তবে একটা চেষ্টা করা যেতে পারে, তাতে করে আরো কিছুদিন হয়তো টিকে থাকবেন, কিন্তু সে-চেষ্টা একটু খরচসাপেক্ষ।

শৌখিন ভদ্রলোকটির মুখে দুশ্চিন্তার ছায়া পড়ল। কি-রকম খরচসাপেক্ষ জানতে চাইলেন। খরচের আভাস দিতে আরো বেশি চিন্তাচ্ছন্ন মনে হল তাঁকে। জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার কথা মতো চিকিৎসা করালে আর কতদিন উনি বাঁচতে পারেন মনে হয়?

—সেটা সঠিক বলা শক্ত, তবে মনে হয় দু-তিন মাসের বেশি নয়।

ঢোঁক গিলে বললেন, শুনলে তবে লাভ কি? ডাক্তারি শাস্ত্রে তো কত কিছুই বলা হয়। (ম্লান মুখ করে ভদ্রলোক বলেই ফেললেন, তাহলে আর কি লাভ! এ-রকম বলে ফেলার জন্য অপ্রস্তুত যে একটু না হলেন এমন নয়। ঢোক গিলে বললেন, আপনাকে খোলাখুলিই বলি ডক্টর, গত ছ'মাস ধরে আমরা শ্বশুরমশাইয়ের চিকিৎসা করে চলেছি, এ-পর্যন্ত হাজার দেড়েক টাকা খরচা হয়ে গেছে...মানে আমাদের যতটুকু সাধ্য তার একরকম শেষে এসে ঠেকেছি...এখন আপনার কথা-মতো চিকিৎসা চালিয়ে গেলে আরো হাজারখানেক টাকার ওপর খরচ হবে, অথচ দু-চার মাসের মধ্যে যাবেনই উনি, এ অবস্থায় টিকিয়ে রেখে...ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না......

ঈষৎ বিস্ময়ে আমি ভদ্রলোকের মুখের দিকে চেয়ে আছি। ও'র হাতে আর আঙুলে আর জামায় যা লাগানো আছে তার বিনিময়ে যা খরচ হয়েছে আর যা হবে তার সবটাই উশুল হয়েও উদ্বৃত্ত থাকতে পারে। অথচ উনি বলছেন, সামর্থ্যের একেবারে শেষের মাথায় এসে ঠেকেছেন।

—আপনাকে আরো একটু খুলে বলি ডক্টর, আপনার ব্যবস্থামতো দু' চার মাস টিকিয়ে রাখার চিকিৎসাও করা যেতে পারে...কিন্তু তাহলে শ্বশুরমশাই তাঁর অবিবাহিত মেয়েটির বিয়ের জন্য মাত্র যে চারটি হাজার টাকা আলাদা করে সরিয়ে রেখেছেন, চিকিৎসার টাকা তার থেকেই টেনে নিতে হবে, এ-ছাড়া আর অন্য কিছু সম্বতি নেই...সে-রকম করাটা ঠিক হবে কিনা ভাবছি...

কথাসরিৎসাগর
গল্প বলার আসর
৮২।৭এম বালিগঞ্জ প্লেস,
কলিকাতা : ১৯
ফোন : ৪৭৬৪৫১

এ-রকম পরিস্থিতিতে কোনো চিকিৎসক কখনো পড়েছেন কিনা আমার জানা নেই। মনে হল ভদ্রলোকের হাতের ঘড়ি আর জামার বোতামগুলো যেন আমার দিকে চেয়ে দাঁত বার করে হাসছে। বললাম, এ-সব নিতান্তই আপনাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার, কি করবেন না করবেন আপনারাই ভেবে ঠিক করুন। একটা কাগজ—

জামাই ভদ্রলোক যেন বাস্তবে ফিরলেন এতক্ষণে। একটা প্যাড এনে সামনে ধরলেন। পুরনো প্রেসক্রিপশন থেকে আমি দুই-একটা ওষুধ বদলে নতুন প্রেসক্রিপশন লিখে দিলাম। সম্পূর্ণ জ্ঞান হবার আগে এবং পরে কি করণীয় জানিয়ে বললাম, ব্লাড-প্রেশার এখন হাই, কয়েক ঘণ্টা পরপর চেক করা দরকার।

শোনামাত্র আহত মুখ জামাইটির। বলে উঠলেন, তাহলে তো যে ভদ্রলোক রোজ দেখছেন তাঁকে এনে বসিয়ে রাখতে হয়।

যে সুরে বললেন কথাগুলো, তার একটি মাত্র অর্থ হল, আবার আমি তাঁদের অহেতুক কিছু বাড়তি খরচের মধ্যে ফেলছি। মনে মনে অসন্তুষ্ট হলেও হেসেই বললাম, আমাকে বার বার এসে প্রেসার চেক করতে হলে আপনাদের আরো বেশি অসুবিধা। যা উচিত তাই বললাম, সেটা করা না করা আপনাদের বিবেচনা। আচ্ছা—

উঠে দরজার দিকে পা বাড়ালাম। দরজার ও-ধারে দেখলাম অবিবাহিতা মেয়েটি, যার বিয়ের জন্য তার বাবা মাত্র চার হাজার টাকা সরিয়ে রেখেছেন—উদগ্রীব মুখে সে দাঁড়িয়ে। ব্যস্তসমস্তভাবে জামাইটি পিছন থেকে এগিয়ে এলেন।—আমাদের ঠিক জানা নেই, আপনার ফী কত ডক্টর?

—বত্রিশ টাকা।

—এক মিনিট ডক্টর, প্লীজ্।

টাকা আনার জন্য হন্তদন্ত হয়ে ঘর থেকে বেরুতেই মেয়েটির মুখোমুখি। দেখলাম মেয়েটি তার হাতে টাকা গুঁজে দিল। বত্রিশটি টাকা হাতে নিয়েই সে অপেক্ষা করছিল। টাকাটা জামাইয়ের হাত থেকে আমার হাতে এলো। হাত বাড়িয়ে ফী নিলাম বটে, কিন্তু এই প্রথম কি-রকম যেন সঙ্কোচও বোধ করলাম একটু। বাড়ি থেকে নেমে আসার পরেও মেয়েটির জলে-ভরা চোখ দুটো আমার চোখে ভাসছিল। আবার হাসিও পাচ্ছিল। আমার তিন বছরের একটি মেয়ে আছে, ভাবী জামাতাটি ওই গোত্রের হতে পারে কিনা সেই উদ্ভট চিন্তা মাথায় এসেছিল। ও'দের ওই জামাইটি আমার প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী ওষুধ আনাবেন কিনা সেই সংশয়ও ছিল। ...ছোট মেয়ের বিয়ের বাবদ তার বাপ যখন মাত্র চার হাজার টাকা সরিয়ে রেখেছেন, সোনার ঘড়ি চুনীর আংটি আর হীরের বোতামওলা জামাই আনতে ভদ্রলোকের কত টাকা খরচ হয়েছিল?

বাড়ি ফিরে নতুন অভিজ্ঞতার ব্যাপারটা স্ত্রীকে বলতে তিনি সবিস্ময়ে মন্তব্য করে উঠলেন, আচ্ছা চামার তো জামাইটা!

আমি বললাম, তা নয়, প্র্যাকটিক্যাল মানুষ।

ওই রোগী নিয়ে আর আমার মাথা ঘামাতে হবে ভাবিনি। কিন্তু পরদিন সকাল আটটা না বাজতেই টেলিফোন। সাড়া দিতে ও-দিক থেকে উদবেগভরা মিষ্টি গলা কানে এলো।—কাল রাতে আপনি আমার বাবাকে দেখে গেছলেন, আমি সেই বাড়ি থেকে কথা বলছি—

—হ্যাঁ বুঝেছি। কেমন আছেন উনি?

—আমাদের মনে হচ্ছে একটু ভালো, এখন পরিষ্কার জ্ঞান আছে, কাল আপনার সব ওষুধ ঠিক-ঠিক পড়েছে—আপনি দয়া করে এক্ষুনি একবার আসুন ডাক্তারবাবু, মা আমাকে বার বার করে বলছেন—

বিড়ম্বনার মধ্যে পড়ে গেলাম। বললাম, এখনই গিয়ে কি হবে, ওষুধটা চলুক, আর ব্লাড-প্রেশার নেওয়া হয়েছে?

—হ্যাঁ, এখনো বেশি শুনেছি, আপনি দয়া করে এক্ষুনি একবারটি এসে বাবাকে দেখে যান ডাক্তারবাবু, মা কাল সমস্ত রাত মুখে জল দেয়নি, ঠায় বসে কাটিয়েছে, আপনার অসুবিধে থাকলেও একবারটি আসুন—

অনুরোধ নয়, টেলিফোনে যেন কান্না-ভরা আকুতি বাজছে কানে। ফ্যাসাদে পড়ে গেলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার ভগ্নিপতি কোথায়?

—তিনি সন্ধ্যায় আসবেন। তাঁর জন্যে কিছু ভাববেন না ডাক্তারবাবু, বাবার চিকিৎসা আমরা করাচ্ছি, আপনি দয়া করে এক্ষুণি আসুন।

অগত্যা রাজি হলাম। একটু যালে গেলামও। আজ ওই মেয়েটিই আমাকে রোগীর ঘরে নিয়ে গেল। অনেকক্ষণ ধরে নিবিষ্ট মনে রোগী দেখলাম। মেয়ে আর তার মায়ের দু'জোড়া উদগ্রীব চোখ আমার মুখের ওপর। রোগীর অবস্থার খুব একটা তারতম্য দেখলাম না। তবু তাঁকে এবং বয়স্কা রমণীটিকে আশ্বাস দিলাম, একটু ভালই তো মনে হচ্ছে—

হাত ধোবার জন্য বাইরে এলাম। মেয়েটি আগের থেকেই সাবান জল তোয়ালে ঠিক করে রেখেছিল। আমি জল-সাবান হাতে ঘষতে ঘষতে তার দিকে তাকালাম একবার। এটুকুর প্রতীক্ষাতেই ছিল যেন। জলের ঘটি হাতে অস্ফুট স্বরে জিজ্ঞাসা করল, সত্যি সত্যি কি রকম দেখলেন ডাক্তারবাবু?

এটুকু থেকেই বোঝা গেল, মেয়েটি বুদ্ধিমতী। সংক্ষিপ্ত জবাব দিলাম, একরকমই।

সঙ্গে সঙ্গে হাতের ঘটিটা মেঝেতে রেখে এক কাণ্ড করে বসল মেয়েটি। দু'হাতে আমার সাবানমাখা হাত দুটো ধরে ফেলল। কাঁদ-কাঁদ গলায় বলে উঠল ডাক্তারবাবু, আপনি জামাইবাবুর কোনো কথা ধরবেন না, যত টাকা লাগে লাগুক, আপনি যেমন করে পারেন বাবাকে বাঁচিয়ে রাখুন ডাক্তারবাবু, টাকার জন্যে কিছু আটকাবে না, আপনি দয়া করে বাঁচান—বাবা ছাড়া আমাদের আর কেউ নেই।

আমি বিধাতা নই। কিন্তু মেয়েটির দিকে চেয়ে সেই স্বল্পক্ষণের জন্যেও আমার বিধাতা হতে ইচ্ছে করছিল।

মাথা নেড়ে আশ্বাস দিলাম, চেষ্টা করব। হাত ধুতে ধুতে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার নাম কি।

—সুষমা।

—পড়ো ?

মাথা নেড়ে সায় দিতে গিয়েও দিল না। বলল, পড়তাম...বাবা অসুখে পড়ার পর থেকে আর কলেজে যাচ্ছি না।

প্রেসক্রিপশনে আরো একটা ওষুধ যোগ করে এবং আনুষঙ্গিক নির্দেশ দিয়ে বললাম, সন্ধ্যার পর এসে একবার দেখে যাব, তারপর যা হয় করা যাবে।

কৃতজ্ঞ মুখে মেয়েটি মাথা নাড়ল, আমি সিঁড়ির দিকে পা বাড়ালাম।

—ডাক্তারবাবু!

ঘুরে দেখি তার হাতে টাকা। নোট কটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিল।

আমি হেসেই বললাম, ওটা থাক এখন, বাবা সেরে উঠুন, পরে দেখা যাবে।

—না না না; চোখে মুখে সত্যিকারের বিড়ম্বনা।—আপনি চেষ্টা করবেন এই ঢের, তাছাড়া টাকা না নিলে আমি যখন তখন আপনাকে ডাকব কি করে?

এরকম সরল উক্তিও আমি বেশি শুনি নি। হেসেই জবাব দিলাম, সকালের মতো ফোনে ডাকতে পারো, সে রকম দরকার মনে হলে চলেও যেতে পারো—কাছেই তো বাড়ি।

—ডাক্তারবাবু!

পা বাড়াতে গিয়েও আবার বাধা পড়ল। আবারও ফিরে তাকালাম। সুষমা একবার বাবার ঘরের দিকে তাকিয়ে নিয়ে গলা আরো খাটো করে বলল, জামাইবাবু কাল আপনাকে সত্যি কথা বলেন নি, বাবা আমার বিয়ের জন্য চোদ্দ হাজার টাকা রেখেছেন, চার হাজার নয়...আজকের ফী-টা অন্তত আপনি নিন, ও-বেলা না-হয় নেবেন না।

মেয়েটির মর্যাদা বোধ দেখে আমি বিস্মিত হয়েছিলাম। অথচ তেমনি অকপট সরল। কেন যেন ওই বিষণ্ণ মুখে একটু হাসি দেখার সাধ হল আমার। গম্ভীর মুখ করে জবাব দিলাম, এক শর্তে নিতে পারি, তোমার বিয়ের সময় নেমন্তন্ন করলেও আমি আসব না।

লালচে মুখ দেখলাম। প্রত্যাশিত হাসিটুকুও দেখলাম। নেমে এলাম। টাকা নেবার জন্য আর পীড়াপীড়ি করল না।

রাতে আবার সেই সোনার ঘড়ি হীরের বোতাম চুনীর আংটি ভগ্নিপতির মুখোমুখি। আমার সকালে আসা এবং ফী না নেবার সংবাদও শুনে থাকবেন। কিন্তু সে সম্বন্ধে উচ্চ-বাচ্য করলেন না। রোগী দেখে পাশের ঘরে আসতে চিন্তিত মুখ করে বললেন, আপনার কালকের কথাটা ভেবে দেখলাম, ডক্টর...যে চিকিৎসা করতে চান করুন...এঁদেরও তাই মত, টাকা যা লাগে লাগবে, তবে একটু কমে-সমে যাতে হয় দেখবেন, বুঝতেই তো পারছেন...এদিকে আবার মেয়েটার বিয়ের কথাবার্তা খানিকটা এগিয়েছে, হয়তো এ মাসের মধ্যেই দিয়ে ফেলতে পারব বিয়েটা...তার মধ্যে কর্তা চোখ বুজলে একটা বিতিকিচ্ছির ব্যাপার হবে...তার থেকে বাঁচুন চিকিৎসা।

ডাক্তার হিসেবে এমন বাস্তবের মুখোমুখি আর বোধহয় আমাকে দাঁড়াতে হয়নি কখনো।

আমার ইচ্ছে মতই চিকিৎসা হয়েছে। তা সত্ত্বেও সুষমার বাবাকে দেড় মাসের বেশি বাঁচান যায় নি। দেড় মাসের মাথার ভদ্রলোক চোখ বুজলেন। যাবার সময় হয়েছে আগের দিনই বোঝা গেছল। পরদিন রাত দশটায় সুষমার টেলিফোন, বাবা নেই। বিকেলেই গত হয়েছেন। তাঁকে শ্মশানে নিয়ে যাবার পর সুষমা শেষ খবরটা আমাকে জানালো।

অভ্যস্ত নই বলে দুটো সান্ত্বনার কথাও বলে উঠতে পারলাম না। সুষমাই বরং বলল, আপনার জন্যেই বাবাকে দিনকতক বেশি পেলাম। আপনাকে কি আর বলব—

সুষমা সত্যিই সুষমা। এর পরেও মাঝে মাঝে ওর সঙ্গে আমার দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে। মায়ের বা নিজের কিছু হলে নিজেই আমার চেম্বারে আসে। ওষুধের ব্যবস্থা নিয়ে যায়। আমার স্ত্রীর সঙ্গেও ওর আলাপ হয়েছে। মেয়েটাকে তাঁরও ভাল লেগেছে।

এর বছর দেড়েক বাদে সুষমার বিয়ে হয়ে গেছে। আমি এবং আমার স্ত্রী সানন্দে সেই বিয়েতে গেছি। বাড়ি ফেরার পর অনেকবার আমার মনে হয়েছে, মেয়েটার আর একটু ভালো বিয়ে হলে ভালো হত। ছেলেটার ছোট স্টেশনারি দোকান আছে একটা, সেই সম্বলের ওপর নির্ভর করে বিয়ে। আমার স্ত্রী অবশ্য বললেন, বেশ বিয়ে হয়েছে।

সুষমার শ্বশুরবাড়ি আমার বাড়ি থেকে মাইল দুই দূরে। দেখা সাক্ষাৎ এর-পর স্বাভাবিকভাবেই কমে এসেছে। বিয়ের বছর কয়েকের মধ্যে বারকতক আমি ওর শ্বশুরবাড়ি গেছি ওর ছেলে-মেয়েকে দেখতে। একটা ছেলে আর একটা মেয়ে ওর। সেই ছেলেমেয়ের কখনো একটু বেশি অসুখ হলেই আমার ডাক পড়েছে। গেছি। নিজের দাদার মতই আদর আপ্যায়ন করেছে আমাকে। ওর সংসারের অবস্থা খুব স্বচ্ছল মনে হয়নি আমার। কিন্তু সহজ হাসিটুকু মুখে লেগে থাকতে দেখেছি। আমাকে দেখামাত্র ও ধরে নেয় ছেলেমেয়ের অসুখ পালালো বলে। লোকের মুখে শুনেছিলাম সুষমা একটা প্রাইমারি স্কুলে মাস্টারি করছে।

মাঝে দীর্ঘকাল আর দেখা হয় নি। হিসেব করলে ওর বিয়ের পর তেইশটা বছর কেটে গেছে। হিসেব করিনি, কারণ সুষমা-প্রসঙ্গ আর তেমন মনেও ছিল না।

সেদিন সকালের দিকে দেখলাম আমার চেম্বারের সামনে একজন নিম্ন-মধ্যবিত্ত গোছের লোক দাঁড়িয়ে আছে। বিমর্ষ মুখ। ঢুকবে কি ঢুকবে না ভেবে ইতস্ততঃ করছে। মুখটা চেনা-চেনা মনে হল আমার। এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলাম, কি চাই?

লোকটা মিনমিন করে যা বলল, তার সারমর্ম, সে সুষমার স্বামী। সুষমার বোধহয় খুব সাংঘাতিক রকমের কিছু অসুখ হয়েছে, আমি যদি দয়া করে একবার তাকে দেখতে যাই।

অমরেন্দ্রকুমার ঘোষ-এর

গদীর লড়াই ৫্

অমরেন্দ্র দাস — বিদ্রোহিনী ৬্

শক্তিপদ রাজগুরু — নায়িকা ৪্

বাঈ বেগম বাঁদী ১২্ | নীল সমুদ্র সবুজ দেশ ৮্

বাসর প্রদীপ ৪্ | আলেয়া মঞ্জিল ৫্

সুনীলকুমার ঘোষ-এর চাঞ্চল্যকর রাজনৈতিক গ্রন্থ ॥ আট টাকা

কাম্বোডিয়া ঝড়ের পথে

বিপ্লবী চে গুয়েভারা ৬্ | স্বাধীনতার হাতবদল ৮্

সুদর্শন সেন — বাঁচার লড়াই — সাত টাকা

সুনীলকুমার ঘোষ-এর

সিলভার জজ ৮্

মার্বেল প্যালেস ৫

টাইপিস্ট গার্ল ৪্

আরতি প্রকাশনী C/o বুক-ফেয়ার, ১ কলেজ রো, কলকাতা-৯

জিজ্ঞাসা করলাম, সুষমা আপনাকে আমার কাছে পাঠিয়েছে ?

কেন জিজ্ঞাসা করলাম জানি না। সুষমার স্বামী মাথা নাড়ল, তারপর বিড়-বিড় করে বলল, না আমার ছেলে আপনার কথা বলছিল।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, সুষমার কি হয়েছে ?

জবাব শুনে বিষম চমকে উঠলাম। পাড়ার ডাক্তার ক্যানসার সন্দেহ করছে। কাঁধের কাছে দু-তিন জায়গায় ফোলা ফোলা। আগে ব্যথা বেদনা ছিল না, এখন একটু একটু ব্যথা শুরু হয়েছে।

বিকেলে যাব বলে দিলাম। মনটা সত্যিই খারাপ হয়ে গেল। পুরনো কথা মনে পড়ল। আমার হাতে জল দেবার সময় ওর সেই দুটি চোখ আজও ভুলিনি।

বিকেলে আমাকে দেখে সুষমা যেন আকাশ থেকে পড়ল। তারপর যেমন খুশি তেমনি রাগ। রাগটা ওর স্বামীর ওপর। কেন ওকে না বলে-কয়ে আমাকে ডেকে কষ্ট দেওয়া হল, স্বোয়ামীর মুরোদ জানা আছে, ইত্যাদি। স্বামী বেচারা নির্বাক।

গম্ভীর মুখে আমি রোগ পরীক্ষায় মন দিলাম। দেখে এবং জিজ্ঞাসাবাদ করে আমারও মনে হল সন্দেহ অমূলক নয়। কিন্তু এ ব্যাপারে আমি বিশেষজ্ঞ নই।

পরদিন বড় সার্জন নিয়ে এলাম এক-জন। তাঁরও একই সন্দেহ। দুদিনের মধ্যে বায়পসি করা হল। বায়পসির রিপোর্ট পজিটিভ। ক্যানসার।

বিশেষজ্ঞর সংগে পরামর্শ করে বোঝা গেল একটাই রাস্তা এখন। ইমিডিয়েট অপারেশন। তাতেও শতকরা পঁচিশ ভাগ মাত্র জীবনের আশা। আর, ভিতরে বেশি দূর ছাড়িয়ে থাকলে তো হয়েই গেল। অপারেশন করতে খুব কম হলেও সর্ব-সাকুল্যে হাজার আড়াই টাকা লাগবে।

সুষমার স্বামীকে আড়ালে ডেকে খোলাখুলি সব বললাম। অপারেশন এক্ষুণি করা দরকার তাও বোঝালাম।

সব শোনার পর লোকটা মিনমিন করে বলল, আশা যখন নেই-ই প্রায়, কাটাছেঁড়া করে কি হবে...তাছাড়া অতগুলো টাকা জোগাড় করা......

হাওড়া কুষ্ঠ কুটীর

সর্বপ্রকার চর্মরোগ, বাতরক্ত, অসাড়তা, ফুলা, একজিমা, সোরাইসিস, দূষিত ক্ষতাদি আরোগ্যের জন্য সাক্ষাতে অথবা পত্রে ব্যবস্থা লউন। প্রতিষ্ঠাতা: পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা কবিরাজ, ১নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া। শাখা: ৩৬, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৯। ফোন: ৬৭-২০৫৯।

রাজ্যের বিরক্তি নিয়ে সুষমার ঘরে এলাম। পিছনে ওর স্বামীও এলো। আমাকে দেখেই সুষমা ঝাঁঝিয়ে উঠল, ও-ঘরে কি ফিস-ফিস হচ্ছিল? কার কত মুরোদ আপনি জানেন না। স্বামীর দিকে চোখ পড়তেই জ্বলে উঠল যেন দেখো, দাদার জন্য আমি কিছু বলব না, কিন্তু অন্য ডাক্তার আনতে আর ওই সব করতে যা খরচ হয়েছে, তার এক পয়সা অর্থাৎ মিটিয়ে না দিলে আমি তুমকে রাখব না বলে দিলাম।

দাদা অর্থাৎ আমি। ওর স্বামী পালালো ঘর ছেড়ে। আমি হাসতে চেষ্টা করে বললাম, ডাক্তার দাদার বোনের চিকিৎসা করতে অন্য ডাক্তার টাকা নেয় না।

সুষমা যেন আমার ওপরেও রেগে গেল। বলে উঠল, আপনাকে তো আজ দেখছি না, আপনার চালাকি আমি জানি। আমার জন্যে আর চেষ্টা করে লাভ কি, আমার কি হয়েছে আমি বুঝি না ?

বললাম, জানো যদি তাহলে চুপ করে থাকো, লাভ আছে বলেই আমি ভাবছি।

একটু বাদে জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা, তোমার ছেলেমেয়েকে দেখছি না, তারা কোথায় ?

নির্বিকার মুখে সুষমা গড়গড় করে যা বলে গেল শুনে ভিতরটা টনটন করে উঠল আমার। মেয়ে বছরখানেক হল কম্প সন্দো চলে গেছে। মেয়েটার সাধ আহ্লাদ ছিল, এ অভাবের সংসারে দু-দণ্ডও মন টিকত, সুযোগ পেয়ে চলে গেছে। আর ছেলেটা তার থেকেও ঢের বেশি বজ্জাত হয়ে উঠেছে। বেশ ভালো বুদ্ধিমান ছেলে ছিল, হায়ার সেকেণ্ডারিতে ছোটখাট স্কলারশিপ পেয়ে-ছিল একটা। সুষমার বড় সাধ ছিল ছেলে আমার মতো ডাক্তার হোক। কোনো কথায় কান না দিয়ে ছেলে সোজা কলেজে ভর্তি হল। অবশ্য ডাক্তারি পড়ার সম্গতিও ছিল না। কি-যে হাওয়া এলো, ছেলের মাথাটাই বিগড়ে গেল একেবারে। পড়াশুনা শিকেয় উঠল। এরই মধ্যে বার তিনেক জেলও খাটা হয়ে গেছে, পুলিশ এখনও মাঝমাঝে বাড়িতে হানা দেয়। শেষের মাথায় সুষমা বলে উঠল, চুলোয় যাক সব, আমি খুব ভালো করে লক্ষ করেছি, ও-ছেলের রক্তে শুধু মন্দ ছাড়া ভালো কিছু নেই।

নির্বাক বসেছিলাম। হঠাৎ দেখি দরজার কাছে একটি ছেলে দাঁড়িয়ে। বছর একুশ বাইশ হবে বয়েস, কোঁকড়া কাঁকড়া চুল, মুখখানা কমনীয়, আর চেনা গভীর দুটো চোখ।

আমার দৃষ্টি অনুসরণ করে সুষমাও তাকে দেখল। তারপরেই তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে উঠল, কি দেখতে এসেছিস ? এখনো তোদের দুকথা শোনাবার জন্য আমি বেঁচে আছি, বুঝলি ? নিজেদের এক রত্তি মুরোদ নেই, লজ্জা করে না মায়ের জন্য আর দাদার কাছে গিয়ে ভিক্ষে চাইতে ? যা দূর-হ দূর-হ আমার সামনে থেকে!

অপ্রস্তুত মুখে ছেলেটা আমার দিকে চেয়ে হাসল একটু। তারপর চলে গেল।

ঘাড়ের বকুনি তার কোথাও স্পর্শ করেছে বলে মনে হল না।

পরদিন আর সুষমাদের বাড়ি যাইনি। কি করা যেতে পারে এখনো ভেবে উঠতে পারিনি। নিজে খরচা করতে চাইলে সুষমা কতটা বেঁকে বসবে তাও অনুমান করতে পারি। মোট কথা মনটা ভালো ছিল না।

রাত্রিতে চেম্বার আওয়ার্স এর পরে চাকর-এসে খবর দিল, একটি ছেলে ডাকছে, জরুরী দরকার বলছে। মা নীচে থেকে খবর দিলেন।

নীচে নেমে দেখি সুষমার ছেলে। ছেলেটার কমনীয় মুখখানা দেখেও কেন যেন আমার রাগই হয়ে গেল। বসতেও বললাম না। জিজ্ঞাসা করলাম, কি চাই ?

ছেলেটা সপ্রতিভ মুখে হাসল একটু। বলল, আমি আপনার সুষমা বোনের ছেলে কাল দেখেছিলেন। বাবার মুখে শুনলাম অপারেশন হলে মা বাঁচতেও পারেন, আড়াই হাজার টাকা লাগবে তাতে...টাকাটা এনেছি, আপনি চেষ্টা করে দেখুন, মা-কে যদি বাঁচাতে পারেন।

সত্যিই একরাশ নোট সে আমার টেবিলের ওপর রাখল। আমি হতভম্ব। হঠাৎই কি-রকম একটা শিহরণ অনুভব করলাম যেন। ছেলেটার সপ্রতিভ মুখ বটে, কিন্তু তেইশ বছর আগে বাপের অসুখে হাতে জল দেবার সময় এর মায়ের যে দুটি চোখ দেখেছিলাম—অবিকল সেই দুটো চোখই দেখছি এখন।

—তোমার নাম কি ?

—কমল।

—এরই মধ্যে এত টাকা কোথা থেকে যোগাড় করলে ?

আমার দিকে চেয়ে তেমনি সপ্রতিভ মুখেই ছেলেটা হাসল আবার। জবাব দিল, আপনি যা ভাবছেন সে-রকম কিছু নয়, অসৎ উপায়ের টাকা দিয়ে মায়ের চিকিৎসা করলে আর পরে সেটা জানতে পারলে আমাকে আক্কেল দেবার জন্যে মা ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে মরবে। ...এক বড়লোক বন্ধুর কাছে ধার করেছি, এ টাকা নিজে খেটে উপার্জন করে শোধ করতে হবে। মোট কথা আপনি মাকে বাঁচাতে চেষ্টা করুন, মা চলে গেলে আমাদের বাড়িতে আর বাতি জ্বলবে না।

ছেলেটা চলে গেল।

আমি বিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে।

জীবনের প্রৌঢ় প্রহরের এই সন্ধ্যায় অনেক দেখা সুখে-দুঃখে নির্লিপ্ত আমারই এই দুই চোখের কোণ দুটো সিরসির করে উঠেছে।

কোথায় যেন পড়েছিলাম, আই উইল নট বয়ো মেরিট ফ্রম আউটসাইড, ইট মাস্ট বি ফ্রম মাই ব্লাড।

আমার স্ত্রী নীচেই ছিল। ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা শুনছিল। তার মুখে শুনলাম, ছেলেটা চলে যাবার পর আমি নাকি বিড়বিড় করে কি বলছিলাম।

আমি কিছু বলছিলাম না, আমি প্রার্থনা করছিলাম। একটু আগে ছেলেটাকে যে চোখে দেখলাম তার সবটুকু সত্যি হোক। সত্যি হোক, সত্যি হোক, সত্যি হোক।

সাঁকো

যশোদাজীবন ভট্টাচার্য

সমতলের পথ পেরিয়ে অনেক দূরে চলে এসেছি। স্মৃতির ভেতরে এখনো জোয়ারের ডাক। চোখের পাতা বুজিয়ে দেখি, আয়োজন সোনার সমুদ্র। সমুদ্র এত শান্ত-স্নিগ্ধ জানা ছিল না। বয়সের ভাঁড়ারে সবকিছুই তোলা থাকে। সময় এলে নিপুণ যাদুকরের মত একে-একে সে তা দেখায়। বড় কৃপণ, বড় হিসেবী। আসা-যাওয়ার ব্যাপারে বুঝি একটুও তাড়াহুড়ো থাকতে নেই। সে জানে, তার পথে যান-বাহনের বালাই নেই। ট্রেন ফেল হবার ভয় দেখিয়ে তাকে যে ব্যস্ত করে তুলবো, মর্জিমাফিক কাজ হাসিল করিয়ে নেবো তেমন সাধ্য কোথায়?

কাঁধে হাত রাখতে গেলে ককিয়ে ওঠে সীমা। পায়ে-পায়ে কী করে যে এতটা পথ চলে এসেছি তাই ভাবি। প্রথম দেখা কোথায় হয়েছিল মনেও পড়ে না। কেমন করে যে হৃদয়ের উত্তাপে ঘন হতে-হতে আলাপ শেষে ঘনিষ্ঠতায় জমাট বেঁধে যায় বুঝিনে। আমরা এখন দুজনে মিলে এক। জীবন যদি রসাল ফল হত তাহলে তার আধখানা কিন্তু আমিই। আমার বাকি আধখানা সীমা। এখন জোর করে কেউ যদি আমাদের বিচ্ছিন্ন করে দিতে চায় তবে সেই সুন্দর আর সুস্বাদু ফলটাই দু-টুকরো হয়ে যাবে। তার মানে সে এক করুণ, কদর্য পরিণতি। যা আমাদের কাম্য নয়।

কিন্তু সীমার চোখে চোখ রাখতে গিয়ে আমি এই প্রথম ভয়ের মুখ দেখি। কথা কইতে গিয়ে খেয়াল হল, আমার মধ্যে এতকাল নিশ্চিন্তে বিচরণ করছিল একপাল হরিণ শাবক। আচমকা বাঘের তাড়া খেয়ে এবার তারা ভরা জ্যোৎস্নার মাঠ মাড়িয়ে অন্ধকার বনের গভীরে ছুটে চলেছে। অথচ এই নিরুদ্দেশ পলায়নের পরিণাম কেউ জানে না। ইচ্ছে হল, বুঝিয়ে বলি সীমাকেই। ব্যাপারটা জলের মত তাহলে ভুল না বুঝে ও বরং সময় থাকতে সামলে নেবে সব।

'আমরা পথ ভুল করিনি তো, জীবন?'

আর্ত, আহত চোখ মেলে অপলক চেয়ে থাকে সীমা।

নানা কথায় ভুলিয়ে-ভালিয়ে আমিই তো একদিন ঘর থেকে বাইরে টেনে এনেছিলুম। তবে আফসোস হচ্ছে। চেহারা দেখে আঁতকে উঠি এখন। কী ছিল, কী হয়েছে। তুষারের মত শাদা মুখ, রক্তহীন। দেখে মায়া হল। অপরাধ যে আমারই। রাগে, অনুশোচনায় দিশে হারাবার আগেই বৃক্ষের সবুজ শাখা ও পল্লবের মত কোমল অথচ বলিষ্ঠ দুই বাহু প্রসারিত করে গাঢ় স্বরে গভীর আবেগ মিশিয়ে বলি, 'আমাকে বুঝি বিশ্বাস হচ্ছে না আর?'

শুনে লজ্জায় অবনত হল সীমা। আমার ওপরেই সুখ-দুঃখের সমস্ত ভার অর্পণ করে নির্দ্বিধায় অভিমান আর অভিযোগের সুরে বেজে উঠল যেন।

'সারাক্ষণ কি তাই ভাবো নাকি?'

ক্ষুণ্ণ মনে হল সীমাকে। ভেতরে ভেতরে ও যে খুব কষ্ট পাচ্ছে তা টের পাই। হয়তো ফেলে আসা ঘর-বাড়ি-ফসলের ক্ষেত নিরন্তর তোলপাড় করে ওকে। ওর চোখের তারায় এখনো সবুজের ছোঁয়া লেগে আছে কিনা বুঝিনে। মাঝে-মাঝে বিদ্যুতের চমক শুধু দেখতে পাই। অথচ যেহেতু শুধু স্মৃতি নিয়ে ঘরকন্না অচল, ও তাই এতবড় ঘটনাটাকেই আমার চোখের আড়ালে রাখতে চেয়ে মরিয়া। কারণ, সীমা এখনো শৈশব-কৈশোরের টুকরো-টুকরো ছবিগুলোকেই পরম মমতা-ভরে আগলে বেড়ায়। তবু জননীর মত স্নেহ দিয়ে, যত্না দিয়ে গোপন স্বপ্ন-গুলোকেই বড় করে তোলার একান্ত বাসনা কেন মরে না। ওর দিকে চেয়ে, ওর কথা ভেবে নিজেকে অক্ষম ঠেকে বার-বার। হয়তো আমরা আমাদের ভালোবাসার যোগ্য হব না কোনোদিন। এই অযোগ্যতায় দায় কিন্তু আমাদের কারো নয়। তাহলে কি ভুল? সমস্তই ভুল? কাছে আসা, কথা বলা, আপনজনে আপনে জড়িয়ে নির্নিমেষ চেয়ে থাকা—এইসব যা কিছু প্রিয়, পবিত্র ও কাম্য মনে হয়—মিথ্যে হয়ে যাবে? একে-একে শূন্যে মিলিয়ে যাবে সব? চিন্তা-ভাবনাগুলি একটার গায়ে আরেকটা পাকিয়ে যাচ্ছে কেমন।

'জীবন, তোমার বুকের ভেতরই কালি জমে আছে। একটু সাফ-সুতরো হওয়া দরকার। নইলে যে বাঁচাটাই মিথ্যে হবে।'

সীমা অভিযোগ করে। আবার সান্ত্বনাও দেয়। কেমন অসহায় মনে হয় ওকে।

ভাবসাব দেখলে রাগ হয়। মনে-মনে নিরুপায় জ্বলতে থাকি আমি। মুখ ফুটে যে দু-কথা শুনিয়ে দেবো তেমন

সাহস নেই। আমি কি কাপুরুষ? লোকে হয়তো ভাবে তাই।

কাঁটাতারের বেড়ার ঠিক ওপারেই সেই দেশ। আমাদের জন্মভূমি। তারপর খেলা-ভাঙার সেই খেলা! আমরা আর আগের মত নেই। এখন একটুতেই ফুঁসে উঠি। অভিমানে, অবিশ্বাসে মন ভরিয়ে পরস্পরকে ঘৃণা করি। ভালোবাসার নাম করে একজন অন্যজনকে চাতুরী দিয়ে ভোলাতে চাই। আর মনে-মনে তৃপ্ত হতে চেয়ে নিজেকেই চোখ ঠারি। বলি, জীবন তুমি আছো? এখনো বেঁচে আছো তো? দ্যাখো, এর নাম সুখ! এর নাম দুঃখ! আমার জইনে-খাঁয়ে দুই হাতের দুই শূন্য মুঠি মেলে ধরি। প্রাণ খুলে হাসতে পারিনে। চেঁচিয়ে যে কাঁদবো তেমন শক্তিই বা কোথায়? শুধু আমার রকম দেখে বুকের মধ্যে গুমরে ওঠে আরেকজন। তাকে আমরা কেউ-ই চিনিনে। না আমি, না সীমা। আবার হাতে-নাতে বোকামিটাই যে ধরে ফেলবো ঘটে তেমন বুদ্ধিও নেই।

কাতরগলার আকুতি ফুটিয়ে সীমা বলে, 'জীবন, তুমি কি ভাবো?'

'কিছু না......কিছু না তো!'

যেন চুরির দায়ে ধরা পড়েছি। লুকিয়ে প্রেম নিবেদন করছি আর কাকে! হঠাৎ চমকে উঠি।

'দিন-দিন বেজায় রোগা হয়ে যাচ্ছো।'

মিষ্টি হাসি হাসলে সীমা। জবাবে আমি যে কী বলি! অসহায় চেয়ে থাকি। যেন নদীর ওপারে গ্রাম ঘিরে বনান্তের সোনা রোদ। আমি যে কবি। কথাটা সীমাকে থেকে-থেকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। পাছে ভুলে যায়।

সারা গায়ে হাত বুলিয়ে পরখ করে সীমা। ভয়ংকর করুণ আর একা আর অসহায় ঠেকে ওকে। সত্যি বলতে কি, আজ অবধি ওর জন্যে কিছুই করিনি। করতে পারিনি। কথা ছিল কেউ কাউকে ঠকাবো না। স্বপ্নটাকে ঝুলিয়ে রেখেছি এতকাল। তার কী পাওয়া যায়? মনের মধ্যে জমে উঠছে ক্ষোভ, দুঃখ, হতাশা। রাগ হয়।

নিজেকে অপদার্থ ভেবে যে সমস্ত দায় থেকে দূরে সরিয়ে রাখবো, দুহাতের ধুলো ঝেড়ে মনে-মনে নিশ্চিন্ত হব, তেমন সুযোগ মেলে না। এ আমি চাইনি। এমন করে চাইনি কোনোদিন। সবকিছুই আমাদের জানান না দিয়ে ইচ্ছে, শক্তি, আয়ত্তের বাইরে চলে যায়। এখন মূক, মৌন বধিরের মত শুধু চলা, চলা আর চলা। মাঝে-মাঝে ক্ষেপে উঠি কেন যে! অকারণ রক্তাক্ত, বিক্ষত করে তুলি যে-যার আপনাকে। লোকে বলে, ধীরে ধীরে আমি নাকি পাগল হয়ে যাচ্ছি। হাতের কাছে একটা আর্শি পেলে হত। অন্তত ভালো করে মুখটা দেখে নেয়া যেতো একবার।

সীমা কিন্তু সান্ত্বনার কথা শোনায়। গাঢ় স্বরে কিসের টান! বর্ষার নাকি বাতাসের খুঁজিনে।

'জীবন, আমার জীবন! তুমি না কবি?'

'তুমি আছো বলেই আমি কবি।'

'তাহলে কথা রাখো! মাঝপথেই ভেঙে পড়লে কি আমাদের চলে?'

'আমি যে কিছুই দেখতে পাচ্ছিনে চোখে।' কান্না পেলো। ইচ্ছে হল এত-কালের পুষেরাখা গোপন ব্যথা দিয়েই সন্ধ্যার আকাশের মত সীমাকে-ও রক্তিম আবেগে ভরিয়ে তুলি।

কিন্তু ও আমাকে ধমকে উঠলো। বললে, 'মিথ্যে কথা।' তারপর খুব ঘনিষ্ঠ হতে চেয়ে গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে চাপা গলায় যথাসম্ভব গুরুত্ব ফুটিয়ে বললে, 'দেখতে না পাও তো কান পাতো। পায়ের শব্দ নিকট হচ্ছে ক্রমশ। দিন আসছে, দিন!'

উৎকণ্ঠায়, অধৈর্যে আমি আমার সমস্ত সত্তাকেই মুহূর্তে টান-টান করে তুলি।

এই শ্রাবণে সীমার বয়স হবে তেইশ।

আর আমি?

চল্লিশেই প্রৌঢ়ের মত আরেকটু নুয়ে পড়বো।

জানি, এখন খুব সাবধানে চলতে হবে আমাদের। খানা-খন্দে অন্ধকার ওঁত পেতে আছে দু'পাশেই। আশা ছিল গোপে-গোপে পৌঁছে যাবো। জোয়ার এলো আর গেলো। হাওয়া উঠলো আবার পড়লো। অথচ ঘুমের ঘোর কাটিয়ে একটিবারও সজাগ হবার কথা মনে পড়লো না। এমনি করেই হালে বসে পাল তুলে নদী পেরোবার সময় না জানি উধাও হল কখন!

সম্পর্কটা কারো কাছেই পরিষ্কার ছিল না কোনোদিন।

যে যার যেমন খুশি ভেবে নিচ্ছে নিক!

প্রতিবাদ করিনে। কারণ, প্রতিবাদ মানেই তো সময় আর উদ্যমের অযথা অপ-চয়। আমরা কেবল একজন অন্যজনকে ঘিরে তুষ্ট থাকতে চাই। চেয়েছি এতকাল। আর ওইখানেই হয়েছে কাল। অবশ্য কেউ কাউকে ঘুণাক্ষরে-ও টের পেতে দিচ্ছিনে, বুকের ভেতরে চলেছে কী তুমুল আলো-ড়ন। কেবল চোখের পাতা বুজিয়ে কোনো-মতে দিন পার করে দিচ্ছি এই ভেবে যে সুসময়ের নাগাল হয়তো আবার পাবো।

'আর কেন?'

'অনেক দিন হয়ে গেলো—তাই না?'

'চল, এইবার ফেরা যাক।'

'কোথায়?'

'একদিন যেখান থেকে এসেছিলুম।'

শুনে ঠোঁট উল্টিয়ে হেসে উঠলে সীমা। আমি অবাক চোখে চেয়ে থাকি। অভিমানে আহত হই।

মাঝে-মাঝে অধীর হয়ে উঠেছে সীমা-ও। মনে-মনে হতাশ হয়ে আক্ষেপ করেছে, আফসোস জানিয়েছে। শেষে আবেদন-নিবেদনে প্রায় ভেঙে পড়তে চেয়েছে। দিন-দিন ও কেমন অবুঝ হয়ে উঠেছে। এখন আর কিছু দিয়েই বাগ মানাতে পারিনে। ভাবি, চুপ-চাপ থাকবো। চোখ থাকতে অন্ধ, কান থাকতে বধির। যে যেমন ভাবুক, যা খুশি বলুক না কেন আমাকেই!

'এমন হলে একদিন পালিয়ে যাবো।' সীমা কেঁপে যায়।

'আর আমি? আমি তাহলে কী নিয়ে থাকি, কাকে নিয়ে?' শব্দ না করে চোখে চোখ রাখি।

'জানিনে।' মাথা ঝাঁকিয়ে ও যেন আমার কথার প্রতিবাদ করতে চাইলে। উড়িয়ে দিতে চাইলে সব। আমার দুঃখ, আমার ঈর্ষা, আমার অভিমান—পাছে কিছু চেয়ে বসি! ওকেই যদি দাবি করি আবার! বললে, 'আমার মন ভালো না। ভালো আর হবেও না কোনোদিন। এখন তাই যেদিকে দু'চোখ যায় চলে যাবো।' অঝোর ধারায় বুক ভাসিয়ে কাঁদতে শুরু করে সীমা।

আমি তো জানি, ও কেমন! ওর দুঃখ আমাকে তাই দ্বিগুণ করে বাজায়। এমন উদাস, গম্ভীর, বিষণ্ণ হবে তা ভাবিনি। আর কোনোদিন এমন করে, এত কাছে থেকে ওকে দেখার সুযোগ পেয়েছি কিনা মনে-ও পড়ে না। না জানি ওর চোখের কোলে জমে আছে কতকালের কালি। রাত্রে হয়তো ঘুমোতে পারে না। কারণ, বিচ্ছেদ। কারণ,

• অলকালকা টনিক • কিংস হেমোটোন
• কিংকোর আর্নিকা হেয়ার অয়েল
• ক্যাসিমা সিরাপ • ইউট্রোটোন
কিং এণ্ড কোম্পানীর নিজস্ব গবেষণায় প্রস্তুত ঔষধগুলি এখন আপনার সেবায় নিয়োজিত।
প্রস্তুতকারক:
কিং এণ্ড কোং
৯০/৬এ, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭
ল্যাবরেটরী:
৯০বি, পার্সী বাগান লেন, কলিকাতা-৯
GRACE/K/30/70
কিং এণ্ড কোম্পানীর সকল শাখায় প্রতিদিন সকাল ৮টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত খোলা থাকে

চোখের আগল বন্ধ করলেই দুঃস্বপ্ন এসে ভর করে। সাঁতাকারের ঘর বাঁধা এ-জীবনে আর হয়তো হবে না।

সেবার শীতের শুরুতেই পাহাড়ের মাথায় দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠলো আগুন। কাড়া-নাকাড়া বাজিয়ে গ্রাম আর শহরের দখল নিতে ছেয়ে এগিয়ে আসছিল হলুদ রঙের এক দঙ্গল মানুষ। আতঙ্কে আর অন্ধকারে কেমন করে যে কাটে দিন। সীমা কিন্তু স্থির, অবিচল। অনেকে ও আমাকে জানে, লোকে-ও ঠিক। আমি যে ওকে ছেড়ে আর কোথাও যাবো না কিংবা কারো হাতে তুলে দেবো না ওকে—মনে-মনে সে খবর পেয়ে গেছে সীমা। আমার তবু ভয়: সবচেয়ে বড় দায় যে ওকে বাঁচানো। দুঃসময়ে কথাটা বেশী করে ভাবতে হয়। কত রক্ত, কত অশ্রুপাতের বিনিময়ে যে পেয়েছি সীমাকে তার হিসেব রাখে কজন?

আগুন নেভে। পথে-ঘাটে তবু সাজো-সাজো রব। কোতোয়ালের সেপাই লোভ হুলো কুকুর। রাস্তা থেকে শিকারটাকে অর্থাৎ তুলে নিয়ে যেতে চেয়ে বসছে। এক-বার রাজার কয়েদখানায় পুরে ফেলতে পারলেই নিশ্চিন্ত। আর কী আশ্চর্য ভাবো! এতসব কাণ্ড নাকি সীমার জন্যে, সীমাকে নিয়েই! কারণ, সীমাকে ওরা সবাই চেনে, সবাই চায়। শুনে বুকের মধ্যে সে কি দারুণ দুশ্চিন্তা! সে কি তুমুল ঝড়। রাগটা খোলসা করে বোঝাতে পারিনে কাউকে। কেবল অসহায় ঈর্ষার আগুনে জ্বলে-পুড়ে

খাক হচ্ছি সারাক্ষণ। সীমা তাহলে আমার একার নয়? একা আমিই তাহলে সীমার নই?

বলতেই মিষ্টি একটা মেয়ের মত আদরে গলে গেলো সীমা। কাঁধে মাথা রেখে গাঢ় স্বরে চুপি-চুপি বললে, 'আমি তোমার! চিরদিন তোমারই থাকবো, জীবন!'

যেন বলা নয়। ঘোষণা করলে সীমা।

সন্দেহ তবু ঘোচে না। সন্তর্পণে চিবুক তুলে চোখ দেখি, মুখ দেখি। প্রাণপণে পুঁথির মত পড়ে দেখতে চাই। শেষে মরিয়া হয়ে বলি, 'কিন্তু ওরা যে বলে তুমি ওদের?'

'পাগল!' সারা মুখে কি অনির্বচনীয় হাসিই যে ফুটিয়ে তোলে সীমা। চেয়ে থাকতে-থাকতে অজান্তে আমার চোখের সামনে দুলে উঠলো ভাদ্রের ভরা নদীর জল, পাকা আউশের ক্ষেত! বাউ বনে হাওয়ার মত অনর্গল কণ্ঠ যেন সীমার। ও বললে, 'দেখতে পাচ্ছো না, কেটে-ছিঁড়ে ওরা আমার কী হাল করেছে? আমি আর কখনো ওদের হই?'

'তিন সত্যি?' আবেগে টল-মল করে উঠি। উচ্ছ্বাসে চেঁচিয়ে বলে চাই। মনে হল, আজ আমার নতুন জন্মের দিন।

'তিন সত্যি!' সীমার হাত আমার হাত ছুঁয়ে কাঁপতে থাকে এবার।

আবার একদিন।

বর্ষা না পেরোতেই আলোচনাটি কলরবে বদল হয়ে গেলো। এপারে-ওপারে শুরু হল তুলকালাম কান্ড। সবাই ভাবলে, যা-হোক একটা হেস্ত-নেস্ত হবে এবার। হল না কিছুই। কাঁটাতারের বেড়াটা যদিও এঁকে-বেঁকে গেলো খানিক, বাঁধনটা কিন্তু শক্ত হল আরো। লাভের মধ্যে এইটুকুই যা হল আর কি।

তারপর অনেকদিনের অনেক কথায় স্মৃতি হয়ে ভোর রাতের দিকে একটা মানুষ এলো। মানুষ তো নয়, আলোর পাখি। সবাই বলে, চারণ। কেউ বা বলে, পাগল। সীমা খুব আস্তে ফিস-ফিস করে বললে, 'চেয়ে দ্যাখো!' বলেই নিজের চারপাশে টেনে দিলে রহস্যের মায়াবী আড়াল।

আমি তো অবাক। এ কি! এ যে আমারই আধখানা! ওপারে কোথায় ছিল এতদিন! কেমন করে ছিল!

আগন্তুকের চোখেও ঠিক আমার মতো বিস্ময়। সে কি ভাবলে। মৃদু হেসে এগিয়ে এলো কাছে। বললে, 'তুমি?'

বলি, 'জীবন।'

শুনে উদাস, চিন্তিত হল। তার সঙ্গে, সমস্ত অবয়বে কী এক বিষাদ। সে ভাবলে। ইতস্তত করলে খানিক। তারপর অস্পষ্ট, জড়িত কণ্ঠে বললে, 'আমিও জীবন। তবে আধখানা।'

চেয়ে দেখি তার চোখে জল। টের পাই, কাছে-দূরে ফসলের ক্ষেত পুড়ছে কোথায়। নিজের ঘর আর ঘরের চারপাশে আগুনে জ্বালিয়ে নৃত্য করছে কারা। অন্ধকার রাত্রির গভীরে অদেখ হৈ-চৈ, চীৎকার শোনা যাচ্ছে। ধোঁয়ার ধোঁয়াকার চারদিক। চোখ জ্বালা করছে আমার। বুকের ভেতরে খাল-বিল-নদী-নালার সমস্ত সুখের, সুস্বাদ, জল দারুণ রোষে শোঁ-শোঁ করে শুকিয়ে খট-খটে হচ্ছে ক্রমশ। যেন আমাকে ঘিরে আমারই চারপাশে প্রতিমুহূর্তে গড়ে উঠছে খাঁ-খাঁ করা দুরন্ত এক মরুভূমি। অচিরে সে হয়তো গ্রাস করবে আমাকে!

অথচ আগন্তুক নির্ভয়, নিশ্চিন্ত, নির্বিকার। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, 'দেখতে এসেছিলুম।'

'কী দেখলে?'

'একই রকম। যেমন আমরা, তেমনি তোমরা। ঊনিশ-বিশ কোথাও নেই।' তার কথায়, প্রতিটি শব্দের গায়ে ভেজা মাটির গন্ধ।

আর এখানে? মানুষ পশু, পাখি, বৃক্ষ—তাবৎ সংসার দগ্ধ হচ্ছে। শুকিয়ে কাঠ হচ্ছে।

গলায় সাবধানতা ফুটিয়ে বলি, 'ফিরে তো যেতে হবেই। ভোর হবার আগেই চলে যেও। পাছে ওরা না টের পায়......'

তার দিকে চেয়ে থেমে যাই। শুনে সে নিথর। থম-থমে দেখাচ্ছে। সারা মুখে কালি লেপে দিয়েছে কে। হয়তো ভেতরে- ভেতরে মেঘ জমেছে কোথাও। এখুনি বৃষ্টি নামবে। অনর্গল ধারায় ভাসিয়ে নিয়ে যাবে শোক-তাপ সমস্ত জঞ্জাল। আপাতত চুপ-চাপ অপেক্ষা করা ভালো।

অনেকক্ষণ পরে ধরা গলায় বললে, 'এমন করে বাঁচা যায় না।' বলে থামলে। আমার চোখের মণি হাতড়ে বেড়ালো তার চোখ। সে চোখে অতলান্ত অন্ধকার। অন্ধকারের ওপারেই বিদ্যুতের চকিত কশাঘাত। চমক করে চমকে উঠি। ভাবি, তুমি তো আমার মত নও। আমি কেমন নিজের দুঃখকেই কৃপণের ধনের মত একা-একা বয়ে বেড়াই। যেন এতেই আমার সুখ। অথচ সুখ আর মেলে না! আর তুমি? কোথা থেকে কোথায় এসে বল তো? অন্ধকারের বাধা মানলে না, চারণ! খুঁজে-খুঁজে ঠিক তো বার করে নিয়েছো আমাকে।

'কেমন করে টিকে আছো যে ভেবে পাইনে!' ফুঁসে উঠলে আগন্তুক। মায়ের মত মিষ্টি গলায় তিরস্কার করলে আমাকেই। তারপর ঝাঁকালো সুরে নতুন খবর শোনাতে চাইলে। 'আমরা কিন্তু মেঘের নিশান উড়িয়ে দিয়েছি ওপারে। একটু পরেই ঝড়ের মিছিল শুরু হবে দেখে নিও।' বলে চুপ। খানিক থেমে হয়তো আকাশ-পাতাল অনেক কিছুই ভেবে নিলে। শেষে সন্তর্পণে মাটি আর জলের গন্ধ মাখা তার নিজস্ব ভাষায় প্রশ্ন করলে, 'আর তোমরা? তোমরা কী করবে এবার?'

জবাব আর খুঁজে পাইনে। এখন আমার গলা শুকিয়ে কাঠ। ইতি-উতি তাকাই। আবছায়ার আবডালে রাজার কোটাল না জানি লুকিয়ে আছে কোথায়। শুনতে পেলে ধড়-মুন্ডু দু'ভাগ করে ছাড়বে। নিরুপায় তাই নিজেকে শোনাবার মত করে বলি, চুপ-চাপ আমার থাকা যায় বুঝি? ভেতরে-ভেতরে আমরাও তৈরী হচ্ছি জেনে রাখো। এই দ্যাখো না আমার বুকের মধ্যে আগুন!'

যেই না বুক চিরে দেখাতে যাবো অমনি সীমা এসে হাজির। আচমকা আমাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কেমন শাসনের সুরে দুজনকেই ধমকে ওঠে।

'বোকা আর কাকে বলে! এই বুঝি প্রাণের কথা বলার সময়?' বলতে-বলতে দেখলে আমাদের। কী ভাবলে। শেষে সারা মুখে, চোখের চাউনিতে প্রসন্ন হাসি ফুটিয়ে বললে, 'শোনাবার কী দরকার? তার চেয়ে যে কাজগুলো এখনো বাকি পড়ে আছে সেগুলোই সেরে ফেলা দরকার।'

মুগ্ধচোখে চেয়ে থাকি। দেখতে দেখতে নিজেকে নদীর মত দুই দিকে ছড়িয়ে দিলে সীমা। সে-নদীর একপ্রান্তে আমি, অন্যপ্রান্তে আমারই আধখানা—আগন্তুক। দুজনার কাঁধে কোমল দুই হাত রেখে সীমা বললে, 'আপাতত এমনি একটা সাঁকো থাকা ভালো। সবার আগে হারানো বিশ্বাসটা তো ফিরে আসুক। নতুন করে পুরোনো ভালোবাসাটাই জমে উঠুক আবার।'

আমাদের কাছে-দূরে নিশ্চিন্ত চিতায় ছাই। কঙ্কাল-করোটি মাঠ। কবরের হাঁ-করা মুখে অন্ধকার। তবু সীমাকে ছুঁয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠি। আবেগে উষ্ণ, অধীর হয়ে উঠি আমরা। আর মনে-মনে শুধু ভাবি, আমাদের প্রাণ থেকে উৎসারিত আনন্দ আর আনন্দ থেকে উদ্গত অশ্রুই বন্যা হয়ে একদিন সব ছাই, সমস্ত অন্ধকার ভাসিয়ে দিয়ে দিগন্তের কাছে ছুটে যাবে। আজ কিম্বা কাল।

শীতের ঠাণ্ডায়
গরম চা সবার প্রিয়
কেনবার সময়
অলকানন্দার এই
সব বিক্রয় কেন্দ্রে
আসবেন
অলকানন্দা টি হাউস
৭ পোলক স্ট্রীট : ২ লালবাজার স্ট্রীট,
কলিকাতা-১
৫৬ চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-১২

চোরাবালি

ছবি বসু

চৌধুরী লেনের সেই বিয়ে বাড়িটায় দুজনে মুখোমুখি। মনীষা ভাবল এ সুস্মিতা না হয়েই যায় না। বাঁ গালে সেই ছোট্ট কালো আঁচিলটি ওর ধবধবে ফর্সা রঙে যা জেল্লা খুলে নিয়েছিল। কিন্তু এখন রঙটা জ্বলে গিয়ে কেমন ম্যাটে মেটে ঠেকল। তবু ও সুস্মিতাই।

মনীষা দেখল সুস্মিতার সিঁথে ফাক-ফ্যাকে শাদা, কালা আধলাপাড় সাদা শাড়ি তার পরণে। চোখের কোলে ক্লান্তির ছায়া। তখন সাহস করে বলেই ফেলে—তুমি ত সুস্মিতা তাই না?

নাম শুনে সুস্মিতা চমকে উঠল, এ নামটা আজকাল মুছে গেছে। এখন সে শুধু মা নয় মাসীমা—এমন কি দিদিমা, ঠাকুমাও। মনীষা বলে যে-মেয়েটি তার নাম ধরে ডাকছে তার কাছে সে ছিল সুস্মিতা মানে সুস্মিতা সেন।

—মনীষা মানে তুই! তার মানে তুই আমি বেঁচে আছি! আমাদের নামটার আওয়াজ কানে শোনা যায়!

সুস্মিতা মনীষাকে এক নিমেষেই চিনে নেয়। হলেই বা মনীষা বিশাল আয়তনের এক প্রৌঢ়া। পরণে লাল পাড় গরদের শাড়ী, গলায় পেল্লাই সাইজের মুক্তোর মালা। তবু মুখটায় এখনও তার কচি ভাবটুকু রয়েছে।

—কি রে হাঁ করে চেয়ে কি দেখছিস! আমার মুক্তোর মালা না এই বিশাল বপু কোনটা?

সুস্মিতা মুচকি হাসে—সবটাই। মনে ভাবছি আমি কেন আর্টিস্ট হলাম না?

—কি হত কি তাহলে?

—মানে সেদিনের মনীষা বগ্যটি যে ছিল একটি বিদ্যুৎশিখা আর আজকের দুটো ছবি পর পর আঁকতাম।

চুপ কর। এই বুড়োবয়সে আবার কাব্যি রোগ ধরল নাকি?

দুটি প্রৌঢ়া—একজন সধবা একজন বিধবা, দুজনের মুখেই খই ফুটছে।

একেবারে করিডরের মুখে সবাকে তাদের গুঁতো খেতে হয়।

—আপনারা প্লিজ একটু জায়গা দিন।

—দেখুন এখানে ভিড় করবার জায়গা না।

—কনের বাড়ির সবাই আসছে, রাস্তা দিন

মনীষা আর সুস্মিতা সরে এল

পাঁকিলের বারান্দায়, আর একটু এগোলেই বির্পাড়। সেখানে বসে বসেছে। কিন্তু ঠিক খ্ঁজে খ্ঁজে ওদের আবিষ্কার করল একটি কমবয়সী বউ, সুমিতার দিকে চেয়ে বলে, অবাক কান্ড, মা, আপনি এখানে! দেখ দিকি আমি সারা বাড়ি খ্ঁজে খ্ঁজে মরছি।

—কেন খ্ঁজছ আমার বৌমা? সুমিতা বউটির দিকে চেয়ে সস্নেহে হাসে।

—বলছি কি খোকন বড্ড বিরক্ত করছে। ওকে নিয়ে বাড়ি যাচ্ছি। আপনি মেয়ের সঙ্গে পরে আসবেন। সুমিতার মুখটা প্রসন্ন হাসিতে ভরে ওঠে। এখানি বাড়ি থেকে এলেই হয়েছিল। বলে কতদিন পর মনীষা মানে তার সেই হারানো জগত, ছেলেবেলা, যেটার সাক্ষী আজ আর কেউ নেই। একমাত্র মনীষা ছাড়া সেদিনের মানুষ।

—বৌমা এঁকে প্রণাম কর। আমার ইস্কুলের বন্ধু।

—ওমা তাই বুঝি।

বৌটি এগিয়ে এসে প্রণাম করে সকৌতুকে চায়।

—ভারি মিষ্টি গলা বউমার, জান মনীষা। অতুলপ্রসাদের গান যা গায়...। শিল্পী বাপের বাড়ি, তারই গুণের মেয়ে আমার বৌমাটি।

—সবসেরা জিনিস ত আজকাল কিনছে। হাজার হলেও রাজধানী ত!

মনীষা এবার কুট কাটে। তারপর হঠাৎ যেন তার হুঁশ হয়—আচ্ছা তোর এখনও তেমনি গানের গলা রয়েছে?

বৌয়ের চাপা হাসি ভরা মুখের দিকে চেয়ে সুমিতার লজ্জা হয়। আঃ এ আবার কী বলে বসে। বলে—বৌমা তুমি খোকনকে নিয়ে বাড়ি যাও। আমি পরে যাব'খন।

কিন্তু মনীষা অত সহজে ছেড়ে দেবার পাত্রী নয়—সেই একবগ্গার মত বলে চলে—তোর বউয়ের গলা আর যার গলাই থাকুক না কেন, তোর গলার পাশে আর কারও গলা দাঁড়াতে পারত! সাধে কি আর সেবুদা তোর জন্য পাগল হয়েছিল!

—কার কথা বললি? সুমিতা কেমন থতমত খায়।

—কেন সেবুদাকে ভুলে গেছিস। ধন্যি মেয়ে! তাহলে আমাকেই বা চিনলি কি করে?

সুমিতা স্মৃতি হাতড়ে হাতড়ে দিশেহারা হয়ে যায়—দিনাজপুরের সেই সবুর ইস্কুলে দুই বন্ধুতে এক সঙ্গে পড়তে যাওয়া। কতই বা বয়স হবে—বছর তেরো নয় পনের। জেলার মিউজিক কনফারেন্সে সুমিতা সেন পর পর তিন বার ফার্স্ট প্রাইজ পেয়েছিল, কথাটা গল্পচ্ছলে বললেও তার নাতি খোকন ভাববে ঠাকুমা বুঝি রূপকথার গল্প শোনাচ্ছে। কিন্তু সেটা যে গল্প নয় সত্যি তার একমাত্র সাক্ষী এই মনীষা, কিন্তু সেবুদা...।

এতক্ষণে মনে পড়ে সেবুদা মানে সেবেশ দত্ত। উকিলপাড়ার লাইব্রেরীঘরের পাশে ছোট্ট ঘরখানায় থাকত একটি কমবয়সী ছেলে। লোকে বলত স্বদেশী করত বলে ইনটার্ন করে রেখেছে। হপ্তায় হপ্তায় থানায় তাকে হাজিরা দিতে যেতেই হবে।

মনীষা বেপরোয়া মেয়ে। সেই বলে—জানিস সুমি, সেবুদা তোর গানের প্রেমে মানে তোর প্রেমে পড়েছে। বাপস কী কথা, গায়ে আলোয়ান জড়ান সেই নিরীহ চেহারার ভালোক মানুষটা সত্যি সুমিতার গান শুনতে আসত......

—কি যে মনে পড়ছে মা—এ তান কথার কি দরকার ছিল বলত?

—তান আবার কি! একটু আস্তে কথা বল দিকি, চারিদিকে সব চেনাজানা মানুষ, শুনলে বলবে কি?

—বলবে আবার কি? এখনও কি সবার শাসন মেনে চলতে হবে?

—তা হয়ত চলবে না তবে এখন ত আর শাড়ী বই কারও চোখের আরাম নই আমরা।

মনীষা ফোঁস করে নিশ্বাস ছাড়ে। সুমিতা ওর মুখের দিকে চেয়েছিল এক-দৃষ্টিতে। একটু থেমে বলে—খুব হচ্ছে বেশ বড় ঘরেই বিয়ে হয়েছে তোর। বেচারী প্রশান্ত। তোকে কী বা দিতে পারত! ওর চিঠিটা তোর বাবার হাতে পড়ায় কী কান্ডটাই না হল।

—কি আর হল! বাবা আমাকে ডেকে পাঠালেন। যতক্ষণ আমার কাছে রোজ অঙ্ক কষতে আসবে, অঙ্ক কষলে মনের অনেক ঘোর কেটে যায়।

মনীষা ওর কথা ভারি বোকা মুখটা নাড়িয়ে বলে—সেইজন্যেই ত আমার অঙ্ক দু চক্ষের বিষ।

টুকটুকে লাল বেনারসী শাড়ী-পরা উজ্জ্বল একটি মেয়ে এসে মনীষার গা ঘেঁষে দাঁড়ায়—মাগো তোমাকে কখন থেকে সারা বাড়ি খুঁজছি। জান মিতুদি শ্বশুর-বাড়ি থেকে যা সব প্রেজেন্ট পেয়েছে।

উল্টে মা বলে—তুমি বলছ মিতুদির মত তোমাকে চটপট বিয়ে দিতে, তাই না? সে আমি মোটেই দেব না। মেয়েটি কপট রাগের ভঙ্গীতে বলে—তাই বলেছি বুঝি। তোমার বড় বাজে কথা বলা স্বভাব।

—তোমার মার এ অভ্যাসটি জন্মগত, এমন গল্পকথাই যে বানাতে পারে।

—তাহলে বুঝুন আমার বাবার হাল, মেয়েটি কল করে বলে বসে।

—বাঃ বেশ সপ্রতিভ ত তোর মেয়ে মনীষা।

—আপনারা বুঝি ছোটবেলার বন্ধু?

—কি করে বুঝলে?

—নইলে এত বয়সে হাসিমুখে চেনার কেউ কি আর অমন তুই তুই করে কথা বলে?

দুই বন্ধুই কথা শুনে জোরে হেসে ওঠে।

—ধন্যি মেয়ের মা হয়েছিস তুই। সুমিতা বুঝি তারিফ না করে আর পারে না।

কপট গাম্ভীর্য নিয়ে মনীষা বলে—তুমি যাও দিকি বাপু। তোমার ঐ গন্ডা-খানেক বয় ফ্রেন্ড না আর কিছু, তাদের সঙ্গে বক বক কর। আমাকে একটু আমার ছোটবেলার বান্ধবীকে নিয়ে থাকতে দাও।

—তথাস্তু।

মেয়েটি বুঝি পালিয়ে বাঁচল।

তারপর সুমিতা আর মনীষা পাশা-পাশি খেতে বসল।

ওদের আসেপাশে কত চেনা-জানা মানুষ, কেউ মাথা নাড়ে, কেউ দু-চার কথা বলে চলে যায়। আসল কথা সবাই বোধহয় টের পেয়ে গেছে যে দিনাজপুরের সেই কলমতলার দুই সখী আজ পরস্পরকে কাছে পেয়ে বিশ্বজগৎ ভুলে গেছে। ওরা দুজনেই অতীতের রাজিশাতে ডুব দিয়েছে তাই বর্তমান [illegible]

ভোট দেব কাকে?

নির্বাচনের নামে দলীয় রাজনীতির রেষারেষি ও ভন্ডামীতে বিভ্রান্ত সাধারণ মানুষের এই ঐতিহাসিক প্রশ্নের উত্তর দেবে

অমিতা রায়

অভিনব উপস্থাপনসহ বাস্তবাট্য

হারানো চিঠি ৩·০০

৪ অঙ্ক ॥ ৩ সেট ॥ ১৮টি স্ত্রী চরিত্র ॥

॥ অন্যান্য নাটক ॥

দুই রাত্রি	নীহাররঞ্জন গুপ্ত	৩·০০
অভিযাত্রা	সুশীল মুখোপাধ্যায়	৩·০০
আজকের নাটক	সুশীল মুখোপাধ্যায়	৩·০০
বাঁধ	সুশীল মুখোপাধ্যায়	৩·০০
বাকি ইতিহাস	বাদল সরকার	৩·২৫

—বিস্তারিত নাটকের তালিকার জন্য লিখুন—

গ্রন্থপীঠ, ২০৯বি, বিধান সরণি, কলিকাতা—৬

CENTRAL LIBRARY

সুমিতা ত ভুলে ভুলেও জিজ্ঞেস করতে পারত—

- হ্যাঁ রে মনীষা, ক' ছেলেমেয়ে তোর?

কিংবা মনীষাও ত সুমিতাকে বলতে পারত—

—কর্তা তোর জন্যে কি রেখে গেছেন রে। ক্যাশ টাকাই বা কত। ওমা ক্যাশ নেই, না রইল, অমন দু দুখানা কলকাতার বাড়ি। হ্যাঁ রে তাড়া কত পাস মোটমাট।

ওরা কিন্তু সেই ছেলেবেলার স্কুল-পালান একটি দিনের গল্পে মশগুল।

মনীষা বল্লে—জানিস সুমি, তুইও ত কত পার্টি আর নেমন্তন্ন খেয়েছিস, কিন্তু মনে আছে সেই হাঁসখালি চরে চড়ুই-ভাতির কথা।

—হাঁসখালি চর তাই না? সেই যেখানে চোরাবালিতে তোর কোমর পর্যন্ত গেঁথে গিয়েছিল।

—তারপরটা মনে পড়ে?

—ইস্, পড়ে না আবার? প্রশান্তই ত তোকে কোলে করে টেনে তুল্ল।

হাসতে হাসতে মনীষার চোখে জল এসে পড়ে।

সুমিতা বল্ল—আসল সবটাই তোর ছল, তুই জানতিস প্রশান্ত আসবেই, নয়ত ওকে পরখ করতে চেয়েছিলি এই ত?

মনীষা বল্লে—হয়ত তাই, তবে আজকের মন নিয়ে সেদিনের অনুভূতিটা স্পর্শ করতে পারছি না।

উল্টো দিকের সারিতে কয়েকটি কলেজের মেয়ে খেতে বসেছিল, ওরাও নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি, খুনসুটি করতে করতে একজন এদের দিকে চোখ ঠেরে বলে—দুই বুড়ীর গল্প হচ্ছে দেখছিস?

একজন বলে—কি রকম কাঁদো কাঁদো মুখ করেছে দেখ,—নির্ঘাৎ বউ ছেলের হাতে নাকাল হওয়ার কথা।

—মোটেই না, বাতের ব্যথার কষ্ট, রাতভোর ঘুম না হওয়া, মেয়েগুলি খিল-খিল করে হেসে ওঠে। ওদের হাসির ছোঁয়াচ এদিকেও লাগে।

—বাস্তবিক সুমি দেবুদার মত ঐ ভীষণ মানুষটা তোর সামনে কি রকম বোকা বোকা হয়ে যেত।

সুমিতা প্রথম চোটে মনে পড়ায় খুব হাসল। তারপর হাসি থামিয়ে গম্ভীরভাবে বলে—আসলে আমরা খুব খারাপ ছিলাম রে, অতবড় মানুষটা, কত তাঁর দেশপ্রেম, কত ত্যাগ সে কথা না ভেবে নিজেদের মত করে দেখেছি।

মনীষা ওর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলে—যেন কথা সাজিয়ে মালা গাঁথতে জানে না সেটাই ও'র মস্ত অপরাধ তাই না?

কিন্তু এবারে উঠতেই হল, খাবার জায়গা ছেড়ে সবাই নেমে যাচ্ছে। নতুন ব্যাচ বসবে। মোতলার মস্ত হলঘরটায় ওরা দুজন দু দরজা দিয়ে ঢুকে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। তখন সেই চোরাবালির জগৎটা যেন ক্রমশই সরে যেতে থাকল।

—বাবা ডাকছে মা, চল এবার বাড়ি ফিরবে না?

—হ্যাঁ যাচ্ছি। একবার বলে আসি।

দুজনেই আবার মুখোমুখি হল।

—জানিস সুমি, দেবুদা আর নেই। বছর পাঁচেক হল মারা গেছে।

—তাই বুঝি। আর প্রশান্তর খবর জানিস না বুঝি? কি রকম যেন ঘরছাড়া মানুষটা। ঘরসংসার করল না, শুনেছি পন্ডিচেরীতে নাকি বছর দশেক হল চলে গেছে।

—তা হবে।

ভিড়ের ধাক্কায় ওদের ভারি শরীর দুটো দুদিকে ছিটকে পড়ল।

সুমিতার ছেলে তাকে পেছন থেকে ধরে ফেলে। বলে—ঐ ত তোমার জুতো, তবে কি খুঁজছ এখানে?

সুমিতা বিড় বিড় করে বলে—জুতো খুঁজব কেন? খুঁজছি মনীষাকে। কি যে শুনেছে মেয়েটা। দেবুদা মারা যাবে কেন? নির্যাতিত রাজনৈতিক কর্মী দেবেন দত্ত দশেক সাঁটে 'চরণপদ্ম' জুতোর দোকান খুলেছে। সেখানে দিব্যি বহাল তবিয়তে রয়েছেন দেবুদা। উপসংহারটা শেষ করে আর বলাই হল না মনীষাকে।

গাড়ীতে উঠতে যেয়েও খানিকটা গুম মেরে দাঁড়িয়ে থাকে মনীষা।

মেয়ে তাড়া দেয়—নেমন্তন্নবাড়ি থেকে যে একেবারে নড়তে চাও না মা। এখনও গল্প শেষ হয় নি বুঝি?

মনীষা আমতা আমতা করে। বলে, একটা কথা বলা হল না।

কি কথাটা সেটা এদের কারও প্রয়োজন নেই। কিন্তু সুমিতাকে সেটা জানান হল না।

প্রশান্ত আসত মনীষার ছোট বোনের জন্য, ওদের ইয়ের কথাটা ত সুমিতা জানে না। তাই হাঁসখালির ঘটনাটার অত রং চড়িয়েছিল।

প্রশান্তর সঙ্গে ওর বোনের বিয়ে হয়। এখন ওরা দিল্লীতে। আসছে কাল বড়দিনের ছুটিতে প্রশান্তরা আসছে কলকাতায়। এ-কদিন ওদের কাছেই থাকবে ওদের পরিবার।

কিন্তু সেই মেটে মেটে রং, কালো-আঁসিল আর আধময়লা কালা পাড় শাড়ীর তারি মানুষটিকে আর দেখতেও পেল না মনীষা।

মঞ্চ সাফল্য ও বাংলাদেশে আলোড়নকারী

২ খানি নাটক

ধনঞ্জয় বৈরাগীর

আর হবে না দেরী

॥ ২·৫০ ॥

এক পেয়ালা কফি

॥ ৩·০০ ॥

গ্রন্থ বিকাশে পাবেন আজই পুস্তক তালিকার জন্য লিখুন

রূপালী মাছ

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

রূপক কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল লতার দিকে। লতা যেন একটু অন্যমনস্ক। লতা কোনের একটা টেবিলে বার-বার তাকাচ্ছে। রূপক, অনিমেষ এবং অবনী কফির কাপে চুমুক দিচ্ছে। ওরা নিজেরা গল্পে মশগুল। লতা একটা মটন ওমলেট নিয়ে বসেছে। ওমলেট খাবার পর সে কফি খাবে। রূপক প্রথম খেয়াল করেনি, পরে দেখল লতা উঠতে চাইছে।

অনিমেষ বলল, এত তাড়াতাড়ি!

লতা ঠাট্টা করে বলল, ঘরের বৌ বাইরে কতক্ষণ থাকে। বলে একটু হাসল।

লতা এবং রূপক তিনটে ছটার শো দেখে বাবার পথে একটু ঢুমেরে যাচ্ছে। রূপক বলল, দেখি কে কে আছে। লতার আসার ইচ্ছা ছিল না। সে তার কলেজ পালিয়ে এখানে অনেকদিন বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে ঘন্টার পর ঘন্টা আড্ডা দিয়েছে। এখন আর এসব ভাল লাগে না। তবু রূপকের অনুরোধে কিছুক্ষণ এখানে বসে যাওয়া। অনেকদিন পর যখন এদিকটাতে আসা গেল তখন একটু বসে যাওয়া যাক। রূপক পুরানো আড্ডায় এসে দেখল অনিমেষ, অবনী যথানিয়মে এখনও আসছে। রূপকের বিয়েতে ওরা বরযাত্রী গিয়েছিল। সুতরাং লতা ওদের যথেষ্ট চেনে। তবু কেন যে সে এসে এসেই এমন অস্বস্তি বোধ করছে রূপক প্রথম প্রথম বুঝতে পারেনি যেন।

রূপক বলল, তা হলে উঠি রে।

অবনী বলল, হাঁ তাড়াতাড়ি উঠে পড় বাপু। রাত অনেক হয়ে যাচ্ছে।

অবনী একটু ফাজিল গোছের ছেলে। বরাবরই সে এমন থেকে গেল। রূপক বলল, দাদা তোমার আর বয়স হল না।

—বিয়ে না করলে বয়স হয় না।

—এবারে করে ফেল চাঁদ। বলে সে লতার দিকে তাকাল। এবং ওঠার চেষ্টা করতেই মনে হল লতা কোনের টেবিলটা অপলক দেখছে। চার পাঁচজনের একটা টেবিল। লতা যে কাকে দেখছে বোঝা যাচ্ছে না।

রূপক নেমে আসার সময় বলেছিল, তুমি কি দেখছিলে!

—কিছু না।

ওরা একটা ট্যাক্সি পেয়ে গেল। খুব লাক। রূপকের মনে হল ট্যাক্সি চলতে থাকলে লতা ওকে সব বলবে।

কিন্তু ট্যাক্সিতে লতা সারাক্ষণ কোন কথা বলল না। যেন সে কি ভাবছে। শরীরটা সিটে এলিয়ে দিয়েছে। ভাবনাটা মনে হচ্ছে বড় দুর্ভোগের। মাঝে মাঝে রাস্তার আলো এসে মুখে পড়লে বড় বিবর্ণ দেখাচ্ছে মুখখানা। এমন মুখ দেখে রূপক লতাকে কোন কিছু আর জিজ্ঞাসা করতে পারল না।

সিঁড়ি ধরে ওঠার সময় লতা মানুষটাকে [illegible] মনে করার চেষ্টা করল।

মানুষটা বার বার চোখ তুলে সকলের অলক্ষে ওকে দেখছিল। লতা ওর দিকে তাকালে সে চোখ নামিয়ে নিয়েছে। বেশ সুন্দর ছাঁটা গোঁফ। মসৃণ গাল। একটা সাদা রঙের হাফসার্ট গায়ে। সেই বড় বড় চোখ। এবং মানুষটা বড় বেশি উঁচু লম্বা।

খেতে বসে রূপক বলল, তোমার শরীর খারাপ।

—না।

—খাচ্ছ না। মুখ গোমড়া করে রেখেছ।

লতা জবাব দিল না। সে পাখাটা ফুল স্পীডে চালিয়ে দিল।

রূপক আর কিছু জানতে চাইল না। মাথার কাছে জানালাটি বন্ধ ছিল, সেটা সে খুলে দিল। ছোকরা চাকরটা ঘুমোতে চলে গেছে। লতা খেতে বসে খুব অল্প খেয়েছে। মটন ওমলেট খেয়ে সে দুটো চেকুর তুলে খাব না এমন বলেছিল, কিন্তু রূপকের পীড়াপীড়িতে সে দুটো মুখে দিয়েছে।

রূপক জানালার পাশে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাল। ঠিক ঠিক কিছু জবাব দিচ্ছে না লতা। ওর ভিতরটা খচ-খচ করছিল। —তুমি কোনের টেবিলটাতে কাকে দেখছিলে!

লতা যেন ধরা পড়ে গেছে এবার। সে বড় বিরক্ত বোধ করল এবং সে বেমালুম অস্বীকার করার চেষ্টাতে কোনরকমে যেন বলল, কাকে আবার দেখব?

রূপক হাসতে হাসতে বলল, ঠিক আছে বলতে হবে না। তবে তুমি আমার কাছ থেকে কিছু লুকোচ্ছ।

—আমার ভাল লাগছে না রূপক। এবার আমি শুয়ে পড়ব।

রূপক জানে এখন সে লতাকে ক্ষেপিয়ে দিতে পারে। আসবার সময় সে কোনের টেবিলটাতে আড়চোখে বার বার তাকাচ্ছিল। এটা অবশ্য কৌতূহলবশতঃও হতে পারে। কতরকমের মানুষ আছে—লেখক, চিত্রকর, অভিনেতা। একবার লতা কেন বন্ধুর সঙ্গে এসে বড় এক অভিনেতার সঙ্গে দুটো কথা বলেছিল, অটোগ্রাফ চাইলে তিনি বলেছিলেন, বাড়ি আসবেন। অবশ্য লতা পরে তার বাড়ি আর যায়নি। অনেকদিন দুজনে শুয়ে শুয়ে ইউনিভার্সিটির জীবনের দুটো একটা এমন অভিযানের গল্প বলে রূপককে চমকে দিতে চেয়েছে। রূপক তখন ঠোঁটের কোনে হাসত। —আমি যে কোথায় ছিলাম তখন রাণী। বলে জড়িয়ে ধরেই দুগালে বাচ্চা ছেলের মতো চুমু খেত।

লতা বলত, কি দস্যিপনা হচ্ছে।

রূপক আরো জোরে এবার কোমরে সাপ্টে ধরত। তারপর কামড়ে কামড়ে লতার লাবণ্যময় শরীরে অজস্র ক্ষত সৃষ্টি করতে চাইত।

লতা বলত, আমি আর তোমার সঙ্গে শোব না।

—কি করবে?

—বাবার কাছে চলে যাব।

— বলবে গিয়ে বাবাকে।

—বাবাকে সব বলে দেব। বলব, কি একটা গুণ্ডাবদমাসের সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়েছ। রাত হলেই ওর কেবল দস্যিপনা জেগে ওঠে। অস্থির ক্লান্ত হয়। আমি আর যাব না। তোমার কাছে থাকব। বলে দুজনই তারপর হা-হা করে হাসত। কিন্তু আজ কি করে যে হাসানো যায় লতাকে রূপক ভেবে পাচ্ছিল না। কারণ রূপকের ভিতর আবার সেই দস্যিপনাটা জেগে উঠেছে। যেমন বিয়ের কিছুদিন পর, শোওয়ার আগে লতাকে অনুরোধ করত, রাণী তুমি দেবী হয়ে যাও, আজও তেমন বলার ইচ্ছা। প্রথম প্রথম এমন বললে, লতা বলত, ওমা কি অসভ্য!

অসভ্য বললেই রূপক ছুটে যেত। এবং পেছন থেকে সাপ্টে ধরে বলত, কি এখন কি হবে?

—আর বলব না।

—ঠিক।

—ঠিক।

তারপর দুহাতে মুখ-চোখ ঢেকে বলত, আমার ভারি লজ্জা করছে রূপক।

—আমার কাছে তোমার আবার লজ্জা কি! তুমি তো আমার কাছে দেবী হতেই এসেছ। তোমার বাবা বলে দেননি, ও যা যা বলবে তাই করবে। দেবী হতে বললে দেবী হবে।

—কি জানি বাপু, তুমি যে কি বল না।

রূপকের বলতে ইচ্ছে হত, ন্যাকা। কিন্তু তা না বলে বলত, রাণী তোমাকে ভীষণ মিষ্টি লাগছে দেখতে।

এরপরই লতার কি উৎসব। আজও সে লতাকে যা বললে খুশী হয়, যেমন সম্বোধনে রাণী বলা, এবং তুমি কি সুন্দর এসব বলে দেখা, খেলবে নাকি দেবী দেবী খেলা, অনেকদিন খেলাটা খেলছি না, ভুলে যাচ্ছি। এদিনে খেলাটা জমবে ভাল। বলে সে বলল, রাণী তুমি কতদিন দেবী হওনি বলত। আজ আমার সামনে এসে একটু দেবীর মতো দাঁড়াবে?

লতা হাই তুলল। লক্ষী রূপক। আজ শুয়ে পড়। আমার শরীরটা ভাল লাগছে না। কাল থেকে আবার সকালে স্কুল। আমাকে সকাল সকাল উঠতে হবে।

—না রাণী তুমি অমন করো না। তুমি আমার সামনে কতদিন দেবীর মতো দাঁড়াওনি বলত।

—কাল দাঁড়াব।

—কাল বললেই কালে পায় তোমায়। তুমি আর দাঁড়াও না।

লতার আবার হাই উঠল। কোথায় যে সে দেখেছে মানুষটাকে। বড় বড় চোখে সে লতাকে দেখছিল। সে কিছু পুরোনো ছবির মতো স্মৃতির ভিতর তাকে মনে করার চেষ্টা করছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় ওর যাকে যাকে ভাল লেগেছিল, এই যেমন রমেশ, অনিন্দ্য আর দেবজ্যোতি, ওদের একজন কেউ কি হবে—কিন্তু না, ওরা ছিল কালো একটু বেঁটে, রমেশের চুল ব্যাকব্রাস করা। ওর চোখ এত বড় ছিল না, এবং ঠোঁট এমন তীক্ষ্ণ নয়। রমেশ রেস্তোরাঁতে একা পেয়ে একবার চুমু খেয়েছিল লতাকে—ঠোঁটে ওর তেমন তীক্ষ্ণতা ছিল না। যে মানুষটা চুরি করে তাকে দেখেছে, সে মানুষের ঠোঁটে প্রবল আকর্ষণ আছে। ঠোঁটে না চোখে, না চিবুকে না উঁচু লম্বা এবং বলিষ্ঠ মানুষ বলে এমন মনে হচ্ছে, সে এখনও তা বুঝতে পারছে না। ওর কিছুই এখন ভাল লাগছিল না। রূপক নীল আলো জেলে বসে আছে—সে এখন দেবী হয়ে যাবে, না আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়বে বুঝতে পারছে না।

রূপকের সিগারেট খাওয়া শেষ। বাইরে এখন জ্যোৎস্না উঠেছে। ক্রিম রঙের পর্দা জানালায়। নিচে লনের ঘাসে একটাও পাতা পড়ে নেই। ওর এই প্রাচুর্যের ভিতর লতা মাঝে মাঝে বড় হাঁপিয়ে ওঠে। সে একটা মিশনারি স্কুলে সেজন্য কাজ নিয়েছে। অথচ বিকেল হলেই লতা আর কোথাও যেতে পারে না। সেজেগুজে রূপকের জন্য বসে থাকতে হয়। সে সোজা অফিস থেকে সিঁড়িতে কোন শব্দ না করেই উঠে আসে। তারপর যথাক্রমে তুকে সামান্য যা কিছু খাবার করে বোঁকে নিয়ে বের হয়ে যায়। এইভাবে জীবন বেশ কেটে যাচ্ছিল লতার—আজ কোথকে একটা উটকো লোক এসে ওকে এমনভাবে পীড়ন করতে থাকল বুঝতে পারল না। চোখ দুটো বড় চেনা চেনা মনে হচ্ছে।

রূপক বলল, আর কতক্ষণ দেরি।

—তুমি আজ রূপক নীল আলোটা নিভিয়ে দাও। এসো না বসে বসে গল্প করি। আমার কি তোমার কাছে চিরটাকাল দেবী হয়ে থাকার কথা! আমার কি অন্য কোন দাম নেই তোমার কাছে।

—তা হলে আমি দেবতা হয়ে যাচ্ছি রাণী, বলে সে লতার দিকে এগুতে থাকলে, লতা জানালায় উঠে গেল। রূপককে অন্যমনস্ক করার জন্য বলল, দেখ আকাশে কি সুন্দর চাঁদ উঠেছে। এবং তখনই একটা ওক উঠে এল লতার।

—তোমার কি হল?

—তোমাকে বার বার বললাম, মটন ওমলেট খাব না, খেয়ে এখন শরীর কেমন গুলোচ্ছে।

—তুমি এত হজম করতে পার আর সামান্য মটন ওমলেট হজম করতে পারবে না কি করে জানব।

রূপককে লতা কিছুতেই বশে আনতে পারছে না। সে ভাবল আর কথা বলবে না। চুপচাপ জানালায় দাঁড়িয়ে থাকবে।

ওদের দুটো খাট। মাঝখানে একটা পিতল কালারের ছোট কাঠের টিপয় এবং তার উপর টেবিল লাইট। ওরা দুজন দু খাটে শোয়। রূপকই প্রয়োজনে নিজের খাট ছেড়ে চলে যায়। প্রথম রাতে খেলাটা ভাল না জমলে সেটা ভোর রাতের দিকে পুষিয়ে দিতে হয়। আজ লতা কোনরকমে লুকিয়ে-লুকিয়ে নিজের খাটে এসে শুয়ে পড়েছে। একটা ভয় আছে ভিতরে এখনও। ভোর রাতের দিকে উঠে চলে আসতে পারে রূপক। সে ভয়ে ঘুমে যেতে পারল না। সে দেখছে রূপক এখনও শোয়নি। একটা বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছে। লতা এবার বলল, রূপক তুমি তো দেখলে আমার শরীরটা ভাল নেই। শরীর গুলোচ্ছে। তুমি জোর

রাতে কিন্তু আমার খাটে এস না। এলে কিন্তু সকালে ঘুম থেকে উঠতে পারব না।

—একটা বড়ি খেয়ে নাও। জল হয় অম্বল হয়েছে। বলে রূপক এক গ্লাস জল নিজেই নিয়ে এল। সে একটা বড়ি ছিঁড়ে দিল। শিয়রে বসে মাথায় হাত বুলিয়ে দেবার সময় বলল, লোকটা কে?

—লোকটাকে আমি চিনি না রূপক। কেন যে সে আমার দিকে এমনভাবে তাকাচ্ছিল।

রূপক দেখল, লতার মুখ খুব বিবর্ণ দেখাচ্ছে। সে বলল, তোমার কি ভয় করছে!

—না।

—ভয় করলে আমার খাটে এসে শুতে পার।

—আমার ভয় করছে না রূপক। কারণ লতা জানে ওর পাশে শুলে যতক্ষণ সে ওকে নিয়ে হাঁস মুরগি পুষতে না পারবে ততক্ষণ কেবল খোঁচাবে। ওকে ঘুম যেতে দেবে না।

রূপক বলল, আমি কিছু করব না। তুমি ইচ্ছা করলে আমার পাশে শুতে পার।

—এ ঠিক আছে রূপক। আলো নেভালেই আমি ঘুমিয়ে পড়ব।

বস্তুত লতার আর কথা বলতে ইচ্ছা হচ্ছে না। রূপক তার স্বামী এ মুহূর্তে ভাবতে কষ্ট হচ্ছে। বরং মনে হচ্ছে ওর যেন কার কাছে যাবার কথা ছিল, সেখান থেকে রূপক ওকে ধরে নিয়ে এসেছে।

আলো নিভিয়ে দিলে এক ফালি জ্যোৎস্না এই ঘরে ঢুকে বড়টা অদ্ভুত রহস্যময় করে দিয়েছে। রূপক ঘুমোচ্ছে। ওর নাক ডাকছিল। লতা ঘুমাতে পারছে না। ওর মাথা ধরেছে। সেই মানুষটা কে? ও কি রাণি মাসির ভাসুরপো অমর। অমরের মুখ এমন সুন্দর নয়। অমরের চোখ ছোট। ভ্রূ অমরের এত টানা নয়। সে এ-ভাবে তাকাতে জানে না।

রাণি মাসির মেয়ের বিয়ের দিন, ভোর রাতের দিকে লতা বাসর থেকে বের হয়ে উপরের সিঁড়ি ভাঙছিল। মনে হল কেউ দাঁড়িয়ে আছে ছাদে। আর না ঘুমিয়ে ছাদে পায়চারি করে সকাল করে দেবে ভেবে-ছিল—নাকি সে অমরকে খুঁজতেই সেখানে সেদিন উঠে গেছিল—সারা দিন মানুষটা তাকে হাসিয়েছিল এবং চোখের দৃষ্টিতে সামান্য ভালবাসা ছিল যেন। ছাদে উঠে সে দেখল সেই মানুষই দাঁড়িয়ে আছে। কেউ দেখে ফেলতে পারে। বুকটা লতার কাঁপছিল, তবু সে কেন যে পাগলের মতো সে রাতে ওর পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলেছিল, খুব পরিষ্কার আকাশ তাই না!

—অমর বলেছে, না। খুব পরিষ্কার না। একটু ধোঁয়া।

—আপনি খুব কথা জানেন।

—যা সত্যি তাই বললাম লতা।

লতা আর হাসতে পারে নি। সে কেমন বিষণ্ণ হয়ে গেছিল। যেন ওর বলার ইচ্ছা ছিল, অমর তুমি জোর করে এখন কিছু করতে পার না!

লতার ঘুম না পেলে যা হয়, কেবল হাই ওঠে। জলতেষ্টা পায়। সে, অার সে যে জীবনের উঠতি বয়সে কাছে এসেছিল তাদের মুখ স্মরণ করার চেষ্টা করল। অনিল, অমল, সুরেশ এবং সেই ছেলেটি যে দেখা হলেই কলেজের গেটে বলত, লতা আমি গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছি, তুমি কখন আসবে। লতা এমন ইতর কথাবার্তা সহ্য করতে পারত না। একা পেলেই ওর ক্লাসের ছাত্রটি ওকে এ-ভাবে টিজ করত। লতা সেজন্য যতটা পারত বান্ধবীদের সঙ্গে সঙ্গে থাকত। কলেজে আসার সময় সে অলকাদের বাড়ি হয়ে আসত। সে এবং অলকা সঙ্গে থাকলে কুমার চৌরাস্তার কোণে হাসত। অলকা বলত, স্যারকে বলে দিস না কেন।

লতা বলেনি। কারণ জানে এ-ভাবে বোকামি করার অর্থ সারা কলেজে সে ট্রেড মার্ক হয়ে যাবে। সে কিছু না বলে বরং একদিন ওকে একা কাছাকাছি পেলে বলেছিল, গাছটা কি গাছ?

—গাছটা কদম ফুলের গাছ।

—গাছে ফুল ফুটেছে?

—তুমি আমি একসঙ্গে দাঁড়ালেই গাছটা বলেছে ওর ফুল ফুটবে।

—তা হলে তুমি নিজের জন্য বলছ না কুমার?

—না। গাছটার জন্য বলছি। গাছটাতে কতদিন থেকে ফুল ফোটেনা। আসবে নাকি।

লতার কিন্তু ওর কথাবার্তা তখন আর কেন জানি তেমন অস্বস্তিকর মনে হয়নি। বরং সে মনে মনে ওর চোখে মুখে সামান্য ভালবাসার উত্তাপ দেখেছিল।

—তুমি আমার এ-ভাবে পিছনে লাগ কেন কুমার!

—আর লাগব না লতা। তুমি আমার দিকে কিছুতেই তাকাতে না কিন্তু।

—মেয়েদের কারু দিকে তাকাতে নেই।

—কিন্তু সুরেশ যে বলল, তুমি ওকে পালিয়ে পালিয়ে দ্যাখো।

—অ মা! কি ছেলেরে বাবা! কি মিথ্যুক। ওকে আবার কবে পালিয়ে পালিয়ে দেখলাম!

—ও তাই বলে সকলকে। তখন আমার হিংসা হত।

লতা ভাবল, তবে ওকে সঙ্গে নিয়ে সুরেশকে একটু জব্দ করতে হবে। সে বলল, কবে যাব তোমার গাছের নিচে।

—তুমি যেদিন বলবে।

—গাছটা কোথায়?

—স্টেশনে যেতে লাল রাস্তার বাঁদিকে গাছ একটা, তার সামনে। বড় মাঠ আছে।

—সুরেশকে ডাকতে বলবে।

—ও বড় পাজি।

—এলে কেমন ওকে দ্যাখ একবার দেখা যেত।

—তুমি আমাকে অবিশ্বাস করছ লতা।

[illegible] নিয়ে আর কি কি কথা হয়। কুমার তাকে নিয়ে ছেলেরা কে কি বলে সব শুনত এবং বলে দিত। যে কুমারকে মনে হয়েছিল ধূর্ত এবং ইতর কিছুদিন ওর সঙ্গে কথাবার্তা বলার পর মনে হল সরল এবং ভীতুগোছের মানুষ কুমার। সে কুমারকে ভয় পেত না। এই কলেজের সব মিনমিনে শয়তানদের সে এই কুমারকে দিয়ে সায়েস্তা করেছিল। সুরেশ ছিল পয়লা নম্বরের।

ওদের দুজনের কেউ হবে সে মানুষটা। প্রায় বারো তেরো বছর আগের ঘটনা। কলকাতা এলে অনেকের রং ফর্সা হয়ে যায়। ভাল চাকরি করলে শরীর লাবণ্যময় হয়ে যায়। মানুষটার চোখে মুখে অপরিসীম লাবণ্য। তখনই রূপক বুঝি টের পেয়ে গেছে—লতা ঘুমায় নি। কারণ ওর হাই উঠছে। সে বিছানা থেকে তড়াক করে লাফ মেরে উঠল। এবং মশারি ঠেলে ভিতরে ঢুকে বলল, লক্ষ্মী, তুমি ঘুমাও নি।

লতা জানে কেন সে উঠে এসেছে। সে পাশ ফিরে শুল।—আমি ঘুমোচ্ছি। তুমি ঘুমাও গে।

—তবে হাই উঠছে কেন তোমার।

—কখন হাই উঠল!

—আমি তোমার হাই উঠলে টের পাই। তুমি উঠে দুবার জল খেয়েছ।

—এবার মনে হচ্ছে ঘুম আসবে। এখন বিরক্ত করলে সারা রাত আর ঘুমাতে পারব না।

—আমি আর পারছি না।

—পারছ না তো যা খুশি করো।

—তুমি রাগ করলে?

—রাগ করলে কি তুমি আমাকে ছেড়ে দেবে।

তখন লতা পাগলের মতো খুঁজছে সেই মানুষের স্মৃতি। শরীরের উপর একজন পুরুষের অহমিকা বজ্রপাতের মতো শিরায় শিরায় ঘৃণা প্রবাহিত করছে, আর অনাঘ্রাত শীর্ণ নদীটির পাশে বসে রয়েছে তার অপেক্ষায়। সে গেলে এক বিস্তীর্ণ ফসলের খেতে তাকে নিয়ে যাবে —শৈশবে এমনই একটা কথা ছিল যেন। আর তখনই মনে হল সেই মনের মানুষ তার মিলে গেছে। বড় কৈশোর কাল তখন লতার। সে তার দাদুর সঙ্গে বর্ষাকালে পুরুলিয়া গিয়েছিল। একটা জলপাই গাছের নিচে তার সমবয়সী এক বালক, কাঁচ হাত পা, শিশু সরল মুখ বালক দাঁড়িয়ে আছে। ঘাটে নৌকা ভিড়লে সে লাফিয়ে পাটাতনে উঠে এসেছিল। দাদু বলেছিলেন মামাবাড়িতে বেড়াতে এসেছেন কর্তা। সে দাদুর কথার জবাব না দিয়ে বলেছিল, এ কে নতুন দাদু।

—এ লতা। আমার নাতনি। মা মারা যাবার পর আমার কাছে নিয়ে এসেছি।

তারপর কি আনন্দ, আনন্দ সারা বাগানে, বনে এবং রথতলার মাঠে অথবা

কালিবাড়িতে কেবল ছুটে বেড়ানো, সে যেন কিসের স্পর্শে এক নতুন জগতের সন্ধান পেয়ে গিয়েছিল—সারা আকাশ মাঠ জুড়ে প্লাবন নেমে আসছে, সেই প্লাবনে ওরা দুজন আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে অন্ধকারে নক্ষত্র খুঁজছিল। কিন্তু পায় নি। নক্ষত্রের অনুসন্ধানে তারপর সে নদী পার হয়ে চলে গেছে। লতাকে অপেক্ষা করতে বলে গেছে। আবার সে ফিরে আসবে। সে ওকে এবার চিনতে পারল। সে আবার ফিরে এসেছে।

রূপক ফিরে গেছে নিজের ঘাটে।

লতা শুধু এখন কাঁদছে, নিজের জন্য কাঁদছে। কাঁদতে তার আজ কি যে ভাল লাগছে! রূপকের সঙ্গে কথা বলতে গেলেই তার আবার সেই একটা ... আসছে। ... অসহায় নিরালম্ব শিশুর মতো কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়ল। স্বপ্ন দেখল ক্রমে অন্তহীন এক জলের নিচে সে ডুবে যাচ্ছে। ... সে দেখতে পেল নীল জলে নানা রকম রঙিন মাছ খেলা করে বেড়াচ্ছে। সে যে এখন কোনটাকে ধরতে চাইছে বুঝতে পারছে না। তার কেবল মাছের ভিতর একটা রূপালি মাছ হয়ে নদীর জলে হারিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে। তার পর সে একটা রূপালি মাছ হয়ে গেল। রঙিন মাছেদের সঙ্গে সে অন্তহীন খেলায় মেতে গেল। সে ঘুমের ভিতর সব শরীর ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখল, রূপালি তার শরীর ... গেছে ... লাল নীল রঙের মাছ ... করছে। কোন মাছটাকে সে ঠিক ভালবাসবে বুঝতে পারছে না

একই ধোপে ৩ ভাবে কাজ ক'রে...

ডেট বেশী সাদা করে

—অন্য যে কোন পাউডারের তুলনায়

কেন এবং কিভাবে তা করে দেখুন

১ ডেট-এ রয়েছে বিশেষ সক্রিয় পদার্থ যা কাপড়ের ভেতরের কঠিন ধুলোময়লা সহজেই দূর করে—কাপড় চমৎকার পরিষ্কার হয়।
২ ডেট-কাপড়ের ময়লা বার ক'রে আবার তা কাপড়ে বসতে দেয়না, কাপড় বেশী পরিষ্কার হয়, বেশী পরিষ্কার থাকে।
৩ ডেট-কাপড় বার্ডিং যায় থোয়াও—কাপড় আগের চেয়ে অনেক বেশী সাদা ও উজ্জ্বল হয় (এতে নীল বা সাদা করবার জন্য কিছুই মেশাতে হয়না)

আজই কিনুন—ডেট

স্বাস্থ্য ধ্যরেন মিলস,বোম্বাই
SHILPI HPMA 38A/70 BEN

সে ডাকে

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

ব্যাপারটা আপনারও ভালো লাগতে পারে। অবশ্য যদি আপনি জীবনের অলৌকিকত্বে বিশ্বাসী হন, কিংবা সোজা কথায় বলতে গেলে বিশ্বজগত এবং জীবনের সবকিছু আপনার কাছে জলবৎ প্রাঞ্জল না হয়ে থাকে। আমার বন্ধু শঙ্কর বলে, জীবনটীবন ফালতু কথা। ওর কী ভেলকি দেখাবে বাবা? সব জানা হয়ে গেছে যে সত্য শুধু বাঁচা-পশুর মত বাঁচা।...আমার বন্ধু শঙ্কর জল লাগে না, আকাশ লাগে না, ফুল পাখি প্রজাপতি লাগে না। জ্বলন্ত ছুটন্ত মানুষ গোঁফ জুলপী দাড়ি স্কাইক্রেপার ইলেভেটর বোমা ছুরি রক্ত লাশ এবং সুন্দরীদের দেহ ইত্যাদি সমন্বিত জটিল একটা 'নুডেল ভাগ' তার—ওই যে কী বলে, 'অস্তিত্ব। অস্তিত্ব—এক্সিস্টেন্স!...কিন্তু আমি? ঈশ্বর বেঁচে থাকলে আমাকে রক্ষা করুন। আমার সামনে বাংলাদেশ। পূব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ হরিৎ তেপান্তরে মোহনগন্ধে ভিজে সোঁদাগন্ধভরা মাটি, পূবে উতলা নদীর ভাটিয়ালি পশ্চিমে গেরুয়া বাউল, উত্তরে 'আলকাপে'র মোহিনী কিন্নরগণ—যারা পুরুষ কিন্তু পুরুষ নয়—নারী তবু নারী নয়—ঘুঙুরে ঘুঙুরে ধ্বনির নক্ষত্র ফোটা অন্য এক আকাশ সেখানে মাথার ওপর আগুনের পাশে সোনা জলের 'বারিলাল' গান।'

প্রায় কবিতা হয়ে উঠছে, কিন্তু কবিতা নয়। ফুল ফোটে পাখি ডাকে প্রজাপতি ওড়ে। আমি যদিও যা কবিতা লিখি, ফুল পাখি প্রজাপতি কদাচ কবিতা নয়। এবং সেই জটিল নুডেল ভাগে'র জাল ছিঁড়ে যদি বেরোতে পারেন, মাত্র সামান্য কমাইল দূরেই অদ্ভুত সরল একটা জগত আপনার দৃষ্টিগোচর হতে পারে। প্রান্তরের একান্তে কোন ঋজু বৃক্ষদেহ—নিরাসক্ত দরিদ্র ঋষির মত কোন পুরুষ তার তলায় বসে পৃথিবীকে অবহেলা করছে না ঠিকই, সে দেখছে দূরের দিকে সোনালীগঞ্জের শাঁখের মত ছিপছিপে বালিকা গড়নের মেয়ে—কাঞ্চনরেখা যার নাম, মাথায় দুপুরের অন্নের থালা নিয়ে এগিয়ে আসে। আপনি দেখবেন, অলস সহিষ্ণু বলদের মত অস্থিসার কিছু কুটির। ছোট্ট এক নদী—যার অববাহিকার নিম্নভূমিতে এখনও এ শীতে বিগত বর্ষার জল জমে রয়েছে। আমি ঠিক এখানেই আসতে বলেছিলাম আপনাকে। হাঁ, এই জলটার পাশে। বলেছিলাম, ব্যাপারটা আপনারও ভালো লাগতে পারে। জলার ধারে সজীব নরম দূর্বা থেকে শিশির শুকিয়ে গেছে এখন।

সূর্য এত কাছে যে তাকে মামা সম্ভাষণ সহজেই করা যায় এবং তার পুরনো স্নেহও অনর্গল আপনাকে আবিষ্ট করে। এই ঘাসের ওপর স্নেহময় রোদ্দুরে বসলে পায়ের নীচে ঠান্ডা স্বচ্ছ জলের ভিতরটা স্পষ্ট দেখতে পাবেন। এবং যে ব্যাপারটা বলছিলাম, জলের নীচের পাল্টা আরেকটা জগত আপনার পছন্দ হয়ে যেতেও পারে। ওই মাছের ঝাঁকটার দিকে লক্ষ্য রাখুন। পিঠের দিকটা ঘন নীল, নীচেটা রুপোলী। দেবদূতেরা সেকালে ঠিক এরকমই ছিলেন। এ কথা ভাবতে ভাবতে আপনার লোম কাঁটা দিতে পারে। মুহুর্মুহু চমকে উঠতে পারেন। কোথায় ছিলেন আপনি? কোন প্রাগৈতিহাসিক সময়ে এদেরই অন্তবর্তী অনুচর বিশেষ, যূথবদ্ধ, বহুর অনুগামী! অধুনা আপনি যূথভ্রষ্ট, নিঃসঙ্গ, বিবিক্ত। আর, ওই যে ন্যাংটো বাগদী ছেলেটি এইমাত্র জল থেকে ভিজে গায়ে একগুচ্ছ শাপলা নিয়ে উঠে এল, একদা আপনিও কি অনুরূপ কোন মাছ জলাশয় থেকে ন্যাংটো উঠে এসেছিলেন? তারপর একটা কিছু ঘটেছিল। শাপলা বেচতে হয়তো বা চলে গিয়েছিলেন শহরের শেয়ালদার ফুটপাতে। তারপর আর ফেরা হল না। হায়, আর ফেরা হয় নি আপনার! ওদিকে চব্বিশটি পরগণা কাঁপিয়ে তৃণবনশ্যামল প্রান্তর ভেঙে কবে কোন নিশুতিরাতে কে খুঁজে বেড়াচ্ছিল আপনাকে। চেরা গলায় ডাকছিল, পরাণ কোথা গেলি রে!

প—রা—ণ-রে! মধ্যরাতে বাবলা ডালে ঝুলানো লণ্ঠনের মত শীতের চাঁদ। টিট্টিভ পাখি ককিয়ে ওঠে, টি...টি...টি! দূর থেকে দূরে ছড়িয়ে পড়ে ভাঙা ডাক মায়ের গলায় —পরাণ কো-থা-গে-লি—রে।

আমার তো ভালই লাগে ব্যাপারটা। আমি যেন সেই শ্যামলা বাছুর—গলায় বড় সাধের ঘন্টা বাঁধা। মাতৃঘাতী হাম্বা রবে খুরের আঘাতে প্রান্তরের ধুলো উড়িয়ে ছুটোছুটি করছে। দূরে আমার ঘন্টা বাজে অন্ধকারে—দূরে মাতৃধ্বনি সঞ্চারিত হয় নক্ষত্রের দিকে। চিৎকার করে উঠি—যাই মা! হায়, এ এক দুর্ধর্ষ কসাইয়ের কঠিন মুঠিতে আমার গলা, শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে:

•

তবে, প্রকৃত কথা হচ্ছে, আপনাকে কিন্তু বাংলাদেশ খুঁজে বেড়াচ্ছে। বাবলা ডালে ঝুলন্ত পুরনো লণ্ঠনের মত চাঁদ। টিট্টিভের ডাক। এবং এতক্ষণে তাহলে এখান থেকেই গল্পটা সুরু করা যেতে পারে।

বিবাদটা খুব সামান্য কারণেই সুরু হয়েছিল। আমার কাছে সামান্য ছিল না অবশ্য। তাহলে কেনই বা হুট করে বেরিয়ে পড়ব প্রতিদিনের নিরুদ্দিষ্ট দলের সংখ্যা বাড়াতে কিংবা খবরের কাগজওলাদের টাঁক ফুলিয়ে তুলতে? যদিও টাকাপয়সা খরচ সম্ভবতঃ বাবারই, কাগজওয়ালারা বিজ্ঞাপনের পাতায় 'স্নেহের খোকা' ছাপবে -এ একটা জঘন্য ব্যাপার। মোট কথা, আমি ঠিক খোকা নই। আমার বয়স পঁচিশ পেরিয়েছে। আমার রাত্রিযাপনের বিহিত সুব্যবস্থার উদ্দেশ্যে বাবা একটি স্ত্রীলোক আইনানুগ যোগাড় করে দিয়েছেন। আমি একটা মাঝারি ধরনের কারখানার লেবার অফিসারও ছিলাম মাস ছয়েক। তারপর লক আউটের ফলে চাকরীটা গেল। তারপর একটা চেষ্টা চলছিল আমার জন্যে—বাবাই চালাচ্ছিলেন, ইতিমধ্যে ঘটনাটা ঘটল।

বাবার ছেলে আর আমার ছেলে হয়ে উঠতেই—মোট বারোশো, আমরা বস্তিতে চলে এসেছিলাম ছিদু মিস্তিরি লেনের গুদামঘর ছেড়ে একটা বড় রাস্তার ধারে তেতালায়—তিনদিকে যার আকাশ অবাধ ব্যাপ্ত, অনেক ছোট বড় মাঝারি গাছপালা আছে, ময়দান আছে একটা; অদূরে রেল লাইন থাকায় বৃষ্টির রাতে ট্রেনের শব্দের সঙ্গে ওয়াগন-ব্রেকার আর পুলিশের লড়াইয়ের শব্দও শোনা যায়। এই ফ্ল্যাটটায় আসবার পর আমাদের ছোট পরিবারটার খরচও ডবল হয়ে উঠেছিল। বাবা তাঁর স্ত্রী অর্থাৎ আমার মাকে সবসময় চমৎকার শাড়ি পরে থাকতে বলছিলেন। এ নিয়ে ওঁদের ছোটখাটো ঝগড়াঝাটিও হচ্ছিল। ছিদু মিস্তিরি লেনে প্রায়ই আমাদের ঝি পালাত। এবং নতুন ঝি আসবার মাঝের সময়গুলোয় মাকেই ঝিয়ের কাজ করতে হত। আমার বউ চাকরী করে। (বাবার মতে, বউমার আস্তো স্বাধীন এবং হিসেবের বাইরে—অর্থাৎ সুন্দর) একটা আপিসের নাকি রিসেপসনিস্ট। মা তাকে কোন কাজ করতে দেয় না। নিজে খাটতেই তার ভালো লাগে। বাবার ধারণা, মধ্যযুগীয় এই মহিলার দরুনই ঝি টিঁকছিল না আমাদের বাড়ি। ঝিয়ের কোন কাজ মায়ের পছন্দ নয়। ফলে নিজেই ঝিয়ের হাত থেকে কাজ কেড়ে নেবে। এবং তার দরুন খুব সাধারণ কমদামী তাঁতের শাড়ি পরে থাকায় মায়ের সবিশেষ অভিরুচি। এ ফ্ল্যাটে আসবার পরও মা সেইসব নগণ্য ইতর শাড়ি পরার অভ্যাস ছাড়ছে না দেখে একদিন বাবা করলেন কী, দুপুর রাতে চুপিচুপি সবগুলো বাথরুমে নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে ফেললেন। পরে জানতে পেরে মা...সেকথা থাক। ক্রমশ দেখছিলাম, মা এই নতুন জীবনের সঙ্গে যেন নিজেকে মানিয়ে নিচ্ছে। চমৎকার নকসাছাপা তাঁত-তসর পরে, মুখে ক্রীম ঘষে, সিঁদুরের টিপ কপালে রেখে, পুবের জানালায় পাশটিতে মা হাসিমুখে বসে থাকছে। কিন্তু এর মধ্যে কী একটা অসহায়তা, একটা তীব্র গোপন আর্তি তার মধ্যে রয়েছে, সেটা টের পেতে আমার দেরী হত না। আনমনে ওঁকে বলতে শুনেছি, 'কী দরকার এতসবের! আমি তো কারো মত নই!' মায়ের এইসময় শব্দ 'কারো মত' আমার কাছে প্রাঞ্জল হয়েছিল পরে। বউমা অর্থাৎ আমার স্ত্রী সুচিত্রা সম্পর্কেই এ শব্দটা প্রয়োগ করছিল মা। সে তো ঠিকই। সুচিত্রার 'এত সবের' দরকার। ও রিসেপশনিস্ট। ওকে সুন্দরী হতেই হয়। ওর পোশাক আসাক জরুরী। মাথায় বকুলী খোঁপা, চোখে কাজল ঠোঁটে পুঁথের মত রং...এবং নিতান্ত রেসিয়ারের মত জামাটাও ওর দরকার। ওর জনসংযোগ এবং অভ্যর্থনার কাজে এসবই তার মূলধন। তবে আশ্চর্য লাগে, শাশুড়ি-বউমার সম্পর্কে কোন তিক্ততা ছিল না। বরং বউমাকে সহযোগিতাতেই ব্যস্ত থেকেছে মা। এবং একবার মৃদু হেসে বলেছিল, 'ছোটকুর (আমার ছোটভাই) বউ কিন্তু চাকুরে হবে না। বউমাকে সারাটি দিন কাছে পাই নে। এত একলা লাগে!' হ্যাঁ, ছোটকুর বউ চাকুরে হবে না এবং মায়ের প্রত্যাশা হয়ে থাকবে, এই আশা একটা আশার মত আশা। আমার মনে হয় না, শুওরের বাচ্চা (সরি!) বিয়ে করবে বা ঘরসংসার করবে। আমি ভেবেই পাই না, মেক্সিকো এলাকার আমেরিকান-ওয়েস্টার্ণ ভেড়চরানো রাখাল ছোঁড়াদের পাতলুন—শুধু পাতলুন কেন, চেহারার ছিরি কী করে একটা বাঙালীবাচ্চার কাছে প্রিয়তম মডেল হয়ে ওঠে! ছোটকুর এক বান্ধবী আবার লুঙ্গি পরে ঘোরে। অবশ্য এ বিষয়ে আমার মান হাস্যকরভাবে (সুচিত্রা থাকা সত্ত্বেও) তুচ্ছ।...বাবা মাঝেমাঝে তাঁর কনিষ্ঠপুত্রকে 'মস্তান' বলে গাল দিয়ে থাকেন। 'হিপ্পি বাঁদর' বলেন। তিনি আরও বলেন যে সম্পদ প্রাচুর্যের ঘৃণ্য গর্ভস্রাবস্বরূপ এক বিশেষ তরুণ সম্প্রদায়ের উদ্ভব যদিচ স্বাভাবিক এবং সম্ভবত অর্থনীতির অবক্ষেপিত স্ত্র অনুসারেই সৃষ্ট, এ পোড়া ক্ষুৎপীড়িত দেশে ইহাদের উদ্রেক হইল কেন? ইহা কি কর্কট জর্জরিত ভারতবর্ষের দেহে দুর্গন্ধ ঘর্মস্রাবের মধ্যে জমিয়া ওঠা নূনাধিক্যসমূহ?...... বাবার সম্পর্কে ঠাট্টা তামাসা অশোভন। এবং লাইন দুটো পিতৃভাষণ হিসেবে অধুনা জনবেদ মহান অপৌরুষের নিত্যগ্রন্থ সংবাদপত্রের ভাষায় সাজিয়ে দিলাম—এটাও ক্রটিকটু। কিন্তু কী করব? আমার মনভাস্তা ত্রিকালদর্শী বাবার চরিত্র এ ছাড়া প্রকাশ পাবে না।

বিনায়ক সান্যাল-এর

বেসুতের অপলাপ

স্মৃতিরঞ্জিত রঙ্গ-রঙ্গীন বিচিত্র চরিত্র-চিত্র।

মনস্বী কবি-সমালোচকের এই গ্রন্থটি সম্বন্ধে
শ্রীপ্রমথনাথ বিশী বলেছেন :
'বইখানা পড়ে প্রচুর আনন্দ পেয়েছি; ...স্কুল ও কলেজ-জীবন সম্বন্ধে এমন চিত্তাকর্ষক বর্ণনা এর আগে চোখে পড়েনি।'

"যুগবাণী"-এর মন্তব্য :
'আপনি একজন 'জাত' লেখক...যতটুকু পড়েছি, তাতেই পাকা হাতের মুন্সিয়ানার পরিচয় পেয়েছি।'

মূল্য — পাঁচ টাকা

প্রকাশক : ডি, এ, লাইব্রেরী
৪২, বিধান সরণী
কলিকাতা—৬

নতুন বাসায় আসবার পর বাবার এক মজার কাণ্ড শুনুন। আমায় উনি খোকা বলে ডাকেন। বাথরুমে ছিলাম। খোকা খোকা চীৎকার শুনে বেরিয়ে আসতে হয়েছিল। দেখেছিলাম, বাবা জানালার ওপর ঝুঁকে পড়েছেন। আঙুল দিয়ে কী দেখাচ্ছেন। পাশে মা এবং রুচিরা। মায়ের মুখের হাসিটা আমি বুঝতে পারি। ওটা রেল-রুটির মত স্বাভাবিক ও সহজ। রুচিরারটা ম্যাস্টিক। রমণে লিপ্ত হলেও, মজার কথা, ওই মজাটা হাসে। ভালবাসার কথাতেও হাসে। এবং বাবার হাসিটা ছিল বাচ্চার ছেলেটার মত, দারুণ মজার হাসি। বাবা হাততালি দিচ্ছিলেন। শিস দিচ্ছিলেন। আবিষ্টভাবে অতি ধীরে বলছিলেন, আর আর বলছেনা আর...

উঁকি মেরে দেখলাম, নীচের দত্ত-বাড়ির দেয়াল ঘেঁষে ওঠা পেয়ারাগাছের ডালে একটা এ্যাবড়-খ্যাবড়ো পাকা পেয়ারা ঠোকরাচ্ছে দুটো পাখি। কালো রং, মাথায় ঝুঁটি, পেটের নীচেটা লাল। বাবা একগাল হেসে আমায় বললেন, খোকা, বুলবুলি, বুলবুলি!

বুলবুলির কথা জীবনে কখনও ভাবিনি। বুলবুলি কী আমি জানতাম না। জানলেই বা কী। পৃথিবীতে অজ্ঞাত শতকোটি রকমের প্রাণী থাকা সম্ভব। অন্তত যতক্ষণ না তার সঙ্গে সংঘর্ষ হয়ে উঠছে অর্থাৎ খবরের কাগজের খবরে বোঝা ব্যাপার না ঘটছে, ততক্ষণ সবকিছুই আমার পক্ষে নিরর্থক। চিড়িয়াখানায়—ভেবে দেখুন—সেই শয়তান সিংহ কিংবা সেই খাঁচাছাড়া মরাল সাপটার হাতে মানুষের মৃত্যুর ঘটনা! হ্যাঁ, এইবার আপনার সিংহ বা মরাল সম্পর্কে কিছু ঔৎসুক্য হতে পারে। তবে তার বেশী কিছু না। অন্তত যতক্ষণ আপনি নিজে না জড়িয়ে পড়ছেন প্রাণী-ঘটিত ঘটনার সঙ্গে। কিন্তু বুলবুলি। ভাবা যায় না। সেকালের শহুরে কলকাতার নবাব-বাবুরা নাকি হাতে-পোষা বুলবুলি নিয়ে পাঁশকাশে গমন করতেন। টেকচাঁদে এ বিষয়ে কিছু থাকা সম্ভব। বাবার এ বুল-বুলি—অভ্যাসের অর্থ বুঝতে পারছিলাম না। বাবা ছেলেবেলায় গ্রামে ছিলেন। প্রবীণ বাঙ্গালী সন্তানের পক্ষে, সুতরাং, এই সব স্পর্শকাতরতা থাকা সহজ। এক বাঙ্গালী লেখক সম্পাদিত বাঙ্গালী লেখকদের ছোট গল্পের ইংরেজী ভাষার সংকলন গ্রন্থ সমা-লোচনা প্রসঙ্গে মার্কিন পত্রিকায় মার্কিন সমালোচকের মন্তব্য পড়েছিলাম—যথা: 'বাঙ্গালী মানসিকতায় যেন গাছপালা পাখি প্রজাপতি আকাশ রোদ্দুর বৃষ্টি ইত্যাদির প্রতি কেমন প্রিমিটিভ ঝোঁক আছে?'... প্রিমিটিভ শব্দটা লক্ষ্য করুন। যা কল্পনা করে বাঙ্গালী হিসেবে—তাই না? আরও যা কল্পনা করে, যখন শুনি মার্ক্সেবাজ বিদুষি বাঙালেরাও বলে, পণ্ডিত ম্যাটারিয়ালিস্ট অর্থাৎ প্রগতিবাদী! আমরা প্রিমিটিভ, তা মানতেই চাইব না, এটা খুব প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা, গাছ ফুল পাখি প্রজাপতি বৃষ্টি রোদ্দুরই খাঁটি বাঙ্গালী শিল্প। এ নিয়েই জগৎসভায় আমাদের গর্ব। হিসেবটা কোন রাজা রাণী কী ফসল, তাতে কী আসে-যায়।

আমার বাবাও আসছিল-যাচ্ছিল না—তা আমি বলেই প্রিমিটিভ ঝোঁকের কথা তুলে তামাসা করি। এই নতুন বাসার চার-পাশে এই বোবা ছবি শুনি মস্তবড়া ভীষণ শহরের মধ্যে একান্ত 'প্রিমিটিভ' একটা পরিবেশ পুনঃ পুনঃ দিনে-রাতে বাবা আবিষ্কার করছিলেন। বাবা কতকটা ধেই-ধেই করে নাচতে বাকি রাখছিলেন। ইউরেকা! ইউরেকা! এই যে আমাদের বাংলা দেশ। দক্ষিণের জানালার সামনে বিশাল শিমুল গাছ। বাবা মাকে বলছিলেন, শীত যেতে-যেতে ওইখানটা লাল-লাল ফুলে ভরে উঠবে। ভাবতে পারো কী হবে চুরু? বাবা আদর করে সোহাগভরে বলছিলেন, টুকটুক, আমার টুকটুক। থামো, আদুরে লোকে বলবে, মাইরি! ওরে শ্যাম, আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে গো। দ্যাখো, আমার যেন সারা যৌবন ফিরে আসছে!...মা হাসছিল। শুধু হাস-ছিল। এবং আমি ছিলাম খুব কাছের বাথরুমে।

জানতাম, বাবা তাঁর নতুন বাসার গল্প বন্ধুদের মধ্যে ছড়িয়ে ফেলে কিছু বাকি রাখেন নি। আমার সঙ্গে দেখা হলেই ওরা আগেই বলছিলেন, এই যে! খুব চমৎকার বাসা পেয়ে গেছ শুনেছি। ভীষণ সবুজ গাছপালা, ফাঁকা চারদিক, খুব আলো-হাওয়া কী বলো?

মাঝে-মাঝে বাবা বন্ধুদের ডেকে এনে (একেবারে বেডরুমের মধ্যে) জানালা দেখিয়ে বলছিলেন, ওইটে খুললেই তুমি সূর্যোদয় দেখতে পাচ্ছ। একেবারে মাঠের ওপার। চমৎকার না? এই শালা কলকাত্তাওলা শহরের মধ্যে...ভাবা যায়? গণ্ডগোল নেই একদম। পাখির ডাকে ঘুম ভাঙছে। পাখির ডাকে সন্ধ্যা নামছে। মাঝরাতে প্যাঁচা ডাকছে। আর ওই যে—ওইখানে চাঁদখানা...আঃ, সে এক জিনিস। জিরেতাজা করেনা সুচি মাইরি। চাষের জেলেন্য। আনন্দেই এসেছি। এসে প্রথম রাত্তিরেই ঝিঁঝি। শুয়ে শুনছি। দুমাসে ঝিঁঝি। মাঝরাত্তিরে—ওঃ! শুনি, ব্যাং ডাকছে গ্যাঙোর গ্যাং। হাজার-হাজার ব্যাং। হুঁ, ব্যাংও ডাকে।

এক প্রশান্ত কৌতুকাভিলেষ কী মুখভরে বাবার কথা। বাবা যখন বললেন, এ বাসার পাশে পাখি ডাকে ব্যাং ডাকে... তখন হঠাৎ ভদ্রলোক গম্ভীর মুখে বলে বসলেন, হ্যাঁ, তারপর মাসের শেষে বাড়ি-ওলাও ডাকে। আমরা সপরিবারে হাসতে-হাসতে প্রায় মারা পড়ছিলাম আর কী! তার পরই কিন্তু—জোর হাসির পর ক্লান্তির মত তাৎক্ষণিক হাল্কা ধরনের কিছুটা যেন বাবার মধ্যে লক্ষ্য করা গেল। শুধু বললেন, হ্যাঁ—ভাড়াটা ভীষণ বেশি। মাসে-মাসে অতগুলো টাকা আমায় যোগানো তো অসাধ্যই ছিল। খোকা ভালো চাকরীটা পেল, তাই।

একটা ব্যাপার আমি এসবের থেকে খুঁজে বের করেছিলাম। সেটা ওই 'প্রিমিটিভ ঝোঁক'। আলো-হাওয়া গাছপালা প্রজাপতি ঘাস ইত্যাদির জন্যে যেন প্রত্যেকটি বাঙ্গালী হাপিত্যেস করছে এ শহরে। কথাটা একদিন বাবার কাছে তুললাম। তুললাম, আমার চাকরী যাবার পর। সাড়ে চারশো টাকা ভাড়া দিয়ে বাবার মাসে থাকে দেড়শো। সুতরাং রুচিরা তার চারশো যোগাতে বাধ্য হচ্ছিল। এটা যে বাবার পরি-বারের পক্ষে অপমানজনক হচ্ছে, সরাসরি সেকথা না বলে অন্যভাবে ওঠানো গেল। এবং কেন যেন বাবা ফেটে পড়লেন।... প্রিমিটিভ বলছ? কিন্তু এই হচ্ছে আমাদের জীবন।...বাবার প্রৌঢ় খসখসে আঙুল-গুলো ভীষণ কাঁপতে-কাঁপতে টেবিলে আওয়াজ তুলল এবং উনি খাঁটি ভারত-সন্তানের মতই ইংরেজীতে ক্রোধোক্তি করতে থাকলেন।...দিস ইজ আওয়ার রিয়াল লাইফ। দিস ইজ আওয়ার মাদারল্যাণ্ড। হুম্! তুমি খুব মডার্নিজমের গল্প করে বেড়াও শুনি। জানো? তোমার এই শহর সামান্য দু-চার মাইল গেলেই ভাঙা কুঁড়ে-ঘর, হাড়সর্বস্ব বলদ, পান্তাভাত খেয়ে খুঁকছে কোটি-কোটি মানুষ? এখনও বুকে পোকা-মাকড় নিয়ে কত মানুষ ঘুমোয় জানো?

কী কথার কী জবাব শুনে আমি থ। থাক, ঘাঁটিয়ে কাজ নেই। স্নিগ্ধ সুরে বললাম, আজকাল বাসা তো পাওয়া যাচ্ছে—ভাড়াও কমছে। সুবোধ বলছিল, হেদোর দিকে...

হেদোর ওঁদো গলিতে আর আমি যাবো না।...বাবা লাল মুখে জবাব দিলেন। এত রাগ কখনও দেখি নি ওঁর।

ছোটকু দাঁড়িয়েছিল আমার ডান দিকে। হঠাৎ বলে বসল, যাবেন না। আর বউদির রোজগারে দিব্যি সংসার চালিয়ে যাবেন বাঃ!

কথাটা আমি বা রুচিরার পক্ষে অপমানজনক হলেও চুপ করে থাকলাম। ছোটকুকে আমি ঘৃণা করি।

বাবা যেন লাল-নীল-হলুদ-ধূসর বিচিত্র রঙের মুখোশ পরে ছোটকুর দিকে তাকালেন। যেন বা বাকশক্তিরহিত। জিম করবেট বলেছেন, বাঘকে এক গুলীতে কাত করতে হলে ঘাড়ে গুলী করো। নয়তো কিছু হবে না। বাঙ্গালীবাঘের ঘাড়ে গুলী করল ছোটকু। বাঘটা নড়ল না। আমি বোকার মত বুকে অর্থাৎ হৃদয়ে গুলী করতে গিয়েছিলাম। ওখানে গুলি বেরিয়ে যায়, আটকে থেকে তক্ষুনি মৃত্যু ঘটায় না।

সন্ধ্যার অনেক পরে রুচিরা এল। রুচিরা একটা প্রেসার কুকার কিনে এনে-ছিল। এবং হঠাৎ ছোটকুর মত সোজাসুজি বাক্যে আমায় বলে উঠলাম, কী সব আজে-বাজে কিনে পয়সা নষ্ট করছ? এখনও বাংলা দেশে কোটি-কোটি উনুনে কাঠ-খড়

জেনেসে রান্না হচ্ছে দুবেলা—কয়লাও জোটে না!

রুচিরা অবশ্য হাসল একটু। শুধু বলল, তুমি দেখছো। ব্যস! রুচিরা বাথরুমে ঢুকল। আমি অস্থিরভাবে গাল চুলকোলাম। সিগ্রেট খেলাম। পায়চারি করলাম। ছোটকু একটা মোক্ষম গল্পী মেরেছে। এতদিন নিঃশব্দে নির্বিচারে কিছু না ভেবে আমি বা আমরা খাবার-দাবার খেয়ে গেছি। এখন প্রতি বারই মুখে তোলার আগে দেখতে পাব, বড়-বড় অক্ষরে রুচিরার স্বাক্ষর আছে।

শুতে যাবার আগে বাবার আকাশবাণী শোনা গেল : শীগগীর আমরা বাসা বদলাচ্ছি।

এবং, তাহলে বলা যায় — আমাদের পরিবারটা ভেংগে গেল এমনি করে। একটা বিকট রকমের অবিচারের ঝড় বয়ে যেতে দেখলাম। বাবা ছোটকু আর মাকে নিয়ে বেহেলার দিকেই কোথায় গেলেন। আমি আর রুচিরা জানলাম না। কারণ, রুচিরাই বলেছিল—আপনারা যান, আমরা (!) এখানেই থাকছি। বলেছিল বটে—কথাটা শুনতেও সাংঘাতিক স্বার্থপর, কিন্তু রুচিরার দোষ ছিল না। ও বাবাকে খুব পিড়াপিড়ি করেছিল। বাবা তো শুনলেন না!

কিন্তু মাসে সাড়ে চারশো দেবে কেমন করে রুচিরা? তথ্য ফাঁস হল পরে। ডাবল কিচেন-প্রিভিসর্মাশ্কিত চার ঘরের দুটো ঘর দেওয়া হল ওর এক বান্ধবী আর তার স্বামীকে। তারপর আমরা রাজা-রাণী। আমাদের জীবনের সমুদয় জটিলতার পিছনে নিতান্ত অর্থনীতির খেলা, এটা প্রাঞ্জল হল আমার কাছে। বেশ চমৎকার একখানা জীবন আমরা পেলাম। এ্যামিবার কোষ-বিভাজনের মত ঘটনার ফলে দুটি সুখী পরিবারের জন্ম হল। শুধু কষ্ট হয়। ওই জানলা খুলতেই 'ফুলকো লুচির মত চাঁদ'। আঃ, বাবা এতক্ষণ কী দেখছেন? শ্যাওলা-পড়া কালো দেয়াল, ভ্যাপসা গন্ধ, গোলমাল, বুট জুতোর শব্দ! ছিরু মিস্তিরি লেনে ওই সব বুট জুতোর শব্দ মধ্য রাতে বাইরে থেকে যেন ক্রমশ আমার ওপর—আমাকে পেরিয়ে চলে যেত। জুতো মাড়ানো শরীর—ক্লান্ত থ্যাৎলানো লাগত। হঠাৎ ভয় পেয়ে ঘুমের ব্রেণ নষ্ট হয়েছে, লম্বা-লম্বা পায়ে জুতো পরে হাঁটতে-হাঁটতে ওই, ওই এসে পড়ল যেন বুকের ওপর। এখন বাবা ফের কি সেই রকম উত্যক্ত হচ্ছেন? নাঃ, কে যেন বলছিল, দোতালার দেড়শো টাকার ফ্ল্যাট—ভালোই। হবে! স্মৃতি শুধু কামড়ায় আমাকে, এই যা। স্মৃতি বলে, তুমি ব্যাটা এখানে দিব্যি জানালা খুলেই দেখছ বিশাল শিমুলের লাল ফুল। তোমার যৌবনে যৌবন আসছে—আর ওদিকে লোকটা ফের বুড়ো হতে-হতে শাদা হতে হতে সিঁটিয়ে যাচ্ছে। একটুখানি যৌবন, মাত্র একটু চেয়েছিল। (বর্বাতি-পরুন, সংবাদ যেমন)।

আমরা এ বাসাতেই আলাদা হয়ে বাস করতে পারতাম। নাকি তা অসম্ভবই হত? বাবা থাকতেন না। ওই ছোটকু শুওরটা...

তারপর একটা ব্যাপার লক্ষ্য করা গেল। অনেকগুলো গাছ এক সংগে থাকলে সে একটা অরণ্য। এবং কোন গাছের পৃথক বৈশিষ্ট্য থাকলেও তা বৃহতে একাকার থাকার দরুন মারাত্মক কিছু দ্যাখায় না। কিন্তু এবার? রুচিরা এই পাঁচজনের সংসারে যা ছিল, এখন তা রইল না। তা ছাড়া মত দুটো গাছ এ উৎসন্ন অরণ্যে। এবার রুচিরাকে খুঁটিয়ে দেখা যাচ্ছিল। কাজকর্ম নেই—সুপ্রচুর অবসর—সেকারণে কিছু নিয়ে থাকতেই হয়। অনর্গল ভাবনা আসে। এলোমেলো। ঝড়ের মত ভাবনা ঘরে ঢুকে জিনিসপত্র তছনছ করতে থাকে। কত প্রিয় গ্লাস ভাংগে। বইয়ের পাতা ছেঁড়ে। জামা-কাপড় ওড়ায়। মাই গুডনেস! রুচিরা কে? আমি তো জানিই নি—জানবার চেষ্টাও করি নি! কেন ওকে এমন পোশাক পরে সেজে-গুজে থাকতে হয়? ওর ওই পেটেন্ট করা হাসি, ওর—যাকে বলে, দেহবল্লরী—অর্ধোন্মুক্ত কোষাগারের মত রোমাঞ্চকর লাগে। স্পষ্ট জানা গেল, রুচিরার এক বৃহৎ অংশ বহুর জন্য বিক্রীত। কত চটুল, কত নিবিড় গরমা-গরম টাটকা সম্পদ, কহবার দুলে-ওঠা উচ্ছ্বাসে ভেংগে-পড়া, প্যাকেটে প্রসিদ্ধ তারামির্ছারির মত দুটো চোখ। আমি ভীষণ গোঁড়া সেকেলে হয়ে পড়ছিলাম। এবং রাতে শুয়ে একটা নিস্তেজ ভারি শরীর ছাড়া কী পাওয়া যেতে পারে এর পর ... কেন, কী হল? আমি প্রশ্ন করলে রুচিরা শুধু বলেছে, বড় ক্লান্ত। যা ধকল যাচ্ছে আজকাল!...তাই-ই তো। ওর জীবনের সেরা জিনিসগুলো ফেরিওলার মত বেচে দিয়ে খালি ঝাঁকা নিয়ে ঘরে ফিরতে হচ্ছে। ওর প্রাণচাঞ্চল্যের প্রায় সবটাই আপিস কিনে ফেলেছে। বাঙালী মেয়ের কাছে এর পর আরকিছু আশা করা তো উচিতই না। একটা—বড়জোর পাখির মত প্রাণ, তাকে মাইলের পর মাইল ওড়ানোর চক্রান্ত। এ একটা জঘন্য ব্যাপার। হুঁ, আমার রীতিমত কষ্ট হল। এসটাবলিশমেন্টের বিশাল দৈত্য ওকে শেষ করে ফেলল।

রুচিরাকে বাঁচানোর জন্য কিছু করা জরুরী। চাকরী একটা শাঁসপানির দরকার। সেই সময় একদিন ছোটকুর সংগে দেখা। ওকে দেখলেই আমার ঘেন্না হয়। বিশেষত ওর সবজান্তা হাবভাব, দন্ত্য স দিয়ে শ ষ উচ্চারণ, ওর পোশাক চেহারা। ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, তা ভাবাই যায় না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ও পড়াশুনোর নাম করে সোজা চলে যায় রেলপোলের নীচের জুয়োর আড্ডায়। মদ খেয়ে হিজড়েদের নাচ দ্যাখে। কখনও ওয়াগনব্রেকারদের দলে এ্যামেচার হয়ে ওঠে। আমার আরও বিশ্বাস, ওর বিছানার নীচে থাকে পাইপগান রিভলবার। ওর পকেটে থাকে মস্তো ছুরি। ওর বন্ধু সতোন ছুরি খেয়ে মারা গেল সম্প্রতি—হলফ করে বলতে পারি, এ কীর্তি ছোটকুর।

এবং সেদিন ছোটকুর হঠাৎ কথার জবাবে এগুলোই গলগল করে তেতোমুখে বলে দিলাম। গাল বেরিয়ে গেল। ছোটকু বলছিল, বউদির দিকে নজর-টজর দেবে নাকি? সেদিন একটা বারে দেখলাম—সংগে এক জম্বর কাপ্তেন...

জবাবে ওইসব বললে ছোটকু একটু হাসল।...তোমার তো সত্যিকার প্যাট্রিয়টিজমই নেই। তুমি বুঝবে কী!

এইবার অসহ্য লাগল। মেক্সিকান খাটলসাজা-বাঙালী ছোকরা তুমি আমায় প্যাট্রিয়টিজম শেখাবে? ঠিক সহজলভ্য নয় ব্যাপারটা—খিঁচি করে ঘুঁষি মেরে বসলাম। বাসস্ট্যান্ডে ভিড় ছিল। পিছনের রেস্তোরায় কতকগুলো বসেছিল। ছোটকু টাল সামলানোর পরই দেখা গেল, সেই ছোকরাগুলো লাফ দিয়ে এসেছে। তারপর বেদম মার লাগাল আমার দেহে। কানের

বেনারসী শাড়ী

ইণ্ডিয়ান সিল্ক হাউস

কলেজ স্ট্রীট মার্কেট

কলিকাতা

।। আমাদের কোন ব্রাঞ্চ নাই ।।

পাশ দিয়ে কতবার চাকার শব্দ গড়িয়ে গেল শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

*

একটা ব্যাপার এতে স্পষ্ট। ছোটকু আমাদের সুখের অরণ্যে বজ্রাঘাত। নষ্ট অরণ্যের পর এখন শুধু অগাধ শূন্যতা জেগে রইল।

ওদিকে এসটাবলিসমেন্টের দৈত্য মুচিরাকে বখশিস দিয়েছে এক সুমিষ্ট কাস্তেন। ধুস্ শালা! আমার জীবনটা এবারে সত্যিকার কদর্য হয়ে উঠল। সেই দুপুরবেলা আমি হুলিয়ে যেতে যেতে বাসস্ট্যান্ড খালি হয়ে গিয়েছিল বা দোকান-পাটে ঝাঁপ পড়তে সুরু করেছিল এটা নিশ্চিত। তারপর কখন দেখি, আমার হাত ধরে যে টেনে ঢুকছে, সে ছোটকুই। হাত ছাড়িয়ে নিয়ে টলতে টলতে হেঁটে গেলাম। সেই সময় মাথার ওপর থেকে কে চাপা গলায় বলল, পালান দাদু, কেটেপড়ুন! ওরা ছুরি আনতে গেছে। মুখ তুলে দেখলাম না লোকটা কে। কিন্তু কথাটা ভারি মূল্যবান মনে হল। ওরা ছুরি আনতে গেছে। অবশ্যই। মুচিরারা ছোটকুরা আমার প্রাক্তন মালিকেরা। এক ইঞ্চি করে ফলা বাড়ছে। একটা শবব্যবচ্ছেদ হবার প্রস্তুতি যেন—যন্ত্রপাতিসংকুল পারিপার্শ্ব, এবং আমার নাড়ি মোচড় দিতে থাকল।

আমি পালালাম। সত্যিসত্যি পালালাম। জেনেশুনেই পালালাম যে এর পর সম্ভবত খবরের কাগজে বিজ্ঞাপনের পাতায় নিরুদ্দিষ্ট কলমে 'স্নেহের খোকা' ছাপা হতে পারে। থাকতে পারে কোন ফোটো। এবং এমন তো হতেই পারে যে আজকালকার অজস্র অ-সনাক্তকৃত লাশের মধ্যে আমাকে খুঁজতে বাবা কিংবা কেউ কেউ সচেষ্টও হবেন। হতে পারে সদ্যপ্রাপ্ত আটটি লাশের আমি একজন।

সেই সন্ধ্যায় দূর পাড়াগাঁর দেশে এক ছোট্ট স্টেশনে বসে ভাঁড়ে চা খেতে খেতে আমার মনে হল, সভ্যতার শেষ দরজা পেরিয়ে আমি এবার 'বাঙ্গালী প্রিমিটিভে' পৌঁছতে যাচ্ছি। একটু হেসে মনে মনে বললাম, অধম সভ্যতা! তোমার মরমানবের টেকনোলজি সঙ্গে নিয়ে তুমি গোল্লায় যাও। তুমি শুওরের বাচ্চা, ক্রমাগত জাহান্নাম কিনে কিনে সাজিয়ে রাখছ। প্রাক্তন বাগান ধ্বংসে হয়ে যাও। সব স্কাইস্ক্রেপার গুঁড়ো হোক। সব সেতু নষ্ট হোক। লাইনচ্যুত হোক সব রেলগাড়ি, উল্টে পড়ুক যানবাহন, পুড়ে ছাই হোক উড়োজাহাজগুলো। পচে যাক ল্যাবরেটরী। বিজ্ঞানী এঞ্জিনিয়ার ডাক্তারদের ফুসফুসে ছ্যাঁদা হোক। এবং চরমতম ভূতাবহগণের পর বেঁচে থাক শুধু একজোড়া মানুষ—একটি পুরুষ আর একটি মাত্র নারী। ফের সুরু হোক নতুন যাত্রা। এই গ্রহে—কিংবা অন্য কোথাও।...

স্টেশন মাস্টারের রীতিমত ফ্যামিলি রয়েছে। সভয়ে আমার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে টেলিগ্রাফের চাবি টিপছিল। তারপর সটান উঠে দরজা বন্ধ করে যেন খালাসীটার উদ্দেশেই বলল, বড় শীত রে, অলক। অলক—বেশ নামটা তো! বাঙ্গালী পয়েন্টস-ম্যান—বয়সে প্রৌঢ়। একা থাকে। ভাব হয়ে গেল। দুজনে চা খেলাম পাশাপাশি বসে। চাওলা কিন্তু ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে কয়েকবার অলকের উদ্দেশে বলল, আজকের কাগজে দেখেছ অলকদা? অলক ঘাড় নাড়ছিল। চাওলা ওকে শেষ অব্দি না শুনিয়ে পারল না।...কাদের লাস পাওয়া গেছে সব।

অলক নিরাসক্তভাবে বলল, কাদের? (কতকটা বাবা খেলতে খেলতে কাদের সাপ ধরার সুরে!)

চাওলা চাপা গলায় বলল, তা কে জানে! তবে বিকেলবেলা দারোগাবাবু এসেছিলেন এদিকে। খুনী নাকি এ তল্লাটেই এয়েছে—জোর খোঁজখবর চলছে।

অলক খিকখিক করে হাসল। আমার দিকে তাকাল।...শুনছেন?

আমি বললাম, শুনছি।

অলক বলল, এখন আপনাগো নতুন মাইনষের হব জ্বালা। বোঝলেন কথাটা?

চাওলা এবার যেন সাহস পেয়ে প্রশ্ন করল, বাবু যাবেন কোথায়?

জবাব অলক দিল। চমৎকার খাঁটি মানুষ সে।...বাবু মাথায় থারে পাগল। ছুটো ভাই পলাইয়া রইছে। খড়ের গাদায় ছুঁচ খোঁজবার লাহান...ফের খিকখিক করে সকৌতুকে হাসতে থাকল সে।

চাওলা সন্দিগ্ধ চোখে বারবার আমাকে দেখছিল। জায়গাটা প্রায় বসতিবিহীন। কোন লোক নেই কোথাও। একটা কাঁচা রাস্তামত চলে গেছে বিরাট মাঠ পেরিয়ে। দোকান বলতে স্টেশনের ছাউনির একান্তে এই চায়ের দোকানটাই আছে। অলকের কাছেই জানা গেছে, ওদিকে কোথায় কোন জোতদারদের জন্মভূমি—সেই সুবাদে এই স্টেশনটা নতুন হয়েছে। চাওলা প্রবল প্রতিবাদে বলল, না, না—তেমন কেউ এ স্টেশনে নামেনি। এক আধ মাসের খবর আমি বলতেই পারি। নামেই নি। সন্ধাই আমার চেনা।

অলক ফের জবাব দিল, তাহলেও মন মানবার কথা না। কী বলেন সার?

সার শুনে আমি খুশি, কিন্তু অপ্রস্তুত। কিছু করার ছিল না। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। ভাগ্যিস, অল্প আলোয় ওরা আমার মুখের কালসিটেগুলো দেখতে পাচ্ছিল না সম্ভবত। অন্ধকারকে ধন্যবাদ। কথামত অলকের ঘরে শুতে গেলাম। এত সাধারণ মানুষের অসাধারণ হৃদয় থাকতে পারে, জানা ছিল না। দুটো রেল কম্বলের একটা দিল সে। রুটি আর আলুর তরকারি বানিয়ে খেলাম। সেইসময়, পূর্ববাংলার অজস্র ব্যাপার সে বর্ণনা করছিল। শেষ বিড়িটি সেঁকবার পর উপসংহার শুনলাম—এই দ্যাশটা অনেক বড়। যা ভাবছেন, এট্টখান না। কত কমু? তবে কী কইছিলেন, হ, ছুটো ভায়ের কথা। ছুটো ভাই আমারও এউড্ডা আছিল। বাবু, ছুটো ভাই থাকলেও কষ্ট, না থাকলেও কষ্ট। যখন ছিল, জ্বলাইয়া বুক কালা কালা করছে—এ্যাখন নাই, এখনও...হ, কী কইছিলাম? ছুটো ভাই একখান চাকু...জোরে হাসতে থাকল লোকটা।

বললাম, যা বলেছ। চাকুতে বাংলাদেশ ভরে গেছে আজকাল।

অলক কী বুঝল, মাথা নেড়ে সায় দিল।

*

পরের দিনটা যা ঘটল, সুরুতে বলে ফেলেছি। আবার বলার দরকার হবে কি? সোজা বেরিয়ে পড়ে উদ্দেশ্যহীন হেঁটে যাচ্ছিলাম—যেন এই পথটাই অবশিষ্ট, যা কোন জাগ্রত দেবীর তীর্থে নিয়ে যাবে। আর, এই প্রথম আমার মনে হল,

...আমার সামনে বাংলাদেশ। পূব-পশ্চিম উত্তর-দক্ষিণে হরিতেশ্যামলে সোহাগে রক্তে ভিজে সোঁদা গন্ধেভরা মাটি। পূবে উতলা নদীর ভাটিয়ালী। পশ্চিমে গেরুয়া বাউল। উত্তরে মোহিনী কিন্নরগণ—পুরুষ তবু পুরুষ নয়, নারী তবু নারীও নয়—নূপুরের ঘুংঘুরের ধ্বনির নক্ষত্রফোটা অন্য এক আকাশ যেখানে মাথার ওপর বুকের ভিতর; এবং দক্ষিণে থামারজ্বলা আগুনের পাশে সোনাক্ষেত্রের 'বরিশাল গান'।

তারপর সেই জলার ধারে, অবিকল যা সব বলেছিলাম,

...প-রা-ণ-রে! মধ্যরাতে বাবলা ডালে ঝুলন্ত লন্ঠনের মত শীতের চাঁদ। হটিটি পাখি কাঁদিয়ে ওঠে, টি টি টি। দূর থেকে দূরে ছড়িয়ে পড়ে ভাংগা ডাক মায়ের গলায়, পরাণ কো-থা-গে-লি-রে!!

সাড়া দিতে ইচ্ছে করছিল, যাই মা! কিন্তু এ এক দুর্ধর্ষ কসাইয়ের কঠিন মুঠিতে আমার গলা। শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসছিল। ধরা পড়ে গেল তাহলে! ধরা পড়ে গেল সব। প্রতীক কখনও বাস্তবতায় একাকার হয়ে ওঠে। যে মাটি কবর বা শ্মশান, সে-মাটিই সৃজনশীলতা। শস্য ও হাড় ওতপ্রোত হয়।

শীতে ঠান্ডা নিঃসাড় হয়ে আমি ফিরে আসছিলাম। সমানা পয়েন্টসম্যানের সেই রেলকম্বলটাই এখন জীবিত মানুষের অবশিষ্ট প্রার্থনা। অলক চোখ মুছে বলল, জানতাম, পাইবেন না। ও জিনিস আর মিলবার না। আমি তো জানি, 'ভুজভুগী'।

হ্যাঁ, ছোটভাই তার মন জুড়ে বাস করছিল।

সকালেই স্টেশনে খবরের কাগজ আসে। চাওলাটা রাখে। সেই কাগজে একটা খবর পড়লাম। মথুরাবাবু লেনের একটা লাস। এ গলিতে এই প্রথম। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র (২২) শ্রীঅনিন্দ্য চক্রবর্তী ওরফে ছোটন ওরফে ছোটকু। বুকে কাঁধে ও পেটে আঘাতের চিহ্ন। পুলিশের ধারণা, পারিবারিক কলহেরই পরিণতি। আগের দিন তার বেকার দাদার সঙ্গে মারামারি হয়েছিল। আসামী বেপাত্তা। খোঁজ হচ্ছে লোকটাকে। ...এবং রিপোর্টারের মন্তব্য; কী সুন্দর ফরসা ছেলেটি! দেখলে বুক টাটায়।

ঝাপসা বাংলাদেশের শীতের আকাশ জুড়ে আস্তে আস্তে একটা মধ্যরাত ছড়িয়ে আসার পর অনেক দূর থেকে ফের কে চেরা গলায় ডাকতে লাগল, পরাণ কো-থা-গে-লি প-রা-ণ-রে!

'ছেলেবেলায় পাখি ধরা ছিল আমার একটা মস্ত শখ। ঠিক শখ নয়, শখের চেয়ে বেশী, কী বলব—তোমাকে অনেকবার বলেছি না?'

'হ্যাঁ; তুমি একটা আস্ত ব্যাধ ছিলে!'

'নাঃ। ব্যাধ ঠিক ছিলাম না কিন্তু। ব্যাধেরা পাখি ধরে সাধারণত পাখি বিক্রী করার জন্যে। কাকমারাদের নাম শুনেছ? কাকমারারা কাক ধরে কাকের মাংস খবার জন্যে: আমরা যেসব পাখি ধরতাম, যেমন—ঘুঘু; বাঁটুল দিয়ে ঘুঘু মারতাম। কাদা দিয়ে গোল গোল গুলি পাকিয়ে সেগুলো রোদে শুকিয়ে উনুনে পুড়িয়ে নিতাম; তারপর বাঁটুল দিয়ে সেই গুলি তাক করে মারতাম গাছের ডালে বসা ঘুঘুকে। ডাক-পাখি, পাতকো—এদের ধরবার জন্যে এক-ধরনের খাঁচা তৈরী করতাম। খালের পাড়ে, বাঁশবনে, ঘরের কানাচে ঝোপঝাড়ে সেই খাঁচা বসিয়ে দিতাম। খাঁচার মধ্যে ঝোলানো থাকত কয়েকটা ধানের শীষ। ডাকপাখি, পাতকো চরতে চরতে খাঁচার কাছে এসে সেই ধান খাবার জন্যে খাঁচার মধ্যে মুখ গলিয়ে দিত, তারপর তাদের ঠোঁটের ঠোক্করে খাঁচার গায়ে লাগানো ফাঁস একসময় তাদের গলায় আটকে যেত। আমি, আমার পাখি শিকারের সঙ্গী দু-একজন বন্ধু মিলে এই সব পাখির মাংস খেতাম; কখনো ঝোল রান্না করে, কখনো ভাজা করে, কখনো আগুনে পুড়িয়ে।"

"মাগো!" পাখির মাংস লোকে খায়? ভাবলেও বমি আসে! ওয়াক—!"

"উঃ! তুমি যে মুরগী খেতে এত ভালবাস? হপ্তায় রোজ মুরগীটা গোটাই ত আজ তুমি খেলে চাও!"

"ই-ইস্—বেশ, খেয়েছি। গল্প বলবে কিনা বল না হলে আমি কিন্তু সত্যিই ঘুমিয়ে পড়ব, আমার ঘুম পাচ্ছে।"

"ঘুম আসছে এই গরমে! গায় হাত দিয়ে দেখ, ঘামে ভেসে যাচ্ছি। দেখি তোমার গা,—এঃ! তুমিও যে ভেসে যাচ্ছ অ্যাঁ!"

"ছোটলোক! নু—নঃ! গল্প বলবে ত বল না হলে ঘুমতে দাও।"

"সারাদিন ত বাবা পড়ে পড়ে ঘুমোও। দুপুরে কী কর গো, ঘুমোও সত্যি? মাঝে মাঝে কোথাও বেরোও না? পুরোনো বন্ধুরা, পাড়ার দাদারা কেউ কেউ আসে না গল্প করতে?"

"ছোটলোক!"

"আঃ! আচ্ছা বাবা আচ্ছা, রোজ দুপুরে তুমি লক্ষ্মী মেয়ের মত ঘরের মধ্যে ঘুমিয়ে থাক। কিন্তু সারাদুপুর আমি যে আগুনের মত গরম কারখানা ঘরে লোহা পিটে পিটে—।"

"ভাল করে লেখাপড়া শিখলে পারতে, অফিসের ঠাণ্ডা ঘরে গদি-আঁটা চেয়ারে বসে ঘুমতে মজা করে!"

"অফিস! অফিসে চাকরী করলে ক' পয়সা পেতাম? লোহা এখন ত আর সত্যিই পিটি না। পিটতাম, তিন বছর আগে। এখন মেজাজে মজুরদের লোহা-পেটা তদারক করি, শেখাই। অনেক থার্ড ক্লাস সরকারী অফিসার—অপিচারবাবুর চেয়ে বেশী কামাই। আর তা না হলে

পাড়া মাতানো এমন জলজ্যান্ত সুন্দরীকে—।"

"আঃ! লাগে না আমার? জোঁকাপেটা হাত ত, সব কিছুকে লোহা মনে করে!"

চোরা ঠেকুর উঠল মনীর। "আজ মাংসে তুমি বেশী রোশন দিয়েছিলে না? ঘুম আর আসবে না। কী পুরোট বলত?"

"লক্ষ্মীসোনা, বল না একটা গল্প। বল না গো, কেউ বলছিলে,—বল বল!"

"একটা শর্ত।"

"কী বল?"

"এই—।"

"ইস্! ঘেন্না করে না তোমার? কী গো তুমি? নাও এবার বল। আবার তুমি বিড়ি ধরাচ্ছ?"

"ধোঁয়া যায় ত শরীরে, না কী? সিগারেটে ঠিক্ মৌজ আসে না জান।"

"কিন্তু তোমার মুখে যা বিশ্রী গন্ধ হয়—। তুমি একটুও সভ্য নও। কেমন যেন তুমি—।"

"মানুষও ত এক ধরনের জন্তু। হা-হা-হা-হা-হা।" উদ্দাম হাসি দিয়ে শুরু করল মনী। "পায়রা ধরা ছিল আমাদের সবচেয়ে উত্তেজনাকর শিকার। আমাদের পাশের বাড়ীর একটা ছেলে, আমারই বয়েসী, তখন সে স্কুল ছেড়ে দিয়েছে, ভবেন তার নাম। তার চেহারাটা ছিল আমার প্রায় বিপরীত। চৌকশ গড়, গুণ্ডা-মার্কা। ফাঁদ তৈরীতে সেই ভবেন ছিল ওস্তাদ। আর আমি ওস্তাদ ছিলাম ফাঁদ পাততে; কখন, কোন জায়গায় কী রকম ফাঁদ বসাতে হবে—। দুপুরবেলা পাড়ার এর ওর গোয়ালে ঢুকে আমরা দুজনে গরুর লেজের চুল ছিঁড়ে আনতাম। আর সেই চুল পাকিয়ে ফাঁদ তৈরী করত ভবেন। তারপর একটা লম্বা মোটা সুতোয় সেই ফাঁদ সারিসারি বাঁধতাম।

যে মাঠে, গোলকুর পায়রার ঝাঁক এসে বসে সেখানে ফাঁদ বসিয়ে ফাঁদের চারপাশে খুদ, ডাল, কলাই ছড়িয়ে দিতে হত। উড়ো পায়রা,—কাদের পায়রা, কোন গ্রাম থেকে আসত—আমরা কিছুই জানতাম না। আমাদের ফাঁদে পায়রা পড়ত, আমরা মাংস খেতাম।

পায়রারা কিন্তু বছরের সব সময় আসত না। মাঠের ধান কাটা হয়ে যাবে। খেসাড়ী কলাই মাঠ থেকে তোলা হয়ে যাবে। আর সেই সময় মাসখানেক ধরে রোজ দুপুরে তারা দেখা দেবে।

এমনি এক পায়রার মরশুমে, একদিন ভবেন আর আমি বেরিয়েছি। আমাদের গ্রাম থেকে একটা বড় মাঠ পেরিয়ে একটা খাল; এই সময় খালে জল থাকে না। সেই খালের পাড়ে একটা উঁচু পড়ো মতন জায়গায় ফাঁদ পাতলাম। ফাঁদের চারপাশে যথারীতি খুদ ডাল ছড়িয়ে দিলাম। ফাঁদের সুতোটা একটা আধলা ইটের সঙ্গে বেঁধে দিলাম। তারপর একটু দূরে, মাঠের মধ্যে একটা বাবলা গাছের ছায়ায় ক্যানেলের ওপর গিয়ে বসলাম।

আমি তখনও ভাল করে বিড়ি ধরিনি। ভবেন একটার পর একটা বিড়ি ধরিয়ে যাচ্ছে। আকাশের দিকে, যেদিক দিয়ে পায়রারা আসে চেয়ে আছি, কখন পায়রার একটা ঝাঁক দেখা দেবে। একটা ঝাঁক পড়েতে নামবে, চরতে চরতে পায়রাগুলো ফাঁদের কাছে আসবে, খুদ ডাল খুঁটে খুঁটে খাবে তখন আমরা হই হই করে তাদের তাড়া করব, উড়ে পালাতে যাবে আর তাদের কারো কারো পা ফাঁদে আটকে যাবে।

সেদিন কী হল, আকাশে আর পায়রার দেখা নেই। ঠিকঠিক দুপুর, কোথাও লোকজনের চিহ্ন নেই। কিন্তু শীত-কালের বেলা, দু' ঘণ্টেই দুপুর বিকেলে গড়িয়ে পড়ে, তখন খালপাড়ের পথে লোক-জনের চলাফেরা শুরু হবে, পায়রারা আর নিচে নামবে না। তাহলে আজ আর পায়রার ঝাঁক আসবে না নাকি! উত্তেজনায় ভবেন ঘন ঘন বিড়ি ধরাচ্ছে। আমিও দু'চার টান খাচ্ছি। ভবেন একবার দুঃখটে বলেই ফেলল, "কী হল বল দিকিন, শালারা আজ আসবেনে নাকি!"

"তাই ত দেখছি!" আকাশের দিকে হা পিত্যেশ নয়নে চেয়ে আছি। মাঝে মাঝে ঘাড় টন-টন করে; চোখ জ্বালা করে। মাঠে দূরে দূরে কতগুলো গরু চরছে। আশেপাশে জঙ্গলে সারি সারি বাবলা গাছ। রোদটা কেন ঝিমিয়ে পড়ছে। মনটা হঠাৎ খারাপ হয়ে গেল। "নাঃ! আজগে আর হল নি বুঝলি?"

ভবেন দেখলাম হতাশ হল না। বলল, "দাঁড়া না, আরো খানিকক্ষণ দেখি। বিকেল একটা ঝাঁক আসবেই—রোজ আসে!"

আরো কিছুক্ষণ কেটে গেল। কারো মুখে কোন কথা নেই। আশা নিরাশার দোলায় দুলছিলাম নীরবে।

আমার কী রকম ঘুম ঘুম পাচ্ছিল। কখন একটু তন্দ্রা এসেছিল, ভবেনের কনুই-এর গুঁতোনিতে হঠাৎ চমকে জেগে উঠে 'কোথায়' বলে আকাশের দিকে চেয়ে দেখি কোথাও পায়রার চিহ্ন নেই।

"ঐ দেখ।" ভবেন আঙুল দিয়ে দেখাল।

দেখি কী, খালের ওপারে মাঠে একটা মেয়ে। কাঁখে গোবরের ঝোড়া। কোন গ্রামের বৌ-ঝি কেউ হবে। তখনও ভাল করে আমার ঘুমের ঘোর কাটেনি। বললাম, "একটা মেয়ে ত। কী রে, মেয়ে কি পায়রা?"

ভবেন চাপা গলায় বলল, "চুপ!"

"কেন?"

"চুপ্! একদম চুপ মেরে থাক্!"

ব্যাপার কিছু আমি বুঝে উঠতে পারলাম না। দেখি যে মেয়েটা গোবর কুড়তে কুড়তে খাল পেরিয়ে আমাদের ফাঁদের পাশ দিয়ে এপারের মাঠে এসে নামল। তারপর দেখি মাঝে মাঝে নিচু হয়ে গোবর কুড়চ্ছে আর মুখ তুলে ঘন ঘন আমাদের দেখতে দেখতে আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছে। মেয়েটা বয়েসে আমাদের চেয়ে দু' এক বছরের ছোট কী বড় হবে। লাল ডুরে কাপড় পরা, ফর্সা ফর্সা রং, একপিঠ এলো চুল; নরম নরম রোদে বেশ মিষ্টি মিষ্টি দেখতে লাগছিল।

ভবেন হঠাৎ বলে উঠল, 'চারপাশটা ভাল করে চেয়ে দেখ ত, কেউ কোথাও আছে কি না—।"

না, লোকজন কেউ নেই কোথাও।

মেয়েটা অনেকটা এগিয়ে এসেছে অমনি ভবেন উঠে দাঁড়াল। আমি তার একটা হাত ধরে তাকে বসিয়ে দেবার চেষ্টা করলে এক ঝটকায় হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে 'দাঁড়া না মজা হবে' বলেই সে এগিয়ে গেল।

ভবেনের মতলব কিছুটা আমি আন্দাজ করতে পেরেছি। একবার ভাবলাম ভবেনকে ডাকি, বলি, ভবেন ফিরে আয়, অমন করে কোথায় চললি, ফিরে আয়। কিন্তু তখন সে অনেকটা দূরে গিয়ে পড়েছে। মেয়েটার পাশাপাশি হেঁটে এগিয়ে চলেছে।

কী করব, পালাব কী না বুঝে উঠতে পারছি না; বুক আমার কাঁপছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভবেনের কাণ্ড দেখছি।

হঠাৎ ভবেন পিছন ফিরে হাতছানি দিয়ে আমাকে ডাকল।

এক ছুটে তার কাছে গিয়ে পৌঁছলাম। মেয়েটা তখন একটু তফাতে একটা বাবলা গাছের আড়ালে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। ভবেন আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিস ফিস করে যা বলার বলল।

আমি আমতা আমতা করে বললাম, "কিন্তু কেউ যদি দেখতে পায়? যদি কেউ জানতে পারে? কিম্বা মেয়েটা যদি ঘরে গিয়ে বলে দেয়?"

ভবেন আমাকে গালি দিল। তারপর অনেকটা হুকুমের মত করে বলল, "তুই খালপাড়ে দাঁড়িয়ে চারদিকে নজর রাখবি। লোকজন কাউকে আসতে দেখলেই তিনবার জোরে জোরে হাততালি দিবি।—আমিও তোকে এমনি পাহারা দোব।" ভবেন হন হন করে এগিয়ে গেল।

আগে আগে চলেছে ভবেন; তার দশ পনের হাত তফাতে পিছনে পিছনে মেয়েটা। আর আমি ভয়ে উত্তেজনায় অভিভূতের মত তাদের অনেকটা পিছনে পা পা করে চলেছি।

একসময় তারা রাস্তা পেরিয়ে খালের নিচে নামল। আমি রাস্তার ওপর এসে দাঁড়ালাম। তারা খালের শুকনো খাত ধরে দক্ষিণদিক বরাবর কিছুটা গিয়ে তার-পর একটা ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

রোদের মধ্যে দাঁড়িয়েও আমার শীত করছিল। বিড়ির বাণ্ডিল, দেশলাই সব ভবেন সঙ্গে নিয়ে গেছে। চারদিকে ঘন ঘন তাকাচ্ছি। না, লোকজনের চিহ্ন নেই, শুধু কতগুলো গরু চরছে। গরুরা কি আর মানুষ যে আমাদের কাণ্ডটা টের পাবে, তেড়ে আসবে। জীবনে এই প্রথম,—কী রকম ভয় আমায় দারুণ রোমাঞ্চ লাগছিল ভাবতে। ঠিকমত গুছিয়ে ভাবতে পারছিলাম না জীবনে এই প্রথম কী করতে চলেছি; ভয়ংকে যাচ্ছিলাম। কেমন একটা ঘোরের মধ্যে ডুবে যাচ্ছিলাম বারবার। যেন স্বপ্নের মধ্যে সাঁতার কাটতে কাটতে কোথায় চলে যাচ্ছি, হাত পা সর্বশরীর অবশ হয়ে

নামের নকল অনেক বেরিয়েছে, কিন্তু এর গুণের নকল নেই

ঠিক আসল নির্মল বার সাবানের মতই বাজারে নকল নির্মল বার সাবান বিক্রি হচ্ছে। নির্মল বার সাবানের জনপ্রিয়তার সুযোগ নিচ্ছে অসাধু সাবান-প্রস্তুতকারীরা। এটা বন্ধ করার যথাযোগ্য ব্যবস্থা হচ্ছে।

নির্মল বার সাবান

পূর্ব-ভারতে এই বার সাবানই কাটতিতে সবার উপরে।

সর্বদা পরিচিত, বিশ্বস্ত দোকান থেকেই আপনি নির্মল বার সাবান কিনবেন। দেখে নেবেন, কুসুম প্রোডাক্টস লিমিটেডের তৈরী খাঁটি নির্মল বার সাবান কিনা। নির্মল বার সাবানে প্রচুর ফেনা হয় আর কাপড়জামা বিনা ঘষলে অতি সহজেই কাচা যায়। ময়লার চিহ্নমাত্র থাকে না। প্রতিবারেই নতুনের মত ধবধবে পরিষ্কার দেখায়।

কুসুম প্রোডাক্টস লিমিটেড, কলিকাতা-১

KPH 4102A

আসছে; এবার বোধহয় সাঁতরে যাব রাস্তার পড়ে যাব। পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে যাব।

হঠাৎ দেখি মেয়েটা চলে যাচ্ছে; হাঁ সেই মেয়েটাই। কাঁখে গোবরের ঝোড়া, লাল ডুরে কাপড় পরা,—যে দিক দিয়ে এসেছিল সেই দিকে ধীরে ধীরে হেঁটে চলে যাচ্ছে।

তপেন এল একটু পরে।

খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছিল তপেনকে।

বললাম, 'ঘরে যাই চ।'

'চ।'

আমাদের ফাঁদের কথা মনে পড়ল হঠাৎ।

ছুটতে ছুটতে ফাঁদের কাছে এসে দেখি কী, একটা সুন্দর সাদা পায়রা ফাঁদে আটকে নেতিয়ে পড়ে আছে ধুলোয়। কতক্ষণ আগে, কখন পায়রার ঝাঁক এসে বসেছিল, কখন উড়ে গেছে, আর এই পায়রাটা—। তাড়াতাড়ি গলা থেকে ফাঁস ছাড়িয়ে দিলাম। যত ডানা ঝাপটেছে উড়ে পালাবার জন্যে ফাঁস গলায় ততোই শক্ত হয়ে বসেছে। খুব খারাপ লাগছিল। একটা পায়রা পোষার শখ আমার অনেকদিন থেকে। এমনি সাদা এমনি সুন্দর একটা পায়রা ফাঁদে পড়ুক, কতদিনের ইচ্ছা আমার। একদিন যদি বা ইচ্ছাটা পূর্ণ হল, ফাঁসটা কিনা গলায় লাগল। দম বন্ধ হয়ে মরল পায়রাটা।

'তারপর?'

বিনতার কণ্ঠস্বরে ননী যেন রীতিমত বিস্মিত হল। 'এত মন দিয়ে শুনছিলে তুমি? আমি ত ভাবলাম তুমি ঘুমিয়ে পড়েছ। আমার কিন্তু ঘুম পাচ্ছে, পরেরটুকু কাল বলব।'

'না না, আজই বল। বল না গো, বল বল।'

'ঘুম পাচ্ছে সত্যি, পারছি না।'

'কাল ত রোববার, দুপুরে ঘুমিও; বল বল।'

'কাল তোমার ইংরাজী সিনেমার ম্যাটিনী শোর টিকিট কাটা আছে যে—।'

'তোমাকে কাল সকাল সকাল স্নান করে দোব। বল বল। কই বল।'

'আচ্ছা মেয়ে যাইহোক! বাকীটা আর না শুনলেই নয়? শোন, এতই যখন ইচ্ছে!'

'বল বল!' আবেগে বিনতা ননীর গলা জড়িয়ে ধরল।

'উঃ! ছাড় ছাড়,—দম বন্ধ হয়ে যাবে যে! শেষকালে পায়রাটার মত অবস্থা না হয় আমার!'

'আহা! নিজে কিনা আস্ত একটা বাঘ।'

'হুঁ। তারপর ফাঁদ গুটিয়ে নিয়ে মরা পায়রাটা হাতে করে ফিরছি। আমরা কেউ আর কোন কথা বলছি না।

বেশ কিছুক্ষণ পরে তপেন হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, 'ননী, কী এত ভাবছিস রে?'

আমি বললাম, 'কই, কিছু ত ভাবিনি। কেন?'

'না। এমনি বললুম। আমি মনে করলুম তুই বুঝি সেই মেয়েটার কথা ভাবছিস।'

তপেনের কেন এমন মনে হল আমি সেই মেয়েটার কথা ভাবছি? কেমন করে তপেন আমার মনের কথা টের পেল?

হঠাৎ তপেন হো হো করে হেসে উঠল।

কী ব্যাপার, এমন করে হাসে কেন তপেন? 'কী রে, হাসছিস কেন? কী হয়েছে?'

'না কিছু হয় নি। এমনি।'

'এমনি মানে? এমনি এমনি কেউ হাসে এমন করে?'

তখনও সে তেমনি হাসছে।

তার ভাবভঙ্গি আমার কীরকম অদ্ভুত মনে হচ্ছিল। আমি জোরে জোরে হাঁটতে লাগলাম।

আমাকে খোঁচা মারল তপেন, 'তোকে কীরম ফাঁকি দিলুম!'

'মানে!' আমি শিউরে উঠলাম।

তপেনের সেই জঘন্য হাসি আবার।

মুহূর্তে, বাজ পড়ার মত কী যেন আমার মধ্যে ঘটে গেল। তপেনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম আমি। লুটে করে পড়ে গেল তপেন চকিতে তার বুকের ওপর চড়ে বসলুম। এক হাতে তার গলা টিপে ধরে আর এক হাতে আমি তার মুখে কপালে ঘুঁসির পর ঘুঁসি চালাতে লাগলাম। লোহার মত শক্ত শরীর তপেনের, ষাঁড়ের মত শক্তি; কিন্তু আমার গায় তখন একটা অসুরের তেজ। তপেন চীৎকার করতে লাগল,— 'ননী ছেড়ে দে, ছেড়ে দে, মরে যাব ননী, ছেড়ে দে—।' দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছিল আমার শরীর মনে—। তপেনের মুখখানি ফেটে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরুতে লাগল,— আমার তখন হুঁশ নেই—।"

এই সময় বিনতা হাঁপাতে হাঁপাতে বলে উঠল, 'জান, আমার জীবনে না একবার এমনি একটা ঘটনা ঘটেছিল; আমি না আমি না, কী বলব, আমি প্রায় পাগল হয়ে গিয়েছিলাম,—কী বলব,—কী যে আমার হয়েছিল—।'

ননী হঠাৎ বিছানায় উঠে বসল। 'কী হয়েছিল, কী ঘটনা ঘটেছিল তোমার জীবনে?'

স্বামীর কণ্ঠস্বরে বিনতা যেন সম্বিত ফিরে পেল। খুব ভয় পেয়ে গেল স্বামীর প্রশ্ন করার ভঙ্গিতে। কাঁপা কাঁপা গলায় উত্তর দিল, 'নাঃ! কি-কিছুই ঘটে নি।'

'নাঃ! এই যে বললে তোমার জীবনে এই রকম একটা ঘটনা ঘটেছিল। ঘটনাটা কী, বল?'

অন্ধকারে বিনতা বিছানার মধ্যে আত্ম-গোপন করতে চাইল। 'ব-বলছি ত, কি-কিছু ন-নাঃ!'

'কিছু না মানে? লুকোচ্ছ! এই মাত্র তুমি নিজেই বললে—।'

'আ-আমি কিছু বলি নি!'

'বল নি? ইয়ার্কি!'

অন্ধকারে উবু হয়ে বসা কালো বিশাল-শরীর ননীকে দেখাচ্ছিল যেন একটা জন্তু-জানোয়ার। নিজেকে বিনতার ভীষণ অসহায় মনে হল। 'বিশ্বাস কর, সত্যি! কিছু নয়। কী বলতে কী বলেছি! স-সত্যি—।'

'বলবে না? বল বলছি!' ননী হুঙ্কার ছাড়ল।

'বিশ্বাস কর; সত্যি, সত্যি কিছু নয়, বিশ্বাস কর।' বিনতার আর্তস্বর ননীর গর্জনে ডুবে গেল,—'আমি কিছু জানি না ভেবেছ! তাই ত বলি তোমার ছেলে হয় না কেন! বল, বল বলছি কী হয়েছিল? বল!'

'ছোটলোক!' বিনতা জোরে খোঁচা মারল।

'শয়তানী!' ইস্পাতের ছুরির মত ননীর কথাটা আপন অস্ফুট উল্লাসে বিনতার রোগা ঘর্মাক্ত শরীরটা ফালা ফালা করতে লাগল।

যন্ত্রণায় দম বন্ধ হয়ে ক্রমশ ঝিমিয়ে পড়তে পড়তে বিনতা শুধু দু-একবার সাপিনীর মত ফুঁসিয়ে উঠল, —'ইতর!'

ব্রণ
দূর করবার জন্য
লিচেনসা

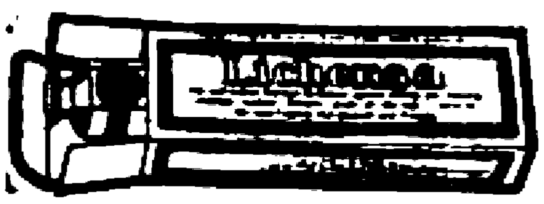

● ১০৮ টি দেশে ডাক্তাররা প্রেসক্রিপশন করেছেন।
● যে কোন নামকরা ওষুধের দোকানেই পাওয়া যায়।

শিশিরকুমার ভাদুড়ী

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
—জাতীয় অধ্যাপক

আমাদের সময়ে বাঙলাদেশে তথা ভারতবর্ষে যে-সমস্ত শ্রেষ্ঠ পুরুষের আবির্ভাব ঘটেছে, জ্ঞান-বিজ্ঞানে সাহিত্যে-শিল্পকলায় ব্যবসায়-বাণিজ্যে রাষ্ট্র-পরিচালনে আর জীবনের অন্য নানাদিকে যাঁরা অনন্যসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে শিশিরকুমার ভাদুড়ি যে একজন প্রধান পুরুষ ছিলেন সে সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নেই। আমার নিজের দীর্ঘ আশি বৎসরের জীবনে ছোটো বড়ো ব্যক্তিত্বশালী বহু অসাধারণ ব্যক্তির সঙ্গে পরিচয়ের সৌভাগ্য হয়েছে। দূর থেকে পরোক্ষভাবে কতকগুলি মহাপুরুষের অনুপ্রেরণা পেয়ে, আর প্রত্যক্ষভাবে কয়েক-জন বিরাট পুরুষের স্পর্শ পেয়ে (তাঁদের মধ্যে যাঁকে 'পূর্ণ মানব' বলা যায় সেই কবি-মনীষী রবীন্দ্রনাথ হচ্ছেন প্রধান), জীবনে সার্থকতা এসেছে, জীবন ধন্য হয়েছে। এঁদের কথা গুছিয়ে বলা সহজ নয়, আর তা বলবার চেষ্টার অর্থ হবে—নিজের আভ্যন্তর জীবনের সমীক্ষা আর প্রকাশ করবার ব্যর্থ প্রয়াস, যার জন্য বিশেষ শক্তি আপেক্ষিত, আর যার পিছনে থাকবে আত্মানুসন্ধান আর উপলব্ধির আলোক। ভারতের শাশ্বত ইতিহাসের ধারার কথা বলবো না—আমাদের এ যুগেই আমাদের পিতা-পিতামহদের কালের ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ মহাপুরুষদের চিন্তা আর শিক্ষার [illegible] যে দুই এক বিন্দু যদি আমাদের জীবনে সার্থকতা এনে দিয়েছে, তার পূর্ণ পরিচয় দেওয়া তো আমার শক্তির বাইরে। আমার গুরুজনদের কাছ থেকে, বিশেষ করে আমার ইস্কুলের আর কলেজের শিক্ষকদের কাছ থেকে যে চিত্তের প্রসার আর মানসিক বিকাশ তাঁদের দয়ায় আমি লাভ করেছি, সেটিও একটি মস্ত বড় সম্পদ, আর তার জন্য আমি ভাগ্য বা নিয়তি বা দেবকৃপা বা কর্মফল যাই থাকুক তার কাছে চিরকৃতজ্ঞ। আমার পিতৃদেব, মাতৃদেবী, পিতামহ, পিতামহী, মাতামহী, মাতুলদ্বয়, আর অন্য আত্মীয় আর আমার শিক্ষকদের সান্নিধ্যের আর তাঁদের স্নেহের কথা মনে হলে কোটি কোটি প্রণাম তাঁদের উদ্দেশে নিবেদন করি।

এঁরা ছাড়া, আমার সতীর্থ সহচর সুহৃৎ মিত্র যারা ছিল, তাদের কাছ থেকে জীবনের ক্ষেত্রে যখন প্রথম অবতীর্ণ হলুম তখন থেকে যা পেয়েছি তার জন্যও নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করি। সমস্ত সহপাঠীদের আর কৈশোর আর যৌবনের অন্য মিত্রদের সব কথার আলোচনার স্থান এ নয়। তবে বর্তমান প্রসঙ্গ হচ্ছে আমার যৌবন ও প্রৌঢ়ত্বের অন্যতম একজন অকৃত্রিম ঘনিষ্ঠ মিত্রকে নিয়ে, সুতরাং সেই প্রসঙ্গে অন্য মিত্র দু-চার জনের কথা এসে পড়বে। সেই অকৃত্রিম আর ঘনিষ্ঠ মিত্র হচ্ছে শিশিরকুমার ভাদুড়ি।

দু বছর ইন্টারমিডিয়েট ক্লাসে পড়া, দু বছর বি-এ, আর দু বছর এম-এ—এই ছয় বছরের কলেজের জীবন। এই ছয় বছরের দুর্লভ ছাত্রজীবনে, প্রথম যৌবনে, পরিপূর্ণভাবে অংশ গ্রহণ করেছি। পরীক্ষায় ফল ভাল হয়েছিল বরাবরই, কিন্তু কখনও book-worm বা পুঁথি-মুখো বা বই-মুখো ছিলুম না—চোখ খুলে কান সজাগ রেখে সব দেখতুম শুনতুম, ছাত্রজীবনের প্রায় সব ব্যাপারেই সচেতন থাকতুম, কোনও কোনও ব্যাপারে যথেষ্ট উৎসাহও দেখাতুম। ভাল ছেলে, মন্দ ছেলে, নিরীহ গোবেচারী ফন্দীবাজ ধড়ীবাজ নীতিবাগীশ অনৈতিক রুচিবাগীশ, দামপান্ডা, রসবোধযুক্ত বেরসিক—সব রকমের ছাত্র ছিল বন্ধুদের মধ্যে। নাম-করা ভাল ছেলেদের সঙ্গে পরিচয়ও হত, আমার আড্ডা জমত সাধারণ ছেলেদেরও সঙ্গে কিন্তু আমার দলের আমরা সকলে, এ বিষয়ে ক্রমে একমত হই যে লেখাপড়ায় মার্কা মারা পরীক্ষায় ফার্স্ট-ক্লাস পাওয়া ছেলে না হলেও,

আমাদের এই ছয় বছরের কলেজের জীবনে সবচেয়ে জনপ্রিয়, সবচেয়ে উজ্জ্বল-মতি, সবচেয়ে সুবুদ্ধি, আর চেহারাতেও তেমনি সুদর্শন ছাত্র ছিল শিশিরকুমার ভাদুড়ি। এক কথায়—শিশিরই ছিল, প্রায় সর্ববাদি-সম্মতিক্রমে

The Most Brilliant and the Most Popular student in Calcutta University for near about a decade.

এ কথা বলায় বিদ্যার ক্ষেত্রে যে সব দিগগজ ছাত্র ছিল তাদের কারো লাঘব করা হয় না—তাদের কৃতিত্ব ছিল অন্য রকমের, আর একটু সীমিত। বিদ্যায় বুদ্ধিতে শিশির আর কারও চেয়ে খাটো ছিল না, আর উপরন্তু ছিল তার একটা সহজ আকর্ষণীয় শক্তি, একটা মার্জিত উচ্চশিক্ষিত মন আর আচার-ব্যবহারে আভিজাত্য, আর সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রতা ভব্যতা আর শালীনতাবোধ, রসবোধ আর সকলের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মেশবার আগ্রহ—এইসব ছিল যে আকর্ষণী শক্তির মূলে। কোনও রকমের চাল অর্থাৎ কৃত্রিমতার সঙ্গে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা কেউ শিশিরের আচরণে ধরনধারণে কল্পনাই করতে পারত না। মানুষ হিসেবে শিশির ছিল সরল, সহজ, সোজা, খাঁটি—ঋজু, স্বতন্ত্র। আমরা যারাই শিশিরের সংস্পর্শে এসেছিলুম সকলেই তার সঙ্গে এক অতি সহজ মৈত্রীসূত্রে গ্রথিত হয়ে গিয়েছিলুম। বহু বৎসর ধরে, আমাদের কলেজের জীবনে আর তার পরেও শিশির ছিল বন্ধুমণ্ডলীর মধ্যমণি, এমন কি মিত্রমালার গাঁথন-সূতো।

নাট্যাভিনয়ে আর পরিচালনায় শিশিরের দিব্য প্রতিভার কথা বলতে বসবো, নাট্যকলারসিকের ভাবনাময় দৃষ্টি নিয়ে কখনও শিশিরের কৃতিত্বের বিশ্লেষণের চেষ্টা করি নি—সে চেষ্টা আমার এলাকার বাইরে। শিশিরকে পেয়েছিলুম মিত্রভাবে, সহৃদয়-বন্ধুভাবে, মানসিক উৎকর্ষ সাধনের ক্ষেত্রে সতীর্থ আর সমানধর্মারূপে, আর একজন পরিপূর্ণ বিদগ্ধ রসিকজনরূপে। তার ব্যক্তিত্বের সেই

দিকগুলির সম্বন্ধে দুই একটি কথা মাত্র এই প্রসঙ্গে নিবেদন করবো।

কবে, কোন তারিখে শিশিরের সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ আর পরিচয় ঘটে তা মনে নেই। তবে মোটামুটি বলতে পারি, ১৯০৭ সালে এন্ট্রান্স পাস করে যখন জেনেরাল-অ্যাসেমব্লিস-ইনস্টিটিউশনে প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্তি হই (জেনেরাল-অ্যাসেমব্লিস পরের বছরেই ডফ-কলেজের সঙ্গে পুনর্মিলিত হয়ে স্কটিশ-চার্চেস কলেজ-এ রূপান্তরিত হয়ে যায়), তখন থেকেই, বোধ হয় প্রথম বছরের শেষ পর্যায়ে যখন আমরা পড়ছি তখন থেকেই, শিশিরের সঙ্গে আলাপ হয়। তখনকার দিনে ক্যালকাটা-ইউনিভার্সিটি-ইনস্টিটিউটে নামে আধা-সরকারী কলেজের ছাত্রদের ক্লাব কলকাতার ছাত্রজীবনে বেশ একটা লক্ষণীয় উঁচু স্থান করে নিচ্ছে। ক্যালকাটা-ইউনিভার্সিটি-ইনস্টিটিউটে ঐ সময়ে ছাত্রদের জন্য আর তাঁদের নিজেদের অনুষ্ঠিত অন্যান্য নানা অনুষ্ঠানের মধ্যে প্রতি বৎসর আবৃত্তির প্রতিযোগিতা হত। বিভিন্ন কলেজ থেকে দুজন করে ছাত্র এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারত। আবৃত্তি হত ইংরেজি, বাঙলা, সংস্কৃত, ফারসী আর আরবী ভাষায়। তিনটি করে পারিতোষিক প্রত্যেক ভাষার জন্য দেওয়া হত। ১৯০৮ সালে জেনেরাল-অ্যাসেমব্লিস-ইনস্টিটিউটে থেকে সংস্কৃতের জন্য নির্বাচিত হই, বোধ হয় শিশির নির্বাচিত হয় ইংরেজির জন্য। সেবার আমি পারিতোষিক পাই নি। শিশির পেয়েছিল কিনা ঠিক মনে পড়ছে না।

এই আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় প্রথম শিশিরের সঙ্গে পরিচয় হয়। সহজ হৃদ্যতার সঙ্গে শিশির অতি শীঘ্র আমার অন্তরঙ্গ মিত্র হয়ে দাঁড়ায়। এর পরে ঐ বৎসরই, আমাদের কলেজে বাঙলা নাটক, ক্ষীরোদ-প্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'প্রতাপাদিত্য', ছাত্রদের দ্বারায় অভিনীত হয়। শিশির আমার এক ক্লাস উপরে পড়ত—দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে—কিন্তু অভিনয়ের ব্যাপারে ইন্টারমিডিয়েট আর বি-এ, এই দুইয়ের চার ক্লাসেরই ছাত্রেরা অংশ গ্রহণ করত। এই অভিনয়ের সম্বন্ধে লক্ষণীয় কিছু মনে পড়ছে না। ফণীন্দ্রনাথ মিত্র বলে আমাদের ক্লাসের এক সুদর্শন সহপাঠী প্রতাপাদিত্যের ভূমিকায় অভিনয় করে, নাটকের কল্যাণীর ভূমিকা নেয় শৈলেন্দ্রনাথ বসু। একটা দৃশ্যের কথা মনে আছে—দুজন মুসলমান আততায়ীর হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য কল্যাণী যখন খাঁড়া ধরে দাঁড়িয়েছে, তখন ঠিক সঙ্গীন মুহূর্তে প্রতাপাদিত্য আর সূর্যকান্ত এসে হাজির, দুজনের হাতে একটি করে প্রমাণ আকারের খেলার বন্দুক, তাঁরা আক্রমণকারীদের উপর তাড়া করে বন্দুক ধরলেন, স্টেজের ভিতর থেকে দুম-দাম করে 'কলেরা পটাশ' অর্থাৎ 'ক্লরেট-অফ-পটাশ'-এর পটকা ফাটানো হলো, আর সঙ্গে সঙ্গে দুই আততায়ী ধরাশায়ী। তবে একটু বে-হিসাবি হয়ে পড়ায়, পটকা ফাটাবার আওয়াজটা ৩।৪ সেকেন্ড পরে হয়ে যায়—তার আগেই আততায়ীদ্বয় ঘায়েল হয়ে শুয়ে পড়ে। দর্শকদের মধ্যে একটু হাসাহাসি হয়, স্টেজ-ম্যানেজার তো চটে কাঁই। এইভাবে আমাদের বাংলা নাটক হয়। পরের বছর, আমরা তখন সেকেন্ড ইয়ার ক্লাসে, ইংরেজি নাটক শেক্সপিয়রের জুলিয়াস সীজার-এর অভিনয় করি। আমাদের কলেজ জীবনের সময়ে কলকাতার প্রায় সব বড় বড় কলেজে বছরে একটি করে বাংলা নাটক, আর একটি করে ইংরেজি নাটক—সাধারণতঃ শেক্সপিয়রের কোনও বই—অভিনয়ের রেওয়াজ ছিল। এটা কেন ছিল ইংরেজি সাহিত্য শিক্ষার একটা ছাত্রপ্রিয় অঙ্গ। এ সম্বন্ধে দু কথা বেশ লেখা যায়। ১৯০৮ সালে দুটো স্কচ মিশনারী কলেজ, আমাদের জেনারেল-অ্যাসেমব্লিস-ইনস্টিটিউশন আর ডফ কলেজ, মিলে একটি কলেজ হয়ে গেল—স্কটিশ চার্চেস কলেজ (পরে স্কটল্যান্ডে ওদের খ্রীষ্টান প্রেসবিটেরিয়ান দলের ধর্ম সংক্রান্ত মত-ভেদের সমাধান হলে, যখন একটি মাত্র স্কটিশ চার্চ পুনঃস্থাপিত হল, তখন স্কটিশ চার্চেস কলেজ'-এর নামও পালটে গিয়ে হল 'স্কটিশ চার্চ কলেজ')। ঐ সালের স্কটিশ চার্চেস কলেজের 'জুলিয়াস সীজার' অভিনয় নানান দিক থেকে এক লক্ষণীয় ব্যাপার ছিল। আর এতে আমি পূর্ণ অংশ গ্রহণ করেছিলুম—কুশীলব বা অভিনেতারূপে নয়, 'বেশ-কারী' বা বেশকারী অর্থাৎ পোষাক-পরিচ্ছদ দিয়ে সাজানোর ভার নিয়ে। কেন এই কাজ আমি ঘাড়ে করে নিই, সে সম্বন্ধে অনেক খুঁটিনাটি কথা আছে—সব কথার অবতারণা এখন করবো না। তবে শিশির এই নাট্যাভিনয়ে ব্রুটাস-এর ভূমিকা গ্রহণ করে, আর সেই জন্যই আমার পোষাক তৈরি করার প্রচেষ্টা মনে হয়েছিল যেন সার্থকই হয়েছিল।

এই অভিনয়কে অবলম্বন করে শিশিরের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করতে হয়, আর মনে হয়, এই সময়ে শিশিরের সঙ্গে আমার মিত্রতা 'আপনি'র পর্যায় থেকে একেবারে তুই-এর পর্যায়ে এসে পৌঁছয়—সেই থেকে বাকী জীবনে শিশির এমন একজন বন্ধু হয়ে দাঁড়ায় (এ রকম অল্প আরও দু-চারজন হয়েছিলেন) যার সঙ্গে 'তুই-তোকারি' ছাড়া আর অন্য সম্বোধনের কথা ভাবতেও পারতুম না।

জুলিয়াস সীজার নাটক অভিনয় হবে ঠিক হল। মহা উৎসাহে মহড়া চলল। কলেজের কাজ হয়ে যাবার পরে বিকাল ৫টা থেকে ৭টা ৮টা পর্যন্ত মহড়া চলত। আমাদের অধ্যাপকদের কেউ-না-কেউ থাকতেন, স্কচ সাহেব অধ্যাপকেরা, আর তাঁদের ইউরোপিয়ান অভিনয়-রসিক বন্ধুরাও কখনও কখনও এসে আমাদের তালিম দিতেন। কলেজ থেকে টাকা বেশী পাওয়া যেত না। ইংরেজি সাহিত্য চর্চার অঙ্গ হিসেবেই এই ইংরেজি (বিশেষতঃ শেক্সপিয়রের) নাটক অভিনয়কে দেখা হত বলে কলেজের কর্তৃপক্ষ উৎসাহ দিতেন। ছেলেরাই চাঁদা তুলে বাইরে থেকে দুই-একজন কলেজের হিতৈষী পুরাতন ছাত্রের কাছ থেকে টাকা যোগাড় করে কাজে নামত। শেক্সপিয়রের নাটক হবে, বাজার থেকে শলমা-চুমকী দেওয়া ঝুটো মখমলের 'রাজবেশ', সাদা রেশমের 'মন্ত্রীর বেশ' প্রভৃতি শস্তায় ভাড়া করে এনে তো ইংরেজি নাটক হবে না। তখন চৌরঙ্গী রোডে গ্রান্ড-হোটেলের একতলায় ব্যান্ডম্যান অপেরা কোম্পানি বলে ইউরোপিয়ান আর অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান বা ফিরিঙ্গিদের এক থিয়েটার কোম্পানি ছিল, তারা মাঝে মাঝে কলকাতায় ইংরেজদের জন্য ইংরেজি নাটকের অভিনয় করত। আমরা শুনেছিলুম যে, তারা বাইরের লোকেদের যেমন বিভিন্ন ইংরেজ আর বাঙালী কলেজের নাটকের জন্য দরকার মত পোষাক ভাড়া দিত। আমাদের একটি বন্ধু আগবাড়া হয়ে এল, বললে, ঐ ব্যান্ডম্যান কোম্পানির কর্তাদের সঙ্গে তার জানাশোনা আছে। সেই আমাদের জন্য পোষাক ভাড়া করে আনতে পারবে। আমরা রোমান পোষাক জুলিয়াস সীজার নাটকের জন্য যা যা চাই তার তালিকা করে তাকে দিলুম। সে পরে আমাদের জানালে, ১৫০ টাকা না কম পড়বে। টাকাটা কিন্তু আগাম দিতে হবে। আমরা তো অকূলে কূল পেয়ে তাতেই রাজী হলুম, টাকা তার হাতে দেওয়া হল। তার পরে সে হঠাৎ ডুব মারলে—আর কলেজে আসে না, তার বাড়িতেও তাকে পাওয়া যায় না। আমাদের কেমন সন্দেহ হল। নাটকের আর দু-তিনদিন মাত্র বাকী আছে, অভিনয় যারা করবে তারা সব তৈরী, কিন্তু পোষাক? শেষে দু তিনজনে গেল ব্যান্ডম্যান অপেরা কোম্পানীর ডেরায়—পোষাকের খোঁজ বা তদবির করতে। সেখানে গিয়ে জানা গেল, কেউ তাদের কাছে পোষাকের জন্য আসেই নি, টাকা দেওয়া তো দূরের কথা। সব শুনে তারা [illegible]

রসুই
গুঁড়া মশলা
ফোন : ৫৫-২৪৪১, ৩৩-১৪৭১
রসুই প্রোডাক্টস্
১৭ আর জি কর রোড, কলিকাতা-৪ ॥ ২০১ মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা-৭

তোমাদের বধ্টি চোর, পুলিসে দাও। সে তো দূরের কথা—এক শনিবার সন্ধ্যায় নাটক হবে, তার পরেই লম্বা দেড় মাসের পুজোর ছুটি। এখন কলেজের মান বাঁচানো যায় কি করে? অভিনয় যে করেই হোক, করতেই হয়। নিমন্ত্রণের কার্ড পর্যন্ত ছাপিয়ে বিলি করা হয়েছে।

গ্রীক রোমান জগতের প্রাচীন সংস্কৃতি, তার শিল্পকলা পোষাক আশাক সম্বন্ধে আমার আগ্রহ ছিল—সেকেন্ড ইয়ার ক্লাসে গ্রীস ও রোমের ইতিহাস আমার প্রিয় বিষয় ছিল। বন্ধুরা জানত। কেউ কেউ এসে বললে, একটা গতি কিছু করো। আমি সাহস করে এগিয়ে এলুম, আমার হামরাহী হয়ে এলেন আর দুজন সহপাঠী, আনন্দকৃষ্ণ সিংহ (পরে ইংরেজির অধ্যাপক হন রিপন কলেজে) আর নীহার মিত্র। আমি বললুম, কুছ পরওয়া নেই—রোমান পোষাক, অতি সাদা সিধে ব্যাপার। সাদা সিল্কের চাদরে হল রোমান পোষাকের প্রধান অঙ্গ, toga টোগা বা অধোবস্ত্র বা উত্তরীয়, প্রায় সারা গা-টা ঢেকে। ভিতরে সাদা কাপড়ের লম্বা একটা পাঞ্জাবী, সেটা হল ভিতরের tunic টুনিক বা chiton খিটন বা জামা। পায়ে চপ্পল। মাথায় একটা রঙ্গীন কাপড়ের ফেটা—বাস্, এইতেই রোমান পোষাক চমৎকারভাবে হয়ে গেল। এখন আমরা আমাদের বন্ধুদের আর দর্শকদের একেবারে কাত করে দিলুম, রোমান সেপাইদের পোষাক বানিয়ে। সোলার টুপি যা তখনকার দিনে সাহেবরা পরত তাই গোটাকতক আনিয়ে তার মাথার খুলি-টুকু ঢাকা যেত যে গোল অংশে সেইটুকু রেখে বাকী সবটা কেটে বাদ দেওয়া গেল। তার পরে মোটা পিজ-বোর্ডের একটা করে Crest বা চূড়ো (মোরগের ঝুঁটিতে যেমন থাকে) কেটে নিয়ে ঐ সোলা-টুপীর মাথাটা চিরে তাতে বসিয়ে দেওয়া গেল। তার পরে সবটার উপরে রুপোলি বা সোনালি কাগজে আঠা দিয়ে সেঁটে দেওয়া হল—ঝকঝক করতে লাগল, যেন পিতল বা ইস্পাতের helmet বা টোপর অর্থাৎ শিরস্ত্রাণ। গালের দু-পাশে আবার cheek-guards বা পিজবোর্ডের এই শিরস্ত্রাণের গাল-বাঁচাবার ধাতুর অংশ তৈরী করে সেঁটে দিলুম, রুপোলী বা সোনালী কাগজ লাগিয়ে, রবারের সরু ইলাষ্টিক লাগিয়ে যাতে খুলে না পড়ে বা আলগা না হয়ে যায়। শিরস্ত্রাণের মাথায় পাখীর পালক বা ঘোড়ার বালামচীর অলঙ্করণ থাকত, সেটার কাজ সারলুম তুলো সেঁটে, দূর থেকে চলনসই হল। সেই রকম হাঁটুর নীচে চপ্পলের উপরে ধাতুর অনুকারী Greave, বা পাদত্রাণ, আর বড় বড় পিজবোর্ড কেটে তাতে রুপোলী বা সোনালী কাগজ, কালো কাগজ সেঁটে হল রোমান ঢাল—এমন কি তাতে S.P.Q.R. (অর্থাৎ Senatus Populusque Romanu—রোমীয় শাসন ও জনসাধারণ') এই মন্ত্র লাগানো গেল—আর রোমের প্রতিষ্ঠাতা দুই ভাই রোমুলুস আর রেমুস নেকড়ে-বাঘের পেটের তলায় বসে তার দুধ খাচ্ছে, এই নকশার ছাপ। পোর্শিয়া ছিল একমাত্র মেয়ের ভূমিকা, বড় কোঁচকানো সায়া দিয়ে ফিতে দিয়ে তার পোষাকও এক রকম দাঁড় করানো গেল। যখন সাদা রেশমের চাদরের টোগা পরে পিজবোর্ডের সাদা টোপর বা বর্ম-শিরস্ত্রাণ পরে এস পি কিউ আর লেখা পিজবোর্ডের ঢাল নিয়ে, বর্মের উপরে লাল রোমান ফৌজী cloak বা দুকূল পরে, অভিনেতারা মঞ্চের উপরে বার দিলেন, আমরা নিজেরা তো মুগ্ধ হয়ে গেলুম, আর সাহেব মেম আর বাঙালী দর্শকেরাও হাততালি দিয়ে তারিফ করলেন। এখন এসব আমার ১৮ বছর-বয়সের ছেলেমানুষী মনে হয়। কিন্তু নাটক জমেছিল শিশিরের Brutus ব্রুটাসের ভূমিকার অভিনয়ে। আর ব্রুটাস-এর প্রতিস্পর্ধী Mark Antony মার্ক আন্টনির ভূমিকা যিনি করেছিলেন ফোর্থ ইয়ার ক্লাসের ছাত্র, আমাদের অগ্রজ-কল্প, নামটা মনে পড়ছে না—তিনিও চমৎকার করেছিলেন, শিশিরের সঙ্গে তাল রেখে চলেছিলেন। যতীন গাঙ্গুলী বলে প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর একটি ছেলে Portia পোর্শিয়ার অভিনয়ও সুন্দর করেছিল।

এইভাবে তো পরের মাথায় ক্ষুর চালিয়ে রক্তপাত করে নাপিত যেমন তার ব্যবসা শেখে, সেইভাবে শিশির আর অন্য অভিনেতা সহপাঠীদের উপর আমাদের এই experiment চালিয়ে আমরা 'ঐতিহাসিক পোষাক তৈরীর কাজে ছাত্রমহলে সুনাম অর্জন করলুম, প্রধানতঃ আমরা তিনজন—আনন্দ সিংহ, নীহার মিত্র, আর আমি। পরে কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিট্যুটের নাট্যাভিনয়ে 'চন্দ্রগুপ্ত', 'অশোক', 'জনা' প্রভৃতিতে আমাদের জয়-জয়-কার আরও হল, আর শিশির যখন উত্তরকালে পুরোপুরি নাট্যকার বৃত্তি নিলে, তখন সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক অগ্রজ-কল্প রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের দলে এলেন, সহজেই আমাদের পরিচালক নেতা হয়ে গেলেন—শিশিরের 'আলমগীর', 'সীতা', 'দিগ্বিজয়ী' প্রভৃতি অভিনয়ে। আর আমাদের সাহায্যে এলেন—বরাবরই ছিলেন—গিরীশ সেন। শিশিরের প্রযোজনার ফলেই বাংলা রঙ্গমঞ্চে হিন্দুযুগের পোষাক-পরিচ্ছদ stage decor বা মঞ্চসজ্জা প্রভৃতি বিষয়ে ঐতিহাসিক দৃষ্টির আধারে একটা যুগান্তর এসে গেল। শলমা চুমকির কাজে কটকটে লাল নীল সবুজ কালো হলদে ভেলভেটের কোট চাপকান ফুলপ্যান্ট বা হাফপ্যান্ট, আর পালখ লাগানো শামলা বা জরীর টুপির রেওয়াজ ধীরে ধীরে উঠে গেল—ইনস্টিট্যুটে আর পরে সাধারণ রঙ্গমঞ্চে শিশিরের পরিচালিত অভিনয় দেখে। হিন্দু রাজার পোষাক বেনারসী জোড়, খালি গায়ে প্রচুর গহনা, পায়ে চপ্পল, মেয়েদের পোষাকে জরীর কাজ করা বা ছাপা রঙ্গীন সাড়ী, আর তদনুরূপ ওড়না এসে গেল। নাট্যাভিনয়ের পোষাক-পরিচ্ছদ বিষয়ে এই নতুন হাওয়া ক্রমে উত্তর ভারতে আর ভারতের অন্যত্রও ছড়িয়ে গেল। অবনীন্দ্রনাথের আর নন্দলাল অসিতকুমার প্রমুখ তাঁর শিষ্যদের ছবি—আর পিছনে রবীন্দ্রনাথের নানা কবিতা আর অন্য লেখা, এ বিষয়ে এগুলিরও অনুপ্রাণনা ছিল নিভৃতে, কিন্তু অত্যন্ত গভীর আর সুদূর-প্রসারী।

শিশিরের সঙ্গে এই ভাবে, নাট্যকলার প্রযোজনা, আর তার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য আলোচনা, বাংলা ইংরেজী আর সংস্কৃত এই তিন ভাষার সাহিত্য নিয়ে—যে ভাব-

বর্তমান বৎসরের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় বই
শংকর-এর
এপার বাংলা ওপার বাংলা
৮ম মাসে ৮ম মুদ্রণ ১০·০০

শ্রীদিলীপকুমার রায়ের
ধর্মবিজ্ঞান ও শ্রীঅরবিন্দ
দাম : ১২

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের নতুন উপন্যাস
তাঞ্জাম
'কাঞ্চন মূল্য'-র পরবর্তী ঘটনা ৪·৫০

সুভাষ সমাজদারের নতুন বই
আবগারী দারোগার ডায়েরী
নিজস্ব অভিজ্ঞতার নানা রহস্যময় কাহিনী ৫·০০

জরাসন্ধ-র
স্বীকৃতি
দাম : ৪·৫০

কুমারেশ ঘোষের নতুন উপন্যাস
এক বর অনেক কনে
দাম : ১০

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সাম্প্রতিক উপন্যাস
আলোকপর্ণা
দাম : ১০

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের
হসন্তী ৪·৫০

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের
আবার আমি আসব ৭·০০

বাক্‌-সাহিত্য প্রাইভেট লিমিটেড : ৩৩, কলেজ রো, কলকাতা—৯

সময় পাওয়া গেল, যে ঘনিষ্ঠতা জন্ম উঠল, সেটাকে আমার জীবনে একটি পরম পদার্থ বলে মনে করি। এই ঘনিষ্ঠ বন্ধুর কেবল আমাদের অন্তরঙ্গ সুহৃদ মহলের লোকেরাই জানত, এর বাইরে প্রকাশের আশংকা বা চেষ্টা ছিল না। শিশিরের নট-গৌরবের কথা বাইরের লোকে সকলেই জানে, তাঁর শিল্পি-জীবনের তার সাধনার তত্ত্ব কুশীলবের বিদগ্ধ রসজ্ঞ আলোচনা আমাদের অন্তরঙ্গ বন্ধুগোষ্ঠীর কেউ কেউ তো করেছেনই, বাইরের নাট্যরসিক নাট্যসমালোচকও সুবিজ্ঞনও করেছেন। শিশিরের লোকপ্রিয়তা এমন ছিল, অন্য সকলকে আপনার করে নেবার ক্ষমতা এমন ছিল যে, যে কেউ তার সান্নিধ্যে আসত তারই মনে হত, শিশির তার অত্যন্ত আপন জন। নিকট দিয়ে মহৎ চরিত্রের, সর্বস্বর-মানসের অসাধারণ পুরুষের পক্ষে বলা হয়, তাদের ব্যক্তিত্ব যেন একটি পল-কাটা হীরে—তার নানা বা মুখ আছে, প্রত্যেকটি থেকে তার নানা Facet বা মুখ আছে, প্রত্যেকটি থেকে আলো ঠিকরে বেরোচ্ছে—আর সেই অসাধারণ পুরুষের সান্নিধ্যে যারা এসেছে তাদের প্রত্যেকেরই মনে হবে, বুঝি এমন একটা স্থান তার সৌভাগ্যের মধ্যে আছে যেখানে আর কারো ঠাঁই নেই, সেখানে তারা দুজনই একক।

শিশিরের সঙ্গে এই হৃদ্যতাটুকু আমার জীবনের অন্যতম সৌভাগ্য, যেমন আরও দশজন মিত্রও ভক্তশিষ্যের সঙ্গে আমারই মত শিশিরের সম্বন্ধে একথা বলবেন। সাহিত্যিক সাংস্কৃতিক নানা আলোচনা আর নাট্য প্রযোজনা, রাজনীতি, চরিত্র-বিচার প্রভৃতি গুরু লঘু নানা বিষয়ের অন্তরালে শিশিরের সঙ্গে আমার বহু কথাবার্তা হত। তার আর আমার দু-জনেরই নানা ব্যক্তিগত কথা আর সমস্যা, সুখ-দুঃখের আদর্শ-আকাঙ্ক্ষার অভাব-অভিযোগের কথা জীবন-মৃত্যু প্রভৃতি অবিনশ্বর জগৎ-শাশ্বতসত্য নিয়ে, দুজনে বসে পা-চারী করতে করতে অন্তরঙ্গ আলোচনা কতবার না শিশিরের সঙ্গে আর পান্নালাল মুখুজ্যের মত দুই এক-জনের সঙ্গে আমাদের হত। সে সবের কোনও record বা স্মরণিকা নেই—তবে আমার মনন আর চিন্তাধারা গড়ে তোলবার পথে সেই সব আলোচনার একটা সার্থকতা ছিল।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে শিশিরের পিতৃ-বিয়োগ হল। এই মহাগুরু নিপাতের সময়ে আমরা জনকয়েক উপস্থিত ছিলুম, শ্মশানবন্ধুর মত শিশির আর তার ভাইয়েদের সঙ্গে তার পিতার দেহ নিম-তলার শ্মশানঘাটে নিয়ে যেতে কাঁধ দিয়ে-ছিলুম। মৃতদেহের সৎকারে আমার অভিজ্ঞতা বিশেষ ছিল না, কেবল পিতা-মহের বেলায় শ্মশানে গিয়েছিলুম, তবুও কালোচিত সবকিছু করার কাজে সহায়তা করি। চিতার উপর পিতার দেহ স্থাপনের পরে শিশির, তারাকুমার আর বিশ্বের পরস্পরের গলা জড়িয়ে ধরে সে কি কান্না। অন্য নানা বিষয়ে পিতার আর মাতার প্রতি শিশিরের ভক্তি ভালবাসার ছোটখাট অনেক নজীর দেখেছিলুম—মাতামহ মেদিনীপুরের মনীষী কৃষ্ণকিশোর আচার্য মহাশয় সম্বন্ধেও তেমনি ভক্তি ভালবাসার পরিচায়ক অনেক কথা শিশিরের মুখে শুনেছি। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে শিশির-কুমারের স্ত্রী বিয়োগ হয়। শিশিরের স্ত্রী ঊষা দেবীর সঙ্গে কখনও সাক্ষাৎকার হয় নি, শিশিরের বাবা একটু রক্ষণশীল সেকেলে ধরনের মানুষ ছিলেন বলেই বোধহয় শিশির বন্ধুদের বাড়িতে এনে পত্নীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে পারে নি। শিশিরের বিয়ে হয়েছিল সুদূর আগরা শহরে, তার শ্বশুর ছিলেন আগরার বিখ্যাত ডাক্তার রায়বাহাদুর নবীনচন্দ্র চক্রবর্তী—আমরা অত দূর বর-যাত্রায় যেতে পারি নি। কিন্তু পরে আমাদের দলের সকলের শ্রদ্ধা ভালবাসার পাত্র, জ্ঞানপ্রিয় মিত্র, আমাদের অতি আপন-জন 'গুরুদেব'-এর সঙ্গে আর অন্য বন্ধুদের সঙ্গে কথায় বুঝেছি, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে স্বাভাবিক গভীর ভালবাসার যোগ ছিল। যখন খবর এল আগরা থেকে বিবাহের কয়েক বৎসর পরে, শিশির আমাদের দলের মধ্যে সকলকেই উপেক্ষা করেই 'গুরুদেব' জ্ঞানপ্রিয়কে উদ্ভাসিত আনন্দে জানাচ্ছে— Gurudev, you'll be glad to hear, I have got a son শিশিরের চোখে মুখে আনন্দের উচ্ছলতা। মাত্র ছয় বছরের বিবাহিত জীবনের পরে এমন কি হল যে ১৯১৬ সালে শিশিরের স্ত্রী আত্মহত্যা করলেন, তাও আবার ভীষণভাবে কাপড়ে কেরোসিন তেল ঢেলে আগুন লাগিয়ে। বন্ধুবর পান্নালাল মুখুজ্যের সঙ্গে শিশিরের গভীর হৃদ্যতা ছিল, শিশিরের রাত্রে ঘুম হত না বলা-বরই, অনেক সময়ে অর্ধেক রাত পর্যন্ত বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে কাটিয়ে তবে শিশির বাড়ি ফিরত, তখনও কখনও পান্নালালের মত কোনও বন্ধুর সঙ্গে বাড়ির কাছে এসেও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বা পায়চারি করে অনাবশ্যক আড্ডাবাজী করে সময় নষ্ট করত। পান্নালালের মুখে

বেঙ্গল কেমিক্যালের
পারফেক্টেড
কোল্ড ক্রীম অব রোজেস
ল্যানোলিন সংযুক্ত
সকল ঋতুতে ত্বক অম্লান ও নিরাপদ রাখে

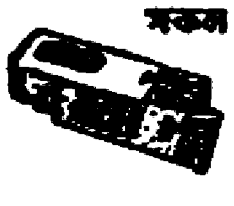

টিউবে এবং
সুদৃশ্য আধারে পাওয়া যায়

বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা • বোম্বাই • কানপুর • দিল্লী
Progressive/BC

বারোটা একটায় শিশিরের স্ত্রী দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে শিশিরের জন্য অপেক্ষা করছে—শিশির তখন বাগানপুকুর লেনের একটি বাড়িতে থাকত।

১৯১৬ সালে আমার নিজের বিবাহের দুই বছর পরে (এই বিবাহে শিশির আর অন্য বন্ধুরা খুব উৎসাহ করে মেতেছিল—শ্রীরামপুরে আমার মামাশ্বশুরের বাড়িতে এই বিবাহ হয়, সকলে দলবেঁধে সেখানে বরযাত্র যায়, আর আমাদের বাড়িতে বৌভাতের দিনও সকলে মিলে এসে খুব হৈ-হুল্লোড় আনন্দ মাতামাতি করে), এক-দিন বেলা দুটো কি আড়াইটের কলকাতায় ৩নং সুকিয়াস রোডে আমাদের বাড়িতে রয়েছি, কি একটা বাজে বই পড়ছি, এমন সময় আমাদের ইনস্টিটিউটের দলের বন্ধু ডাক্তার অঘোরনাথ ঘোষ হঠাৎ এসে হাজির। বয়সে আমার চেয়ে ৩।৪ বছরের বড় ছিলেন, আমরা তাঁকে 'অঘোরদা' বলতুম। ইনি ছিলেন হাইকোর্টের বিখ্যাত ব্যারিস্টার বটকৃষ্ণ বা বটু ঘোষের ছোট ভাই। এঁদের বাড়ি ছিল বিদ্যাসাগর স্ট্রীটে, সুকিয়াস স্ট্রীটের মোড়ের কাছেই। তাঁকে আকস্মিকভাবে এই রকম আসতে দেখে আশ্চর্য লাগল, বিশেষ দেখলুম তাঁর মুখখানা গম্ভীর। কিছু জিজ্ঞেস করবার আগেই বললেন—'তোমার চেনা এ পাড়ার কোনও অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট আছে?' 'অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট!' কি ব্যাপার? অঘোরদা বললেন, ঘণ্টা দেড়েক হল, শিশিরের বউ সম্ভবতঃ আত্মহত্যা করবার জন্যই কাপড়ে কেরোসিন তেল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে, গা অনেকটা ভীষণভাবে পুড়ে গিয়েছে, কথা কয়েছিল, এখন অজ্ঞান হবার অবস্থা। খবর পেয়েই গিয়ে আমি যা দেখেছি বোধ হয় বাঁচবে না—এখন একটা dying deposition শেষ উক্তি নেওয়া দরকার, তাই অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট চাই। চমকে গেলুম। তখনই পাড়ার মাতব্বর ছিলেন রিটায়ার্ড ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট রায়-বাহাদুর চণ্ডীচরণ চাটুজ্যে—তিনি এক ভদ্র-লোকের নাম বলে দিলেন, প্রবীণ ব্যক্তি, নামটি ভুলে যাচ্ছি, আমাদের পাড়াতেই থাকতেন, তিনি রাজী হলেন এই শেষ উক্তি লিখে নিতে। তিনি তৈরী হতে হতেই ঘোড়ার গাড়ি এনে অঘোরদা আর আমি তাঁকে নিয়ে শিশিরের বাড়িতে এসে পৌঁছলুম—ততক্ষণে বোধ হয় পৌনে চারটে হয়ে গিয়ে-ছিল। শিশিররা তখন আপার সার্কুলার রোডের পুবে, রাজা রামমোহন রায়ের বসত-বাড়ি এখনকার সুকিয়াস স্ট্রীট থানার আপিসের কাছে বাগীপাড়া লেনে একটা দোতলা ভাড়া বাড়িতে থাকত। ঐ বাড়িতেই সপ্তাহখানেক আগে শিশিরের বোন গৌরীর বিয়ে হয়েছিল, শিশিরের ভগিনী-পতি শম্ভু, কৃষ্ণনগরে বাড়ি, গিয়ে দেখলুম বরকনে তখন শিশিরদের ওখানেই বিয়ের পরে এসেছে। শিশিরের বাড়িতে পৌঁছে দেখলুম, কিছু আত্মীয় বন্ধুর ভীড় বাইরে, শিশিরের এক জেঠতুতো দাদা মণিলালবাবু, তিনি আমার এসে গিয়েছেন, আর শিশিরের দুই হাতে ডাক্তার পাতায় ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিচ্ছেন। শিশির আমাকে দেখে কোনও কান্নার ভাব যেন চেপে বললে, 'এসেছিস? মেয়েদের সম্বন্ধে কখনও উদাসীন হবি না।' অঘোরদা সঙ্গে সঙ্গে ম্যাজিস্ট্রেটকে উপরে নিয়ে গেলেন। মিনিট পনেরো পরে তিনি নেমে এলেন। সার্টিফিকেটের মত মুমূর্ষু ঊষা দেবীর জবানবন্দী ইংরেজিতে কালি দিয়ে তিনি লিখেছেন, কাগজখানি আমাদের সামনে পড়েছিলেন, আমাদের হাতে দিলেন। তিনি লিখেছিলেন—যতদূর মনে আসছে—

> Heard the dying declaration of the lady.

(তার পরে নাম),

> She seemed to be in a very bad condition and appeared to be rapidly sinking into unconsciousness. She declared that out of a mistaken idea that her husband neglected her and did not love her that she had herself set fire to her sari after puring kerosine oil on her person. She was sorry for what she did, and no one was to blame for this. Before she could reply to other questions, she bcame unconscious.

উপস্থিত দুই চারজনের নামও সাক্ষী-হিসাবে এই সার্টিফিকেটে ছিল। ম্যাজিস্ট্রেট মহাশয় অতি সজ্জন, তাঁর সহানুভূতির জন্য তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে গাড়ি করে তাঁর ফিরবার ব্যবস্থা করে দিলুম। শিশিরের মুখে তখন সংক্ষেপে কিছুটা ব্যাপার শুনলুম—পরে আরও শুনি। বাড়িতে বিবাহের ব্যাপার নিয়ে আত্মীয়স্বজন এসেছিল, শিশিরের সঙ্গে তার স্ত্রীর সে কয়দিন নিভৃতে সাক্ষাৎ হত না। শিশির একটু খুনসুটি করত স্ত্রীর সঙ্গে, স্ত্রী তাতে একটু রাগারাগি করত। দাম্পত্য কলহ—শিশির বাহাদুরী দেখাবার জন্য—নিজেও খামখা রাগ দেখাত, কথা কওয়া লোক দেখানো বন্ধ করে দিয়েছিল। এর মধ্যে স্ত্রী দুবার এসে যেচে শিশিরের সঙ্গে কথা কইতে আসে, পুরুষ-পুঙ্গব বাহাদুরী দেখিয়ে চলে যায়। এটা তার স্ত্রীর মনে লাগে, ভীষণ অভিমান হয়। আক্ষেপের বিষয়, এখানে দাম্পত্য কলহে বহ্বারম্ভে এক অভাবনীয় ট্রাজেডি ঘটে গেল শিশিরের জীবনে। শিশির কিন্তু আড়াল থেকে যেন মজা দেখছিল। যেদিন ঐ ভীষণ ব্যাপার হল, সকালে শিশির আর একবার মৌখিক রাগ দেখায়। সমস্ত সকাল তার স্ত্রীর মনটা যে গুমরে উঠছিল, সে খবর কেউ রাখে নি, শিশিরও নয়। তার স্ত্রী বেশ সহজভাবে ননদ আর নতুন নন্দাইয়ের সঙ্গে আলাপ করেছে, নিজের বাপের বাড়ি আগরপাড়ায় ননদ-নন্দাই গেলে তাদের কি কি দেখাবে সে-সব কথাও বলেছে। শিশির বাইরের ঘরে ছিল। ছোট বাড়ি—হঠাৎ একটা শব্দ হল, যেন একটা বোতল পড়ে গেল। শিশিরের মা জিজ্ঞেস করলেন—'কিসের আওয়াজ? কে যেন বোতল ফেললে?' শিশিরেরও অনুমান ছিল, বোতল

আমাদের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বই

সমুদ্রের হাওয়া	সুবীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়	৫,
জবাবদিহি	সুভাষ চক্রবর্তী	৪,
অরণ্যবহ্নি	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	৫॥

দীপক চৌধুরীর

পথ ও প্রেমিক ৫,　ধড়িবাজীর স্বর্গ ৭,

জেন কার্পেন্টার

প্রতিপত্তি ও বন্ধুলাভ ৪॥　দুশ্চিন্তাহীন নতুন জীবন ৫॥

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের

অখণ্ড অমিয় শ্রীগৌরাঙ্গ

১ম খণ্ড ৮॥　২য় খণ্ড ৮,

মরুকন্যা	মনোজ বৈরাগী	৭,
সূর্যের সন্তান	শচীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৫,

নাটক

ফেরারী ফৌজ	উৎপল দত্ত ...	৩,
ফরিয়াদ	দীপক চৌধুরী	৩,

মনোজ বৈরাগীর

এক পেয়ালা কফি ৩,　আর হবে না দেরী ৪॥

গ্রন্থ বিকাশ　কলিকাতা—৬

স্ত্রীর হাত থেকেই পড়ে গিয়েছে, তাই স্ত্রীকে আরও চটাবার জন্য বলে উঠল—'কে আবার ফেলবে? তোমার গুণবতী বউ।' বলবার সঙ্গেই শিশিরের কেমন সন্দেহ হল, কেরোসিন তেলের বোতল ফেলতে গেল কেন? দেরী না করে শিশিরও তেতলার ছাতে গেল, ছাতে পৌঁছেই অভাবনীয় ব্যাপার—স্ত্রীর সর্বাঙ্গ আগুনে জ্বলছে, শাড়ীটা গায়ে দুপাট করে শক্ত করে জড়ানো, উষা শিশিরকে দেখেই চীৎকার করে বলে উঠল, 'ওগো আমায় বাঁচাও।' শিশির সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, মা, মা, শীগগির এসো, সর্বনাশ হয়ে গেল! ওরে তারু, বিশু, শীগগির সব্বাই আয়।' আর নিজের দুই খালি হাতে স্ত্রীর দেহ ধরে চাপড় মেরে মেরে আগুন নেবাবার চেষ্টা করতে লাগল। দু ভাই তারাকুমার বিশ্বনাথ আর মা এরা এসে পড়লেন। বিশ্বনাথ বুদ্ধি করে ছাতের উপরে একটা ছেঁড়া লেপ বা মাদুর পড়েছিল সেইটে দিয়ে বউদিদির জ্বলন্ত শাড়ীর উপরে জড়িয়ে দিলে। তাতেই আগুন নিভে গেল। কিন্তু শিশিরের কাছে শোনা, তার স্ত্রীর পরনের শাড়ী সবটা পুড়ে যাওয়ায় জ্বলন্ত শাড়ী যেটুকু গায়ে ছিল সেটুকুও ছাড়তে চাইলে না। যা হোক, শেষটায় আগুন নিবে গেল, কিন্তু যা করবার তার চেষ্টা হল, কিন্তু যা হবার তা হয়ে গেল। ধরে ধরে নিচে এনে শুইয়ে দেওয়া হল। অসহ্য যন্ত্রণা—শিশিরের প্রশ্ন—'কেন এমন করলে' তার

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সাময়িক পত্রপত্রিকা

পশ্চিমবঙ্গ

সচিত্র বাংলা সাপ্তাহিক। এতে সরকারের জনকল্যাণমূলক কার্যকলাপের সংবাদ ছাড়াও নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয় নানা তথ্যসম্বলিত প্রবন্ধ ও সরকারী বিজ্ঞপ্তি।

প্রতি সংখ্যা—১০ পয়সা; ষাণ্মাসিক—২·৫০ টাকা
বার্ষিক—৫ টাকা।

ওয়েস্ট বেঙ্গল

সচিত্র ইংরেজী সাপ্তাহিক। সমসাময়িক ঘটনাবলী সম্পর্কিত সংবাদ, তথ্যমূলক প্রবন্ধ, সরকারী বিজ্ঞপ্তি ইত্যাদি নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়ে থাকে।

প্রতি সংখ্যা—২০ পয়সা; ষাণ্মাসিক—৫ টাকা
বার্ষিক—১০ টাকা।

গ্রাহক হবার ও বিজ্ঞাপন প্রকাশের জন্য নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

বিক্রয়-ম্যানেজার
তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার,
রাইটার্স বিল্ডিংস, কলিকাতা-১

প, ব, (তথ্য ও জনসংযোগ) বি ৩৬৮৩।৭০

যেন সব ছেলেমানুষি সন্দেহ চলে গেল। শিশিরকে বললে, 'আমি ভুল করেছি। এর কী সাজা হবে? আমি কি আবার বেঁচে উঠবো?' আর সঙ্গে সঙ্গে আশঙ্কা—'আচ্ছা, যদি বেঁচে উঠি, আর সমস্ত গা তো পোড়ার দাগে ভীষণ হয়ে উঠবে। সবাই দেখে ভয় পাবে—তোমার মনে তখন কি হবে?' যতদূর পারা যায় সান্ত্বনা দিয়ে তার প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা হতে লাগল। সকলেই মুহ্যমান। জীবনের আশা বেশী নেই। নলিনীদার অঘোরদার পরামর্শ মত অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট ডেকে শেষ জবানবন্দীর ব্যবস্থা হল।

এদিকে শিশিরের দুই হাতের চেটো আগুনে পুড়ে ফেটে গিয়েছে, মাংসের তলায় হাড় দেখা যাচ্ছে। তারও ব্যবস্থা সঙ্গে সঙ্গেই করতে হল। শিশিরের মুখে যেন আর কথা বেরুচ্ছে না।

অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট চলে যাবার মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই উপর থেকে কান্নার রোল এল—তার আগেই শিশির উপরে গিয়েছিল।—সব শেষ।

আমরা তৈরী ছিলুম—শেষকৃত্য করবার জন্য। কিন্তু প্রশ্ন উঠল, পুলিশের অনুমতির আবশ্যকতা আছে কি না—আত্মহত্যা, অনারারি ম্যাজিস্ট্রেটের নেওয়া জবানবন্দী, তা সত্ত্বেও পোস্ট মোর্টেম হাঙ্গামা হবে কি না। মৃত্যু হল সাড়ে পাঁচটা আন্দাজ। আমাদের তিন চারজনের চেষ্টায়—বন্ধুবর নগেন্দ্রনাথ দাস, পুলিশের বড় অফিসার রায় বাহাদুর পূর্ণচন্দ্র লাহিড়ী মহাশয়ের জামাতা আমাদের সহপাঠী শিশির-বন্ধু অনিলকুমার সান্যালের যত্নে, লাহিড়ি মহাশয়ের অনুগ্রহে যথাবশ্যক পুলিশের অনুমতি ঐ সার্টিফিকেটের আধারে পাওয়া গেল। সে সমস্ত খুঁটিনাটি বর্ণনার দরকার এক্ষেত্রে নেই।

শ্মশানযাত্রীদের মধ্যে এবারও আমি কাঁধ দিলুম। শিশিরকে তার হাতের অবস্থা বুঝে নলিনীদা অঘোরদা বাড়িতে আটকে রাখলেন। শিশিরের মায়ের আকুল কান্না কানে ভেসে আসতে লাগল—'ওরে আমার শিশিরের ঘরের লক্ষ্মী এমনি করে চলে গেল রে।' শ্মশানেও শিশিরের ছোট ভাইয়েদের কান্নাও থামানো যায় না।

কি জন্য অনাশঙ্কিতভাবে এই রকম ঘটনা ঘটে যায়, তার কোনও হদিস আমরা পাই না। একটা কথা শিশিরের কাছে পরে শুনেছিলুম—ঐ পাড়ায় মাসখানেক আগে কি কারণে জানি না আর একটি বউ ঐ ভাবে কাপড়ে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা করে। শিশিরের বাড়ীতে ঐ ব্যাপার নিয়ে সকলের মধ্যে অনেক রাত পর্যন্ত কদিন ধরে চর্চা হত। শিশিরের স্ত্রীর মনের অবচেতনায় ঐ ব্যাপারটা ঢুকেছিল হয়তো, তার পরে মানসিক দুর্বলতা কোনও মুহূর্তে হঠাৎ এইভাবে অবচেতনা থেকে কার্যক্ষেত্রে তার প্রকাশ হল। পাড়ার মুসলমান প্রতিবেশীর অনেকের মধ্যে দুঃখের সঙ্গে বলতে শুনি—'আহা হা, এমন রাণীর মতন বউ, এমন রাজপুত্তুরের মতন বেটা (শিশিরের এই একমাত্র সন্তান বোধ হয় তখন দুই আড়াই বছরের শিশু), তোর ঐ বেটার কথাও একবার মনে হল না, ঐ দিন সকালেও তো তাকে কোলে নিয়ে পিয়ার করেছিলি।'

তারপরে প্রায় ২৪।২৫ দিন, শিশিরের হাতের ঐ ভীষণ হাড়-বের-করা পোড়া ঘা একটু না শুকিয়ে আসা পর্যন্ত আমরা দুপুরে ওর বাড়িতে যেতুম। শিশিরের অনুশোচনা—আমাকে উপদেশ—কখনও মেয়েদের ঐভাবে হেনস্থার ভাব দেখাবে না—আর তা ছাড়া অন্য প্রাসঙ্গিক অপ্রাসঙ্গিক নানা কথা হল। জীবন মৃত্যুর এই রহস্যের মধ্যে আমাদের পরস্পরের মন আর সমানধর্মিতা আমরা কতকটা উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম। এই ঘটনা শিশিরকে আমাদের জনকয়েকের কাছে আরও অন্তরঙ্গ আরও আত্মীয় করে তুলেছিল।

চিরজীবন শিশিরের মনে এই দাগ রয়ে গিয়েছিল—শিশিরের মাতৃদেবীর উক্তি—এমনি করে শিশিরের ঘরের লক্ষ্মী চলে গেল—অতি সত্য কথা। উমা দেবী বেঁচে থাকলে শিশিরের জীবনের সম্ভাবনা আর সাফল্য, দুইই অনন্যসাধারণও হলেও, বোধ হয় আরও পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারত—কতকগুলি বিষয়ে শিশিরকে 'বাউণ্ডুলে' করে তুলতে না, তাকে জীবনে reckless বা সাপরওয়া হবার পথে ঘরের লক্ষ্মী অন্তরায় নিশ্চয়ই হতেন, শিশিরকে আরও পরিপূর্ণ মানুষ করত।

কিন্তু এই গুরুতর দুঃখেও শিশিরকে তার জীবনের ব্রত যা সে গ্রহণ করেছিল তা থেকে বিচ্যুত করতে পারে নি। কত ঝড়-ঝাপটা তার উপর দিয়ে গিয়েছে, কিন্তু শিশির ছিল অটল—তার path of rectitude সততার পথ ছিল তার পক্ষে একেবারে ধরাবাঁধা। শিশিরের চিত্তের প্রসন্নতা চাপা পড়ে নি—তার মানসিক গুণ, তার নিত্যানন্দ পরিহাস-প্রিয়তা, তার সব মানুষের প্রতি দরদ, এ সমস্ত শেষ পর্যন্ত তার মধ্যে উজ্জ্বলভাবে বিদ্যমান ছিল। তার পরিহাস-প্রিয়তার একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে প্রসঙ্গ শেষ করবো।

সংস্কৃতি সিরিজ

উদ্বাস্তু ॥ শ্রীহিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়
উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধানের ইতিহাসপ্রসঙ্গ। সমাধানের ব্যর্থতা কেন? সচেতন পাঠকের অপরিহার্য। [১০·০০]

কালিকট থেকে পলাশী ॥ শ্রীসতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়
পাশ্চাত্য জাতিগুলির প্রাচ্য অভিযানের ইতিবৃত্ত। বর্ণাট্য বিরল মানচিত্র। [৬·৫০]

বাঁকুড়ার মন্দির ॥ শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
বাঁকুড়ার তথা বাঙলার মন্দিরগুলির সচিত্র পরিচয় ও ইতিহাস। ৬৭টা আর্ট প্লেট। [১৫·০০]

রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি ॥
ডঃ সুধাংশুবিমল বড়ুয়ার গবেষণামূলক সরল আলোচনা। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেনের ভূমিকা। [১০·০০]

ঠাকুরবাড়ীর কথা ॥ শ্রীহিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়
রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর পূর্বপুরুষ ও উত্তরপুরুষদের সুষ্ঠু আলোচনা। [১২·০০]

উপনিষদের দর্শন ॥ শ্রীহিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়
উপনিষদসমূহের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা। [৭·০০]

ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য ॥
ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত এই বইটির জন্য সাহিত্য আকাদমী পুরস্কারে ভূষিত। [১৫·০০]

বৈষ্ণব পদাবলী ॥ সাহিত্যরত্ন শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
প্রায় চার হাজার পদের আকরগ্রন্থ। [২৫·০০]

সাহিত্য সংসদ
৩২এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা—৯

শিশির যখন শিক্ষাগুরুদের আশীর্বাদ আর শুভেচ্ছা নিয়ে নাট্যকার বৃত্তি অবলম্বন করল, তার পূর্বে সে কয়েক বৎসর ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপনা করে বিদ্যাসাগর কলেজে। শিশির এম-এ পরীক্ষায় পাস করে যেন তুড়ি মেরে—রীতিমত পাঠ করার অভ্যাস ছিল না। আমাদের অন্যতম সহপাঠী সুহৃৎ অম্বিকা মজুমদার, যে বহু বৎসর ধানবাদে থেকে ওকালতি করে, শিশিরের এম-এ পরীক্ষার সময়ে তার তত্ত্বাবধায়ক ছিল—শিশির যে কষ্ট করে পাঠ্য পুস্তকগুলি পড়বে পরীক্ষায় তৈরী হবার জন্য সে ধৈর্যও তার ছিল না। তার অভ্যাসমত মোটা বর্মা চুরুট ধরিয়ে সে টানত, অম্বিকা বইগুলি চেঁচিয়ে পড়ত, তাতে শিশিরও বিষয়বস্তুর সঙ্গে পরিচয় লাভ করত। কিন্তু সাহিত্যবোধ ছিল শিশিরের অসাধারণ, আর কি ইংরেজি আর কি বাঙ্গলা, দুইয়েতেই তার দখলও ছিল লোভনীয়—প্রকাশ-ক্ষমতা অনেক তথাকথিত ভাল ছেলেরও ছিল না। এইজন্য সে সহজেই এম-এ পাস করল, দ্বিতীয় বিভাগে। অধ্যাপকের পদও সে পায়। কিন্তু সব সময়ে ঘরে পড়াশুনো করবার আগ্রহ বা ইচ্ছা তার হত না। অমনি সাধারণ সাহিত্য-জ্ঞানের উপর নিজেই ক্লাসে কাজ চালাত—আর চালাত সুন্দরভাবে। ইংরেজি কবিতার নাটকের পাঠেই যেন তার ব্যাখ্যা হয়ে যেত। কিন্তু এ সত্ত্বেও, মাঝে মাঝে তার একটু-আধটু বিপদও ঘটত। যথাসম্ভব শিশিরের মুখের কথাতেই তার অধ্যাপক জীবনের একটি মজার ঘটনা বলি।—'ওহে, কাল বড় বিপদে পড়েছিলুম। কিন্তু গুরুবলে রক্ষা পেয়ে গিয়েছিলুম। জানিস তো, বইটই অভিধান ঘেঁটে পাঠ তৈরী করে যাওয়া আর ধাতে সয় না—উপস্থিত যা মনে হয়, তাই সাজিয়ে গুছিয়ে নাটকীয় ভঙ্গীতে বলি, ছেলেরা ভালবাসে, তাতেই খুশী হয়—এইতে আমার রক্ষে। এখন হয়েছে কি, কাল আমি থার্ড ইয়ার ক্লাসে মিলটনের Paradise Regained পড়াচ্ছি। কবে ছাত্রাবস্থায় প্রাচীনকালে একবার ভাসা-ভাসারূপে এই নীরস কাব্য পড়েছিলুম, সব কিছু মনে নেই। পড়াতে পড়াতে দেখি, তিন চার লাইন নীচে একটা শক্ত শব্দ রয়েছে, তার মানেটা মনে আসছে না। context থেকেও আঁচ করতে পারছি না। কি করি? মনে করলুম ঐখানেই ঐ দিনের মত ইতি করি, ক্লাসের ছুটি দিয়ে দিই। তখনও আধ ঘণ্টা বাকী আছে, এত আগে ভাগে ছেড়ে দিলে ভাল দেখাবে না—বিশেষতঃ যখন আগের কয়দিন বাজে গল্প করেই কাটিয়েছি। কপাল ঠুকে তো ভগবের সঙ্গে সেই অংশটার 'রীডিং' পড়ে যেতে লাগলুম, মানে-না-জানা কথাটা অমনি আলটপকা ডিঙিয়ে এগিয়ে চললুম। সঙ্গে সঙ্গে, যেমন আশঙ্কা করেছিলুম, ক্লাসের গ্যালারির এক কোণ থেকে একজন ছাত্র দাঁড়িয়ে উঠে জিজ্ঞাসা করলে,

what is the meaning of this word, sir?

মনে হল, বুঝি মাথায় ডাণ্ডা মারলে—সঙ্গে সঙ্গেই যে ব্যাখ্যা চাই। এখন যদি হঠাৎ ভূমিকম্প হয়, কিংবা কোনও ছাত্র যদি ভির্মি যায়, বা ক্লোরা-সুদ্ধ প্লাটফর্ম-সুদ্ধ মা যদি আমায় গ্রাস করে, তাহলে যেন বেঁচে যাই। তা তো হবে না—একটু ভাববার জন্য সময় নিলুম—চশমাখানা চোখ থেকে খুলে রুমাল বার করে খুব ভাল করে ঘষে ২।০ মিনিট ধরে পরিষ্কার করলুম, তারপরে রুমাল দিয়ে মুখখানা ভাল করে মুছে যেন মুখের চেকনাই করলুম। সঙ্গে সঙ্গে একটা brain-wave এল—একটা উত্তর জুটে গেল। চশমা পরে মুখ মুছে, চেহারাটা যেন বাগিয়ে ধরে, ছাত্রটির দিকে তাকিয়ে ইশারায় তাকে দাঁড়াতে বললুম—তারপরে তাকে বললুম,

you there, my friend : now take a good look at me. Do I look like a dictionary?

শুনে ছেলেটা তো কিংকর্তব্যবিমূঢ়, আর সারা ক্লাস হো হো হেসে উঠল—যেন ছেলেটাই কিছু বেকুবি করেছে। তখন গম্ভীরভাবে ছেলেদের, বিশেষ করে ঐ ছেলেটিকে উপদেশ দিলুম—আজকালকার ছেলেরা নিজে খাটবে না, অভিধানে তাদের ভয়, তারা চায় অধ্যাপক সব জিনিস তাদের গিলিয়ে দেবে। এ চলবে না। তারপরে সেই ছেলেটিকে বললুম—

Look here, you must find out from the Dictionary what is the meaning of the word, and then tomorrow you must tell me and the class what the word means. See?

ছেলেটি Yes sir. বলে তো নিষ্কৃতি পেলে—আমিও নিষ্কৃতি পেলুম, পূর্ববৎ আমার এই অধ্যাপনা চলতে লাগল।' আমি শুনে বললুম, 'ভাই শিশির, এ হল adding insult to injury—একটা ধর্মে সইবে না, বেচারি তোর কাছ থেকে জানতে এসেছে শিখতে এসেছে তো, তার উপরে এই তার দেওয়া।' তখন শিশির বললে—'আরে ভাই, আমি যে ঠিক মনে করে কালকের ক্লাসের জন্য ডিকশনারি দেখে ঐ শব্দটির সম্বন্ধে যে ওয়াকিবহাল হয়ে আসবো, তারই বা কি স্থিরতা আছে'?

এই রকম উপস্থিত বুদ্ধি ছিল শিশিরের—আর তার খুবিয়ে দেবার ক্ষমতাও উপযুক্ত ছিল খুব উঁচুদরের, সেইজন্য ছেলেরা তাকে খুবই শ্রদ্ধা করত, ভালবাসত। আমাদের স্কটিশ-চার্চেস-কলেজের বিখ্যাত ইতিহাসের অধ্যাপক অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় একবার আমাদের এক সতীর্থকে বলেছিলেন, (সে যখন তাঁর কাছে গিয়ে জানতে চাইলে successful professor হতে গেলে কি কি গুণ থাকা চাই)—'দেখ বাবা, তান্ত্রিকদের পঞ্চ-মকার জানো তো? শিখদের পঞ্চ-ককার জানো তো? তেমনি শিক্ষা-ব্যবসায়ে নাম করতে গেলে পঞ্চ-বকারের সাধনা করতে হয়—সেই পঞ্চ-বকার হচ্ছে, in order of their importance—বচন, বপু, বুদ্ধি, বিনয়, বিদ্যা। খুব বক্তা হলে, মুখ দিয়ে যদি খই ফোটে, তাহলে "মুখেন মারিতং জগৎ"—কথায় ছেলেদের বশে আনতে পারবে। তার-পর চেহারাখানিও বপুসই হওয়া দরকার—চার ফুট আট ইঞ্চি সাইজের প্রফেসর পাঁচ ফুট ছ' ইঞ্চি সাইজের ছাত্রকে কব্জা করতে পারবে না। তারপরে চাই বুদ্ধি—বান্দ ছেলে, দাগ বাজ ছেলে কথা পাকা পোড়খাওয়া পাজী ছেলেদেরও বুদ্ধির প্যাঁচে ফেলে, কৌশলে তাদের হাত করতে হয়। তারপরে বিনয় তো আছেই—বাবা, বা প্রাণ চায় করো, তবে আইনের মাত্রা লঙ্ঘন করে, ছা-পোষা মাস্টার, আমার বদনাম করো না। আর শেষ দরকার—বিদ্যা। এটার আধিক্য successful professor হতে গেলে ততটা দরকার নেই।' এই উপদেশ অনেকেই মেনে নেবেন। কিন্তু শিশিরের এই উপদেশের দরকার ছিল না। স্বাভাবিকভাবেই তার বচন, বপু, বুদ্ধি, বিনয়, বিদ্যা সমস্তই ছিল, সে-সবের প্রয়োগও তার স্বভাবসিদ্ধ। এটা শিশিরের কাছে যেন স্বরূপেই ছিল।

এই ছিল আমাদের শিশির। কতকগুলি দুরদৃষ্টের বাধা না পেলে, সে বাংলাদেশের ভারতবর্ষের তথা সমগ্র জগতের সংস্কৃতি আর সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আরও কত বড় হতে পারত তার বার্থ কল্পনা করে লাভ নেই। সে যা ছিল তাইতেই বাঙালীর আর ভারতীয়দের সাংস্কৃতিক জীবনে সে অমর হয়ে থাকবে।

স্টার
[শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত নাট্যশালা]

ঊর্মিলা

নাটকীয় সংঘাতে ও অভিনয়-মাধুর্যে অনুপম।
প্রতি বৃহস্পতি ও শনিবার : ৬টায়
প্রতি রবিবার ও ছুটির দিন : ২॥টা ও ৬টায়
।। রচনা ও পরিচালনা ।।
দেবনারায়ণ গুপ্ত
।। রূপায়ণে ।।
অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, অপর্ণা দেবী, নীলিমা দাস, মঞ্জুলা চট্টোপাধ্যায়, সতীন্দ্র ভট্টাচার্য, দীপিকা দাস, শ্যাম লাহা, প্রেমাংশু বসু, বাসবী চট্টোপাধ্যায়, কালিদাস সান্যাল, গীতা দে ও বঙ্কিম ঘোষ।

নানা রঙের দিনগুলি

কানন দেবী

রাধা ফিল্মসের বেশ কয়েকটি ছবিতে জহর গাঙ্গুলির বিপরীতে নায়িকারূপে অভিনয় করেছিলাম। তবু এ প্রসঙ্গে বিশেষ করে 'মানময়ী গার্লস স্কুল'-এর কথা মনে পড়ে। কারণ বোধহয় এ ছবির পরই রাতারাতি আমাদের উভয়েরই বৈপ্লবিক প্রতিষ্ঠা ও সম্মান। অন্যভাবে বলা যায় আমাদের আসন চিত্ররসিকের দরবারে কায়েমী হয় এ ছবিরই মাধ্যমে।

এখনও স্পষ্ট মনে পড়ে ১৯৩৫ সনের ১৩ মে কর্ণওয়ালিশ টকিতে (এখনকার শ্রী) এ ছবি রিলিজ হয়েছিল। কর্মজীবনে সার্থকতার প্রথম সোপানরূপে যে ছবিকে আণ্ডারলাইন করা যায় সে ছবির 'হিরো' বা সাথীশিল্পীর একটি বিশেষ মূল্য সকল শিল্পীর কাছে থাকাটাই স্বাভাবিক। আমিও এর ব্যতিক্রম নই। মেয়েদের মন একটু বেশী মাত্রায় ভাবপ্রবণ বলেই হয়ত 'মানময়ী গার্লস স্কুল' সম্বন্ধে আবেগ, আমার চাপা স্বভাব সত্বেও, মাঝে মাঝে প্রকাশ হয়ে পড়ত। আমার এ দুর্বলতা স্টুডিওতে সমসাময়িক সকল শিল্পী ও কর্মীর হাসি-কৌতুকের অন্যতম বিষয় হয়ে উঠেছিলো। সে সময়েই দেখেছি স্বাভাবিক কৌতুকপ্রবণতাবশতঃ জহরবাবু মুখে হয়ত সেইসব হাসিঠাট্টায় যোগ দিয়েছেন, কিন্তু যে মুহূর্তে অল্পবয়সী মনের স্পর্শকাতরতা বা যে কারণেই হোক আমার চোখ অজ্ঞাতে ছলছলিয়ে উঠেছে অমনি জহরবাবু অন্য মানুষ। 'যাঃ, ছেলেমানুষের পেছনে বড় লাগিস। ও ছবি সম্বন্ধে আমার দুর্বলতাই কি কিছু কম রে। ওর বস্তুঃ প্রথম যুগের সাকসেসফুল পিকচার। সাক্ষাৎ মা লক্ষ্মী, মা লক্ষ্মী।' বলে দুহাত জোড় করে যখন কপালে ঠেকাতেন তখন তাঁর সেই গদগদ ভাবতন্ময়তার মধ্যে এমন একটা আন্তরিক দৃঢ়তা ফুটে উঠত যে, সকলেই হাসিকৌতুক ভুলে সিরিয়াস হয়ে উঠতেন। সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশও পাল্টে যেত। এই রকম হাসির সুরে গভীর কথা বলতে পারা বা কৌতুকের সঙ্গে সঙ্গে জীবনের অন্যদিকটির সম্বন্ধেও সচেতন থাকাটাই যেন জহরবাবুর জীবনসঙ্গীতের মূল সুর ছিলো। এই কারণেই হয়ত উত্তরকালে তিনি এই ধরনের অভিনয়-কুশলতার পাকা কারিগর হয়ে উঠতে পেরেছিলেন।

অ্যালবামের প্রথমদিকের পাতা উল্টে যাবার মত জহরবাবুকে জড়িয়ে আজ কত ছবিই না মনে ভেসে উঠছে। কোনোটি স্পষ্ট, কোনোটি ঝাপসা।

সেসব দিনের অপরিণত মনের এলোমেলো স্মৃতির আলোছায়ায় কাহিনী গুছিয়ে বলা বড় শক্ত। তবু সব মিলিয়ে জহরবাবুর অনন্যময় ব্যক্তিত্ব বুঝি ভোলার নয়।

বোধহয় 'মানময়ী গার্লস স্কুল'-এর আগেই হবে। জ্যোতিষবাবুরই পরিচালনায় 'কণ্ঠহার' নামে এক অপরাধমূলক রহস্যচিত্রে আমি ও জহরবাবু নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করি। আগেই বলেছি বয়স তখন অল্প, সবকথা ভাল করে মনে পড়ে না। কিন্তু দুটি দিনের কথা কেন জানি না ভুলতে পারি না। জহরবাবুর (নায়কের নাম মনে নেই) বন্ধু গৌরীকান্ত মদ্যপ এবং আনুষঙ্গিক দোষে অভ্যস্ত। ভিলেন গৌরীকান্ত (অভিনয়ে ছিলেন ধীরাজ ভট্টাচার্য) নববিবাহিত বন্ধুকে নিজের পথে টানতে গিয়ে তাদের মধুর দাম্পত্যজীবনে অশান্তির ঝড় তোলে। মনে আছে বিয়ের কদিন পরে কোনো এক সন্ধ্যায় গৌরীকান্ত 'পুরুষমানুষের কি সবসময় ঘরের কোণে বসে থাকা? চল একটু ঘুরিয়ে আসি।' বলে বন্ধুকে জোর ক'রে বাইরে নিয়ে আসবে। সে সময় বাইরে যাবার প্রবল অনিচ্ছা। অথচ সে অনিচ্ছা প্রকাশে পুরুষোচিত সঙ্কোচভাবে দোলায়মান নায়ক, আর ঘোমটার আড়ালে নায়িকার ভ্রূকুটির নিষেধ—এই ছিল আমাদের এক্সপ্রেশনের বিষয়।

'যাচ্ছি, যাচ্ছি। আঃ ছাড় না'—বলে জহরবাবুর বারবার করুণ দৃষ্টিতে পিছন ফিরে তাকানোর উত্তরে আমার ঘোমটা থেকে সজল নয়ন চোখ থাকবে স্থির। কিন্তু অমন লম্বা-চওড়া মানুষটির এতখানি নাজেহাল অবস্থা দেখে হাসতে হাসতে

আমার প্রায় গড়িয়ে পড়ার অবস্থা হোত। আমার হাসি দেখে জহরবাবু, ধীরাজবাবু সবাই হেসে গড়াতেন। বার বার শট নষ্ট হওয়ার জন্য জ্যোতিষবাবুর কাছে বকুনী খেয়ে শেষটায় সত্যিই কেঁদে ফেললাম। 'বাস বাস, এইবার ঠিক হবে। না কাঁদলে কখনও কোনো ভাল কাজ হয়?'

জহরবাবুর কথার মানে সেদিন বুঝিনি। তবু চমকে উঠেছিলাম। আজ বুঝেছি। কিন্তু এই কথা ভেবে আশ্চর্য না হয়ে পারছি না। অমন চিন্তার কথা অত সহজে কেমন করে বলতে পেরেছিলেন? তাঁর সহজাত অন্তর্মুখীনতার প্রসাদেই নয় কি?

...অনেক পরে আমার প্রডাকশনে কাজ করবার সময় তাঁর আন্তরিক সহজ ব্যবহার যে আমায় কত প্রেরণা দিয়েছে বলতে পারি না। ঠিক সময়ে সেটে আসা, কাজ করা, অভিনয় ছাড়াও অন্যান্য ব্যাপারে তাঁর পরমাত্মীয়ের মত সহায়তা ভোলার নয়। মনে আছে একদিন সামান্য অসুস্থতা সত্বেও তিনি সেটে এসেছিলেন বলে আমি রাগ করে বলেছিলাম, 'শরীর খারাপ নিয়ে সেটে আসার কি দরকার ছিলো? একটা ফোন করে দিলেই ত হোতো। সবেতেই আপনার বাড়াবাড়ি।'

'সে কি হয়? এ ত শুধু তোমার আমার ব্যাপার নয়। অনেককে নিয়ে কাজ। একজন না এলে টিমওয়ার্ক সাফার করে। শিল্পী হয়ে সেটা কি করে বরদাস্ত করি বল।' জহরবাবুর কথার জবাব দিতে পারিনি। আমার প্রডাকশনেরই 'নববিধান'-এর স্যুটিং চলার সময় জহরবাবু তিন-চার দিন ইনফ্লুয়েঞ্জায় ভোগার পর সুস্থ হয়ে যেদিন কাজে এলেন আমি ওকে স্টুডিওর খাবার না দিয়ে বাড়ী থেকে ওঁর জন্য তৈরী করে নিয়ে যাওয়া স্টু প্লেটে ঢেলে একটা চামচ দিয়ে ওঁর হাতে দিতেই বললেন, 'এটা কি? এ'র মানে! আমি বাঙালী মানুষ এসব স্টু-ফু কি আমার পোষায়? যাক এসেছ যখন যাও' বলেই চামচটা ফেলে দিয়ে এক

চুমুকে খাকে বলে একরকম গলায় ঢেলেই হাত দিয়ে বেয়ারাকে ডেকে বললেন, 'ওহে, এবার একটা কলাপাতা পেতে যা রান্না হয়েছে এনে দাও। হাঁটু অবধি কাপড় তুলে বাবু হয়ে বসে হাপুস-হুপুস করে কলাপাতায় গড়ানো ঝোল দিয়ে ভাত না খেলে কি আমাদের পেট ভরে?' ঝোলেঝালে মেশানো এই নির্ভেজাল বাঙালীত্বকে তিনি আজীবন আঁকড়ে থেকেছেন। জহর গাঙ্গুলীকে যদি ভোলা যায়, ধুতি-পাঞ্জাবি পরা জনপ্রিয় 'সুলালদা'কে ভোলা সম্ভব কি?

জীবনকে পরিপূর্ণভাবে জানবার তাগিদেই কোন যুগে যাত্রায় যোগ দিয়ে নাটক ও মঞ্চের পথ বেয়ে তিনি সিনেমায় এসে পৌঁছেছিলেন জানি না। প্রয়োজনের চেয়ে শখটাই বোধহয় তাঁর কাছে বড় ছিল। জহরবাবুর ব্যাপক পরিচিতি সিনেমার মাধ্যমেই। কিন্তু শিল্পচর্চা তাঁর কাছে টবের শৌখীন ফুল ছিলো না। জীবনের মাটির সঙ্গে যোগ ছিল বলেই তাঁর সকল অভিনয়ই মনকে এমন করে স্পর্শ করে। জহরবাবুকে দেখে বার বার একথা মনে হয়েছে।

তিনি সুন্দর ছিলেন কি ছিলেন না, এ প্রশ্ন কখনও মনে জাগেনি। এখনকার মত তখন ত এত শুক্রবারের পাতা, দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক ফিল্ম-জার্নাল ছিলো না। আজ শিল্পের ব্যাপক প্রচারের যুগ। এখন সকল রকম প্রতিভাকে নানা ভাবে ও বিন্যাসে ফুলের তোড়ার মত সাজিয়ে সাধারণের সামনে তুলে ধরা হয়। ছোট-বড় সকল শিল্পীকেই সকলের দৃষ্টিগোচর করাই এ'দের কাজ। করেনও। কিন্তু তখন যে গাছের ফল সেই গাছেই ফুটত, পাকতো, ঝরত। এমন যুগের শিল্পী হয়েও জহরবাবু আপন ব্যক্তিত্বে, সরলতায়, সংবেদনশীল অন্তরের দাক্ষিণ্যে সকলকে কাছে টানতে পেরেছেন, জীবনবোধের সহজ আলোয় অভিনীত চরিত্রকে জীবন্ত করে তুলেছেন, তাঁর সম্বন্ধে এইটেই সবচেয়ে বড় কথা।

শিল্পীজীবনের সুদীর্ঘ তিনটি যুগের অজস্র দানে জহরবাবু চিত্রজগতকে ভরে দিয়েছেন। প্রথম যুগের মঞ্চঘেঁষা সিনেমা, দ্বিতীয় যুগে সিনেমার আরো আধুনিকতার দিকে এগিয়ে যাবার প্রবণতা এবং বর্তমান যুগের প্রগতিশীল নাচাগানাটি—এই প্রতিটি অধ্যায়—পরিবর্তনের তালে তালে তিনি আশ্চর্য সুন্দরভাবে নিজেকে শুধু খাপ খাইয়েই নেননি—কাহিনী ও চরিত্রের অপরিহার্য অংশ হয়ে উঠেছেন তাঁর খেলোয়াড়সুলভ গ্রহণশক্তি মনের শক্তিতে এবং সেটা জোর করে মানিয়ে নেওয়া নয়, স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দে জীবনে জীবনযোগ করা। একথা ভুললে চলবে না।

জহরবাবুর অন্তর্ধান নিঃসন্দেহে অভিনয় জগতের এক অপূরণীয় ক্ষতি।

বনফুল: পরিচালনা : বিজয় ভাট/ববিতা ফটো : অমৃত

অভিনব সিনেমা মাসিক পত্রিকা
আলোছায়া
প্রতি সংখ্যায় থাকে রহস্য উপন্যাস, শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের গল্প, শ্রেষ্ঠ বিদেশী গল্প, বিভিন্ন অভিনব ফিচার, গান স্বরলিপি, মনস্তাত্ত্বিক যৌনতত্ত্ব ও অসংখ্য সিনেমার রঙীন ছবি।
প্রতি সংখ্যা ৫০ পঃ ; বার্ষিক ৬৲
১৬/১৭, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

বেস্ট লুক
মোলায়েম কাপড়ে ও নিখুঁত গঠনে তৈরী
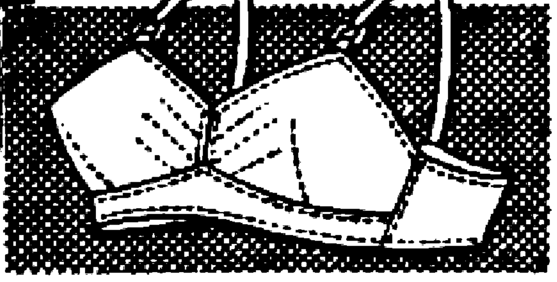
"প্রিন্সেস"
আপনার দেহ-সৌন্দর্য্য বাড়িয়ে তুলবে

কিন্তু তার চেয়েও ক্ষতিকর সমসাময়িক যুগের মুক্ত প্রাণের এক উদার মানুষের সংগে একটা বিশেষ যুগের অনেকখানি সম্পদ হারানো। শিল্পীর দেখা হয়ত বা মিলবে, কিন্তু জীবনবোধ ও শিল্পবোধ মেশানো দোষেগুণে ভরা এমন এক নিটোল হৃদয়ের স্পর্শ এই আবেগকৃপণ হিসেবী জগতে কি খুব বেশী পাওয়া যাবে?

এরপর নিউ থিয়েটার্সের নানা-রঙা উজ্জ্বল অধ্যায়। ১৯৩৬ সালের এপ্রিল কি মে মাসে মনে নেই রাধা ফিল্মস ছেড়ে নিউ থিয়েটার্সে যোগ দেবার সংবাদ ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রিতে ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও রাধা ফিল্মস ছেড়ে আসতে দেরী হয়েছিল। মনে পড়ে 'দেবদাস' ছবি সুরু করার আগে 'প্রমথেশ বড়ুয়া আমায় পার্বতীর রোল দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু রাধা ফিল্মসের সংগে চুক্তিবদ্ধ ছিলাম বলে, সেই দুর্লভ সুযোগ যখন হাতে পেয়েও ছেড়ে দিতে হোল, নির্মম নিয়তির পায়ে যেন মাথা খুঁড়তে ইচ্ছে করছিলো। নিউ থিয়েটার্স তখন সবচেয়ে অভিজাত প্রতিষ্ঠান। আর মিঃ বড়ুয়া ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রিতে রূপকথার নায়কতুল্য। তাঁর সংগে এবং তাঁরই পরিচালনায় কাজ করাটা যে কোনো শিল্পীর পক্ষেই তখন হাতে চাঁদ পাওয়ার সামিল। তার ওপর শরৎবাবুর বই! এমন দুর্লভ যোগাযোগ জীবনে কি আসে? কিন্তু আমি বিনা আয়াসে এমন লোভনীয় আহ্বান পেয়েও সাড়া দিতে পারলাম না,—এর পিছনে কোনো কুটিল গ্রহের চক্রান্ত ছিল বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু এ বাধা যে সত্যিকারের বাধা নয়, রাধা ফিল্মসের কর্তৃপক্ষের অছিলা এবং নিজেদের স্বার্থে অভিভাবকহীনা অনভিজ্ঞা অসহায়ার প্রতি উৎপীড়ন একথা জেনেছি অনেক পরে।

গভীর আক্ষেপ ও হতাশায় যখন মন ছেয়ে এল তখন হঠাৎই একদিন মা আমার দীক্ষা নেবার ব্যবস্থা করলেন। এই প্রসংগেই বলি একটি অনুভূতি যেন গানের কলির মতই বার বার আমার জীবনে ঘুরে ফিরে এসেছিল। মানুষ যখন একেবারেই অবলম্বনহীন, নিঃসহায় হয়ে পড়ে, অন্ধকারে পথ হারিয়ে বিভ্রান্ত হয়ে ঈশ্বরের অস্তিত্বে সংশয়ী হয়, ঠিক তখনই যেন কোন অপ্রত্যাশিত পথ বেয়ে স্নিগ্ধ আশ্বাস ঝর্ণার মত নেমে রুক্ষ জীবনকে সরস করে তোলে। আর তখনই উপলব্ধি করি তাঁর বরাভয় 'আমি আছি।'—তাই মাঝে মাঝে মনে হয় পথ হারানোটা বুঝি পথ খুঁজে পাওয়ারই রূপান্তর।

দীক্ষা নেবার দিনটি আজো মনে পড়ে। কোনো বিরাট দর্শন অথবা আধ্যাত্মিক তত্ত্ব উপলব্ধি করবার মত বয়স অথবা মনের পরিণতি কোনোটাতেই তখন পৌঁছইনি। কিন্তু কানে কানে গুরু যখন ইষ্টনামটি বলে দিলেন কেমন এক অপার্থিব আনন্দের শিহরণে সারা দেহমন যেন কেঁপে উঠল। মনে হোল সারা পৃথিবী যেন আলোয় হেসে উঠেছে। কোথাও এতটুকু মালিন্য নেই। আমি যেন এতদিনের আমির চেয়ে আলাদা, আমার অসাধ্য কিছু নেই। তখন যাকে দেখছি—যা দেখছি সবই যেন একটা নিটোল আনন্দের আলোয় ঝলমলিয়ে উঠছে। এরই মধ্যে গুরুদেব ভাগবত পাঠ সুরু করলেন। সংস্কৃত শ্লোক পড়ে পড়ে উনি বাংলায় তর্জমা করে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। সবটা মনে নেই। কিন্তু যে শ্লোক জীবন্ত শাস্ত্রর মত মনকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিলো সেটি হোল—'পর্যায় যোগাম্বিহিতং বিধাত্রা কালেন সর্বং লভতে মনুষ্যঃ—যার অর্থ হোল বিধাতা সবই পর্যায়ক্রমে সাজিয়ে রেখেছেন। যথাসময়ে মানুষ তা পাবে। ঐ একটি কথাই যেন অনেক আশা অনেক সম্ভাবনার প্রতিশ্রুতিতে সকল ক্ষোভ মুছিয়ে দিল।

সেদিন থেকেই এই ধরাবাঁধা জীবনের গতি যেন পাল্টে গেল। মনে হোল এই ধুলোর পৃথিবীতেও এমন রূপ আছে যাকে চিনতে না চিনতে মন কেড়ে নেয়, এমন ডাক আছে যা শুনতে না শুনতে প্রাণ সাড়া দেয়, এমন আলো আছে যা দেখতে না দেখতে মন [illegible] পেয়েছি।

এ মুহূর্ত দুর্লভ। জীবনে এক আধবারই আসে, কিন্তু আসে সমস্ত জীবনে বিপ্লব ঘটিয়ে গোটা দৃষ্টিভঙ্গীটাকে যেন বদলে দিয়ে যায়। যে অনুভূতির বীজ সেদিন মনে উপ্ত হোলো পরে তাই বনস্পতি হয়ে ওঠে। কিন্তু সেকথা পরে বলব, যথাস্থানে। এখন যা বলছিলাম।

এরপরই হোল নিউ থিয়েটার্সের যুগ। যেদিন প্রথম নিউ থিয়েটার্সের দ্বারে যাই সে রোমাঞ্চকর অনুভূতির কাঁপন ভোলার নয়। কতদিনের কতরাতের স্বপ্ন দিয়ে-গড়া নিউ থিয়েটার্স হাতীমার্কা বানার। এই কৃতকীর্তি পতাকাবাহীদের মধ্যে স্থান পাওয়া,—এ সৌভাগ্য ভাবা যায়? কিন্তু প্রথম দিন যতখানি উৎসাহ নিয়ে গেলাম ঠিক ততখানিই নিরানন্দ নিয়ে ফিরে আসতে হোল।

এও এক অভিজ্ঞতা। দুপুর থেকে স্টুডিওতে গিয়ে বসে আছি ত আছিই। কেউ কথাও বলে না ডাকেও না। আর

সকালের সে কি গর্বিত চালচলন। যেন মাটিতে পা-ই পড়ে না। সবসময় যেন লোকে তা দেখুক ভাব। বেয়ারা থেকে শুরু করে মেকআপম্যান অবধি সকলের। আমরা কি যে সে লোক? এন টি বসনায় কাজ করি। এই ভাবেই ভাবখানা। দিন গড়িয়ে বিকেল এল। বিকেলের পর সন্ধ্যা। হঠাৎ যেন 'সাজ সাজ' রব উঠল। 'কি ব্যাপার?' না, 'সাহেব আসছেন'। সাহেব?—অবাক হয়ে তাকাতেই এক বেয়ারা আমার অজ্ঞতা দেখে দুপা সরকম হয়ে এগিয়ে এসে চুপিচুপি বলল 'সাহেব হলেন বি এন সরকার—নিউ থিয়েটার্সের ভগবান, এটা জেনে রাখুন।' বলেই ব্যস্তসমস্ত ভেতরের দিকে, মাথার ক্যাপ ঠিক করে রেখে কেবলী বিনয়ের পদ-সঞ্চার করিয়ে সাহেবের গাড়ীর দিকে ছুটল। অন্যান্য সবাইও সাহেবের সম্বর্ধনার আগে ঠিক কার্পেটের ভাঁজের মতই নিজেদের যথাসম্ভব ঝাড়পোঁছ করে নিলেন। সুট পরিহিতরা টাই-এর নটটা একটু টাইট করে রুমাল দিয়ে মুখটা মুছে নিলেন। কেউ বা সার্টের কলারটা একটু সোজা করে নিলেন। আমার ধুতি-পাঞ্জাবি পরিহিতরা পাঞ্জাবির হাতের ভাঁজ টান টান করে, কোঁচাটা ধরে ঠিক খেলার মাঠে দৌড়ানোর প্রতিযোগিতায় নামার মত উদ্‌গ্রীব হয়ে রইলেন বি এন সরকারের গাড়ীর দিকে। তারপরের প্রতিযোগিতা কোনো কে সবচেয়ে আগে সাহেবের চোখে পড়তে পারেন এবং তার অভিবাদনে আনুগত্যের প্রকাশ সাহেবের কতটা বেশী প্রসন্ন দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে? সারাদিন বসে থাকার বিরক্তি ও ক্লান্তির বাধা ঠেলেও মনটা যেন মুহূর্তের জন্য কৌতুকে নেচে উঠল। নিজের অজান্তে কখন উঠে দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে এগোতে শুরু করেছি বুঝতেই পারিনি। হঠাৎই এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ঠিক তামাশা দেখার মতই উপভোগ করলাম অবস্থা বিশেষে সম্ভ্রান্ত মানুষও কেমন ক্রীতদাসের মত হয়ে যায়। এক টি পাকা বাঙিয়া পরস্পরকে ধাক্কা দিয়ে প্রায় পাঁচজনে মিলে সাহেবের গাড়ীর দরজা খুলেছেন। সাহেব গাড়ী থেকে মাটিতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে দু পাশের অনুগতের দল তাঁর সঙ্গে হাঁটতে শুরু করলেন। তার আগে অবশ্য হয়তো জোড় করে প্রায় মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে নমস্কার করা হয়ে গেছে। আমি তাঁরই

স্টোরাক্রমের একজন শিল্পী, সেইদিনই প্রথম কাজে যোগ দিয়েছি, সারাদিন বসে আছি। অথচ আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় করানোরও একটা প্রয়োজন আছে একথা কারো চিন্তাতেও স্থান পেয়েছে বলে মনে হোলো না। যে যার নিজের ভাবনাতেই বিভোর। আমার মত সামান্য মানুষের দিকে তাকাবার তাঁদের সময় কই? আমি 'কিংকর্তব্যবিমূঢ়' হয়ে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়েই বুঝতে পারলাম তাঁর সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য দাঁড়িয়ে থাকাটা বিড়ম্বনা ছাড়া আর কিছুই নয়। সরল ভাবে একাজ সম্পন্ন করার মত কোনো মধ্যস্থ ব্যক্তি এতবড় প্রতিষ্ঠানেও নেই, এ অভিজ্ঞতা যেমন বিস্ময়ের তেমনই বেদনার। যাই হোক দূর থেকে দুহাত জোড় করে তাঁকে নমস্কার জানিয়ে জনা কয়ে চলে এলাম। সে নমস্কার সমস্ত ভক্তের ভীড়ের আড়াল অতিক্রম করে সাহেব বি এন সরকারের চোখে পড়েছিলো কিনা জানি না। কিন্তু তাঁরই প্রতিষ্ঠানের শিল্পী হয়ে যখন সেই-দিনই প্রথম প্রবেশ করলাম এ কর্তব্য না করলে সে অ-সৌজন্য নিজেকেই পীড়া দিত। যাই হোক আরো ঘণ্টা দুয়েক বসে থেকে পি এন রায়কে 'আমি এখন যেতে পারি?'—বলতেই খুব অবাক হয়ে তিনি বললেন 'সে কি। আপনি এখনও বসে?'—মনটা খুবই দমে গেল।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা জানানো দরকার। আমার নিউ থিয়েটার্সে যোগ দেবার প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা বর্ণনার কাহিনীর মধ্যে যেন সাহেব বি এন সরকারের প্রতি বিন্দুমাত্র কটাক্ষ বা ক্ষোভ আছে ভেবে নিয়ে আমার প্রতি অবিচার না করেন। কারণ এখানে আমার আলোচ্য তাঁর পারিপার্শ্বিক, তিনি নন।

একথাও সবিনয়ে জানাচ্ছি বি এন সরকার প্রথম দর্শনেই আমার মনে গভীর শ্রদ্ধার ছাপ ফেলেছিলেন। নামে সাহেব, চেহারাতেও সাহেব। স্বল্পভাষী, গম্ভীর মানুষটির আভিজাত্য ও সম্ভ্রমবোধ চোখে না পড়ে পারে? চারপাশের মানুষের এই কৌতুকপ্রদ চাটুকারিতা তাঁর মনকে বিন্দুমাত্রও স্পর্শ করতে পেরেছে বলে মনে হোলো না। এক অনায়াসলব্ধ স্বাতন্ত্র্যের মাঝেই যেন তিনি রাজকীয় মর্যাদায় আসীন। কাজের অতিরিক্ত একটি অনাবশ্যক কথাও তাঁর মুখ থেকে শোনা যেত না।

তাঁর সঙ্গে সরাসরি কোনো কথা বলার সুযোগ আমাদের ছিলো না, কারণ আমাদের অভাব-অভিযোগ ও বক্তব্য অন্যের মাধ্যমে তাঁর কাছে পৌঁছে দেবারই ব্যবস্থা ছিলো। সকল কথা তাঁর কানে পৌঁছত কিনা তাও জানি না। তবে যে প্রার্থনা পৌঁছত তা মঞ্জুর হতে দেরী হোতো না। এই স্বল্পকালের এক পুরোনো সংবাদের লেখায় পড়েছি—সরকার সাহেব বলেছেন আমরা তাঁকে কর্নফিডেন্স নিতাম না বলেই আমাদের

প্রত্যেকের চিন্তা ও বৈশিষ্ট্যের সম্বন্ধে তাঁর মনে কোনো ধারণা গড়ে উঠতে পারেনি। কিন্তু এ সম্বন্ধে আমাদের (বিশেষ করে আমার কথাই বলতে পারি) ক্ষোভের সীমা নেই এই কারণে যে, তাঁর মত এক মহান ব্যক্তির আওতায় থেকে এসেও তাঁর কাছাকাছি যাবার অথবা তাঁর সঙ্গে কথা বলবার সুযোগ বিশেষ পাইনি। কাজেই এই আক্ষেপ বা অভিযোগ আমাদের দিক থেকে হওয়াটাই স্বাভাবিক কেন মিঃ সরকার তাঁর প্রতিষ্ঠানের শিল্পীদের সাথেই সঙ্গে মোকাবিলা দেখা করবার, আলোচনা করবার অথবা প্রয়োজনের কথা বলবার প্রথা চালু রেখে তাঁর সঙ্গে সহজ সম্পর্ক স্থাপনের পথ উন্মুক্ত করে দেননি? পরে যখন হঠাৎ তাঁর কাছে গিয়ে একটু-আধটু কথা বলার সুযোগ পেয়েছি, তত-বারই তাঁর সহানুভূতিশীল, উদার হৃদয়ের স্নেহস্পর্শ—তাঁর প্রতি মনকে সম্ভ্রম কৃতজ্ঞ-তায় ভরিয়ে তুলেছে আর অতৃপ্ত ক্ষোভের সঙ্গে বারবারই মনে হয়েছে 'এ সুযোগ কেন আগে পেলাম না? তাহলে ত কত সহজভাবে, কত স্বাচ্ছন্দ্যে মনের আনন্দে কাজ করতে পারতাম। যে কৃত্রিম আড়ষ্টতার আড়াল আমাদের ও তাঁর মধ্যে গড়ে উঠে-ছিল—তার কোনো প্রয়োজন বা সার্থকতা ছিল কিনা সে প্রশ্নের উত্তর আজও খুঁজে পাইনি। কিন্তু এই নীরব মানুষটি যে শিল্প ও শিল্পীর অকৃত্রিম পূজারী এবং ভারতে চলচ্চিত্র শিল্পের অগ্রগতিকে ইনি একাই একশ বছর এগিয়ে দিয়েছেন সে যুগের শ্রেষ্ঠ শিল্পী, সুরকার, গীতিকার, পরিচালকদের তাঁর পতাকাতলে একত্র করে এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। এ অবদানের কাছে বাঙালী মাত্রেই ঋণী। জগতের রসিক সমাজে আজ ভারতীয় চলচ্চিত্রের এই সম্মান ও স্বীকৃতি হয়ত স্বপ্নই থেকে যেত যদি না বি এন সরকারের মত মানুষ এই কাজে এগিয়ে এসে অগ্রদূতের হাল ধরতেন। যে যুগে সমাজের উচ্চমহল সিনেমা থিয়েটারকে হীন চোখে দেখতেন ঠিক সেই যুগেই এক অভিজাত পরিবারের সন্তানের তাঁর যথা-নির্দিষ্ট কৃতিত্বের কর্মক্ষেত্র ত্যাগ করে তদানীন্তন উপহাস্য বাণিজ্যের (চলচ্চিত্র তখনও শিল্পের মর্যাদা পায়নি) উন্নতি-কল্পে আত্মনিয়োগ করাটা কতখানি বুকের পাটা থাকলে তবে সম্ভব হয় সে কথা আজ কল্পনাও করা যায় না। তাই এই সুযোগে প্রণাম জানাই এই দূরদৃষ্টি সম্পন্ন মানুষটিকে, আমাদের চলচ্চিত্র শিল্পীদের আজকের দিনের এই সম্মান গৌরব প্রাপ্তির মূলে যাঁর অকৃপণ সহায়তা অন্তঃপ্রবাহী প্রাণরসের মতই প্রবাহিত ছিল।

অনুলিখন—সন্ধ্যা সেন

(বক্তব্যের কিছু কিছু অংশ কোনো কোনো পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে থাকলেও এখানে প্রাসঙ্গিক বলেই উদ্ধৃত হয়েছে)

—কানন দেবী

২৭ ডিসেম্বর সন্ধ্যে পাঁচটা

...পুরের রূপকথা

রচনা ও নির্দেশনা :

টিকিট—১, ২, ৩, ... এর পর ১০ জানু:

চটি

সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়

সারাজীবন বিপদগ্রস্ত হতে হতে শেষে যে বিপদ আসে তা হৃদয়ঙ্গম করার জিনিস। বিপদের শুরু, হয় মাসখানেক আগে, নির্মলের এবারের নতুন চটিজোড়া নিয়ে। কিন্তু নির্মলের চটি বললে মোটে ঠিক বলা হয় না। সম্পূর্ণ ভুল বলা হয়ে যায়।

সেই ছোটবেলায় বা নটিবয়, তারপর থেকে এক জোড় চটি ছাড়া জুতো বলতে নির্মলের কোনো-কালেই কিছুই নেই। বিবাহের সময় একজোড়া পাম্প-শু পেয়েছিল বটে, সেটা বছর চারেক হতে চলল বিয়ের জোড় কি জামাইবাবুর সাথে জবলপুরে তোলা মলিনার বালিকা বয়সের ছবিটার সঙ্গে হয়ত তোরঙ্গ বা আলমারির কোণায় পড়েই আছে। নতুন চাকরিটার ইন্টারভিউ-এর দিন দাদার শু পরে গিয়েছিল ঠিকই, সওদাগরী অফিস, নইলে নাকি কাজটাই পেত না। তারপর থেকে চটিতেই তো দিব্যি চলে যাচ্ছে।

চটি ছাড়া সে কিছু পরে না, সে কখনো চটিতে হাফসোল লাগায় না। তাকে কাজেই বুরুশ-পালিশ এ-সবের বালাই তাদের বাড়িতে নেই। মলিনাও চটি বা ঐ-জাতের জিনিস কেনে। চটি ছিঁড়ে কি অকেজো হয়ে গেলে সে সটান চলে আসে কলেজ স্ট্রীটে। নিউ মার্কেটেও যায়, সে তো অফিসের লাগোয়া। সে বরাবর বাড়ি ফেরে নতুন চটি পরে, পুরোনো চটি দোকানে নিয়ে নেয় ভালোই, নতুবা, নতুন বাক্সসহ কাছাকাছি মুচিকে নির্মল তা দান করে। ডাস্টবিনেও ফেলে দেয়। দোকানের পর দোকান ঘুরে বেশ নির্বাচন করেই ও বহুসময় ধরে সে চটি কেনে, টেকসই দেখে তো বটেই, প্রায়ই খবর কাদায় হড়কে যাবার আগে চটি বদলের তার প্রয়োজন হয় না। সব সময় একাকিনের চেষ্টাতে চটি কেনা যায় নাকি? সেক্ষেত্রে, ছেঁড়া চটি পরেই সে কোনোমতে কদিন চালায়, ফুটপাতে মুচিকে দিয়ে একটু সেলাই-ফোঁড়াই করিয়ে নেয় কখনো-বা, পুরোপুরি মনোমাফিক না-পাওয়া পর্যন্ত চটি কেনা থেকে তবু সে বিরত থাকে। বাস্তবিক, একটি চটি মানে কি শুধু তার দীর্ঘায়ু নাকি? আরো নানান দিক আছে, যেমন, সেটা স্টাইলিশ তো হবে—যার নাম কিনা বেশ আধুনিক বা সমকালীন হবে—অথচ এমনটি হওয়া চাই যেন চোখে না পড়ে, যেন পথচারী শতসহস্র চটির ভিড়ে তা মিশে থাকার যোগ্য হয়। মোট কথা, তার একটা ইউনিফরমনেস থাকা দরকার। সাবালক হবার পর থেকে চটি থেকে চটি সে এ-ভাবেই কিনে যাচ্ছে, অর্থাৎ একা-একা, বন্ধুবান্ধব কারো সাহায্যের প্রয়োজন কোনোদিনই হয়নি। আজ সে একটা বিশেষজ্ঞতা অর্জন করেছে বলা চলে এ-ব্যাপারে মানে, তার চটি-ব্যাপারে, সে। আর কিছু না বুঝুক, এটা মলিনা বোঝে: যে-জন্য একাকিনে যেমন মলিনা তার চটি কি চটিজাতীয় জিনিস সে নিজেই কেনে বা কিনিয়ে নেয় অপরপক্ষে সে কখনো চটি-সংক্রান্ত নির্মলের সিদ্ধান্তে বা কোনোরূপ সাহায্য করার প্রস্তাব করে না। ফলত, বিবাহোত্তর চার বছরে নির্মলকে ৬-টি চটি কিনতে হয়েছে। দীর্ঘজীবিনসহ আগের সবেরই ক্রয়কালীনতার কথা মলিনা বরাবরই প্রতি চটিজোড়াকেই দিয়ে দোকানে সেই চর্চিন বা এক্সচেঞ্জের জন্য। বিশেষ আগের কম দামীটি তো একেবারে হালফিল কেনা হয়েছিল।

বিয়ের পর যাকে অনেক সময় মধু-চন্দ্রিমা বলা হয়, কতকটা সে-কারণেই তারা চুনারে গিয়েছিল। চুনারে তখন শরৎ, মাঠভরা মখমল ঘাসের, একটা টিলো পাঁচের গঙ্গার পারাপারহীন স্রোতের ওপর কেল্লা 'ডক্ষন' নামে ডাকের খোলামেলার বাড়িটা একেবারে ঝিল্লিকেটেই, সেখানে রোদে বসে ও পাহাড়ি হাওয়ায় সে বাক্সটি প্রথম খোলে ও মুখ-বন্ধের খবরের কাগজ দু'হাতে সরিয়ে বাবে ভেজে মল্লিকাকে চটিজোড়া দেখায়, বার বাহাবা, সে কৃতজ্ঞ যে, প্রথম দর্শিকাপাতেই মল্লিকা যা বোঝার বোঝে। 'ওঃ!' বেশে চমৎকার উঠেছিল মল্লিকা, 'কখন কিনলে?' 'তুমি আমাকে আগে বলোনি!' ওষ্ঠাধর বিস্তৃত করে সে আরো বলে। সত্যি, ভারী আকর্ষণীয় ছিল মল্লিকার ঠোঁটজোড়াও, দুকেনো এবং কাঁপত, ধনোজ্জ্বল পাতলা বলাও বলা চলে। এ ছিল সেই ধরনের ঠোঁট, তাপর এবং পুরন্ত, কথা বললেই যা বন্ধ হয়ে হাঁকিয়ে পড়ে, পুরুষ-মানুষকেই তার কাছে টানে বা। চুনারেই সে ঐ চটিজোড়া প্রথম ব্যবহার করে, আহা, তখন সৌখিন জিনিস বিনপদের হয়ে উন্মাদ ও উপর্যুপরি ব্যবহারে, পাথরে ঠেকায় ক্ষেত-ক্ষেত্রে, পাহাড়ি রাস্তায় ক্রমাগত ওঠা-নামায় শত্রুপক্ষেই দুবি তা অমন ক্ষয়কারী হয়ে পড়ে। কলকাতায় ফেরার কিছুদিনের মধ্যেই আবার চটি কিনতে হয়।

অপর একজোড়া চুরি হয়ে যায়। চুরি? হ্যাঁ, চুরি। সেটা অবশ্য, সেব-বিপদের কথা এই এবারের চটিজোড়ার মতন, আনকোরা নতুন ছিল না। তবে সেটিও ছিল কোলা-পুরী। সেবার চুনার থেকে ফিরেই নতুন চটি কিনতে হয় এবং মাসপাঁচেকের মধ্যে, মানে, তাদের বিয়ের বছর ঘুরতে না-ঘুরতেই ঐ কাণ্ড! সেটা ছিল ভারী সুন্দর, কালচে চামড়ার, অ্যাঙ্কলের মাঝামাঝি স্ট্র্যাপটিতে ছিল একটিমাত্র প্যাঁচ! তার বা তার লম্বাপানা কলা পায়ে দি বা মানিয়েছিল। আ, তার ফিটনেস আজো পায়ে লেগে আছে।

সত্যি, ভাবাই যায় না, কম্পার্টমেন্ট উপরে চটিটি চুরি হয়ে যায় এবং চোখের পলকে। সে-বছর দিনতিনেক ধরে প্রায় ১১ ইঞ্চি বৃষ্টি হয়, এমন যে ডি ভি সি জল ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। বাড়ির চারদিকে বৃষ্টির জল এত জমে ওঠে যে নির্মল সেদিন অফিস যেতে পারে না। চারদিকে আর-সব ডুবে গিয়ে জলের খানিকটা খালি জমি ও বড়রাস্তার সঙ্গে সংযোগ-রক্ষাকারী কালভার্টটি শুধু জেগে থাকে।

মুষলধারে বৃষ্টি একবার থেমে যায়। আকাশ অবশ্য মেঘলা সেবারও, কোনো হাওয়া নেই আলোর ছটাই। এ মৌসুমের ব্যাপার মন বুঝে নির্মল একটা আরামদায়ী বোধ করে বাইরে যাবার, চট করে উঠে পড়ে একটা পাঞ্জাবি গলাতে গলাতে বাড়-দ্বারের সে মল্লিকাকে ডাকে, 'কিছু পয়সা দাও তো?'

'সিগারেট?'

'আঃ দাও না', বলে সে চটিজোড়ার দিকে অগ্রসর হয়।

একজোড়ার বিড়ালীর বেশ কয়েকদিন হল বাচ্চা হয়েছে। তার একটি কিভাবে একলা হয়ে কী-ভাবে ঢুকে পড়েছে তাদের ফ্ল্যাটে, বর্ষায় তো বটেই, নির্মলের চটির ওপরেই বসে আছে। 'হুস্‌', 'হুস্‌', বলে হাত নেড়ে তাকে তাড়াবার চেষ্টা করে নির্মল, ইশ্‌, এক্ষুনি বৃষ্টি এসে যাবে। নির্মল এবার মারমুখো জোরে তাড়া দিলে, রত্তিটুকুন বিড়ালছানা তারই চটিতে বসে দুঃসাহস করে তাকে শাসায়, স্পষ্টত সে একটা ঠ্যাঙও তোলে। এ-সময় মল্লিকা এসে একহাতে টুঁটি ধরে ছানাটা তুলে ধরে ও অন্য হাতে একটা টাকা নির্মলের দিকে বাড়িয়ে দেয়। 'এত তেজ, নিশ্চয় বিড়ালী!' নির্মল সহাস্যে বলে। টাকাটা একরকম ছোঁ মেরে কেড়ে নিয়ে খোলা দরজা দিয়ে সে তরতর করে চটি পায়ে একতলায় নেমে যায়। যা করার, বৃষ্টি আসার আগেই করতে হবে। সময় খুব নেই।

দু' এক পশলা বৃষ্টি হলেই এদিকটা দ্বীপান্তরের মতো হয়ে ওঠে। একতলার খোলা দরজা থেকে গোড়ালি সমান জলে সে দ্বিধাহীন নেমে পড়ে। চটি পরে? হ্যাঁ, চটি পরে। তবে আর তার কাঁহাতক কোথায় এমন চটিই যদি সে কিনবে যা নাকি রোদে-জলে-কাদায়-পাহাড়ে পরা যায় না? বালির ওপর দিয়ে হাঁটা যায় না? বা, যা পরে পাহাড় ডিঙনো যায় না? এই চটিজোড়া সে কিনতে পায় কলেজ স্ট্রীটের 'পদাম্বুজ' থেকে। কেনার সময় তাঁর মজার একটা কথা হয় দোকানের বালক-কর্মচারীর সঙ্গে। চার-পাঁচ জোড়া চটির একটাও ফিট করছে না দেখে ছেলেটি, 'আপনার পায়ের মাপ শুধু' বললে, উত্তরে নির্মল তাকে বলে, 'দ্যাখো ভাই, পা আমার যে-রকমই হোক তা তো আর তোমার জুতোর মাপে করা যাবে না, জুতোকেই আমার পায়ের মাপে হতে হবে।' উক্তিটি কোনো না-কোনো দিক থেকে মার্জনার হয়েছিল, কেননা, উত্তর শুনে, দোকানের পিছন থেকে দোকানের মালিক বেরিয়ে আসে ও স্বহস্তে প্রকৃত চটিটি নির্মলের পায়ে পরিয়ে দিয়ে যায়। সত্যি, নির্মল চটি কেনে বড় মনস্তাত্ত্বিকভাবে এবং প্রতি চটির সঙ্গে, কেনার আগে, একটা ভালোবাসাবাসি না-হওয়া অবধি সে তা কেনে না, বলা চলে। মাঝেমধ্যেই নির্মল তার চটিজোড়া খোর দোলে, তাকে রোদে দিতে দেখা যায়। কোলাপুরিগুলো তো একবার রোদে দিয়ে একটু তেল মাখলে দ্বিগুণ চকচকে হয়ে ওঠে। কিন্তু কে বলবে নির্মলের প্রাণে একটু মায়াদয়া আছে যখন সে, দুদণ্ড ও দ্বিধাহীনভাবে জলে-কাদায় নেমে পড়ে—জুতো পরে নামতে সে যা দ্বিধান্বিত হয়—দেখে মনে হয় যেন সে আনন্দে, দুষ্ট ছেলেদের মতো চাপকে নাচাচ্ছে। হাজার চটির ভিড় থেকে পরিশ্রম-সাধ্য পছন্দ করে সে, নির্মল বাবু, সেই তো এটা কিনেছে। নির্মলকে সার্টিস দিতে হয় বাধা।

সেদিন শুকনো কালভার্টে উঠে চপ্‌ করে দাঁড়ায় নির্মল। মাঠে অগাধ জল হলেও রাস্তায় জল একহাঁটু। গর্তগুলো এড়িয়ে যেতে না-পারলে জল বিপদসীমা ছাড়িয়ে, সে জানে। হঠাৎ, বহুকাল পরে, স্মরণকালের মধ্যে বোধ হয়তো এই প্রথম, চটিজোড়া কালভার্টে রেখে খালি পায়ে নির্মল জলে নেমে পড়ে।

কালভার্টটি এদিকে বাড়ি থেকে দূরে; ২১০ টাকা দামী স্বল্প হাউসিং এস্টেটের তাদের এই দক্ষিণ-পূর্বদিকের চারতলার ফ্ল্যাট থেকে দূরত্ব, শুধু জানালার পর্দার ওপর মল্লিকার মুখ তো জেগেই ছিল, সে চটির প্রতি একটা ইশারা করে যেতে পারত। মল্লিকার চোখে চশমা, তবে বাইরের জিনিসটি শুধু সে দেখতে পায় না। তা ছাড়া জল তো বা তেমন ভিড়ইনে, গভীরতের জলে চটিজোড়া কি বেশি-বেশি ভিজত নাকি?

পথ প্রাণীহীন। মোড়ে একটা রিকশা এখনো দেখা যায়, এক্ষুনি বাঁক নিলে রাস্তায় বলতে আর কিছুই থাকবে না। রাস্তা পেরিয়েই মুদিখানার দোকান, এখন বাঁশ-বেড়া, তবে যাটা ভেতরেই আছে। নতুন বৌ আনিয়েছে দেশ থেকে, আর এই বৃষ্টি, যাবেটা কোথা। লোকটা সিগারেটও দেয়। এখানে পৌঁছে কালভার্ট পর্যন্ত বেশ দেখা যায়। চারদিকের পানাচাঁই, খোলা, নোংরা জলের মধ্যে ঐ কোণ বরাবর, কালভার্টের ওপর, তার নাতিতরুণ চটিজোড়া, সে দ্যাখে। তাড়াতাড়ি করে সিগারেট পেতে কতটুকুই বা দেরী হয়ে থাকবে, বড়জোর পাঁচ মিনিট? ইতিমধ্যে মেঘ ঝরে পড়ে।

এবং মুখ ঘুরিয়েই, কে বলে বিশ্বাস্য বলে কিছু নেই, জীবনের বিশ্বাসযোগ্য-অবিশ্বাস্যতাকে সে প্রত্যক্ষ করে। তার চটি-জোড়া আর নেই! নেই? না, কই নেই তো! এবং ঠিক সেই জায়গায় কোথা থেকে ও কী করে কে জানে একটি কোঁকড়া-চুল ছেলের আস্ত মূর্তিমানের মতন। পাশে রাস্তার জলের ওপর দাঁড়িয়ে ছেঁড়া গেঞ্জি-গায়ে ও কালো হাফপ্যান্ট-পরা একটি গরীব লোকের ছেলে।

ছেলেটি কোথা থেকে এল! ছপছপ শব্দ তুলে কোনাকুনি হেঁটে নির্মল কালভার্টের ওপর ওঠে। যেতে যেতে মেঘ ডেকে ওঠে ও হুড়মুড় করে বৃষ্টি নেমে পড়ে। বৃষ্টির মধ্যে ছেলেটি জলে গোড়ালি ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে। যেন তার কোথাও যাবার নেই! কালভার্টের ওপর ঠিক অবিকল চটিজোড়ার জায়গায়, যেন চটির বদলেই রয়েছে, বস্তু কতটা হ-য-ব-র-ল'র সেই 'গিরগিটি নেড়া'-ব্যাপার নাকি ব্যাপারটা? 'এখানে একজোড়া চটি

ছিল?' পাশেই কারখানার টিনের চালের জন্যে বৃষ্টির শব্দ এত বেশি যে ঠোঁট দুটি যথাসম্ভব ফাঁক করে নির্মলকে বেশ চেঁচিয়ে বলতে হয়, যে-জন্যে মুখের মধ্যে তীরের মত বৃষ্টির জল এসে পড়ে। ছেলেটি মাথা নেড়ে বলে, 'আমি তো জানি না।' 'সে কী!' অবাক লাগে নির্মলের, এ-রকম অবস্থায় পড়লে বড় বোকা-বোকা লাগে, তার ওপর আবার মৃদু হাসি পায়, যা বোঝারই। নির্মল অসহায়-ভাবে ওপর দিকে চায়, বৃষ্টি আরো ঝেঁপে আসছে, চারতলার জানালা একটুখানি ফাঁক করে মুহুর্মুহু হাত নেড়ে কালভার্টের দিকে ইশারা করছে মলিনা, সেদিকে চেয়ে বড়সড় একটা পানাফুলের জল-ধোয়া অমন বেগুনি ছাড়া কোনো চটি নির্মলের চোখে পড়ে না। ক্ষেপে-ক্ষেপে বৃষ্টি আরো বাড়ে, ঘন ঘন বিদ্যুচ্চমক ও মেঘ ডাকাডাকির মধ্যে নিচু হয়ে নির্মল ফুলটা কুড়িয়ে নেয়। ফ্ল্যাটের দরজা খুলে মলিনা একরকম কেড়ে নেয় তার হাত থেকে ফুলটি ও কাসে জল ভরে তখুনি রাখে। তারপর শুকনো তোয়ালে বের করে নির্মলের হাতে দেয়। সেদিন আর বাইরে বেরোবার অবকাশ করে না। ফ্ল্যাটে এ-ঘর ও-ঘর করতে গিয়ে কতবার চোখে পড়ে, নির্মল ততবারই বিশ্বাস করতে চায় যে ঐ সদ্য বেগুনি ফুলটাই হচ্ছে তার চটি; সে ইচ্ছুক, তবু তার বিশ্বাস হয় না। ফুলের কারুকাজ থেকে বেগুনি আভা ছাড়া কিছু আর কোনো চটি তার চোখে পড়ে না।

যাই হোক, পরদিন ঘরে-পরার হাওয়াই চপ্পল পরে নির্মলকে বাজারে যেতে দেখার আগে ব্যাপারটা লক্ষ্যই করেনি মলিনা। গত রাতে নির্মল তাকে যার-পর-নেই আপ্যায়ন করে। শুধু চটিহারা নির্মলের রাতের ভালোবাসার যথার্থ-ব্যাপারে দিনের বেলায় সে রীতিমত বোকা বনে যায়।

*

কিন্তু এবারের চটি নিয়ে যে বিপদ আসে অভাবিত দিক থেকে, সত্যি, তা দুরবস্থায় ফেলার জিনিস। এ কিছু হঠাৎ স্ট্র্যাপ ছেঁড়া বা চুরি-টুরি হওয়ার ব্যাপার না। ব্যাপার এই যে, আসলে, গত মাস দুই ধরে নির্মল যে-চটিজোড়া পরে আসছে-যাচ্ছে সেটা তার চটিই নয়!

অথচ, এবার চটি কিনতে তাকে একটুও বেগ পেতে হয়নি। বিখ্যাত কলেজ স্ট্রিটে এবার তাকে আদৌ ঘোরাঘুরি করতে হয়নি। কিছু টাকার জন্যে সে গিয়েছিল শিবপুরে, মামার ওখানে। টাকা পায়ও। স্টপে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে, ট্রাম-বাস কিছুরই দেখা নেই, মাঝে মাঝে শালিমারের দিক থেকে লরি-ভরা মাল ও ট্রাক ভর্তি সি, আর, পি, যায়। ওদিকে ঘন ঘন বোমার শব্দ আগেই পেয়েছে।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে, তারপর সিগারেট-এর দোকানে দড়ি তুলতে গিয়ে সে চমকে ওঠে—আরে! ধূলিমলিন কাচের [illegible] র‍্যাকের ভেতর দিয়ে মাস দুই আগে ও ধোঁয়া কুয়াশার মধ্যে সহজেই এবারে চটি-জোড়ার সম্মুখীন হয় সে। শুধু হাতে না নিয়ে তথা পায়ে গলাবার আগে চটির মাহাত্ম্য সে বোঝে নি। হ্যাঁ, এর জাত আলাদা। স্ট্র্যাপের বদলে, ওহ্, এটা তৈরি হয়েছে কিনা চামড়ার কতকগুলো পাকানো দড়ি দিয়ে? ভাবা যায়! স্রেফ দড়ি দিয়ে—আর কিছু: না—না কোনো পেরেক, না একটা সেলাই, না-কিছু। এ-রকম চটি এখানে এই শিবপুরের এঁদো দোকানে এল কোত্থেকে, কতদিন ধরে বা পড়ে আছে এই ভাঙা ধুলোভরা শো-কেসে। আর এর পাতলা সোল, আ, নারীর অলিক্ষক বড় ঠোঁট যা, পায়ে গলিয়ে দু' পা হেঁটেই সে বুঝতে পারে, একে নিষ্পিষ্ট করার মত সুখ আর কী। এত হালকা! এ কী এ-দেশে তৈরি? উত্তরের জন্যে সে দোকানীর লোল মুখের দিকে তাকায়। আসন্ন বিক্রির লোভে দোকানে মলিন আলোতেও জ্বলন্ত হয়ে উঠছে বৃদ্ধের কোটরাগত দুটি চোখ—এ-ছাড়া সে কিছুই সেখানে খুঁজে পায় না। নীরবে সে চটিজোড়া কেনে ও পুরোনোটি বিনা বাক্যব্যয়ে রেখে দোকান থেকে বেরিয়ে আসে। আগেরটা আরো মাসখানেক বেকসুর চলত। ঠিক এখনি কেনার দরকার ছিল না। মামার কাছে পাওয়া প্রায় সব টাকাই বেরিয়ে গেল।

সে অন্তত দু মাস আগের কথা। তারপর মাসখানেক আগে একদিন ছুটে ট্রাম ধরতে গিয়ে ও অতি অনিশ্চিতভাবে পড়ে গিয়ে নির্মলের প্রথম সন্দেহ হয়। উঠে দাঁড়িয়ে, পা থেকে খুলে, একপাটি উল্টিয়েই যা বোঝার সে বোঝে। যেন তার মাথার ভিতরে, স্বল্পকালের মধ্যে এই প্রথম, স্বপ্ন-এলাকার নিউরনগুলির মধ্যে দারুণ কোলাহল পড়ে যায়: মাথার ভিতরে লক্ষ-লক্ষ-লক্ষ নিউরনের সহসা ছোটাছুটি সে টের পায় বললে একটুও বেশি বলা হয় না।

এ কার চটি সে পরে আছে গত এক, দেড় কি দু মাস ধরে? এ তার চটি নয়! অথচ, কে বলবে এ তার নয়, অবিকল তারই, এটিও মাস খানেকের মত ব্যবহৃত। নিজের মনের ভুলে কখন সে দ্বিতীয়-রহিত ভেবে তার চটিজোড়াকে ভুল করেছিল। অথচ আছে: ছিল। অবিকল অন্য-একজোড়া ছিল এই কলকাতাতেই, কেননা, বিগত দু' মাসের মধ্যে সে কলকাতার বাইরে যায়নি এবং যা কিনা কেনা হয়েছিল আনুমানিক মাস দুই আগেই! [illegible] মাঝখানে হতচেতন দাঁড়িয়ে থেকে ধাক্কা খেতে খেতে একপাটি চটি ধরে নির্মল দাঁড়িয়ে থাকে। তার গোড়ালির চাপ পড়ে বাঁ-দিকে। সাধারণত তাই তো পড়ে থাকে তার মত গড়পড়তা মানুষের? কিন্তু, ক্রমাগত পেষণে এর [illegible] করে গেছে, সে এই জন্যে পিছলে পড়েছিল—বাঁ-দিকে গোড়ালির চাপে ছুটন্ত শরীরের ভার অভ্যাসমতন রাখতে গিয়ে। কিছুদিন যাবৎ এ নিয়ে অসুবিধের আরো দু একটি খুঁটিনাটি নির্মলের এবার মনে পড়ে। সে আর ট্রামে ওঠার চেষ্টা করে না। এখান থেকে বাসা পর্যন্ত মাইল তিনেক হাঁটার জন্যে প্রস্তুত হয়ে ফুরনো সিগারেট থেকে আর একটা আগুন ধরিয়ে সে এগোয়। তবু তার কিছুতে মনে পড়ে না যে গত দু মাসে কোথায় কোথায় গিয়েছিল, কোথাও-বা পা থেকে খুলে রেখেছিল চটি অথবা

সুনীলকুমার ঘোষের রহস্য উপন্যাস
গ্রীণ হাউস মিষ্ট্রি ৭৲
নারায়ণ রাজগুরুর কালাপাহাড় ৬৲
রবীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের স্বর্ণ ময়ূর ৬৲
নীহাররঞ্জন গুপ্তের
পোড়ামাটি ডাঙ্গাঘর ৮৲

রাজসিংহের নতুন উপন্যাস
এই দশকের কলকাতা
সাত টাকা
বৈপায়নের ঘেরাও ৫৲
রাহুল সাংকৃত্যায়নের
সিংহ সেনাপতি ৮৲

ভ্যারাইটি পাবলিশার্স : ১৩ কলেজ রো, কলিকাতা—৯

CENTRAL LIBRARY

কার বাড়িতে বা ঠিক কোথায় তার অজ্ঞাতসারে চটি বদলাবদলি হয়ে গেল। আকাশ-পাতাল রোমন্থন করেও সে কোনো কিনারা করতে পারে না। যত মনে করতে চেষ্টা করে, ভুলে-যাওয়া তাকে তত ছেঁকে ধরে। অন্যদিকে খেজুরি বসাতে সে একবার, দু'বার পর্যালিবার্য চেষ্টা করে। পঞ্চাশ পায়ের বেশি সে এগুতে পারে না। গোড়ালির ভার্নাদিক থেকে একটা শিউরানি উঠে এসে মেরুদাঁড়া নরম করে দিয়ে এখন মাথায় ঢুকে পড়ছে, শরীর ভেসে যাচ্ছে যাবে, বুকের ওঠা-পড়া অসম্ভব বেড়ে গেছে, সে হাঁফায়। সে থেমে যায়; থেমে সে আবার হাঁটতে শুরু করে।

*

এতে কোনো ভুল নেই যে অন্তত মাস-খানেকের বেশি সময় ধরে নির্মল যে চটিজোড়া পরে রয়েছে তা নির্মলের নয়। ট্রাম-অ্যাক্সিডেন্টটি ঘটে আজ থেকে এক মাস আগে। সেটা ছিল পে-ডে। পড়ে যেতে-যেতেই নির্মলের হাত চলে গিয়েছিল বুকের বাঁ-দিকে হার্টের ওপর, পে-প্যাকেটটি সে-দিকেই ছিল। চটির আসল মালিকও টের পেয়েছে নিশ্চয় এতদিনে। সন্দেহ কী যে, ও-প্রান্ত থেকে সেও এমনি খোঁজাখুঁজি শুরু করে দিয়েছে।

সমস্যা বটে একটা। সমস্যা যখন, সমস্যা মাত্রেরই একটা না-একটা সমাধান থাকার কথা। কিন্তু নির্মলের কেমন একটা পূর্বধারণা জন্মায় যে এটা বোধহয় গুজবের সেই অতিলৌকিক ধরনের, যত দিন যাবে যার জটিলতা ও রহস্য বাড়বে বই কমবে না। সূত্রো [illegible] অনুসরণ করলে, জটিলতা [illegible] হয়, এটা একটা সত্য ধারণা বটে। শুধু স্থিরনিশ্চিত হবার আগে যে-কোনো একটি সূত্রো পরীক্ষামূলক ছুঁতে নির্মল সাহস পায় না। একটিমাত্র ভুলে, এক্ষেত্রে, এক-জীবনের ভুলচুক হয়ে যাবে, সে মনে করে। বহু রাত অব্দি জেগে জেগে সে ভাবে। এর শেষ কোথায় নির্মল কিছুতে বুঝে পায় না। 'আচ্ছা, জ্ঞানের বিয়েটা কত তারিখে ছিল বলো তো?' মলিনা মনে করে এটা কোনো প্রশ্নই না, যে-জন্যে, উত্তরে, অন্ধকার থেকে তার বুকের টিপকল খোলার পুটপুট ভেসে আসে। 'আচ্ছা, জ্ঞানের বিয়েতে কি আমি চটি পরে-ছিলুম?' মলিনার পিঠের দিক থেকে উপুড় হয়ে শুয়ে নির্মল এবার জানতে চায়। 'সবুর করো না, আঃ। হুকটা খোলো।' চাপা কামনাকাতর গলায় মলিনা জবাব দেয়। জ্ঞানের বিয়েতে চটি খোলার প্রশ্ন ছিল না তো... নির্মলের মনে পড়ে যায়।

শ্যামপুকুরের দেবজ্যোতির সঙ্গে এক-দিন দেখা, সেও প্রায় মাস দুই হতে চলল। 'কোথ আছে, কোথ?' একটা মুদির দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে উচ্চকণ্ঠ স্বরে দেবজ্যোতি জিজ্ঞেস করছিল। ছেলের হাম [illegible] এলে ভয় না বিপদে পড়ে। না, চটি সেবনে—দেবোনাম। সে কথা নয়। সে দেবজ্যোতির বাড়িতেই যায়নি। পা স্পর্শ করাও। আর হোমিওপাথি করাবে, বুঝলে?' গোয়ের হলে তাকে এড়িয়ে যায়। তখন সবে সন্ধে, তবু বাকি গলিটা অস্বস্তিকর ফাঁকা। আজকাল এদিকে গণ্ডগোল লেগেই আছে। এক জায়গায় জামা কাপড়টা আঁট করার জন্যে জামাটা তুলতেই তড়াক করে তিনটি ছেলে অন্ধকার রক থেকে একসঙ্গে লাফিয়ে ওঠে। নির্মলও জামা তুলে রেখে যতক্ষণ উচিত তার চেয়ে বেশি সময় ধরে কাছা আঁটে। সে কিছু শেল-ফ্রেন্ড নয়, এটাই দেখায় আর কী। কিন্তু এটাও কথা না। গলি থেকে পরিত্যক্ত রাজপথে পড়ে, ট্রামলাইনের দিকে একা যেতে যেতে ও একবারও মুণ্ডু না ঘুরিয়ে সেদিনই প্রথম নির্মল বুঝতে পারে যে, দূরত্ব বজায় রেখে একজোড়া চটি-পরা পা তাকে অনুসরণ করে আসছে।

কথা হল, সেদিন সে যে-চটি পরে ছিল সে কী তার? কেননা, সেই থেকে শুরু। তারপর থেকেই দিনকে-দিন সে কেমন আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে, সে ভেবে দ্যাখে। বিশেষত, ট্রাম অ্যাক্সিডেন্টের পর থেকে এটা বেড়েই চলেছে। একটা চার্টার্ড ফার্মে পার্টটাইম সেরে ফিরতে আজকালকার হিসেবে নির্মলের বেশ রাত হয়ে যায়। দোকানপাট এদিকে বিলকুল বন্ধ হয়ে যায়। এস্টেটের মেন গেট থেকে তাদের এক-ব্লক পর্যন্ত সুরকির পথটুকু ৯টা নাগাদ নিঝুম হয়ে পড়ে। এইটুকুর মধ্যেই নির্মল ঘাড় ফিরিয়ে বারকয়েক আসপাশ দেখে না-নিয়ে পারে না। কেউ বোধহয় একা-তাকে কোনো কিছুর জন্যে দায়ী করবে যে জন্যে সে অপরাধী নয়, অন্তত কোনো প্রমাণ নেই যে সে নয়। উল্টোদিকে সে সম্পূর্ণ নিরপরাধ এই বোধও তার মধ্যে জন্মাতে দ্যাখে। আজ থেকে চার বছর আগে, ভোরবেলার কথা ভেবেই সে এই দক্ষিণ-পূবের বারান্দাঅলা ফ্ল্যাটটি নেয়। বরাবর সে ভোরে ওঠে, প্রত্যুষার এই লাল রোদ্দুরটুকুর জন্যে পঞ্চাশ টাকা দিয়ে দেওয়া সে যুক্তিযুক্ত মনে করে। কিছুদিন হল সে আর বারান্দায় বসে না। শুধু সে কেন, একটি ভ্যান আসতে দেখলে আজকাল ভয় কে না পায়। অনেকেই এ-রকম পাচ্ছে কিনা নির্মল জানে না। আজকাল কে বা কার সঙ্গে মন খুলে কথা বলে, বিশেষত এ-সব ব্যাপারে। গত মাস দুই ধরে, প্রায় চটি বদলের সমসাময়িক কাল থেকে, তার এই অপরাধীবোধ ক্রমে ক্রমে বরং বেড়েই গেছে।

তাদের ব্লকে ঢোকার মুখে একটা ছোট গেট রয়েছে। গেটের আংটা খোলার 'টিং' করে ছোট্ট শব্দটা দিনের মধ্যে কতবারই না তার হৃৎস্পন্দন এলোমেলো করে তোলে। আগে তবু, রাতের দিকেই ভয় করত বেশি, [illegible] কথা বলতে বলতে [illegible] কেউ গেলে সে উৎকর্ণ হয়ে পড়ত। এখন আর দিন-রাত নেই। ব্লকে আরো ৭টি ফ্ল্যাট রয়েছে, তাদের কেউ হতে পারে, এ-রকম ভেবে নির্মল আর কোনো সান্ত্বনা পায় না।

রাত এক সময় সত্যি সত্যি স্তব্ধ হয়। ইয়ার্ডে মালগাড়ির শান্টিং-এর বিলম্বিত ঝকঝক-এর সঙ্গে পা ফেলে তখন কলকাতার দিক থেকে এগিয়ে আসে এক-জোড়া চটি-পরা পায়ের হেঁটে আসার শব্দ, সে শুয়ে শুয়ে শোনে। রাস্তার ধুলো-কাঁকরের ওপর অসংলগ্ন পদপাত অতি অস্বাভাবিক ও রহস্যজনকভাবে তাদের এস্টেটের চারদিকে ঘোরাফেরা করে। তারপর একদিন 'টিং' করে গেট খুলে পদশব্দ ঢুকে পড়ে তাদেরই ব্লকে। একতলার সিঁড়ির নিচে দারোয়ানের সঙ্গে নিচু গলায় জিজ্ঞাসাবাদ নির্মল স্পষ্ট শুনতে পায়। সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসে। হৃৎস্পন্দন থামিয়ে নির্মল অপেক্ষা করে। একতলা...দোতলা...তিনতলা...পদশব্দ এক-দিন সত্যি সত্যি চারতলায় উঠে আসে। তারপর একসময়, কোনো এক সময়, চারতলার ৩১ নম্বরের 'বজার' বেজে ওঠে। নির্মল আর পারে না। মলিনার [illegible]-এর মধ্যে ঢুকে পড়ে। মলিনা বলে ওঠে, 'কে?' বিয়ের পর থেকে গত চার বছর ধরে এই মলিনাই ছিল তার অনিদ্রারোগের একমাত্র চাবুক তথা অব্যর্থ মকরধ্বজ। আজকাল মলিনাও পারে না। মলিনা ঘুমিয়ে পড়ে। সে জেগে থাকে।

এর ওপর একদিন ভোররাতে নির্মল একটা স্বপ্ন দেখে ফ্যালে। একটা রৌদ্র-করোজ্জ্বল বালুকাময় উপত্যকার খালি পায়ে সে দাঁড়িয়ে, তার পা পুড়ে যাচ্ছে, তাকে ক্রমাগত পা বদল করতে সে দ্যাখে। ওদিকে একটা পাহাড়, ত্রিকোণ, বেশী দূরে হবে না, তার সবুজ বনানী স্পষ্ট দেখা যায়—যা ডিঙোবার সাহস তার নেই, যার ওপারে কী সে জানে না। অথচ পিছনের জনপদ থেকে তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। দিনের বেলায় ধ্রুব তারকার জন্য ভুল করে আকাশে তাকিয়ে তার আরো ভুল ভাঙে। আকাশে সূর্য নেই। বিরতিহীন বিদ্যুচ্চমকে ভরা এ এক অলৌকিক দিনের বেলা, এখানে হাওয়া নেই। 'আশায় কবর ছুমি', কে যেন বলেই যায় তাকে।

ঠিক তখুনি বালির ওপর দিয়ে একটা মসমস ধ্বনি শুনে সে চমকে ওঠে—কে? অদূরে দিয়ে একজোড়া চটি হেঁটে যায়। চাঁদে ওঠার আগে হাঁসের মত সেদিকে সরু ও লম্বা হয়ে যায় তার গর্দান, 'চটি, তুমি কী প্রভু খুঁজছ?' সে বলতে চায়, তবু তার গলা দিয়ে স্বর বেরোয় না। সে এক-পা এগুতেই দ্রুততর হেঁটে চটি অনেকটা এগিয়ে যায়। নির্মল হঠাৎ দৌড় শুরু করে দেয়। চটি ক্রমাগত দিক বদলায়—তবু সে পাহাড়ের দিকেই ছুটে চলেছে নির্মল জানে—যেখানে ঢুকে পড়লে নির্মল আর তাকে খুঁজে পাবে না। [illegible] যাচ্ছে তার চটিহারা পা—তবু, এই প্রাণহীন নিরালম্ব উপত্যকায় সে লুকোবে কোথা, —দুঃস্বপ্নে উৎকণ্ঠ

জেব্রার দিকে মরুভূমির সোনালী সিংহের মত অবিশ্বাস্য দৌড়ে নির্মল বারংবার তার কাছাকাছি পৌঁছয় ও শেষ পর্যন্ত পাহাড়ের প্রায় পাদদেশে তার জ্বলন্ত লাফের থাবা একটা পাটি চেপে ধরে। সঙ্গে সঙ্গে রোদের প্রকাণ্ড ঝাপ্পড় তার গালে এসে লাগে। স্বপ্নের মধ্যে বাথা পেয়ে নির্মল লুটিয়ে পড়ে... 'এই—এই—কী হচ্ছে—আঁ—কী হচ্ছে' হাসি-হাসি মুখ মুখের কাছে নামিয়ে এনে মলিনা তাকে জাগায়। নির্মল বহু সময় ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে থাকে। ওঃ, কী কষ্ট তার সর্বাঙ্গে. কেউ যেন বাঁশপেটা করেছে সারা রাত। অতিকষ্টে মোচড়ানো হাত তুলে. চুল সরিয়ে মলিনার ঘাড়ে সে রাখে. 'আচ্ছা মলিনা, ওই যে সেদিন কাঠের পাটি নিয়ে টুবলুরা ক্রিকেট খেলছিল না, সেটা কোথায়। সেটা কাদের।'

'ওমা। তা নিয়ে তুমি কী করবে?'

'আঃ।' শরীরময় বাথা আড়মোড়া দিয়ে ভেঙে বুক থেকে মলিনাকে পাশে নামিয়ে রাখে নির্মল, 'তুমি কিছু বোঝো না। আজকালকার দিনে, ধরো যদি একটা হাউস ব্রেকার আসে, মাঝরাতে আসতে তো পারে? একটা-কিছু—কিছু—একটা থাকার তো দরকার। আমি কী দিয়ে তাকে রুখবো? কী আছে আমাদের, একটা বেড়াবার ছড়ি ছাড়া?' শূন্যে দু হাত তুলে নির্মল বিলাপ করে, 'ডাকলে আজকাল কেউ সাড়া দেবে তুমি মনে করো?'

যার চটি সে এখন কোথায়। নির্মল ভাবে। নির্মলদের পৈতৃক ছোট্ট বাড়িটি কবেই, সেই ছোটবেলাতেই, বিক্রি হয়ে গেছে। সে বেশ কয়েক বছর হতে চলল. একদিন, তখন সন্ধেবেলা, কী একটা ছুতো করে সে বাড়িটায় ঢুকে পড়ে ও উঠোনে তাদের আমলেই অকেজো হ্যান্ডপাম্পটি আজো থেকে গেছে দেখতে পায়। ছেলে-বেলায় তার একটা লাল মার্বেল ওর ভেতর পড়ে গিয়েছিল। মার্বেলটি আজো ওখানে থেকে গেছে, নির্মল জানে। এ শুধু নির্মলই জানে যে, যে চটি সে পরে আছে সেটা তার নয়।

নইলে এবারের চটিজোড়া যথার্থই প্রশংসা কুড়িয়েছিল। অফিসে এখনো কারো চোখে প্রথম পড়লে কিছু না-কিছু জানতে চাইবেই। আগে কত আগ্রহ ভরে উত্তর দিত। এখন এড়িয়ে যায়। অফিসে টেবিলটি তার কাছে একটা দাবার ছকে পরিণত হয়ে যায় যেন। একটিমাত্র কাল্পনিক ঘুঁটিকে সে দাবা-বোড়ে-রাজা-রানী কি মন্ত্রীর বেপরোয়া চালে চালায়. যত্র-তত্র রাখে। কোনো একটি ঘরে ঘুঁটিটাকে সে এক মুহূর্তের বেশি রাখতে পারে না। রেখেই. তাকে তুলে নিতে দেখা যায়। সে এখন ঠিক কোথায় বা কোন দিকে। সে কী ঠিক পথে? তার থেকে আর কত দূরে: নাকি সে দূর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে. এটাই জানতে উৎসুক তার মন বেশি। সে কী টের পেয়েছে? হ্যাঁ, পেয়েছে। না, পায় নি? টের পেয়ে, সে কী তুলে রেখেছে নাকি নির্মলের চটি না পরেই যাচ্ছে তার মত? সে হয়ত আর একজোড়া কিনেই নিয়েছে। নির্মল পারে নি কিনতে। মাসের শেষে নির্মল পারে না।

বাসে-ট্রামে সর্বত্র নির্মল লোকের চটি-পরা পা লক্ষ্য করে। এত রকমের পা হয় নাকি মানুষের? রেস্তোরাঁ-সেকশনের দোতলা থেকে ফুটপাত স্পষ্ট দেখা যায়। অনেক সময় ফুটপাতে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। গত রবিবার চটি পরে মলিনার জ্যাঠামণি এসেছিলেন। চুনোটের মধ্যে চটিটা পুরোপুরি দেখতে না পেয়ে নির্মল কৌতূহলী হয়ে পড়ে। সে বহুক্ষণ চোখ সরাতে পারে নি। প্রণাম করতে ভুলে যাবার জন্যে নয়, এঃ হে, ওঁর পায়ে যেটা আছে এটা একদম ভুল যাওয়ায় সে খুবই লজ্জিত হয়ে পড়ে। ঘন-ঘন বেগে বাঁদিক পা দোলাচ্ছিলেন ভদ্রলোক। কদিন আগে মেজদার বাসা থেকে উঠতে কিছুটা রাত হয়ে যায়। বাসার সামনে ডিপো থেকে বেরুবার মুখে ফাঁকা ট্রামের লাইন-পাল্টানোর খটাং-খট শুনেই সে বরাবর বুঝত বুঝেছে, আগে টু-না-মিনিট বাকি দিতে পারত। আজকাল অবশ্য আটটা-নটা থেকে ট্রাম-বাস ফাঁকা হতে শুরু করে। তবু এ কেউ শুনেছে, রাত সাড়ে নটার ফাঁকা বাসে শুধু, সে ও আর একজনমাত্র যাত্রী, বাস শ্যামবাজার ছাড়লে অন্যমনস্ক নির্মল সহসা পিছন ফিরে তবু তা-ই লক্ষ্য। ওদিকে দুজন বসার লম্বা সীটের কোণে মুড়িসুড়ি দিয়ে সে একা বসে, লোকটি খর্বকায়, মধ্যবয়সী ও তার নাক বাঁকা, নির্মল লক্ষ্য। লোকটি এতক্ষণ তাকে হ্যাঁ তাকেই দেখছিল, নির্মল বুঝতে পারে। মুহূর্তে, কেন কে জানে, লোকটার পা দেখার জন্য নির্মল ব্যাকুল হয়ে পড়ে। লোকটা তৎক্ষণাৎ পা সরিয়ে নেয়, সে দেখতে পায় না। লেক-টাউনের কাছে আচমকা দ্বিতীয়বার মুখ ফিরিয়ে নির্মল লক্ষ্য দুজন নিমগ্ন কন্ডাক্টর ছাড়া হু-হু বাসে সে একা!

*

এর মধ্যে অফিসের কাজে এক সপ্তাহের জন্যে নির্মলকে বাইরে যেতে হয়। ভোরের ট্রেনে বাড়ি ফিরেই শোনে পানিহাটি থেকে কে একজন পর পর দুদিন, পরশু এবং কাল, দুদিনই সন্ধের পর তার খোঁজে এসেছিল। 'আচ্ছা লোক বাবা! বললুম তুমি আজ ফিরছ, তবু

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের
সর্বশেষ পূর্ণাঙ্গ মহৎ উপন্যাস
কাচের দরজা ৪·০০
* এই লেখকের অন্যান্য উপন্যাস *
নির্জন শিখর ৫·০০ তৃতীয় নয়ন ৪·০০ বনবাংলো ৪·০০
কৃষ্ণচূড়া ৬·৫০ তিন প্রহর ৪·০০ বনজ্যোৎস্না ৪·০০
সুনন্দর জার্নাল ৪·৫০

অপু বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপু
পথের পাঁচালী। অপরাজিত এবং
কাজল তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় একত্রে
দাম ১৮৲। সর্বসাধারণকে ২০% Discount দেওয়া হচ্ছে।
ডাকে নিতে হলে ৩৲ টাকা অগ্রিম পাঠাবেন।

জীবনানন্দ দাশের কাব্যগ্রন্থ
বনলতা সেন / রূপসী বাংলা / মহাপৃথিবী / ধূসর পাণ্ডুলিপি
কবির শ্রেষ্ঠ কাব্য-চতুষ্টয়। মূল্য ১২·০০ (২০% কমিশন বাদে ৯·৬০)।
গ্রন্থপ্রকাশ : বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ। ১৪ বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট, কলি-১২

আবার কাল এসে জ্বালাবে। কী অদ্ভুত-ভাবে কেন দেয় না লোকটা!'

পা-নি-হা-টি! কোন দিকে? পানিহাটিতে তার চেনা কেউ থাকে না তো। সে কখনো পানিহাটি যায় নি। সে যেখানে, পানিহাটি তার থেকে কত দূরে? হঠাৎ পানিহাটিকে পৃথিবীর একমাত্র রহস্যময় জায়গা বলে মনে হয় নির্মলের যা বহু দূরে অজানার মধ্যে থেকে যাচ্ছে।

'পানিহাটি?'

'পানিহাটিই তো বললাম।'

'দেখতে কেমন?' মুখে আলোকের রেখে নির্মল জানতে চায়।

'খোকা মতন। বেশ স্মার্ট দেখতে।' সাধারণত নির্মল জেনেছে। তাই অঞ্জনা ঠোঁট টিপে হাসে।

'নাম বললে?' শরীর শক্ত করে মুখ ফিরিয়ে তাকায় নির্মল।

'নামটাম তো কিছু বলল না বাপু। তা না কী?'

'পানিহাটি কোন দিকে তুমি জানো?'

'না তো।'

হাতারে না তাকিয়ে হঠাৎ ট্রাউজারটা দেওয়ালে ছুঁড়ে মারে নির্মল। দৌ করে দুই দু হাতে মঞ্জিনার কাঁধ ঝাঁকাতে শুরু করে, 'কেন জিজ্ঞেস করোনি তুমি নাম কী, অ্যাঁ?' চীৎকারে সে ঘর কাঁপিয়ে তোলে। 'পানিহাটি কোথায় জানো না, নাম কী জানো না, কেন এসেছিল জানো না... হোয়াট আর ইউ? কী করতে রয়েছ তুমি বাড়িতে? আমার কার সঙ্গে কী দরকার... কতটুকু দেখতে পাচ্ছ তুমি আমার অ্যাঁ? গাধা কোথাকার।' বলে ধোঁকে বিছানায় ঠেলে ফেলে দেয় নির্মল। তারপর পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে হাঁপায়। শুধু শু ও আন্ডারউয়্যার-পরা লোমশ তাকে দেখে মনে হয় যেন রাঁটপ্রকৃতি বা উপকথা থেকে কেন দু পায়ে উঠে দাঁড়িয়েছে এক দৈত্যাকার কুকুর-মানুষ। 'আজ সন্ধেবেলা সে আবার আসবে বলেছে', আঁকস বেদনার মুখে ম্রিয়মাণ মঞ্জিনা তাকে জানায়। সে কাঁদতে ভুলে গেছে।

আকস্মিক শব্দের দিকে থেকে প্রৌঢ় বিশ্বনাথ বৌমাকার মত এককথিল পান এগিয়ে দেন, "কী ব্যাপার বৌমাই, রোজ চেঁচিয়েকেন, রোজ চেঁচিয়েকেন। বড় বাজি বাইরে ফেরেন। তবু রোজ সেই এক কথা, নির্মল রায় আছেন? ব্যাপার কী নির্মল?"

আজ সকাল থেকে রেডিওর মাইক্রোফোনের কথা বারবার বলা হচ্ছে। সারাদিন মেঘও করে রয়েছে। অন্যেকের বড় নির্মলও তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে আসে। এসে দ্যাখে মঞ্জিনা বাড়ি নেই। একটা চিঠিতে লোকটির আজ সন্ধেবেলা আসার কথা মনে করিয়ে দিয়ে পাশের ফ্ল্যাটের টুকুকে নিয়ে বাপের বাড়ি চলে গেছে। রাতের খাবার করে রেখে গেছে অবশ্য। তবু এটা একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে মঞ্জিনা।

অনেকক্ষণ ধরে স্নান করে, তারপর পাজামা, পাঞ্জাবি ও হাওয়াই চপ্পল পরে নেয় নির্মল। বসার-ঘরে এসে তার বেশ সাফসুফ লাগে। বিয়ের পর চার-বছর দাঁড়িয়ে গেল শুধু হাত্তা ও জুতো-বুরুশের মতই, গৃহস্থালীর বেশ কিছু অবশ্যম্ভাবী জিনিস তাদের নেই। যেমন, আজো তাদের কোনো বুক-সেল্ফ নেই। অথচ বইটই ম্যাগাজিন এবং কাগজপত্র—সব মেঝের ওপর, খাটের তলায় ছড়ানো। লোকটি যদি আসে ঐ কোনায় সোফাটায় তাকে বসতে দিয়ে তার পিছনে ঘরের অপর ল্যাম্প-স্ট্যান্ডটি জ্বালিয়ে দেবে, নির্মল ঠিক করে ফেলে। বইপত্র সরিয়ে একটু পথ করে রাখবে নাকি? কার্পেট থেকে 'দি অ্যানাটমি অফ কনফ্রিজিয়াম' বইটি হেঁট হয়ে তুলে রাখতে গিয়ে কী মনে নির্মল আবার ওখানেই রেখে দেয়। কদিন ধরেই ফুলদানীতে গোঁজা রয়েছে খবরের কাগজের একটা দরকারী পাতা। সেটা খুলে রাখে। তারপর দেওয়াল-আলো নিবিয়ে এদিকের ল্যাম্পস্ট্যান্ডটি জ্বালিয়ে দেয় ও তার নিচে একটা ম্যাগাজিন নিয়ে বসে। ঝড় জল শুরু হবার আগেই ওরা পৌঁছে গেছে মনে হয়। টুকুদের কাছে একটু পরেই খবর পেয়ে যাবে। বাইরে মেঘ গর্জন।

ঠিক সাতটা বাজলে ঝড় আসে, হাত-কলে যথারীতি সাইরেন বেজে ওঠে এবং আসে সে। 'ক্রিং... ক্রিং-ক্রিং... ক্রিং...ক্রিং-ক্রিং... ক্রিরর্বিং...ক্রিররর্বিং...' সাতটা ঠিকই বলেছিল মঞ্জিনা—অভূতপূর্বভাবে বেল বেজে চলে, কাটা-কাটা, টানাটানা অকুতোভয় ও জেদী, যেন কেউ মজা করছে। কেউ কারো বাড়িতে এসে এ-ভাবেও তাহলে বেল বাজায়? একটানা এ-হেন বেল বাজিয়ে অবিশ্বাসকে সে বিশ্বাস-যোগ্য করে তোলে। নির্মল একটু সময় নেয়। গলা খাঁকারো করে তারপর সাড়া দেয়, 'কে এএ?' বেল থেমে যায়।

দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে আগন্তুক ঢুকে পড়ে। ঠাট্টা করেছিল মঞ্জিনা। মোটেই স্মার্ট বা খোকা নয়। আধবুড়ো লোকটা পিঠ দিয়ে পাল্লা চেপে ধরার আগে তার পিছনে মুহুর্মুহু বিদ্যুৎ জ্বলে ওঠে, যে-জন্যে নির্মলের মনে হয় বিদ্যুৎ যাকে তাড়া করে এ সে।

লোক বর্ষকায়, তবু তাকে বামন বলা চলে না। তার মাথায় ফেল্টের টুপি। সে একটি মেরোজ রেনকোর্ট পরে এসেছে যাতে এখনো বোতাম লাগাবার প্রয়োজন হয়নি যে-জন্যে অলিভগ্রীন ট্রাউজারের মধ্যে শার্ট ঠিক মতন গোঁজা হয় নি দেখা যায়, ময়লা আন্ডারওয়্যার শিড়সহ খানিকটা বেরিয়ে। সদ্য ডুব দিয়ে উঠলে যেমন হয়, ভিজে চুলগুলো লেপ্টে রয়েছে কপালে—অর্থাৎ, দুর্দান্ত বৃষ্টিই এমনটি করেছে বা হতে পারে ঘাম। তার বেমানান চওড়া বুকের ওঠা-পড়া দেখে নির্মল বুঝেছিল লোকটি হাঁপাচ্ছে।

কাঁপা হাতে আগন্তুক নিজেই হ্যাটটি খুলে দেয়। তারপর তালু উল্টে ও এক সঙ্গে ভ্রূ ও তর্জনী নাচিয়ে নির্মলকে তার সঙ্গে ভেতরে যেতে বলে।

'আপনি নির্মল রায়?' ল্যাম্পস্ট্যান্ডের উজ্জ্বল নিচে এদিকের সোফাটায় গম্ভীর-ভাবে বসে পড়ে আঙুল তুলে সে জানতে চায়। তার কণ্ঠস্বর দুর্বার, যৌবনকালে হয়তো তার রূপ হত খুব, ঠিক যেন একটা বন্ধ দরজা খুলতে সংঘাতের শব্দ। নির্মল মাথা নাড়া সত্ত্বেও লোকটা সৌজন্যসূচক বিনীত করে অকারণে আবার প্রশ্ন করে, 'নির্মল রায়?' বলে সে একটা বন্ধ খাম নির্মলের দিকে বাড়িয়ে ধরে। খাম ছিঁড়তে ছিঁড়তে নির্মল দ্যাখে ইতিমধ্যেই সে সোফায় পা এলিয়ে দিয়েছে। এ নয় যে সে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে, নির্মলকেই দেখছে, তবু সে তার দিকে তাকিয়ে নেই। অন্তত, নির্মলের অস্তিত্ব সম্পর্কে তার কোনো ধারণা আছে, এ তার হাবভাব দেখে মনে হয় না।

'স্নেহের' নির্মল পড়ে যায়, 'এই ভদ্রলোকের নামও নির্মল, তবে ইনি রায় নন। এঁদের বাড়ি পানিহাটি, আমাদের বাড়ির কাছে সি-আই রোডে এঁর নতুন বাড়ি হচ্ছে। সেই কারণে আজকাল প্রায়ই আসেন ও বেড়ে আমাদের সঙ্গে আলাপ করেন। তুমি শেষ যে-দিন আসো, ইনি পাশের ঘরে বাবার সঙ্গে কথা বলছিলেন। অনেক দিন পরে গতকাল হঠাৎ এসে উনি বললেন আমাদের বাড়িতে সেদিন এঁর চটি-বদল হয়ে গেছে, চটি দেখেই আমি বুঝি, তোমার সঙ্গে। আজ তোমার ঠিকানা আর অফিসের নম্বর এঁকে দিলুম। শুনেছি ভদ্রলোক বহু আগে পাগলাগারদে ছিলেন, তবে এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। তবু এঁর সঙ্গে বুঝে-সুঝে কথা বোলো, মা বলে দিয়েছেন। ইতি, তাপস।' চিঠির তারিখ দিন আটেক আগেকার।

'আসলে বদলা-বদলি হয়নি, বুঝলেন। সব ঠিকই আছে। আমারই ভুল হয়েছিল, মাপ করবেন। সব ঠিক আছে...' খস করে দেশলাই জ্বালিয়ে সে নির্মলের দিকে হেঁটে আসে। নির্মলের ঠোঁটের সিগারেটটা ধরিয়ে দেয় ও নির্মলেরই প্যাকেট থেকে বের করে, নেভার আগে, নিজেও একটি সিগা ধরিয়ে নেয়। তার আঙুল পুড়ে যাবার কথা, নিশ্চয় গেছেও, তবু সে অবলীলাভাবে অবশিষ্ট কাঠিটুকুর আগুন হাত থেকে নেবায় ও অ্যাসট্রেতে ফ্যালে। 'তবু দেখুন', ঠোঁট বাঁকিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে সে নির্মলকে হেসে বলে, 'আমি আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এলুম। আলাপ করে গেলুম আমি আপনার সঙ্গে। বেশ গেলুম, হুঁ, তাই না?'

নির্মল অনেকক্ষণ কথা বলতে পারে না। স্কাইলাইটটা বিদ্যুতের আলোয় জ্বলে উঠে পরক্ষণেই অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে। সে সেদিকে চেয়ে থাকে। ঘর নীরবতায় ভরে যায়।

তারপর এক সময় নির্মল বলে, 'আপনি কিন্তু, আমার মনে হয়, প্রথমেই ঠিক

বসেছিলেন। মানে যে-চটি আপনি পরে আছেন, সেটা...'

'ও নোও! নেভার! আই অ্যাম সিওর। এ নিয়ে আপনি একদম ভাববেন না।'

'তাহলে আপনি এলেন কেন! এত খোঁজাখুঁজি—এ কী জন্যে?'

'নেভার ইউ মাইন্ড! তাই তো বলছি, আমি তবে এ-সবে কেন, উঁ?' সাদা ঠোঁটের কোন মুড়ে সে হাসে, 'আমি এ-সবে কেন। তাই না...?' রেনকোটের পকেটে কনুই অব্দি ঢুকিয়ে আগন্তুক একটা সবুজ চিরুনি বের করে চুল আঁচড়ে নেয়। তারপর ধীরে সুস্থে অপর পকেট থেকে একটা খড়খড়ে কাগজ বের করে অসম্ভব বাঁকা ও বেঁটে পায়ে বইপত্র মাড়িয়ে ও-প্রান্তে নির্মলের অন্ধকার সোফা পর্যন্ত হেঁটে যায়। নির্মল এবার এদিকের স্ট্যান্ডটির সুইচ টিপে দেয়। 'পড়ুন আপনি পড়ুন এটা...' নরমগলায় সে অনুরোধ করে। কাগজটা দু' হাতে লম্বালম্বি খুলে ধরে নির্মল দ্যাখে দশ টাকার নন্‌জুডিসিয়াল স্ট্যাম্প একটা, খাঁটি পার্চমেন্ট। রুদ্ধশ্বাসে সে পড়ে যায়:—

ডীড অফ রেলিংকুইশমেন্ট

আমি শ্রী .... পিতা... .... সাকিন .... এতদ্দ্বারা স্বপ্রণোদিতপূর্বক বলিতেছি যে অদ্য শ্রীনির্মল সরকার পিতা উপেন্দ্রনাথ সরকার সাকিন পানিহাটি, ২৪-পরগণা......হইতে ....তারিখে ক্রীত যে চটি পরিয়া আছেন তাহাতে আমার কোনো স্বত্ব-স্বামীত্ব নাই তথা ইহা আমার নিজের বলিয়া কোনো দাবী করি না কিম্বা ভবিষ্যতে করিব না কিম্বা আমার উত্তরাধিকারীগণ কোনো দাবী করিবে না কিম্বা দাবী করিলেও তাহা সর্বসময়ে আইনমোতাবেক অগ্রাহ্য হইবে। এতদর্থে সুস্থ শরীরে ও সজ্ঞানে এবং অন্যের বিনানুরোধে অত্র নাদাবীপত্র লিখিয়া দিলাম।

'এ-এাই। এইখানে হাঁ, এইখানে—' খোলা বলপয়েন্টের পেন মেঝের ওপর 'দি এ্যানালেকটস অফ কনফুসিয়াস'-এর পাশে একবার রেখে তর্জনী ঠুকে লোকটা দেখায়, 'এইখানে একটা সই করে দিন। জাস্ট নির্মল ব্যস। ব্যাস, আর কিছু লাগবে না।'

সেই পাঠ শুরু করার পর এতক্ষণে নির্মলের হৃদপিণ্ডে প্রথম শব্দ হয়। তারপর অনেকক্ষণ পর পর বাঁট হতে থাকে। ভদ্রলোকের বুকের প্রকাণ্ড ওঠা-পড়া দেখে নির্মল বোঝে হাঁপানোর সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। সই-করার জায়গার পাশে থেকেই লালকালির একটা টিক মারা রয়েছে সে দ্যাখে।

সকৌতুক স্মিত হাসিতে মুখের বলিরেখা ও গর্তগুলি ভরিয়ে ফেলে আগ্রহভরে সে দাঁড়িয়ে।

'আমি দুঃখিত নির্মলবাবু। আমি পারব না।'

'ও!' মুখ অন্ধকার করে আগন্তুক জানতে চাইল, 'কিন্তু কেন বলবেন কী?'

নির্মল বলল, 'কারণ আপনি যেটা পরে আছেন সেটা আপনার চটি নয়।' বিদ্রূপ ও ঘৃণায় আগন্তুকের মুখ বীভৎস হয়ে ওঠে।

'ওহ্, নো-নো! দ্যাটস ইট। এ নিয়ে আপনি একদম ভাববেন না। এটা ছেড়ে দিন, প্লীজ, এটা ছেড়ে দিন...' ভূতগ্রস্তের মত সে ঠকঠক করে কাঁপতে শুরু করে 'অচ্ছা। আমি বরং আর-একদিন আসব।'

'আপনি আর আসবেন না।' নির্মল উঠে দাঁড়ায়।

'আরে! বসুন, বসুন।' নির্মলের পিঠে সে এবার হাত রাখে। হাত পৌঁছয়। হুঃ-হুঃ-হুঃ-হুঃ করে ধোঁয়া ছেড়ে নির্মলের মুখোমুখি সামনে মুখমণ্ডল ধোঁয়ায় লুকিয়ে ফেলে ধোঁয়ার আড়াল থেকে লোকটা বলতে থাকে, 'দেখুন নির্মলবাবু, আমি যেটা পরে আছি যদিও সেটা আমারই—অ্যান্ড দ্যাট ইজ এ ফ্যাক্ট—তবু যখন কথাটা উঠেছে...মানে আপনারও যখন মনে হয়েছে—ভুল—তবু মনে তো হয়েছে, তাই না, উঁ? আসলে উই হ্যাভ আনফর্চুনেটলি মেড এ কেস আউট অফ ইট অল...আমাদের একটা সম্পর্ক হয়ে গেছে—একটা বন্ধন—তাই তো? তাই যদি হয় তাহলে আমাকে আবার আসতে হবে, তাই না?' মাথা থেকে খুলে টুপি দিয়ে ধোঁয়া তাড়িয়ে বিনীত করে সে বলে, 'হেঃ হেঃ...ইউ সী মাই পয়েন্ট?'

'তার চেয়ে লেট আস মেক এ ডীল' অ্যান্ড সেনসিবল পীপল অলওয়েজ ডু' আগন্তুক এবার ধমকের সুরে সোজাসুজি প্রস্তাব করে, 'আপনি এখানটা একটা সই... জাস্ট নির্মল ব্যস, দ্যাট উড ডু। এবং আমাদের আর দেখা হবে না।' সী মাই পয়েন্ট?' চোখ পাকিয়ে সে জানতে চায়।

তর্জনীতে তর্জনী আটকে হাতদুটো কোলের ওপর ফেলে রেখে নির্মল বসে থাকে। স্কাইলাইটটা বহুক্ষণ অন্ধকার হয়ে আছে। বহুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে আছে তারবন। তবে তার হৃদপিণ্ড ফেটে দুখানা হয়ে যেতে চাইছে, 'তবে তাই হোক' সে বলতে চায়। তবু নিজের দ্যারিসে-এ হাত চেপে রেখে সে বসে থাকে।

'আমি। পারব। না।' সে বলে।

'সো ইউ ডোন্ট এগ্রি?' কলম বন্ধ করে কাগজটা পকেটে ঢোকাতে ঢোকাতে আগন্তুক মুখ কালো করে বলে, 'তাহলে দেখা হবে মাঝে-মাঝে? একদিন আপনি ক্লান্ত হয়ে পড়বেন। এর-চেয়ে সই-করে-দেওয়া ভালো মনে করে হয়ত একদিন আপনি—ইউ কান্ট রুল দ্যাট আউট—সে-জন্যে আমাকে আসতেই হবে। অচ্ছা উঠি...' বলে গম্ভীরভাবে সে সোফায় ডুবে যায়। ততক্ষণ তার পা'র দিকে তাকাবার কথা মনে পড়ে নির্মলের। সে তাকায়: সঙ্গে সঙ্গে গোটা ঘর ভরিয়ে মুহুর্মুহু ঝলসে ওঠে বিদ্যুৎ ও বিদ্যুতে ঝলসাতে থাকে তার পা। ল্যাম্প-স্ট্যান্ডের ঢাকা আলোর নিচে দুগ্ধঅন্ধকার

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা

ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৫·৫০ দ্বারকানাথ ঠাকুরের জীবনী
শ্রীসত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার ৩·৭৫ রবীন্দ্রনাথ ও ভারতবিদ্যা
ডক্টর হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় ২·০০ দি হাউস অফ্ দি টেগোরস
ডক্টর শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য ৫·০০ পদাবলীর তত্ত্বসৌন্দর্য ও কবি রবীন্দ্রনাথ
সোমেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ১৫·০০ সঙ্গীতচন্দ্রিকা
ডক্টর প্রবাসজীবন চৌধুরী ৮·৫০ টেগোর অন্ লিটারেচার এন্ড এসথেটিকস
রবীন্দ্র-কুমার উপাধ্যায় ১২·০০ রবীন্দ্র-সংকলিত
ডক্টর মনীলাল সেন ১৫·০০ এ ক্রিটিক্ অফ দি থিওরিজ অফ বিপর্যয়
শ্রীবালকৃষ্ণ মেনন ২৫·০০ ইণ্ডিয়ান ক্লাসিকাল ডান্সেস্
ডক্টর প্রবাসজীবন চৌধুরী ১০·০০ স্টাডিজ্ ইন এস্থেটিকস
ডক্টর ধীরেন্দ্র দেবনাথ ৬·০০ রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে মৃত্যু
ডক্টর অমিতাভ মুখোপাধ্যায় ১৬·৫০ রিফর্ম অ্যান্ড রিজেনারেশন ইন বেঙ্গল
ডক্টর সোভনলাল মুখোপাধ্যায় ১৪·৫০ সোশিওলজি অফ্ পলিটিক্স

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ৬/৪ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা-৭
পরিবেশক : জিজ্ঞাসা। ১এ কলেজ রো ও ১৩৩এ রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা

মির্জের চটিজোড়াকে মরণকামড় কামড়ে ঐ পড়ে রয়েছে আগন্তুকের পা, ঐ বিচ্ছুরিত হচ্ছে চটি থেকে ঝন-ঝন বিদ্যুৎ। নির্মলের শরীর সে দিকে ঝুঁকে যেতে চায়। মরুভূমির সিংহের গা থেকে অবিরল সোনালী ঝলক-ঝলক উঠিয়ে যাচ্ছে হবে বুক, তবু সে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে। আজ থেকে দু' মাস আগে একদিন, কোনো-এক দিন, নিজের মনের ভুলে কখন সে মিথ্যা বিশ্বাসের কাছে সর্বান্তঃকরণে গলিয়ে দিয়েছিল তার পা, পথ ছেড়ে সেই থেকে ক্রমাগত বিপথে চলে গিয়ে আজ আর ফেরা বলতে কী থাকবে? আ, বুক উজাড় করে এবার একটা নিঃশ্বাস ফেলল নির্মল, জোড়াদির বাড়িতে একদিন সন্ধেবেলার একটিমাত্র ভুল এক জীবনের ভুলচুক হয়ে গেছে।

গোল আলোকাধারের নিচে ঐ বসে রয়েছে নির্মল সরকার। তার শরীর থেকে এখন শীতের বাষ্প বেরুচ্ছে। সে উঠছে না কেন। সবল বিশ্বাসে অর্ডার দিয়ে 'সমাব-সেওয়া' একজন পাহারাদারী নিয়মের অ্যাক-সেপ্ট করার পর তার তো ওঠাই উচিত। প্রতি মুহূর্তে সে একটা অপরিহার্য অংশ হয়ে উঠছে নির্মলের, ইতিমধ্যেই শরীরিক-ভাবে তাকে ছাড়িয়ে নেবার ক্ষমতা নির্মলের আর নেই। রোমহর্ষ নির্মল তাকে মুখোমুখি আর চলে যেতে বলতে পারবে না। ওদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে বাইরে সাইক্লোন শুরু হয়ে গেছে।

তোমার নামেই ।। মণীন্দ্র রায়

তুমি, শুধু তোমার নামেই
তুমি, সর্বস্ব আমার,
তোমার নামেই লেখা আজীবন এই
কবিতার অক্লান্ত দলিল।
কৈশোরের ফুল আর পাখির ডানাতে
যৌবনের তারাভরা যন্ত্রণার রাতে
নিয়ত তোমারই দিকে, তোমার দিকেই
খোলা এই চোখের ঝিলমিল।

।। ২ ।।

যখনি দিয়েছি উঁকি মোজাইক মেঝের কুঠিতে,
বসেছি মিল-এর পাশে ভাঙা-বেঞ্চি চায়েরু দোকানে,
ঘুরেছি নদীর ধারে, চলে গেছি চাষীর উঠানে,
বারে বারে নানা স্তরে দেখি যতো ছবি—
রঙিন কার্পেটে সেই কুকুরের মুখে ছোঁড়া রুটি,
অথবা এক-ভাঁড় চায়ে খুশির বঞ্চনা,
গুণটানা বাঁকানো দেহে ঘর্মাক্ত রোদ্দুর,
কিম্বা শূন্য মরাইয়ের অমানুষী চক্রান্তের দিকে
প্রশ্নময় চোখের ঝিলিক,
যা-কিছু দেখেছি আমি, এঁকেছি হৃদয়ে,
তুমি, শুধু তোমার নামেই
তুমি, সর্বস্ব আমার,
তোমার টানেই আজীবন
কবিতার মূর্তি গড়া এই।

।। ৩ ।।

যে আকাশ অযুত বছর
জেগে আছে মহীয়ান স্বাধীন স্বরাট,
অথচ রেশমকীটে গুটির উদরে যার খোলে না দুয়ার,
কেবলি গোপন অঙ্কে ব্যাঙ্কে ব্যাঙ্কে বাড়ে রক্তচাপ,
কেবলি ধানের মাঠে ছুটে আসে বর্গীর বল্লম,
আর অন্ধ কোলাহলে শুধু আস্ফালন,
চতুর্দিকে মুখোশের আদিম উল্লাস,
কিম্বা কোনো অতিকায় ডাইনির মায়ায়
সুপ্তি-বিচরণে যেন দুঃস্বপ্নের ডাকে
অনন্ত আকাশ থেকে বহিষ্কৃত, আমরা মানুষ,
পাতালের জ্বালামুখে ঝুলে আছি অদৃশ্য সুতোয়।

আর, এই স্নায়ু-ছেঁড়া বুকচাপা দিনে
এই—যে শব্দকে খুঁজি মগ্ন উচ্চারণে,
প্রেমিকার মতো তাকে স্পর্শ করি, আর
দামাল শিশুর মতো রাখি গালে গাল,
শব্দের মাটিতে এই-যে জন্ম-নেওয়া গাছের মতোই,
সে তো তুমি, তোমার নামেই
তুমি, সর্বস্ব আমার,
তোমার ডাকেই আমি খুঁজে ফিরি আকাশ কপাট—
আর আজীবন
অঙ্গারিত ক্লোরোফিলে গড়ে চলি আজো
স্বপ্নগুলি, প্রশ্ন এই, আগুনের কাঠ।।

কবিতা

প্রতীক্ষা রোজই তার ।। কৃষ্ণ ধর

রোজই প্রতীক্ষা তার আনন্দিত কোনো বা সংবাদ
এসে বসবে চায়ের টেবিলে প্রাত্যহিকে
হয়তো বা এইবার প্রসন্ন নিষ্পাপ কোনো মুখ
উঁকি দেবে জানালার ধারে চিরায়ত।

রোজই তার নিশ্চিত হতাশা, রুক্ষ, ক্রুদ্ধ করতল
নিজেকেই যেন খুঁড়ে রক্তাক্ত নখরে অবিরত
ম্লানমুখ প্রতিবেশী, ভয়ার্ত গলায় শুধু ডাকা
বাতাসে বারুদ-গন্ধ, শ্বাসকষ্ট এই অন্ধকারে।

তখনও চলেছে খোঁজা আঁকাবাঁকা কালির অক্ষরে
শব্দের বিচিত্র যাদু, চিত্রকল্প, ছন্দের চমক
মানুষেরই মতো করে নিরপেক্ষ কোনো বা আকৃতি
যাকে চিনি, যাকে জানি, যার সঙ্গে নিয়ত সংলাপ।

তাকেই তো আমরা চাই, পরস্পর মুখোমুখি বসা
যাকে নিয়ে থাকা যায় স্বাভাবিক মানুষের ঘরে
সাংসারিক দুঃখসুখ কিংবা কোনো স্বপ্নেরই কথা
যার জন্য ভাবনা-চিন্তা, মাথাকোটা নির্মম পাথরে।

মানুষ নেই ॥

রাম বসু

আমার নির্জনতায় তারা খসে পড়লো
ন' ইঞ্চি ফলা খোলা ছোরার মতো
তারা
ছোরা
আমার নির্জনতাকে এ ফোঁড়-ও ফোঁড় করে দিল

রাস্তায় ট্রাম চলছে, বাস চলছে, লোক চলছে
মানুষ নেই

কবে একদল আদিম মানুষ জ্বালিয়ে দিয়েছিল আকাশ
উপকথার সেই আকাশ এখন নিভে-আসা অঙ্গারের মতো
এখনও খোলস-ছেড়ে-দেওয়া সাপের মতো ল্যাজের বাড়ি মারছে
হাওয়ায় উড়ছে ছাই, ফুলকি; হাওয়ায় হাওয়ায় গন্ধ

রাস্তায় কে যেন বলছে :
যারা ভুল করে না তারা কিছুই করে না
রাস্তায় কে যেন বলছে :
যারা ভুল ছাড়া আর কিছুই করে না, তারা কি করে?

রাস্তায় ট্রাম চলছে বাস চলছে আলো জ্বলছে
মানুষ নেই

আমার নির্জনতায় রক্তের গন্ধ
আমার ফসলের মাঠে আর্তনাদ
আমার গাছগুলো পাতা ফেলে দিয়ে মুখ ঢেকেছে
জোৎস্নায় আমার নদী শাদা থানে মোড়া শব

শহর, বাসি ঠাণ্ডা মাংসের মতো শহর
মানুষে দানবে বোনা বিচিত্র শহর, দ্যাখো
নিমতলা থেকে চোখ মুছতে মুছতে এল সময়
দ্যাখো গঙ্গার জলে পা ডুবিয়ে বসে আছে আহত যৌবন
ওর মুখের এক পাশে পড়া চিতার আলোয় কি যেন নাচছে

আমার নির্জনতায় কে যেন ঘুরে দাঁড়াল, কে?

রাস্তায় ট্রাম চলছে বাস চলছে লোক চলছে
মানুষ নেই

ভালবাসা কার ডাক নাম ॥

তরুণ সান্যাল

তাকে হয়ত ভালোবাসা ডাক নামে আজো ডাকা যায়,
কে জানে, আমার ঠিক জানা নেই, অন্য কেউ জানতে পারে
কারো জানা থাকতে পারে, অথবা কি জানি...

বাদল গড়িয়ে বেলা শরতের মেঘে উদাসীন
সন্ধ্যায় মলিন দূর...অশ্রুপাতে রাঙা চোখ কেবলই বিদায়,
ছোট হয়ে আসে দিন, অন্ধকার বিপুল নিশ্চিত থাবা
দীর্ঘ, দীর্ঘতর হয় বিস্তৃত ছায়ায়
শ্মশান ঝাঁকড়াচুলো ধুলোমোড়া গাছ কুয়াশায়
গা-ঢোল হিংস্র কাঁটা, আর
পাশব ধারালো রাস্তা বাঁকা তলোয়ার
কারো প্রতীক্ষায়
অলিগলি হাজার গলির বাঁকা নখে চোখ মটকে থাকে
আলো অন্ধকার—
যেন সব প্রলয়ের প্রণয়ের সাঁকোগুলি দুমড়ে খসে যায়
বিস্ফোরণ কালো হাতে উঠে যায়, ফেটে যায় নক্ষত্রে সুদূর
মধ্যরাত ভয়াল, কেবল রক্ত পাম্প করে সারা কলকাতায়
বিদ্যুতের শিরা বেয়ে ধক-ধক ডায়নামো
হস্ত অঙ্গারিত দৃষ্টি, গলায় পিত্তের জ্বালা
ওষ্ঠে নুন, জাগরণ, নাকি জ্বর,
অথবা নাড়ির মধ্যে জন্মের মুহূর্তে কোনো
জননীর বিদীর্ণ যন্ত্রণা, নাকি
বেদনার প্লাবন, শ্রাবণ, স্মৃতি অন্ধকরা চৈতন্যের ঝড়?

কলকাতায় দিনরাত্রি ঘটাং ঘট ঘটাং ঘট দ্রুত কামরা ট্রেন
মধ্যরাতে অন্ধস্মৃতি ইয়ার্ডে ঘুমায়
গিঁঠে গিঁঠে বাঁধা লম্বা মালগাড়ি
কাকজোৎস্না পিছলে যায় লোকো শেডে, করোগেট চালায়
কে জানে-বা কোন ব্রীজে অন্ধ নীচে গোপনে কুটিল
জলের দুভাগ জিহ্বা নিভৃত ছোবল
ধ্বংসের গোপন ছোঁয়া মারে
শব্দের ঝাঁকানি শুধু অভ্যাসে বিক্ষিপ্ত ছেঁড়া ঘুম...
একটি চূড়ান্ত টানে ঘোর দুর্ঘটনা

ভালোবাসা, তোর মুখ মনে পড়লে নেচে ওঠে
শ্যামলে উঁচানো কৃষ্ণচূড়া
চোখে জল ভরে আসে, আর রক্তবমনের শ্রমে
নাড়ি উল্টে আসা ঘৃণা দিগন্তে মলিন মূর্চ্ছা যায়
যা আমার নিরন্ত যন্ত্রণা

বিবাহ-মিছিল লাল ফার্দি নতে, বিস্ফোরণ, জিসাস অশ্লীল শিস,
ভালোবাসা, তোর কাছে এ-জন্মের মূল্য ফিরে চায়।।

রাবণের ফাঁদ ॥ অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

কতো সহজেই দ্যাখো পাখিদের বিঁধে আনো তুমি
দীর্ঘসূত্রী ঘুড়ির বয়নে;
পুলিশেরও হাতে আছে নানান্ রঙের ঘুড়ি তাই
তোমার নাগাল পায় তার সাধ্যসময় কোথায়?
ইতিমধ্যে পাখিদের বিকিয়ে দিয়েছো তুমি আর
ভবন তুলেছো নয়া নতুন-নতুন আলিপুরে—
কীভাবে তোমার জামা তৈরি হয় অপরের ক্ষতির পশমে।

কোন্ খাতে শাস্তি পাবে তুমি বা পুলিশ, আমি ভাবি;
চোর-পুলিশ খেলায় দক্ষতা দিলে সেজন্যে বুঝি-বা
তোমার জিজিয়া-কর একদিন মকুব হতে পারে;
পাখির আসা ও যাওয়া বন্ধ করে দিলে এমন কি
অঢেল জায়গীরও পেতে পারো?
শুধু জানি আকাশেও রাবণের ফাঁদ পাতা ব'লে
জেনেশুনে নিজেদের শিকার হয়েছে সব পাখি!

জেগে আছি ॥ রত্নেশ্বর হাজরা

হাওয়া আসে
হাওয়া ফিরে যায়   আমি
ঘুমুতে পারি না   শুধু
রক্ত ভেসে যায় তার প্রত্যেক নদীতে   তার
ফেরার সময়
প্রত্যেক উঠোনে লাল দোপাটিতে   ঘাসে
সপ্তর্ষির মতো চিহ্ন
জেগে থাকে
যা কিছু স্বীকৃত তা-ই সত্য নয় সত্য নয় সত্য নয়—

শব্দ থেকে ছুটে যায় ধ্বনি
ধ্বনি প্রতিধ্বনি
চলে গেলে হাওয়া আসে
রাত্রি ফিরে যায়   তার
আসার সময় কাঁপে প্রত্যেক নদীতে
প্রত্যেক জ্যোৎস্নায়   আর
নদী চলে যায়
জ্যোৎস্না চলে যায়   আমি
ঘুমুতে পারি না   আমি কিছুতেই
ঘুমুতে পারি না—

আমার ছায়া আমায় ॥ শক্তি চট্টোপাধ্যায়

আমার ছায়া আমায় করে আঘাত!
ভিতরে যাই বাহিরে যাই তখন করে আঘাত,
যেন সে চায়, আমার মরে যাওয়া...
যেন সে চায়, আমার ফাঁকা হাওয়ায়
দুহাত তুলে একক জেগে থাকাই...

আমার ছায়া আমায় করে আঘাত!

ওদের ছায়া আমার করে আঘাত
রক্ত খেয়ে আঁচায় আর দুপাশে চোখ নাচায়
হাড়ের কাঠি ভয়াল লাঠি কাদের মেরে বাঁচায়?
ওদের ছায়া আমায় করে আঘাত!
বলার মতো কিছুই নেই, যখন নিজ বাঁহাত
নিজেরি ডান হাতকে দেয় কামড়
স্কন্ধকাটা, আপন দোষে পামর!

যখন মনে ছায়া পড়ে। শ্যামসুন্দর দে

আমার হৃদয়টাকে আমি কখনো দেখিনি
প্রতিক্ষণ অনুভবে যদিও ঘোষণা
আমাদের আশেপাশে দৃশ্যপট
শরীরী আকার নিয়ে কত না কাহিনী
অথবা বাতাসে বয়ে-আসা কথাগুলো
সে সবের যোগফলে আমার হৃদয় উথাল-পাথাল।
যখন আমার মনে ছায়া পড়ে
একান্ত বন্ধুর কোন বিয়োগান্ত ছবি
চোখে যার আঁকা ছিল এক স্বপনেরই রেখা
যে আমার প্রিয় বন্ধু—দৃষ্টির আড়ালে
কোনদিন দেখিনিতো মুখচ্ছবি।
আমার প্রিয় কোরক ছিঁড়ে দিল
হিংসার বিকৃত বোধ।
নিহত কোরক তার দাউ দাউ আগুনের জ্বালা
বুকের আড়ালে ঢাকা হৃদয় এখন
শরীরী আকার ছেড়ে পরিব্যাপ্ত বিশ্বে
হাজার কথায় যেন ফেটে পড়ে
বাদল-বিদ্যুতে লেখে ইতিহাস।
যদিও চোখে দেখিনি হৃদয়টাকে
দুরান্তের ফুলগুলি দূরে দূরে ফোটে।

নব তরঙ্গ ।। সত্যানন্দ ভট্টাচার্য

যে ভাষা হতে পারেনি মুখর
ছিল মূক
লুঠেরা পিশাচের আলিঙ্গনে
বুনো-অমার্জিত অভিধান তার—
অপাংক্তেয়—উপন্যাসে কাব্যের কথায়।
আজ মুক্তিস্নান
তাদের বিদ্রোহী সুরে নবীনের কণ্ঠ ভরপুরে।।

তারই কল্লোলিত ধ্বনি কালের দরবারে
খুঁড়ে বহু বসন্তের কবর
আসে নিয়ে ভোরের স্বপ্নের খবর।
মুক্ত জীবনের স্পৃহা—
করে চুরমার বন্দী শৃঙ্খলা
চলতি চিন্তার সৌধ ধূলিতে লোটায়।
গর্বোদ্ধতের রোশনাই
বহু অবৃত বর্ষ পরে, যায় দ্বীপান্তরে
নির্জন চির অবসরে।।

লাঞ্ছিতের ঘৃণা ফুঁসেছে আক্রোশে—
কলনাদে উচ্ছ্বসিত বেগে যায় ধেয়ে
চৌচির প্রতিষ্ঠার বাঁধ দুরপনেয়
তাই গুঞ্জন নয়—উঠেছে বিভৎস আর্তনাদ
ফসলের কণ্ঠ বেয়ে।

মেদহারা কঙ্কাল তুলেছে শির
দশন-প্রকট—প্রতিপক্ষের ভীতি-বিভীষিকা।
বুকচাপা কান্না জ্বালায় আগুন
খেত ও খামারে
জাগৃতির শুকতারা হাসে
শোণিতের বিন্দুতে মুক্তির বারতা।

শ্রমিক কিষাণের জঙ্গী মন
গুচ্ছবাঁধা এক চেতনায়
বারুদের গন্ধেই
জনতার নির্দিষ্ট প্রত্যয়
সংঘাতী বার্তা গ্রামে জনপদে
নগরে নগরে তার আগমনী
অবরোধ দুর্জয় ঘনায়।

রক্তে খুঁজি ।। গণেশ বসু

তাহলে আবার এলো ফিরে এলো সে-বুনো স্মৃতির কারাগার
আবার বাতাসে কাঁপে বিপন্ন যৌবন লাখো রাতের চূড়ায়
জমাট রক্তের গন্ধ মাথা খোঁড়ে, পেশীর মাদলে হাহাকার
দ্রিমিকি দ্রিমিকি জ্বলে ফসফরাস, কোন্‌দিকে যাবে বা কোথায়?
শ্মশান চাঁড়াল, অন্ধকারে হাসে।

দীর্ঘবেলা বয়ে গেল, দীর্ণ শ্বাস, অশ্রু হু-হু মাটির ওপর
ঝরানো পালক শাদা, আত্মদাহ, সময়ের সে-দাবি মেটাতে
বেঁচে আছি আন্দোলিত মেঘে যা শিকলে দীর্ঘ,
আপোষের দামাল কবর।

দীর্ঘবেলা বয়ে গেল মুখর শব্দের ওম পারেনি ফোটাতে
ক্রোধের গভীর থেকে যন্ত্রণার স্বর্ণচাঁপা মাঝারিপনার দীনতায়,
শ্মশান চাঁড়াল হাসে, রক্তে খুঁজি অন্য পথ
আগুনের সে-খোড়ো ডানায়।

কাপুরুষের জন্ম ও জীবন বৃত্তান্ত ।। গৌরাঙ্গ ভৌমিক

জন্মের সময়
তুমি আমাকে মুড়ে দিয়েছিলে মৃত হরিণীর ছালে।
চোখ মেলেই দেখেছিলাম, একটি স্ট্যাচুর মুখ,
আর, কয়েকটি মৃত প্রজাপতি ও মৌমাছির পালক।

যৌবনে আমি সৈনিক হয়েছিলাম,
তুমি বলেছিলে : 'সাহসে বুক বেঁধো।'
আমি পোষাক বানিয়েছিলাম, মৃত বাঘের ছালে।

আজ চতুর্দিকে শনশন ঝাউয়ের শব্দ।
আমি ফিরে এসেছি দীর্ঘতর উপকূলে।

তুমি বলেছিলে : 'সীমান্ত বদলের সময় দর্পণের সামনে দাঁড়িও
সূর্যোদয়ের আগে গল্প করো নক্ষত্রের সঙ্গে।'

আমি নদীর আয়নায় নিজের মুখ দেখলাম,
অসম্ভব রূপন, এক কাতর মুখ।
একটি প্রান্তর এখন ফিরে যাচ্ছে নক্ষত্রের সঙ্গে নক্ষত্র হয়ে।

ভোর হতেই ॥

আশিস সান্যাল

সমস্ত রাত ধরে একটা হিংস্র অন্ধকার
বুকের চারপাশে
শব্দহীন হেঁটে বেড়ালো।
তারপর ভোর হতেই
ডানা ঝটপট করে
উড়ে গেলো এক অবিস্মরণীয় স্তব্ধতার দিকে।

অনেকটা দূরে
দেখা গেল,
এক ঝাঁক শব্দহীন রাজহাঁস
উত্তাল সমুদ্র ছুঁয়ে
ভেসে আসছে।
প্রভাতের সিংহ-দরজায়
তাদের প্রতিধ্বনি।

মনে হলো যেন অনাদিকাল ধরেই
কুটিল হিংস্রতা
বুকের মধ্যে ঝটপট করছিলো।
আর সমস্ত রাত
তার পদচারণার শব্দে
কেঁপে কেঁপে উঠছিলো।

ভোর হতেই
ত্রস্ত হরিণের মতো সেই অন্ধকার
ছুটে পালালো
অন্য এক নিরাবরণ স্তব্ধতার দিকে।
সমস্ত আকাশ
তোমার মুখের মতো প্রত্যাশায় অন্ধকার জ্বলে উঠলো।

আনবে কি? ॥

সুমিত চক্রবর্তী

আকাশে আকাশে নিঃসীমে
পাহাড়বন্দী গ্রামের ঢেউ
শিমুল কুসুম রঙ-রের ফেউ
হায়! জীবনের রজনা।

বাতাসে বাতাসে ডাকছে কে?
সুদূরে প্রহর গুনছে কে?
গুহার গর্ভে কিসের দীপ
গুল্মলতার প্রচ্ছদে?

না হয় থাকুক দুঃস্থ যুগ
সময় বিভোর দুর্গমে
আজ বেদনার দীর্ঘশ্বাস
রৌদ্রালু দিন আনবে কি?

সঙ্গ নিঃসঙ্গতার দিনলিপি ॥

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

পরিবর্তে আমাকে দাও উন্মোচিত দুঃখ উন্মোথিত আনন্দ
আমাকে দাও নগ্ন আত্মার আলিঙ্গন
পুণ্য স্পর্শের প্রশ্নহীন সান্ত্বনা
আমি তোমাকে জন্ম দিয়েছি দিয়েছি মৃত্যুকেও

এই তো আমার পারাপারহীন জীবন—
গন্ধবিহীন প্রস্ফুটিত জাগরণ
এই তো আমি খুলে রেখেছি ধুলোয় আমার নাম—আমার
অলিখিত পরিচয়পত্র
দেখার মতন কিছুই নেই আলোও নয় ছায়াও নয়
দগ্ধ দিনে ছড়িয়ে দেবো দীর্ঘ ছায়া এমন হাত শরীরে নেই
কাঁধের পাশে ঝুলন্ত অক্ষমতা
শুধু নিতে পারে দিতে পারে না কিছুই

এই তো আমার পারাপারহীন জীবন—
গন্ধবিহীন প্রস্ফুটিত জাগরণ

আমাকে করুণা দাও
দাও উন্মোচিত দুঃখ
উন্মোথিত আনন্দ
আমি তোমাকে জন্ম দিয়েছি দিয়েছি মৃত্যুকেও

কস্মৈ দেবায় ॥

অনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায়

আশ্বলায়ন শ্রৌত সূত্রে
সোচ্চার মন্ত্র করে পাঠ
ঘন পত্র অরণ্য মর্মর,
মুখরিত সাম গান
নদী কলতানে,
বোধায়ন অবভৃংস যাজনামুখর
সু-উচ্চ সঘন তত
অধরার আকৃতি শিহর,
তপোবন নিনাদিত স্বস্তি সম্ভাষণে
অগ্নিদেবার স্বাহা।

কিন্তু সে কোন অগ্নি?
জোহু নাম যার
বেদযজ্ঞ পাঠ ক্রমে,
অথবা সে খাণ্ডব দাহনে
পরিতৃপ্ত হয় নাই
[illegible]

Bata
বাটা সানওয়ে

আন্ডারগ্রাউন্ড ছবি

এন কে জি

কিছুকাল পূর্বে, বছর দুই বা তিন হবে বোধ করি, কলকাতার ম্যাক্সমুলার ভবনের কর্তৃপক্ষের সৌজন্যে ওঁদেরই নিজস্ব প্রেক্ষাগৃহে প্রথম কিছু 'আন্ডার-গ্রাউন্ড' ছায়াছবি দেখবার সুযোগ ঘটে।

তখন অবশ্য অতীত জীবনের কৈশোর বা প্রথম যৌবনের সেই বিস্ময়-বহুল দশা বহু পূর্বেই কেটে গেছে, যখন 'আন্ডার গ্রাউন্ড' শব্দটা মনের মধ্যে একটা অনুচ্চার কৌতূহলের আবর্ত সৃষ্টি করত। বিশেষ এক ধরণের আন্দোলনকারীদের বা আইনের কবল থেকে মুক্তি প্রয়াসে তৎপর ব্যক্তি সম্পর্কেই এই কথাটার ব্যবহার, সেই তখন শুনে-শুনে অপার বিস্ময়ে ভাবতাম কি ক'রে এইসব নির্ভীক, বেপরোয়া ব্যক্তিরা দিনের পর দিন পাতালপুরীর গোপন অন্ধকারে বসে আপনাদের কর্মকাণ্ড ভূপৃষ্ঠের অধিবাসীদের চোখে ধুলো দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করেন। আবার লজ্জায় কাউকে জিজ্ঞাসা করতেও পারতাম না, কোথায় যেন বাধতো—কি জানি, যদি কোন আপন অজ্ঞতা প্রকাশ পায়! তাই চুপ করেই থাকতাম।

অবশেষে একদিন যখন এই অজ্ঞতা-প্রসূত যন্ত্রণার অবসান হ'ল, শব্দটির তাত্ত্বিক অর্থ মোটামুটি উপলব্ধির গোচরে এল, তখনও কিন্তু এই দুঃসাহসিকদের সম্বন্ধে সম্ভ্রম বোধটা পুরোপুরি বিলুপ্ত হল না। ক্রমে চিত্র-সাংবাদিকতার কর্ম-জীবনের অনুভূতির পর্যায়ে একদিন 'আন্ডার গ্রাউন্ড' ছবির অভ্যুদয় ঘটল। বিস্ময় ততোটা নয়, কৌতূহল তার চাইতে অনেক প্রবল হল। কি এই শ্রেণীর ছবির মৌলিক বক্তব্য? কোথায় অন্য ছবির সংগে এর চারিত্রিক বিচ্ছেদ রেখা? তখনও ভারতের মাটিতে এই শ্রেণীর ছবির আমদানী ঠিক ঘটেনি, তাই জিজ্ঞাসাটা ভেতরে রয়ে ও বেড়েই গেল, বিদেশের পত্র-পত্রিকায় এই সম্বন্ধে সমালোচনা ও নিবন্ধাদি পড়ে। কি তার ভাব, কিবা তার ভাষা, সে সম্বন্ধে কোন প্রত্যক্ষ ধারণা হল না, ছবি দেখার সুযোগ না পেয়ে। প্রথম যখন দেখলাম, তখনও খুব একটা সুস্পষ্ট প্রত্যয় মনে গড়ে উঠল না।

মেরা নাম জোকার / পদ্মিনী

সম্প্রতি কিছুদিন হল এই ম্যাকস্-মুলার ভবনেরই উদ্যোগে, ওঁদের সেই প্রেক্ষাগৃহেই আবার কিছু আণ্ডারগ্রাউণ্ড ফিল্ম দেখলাম। ঠিক পরে পরেই এই একই উদ্যোক্তাদের আয়োজনে আর একটি স্মরণীয় চিত্র প্রদর্শনেরও অনুষ্ঠান—এটি অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস-এর প্রেক্ষাগৃহে: 'ওবারহাউসেন ইন ইন্ডিয়া '৭০' এই নামে। যেখানে দেখানো হয় জার্মানীর ওবারহাউসেন সর্ট ফিল্মস ফেস্টিভ্যালের জুরীগণ কর্তৃক 'শ্রেষ্ঠ' বলে—নির্বাচিত বিভিন্ন দেশের হ্রস্বাকার চিত্রসমূহ থেকে নির্বাচিত এক চিত্রমালা। এই সুবিধ ছবি দেখানোরই মূল উদ্দেশ্য এদেশের উন্নত স্তরের চলচ্চিত্র-আগ্রহী, শিক্ষার্থী ও চলচ্চিত্র-কারিগরদের মনে একটা সুস্পষ্ট আভাস গড়ে উঠতে দেওয়া,—চিত্রশিল্পের এই দুটি নবজাতকের শৈল্পিক, বৈজ্ঞানিক এবং আঙ্গিক ব্যাখ্যান ব্যাপারে।

আণ্ডারগ্রাউণ্ড ফিল্মের তালিকায় যেসব ছবি ছিল মোটামুটি তাদের নাম এইরকম:
Note from above (Great Britain); Water Melon (Great Britain); The Bed (U.S.A.); The Sweet Home (Holland); San Francisco Great Britain); Invocation (Great Britain); Film 68 (Federal Republic of Germany);

ইত্যাদি। এর মধ্যে যে ছবিগুলি দেখানো সম্ভব হল আমাদের, তার মধ্যে শেষোক্ত দুটি ছবি বাদ পড়েছিল। এই প্রদর্শিত ছবিগুলির আলোচনায় পরে সুযোগমত যাওয়া যেতে পারে।

আণ্ডারগ্রাউণ্ড ছবিগুলি (সেই সঙ্গে খণ্ডচিত্রও) নিয়ে পাশ্চাত্যে আজ যেসব বিশেষ পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে, তত্ত্বাকারে নয়, হাতেনাতে, তাতে স্পষ্টই অনুভূত হয় যে, এই ছবিগুলির বিশেষ প্রকরণের ও সূক্ষ্মশ্রেণীর আঙ্গিকের যে দ্রুত হেরফের ঘটছে এই সম্পূর্ণ বিভিন্ন জাতের ও স্বাদের ছবিগুলির পরিকল্পনা ও তার রূপায়ণপথ ধরে—বিশিষ্ট গবেষক-চিত্রকারদের শিল্পমাধ্যমে, তার প্রথম লক্ষ্যস্থল হল থিয়েট্রিক্যাল সিনেমার পুরোনো নৈতিক ও শৈল্পিক বিধিবদ্ধ চিরাচরণের একঘেয়েমীর গণ্ডীর বাইরে এই অভিনবরূপে আধুনিক শিল্পমাধ্যমটিকে এক দুঃসাহসিকতায়মণ্ডিত নবরূপকল্প দেওয়া, যার মধ্যে প্রকৃত শিল্পরসসন্ধানপুষ্ট, গোঁড়ামিমুক্ত মানবমন শিল্পটিকে তার রূপ, রীতি ও কল্পনার এতোকালের বন্দীদশা থেকে সজোরে উদ্ধার করে বাইরে এনে তাকে ছেড়ে দেবে একটা নতুন স্বচ্ছ ও মুক্ত শিল্পপ্রবাহের চলমান স্রোতে, যেখানে সে খুঁজে পাবে নতুন শিল্পজীবনের এষণা, নতুন অন্তর্দৃষ্টির গভীরতা, নতুন শিল্পঅভিযানের প্রাণাতিসার।

চিত্ররসিকমনে এখন স্বতঃই প্রশ্ন উঠতে পারে 'আণ্ডার গ্রাউণ্ড' ফিল্মের যথার্থ পার্থক্য কোথায় অন্য সেইসব অগ্রগামী শিল্পরূপ ও রীতিচিহ্নিত ছবির সঙ্গে যেগুলি ঐ তাদের মতে প্রকৃত শিল্পের অপাংক্তেয় থিয়েট্রিক্যাল সিনেমার মধ্য এতোকাল উন্নতনাসিক আভিজাত্যবোধে পরিহার করে এসেছে, অথচ যারা আণ্ডার গ্রাউণ্ড ছবি নয়। এই শ্রেণীর আত্মচিহ্নিত মর্যাদাবিশিষ্ট ছবির ভিন্ন দেশের ভিন্ন কালের পরিপ্রেক্ষিতে ভিন্ন ভিন্ন নামকরণ ঘটেছে। যেমন আভাগার্দ, নিউওয়েভ, নিউ এজ ইত্যাদি। মোটামুটি আলোচনার সুবিধার্থে এদের সবগুলোকেই এই আভাগার্দ ছবির কল্পনাপুষ্ট বলে উল্লেখ করা যাক এক্ষেত্রে।

একথা আজ 'আণ্ডার গ্রাউণ্ড' ছবির স্রষ্টারা মেনে নিয়েছেন যে মূলগত দৈহিক ও আঙ্গিক রূপ বিশ্লেষণে ও বিচারে ঠিক তেমনভাবেই এদের বলা চলে অভাগার্দ ছবির উন্নততর সমগোত্রীয় বলে যেমনভাবে বলা চলে আজকের যুগের সিনেমা ভারিটি-কে গতকালের প্রথাবদ্ধ ডকুমেন্টারি বা প্রামাণ্য চিত্রের সর্বাধুনিক সংস্করণ রূপে। অবশ্য 'আণ্ডার গ্রাউণ্ড' ছবির উগ্র মতবাদীদের মতে এটাও এক ভ্রমাত্মক এবং অন্যায় রূপবিশ্লেষণ। এর থেকে নাকি এমন ধারণা জন্মাতে পারে যে পূর্বের ঐ ছবির বীজ থেকেই এই ফল জন্ম নিয়েছে। এঁরা বলতে চান, 'আণ্ডার গ্রাউণ্ড' ছবি আভাগার্দ ছবিরই স্বাভাবিক আবর্তন নয়, কোথাও কিছু কিছু সৌসাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও। আগে একটা শিল্পরূপ ঘটেছে। জীবনের নিয়ত পরিবর্তনশীল আবহের ও প্রবাহের প্রভাবে সেটার দ্রুত বৈপ্লবিক ধারায় রূপান্তর ঘটছে। এবং যেহেতু যথার্থ শিল্পসৃষ্টি নিত্যনতুন স্বয়ম্ভু প্রকার-প্রকরণ আবিষ্কারের শৃঙ্খলামণ্ডিত হয়ে নিজেকে প্রকাশ করতে পারে না ও চায় না সেহেতু পার্থক্যের শিল্পের প্রকরণ, রূপ ও ভাবনাধারার সঙ্গে মানবমনের বংশস্রোতধারার প্রাকৃতিক নিয়মে কিছুটা

উদ্দীপনায় পরিপুষ্ট জীবন ও
চাপল্যে চঞ্চল যৌবনকে ঘিরে
অভূতপূর্ব আনন্দময় এক পরিচ্ছন্ন উপভোগ্য চিত্র যার অভিনয়ের সৌষ্ঠব, সঙ্গীতের মাধুর্য ও নৃত্যের মোহাবেশ এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রমোদসম্ভার সৃষ্টি নিয়ে এসেছে!

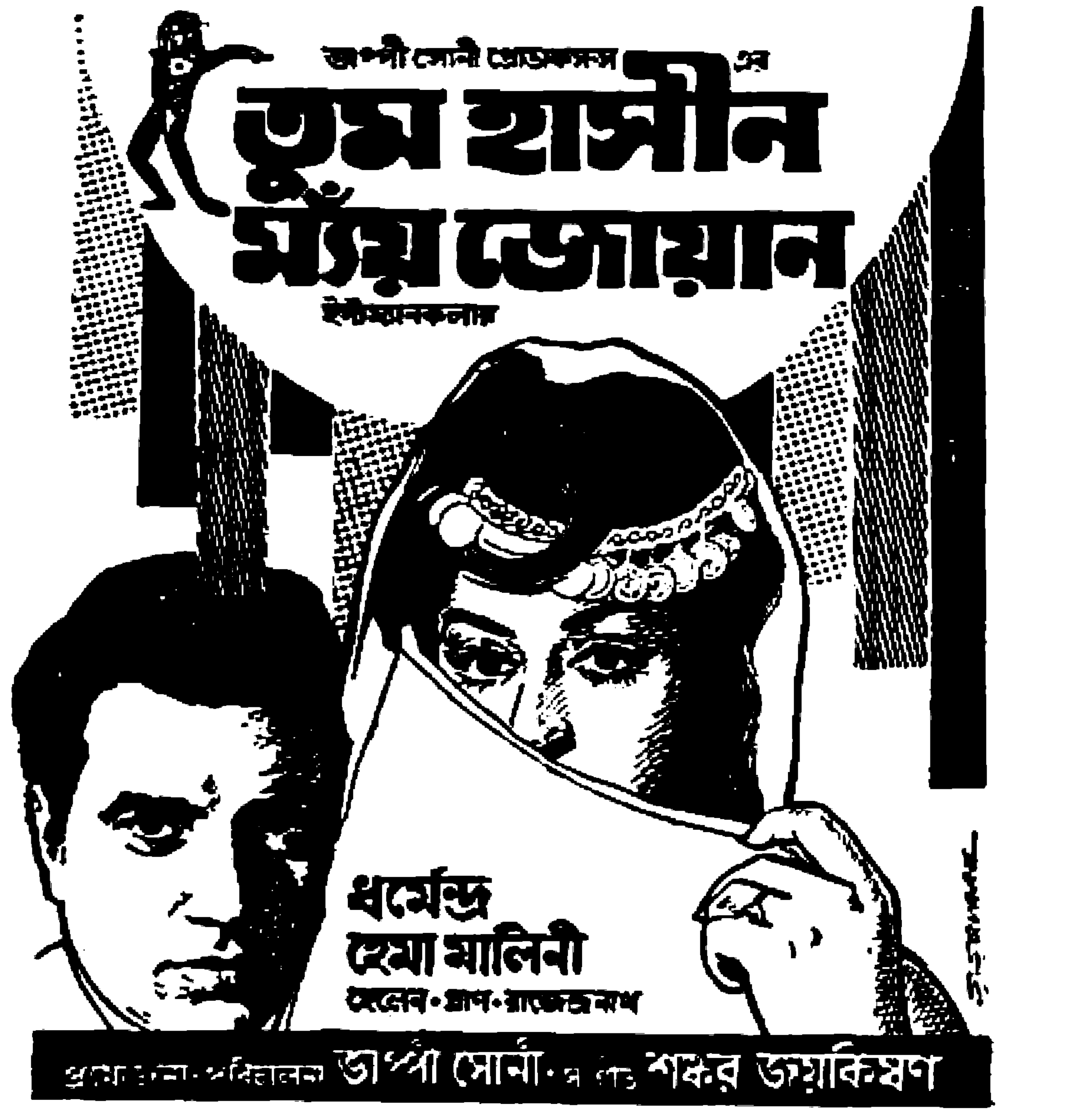

সোসাইটি - পূর্ণশ্রী - মেনকা - গ্রেস - গণেশ
২৷, ৫৷, ৮৷ ২, ৫৷, ৮৷ ২, ৫.৮ ২৷৷, ৫৷, ৮৷৷ ২৷, ৫৷৷, ৮৷
ইণ্টালী পিয়ালী : ঊর্বশী : রূপশ্রী : সোনালি : ...
(মেটিয়াবুরুজ) (বেহালা) (চুঁচুড়া) (কাটপাড়া) (আসানসোল) (রাউরকেলা)
২৷, ৫৷৷, ৮৷

একাত্মরূপ ও ভাববোধ তার থাকবেই। কেননা উদ্ধত বিপ্লবী শিল্পস্রষ্টার হঠকারিতাযোগে যদি কিছু তথাকথিত সম্পূর্ণ অভিনব সৃষ্টি রচিত হয়ও তবে তাদের অন্তিম স্থানলাভ ঘটবে 'মিউজিয়াম'-এর চিরশীতল ক্রোড়ে, কেবলমাত্র ঐতিহাসিক আগ্রহসূচক হয়ে। অনন্ত, নিরবধিকালের সম্প্রসর স্রোতে সঞ্চরণশীল মানবজাতির শিল্পসৃষ্টি-মহিমা সর্বদাই ভাবধারার নতুন কায়কল্পকে চিন্তায় ও কর্মে গঠন করে নতুন দিনের ভাবধারার সঙ্গে সেই স্রোতের মেলবন্ধন রচনা করে। তেমনি করেই এসেছে আজ 'আন্ডার গ্রাউন্ড' ফিল্ম, আভাগার্দ ছবির স্রোতধারায় শিল্পসমুদ্রমুখী প্রবল আকর্ষণে।

আবার বিশেষজ্ঞরা এও বলেছেন, 'আন্ডার গ্রাউন্ড' ছবির সঙ্গে পূর্বেকার আভাগার্দ ছবির মূলগত পার্থক্য কিন্তু উভয়ের ক্ষেত্রে তুলনাগত বিচার বা পারস্পরিক বিভেদ বিচারে নয়, পার্থক্য হলো উভয়ের এমফ্যাসিস বা গভীরতর আত্মমুদ্রণ প্রকৃতির বিভিন্নতায়। অর্থাৎ সোজা কথায়, এ প্রভেদ শিল্পপদ্ধতির ও তাদের বিশেষ বক্তব্য রীতির। তাদের বক্তব্যের বিশ্লেষণভঙ্গীর তীক্ষ্ণতা বা তার উপর গুরুত্ব স্থাপনের নির্ণয়-নীতির প্রভেদ। পাশ্চাত্যে আজ এ নিয়ে নানা পরীক্ষা, সমবীক্ষণ, নানা চিন্তাধারা ও কলাকৌশলের অভিযান চলেছে। এবং এ কথা আজ স্বীকৃত যে আভাগার্দ ছবি ও 'আন্ডার গ্রাউন্ড' ছবির বহিরঙ্গের কিছু মিল থাকলেও পার্থক্য অনেক। প্রথমটা হলো প্রচলিত ফিল্ম শিল্প, যার আসল কমার্শিয়াল চিত্রেই পটে। তারই যোগ্য নতুন নতুন চিন্তাধারা, বিষয়বস্তু ও চিত্রগ্রহণের রীতি ও প্রকৃতি নিয়ে 'আন্ডার গ্রাউন্ড' ছবির নানাবিধ নতুন পন্থের সন্ধানে অভিযান—যা পরিণতিতে তাদের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব স্থায়ীভাবে মুদ্রিত করতে পারবে শুধু চলচ্চিত্রের শিল্পমাধ্যমের উপরেই নয়, তারই মধ্য দিয়ে গোটা দেশের ও জাতির ও বিশ্বসমাজের উপর। কিন্তু 'আন্ডার গ্রাউন্ড' ফিল্ম-এর কল্পনা ও বিস্তারের মর্মরূপ অনেক বেশী আপোষবিহীন, গম্ভীর এবং সমর্পিত আদর্শে আস্থাবান। এর স্রষ্টারা নাকি বিশ্বাস করে যে হলিউড এবং টি-ভি আপনাপন পন্থানুসরণেই চলবে, আভাগার্দ ছবিও তারই সংস্কারতর, কিছুটা বিদ্রোহাত্মক সংস্করণ, কিন্তু মূলত বিভিন্ন গোষ্ঠির নয়। 'আন্ডার গ্রাউন্ড' ছবির মানসিকতা ও পথ, এর অনুগামীরা বলেন, নন-থিয়েট্রিকাল সিনেমার সঙ্গে সম্পূর্ণ সমান্তরাল সুরে, গতিতে, আত্মপ্রক্ষেপণে। এককথায় তাকে বলা যায় প্যারালাল সিনেমা।

১৯০০ সালে প্রামাণ্য চিত্রগ্রহণ পদ্ধতির যখন এক বিস্ময়কর অভ্যুত্থান ঘটল গ্রেট ব্রিটেনে, ফ্লাহার্টির নানুক অব দি নর্থ বা ওয়াইল্ড উয়িংস প্রভৃতি স্মরণীয় কয়েকটি চিত্রের মারফতে, তখন সেই সব চিত্রে স্রষ্টা হলেন যাঁরা তাঁরা বিদায় নিলেন পুরোনো মামুলী প্রথায় অঙ্কলেখীকারদের কাছ থেকে, আর সেই সঙ্গে নতুন আর্থিক কর্তৃত্বের মুখোমুখি হয়ে আপন গরজেই বিদায় দিলেন পুরোনো টেকনিকের শিল্পমাপকাকেও। কিন্তু এঁদের তৈরী প্রামাণ্য চিত্রের আত্মিক রূপটা কোন বৈপ্লবিক পরিবর্তনের প্রয়াসী ছিল না, যদিও তাদেরও নয়নে ও ভঙ্গীতে ছিল অনেকখানি প্রসারিত দৃষ্টি, কল্পনার বিস্তার আগামী দিনের প্রতি। কিন্তু যে ছবি হল কল্পনাতেই ননথিয়েট্রিকাল দর্শকের জন্য বা এমন দর্শকের জন্য যাঁরা প্রথমত নয়, দ্বিতীয়ত থিয়েট্রিকাল দর্শক (কিছুটা গভীরতর অর্থে), সেই আন্ডার গ্রাউন্ড ফিল্ম এলো একটা সম্পূর্ণ ভিন্নতর স্বাদের, বলিষ্ঠতার ও বিদ্রোহের নিশান উড়িয়ে, তারা হতে চাইল নতুন প্রজাতির ভাব স্বাধীনতার দিগদর্শক, যা মানবে না মানুষের গড়া কোন বিধিনিষেধের আরোপ; সেন্সর প্রথার বা সমাজশাসনের ভ্রুকুটি যারা অগ্রাহ্য করবে। স্বভাবতই তাঁরা থিয়েট্রিকাল সিনেমাতে পৌঁছুবার রাস্তার প্রবেশাধিকার পাবে না, এবং এবম্বিধ দর্শক তার কাম্যও নয়। তার প্রদর্শনক্ষেত্রও তাই সীমিত হল ভিন্নতর গণ্ডীতে, প্রাইভেট বা স্পেশালাইসড দর্শকের শিল্প-অনুশীলনার্থে। কাজেই বলা চলে, 'আন্ডার গ্রাউন্ড' ছবির দর্শক ও সমর্থক এক কিন্তূতকিমাকার মণ্ডিত। তাঁরা এক নতুন সিনেমা-দর্শনের প্রতীক। যেমন ধরুন বীট পোএমস, নবতর যুগের ফোকমিউজিক বা পপ-মিউজিক, যার প্রভাব আজ জন থেকে বহু জনান্তরে ছড়িয়ে পড়ছে। তাকে আজও বহুজনের ভাল না লাগতে পারে অশ্লীলতায়, সামাজিক রীতিনীতির বা শিল্পাদর্শের জটিল মানের প্রশ্নে। সেই সঙ্গেই আছে সাধারণ দর্শক বা রীতিবদ্ধ সমালোচকের কাছে অনেকখানি দুর্বোধ্যতার প্রশ্ন। কিন্তু তবু তার যাত্রা তার ভৈরব কল্লোল নিয়ে আজ সমাজের মনের তটপ্রান্তে সমাগতপ্রায়। এবং তার ভাবভঙ্গী দেখে ঠিক এমন মনে করার কারণ নেই যে আজকের সিনেমার এই নবরূপকল্প আধুনিক যুগের দর্শকের ভাবধারাকে আচ্ছন্ন করবার প্রয়াসে হার মেনে অবশেষে পুরোনো দিনের চিত্রাদর্শের কাছে নতিস্বীকার করে স্বায় থেকেই বিদায় নেবে। তা সে বলেই কেননা আমাদের অভ্যস্ত রুচিতে আঘাত করুক, দুর্বোধ বলে অভিহিত হোক, নগ্নতা বা উচ্ছৃঙ্খলতার পতাকাবাহী বলে কলঙ্কশাসিত হোক। শিল্পে এই নবজাগরণ নিরুদ্ধ হবে কি আগামী যুগের দর্শকমনকে প্লাবিত করবে বলা কঠিন। কিন্তু তাকে প্রতিহত করাও কঠিন কার্য বলে মনে হয়। কেননা এ প্রশ্ন পুরাতনের সঙ্গে নবীনের ভাবদ্বন্দ্বের প্রশ্ন।

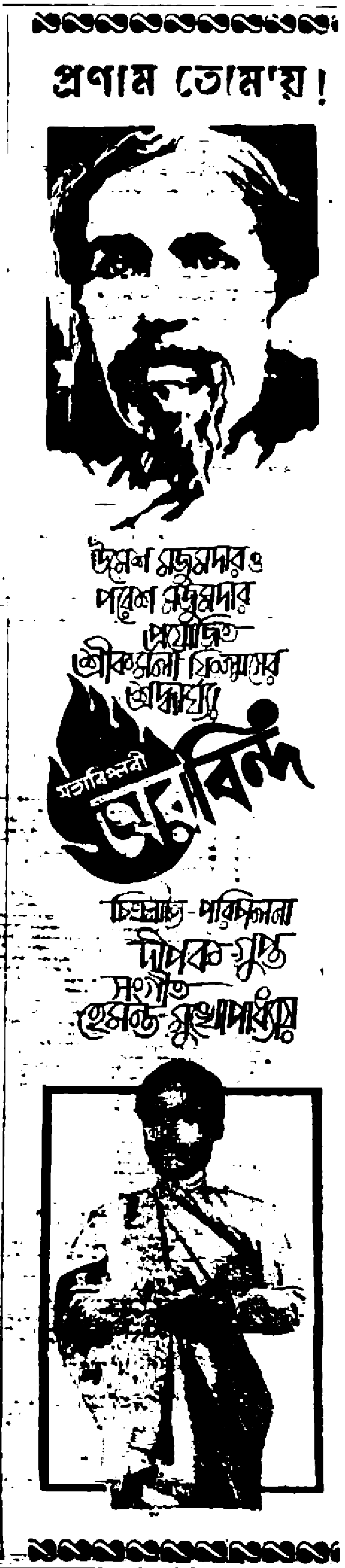

CENTRAL LIBRARY

দেবিকা রানী

বিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য

জীবনের সব আশা পূর্ণ হয়েছে এমন লোকের সঙ্গে আজও দেখা হলো না। মানুষের জীবনে কি চাই? ঐশ্বর্য, রূপ, খ্যাতি, প্রতিপত্তি এর কোনটা পান নি দেবিকারানী? ঐশ্বর্যের আলোচনা না-ই করলাম সেটা কে না জানেন? রূপ? আজও যেন ঠিক কুড়ি বছর আগের দেখা মূর্তিটাই দেখছি। এটা সত্যিই একটা অদ্ভুত আশ্চর্য ঘটনা।

আমি নিজে সিনেমায় কখনও বিশেষ আগ্রহান্বিত ছিলাম না। বছর সতেরো আগে দেবিকারানীর অতি ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসে দু একটা নাম-করা ছায়াচিত্রের পরিচয় পেয়েছি। সময় পাই নি। জীবন সংগ্রামে প্রতিনিয়ত বাড়ীতে, পথে, ঘাটে অভিনয় দেখে এত ব্যস্ততার ভিতর সময় কেটেছে, কাটছে অভিনয় দেখার সময় জোটে নি। কি আশ্চর্য ঘটনা। কোত্থেকে ছিটকে পড়ে ঢুকলাম গিয়ে সেই ভিন্ন জগতে, আজও যার সঙ্গে আমার পরিচয় মোটেই নিবিড় হয়ে উঠলো না।

তাঁকে শুধু একজন সাধারণ অভিনেত্রী হিসেবে ভাবতেই পারি না। সতেরো বছরে অন্ততঃ এক হাজার চিঠি ও সতেরোশো ঘণ্টার নিবিড় আলোচনায় তাঁকে দেখেছি বিভিন্ন রূপে। বিশ্ববিশ্রুত দার্শনিক সর্বে-পল্লী রাধাকৃষ্ণনের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে আলোচনা করতে পারেন বিশ্বের কজন অভিনেত্রী? দেবিকারানীকে দেখেছি সেই আলোচনা করতে। অন্ততঃ পঞ্চাশবার আমাকে তিনি নিয়ে গেছেন সঙ্গে, কারণে, অকারণে। লাভটা আমারই হয়েছে। জীবনের একটা নতুন জানালা খুলেছে। অজানার পরিধিটা কত বড়, জানার পরিমাণটা বাড়লে সেটা যেন আরও বেড়ে যায়।

একদিন ঘণ্টা তিনেক ধরে আমাকে শোনাচ্ছিলেন কিভাবে 'অচ্ছুৎ কন্যা' বইটা তৈরী করেছিলেন। বলতে ভারী লজ্জা করছে, ছাত্রদিনে, তেইশ বছর বয়সে মাত্র নটি সিনেমা দেখেছিলাম। তার ভিতর 'অচ্ছুৎ কন্যা' ছিল না। আমার 'ব্লাইন্ড' স্পটটি ওঁর বুদ্ধিদীপ্ত নজর এড়ায় নি। ঠিক ধরে ফেলেছেন। বললেন, তুমি তো মাত্র নটা সিনেমা দেখেছো। তার ভিতর ওটা পড়েছে কি?

বললাম, 'আজ্ঞে বলার কিছু নেই।'

মানে, দেখো নি।

শিক্ষা বিভাগে কাকে টেলিফোন করলেন। তখন কালচারাল সোসাইটি ফর ফিল্মস্ বলে একটা প্রতিষ্ঠান ছিল। মিঃ মাহেন্দ্রনাথ তার একজন কর্তা ছিলেন। তাকে বললেন পরদিনই সাপ্রু হাউসে 'অচ্ছুৎ কন্যা' দেখাবার আয়োজন করতে। আরও বললেন বন্দোবস্ত যেন সব ঠিকভাবে হয়। তার 'বধূকে দেখানো হবে এ ছায়াচি[illegible]

আমাকে বললেন যতজন খুশী বন্ধু নিয়ে সিনেমাটা দেখে আসতে। কাউকে বলতে চাইলুম না। যাকে পেলাম পাশে তাকেই নিয়ে গেলাম। একজন ছিলেন বাংলার এ্যাকাউন্টস্-এর কমলা গুপ্তা। আরও কে কে যেন ছিলেন। গিয়ে দাঁড়ালুম। সময় হয়ে গেছে। তবুও বই শুরু হচ্ছে না। সবাই ঠাট্টা বিদ্রূপ শুরু করলেন। তোমাকে নিয়ে তামাসা করেছেন দেবিকারানী। তুমি ধরতে পারো নি।

মনে মনে ভাবলুম আমি কি সত্যিই এতখানি বেকুব? মাঝা ফুলে নয় দু-এক-জন কর্তাব্যক্তি দাঁড়িয়েছিলেন।

ভয়ে ভয়ে গিয়ে একজনকে জিজ্ঞাসা করলুম মশাই এখানে আজ 'অচ্ছুৎ কন্যা' দেখানো হবার কথা ছিল। সেটা হবে কি?

তিনি বললেন হবে। নিশ্চয়ই হবে। আমরা দেবিকারানীর বন্ধুর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে। তিনি এলেই শুরু করে দেওয়া হবে।

বিনীতভাবে নিবেদন করলাম, তাঁর বন্ধু কিনা জানি না, তবে আমাকে এখানে এই সিনেমাটা দেখতে দেবিকারানীই পাঠিয়েছেন। নামটা পেশ করলুম। অতঃপর রাজসম্মানভাবে সবাই মিলে ভিতরে নিয়ে বসালেন। আদর আপ্যায়নের ঠেলায় জীবন অতিষ্ঠ হবার জোগাড়। আমি হাঁ করে সিনেমাটা দেখলাম বসে বসে। লোকগুলো মাঝে মাঝে কিছু করছিল। ঠান্ডা, গরম পানীয় দিয়ে। সিনেমা দেখে ফেরার সময়ও [illegible]। একখান ফুল এনে

তোড়া তোড়া সাজিয়ে যত্নভাবে এ, ও, সে, হাজির। ফুলগুলো যেন দেবিকা-রানীকে পৌঁছে দি আমি। একটা ফুলও আমি স্পর্শ করলাম না। বন্ধুর জন্য ফুল-গুলো এনেছিল। সাদামাটা কর্তুর চেহারা দেখে ওরা স্ট্র্যাটেজিটা বদলে দিল। আমি বললাম ফুলগুলো দয়া করে ইম্পিরিয়ালে পাঠিয়ে দেবেন কার্ড লাগিয়ে। অন্যের দেওয়া ফুল নিজের হাতে কখনও দিই না আমি।

তাড়াতাড়ি ট্যাক্সিতে উঠলাম।

পরদিন সকালবেলা সঙ্গীত-নাটক একাডেমির অফিসে বসলাম গিয়ে। বললেন, কেমন দেখলে? আমি তখনও তাঁর দিকে তাকিয়ে হাঁ করে। ঠিক যেন একটা বাঙাল সদ্য শিয়ালদা থেকে নেমে ট্রাম, বাসগুলো ছুটতে দেখে অবাক হয়ে তাকিয়ে।

কি দেখছো?

না কিছু না।

তা হবে না। বলতে হবে।

আবার বললাম কিছু না।

তবে অমনভাবে কি দেখছো।

কিছু অন্যায় হচ্ছে?

না ঠিক তা নয়। চরিত্রটা জানি তোমার। না হলে মেয়েদের অত নিকটে তুমি ঘেঁসতে পারতে না। তবুও আমার কৌতূহল জাগছে বইকি। কি দেখছো বলো।

বললাম আপনাকে দেখছি।

কি আশ্চর্য! এতগুলো বসন্ত এলো, গেলো, তার একটা রেখা পর্যন্ত ফেলে যায় নি রমণীর মুখে।

বললাম, কি করে হলো এটা? কিভাবে এটা সম্ভবপর? আমার প্রশ্নের জবাব দিলে না? কেমন দেখলে?

হেঁসে বললাম, আমি কিন্তু আমার প্রশ্নের জবাব না পেলে আপনারটার জবাব দেব না।

শুধু প্রশ্নের কাটাকাটিতেই চাকরীটা জুটেছিল একদিন। সেসব আজ নিশ্চয়ই ফাঁস করে দেব না।

দিনের কাজ শুরু হয়ে গেল।

তেপ্পান্ন সালের অখিল ভারতীয় ফিল্ম সেমিনার ভারতের সাংস্কৃতিক ইতি-হাসে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। সাহিত্যিক, আর্টিস্ট, অভিনেত্রী, অভিনেতার এক মহা-মিলন। মিলন কেন্দ্র স্বাধীন ভারতের রাজ-ধানী মহানগরী দিল্লী। এর পুরোধা ছিলেন দেবিকারানী। সেখানে প্রতিদিন দেখেছি বাংলা দেশের লেখক, বাঙ্গালী অভিনেতা, অভিনেত্রীদের ওপর স্নেহমাখা নজর।

আলোচনার স্মারকলিপিতে, প্রচারপত্র সব জায়গাতেই বাংলা দিয়ে সব কাজ শুরু।

পরিহাস করে ভারত সরকারের একজন কর্তাব্যক্তিই প্রশ্ন করেছিলেন। ম্যাডাম, সব জায়গাতেই দেখছি বাংলা দেশ দিয়েই শুরু। লিস্ট দেখে ঠিক বুঝতে পারছি না এটা অ্যালফাবেটিক্যাল না অ্যারেঞ্জিং টু মেরিট।

পাঁচ সেকেন্ডও দেরী হল না।

জবাব এসে গেল ধারালো তীরের বেগে।

বাংলাদেশের চেয়ে একটা জায়গা নির্ধারিত করে দাও অভিনয়ে, সঙ্গীতে, সাহিত্যে, কলায়, সংগীতে, চিত্রকলায় যার অবদান সর্বভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে বিন্দুমাত্র বেশী। সমস্ত প্রোগ্রাম আবার ছাপাবে, সমস্ত সাহিত্যপত্র আবার তৈরী করে এই সভায় আমি পরিবেশন করবো।

বাংলা দেশ থেকে এসেছিলেন পঙ্কজ মল্লিক, এসেছিলেন সুপ্রভা মুখার্জি, সাহিত্যিক প্রবোধ সান্যাল, নৃত্যবিদ উদয়-শঙ্কর, প্রডিউসার বিমল রায় (বোম্বে থেকে), অহীন চৌধুরী, সোহন সেন, পশুপতি চট্টোপাধ্যায়, নমিতা সিংহ, দেবকী বসু, এম ডি চ্যাটার্জি, অজিত বসু, মধু শীল, ডঃ আর এস বসু। সবার যত্ন নিয়েছেন ব্যক্তিগতভাবে। শুধু নিজে নেন নি। নেবার নির্দেশ দিয়েছেন। প্রতিদিনের পুরোধা হিসেবে সামনে এগিয়ে দিয়েছেন পূর্বের বোম্বাই প্রডিউসার নিউ থিয়ে-টার্সের বি এন সরকারকে।

জানো তো আমি শুধু বাঙালী নই। আমি বাঙাল। উত্তর বাংলার মেয়ে। মনে জানো? যা বলবো কবিতে ছাড়বো। এদের একটু ইংরিজীতে বুঝিয়ে দাও তো।

দেবিকা সেদিনের সভায় উচিতে মর্ম বেদনা পেয়েছিলেন। আমাকে সভার শেষে বলেছিলেন পার্টিশানে দুটো বাংলা শুধু প্রকাশনা হয় নি। শুধু ফিল্মকার্ডি আমরা পিছিয়ে নই বরং আমরা অ্যালফাবেটি-ক্যালিও কতো পিছিয়ে গেছি দেখো।

সত্যিই তো। আজ অ্যালফাবেটিক্যাল সব অনুষ্ঠানের আয়োজনে ওয়েস্ট বেঙ্গলের ডাক আসে সবার শেষে। এ দুঃখ কজনের মনে ছোঁয়া লাগায়?

প্রেস কনফারেন্সে, সঙ্গীত আলোচনা চক্রে, সাধারণ বৈঠকে প্রায়ই বাংলা কবিতা আবৃত্তির চেষ্টা করতেন। আটকে গেলেই কবিতাটা শেষ করতেন না। তবে বলতেন শুনিয়ে দাও না বাকীটুকু—গ্রামছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথ।

বলো, তোমরা তো অনেক ভাষায় গান শিখেছো, কবিতা পড়েছো—জার্মান, ফ্রেঞ্চ, রাশিয়ান, ইংরিজী—এ কবিতার তুলনা নেই। রবীন্দ্রনাথের কবিতা! দেবিকারানী রবীন্দ্রনাথের পরিবারের মেয়ে। লণ্ডনে যখন তিনি ইন্টিরিয়র ডেকোরেশনে শিক্ষা নিতে গিয়েছিলেন তখন সেখানে তাঁর লোকাল গার্জিয়ান ছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

বলছিলেন, জানো সেখানে একদিন পরিচয় হবার পর বললেন গুরুদেব কি করেছো জানো না? ওঁর দেবিকারানীর ডাক নাম। দেখছি সব লাল করে ফেলেছো। বেশ অপরিমেয়। মনে হচ্ছে যেন এখনি আমায় স্পর্শ করবে।

রবীন্দ্রনাথ নাতনীকে কাছে টেনে আদর করেন।

বয়স আঠারো। শাড়ী, ব্লাউজ, জুতো মোজা কপালের টিপ, হাতের (কি যেন বলে ওটাকে নামও জানি না, জিজ্ঞাসা করার লোকও নেই কেউ পাশে) চুড়ি সব লাল।

দেবিকারানী বললেন আমার কিন্তু বিন্দুমাত্র খেয়াল ছিল না। আনকনশাসলি সব লাল হয়েছিল।

উৎফুল্ল হয়ে বললাম, আজও তো আপনার ওটাই প্রিয় রঙ—ফেবারেট কালার। মানায় দিব্যিভাবে।

স্বামী অধ্যাপক স্বেতোস্লাভ রোয়েরিকের প্রিয় রঙটা আবার লাল নয়। সেটা নীল—যে রঙের সঙ্গে ইউরি গ্যাগারিন তুলনা করেছিলেন মহাকাশ পথের।

আজও দেবিকারানীকে ঐ লাল রঙের বেশেই সবচেয়ে সুন্দর মানায়।

কালো রঙ দেখতে পারেন না। আমার কালো স্যুট, কালো কোট ওঁর মোটেই পছন্দ নয়। টেবিলের টেলিফোনটা প্রথম দিন কালো ছিল। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সেটাকে বদলে লাল করে দিয়েছিল দিল্লীর ডাক তার বিভাগ।

জনসাধারণকে খুব ভালবাসেন। একদিন বলছিলেন এমন সহজ সরলভাবে লিখতে শেখো যাতে সাধারণ অর্ধশিক্ষিত মানুষও তা বুঝতে পারবে। ছায়াচিত্রের প্রথম উদ্দেশ্য হলো সাধারণ মানুষের মনোরঞ্জন। সঙ্গে সঙ্গে তার শিক্ষা। প্রতিটি ছায়াচিত্রের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ। এইটুকু সর্বদা মনে রাখতে হবে। আর্ট হলো জীবনের প্রতিচ্ছবি। 'মিরর অব সোল।' অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সেখানে কৃত্রিমতা এলেই আর্টের মৃত্যু। আর একটা প্রধান কথা মনে রাখতে হবে। প্রতিটি ছায়াচিত্রের একটা উদ্দেশ্য থাকবে। শুধু চিত্তবিনোদন নয়। একটা মেসেজ থাকবে। লক্ষ্য করে দেখো আমাদের সময়ে আমরা যেসব ছায়াচিত্র তৈরি করেছি তার প্রত্যেকটিতে একটা বাণী ছিল—দেশের জন্য, জাতির জন্য, সমাজের জন্য সবাইকে কাছে টেনে ভাবতে শেখাতে হবে। তাদের নিয়েই তো জাতি। মুষ্টিমেয় পণ্ডিত ধনী দর্শক ক্লাসিক্যাল আর্টস নিয়ে নাড়াচাড়া করতে পারে, আমাদের বক্স অফিস হিট তো ঐ সাধারণ মানুষের দল। তাদের জীবন নিয়ে তাদের চিন্তাভাবনা নিয়ে, তাদের মতন সরল সহজভাবে শক্ত সমস্যা তুলে ধরতে হবে, আবার সে সমস্যার সমাধানের পথও দেখাতে হবে। আজকাল ডিরেক্টাররা এদিকে ততখানি দৃষ্টি ফেলেন কি?

পাশে বসে মৃদু হাসছিলেন মনীষী শিল্পী স্বেতোস্লাভ। তিনি পরিষ্কার বাংলা বুঝতে পারেন। দু-একটা লাইন বলতেও চেষ্টা করেন। বললেন ঠিক কথা। যে শিল্প জনতার কাছে অবোধ্য সে শিল্প শিল্পই নয়। মডার্ন এ্যাবস্ট্র্যাকট আর্টের ওপর কটাক্ষ করে বললেন একটা জুতোকে উল্টো করে টাঙিয়ে রাখলে আর্ট হয় না। চিন্তাধারাকে উঁচু করতে হবে। রূপ হবে সত্য, শিব, সুন্দর। দুজনেই সুন্দরের উপাসক। এঁদের পাশে বসলে দুনিয়ার সব কিছু মন থেকে মুছে যায়। সকালে বসেছি। দুপুর গড়িয়ে গেছে। টের পাইনি। দিন গড়িয়ে গেছে, রাত কেটে গেছে খেয়াল হয় নি। কটা দিন এঁদের সান্নিধ্যে ছিলাম হিমালয়ে। দেরাদুন, মুসৌরী পর্যন্ত গাড়ী। তারপর পায়ে হাঁটা পথ।

হিমালয়কে আমরা এত ভালবাসি কেন জানো? এই হিমালয়ের ডাকেই আমার বাবা অধ্যাপক মহর্ষি নিকোলাস রোয়েরিক এসেছিলেন ভারতে। যা নেই হিমালয়ে তা নেই বিশ্বে। এর উঁচু শুধু জায়গাটাই নয়, বিশ্বের সবচেয়ে বড় বড় চিন্তার জন্মস্থান—বার্থপ্লেস অব দি গ্রেটেস্ট থটস অব দি ওয়ার্ল্ড। দি নোবলেস্ট থটস ওয়েব অল বর্ন হিয়ার। রাতের পর রাত অধ্যাপক রোয়েরিককে আমি মহামতি বুদ্ধের ধ্যান করতে দেখেছি। হিমালয়ের আকর্ষণে এঁরা সবকিছু ভুলে যেতে পারেন। কে না যায়?

স্বেতোস্লাভ ওষুধে বিশ্বাস করেন না। আলোপ্যাথিকে তো নয়ই। ওঁর কাছে অন্তত দুশো গাছের শিকড় সেলোফেনের কাগজে মোড়া রাখা আছে। কানে ব্যথা, মাথায় ব্যথা, পেটে ব্যথা হয়েছে বলার উপায় নেই। সঙ্গে সঙ্গে একটুকরো শিকড় বের করে দেবেন শিল্পীসাহেব। 'নাও, চিবিয়ে এক সিপ জল দিয়ে গিলে ফেলো। হিমালয়ের গাছের শিকড়। এক্ষুনি অসুখ সেরে যাবে।'

একবার সন্ধ্যার একটু পরে দেখা করতে গেছি। দেখলাম ড্রইংরুমে নেই অভিনেত্রী। ডাকলেন ভিতরে। তিন রুমের স্যুট। ইম্পিরিয়ালের ১০৪ নাম্বার কামরা। ওঁদের জন্য বাঁধা থাকে।

বললাম একি? চোখে জল কেন?

ভয়ানক মাথা ব্যথা করছে। তুমি লক্ষ্মীটি একটা কাজ করো। তাড়াতাড়ি কর্নেল যাযাবরকে ফোন করে বলো অসুস্থতার লক্ষণগুলো। তারপর তাড়াতাড়ি 'স্টন এ্যান্ড ক্রিস'-এ ফোন করে ওষুধটা আনিয়ে আমায় খাইয়ে দাও। খুব তাড়াতাড়ি। সাহেব এসে পড়ার আগে করা চাই।

সাহেব এসেই নিজের ওষুধ বের করে দেবেন। ডাক্তার কর্নেল চৌধুরীর মেয়ে

এবার বড়দিনে

আপনার শুভেচ্ছার প্রতীক ও প্রিয় উপহার হোক

হ্যাণ্ডলুম বস্ত্রসম্ভার

নতুন এসেছে : কাশ্মিরী শাল ও স্টোল
আর তা ছাড়া পাবেন পছন্দমত

সার্ট **শাড়ি** ড্রেসপীস্
টাই স্টোল

মটের কাপড় • ধুতি • গৃহসজ্জার বস্ত্রাদি
তোয়ালে ও ভারতের অন্যান্য তাঁতবস্ত্রসম্ভার

শীততাপনিয়ন্ত্রিত

হ্যাণ্ডলুম হাউস

২, লিণ্ডসে স্ট্রীট, কলিকাতা-১৬
দি অল ইণ্ডিয়া হ্যাণ্ডলুম ফ্যাব্রিকস্ মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ কর্তৃক পরিচালিত।
পাইকারী বিভাগ : ২, গার্স্টিন প্লেস, কলিকাতা—১

দেবিকারানীর ঐ হিমালয়ের শিকড় আর ভালো লাগে না।

তাড়াতাড়ি চাই করলাম। পনেরো মিনিট পনেরো-কুড়িটা ভিতর দিয়ে দিলাম।

ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে আনন্দমনে শিস দিতে দিতে অধ্যাপক ঘরে ঢুকলেন। কি ব্যাপার?

সেকুবের মতন বলে ফেললাম শরীর ভারী অসুস্থ। ঘরে ঢুকেই মাথায় হাত দিয়ে, হাত ধরে নাড়ীটা পরীক্ষা করে শিকড়ের টুকরো আনতে ছুটলেন।

হেসে দেবিকারানী বললেন, কার মাথা ব্যথা করছে? আমার তো নয়। বোধহয় ওর। আমি এমনি শুয়েছিলাম।

বিপদ গুনলাম।

শিকড় গিলতে হল।

প্রাকৃতিক চিকিৎসার মতন জিনিস নেই। বলেই প্রাচীন ভারতবর্ষে অশ্বিনীকুমার থেকে শুরু করে হিস্টরি অব মেডিসিন ইন ইন্ডিয়ার ওপর যে লেকচারখানা পরিবেশন করলেন তার তুলনা শুধু স্বর্গত বিধান রায়ের বক্তৃতার সঙ্গেই চলে।

আমাদের ভারতবর্ষ, আমাদের হিমালয়, আমাদের দর্শন, আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের সত্য শিব সুন্দরের উপাসনা, আমাদের বিবেকানন্দ, আমাদের রবীন্দ্রনাথ বলতে শিল্পী উন্মত্ত। ভারতবর্ষকে তিনি এত আপন করে নিয়েছেন যে, মাঝে মাঝে সহধর্মিণীর সঙ্গে মাতৃভাষার রাশিয়ানে কথা না বললে মনেই পড়ে না এ মহান্ শিল্পীর জন্ম ভারতের অনেক দূরে সোভিয়েট দেশে।

রবীন্দ্রনাথের নাতনী, কর্ণেল এম এন চৌধুরীর মেয়ে দেবিকার জন্ম দক্ষিণ ভারতের ওয়ালটেয়ারে। তিনি একাধিক দক্ষিণী ভাষায় পারদর্শিনী। বিলেতে লেখাপড়া করেন। পঠদ্দশায় রয়্যাল অ্যাকাডেমি অব্ ড্রামাটিক আর্টস ইন লন্ডনে অভিনয়ে পারদর্শিতা অর্জন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা গ্রহণ কালেই বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। বিলেতে তিনি ইন্টিরিয়র ডেকরেশন শিল্পে নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াতে চেষ্টা করেন। ১৯২৮ সালে ভারতের ছায়াচিত্র জগতের অগ্রদূত হিমাংশু রায় বিলেতে যান। সেখানে তাঁর প্রথম প্রণয়, তারপর পরিণয় ঘটে। সেখানে 'লাইট অব্ এশিয়া', 'শিরাজ', 'এ থ্রো অব্ ডাইস'-এর প্রডিউসার হিসেবে হিমাংশু রায় আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেন। লন্ডনে তিনি বিশ্ববিখ্যাত প্রডিউসার ব্রুস উলফের সঙ্গে কাজ করেন। এটা ঘটেছিল ১৯২৮ খৃঃ। ১৯২৯ খৃঃ হিমাংশু রায়ের সঙ্গে দেবিকারানী জার্মানীতে যান। সেখানে ডিরেক্টর পাস্ত সাহেবের অধীনে শিক্ষা গ্রহণ করেন। তখন 'সাইলেন্ট টকি' থেকে 'সাউন্ড টকি'র সূত্রপাত। হিমাংশু রায়ের সঙ্গে দেবিকারানী জার্মানী থেকে সুইজারল্যান্ড ও নরওয়ে সুইডেনে যান। ভারতে ফিরে 'কর্ম' ফিল্ম পরিবেশন করেন। এ ফিল্মে দেবিকারানীর সঙ্গে ছিলেন বর্ধমানের রাজকন্যা সুধারানী।

বোম্বাই এবং বাংলার জনপ্রিয় নায়ক বিশ্বজিৎ। ফটো : অমৃত

ভারতে 'কর্ম' প্রথম সাউন্ড পিকচার। বইখানা একসঙ্গে ইংরিজী ও হিন্দুস্থানীতে পরিবেশিত হয়।

ধীরে ধীরে বম্বে টকিজের জন্ম। ১৯৩৪ খৃঃ ভারতের ছায়াচিত্র জগতে এক স্মরণীয় যুগ। ইংল্যান্ড, জার্মানী, ফ্রান্স থেকে বিশেষজ্ঞ আনিয়ে হিমাংশু রায় ভারতীয় অভিনেতা, অভিনেত্রী, টেকনিশিয়ানদের পারদর্শী করে তোলেন।

দেবিকারানীর সৃষ্টির সঙ্গে যাঁদের পরিচয় তাঁরা আমার চেয়েও ভালভাবে এ বিষয়ে বলতে পারবেন। তবে দিনের পর দিন তাঁর মুখে যে সব বইয়ের কাহিনী শুনেছি তার ভিতর জওয়ানি কি হাওয়া, জীবন নাইয়া, অচ্ছুত কন্যা, সাবিত্রী, জীবন প্রভাত, দুর্গা, বচন, ইজ্জত ইত্যাদি কত তিনি প্রডিউস করেছিলেন, কেমন করে অভিনয়ের জন্য নিজেকে তৈরী করেছিলেন আমার যেন মুখস্থ হয়ে গেছে।

সেদিন আলোচনা হচ্ছিল 'হিউম্যান সাফারিং'-এর ওপর। রাধাকৃষ্ণনের দর্শন থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত উদ্ধৃত করে অভিনেত্রী আমাকে মুগ্ধ করেছিলেন। কখন বিদায়ের সময় কেটে গেছে খেয়াল হয়নি। বললেন, রবীন্দ্রনাথ গীতাঞ্জলি থেকে বলো তো সেই লাইনগুলো, 'এই ক্ষ্যাপা ভালো নিঠুর হে, এই করেছো ভালো, এমনি করে হৃদয়ে মোর তীব্র দহন জ্বালো।'

বললাম।

আজও জানি না এ'র জীবনে কি দহন থাকতে পারে। তবে একটা বেদনার কথা বলেছিলেন, আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, এত বই প্রডিউস করলেন, এত খ্যাতিমান অভিনেতা, অভিনেত্রী তৈরী করলেন নিজের হাতে, বাংলা একটা বই প্রডিউস করলেন না? একটা বইতে অভিনয় করলেন না?

চোখে দেখলাম জল টলমল করছে।

বললেন, রিয়্যালি ইউ টেক্ লাইক আন্ এন্ড ফিলসফার। তোমার সঙ্গে গল্প করে তোমনই এত আনন্দ পাই। আমার জীবনের এটা একটা কত বড় বেদনা তুমি ভাবতে পারবে না।

আঁচল দিয়ে জল মুছলেন।

রবীন্দ্রসঙ্গীত

অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়

আমার প্রথম শিক্ষাগুরু রবীন্দ্রলাল রায়—মালবিকা কাননের বাবা। আমার সঙ্গে মালবিকার খুব বন্ধুত্ব ছিল। আমরা মাঝে মাঝে একসঙ্গে শিখতাম। রবীনবাবুর শিক্ষাপদ্ধতি এত সুন্দর ছিল যে, সরগমের মত শুষ্ক জিনিসও যেন কবিতার মতো সরস হয়ে উঠত। রবীনবাবুর কাছে শেখবার সময় আমি খেয়ালিয়া হবার স্বপ্নই দেখতাম। আমি ম্যাট্রিক পাশ করার পর লক্ষ্ণৌ মরিস কলেজে ভর্তি হবার কথা চলছিল। কিন্তু মন মত না থাকায় শান্তিনিকেতন গেলাম। শান্তিনিকেতনের সঙ্গে আমাদের পারিবারিক যোগাযোগ ছিল। বাড়িতে তখনকার দিনের রবীন্দ্রসংগীতের রেকর্ডের প্রচুর সংগ্রহ ছিল। ছোটবেলা থেকে সেইসব শুনে অজান্তেই রবীন্দ্র-সংগীতের ওপর একটা আকর্ষণ গড়ে উঠেছিল। কিন্তু সংগীতের প্রতি স্বাভাবিক অনুরাগ-জাত সহজ বোধ থেকেই বাবা বলেছিলেন, ক্লাসিক্যাল গান না শিখলে—শোনাবার উপযুক্ত গানের গলা তৈরী হয় না।

শান্তিনিকেতনে প্রথমে মারাঠি অধ্যাপক বিনায়ক মাসোজিমশায়ের কাছে উচ্চাঙ্গ-সংগীতে তালিম নেওয়ার প্রথাই ছিল। তাঁরও ইচ্ছে ছিল আমি খেয়াল শিখি। তারপরই এল রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষার অধ্যায়। তখনই দ্বন্দ্বের শুরু। কোনদিকে যাব? রাগ-সংগীতের প্রতি টানটা আমার সংগীত ধর্মেও অনুকূল হবে, না রবীন্দ্রসংগীতের পথেই সন্ধান মিলবে পরম প্রাপ্তির—জ্ঞানে-অজ্ঞানে, চেতনায় বেদনায় যাকে খুঁজেছি। দুটো সম্পূর্ণ আলাদা জগৎ। একটা সুরের সীমাহীন ব্যাপ্তি আপনাকে প্রকাশের পথ খুঁজছে, নানান তান ও বিস্তারের বৈচিত্র্যে, অন্যটায় ভাষা যেন ভাবাতীতের মিলন-স্পর্শে আত্মহারা। দুটি সংগীতের ধারায় সৌন্দর্য, মাধুর্যের বিভিন্ন রূপের রসলোক উন্মুক্ত। দুটি দিকই আমায় সমান আকর্ষণ করত। শুধু রবীন্দ্রসংগীতকেই বেছে নিয়েছিলাম সাংগীতিক সাফল্যের নিশ্চিত সোপানরূপে।

ইন্দিরা দেবী ও শৈলজাদা উভয়ের কাছেই আমি নিয়মিত ভাবে রবীন্দ্রসঙ্গীতের শিক্ষা গ্রহণ করেছি।

ইন্দিরা দেবীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের গানের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল—শান্তিনিকেতনের আগের যুগে, যখন কবি কোলকাতায় থাকতেন। কাজেই প্রথমের দিকের গানগুলোতে কবির যথাযথ ভাবনার রূপটি বিবিদিদির (ইন্দিরা দেবী) কাছে অতি অবিকৃত রূপে ধরা দিয়েছে। আবার শৈলজাদা, শান্তিনিকেতনের যুগের রবীন্দ্রনাথকে পুরোপুরি ভাবেই পেয়েছেন। দুটো রূপ সমান্তরালী হওয়ার দরুন সংঘাত হ'য়নি, উপরন্তু উভয়েই উভয়ের পরিপূরক হয়ে উঠতে পেরেছে।

এইরকম ভাবেই শিক্ষা চলছিল এবং অজান্তেই রবীন্দ্র-সংগীতকে কখন মনপ্রাণ দিয়ে ফেলেছি বুঝতেই পারিনি। সচেতন-ভাবে এ সত্য বোঝা গেল কোলকাতায় এসে সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর কাছে তালিম নেবার সময়। এই মানুষটির কাছে আমার ঋণের সীমা নেই। কারণ, রবীন্দ্র-সংগীতের অন্তর্লীন রূপটির সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে তাঁরই শিক্ষায়।

সুরেশবাবু সংগীতজ্ঞ এবং উচ্চাঙ্গ সংগীতের সাধক বলেই বোধহয় পাণ্ডিত্যের অভিমান তাঁর ছিল না। তিনি ছিলেন উদার, বহুমুখী এবং রবীন্দ্রসংগীতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। শুধু শ্রদ্ধাশীল বললে কমই বলা হয়। তিনি রবীন্দ্রসংগীতের নানাদিক সম্বন্ধে 'ওয়াকিবহাল' ছিলেন বলে সাধারণ ওস্তাদিপন্থীদের মত রবীন্দ্রসংগীতকে "সংগীত নয়" বলে অশ্রদ্ধা করবার মত উন্নাসিকতা তাঁর ছিল না। আমার মানসিক প্রবণতা লক্ষ্য করেই হয়ত তিনি আমায় ধ্রুপদের তালিম দিলেন। ঠুংরী সম্বন্ধেও শিক্ষা দিলেন।

একটা রাগের তালিম দিয়েই সেই রাগের ছোঁওয়ালাগা নানারকমের রবীন্দ্র-সংগীত তিনি আমার কাছে শুনতে চাইতেন। গান শেখার পর রবীন্দ্র-সংগীতে সুর-বিন্যাস সম্বন্ধে আলোচনা করে, কোন্‌খানে আবছাভাবে কোন্‌খানে স্পষ্টভাবে কোন রাগের ছায়া এসে কেমন করে এক অচিন্তনীয় মধুরতায় পরিণতি পেয়েছে, কি সুন্দর করে যে বুঝিয়ে দিতেন! রবীন্দ্রসংগীতের একটা নতুন দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর কাছেই পেলাম। আর এ সম্বন্ধে চিন্তার দুয়ার তিনিই খুলে দিলেন। এতদিন অবধি শুধু গাওয়ার আনন্দেই গেয়ে গেছি। এখন গাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কেন ভাবতেও শুরু করে দিল। আর এ ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে এমন অনেক নতুন দিক চোখে পড়ল যা আগে কখনও পড়েনি।

রাগের মর্মমূলে রবীন্দ্রনাথ যে কিভাবে প্রবেশ করেছেন—তার ভাবগ্রাহিতা কিভাবে রাগ-নির্যাসকে আত্মসাৎ করেছে রবীন্দ্র-সংগীতের কম্পোজিশন বিশ্লেষণ করে সুরেশবাবু আমায় সেটা বুঝিয়ে দিয়েছেন।

এখন আমরা সরগম দিয়ে রাগ চিনতে চাই। কিন্তু এই সরগমেরই প্রয়োগে কত যে তফাৎ। যেমন, সারং, মল্লার, দেশ—এইসব রাগের আরোহী ও অবরোহীতে তফাৎ বিশেষ নেই। তফাৎটা হচ্ছে প্রতিটি স্বরের বর্ণ অথবা স্বরপ্রয়োগের প্রণালীতে। সকাল ও সন্ধ্যার অনেক রাগের পর্দা এক হলেও সকাল ও সন্ধ্যার রূপ আলাদা। একই পর্দা যেমন সরগা মমা-র সকালের রাগে বর্ণের অবরোহী-গতি সন্ধ্যার রাগে আরোহী-গতি।

রবীন্দ্রনাথ রাগ ধরে হয়ত শেখেননি। কিন্তু রাগের মেজাজটির নাগাল ছিল যেন তাঁর হাতের মুঠোয়। তাই কথার সঙ্গে সুরের মালাবদল হয়ে গেছে তাঁর সংগীত-মানসের স্বধর্মের সহজ তাগিদে। এতদিন এ সত্য না বুঝেই গেয়েছি, এখন এ সত্য অন্তঃসলিলা প্রাণরসের মত মনের অতলে তার কাজ করে যাওয়ায় অনেক অজানা দিকও যেন স্বচ্ছ হয়ে উঠল। বুঝলাম সহজ হতে হলে কতখানি গভীর বোধ থাকা প্রয়োজন। যেমন ধরুন ফৈয়াজ খাঁ অথবা আলি আকবর' কোনো জটিল তান অথবা কূট স্বরসমন্বয়ের মধ্যে না গিয়েও একটি পর্দার সোজা সরল প্রয়োগে কি অবর্ণনীয় রসসৃষ্টি করেছেন! কেন? না, রাগের অন্তরে এঁরা প্রবেশাধিকার পেয়েছেন। জ্ঞানীর সহজ অধিকারে এই অধিকার সবার থাকে না।

স্বরলিপিকে অতিরিক্ত মর্যাদা দেওয়াটা আধুনিক কালের নিয়ম। আমি বিশ্বাস করি গুরুমুখী শিক্ষায়। আগেকার কালের পুরানো রেকর্ডের চেয়ে আজকালকার রেকর্ডকৃত রবীন্দ্রসংগীতের সুর অনেক বেশী স্বরলিপি-অনুসারী। কিন্তু রবীন্দ্র-নাথকে পুরানো দিনের রেকর্ডের গানেই

যেন বেশী কাছে পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের কাছে সাক্ষাৎভাবে যাঁরা গান শিখেছেন তাঁদের সুরের মধ্যেও কিছু পার্থক্য হয়ত লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু সেটা বাইরের আবরণ মাত্র। অন্তর্নিহিত ভাবের ঐক্যে সবাই এক পরিবারেরই। শিল্পের ক্ষেত্রে শিল্পী-ব্যক্তিত্বের একটি স্থান চিরদিনই আছে ও থাকবে। এতেই প্রমাণিত হয় স্বরলিপির চেয়ে 'গায়কী' অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। রাবীন্দ্রিক ভঙ্গিমাকে অনাহত রাখাই রবীন্দ্রসংগীতের বড় কথা—স্বরলিপির সামান্য তফাতে কিছু যায় আসে না। এই গায়কী সম্বন্ধে বড়দের কাছে প্রত্যক্ষ শিক্ষা না নিয়ে শুধুমাত্র স্বরবিতানের বিদ্যাকে সম্বল করে রেডিওতে অথবা সাধারণ সভায় রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করতে ছোটাটা আমি স্বেচ্ছাচার বলে মনে করি। বহুল প্রচার অথবা জনপ্রিয়তার বাঞ্ছিত পরিণতিতে পৌঁছনোটা এ সংগীতের অবশ্যই এক উজ্জ্বল দিক। কিন্তু এই বহুল প্রচারেরই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি পরিবেশনায় সহজীকরণের প্রবণতা।

ভারতীয় সংগীতের উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া ঐতিহ্যকে অনুসরণ করে আপন প্রতিভা ও শিল্পভাবনা অনুযায়ী এক রসরূপ দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। এইজন্যই সাধারণভাবে সংগীতশিক্ষা তথা ক্লাসিক্যাল গানের তালিমে কণ্ঠচর্চা দ্বারা ভিত তৈরী করে তারপর কবির স্বকীয়তাকে অনুভব করতে হবে। তাঁর ধ্যান-কল্পনার ছবিটি প্রত্যক্ষ করাটা সাধনাসাপেক্ষ। সর্বোপরি শিল্পীর আপন অনুভূতির স্পর্শ ত আছেই। এতগুলি বস্তুর সমন্বয় না ঘটলে রবীন্দ্রসংগীত কেন কোনো সংগীতই গাওয়া উচিত নয়। এ-কথা ভুলে শুধুমাত্র সু-কণ্ঠকে সম্বল করে গাইতে গেলে রসসৃষ্টি ত হয়ই না। রসসৃষ্টি না হলেই কৃত্রিমতা বা একঘেয়েমো এসে পড়ে।

এই হোলো একঘেয়েমোর একটা কারণ। আর একটা কারণ হোলো—রবীন্দ্রসংগীতের বিভিন্ন ধারার বিচিত্র অধ্যায়কে অধ্যয়ন করার অভাব। রবীন্দ্রসংগীত এবং সাহিত্য কখনও এক জায়গায় থেমে থাকেনি। কবির জীবনে নানা ঘটনা বেদনার ঘাত-প্রতিঘাতে সাহিত্যের মত তাঁর সংগীতধারাও বারবার মোড় ঘুরেছে। আপন প্রতিভা, সাধনা ও অনুভবের সচেতন পরিমার্জনা দ্বারা বারবার কবি আপনার সংগীতচিন্তা ও প্রকাশকে শুদ্ধ করে নিয়েছেন। এ-সংগীত তাঁর হঠাৎ জ্বলে ওঠা দীপ্তি নয়, মননশীল অন্তরের গভীরতম আলোক-সম্পদ। এ-সত্য বুঝতে হলে শিক্ষা, চিন্তা, ও ধ্যানের প্রয়োজন একথা আবার বলছি।

কিন্তু রবীন্দ্রসংগীতের পটভূমিকা স্টাডি না করে শুধুমাত্র স্বরলিপি অনুসরণ করে গাইতে গেলে, বৈচিত্র্য উপভোগের আনন্দ থেকে শ্রোতাদের বঞ্চিত করা হয়। যেমন ধরুন 'স্বপন যদি ভাঙালে রজনী-প্রভাতে'—এখানে মপম ম সপমপ-র...সার রে সাগ মাঁড় যে ছবি ফুটে উঠল সেটা রবীন্দ্রনাথ কি বলতে চেয়েছেন না বুঝে শুধুমাত্র স্বরলিপি তুলে গাইলে ফোটানো সম্ভব কি? কিম্বা 'বিরহ মধুর হোলো'—এভাবে গাইতে গেলে গাওয়া একরকম হয়ত হোলো, কিন্তু ছবিটি হারিয়ে গেল। মাঝে মাঝে ব্লাইন্ড অ্যাসথেটিক সেন্সের ছাঁদের এক-আধবার সুন্দর হয়ে গেল পরমুহূর্তেই সেটি হারিয়ে যায়। কিন্তু বুঝে গাইলে সে দারিদ্র থাকে না।

যেমন ধরুন 'আগে চল ভাই'—গানটি বঙ্গভঙ্গ যুগের ত? এখানে সেই পরিবেশানুযায়ী সুরের আদর্শ হয়েছে আবেগ উত্তেজনা। কিন্তু পুরোনো আমাদের ধ্রুপদী অথবা রাগসংগীতেও কিম্বা দেশের দিকের প্রেম-সংগীত কি ঐ একইভাবে গাওয়া যায়? কিন্তু তবু এখন অনেকেই এভাবেই গাইছেন। সেটা আমার মনঃপূত নয়।

গান শুরু করার সময় থেকেই রবীন্দ্রসংগীতে মেয়েলিপনার অভিযোগ অনেকের কাছেই শুনে আসছি। কারণ কি? চিন্তা করে দেখলাম—আগেকার দিনে রবীন্দ্রসংগীতে মূলত মহিলা শিল্পীদের প্রাধান্য ছিল। কারণ, ঠাকুরবাড়ীর মেয়েরাই সংস্কৃতি জগতে অগ্রণী। কবি গান লিখেই আশেপাশে স্নেহের পাত্রদের শিখিয়ে দিতেন, তাঁরাই জীবন্ত স্বরলিপি হয়ে উঠতেন। তার ফলে রবীন্দ্র-সংগীতের প্রথমযুগে এক মহিলাগোষ্ঠী গড়ে ওঠে এবং তাঁদের গাওয়া গানগুলি বিখ্যাত হয়। এর পরে পুরুষেরা যখন গাইতে শুরু করলেন, তাঁরা এই পদ্ধতি অনুসরণ করার ফলে ওজস্বর্জিত এক মেয়েলী গায়নরীতি চালু হয়ে গেল। রবীন্দ্রসংগীত প্রথম গাইতে গিয়ে একটা পুরুষালী গায়কের অভাব আমায় বড় পীড়া দিত।

রবীন্দ্রসংগীতের যুগ সারা করে শুরু হোলো রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর। তাঁর প্রেম-সংগীত, ধ্রুপদী গান ইত্যাদির দিকে অন্যান্য সকলের মত আমারও আগ্রহ আছে। তবু কবির তাঁর দেশের নিজের গানের বিমূর্ত রূপই আমার মন টানে বেশী। যেমন—'এসেছিলে তবু আস নাই'—এখানে যেন শব্দগুলো রঙ হয়ে উঠে একটা ছবির সৃষ্টি করছে—এই রূপকল্পনা আমায় যেন পাগল করে দেয়।

যথার্থ জনগণের গান বলতে যা হওয়া উচিত, রবীন্দ্রনাথের গানে সে গুণ কতটা আছে তা সন্দেহাতীত নিশ্চয় নয়। কারণ রবীন্দ্রনাথ শুধু গীতিকার ও সুরকারই নন—অনেক কিছু ছাড়িয়ে তিনি রবীন্দ্রনাথ। তাঁর এই দারিদ্র ও তাঁর গানের বহুল প্রচারের সহায়ক।

এক্ষেত্রে আমার প্রশ্ন শিল্পী হয়ত আপন আকর্ষণে শ্রোতা তৈরী করে নিতে পারে। কিন্তু রসিকজনের চাহিদাও ফুটিয়ে তোলে শিল্পীর সৃজন-মানসের ফল। যতই প্রচার হোক বিশুদ্ধ রবীন্দ্র-সংগীত যথার্থ বিদগ্ধ মনের কাছে ছাড়া ঠিক জায়গায় না দিতে পারে না। উচ্চতর সাহিত্য আশা করে তার পাঠকের কিছুটা প্রস্তুতি, উচ্চতর শিল্প আশা করে দর্শকের প্রস্তুতি, তেমনই সংগীতশিল্পীরও কি কিছু চাইবার বা আশা করবার নেই? জনসাধারণের রুচি শুদ্ধতর সংগীতরসের দিকে এগোবে না সংগীত তাদের রুচির কাছে মাথা নত করবে? শিল্পী হিসাবে রসগ্রাহীদের কাছে আমার আজ এই প্রশ্ন।

অধ্যাপক প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত প্রণীত
দর্শন—তৃতীয় পত্র
মনোবিদ্যা
৬ষ্ঠ সংস্করণ—১৩·০০
অধ্যাপক বতেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত
শিক্ষা—তৃতীয় পত্র
ভারতের শিক্ষা সমস্যা
৩য় সংস্করণ—১২·০০
অধ্যাপক হালদার ও রায় প্রণীত
বি. টি., বি. এড. চতুর্থ পত্র
ভারতের শিক্ষা সমস্যা
মূল্য—১২·০০
BP ব্যানার্জী পাবলিশার্স
৫/১এ, কলেজ রো, কলিকাতা—৯ ফোন : ৩৪-৭২৩৪

বাঙলা রঙ্গমঞ্চ সম্পর্কে নতুন চিন্তা

পশুপতি চট্টোপাধ্যায়

১৯৩০ সালের অক্টোবরের একটি সন্ধ্যায় যেদিন হাওড়া স্টেশন থেকে শিশিরকুমার ভাদুড়ী তাঁর সম্প্রদায়ভুক্ত অভিনেতা ও নর্তকী দলকে নিয়ে মার্কিন মুলুকে পাড়ি দেন, সেদিন তিনি তাঁর মনের কোণে নিশ্চয়ই এই আশা পোষণ করেছিলেন, যোগেশচন্দ্র চৌধুরী রচিত 'সীতা' নাটকে রাম-এর ভূমিকায় তাঁর অভিনয়নৈপুণ্যে এবং ঐ নাটকের সার্থক প্রযোজনা দেখে মার্কিনী দর্শকরা তাঁর প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠবেন। কিন্তু ইতিহাস বলে, তা বাস্তবে ঠিক তেমনভাবে ঘটেনি। কিছুজনে বলেন, শিশিরকুমার যদি বাংলা সাধারণ রঙ্গমঞ্চ থেকে সীতার বিভিন্ন ভূমিকার জন্যে কুশলী অভিনেতা-অভিনেত্রী বাছাই করে নিতেন ও বেশ ভালো করে মহড়া দিয়ে প্রস্তুত হতেন এবং অপরদিকে 'কিটমেয়ার'-এর রঙ্গপীঠের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা প্রভৃতির মাপ জানিয়ে তার উপযোগী দৃশ্যপট প্রভৃতি প্রস্তুত করে নিয়ে যেতেন, তাহলে তিনি সেখান থেকে যশের মুকুট মাথায় দিয়ে ফিরতে পারতেন।

কিন্তু আমি বলি, তাতেও হয়তো হত না। যোগেশচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত সীতা নাটককে ১৯৩০-৩১ সালের নিউইয়র্কের দর্শকদের সামনে উপস্থাপিত করবার জন্যে যখন ঘণ্টা আড়াই-তিনের মধ্যে অভিনয় করবার মতো সংক্ষিপ্ত করে নেওয়া হল, বিভিন্ন ভূমিকায় শিশিরকুমার, নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী, নটশেখর নরেশচন্দ্র মিত্র, তিনকড়ি চক্রবর্তী, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, রবীন্দ্রমোহন রায়, বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, তুলসীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী প্রভা, কঙ্কাবতী, চারুশীলা প্রভৃতি সে-যুগের সকল বিশিষ্ট অভিনেতা-অভিনেত্রীকে অবতীর্ণ করানো হল, সখীদলে যথার্থ সুন্দরী তরুণীদের যথেষ্ট নৃত্যগীত শিক্ষা দেবার পর মঞ্চস্থ করা হল, দৃশ্য ও সাজসজ্জা অজন্তা-ইলোরার আদর্শে গঠিত হল অর্থাৎ সীতাকে সকল দিক দিয়ে সর্বাঙ্গ-সমন্বিতা করার কোনো রকম ত্রুটি রাখা হল না, তাহলেই কি বাঙলা ভাষায় অভিনীত সীতাকে সন্দর্শন করে নিউ-ইয়র্কের মার্কিন দর্শকরা সমস্বরে ধন্য ধন্য করে উঠত? মনে রাখতে হবে, সময়টা ছিল ব্রডওয়ের থিয়েটারগুলির গৌরবময় যুগ। স্তানিস্লাভস্কির প্রযোজনা প্রথার সঙ্গে মার্কিনী দর্শকরা তখন সুপরিচিত; ম্যাকস রাইনহার্ট নিজে সেখানে গিয়ে 'মিরাকল', 'নাইটস ড্রিম', 'এভরিম্যান', 'ড্যান্টনস ডেথ' প্রভৃতি নাটক প্রযোজনা করেছেন। তাছাড়া ওখানকার দর্শকরা তখন এথেল ব্যারিমোর, জন ও লাওনেল ব্যারিমুর, হেলেন হেজ, ক্যাথারিন কর্ণেল প্রভৃতি অভিনেতা-অভিনেত্রীর নাট্যকুশলতাকে প্রত্যহ প্রত্যক্ষ করছেন। এ অবস্থায় বাঙলা ভাষার মাধ্যমে শিশিরকুমারের নেতৃত্বে একটি বাঙালী নাট্য-সম্প্রদায়ের সু-অভিনয় তাদের কতখানি আকৃষ্ট করতে সমর্থ হত সে-বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ থাকাই স্বাভাবিক নয় কি? শিশিরকুমারের মতো কুশলী অভিনেতা কোনোও দেশেই ভূরি ভূরি জন্ম-গ্রহণ করেন না। দিলীপকুমার রায় এক সময়ে বসুমতীতে 'নাচঘর' সাপ্তাহিকে লিখেছিলেন, 'একমাত্র রাশিয়ার কাচালভ শিশিরকুমারের সঙ্গে তুলনীয়।' কিন্তু সংলাপকে বাদ দিয়ে ত তাঁর অভিনয় নয়। সীতার 'কার কণ্ঠস্বর' শিশিরকুমারীর 'বৎস! বৎস!' রঘুবীরের 'ভীত নহি মায়ের সন্তান, শিশু চীন সিংহ সনে যুঝে রণ', কিংবা শেষরক্ষার 'বকবো' ডাক—সবই সংলাপাশ্রয়ী। যে-সব দর্শক এই সব সংলাপের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে না, তারা তাঁর অভিনয় সৌন্দর্যের কতটুকু উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে? আমরা রুশ চলচ্চিত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনেতা চেরকাশভ-এর 'আইভান দ্য টেরিবল' এবং অন্যান্য ছবিতে অভিনয় দেখেছি। এবং তা দেখে মাত্র এইটুকু বুঝতে পেরেছি, উনি একজন ক্ষমতাশালী অভিনেতা; কিন্তু ওঁর অভিনয়জাত চূড়ান্ত রস উপলব্ধি করতে কিছুতেই পারিনি রুশ ভাষার সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় না থাকার দরুন।

'সীতা' চূড়ান্ত সাফল্যমণ্ডিতভাবে অভিনীত হলেও নিউইয়র্কের সাধারণ দর্শক তা নিয়ে কিছুতেই মাতামাতি করত না; কারণ ঐ অভিনয় তাদের মধ্যে কোনোও অভিনবত্বের উপঢৌকন বহন করে নিয়ে যেত না। তারা দেখত, তাদের সাধারণ রঙ্গমঞ্চের মতো একটি মঞ্চে দৃশ্যপট-সমন্বয়ে একটি বিদেশী নাটকের অভিনয় হচ্ছে বিদেশী শিল্পীদের দ্বারা; মঞ্চসজ্জা ও বেশবাস ভারতীয়, গান ভারতীয় সুর এবং নৃত্যে ভারতীয় ভঙ্গী। অভিনব কিছু নয়। জাপানী নো বা কাবুকী নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে আমেরিকার নাট্যাভিনয়ের যে-পার্থক্য প্রত্যক্ষ করা যায়, রাশিয়ার ব্যালের সঙ্গে আমেরিকার ব্যালের যে-তফাৎ স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর, আমেরিকার নাট্যাভিনয় থেকে ভারতীয় নাট্যাভিনয়ের তেমন কোনো পার্থক্য থাকা সম্ভব নয়। কারণ আমেরিকার নাট্যাভিনয় বা নাট্যপ্রযোজনা পদ্ধতি যে ইংলণ্ডীয় প্রথা থেকে উদ্ভূত, ভারতীয় মঞ্চাভিনয় বা মঞ্চ-প্রযোজনা পদ্ধতিও সেই একই ইংলণ্ডীয় প্রথার অনুরূপ।

এটাতো জানা কথা, বিদেশীয়ের জাহাজে চড়ে নাট্যাভিনয়ের রঙ্গমঞ্চটি আমাদের দেশে এসে পৌঁছেছে। সাঁ সুসি, ওল্ড প্লে হাউস, চৌরঙ্গী থিয়েটার, ক্যালকাটা থিয়েটার প্রভৃতির আদর্শেই প্রসন্নকুমার ঠাকুরের 'হিন্দু থিয়েটার' বা পাইকপাড়ার সিংহবাবুদের 'বেলগাছিয়া থিয়েটার' গড়ে ওঠে। এবং পরে ঐ আদর্শ পথেই আমাদের সাধারণ রঙ্গালয় 'ন্যাশনাল থিয়েটার' জন্মগ্রহণ করে। রঙ্গমঞ্চস্থাপনা রীতির বহু বিবর্তন সত্ত্বেও নাট্যপীঠ—স্টেজ, প্রসিনিয়ম প্রভৃতি আজও অটুটভাবে ইংরেজী তথা পাশ্চাত্য প্রভাবের সাক্ষ্য বহন করছে।

প্রাচীনকালে ভারতীয় হিন্দু রাজা-রাজড়ার যুগে রঙ্গপীঠ প্রভৃতির যে অস্তিত্ব ছিল, ভরত-নাট্য শাস্ত্রে তার উল্লেখ পাওয়া গেলেও এবং রামগড় পাহাড়ে তার কিছুটা ভগ্নাবশেষের সন্ধান মিললেও ইংরাজী শিক্ষিত বাঙালী যে তার থিয়েটারের প্রবর্তন ইংরেজেরই অনুকরণে করেছে, এ-কথা সর্ববাদীসম্মত।

ইংরাজী শিক্ষিত বাঙালী তার এই থিয়েটারপ্রীতি দ্বারা তার একান্ত নিজস্ব যাত্রাকে করেছে চরমভাবে উপেক্ষা। যে-শিশিরকুমারের আমেরিকা অভিযান নিয়ে এই প্রবন্ধের সূচনা, তিনিই বলেছেন, 'গিরিশবাবুরা যদি যাত্রাকে উন্নত করবার চেষ্টা করতেন, ইংরেজি নাটকের মোহে চোখ ঝলসে না যেত, তাহলে বাঙলা নাটকের চেহারা অন্য রকম হোত।' শুধু এইটুকুই নয়; তিনি একান্তভাবে বিশ্বাস করতেন, বিদেশীয় অনুকরণে গড়া বাঙলার ফ্রেমে-আঁটা থিয়েটারে বাঙালী মনীষা তথা প্রতিভার পূর্ণ বা সম্যক বিকাশ কোন মতেই সম্ভব নয়। এবং সেই জন্যেই তিনি বারংবার বলেছেন, বাঙলার নিজস্ব বস্তু যাত্রার উন্নতি ঘটিয়ে তাকে বর্তমান থিয়েটারের জায়গায় বসাতে হবে। তা নইলে বাঙালী জিনিয়াস কোনও দিনই তার পূর্ণ মহিমায় মুঞ্জরিত হয়ে উঠতে পারবে না।

আজ বার্টল্ট ব্রেখট নিয়ে আমাদের মধ্যে নতুন আলোড়ন শুরু হয়েছে। অভিনেতা সব সময়েই মনে রাখবে, সে একটি চরিত্রকে রূপায়িত করছে এবং দর্শককেও মনে রাখতে হবে, তিনি একটি অভিনয় দেখছেন, সত্য কোনো ঘটনাকে প্রত্যক্ষ করছেন না—ব্রেখট-এর এই যে থিয়োরী, যা আমরা তাঁর 'ককেশিয়ান চক সার্কেল' বা 'থ্রী পেনী অপেরা।' অভিনয়ের ভিতর দিয়ে প্রত্যক্ষ হতে দেখি, তা আমাদের দেশের যাত্রাভিনয়ে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি আমাদের বাল্যকালে, থিয়েটার খোলা মঞ্চের প্রচলনের পূর্বে। যাত্রার আসর পাতা হয়েছে দর্শকদের মাঝখানে দশ হাত বর্গ পরিমিত স্থান জুড়ে—সেখানে আছে দুখানি চেয়ার বা টুল ভেলভেটের আচ্ছাদন নিয়ে মোড়া; এই আসনে বসবেন রাজরাণী বা নাটকের সম্মানিত পাত্র-পাত্রী। এই আসরের এক পাশে বসেছেন বাদকদের দল হারমোনিয়ম, তবলা, মৃদঙ্গ, বেহালা, ফ্লুট ক্ল্যারিওনেট কর্নেট, স্যাক্সোফোন, মন্দিরা, খঞ্জনী প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র নিয়ে। অপরদিকে বসেছেন দোহারের দল, সংখ্যায় আট, দশ বা বারো। আর আসরের চার কোণ জুড়ে বসে আছেন চারজন শামলা ও চাপকান পরিহিত জুড়ী। যাত্রাপালা শুরু হবার ঘণ্টা পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই প্রথমে বাদ্যসঙ্গে ঐকতানবাদন হত সে-প্রথা আজও চালু আছে। দ্বিতীয় ঘণ্টা পড়া মাত্র দোহার ও জুড়ীরা মিলে শুরু করত নান্দীপাঠ

অভিনেত্রী অপর্ণা

জিন্দেগী জিন্দেগী/পরিচালনা—তপন সিংহ/জনৈক রূপশিল্পীর সঙ্গে তপন সিংহ, সুনীল দত্ত এবং ওয়াহিদা রহমান।

সাধনা   ফটো : অমৃত

বা দেবেশ্বরীর আরাধনা সঙ্গীত। তৃতীয় ঘণ্টায় হত আসল পালা আরম্ভ। নাটক চলতে চলতে যেখানেই নাট্যরস ঘনীভূত হয়ে ওঠে, ভাবের আলোড়নে দর্শকহৃদয় মথিত হয়ে ওঠে, দর্শকের নাটকের সঙ্গে একাত্ম হয়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখা দেয়, সেখানেই আসরের চার কোণে উপবিষ্ট চারজন জুড়ীর মধ্যে একজন দাঁড়িয়ে উঠে অভিনয়কারী কোনো চরিত্রের গুরুত্বপূর্ণ একটি উক্তিকে অবলম্বন ক'রে গান ধরেন এবং তাঁর গানকে অনুসরণ করেন দোহারেরা। এমনকি তাঁর গানের সুর অবলম্বন ক'রে এক একজন বাদ্যযন্ত্রী—কোনো বেহালা বা ক্ল্যারিওনেট বাদক—বাদ্যের মাধ্যমে তাঁর কল্পনা প্রকাশের সুযোগ নিতেন। যতক্ষণ এইভাবে গান-বাজনা চলত, ততক্ষণ আসরে উপস্থিত নট-নটীরা বিশ্রাম গ্রহণ করতেন। আসরেরই এক পাশে উপবিষ্ট হয়ে কোনো নারী চরিত্রের পুরুষ-অভিনেতাকে সকলের সমক্ষে ধূমপান করতেও দেখা যেত। এর চেয়ে বড়ো 'অ্যালিয়েনেশন'-এর প্রক্রিয়া ব্রেখটও কল্পনা করতে পারেন না।

অশিক্ষিতের হাতে পড়ে একদিন যেমন আমাদের হিন্দুধর্মের অধোগতি হয়েছিল, আমাদের বাংলা সংস্কৃতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাহন যাত্রাও তেমনি অর্ধ-শিক্ষিত এবং অশিক্ষিতদের করতলগত হয়ে বিকৃত রূপ ধারণ করেছিল। একদিন শ্রীচৈতন্যদেবের মতো ভক্ত-পণ্ডিত যে-যাত্রাভিনয়ের সাহায্যে সাধারণের মধ্যে ভক্তিরসের বন্যা বইয়ে দিয়েছিলেন, সেই যাত্রার দুর্দশার দেখা দিয়েছিল শিক্ষিত জনের চরম উপেক্ষার ফলে। আজ আবার জনসাধারণের দৃষ্টি যাত্রার দিকে আকৃষ্ট হয়েছে বটে, কলকাতার শ্রেষ্ঠ সাংস্কৃতিক নিকেতন 'রবীন্দ্র-সদন'-এও যাত্রার আসর বসছে বটে, কিন্তু শিক্ষিত সুরসিক নাট্যস্রষ্টা যতদিন না যাত্রা সম্প্রদায়ের কর্ণধার হচ্ছেন, যাত্রার যথার্থ রূপ প্রকাশের উপযোগী দৃষ্টিসম্পন্ন শিল্পীরা এই যাত্রাজগৎকে ঢেলে সাজাচ্ছেন, ততদিন আমাদের একান্ত নিজস্ব এই যাত্রাভিনয়কে আমরা গর্বের সঙ্গে বিশ্বের দরবারে উপস্থিত করতে পারব না।

যাত্রা বাংলার লোক-সংস্কৃতির একটি বিশেষ অঙ্গ। গ্রামকেন্দ্রিক বঙ্গদেশে যাত্রার আসর বসত হাটে, মাঠে, ঠাকুরতলায় এবং জমিদারবাড়ীর নাটমণ্ডপে। সেকালে যাত্রা দেখবার জন্যে দর্শককে কোনো রকম টিকিট কিনতে হত না। যাত্রাদলের ব্যয়ভার বহন করতেন স্থানীয় জমিদার বা সমবেতভাবে দোকানদার, আড়তদার প্রভৃতি ব্যবসায়ীরা। কিন্তু আজ শহরকেন্দ্রিক পশ্চিমবঙ্গে যাত্রানুষ্ঠান যেখানেই হোক না কেন, সেখানেই দর্শকরা প্রবেশাধিকার অর্জন করে অর্থের বিনিময়ে সংগৃহীত প্রবেশপত্রের সাহায্যে। প্রতিটি যাত্রা-আসরই আজ থাকে ঘেরা—আগেকার মতো অবারিত নয়। এবং শহরেও বেশীর ভাগই থিয়েটারের মতো বাঁধা মঞ্চের উপর যাত্রার আসর বসানো হয় এবং সেই মঞ্চের সম্মুখভাগের প্রেক্ষাগৃহে আসনে উপবিষ্ট থেকে দর্শকরা যাত্রা দেখেন। আগেকার মতো আসরের চারদিকে উপবিষ্ট দর্শকের মাঝে যাত্রাভিনয় হয় কদাচিৎ কোনো গ্রামে বা কোলিয়ারী অঞ্চলে। কিন্তু সেখানেও আসর করা হয় একটি ফুট আড়াই-তিন উঁচু এবং বারো থেকে পনেরো ফুট লম্বা চওড়া একটি মঞ্চ বেঁধে, যে-মঞ্চ পর্যন্ত সাজঘর থেকে একটি রাস্তা ক'রে দেওয়া হয় শিল্পীদের প্রবেশ ও প্রস্থানের জন্যে। এই মঞ্চ থেকে হাত কয়েক দূরে মঞ্চের চতুর্দিক একটি বেষ্টনী স্থাপন ক'রে তার ওপাশে দর্শক আসন স্থাপন করা হয় গ্যালারীর আকারে। সামনের কয়েক সারি হয়ত চেয়ারেও বসানো হয় দর্শকদের মধ্যে টিকিটের হারের তারতম্য অনুসারে শ্রেণী-বিভাগ করার জন্যে। কিন্তু এ ত' হল অস্থায়ী রঙ্গমঞ্চ কয়েক রাত্রি যাত্রাভিনয়ের জন্যে।

আজ এই বৈজ্ঞানিক যুগে আমাদের বাংলার নিজস্ব এই সংস্কৃতির বাহনটির জন্যে শুধু কলিকাতা মহানগরীতেই নয়, পশ্চিমবঙ্গের সকল মফস্বল শহরেই বিশেষভাবে নির্মিত স্থায়ী নাট্যশালা নির্মাণ করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। এই নাট্যশালা হবে সম্পূর্ণ গোলাকার। রঙ্গপীঠ বা মঞ্চটিও হবে সম্পূর্ণ গোলাকার এবং ত্রিশ ফুট ব্যাসবিশিষ্ট ঘূর্ণনক্ষম। মঞ্চটিকে প্রেক্ষাগৃহের ঠিক মধ্যস্থলে স্থাপন করা কিংবা এক পাশ ঘেঁষে স্থাপন করা যেতে পারে। মধ্যস্থলে স্থাপন করলে মঞ্চকে ঘিরে চারদিকেই দর্শকআসন স্থাপন করা চলবে; আর এক পাশ ঘেঁসে স্থাপন করলে মঞ্চের তিনদিক ঘিরে বৃত্তের চাপের আকারে দর্শক আসন স্থাপন করতে হবে। প্রেক্ষাগৃহের ব্যাস হবে ১২০ থেকে ১৫০ ফুট। প্রেক্ষাগৃহের বাইরে যে ত্রিশ ফুট চওড়া ঢাকা বারান্দা প্রেক্ষাগৃহটিকে বেষ্টন করে থাকবে, তার অর্ধেকটায় থাকবে দর্শকসাধারণের বিশ্রামস্থান, টিকিটঘর, শৌচাগার প্রভৃতি। বাকী সংরক্ষিত অর্ধেকটা জুড়ে থাকবে শিল্পীদের সাজঘর, বিশ্রামস্থান, অভিনয়ের জন্যে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির ভাণ্ডার, যন্ত্রী সংঘের ভাণ্ডার, কলাকুশলীদের স্থান ইত্যাদি। প্রেক্ষাগৃহের দেওয়ালে বাইরের ঢাকা বারান্দা থেকে থাকবে নীচের দিকে প্রবেশের জন্যে চারটি পথ এবং গ্যালারীর শিখরদিকে যাবার জন্যে বিশেষভাবে প্রস্তুত সিঁড়ি দিয়ে উঠে আরও চারটি প্রবেশপথ। শিল্পীদের মঞ্চ প্রবেশের জন্যে থাকবে দুটি সুড়ঙ্গ-পথ, যা থেকে সিঁড়ি দিয়ে মঞ্চে আসা যায় এবং দুটি দেওয়ালের প্রায় অর্ধেক উঁচু থেকে ক্রমে মঞ্চ পর্যন্ত ঢালু হয়ে আসা পথ। এছাড়া ট্রাপ-ডোর বা ঢাকা দরজা ইত্যাদিও থাকতে পারে। বাদ্যকারগণ মঞ্চের চতুর্দিকে বিশেষভাবে নির্মিত অপেক্ষাকৃত নিম্ন স্তরের বেদীতে বসবেন এবং তাঁদের দুপাশে দুভাগে বসবেন দোহারেরা। জুড়ীদের জন্যে গোলাকার মঞ্চের চার কোণে অর্থাৎ পরিধির চার ভাগের সমান দূরত্বে চারটি বিশেষ আসন স্থাপিত থাকবে।

মঞ্চের ফুট দশ-বারো উপরে এক বা দেড় ফুট চওড়া একটি বৃত্তের আকারে একটি কাষ্ঠ, লৌহ বা কংক্রীট নির্মিত বেষ্টনী ঝোলানো থাকবে, যা থেকে আলোক-প্রক্ষেপ করার ব্যবস্থা থাকবে। বিভিন্ন রকম শব্দ-প্রক্ষেপণ এবং অপরাপর বৈজ্ঞানিক সুযোগ-সুবিধার জন্যেও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি স্থাপনের কথাও চিন্তা করা যেতে পারে।

যাত্রাভিনয়ে আধুনিক বিজ্ঞানপ্রদত্ত সুযোগ-সুবিধার সংগত ব্যবহারকে সমর্থন জানিয়েও বলব, আমাদের যাত্রা থেকে আমাদের জীবনের সঙ্গী গানকে যেন কোনওমতে বর্জন করা না হয়। আমরা গান শুনতে শুনতে জন্মগ্রহণ করি, গান শুনতে শুনতে ধরাধাম থেকে বিদায় নিই। গান আমাদের জীবনের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। আমাদের নাটকেও গানের সুপ্রচুর প্রচলন দেখতে চাই। কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চে দীর্ঘকাল ধরে অভিনীত 'অ্যান্টনী কবিয়াল' বাঙালী সমাজে গানের জনপ্রিয়তার কথা সোচ্চারে ঘোষণা করেনি কি?

বাঙলা সাধারণ রঙ্গমঞ্চের শতবর্ষ পূর্ণ হবার আর বিশেষ দেরী নেই। ১৯৭২-এর ৭ই ডিসেম্বর থেকে আমরা যেন বিগত শতকের থিয়েটারগুলিকে চির-বিদায় দিয়ে বাঙলার মনীষার যথার্থ ক্ষেত্র বাঙালীর সংস্কৃতির যথার্থ বাহক যাত্রাকে পুনরুজ্জীবনের সংকল্প গ্রহণ করি। এবং এর মাধ্যমেই আমরা শিশিরকুমারের স্বপ্নকে সার্থক করতে পারব।

— নতুন নাটক —
সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত
কবি মণীন্দ্র রায়ের কাব্য-নাটক
নাটকের নাম ভীষ্ম
৩·৫০
শ্রেষ্ঠ নাট্যশিক্ষক, অভিনেতা ও
নাট্যকার জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়ের
চরৈবেতি : ৩·৫০
১টি সেট, ৩টি নারী চরিত্র
অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার
জোছু বন্দ্যোপাধ্যায়ের
শঙ্খবিষ : ৩·০০
১টি সেট, ১টি নারীচরিত্র
উদীয়মান নাট্যকার
অমর মুখোপাধ্যায়ের
মৃতদেহ : ৩·২৫
১টি সেট, ১টি নারীচরিত্র
জিজ্ঞাসা : ৩৩/১, কলেজ রো, কলি-৯

CENTRAL LIBRARY

হিন্দি নাট্য প্রচেষ্টা একটি সমীক্ষা

অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

থিয়েটারের ব্যাপারে ভারতবর্ষের অন্যান্য ভাষাভাষীর তুলনায় বাঙালীদের এমনিতেই বেশ কিছুটা সুপিরিয়রিটি কমপ্লেক্স আছে। এই কমপ্লেক্স থাকবার মত যথেষ্ট বাস্তব ভিত্তি আছে একথা বোঝাও খুব সোজা। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে যে-কোন ধরনের কমপ্লেক্সই যেমন স্বাভাবিকতাকে নষ্ট করে, তেমনি থিয়েটার নিয়ে বাঙালীদের এই কমপ্লেক্স ভারতবর্ষের অন্য ভাষায় নাটকের অগ্রসরমানতাকে ঠিকমত বুঝতে দেয় না। ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যে নাট্য রচনা, বোধ প্রযোজনা, সমালোচনা এবং পত্রিকা সম্পর্কে আমরা সাধারণভাবে খুব অবহিত নই, তারই ফলে অন্যান্য রাজ্যে নাট্যপ্রচেষ্টার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা নাটকের স্থান সম্পর্কেও আমরা সঠিকভাবে জানি নই। এই জানবার পক্ষে বাধা হল এই যে, মোটামুটি সব রাজ্যে থিয়েটার নিয়ে সংস্কৃতিক চর্চা করেন এমন মানুষদের উপযোগের ভাষা হল ইংরেজি। এ-ব্যাপারে সর্বভারতীয় এমন কোন ইংরেজি কাগজ নেই যা সবার কাছে পৌঁছতে পারে। দিল্লী থেকে শ্রীরাজিন্দর নাথ নামে এক সাংবাদিক যুবক (যিনি দিল্লীতে হিন্দী নাটক প্রযোজনায় একজন খ্যাতিমান নির্দেশকও) এবং শ্রী টি পি জৈন নামে আরেকজন সাংবাদিক যুবক (যিনি রাজিন্দর নাথের দলের মুখ্য অভিনেতা এবং শ্রীবাদল সরকারের 'বাকি ইতিহাস'-এর হিন্দী অনুবাদের নায়কের চরিত্রে অভিনয় করে থাকেন) 'এনঅ্যাক্ট' নামে একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশ করে থাকেন। কিন্তু তার মুদ্রণ-সংখ্যা খুবই কম। দিল্লী থেকে শ্রীনেমিচাঁদ জৈনের সম্পাদনায় 'নটরঙ্গ' নামে একটি ত্রৈমাসিক হিন্দী পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হয়, তাতে সর্বভারতীয় থিয়েটারের গুরুত্বপূর্ণ খবরগুলি পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, উত্তর ভারত ছাড়া হিন্দী ভাষা পড়া এবং লেখা সম্পর্কে আগ্রহ যথেষ্ট না হওয়ার জন্য 'নটরঙ্গ' সবার হাতে পৌঁছোয় না। আরও মুশকিল হল এই যে, কেন্দ্র থেকে যেভাবে [illegible] ভারতবর্ষের সব রাজ্যের ওপরে হিন্দী চাপিয়ে দেবার চেষ্টা রয়েছে, তাতে হিন্দী যাদের মাতৃভাষা নয় এমন সবাই মানসিকভাবে বিদ্রোহ প্রকাশ করার ফলেই এক ধরনের স্বেচ্ছাকৃত ঔদাসীন্য আছে। তামিল, তেলেগু, মালয়ালম এবং কানাড়ি ভাষায় নাটকের পরিচয় দক্ষিণ ভারতের বাইরে বিশেষ জানা যায় না। এমনকি দক্ষিণ ভারতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নৃত্যনাট্যের ভঙ্গী 'কুচিপুড়ী'ও আমাদের এদিকে তেমন পরিচিত নয়। শ্রীকালিন্দী পাণিগ্রাহী রচিত ওড়িয়ায় মঞ্চসফল নাটক 'বনহংসী' সম্পর্কে আমরা প্রায় কিছুই জানি না। অসমীয়া নাটক সম্পর্কেও তাই। শ্রীগিরিশ কারনাড় রচিত 'মহম্মদ তুঘলক' নাটকটি উর্দু-ঘেঁষা হিন্দী অনুবাদে আমাদের হাতে এসে না পৌঁছালে আমরা সে সম্পর্কেও বিশেষ কিছু জানতে পারতাম না। বছরদুয়েক আগে প্রেসিডেন্সী কলেজ ম্যাগাজিনে ইতিহাসে স্নাতক শ্রেণীতে পাঠরত একটি ছাত্রের লেখা 'মহম্মদ তুঘলক' সম্পর্কে ইংরেজীতে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। প্রবন্ধটির ভূমিকায় লেখা আছে, "লেখক অকালে ইহলোক ত্যাগ করেছেন। প্রবন্ধটিতে মহম্মদ তুঘলকের দেশ, কাল, কার্যপদ্ধতি এবং শাসনব্যবস্থাকে প্রচলিত ইতিহাস বিচারের বিরুদ্ধে নতুন আলোকে বিচার করা হয়েছে।" রচনাটি পড়ে প্রত্যয় জন্মায় লেখক বেঁচে থাকলে দেশ তাঁর কাছ থেকে ভবিষ্যতে অনেক বেশী কিছু পেতে পারতো। আশ্চর্য এই যে, তাঁর প্রবন্ধে মহম্মদ তুঘলক সম্পর্কে যে- যে কথা বলা আছে, শ্রীগিরিশ কারনাড়ের নাটকেও সেগুলি প্রায় হুবহু প্রতিফলিত। এছাড়া নাটকটির নাট্যগুণও অসাধারণ। এ-নাটকটির বাংলা অনুবাদ করে অভিনয় করলে বাংলা রঙ্গমঞ্চ একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক নাটক পেতে পারে। দুর্ভাগ্য এই যে, এই নাটকটি বাজারে মুদ্রিত পুস্তকাকারে লভ্য নয়। দিল্লীর ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামার অধ্যক্ষ শ্রীএব্রাহিম আলকাজি কেবলমাত্র তাঁর ছাত্রদের জন্য এই নাটকটির অনুবাদ করিয়েছেন এবং কয়েকটি প্রতিলিপি হিন্দী টাইপে মুদ্রিত করিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে সোজাসুজি যোগাযোগ করলে অবিশ্যি এই নাটক নিয়ে কাজ করার জন্যে প্রতিলিপি পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু তবু এই অনুবাদ তাঁর ব্যক্তিগত প্রচেষ্টারই অন্তর্ভুক্ত। কেন্দ্রীয় সাহিত্য অ্যাকাডেমী শ্রীলোকনাথ ভট্টাচার্য কৃত মলিয়র-এর 'তার্তুফ'-এর অনুবাদ প্রকাশ করেছেন। বাজারে বিখ্যাত গ্রীক নাটক 'তেক'-ও পাওয়া যায়, কিন্তু অন্যান্য রাজ্যের নাটকগুলির অনুবাদের ব্যাপারে সাহিত্য অ্যাকাডেমীর প্রচেষ্টা আদৌ উল্লেখ্য নয়। শ্রীআলকাজি তাঁর ছাত্রদের জন্য বিভিন্ন ভাষাভাষী নাটকের একটি চমৎকার গ্রন্থাগার করেছেন, তাতে অধিকাংশই হিন্দী অনুবাদ এবং কিছু

তরুণ অভিনেতা বিজয় সাহানী
—ফটো : অমৃত

ইংরেজী অনুবাদও টাইপ করে বাঁধিয়ে সংরক্ষণ করে থাকেন। সেগুলি খুবই মূল্যবান। বিদেশের প্রায় সব গুরুত্বপূর্ণ নাটকগুলিকেই তিনি হিন্দীতে অনুবাদ করিয়েছেন। অন্যান্য রাজ্যের বিভিন্ন নাটক অনুবাদেও তাঁর প্রচেষ্টা অগ্রগামী। হিন্দী ভাষায় অবশ্য শেকসপিয়রের গোটা-কুড়ি নাটক বই হিসেবে প্রকাশিত হয়ে বাজারে বিক্রী হয়। রবীন্দ্রনাথের অনেক নাটক হিন্দীতে অনূদিত হয়ে বাজারে পাওয়া যায়। শান্তিনিকেতনের শ্রীদ্বিবেদী তো বহুকাল আগেই 'রক্তকরবী'-র (হিন্দী 'লালকনের') অনুবাদ করেছেন। বিসর্জনেরও হিন্দী অনুবাদ বাজারে পাওয়া যাবে। চার অধ্যায়ের (নাটক নয়, কিন্তু বাংলাদেশে বহুরূপীর সফল মঞ্চ রূপায়ণের পর নিঃসন্দেহে উল্লেখ্য) অনুবাদ তো কলকাতায় বড়বাজারের হিন্দী বইয়ের দোকানে কিনতে পাওয়া যায়। মালঞ্চের হিন্দী অনুবাদ 'বিশ্বভারতী'ই প্রকাশ করেছেন। শরৎচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক-গুলিও হিন্দী অনুবাদে প্রকাশিত। এছাড়া যেসব নাটক একাধিকবার হিন্দীতে অনূদিত হয়ে মঞ্চসফলতা পেয়েছে সেগুলি হল শ্রীশম্ভু মিত্র ও অমিত মৈত্র রচিত কাঞ্চনরঙ্গ ও পৈসা বোলতি হ্যায়। কাঞ্চনরঙ্গ অনুবাদ করেছেন শ্রীনেমিচাঁদ জৈন। শ্রীবাদল সরকারের বাকি ইতিহাস-এর অনুবাদের কৃতিত্বও তাঁর। এবম্ ইন্দ্রজিৎ এবং শ্রীধনঞ্জয় বৈরাগীর রজনী-গন্ধা অনুবাদ করেছেন শ্রীমতী প্রতিভা আগরওয়াল। শ্রীঋত্বিক ঘটকের সাঁকো নাটকের অনুবাদ করেছেন ডঃ মহেশ্বর। প্রতিভাজী ও মহেশ্বরজীর অনুবাদগুলি প্রকাশিত হয়েছে কলকাতা থেকে। এছাড়া হিন্দীতে অনূদিত হয়েছে শ্রীবাদল সর-কারের বল্লভপুর কী কাহানী, শ্রীমোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নিষাদ। হিন্দীতে নিষাদ প্রযোজিতও হয়েছে, বাংলায় এখনও হয়নি। উল্লিখিত নাটকগুলি শুধু হিন্দীতেই নয়, ভারতবর্ষের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ভাষাতেও অনুবাদ হয়েছে, এ-ব্যাপারে মারাঠি ও গুজরাটি ভাষার উল্লেখ করতে হয়। ভারত-বর্ষের অন্যান্য ভাষার বিভিন্ন নাটক হিন্দীতে প্রচুর পরিমাণে অনূদিত হয়েছে। নটরঙ্গ পত্রিকায় প্রায়ই তার তালিকা পাওয়া যাবে। যেমন মারাঠি থেকে: 'কস্তুরীমৃগ' নাট্যকার শ্রীপুরুষোত্তম লক্ষ্মণ দেশপাণ্ডে, অনুবাদক শ্রীরাহুল বারপুতে। 'রায়গড়ের জাগৃতি' নাট্যকার শ্রীবসন্ত কানেটকর অনুবাদক শ্রীবসন্ত দেব। 'রোদের আড়ালে' নাট্যকার শ্রীবসন্ত কানেট-কর, অনুবাদক শ্রীবসন্ত দেব। 'লক্ষপতি' নাট্যকার শ্রীবিজয় তেন্ডুলকার, অনুবাদক শ্রীবসন্ত দেব। শ্রীবিজয় তেন্ডুলকারের 'চুপ, বিচার চলছে' এবং 'একটা জেদী মেয়ে' অনুবাদ করেছেন শ্রীকমলাকর সোনটক্কে এবং শ্রীবিজয় ওয়াপটে। শ্রীধানোলকর-এর 'দিনাসলা বাজীরাও', শ্রীসাঠে রচিত 'বিদ্রূপ ও কল্লোল' এবং শ্রীবিদ্যাধর পুণ্ডলীক

কালীকান্ত মৈত্রের বহু বিতর্কিত গ্রন্থ ॥ বারো টাকা

মার্কসবাদ লেনিনবাদ তত্ত্বে ও প্রয়োগে

বেনুইন-এর চাঞ্চল্যকর গ্রন্থ ॥ দশ টাকা

ওরা নকশালপন্থী কেন?

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
কালরাত্রি ৮্
বিচারক ৩্

অমরেন্দ্র ঘোষ
শত শহীদের রক্তে ৬্
অগ্নিযুগের নায়ক ৫্

অনিল রায়ের কেবলমাত্র প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য
ব্যভিচার যুগে যুগে ৮্

শেখর সেনগুপ্ত ॥ চার টাকা
নির্যাতিত নিগ্রো

শৈলেশ দে ॥ পাঁচ টাকা
ফাঁসি মঞ্চ থেকে

জরাসন্ধ বিচিত্রা ৬্

সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ
সবার প্রিয় সুভাষ — দশ টাকা
নকশালবাড়ি — আট টাকা

পি. সরকার
সমাজবিরোধী — সাত টাকা
আমি কামালপাশা — পাঁচ টাকা

বহুরূপী: জ্যোতি বসু জবাব দাও ৪্

নীহাররঞ্জন গুপ্ত: কোমল গান্ধার ৮্ নিশিবধু ৬্ মুখমহল ৮্ উত্তর ফিসন্ত ৪্ উর্বশী ৬্ মরবারী ৩॥০ নটিনী ৩্ রাগরাজিত ৩্ হেমন্তিকা ৩্ হৈমবকল্যাণ ৩্ ঘুমভাঙার গান ৩্ হলুদ বসন্ত ২্

জরাসন্ধ: অপর্ণা ২॥০
শ্যামল গুপ্ত: অনু-অন ২্ নবরাগ ৩্
বাজীরাও সেন: তন্দ্র বিহঙ্গ ৩্

(ছায়াচিত্রে রূপায়িত হচ্ছে) মানসকন্যা ২॥০ নন্দিতা ৩্
আশাপূর্ণা দেবী: দ্বিতীয় অধ্যায় ৩্ আত্মদর্পণ ২॥০ অনির্দিষ্ট ৩্ যাহা চাই তাহা ৩্

প্রেমেন্দ্র মিত্র: জেগে থাকে প্রেম ৩্ বাঁশিবাসর ৩্ রূপের নাম কুমতি ৪্ হৃদয় দিয়ে গড়া ২॥০
অবধূত: অনাহত আহুতি ৫্ সঙ্গিনী ২্ মন যারে চায় ২্

দীপক চৌধুরী: মনের মধ্যে মন ৩্
উত্তমপুরুষ: স্বর্ণমেখলা ৬্
সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ: ব্যভিচারিণী ৮্

তুলি-কলম: ১, কলেজ রো, কলকাতা-৯ ফোন: ৩৪-৮১৮০

রচিত 'চক্র' নাটকের হিন্দী অনুবাদ হয়েছে। প্রখ্যাত কানাড়ী নাট্যকার শ্রীআদ্য রঙ্গাচার্য রচিত 'শোন, জনমেজয়' নাটকের অনুবাদ করেছেন শ্রীনেমিচাঁদ জৈন এবং শ্রী বি ভি কারন্ত। শ্রীকারন্ত শ্রীরঙ্গাচার্য রচিত 'থাকবো কি?' এবং 'স্বপ্নভারত'-এর অনুবাদ করেছেন। শ্রীআদ্য রঙ্গাচার্য রচিত 'নায়ক বিনায়ক'-এর অনুবাদ করেছেন শ্রীপ্রেমা কারন্ত এবং শ্রীমীনা উইলিয়ামস।

শ্রীগিরিশ কারনাড়-এর 'মহম্মদ তুঘলক' ও 'যযাতি'র অনুবাদ করেছেন শ্রী বি ভি কারন্ত। শ্রীরসিকলাল পারেখ রচিত গুজরাটি নাটক 'শর্বিলক' এবং শ্রীশিবকুমার যোশীর 'শাপমোচন' নাটক দুটিও হিন্দীতে অনূদিত হয়েছে। 'শাপমোচন' অনুবাদ করেছেন শ্রীমতী প্রতিভা আগরওয়াল। দক্ষিণ ভারতীয় নাট্যকার শ্রী টি এন গোপীনাথ নায়ার রচিত 'পরীক্ষা' এবং 'প্রতিধ্বনি' এবং শ্রীশঙ্কর পিল্লৈ রচিত 'বন্দী' নাটক হিন্দীতে অনূদিত হয়েছে। ওড়িয়া নাটক 'বনহংসী'র হিন্দী অনুবাদ করেছেন শ্রীমনমোহন দাশ। শ্রীপ্রভাত মুখোপাধ্যায়-এর 'দেবী' (যে-গল্পটি নিয়ে সত্যজিৎবাবু ছবি করেছিলেন) গল্পটিকে হিন্দীতে নাট্যরূপ দিয়েছেন শ্রীনেমিচাঁদ জৈন। শ্রীবাদল সরকারের 'সারারাত্তির'-এর হিন্দী অনুবাদ করেছেন শ্রীমতী প্রতিভা আগরওয়াল। মোহিতবাবুর 'নিবাদ' অনুবাদ করেছেন শ্রীচন্দ্রকুমার। এছাড়াও হিন্দীতে বহু মৌলিক নাটক রচিত হচ্ছে। সেগুলি বাংলাদেশের মৌলিক নাটকের চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। 'মরণশীল জীব', 'আপনার অনুগত রাজা!' 'জিতে গেছি', 'দেওয়ালহীন বাড়ি', 'বড় খেলোয়াড়', 'তুষার প্রাসাদ', 'উত্তর প্রিয়দর্শী', 'সূর্যমুখী', 'কলঙ্কী', 'শ্রীমুর অভিমন্যু', 'চাঁদের আসর', 'দিব', 'যেরাও চক্রব্যূহে অভিমন্যু', 'মন্দ্র ভ্রমর', 'অর্ধ-চক্র' (শ্রীমোহন রাকেশ রচিত), 'জনপদবধূ' (শ্রীঅমৃতলাল নাগরের উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়েছেন শ্রীমতী প্রতিভা আগরওয়াল), 'ময়লা একটা চাদর' (রাজেন্দ্রসিং বেদীর উপন্যাসের নাট্যরূপ), 'ভূমিকম্প', 'বড়-মানুষ', 'কাঁচের খেলনা', 'ডাক্তার', 'রক্তদান' 'মমতা', 'কাঁটিনেন্ট', 'রেখা' 'অশোক' 'ধর্মরাজ' ইত্যাদি আরও বহু নাটকের নাম করা যায়। এর মধ্যে কিছু কিছু নাটক আমার ব্যক্তিগত মতে আমাদের অধুনা প্রকাশিত নাটকগুলির চেয়ে শ্রেয়। রাজস্থান সঙ্গীত নাটক আকাডেমীর ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'রঙ্গযোগ'-এও বিভিন্ন হিন্দী নাট্য-প্রচেষ্টার খবর পাওয়া যাবে। তবু বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য আকাদমী পুরস্কারপ্রাপ্ত শ্রীমোহন রাকেশ রচিত 'আষাঢ় কা এক দিন'। মহাকবি কালিদাসের কাব্যজীবন, ব্যক্তিগত প্রেম এবং রাজদরবারে সভাকবির আসনে উন্নীত হওয়ার সাফল্য ও বেদনা নিয়ে লেখা এ-নাটক। তাঁর 'লহরোঁ কী রাজহংস' রচিত হয়েছে রাজপুত্র সিদ্ধার্থের কাহিনী নিয়ে কিন্তু তাঁর সর্বাধুনিক রচনা 'আধে অধুরে' বিভিন্ন দিক থেকে বৈশিষ্ট্যের দাবী করতে পারে। একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের পটভূমিকায় রচিত খণ্ডবিখণ্ড সাংসারিক কাহিনী। কালো পোশাক পরিহিত এক ব্যক্তি এই নাটকের নায়ক। তিনি এই বাড়ীর স্ত্রীর স্বামী। পোশাক পরিবর্তন করে তিনি ঐ স্ত্রীর অফিসের অফিসার, অন্যত্র তিনিই তাঁর পূর্ব প্রণয়ী এবং সর্বশেষে তাঁর পুরুষবন্ধু। এছাড়া আর তিনজন পাত্রপাত্রী আছেন নাটকে। উক্ত স্ত্রীর দুই মেয়ে ও এক ছেলে। সামান্য কথা ও ভঙ্গীর পরিবর্তনে কিছু বিয়োজন ও সংযোজনে কেমন করে একই ব্যক্তি একজন মহিলার স্বামী অফিসার পূর্ব প্রণয়ী আর বন্ধু হয়ে উঠতে পারে এই উপস্থাপনা আশ্চর্য রকম সুন্দর। শ্রীজ্ঞানদেব অগ্নিহোত্রী রচিত 'শুতুর মুর্গ' (উটপাখী) সমসাময়িক অবস্থার ওপর কটাক্ষমূলক নাটক। শ্রীধর্মবীর ভারতীর 'অন্ধাযুগ'-এর পটভূমিকা কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের শেষ আটঘণ্টার ঘটনা। আধুনিক গদ্য কবিতায় লেখা নাটক। যুগের সিংহাসনে বসে আছেন অন্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র। সমস্ত যুগ অন্ধতার লালিত। মমতার অন্ধত্ব, জড়তার অন্ধত্ব এবং অজ্ঞানতার অন্ধত্বে প্রতিপালিত প্রজাকুল। মহানায়ক শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যু আসন্ন। মহাযুদ্ধের শেষে যুধিষ্ঠির রাজত্বার গ্রহণ করেছেন কিন্তু তিনি কিছুই করতে পারছেন না। কেননা, প্রজারা সবাই পূর্ব-শাসনের হাতে গড়া। অশ্বত্থামা পশুশক্তিতে বিশ্বাস করতেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের অভিশাপে রোগগ্রস্ত। যুযুৎসু কৌরব দল এবং দেশের ক্রেতাও সত্যকে বড় বলে করেছিলেন, তিনি মোহমুক্ত হয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন এবং সঞ্জয় যিনি ছিলেন নিরপেক্ষ জ্ঞানের অধিকারী, যুদ্ধের পর দিব্যদৃষ্টি হারিয়েছেন। এই খণ্ড-বিখণ্ড ব্যক্তিগুলিকে নিয়ে কেমন করে এক মহাযুদ্ধের শেষে মানুষ নতুন সৃষ্টির কাজে নিমগ্ন হয়ে অন্ধ যুগকে অতিক্রম করবে—এ-নাটকে তাই দিতে হয়েছে। শ্রীললিত সেহগল রচিত 'হত্যা এক আকার কী' নাটকে চারজন পুরুষ চরিত্র আছে। গান্ধীজীর হত্যার ষড়যন্ত্রের ওপর রচিত এই নাটকটি হিন্দী নাট্যরচনার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। দিল্লীর অভিযান গোষ্ঠী শ্রীরাজিন্দর নাথের নির্দেশনায় এই নাটক সাফল্যজনকভাবে অভিনয় করেছেন। 'হত্যা এক আকার কী' ছাড়াও শ্রীললিত সেহগল 'বয়নাদ', 'তামাসা', 'তিন ফরিস্তে', 'কাগজ কী দীবার' রচনা করেছেন। এছাড়া মৃচ্ছকটিকের অনুবাদ করেছেন। 'হত্যা এক আকার কী' নাটকে সংযোজিত :

ভু' মাকে পিণ্ড দনী ন আয়া,
তলা মৈনু' তোঁর সেঁাই
ভু' দেশ আজাদ কয়ারা,
তলা মৈনু' তোঁর সেঁাই
বীরাঁ তো তোপাঁ খোহ লইয়াঁ,
তলা মৈনু' তোঁর সেঁাই
মাবাঁ তো ধীয়াঁ খোহ লইয়াঁ,
তলা মৈনু' তোঁর সেঁাই

নাটকটিকে আশ্চর্য বিশিষ্টতা দিয়েছে। 'আধে অধুরে' নাট্যরচনায় শ্রীমোহন রাকেশ হিন্দী কথ্যভাষা নিয়ে ভাঙাগড়ার একটি অভূতপূর্ব গবেষণা করেছেন এবং তাতে আশাতীতভাবে সফল হয়েছেন। এই কাহিনী অবলম্বনে 'তিসরী কসম' খ্যাত চিত্র-পরিচালক শ্রীবাসু ভট্টাচার্য দিল্লীতে প্রযোজিত এই নাটকের ভূমিকালিপিতে অংশগ্রহণকারী শিল্পী ও পরিচালক শ্রীওম শিবপুরী এবং শ্রীসুধা শিবপুরীকে নিয়ে একটি চলচ্চিত্র নির্মাণ করছেন। শ্রীওম শিবপুরী দিল্লীর একজন প্রখ্যাত যুবক অভিনেতা। শ্রীইব্রাহিম আলকেজি প্রযোজিত 'মহম্মদ তুঘলক' নাটকে তিনি প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেছেন।

আগেই বলেছি, শ্রীললিত সেহগল-এর 'হত্যা এক আকার কী' নাটকটি দিল্লীতে শ্রীরাজিন্দর নাথের নির্দেশনায় উল্লেখযোগ্য মঞ্চসফলতা লাভ করেছে। এই কাহিনীটি অবলম্বনে বম্বেতে শ্রীবিমল আহুজা খ্যাতিমান অভিনেতা ডেভিডের সহযোগিতায় 'ফাইভ পাস্ট ফাইভ' নামে একটি ইংরেজী ভাষায় চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন এবং বিদেশে প্রশংসিত হয়েছেন। প্রায় প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কৃত নাটক হিন্দীতে অনূদিত হয়েছে। শ্রীমোহন রাকেশ তো স্বয়ং 'অভিজ্ঞান শকুন্তলমের' হিন্দী অনুবাদ করেছেন। এমনকি সংস্কৃত একাঙ্ক নাটক 'ভগবদজ্জুকম্'-এর অনুবাদ করেছেন শ্রীনেমিচাঁদ জৈন।

পাটনা শহরে শ্রীঅনিলকুমার মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বিহার আর্ট থিয়েটার বাংলা হিন্দী ও ইংরেজী নাটক প্রযোজিত করে থাকেন। আর্থার মিলার-এর 'ডেথ অব এ সেলসম্যান' এবং স্যামুয়েল বেকেটের 'ওয়েটিং ফর গোডো'-র ইনি হিন্দী অনুবাদ করেছেন 'এক সেলসম্যান কী মৌত' এবং 'ইন্তজার'। আয়োনেস্কোর 'রাইনোসেরাস'-এরও হিন্দী অনুবাদ ইনি করেছেন। এছাড়া এঁর রচিত হিন্দী নাটক 'পার্লার' 'জনী খিচড়ী', 'বিপ্লবী', 'কারখানা'

কথাসরিৎসাগর
গল্প বলার আসর
৮২।৭এর বালিগঞ্জ প্লেস।
কলিকাতা ঃ ১৯
ফোন ঃ ৪৭৬৪৫৯

'বহুরূপী', 'বিনা দুলহিন কী শাদী', 'হম জিনা চাহতে হৈ', 'বিন্নী' ও 'আসাম মেল' উল্লেখযোগ্য।

দিল্লীতে হিন্দী নাটক অভিনয়ের একাধিক দল আছে। তাঁদের প্রযোজনা অহিন্দীভাষীদের মধ্যেও যথেষ্ট উৎসাহের সঞ্চার করে। এ-ব্যাপারে সবচেয়ে অগ্রণী শ্রীইব্রাহিম আলকাজি নিজে। তিনি রাজা ইডিপাস', 'দি ট্রোজান ওমান' এবং আধুনিক কালে কিছু বিদেশী নাটক হিন্দী ভাষায় প্রযোজনা ছাড়াও মহম্মদ তুঘলক এবং অন্ধাযুগ নাটকটির সবিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা করেছেন। সাম্প্রতিককালে বার্লিনের অ্যাসাম্বল'-এ কার্ল ওয়েবার-এর যুগ্ম উদ্যোগে শ্রীআলকাজি প্রযোজিত বারটোল্ট ব্রেখ্‌টের 'দ্য ককেশিয়ান চক সার্কল এবং 'দ্য থ্রি পেনি অপেরা'-র হিন্দী প্রযোজনা সর্বভারতীয় স্তরে বিশেষ সুনাম অর্জন করেছে। কলকাতায় একাধিক নাটকের দল আছে। তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ 'অনামিকা'। এই দলের প্রধান নির্দেশক শ্রীশ্যামানন্দ জালান। ইনি হাই-কোর্টের অ্যাডভোকেট। জীবিকাগত কারণে বিদেশে থাকাকালীন ইনি নাট্যচর্চা সম্পর্কে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন। এঁদের প্রত্যেকটি প্রযোজনায় অসাধারণ বুদ্ধির ছাপ থাকে। এঁর মেয়ে কুমারী অভাও একজন ভাল অভিনেত্রী। শ্রীমতী প্রতিভা আগরওয়াল এই দলের একজন প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী। ইনি হিন্দীভাষায় অধ্যাপনা করে থাকেন। এঁর মেয়ে রামা আগরওয়ালও বেশ সুন্দর অভিনয় করেন। এছাড়া শ্রীকৃষ্ণ-কুমার, শ্রীকল্যাণ চট্টোপাধ্যায় এই দলের শক্তিমান অভিনেতা। কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের হিন্দী ভাষার অধ্যাপক শাস্ত্রীজীও এই দলের উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত। হিন্দীভাষী ছাড়াও বিভিন্ন নাট্য দলের সঙ্গে যোগাযোগের জন্যে এঁরা অনামিকা কলাসঙ্গম প্রতিষ্ঠা করেছেন, তার কাজও বেশ গুরুত্বপূর্ণ। এঁরা বিভিন্ন সময়ে নাটকের ওপর আলোচনা-সভার ব্যবস্থা করে থাকেন। ভারতবর্ষের গুরুত্ব-পূর্ণ নাট্যপ্রযোজনাগুলিকে অভিনয়ের জন্যে আমন্ত্রণের ব্যবস্থা করে থাকেন এবং হিন্দী নাটকের নিয়মিত অভিনয় সম্পর্কে এঁদের উদ্যম ও পরিকল্পনা খুবই প্রশংসা-জনক। এঁরা এঁদের সফল প্রযোজনাগুলি কলকাতায় একাধিকবার এবং বাংলাদেশের বাইরে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শহরে অভিনয় করে খুবই প্রশংসিত হয়েছেন।

বাংলাভাষায় ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের নাটকের অনুবাদ কিংবা অভিনয় বিশেষ হয়নি। এক সময়ে মুক্ত অঙ্গনে শৌভনিকের প্রযোজনায় 'আন্ডার সেক্রেটারী'র বাংলা অনুবাদ 'যা নয় তাই' শ্রীবীরেশ মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীমতী নিবেদিতা দাসের উদ্যোগে অভিনীত হয়েছে। প্রযোজিত হোক আর না হোক ভারতবর্ষের অন্যান্য ভাষার নাটকগুলিকে বাংলা নাটকের নিজস্ব স্বার্থেও অনুবাদ করলে আমাদের পক্ষে ভাল হবে। এতে আমরা সর্বভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা নাটকের সঠিক স্থান নির্দেশ করতে পারবো। কেউ এ-ব্যাপারে উদ্যোগী হলে সঙ্গীত নাটক আকাডেমীর সম্পাদক ডঃ সুরেশ অবস্থি সাহায্য করতে আগ্রহী। তিনি অর্থ সাহায্য এবং প্রকাশনার ব্যাপারে সবরকম সাহায্য করতেই প্রস্তুত। কিন্তু এই প্রবন্ধের শুরুর দিকে উল্লিখিত কারণ-গুলির জন্যে এ-ব্যাপারে কাজ এখনও কিছুই এগোয়নি, এবং সর্বভারতীয় ক্ষেত্র নাট্যপ্রচেষ্টার ব্যাপারে আমাদের অজ্ঞতা দূরীকরণের কাজ বহুল পরিমাণে বাকী রয়ে গিয়েছে।

ভারতবর্ষের অন্যান্য ভাষার নাটকের বাংলা অনুবাদ করতে হবে আমাদের নিজেদের স্বার্থেই; যে-স্বার্থে বাংলা নাটক অন্যান্য ভাষায় অনূদিত হচ্ছে সেই একই কারণে। ইতিমধ্যেই অন্যান্য ভাষায় বাংলা নাটকের অনুবাদের কাজ আমাদের গ্রহণ করা উচিত ছিল, কিন্তু সে-কাজ আগ্রহী ব্যক্তিরা আগেই গ্রহণ করেছেন। সুনাম কি পুরস্কারের লোভে নয়, বাংলা নাটকের নিজস্ব স্বার্থেই এই অনুবাদের কাজ অনেক বেশী করে গ্রহণ করা উচিত। এ-ব্যাপারে কলকাতায় রবীন্দ্রভারতী নাট্য-বিদ্যালয়ের উৎসাহ অনেক বেশী কার্যকর হতে পারে। বাংলাদেশে তো এপর্যন্ত জাতীয় নাট্য-শালা প্রতিষ্ঠিত হল না, নইলে সেখানেও কিছুটা কাজ হতে পারতো। এখন বাংলা-দেশে তুলনামূলকভাবে অনেকগুলি বিদেশী নাটক অনূদিত ও অভিনীত হচ্ছে। আবার অনুবাদের কথা তুললেই মৌলবাদীরা আঁতকে উঠবেন। তবু মৌলিক নাটক যে কী বস্তু তা বোঝার জন্যেও ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষার নাটকের অনুবাদ আমাদের সাহায্য করবে।

আমাদের বাংলাদেশে কয়েকটি নিয়মিত মঞ্চ আছে। হিন্দী থিয়েটারের জন্যও অনেকগুলি মঞ্চ সারা ভারতবর্ষব্যাপী তৈরী হয়ে গেছে। এখনও ওঁদের প্রযোজনা সাধারণভাবে বিদেশের বিভিন্ন প্রযোজনার মুখাপেক্ষী। এখনও ওঁদের প্রযোজনাগুলি ওঁদের ঐতিহ্যের সঙ্গে সার্থকভাবে যুক্ত হতে পারেনি। এখনও ওঁরা নিঃসন্দেহে ভারতবর্ষের অন্যান্য ভাষার নাটকের চেয়ে বাংলা নাটককেই সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান দিয়ে থাকেন। এ-কথা সত্যি যে, বাংলা নাটকের শুরু থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত নাট্যঐতিহ্য সৃষ্টিকারী তেমন বড় নাট্যকার হিন্দীতে এখনও আসেননি, কিন্তু প্রযোজনার ক্ষেত্রে ওঁদের অসাধারণ সাফল্য এবং নাট্যরচনা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে ওঁদের বিরাট ও ব্যাপক কর্মকাণ্ড অদূর ভবিষ্যতে ওঁদের নিজস্ব প্রথার আসনটিকে আবিষ্কার করতে সাহায্য করবে।

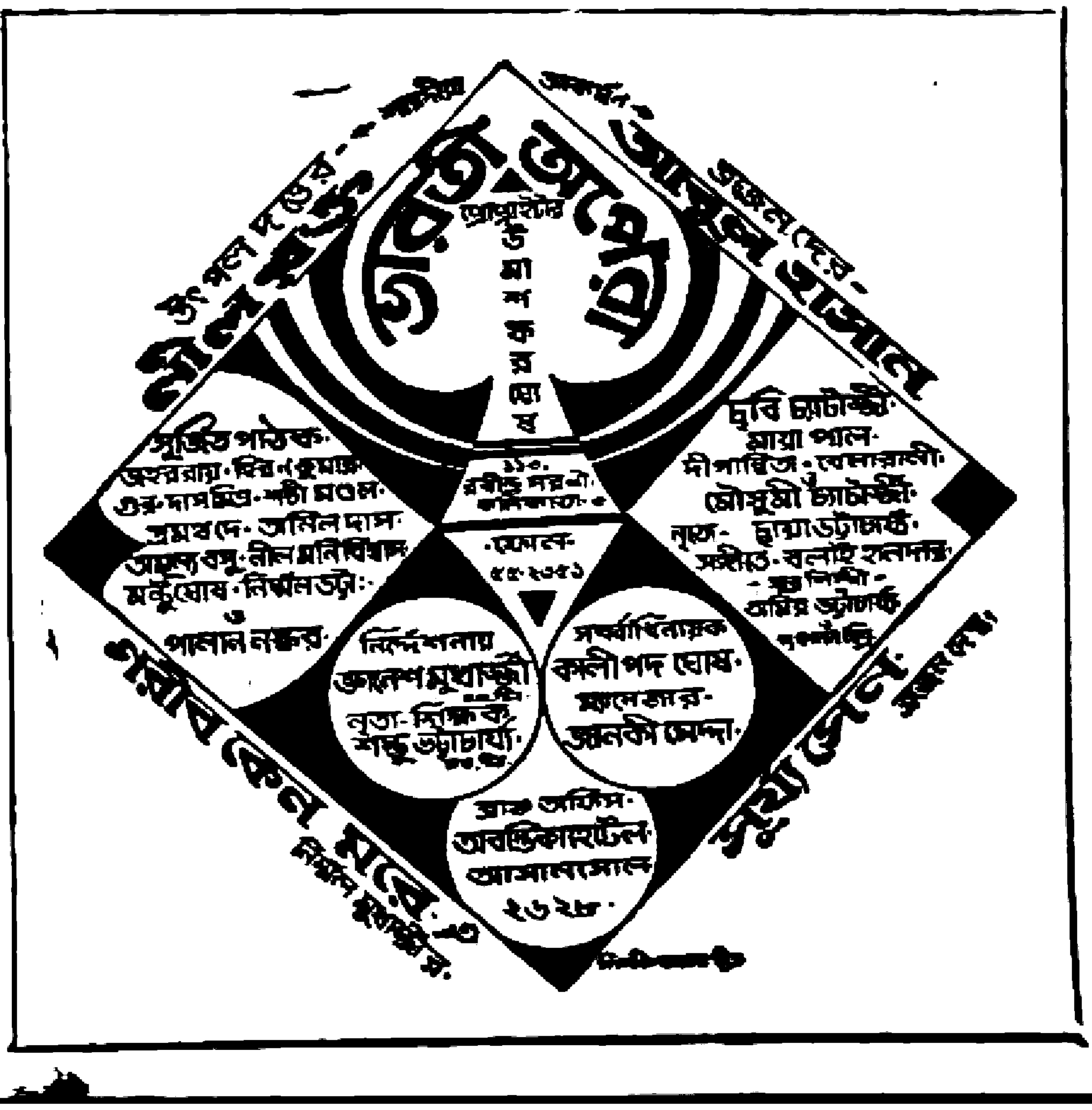

আমিই লেনিন

শান্তিগোপাল

সামনে পর্দা। নেপথ্যে কণ্ঠস্বর—

১৮৭০ খৃঃ ১০ই এপ্রিল থেকে ১৯২৪-এর ২১ জানুয়ারী পর্যন্ত মানব-ইতিহাসের একটানা এক অধ্যায়—একটি অবিস্মরণীয় যুগ। কিন্তু এই ৫৩-৫৪ বছরের মাঝেই এর অস্তিত্ব শেষ হয়ে যায়নি। মানব-সভ্যতা যতদিন থাকবে ততদিন এই ক' বছরের ইতিহাস প্রতিবার নতুন করে মানুষের হাতে এসে নতুন প্রেরণা দেবে, আর বিশ্বমানবসত্তা শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণ করবে সেই যুগন্ধর পুরুষকে, যিনি আদিম পৃথিবীর শোষণ-জগদ্দলটা সর্বপ্রথম সরিয়ে নিয়েছিলেন সর্বহারাদের বুকের ওপর থেকে। সেই কীর্তিমান শুধু রাশিয়ার নন, সর্বজাতির, সর্বকালের গৌরবের ও গর্বের ধন। তিনি ভলোদিয়া—তিনি ভ্লাদিমির উলিয়ানভ—আমাদের আদরের 'লেনিন'।

'লেনিন ভেঙেছে বিশ্বে জনস্রোতে
অন্যায়ের বাঁধ,
অন্যায়ের মুখোমুখি লেনিন জানায় প্রতিবাদ
মৃত্যুর সমুদ্র শেষ ; পালে লাগে
উদ্দাম বাতাস,
মুক্তির শ্যামল তীর চোখে পড়ে,
আন্দোলিত ঘাস।
লেনিন ভূমিষ্ঠ রক্তে ক্লীবতার কাছে
নেই ঋণ,
বিপ্লব স্পন্দিত বুকে মনে হয়
আমিই লেনিন।'

—হাঁ আমিই লেনিন।

সরে যায় মঞ্চের পর্দা। অজস্র, অগণিত শ্রোতা। শহরে শহরে গ্রামে গ্রামে পৌঁছে গেছে লেনিনের ডাক। দেশে-দেশে এই মানুষটি যেন নির্যাতিত মানুষের আত্মার আত্মীয়। ৩৫০ কোটিরও বেশি মানুষের বাস এই গ্রহে। লেনিনের নাম শোনেননি, এমন মানুষ আছেন সংখ্যায় খুব কমই। লেনিনের নাম জড়িত ১৯১৭ খৃঃ অক্টোবর বিপ্লবের সঙ্গে। এই বিপ্লব পৃথিবীর চরিত্র বদলে দিয়েছে। শুধু রাশিয়ার জন্য নয়, এই বিশ্বের সমগ্র মানব জাতির জন্য সমাজতন্ত্রের পথ উন্মুক্ত করেছে। লেনিন লড়াই করেছিলেন কাদের জন্যে? যারা নিজেদের শ্রমের দ্বারা পৃথিবীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানে অবদান যোগায় এবং তার বৈষয়িক আত্মিক সম্পদ বৃদ্ধি করে তাদেরই সুখের জন্য। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের প্রতিষ্ঠাতা কার্ল মার্কস ও ফ্রেডরিক এংগেলসের পর আর কেউ সেই লক্ষ্যের জন্য এমনভাবে লড়াই করেনি।

লেনিন চরিত্রাভিনয়ের কথা শুনে হতবাক্ হয়েছিলাম প্রথমে। চিন্তার যে মানুষের পরিধি আমার অকল্পনীয়, তাকে আমি ধরব কিভাবে। তবুও পিছিয়ে পড়বার মত মন আমার নয়। প্রতিটি মুহূর্তের চিন্তা হোল তখন লেনিন। সেই সঙ্গে সাধ্যমতো পড়াশুনো। রাশিয়ার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা, লেনিনের ভূমিকা, অভ্যুত্থান, বিপ্লবের পটভূমি, বিপ্লব ও পরবর্তীকাল সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে জানবার চেষ্টা করলাম। সেই সঙ্গে পড়েছি অসংখ্য লেনিনের জীবনী। ছবি

দেখেছি। বোঝবার চেষ্টা করেছি মানুষ লেনিনকে। কথা বলবার ধরণ, চলা-ফেরার স্বাতন্ত্র্য, পোশাক পরিচ্ছদ, মুদ্রাদোষ আরো অনেক কিছু—যা নিয়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে একটি মানুষ। তাকে নিজের মধ্যে ফোটাবার আপ্রাণ চেষ্টা করলাম। সে এক নিদারুণ অধ্যবসায়—প্রতিটি ব্যর্থতা এনে দিয়েছে নতুন করে জানবার আগ্রহ।

তারপর একদিন মঞ্চে, আমি লেনিন হয়ে গেলাম। সে দিনগুলো, রাতগুলো, আজ স্বপ্ন। আবার আমার ফিরে যেতে ইচ্ছে করে মানুষের মাঝখানে। মঞ্চে শান্তিগোপাল আর লেনিন সেদিন একাকার। সামনে বসে অজস্র জনতা। দূর দূর অঞ্চল থেকে এসেছে ওরা। কী অসীম আগ্রহ। কী নিদারুণ প্রতীক্ষা। ঘন্টার পর ঘন্টা কেটে গেছে, তবু জায়গা থেকে নড়েনি কেউ। মনে হোত ঐ যে অগণিত শ্রোতা ওরা আমার দেশের বঞ্চিত অবহেলিত শোষিত মানুষ। ও'রা এসেছে নতুন দিনের কথা জানতে। একটি মানুষের সংগ্রাম-মুখর জীবন ওদের কাছে আজ বাস্তব। সে মানুষ লেনিন। আর সেই মুহূর্তে আমিই লেনিন।

*

হ্যাঁ, আমিই লেনিন।

কমরেড্‌স! বুকের রক্ত দিয়ে আমরা জয়ী হয়েছি। সেই রক্তে রাঙা হয়েছে আমাদের নিশান। এই নিশান হাতে নিয়ে এবার থেকে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে সামনের দিকে, হাতে হাত রেখে, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে। সারা দেশে কোথাও থাকবে না শ্রেণীভেদ, দারিদ্র নির্বিশেষে সব রকমের পরই পাবে সমান মর্যাদা। জড়তার বিরুদ্ধে, অজ্ঞানতা, সংকীর্ণতা, ক্লীবতার সংগ্রাম—আমাদের বিপ্লব। এই আনন্দের জোয়ারে কোনওদিন ভাটা না পড়ে। এই প্রাণোচ্ছলতার উন্মত্ততা যেন কোনও দিন স্তিমিত না হয়। এই বিপ্লবের আগুন যেন কোনওদিন না নিভে যায়।

সত্যিই তো বিপ্লবের আগুনে যাতে নিভে না যায়, সে দায়িত্ব শ্রমিক কৃষকের সংগে শিল্পীর ওপর দিয়ে গেছেন লেনিন। এই কথাটি বারবার আমার মনে পড়ত। একটি কথাই তখন ভেবেছিলাম লেনিন রাশিয়ায় যে দুরবস্থার অবসান ঘটাতে চেয়েছিলেন দুর্ধর্ষ শাসকদের উৎখাত করে, আমাদের দেশের অবস্থা কি তার থেকে এমন কিছু উন্নত? এদেশের মানুষও না খেয়ে মরে, এদেশেও বাবা মা পয়সার অভাবে লেখাপড়া শেখাতে পারে না সন্তানকে। পারে না নিদারুণ রোগ-যন্ত্রণা থেকে মুক্তির জন্য ওষুধ সংগ্রহ করতে, বুভুক্ষু মানুষের মিছিল শুধু শহরে নয়, গ্রামেও চোখে পড়বে। তাই আজ আমার কাছে লেনিনের স্বপ্ন বড় বাস্তব হয়ে ওঠে। হারিয়ে ফেলি নিজেকে। ভুলে যাই অর্থ, যশ। উন্মাদ হয়ে যাই যেন মুহূর্তে, মুহূর্তে।

যাত্রা জগতে আমার প্রথম প্রবেশ 'উদয়াচলে'। এই সংস্থার নানান বই-এ অভিনয় করেছি। অতি সাধারণ সে সব চরিত্র। তবুও নিজেকে তৈরী করার দিক থেকে, সে সব দিন ছিল আমার চরম শিক্ষার দিন। বেশ কিছুকাল পরে তরুণ রায়ের ওখানে শিখেছিলাম মঞ্চাভিনয়ের কলা-কৌশল। বাঞ্ছিত ধারণা, যে কোন অভিনেতাকে তার অভিনয় মাধ্যমের সামগ্রিক দিক সম্পর্কে পূর্ণজ্ঞান অর্জন করতে হবে। বুঝতে পারি না, তা না হলে, কি করে একজন শিল্পীর পূর্ণ বিকাশ সম্ভব।

অনেক পরে এলাম নিউ রয়েল বীণাপাণি অপেরায়। মাসিক মাইনে সাট টাকা। নতুন বইয়ে একটু বেশী গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয়ের সুযোগ পেলাম। সে সব দিনগুলি যেন, ছবির মত সাজান। নির্জনে যখন অতীতকে ভাবি, তখনই তারা জীবন্ত হয়ে ওঠে।

আজ থেকে তের বছর আগে 'রূপ-কুমার' পালায় রঘু ডাকাত চরিত্র পেলাম। সেই আমার প্রথম মুখ্য-চরিত্রাভিনয়। কিছু খ্যাতি পেলাম। কিন্তু তখন যাত্রা-জগতে বড় বড় অভিনেতা। তাদের টপ্‌কে যাওয়ার দুঃসাহস ছিল না। নানা প্রতিকূল আব-হাওয়া আমাকে কিছুটা বিভ্রান্ত করে ফেলল। তবুও শ্রদ্ধেয় পঞ্চু সেন আমাকে ভাগের বলি পালায় কঙ্ক চরিত্রে অভিনয় করতে দিলেন।

তারপর চন্দ্রাবলীতে জয়চন্দ্র। অভিনয় করে সামান্য স্বীকৃতি মিলল। তবুও যাত্রা জগতের প্রচলিত নায়ক চিন্তার থেকে আমি তখন অনেক দূরে। স্বপ্ন দেখছি সেই সিঁড়ি বেয়ে ওঠবার। নানা প্রতি-কূলতার মধ্যে নট্ট কোম্পানীতে যোগ দিলাম। জাহান্দার শায় মিরোকলা অভিনয় আমার জীবনের একটি স্মরণীয় ঘটনা। এই চরিত্র অভিনয় করে বহু দর্শকের অভিনন্দন পেয়েছি। কিছুটা তৃপ্তি তো বটে। আবার ফিরে গিয়ে নিউ রয়েল বীণা-পাণি অপেরায় যুযুৎসু পালায় অভিনয় করলাম।

তারপর এলাম তরুণ অপেরায়। তরুণ অপেরাই আমার জীবনে স্মরণীয় অধ্যায়। পরপর কয়েকটি পালায় মুখ্য চরিত্রাভিনয়ের সুযোগ পেলাম। রক্তের নেশা, শেষ অঞ্জলি, মেঘে ঢাকা রবি, ঘুম ভাঙার গান, হিটলার, লেনিন, রাজা রামমোহন, নেপোলিয়ান রমলা সার্কাস। হিটলার-এ অভিনয় রাম-মোহন অভিনয় থেকেও জনপ্রিয় হয়েছিল। নেপোলিয়ন এবং রমলা সার্কাস এখনও পরীক্ষার স্তরে। নিজস্ব বিশ্বাস, লেনিনই বোধহয় আমার সাম্প্রতিক অভিনীত শ্রেষ্ঠ চরিত্র। চারদিকের জীবন দেখে প্রত্যেকের মধ্যে একটি স্বপ্ন, আশা, ইচ্ছা যাই বলুন না, কিছু একটা করবার প্রেরণা জাগে। সেই প্রেরণায় কাজ করে যায় মানুষ। অভিনেতাও নিজের চরিত্র-ধর্ম অনুযায়ী উপযুক্ত চরিত্র পেলে তবেই হয়ে ওঠেন সার্থকময়। আমার মনে হয় লেনিন চরিত্রে হয়ত তেমন কিছুই আমি পেয়েছিলাম। আমার অন্তরঙ্গরা কেউ কেউ বলেছেন, আজ যে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেলেন, হয়ত আপনার ডাক পড়বে সিনেমায়। সে তো খুবই আনন্দের। কিন্তু তারা মনে রাখবেন, যাত্রা-জগতের যে সব শিল্পী আমার সংগে অভিনয় করে আমার সফলতাকে বিকশিত করেছেন, তাদের কি আমি ভুলতে পারি। আমি জানি যাত্রায় যেমন প্রচুর অর্থ,

এক তরুণ নাট্যকার ও তার যাত্রা সংস্থার বাস্তব জীবন কাহিনী—

সমস্ত নতুন মুখ নিয়ে দুঃসাহসিক অভিযান

শ্রেঃ—অনিল : সন্ধ্যা : সলিল : অরুন্ধতী : মন্মথ : শেফালি : রবী
বালা : প্রদ্যুম্ন : চিত্রা : শম্ভু : মায়া প্রমুখ ও
বিশেষ চরিত্রে— অনুপকুমার : জ্ঞানেশ মুখার্জী : অরুণ মুখার্জী।
কাহিনী : মধু বানার্জী। সঙ্গীত : সত্যদেব চ্যাটার্জী। সম্পাদনা : [illegible]।
আলোকচিত্র : সুবোধ বানার্জী। রূপসজ্জা : দুর্গা চ্যাটার্জী।
শব্দ গ্রহণ : জে. ডি. ইরানী ও অনিল তালুকদার।
শিল্প নির্দেশনা : গৌর পোদ্দার। প্রধান সহকারী পরিচালক : সুবোধ দে।
ব্যবস্থাপনা : বিনু রায়। স্থির চিত্রগ্রহণ ও প্রচার : তপন ঘোষ।
নেপথ্য কণ্ঠসঙ্গীত : মান্না দে - সুতপা মুখার্জী - শিবু ভট্টাচার্য
নীনা মজুমদার - ললিতা ও মনোজ ভট্টাচার্য।
—প্রগতি চিত্র নিবেদিত ও পরিবেশিত—

যেমন আছে দারিদ্র্য। অন্যের সম্পদের ভাগ করে আমি কোথাও খাওয়ার জায়গায় যেতে পারি না। বর্ষায় কলপুরে আমাদের কোন কাজ থাকে না। একমাত্র সেই সময়ই আমি সিনেমায় অভিনয় করব। অন্য সময় যাত্রা। কারণ, এই যাত্রা আমার ধর্মীয় মূল। আগে যাত্রা তারপর সিনেমা। বিপুল ঐশ্বর্যের মোহ আমার নেই। আমি জানি কোন শিল্পীর পক্ষেই এমন বিকাশ সম্ভব নয়। ঐ সব দুঃস্থ দারিদ্র্যের সহযাত্রীদের জীবনেও আজ এসেছে নতুন দিনের স্পন্দন, শিহরণ। প্রত্যেকের মধ্যে জেগেছে আত্ম-মর্যাদা। ওদের সামনে নতুন স্বপ্ন। নতুন দিনের ইশারা। একজন তরুণ কবির ভাষায় বলতে পারি—

আজ আমরা
নবকালের ঘোড়সওয়ার,
আমাদের দুনিয়া
বদলাচ্ছে
বদলে যাচ্ছে!

কমরেডস,
এগিয়ে চলার আওয়াজ তোল!
প্রজ্জ্বলন্ত সূর্য
করুক করুক
অগ্নিবর্ষণ!
জীবন
সামনে আমাদের জীবন,
তার ভবিষ্যৎ সংগী লেনিন,
আর ভবিষ্যৎ
সংগী যৌবন!

নবনাট্য আন্দোলন ও একটি প্রশ্ন

দিলীপ মৌলিক

চোখ ও মনের অজানা আকাশটা যদি হঠাৎ একটি বিস্ময়ের দোলা জাগিয়ে অতল গভীরতার নতুন করে প্রাণময় হয়ে ওঠে, তখন চমক জাগে প্রাণের সোনালী সমুদ্রে। বিমুগ্ধ হয়ে তখন ভাবি, এই আলোড়নেই চিরন্তনের হবে সেতুবন্ধন; কিন্তু এই অনুভূতি সত্য হয়ে ওঠে তখনই যখন এই আকস্মিকতার আবেগ জীবনের বাস্তব বেগের নিবিড় সান্নিধ্য লাভ করে। দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে নানা রকম শৈল্পিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে যে নতুন চিন্তার জোয়ার নাট্যানুরাগীদের মানসিকতাকে আপ্লুত করেছে, তার উচ্ছ্বসিত আমেজটা কতটা আজকের প্রশ্নবিদ্ধ জীবনকে উদ্বেল করতে পেরেছে; সীমানাবিহীন প্রতিটি প্রান্তরে প্রসারিত প্রতিটি মানুষের জীবনকল্লোল কতটা আভাসিত হয়েছে এই অন্য ধরনের থিয়েটারের নতুন আলোয়, তার নিরিখেই নাট্য-আন্দোলনের বা প্রগতিশীল নাট্যচর্চার মূল্যায়ন হবে। অচেনা আকাশটার বুকে জীবনের সুখ-দুঃখের মেঘ এনে দিলেই, চেনার বলার দিগন্ত মিশে যায় মাটির মমতায়। এই সত্যের আলোতেই বিচার করা যাক, দেশের সাধারণ মানুষ আর নাট্যচর্চার গণ্ডী, এর মধ্যে পরিচিত কতটা অন্তরঙ্গ হতে পেরেছে।

ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক নাটকের অতিরঞ্জিত ও অতিনাটকীয় পরিবেশ থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে এসে 'নবান্ন' যেদিন নতুন এক স্বাদ বাংলার নাট্যমঞ্চে এনে দিল, সেদিন থেকেই ধ্বনিত হল বাংলা থিয়েটারের রূপান্তরের বিপ্লবাত্মক পদক্ষেপ। নীলদর্পণের মধ্যে যার সূচনা নবান্নের মধ্যে তা সুপ্ত সম্ভাবনায় মুখর হয়ে উঠল। নবান্ন থেকে শুরু করে দেশের মঞ্চবিবর্তন কর্ম ও কনটেন্টের দিক থেকে বিপ্লবের ছন্দেই এগিয়েছে সন্দেহ নেই। নাটক করা যাঁদের পেশা নয়, তাঁদেরই শিল্প-চর্চার নিষ্ঠায় দেশের নাট্যলোক রূপান্তরের আলো পেয়েছে। দেশের সার্বিক শিল্প-সংস্কৃতির ইতিহাসে এটা একটা নিঃসন্দেহে গৌরবান্বিত অধ্যায়।

আজকের থিয়েটার সম্পর্কে যে অদম্য উৎসাহ ও অশ্রান্ত কৌতূহল জেগেছে, তার মূলে আছে বিভিন্ন ধরনের নাট্য-প্রযোজনা ও আঙ্গিকের চমকপ্রদ ব্যবহার। বিদেশী নাটকের অসংখ্য রূপান্তর লোকের পরিচিতির সীমা প্রসারিত করেছে এবং পরিবেশের স্বাতন্ত্র্যে চমকও জাগায় মনে। এপিক শো, অ্যাবসার্ড নাটক ও রূপক নাটক প্রভৃতি বিভিন্নমুখী নাট্য-নিরীক্ষায় বিপ্লবও আসছে চিন্তার জগতে। কিন্তু এখন প্রশ্ন হল, এই বিপ্লবের স্বরূপ কি দেশের প্রতিটি দর্শকের মনে স্পষ্টতা পেয়েছে বা তা প্রাণের গভীরে তুলেছে আন্দোলন? এই প্রশ্নের সামনে আজ বলিষ্ঠভাবে মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াতে হবে। তার কারণ দেশের বহু সাধারণ লোক এই নাট্যচর্চার স্বাদ পাচ্ছে না, বহু ক্রুদ্ধ কণ্ঠ মুখর হয়ে উঠতে শুনছি—'এ কি নাটক? আমরা কোথায়? আমাদের জীবন কোথায়?' যাঁরা এ কথা বলছেন, তাঁদের মনোবৃত্তি বা অনুভূতিকে পুরাতনপন্থী বা অগভীর বলে উড়িয়ে দিলে চলবে না, বরঞ্চ তাঁদের এই ক্ষোভের নেপথ্যে সত্যতা আছে কিনা, তাকেও বিচার করে দেখতে হবে। নচেৎ নাট্য-আন্দোলন একটি বিশেষ শ্রেণীর 'ইনটেলেকচুয়াল' দর্শকেরই উপলব্ধির সামগ্রী হবে, দেশের জনসাধারণ সে সম্পদ থেকে হবে বঞ্চিত। সে বঞ্চনা কিন্তু শিল্প-সংস্কৃতির ইতিহাসে মোটেই কাম্য নয়।

একটা কথা কিন্তু খুব সত্য যে, আজকের নাটক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে প্রচণ্ড পরিমাণে একটি বিদগ্ধ শিল্প-বোধ কাজ করছে, যার ফলে মানসিকতার একটি উঁচু স্তর থেকে আলো জেলে মননের আবেগ আনা হচ্ছে নাট্য-নিরীক্ষায়। অবশ্য পুরনো চিন্তার গ্রন্থি-মোচনের এই শৈল্পিক অনুরাগই প্রয়োজন। কিন্তু শিল্পের প্রাণময় ভিত্তি বাস্তব জীবনেরই গভীরে, এ সত্যটা ভুলে গেলে চলবে না। সাগর পারের নাট্য-সাহিত্য থেকে ব্রেখট, পিরানদেলো, চেকভ, আয়ানেস্কো, আনৌয়িল, ওনীল, আর্থার মিলার প্রভৃতি নাট্যকারদের সৃষ্টিকে আমাদের দেশের দর্শকদের সামনে আজ মঞ্চের আলোয় দেখান হচ্ছে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বিদেশী চরিত্রগুলো দেশের জল হাওয়ার আমাদের মত হওয়ার চেষ্টা করে, কিন্তু সে চেষ্টা সবক্ষেত্রে কতটা সার্থক হয়, সে বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। আসল কথা হল প্রতিটি দেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ কোন না কোন ব্যাপারে ভিন্ন। তাই ইটালী বা জার্মানীর একটি চরিত্রকে যখন বাংলার আলো, হাওয়ার স্পন্দন দেওয়া হয়, তখন সে বাঙালী হতে গিয়েও পরিপূর্ণভাবে বাঙালী হতে পারে না, আবার ইটালী বা জার্মানীর প্রাণসত্তা হারায়। শেষ পর্যন্ত বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে একটি মিশ্র চরিত্রের মানুষ হয়ে দাঁড়ায়।

তাহলে কি এই সব নাট্যকারদের সান্নিধ্যের কোন অর্থ নেই? নিশ্চয়ই আছে, তবে এঁদের নাটকের চরিত্রগুলোর মত আমাদের দেশের মাটিতেও বহু চরিত্র মুঠো-মুঠো অনুভূতি নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদেরও ধরতে হবে নাটকে। দেশের মানুষ মঞ্চের আলোয় নিজেকে আন্তরিকভাবে চিনলেই, পরে সেই নিজেকে চেনার নিবিড় তার অন্য দেশের মানুষকে চিনে নেবে জানার নতুন উদ্দীপনায়। রূপান্তরিত নাটকের বিরোধিতা করতে চাইছি না, শুধু বলছি আমাদের দেশের বহু প্রান্তরের জীবন্ত সমস্যা উপেক্ষিত আছে আজকের নাটকে। জীবনধর্মী নাট্য-প্রযোজনা কি আমাদের দেশের এই জীবনকে বাদ দিয়ে সম্ভব? এই জীবনের কথা না বলে এক-মাত্র বিদেশের জীবনচর্যার শরণাপন্ন হওয়ার মধ্যে কোন গভীরতর শিল্পসত্য লুকিয়ে থাকতে পারে, সেটা সূক্ষ্মভাবে ভেবে দেখার সময় আজ এসেছে।

অ্যাবসার্ড নাটকের প্রযোজনা আজকের নাট্যচর্চার একটি বিশিষ্ট অধ্যায়। অদ্ভুত উদ্ভট গল্পের মধ্য দিয়ে নাট্যসংঘাত তৈরী হয় এবং দর্শককে আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব এক সত্যকে বিশ্বাস করে নিতে হয়। এ নাটকের নায়ক এক আগন্তুক; যে ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত ও ক্লান্ত; যার কাছে এই চলমান পৃথিবীর কোন অর্থ নেই, একটা শূন্যতাই এর একমাত্র শোভা। এই ধরনের এক বাস্তববিচ্ছিন্ন নায়কের আর্তনাদ 'আমার কণ্ঠনালীতে সবটা আটকে গেছে' অ্যাবসার্ড নাটকের সীমানা জুড়ে আছে। কামু, আয়ানেস্কো যাঁরা এই বিশিষ্ট নাট্যচর্চার পথ উন্মুক্ত করে প্রযোজনা এবং শিল্প-সৃষ্টির ইতিহাসে এক নতুন পদক্ষেপ চিহ্নিত করতে চেয়েছিলেন, তাঁদের সৃষ্টিকে সামনে রেখেই বাংলা দেশে এই ধরনের নাটক মঞ্চস্থ হচ্ছে। কিন্তু প্রশ্ন হল মানসিকতার দিক থেকে এ দেশের দর্শক

[illegible] আসেন, পরিচালনা : [illegible] ও [illegible] ফটো : অমৃত

কি আয়োনেস্কোর 'আমেদি' অ্যাবসার্ড স্টোরিকে বাস্তব জীবনে গ্রহণযোগ্য শিল্প-সত্য বলে মেনে নিতে পারছে? যে কটি এই ধরনের নাটক এ দেশের মঞ্চে পরিবেশিত হয়েছে, তার আবেদন কোণঠাসা এক বিশেষ শ্রেণীর বিদগ্ধ দর্শকের কাছে: সাধারণ মানুষ তার মধ্যে কোন বিষয়বস্তু বা আত্মসত্তা খুঁজে পায় নি।

আসল কথা হল যে, চোখে দেখা জীবনটাকে যেখানে সম্পূর্ণ করে জানা হল না: তার প্রতিটি মুহূর্তের বিচিত্র সমস্যাকে কেন্দ্র করে গড়ে-ওঠা আন্দোলন বা আলোড়নকে যে নাটকের সংঘাতে নিঃশেষে যেখানে ছায়া দেওয়া হল না: সেখানে প্রথমেই এই জীবনটাকে অর্থহীন বলে ভাবা যায় কি করে? তাছাড়া জীবনের এই অর্থহীনতা আমাদের দর্শকের সমর্থন পায় না। তাহলে কি করে 'আগন্তুক' নায়ককে আমাদের প্রাণের দোসর হিসেবে মেনে নেওয়া যায়? ইউরোপের নাটকে জীবনকে বহু দিক থেকে প্রতিফলিত করা হয়েছে। বাস্তব জীবন সমস্যার গভীরে আলোকসম্পাত সেখানে সম্পূর্ণ বলেই

কথাসরিৎসাগর
গল্প বলার
আসর
৮২।৭এন [illegible] লেন।
কলিকাতা : ১১
ফোন : ৪৭৬৪৫৬.

সেখানকার দর্শক মনোবৃত্তির দিক থেকে জীবনের গভীরে লুকানো আর একটি নতুনতর জীবন সত্যের ছবি দেখে পরিচিতির সেতুবন্ধনের চেষ্টা করছেন। কিন্তু আমাদের দেশে, শহরে ও গ্রামের প্রতিটি মানুষের চলমানতাকে, তার বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতকে এখনো সম্পূর্ণ রূপ দেওয়া হয় নি। তাই মনে হয় অ্যাবসার্ড নাট্য-প্রযোজনা আমাদের দেশে আকস্মিকতম চমক সৃষ্টি করেছে, কেননা প্রত্যাশিত মুহূর্তের সাড়া পেয়ে তা আসতে পারে নি।

আঙ্গিকের দিক থেকেই আজকের নাট্য-প্রযোজনা অসাধারণ বলিষ্ঠতার সন্ধান দিয়েছে। আলোকসম্পাত, আবহ-সঙ্গীত, মঞ্চসজ্জার মধ্যে সব সময়েই একটা শৈল্পিক সাজেসটিভনেস কাজ করছে। ফর্মের দিকে দেখা দিচ্ছে অসাধারণ কৌতূহল, প্রযোজকের দৃষ্টি প্রায় বেশীর ভাগ সময়েই নিবদ্ধ থাকছে কি করে 'টেকনিকাল গ্ল্যামার' সৃষ্টি করে মঞ্চকে মায়ামন্দির করে তোলা যায় সেদিকে। নাট্য-প্রযোজনার এই 'প্রসাধনকলা'র মূল্যকে যেমন অস্বীকার করা যায় না, তেমনি উপেক্ষা করা যায় না এর 'সাধনবেগ'কে। দুয়ের সুষ্ঠু সমন্বয়েই তো সার্থক শিল্প-সৃষ্টি।

যে কথা স্পষ্ট করে বলতে চাইছি তা হল এই যে, আমাদের আজকের নাটক আমাদের দেশের বর্তমান জটিল পরিশ্রান্ত জীবনকল্লোলের মাঝপথে দাঁড়িয়েও যেন মনে হয় সরে যাচ্ছে দূরে, অনালোকে দূরান্ত বা সাগরপারে। অন্য দেশের দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের দেশের আলো হাওয়ায় লালিত মানুষগুলোর প্রাণসত্তাকে কি স্পষ্টতায় ছায়া দেওয়া যায়? আর কেনই-বা এই দূরে সরে যাওয়া? এই বিচ্ছিন্নতার মধ্যে কোন মহত্তর শিল্পসাধনার ইঙ্গিত থাকতে পারে? অনেকে বলবেন আমাদের দেশের মানুষের বাস্তব জীবন সমস্যা নিয়ে অনেক নাটক লেখা হয়েছে এবং আজও হচ্ছে। কথাটার আংশিক সত্যতা মেনে নিয়েও বলব যে, এক বিশেষ মধ্যবিত্ত বা নিম্ন-মধ্যবিত্ত বা ধনীর জীবনকে এবং তাতে আবর্তিত কিছু চরিত্রকে নাট্যসংঘাতে ছায়া দেওয়া হয়েছে; কিন্তু যে মানুষগুলো শহর থেকে দূরের জীবনধারাকে কর্মনিষ্ঠার আর উদ্বেল আন্তরিকতায় ধরে রেখেছে, তাদের কথা আজকের নাটক মোটেই সোচ্চারে বলছে না। অথচ এই মানুষগুলোর সংখ্যা আমাদের দেশে অনেক। তাহলে কি এদের জীবনে কোন সংশয় বা সংঘাতের আবর্ত নেই, যাকে কেন্দ্র করে বলিষ্ঠ জীবনবোধের নাটক গড়ে উঠতে পারে? যদি তাই না থাকে, তাহলে কি করে 'নীলদর্পণ', 'নবান্ন', 'ছেঁড়া তার' এসেছিল; কি করে 'দেবীগর্জন', 'গর্ভবতী জননী', 'অঙ্গার' সৃষ্টি হয়েছে?

এখনও প্রচুর সমস্যা ও সংঘাত এই সব মানুষের জীবনে ছড়ানো আছে। এগুলো নিয়ে এমন নাটক লেখা যেতে পারে, যা সম্পূর্ণভাবে হবে আমাদের দেশের নাটক, যা হবে আমাদের অনুভূতির স্বকীয়তায় প্রোজ্জ্বল একটি শিল্পসৃষ্টি। কিছু-কিছু নাটকে আজ দেখতে পাচ্ছি কৃষক আর শ্রমিক-জীবনের সমস্যা দেখাতে গিয়ে বিদেশী নাট্যকারদের স্মরণ নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু আমাদের দেশের কৃষক ও শ্রমিকের সমস্যা কি নিজেদের আলোয়-অন্ধকারে প্রকাশের পথ পাবে না? এই সব মানুষ-গুলো নাটকের মধ্যে তাদের জীবন-সংগ্রামের ছবি, এবং সবার ওপরে নিজেদের দেখতে পেলেই তাদের জীবনের সাথে মিশে-যাওয়া সার্থক হবে এবং শিল্পবোধও উন্নততর হবে। এবং সেই সূত্রে বিদেশী নাট্যসম্ভারের সিরিয়াসনেসের দিকে আকর্ষণও আসবে তাদের।

নাট্য-আন্দোলনের পথ বেয়ে যে নাটক এসেছে এবং যে নতুনতর প্রযোজনা সূচিত হয়েছে, তাকে শুধু কলকাতা শহরের দর্শকের জন্য সীমিত করে রাখলে, দেশের নবনাট্য প্রচেষ্টার কোন বৈশিষ্ট্যই আরোপিত হবে না। 'অন্য ধরনে'র থিয়েটারের প্রথম যুগে ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের নাটক-গুলো কিন্তু এই প্রসারিত চিন্তার মূল্য দিত, তখন নাটকগুলো শহরের মত যতটা সম্ভব কিছু-কিছু গ্রামের মাঠে-মাঠে পরিবেশিত হত। আজ তো সুযোগ আছে অনেক, আজ কেন এ কাজ ফলান্বিত হবে না? নাট্য-আন্দোলনের সঙ্গে শহর থেকে দূরের মানুষগুলোকেও জড়াতে হবে, নইলে আংশিক নাট্যনিরীক্ষার কোন মূল্য নেই। বাংলা দেশের সামগ্রিক প্রাণসত্তাই যদি নব-তাড়নে সে আন্দোলনে আলোড়ন নাট্য আন্দোলনে আন্দোলিত না হল, কোথায়?

গল্পাশ্রয়ী ছবি

নির্মল ধর

মাল্যদান/পরিচালনা : অজয় কর/সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় এবং সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ফটো : অমৃত

সাহিত্য একটি স্বাধীন শিল্প মাধ্যম। ছবি ও (এমনকি স্টিল ফোটোগ্রাফীও) আবার শিল্প। দুয়ে মিলে তৈরী হয়েছে সিনেমা। সিনেমা বিশিষ্ট শিল্পের মধ্যে অন্যতম শিল্প হিসাবে পরিচিত।

সাহিত্যে যেমন গল্প, উপন্যাস, কবিতাকে নির্দিষ্ট একটি সংজ্ঞার বেড়াজালে আটকে রাখা যায় (এখন অবশ্য সংজ্ঞার বেড়াজালে কেউই আর আটকা থাকতে চাইছে না), সিনেমাকে তেমন কোন গণ্ডির মধ্যে আটকানো যায় না। সাহিত্যের প্রধান তিনটিতেই তার অবাধ যাতায়াত। গল্প, উপন্যাসের তো কথাই নেই, কবিতা নিয়েও ছবি হয়েছে একাধিক।

শেক্সপীয়র থেকে শুরু করে আজ বাজারে যে সব যৌন-উপন্যাস হট কেকের মত বিক্রী হচ্ছে, তার উপর যেমন ছবি হচ্ছে, আবার ক্লাসিক সাহিত্যও বাদ পড়ছে না প্রযোজক-পরিচালকের চোখ থেকে।

প্রযোজক ছবির জন্য কাহিনী নির্বাচনের আগেই ভাবেন দর্শকের কথা। আর সেই কারণেই ছবির জন্য একটা মজাদার গল্পের কথা মনে রাখতে হয় তাঁকে। তাই তিনি স্বারস্থ হন জনপ্রিয় লেখকের। পরিচালক ছবি করেন, দর্শকের হাততালিও পাওয়া যায় অতি সহজেই।

সংসার/পরিচালনা : সলিল সেন/সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এবং নন্দিনী মালিয়া

আজকের নায়ক/পরিচালক দীনেন গুপ্ত এবং সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়
ফটো : অমৃত

এখনই/অপর্ণা সেন, স্বরূপ দত্ত এবং পরিচালক তপন সিংহ

এতদিন চলে আসছিল এইভাবেই। হয়তো বা চলতো আরও বহুদিন। কিন্তু সর্বনাশা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সব ওলট-পালট করে দিল। মানুষের চিরাচরিত বিশ্বাসের মূলে ধরে নাড়া দিয়েছে এই যুদ্ধ। সব কিছু ভেঙে তছনছ করে দিয়েছে। সাহিত্য, শিল্প ও ধর্ম কোনোটাই আর কোনো একটা স্থিরকেন্দ্রে স্থির থাকতে পারছে না। কারণ যাই হোক, চারদিকে আলোড়ন জেগেছিল যুদ্ধের পরে। সাহিত্য চিত্রকলা যেমন অন্য পথিতে বইতে শুরু করেছিল, ধর্মকে নিয়ে যেমন চুলচেরা বিচার শুরু হয়েছিল। সিনেমাও তখন আর অচল হয়ে বসে থাকেনি। শুরু হয় সিনেমার নব জাগরণ।

ফ্রান্স আর ইতালীই সেই দেশ যেখানে সিনেমাকে নিয়ে কাটা ছেঁড়া বিচার বিশ্লেষণ চলেছে প্রায় একটি দশক ধরে। এতদিনকার প্রচলিত নিয়মনীতি ব্যাকরণের জাল ছিঁড়ে পরিচালকরা সিনেমা আর্টকে এক নতুন প্ল্যাটফর্মে দাঁড় করাতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। এবং সেই দুরূহ কাজে তাঁরা সফলও। চিত্র-নির্মাতারা নিজস্ব চিন্তাকে পর্দায় মূর্ত করে তুলতে সচেষ্ট হলেন, তাঁদের চিন্তার বাইরের যা কিছু সবই পরিত্যক্ত হলো অপ্রয়োজনীয় বলে। নাটক-সংঘাতের প্রচলিত পথ হারিয়ে গেল অজ্ঞানের আড়ালে। আসল ব্যাপার চলচ্চিত্র আর পরনির্ভরশীল থাকতে রাজী হোল না। পরিচালকরাও সেই কথা ভেবে সিনেমাকে মুক্তি দিলেন।

সিনেমা যে তখন থেকে শুধুমাত্র স্বনির্ভর হোল তা নয়, আকৃতি ও প্রকৃতিতে এক বিরাট পরিবর্তনও এলো। নিটোল গল্পের বেড়া ডিঙিয়ে কবিতার মতো মানুষের মানসিক চিন্তার গভীরে ডুব দিতে চাইল সিনেমা। আমরা পেলাম 'লাস্ট ইয়ার ইন ম্যারিয়েনবাদ' পেলাম 'লা নত্তে'। এ সব ছবিতে যে গল্প একেবারেই অনুপস্থিত নয় যদিও, কিন্তু গল্প ছাড়িয়ে চরিত্রের বিশ্লেষণ সেখানে মুখ্য। তাই চিত্র-নাট্যকার আঁলা রোব্বে গ্রীয়েৎ (ইনি একজন খ্যাতনামা ফরাসী কবি) বলেছিলেন—

নিজের ভাষায় ও নিজের ধর্মে সিনেমা নিজেই আপন পথ করে নিয়েছে। মৌলিকত্ব খুঁজে পেয়েছে নিজের চরিত্রে। অতীতে সিনেমাকে জনপ্রিয় করে তোলার প্রধান শর্ত ছিল সার্বজনীন আবেদন, এখন তা পরিত্যক্ত। আজকের ছবিতে দর্শকের অস্তিত্বকে অস্বীকার করার এক প্রবণতা দেখা দিয়েছে।

তাই গল্পের বাঁধান পথ ছেড়ে সিনেমা পা বাড়িয়েছে নতুন জগতের মেঠো পথে। যেখানে জীবন আছে, নাটক নেই। যেখানে সংকট আছে, পরিত্রাণের গলিঘুঁজি নেই। যেখানে বাস্তব আছে, উদ্ভট চিন্তা নেই।

তবে গল্প যে একেবারে অনুপস্থিত তা বলা ঠিক নয়। কারণ প্রতিমা খড়ের কাঠামো ছাড়া যেমন গড়া যায় না, তেমনি বক্তব্য যাই হোক না কেন, একটা অবলম্বন তো দরকার। কাঠামোকে ধরেই চরিত্র প্রাণ পায়। চরিত্রের বিভিন্ন আসপেক্ট লক্ষ্য করলে, আমরা বাস্তবের ছোঁয়া পাব।

সত্যজিৎ রায় 'নায়ক' থেকে অ-গল্পাশ্রয়ী ছবি করতে শুরু করেছেন। গল্প নেই অথচ ছবি—এমন ছবির সংখ্যা বাংলাদেশেই বেশী। মৃণাল সেনের 'ভুবন সোম' বা 'ইন্টার-ভিউ' বা সত্যজিৎবাবুর 'প্রতিদ্বন্দ্বী' সেই জাতের ছবি।

গল্প নয়, দুঁদে অফিসার ভুবন সোমের একদিনের ছুটি কাটানোর অভিজ্ঞতায় তার অনুভূতির পরিবর্তনই 'ভুবন সোম' ছবির মূল কথা। রণজিৎ মল্লিক একমাত্র স্যুট না থাকার দরুন চাকরী পেল না—এ নিয়ে পরিচালক যত হাল্কা ভঙ্গীতেই ছবি করুন না কেন নায়কের মানসিক অস্থিরতাই 'ইন্টার-ভিউ' ছবির প্রধান বক্তব্য। আবার সিদ্ধার্থ তার আশপাশের হাজারো শত্রুর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় না পেরে উঠলেও তার শহরের প্রতি আকর্ষণই তাকে যথার্থ 'প্রতিদ্বন্দ্বী' করে তুলেছে। অ-গল্পাশ্রয়ী ছবির উদাহরণ এগুলোই। কিন্তু গল্পের ছিঁটে আবরণ একটা আছে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে প্রায়শঃই গল্প ছাড়া ছবি হতে পারে না। —এ সত্য কতদূর সত্য তা অবশ্যই বিচারের শুধু নয়, সঙ্গে সঙ্গে বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে। চিত্রশিল্পী রং দিয়ে মুহূর্তের একটি বিভ্রান্ত চিন্তাকে ধরে রাখেন ক্যানভাসে। যদিও বহু ক্ষেত্রে দুর্বোধ্যতার আড়ালেই তাদের বাস, কিন্তু সর্ব বাস্তবতাও শিল্পের অন্যতম শর্ত।

তাই জন্ম নিয়েছে ইঙ্গিতধর্মী ছবি বা সিম্বলিক ফিল্ম, পোয়েটিক ফিল্ম বা কবিতাধর্মী ছবি। ইঙ্গিতধর্মী কাহিনী চিত্র আমাদের দেশে হয়নি, দু'টিকয় ছোটো ছবি অবশ্য হুসেন সাহেব ও সত্যদেব দুবেজী করেছেন। বাংলাতেও হয়েছে কয়েকটি। কিন্তু কবিতাধর্মী ছবি একেবারেই অনুপস্থিত। কক্তোর অর্ফিয় বা লা বেতে লা রিভেতের কথা মনে আসে এ প্রসঙ্গে। রোবো গ্রীয়েৎ এর 'লা ইম্‌মরত্যাল'ও এই জাতের ছবি।

অনেক ক্ষেত্রে ছবির কবিতা ধর্মের সঙ্গে কবিতাধর্মী ছবি মিশে যাওয়ার কথা। ছবির কবিতা ধর্ম বলতে বোঝায় ব্যক্তিগত ও বিমূর্ত অভিব্যক্তির মাধ্যমে চরিত্র বা ঘটনার পরিস্ফুটন। কিন্তু কবিতাধর্মী ছবি কোনো বিশেষ ঘটনা বা চরিত্র নয়, প্রতিটি ফ্রেমের মধ্য দিয়ে মনোজগত বিচিত্র ব্যবহারে এক কাব্যময় পরিবেশ সৃষ্টি করে।

ফিল্ম কাব্য ধারায় ইঙ্গিতধর্মিতার তাৎপর্য অপরিসীম। তবে বাস্তব চরিত্র বা সমস্যার যে কোনো প্রয়োজন নেই তা বলি না। ছবিতে কবিতা সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন বাস্তব চরিত্র ও ঘটনাগুলিকে স্রষ্টার মনন ও অনুভূতির প্রতীকে রূপান্তরকরণ। তাদের সত্তার আভাসটুকু থাকে মাত্র, বেশী স্বরূপ থাকলেই কিংবা অত্যধিক বর্ণনাত্মক বা বাস্তবনির্ভর হলেই লিরিকের শুধু নির্যাস-টুকু হারিয়ে যায়। ফিল্মকাব্যের মূল শর্তই হচ্ছে আঙ্গিক ও বিষয়কে সামগ্রিক-ভাবে শিল্পীর কল্পনায় রূপান্তর করা।'

সত্যজিৎ রায়ের চারুলতা, কাঞ্চনজঙ্ঘা বা সাম্প্রতিক ছবি 'প্রতিদ্বন্দ্বী'তে ছবির কবিতা-ধর্মিতার প্রকাশ একাধিক দৃশ্যে পাওয়া যাবে। 'চারুলতা'র কণ্ঠের মধ্য দিয়ে অমলের 'হরে মুরারে মধুকৈটভারে' আবৃত্তি করতে করতে প্রবেশের দৃশ্য, 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'র শিশুর ঘোড়ায় চড়ে বার বার ঘোরা ও বলা—'মা আমি তিনবার ঘুরেছি আবার ঘুরব' বা শেষ দৃশ্যে নেপালী শিশুটির চকোলেট খাওয়ার দৃশ্যে নেপালী লোক-সঙ্গীতের সুর বাজানোর দৃশ্য এবং প্রতিদ্বন্দ্বী'র শেষ দৃশ্য যথার্থ ফিল্ম-কাব্যের উদাহরণ। মৃণালবাবুর 'ভুবন সোম' বা তপন সিংহের 'অতিথি' ও ঋত্বিক ঘটকের 'সুবর্ণ-রেখা'য় এমনতরো ইঙ্গিতময় ও কাব্যধর্মী দৃশ্য একাধিক আছে।

অথচ এই সব প্রতিটি ছবিরই একটা গল্প আছে। সুতরাং বলা যায় গল্প ছাড়া সাদা পর্দায় তা প্রকাশ করা গেলেও জনগ্রাহ্য ছবি হতে পারে না, কিন্তু দু ঘন্টা ধরে না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। চরিত্র বা ঘটনার বিমূর্ত চিত্রণ মূল ছবির কোনো বিশেষ অংশে স্থান পেতে পারে বটে, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে স্থান পেতে পারে না।

অ-গল্পাশ্রয়ী ছবির কথা যত জোর দিয়েই বলা হোক না কেন প্রকৃতপক্ষে সোনার পাথর বাটির মত সেটি অপ্রাপ্য। ছবি যত উদ্ভট বা সুন্দর, যত ছোটো বা বড় যাই হোক না কেন একটা 'গল্প' থাকতেই হবে। এক মিনিট স্থায়ী কয়েকখানা ছবি দেখেছি, সেখানেও গল্প আছে, কোনোটির গল্প আবার এতো বড় যে বলতেই হয়তো একশো মিনিট লাগতে পারে। কিন্তু ছবির সময় কাল মাত্র এক মিনিট। কাহিনীচিত্রের তো কথাই নেই।

কথাসরিৎসাগর
গল্প বলার আসর
৮২।৭এন বাগিচর লেন।
কলিকাতা : ১৯
ফোন : ৪৭৬৪৫১

বিজ্ঞাপনে ফ্যাশান

ভবতোষ সাহা

হাতে অখণ্ড অবসর। আনমনে হাঁটছিলাম। লোকজনের দ্রুত চলাফেরা আর আলোর বাহার দেখতে দেখতে চলেছি। নিয়ন সাইনের জ্বলা-নেভা দেখতে এমনিতেই আমার খুব ভাল লাগে। তাই বিকেল পেরিয়ে সন্ধ্যের এই সময়টুকু পথ চলতি নিঃসঙ্গ অবসর আমার কাছে খুব প্রিয়। সারাদিনের ঝক্কি ঝামেলার পর এখন আমি সম্রাট। আমার চেয়ে সুখী আর কেউ নেই। যৌবনবতী শহরের আসল সৌন্দর্যটুকু কেউ দু'চোখ ভরে দেখলে পেলো না। ওদের জন্য আমার আপশোষের শেষ নেই।

অনেক দূর চলে এসেছি। মনে মনে ভাবছি, শহরের রাস্তায় পথ চলা বিন্দুমাত্র ক্লান্তিকর নয়। বেশ মনোরম। হাঁটতে হাঁটতে সময় যে কোনখান দিয়ে গড়িয়ে যায় বোঝা দুঃসাধ্য। এই পথ চলার আনন্দ আমি একা একা উপভোগ করতেই ভালবাসি। কারণ, নিয়ন সাইনের জ্বলা-নেভা দেখা আর রাস্তায় লোকজনের চলা-ফেরায় অসম্ভব দ্রুততার আবিষ্কারের বিস্ময়কর আনন্দ কারো কাছে প্রকাশ করা চলে না। সবাই ভাববে, ছেলেমানুষী। তাই এই আনন্দের মুহূর্তে একা থাকাই আমার পছন্দ।

পথ চলছি আর রাস্তার সব সৌন্দর্য গিলে খাচ্ছি। এমন সময় চোখ আটকে গেল একটা শোকেসে। ভরা যৌবন এক যুবতী দিব্যি আরামে শুয়ে আছে একটা সুন্দর কার্পেটের উপর। আর একটু নজর করতেই দেখি, মেয়েটি বন্দিনী। শক্ত করে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। নড়বার উপায় নেই। ঘরটি সুন্দর করে সাজানো। চারদিকে সোফা-কৌচ। দামী পর্দা ঝুলছে। নয়নমনোহর বর্ণসুষমা। মনে হোল, এই ঘরটি যদি আমার হতো। আমার মধ্যবিত্তের নীরক্ত মানসিকতায় এই অসম্ভব স্বপ্ন তখন ভীষণভাবে নাড়া দিয়ে যাচ্ছে। একই চিন্তায় ক্রমশ আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছি। জানি কোনদিন এই সৌন্দর্যের রাজ্যে পৌঁছুতে পারবো না। তবু আজকের সান্ত্বনা, এমন জিনিষ দু-চোখ ভরে দেখতে পাচ্ছি। এই পাওয়ার আনন্দও নেহাত কম নয়। সেই আনন্দে আমি মশগুল। ওটি যে শোকেস আর এই সাজানো গুছানো যে পণ্যের বিজ্ঞাপন সে চিন্তা ততক্ষণে আমার মাথা থেকে ডানা মেলে উধাও হয়ে গেছে।

দাঁড়িয়ে আছি তো দাঁড়িয়েই আছি। কতক্ষণ এমনভাবে কেটে গেছে সে খেয়াল নেই। হঠাৎ দেখলাম, যন্ত্রণায় মেয়েটির মুখ নীল হয়ে গেছে। ও আর এ বাঁধন সইতে পারছে না। কাতর চোখে আমাকে ওর কাছে ডাকছে। সেই মুহূর্তে আমার পৌরুষ চিনচিনিয়ে উঠলো। মনে হলো, বন্দিনী যুবতী আমার সাহায্য চাইছে আর আমি চুপ করে থাকবো, তা হতে পারে না। রূপকথার রাজপুত্রের স্বপ্ন আমাকে পেয়ে বসলো। পক্ষীরাজ ঘোড়া আর খাপ খোলা তরবারির কথা চিন্তায় এলো না। এই যুবতীকে বন্দিনী দশা থেকে মুক্ত করাই আমার কাজ। এদিকে মেয়েটির কাতরতা আরো বাড়ছে। অজানা আশঙ্কায় ক্রমেই নীল হয়ে যাচ্ছে। হয়তো ওর অপহরণকারী দুর্বৃত্তেরা এক্ষুনি এসে হাজির হবে। তারপর ওর উপর চলবে উৎপীড়ন। না, ভাবা যায় না। আমি বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করে ওর আহ্বানে সাড়া দিয়ে ওর পাশে এসে দাঁড়ালাম।

তাড়াতাড়ি ওর বাঁধন খুলে দিলাম। সেই সময় অনুভব করলাম, তরবারি না থাকার বিশেষ অভাব বোধ। ধারালো কিছু থাকলে কত সহজে এই কাজটা শেষ করতে পারতাম। কিন্তু তখন এসব চিন্তায় কালক্ষেপের মুহূর্ত অবকাশ নেই। যদি দুর্বৃত্তেরা এসে পড়ে। যাই হোক হাত চালিয়ে বাঁধনগুলো আলগা করে দিলাম। মেয়েটি উঠে দাঁড়ালো। সঙ্গে সঙ্গে ওর শরীর থেকে মায়ামন্ত্রবলে সব বাঁধন মিলিয়ে গেল। আমার তখন দারুণ উত্তেজনা। প্রায় কাঁপছি। মেয়েটি আমার দিকে তাকিয়ে দুষ্টুমিভরা চাহনিতে মিটি মিটি হাসছে। আমি ভাবছি, এবার সে নিশ্চয়ই এসে গদগদ হয়ে বলবে, তোমার জন্যই বাঁচলাম। আমি তোমারই।

কিন্তু সে সব কিছু নয়। মিটি মিটি হাসতে হাসতেই সে ছুট লাগালো। আমার পৌরুষ তখন ভীষণ আহত। লেজে পা পড়া সাপের মত ফুঁসছে। দেখতে দেখতে সে অনেক দূরে চলে গেছে। আমি আর দেরি না করে ওর পেছনে ছুটতে লাগলাম। কতদূর চলে এসেছি কোন খেয়াল নেই। অন্ধকার অরণ্য। বিরাট বিরাট গাছ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। এর মধ্যে মেয়েটিকে কি করে খুঁজে ভেবে পেলাম না। তাছাড়া ছুটে ছুটে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। তাই একটা গাছের গোড়ায় দাঁড়িয়ে পড়লাম। মনে তখন অন্য ভাবনা। মেয়েটি নিশ্চয়ই মায়াবিনী। ভুলিয়েভালিয়ে আমার প্রাণনাশই ওর উদ্দেশ্য। মনে পড়লো, নিশির ডাকের দু-চারটি শোনা কাহিনী। কি রকম ভয় ভয় করতে লাগলো। স্থির করলাম, রাতটা কাটাতে পারলে দিনের আলোয় চো চা দৌড়।

অন্ধকার আস্তে আস্তে ফিকে হয়ে আসছে। আমি পালাবার ফিকির করছি। এমন সময়, সেই মেয়েটি আসছে। এবার সিংহবাহিনী। অদ্ভুত পোশাক। পুরোপুরি আদিম-অরণ্য। আর তার পেছন পেছন কাঁধ থেকে মাটিতে লুটিয়ে পড়া পোশাকটি ধরে তিনজন মেয়ে। মেয়েটি সদ্যস্নাতা মনে হলো। কিন্তু অতশত ভাববার সময় তখন নেই। একে তো গভীর জঙ্গল। অচেনা অজানা। তারপর আবার সিংহ। প্রাণভয়ে আমি অস্থির। অথচ পালাবার সঠিক পথ জানা নেই। ক্রমে সেই সিংহবাহিনী আমার কাছে এগিয়ে আসছে। ভয়ে আমি সিঁটিয়ে যাচ্ছি। বিশাল বপু সিংহ ভীষণ হুংকার ছাড়ছে। একবার ভাবলাম, পরের উপকার করতে এসে একি বিপদ ডেকে আনলাম। মনে মনে স্মরণ করলাম সেই মহাজন বাক্য : ভাবিয়া করিও কাজ করিয়া ভাবিও না। কাজটা আমি ভেবেচিন্তেই করেছি তাই উতলা না হয়ে বরং দেখা যাক। তবু বুকের ভেতরটা কেমন দুরু দুরু করছে। সেই গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

সিংহবাহিনী আমার দিকেই এগিয়ে আসছে। সেই দুষ্টুমিভরা চাউনি। মিটিমিটি হাসি। যেন স্বপ্ন দেখছি। মেয়েটি আমার কাছে পৌঁছে গেল। আমাকে ইশারায় ডাকতেই নিরুপায় সাড়া দিলাম। কিন্তু পা নড়ছে না। আমার অবস্থা বুঝতে পেরে সে নিজেই এগিয়ে এলো। আমাকে তুলে নিলো সিংহের পৃষ্ঠে। আমরা এগুতে লাগলাম। ভয় থেকে এবার অনেকটা নির্ভয়ে উত্তীর্ণ হতে পেরেছি।

আমি ধুতি-পাঞ্জাবি পরা বাঙ্গালী সন্তান কি করে সিংহের পিঠে চড়বো সে ছিল এক ভাবনা। অত ভাববার সময় নেই। তাই তাড়াতাড়ি উঠে পড়েছিলাম। আর সঙ্গে সঙ্গে এক ভেল্কিবাজি। আমার পোশাকও মেয়েটির অনুরূপ। ভীষণ আরণ্যক। জন্তু-জানোয়ারের চামড়া। এবার একটু সাহস ফিরে এসেছে। পোশাকে হাত বুলিয়ে দেখলাম, রঙেই সব জন্তু-জানোয়ারের চামড়া, আসলে সবই আধুনিক পোশাক। এ যে কি হচ্ছে কিছুই বুঝতে

পারছি না। সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। একটু আগেই মনে হচ্ছিল, আমরা বাড়ি আসব আর কি। এখন আর সেসব ভাবতেই পারছি না।

সিংহটি চলতে চলতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। মেয়েটির ইশারায় এবার নেমে পড়তে হলো। সে নিজেও নেমে দাঁড়ালো। সামনেই একটা সুন্দর জলাশয়। সিংহ জল খেতে গেল। এবার মেয়েটির আসল রহস্য জানা যাবে আশা করলাম। ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে চোখ ফেরাতে দেখি মেয়েটি উঠে দাঁড়িয়েছে। আমি ব্যগ্র হয়ে ওর দিকে তাকাতেই ইশারায় আমাকে অপেক্ষা করতে বলে চলে গেল। এদিকে তাকিয়ে দেখি সিংহ আর নেই। এ কোন গোলকধাঁধায় আমি ঘুরপাক খাচ্ছি তাই ভাবতে লাগলাম।

হঠাৎ সেই মেয়েটি এসে উপস্থিত। দু-হাতে ধরা একটি শার্ট ওর বুক আড়াল করা। সে যেন নাচতে নাচতে আসছে। সে পোশাকও আর নেই। এবার পুরো নতুন পোশাক। কিন্তু ওই শার্টটার জন্যে ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। এসেই শার্টটা আমার দিকে ছুঁড়ে দিল। আর ইশারায় ওটা পরে নিতে বললো। আমি আর দেরি করলাম না। যত তাড়াতাড়ি এই ধাঁধা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। কিন্তু শার্টটা পরেই দেখি আমি পুরোপুরি হাল ফ্যাশানে পৌঁছে গেছি। কাউবয় প্যান্ট আর পয়েন্টেড সুয়ে আমি একে-

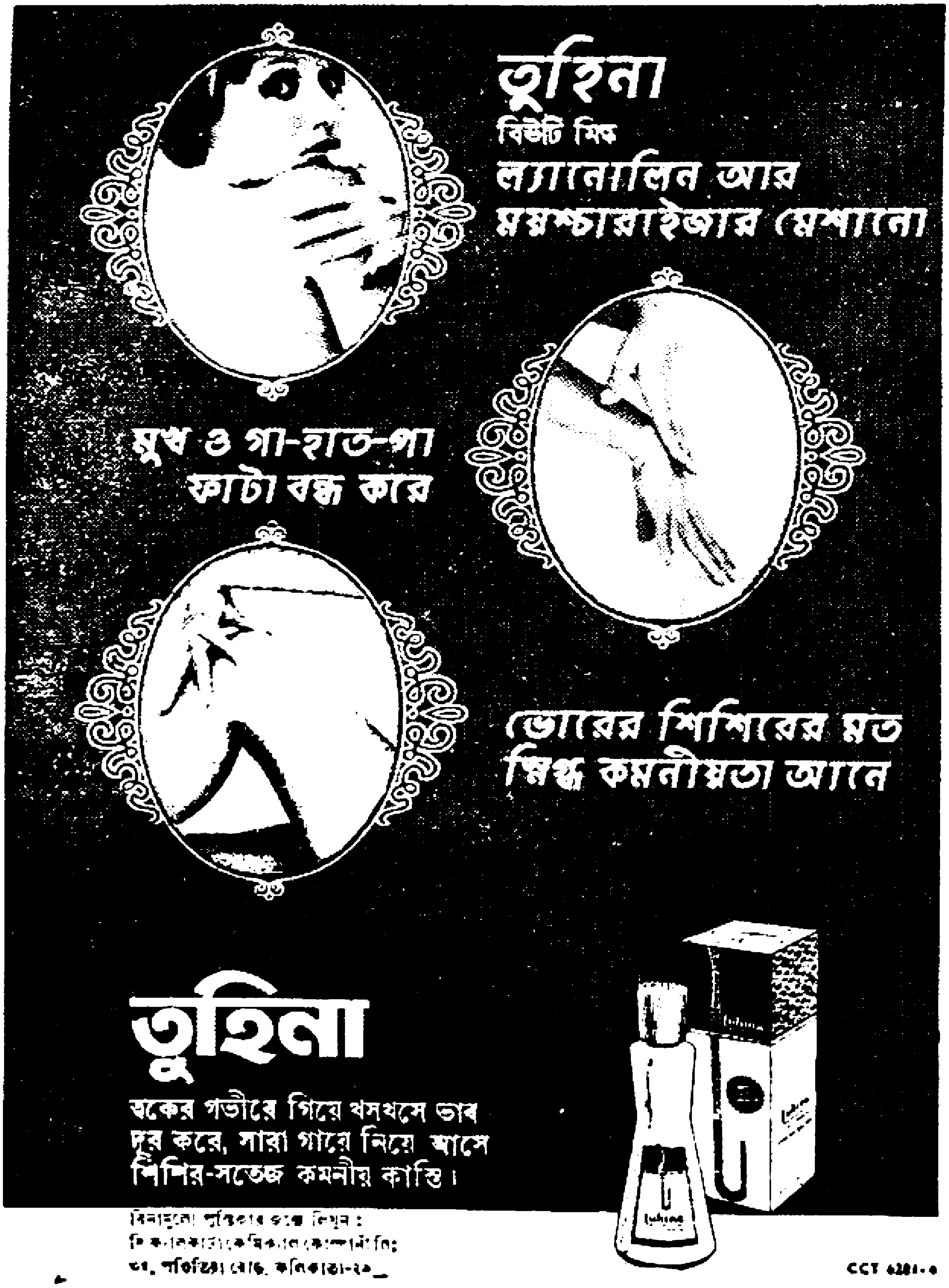

বারে আধুনিক। এবার তাকাই মেয়েটির দিকে। ওর পোশাকেও বিপ্লব উপস্থিত। প্যান্ট আর সুন্দর ডিজাইন করা একটি কামিজ। আমি বিস্ময়ে ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম। ওর চোখেমুখে শুধু সেই দুষ্টুমিভরা চাউনি। এবার হাসিটা অনেক উজ্জ্বল মনে হলো।

আমরা চলতে শুরু করলাম। অনেক দূর চলে এসেছি। কখন জঙ্গল ছাড়িয়ে এসেছি খেয়াল নেই। একেবারে শহরের সীমায়। এতক্ষণে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলাম। মনে হলো, পৈত্রিক প্রাণটা নিয়ে বাড়ি ফিরতে পারবো। এই ভেবে এগুচ্ছি। এমন সময় সেঁথ গুটিকয় ছেলে আর মেয়ে মোটর বাইক ছুটিয়ে আসছে। মেয়েটি হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠলো। ওরা আমাদের কাছাকাছি এসে থেমে গেল। মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে আমাকে কি একটা ইশারা করলো। দেখলাম ও একটা মোটর-বাইক চেপে বসেছে। আর আমার জন্যও একটা উপস্থিত। আমি যথাজ্ঞা উঠে পড়লাম। না বলার উপায় নেই। যদি এভাবে বেঘোরে জীবনটা যায়। তাই বাঁচবার ক্ষীণ আশা নিয়ে ওর কথামতোই চলছি।

সবেগে মোটর বাইক ছুটে চলেছে। বিরাট চওড়া রাস্তা। অজগরের মতো এঁকেবেঁকে গেছে। মোটর বাইক চালানোর এতক্ষণ কোন দিকে খেয়াল ছিল না। এবার স্পীড বজায় রেখেও মেয়েটির দিকে এক-নজর তাকালাম। পোশাক আবার বদলে গেছে। সেই প্যান্টি আর নেই। সর্টস আর সার্ট এবার প্রায় পুরুষের সমান। কোমরে চওড়া বেল্ট। সার্ট আর সর্টসে ঝালর দেওয়া। আমার পোশাকও তাই। আমার বিস্ময়বিমূঢ় অবস্থা দেখে ওরা সবাই হেসে খুন। আমি চট করে বোকামি ভাবটা কাটিয়ে ওদের সঙ্গে হাসিতে যোগ দিলাম।

মোটর বাইক ছুটিয়ে ক্লান্ত হয়ে আমরা সবাই এক জায়গায় বসে পড়লাম। সবাই বেশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসেছি। ঘাসের উপর গা এলিয়ে দিয়েছে মেয়েটি। আর সঙ্গে সঙ্গে পোশাকে পরিবর্তন। সর্টস আর শার্ট নিমেষে উধাও হয়ে গেছে। সুন্দর একটি শাড়ি নিখুঁত কায়দায় পরা। বেশ নামিয়ে। যেন শাড়িটা গায়ে বসে আছে। সে গা এলিয়ে দিতেই বুক থেকে আঁচলটা পড়ে গেল। এতক্ষণ শুধু সেই মেয়েটির দিকেই তাকিয়ে ছিলাম। এবার নজর দিলাম অন্যদের দিকেও। ওরা সব ভিন্ন ভিন্ন পোশাকে। দেখা হবার পর থেকে সকলেরই তো একই পোশাক ছিল। এবার পরিবর্তন হয়েছে। একজন পরেছে লুঙ্গি আর কামিজ। এ পোশাক আমার অজানা। কিন্তু বুঝলাম ব্রহ্মদেশের চাল এবার আমাদের ধরে ফেলেছে। আর একজনের অঙ্গে নতুন পোশাক। কিছুটা ঢিলা-ঢালা প্যান্ট আর কামিজ। এ পোশাকটা ঠিক বুঝতে না পেরে সেই মেয়েটির দিকে তাকালাম। এই প্রথম সে মুখ খুললো, এ হলো বেল বটম। ফ্যাশনে এ দুটি লেটেস্ট। সে চুপ করে গেল। আর কোন কথা নয়। শুধু দুজন দুজনের দিকে তাকিয়ে আছি। ও যত হাসছে আমি তত অবাক হচ্ছি। ওর হাসির কারণ ঠিক ধরতে পারছি না কোন-মতেই।

কতক্ষণ এমনি দাঁড়িয়ে ছিলাম খেয়াল নেই। হঠাৎ আলোটা নিভে গেল। চোখের সামনে অন্ধকার। ভোজবাজির মতো যেন সব উঠে গেল। এতক্ষণে খেয়াল হলো, আমি সেই শো-কেসের বন্দিনী মেয়ের সামনেই দাঁড়িয়ে আছি। ভীষণ লজ্জা হলো। কত কি ভেবেছিলাম বসে। আবার তাকালাম সেই মেয়েটির দিকে। ও তখনো তেমনি দুষ্টুমিভরা চাউনিতে মিটি মিটি হাসছে। নিজের লজ্জা ঢাকতে উল্টো পথ ধরলাম।

সারস্বতের সাম্প্রতিক প্রকাশন

ইতিহাসে ট্র্যাজিক উল্লাসে
বিষ্ণু দে ॥ ৫·০০

মঞ্চের বাইরে মাটিতে
অরুণ মিত্র ॥ ৪·৫০

জামায় রক্তের দাগ
মণীন্দ্র রায় ॥ ৪·০০

প্রবন্ধ সংকলন
মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ ॥ ৮·০০

হাজার বছরের বাংলা গান
প্রভাতকুমার গোস্বামী সম্পাদিত ॥ ১৫·০০

রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র
নেপাল মজুমদার ॥ ১০·০০

বাঘ ও অজন্তা
দেবব্রত মুখোপাধ্যায় ॥ ৬·৫০

সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস
ডঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রী ॥ ৮·০০

বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব পদাবলীর ক্রমবিকাশ
ডঃ সতী ঘোষ ॥ ৫·০০

সুকান্ত-সমগ্র ১৫·০০
সুকান্ত ভট্টাচার্য

বৈরী মন
মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় ॥ ৪·৫০

মলিন আয়না
রাম বসু ॥ ২ ৫০

আবৃত-ইতিহাস উনকোটি ॥ জয়ন্তনাথ চৌধুরী ॥ ৫·০০

সারস্বত লাইব্রেরী ২০৬ বিধান সরণী ॥ কলিকাতা-৬
ফোন : ৩৪-৫৪৯২

পুতুল দিয়ে ঘর সাজান

কল্যাণী বসু

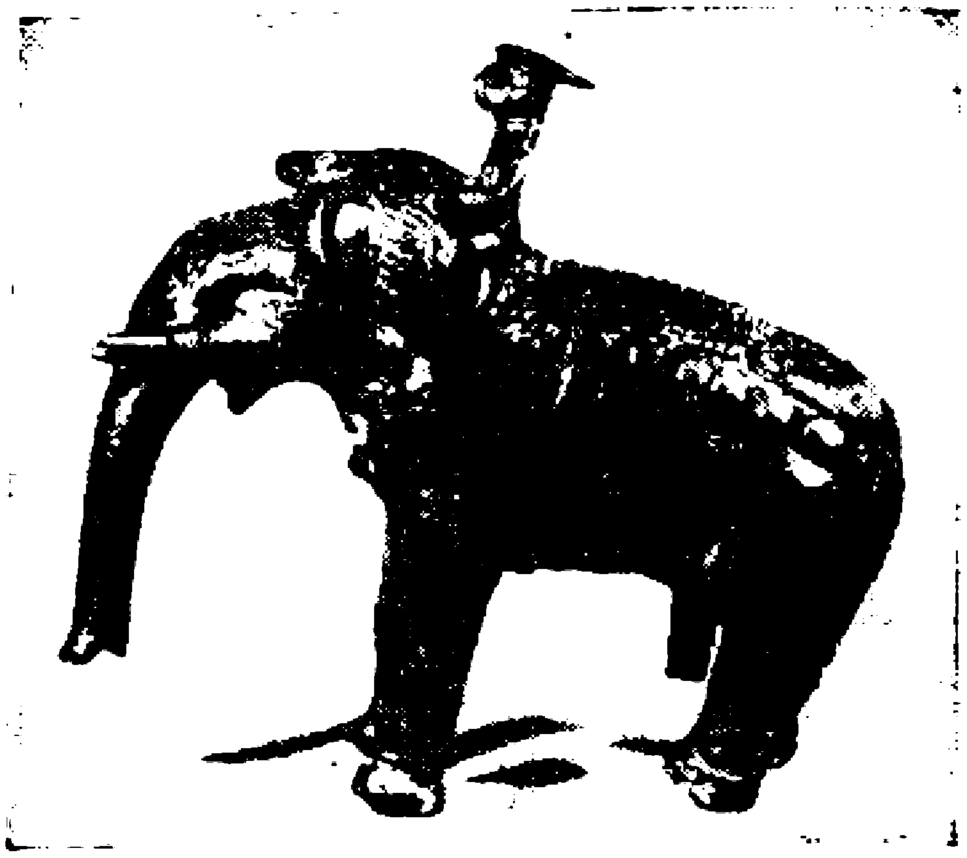

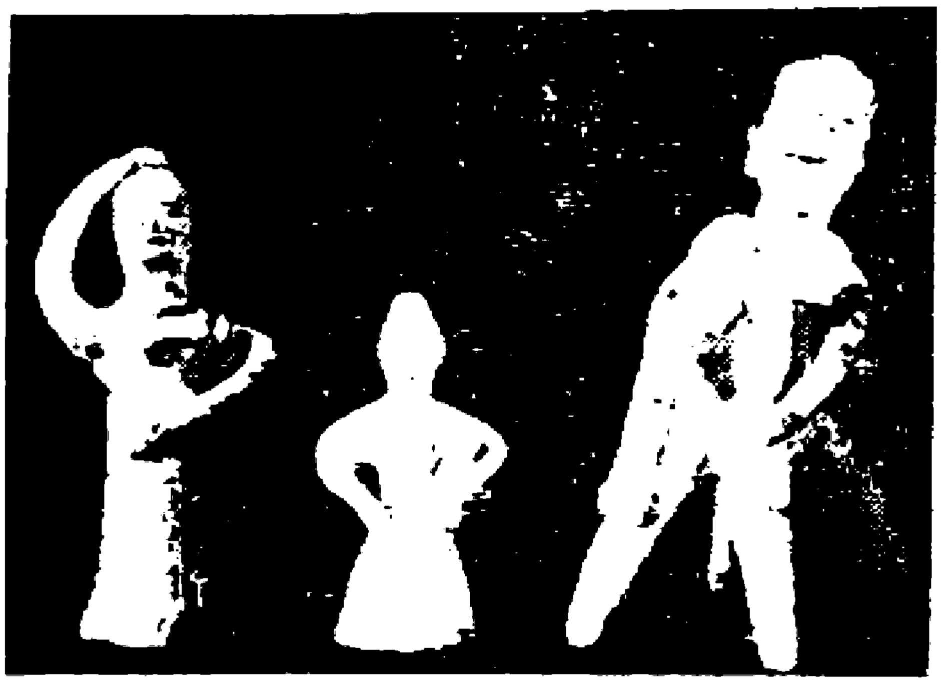

সহজ কথায় ক্ষুদ্রায়তন মূর্তিই পুতুল। প্রাচীনকালে পুতুলের প্রয়োজন হয়েছিল মোটামুটি দুটি কারণে। শিশুদের খেলার জন্য এবং টোটেম বা যাদুক্রিয়ায় বিশ্বাসী গ্রামবাসীদের পূজার জন্য।

ছেলেভুলানো পুতুল ছিল নানাপ্রকারের। নানা জিনিসের তৈরি পুতুলের মধ্যে মাটির পুতুল, কাঠের পুতুল, শোলার পুতুল, কাগজের পুতুল, ন্যাকড়ার পুতুল, গালার পুতুল উল্লেখ করবার মত। তা ছাড়া ব্রত ইত্যাদি কাজের জন্য তৈরী হোত নানাধরনের পুতুল এই টোটেম বিশ্বাসের পটভূমিতেই।

বাংলাদেশে মোটামুটিভাবে যে সব পুতুলের কাজ হোত বা এখনও হচ্ছে তাদের মধ্যে রয়েছে মাটির পুতুল। গায়ে কোথাও রং লেপা, কোথাও পোড়ানো কালো বা লাল রঙে। কাঠের রংদার পুতুল বাংলা দেশের অনেক জায়গায় পাওয়া যেত। এখনও কিছু কিছু হয় নদীয়া আর বর্ধমান জেলায়। মাটির পুতুলে অল্প রংও লাগানো হয় কোথাও কোথাও। পোড়ামাটির পুতুল হয় পাঁচমুড়ায়—শুধু ঘোড়া নয়, হাতী, বাপ-পুতুল, মেয়েপুতুল, ষষ্ঠীজননী, বল্লা-বাণিজ অনেক রকমের পুতুল হয় ওখানে। ঘোড়া শুধু পাঁচমুড়া নয় সোনামুখী এবং আরও অনেক জায়গায় হয়—তবে চেহারায় তফাৎ আছে। ফকিরের, সাহেবের, পিটুলীর এমন কি গোবরের পুতুলও হোত বাংলা দেশে, এককালে।

পশ্চিম বাংলার যে সব অঞ্চলে এখনও পুতুল তৈরী হয়ে থাকে তাদের কয়েকটি জায়গার নাম উল্লেখ করছি। পোড়ামাটির পুতুল তৈরী হয় পাঁচমুড়া-সোনামুখীতে-বাঁকুড়া জেলায়। মাটির পুতুল হয় বীরভূমের রাজনগরে। সে পুতুলের ঢং আলাদা। রাধাকৃষ্ণ মূর্তি আহ্লাদী বুড়ি, গণেশজননী এমনি নানা ক্ষুদ্রায়তন মূর্তি বা পুতুল তৈরী হয় রাজনগরে। কালীমূর্তি, দক্ষিণেশ্বর ও তার ছোট ছোট পুতুলের মতো সংস্করণগুলি তো ঘর সাজানোর কাজে এককথায় অপূর্ব। এ পুতুলগুলি তৈরী হয় কলকাতার কাছেই ২৪ পরগণায় জয়নগর-মজিলপুরে। এখনো দুটি পরিবার একাজ করে যাচ্ছেন। পোড়ামাটির ছোট ছোট পুতুল-হাতী, ঘোড়া, বুড়োঠাকরুণ এসব তৈরী হচ্ছে কলকাতার পাশেই। পূর্ব বাংলা থেকে অনেক পটুয়া এসেছেন পশ্চিমবাংলায়। তাঁরা কলকাতার আশেপাশে—বারাসত অঞ্চলে এবং আরও দু' একটি জায়গায় বাস করছেন—মনসার ঘট গড়ছেন, সরায় ছবি আঁকছেন, পুতুলও বানাচ্ছেন। ঘর সাজানোর কাজে সরা, মনসার ঘট এসবও বেশ চলতে পারে। সরাগুলিকে দেওয়ালে সাঁটা যেতে পারে—বিশেষ করে হুইংরুমের দেওয়ালে। বুক সেলফে বা আলমারীতে তো রাখা যাবেই।

আগেই বলেছি কাঠের পুতুলের কথা। কাঠের পুতুল বাংলা দেশের প্রায় সব জায়গাতেই হয় কিছু কিছু। তবে বর্ধমান-নবদ্বীপ - পাটুলী - দাঁইহাট - শান্তিপুর

আপনি কোন পত্রিকা পড়েন ও কেন পড়েন ?

একদিন হয়তো এই প্রশ্নের বিশেষ কোন গুরুত্ব বা সার্থকতা ছিল না। কিন্তু আজ জগতের ঐতিহাসিক মুহূর্তে এই প্রশ্নের উত্তরের উপর শুধু আপনার আমার নয়, সমস্ত জাতির ভাল-মন্দ উত্থান-পতন সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করছে।

আপনি কোন পত্রিকা পড়েন? কি ভাবে পড়েন? হাতের সামনে সুবিধা মতন যখন যে-পত্রিকা পান, তাই পড়েন? না বিশেষ পত্রিকা আছে, যা না পড়লে মনে হয় দিনটা ফাঁকা ফাঁকা যাচ্ছে।

শুধু একা আপনার কথা নয়। আপনার বাড়ীতে আপনার স্ত্রী পুত্র কন্যা তাদের হাতে কোন পত্রিকা আপনি পড়তে দেন? এমন কোন একখানা পত্রিকা পেয়েছেন কি, যা নিশ্চিন্তে নির্ভাবনায় আপনার বাড়ীর সকলে পড়তে পারে এবং সকলেই সমানভাবে তা থেকে আনন্দ আর শিক্ষা পেতে পারে?

আপনি যে-পত্রিকা পড়েন বা আপনার ছেলেমেয়েদের হাতে যে-পত্রিকা ধরে দেন, ভেবে দেখেছেন কি তাতে আপনার ও তাদের মনের চাহিদা মিটছে কি না? সে কি শুধু অবসর-বিনোদনের খেলা? না, তা থেকে আপনি আপনার মনের তৃপ্তি, অবসরের আনন্দ, চিন্তার খোরাক, জীবন-পথের পাথেয়র সন্ধান পান? সে-পত্রিকা কি আপনাকে এনে দেয় আপনার জাতির, আপনার সমাজের, আপনার সাহিত্যের আধুনিকতম সংবাদ? সে পত্রিকা কি আপনার জীবন-যাত্রার পথে এগিয়ে চলার সহায় হচ্ছে? সে-পত্রিকা কি আপনার জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ধারার রূপ ফুটিয়ে তুলছে ও তুলে ধরছে আপনার সম্মুখে জাতির বর্তমান ও ভবিষ্যৎ মহা সম্ভাবনার ইঙ্গিত? যদি তাই না হয়, তাহলে সে-পত্রিকা পড়বার সার্থকতা কোথায়? নিজের মনের অন্তঃপুরে এবং নিজের বাড়ীর অন্তঃপুরে যে-পত্রিকাকে স্বচ্ছন্দে প্রবেশ করবার অধিকার দিয়েছেন, তার সম্বন্ধে আপনার নিশ্চয়ই দাবী আছে। সে-দাবী কি সে-পত্রিকা মেটাতে পারছে পূর্ণ মাত্রায়? আজ পত্রিকা কেনবার সময় আপনাকে এই সব কথা নিজের মনে ভেবে দেখতে হবে। আজকে আপনাকে আমাকে নিয়ে একটা নতুন জাতি গড়ে উঠছে। আজকে আমাদের জীবনের প্রত্যেকটা প্রয়োজনীয় জিনিস আমাদের যাচাই করে নিতে হবে।

এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা ও বিশ্লেষণ করে, এক মহান আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে পঁচিশ বৎসর পূর্বে, বাঙালীর সমস্যাবহুল জীবনের সন্ধিক্ষণে 'গল্প-ভারতী' আত্মপ্রকাশ করে। জাতির মানসিক প্রয়োজনের সবচেয়ে বিপন্ন লগ্নে 'গল্প-ভারতী' জাতির নব জাগরণে এক মহৎ আদর্শ তার প্রত্যেক গ্রন্থের মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছে। জাতির উন্নয়নের কাজে সাহিত্য সবচেয়েবেশী প্রয়োজন—এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে 'গল্প-ভারতী' বর্তমান বাংলা সাহিত্যে এক নতুন সঞ্জীবনী সুর ধ্বনিত করে তুলেছে এবং আপনার অন্তরের চাহিদা মেটাবার সঙ্কল্প গ্রহণ করেছে।

'গল্প-ভারতী'র পরম সৌভাগ্য যে বাংলার প্রত্যেক শ্রেণীর চিন্তানায়ক এবং প্রত্যেক শ্রেণীর সাহিত্যরথীই 'গল্প-ভারতী'কে তাদের প্রত্যক্ষ সহানুভূতির দ্বারা সমৃদ্ধ করে আসছেন এবং তাঁদের সমবেত চেষ্টার ফলেই আজ 'গল্প-ভারতী' বাংলার মানসিক জগতে তার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করে নিতে পেরেছে, ও সাহিত্য জগতে এক গৌরবময় নূতন অধ্যায়ের সৃষ্টি করেছে। এই সাহিত্য সাধনার ব্রতে আমরা আপনার একান্ত সহযোগিতা প্রার্থনা করছি।

আজ আমরা সারা ভারতে প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙালীর কাছে 'গল্প-ভারতী'কে পৌঁছিয়ে দেবার এক বিরাট পরিকল্পনা নিয়ে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছি। আপনি বাঙালী, আমাদের একান্ত অনুরোধ, নবজাগ্রত জাতীয় জীবনের মহা সম্ভাবনাপূর্ণ আশা ও আকাঙ্ক্ষার প্রতীক ও বাঙালীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক অর্ঘ, মহা আদর্শের বাহক 'গল্প-ভারতী'র পাঠক হয়ে ঘরে ঘরে তার বার্তা প্রচারে সহায়তা করুন।

'গল্প-ভারতী'র গ্রাহক হওয়া মানে বাংলা সাহিত্যের অগ্রগতিতে সাহায্য করা।

আজই 'গল্প-ভারতী'র গ্রাহক হোন। বাৎসরিক চাঁদার হার ১৫্।

ভারতী সাহিত্য ভবন প্রাইভেট লিঃ

ভারতের সর্বত্র যেখানে এজেন্ট নাই সেখানে সম্ভ্রান্ত এজেন্ট আবশ্যক।

২৭৯বি, চিত্তরঞ্জন এ্যাভিনিউ, কলিকাতা - ৬। ফোন :—৫৫-৩২৯৪ ও ৫৫-১৩৫৫

অঞ্চলের কাজের কথা প্রায়ই শোনা যায়। নবদ্বীপের কাছে নতুনগ্রামে তৈরী হয় কাঠের প্যাঁচা, গৌরাঙ্গ মূর্তি, বাউল মূর্তি, কালীঘাটের পুতুল ইত্যাদি। কালীঘাটের পুতুল কালীঘাটে তৈরী হয় না, হয় নতুনগ্রামে, বিক্রি হয় কালীঘাটের মন্দিরসংলগ্ন বাজারে। সেই থেকেই নাম কালীঘাটের পুতুল। কালীঘাটের পুতুলকে কেউ কেউ বলেন 'মামী ডলস'। মিশরের মামীর অনুকরণে চ্যাপ্টা শোয়ানো হবার এই পুতুলগুলি ঘর সাজানোর পক্ষে একেবারে আদর্শ বলা যেতে পারে। এগুলিকে বুক-শেলফে, ম্যান্টেলপিসে শুইয়ে বা দাঁড় করিয়ে রাখা চলে। দেওয়ালে কোনও 'অ্যাডেসিভ' দিয়ে লাগিয়ে-দিতে পারেন। বিহারের রাঁচীর কাছে তুপুদানা গ্রামে যে মা-ছেলে ও রাজা-রাণী পুতুল পাওয়া যায় তাও 'মামী ডলসে'র ঢঙেই তৈরী এবং সমানভাবে ঘর-সাজানোর কাজে লাগানো যায়।

গালার পুতুল পাওয়া যেতো বীরভূমের ইলামবাজারে। এখন আর সে পুতুল পাওয়া যায় না। তবে উড়িষ্যার কোরাপুট জেলার নওরঙ্গপুরের গালার পুতুল যদি জোগাড় করতে পারেন তো তার জুড়ি নেই। উড়িষ্যার সরকারী এম্পোরিয়ামে পাবেন। কটক আর ভুবনেশ্বরে গেলে কিনে আনতে পারেন।

শোলার পুতুল মেলায় পাওয়া যায় এখনো সর্বত্র। কুমোরটুলীর শোলার কারিগরেরা বানিয়ে দিতে পারেন। আসামের গোয়ালপাড়ার শোলার ফুল, কালীমন্দিরের মুখোশ আর সব মজার মজার জিনিস যদি জোগাড় করা যায়, তো আপনার ড্রইংরুম দেখে লোকের তাক লেগে যাবে। আসামের নলবাড়ীর ঝাঁপি তো কলকাতার অনেক বাড়ীতেই দেখেছি। নাগাল্যাণ্ড বা নেফা অঞ্চলের বর্শা, তীর ধনুক এসব দিয়ে ঘরের চেহারা পালটে দেওয়া যায়।

পিতলের ঢোকরা মূর্তি আর পুতুল তৈরী হয় বর্ধমান জেলার দ্বারকার কাছে দরিয়াপুরে আর বাঁকুড়া শহরে। এসব কাজ কলকাতার অনেক দোকানে পাওয়া যায়।

বালি-পাথরের মূর্তি আসে পুরীর পাথুরিয়াসাহী থেকে। কোনারকে যে সব মূর্তি থাকে তারই অনুকরণে তৈরী ছোট ছোট মূর্তিগুলি ঘরে কিংবা বাইরের বারান্দায় বা বড় মূর্তি হলে বাগানেও রাখতে পারেন, অবশ্য যাদের বাড়ীর সংগে বাগান আছে তারা।

একরকমের নাচিয়ে পুতুল বা 'ডান্সিং ডল' পাওয়া যায় কলকাতায়। নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর সংলগ্ন ঘূর্ণি থেকে আসে তারের ফ্রেমের ওপর মাটির পুতুল, নানারকমের ফলের প্রতিকৃতি, মাটির আরশোলা, টিকটিকি, মশলা-সুপুরী, এলাচ, লবঙ্গ, দারচিনি সবই মাটির। পুতুলের মধ্যেও রয়েছে গ্রামের সব দৃশ্য—কৃষক চাষের হাল কাঁধে মাঠে যাচ্ছে, সাপুড়ে সাপ-খেলা দেখাচ্ছে মাটিতে এমনি সব চিত্র ফুটিয়ে তোলা এ সব পুতুল সবাই দেখেছেন। এগুলি সবই হয় সাজাবার পুতুল।

কাপড়ের বা আরও বুঝিয়ে বলতে গেলে কাটা কাপড়ের পুতুল বা 'র‍্যাগ ডলস' তৈরী হয় কলকাতায় আর কলকাতার আশেপাশের কয়েকটি অঞ্চলে। চটের টুকরো বা ছাঁট থেকে তৈরী হচ্ছে একরকমের ঝোলানো ঝুঁটিওলা পুতুল—এগুলি মোটর গাড়ীতে জানলায় ব্যবহার হচ্ছে। শহরে যারা থাকেন তারা অনেকেই এরকম পুতুল হামেশা দেখে থাকবেন।

বিয়ের তত্ত্বে ক্ষীরের পুতুল তৈরী হতে আজও দেখেছি। বৌবাজার অঞ্চল দিয়ে যেতে বিশেষ করে নির্মলচন্দ্র স্ট্রীটে দু একটি দোকানে ক্ষীরের এসব পুতুল বিক্রি হতে দেখা যায়।

মোটামুটি যা পুতুল পাওয়া যায় তা নিয়ে কিছু আলোচনা করলাম। ভারতের অন্যান্য প্রান্তেও নানা ধরনের পুতুল পাওয়া যায়। এটিকোপাক্কা, আগ্রা, গুজরাটের সাংখেড়া ইত্যাদি ভারতের নানাপ্রান্তে নানা ধরনের পুতুল রয়েছে। হরিণের আর মোষের শিংয়ের তৈরী পুতুল, জন্তু-জানোয়ারের প্রতিকৃতি—ময়ূর, সারস, মুরগী, চাঁদামাছ, চিংড়ি মাছ ইত্যাদি নানা জিনিসের প্রতিকৃতি শিংয়ের দ্বারা তৈরী করেন ত্রিবেন্দ্রামের কারীগরেরা। উড়িষ্যার পারলেখামুন্ডী ও মেদিনীপুরের বৈকুণ্ঠচক-কোতঘনশ্যামের কারীগরেরাও এ জাতীয় কাজ করে থাকেন। ঘর সাজানোতে এ সব পুতুলও ব্যবহার করা চলবে। কলকাতায় এ সব জিনিস পাওয়া যায় সরকারী ও কতকগুলি বে-সরকারী দোকানে।

নাড়াজোল, রাজনগর, কাঁটালিয়া ইত্যাদি বাংলা দেশের নানা জায়গায় যে সব পুতুল তৈরী হয় সে সব কলকাতার বাজারে প্রায় আসে না বললেই চলে। অনেক কষ্টে এ সব গ্রাম থেকে কেউ কেউ পুতুল সংগ্রহ করে এনেছেন শখের খাতিরে। তবু বলবো এখনো নানাধরনের যে সব পুতুল কলকাতায় পাওয়া যায় তা দিয়ে আপনি নিঃসন্দেহে আপনার ঘরটিকে মনোরম করে তুলতে পারেন।

কলকাতার শহরে মানুষের মাথা গোঁজার জন্য যে সামান্য জায়গাটুকু পাওয়া যায় একটু চেষ্টা করলে অল্প খরচে তাকেও যে মনের মতো করে সাজিয়ে তোলা সম্ভব একথা জোর গলায় বলতে পারি। আমাদের দেশের ঘট, পট, পুতুল ইত্যাদির ছিটে-ফোঁটা যা আজও মেলে তা ব্যবহার করে ঘর সাজিয়ে দেখতে পারেন।

এইসব পুতুল ঘর সাজানর নানাভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে

ফুলসাজানোয় ভারতীয় ভাব

উমা বসু

আমাদের দেশে ফুল দিয়ে সাজানোর ধারা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের চেয়ে একটু অন্য ধাঁচেই গড়ে উঠেছে। এ দেশের গরম হাওয়ায় ফুলের সজীবতা রক্ষা করাই এক সমস্যাবিশেষ, আর আমাদের দিশী ফুল সবই অত্যন্ত অল্পায়ু, সে জন্য এখানের ফুল ব্যবহারের রীতি জাপান বা ইউরোপে প্রচলিত রীতি থেকে ভিন্ন হবে সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আমরা ফুল ভালবাসি না কিংবা ফুলের ব্যবহার এদেশে নেই এমন বলাটাও ভুল। আমাদের দেশে সকালের তোলা ফুল বিকেলে ফেলে দিতে হয়, সন্ধ্যায় যে ফুলে খোঁপা সাজাই রাতে তার ক্লিষ্ট বিবর্ণ রূপ মন ভারাক্রান্ত করে তোলে পুজোর বেদীতে নিত্যনূতন ফুলের অর্ঘ্য সাজান হয় লাল নীল হলুদ ও সাদায়। গৃহসজ্জার অঙ্গ হিসেবে ফুলের ব্যবহার গড়ে ওঠেনি তার আরো কারণ আছে। আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকেই প্রকৃতির কোলে এতদিন ছিলেন—উনিশ শতকের শেষ থেকে কিছু লোক পুরোপুরি শহুরে হতে থাকেন। এদেশের আকাশে এত আলো, প্রকৃতিতে এত রঙের ছটা যে ঘরের মধ্যে তাকে আবার ধরে রাখার প্রয়োজন বোধ হয় নি; এদেশে কোন ঋতুতেই আকাশ বা বনানী রঙের মাধুর্য হারিয়ে রিক্ত হয় না ওদেশের মত। বর্ষা বা শীতের প্রকোপ থেকে রেহাই পাবার জন্য আমাদের ঘরের মধ্যেও কাটাতে হয়নি দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ। সে জন্যই যোরহয় শীতপ্রধান দেশে গৃহসজ্জায় যেমন নজর নেওয়ার রীতি প্রচলিত হয়েছে তেমনটি আমাদের দেশে হয় নি। কিন্তু বর্তমানে দেশ ও কালের দূরত্ব ক্রমশঃ কমে যাচ্ছে আর শহুরে সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক দেশেই নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য অল্প-বিস্তর হারাচ্ছে। এই ভাঙাগড়ার খেলায় কি লাভ হোল কি লোকসান হোল তার বিচারের ভার পণ্ডিতদের উপর ছেড়ে দিয়ে আমরা এদেশের ফুল সাজানোর রীতিতে বর্তমানে যে পরিবর্তন এসেছে তাই একটু আলোচনা করবো।

আমরা আজকাল যারা শহরে বাস করি তাদের কাছে ফুল ও পাতা শুধু প্রকৃতির একটি সুন্দর দান নয় তার থেকে আরো বেশী কিছু দেখি আর পাই। শহুরে জীবন যে আজ ঘরের চার দেয়ালের মাঝেই আটকা পড়ে গেছে। আকাশ-মাটি-মাঠ-ঘাট-বন সবই আমাদের কাছ থেকে অনেক অনেক দূরে সরে গেছে। শহরের ইট-কাঠ, কংক্রীট আর কাঁচের মাঝে প্রাণ যখন হাঁপিয়ে ওঠে তখন ঘরে রাখা রজনীগন্ধার একটি গুচ্ছ কিংবা জানালার পাশে চৈতালী হাওয়ায় দুলে ওঠা গাছের ডাল পাতার শব্দ অনেক দূরে সরিয়ে রাখা সজীব পৃথিবীর প্রাণের স্পন্দনটিই মনে করিয়ে দেয়। শহরের দৈনন্দিন জীবনের একঘেয়েমি কাটাবার জন্য তাই আজ প্রয়োজন হয়েছে রঙের বৈচিত্র্য; রূপপিপাসু মন আজ তাই ঘরটিকেই নানাভাবে সাজিয়ে তুলতে চায় নানা রঙে। সেই প্রয়োজন মেটানোর জন্যই আজ আমরা ইংল্যাণ্ড বা জাপানের মত ঘর সাজাতে ফুলকে ব্যবহার করতে শুরু করেছি। এদেশে এখন নানা রকমের ফুল ও পাতাবাহারী গাছেরও আমদানী হয়েছে, যত্ন নিলে দু-চার দিন তাদের ফুলদানীতে তাজা রাখা যায়। এদেশেও ক্রমে ক্রমে বর্তমান রীতির ফুল সাজানোর একটি নিজস্ব ঐতিহ্য গড়ে উঠবে আশা রাখি।

আমাদের মধ্যে যাঁরা ফুল সাজান তাঁরা সাধারণতঃ পাশ্চাত্য রীতি কিংবা জাপানী-রীতিতে ফুল সাজান আর কয়েকজনা নিজস্ব স্বাভাবিক সৌন্দর্য-জ্ঞান থেকে সাজিয়ে থাকেন। যাঁরা সংখ্যায় বেশী অথবা নানা রঙের সংমিশ্রণ, পছন্দ করেন তাঁরা

পাশ্চাত্য রীতি অনুযায়ী সাজান। যাঁরা অল্প কয়েকটি ফুল ও স্বাভাবিক সৌন্দর্য পছন্দ করেন তাঁরা জাপানী রীতিতে সাজান। এই দুই রীতিকে কেমন করে আমাদের দেশের উপযোগী করে ভারতীয় ভাবধারার সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া যায় সে বিষয়ে সবার দৃষ্টি দিতে অনুরোধ করি। কোন জিনিসকে শুধু অনুকরণ করলে যেমন তার মধ্যে প্রথম শ্রেণীর শিল্প নিদর্শন সম্ভব নয় তেমনি তার আকর্ষণও চিরস্থায়ী হতে পারে না। বর্তমান যুগের উপযোগী করে এই শিল্পটিকে কেমন করে ভারতের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে গড়ে তোলা যায় আমাদের সবারই সে চেষ্টা করতে হবে।

অনেকেই হয়তো জানেন না জাপানের ফুল সাজানো যা আজ ইকেবানা নামে সারা বিশ্বের মনোযোগ কেড়েছে তার সঙ্গে আমাদের কত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। আমাদের সুপরিচিত পূর্ণঘটেই সুন্দর পরিণতি আজকের প্রসিদ্ধ ইকেবানা। ৬০০ খৃষ্টাব্দে জাপানে বৌদ্ধধর্মের অনুপ্রবেশ ঘটে, ইকেবানার জন্ম হয় কিয়োটো শহরের এক বৌদ্ধমন্দিরে, এখানেই জাপানী পুরোহিতদের স্বাভাবিক সৌন্দর্যজ্ঞান দিয়ে ঘট তার রূপান্তর। আমরা যদি ভারতের নিজস্ব শিল্প সাধনার কথা স্মরণ করে ফুলের ও পাতার সঙ্গে মিতালী পাতাই তবেই এ-শিল্পটির উপযুক্ত সমাদর করতে পারব। ফুল সাজানোর পাত্র হিসাবে আমরা ভারতীয় ঢাঁচের কোন জিনিস ব্যবহার করতে পারি, যেমন পাথর বা ধাতুর তৈরী ঘট, কলস, পানাউঁচু থালা, পুষ্পপাত্র, বাটি নানা মাপের, কোষা ধূপদানী প্রভৃতি।

এদেশী গাছের মধ্যে কামিনী, বকুল, ঝাউ, করমচা, ধুতরো, পেয়ারা বা তেঁতুল তাদের মধ্যে [illegible] ফল ব্যবহার করা চলে। ফুলের সঙ্গে শোলা বা তালপাতার ফুল ব্যবহার করে নতুনত্ব আনা যায়। বিশেষ অনুষ্ঠানের দিন দুই বা তিন পর্যন্ত এক বা দেড় ফুট লম্বা তারে গেঁথে সাজিয়ে চারপাশে আটকে দিলে বেশ সুন্দর দেখায়। লক্ষ্মীপুজোর দিন ফুলের সঙ্গে ধানের শিস, কালীপুজোর দিনে পাতাবাহার ব্যবহার করে বাড়ীতে ঠাকুমা দিদিমার কাছে সহজেই প্রশংসা আদায় করা চলে। এমনিভাবে নিজেদের দেশের জিনিস নিজেরাই আর দশজনার সামনে তুলে ধরতে হবে। শোলার ফুল কাঠি বা তারে গেঁথে কেমন ব্যবহার করা যায়, তা ছবিতে দেখান হয়েছে।

—অতুলনীয় ঐতিহ্যপূর্ণ—
বাংলার তাঁতবস্ত্র
উৎসবে এবং নিত্যপ্রয়োজনে ব্যবহার করুন।
"সমবায় সমিতিতে উৎপাদিত তাঁতবস্ত্রের প্রাপ্তিস্থান"
● দি ওয়েষ্ট বেঙ্গল ষ্টেট হ্যাণ্ডলুম উইভার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটী লিমিটেড
৬৭, বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রীট, কলিকাতা-৪ ও শাখা কেন্দ্রসমূহ।
● গভর্ণমেণ্ট সেলস এম্পোরিয়াম
৭।১, লিণ্ডসে স্ট্রীট, কলিকাতা; ১২৮।১, বিধান সরণী, কলিকাতা;
১৫১।১।১এ, রাসবিহারী এভেন্যু, কলিকাতা;
১৮।এ, গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড (সাউথ), হাওড়া।

সব মানুষের জন্য • সব কলমের জন্য
সুলেখা
সুলেখা স্পেশ্যাল
পার্মানেন্ট: ব্লু-ব্ল্যাক ★ রয়েল ব্লু ব্ল্যাক ★ ব্রাউন
ওয়াশেবল: রয়েল ব্লু রেড ★ গ্রীন
সুলেখা একজিকিউটিভ
পার্মানেন্ট: ব্লু-ব্ল্যাক ★ নেভি ব্লু ★ সুপার ব্ল্যাক
ওয়াশেবল: রয়েল ব্লু ★ এমারেল্ড গ্রীন
ভারমিলিয়ন রেড
Sulekha
সুলেখা জেনারেল
পার্মানেন্ট: ব্লু-ব্ল্যাক
ওয়াশেবল: রয়েল ব্লু ★ রেড ★ ব্ল্যাক
ভারতে সর্বাধিক বিক্রয়ের গৌরব-ধন্য
সুলেখা ওয়ার্কস লিঃ,
সুলেখা পার্ক, কলিকাতা-৩২

যাত্রা আর মঞ্চ মুখোমুখি আজ

নন্দলাল ভট্টাচার্য

১৭৯৫ সালের ৫ নভেম্বর। ক্যালকাটা গেজেটে প্রকাশিত হলো ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন। লেবেডফ তাঁর বাঙালী কয়েদায় সাজান নতুন রঙ্গমঞ্চে 'ডিসগাইস' নামে একটি নাটক মঞ্চস্থ করবেন। নাটকে অংশ নেবেন পুরুষ ও মহিলা শিল্পীরা। আর বিজ্ঞাপন ঘোষিত নাটকটির অভিনয় ১৭৯৫ খৃঃ ২৭ নভেম্বর। বাংলা দেশের মানুষ সর্বপ্রথম দেখলো বাংলা থিয়েটার। ভেঙে পড়লো গোটা কলকাতা। এতদিন পর্যন্ত বাঙালী নাটক দেখার সাধ মিটিয়েছিলো যাত্রা আর ইংরেজ প্রতিষ্ঠিত নাট্যশালার অভিনয় দেখে, এবার তার আনন্দ বিনোদনের নতুন আরেক মাধ্যম।

কলকাতা গেজেটে যখন লেবেডফের বেঙ্গলী থিয়েটারের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হলো প্রায় ঠিক সেই সময়েই পরমানন্দ অধিকারী প্রচলিত কৃষ্ণ বা কালীয়দমন যাত্রায় যোগ করলেন নাটকীয় ক্রিয়া আর সংলাপ। সূচিত হল নতুন যাত্রার জন্মলগ্ন।

ইতিহাসের পথ ধরে পিছু হটা যাক। মধ্যযুগের দেবউৎসবকে কেন্দ্র করে পরিবেশিত যাত্রাকে বলা হোত নাটগীত। তারপর চৈতন্যের আবির্ভাবে বাংলা দেশ প্লাবিত হয় বৈষ্ণবী প্রেমের ধারায়। যার প্রভাবে যাত্রার আসরে একাধিপত্য বিস্তার করে কৃষ্ণ বিষয়ক কাহিনী। কীর্তনের একই সুরে আসর হলো মুখরিত। এলো বৈচিত্র্যহীনতা।

তখন কেন্দ্রে মুসলমানী শাসন ব্যবস্থা প্রায় ভেঙে পড়েছে। গড়ে উঠছে এক-একটি প্রায় স্বাধীন রাজ্য। দেখা দিচ্ছে ছোট ছোট রাজা জমিদারের দাপট। সামাজিক বন্ধন শিথিল হতে শুরু করেছে। অন্য দিকে বিদ্যাসুন্দর ইত্যাদি মঙ্গলকাব্যকে কেন্দ্র করে যথেচ্ছ আদিরসের বিতরণ হতে থাকে। এরপর ইংরেজ আগমনের সঙ্গে পাশ্চাত্যের জ্ঞানে উদ্ভাসিত হলো দেশ। সৃষ্টি হলো নগরমুখী সংস্কৃতি। বাংলার লোকশিল্প তথা সংস্কৃতি যেন আবদ্ধ হলো ছোট্ট জলার মধ্যে। নিস্তরঙ্গ জীবন যাত্রায় প্রচলিত আমোদ প্রমোদ কোন ঢেউ আনে না। আদিরসাত্মক অশ্লীলতায় ভরা যাত্রাপালা যেন গ্রামজীবনে মাদকতার নেশা আনে। নাগরিকমন আর বিদগ্ধজন তখন অনেক দূরে সরে গেছে।

১৭৮০ শকাব্দে রাজেন্দ্রলাল মিত্র বিবিধার্থ সংগ্রহে লেখেন, 'গত চারি বৎসরাবধি কলকাতা নগরে অনেক স্থানে প্রকৃত নাটকের অভিনয় সম্পন্ন হইতেছে।...এই সরস বিনোদে দেশ ব্যাপ্ত হয়—প্রতি গ্রামে ইহার অনুরাগ হয়—ইহার প্রাদুর্ভাবে যাত্রা, কবি, খেউর প্রভৃতি উৎসবের দূরীকরণ ঘটে—ইহা কর্তৃক বাংলাদেশে কুনীতির উৎসেদ ও নির্মল ব্যবহারের প্রাদুর্ভাব হয়—ইহাই আমাদিগের নিতান্ত বাঞ্ছনীয়।' যাত্রা সম্পর্কে এই ছিল সেকালীন বিদগ্ধজনের অভিমত।

ওদিকে ঊনিশ শতকের বাঙালীর মনে নাট্যতৃষ্ণা জেগে উঠেছে। প্রচেষ্টা চলছে দেশীয় নাট্যশালা গড়ার। শ্যামবাজারে প্রতিষ্ঠিত হয় নবীনচন্দ্র বসুর নাট্যশালা। এ ছাড়া জোড়াসাঁকো নাট্যশালা, সাতুবাড়ীর নাট্যশালা, বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ, বেলগাছিয়া নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শুরু হয়েছে নতুন বাংলা নাটক রচনা। বাংলা সাহিত্যের আরেকটি ধারা পুষ্ট হতে থাকে। রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুল সর্বস্ব' নাটক যে উদ্দীপনা সৃষ্টি করলো তারই পরিণতি মাইকেল মধুসূদনে। রচিত হোল শর্মিষ্ঠা।

১৮২২ খৃঃ ২৬ জানুয়ারী 'সমাচার দর্পণ' থেকে 'কলিরাজার যাত্রা' নামে এক নতুন যাত্রার কথা জানা যায়। এসব যাত্রার আসরে নানা ধরনের সং-এর আবির্ভাব হোত। এরই পর নলদময়ন্তী ও নন্দ বিদায় যাত্রার কথা জানা যায়। এই নন্দ বিদায়' যাত্রায় মেয়েরাই মেয়েদের ভূমিকায় অভিনয় করত। সংবাদ ভাস্করের (১৮৪৯ খৃঃ ১৭ এপ্রিল) ভাষায় 'এতদ্দেশে যে সকল যাত্রা হইয়া থাকে এ যাত্রা সেরূপ যাত্রা নহে। ইহা নূতন প্রকার যাত্রা।' এই নতুন যাত্রার প্রতি নাগরিক মন বিমুখ তো ছিলই না, বরং তাদেরই উৎসাহ ও সক্রিয় সহযোগিতায় এ যাত্রা পরিপুষ্ট হতে থাকে।

উৎপল দত্তের

অগ্নিগর্ভ নাটক যা বাংলাদেশে
আলোড়ন এনেছে, ও মনে সাড়া দিয়েছে

ফেরারী ফৌজ

॥ ৩·০০ ॥

গ্রন্থবিকাশে পাবেন. আজই পুস্তক তালিকার
জন্য পত্র লিখুন

বাংলা নাটকের আদি যুগেও দেখা যায় বাংলা নাটক সাধারণতঃ শেকসপীয়র বা সংস্কৃত নাটকের অনুবাদকে আশ্রয় করে অগ্রসর হচ্ছে। অ.কালের যুগের সূচনাকালের চার বছর পরে প্রথম মৌলিক বাংলা নাটক তারাচরণ শিকদারের 'ভদ্রার্জুন' মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে গড়ে ওঠে। এর পর দীনবন্ধু মিত্র পর্যন্ত যে কখানি নাটকের কথা জানা যায়, তার বেশীর ভাগই অনুবাদ। কয়েকখানি মাত্র মৌলিক নাটক। এর মধ্যে মধুসূদনের ঐতিহাসিক ও প্রহসনগুলিতে এক ধরনের জীবনমুখরতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাঁর পৌরাণিক নাটকগুলিও অলৌকিকতার দ্বারা ভারাক্রান্ত নয়। দীনবন্ধু মিত্রের নাটকে ফুটে ওঠে সমসাময়িক সমাজের সমস্যা। তাঁর 'নীলদর্পণ' বাংলা নাটকের এক দিকচিহ্ন হিসেবেই বর্তমান রয়েছে। দীনবন্ধু মিত্রের পর উল্লেখযোগ্য নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের প্রথমদিকের নাটকগুলি রামায়ণ মহাভারত ভাগবতের পৌরাণিক বিষয়গুলিকে কেন্দ্র করে রচিত। এতে অলৌকিকতার প্রভাব ছিল স্পষ্ট। সংলাপের ক্ষেত্রেও গিরিশচন্দ্র এক নতুন ধরনের অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন করেন। এই ছন্দ গৈরিশ ছন্দ নামে পরিচিত।

এর পাশাপাশি বিবর্তনের সূত্র ধরে না এলেও আরেক ধরনের যাত্রা আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। একে বলা হোত গীতাভিনয়। অপেরা ধরনের এই গীতাভিনয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গীত, নতুন ধরনের নৃত্য ও পাশ্চাত্যধরনে বাংলা নাটকের সংলাপ গড়ে ওঠে। রসের দিক থেকে এতেও ছিল প্রাচীন যাত্রার ভঙ্গি, নতুন যাত্রার আনন্দ আর সেকালীন বাংলা নাটকের কারুণ্য রসের সংমিশ্রণ। অন্তরঙ্গে ও বহিরঙ্গে প্রাচীন যাত্রা ও নতুন যাত্রার যোগ থাকায় এ যাত্রা যেমন সাধারণের মনোরঞ্জন করতো তেমনি সেকালীন শিক্ষিত জনেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়। দেখা গেল গীতাভিনয়ের মধ্য দিয়েই কবি সঙ্গীতের উচ্চ ধারাগুলি টিকে থাকার চেষ্টা করে। ক্রমে গীতাভিনয়ের গীতের অংশকে কমিয়ে সংলাপের অংশ বাড়ান হয়। যাত্রায় পৌরাণিক কাহিনীগুলি আসনস্থ হতে থাকে। এই পর্বে গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকগুলির প্রভাবও যাত্রার উপরে যথেষ্ট পরিমাণে পড়েছিল। পৌরাণিক নাটকের মতই পৌরাণিক যাত্রাও কখনো বিয়োগান্ত হোত না। কাহিনী মিলনাত্মক না হলেও পরিণামে সকলের মিলন দেখানো হোত। মর্তে সম্ভব না হলেও স্বর্গ, বৈকুণ্ঠ বা শিবলোক যেখানেই হোক না কেন। শুধু পৌরাণিক নাটক কেন মঞ্চেও যখন ঐতিহাসিক দেশাত্মবোধক নাটক মঞ্চস্থ হয় তখন যাত্রাও সেই ধারাকে মেনে নিয়েই এগিয়ে যেতে থাকে। সূচনা হয় স্বদেশী যাত্রার। প্রাচীন যাত্রায় যে অশ্লীলতা ছিল তা দূর করতে সর্বপ্রথম এগিয়ে আসেন কৃষ্ণকমল গোস্বামী। তিনি সম্পূর্ণভাবে সমর্থ না হলেও যাত্রাকে যারা নতুন মর্যাদা দিলেন তাঁদের মধ্যে মতিলাল রায় এবং নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রয়োগরীতি ও নাট্য রচনার ক্ষেত্রে মতিলাল এক নতুন ধারার সৃষ্টি করেন। তাঁর নাটকগুলির মধ্যে একদিকে যেমন নাটকীয়তা ছিল তেমনি কথকতার ঢং-এ তিনি এর মধ্য দিয়ে আদর্শ ও স্বাদেশিকতাও প্রচার করে গেছেন। মূলত তিনি যাত্রাকে বর্তমানের মর্যাদার আসনে তুলে বসিয়ে গেছেন। তাঁর সবগুলি পালাই প্রায় পৌরাণিক পালা। তাঁর মৃত্যুর পর ধর্মদাস ও ভূপেন নারায়ণ এই ধারাটিকে অব্যাহত রাখেন। অন্যদিকে নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় কৃষ্ণযাত্রাকে সংস্কৃত করে এক নতুন স্বাদে সৃষ্টি করেন। বিশেষ করে তাঁর রচিত সঙ্গীতগুলি এক বিশেষ মর্যাদার অপেক্ষা রাখে। যাত্রা ইতিহাসের আর এক উল্লেখ্য পুরুষ মথুরানাথ সাহা। ইনি সর্বপ্রথম থিয়েট্রিক্যাল যাত্রাপার্টির প্রবর্তন করেছিলেন।

যাত্রার এই পর্বের লেখকদের মধ্যে বিশেষ করে লিখতে হয় ধনকৃষ্ণ সেন, মতিলাল ঘোষ, ভবতারণ চট্টোপাধ্যায়, অঘোরনাথ কাব্যতীর্থ, ভোলানাথ রায়, নিতাইপদ চট্টোপাধ্যায়, হরিপদ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম। যাত্রা বা থিয়েটারে স্বদেশী নাটকের কথা বলার আগে এর আগমনী-পর্বে সামাজিক অবস্থার কথা বলা দরকার। ১৯০৫ খৃঃ। লর্ড কার্জন দেশে প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি করলেন বঙ্গ-ভঙ্গের ঘোষণা করে। কবি, সাহিত্যিক নাট্যকার—যে যেভাবে পারলেন গর্জে উঠলেন এর বিরুদ্ধে। মঞ্চে গিরিশচন্দ্র তাঁর পুরানো নাট্যধারা ছেড়ে লিখলেন সিরাজদ্দৌলা, চণ্ড, আনন্দরহো প্রভৃতি নাটক। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় লিখলেন মেবার পতন, প্রতাপ সিংহ, দুর্গাদাস প্রভৃতি। ক্ষীরোদপ্রসাদ লিখলেন নন্দকুমার, বঙ্গের প্রতাপাদিত্য প্রভৃতি। এ ছাড়া মন্মথ রায়ের কারাগার, শচীন সেনগুপ্তের 'গৈরিক পতাকা', সিরাজদ্দৌলা, ধাত্রীপান্না, রাষ্ট্রবিপ্লব প্রভৃতি উল্লেখ করতে হয়।

অম্বিকা নাট্য কোম্পানী

হেড অফিস—১১৭।১, রবীন্দ্র সরণী কলিকাতা—৬, ফোন : ৫৫-২৪৫২

এবারে অথা রচনায় নির্মাল্য

ব্রজেনবাবুর **জিঘাংসা** ।। ব্রজেনবাবুর **দেবতার অভিশাপ**

ব্রজেনবাবুর **লৌহমানব** ।। কানাই নাথের **আধার ঘরের আলো**

১৫০তম রজনী অতিক্রান্ত ব্রজেনবাবুর

কা-লা-পা-হা-ড়

শ্রেষ্ঠাংশে

অমিয় বসু ।। বিমল লাহিড়ী

নিতাই দাস ।। শ্রীমতী ছবি রায়

চন্দ্রশেখর (চিত্রশ্রী) ।। দেবকুমার ও আরও অনেকে

বায়নার জন্য যোগাযোগ করুন

পরিচালক : অশ্বিনীকুমার দাস   ম্যানেজার : অনিল দাস

কামাখ্যা হিন্দু হোটেল, তিনসুকিয়া, ফোন—৪৫০

বাংলা নাটকের এই স্বাদেশিকতা যাত্রা পালাতেও প্রতিফলিত হোল। আগে যেসব পালাকারের নাম উল্লেখ করা হয়েছে তাদের পালায় স্বাদেশিকতার উপাদান থাকলেও, স্বদেশী যাত্রাকার হিসেবে সবচেয়ে বেশী প্রসিদ্ধি লাভ করেন মুকুন্দ দাস। যাত্রাগানের মধ্য দিয়ে তিনি বাংলার প্রত্যন্ত প্রদেশেও স্বাদেশিকতার বাণী প্রচার করেন। আর শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতাই নয় সামাজিক সংস্কারের ক্ষেত্রেও তাঁর লেখনী সোচ্চার ছিল। তাঁর মাতৃপূজার পথ 'সাথী' প্রভৃতি পালার নাম উল্লেখ্য। যাত্রায় স্বাদেশিকতা প্রচারে যাঁরা এগিয়ে আসেন তার মধ্যে কুঞ্জলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ফণীভূষণ বিদ্যাবিনোদ, ভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রী, ব্রজেন দে, জিতেন বসাক, পশুপতি চট্টোপাধ্যায়, নন্দগোপাল রায়চৌধুরী, পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

স্বদেশী যাত্রা, যাত্রার ইতিহাসের মোড় ঘোরার এক দিকচিহ্ন। মূলত এই সময়েই যাত্রা থেকে ভক্তিভাব সম্পূর্ণভাবে দূর হয়ে, নাটকীয় কৌতূহল সৃষ্টির দিকেই বেশী করে নজর দেওয়া হোল। যাত্রা ও মঞ্চ এলো কাছাকাছি। অন্যদিকে রামায়ণ গান, চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল ইত্যাদি গানের দল ভেঙে যে যাত্রার সৃষ্টি হয় তা অক্ষম অভিনয়, অযোগ্য বেশভূষা ও কাহিনীর কদর্যতায় দর্শককে দূরে সরিয়ে দেয়। স্বাধীনতার আগে পর্যন্ত নাটকগুলির বিবর্তন হয়েছিলো পেশাদারী মঞ্চকে কেন্দ্র করে। কিন্তু স্বাধীনতা উত্তরকালে বাংলা নাটকের যে ধারাটি গড়ে উঠেছে তা কিন্তু সম্পূর্ণভাবেই সৌখিন ও নাট্যদলগুলিকে কেন্দ্র করে।

স্বাধীনতার ঠিক আগে বিজন ভট্টাচার্যের নবান্ন নাটককে কেন্দ্র করে গণনাট্য আন্দোলন শুরু হয়। এই সময় সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ অবক্ষয়ী সমাজের বিভিন্নমুখী সমস্যা ইত্যাদিই হোল নাটকের প্রধান উপজীব্য। এ ছাড়া যুদ্ধোত্তর ইয়োরোপ, আমেরিকার নানা সমসাময়িক নাটকগুলির অনুবাদও প্রচুর পরিমাণে মঞ্চস্থ হতে থাকে। এ পর্বের নাট্যকারদের মধ্যে দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়, উৎপল দত্ত, শম্ভু মিত্র, তরুণ রায়, কিরণ মৈত্র, রমেন লাহিড়ী, শৈলেশ গুহ নিয়োগী, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, মনোজ মিত্র, মহনকুমার ঘোষ, জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম উল্লেখ করতে হয়। প্রসঙ্গক্রমেই আসে বনফুল, মনোজ বসু, বিধায়ক ভট্টাচার্যের নাম।

মঞ্চের ক্ষেত্রে যা হোল, যাত্রায় তা হোল না। অর্থাৎ এখানে পেশাদারী যাত্রাদলগুলি যাত্রার অগ্রগমনের জন্য সংগ্রাম করে যেতে লাগলেন। কোন অপেশাদারী আন্দোলন এখানে গড়ে উঠতে পারলো না। দেশ বিভাগের ফলে প্রচণ্ডভাবে ঘা খাওয়া যাত্রাজগতে, বেশ কিছুকাল অচল অবস্থা দেখা দেয়। নতুন যাত্রায় সামাজিক ও বস্তুর সমস্যাগুলি এতে স্থান পেলেও কাল্পনিক নাটকগুলি আসর জাঁকিয়ে বসে। এইসব পালা ১৯৬০-৬২ খৃঃ পর্যন্ত টিকে থাকে। তারপর মঞ্চের মতই যাত্রার কাহিনী ও আঙ্গিকেও এলো পরিবর্তন এবং তা বেশ দ্রুতই। বর্তমানে দেখা যাচ্ছে যাত্রায় অতি আধুনিক জীবনজিজ্ঞাসা বা সমস্যা থেকে শুরু করে জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস, আন্তর্জাতিক চরিত্র বা আন্দোলনও রূপায়িত হচ্ছে। কাহিনীর এই বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সংলাপ ও সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও আধুনিকতার ছাপ স্পষ্টই হয়ে ওঠে।

এ ছাড়া অভিনয়ধারা ও অতি-নাটকীয়তাও ত্যাগ করে বাস্তবমুখী হয়ে উঠেছে। শুধু তাই নয় উৎপল দত্ত, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, সুনীল দত্ত, রমেন লাহিড়ী, বিধায়ক ভট্টাচার্য প্রভৃতি নামী নাট্যকার ও সাহিত্যিকদের আগমনে যাত্রা বেশ পরিপুষ্ট হচ্ছে। বর্তমানে যাত্রার আসরে লেনিন, হিটলার, সূর্য সেন, জালিয়ানওয়ালাবাগ, বিবেকানন্দ, বিদ্যাসাগর, বিনয়-বাদল-দীনেশ, নীলরক্ত, শিল্পী চলো, মধুসূদন, দেবদাস, রজনী, বৌঠাকুরাণীর হাট, বিপ্লবী ভিয়েতনাম, সিরাজের কান্না প্রভৃতি পালা আসরস্থ হচ্ছে। এ সব নাটকের সংলাপবৈচিত্র্য, কাহিনী পরিবেশনা, অভিনয় ধারা সব কিছুতেই যে পরিচ্ছন্নতা ও রুচির ছাপ রয়েছে তা অনেক সময় মঞ্চের চেয়েও প্রগতিশীল। যাত্রা সম্পর্কে এই দশকের সবচেয়ে উল্লেখ্য ঘটনা ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদের। আকাদেমি পুরস্কার এবং তরুণ অপেরার সোভিয়েত দেশ পুরস্কার প্রাপ্তি।

নিউ প্রভাস অপেরা

৩৩৩এ, রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা-৬। ফোন ৫৫-৫৭৮৭

স্বত্বাধিকারী : দীনবন্ধু গুছাইত পৃষ্ঠপোষক : তিনকড়ি গুছাইত

যাত্রাজগতের বিস্ফোরণ—

বিপ্লবী ভিয়েতনাম

রচনা : দেবেন নাথ : সুর : অজিত বসু : নেপথ্য কণ্ঠ : কাজী সব্যসাচী : আলোক : অজাতশত্রু

সম্পাদনা ও নির্দেশনা—রমেন লাহিড়ী

ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়ের—সিরাজের কান্না

তৎসহ—শ্রীকান্তের সংসার ঃঃ পাগল ঠাকুর

রূপায়ণে—পূর্ণেন্দুশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, অভয় হালদার, প্রণয় কুমার, রবীন চ্যাটার্জী, অমূল্য ভট্টাচার্য, নিমাই দত্ত, মহেন্দ্র ব্যানার্জী (হাস্য), জয়ন্তকুমার, প্রফুল্ল ব্যানার্জী, বীরেন দেবনাথ, সুবর্ণ সামন্ত, রীতা দত্ত, অনিলা ভট্টাচার্য, অরুণা গোস্বামী, মঞ্জু ব্যানার্জী, বিমলরাণী ও অনাদি চক্রবর্তী।
সঙ্গীতে—কুমুদ মালী (ভুলুয়া), ধনঞ্জয় নস্কর, সীতাংশু ধাড়া।
নৃত্য—পশুপতি সিং, ছবিদাস, ধীরেন, রাজেন, শঙ্কর।
আবহ-সঙ্গীত পরিচালনায়—হিমাংশু ধাড়া, হরিদাস নট্ট।

ম্যানেজার : প্রভুল ব্যানার্জী - মৃত্যুঞ্জয় পাণ্ডা সহকারী : বিশ্বনাথ চৌধুরী

উপদেষ্টা—কমল চ্যাটার্জী : পরিচালক—রমেন বসু মল্লিক

এর নাম অপর্ণা

**মায়ের চোখের মণি,১০০ অবধি স্কিপিং করতে পারে
আর নামতা পারে ১১ ঘর অবধি!**

আসল জিনিসটি ওর চাই!

অপর্ণা কেবল বলে,'আমি কবে হব মায়ের মত বড়'।
ওর মা তাকে [illegible] বলেন,'খুব ভাল হবি, খুব কাজের হবি'।
আর তাইতো মা ওকে রোজ হরলিক্স খেতে দেন—
যাতে ওর বাড়ন্ত শরীর প্রয়োজনীয় পুষ্টি পায়।
হরলিক্সই হলো আসল জিনিস।
পুষ্টিকর উপাদান আর শক্তিদায়ক প্রোটিন থাকাতে
হরলিক্স ছেলেমেয়েদের শরীর গড়ে তুলতে বিশেষ
সাহায্য করে।

হরলিক্স খাঁটি গরুর দুধ, উৎকৃষ্ট গম এবং অঙ্কুরিত
পুষ্টিকর খাদ্য দিয়ে তৈরী বলেই এর এতো গুণ।
হরলিক্সের ওপর মায়েদের অগাধ বিশ্বাস।
ডাক্তাররা আজ ৮০ বছরের ওপর হরলিক্স খেতে
নির্দেশ দিয়ে আসছেন।
রোজ হরলিক্স খেয়ে আপনার ও পরিবারের সকলের
স্বাস্থ্য ও শক্তি বজায় রাখুন।
হরলিক্স অতিরিক্ত পুষ্টি আর বাড়তি শক্তি দেয়।

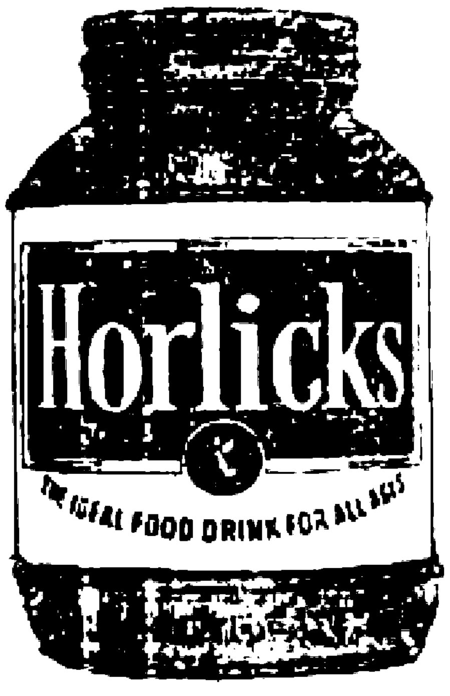

'হরলিক্স' হ'লো আসল জিনিস

'হরলিক্স' একটি রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক

HL 1854 A

এই মহানগরী, অন্য নগর

দক্ষিণারঞ্জন বসু

কলকাতা জীবন্ত মহানগরী, কিন্তু এ শহর দুর্গতিগ্রস্ত শহর। পথে বেরুলেই এখানে আতংক, সামনেই ঝুঁকি দুর্ঘটনা কিংবা কোনো বিপত্তি।

কিন্তু কী করে কলকাতা এমন হলো? দেখতে দেখতে আজ একি তার অবস্থা? কারণ তার হয়তো অনেক। আসল কারণ, আমাদের শহরকে আমরা ভালোবাসি না।

কলকাতা ভাবনায় এলেই অন্য দেশ ও অন্য নগর-নগরীর কথা মনে পড়ে। তার সব নিয়ে আলোচনা অসম্ভব। একটি দেশের নগর-শাসন ব্যবস্থা এবং তাদের নাগরিক কর্তব্য-বোধের কথাই বলি।

আমেরিকার রাজনীতির অনেক কিছুর সঙ্গেই আমার মনের সায় নেই। কিন্তু সে দেশের মানুষের নগর-পরিকল্পনায়, নগর-শাসন ব্যবস্থায় এবং তাঁদের পৌর-প্রীতি ও দেশপ্রেমে আমি মুগ্ধ। তা নিয়েই এ আলোচনা।

বছর পনেরো আগের কথা। আমি নিউ অর্লিন্স শহরে। উত্তর আমেরিকার দক্ষিণাঞ্চলের বৃহত্তম বন্দর-শহর নিউ অর্লিন্স। দুটি জায়গা থেকে বিশেষ আমন্ত্রণ আমার। একটি পোর্ট কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে। অপরটি মেয়র ও সিটি কাউন্সিলের। স্থানীয় স্টেট ডিপার্টমেন্টের রিসেপশন সেন্টারের ওপর আমার কর্মসূচী নির্ধারণের ভার। তাঁদের কাছ থেকে এ দুই আমন্ত্রণ সংবাদে আমি খুশি।

শেষটিতে আমেরিকার পৌরশাসন-পদ্ধতি শহর-জীবন সম্বন্ধে বিস্তৃত জানার নিশ্চিত সুযোগ। মার্কিন সফরে যাবার আগে পশ্চিমবঙ্গ পৌরকরদাতা সমিতির অনুরোধও ছিল তা জানবার।

সকালবেলা বন্দর-ঘাটে পৌঁছি। পরিচ্ছন্নতায় মন তৃপ্ত। কলকাতার গঙ্গার ঘাটের ছবিও সঙ্গে সঙ্গেই মানসনেত্রে। গঙ্গা পুণ্যতোয়া! কিন্তু তার পবিত্রতা রক্ষায় আমাদের যত্ন, আমাদের প্রয়াস কতটুকু? কর্মহীন পুণ্যলোভ ওদের কাছে নিরর্থক—জীবনে সুন্দরের প্রতিষ্ঠায় ওদের প্রাণ-প্রযত্ন। তাই মিসিসিপির নুড়ীর জুড়ে স্বপ্নলোক।

দু' ঘণ্টার প্রমোদ-ভ্রমণ। আমন্ত্রিত আমরা দুজন। আমি আর সুইডিশ পার্লামেন্টের একজন সদস্য। পোর্ট কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি সঙ্গী আমাদের। তা ছাড়া অন্যান্য রাজ্যের আমেরিকান কয়েকজন।

বন্দর-প্রতিনিধি ঘুরিয়ে দিচ্ছিলেন আমাদের সব। নদীর বুকে জাহাজে বসে দেখছিলাম দু' তীরের কর্মব্যস্ততা আর কর্মকুশলতা। কাজে আলস্য নেই, কাজে অতৃপ্তি নেই। পূর্ণ সাফল্যে পূর্ণ সন্তোষ, পরিপূর্ণ শান্তি। সর্বত্রই লক্ষ্য করেছি, ফাঁকি নেই কোথাও। জাতকে বড়ো করে তোলবার মূল রহস্য সেখানে।

পরদিন বিকেলে সিটি হলে একটি ছোট্ট অভ্যর্থনা। সিটি হল মানে মিউনিসিপ্যাল বিল্ডিং। মেয়র ও কাউন্সিলম্যানদের স্বাক্ষরিত নাগরিক অধিকার দান সম্বলিত সম্বর্ধনা-পত্রের ঘোষণায় আমিও নিউ অর্লিন্স শহরের একজন সম্মানিত নাগরিক। সে প্রসংগেই আরো একটি বিচিত্র প্রাপ্তি—'গোল্ডেন কী অব দি সিটি'। একটি সুদৃশ্য কৌটোয় সুরক্ষিত একটি সোনালী চাবি। এ নাকি সম্মান-প্রতীক। এর কোনো প্রয়োজন ছিল না আমার। নগর-কর্তাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় তাঁদের কর্মনিষ্ঠা এবং পৌর-প্রীতির পরিচয় পেয়েই আমার বেশি আনন্দ।

অনেক কথাই হলো আমেরিকার নগর-জীবন সম্বন্ধে, আমেরিকার নগর-শাসন পদ্ধতি সম্পর্কে। সে বিষয়ে কিছু লিটারেচারও হাতে এলো। তারপর শুধু সিটি হল নয়, সারা শহর ঘুরে দেখে অনেক জ্ঞান সঞ্চয়। 'দ্বন্দনগরী' বলে শিকাগোর কুখ্যাতি। সেখানেও নগর-সৌন্দর্য নব নব পরিকল্পনা। আর তা রূপায়ণে সকলের সহযোগিতা। পৃথিবীর বৃহত্তম বাণিজ্য-কেন্দ্র নিউইয়র্ক। কর্মমুখর আরেক মহানগরী। ডলার মাহাত্ম্যে মশগুল মন। সেই নিউইয়র্কও রূপচর্চায় ও স্বাস্থ্যরক্ষায় সদা সতর্ক।

প্রবল ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য আমেরিকায়। তা সত্ত্বেও সে দেশের নগর-জীবনের বিকাশে, জাতীয় জীবনের অগ্রগতিতে সহযোগিতার অবদান অতুলনীয়। এ শহর আমার, এ দেশ আমার—এ বোধ যতোদিন না আসছে আমাদের মধ্যে, শহরকে সুন্দর করবার, দেশকে এগিয়ে নেবার পথে সহযোগিতা দেবার সুবুদ্ধিও হবে না ততোদিন।

প্রতি বছর 'নাগরিক দিবস' পালনের রেওয়াজ রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে। এমনি অনেক 'দিবস' পালিত হয় এখানে। কিন্তু আমার মনে হয় 'নাগরিক দিবস'-এর গুরুত্ব সর্বাধিক। নাগরিক কর্তব্য স্মরণ ও প্রতিশ্রুতি গ্রহণ। এ প্রত্যেক নাগরিকের সেদিন অবশ্য করণীয়। জনগণের দ্বারা গঠিত জনগণের জন্যে জনগণের সরকারের প্রতি সেদিন সবার মুখে মুখে আস্থা ঘোষণা। নগর-শাসন ব্যবস্থায়ও সেই গণতান্ত্রিক বোধেরই প্রতিচ্ছায়া।

রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণায়, শাসনতান্ত্রিক বিধি-ব্যবস্থায় আমাদের সঙ্গে আমেরিকানদের অনেক মিল। এ আমাদের অনুকরণ-প্রিয়তার একটা দিক। কিন্তু জীবনযাপন প্রণালীতে এ দুই দেশে অনেক তফাৎ। আমরা গণতন্ত্রের বড়াই করি। কিন্তু গণতন্ত্রেরও যে একটা অর্থনৈতিক ভিত্তি রয়েছে, আমার ভারতে তার স্বীকৃতি নেই। অন্তত সাধারণ মানুষের কাছে তার কোনো পরিচয় নেই। বড়ো বড়ো কথার ফুলঝুরিই শুধু, কাজে কোথায় এবং কতটুকু তার রূপায়ণ? সাম্য, স্বাধীনতা ও ন্যায় ভিত্তিক গণতান্ত্রিক জীবন-পদ্ধতির ব্যাপকতা আমেরিকায়। কি দেশ-শাসন, কি নগর-শাসন সবই সেখানে সে অনুযায়ী।

নগর উন্নয়নের শিক্ষা আমেরিকার সর্ব-শ্রেণীর সকল নর-নারীর পবিত্র শিক্ষা। নগর-বিধি মেনে চলা ওদের ধর্মবিশেষ। শহরের সর্ববিধ সুখ সুবিধা বিধানে সহযোগিতা ও সমন্বয় সবার কাম্য। তীব্র ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য বোধও কখনো বাধা হয় না সেখানে নাগরিক কল্যাণমূলক কাজে। তাঁর চেষ্টায় তাঁর পল্লী তাঁর শহর সুন্দরতর হতে পারে, আরো স্বাস্থ্যকর হতে পারে, এ সম্পর্কে প্রত্যেকেই সজাগ এদেশে। বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই এদেশবাসী লাভ করে এ শিক্ষা। পল্লী ও শহর উন্নয়নমূলক কাজের জন্যে রয়েছে নানা সমাজসেবী প্রতিষ্ঠান। রাজনীতির স্পর্শমুক্ত এসব সংস্থা। পল্লী ও নগর সেবাতেই এদের সার্থকতা। সংস্থার অসংখ্য তালিকা। কয়েকটির কথা বলি। বিভিন্ন চেম্বার অব কমার্স, সিটিজেন্স লীগ, টাক্স পেয়ার্স অ্যাণ্ড ভোটার্স ক্লাব, মিউনিসিপ্যাল লীগ,

শাড়ীর মেলা
নিউ বেনারসী হাউস
কলেজ স্ট্রীট নং (পূব) কলিকাতা-৭

প্যারেন্ট-টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন ইত্যাদি নগর-প্রতিষ্ঠান ছাড়াও আমেরিকান পাবলিক ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন, আমেরিকান প্ল্যানিং ও সিভিক অ্যাসোসিয়েশন, ন্যাশনাল রিক্রিয়েশন অ্যাসোসিয়েশন, ন্যাশনাল লীগ অব উইমেন ভোটার্স, ন্যাশনাল হেলথ কাউন্সিল ইত্যাদি বহু জাতীয় সংস্থা রয়েছে নগরে নগরে নাগরিক স্বার্থরক্ষার কাজে যে-গুলি সদা-নিযুক্ত। নগর-জীবনে নানা স্বাচ্ছন্দ্য বিধানে এবং সবার চিত্তবিনোদনে বিবিধ ব্যবস্থাপনায় এ সব সংস্থার সদস্যদের গভীর আনন্দ। আদর্শ নাগরিক গড়ে তোলার কাজেও তাদের অনেক দান।

ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল আইনে অনেক ত্রুটি। সে সব ত্রুটির সুড়ঙ্গ পথেই পৌর-শাসন ব্যবস্থায় অনেক গলদের প্রবেশ। বিভিন্ন প্রগতিশীল দেশের অভিজ্ঞতায় আমাদের বিধি-বিধানের সংশোধন অবশ্য প্রয়োজন। সে পরিপ্রেক্ষিতেই আমেরিকার নগর-শাসন সম্বন্ধে এবার সংক্ষেপে বলি। তিনটি প্রণালী চালু এ ব্যাপারে আমেরিকায়। গোড়াগুড়ি থেকে চলে আসছে মেয়র-কাউন্সিল ব্যবস্থা। এ একেবারে পুরনো ইংল্যান্ডের পৌর শাসন প্রণালীর মার্কিন রূপ। বৃটিশ উপনিবেশের যুগ তখন আমেরিকায়। প্রবাসী শাসক ইংরেজ স্বদেশের পৌর-ব্যবস্থাই চালু করেছেন এদেশেও। কিন্তু তখনকার দিনে মেয়রের কর্তৃত্ব ছিল অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। আজ নগর-শাসনে মেয়রের ক্ষমতা অনেক বেশি।

এই মেয়র-কাউন্সিল পদ্ধতিরও অবশ্য পৃথক ধারা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। একটিতে কাউন্সিল মেয়রের উপদেষ্টা পরিষদ মাত্র মেয়রের সম্পূর্ণ কর্তৃত্বাধীন। অন্য ধারায় কাউন্সিলই প্রকৃত শক্তিস্তম্ভ ও মেয়রের পরিচালক। মেয়র যেখানে স্বপ্রধান সাধারণত সমস্ত বিভাগীয় কর্তা নিয়োগই তাঁর হাতে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান পদের জন্যে তাঁর মনোনয়ন পেশ করা হয় কাউন্সিলের কাছে অনুমোদনের জন্যে। তবে সে শুধু কাগজেপত্রে। আসলে মেয়রের কথাই শেষ কথা। বিশেষ করে ছোট ছোট শহরে, শিকাগোর মতো কোনো কোনো মহানগরীতে মেয়রই সভাপতিত্ব করেন কাউন্সিল সভায়। কাউন্সিলের বিশেষ বিশেষ সিদ্ধান্ত বাতিল করার অধিকারও রয়েছে অনেক পৌরাধিনায়কের। নিউইয়র্ক মহানগরীর মেয়রও এমনি স্বপ্রধান। স্থানীয় শাসনবিধি সংক্রান্ত যে কোনো সিদ্ধান্ত তিনি বাতিলের অধিকারী। কোনো বিষয়ে তাঁর এই ভেটো প্রয়োগের ক্ষমতা নিরর্থক করতে কাউন্সিলের অন্তত দুই-তৃতীয়াংশের ভোট প্রয়োজন।

মেয়র-কাউন্সিল পদ্ধতিতে প্রায় সর্বত্রই বাজেট রচনার দায়িত্বও মেয়রেরই। নিউ-ইয়র্ক বা ঐরূপ কোনো কোনো বড়ো শহরে মেয়র-নিযুক্ত সিটি ট্রেজারারের ওপর সে ভার ন্যস্ত। কারণ অর্থ দপ্তরের কর্তা তিনি। বিভিন্ন মিউনিসিপ্যাল কোর্টে বিচারকের কাজও করতে হয় মেয়রকে। মার্কিন পৌর-শাসন ব্যবস্থার এও একটি বিশেষ দিক। তবে অনেক শহরে আবার সিটি ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করেই মেয়রের পৌর-বিচারের দায়িত্ব শেষ। সিটি ম্যাজিস্ট্রেট-দের ওপরেই সরাসরি বিচারের ভার সেখানে।

স্বপ্রধান হলেও এই মেয়র-কাউন্সিল ব্যবস্থায় আপন খেয়ালখুশি মতো কাজ করতে পারেন না মেয়র। তাঁকে অপসারণ করারও বিধিবিধান রয়েছে। গুরুতর কোনো অভিযোগে সিটি কাউন্সিল ভোটাধিক্যে মেয়র অপসারণে সক্ষম। অনেক শহরে

ছোটদের সচিত্র ইংরেজী-বাংলা অভিধান

জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাব্লিশার্স প্রাঃ লিঃ প্রকাশিত

শিক্ষা বিভাগ ও মনীষিবৃন্দ প্রশংসিত

পরিবর্ধিত নবম সংস্করণ বাহির হইতেছে !

COMMON WORDS

* পৃষ্ঠা সংখ্যা ২২৪ * ছবির সংখ্যা ৩৮০ * দাম আড়াই টাকা

জেনারেল বুকস্

এ-৬৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা—১২

পৃথিবীর সমস্ত খেলাধুলার খবর আপনার শ্রবণ গোচরে এনে দেবে আর আনন্দ দেবে নানা দেশের নানা জাতির সুমিষ্ট সঙ্গীতে—

রজার্স থেকে
কিনুন বিশ্বের সেরা মানে তৈরী সুন্দর নতুন
পূজা মডেলের ফিলিপস্ রেডিও

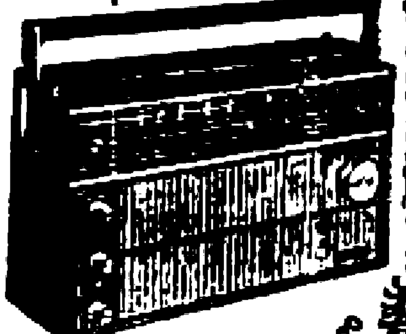

মূল্য : ১১৯, থেকে ৭৬৮,

তাছাড়া পাবেন : রেডিওগ্রাম (ফিলিপস্ রেডিও ও গ্যারার্ড চেঞ্জার ফিট করা) ★ রেকর্ড প্লেয়ার ★ চেঞ্জার ★ স্টিরিওগ্রাম ★ পূজার রেকর্ড ও অন্যান্য রেকর্ড (শুধু থিয়েটার রোডে) ★ 'এভারেডি' ট্রানজিস্টার ব্যাটারী ইত্যাদি।

PHILIPS

শীততাপ নিয়ন্ত্রিত শো-রুম

জি রজার্স অ্যাণ্ড কোম্পানী

১২, ডালহৌসি স্কোয়ার ইস্ট, কলিকাতা-১ ২২-৫৪৭২

৫১, থিয়েটার রোড, কলিকাতা-১৭ ৪৪-০৭৭৬

ভোটদাতাদের ক্ষমতা রয়েছে মেয়রকে পদচ্যুত করার। বহু রাজ্যে আবার মেয়রের পদচ্যুতি গভর্ণরের হাতে।

এবার সিটি কাউন্সিলের কথা কিছু বলা যাক। আমরা যাঁদের কাউন্সিলর বলি আমেরিকায় তাঁরা কাউন্সিলম্যান। নগর-পরিধি ও নগর-গুরুত্বে তাঁদের সংখ্যার কমবেশি। কোথাও পাঁচ, কোথাও পঞ্চাশ। তবে বিভিন্ন পৌরসভায় কুড়ি থেকে ত্রিশই তাঁদের সাধারণ সংখ্যা। বড়ো বড়ো শহরের মেয়রের মতোই কাউন্সিলম্যানরাও পূর্ণসেবক। ছোট শহরে তা সম্ভব নয় বলেই বাইরের উপার্জনে তাঁরা নির্ভরশীল।

অনেক শহরে নির্বাচিত সভাপতিই পরিচালনা করেন কাউন্সিল সভা মেয়রের পরিবর্তে। নিউ অর্লিয়েন্সে দেখেছি, সেখানে নগর-শাসন চলে কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত মতে। সে পৌরসভায় কাউন্সিলের দুজন সভাপতি। তাঁরা দুজনেই কাউন্সিলের নির্বাচিত। কাউন্সিল অধিবেশনে পর্যায়-ক্রমে সভাপতিত্ব করেন তাঁরা। এই রীতি। আর কোনো শহরে কাউন্সিলের এমনি ডবল সভাপতি আছেন কিনা আমার জানা নেই।

কাউন্সিলম্যানদের কার্যকাল সাধারণত মেয়রেরই মতো। জনস্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, নৈতিক মান সম্পর্কে বিধি-বিধান রচনা এবং জরুরী প্রয়োজনে অর্ডিন্যান্স জারি তাঁদের কার্যাবলীর মধ্যে বিশেষ উল্লেখ্য। নগর-সৌন্দর্য বিধানের দিকে লক্ষ্য রাখাও তাঁদের কাজ। কোনো কোনো পৌরসভায় বিভিন্ন

কসমেটিক ডিভিসন বেঙ্গল কেমিক্যাল কলিকাতা • বোম্বাই • কানপুর দিল্লী • মাদ্রাজ • পাটনা

রঞ্জিত মল কাংকোরিয়া
নিবেদিত

চির বিপ্লবী স্রষ্টা

উদয় শঙ্করের

উদয় শঙ্করের শঙ্করকোষ

ভারতে প্রথম পর্দা ও
মঞ্চের সমন্বয়ে
অভূতপূর্ব সৃষ্টি

উদয়শঙ্কর বলেন :

"গত বিশ বছর ধরে একটি অভাবনীয় বিচিত্রানুষ্ঠান সৃষ্টির কথা আমি চিন্তা করে আসছি। আমার সেই স্বপ্ন আজ বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে—তাই আমি সুখী।"

উদয় শঙ্করের শঙ্করকোষ

যুগান্তর বলেন :

...সেই চমক লাগানো কৌতূক, যার মধ্যে শুধু বাহিরিন্দ্রিয়ের শিহরণই নেই, আছে শিল্পীর গৌরব জোকের দীপ্তি। এ ম্যাজিক কি?—এর মধ্যে আছে আমাদের দৈনন্দিনের চেনা-বহুদিনের অতি পরিচিত বস্তুসম্ভার যাত্রা, অপেরা, থিয়েটার, লোকনৃত্য, সিনেমা, নৃত্যনাট্য, মুকাভিনয়, কিন্তু নূতন কিছু না থেকেও নান্দন কলাশিল্পের সঙ্গম নূতন হয়ে উঠেছে যে স্পর্শমণির সংস্পর্শে সে ছোঁয়া উদয়শঙ্করের অলোক সম্ভব প্রতিভা।

আনন্দবাজার বলেন :

"পর্দায় আর মঞ্চে একের পর এক, অথবা একই সঙ্গে যে সব ব্যাপার দেখা গেল, সেখানে চমক ছিল, মজা ছিল, বস্তু যোগও। উপস্থিত দর্শক মুগ্ধ।"

উদয় শঙ্করের শঙ্করকোষ

আকাদেমী অফ ফাইন আর্টস

প্রত্যহ দুটি শো ৩টা ও ৬টা
সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত
অগ্রিম টিকিট পাওয়া যাচ্ছে।

শাসন বিভাগও সংগঠন করে কাউন্সিল। কর্মীদের বেতন-ভাতা নির্ধারণ করে। কাউন্সিলের গুরুত্ব যেখানে বেশি সেখানে তাদের এসব কাজ।

এই হলো মেয়র-কাউন্সিল প্রণালীর মোটামুটি কথা। আমেরিকার পৌরশাসনে এ ব্যবস্থাই সর্বাধিক চালু। কমিশন ব্যবস্থাও চালিত আছে অনেক শহরে। এক্ষেত্রে মেয়রই অবশ্য প্রধান পদ। তবে এ পদ প্রাপ্য কোনো একজন কমিশনারেরই।

কমিশন প্রণালী প্রবর্তনের একটি কাহিনী আছে। আমেরিকার বৃহত্তম রাজ্য টেক্সাস। প্রাকৃতিক সম্পদে এ রাজ্য অতি সমৃদ্ধ। তা' বলে প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে তার নিষ্কৃতি নেই। টেক্সাসেরই এক শহর গ্যালভেস্টন। বিংশ শতাব্দীর শুরুতেই এ শহরের চরম বিপদ। ভীষণ বন্যা। প্রচণ্ড ঝড়ের পর মেক্সিকো উপসাগরের ক্ষিপ্ত রূপ। প্লাবিত গ্যালভেস্টনে ধন-প্রাণের প্রচুর ক্ষতি। নাগরজীবন সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত। নগর রক্ষায় রাজ্য আইনসভায় কয়েকজন বিশিষ্ট নাগরিকের পক্ষ থেকে একটি জরুরী পরিকল্পনা পেশ। সে পরিকল্পনা গৃহীত হলো। সিটি কাউন্সিল ও মেয়র পরিচালিত পৌরশাসন ব্যবস্থা সাময়িকভাবে বাতিল করে দিয়ে নিয়োগ করা হলো পাঁচজনের এক নগর-কমিশন। পাঁচজন সংশ্লিষ্ট শিল্পপতির হাতে ভার পড়লো পৌর-শাসনের। পাঁচজন কমিশনার পাঁচটি বিভাগে ভাগ করে নিলেন তাঁদের কাজ। দ্রুত ফিরিয়ে আনলেন শহরের স্বাভাবিক অবস্থা। ফলে এ প্রণালী শুধু গ্যালভেস্টনেই নয়, এর জনপ্রিয়তা ছড়িয়ে পড়লো সারা রাজ্যে, এমনকি টেক্সাসের বাইরেও অনেক পৌরসভা কমিশন ব্যবস্থা মেনে নিলো। কমিশনের সদস্য সংখ্যা সাধারণত তিন থেকে সাতের মধ্যে। স্থায়ী তারা কোথাও দু' বছর, কোথাও চার বছরের জন্য।

জনপ্রিয়তার দিক থেকে অবশ্য তৃতীয় পৌরশাসন প্রণালীর দ্বিতীয় স্থান। কাউন্সিল-ম্যানেজার শাসন ব্যবস্থার কথা বলছি। এও আরেক বন্যা-বিপর্যয়ের ফল। ১৯১৪। ওহাইও রাজ্যের ভীষণ প্লাবনে ডেটন শহর ডুবুডুবু। এ অবস্থায় মেয়র-কাউন্সিল ও কমিশন ব্যবস্থার অপূর্ব সমন্বয়ে এক অভিনব নগর-শাসন পদ্ধতির উদ্ভব ডেটনে। কমিশন ব্যবস্থার মতোই পাঁচজনের এক কাউন্সিলের হাতে নগর-রক্ষা ও উন্নয়নের ভার। নাগরিকরা নিশ্চিন্ত কিন্তু উদাসীন নয়। সবাই সহযোগিতায় সদা প্রস্তুত। ডেটন শহরের সে-বিপদ উদ্ধার এমনিভাবেই। তারই পর থেকে সারা দেশে হাজারেরও বেশি শহরে এই কাউন্সিল-ম্যানেজার শাসন চালু। শুধু আমেরিকাতেই নয়, কানাডাতেও অনেক শহরে এমনিতর পৌরশাসন।

প্রথম দুটি পৌরশাসন পদ্ধতির অর্থাৎ মেয়র-কাউন্সিল ও কমিশন প্রথার যা কিছু ভালো তা নিয়ে এই নতুন ব্যবস্থা। মানে কাউন্সিল-ম্যানেজার শাসনরীতি। অতি সমস্যাসংকটে গলদ নষ্ট হবার সম্ভাবনা নেই এতে। কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত রূপায়ণের ভার তাঁদেরই নিযুক্ত যোগ্য ম্যানেজারের ওপর। দায়িত্ব পালনে ম্যানেজারের পূর্ণ স্বাধীনতা। দলবাজির কোনোই সুযোগ নেই সেখানে। কাউন্সিলের সভায় যোগ দিয়ে আলোচনায় অংশ গ্রহণেও ম্যানেজার অধিকারী। কিন্তু কোনো বিষয়েই ভোটাধিকার নেই তাঁর। তবুও এই ম্যানেজারই পৌরসভার প্রধান কর্মকর্তা। কাউন্সিলম্যানদের তাই কাজ হালকা। নতুন নতুন পরিকল্পনা চিন্তায়, উন্নয়নমূলক নানা ব্যবস্থাপনায় অনেক সময় তাঁদের হাতে। রাজনৈতিক কচকচি থেকে মুক্ত পৌরশাসন। আমেরিকার নগর-জীবন তাই এত সুন্দর, এত সুখকর! শুধু আমেরিকায় কেন, সভ্য-জগতে প্রায় সর্বত্রই নগর-পরিবেশ মনোরম—সবার আনন্দে আনন্দমুখর। নাগরিকরা সব বড়ো শহরেই নিজ নিজ শহর নিয়ে গর্বিত।

আর আমরা আমাদের এ কলকাতায়? আজ আর এ কলকাতায় গৌরব করার মতো আমাদের কী আর এমন আছে? কতকালের আনন্দ-মেলা আজ আর এই মহানগরী? দিনের কর্মক্লান্তি শেষে সায়াহ্ন-শান্তি আহরণের কোথায় কতটুকু ব্যবস্থা এ শহরে আর সহজলভ্য? বক্তৃতার অধিকারক্লিষ্ট জীবন-বিষণ্ণতা মোচনে বক্তৃতা, বিবৃতি ও বিজ্ঞাপন ছাড়া দৃঢ় প্রয়াসের লক্ষণই বা কোথায়? শ্রীহীন দীনতায় রাজপথগুলির অঙ্গে অঙ্গে শুধুই লজ্জাচিহ্ন! এ যেন রাজপথ নামে এক একটি ব্যঙ্গ কবিতা। পথ-চলায়ও আনন্দ আছে। কিন্তু এই মহানগরীতে চিত্তবিনোদন নয়, চিত্ত-বিকার ঘটে পথ-চলতে গিয়ে। দীর্ঘকাল ধরে এ তো প্রত্যেক নাগরিকেরই প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতা। হায় গঙ্গার ঘাট! পার্কগুলিরই বা কী শোচনীয় অবস্থা। বাজার পরিবেশ? স্কুল? কোনটা বাদ দিয়ে কোনটার কথা বলবো?

প্রায়ই খবরের কাগজে কলকাতা কর্পোরেশনের বিতর্ক ও মাঝে মাঝে হাতাহাতির সংবাদ পড়ে বুঝতে পারি অন্যতম শ্রেষ্ঠ এই মহানগরীতেও একটি পৌরসভা আছে। সেখানে পৃথিবীর বড়ো বড়ো সমস্যা নিয়ে ঝড় ওঠে। স্থানীয় নাগরিক সমস্যা নিয়ে ভাবনা-চিন্তার তেমন সময় কোথায়? পড়তে পড়তে তুলনা করি আর ভাবি আমাদের অবস্থা। আমরা তর্কে মাতি আর ওরা কাজে, নগরবাসীদের স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের কাজে মাতোয়ারা। আমাদের পৌরসভাগুলি কবে সত্যিকারের কর্মসভার রূপ নেবে? পৃথিবীর অন্যান্য উন্নত নগরের দৃষ্টান্তে আমরা কি কোনোদিনই উদ্বুদ্ধ হবো না?

মানুষ বনাম মেশিন

অজয় বসু

হারপাসটাম বা ফলিসের কথা ছেড়েই দিলাম। ওসব তো আদিকালের অনুষ্ঠান। রোমান আমলের। ও দুটোই হয়তো আধুনিক ফুটবলের পূর্বপুরুষ। কিন্তু পূর্বপুরুষের জীবন কাহিনী তেমন ঐতিহাসিক তথ্যের ওপর দাঁড়িয়ে নেই। বরং বলা যেতে পারে যে হারপাসটাম ও ফলিস, দুয়ের অঙ্গেই প্রাগৈতিহাসিক আমলের কিংবদন্তী জড়ানো। তাই পূর্ব-পুরুষের বাসভূমি যে মুলুকই হোক না কেন, সেখানে কিন্তু ফুটবলের বসবাস ঘটে নি।

ইংলণ্ডই ফুটবলের আঁতুড়ঘর এবং যৌবনের লীলাভূমি। কিংবদন্তীর সেই ড্যানিস হানাদারের কর্তিত মুণ্ডে লাথি মারতে মারতে, অথবা অন্য যে কোনো সূত্রে ইংলণ্ড ফুটবল খেলতে শিখেই খেলাটিকেও আপন করে নিয়েছিল। ভাল লাগা থেকে ভালবাসা জন্মায়। খেলতে ভাল লাগতো বলেই, খেলাটিকেও ইংলণ্ড ভালবেসে ফেলে। ফলে ইংলণ্ডের মাঠে ও মাটিতে ফুটবলের লালনপালনের পরিকল্পনাও সযত্নে রচিত হয়।

অপেশাদার থেকে পেশাদারী ফুটবল, প্রীতি প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে আন্তর্জাতিক ম্যাচ, ফুটবলের এক বিরাট কর্মকাণ্ডের হোতা ওই ইংলণ্ডই। ইংলণ্ড শুধু নিজেই খেলে নি, সুযোগ পেলেই দেশে দেশে ফুটবলকে ছড়িয়ে দিয়েছে।

ইংরেজের দাসত্বের শৃঙ্খল ছিঁড়ে ফেলার সর্বাত্মক চেষ্টার লগ্নেও ইংরেজের ওই উপহার ফুটবলের দিকে আমরা মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারি নি। খেলাটির আবেদন এমনই সর্বজনীন। ইংরেজ যেখানে গিয়েছে, তার রাজ্যপাট অথবা ব্যবসা সংক্রান্ত কাজের টানে, সেইখানেই তার সঙ্গে ছিল একটি ফুটবল। কালের নিয়মে শাসক বা বেনিয়া ইংরাজ সে সব দেশ ছেড়ে যেতে বাধ্য হলেও ফেরার সময় কিন্তু সেই ফুটবলটি সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারেন নি। ইংরেজের ফুটবল ততোদিনে অন্য মুলুকে কায়েম হয়েছে। সেই ফুটবল যারা খেলে তারা সবাই ইংরেজের কাছে ঋণী। আমরা তো কোন্ ছার। একালের ফুটবল জগতের অবিসম্বাদী নায়ক যে দেশ সেই ব্রেজিল পর্যন্ত ইংলণ্ডের ঋণের ভারে আনত শির। কারণ, এক ইংরাজের চেষ্টাতেই খাস ব্রেজিলে ফুটবল খেলা চালু হয়েছিল। ভদ্রলোকের নাম চার্লস মিলার। জন্ম সাওপাওলোতে হলেও মিলার আসলে ছিলেন এক ইংরাজ পরিবারের সন্তান। মিলারের ছাত্র-জীবন কাটে ইংলণ্ডেই। অধ্যয়ন অন্তে আবার সাওপাওলোতে ফেরার সময় মিলার দুটি-একটি ফুটবল সঙ্গে করে নিতে ভোলেন নি। ব্যাস্, ওই কটি ফুটবলই সারা ব্রেজিলে এক নতুন কালের অভ্যুদয় ঘটিয়ে দেয়। বেশি দিনের কথা নয়। মিলার বল নিয়ে মাঠে নেমে-ছিলেন গত শতাব্দীর শেষ দিকে। কিন্তু এক শতাব্দী পেরিয়ে অন্য শতকের মাঝপথে পৌঁছতে না পৌঁছতেই ব্রেজিল ফুটবল নিয়ে কি কাণ্ডই না করে বসলো। সবাইকে দিলো টেক্কা। ফুটবলে সবার গুরু ইংলণ্ডকে পর্যন্ত ঠুঁটো জগন্নাথ বানাতে ব্রেজিলীয় দক্ষতার এতোটুকু টান পড়লো না।

কিন্তু তবু ইংলণ্ডই ফুটবলের জনক, সারা দুনিয়ার পথিকৃৎ। এই সোচ্চার স্বীকৃতি শুনে ইংলণ্ডের গুমোর কিন্তু বড় বেড়েছিল। তাই ১৯০০ সালে যখন বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতার প্রথম আসর বসে তখন ইংলণ্ড সেই আয়োজনটি উপেক্ষাই করে বসে। 'ফুটবলে আমরা গুরু ও ওস্তাদ। আমরা কেন শিষ্য সাকরেদদের সঙ্গে খেলবো!' এই ভেবেই বুঝি ইংলণ্ড সেদিন আত্মম্ভরিতার ভুলো বসে অস্বাভাবিক উচ্চমন্যতায় ভুগছিল। এ ভোগান্তির জের চলেছিল, যতোদিন ততোদিন ইংলণ্ডকে বিশ্ব ফুটবলের আসরে দেখতে পাওয়া যায় নি। ওই আসরে ইংলণ্ডকে প্রথম দেখা গেল ১৯৫০ সালে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তরকালের প্রথম অনুষ্ঠানে।

শুধু দেখাই গেল না। সেবার ফুটবলে গুরু ইংলণ্ডের ওস্তাদী দেখে শিষ্যরা সব মুচকে মুচকে হাসতে শুরু করে দিলে। আর বুক ফাটা আর্তনাদ তুলে গুরু নিজের কণ্ঠেই দুনিয়াকে শুনিয়ে দিলে 'আমরাই তো ওদের আমাদের হারিয়ে দিতে শিখেয়েছি!' ওরা কারা? ওরা হলো

স্যার অ্যালফ র‍্যামজে

আমেরিকান দল। ফুটবল যারা খেলেন না, যাদের জয়ের সংবাদ পেয়ে স্বদেশের সংবাদপত্র পর্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য নয় বলেই ছাপাতে কুণ্ঠাবোধ করেছিল, তারাই। সেই তারা হারিয়ে দিতেই ইংলণ্ডের পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গিয়েছিল। উচ্চ-মন্যতার মশলা দিয়ে সযত্নে বানানো ইংলণ্ডীয় ফুটবলের কাঠামোটির অস্তিত্ব কবে যে নড়নীয় কাদামাটিতে রূপান্তরিত হয়েছিল তা ইংলণ্ড আগে টের পায় নি। টের পেলো সেই ১৯৫০ সালে, ফুটবলে অজ্ঞাতকুলশীল আমেরিকার কাছে হেরে।

সেই থেকে লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধারের চেষ্টা চলেছে, সফলতায় যে চেষ্টার উত্তরণ হলো ১৯৬৬ সালে। স্বদেশে আয়োজিত বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতায় সেবারেই ইংলণ্ড পেলো শীর্ষসম্মান। পেয়ে আবার গুমোর বাড়লো। স্যার আল্‌ফ র‍্যামজে জাতীয় দলের হাল ধরে থাকতে সে গুমোর কমবে কি?

আগেরবারের বিশ্ব বিজয়ী এবার মেক্সিকোতে কোয়ার্টার ফাইনালের গণ্ডীই ডিঙোতে পারে না। অমবাট এক প্রতি-দ্বন্দ্বিতায় ইংলণ্ডকে ৩—২ গোলে হারিয়ে পশ্চিম জার্মানী চার বছর আগেকার 'ওয়েম্বলী ডাকাতির' শোধ নিয়েছে। আর সব বাধাই টপাটপ ডিঙিয়ে ব্রেজিল ফুটবলের সোনার পরীকে চিরদিনের জন্যে নিজের সিন্দুকে পুরে রাখার অধিকার অর্জন করে নিয়েছে।

১৯৫৮, ১৯৬২ ও ১৯৭০, বারো বছরের ফাঁকে ব্রেজিল তিন তিনবার বিশ্ব ফুটবলের আসর মাতিয়ে দিয়েছে। তবু কি স্যার আল্‌ফ [illegible]

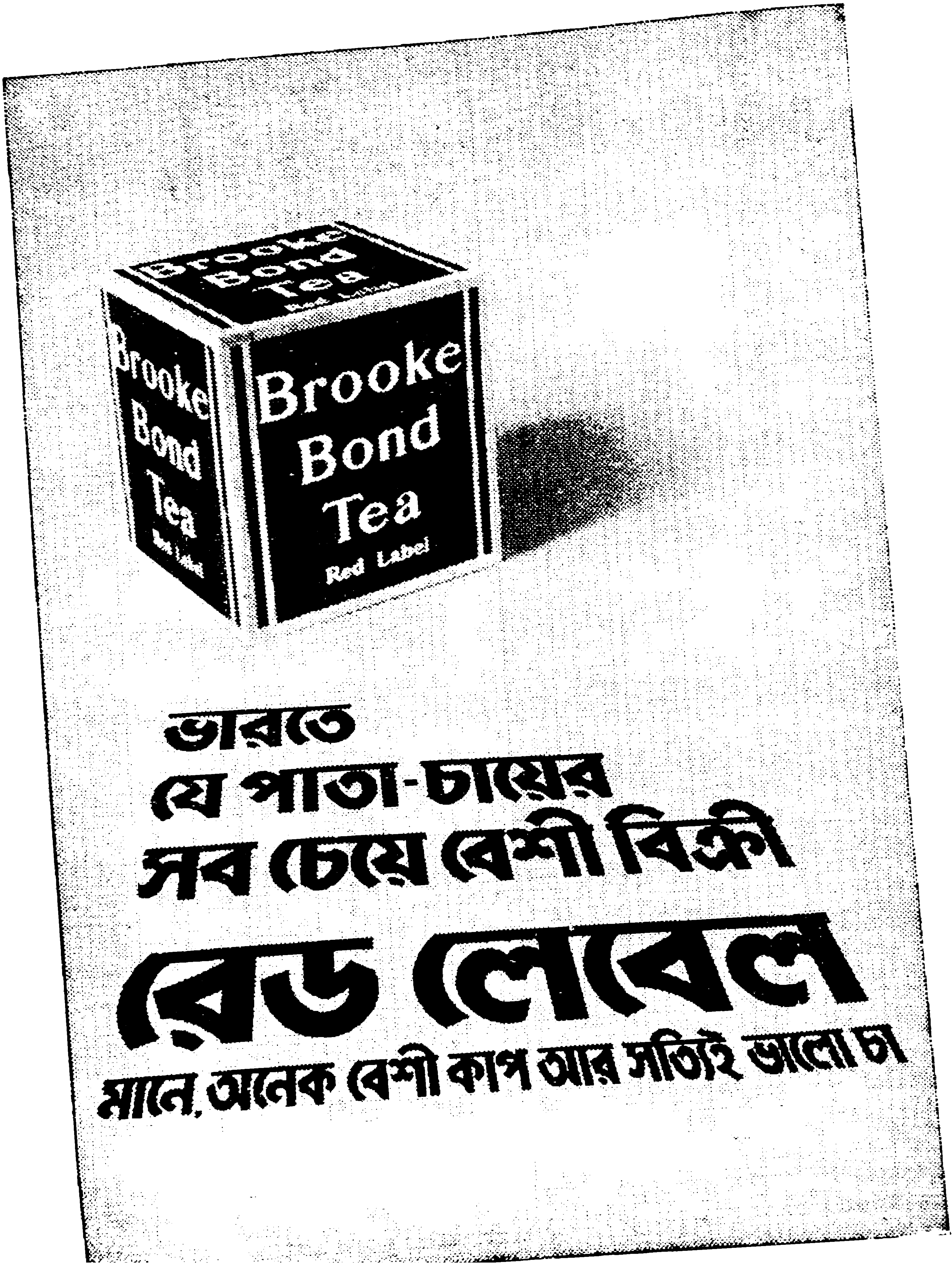
Brooke
Bond
Tea
Red Label
ভারতে
যে পাতা-চায়ের
সব চেয়ে বেশী বিক্রী
রেড লেবেল
মানে, অনেক বেশী কাপ আর সত্যিই ভালো চা

কাবেন! হেরে দেশে ফিরে কোথায় মুখ চুপ করে লুকোবেন, তা নয় সাংবাদিকদের পেয়ে জাঁক করে বলে বসলেন 'ব্রেজিলের কাছ থেকে আমাদের কিছুই শেখবার নেই!' শুনুন কথা!

আলফ র‍্যামজে যৌবনে ছিলেন খেলোয়াড়। খেলা ছেড়ে দেবার পর অনেক দিন ধরেই কোনো না কোনো দলের তত্ত্বাবধান করছিলেন, কখনো কোচ, কখনো বা ম্যানেজার হিসেবে। ১৯৬৬ তাঁর ম্যানেজারীতে ইংলেন্ড বিশ্ব ফুটবল জয় করায় সঙ্গে সঙ্গে কৃতজ্ঞ ইংলন্ডের পক্ষ থেকে ইংলন্ডেশ্বরী এলিজাবেথ আলফ র‍্যামজেকে 'স্যার' উপাধিতে ভূষিত করেন।

কোনো খেলোয়াড়, দলপতি ববি মুর অথবা ১৯৬৬ সালের বিশ্ব ফুটবল আসরের অনাতম সেরা (সর্বশ্রেষ্ঠ?) ববি চার্লটনও নন, নাইটহুড পেলেন দলের ম্যানেজার আলফ র‍্যামজে। পেয়েই আপদে কুলে এমনই কলা গাছ হলো যে হারের পরও বুদ্ধিহীন কৈফিয়ৎ খাড়া করতে স্যার আলফ র‍্যামজে লজ্জা পেলেন না। বলে বসলেন 'ব্রেজিলের কাছ থেকে আমাদের কিছুই শেখবার নেই!'

শেখবার নেই? না, শিক্ষণীয় যা কিছু আছে তা স্যার আলফের দৃষ্টিতে ধরা পড়ছে না?

না পড়াই স্বাভাবিক। নাইটহুড পাওয়া এবং ১৯৬৬ সালে দেশ জোড়া অভিনন্দন পেয়ে আলফ র‍্যামজের মনে করতে ভাল লাগছিল যে ইংলন্ডকে একবারের মতো জুলে রিমে কাপ পাইয়ে দেবার কৃতিত্ব তো একা তাঁরই। অন্যদের আবার ভূমিকা কি। এবং ইংলন্ডকে যদি আবার বিশ্ব ফুটবল পেতে হয়, তাহলে তিনি ছাড়া গতিও নেই। ভাবতে ভাবতে স্যার আলফ র‍্যামজে খেলোয়াড়দের প্রশিক্ষণ, নির্বাচন এবং আনুষঙ্গিক সমস্ত ক্ষমতা ও অধিকারই নিজের মুঠিগত করেছেন। ১৯৬৬ থেকে ১৯৭০, এই চার বছরের তিনি ইংলন্ডের খেলোয়াড়দের বোঝাবার চেষ্টা করেছেন যে দলের 'কল' হিসেবে শুধু নির্দেশ দেওয়ারই নয়, ভালমন্দ চিন্তা করার অধিকারও তাঁর ছাড়া আর কারুরই নেই।

যেন একপাল মেষ শাবককে তাদের করণীয় কি তা বোঝাতে শুধু পালকই ছড়ি ঘুরিয়ে চলেছে। এই চার বছর ধরে ইংলন্ডের খেলোয়াড়েরা বিনা প্রতিবাদে শুধু ম্যানেজার স্যার আলফ র‍্যামজের চিন্তারই দাসত্ব করেছেন। ম্যানেজারের 'ইমেজ' ডিঙিয়ে দলের কোনো খেলোয়াড়ের প্রতিচ্ছবি যাতে বড় না হয়ে ওঠে তার দিকে স্যার আলফের নজর ছিল কড়া। তিনি 'স্টার সিস্টেমকে' ধ্বংস' করেছেন, খেলোয়াড়দের ব্যক্তিত্বকে বাড়তে দেন নি। নিজের ব্যক্তিসত্তার পক্ষপুটে অন্যদের ভূমিকাকে গিলে রাখতে চেয়েছেন।

এই অবস্থায় মেক্সিকোতে ইংলণ্ড আবার বিশ্ব কাপ জয় করলে লোকে বলতো, স্যার আলফই ইংলন্ডকে জুলে রিমে কাপ পাইয়ে দিয়েছেন। স্যার আলফ তাঁর খেলোয়াড়দের 'মানুষ' হতে দেন নি। চেয়েছিলেন তাদের মেসিনে পরিণত করতে। তাঁর একমাত্র পরিকল্পনাই ছিল, তিনি নিজে বোতাম টিপবেন আর মেসিনগুলো হাত পা নাড়া সুরু করে দেবে।

চার বছরের দীর্ঘ পরিকল্পনা। কাজেই স্যার আলফ তাঁর নিজের মতলব হাঁসিলে অনেক দূর এগিয়েও ছিলেন। কিন্তু ও পথে ইংলন্ডকে বিজয় তোরণের সামনে দাঁড় করিয়ে দিতে পারেন নি। ১৯৬৬ সালে ইংলন্ডের খেলোয়াড়দের অনেক স্বাধীনতা ছিল। আর সেই স্বাধীনতার স্বাদ পেয়ে ইংলন্ডের এক একজন খেলোয়াড়ও সারা মাঠ জুড়ে বাহাদুরী দেখিয়েছেন। কিন্তু ১৯৭০-এ যা কিছু স্বাধীনতা তা একা স্যার আলফই ভোগ করেছেন। ফলে স্যার আলফের বোতাম টেপা কলের পুতুলগুলি আর মাঠ জুড়ে ছড়িয়ে পড়তে পারেন নি। এবং মাঠে নেমে মানুষের মোকাবিলায় হালে পানিও পায় নি।

স্যার আলফকে কে বলে বোঝাবে যে মেসিনের সামর্থ্য সীমাবদ্ধ, কিন্তু মানুষের সম্ভাবনার শেষ নেই! ছক বাঁধা জানা পথে মেসিন ছোটে গড়গড়িয়ে। কিন্তু অজানা পথের বাধা ডিঙোতে যে মুস্কিল আসানের ভূমিকা নিতে পারে, সে ওই বোতাম টেপা কলের পুতুলগুলো নয়। সে হলো জীবন্ত মানুষ, নব নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধিতে বলীয়ান যে। যে ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। ম্যানেজার রাস্তা বাতলায়, চলতি পথের বাঁকে বাঁকে কাঁটা গাছের ঝোপঝাড় যেখানে আছে তার সন্ধানও খেলোয়াড়দের জানিয়ে রাখে। কিন্তু পথের মাঝে হঠাৎ গজিয়ে ওঠা কোনো সমস্যার হদিশ ম্যানেজার দেবে কোথা থেকে এবং যে সমস্যা সমাধানের দাওয়াই বা তাঁর জানা থাকবে কি করে?

কাজেই অভাবনীয় পরিস্থিতি সামাল দিতে হলে খেলোয়াড়দের চিন্তা ভাবনায় প্রেরণা যোগাতে হয়। তাদের নিজের চিন্তার ক্রীতদাসে পরিণত করলে মুস্কিল আসান হয় না।

মেসিনের চেয়ে মানুষ বড়, এই সহজ, সরল তত্ত্বটি স্যার আলফ অনুধাবন করতে পারেন নি। অথচ এই তত্ত্বেই ব্রেজিলের বড়ো বিশ্বাস। আজ বলে নয়, সেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তরকালেই বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতার পুনরারম্ভের লগ্ন থেকেই ব্রেজিল এই বিশ্বাসের পায়ে মাথা ঠুকে আসছে। এবং ব্রেজিলের অচলা ভক্তিতে ভাগ্য দেবীও যে কতো প্রসন্ন তা ১৯৫৮, ১৯৬২ ও ১৯৭০, এই তিনবারের বিশ্ব কাপ ফুটবলের ইতিহাস থেকেই জানা যাচ্ছে।

ছক বেঁধে ফুটবল খেলালেও ছকের পায়েই ব্রেজিল আত্মসমর্পণ করে বসে থাকে নি। প্রয়োজনে ছক ভাঙার খেলায় মেতে নতুন ছক গড়ে নিয়েছে। খেলতে খেলতে এই ভাঙাচুর ও গড়ার কাজ চলে যেখানে, প্রত্যক্ষে সেখানে ম্যানেজারের ভূমিকা নেই। ভাঙা-গড়ার এই খেলায় খেলোয়াড়েরাই বিশ্বকর্মা। চিন্তার স্বাধীনতা পেয়েই তাঁরা নতুন সৃষ্টি আনন্দে মাততে পেরেছেন। শুধু ম্যানেজারের হুকুম তামিলেই মন থাকলে কি আর নতুন সৃষ্টির কাজে হাত দেওয়া যেতো?

ফুটবল দলগত খেলা। দলের কল্যাণে ব্যক্তিসত্তাকে বিলিয়ে দিতে হলেও ব্যক্তিসত্তাকে বরবাদ করলে চলে কি? ব্যক্তি নিয়েই যেমন দল, তেমনি ব্যক্তির কৃতিত্বেই সমষ্টির কীর্তি। ব্যক্তি বা খেলোয়াড় বিশেষে দলের সম্পত্তি বাড়ে। একজন পেলে থাকলেই একটি দল যে অসামান্য শক্তিধর হয়ে পড়ে তা ওই ব্যক্তি বৈশিষ্ট্যের গুণেই। ব্রেজিল এ সারসত্যটি উপলব্ধি করতে পেরেছে বলেই ব্রেজিলীয় কোচ মারিও জাগালো পেলে, জাইর্জিনহো, টোস্টাও, গারসনদের উন্মেষের সুতো ছেড়ে রেখেছিলেন। সব সুতো লাটাইয়ে টান টান করে লাটাইটিকে নিজের হাতে তুলে রাখবার লোভ দেখান নি। অথচ এই লোভটি সম্বরণ করতে পারেন নি ফুটবলের 'নাইট' আলফ র‍্যামজে। র‍্যামজের হাতের ঘুড়ি মনের উড়তে পারে নি। জাগালোর ঘুড়ি, মুক্ত বিহঙ্গের মতো পাখা দুটি মেলে সারা আকাশ জুড়ে ঘুরেছে, ফিরেছে। নেচেছে।

এই ছুটে বেড়ানোর ছবি কেমন রঙদার তা এক বৃটিশ বোদ্ধার মুখেই শুনুন। ভদ্রলোকের নাম জন আর্ডনার। ফুটবলে

উইকেট থেকে বাউণ্ডারী
(প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত প্রায়)
দিলীপ দত্ত
দাম — তিন টাকা
বাক-সাহিত্য (প্রাঃ) লিঃ
৩৩, কলেজ রো, কলকাতা—৯

বিশেষজ্ঞ এবং জাত লিখিয়ে হিসেবে গার্ডনারের নাম সারা বিশ্বে ছড়িয়ে আছে। তিনিই লিখছেন,

'হলুদে রঙা জামা গায়ে টোস্টাও, পেলে, রিভেলিনো এবং জাইর্জিনহো মাঝ মাঠে মুহূর্তের জন্যে পরস্পরের কাছাকাছি জড়ো হলেন। কিন্তু পরক্ষণেই কে কোথায় ছিটকে গেলেন। যেন আতসবাজীর টুকরো টুকরো স্ফুলিঙ্গ সব। এদিকে বল চলেছিল পায়ে পায়ে ফিরে। হঠাৎ দেখি কি চারজন আবার কাছাকাছি এসে একই কাজের জন্যে এক জায়গায় জড়ো হয়েছে। ছবিটি দেখবার মতো।'

এই ছবি যাঁরা আঁকতে পারেন, তাঁরা সৃজনধর্মী শিল্পী। শিল্পকর্মে প্রেরণা যোগাতে এই সব শিল্পীদের স্বাধীনতা দিতে হয়। মারিও জাগালো ব্রেজিলের খেলোয়াড়দের সেই স্বাধীনতা দিয়েছিলেন তাই মেক্সিকোতে বিশ্ব কাপ ফুটবলের আসর ব্রেজিলের গন্ডা গন্ডা খেলোয়াড়ের ব্যক্তিগত ক্রীড়া নিপুণতার স্বাক্ষরে সমৃদ্ধ হয়েছে। দলগত খেলায়ও যে ব্যক্তি বৈশিষ্ট্য মস্তো ভূমিকা নিতে পারে, তারই প্রমাণ মেক্সিকোতেই মিলেছে। কিন্তু স্যার আলফ এ স্বাধীনতা কাউকে দেন নি। তাই ইংলন্ডের কোনো খেলোয়াড়ের নাম-ডাকে মেক্সিকোর আকাশ মুখরিত হয়নি। যতো হাঁকডাক তা ব্রেজিলীয় প্রতিভাদের ঘিরেই।

ব্যক্তি বৈশিষ্ট্যের ক্ষুরধার প্রভাবেই এবার মেক্সিকোতে ৪+৪+২-এ গড়া রক্ষণাত্মক দুর্গ বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছে। জান বাঁচাবার তাগিদে আঁটোসাটো যে ছক অনেক ভেবেচিন্তে গড়া হয়েছিল, প্রতিভা-ধরের আক্রমণাত্মক খেলোয়াড়পনা তা তছনছ করে দিয়েছে।

এমন কার্যকর খেলোয়াড়পনায় কি মেশিন মেতে উঠতে পারে! পারে মানুষই, যার চিন্তার জগৎ দিগন্তের মতো সীমাহীন এবং যার কর্মক্ষমতা মাপজোকের বাইরে। গড়া ছাঁচ ও রসদ যুগিয়ে বোতাম টেপো, যন্ত্র হনহনিয়ে ছুটবে। কিন্তু রসদ ফুরোলে যন্ত্র সক্রিয় থাকবে কোন্ সে বস্তুর কল্যাণ স্পর্শে? আবার বলি, মানুষের সামর্থ্য যন্ত্রের মতো সীমাবদ্ধ নয়। প্রশিক্ষক বা ম্যানেজার যে পরি-স্থিতির সন্ধান দিতে পারেন না সেই পরি-স্থিতির সামনে পড়েও মানুষ যন্ত্রের মতো হাত গুটিয়ে বসে থাকে না। একটা উপায় ঠাওরে পরিস্থিতির জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করে। এবং বেরিয়ে এসে নতুন সমস্যার বিপাকে জড়িয়ে ধরার চেষ্টায় নতুন কোনো ফাঁদ নিক্ষেপ।

ফুটবল শুধু জগাখিচুড়ি নয়, মগজেরও খেলা বটে। এবং মগজটি শুধু ম্যানেজার কোচ ট্রেনারের থাকলেই চলে না, ও বস্তুটি খেলোয়াড়দেরও থাকা চাই। নইলে চলে না। পায়ের কড়ি যোগাতেও করা যে যায় না, সে কথাটি এতোদিন মেশিন গড়ন-ওয়ালা স্যার আলফ রামজে বুঝতে চান নি। মেক্সিকোর হার, চারপাশের বিরূপ সমালোচনায় উত্যক্ত হওয়ার পর এবার হয়তো তাঁর উপলব্ধি সত্যের দিকে ঝুঁকবে এবং তিনি বুঝতে পারবেন যে জীবনে যেমন, খেলার মাঠেও তেমনি, মানুষই সত্য, মেসিনের চেয়ে অনেক বড়।

ব্যক্তি বৈশিষ্ট্যের ডানা দুটিকে দাঁড়িওয়ালা কাঁচি দিয়ে কেটে দিয়ে 'টিম স্পিরিট' বাড়াবার এক প্রাণান্তকর ঝোঁক আমাদের দেশের অনেক ফুটবল কোচকেও পেয়ে বসেছে। তাঁরা খেলোয়াড়দের নিজস্ব পথে সহজভাবে বিচরণ করতে দিচ্ছেন না। শিক্ষা-শিবিরে বল পাওয়া মাত্র পাশ করার হুকুম হাঁকছেন এবং খেলার দিনেও পার্শ্বরেখার পাশে বসে অহরহ উপদেশ দিচ্ছেন, পাশ ওয়াল পাশ, চিপ্, এখনই। এঁরা সবাই ঘুরছেন অবক্ষয়ের গোলক-ধাঁধায়। তাই এঁদের শিক্ষণ পরিকল্পনায় পরিণামে তেমন কোনো খেলোয়াড়কেও পাওয়া যাচ্ছে না। ক'বছর আগেও ফুটবল খেলোয়াড়দের কথা উঠলেই সৃজনধর্মীতার দু-চার টুকরোর (প্রদীপ ব্যানার্জী, বলরাম, চুণী গোস্বামী) নমুনা নিশ্চয়ই নজরে পড়তো। কিন্তু আজ যে এই নমুনার ছিটেফোঁটারও অস্তিত্ব নেই!

এই সব প্রশিক্ষক নিজের গড়া দুনিয়াতেই বাস করতে চাইছেন। স্যার আলফ রামজেও তাই চেয়েছিলেন কিন্তু পরিণাম যে ভাল হয় নি তা দেখে ও ঠেকে যদি শিক্ষালাভ না করা যায় তাহলে আমাদের ফুটবলের কপালেও অনেক দুঃখ তোলা থাকবে। এবং অনেক দিনের জন্যেই।

একটি দলের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এগারোটি। অঙ্গে-প্রত্যঙ্গে যদি সামর্থ্য বাড়ে তবেই দলের পুষ্টি পরিণত হয়। তাই সবার আগে প্রয়োজন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে জোর বাড়ানো। ব্যক্তি সত্তা ও ব্যক্তি বৈশিষ্ট্যের বিসর্জনে এই জোর বাড়ানো সম্ভব নয়। তাই প্রস্তাব, অকারণে টিম স্পিরিটের ধুয়ো না তুলে ব্যক্তির বিকশিত হওয়ার পথ সুগম করে তোলা হোক। মেশিনকেই একমাত্র পরিত্রাণ কর্তা না ভেবে মানুষকেই মুক্তিদাতা বলে মানার নিষ্ঠা দেখানো হোক। তাহলেই ঘোড়ার সামনে গাড়ী না জুতে গাড়ীর আগে ঘোড়া জোতার সহজ কাজটি সম্পন্ন করে তোলার রাস্তা খুঁজে পাওয়া যাবে।

ওয়ার্ল্ড কাপের বই

নীলিমেশ রায়চৌধুরী

জুলে রিমের নেপথ্যে

[দাম চার টাকা]

১৯৭০ সালের মেক্সিকো আসরের তথ্যপূর্ণ বই। বহু ফটো দেওয়া আছে।

একদা ভারতে ওপেনিং ব্যাটসম্যান ও বোলাররা ছিল

মতি নন্দী

১৯৭১-র ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে কোন্ দুজন ব্যাটিং-এ ও বোলিং-এ আমাদের ইনিংস শুরু করবে, এখনো তা জানি না। ১৯৬৯-এ নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার ভারত সফরে আটটি টেস্টে সাতজনকে—আবিদ আলি, চেতন চৌহান, অজিত ওয়াড়েকর, ইন্দ্রজিৎ সিংহজী, দিলীপ সরদেশাই, ফারুক এর্নাজিনীয়ার, অশোক মানকড়—আমাদের ব্যাটিং ইনিংস শুরু করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ছটি ইনিংসে আমাদের প্রথম উইকেট পড়ার সর্বোচ্চ রাণ ৫৭ (আবিদ ৬৩ ও চেতন ১৪)। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে দশ ইনিংসে ৫০-এর বেশি রাণ তোলায় আটবার ব্যর্থ হয়েছে ওপেনিং জুটি। বাকি দুটি ইনিংসে ৮৫ ও ১১১ রাণ ওঠে ফারুক ও অশোকের চেষ্টায়। অর্থাৎ ১৬ ইনিংসের মধ্যে তেরোবারই আমাদের ব্যাটিং ইনিংসের ভিত্ত অর্ধশত রাণের উপর ওঠেনি।

অস্ট্রেলিয়া বা নিউজিলান্ডের প্রথম উইকেট পার্টনারশিপেও একই অবস্থা প্রায়। অস্ট্রেলিয়া প্রথম উইকেটে শত রাণের ভিত্ত তৈরী করতে পারে নি। নিউজিল্যান্ড পেরেছে একবার। কিন্তু তার কারণ আমাদের পেস-বোলাররা নন—প্রসন্ন, বেদী এবং বেঙ্কট-রাঘবন। দুটি সিরিজে ওপেনিং ব্যাটসম্যানদ্বয়ের ৩২টি উইকেটের মধ্যে প্রসন্ন একাই ১২, নট আউট ৫, রাণ আউট ৩, বেঙ্কটরাঘবন ৪, বেদী ২। অর্থাৎ আমাদের ওপেনিং বোলাররা পেয়েছে মাত্র ৬টি। ওপেনিং বোলাররূপে ১৬ ইনিংসে বল করেছে সাতজন—রুসি সুর্তি, অজিত পৈ, আবিদ আলি, জয়সীমা, সুব্রত গুহ, একনাথ সোলকার ও মহীন্দর অমরনাথ। উক্ত ছয়টি উইকেটের মধ্যে অমরনাথ—১, সুব্রত—১, সুর্তি—২, আবিদ —২।

এখন ভারতের সেরা সাতজন—ওপেনিং ব্যাটসম্যান ও ওপেনিং বোলারের (না হলে টেস্টে খেলান হল কেন!) সর্বশেষ টেস্ট নৈপুণ্য থেকে একটি কথা স্পষ্ট—আমাদের উইকেট ফাস্ট বোলার তৈরীতে অক্ষম তাই ব্যাটসম্যানরাও অনুশীলন না পেয়ে প্রাথমিক ধাক্কাটা সামলাতে পারছে না। আমাদের ৩৮ বছরের টেস্ট খেলার ইতিহাসে ব্যাপারটা কিন্তু প্রথম কুড়ি বছরে এমন শোচনীয় ছিল না। তখন ওপেনিং ব্যাটসম্যান ও বোলারের অভাব ছিল না, বরং স্পিনারই দুর্লভ ছিল।

ভারতের প্রথম টেস্ট ম্যাচ লর্ডসে, ১৯৩২-এর জুনে। আমাদের দলে সেদিন কোন খাঁটি স্পিন বোলারই ছিল না। সি কে নায়ডু উঁচু করে অফ-ব্রেক বল দিতেন বটে, কিন্তু খাঁটি স্পিনারের পংক্তিতে তাঁকে রাখা যায় না। জার্ডিনের ইংল্যান্ড দলের বিরুদ্ধে ১৯৩৩-৩৪ সিরিজে বোম্বাইয়ে প্রথম টেস্টে, ৪১ বছরের জামসেদজীকেই

মহম্মদ নিসার

আমাদের প্রথম টেস্ট স্পিন বোলাররূপে অভিহিত করা ছাড়া উপায় নেই। এই ন্যাটা পার্শি বোলার তিনটি উইকেট পেয়েছিলেন, কিন্তু আর ওকে টেস্ট খেলতে ডাকা হয় নি। কলকাতার দ্বিতীয় টেস্টে এলেন সি এস নায়ডু। ইনিই প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় টেস্ট স্পিন বোলারদের আদি-পুরুষ। কলকাতা ও মাদ্রাজ টেস্টে ওঁকে মোট বল করতে দেওয়া হয়েছিল ২৩ ওভার যদিও অধিনায়ক ছিলেন ওর দাদা সি-কে। দুটি টেস্টে সি-এস কোন উইকেট পান নি।

১৯৩৬ ইংল্যান্ড সফরে খাঁটি স্পিনার তো কেউই ছিলেন না। অমরনাথকে ফেরৎ পাঠালো, তাঁর বদলী হিসাবে সি এস নায়ডু ইংল্যান্ড যান। পালিয়া প্রধানতই ব্যাটসম্যান, কিন্তু তাঁকেই স্পিন বোলার-রূপে টেস্টে কাজ চালাতে হয়েছিল। ১৯৩৬ লর্ডস টেস্টে সি-এস মাত্র তিন ওভার বল করার সুযোগ পান এবং কোন উইকেট পান নি। তিনটি টেস্টে খেলে একটিও উইকেট না পাওয়া সত্ত্বেও একজন স্পিন বোলারকে চতুর্থবার খেলার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে এমন ব্যাপার এখন অকল্পনীয়। ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে সি এস নায়ডু ১৭ ওভার বল করে টেস্টে প্রথম একটি উইকেট পান ৪৭ রানে।

অমর সিং

১৯৩২ থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্যন্ত সাতটি সরকারী ও নয়টি বেসর-কারী টেস্টে ভারতের বোলার ছিলেন দুজনই—মহম্মদ নিসার ও লালা অমর সিং। একমাত্র এই দুজনের পেস ও সুইং -এর উপরই নির্ভর করত ভারতের টেস্ট আক্রমণ। সাতটি সরকারী টেস্টে ৮৪টি উইকেট পান ভারতের বোলাররা, তার মধ্যে নিসার পেয়েছেন ২৫ ও অমর সিং ২৮—অর্থাৎ তিন ভাগের দুই ভাগ এই দুজনের। এই দুজনের আমলে ভারতের বিরুদ্ধে সরকারী টেস্টে শত রানের ওপেনিং পার্ট-নারশীপ একবারই হয়েছে, ১৯৩৩-৩৪, মাদ্রাজে। কিন্তু ১৯৩৬ ইংল্যান্ড সফরে

আমাদের প্রথম উইকেটের দুই ব্যাটসম্যান, বিজয় মার্চেন্ট ও মুস্তাক আলি, ২০০ রানের পার্টনারশিপ তৈরী করেন আগেন, গোয়ার, হ্যামন্ড, ভের্বটি ও রবিন্সের পেস, স্পিন, অফ-ব্রেক ও গুগলি ব্যর্থ করে। কুড়ি বছর পর প্রথম উইকেটের এই সংখ্যা অতিক্রান্ত হয় বিনু মাঁকড় ও পঙ্কজ রায়ের ৪১৩ রানের জন্য। কিন্তু এখন পর্যন্ত আর একবার দ্বি-শত রানের পর ভারতের প্রথম উইকেট পতনের নজীর পাওয়া যায় নি।

১৯৩৬-এর জুলাইয়ে ওল্ড ট্র্যাফোর্ডেই প্রথমবারের মত মার্চেন্ট-মুস্তাক একত্রে ভারতের ইনিংস শুরু করেন। খেলোয়াড় জীবনে ওঁরা দুজন মাত্র চারটি সরকারী টেস্টের সাতটি ইনিংস একত্র ওপেন করেছেন। তার মধ্যে ওঁরা তিন ইনিংসে তোলেন—২০৩, ১২৪, ৯৪। এই দুজন যখন ক্রিকেট খেলা শিখেছেন, তখন ভারতের উইকেট ফাস্ট বোলারের সহায়ক ছিল।

ত্রিশ-চল্লিশ বছর আগে ভারতে খাঁটি স্পিনার খুব কমই ছিলেন। টেস্ট ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারণ করার মত একজনও ছিলেন না। ১৯৩৬-এ অমরনাথের বদলে সি এস নায়ডুকে পাঠান হলে ডগলাস জার্ডিন মন্তব্য করেছিলেন, একজন ন্যাটা স্পিনারকে পাঠালে ফলাফলের অনেক হেরফের ঘটতে পারত। কিন্তু পাঠাবার মত একজনও তখন ছিলেন না। বিনু মাঁকড় এলেন দু বছর পর। এখন তো ঝাঁকে ঝাঁকে স্পিনার দেখা যাচ্ছে। এটা ঘটতে শুরু করেছে ১৬-১৭ বছর। ব্যবসায়িক স্বার্থের দিকে ঝোঁক পড়ায় টেস্ট ম্যাচগুলিকে পাঁচদিন ধরে টিঁকিয়ে রাখার জন্য এমনভাবে উইকেট-গুলি তৈরী করা হল যার ফলে নির্জীব উইকেটে ছেলেরা আর জোরে বল করায় উৎসাহ পেল না। ভারতীয় ক্রিকেট থেকে আপনা হতেই শক্তি ও শৌর্যের বিদায় ঘটে। নিষ্প্রাণ উইকেটে বল করে করে রমাকান্ত দেশাই তো দশ বছরের মধ্যেই নিজেকে খাক করে বিদায় নিলেন।

ফাস্ট বোলিং উৎখাত করার মারাত্মক ফল সব থেকে বেশি ফলেছে, বিদেশে আমাদের টেস্ট খেলাগুলিতে। ১৯৫৯ ইংল্যান্ড সফরে পাঁচটি টেস্টেই আমাদের হার হয়। পরের সফর ওয়েস্ট ইন্ডিজে এবং পাঁচটি টেস্টেই পরাজয়। তারপর আবার ইংল্যান্ড এবং সিরিজের সবকটি টেস্টে (তিনটি) আমাদের মুখে চুনকালি পড়ে। একটি টেস্টে কুন্দরন বল ওপেন করে-ছিলেন। এর পর অস্ট্রেলিয়া সফর এবং এখানেও সবকটি টেস্টেই (চারটি) আমাদের মাথা হেঁট।

বিদেশের মাটিতে টানা সতেরোটি টেস্টে পরাজয়! কারণ? মনসুর আলি কারণ দিয়েছেন তার 'টাইগারস টেল' বইটিতে:—দেশের মাটিতে নির্জীব উইকেটে খেলতে অভ্যস্ত ব্যাটসম্যানরা, বিদেশে প্রাণবন্ত উইকেটে পেস বোলারদের সামনে আর হালে পানি পায় না। যতদিন না ভারতীয়

লালা অমরনাথ

উইকেটগুলি দ্রুতগতি বলের সহায়ক হচ্ছে, ততদিন আমরা ফাস্ট বোলার তৈরী করতে পারব না এবং ব্যাটসম্যানরাও ফাস্ট বোলিং-এর মোকাবিলায় ব্যর্থ হবে।

আমাদের ফাস্ট বোলারের চমকপ্রদ সাফল্যের কথা বলতে গেলে ১৯৩২ লর্ডস টেস্টের প্রসঙ্গ প্রথমেই মনে পড়বে।

সাটক্লিফ	ব নিসার	৩
হোমস	ব নিসার	৬
উলী	রান আউট	৯
হ্যামণ্ড	ব অমরসিং	৩৫

এই স্কোরশীট তৈরী হবার মাত্র দশ-দিন আগে সাটক্লিফ-হোমস ৫৫৫ রানের প্রথম উইকেট পার্টনারশিপের বিশ্ব রেকর্ড করেছেন। ১৫ মিনিটের মধ্যেই নিসার ওদের প্যাভিলিয়নে ফেরৎ পাঠিয়ে দেন। লাল সিং যখন উলীকে রান-আউট করলেন, ইংল্যান্ডের রান তখন ১৯!

এর থেকেও চমকপ্রদ প্রারম্ভিক বিস্ফোরণ আর একবারই মাত্র ভারতীয় ওপেনিং বোলারের দ্বারা ঘটেছে—১৯৪৬-এ লর্ডসেই আবার।

হাটন ক নাইডু	ব অমরনাথ	৭
ওয়াশব্রুক ক মাঁকড়	ব অমরনাথ	২৭
কম্পটন	ব অমরনাথ	০
হ্যামণ্ড	ব অমরনাথ	৩৩

বিশ্বের যে-কোন কালের যে-কোন বোলারের স্বপ্নের চারটি উইকেট! এই চারটি উইকেট অমরনাথ পেয়েছিলেন নিখুঁত পাঁচে, মাত্র ২৭ রানে, ১৭ ওভার বল করে সাতটি মেডেন নিয়ে। ওয়াশব্রুক ও কম্পটন আউট হন পর পর দুই বলে। হ্যামণ্ড হ্যাটট্রিক বন্ধ করেন। চারটি উইকেট পড়েছিল ৭০ রানে। চিরকালের বিশ্ব একাদশে এই চার-জনের মধ্যে তিনজন তো নিশ্চয়ই আসবেন। অমরনাথের মত এমন কৃতিত্ব আর কয়েক মাস পরেই ব্রিসবেনে দেখান সম্ভব হয়েছিল কীথ মিলারের। ইংল্যান্ডের ৫৬ রানের মধ্যে প্রথম চার ব্যাটসম্যানকে—হাটন, ওয়াশব্রুক, এডরিচ ও কম্পটন—মিলার আউট করেন।

দেশীয় শিল্পে বিস্ময়

সকল সম্ভ্রান্ত দোকানে পাওয়া যায়

একমাত্র পরিবেশক
গৌরমোহন দাস এণ্ড কোং
২০৩, ওল্ড চীনাবাজার স্ট্রীট,
কলিকাতা—১

গত বছর টেস্ট ম্যাচ চলাকালে, বিশ্বনাথের ব্যাটিং নিয়ে কথা হচ্ছিল লালা অমরনাথের সঙ্গে। বললাম, "আটচল্লিশের ভারতীয় দলে যদি বিশ্বনাথকে স্থান দেওয়া হত, তাহলে দলের কেউই ভ্রূ কুঁচকে বলত না 'এ আবার কে?' এখন পর্যন্ত, ভারতের সেরা টেস্ট দল হিসেবে কি আটচল্লিশের দলকেই আপনার মনে হয় না?"

অমরনাথ হাসলেন বটে কিন্তু কথাটা যেন মনঃপূত হল না। বললেন, "আটচল্লিশে যে-দল অস্ট্রেলিয়ায় গেছল, সেই দলই বা সেরা নয় কেন? তখনকার অস্ট্রেলিয়া টেস্ট দলের অন্তত দশজন অনায়াসে বিশ্ব একাদশে স্থান পাবার যোগ্য ছিল। তাদের বিরুদ্ধে আমরা কি খুব খারাপ খেলেছি?"

১৯৪৭-৪৮-এর অমরনাথের ভারতীয় দলের বিরুদ্ধে ব্র্যাডম্যানের অস্ট্রেলিয়া পাঁচটি টেস্টে একবারও শত রানের ওপেনিং পার্টনারশিপ স্থাপন করতে পারেনি। ব্রাউন, বার্নেস ও মরিস ব্যাটিং-নৈপুণ্যের তুঙ্গে থাকা সত্ত্বেও। অথচ মাঁকড় ও সরবতে প্রথম উইকেটে ১২৪ রান তুলেছিলেন লিন্ডওয়াল, মিলার ও জনস্টনের বিরোধিতা তুচ্ছ করে। এই সিরিজে ভারতের এক নম্বর বিনু মাঁকড় দুটি শতরান করেন এমন আক্রমণের বিরুদ্ধে যার সমপর্যায়ী প্রারম্ভিক আক্রমণ টেস্ট ইতিহাসে খুব কমই পাওয়া যাবে। ১৯৫২ লর্ডসে তাঁর ১৮৪-র মত ইনিংসের জুড়ি মেলাও যেমন ভার হবে।

বিনু মাঁকড়ের পর পঙ্কজ রায়, নরী কন্ট্রাক্টর, জয়সীমা, সরদেশাই, গায়কোয়াড়, কুন্দরন, এঞ্জিনীয়ার এবং আরো অনেকের পর এখন কিনুর ছেলে অশোক ভারতের ওপেনিং ব্যাটসম্যানদ্বয়ের একজন হিসাবে গণ্য হতে চলেছে। গত বছর অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে চারটি টেস্টে দু নম্বরে ব্যাট করতে নেমে অশোক কানপুরে ও দিল্লীতে ৬৮, ৬৪, ১৭, ৭ করার পর ওপেনিং ব্যাটসম্যানের পরীক্ষা-কেন্দ্র কলকাতা ও মাদ্রাজে ৯,২০,০,১০ করে। কলকাতায় ওঁর ব্যাটিং দেখে লালা অমরনাথকে বলতে শুনি, "ভারতের সর্বকালের সেরা ওপেনিং ব্যাটসম্যান ও সিলেকশান কমিটির চেয়ারম্যান বিজয় মার্চেন্টের উচিত, অশোককে নেটে নিয়ে গিয়ে, কিভাবে সুইং খেলতে হবে দেখিয়ে দেওয়া।"

অমরনাথের পর হাজারে, ফাড়কর, রামচাঁদ, উমরিগড়, দিভেচা, রঞ্জনে, সুরেন্দ্রনাথ, দেশাই, জয়সীমা, আবিদ আলি এবং আরো অনেকের পর এখন লালার ছেলে মহীন্দর টেস্ট সীমানায় পা দিয়েছে ওপেনিং বোলাররূপে। একটি টেস্ট সে খেলেছে, গত বছর মাদ্রাজে। স্পিনারদের উইকেটে বোলারদের দখল-করা মোট ১৮ উইকেটের মধ্যে (প্রসন্ন ১০, মানকেট ১০, বেঙ্কট রাঘবন ৬ উইকেট) মহীন্দর দ্বিতীয় ইনিংসে অস্ট্রেলিয়ার ১২ রানের মধ্যে স্টাকপোল ও চ্যাপেলকে বোল্ড করে বাহবা আদায় করেছিল। কিন্তু এখনো সে সম্ভাবনার পূর্ণতায় পৌঁছবার অপেক্ষায়।

বস্তুত, যে-কথাটা বলার জন্য নানান দৃষ্টান্তের তালিকা দাখিল করলাম, তা শুধু এই কথাটা বলার জন্য, একদা আমাদের ওপেনিং ব্যাটসম্যান ও বোলার ছিল, কিন্তু গত দশ বছর ধরে আমাদের হাতড়াতে হচ্ছে এদের একজোড়া করে পাবার জন্য। কিন্তু এখনো পাইনি। অথচ অসাধারণ যোগ্যতাসম্পন্ন স্পিন বোলার প্রচুর পেয়েছি, কারণ নিশ্চয়ই উইকেটের অনুকূল্য। ফাস্ট বোলারদের অনুকূলে উইকেট তৈরী করাটা আমাদেরই হাতে। কিন্তু সে হাত কেন যে পক্ষাঘাতগ্রস্ত বোঝা যাচ্ছে না। বছর-পাঁচেক টেস্ট খেলা বন্ধ করলে বোধহয় আমরা আবার ওপেনিং বোলার ও ব্যাটসম্যান তৈরীতে মন দিতে পারব।

কথাসরিৎসাগর
গল্প বলার আসর
৮২।৭এন বালিগঞ্জ প্লেস।
কলিকাতা : ১৯
ফোন : ৪৭৬৪৫১

চিত্তবিনোদনে জেনারেলের বই
[জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড প্রকাশিত]

● সঙ্গীতসম্রাট দ্বিজেন্দ্রলালের কালজয়ী গানগুলির স্বরলিপি করেছেন তাঁর সুযোগ্য পুত্র সুরসুধাকর দিলীপকুমার রায়। বিভিন্ন সুর ও বিভিন্ন পর্যায়ের ৮২টি গানের সমষ্টি দ্বিজেন্দ্র-গীতি প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় সংস্করণ, দাম আট টাকা ।। বিখ্যাত ৩০টি গানের স্বরলিপি হাসির গান, দাম তিন টাকা ।।

● বিদ্রোহী ও সাধক কবি নজরুল ইসলামের নিজস্ব সুর অনুসারী বিখ্যাত গানগুলির স্বরলিপিকার তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগী ও প্রসিদ্ধ সুরকার শ্রীনিতাই ঘটক। ৩১টি গানের স্বরলিপি নিয়ে সঙ্গীতাঞ্জলি, প্রথম খণ্ড, আর ২৯টি গান নিয়ে সঙ্গীতাঞ্জলি দ্বিতীয় খণ্ড। উভয় খণ্ডের দাম পাঁচ টাকা করে। 'দেবীস্তুতি', 'বিজয়া' ও 'হরপ্রিয়া'—এই তিনখানি গীতিনাট্যের সংকলন দেবীস্তুতি, দাম তিন টাকা। ভূমিকা লিখেছেন ডক্টর গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়।

● সঙ্গীত সম্বন্ধে আগ্রহী পাঠকদের জন্যে আরও দুটি বই : ডঃ প্রিয়ব্রত চৌধুরী এম-এ, ডি-ফিল রচিত রবীন্দ্রসঙ্গীতের যথার্থ মূল্যায়ন রবীন্দ্র-সংগীত : লোকগীতি, কীর্তন ও উচ্চাঙ্গ সংগীতের প্রভাব, দাম বারো টাকা ।। সঙ্গীতশাস্ত্রী সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী লিখিত দিনের বেলার রাগসমূহের বিশদ আলোচনা রাগ-মূল্যায়ন (প্রথম খণ্ড) দাম আট টাকা ।।

● অপেশাদার নাট্যসংস্থার অভিনয়-উপযোগী সদ্যপ্রকাশিত তিন অঙ্কের নাটক ছুটির খেলা। আকাশবাণীতে অভিনীত। লেখিকা শ্রীমতী অমিতা রায়। দাম দু' টাকা ।।

বিদ্যালয়ের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের অভিনয় করার মতো ছোট্ট নাটিকা অমলরঞ্জন রায় রচিত স্বামী বিবেকানন্দ, দাম আট আনা ।।

জেনারেল বুকস্
এ-৬৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-১২

ভারতের প্রথম অলিম্পিয়ান নর্ম্যান প্রিচার্ড

আরণিম

সেই ১৯০০ খৃস্টাব্দে, আধুনিক ওলিম্পিক গেমস্‌-এর একেবারে দ্বিতীয় অনুষ্ঠানে, ভারত সংযুক্ত হয়েছিল এই আন্তর্জাতিক ক্রীড়া-অনুষ্ঠানের সঙ্গে, যা কিনা আজকের দুনিয়ায় বৃহত্তম ও সবচেয়ে প্রতিনিধিত্বমূলক বলে সম্মেলন। এবং তা ঘটেছিল কলকাতার এক অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান যুবকের উদারতায়। অথচ তাঁর সম্পর্কে আজকের ভারত তথা কলকাতার কি অপরিসীম উদাসীনতা।

ভাবতেও আশ্চর্য লাগে, যে-যুগে বহু ভারতীয় নিজের জাতিসত্তা অস্বীকার করে নিজেকে ইংরেজ বলে ঘোষণা করবার জন্য ব্যগ্র সেই যুগে কলকাতার এক ফিরিঙ্গী যুবক স্বেচ্ছায় ভারতীয় ঘোষণা করেছিলেন এবং তাঁর এই ভারতীয়ত্ব স্বীকৃতির ফলেই অন্য কোন ভারতীয়ের অজান্তেই ভারত ওলিম্পিকে প্রথম আসন পেয়েছিল। এবং সেই সঙ্গে রৌপ্যপদক বিজয়ীর তালিকাতেও দু-দুবার ঠাঁই পেয়েছে ভারত। যা কিনা এ্যাথলেটিক্‌সের ক্ষেত্রে এই শুরু ও শেষ।

ফিরিঙ্গীরা ইঙ্গ-ভারত মিশ্র জাতি, কি ভারতে স্থায়ী বসবাসকারী খাঁটি শ্বেতাঙ্গ, সে-সমস্যার সমাধান আজও হয়নি, অন্তত গৌরবর্ণ, কটা চুল ও নীল চোখওয়ালা ফিরিঙ্গী নামধারীদের পক্ষে। তবে আমাদের যৌবনে, অর্থাৎ দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তীকালে ফিরিঙ্গী সমাজের দাপট এদেশে ছিল প্রবল। এক সময় তারা অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান অভিধা পুরোপুরি অস্বীকার করে এবং নিজেদের সমাজের নামকরণ করে ডোমিসাইল্ড ইয়োরোপীয়ানস। তিনের দশকে একবার ফিরিঙ্গী সরকারী কর্মচারীদের উপর কোন পুরুষে ভারতীয় রক্তের সংমিশ্রণ ঘটেছিল, তা ঘোষণা করার সরকারী নির্দেশে কি সাংঘাতিক উষ্মার প্রকাশ দেখেছি।

প্যারিসে দ্বিতীয় ওলিম্পিকে যোগদানকারী নর্ম্যান প্রিচার্ড চেহারায় ইংরেজ বলেই চলে যেতেন। তাঁর মধ্যে ভারতীয় রক্ত কতটুকু ছিল, বা আদপেই ছিল কিনা, তাও জানবার উপায় ছিল না। তাছাড়া শেষজীবনে তিনি ইংলণ্ডের স্থায়ী বাসিন্দা হিসেবে অবশিষ্টকাল কাটিয়ে গিয়েছিলেন। শুধু ওলিম্পিক গেমসের এণ্ট্রি-ফর্মে তিনি নিজেকে ভারতীয় বলে ঘোষণা করেছিলেন।

ছাত্র হিসেবে প্রিচার্ড পড়তেন সেণ্ট জেভিয়ার্সে, ফুটবলও খেলতেন সেণ্ট জেভিয়ার্স-এর হয়ে, যে সেণ্ট জেভিয়ার্স তখনকার আই এফ এ-র নিয়মমাফিক ইয়োরোপীয়ান ক্লাব বলে চিহ্নিত ছিল, যেমন ছিল ওয়াই এম সি এ।

তখন আই এফ এ-র সম্পাদক পদেও ইয়োরোপীয়ানদেরই অধিকার, যদিও এই শতাব্দীর প্রথম দিকে একবার মন্মথ গাঙ্গুলীকে জয়েণ্ট সেক্রেটারি করা হয়েছিল। ১৯০০ থেকে ১৯০২ পর্যন্ত প্রিচার্ড আই এফ এ-র অবৈতনিক সম্পাদক ছিলেন। ফিরিঙ্গীদের চাকরির বাজারে প্রাধান্য, পুলিশ সার্জেণ্ট হিসেবে দাপট এবং ভারতীয়দের প্রতি অবজ্ঞা ও দুর্ব্যবহারে ক্ষিপ্ত হয়ে আমরা বলতাম, ওদের খাঁটি ইংরেজরা পোঁছে না, কিন্তু আমাদের আত্মপ্রসাদের কোন বাস্তব ভিত্তি বোধহয় ছিল না।

তখনকার ফিরিঙ্গী সমাজ সম্পর্কে এত গাওনা যে গাইলাম, তার কারণ আজকের তরুণেরা এদেশে পড়ে-থাকা অবশিষ্ট দু-চারজন ফিরিঙ্গীদের আচরণ দেখে কল্পনাও করতে পারবেন না যে, সে-যুগের ফিরিঙ্গীরা ছিল মনে-প্রাণে ব্যবহারে ও মর্যাদায় বৃটিশ-রাজপরিবারের অতি নিকট জ্ঞাতি যেন। সুতরাং একজন ফিরিঙ্গী যুবকের পক্ষে স্বেচ্ছায় "আমি ভারতীয়" বলে ঘোষণা করা যুগের সঙ্গে একেবারেই সম্পর্কহীন। এবং তাঁর এই স্বীকৃতির জোরেতেই ভারত ওলিম্পিক গেমসে প্রথম এশিয়ান জাতির মর্যাদায় অধিষ্ঠিত।

এত বড় ঐতিহ্যের স্রষ্টা সম্পর্কে আমাদের একান্ত উদাসীনতা আমি রীতিমত মর্মপীড়া বোধ করি এবং তাঁর সম্পর্কে আগ্রহ সৃষ্টির প্রয়াসেই তাঁর প্রসঙ্গ অবতারণা করছি।

এই নর্ম্যান প্রিচার্ডের ব্যক্তিসত্তা নির্ণয়ের কোন আন্তরিক প্রয়াস আজ পর্যন্ত হয়নি। অনেকেই আলোচনাপ্রসঙ্গে 'কে এই নর্ম্যান প্রিচার্ড' প্রশ্ন করে কর্তব্য শেষ করেন। ব্যক্তিগতভাবে আমি বহু অনুসন্ধান করে তাঁর সম্পর্কে যা জেনেছি, তা কোন একটি বহুল-প্রচারিত ইংরেজী দৈনিকে একদা প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু দৈনিক সংবাদপত্রের প্রবন্ধ পড়তে যতটুকু সময় লাগে ভুলতে সময় লাগে তার চেয়েও কম, বিশেষ করে যদি বিষয়টি সম্পর্কে আগ্রহ না থাকে। একথা কে না জানে যে, এক কপি খবরের কাগজের দামে পরদিনই ওই কাগজের এক কিলোগ্রাম বিক্রি হয়।

নর্ম্যান প্রিচার্ড সম্পর্কে আমি যা জেনেছি, সে-বিষয়ে আমি নিঃসংশয় হলেও সকলেই যে তা নির্বিচারে মেনে নেবেন, তাও নয়। আমার সিদ্ধান্তে সন্দেহ নিয়ে আরো দশজনে তাঁর সম্পর্কে গবেষণা করে সত্য নির্ণয়ে ব্রতী হলে আমি বরং সুখীই হব।

তবে গবেষণার ব্যাপারে বড় বেশি দেরি হয়ে গেছে। এখন বোধহয় আর কিছুই করা যাবে না। প্রিচার্ড-এর সমসাময়িক এথলেট তিনজনের মধ্যে দুজনকে আমি পেয়েছিলাম, যাঁদের কাছ থেকে আমি তাঁর ব্যক্তিসত্তা নির্ণয় করতে পেরেছিলাম। আজ তাঁরা সবাই মৃত।

ওলিম্পিক গেমসে নর্ম্যান প্রিচার্ড-এর কৃতিত্ব সম্পর্কে আমরা প্রথম জানলাম সেদিন, পঞ্চাশের গোড়ার দিকে হ্যারল্ড এব্রাহামস-এর গ্রন্থে ওলিম্পিক পদকবিজয়ীদের পূর্ণাঙ্গ তালিকায় তাঁর নামের উল্লেখ দেখে।

ভারত হিসেবে ভারতীয়দের ওলিম্পিকে প্রথম যোগদান ১৯২০ সালের অ্যাণ্টওয়ার্প গেমসে। প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী সেই প্রথম ওলিম্পিকে মোহনবাগানের পি সি ব্যানার্জি সমেত চারজন এথলেট ও দুজন কুস্তিগীর পাঠানোর প্রয়োজনেই স্যার ডোরাব টাটার নেতৃত্বে ইণ্ডিয়ান ওলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশান সংগঠিত হয়, যেমন আই এফ এ সংগঠিত হয়েছিল সর্বভারতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার জন্য একখানা শীল্ড পরিচালনার উদ্দেশ্যে।

প্রথম ওলিম্পিক গেমস যখন এথেন্সে অনুষ্ঠিত হয় ১৮৯৬ সালে, তার সাংগঠনিক সভা থেকে কোন অশ্বেতাঙ্গ দেশে আমন্ত্রণ পাঠানো হয়নি। দেশে দেশে ওলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশান গঠনের কথাও তখনো কেউ ভাবেনি। যাঁরা শুনে যে যেভাবে পেরেছে, গিয়ে যোগদান করেছে, সরাসরি এণ্ট্রি করেছে, তবে এণ্ট্রি-ফর্মে নামের সঙ্গে দেশ তথা জাতিসত্তা উল্লেখ করতে হয়েছে।

প্রথম ওলিম্পিকে ইয়োরোপের বাইরের দুটি রাষ্ট্র থেকে লোক এসেছিল আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র ও অস্ট্রেলিয়া, জাতি হিসেবে ব্রিটিশদের সগোত্র। প্যারিসের দ্বিতীয় ওলিম্পিক যে ওলিম্পিক, তার খবরই অনেকে রাখতো না; যোগদানকারী-

দের ক'জনের তা জানা ছিল তাও সন্দেহ। প্যারিস আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর অঙ্গ হিসেবে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ক্রীড়া-প্রতিযোগিতাই আধুনিক ওলিম্পিকের প্রবর্তক ফরাসী ব্যারন পিয়ের দ্য কুবার্তিনের চেষ্টায় ও আগ্রহে ওলিম্পিকের ছাপ পেয়েছিল এবং প্রথম ওলিম্পিকের চার বছর পরের অনুষ্ঠান হিসেবে দ্বিতীয় ওলিম্পিক হিসেবে নথিবদ্ধ হয়েছে। ওই অনুষ্ঠানে দক্ষিণ আমেরিকার মিশ্রজাতি একজন কিউবান এসেছিল। আর যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ নিগ্রো আসে প্যারিসের পরবর্তী সেন্ট লুই ওলিম্পিকে।

এশিয়া ভূখণ্ড দীর্ঘকাল ওলিম্পিক থেকে দূরে পড়েছিল। প্রথম উদ্যোক্তারা প্রাচ্যের নব-অভ্যুত্থিত শক্তি জাপানকে পর্যন্ত আমন্ত্রণ জানায়নি—ভারত, চীন বা অন্য পরাধীন দেশগুলি সম্পর্কে তো কথাই ওঠেনি। জাপান প্রথম যোগ দেয় ১৯১২ সালের স্টকহোম ওলিম্পিকে। ওলিম্পিক ক্ষেত্রে এশিয়ার এই প্রথম প্রবেশেরও ১২ বছর আগে ভারত থেকে নর্মান প্রিচার্ড কি করে ওলিম্পিকে যোগদান করতে গেলেন, কে তাঁর কাছে ওলিম্পিকের বার্তা পৌঁছে দিল, তা জানা যখন যায়নি, আর যাবেও না।

প্রিচার্ড যখন ওলিম্পিক থেকে দুখানা রৌপ্যপদক জিতে এসে কলকাতায় তাঁর সাথী এথলেটদের দেখিয়েছিলেন, কেউ আমল দেয়নি তাঁকে। ওলিম্পিক! সে আবার কি? ওরকম মেডেল কলকাতার স্পোর্টসে তাঁরা অনেক জিতেছেন।

বস্তুত কলকাতায় তখন দৌড়ের বাজীতে সবচেয়ে ওস্তাদ পরবর্তী কালে (১৯১২ সালে) আই এফ এ শীল্ডবিজয়ী মোহনবাগান দলের অধিনায়ক শিবদাস ভাদুড়ী। কলকাতার স্পোর্টসে নর্মান প্রিচার্ড কখনো তাঁকে হারাতে পারেননি। এবং সেই কারণেই শিবদাস ভাদুড়ী, জিতেন দাশগুপ্ত ও এ এস আপকার—নর্মানের তিন সাথী এথলেট তাঁর ওলিম্পিক রৌপ্যপদককে আমল দেননি।

এব্রাহামস-এর বইখানা এদেশে এসে পৌঁছতে প্রিচার্ড সম্পর্কে সামান্য কিছু কৌতূহল সৃষ্টি হয়েছিল। এবং বিতর্কটি উত্থাপনের পর কলকাতা স্পোর্টসে তখনকার পিতামহ স্থানীয় আপকার যখন নর্মান প্রসঙ্গে বলতে শুরু করেছিলেন, মুগ্ধবিস্ময়ে শুনেছিলাম। তাঁর বলা শেষ হতে, আমি প্রশ্ন করতে থাকি এবং মোটামুটি একটি ছবি খাড়া করতে সমর্থ হই। আপকারের নির্দেশেই কলকাতা স্পোর্টসের অপর পিতামহ জিতেন দাশগুপ্তের সঙ্গে সংযোগ করি। দাশগুপ্ত মহাশয়ের সঙ্গে কথা বলেও আপকার প্রদত্ত তথ্যগুলির সমর্থন পাই।

নর্মান প্রিচার্ড সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলের ছাত্র হিসেবেই অতি তরুণ বয়স সেন্ট জেভিয়ার্স ক্লাবের হয়ে ফুটবল খেলেছিলেন। সেই ১৮৮৯ সালে কলকাতায় যখন সর্বপ্রথম ফুটবল টুর্নামেন্টের প্রবর্তন হয়, ট্রেডস কাপের সেই প্রথম রাউণ্ডের খেলায় সেন্ট জেভিয়ার্সের হয়ে বাঙালীদের প্রধান দল শোভাবাজারের বিরুদ্ধে তিনটি গোল করেন নর্মান দ্বিতীয়ার্ধে। সেই সূত্রে প্রতিযোগিতামূলক ফুটবলে কলকাতার মাটিতে প্রথম হ্যাট্রিক করার কৃতিত্ব তাঁরই। মাত্র এক বছর আগে ভারতের মাটিতে সর্বপ্রথম ফুটবল প্রতিযোগিতা, কেবল ফৌজী দলগুলির জন্য খেলা ডুরাণ্ড কাপ অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম বছর ডুরাণ্ড কাপে কোন হ্যাট্রিক না যদি হয়ে থাকে, তবে ভারতের সর্বপ্রথম ফুটবল হ্যাট্রিকও নর্মানের।

ওই পর্যন্ত। তারপর আর ফুটবলে তাঁর বিশেষ কৃতিত্বের খবর পাওয়া যায় না। তবে ফুটবলের সঙ্গে নর্মানের সম্পর্ক যে ক্রমশ ঘনিষ্ঠ থেকে ঘনিষ্ঠতর হয়ে উঠেছিল এবং কলকাতা ফুটবলে নর্মান প্রিচার্ড যে একজন কেউকেটা বলে গণ্য হয়েছিলেন, তার প্রমাণ ১৯০০ সালে তাঁর আই এফ এ-র অবৈতনিক সম্পাদক পদে নির্বাচিত হওয়া।

আই এফ এ-র সেক্রেটারি নির্বাচিত হয়েই প্রিচার্ড হঠাৎ বিলেত চলে যান এবং ফিরে এসে বন্ধুবান্ধবদের তাঁর ওলিম্পিক মেডেল দেখান। এই তথ্য আমাকে জানান আপকার এবং তা সমর্থন করেন জিতেন দাশগুপ্ত মহাশয়।

প্যারিস ওলিম্পিকের খবর প্রিচার্ডের এখানে বসে জানার কথা নয়। ইংল্যাণ্ড থেকে ফিরবার পথে প্যারিস আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী উপলক্ষে আয়োজিত ক্রীড়ানুষ্ঠানে যোগদানের আগ্রহ নিশ্চয়ই তিনি ইংল্যাণ্ডের এথলীটদের কাছ থেকে পেয়েছিলেন।

ফিরে এসেও প্রিচার্ড আই এফ এ সেক্রেটারির পদে বহাল থাকেন। এখানে বলা প্রয়োজন যে, তখন মাত্র আটটি শ্বেতাঙ্গ দল নিয়ে গঠিত ফার্স্ট ডিভিশান লীগ ও আই এফ এ শীল্ড মে-জুন-জুলাই তিন মাসে সাঙ্গ হয়ে যেত। তারপর সাহেবরা রাগবি খেলতো। কাজেই আই এফ এ সম্পাদকের কাজের বোঝা মোটেই ভারি ছিল না। মাঠে মসমাঝারি, কথায় কথায় প্রোটেস্ট প্রভৃতি কলকাতা ফুটবলের আধুনিক সমস্যাগুলি তখন আদপেই ছিল না। তাই আই এফ এ-র সেক্রেটারি প্রিচার্ডের হঠাৎ ফুটবল মরশুমে বিলেত চলে যাওয়াতে আই এফ এ-র কাজে কোন ব্যাঘাত হয়নি।

শ্বেতাঙ্গ পরিচালিত আই এফ এ সম্পাদক হয়েও প্রিচার্ড কিন্তু নিজেকে পুরোপুরি ইংরেজ ভেবে নেটিভদের থেকে দূরে থাকতেন না, একথাও বলেছেন আপকার। আসলে তিনি নিজেকে পুরোপুরি কলকাতার লোক ভাবতেই অভ্যস্ত ছিলেন; তবে সে কলকাতা ছিল ইংরেজদের কলকাতা, সেখানে নেটিভদের ঠাঁই ছিল, কিন্তু কদর ছিল না। তাই বিলেত ঘুরে আসার পর নর্মানের স্থানীয়দের সঙ্গে মেলামেশায় অনেকটা ঢিলে পড়ে গিয়েছিল।

কিন্তু আই এফ এ সেক্রেটারি দ্বিতীয়বার যে নিখোঁজ হলেন তার পাত্তা এখানে কেউই আর জানতে পারেনি। তবে সম্পাদক হঠাৎ নিখোঁজ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আই এফ এ-র তহবিলও কিছু নিখোঁজ হয়েছিল, এমন কানাঘুষাও নাকি শোনা গিয়েছিল।

বলা-কওয়া নেই, কলকাতার ছেলে প্যারিসে গিয়ে ওলিম্পিকের মেডেল জিতে নিয়ে এল—এমন কথা অবিশ্বাস্য বলেই মনে হয়, যদিও আপকার প্রমুখরা ওলিম্পিক মেডেল জেতাকে সেদিন কোন বিশেষ কৃতিত্ব বলে মনেই করেননি এবং সেই কারণেই তা অবিশ্বাস করার কারণও খুঁজে পাননি।

তবে ১৯০২ সালে ভারত থেকে হঠাৎ নিখোঁজ হবার পরবর্তী কাহিনী শুনলে প্রিচার্ডের কোন অভিযানই দুঃসাহসিক ও অবিশ্বাস্য মনে হবে না। কিন্তু তার খবর আপকার বা প্রিচার্ডের তখনকার অন্য বন্ধুরা তো দূরের কথা, এদেশে কেউই জানতেন কিনা সন্দেহ। শেষের কথা আমি যা জেনেছি, তা এই প্রবন্ধের শেষেই বলবো।

ওলিম্পিক থেকে ফিরে এসে প্রিচার্ড

অর্দ্ধ শতাব্দী ব্যাপী অক্ষুন্ন সুনাম
বি, কে, সাহার
"চা"
কলেজ স্ট্রীট মার্কেট ঢুকে এগোলেই পাবেন
৮/৩ন কলেজ স্ট্রীট মার্কেট (মহাত্মা গান্ধী রোড মোড়)

যে গোঁফ রেখেছিলেন, তার সঙ্গে ১৮৯৬ সালের এথেন্স ওলিম্পিকে ১০০ মিটার দৌড় প্রতিযোগীদের ছবিতে দেখা গোঁফের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। তা থেকে মনে করা অস্বাভাবিক নয় যে, ওই ধরনের গোঁফ তখন ইয়োরোপীয় তরুণ-সমাজে প্রচলিত ছিল এবং ইয়োরোপের তরুণদের দেখে এসেই প্রিচার্ড ওই গোঁফ রেখেছিলেন।

প্যারিস ওলিম্পিকে প্রিচার্ড তিনটি বিষয়ে প্রতিযোগিতা করেছিলেন এবং তিনটিই ট্র্যাক ইভেন্ট। ওই তিনটিতে তাঁর ফলাফল আমরা জানতে পেরেছি। তবে ২০০ মিটার দৌড়ে যে দ্বিতীয় স্থান পেল, সে যে ১০০ মিটার দৌড়ে নামেইনি, তা মনে হয় না, তবে ১০০ মিটারের ফলাফলে প্রিচার্ডকে খুঁজে পাওয়া যায়নি।

২০০ মিটার দৌড়ে আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের টিউকেসবেরি ২২-২ সেকেন্ডে প্রথম হন। তখনকার দিনে ওই সময়টা অবিশ্বাস্য বলেই মনে হবে। কিন্তু দৌড়টি হয়েছিল সোজা ট্র্যাকে। দ্বিতীয় স্থান পেতে নর্ম্যান প্রিচার্ড কত সময় নিয়েছিলেন, তা জানা যায় না। তবে টিউকেসবেরি-কে অন্য একটি প্রতিযোগিতা ২০০ মিটার হার্ডলসে তৃতীয় স্থানে ফেলতে পেরেছিলেন প্রিচার্ড। তাতে অনুমান করা অন্যায় হবে না যে, ২০০ মিটার দৌড়ে তাঁকে খুব বেশি পিছনে ফেলতে পারেননি টিউকেসবেরি। ২০০ মিটার হার্ডলসে প্রিচার্ডের আগে দৌড় শেষ করে প্রথম স্থান পেয়েছিলেন আমেরিকান ক্রায়েনজ্‌লাইন। আর ১১০ মিটার হার্ডলসে প্রিচার্ড হয়েছিলেন পঞ্চম, বিজয়ী সেই ক্রায়েনজ্‌লাইন।

ওলিম্পিক থেকে ফেরার দু' বছর পরে আই এফ এ-র সম্পাদক নর্ম্যান প্রিচার্ড অন্তর্ধান হয়ে কোথায় গেলেন, কি হল তাঁর, কিছুই জানবার উপায় ছিল না। এবং আমিও প্রিচার্ডের কাহিনীতে যবনিকা টেনে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম।

বেশ কিছুদিন পরে সংবাদপত্র অফিসে একখানা চিঠি এল, প্রিচার্ড-এর পরবর্তী জীবন সম্পর্কে কিছু জানা যায় না—এই উক্তি পাঠ করে একজন পত্রলেখক জানালেন, প্রিচার্ডের জীবনের অজ্ঞাতবাস অধ্যায়।

নামের পদবিতে লেখক বৃটিশ, অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান হওয়াও অসম্ভব নয়। অস্ট্রেলিয়ারই কোন দূরাঞ্চল থেকে লেখা চিঠিতে তিনি জানালেন যে, নর্ম্যান প্রিচার্ড ভারতবর্ষ থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে সোজা ইংল্যান্ডে গিয়েছিলেন এবং সেখানে মঞ্চাভিনয়ে যোগদান করেছিলেন। ভারতবাসী অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানের মুখের ইংরেজী সংলাপ উচ্চারণ-দোষে দর্শকসমাজের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করায় প্রিচার্ডকে বহু সমালোচনা সহ্য করতে হয়েছিল এবং তাঁকে ইংল্যান্ডের মঞ্চ থেকে তল্পি গোটাতে হয়েছিল।

কিন্তু তাতে হার মানবার লোক ছিলেন না প্রিচার্ড। আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে সোজা নতুন দুনিয়া আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে চলে যান। সেখানে তখনকার সবাবিস্মৃত চলচ্চিত্র আকৃষ্ট করে প্রিচার্ডকে। খেলোয়াড় প্রিচার্ড-এর দেহসৌষ্ঠবের জোরেই হোক বা অন্য যে-কোন কারণেই হোক প্রিচার্ড চলচ্চিত্রে অভিনেতা হিসেবে স্থান করে নিয়েছিলেন। বিশেষ সে-যুগের নির্বাক চলচ্চিত্রে প্রিচার্ডের ভারতীয় ইংরেজী উচ্চারণ কোন বাধা সৃষ্টি করতে পারেনি।

তবে অভিনেতা হিসেবে প্রিচার্ড সাফল্য লাভ করেছিলেন এবং অনেকগুলি ছায়াছবিতে অভিনয় করেছিলেন। তাঁর অভিনয়ে সবচেয়ে বড় স্বীকৃতি মিলেছিল বিশের মাঝামাঝি যুগের নির্বাক বো জেস্ত ছবিতে উপনায়কের ভূমিকা লাভে। বো জেস্ত নির্বাক যুগের এক যুগসৃষ্টিকারী ক্লাসিক ছায়াছবি। নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র নক্ষত্র রোনাল্ড কোলম্যান। এমন ছবিতে উপনায়কের ভূমিকা যাঁকে দেওয়া হয়েছিল, তিনি কৃতী অভিনেতা ছিলেন নিঃসন্দেহে। হলিউডেই ত্রিশের যুগে নর্ম্যান প্রিচার্ড-এর মৃত্যু হয়, তবে সবাক চিত্রের অভ্যুদয়ে ওই নক্ষত্রটি নিষ্প্রভ হয়ে সরে গিয়েছিলেন।

ওই চিঠিখানা সংবাদপত্রে ছাপা হয়েছিল। কবে কোন্ তারিখে, কোন্ পৃষ্ঠার কোন্ কলমে, আজ তা আর স্মরণ করতে পারছি না। ওই পত্রেই নর্ম্যান প্রিচার্ডের কলকাতার জীবনের সঙ্গে পরবর্তী জীবনের যোগসূত্র স্বীকৃত হয়েছিল।

হবে যে যুবক তখনকার ধীরগামী জাহাজী যাত্রার যুগে সকলের অজ্ঞাতে কলকাতা থেকে প্যারিসে গিয়ে ওলিম্পিকে যোগদান করতে পারেন, হোক তা দুর্বল সংগঠনযুক্ত ওলিম্পিক, তাঁর পক্ষে পরবর্তী জীবনের বর্ণিত কাহিনী এতটুকুও অস্বাভাবিক বা অতিরঞ্জিত মনে হয় না। এক দুর্ধর্ষ যুবকের চিরচঞ্চল মানসিকতার অখণ্ড কাহিনী নর্ম্যান প্রিচার্ডের জীবন, ইংল্যান্ডের জীবন ও আমেরিকার জীবন।

এথেন্সে ও প্যারিসে প্রথম দুই ওলিম্পিকেই অনুষ্ঠান ক্ষেত্রে উপস্থিত হওয়ার পর নাম দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। হঠাৎ প্যারিসে বেড়াতে গিয়ে দৌড় প্রতিযোগিতার উপস্থিতির আকর্ষণেই হয়তো নর্ম্যান নাম দিয়েছিলেন এবং যেহেতু তিনি ভারত সরকারের পাসপোর্ট বহন করছিলেন, এন্ট্রিফর্মে তাঁকে ভারতের লোক বলেই ঘোষণা করতে হয়েছিল।

পরবর্তী যুগে ভারতের ওলিম্পিক দলে অ্যাংলো ইন্ডিয়ানদের ছড়াছড়ি, এমন কি রোম ওলিম্পিকে (১৯৬০) স্বাধীন ভারতের হকি দলের অধিনায়ক ছিলেন লেসলি ক্লডিয়াস। এ যুগে ওলিম্পিকে যোগদানের অধিকার পেতে হলে যে ভারতীয় হতে হয়, সেটুকু স্বীকৃতি কিন্তু অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানরা সহজে মেনে নেন নি। আমস্টার্ডামে (১৯২৮) ভারতের প্রথম ওলিম্পিক হকি দলের ফিরিঙ্গী খেলোয়াড়েরা বিদ্রোহ করে ঘোষণা করেছিলেন, আমরা ভারতীয় নই, ভারতে বসবাসকারী বৃটিশ। ভবিষ্যতে অনুরূপ উদ্ধত উচ্ছৃঙ্খল বন্ধ করার জন্যই ভারতীয় ওলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন নিয়ম করে দেয়, ভারতীয় দলের হয়ে ওলিম্পিকে যোগদান করতে হলে 'আমি ভারতীয়' বলে স্বীকৃতিপত্র সই করে দিতে হবে এবং মার্চপাস্টে মাথায় পাগড়ি পরতে হবে।

আমাদের যুগে যখন ভারতের সদ্য-জাগ্রত স্বজাতিচেতনার চাপে ফিরিঙ্গী সমাজ কিছুটা ত্রস্ত ও বিব্রত, তখনও তাদের ওই ইংরেজ হওয়ার দাবি, যা দাবাতে কড়া আইন করতে হয়েছিল। আর এদেশের সর্বজন স্বীকৃত ইংরেজ প্রভুর ঘনিষ্ঠ জ্ঞাতি হিসেবে ফিরিঙ্গীদের স্বীকৃতি যখন অবিসংবাদিত, সেই যুগে—বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনেরও পাঁচ বছর আগে বৃটিশের প্রাচ্য সাম্রাজ্যের প্রধান কেন্দ্র কলকাতার গৌরবর্ণ কটাচুল নীল চোখ ও ইংরেজ সমাজে পা ঘষাঘষি-করা যুবক নর্ম্যান প্রিচার্ড ভারতীয় বলে নিজেই স্বীকার করেছিলেন। প্রসঙ্গত, ১৯০৮ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত জাতীয় এথলেটিক্সে বাংলার মহিলা দলের অধিনায়িকা শ্রীমতী ভবোথি প্রিচার্ড (হার্ডলার) নাকি সম্পর্কে নর্ম্যান প্রিচার্ডের ভ্রাতুষ্পুত্রী ছিলেন।

তিন মহাদেশ দাবড়ে বেড়ানো এবং উপন্যাস সুলভ চমকপ্রদ জীবন কাহিনীর অধিকারী ওই ব্যক্তিটিকে কোন মতেই অস্বীকার করা চলে না।

রাজার খেলা

অজয় হোম

কলকাতার বাহান্ন নম্বর আমহার্স্ট স্ট্রিটকে, যাঁরা খেলাধুলো সম্বন্ধে একটু সচেতন তাঁরা জানেন ওটা ক্রিকেট খেলার বাড়ি এবং বাড়ির সব ছেলেরাই ব্যাট ঘোরায়। কিন্তু খুব কম লোকই জানেন ওখানে ক্রিকেট ছাড়াও নানা বিষয়ে চর্চা হতো। সংগীত-সাহিত্য-নাট্য থেকে শুরু করে শিকার, পশুপাখি পোষা—কি নয়। এর ওপর তুখোড় আড্ডা। সব কিছুরই মধ্যমণি ছিলেন হিতেনদা অর্থাৎ স্বর্গত হিতেন্দ্রমোহন বসু। অসম্ভব ভালো ফার্সি জানতেন। ফার্সি থেকে মূল ওমর খৈয়াম অনুবাদ করেছিলেন। এছাড়া তিনি ছিলেন পন্ডিত, সংগীতজ্ঞ ও নানা বিষয়ে গুণসম্পন্ন।

১৯০৭-০৮ সাল। আমাদের তখন পাখিপোষা এবং পক্ষিতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান-সঞ্চয়ের ধুম চলছে। উৎসাহদাতা হিতেনদা। তাঁর বিরাট লাইব্রেরি। পড়াশোনার সঙ্গে চলত হাতিবাগান, সেয়ালদা, হগসাহেবের বাজার থেকে পাখি সংগ্রহ এবং চিড়িয়াখানা ও যাদুঘরে গিয়ে পাখি দেখা।

ক্রিকেট মরশুম শেষ। পাখি নিয়ে মেতেছি। কিছু পাখিধরা বেদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। তাদের আড্ডা ছিল পাতিপুকুরে। কিন্তু তাদের সঙ্গে কলকাতার আশেপাশে ঘুরি পাখিধরা ফাঁদ—সাতনলা চৌখুড়ি ইত্যাদি নিয়ে। অনেক নতুন পাখির সঙ্গে পরিচয় হয়।

দৈনন্দিন পড়াশোনা ও অভিজ্ঞতার বিবরণ পেশ করতে হয় আমাদের 'বার্ডস রিসার্চ ইন্সটিটিউট' বা পক্ষি-গবেষণা সংস্থার সভাপতি হিতেনদার কাছে। সেক্রেটারি ক্রিকেট খেলোয়াড় কার্তিক বসু। আড্ডাটা বসে বাড়ির ভিতরের মাঠটায় যেখানে কংক্রিটের ক্রিকেট-পিচ আছে তার উপর। আমরা কজন সভ্য। আমাদের মধ্যে বর্তমানে বোম্বাইবাসী ক্রিকেট-খেলোয়াড় বাপী বসু ছিল বৌ-কথাকও ও পাপিয়া পোষার এবং ডাকানোতে সিদ্ধহস্ত।

একদিন হিতেনদা ওপর থেকে নেমে এলেন হাতে একটা বই নিয়ে। প্রশ্ন করলেন, রাজাদের স্পোর্টস অর্থাৎ খেলা কি? আমরা সমস্বরে বলি, কেন ক্রিকেট—'লর্ডস গেম'। তিনি বললেন, ক্রিকেট খেলার রাজা হতে পারে কিন্তু রাজার খেলা ক্রিকেট নয়। কারণ সবদেশে ক্রিকেট খেলা হয় না এবং সব রাজামহারাজা বা লর্ড-ব্যারনরা ক্রিকেট খেলে না। আমরা বলি তবে শিকার? জবাব দেন, হাঁ। তবে শিকারের রকম ভেদ আছে। তোমরা সবাই পুরোনো রাজপুত কাংড়া মোগল ছবি দেখেছ। সেইসব ছবিতে নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ শিকারের ছবি এবং অন্য ছবিতেও রাজা-রাজপুত্র বা সমগোত্রীয় লোকের হাতে একটা বাজপাখি। এই বাজ পাখি দিয়ে শিকারই হচ্ছে রাজার খেলা।' কি ইংল্যান্ড, কি ইউরোপ, কি আমেরিকা, আফ্রিকা, এশিয়া পৃথিবীর সর্বত্র এর সমাদর। বাংলাদেশে এ নিয়ে কেউ চর্চা করছে কিনা জানি না, তবে ভারতের আর সর্বত্র এই শিকার-খেলার আদর আছে।' এই

কহেরি বা বাজকউরি

বলে তিনি হাতের বইটি খুললেন। ফার্সিতে সুললিত ছন্দে লেখা বাজপাখি দিয়ে এক শিকার কাহিনী পড়ে শোনালেন। আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনলাম সেই অপূর্ব বর্ণনা। ও'র কাছেই শুনলাম বাজপাখিকে শিকার শেখানোর সবচেয়ে ভালো বই 'বাজনামা-ই-নাসিরি।' ইংরেজি অনুবাদ আছে ডি-সি ফিলট-এর।

The Baz-Nama-Yi-Nasiri, a persian treatise on falconry, tr. by Douglas C. Phillot, B. Quaritch 1908

বাংলাদেশের শিকরেবাজ জোগাড় হল। অসম্ভব ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের ফলে কার্তিক বসু পাখিটাকে শিকারের উপযুক্ত করে গড়ে তুললেন।

ক্রিকেটার কার্তিক বসু যে দক্ষতায় বাজপাখিকে পোষ মানিয়ে শিকার ধরে আনতে শেখাতেন অপর কোন বাঙালীর সেরকম দক্ষতা আজও আছে কিনা আমার জানা নেই। দু-চারটি বড় জাতের বাজ ছাড়া প্রায় সব জাতের বাজ নিয়ে তিনি শিকার করেছেন।

বাজপাখি বশীভূত করা খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার—যথেষ্ট ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের প্রয়োজন। প্রথমদিকে সারা দিনে যতক্ষণ পারা যায় এমনকি সন্ধ্যার পরও বাঁ হাতে পাখিটিকে নিয়ে হাতে হাতে ঘুরতে হবে। লোকজনের মধ্যে থাকতে হবে। পাখির সঙ্গে কথা বলতে হবে। মাঝে মাঝে ডান-হাতটাকে মুখের সামনে এনে চাঁদিতে মাথা থেকে লেজ পর্যন্ত হাত বুলোতে হবে।

মানুষের হাতকে পাখির সবচেয়ে ভয়। তারা সবকিছু বরদাস্ত করতে পারে কেবল হাত ছাড়া। তাঁদের মানুষেরা বা 'ম্যানিং' করতে বেশ সময় লাগে। আসল বশটা হয় খিদে এবং খাদ্য দিয়ে। মাংস হল বাজপাখির একমাত্র খাদ্য। পায়ের কাছে মাংসের টুকরো ধরলে যদি খাবা দিয়ে চেপে ধরে তবে বুঝতে হবে এ পাখি পোষ মানবে।

একবার হাজারিবাগ জেলার গিরিডিতে একটা ঈগল (স্পটেড ঈগল; আকুইলা পোমারিনা) ফাঁদ পেতে ধরা হয়েছিল। সেটা কিছুতেই পায়ে মাংস চেপে ধরতো না। অর্থাৎ নিজে থেকে খেত না। জোর করে মাংসের টুকরো তার মুখের মধ্যে পুরে দিতে হত। মাস দেড়েক হরেক-রকম চেষ্টা করেও তাকে বশ মানাতে পারা গেল না তখন ছেড়ে দেওয়া হল। প্রথমটা সে বুঝতে পারে নি যে, তাকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। অনুভব করার পর আমাদের মাথার উপর চক্কর দিতে লাগল বৃত্ত ক্রমে বাড়ল, তারপর উত্তরমুখে সোজা উড়ে গিয়ে দিগন্তে মিলিয়ে গেল। এর চলে যাওয়াটা আজও মনের মধ্যে গাঁথা আছে।

খালে পাহাড়ে [illegible] পাখি যেমন নিয়ে

টুকরো কেটে পাখির মুখে ধরতে হবে। পাখি সাগ্রহে খাবে এবং মুখে কুই-কুই ধ্বনির আওয়াজ করবে। খাওয়ার সময়টা মোটামুটি নির্দিষ্ট রাখতে হয়।

এভাবে পালক ও পাখির মধ্যে সমঝোতা গড়ে উঠলে খাওয়াবার আগে একটা কাঠের চেয়ারের মাথায় পাখিকে বসিয়ে পায়ের বন্ধনীর সংগে সরু দড়ি বা ফিতে লম্বা করে রেখে শেষপ্রান্ত চেয়ারে বাঁধতে হয়। দূর থেকে বাঁ হাতে উইকেটরক্ষকের দস্তানা পরে ডান হাতে মাংসের টুকরো ধরে বাঁহাতের বুড়ো আঙুল ও তর্জনীর মধ্যে আস্তে আস্তে ঠুকে ও মুখে শব্দ করে বাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হয়। মাংসের টুকরোর প্রতি বাজপাখির নজর পড়লেই মুহূর্তমধ্যে উড়ে এসে বাঁহাতের দস্তানার উপর বসে মাংসের টুকরো আঁকড়ে ধরবে। দ্রুতগতি ও পাঞ্জার জোর লক্ষ্য করার বিষয়। মাংসের টুকরো সরিয়ে নিয়ে শুধু হাতে পাখি বসানোর চেষ্টা করে দেখা গেছে খুব সময় তারা সাড়া দেয়। কয়েক-দিন পর লম্বা সুতোর আর দরকার হয় না, এমনিতেই বাজপাখি আসতে থাকে। দূরত্ব ক্রমশ বাড়ে। শেষে গাছের উপর বা বাড়ির কার্ণিসের উপর উড়িয়ে দিলেও মাংস নিয়ে ডাকলেই আসতে থাকে।

পরবর্তী শিক্ষা—শিকার ধরা। বাজ-পাখি দিয়ে যে পাখি শিকার করতে হবে তার আস্বাদন বাজপাখিকে আগে করাতে হয়। তারপর সেই পাখি সংগ্রহ করে মাটিতে বেঁধে রেখে বাজকে হাতের মুঠোয় ধরে (যেমন পায়রাকে ধরা হয়) সেই বাঁধা পাখিকে দূর থেকে একটু আড়াল করে দেখাতে হয়। বাজ হাতের মধ্যে ছটফট করতে থাকে শিকার ধরার জন্যে। বাজকে এখন নিচু হাতে ছুঁড়তে হবে। হাত থেকে ছাড়া পেয়ে সে বড়ের বেগে উড়ে গিয়ে দুপায়ে শিকারকে মোক্ষমভাবে চেপে ধরবে। পায়ের পিছনের নখ শিকারের দেহে বসিয়ে দেয়। ডানা ছড়িয়ে ডাক দিয়ে মালিকের জন্যে অপেক্ষা করে। মালিক গিয়ে শিকারকে ছাড়িয়ে নেয়। প্রথম যে পাখি শিকার করে তার কন্ঠনালী ছুরি দিয়ে কেটে দু-এক ফোঁটা উষ্ণ রুধির বাজপাখিকে পান করতে দিতে হয়। এতে বাজের তেজ বাড়ে। মাঝে মাঝে একটু কাঁকরও খাওয়াতে হয়। দু-চার জাতের পাখি শিকার রপ্ত হলে বুনো পাখি শিকারে নামতে হয়। বুনো পাখির পিছনে (বাজ পাখির) ধাওয়া ও শিকার ধরার দৃশ্য খুবই উত্তেজনাপূর্ণ ও রোম-হর্ষক।

এতক্ষণ যে বাজপাখির কথা বললাম তা ছোটো-ডানার। বাজপাখি দু'জাতের— ছোট-ডানা (হক) ও বড়ো-ডানা (ফকন)। ছোটো-ডানার সবচেয়ে বড়ো পাখি—বাজ (গোশক, অ্যাকসিপিটার জেন্টিলিস)। বাজের চোখের উপর চামড়ার ঠুলি পরিয়ে রাখতে হয়। এরা লম্বায় ২৪ ইঞ্চি, তাই [illegible] হয় না। এরা হাতের ঝাঁকানি এবং পালকের ইশারাতেই বুঝতে পারে কাকে ধরতে হবে।

শিকারের দিকে ছোটো-ডানার বাজ-পাখিদের নিচু হাতে ছোঁড়াই ঠিক পন্থা। বাকি শেখানোর ধারা মোটামুটি এক। অন্ধকারে শেখানোরও এক ধারা আছে।

বাজ, ঈগল ইত্যাদি মাংসাশী ও শিকারী পাখির স্ত্রীজাতিরাই দৈর্ঘ্যে বড়ো এবং তারাই প্রকৃত ভালো শিকারী। তাদের নামেই এই সব পাখিদের পরিচয়। যেমন, স্ত্রী বাজ, পুরুষ জুর্রা; স্ত্রী বহেরি, পুরুষ বহেরি-বাচা; স্ত্রী শাহীন, পুরুষ কোহি বা কোরেলা; স্ত্রী মেকর বা চেরাগ, পুরুষ চারচেলা; স্ত্রী লগার, পুরুষ জুগর; স্ত্রী ধুতি, পুং ধুতের (ছবি), স্ত্রী তরমুতি, পুং চেটুওয়া; স্ত্রী শিকরে পুং চিকেরা; ইত্যাদি।

একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি পাখির বাসা থেকে সংগৃহীত বাচ্চা পাখি কখনও ভাল শিকারী হয় না। পালকের কাছে থাকার ফলে স্বাভাবিক অবস্থায় খানোর জন্যে নিজে থেকে শিকার করতে বাধ্য হয় না তাই আয়েসী হয়ে যায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে অমৃতসরে প্রতি কালীপুজোর দিন বাজপাখির হাট বা মেলা বসত। এখন বসে কিনা জানি না। ভারতের বিভিন্ন স্থানের অসংখ্য বাজপাখি নিয়ে বাজের শিক্ষকরা যেমন আসত তেমনি আসতেন রাজামহারাজারা। ছোট-বড় কেউই বাদ থাকতেন না। বেচাকেনা খুব হত। একবার এই মেলায় উপস্থিত ছিলাম। জীবনে যেসব পাখি ছবিতে দেখেছিলাম এবং বই পড়ে তাদের সম্বন্ধে যেটুকু জ্ঞানলাভ করেছিলাম তাদের চাক্ষুষ দেখার আনন্দ পেলাম। এই মেলায় বাজপাখির দক্ষতা এবং শিক্ষকের কেরামতির পরিচয় পেয়ে-ছিলাম। কারা যেন কয়েকটা পায়রা ছেড়ে-ছিল। হাততালি ও শিসের জোরে তারা বেশ উঁচুতে উঠেছিল। পাখির মাথার টুপি বা 'হুড' খুলে এক শিক্ষক বহেরি বা বাজ বর্তীর (পেরিগ্রিন ফকন: ফ্যালকো পেরি-গ্রিনাস) ছাড়লেন। বহেরি উড়ল। কে যেন বলল, জোরে 'পাতিয়ালা!' রকেটের মতো পায়রাগুলোর পিছনে ছুটল বাজ বর্তীর পাতিয়ালা। সাক্ষাৎ যম তাদের পিছু নিয়েছে দেখে কয়েকটা পায়রা ঝপঝপ করে নামতে শুরু করে দিল। বহেরির লক্ষ্য একটি পায়রার দিকে যে সবচেয়ে উঁচুতে এবং দ্রুতগামী। পায়রা উড়ে চলেছে, বাজ বর্তীর আক্রমণ কাটাবার চেষ্টা করছে কখনও ডিগবাজি খেয়ে উল্টোমুখে, কখনও নিচুতে। এই সময় আর-একজন শিকারী একটা শাহীন বাজ (ফ্যালকো পেরিগ্রিনাস পেরিগ্রিনেটর) ছাড়লেন। বহেরির জাতভাই এই শাহীন, একই প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত। বহেরি বুঝেছে তার ভাগীদার জুটে গেছে। সে পায়রাটাকে ধরার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

আমির ভার্নিক থেকে বর্ধমানের মহারাজার পক্ষিপালক তাঁর একটা বাজ পাখি ছেড়ে দিলেন। শিকারীদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পাখি—এই বাজ। বাজ সম্বন্ধে শুধু বইয়ে পড়েছি, ছবিতে দেখেছি। অমৃতসরের মেলায় এসে চাক্ষুষ পরিচয় হল।

এদিকে বহরি তার জাতভাই শাহীনের আগমনবার্তা পেয়ে তার গতি বাড়িয়ে দিল। ফাইটার প্লেন যেভাবে ডিগবাজি মেরে একটু দূরে গিয়ে বাঁক নেয়, শত্রুর বিমানের উপর গুলি বর্ষণ করে, ঠিক সেইভাবে বহরি পায়রাটার পিছন ছেড়ে বাঁদিক দিয়ে অর্ধ চক্রাকারে এসে পড়ল তার সামনে। পায়রাটা ডিগবাজি খেয়ে নামার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ব্যর্থ হল। বহরির দু পায়ের শক্ত মুঠিতে ধরা পড়ল হতভাগা পায়রাটা। দর্শকরা আনন্দে চিৎকার করে উঠল—সাবাস! সাবাস! বহরির শিকারী মোচে চুমকুড়ি দিয়ে বুক ফুলিয়ে চারদিকে তাকাতে লাগলেন। দর্শকদের বোঝালেন তাঁর পাখির কত এলেম।

উল্লাসধ্বনি মিলাতে না মিলাতে তলা থেকে শাহীন বিদ্যুতের মত ছিনিয়ে নিল বহরির পা থেকে তার শিকার। আক্রমণটা এত অতর্কিতে হল যে, বহরি বুঝতেই পারেনি, এমনকি কেউ আশাও করেনি তারই জাতভাই এমন চৌর্যবৃত্তি করবে। বহরির শিকারীও করেননি, তার উঁচু গোঁফ ঝুলে গেল। পরাজিত বহরি ফিরে আসছে তার শিকারীর ইঙ্গিতে। এখন শাহীনের শিকারীর তারিফ না করে উপায় কি?

তাকিয়ে দেখলাম নীল আকাশে শাহীনকে মাঝে রেখে বাজ চক্কর দিচ্ছে। শাহীনের অবস্থা সঙ্গীন। সে পালাবার তাল খুঁজছে। বিপদ বুঝে শাহীনের শিকারী ঘনঘন নিশানা দিচ্ছেন ফেরার জন্যে। কিন্তু ফিরবে কি করে? ফিরতে দেবে কে? বাজ এল বিনামেঘে বজ্রপাত—চোখের পলকে শাহীনকে আক্রমণ করে বাজ ছিনিয়ে নিল আধমরা পায়রাটা। ঠোঁটে নিয়ে ফিরছে বাজাধিরাজ বাজ। দর্শকদের উল্লাসধ্বনিতে চারদিক মুখরিত হয়ে উঠেছিল। অমৃতসরে এই বাজের খেলা আজও মনের মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে আছে।

বাজপাখি ওড়ানো বা ফকনরির একটা ঐতিহ্য আছে। প্রাচীন মিশরের বাজমাথা হোরাস দেবতা নিত্য পূজা পেতেন। প্রাচীন মিশরের ছবিতে এবং খোদাই করা দেওয়ালের গায়ে বাজ ও বাজ ওড়ানোর অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। চীনদেশে বাজ ওড়ানো শুরু হয়েছিল খৃষ্টপূর্ব দু হাজার বছর আগে। ভারত, আরব, এশিয়া মাইনর, পারস্য ও জাপানে শুরু হয় খৃষ্টপূর্ব ছ'শ বছরেরও আগে। খোরসাবাদের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে একটা খোদাই মূর্তি পাওয়া গেছে—এক শিকারীর হাতে বাজপাখি। পণ্ডিতরা বলেন, এ মূর্তির বয়েস খৃষ্টপূর্ব ১৭০০।

পারসী ও আরবদের হস্তলিখিত এক পুঁথি বলে যে, বাজ ওড়ানো প্রথম শুরু করেন ইতিহাসপূর্ব এক পারসীক রাজা। ইতিহাস বলে, পারস্য থেকেই মোগল রাজারা এই ঐতিহ্য ভারতবর্ষে বহন করে এনেছিলেন।

ইংল্যান্ড এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশের লেখকদের লেখায় ফকনারি এবং টিউটনীয় বাজের কথা পাওয়া যায়। মিশরে এখনও নাকি বাজ ওড়ানোর রেওয়াজ আছে। প্লিনি, অ্যারিস্টটল এবং মার্শাল প্রমুখদের লেখাতে ও বাজ ওড়ানোর কথা আছে। বাজ-ওড়ানোর চলন ইংল্যান্ডে প্রথম আসে ৮৬০ খৃষ্টাব্দে এবং তখন থেকে ১৭শ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত ইংল্যান্ডের খুবই জনপ্রিয় স্পোর্টস ছিল। আর কোনও খেলাধুলো এর ধারে কাছে ঘেঁষতে পারত না। আইন করা হয়েছিল রাজা ওড়াবেন ঈগল, লর্ড বা তার সমকক্ষরা সাকার ও বাজ সাধারণ লোকেরা স্প্যারো হক (অ্যাকসিপিটার নিসাস)। আর মেয়েদের জন্যে ছিল মার্লিন বা তুরুমতি (ফ্যালকো কোলাম্বেরিয়াস)। আইন লঙ্ঘনে দণ্ড দেওয়া হত। মধ্য এশিয়া ও মঙ্গোলিয়ায় স্বর্ণ ঈগল (অ্যাকুইলা ক্রাইস্যায়েটস) ওড়ানোর প্রচলন ছিল। ইতালির বেনিতো মুসোলিনি বাজ ও ঈগল ওড়াতেন। তার পাখিশালায় অনেক জাতের বাজ ও ঈগল ছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এই বাজের খেলার চলন এক রকম এশিয়া এবং আমেরিকায় সীমাবদ্ধ হয়েছে। বস্তুত বর্তমানে উত্তর আমেরিকার টেকসাসের লস ফ্রেসনোসে ফকনারি ক্লাব অব আমেরিকার হেডকোয়ার্টার্স অবস্থিত। ওখান থেকে এক পত্রিকা প্রকাশিত হয়, নাম ফকনারি—নোটস অ্যান্ড নিউজ।'

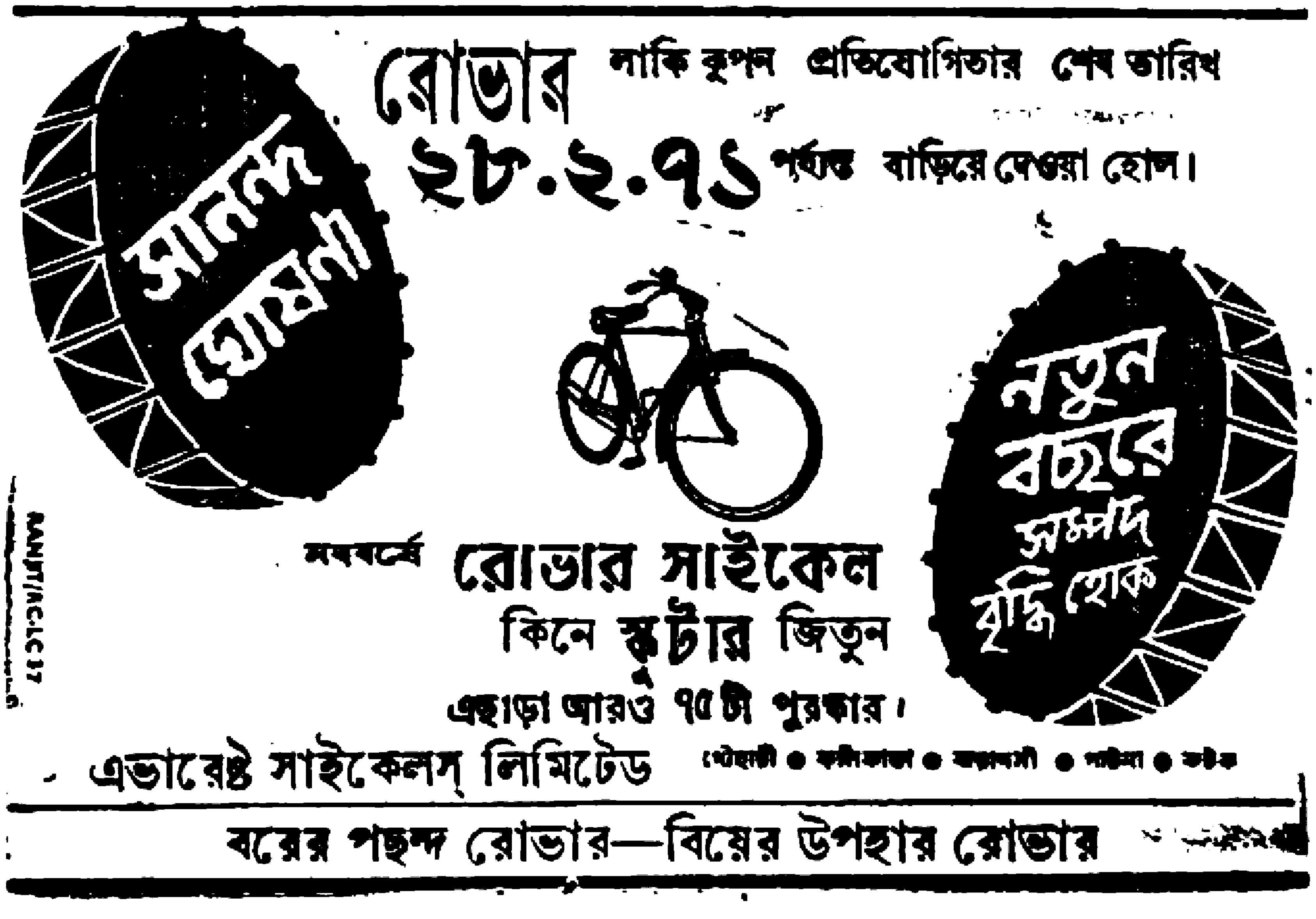

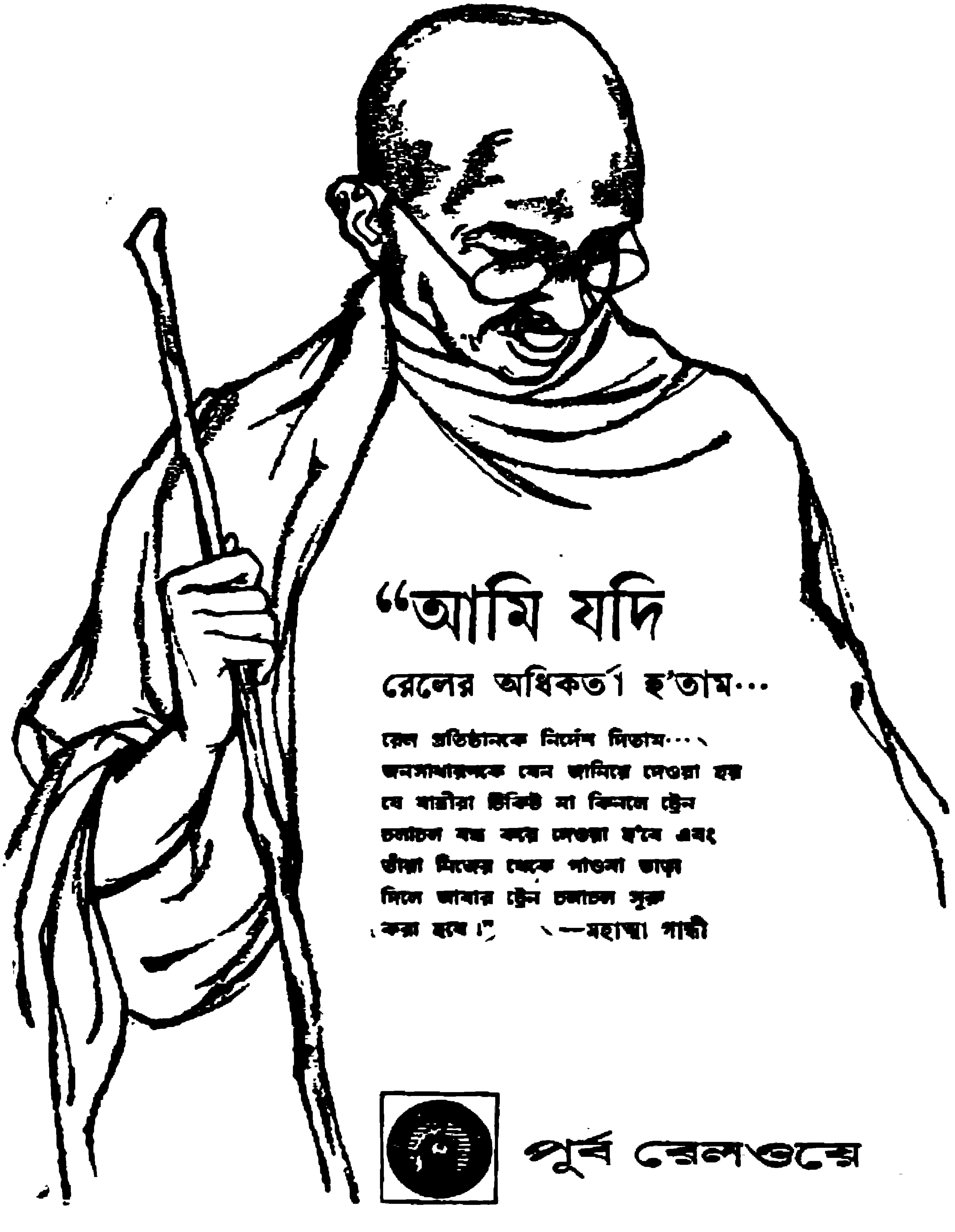
"আমি যদি
রেলের অধিকর্তা হ'তাম…
রেল প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশ দিতাম…
জনসাধারণকে যেন জানিয়ে দেওয়া হয়
যে যাত্রীরা টিকিট না কিনলে ট্রেন
চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হ'বে এবং
তাঁরা নিজের থেকে পাওনা টাকা
দিলে আবার ট্রেন চলাচল সুরু
করা হবে।" —মহাত্মা গান্ধী
পূর্ব রেলওয়ে

পঙ্কজ রায়। একটি ইতিহাস

কমল ভট্টাচার্য

'দৈবায়ত্তং তু পৌরুষম'—পুরুষকার সাধনার মাধ্যমে নিজেকে অর্জন করতে হয়। মহাভারতের শ্রেষ্ঠ চরিত্র কর্ণের এই বাণী বোধহয় সবচেয়ে বেশী প্রতিফলিত হয়েছে পঙ্কজ রায়ের জীবনে। কেবলমাত্র সাধনার জোরে যাঁরা কৃতী হয়েছেন ক্রিকেটার পঙ্কজ রায় তাদেরই একজন।

কুমারটুলীর রায়বাড়িতে ক্রিকেট খেলার কিছু চর্চা ছিলো। বাড়ির সামনে কুমারটুলী পার্কের সবুজ মাঠটা রায়বাড়ির বারো বছরের কিশোর ছেলেটাকে অবিরত যেন হাতছানি দিয়ে ডাকতো।

হাত ধরে কেউই খেলা শেখায়নি তাকে। বারো বছরের কিশোর পঙ্কজ নিজের তাগিদে প্রথম নাম লেখায় কুমারটুলী ক্লাবে। ধুতিপরা ফুটফুটে ছেলেটাকে রোজই দেখা যেতো কুমারটুলী পার্কে। রোদে পুড়ে জলে ভিজে প্রচণ্ড অধ্যবসায়ের সঙ্গে খেলতো পঙ্কজ। ফুটবল, হকি, ক্রিকেট তিনটি খেলাই খেলতো সে প্রচণ্ড আগ্রহের সঙ্গে। যে কোন খেলাকে প্রাণবন্ত করে তুলতে নিজেকে সেই খেলায় কুশলী করে তুলতে চেষ্টার অন্ত ছিলো না তার। আন্তরিক নিষ্ঠা এবং নিরন্তর অভ্যাসের মধ্য দিয়ে প্রখ্যাতনামা খেলোয়াড়দের সমান ক্ষমতা লাভ করা যায়—বারো বছরের কিশোরের নিরন্তর চেষ্টার মধ্যে সেই বোধ যেন সোচ্চার হয়ে উঠেছিলো।

১৯৩৯ সাল। খেলা মহামেডান স্পোর্টিং-র সঙ্গে। পঙ্কজও গিয়েছে থার্ড রিজার্ভ হিসেবে খেলতে। দাদা ঐ খেলায় ক্যাপ্টেন আর বড়ো চক্রবর্তী আম্পায়ার। মনটা খুঁত খুঁত করছে ওর। ধুস্—থার্ড রিজার্ভ! —চোদ্দ নম্বর খেলোয়াড়? খেলার সুযোগ মিলবে কিনা সন্দেহ। অস্থির হয়ে উঠেছিলো সে থেকে থেকে। হাতটা নিসপিস করছিলো। অবশেষে সুযোগ এলো হঠাৎ। ধুতি পরেই মাঠে নেমে পড়লো পঙ্কজ। ওর জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় দিন : প্রথম ম্যাচ খেলা, আর জীবনের এই প্রথম ম্যাচ খেলায় রান হলো দুই—নট-আউট।

রান যাই হোক না কেন, নট-আউট থেকে মুখ তো রাখা গেছে। কিন্তু ফিল্ডিং করতে গিয়েই গণ্ডোগোল। ফিল্ডিং করছিলো স্কোয়ার লেগে, একটু যেন

মাদ্রাজ টেস্ট ম্যাচে পঙ্কজ রায় এবং ভিনু মানকাদ : মাদ্রাজে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ১৯৫৫—৫৬ সালের টেস্টে এই দু'জন প্রথম উইকেটের জুটিতে ৪১৩ রান সংগ্রহের সূত্রে প্রথম উইকেট জুটির যে বিশ্ব রেকর্ড রান করেছিলেন তা আজও অক্ষুণ্ণ আছে।

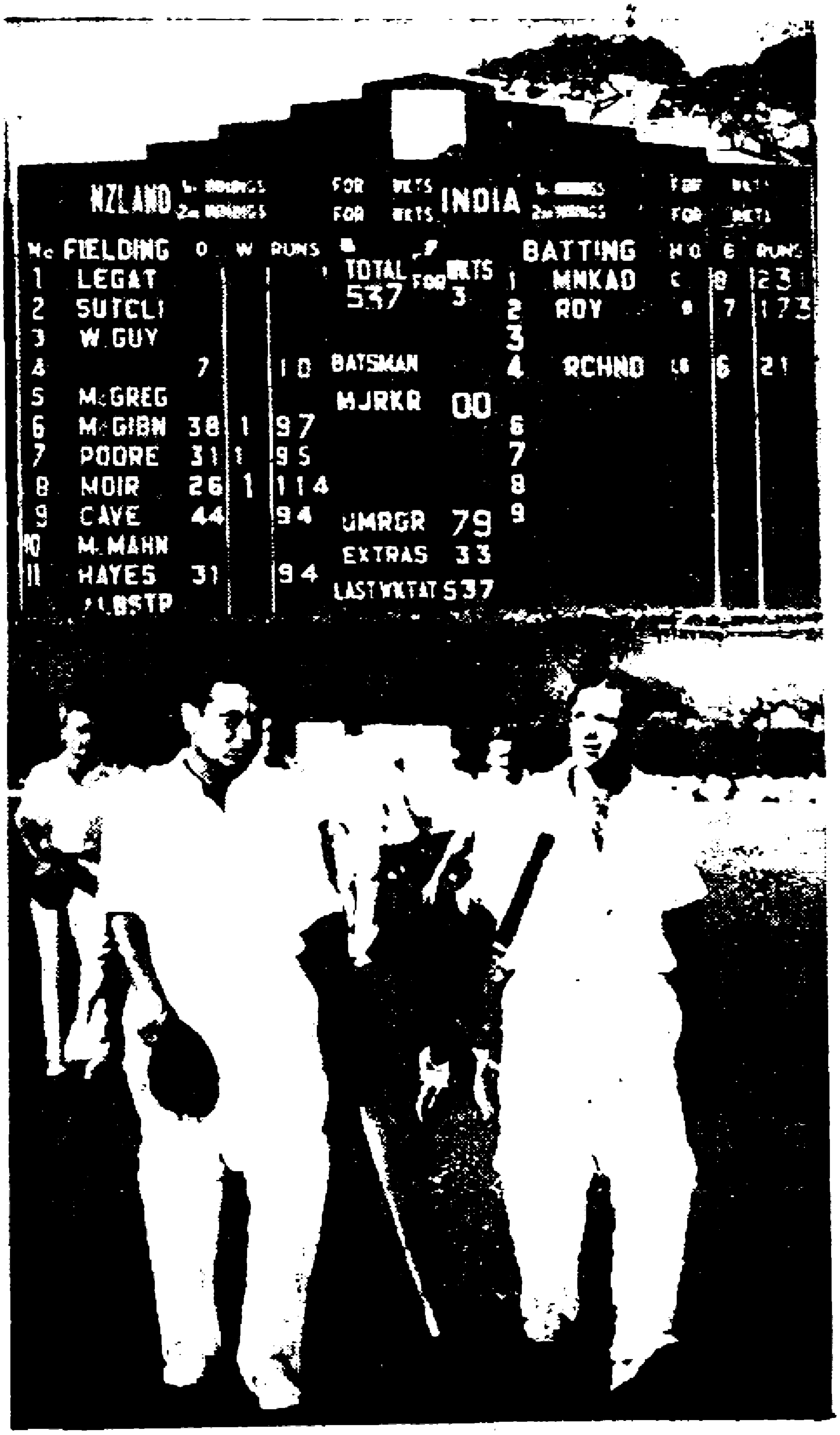

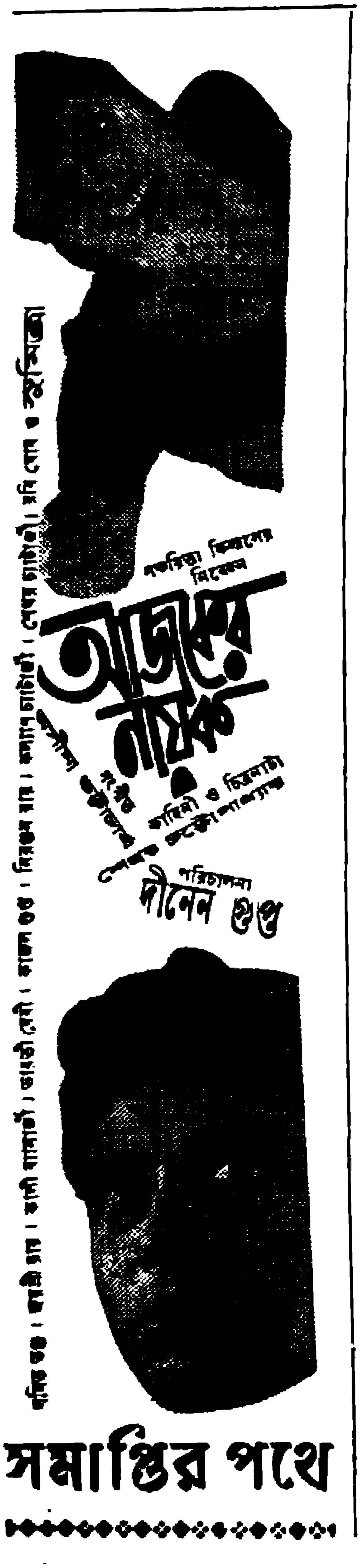

অনামনস্ক অসতর্ক ছিলো আর তারই ফাঁক দিয়ে বলটা ছুটে লাগলো একেবারে বাউন্ডারীর বাইরে।

এজন্যে প্রচন্ড বকুনি খেলো দাদার কাছে। চোখমুখ লজ্জায় লাল পঙ্কজের। জীবনের সেই প্রথম দিনটিতে প্রতিজ্ঞা করেছিলো সে—খেলাটাই হলো জীবন। মুহূর্তের জন্যেও অনামনস্ক থেকে জীবনের খেলা এবং খেলার জীবনকে বিপর্যস্ত হতে দেবে না কিছুতেই।

সত্যিই অসম্ভব স্থিরপ্রতিজ্ঞ ছেলে পঙ্কজ রায়। উত্তরজীবনে কখনও সে ভুল করেনি খেলতে নেমে। কখনও অনামনস্ক হয়নি খেলার সময়।

ছোট্ট পঙ্কজ কুমারটুলী থেকে এলো 'সিটি টীমে'। শুরু হলো ওর সত্যিকারের ক্রিকেট খেলা। নিয়মিত খেলা শুরু হয় স্পোর্টিং ইউনিয়নে এসে। কল্পনাই করা যায় না একটা চোদ্দ বছরের কিশোর প্রথম শ্রেণীর একটা নামী ও দামী ক্লাবের সেকেন্ড টীমে নিয়মিত খেলছে। বড়ো হওয়ার আকাঙ্ক্ষা ওর মনের মধ্যে তীব্র দীপশিখার মতো জ্বলছিলো। আর তার জন্যেই খেলাকে ধ্যান জ্ঞান করে নিয়মিত কঠোর অনুশীলন করে ঐ অতোটুকু বয়সেও কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখতে শুরু করেছিলো।

প্রথমে পঙ্কজ ছিলো স্পোর্টিং ইউনিয়নের 'এ' ডিভিসনের ফুটবল খেলোয়াড়। 'নিয়মিত ক্রিকেটার' হওয়ার পিছনে একটা ঘটনা আছে।

সেবারে স্পোর্টিং ইউনিয়নের ফুটবল খেলা মহামেডানের সঙ্গে। ঐ ম্যাচে পঙ্কজ ছিলো ফরওয়ার্ডে। একবার সুযোগ পেয়েই বল ঢুকিয়ে দেয় মহামেডানের গোলের মধ্যে। গোলটা দিতেই মহামেডানের তাজ মহম্মদ অকারণে প্রচন্ড ধাক্কা মারে পিছন থেকে। ঘুরে পড়ে যেতেই হাতের কনুই জখম হলো পঙ্কজের। এই জন্যে প্রায় তিন হপ্তার মতো খেলাধুলো সব বন্ধ রাখতে হয়। এই সময়েই পঙ্কজের অনুরাগী পরিচিত বন্ধুরা ওকে বারণ করে ফুটবল খেলতে। '—ক্রিকেট তো তুমি ভালোই খেলছো, ফুটবল ছেড়ে দিয়ে বরং এইদিকে মন দাও।' বন্ধুদের সানুরাগ আবেদন তার মনকে নাড়া দেয়। অবশ্য জখম হবার ভয়টাও কিছু কম ছিলো না। তখন থেকেই পুরোপুরি ক্রিকেটে সমর্পিতপ্রাণ।

ঘটনা ঘটেছিল বলেই বাংলা ক্রিকেটে এরকম এক রত্নের আবির্ভাব ঘটেছিল, ওয়ার্ল্ড রেকর্ড নিয়ে টেস্ট ম্যাচে যার বহু কৃতিত্ব অবিস্মরণীয়।

ওয়ার্ল্ড রেকর্ডের মতো কৃতিত্ব যার আছে তাকে কিন্তু চিরকাল লড়াই করতে হয়েছে ভাগ্যদেবতার সঙ্গে। জীবনের শুরুতেই প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ আসেনি তার। লড়াই করেই তাকে প্রতিষ্ঠা পেতে হয়েছে কেউই তাকে সাহায্য করেনি এগিয়ে এসে। কেউই কখনও 'কোচ' করেনি ওকে খেলার মান বাড়ানোর জন্যে। একমাত্র নীহার মিত্র ছাড়া। খুব ছোট থেকেই নীহারদা ব্যাটিং বোলিং-এ যা একটু সাহায্য করেছেন ওকে। নীহারদার প্রেরণা অনেক সাহায্য করেছে ওকে বড়ো হতে। উনিই হাত ধরে ওকে নিয়ে এসেছিলেন স্পোর্টিং ইউনিয়নে। যদি একটু সুযোগ সুবিধা, আরও ভালো কোচিং পেতো ছেলেটা, তাহলে আরও অনেক অনেক বেশী সুনাম অর্জন করতে পারতো সে। কিন্তু তা হয়নি। যতটুকুই হয়েছে সবই তার নিজের সাধনার ফল।

পঙ্কজের সাধনা যেন একলব্যের মতো। গুরু নেই। অথচ শিখবার আছে অপার বাসনা। তাই মনে মনে গুরু হিসেবে বরণ করে নিয়েছিল বরণীয় ক্রিকেটার বিজয় মার্চেন্টকে। মার্চেন্টের খেলা, তার ব্যাটিং-র কলাকৌশল, বল আয়ত্ত করার অনায়াস স্বাচ্ছন্দ ভঙ্গী দিনের পর দিন লক্ষ্য করেছে গভীর আগ্রহ এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে এবং নিজে নিজে তা' রপ্ত করার চেষ্টা করেছে। শুধু মাত্র খেলা দেখে খেলা শেখার চেষ্টা সত্যিই একেবারে অভাবনীয়, সত্যই প্রশংসনীয়, আর পঙ্কজ নিঃসন্দেহে সত্যিই মহাভারতের অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্যের সার্থক শিষ্য একলব্যের জীবন্ত উদাহরণ।

খেলার মান ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। পনের বছর বয়সে ম্যাট্রিক পাশ করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে খেলা শুরু করে। বিশ্ববিদ্যালয়-এর হয়ে প্রথম খেলা খেলেছিলো আলিগড়ে। সে খেলায় পঙ্কজ যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দেয়।

১৯৪৬ সালে উত্তরপ্রদেশের সঙ্গে প্রথম রণজি ট্রফিতে খেলে পঙ্কজ। প্রথম খেলাতেই একশ'র উপর রাণ তুলে রণজি ট্রফির ইতিহাসে রীতিমতো রেকর্ড—এক নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি। আজও পর্যন্ত বাংলা দলের কেউ রণজি ট্রফির খেলায় পঙ্কজ রায়ের রেকর্ড (সর্বমোট রানের) ভাঙতে পারে নি, ভবিষ্যতে কেউ ভাঙতে পারবে কিনা সন্দেহ।

রণজি ট্রফিতে ইতিহাস সৃষ্টি করার পিছনে আর একটা ইতিহাস আছে।

তখন স্পোর্টিং ইউনিয়নের পঙ্কজ রায়ের নামডাক একটু একটু হতে শুরু করেছে। উত্তরপ্রদেশের সঙ্গে রণজি খেলায় আমি ছিলাম বাংলা দলের অধিনায়ক। সিলেকশন কমিটির মিটিং হচ্ছে কলকাতায়। মিটিংয়ে দশজন খেলোয়াড়ের নাম ঠিক হয়ে গেছে। কিন্তু মুশকিল বাধলো শেষজনকে ঠিক করতে গিয়ে। আমাদের সামনে দুটো নাম আছে—পঙ্কজের আর বাবলুর (এ কে দাস)। কমিটি ক্যাপ্টেন ছিলাম বলে আমার উপরই ভার পড়লো এই দুজনের মধ্যে একজনকে বেছে নেওয়ার। মনস্থির করতে পারলুম না হঠাৎ। সত্যি বলতে কি আমি কিন্তু তখন দুজনের কারও খেলা তেমন দেখিনি। তবুও আমি শেষ মুহূর্তে পঙ্কজকেই দলে

নিলাম। কেননা, আমি ভেবেছিলাম ছেলেটা হাজার হোক ফুটবল তো খেলে, এর কাছ থেকে ব্যাটিং বোলিং যদি নাও পাই, ফিল্ডিংটা তো পাবো। আমার আশা কিন্তু ব্যর্থ হয়নি। পঙ্কজ দলের মান বাড়াতে পেরেছিলো সেদিন।

খেলা আরম্ভ হওয়ার আগে ওকে নিয়ে আমার চিন্তা কম ছিলো না। যদিও 'ওপেনার' হিসেবে ওকে নামানোর কথা ছিলো তবুও আমি ভরসা পাচ্ছিলাম না। নতুন ছেলে, কি জানি ভয়ে বা অনভিজ্ঞতায় বেসামাল কিছু যদি করে ফেলে। কিন্তু পঙ্কজের সঙ্গে আলাপ করে আমার সমস্ত দ্বিধা কেটে গিয়েছিলো। প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস, প্রচণ্ড সাহস দেখেছিলাম ছেলেটার মধ্যে। আমার অভিজ্ঞতা যেন আমায় এই আশ্বাসই দিয়েছিল যে এই মনোভাবের ছেলেরা কখনই ব্যর্থ হয় না। সত্যিই তাই জীবনের প্রথম রঞ্জি খেলায় ব্যর্থ হয়নি পঙ্কজ।

শুধু আত্মবিশ্বাস বা সাহস নয়, তার মধ্যে দেখেছিলাম অসামান্য কষ্টসহিষ্ণুতা। খেলার জন্যে এতো কষ্ট স্বীকার কম খেলোয়াড়ের মধ্যে দেখা যায়।

ক্রিকেটকে আয়ত্ত করার জন্যে খুব ছোট বেলা থেকেই সে প্রচণ্ড পরিশ্রম করতো। একথা সবাই জানে পঙ্কজ রীতিমতো অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে। কায়িক পরিশ্রম কখনই তাদের করতে হয়নি, তবুও অনুশীলনের জন্যে যে পরিশ্রম তার সামনে কখনও সে মাথা নোয়ায় নি।

রোজ খুব ভোরবেলায় গাড়ী নিয়ে সে চলে যেতো ময়দানে। পঁয়তাল্লিশ মিনিট থেকে এক ঘণ্টা দৌড়ুতো সেখানে। তারপর ফিরে এসে বাড়ীতে কিছুক্ষণ 'স্যাডো' করতো। ব্যাট করতো রোজ দুপুরবেলা এক থেকে দেড় ঘণ্টা পর্যন্ত। এই অনুশীলনে কোনদিনই ব্যতিক্রম দেখা যায়নি তার জীবনে।

কষ্টস্বীকারের কথাপ্রসঙ্গে পঙ্কজ পুণে ট্রায়াল ক্যাম্পের কথা প্রায়ই বলতো। কি অমানুষিক কষ্টস্বীকার করতে হয়েছে ঐ ক্যাম্পে।

এম-সি-সি'র বিরুদ্ধে ভারতীয় দলকে শক্তিশালী করে গড়ে তুলবার জন্যে এই ট্রায়াল ক্যাম্প। বাংলা থেকে পাঁচজন যোগ দিয়েছিলো—পঙ্কজ, খোকন সেন, পুটুদা, প্রেমাংশু আর মণ্টু ব্যানার্জি।

সকালে উঠে পুণায় রাস্তায় দৌড়ুতে হতো সবাইকে। তিন মাইলেরও বেশী। দৌড় শেষ হলে শুরু হতো দৈহিক ট্রেনিং বা শারীরিক ব্যায়াম। এ স্কুলের ড্রিলমাস্টারের পি-টি নয়, সেনাবাহিনীতে যে কঠোর পদ্ধতি ট্রেনিং দেওয়া হয় তারই কারবন কপি আর কি। ভারী ভারী বস্তা নিয়ে দৌড়ুতে হতো এক এক সময়। তার মেয়াদ প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট। তারপর প্রাতঃরাশের ছুটি। সকাল নটা বাজলেই আবার মাঠে—এবার ফিল্ডিং-র অনুশীলন। বারোটা অবধি কেবলমাত্র এই অনুশীলনই চলতো।

এরপরে মধ্যাহ্নভোজের বিরতি। তিনটে বাজার সঙ্গে সঙ্গে সবাইকে হাজির হতে হতো মাঠে। তিনটে থেকে ছটা পর্যন্ত চলতো ব্যাটিং আর বোলিং-র প্র্যাকটিশ। এই সময়ে প্রত্যেককে পনের মিনিট করে ব্যাট করতে হতো আর বল করতে হতো তিনজন করে ব্যাটসম্যানের বিরুদ্ধে অর্থাৎ পঁয়তাল্লিশ মিনিট।

আপশোস হয়, আজকের দিনে এই প্রচেষ্টা কই! অথচ তখন দলকে শক্তিশালী করার জন্যে হাজারে, মার্চেণ্ট, মুস্তাক আলীর মতো শ্রেষ্ঠ ক্রিকেটারও কি হাড়ভাঙা খাটুনিই না খেটেছেন।

পঙ্কজের মনে কিন্তু দারুণ একটা ক্ষোভ আছে।

নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে মাদ্রাজ টেস্টে পঙ্কজ আর মানকড় মিলিয়ে বিশ্ব রেকর্ড করেছিলো কোতটা সে সম্বন্ধেই। আস্তে আস্তে রান তুলছিলো ওরা। দেখেশুনে হিসেব করে বল মারছিলো দুজন। সেঞ্চুরী অনেকক্ষণ হয়ে গেছে। পঙ্কজের মনে তখন দারুণ আশা সে ডবল সেঞ্চুরী করবে। উইকেট ওদের পক্ষেই আছে, আর একটা সেঞ্চুরী করা এমনকি আর শক্ত

কাজ! কিন্তু ভাগ্য চিরকাল ওর বিরোধিতা করেছে। একদল ব্যাটের ধরে রান যখন তখন দলের ক্যাপ্টেন উমরিগড়ের কাছ থেকে একটা চিরকুট এলো ওদের কাছে—'হিট এণ্ডার রন।' দলের শৃঙ্খলা রাখতে গেলে অধিনায়কের নির্দেশ মানতে হয়, আর সেই মানাটাই কাল হ'লো। ১৭২ রানের মাথায় লং অফে ক্যাচ দিয়ে ফিরে এলো পঙ্কজ। মানকড় কিন্তু অগ্রাহ্য করেছিলেন উমরিগড়ের নির্দেশ। উনি ঐ খেলায় ডাবল সেঞ্চুরী করলেন। আর উমরিগড়? পঙ্কজের ঠিক পরে নেমে আশী মিনিট উইকেটে থেকে রান তুললেন মাত্র দশ। তাহ'লে ডাবল সেঞ্চুরী করার কৃতিত্ব থেকে পঙ্কজকে বঞ্চিত করলো কে? ভাগ্যদেবতা না অন্য কেউ?

আগেই বলেছি খেলার ব্যাপারে কেউই তাকে সাহায্য করেনি বরং বঞ্চনাই করেছে, তার প্রাপ্যটুকুও দেয়নি। নইলে ভারতীয় দল থেকে তাকে যখন বাদ দেওয়া হয়, তখন তার জৌলুষ মধ্যাহ্ন সূর্যের মতো। ওয়ার্ল্ড রেকর্ড, পর পর কয়েকটি সেঞ্চুরী, মুস্তাকার উমরিগড়ের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে ভালো ব্যাটিং এ্যাভারেজ থাকা সত্ত্বেও বিশ্বের একজন শ্রেষ্ঠ ওপেনারকে বাদ দিয়ে দেওয়া হলো ভারতীয় দল থেকে। পঙ্কজ অক্ষম হয়ে পড়েনি, স্থিমিত হয়ে আসেনি ওর ক্রীড়ানৈপুণ্য। দলের অন্যদের তুলনায় তখনও যে দক্ষ ও কুশলী তাকে বাদ দেওয়ার কারণ কি। সত্যি বলতে কি এ জিনিসটা আজও বাংলাদেশের ক্রীড়া-রসিকদের মনে রহস্যই হয়ে আছে।

ইদানীং চোখে কম দেখতে শুরু করেছিলো পঙ্কজ। চশমা নিতে ভয়, কি জানি যদি বল এসে চোখে লাগে তবে চোখটা তো চিরদিনের মতো যাবে। এই ভয়েই বিনা-চশমায় খেলতো সে প্রথম প্রথম। ওর এক বন্ধু ছিলো চোখের ডাক্তার। চক্ষু-চিকিৎসক বন্ধুই সাহস দিতে চশমা নেয়। পাওয়ার মাইনাস এক।

চশমা নেওয়ার আগে ও পরে চোখ সম্বন্ধে নানা কথা শুনে পাগল হয়ে যাওয়ার জোগাড়। শুভার্থীরে বারবার একই কথা কানের কাছে বলতে থাকলে শুধু বিরক্তিই নয়—নার্ভও কমজোরী হতে বাধ্য আর তখনই ভয় আতঙ্ক মনের মধ্যে স্থায়ীভাবে বাসা বাঁধার সুযোগও করে নেয়। পরিচিত বন্ধু-বান্ধবরা রাতদিনই বলতে থাকে—এবার তোমার খেলা ছেড়ে দিতে হবে, চশমা নিয়ে ক্রিকেট খেলা যায় না ইত্যাদি ইত্যাদি। তবু পঙ্কজ ভয় পায়নি, নার্ভ শক্ত করে রাখার দরুণ পঙ্কজ এগুলো অতি সহজেই কাটিয়ে উঠতে পেরেছিলো। জীবনে একবারই কেবল দুঃখে পড়েছিলো, যখন নিউজিল্যাণ্ডের সঙ্গে খেলার দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচ-এ তাকে বাদ দেওয়া হলো। দৃষ্টিশক্তিতে যে সামান্য ত্রুটি ছিলো সেটা স্মরণ হতেই চোকশ হয়ে ওঠে পঙ্কজ।

পঙ্কজের সবচেয়ে বড়ো গুণ উচ্চাশা আত্মবিশ্বাস আর সাহস।

তার উচ্চাশা ছিলো আকাশছোঁয়া। আর এটা থাকা দরকার। নইলে কেউই বড়ো হতে পারে না। পঙ্কজ আমায় প্রায়ই বলতো—'কমলদা, আমি হাফ, সত্তর, আশী, নব্বই করলে একটুও তৃপ্তি পাই না। যতক্ষণ না সেঞ্চুরী করছি ততক্ষণ আত্মতৃপ্তি আসে না।' এটা কিন্তু তার জীবনে বহুবার আমি দেখেছি। অল্প রান করে মাঠ থেকে বিদায় নিলে তাকে কেমন ম্লান হয়ে যেতে দেখেছি বহুবার।

পঙ্কজের আত্মবিশ্বাস আর সাহস প্রশংসনীয়। বাঘা বোলারের বলের সামনে অনেক ব্যাটসম্যানই সাহস হারিয়ে ফেলেন। শূন্য, দুই এক রান করে প্যাভিলিয়নে ফিরে আসেন তাঁরা দৃঢ় মনোবলের অভাবে। এ ব্যাপারে পঙ্কজ ছিলো ঠিক উল্টো। কুশলতার জোরে অনেক বোলার তাকে প্রথম দর্শনে পরাস্ত করতে পেরেছে বটে, কিন্তু আপাত হার স্বীকার করলেও তার মনোবলে ঘুন ধরেনি। সাহস হারায়নি। বরং পরে ঐ বোলারের বোলিং পদ্ধতি, বল দেওয়ার কায়দাকানুন অত্যন্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে খুঁটিয়ে দেখে আবিষ্কার করেছে বোলারের দুর্বলতা। আর তারই সুযোগ নিয়ে তার পরের খেলাগুলোতে কাবু করে দিয়েছে, সেই বোলারকে। যে সব খেলায় গোড়ার দিকে পঙ্কজ সুবিধে করে উঠতে পারেনি, শেষের দিকে সেই সব খেলায় যথেষ্ট পারদর্শিতা দেখিয়েছে। একাধিকবার তার প্রমাণ সে রেখেছে অকাতরে। অসাধ্য সাধন করতে গেলে চাই ধৈর্য, আর পঙ্কজ ছিলো অসীম ধৈর্যশালী খেলোয়াড়। এই সমস্ত গুণটা ছিলো স্যর জিওনর হব্‌সের মাঠের খেলার কলাকৌশল ব্যক্তিগতভাবে পঙ্কজ রায়কে সবচেয়ে বেশী মুগ্ধ করেছে।

একটা কথা প্রায়ই বলতো—কোন বল শরীরে প্রচণ্ড আঘাত করলে বোলারকে আমি বুঝতে দিতে চাই না যে আমার লেগেছে। আমি কখনই আহত জায়গায় হাত দিতুম না। আমি জানি বোলার যদি একবার বুঝতে পারে তার বলে ব্যাটসম্যান কাবু হয়ে পড়েছে, তবে তার আত্মবিশ্বাস যায় বেড়ে। উল্টোটা হলে যেমনি মনোবল হারিয়ে ফেলে বোলাররা। আর ঠিক সেই-জন্যেই আমি বুঝিয়ে দিতে চাইতুম—'ওহে, বোলার, তোমার বলে আমার কিছুই হবে না।'

পঙ্কজের এ কথাটা অত্যন্ত সত্যি। উইকেটে দাঁড়িয়ে ব্যাটসম্যানের সবচেয়ে বড়ো কর্তব্য হলো নিজের আত্মবিশ্বাস আর মনোবলকে অটুট রাখা।

পঙ্কজের অভিমত হলো ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের এই দুটি গুণকে আন্তরিকভাবে আয়ত্ত করা দরকার। কেন না, ভারতে তেমন ফাস্ট বোলার নেই। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, অস্ট্রেলিয়ার তুলনায় এখানকার ফাস্ট বোলারদের বলে স্পীড অনেক কম। আর বেশী স্পীডের জন্যে ব্যাটসম্যানরা আহত যেমন হয়, তেমনি হার স্বীকার করে অতি সহজে। সেজন্য আত্মবিশ্বাস-এ অটল থেকে সাহসী মনোভাবকে পুঁজি করে দৃঢ় থাকলে অনেক বেশী লাভবান হবেন ব্যাটসম্যানেরা।

পঙ্কজ আজ সারা ভারতবর্ষের পি রায়। বিদেশের সঙ্গে খেলায় বহুবার কৃতিত্বের সঙ্গে ভারতের মুখ উজ্জ্বল করেছে। সেই দিক থেকে আমরা সবচেয়ে বেশী গর্বিত, কেননা, সে আমাদের বাংলাদেশের ছেলে। বাংলা ক্রিকেটকে উন্নতির শিখরে তুলতে তার অবদান কোনদিনও ভুলবার নয়। খেলার প্রতি একনিষ্ঠ ভালোবাসা, খেলাগুলোকে সার্থকভাবে রূপায়িত করায় তার যে ভূমিকা তা আজকের কোন ক্রিকেট ক্রীড়া-রসিক ভুলতে পারেন না।

বাংলা ক্রিকেটের এই জ্যোতিষ্কের সদানন্দময় ব্যবহার, অসীম ধৈর্য যে কোন পরিস্থিতিতে নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতাকে আজকের তরুণদের নিশ্চয় বরণ করা উচিত। বিসর্জন দেওয়া উচিত সে যেমন বিসর্জন দিয়েছিলো তার মনের অহং ভাবকে। সম্মান করা উচিত সে যেমন করতো প্রবীণদের। তবেই তো তার মতো জনপ্রিয় হয়ে উঠবে সবাই। আর একথা অনস্বীকার্য, জনপ্রিয়তা খেলার মান বাড়ানোর পক্ষে যথেষ্ট প্রয়োজন। ওটা টনিকের মতো কাজ করে।

সাধনার জোরে পঙ্কজ রায় বিশ্ব ক্রিকেটে স্থান পেয়েছেন। তার জীবন থেকে বড়ো হওয়ার যে গুণ আমরা পেতে পারি, তা হলো প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস, আন্তরিকতা, অসীম সাহস, অপার উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং স্বীয় সাধনায় ও লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্যে অত্যন্ত অনুরক্তি, নিরলস প্রচেষ্টা, আর অপরসীম কষ্টসহিষ্ণুতা। এই সং গুণগুলিই উজ্জ্বল ঘটিয়েছে পঙ্কজ রায়ের কুমারটুলী পার্ক থেকে হাজির করেছে, বিশ্বক্রীড়াঙ্গনে অবিস্মরণীয় অভিধায় মণ্ডিত করেছে।

বহুরূপী
বিশ্বরূপার রাস্তার সার্কুলার
রোডের মোড়ে (৫৫-৬৮৪৬)

নান্দীকার
২৬শে শনিবার ৬টায়
২৭শে রবিবার ২।। ও ৬টায়
তিন পয়সার পালা
৩১শে ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার ৬টায়
মঞ্জরী আমের মঞ্জরী
১লা জানুয়ারী শুক্রবার ২।।টে ও ৬টায়
শের আফগান
নির্দেশনা : অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

হিরো

দিলীপ দত্ত

আর্থার মেইলী ছিলেন অস্ট্রেলিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ন্যাটা স্পিন বোলার। তখন তিনি ক্রিকেট জীবনের প্রারম্ভে। এই সময় বিশ্ববিখ্যাত ভিক্টর ট্রাম্পারের বিরুদ্ধে খেলার সুযোগ পেলেন। ট্রাম্পার তখন বিশ্বশ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যান, তাছাড়া তিনি মেইলীর 'হিরো'। ট্রাম্পারের বিরুদ্ধে বল করার সুযোগ মেইলীর কাছে হাতে স্বর্গ পাওয়ার মতন।

মেইলী এই অভাবিত সৌভাগ্যের কথা বিশ্বাসই করতে পারছিলেন না। ভাবতে লাগলেন, এ কখনই হতে পারে না, খেলার দিনের আগে হয়ত যুদ্ধ লেগে যাবে, হয়ত ভূমিকম্প হবে, কত লক্ষ ঘটনা ঘটতে পারে কে জানে।

দেওয়ালে ট্রাম্পারের একটি ছবি টাঙানো ছিল। মেইলী বিছানায় শুয়ে তারই দিকে চেয়ে ছিলেন। বিশ্বাসই করতে পারছিলেন না যে, এই বিশ্ববিখ্যাত ব্যাটসম্যানটি তাঁরই সামনে উইকেটে এসে আম্পায়ারের কাছে গার্ড নেবেন 'টু লেগস প্লিজ, আম্পায়ার।'

এই খেলার ব্যাপারটি মেইলীর বাড়ীতেও সাড়া জাগিয়েছিল। মেইলীর বাবা বললেন, 'শনিবার ট্রাম্পারের বিরুদ্ধে খেলবে, যদি তোমায় বল করতে দেয় তাহলে মরেছ।'

মা বললেন, 'ওরকম কেন বলছ, কি হবে কেউ কি বলতে পারে।'

মেইলী কিছুই বলেননি। খেলার মাঠে কি হবে সে কথা তাঁর চিন্তার বাইরে। তিনি কেবল ভাবছেন, যদি ট্রাম্পারের কিছু হয়, যদি তিনি সেই ম্যাচে খেলতে না পারেন।

মেইলী তখনও পর্যন্ত ট্রাম্পারের খেলা দেখেননি। মাঝে মাঝে সিডনি ক্রিকেট ক্লাবের প্যাভিলিয়নের গেটের সামনে দাঁড়িয়ে থেকে তাঁর 'হিরো'কে বেরিয়ে যেতে দেখেছেন। একবার ট্রামে ট্রাম্পারের পাশে বসে কিছুটা রাস্তা গিয়েছিলেন, আরও কিছুটা যাবার ইচ্ছে ছিল কিন্তু পকেটে টিকিট কাটার পয়সা ছিল না। কন্ডাক্টর যদি কান ধরে নামিয়ে দেয়, তাই তাড়াতাড়ি নেমে পড়তে হয়েছিল।

মেইলী লিখেছেন যে, তিনি স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি কোনদিন ট্রাম্পারের সঙ্গে কথা বলবেন, খেলার কথা ত ছেড়েই দিন। তাই ট্রাম্পারের বিরুদ্ধে খেলার দলে নির্বাচিত হবার পর থেকে খেলার দিন পর্যন্ত আমি আধপাগল হয়ে গিয়েছিলাম।'

তাঁর প্রথম টেস্ট ম্যাচ পর্যন্ত মেইলী নিজেই খেলার প্যান্ট এবং সার্ট ইস্ত্রি করতেন। কিন্তু সেই খেলার আগের দিন তিনি যে কতবার জামা প্যান্ট ইস্ত্রি করেছেন তার কোন ইয়ত্তা নেই। খেলার দিন এল। সকালে ঘুম ভেঙেই তাড়াতাড়ি জানলা দিয়ে দেখলেন বৃষ্টি পড়ছে কিনা। না, বেশ সুন্দর সকাল, রোদ উঠেছে। কিন্তু কে জানে খেলা আরম্ভ হবার আগে হয়ত বৃষ্টি এসে যাবে, ট্রাম্পারের হয়ত অসুখ করে যাবে, কিংবা যদি কোন এ্যাকসিডেন্ট হয়, ট্রামের সঙ্গে ধাক্কা লাগে যদি সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে পা মচকে যায়।

মেইলীর চিন্তায় বাধা পড়ল দরজায় ঘন ঘন কড়া নাড়ায়। দুধওয়ালা দুধ দিতে এসেছে। 'মরুকগে, দুধ ফেলে দিক, আমি এখন আর এ জগতে নেই, আমি ট্রাম্পারের বিরুদ্ধে খেলছি, দুধ তুমি দাও আর না দাও আমার বয়ে গেছে।' মেইলী ঘড়ির দিকে তাকালেন। ঘড়িটা স্লো নেইত, বন্ধ হয়ে যায়নি।... ভাবতে লাগলেন, হয়ত তিনি ট্রাম্পারকে বল করতেই পারবেন না, তার আগেই যদি আউট হয়ে যান। কিংবা যদি তাকে বলই করতে দেওয়া না হয় 'আমি ত আর ক্যাপটেনের কাছ থেকে বল চেয়ে নিয়ে বল করতে আরম্ভ করে দিতে পারি না।' আচ্ছা ট্রাম্পার এখন কি করছে, তিনি কি জানেন আমি আজ খেলছি, দূর আমার কথা জানেনই না উনি। উনি বোধ হয় এখন প্রাতরাশ শেষ করছেন... উঃ সকালটা কি বড়, শেষ হতে আর চায় না। যাই বাগানটা কুপিয়ে দুটো গাছ পুঁতে আসি... আসি... না না ক্লান্ত হয়ে পড়ব, বরং একটু শুয়ে বিশ্রাম নিই... বা বা যদি ঘুমিয়ে পড়ি...দূর ছাই।'

মেইলী অস্বাচ্ছন্দ্যভাবে সকালটা কাটালেন। অবশ্য ঠিক সময়ে মাঠে পৌঁছলেন। অধিনায়ক হ্যারি গভার্ডকে জিজ্ঞেস করলেন, 'উনি এসেছেন?'

'কে উনি' গভার্ড বিরক্তভাবে উত্তর দিলেন। মেইলীর ইচ্ছে হয়েছিল ব...ন ...,

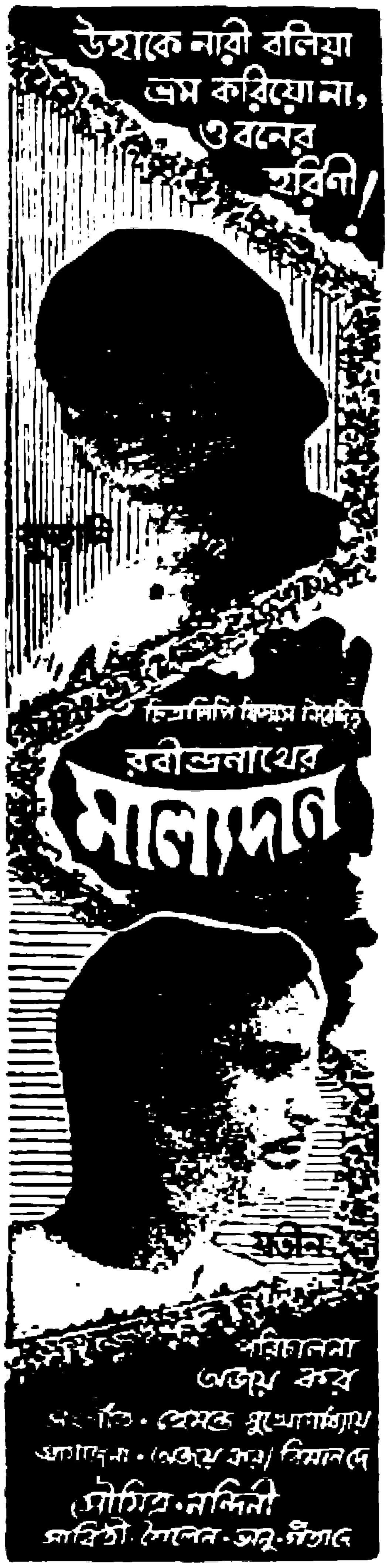

মুক্তি আসন্ন!

বিশ্ব পরিবেশনা:
চিত্রলিপি ফিল্মস্

১৫ চিত্তরঞ্জন এভিনিউ.
কলিকাতা-১৩

জ্যাদিরাস সাঁতার আবার কে, কিন্তু কি ভেবে চুপ করে গেলেন।

ভিকটর ট্রাম্পারের দল টস জিতে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নিলেন। ট্রাম্পার ব্যাট করতে নামতেই অধিনায়ক গডার্ড মেইলীকে বললেন, 'তোমাকে এখন বল করতে দেব না, তাহলে তোমার বলে এমন মার মারবে যাতে তুমি গ্রেড ক্রিকেটে খেলার সুযোগই পাবে না।'

মেইলী মনে মনে ভাবলেন কথাটা হয়ত ঠিক। কিন্তু মারের ভয়ে ট্রাম্পারকে বল করার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হবেন। জয় চাই না, কিন্তু নায়কের সঙ্গে একই মাঠে অভিনয়ের সুযোগ হারাব।'

কিন্তু গডার্ড ... মত পরিবর্তন করলেন, কিছুক্ষণের মধ্যেই মেইলীকে বল করতে দিলেন।

মেইলীর প্রথম বলটা কি হয়েছিল তা তাঁর মনে নেই। তখন তাঁর মাথা ঘুরছিল, সব কিছু যেন ঝাপসা, হঠাৎ প্রচণ্ড হাত-তালিতে তাঁর ঘোর কাটল। হয়ত বলটাতে ওভার বাউণ্ডারী হয়েছিল।

দ্বিতীয় বলটি মনে আছে। সেটা ছিল লেগ ব্রেক। তাঁর হাত থেকে বেরোবার পর থেকে লাট্টুর মত ঘুরতে ঘুরতে নিখুঁত লেংথের দিকে এগিয়ে গেল। প্রচণ্ড স্পিন থাকার দরুন বলটি বাতাসে অফস্টাম্প থেকে মিডল ও লেগস্টাম্পের দিকে ঘুরে গেল। অন্য কোন ব্যাটসম্যান হলে মেইলী আর ফিরেও তাকাতেন না স্টাম্প লাগার আওয়াজ শোনার জন্য অপেক্ষা করতেন, কিন্তু হিরোর প্রতি শ্রদ্ধায় তিনি তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপ লক্ষ্য করতে লাগলেন।

ট্রাম্পার ধীরচিত্তে বলটিকে দেখে নিলেন, তারপর বাঁ পা বাড়ালেন বলটি যেখানে মাটিতে পড়ছে তার কাছে, ব্যাট উঠল কাঁধের পিছনে। বিদ্যুতের মত নেমে এল, বল মাটিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাটে-বলে সংযোগ হল, তারপর শুধু একটি শব্দ কানে এল, বলটি বাউণ্ডারী লাইনের বেড়ায় লাগার আওয়াজ।

'এত সুন্দর সট আমি আর দেখিনি' মেইলী মন্তব্য করেছিলেন।

মাঠের মধ্যে শুধু একজন এই সটটির গতিপথ লক্ষ্য করেননি, তিনি হলেন ভিকটর ট্রাম্পার। সটটি মারার পরই তিনি পেছন ফিরে হেঁট হয়ে ব্যাট দিয়ে পীচ ঠুকতে লাগলেন। তিনি জানতেন বলটি কোথায় যাবে।

মেইলীর মনে পড়ল, ট্রাম্পার বাগান-কোরেটের গুগলী বলে একটু অস্বস্তি বোধ করেছিলেন। মেইলীর ভাগ্য ছিল সুপ্রসন্ন। পরের বলটি দিলেন গুগলী। লেগব্রেকের মত বাতাসে ঘুরে যাওয়া এবং মাটিতে পড়ার পর গতি পরিবর্তন করার পক্ষে বলটিতে স্পিন ছিল যথেষ্ট। কেবল ছিল একটু বেশী টপস্পিন। সব জানা অন্য বলের চেয়ে আগে এবং হঠাৎ পড়বে মাটিতে এক গতিতে অন্য কোন বল যেখানে মাটিতে পড়ে টপস্পিন থাকলে পড়বে অন্তত তার চেয়ে আঠারো ইঞ্চি আগে।

ট্রাম্পার বলটি ঠিক বুঝতে পারেননি। আগেকার মতই ক্রিজ ছেড়ে এগিয়ে এসে-ছিলেন, কিন্তু বলটি তাঁর আন্দাজ মত যে জায়গায় পড়া উচিত ছিল সে জায়গায় না পড়ায় তাঁর বাঁ পা'টি রইল বলের এক ফুট দূরে।

ট্রাম্পার ভুল বুঝতে পেরে সামলে নেবার চেষ্টা করেছিলেন ব্যাটটি আরও জোরে চালিয়ে কিন্তু ব্যাটে-বলে সংযোগ হয়নি। অল্পের জন্য লেগস্টাম্প স্পর্শ না করে বলটি চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে উইকেটরক্ষক স্টাম্প করলেন। ট্রাম্পার তখন ক্রিজ থেকে দু গজ দূরে। তিনি ক্রিজে ফিরে আসার কোন চেষ্টাই করেননি। সেটা তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ।

ট্রাম্পার উইকেট ছেড়ে যাবার সময় মেইলীর দিকে চেয়ে বললেন, 'খুব ভাল বল আমার পক্ষে খেলা সম্ভব নয়।'

আর মেইলীর মনে জয়ের উল্লাস নেই। মনে হল তিনি যেন খুব প্রিয় জিনিসকে নিজের হাতেই ভেঙে ফেলেছেন।

রাশিয়ায় দাবা খেলা

যুগ পরিবর্তনের প্রতীক্ষা

গজানন্দ বোড়ে

রাশিয়ানদের দাবা খেলায় দক্ষতা কি কমছে? ১৯৭০ সালের দুটি শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগিতা—(ক) রাশিয়া বনাম অবশিষ্ট বিশ্বদল এবং (খ) ঊনবিংশ দাবা অলিম্পিয়াডের ফলাফলের ভিত্তিতে এমনটা মনে হওয়া স্বাভাবিক। দাবার হাওয়া কি আবার পূর্ব থেকে পশ্চিমে বইতে শুরু করেছে? অন্তত বলা যায়, যে সন্দেহ আজ আমাদের মনকে দোলায়িত করছে, সেই সন্দেহ আজ রাশিয়ার প্রত্যেক গ্র্যান্ডমাস্টারকেই ভাবিয়ে তুলেছে।

যেমন, কয়েক বছর ধরেই রাশিয়ার পত্র-পত্রিকায় এই নিয়ে সোরগোল হচ্ছে যে, বর্তমান বিশ্বচ্যাম্পিয়ন বোরিস স্পাসকিই গত চোদ্দ-পনেরো বছর ধরে তাদের কনিষ্ঠতম গ্র্যান্ডমাস্টার হয়ে আছেন। অর্থাৎ কিনা বর্তমানে রাশিয়ায় স্পাসকির চেয়ে কম বয়সের গ্র্যান্ডমাস্টার আর কেউ নেই। এই সংবাদ যদি সত্য হয়—চাঞ্চল্যকর সন্দেহ নেই। কারণ এত দিনে বোধহয় রাশিয়ার নতুন দাবা-প্রতিভার ঘাটতি পড়তে শুরু করেছে। ওদেশের দাবার জগতে 'জেনারেশন গ্যাপ' আর বোধহয় ঘোচান গেল না।

রাশিয়া বনাম অবশিষ্ট বিশ্বদল

এর পরিপ্রেক্ষিতে আমরা ৭০ সালের পূর্বোক্ত দুটি প্রতিযোগিতা নিয়ে কিঞ্চিৎ পর্যালোচনা করব। সকলেই জানেন, এ বছর ২৯শে মার্চ থেকে ৫ এপ্রিল পর্যন্ত বেলগ্রেডে এক তুলনাহীন দাবার আসর বসেছিল। এক পক্ষে ছিল সোভিয়েত রাশিয়া এবং অন্য দিকে বাছাই-করা খেলোয়াড় নিয়ে অবশিষ্ট বিশ্বদল। 'শতাব্দীর সেরা ম্যাচ' হিসেবে চিহ্নিত এই প্রতিযোগিতায় প্রতি পক্ষে দশজন করে খেলোয়াড় দশটি বোর্ডে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। প্রতিটি বোর্ডে মোট ৪টি করে গেম খেলা হয়। পৃথিবীর সেরা-সেরা গ্র্যান্ডমাস্টাররা — দু-তিনজনকে বাদ দিলে— সোভিয়েত রাশিয়াতেই রয়ে গেছেন, একথা মনে রাখলে ভাবতে অবাক লাগে যে, এই খেলায় দুর্ধর্ষ রাশিয়ান দল মাত্র ১ পয়েন্টের ব্যবধানে জয়লাভ করেছে। [দাবা খেলায় প্রতি জয়ের জন্যে ১, ড্র'র জন্যে ½ এবং পরাজয়ের জন্যে ০ ধরা হয়।] মোট ৪০ পয়েন্টের মধ্যে রাশিয়ার সংগ্রহ ২০½ পয়েন্ট, অবশিষ্ট দলের ১৯½। প্রকৃতপক্ষে রাশিয়ান দলের জয়লাভ মাত্র ½ পয়েন্টের জন্যে, কারণ তারা আর ½ পয়েন্ট কম পেলেই খেলার ফলাফল হত অমীমাংসিত। দাবার জগতে বর্তমান কালের প্রায় সবকটি শ্রেষ্ঠ নামই রাশিয়ান পক্ষ সমর্থন করেছে, পক্ষান্তরে অবশিষ্ট দলের ববি ফিশার এবং বেন্ট লারসেনকে বাদ দিলে আর কেউই এখন সেরকম জগৎজোড়া খ্যাতির অধিকারী নন।

তাছাড়া, প্রথম ৪টি বোর্ডের ফলাফল দেখুন। এই চারটি বোর্ডে বর্তমান রাশিয়ার প্রথম ৪ জন খেলোয়াড় অংশ গ্রহণ করেছেন [মাত্র ১টি গেমে স্পাসকির জায়গায় খেলেন লিওনিদ স্টীন]। এই ৪টি বোর্ডের ফলাফলে রাশিয়া হেরেছে অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে, পরিষ্কার ৫ পয়েন্টের ব্যবধানে। রাশিয়ার পক্ষে স্পাসকি (স্টীন), পেত্রোসিয়ান, কর্চনয় এবং পোলুগায়েভস্কী অর্জন করেছেন মাত্র ৫½ পয়েন্ট, অপর দিকে বিশ্বদলের পক্ষে লারসেন, ফিশার,

আনাতোলি কারপভ

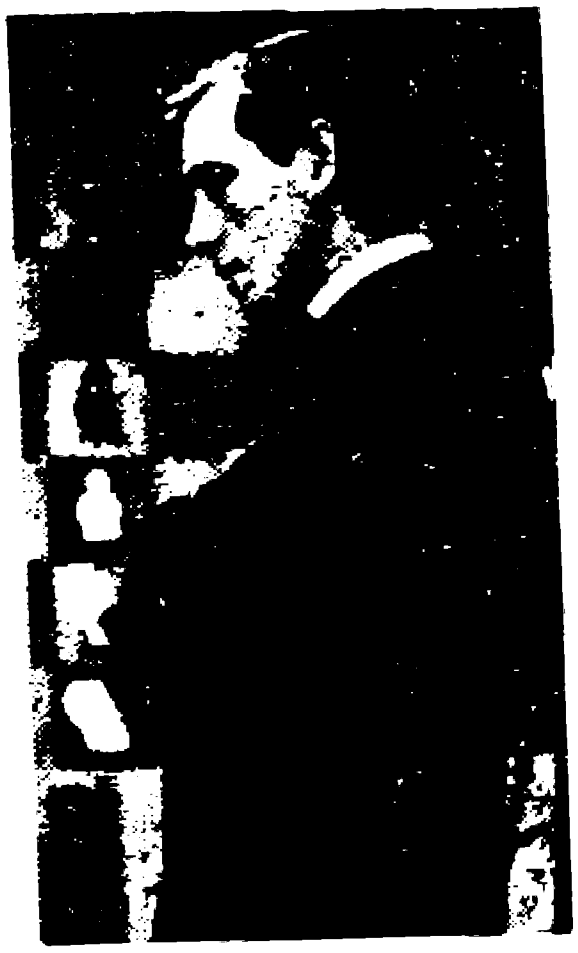

য়ুরী বালাশভ

পোর্টিশ এবং হোর্ট সংগ্রহ করেছেন ১০½ পয়েন্ট। একমাত্র ১০ম বোর্ডের ৩-১ ফলাফলেই রাশিয়া খেলাটিকে নিজেদের অনুকূলে নিয়ে যেতে পেরেছে। এই বোর্ডে রাশিয়ানদের পক্ষে খেলেছেন সর্বকালের একজন শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় পল কেরেস, যিনি অত্যন্ত সম্প্রতি দাবা খেলা থেকে অবসর নিয়েছেন। তাঁর বিপক্ষে খেলেছিলেন একজন খ্যাতিহীন গ্র্যান্ডমাস্টার—যুগোশ্লাভ ইভকভ। শেষ বোর্ডের খেলা ২-২ পয়েন্টে অমীমাংসিত থাকলেই রাশিয়ার পরাজয় ঘটে যেত।

রাশিয়ার বিপক্ষে সারা পৃথিবী একত্রিত হয়ে খেলেছে, এই যুক্তি দিয়ে রাশিয়ার আপেক্ষিক অসাফল্যের সাফাই গাওয়া যায় না। অন্যান্য দেশের তুলনায় রাশিয়া দাবা খেলায় বহুবর্ষ অগ্রসর—এটা যাঁরা জানেন তাঁদের কাছে এই সম্মিলিত বিশ্বদল যুক্তি অসার। ব্যক্তিগতভাবে অনেক খেলোয়াড় এবং দেশ হিসেবে পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলি দাবার চর্চায় অনেক দূর এগিয়ে গেছেন এটা গত কয়েক বছর ধরেই লক্ষ্য করছি। তবুই ফলশ্রুতি হিসেবে দেখা গেল শতাব্দীর সেরা ম্যাচে রাশিয়া সত্যিকারের প্রতিভা অর্জন করতে পারে নি। এর একমাত্র কারণ রাশিয়ায় সত্যিকারের তরুণ প্রতিভার অভাব। আমরা জানি, বর্তমান রাশিয়ায় ৪০ লক্ষেরও বেশী রেজিস্টার্ড দাবা খেলোয়াড় প্রতিনিয়ত এই খেলার নিয়মিত অনুশীলন করে চলেছেন। রাশিয়ান খেলোয়াড়রা বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম খেলোয়াড়দের সঙ্গে অনুশীলনের সুযোগ পান, যে সুযোগ অন্য দেশে নেই।

CENTRAL LIBRARY

রাশিয়ান দলে একজনও তরুণ খেলোয়াড় ছিলেন না। দল গঠনের জন্যে ডাক দিতে হয়েছিল—স্পাস্কিকে বাদ দিলে—আরো চারজন প্রাক্তন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন এবং কয়েকজন ভেটারেনকে যাঁরা প্রত্যেকেই বয়সের ভারে আক্রান্ত। এদের মধ্যে দু'জন—বর্ভিনিক এবং পল কেরেস তো দাবার জগৎ থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। এই সঙ্গে যদি মনে রাখি যে, রাশিয়ার খেলোয়াড়রা প্রতিযোগিতা সুরু হবার এক মাস আগে থেকে সম্মিলিত অনুশীলনের সুযোগ পেয়েছিলেন, এই সুযোগ স্বাভাবিক কারণেই অবশিষ্ট দলের খেলোয়াড়দের ছিল না। এবং অবশিষ্ট দলের খেলোয়াড়রা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লড়াই সুরু হবার মাত্র কয়েক ঘন্টা আগে এসে তাড়াহুড়ি করে রণক্ষেত্রে নেমেছিলেন, এ সংবাদ জানার পর রাশিয়ার কৃতিত্ব আরো কিছুটা ম্লান হয়ে যায়।

রাশিয়ার জয়লাভকে ছোট করা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি শুধু বলতে চাইছি যে, দাবার জগতের চত্বরে সোভিয়েট রাশিয়া একাধিপত্যের যে প্রাচীর গড়ে তুলেছিল গত ২০।৩০ বছর ধরে, সে প্রাচীরে কিছু কিছু ফাটল দেখা দিতে সুরু করেছে। এবং এই প্রাচীর ভেঙ্গে যেতে পারে যদি না নতুন প্রতিভার সিমেন্ট ঢেলে একে মজবুত করা হয়।

উর্নাবিলে দাবা অলিম্পিয়াড্

উর্নাবিলে দাবা অলিম্পিয়াডের ফলাফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, শতাব্দীর সেরা ম্যাচে রাশিয়ার আপেক্ষিক অসাফল্য কোন আকস্মিক বিপর্যয়মাত্র নয়। প্রতি দু' বছর অন্তর অনুষ্ঠিত হয় বিভিন্ন দেশের মধ্যে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা, যা দাবা অলিম্পিক নামে খ্যাত। চারজন খেলোয়াড় নিয়ে গঠিত হয় এক একটি দেশের টীম। ১৯৫২ সালে দাবা অলিম্পিকে প্রথম অংশ গ্রহণ করার সময় থেকে আজ পর্যন্ত প্রত্যেক বারই (অর্থাৎ মোট ১০ বার) রাশিয়া দাবা অলিম্পিকে শীর্ষস্থান অধিকার করে আসছে। ১৯৭০ সালের সাইজেন (পশ্চিম জার্মানী) অলিম্পিকেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। এই ১০ বারের প্রতিযোগিতায় ফাইনালে রাশিয়া বিভিন্ন দেশের সঙ্গে ১০০ বারের বেশী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়েছে এবং এর মধ্যে তারা মাত্র ২ বার দু'টি দেশের কাছে হেরেছে: ১৯৫৬ সালে হাঙ্গেরীর কাছে এবং ১৯৬৪ সালে পশ্চিম জার্মানীর কাছে। কিন্তু লক্ষণীয় এই যে, ১৯৬৮ সালের লুগানো অলিম্পিয়াডে দ্বিতীয় স্থানাধিকারী যুগোশ্লাভিয়ার সঙ্গে রাশিয়ার পয়েন্টের ব্যবধান ছিল ৭½, কিন্তু এবারে সেই ব্যবধান একেবারে মাত্র এক পয়েন্টে নেমে এসেছে। এবারের অলিম্পিকে মোট ৭০টি দেশ অংশ গ্রহণ করেছিল। ফাইনালে উঠেছিল বারোটি দেশ। ফলাফল হল: (১) রাশিয়া ২৭½ (মোট ৪৪ পয়েন্টের মধ্যে), (২) হাঙ্গেরী ২৬½, (৩) যুগোশ্লাভিয়া ২৬, (৪) ইউ-এস-এ ২৪, (৫) চেকোশ্লোভাকিয়া ২০½, (৬) পশ্চিম জার্মানী ২২, (৭) আর্জেন্টিনা ২১½, (৮) বুলগেরিয়া ২১½, (৯) পূর্ব জার্মানী ১৯, (১০) রুমানিয়া ১৮½, (১১) কানাডা ১৭½, (১২) স্পেইন ১৬।

উল্লেখযোগ্য, এই প্রতিযোগিতার ফাইনালে ওঠার আগে সেমি-ফাইনাল পর্যায়ে এই সর্বপ্রথম রাশিয়া ৩০ পয়েন্ট সংগ্রহ করে দ্বিতীয় স্থানে নেমে যেতে বাধ্য হয়। প্রথম স্থান লাভের সম্মান অর্জন করে যুগোশ্লাভিয়া। শেষোক্ত দেশের প্রতিপক্ষবৃন্দ রাশিয়ার প্রতিপক্ষের তুলনায় মোটেই দুর্বল ছিল না।

ফাইন্যালেও রাশিয়া হাঙ্গেরীর বিরুদ্ধে ড্র করেছে নেহাতই বরাত জোরে। নার্ভাস হয়ে গিয়ে কোরিন্চৈস কর্চনয়ের কাছে জেতা খেলা ছেড়েছেন এবং চসোম স্মাইসলভের কাছে জেতা খেলা ড্র করেছেন। কর্চনয়ের স্বীকারোক্তি থেকে আমরা তা জানতে পারি।

আমেরিকার সঙ্গে প্রথম বোর্ডে স্পাস্কি ববি ফিশারকে হারালেও পোলুগায়েভস্কি এবং স্মাইসলভ যথাক্রমে ল্যারি ইভান্‌স্ এবং লোম্বার্ডির বিরুদ্ধে অনেক কষ্ট করে ড্র করেছেন এটাও কর্চনয়েরই স্বীকারোক্তি। মূল্যবান খেলার পর্যালোচনা আমেরিকানদের পক্ষে ত্রুটিপূর্ণ হওয়াতেই রাশিয়া আমেরিকার বিরুদ্ধে জয়লাভ করতে পেরেছে ২½-১½ পয়েন্টের ব্যবধানে।

রাশিয়ানদের কাছে স্পাস্কি এখন 'একা কুম্ভ রক্ষা করে নকল বুঁদিগড়ের' মত অবস্থা। বাকী গ্রান্ডমাস্টারদের দিয়ে আরো কিছুদিন কাজ চললেও আর বেশী দিন চলবে না, একথা সোভিয়েত রাশিয়া আজ বুঝতে পারছে। তাই নতুন প্রতিভার জন্যে ওদেশে বেশ কিছুদিন ধরেই সোরগোল উঠেছে।

যুগ পরিবর্তনের আভাস?

খানিকটা স্বস্তির নিশ্বাস তাঁরা অবশ্য ফেলতে পারছেন এ বছরের রাশিয়ান চ্যাম্পিয়নশীপের সেমি-ফাইন্যাল পর্যায়ের খেলাগুলি দেখার পর। চারটি জোনে বিভক্ত এই সেমি-ফাইন্যালের প্রত্যেকটি জোনেই অনেক নতুন মুখের সন্ধান পাওয়া গেছে। অনেক তরুণ খেলোয়াড়ই এ বছর বহু গ্রান্ডমাস্টারকে পিছনে ফেলে শীর্ষস্থানগুলি দখল করতে পেরেছেন। পক্ষান্তরে মনে রাখতে হবে, যেহেতু এ বছরের রাশিয়ান চ্যাম্পিয়নশীপ, বিশ্ব-চ্যাম্পিয়নশীপের প্রথম পর্যায় অর্থাৎ 'জোনাল' টুর্নামেন্ট নয়, সেহেতু অনেক নামকরা গ্রান্ডমাস্টারই এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করছেন না। তাছাড়া এ রকম নতুন মুখ প্রতিবারই রাশিয়াতে কিছু দেখা যায়, কিন্তু তাঁরা কেউই এখন পর্যন্ত তাক-লাগানো গ্রান্ডমাস্টারের পর্যায়ে যেতে পারেন নি। এ প্রসঙ্গে নভোস্তি প্রেস এজেন্সীর এক প্রতিনিধির সাক্ষাৎকারে বর্ভিনিকের উক্তি প্রণিধানযোগ্য:

'কয়েক বছর আগে এটা পরিষ্কার বোঝা যায় নি, আমরা স্পাস্কি এবং তাঁর সহযোগী গ্রান্ডমাস্টারদের স্থান পূরণ করার মত সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি কি-না। উঠতি তরুণ খেলোয়াড় প্রচুর ছিল, কিন্তু স্পাস্কি এবং তাদের মত সত্যিকারের মেধাবী খেলোয়াড়ের দেখা পাওয়া যায় নি।' এখন আবার দাবার আকাশে বেশ কয়েকজন সত্যিকারের সক্ষম এবং সম্ভাবনাপূর্ণ খেলোয়াড়ের আবির্ভাব ঘটেছে। একথা মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে, তাদের কয়েকজন খুব শক্তিধর দাবা খেলোয়াড় হবে, হয়তো স্পাস্কি বা তাদের মতই সমান শক্তিধর।'

উক্ত প্রতিনিধির কাছে বর্ভিনিক বলেছেন যে, ২১ বছরের যুরি বালাশভ এবং ১৯ বছরের আনাতোলি কারপভের মধ্যে তিনি প্রতিভার বীজ দেখতে পেয়েছেন। প্রথমোক্ত জন মস্কো ফিজিকাল কালচার ইনস্টিটিউটের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র, বর্তমানে ববি ফিশারের প্রতিভার ওপর গবেষণা করছেন তাঁর ডিপ্লোমা থিসীসের জন্যে। তাছাড়া তিনি পল কেরেসের ওপরও পড়াশুনো করছেন। এর ফলে গত বছর থেকেই তার খেলায় এক আশ্চর্য পরিবর্তন এসেছে। আর কারপভ সম্বন্ধে বর্ভিনিকের বক্তব্য এই যে, বালক অবস্থায় সে রকম প্রতিভার পরিচয় দিতে না পারলেও ১৯৬৫ সালে রাশিয়ার অন্যতম বিখ্যাত কোচ ফারম্যানের কাছে ট্রেনিং নেবার ফলে কারপভের খেলাতেও এক নতুন দিগন্ত খুলে গিয়েছে। স্পাস্কির পর একমাত্র কারপভই গত বছর বিশ্ব-জুনিয়ার চ্যাম্পিয়ন হতে পেরেছেন। তার চেয়েও বড় কথা, মাত্র ১৯ বছর বয়সেই তিনি রাশিয়ান চ্যাম্পিয়নশীপের ফাইন্যালে খেলবার অধিকার অর্জন করেছেন। বর্ভিনিকের মতে, এমন খেলোয়াড় খুব কম দেখা যায়।

৩০রের দশকে বর্ভিনিক এবং কেরেস, চল্লিশের দশকে ব্রনস্টীন, পেত্রোসিয়ান এবং স্মাইসলভ, পঞ্চাশের দশকে স্পাস্কি এবং তাল—তরুণ প্রতিভার এই নিরবচ্ছিন্ন অনুপ্রবেশে ছেদ পড়েছে ষাটের দশকে। সত্তরের দশকে বালাশভ এবং কারপভ বোধ-হয় নব-যাত্রা সুরু করলেন। আমরা তাঁদের শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি, কিন্তু এটাও মনে রাখি, দাবার জগতে রাশিয়ার একাধিপত্য নষ্ট হলে দাবা খেলার উপকারই হবে।

রেকর্ড ভাঙছে এবং ভাঙবে

অমল দাশগুপ্ত

প্রশ্ন উঠেছে, বিভিন্ন ক্রীড়া-প্রতিযোগিতায় এই যে রেকর্ড ভাঙা হচ্ছে সেজন্যে কৃতিত্বটা কার? ক্রীড়া-প্রতিযোগীর, না, বিজ্ঞানীর? এমন বিপদের সম্ভাবনা কি নেই যে, ক্রীড়ার আসরে আসল লড়াইটা চলবে বিজ্ঞানীদের মধ্যে, ভিন্ন ভিন্ন গবেষণাগারের মধ্যে, ক্রীড়া-সামগ্রীর উৎপাদকদের মধ্যে? বিশ্বের সেরা অ্যাথলীটরা এত যে রেকর্ড করছেন তার পিছনে আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার অবদান কতখানি?

অলিম্পিক বিজয়ী নিগ্রো অ্যাথলীট বব বীমনকে লাফাতে দেখে এই প্রশ্নগুলো মনে জাগতে পারে। দৃশ্যটি কল্পনা করা যাক। বব বীমন দৌড় শুরু করেছেন। কিন্তু তাঁর দৌড় সাধারণ দৌড়ের মতো তো নয়! দৌড়বার সময়ে সাধারণ মানুষ যে-ভাবে পা ফেলে বব বীমন তো তেমনভাবে পা ফেলছেন না! মনে হচ্ছে ধীরগতি চলচ্চিত্রের একটি দৃশ্য যেন। যে জমির ওপর দিয়ে বব বীমন দৌড়চ্ছেন তাও সাধারণ জমির মতো নয়। লাফ দেবার সীমানায় এসে বব বীমন তাঁর পদক্ষেপকে একটু যেন কমিয়ে আনলেন। তারপরেই প্রচণ্ড এক লাফ। শূন্যে উঠে যাচ্ছেন বব বীমন, আরো, আরো, আরো। বেতারে ও টেলিভিশনে প্রচণ্ড একটা সোরগোল উঠে মিলিয়ে যেতে না যেতে বব বীমন জমি স্পর্শ করলেন।

লংজাম্পে বব বীমনের এই অলিম্পিক সাফল্যের মূলে শুধুই কি তাঁর শারীরিক পটুত্ব? নাকি, খানিকটা টার্টান রানওয়েরও, কৃত্রিম উপকরণে তৈরী যে রানওয়ে দিয়ে তিনি দৌড়চ্ছেন?

নির্দ্বিধায় বলা চলে, অবশ্যই বব বীমনের শারীরিক পটুত্ব। তিনি যদি সাধারণ জমির ওপর দিয়ে দৌড়ে এসে লাফাতেন তাহলেও অলিম্পিক্সে থাকতেন এবং সম্ভবত বিশ্ব-রেকর্ডও ভাঙা করতেন। কিন্তু সেক্ষেত্রে তাঁর দৌড়ে আসার ভঙ্গিটি হয়তো এমন সুন্দর হত না, লাফ দেওয়াটি হয়তো হত না এমন নৈপুণ্যমণ্ডিত। স্বীকার করতেই হবে বব বীমন যে এমন একটি লাফ দিতে পেরেছেন তার পিছনে অনেকগুলো কারণ ক্রিয়াশীল: তাঁর ক্রীড়া-প্রতিভা, তাঁর শারীরিক পটুত্ব, তাঁর ট্রেনিং, তাঁর মানসিক প্রস্তুতি এবং অবশ্যই টার্টান রানওয়ে। বলা বাহুল্য, শেষোক্ত কারণটিই একমাত্র কারণ নয়।

ট্র্যাক ও ফিল্ডের ক্রীড়ায় টার্টান রানওয়ের মতো উদ্ভাবনা সচরাচর ঘটে না। তাই কিছু ঘটলেই সোরগোল পড়ে যায়। আমার তো মনে হয়, বাক্কবের এশীয় ক্রীড়া-প্রতিযোগিতায় সিংহলের দৌড়বীর খালি পায়ে দৌড়েই যে সকলকে টেক্কা দিয়েছেন তাও কম সোরগোল করার মতো ঘটনা নয়। কেননা খালি পায়ের চেয়ে কাঁটা-লাগানো জুতো পায়ে দৌড়তে সুবিধে অনেক বেশি, কাঁটার হেরফেরে সুবিধের তারতম্যও ঘটে থাকে। তবুও সিংহলী দৌড়-বীর খালি পায়েই আসর মাত করেছেন। জুতো পায়ে দৌড়বার ট্রেনিং পেলে তিনি যে কী করতেন তা অনুমান করা চলে। প্রযুক্তিবিদ্যার উদ্ভাবনা এক্ষেত্রে তাঁর শারীরিক পটুত্বের সহায়ক অবশ্যই হত।

কিন্তু যে-সব ক্রীড়ায় প্রযুক্তিবিদ্যার উদ্ভাবনা অহরহ ঘটে চলেছে, সেখানে কিন্তু ব্যাপারটা কোনো সময়েই সোরগোলের বিষয় হয় না। মোটর সাইকেল বা মোটরের রেসের কথা ধরা যাক। এই রেসে পুরনো মডেল অনবরত বাতিল হয়ে যাচ্ছে, নতুন থেকে নতুনতর মডেল অনবরত প্রবর্তিত হচ্ছে। যে মডেলের মোটর চালিয়ে একজন প্রতিযোগী রেস জিতলেন তাঁকে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সেই মডেলটি বাতিল করে নতুনতর মডেলের সন্ধান করতে হয়। মোটরচালক যতোই অভিজ্ঞ হোন, যতোই পটু হোন, সাধারণ একটি ফোর্ড চালিয়ে তিনি মোটর-রেস জিতবেন বলে যদি কল্পনা করে থাকেন তাহলে তাঁকে হতাশ হতেই হবে।

বিমান-চালনার কলাকৌশল প্রদর্শনের প্রতিযোগিতা সম্পর্কেও একই কথা। শুধু অভিজ্ঞতা ও পটুত্বের কাজ নয়, বিমান হওয়া চাই সর্বাধুনিক মডেলের।

মোটর-রেস বা বিমান-চালনার কলাকৌশল প্রদর্শনের প্রতিযোগিতার চেহারা এত দ্রুত পালটাচ্ছে যে আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই আজকের দিনের চেহারাটি সম্পূর্ণ অবলুপ্ত হবার সম্ভাবনা। ২০০০ সালের মোটর-রেস বা বিমান-চালানার কলাকৌশল প্রদর্শনের প্রতিযোগিতা যাঁরা চাক্ষুষ করবেন তাঁদের চোখে তিরিশ বছর আগেকার প্রতিযোগিতার চেহারাটি অবশ্যই মনে হবে মান্ধাতার আমলের। কলকাতার রাস্তায় ভিন্টেজ কারের সমাবেশ দেখে আমরা আজকাল তা মনে করি। অথচ কত বছর আগেকারই বা ঘটনা!

হয়তো ২০০০ সালের মোটরটি হবে নিউক্লিয়ার বা ফোটোন রকেট চালিত। ফলে তখনকার মোটর-রেসের নিয়ম-কানুনও হবে আলাদা, হয়তো মোটর-রেস নামটিই আর থাকবে না, অন্য কোনো নাম দেওয়া হবে সেই প্রতিযোগিতার।

তবুও, যতো যাই হোক, সেই ২০০০ সালের নিউক্লিয়ার বা ফোটোন মোটরের চালকটিকেও শারীরিক পটুত্ব ও অভিজ্ঞতার দিক থেকে আজকের দিনের মোটরচালকের মতোই যোগ্যতাসম্পন্ন হতে হবে। মাত্রার দিক থেকে বেশি তো কম নয়।

এমন কথা উঠতে পারে, নিউক্লিয়ার মোটরের যুগে শারীরিক পটুত্ব ও অভিজ্ঞতা নির্ভর ক্রীড়ার কোনো অস্তিত্বই থাকবে না। ক্রীড়া হয়ে উঠবে সম্পূর্ণ যন্ত্রনির্ভর। কথাটা সত্যি কিনা তা জানবার জন্যে ভবিষ্যতের নিউক্লিয়ার মোটরের যুগ পর্যন্ত অপেক্ষা করার কোনো প্রয়োজন নেই, বর্তমান কালের দিকেও তাকানো যেতে পারে।

সকলেই জানেন, হালে কম্পিউটারের সাহায্যে দাবাখেলার রেওয়াজ শুরু হয়েছে। এই কম্পিউটার দাবা-খেলোয়াড়কেই দৃষ্টান্ত হিসেবে ধরা যাক।

আসলে ব্যাপারটা কী? কম্পিউটার কি সত্যিই ভেবে-ভেবে দাবার চাল দিয়ে থাকে? মোটেই নয়। ভাবনা করার কোনো ক্ষমতাই কম্পিউটারের নেই। আসলে মানুষ খেলোয়াড়রাই প্রোগ্রাম রচনা করে থাকে, কম্পিউটারের দাবার চাল সেই প্রোগ্রাম অনুযায়ী। ফলে যে কম্পিউটারের প্রোগ্রামে যতো বেশি পটুত্ব ও অভিজ্ঞতা সেই কম্পিউটারের দাবার চালও ততো বেশি পাকা। কম্পিউটারে কম্পিউটারে লড়াই হলেও তাই সেখানেও হার-জিৎ এসে যায়। সোভিয়েত কম্পিউটার ও মার্কিন কম্পিউটারের দাবার লড়াইয়ে জিৎ হয়েছিল সোভিয়েতের। আসলে এই জিৎ প্রোগ্রামের, যন্ত্রের নয়।

কম্পিউটারের জিৎ শেষ পর্যন্ত প্রোগ্রামের জিৎ হওয়া সত্ত্বেও একথা কিন্তু কিছুতেই ধরে নেওয়া চলে না যে, অতঃপর দাবাখেলা চলবে শুধু কম্পিউটারে কম্পিউটারে, মানুষে মানুষে নয়। প্রাক্তন বিশ্ব দাবা চ্যাম্পিয়ন মিখাইল বোৎভিনিক বলেন, 'মোটরগাড়ি ও মোটর সাইকেল আবিষ্কার হয়েছে বলে অ্যাথলেটিক্‌স্‌-এ আগ্রহ কমে যায় নি।... দৌড়ের ট্র্যাকে অ্যাথলীটরা প্রতিযোগিতায় নামে বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুতগামী মানুষ কে তা স্থির করার জন্যে। দাবাখেলার বেলাতেও অনুরূপ অবস্থা থাকবে। মানুষের মধ্যে কে সবচেয়ে ভালো দাবা খেলে তা স্থির করার জন্য মানুষ প্রতিযোগিতায় নামবেই।'

অজেয় কম্পিউটার যতো বড়ো দাবা-খেলোয়াড়ই হোক, তার প্রোগ্রাম রচনায় মানুষের যতো পটুত্বই প্রকাশ পাক, নিছক মানুষ হিসেবে তার পটুত্ব কতখানি তা যাচাই করার জন্যেই সে নিজেও দাবার ছক সাজিয়ে বসবে। এই আগ্রহ নিয়েই মানুষ মানুষ, নইলে ক্ষুদ্র ধড় ও প্রকাণ্ড মুণ্ডু বিশিষ্ট একটি মামুলি জীব হয়ে দাঁড়াত মাত্র।

দৈহিক শক্তি পরিমাপে যন্ত্র

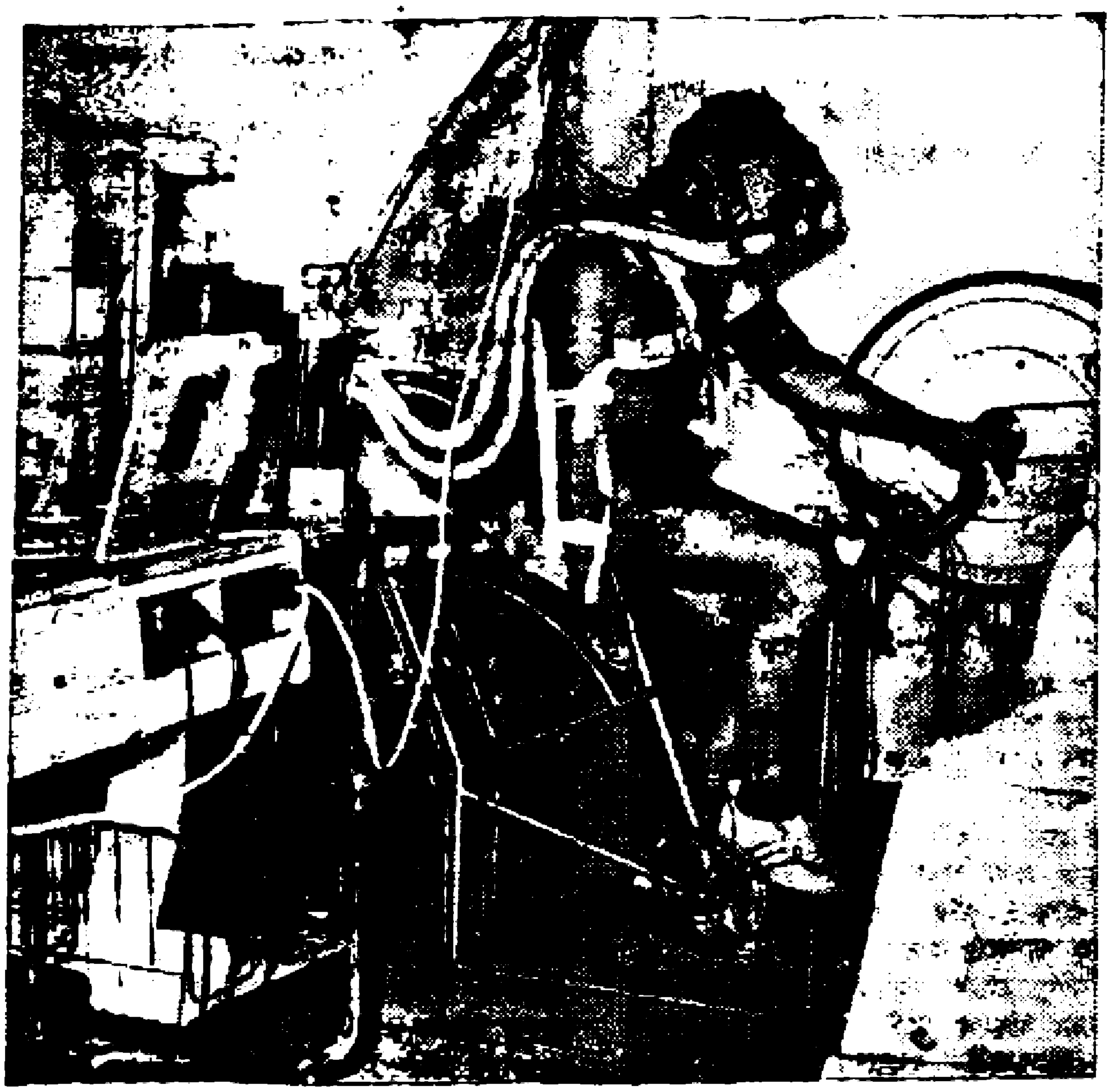

ফলে ক্রীড়াচর্চা থেকে মানুষ কোনোদিন বিরত হবে এমন সম্ভাবনা নেই। বরং যন্ত্রের কল্যাণে মানুষ যতো শারীরিক শ্রম থেকে অব্যাহতি পাবে, যতো জীবনধারণের দৈনন্দিন ঝঞ্ঝাট থেকে মুক্ত হবে, ততো বেশি বেশি সময় ব্যয় করবে ক্রীড়াচর্চায় ও অন্যান্য ধরনের শারীরিক বিনোদনে। বিশেষ করে ক্রীড়াচর্চা যেখানে তার মাংসপেশীর সক্ষমতার প্রমাণ উপস্থিত করতে হয়, দৃষ্টিশক্তির সঠিক বিচারে উত্তীর্ণ হতে হয়। আমাদের বংশধরেরাও যে আমাদের মতোই দৌড়বে, সাঁতার কাটবে, কুস্তি লড়বে, ফুটবল খেলবে তা নিঃসন্দেহে বলা চলে। হয়তো আরো কিছু নতুন খেলার মেতে উঠতে পারে যা এখনো পর্যন্ত আবিষ্কার হয়নি। খেলার কসরৎ দেখানোর ব্যাপারটা একদল রোবোটের ওপরে ছেড়ে নিজেরা জবুথবু জীবন কাটাবে এমন সম্ভাবনা নেই।

কিন্তু প্রযুক্তিবিদ্যার উদ্ভাবনা তো আর বন্ধ থাকবে না। ক্রীড়াজগতে তার অনুপ্রবেশ ঘটবেই। ফলে একই ক্রীড়া আজকের দিনে যে চেহারায় উপস্থিত হচ্ছে প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতির কল্যাণে আগামী দিনে তার চেহারা ভিন্নতর হবেই। প্রযুক্তিবিদ্যার নতুন নতুন উদ্ভাবনার ফলে যখন উৎপাদনের পদ্ধতি উন্নততর হয় এবং আমাদের জীবনযাত্রার স্বাচ্ছন্দ্য বাড়ে, তখন আমরা ব্যাপারটাকে স্বাভাবিক বলেই ধরে নিই। এমনটি তো হবেই।

কিন্তু যেই মুহূর্তে প্রযুক্তিবিদ্যার কল্যাণে কোনো একটি বিশেষ ক্রীড়ার ধারায় উন্নতির যোগ ঘটল, অমনি চারদিকে গেল-গেল রব। ব্যাপারটা এতদূর গড়িয়েছে যে অনেকে কল্পিত শুরু করেছেন অলিম্পিক রেকর্ড-টেকর্ড সবই বাজে, ব্যক্তি-মানুষের কোনো কৃতিত্ব সেখানে নেই, সবটাই প্রযুক্তিবিদ্যার উদ্ভাবনার কারসাজি।

একটা দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক। পোলভল্টের দণ্ড হিসেবে ফাইবার-গ্লাসের ব্যবহার। গত দশ বছর ধরে ফাইবার-গ্লাসের সাহায্যে পোলজাম্প দেওয়া হচ্ছে এবং অতীতের সমস্ত রেকর্ড ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছে। গত দশ বছর ধরেই দাবি শোনা যাচ্ছে ফাইবার-গ্লাস নিষিদ্ধ করা হোক।

কথাটা সত্যি, ফাইবার-গ্লাসের সাহায্যে লাফ দেওয়া হচ্ছে বলেই পোলজাম্পে রেকর্ডের মাত্রা এত উঁচুতে উঠেছে। কিন্তু তাতে আপত্তি কেন? ফাইবার-গ্লাস অনেক বেশি নমনীয়, লাফ দেবার সময়ে ফাইবার-গ্লাস প্রথমে ধনুকের মতো বেঁকে যায় তারপরে স্প্রিং-এর মতো লাফিয়ে ওঠে—এতনোই কি? তাহলে তো আগেকার কালের বাঁশকেও বাতিল করতে হয়, লোহার রড হলেই সবচেয়ে ভালো।

ফাইবার-গ্লাসের সাহায্যে লাফ দিতে হলে কি কম শারীরিক পটুত্বের প্রয়োজন? মোটেই নয়। অন্যদিকে ফাইবার-গ্লাসের সাহায্যে লাফ দেবার সময় ক্রিয়াকাণ্ডটির মধ্যে এমন এক সুষমা ফুটে ওঠে যে পাকা শিল্পীর হাতের কাজ বলে মনে হয়। ফাইবার-গ্লাসের সাহায্যে লাফ দেবার পাশে বাঁশের সাহায্যে লাফ দেবার ব্যাপারটি শিল্পবোধসম্পন্ন মানুষের চোখে খানিকটা বদখত মনে হবেই। একই কথা টার্টার রানওয়ে সম্পর্কে। রেকর্ড ভঙ্গ হোক, কিন্তু ক্রীড়া হয়ে উঠছে শিল্পসুষমামণ্ডিত, শারীরিক পটুত্বের নিরীখ তো অবশ্যই, বরং আগের চেয়েও হয়তো অনেক বেশি মাত্রায়—অতএব শুধু সোরগোল তুলে ব্যাপারটাকে ঠেকানো যাবে না। প্রযুক্তিবিদ্যার উদ্ভাবনা হতেই থাকবে, রেকর্ডও কদাচ অ-ভঙ্গ থাকবে না।

ব্যাপারটা তো কারও ইচ্ছের ওপর নির্ভর করে না। প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতি বন্ধ হোক, প্রযুক্তিবিদ্যা পিছিয়ে যাক—এমন ভাবনা আজকের দিনে অর্থহীন। আজকের দিনে হাওয়া-ভরা চামড়ার যে গোলকটি দিয়ে ফুটবল খেলা হয়, দু-শো বছর আগে তার কোনো অস্তিত্ব ছিল না। তাই বলে কি কেউ চাইলেই এখন আবার ন্যাকড়ার ফুটবল প্রবর্তন করতে পারবেন? যদিও পারেন তো সেই ন্যাকড়ার ফুটবলে খেলতে নেমে এ-কালের সর্বশ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় পেলে কি তাঁর নৈপুণ্য দেখাতে পারবেন? ভবিষ্যতে হয়তো এই চামড়ার ফুটবলও বাতিল হয়ে যাবে—তখনকার খেলার নৈপুণ্য প্রকাশ পাবে তৎকালীন ফুটবলের সাহায্যেই। জোর-জবরদস্তি করলেও চামড়ার ফুটবলে তখন আর খেলা জমবে না।

প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতি হবেই। তার ফলে খেলার সামগ্রী ও খেলার সাজসরঞ্জাম চেহারা পালটাবেই। খেলায় দেখা দেবে নতুন নৈপুণ্য, রেকর্ডের পর রেকর্ড ভঙ্গ হয়ে চলবে। কিন্তু তার ফলে প্রতিযোগিতার রোমাঞ্চ কমবে কি? মেক্সিকো অলিম্পিকে পোলজাম্পের প্রতিযোগিতার সকল প্রতিযোগীর হাতেই ছিল ফাইবার-গ্লাসের দণ্ড—তাই বলে আগের থেকেই কি বলা গিয়েছে জয় হবে কার?

মানুষ সব সময়েই চায় তার শরীরের ক্ষমতার চূড়ান্ত প্রকাশ করতে। আইনস্টাইনের বারবেল কি কোনো মানুষ কোনদিন তুলতে পারবে? ১০০ মিটার দৌড়তে পারবে পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে? পোলজাম্পে লাফাতে পারবে দশ মিটার?

কোনো প্রশ্নের জবাবেই জোর গলায় বলা চলবে না—না! বিজ্ঞানী এসে দাঁড়িয়েছেন সাহায্যের হাত বাড়িয়ে, মানুষের মাংসপেশীর ক্রিয়াকাণ্ড নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ গবেষণা চলছে, প্রযুক্তিবিদ্যার উদ্ভাবনা অব্যাহত—অতএব কোনো কিছুই এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকবে না। আজকের চোখে এখনো যা বিস্ময়কর অনিবার্যভাবেই তা হয়ে উঠবে ঘটনা। রেকর্ড ভাঙছে এবং ভাঙবে—মানুষ যতো দিন এই পৃথিবীতে আছে।

ওয়েস্টইন্ডিজ বনাম ভারতবর্ষ

ক্ষেত্রনাথ রায়

ভারতীয় ক্রিকেট দল আগামী ১৯৭১ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী জামাইকায় পৌছে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ক্রিকেট সফর শুরু করবে ৫ই ফেব্রুয়ারী থেকে। সফরের শেষ ম্যাচ খেলতে নাববে ১০ই এপ্রিল। ভারতীয় ক্রিকেট দলের ১৯৭১ সালের এই সফর—তৃতীয়বারের ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফর। আগের দুটি সফর ১৯৫২-৫৩ এবং ১৯৬১-৬২ সালে। এ পর্যন্ত ভারতবর্ষ এবং ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট দলের মধ্যে যে পাঁচটি টেস্ট সিরিজ খেলা হয়েছে তার প্রতিটিতেই ওয়েস্ট ইণ্ডিজ 'রাবার' পেয়েছে। অর্থাৎ প্রতিটি সিরিজে সর্বাধিক খেলায় জয়লাভের গৌরব লাভ করেছে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের মাটিতে আগের দুটি টেস্ট সিরিজের ফলাফল : ১৯৫২-৫৩ সালে চারটি টেস্ট খেলা ড্র এবং একটি খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজের জয় এবং ১৯৬১-৬২ সালের পাঁচটি টেস্ট খেলাতেই ওয়েস্ট ইণ্ডিজ জয়ী হয়ে অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দেয়—আন্তর্জাতিক সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে একটি সিরিজের পাঁচটি খেলায় জয়লাভের নজির মাত্র চারটি আছে।

আন্তর্জাতিক টেস্ট ক্রিকেট খেলার আসরে ভারতবর্ষ যে-সব দেশের সঙ্গে টেস্ট ম্যাচ খেলেছে তাদের মধ্যে একমাত্র ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের বিপক্ষে আজ পর্যন্ত একটা টেস্ট খেলাতেও জিততে পারেনি। ভারতবর্ষের পক্ষে খুবই আক্ষেপের কথা। তবে ভারতবর্ষের আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন যুক্তি নেই এমন নয়। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের বিপক্ষে যে-সময়ে (১৯৪৮-৬৭) ভারতবর্ষ পাঁচটা টেস্ট সিরিজ খেলেছে সেই সময়ের ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট দল অনেক বেশী শক্তিশালী ছিল ভারতবর্ষের থেকে। তাছাড়া ১৯৬১ সাল থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত সময়টা ছিল ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেটের স্বর্ণ যুগ। ব্যাটিং, বোলিং, ফিল্ডিং এবং দল পরিচালনা—খেলার সর্ববিষয়েই সমান দক্ষতার পরিচয় দিয়ে বেসরকারীভাবে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ানের সম্মান লাভ করেছিল। ব্যাটিংয়ে উইকস-ওরেল-ওয়ালকট—এই তিনজন 'ডব্লিউ থ্রি' নামে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলার আসরে যে বিশ্বখ্যাতি অর্জন করেছিলেন তার তুলনা নেই। এই তিনজন নিগ্রো খেলোয়াড়ের নামের ইংরেজী আদ্য অক্ষর 'ডব্লিউ' নিয়েই এই 'থ্রি ডব্লিউ'। খেলার আসর থেকে এই 'থ্রি ডব্লিউ' অর্থাৎ উইকস, ওরেল এবং ওয়ালকট—সকলেই বিদায় নিলে তবেই বিপক্ষ দল হাঁফ ছেড়ে বাঁচতেন। ব্যাটিংয়ে এমনই দাপট ছিল প্রত্যেকেরই। এখানে একটা উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হবে।

ক্লাইড ওয়ালকট

এভার্টন উইকস

ভারতবর্ষের বিপক্ষে কিংস্টনে ১৯৫২-৫৩ সালের টেস্ট সিরিজের শেষ পঞ্চম টেস্ট খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রথম ইনিংসের ৫৭৬ রানে এই 'থ্রি ডব্লিউ' ৪৬৪ রান সংগ্রহ করেছিলেন—ওরেল ২৩৭, উইকস ১০৯ এবং ওয়ালকট ১১৮। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের আর একজন খেলোয়াড়—তিনি সর্বকালের শ্রেষ্ঠ 'অল রাউণ্ডার' গারফিল্ড সোবার্স। দলের দক্ষ অধিনায়ক হিসাবেও তাঁর যথেষ্ট আন্তর্জাতিক খ্যাতি আছে। বোলিংয়ে ভ্যালেনটাইন, রামাধীন, কিং, গিলক্রাইস্ট, হল, গিবস এবং সোবার্স ভারতীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে ত্রাস সৃষ্টি করেছিলেন। বিশেষ করে ফাস্ট বোলার ওয়েসলী হল। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলার আসরে ওয়েসলী হল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ফাস্ট বোলার হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। ইংল্যাণ্ড এবং অস্ট্রেলিয়ার বাঘা বাঘা ব্যাটসম্যানরাও তাঁর বলের সম্মুখীন হয়ে 'বলির পাঁঠা' হয়ে যেতেন—এমনই ছিল তাঁর বোলিংয়ের সংহার মূর্তি। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেটের সে স্বর্ণযুগ ১৯৬৭ সালে শেষ হয়ে গেছে। আজ তারা অতীতের ছায়ামাত্র।

১৯৬০-৬১ সালের অস্ট্রেলিয়া সফর থেকেই ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট দলের স্বর্ণ যুগের সূচনা এবং এই সময়েই ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট মহলে শ্বেতকায়দের দীর্ঘকালের প্রভুত্ব এবং অশ্বেতকায়দের সম্পর্কে অন্যায়-অবিচার লোপ পায়। ১৯৬০-৬১ সালে অস্ট্রেলিয়া সফরকারী ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট দলে অধিনায়ক পদে নির্বাচিত হলেন ফ্র্যাঙ্ক ওরেল (পরবর্তীকালে স্যার)। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট দলে নিয়মিতভাবে একজন অশ্বেতকায় খেলোয়াড়ের অধিনায়কের পদলাভ এই প্রথম। ওরেলের নেতৃত্বে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট দলের ক্রিকেট খেলা সম্পর্কে ধ্যান-ধারণা সম্পূর্ণ বদলে যায়। ওরেল ছিলেন উজ্জ্বল ক্রিকেটের

ফ্র্যাঙ্ক ওরেল

গারফিল্ড সোবার্স

ওয়েসলী হল

একনিষ্ঠ সাধক এবং এ বিষয়ে অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক রিচি বেনো তাঁর একাত্মা হয়েছিলেন। আন্তর্জাতিক টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বনাম অস্ট্রেলিয়ার ১৯৬০-৬১ সালের টেস্ট সিরিজ একটি নতুন অধ্যায় যোজনা করেছে। অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট বোর্ড অস্ট্রেলিয়া বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের টেস্ট সিরিজে বিজয়ী দলের পুরস্কার হিসাবে ওরেলের স্মরণার্থে 'ওরেল কাপ' উপহার দিয়েছেন। পৃথিবীর অপর কোন ক্রিকেট খেলোয়াড় তাঁর জীবদ্দশায় এত বড় আন্তর্জাতিক সম্মান লাভ করেননি। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ১৯৬০-৬১ সালের টেস্ট সিরিজে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ভাগ্যদোষে ১—২ খেলায় (টাই ১ এবং ড্র ১) যে পরাজিত হয়েছিল তা অস্ট্রেলিয়ার জনসাধারণও অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। তাঁরা যে-ভাবে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট দলকে নাগরিক সম্বর্ধনা সভায় সম্মানিত করেছিলেন তার সঙ্গে একমাত্র রাজকীয় সম্বর্ধনার তুলনা চলে। ১৯৬১ সাল থেকে ১৯৬৭ সালের মধ্যে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল ৬টি টেস্ট সিরিজ খেলে ৫টি সিরিজে 'রাবার' জয়ী হয় এবং সেই সূত্রে তারা বেসরকারীভাবে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান আখ্যা লাভ করেছিল। এই সময়ে ওরেলের নেতৃত্বে তারা ভারতবর্ষকে ৫—০ খেলায় এবং ইংল্যাণ্ডকে ৩—১ খেলায় (ড্র ১) পরাজিত করে এবং সোবার্সের নেতৃত্বে অস্ট্রেলিয়াকে ২—১ খেলায় (ড্র ২), ইংল্যাণ্ডকে ৩—১ খেলায় (ড্র ১) এবং ভারতবর্ষকে ২—০ খেলায় (ড্র ১) পরাজিত করে।

১৯৬৭ সালের ১৮ই জানুয়ারী পর্যন্ত ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট দলের স্বর্ণ যুগ ছিল। তারপর ১৯৬৭-৬৮ সাল থেকে তাদের যে পতন আরম্ভ হয়েছে তা অব্যাহত আছে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল সোবার্সের নেতৃত্বেই উপর্যুপরি তিনটি টেস্ট সিরিজে হেরেছে—১৯৬৭-৬৮ সালে ইংল্যাণ্ডের কাছে ০—১ খেলায় (ড্র ৩), ১৯৬৮-৬৯ সালে অস্ট্রেলিয়ার নিরপেক্ষ ১—৩ খেলায় (ড্র ১) এবং ১৯৬৯ সালে পুনরায় ইংল্যাণ্ডের কাছে ০—২ খেলায় (ড্র ১)। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট দল শেষ টেস্ট ম্যাচ খেলেছে ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে ১৯৬৯ সালের ১৫ই জুলাই। এই শেষ টেস্ট খেলায় তারা ইংল্যাণ্ডের কাছে ৩০ রানে হেরেছিল।

এক ইনিংসে দলগত সর্বাধিক রান

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে

ভারতবর্ষে : ৬৪৪ (৮ উইঃ ডিক্লেঃ), নিউদিল্লী, ১৯৫৮-৫৯

ওয়েস্ট ইণ্ডিজে : ৬৩১ (৮ উইঃ ডিক্লে), কিংস্টন, ১৯৬১-৬২

ভারতবর্ষের পক্ষে

ভারতবর্ষে : ৪৫৪, নিউদিল্লী, ১৯৪৮-৪৯

ওয়েস্ট ইণ্ডিজে : ৪৪৪, কিংস্টন ১৯৫২-৫৩

এক ইনিংসে দলগত সর্বনিম্ন রান

(পুরো ইনিংস অর্থাৎ ১০ উইকেটে)

ভারতবর্ষের পক্ষে

ভারতবর্ষে : ১২৪, কলকাতা, ১৯৫৮-৫৯

ওয়েস্ট ইণ্ডিজে : ৯৮, ত্রিনিদাদ, ১৯৬১-৬২

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে

ভারতবর্ষে : ২২২, কানপুর, ১৯৫৮-৫৯

ওয়েস্ট ইণ্ডিজে : ২২৮, বার্বাডোজ, ১৯৫২-৫৩

এক সিরিজে সর্বাধিক ব্যক্তিগত মোট রান

ভারতবর্ষের পক্ষে

ভারতবর্ষে : ৫৬০ রান—রুসী মোদী (টেস্ট ৫, ইনিংস ১০, নটআউট ০, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ১১২, সেঞ্চুরী ১ এবং গড় ৫৬·০০), ১৯৪৮-৪৯।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজে : ৫৬০ রান—পলি উমরীগড় (টেস্ট ৫, ইনিংস ১০, নট আউট ১ বার, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ১৩০, সেঞ্চুরী ২ এবং গড় ৬২·২২), ১৯৫২-৫৩।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে

ভারতবর্ষে : ৭৭৯ রান—এভার্টন উইকস (টেস্ট ৫, ইনিংস ৭, নটআউট ০, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ১৯৪, সেঞ্চুরী ৪ এবং গড় ১১১·২৮), ১৯৪৮-৪৯

ওয়েস্ট ইণ্ডিজে : ৭১৬ রান—এভার্টন উইকস (টেস্ট ৫, ইনিংস ৮, নটআউট ১ বার, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান

ভারতবর্ষ বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ

টেস্ট খেলার সূচনা : ১০ই নভেম্বর, ১৯৪৮, নিউদিল্লী

শেষ টেস্ট খেলা : ১৮ই জানুয়ারী, ১৯৬৭, মাদ্রাজ

টেস্ট খেলার ফলাফল

সাল	স্থান	ভারতবর্ষ জয়ী	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ জয়ী	ড্র	মোট খেলা	রাবার জয়ী
১৯৪৮-৪৯	ভারতবর্ষ	০	১	৪	৫	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ
১৯৫২-৫৩	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	০	১	৪	৫	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ
১৯৫৮-৫৯	ভারতবর্ষ	০	৩	২	৫	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ
১৯৬১-৬২	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	০	৫	০	৫	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ
১৯৬৬-৬৭	ভারতবর্ষ	০	২	১	৩	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ
	মোট	০	১২	১১	২৩	

২০৭, সেঞ্চুরী ৩ এবং গড় ১০২·২৮), ১৯৫২-৫৩

এক ইনিংসে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রান

ভারতবর্ষের পক্ষে : ১৭২ নটআউট—পলি উমরীগড়, পোর্ট অব স্পেন ১৯৬১-৬২

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে : ২৫৬—রোহন কানহাই, কলকাতা, ১৯৫৮-৫৯

এক সিরিজে সর্বাধিক উইকেট

ভারতবর্ষের পক্ষে

ভারতবর্ষে : ২২টি উইকেট—সুভাষ গুপ্তে (ওভার ৩১২·৩, মেডেন ৭১, রান ৯২৭ এবং গড় ৪২·১৩)—১৯৫৮-৫৯

ওয়েস্ট ইণ্ডিজে : ২৭টি উইকেট—সুভাষ গুপ্তে (ওভার ৩২৯·৩, মেডেন ৮৭, রান ৭৮৯ এবং গড় ২৯·২২)—১৯৫২-৫৩।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে

ভারতবর্ষে : ৩০টি উইকেট—ওয়েসলী হল (ওভার ২২৯·৪, মেডেন ৬৫, রান ৫৩০ এবং গড় ১৭·৬৬)—১৯৫৮-৫৯

ওয়েস্ট ইণ্ডিজে : ২৮টি উইকেট—এ এল ভ্যালেনটাইন (ওভার ৪৩০, মেডেন ১৭৯, রান ৮২৮ এবং গড় ২৯·৫৭)—১৯৫২-৫৩

এক ইনিংসে সর্বাধিক উইকেট

ভারতবর্ষের পক্ষে : ৯টি (১০২ রানে)—সুভাষ গুপ্তে, কানপুর, ১৯৫৮-৫৯।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে : ৮টি (৩৮ রানে)—লান্স গিবস, বার্বাদোজ ১৯৬১-৬২

বিভিন্ন মাঠে খেলার উদ্বোধন তারিখ

ভারতবর্ষে

খেলার স্থান	উদ্বোধন তারিখ	মোট খেলা
নিউ দিল্লী	১০ই নভেম্বর, ১৯৪৮	২
বোম্বাই	৯ই ডিসেম্বর ১৯৪৮	৪
কলকাতা	৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৪৮	৩
মাদ্রাজ	২৭শে জানুয়ারী, ১৯৪৯	৩
কানপুর	১২ই ডিসেম্বর, ১৯৫৮	১

ওয়েস্ট ইণ্ডিজে

খেলার স্থান	উদ্বোধন তারিখ	মোট খেলা
ত্রিনিদাদ	২১শে জানুয়ারী ১৯৫৩	৪
বার্বাদোজ	৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫৩	২
জর্জ টাউন	১১ই মার্চ ১৯৫৩	১
কিংস্টন	২৮শে মার্চ ১৯৫৩	৩

বিভিন্ন কেন্দ্রে টেস্ট খেলার ফলাফল

ভারতবর্ষে

স্থান	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ জয়ী	ভারতবর্ষ জয়ী	খেলা ড্র	মোট খেলা
নিউ দিল্লী	০	০	২	২
বোম্বাই	১	০	৩	৪
কলকাতা	২	০	১	৩
মাদ্রাজ	২	০	১	৩
কানপুর	১	০	০	১
মোট :	৬	০	৭	১৩

টেস্ট খেলার সংক্ষিপ্ত ফলাফল

সাল	স্থান	খেলার ফলাফল
১৯৪৮-৪৯	নিউ দিল্লী	অমীমাংসিত
	বোম্বাই	অমীমাংসিত
	কলকাতা	অমীমাংসিত
	মাদ্রাজ	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ এক ইনিংস ও ১৯৩ রানে জয়ী
	বোম্বাই	অমীমাংসিত
১৯৫২-৫৩	ত্রিনিদাদ	অমীমাংসিত
	বার্বাদোজ	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ১৪২ রানে জয়ী
	ত্রিনিদাদ	অমীমাংসিত
	জর্জটাউন	অমীমাংসিত
	কিংস্টন	অমীমাংসিত
১৯৫৮-৫৯	বোম্বাই	অমীমাংসিত
	কানপুর	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ২০৩ রানে জয়ী
	কলকাতা	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ এক ইনিংস ও ৩৩৬ রানে জয়ী
	মাদ্রাজ	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ২৯৫ রানে জয়ী
	নিউ দিল্লী	অমীমাংসিত
১৯৬১-৬২	ত্রিনিদাদ	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ১০ উইকেটে জয়ী
	কিংস্টন	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ এক ইনিংসে ও ১৮ রানে জয়ী
	বার্বাদোজ	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ এক ইনিংসে ও ৩০ রানে জয়ী
	ত্রিনিদাদ	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ৭ উইকেটে জয়ী
	কিংস্টন	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ১২৩ রানে জয়ী
১৯৬৬-৬৭	বোম্বাই	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ৬ উইকেটে জয়ী
	কলকাতা	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ এক ইনিংসে ও ৪৫ রানে জয়ী
	মাদ্রাজ	অমীমাংসিত

ওয়েস্ট ইণ্ডিজে

স্থান	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ জয়ী	ভারতবর্ষ জয়ী	খেলা ড্র	মোট খেলা
ত্রিনিদাদ	২	০	২	৪
বার্বাদোজ	২	০	০	২
জর্জ টাউন	০	০	১	১
কিংস্টন	২	০	১	৩
মোট :	৬	০	৪	১০

মোট খেলার ফলাফল

	মোট খেলা	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ জয়ী	ভারতবর্ষ জয়ী	খেলা ড্র
ভারতবর্ষে	১৩	৬	০	৭
ওয়েস্ট ইণ্ডিজে	১০	৬	০	৪
মোট :	২৩	১২	০	১১

সেঞ্চুরী উপর্যুপরি চার ইনিংসে

এভার্টন উইকস (ওয়েস্ট ইণ্ডিজ)—১২৮ রান (১ম টেস্ট, নিউ দিল্লী), ১৯৪ রান (২য় টেস্ট, বোম্বাই) এবং ১৬২ ও ১০১ রান (৩য় টেস্ট, কলকাতা) ১৯৪৭-৪৮। এখানে উল্লেখ্য, ১৯৪৭-৪৮ সালে ভারত সফরের আগে উইকস কিংস্টনে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে চতুর্থ টেস্টে সেঞ্চুরী (১৪১ রান) করায় উপর্যুপরি টেস্টের পাঁচ ইনিংসে সেঞ্চুরী করার যে বিশ্বরেকর্ড করেন তা আজও কেউ স্পর্শ করেন নি।

একটি টেস্টের উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরী

১৬২ ও ১০১ রান—এভার্টন উইকস, ৩য় টেস্ট, কলকাতা ১৯৪৭-৪৮।

একটি ইনিংসে চারটি সেঞ্চুরী

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ : ওয়ালকট ১৫২ রান, গোমেজ ১০১ রান, উইকস ১২৮ রান এবং ক্রিশ্চিয়ানী ১০৭ রান (১ম টেস্টের ১ম ইনিংসে, নিউ দিল্লী, ১৯৪৭-৪৮)। এখানে উল্লেখ্য, টেস্ট ক্রিকেট খেলায় এই রকম নজির এর আগে মাত্র একটি ছিল—১৯৩৮ সালে নটিংহামে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ১ম ইনিংসে ইংল্যান্ডের হাটন (১০০ রান), বার্নেট (১২৬ রান), কম্পটন (১০২ রান) এবং পেন্টার (২১৬ নট-আউট) সেঞ্চুরী করেন।

উপর্যুপরি ইনিংসে ৬০০ রান

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ : ৬৩১ (নিউ দিল্লী, ১ম টেস্ট) এবং ৬২৯ রান—৬ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড (বোম্বাই, ২য় টেস্ট), ১৯৪৭-৪৮।

গুরু দত্ত ফিল্মস কম্বাইন তরুণদের চিত্রতারকা হওয়ার পথ তৈরী করেছে !

পুরাতন কালের রেহমান কামিনী কৌশল ডেভিড বেলা বোস নাদিরা ও সঞ্জীবকুমারের সঙ্গে এগারো জোড় তরুণ-তরুণী !!

এই উপভোগ্য চিত্রে আনন্দমুখর ও যৌবনদীপ্ত সজীবতা শঙ্কর-জয়কিষণের সঙ্গীত সুধায় আলোকিত হয়ে উঠেছে !!

শুভমুক্তি ২৫শে ডিসেম্বর

বড় দিনের শ্রেষ্ঠ প্রমোদ সম্ভার

রক্সি-দর্পণা-মেনকা-নাজ-লিবার্টি-ছায়া

চিত্রপুরী — কমল — নবভারত — শিবানী — নারায়ণী — দীপক (মাখলা) — মানসী (শ্রীরামপুর)

রূপালী (চুঁচুড়া) — লক্ষ্মী (টিটাগড়) — আরতি (বর্ধমান) — রূপশ্রী (রাঁচি)

নির্বাক ছবি

চিদানন্দ দাশগুপ্ত

মহাবিপ্লবী অরবিন্দ/পরিচালনা : দীপক গুপ্ত। নির্মল বসু এবং সুলেখা। ফটো : অমৃত

গত কুড়ি বছর ধরে ভারতবর্ষে ফিল্ম সোসাইটির আন্দোলন চলা সত্ত্বেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেমা শিল্পের আদিপর্বে নির্বাক ছবির যে সুদীর্ঘ অধ্যায় তা এখনও আমাদের কাছে অপরিচিত। অথচ ছায়াছবি আবিষ্কৃত হয় ঐ সময়ে, আমেরিকাতে। ফিল্ম ও ফিল্মের ভাষা বলতে আজ আমরা যা বুঝি তার সৃষ্টিকর্তাও একজন আমেরিকান, ডেভিড ওয়ার্ক গ্রিফিথ।

বিদেশে আজ অনেকেই হয়তো দাবী করতে পারেন যে, তাঁরাই হচ্ছেন ছবি তোলার যান্ত্রিক উপকরণ, এককথায় সিনেমা শিল্পের আবিষ্কর্তা। কিন্তু একথা অস্বীকার করা যায় না যে, সিনেমা শিল্পের আদিপর্বে যে সমস্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা কাজকর্ম হয়েছে তার অধিকাংশের সূত্রপাত যুক্তরাষ্ট্রে। যেহেতু ছায়াছবি যন্ত্রযুগের এক বিশেষ ধরনের শিল্পকলা, যান্ত্রিক কলাবিদ্যার প্রত্যক্ষ অবদান, তাই অতি স্বাভাবিক নিয়মে যন্ত্রবিজ্ঞানে অগ্রসর দেশেই যে এর জন্ম ও উন্নতি সাধিত হবে, এ ব্যাপারে আশ্চর্যের কিছু নেই। সোভিয়েত রাশিয়ার বিখ্যাত চিত্রপরিচালক আইজেনস্টাইন বলেছেন : আমেরিকার শিল্পোন্নতির সঙ্গে তার ছায়াছবির প্রগতি গভীরভাবে যুক্ত।

১৯১০ সালে সমগ্র পৃথিবী জুড়ে আনুমানিক ষাট হাজারেরও বেশি প্রদর্শনী কেন্দ্রে সিনেমা দেখানো হতো। আর এই ষাট হাজার প্রদর্শনী কেন্দ্রের চার ভাগের এক ভাগই ছিল শুধুমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে।

মার্কিন ছায়াছবির আদিপর্ব নিষ্পাপ ও সারল্যের প্রতীক। ছায়াছবিতে 'কমার্শিয়াল কোর্স' বা কলুষ দিকগুলি প্রাধান্য পেলো পরবর্তীকালে, বেশ কিছু বছর পরে।

গোড়ার দিকে ছবি দেখানো হতো হাটে-বাজারে, সার্কাসের আসরে, মিউজিক হল বা পিপশোগুলিতে কিংবা রাস্তার ধারে। অধিকাংশ দর্শকই সাধারণ মানুষ। শিক্ষিত বা উচ্চবিত্তের যে শিল্পজগৎ, সেখানে তার প্রবেশ নিষেধ।

প্রদর্শনী মূল্য একখণ্ড নিকেল, যার থেকে সিনেমার নামই হয়ে গেল নিকেলো-ডিয়নস। সাধারণ মানুষের মনোরঞ্জনের জন্য এইসব সস্তাদরের শো-হাউসগুলিতে প্রধানত দেখানো হতো টুকরো টুকরো জীবন্ত ছবি—কোথাও ট্রেন এসে ঢুকছে স্টেশনে, প্রচণ্ড জলোচ্ছ্বাস ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে নায়েগ্রা প্রপাত, আবার কোথাও বা মিউজিক হলে শরীর দুলিয়ে ঘুরে ঘুরে নাচছে কোন রূপসী মেয়ে।

ছায়াছবির আদিপর্বে হাস্যরসিক হিসেবে নাম করেছিলেন যাঁরা—জন বুনি থেকে বেন টার্পিন, বাস্টার কিয়াটন, ফ্যাটি আরাবাকলস ও মাব্ল নরমান্ড এবং পৃথিবীখ্যাত চার্লি চ্যাপলিন—তাঁরা সবাই একদা মিউজিক হলের সাধারণ কমেডিয়ান-দের মতো অতি সাধারণ স্তরের হাস্যরসিক হিসেবে পরিচিত ছিলেন। ছায়াছবি ছিল তাঁদের কাছে শিশুর হাতে নতুন পাওয়া খেলনার মতো। একান্তভাবে বাস্তব-নিষ্ঠ ছবিগুলোর মধ্যে দিয়ে তাঁরা প্রচলিত রীতিনীতি ও শাসক সম্প্রদায়ের বিদ্রূপাচরণ করতেন। ম্যাক সেনেট-এর কেস্টন কমেডিগুলোর উপমা হলো, কেস্টন পুলিশ বাহিনীর ব্যর্থতার আলেখ্য তুলে ধরা ও যারা আইনশৃঙ্খলার ধারক, প্রতি পদক্ষেপে তাদের নাস্তানাবুদের ছবি নানাভাবে দেখানো। এরা সবাই দরিদ্র ও সর্বহারাদের দিকে। রাঘববোয়াল যেমন চুনোপুঁটি গিলে খায় তেমনি একজন হৃষ্টপুষ্ট বড়লোক তার থেকে দীন দুঃস্থ একটি মানুষকে মুরগীর মতো খেয়ে ফেলতে চাইছে,—'গোল্ড রাশ'-এর এই দৃশ্যেই শুধু নয়, চার্লি চ্যাপলিন তাঁর সব ছবিতে এই একই বক্তব্য প্রকাশ করে গেছেন।

মর্যাদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ফিল্মের মাধ্যমে যখনই অর্থাগম শুরু হলো, ছবি নির্মাণের ব্যাপারটা তখনই প্রযোজকদের ইচ্ছের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়লো। সাধারণ মানুষের সঙ্গে চলচ্চিত্রের দীর্ঘ-দিনের সম্পর্কে ফাটল দেখা দিলেও বুর্জোয়া এবং শহরাঞ্চলের মধ্যবিত্তের উপযোগী বিষয়বস্তু ছবিতে প্রাধান্য পেতে থাকলো। ডেভিড গ্রিফিথ তাঁর প্রথম ছবিতে নিজের নাম পর্যন্ত উল্লেখ করতে চাননি। তাঁর আকাঙ্ক্ষা ছিলো নাটকে অভিনয় করে অভিনেতা হওয়া, ছায়াছবির মতো সস্তা ব্যাপারে নিজের নামকে তাই তিনি জড়াতে চাননি। অথচ গ্রিফিথ সম্পর্কে বলা হয় যে, আজকের দিনে ফিল্মের যে ভাষা ও আঙ্গিক, তিনিই তার জনক।

আজও যদি ১৯১৬ সালে তোলা ডেভিড গ্রিফিথের 'ইনটলারেন্স' ছবিটি দেখা যায়, চমকে যেতে হয় তাঁর কল্পনা ও উদ্ভাবনী শক্তি প্রত্যক্ষ করে। চলচ্চিত্র আঙ্গিকের এমন দুরূহ প্রয়োগ প্রায় দেখাই যায়না।

চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে সোভিয়েত রাশিয়ার নির্বাক যুগের খ্যাতিমান স্রষ্টা আইজেনস্টাইন ও পুডোভকিনকে গ্রিফিথ অনেক প্রেরণা যুগিয়েছিলেন। গ্রিফিথের প্রভাব আইজেনস্টাইন কখনো অস্বীকার করতে পারেন নি। 'ডিকেন্স-গ্রিফিথ ও আজকের চলচ্চিত্র' নামক বিখ্যাত প্রবন্ধে আইজেনস্টাইন বলেছেন : সোভিয়েত চলচ্চিত্রে মন্তাজের বিবর্তন ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে গ্রিফিথের অবদান অসাধারণ। সে অবদান গ্রিফিথের কাছে ডিকেন্সের যে অবদান তার থেকে কোন অংশেই কম নয়।

গ্রিফিথ সম্পর্কে আলোচনাকালে গ্রিফিথ ডিকেন্সকে প্রকাশ করতে গিয়ে কোথায় কৃতকার্য ও কোথায় অকৃতকার্য, আইজেনস্টাইন তা ব্যাখ্যা করেছেন। গ্রিফিথের উক্তি নিয়ে তিনি বলেছেন 'সে ছবিই ভালো যে ছবিতে ভালো-মন্দের দ্বন্দ্বে শেষ পর্যন্ত ভালোর জয় ও মন্দের পরাজয় ঘটে।' আইজেনস্টাইন নিপুণভাবে এর সঙ্গে জুড়ে দিলেন, 'একেই অসবার্ট সিটওয়েল ডিকেন্স প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে সৎ-অসৎ-এর দ্বন্দ্ব বলে বর্ণনা করেছেন।' চলচ্চিত্র জগতে ভিক্টোরিয় যুগের মধ্যবিত্তের মার্কিন সমাজে গ্রিফিথ এক অতি সুউচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ফিল্মের কলাকৌশল ও আঙ্গিকের ব্যবহারে তিনি সিনেমাশিল্পের আদি পুরুষ।

চিদানন্দ দাশগুপ্ত পরিচালিত বিলেত ফেরৎ/নির্মলকুমার এবং নবাগতা সোহাগ সেন।

[illegible] প্রতিশ্রুতি/বসন্ত চৌধুরী এবং কাজল [illegible]। ফটো : অমৃত

আশ্চর্য এই যে, প্রথমদিকে ছায়াছবির নির্মাণকার্যে চ্যাপলিনের দান অকিঞ্চিৎকর হলেও তিনিই চলচ্চিত্রের ইতিহাসে আজ পর্যন্ত অমর হয়ে রইলেন। তাঁর ছবি সব সময় নতুন। অথচ গ্রিফিথ যিনি চলচ্চিত্রের স্রষ্টা তাঁর নাম প্রায় মুছে যেতে বসেছে। দীর্ঘদিনের ব্যবধানেও চ্যাপলিনের প্রাচীনতম ছবিগুলি আজও অনাবিল আনন্দে উপভোগ করা যায়। আসলে, চ্যাপলিনের বিষয়বস্তু স্থান ও কালের ঊর্ধ্বে, সমকালীন জগতের কোন নির্দিষ্ট সীমায় আবদ্ধ নয়। খুব সম্ভব কমেডিকে বেছে নিয়েছিলেন বলেই এ ব্যাপারে তিনি এতো কৃতকার্য হয়েছিলেন।

চলচ্চিত্র শিল্পের পথিকৃৎ যাঁরা তাঁদের ছবি দেখার সময় আমাদের উচিত সিনেমা-শিল্পে তাঁদের অবদান ও শিল্পকর্মের নৈপুণ্যকে আলাদা করে দেখা। ইতিহাসকে ভুলে গিয়ে আমরা যদি শুধুমাত্র তাঁদের ছবি দেখতেই চাই, তাহলে মনে হতে পারে কমেডিকে কেন্দ্র করেই বুঝি নির্বাক যুগের মার্কিন চলচ্চিত্র শিল্প বিকাশলাভ ও পরিণত রূপ গ্রহণ করেছিল।

প্রতিবাদ/বিশ্বজিৎ এবং মৌসুমী চট্টোপাধ্যায়। ফটো : অমৃত

আঁধারে [illegible]

সেই সময় উচ্চবিত্ত সম্প্রদায় যে দৃশ্যগুলোকে অশ্লীল বলে বর্ণনা করেছিলেন, আজ আমাদের কাছে ছবির সে দৃশ্যগুলো নির্মল হাসির উৎস। ছবিগুলি দেখে আজ আমাদের মনে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়, বিংশ শতাব্দীর শুরুতে যাঁরা প্রথম এই ছবিগুলি দেখেছিলেন তাঁদের মনে একই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল।

এসব ছবি দেখতে দেখতে আমরা চলচ্চিত্র শিল্পের পথিকৃতদের ক্ষমতা দেখে মুগ্ধ হই, অবাক হয়ে যাই কেমন করে তাঁরা শিল্পকলার এই মাধ্যমটিকে ক্রমোন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও বলতেই হবে, কখনো কখনো এসব ছবি যাদুঘরে যত্নে তুলে রাখা অতীতের শিল্পকর্ম হিসেবে দেখে থাকি, কখনো কখনো তাদের আজগুবি ধরনধারনে আমরা খুব মজা পাই, কখনো কখনো সিনেমা শিল্পের সানন্দ ও সরল শৈশবকে মনে করে আমাদের মনে বিষণ্ণতা জাগে, কখনো কখনো গ্রেটা গার্বোর মতো কোন এক ব্যক্তিত্বের জাদুতে আমরা মুগ্ধ হই—এর চেয়ে আর বেশি কিছু নয়। যাই হোক, নির্বাক যুগের মহৎ কর্মগুলি কিন্তু সময়ের পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছে। বাস্টার কিটনের অদ্ভুত মুখভঙ্গি, কেস্টন পুলিশ বাহিনীর মজাদার ব্যাপারস্যাপার, চ্যাপলিনের গভীর মানবিকতা গত অর্ধশতাব্দীতেও যে তার সর্বজনীন আবেদন রক্ষা করে চলেছে তাতে সন্দেহ নেই।

মাত্র
5টি পয়সা
খরচ করলে
আপনি আপনার
পরিবার সীমিত
রাখতে
পারবেন!

নিরোধ

পরিবার পরিকল্পনার জন্যে
উন্নত ধরণের
রবারের জন্মনিরোধক
15 পয়সায় 3টি

সময়ের ব্যবধানে সন্তান উৎপাদনের জন্যে

আজকাল, নিজের ইচ্ছে মাফিক সময়ে ছেলেপিলের জন্ম দেওয়া সম্ভব। হঠাৎ কিছু হয় না। আপনি যখন চাইবেন, তখনই আপনি সন্তান উৎপাদন করতে পারবেন। নিরোধ আপনাকে সেই ইচ্ছাপূরণের সুযোগ দেয়।

মা ও শিশুর স্বাস্থ্যের জন্যে

জন্মের পরে প্রথম তিন বা চার বছরের সময়ে শিশুর যত্ন নেওয়া উচিত—তাহলেই ওরা ভালো ভাবে বেড়ে উঠবে বলে ডাক্তারেরা মত দিয়ে থাকেন। সন্তান প্রসবের পরে স্বাস্থ্য আবার ফিরে পাওয়ার জন্যে মায়েরও কিছু সময় দরকার। নিরোধ ব্যবহার করে আপনি খুব সহজেই পরবর্তী সন্তানের জন্ম স্থগিত রাখতে পারেন।

নিরোধ (কণ্ডোম) পুরুষদের জন্যে উন্নত ধরণের রবারে তৈরী জন্মনিরোধক। পৃথিবীর সর্বত্র নিরোধ ব্যবহার করা হয় কারণ এটি খুবই সহজ ও নিরাপদ পদ্ধতি। যারা ব্যবহার করে, তাদের আদৌ স্বাস্থ্যহানি হয় না। নিরোধ সব জায়গায় পাওয়া যায়।

মুদীর দোকান, মণিহারী দোকান, ওষুধের দোকান, সাধারণ বিপণী, পানের দোকান আদিতে নিরোধ বিক্রী হয়।

সবুজ মানুষ ও ফাদার ঘনশ্যাম

অদ্রীশ বর্ধন

ভারতের পশ্চিম উপকূলের বিস্তীর্ণ তটরেখার কোনো এক স্থানে শুরু এই কাহিনীর প্রথম দৃশ্য।

সমুদ্রতট। চিরহরিৎ অরণ্য আর ধু-ধু সৈকতের সমান্তরাল রেখায় বেশ খানিকটা জমি। গোল্‌ফলিংকস। নীল সাগরের ঢেউয়ের মাথায় নাচছে ধূসরতা। নির্জন সৈকতও নিস্তব্ধ হয়ে উঠছে প্রদোষ-বিষাদে।

সমান্তরাল রেখায় বিস্তৃত এক ফালি জমিতে গল্‌ফ খেলছে এক যুবক। একাই খেলছে। কিন্তু পরম উৎসাহে খেলছে। এলোপাথাড়ি মারের ধার দিয়েও যাচ্ছে না। প্রতিটি 'স্ট্রোক' হিসেব করা; চুলচেরা বিচারে বলের গায়ে ঘা পড়ছে; বল ছুটছে হিসেবের পথ ধরে—উল্টোপাল্টা নয়। সংক্ষেপে, জনহীন সাগরতীরে যুবক হাত পাকাচ্ছে। কব্জির মৃদু মোচড়ে স্টিক ঘুরছে, বল উড়ছে, যেন ঘূর্ণিবায়ু বশ মেনেছে যুবকের জাদুকরী হাতের মোহে।

শুধু গল্‌ফ কেন, যুবক অন্যান্য অনেক খেলাতেও বেশ পটু। খেলা শেখা তার কাছে ছেলেখেলা। দু হপ্তায় বেহালা শেখা বা পত্রযোগে ফরাসী উচ্চারণ রপ্তকরা জাতীয় বিজ্ঞাপনে তাই তার এত আগ্রহ। বিজ্ঞাপনের এই আজগুবির দুনিয়ায় বিচরণ করতে যুবক তাই ভালবাসে।

যুবক আর্ডমিরাল রাকা নম্বর প্রাইভেট সেক্রেটারী। আর্ডমিরালের প্রাসাদোপম বাসগৃহ গল্‌ফ-জমি যেখানে শেষ হয়েছে, ঠিক তারপরেই। যুবক আর পাঁচজন যুবকের চাইতেই উচ্চাকাঙ্ক্ষী। প্রাইভেট সেক্রেটারী হিসাবেই জীবন কাটিয়ে মোক্ষ লাভ করা তার মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। সে জানে, প্রাইভেট সেক্রেটারীগিরির মেয়াদ যত তাড়াতাড়ি শেষ করা যাবে, ততই উচ্চাশার উচ্চসোপানে আরোহণের সুযোগ আসবে। কিন্তু, সেক্রেটারী জীবিকায় ইস্তফা দেওয়ার শ্রেষ্ঠ উপায় হল খুব ভাল সেক্রেটারী হওয়া। কথাটা একটু প্যাঁচালো বটে, কিন্তু মানেটা সোজা। যুবক তাই অত্যন্ত ভাল সেক্রেটারী। কাটিকারেকে আর্ডমিরাল রাকা নম্বর চিঠিপত্র সংগ্রহ করতে সে সিদ্ধহস্ত। গল্‌ফ প্র্যাকটিসের মতই এ ব্যাপারে তার লেখনী আর হাত যুগপৎ ঘূর্ণিবায়ুর মত চলে।

আর্ডমিরাল এখন সমুদ্রে। ছ' মাস তিনি গৃহছাড়া। ফেরবার সময় হয়েছে বটে। কিন্তু কয়েক ঘণ্টা বা কয়েক দিন আগে তাঁর আবির্ভাব ঘটছে না।

যুবকের নাম ধরা যাক ইন্দ্রনীল। উড়ন্ত বলের গতিবিধি দেখবার জন্যে একলাফে একটা টিলার ওপর উঠল ইন্দ্রনীল। উঠেই এক আশ্চর্য দৃশ্য দেখল। প্রথমে মনে হল বুঝি চোখের ভুল। অথবা ফ্যানটাসি। নিশ্চয় ভুতুড়ে নাটক। নয়তো অসম্ভব কিছু। চোখ রগড়ে নিয়ে আবার তাকাল। দেখল,

ঝড়ের কালো মেঘ দিগন্তে যেখানে মিশেছে—সেখানে গোধূলির শেষ রক্তরাগ স্বর্ণরশ্মি নিয়ে কৃষ্ণ-নীল সমুদ্রের শীর্ষে কাঁপছে পশ্চিমের সেই রক্তিমাময় পটভূমিকায় যেন মূক অভিনয় করছে দুটি কিম্ভূতকিমাকার মূর্তি।

পরক্ষণেই বিভ্রম খানিকটা পরিষ্কার হল। দিগন্তের বুকে নয়—সৈকতের ওপরেই দুবে, এই মুকাভিনয়ের। বিচিত্র টুপী মাথায় দুটি মনুষ্যমূর্তি ভ্যলান্তোর মত বিদঘুটে নাচে মত্ত হয়ে এগিয়ে চলেছে। স্বর্ণরশ্মির পটভূমিকায় দেখা যাচ্ছে তাদের কৃষ্ণ দেহরেখা দুজনেরই কটিবন্ধে ঝুলছে তরবারি। যেন মধ্যযুগীয় কোনো কাপ্তানীয় বম্বেটজাহাজ থেকে আবির্ভূত হয়েছে দুটি প্রেত। এ যেন ভৌতিক নাটক। ভুতুড়ে জাহাজও নিশ্চয় আছে আশেপাশে কোথাও!

চোখ রগড়ে ভালভাবে তাকাতেই ফ্যানটাসি-কল্পনা তিরোহিত হল। ইন্দ্রনীল যা দেখল, তা ভূত নয়, প্রেত নয়, অসাধারণ বটে। কিন্তু অবিশ্বাস্য নয়। দেখল, দুই মূকাভিনেতাই এমন জমকালো ইউনিফর্ম পরেছে, যা বিশেষ উপলক্ষ ছাড়া পারতপক্ষে কেউ পরতে চায় না। পুরোধা ব্যক্তিকে চিনতে কষ্ট হল না। ঐ উঁচু নাক ছুঁচালো দাড়ি আর লোহার শিকের মত মজবুত শরীর শুধু একজনেরই আছে। নাম তাঁর অ্যাডমিরাল রাকা দত্ত। ইন্দ্রনীলের মনিব।

মজা হচ্ছে এই যে, পেছনের ব্যক্তি সম্বন্ধে আডমিরাল যেন মোটেই সজাগ নন। তিনি চলেছেন আপন মনে।

পেছনের লোকটিকে চেষ্টা করেও যেন চিনতে পারল না ইন্দ্রনীল। বুঝতেও পারল না এমন অসময়ে কেন জাহাজ ছেড়ে স্থলে অবতীর্ণ হলেন আডমিরাল। জমকালো পোশাক নিশ্চয় অকারণে পরেন নি। কিন্তু ইউনিফর্ম পরে সং সেজে অ্যাডমিরাল কদাচ বহির্মুখো হননি। ইন্দ্রনীল সেই মুহূর্তে এ রহস্যের কোনো সমাধান খুঁজে পেল না। এর পরেও বেশ কিছুকাল ইউনিফর্ম রহস্য অনেকেরই মাথা ঘর্মাক্ত করেছে। পোশাক পরিবর্তনের জন্য পাঁচ মিনিট সময়ও কি পাননি আডমিরাল?

তাই, সেই মুহূর্তে ইন্দ্রনীল যা দেখল, তা কমিক অপেরার সমতুল্য।

এবার দ্বিতীয় মূর্তিটিকে নিয়ে গবেষণা করা যাক। লোকটির পরনে লেফটেন্যান্টের নিখুঁত পোশাক। অথচ ধরনটা লেফটেন্যান্টজনোচিত নয় মোটেই। লোকটা হাঁটছে অদ্ভুতভাবে; অসহজ অদ্ভুত চলনভঙ্গিমা; কখনো পাই পাই করে, কখনো খানুকের মত পা টেনে টেনে; ভাবখানা যেন অ্যাডমিরালকে ছেড়ে এগিয়ে যাওয়া ঠিক হবে কিনা, এ বিষয়ে কিছুতেই মনস্থির করা যাচ্ছে না। আডমিরাল অবশ্য কানেখাটো মানুষ। কাজেই পেছনে বালির ওপর পদশব্দ শোনা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তবে বালুকা-পদচিহ্ন নিয়ে যে কোনো ডিটেকটিভ গবেষণা করলে গোটা কুড়ি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারত। মনে হত, পায়ের মালিক কখনো দাঁড়িয়েছে, আবার কখনো নেচেছে। লোকটার মুখ প্রদোষালোকে অস্পষ্ট থাকলেও চপল চোখ দুটো বাতি-মত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। সে চোখে উত্তেজনা নেচে নেচে উঠছিল। একবার ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়োতে শুরু করল লোকটা; কিন্তু আচমকা দাঁড়িয়ে গেল। আবার পা টেনে টেনে মাতালের মত বেসামাল ভঙ্গিমায় বালি মাড়াতে লাগল। তারপরেই একটা বেয়াড়া কাজ করল লোকটা। ইন্দ্রনীল স্বপ্নেও ভাবেনি এমন সৃষ্টিছাড়া কাজ কোনো নৌ-অফিসারের পক্ষে সম্ভব। এক ঝটকায় খাপ থেকে তরোয়াল টেনে বার করল নাচিয়ে মূর্তি।

নাটকের এই চরম মুহূর্তে দুজন মূকাভিনেতাই অদৃশ্য হল একটা টিবির আড়ালে। বিদ্যুৎচমকের মত তরবারি ঝলক দেখল ইন্দ্রনীল। দেখল, সহসা শূন্যে আন্দোলিত হল খাপমুক্ত উলঙ্গ কৃপাণ। ফলার এক ঘায়ে ছিন্নবিচ্ছিন্ন কতকগুলো লতাপাতা ছিটকে পড়ল জমির ওপর।

মুখ কালো হয়ে গেল ইন্দ্রনীলের। থমথমে মুখে কি যেন ভাবল। তারপর দৌড়োলো রাস্তার দিকে। প্রাসাদের সামনে দিয়ে রাস্তাটা ঘুরে সমুদ্রের দিকে গিয়েছে। এবং টিবির আড়াল থেকে বেরিয়ে আডমিরালকে এই পথেই আসতে হবে। সৈকতপথ বেয়ে বন্ধ-ভবনে আসবার এইটাই একমাত্র পথ। সুতরাং ইন্দ্রনীল সেই পথেই দৌড়োলো।

কিন্তু আডমিরাল বাড়ি ফিরলেন না। ইন্দ্রনীলও ফিরল না। অনেক...অনেক ঘণ্টা পরেও যখন কারো টিকি দেখা গেল না, তখন সোরগোল পড়ল বন্ধ-ভবনে।

প্রতীক্ষা অবশেষে প্রমাদে পরিণত হল। সুদীর্ঘ ঝাউ আর পাম গাছের বেরাটোপে ঢাকা বন্ধ-ভবনে ঘর আর দালানের সংখ্যা যত, বাসিন্দার সংখ্যা তার চাইতে অনেক কম। সামনের হলে এদের একজনকে দেখা গেল। খর্বাকৃতি আকারে আঁটকায়, প্রকারে বরাগাব, জীবিকায় আডমিরালের নায়েব-স্থানীয়। দীর্ঘদিন ধরে এ বাড়ির এবং বাসিন্দাদের তত্ত্বাবধান করতে করতে বাড়ির একজন হয়ে গিয়েছে। বৃদ্ধের নাম হরিভক্ত।

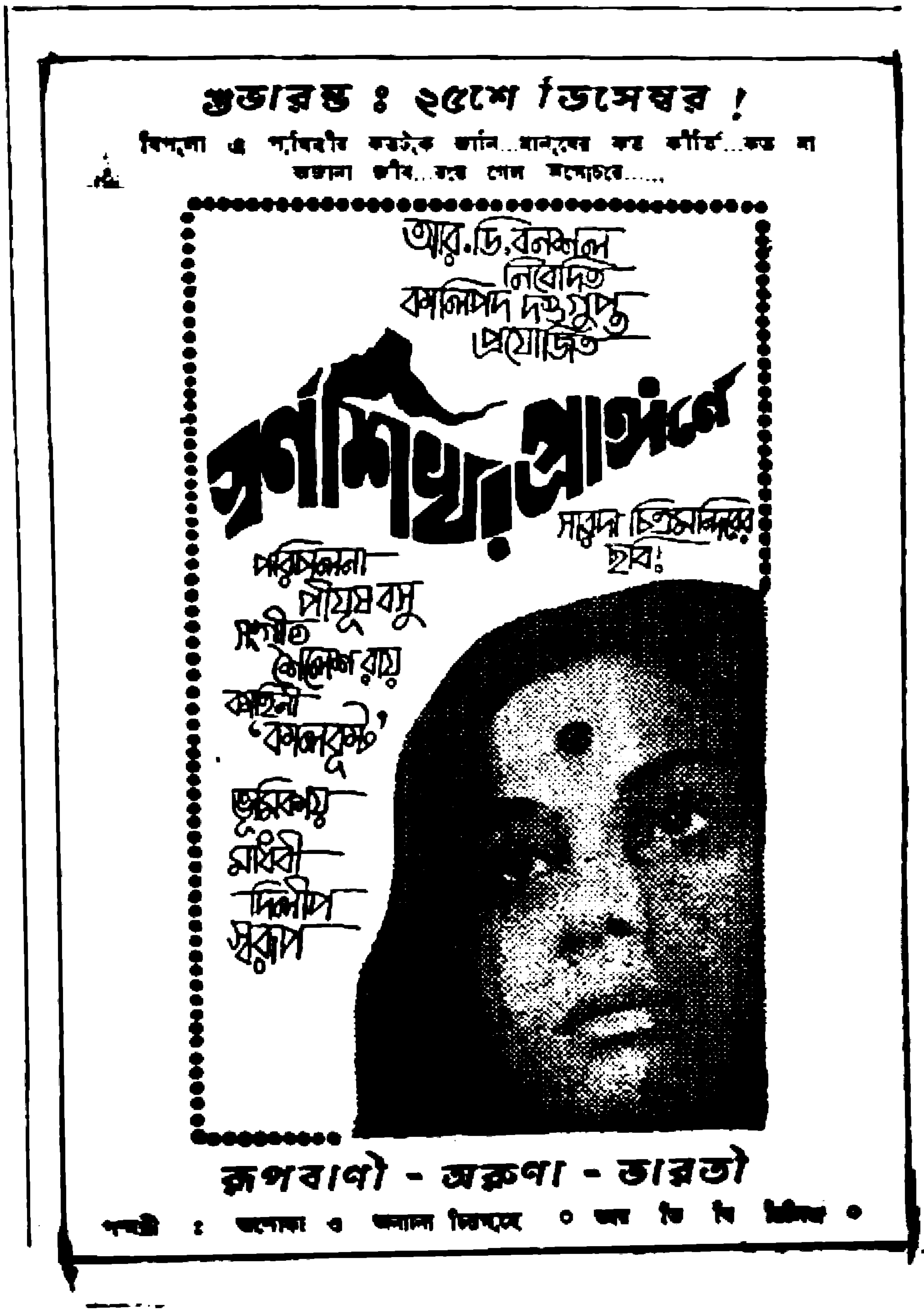

পাকা চুল, পাকা গোঁফ, কিন্তু অনমনীয় মেরুদণ্ড।

সামনের হলঘরে পায়চারী করছিল হরিভক্ত। জানলার মধ্যে দিয়ে ঘন ঘন উৎকণ্ঠ চাহনি নিক্ষেপ করছিল বক্রাকারে বিস্তৃত শ্বেতপথের দিকে। পাদচারণায় অস্থিরতা ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

হরিভক্ত অ্যাডমিরালকে ভক্তি করত প্রভু হিসেবে। কিন্তু দাদা হিসেবে অ্যাডমিরালকে তার চাইতেও বেশি ভক্তি করত অ্যাডমিরাল সহোদরা দময়ন্তী। ভদ্রমহিলা বাকপটিয়সী। তবে কথার তোড়ের সঙ্গে জলপ্রপাতের খানিকটা সাদৃশ্য আছে। মিষ্টভাষাবর্জিত চীৎকারেও তিনি পটু। কৌতুকপরিহাস জিনিসটা তাঁর কুষ্ঠিতে লেখা নেই। ভদ্রমহিলার আর এক নাম হিরন্ময়ী হওয়া উচিত। কেননা, দাদার কৌলিন্য বজায় রাখতে গিয়ে তিনি আপাদমস্তক কাঞ্চন অলংকারে ঢেকে রাখতে সদাব্যস্ত। হিরন্ময়ী ওরফে দময়ন্তী এই হলঘরেই উপস্থিত ছিলেন।

ঘরে উপস্থিত তৃতীয় ব্যক্তি একজন যুবতী। রূপসী। নাম মেখলা। অ্যাডমিরালের একমাত্র সন্তান। মেখলার টলটলে দুটি চোখ সদাই স্বপ্নছাওয়া। পিসীর মত কথার জলপ্রপাত নয় মেখলা। ঠিক উল্টো। অপ্রয়োজনে একটি শব্দও শোনা যায় না। কিন্তু শোনা যখন যায়, তখন মনে হয় বুঝি টুং-টাং করে কোথাও জলতরঙ্গ বাজছে। মেখলা বড় একটা হাসে না। কিন্তু যখন হাসে, তখন মনে হয় বুঝি জগৎজুড়ে আনন্দের হাট বসেছে, দোয়েল-কোকিল খুশীর গান গাইছে, নির্ঝরিণীর উৎস খুলে গিয়েছে।

দময়ন্তী ওরফে হিরন্ময়ী মাথা নাড়ালেন এবং স্বর্ণাকাঙ্ক্ষণীর ফাঁকে ফাঁকে বললেন—'এখনো এসে পৌঁছোলো না কেন বুঝছি না। অথচ সমুদ্রের ধার দিয়ে অ্যাডমিরালকে বাড়ি ফিরতে দেখেছে ডাকপিওন। সঙ্গে অবশ্য ঐ উটকো বিটকেল জীবটা ছিল, লেফটেন্যান্ট নীলকণ্ঠ। হরি, হরি... কেন যে বাঁদরটাকে লেফটেন্যান্ট বলা হয় বুঝি না?'

মেখলার বিষাদময় নয়নে বিদ্যুৎ খেলে গেল। বলল, 'লেফটেন্যান্ট বলেই বোধ হয় লেফটেন্যান্ট বলা হয়।'

দময়ন্তী নাসিকাধ্বনি করে বললেন,—'মরণ আর কি! অ্যাডমিরাল ওকে এখনও রেখেছে কেন বুঝি না।' ভাবখানা যেন লেফটেন্যান্ট নীলকণ্ঠ অ্যাডমিরালের বাড়ির চাকর। যখন তখন দূর-দূর করে তাড়িয়ে দিলেই চলে। প্রাক্তন নৌ-বীর দময়ন্তীর কথায় মনন অবলা এইরকমই। দাদাকে দাদা বলে ডাকলে রাগে লাগে। অ্যাডমিরাল না বললে তুষ্ট-তুষ্টি প্রকাশ পায় না।

মেখলা অনুচ্চকণ্ঠে বলল—নীলকণ্ঠ [illegible] [illegible] [illegible] পারে [illegible] [illegible] অফিসার হবে, এমন কোনো কথা নেই।'

'অফিসার!' নায়েগ্রা জলপ্রপাতের গর্জন শোনা গেল দময়ন্তী ওরফে হিরন্ময়ীর কণ্ঠে—'রামগড়ুরের ছানা আবার অফিসার হবে কী? অফিসার বটে সেক্রেটারী ইন্দ্রকীল। আহা! আহা! কি সুন্দর বক্তৃতা দেয়!'

হাসল মেখলা। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল যেন ত্রিভুবনে আনন্দের হাট বসে গেল। হেসে বলল—'তা ঠিক। বই পড়ে বক্তৃতা শেখা নীলকণ্ঠের ধাতে নেই। ও জিনিসটা ইন্দ্রকীল ভাল পারে। দুনিয়ার সব কিছুই বই পড়ে শিখতে পারে।'

অকস্মাৎ মুখ অন্ধকার হল দময়ন্তীর—'ইন্দ্রকীলও তো এখনো এল না।'

হাসি থামাল মেখলা—তাও তো বটে। না এলেই বা কী?'

পিসী জবাব দিল না। নীরবে এসে দাঁড়াল জানলার পাশে।

তখন হলুদ সন্ধ্যা ধূসর হতে হতে আবার সাদা হয়ে আসছে। কারণ, চাঁদ উঠছে। ধু-ধু সৈকত চাঁদের আলোয় অপরূপ হয়ে উঠেছে। মসৃণ বালির ওপর দিয়ে চোখ পিছলে যাচ্ছে অনেক দূর। কিন্তু গতিমুখ হচ্ছে এক জায়গায়। সেখানে লম্বা লম্বা তরুবীথির নীচে পাঁক, কাদা আর বদ্ধ জলভরা একটিমাত্র পুকুর। পাড়ে টিনের ছাউনি দেওয়া জেলেদের আস্তানা। বিচিত্র নাম আস্তানার। চাঁদের আলোতেও দূর থেকে সাইনবোর্ডটা দেখা যাচ্ছিল। জ্বল জ্বল করছিল নামটা—

সবুজ মানুষ।

তাস, জুয়া, দিশি মদের আড্ডায় এ নাম নিশ্চয় বেমানান। এ নামকরণের কোনো কারণও জানা নেই। সৃষ্টিছাড়া নামের ঐ টিনের ছাউনি ছাড়া নির্জন সৈকতে আর কিছুই চোখে পড়ল না। কিছুক্ষণ আগেই বালুকাভূমিতে অ্যাডমিরালকে হাঁটতে দেখা গিয়েছিল। কিন্তু এখন যেন তাঁকে ভূতে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে। পেছনের কিম্ভূতকিমাকার সেই বিচিত্র মূর্তিটিও যেন বাতাসে মিলিয়ে গিয়েছে। কান্ড দেখতে খুব তাড়াতাড়ি দৌড়োচ্ছিল সেক্রেটারী ইন্দ্রকীল। সে বেচারীও বুঝি কর্পূরের মত উবে গিয়েছে।

মাঝ দুপুরে কিন্তু দৃশ্যমান হল সেক্রেটারী। ঝাঁপবারের মত বাই বাই করে দৌড়ে এল কোথেকে। চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় তুলল। হাঁকডাক শুনে সকলে নেমে এসে দেখল কাগজের মত সাদা হয়ে গিয়েছে ইন্দ্রকীলের মুখ। পেছনে পুলিশ ইন্সপেক্টরের লালমুখ কিন্তু তথানন্দ থমথমে। সে মুখে প্রকারের সংকেত। মহাকালের শিঙনাদ। অবেক্ষো সবাই ভড়কে গেল।

ধীরে সন্দেহ ব্যাপারটা ভাঙা হল। অ্যাডমিরাল মৃতাবস্থায় পাওয়া গিয়েছে। শ্যাওলা, কাদা, পাঁক আর পচা জলভরা পুকুরটার মধ্যেই তাঁর শরীরটা নিস্প্রাণ দেহে। মারা গেছেন জলে ডুবে।

ইন্দ্রকীলের উৎসাহ আর উত্তেজনা কিন্তু অল্পক্ষণে বাঁধ পেল। জোয়ারের আলো

ফুটতে না ফুটতেই প্রশ্নে প্রশ্নে বেচারী পুলিশ ইন্সপেক্টরকে জর্জরিত করে ফেলল। 'সবুজ মানুষ' নামক আস্তানার অলিন্দের রাস্তা থেকেই ইন্সপেক্টরকে পাকড়াও করে এনেছিল ইন্দ্রকীল। কাজেই ভদ্রলোককে একটা আলাদা ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে এমন জেরা আরম্ভ করল যে বাইরের কেউ দেখলে ভাবত ইন্দ্রকীলই পুলিশ আর পুলিশ ইন্দ্রকীল। কিন্তু গোমড়ামুখো ইন্সপেক্টরকে দেখলে যতটা হাঁদাবোকা মনে হয়, আসলে ততটা নন। কেন না, ইন্দ্রকীলের প্রশ্নবাণগুলোকে তিনি সুকৌশলে ঘুরিয়ে ইন্দ্রকীলের দিকেই নিক্ষেপ করতে লাগলেন এবং মুখোমুখি-দুয়ে প্রশ্নকর্তাকেই প্রায় কোণঠাসা করে আনলেন।

'খুন দিলে ডিটেকটিভ হবেন?' সাহিক একটা কেতাব পড়ে দেশোয়ালী ডিটেকটিভের কায়দায় ইন্দ্রকীল বলেছিল—'আমার তো মশায় মনে হয় এ হোল সেই চিরাচরিত ত্রিভুজ। মানে, আত্মহত্যা, খুন অথবা দুর্ঘটনা।'

রামগড়ুর মার্কা পুলিশ ইন্সপেক্টর তখন বললেন—'অন্ধকার এমন কিছু গাঢ় হয়নি তখনও। তাছাড়া, পুকুরটাও চলার পথ থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে। কাজেই ভুল করে পুকুরে তিনি পড়ে যেতে পারেন না। দুর্ঘটনা অসম্ভব। আত্মহত্যার প্রস্তাবনাও অচল। কেন না, কে না জানে অ্যাডমিরালের মত কৃতী আর সুখী পুরুষ এ অঞ্চলে দ্বিতীয় আছে কি না সন্দেহ। তাঁর ঘরে শান্তি, কাজে শান্তি, মনে শান্তি, দেহে শান্তি। কাজেই খামোকা আত্মহত্যা করতে যাবেন কেন? টাকার ঘাটতি থাকলেও বরং কথা ছিল। কিন্তু উনি যে কোটিপতি, তা আপনিও জানেন, আমিও জানি।'

ইন্দ্রকীলের চক্ষু বিস্ফারিত এবং পরমুহূর্তেই সঙ্কুচিত হল মাথা নুয়ে। শেষ হতেই কাষ্ঠকণ্ঠে বলল—'তাহলে নিশ্চয় খুন।'

'অত ধড়ফড় করে কোনো সিদ্ধান্তে আসাটা ঠিক নয়। ইন্দ্রনীকীলের আবার সব কিছুই ধড়ফড় করে বলা অভ্যাস—অ্যাডমিরাল তো টাকার কুমীর। আপনি তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারী। বলতে পারেন এত টাকা কার ভোগে লাগবে। তিনি না থাকলে?

কাঁচুমাচু করে ইন্দ্রকীল বলল—'অত প্রাইভেট খবর রাখবার মত প্রাইভেট সেক্রেটারী আমি নই। অ্যাডমিরালের সলিসিটর্স-এর কাছে খোঁজ করলে উইলের খবর পেতে পারেন।'

'নাম কি সলিসিটর্স-এর?'

'মেসার্স শাই জিরাট মার্ট।'

'ঠিকানা?'

'কলুতলগাড়ি।'

ফাঁক পেলেই একটা চক্কর দিয়ে আসুন।'

ফাঁক এখুনি করে নিন। নিজে এখুনি যান।' ইন্দ্রকীলের মন আর টব সইছিল না। সঙ্গীদের চরণ নিজেই ধরাশায়ী একপাক ঘুরে এল।

তারপর হঠাৎ করে জিজ্ঞেস করল—লাশের কি হল?'

'পোস্টমর্টেম হচ্ছে। ডাক্তার কিরণ দেখছেন। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই রিপোর্ট দেবেন।'

'এক কাজ করলে হয় না? চলুন না, সলিসিটরের অফিসেই দেখা করা যাক ডাক্তারের সঙ্গে।' বলতে বলতে অকস্মাৎ স্তব্ধ হল ইন্দ্রনীল। এতক্ষণ চোখেমুখে কৌতূহলভাব ছিল, এবার দেখা গেল বিমূঢ়তা।

বলল—দেখুন স্যার, অ্যাডমিরালের মেয়ের কথাটাও তাদের দরকার। প্রেমিকা বলে নাকি এ সবই ঢং-ঢাং। মানে বুঝলেন? মানে হল ফক্কা। কিসসু না। আমরা নাকি ছেলেখেলা করছি। কি কাণ্ড বলুন তো! কোথাকার এক ফালতু ঘনশ্যাম, তার ওপর অগাধ আস্থা প্রেমিকার। ঠিকানাও দিয়েছে আমাকে। যত্তো সব......পাদরী-ফাদরীদের আমি আবার—বুঝলেন কিনা—তেমন আমোল দিই না।'

'পাদরীদের আমিও আমোল দিই না,' বললেন ইন্সপেক্টর। 'তবে ঘনশ্যাম পাদরীকে দিই। হীরে চুরির একটা বিদঘুটে মামলায় ফাদার ঘনশ্যামের কীর্তি আমি দেখেছিলাম ভদ্রলোকের পাদরী না হয়ে দারোগা হওয়া উচিত ছিল।'

'তাহলে ফাদারকেও সলিসিটরের অফিসে আসতে বলি' বলে ঘর থেকে রকেটের মত বেরিয়ে যেতে যেতে বলল ইন্দ্রনীল।

সলিসিটরের অফিসে পৌঁছে দেখা গেল এক বিচিত্র মূর্তিকে। চাঁদপানা মুখে হাসি আর ধরে না। ফ্যালফেলে চাহনিতে নির্বোধ-ভাব। মস্তোবড়ো ভাঁটিভাঙা চশমা। কালো আলখাল্লায় কাদা আর ধুলোমাখা। প্রায় সমস্ত তালিমারা ভাঙা ছাতাটি মিউজিয়ামে রাখবার মত। বিশেষ আয়েস করে চেয়ারে বসেছিল আহাম্মক প্যাটার্নের এই সজীব বস্তুটি। হেসে হেসে গল্প করছিল সলিসিটরের সঙ্গে।

ডাক্তার কিরণ বোসও সেই মুহূর্তেই পৌঁছেছিলেন। হাতের ব্যাগটা তিনি কোণের টেবিলে রাখলেন। এক দৃষ্টে চেয়ে রইলেন ঘনশ্যাম পাদরীর বোকা বোকা হাসি হাসি মুখের দিকে।

মুখ দেখে ইন্দ্রনীল এবং ইন্সপেক্টর দুজনেই বুঝল, দুঃসংবাদটা এখনো ডাক্তার কাউকে জানান নি। জানালে কারোরই হাসি উবে যেত। মুখ আমসি হত।

ঘনশ্যাম পাদরী বলছিল—কি মিষ্টি সকাল বলুন তো। রাতের ঝড় ভালই করেছে। ধুলো ময়লা উড়িয়ে নিয়ে গেছে—কিন্তু এক ফোঁটাও বৃষ্টি ফেলেনি।'

'তা যা বলেছেন,' একটা ফাউন্টেন পেন নাড়াচাড়া করতে করতে বলল সলিসিটর মিঃ মূর্তি। 'আকাশ তো দেখছি নির্মেঘ। ঠিক যেন ছুটির দিন।' বলতে বলতেই চোখ পড়ল আগন্তুকদের ওপর। কলম রেখে উঠে দাঁড়াল। —'আরে ইন্দ্রনীলবাবু যে! আছেন কেমন? অ্যাডমিরাল ফিরেছেন?'

॥ পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে চলছে ॥

দর্শক ও সমালোচক প্রশংসায় পঞ্চমুখ......

অমৃত বলেন :—ছবির নাম-ভূমিকায় সন্ধ্যা রায় নাচে, সংগীতে যে অসামান্য নাট্যনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন, তা এই ভূমিকাটিতে তাঁর শিল্পিজীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বলে চিহ্নিত করে রাখবে।......"রূপসী" কাহিনীর প্রাণোচ্ছলতায়, অভিনয়ের অসাধারণত্বে এবং সর্বোপরি সঙ্গীতের সুরমায় ভরপুর হয়ে অসামান্য জনপ্রিয়তা লাভ করবে।

দেশ বলেন :—ছবির বিশেষ আকর্ষণ সন্ধ্যা রায়ের স্বচ্ছন্দ অভিনয়। তাঁর প্রাণোচ্ছলতার গুণে রূপসী ভাল লাগছে।

Amrita Bazar Patrika বলেন :—Sandhya Roy, in the title role, is easily the top scorer with her rustic airs and playfully changing moods, in all of which she sounds just right.

আনন্দবাজার পত্রিকা বলেন :—নাম-ভূমিকায় সন্ধ্যা রায়ের অভিনয় যেমন স্বচ্ছন্দ, তেমনই প্রাণোচ্ছল।

যুগান্তর বলেন :—সন্ধ্যা রায়—দুরন্ত স্বভাবের এই উজ্জ্বল চরিত্রের সঙ্গে তিনি অনেকাংশে একীভূত হতে পেরেছেন—নাচে এবং সঙ্গীতেও।

অরুণ রায়চৌধুরী প্রযোজিত

সন্ধ্যা রায় • অনিল চট্টোপাধ্যায় • ... ও অজিত গাঙ্গুলী

কাহিনী চিত্রনাট্য ও পরিচালনা অজিত গাঙ্গুলী সুর অনিল বাগচী

রাধা : পূর্ণ : জ্যোতি
(২॥, ৫॥, ৮॥) (২॥, ৫॥, ৮॥) (২॥, ৫॥, ৮॥)
পদ্মশ্রী : আলোছায়া : এরোরা : অলকা : মায়া
পার্বতী (১২৷, ৩৷, ৬) : জয়শ্রী : তোপসে : কল্যাণী : রূপা
মীনা : মৃণালিনী (১, ৪, ৭) : কৈরী ও অন্যান্য।

এতক্ষণে কথা বলল সেক্রেটারী ইন্দু-কীল। ভিজে ভিজে গলা ভয়ভ্রষ্টের মতই গমগম করে ঘরের মধ্যে।

বলল—'না, আর্ভামিয়াল ফেরেন নি। ফিরবেন না। কাল রাত্তিরে উনি জলে ডুবে মারা গিয়েছেন।'

সব চুপ। হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনও বুঝি সকলের সাময়িকভাবে স্তব্ধ হয়ে গেল। নিথর নিস্পন্দ দেহে তাকিয়ে রইল সার্জিস্টের এবং পাদরী। জলে ডুবে' শব্দ দুটি দার কয়েক দুজনেই বিড় বিড় করে উচ্চারণ করল। তারপর শুরু হল প্রশ্নের তুড়তুড়ানি।

'কবে? কখন?' কাদারের প্রশ্ন।

'লাশ কোথায়?' সার্জিস্টের প্রশ্ন।

'সমুদ্রে মানুষের পাশেই, জবাব দিল ইন্সপেক্টর। 'সমুদ্রের ধারে নোংরা পুকুরটায়। শ্যাওলা, কাদা, পাঁকে চেনা যাচ্ছিল না আর্ভামিয়ালকে। ডাক্তার কিনি অবশ্য—ও কী! কাদার! কী হল? শরীর খারাপ?'

থর থর করে কেঁপে উঠল কাদার—'সমুদ্র মানুষ! না, না, তেমন কিছু নয়। মাথাটা হঠাৎ ঘুলিয়ে গেল।'

'কেন ঘুলোলো?'

'সমুদ্র শ্যাওলায় আর্ভামিয়াল নিজেই সমুদ্র মানুষ হয়ে গিয়েছিলেন বলে।' কাষ্ঠহাসি হাসল বেঁটে পাদরী। 'শ্যাওলাটা সমুদ্রের হলেই বরং মানাতো।'

'সমুদ্রের শ্যাওলা?'

'মানে, সামুদ্রিক উদ্ভিদ।'

স্থির চোখে সবাই দেখছিল খর্বকায় পাদরীর চাঁদপানা মুখ। লোকটা যে পাগল, সে বিষয়ে কারোরই তিলমাত্র সন্দেহ ছিল না। ছিটিয়াল সন্দেহ ওরকম। মনে মনেই বলল ইন্দুকীল।

অথচ নৈরাশ্য খানখান হল ডাক্তার কিনির অমোঘ কণ্ঠে। উনি বললেন—'আর্ভামিয়াল সত্য জলে ডুবে মৃত্যু সম্বন্ধে শেষ কথাটা এখনো বলা হয়নি।' বলে একটু থামলেন। পিদমি পাদরীর দিকে কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন এবং শেষ করলেন—'আর্ভামিয়াল হয়ত সত্য জলে ডুবে মরেন নি।'

সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য চৈতন্যের মত তীক্ষ্ণ কণ্ঠে মুহূর্তেই একটা প্রশ্ন নিক্ষেপ করল ইন্দুকীল।

ডাক্তার তার জবাবে মৃদু-মধুর কণ্ঠে বললেন—' লাশকাটা টেবিলে আর্ভামিয়ালকে আমি উল্টে পাল্টে দেখেশুনে দেখেছি।

'মাথার পিছনে মুখে বাঁধিয়ে ওঁকে খুন করা হয়েছে। লাশটা জলে ফেলা হয়েছে তার অনেক পরে।'

কাদার কলিমার কিছু বলল না। শুধু মিটমিট করতে লাগল ডাক্তার কিনিকে। কুতকুতে চোখ দুটিকে বড্ড বেশী প্রদীপ্ত মনে হল। সেক্রেটারী ইন্দুকীল মিশটোরী গলায় জানতে চাইল আর্ভামিয়ালের উইল বৃত্তান্ত। উইলটাই নিশ্চয় রহস্যের খনি। অর্থই অনর্থের মূল।

'উন থেকে তাল বানানোর প্রচেষ্টা হিসেবে ধুলিসাৎ হয়ে গেল সার্জিস্টের জবানিতে। ভদ্রলোক সবিনয়ে জানালেন, রহস্যের নামগন্ধ নেই তাঁর উইলে। স্থাবর-অস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তি তিনি মরণের পর মেখলাকে দিয়েছেন।

শুনে কেমন চুপসোনোর মত চুপসে গেল ইন্দুকীল। ইন্সপেক্টরের গোয়েন্দামুখে অবশ্য ভাবান্তর ঘটল না। একে-একে সার্জিস্টের ঘর থেকে রাস্তায় নামল সকলে। হন্তদন্ত হয়ে আগে আগে চলল ইন্দুকীল। ঘনশ্যাম পাদরী কিন্তু ডাক্তারের পাশে সেঁটে রইল।

ডাক্তার কিনি অপাঙ্গে দেখলেন পিদমি পাদরীকে। বললেন,—'কি ভাবছেন?'

'ভাবছি আর্ভামিয়ালের মেয়ের কথা' চোখ পিটপিট করে বলল ঘনশ্যাম। 'মেয়েকেই জানি। আর্ভামিয়ালের সঙ্গে শুধু মুখচেনা।'

'আপনি যা ভাবছেন, তা নয়। আর্ভামিয়াল অজাতশত্রু, অকস্মাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন ডাক্তার।

'অজাতশত্রুরও শত্রু থাকে। সেগুলো বোধহয় আমাকে বলা যায় না? পাদরী ঘনশ্যামকে একথা কিন্তু আহাম্মক মনে হল না।

ফোকাসের দেখা কঠিন হল ডাক্তারের। বললেন—দেখুন মশায়, ভদ্রলোক ভয়ানক বদমেজাজী ছিলেন। একটা অপারেশনের ব্যাপারে আমাকে হুমকি দিয়েছিলেন কোর্টে যাবেন। পরে অবশ্য সুবুদ্ধির উদয় হয়েছিল। ওরকম তেজিয়া মেজাজের লোক অধস্তন কর্মচারীদের জুলজুলায় করবে, এ আর আশ্চর্য কি।'

ঠিক এই সময়ে কাদার ঘনশ্যামের দৃষ্টী-চক্ষু নিবদ্ধ হল বাবয়াম ইন্দুকীলের ওপর। ইন্দুকীল সহসা কেন দৌড়োচ্ছে। কেন দৌড়োচ্ছে, তাও দেখা গেল। মত্ত-তরুনের দিকে ঘাড় হেঁট করে হাঁটছে মেখলা। দেখতে দেখতে মেখলার নাগাল ধরে ফেলল ইন্দুকীল। তারপর যেন উদ্ভ-কণ দুটি চলমান মূর্তির পৃষ্ঠদেশে যে নীরব অভিনয় মঞ্চস্থ হল, তা অনিমেষে অবলোকন করল ঘনশ্যাম পাদরী।

সামনেই ডাক্তারের বাড়ি। দুম করে কাদার জিজ্ঞেস করল —'তাহলে আপনার আর কিছু বলার নেই?'

'কেন থাকবে?' সমান বেগে জবাব দিলেন ডাক্তার। কেনই বা কিছু বলার থাকবে এবং কেনই বা তিনি তা বলবেন না—এ প্রসঙ্গ শূন্যে রেখেই তিনি সহসা অন্তর্হিত হলেন বাড়ির মধ্যে।

থপথপ করে একাই চলল কাদার ঘন-শ্যাম। দেখল, মত্ত-তরুনের তোরণের সামনে পৌঁছেছে ওরা দুজন। তারপরেই একটা কাণ্ড ঘটল। আচমকা বোঁ করে ঘুরে দাঁড়াল মেখলা। হনহন করে এল কাদারের সামনে? ফিসফিস করে বলল—'কাদার, কাদার, জরুরী কথা আছে। এখুনি শুনতে হবে।'

'নিশ্চয় শুনব', সহজ গলায় বলল কাদার—'কোথায় বসি বলো তো?'

'মাঠে', বলে মেখলা নিজেই আগুয়ান হল। একটা ঝোপের সামনে অসঙ্কোচে বসল। কাদারের হাত ধরে টেনে বসালো সামনে। কালবিলম্ব না করে বলল—'ইন্দু-কীল ভয়ানক ভয়ানক কথা বলছে।'

ঘাড় কাৎ করল কাদার। ভাবখানা, তা তো বলবেই।

'কথাটা নীলকণ্ঠ সম্পর্কে। চেনেন নীলকণ্ঠকে?'

'শুনেছি জাহাজে নীলকণ্ঠকে সবাই 'জলি নীলকণ্ঠ' বলে। কারণ, ঠিক উল্টো। নীলকণ্ঠ মোটেই 'জলি' নয়। বরং বোম্বেটে-দের মত গোমড়া। মুখ তো নয় যেন নারকোটি।'

'নীলকণ্ঠ এখন 'জলি' নয় বটে—কিন্তু এককালে ছিল', বাতাসের মত সুরে বলল মেখলা। ঐ যে নির্জন সৈকত দেখছেন, ঐখানে আমরা দুজনে কত খেলা খেলেছি। ওর মত হাসিখুশী আমুদে মানুষ আমি জীবনে দেখিনি। ওর বড় সখ ছিল জাহাজে চাকরী করবে। বোম্বেটেদের মত দাঁতে ছুরি কামড়ে মাস্তুল বেয়ে ওপরে উঠবে। কোমরে তরোয়াল বেঁধে সাত সমুদ্র পাড়ি দেবে। ওর সে স্বপ্ন সফল হয়েছে কিনা জানি না—কিন্তু জাহাজে চাকরী নেওয়ার কিছু-দিন পর থেকেই ওর মুখের হাসি মিলিয়ে গিয়েছে। বোধহয় নীলকণ্ঠের স্বপ্ন ভঙ্গ হয়েছে। তাই হাসতে ভুলে গিয়েছে। আমাকেও ভুলতে চাইছে। আমার ধারে কাছেও আসতে চায় না—এড়িয়ে যায়। মনে হয়, স্বপ্নভঙ্গ ছাড়াও মস্ত একটা বেদনা ওর বুক ভেঙে দিয়েছে। ইন্দুকীলের মুখে এখন যা শুনলাম, তা যদি সত্যি হয়। তাহলে বলব নীলকণ্ঠ পাগল হয়ে গিয়েছে। নয়তো ওর ঘাড়ে ভূত চেপেছে।'

'কি বলেছে ইন্দুকীল?' কাদারের প্রশ্ন।

'ভয়ংকর কথা বলেছে, বলতেও কষ্ট হয়। ইন্দুকীল নিজের চোখে দেখেছে কাল সন্ধ্যায় বাবার পেছন নিয়েছিল নীলকণ্ঠ। কিছুতেই যেন মনস্থির করতে পারছিল না। তারপর আচমকা তরোয়াল টেনে বার করে-ছিল...ডাক্তারের মুখে শুনেছেন তো বাবার বুকে শুধু ফলা ঢুকিয়ে কেউ খুন করেছে...বাবার সঙ্গে নীলকণ্ঠের কথা কাটাকাটি হত জানি। কিন্তু তার জন্যে খুন করা যায় না। নীলকণ্ঠ এককালে বন্ধু ছিল বলে এত কথা বলছি ভাববেন না। নীলকণ্ঠ এখন আর বন্ধু তো নয়ই—আমাকে চিনতেও পারে না। কিন্তু আমি জানতে চাই, কেন ইন্দুকীল মিথ্যে বলে বলল—'

'ইন্দুকীল সব কিছুই মিথ্যে বলেছে বলে', ধীরে সুস্থে বলল কাদার ঘনশ্যাম।

কিছুক্ষণ সব চুপ। তারপর মেখলা কথা বলল। এবার একেবারে আলাদা সুরে।

'ইন্দুকীল আরও কিছু বলছে।'

'আরও কিছু?'

'আমাকে বিয়ে করতে চাইছে।'

'অভিনন্দনটা কাকে জানাই বলো তো? তোমাকে না, ইন্দুকীলকে?'

খোঁচটুকু যেন গায়ে মাখল না মেখলা। বলল—'আমি বলছি পুরো চব্বিশ ঘণ্টাও যায়নি আমি বাবাকে হারিয়েছি। এর মধ্যেই এত বিয়ে পাগল হওয়া সাজে না। তাছাড়া সবুরে মেওয়া ফলে।'

'মেওয়া!' কথায় ঘনশ্যামের নির্বোধ মুখে যে ভাব জাগ্রত হল, অভিধানে তার নাম অবশ্য কৌতুক।

'ইন্দুকীল বলছে, আমি তার স্বপ্নের রাণী, নয়নের নিধি। আমি ছাড়া তার জীবন বৃথা। ইন্দুকীল নাকি কবে আমেরিকায় ছিল, সে কথাও বলল। কিন্তু তার প্রমাণ পেলাম ওর হিসেবী মন দেখে।'

পাদরী ঘনশ্যাম গম্ভীর হল—'বুঝেছি। ইন্দুকীলের ব্যাপারে মনস্থির করার আগেই তুমি নীলকণ্ঠর ব্যাপারটা খোলসা করতে চাও।'

নিমেষে যেন একমুঠো ফাগ পড়ল মেখলার টুকটুকে সুন্দর মুখে। নিখুঁত সতেজ আনন ক্ষণেকের জন্য বিহ্বল হল। পরমুহূর্তেই হাসল মেখলা। বুঝি একঝাঁক পায়রা উড়ে গেল নীল আকাশে। ত্রিভুবনে আনন্দের হাট বসে গেল। মুখ টিপে শুধু বলল—'বাঃ!'

কিছুক্ষণ সব চুপ। মেখলার মুখে স্বর্গসুখের আভাস। তারপর পত্র মর্মরের সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলল মেখলা—'ফাদার!'

'বল।'

'আপনি বড্ড বেশি জেনে ফেলেছেন।'

'নারে! তেমন কিছুই জানিনি। শুধু একটি ছাড়া।'

'কোনটা?'

'তোমার বাবাকে যে খুন করেছে।'

তড়িতাহতের মত সিধে হয়ে বসল মেখলা। সাদা হয়ে গেল মুখ। ঘনশ্যাম পাদরী ঘাস ছিঁড়তে ছিঁড়তে যেন ছিন্ন ঘাসকেই উদ্দেশ করে বলল—'আমি একটা প্রকাণ্ড উজবুক। খুনীর নাম যখন প্রথম টের পেলাম, তখন এমন 'সিন ক্রিয়েট' করলাম যে সবাই ভাবল আমি বুঝি পাগল।'

'কখন টের পেলেন?'

'যখন ওরা সবুজ শ্যাওলা আর 'সবুজ মানুষ' নিয়ে কথা বলছিল।'

বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল পিগমী পাদরী। জম্বো ছাতাকে বগল দাবা করার বহর দেখেই বোঝা গেল মতলব স্থির। কঠিন সংকল্প চিক-চিক করল কুতকুতে ঐরাবত-চোখে।

বলল বেজায় গম্ভীর গলায়—'মাথ মেখলা, যা বললাম, তা ছাড়াও আমি আরও কিছু জানি। কিন্তু তোকে বলব না। খবরটা খারাপ সন্দেহ নেই, কিন্তু তুই যতটা খারাপ ভাবছিস ততটা নয়। আমি এখন চললাম নীলকণ্ঠ দর্শনে। শুনেছি, সমুদ্রের ধারে 'সবুজ মানুষ'-এর আশপাশে কোথাও যেন থাকে ছোকরা। ইন্দুকীল অবশ্য ঐখানেই ঘুর ঘুর করতে দেখেছিল ওকে। দেখা যাক,' বলে চলন্ত জালার মত বেগে উধাও হল ঘনশ্যাম পাদরী।

মেখলা সাত-পাঁচ ভাবতে লাগল। উদ্ভট উদ্ভট চিন্তা মাথায় আকার নিতে লাগল। ফাদারের অকস্মাৎ লম্ফ নিয়ে গবেষণা করল। সবুজ শ্যাওলা আর সবুজ মানুষ সম্পর্কিত হেঁয়ালি নিয়ে আকাশ-পাতাল কল্পনা করল। ভরদুপুরেও মনে হল যেন যক্ষবক লক্ষ লক্ষ অট্ট অট্ট হাসছে। মনে হল, সাগরপাড়ের নোংরা জলার কাদা আর পাঁকে সবুজ প্রেত বিচরণ করছে। যেন 'সবুজ মানুষ' নিছক আস্তানা নয়—কারাহীনদের ষড়যন্ত্র-গৃহ।

সূর্য অস্ত যাবার আগেই একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। মেখলা যা হারিয়েছিল, তা আবার ফিরে পেল। কিন্তু মনে হল, দুনিয়াটা বুঝি সহসা উল্টে গেছে। নইলে এমন অসম্ভব কাণ্ড কেন ঘটবে? কেন এত বছর পর বিস্তীর্ণ বালুকাভূমির ওপর দিয়ে দীর্ঘ পদক্ষেপে নীলকণ্ঠকে এগিয়ে আসতে দেখা যাবে? কেনই বা দূর থেকে মনে হবে নীলকণ্ঠ আবার আগের নীলকণ্ঠ হয়ে গিয়েছে? সেই রকম হাসি-খুশী, প্রাণবন্ত উজ্জ্বল?

বহু দূরে প্রথমে বিন্দুর মত দেখা গিয়েছিল নীলকণ্ঠকে। কিন্তু তবুও মেখলার মনে হয়েছিল সচল কিছুটা যেন আনন্দে আটখানা, খুশীতে ডগমগ! দৃষ্টি-বিভ্রম নয় তো?

কাছে আসতে মেখলা দেখল, না ভুল নয়। নীলকণ্ঠই বটে। কিন্তু যেন মন্ত্রবলে পালটে গিয়েছে তার মুখের চেহারা। আনন্দ, উল্লাস, হাসি যেন ঝলমল করছে তার অবয়ব ঘিরে। নীলকণ্ঠ... সেই নীলকণ্ঠ...বহু বছর আগের নীলকণ্ঠই আবার ফিরে আসছে...বিষণ্ণ নয়—প্রসন্ন নীলকণ্ঠ...সোজা সামনে এল সে। শক্ত মুঠিতে মেখলার দু কাঁধ চেপে ধরল...কসাইদের মত [illegible] চোখে মেখলার বিহ্বল মুখ দেখল...তারপর অট্টহাসে বলল—'মেখলা, এবার তো আমিই তোমায় দেখব।'

মেখলা কেন কিরকম হয়ে গেল। কি বলল, তা ও নিজেই জানল না। বুকফাটা বেদনাই ঝরে পড়ল আকুল কটি কথার মধ্যে। জানতে চাইল, কেন, কেন নীলকণ্ঠর এই পরিবর্তন? কেনই বা আনন্দে আটখানা তার চিত্ত?

'কেন জানো না?' সকৌতুকে বলল নীলকণ্ঠ—'দুঃসংবাদটা এই মাত্র শুনলাম যে!'

•

মঙ্গু-ভবনের সামনের বাগানে সেদিন সবাইকে দেখা গেল। [illegible] রাকা দত্তর সলিসিটর মিঃ মূর্তিও এসেছে।

মক্কেলের মৃত্যুতে তার কাজ বেড়েছে। উইলের খুঁটিনাটি নিয়ে আলোচনা করা দরকার। তাই সবার মনেই কৌতূহল।

এসেছে সবাই। যাদের দরকার, তারা তো বটেই; যাদের দরকার নেই, তারাও বাদ যায়নি। যেমন পুলিশ ইন্সপেক্টর। দুই চোখে তাঁর জীবন্ত জিজ্ঞাসা। এনার্জি-ঠাসা পিস্টন-রডের মত ছটফট করছে প্রাইভেট সেক্রেটারী ইন্দুকীল। উল্কাবেগে ছুটে যাচ্ছে, অভ্যাগতদের বাগানে ডেকে আনছে এবং পরমুহূর্তেই আবার নক্ষত্র-বেগে উধাও হয়ে যাচ্ছে নতুন অভ্যাগতদের খাতির করতে। লেফটেন্যান্ট নীলকণ্ঠ লাজ-লজ্জার বালাই না রেখে মেখলাকে নিয়ে প্রজাপতির মত ফুরফুর করছে। একটা বদাকার ছাতাকে অবলম্ব করে বেজায় বিদঘুটে এক খাটো পাদরীও দাঁড়িয়ে আছে একধারে। [illegible] নিরেট মুখের নির্বোধ চাহনি দেখে অনেকেই মুচকি হেসে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে।

অভিনয় সৌকর্য, পরিবেশন পদ্ধতি সব কিছুতেই একটা স্বতন্ত্র নিষ্ঠা আর পরিচ্ছন্ন রুচির ছাপ পরিপুষ্ট। দেখে নির্দ্বিধায় বলা যায় লোকনাট্য এবার যাত্রা আসরের

অন্যতম শ্রেষ্ঠ দল

লোকনাট্য

সামনে সজাগ বৃটিশ বেড়াজাল, পিছনে বেইমান জাপানী সাম্রাজ্যবাদ, তার মাঝে ডিনামাইটের বিস্ফোরণে ঝলসে উঠলো আজাদ হিন্দ গেরিলাদের বিপ্লব দীপ্ত মুখ—ভারত মুক্তি যজ্ঞের হোমানলে উদ্ভাসিত। অসংখ্য মুখের মিছিল, আর সুভাষের আহবান—

দিল্লী চলো

*

সমুদ্র শাসন

রচনা ও পরিচালনা—উৎপল দত্ত

* উপর তলার বিলাস :—ক্যাবারে, ট্যুইস্ট, লক্ষ টাকার ফ্যাসান :—
* মাঝে আর্ণবক্রয়ের বিষাক্ত বেদনা।
* নীচে :—সর্বহারার বোবা কান্না।

বর্তমান সমাজের তিনটি দিক।

পাঁচ পয়সার পৃথিবী

রচনা—ভৈরব গাঙ্গুলী

আগামী নাট্যার্ঘ

উৎপল দত্ত রচিত ও পরিচালিত

লাল নিশান

[১৯৪৬ সালে ভারতের জনগণ শুরু করেছিলেন মুক্তিযুদ্ধ। সে যুদ্ধ ব্যর্থ হোলো কেন? সে বীরত্ব কি বিফলে গেল ?]

প্রযোজনা লোকনাট্য ৩৬৮ রবীন্দ্র সরণী কলিকাতা—৬ * ৩৩২৫১৭

বাগানের সবুজ লনে পুরো দলটাকে দাঁড় করিয়ে রেখে সহসা বাড়ির মধ্যে উধাও হল ইন্দুকীল। আপ্যায়নের আয়োজন সম্পূর্ণ করেই ফিরে আসছে—এ কথাও বলে গেল। চোখের আড়াল হতেই ফিসফিসিয়ে বলল নীলকণ্ঠ—'দেখলেই মনে হয় যেন ক্রিকেট খেলছে—রান তুলতেই ব্যস্ত।'

সলিসিটর বলল—'ছোকরা যেন ঘোড়ায় জিন দিয়ে এসেছে। আমার ওপরেই তাম্বি করে গেল কেন উইল অনুযায়ী তাড়াতাড়ি কাজ করছি না। মেখলা কিন্তু বোঝে। দেরির জন্যে তাগাদা লাগায় না।'

ফস করে ডাক্তার বললেন—'ছোকরা কিন্তু দিব্যি চটপটে। বেশ চৌকস।'

নীলকণ্ঠ ভুরু তুলল—'মানেটা বোঝা গেল না। চটপটে হওয়াটা কি দোষের?'

'মোটেই না, মোটেই না,' ডাক্তার নিজেই প্রহেলিকা হলেন—'শুধু চটপটে হলেতো ভালই হত। সেই সঙ্গে বড্ডো নিরুদ্বিগ্ন কিনা।'

'এটা কি শব্দ-জব্দর নতুন খেলা?' একটু রূঢ় শোনালো নীলকণ্ঠর গলা।

'আজ্ঞে না। ইন্দুকীলবাবু ভীষণ চটপটে। পায়ে যেন অষ্টপ্রহর পাখা লাগানো। কিন্তু বলতে পারেন, এ হেন পা-পাখা মানুষটা রাতদুপুর পর্যন্ত পুকুর আর 'সবুজ মানুষের' আশপাশে কেন ঘুটঘুট ঘুরঘুর করল? কেনই বা ইন্সপেক্টরের না আসা পর্যন্ত নির্ভাবিত হয়ে রইল। ইন্সপেক্টরই এসে লাশ আবিষ্কার করেন, তাই না? ইন্সপেক্টরের সঙ্গে 'সবুজ মানুষ' আড্ডাখানায় বাইরে রাতদুপুরে মোলাকাৎ করার কি দরকার ছিল ইন্দুকীলবাবুর?'

নীলকণ্ঠ পলকহীন চোখে চেয়ে রইল। বলল—'ইন্দুকীল তাহলে মিথ্যে বলছে?'

ডাক্তার মৌনী হয়ে গেলেন। অট্টহাস্য করল সলিসিটর।

বলল—'ছোকরার বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ শুধু একটাই। আইন নিয়ে আমাকে জ্ঞান দিতে আসাটা ধৃষ্টতার শামিল নয় কি?'

এবার মুখ খুললেন পুলিশ ইন্সপেক্টর—'তা যদি বলেন তো সে অভিযোগ আমারও আছে। ভদ্রলোক আমাকেও গোয়েন্দাগিরি নিয়ে জ্ঞান দিতে এসেছিলেন। কিন্তু সেটা দোষের নয়। দোষের হল ডাক্তারবাবু যা বললেন। সিরিয়াস ব্যাপার। এ প্রশ্নের জবাব ইন্দুকীলবাবুকে এখনি দিতে হবে।'

নীলকণ্ঠ বলল—'ঐ তো আসছে ইন্দুকীল।'

বোরাগাড়ায় দেখা গেল চন্দনে সেক্রেটারীকে। কিন্তু কেউ কিছু বলার আগেই অতর্কিতে ঠিক যেন শর্ষচিলের ডাক শোনা গেল।

সচমকে সবাই দেখল কদাকার পাদরী লাট্টুর মত পাক খেতে খেতে সবার আগে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। দুহাত তুলে রাস্তা আটকেছে এবং অবিকল শর্ষচিলের মত তীক্ষ্ণ গলায় চেঁচাচ্ছে—'দাঁড়ান! এগোবেন না! ইন্দুকীলবাবুকে আগে আমি একটা কথা বলব। সেটা বলা না হলে জানবেন যাচ্ছেতাই রকমের একটা ভুল বোঝাবুঝি হবে।'

'এটা কি ধরনের তামাসা?' চোয়াল শক্ত হল সলিসিটরের।

'তামাসা নয়—সুসংবাদ,' বলল ফাদার ঘনশ্যাম।

'দেখুন ফাদার,' চোখ গরম করে কি বলতে গিয়ে থেমে গেলেন ইন্সপেক্টর। কেননা, হঠাৎ মনে পড়ল এর আগেও কয়েক ক্ষেত্রে এরকম তামাসা দেখিয়েছে বেঁটে পাদরী এবং প্রতিবারে ভেল্কিও দেখা গেছে। 'নেহাৎ আপনি বলে আমি—'

ফাদার ঘনশ্যাম মণ্ডল ততক্ষণে সচল জালার মতই বিস্ময়কর বেগে দৌড়োচ্ছে ইন্দুকীলের দিকে। দুজনেই হাত মুখ নেড়ে কিছুক্ষণ পায়চারী করল গাড়ি-বারান্দায়। অন্তর্হিত হল বাড়ির মধ্যে। মিনিট বারো পরে ফাদার ঘনশ্যাম একাই বেরিয়ে এল—ইন্দুকীল নয়।

তাজ্জব কাণ্ড! বাড়ির মধ্যে পুনঃপ্রবেশের কোনো বাসনাই দেখাল না ফাদার। সবাই যখন গোভাবাতা করে সদর দরজা পেরুলো, পাদরীঘনশ্যাম তখন সবুজ লনে ধপাস করে বসে পড়ল। পাইপ ধরিয়ে স্মিত মুখে বিহঙ্গ-কূজন শুনতে লাগল। দুই চোখে ভাসতে লাগল নিবিড় প্রশান্তি।

•

সদর দরজা আবার যখন সশব্দে দুহাট হল, ফাদার ঘনশ্যাম মণ্ডল তখন তামকূটের পুরু পুরু ধূম্রে সম্পূর্ণ আচ্ছাদিত। সবার আগে দৌড়ে এল মেখলা আর নীলকণ্ঠ। দুই চোখে তাদের বিপুল বিস্ময়। পেছনে পদভরে মেদিনী কাঁপিয়ে এলেন ইন্সপেক্টর। থমথমে মুখে প্রচণ্ড ক্রোধ।

মেখলা জলতরঙ্গ-ঝংকারে বলল—'ফাদার, একী কাণ্ড! ইন্দুকীল নেই!'

'পালিয়েছে!' সমান তেজে বলল নীলকণ্ঠ—'সুটকেশ নিয়ে চম্পট দিয়েছে ইন্দুকীল। ফাদার, কি বলেছিলেন ওকে?'

রুদ্ধশ্বাসে মেখলা বলল—'বলবেন আবার কি? যা সত্যি তাই বলেছেন। উঃ, হাড়ে হাড়ে এত বদমাসি ছিল?'

বোমার মত ফাটলেন ইন্সপেক্টর—'একী করলেন ফাদার? এভাবে আমার মাথা হেঁট করলেন কেন?'

'আমি?' চোখ কপালে তুলল ফাদার ঘনশ্যাম, 'কী করেছি আমি?'

'কি করেন নি?' ইন্সপেক্টরের বিকট চীৎকারে সামনের গাছের পাখীগুলো ভয় পেয়ে আকাশে উড়ল।' খুনে বদমাসটাকে আপনি পালাতে দিয়েছেন, হাতে হাত মিলিয়েছেন।'

'অতীতে অনেক খুনে বদমাসের হাতে আমি হাত মিলিয়েছি ঠিকই,' থেমে থেমে বলল ফাদার ঘনশ্যাম, 'কিন্তু খুনে কখনো নয়।'

মেখলা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলল—'আপনি কিন্তু জানতেন। তাই লাশ পাওয়ার খবর শুনে আপনি ওরকম হয়ে গেছিলেন। ডাক্তারবাবুও বলেছিলেন, অধস্তন কর্মচারীরা দুচক্ষে দেখতে পারেনি বাবাকে।'

'ছিঃ, ছিঃ, গোড়া থেকেই আপনি জানতেন—' ইন্সপেক্টরের শুরু করলেও তাঁর মুখের কথা লুফে নিয়ে বলল মেখলা—'জানতেন আসল হত্যাকারী আসলে—'

'সলিসিটর মিঃ মূর্তি,' ধীর গম্ভীর কণ্ঠে শেষ করল ফাদার ঘনশ্যাম মণ্ডল।

'কে?' যেন বন্দুক নির্ঘোষ শোনা গেল ইন্সপেক্টরের কণ্ঠে। আবার কতকগুলো পাখী আকাশে উড়ল।

কিন্তু তখুনি কোনো জবাব দিল না ফাদার। ধীরেসুস্থে পাইপ ঠুকে ছাই ঝাড়ল। তারপর ঘাসকে উদ্দেশ করে বলল—'আমি জানতাম। গোড়া থেকেই আমি জানতাম সলিসিটর মিঃ মূর্তিই খুন করেছেন আর্চিবল্ড রাকা দত্তকে। উইল পড়ার জন্যে ঐ তো উনি এসেছেন। জিজ্ঞেস করেই দেখুন না।'

শ্বাসরোধী স্তব্ধতা। জোড়া জোড়া স্তম্ভিত দৃষ্টি নিবদ্ধ ফাদারের ওপর। ফাদার কিন্তু তখন পাইপে নতুন তামাক ঠাসতে ব্যস্ত। দেশলাই ঠুকে অগ্নিসংযোগ করা পর্যন্ত ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলেন ইন্সপেক্টর। তারপর আবার শুরু হল তর্জনগর্জন।

'কিন্তু কেন?'

'তাও তো বটে; কেন?' বলতে বলতে চিন্তান্বিত মুখে উঠে দাঁড়াল ফাদার। গলগল করে তামাকের ধোঁয়া বেরোতে লাগল নাকমুখ দিয়ে। 'কেন? বড় কঠিন প্রশ্ন। কেনর উত্তর দিতে গেলে একটা বড় কাহিনীর খবর দিতে হয়। জঘন্য অপরাধ। না, না, খুন নয়—খুনের চাইতেও খারাপ।'

বলে, পাইপ নামিয়ে জ্বলজ্বলে চোখে তাকাল মেখলার দিকে। বলল স্নেহকোমল কণ্ঠে—'দুঃসংবাদ সহ্য করার বড় মন তোর আছে মেখলা। তাই সোজাসুজিই বলছি। তুই আর্চিবল্ড রাকা দত্তর কন্যা নয়—কুমারী কন্যা নোস।'

পরক্ষণেই ছুরি ধরতে গেল দুঃসংবাদটা শুনে। পাখীগুলো কিন্তু হঠাৎ মহাউল্লাসে শোরগোল করে উঠল মাথার ওপর।

নির্বিকার গলায় বলল ঘনশ্যাম পাবদী—'সলিসিটর মিঃ মূর্তি হলেন পয়লা নম্বরের প্রতারক। বন্ধুর মুখোশ পরে তিনি তোর বাবাকে পথে বসিয়েছেন। যাঁর হাতে সম্পত্তির যাবতীয় ভালমন্দ ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে সাগর পাড়ি দিতেন তোর বাবা, সেই সলিসিটরই অ্যাডমিরালের শেষ কানাকড়িটিও ফুঁকে উড়িয়ে দিয়েছেন। পথে বসানোর পর অ্যাডমিরালের মুখ বন্ধ করার জন্যেই তাঁকে খুন করার দরকার হয়েছিল। সেকাজও নির্বিঘ্নে শেষ হয়েছে।' বলে বুকে টান দিয়ে নিভন্ত তামাক আবার জ্বালিয়ে নিল কাদার। তুই যে কন্যাকন্যা হয়েছিস, এই দুঃসংবাদটাই নীলকণ্ঠকে শুনিয়েছিলাম। শুনেই নীলকণ্ঠ দৌড়ে এল। দুহাতে তোকে আগলে রাখল। অসাধারণ মানুষ এই নীলকণ্ঠ।'

'থামুন মশায়।' খেঁকিয়ে উঠল নীলকণ্ঠ।

নীলকণ্ঠ এ যুগের মানব-দানব' বিশ্লেষণ-তন্ময় বৈজ্ঞানিকের মত প্রশান্ত কণ্ঠ কাদার ঘনশ্যামের। 'নীলকণ্ঠ একটা ছন্নছাড়া ব্যতিক্রম, প্রাগৈতিহাসিক অনুকরণ, প্রস্তর যুগের বর্বর জীবাশ্ম। নীলকণ্ঠের মত প্রাণী এ যুগে লোপ পেয়েছে। অধুনা-লুপ্ত সরীসৃপ-মানব। নীলকণ্ঠ বউয়ের পয়সায় খেতে চায়নি—নিজের পয়সায় বউকে খাওয়াতে চেয়েছে। অষ্টপ্রহর বাপের বাড়ির টাকার খোঁটা খেয়ে, এমন বউ চায়নি নীলকণ্ঠ। তাই ঐরকম ছন্নছাড়া দিকহারা হয়ে গিয়েছিল এতদিন। কিন্তু যেই আমি গিয়ে তোর রাস্তায় বসার সুসংবাদ দিলাম, অমনি হাসিখুশীতে ঝলমল করে উঠল। নীলকণ্ঠ বউকে মুঠোয় রাখতে চায়—বউয়ের মুঠোয় থেকে চায় না। কিরে, গা কিরকম করছে নাকি? মহামানব চরিত্র তাই না? এবার শোন, ইন্দ্রকীলের কীর্তি'।

ইন্দ্রকীলকে যেই বললাম তুই পথে বসেছিস, অমনি তড়িঘড়ি সুটকেশ গুছিয়ে জাহাজে চেপে চম্পট দিল বেচারী। বাবোজা রাম কাঁচকলা দিল ওর ওপর। ও হল মাদুলী টাইপ। উচ্চাকাঙ্ক্ষী। রাজত্ব আর রাজকন্যা একসঙ্গেই চায়। রাজত্ব বাদ দিয়ে রাজকন্যা পোষা বড় ঝক্কির ব্যাপার। হিসেবে আসে না। কাজেই প্র্যাকটিক্যাল সেক্রেটারী প্র্যাকটিক্যালি চম্পট দিয়েছে।'

'অ্যাডমিরাল যে রাস্তায় বসেছেন, এ খবর আমি তাঁকে দিইনি। কিন্তু উনি পেয়েছিলেন। পেয়ে রেগে তিনটে হয়ে সোজা জাহাজ থেকে ডাঙায় নামেন। অত্যোগমত ধড়াচূড়া ছাড়তেও ভুলে গিয়েছিলেন। হন হন করে চলেছিলেন বিশ্বাসঘাতক বন্ধুকে শায়েস্তা করতে। রাগের চোটে দিকবিদিক জ্ঞান ছিল না। আগেই অবশ্য পুলিশে খবর পাঠিয়েছিলেন। তাই মাঝরাতে ইন্সপেক্টরকে দেখা গিয়েছিল 'সমুদ্র মানুষ' আড্ডাখানার পাশে। অগ্নিশর্মা অ্যাডমিরালের সামনে যাবার সাহস ছিল না লেফটেন্যান্ট নীলকণ্ঠর। অথচ তাঁর ক্রোধ দেখে সে প্রমাদ গুনেছে—দরকার হলে সাহায্য করার জন্যে পেছন পেছন দৌড়েছে। কিন্তু দ্বিধা আর ভয়ের জন্যে সামনে যেতে পারেনি। সৈকতে নীলকণ্ঠর খাপছাড়া হাঁটার এই হল কারণ। আর তরোয়াল? নীলকণ্ঠর ভেতর একটা ছেলেমানুষ আছে। সে আড়ম্বর ভালবাসে, তরোয়াল ঘুরোতে ভালবাসে—তাই পদমর্যাদায় তরোয়াল খাপ না থাকলেই একটা তরোয়াল কোমরে ঝুলিয়ে রাখে। কে না জানে, ফাঁকা জায়গায় হাতিয়ার নিয়ে আস্ফালন করতে শিশু বুড়ো সকলেই ভালবাসে। নির্জন সমুদ্রতীরে হঠাৎ তরোয়াল বার করে মাথার ওপর ঘুরিয়ে গাছপাতা জবাই করে তাই নির্দোষ আনন্দে মেতেছিল নীলকণ্ঠ।

'হাতিয়ার নিয়ে খেলা করার প্রবণতা প্রত্যেক পুরুষের মধ্যেই আছে। হাতিয়ার না হয়ে হাতিয়ারের মত চেহারা হলেও নাড়াচাড়া করতে ইচ্ছে যায়। কাগজকাটা ছুরিও এর ব্যতিক্রম নয়। তাই আমি অত অবাক হয়েছিলাম।'

'কখন অবাক হয়েছিলেন?' মেখলার প্রশ্ন।

'সলিসিটর মিঃ মূর্তি যখন এই সহজ প্রবণতার ব্যতিক্রম হলেন।'

'মানে?' ইন্সপেক্টরের হুংকার।

'সলিসিটরের অফিসে সেদিনের কথা মনে নেই?' বলল কাদার ঘনশ্যাম। 'কলম নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলেন সলিসিটর—কাগজকাটা ছুরি পাশেই পড়েছিল। দিব্যি ঝকঝকে ছুরি। ফলাটা বেশ ছুঁচোলো। সে তুলনায় কলমটা ভাঙা, ধুলোয় ভর্তি, কালিতে লেপা। ছুরিটা কিন্তু সদ্য সাফ করা। অথচ ছুরি নিয়ে খেলা করলেন না মিঃ মূর্তি। কেন? দুশ্চরিত্র হলেও মনের সঙ্গে ছলনা করার একটা সীমা আছে।'

কিছুক্ষণ সব চুপ। সবাই যেন মন্ত্রমুগ্ধ। অকস্মাৎ হুঁশ হল ইন্সপেক্টরের। পেছন ফিরে দেখলেন, সলিসিটর নেই।

কিন্তু ব্যস্ত হলেন না। মাথা চুলকে বললেন—'খুনীকে ঠিক কখন খুনী বলে মনে হল বললেন না তো?'

'ঠিক যখন ইন্দ্রকীল সলিসিটরের অফিসে গিয়ে খবর দিল অ্যাডমিরাল আর ফিরবেন না। উনি জলে ডুবে মারা গেছেন। তখন কিন্তু কারো পক্ষেই জানা সম্ভব ছিল না যে অ্যাডমিরাল কিভাবে মারা গিয়েছেন। শুধু জানতাম, অ্যাডমিরাল ফিরছেন। ইন্দ্রকীল যেই বলল, জলে ডুবে উনি মারা গিয়েছেন, অমনি আমি জিজ্ঞেস করলাম—'কবে? কখন? কিন্তু মিঃ মূর্তি জিজ্ঞেস করলেন—লাশ কোথায়?'

ঘনশ্যাম পাবদী থামল। পাইপ ঠুকে ছাই ঝাড়ল। তারপর যেন নিজেকেই বলতে লাগল—'সমুদ্রে যাঁর বারোমাস কাটে, হঠাৎ যদি শোনা যায় তিনি জলে ডুবে মারা গিয়েছেন, তাহলে ধরে নিতে হবে সমুদ্রেই তিনি ডুবেছেন। কিন্তু এ জেনেও যদি কেউ ফস করে বলে বসেন, লাশ কোথায়, তাহলে স্বভাবতই মনে হয়—প্রশ্নকর্তা জানেন লাশটা সমুদ্রে নেই—অন্য কোথায় আছে। মানে, যেখানে উনি রেখে এসেছেন। নির্জ্ঞান মনের এই হল কারসাজি। অবচেতন মনই সলিসিটরকে সেদিন ধরিয়ে দিল। তাই আমি অমন ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিলাম। হাজার হলেও খুনীর সামনা সামনি বসা চাট্টিখানি ব্যাপার নয়। হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল। আবোলতাবোল বকে সহজ হবার চেষ্টাও করেছিলাম। বলেছিলাম, যে শ্যাওলায় অ্যাডমিরাল সবুজ হয়েছিলেন, সে শ্যাওলাটা বরং সামুদ্রিক উদ্ভিদ হলেই মানাতো। কথাটা দ্ব্যর্থক।'

'কিন্তু অ্যাডমিরাল খুন হলেন কোথায়?' ইন্সপেক্টর এবার রেগে উন্মত্ত হল।

'হায় পোড়াকপাল, সাতকাণ্ড রামায়ণ শুনে শেষে এই প্রশ্ন?' কাদার ঘনশ্যামকে এই প্রথম খেঁকিয়ে উঠতে দেখা গেল। 'সোজা সলিসিটরের অফিসে গিয়েছিলেন অ্যাডমিরাল। নীলকণ্ঠ অন্দরে ধাওয়া না করে নিজের বাড়ি যায়। সলিসিটর তাঁর টেবিলের কাগজকাটা ছুরি দিয়ে বন্ধু নিধন করে লাশটা রাতারাতি পুকুরে ফেলে যান। হয়েছে?'

শেষ প্রশ্নটা অবশ্য ইন্সপেক্টর না শুনেই প্রভঞ্জন-বেগে তিরোহিত হল এবং একঘণ্টার মধ্যেই পাই, ভিক্টর, মূর্তি সলিসিটরস'-এর অন্যতম অংশীদার মিঃ মূর্তিকে গ্রেপ্তার করল।

ঠিক সেই সময়ে ধু ধু বালুকাবেলায় ছেলেমানুষের মত ছুটোছুটি করছিল দুটি মূর্তি। নীলকণ্ঠ আর মেখলা। *

(* বিদেশী ছায়ায়

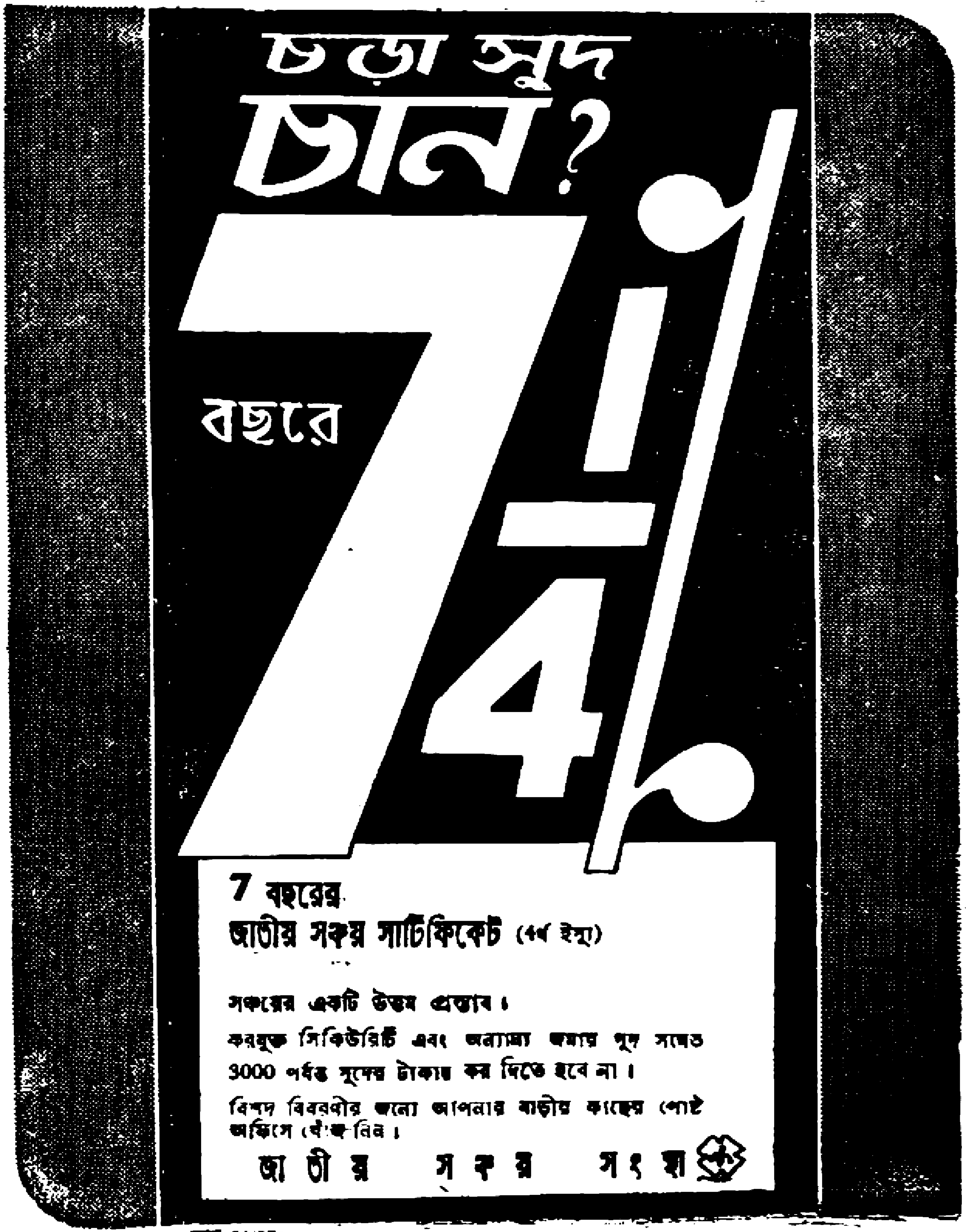
চড়া সুদ
চান?
বছরে 7 1/4 %
7 বছরের
জাতীয় সঞ্চয় সার্টিফিকেট (৪র্থ ইস্যু)
সঞ্চয়ের একটি উত্তম প্রস্তাব।
করযুক্ত সিকিউরিটি এবং অন্যান্য জমার সুদ সমেত 3000 পর্যন্ত সুদের টাকায় কর দিতে হবে না।
বিশদ বিবরণীর জন্যে আপনার বাড়ীর কাছের পোষ্ট অফিসে খোঁজ নিন।
জাতীয় সঞ্চয় সংস্থা
davp 70/371

উপরে : অর্চনা এবং সতীশ

সুরের রাজা

অরুণ চট্টোপাধ্যায়

সঙ্গীতাচার্য বিঠোফেনের অপূর্ব সুর-সৃষ্টি পৃথিবীর ঐশ্বর্য, তাই তিনি সর্ব দেশের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ সুরস্রষ্টাদের অন্যতম, অতুলনীয়। পরিণত বয়সের বিঠোফেন সম্পর্কে জীবনীকার থেয়ারের অভিমত : সুরস্রষ্টা বিঠোফেন নিজ জগতের অধীশ্বর, নিজ আকাঙ্ক্ষা ও অনুভূতির দাস। এমন বিধান দিয়ে তিনি সুর রচনা করেন, যা তাঁর একান্ত নিজস্ব।

বিঠোফেনের সঙ্গীতে তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির চিহ্ন ফুটে উঠেছে। সেই উপলব্ধির প্রতি তাঁর মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে। তাঁর সঙ্গীত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাই তা সুদূরপ্রসারী। সে সুর স্থান-কাল পাত্রের প্রভাব অতিক্রম করে অন্তর্লোকের দিশারী। বাস্তব সংগ্রাম ও বাধা-বেদনার শেষ থেকেই শুরু। কঠিন দ্বন্দ্বের দুঃখ-দহন জয় করে তিনি সৃষ্টি করেছেন নিজের জগৎ। সে জগৎ কখনও ভয়ঙ্কর, কখনও বা অলৌকিক আনন্দ আর আশাবাদের প্রশান্তিতে ভরপুর। তিনি সে জগতের একক অধীশ্বর। শুধু সে-জগৎ আমাদের অজানা নয়, তাঁর সঙ্গীতে আমরা অনুভব করি অনাস্বাদিত নতুন জগতের অপূর্ব স্বাদ।

স্রষ্টার মনের চিত্ররূপ প্রকাশ হতে পারে সঙ্গীতে। সে রূপ শিল্পের যে কোন শাখায় প্রকাশ সম্ভব। [illegible]

এবং সুর দুটি সম্ভব একই বিষয়বস্তুর উপর কেন্দ্র করে, কিন্তু দুটির মিল সামান্যই। বিঠোফেন এক সময় তাঁর এক ছাত্রকে 'ডি মাইনর সোনাটা' সম্পর্কে বলতে গিয়ে শেকস্‌পীয়রের 'টেম্পেস্ট' পড়তে উপদেশ দেন। কিন্তু তা তিনি কৌতুক করেই বলেছিলেন বলে মনে হয়। নয়তো তিনি 'টেম্পেস্ট'-এর নামই শুনেছেন, পড়েন নি। কারণ শিরোনাম ছাড়া দুটি শিল্পকর্মের মিল নেই। সঙ্গীত ভাবাশ্রয়ী হলে তা সার্থক হতে পারে না, সেজন্যই ভাগ্‌নার প্রতিভাবান সঙ্গীত স্রষ্টা হয়েও তাঁর সঙ্গীত বিঠোফেনের মত প্রাণস্পর্শী হতে পারে নি। বিঠোফেন তাঁর 'এফ মেজর কোয়ারটেট' রচনাকালে 'রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট'-এর কোনও দৃশ্যের কথা স্মরণ রাখলেও দুটি শিল্পকর্মের রূপ ভিন্ন, তাই বিঠোফেনের রচনা অনুকরণদোষ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পেরেছে। বিঠোফেন ভাবপ্রকাশের একমাত্র স্বাধীন বাহন বলে মনে করতেন সঙ্গীতকে। সঙ্গীতেই সৃষ্টির মূল সুর অব্যাহত থাকে। তাঁর 'সিম্ফনি' এক স্তর থেকে অন্য স্তরে পরিবর্তিত হয়ে অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির ছন্দবন্ধ প্রকাশে সার্থক। সেজন্য তাঁর শেষ জীবনের প্রতিটি রচনার সুর অখণ্ড ঐক্যবদ্ধ, সুসংহত।

বিঠোফেন প্রচলিত নিয়ম উপেক্ষা করে চলতেন। অবশ্য প্রথম জীবনের রচনায় বাখ্‌ ও মোৎসার্টের পদ্ধতির ক্ষীণ ছায়াপাত লক্ষণীয়। শেষ জীবনে তিনি হ্যান্ডেলের রচনা নিয়ে অনেকটা সময় কাটিয়েছেন। তবু তিনি সকলের প্রভাবমুক্ত। তাই বলে তিনি জীবনকে অস্বীকার করেন নি, তাঁর সঙ্গীতে আনন্দ, বেদনা, উদ্দাম, আশা, আকাঙ্ক্ষা, হতাশা—কিছুই উপেক্ষিত নয়। এ সব কিছুই তাঁর জীবনে গভীর রেখাপাত করেছে। কাহার প্রভাব তিনি উপেক্ষা করে চলতেন। তাঁর 'ইরোইকা সিম্ফনি' বীর যোদ্ধা নেপোলিয়ন, এবারক্রোম্বর প্রমুখের উদ্দেশ্যে রচিত হলেও তা কোন একজন বীরের জীবন-গাথা নয়, তাঁর নিজ মনের প্রতিফলনে সে সুর বিশ্বজনীন। সাফল্যের মধ্যেই জীবন—একথা তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন, এই বিশ্বাসের প্রকাশ ঘটেছে, তাঁর 'সি মাইনর সিম্ফনি'তে। এমনিভাবেই তাঁর উপলব্ধির অনুভূতি সার্থকভাবে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর সৃষ্টির মধ্যে। 'হ্যামারক্লেভিয়ার সোনাটা' অপরাজেয় আত্মোপলব্ধির অচৈতন্য প্রকাশ, কেননা যে কোনও মহৎ শিল্পসৃষ্টি স্বতঃস্ফূর্ত, যা কোন বাঁধাধরা নিয়মের ভিতর দিয়ে উৎসারিত হয় না। বিঠোফেনের ব্যক্তিত্ব ধীরে ধীরে তাঁর অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে গড়ে উঠেছে, সে ব্যক্তিত্ব একটি নিটোল সুরে সৃষ্টির মত অবিচ্ছিন্ন, সুসমযোজিত এবং ছন্দবদ্ধ। তাঁর চিন্তার গভীরতাও ব্যাপক, যা খুব কম সঙ্গীতস্রষ্টার স্পষ্ট।

তখনকার জার্মানীতে ল্যাটিন ও গ্রীক সাহিত্যানুরাগ ছিল সংস্কৃতির প্রধান অঙ্গ। সম্ভ্রান্ত ও সংস্কৃতিবান পরিবার মাত্রেই ছিল ল্যাটিন ও গ্রীক সাহিত্য-চর্চার অনুরাগী। সেই সমাজে মিশে পৃথিবীর দুই সমৃদ্ধশালী সাহিত্যের অনেক খবরই তিনি জেনেছিলেন। সম্ভ্রান্ত ও সংস্কৃতিবান পরিবারের কৃতী ছেলে ফন ব্রাউনিং-এর বিশিষ্ট বন্ধু হিসেবে সে-সমাজে ছিল তাঁর নিত্য আনাগোনা। আর কাউণ্ট ভলডস্টাইন-এর সংস্পর্শও তাঁকে সে-সুযোগ এনে দিয়েছিল। ছুটির অবসরে বিঠোফেন ব্রাউনিং-পরিবারের সঙ্গে বেড়াতে যেতেন। এসব দিনগুলি ছিল মহানন্দের। অন্তরঙ্গ বন্ধু ফন ব্রাউনিং-এর প্রতি কৃতজ্ঞতাস্বরূপ বিঠোফেন দুটি রচনা ব্রাউনিং ও তাঁর স্ত্রীর নামে উৎসর্গ করেছিলেন।

'কোরট চ্যাপেলের' ভায়োলা-বাদক হিসেবে বিঠোফেন ইতিমধ্যেই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন। তার উপর সদ্য প্রতিষ্ঠিত 'থিয়েটারকাল অর্কেস্ট্রা'-তেও তিনি যুক্ত। এখানে চার বছর ভায়োলা-বাদক হিসেবে তিনি সঙ্গীত-পরিচালক জোসেফ রিখা এবং অন্যান্য দক্ষ শিল্পীর সম্পর্কে আসেন। বিখ্যাত পিয়ানো-বাদক দুসেক-কাদের সঙ্গীতের সঙ্গেও পরিচয় এ-সময়েই। সঙ্গীত-জীবনের পটভূমি রচনায় এই বছরগুলি প্রকৃত সাহায্য করেছে। তিনি কি শিখলেন, তা তাঁর কাছে বড় নয়, বরং যা উপলব্ধি করলেন তাই তাঁর কাছে ছিল প্রধান। সমকালীন সঙ্গীত-রচনার রীতি-নীতি ও চিন্তাধারার প্রভাবমুক্ত থেকে

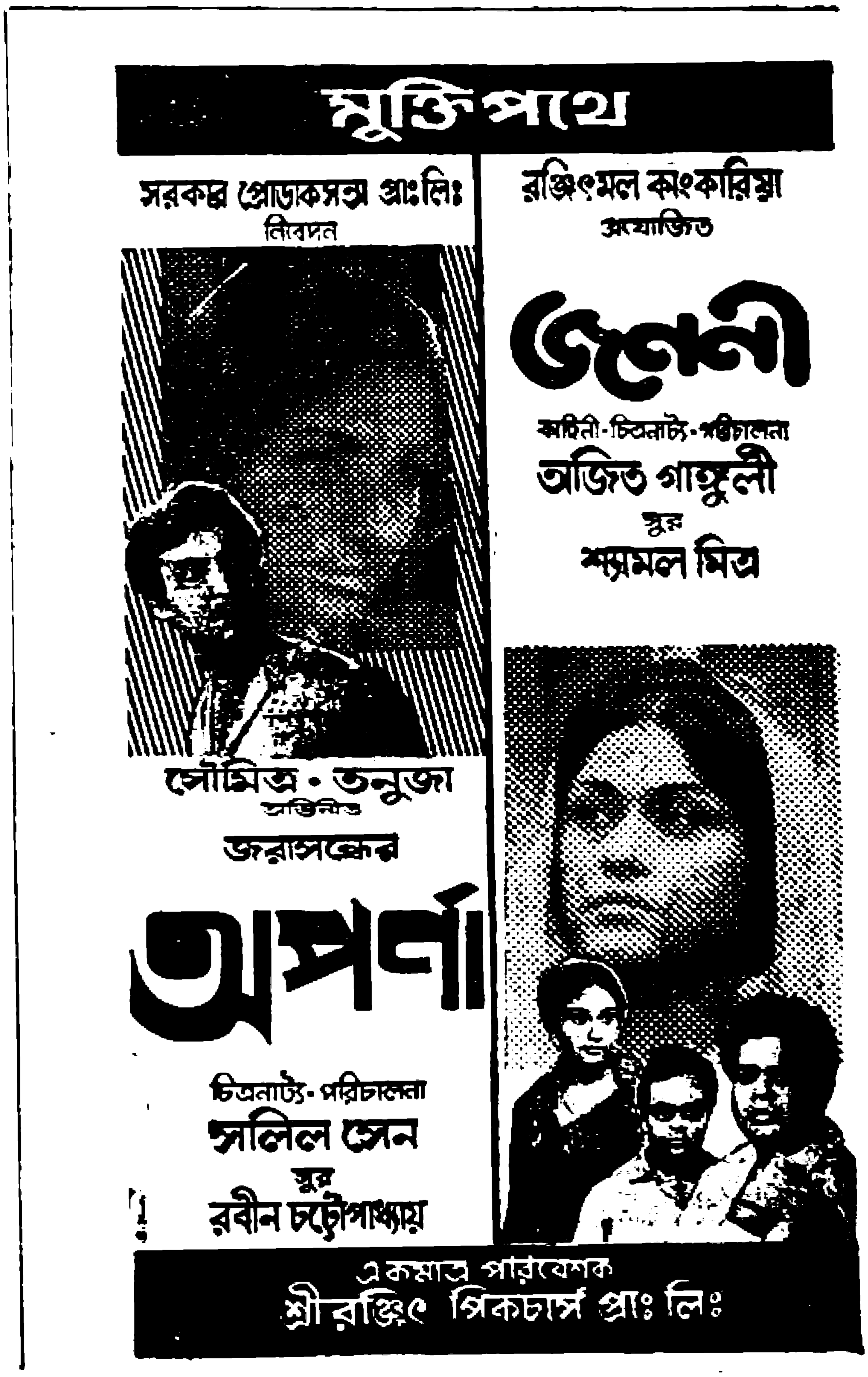

বিঠোফেন আমরণ তাঁর নিজ অভিজ্ঞতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, সেজনাই ক্রেডো অব দি মাস ইন ডি স্বকীয়তায় প্রাণ-স্পর্শী। প্রসঙ্গক্রমে তাঁর কিশোর বয়সের উক্তি স্মরণযোগ্য। তিনি জোসেফ হেডন, মোৎসার্ট, এলব্রেটসবারগার প্রমুখের সম্পর্কে বলালেন : 'এ'দের কাছে আমার আর কিছুই শেখার নেই।'

বধিরতার লক্ষণ প্রকট হওয়ায় বিঠো-ফেন অদ্ভুত একাকীত্ব অনুভব করে চঞ্চল হয়ে ওঠেন। বিঠোফেন ফরাসী বিপ্লবের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। তাই তিনি আত্মসমাধি চাননি; চেয়েছিলেন পৃথিবীর রূপ-রস-গন্ধ পরিপূর্ণ উপভোগ করতে। মানুষের কথা, পাখির ডাক, গাছগাছালীর মৃদু স্পন্দন শুনতে চেয়েছিলেন। ১৮১০ খৃঃ ২ মে একখানি চিঠিতে লেখেন :

'...কে পারে বাইরের ঝড়ের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে? তবু আমি সুখী হতাম, সম্ভবত সবচেয়ে সুখী লোকদের একজন হতে পারতাম, যদি শয়তান আমার শ্রবণেন্দ্রিয়ের অধিকার ছিনিয়ে না নিত।... আহা, জীবন এত সুন্দর, অথচ তা আমার কাছে কত বিষময়।'

ভাগলারকে লেখা উপরের চিঠিতে এ-কথা স্পষ্ট যে, তিনি শ্রবণশক্তি হারাবার ভয়ে ভীত, সেজনাই তাঁর কাছে জীবন বিষময়। নতুবা তিনি পৃথিবীর অন্যতম সুখী মানুষ, অর্থাৎ তিনি 'বাহ্যিক ঝড়' উপেক্ষা করছেন অনায়াসেই। একই চিঠিতে তাঁর বয়স জানার জন্য দীক্ষান্ত অভিজ্ঞানপত্র পাঠাতে লিখে-ছিলেন। তিনি তাঁর প্রকৃত বয়স জানতেন না। তাঁর বাবা বিঠোফেনের বয়স দু' বছর কমিয়ে বলতেন। উদ্দেশ্য : তাঁর অসামান্য প্রতিভা আরো চমকপ্রদ করা। আসলে ১৭৭২ খৃঃ নয়, তিনি জন্মগ্রহণ করে'ছিলেন ১৭৭০ খৃঃ ১ ডিসেম্বর।

বিঠোফেন পরের মাসেই আর এক বন্ধুকে একটি আয়না পাঠাতে অনুরোধ করেছিলেন, বিঠোফেনের আয়নাটি ভেঙে গিয়েছিল বলেই। এই চিঠিদুটি লেখার সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৪০ বছর, এ-বয়সে এমন চিন্তাধারা তাঁর মনোবেদনাকেই প্রকাশ করে।

১৮০৯ খৃঃ তিন রাজপুত্রের অর্থানু-কূল্য লাভ করলেও ১৮১১ খৃঃ থেকে ১৮১৫ খৃঃ মধ্যে এক এক করে সব অব-লম্বন তিনি হারালেন। ১৮১০ খৃঃ তাঁর আর্থিক অবস্থা চরমে উঠেছিল। ১৮১৪ খৃঃ তাঁকে শেষবারের মত প্রকাশ্যে পিয়ানো বাজাতে দেখা যায়। বধির বিঠোফেনের পিয়ানোতে 'ওপাস-৯৭ ট্রিও'-র যে সুর সেদিন প্রাণ পেয়েছিল, তা শুনে এবং তাঁর মর্মান্তিক হাবভাব লক্ষ্য করে সকলে ব্যথিত হয়ে পড়েছিলেন। এর পর শুধু কমিশনের অর্থ দিয়েই তাঁকে দিন অতি-বাহিত করতে হত। পিয়ানো বাজাতে পারেন না, শিক্ষকতাও সম্ভব নয়। এবং তা তিনি শুনতে পান না বলেই। ১৮১৯ খৃঃ থেকে ১৮২৭ খৃঃ ২৬ মার্চ তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত তিনি কেবল সুর সৃষ্টিতেই মগ্ন ছিলেন। এ-সময়েই তাঁর সব বিখ্যাত সুরের জন্ম।

বিঠোফেনের পরিণত মনের সৃষ্টির তুলনা নেই। সমস্ত জীবনের অভিজ্ঞতার মিশ্রণে জন্ম নিয়েছে নতুন অনুভূতি, পরি-পূর্ণ অভিজ্ঞতায় যা অবিস্মরণীয়। প্রকৃত-পক্ষে ১৮২৩ খৃঃ পরই তিনি এক এক করে নতুন সুর সৃষ্টি করে চললেন। 'ই ফ্ল্যাট মেজর, ওপাস-১২৭', 'সি সরেপ মাইনর, ওপাস-১৩১', 'এফ মেজর, ওপাস-১৩৫' প্রভৃতি তাঁর সারাজীবনের শ্রেষ্ঠ ফসল। এ-সুরের জন্ম তাঁর প্রগাঢ় আধ্যাত্মিক উপলব্ধির মধ্যেই। সে 'সিম-ফনি' পলে পলে সঞ্চিত অভিজ্ঞতার সুসংযোজন। তাঁর সঙ্গীত তাই 'মিস্টিক' এবং 'মেটাফিজিক্যাল'। বিঠোফেনের মনের গভীরে যে অনুভূতি বাসা বেঁধেছিল, তার পূর্ণ প্রকাশ ঘটেছে শ্রেষ্ঠসৃষ্টি 'এফ মেজর, ওপাস-১৩৫'-এ। এটি তিনি শেষ করেন ১৮২৬ খৃঃ শেষভাগে, ভাই জোহানের বাড়িতে। ২ ডিসেম্বর ভাইপোকে সঙ্গে করে ভিয়েনা ফিরলেন। দীর্ঘ পথযাত্রায় দুর্বল বিঠোফেন তখন নানা ব্যাধিতে আক্রান্ত। শোথ রোগের দরুণ তিনি যে মানসিক কষ্ট পাচ্ছিলেন, তার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য চারবার তাঁর দেহে অস্ত্রোপচার করা হয়। অবশেষে দু'দিন অচৈতন্য থাকার পর ১৮২৭ খৃঃ ২৬ মার্চ তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন।

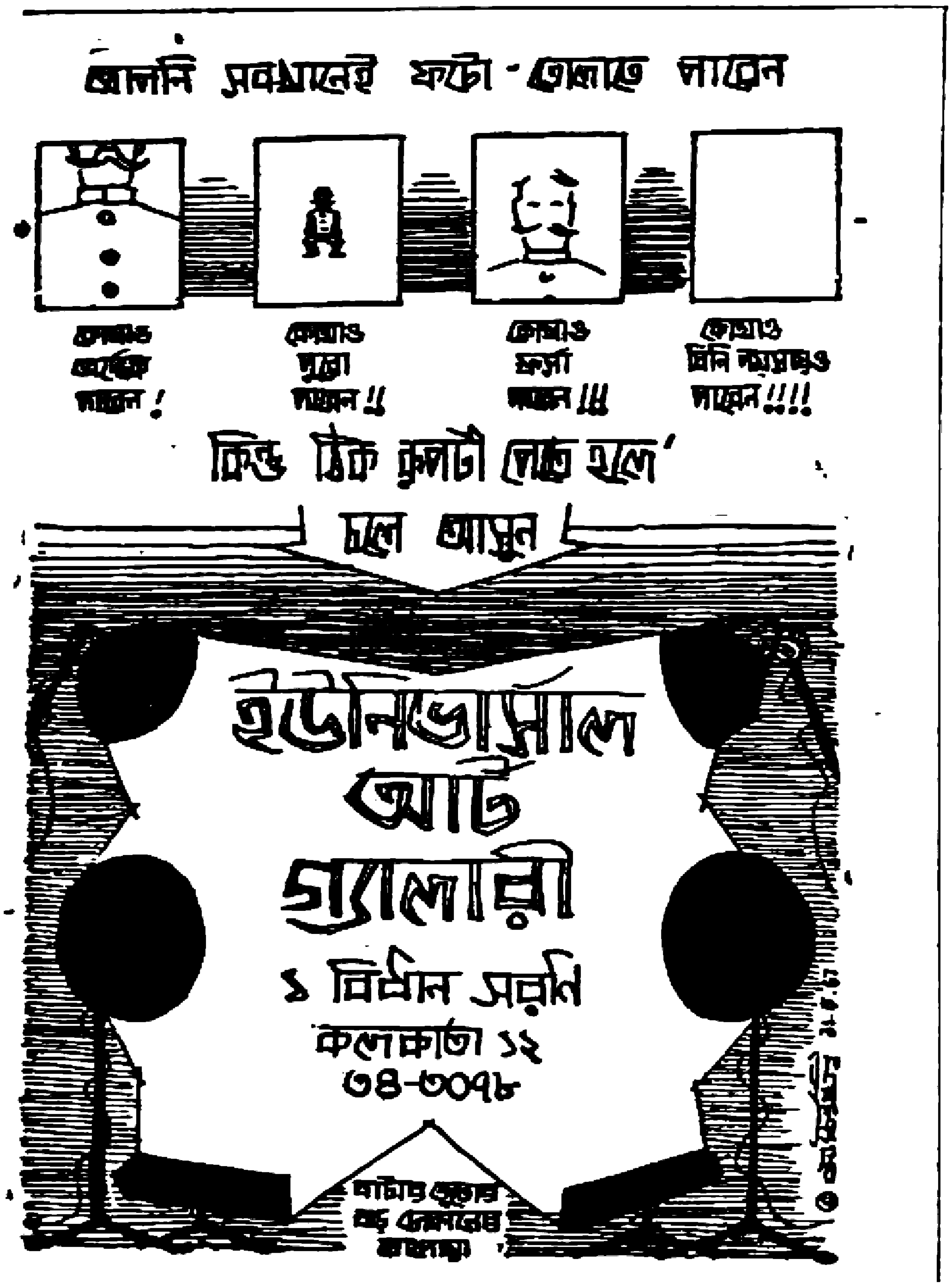

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

সমীরদা—

রোজগেরে, ফূর্তিবাজ লোক, ঘরোয়া কাজে চৌকশ

"আসল জিনিষটি আমার চাই!"

খোলা মেজাজের মানুষ সমীর — সারাদিন মনের ফূর্তিতে কাজ করতে পেলেই খুশী। বলে, শরীর ভালো তো সব ভালো।
ওর স্ত্রী সেটা বোঝেন আর বোঝেন বলেই রোজ ওকে হরলিক্স খেতে দেন।
হরলিক্সই হ'লো আসল জিনিষ।
পুষ্টির উপাদান আর শরীরগঠনকারী প্রোটিনে ভরপুর হরলিক্স স্বাস্থ্য ও শক্তি অটুট রাখে।

খাঁটি সরের দুধ, উৎকৃষ্ট গম এবং অন্যান্য পুষ্টিকর খাদ্য দিয়ে তৈরী বলেই হরলিক্সের এত গুণ।
ডাক্তাররা আজ ৮০ বছরের ওপর হরলিক্স খেতে নির্দেশ দিয়ে আসছেন।
রোজ হরলিক্স খেয়ে আপনার ও পরিবারের সকলের স্বাস্থ্য ও শক্তি বজায় রাখুন।
হরলিক্স সত্যিকারের পুষ্টি আর স্বাভাবিক শক্তি দেয়।

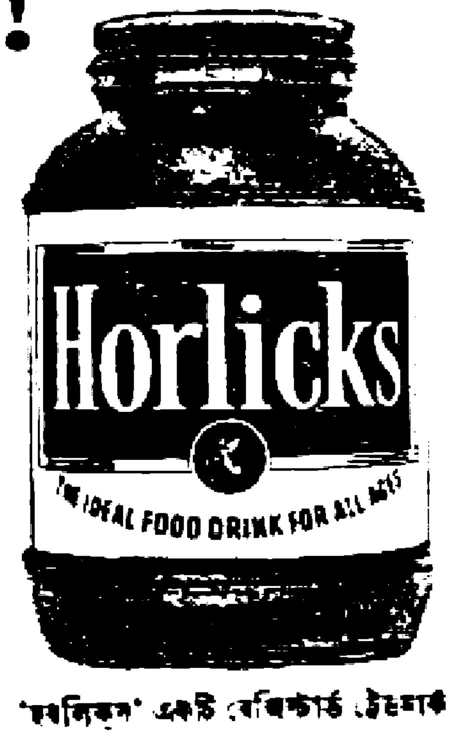

'হরলিক্স' হ'লো আসল জিনিষ

'হরলিক্স' একটি রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক

HL 1855 A

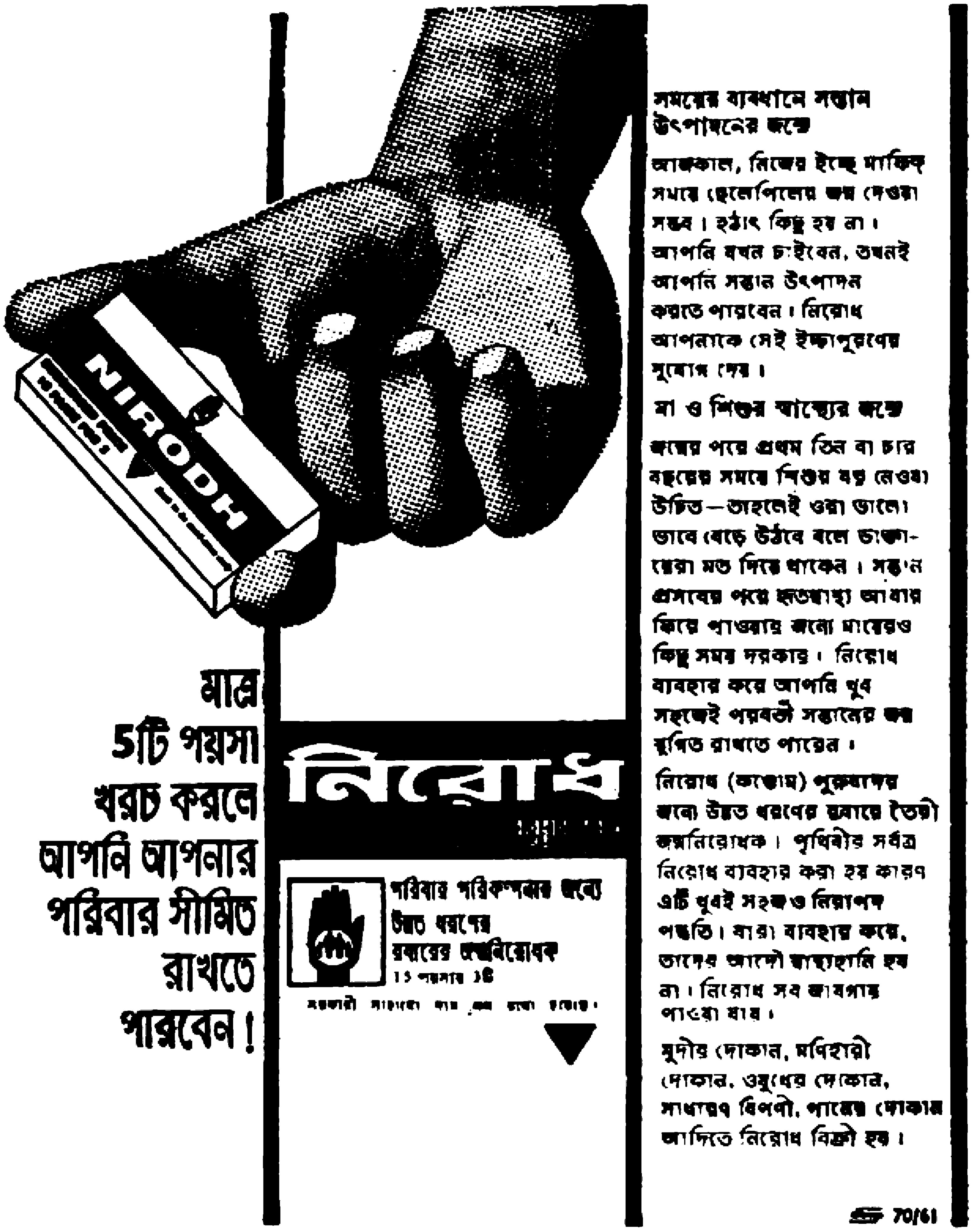
NIRODH
মাত্র
5টি পয়সা
খরচ করলে
আপনি আপনার
পরিবার সীমিত
রাখতে
পারবেন !
নিরোধ
পরিবার পরিকল্পনার জন্যে
উন্নত ধরণের
রবারের জন্মনিরোধক
15 পয়সায় 3টি
সময়ের ব্যবধানে সন্তান
উৎপাদনের জন্যে
আজকাল, নিজের ইচ্ছে মাফিক সময়ে ছেলেপিলের জন্ম দেওয়া সম্ভব। হঠাৎ কিছু হয় না। আপনি যখন চাইবেন, তখনই আপনি সন্তান উৎপাদন করতে পারবেন। নিরোধ আপনাকে সেই ইচ্ছাপূরণের সুযোগ দেয়।
মা ও শিশুর স্বাস্থ্যের জন্যে
জন্মের পরে প্রথম তিন বা চার বছরের সময়ে শিশুর যত্ন নেওয়া উচিত—তাহলেই ওরা ভালো ভাবে বেড়ে উঠবে বলে ডাক্তারেরা মত দিয়ে থাকেন। সন্তান প্রসবের পরে স্বাস্থ্য আবার ফিরে পাওয়ার জন্যে মায়েরও কিছু সময় দরকার। নিরোধ ব্যবহার করে আপনি খুব সহজেই পরবর্তী সন্তানের জন্ম স্থগিত রাখতে পারেন।
নিরোধ (কন্ডোম) পুরুষদের জন্যে উন্নত ধরণের রবারে তৈরী জন্মনিরোধক। পৃথিবীর সর্বত্র নিরোধ ব্যবহার করা হয় কারণ এটি খুবই সহজ ও নিরাপদ পদ্ধতি। যারা ব্যবহার করে, তাদের আদৌ স্বাস্থ্যহানি হয় না। নিরোধ সব জায়গায় পাওয়া যায়।
মুদীর দোকান, মণিহারী দোকান, ওষুধের দোকান, সাধারণ বিপণী, পানের দোকান আদিতে নিরোধ বিক্রী হয়।
70/61

১০ম বর্ষ
৩য় খণ্ড

অমৃত

সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday 1st January, 1971 শুক্রবার, ১৬ই পৌষ, ১৩৭৭ 40 Paise

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য অমৃতের কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে অমৃতের কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পিতে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে অমৃতের কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

		কলিকাতা		মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা	২০-০০	টাকা	২২-০০
ষাণ্মাসিক	টাকা	১০-০০	টাকা	১১-০০
ত্রৈমাসিক	টাকা	৫-০০	টাকা	৫-৫০

'অমৃত' কার্যালয়
১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোন : ৫৫-৫২০১ (১৪ লাইন)

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
৭০৮	চিঠিপত্র		
৭১০	সাদা চোখে		—শ্রীসমদর্শী
৭১২	দেশেবিদেশে		—শ্রীপুণ্ডরীক
৭১৪	ব্যঙ্গচিত্র		—শ্রীকাফী খাঁ
৭১৫	সম্পাদকীয়		
৭১৬	যে দিকেই যাই	(কবিতা)	—শ্রীমৃগাঙ্ক রায়
৭১৬	যদি বলি	(কবিতা)	—শ্রীতুলসী মুখোপাধ্যায়
৭১৬	আমার মা কে	(কবিতা)	—শ্রীজয়ন্তী রায়
৭১৭	কবি কুমুদরঞ্জন		—শ্রীনরেন্দ্র দেব
৭১৮	জোনাকি	(গল্প)	—শ্রীশান্তি পাল
৭২৪	শতবর্ষের পথিক		—শ্রীদিলীপ বসু
৭২৬	এই আমাদের দেশ		—শ্রীনন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
৭২৭	তুলসীচরিত	(উপন্যাস)	—শ্রীনলীমাধব চৌধুরী
৭৩০	মুখের মেলা		—আবদুল জব্বার
৭৩৩	সাহিত্য ও সংস্কৃতি		—শ্রীঅভয়ঙ্কর
৭৩৭	বইকুণ্ঠের খাতা		—শ্রীগ্রন্থদর্শী
৭৪০	মনের কথা		—শ্রীমনোবিদ
৭৪৩	নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে	(উপন্যাস)	—শ্রীঅতীন বন্দ্যোপাধ্যায়
৭৪৯	নিকটেই আছে		—শ্রীসন্ধিৎসু
৭৫১	তোমাকে	(উপন্যাস)	—শ্রীনিমাই ভট্টাচার্য
৭৫৪	বিজ্ঞানের কথা		—শ্রীঅয়স্কান্ত
৭৫৭	অঙ্গনা		—শ্রীপ্রমীলা
৭৫৯	পিঞ্জর	(বড় গল্প)	—শ্রীসুভাষ সিংহ
৭৬৩	এক বিদেশিনী ও কলকাতার মঞ্চ		—শ্রীবৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়
৭৬৯	গোয়েন্দা কবি পরাশর		—শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র রচিত —শ্রীশৈল চক্রবর্তী চিত্রিত
৭৭০	পায়ের পদাবলী		—শ্রীবিমল বসু
৭৭১	চিলড্রেন্স ফিল্ম		—শ্রীস্বপনকুমার ঘোষ
৭৭৩	ফুল কেন প্রিয়		—শ্রীসন্ধ্যা সেন
৭৭৪	প্রেক্ষাগৃহ		—শ্রীনান্দীকর
৭৮০	আন্তর্জাতিক অ্যাথলেটিক্স		—শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়
৭৮৩	খেলাধুলা		—শ্রীদর্শক

প্রচ্ছদ : শ্রীদীপ্তি দাশগুপ্ত

পি. ব্যানার্জীর
অর্শ চিকিৎসা
৩০ পিল টা: ২·৫০
১৬ পুরিয়া চূর্ণ ২·২৫
মলম ৩০ গ্রা: ২·৫০
বিনামূল্যে বিবরণী দেওয়া হয়
পি. ব্যানার্জী
৩৬বি, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড
কলিকাতা-২৫
৫৩, গ্রে স্ট্রিট, কলিকাতা-৬
১১৪এ, আশুতোষ মুখার্জী রোড
কলিকাতা-২৫

নিবেদন
ডঃ প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত
আধুনিক চিকিৎসা
পুস্তকের ২য় সংস্করণ সম্পূর্ণভাবে নিঃশেষিত হইয়াছে এবং বহুল পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ যন্ত্রস্থ। সেই ৩য় সংস্করণের মূল্য ছয় টাকা ও শোভন সংস্করণের জন্য আট টাকা নির্ধারিত হইয়াছে।
পুস্তকের পূর্ণ মূল্য অগ্রিম পাঠাইয়া অর্ডার বুক করিলে, পুস্তক প্রকাশের অব্যবহিত পরেই আমরা রেজিস্ট্রি ডাকে প্রেরণ করিয়া দিব। কোন ডাক খরচা লাগিবে না।

চিঠিপত্র

'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' সম্বন্ধে

এই সম্বন্ধে শ্রীগৌরগোবিন্দ চক্রবর্তীর পত্রের (২৭ সংখ্যা ২৭শে কার্তিক ১৩৭৭) সমালোচনা করেছেন শ্রীচন্দন ভট্টাচার্য মহাশয়। সমালোচনা দেখিয়া চন্দনবাবুর চেয়ে আমরা বিস্মিত হয়েছি তার চেয়ে আরও বেশী। ৭১ বৎসরের বৃদ্ধ বিপ্লবী, সাহিত্যিক এবং আগের দিনের সাংবাদিক গৌরবাবু বাহিরে ও ১৯৩০—৩৮ পর্যন্ত বন্দীজীবনে যৌন বিজ্ঞানী হ্যাভেলক এলিস থেকে পৃথিবীর বিখ্যাত যৌন-মনস্তত্ত্ববিদদের বাৎস্যায়ন প্রভৃতিও শুধু অধ্যয়ন করেছেন তাই নয়, ফ্রয়েড থেকে পাভলব প্রভৃতির মনোবিশ্লেষণতত্ত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধেও গবেষণা করেছিলেন। জেলের বিভিন্ন দাগী কয়েদী (Habitual criminal) অথবা স্বভাব দুর্বৃত্তের ৩৫০জনের জীবনের বৃত্তান্ত ও স্বীকৃতিও গ্রহণ করেছিলেন, তাদের নিজেদের মুখ থেকে। জেলের বাইরে এসে কিছুদিন perversion (যৌন-বিকৃতি) বা তজ্জনিত ইনসমনিটি প্রভৃতি জাতীয় রোগের চিকিৎসা করে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন, তাতে তিনি দেখেছেন, ১০-১২ বৎসর বয়সের মধ্যে (Libido period) যে ছেলেমেয়েরা যৌন-চেতনা লাভের পূর্বে অসৎ ব্যক্তি বা অসৎ ছেলেমেয়েদের দ্বারা অসময়ে বিকৃত যৌন শিক্ষা লাভ করে তার প্রতীক তার অন্তর্মনে স্থান লাভ করে পরিণত বয়সে যৌন-বিকৃতি—নানারূপ মানসিক রোগ সৃষ্টি করে এবং কখনও কখনও তাদের দুর্বৃত্তে পরিণত করে। এইজন্যই ১০।১১ বৎসরের অমলা ও সোনার এই অপরিণত বয়সের বিকৃত যৌনক্রিয়াকে কিশোর-কিশোরী পাঠক-পাঠিকাকে ঐ নতুন যৌন ক্রিয়াটি শিক্ষা দিতেই শুধু তিনি আপত্তি জানিয়েছিলেন। মনে হয় ভট্টাচার্য মহাশয়ও তাদের পরিবারের অমলা ও সোনাদের ঐ নতুন ক্রিয়াটি শেখাতে আপত্তি করবেন। সত্য নয় কি? গৌরবাবু তো মালতী বা আন্নুবিবিদের ঘটনাগুলির প্রতিবাদ করেন নাই। কারণ, তাদের দেহ ও মনে যৌন চেতনার অভাব ছিল না। স্বয়ং শিশু সোনাইতো বৃদ্ধ ও পাপবোধকে ছাড়তে পারল না দীর্ঘদিনেও এইতো প্রতিবাদ। শিশুদের প্রাথমিক যৌন-শিক্ষা দিতে পারেন স্বয়ং তাদের মাতৃদেবী।

ভট্টাচার্য মহাশয়ের বিলাতী পত্রিকার সংবাদ—দুই নারীর পরস্পরকে বিবাহ বা সমকামিতার কথা যা তিনি লিখেছেন, তা মহাভারতে ভগীরথের জন্মের পুরাতন কাহিনীর নতুন রূপ এখানেও বিবর্তিত অবান্তর। ওটা রোগ, ওটা স্বাভাবিক ঘটনা নয়। এর বিচারের ভার 'অমৃত' পত্রিকার অন্যতম বিশেষজ্ঞ লেখক 'মনোবিদ'-এর হাতেই ছেড়ে দেওয়া উচিত।

পরিশেষে জানাচ্ছি, গৌরবাবু তাঁর পত্রখানি পত্রিকায় প্রকাশের জন্য 'অমৃত' পত্রিকার সম্পাদককে পাঠাননি শুধু সম্পাদক মহাশয়কে অবহিত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি পত্রিকায় সেটা প্রকাশ করে একদিকে উদারতাই দেখিয়েছিলেন।

নীলা চট্টোপাধ্যায়,
কৃষ্ণা চৌধুরী বি-এ, বি-টি,
কলিকাতা-৫৬।

শারদ সাহিত্য পরিক্রমা

অমৃতের নিয়মিত পাঠক হিসেবে 'পর্যবেক্ষক' লিখিত শারদ সাহিত্য পরিক্রমা এবং এ সম্পর্কে পাঠক-পাঠিকাদের আলোচনা খুব আগ্রহ সহকারে পড়ছি। আমার মনে হয় বহুকাল পরে সমাজ-সচেতন এবং জীবননিষ্ঠ সাহিত্যের পক্ষে একটা প্রত্যক্ষ আলোচনা শুরু হয়েছে। এই চিন্তা-ভাবনা ও আলোচনা কেবল কথার মাধ্যমে না থেকে সাহিত্যের বিভিন্ন দিকে যদি প্রতিফলিত হয় এবং লেখক পক্ষে সম্পাদক, প্রকাশক ও পাঠকগণও যদি সমাজ সচেতন সৎ-সাহিত্যের যথার্থ সমজদার হন তবেই সাহিত্যের ক্ষেত্রে একটা নতুন জোয়ার আসা সম্ভব হবে। বর্তমান সমাজ-জীবনে নানা সমস্যা যখন বিশেষ প্রকট আকার ধারণ করেছে, মানুষের জীবনই যখন এক বিরাট জিজ্ঞাসার মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে, সমাজের সর্বস্তরের মানুষ যখন ভীষণভাবে চিন্তিত, আলোড়িত ও বেঁচে থাকার অর্থ সন্ধানে ব্যস্ত তখন এটা খুবই বিস্ময় ও বেদনার কথা হবে যদি লেখকরা এসব থেকে দূরে সরে থাকেন।

শ্রীপর্যবেক্ষক একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরেছেন তাঁর আলোচনায় মানুষ তার প্রাত্যহিক জীবন-যাপনের ক্ষেত্রে সাহিত্যের প্রয়োজন কতটা বোধ করেন, লেখকগণই বা সমাজ-জীবনের কতটা কাছাকাছি আসতে পেরেছেন, একালের সাহিত্যিক মানুষকে সমাজ সভ্যতাকে কোন সত্যে বিধৃত দেখতে চান।'—এসব বিষয় নিশ্চিত জরুরী। কেননা সাহিত্য লিখিত হচ্ছে, পত্র-পত্রিকা চলছে, প্রকাশক বই ছাপছেন, আমরা পাঠকেরা পড়ছি। এগুলো একটা অন্ধ দৈব তাড়নার ব্যাপার, একটা বিশ্বাস করতে মন চায় না। বিশেষ করে সত্তর দশকে পা দিয়ে স্টলে স্টলে দেখা যায় অসংখ্য যৌন ও সিনেমার পত্রিকা। তাতে অনেক নাম করা লেখকগণও লিখে থাকেন। কিন্তু অনেক সময় এটাও লক্ষ্য করি যে, একই লেখক একটি ভাল নামকরা পত্রিকায় যেভাবে চিন্তা ও পরিশ্রম করে লেখেন, যৌন বিষয়ক পত্রিকাদিতে লেখার ব্যাপারে তিনি অন্য মনোভাব পোষণ করেন। পাঠক হিসেবে এখানেই আমাদের আপত্তি। সম্পাদকের মুখ রক্ষা করে লেখক কেন লিখবেন? কোথায় লেখা প্রকাশিত হচ্ছে সেটা বড় কথা নয়, কি মানের লেখা প্রকাশিত হচ্ছে সেইটাই বড় কথা। বহুকাল আগে বিদেশে 'Money Writers' বলে একটা কথা প্রচলিত হয়েছিল। আশা করি বর্তমান সময়ের লেখকগণ তার খপ্পরে পড়বেন না, নিজেই লিখবেন।

বিশেষত তরুণ কবি সাহিত্যিকদের কাছে প্রত্যাশা আমাদের অনেক। তাঁদের সংস্কারমুক্ত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি একালের সমাজজীবনে স্বচ্ছ আলোকপাত করুক। বাংলা সাহিত্যে সমাজচেতনা ও জীবননিষ্ঠ রচনার তো অভাব নেই। একালেও অবশ্য এ পথের পথিক—অনেকেই। কিন্তু অনেক শক্তিমান তরুণ লেখককেও যখন দেখা যায় অবহেলা ভরে যা-তা লিখছেন, ভূরি ভূরি লিখছেন, তখন মনে হয় বুঝি বা তাঁরা নির্লোভ ও নির্মোহ নন।

অত্যন্ত আশার কথা, সাম্প্রতিককালে গল্প কবিতার ক্ষেত্রে বিষয়নিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি বৃদ্ধি পেয়েছে। অমৃতে এই সব আলোচনায় সেই দিকটা যে পরিস্ফুট হতে পারছে সেটা আমাদের কাছে খুব সুখেরই বিষয়।

অজিত বসাক
কলিকাতা-১০

(২)

আমি অমৃত নিয়মিত পড়ি। অমৃতে প্রকাশিত গল্প-উপন্যাস ছাড়াও সাহিত্য বিষয়ে আলোচনা ও খবরাখবর আমার খুব ভাল লাগে। কয়েক সংখ্যায় শ্রীপর্যবেক্ষক লিখিত শারদ সাহিত্য পরিক্রমা নামক আলোচনাগুলি পড়ে বর্তমান বাংলা সাহিত্যের গতি প্রকৃতির বিস্তৃত পরিচয় জেনে উপকৃত হলাম। আশা করি আরও অনেক পাঠক-পাঠিকার কাছে এই আলোচনাটি সমাদৃত হবে। শ্রীক্ষুদিরাম দাস মহাশয়ের চিঠির বক্তব্যের সঙ্গে আমি একমত যে 'অত্যন্ত শ্রম ও নিষ্ঠার সঙ্গে লেখক প্রবীণ ও নবীন গল্পকারদের এ সময়ের গল্পের পরিচয় দিয়েছেন।' কেবল গল্পই নয় উপন্যাস সম্পর্কেও শ্রীপর্যবেক্ষক যেভাবে তথ্য-

চিঠিপত্র

নিষ্ঠ আলোচনা করেছেন তাতে বিস্মিত হতে হয় এই জন্য যে, এই অল্প সময়ের মধ্যে তিনি প্রচুর পাঠের শ্রম স্বীকার করেছেন। তাঁর মতামতও আমার বেশ ভাল লেগেছে। বেতার জগতে প্রকাশিত 'হাঁসের আকাশ' আমাদের প্রিয় লেখক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের এবার শারদ সাহিত্যে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। এই উপন্যাস পড়তে পড়তে আমি ভাবতেও পারিনি যে অকস্মাৎ তিনি আমাদের ছেড়ে চলে যাবেন। এই উপন্যাসটির সম্পর্কে শ্রীপর্যবেক্ষক বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। তার কিছু অংশ উদ্ধৃত করবার লোভ সংবরণ করতে পারছি না। 'শিকার শেষ পর্যন্ত গৌণ হয়েছে, এই বিস্তীর্ণ পটভূমিতে স্থাপিত নর-নারীর মানসিক টানা-পোড়েন, দ্বন্দ্ব-সংঘাত প্রাধান্য পেয়েছে। নারায়ণবাবুর ক্ষেত্রে সেটাই স্বাভাবিক, তাঁর লেখা প্রকৃত জীবন-বিচ্ছিন্ন স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, বরং বলা চলে জীবনের বাস্তব বিকলাঙ্গ সর্বদাই সেখানে অধিক অধিকার স্থাপনের চেষ্টা করেছে। সুমন দেবরায় নামে স্কুলের শিল্প শিক্ষকটি যখন বন্ধুকে বলে 'তোমাদের জমিদারীর বাহাদুরী আছে হে, কিছু আর রাখোনি, শুষে সব ছিবড়ে করে দিয়েছো। কয়েকটা হাঁস-টাঁস এদের দু-চারজনকে দিয়ে দিলে পারতে, একটু প্রোটিন খেয়ে বাঁচত।'—তখন এক দীর্ঘ স্খলিত ঐতিহ্যের নিম্নতম পুরুষও চমকে উঠে মুখ ফেরায়, সে মুখ একালের সমাজ-মানসের দিকেই ফেরানো।'

পরিশেষে একটা কথা আমার মনে হয়েছে তরুণ ও নবীন লেখকদের গল্প সম্পর্কে যেমন ব্যাপকভাবে বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে উপন্যাসের ক্ষেত্রে তা হয়নি। কয়েকজন তরুণ লেখক যেমন অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ প্রমুখের উপন্যাসের আলোচনা থাকা প্রয়োজন ছিল।

অরুণ সরকার
কলিকাতা-৫১

(৩)

আমি নিয়মিত পাঠক হিসাবে অমৃতে প্রকাশিত পর্যবেক্ষক লিখিত শারদ সাহিত্য পরিক্রমা নিয়মিত পড়ছি। বিশেষ করে কবিতা সম্পর্কে 'পর্যবেক্ষক'-এর আলোচনাটি আমার খুবই ভাল লেগেছে। আমি বরাবরই কবিতা লিখেও থাকি। কিন্তু পড়তে পড়তে কিছু কবিতা আমার পক্ষে দুর্বোধ্য মনে হয়।

পর্যবেক্ষকের এই আলোচনায় পরিষ্কার ভাবে বুঝতে পারলাম যে কোন্ কোন্ কবিতা সাধারণ পাঠকের কাছে বুঝে ওঠা কঠিন হয় এবং কোন্ কোন্ কবিতা সাধারণ পাঠকের পক্ষে সহজেই বুঝে ওঠা সম্ভব হয়। এদিক থেকে পর্যবেক্ষকের এই আলোচনাটি কবি মহলে বিশেষ করে উঠতি কবি এবং কবিতার সাধারণ পাঠক-পাঠিকার কাছে সমাদর লাভ করবে।

সমাজ সচেতন কবিতাগুলি পড়তে ব্যক্তিগতভাবে খুব ভাল লাগে। তবে সব সমাজ সচেতন লেখকের পক্ষে সব সময় সমাজ ভাবনার যথার্থ রূপ ফুটিয়ে তোলা সম্ভব নয়। এবারের শারদীয় পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত কবিতাগুলিতে বর্তমানকালের জীবনযাত্রা নির্বাহের সমস্যা সংঘাত, নিম্ন-বিত্ত এবং মধ্যবিত্তের জীবন-সংগ্রাম, দারিদ্র্য, বেকারী, রাজনৈতিক আলোড়ন, শারিকী সম্মর্ষ, অরাজকতা, সর্বস্তরের মানুষের মনে অসন্তোষ, শূন্যতা ও অস্থিরতা এবং সর্বশ্রেণীর সাধারণ মানুষের বাঁচার কথা ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে এটা খুবই সুখের বিষয়। বাংলাদেশে এত কবিতার পত্রিকা বের হয়েছে কারও পক্ষেই সবকটি পত্রিকা সংগ্রহ করে পড়বার মত সৌভাগ্য হয় না। সেদিক থেকে পর্যবেক্ষকের বর্তমান আলোচনাটি আমাদের যথেষ্ট সহায়ক হবে সন্দেহ নেই।

অমরেশ চক্রবর্তী
গঙ্গারামপুর
পঃ দিনাজপুর

(৪)

শারদ সাহিত্য পরিক্রমা শীর্ষক প্রবন্ধের মাধ্যমে এবারে বিভিন্ন শারদীয় পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত কবিতার দীর্ঘ আলোচনাটি পড়লাম। শ্রীপর্যবেক্ষক মহাশয় গভীর দৃষ্টি দিয়ে কবি ও তাঁর কাব্যের আলোচনা করেছেন। সেজন্য পর্যবেক্ষক মহাশয়কে ধন্যবাদ। আলোচনাটি সাহিত্যপিপাসুদের পক্ষে নিঃসন্দেহে প্রয়োজনীয় খোরাক। আজকের এই দুর্যোগের অন্ধকারে কোন সাহিত্যিক-কবি কোন্ পথে চলেছেন অথবা তাঁদের সৃষ্টির পরবর্তী অধ্যায় নতুন কিছু পাঠক-মহলকে বিতরণ করবেন কিনা তার সব সংবাদ পর্যবেক্ষক মহাশয় স্বল্প পরিসরে দিয়েছেন। আধুনিক কাব্য-বিপ্লবের যুগে (পর্যবেক্ষকের আলোচনা অনুযায়ী) মনে হয়, বাংলা কাব্য জগতে হয়ত কিছুদিনের মধ্যে নতুন নতুন প্রতিভাধরের আবির্ভাব হবে। এবং সেটা খুবই শিগগীর। তবে আমার মনে হয় কবিগণ বৈদেশিক ছাঁচে নিজেদের তৈরী করে ফেলেছেন এবং সেই-জন্যই কাব্যের বিষয়বস্তুটুকু সাধারণ পাঠক-মহলের কাছে হয়ে উঠেছে দুর্বোধ্য। কিন্তু তাঁরা যদি নিজেদের প্রতিভাকে নিজস্ব পরিকল্পনায় গড়ে তোলেন তবে মনে হয়, এই কাব্য-সংগ্রাম আরও বেশী জোরদার হবে। বর্তমানে কথা হল এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্যের ব্যাপারে সম্পাদকদের এগিয়ে আসতে হবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তাঁরা এগিয়ে এসেছেন কি?

অমৃতের পাঠক হিসাবে আমি বলতে পারি আপনারা এ বিষয়ে নবীন কবির সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন। আশা করা যায় আপনারা নবীন কবির কর্ণধার হয়ে আরও বেশী করে কবিতা প্রকাশ করবেন।

সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়
কর্ণপুর, বর্ধমান

(৫)

শারদ সাহিত্য বিভাগে কবি ও কবিতা নিয়ে পর্যবেক্ষক মহোদয় আলোচনা করতে গিয়ে আসাম থেকে প্রকাশিত 'উৎস' ও 'সর্পিল'-এর নামোল্লেখ করেননি। সেই জন্যেই আমার এ ধারণা হয়েছে যে, পর্যবেক্ষক মহোদয়ের অনিচ্ছাতেই হয়তো কিছু নাম তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। সারা উত্তরবঙ্গ ও আসামসহ প্রকাশিত পত্রিকায় মাত্র একটি কবিতাই পর্যবেক্ষকের ভাল লাগায় কিছুটা আশ্চর্যান্বিত হয়েছি। এ বছর পুজোয় প্রকাশিত বাংলা পত্রিকার মধ্যে 'ত্রিবৃত্ত' কবিতা সংখ্যা হিসেবে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করলে, মেনে নিতেই হয়। কিন্তু শুধু ঐ একটি পত্রিকার কথাই বলছি না। এবার পুজোয় যাঁরা ভাল কবিতা লিখেছেন এবং যে পত্রিকাগুলিতে ভাল লিখেছেন অথচ সেই সকল কবি ও পত্রিকার নাম অনুল্লেখিত রয়েছে, তাঁদের নাম উল্লেখিত হলে আরো খুশি হতাম।

অধ্যাপিকা হেমা বড়ুয়া
ধুবড়ী, আসাম

'সাহিত্যের খবর' প্রসঙ্গে

গত ২৫ অগ্রহায়ণ তারিখের 'অমৃতের ৪০১ পৃষ্ঠায় 'সাহিত্যের খবর' স্তম্ভে লেখক বলেছেন—'পণ্ডিত ডঃ রাধাগোবিন্দ নাথের রচিত শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে গ্রন্থ বাঙালী তথা ভারতবাসীর নিকট এক উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি।' এ বিষয়ে আমার নিবেদন এই শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বিরচিত। ডঃ নাথ উক্ত গ্রন্থের বিশদ ব্যাখ্যা করেছেন এবং তাঁর ভাষ্যের নাম 'গৌর কৃপাতরঙ্গিণী'।

সত্যেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত,
পুটিয়ারী,
২৪-পরগণা।

CENTRAL LIBRARY

শাদা চোখে

সারা দেশব্যাপী আবার নির্বাচনী আবহাওয়া সৃষ্টি হয়েছে। আনুষ্ঠানিক ঘোষণার অপেক্ষা না রেখেই বিভিন্ন দল ইতিমধ্যেই নেপথ্যে রণনীতি স্থির করবার জন্য অনেক শলাপরামর্শ করেছেন। এমন কি অনেক দল সম্ভাব্য প্রার্থী তালিকাও প্রস্তুত করে ফেলেছেন। শুধু তাই নয়, বাজার গরম করার জন্য কে কত শক্তিশালী, গণসমক্ষে তার মহড়া দিতেও শুরু করেছেন।

কিন্তু লোকসভার জন্য নির্বাচন হলেও রাষ্ট্রপতি শাসিত পশ্চিমবঙ্গে বর্তমান অবস্থায় নির্বাচন সম্ভব কিনা তা নিয়ে মতান্তর দেখা দিয়েছে। বাংলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শ্রীসুশীল ধাড়া ইতিমধ্যেই বলেছেন, একমাত্র নির্ভেজাল দলপ্রেমীরাই পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান অরাজকতার পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচনের দাবী করতে পারেন। দেশপ্রেমিকরা পারেন না। বাংলা কংগ্রেস দেশপ্রেমিক, অতএব বর্তমান অবস্থায় তাঁরা নির্বাচনের কথা চিন্তা করছেন না।

দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক নীরবতা ভঙ্গ করে আদি কংগ্রেসের রাজ্য সম্মেলনে শ্রীঅতুল্য ঘোষ বলেছেন, ইন্দিরাজী হঠাৎ নির্বাচন চাইছেন শুধু ভারতীয় রাজনীতিতে অনিশ্চয়তা আরও দীর্ঘস্থায়ী করার জন্যে। পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে যে ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদ চলছে, এবং ফলে যে নিরাপত্তাবোধের অভাব দেখা দিয়েছে এর পরিপ্রেক্ষিতে সুষ্ঠু নির্বাচন হওয়া সম্ভব কিনা আদি কংগ্রেস সম্মেলন থেকে এই সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে আপাতত তাঁরা নির্বাচনের বিরোধিতা করেছেন বলেই মনে হয়। জনসংঘ, দল হিসাবে ক্ষুদ্র হলেও তাঁদেরও রাজ্য সম্মেলন থেকে নির্বাচনের বিরোধিতা করে প্রস্তাব পাশ হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের শাসক কংগ্রেস নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত, এই কথা ঘোষণা করেও বর্তমানে আইনশৃঙ্খলাজনক পরিস্থিতির যে অবনতি ঘটেছে তার উল্লেখ করেছেন। সোজাসুজিভাবে না বললেও তাঁদের ইচ্ছা আপাতত পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন স্থগিত রাখা হোক। তবে তাঁদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব যদি নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নেন রাজ্য ইউনিটের পক্ষে তার বিরোধিতা করা সম্ভব নয়। রাজ্যের বামপন্থী দলগুলি অবশ্য নির্বাচন অবিলম্বেই দাবী করেছেন। এঁদের মধ্যে মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি বিগত নভেম্বরেই নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য দাবী করেছিলেন এবং তা না করা হলে আন্দোলন করে সব অচল করে দেওয়ার কথাও ঘোষণা করেছিলেন। যা হোক, ক্ষেত্র বিশেষে আন্দোলন হয়েছে, তবে শুধু নির্বাচনের দাবীতে মার্কসবাদী কম্যুনিস্টরা তেমন কিছু করেন নি। শ্রমিকদের মাইনে বৃদ্ধির আন্দোলনের সঙ্গে নির্বাচনের দাবীটা অবশ্য সর্বত্রই জুড়ে দেওয়া হয়েছে। কাজেই ইন্দিরাজী যদি এখন নির্বাচন অনুষ্ঠান করেন তবে মার্কসবাদী কম্যুনিস্টরা খুশিই হবেন। এবং বামপন্থী কম্যুনিস্টরা যখন খুশী তখন তাঁদের ছয় পার্টির জোটের শরিকরাও খুশী হবেন বলে ধরা যায়। তাঁরা আর এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে হয়ত বলবেন, তাঁদের আন্দোলনের চাপে পড়েই নির্বাচন করতে হচ্ছে।

অষ্টবামের অন্তর্ভুক্ত দলগুলিও অবিলম্বে নির্বাচন চান। তবে কখন এই নির্বাচন হওয়া উচিত সে সম্পর্কে কোন শরিকরাই সুনির্দিষ্ট তারিখ বলতে নারাজ। খবরে প্রকাশ, বড় শরিক দক্ষিণপন্থী কম্যুনিস্ট পার্টি ইতিমধ্যেই তাড়াহুড়ো নির্বাচন না করার জন্য ইন্দিরাজীর কাছে বলেছেন।

দুই বামপন্থী গোষ্ঠীর মধ্যে বর্তমানের অনিশ্চয়তা ও বর্তমান বিশৃঙ্খলার আবহাওয়া নিরসনকল্পে জনপ্রতিনিধিত্বমূলক সরকার গঠনই যে একমাত্র দাওয়াই, এই বিষয়ে মতানৈক্য নেই। তাঁরা বর্তমানের এই ভয়াবহ অবস্থাকে মোটেই প্রশাসনিক ব্যাপার বলে মনে করেন না। রাজনৈতিক সমস্যা হিসাবে বিশ্লেষণ করে তাঁরা এই অস্বস্তিকর পরিবেশের অবসানের জন্য রাজনৈতিক সমাধানের উপর জোর দিচ্ছেন। এতদসত্ত্বেও আশু নির্বাচনের তারিখ সম্পর্কে তাঁরা একমত হতে পারছেন না। প্রশ্ন হচ্ছে, কেন। উত্তর পেতে গেলে ইতিহাসের পুনরালোচনা প্রয়োজন। যুক্তফ্রন্টের রাজত্বকালে বড় অংশীদার বাম কম্যুনিস্টরা সংগঠনকে বাড়াবার জন্য সরকারী যন্ত্র ব্যবহার করেছিলেন বলে অভিযোগ শোনা গেছে। সে যাক, যেভাবেই হোক, বাম কম্যুনিস্টরা যে সংগঠন বাড়িয়েছেন তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু যখন যুক্তফ্রন্ট ভেঙ্গে গেল তখন তাঁদের প্রভাবও কিছুটা কমে যেতে লাগল। কিন্তু আশু নির্বাচন হলে বাম কম্যুনিস্টরা সেই ক্রমসঙ্কুচিত সংগঠনকে সার্থকতার সঙ্গে কাজে লাগাতে পারবেন এবং দলীয় শক্তি বৃদ্ধি সম্ভব হবে—এই আশা করেই তাঁরা নির্বাচনের উপরই জোর দিয়ে এসেছেন। বাম কম্যুনিস্টরা মনে করছিলেন এককভাবে লড়লেও তাঁরা পুনরায় ক্ষমতা করায়ত্ত করতে পারেন বা না পারেন অন্ততপক্ষে তার সিংহদরজায় গিয়ে উপস্থিত হতে পারবেন। কাজেই আশু নির্বাচনে তাঁদের প্রভাব বৃদ্ধির ব্যাপারে বাম কম্যুনিস্টরা বিশেষ আশান্বিত।

কিন্তু অষ্টবামের শরিকরা মনে করেন যে, বাম কম্যুনিস্ট দলকে রাজনৈতিক ভাবে

বিচ্ছিন্ন করার যে প্রয়াস সুরু হয়েছে তাকে সম্পূর্ণ না করে নির্বাচনের মহড়া নেওয়া ঠিক হবে না। তাঁদের অনেকের কাছে বামপন্থী সংকীর্ণতাই সবচেয়ে বড় শত্রুরূপে পরিগণিত হয়েছে। এবং এর বিকল্প হিসাবে গণতান্ত্রিক ও অন্যান্য বামপন্থী দলগুলির সমঝোতা একান্ত প্রয়োজন—এই বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য জোর চেষ্টা চলছে। ফলে, অন্টবামের মধ্যে একটা তত্ত্বগত মতানৈক্য ঘটছে। কিন্তু অন্টবামের বেশীর ভাগ শরিকই মনে করেন, শাসক কংগ্রেস যেমন প্রতিক্রিয়াশীল—বামপন্থী সঙ্কীর্ণতাও অনুরূপভাবে পরিবর্তনকামী সমাজ-সৃষ্টির পক্ষে অন্তরায়। অতএব, এই দুই শক্তি থেকে তফাৎ থেকে একটি শক্তিশালী তৃতীয় শিবির গঠন করা একান্ত জরুরী। তত্ত্বগত দিক থেকে এই বক্তব্য যথার্থ বলে মানলেও অনেকে শাসক কংগ্রেসের সংগে নিদেনপক্ষে কিছু সংখ্যক আসন ভাগাভাগি করেও উগ্র বামপন্থীদের শক্তি হ্রাসের পক্ষপাতী। এই যুক্তি যাঁদের কাছে থেকে এসেছে তাঁরা উগ্র বামপন্থীরা বা বামপন্থী কম্যুনিষ্টরা ক্ষমতায় এলে দেশের রাজনৈতিক চিত্র কি রূপ পরিগ্রহ করতে পারে তাঁর সুস্পষ্ট ছবি আঁকতে পারেন অভিজ্ঞতার মাধ্যমে। কাজেই তাঁদের যুক্তি একেবারে উড়িয়ে দিতে পারছেন না অনেকে। এই দোটানার মধ্যে পড়ে অন্টবাম কতৃতপক্ষে এখনও হাবুডুবু খাচ্ছে।

রাজনৈতিক বক্তব্য প্রস্তুত করেও অন্টবাম এখনও পুরোপুরিভাবে একটি নির্বাচনী জোটে বা ফ্রন্টে উন্নীত হতে পারে নি। দক্ষিণপন্থী কম্যুনিস্টদের পশ্চিমবঙ্গ ইউনিট রাজ্যে নব কংগ্রেসের সংগে যে-কোন প্রকারের আঁতাতের বিরোধী বক্তব্য রেখে অন্টবামকে একটি সুসংগঠিত ফ্রন্টে যখন রূপ দেবার চেষ্টা করছিলেন, তখনই আবার নতুন করে শাসক কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতার উপর জোর দেওয়া হচ্ছে দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের পক্ষ থেকে। কাজেই অন্টবাম তাঁদের বর্তমান রূপ বজায় রাখতে পারবে কিনা সে সম্পর্কে সন্দেহের ভাব দেখা দিয়েছে। যা হোক, নির্বাচনের সুনির্দিষ্ট তারিখ ঘোষিত হলে এর একটি ফয়সালা হয়ে যাবে বলে মনে হয়। অন্টবামের নেতারা অবশ্য আশাবাদী। তা না হলে তাঁরা কে কত আসনে লড়াই করবেন সে সম্পর্কে শরিকদের প্রতি নির্দেশ দিতেন না।

অন্যদিকে বাংলা কংগ্রেসের গণতান্ত্রিক মোর্চার রূপ পরিস্ফুট হয়ে উঠলেও ঐ দল আশু নির্বাচন চাইছেন না বলে শাসক কংগ্রেস কিছুটা বিপাকে পড়েছেন। শাসক কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ শ্রীঅজয় মুখার্জিকে বোঝাবার চেষ্টা করছেন যে এই রাজ্যে ক্ষমতায় আসতে না পারলেও কেন্দ্র যদি হাতে থাকে তবে রাজনীতির মোড় ঘোরানো আদৌ কঠিন নয়। বাংলা কংগ্রেস যদি রাজি না হয় তবে লোকসভার নির্বাচনও কঠিন হয়ে পড়ে। কেননা, পশ্চিমবঙ্গে মধ্যবর্তী নির্বাচন না করে শুধু যদি লোকসভার নির্বাচন করা হয় তা কেমন বিসদৃশ ঠেকে। সত্যিই রাজ্য বিধানসভার নির্বাচন মুলতুবী রেখে শুধু লোকসভার নির্বাচন করার পক্ষে কোন বিশ্বাসযোগ্য যুক্তিও খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে। সুতরাং, বাংলা কংগ্রেসকে রাজি করাতে না পারলে সমস্যাটা কিছুটা জটিল আকারই ধারণ করতে পারে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, বাংলা কংগ্রেস কেন বর্তমানে নির্বাচনের কথা চিন্তাই করছেন না। একথা ঠিক নয় যে, বাংলা কংগ্রেস তার পরিকল্পিত গণতান্ত্রিক মোর্চার ভবিষ্যৎ শরিকদের এক করতে পারেন নি। শাসক কংগ্রেসও এই মোর্চার অংশীদার হিসাবে পি এস পি দলকে সঙ্গে নিতে রাজী। কিন্তু কম্যুনিস্টদের সঙ্গে নিতে নিমরাজী। কারণ দলের অভ্যন্তরে এই সম্পর্কে যথেষ্ট মতানৈক্য বর্তমান। শাসক কংগ্রেসের একটি বিরাট অংশ কম্যুনিস্টদের মধ্যে কোন প্রকারভেদ দেখতে পান না। গত ফড়লপুর শিবিরে অনেক জেলার প্রতিনিধিরা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এই বক্তব্য রেখেছেন। অবশ্য উপর থেকে নির্দেশ এলে এই সমস্ত কর্মকর্তারা কি পন্থা নেবেন তা জানা যায় নি। তবে কম্যুনিষ্ট বিরোধিতা যে খুবই প্রবল তা সম্পূর্ণভাবে প্রত্যক্ষ করা গেছে। শাসক কংগ্রেসের রাজ্য নেতৃত্বে অনেকের আদি কংগ্রেস নেতাদের প্রতি দুর্বলতা আছে বলে অভিযোগ শোনা যায়। কিন্তু তা থাক বা না থাক, কৌশল হিসাবে তাঁরাও আদি কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতার বিরোধী। তাঁদের প্রতিক্রিয়াশীল হিসাবে চিহ্নিত করে বাইরে রাখলে অনেকেই মনে করেন এতদিন পর্যন্ত যাঁরা অপ্রত্যক্ষ বামপন্থী হিসাবে নিজেদের ভূমিকা পালন করছিলেন তাঁরা এবার শাসক কংগ্রেসের দিকে ঝুঁকে যাবেন। এবং এ সুযোগ হারানো কোন প্রকারেই উচিত নয়—যদি কংগ্রেসকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকতে হয়। এ রকমের একটা চিন্তাধারা শাসক কংগ্রেসের মধ্যে জোরালো রূপ নেওয়ার ফলে শ্রীঅজয় মুখার্জি ও শ্রীপ্রফুল্ল সেনের মধ্যে যে আলোচনা চলছে তা সার্থক রূপ পরিগ্রহ করতে পারছে না। শ্রীমুখার্জির বাংলা কংগ্রেসের ধারণা তিন কংগ্রেস, পি এস পি, এস এস পির অংশ ও সৈয়দ বদরুদ্দোজার নবগঠিত দল যদি একসঙ্গে মিলিত হয় তবে বর্তমান অবস্থার পুনরায় একই আদর্শে বিশ্বাসী দলগুলির একটি সরকার গঠিত হওয়া একপ্রকার নিশ্চিত বলেই ধরে নেওয়া যেতে পারে। বাংলা কংগ্রেসেরও ধারণা, কম্যুনিস্টদের মধ্যে কোন মৌলিক পার্থক্য নেই। কাজেই বাংলা কংগ্রেসের শক্তিমান সম্পাদক শ্রীসুশীল ধাড়ার সঙ্গে শাসক কংগ্রেসের একটি বিরাট অংশের চিন্তা ভাবনা সম্পূর্ণ মিলে গেছে। অন্য দিকে পি এস পির সঙ্গে একাত্মতা ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে। আর এস এস পির অংশে শ্রীকাশীকান্ত মৈত্রের নেতৃত্বে তাঁদের সঙ্গে হাত মেলাবেন না এমন কথা বলা যায় না। কারণ শ্রীমৈত্র ও তাঁর অনুগামীরা গত জলপাইগুড়ি সম্মেলনে শেষ পর্যন্ত উপস্থিত না থেকে 'ওয়াক আউট' করে বেরিয়ে এসেছেন। কেননা তাঁদের নিছক 'গণতান্ত্রিক মোর্চা' গঠনের প্রস্তাব নাকি সম্মেলনে বিশেষ পাত্তা পায় নি। অধিকন্তু, বাংলা কংগ্রেসের নাগরিক নিরাপত্তা কমিটির সঙ্গে এস এস পির কোন সম্পর্ক নেই—সরকারীভাবে এই ঘোষণা করার পরও দেখা যাচ্ছে শ্রীমৈত্র ও তাঁর সহকর্মীরা ঐ কমিটির আয়োজিত সভায় বক্তৃতা করে চলেছেন। এ সমস্ত উপসর্গ দেখে মনে করা যেতে পারে যে আখেরে শ্রীমৈত্র হয়ত তাঁর দলবল নিয়ে এস এস পি থেকে সরেও যেতে পারেন। চিন্তার পার্থক্য যেখানে বর্তমান সেখানে সরে যাওয়া অসম্ভব নয়। যা হোক বর্তমানে বাংলা কংগ্রেসের গণতান্ত্রিক মোর্চার এই হচ্ছে রূপ। শুধু আদি কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতার প্রশ্নটা নিয়েই যা একটু গোলমাল থেকে গেছে। শাসক কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব চান, ডান কম্যুনিষ্টদের সংগে নিতে, যাতে দলটি একটা বামপন্থী রূপ লাভ করতে পারে। আর আদি কংগ্রেসকে বাইরে রাখতে, যাতে তাঁদের প্রগতিশীল চরিত্র সম্পর্কে আদৌ কোন সন্দেহ না থাকে। কিন্তু বাংলা দেশে এ চিন্তায় বাধ সাধছে বলেই যত গণ্ডগোল। তবে মনে হচ্ছে কৌশলের খাতিরে ডান কম্যুনিষ্টদের এই রাজ্যে তফাতে রাখার চেষ্টা হবে। যদি নিরঙ্কুশ ক্ষমতা লাভে অসুবিধা হয়, তবে নির্বাচনের পরেও একটি সমঝোতা হতে পারে। এতদ্‌সত্ত্বেও বাংলা কংগ্রেসকে সারা ভারতের রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তা করার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে। আর এই অসুবিধাটুকু দূর হলেই হয়ত অরাজক অবস্থার কথা বলে বাংলা কংগ্রেসও নির্বাচন স্থগিত রাখার জন্য চাপ দেবে না।

এদিকে বাম কম্যুনিষ্টরা ইতিমধ্যেই একেবারে প্রস্তুত হয়ে পড়েছেন। তাঁরা কত আসনে লড়বেন তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিতও দিয়েছেন। ছয় পার্টি জোটে তাঁরাই প্রধান। কাজেই ২০৭টি আসনে তাঁরা প্রার্থী দেবেন বলে নাকি স্থির করেছেন, অন্য কয়টিতে তাঁদের সহযোগীরা লড়বেন। আসনগুলির নাম প্রকাশ না পেলেও বোঝা যায়—তাঁদের বিরোধী বামপন্থী দলের কিছু কিছু আসনে হয়ত প্রার্থী দাঁড় করাবার কথা ঘোষণা করে চাপ সৃষ্টির চেষ্টা করবেন বা কোন প্রার্থী না দিয়ে একটি বন্ধুত্বমূলক আস্থা প্রদর্শনের চেষ্টা করবেন। মনে হয় আর এস পি ও লোক সেবক সঙ্ঘের আসনগুলিতে তাঁরা প্রার্থী না দেওয়ার কথাই ঘোষণা করবেন। তবে আর এস পির হয়ত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিটে প্রার্থীর নাম ঘোষণাও করতে পারেন যাতে আর এস পি তাঁদের নির্বাচনী নীতি অবিলম্বে ঠিক করেন। বাম কম্যুনিষ্টদের পক্ষ থেকে এত বেশি সংখ্যক প্রার্থী দাঁড় করানোর অর্থ হচ্ছে, এই রাজ্যে একটি আবহাওয়া সৃষ্টি করা যাতে জনসাধারণের মনে ধারণা হয় যে সি পি এমই একমাত্র শক্তিশালী দল এবং তাঁরাই বিকল্প স্থিতিশীল সরকার গঠন করতে পারেন।

কিন্তু রাজনৈতিক আবহাওয়া বর্তমানে যেভাবে বইছে, এর যদি পরিবর্তন না হয় তবে নির্বাচনের ফলশ্রুতি হবে—অনিশ্চয়তা দীর্ঘায়িত করা মাত্র। অন্য কিছু নয়।

—সমদর্শী

দেশে বিদেশে

সংসদের সদস্যরা শীত অধিবেশনের শেষেও জেনে যেতে পারেন নি, প্রধানমন্ত্রীর মনে কি আছে। এই অধিবেশনের শেষে ইন্দিরা গান্ধী সংসদের দলনেতাদের এক ভোজসভায় আপ্যায়িত করেছিলেন। সেখানে কেউ-কেউ জানতে চেয়েছিলেন, এটা তাঁদের বিদায়ী ভোজসভা কিনা। প্রধানমন্ত্রী সেদিন মুখ খোলেন নি। স্বভাবতই সংসদ সদস্যরা উৎকণ্ঠার মধ্যে ছিলেন এবং খবর বেরিয়েছিল যে, পার্লামেন্ট সদস্যদের ভিতর ঘুমের বড়ির চাহিদা বেড়ে গেছে।

কিন্তু কয়েক দিন পরেই জানা গেল, সংসদ সদস্যদের এড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী পরোক্ষভাবে প্রসঙ্গটি শাসক কংগ্রেস দলের ওয়ার্কিং কমিটির সামনে এনেছেন। লোকসভা ভেঙে দিয়ে অন্তর্বর্তী নির্বাচন আহ্বান করা হবে কিনা সে বিষয়ে অবশ্য তিনি কমিটির মতামত জানতে চান নি, তিনি শুধু এটুকুই জানতে চেয়েছেন, অন্তর্বর্তী নির্বাচন যদি হয় তাহলে শাসক কংগ্রেস দল কোন রাজ্য থেকে লোকসভার কয়টি আসন পেতে পারেন সেবিষয়ে রাজ্যগুলির প্রতিনিধিদের ধারণা কি। কমিটির সদস্যরা তাঁকে যে উত্তর দিয়েছেন তার ভিত্তিতে শ্রীমতী গান্ধী এখন লোকসভা ভাঙার সুপারিশ করবেন কিনা, এই প্রশ্নের উত্তর সংসদ সদস্যরা পেয়েছেন। যে প্রশ্নের উত্তর এই পর্যালোচনা লিখবার সময় পর্যন্ত জানতে বাকী আছে সেটা হল, কবে তিনি এই সুপারিশ করবেন এবং লোকসভার অন্তর্বর্তী নির্বাচন করা হবে।

শাসক কংগ্রেস দলের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যরা প্রধানমন্ত্রীকে মোটের উপর এই পরামর্শই দিয়েছেন যে, এখন লোকসভা ভেঙে দিয়ে আগামী ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাসে যদি অন্তর্বর্তী নির্বাচন করা হয় তাহলে শাসক কংগ্রেস দল লোকসভার ২৪০টির বেশী আসন পেতে পারে। কোন্ রাজ্য থেকে কয়টি আসন ধরা হয়েছে তার বিস্তারিত হিসাব না বেরোলে বোঝার উপায় নেই ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যরা লোকসভায় এই ধরনের একক নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের আশা করছেন কি গণনার ভিত্তিতে। তবে দলের সদস্যদের আশাবাদী হওয়ার কয়েকটি বাস্তব হেতু আছে। যেমন, হিসাব নিয়ে দেখা গেছে, কংগ্রেস বিভক্ত হওয়ার পর যেসব উপ-নির্বাচন হয়েছে সেগুলিতে বিরোধী কংগ্রেসের তুলনায় শাসক কংগ্রেস অনেক বেশী সাফল্য লাভ করেছে। খুব সম্প্রতি শাসক কংগ্রেস দল পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ ও অন্ধ্রপ্রদেশে বিধানসভার উপনির্বাচনে একটি করে আসন জয় করেছে। আরও একটি গণনা কমিটির সদস্যদের হিসাবের মধ্যে স্থান পেয়ে থাকতে পারে। সেটা হল এই যে, কংগ্রেস বিভক্ত হওয়ার পর যে দুটি রাজ্যে শাসক কংগ্রেস দলের অস্তিত্ব প্রায় ছিল না বললেই হয় সেই দু রাজ্যেই এই দল এখন আস্তে-আস্তে পা রাখার জায়গা করে নিচ্ছে। বিরোধী কংগ্রেস দলের লখনৌ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে গুজরাটে বিরোধী কংগ্রেসের মধ্যে ব্যাপক বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে। সেখানে মনুভাই শাহ প্রমুখ বিরোধী কংগ্রেস নেতারা শাসক কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন। মহীশূরেও বিরোধী কংগ্রেসের মধ্যে ভাঙনের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।

তৃতীয় আর একটি গণনাও করা হয়ে থাকতে পারে। ১৯৭২ সালে যথানির্দিষ্ট সময়ে যদি লোকসভার নির্বাচন হয় তাহলে সেটা করতে হবে অধিকাংশ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের সঙ্গে একযোগে। পাঁচটি অথবা বড়জোর ছয়টি রাজ্যে বিধানসভা এই নির্বাচনপর্ব থেকে বাইরে থাকতে পারে। নাগাল্যান্ডে স্বাভাবিকভাবেই বিধানসভার পরবর্তী নির্বাচন ১৯৭৪ সালের আগে হওয়ার কথা নয়। বিহার, উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব ও কেরলে ১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনের পর এক দফা অন্তর্বর্তী নির্বাচন হয়ে গেছে। পশ্চিমবঙ্গে দুই দফা অন্তর্বর্তী নির্বাচন হয়ে গেছে এবং তৃতীয় আর এক দফা অন্তর্বর্তী নির্বাচনের জন্য প্রতীক্ষা হচ্ছে। যে রাজ্যগুলিতে লোকসভা ও বিধানসভার নির্বাচন পৃথকভাবে অনুষ্ঠিত হবে সেগুলিতে শাসক কংগ্রেস দল আঞ্চলিক পার্টির সঙ্গে সমঝোতা করে তাদের সহায়তা বেশী করে নিতে পারবে এবং বিধানসভার নির্বাচনে যেসব স্থানীয় প্রশ্ন ওঠে সেগুলি থেকে তফাতে থাকতে পারবে। ১৯৭২ সালে লোকসভার নির্বাচন হলে শাসক কংগ্রেস দল কয়েকটি মাত্র রাজ্যে এই সুবিধা পাবে আর ১৯৭১ সালে লোকসভার নির্বাচন হলে শাসক কংগ্রেস প্রায় সব রাজ্যেই পাবে এই সুবিধা।

এই গণনার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ একটা বড় ব্যতিক্রম। ১৯৭১ সালে লোকসভার নির্বাচন হলে পশ্চিমবঙ্গের লোকসভা নির্বাচন-কেন্দ্রগুলিতেও ভোট নেওয়া হবে; আর পশ্চিমবঙ্গে যখন লোকসভার নির্বাচন হবে তখন বিধানসভারও নির্বাচন না করার যুক্তি থাকবে না। কিন্তু ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাসের মধ্যে কি পশ্চিমবঙ্গে ভোট নেওয়ার মতো উপযুক্ত আবহাওয়া তৈরী হবে? যতদূর খবর পাওয়া যাচ্ছে তাতে মনে হয়, এই ব্যাপারে শাসক কংগ্রেস দলের নেতারা এক রকম হাল ছেড়েই দিয়েছেন। তাঁদের ধারণা হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে যাহা ১৯৭১, তাহা ১৯৭২। উপরন্তু সেখানে শাসক কংগ্রেসের সুদিন ফেরার জন্য আরও এক বছর অপেক্ষা করতে গেলে অন্য রাজ্যগুলিতে ইতিমধ্যে দলের অসুবিধা বাড়তে পারে। জিনিসপত্রের দাম চড়ছে, আগামী বছরের বাজেটে ভারত সরকারকে ট্যাক্সের বোঝা বাড়াবার অপ্রিয় কর্তব্য করতেই হবে, পর-পর তিন বছর ভাল ফসলের পর আর একবারও যে প্রকৃতির দাক্ষিণ্য লাভ করা যাবে, এমন নিশ্চয়তা নেই। অতএব পশ্চিমবঙ্গের ভরসায় না থেকে অন্যান্য রাজ্যের উপর ভরসা করে এখনই লোকসভার অন্তর্বর্তী নির্বাচনে নেমে পড়া যাক, এমন একটা হিসাব শাসক কংগ্রেস দলের নেতাদের মধ্যে গুরুত্ব লাভ করে থাকতে পারে।

●

প্রাক্তন রাজন্যদের ভাতা ও অন্যান্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধা প্রত্যাহার করার প্রশ্নটি নিয়ে ইন্দিরা সরকার যে বিড়ম্বনায় পড়েছেন সেটাও প্রধানমন্ত্রীকে লোকসভা ভেঙে দেওয়ার সিদ্ধান্ত করতে উদ্বুদ্ধ করে থাকতে পারে। সুপ্রীম কোর্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ রায়ে এমন একটি পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছে যেখানে রাষ্ট্রপতির আদেশে তো নয়ই, এমন কি সংসদে সংবিধান সংশোধন করেও প্রাক্তন রাজন্যদের ভাতা লোপ করা যাবে কিনা সেবিষয়ে আইনগত প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। প্রশ্নটা যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে সেটা হল, সুপ্রীম কোর্টের রায়ের ফলে প্রাক্তন রাজন্যদের ভাতা পাওয়ার অধিকারটা সম্পত্তির অধিকার কিনা। সুপ্রীম কোর্টের স্পেশ্যাল বেঞ্চের ১১ জন সদস্যের মধ্যে অবশ্য মাত্র দুইজন (প্রধান বিচারপতি হেদায়েতুল্লা ও বিচারপতি হেগড়ে) স্পষ্ট করে বলেছেন যে, সংবিধানের ২৯১ অনুচ্ছেদে প্রাক্তন রাজন্যদের যে ভাতা দেওয়া হয়েছে সেটা হচ্ছে সম্পত্তি সংক্রান্ত অধিকার। তাহলেও, অনেক আইনজ্ঞের ব্যাখ্যা এই যে, বেঞ্চের অধিকাংশ সদস্যের

নয়াদিল্লীতে নিজ আবাসে রাষ্ট্রপতি শ্রীভি ভি গিরি রুশ বিদেশী বাণিজ্য দপ্তরের মন্ত্রী মিঃ এন এস প্যাটোলিচেভের (বাঁদিকে) সঙ্গে কথা বলছেন। ভারতস্থ সোভিয়েট রাষ্ট্রদূত মিঃ এন এম পেগভ (মাঝখানে) ও এই আলোচনায় যোগ দেন।

রায়ের মর্মার্থ হচ্ছে, প্রাক্তন রাজন্যদের ভাতা পাওয়ার অধিকার কার্যত সম্পত্তি সংক্রান্ত অধিকার। মুশকিল এই যে, ভারতীয় সংবিধানের নির্দেশ অনুসারে সম্পত্তি সংক্রান্ত অধিকার হল একটি মৌলিক অধিকার। এবং, বিখ্যাত গোলকনাথ মামলায় প্রধান বিচারপতি হেদায়েতুল্লা যে রায় দিয়েছিলেন সেই রায় অনুসারে পার্লামেন্ট সংবিধান সংশোধন করে কোন মৌলিক অধিকার খর্ব করতে পারেন না। সংবিধানে মৌলিক অধিকারের উপর যেসব 'ন্যায়সঙ্গত বিধিনিষেধ' আরোপ করার কথা আছে সেগুলি প্রয়োগ করার ব্যাপারেও অসুবিধা আছে। প্রথমত, যে সম্পত্তি হচ্ছে আসলে নগদ টাকা সেটা সরকার নিয়ে নিতে পারেন কিনা সেবিষয়ে আইনগত সন্দেহ আছে। দ্বিতীয়ত, যদি-বা দখল করা যায় তাহলেও সংবিধানের নির্দেশ অনুযায়ী তার দরুণ খেসারত দিতে হবে এবং ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্তকরণের মামলার পর এই খেসারতের পরিমাণ স্থির করে দেওয়ার ব্যাপারে চূড়ান্ত ক্ষমতা পার্লামেন্টের নয়, সুপ্রীম কোর্টের। শুধু তাই নয়, সুপ্রীম কোর্টের নির্দেশ হচ্ছে, যে সম্পত্তি দখল করা হচ্ছে তার মূল্যের সঙ্গে খেসারতের পরিমাণের একটা সামঞ্জস্য থাকা চাই। রাজন্যদের বিশেষ ভাতা লোপ করে তার জায়গায় যদি খেসারত হিসাবে সমপরিমাণ অর্থই সরকারী তহবিল থেকে গুনে দিতে হয় তাহলে ভাতা লোপ করার কোন মানেই থাকে না।

এই গোলকধাঁধা থেকে বেরোবার রাস্তা কি? জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা যদি মনে করেন যে, আজকের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতিহীন রাজন্য ভাতাগুলি তুলে দেওয়া উচিত তাহলে সুপ্রীম কোর্টের হস্তক্ষেপের সুযোগ না রেখে জনগণের সেই ইচ্ছাকে কার্যকরী করার উপায় কি? বিশিষ্ট আইনজ্ঞ ও প্রাক্তন অ্যাটর্নি-জেনারেল এম সি শীতলবাদ বলেছেন যে, ভবিষ্যতে এক দিন সুপ্রীম কোর্টই হয়ত নিজের রায় সংশোধন করবে। পাঞ্জাব হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি শ্রী জি ডি খোসলা বলেছেন যে, রাজ্যগুলির সীমানা পরিবর্তনের বেলায় যেমন রাজ্য বিধানসভাগুলির মতামত নেওয়ার ব্যবস্থা আছে মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ের অনুচ্ছেদগুলির সংশোধনের জন্যও যদি সেরকম কোন ব্যবস্থা রাখা যায় তাহলে সুপ্রীম কোর্টের আপত্তি দূর হবে। আবার কেউ-কেউ বলেছেন যে, সবচেয়ে ভাল রাস্তা হচ্ছে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সংবিধানের ১৪৩(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সুপ্রীম কোর্টের উপদেশ চাওয়া।

চতুর্থ আর একটি অভিমত আছে সেটা রাজনৈতিক মহলের এবং সেই অভিমত লোকসভার অন্তর্বর্তী নির্বাচনেরই ইঙ্গিত দেয়। অভিমতটা হচ্ছে এই যে, পার্লামেন্ট ও আদালতের দড়ি টানাটানিতে যে অচল অবস্থা দেখা দিয়েছে সেটা জনগণকে ভাল-ভাবে বুঝিয়ে সরকারের উচিত নূতন করে জনগণের রায় নেওয়া। এই রায়ের ভিত্তিতে গঠিত সরকারের পক্ষে জনগণের ইচ্ছাকে বাস্তব রূপ দেওয়া সহজ হতে পারে।

●

লোকসভার আসন্ন অন্তর্বর্তী নির্বাচন ঘোষণার প্রাক্কালে ভারতীয় রাজনীতির একটি উল্লেখযোগ্য খবর হল নয়াদিল্লীতে মুসলিম সম্মেলন অনুষ্ঠান এবং সেখানে মুসলিম রাজনৈতিক দলগুলির কার্য-কলাপের সমন্বয় সাধন করার জন্য একটি সংস্থা গঠনের সিদ্ধান্ত। নয়াদিল্লীর ঐ সম্মেলনের উদ্যোক্তা ছিল মুসলিম মজলিস। ১৯৬৪ সালে কলকাতা ও অন্যত্র সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর গঠিত এই অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে যেভাবে মুসলিম রাজনীতির ভিতর স্থান করে নিয়েছে সেটা লক্ষ্য করার মত ঘটনা। মুসলিম লীগ ভারতীয় মুসলমানদের এক-মাত্র প্রতিনিধি বলে যে দাবী করত সেই দাবী অবশ্য মুসলিম মজলিসের আবির্ভাব-এর ফলে ক্ষুণ্ণ হচ্ছে; কিন্তু এটাও লক্ষ্য করার মতো যে, মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক সুলেমান সেইত মজলিসেরও একজন সম্পাদক।

এ বিষয়ে-- [illegible]

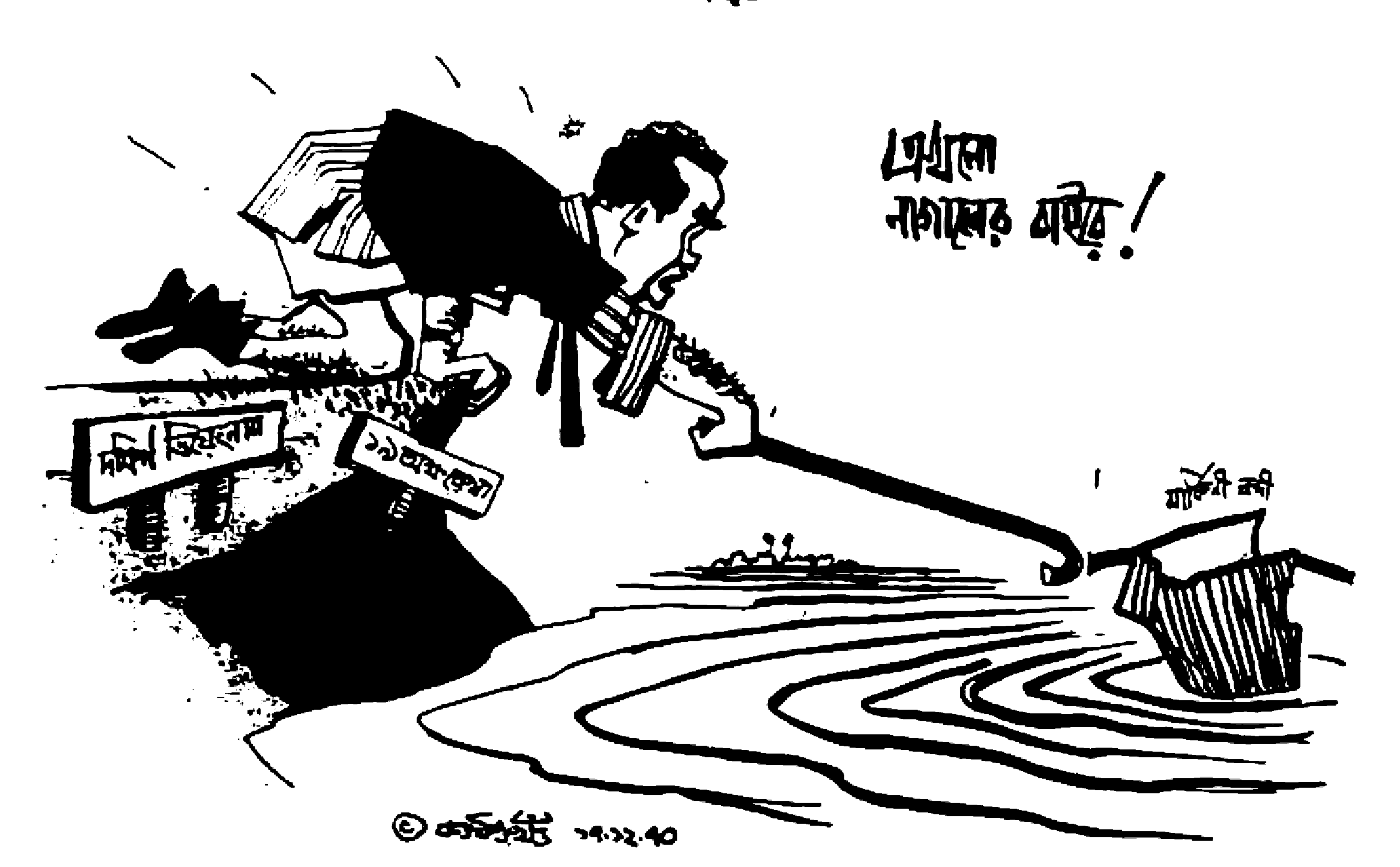

মুক্তিফ্রন্ট সংগঠনটির কার্যকলাপের প্রতি সমস্ত রাজনৈতিক দল লক্ষ্য রাখবে। অন্তর্বর্তী নির্বাচন হলে এই সংগঠন যাতে, বিশেষ করে উত্তর ভারতে, উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে।

●

ঘটনার আশ্চর্য পরিহাস বলতে হবে যে, ১৪ বছর আগে আর একটি দাঙ্গা-হাঙ্গামার মধ্য দিয়ে যে মানুষটি পোল্যাণ্ডের কম্যুনিস্ট পার্টির প্রধান হিসাবে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন তিনিই আর একটি দাঙ্গার পর সেই গদি থেকে অপসৃত হলেন। সরকারীভাবে যদিও বলা হচ্ছে যে, ভগ্নস্বাস্থ্যের গোমুলকা স্বাস্থ্যের কারণে অবসর গ্রহণ করেছেন তাহলেও একথা বুঝতে বাকী থাকছে না যে, পোল্যাণ্ডের বন্দর শহর গডানস্ক শহরে যে শ্রমিক বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল এবং পরে যে বিদ্রোহ গডিনিয়া, সোপোট, স্টেটিন প্রভৃতি বাল্টিক উপকূলবর্তী পোলিশ শহরগুলিতেও ছড়িয়ে পড়েছিল সেই বিদ্রোহই গোমুলকা, পোলিশ রাষ্ট্রপ্রধান মারিয়ান স্পাইচালস্কি প্রভৃতির পতন ঘটিয়েছে।

ঘটনার পরিহাস এখানেই যে, গোমুলকা নিজে একজন উদারনীতিবাদী বলে পরিচিত ছিলেন। স্তালিনের আমলে তিনি কারারুদ্ধও হয়েছিলেন। ১৯৫৬ সালে পোজনান শহরে শ্রমিক বিক্ষোভ দেখা দেওয়ার পরই বিক্ষুব্ধ শ্রমিকদের শান্ত করার জন্য তাঁকে ক্ষমতায় বসান হয়েছিল। ক্ষমতায় এসে গোমুলকা পোল্যাণ্ডে স্তালিনের আমলের রাজনৈতিক কঠোরতা অনেকখানি শিথিল করেছিলেন। কিন্তু পরিস্থিতি তিনি আয়ত্তের বাইরে যেতে দেন নি। তাঁর ক্ষমতা লাভ করার পরই হাঙ্গেরীর অভ্যুত্থানের ঘটনা তাঁকে একথা ভালভাবেই বুঝিয়ে দিয়েছিল যে, রাশিয়ার সীমান্তবর্তী দেশ পোল্যাণ্ডের পক্ষে রাশিয়ার বিরাগভাজন হওয়া খুবই বিপজ্জনক। ১৯৬৮ সালের বসন্তকালে চেকোশ্লোভাকিয়ায় যে ঘটনা ঘটে তার ধাক্কাও পোল্যাণ্ডে এসে লেগেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পোল্যাণ্ড জার্মান সৈনিকদের আক্রমণের শিকার হয়েছিল, শিকার হয়েছিল চেকোশ্লোভাকিয়াও। সেই স্মৃতি পোল্যাণ্ডের মানুষ ভুলতে পারে নি। ১৯৬৮ সালে তাই যখন চেকোশ্লোভাকিয়ার মাটিতে পূর্ব জার্মানীর সৈনিকদের সঙ্গে পোল্যাণ্ডের সৈনিকদেরও প্রবেশ করতে দেখল তখন তারা সেটা খুব ভাল চোখে দেখে নি। এর প্রকাশ ঘটল যখন ওয়ারশতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা জার-বিরোধী মনোভাবে লেখা ঊনবিংশ শতাব্দীর একটি নাটক অভিনয় করতে চাইলেন। কর্তৃপক্ষ তাঁদের এই অনুমতি দিলেন না। ছাত্ররা সে সময়ে রাস্তায় বেরিয়ে এসেছিলেন। তার পরও পোল্যাণ্ডের বিভিন্ন স্থান থেকে কিছু-কিছু হাঙ্গামার খবর পাওয়া যাচ্ছিল। গত মে মাসে ভ্রোৎস্লাভ শহরে গৃহিণীরা খাদ্যের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে মাংসের দোকানের কাঁচ ভেঙে ফেলেন। এর মাস তিনেক পরে বিক্ষোভকারীরা ঐ শহরের সরকারী অফিসগুলির সামনে যে হাঙ্গামা করেছিলেন তা দমন করার জন্য সৈন্য ডাকতে হয়েছিল।

চূড়ান্ত পরিণতি ঘটল বড়দিনের ঠিক আগে বাল্টিক সাগরের তীরবর্তী শহরগুলিতে দাঙ্গাহাঙ্গামার মধ্যে। এবারকার হাঙ্গামায় উপলক্ষ খাদ্যের মূল্যবৃদ্ধি। খবরে প্রকাশ যে, সম্প্রতি মূল্যতালিকার যে সংশোধন করা হয়েছে তাতে শিল্পজাত পণ্যদ্রব্যের দাম কমান হলেও খাদ্যবস্তুর দাম শতকরা ২০—৩০ ভাগ বাড়ান হয়েছে। বড়দিনের আগে এই মূল্যবৃদ্ধি পোল্যাণ্ডের রোমান ক্যাথলিক প্রভাবাধীন মানুষ যে মোটেই সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করতে পারেন নি দাঙ্গা-হাঙ্গামার মধ্য দিয়ে সেকথা প্রকাশ পেল।

খাদ্যবস্তুর উৎপাদনে পোল্যাণ্ডের ব্যর্থতার পরিচয় আগেও পাওয়া গেছে। পূর্ব ইউরোপের মধ্যে পোল্যাণ্ডই একমাত্র দেশ যে পি এল-৪৮০ অনুযায়ী আমেরিকা থেকে খাদ্যশস্য আমদানী করেছে। সোভিয়েট রাশিয়ার যে খাদ্যশস্য পাঠাতে হয় সেটাও পোল্যাণ্ডের খাদ্যের ঘাটতি বাড়াতে সাহায্য করে থাকতে পারে। ১৯৬৯ সালে পোল্যাণ্ডে যে বন্যা ও অনাবৃষ্টি হয় তাতে কৃষিপণ্যের উৎপাদন আগের বছরের তুলনায় প্রায় ৫ শতাংশ কমে যায়। এর পর আসে প্রচণ্ড শীত এবং শীতের শেষে বন্যা। হয় খাদ্যদ্রব্যের কঠোর রেশনিং অথবা মূল্যবৃদ্ধি প্রায় অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। যাঁদের পরামর্শে বড়দিনের ঠিক আগে মূল্যবৃদ্ধির কথা ঘোষণা করা হয়েছিল তাঁরা গোমুলকাকে ক্ষমতা থেকে সরাবার উদ্দেশ্য নিয়েই করেছিলেন, এমন সন্দেহ এখন মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। ২৩-১২-৭০ —দূরদর্শী

CENTRAL LIBRARY

সম্পাদকীয়

লোকসভার মধ্যবর্তী নির্বাচন

অনেক দিন ধরেই যে-জল্পনা চলছিল তা এখন প্রায় নিশ্চিত হতে চলেছে। শাসক কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এই চিন্তা লালন করা হচ্ছিল অনেক দিন থেকেই যে, বর্তমান লোকসভাকে তার পুরো মেয়াদ পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না। তাই ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারী-মার্চ নাগাদ লোকসভার মধ্যবর্তী নির্বাচন করার পক্ষে শাসক কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির মত প্রধানমন্ত্রীকে তাঁর কাজে এগিয়ে যেতে উৎসাহিত করল। ভারতে এর আগে লোকসভার মধ্যবর্তী নির্বাচন হয় নি। প্রত্যেক লোকসভাই পাঁচ বছর মেয়াদ পুরো করে নতুন নির্বাচনের মুখোমুখি হয়েছে। এবারে তার ব্যতিক্রম ভারতীয় রাজনীতির একটি বাস্তব দিকের প্রতিই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

সংগঠনপন্থী কংগ্রেসের নেতারা অবশ্য এ খবর শুনেই হাঁ-হাঁ করে উঠেছেন। তাঁদের বক্তব্য হল এই যে, লোকসভায় যে-সরকারের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই তাঁরা পার্লামেন্ট ভেঙে নতুন নির্বাচনের পরামর্শ রাষ্ট্রপতিকে দিতে পারেন না। এই যুক্তি আইনের দিক থেকে কতখানি বিচারসহ সে-প্রশ্নের মধ্যে না গিয়েও বলা চলে যে, কোনো সরকারের প্রধানমন্ত্রী যতক্ষণ পর্যন্ত পার্লামেন্টে পরাজিত না হচ্ছেন ততক্ষণ পার্লামেন্ট ভেঙে দেবার পরামর্শ তিনি দিতে পারেন। এ নজীর বৃটিশ পার্লামেন্টের রয়েছে। দ্বিতীয়ত বিরোধী দলের যদি সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকত কিম্বা বিকল্প সরকার গঠনের ক্ষমতা থাকত তাহলে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তো সরকারের নেতৃত্বই করতে পারতেন না। সুতরাং মধ্যবর্তী নির্বাচনের জন্য প্রধানমন্ত্রী যদি রাষ্ট্রপতিকে অনুরোধ করেন তাহলে তিনি নিজের ক্ষমতার এক্তিয়ারের মধ্যেই তা করবেন। এতে সংবিধান-বিরোধিতার কোনো প্রশ্নই গ্রাহ্য হবে না।

ভারতের রাজনীতিতে একক নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের মতো কোনো দল বর্তমানে আছে কিনা সন্দেহ। কংগ্রেস অবিভক্ত থাকার কালে তারা এ নিয়ে মাথা ঘামাত না। কিন্তু এখন সকল দলকেই চিন্তা করতে হচ্ছে কিভাবে জোটবন্দী হয়ে নির্বাচনে লড়াই করা যায়। রাজ্যগুলোতে বিভিন্ন ধরনের সরকার কায়েম হয়েছে। অনেক রাজ্যেই সরকারের অবস্থা টলমল। পশ্চিম বাংলায় তো বিধানসভাই নেই। কিন্তু লোকসভাকে বোধ হয় আর অপেক্ষা করানো চলে না। এবং শাসক কংগ্রেস মনে করছেন যে, এখন নির্বাচন হলে হাওয়া তাঁদের অনুকূলে বইবে। বিভিন্ন রাজ্যে উপনির্বাচনে শাসক কংগ্রেস ভাল ফল পেয়েছে। এমন কি সংগঠনপন্থীদের ঘাঁটি গুজরাট এবং মহীশূরেও শাসক কংগ্রেসের অবস্থা এখন ভাল। গুজরাটে সংগঠন-কংগ্রেসে বিরাট ভাঙন ধরেছে। মহীশূরে ও বাঙ্গালোর পৌরসভার নির্বাচনে শাসক কংগ্রেস আশাতীত সাফল্য অর্জন করেছে।

শাসক কংগ্রেসের প্রতিপক্ষরাও নিশ্চিন্তে বসে নেই। উত্তর প্রদেশ ও হিন্দীভাষী এলাকায় জনসঙ্ঘ এবং স্বতন্ত্র পার্টি তার প্রবল প্রতিপক্ষ। তবে স্বতন্ত্র পার্টিতেও ভাঙন ধরেছে। জনসঙ্ঘ যতটা হৈ-হল্লা করে নির্বাচনে তার প্রতিফলন ঘটবে কিনা তা বিচারসাপেক্ষ। দক্ষিণে তামিলনাড়ুতে ডি এম কে-র আধিপত্য বজায় আছে। কিন্তু সম্প্রতি যুবসমাজ এই দলের সরকারের প্রতি ক্ষুব্ধ। তাই সেখানে কামরাজই সফল হবেন কিম্বা জগজীবনরাম, তা দেখার একটা সুযোগ আসবে মধ্যবর্তী নির্বাচনে। কেরলে বামপন্থীদের একাংশের সঙ্গে বোঝাপড়া করে শাসক কংগ্রেস বিস্ময়কর সাফল্য অর্জন করেছে। এই ধরনের বোঝাপড়া আগামী নির্বাচনেও হতে পারে এবং তাতে প্রধানমন্ত্রী ভাল ফল পাবার আশা রাখেন। এস এস পি ও মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টিও নির্বাচনের জন্য তৈরী হচ্ছে। উত্তরপ্রদেশ ও বিহারে এস এস পি-র সাফল্য লাভের আশা।

শাসক কংগ্রেস বিরোধিতার দরুণ এস এস পি যে কোনো ধরনের নির্বাচনে বোঝাপড়ায় আসতে পারে। তাতে জনসঙ্ঘ ও স্বতন্ত্র পার্টিও যদি আসন জেতে, এস এস পি আপত্তি করবে না। কার্যত জনসঙ্ঘের সঙ্গে তাঁরা একত্রে মন্ত্রিত্ব করবেন। উত্তরপ্রদেশে সংগঠন কংগ্রেসকে তাঁরা ক্ষমতায় ফিরে আসতে সাহায্য করেছেন। অবশ্য এ নিয়ে এস এস পি-র মধ্যেও মতবিরোধ আছে তা আসন্ন নির্বাচনে কী রূপ নেবে বলা মুস্কিল। মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি গত বিধানসভার নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে একক বৃহত্তম দল হিসাবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। এবার তাঁদের প্রাক্তন সহযোগীরা দ্বিধাবিভক্ত। গণসংগঠনগুলোতে তাঁদের প্রভাব অক্ষুণ্ণ থাকলেও ছাত্র ও যুব সম্প্রদায়ে তাদের প্রভাবকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে অন্য ধরনের শক্তি। পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে যে-অশান্তি চলছে তাতে নির্বাচনে ভোটদাতারা নির্বিঘ্নে ও নির্ভয়ে কত সংখ্যায় ভোট দিতে আসেন তার ওপর বিভিন্ন দলের সাফল্য-অসাফল্য অনেকখানি নির্ভরশীল। তাছাড়া লোকসভার নির্বাচন হলে পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভার নির্বাচনের প্রশ্নও উঠবে। বামপন্থীরা নির্বাচন দাবী করেছেন কিন্তু বাংলা কংগ্রেস এখনি নির্বাচনের পক্ষপাতী নন। তবু লোকসভার নির্বাচন হলে পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভার নির্বাচন না করার কোনো যুক্তি থাকবে না। যদিও এই নির্বাচনের পরেও এখানে স্থায়ী সরকার গঠিত হবে কিনা তা বলা যাচ্ছে না। এককভাবে কোনো দল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলে এখানে সরকার চালানো কঠিন। তবে কেরলের অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি হলে পশ্চিমবঙ্গও যে জনপ্রতিনিধিমূলক সরকার পাবে না, এমন কথা জোর দিয়ে বলা যায় না।

যেদিকেই যাই ॥

মৃগাঙ্ক রায়

আমি যেদিকে যাই সেদিকেই
তোমার দিকে যাবার পথ,
আমি যেদিকে তাকাই সেদিকেই
তোমার তাকিয়ে-থাকা চোখ আমার চোখে পড়ে,
আমি যখনই তোমাকে ডাকি
তোমার কণ্ঠে আমার ডাক ফিরে আসে।

—

আমার ফিরে যাবার পথ নেই
দাঁড়িয়ে থাকার মতো স্থির মাটি নেই,
সামনে যেদিকে তাকাই সেদিকেই
নিহত মানুষ।
তোমার আমার মধ্যে নির্মিত সেতু নেই।
অথচ আমি যেদিকেই যাই সেদিকেই
তোমার দিকে যাবার পথ॥

যদি বলি॥

তুলসী মুখোপাধ্যায়

যদি বলি, আছে কোথাও বাগানবাড়ী
দীঘির পাড়ে বটের ছায়া, শেতলপাটি
নেমন্তন্ন চিঠির মতো সবুজ মাটি
মুচকে হেসে বলবে মাতাল—
বুকনি যেন ঢাকের বাঁড়ি
কেননা, এই পাতালে সকলকিছুই উল্টোপাল্টা
পায়ে পায়ে শ্মশানমশান
মামদোভূতের হাতের ঝাণ্টা!

যদি বলি, পান্থশালার মতন মানুষ
দাঁড়িয়ে আছেন মোড়ে মোড়ে
কাছে গেলেই জড়িয়ে ধরে
আতরজলে চান করিয়ে ডেকে নেবে ভেতরবাড়ী
বলবে হেসে মিথ্যেবাদী মিথ্যেবাদী—
কেননা, এই অরণ্যে সবকিছুই তো উল্টোপাল্টা
একের সঙ্গে অন্যজনার নিত্য আড়ি
এবং হাত বাড়ালেই
বনমানুষের হাতের ঝাণ্টা!

আমার মা-কে ॥

জয়ন্তী রায়

তুমি তো কিছুই সুখ নিলে না,
দু' চোখ তুলে দেখলে না তো—
শুধুই পথে পরিক্রমা—সময়টুকু ফুরিয়ে দিলে,
ক্লান্ত ডানা অবক্ষয়ে :
তুমি তো কিছুই সুখ নিলে না—
অনেক আলোর সোনা-আকাশ,
ফসল ভরা মেঠো ক্ষেতের আহ্লাদী ঘ্রাণ
এবং কাঁচ দুব্বোঘাসের আলতো ছোঁওয়া—
এলানো রোদ, চড়ুই পাখীর ব্যস্ততা বোধ,
অন্য মনে সৌখীন সাধ—
এসব কিছুই নিলে না তো :
তুমি কিছুই সুখ নিলে না,
আলো জেলে সরিয়ে দিলে
অন্ধকারের অনেক ছায়া;
হেমন্তকে কোথায় রেখে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলে
সমস্ত দিন একা ছুটে ঘর সাজালে—সমস্ত দিন—
সারা দিনের সহস্র কাজ,
সবার ভাল-মন্দ নিয়ে ভাবলে শুধু;
স্বাদ নিলে না বিচিত্রতার,
ভাগ নিলে না প্রাত্যহিকের আসক্তিতে,
সমস্ত দিন একা ছুটে কাটলো তোমার।
সমস্তক্ষণ রইলে নিজে অন্ধকারে,
বাইরে জেলে অনেক আলোর দীপান্বিতা।

CENTRAL LIBRARY

কবি কুমুদরঞ্জন

নরেন্দ্র দেব

বয়সে বছর কয়েকের বড় হলেও 'দাদা' বলে ডাকিনি কোনওদিন। ভারতী পত্রিকার অফিসে যে সাহিত্যিকদের আড্ডা বসতো তার কড়া নিষেধ ছিল কেউ কাউকে 'দাদা' বলবে না। বন্ধুরা পরস্পরকে নাম ধরে ডাকবে। স্বর্গীয় সৌরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় আমাদের আজকের চেয়ে বয়সে বেশ বড় ছিলেন কিন্তু কেউ আমরা কখনো তাঁকে 'সৌরেনদা' বলিনি। কুমুদরঞ্জন যদিও ভারতীর আড্ডার সদস্য ছিলেন না, কিন্তু যেহেতু তিনি কবি ও সাহিত্যিক অতএব বয়স তাঁর যাই হোক আমরা তাঁকে কুমুদরঞ্জন ছাড়া আর কিছু বলিনি কোনও দিন।

কুমুদরঞ্জন গ্রামের ছেলে হলেও কলেজে পড়বার সময় দীর্ঘকাল কলকাতায় কাটিয়েছিলেন। কবি তিনি ছাত্রাবস্থা থেকেই। অবশ্য শুধু 'কবি' বললে সঠিক পরিচয় দেওয়া হল না, 'সুকবি' বলে খ্যাতি তাঁর ছাত্রাবস্থা থেকেই ছিল এবং সে খ্যাতি তিনি বৃদ্ধ বয়সে মৃত্যুকাল পর্যন্ত অক্ষয় রেখে যেতে পেরেছেন।

কুমুদরঞ্জনের কাব্যের মধ্যে কোনও রচনা চাতুর্য দেখাবার প্রচেষ্টা নেই। প্রত্যেকটি কবিতা সহজ সরল স্বাভাবিক তাই অনায়াসেই শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলের অন্তর স্পর্শ করে। এ গুণ সহজসাধ্য নয়। স্বভাব কবি ভিন্ন অন্য কারুর পক্ষে সর্বজনচিত্ত স্পর্শ করা সম্ভব নয়। কুমুদরঞ্জন এই অসাধ্য সাধন করতে পেরেছিলেন। তিনি ছিলেন গ্রামের মানুষ। ছাত্রাবস্থায় বহুকাল এই কলকাতা শহরে কাটালেও কলকাতা কুমুদের 'কোগ্রাম'কে ভোলাতে পারে নি। পড়া শেষ করে 'গ্রাজুয়েট' হয়ে দেশে চলে গেলেন এবং দেশের স্কুলে মাস্টারীর কাজ নিয়েই সারা জীবন কাটিয়ে দিলেন। কবিতা লেখার ঝোঁক তাঁর শুনেছি স্কুলের ছাত্রাবস্থা থেকেই ছিল। বয়স তখন তাঁর দশ বছরের বেশী নয়। সেই কিশোর বয়সের সহজ সরল রচনার ধারা কুমুদরঞ্জন তাঁর পরিণত বয়স পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছিলেন। কখনও কোনও দিন দুরূহ দুর্বোধ্য শব্দ ব্যবহার করে আভিধানিক ভাষায় কবিতা রচনার চেষ্টা করেন নি। কুমুদরঞ্জনের প্রত্যেকটি রচনা সহজ সরল অথচ মর্মস্পর্শী।

বিংশ শতাব্দীতে বাংলা ভাষায় নতুন ধরনের কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল কুমুদরঞ্জন মল্লিকের। তাঁর কবিতাগুলি যেমন ছোট-ছোট কবিতার বইগুলিও তেমনি বেশ ছোট-ছোট। একখানি ফুলস্কেপ কাগজের চার ভাঁজ করলে যে আকার হয় কুমুদরঞ্জনের কাব্যগ্রন্থগুলিই আমরা সর্বপ্রথম সেই আকারেই পেয়েছিলুম। কয়েকখানি বইয়ের নাম করলে হয়ত অনেকের মনে পড়বে — তেমন ছোট আকারের কাব্যগ্রন্থ ইতিপূর্বে আর কোনও কবি ছাপান নি। কুমুদরঞ্জনের রচিত কবিতাগুলির মধ্যে কবি তাঁর রচনায় আকৃতিতে নূতনত্ব দেবার চেষ্টা না করলেও তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে নূতনত্ব এনেছিলেন। কয়েকখানির নাম করলেই বইগুলির কথা অনেকের মনে পড়বে। যেমন 'শতদল', 'বনতুলসী', 'একতারা', 'বীণা' ইত্যাদি আর ৮।৯ খানি কাব্যগ্রন্থ।

বলা বাহুল্য যে এত বেশী সংখ্যক কাব্যগ্রন্থ আর কোনও বাংলা কবির প্রকাশিত হয় নি। অবশ্য এ কাব্যগ্রন্থগুলি যেমন আকারে ছোট তেমনি মুদ্রিত কবিতাগুলিও সংখ্যায় অল্প। শিশু বালক ও কিশোরদের উপযোগী অসংখ্য কবিতা ইনি রচনা করেছিলেন। এই কবিতাগুলির মধ্য থেকে বিদ্যালয়ের পাঠ্য হবার উপযোগী কতকগুলি কবিতা নির্বাচিত করে নিয়ে কবিশেখর কালিদাস রায় একখানি 'স্কুল পাঠ্য' কাব্যগ্রন্থ সম্পাদন করেছেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে গ্রন্থখানি পাঠ্য-পুস্তকরূপে গৃহীত হয়েছে।

কুমুদরঞ্জনের একখানি নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ কবিতা সংগ্রহ প্রকাশ করেছেন বিশিষ্ট পুস্তক প্রকাশক মিত্র-ঘোষ কোম্পানী। এই বইখানি প্রকাশের অনেক বৎসর আগে একদিন কুমুদরঞ্জন আমাকে ডেকে ছিলেন তাঁর কাছে। তিনি তখন কলকাতায় এসে পটলডাঙ্গায় সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের পরিত্যক্ত বাড়ীতে উঠেছেন। সে বাড়ীটি তখন একটি 'মেসে' রূপান্তরিত হয়েছিল। কবিবন্ধুর ডাকে সেই দিনই বিকেলে গিয়ে হাজির হলুম কবির কাছে। আমি তখন ঠনঠনে কালিবাড়ীর সামনে ৩নং মুক্তারাম রোডে আমাদের পৈতৃক ভবনে বাস করি। পটলডাঙ্গা ওখান থেকে খুবই কাছে।

কুমুদ আমাকে পেয়ে খুবই খুশী। বার করলে তার মস্ত মোটা এক কবিতার ফাইল। বললে একখানা নির্বাচিত কবিতার বই বার করতে চাই। সেই বইয়ের জন্য এই কবিতাগুলো বেছে রেখেছি। তুমি একটু দেখে, এগুলো সব দেওয়া চলবে কিনা। পড়তে শুরু করে দিলেন কবি তাঁর নির্বাচিত কবিতাগুলি। কাব্যপ্রিয় কবি তাঁর স্বরচিত কবিতাগুলি সন্তানের তুল্য ভালবাসতেন। তাঁর নির্বাচন শুনে বুঝলুম মা যেমন তাঁর অক্ষম সন্তানের প্রতি একটু অধিক মমতা বোধ করেন, কুমুদরঞ্জন তেমনি তাঁর একাধিক দুর্বল রচনাকেও ফেলতে পারেন নি। বললুম নির্বাচিত কাব্যগ্রন্থে এগুলি দেওয়া ঠিক হবে না, এ সব বাদ দাও। কবি নিতান্ত অনিচ্ছুক মনে সেগুলি বাদ দিয়ে রাখলেন বটে, কিন্তু বুঝলুম কবির মন সেগুলির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে।

কবিশেখর কালিদাস রায় কুমুদের চেয়ে বয়সে অনেক ছোট হলেও কবির ছিলেন অতি অন্তরঙ্গ বন্ধু। শেষ পর্যন্ত কবিতা নির্বাচনের ভার নিজের ওপর না রেখে কালিদাসের উপরই ছেড়ে দিয়েছিলেন। ফলে কুমুদরঞ্জনের 'স্বনির্বাচিত কবিতা' কবিশেখর কালিদাসের দ্বারা শেষ পর্যন্ত নির্বাচিত হয়ে প্রকাশিত হল। যেমন হয়েছে তাঁর শিশুপাঠ্য বা স্কুলপাঠ্য কবিতাগুলি।

কোনও কবিই নিজের রচনার সুবিচারক হতে পারেন না। তাঁর কাছে নিজের সব রচনাই ভাল লাগে। একমাত্র রবীন্দ্রনাথকেই দেখা গেছে স্বরচিত কবিতার শ্রেষ্ঠ অপকৃষ্ট বিচার করে গ্রন্থাকারে ছাপার সময় নির্বাচন করে, ও বাদ দিয়ে ছাপা। কবি কুমুদরঞ্জন তাই কবিবন্ধু কালিদাস রায়ের সাহায্য নিয়ে ভাল করেছিলেন। কবি কুমুদরঞ্জনের সঙ্গে যাঁদের পরিচয়ের সৌভাগ্য হয়েছিল তাঁরা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন এমন বিনীত নম্র সহজ সরল মানুষ তাঁরা এ যুগে দ্বিতীয় কাউকে দেখেন নি।

অজয় ও কুনুর নদীর সংযোগস্থলে কোগ্রামে কবির জন্ম এবং সারা জীবন তিনি এই গ্রামকে ভালবেসে এরই কোলে সামান্য স্কুল শিক্ষকের কাজ নিয়েই স্বচ্ছন্দ জীবন কাটিয়েছেন। কিন্তু শেষ বিদায় নিতে হল তাঁকে এই কলকাতাতেই তাঁর সন্তানের স্বরচিত নবগৃহে। বাংলা দেশের কাব্যাকাশ হতে একটি সূর্যরশ্মি তারা নিভে গেল।

জোনাকি

শান্তি পাল

কালকের বিকেলটা এমন ছিল না। এমন ভারী মেঘলা বিবর্ণ। বেলাশেষের পড়ন্ত নরম রোদ মেখে আকাশ ঝকঝকে ছিল। সদ্য চুনকামকরা দেয়ালের মত পরিচ্ছন্ন। কাল-বিকেলে ঠিক এমন সময়...আড়চোখে জ্যোৎস্না দেয়ালঘড়িতে একবার তাকাল, এমন সময় নির্মল জ্যোৎস্নার হাতের আঙ্গুলে কটি আঙ্গুল দিয়ে আলতো করে ছুঁয়ে-ছিল। আগ্রহভরে সহজ আত্মীয়তায় অথচ কেমন মন-কেমন-করা উদাসীনো। ঝলমলে রোদমাখা উজ্জ্বল বিকেলে পথ চলতে চলতে নির্মল হঠাৎ বলেছিল, চল না, কোথাও সামান্য সময় বসি।

নির্মলের মনে সে সময় নিশ্চয় কোন দ্বিধা বা ইতস্ততঃ ভাব ছিল না। থাকলে এরকম প্রস্তাবে জ্যোৎস্না কিঞ্চিৎ উত্তপ্ত বা আহত হবে কিনা সেকথা ভাবত।

এসব ভাবতে ভাবতে একটা ভারী শ্বাস ফেলে নড়েচড়ে বসল জ্যোৎস্না। এতক্ষণ খাটের ওপর চোখে আড়াআড়ি হাত চাপা রেখে শুয়েছিল বিকাশ। সামান্য শব্দে এবার চোখ খুলে নীচে তাকিয়ে জ্যোৎস্নাকে দেখল।

—কি করছ বলত সেই থেকে?

—সেলাই। দেখছ তো।

—যত সব বাজে কাজ।

—শুয়ে শুয়ে কুঁড়েমি করার থেকে অনেক ভাল।

বিকাশ আর কথা বাড়াল না। যে যার নিজেকে নিয়ে থাকাই ভাল। একথা ভেবে এক পাক গড়াগড়ি খেল বিছানায়। জ্যোৎস্নারও আর ভাল লাগছিল না। সেলাই রেখে উঠে বারান্দার দিকে গেল। সব ধরণের দোতলা ঝুলবারান্দা সমস্তটার ওপর জ্যোৎস্না পাঁচিলে ভর দিয়ে ঝুঁকে দাঁড়াল। এই বর্ষাতেও কিছু মানুষজন রিকসা ও মোটরের ব্যস্ত যাতায়াত দেখল। আকাশ সারাদিনই মেঘলা। রাশি রাশি ভিজে মেঘ যেন আকাশ জুড়ে থমকে আছে। মাঝে মাঝে হাওয়ার ঝাপটায় সূক্ষ্ম জলকণা তুষার-পাতের মত ঝরে যায়। শরীরে মুখে চুলে।

—এই, শুনছ? ঘর থেকে মিহি গলায় ডাকল বিকাশ। বাইরের দৃশ্য থেকে চোখ সরিয়ে তাকাল জ্যোৎস্না,

—বল।

—এদিকে শোন।

জ্যোৎস্না সামনে এল। আঙুলে দিয়ে উড়ো চুল ঠিক করল। শনিবারের বিকেল। সকাল সকাল কলেজ থেকে ফিরে চা খেয়েই বিছানায় শুয়েছে বিকাশ। ঠিক ঘুমোচ্ছে না, মেঘলা অপরাহ্নের আলস্যে গড়াচ্ছে শুধু। জ্যোৎস্নাকে আসতে দেখে দুবার আয়েজের হাই তুলল, আঙুলে আঙুলে জড়িয়ে মটমট শব্দ করল তারপর ক সেকেণ্ড চুপচাপ চেয়ে থাকল ওরদিকে। তা দেখে ঠোঁটের কোণে ক্ষীণ হাসল জ্যোৎস্না।

—অকারণ ডাকাডাকি করছ কেন বলত?

—এমনি। ইচ্ছে হল তাই।

—আসলে শুধু ইচ্ছেটাই? জ্যোৎস্না তাকাল কটাক্ষে।

—আর এক কাপ চায়ের প্রয়োজন ছিল। বিকাশ একটু থেমে বলল।

—তাই বল। জ্যোৎস্না দু মুহূর্ত চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। মেঘলা আকাশের ছায়ায় সাদা দেয়ালগুলি পর্যন্ত বিবর্ণ লাগছে। ঘরের কোণে কোণে কড়িকাঠে আসবাবের ফাঁকে ধুপেসি অন্ধকার জড়ো হয়ে উঠছে। বাইরে এখন সামান্য শব্দে বৃষ্টি হচ্ছে। এলোমেলো খাটের বিছানায় আধশোয়া বিকাশ, বালিশে কনুয়ের ভর দিয়ে এক নজর ওকে দেখে নিয়ে জ্যোৎস্না রান্নাঘরে চলে এল। স্টোভে কেটলি বসাতে গিয়ে নিজের হাত পায়েও কেমন আলস্য বোধ করল। আসলে এটা মনের বিমুখতা, মনে মনে বলল জ্যোৎস্না, একটানা বিরামহীন সেবাব্রত কর্তব্যপরায়ণতা মাঝে মাঝে দুরূহ ভার হয়ে ওঠে বইকি। সেটা নিজের স্বামীর প্রতি হলেও। বিকাশ যেন একটা বয়স্ক শিশুর মত। নিজের সমস্ত ব্যক্তিগত ব্যাপারে জ্যোৎস্নার ওপর নির্ভরশীল। মেয়েদের অবশ্য এটা ভাল লাগে, জ্যোৎস্না ভাবল, তার নিজেরও লাগত এক সময়। তবু নির্ভরতারও একটা শেষ আছে। সব যত্নেরই ধৈর্যসীমা আছে। সেটা না মানলে আস্তে আস্তে তা একটা কঠিন দায়িত্বই হবে যায় শুধু। আর ভালবাসা? ভালবাসার কথা মনে হতে ঠোঁটের ফাঁকে হাসি খেলল জ্যোৎস্নার। ওটা সম্ভবত তৈরী করা জিনিস। ভালবাসি এই ধারণাটা মনের মধ্যে ধরে রাখতে হয় চেষ্টা করে, না হলেই হঠাৎ হঠাৎ অসাবধানে কখন যেন মিলিয়ে যায় ভোজো হাওয়ার মধ্যে বৃষ্টির গন্ধের মধ্যে। জ্যোৎস্নার কয়েক মিনিটের এসব চিন্তার মধ্যেই কেটলির জল ফুটে এল। চা নিয়ে এঘরে এসে বিকাশকে তেমনি শোয়া দেখল জ্যোৎস্না। বিকেলের আলো সম্পূর্ণ মরে গিয়ে অন্ধকার ঘনিয়েছে ঘরে বাইরে সর্বত্র। এমন বর্ষার শব্দ ও মেদুর অন্ধকারে কেমন হাঁফ ধরে গেল জ্যোৎস্নার। তাড়াতাড়ি সুইচ জেলে আলোকিত করল ঘরকে। বিকাশ উঠে কাপ নিল। বলল,

—তুমি খাবে না?

—আমি বারবার চা খাই না।

—তবে এখানে এসে বসো।

—বাঃ আমার গা ধোয়া চুল বাঁধা সবই যে বাকি।

—এমন বৃষ্টির দিনে কেউ সাজে না। বিকাশ রহস্য করল, সেই যে একটা কবিতা আছে না, যেমন আছো তেমনি এসো—

—থাক, জ্যোৎস্না বাধা দিল, আপাতত তুমি উঠে একটু সাজসজ্জা করলে আমি বাধিত হব।

ওর বলার ভঙ্গিতে বিকাশ হেসে ফেলল। জ্যোৎস্না হাতের ওপর তোয়ালে এনে দিলে উঠে পড়তে বাধ্য হল। ক মুহূর্ত ওর শিথিল পায়ে বাথরুমে যাওয়া লক্ষ্য করল জ্যোৎস্না। তারপর আপনমনে টুকিটাকি কাজে ব্যাপৃত হল। ঘড়িতে ছটা বেজে গেছে অনেকক্ষণ। গতকাল এ সময়টা যেন সন্ধ্যা নেমেও নামেনি। চারদিকে কেমন একটা শান্ত গভীর বিকেলের পরিবেশ তখনও ছিল। সামান্য এলোমেলো বাতাসে ক্রমশ ধূসরতার রং ছড়িয়ে পড়ছিল। কিন্তু তা এত আস্তে যে চারদিকের বাড়ীর দেয়াল কার্ণিশ গাছগাছালির মাথা এমনকি চলন্ত গাড়ীগুলির গা থেকে উজ্জ্বলতার মুছেও যেন মুছছিল না। সে সময় বিস্ময়কালে নির্মল কি রকম তৃপ্ত চোখে বলেছিল,

—দারুণ ভাল লাগল আজ তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে। এমনি পথের মধ্যে।

—ধন্যবাদ। জ্যোৎস্না ছোট্ট করে অহংকৃত হেসেছিল।

—আবার কবে দেখা হবে কে জানে। নির্মলের স্বরটা হঠাৎ করুণ লেগেছিল জ্যোৎস্নার কানে।

—হবে নিশ্চয়ই। কেন না কোনদিন। জ্যোৎস্না যেন সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিল।

—তাবে আসছ তো মধ্যে মাঝে? ভুলে যেও না যেন আবার।

—নিশ্চয়ই না। নির্মলের মিনতিতে জ্যোৎস্না সৌজন্য করে হেসেছিল। মাঝে মধ্যে ওখানে গেলে ভালই লাগবে আমার।

বিকাশ ঘরে ফিরে আসতেই বাথরুমের দিকে চলে গেল জ্যোৎস্না; আজ আবহাওয়ায় বেশ ঠাণ্ডা ভাব। একটা শীতল শব্দময় সন্ধ্যা যেন চারপাশে বিছিয়ে রয়েছে। তবু শরীরে খানিকটা ঠাণ্ডা জলের স্পর্শ কাম্য মনে হচ্ছে। দরজা বন্ধ করে বাথরুমের নির্জনতার মধ্যে খানিকটা চুপচাপ রইল জ্যোৎস্না। তারপর বিক্ষিপ্ত মনকে গুছিয়ে এনে গায়ে জল ঢালায় প্রবৃত্ত হল।

কড়া নাড়ার শব্দে ফ্ল্যাটের দরজা খুলেই যুগপৎ বিস্মিত ও খুশী হল জ্যোৎস্না।

—নমিতা, তুই?

—আসতে নেই? ভেতরে পা দিয়ে হাসল নমিতা।

কালিকট থেকে পলাশী

প্রখ্যাত ইতিহাসবেত্তা শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদারের অভিমত :

"১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে পর্তুগীজ বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল মালাবার উপকূলে কালিকট নগরে। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে তাহারই ফলে পলাশীর প্রান্তরে ইংরেজ বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডে পরিণত হল। তারপর অদূর ভবিষ্যতে ক্ষুদ্র এক বণিক সম্প্রদায় সমগ্র ভারতে স্থাপন করল এক বিশাল সাম্রাজ্য এবং ক্ষুদ্র এক দ্বীপের অধিবাসীরা পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে বড় সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হল। স্বপ্ন বা উপন্যাসের মতন শোনালেও এটি বাস্তব ঘটনা—এবং শ্রীসতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় অতি সহজ ভাষায় এই অদ্ভুত কাহিনী বর্ণনা করেছেন—'কালিকট থেকে পলাশী' গ্রন্থে। এই প্রসঙ্গে তিনি সুদূর প্রাচীনকাল থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের মধ্যে বাণিজ্য চলাচলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন—এবং ১৪৯৮ থেকে ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে পর্তুগীজ, ডাচ, ফরাসী, দিনেমার, ইংরেজ প্রভৃতি জাতীর বণিকদের প্রাচ্যে বাণিজ্য ও রাজ্যের উত্থান পতনের কাহিনী বিবৃত করেছেন। এই কাহিনীর মধ্য দিয়ে আমরা দেখতে পাই পৃথিবীতে কি যুগান্তর ঘটেছে বিশেষতঃ ভারতের ইতিহাসে সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্পূর্ণ এক নূতন রূপ পেয়েছে। এই ঐতিহাসিক কাহিনী গ্রন্থকার যেরূপ নিপুণতার সহিত গল্পের মত সরস করে পাঠকের কাছে উপস্থিত করেছেন তার জন্য তিনি আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। মানুষের অগ্রগতির ইতিহাস যাঁরা জানতে চান—তাঁরা এই বইখানি পড়ে বিপুল আনন্দ ও প্রচুর জ্ঞান লাভ করবেন।"

দশটি চিত্র মানচিত্র॥ টাঃ ৬·৫০

সাহিত্য সংসদ

৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-৯

—না, তা নয়। তবে এমন হঠাৎ আশা করতে পারিনি।

—ঘরকন্নায় খুব ব্যস্ত আছিস নাকি এখন?

—না, রবিবারের সকালে তেমন ব্যস্ততা থাকে না। চল, ঘরে বসবি।

নমিতাকে সঙ্গে নিয়ে বসার ঘরে এল জ্যোৎস্না। চেয়ারে হেলান দিয়ে মুখে খবরের কাগজ মেলে ধরেছিল বিকাশ। ওদের পায়ের শব্দে তাকাল।

—আমার বান্ধবী, নমিতা। সংক্ষেপে জানাল জ্যোৎস্না।

—নমস্কার। বিকাশ হাসি হাসি মুখে বলল। আপনাকে তো চিনি, দেখেছি এর আগে।

—অতএব পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। এবার খোশ গল্পের পালা। নমিতার কথার ভঙ্গিতে ওরা দুজনেই হাসল। নমিতা ইদানীং বেশ সুশ্রী হয়েছে আগের তুলনায়। জ্যোৎস্না চেয়ে চেয়ে দেখছিল। ওর চোখ-মুখ হাত-পায়ে কেমন একটা খুশীর জল। সাজসজ্জায় ঈষৎ মার্জিত উজ্জ্বলতা।

—তোরা কথা বল আমি চা করে আনি। জ্যোৎস্না সুগৃহিণীর মত বলল।

—তোকে কিন্তু আজকাল টিপিক্যাল সংসারীদের মতই লাগে। নমিতা মন্তব্য করল ঠাট্টা করে।

—যে সংসার করে তাকে সংসারী লাগবে না? উত্তরটা হেসেই দিল জ্যোৎস্না। তবু বুকের গোপন থেকে একটা ম্লান ছায়া কেন তার হাসিতে বিস্তৃত হল। সেটুকু ঢাকতে তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে চলে এল সে।

—আমাদের ক্লাবের খবর-টবর রাখিস? চা খেতে-খেতে বলল নমিতা।

—সেই তো বিয়ের পর দু-একবার গিয়েছি মাত্র। তোদের কাছেই যাওয়া হয়ে ওঠে না।

—এই এক বছর না দেড় বছরে মাত্র দুবার? নমিতা অপ্রস্তুত করে দেবার মত মুখভাব করল। বিকাশকে ইঙ্গিতে দেখাল, উনি কি পছন্দ করেন না নাকি? অবশ্য বিজ্ঞানের অধ্যাপকের এই সমস্ত অকস্তুতে আগ্রহ না থাকাই স্বাভাবিক।

—না ঠিক ওর জন্যে নয়, জ্যোৎস্না যেন নিজেকে দুরন্ত অবস্থা থেকে তোলবার চেষ্টা করছিল, আমিই ঠিক সময় করে উঠতে পারি না, ব্যাপারটা বুঝলি?

—তোদের আমলের সেই পুরনো ক্লাব আর নেই, জানিস। শুধু মাঝে মধ্যে স্বরচিত কবিতা পাঠ আর রবীন্দ্রসঙ্গীতের ঘরোয়া আসর দিয়েই শেষ করি না তোদের মত আজকাল আমরা। যেদিন থেকে আমি আর সনৎ, সনৎকে মনে আছে তো, ক্লাবের ভার নিয়েছি, সেদিন থেকেই তার চেহারা বদলেছে।

—এখন কি-কি হয়? জ্যোৎস্না আগ্রহী হতে চাইল।

—এই নাটক-টাটকও হয়। এই মাস না, একটা ম্যাগাজিন এবার বের করছি আমরা, নমিতা ব্যাগ খুলে কাগজপত্র বার করা শুরু করল, মান্থলি জার্নাল একটা বুঝলি, স্বল্প কবিতার সঙ্গে পলিটিক্যাল লোশনও থাকবে এর।

বিকাশ মনোযোগ দিয়ে ওর কাগজপত্র দেখছিল, জ্যোৎস্নাও দেখল কিছু-কিছু।

—ভালই তো করছিস।

—অবশ্যই ভাল, তবে এর পিছনে তোমাদেরও হেল্প চাই।

—হেল্প? হেসে তাকাল জ্যোৎস্না।

—যেমন তুমি এর জন্য ফিজিক্যালিও খাটতে পার, অথবা কিছু ডোনেশনও দিতে পার। নমিতা পড়া বোঝাবার মত করে বলল।

এতক্ষণে নমিতার এমন হঠাৎ আসার অর্থ আবিষ্কার করল জ্যোৎস্না। সামান্যক্ষণ কি ভাবল মনে-মনে। তারপর বিকাশের দিকে অলক্ষ্যে একবার চেয়ে বলল,—আচ্ছা এ ব্যাপারে আমি পরে তোর সঙ্গে একদিন দেখা করব।

—তার মানে একদিন ক্লাবে আসছিস। সুখবর। নমিতা চটপট বলল, তারপর কি মনে পড়তে বলল আবার, আচ্ছা, সেই নির্মল নামের ছেলেটাকে আজকাল আর দেখি না কেন বলত? সেই যে তোর ছোট-বৌদির ভাই?

—আমি কেমন করে জানব। একটু থেমে-থেমে ঢোক গিলে বলল জ্যোৎস্না।

—যাক গে, ওকে দিয়ে বিশেষ কাজও পাওয়া যেত না বোধহয়। নমিতা কিঞ্চিৎ তাচ্ছিল্যের মত করে হাসল, দেখলেই মনে হয় ছেলেটা ক্যালাস।

জ্যোৎস্না উঠে আস্তে-আস্তে ঘরের অন্য পাশে সরে এল। এটা-সেটা অনাবশ্যক জিনিস নিয়ে নাড়াচাড়া করল। কানের পাশটা কেমন যেন সামান্য উষ্ণ লাগছিল। নমিতার চাল-চলন কথাবার্তা এখন ক্রমশ ওর কাছে সভ্যতাহীন ও উন্নাসিক বলে প্রমাণিত হচ্ছিল। নমিতা এখন বিকাশের সামনে অনবরত কথার ফুলঝুরি ফোটাচ্ছিল।

—কিছুদিনের মধ্যেই, বুঝলেন, একটা বেশ কালচারাল ফাংশন করার ইচ্ছে রয়েছে। গানের পারফরমেন্সই হোক অথবা একটা অ্যাবসার্ড ড্রামা। যাই হোক, আপনাদের কাছে আবার আসতে হবে তো টিকিট বিক্রি করতে। নমিতা মধুর করে হাসল।

—নিশ্চয়ই আসবেন। বিকাশও সৌজন্য করল।

জ্যোৎস্নার মনে হচ্ছিল নমিতা যেমন কথাবার্তায় দক্ষ, ওর একটা সেলস রিপ্রেসেনটেটিভ হওয়াই উচিত ছিল। যদিও অবশ্য নমিতাদের অবস্থা খুবে স্বচ্ছল, জ্যোৎস্না জানে, ওর বাবা একজন উচ্চপদস্থ অফিসার।

—আচ্ছা আজ তাহলে উঠি। শব্দ করে চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়াল নমিতা। জ্যোৎস্নার দিকে চেয়ে বলল, তোর কাজ-কর্মে বোধহয় খুব ব্যাঘাত ঘটালাম।

—না-না, তাতে কি। জ্যোৎস্না মুখে হাসির পর্দা টানল।

—মনে করে যাস কিন্তু। ভুলে থাকিস না যেন।

—ভুলব না, যাব এর মধ্যে একদিন। জ্যোৎস্না দায়সারা গোছের বলল।

নমিতা চলে গেলে জ্যোৎস্না শোবার ঘরে এল। বিকাশও এল ওর সঙ্গে। একটু ইতস্তত করে বলল,—তোমার বান্ধবী বলছিলেন যখন, আজই দিয়ে দিলে না কেন কিছু।

জ্যোৎস্না অনেকক্ষণ কিছু সাড়া দিল না। তারপর কি ভেবে বিকাশের মুখের দিকে চেয়ে একটু চাপা স্বরে বলল,—বড়-পিসিমার টাকাটা এখনো পাঠান হয় নি।

বিকাশের বড়পিসিমা সহায়সম্বলহীনা। থাকেন বিকাশের দাদার বাসায়। সৌজন্যবশত বিকাশ কিছু টাকা প্রতি মাসে পাঠায় তাঁকে। এ মাসে প্রথম দিকে বাড়তি কিছু খরচ হওয়ায় টাকা পাঠাতে বিকাশ এখনো ইতস্তত করছে। জ্যোৎস্না এ কথাটা মনে করিয়ে দিতে বিকাশ যেন একটু থিতিয়ে গেল। কপালে সূক্ষ্ম দাগ পড়ল কট।

—তাছাড়া এসব ব্যাপারে বিশেষ কিছু খরচ করতে আমার ইচ্ছেও নেই তেমন। জ্যোৎস্না একটু বিরক্ত সুরেই উচ্চারণ করল।

—কেন? বিকাশ হঠাৎ হাসি টানল ঠোঁটের কোণে, এই ক্লাব-ট্যাব তো জানি আগে তুমিও করতে।

জ্যোৎস্না এক পলক ওর মুখের দিকে তাকাল, ওর হাসিতে সরলতা অথবা ব্যঙ্গ তা বুঝল না। সামান্য সময় থেমে থেকে বলল, — তখন ওটা একটা ঘরোয়া, প্রায় পারিবারিক ব্যাপার ছিল। এখন বোধহয় আস্তে-আস্তে বারোয়ারী হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই ওতে আর আমার আগ্রহ নেই।

জ্যোৎস্না ইচ্ছে করেই যেন আলোচনা বন্ধ করার জন্যে রান্নাঘরে চলে গেল। সকাল বেলার সমস্ত কাজগুলি এখনও পড়ে রয়েছে। অথচ কোনকিছুতেই যেন ওর মন সংপৃক্ত হতে পারছে না। নমিতা দমকা হাওয়ার মত এসে যেন ওর জীবনধারার একটানা সুরে হঠাৎ সাময়িক ছেদ টেনে দিয়ে গেল। একচিলতে রান্নাঘরের নির্জন একাকিত্বে এই মুহূর্তে নিজের মধ্যে কেমন একটা শূন্যতাবোধে আক্রান্ত হল জ্যোৎস্না। নিজেকে সমস্ত পৃথিবী থেকে পরিত্যক্ত এক বিচ্ছিন্ন সত্তা বলে উপলব্ধি করল। এবং এই বিচ্ছিন্নতার অনুভূতি ক্রমশ ওকে এই সংসার এই ঘর-গৃহস্থালী এমন কি বিকাশের প্রতিও বিমুখ করে তুলল।

ও-ঘরে বিকাশ দাড়ি কামাবার সরঞ্জাম নামাচ্ছে, অনুভবে বুঝল জ্যোৎস্না। এখন বেশ কিছুটা সময় যাবে ওর দাড়ি পরিচর্যায়। জ্যোৎস্না জোর করে কাজকর্মে মনোযোগ দেবার [illegible]

কাল বিকেলের মেজাজে মেঘলা ভাব এখন আর নেই। এই প্রথম বেলাতেই আকাশ বেশ উজ্জ্বল এবং রোদ তীক্ষ্ণ মনে হচ্ছে। অবশ্য এ সময়টায় বৃষ্টি নামার কোন স্থিরতা নেই। তবু এখন দর্পণকান্ত মেঘের বর্ণাঢ্য আলোয় চারপাশ বেশ ছিমছাম ঝকঝকে লাগছে। জানলার বাইরে কার্ণিশে গজিয়ে-ওঠা একটা টুকরো গাছের সদ্য-বৃষ্টিধোয়া অপরূপ রং দেখতে-দেখতে আনমনে আবার নমিতার কথা ভাবল জ্যোৎস্না। এবং নমিতার সূত্র ধরে এখন আস্তে-আস্তে ওর পুরনো জীবন পূর্ব-পরিচিত সব মানুষগুলি ছবির মতন সামনে ভাসছিল। বিয়ের আগে জ্যোৎস্না তার ছোড়দার বাড়ীর বৈঠকখানা ঘরটিতে একটা ক্লাব মত করেছিল। মাত্র কয়েকজন বান্ধবী ছিল এর মধ্যে। তত্র ছিল ছোটবৌদির ভাই নির্মল। অল্পবয়সের উচ্ছ্বাসপ্রবণ মানসিকতা আর নিজেকে ছড়িয়ে দেবার প্রয়াস তাদের এ ব্যাপারে উৎসাহিত করেছিল। ওদের তখন কাজকর্ম সর্বদাই অলৌকিক উন্মাদনা। স্বরচিত কবিতার আসর, ঘরোয়া গানের জলসা, ক্লাবের এই সব কাজেই মেতে থাকত তখন জ্যোৎস্না। মা পছন্দ করতেন না, রাগ করতেন। বিশেষ করে ছোড়দার বাসায় ওর এমন যাতায়াত মাকে বিরক্ত করত। ছোড়দা নিজের মতে বিয়ে করেছিল তাই আলাদা বাসায় থাকতে হত তাকে। মা বা অন্য দাদারা তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক রাখতেন না। জ্যোৎস্না কিন্তু থাকতে পারত না ছোড়দার কাছে না গিয়ে। ভীষণ ভাল-বাসত ছোড়দা তাকে, তাই। ছোড়দার বৈঠকখানাকে ক্লাবঘর বানিয়ে প্রায় রোজই যাতায়াত করতে পারত জ্যোৎস্না। ছোড়দার প্রশ্রয়ে বৌদির উৎসাহে সুন্দর দিনগুলি ভালই কাটত ওর।

বিকাশ দাড়ি কামিয়ে বাথরুমে ঢুকেছে। এখনি হয়ত আর একবার চায়ের ফরমাস হবে। সময়ে মানুষের কত পরিবর্তন হয়, জ্যোৎস্না ভাবল, মানুষের জীবনে, কার্য-ধারায়। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রংয়ের পলস্তরা পড়ে। সেই আগের দিনের চঞ্চল স্বপ্নাশ্রয়ী জ্যোৎস্না আজ সংসারের চাকে-চাকে নিজের অস্তিত্বকে বিছিয়ে দিয়েছে। নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে একটি মাত্র মানুষের ভাল-লাগা মন্দ-লাগা প্রয়োজন-অপ্রয়োজনের চতুঃসীমানায়। ভেবে একটা শ্বাস ফেলল জ্যোৎস্না। রান্নাঘর ছেড়ে এপাশে চলে এল। তখন তোয়ালে দিয়ে বিকাশ মুখ মোছা শুরু হল। জ্যোৎস্না দরজার কাছে এসে এক মুহূর্ত দাঁড়াল,

—আমি কাল কিম্বা পরশু একবার মায়ের ওখানে যাব।

—যেও। বিকাশ আয়নার সামনে দাঁড়াল।

—সেই সঙ্গে ছোড়দার কাছেও ঘুরে আসব।

তার মানে সারাদিনের জন্য নিশ্চিন্ত তো? বিকাশ রহস্য করে হাসল, আর আমি বেচারা দুরবস্থায় কাটাব এদিকে।

জ্যোৎস্না ওর কথার উত্তর দিল না। দরজা থেকে সরে এল। বিকাশের সমস্ত সুবিধে-অসুবিধে দিয়ে জ্যোৎস্না নিজের দিন-রাত্রিকে ভরে ফেলেছে। এর মধ্যে বৈশিষ্ট্যের ফাঁক কোথাও নেই। তা হোক। জ্যোৎস্না তবু যাবে। একদিনের জন্যও অন্তত খোলা হাওয়ায় নিঃশ্বাস ফেলে আসবে।

—একি, তুমি যে? একটা অবিশ্বাস্য বিস্ময় ও আনন্দে চমকে গেল নির্মলের স্বর।

—এলাম। রঙিন কাপড়ের ইজিচেয়ারে বসে দুলতে দুলতে নিল জ্যোৎস্না।

—এ সময় এমন হঠাৎ আসবে, ভাবতে পারি নি। সামান্য অপ্রস্তুতভাবে নির্মল খালি গায়ে গেঞ্জি চাপাল।

—আমিও ভাবি নি। ছোড়দার বাড়ী গিয়েছিলাম, মনে হল ক্লাবে তুমি তো আর আসো না, একবার দেখে গিয়েই দেখা করি। চেনাশোনা মানুষদের কখনো কখনো দেখতে ইচ্ছে হয়। কথাটা বলে আপন মনেই হাসল জ্যোৎস্না।

—তুমি সেই আগের মতই আছো। ছটফটে আর খেয়ালী। সস্নেহে বলল নির্মল।

নমিতার কথাটা মনে পড়ল জ্যোৎস্নার। দীর্ঘকাল সংসারী মানুষের মত নয় যাকে এই মুহূর্তে সে। বেশ খুশী খুশী হল মনটা।

—তারপর কি খবর বল। জ্যোৎস্না মধু সুরে বলল, ছোট বৌদির মুখে শুনলাম কদিন খুব অসুস্থ ছিলে।

—তাই দেখতে এলে। নির্মলের মুখে পরিতৃপ্ত রেখা ফুটল। তা ওটা কোন খবর নয় তেমন। অসুখ মানুষ মাত্রেই হয়। আসলে খবর তো এখন তোমার। নির্মল কৌতুকে হাসল।

—কেন, আমি বিয়ে করেছি বলে, নির্মলদা? জ্যোৎস্না কেমন অদ্ভুত হাসি নিয়ে তাকাল ওর দিকে। ক্রমশ হাসিটা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে শব্দে পরিণত হল, বিবাহিত জীবনের প্রাইভেসিটাই কি তাহলে আসল খবর? হি হি হাসিতে গড়িয়ে পড়ল জ্যোৎস্না।

—তুমি আগের চেয়েও দুষ্টু হয়ে গেছ। গলার স্বরে প্রশ্রয় মাখিয়ে বলল নির্মল, কি আনাবো বল, শুধু চা না আর কিছু?

—দাঁড়াও ভেবে বলছি। জ্যোৎস্না চেয়ার ছেড়ে উঠে ইতস্তত ঘরের মধ্যে ঘুরল দু একবার। তাকের ওপর রাখা ছোট আয়নায় মুখ দেখল। ইস, কি করে রেখেছ জিনিসপত্র। জ্যোৎস্না টুকিটাকি অগোছালো বস্তুগুলি দ্রুত হাতে সাজিয়ে রাখল।

—আমার অভ্যেসটা এসে আজ খারাপ হবে, নির্মল হাসল, আমার এমন গুছানো বিছানা বই তাক সব দেখছ।

—তোমাদের এই মহিলা স্পর্শবিহীন হাহাকারভরা ঘরে আমার ছুটির দণ্ডটুকু রেখে যাবো নাকি?

—হাজির।

—সত্যি নির্মলদা, একদিক দিয়ে বেশ আছ তোমরা। জ্যোৎস্না হাসি মুখে অথচ আক্ষেপ করার মত বলল, কোন ঝামেলা নেই, দায়-দায়িত্ব নেই। সংসারের বদ্ধ হাওয়ায় শ্বাস নিতে হয় না।

—তা হলেও, জ্যোৎস্নার দিকে কটাক্ষে চেয়ে নির্মল ঠাট্টা করল, সংসারের বদ্ধ হাওয়ায় মানুষের চেহারা কিন্তু বেশ হৃষ্টপুষ্ট হয়। বেশ সুখী সুখী ধরনের।

—এই, ইয়ার্কি হচ্ছে? জ্যোৎস্না হি-হি করে উঠল তুমি জান না দুপুরে ঘুমোলেই মানুষের চেহারা গোলগাল হয়। ওর সঙ্গে সুখের কোন সম্পর্ক নেই। কথাটা বলে জানলার কাছে সরে এল জ্যোৎস্না। বাইরে তাকিয়ে অপরাহ্নের মেদুর মৃদু ম্লান ছায়া ও আকাশ দেখল।

—মনে হয় মেঘ করেছে নির্মলদা। বৃষ্টির আগেই আমার চলে যাওয়া উচিত।

—সে কি, তুমি কিছু খেলে না যে?

তা হবে না জ্যোৎস্না।

—বেশ তো, চল না বাইরে যাই, জ্যোৎস্না সহজভাবে বলল, পথেই কিছু খেয়ে নেব তোমার কাছে।

—তোমার যদি ইচ্ছে হয়, হবে তাই। নির্মল গায়ে জামা চাপাল।

পথে বেরিয়ে জ্যোৎস্না ভাবল, নির্মলের মতন পরিচ্ছন্ন দ্বিধাহীন মনের ছেলে কমই হয় এবং সে জন্যই ওর কাছে অনায়াসে সহজ হওয়া যায়।

—ওখানে যাবে? ছিমছাম একটা রেস্তোরাঁ দেখিয়ে বলল নির্মল।

—চল। জ্যোৎস্না খুশি হওয়ার মত বলল।

রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে দু মিনিট চুপচাপ হাঁটল ওরা। ঈষৎ জোড়া হাওয়া থেকে থেকে ওদের চোখে-মুখে ঝাপটা দিচ্ছিল। উড়ন্ত আঁচল ও মুখের ওপর থেকে চুল সরিয়ে আকাশের দিকে তাকাল জ্যোৎস্না। ছোট হয়ের মেঘ ক্রমশ ঘন হয়ে পাঁজুর আসছে দিগন্ত জুড়ে। ব্যস্ত পাখী শাখার ঝাপটে শুনো বাসা খোঁজে। মেঘের আড়ালে আড়ালে কখন বিকেল সরে গিয়ে সন্ধ্যার ধূসরতা চারদিকে ব্যাপ্ত হতে শুরু করেছে। সে রকম আবছা আলোয় নির্মলের নিশ্চুপ মুখের দিকে চেয়ে কি এক ধরনের মমত্ববোধে আচ্ছন্ন হল জ্যোৎস্না। সদ্য অসুস্থ কিছুটা শীর্ণ চেহারা, রুক্ষ এলোমেলো চুল, ক্লান্ত দুর্বলতাক দৃষ্টি এবং শিথিল চলার ভঙ্গিতে নির্মলকে যেন আজ ভীষণ বঞ্চিত পরিত্যক্ত ও উদাসীন বলে মনে হচ্ছিল।

—আমার কিন্তু এখুনি বাড়ী ফিরতে ইচ্ছে করছে না নির্মলদা। তুমি আমায় বাসে তুলে দেবার জন্য ব্যস্ত হচ্ছ নাকি? জ্যোৎস্না আবদারের গলায় বলল।

—তাছাড়া কি? নির্মল গলায় দুষ্টুমনের গাম্ভীর্য আনল, দেখছ না আকাশের অবস্থা, বৃষ্টি এলে ভিজে একাকার হবে যে?

—অনেকদিন জোর বৃষ্টি মাথায় করে পথ চলি নি। অনাবশ্যক ইচ্ছেয় রাস্তায় ঘুরেছি কবে, মনেই পড়ে না, নির্মলদা।

—দূর পাগল, নির্মল হাসল, তাহলে কোথায় বসবে।

—এই তো বাঁ-দিক দিয়ে গেলে গঙ্গার পাড়, না? জ্যোৎস্না উৎসাহে ওকে বোঝাল, গঙ্গার পাড় ধরে হেঁটে হেঁটে খানিকটা যাব। মাঝ পথে যদি বৃষ্টি আসে,—তোমার আবার ভিজলে শরীর খারাপ হবে তাই না? তা যদি বৃষ্টি আসেই, কোথাও না কোথাও একটু মাথা আড়াল করা যাবে, কি বল?

আপন প্রাণের উল্লাসেই জ্যোৎস্না কথা বলে যাচ্ছিল, নির্মল শুনছিল চুপচাপ। ওর খামখেয়ালী ভাবটাকে মনে মনে লক্ষ্য করছিল।

—দ্যাখো কি অদ্ভুত লাগছে। জ্যোৎস্না গঙ্গার ধারে এসে জলের দিকে আঙুল দেখাল।

নির্মল চেয়ে দেখল বর্ষার নদী আশ্চর্য পূর্ণতায় টলমল। দিগন্তবিস্তারী ধূসর আবছায়া জলের বুকে প্রতিবিম্বিত হয়ে দুলছে। জোলো হাওয়ায় অস্থির ঢেউগুলি তীরের কাঠিন্যে মাথা ঝাপটাচ্ছে।

—এস না, একটুক্ষণ বসি তার চেয়ে। এখানটা বেশ পরিচ্ছন্ন আর নির্জন। নির্মল এতক্ষণ পথ হেঁটে এবার একটু স্থিতু হতে চাইল।

—বেশ তো, এসো। জ্যোৎস্না তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে গেল। অদ্ভুত আজকে যেন বোহেমী হবার নেশা পেয়ে বসেছিল ওকে। এই মুহূর্তে ও মনে রাখল না, সন্ধ্যার মধ্যে ওর বাড়ী ফেরার কথা, বিকাশের একজন সহকর্মী বন্ধু ও তাঁর স্ত্রীর আসার কথা এবং তাদের সামনে নিখুঁতভাবে চায়ের ট্রে সাজিয়ে রেখে আপ্যায়ন করার কথা।

গঙ্গার ঘাটে ঘনিয়ে আসা আঁধার, ইতস্তত কিছু লোকের চলাফেরা, তীরের অতি কাছে পরস্পর সংলগ্ন দুটো নৌকো, ছইয়ের ভেতর ক্ষীণ আলোর রেখা। মাথার ওপর ডালপালা জড়াজড়ি করা ঝাঁকড়া অশত্থ গাছ। এসব কিছুই জ্যোৎস্নার অন্তরকে একটা ছন্নছাড়া মোহে ও অদ্ভুত ভাললাগায় ভরে রেখেছিল।

নির্মল বসে অনেকক্ষণ চুপচাপ ছিল। কি যেন ভাবছিল অন্যমনে। তারপর এক সময় খুব থেমে থেমে গম্ভীর গলায় বলল,

—একটা প্রশ্ন করছি, জ্যোৎস্না, তোমার স্বামী কি জানেন, তুমি আজ আমার সঙ্গে দেখা করবে?

চকিতে জ্যোৎস্না তাকাল নির্মলের দিকে। ওর দুরাগ্রহী দৃষ্টি, শান্ত মুখ ও কঠিন ভঙ্গি দেখল।

—না, ঈষৎ বাঁকিয়ে উত্তর দিল জ্যোৎস্না, মানে আমি তো হঠাৎ চলে এলাম তোমার কাছে।

—উনি বোধহয় আমার নামও জানেন না, তাই না। নির্মল সামান্য শব্দ করে হাসল। সে হাসিতে কিসের প্রকাশ, ঝাপসা অন্ধকারে টের পেল না জ্যোৎস্না।

—জানে, জ্যোৎস্না জোর দিয়ে বলে উঠল, তুমি আমার আত্মীয়, বৌদির ভাই, আমার—আমার বন্ধু, তাও নিশ্চয়ই জানে।

—জ্যোৎস্না, নির্মল এবারে পরিপূর্ণভাবে জ্যোৎস্নার দিকে তাকাল, উনি কি জানেন আমি এক সময় তোমায় ভালবাসতাম?

—না। জ্যোৎস্না কেমন যেন বুকচাপা শ্বাসের শব্দে উচ্চারণ করল।

—তুমি যে আমাকে হঠাৎ একদিন প্রত্যাখ্যান করে ওঁর সঙ্গে বিয়েতে মত দিয়েছিলে, তাও তো কখনো জানাওনি ওঁর কাছে?

নির্মলের আচরণ ক্রমশ কেমন দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছিল। জ্যোৎস্না বিব্রত হয়ে উঠেছিল। এরকম আবহাওয়া, জোয়ারে ফেঁপে ওঠা নদী ও হাওয়ায় গাছের পাতার শব্দই নির্মলের এমন অস্থির মানসিকতার পরিবর্তনের জন্য দায়ী, মনে মনে ভাবল, জ্যোৎস্না। জলের গায়ে তীব্র আলোর দাগ ফেলে একটা স্টিমার এগিয়ে আসছিল। সেদিকে চেয়ে খুব আস্তে আস্তে জ্যোৎস্না বলল,

—সে কথা বলা প্রয়োজন মনে করিনি কোনদিন। অনেক কিছু অনুভব আছে যা বুকের ভেতর আঁকড়ে ধরে থাকাই ভাল, প্রকাশ হলে হয়ত তার গাম্ভীর্য তার পবিত্রতা নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

—তা হবে। নির্মল আঙুল দিয়ে চুল সোজা করল। তারপর বলল, বিয়ে করে তুমি সুখী হয়েছ তো, জ্যোৎস্না?

—কঠিন প্রশ্ন, নির্মলদা। জ্যোৎস্না ক্ষীণ হাসল, হেঁয়ালির মত করে বলল, হয়ত হয়েছি, হয়ত বা নয়। আমি অত ভেবে দেখতে পারি না।

দূরে মেঘের স্তর ফুঁড়ে খানিকটা চকিত আলো ফুটল, তারপর গম্ভীর গুমগুম শব্দ বাতাস কেটে দূরদূরান্তে মিলিয়ে গেল।

—এবার ওঠা উচিত, নির্মল তাড়া দিল, জোরে বৃষ্টি নেমে গেলে তোমার বাড়ী ফিরতে অসুবিধে হবে।

—আমার বাড়ী একদিন আসবে তো? জ্যোৎস্না উঠে দাঁড়িয়ে বলল।

—যাব। নির্মল সোজাসুজি হাসল।

—কবে যাচ্ছ বলো। জ্যোৎস্নার কণ্ঠ ব্যাকুল শোনাল, যেন প্রমাণ করতে চাইল, জ্যোৎস্না শুধু স্বামীর অলক্ষ্যে নির্মলকে নির্মলের একক জীবনকে সান্ত্বনা দিতেই আসেনি, তার সঙ্গে পূর্বপরিচয়কে স্বীকৃতি দেবার সাহসও জ্যোৎস্নার আছে।

—কবে যাব? নির্মল এক মুহূর্ত চিন্তা করল, তারপর বলল, তোমার যেদিন নেমন্তন্ন খাওয়াবার ইচ্ছে হবে আমার নামে একটা পোস্টকার্ড ফেলে দিও, কেমন?

—বেশ, তাই হবে। জ্যোৎস্না যেন নিশ্চিন্ত হল, তারপর আঁচলটা গায়ে জড়িয়ে তাড়াতাড়ি বাস রাস্তার দিকে এগোল।

রান্নাঘরের ছোট জানলার ফ্রেমে এক-ফালি আকাশ চোখে আসে। কালকের বৃষ্টি সারারাত মাতামাতি করেছে। এখন আকাশ নির্মেঘ। কালচে নীল রঙের। গোটা তিনেক জ্বলজ্বলে তারাও দৃশ্যমান এখান থেকে। ও ঘরে বিকাশ রেডিও খুলে রেখেছে। একটা পরিচিত গান ভেসে আসছে, দূর-দেশী সেই রাখাল ছেলে। গানটা এককালে জ্যোৎস্নার খুব প্রিয় ছিল। প্রায়ই গাইত আপন মনে। গান শুনতে শুনতে কাজ করছিল জ্যোৎস্না। বর্ণহীন দিনগুলো আজ সারাক্ষণ যেন ঝকঝকে লেগেছে।

রাত সম্ভবত নটা হবে। বিকাশের খাওয়ার সময় হয়েছে। বিকাশ ঘড়ির কাঁটা ধরে খায়। নিয়মটা অবশ্য জ্যোৎস্নারই। জ্যোৎস্না নিজে তা করে না। খাওয়া দাওয়ার একটু বেহিসেবীপনাই তার ভাল লাগে। এঘরে টেবিল-চেয়ারে বসে এতক্ষণ বিকাশ তার কলেজের পরীক্ষার খাতা দেখছিল। এখন জ্যোৎস্না এসে দেখল, বিকাশ দু আঙুলে কপাল টিপে ধরে আছে। গান শেষ হয়েছিল। জ্যোৎস্না রেডিও বন্ধ করে বিকাশের কাছাকাছি এল।

—মাথা ধরেছে নাকি?

—হ্যাঁ, হঠাৎ বিশ্রীভাবে ধরে গেল মাথাটা। বিকাশ গলায় কষ্ট ব্যক্ত করল।

—তাহলে খাতা দেখা বন্ধ কর তো, জ্যোৎস্না সমবেদনার রাগ দেখাল। বিকাশের হাতের কলমটা নিয়ে বন্ধ করে রাখল, বলল, এখন খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়।

—কেমন যেন কিছু ভাল লাগছে না। বিকাশ চেয়ারে হেলান দিয়ে শরীর হাত-পা টান টান করল।

জ্যোৎস্না স্বামীর কপালে হাত রাখল। বলল,

—গা তো ভালই আছে, সারাদিন কলেজে দাঁড়িয়ে এসে আবার খাতা দেখতে বসেছ, আসলে ক্লান্ত লাগছে তাই।

CENTRAL LIBRARY

—কপালে হাতটা রাখো তো, বেশ লাগছে।

—না, আগে কিছু খেয়ে নাও, তারপর মাথা টিপে দেব না হয়।

বিকাশ বাধ্য ছেলের মত কথা শুনল। রাতের খাওয়া শেষ করে বিছানায় এসে শুল। জ্যোৎস্না আলো নিভিয়ে ওর শিয়রে এসে বসল।

—তোমার খাওয়া কখন হবে? বিকাশ প্রশ্ন করল।

—হবেখন। রাত তো বেশী নয়। জ্যোৎস্না ওর ঘন চুলে আঙুল ডোবাল। বিকাশ চুপ করে শুয়ে রইল। আরামে অথবা ঘুমের চেষ্টায় বিকাশ বড় নির্ভরশীল, জ্যোৎস্না ভাবল, একেবারে শিশুর মত, কথাটা ভেবে বুকের মধ্যে মমতা উপলব্ধি করল জ্যোৎস্না। বেশিদিন বিয়ে হয়নি ওদের। তবু ইতিমধ্যেই বিকাশ নিজের দৈনন্দিন জীবনে ওকে ছাড়া ভীষণভাবে অসহায় ও অনভিজ্ঞ। ঠোঁটে হাসি এল জ্যোৎস্নার অন্ধকারে। কাল সন্ধ্যায় জ্যোৎস্নার ফিরতে একটু দেরী হওয়ায় বিকাশকে নিজের জন্য এক কাপ চা করে নিতে হয়েছিল। তাতেই নাকি দারুণ নার্ভাস লেগেছিল বিকাশের। ভাগ্যিস কাল বিকাশের সেই বন্ধুদম্পতি আসেন নি। জ্যোৎস্না মনে মনে জিভ কাটল, আকাশে বর্ষার মেঘ দেখেই নিশ্চয় তাঁদের বেড়াতে আসার শখ স্থগিত রাখতে হয়েছে। হিসেবী সংসারী লোক সব, জ্যোৎস্নার মত কেউ তো আর ছন্নছাড়া খাম-খেয়ালী নয় যে জল-বৃষ্টি মাথায় করে রাস্তায় হাঁটবার জন্যে উৎসাহিত হবে। নিজের গত দিনের খেয়ালীপনার কথা ভেবে আবারও হাসল জ্যোৎস্না। দূরদেশী সেই রাখাল ছেলে, গানের সুরটা বার বার মনে গুঞ্জন করে ফিরছে। বিকাশ চুপচাপ শুয়ে আছে সোজা হয়ে। হয়ত ঘুমোচ্ছে, হয়ত নয়। এই নিশ্চুপ রাত ঠাণ্ডা হাওয়া অন্ধকার বিছানো ঘর জ্যোৎস্নার মনে ছেঁড়া ছেঁড়া ভাবনায় তরঙ্গিত হচ্ছিল। কাল সারারাত বৃষ্টিমুখর ছিল। কাল সন্ধ্যে-বেলা নির্মল ওকে বাসে তুলে দিতে এসে বেশ ভিজে গিয়েছিল। নির্মলের শরীর কেমন আছে কে জানে। ভেবে উদ্বেগ বোধ করল জ্যোৎস্না। নিজের ওপর রাগ হল। অনর্থক নির্মলকে কষ্ট দেবার জন্যে। অবশ্য নির্মল জ্যোৎস্নার জন্য কষ্টকে কষ্ট মনে করে কিনা সন্দেহ আছে। খানিকক্ষণ আলো নেভানো ঘরে থাকতে থাকতে চোখটা বেশ সয়ে এসেছে। খুব অস্পষ্টভাবে ঘরের সাদা দেয়াল আসবাবপত্রগুলি বিছানা এবং বিছানায় শায়িত বিকাশের শরীরের রেখা দেখা যাচ্ছিল। কেমন যেন সব কিছু ছবির মত লাগছিল জ্যোৎস্নার কাছে। এবং এরকম সাজানো ঘরের ছবি দেখতে দেখতে নির্মলের ঘরের দৃশ্যটা ওর মনে এল। দুটি একক খাট, বইয়ের র‍্যাক, আলনা, জামা ইত্যাদি ঝুলো কটি কম্বলে সাজানো মেসের অপরিসর ঘর। দেয়ালে অনেক দিন চুনকাম নেই। জ্যোৎস্নার ইচ্ছে করছিল এই ঘর এই জিনিসপত্র সব নতুন করে ঢেলে সাজিয়ে দেয়। সেই মুহূর্তের এই খেলো ইচ্ছেটার কথা ভেবে এখন হাসি পেল জ্যোৎস্নার। নির্মলের এমনি সাদামাঠা জীবনযাত্রাটাই সব। আজ এবং সম্ভবত চিরকালই। জ্যোৎস্নার ছোট-বৌদির বাবা মা নেই। অবস্থাও তাঁদের খুব ভাল ছিল না। অন্যান্য ভাই-বোন সব বিবাহিত। একমাত্র অকৃতদার ভাই নির্মলের আপাতত একক জীবন। নিঃসঙ্গ এবং বৈশিষ্ট্যহীন। ইদানীং ওর এই নির্বিশেষ ভাবটা বেশি করে লক্ষ করা যায়। নিতান্ত সাধারণ একটা চাকরী, সাধারণ পড়াশোনা, সাধারণ চেহারা। আগে তবু শরীরে একটা উচ্ছলতা ছিল, কথাবার্তায় ধার ছিল।

বিকাশকে ঘুমন্ত জেনে আস্তে আস্তে খাট থেকে নেমে এল জ্যোৎস্না। অন্ধকার ঘরে কোথা থেকে একটা জোনাকি চলে এসেছে। আলমারির গায়ে ড্রেসারের হাতলে কখনো বা খাটের বাজুতে বিন্দুসম আলোটা দপদপ করে জ্বলছে নিভছে। যেন কার অনুসন্ধানী চোখ এই অন্ধকার নৈঃশব্দের বুকের ভেতরের কোন গোপন সত্যকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। ঈষৎ ক্লান্ত শ্লথ পায়ে জ্যোৎস্না এবার রান্নাঘরের দিকে চলে এল। এরকম একা নির্জনে তার পুরনো জীবনের কথাগুলি মনে আসছিল। এবং নির্মলের কথা। নির্মলের চেহারা বা সংগতি যাই হোক ওর মনটা যেন বড় ভাল। ওর হাসি, আচার ব্যবহার ও হৃদয়, সব কিছু যেন আলাদা রকম, অন্যের থেকে সম্পূর্ণভাবে আলাদা। কারো সঙ্গে যেন তুলনাই হয় না। সে সময় তাই জ্যোৎস্নার আবেগতাড়িত মন নির্মলকে যেন বেশ পছন্দই করে ফেলেছিল। নির্মলের মুগ্ধতা ও বাধ্যতা তার ভাল লাগত। তার নিরহংকার প্রেমের কদাচিত চকিত প্রকাশ জ্যোৎস্নাকে খুশী করত। যদিও জ্যোৎস্না কখনো তেমন কিছু আশ্বাস ওকে দিয়ে ফেলেনি। হয়ত তাতে লাভই হয়েছে, হয়ত বা তা নয়।

রান্নাঘরে খুঁটিনাটি যাবতীয় রাতের কাজ সেরে অল্প সময়েই আবার এঘরে চলে এল জ্যোৎস্না। তেমনি স্তব্ধ অন্ধকার চতুর্দিকে। শুধু পাখার স্পীড ও ঘড়ির শব্দ। এবং বিকাশ তেমনি একভাবে শায়িত। এক নজর সব কিছু দেখে নিয়ে বাইরের বারান্দায় এল জ্যোৎস্না। প্রায় নিঝুম রাস্তা লাইটপোস্টের ম্রিয়মাণ আলোয় কেমন যেন মৃতের মত লাগে। সামনের ফুটপাথে রিকসার মধ্যে বেহুঁশ ঘুমন্ত একজন রিকসাওয়ালা ও কদাচিত দুটি একটি মানুষ পথে দেখা যাচ্ছিল। বিকাশকে বিয়ে করায় নির্মলের হয়ত প্রচণ্ড অভিমান। তার সঙ্গে ছোটবৌদিরও। ওরা হয়ত জ্যোৎস্নাকে স্বার্থপর, কেবলমাত্র নিরাপত্তাকামী ভাবে। এবং নির্মল একথাও ভাবে যে, জ্যোৎস্না স্বামীর কাছ থেকে নির্মলের অস্তিত্ব লুকিয়ে রাখতে চায়। একথা মনে হতে অস্বস্তিতে ছটফট করে উঠল জ্যোৎস্না। না, নির্মলের এধারণার ভুল ভেঙে দেবে সে। ওকে সমাদর করে নিয়ে আসবে একদিন বাড়ীতে। বিকাশের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে। এবং অন্তত একথাটা জানিয়ে রাখবে বিকাশকে যে নির্মল ওর যথেষ্ট খাতির ও শ্রদ্ধার পাত্র।

মনে মনে এমন একটা প্রতিজ্ঞা করতে পেরে স্বস্তির শ্বাস ফেলল জ্যোৎস্না। দূর-দেশী সেই রাখাল ছেলে, গানটা মনে মনে নতুন সেতারের সুরের মত বাজল আবার। শিথিল পায়ে বারান্দা থেকে জ্যোৎস্না ঘরে চলে এল। এবং সঙ্গে সঙ্গে বিকাশ বলে উঠল,

—এত রাত পর্যন্ত জেগে থাকছ, শরীর খারাপ হবে যে।

বিকাশের গলায় উদ্বেগ ও মমতার উত্তাপ খেলা করল।

—তুমি এখনো ঘুমোও নি? জ্যোৎস্না বিস্ময়ে প্রশ্ন করল।

—না, এত যন্ত্রণা নিয়ে সহজে ঘুমোন যায় না। চুপচাপ পড়ে আছি তাই। কিন্তু তুমি এবার শুয়ে পড়।

এতক্ষণে শরীরে সত্যিই একটা পরিশ্রান্ত-ভাব ও অবসাদ বোধ করল জ্যোৎস্না। ঘরের দরজা বন্ধ করে বিছানার কাছে চলে এল। বিকাশ ওপাশ ফিরে শুয়েছে এবার। ও এক্ষুনি ঘুমোবে না। জ্যোৎস্নারও এখন ঘুম আসবে না। এখন অনায়াসেই ওর কাছে নির্মলের কথা বলতে পারে জ্যোৎস্না। ওকে নেমন্তন্ন করে বাড়ীতে ডাকার কথা। কিন্তু কি বলবে জ্যোৎস্না? নির্মল ওর আত্মীয়। নিতান্ত সাধারণ চেহারার সাদা-মাঠা বৈশিষ্ট্যহীন ব্যক্তি। তাকে বিকাশ কিভাবে নেবে কে জানে। হয়ত বাড়ীতে আসবে, দুটো আলাপপরিচয় হবে তারপর চা খেয়ে সৌজন্য বিনিময় করে চলে যাবে নির্মল। সম্ভবত আর কোনদিন আসবে না। কি লাভ তাতে। জ্যোৎস্নার বা নির্মলের অথবা বিকাশের? কে জানে হয়ত বা অমন একজন সাদামাঠা প্রায় শ্রীহীন চেহারার আত্মীয়ের প্রতি জ্যোৎস্নার অনাবশ্যক উচ্ছ্বাস ও আগ্রহ দেখে বিকাশের কটুচোখ পালিশকরা হাসির আড়ালে ব্যঙ্গ ও করুণায় বিকশিত হয়ে উঠবে। তবে থাক, জ্যোৎস্না দাঁতে ঠোঁট কামড়ে ভাবল, কাজ নেই ওসবে। যে যার নিজের গণ্ডীতে থাকাই ভাল। জ্যোৎস্না তার নিজস্ব বৃত্তের মধ্যে বিকাশ এবং তার সংসার এবং অদূর ভবিষ্যতে হয়ত আরো দু একটি প্রাণীকে নিয়ে পরিপূর্ণ হয়ে থাকুক। এবং সেই বৃত্ত সীমার বাইরে থাকুক অন্য মানুষ, অন্য পৃথিবী। এসব ভাবতে ভাবতে একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে বিছানায় উঠে শুয়ে পড়ল জ্যোৎস্না।

শতবর্ষের পথিক

দিলীপ বসু

ইউরোপীয় সঙ্গীতের বিরাট সৃজনশীল প্রতিভা লুডউইগ ভন্ বীটোভেনের (জার্মান উচ্চারণের প্রতিলিপি না করে আমরা প্রচলিত ইংরাজী উচ্চারণই ব্যবহার করবো) দ্বিশত জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হচ্ছে সারা পৃথিবীতে এবং তাঁর জন্মভূমি জার্মানীতে।

বাখ্ থেকে হাডেন অবধি যে ক্লাসিক্যাল সঙ্গীতের ধারা ইউরোপে চলছিল, মোৎসার্টে প্রথম যে রোমান্টিক ধারার সূচনা আমরা দেখি, বীটোভেন সেই রোমান্টিক ধারার প্রকাশ। সেদিক থেকে বীটোভেন ইউরোপীয় সঙ্গীতের ইতিহাসের ক্রমবিকাশে এমন একটি স্থান অধিকার করে রয়েছেন, যা একেবারে তাঁর স্বকীয় বৈশিষ্ট্য। এই রোমান্টিকতার প্রভাব একদিকে যেমন তাঁর সারা জীবনকে অস্থির, অন্যদিকে অকাল বধিরতা তাঁকে আরো বেশী দুর্দমনীয়, খানিকটা রুক্ষ স্বভাবের এবং আত্মগত শিল্পী করে তুলেছে। তারপর তাঁর ২১ বছর বয়সে ঘটলো ফরাসী বিপ্লব (১৭৮৯)। ফরাসী বিপ্লবের সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার বাণী, গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য সংগ্রাম ও প্রবল আন্দোলন তাঁর জীবন, তথা শিল্পকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করেছে।

জন্ম তাঁর বন্ শহরে; প্রথম সঙ্গীত-শিক্ষা পিতার কাছে পাঁচ বছর বয়স থেকে। পরে ভিয়েনাতে মোৎসার্টের প্রথমে বিশেষ আমোল না পেলেও কথিত আছে, মোৎসার্ট বলেছিলেন, এই ছেলে একদিন সঙ্গীত-জগতে আলোড়নের সৃষ্টি করবে।

নীফের শিক্ষাধীনে মাত্র এগারো বছর বয়সেই তাঁর প্রথম পিয়ানো সোনাটা প্রকাশিত হয়, কলোন শহরের ইলেকটরকে উৎসর্গিত করে। পরে এঁরই আনুকূল্যে, ১৭৯২-তে বীটোভেন ভিয়েনা যান এবং হাডেনের কাছে প্র্যাকটিক্যাল ও এলব্রেখট্‌সবার্গারের কাছে কিছু থিওরী অধ্যয়ন করেন। বিশেষ কোনো কৃতিত্বের পরিচয় তিনি দিতে পারেন নি, কারণ নিজেই ব্যক্ত করেছেন এক চিঠিতে : "আমি সঙ্গীতের নিয়ম শিখতে চাই কেবলমাত্র তাকে ভেঙে নতুন কিছু করবার জন্য।" বিদ্রোহী মেজাজটি এই বাইশ বছর বয়সেই বেশ সুস্পষ্ট।

সঙ্গীতগুরু হাডেনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কেও দেখি একই অবস্থা। আগের যুগের হাডেনের চালচলন কথাবার্তা, লেখবার পদ্ধতি, পূর্বসূরীদের প্রতি শ্রদ্ধা—সবই ছিল কেতাদুরস্ত, আর বীটোভেন ঠিক তার উল্টো। ১৭৯৫-তে তাঁর পিয়ানো বাদন ভিয়েনার বিদগ্ধ সঙ্গীতরসিক মহলে বিশেষ উত্তেজনা ও তর্কের সৃষ্টি করেছে, কিন্তু কেউই তাকে 'ভালো' বলতে পারেন নি। তাঁরা বলেছেন,

"absolutely brilliant but hardly delicate and at times unclear"

এই সময়ে তিনটি পিয়ানোতে রচনা বীটোভেন বন্ধু প্রিন্স লীখ্‌নোভ্‌স্কিকে উৎসর্গ করে তাঁর প্রথম রচনা বলে ঘোষণা করেন (আগের কিছু কিছু রচনা কাজেই বাতিল বলে ধরতে হবে)।

ব্যক্তিগত জীবন

বীটোভেনের অভ্যাস ছিল বেশ ভোরে উঠে দুপুরের খাবার সময় অবধি একনাগাড়ে সঙ্গীত রচনা করা। এ সময়ে তিনি নিজের মনে মনে কখনও কখনও উচ্চস্বরে সুর ভাঁজতেন, আর কেউ কথা বলে বা অন্য কোনো ভাবে তাঁকে বিরক্ত করলে রাগারাগির আর অন্ত থাকতো না।

দুপুরে খাওয়াটা অনেক সময়ে ভুল হয়ে যেতো। বেড়াতে বেরোতেন একলা একলা, উদ্দেশ্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নিরীক্ষণ ও উপভোগ করা, তাঁর মতো প্রকৃতি-প্রেমিক লোক বেশী পাওয়া যায় না, এবং প্রকৃতির প্রতি প্রেম তিনি নিবেদন করেছেন তাঁর ষষ্ঠ সংখ্যক সিম্ফনিতে, (পরে যথাসময়ে আলোচনা করবো)।

বেড়াবার সময় এবং পরে সন্ধ্যাবেলা যখন তাঁর কোনো না কোনো বন্ধুর বাড়ীতে অথবা থিয়েটারে কাটাতেন, সঙ্গে থাকতো একটি ছোট লেখবার খাতা, যাতে অনেক কিছু টুকরো টুকরো মন্তব্য এবং ছোট ছোট সুরের কলি লিখে রাখতেন। ভিয়েনার পাথর-বাঁধানো অলিগলির মোড়ে মোড়ে জনজীবনের মর্মস্থল থেকে যে লোকসঙ্গীতের ছোট ছোট সরল অনাড়ম্বর প্রকাশ, বীটোভেন তাকে বেঁধে রাখতেন তাঁর ছোট খাতাতে, পরে তার মার্জিত রূপ হয়তো অনেক সময় তাঁরও অজান্তে প্রকাশিত হত, তাঁর পিয়ানো সোনাটা বা এমনকি সিম্ফনির মাধ্যমেও।

বীটোভেন জীবনে কয়েকবার প্রেমে পড়েছেন, বিয়ে করা শেষ অবধি হয়ে উঠে নি; তার একটা প্রধান কারণ—তিনি যতো বড়ো সঙ্গীতজ্ঞই হোন, ভিয়েনার ভূস্বামী-অধ্যুষিত এরিস্টোক্রাটরা তাঁকে সম্মান করলেও কন্যাদান করতে সম্মত ছিলেন না। ত্রিশ চল্লিশ বৎসর পূর্বেও আমাদের সমাজেও এর ব্যতিক্রম দেখি না।

যাই হোক, বীটোভেনের জীবনের ট্র্যাজিডির এটাও একটা দিক, আর বলাই বাহুল্য, একেবারে স্বাধীনচেতা মানুষটিকে এই সামাজিক বৈষম্য আরো আত্মস্থ বিমর্ষ করে তুলেছিল। তাঁর মৃত্যুর পরে পেন্সিলে লেখা কয়েকটি প্রেমপত্র আবিষ্কৃত হয়েছে, বহু জল্পনা হয়েছে কাকে লেখা, তার বর্ণনা এখানে আর উত্থাপিত হল না।

ট্র্যাজেডির প্রথম পর্যায়

তাঁর জীবনের আসল ট্র্যাজেডি শুরু বধিরতা। ১৮০২ সালেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, ক্রমশই শ্রবণশক্তি কমে যাচ্ছে। এই সময়েই লেখা তাঁর 'The Heiligenstadt Testament' —হাইলীগেনস্টাড শহরের নামানুসারে তাঁর দলিল। তিনি লিখছেন :

..."আহা, এটা কি করে সম্ভব হল, যে ইন্দ্রিয়টি আমার সর্বাপেক্ষা জোরালো হওয়া উচিৎ, সেটিই সর্বাপেক্ষা দুর্বল। ...ক্ষমা করো আমাকে, যদি দেখ আমি মুখ ফিরিয়ে চলে যাচ্ছি যেখানে আমি সর্বান্তঃকরণে তোমাদের সঙ্গে মিশতে

চাই।... আলাপ পরিচয়ে বা বাক্যালাপে আমি কোনো শান্তি পাই না, আমার সহচর বা বন্ধুদের সঙ্গে চিন্তার আদান-প্রদানও সম্ভব নয়। আমাকে নিঃসঙ্গ একাকীত্বে দিন কাটাতে হয়।" সারা দলিলটি এই সুরে বাঁধা। শেষে বলছেন : "মৃত্যু যদি আসেই আমি দুঃখিত হব না। তবে আমার শিল্পগত ক্ষমতার পূর্ণ বিকাশের পূর্বেই যদি আসে, তাহলে আমার নিদারুণ দুর্ভাগ্য সত্ত্বেও আমি বলবো, মৃত্যু একটু আগে এসে পড়েছে এবং আমার একান্ত ইচ্ছা, যেন আর একটু পরে আসে।" দলিলটি লেখা ৬ই অক্টোবর, ১৮০২। তখনও তাঁর বহু রচনা, এবং বিশেষ করে তৃতীয়, পঞ্চম, ষষ্ঠ এবং নবম সিম্ফনি রচিত হয় নি।

• • •

তৃতীয় সিম্ফনি

এবারে তাঁর সিম্ফনি কয়েকটি আলোচনা করা যাক।

১৮০২ সালে আরম্ভ করে ১৮০৪-এ তিনি তাঁর তৃতীয় সিম্ফনি (বলা হয় বীরের প্রতি উৎসর্গীকৃত) শেষ করেন। ফরাসী বিপ্লবের সমর্থক ও অনুরাগী বীটোভেনের কাছে নেপোলিয়ন ছিলেন বিপ্লবের তথা মানুষের মুক্তির প্রতীক। তাঁকেই উৎসর্গ করে রচনা করছিলেন এমন সময়ে খবর পেলেন নেপোলিয়ন নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করেছেন। বীটোভেনের রাগত উক্তি তাঁর বন্ধুরা লিখে রেখেছেন : "শেষকালে তিনিও (নেপোলিয়ন) একজন সাধারণ মানুষের বেশী কিছু নয়! এবার তিনি জনগণের দাবীকে পায়ে মাড়িয়ে চলবেন, আর চালিত হবেন উচ্চাশার বশে। সকলের উপরে নিজেকে বসিয়ে তিনি হবেন একজন স্বৈরাচারী।" বলা বাহুল্য, উৎসর্গটি নেপোলিয়নকে দেওয়া বাতিল করে সাধারণভাবে বীরের সিম্ফনি নামে ইতিহাসে খ্যাতি লাভ করেছে। এর সাঙ্গীতিক দিকের কেবল এইটুকু এখানে বলা যেতে পারে যে, এর ষড়জ-গান্ধার-পঞ্চমের কর্ডের ব্যবহার সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত এবং বীররসের বিশেষ প্রকাশ বলে লেখকের ব্যক্তিগত ধারণা।

পঞ্চম সিম্ফনি

অনেকে এর নাম দিয়েছেন 'ভাগ্য'। পাঁচ বছর ধরে রচনা করে শেষ করেন ১৮০৮ সালের মার্চ মাসে এবং প্রথম জনসাধারণ্যে উপস্থিত করা হয় ঐ বছরের ২২শে ডিসেম্বর।

'ভাগ্য' নামকরণ হয়েছে, কারণ এ সময় বীটোভেন একেবারে বধির এবং তাঁর জীবনীকার সিন্ডলারকে তিনি বলেছিলেন : "এইভাবেই ভাগ্য দ্বারে করাঘাত করে।"

এই সিম্ফনির একেবারে শুরুতেই ঐরকম দ্বারে করাঘাতের মতো আওয়াজ (সুরে) আছে—ডা ডা ডা ডাঃ—প্রসঙ্গত, আন্তর্জাতিকভাবে মর্সকোডে এই শব্দের পরম্পরা আজ ব্যবহৃত। সিম্ফনির মধ্যে ভাবের উত্থান-পতন, শেষ হচ্ছে দারুণ আশার ঘোষণার সঙ্গে। সারা সিম্ফনির মধ্যে আশা-নিরাশার দোলা, দ্বন্দ্ব, আর ভাগ্য যেন আছড়ে আছড়ে পড়ছে, শেষ অবধি তাকে পরাস্ত করে জয়ের সুর ঘোষিত হল।

ভাবতে আশ্চর্য ও দুঃখ হয়, অতো বড়ো সুরসম্পদের স্রষ্টা নিজের কানে কিছুই শুনতে পান নি, শুধু বিজয়ী মনের জয়বার্তার বাণী শুনিয়েছেন বিশ্বমানবকে।

ষষ্ঠ বা প্যাস্টোরাল সিম্ফনি

১৮০৭ সালে আরম্ভ করে এক বছর পরে পঞ্চম সিম্ফনির কিছু পরে শেষ করেন। আগেই বলেছি, বীটোভেন ছিলেন প্রকৃতি-প্রেমিক। তিনি একবার বলেছিলেন : "লোকের অপেক্ষা গাছপালাকে আমি বেশী পছন্দ করি। আমার চেয়ে প্রকৃতিকে কেউ বেশী ভালোবাসে না। বনভূমি, গাছপালা, পর্বতমালা—একজনের সমস্যার সমাধান করতে পারে এরাই।"

সিম্ফনিতে সাধারণত চারটি পরিচ্ছেদ বা মুভমেণ্ট থাকে, এতে পাঁচটি। পরিচ্ছেদের নামগুলি যথাক্রমে সাজালে দাঁড়ায় এই যে, বনভূমি সমাচ্ছন্ন গ্রামাঞ্চলে গেলে মনে স্ফূর্তি ও শান্তির উদয় হয়; কুলকুল করে নদী বয়ে যাচ্ছে, পাখীরা ডাকছে (কয়েকটি পাখীর ডাকের সুর বীটোভেন এখানে বসিয়েছেন); কৃষকরা আনন্দ করছে এবং গ্রামের সরাইখানাতে যে সুর বীটোভেন কৃষক-গায়কদের কাছে শুনেছিলেন, তা এখানে বসানো আছে; এমন সময়ে এলো প্রচণ্ড ঝড়, তুফান, বিদ্যুৎ-চমকানো আলো ও বজ্রের আওয়াজ এবং বৃষ্টি। সবকটিই সরাসরি যন্ত্রের আওয়াজে নকল করা হয়েছে।

ভারতীয় সঙ্গীতরসিকের মনে স্বভাবতই মল্লার বা মেঘরাগের সঙ্গে তুলনা এসে বিতর্কের সৃষ্টি হতে পারে। মল্লারে নি-ধা কে ব্যবহার করে ব্যাঙের ডাকের নকল বা মেঘরাগে প-নি-প নিশ্চয়ই গাঢ় পুঞ্জ মেঘের ছবি আমাদের সামনে উপস্থিত করলেও, আমাদের মতে এ ক্ষেত্রে দুই সঙ্গীতের জাত একেবারে আলাদা। সঙ্গীতের মাধ্যমে বর্ষার বিমূর্ত রূপকে প্রতিষ্ঠা করারই চেষ্টা করি আমরা, হয়তো মেঘরাগে ভারী গমকের ব্যবহার করে তাকে আরো ফুটিয়ে তোলা যায়, কিন্তু প্রকৃতিকে সরাসরি হাজির করার চেষ্টা আমরা কখনও করি নি। মনে রাখি, কোনটা ভালো বা মন্দ, সেটা যেমন আমাদের বিচার্য নয়, তেমনি উপরে লিখিত মন্তব্যটিও একান্তই ব্যক্তিগত মত।

প্যাস্টোরাল সিম্ফনির শেষ বা পঞ্চম পরিচ্ছেদে আবার ঝড়ের পর প্রশান্তি, এবং সেটা বুঝতে ভুল করবার কোনো অবকাশই নেই। চতুর্থ এবং পঞ্চম পরিচ্ছেদ চলে আসে একেবারে পর পর, কোনো ফাঁক নেই।

নবম সিম্ফনি

নিশ্চয়ই বীটোভেনের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি এটি। ১৮২২ থেকে ১৮২৩ এর মধ্যেই তিনটি পরিচ্ছেদের রচনা শেষ। এই সময়ে বীটোভেন জার্মান কবি শীলারের 'Old to Joy' (আনন্দের কাব্যছন্দ)-এর চারটি লাইনের গান চুকিয়ে দিলেন। সিম্ফনির বা সংধ্বনির বহু যন্ত্রের মিলিত স্বরের মধ্যে কণ্ঠসঙ্গীতের সমন্বয়—বীটোভেনের প্রতিভার বৈশিষ্ট্য।

কবি শীলার ১৭৮৫-তে প্রথমে এটিকে 'Ode to Freedom' (মুক্তির কাব্যছন্দ) নাম দেবেন ঠিক করেছিলেন, রাজরোষ এড়াতে সেটির নামকরণ বদলাতে হয়। বীটোভেন ঘটনাটি জানতেন।

১৮২৪-এর ৭ই মে প্রথম যেদিন নবম সিম্ফনি জনসাধারণ্যে উপস্থিত করা হল, বীটোভেন অর্কেস্টার বাদকদের মধ্যে বসেছিলেন। শেষ হবার পর উচ্ছ্বসিত হল-ফাটানো করতালি, বহুক্ষণ ধরে; অর্কেস্টার মধ্যে বীটোভেনের মুখ শ্রোতাদের থেকে উল্টোদিকে ফেরানো, অতো উচ্চ করতালির একটি শব্দও তাঁর কানে যায় নি, কাজেই তিনি মুখও ফেরানো দরকার মনে করেন নি। অবশেষে একজন গায়িকা যখন বীটোভেনকে ধরে ঘুরিয়ে দিলেন, তখন হাততালির 'দৃশ্য' দেখে স্রষ্টার চোখে জল এলো।

নবম সিম্ফনিতে সর্বমানুষের ভ্রাতৃত্বের কথা আছে বলেই এবার ইউনাইটেড নেশনসের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে ভারতের যশস্বী সঙ্গীতজ্ঞ জুবিন মেহতার পরিচালনায় (জুবিন মেহতা আজ পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কনডাক্টর হিসাবে নাম করেছেন) বীটোভেনের নবম সিম্ফনি বাজাবার ব্যবস্থা করা হয়।

বীটোভেনের জীবনের ট্র্যাজেডীর মর্মপীড়া আমরা উপলব্ধি করতে পারি যখন ভাবি, সুরের রাজা অমর সুরস্রষ্টা নিজের সুর নিজে কখনও শোনেন নি। অথচ রচনা করে চলেছেন কোন্ যন্ত্র কোথায় বাজবে, কি স্কেলে, নবম সিম্ফনিতে গানের সঙ্গে যন্ত্রের সমন্বয়—বোধহয় শ্রবণশক্তির বদলে অন্য কোনো শক্তি কাজ করে যায়। ভারতীয় সঙ্গীতের যদু, পণ্ডিত ভাতখণ্ডে শেষ জীবনে বধির হয়ে গিয়েছিলেন। অধ্যাপক ধূর্জটিপ্রসাদের এখনো অপ্রকাশিত স্মৃতিকথাতে দেখেছি, ভাতখণ্ডেজী ধূর্জটিপ্রসাদকে বলছেন, 'এতো, গতরাত্রে মঙ্গল রাগ আমার কাছে রূপ ধরে এসেছিল।' বীটোভেনও নিশ্চয়ই সুরের রূপ (চিত্ররূপ না হওয়াই স্বাভাবিক, কারণ ইয়োরোপীয়ান সঙ্গীতে ওটা চালু নয়) মনের দিব্যচক্ষে দেখতে পেতেন।

"Music when soft voices die vibrates in the memory".

এই আমাদের দেশ

ওলন্দাজ-পর্তুগীজ-নখক্ষত চুঁচুড়া-হুগলীতে

ইমামবাড়া/হুগলী। ফটো : শীতাংশু মিত্র

পাতাঝরা শিমুল গাছগুলো ট্রেনপথের দুপাশে এক-একা দাঁড়িয়েছিল। শীত এসে গেছে, পাতা ঝরে গেছে, কুঁড়ি এসে গেছে ডগায়, এখনও ফুল ফোটানোর বেলা হয়নি। ইট-ভাটার মাটি তুলে এবড়ো-খেবড়ো পুকুর, পুকুরের পাশে পাশে একটা দুটো খেজুর গাছ, মাথা চিরে গলায় কলসির রস বার করছে গেছেরা। শীতের বাংলায় দেশ ক্ষেতের লাবণ্য ঝলমলে হয়ে উঠেছে চোখ পড়লে আটকে যায়।

ভোর না হতেই বেরিয়ে পড়েছিলেম হুগলী লাইনে। ট্রেনে চড়ে বসেই পৌঁছালুম চুঁচুড়ায়। বিদেশী বণিকদের ধারালো নখের ক্ষত বাংলাদেশের সমস্ত অঞ্চলেই ছড়িয়ে রয়েছে। চুঁচুড়ায় পর্তুগীজদের প্রচুর আধিপত্য ছিল, মোগলরা সে আধিপত্য লোপ করে নিজেদের প্রভুত্ব বিস্তার করে। ওলন্দাজরা স্বভাবতই একটু সৌখিন ছিল, জাঁক-জমকের সঙ্গে চলত। সে সময়েই তারা ফোর্ট গাস্টেভাস নামে একটা দুর্গ তৈরী করে। তারপর এল ইংরেজ। ইংরেজরা সে দুর্গ ভেঙে ফেলে সেখানে তৈরী করল একটা ব্যারাক—এইরকম দীর্ঘ ব্যারাক খুব কমই দেখা যায়। ইংরেজদের কাছে হেরে যাবার পরও বহুদিন ওলন্দাজরা এদেশে ছিল, শেষে সুমাত্রার বদলে ইংরেজদের চুঁচুড়া ছেড়ে দেয়।

ওলন্দাজদের সময়েই অনেক আর্মেনীয় চুঁচুড়ায় বাস করত। তাদের মধ্যে খোজা জোহানেসের পুত্র আর্মেনীয় মার্গার একটি গির্জা তৈরী করে। গির্জাটি সেন্ট জন দি ব্যাপটিস্ট এর নামে উৎসর্গ করা হয়। এই গির্জাটিই পুরনো সব কটি গির্জার মধ্যে দ্বিতীয়। হুগলীর মহসীন কলেজ, কলিজিয়েট স্কুল, মাদ্রাসা—এগুলি তৈরী করেছিলেন দানবীর হাজী মহম্মদ মহসীন। এখানকার প্রাচীন নিদর্শনগুলির মধ্যে আর্মেনীয়দের গির্জা ছাড়াও গঙ্গার ধারের আর একটি গির্জা আর ওলন্দাজ আর্মেনীয়দের গোরস্থান উল্লেখযোগ্য। চুঁচুড়া ও চন্দননগরের মাঝামাঝি গঙ্গার ধারে গোস্বামীঘাটে ছিল 'কনে বৌ' এর মন্দির। দেবী সরকার নামে স্থানীয় একজন লোকের ছোট বৌ-এর ইচ্ছানুসারে এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলেই নাকি এই রকম নাম হয়েছিল।

চুঁচুড়া ঘুরে হুগলী। সামান্য দূর। হুগলীর নাম নিয়ে অনেকে অনুমান করেন আগে প্রচুর হোগলা বন ছিল এখানে, সেই থেকেই এই নাম। বিদেশী বণিকরা এদেশে উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন গঙ্গার তীর কেন্দ্র করে, পর্তুগীজরাই সেদিক থেকে প্রথম। তারা সম্রাট আকবরের অনুমতি নিয়ে হুগলীতে একটা কুঠি স্থাপন করে। পর্তুগীজ জলদস্যুদের অত্যাচারের ফলে বাংলার সামুদ্রিক বাণিজ্য নষ্ট হয়ে যায়। সপ্তগ্রাম বন্দরেও ভাটা পড়ে। শাজাহান সম্রাট হবার পরই কাসিম খাঁকে পর্তুগীজ দমনের জন্যে পাঠিয়ে দেন। কাসিম খাঁর সেনাবাহিনী প্রায় তিন-চার মাস হুগলী অবরোধ করে থাকে, তাতেও পর্তুগীজরা আত্মসমর্পণ না করলে ব্যান্ডেলের গির্জার কাছে বারুদে আগুন দিয়ে দুর্গপ্রাচীর উড়িয়ে দেয়। এই যুদ্ধে নাকি এক হাজার পর্তুগীজ মারা যায় ও হাজার চারেক মোগলদের হাতে বন্দী হয়। তারপর থেকেই পর্তুগীজদের প্রাধান্য কমে যেতে থাকে।

তারপর এল ইংরেজরা। হুগলীতেই কুঠি তৈরী হল। কিন্তু ব্যবসাতে বিশেষ সুবিধে হল না। তারপর কাশিমবাজার, পাটনা, বালেশ্বরে কুঠি তৈরী হল, সেখান থেকে চলতে লাগল সোরা ও রেশমের ব্যবসা। ক্লাইভের সময়ে ইংরেজ সৈন্য হুগলীর দুর্গ, ফৌজদারের সমস্ত সম্পত্তি নিয়ে নেয় এবং হুগলীর পাশাপাশি গ্রামগুলি লুঠ করে কলকাতায় ফিরে আসে। এখন যেখানে পুরাতন কাছারী বাড়ি সেখানেই মোগলদের দুর্গ ছিল। গৌরী সেনের নাম প্রবাদের মত সকলের মুখে মুখে ফিরে। প্রায় তিনশো বছর আগে গৌরী সেন হুগলীর কাছেই জন্মগ্রহণ করেন। ব্যবসাতে তিনি প্রচুর টাকার মালিক হন। সেই টাকার অনেকটাই তিনি দুঃস্থ মানুষদের দান করেন।

অতিরিক্ত বিলাসী লোকের তুলনা করতে গিয়ে লোকে বলে, নবাব খাঞ্জা খাঁ। এই খাঞ্জা খাঁ তেহরান থেকে এখানে এসে মোগল বাদশাহের কাছে কাজ নেন। তারপর হুগলীর ফৌজদার নিযুক্ত হয়ে আসেন।

হুগলীর ইমামবাড়ার নাম সকলেরই জানা। হাজি মহম্মদ মহসীন এটি তৈরী করেছিলেন। তখনকার দিনে খরচ পড়েছিল নাকি পৌনে তিন লাখ টাকা। এর গম্বুজটি উঁচু আশি ফুট। দেওয়ালে উৎকীর্ণ আছে কোরানের প্রচুর শ্লোক। ইমামবাড়ার সমস্তটা ঘুরে দেখতে বেশ সময় লাগে। এরই ভেতর আর একটি দর্শনীয় বস্তু ঘড়ি ঘর। যদি যান পুরো ঘন্টার সময়ে অর্থাৎ তিনটে কি চারটেতে—তাহলে দেখতে পাবেন বিরাট এক ঘন্টার ওপর বিপুল আয়তনের হাতুড়ি আপনা-আপনিই ঘন্টার ওপর পড়ে ঢং-ঢং করে বাজিয়ে দিচ্ছে তিনটে, চারটে। আধ ঘন্টায় ঘন্টা পড়ে না।

চুঁচুড়া, হুগলী একটা দিনেই ঘুরে নেওয়া যায়। শহর থেকে এমন কিছু দূরও নয়, দৌড়াদৌড়ির খুব একটা পরিশ্রম সাপেক্ষও নয়। অথচ প্রাচীনকালের অনেক নিদর্শন ছড়িয়ে রয়েছে আনাচে-কানাচে।

—[illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়

তুলসীচরিত

ননীমাধব চৌধুরী

(৩১)

মাসের পর মাস গড়িয়ে প্রায় তিনটি বছর কেটে গেল।

ইস্টার্ণ ইণ্ডিয়া করপোরেশন বড়, নামকরা, সুপরিচালিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে এই সময়ের মধ্যে, আরও বাড়ছে। অফিসের একাংশ চলে গিয়েছে দেবাশিসের পৈতৃক ভবনে। বাড়ীটা উদ্ধার হয়েছে দেবাশিস জানিয়েছিল, কি করে উদ্ধার হল জানায়নি। বিশেষ কৌতূহল না থাকায় আমিও জানতে চাইনি।

অশোক তার কারবার দু ছেলের হাতে ছেড়ে দিয়েছে, নিজে শাস্ত্রানুশীলন করে, ধর্মচর্চা করে। তীর্থ ভ্রমণ করে। মাঝে মাঝে আমার কাছে এসে বসে, নানা রকম কথাবার্তা হয়। তুলসীর ছোট ভাই ফণী অশোকের কারখানায় ভাল কাজ করছে, নিজের চেষ্টায় বি-এসসি পাশ করেছে। যথেষ্ট উন্নতি করবে বোঝা যায়।

তুলসী ডাক্তারি পাশ করে বেরিয়েছে। মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এক বছরের একটা চাকুরি পেয়েছে, সেই চাকুরি করছে। হাসপাতালের কোয়ার্টার্সে তাকে থাকতে হয় চাকুরির জন্য। টাকা রোজগারের আকর্ষণে জেঠামণিকে ছেড়ে থাকবার ব্যবস্থা কাদাকাটা না করে মেনে নিয়েছিল। একটা স্থায়ী সরকারী চাকুরির জন্য চেষ্টা করছে, কলকাতার বাইরে যাবার জন্য প্রস্তুত থাকলে পেয়ে যেতে পারে।

অন্য লোকেও চেষ্টা করছিল তুলসীর জন্য। কথাটা আমি জানতাম, তুলসীকে কিছু বলিনি। আমি না বললেও কথাটা যে তার অজ্ঞাত নয় আবিষ্কার করলাম অন্য একটা বিষয় সম্পর্কে তুলসীর সঙ্গে কথা কইতে গিয়ে। বিষয়টা তুলসীর বিয়ে।

তুলসীর বিয়ের কথা আবার উঠেছিল তার ডাক্তারি পাশ করে বেরোবার পরে। উঠেছিল মহামায়ার শিষ্যা সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে।

মহামায়ার একটি শিষ্যা সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল পাড়ার ধর্মপ্রাণা বর্ষীয়সী ভদ্রমহিলাদের নিয়ে। এঁরা আসতেন ধর্ম কথা শুনতে, কইতে, কিন্তু বাস্তবিক, অবিবাহিতা কন্যাদের মায়েদের মাথায় কন্যার বিবাহ সমস্যা পাকে পাকে জড়িয়ে থাকে। ধর্ম কথার ফাঁকে এ সমস্যাও আলোচিত হত। তাঁরা পরামর্শ দিতেন তুলসীর বিয়ের চেষ্টা করতে। মহামায়া দাদার কানে তুলে দিত তাঁদের পরামর্শ।

ভাবলাম কথাটা তুলসীর কাছে পাড়বার সময় হয়েছে। তার বিয়ে করবার বড় আপত্তির অজুহাত ব্যবহার করা আর চলবে না, আর্থিক স্বাধীনতা লাভ করেছে হয়েছে। কি বলে শোনা দরকার। তার বিয়েটা হয়ে গেলে বাণপ্রস্থ আশ্রম ছেড়ে সন্ন্যাস আশ্রম নেবার কথা ভাববার অবকাশ পাওয়া যাবে। কিছুদিন দেরি করলাম তবু, তার চাকুরির মেয়াদ শেষ হবার মাসখানেক থাকতে একদিন ছুটি উপলক্ষ্যে বাড়ীতে এলে কথাটা পাড়লাম।

খাঁচাঘরে বসে কি পড়ছিল তুলসী সন্ধ্যার দিকে। ঘরে ঢুকে দেখলাম আমার চেয়ারটা দখল করে বসেছে। উঠে দাঁড়াচ্ছিল, বললাম, বোস ওখানে, আমি আরাম চেয়ারে বসছি।

আজ সে বাড়ীতে ছিল। মহামায়াকে সন্ধ্যা দিতে না দিয়ে নিজে দিয়েছিল। তুলসীমঞ্চে প্রণাম করবার সময় কপালে একটু মাটি লেগেছিল, সেটা রয়ে গিয়েছে দেখলাম। একটা স্নিগ্ধ প্রসন্নতার ভাব লেগে রয়েছে মুখে।

বললাম, তুই পড়ছিলি ডিস্টার্ব করলাম একটা কথা বলব বলে। তোর সঙ্গে ভাল করে কথাবার্তা বলবার সময় আজকাল পাওয়া শক্ত, এরপর আরও শক্ত হবে।

আরও শক্ত হবে কেন?

কোথায় চলে যাবি চাকুরি নিয়ে, দেখা পাওয়া যাবে না এরপরে।

তোমার আসল কথাটা কি বলে ফেলো জেঠামণি।

বলছি, তাড়া দিসনে বাপু, বুড়ো মানুষ, গুছিয়ে বলতে একটু সময় লাগে না?

বেশ, সময় নিয়ে বলো। মিষ্টি করে হেসে বলল।

কথাটা কি জানিস, এখন তোর বিয়ে করবার সময় হয়েছে।

বলল, সময় পার হয়ে গিয়েছে।

না, হয়নি। ডাক্তারি পাশ করেছিস, স্বাধীনভাবে রোজগার করবার মত অবস্থা হয়েছে, আপত্তি করিস না আর। তোর বিয়েটা হয়ে গেলে আমিও মুক্তি পাই।

বলল, তার মানে কি হল জেঠামণি?

মানে থাক, তোর মত কি বল? চেষ্টা করি?

উঠে এসে আরাম চেয়ারের হাতলের ওপরে বসল, বলল, তুলসীর বিয়ে হবে না জেঠামণি। কলকাতায় চাকুরি নিয়ে সে তোমার কাছে থাকবে, তোমাকে মুক্তি দেবে না ঠিক করেছে।

বললাম, অনেকগুলো বাজে কথা বললি এক নিশ্বাসে। কেন তোর বিয়ে হবে না, শুনি? তোর পছন্দমত ছেলে খুঁজে বের করব।

পারবে না জেঠামণি। যাকে খুঁজতে চাও চেষ্টা করে দেখতে পারো।

চেষ্টা করব। কি রকম ছেলে তোর পছন্দ বলতো?

গালে হাত দিয়ে ভাববার অভিনয় করল এক মিনিট। তারপর বলল, একটু সময় দাও, বলব পরে।

আরেকটা কথা। চাকুরি নিয়ে কলকাতায় থাকবার কথা বললি, তেমন চাকুরি কোথায় পাবি?

একটু ভেবে বলল, তোমার ছাত্র মিঃ ভাদুড়ী একটা অফার দিয়েছেন। চাকুরির সঙ্গে শর্ত আছে ফার্মাকোলজি পড়তে হবে।

দেবাশিস তাহলে তুলসীর কাছে সরাসরি প্রস্তাব জানিয়েছে। তিনশো টাকা মাইনে দিয়ে কারখানায় ক্লিনিকসের মেডিকেল অফিসারের পদ দিতে চায় বলেছিল।

বললাম, দেবাশিসের অফার নিতে চাস?

তুমি কি বলো? আমার নেয়া না নেয়া নির্ভর করছে তোমার ওপরে। তিনি তোমাকে বলেছেন জানি, কথাটা এতদিন চেপে রেখেছিলে তুমি, আমাকে বলবে কিনা ভাবছিলে। তোমার ইতস্তত করা থেকে বুঝেছি কি আমার তার অফার নেয়া উচিত কিনা তোমার মনে দ্বিধা আছে?

অতি বুদ্ধিমতী মেয়ে তুলসী, তার সঙ্গে খোলাখুলি কথা বলা ভাল মনে হল। বললাম, চেয়ারে গিয়ে বোস, দু-একটা কথা বলব। তোর এখনকার চাকুরির শেষ হলে, বাড়ীতে ফিরে এলে কথাটা তোকে জানাব বলে চুপ করেছিলাম।

বলল, তার মানে মিঃ ভাদুড়ীর প্রস্তাব শুনে তোমার মনে ভাববার কথা কিছু এসেছিল?

শোন কি বলি। দেবাশিস তোকে শুধু এই চাকুরি দিতে চায় না, তার কাজের মধ্যে তোকে নিতে চায় তার কথা থেকে বুঝলাম। মেলামেশা করতে হবে তার সঙ্গে। তার চেহারার, তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ব্যবহারের একটা ম্যাগনেটিজম আছে। এর প্রভাব এড়াতে পারবি না তুই। তুই এক রকমের মানুষ ও একেবারে অন্য রকমের

CENTRAL LIBRARY

মানুষ। এ থেকে হয়ত অসুবিধার সৃষ্টি হতে পারে।

খুলে বলো।

বললাম, সব কথা বলতে পারব না কিছু বলছি।

বিলাতে, আমেরিকায় তার জীবনযাত্রার কাহিনী, তার আগে দেশে থাকতে তার দুশ্চরিত্রতার কথা না বলে বললাম, আমেরিকায় এক ভদ্রমহিলার সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হয়েছিল, বয়সে তিনি অনেক বড়, অগাধ টাকার মালিক। আমেরিকায় তার পড়াশোনা করবার সব ব্যয় ইনি বহন করেছিলেন, যে কারখানা সে এখানে গড়ে তুলেছে তার জন্য টাকা দিয়েছিলেন, অনেক টাকা সুদে দিয়েছিলেন। অন্য নানা রকম কাজের জন্য প্রচুর টাকা তার হাতে দিয়েছিলেন মারা যাবার আগে। মারা যাবার আগে দেবাশিসকে তিনি ডেকে পাঠিয়েছিলেন। সে গিয়েছিল তুই জানিস। এ দেশের অনেক ভাল জিনিস তিনি ভালবাসতে শিখেছিলেন তার প্রভাবে।

হয়ত কিছুটা তাঁর প্রভাবে, বেশীটা নিজের ভেতরের শক্তির বিকাশের ফলে দেবাশিসের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। প্রচুর শক্তি তার মধ্যে রয়েছে জেনে তার অনেক মারাত্মক দোষ-ত্রুটি সত্ত্বেও আমি প্রথম থেকে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলাম। কেন জানি না সেও বরাবর আমাকে শ্রদ্ধা করেছে। মন দিয়ে শুনছিস?

শুনছি, বলো।

তাকিয়ে দেখলাম দেবাশিসের ছবির দিকে তার দৃষ্টি রয়েছে। বললাম, দেবাশিসের মধ্যে দুটো সত্তা ছিল, একটার নাম দিয়েছিলাম জায়েন্ট, অন্যটার নাম দিয়েছিলাম মনস্টার।

মনস্টার কি?

দৈত্য, যে সমাজের শত্রু, মানুষের সুস্থ জীবনের শত্রু। সোশ্যাল এনিমি।

শত্রু বলছ কেন?

বরাবর স্ত্রী-পুরুষের সুস্থ সম্পর্ক, সমাজনীতির অনুশাসন সম্বন্ধে সে স্বেচ্ছাচারী, প্রচলিত বিশ্বাস, রীতিনীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহী।

বলল, এখনকার বেশীর ভাগ মানুষ তো তাই।

তারা অজ্ঞ, নির্বোধ, প্রবৃত্তি-চালিত বিদ্রোহী, দেবাশিস বিজ্ঞ, বুদ্ধি-চালিত, শক্তিমান বিদ্রোহী, রূপবান, তীক্ষ্ণবুদ্ধি সাহসী বিদ্রোহী।

বলল, জায়েন্ট মনস্টারকে মেরেছে মনে হয় কি তোমার?

কর্মী দেবাশিস জয়ী হয়েছে চোখে দেখছি। মনস্টার মরেছে হয়ত।

বলল, মনস্টার মরে থাকলে মিঃ ভাদুড়ীর মধ্যে আর কি পরিবর্তন দেখতে পাবার আশা রয়?

মানব জীবনের পরম সত্য প্রকাশ হবে তার মধ্যে, নিষ্কলঙ্ক চরিত্র, প্রকৃত জ্ঞানীর পরিচয় পাওয়া যাবে তার ব্যবহারে, কথায়।

বলল, জীবনের পরম সত্য? সেটা কি বুঝিয়ে বলবে একটু?

বললাম, তোকে বুঝিয়ে বলবার দরকার দেখছি না তুলসী, নিজের উপলব্ধির বলে তুই খানিকটা বুঝতে পারিস মনে করি।

কেমন করে একটু হাসল তুলসী। মাথা নামিয়ে কি ভাবল, তারপর বলল, দেবাশিসবাবুকে তুমি তো ভালবাসতে তাঁর মধ্যে মনস্টার আছে জেনেও?

বললাম, সেটা অন্য জিনিস তুলসী, ভুল বুঝিস না। সেটা ইন্টেলেকচুয়াল এডমিরেশন ফর দি জায়েন্ট ইন হিম। আমি তার হিতাকাঙ্ক্ষী এ কথা সত্যি, সেটাও ঐ জায়েন্টের জন্য।

উঠে এসে আমার চেয়ারের হাতলের ওপরে আবার বসল, বলল, আমার মনের একটা সমস্যা সমাধান করবার জন্য কথাটা জিজ্ঞেস করছি। আমাদের গায়ের চামড়া একটা আবরণ। অনেক দেখতে খারাপ জিনিস চোখের আড়ালে রাখে। আমাদের কাপড় একটা আবরণ, দেহের নগ্নতাকে আড়ালে রাখে। দেহের মধ্যে ময়লা জমলে সেটাকে বলে অসুখ। ওষুধ খেতে হয় ময়লা দূর করবার জন্য। চামড়ায় ময়লা জমলে সাবান দিয়ে ঘষে স্নান করতে হয়; কাপড়ে ময়লা হলে কেচে নিতে হয়। মনের মধ্যে ময়লা জমলে সেটা কি করে সাফ করতে হবে?

সাইকিয়াট্রিকস পড়ে দেখ।

পড়ব, তোমার প্রেসক্রিপশান কি বল?

তুলসীর ডান হাতখানা কাঁধের ওপরে উঠে এল, বলো না জেঠামণি।

হেসে বললাম, কার মনের ময়লা কি করে সাফ করবি আমি তার কি জানি! সুতী কাপড়ের ট্রিটমেন্ট, উলের কাপড়ের, সিল্কের কাপড়ের ট্রিটমেন্ট এক নয় জানিস।

একটু হাসল।

আমার মনে যে সন্দেহের উদয় হয়েছিল তুলসীর মনের ময়লা দূরীকরণের প্রেসক্রিপশান সম্বন্ধে আগ্রহের পরিচয় পেয়ে সেটা ঘনীভূত হল তার হাসি দেখে।

প্রশ্ন করলাম, দেবাশিসের প্রস্তাব তোকে জানাব বলেছি। তোকেও যখন বলেছে উত্তর যা ঠিক করিস তাকে দিয়ে দিস।

বলল, মিঃ ভাদুড়ীর সম্বন্ধে যে সব কথা বললে তারপর তাঁর প্রস্তাবে রাজী হওয়া কি সম্ভব? তোমার কাছে থাকবার জন্য কলকাতায় চাকুরি খুঁজছি, আরও খুঁজব।

খুঁজলেই কি এমন ভাল চাকুরি অন্য জায়গায় পাবি?

রেগে গেল তুলসী, অমন বাজে কথা বলো না জেঠামণি। তোমার আপত্তি থাকলে ভালতম চাকুরির লোভ আটকাতে পারবে না আমাকে বেশ জানো। তোমার মনের কথাটা কি বলো।

তাকালাম তুলসীর মুখের দিকে। সত্যি রেগেছে এই পলাতক ভাবটাকে নিয়ে টানাটানি করছে মুখের ওপরে আনবার জন্য।

বললাম, আমার মনের নাগাল পাচ্ছি না বাছা, খুঁটির দড়ি ছিঁড়ে মাঠের পানে পালিয়েছে। তোমার মনের কথা জেনে চলবার চেষ্টা করতে পারো।

হেসে ফেলল তুলসী, বলল, ভেবেছিলাম জব্দ করেছি তোমাকে, পালাচ্ছ দেখছি।

গাড়ীর শব্দ পেলাম।

তুলসীকে বললাম, দেখ তো কে এল।

বারান্দার আলো কে জ্বালাল। খাঁচাঘর থেকে বেরিয়ে তুলসী বলল, আসুন মিঃ ভাদুড়ী, জেঠামণি এই ঘরে আছেন।

তারপর বলল, একটু চা খাবেন? আচ্ছা বসুন, আনছি।

ঘরে ঢুকে হাতের এটাচি কেস টেবিলে রেখে দেবাশিস বলল, কারখানা থেকে ফিরছিলাম, মনে হল আপনার কাছে একটু বসে যাই।

বললাম, বসো আরাম করে। তুলসী আজ বাড়ীতে আছে। মাছ ডিম যা হোক কিছু এসেছে, খেয়ে যেতে পারো।

ওঁকে রান্না করতে হবে?

তুমি না এলেও করত। আমিই ছুটি দিই না মহামায়াকে।

কিছুক্ষণ কি ভাবল, দেখলাম, বলল, একটা অনুরোধ করতে চাই—

বেশ, বলো।

ডিশে পাঁপর ভাজা ও শসার চাকতি নিয়ে ঘরে এল তুলসী, বলল, খান, চা আনছি।

বেরিয়ে যাচ্ছিল বললাম, দেবাশিসকে খেতে দিতে পারবি? মাছটাছ কিছু আছে?

বলল, মাছ নাই, ডিম আছে। ডিমের ডালনা করছি, লুচি ভেজে দেব।

ভেতরে গিয়ে একটু পরে চা নিয়ে এল। নিজের জন্য এক কাপ এনেছিল। চা খেতে খেতে বলল, সাড়ে সাতটা এখন, নটায় খেতে দেব।

দেবাশিস বলল, কিছুক্ষণ গল্প করবার জন্য এসেছি। দশটা হলেও চলবে।

তুলসী বলল তাহলে গল্প করুন বসে, আমি একটু দেখে আসি।

বিনা অস্ত্রোপচারে
অর্শ থেকে
আরাম পাবার
জন্য
হ্যাডেনসা
ব্যবহার করুন!

বললাম, যা খেতে দিবি শুনলাম, এখুনি দেখতে যাবার মত কিছু দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। বোস কিছুক্ষণ।

বলল, বড্ড বাজে কথা বলতে শুরু করেছ আজকাল জেঠামণি। দেখতে হবে না কি আছে কি নাই, না থাকলে কি দিয়ে কি করতে হবে, খাবার খাদ্যবস্তুর স্বল্পতা সত্ত্বেও অতিথি যাতে মনে করেন খুব খেলাম—

হাসতে হল, দেবাশিসও হাসল। হাসলাম কিন্তু মনে মনে বললাম, হুঁ। দেবাশিসের সামনে হঠাৎ আজ কথার ফুলঝুরি জ্বালাচ্ছ কেন তুমি ডাঃ শ্রীমতী তুলসী ভট্টাচার্য এম বি বি এস? আগে তো এটা চোখে পড়েনি?

বললাম, আচ্ছা, যাও তাহলে।

দেবাশিস বলল, দুটো কাজের ভার আপনাকে নিতে অনুরোধ করছি। স্কলারশিপের জন্য টেকনোলজির শিক্ষার্থী নির্বাচন ও কালচারাল সহযোগের জন্য বরাদ্দ টাকার ব্যবস্থা করা। স্কলারশিপের ক্যান্ডিডেট নির্বাচন করা একটা সমস্যা হয়ে উঠেছে। এত ক্যান্ডিডেটের সঙ্গে কথা বলতে হয়, এত দরখাস্ত দেখতে হয় যে অনেকটা সময় যায় আমার।

বললাম, অন্য লোক দেখো দেবাশিস, আমি পারব না। কোন সূত্রে কিছু টাকা পাওয়া যেতে পারে জানলে ভারত মহাসাগরের ঢেউ ভেঙে পড়বে লোকের ওপরে, আমি বুড়ো মানুষ—

হেসে বলল, ভাবছিলাম কটা য়ুনিভার্সিটি ও দেশের ধর্ম ও কালচার প্রচার করছে এমন দু একটা প্রতিষ্ঠানের হাতে এ কাজ ছেড়ে দিতে পারলে—

উৎসাহ দিয়ে বললাম, খুব ভাল আইডিয়া দেবাশিস, ঐ ব্যবস্থা করে ফেলো।

আমাদের আলাপ চলছিল তুলসী ঘরে এল কি চিবুতে চিবুতে।

বললাম, চিকুইংগাম ধরেছিস নাকি?

বলল, লবঙ্গ, লবঙ্গ। হাতে পয়সা হলে চিকুইং গাম ধরব।

রান্না হয়ে গেল?

জেঠামণির কথা শুনেছেন মিঃ ভাদুড়ী? আধ ঘণ্টার মধ্যে রান্না হয় নাকি? এটা কি বিলাত না আমেরিকা? রান্না করা খাবারের প্যাকেট আনলাম, সুইচ টিপে হিটারে একটু লার্ড বা মারগারিন দিয়ে গরম করে নিয়ে খেতে শুরু করলাম। এখানে তোলা উনুনে ধরাতে হয়, ডিম ও আলু সিদ্ধ করতে হয়, আটা মাখতে হয়, লেচি বানাতে হয়, বেলতে হয়, ডালনার জন্য মশলা বাটতে হয় ইত্যাদি। এগুলোর ভার দিয়ে এলাম অধরের হাতে। পিসীমা উৎসাহ করছিলেন গীতা হাতে করে, বলে এলাম ভক্তি করে পাঠ করো, পাঠের সময় অন্য চিন্তা করলে পার্থসারথি চটে যাবেন, কত মেহনত করে অর্জুনকে বোঝাতে হয়েছে ভাল ভাল তত্ত্বকথা।

বললাম, তুলসী, প্রেসার দেখার যন্ত্রটা এনেছিস কি? কেমন লাগছে—

এগিয়ে এসে উদ্বিগ্ন মুখে চেয়ারের হাতলে বসল তুলসী, হাত নিয়ে নাড়ী দেখল, বলল, চলো তোমাকে শুইয়ে দিয়ে আসি জেঠামণি, ওঠো, পিঠের নীচে হাত দিল তোলবার জন্য। তোমার প্রেসার বেড়েছে বলোনি, তাই ওটা আনিনি। ওঠো, ওঠো—

হেসে বললাম, তুই উঠে গিয়ে চেয়ারে বোস। আমার কিছু হয়নি, মনে হল তোর প্রেসার বেড়েছে, যে রকম কথা বলছিলি। যন্ত্রটা থাকলে দেখা যেত কতটা বেড়েছে।

হাঁ করে তুলসী আমার দিকে চেয়ে রইল কয়েক সেকেন্ড, তারপর বলল, ভাল হবে না জেঠামণি যদি এমন করো আমার সঙ্গে।

না বাপু, আর করব না, তুই বোস আমার পাশে চেয়ারটা টেনে নিয়ে।

দেখলাম, দেবাশিস হাসছে তুলসীর কাণ্ড দেখে।

ঠাণ্ডা হতে তুলসীর সময় লাগল না, পাশে বসে আমার মাথায় হাত বুলাতে লাগল।

বললাম, তুলসী, তোর কপালে মাটির মত কি লেগে রয়েছে, মুছে ফেল।

মোছবার জন্য হাত উঠিয়ে নামিয়ে নিল, বলল, তুলসীমঞ্চে প্রণাম করবার সময় লেগেছে বোধ হয়, মুছতে নাই।

তাই বলে মাটি মেখে থাকবি?

থাকব।

বললাম, গলায় কি একটা পরতিস, সেটা দেখছি না।

তুলসীর মালাটা কি করে ছিঁড়ে গিয়েছে জেঠামণি, কাল সকালে খুঁজে দেখব।

শাঁক বাজাতে শুনলাম না আজ, বাজাসনি বুঝি?

প্রদীপ দিয়ে বাজালাম তো, তোমার কানে যায়নি বুঝলাম।

বললাম, একটু পেয়েছিলাম বটে মনে হচ্ছে এখন। ভেবেছিলাম কোয়ার্টারে নানা রকমের মেয়েদের মধ্যে থাকতে এ সব ভুলে গিয়েছিস।

হাসতে লাগল তুলসী। বলল, তোমার কথা বুঝতে পারছিলাম না এতক্ষণ। মিঃ ভাদুড়ীকে জানাচ্ছ আমি তুলসীমঞ্চে প্রদীপ দিয়ে প্রণাম করি, শাঁখ বাজাই। তুলসীর মালা গলায় পরি, কেমন? ডাক্তারি পাশ করেও আমি সেকেলে মেয়েদের মত হিন্দুয়ানি মানি, তাই না?

সাংঘাতিক মেয়ে। চোখ গিলে বললাম, জানালে কি দোষ?

বলল, দোষের কথা হচ্ছে না, জানাতে হবে কেন?

দেখ তুলসী, বাজে জেরা করিস না। দেবাশিসের মাস্টারমশাই আমি, তার জ্ঞান বুদ্ধির সহায়তা করা আমার কর্তব্য।

উঠে পড়ল চেয়ার ছেড়ে, তোমার কর্তব্য পালন করো, আমি রান্না করতে যাচ্ছি।

চলে গেল।

দেবাশিসকে প্রশ্ন করলাম, তুলসীর কাছে যে প্রস্তাব করেছিলে তার উত্তর দিয়েছে কি?

বলেছেন আপনার সঙ্গে কথা বলবেন তারপর জানাবেন।

বললাম, তুলসীর সঙ্গে কথা হচ্ছিল আজ তুমি আসবার আগে। সে কলকাতায় থাকতে চায়, ভাল কাজও চায়। মনে হল তোমার প্রস্তাব গ্রহণ করবার জন্য সে তৈরী করছে নিজেকে।

প্রশ্নসূচক দৃষ্টি তুলে তাকাল আমার দিকে।

বললাম, তুলসীর নিজের ইচ্ছা আছে মনে হয়, আমার সম্মতি চায়। সম্মতি না পেলে যাবে না। সম্মতি দিতে পারি কিনা ভাবছি। তুলসী আমার কত আদরের তার কিছু জানো তুমি। তোমার অধীনে চাকুরি করতে গিয়ে তার মনে কোন রকম গ্লানির কারণ দেখা দিলে আমার পক্ষে সেটা মারাত্মক হবে। সে অন্য অনেক সাধারণ মেয়েদের মত নয়, একেবারে আলাদা জাতের মেয়ে। ডাক্তারি পাশ করেছে, আমার সামান্য যা কিছু আছে সব তুলসীর। তোমার কাছে চাকুরি না নিলেও তার চলে যাবে।

মাথা নীচু করে দেবাশিস বলল, আপনার কথা বুঝলাম। ওঁকে চাকুরি দেবার প্রস্তাবের মূলে রয়েছে শুধু আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতাবোধ, আপনার একটু কাজে আসবার আকাঙ্ক্ষা। আমি ওঁর হিতাকাঙ্ক্ষী। ওঁর মনে কোন গ্লানির কারণ দেখা দেবে না ভরসা করি। উনি তো আপনার কাছে থাকছেন, সব কিছু আপনার চোখের ওপরে থাকবে।

বললাম, আমি জানি তুমি সত্যবাদী। তোমার সত্যনিষ্ঠার জন্য মনে মনে শ্রদ্ধা করেছি আমি, স্নেহ করেছি। আমি সম্মতি দিলাম তুলসীকে জানিয়ে দেব।

চুপ করে বসে রইল দেবাশিস মাথা নামিয়ে।

একটু পরে আমি তার কারখানার কাজ কর্মের কথা তুললাম। অনেকক্ষণ কথাবার্তা চলল। কোমরে কাপড় জড়িয়ে তোয়ালে কাঁধে তুলসী ঘরে ঢুকে বলল, মিঃ ভাদুড়ী উঠুন, জেঠামণি ওঠো, খাবার দেওয়া হয়েছে।

বললাম, এত তাড়াতাড়ি হয়ে গেল, মন লাগিয়ে রান্না করিসনি মনে হচ্ছে।

বলল, আজ বড্ড বাজে বকছ জেঠামণি। বসে যাও, রুটি ভেজে দিচ্ছি, আস্তে আস্তে খাও। (ক্রমশঃ)

সুখের মেলা

তিনকড়ি গুরুমশায়

তিনকড়ি গুরুমশাই একজন তোবড়ানো-গাল 'বকম্‌বেজে' মানুষ। তাঁর বয়সের নাকি গাছ-পাথর নেই। অন্তত একাশিটা কলাগাছ আত্মহত্যা করেছে।

বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে মামলো ওরফে মামুদ সেখ তোতলাতে তোতলাতে বলে, 'দা-দা-দা-দাদা, এক একটা বছরে তো— ক-ক-ক-কলা গাছ কাঁদি বিইয়ে ফি-ফি-ফি-ফিনিশ হয়ে যায়। তার মানে গু-গু-গু-গুরুমশাইয়ের বয়েস একাশি বছর। দা-দা-দা-দাদা, আমরা বলে চল্লিশ বছর বাঁচতে গেলে বলে, বা-বা-বা-বাই জন্মে যায়—কাটো, এবার কেটে পড়!'

তিনকড়ি নম্বর রেগে গেলে তাঁর চোখের কোটরের গাঁজার কোলকের ভেতরে যেন আগুন ঝমকায় দপদপ করে। ঘসঘস করে 'চাতোড় (উরু) চুলকোন তিনি। ফাকুস ফাকুস করে গাল নাড়েন, যেন কাঁচ ছেলের মতন মায়ের দুধ খাচ্ছেন। তারপর ফাটাচেরা স্বরে চেঁচাতে থাকেন, 'তোর ঠাকুর্দা ছিল ঘরামী, 'হোঁদোল-কুঁতকুতে' নাম ছিল তার। মাথায় ছিট ছিল তার। বলত মানুষ আগে হয়েছে না ভগবান আগে হয়েছে বল, বলত ডিম আগে হয়েছে না মুরগী আগে। ঘরের বাঁশ আর বাঁশের ঘর দুটোর তফাৎ কি? আমি বলতুম মানুষ আগে হয়ে তারপর ভাবলে এই জগৎ সংসার কেউ না কেউ বানিয়েছে, তার নাম দাও ভগবান।'

'দা-দা-দা-দাদা ঠাকুর্দার তো মাথা ছাগলো! তা ডিম আগে না মুরগী আগে?'

ঐ দাদার কথা নিয়ে 'হেঁড়ে-হুল্লোড়' বেধে যেত।' তাঁড়ি খেয়ে তখন গাঁয়ের সবাই 'টং' হয়ে থাকত। একজনে ডিম আগে তো ও' বললে ডিমটা কি তোর মাসী এসে পেড়েছিল দাদা! মানুষ এত বড় প্রাণী, অনেক 'ক্ষামতা' ধরে—উড়োজাহাজ চালাতে পারে আকাশে—ডুবুরি হয়ে পাতালের আঁধার সমুদ্রে নামতে পারে—কিন্তু দাদা হাজার কোঁৎ পেড়েও একটা ডিম পাড়তে পারে না! মেয়েমানুষেও না—হাজারের মাসী আর পারবে কেন? হাজারে বেঁড়িয়া হেঁকে দিলে ভোঁদার চাচার নাকে ঘুষি! মারামারি, রক্তারক্তি সারারাত। কি নিয়ে মারামারি হল? তাইতো তাইতো—কেউ বলতে পারে না। হোঁদোল-কুঁতকুতে বললে, ডিম আগে না মুরগী আগে!'

সবাই হৈ হৈ। মুরগী আগে। না, ডিম আগে। শেষে আমি হেঁকে বলে দিলুম, যে ডিম আগে বলবে তাকে ডিম পাড়তে হবে। তাহলে? মানুষ কি ডিম পাড়তে পারে? অতএব প্রমাণ হয়, গোপনে কোনো একদিন অন্ধকার চাঁদের ভিতরে ডিম রেখে দিয়ে চলে গেছেন স্বয়ং ভগবানই। আর ডিমটা সঙ্গে সঙ্গে ফট করে কেটে মুরগী বেরিয়ে পড়ল। হাতীর মতন বড় বড় মুরগী!'

তিনকড়ি গুরুমশাই যেখানে থাকবেন আসর সরগরম। একালের শিক্ষিত ছেলেদের দেখলেই তাদের ওপরে যেন করে দেখা চাই তাঁর—স্যাকরা যেমন করে সোনা কষে দেখে কষ্টি পাথর দিয়ে। তারাও বেশ রস পায়।

মামলো বলে, 'বা-বা-বাকিটা বল। বাঁশের ঘর আর ঘরের বাঁশ—দুটোতে ত-ত-তফাৎ কি?'

তিনকড়ি মাস্টার বলে, 'বাঁশের ঘর মানে যে ঘরটা বাঁশ দিয়ে তৈরি আর ঘরের বাঁশ মানে ঘরের কোনো একখানা বাঁশ!'

মামদো বলে, 'তাহলে তো ঐ একই হল?'

'দূর্ শালা, মাসীর ছেলে আর ছেলের মাসী কি এক? বাপের 'বোনাই' (ভগ্নি-পতি) আর বোনাইয়ের বাপ কি এক লোক? একজন পিসেমশায় আর একজন তালুইমশায়। মাসীর ছেলে হল বৌয়ের দেওর আর ছেলের মাসী হল ধর্মমতো শালীকা।'

চা দোকানের মোড়ে রোয়াকের মধ্যে হ্যারিকেনের স্বল্প আলোয় লোকগুলোকে আস্ত ভূতের মতন মনে হয়। ময়লা কাঁথা কানি গায়ে, নাগাড়ে ফসফসে খা, মুখে কাঁচা পাকা বিছুহাির নুড়োগোঁফ। অশ্লীল অশ্রাব্য কথাবার্তা। পুংলিঙ্গের আদি রসাত্মক শব্দটি তাদের সব শব্দের গুরুদেব। হাড়ে মাসে দারিদ্র্য। তিনকড়ি মাস্টারের মাইনে না এলে তিনি দিনকতক 'সর্বহারা'। মাইনে এসে গেলেই নবাব নবাব। মহৎ মনুষ্যের কথা। তাঁকে এবার স্কুল থেকে সরানো হবে জানলেই ক্ষেপে পড়েন, 'সরাবে, কুলো শালার বাপেও পারে? স্কুল বোর্ডের যিনি হেড কর্তা তিনি একজন মেয়ে, আমি মা বলে ডাকলেই তিনি কেন আঁতকে ওঠেন—সবাই 'দিদি' বলতে অজ্ঞান—এ বুড়ো 'মা' বলে কেন? তবু ভদ্র-লোকের মেয়ে কিনা—বলেন, বসুন বসুন—কে বললে আপনাকে ছাঁটাই করা হবে? ছাঁটাই করার বয়স কি আপনার আছে? বোঝ শালা, তোরা কড়াকে গণ্ডাকে সিরকে দশুকে জানিস? তিন পাতা ইংরেজি পড়া বিদ্যে—এই আলোক মাস্টার—চুরি করে স্কুল ফাঁকি দিয়ে দিয়ে বি-এ পাশ করেছে—বলি, এই ক'টা শব্দের অর্থ বলত কে বোঝে?'

'কি শব্দ গুরুমশায়?' শুধোলে জাল বুনতে বুনতে প্রহ্লাদ দাস। চোখে তার ছানি পড়েছে। জল ঝরে। তিনকড়ি মাস্টার বলে, 'শালা হাত কানা' পেল্লাদ। হাত ধরে ধরে ওর বাড়ি পর্যন্ত নিয়ে যেতে হবে। বউ তারপর হাত ধরে নিয়ে যাবে। ওর বউ আমার নাতবৌ হয়, যদি একটা চুমুও খায় আমাকে, দেখতে পাবে না। তা চোখে না দেখলেও অভ্যাসের বশে কেঁড়ে-নালি চালিয়ে জাল বুনে যাচ্ছে। আর অভ্যাসের বশে আমরা সবাই তো কাজ করে যাচ্ছি—বেঁচে আছি। —কি কি শব্দ? বাংলা শব্দ। কই বলত আনন্দ, তুইতো কলেজে পড়িস। এইসব শব্দের মানে বল। 'সুনকুনি', 'মোড়ুম্বা', ঠিকুরি', 'চোরমুড়ো', 'বালামুচি', 'পুদড়ি', 'থাবনা', 'টকর', 'খলুকি', 'ধুনুড়ি', 'হাঁশিরি', 'কানাচি', 'পলাদ', 'গুডিম', 'তা', 'সুমো', 'তেউড়' 'চুমরি' বলতে পারবে? লবডঙ্কা।'

আনন্দ মাল অবস্থাপন্ন ঘরের সৌখিন, সুদর্শন ছোকরা। পোশাক-আষাকে কেতাকেতিয়া বাবু। সে বলে, 'গেঁইয়া কথা জেনে লাভ কি?'

তিনকড়ি মাস্টারের চোখ দুটো পাঁজার কোয়েকের মতন আগুন দপদপ করে। বলে, 'গেঁইয়া কথা? গাঁ থেকেই তো শহরের জন্ম হে? শহর ছোকরার বয়স কত? ঠাকুরদাদার নাম জানো না তোমরা এমন কুলাঙ্গবাজ মাইডিয়ার ছোকরা। মিষ্টি মিষ্টি কথা বলবে, মাগী পটাবে, এই তো তোমাদের ধান্দা! শব্দের ইতিহাস কি জানবে? শোনো, 'সুনকুনি' হল হাতের আঙুলের নখের কোলে ফালি ফালি সরু সরু হয়ে যে চামড়া ওঠে। 'ঠিকুরি' হুঁকোতে তামাক সাজবার সময় কোলকের মধ্যে আগুন তোলার আগে একটা ছোট্ট মাটির ঢেলা দিতে হয়, সেইটে। 'মোড়ুম্বা'—গরুটা কাঁটাগাছে দড়ি জড়িয়ে 'মোড়ুম্বা' হয়ে আছে—মানে মুড়মুড়ে আছে। 'চোরমুড়ো' একরকম উদ্ভিজ্জ—বাঁশবনের মধ্যে হয়—হালো আধ হাত উঁচু—আধ হাত চওড়া—গোলাকার—খোবড়া খোবড়া গা। কোবরেজি ওষুধে হয়। 'বালামুচি' ছোড়ার জেজের চুল। 'পুদড়ি' ছেঁড়া কাঁথা। 'থাবনা' মুসলমানবাড়ির মেয়েরা জানে—একটা মাটির তৈরি জিনিস—তাতে হাঁড়ি বসিয়ে যেন গড়ায়। কতকটা উপুড় করা নিরেট মালসার মতন। ভদ্রলোকের ছেলেদের এখন বোকাও 'মালসা' কাকে বলে? 'টকর হল গরুর মাথার মাংসের একটা অংশ। 'খলুকি' চালের আটার বড় বড় অংশ। 'ধুনুড়ি'—কাঁথাটা ছেঁড়া ধুনুড়ি হয়ে গেছে—মানে শতছিন্ন। 'হাঁশিরি' গাছ, 'কানাচি' ভাঁড়ের গলার দড়ি, 'পলাদ' গরুর গলার মোটা দড়ি গড়ায় বাঁধবার সময় দেওয়া হয়। 'গুডিম'—পাখির বাচ্চার গুডিম অর্থাৎ গু-ডিম ভাঙে নি। ছোঁড়া তোর এখনো গুডিম ভাঙেনি—মুখে মায়ের দুধের গন্ধ—লম্বা লম্বা বাত ঝাড়ছিস! 'তা' হল মুরগী যাতে বসে ডিম ফুটবে। ডিমে 'তা' দিচ্ছে—মানে ওম্ বা গরম দিচ্ছে বলা হয় বটে কিন্তু 'তা' হল একটা পাত্র—যাতে ডিম রেখে মুরগী বসে থাকে। 'সুমো' চিংড়ি মাছের গোঁফ। 'তেউড়' বাঁশের কোঁড়—যা মাটি ফেড়ে সবে গজিয়ে উঠেছে। 'চুমরি' হল নারকোল গাছের মোচ। এখন মোচ মানে হিন্দীতে গোঁফ। শহুরে বাবাজীরা তাই না বুঝে বসে। বাংলা ভাষার এত শব্দ ছিল, আদি শব্দ, যাদের জন্ম দোয়াশলা ভাবে হয়নি—শহরে নতুন নতুন বিদেশী 'মোয়াম' আমদানি হওয়ায় তারা গাঁয়ের অন্ধকারে হারিয়ে গেল।'

আনন্দ বললে, 'ভাষাতত্ত্বের বই আছে আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডক্টর সুকুমার সেনের—সে সব পড়লেই জানতে পারা যাবে। তিনকড়ি গুরুমশায় অনেক জানেন সত্যি, কিন্তু তিনটে কড়ি তাঁর ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর কিনা তিনি জানেন না।'

আনন্দ মাল কোঁচা দুলিয়ে সিগারেট টানতে টানতে চলে গেল। তার কথায় যেন গুরুমশায় অপমান বোধ করলেন। মুখ গোঁজ করে রইলেন কিছুক্ষণ। পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে মাটি ওসকাতে লাগলেন।

মামদো বললে, 'মাস্টার তুমি রাগ কর না। ওর জন্মের আগে ওর মা কলকাতার বা-বা-বাবুর বাড়ি চাকরি করতে গেল বিধবা হয়ে। একটা বাবু ওর মায়ের টানে এখানে চলে এল। পুরোনো জমিদার ছিল, হাঁচ-হাঁড় মামলা মোকদ্দমা করে সব উড়িয়ে দিয়েছিল। ওর নাগমশায়ের মেয়ের আবার বি-বি-বি-বিয়ে দিলে সেই বাবুর সঙ্গে। বাবুর টাকা ছিল। শালার ছেলেটার তাই চাওড়া চাওড়া বা-বা-বাকি!'

তিনকড়ি মাস্টার বললেন, 'ওসব খবর তুই কি জানিস মামদো! জন্মের জন্যে কেউ দোষী নয়। মা জানে বাপ, মন জানে পাপ।' তা নয়, ওরা আমাদের অশিক্ষিত গ্রাম্য ভূত বলে ঠাট্টা করে। তিনকড়ি নাকি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর! ত্রিমূর্তি আর কিছুর হয় না?'

চা-দোকানী শাজাহান মিয়া এবার একটা হারমোনিয়ামের বেলো টেনে দরাজ গলায় গান গাইতে শুরু করে। লাউয়ের খোলের একতারার টঙ্কার মেরে হাঁসানন্দে মেতে সাদা অতুল ছোঁড়াটা। ঘাড় পর্যন্ত তার ঢেউ খেলানো চুল। 'ঘোর-প্যাঁকড়া' কাঁপা। বাঁদ দলে দিয়ান ডাকে। সামনের মুদিখানায় রাজ্যের চাষীবাসী লোক গল্প-গুজব করছে। কেউ বা কাটারী বঁটি হাঁড়ি বদলে দিয়ে আজকের এককেলোটা চালিয়ে নিয়ে বালবাচ্চাদের নিয়ে বাঁচবার জন্যে এসে বসে আছে তিন মাথা হয়ে গুড়ের ভাঁড়ের মতন।

বেড়িওতে বক্তৃতা দিচ্ছেন শহরের বাবুরা। শহরের মেয়েরা গানও গান বেশ সোন্দর সোন্দর। গান গেয়েই কেউ কেউ নাকি গাড়ি বাড়ি করে ফেলেছেন। তোমরা গান শুনে বাহবা দিলেই তাঁরা সুন্দর কর যুক্ত করে নমস্কার করে তোমর দুলিয়ে চলে যান পরীর মতন। সে এক জীবন।' তিন-কড়ি মাস্টার বলেন এসব। আজব শহর নাকি কলকাতা—সেসব এক কাহিনী আছে তিনকড়ি মাস্টারের। একবার নাকি তাঁকে এক বাড়িতে ফাঁকি দিয়ে নিয়েছিলেন—কী

প্রকাশিত হল—
অজিতকুমার মুখোপাধ্যায়
হিমালয়ের টানে
যে তীর্থস্থানগুলি আজও দুর্গম কিন্তু অনির্বচনীয় সুষমা ও অপার্থিব মহিমার আধার—রসাত্মক রচনায় আপনাকে দেখা সেই যমুনোত্রী, গঙ্গোত্রী, কেদার ও বদরীর মনোজ্ঞ বিবরণ। বারোখানি চিত্র ও সুদৃশ্য প্রচ্ছদপট।
দাম—৫,
পরিবেশক—
বাক সাহিত্য প্রাইভেট লিমিটেড
৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা—৯

ঝিরঝিরি পোড়া গন্ধ। রাস্তায় এসে বমি হয়ে গেল গাড়ির মধ্যে। একজন শহুরে বাবু মস্করা করে বললেন, 'বমি তো মেয়েরাই করে! বোঝ শালার পোড় কথা! যেন আমি পোয়াতি!'

তারপর তিনকড়ি মাস্টার বলেন, শালা আমি নিজের চোখে দেখে এসেছি শহুরে মেয়েরা বালিশের খোল পরে আছে, ঘাড়ের কাটা যেন লাঙলের মতন বড় ধর্মতলার একটা বিল্ডিং-বাড়ির মাথার গম্বুজে, মাঠের আলো-অন্ধকারে জোড়া জোড়া নারী পুরুষ বসে আছে কাছে কাছে কত সব—কিন্তু বেশি কাছে এলেই পুলিশে ধরে নিয়ে যাবে—ভারি যন্ত্রণার জীবন মাইরি! বাইরে ঐ চাকচিক্য। আমাদের মতন খোলা মাঠ বন নেই।'

চা-দোকানী শাহজাহান মিয়া যাত্রা-দলের বিবেকের গান করে। দরাজ গলায় সে গাইছিল:

জন্মেছ এই বাংলা দেশে
কি খাবে আর ভাই
ভেজাল ভিন্ন এখানেতে
কোনো কিছু নাই।
সরষের তেলে শিয়াল কাঁটার দানা
তা খেয়ে লোক কুড়ি বছরেই
হচ্ছে চোখে কানা।
পড়ছে মাথার টাক
দাঁতগুলো সব যাচ্ছে খসে
গালটা হয়ে ফাঁক।
ভেজাল দুধে, ভেজাল 'আয়কে'
ভেজাল যাচাই করতে পারে কে?
প্রেমে ভেজাল, স্নেহে ভেজাল
ভেজাল জীবনটাই
ভেজাল ভিন্ন বাংলাদেশে
আসল কিছু নাই।

এ গান তিনকড়ি মাস্টারের লেখা। কত যাত্রাদলের পালা লিখে দিয়েছেন তিনি। জমির 'কালি' মানে জরিপ করতে হলে ওঁর মতন আর ওস্তাদ কেউ নেই। দলিল, মামলা, মাপজোক, খড়, বীজ, নারকোল, উলু, পাকাটির হিসেব করে দেন তিনি চাষীদের। তারা বিড়ি দেয়। চা খাওয়ায়। কিন্তু মাস্টারের দুঃখের শেষ নেই। পাঁচ পাঁচটা সোমত্ত মেয়ে তাঁর আইবুড়ো হয়ে পড়ে আছে ঘরে। বর জুটছে না, পণ চায়, সোনা চায় দশ ভরি করে। স্কুলের মাইনে আসে না যখন মুখ খারাপ করে গালাগালি করেন আকাশ-বাতাস, সরকার, মুদিঅলা, আধুনিক কাল—সবাইকে।

বড় মেয়ে নন্দিনী, মেজমেয়ে নলিনীর যৌবন ঝরে গেছে। ছেলেটা ন্যাংড়া হয়েও বগলে লাঠি নিয়ে চটকলে নলী সাবাড়ের কাজ করতে যায়। বদলি কাজ—তবু যা পায় একবেলা আটার রুটটা হয়। তার আবার বায়না, বিয়ে করে আলাদা থাকবে। দাড়ির চুল পাকল, কবে বিয়ে হবে?

মুদিঅলা বলে, তিনকড়েটা মাস্টার হলে কি হবে, একের নম্বর হাঁচড়। আমার দোকানে দুশো টাকা দেনা। বাস্তুভিটে পর্যন্ত বন্ধক। এবার টাকা না দিলে 'কোড়সা' করে বেঁধে পাঁদানি দেব।'

তিনকড়ি মাস্টার বেশি রাত হলে গা আড়াল দিয়ে সটকান দেন মুদিঅলার চোখ এড়িয়ে। বাতকানা প্রহ্লাদ দাশ তখনো জাল বুনছে বসে বসে। একা আসতে পারবে না। হয়তো খানাডোবায় পড়ে যাবে। —কিন্তু হঠাৎ যেন ভয় মতো হয়ে গেল তিনকড়ি মাস্টারের। বসে পড়লেন। হাঁপাতে লাগলেন। প্রায় দুদিন আজ তার খাওয়া হয় নি। স্কুলের একটা ছেলের গোটা কতক মুড়ি চেয়ে খেয়েছিলেন। হেডমাস্টার আলোকবাবু ব্যাপারটা জেনে ফেলে ধমক দিলেন: 'ছি, এসব করবেন না, লজ্জা হয় না, ছাত্রের টিফিন চেয়ে খান?'

ঠিক ঠিক। তিনকড়ি মাস্টার ভাবলেন, আজ রাতেই তিনি গলায় দড়ি দেবেন। কিন্তু আন্দোলন করে মাইনে একটু বাড়ার ফলে যে উপরি পাওনাটা হয়েছে তা যদি কালই এসে পড়ে? না, বাঁচতে হবে। উঠে দাঁড়ালেন তিনি। কিন্তু শরীর টলছে যেন মাতালের মতন। পথ হারিয়ে যাচ্ছে। শেষে হাতে পায়ে ভর দিয়ে চলতে শুরু করলেন তিনকড়ি গুরুমশায়। তবু তাঁকে বাঁচতে হবে।

আবদুল জব্বার

"পীন পরিমাহ ভরিয়া উঠিল যেখানে যা ছিল অপূর্ণতা"
। কালিদাসের কুমার-সম্ভব থেকে অনুবাদ।

"সোনার কটোরি কুচযুগ শিরি কনকমণির লাগে"
। পদাবলী - চণ্ডীদাস।

"বক্ষের বিকোশবাস যার পরাপতি ভাঙিয়া যুগল স্বর্ণ কঠিন পাষাণে"
। চিত্রা - রবীন্দ্রনাথ।

বিজ্ঞানের বিস্ময়কর আবিষ্কার!

একটি বিশেষ হর্মোন আর নানা বিশিষ্ট উপকরণে তৈরি ডার্মাকেয়ার অস্ট্রোজেনিক ডেভলপিং ক্রীম। বক্ষের শিথিলতা, অপূর্ণতা এর ছোঁয়ায় নিমেষে উধাও। বিকশিত বক্ষ-সৌষ্ঠবে গরবিনী যৌবনবতীর দিকে চেয়ে সবার বুক তখন দুরুদুরু!

ডার্মাকেয়ার
অস্ট্রোজেনিক ডেভলপিং ক্রীম
প্রস্তুতকারক : সাহেব সিং'স্

• সব বড় স্টেশনারী দোকানে পাবেন •

'বিউটি ইজ ইওর বার্থরাইট' পুস্তিকার জন্য এবং আপনার রূপচর্চার নানা রকমের উত্তরের জন্য আমাদের 'বিউটি কনসালটেন্টস্, পোষ্ট বক্স : ৫৫০, দিল্লী,—এই ঠিকানায় লিখুন

SS—2/70

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

VERSI

ভিয়েৎনামের প্রাণপুরুষ

এ যুগের বিস্ময় হো চি মিন। শুধু ভিয়েৎনামের মানুষ নন, আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে জীবনের দীর্ঘ সংযোগের ফলে তিনি মহান নায়কের সম্মানলাভ করেছিলেন। ফরাসী লেখক জাঁ লাকাতুর এক আশ্চর্য রেখাচিত্র এঁকেছেন সেই বিচিত্র মানুষটির যিনি পঞ্চাশ বছর ধরে ঔপনিবেশিক জনগণের বিদ্রোহের প্রতীক।

বইটি অক্টোবর ১৯৬৬ থেকে ফেব্রুয়ারী ১৯৬৭-র মধ্যে রচিত এবং প্রায় সেই সময়ে মূল ফরাসী সংস্করণ প্রকাশিত হয় এবং ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে আরো অনেক পরে: ফলে গ্রন্থটির শেষাংশ কিঞ্চিৎ ব্যাকডেটেড হয়ে পড়েছে, কারণ ইতিমধ্যে আরো অনেক ঘটনা ঘটে গেছে। তথাপি গ্রন্থটির বুদ্ধিগ্রাহ্য বিশ্লেষণ ভিয়েৎনামের সাম্প্রতিক অবস্থাকে অনেকটা সহজবোধ্য করেছে।

লাকাতুর তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগী ফিলিপে ডেভিলার্সের Histoire du Vietnam নামক গ্রন্থের একটি অংশ উদ্ধৃত করেন যা অর্থপূর্ণ।

ডেভিলার্স লিখেছিলেন—১৯৪৫ খৃঃ ২৫ আগস্ট, জাপানীদের অস্ত্র সমর্পণের দশদিন পরে ভিয়েৎমিন ভিয়েৎনামের সমগ্র অঞ্চল অধিকার করে নেয়—তারাই শক্তিতে অধিষ্ঠিত হল।

লাকাতুর বলেছেন—যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্রিটিশ সরকার উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গীতে একটা মৌলিক পার্থক্য ছিল। তারা স্পষ্টই বুঝেছিলেন যে ইন্দো-চীনে ফরাসী বিতাড়নের ফলে তাদের নিজেদের অবস্থাটা কাহিল হয়ে পড়লে তার ফলে যুক্তরাষ্ট্রের নীতি (তখন রুজভেল্টের নীতি) আর ব্রিটিশ নীতির মধ্যে বিরোধ ছিল। লাকাতুর বলেছেন—

'চার্চিল এবং তাঁর পরবর্তী শ্রমিক দল নিয়মিতভাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতিকে বাধা দেন।' এই সূত্রে জেনারেল গ্রেসীর ভূমিকা বিশেষভাবে [illegible]

এলান গিন তাঁর 'উইটনেস টু ভিয়েৎনাম' নামক বিখ্যাত গ্রন্থে এই সূত্রে বলেছেন—

'এই অপেক্ষাকৃত অপরিচিত ব্রিটিশ জেনারেলটির কৃতিত্ব স্বীকার করতে হয় যে তিনি প্রায় নিজের দায়িত্বে তাঁর প্রতি প্রদত্ত নির্দেশ অমান্য করে গেছেন। এই কর্মে তিনি ভিয়েৎমিনকে (লীগ ফর ভিয়েৎনাম ইন্ডিপেন্ডেনস—হো চি মিনের নেতৃত্বে পরিচালিত) জব্দ করেছেন এবং কম্যুনিস্টদের ষোড়শ সমান্তরাল রেখার দক্ষিণ অংশে প্রভুত্ব করার দৃঢ়সংকল্প ব্যাহত করেন। তা না হলে হয়ত একটা গণতান্ত্রিক সাউথ ভিয়েৎনাম গড়ে উঠত।'

তবে মনে হয়—জেনারেল গ্রেসী একেবারে নিজের খুশীতে কাজ করেননি। তাঁর ওপর কোনও গোপন নির্দেশ ছিল। যাই হোক, ১৯৪৫ খৃঃ থেকে ভিয়েৎনামে যা কিছু ঘটেছে তার প্রাথমিক দায়িত্ব ব্রিটেনের। হারল্ড উইলসনের শ্রমিক সরকার—কেন জোর গলায় যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতি সমর্থন করেছেন তা লাকাতুরের এই বই থেকে জানা যাবে। লাকাতুর এই দিকটির ওপর বিশেষ আলোকপাত করেননি। এই গ্রন্থের শেষে লেখক উল্লেখ করেছেন ফরাসী মধ্যস্থ জাঁ সাঁতেনী একটা প্রস্তাব করেছিলেন বোঝাপড়ার। কিন্তু সেই প্রস্তাব হো চি মিন ভদ্রভাবে প্রত্যাখ্যান করেন। সাঁতেনীকে পাশ্চাত্য নব্য উপনিবেশবাদের প্রবক্তা হিসাবে গ্রহণ করতে পারেন নি।

মধ্য ভিয়েৎনামের একটি ক্ষুদ্র গ্রামে ১৮৯০ খৃঃ ১৯ মে হো চি মিনের জন্ম। সেই পল্লী পরিবেশেই এই মহান নেতা গড়ে উঠেছেন এবং অতি অল্প বয়সেই ফরাসী ঔপনিবেশিক ব্যবস্থায় শোষণ [illegible] নীতির প্রতি অন্তরে তিক্ততা সৃষ্টি হয়। [illegible] ফরাসী ঔপনিবেশিক নীতি শুধু শোষণ [illegible] এবং দমনের নীতি ছিল না, [illegible] জনগণের প্রতি অবজ্ঞা নির্যাতন [illegible]

এই শাসক গোষ্ঠীর অত্যাচার দর্শনে তিনি প্রায় অল্প বয়স থেকেই দৃঢ়সংকল্প ছিলেন। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে তিনি পর্যটন করেছেন পথের সন্ধানে। প্রথম মহাযুদ্ধের কালে হো যখন লন্ডনের একটি হোটেলে পাচকের সহকারী হিসাবে কাজ করতেন তখন আইরিশ অভ্যুত্থানের সংবাদ পান এবং সেই আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে পড়েন। এর কিছু পরেই সর্ব প্রথম হো চি মিন এবং সেই সঙ্গে তাঁর স্বদেশের নাম সর্বত্র প্রচারিত হয়। ফরাসীরা এই প্রচার চাপবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু পারেনি।

ফরাসী সরকারের এঁদের সংহতি নষ্ট করার অপচেষ্টায় ১৯১৯ খৃঃ প্যারিস শান্তি বৈঠকে তৌনকিন, আনাম এবং কোচিন চীনকে খণ্ডিত করেন। হো চি মিন স্বদেশের মুক্তির জন্য প্রেসিডেন্ট উইলসনের চতুর্দশ নীতির ভিত্তিতে একটি 'আবেদন' দাবী পেশ করেন। হো চি মিনের এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হল, কিন্তু এই থেকেই সুদীর্ঘকাল প্রসারিত মুক্ত পথ।

একদা যা জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমিকদের সংগ্রাম ছিল তা ক্রমশঃ গণবিপ্লবে পরিণত হল। প্রায় অর্ধ-শতাব্দীকাল ধরে হো চি মিন এবং তাঁর অনুগামীদের ধ্যানজ্ঞান হল ভিয়েৎনামের মুক্তি সংগ্রাম। সেই সংগ্রাম প্রচেষ্টা সফল হল। ভিয়েৎনামের মানুষ আজ এক আপোষ বিরোধী সংগ্রামে জড়িত, তারা সর্বস্ব পণ করে লড়াই একটা চূড়ান্ত সমাধানের জন্য।

এই দুঃখকর বিরাম বিহীন অভিযানে হো চি মিন দুটি ছদ্মনাম গ্রহণ করেন, এর মধ্যে 'আই কুয়োক' নামটি প্যারিস শান্তি কনফারেন্সে প্রস্তাব পেশ করার সময় প্রথম [illegible] দেশের লোক তাকে অকুণ্ঠ [illegible] আসনে বসিয়েছে।

[illegible] এমন এক মহা- [illegible] মুক্তি। [illegible]

রুশ অনুবাদে নজরুল ইসলামের কাব্য সংগ্রহ

নজরুল ইসলাম নির্বাচিত কবিতা/প্রচ্ছদপট

দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণে 'নজরুল ইসলামের নির্বাচিত কবিতা' সংকলন মস্কোর নউকা প্রকাশভবন থেকে এ বছর প্রকাশিত হয়েছে। এই নতুন সংস্করণে নজরুলের আরও অনেকগুলি কবিতা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং কবির ৭০তম জন্ম-বার্ষিকী উপলক্ষে তা প্রকাশিত হয়। এই সংকলনে অন্তর্ভুক্ত নজরুলের কবিতাগুলি বাংলা ভাষা থেকে রুশ ভাষায় অনুবাদ করেছেন বিশিষ্ট কবি এম, কুরগান্তসেভ এবং বইটির এক দীর্ঘ ভূমিকা লিখেছেন ও সম্পাদনা করেছেন খ্যাতনামা ভারততত্ত্ববিদ অধ্যাপক ই, পি, চেলিশেভ। বইয়ের ভূমিকাতে তিনি কবি ও বিপ্লবী নজরুলের জীবনকথা ও তাঁর কাব্যধারা সম্পর্কে সুচিন্তিত আলোচনা করেছেন। ১৯৬১ সালে অধ্যাপক চেলিশেভ কলকাতায় আসেন ও কবির সাক্ষাৎ লাভ করেন। ভূমিকায় তিনি এ ঘটনার উল্লেখ করেছেন। সংকলনটি শুরু হয়েছে নজরুলের বিখ্যাত 'বিদ্রোহী' কবিতা দিয়ে এবং মোট তাঁর ৩০টি কবিতা এতে সংকলিত হয়েছে।

স্বমতে আনার তাঁর উদগ্র আগ্রহ। তিনি তাঁর নীতি জোর করে কারো ওপর না চাপিয়ে যুক্তি তর্কের দ্বারা বুঝিয়েছেন। আরেকটি অসামান্য গুণ ছিল তাঁর নিরলস-কর্মী গোষ্ঠীর মধ্যে অখণ্ড ঐক্য—অনেক রকম সমস্যার মুখেও এইভাবে ঐক্য অক্ষুণ্ণ রাখার নিদর্শন আধুনিককালের বিপ্লবের ইতিহাসে আর পাওয়া যায় না।

এর জন্যই ১৯৪৬ খৃঃ যে সরকারী গোষ্ঠী নিয়ে হো চি মিন জনসে দরবার করতে গিয়েছিলেন আজো সেই দলই অটুট হয়ে বিরাজমান। এই গোষ্ঠীর অন্তর্গত অ-কম্যুনিস্টদের সম্পর্কেও এই মন্তব্য প্রযোজ্য। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর যুক্তরাষ্ট্র [illegible]

এবং হংকং অধিকার করুক। সেই প্রচেষ্টা বানচাল করার উদ্যোগ পর্বে হো বলছিলেন—

> "It is better to Snig France's dung for a while than to eat China's all our lives".

এরই নাম পরিণত রাজনৈতিক দৃষ্টি-ভঙ্গী।

প্রথম প্রথম ব্রিটিশ এবং পরে ফরাসীরা হো চি মিনের প্রতি অনেক অপকৌশল প্রয়োগের চেষ্টা করেছেন। এই রকম ঘটেছে ১৯৪৬ খৃঃ দুবার। এরপর জেনেভা চুক্তি সম্পর্কে যখন বেশ মিল-মিলের মধ্যে আলোচনা চলছিল তখন মধ্যেই দক্ষিণ ভিয়েৎনামকে বিকিয়ে দেওয়া হল [illegible]

লাকাতুর এই গ্রন্থের শেষাংশে লিখেছেন—'স্বদেশের এতটুকু অমর্যাদা হতে দেবেন না হো। তাঁর কাছে স্বদেশের চেয়ে বড়ো আর কিছু নেই।'

এই গ্রন্থটিতে ভিয়েৎনামের প্রাণপুরুষ হো চি মিনের যে রেখাচিত্র লাকাতুর এঁকেছেন তা সার্থক হয়েছে। অজস্র তথ্য ও সমসাময়িক মন্তব্য সমাবেশে গ্রন্থটির ঐতিহাসিক মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে।

—[illegible]

PORTRAIT OF HO CHI MINH : By Jean Lacoutre: Translated by Peter Wiles, Publishers: Messrs ALLEN LANE, (The Penguin Press) London, Price 25 Shillings

সাহিত্যের খবর

কুমুদরঞ্জনের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি ।। বর্তমান বাংলার প্রবীণতম কবি কুমুদরঞ্জনের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য গত ১৩ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় সাহিত্যতীর্থের দপ্তরে বিশিষ্ট কবি-লেখকরা সমবেত হন। কবির পবিত্র স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে ভাষণ দেন সর্বশ্রী আশাপূর্ণা দেবী, বাণী রায়, মনোজ বসু, পুষ্প দেবী, মন্মথ রায়, জরাসন্ধ, দক্ষিণারঞ্জন বসু, ভবানী মুখোপাধ্যায়, অখিল নিয়োগী, কুমারেশ ঘোষ, কৃষ্ণ ধর, রণজিৎকুমার সেন, হিমু বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপাল ভৌমিক প্রমুখ। সভায় পৌরোহিত্য করেন শ্রীমতী রাধারাণী দেবী। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবগুলি হল:—(১) কুমুদরঞ্জনের স্মৃতি-স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ; (২) সমগ্র রচনাবলী প্রকাশ, (৩) প্রামাণ্য জীবনী প্রকাশ; (৪) বালিগঞ্জ প্লেসের যে অংশে কবি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন, তার নামকরণ হোক 'কুমুদরঞ্জন সরণী'। প্রস্তাবগুলি উত্থাপন করেন শ্রীরমেন্দ্রনাথ মল্লিক।

তাহা হোসেন সম্পর্কে বই ।। তাহা হোসেন একালের মিশরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক। তাঁর ৮০-তম জন্মদিবস উদযাপন উপলক্ষে মিশরের প্রখ্যাত প্রকাশন 'দার-এর হিলাই' তাঁর সম্পর্কে একটি বই প্রকাশ করেছেন। বইটির নাম 'তাহা হোসেন : সমকালীনদের দৃষ্টিতে'। এতে তাহা হোসেনের সাহিত্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিশিষ্ট মিশরীয় লেখকরা যে সব আলোচনা করেছেন, তা সংকলিত হয়েছে। ভূমিকায় প্রখ্যাত সমালোচক মহম্মদ আইনুব লিখেছেন যে, তাহা হোসেনের প্রতিভার দিক তিনটি—তাঁর স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব, তাঁর উদারচেতা হৃদয় ও সাহিত্য রচনায় নব কৌশল অবলম্বন। প্রখ্যাত কবি আয়েজ রহমান সেদকি লিখেছেন—'কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মিশরীয় ডীন তাহা হোসেন আরবি সাহিত্যেরও প্রথম ডীন। তিনি এই পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন প্রতীচ্য সাহিত্য ও আরবি সাহিত্যে সুগভীর পাণ্ডিত্যের জন্য।' ডঃ সোহির এল কালামাও শিক্ষাবিদ হিসেবে তাহা হোসেনের কৃতিত্বের কথা উল্লেখ করেন। ডঃ আব্দেল হামিদ ইয়ুনেসের মতে—তাহা হোসেন লোক সাহিত্যের একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর নিজের রচনাও লোক-সাহিত্য দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছে। ডঃ রামেস ফ্রান্সিস—'তাহা হোসেন ও ফরাসী সাহিত্য' নামক প্রবন্ধে লিখেছেন—'তাহা হোসেন এমন একজন লেখক ছিলেন যিনি অন্য দেশের সাহিত্য পাঠ করে তার রত্নরাশি নিজ সাহিত্যে উপহার দিয়েছেন। ফরাসী সাহিত্য তিনি খুব ভালভাবে পড়েছিলেন, যার জন্য তাঁর রচনায় ফরাসী দেশ ও ফরাসী ভাষার অনেক প্রভাব দেখা যায়। যেমন—'দি ভয়েস অব প্যারিস' 'মোমেণ্টস' 'পেজেস অব লিটারেচার এণ্ড ক্রিটিসিজম' ইত্যাদি গ্রন্থে ফরাসী দেশ ও ফরাসী সাহিত্যের প্রভাব লক্ষণীয়।' ডঃ ফ্রান্সিস নিজে তাহা হোসেনের 'দি সং অব দি নাইটএঙ্গেল' গ্রন্থটি ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করেছেন। ডঃ মহম্মদ আমিন এল-এলেম বইটির শেষ প্রবন্ধের এক জায়গায় লিখেছেন—'তাঁর জীবন ও দর্শন বিগত অর্ধ-শতাব্দী ধরে আরবিক সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রধান প্রবাহ ছিল এবং ভবিষ্যতের সাহিত্যিকদেরও তা সমভাবে অনুপ্রাণিত করবে। মিশরের সাহিত্য সম্বন্ধে আমরা ধারণা খুব অস্পষ্ট। আশা করি, এই আলোচনা থেকে বোঝা যাবে, সাহিত্য সেখানেও আজ সমৃদ্ধির পথে।

অস্ট্রেলিয়ার পুস্তক প্রকাশন সংস্থা ।। অতি সাম্প্রতিক কালেই অস্ট্রেলিয়ায় পুস্তক প্রকাশন সংস্থার সমৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়: দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ববর্তী অবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তখন সরকারী আইন বা দলিল ইত্যাদি নিয়েই বছরে ৫০টির মত বই প্রকাশিত হত। কিন্তু ইদানিং বইয়ের বিক্রী এবং প্রকাশ খুবই উল্লেখ্য স্থান অধিকার করেছে। ১৯৫৭ সালে অস্ট্রেলিয়ায় প্রকাশন সংস্থা ছিল মোট ২৯টি। গত এপ্রিল মাসে সিডনিতে সম্মেলন হয়, তাতে দেখা যায় মোট প্রকাশন সংস্থা এখন দাঁড়িয়েছে ৩২৫টিতে। পৃথিবীর বিভিন্ন পুস্তক প্রদর্শনীতেও এখন অস্ট্রেলিয়ার বই স্থান পাচ্ছে। ওসাকায় অনুষ্ঠিত এক্সপো—৭০-এ অস্ট্রেলিয়ার বই ছিল এক বিশেষ আকর্ষণ। এছাড়াও ফ্রাঙ্কফুর্ট বিশ্ব পুস্তক প্রদর্শনীতেও প্রতি বছরই তাঁরা আমন্ত্রিত হন। ইংলণ্ড, আমেরিকা, আফ্রিকা এবং এশিয়ায় এখন তাঁদের বই প্রচুর পরিমাণে রপ্তানী হয়। কারণ, সেখানকার গ্রন্থাগার তাঁদের বই সংগ্রহে বিশেষ মনোযোগী হয়ে উঠেছেন। এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে পড়ছে। ইদানিং ভারতীয় গ্রন্থ সম্বন্ধে এশিয়া, আফ্রিকা এবং অন্যান্য দেশে খুব আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে অথচ ভারতীয় গ্রন্থ পড়ার সুযোগ তাঁদের হচ্ছে না। যদি বই অনুবাদ করে প্রকাশকরা এই সব দেশে প্রচারের ব্যবস্থা করেন তাহলে একদিকে যেমন ব্যবসায়িক [illegible] অন্যদিকে সাহিত্যে সমৃদ্ধির [illegible]

শিশু সাহিত্যে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার লাভ ।। বাংলা ভাষায় শিশু সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য এ বছর রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পেয়েছেন অধ্যাপক ডঃ মৃত্যুঞ্জয়-প্রসাদ গুহ। যে বইটির জন্য তিনি এ পুরস্কার লাভ করেছেন তার নাম 'চল যাই চাঁদের দেশে'। এই পুরস্কারের আর্থিক মূল্য এক হাজার টাকা।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে ডঃ গুহের বিজ্ঞান ভিত্তিক গ্রন্থ 'আকাশ ও পৃথিবী'র জন্য ১৯৬৪ সালে রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করেন এবং 'বিজ্ঞানের বিচিত্র বার্তা' নামক অপর একটি গ্রন্থের জন্য ১৯৬৯ সালে ইউনেস্কো পুরস্কারে সম্মানিত হন।

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর জন্ম-শতবার্ষিকী ।। রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম-শতবর্ষ উপলক্ষে সম্প্রতি রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় জোড়াসাঁকোয় এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। বিভিন্ন বক্তা বলেন্দ্রনাথের কাব্যে ও প্রবন্ধে রচনাশ্রী সম্বন্ধে আলোকপাত করেন। বলেন্দ্রনাথের বাংলা গদ্যরীতি, সংস্কৃত কাব্য আলোচনার বৈশিষ্ট্য, শিল্প প্রসঙ্গে বৈশিষ্ট্য এবং অন্যান্য প্রসঙ্গে বক্তারা আলোচনা করেন। সভায় পৌরোহিত্য করেন ডঃ অজিতকুমার ঘোষ।

বাংলার লোক-সংস্কৃতি সম্বন্ধে আলোচনা চক্র ।। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের উদ্যোগে গত ১৭—২০ ডিসেম্বর কলকাতা তথ্যকেন্দ্রে বাংলার লোক সংস্কৃতির উপর এক আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয় প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন—'এই ধরনের প্রচেষ্টা বাংলাদেশে এই প্রথম। উদ্বোধন করেন ডঃ রমা চৌধুরী। বিভিন্ন দিনে আলোচনা সভাগুলিতে সভাপতিত্ব করেন ডঃ সুরজিৎ সিংহ, শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়, স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, ডঃ হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ ও ডঃ শীতাংশুনাথ বসু।

যাঁরা আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন ডঃ সুকুমার সেন, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, ডঃ সুধীর চট্টোপাধ্যায়, [illegible] ডঃ [illegible] [illegible]

নতুন বই

পরশুরাম ও ত্রৈলোক্যনাথের ব্যঙ্গরচনা (আলোচনা) — গীতা অধিকারী। সাহিত্য প্রকাশ। ৫।১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট। কলকাতা—৯। দাম নয় টাকা।

বাঙলা সাহিত্যে হাস্যরসের আমদানী বেশী পুরোন নয়। হাস্যরসের অতি কাছাকাছি ব্যঙ্গের অবস্থান। ব্যঙ্গ বা হাস্যরসকে দীর্ঘস্থায়ী হতে গেলে উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যগুণান্বিত হতে হবে। হাস্যরস বা ব্যঙ্গসৃষ্টিতে ত্রৈলোক্যনাথ বাঙলা সাহিত্যে পথিকৃৎ। এত রোমাঞ্চকর এবং বিচিত্র কল্পনাসমৃদ্ধ লেখক বিরল। সমকালে তাঁর অসামান্য রচনার যোগ্য স্বীকৃতি মেলেনি। তাঁর ছিল এক সহানুভূতিশীল শিল্পীহৃদয়। হালকা চালে হাস্য ও ব্যঙ্গের স্নিগ্ধ ধারায়, যুগপৎ তাঁর উদ্ভট কল্পনার মনোরম পরিবেশ, সহজ ভাষায় ও সাদামাঠা চরিত্র রচনায় ত্রৈলোক্যনাথ সিদ্ধহস্ত। ব্যঙ্গসৃষ্টিতে তাঁর যে নিরাসক্ত মনটি পাই তাই-ই তাঁর সাহিত্যে খাঁটি ব্যঙ্গরসের যোগান দিয়েছে। গ্রামবাঙলার সাদামাঠা জীবন, সমাজ, সংলাপ, পরিবেশ নিখুঁতভাবে ফুটিয়েছেন ত্রৈলোক্যনাথ। প্রকৃত ব্যঙ্গস্রষ্টার আদর্শ নিরাসক্ত মন। ত্রৈলোক্যনাথে তা স্পষ্ট।

শ্রীমতী অধিকারী এই যুগপ্রবর্তক সাহিত্যস্রষ্টাকে নিয়ে সুদীর্ঘ গবেষণা গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। পূর্ণাঙ্গ রচনা ত্রৈলোক্যনাথ ও পরশুরামকে কেন্দ্র করে। বর্তমান খণ্ডে আছে ত্রৈলোক্যনাথ, পরবর্তী খণ্ডে থাকবে পরশুরাম। ত্রৈলোক্যনাথের জীবন ও সাহিত্য পরিক্রমার সঙ্গে পরবর্তীকালে তাঁর প্রভাব সম্পর্কে বিস্তৃত আলোকপাত করা হয়েছে। 'কোকলা দিগম্বর'কে এখনও বাঙালী ভোলে নি। 'কঙ্কাবতী' ছিল সব থেকে জনপ্রিয় রচনা। সেই সঙ্গে পাপের পরিণাম, ডমরু চরিত, ভূত ও মানুষ, মজার গল্প, মুক্তামালা—সম্ভবত এখনও রসিক পাঠককে মুগ্ধ করে। যথেষ্ট যুক্তি ও তথ্যসহ শ্রীমতী অধিকারী স্বীয় সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠায় সার্থক হয়েছেন। আশা করা যায়, তাঁর পরিশ্রম উপযুক্ত স্বীকৃতি পাবে।

ইতিহাসচক্র— রামমনোহর লোহিয়া। **ভারত ভাগের অপরাধী যারা**—রামমনোহর লোহিয়া। রামমনোহর লোহিয়া সাহিত্য প্রকাশন ট্রাস্ট। ৮ ইণ্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট। কলকাতা—১৩। প্রতিখানির দাম চার টাকা।

ভারতে সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠার অক্লান্ত সৈনিক রামমনোহর লোহিয়া সামাজিক কুসংস্কারমুক্ত এক নতুন ভারতের স্বপ্ন দেখেছিলেন। শুধু পাণ্ডিত্য নয়, স্বাধীন চিন্তা ও দার্শনিক ভাবনায় প্রোজ্জ্বল তাঁর ব্যক্তিত্ব। ভাষণে এবং রচনায় স্পষ্টবাদিতা এবং বলিষ্ঠ মন্তব্যের জন্য তিনি বহুজনের প্রিয় ও অপ্রিয় ছিলেন। লোহিয়াজীর ইংরেজি রচনাবলী বাঙলায় প্রকাশের ব্যবস্থা করেছেন রামমনোহর লোহিয়া সাহিত্য প্রকাশন ট্রাস্ট। 'হুইল অফ হিস্ট্রি' বা 'ইতিহাসচক্রে' লোহিয়াজী মানব ইতিহাসের ক্রমাভিব্যক্তির ধারা বিশ্লেষণ করেছেন। 'ভারত ভাগের অপরাধী যারা' বইটি বিভক্ত ভারতের পটভূমিকায় রচিত। লোহিয়াজীর সিদ্ধান্তের সঙ্গে অনেকের মতপার্থক্য থাকতে পারে, কিন্তু তাঁর মতকে একেবারে উপেক্ষা করা অসম্ভব।

সংকলন ও পত্র-পত্রিকা

গ্রন্থপরিক্রমা (নভেম্বর, ১৯৭০)—সম্পাদক : অপর্ণাপ্রসাদ সেনগুপ্ত। ৩০।১বি, কলেজ রো, কলকাতা—৯। পঁচিশ পয়সা।

সমালোচনা-সাহিত্য-নির্ভর পাক্ষিক পত্রিকা 'গ্রন্থপরিক্রমা' সুদীর্ঘ আট বছর ধরে বলিষ্ঠভাবে সাহিত্যসেবা করে আসছে। সাহিত্যের 'সিরিয়াস' পাঠক যাঁরা বাংলা-সাহিত্যের এবং নতুন বইয়ের সত্যিকার খবর চান তাঁরা 'গ্রন্থপরিক্রমা'র পরিক্রমণ করলে নিশ্চয়ই খুশী হবেন।

কালদর্পণ (ঈদ সংকলন, নভেম্বর, ১৯৭০) সম্পাদক : মুন্সী আবদুর রহীম। মথুরাপুর, ২৪ পরগণা। মূল্য : ১·২৫ পয়সা।

'প্রতিভা সাহিত্য চক্রে'র মুখপত্র 'কালদর্পণ'-এর তৃতীয় বর্ষের তৃতীয় সংখ্যাটি 'বিশেষ সংখ্যা' হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। গল্প-কবিতা-প্রবন্ধ-জীবনী-ভ্রমণ-কাহিনী প্রভৃতির সমাহারে। মুসলিম জন-জীবনের নানান সমস্যার ওপর নানান দিক থেকে প্রতিবাদের আলোয় উদ্ভাসিত করে তোলার আন্তরিক প্রচেষ্টা প্রশংসার্হ। অধিকাংশ গল্প-কবিতা-প্রবন্ধের পটভূমি এই জনজীবন, যা কুসংস্কারের অন্ধকারে বন্দী; ধর্মের বিকৃত ব্যাখ্যায় পঙ্গু, অচলায়তনের কারাপ্রাচীর ভেঙে সত্যের ও কুসংস্কারমুক্ত আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠবার জন্যে আকুল হয়ে উঠেছে।

কণিকা (১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা)—সম্পাদক : প্রশান্ত দাঁ ও জয়ন্ত রায়। ২৫।এ, বেনিয়াটোলা স্ট্রীট কলকাতা—৫। মূল্য : চল্লিশ পয়সা।

'দিশারী' পত্রিকা কিন্তু আকৃতির সমস্ত সাহিত্যগুণে এর মধ্যে বিভিন্ন বিভাগের মাধ্যমে সুচারুরূপে পরিস্ফুট করে তোলা হয়েছে। গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা, হাসির গল্প, শিক্ষা-সমস্যা, বিজ্ঞান-প্রসঙ্গ, খেলাধুলা প্রভৃতি প্রতিটি রচনাই সুনির্বাচিত এবং সুলিখিত।

নবান্ন (বড়দিন-এর বিশেষ সংখ্যা, ১৯৭০) —সম্পাদক : সুবোধবিকাশ দত্ত। সাহিত্য সদন, ৬৫।এ, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯। মূল্য : এক টাকা।

বঙ্গীয় খ্রীষ্ট-ধর্মাবলম্বীদের মুখপত্র মাসিক পত্রিকা নবান্ন-এর তৃতীয় বর্ষের একাদশ ও দ্বাদশ সংখ্যাটি বড়দিন বিশেষ সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। সম্পাদকীয়, চলতি প্রসঙ্গ, কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প, নাটিকা, ভ্রমণ কাহিনী কিশোরমহল, যুব সম্মেলন, রম্যরচনা, মণ্ডলী সংবাদ, আলেখ্য, মধুরেণ প্রভৃতি নানান বিভাগে সুরচিত রচনা-সম্ভারে খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীদের সমাজ-জীবনের জীবন্ত দর্পণ হয়ে উঠেছে এই পত্রিকা। প্রবন্ধ বিভাগটি বিশেষভাবে আকর্ষণীয়। ভবানী মুখোপাধ্যায়ের 'বিশ্বাস ও অবিশ্বাস, অরবিন্দনাথের 'ধর্ম বনাম অধর্ম' এবং বিশু সেনের 'মার্কসবাদীদের চোখে যীশুখ্রীষ্ট' শুধু খ্রীষ্ট অনুরাগীদের নয়—সাহিত্যরসিকদের চিন্তার খোরাক যোগাবে।

নীহারিকা—(অকটোবর-ডিসেম্বর, ১৯৭০)— সম্পাদক : প্রিয়লাল মৌলিক। ৩৫সি, মতিলাল নেহরু রোড, কলকাতা-২৯। পঞ্চাশ পয়সা।

গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনীর সংকলন। প্রতিমা দেবীর ('নিউইয়র্ক ভ্রমণ') এবং সুখরঞ্জন চক্রবর্তীর ('এই দর্শক, এত সংবাদ ও কীর্তিভূষণ') রচনা দুটি উল্লেখ করবার মতো।

স্বপ্ন-মুখ—সম্পাদক : শ্যামল শুক্ল। মানকর, বর্ধমান। পঁচিশ পয়সা। দ্বিমাসিক পত্রিকার প্রথম সংখ্যা।

কমলতা—(দ্বিমাসিক সাহিত্যপত্র) সম্পাদক : প্রবীর ভট্টাচার্য ও সন্তোষ সিংহ। ৩৩।১, মাধবাগান রোড, শ্যামনগর, ২৪ পরগণা। পঞ্চাশ পয়সা।

কুশক (১ম বর্ষ : ১ম সংখ্যা) : সম্পাদক—এম এম ইয়াসিন। বীরপুর, হুগলী। কুড়ি পয়সা।

মিনিহংস—সম্পাদক : ইন্দ্রজিৎ বসু, শুকদেব ঘোষ। ১৯ কাশীপুর রোড, কলকাতা ২। পঁচিশ পয়সা।

ঢেউ—ত্রৈমাসিক পত্রিকার প্রথম সংখ্যা। তিরিশ পয়সা। জনপুট রোড, কাঁথি, মেদিনীপুর।

বইকুণ্ঠের খাতা

জীবন নির্ভর কবিতার অনুবাদ : গাথা সপ্তশতী

"চর্চার অভাবে একেকটি উন্নত ভাষা পর্যন্ত মানুষ ভুলে যায়, ভুলে গেছে—তার প্রমাণ আছে পৃথিবীর সর্বত্র। এজন্যে কেউ দুঃখ করেন না। দুঃখ করার কিছু নেইও। প্রতিনিয়ত দেখতে পাচ্ছি, প্রতিটি সজীব ভাষাই ক্রমাগত শরীর ও পোশাক বদল করে দূরে সরে যাচ্ছে আদি উৎস থেকে। ঘটছে শব্দের অর্থান্তর, অনুষঙ্গের রদবদল। চসারের ইংরেজী, কেবল বিদেশীর কাছে নয়, আজকের লণ্ডন-বাসীর কাছেও দুর্বোধ। চর্যাপদের বাংলাকেই কি আমরা সহজে বুঝতে পারি ভাষাতাত্ত্বিকের সাহায্য না নিয়ে?"

সেদিন কথাটা যখন শুনেছিলাম, তখন একটা ভেবে দেখিনি। জনৈক অধ্যাপক দুঃখ করে বলছিলেন : "আমি বিস্মৃত-প্রায় ভাষার পুনরুদ্ধারের কথা বলছি না, তার ভাবসম্পদের দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমরা যখন সাহিত্যের বিষয় ও আঙ্গিকের সন্ধানে য়ুরোপের দিকে যাত্রা করি, তখনও একবার ঘরের কাছে কি আছে তার খোঁজখবর করে পর্যন্ত দেখি না। তার কারণ বোধহয়, আধুনিকতার শিক্ষাটা আমরা পেয়েছি য়ুরোপের কাছ থেকে। ফলে, ওঁরা যখন আমাদের দিকে হাত বাড়িয়েছেন, তখন আমরা নিজেদের দিকে চোখ ফিরিয়েছি। এমন ঘটনাও ঘটেছে, বাংলাদেশে বসে বাঙালীর লেখা লোক-সাহিত্যের বই বেরিয়েছে কলকাতা থেকে নয়, সুদূর জার্মানী থেকে জার্মান ভাষায়। হয়তো একালেই আধুনিক সাহিত্যের আলোচনায় অথবা প্রাচীনের প্রসংগ উত্থাপন করতে লজ্জা পাই। অতীতের কাছে ঋণ স্বীকারের কথাটাও মনে পড়ে না।"

তারপর ব্যাখ্যা করে তিনি বললেন : "অতীতের কাছ থেকে আমরা কি নেবো, সেটা বড়ো কথা নয়, কিভাবে নেবো সেটাই বড়ো কথা। পুরনোর মধ্যে প্রত্যাবর্তনের কথা কেউ বলবেন না। তার মধ্যে যদি কোনো ঐশ্বর্য থাকে, তবেই তাকে গ্রহণের প্রশ্ন ওঠে—না হলে নয়। বিলকে পুরা-কাহিনীর জগৎ থেকে আধুনিকতার উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন, কবতোর মধ্যেও দেখেছি প্রাচীন ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধারের প্রয়াস। এঁরা কেউ অনাধুনিক ছিলেন না। পৃথিবীতে এ পর্যন্ত যতগুলি রেনেশাঁস হয়েছে, তার মূলে ছিল অতীতের পুনরা-বিষ্কার ও পুনর্মূল্যায়নের আকাঙ্ক্ষা। আজও যদি আমরা সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নতুন কিছু করতে চাই, তাহলে আমাদের সেই আলোর সন্ধান পেতে হবে। আজকের সাহিত্য যতই আন্তর্জাতিক চেতনাসম্পন্ন হোক না কেন, যদি কিছু স্বাতন্ত্র্য অর্জন করতে হয়, তাহলে তাকে নিজস্ব ঐতিহ্য থেকেই উপাদান ও প্রেরণা সংগ্রহ করতে হবে।"

আমি তাঁর সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হতে পারিনি সেদিন। আজও প্রতিবাদের ভাষা খুঁজে পাইনি। কোন যুক্তিতেই বা বিতর্ক করবো? আধুনিক কবিসাহিত্যিকরা বিষয়টা ভেবে দেখতে পারেন। সত্যি কথা বলতে কি, প্রাচীন সাহিত্যের অতি সামান্য অংশই আমি পড়েছি। তাও সংস্কৃতের অনুবাদ, প্রাকৃতের কথা বলতে পারবো না।

গাথা সপ্তশতী

সম্প্রতি মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতে লেখা সাত-বাহন-রাজ হাল-সঙ্কলিত 'গাহাসত্তসঈ'-এর বাংলা পদ্যানুবাদ করেছেন শ্রীযুক্ত পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য। এর আগে বইটির গদ্যানুবাদ করেছিলেন ডঃ রাধাগোবিন্দ বসাক। মনে হয়, প্রাকৃত ভাষার অধ্যাপক হিসেবে গাথা সপ্তশতীর বিশ্লেষণ ও আলোচনাই পার্বতীবাবুকে অনুবাদে উৎসাহিত করে। তিনি বলেন : "ভাষা-তত্ত্বের নীরস আলোর মধ্যেও ক্ষণে ক্ষণে এর কাব্যসৌন্দর্য আমাকে মুগ্ধ করেছে। ভাষার অস্থি-বিদ্যার অঙ্গুলি সঙ্কেতের মধ্যে যে রূপসী মাঝে মাঝে তার অস্তিত্ব অনুভব করিয়েছে, স্বীকার করি তাকে অবজ্ঞা করা আমার সম্ভব হয়নি।"

তিনি অনুভব করেছেন, গাথাসপ্ত-শতীর শ্লোকগুলি যেন তাঁর কাছে প্রকাশের ভাষা চাইছিল। বুঝতে পেরে-ছিলেন, মাতৃভাষার মধ্য দিয়ে তাদের বাঙ্ময় করে তুললে, প্রায় দু হাজার বছর পূর্বেকার—কালিদাসের পূর্ব যুগের এক অভিনব সৃষ্টির রূপলাবণ্য ধরা দেবে। সেজন্যে তিনি তাঁর গুরু রাধাগোবিন্দ বসাকের কাছে যান এবং অনুবাদের অনু-মতি প্রার্থনা করেন।

ডঃ বসাক অনুমতি দিয়ে বলেন, তোমাকে নতুন কিছু করতে হবে, নতুন [illegible]

উত্তরে পার্বতীবাবু বললেন : "আপনি তপস্বী, আপনার তাপ এবং তপস্যা দ্বারা বাঙলার মাটিতে গাথার গঙ্গাধারা নিয়ে এসে আমাদের প্রাণ জুড়িয়েছেন। অনুমতি করুন, আমি সেই গাথার ধারায় তরুণ ফুঁক—একটু ছন্দের স্পন্দন, আর কিছু না।"

ডঃ বসাক উপদেশ দিলেন: "তুমি গানের জবাব গানেই দিও। তোমারও তপস্যা চাই, গাথার সর্বতোমুখী শব্দ-গম্ভীর আলোচনা তোমার কাছে প্রত্যাশা করি।"

কিন্তু কাজে হাত দিয়ে দেখেন, সামনে এক বিষম সমস্যা। একালের বিচারে সপ্তশতীর কোনো কোনো গাথার রুচি-বিরুদ্ধ বিষয়ের অনাবৃত প্রকাশ হয়ে গেছে। তিনি ভয় পেয়ে আবার ছুটলেন ডঃ বসাকের কাছে। বললেন : "আমি শ দুই গাথা বাদ দিয়ে অনুবাদ করতে চাই, এবং অনূদিত গ্রন্থের নাম দিতে চাই : 'সপ্ত-শতীর পঞ্চশতী।"

শুনে ডঃ বসাক বললেন : "অসম্ভব। তুমি শ্লীল অশ্লীলকে অস্তিত্ববাদীর দৃষ্টি দিয়ে দেখো। সবই তুলনামূলক। প্রকাশেই অশ্লীলের অশ্লীলতা। তোমার প্রকাশের নিপুণতায় তাকে ঢেকে দিও, বস্তুটাকে হৃদয়োপযোগী করে বলো।"

তাঁর কথায় পার্বতীবাবুর সংশয় কেটে গেলো। নতুন দৃষ্টি দিয়ে তিনি দেখলেন, নৃপতি হাল আধুনিক কালের সূক্ষ্ম বিচারেও একজন খাঁটি রিয়ালিস্ট। তাঁর অপর গুরু আচার্য সুনীতিকুমার চট্টো-পাধ্যায়ের সাহায্যও তিনি পেয়েছেন। বলেন : "আমি আমার কীর্তিটিতে তার কতটুকুই বা ধরে রাখতে পেরেছি? সান্ত্বনা এই, আমার আচার্যদ্বয়ের কাছে এই প্রৌঢ় বয়সেও আবার ছাত্র হয়ে বসতে পেরেছি।"

অবশ্য এসবই হলো, প্রত্যক্ষ প্রেরণার কথা, পূর্বসূরীর সাহায্যের সাঁবনয় স্বীকৃতি। শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ও তাঁকে উৎসাহ এবং উপদেশ দিয়েছেন নানা-ভাবে। প্রচলিত গ্রন্থে সুপ্রাপ্য 'কাঁজাহি ভূলিঅন্দেলো কক্খউ বো......' গাথাটির সন্ধান তিনি তাঁকে দিয়েছিলেন।

আমি বইটি পড়েছি একাধিকবার। সুদীর্ঘ ভূমিকাটিও। সাতটি শতকে বিন্যস্ত মোট অনূদিত গাথার সংখ্যা ৭০০ হলেও, প্রতি শতকের শেষেই একটি করে গাথা আছে অতিরিক্ত। বলা যায়, এগুলি প্রতি শতকের সমাপ্তিসূচক গাথা। বাংলা হরফে ছাপা মূল প্রাকৃতে লেখা গাথাটি ছাপা হয়েছে বইয়ের বাঁদিকের পৃষ্ঠায়, ডানদিকে মুদ্রিত হয়েছে বাংলা অনুবাদ।

পার্বতীবাবু বলেন : "খুব হুঁশিয়ার হয়ে বলতে গেলে, এই প্রাকৃতকে বলতে হবে—মহারাষ্ট্রী প্রাকৃত নামে অভিহিত, প্রাচীন ভারতের লোকভাষার আধারে গঠিত, একটি সাহিত্যিক ভাষা।......এমন সংগ্রহ বা সঙ্কলনকে সংস্কৃতে বলা হয় কোষকাব্য, ইংরেজীতে অ্যানথোলজি। এ জাতীয় লোকরঞ্জন কবিতা সংগ্রহ অতি প্রাচীনকাল থেকেই সর্বত্র আদৃত হয়ে আসছিল। সংস্কৃতে যেটা কোষ, ফার্সীতে তাকে বলে কুল্লিয়ৎ। কুল্লিয়ৎ-এ-হাফিজ—হাফিজের নানা ধরনের কবিতাসংগ্রহ।" সাতশ' গাথার সঙ্কলন বলেই নৃপতি হাল এই গ্রন্থের নাম রেখেছিলেন : 'গাহা-সত্তসঈ'।

ইতিহাসের নজীর টেনে তিনি বলেন: 'সঙ্কলনই হোক অথবা একক কবির মৌলিক রচনাই হোক, শ্লোকের সংখ্যার কাব্যকে পরিচিত করার রীতি ভারতবর্ষে প্রাচীন যুগে ছিল, মধ্যযুগে ছিল, আধুনিক যুগেও আছে। আট শ্লোকের সমষ্টি একদা কালিদাসের নামে প্রচলিত থেকে নাম নিয়েছিল 'শৃঙ্গারাষ্টক।' অমরু কবির নিজ রচনা অথবা সঙ্কলনগ্রন্থ 'অমরুশতক'। ময়ূর কবির 'সূর্যশতক'। এমনই সংখ্যা নামে পরিচিত আমাদের এই গ্রন্থও 'গাথা সপ্তশতী।'

হালের বহুবছরেরও কিছু বেশী পরে লক্ষ্মণসেনের সভাকবি আচার্য গোবর্ধন হালকে অনুসরণ করে তাঁর সংস্কৃত ভাষায় লেখা একটি শ্লোক-সঙ্কলনের নাম রেখে-ছিলেন 'আর্যাসপ্তশতী।' পার্বতীবাবুর মতে: হালের রচনায় কামনা তত্ত্বতন্ত্রীর বিশ্লেষণ আর গোবর্ধনের রচনায় আছে শৃঙ্গারেরর সংগমের—বচন বিন্যাস। উদ্দেশ্য এক, শুধু গ্রন্থ দুইখানির ভাষা ভিন্ন। একটির প্রাকৃত—অন্যটির সংস্কৃত। গোবর্ধনের আরো পাঁচ বছর পর জয়-পুরাধিপতি রাজা জয়সিংহের সভাকবি বিহারীলাল চৌবে ১৬৬২ খৃষ্টাব্দে ব্রজ-ভাষায় সাতশো দোহা রচনা করে নাম দিলেন 'সতসঈ'।

এ বইয়েরও ভঙ্গি এক। অনেক দোহা রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক হলেও জীবন্ত মানুষের ভাবাবেগই প্রাধান্য পেয়েছে সর্বাধিক। প্রথম দোহাতেই বিহারীলাল লিখেছেন :

'মেরী ভব-বাধা হরো রাধা নাগরি সোই।
জা তনকী ঝাঁই পরে
স্যাম্ হরিত-দুতি হোই।।'

অর্থাৎ, যার তনুর আভা পড়ায় শ্যাম হরিত-দ্যুতি হয়ে গেলেন, সেই রাধা নাগরী আমার সংসার বন্ধন দূর করুন।'

গাথা সপ্তশতীর বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে পার্বতী-বাবু বলেন : এমন কামকামনার তত্ত্বতন্ত্রী বিশ্লেষণ এবং সেই সঙ্গে দেবদেবীর লীলা-রনায় পারদর্শী কবি হলেন জয়দেব-গোবর্ধন-বিহারীলালেরা। শ্রীমন্নরপতি হালও তাঁর দেবতা হরগৌরীকে অনুরূপভাবেই গ্রন্থারম্ভে বন্দনা করেছেন। কিন্তু জয়দেব-বিহারীলালের ভক্তিভাবটা যেমন মাঝে মাঝে তার অস্তিত্ব অনুভব করায় গোবর্ধন ও হালে সে ভাবটা আসে না। মনে হয়, এই দুই কবি যেন দেবতাকে নমস্কারটুকু জানিয়ে কাম-কামনার লীলায় নেমে এলেন। শ্রীকবি হাল আদৌ মধ্যে ৫ অন্তে ৫ দেবতাকেও রেখেছেন। আদিতে এবং অন্তে মহেশ্বর মহেশ্বরীকে প্রণাম জানিয়েছেন। মন্ত্রের "ওঁ" বীজের মতো গ্রন্থারম্ভে এবং গ্রন্থ শেষে ইষ্টদেবতার লীলাকীর্তন করে তিনি গ্রন্থকে অবিনশ্বর করতে চেয়েছেন। কিন্তু ভক্তিভাব তো কোথাও ফোটেনি। যাঁরা একথা বিশ্বাস করতে চাইবেন না, তাঁদের ২।৫১ গাথাটি পড়তে বলি কবি নিষ্কলঙ্কের নিষ্কলঙ্ক ভক্তির স্বরূপ উপলব্ধি করতে বলি। আসলে গোবর্ধন এবং হাল তাঁদের সপ্তশতীতে রক্ত মাংসে গড়া মানুষেরই গান গেয়েছেন—যে মানুষের জীবন-রথ চালিয়ে নিয়ে চলেছে একাদশ ইন্দ্রিয়—ধর্মও নয়, দেবতাও নয়।'

সাধারণত সংস্কৃত ও প্রাকৃত কোষকাব্য-গুলি বিষয় অনুসারে সাজানো হয়ে থাকে। গাথাসপ্তশতী সেভাবে সাজানো হয়নি। পার্বতীবাবু বলেন : 'অত্যন্ত সাজ সর্বদা সকলের ভালো লাগবে এমন কথা নেই। অকতেয়র এলোমেলো সাজও মাঝে মাঝে অপরূপ হয়ে ওঠে। তাই বুঝি হাল রাজার বিষয়গুলি সাজালেন না।' তিনি রবার্ট হেরিক প্রসঙ্গে লেগুইস ও ক্যাজা-মিয়ানের মন্তব্য উদ্ধার করে বলেন : 'এ স্যুইট ডিজঅর্ডার অ্যাজ অ্যাসথেটিক প্রিন্সিপল। হি লাভস ইট ইন পোয়েট্রি অ্যাজ মাচ অ্যাজ ইন উইমেন্স ড্রেস।'

গাথা সপ্তশতীর জনপ্রিয়তা ও অনন্যতা

গাথা সপ্তশতীর একটা সংস্করণ প্রকাশ করেছিলেন প্রসিদ্ধ জার্মান পণ্ডিত বেবর। ভারতেও কালে কালে এই গ্রন্থের বিভিন্ন টীকা ও ভাষ্য লেখা হয়েছে। তার জন-প্রিয়তা ছিল এককালে উড়িষ্যা থেকে গুজরাট পর্যন্ত—কাশ্মীর থেকে দক্ষিণ ভারত। আনন্দবর্ধন, ভোজদেব, বিশ্বনাথ প্রমুখ প্রখ্যাত আলঙ্কারিকেরা উদাহরণ

রসুই
গুঁড়া মশলা
ফোন : ৫৫-২৪৪১, ৩৩-১৫৭১
রসুই প্রোডাক্টস্
১৭ আর জি কর রোড, কলিকাতা-৪ ॥ ২০১ মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা-৭

সংগ্রহের জন্য একসময় গাথা সপ্তশতীরই শরণাপন্ন হয়েছিলেন।

পার্বতীবাবু বলেন : 'সংস্কৃত সাহিত্য যদি তার জীবনীশক্তি নিয়ে ধারাবাহিকভাবে চলে এসে আধুনিককালে পৌঁছুতে পারতো এবং আধুনিক সাহিত্যের রূপ ও ফর্ম-গুলো স্বীকার করে নিতে পারতো, তবে দেখতাম এই কোষকাব্যের মুক্তকগুলির কোনো কোনো গুচ্ছ উপন্যাস হয়ে উঠেছে। এরা এমনি বাস্তবতায় সমুজ্জ্বল। আমার তো মনে হয়, সপ্তশতীর প্রতি টুকরোতে বীজাকারে এক একটি ছোট গল্প রয়েছে।

'উজ্জ্বল নীলমণি' গ্রন্থে শ্রীরূপ গোস্বামী একটি প্রাকৃত শ্লোককে হালের বলে নির্দেশ করেছেন। শ্লোকটি হলো :

'লীলাই তুলিঅসেলো রক্খউ
বো রাহিআত্থণফংসো।
হরিণো পঢ়মসমাগমসজ্ঝসবেবিরও
হত্থো।।'

যার অর্থ হলো : 'যাঁর হস্ত অক্লেশে গিরি-গোবর্ধন ধারণ করেছিল, সেই কৃষ্ণের হস্ত প্রথম সমাগমে শ্রীরাধার স্তনস্পর্শে কম্পিত হলো। সেই হস্ত তোমাদের রক্ষা করুন।' কিন্তু প্রচলিত গাথা সপ্তশতীতে এই শ্লোকটি নেই। সে জন্যেই অনেকের সন্দেহ থাকতে পারে, হালসংকলিত সাতশো শ্লোক হয়তো প্রচলিত গাথা সপ্তশতীতে অবিকৃত নেই। কিংবা অনুলিখনের সময় অদলবদল হয়েছে। মহারাষ্ট্রী পণ্ডিত সদাশিব আত্মারাম জোগলেকর সম্পাদিত গাথা সপ্তশতীর একটি উত্তরার্ধ আছে। ইংরেজী উদ্ধৃতি দিয়ে পার্বতীবাবু বলেন : 'ট্র্যাডিশান ওয়াজ করাপটেড ইন দি হ্যাণ্ডিং ডাউন অব দি ওরিজিন্যাল অথরিটিজ।'

কিন্তু কে এই সাতবাহন-রাজ হাল? ঐতিহাসিকেরা তাঁর বিশেষ কোনো পরিচয় লিখে রেখে যাননি। পার্বতীবাবুর মতে, 'গাথা সপ্তশতীকে গোদাবরীর গান বললেও অত্যুক্তি হবে না।' ভূমিকায় তিনি সাত-বাহন শাসন ব্যবস্থা ও জনগণ প্রসঙ্গে লিখেছেন : 'সাতবাহন রাজ্যে নারীর স্থান ছিল সমাজের উচ্চস্তরে। স্ত্রী সম্পত্তির অধিকারিণী হতে পারতো। ভাস্কর্যে গঠিত মূর্তিগুলিতে দেখা যায় মেয়েরা বৌদ্ধ প্রতীক পুজো করছে।...সপ্ত-শতীর গাথাগুলি নারীর মুখেই উচ্চারিত হয়েছে।...সাতবাহন রাজ্যে গরীবের ঘরও বেশ সাজানো গোছানো থাকতো। কাষ্ঠাসন, বসার চৌকি, পানপাত্র, খাট সব কিছুর মধ্যেই একটা আকর্ষণীয় শিল্পের ছাপ রয়েছে।...১।৩৫ গাথায় দেয়াল চিত্রে রামায়ণ কাহিনী অঙ্কিত রয়েছে দেখা যায়।'

বিভিন্ন গাথার বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, একটি সমৃদ্ধ সাহিত্য সৃষ্টির অনুকূল আবহাওয়া ছিল সারা দেশে। সপ্তশতীর বেশীর ভাগ শ্লোকের উৎস সাধারণ মানুষ। সেজন্যেই বিস্মিত হয়ে পার্বতীবাবু বলে-ছেন : 'মহারাজের অধীশ্বর নরপতি হাল, যাঁকে ভোজদেব স্মরণ করেছেন আচার্যরূপে, তিনি আলগোছে কেমন করে এবে-বারে গ্রামীণ জীবনে নেমে এসেছেন, এ একটা পরম বিস্ময়।...ক্ষমতার অভ্রভেদী চূড়া থেকে রাজা অবহেলার দৃষ্টিতে জন-সাধারণকে দেখেননি, দেখেছেন ধূলি-ধূসরিত পথপ্রান্তে দাঁড়িয়ে। তিনি তাদের সুখ-দুঃখের অংশ গ্রহণ করেছেন।'

অর্থাৎ গাথা সপ্তশতীর বড়ো কথা হলো তার রিয়্যালিজম, যে-রিয়্যালিজম গড়ে উঠেছে অতি সাধারণ মানুষের অনুভূতিকে কেন্দ্র করে—প্রেম-অপ্রেমের নিবিড়তায়। আছে গৃহস্থের সুখ-দুঃখের কথা। দু একটি গাথাকে বলা যায়, প্যাস্টোরাল সঙ। দ্বিতীয় শতক-এর ৭২ নম্বর গাথাটিকে উদাহরণ হিসেবে স্মরণ করা যায়। পার্বতী-বাবু অনুবাদ করেছেন :

মৃত মহিষের ঘণ্টার মালা অতি
সযতনে পুরেছে রাখে,
মহিষ বাথানে এক পাল আছে
সাধের ঘণ্টা পরাবে কাকে?
গৃহপতি তাই ঘণ্টার মালা
বহুকাল ধরে যতন করি
চণ্ডীর ঘরে টানাইয়া রাখে
সজল নয়নে তাহারে স্মরি।

এ দুঃখের কোনো ভাষা নেই। একজন চাষীর কাছে তার প্রিয় মহিষটিও যে সন্তানতুল্য। তার বেদনা কাউকে বোঝানো যায় না বলেই দুর্বিষহ।

কাব্য সৌন্দর্য এবং অন্যান্য

আমি প্রাকৃত জানি না। মধ্যযুগের বাংলা পড়তে গেলেই হোঁচট খাই। গাথা-সপ্তশতী সম্পর্কে আমার যা কিছু ধারণা, সবই পার্বতীবাবুর অনুবাদের ওপর নির্ভর করে। কেননা, ওয়েবার বসাকের গদ্যানুবাদটি আমি পড়ার সুযোগ পাইনি। সেজন্যে এখন আর কোনো কষ্টও হচ্ছে না। ভাষা-বিশেষজ্ঞের কলম থেকেই সপ্তশতীর বাংলা রূপান্তর ঘটেছে। অনুবাদের ভাষা স্বচ্ছ, সাবলীল ও অকৃত্রিম। ভূমিকা হিসেবে প্রদত্ত তাঁর আলোচনাটি অত্যন্ত মূল্যবান।

পার্বতীবাবু বলেন : 'গাথা সপ্তশতীর সর্বত্র সত্যসুন্দরের ছবি আঁকা। সপ্তশতীর কবিরা যা দিয়ে গেছেন, তাতে আমাদের কল্পনা মুহূর্তে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে এবং সেই কল্পনার আলোকেই দর্শন অত্যন্ত স্পষ্ট ও বিশদ হয়ে ওঠে। কল্পনায় পাওয়া যা হয় এটাই তো সাহিত্যিক উপলব্ধি।... কবিবৎসল হালের দিন থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত গোদাবরীতে অনেক জল গড়িয়েছে। সেদিনের ঘটনা পরম্পরা যুগ-যুগ সঞ্চিত বালুর পাহাড় সমাকীর্ণ হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে কিন্তু কালের কপাট-বক্ষে ও কার সুস্পষ্ট চিহ্ন?...সে এই বিস্ময়ের রাজা সপ্তশতী, গোদাবরীর গান, বিশ্বের প্রতিধ্বনি—সেই 'পোয়েটিক ট্রুথ অব সাবস্টেন্স' বস্তুমুখো বস্তুর কাব্যরূপ।'

তিনি লক্ষ্য করেছেন : 'সপ্তশতীর সতীরা আর অসতীরা, গ্রামণী আর গ্রাম-বধূরা, বিলাসী আর বিলাসিনীরা, চতুরা আর মুগ্ধারা শিল্পের তুলিতে আঁকা তেমনই অবিনশ্বর ছবি।'

এই সংকলনের সম্পাদক তথা সংকলক হাল যদি আধুনিক যুগের মানুষ হতেন, তা হলে তাকে নিয়ে রীতিমতো হৈচৈ পড়ে যেতো। তিনি গাথা সংগ্রহ করতে গিয়ে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ দৃষ্টির পরিচয় দিতে পেরেছিলেন সেই বিস্মৃতপ্রায় যুগে। শ্লীল-অশ্লীলের বিচার করেননি। শুধু কাব্যিক সৌন্দর্যের দিকে তাকিয়ে তিনি বিপরীত মানসিকতার কবিদেরও নিঃসংকোচে জায়গা দিয়েছেন পাশাপাশি। পার্বতীবাবু বলেন : 'ঘটনাগুলি ঘটনা বলেই ঘটেছে। এতে জগতের যেমন কর্তব্যবোধ নেই, তেমনি কবির মানসরাজ্যেও তেমনি কোনো ক্রিয়া-বিক্রিয়া নেই। স্বপ্নরাজ্যের দুর্বল অন্ধকারেই যত হাসিকান্না। জাগরণের সবল মুহূর্তে হাসিকান্না নেই। গাথার সংকলয়িতা যেন সৃষ্টির মূল রহস্য ধরে টান দিয়েছে। ...সপ্তশতীর শ্লীলতা-অশ্লীলতা বিচারে এই দিকের বিস্মৃতির কথা ভুললে চলবে না।'

প্রকৃতপক্ষে গাথাসপ্তশতী সহজাত কবিদের অকুণ্ঠ প্রকাশ। জীবনের বৈচিত্র্যই তার প্রধান ও একমাত্র উৎস। ইংরেজীতে যাকে ভালগার বলা হয়, সে দোষে দোষী করা যায় না সপ্তশতীর কবিদের। পার্বতী-বাবুর মন্তব্যটাই ঠিক : 'গাথার কবিরা আয়াস রচনায় জীবনের উপরেই নির্ভর করে চলেছিলেন। সেক্স ও স্বর্গের জন্য তাঁদের কোনো শিরঃপীড়া ছিল না।' গ্রন্থটি অনুবাদের জন্য তিনি সকলের কাছেই প্রশংসা পাবেন।

—রূপদর্শী

আরও সূর্যের কাছে, জলকে ছিলেন
এবং আশা যখন বৃষ্টির কবি
দক্ষিণারঞ্জন বসুর
সদ্যপ্রকাশিত অবিস্মরণীয় কাব্যগ্রন্থ
রাত্রিকে দিনকে
মূল্য চার টাকা মাত্র
●
পদ্মা আমার গঙ্গা আমার
বাংলাদেশের ওপর
কবি দক্ষিণারঞ্জন বসুর
আবেগধর্মী এক অপূর্ব কবিতা সংকলন।
আমাদের সবার মনের কাছে
এক বাংলাই সত্য,
তারই প্রকাশ এই সুন্দর সংকলনটিতে।
মূল্য তিন টাকা মাত্র
: মধুরেণ সিণ্ডিকেট :
৬৪/১০ বেলেঘাটা রোড, কলি-৩৭

মনের কথা

সুরাসক্তির পরিণতি
সুরা ও নিঃসঙ্গতা

—ঐ যে ওরা আসছে! পরীদের মত শরীর, মুখটা বাঘের মত, দাঁত দুটো বেরিয়ে পড়ছে! আমাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে! আমাকে অন্য কোথাও নিয়ে যাও। ওদের তাড়াও, নইলে আমি মরে যাবো!...... আমার ভয় করছে, ভীষণ ভয় করছে!......জানালা দিয়ে ওটা কি আসছে? একটা হাত, মস্ত বড় একটা লোমওয়ালা হাত! কড়িকাঠ দিয়ে সাপ নেমে আসছে! সাপ না কুমীর? তাড়িয়ে দাও! তাড়িয়ে দাও! এই! যাঃ! যাঃ!

রোগী বিছানার ওপর উঠে বসলো। চোখ দুটো ভয়ে ঠেলে বেরিয়ে আসছে। বালিশ নিয়ে জানালা লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারলো। ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছে, সারা শরীর কাঁপছে, আত্মরক্ষার ভঙ্গীতে হঠাৎ পাশবালিশটা আঁকড়ে ধরে জানালার দিকে তাকিয়ে রইলো। গলার স্বরে কাঁপন। মুখের পেশীগুলোও কাঁপছে।

—কই কেউ নেইতো। কেন ভয় পাচ্ছেন? ঘরে আমরা ছাড়া কেউ নেই। জানালা তো বন্ধ রয়েছে। দরোজার সামনে দাঁড়িয়ে দেখুন। এইতো আমি। আমি মিণ্টু। আমাকে চিনতে পারছেন না?

ঠাণ্ডা জল দিয়ে পা হাত মুখ স্পঞ্জ করে দেওয়া হলো। অনেক আশ্বাস দেওয়াতে রোগী চোখ বুজলো। বোধ হয় ঘুমিয়েই পড়লো।

ডাক্তারবাবু এলেন। দেহের উত্তাপ নিলেন, রক্তচাপ দেখলেন। রোগীর ঘুম ভেঙে গেল। রোগী আবার চীৎকার করে উঠলো। জড়িয়ে জড়িয়েই কথা বলছে, খুব স্পষ্টভাবে কথা বোঝা যায় না।

—আমাকে বেঁধে ফেলেছে। এবার জ্যান্ত পুড়িয়ে মারবে। কসাই কেটে খাবলা খাবলা করে মাংস তুলে নিয়ে ওরা ব্রেক-ফাস্ট করবে। আমাকে বাঁচাবার জন্যে কেউ আসছে না। ওহো হো...... ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো রোগী। ইনিয়ে বিনিয়ে বলতে লাগলো, ঘরময় ইঁদুর ঘুরে বেড়াচ্ছে; দাঁতের বিষ নিয়ে আমাকে কামড়াতে আসছে। ...দেওয়াল বেয়ে বিষাক্ত পোকা নেমে আসছে।... তোমরা দেখতে পাচ্ছো না কেন?

হঠাৎ হাতটা সামনের দিকে প্রসারিত করে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলো। সে দেখতে পাচ্ছে, ডাক্তারের পকেট থেকে তিনজন খুদে খুদে মানুষ বেরিয়ে আস্তে আস্তে তার হাতের তালুর উপর এসেছে। তাদের পোশাকে কত রঙ! মাথার পাগড়ী-গুলোতে মণিমাণিক্য জ্বলজ্বল করছে। হাতের তলোয়ারগুলো চকচক করছে। তারা নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়ে দিয়েছে!

ডাক্তারবাবু একরকম জোর করিয়েই শুইয়ে দিলেন। চোখ দুটো দেখলেন। জিভ দেখতে চাইলেন, রোগী দেখালো না। মিণ্টু আর তার কাকিমা হাতটা চেপে ধরলো, ডাক্তারবাবু ন্যারকোটিক ইনজেক-শন করলেন। রোগী তখনও চেঁচাচ্ছে।

—শোনো তোমরা, কিভাবে ওরা আমাকে শাসাচ্ছে। ওরা কি অভদ্রভাষায় গালাগালি দিচ্ছে, শোনো! বাড়ীর বাইরে গেলেই ভোজালী দিয়ে আমার জিভ কেটে নেবে। ......আমাকে নিয়ে যাচ্ছে! কেওড়া-তলা না? এ কোন শ্মশান? কেওড়াতলা বলেই মনে হচ্ছে। বল হরি হরিবোল! বল হরি হরিবোল! কাঠগুলো শুকনো নয়, বিচ্ছিরি ধোঁয়া হচ্ছে। আগুনের চেয়ে ধোঁয়া বেশি।

এইবার ক্রমশ কথা বেশি করে জড়িয়ে এলো, গলার স্বর নেমে এলো, রোগী ঘুমিয়ে পড়লো।

ডাক্তারবাবু রোগীকে চিনতেন। এ বাড়ীর অনেকদিনের ডাক্তার তিনি। রোগীকে হাসপাতালে পাঠাবার বন্দোবস্ত করে দিয়ে বিদায় নিলেন। বাড়িতে রেখে এ রোগের চিকিৎসা চলে না।

সুরাসক্তির শেষ পর্বের ছবি। ডিলিরিয়ম ট্রেমেন্সের টিপিক্যাল কেস।

রোগী ভুল বকছে, ভয় পাচ্ছে, হ্যালুসিনেশনে ভুগছে। দর্শনেন্দ্রিয়ের হ্যালুসিনেশনই বেশী। জন্তুজানোয়ার, অদ্ভুত চেহারার মানুষ, খুদে খুদে পোকা-মাকড়, সব একেবারে অতি স্পষ্ট দেখতে পায় রোগী। উদ্ভট উদ্ভট দৃশ্য দেখে ভয় পেয়ে রোগী চীৎকার করতে থাকে। বিছানা থেকে, শরীর থেকে পোকামাকড় তাড়াতে থাকে।

এই দৃষ্টিভ্রম (ভিসুয়াল হ্যালু-সিনেশন) প্রধানত রাতেই দেখতে পায়, দিনের বেলাতে অনেকটা স্বাভাবিক আচরণ করে। স্থানকালের সঠিক নির্দেশ করতে পারে না রোগী, অনেক সময় পরিচিত লোককে চিনতে ভুল করে। প্রশ্ন করলে উত্তর দিতে চায় না, শুধু ভয়ের কথা হ্যালুসিনেশনের কথাই বলে। বর্তমানের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তার কথাবার্তা, চাহনি, হাবভাব ইত্যাদি থেকে মনে হয় যেন অন্য এক কাল্পনিক লোকে বিচরণ করছে। অনেক সময় দেখা যায় দেহের তাপ বৃদ্ধি পেয়েছে, নাড়ীর গতি বেড়েছে, রক্তের চাপও বেশী হয়েছে। কথা মাতালদের মত জড়ানো ও গলার স্বরে কাঁপন। মুখের পেশীতেও সামান্য কাঁপন দেখা যায়। জিভের ডগার কাঁপন বেশ স্পষ্টভাবে বোঝা যায় আর মনে হয় চোখের মণি দুটো যেন নাচছে। এই কাঁপন (ট্রেমর) এবং আতংকের প্রলাপ (ডিলিরিয়ম) এই রোগের বিশেষত্ব। এ থেকেই এই রোগের ল্যাটিন নামের উৎপত্তি। চেতনার আচ্ছন্নতা, অসংবদ্ধ প্রলাপ ও ভয়োন্মত্ত আচরণ সুরাসক্তির অন্যতম পরিণতি।

অবশ্য এই অবস্থায় রোগী খুব বেশী দিন থাকে না। বড় জোর চার পাঁচদিন এই উন্মাদ অবস্থা চলতে থাকে; তারপর খুব লম্বা একটা ঘুমের পর রোগী প্রায় স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পায়। তখন থাকে দুর্বলতা, ক্লান্তির ভাব আর গ্লানি। কিন্তু রোগীকে বিপদমুক্ত বলা চলে না।

ডিলিরিয়াম ট্রেমেন্স আরম্ভ হবার কিছুদিন আগে থেকেই সুরাসক্তি হ্রাস পেতে থাকে। এ্যালকোহল আর সহ্য হচ্ছে না। পান করলেই বমির ভাব, বমি হয়ও। শরীর খারাপ লাগে, আড্ডার হৈহুল্লোড় আর পছন্দ হয় না, কেমন যেন একটা মনমরা ভাব, ঘুম ভালো হয় না, খিদে একেবারে থাকে না। ঘুমের আগে চোখের সামনে অদ্ভুত অদ্ভুত রঙ বেরঙের দৃশ্য ভাসতে থাকে।

সুরাপান ছাড়তে গেলেও অনেক সময় ডিলিরিয়াম ট্রেমেন্সের উপসর্গ দেখা দিয়ে থাকে। আর এক ধরনের সুরাসক্তির পরিণতি দেখা যায়, যা দীর্ঘস্থায়ী ও সুরাপান বন্ধ হবার পরও চলতে পারে। এই অবস্থার প্রধান উপসর্গ শ্রুতিভ্রম (অডিটোরী হ্যালুসিনেশন)। চেতনা আচ্ছন্ন নয়, পরিবেশ সম্পর্কে জ্ঞান স্বাভাবিক ও সঠিক। ঘুম হয় না আর বিনিদ্ররজনীতে এরা নানারকমের কথাবার্তা শুনতে থাকে। এদের শ্রুতিবিভ্রম শুরু হয় প্রথমে কোনো একটা বাস্তব শব্দকে ভিত্তি করে। যেমন চলার খাক খাক শব্দ, ঘড়ির টিকটিক শব্দ অথবা ঝিঁঝিঁপোকার ডাক ওদের কাছে বিচিত্র অর্থবহ বলে অনুমিত হয়। মনে হয় যেন অন্তরীক্ষ থেকে কথা ভেসে আসছে, তারা যেন অত্যাচারের ভয় দেখাচ্ছে, কুৎসিত ভাষায় গালিগালাজ

রয়েছে। ভিজিবিয়াম ট্রেমেন্সের ভিস্যুয়াল হ্যালুসিনেশন এখানে নেই। অনেকটা নির্যাতনমূলক ভ্রান্তির রোগীর উপসর্গের মত। সুরাসক্তির ইতিহাস না জানা থাকলে এদের প্যারানইয়ার রোগী মনে হবে। এদের বিশেষত্ব, এদের সংলাপে প্রথম পুরুষ তৃতীয় পুরুষে পরিণত। একজনের সংলাপের অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত করা চলতে পারে।

—মদ আর ওর পেটে যেতে চাইছে না। ওর পেটের মধ্যে কালনাগিনী কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে। পেটে পড়লেই ফোঁস করে শুষে নিচ্ছে। কাজেই ও আর বোতল-বাহিনীর পুজো করতে চাইছে না! নিজের পয়সায় জাতিভোজন করার কোন আহাম্মক!

—কাল সারারাত ব্যাটা জেগে ছিলো! না জেগে থেকে উপায় কি? ঘড়ির ভেতর থেকে ওঁরা সারারাত ভয় দেখিয়েছেন। বলেছেন—ধিক্ ধিক্ ধিক্ ধিক্! তোকে ধিক্, তোর বাবাকে ধিক্। তোর মামাকে ধিক্। তোর বাবা মাতাল, মামা মাতাল, তুইও মাতাল।

—লোকটা মহামূর্খ। কিন্তু বুদ্ধি আছে! ঠিক ধরতে পেরেছে। ট্রেন করে মহারাজ গুম গুম করতে করতে বেরিয়ে গেলেন। ওর বাড়ীর পাশ দিয়েই তো রেল লাইন। কি বলে গেলেন জানো? এই বল না, কি বললেন। চোখ নেব, দেখে নেব, দেখে নেব, দেখে নেব। ব্যাটা ইঁদুরছানার মত ভয় পেয়ে জেলের মধ্যে ঢুকলো।

এই তিন উক্তির তৃতীয় পুরুষ স্বয়ং রোগী।

এই অবস্থা তীব্র (অ্যাকিউট) ভাবে দেখা দিলে অনেক সময় স্কিজোফ্রেনিয়ার অ্যাকিউট অবস্থার মত মনে হতে পারে। তবে সুরাসক্ত রোগীরা সঙ্গীসাথী খোঁজে, লোকজনকে এড়িয়ে চলে না। এখানেই এদের সঙ্গে স্কিজোফ্রেনিকদের তফাৎ বোঝা যায়। এই অবস্থাকে বলা হয় অ্যালকোহোলিক হ্যালুসিনোসিস।

সুরাসক্তির আর এক পরিণতির নাম দেওয়া হয়েছে বিজ্ঞানী করসাকফের নামে। এই অবস্থার প্রধান মানসিক উপসর্গ স্মৃতিবিভ্রম। রোগী একটা নির্দিষ্ট সময়ের সব কিছু ঘটনা ভুলে যায়। সাধারণত রোগের আরম্ভের সময় থেকে তিন কি চার বছরের আগেকার কোনো কিছুই সঠিকভাবে স্মরণ করতে পারে না, কিন্তু পুরনো সব কিছু মনে থাকে। সমকালীন স্মৃতিবিভ্রমের ফলে কাজকর্মের ভারী অসুবিধা ঘটে। অনেক কিছু কাল্পনিক উপাখ্যান তৈরী করে স্মৃতির দৈন্য ঢাকবার চেষ্টা করে। অনেক উদ্ভট কাহিনীর নায়ক হিসেবে নিজেকে কল্পনা করে তৃপ্তি পায়। কিন্তু বুদ্ধিবিবেচনা পুরোপুরি নষ্ট হয়েছে বলে মনে হয় না। যদিও বিচারশক্তি কমে যায় এবং অসংলগ্ন বকতে থাকে; তবুও ঠাট্টা বোঝে, খানিকটা আত্মসমালোচনাও মাঝে মাঝে করতে পারে। সাধারণ চিত্ত-

ভ্রংশের (প্রোগ্রেসিভ ডিমেনশিয়া) সঙ্গে রোগ-নির্ণয়ে গোলমাল ঘটতে পারে। তবে সুরাসক্তির ইতিহাস জানা থাকলে ডায়াগনোসিসের খুব অসুবিধে হয় না। স্থানকাল সম্বন্ধে স্মৃতিবিশৃঙ্খলা ঘটেই ঘটে, পাত্রপাত্রী সম্বন্ধে ততটা নয়। নার্স, ডাক্তার, আত্মীয়স্বজনকে চিনতে পারে, কিন্তু মাঝে মাঝে এ ব্যাপারেও গোলমাল ঘটতে পারে। সকালবেলা হয়তো ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করে—এখন রাত কটা? কাল এমনি সময়েই তো প্রাইমমিনিস্টারের সঙ্গে ডিনারের নিমন্ত্রণ ছিল। ডাক্তারবাবুকেও যেন পাশের টেবিলে দেখেছিল। একটা কূটনৈতিক ব্যাপারে প্রাইমমিনিস্টার ওর পরামর্শ চেয়েছিলেন। ও বলে দিয়েছে, সাদা চামড়ার লোক থেকে দূরে থাকতে। কু-ক্লাক্স-ক্লানের ষড়যন্ত্রের ব্যাপারটা ওঁকে জানিয়ে দেওয়া দরকার। মিসিসিপি থেকে ওদের আড্ডা এখন ভারতবর্ষে উঠে এসেছে। কিম্বা নিজের এক কাল্পনিক বীরত্বের কাহিনী ফেঁদে বসে নার্স-এর কাছে। এইতো সেদিন, মুখোশধারী কয়েকজন দুর্বৃত্ত নার্সকে কিডন্যাপ করার চেষ্টা করেছিল, রোগী একলা শুধু জিউজুৎসুর প্যাঁচ কষে তিন ব্যাটাকে ধরাশায়ী করে নার্সকে উদ্ধার করে।

সুরাসক্তির পরিণতি অনেক ক্ষেত্রেই করুণ। প্রায় সব রাষ্ট্রই এ সম্বন্ধে অবহিত। সুরাপান নিবারণের চেষ্টা অনেক রাষ্ট্র মাঝে মাঝে করে থাকেন। কিন্তু সমাজের অন্তর্নিহিত গলদগুলো রেখে দিয়ে শুধু আইন করে সুরাপান নিষিদ্ধ করলে, বিশেষ ফল পাওয়া যায় না। নিষিদ্ধ চোলাইকারী ও অসাধু সরকারী কর্মচারীরাই শুধু এ নিষেধাজ্ঞার ফলে লাভবান হয়। পুরনো মরুভূমি থেকেও ওরা রস সংগ্রহ করতে ওস্তাদ। অনেক দেশে সুরাপান রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের অঙ্গ। সে সব দেশে সুরাসক্তি দূর করা খুবই কঠিন ব্যাপার। তাছাড়া, সুরাপায়ীরা

সরকারী অন্তঃশুল্ক (এক্সাইজ) ভাণ্ডার পূর্ণ করতে সাহায্য করে। সরকারী প্রচেষ্টা তাই আন্তরিক না হওয়াই স্বাভাবিক।

সুরাসক্তির কারণ হিসেবে আমি সুরাসক্তের মানসিক বিশৃঙ্খলা ও দুর্বলতাকে প্রাধান্য দিয়েছি। অন্য কারণেও যে সুরাসক্তি ঘটতে না পারে, এমন নয়। সঙ্গদোষে ব্যক্তি সুরাসক্ত হয়ে পড়তে পারে। অনভ্যাসজনিত ক্ষেত্রেও অনেক মদ্যপানে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। আমাদের দেশে সুরাপান খানিকটা প্রেস্টিজ ও স্ট্যাটাস বাড়াতে সাহায্য করে। সেই কারণে হয়তো সুরাপায়ীর সংখ্যা বেড়ে চলেছে। নিওরিচ ও নিওরিচাদের পানাসক্তির একটা কারণ নিশ্চয়ই 'প্রেস্টিজ' বাড়ানোর চেষ্টা। কিন্তু স্কুল কলেজের অপ্রাপ্তবয়স্কদের পানাসক্তি বৃদ্ধির কারণ খুঁজতে হলে আমাদের আরো গভীরে যেতে হবে। ভেঙে পড়া সমাজব্যবস্থা, চাকরী সম্পর্কে হতাশা ও অনিশ্চয়তা, সর্বস্তরে দুর্নীতির অনুপ্রবেশ, মূল্যবোধের অবলুপ্তি; ইত্যাদি নানাদিকের বিচারবিশ্লেষণ ছাড়া ক্রমবর্ধমান সুরাসক্তির কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে না। যে সব কারণে জুভিনাইল ডেলিনকুয়েন্সি বাড়তির মুখে, সেই সব কারণেই, মনে হয়, সুরাসক্তিও বেড়ে চলেছে। আধুনিক গল্প-উপন্যাসে হতাশা ও বিচ্ছিন্নতার ছবি যেভাবে চিত্রিত হচ্ছে, তাতেও তরুণ মন খানিকটা প্রভাবিত হচ্ছে। থিয়েটার সিনেমায় মদ্যপায়ী দুর্বৃত্তকে হিরো দেখলে মদ্যপানের প্রতি কিশোরমন আকৃষ্ট হবে, এটাই স্বাভাবিক।

সুরা ও নারী নিয়ে অনেক কাব্য-কাহিনী রচিত হয়েছে। রোমান্টিক ভাব-বিলাসী ও বাস্তববাদী; দু দলেরই। এ থেকে কল্পনাপ্রবণ অনেকে সুরাকে প্রেম-চর্চা ও নারীসম্ভোগের একটা অত্যাবশ্যক উপাদান মনে করে থাকেন। আবার বাগান-বাড়ী ও নিষিদ্ধ পল্লীর স্ফূর্তির সঙ্গে মদ্যপান একটা আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠান

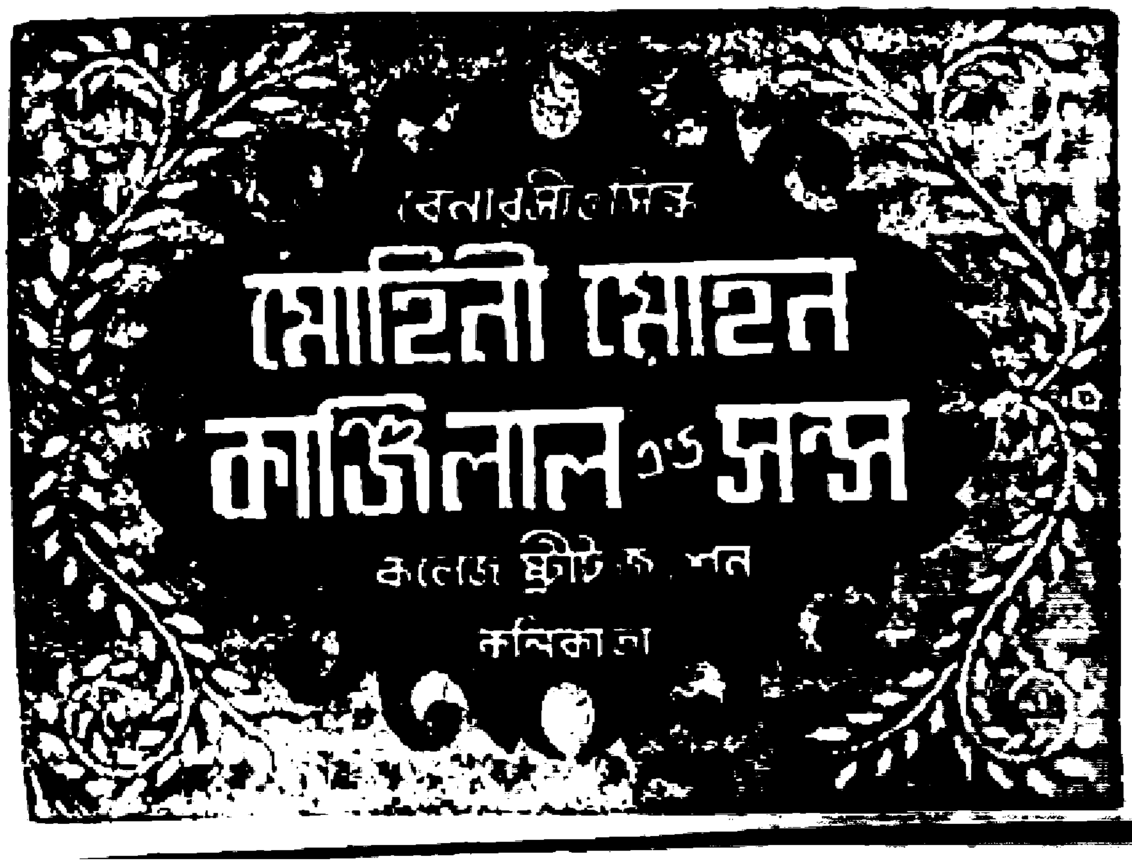

হিসেবে পরিগণিত। তবে সুরা কি অ্যাফ্রোডিজিয়াক? সুরাপানে যৌনশক্তি বাড়ে কি? আমাদের কাছে অনেকে এই প্রশ্ন তুলেছেন। এ সম্বন্ধে নিশ্চিধায় বলা চলে যে সুরা অ্যাফ্রোডিজিয়াক নয়। যৌন-শক্তিবর্ধক টনিক হিসেবে সুরাপান একটা মারাত্মক ভুল। বিচারবিবেচনা, নীতিবোধ, সৌন্দর্যবোধকে শিথিল করে অ্যালকোহল মানুষকে অস্বাভাবিক অবৈধ যৌন সম্পর্কে অনুপ্রাণিত করতে পারে, জৈবমানসকে (উত্তমাদিম্ফককে নিস্তেজিত করে) সাময়িক-ভাবে উত্তেজিত করে প্রেমসম্পর্কহীন যৌন-সম্পর্ক স্থাপনে সহায়তা করতে পারে; কিন্তু উপভোগের ক্ষমতা বাড়ানো দূরের কথা নির্বাহিত সুরাপানের ফলে ক্রমশ উপভোগ ক্ষমতা হ্রাস পেতে পেতে একেবারে লুপ্ত হবার সম্ভাবনাই অধিক। অ্যালকোহলিকের যৌনক্ষমতা কমে যাবার ফলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে তার মনে যৌন ঈর্ষার ডিলিউশন অফ জেলাসি অস্বাভাবিক অমূলক ঈর্ষার প্রকাশ দেখা যায়। প্রেমিকা বা স্ত্রীকে সন্দেহ করতে আরম্ভ করে। তার সুরাপান সম্পর্কে যে-কোনো সমালোচনাকে সে পরপুরুষের প্রতি আসক্তির প্রমাণ বলে ধরে নেয়। একজন ডাক্তারের রিপোর্টে পড়েছি যে এক সুরাসক্ত তার ৬০ বছরের স্ত্রীকে পাশের ফ্ল্যাটের এক কুড়ি বছরের ছেলের সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত সন্দেহ করে পুলিশের কাছে গিয়ে নালিশ জানিয়েছিল। অন্য একজন মদ্যপায়ী তার জ্যেষ্ঠপুত্রকে মায়ের সঙ্গে অবৈধ মিলনের অপরাধে মারাত্মকভাবে আঘাত করেছিল। কয়েক বছর আগে আমার পরিচিত একজন মদ্যপায়ী অনুরূপ সন্দেহ করে স্ত্রীকে মারধোর করে, বাড়ী ছেড়ে এক হোটেলে এসে আশ্রয় নিয়েছিল। সুরা কোনো শক্তিকেই বাড়ায় না। পশুপ্রবৃত্তিকে তীব্র করে তোলে, মানুষকে অমানুষ করে।

সুরাপান মানুষকে সোশ্যাল বা সামাজিক করে তোলে; এই বক্তব্য একটা ধারণা খুবই চালু: সুরাকে একটা 'কম্যুনি-কেশন মিডিয়াম' মনে করার কারণ কি? সত্যিই কি সুরাপানে ব্যক্তি বেশী সামাজিক হয়? আধুনিক নগর-সভ্যতার অন্তরঙ্গ-ভাবে মেলামেশার সুযোগ কম। পাশাপাশি ফ্ল্যাটে থেকেও আমরা অপরিচিত। একই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করছি দুবেলা, পরস্পরের মুখ চিনি কিন্তু পরিচয় জানি না। দোকানে বাজারে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে একই জিনিষ একই দরে কিনি, কিন্তু পরস্পরের সঙ্গে আলাপ করি না। কিছু ক্লাব, জিমন্যাসিয়ামে আমরা খুব কাছাকাছি আসি, পরিচিত হই, মুখ খুলি, কিন্তু মন খুলি না। গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপে পুকুরপাড়ে, নদীর ঘাটে, যে আন্তরিকতার বন্ধনে আগেকার মানুষ বাঁধা থাকতো, আজকের শহরবাসী মানুষের সেই সহমর্মিতার বাঁধনে বাঁধা পড়বার সুযোগ-সুবিধা নেই। মানুষের কাছে এই ভাববিনিময় প্রয়োজন একান্ত অপরিহার্য। অফিসে, আদালতে সহকর্মীদের সঙ্গে আন্তরিক ভাববিনিময়ের সুযোগ মিললেও, সেখানেও আমরা সহজ-ভাবে মন খুলতে পারি না। আমাদের নাগরিক ভদ্রতার মুখোশ খুলে অন্তরের কথা বলতে পারি না। সব সময়েই আমরা হয়ে থাকি চাপা উত্তেজনায় পীড়িত, নিজের মধ্যে গোটানো সংকুচিত। আমার কথা ও শুনবে কেন? মনে মনে হয়তো হাসবে। এই সব ভেবে আমরা কর্মস্থানে সহকর্মীদের কাছেও নিজেদের ঠিক মতো 'কম্যুনিকেট' করতে পারি না। কোনো কোনো সমাজ-তাত্ত্বিকের মতে এই 'টেনসন' দূর করার, এই বিচ্ছিন্নতা নিরসনের একমাত্র জায়গা ভাঁটি-খানা। সুরাপানে 'টেনসন' কাটে, রিল্যাক্সেশন আসে, সহজ হই, স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি, বিচ্ছিন্নতার ঘটে নিরসন। পরিচিতের আরো ঘনিষ্ঠ হই, অপরিচিতকে অনায়াসে নিজের টেবিলে ডেকে আনি। অনেক জমানো কথা বলে নিজেকে হাল্কা করি। অপাতদৃষ্টিতে মনে হবে, কথাটা বোধ হয় সত্যি। আমরা অনেক জমানো কথা বলে নিজেকে হাল্কা করি। আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে, কথাটা বোধ হয় সত্যি। আমরা নিঃসঙ্গতাবোধে অল্পবিস্তর পীড়িত সকলেই। বিচ্ছিন্নতা ও আত্মকেন্দ্রিকতা দূর করা ভাঁটিখানার এসে কাউকে ভুলতে পারা যায়। কিন্তু ভাঁটিখানায় সমবেত সুরাপায়ী-দের আলাপ-আলোচনা কিছুক্ষণ মন দিয়ে শুনলেই বোঝা যাবে যে তারা ভাববিনিময় করছে না, কম্যুনিকেশন ঘটছে না। প্রত্যেকে নিজের কথা বলে চলেছে, অন্যের কথা শুনছে না। জমানো কথা বলে হাল্কা হচ্ছে, কিন্তু দুঃখের ভার কমছে না। কেউই কারুর দুঃখবেদনাতে সাড়া দিতে পারছে না। নিজেকে জাহির করছে। কিন্তু প্রকাশ করছে না। পূর্ণ নিস্তেজনা নেমে আসার আগে বাড়ী ফিরে আসাপিরিন খেয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করবে, সকালে উঠে হয় একটা ছোট পেগ, কিম্বা এর্মাফেটামিন খেয়ে দৈনন্দিন কর্ম-সূচীর সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করার চেষ্টা করবে, আবার অনেক আশা নিয়ে সন্ধ্যার আস্তানায় ফিরে আসবে। সে আশা এদের কোনোদিন মিটবে না।

এবার চিকিৎসা সম্বন্ধে সামান্য দুচারটে কথা বলে সুরা-পর্ব শেষ করছি। চিকিৎসার দুটি অঙ্গ: একটির উদ্দেশ্য আরোগ্য, অন্যটির প্রতিরোধ। ভিটামিন, টনিক, পথ্য, ওষুধ এসব নিশ্চয়ই দরকারী। কিন্তু সাইকোথেরাপী সুরাসক্তির চিকিৎসায় অপরিহার্য। সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বোধ হয় সাইকোথেরাপির। সাইকোথেরাপির উদ্দেশ্য সুরাপায়ীর মনোবিকারের কারণ নির্ণয়, ও সেই কারণ দূর করা; তার ব্যক্তিত্বকে সংগঠিত করা, তার ইচ্ছাশক্তিকে জোরালো করা ও তার মধ্যে অ্যালকোহল সম্পর্কে বিতৃষ্ণা সৃষ্টি করা। কথাবার্তা, জাগ্রত ও সম্মোহিত অবস্থায় অভিভাবন, অনেক রোগীর সঙ্গে গ্রুপথেরাপী; ইত্যাদি মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসার সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। বিভিন্ন ধরনের রোগীর পক্ষে বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসা উপযোগী ও কার্যকরী। এছাড়া, সঙ্গে সঙ্গে চলে শিক্ষামূলক উপ-দেশ। অ্যালকোহল সম্পর্কিত সমস্ত অলীক ধারণা দূর করা ও অ্যালকোহলের যে শরীর বা মনের উপর ক্ষতিকারক প্রভাবগুলিকে রোগীর সামনে তুলে ধরা এই চিকিৎসার মূল উদ্দেশ্য।

সুরাপান ছাড়ার ফলে আনুষঙ্গিক যে সব উপসর্গ দেখা দিয়ে থাকে; যথা উদ্বেগ, বিষাদ, নিদ্রাহীনতা; সেগুলোর চিকিৎসার জন্যে উপযুক্ত ওষুধ দেওয়া হয়।

কণ্ডিশনড রিফ্লেক্স চিকিৎসা আজকাল অনেক হাসপাতালে ও ক্লিনিকে চালু হয়েছে। এর ফলে অ্যালকোহল পেটে পড়লেই রোগীর বমনোদ্রেক হবে ও সত্যিই বমি করে অ্যালকোহল পেট থেকে বের করে দেবে। বমনোদ্রেককারী কোনো ওষুধ ইনজেকশন করে রোগীকে অ্যালকোহলের গন্ধ শোঁকানো হয়, সঙ্গে সঙ্গে বলা হয় যে অ্যালকোহল আর তার সহ্য হবে না, খেলেই বমি হবে। ওষুধের ক্রিয়া সুরু হবার পূর্বমুহূর্তে রোগীকে সুরাপান করতে দেওয়া হয়। বলা-বাহুল্য, সুরা মদে যেখানে আগেই বমির সঙ্গে বেরিয়ে যায়। এইভাবে ২০।২৫ দিন ধরে চিকিৎসা চলার ফলে অ্যালকোহল বমনোদ্রেককারী উদ্দীপকে পরিণত হয়ে রোগীর পক্ষে আর সুরাপান সম্ভব হয় না। এরপরও মাসে অন্তত একবার ইনজেকশন ও অ্যালকোহল একসঙ্গে দিয়ে রিফ্লেক্সকে সুদৃঢ় ও শক্তিশালী করা হয়। বছরখানেক চলার পর আর চিকিৎসার প্রয়োজন হয় না।

আজকাল সংবেদনশীল রাসায়নিক দ্রব্যের সাহায্যে (অ্যনটে অ্যাবিউস, অ্যন্ট-এথিল) সুরাসক্তির চিকিৎসা চলেছে। ফলও পাওয়া যাচ্ছে। এই কেমিক্যাল অ্যাল-কোহলের বিপাকক্রিয়ায় বিশৃঙ্খলা ঘটিয়ে শরীরের উপর বিষম প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। দেহের মধ্যে অ্যাসিটালডিহাইডে জমে এবং তার ফলে সুরাপায়ীর শারীরিক ক্লেশ অসহ্য হয়ে ওঠে। এ সত্ত্বেও যদি অ্যালকো-হল সেবন করতে থাকে, তাহলে বমি হয়, শ্বাসকষ্ট হয়, এবং শেষ পর্যন্ত সুরা-পানের ফলে তার চৈতন্যশক্তি লোপ পায়। সোজা কথায়, অ্যালকোহল আর কিছুতেই সহ্য হয় না। কাজেই সে সুরাপান বন্ধ করতে বাধ্য হয়।

শেষোক্ত চিকিৎসা ছাড়া আর সব রকম চিকিৎসাই রোগীকে হাসপাতালে আটকে রেখে করা দরকার। শেষোক্ত চিকিৎসা আউটডোর থেকে চলতে পারে। তবে সবরকম চিকিৎসাতেই রোগীর সহযোগিতা দরকার। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, পর্যন্ত মদ্যপদের কাছে আসছে না আর মদ্যপদেরও পর্যন্তের কাছে আনা যাচ্ছে না।

—অবোধন

নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

(৩৭)

জানালা খোলা। কামরাঙা গাছের অন্ধকারে কিছু জোনাকি জ্বলছে। বেতঝোপ পার হলে মাঠ। মাঠে আশ্চর্য সাদা জ্যোৎস্না। বড়বৌ সেই সাদা জ্যোৎস্নার দিকে তাকিয়েছিল, না ঘরের আয়নায় নিজের মুখ দেখছিল বোঝা যাচ্ছে না। গলায় চন্দ্রহার পরেছে বড়বৌ। নীল রঙের বেনারসি পরেছে। হাতে চুড়ি। চোখে বড় করে কাজল টেনেছে। মুখে স্নিগ্ধ প্রসাধন। মানুষটা যদি আসে, এই আশায় দরজা খোলা রেখে জানালার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

সকালে এ-বাড়িতে কিছুটা উৎসবের মতো ঘটনা ঘটেছে। কারণ ভূপেন্দ্রনাথ দুজন মানুষ নিয়ে এসেছিল। ওরা সন্ন্যাসী মানুষ। ওরা এ-বাড়িতে সারা রাত ধুনি জ্বালিয়ে বসেছিল। এবং পাগল মানুষকে নিরাময় করার জন্য অপার্থিব সব ঘটনা-ঘটিয়ে বাড়িময় মানুষের তাজ্জব বানিয়ে দিয়েছিল। ওদের ভোজনের নিমিত্ত নানাবিধ পায়েস হয়েছে। বড়বৌ সারাদিন খেটে স্বামীর শুভ কামনায় রাত হলে নিজের ঘরে চলে এসেছে। তিনি এখনও আসছেন না। একেই দরজা বন্ধ করে দেবে বড়বৌ। শীতকালটা অনাবার বেশ শান্ত থাকেন। এবারে তাও না। আজকাল রাত হলে বড়বৌ নানাভাবে সাজতে থাকে। যে যে চেহারায় ওকে বিদেশিনী মনে হতে পারে সে তা তা করার চেষ্টা করে। কখনও কখনও বড়বৌ একেবারে অন্য জগতের ভিতর ডুবে যায়। সে যেন তার স্বামীকে নিয়ে পুতুল খেলতে বসে। সেই ছোট্ট বয়সের মুখ চোখ তার চারপাশে খেলা করতে থাকে তখন। খেলা করতে করতে সে প্রথম এ-মানুষের সঙ্গে সহবাসের আনন্দ পেয়ে এখন ভাবছিল। বোধহয় সেটা এক কল্পকালই হবে, এবং বোধহয় আকাশে সেদিন আশ্চর্য সাদা জ্যোৎস্না ছিল।

কেন জানি বড়বৌর, আজ ঠিক সেই দিনটি এখন তার মনে হল। সে জানে এখনও মানুষটা দক্ষিণের বারান্দায় বসে রয়েছে। না ডাকলে বোধহয় আসবে না। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। কেবল বারান্দায় একটা হ্যারিকেন জ্বলছে। তবু তার লজ্জা করছে এই সাজে উঠোনে নেমে যেতে। প্রায় অভিসারে যাবার মতো। সে গেলেই তিনি উঠে পড়বেন। তাঁর মনে হবে তখন বড়বৌ তাঁর জন্য প্রতীক্ষা করছে জানালায়। এ-সব ভাবতে বড় ভাল লাগে। সে নেমে যাবে কিনা ভাবছিল, তখন দেখল তিনি হেঁটে এদিকে আসছেন। তাড়াতাড়ি বড়বৌ জানালায় গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। মানুষটার জন্য যে তার প্রতীক্ষা, তিনি না এলে যে বড়বৌর অভিমানে চোখে ঘুম আসে না এমন বুঝতে দিতে চাইল না। সে শক্ত হয়ে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে থাকল।

মানুষটা এসেই আজ কেমন পাগলের মতো বড়বৌকে জড়িয়ে ধরল। দরজা খোলা। কেউ দেখে ফেলতে পারে। দরজা বন্ধ করে দিলে ভাল হত। কিন্তু এমন যে আবেশ মানুষটার যদি তা হারিয়ে যায়, দরজা বন্ধ করতে গেলে তিনি যদি রাগ করেন, অথবা পাগলের মতো চোখ মুখ আলগা করে রাখেন তবে এ-রাতের নিঃসঙ্গতা অসহ্য হয়ে উঠবে। সে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল। সে এমন কি মুখ ঘুরিয়ে মানুষটাকে দেখল না। ওর ঘুম চলে আসছে। মানুষটা এখন নীল রঙের এমন সুন্দর শাড়িটা টেনে খুলে ফেলল। ফের হুঁস হল বড়বৌর। দরজা খোলা। তবু সে দরজা বন্ধ করতে ছুটে গেল না। মানুষটা এখন যা খুশী করুক। অন্যদিন এই মানুষই দরজা বন্ধ করলে ক্ষেপে যায়। হঠাৎ হঠাৎ টেবিল ঠেলে ফেলে দেয়। থাম ধরে ধরে ঝাকাতে থাকে। কখনও কখনও টেবিলে ঘুসি মেরে সব কাচের বাসন ঠেলে ফেলে দেয়। তারপর এক প্রলয়-নাচন নাচতে আরম্ভ করলেই বড়বৌ ডাকে, ঠাকুরপো, ও ছোট ঠাকুরপো দেখুন এসে কি আবার আরম্ভ করছে! সঙ্গে সঙ্গে ভীতু মানুষের মতো মণীন্দ্রনাথ খাটের উপর উঠে লেপের ভিতর ঢুকে যায়। যেন কিছুই সে করেনি। সে বড় ভাল ছেলে। আজ সেই মানুষ কি যে করছে তাকে নিয়ে। বসন ভূষণ খুলে ফেলছে। আবেশে চোখ বন্ধ হয়ে আসছে। প্রায় যেন স্বপ্নের মতো ঘটনা। এমন ভালবাসা সে কতদিন চেয়ে চেয়ে তবে পেয়েছে। ভিতরে ভিতরে বড়বৌ অস্থির হয়ে পড়ছিল। দুহাতে যা খুশী করুক এমন ইচ্ছাতে বড়বৌ শরীর খাটে বিছিয়ে দিল। নরম শরীর, স্তন এবং কোমল হাত এবং কোথায় যেন প্রপাতের মতো জলের শব্দ শোনা যাচ্ছে, সে ঠেলে সেই মানুষকে সেখানে নিয়ে যেতে চাইল। কিন্তু মানুষটা যেন প্রপাতের শব্দ শুনতে পাচ্ছে না—কি যে করণীয় এই শরীর নিয়ে বুঝতে পারছে না যেন। বড়বৌ মানুষটাকে এবার জোরে চুমু খেল। এবং পাগলের মতো অস্থির হয়ে পড়তেই মণীন্দ্রনাথ একেবারে ঠাণ্ডা মেরে গেলেন। মণীন্দ্রনাথ খাট থেকে নেমে জানালায় এসে দাঁড়ালেন।

বড়বৌ বলল, এই শোন। আমি আর এমন করব না।

মণীন্দ্রনাথ নগ্ন শরীরে দাঁড়িয়ে থাকলেন।

—আমি কিছু করব না বলছি। এস আমার পাশে শোবে।

মণীন্দ্রনাথ সাদা জ্যোৎস্না দেখছেন এখন।

—তুমি আমার পাশে শুধু শোবে। বলে হাতটা নিয়ে বুকের ভিতর খেলা করতে থাকল।

দরজা খোলা। সে দরজা বন্ধ করে দিল এবার। এবং জানালার পাশে এসে দাঁড়াল।

ঘরে মৃদু আলো জ্বলছে। একটা পাখি ডাকছিল। তারপর একসঙ্গে অনেকগুলি পাখি ডেকে উঠল। ভিতরে বড় কষ্ট বড়বৌর। মানুষটা এমন পাহাড় বেয়ে ছুটতে পারে আবেগে ডুবে যেতে পারে—তার যেন বিশ্বাসই হচ্ছিল না। সে যেন স্বপ্ন দেখে উঠে এসেছে। সব বৃথা। কারণ কতভাবে—বড়বৌ যে চেষ্টা করছে, এই এই দ্যাখো আমার শরীর, এই দ্যাখো নীল শিরা উপশিরায় কি প্রসন্ন আলো খেলা করে বেড়াচ্ছে। তুমি একটু ছুঁয়ে দ্যাখো, মনে হবে তোমার, দীর্ঘদিন তুমি বনবাসে ছিলে। দ্যাখো এই চোখ, মুখ। তুমি আমার কপালে হাত রাখো। আমি তো তোমার কাছে কিছু চাইনি। কিছু চাইনি! কেবল তুমি যদি একবার আমাকে অপলক দেখতে। আমার মনে হয় তবে তুমি এমন-ভাবে গ্রামে মাঠে ঘুরে বেড়াতে না। আমাকে আর একবার জড়িয়ে ধর না গো। আমি কিছু করব না। সত্যি বলছি। তিন সত্যি।

মানুষটা বড়বৌকে কিছুতেই আর স্পর্শ করল না। চোখ দেখলেই টের পাওয়া যায় মানুষটা আর রক্তমাংসের পৃথিবীতে নেই। কোর্টের শব্দকে সে জানালি কবুতর উড়তে দেখতে পাচ্ছে।

বড়বৌ ডাকল, শুনছ!

সে কিছুই শুনছে না। নদীর জলে সে শুনতে পাচ্ছে কম কম শব্দ। জাহাজের প্রপেলার ঘুরছে। কিছু অপরিচিত পাখি মাস্তুলে। রেলিঙে সেই সোনার হরিণ দাঁড়িয়ে। হাত দিলেই যে দূরে হারিয়ে যায়। কাছে যা কিছুতেই পাওয়া যায় না। পলিন রেলিঙ ধরে দাঁড়িয়ে আছে। আর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

বড়বৌ বলল, আমি সত্যি বলছি কিছু করব না। তোমার যা খুশী যেমনভাবে খুশী আমাকে দাও।

বড়বৌ বড় অবুঝ হয়ে গেছে। চোখ দেখলেই সব টের পাওয়া যায়। সে কেন যে এমন করছে তবু সে কেন বুঝতে পারছে না মানুষটা আর মানুষ নেই। মানুষটার ভিতর নদীর নীল জল খেলা করে বেড়াচ্ছে।

বড়বৌ এবার হাত ধরে খাটে নিয়ে যেতে চাইল তাকে। সে গেল না। সে জানালার একটা পাট বন্ধ করে দিল। তারপর দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। নিজের বসন ভূষণ সব আলগা করে ছুঁড়ে ফেলল খাটে। শেষে কি দেখল বড়বৌর মুখে। মুখ দেখে হাসল। দুষ্টু বালকের মতো হাসিতে মুখ ভরে গেল। যেন বলল, এস আমরা সাদা জ্যোৎস্নায় হেঁটে হেঁটে নদীর চরে চলে যাই। কেউ দেখবে না। আমরা চুপি চুপি সেখানে দুজনে পালিয়ে বসে থাকব। আকাশের নিচে সাদা জ্যোৎস্নায় দুজনে বসে থাকতে কি যে ভাল লাগবে না!

বড়বৌ কিছু বুঝতে পারল না। কেন এমন সরল বালকের মতো তিনি হাসছেন। সে কাছে গিয়ে দাঁড়াল। তিনি তখনও হাসছেন। হাসতে হাসতে দরজা খুলে ফেলেছেন। বড়বৌ তাড়াতাড়ি আলোটা নিভিয়ে দিল। মানুষটি উঠোনে নেমে যাচ্ছে। কি হবে এখন! বড়বৌ তাড়াতাড়ি সেই বেনারসি শাড়িটাকে কোনরকমে শরীরে জড়িয়ে নিল। পাগল মানুষের কাপড়টা খাট থেকে তুলে নিল। এই মানুষ এমন এক অবস্থায় বের হয়ে গেলে কবে যেন ঘরে উঠে আসবে কে জানে! লজ্জায় যেন তার মাথা কাটা যাবে। অন্তত কাপড়টা পরিয়ে দিতে পারলে মানুষটাকে আর পাগল মানুষ মনে হবে না। নিরীহ মানুষ, অবলা জীবের মতো তার চোখ তখন। গ্রামের পর মাঠ, মাঠে মাঠে তিনি এক সাদা পুরুষের মতো হেঁটে যাবেন।

বড়বৌ উঠোনে নেমে দেখল ধীরে ধীরে বাঁশতলা দিয়ে তিনি নেমে যাচ্ছেন। সে দেখল ভুলে গিয়েছিল ঘরের। চারপাশে টাকাল। কোন ঘরে আলো জ্বলছে না। কোন সাড়া শব্দ নেই। একবার ভাবল শচীন্দ্রনাথকে ডাকে, উঠে দেখুন, কিভাবে বের হয়ে যাচ্ছে! কিন্তু নিজের প্রসাধনের কথা ভেবে ডাকতে সংকোচ বোধ করল। বরং সে গিয়ে সামনে দাঁড়ালে, দুহাত বাড়িয়ে দাঁড়ালে আর তিনি নড়তে পারবেন না।

কুয়াশায় এসে দেখল মণীন্দ্রনাথ দ্রুত মাঠে নেমে হাঁটছেন। সেও মাঠে নেমে এল। স্বামী তার এমন বেশে গ্রাম মাঠ ঘুরে বেড়াবে ভাবতেই কান্না পাচ্ছে। সে, যে করে হোক কাপড়টা পরিয়ে দেবে। তারপর যেমন খুশি, যেদিকে খুশি তিনি চলে যাবেন। সেও মাঠের উপর দিয়ে দ্রুত ছুটতে থাকল।

বসন্তের মাঠ। ফসল নেই। শুধু কিছু জমিতে পেঁয়াজ রসুনের গাছ, লঙ্কা গাছ। চারপাশে জমির বেড়া। মাঠে নেমেই মনে হল মানুষটা কোথাও যেন তার স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। সে কেবল ছুটে নাগাল পাচ্ছে না। সে দেখল তখন তিনি দূরে দাঁড়িয়ে আছেন। বড়বৌকে মাঠে নেমে আসতে দেখে বুঝি সামান্য বিস্মিত হয়েছেন। তিনি নড়ছেন না। বড়বৌ জমির উপর দিয়ে ছুটছে। ছুটে ছুটে আর পারছে না। হাঁপিয়ে উঠছে। কাছে গিয়ে সে কথা বলতে পারছে না। তুমি এ-ভাবে বের হয়ে গেলে লোকে কি বলবে! এসব বলতে গিয়ে গলায় আটকে যাচ্ছে।—লক্ষ্মী কাপড়টা পরে নাও। আমি আর তোমাকে বিরক্ত করব না। এমনও বলার ইচ্ছা। কাপড়টা বড়বৌ পরিয়ে দেবে, পরিয়ে দিলেই সোনার হরিণের খোঁজে অথবা নীলকণ্ঠ পাখি খুঁজতে বের হয়ে যাবেন। এমন এক সুদৃশ্য শরীরে টান টান হয়ে দাঁড়ালে, বড়বৌর আর ভয় থাকবে না। ভাবল, কাপড়টা পরিয়ে দিয়েই বলবে, হ্যাঁগো আমাকে বাড়ি দিয়ে আসবে না। একা আমি যাব কি করে!

সে কি ভাবল আর কি হয়ে গেল! হতভম্ব সে। ভেবেছিল কাপড় পরিয়ে দিলেই মানুষটা ওকে বাড়ি পৌঁছে দেবেন। তাকে এত বড় মাঠে একা ফেলে যাবেন না। কিন্তু মানুষটার চেহারা অন্যরকম। বড় বেশি হাসি হাসি মুখ। তিনি এক টানে বড়বৌর কাপড় খুলে ফেলেছেন। খুলে ফেলেই একেবারে বালক। বালকের মতো সাদা জ্যোৎস্নায় দাঁড়িয়ে হা হা করে হাসছেন। কুয়াশার ভিতর মাঝে মাঝে মুখ তাঁর অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সাদা জ্যোৎস্নায় একটু একটু কুয়াশায় এক রহস্যজনক ভাব তাঁর মুখে। বগলে কাপড় নিয়ে চিরদিনের তীর্থযাত্রীর মতো তার যেন ভ্রূক্ষেপহীন যাত্রা। বড়বৌকে এসব ভীষণ আড়ষ্ট করে দিল। কিছু সে বলতে পারল না। খেলাচ্ছলে তিনি যেন এমন সব করছেন। দূরে দূরে সব বন মাঠ, সাদা জ্যোৎস্না এবং হালকা কুয়াশা দেখে তিনি বড়বৌকে নিয়ে স্থির থাকতে পারছেন না। কেবল ছোটার ইচ্ছা হচ্ছে তাঁর। কোথাও সেই যে তিনি একটা নীল বর্ণের লতা নিয়ে এসে-ছিলেন কলকাতা থেকে, যেখানে ঈশম নদীর চরে একা রাত যাপন করে, এবং এক নীল বর্ণের লতা থেকে কত হাজার নীলবর্ণ লতা ফুল ফল সৃষ্টি হচ্ছে এখন—তেমন জায়গায় তাঁর চলে যেতে ইচ্ছা হচ্ছে। কিছু ভাল লাগছে না তাঁর। তিনি যখন কলকাতা থেকে শেষবারের মতো ফিরে এলেন, সঙ্গে সব নানারকমের গাছ ছিল তার। এখন আর মনে করতে পারছেন না কি গাছ সে সব। কি লতা সে সব। কেবল মনে পড়ছে, একটা নীলবর্ণের লতা ছিল। সবাই সেটা ফেলে এসেছিল গয়না নৌকায়। কেবল ঈশম তুলে এনে চরের জমিতে লাগিয়ে দিয়েছিল। যখন কিছু ভাল লাগত না, তিনি তখন নদীর চরে নেমে লতার গোড়ায় সারা বিকেল জল ঢালতেন। এই মাঠে নেমে বড়বৌর আড়ষ্ট মুখ চোখ দেখে তাঁর সে সব মনে পড়ছিল।

বড়বৌ ভীষণ ভয় পেয়ে গেছে। সে বলল, দাও লক্ষ্মী। আমার কাপড়টা দাও।

CENTRAL LIBRARY

আমরা কোথাও যাব বলে বের হয়েছি। সংসারে কোথাও যাব বলে বের হলে ফিরতে নেই।

—তুমি কি চাইছ বল! কি পেলে তুমি সুখী হবে বল, সব দিচ্ছি। আমি চলে যাব এ-দেশ ছেড়ে। আমি চলে গেলে সুখী হবে! বল তুমি। তুমি না বললে আমি তাই করব!

এ-ভাবে কিছু হয় না। আমরা শেষ পর্যন্ত কিছু করতে পারি না। তবু হাঁটি। হেঁটে হেঁটে ক্লান্ত হই। মনে হয় সামনেই একটা সরাইখানা আছে। একটু [illegible] সরাইখানার পিছনে সবাই আমরা ছুটছি।

—কেউ দেখে ফেললে কি হবে বলত! মান সম্মান কোথায় থাকবে। তোমার বৌ আমি। কেউ দেখে ফেললে কত বড় অসম্মান হবে বলত।

জীবনের নানারকমের খেলা আছে। লাল নীল বল নিয়ে যেমন একটি খেলা। কোনটা যে কি রকমভাবে চোখের উপর কোথায় যাবে জানি না। তবু খেলি। মনে হয় খেলার মাঠে জয়-পরাজয় হবে। এবং খেলার মাঠ পার হয়ে এলে একটা সেতু দেখতে পাই। সেতুর উপর একজন ফকির মানুষ দাঁড়িয়ে থাকে। সে বলটা ছিল আমাদের খেলার বস্তু, সেই বলটা ফকির সাহেবের প্রাণ মনে হয়।

—কোন এ-ভাবে তুমি আমাকে পিছু পিছু কতদূর নিয়ে যাবে। তুমি কি ভেবেছ। আমরা তোমার বাপের কাছে চলে

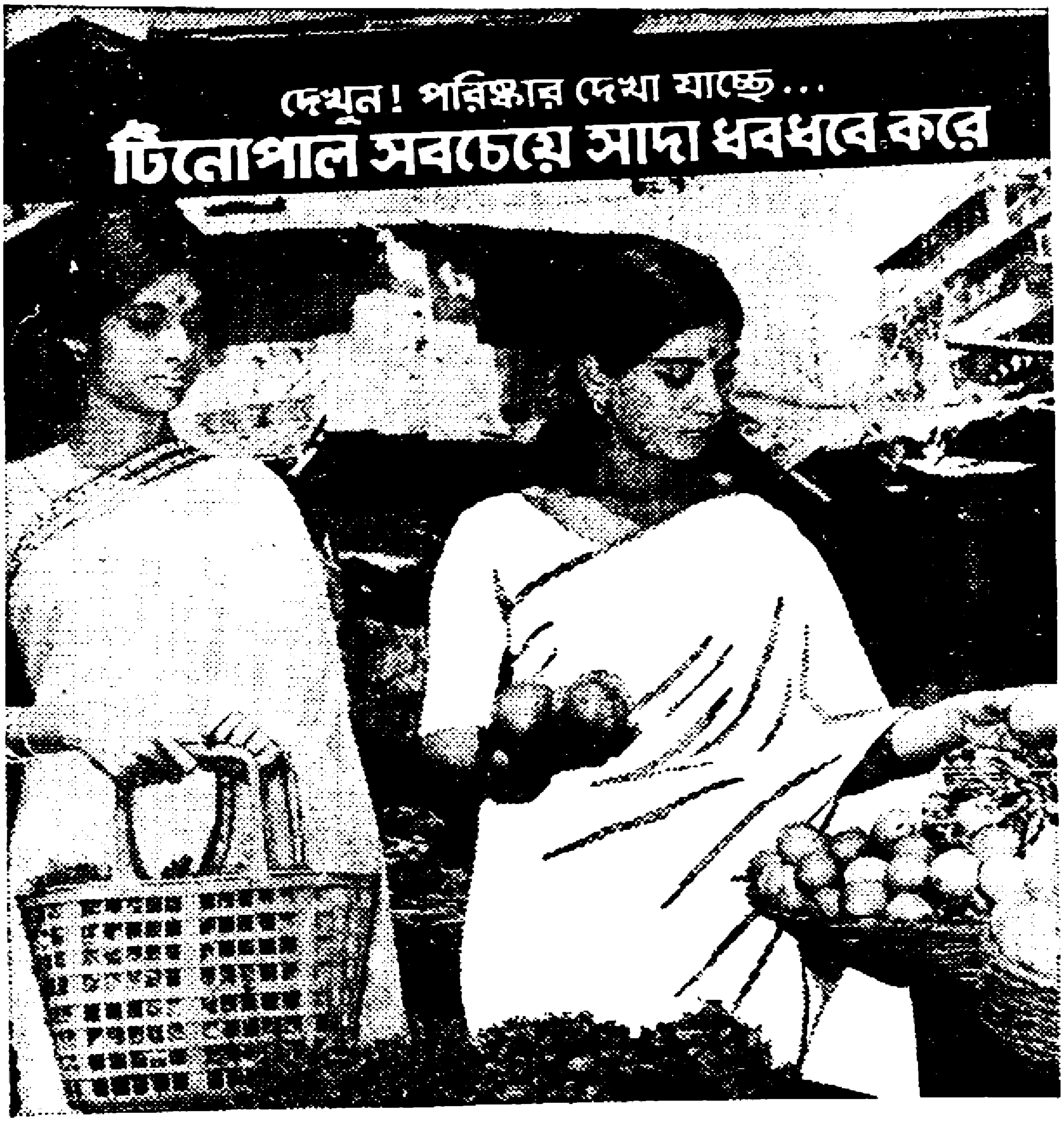

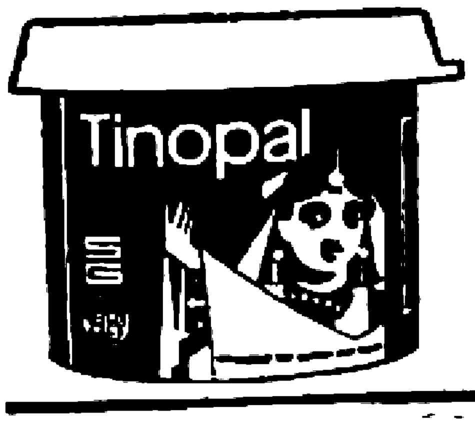

পরীক্ষা করে দেখা গেছে! সামান্য একটু টিনোপাল দেবার ধোবার সময় দিলেই কি চমৎকার ধবধবে সাদা হয়— এমন সাদা শুধু টিনোপালেই সম্ভব। আপনার শার্ট, শাড়ী, বিছানার চাদর, তোয়ালে—সব ধবধবে!

আর, তার খরচ? কাপড়পিছু এক পয়সারও কম! টিনোপাল কিনুন—রেগুলার প্যাক, ইকনমি প্যাক, কিংবা "এক বালতির জন্যে এক প্যাকেট"!

® টিনোপাল—জে আর গেইগী এস এ, বাসল, সুইজারল্যান্ড-এর রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক।

সুহৃদ গেইগী লিঃ, পোঃ আঃ বক্স ১১০৫০, বোম্বাই ২০ বি. আর.

Shilpi HPMA-13/70 Ben

CENTRAL LIBRARY

এসেছি। ছিঃ ছিঃ কি বিপদে তুমি আমাকে ফেললে বলত। সামনে নদী। নদীর চরে একটু দূরে তরমুজ খেত। তুমি আমার মানসম্মান রাখলে না। দাও। কাপড়টা দাও। তুমি যা বলবে আমি তাই করব। কি করে ফিরব। এত বড় মাঠ পার হয়ে যাব কি করে।

মাঠ কেউ পার হতে পারে না বড়বৌ। পার হব বলে সবাই বের হয়ে পড়ি। তারপর রাতদিন কুয়াশায় হাঁটা। হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত বিষন্ন। কোথাও কোন জলছত্রের কাছে তারপর নিরিবিলি বসে থাকা। কেউ আমাদের বলে দিতে পারে না কতদূর গেলে এই মাঠ শেষ হবে। শুধু জলছত্রের মানুষটি তোমাকে জলদান করবে আর বলবে, জল খেলে তৃষ্ণা নিবারণ হয়। সামনে যে বন আছে, তার ওপারে একটা কদম ফুলের গাছ পাবে। সেখানে আমার মতো আর একজন মানুষ জলছত্র খুলে বসে রয়েছে। মাঠ পার করে দিতে কেউ পারে না বড়বৌ। আমরা সবাই ইচ্ছা করলে শুধু তেষ্টার সময় জলদান করতে পারি। আর কিছু পারি না।

—তুমি কি কিছু বলবে না। নদীর চরে তোমার কি আছে। তুমি ওদিকে হাঁটছ কেন! আমি তোমার সঙ্গে জোর করে কিছু ফিরে পাব না জানি। আমাকে এ-ভাবে কেউ দেখে ফেললে ঠিক আত্মহত্যা করব বলছি।

এবারে পাগল মানুষ স্থির হয়ে দাঁড়ালেন। শাড়িটা বগলতলা থেকে বের করে বড়বৌর হাতে দিলেন। তারপর হাঁটতে থাকলে সহসা কেন জানি বড়বৌর মনে হল, মানুষটার অভিমানে বুক ফেটে যাচ্ছে। এই সাদা জ্যোৎস্নায় তিনি তাকে নিয়ে হয়ত এমনি হাঁটতে চান। এবং কেন জানি ওর মনে হল—আর সে একা ফিরে যেতে পারবে না। এক অত্যাশ্চর্য মায়া এখন এই নিরিবিলি সাদা জ্যোৎস্নায় এবং কুয়াশার ভিতর। বড়বৌ মানুষটার পিছু পিছু হেঁটে গেল। যেখানে নদীর চর, চরের ও-পারে ছইয়ের ভিতর ঈশম ঘুমোচ্ছে। ওরা দুজন চুপচাপ নদীর চরে বসে থাকলে কে টের পাবে। কুয়াশার ভিতর সবই অস্পষ্ট এবং মায়াজালে ঢাকা। বড়বৌ তার পাগল স্বামীকে নিয়ে নির্জনতায় ডুবে গেল। বলল, আমার আর কে আছে। তুমি বাদে আমার আর কি আছে!

ঈশম খক খক করে কাসছিল। কাসির জন্য সে ঘুমোতে পারছে না। খুব বেশি কাসি পেলে সে উঠে তামাক খায়। তার হুঁকা কলকি এবং পাতিলে আগুন সব ঠিক ঠাক। এখন রাত ক প্রহর সে টের পাচ্ছে না। ছইয়ের বাইরে এলে সে আকাশে চাঁদের অবস্থান দেখে টের পেত—রাত কটা বাজে। অথবা সে চুপচাপ শুয়ে থাকলে টের পায়—ক প্রহর রাত। প্রথম প্রহরে ঠাকুরবাড়ির আরতির ঘণ্টা বাজে, দক্ষিণের ঘরে আলো জ্বালা থাকে। যে সব খরগোস হাসান পীরের দরগা থেকে বের হয়েছে নদীর চরে আসবে বলে, তরমুজের পাতা ওদের বড় প্রিয়, তারা প্রথম প্রহর শেষে জমির আলে এসে পড়লে টের পায় ঈশম, ওরা আসছে। সে কান পেতে রাখলে টের পায়—ওরা খরগোস না সজারু। সে এখন খুব কাসছে বলে টের করতে পারছে না, সজারু কি খরগোস, খাটাশ না শেয়ালে কারা এসে আলের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। রাত গভীর হলেই ওরা চুপি চুপি ঢুকে পড়বে জমিতে ঈশম ওদের তাড়াবার জন্য টিনের ডংকা বাজায়। প্রহর শেষ হলেই সে ডংকা বাজায়। আর তখন যত এইসব খরগোস, খাটাশ অথবা শিয়াল সজারু সব ছুটতে শুরু করে নদীর দিকে।

তখন ওর মনে হয় কে যেন হাঁকছে নদীর চরে—কে জাগে?

—আমি আল্লার বান্দা ঈশম জাগি। সে খালি মাঠে চিৎকার করে বলে।

এই নদীর চর সাদা জ্যোৎস্না, বড় বড় তরমুজ এবং নদীর জল তার কাছে তখন এক বেহেস্তের সামিল। সে হাতে তালি বাজায়। চুপচাপ এই নিশীথে ধরণী কি শান্ত। কেবল সব নিশীথের জীবেরা আহারের অন্বেষণে বের হয়েছে। সে টের পাচ্ছে না তারা কতদূর এসে গেছে। সে উঠে বসল। তামুক না খেলে তার কাসি কমবে না। সে ছইয়ের বাতা থেকে কলকি টেনে নিল। একটু তামাক ভরে খড়কুটো জেলে সামান্য আগুন নিল কলকিতে। ওর কাসতে কাসতে দম বন্ধ হয়ে আসছে। সে কেমন অন্যদিন তরমুজের জমিতে একা নিশীথে দাঁড়িয়ে তামুক খায়, পাখপাখালি অথবা বন্য জীব তাড়ায় তামুক খেতে খেতে, আজ তা পারছে না। কাসিটা ওকে বড় বেশি জব্দ করে ফেলেছে। সে তামুক খেতে খেতে টিনের ডংকা বাজাল। ছইয়ের বাইরে কি সাদা জ্যোৎস্না। কালো কালো ঐ পাখির ডিম! চুপচাপ সেই ডিমের উপর বসে থাকা, তামুক খাওয়া, নদীর জল যে কল কল করে সমুদ্রে নেমে যাচ্ছে সে সব শব্দ শোনা বড় মনোরম। আর আকাশের অজস্র নক্ষত্র দেখতে দেখতে ঈশম যে বার বার কতবার এই জমিতে রাত কাবার করে দিয়েছে, একফোঁটা ঘুমায় না, এখন ঈশমকে দেখলে তা বোঝা যাবে না। আজ ঈশম এমন সাদা জ্যোৎস্না দেখেও ছইয়ের বাইরে হামাগুড়ি দিয়ে বের হল না। সামান্য কুয়াশা নদীর পারে পারে। এই কুয়াশার ভিতর সে অস্পষ্ট এক ছবি দেখে চমকে উঠল।

সে হামাগুড়ি দিয়ে বের হবে ভাবল। ওরা কারা এল। ওর তরমুজ খেতে এমন গভীর রাতে কারা আসতে পারে। তরমুজ চুরি করতে আসে যারা, ওদের চাল চলন অন্যরকম। সে দেখলেই টের পায়, মানুষেরা তরমুজ চুরি করতে এসেছে। কিন্তু সে যে দেখছে তরমুজের উপর ওরা নিবিষ্ট মনে বসে রয়েছে। দুজন দু মুখে। একজন পূবে অন্যজন পশ্চিমে। ওরা যেন একটা তরমুজের উপর বসে পূব-পশ্চিম দেখছে। এবং ওরা যে একেবারে শরীর নাঙ্গা করে রেখেছে—এই মন্দা কুয়াশার ভিতরও বেশ তা স্পষ্ট। কুয়াশা প্রবল নয়। হালকা। জমির উপর নদীর পাড়ে কুয়াশা একটা পাতলা সিল্কের মতো বিছিয়ে আছে। সবুজ সব তরমুজের পাতায় শিশির জমছে। আর দুই মানুষ, মনে হল একজন। স্ত্রীলোক হবে, তা হউক, সংসারে কত জীব ঘুরে বেড়ায়, ওরা নিশীথে এই পৃথিবীর মায়ায় নেমে আসে, ওদের যা কিছু আকাঙ্ক্ষা, অথবা বলা যায়, এমন নদীর পাড় তরমুজ খেতে নিশীথে নেমে আসতে না পারলে তাদের আত্মা বড় কষ্ট পায়।

তা তোমরা নেমে এসেছ জীবেরা, আত্মা তোমাদের কান্নাকাটি করছে, এই জমিতে সাদা জ্যোৎস্নায় বেড়াবার সখ তোমাদের, বেড়াও। আমি ঈশম আল্লার বান্দা চক্ষু বুইজা থাকি। দ্যাখি না কিছু। তোমাদের লীলাখেলা দেখতে নাই। সে এই ভেবে আর বের হল না ছইয়ের ভিতর থেকে। এমন মায়া এই গাছপালা পাখির, কেউ যেন তা ফেলে চলে যেতে চায় না। গেলেও আবার ফিরে আসার আকাঙ্ক্ষা। এবং তারা নিশীথে নেমে আসে।

ওর মনে হল সেও এই জমিতে আবার একদিন ফিরে আসবে। তখন সে থাকবে না। তার আত্মা বিনষ্ট হবে কি হবে না সে তা জানে না। যা সে নিজ হাতে তৈরি করেছে, এই মাটি, মাটির প্রতিটি খণ্ড অংশ, সে যেন মাটি হাতে নিলেই বলতে পারে চাষের সময় কত বাকি, কোন লতা এবারে জমিতে লাগালে বড় বড় তরমুজ হবে, সে তখন তার বড় বড় তরমুজ দেখতে নেমে আসবে। ঠিক মতো চাষাবাদ হচ্ছে কিনা, মরে গেলেও সে না এসে না দেখে থাকতে পারবে না।

অথবা তার মনে হল সংসারে কিছুই বিনষ্ট হয় না। কারণ যারা এই মাটিতে জন্মেছে, মরেছে এবং যারা এখন আকাশে বাতাসে ঘোরাফেরা করছে তারা এমন সুন্দর এক জগত দেখে স্থির থাকতে পারেনি মানুষের অবয়বে এই তরমুজ খেতে নেমে এসেছে।

এবং এও সে ভেবেছে, দুই কেরান্ডা, অথবা কীন পাঁচ যোরাফেরা করছে এই জমিতে। সে হইবের বাইরে বের হয়ে ওদের এমন লীলাখেলার বাধার সৃষ্টি করল না। এমন কি সে যে কাসছিল, তাও সে বন্ধ করে থামিয়ে রাখছে। ধীরে ধীরে তামাক টানছে। তামাক টানলেই বুকটা হুক্কা লাগে। কাসি কমে যায়। সে কাসি কমাবার জন্য তামাক খাচ্ছিল, আর দূরে কেরান্ডার লীলাখেলা দেখছে। ঈশম নিশীথের মানুষ। দিনে তার ঘুমে যাবার অভ্যাস। সে সেই যে যৌবনে গয়না নৌকার মাঝি ছিল, তার মনে আছে, সে রাতে রাতে গয়না নৌকা চালাত। ওর গয়না নৌকা, বারদি, কাওসার খালে খালে শরাশরদির নদীতে পড়ত। তারপর মহজমপুর হয়ে আলি-পুরের বাজার পার হয়ে মাছের চর এবং পরে নাগাবন্দ, শেষে সকাল হতে না হতে নারানগঞ্জের ইস্টিমার ঘাটে নৌকা লাগিয়ে বসে থাকা। আবার সাঁজ নামলে মানুষ নিয়ে ফিরে আসা ঈশমের। সেই নিশীথের যাত্রা সুগম ছিল না। নানা জায়গায় ভিন্ন ভিন্ন কিংবদন্তি, ফাঁসির মানুষ ঝোলে কোথাও, পেঁচার আর্তনাদ বড় নিম গাছটার রাতে কি যে ভয়াবহ লাগে, একবার সে কাওসার বিলে বড় শিমুল গাছের মাথায় আগুন জ্বলতে দেখে পথ হারিয়ে ফেলেছিল—এই সবই এখন ঈশমকে নানা-ভাবে ভাবাচ্ছে। এই যে সে শিশু বয়স থেকে মাটির কাছাকাছি বড় হচ্ছে, সে পাইক খেলত, সামসুদ্দিনের বাপ ছিল তার সাকরেদ, ঠাকুরবাড়িতে তখন দুর্গাঠাকুর আসত শরৎকালে। সামসুদ্দিনের হাত ধরে ওর বাপ আসত অষ্টমীর দিনে, আর পাইক খেলা, ছোট লাঠি হাতে ঈশম বুকের শক্ত পেশী তুলে দাঁড়ালে, গ্রামের সব মানুষ ভেঙে পড়ত। ওর অসীম শক্তি ছিল তখন। লাঠি খেলায় সে সামসুদ্দিনের বাপকে কতদিন হারিয়ে দিয়েছে, দিয়েই ওরা দুই দোস্ত হাতে পায়ের কাদা যে যার মতো ধুয়ে ফেললে কে বলবে—কিছুক্ষণ আগে রক্তচক্ষু দুইজনের, দুইজনাতে লড়ালড়ি, কে মরে কে বাঁচে ঠিক থাকে না তখন।

আর ঠাকুর কর্তা পূজো বন্ধ করে দিলেন, সেই দিন, এক দুঃখের দিন বড়, বড় ছেলে পাগল হল, দুর্গা ঠাকুর শরা-শরদির জলে ফেলে দিয়ে এসে বসলেন বারান্দায়, মা আমার তুমি তামাশা রাখলা। পোলা আমার ভাল না হইলে তোমার পূজা কে দেয়। তিনি পূজো বন্ধ করে দিলেন। ঈশমের লাঠি খেলা সেই থেকে বন্ধ হয়ে গেল। সে মহরমের দিনে লাঠি খেলায় জুৎ পেত না। কি যেন সে দেবীর সামনে এত দিন দেখিয়েছে, পূজো বন্ধ হলে তার মনে হয়, যে ভয়ে-ভয়ে তার হাওয়ায় লাঠি ঘোরাতে পারত না। কেবল যেন এক দেবী, মা, জননী, ঈশমকে বলছে, তুই আমাকে আর লাঠি খেলা দেখাবি না ঈশম। আমাকে নদীর জলে রেখে আসবি না!

দশমীর দিনে ওরা যখন নৌকা ভাসাত দুর্গা প্রতিমা নিয়ে—কি যে হৈহৈ-রৈরৈ, সে ত তখন মাঝের ভিতর এক। সে বড় নৌকোর বড় মাঝি। সে জানত প্রতিমা দুলবে কিনা, সে জানত স্রোতের মুখে নৌকা পড়ে গেলে দেবীর চালচিত্র উল্টে যাবে কিনা, সে বৈঠায় দাঁড়িয়ে হাঁকত, মার টান, দুই দিকে মাঠ সামনে নদী, পানিতে শাপলা ফুল, মা জননী ভাইসা যায় জলে। এই ছিল ঈশম, সে কতবার প্রতিমা বিসর্জন দিয়ে দেবীর তরবারি জল থেকে ডুবে-ডুবে তুলে এনেছে। তরবারি, শঙ্খ, গদা-পদ্ম, সব সে এক-এক করে তুলত। কারণ প্রতিমা জলে উপুড় হয়ে ভাসত। সে ডুবে-ডুবে মাছের মতো গিয়ে তুলে আনত। কারণ বাড়ি গেলে লোকের বেটা সাধু কোণে বসে থাকবে। যতক্ষণ এই তরবারি সামুকে না দিতে পারবে, ততক্ষণ মনে তার শান্তি থাকে না। একবার কর্তা ঠাকুরের কোন আত্মীয় এসেছিল, সে বিসর্জনের আগেই সব খুলে নিতে চেয়েছিল। কারণ সাধুর সখ, ছেলেপুলের হাতে, তরবারি, চক্র এবং সেই লম্বা টিনের পাতে তৈরি ত্রিশূল দিয়ে দেবেন। নদীর জলে ডুবে গেলে তুলে আনা যাবে না।

কিন্তু ঈশম হাসল—কি কইবা হয়। জননীর গায়ে হাত দিতে নাই! পানিতে জননীরে না ভাসাইলে কার হিম্মত দেবীর গায়ে হাত দেয়।

সেই আত্মীয়, এমন এক চাকর মানুষের মুখে এত বড় কথা শুনে হেঁকে উঠেছিল, কেরে বেটা তুই। দুই দিনের মানুষ, ভাতের কম জম।

ঈশম বলেছিল, কর্তা অত মোক্তা না। আমার নাম ঈশম। দেবীর গয়ে হাত দান ত নাথি।

লাগে মারামারি আর কি! ভূপেন্দ্রনাথ, চন্দ্রনাথ ওরা সব ছোট তখন। মণীন্দ্রনাথ মাত্র শৈশবের মানুষ। মণীন্দ্রনাথ বলেছিল, মামা তা হয় না। সংসারে এমন নিয়ম ছিল তখন। ঈশম শুক্কার কদিন গয়না নৌকার কাজ বন্ধ রাখত। শুক্কার কদিন তার নানাভাবে কেটে যেত। সে সব দিনের সে ভাবতেও পারে নি, ঠাকুর বাড়ির এই উত্তর জমিতে কখনও বড়-বড় তরমুজ ফলবে। সে যদি তখন থেকে এই জমিতে এসে নামতে পারত, জমির চেহারা কত পাল্টে যেত আরও। কত সে মেহনত করে ফেলেছে। কত সে আবার বিচিত্র লীলা দেখতে পেত। অথবা তার সেই সব জীবনচরিত যে সে নিয়ে এসেছে এখন সে টের পাচ্ছে না। সে চুপচাপ হইয়ের নিচে বসে দেখতে পাচ্ছে ওরা এখন দাঁড়িয়ে-ভুড়ে কি একটা বিচিত্র দিক। প্রায় মন্ত্র পাঠের মতো জোরে-জোরে কি সব বলছে। যেন পারে কেউ নদীর জলে দাঁড়িয়ে কোমল শাঁখে শাঁখ করছে। অথবা মনে হয় নদীর জলে কেউ তর্পণ করছে। দুর্গাপঞ্চমীর জাওয়াক আকাশ-বাতাস মথিত করে উপরে উঠে যাচ্ছে। বাঘ ঈশম চুপচাপ দেখতে-দেখতে এমন ভাবছে। সে আরও ভাবছে কিছু, সে মনে করতে পারছে না, সেটা কোন সাল, কোন সালে বড়কর্তার বিয়ে হল। বিয়ের বছরই তিনি পাগল হলেন, না মনে হচ্ছে, বিয়ের পর তিনি সাত-আট মাস এখানে ছিলেন না। চাকরিতে গিয়ে সাত-আট মাস নিজের এই পাগলামি রোখার চেষ্টা করেছিলেন। সরকারি চাকরি, কত দিন আর পাগলামি করে রাখা যায়। সেবারেই তিনি ঘরে ফিরে আসেন নানা রকমের লতাপাতার ডাল এবং মূল নিয়ে আসেন। অদ্ভুত মানুষের ইচ্ছা, সবাই ওকে যখন আনতে গেল, ফাওসার খালে গয়না নৌকা লেগে আছে, ঈশম নৌকা বেঁধে বসে রয়েছে, এত গাছপালা, বিচিত্র সব গাছ, সে জানেও না কোনটা কি গাছ, বাড়িতে খবর পাঠিয়ে লোক আনিয়েছে, যারা এসেছিল তারা দেখল মণীন্দ্রনাথ কলকাতা থেকে সব বিদেশী লতা এবং মূল নিয়ে এসেছেন। তার ভিতর ছোট একটা পাইন গাছ, কিছু ঝাউ জাতীয় গাছ, এবং একটা তরমুজের লতা। বড়োকর্তা নিজে এসে যখন এমন দেখলেন, চোখ

কেউই তাঁর তখন জল জমেছিল। একেবারে মাথাই গেছে। কিন্তু সেই সন্দেহ। শুধু কিছু গাছপালা এবং কীট-পতঙ্গ নিয়ে ফিরেছেন।

নৌকা খালি করে সব ফুলে নিয়ে যেতে হল। না নিলে মানুষটা ঘরে ফিরবে না, কেবল আমেকো যা-কিছু সামনে দেখতে পায়, ওরা অর্থাৎ ভূপেন্দ্রনাথ, চন্দ্রনাথ এবং আর সব কীট-পতঙ্গ মাঠে উঠে যেতে দিয়েছিল। কিন্তু ফুলের জন্য, যেমন সেন্টপলিয়ানার জন্য, মাসাক্রেলিয়ার নাম এবং নানা ধাতীর কাঠ পাথর চাপা দিয়ে ওরা বাড়ি এনে হাজির করেছিল। উপেন নৌকা সাফ করতে গিয়ে দেখল একটা লতা, এ-অঞ্চলে তরমুজ হয় না, কিন্তু হয় ওর মতো হয়েছিল ওটা ফিকেই-সবুজ কিন্তু নীল-নীল ডাল, এবং পাতাগুলো বিচিত্র রঙের। সে ওটা নিয়ে গহনা নৌকার গোলাপি মেলে উঠে এসেছিল। এসে সকলকে দেখিয়ে এটা বলেছিল। এটা একটা লতা। কি লতা জানেন?

সবাই দেখল। কেউটা চিনতে পারল না। সে নিজেদের পাড়ে তখন নাবালকের মতো দাঁড়িয়ে। শিবরে শচীন্দ্রনাথ বসে ছিল। দাঁড়িয়ে ঘর ভন্দ্রলোকের ভিড়। ভূপেন্দ্রনাথ সবটাই ভিড় করছে মানুষ সবাই। তরমুজের লতাটা কেউ ভালভাবে দেখেনি। একটা বিস্ময় সারা বাড়িতে ছড়িয়ে আছে। কেউ এ-নিয়ে কিছু বলছে না। সে লতাটা ফেলে দিতেও পারছিল না। কি যে করে এখন — সে ভাবল যেখানে নদীর চর জেগে উঠেছে, এবং উঁচু জমি, কিছুই জন্মায় না, বালি জমিতে কোন চাষবাস হয় না, সেখানে এই লতা রোপণ করে রাখলে হয়। যদি কিছুই হয়, তবে ফুল-ফল না হলেও মজা ফুটবে। বেশ আলোই লতা লাগান হল। সে বড় নৌকায় যায়, এবং শাক-সবজি সে বাড়ির মানুষের মাথায়, তার কিছুতেই লতাটা ফেলে দিতে ইচ্ছা করল না। সে নদীর চরে নেমে খুব যত্ন করে গাছটা রোপণ করল। চার পাশে বাবলার ডাল দিয়ে বেড়া দিল। এবং প্রতি সপ্তাহে সে এসে দেখতে পেত, গাছটা ক্রমে বড় হচ্ছে—কি গাছ অথবা কি লতা এটা, কি ফল দেবে, কোন মাসে ফুল হবে, না কি কোন বুনো লতা, এমন দেখার এক অদ্ভুত বাসনা উপেনের। সে গহনা নৌকা নিয়ে একাই কাওরার খালে গোলাপি ফেলে উঠে আসত। সে বিভিন্ন কাজে প্রথম উঠে না গিয়ে এই গাছটার পাশে দাঁড়াত। বড় বেশি সজীব এই গাছ। সে দেখত কি সুন্দর লতা ছড়িয়ে পড়েছে চার পাশে। সে একদিন এসে দেখেছিল গাছটার পাশাপাশি ঠাকুর নদী থেকে জল এনে দিচ্ছে। এবং হঠাৎ একদিন ফুল ফুটল সে দেখল লোকটার হাতে বাজো কাঁচের জল। কুমড়ো নয় ত আবার! না তা হবে কেন। সে সব জানে, গাছ চেনে, শুধু এ-গাছটা চেনে না। বিধি তার মাঝে-মাঝে বিস্ময় হয়। কি এক আকর্ষণ সেই গাছে। সারাক্ষণ একটা লতা নিয়ে উপেন দাঁড়িয়ে সে ভুলে যাচ্ছে।

আর কিনা সেই বসন্তেই দুটো বড় টকটকে ফুল। ফুলগুলোর লতা ভরে এলো। ভিতরটা কি লাল! যেন চিনির রস জেমে রয়েছে ভিতরে। সে টকটকে ফুলে সব লতা কেটে-কেটে ভাগ দিয়ে রাখল। এবং যখন গহনা নৌকার কাজ বন্ধ হয়ে গেল, দুই গরু নিয়ে সে মাঠ চষতে নেমে পড়ল। বুড়োকর্তা বললেন, তুই কি পাগল! জমিতে কিছু হয় না। উঁচু জমি। তুই এই প্রাণপাতে কি করছ। তিনি খুঁজে দেখে পেয়েছিলেন, অভাবে-অনটনে উপেন এবার কাজ চায়। বয়স হয়ে যাচ্ছে। আর শরীর নাই সবলের গহনা নৌকার দাঁড় বাইবার। সে এবার কাছে-পিঠে বিভিন্ন কাজে থাকার জন্য একটা কাজ চায়।

তিনি বললেন, তুই তবে বাড়িতে থাক। ক্ষেত-কাম কর। তুই পৌঁছাস অবধি। তাঁকলী কবিরাজের কাছ থেকে অবধি নিয়ে যায়।

সেই থেকে সে সুখে থেকে গিয়েছিল। না ঠিক সেই থেকে নয়। ওর! যা হয়েছিল তা নয়। জমি কখনো চাষ-বাস হবে না এমন নদীর পাড়ের জমি, জমিতে তরমুজ ফলবে, জমিতে সব ফসল হয় না—যায় না, তার তা। সে প্রাণপাত করে এই মাটির সঙ্গে প্রায় লড়াইয়ে নেমেছিল।

সেই এক লড়াই। মাটির সঙ্গে মানুষের লড়াই। পুরাকালে যখন মানুষ আগুন জ্বালাতে জানত না, পশু-পাখি মেরে কাঁচা খেত, জঙ্গলে আহার করত, উপেনের মুখ দেখলে তখন এমনই মনে হত। সবাই কি তামাশাটাই করছে উপেনকে নিয়ে। সবাই বলল, উপেনটাও পাগল হয়ে গেছে। দু-তিন বিঘার মতো শুধু বালির চর। এ-অঞ্চলে এমন জমিতে কে আবার চাষবাস করে! কিন্তু উপেন সূর্যের মতো লাল রঙ নিয়ে এল মাঠে। চৈত্র মাসে মানুষের চোখে বিস্ময়। উপেন নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে সবাইকে খেতে তরমুজ কেটে খাওয়াচ্ছে। ভিতরটা তরমুজের কি লাল! কি লাল! সে সবাইকে বলছে, খেয়ে দেখুন। মিসরির সরবত যেন, ঠিক। চৈত্র মাসের আগুন জ্বলছে চার পাশে। খাঁ খাঁ করছে সূর্য পর্যন্ত আকাশ থেকে পালাচ্ছে আর তখন কিনা উপেন বলছে, কি লাল খাচ্ছেন ভিতরটা। খান। খান মিসরির পানা।

সেই উপেন এখন কাঁদছে। সে তর-মুজের সব লতার ভিতর থেকে দেখতে পাচ্ছে—ওরা নদীর পাড়ে-পাড়ে এবং তরমুজ ক্ষেতের ভিতর হাঁটাহাঁটি করছে। কখনও দুটো স্ত্রীলোকটি। পুরুষটি পিছনে তাড়া করছে। কখনও ওরা চুপচাপ একটা তরমুজের উপর পাশাপাশি বসে থাকছে। কিছু বলছে না। আকাশে কি সব দেখছে। আবার কখনও ধীরে-ধীরে ওরা জল হচ্ছে, সবুজ হচ্ছে, আলিঙ্গনে দীর্ঘ সময় আবদ্ধ থাকছে। উপেন বলল, হাঁ মানুষ ফুলের হাঁক, দেব-দেবীর মধ্যে পাপ নয়।

সে দেখেছিল কিছু দেখবে না। কিন্তু এমন খেলা না দেখে থাকা যায়। নতুন কিশোর-কিশোরী যেন ধর্মের মতো একদিন ঢাক-ঢোল বাজাবে। এই নদীর চরে। তরমুজ খেতে মানুষ ফুলের কেউ হবে, প্রেমলীলা সাঙ্গ হলে নেমে আসে। পৃথিবীর শাশ্বত সুন্দর দৃশ্য এখন এই জমিতে। সে কিছুতেই কাঁদছে না। সব বন্ধ করে পড়ে আছে। এখানে একজন মানুষ আসে, টের পেলেই ওরা অন্তর্ধান করবে।

আহা! কি সুন্দর সুষমা এই জগতে। পৃথিবীতে বেঁচে থাকা কি সুখ! অনন্ত-কাল এই পৃথিবী এবং সৌরজগৎ আপন মহিমায় আবর্তন করছে। মানুষ কীট-পতঙ্গ পশু-পাখি দলে-দলে মিছিলের মত ঘুরছে-ফিরছে। হাজার লক্ষ অথবা কোটি-কোটি বছর ধরে ঘুরছে-ফিরছে। এই যে এক তরমুজের জমি, এখানে এসার নেমে এস তোমরা, এলেই দেখতে পাবে—প্রায় সাদা জ্যোৎস্নার মত এক নারী-মূর্তি, এবং হাটের শীতের মত দৃঢ় অবয়বে এক পুরুষের আশ্চর্য লীলা। কেউ টের পেল না। একমাত্র উপেন চুরি করে সব দেখে ফেলেছে। সে বলল, আমি উপেন বড় ভাগ্যবান মানুষ। কেন বলার ইচ্ছা, আমার আর কষ্ট কি। আমার জমিতে ঈশ্বরের আবাস। দুঃখের আমার শেষ নাই।

(ক্রমশ)

নিকটেই আছে

রিজার্ভেশন

দাদা,

একটা ধাঁধার জবাব দেবেন? হাওড়া থেকে এলাহাবাদ আটশো তেরো কিলো-মিটার। আজ কুড়িটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে হাওড়া ছাড়লে ট্রেন এলাহাবাদ পৌঁছবে পরদিন ষোলটা পাঁচ কি দশে। মাঝে এক রাত্তিরের জন্য যদি সাড়ে চার টাকা রিজার্ভেশন চার্জ গুনতে হয় তাহলে হাওড়া টু এলাহাবাদের থার্ড ক্লাশের ভাড়া কত পড়বে বলুন তো?

না, না—হাসি-ঠাট্টা না। খুব সিরি-য়াসলি জিজ্ঞাসা করছি। আপনি তো হপ্তায় হপ্তায় 'তেনাদের' কীর্তিকলাপের গল্প লিখছেন—এতদিনে বোধহয় কয়েক ডজন গল্পের ডিম ফুটিয়েছেন—দয়া করে আমার প্রশ্নটার সদুত্তর দেওয়ার চেষ্টা করুন তো। একটা অনুরোধ শুধু করব, 'ভাড়া কত?' জানার জন্য রেল কোম্পানীর ডিরেকশনারীটা ঘাটবেন না—ওটা মিথ্যে কথা বলে।

কারণ আমি ও সুভাষ গোড়ায় তাই করেছিলাম। সুভাষকে আপনি চেনেন না। সুভাষ চক্রবর্তী আমার কলিগ। আপনি তো জানেন আমি খিদিরপুরের কাছে একটা টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটে পড়াই। অ্যাকচুয়ালি পড়ানোটা আমাদের কাজ নয়, দেখানোই আমাদের নিয়ম। আমরা ডেমনস্ট্রেটর। মাস গেলে দুশ পঁচিশ চারশো পঁচাত্তর স্কেলে ডি-এ সমেত মোট মাইনে পাই তিনশো সত্তর টাকা। হাতে পাই কোন মাসে দুশ নব্বই কোন মাসে দু পাঁচ টাকা বেশী। প্রভিডেন্ট ফান্ড, প্রভি-ডেন্ট ফান্ডের লোন, ইনকাম ট্যাক্স আর একটা বিশ বছর মেয়াদী স্যালারী সেভিংস স্কীমের জীবনবীমার বরাদ্দ ঢুকিয়ে ওর বেশী কখনো হাতে আসে না।

আসে না তো আসে না—তা আর কি করব। হাজার হাজার ইঞ্জিনিয়ার যে দেশে বেকার, সেখানে যে এখনো চাকরী-বাকরী করে দু মুঠো ভাতের ব্যবস্থা করতে পারছি, তাই যথেষ্ট। আপনি তো জানেন আমি বিয়ে-থা করিনি। বাবা মা অনেক করেছিলেন। আমি সাফ বলে দিয়েছি যার দু দুটো বয়স্থা ছোট বোনের বিয়ে আজও হয়নি, যার একটা ছোট ভাই এখনো স্কুলের গণ্ডী পেরোয় নি এবং বাবা যার ভাজ বাদে কাল একশ তিরিশ টাকা পেনসন সম্বল করে ঘরে ফিরে আসবেন, তার এখন ওসব খোয়াব না-দেখাই ভাল।

তবু তো আমাদের অবস্থা ভাল। বাপ বেটো দুজনে মিলে মাসের শেষে শ ছয়েক টাকা ঘরে আনি। সুভাষদের অবস্থা যদি দেখতেন। বাবা নেই। সুভাষের বড়দা একটা বিলেতি কোম্পানীতে ওভারসিয়ারের কাজ করতেন। ভালই মাইনে পেতেন। হঠাৎ কি হল একদিন দুপুরে কোম্পানীর লোকেরা ধরাধরি করে বাসায় পৌঁছে দিয়ে গেল—চোখ দুটো জন্মের শোধ গেছে। ওর মা প্যারালিসিসের রুগী। এখন ওই সুভাষের ঘাড়ে গোটা সংসারটা—মা, অন্ধ দাদা, ছোট দুটো ভাই, বৌদি ও একটা ভাইপো। সুভাষ নাইটে বি-ই পড়ছিল। সে সব বন্ধ হয়ে গেছে। এখন সকাল সন্ধ্যে পাড়ায় পাড়ায় পাইক্কেরী হারে ছাত্র পড়ায়। আর পড়াবেই বা কি? পড়াশোনার পাট তো এদেশে চুকে গেছে। পরীক্ষাই যদি দিতে না হয়, চালাও প্রমোশন যদি মেলে তবে কোন গার্জিয়ান মিথ্যে মিথ্যে প্রাইভেট টিউটরের কড়ি গুনবে। কমতে কমতে গত মাসে দুটোয় এসে ঠেকেছিল টিউশনি। এ মাসে সে দুটোও গেছে।

পয়লা তারিখ মাইনে নেওয়ার সময় লাইনে সুভাষকে না দেখে, টিচার্স রুমে ফিরে এলাম। দেখি ও একমনে ছাত্রদের ড্রইং শীট দেখছে। কি রে মাইনে নিবি না?—জিজ্ঞাসা করলাম সুভাষকে। বোধহয় শুনতে পায় নি। চুপ-চাপ শীট দেখ-ছিল। এবার গায়ে একটা ঠেলা মেরে ফের বললাম—কিরে নিবি না?

কি? লাল-নীল পেন্সিলটা শীট-গুলোর ওপর নামিয়ে রেখে ভীষণ ক্লান্ত চোখ দুটো একবার শুধু তুলল। দেখে মনে হোল সারা রাত্তির বোধ হয় ঘুমোয় নি। চোখ দুটো কচলাতে কচলাতে বলল—আজ নেব না।

কেন?—আমার কৌতূহল হল জানতে।

আবার একটা লোন চেয়েছিলাম। স্যাংশন হয়েছে। প্রভিডেন্ট ফান্ডের পুরোনো লোনটার জন্য শ দুয়েক এখনো বাকী। অ্যাকাউন্টেন্টবাবুকে বলে দিয়েছি মাইনের সঙ্গে ওটা অ্যাডজাস্ট করে দিতে। কাল লোনটা পাব।—বলে খড়িওঠা শুকনো গায়ে ম্লান হাসির ভুসকুড়ি ফোটাল সুভাষ।

আবার কেন লোন নিচ্ছিস?—জিজ্ঞাসা করি আমি।

দুটো কারণে—জবাব দেয় সুভাষ। মার কয়েক দিন ধরেই বাড়াবাড়ি চলছে। রাতে একদিনও ঘুমুতে পারছি না। ওদিকে ছ তারিখ এলাহাবাদে যাব। ইন্টারভ্যু। ইণ্ডিয়ান কর্পোরেশনে লোক নিচ্ছে। অ্যাপ্লাই করেছিলাম। ওরা ডেকে পাঠিয়েছে। বলেছে যাতায়াত ভাড়া দেবে, তবে এখন নয়, ইণ্টারভিউতে অ্যাপীয়ার হওয়ার পর। হাতে তো পয়সা নেই একটাও। টিউশনি দুটো খতম হয়ে গেছে। যা পেয়েছিলাম ডাক্তার আর ওষুধেই সব বেরিয়ে গেল। সারাটা মাস এখনো পড়ে। তাই লোন না নিয়ে আর উপায় কি বল?

সত্যি ওর আর কোন উপায় নেই। আমার যদি ক্ষমতা থাকত ওকে দিতাম। কিন্তু আমার অবস্থা তো সবই আপনি জানেন। ওদিকে এলাহাবাদের চাকরীটার মাইনে এখানকার চেয়ে অনেক বেশী—কম করেও সোয়া শ টাকা বেশী পাবে, যদি হয়।

আমরা সবাই মাইনে নিলাম এক তারিখ। সুভাষ নিল দু তারিখ। মাইনে নিয়ে এসে বলল—দেখ, চ একটু সিটি বুকিং অফিসে যাই। একটা টিকিট কাটব এলাহাবাদের।

আমাদের কলেজের কাছেই একটা সিটি বুকিং অফিস আছে। সেখানে যাওয়ার আগে অফিসের বাঙশখানায় একবার চোখ বুলিয়ে নিলাম—হাওড়া টু এলাহাবাদ

কিছু বলবার আগেই জানতে চাইলেন, নিশ্চয়ই খুব ঘোরাঘুরি করে অনেক বেলায় ফিরেছেন?

আমি একটু সলজ্জ হাসি হেসে বললাম, খুব বেশী ঘোরাঘুরি করিনি তবে একটু বেলা হয়ে গিয়েছিল।

'অফিস থেকে বাড়ী ফিরেই আপনাকে টেলিফোন করেছিলাম...

'তাই নাকি?'

শুনলাম আপনি ঘুমুচ্ছেন। তাই জাগাতে বারণ করেছিলাম। এই একটু আগেও কেমন করে জানলাম ঘুমুচ্ছেন তখন আর না এসে পারলাম না।' মিঃ রায় হাসতে হাসতে আমার দিকে তাকালেন।

'ছি, ছি কি লজ্জার কথা।'

'ওসব লজ্জা-টজ্জা ছাড়ুন মশাই। গেট রেডি। ওদিকে খাবার-দাবার যত ঠাণ্ডা হবে গিন্নী তত বেশী গরম হতে শুরু করবে।'

আমি না হেসে পারলাম না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলাম, এত খাবার-দাবারের কি ব্যাপার?

'এমন কিছু নয়, তবে ইউ আর হ্যাভিং ডিনার উইথ আস টু-নাইট।'

আমি বললাম, আই অ্যাম সিওর শি ইজ নট এ ডিক্টেটর বাট এ কম্যান্ডার ইন চীফ হার ম্যাজেস্টি। সুতরাং আর দেরী না করে তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নিই।

তাড়াতাড়ি হয়ে এসে জামা-কাপড় পাল্টে নিলাম। ড্রেসিং টেবিলের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুলগুলো ঠিক করে নিয়ে তোয়ালে দিয়ে মুখটাকে পরিষ্কার করলাম। ব্যস! ঘড়ি পরতে গিয়ে দেখি সাতটা বেজে গেছে। ড্রইংরুমে আসতেই মিঃ রায় উঠে পড়লেন ও দুজনেই বেরিয়ে পড়লাম।

নিউ ফরেস্ট কলকাতা মহানগরী তো বটেই, এমন কি কালীঘাট-ভবানীপুরের চাইতেও অনেক ছোট। নিউ ফরেস্টের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত মাইল খানেকের বেশী হবে না। তাছাড়া ভারী সুন্দর ও শান্ত পরিবেশ। অনেকটা শিবপুরে বোটানিক্যাল গার্ডেনস আর পুরাণ আমলের ইডেন গার্ডেনের মিকশ্চার আর কি! তবুও এখানকার বাসিন্দারা এই পথে এই পরিবেশে হাঁটেন না। কেউ গাড়ীতে, কেউ সাইকেলে আমি অবাক হই, আমার ভাল লাগে না।

হাওড়া

কুষ্ঠ কুটীর

সর্বপ্রকার চর্মরোগ, বাতরক্ত, অসাড়তা, ফুলা, একজিমা, সোরাইসিস, দুষিত ক্ষতাদি আরোগ্যের জন্য সাক্ষাতে অথবা পত্রে ব্যবস্থা লউন। প্রতিষ্ঠাতা: পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা কবিরাজ, ১নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া। শাখা: ৩৬, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৯। ফোন: ৬৭-২০৫৯।

মিঃ রায়ের গাড়ীতে যেতে যেতেই জিজ্ঞাসা করলাম, এইটুকু পথের জন্য আবার গাড়ী আনলেন কেন?

'প্রথম প্রথম এইটুকু মনে হয়। কিছুদিন পরে আর এইটুকু মনে হবে না।'

কথাটার সঙ্গে এক মত হতে পারলাম না কিন্তু কিছুটা সত্য বৈকি। অধিকাংশ [illegible] নিজের বেলায়, বাসর ঘরে স্ত্রীকে যত ভাল লাগে, অপরূপা, মহীয়সী মনে হয়, পরে তা মনে হয় না। দৈনন্দিন জীবনের সংঘর্ষে মনের কিছু কিছু মিহি সুর, কিছু সূক্ষ্ম নিত্য আহত হয়, কিছু কখন হারিয়ে যায়। গ্রীষ্ম-বর্ষা-শরত-হেমন্তের ঘূর্ণি পথে কখনও কিছু হারিয়ে যায়, কখনও কিছু পাওয়া যায়। কোন জমিই চিরকাল উর্বরা থাকে না। জমিকে উর্বরা রাখতে হলে মাঝে মাঝেই সার দিতে হয়। সংসার জীবনে অনেকেই জানেন না, বোঝেন না এসব চিরন্তন সত্য। যাঁরা এসব জানেন না, পারেন না, তাদের কাছে সংসার রসহীন, মাধুর্যহীন হয়ে পড়ে। সবাই তো তা নয়। বাসর ঘরে যাকে মনোরমা মনে হয়েছিল, সংসার জীবনের চরম দুর্যোগের রাত্রিতে তাকে তো আরো আপন মনে হতে পারে, আরো নিবিড় করে তার ভালবাসার উষ্ণ উত্তাপ অনুভব করাও সম্ভব।

নিউ ফরেস্টের এই শান্ত নিবিড় বনানীর পরিবেশ প্রথম প্রথমই শুধু ভাল লাগবে কেন? তাহলে এই বিশ্ব প্রকৃতির প্রাচুর্যের মেলা কি শুধু শৈশবেই ভাল লাগবে? যৌবনে, প্রৌঢ়ত্বে কি হিমালয়ের রূপ ভাল লাগবে না? আবীর-রাঙা গোধূলির মিষ্টি কয়েকটা মুহূর্ত কি নিউ ফরেস্টের মানুষকে আনমনা করে না?

না, না, তা কি করে হয়? তা কি কখনও সম্ভব? এই রাস্তা দিয়ে আমি আগেও গিয়েছি, এখনও যাচ্ছি। এই পরিবেশ কি আমার তত ভাল লাগছে না? গাড়ীটা মোড় ঘুরতে না ঘুরতেই নিজের মনকে নিজে জেরা করলাম। হাওড়া কোর্টের উকিলের মত কঠোর নির্মম হয়ে জেরা করলাম। কই না তো! আজও তো বেশ লাগছে। বরং বাতাসটা যেন আরও মিষ্টি, আরো স্নিগ্ধ। মনে হচ্ছে এই মুহূর্তে আমি যদি গাড়ী থেকে নেমে পড়তে পারতাম, তাহলে মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াতাম এই আবছা অন্ধকারভরা বনবীথিতে।

গেস্টহাউস থেকে মিঃ রায়ের বাড়ী—কতটুকুই বা পথ? দু'তিন মিনিটের পথ! তা হোক। এই দু-তিন মিনিটের মধ্যেই কত কি ভাবছি। ভাবছি রামচন্দ্রের কথা, কৈকেয়ীর কথা। দীর্ঘ চোদ্দ বছরের জন্য নির্বাসিত হয়েছিলেন রাম। আশ্রয় নিতে হয়েছিল দণ্ডক মহারণ্যে। রাজপ্রসাদের প্রাচুর্য হারাতে হয়েছিল কিন্তু তার বিনিময়ে কি তিনি কিছুই পান নি? নবীন প্রকৃতির অকৃপণ ঔদার্যের মেলায় কি কোন আকর্ষণ নেই? নিশ্চয়ই আছে। সেদিনও ছিল, আজও আছে। তাইতো আজো শহরের-নগরের মানুষ ক্লান্ত শ্রান্ত হলে ছুটে আসে উদার বিস্তৃত প্রকৃতির কোলে।

মিঃ রায় অ্যাকসিলারেটরের পর থেকে ডান পা তুলে ব্রেক দিয়ে গাড়ী ওর বাংলোর গেটের মধ্যে ঢুকাতেই আমার ওসব চিন্তা পালিয়ে গেল। আমার খেয়াল হলো, আমি ডিনার খেতে এসেছি।

ছোট ছোট পাথরের পর গাড়ী চলছিল পোর্টিকোর দিকে। গাড়ী থামাবার সঙ্গে সঙ্গেই মিঃ রায় হর্ণ দিলেন, ঘোষিত হলো আমাদের আগমন বার্তা।

গাড়ী থেকে নেমেই মিঃ রায় বললেন, আসুন।

আমি মিঃ রায়ের পিছন পিছন চললাম। অন্দরকে ঘরে স্টাডিতে নয়, সোজা ড্রইংরুমে। বিরাট ড্রইংরুম। শুধু বসবার জন্য, গল্পগুজব করবার জন্য এত বড় ও এত ভাল ঘরের কথা আমি ভাবতেই পারি না। কোন দিন দেখিনি বা উপভোগ করিনি বলে প্রয়োজনও অনুভব করি না। শিলচরে কিছু কিছু লোকের বাড়ীতে বসার ঘর দেখেছি কিন্তু এত ভাল ড্রইংরুম দেখিনি। আমাদের গুরুচরণ কলেজের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক চন্দ্র-বাড়ীতেই শুধু ড্রইংরুম দেখেছি। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের বাংলোয় হয়ত একটা ড্রইংরুম আছে, তবে আমি দেখিনি। সে ড্রইংরুম নিশ্চয়ই এত ভাল নয়। সত্য কথা বলতে কি, শিলচর বা কলকাতায় থাকতে ড্রইংরুমের কথা বিশেষ শুনতামই না। দেখতামও না। প্ল্যানিং কমিশনের কৃপায় দিল্লীতে এসেই ড্রইংরুমের সঙ্গে আমার প্রথম প্রত্যক্ষ পরিচয়।

মিঃ রায়ের ড্রইংরুম দেখে বেশ লাগল। এক পাশে একটা বড় সোফা সেট। ফায়ার-প্লেসের ধারে বেতের সোফা সেই। কার্পেট, টিপাই, সেন্টার টেবিলগুলোও ভারী চমৎকার। ঘরের তিন কোণায় তিনটে লাইট-স্ট্যান্ড। ডিভানের পিছনে একটা চাইনীজ স্ক্রিন। আরো ছোট-খাট টুক-টাক কি কি যেন আছে।

মিঃ রায়ের পিছনে পিছনে ড্রইংরুমে ঢুকেই বেশ লাগল। শুধু ভাল লাগল? লোভ হচ্ছে নাতো? লোভ? হাঁ হাঁ লোভ। ভাল জিনিস দেখলে লোভ হয় না? সেই ছোটবেলায় মামা আর মাসীর সঙ্গে শিলং বেড়াতে গিয়ে পুলিশ বাজারের দোকানে নানা রকমের খেলনা দেখে আমার লোভ হয়েছিল না? কেন কলকাতায় পোস্ট-গ্রাজুয়েট হস্টেলে থেকে পড়বার সময় চৌরঙ্গী পাড়ায় গেলে কত কি দেখে লোভ হতো না? বড় বড় সুন্দর গাড়ী-বাড়ী দেখতাম ঠিক লোভ হতো না। ওগুলো যে পাবার নয়, লোভ করে লাভ কি? শো-কেস- সাজান সুন্দর সুন্দর জামাকাপড় দেখে কিন্তু লোভ হতো। শুধু জামাকাপড় কেন? সুন্দর মনের মত একটা বৌয়ের কি লোভ হয়নি? নিশ্চয়ই হয়েছিল।

সেসব দিন অনেক পিছনে ফেলে এসেছি। মাঝে কবছরে প্রায় সাধু হয়ে

গিয়েছিলাম। নিজের জীবনের প্রতিই কোন আকর্ষণ ছিল না, লোভ তো দূরের কথা। কিন্তু নিউ ফরেস্টে আসার পর এ কি হলো? ঐ শান্ত-স্নিগ্ধ শাল-পাইনের মধ্যে ঘোরাঘুরি করে নিজেকে এত ভাল লাগছে কেন? গেস্ট হাউসের ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় নিজেকে এত সুন্দর মনে হয়েছে কেন? মিঃ রায়ের এই ড্রইংরুমে এসেই বা এত ভাল লাগছে কেন? এই শাল-পাইনের বনে, শিবালিক পাহাড়ের আড়ালে কোন সূর্য লুকিয়ে নেই তো যে আবার জমাট-বাঁধা আশা-আকাঙ্ক্ষা কামনা-বাসনার বরফ গলিয়ে দেবে?

জানি না। ভগবানের কি ইচ্ছা, তা জানি না। তবে এই ড্রইংরুমে ঢুকে একবার চার-পাশ দেখে নিয়েই বললাম, হাউ লাভলি!

খুশী হয়ে মিঃ রায় বললেন, ইউ থিংক সো?

'নিশ্চয়ই।'

মিঃ রায় হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, একটা কথা জেনে রাখুন যে, মনের মত একটা আস্তানা আর স্ত্রী যদি না পাওয়া যায় তাহলে এই পৃথিবীর কোন সৌন্দর্য, কোন আনন্দ উপভোগ করা যায় না।

'তাই নাকি?'

'ইয়েস স্যর। ইউ ক্যান অলসো পুট ইট দি আদার-ওয়ে। মনের মত স্ত্রী আর সংসার হলে জীবনের সব দুঃখ, সব ব্যর্থতা, সব সমস্যার মোকাবিলা করা যায়।'

আমি মুখে কিছু বললাম না, বলতে পারলাম না, বলতে ইচ্ছা করল না। শুধু একটু হাসলাম। পাশের একটা সোফায় বসতেই উনি ভিতরে গেলেন, বসুন, আসছি।

আমি চুপ করে সোফায় বসে আছি আর ভাবছি, এই ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার দেখা হলো কেন? এর সঙ্গে যত বেশী ঘনিষ্ঠ হচ্ছি, যত বেশী দেখছি, আমার প্রতি, আমার জীবনের প্রতি তত বেশী লোভ হচ্ছে। একটা অদম্য চাপা ইচ্ছা যেন মাথা ফুঁড়ে বেরুতে চাইছে। গর্তের মধ্যে যেন একটা কামনা-বাসনা-লালসার কেউটে সাপ লুকিয়ে আছে। আমি তাকে দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু তার ফোঁস ফোঁস আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি নাকি?

ড্রইংরুমটা আর একবার ভাল করে দেখলাম। বেশ ভাল লাগল। মনে হলো আমার যদি একটা ছোট্ট সুন্দর ড্রইংরুম থাকত? শীতের সন্ধ্যায় ফায়ার প্লেসের ধারে বসে বসে বই পড়তে পারতাম! না, না, তার চাইতে আরো ভাল হতো যদি গল্প করতে পারতাম! কিন্তু কার সঙ্গে গল্প করব? কে আছে আমার?

প্রায় একই সঙ্গে রায় দম্পতি ড্রইংরুমে এলেন। মিসেস রায় ট্রে থেকে কফির পেয়ালা আমার হাতে তুলে দিতে দিতে বললেন, আজ বুঝি খুব ঘুরেছেন?

'খুব বেশী ঘোরাঘুরি করার লোক আমি না।'

অন্য পেয়ালা কফি স্বামীর হাতে তুলে দিতে দিতে জিজ্ঞাসা করলেন, কেন?

'আমি বড় কুঁড়ে।'

মিসেস রায় এবার নিজের এক পেয়ালা কফি নিয়ে আমার পাশের সোফায় বসে বললেন, আপনাকে দেখে তো খুব চটপটে স্মার্ট মনে হয়।

'যা মনে হয় তা কি সব সময় সত্যি হয়?'

এবার মিঃ রায় মুখ খুললেন, এই তো ইন্টেলিজেন্টের মত কথা।

মিসেস রায় শুধু একটু হাসলেন। মনে হলো আমার মন্তব্য উপভোগ করেছেন কিন্তু মুখে কিছু বললেন না।

আমি এবার মিসেস রায়ের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, নিউ ফরেস্ট আপনার কেমন লাগে?

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর এলো, খুব ভাল লাগে।

'কেন বলুন তো?'

'এত সুন্দর জায়গা; ভাল লাগবে না?'

'শুধু সুন্দর জায়গা হলেই ভাল লাগে?'

মিসেস রায় আপন মনেই একটু হাসলেন, না, শুধু তা নয়......

'তবে?'

'নিজেকে দেখার, বোঝার এত ভাল জায়গা বোধকরি আর পাব না—অন্ততঃ আগে পাইনি। তাই নিউ ফরেস্ট আমার খুব ভাল লাগে।'

আমি তারিফ না করে পারলাম না, বাঃ! ভারী সুন্দর কথা বললেন তো!

মিঃ রায় আর চুপ করে থাকতে পারলেন না, ডোন্ট ফরগেট শী ইজ মাই ওয়াইফ!

আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম, বাট বাট ইউ আর হার হাসব্যান্ড?

'প্রতিবাদ করব না।'

ড্রইংরুমে বসে বসেই আমরা একটা গাড়ী আসার আওয়াজ পেলাম। পোর্টি-কোতে গাড়ী ব্রেক করার সঙ্গে সঙ্গেই হর্ণ বাজল। আমি বসে রইলাম। ওরা দুজনেই উঠে গেলেন।

আমি ড্রইংরুমে বসেই গাড়ীর দরজা বন্ধ করার আওয়াজ পেলাম। কথাবার্তাও শুনতে পেলাম একটু-আধটু। কথাবার্তা বলতে বলতেই ওরা দুজনে একজন বয়স্ক ভদ্রলোককে নিয়ে ড্রইংরুমে ঢুকলেন। আমাকে দেখেই ভদ্রলোক মিঃ রায়কে জিজ্ঞাসা করলেন, ইনিই কি সাগর চট্টোপাধ্যায়?

আমি উঠে দাঁড়িয়ে কিছু বলবার আগেই মিঃ রায় বললেন, তুমি তো ঠিক ধরেছ দাদা!

ভদ্রলোক হাসতে হাসতে বললেন, মাধুরী আমাকে যে ডেসক্রিপসন দিয়েছে তাতে তো না চেনার কোন কারণ নেই।

মিসেস রায় হাসলেন। তারপর আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন, ইনি আমাদের দাদা—ডকটর এস পি সরকার—অয়েল অ্যান্ড ন্যাচারাল গ্যাস কমিশনের অ্যাড-ভাইসার।

আমি হাত জোড় করে নমস্কার করলাম। ডকটর সরকার বললেন, এরা দুজনে তো আপনার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তা রোজ রোজ এদের এখানে এসে নিজের প্রশংসা না শুনে আমার ওখানে চলে আসবেন।

আমি হাসি হাসি মুখে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কোথায় থাকেন?

'এই কাছেই। ওরা ডাইরেকশন দিয়ে দেবে। কাল চলে আসবেন।' এবার মিঃ আর মিসেস রায়ের দিকে লক্ষ্য করে বললেন, চলি দুজনে।

স্বামী-স্ত্রী প্রায় এক সঙ্গে বলে উঠলেন, এক্ষুণি?

'হ্যাঁ এক্ষুণি যাব, তার কারণ আমাকে একটু ঘুরে মুন্নাকে সিনেমা থেকে আনতে হবে।'

মিসেস রায় বললেন, মুন্না সিনেমায় গেছে?

'হ্যাঁ।'

'আজ সকালে যখন টেলিফোন করে-ছিলাম, তখন তো কিছু বললে না।'

'মুসৌরী থেকে রমা এসেই ওকে নিয়ে সিনেমায় গেছে।'

'রমা আজ থাকবে?' মিসেস রায়ই জানতে চাইলেন।

'হ্যাঁ, ও কাল সকালেই যাবে।'

ডকটর সরকারকে আমরা সবাই বিদায় জানাতে বারান্দায় এলাম। গাড়ীতে উঠে উনি আর একবার আমাকে আমন্ত্রণ জানালেন, কাল আসছেন তো?

আমি বললাম, আচ্ছা আসব।

ডকটর সরকার চলে গেলেন।

(ক্রমশঃ)

শীতের ঠাণ্ডায়
গরম চা সবার প্রিয়
কেনবার সময়
অলকানন্দার এই
সব বিক্রয় কেন্দ্রে
আসবেন
অলকানন্দা টি হাউস
৭ পোলক স্ট্রীট : ২ লালবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১
৫৬ চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-১২

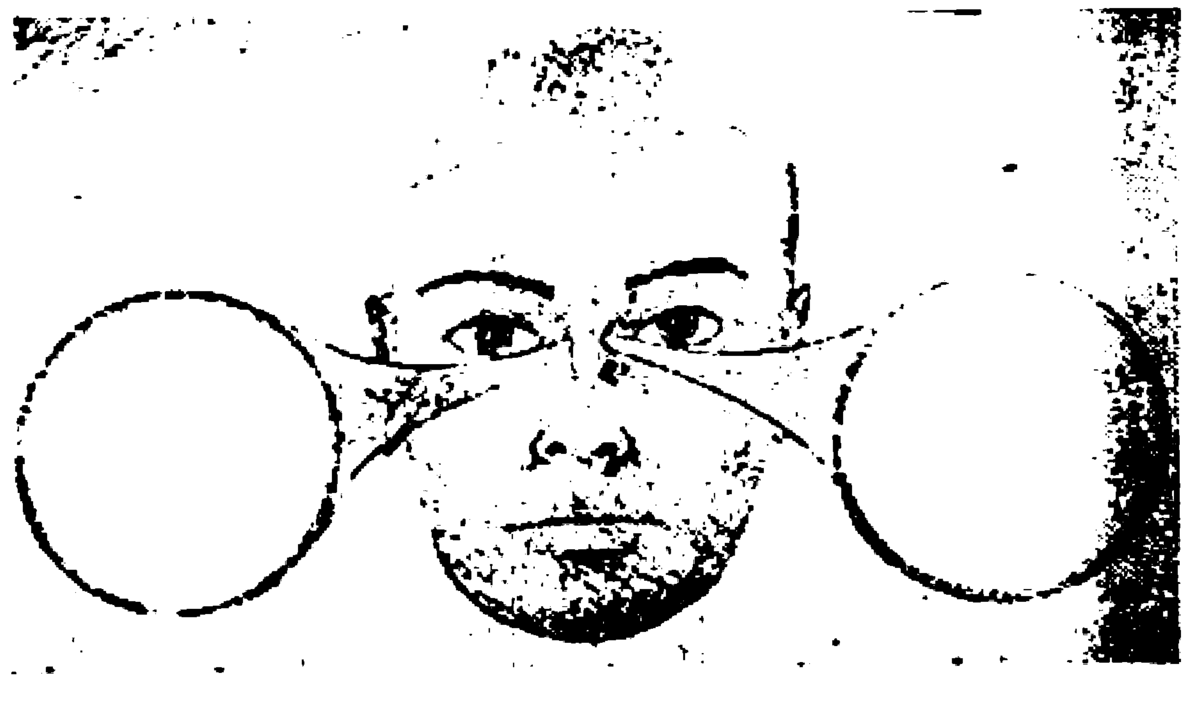

বিজ্ঞানের কথা

আমরা গন্ধ শুঁকি কি করে?

কোনো একটি জন্তু পালিয়ে যাচ্ছে, শুধু তার গন্ধ শুঁকেই কুকুর তার পিছু ধাওয়া করতে পারে। অপরাধী পালিয়ে যাবার অনেকক্ষণ পরে অপরাধীর ফেলে-যাওয়া কোনো বস্তু থেকে গন্ধ শুঁকে পুলিশের কুকুর সেই গন্ধ ধরে-ধরে এগিয়ে অপরাধীকে খুঁজে বার করেছে, এমন দৃষ্টান্ত এই কলকাতা শহরেও কম নয়। কুকুরের এই আশ্চর্য ক্ষমতা দেখে আমরা অবাক হই। কিন্তু প্রাণীজগতে গন্ধ শোঁকার ক্ষমতা কুকুরের চেয়েও বেশি, এমন দৃষ্টান্তও আছে। পুরুষ ফির্পাস মথ কয়েক মাইল দূর থেকেও স্ত্রী মথের গন্ধ টের পায়। গন্ধ টের পাবার এই ক্ষমতা কোনো-কোনো ক্ষেত্রে এমনই হতবুদ্ধিকর যে, সাধারণ বুদ্ধি থেকে তার কোনো ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। ফলে এ-ব্যাপারে উদ্ভট সমস্ত কল্পনা করা হয়েছে। এটা খুবই স্বাভাবিক, কেননা শারীরবিদ্যায় এই একটি বিষয়ে গবেষণা কিছুটা অবহেলিত। ঘ্রাণ ব্যাপারটি কী, নাকে কি করে গন্ধ ধরা পড়ে—কুড়ি বছর আগেও এ-নিয়ে কোনো গবেষণা হয় নি। প্রথম গবেষণা শুরু করেন যে বিজ্ঞানী তিনি হচ্ছেন লর্ড আড্রিয়ান। তিনিই বিষয়টিতে অন্য বিজ্ঞানীদের আগ্রহ জাগিয়ে তোলেন। তারপর থেকে ঘ্রাণ-সম্পর্কিত গবেষণায় ছেদ পড়ে নি। এখনো পর্যন্ত বিষয়টি সম্পর্কে জ্ঞান খুব বেশি নয়, তাহলেও নাকে কি ভাবে গন্ধ ধরা পড়ে তার মূল কথাগুলো মোটামুটি জানা গিয়েছে।

পলায়মান পশুর অতি মৃদু গন্ধকে অন্য সমস্ত গন্ধ থেকে আলাদা করে চিনতে পারা—কুকুরের এই আশ্চর্য ক্ষমতার মূলে প্রধান ভূমিকা বিশেষ এক ধরনের কোষের। নাসারন্ধ্রের ধারে-ধারে যে-সমস্ত টিসু রয়েছে, এই কোষগুলো রয়েছে তারই মধ্যে। আসলে এই ঘ্রাণ-কোষ ঘ্রাণযুক্ত কণিকাকে চিনে নিতে পারে, কতখানি ঘ্রাণ আছে তার মাপ নেয়, তার পরে নার্ভ মারফৎ সেই খবর পাঠিয়ে দেয় মস্তিষ্কে।

সঙ্গের এক নম্বর ছবিটি ঘ্রাণ-কোষের, অনেক বড়ো করে দেখানো। কোষটি দুই মেরু বিশিষ্ট। তার দেহটি অণ্ডাকার। কোষের প্রত্যন্ত অংশ থেকে ছড়িয়েছে দণ্ডের মতো চেহারার একটি ব্যাপার আর তা শেষ হয়েছে বাইরের সীমানার ঝিল্লীতে। এই শেষ হওয়ার জায়গাটি গোল আর বড়ো, একটি ফোসকার মতো, বলা যেতে পারে ঘ্রাণ-ফোসকা। এই ফোসকা থেকে ঠেলে বেরিয়ে শ্লেষ্মা পর্যন্ত গিয়েছে কতকগুলো অতিসরু চুলের মতো ফিলামেন্ট। এগুলোকে বলা হয় সিলিয়া। কোষের অপর দিকটি ক্রমেই সরু হয়ে মস্তিষ্ক পর্যন্ত চলে গিয়েছে।

এই হচ্ছে ঘ্রাণ-কোষ। এই ঘ্রাণ-কোষের যে অংশটি আমাদের আলোচনার পক্ষে বিশেষ দরকারী তা হচ্ছে সিলিয়া—অতি সরু চুলের মতো কতকগুলো ফিলামেন্ট। ঘন একটা জালের মতো এগুলো ছড়িয়ে থাকে শ্লেষ্মার ওপরে আর গন্ধযুক্ত কণিকাগুলো এই জালেই ধরা পড়ে। এখনো পর্যন্ত যতোটুকু জানা গিয়েছে তা থেকে বলা চলে, নাকে গন্ধ ধরা পড়ার প্রক্রিয়ার প্রাথমিক ক্রিয়াটি এই সিলিয়ার ঝিল্লিতেই সম্পন্ন হয়ে থাকে। তবে ঠিক কিভাবে এই গন্ধ-রূপ উদ্দীপকটি বৈদ্যুতিক সঙ্কেতে রূপান্তরিত হয়, যে-সঙ্কেত নার্ভ মারফৎ গিয়ে পৌঁছয় মস্তিষ্কে, তা এখনো পুরোপুরি জানা যায় নি। শুধু এটুকু বলা চলে এ-দুয়ের মধ্যে সরাসরি সম্পর্ক।

সিলিয়া আরো একটি বড়ো কাজ করে থাকে। সিলিয়া ছড়ানো রয়েছে ঘন একটি জালের মতো। ফলে প্রত্যেকটি গন্ধ-কোষে গন্ধ-ধরার এলাকার আয়তন অনেকখানি বেড়ে যায়। মানুষের নাকের এক-একটি দিকে সমস্ত সিলিয়ার মোট আয়তনের পরিমাণ ৩০ থেকে ৫০ বর্গ-সেন্টিমিটার পর্যন্ত। অর্থাৎ সিলিয়ার গ্রাহক ঝিল্লী যেন দুটি মস্ত জাল, যাতে রাসায়নিক সাড়া জাগে। অপর ছবিতে শিল্পীর কল্পনায় এ-ব্যাপারটি দেখাবার চেষ্টা করা হয়েছে। আমরা যখন নাক দিয়ে বাতাস টানি, এই জালে তা বিস্ফোরিত হয়। অধিকাংশ স্তন্যপায়ী প্রাণীর ক্ষেত্রে ঘ্রাণ-কোষ দ্বারা ব্যাপ্ত এলাকাটি মানুষের চেয়ে যথেষ্ট বড়ো। মানুষের চেয়ে এই সব প্রাণীর গন্ধ ধরার ক্ষমতা কেন বেশি, সম্ভবত এই তার একটি কারণ।

কিছুকাল আগেও অনেকের ধারণা ছিল যে, গন্ধযুক্ত কণিকা থেকে একটা কিছু বিকীরণ ঘটে আর তা থেকেই নাকে গন্ধ ধরা পড়ে। এখন স্পষ্টভাবেই বলা চলে, গন্ধযুক্ত কণিকাগুলো গন্ধ-কোষের সরাসরি সংস্পর্শে এলে তবেই গন্ধ ধরা পড়ে। তবে সিলিয়ায় পৌঁছবার আগে গন্ধযুক্ত কণিকাগুলোকে পার হতে হয় শ্লেষ্মার অতি পাতলা একটি জলবৎ স্তর। সাধারণত ধরে নেওয়া হয় যে, গন্ধ ধরা পড়ার প্রক্রিয়ার এই হচ্ছে প্রথম পর্ব। এর ফলে সিলিয়ার ঝিল্লির পরমাণুর বিন্যাসে কিছু অদল-বদল ঘটতে পারে এবং ঝিল্লির বিশেষ বিশেষ অবস্থানে গন্ধযুক্ত কণিকাগুলো স্থান করে নিতে পারে। ঠিক কী চেহারায় ব্যাপারটি ঘটে তা এখনো গবেষণার বিষয়। তবে একথা ঠিক, শুধু পরমাণুর বিন্যাস-গত অদল-বদল নয়, অন্য নানাভাবেও গন্ধযুক্ত কণিকাগুলো গন্ধ কোষকে প্রভাবিত করে থাকে।

শেষ পর্যন্ত এই দণ্ড-কোষের মাধ্যমেই গন্ধ-রূপে উদ্দীপক রূপান্তরিত হয় বৈদ্যুতিক সংকেতে। এই রূপান্তরণের চূড়ান্ত প্রমাণ বিজ্ঞানীদের হাতে আছে কিন্তু এই রূপান্তরণ ঠিক কিভাবে হচ্ছে, তার বিস্তৃত চেহারাটি এখনো বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিষয়।

কেঁচো সম্পর্কে জানবার কথা

কেঁচো নামক জীবটিকে আমরা যে বিশেষ পছন্দ করি মনে হয় না। জলের, ডাঙার ও আকাশের হরেক রকমের জীব আমাদের রূপকথায় ও উপকথায়-নীতিকথায় ভিড় করে আছে। আধুনিক কবি চিল নিয়েও কবিতা লিখেছেন, আধুনিক চলচ্চিত্রকার অরণ্যের ও মরুভূমির জীবদের বিচিত্র জীবন-যাত্রা দেখাতে গিয়ে কাঁকড়াবিছেকেও বাদ দেন নি, তিমি মাছ নিয়ে বিশ্ব-সাহিত্যের স্মরণীয় সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে, হাতি ও পাখি নিয়ে লেখা এক-একটি গোটা উপন্যাসের সংখ্যা বড়ো কম নয়। ভ্রমরের গুনগুন, পাখির পাখনাটি, পেঁচার চাউনি ও আরো অনেক কিছুই আমাদের কবিদের কাছে ভাবপ্রকাশের রূপকল্প— কিন্তু কেঁচো? এই বিশাল প্রেক্ষাপটে কেঁচোর স্থান বড়ো একটা নেই। কোনো কোনো লেখক মেরুদণ্ডহীন ভীরু স্বভাবের মানুষকে কেঁচোর সঙ্গে তুলনা করে আর যাই করুন কেঁচো নামক জীবটি সম্পর্কে জ্ঞানের পরিচয় দেন নি।

জীববিজ্ঞানীদের কাছে অবশ্য কি কেঁচো, কি ব্যাঙ, কি আরশোলা সবই সমান আগ্রহ ও পর্যবেক্ষণের বিষয়। জীব-বিজ্ঞানের প্রাথমিক ছাত্রকে পর্যন্ত অন্য অনেক কিছুর সঙ্গে কেঁচো সম্পর্কেও জানতে হয়। ব্যবচ্ছেদ-পাত্রে দুটি মাত্র পিনের সাহায্যে একটি জ্যান্ত কেঁচোকে গেঁথে নিয়ে ছুরি চালানোর দক্ষতায় উত্তীর্ণ হয়ে তবেই তাকে নিজের চোখে কেঁচোর শরীরের আঁধিসন্ধির অনুসন্ধান করতে হয়। এক্ষেত্রে বলা যেতে পারে, লম্বা পিচ্ছিল একটা সুতোর মতো কেঁচোর শরীরটাই ব্যবচ্ছেদবিদ্যার তাকে পাকা করে তোলে। কেঁচোর শরীরে ছুরি চালনায় পাকা হাত শিরাপথে ভুল করবে, এমন সম্ভাবনা কম। কেঁচো এদিক থেকে অবশ্যই ব্যবচ্ছেদবিদ্যা-শিক্ষার্থীর পক্ষে উপকারী জীব।

আজকের বিজ্ঞানের কথায় কেঁচোদের সম্পর্কে অন্য ধরনের একটি খবর জানাতে চাই যা থেকে ধারণা হবে জগৎসংসারে আমাদের জীবনধারণের পক্ষেও এই জীবটির ভূমিকা কম উপকারী নয়।

খবরটি এই : যে-জমিতে কেঁচো আছে সেই জমির গাছ অধিকতর বাড়ন্ত হয়ে থাকে।

খবরটি নতুন নয়। গত একশো বছরেরও বেশি কাল ধরে জমি নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেছেন তাঁদের মুখে শোনা গেছে। বিবর্তনবাদ তত্ত্বের প্রবক্তা বিজ্ঞানী চার্লস ডারউইনও বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে গিয়েছেন। তাঁদের ধারণা ছিল, কেঁচো ও জমির ভিতরকার অন্যান্য মেরুদণ্ডী প্রাণী মৃত উদ্ভিদের জৈব পদার্থকে জমির সঙ্গে মিশিয়ে দেয়, জমির চূর্ণীসাধন করে, জমিকে আলগা করে দেয় এবং তার ফলে জমি থেকে পাওয়া যায় আরো বেশি পরিমাণ নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ও উদ্ভিদের বাড়বৃদ্ধির জন্যে প্রয়োজনীয় অন্যান্য জরুরি পদার্থ। তবে একশো বছরেরও বেশি কাল ধরে এই কথাগুলো যদিও বলাবলি হচ্ছিল কিন্তু এতদিন হাতেকলমে পরীক্ষা করে কেউ প্রমাণ উপস্থিত করেন নি যে, উদ্ভিদের আরো বাড়বৃদ্ধির জন্যে ও আরো ফসলের জন্যে জমির মধ্যেকার এই লক্ষণগত পরিবর্তনগুলো কতখানি জরুরি।

ফ্রান্সের দিজঁতে অনুষ্ঠিত জমি-সংক্রান্ত প্রাণীবিদ্যার চতুর্থ আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে (সেপ্টেম্বর ১৯৭০) দুজন গবেষক স্বতন্ত্রভাবে উদ্ভিদের বাড়বৃদ্ধি ঘটাবার ব্যাপারে কেঁচোর ভূমিকা সম্পর্কে সাক্ষ্যপ্রমাণসহ উপস্থিত হয়েছেন।

একজন হচ্ছেন কানাডার ওন্টারিওর মৎস্য ও অরণ্য বিভাগের ডি কে মার্শাল। তিনি কয়েকটি টবে পাইন জাতীয় গাছের চারা পুঁতেছিলেন। কোনো কোনো টবে ছিল সাধারণ মাটি, কোনো কোনো টবে জীবন্ত বা মরা কেঁচো সমেত মাটি। তারপর উনিশ মাস ধরে তিনি সেই চারাগাছগুলোর শেকড়, কাণ্ড ও শাখার মাপ এবং ওজন নিয়েছিলেন। পরীক্ষার শেষে দেখা গেল যে-সব টবের মাটিতে কেঁচো ছিল সেখানকার চারাগাছের কাণ্ড বেশ লক্ষণীয় রকমের বেশী ভারী ও অপেক্ষাকৃত মোটা, শেকড়ের বুনট অনেক ঘন। যে-সব টবের মাটিতে কেঁচো ছিল না সেখানকার চারাগাছ এমনটি নয়। তারপরে তিনি বিভিন্ন টবের জমির উর্বরতা বিশ্লেষণ করে দেখলেন। কেঁচো সমেত জমিতে নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও ক্যালসিয়াম পাওয়া গেল অনেক বেশি, কিন্তু পটাসিয়াম কম। তিনি সিদ্ধান্ত করলেন যে, জমির এই তারতম্যের দরুনই কেঁচো সমেত জমির চারাগাছের বাড়বৃদ্ধি বেশি। এই পরীক্ষাকার্য চালাতে গিয়ে আরো একটি ব্যাপারে তিনি স্পষ্ট সিদ্ধান্ত টানতে পারলেন। অনেকের ধারণা, অমেরুদণ্ডী প্রাণীর শরীর জমির সঙ্গে মিশলে জমির উর্বরতা বাড়ে। কিন্তু মার্শাল দেখলেন মরা কেঁচো সমেত জমির চারাগাছে আর কেঁচোহীন জমির চারাগাছে কোনো পার্থক্য নেই। এ থেকে তাঁর সিদ্ধান্ত, ধারণাটি ভুল, অ-মেরুদণ্ডী প্রাণীর পচনশীল শরীর-জমির উর্বরতা বৃদ্ধির সহায়ক নয়।

চিত্র—এক

দ্বিতীয়জন হচ্ছেন হল্যান্ডের আর্ন-হেমের জে আন বী। তিনি পরীক্ষাকার্য চালিয়েছিলেন ফলের বাগানে। ছটি ফলের বাগানে প্রত্যেকটি গাছের চারদিককার জমিতে তিনি কেঁচো ছেড়েছিলেন ছশোটি করে। তারপরে পর-পর দুটি বছর তিনি এই কেঁচোযুক্ত বাগানের গাছের বাড়বৃদ্ধির সঙ্গে কেঁচোহীন বাগানের গাছের বাড়-বৃদ্ধির তুলনা করেছিলেন। শেকড়ের সংখ্যা গণনায় দেখা গেল কেঁচোযুক্ত বাগানের গাছে শেকড়ের সংখ্যা ১৬ থেকে ১১ শতাংশ বেশি। জমির উর্বরতা বিশ্লেষণেও কেঁচোযুক্ত বাগানের জমির স্থান উঁচুতে।

আজকাল চাষের কাজে অনবরত কীট-নাশক রাসায়নিক ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এই কীটনাশক রাসায়নিক কেঁচোকেও ধ্বংস করে। ফলে জমির ফলন কমে যাবারই সম্ভাবনা।

দেখা যাচ্ছে কেঁচো নিতান্ত তাচ্ছিল্য করার মতো জীব নয়। জমির ফলন বাড়িয়ে তুলতে পারে যে জীব তার কদর অবশ্যই থাকা উচিত।

গানের সুরে ঘুম

বিশ্বের দেশে দেশে গানের সুরের বিচিত্র ব্যবহার শুরু হয়েছে। কানাডায় ও সোভিয়েত ইউনিয়নে গানের সুর বাজিয়ে শাকসব্জির ফলন বাড়ানো হচ্ছে। গানের সুর শুনতে শুনতে কাজ করলে কারখানার শ্রমিকদের উৎপাদন-ক্ষমতা নাকি দুলে ওঠে। সম্প্রতি বিলেতের একটি ডাক্তারী পত্রিকায় খবর বেরিয়েছে, কোনো একটি হাসপাতালে নাকি অনিদ্রার রোগীদের গানের সুর শুনিয়ে ঘুম পাড়ানো হচ্ছে।

হাসপাতালের এই ওয়ার্ডে রোগীর সংখ্যা ছিল বত্রিশ। প্রত্যেককেই ঘুম

পাড়াতে ঘুমের ওষুধ প্রয়োজন হত। তারপরে একদিন ডাক্তাররা ঠিক করলেন টেপ-রেকর্ড করা সঙ্গীত শুনিয়ে ঘুমের ওষুধ ছাড়াই রোগীদের ঘুম পাড়ানো যায় কিনা পরখ করে দেখবেন।

তা তো হল, কিন্তু কি ধরনের সঙ্গীত? হাল্কা পপ? ফিল্মী? নাকি ক্লাসিকাল? হাল্কা পপ ডাক্তাররা এক-কথায় বাতিল করে দিলেন। সঙ্গীত হওয়া চাই এমন যেন রোগীদের তেমন পরিচিত না হয়। অতএব, ক্লাসিকাল। তবে অবিমিশ্র ক্লাসিকালও নয়। অপেরা লোকসঙ্গীত ইত্যাদির সঙ্গে খানিকটা মিশেল। পরীক্ষার ফল পাওয়া গেল চমকপ্রদ। বাহান্নজন রোগীর মধ্যে সাতাশজনেরই কোনো ঘুমের ওষুধ প্রয়োজন হল না, গানের সুর শুনেই ঘুমিয়ে পড়লেন।

আমাদের দেশে এখন ট্রানজিস্টরের ছড়াছড়ি। ট্রানজিস্টরে গানের সুর শুনে লোকে বেশি ঘুম যায় কিনা তা এখনো জানা যায় নি। তবে ট্রানজিস্টরে গানের সুর শুনে পেটের খিদে ভুলে থাকা যায় কিনা, বেকার থাকার যন্ত্রণা সহনীয় মনে হয় কিনা, এ-বিষয়ে গবেষণা চালাবার যথেষ্ট স্কোপ আমাদের দেশে আছে বলে মনে হয়। চাই কি, তার ফলে আজকের অশান্ত পরিবেশকে শান্ত করার উপায়ও পাওয়া যেতে পারে।

—অয়স্কান্ত

একই ধোপে ৩ ভাবে কাজ ক'রে...

ডেট বেশী সাদা করে
—অন্য যে কোন পাউডারের তুলনায়
কেন এবং কিভাবে তা করে দেখুন
১ ডেট—এ রয়েছে বিশেষ সক্রিয় পদার্থ যা কাপড়ের [illegible] কঠিন ময়লা সহজেই দূর করে—কাপড় চমৎকার পরিষ্কার হয়।
২ ডেট -কাপড়ের [illegible] বাড়তে দেয় না, কাপড় বেশী পরিষ্কার হয়, বেশী পরিষ্কার থাকে।
৩ ডেট—কাপড় [illegible] বেশী সাদা ও উজ্জ্বল হয় (এতে নীল বা সাদা [illegible]
[illegible]
আজই কিনুন—ডেট
[illegible] লিমিটেড, বোম্বাই

অঙ্গনা

খোকা ঘুমালে

বাচ্চাকে খাওয়ানো-দাওয়ানো যেমন এক সমস্যা তেমনি ঘুম পাড়ানোও এক বিরাট সমস্যা। প্রত্যেক মা-বাবাকেই এই সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। শিশু যে সব সমস্যা বহুল প্রশ্নের অবতারণা করে গোড়া থেকেই তার সূত্রপাত ঘটে। এজন্য খুব একটা ঘাবড়ানোর কিছু নেই। এসব সমস্যা বহুল প্রশ্নের অর্থ এই নয় যে খুব একটা অবহেলা চলতে পারে। বরং সময় বুঝে অভিজ্ঞ মানসিক চিকিৎসকের দরবারে সমস্যাসহ শিশুটিকে হাজির করা দরকার। ঘাবড়ানোর কিছু নেই এজন্য যে, শিশুর কোন অভ্যাসই খুব একটা দীর্ঘস্থায়ী হয় না। কিন্তু যদি শিশুকে অবহেলা করা হয় এবং তার জন্য ভাল ব্যবস্থা না হয় তবে সেই অভ্যাস ভবিষ্যতে খারাপ রূপ নিতে পারে। এর অর্থ হলো এই যে, শিশুকাল থেকেই অভ্যাস বিকশিত হয়।

শিশুকে ঘুম পাড়ানোর সমস্যাও এই একই রকম। অভ্যাস গঠনের ব্যাপারে এসময় থেকে নজর দেওয়া সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বয়স্ক ব্যক্তিদের আচার-আচরণে শিশুকে বিশেষ প্রভাবিত করে। তাই দেখা যায়, এসময় তার খাওয়া-দাওয়ার যেমন অভ্যাস করানো হয় ভবিষ্যতে তাই চরিত্রের অঙ্গ-রূপে প্রকাশ পায়। অনেক শিশু আছে স্তন দুধ খেতে চায় না অথবা বোতলের দুধেও সে গররাজী। খাওয়ার কথা শুনলেই সে উচ্চস্বরে কান্না জুড়ে দেয়। মা-বাবা অধিকাংশ ক্ষেত্রে নানা প্রলোভন দেখিয়ে শিশুকে সাময়িক নিবৃত্ত করেন। সেই শিশুবেলায়ই তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে খাওয়ানো একান্ত অসম্ভব। এই ইচ্ছার জোর আস্তে আস্তে খাওয়া থেকে অন্যত্রও প্রসারিত হয়। ফলে, শিশুচরিত্রের উন্মেষে যথেষ্ট ত্রুটি থেকে যায়। সে মনে করে মুখের জোরে নিজের দাবী আদায় করে নেওয়া খুবই সহজ।

আবার কোন কোন মা শিশুকে দুধের বোতল দিয়ে ঘর-সংসারের কাজে মেতে থাকেন। শিশু হয়তো খাচ্ছে না অথবা কান্নাকাটি করছে। মায়ের কিন্তু সেদিকে নজর দেবার ততটা অবসর নেই। তিনি আপন মনে কাজই করে চলেছেন। শুরুতেই শিশুরা এক্ষেত্রে প্রচণ্ড ধাক্কা খায়। এতে তাদের চরিত্রে বেশ দাগ পড়ে। এসব শিশুরা একটু উগ্র মেজাজী হয়। মা-বাবার দোষে এভাবেই শিশুর জীবন হয়ে ওঠে নিরাশাপূর্ণ। যদি শিশুকে যথার্থ মানুষ করে গড়ে তুলতে হয় অর্থাৎ সব মা-বাবাই যা চান, তবে এ সম্পর্কে যথেষ্ট সজাগ থাকতে হবে। কারণ, এই সামান্য সব ঘটনা থেকেই তার মনে নানা বিরোধের সৃষ্টি হয়। সে এর বদলা নিতেও ছাড়ে না। নির্ধারিত সময়ে মা যখন আবার তাকে স্তনপান অথবা বোতলের দুধ খাওয়াতে আসবেন তখন সে গড়াতে শুরু করবে। এসময় মুখই হবে তার সবচেয়ে বড় হাতিয়ার।

এরকমভাবে শিশু বেড়ে ওঠে। শিশু-কালে কান্নার বাড়িমাৎ করার ঘটনা থেকেই তার চরিত্রের বিকাশ বড় হয়েও সে নিজের কথাকে নষ্ট হতে দেবে না। এর প্রথম এবং স্পষ্ট প্রকাশ দেখা যাবে সে যখন কথা বলতে শিখবে। তার কথা হবে কটু এবং আচরণ হবে নির্দয়।

বাচ্চা যখন দু তিন বছরে পা দেবে তখন তার আচার-আচরণে ভাল-মন্দের বিকাশ ঘটতে শুরু করে। এসময়ে মা-বাবা এবং অভিভাবকদের অত্যন্ত সতর্ক থাকা দরকার। অত্যন্ত নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এবং যত্নের সঙ্গে শিশুর আচার-আচরণ নির্ধারিত করা প্রয়োজন। তাহলেই শিশুর চরিত্র হবে সুগঠিত এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাপূর্ণ।

কখনো কখনো শিশু মা-বাবাকে ছাড়িয়ে চিকিৎসককেও এক বিরাট সমস্যায় ফেলে দেয়। শিশুকে ঘুম পাড়ানো নিয়ে সবাই বিব্রত। কেউ কেউ বলেন যে, যেমন সময়ে খাওয়া-দাওয়া তেমনি সময়ে শিশুকে ঘুম পাড়ানো দরকার। এই অভ্যেস যদি করানো যায় তবে তা তো খুবই ভাল। কিন্তু তা বলে মা-বাবাকে এরকম পরামর্শ দেওয়া সংগত নয় যে বাচ্চা যদি নির্দিষ্ট সময়ে শুতে কিছু আপত্তি করে তো তাকে জোর করে শুইয়ে দিতে হবে। প্রয়োজন হলে তাদের খাবার জন্য যেমন মিষ্টি দুধ দেওয়া হয় তেমনি এবার ঘুমের জন্য ওষুধ খাইয়ে দিতে হবে। এর ফল হয় খুবই মারাত্মক। এর কুফল আর সবকিছুর মতো পরেই ফলে।

শিশুকে ঘুম পাড়ানোর ব্যাপারটা একান্তভাবেই মায়ের। তার ঘুমের জন্য এমন কোন পন্থা বের করতে হবে যে, একবার অভ্যাস হয়ে গেলে আর দ্বিতীয়বার ঘুমের জন্য তাকে বলতে হবে না। সে ঠিক সময়মাফিক শুয়ে পড়বে। বাচ্চা যখন আর বাচ্চা থাকে না অর্থাৎ চলতে ফিরতে পারে, হেসে খেলে কথা বলে বাড়ির সবাইকে আনন্দ দেয় তাকে ঘুম পাড়ানোর ব্যাপারেও অনেক সময় এই সমস্যার উদ্ভব হয়। এসময় আবার তাকে শোয়ানোর জন্য চেষ্টা করলেও সে এতে মোটেই সন্তুষ্ট হয় না। ইংল্যাণ্ডের এক বিখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ আর এস ইলিংওয়ার্থ ঘুমের ব্যাপারে শিশুকে শুধু করে মায়ের মনে যে শংকার সৃষ্টি হয় তিনি তার প্রতিকারের পথ বাতলে দেন।

প্রত্যেক বাচ্চারই নিজের নিজের শোবার একটা সময় আছে। একজন বিশেষ-ভাবে নজর দেওয়া দরকার যে এই নির্দিষ্ট সময়টুকুতে সে কি করে. ঘুমোয় না জেগে থাকে? বাচ্চা রাত্রিবেলা শোবার আগে কিছুক্ষণ জেগে থাকে এবং ভোরবেলা ঘুম থেকে ওঠার নির্দিষ্ট সময়ের বেশ কিছুক্ষণ আগেই তার ঘুম ভেঙে যায়। এজন্য বিশেষ চিন্তার কোন কারণ নেই। কারণ, শিশুর কখন শোওয়া উচিত এবং কতক্ষণ শোওয়া উচিত সে ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন মত আছে।

শিশুর শোওয়ার ব্যাপারে মায়ের নজর দেওয়া বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। অন্তত দু-তিন বছর পর্যন্ত এ সম্পর্কে খুবই সতর্ক থাকা

হয়েছেন। এর ফলে ভবিষ্যতে শিশুর সম্বন্ধে বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতায় অনেক নিরসন হয়। যদি বাচ্চা ঘুমুচ্ছে না দেখে মা ধমকান অথবা মারধোর, ভয় দেখান তবে তার বিপরীত ফল ফলে। ঘুম সম্বন্ধে তার মনে এক অজানা ভয় বাসা বেঁধে থাকে।

শিশুর প্রসঙ্গে মা কখনো কখনো ভুল করেন। গ্রীষ্মের দুপুরে বা এমনি সময়ে দুপুরে অনেক মাই চান যে শিশু বেশ কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নিক। এর মূল রহস্যটুকু হলো যে, সারাদিন সংসারের হাড়ভাঙা খাটুনির পর মাও একটু গড়িয়ে নিতে পারবেন। দুপুরে বাচ্চা দু-তিন ঘণ্টা টানা ঘুমিয়ে নিল। এরপরও মা আশা করেন সন্ধ্যার পাড়া পড়লেই বাচ্চা আবার ঘুমের কোলে ঢলে পড়বে। এ আশা কিন্তু অসঙ্গত। বিশেষ দু বছরের শিশুর কাছে এ আশা করা যায় না। অনেক মা এটা বুঝতে চান না। ফলে তাঁরা ভুল করেন। তাই নিয়ম হলো, দুপুরবেলা শিশুকে অল্পক্ষণ ঘুমুতে দেওয়া যাতে সন্ধ্যার সময় তার ঘুম পায়।

শিশুর শোওয়ার ব্যাপারে সমস্যার উদ্ভব হতে পারে এজন্য দিনের বেলা তার ঘুমের জন্য খুব একটা পীড়াপীড়ি না করাই ভাল। আর মায়েরও একারণে দুশ্চিন্তার কোন সঙ্গত কারণ নেই। দিনের বেলা ভালভাবে শিশুর পরিচর্যা করা চলে। মা সারাদিন শিশুকে নানা অনুশাসন শেখাতে পারেন। তাই দিনের বেলা শিশুকে ঘুম পাড়িয়ে নিশ্চিন্ত হওয়ার অর্থই হলো রাত্রিতে তার শোয়ার ব্যাঘাত ঘটানো। আর সারাদিনে যে শিশুর মধ্যে হতাশা আসে রাত্রিতে ঘুমানোর ব্যাপারে সে তত বেশি ঝামেলা করে।

বাচ্চার সঙ্গে এমন কোনকিছু করা উচিত নয় যাতে তার মনে দৃঢ় ধারণা না হয় যে কান্নাকাটি বা বায়না-আবদার করে সে ঠিক জিতে যাবে। মাকে হয় বাচ্চার সঙ্গে শুতে হবে অথবা তার পাশে বসে ছেলে ভুলানো কাহিনীর মাধ্যমে মনোরম পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। আর গান গেয়ে বাচ্চাকে ঘুমোতে পারলে তো সবচেয়ে ভাল।

যদি শিশু ঘুমুতে না চায় অথবা ছটফট করে তবু মায়ের বিরক্ত হওয়া চলবে না। অনেক মা এসময় রেগে গিয়ে বাচ্চাকে মারধোর করেন। এতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়। শিশু মায়ের কাছ থেকে ভালবাসা চায়। শিশুর সঙ্গে তাই ধীর-স্থির ব্যবহার করতে হবে এবং আদরযত্নে ভুলিয়ে রাখতে হবে। তবেই সমস্যাও অনেক হাল্কা হয়ে যাবে। বাচ্চা অনেক সময় মা-বাবার সঙ্গে থাকতে চায়। কোন কোন মা-বাবা এটা বুঝতে চান না। তাঁরা বিরক্ত হন। শিশুর সঙ্গে মা-বাবার পক্ষে এর চেয়ে নির্দয় ব্যবহার আর হতে পারে না।

দু'তিন বছর পরও এক একটি শিশু এক নাগাড়ে দু'তিন ঘণ্টা শুতে চায় না। জীবনধারার এই গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তটিতে শিশুকে একা একা কাঁদতে দেওয়া মায়ের উচিত হবে না। এজন্য তাকে নানাভাবে ভোলাতে হবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও মনে রাখতে হবে যে, এটা যেন তার অভ্যাসে না দাঁড়িয়ে যায়।

ঘুম পাড়ানোর সময় শিশুর সঙ্গে হৈহুল্লা না করাই ভাল। তাহলে ঘুমের নেশা কেটে যায়। কোনকিছু পড়েও শোনানো উচিত নয়। সম্পূর্ণ শান্তভাবে তাকে ঘুম পাড়াতে হবে। আবার মা যদি তার সঙ্গে শুতে না পারে অথবা সঙ্গে নিয়ে শোয় তবে গান গেয়ে অথবা গল্প শুনিয়ে তাকে ঘুম পাড়াতে হবে। শিশু কান্নাকাটি করে বলে অনেক মা তাকে ছেড়ে দেন। এটা কিন্তু উচিত নয়। একাকীত্বের অনুভব থেকেই সে কাঁদে এসময়। তাই যত্ন করে তাকে কোলে নিয়ে ঘুমপাড়ানি গান গাইতে হবে। ভালবাসা পেলে শিশু আপনি ঘুমিয়ে পড়বে।

রাতে শিশুর ঘুম ভেঙে যায়। এসময় সে মায়ের সঙ্গে হাসি গানে কাটাতে চায়। এটা খুব একটা খারাপ নয় কিন্তু এসময় শিশুকে একলা থাকতে দেওয়াই ভাল। তবে সব শিশুই যে রাত্রিরে জেগে ওঠে এমন নয়। যে শিশু দুপুরে বেশি ঘুমোয় এবং সন্ধ্যার পরই মায়ের তাড়নায় শুয়ে পড়ে তাদের ক্ষেত্রেই এটা ঘটে। মা-বাবার কথাবার্তায়ও শিশুর ঘুম ভেঙে যায়। এজন্য তার আলাদা শোবার ব্যবস্থা করা দরকার। শিশু যদি ঘুম ভেঙে কাঁদতে শুরু করে তবে সঙ্গে সঙ্গে তাকে আদর করে শান্ত করা দরকার। এব্যাপারে অবহেলা করা উচিত নয়। —প্রবীণা

পোল্যাণ্ডের মেয়েরা

পোল্যাণ্ডের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি এখন সবই প্রায় মহিলাদের অধিকারে। এইসব বিদ্যালয়ের শতকরা আশী ভাগেরও বেশি শিক্ষকতার কাজ করছেন মেয়েরা। স্বাস্থ্য বিভাগেও তাঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রাপ্ত শতকরা আশীজনেরও বেশী মহিলা, চিকিৎসাসংক্রান্ত বিভিন্ন কাজে রত আছেন, দন্ত চিকিৎসাতেও রয়েছেন সমসংখ্যায়। ওষুধপত্র তৈরী ইত্যাদির কাজে রয়েছেন শতকরা সাতাত্তর ভাগেরও বেশি। তবে চিকিৎসক হিসাবে মহিলাদের শতকরা হার কিছু কম—চুয়াল্লিশ ভাগ মাত্র।

যেসব কাজ আগে পুরুষদের একচেটিয়া বলে ধরা হোত, অনেক বছর ধরেই সেগুলো মেয়েদের আওতায় আসতে আরম্ভ করেছে। মেয়েদের উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে ইঞ্জিনীয়র, টেকনিসিয়ান, মেকানিক এবং ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার হবার জন্য। মেয়েদের কারিগরী বিদ্যালয়ে ভর্তি করার জন্য সীমা টেনে দেওয়া হচ্ছে অর্থাৎ স্কুল কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করা হচ্ছে শতকরা কিছু সংখ্যক মেয়ে ছাত্রী তাদের ভর্তি করতেই হবে। বাবা-মায়ের পুরনো সংস্কারের প্রাচীরে ধস নেমেছে আর স্কুলের কর্তৃপক্ষদের বোঝানো হচ্ছে যে ছেলেদের স্কুলে মেয়েদের ভর্তি করার আপত্তি একেবারে ভিত্তিহীন।

অনেক কারখানা এবং প্রতিষ্ঠানে রাজী করাবার চেষ্টা চলছে যাতে চিরকেলে পুরুষদের কাজগুলিতে মেয়েদের নিয়োগ করা চলে। মেয়েদের নিয়োগ করার দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্ত কর্মীপদগুলির পুনর্বিন্যাসের চেষ্টা, কারিগরী স্কুল থেকে স্নাতক হয়ে বেরিয়ে আসা মেয়েদের সামনে অনেক নতুন সম্ভাবনা খুলে দিয়েছে।

সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান হিসাব অনুসারে কি অবস্থা দেখা যায়? দক্ষ মহিলা কর্মীর কর্মনিয়োগের কাঠামো কি বদলে গিয়েছে? মেয়েদের বাছাইকরা পেশার কি পরিবর্তন ঘটেছে? অর্থাৎ মেয়েরা কি আগের চেয়ে আজকাল অ-প্রচলিত কাজ বেশী গ্রহণ করতে চাইছে?

১৯৫৮ আর ১৯৬৪ সালের কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান দপ্তরের কর্মী সংক্রান্ত গবেষণার ফলাফল থেকে এসব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়।

কয়েক বছর আগে মেয়েরা যেভাবে কারিগরী শিক্ষা গ্রহণ করতে ইচ্ছুক ছিল, তার চেয়ে মেয়েদের সংখ্যা আজকাল আরও কিছু বেড়েছে, আবার চিকিৎসাবিদ্যা এবং বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে মেয়েদের আজকাল অপেক্ষাকৃত কম দেখা যায়।

১৯৫৮-তে উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত প্রতি একশত কর্মী মহিলাদের মধ্যে ন'জন করে ছিলেন ইঞ্জিনীয়র, ১৯৬৪তে এ সংখ্যা বেড়ে হয় ১১ জন; ১৯৬৪ সালে উচ্চ-বিদ্যালয়ে প্রবেশ লাভ করেছে যেসব মেয়েরা তাদের প্রতি একশ জনের মধ্যে ১৬জন বেছে নিয়েছে কারিগরী শিক্ষা।

১৯৫৮-তে মাধ্যমিক বৃত্তিমূলক শিক্ষাপ্রাপ্ত প্রতি একশতজন মহিলা কর্মীর মধ্যে ১২জন ছিলেন কারিগর, ১৯৬৪তে তেরোজন, একই বছরে মাধ্যমিক বৃত্তিমূলক বিদ্যালয়ের প্রতি একশ ছাত্রীর মধ্যে ১৮জন ছাত্রী কারিগরী শিক্ষার পথ বেছে নিয়েছিলেন।

আরও বলা হয়েছে যে, বৃত্তিমূলক বিদ্যালয়গুলিতে মেয়েদের উপযোগী শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকলেও মেয়ে ছাত্রী আগে সেখানে অনুপাতে কমই ভর্তি হোতো কিন্তু বর্তমানে সেখানে ক্রমেই অধিকতর সংখ্যায় মেয়েরা ভর্তি হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, কারিগরী বিদ্যালয়গুলিতে মেয়েদের শতকরা হার ১৯৫৫-র ০·৩ থেকে বেড়ে ১৯৬৬তে শতকরা ১০এরও বেশী দাঁড়িয়েছে। আবার ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং স্কুলগুলিতে ১৯৫৫তে যেখানে শতকরা ৪·২ ছিল ১৯৬৬তে সেখানে হয়েছে শতকরা ১০।

পোল্যাণ্ডের মেয়েরা ধীরগতিতে দৃঢ়ভাবে কর্মজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করে চলেছেন।

—অঞ্জলি বসু

(পূর্বে প্রকাশিতের পর)

এসব নিয়ে বীথির কোন মাথাব্যথা নেই। ও স্পষ্ট করে বলে, গায়ের উপর মাছি বসলে তাড়িয়ে দেওয়া ছাড়া উপায় কি। এ নিয়ে খুঁতখুঁত না করে নির্বিকার থাকবি মীরা। অত বাছলে রাস্তায় বেরোন যায় না।

বীথিকে চোখের ইসারায় নামতে বলে মীরা। আবার ঠেলাঠেলি ধাক্কাধাক্কি। যথাসম্ভব নিজেকে বাঁচিয়ে নামল সে। বীথি দু' হাত দিয়ে কাপড় ঠিকঠাক করতে থাকে। হাসি হাসি মুখ। গা জ্বলে যায় ওর হাসি দেখলে। অন্য পুরুষের ছোঁয়া খুব ভাল লাগে বুঝি মুখপুড়ি! ইতর লোকগুলিকে যদি স্যাণ্ডেলের বাড়ি মারতে পারতো!

একটা রিকসা ডেকে উঠল দুজনে। বীথি বকবক সুরু করেছে। ওর প্রেমিকের গল্প। অনেক শুনেছে মীরা আর ভাল লাগে না শুনতে। অথচ আগ্রহ প্রকাশ করতে হবে। নইলে চটে যাবে বীথি। মুখ কালো করে কথাই বন্ধ করে দেবে। কী রে শুনছিস তো?

হ্যাঁ শুনছি বীথি। তারপর?

বাড়ির কাছাকাছি রিকসা আসতে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল মীরা। বীথি ভাড়া দিতে গেলে ধমক দিয়ে বলল, ইয়ারকি মারিস না। বলে তাড়াতাড়ি ভাড়া মিটিয়ে দেয়।

ঘরে ঢুকে প্রথমেই পল্টুকে দেখল। একটা বেলুন নিয়ে খেলছিল। ওকে দেখে ছুটে এল। দু' হাত দিয়ে জাপটে চিৎকার করে ওঠে, আমার বল কোথায় মামণি। কই দাও।

মীরা কোলে তুলে নিল পল্টুকে। বীথিকে বলল, ওঘরে চল। ছি পল্টু সোনা। দুষ্টুমী করে না। কী ভাববে তোমার এই মাসীটা। তোমার বীথিমাসী। দেখবে চল, তোমার জন্যে কী এনেছি।

পল্টু ঘাড় ফিরিয়ে বারবার বীথিকে দেখতে থাকে।

সবার সঙ্গে বীথির পরিচয় করিয়ে দেয়। নীহার খুব একটা আগ্রহ প্রকাশ করলেন না। দু' চারটি কথাবার্তার পর কাজের অজুহাতে সরে যান। মীরা খানিকটা বোঝে। স্নায়ুযুদ্ধের ফলাফল কী হবে তা সে জানে না। আজকাল বাক্যালাপ প্রায় বন্ধ। শেফালীর সঙ্গে আলাপ করছে বীথি। স্বাভাবিক সাবলীল আলাপ। বীথির কোলে পল্টু। দু' চোখ বড় বড় করে ওদের মুখ দেখছে। দাদা বাড়ি ফেরেনি এখনও। মনে পড়ল ওর সঙ্গে বেশ জরুরী কথা আছে।

—তোমরা কথা বল। এখুনি আসছি।

দিব্যি বীথির কোলে পল্টু চুপচাপ। হাসল মনে মনে মীরা। বীথি নিশ্চয়ই অনেক কিছু ভাবছে। বারান্দা দিয়ে এগোবার সময় রান্নাঘরে উঁকি মারল সে। উনুনের দিকে মুখ করে প্রস্তরমূর্তির মত মা বসে!

সিঁড়ি বেয়ে তাড়াতাড়ি নীচে নামতে থাকে মীরা। এই প্রথম বীথি এল বাড়িতে। খালি এক কাপ চা দেওয়া যায় না। কাছেই দোকান। মিষ্টি আর সিঙ্গাড়া কিনে ফিরল মীরা। কী অসভ্য ছেলেগুলি! শিস দিয়ে উঠল। হ্যাবলার মত হাসি। অশ্লীল উক্তি দূর থেকে ছুঁড়ে মারা। রীতিমত এখনও বুক কাঁপছে। আবছায়া অন্ধকারে রোয়াকে বসে থাকলেও গলার স্বরে চিনেছে। এ বাড়ির কয়েকটা বখাটে ছোকরা।

ঘরে ঢুকে মীরা বলল, রাস্তা থেকে হাসির শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম। কী ব্যাপার বৌদি?

—এমন কিছু নয়। বীথি হাসিমুখে বলে, এবার উঠতে হয়। ভারী লক্ষ্মী ছেলে পল্টু। খুব ভাব হয়ে গেছে আমার সঙ্গে।

—বসুন। এত তাড়াতাড়ি আপনাকে ছাড়ছি না।

শেফালী বেরিয়ে যেতেই বীথি স্পষ্ট চোখে তাকায় মীরার দিকে। খানিকক্ষণ তাকিয়ে দেখল। বহু কথা জমে রয়েছে। হুড়মুড় করে সব একসঙ্গে বেরিয়ে আসতে চাইছে।

—চুপ! মীরা শাসনের ভঙ্গিতে আস্তে আস্তে বলল, কোন কথা নয়। সব জানাবো তোকে। ছেলেটা দেখছি এরই মধ্যে তোর খুব ন্যাওটা হয়েছে। নিবি ওকে?

পল্টুকে জড়িয়ে আলতো চুমু খেল বীথি, পারবি দিতে? আমার কিন্তু আজ রাত্রে ঘুম হবে না। সত্যি, তোকে বাইরে থেকে দেখলে...। চুপ করে যায় সে। শেফালী ঘরে ঢুকল। মিষ্টি হেসে প্লেট চায়ের কাপ এগিয়ে দেয়।

—ওকে দে আমার কাছে। মীরা এক-রকম জোর করে পল্টুকে কোলে নেয়। পল্টু কিছুতেই আসবে না। বীথি হাসি খুব ভাল। তুমি শুধু বকো। কিছু কিনে দেও না। তুমি খারাপ দুষ্টু!

তিনজনে খুব হাসল। বীথি একা কিছুতেই খাবে না।

—ঢং করিস না। মীরা চোখ পাকায়, খিদে পেয়েছে অথচ বাইরে ভদ্রতা করছিস।

কিছুক্ষণ পর বীথি বিদায় নেয়।

শেফালী হাসিমুখে বলল, মাঝে মাঝে আসবেন কিন্তু।

—আপনি কবে যাচ্ছেন বৌদি? কিরণের সঙ্গে আলাপ হল না। আসছে মা সামনের রোববার।

সঙ্গে সঙ্গে কথা দিল না শেফালী। নিশ্চয়ই যাবে। যাওয়ার আগে মীরার কাছে খবর নেবে। পল্টুকে কোলে নিয়ে সিঁড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দেয় শেফালী।

শোভাবাজারের মোড়ে ট্রামে তুলে দেয় বীথুকে। হাঁটিতে হাঁটিতে সংক্ষেপে বীথুর প্রশ্নের জবাব দেয় মীরা। অসংখ্য প্রশ্ন। বুক ভার হয়ে ওঠে। গলা কেঁপে যায়। ফেরার পথে দ্রুত হাঁটে। কে জানে কোথায় গিয়ে পৌঁছবে সে! রজত একদিন বাড়িতে এসে হাজির হতে পারে। এই চিন্তা ওকে কুরে কুরে খাচ্ছে।

বাড়ি ফিরে দাদার মুখোমুখি হল।

কোন কথা বলল না বিনয়। কেমন অস্বাভাবিক গম্ভীর চোখমুখ। মীরা ভাবল আজ কোন আলোচনা করবে না। কাল সকালে দেখা যাবে। ঘরে ঢুকে দেখল চিৎ হয়ে পল্টু ঘুমিয়ে। ঝুঁকে ওর কপালে একটু চুমু খেল। ওর পাশে শুয়ে পড়ল। তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়ল টের পেল না।

।। আট ।।

বাইরে প্রকাশ না করলেও, হাসি হাসি মুখ, খুব স্বাভাবিক, কেন কিছু হয়নি; মীরার হাবভাব দেখে মনে মনে হাসে বিনয়। তুমি একটু কথা বলো দাদা, দ্যাখ লোকটা কী চায়, এভাবে পথে ঘাটে পিছু নেয় কেন। দেখবে বৈ কি। যদিও কাজটা কঠিন। রীতিমত অস্বস্তিকর। তবু কথা দিয়েছে, যাবে রজতদার কাছে, স্পষ্ট আলোচনা করা দরকার।

ভয় পেয়েছে মীরা। অতএব কিছু করা দরকার। বিনয় জানে না, আলাপ আলোচনার জলাকলটা শেষপর্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে।

টেলিফোনে সব কথা বলা যায় না। তবু রজতদা কয়েকবার জিজ্ঞেস করেছে, কী দরকার? প্রতিবার উত্তর দিয়েছে বিনয়, জরুরী কথা আছে। কখন দেখা হবে?

আজ এক পিরিয়ডের পর আর ক্লাস হয়নি। ছাত্ররা স্ট্রাইক করেছে। কারণ কী স্ট্রাইক সে জানে না। খুব একটা কৌতূহল প্রকাশও করেনি। সোজা বাড়ি চলে এসেছে।

—এত তাড়াতাড়ি ফিরলে? শেফালীর চোখমুখে কোলাকোলা। তাড়াতাড়ি সে বাসের কাপড় ঠিকঠাক করতে থাকে।

—স্ট্রাইক। পাঞ্জাবি খুলে আলনায় রাখে বিনয়, কী একটা ব্যাপারে ছাত্ররা স্ট্রাইক করেছে।

সাড়টায় পর রজতদা যেতে বলেছে। অনেকটা সময় হাতে। শেফালীর চুলের গন্ধ বড় তীব্র। বাথরুম থেকে হাত মুখ ধুয়ে এল বিনয়। বারান্দায় মা ঘুমিয়ে। পল্টু একপাশে শুয়ে। ওকে দেখে মিট-মিট করে হাসল। কথা বলতে সাহস পেল না। মা গম্ভীর মুখ ফিরিয়ে। খুব ভয় করে ওকে।

—চা তৈরী করবো? শেফালী হাসি-মুখে ধুতি গেঞ্জী এগিয়ে দেয়।

—একটু পরে। ও কি, যাচ্ছ কোথায়। বলে সে শেফালীকে কাছে টেনে নেয়। শেফালী কোন বাধা দিল না। বরং আরও ঘন হয়ে আসল বুকের কাছে। বিনয় পরপর কয়েকটা চুমো খায়। আশ্চর্য! কোন উত্তেজনা সে অনুভব করছে না। রক্ত তোলপাড় করে উঠছে না। তাকাল শেফালীর দিকে। দুচোখ বোজা। সমস্ত মুখে হাসি। হঠাৎ ইচ্ছে করল দূরে ঠেলে দেয় ওকে। কিন্তু এরকম অস্বাভাবিক আচরণ করা ঠিক হবে না ভেবে অতিকষ্টে নিজেকে সংযত করল।

বারান্দায় পল্টু হেসে ওঠে। শেফালী শরীরে নিজেকে দূরে সরিয়ে নেয়। ঘন ঘন তাকায় দরজার দিকে। তারপর মৃদু হেসে বিনয়ের দিকে ভ্রূভঙ্গী করে আস্তে আস্তে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়।

বিছানায় শুয়ে বিনয় সিগারেট ধরাল। শেফালী হাই সেকেন্ড ক্লাস পেয়েছে। দিনের পর দিন কেটে যাচ্ছে। কোন রকম চিহ্ন দেখছে না ওর দিক থেকে স্কুলে কাজ নেবার। এ সম্পর্কে একটা কথাও আজ পর্যন্ত বলেনি। বিনয় ভেবে কোন কূল কিনারা পায় না। বরং বিরক্তিতে মনটা বিষিয়ে ওঠে। কী চায় শেফালী? স্পষ্ট কোন দাবি নেই। গতানুগতিক জীবন-যাপন। বিয়ের পর মেয়েরা কী এরকমই হয়ে যায়? দূর ছাই! সে ছাইদানীর ভিতর সিগারেটের টুকরো গুঁজে দেয়। একটু বিশ্রাম দরকার। রজতদাকে কি কি প্রশ্ন করবে ভাবতে থাকে। নিতান্ত মীরার মুখ চেয়ে যাওয়া। নইলে লোকটার মুখদর্শন আর সে জীবনে করতো না! ওর কথা মনে পড়লেই বিতৃষ্ণা জাগে।

—ঘুমোলে নাকি। শেফালী বেশ জোরে কয়েকবার ঠেলা দেয়। দ্যাখ, এরই মধ্যে নাক ডাকা সুরু হয়ে গেছে। এই শুনছো।

পাতলা ঘুম। চোখ খুলে বিনয় প্রসাধিত মুখ দেখল। চায়ের কাপ হাতে শেফালী দাঁড়িয়ে। কটা বাজে? ঘড়ির দিকে তাকিয়ে লাফিয়ে উঠে বসল। ইস্ ছটা বেজে দশ।

চায়ের কাপ হাতে তুলে চুমুক দিয়ে বিনয় বলল, আরও আগে ডাকলে না কেন। সাড়টার মধ্যে পৌঁছতে হবে।

—কোথায়?

একটু ইতস্তত করল বিনয়। মীরা-রজতদা প্রসঙ্গ সবই জানে শেফালী। তবু এ সম্পর্কে আলোচনা করতে তার ভাল লাগে না। মনে হয় কোথায় যেন একটা অসম্মানের ব্যাপার রয়েছে।

কিছু বলার আগেই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায় শেফালী। রেগে গেল বোধহয়। মুখ কালো করে চলে গেছে। আপনমনে হাসল বিনয়। দ্রুত পোশাক পাল্টে নিল। এখন সময় নেই দুটো মিষ্টি কথা বা আদর জানানো। এপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছুটতে হবে।

বাইরে বেরুবার আগে রান্নাঘরে শেফালীকে দেখল। আনাজ কুটছে। মা মুড়ো কিছু বলছেন। মাকেও কিছু জানাল না বিনয়। পল্টু চিৎকার করে পড়ছে। পড়া মানে আবোল-তাবোল বকে যাওয়া। নিঃশব্দে দরোজা ঠেলে বাইরে এল। সিঁড়িতে অন্য ফ্ল্যাটের আলো এসে ছুইয়ে পড়েছে। সারা বাড়িতে মিশ্রিত চিৎকার। অস্পষ্ট, দুর্বোধ্য। গলিতে আবছায়া অন্ধকার। প্রেতের মত লরি দাঁড়িয়ে। ছায়া-মূর্তিরা নিঃশব্দে চলাফেরা করছে। ময়লার ঝাঁঝালো গন্ধ। দ্রুত হাঁটতে লাগল সে। নাকে রুমাল চেপে

বড় রাস্তায় পা দিয়ে ট্যাক্সি ডাকল। নইলে ঠিক সময় পৌঁছতে পারবে না। নরম গদী। হেলান দিয়ে বসে সিগারেট ধরাল বিনয়। মানুষজন, আলো, সাইন-বোর্ড সব উড়ে যাচ্ছে। কোন কিছু স্পষ্ট চোখে পড়ছে না। নানারকম ভাবনা উঁকি মারছে। রজতদা কিভাবে প্রস্তাবটা গ্রহণ করবে কে জানে। যদি অপমান করে? করুক। কোন প্রতিবাদ করবে না। মুখ বুজে সহ্য করবে। ফিরে আসবে। আর কোনদিন যাবে না। কোনরকম সম্পর্ক রাখবে না।

ভাগ্য বা নিয়তি এসব সে মানে না। তবু এরকম হয় কেন? এত ভুল বোঝাবুঝি, পরস্পরের প্রতি অশ্রদ্ধা, স্ত্রী কলহ, পরিণামে বিচ্ছেদ। এসব নাকি নিয়তি। মানুষের করবার কিছু নেই। তাই কী? বেশ সন্দেহ তার। কেননা মানুষের অসাধ্য কিছু নেই। আধুনিক মানুষ সবকিছুর মোকাবিলা করতে প্রস্তুত।

মেয়েদের মন বুঝে চলা কী দুঃসাধ্য ব্যাপার। বিয়ের পর এ-বোধটা তার তীব্র-তর হয়েছে। শেফালীকে ঠিক বুঝতে পারছে না। খুব কাছে অথচ কত দূরে। যখন তখন রাগ অভিমান চোখের জল। মাঝখানে কোলবালিশ রেখে কৃত্রিম ব্যব-ধানের প্রাচীর সৃষ্টি করা। মাঝরাত্রে নাটকীয় সুরে সংলাপ। অনেক সময় মনে হয়েছে, যে-স্ত্রীলোকটি তার বুকে মুখ গুঁজে নিঃশব্দে কাঁদছে, সে কী শেফালী, না অন্য কেউ!

বিমলটা এল না। গত রোববারে আসার কথা ছিল। যাকগে, না এলে কি করা যাবে। দিন দিন কেমন ভোঁতা হয়ে উঠছে ছেলেটা। চেহারার দিকে তাকালে বোঝা যায়। নিছক দিনগত পাপক্ষয়। ভেবে বিনয় শিউরে উঠল। ঐরকম জীবন-যাপন তার কল্পনার বাইরে। পরক্ষণেই মনে হল তার, সহস্র লক্ষ লক্ষ জনতা, রোজ সকালে যারা শহরতলী থেকে ট্রেনে ট্রামে বাসে চেপে শিয়ালদহ স্টেশন পেরিয়ে পিলপিল করে নানাদিকে ছুটে যায়, নিশ্চয়ই কোনখানে তাদের একটা তীব্র চাহিদা আছে বাঁচবার জন্যে। শুধু সেই জানে না।

ক্রমাগত ব্যবহারে সব জীর্ণ হয়ে যায়। পুরনো একঘেয়ে। ঘুরেফিরে একই কথা। আহার ভোজন শয়ন। পরিচিত শরীরের গন্ধ। কথা বলার ঢং হাসি বেড়ানো—ক্লান্তিকর পুনরাবৃত্তি। অথচ রেহাই নেই। তুমি মরে যেতে পারবে না বিনয়। মরে গেলে সবাই তোমাকে বলবে কাপুরুষ

CENTRAL LIBRARY

ফটো : সুভাষ সরকার

দায়িত্বহীন। এরই মধ্যে শেফালীকে তোমার ভাল লাগছে না। কেন?

'আমি জানি না।' বিনয় অস্ফুট স্বগতোক্তি করল। তারপর ড্রাইভারের দিকে তাকাল। ঘড়ি দেখল। প্রায় সাড়ে সাতটা। রজতদাকে না পেলে, যদি তার দেরী দেখে বেরিয়ে যায়, সাতটার মধ্যে পৌঁছবার কথা, তার উচিত ছিল শেফালীকে আগে থাকতে জানিয়ে রাখা। শেফালীরও কী উচিত ছিল না আরও আগে তাকে জাগিয়ে দেওয়া?

ট্যাক্সির মিটার দেখে ভাড়া মিটিয়ে বিনয় প্রায় ছুটতে শুরু করল। তার আগে লম্বা একটা ছায়া ছুটছে। ছায়াটা ক্রমশঃ লম্বা হচ্ছে। ছায়াটাকে মাড়িয়ে সে এগিয়ে চলল। কলিং বেল টিপে রুদ্ধনিশ্বাসে অপেক্ষায় রইল। শব্দ এগিয়ে আসছে। থপথপ শব্দ।

দরোজা খুলে রজত হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানাল, ভেতরে এসো বিনয়।

মুখোমুখি দুজনে সোফায় বসল। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল।

—জাস্ট এ মিনিট। বলে রজত সোফা ছেড়ে কিচেনে গিয়ে ঢুকল।

নিঃশব্দে সিগারেট টেনে চলে বিনয়। ঘরের চারিদিকে তাকায়। কোন চিহ্ন রেখে যায়নি মীরা। কীভাবে কথাটা শুরু করবে রজতদার সঙ্গে ভাবতে থাকে। রীতিমত অস্বস্তিকর ব্যাপার। তবু তাকে বলতে হবে। হাসতে হবে। এড়িয়ে চলতে হবে যথাসম্ভব কুশ্রী উত্তেজনা।

বুক-সেলফের কাছে নীচু হয়ে ঝুঁকে দাঁড়াল বিনয়। নতুন কোন সংযোজন নেই। কয়েক বছর আগের কেনা সব বই। ইতিহাস অর্থনীতির বই বেশি। পড়ার অভ্যাস কী রজতদার এখনো আছে? নাকি এই সব পড়াশুনা আর ভাল লাগে না। তার চেয়ে নিত্যনতুন উত্তেজনার মাঝখানে ডুবে থাকা অনেক মোহময়। শুধু রজতদা কেন, মনে পড়ল তার, অনেকের মুখ ভেসে উঠল, তারা সর্বশ্রেণীর, ফাস্ট লাইফ পছন্দ করছে। নিজের কাছ থেকে রেহাই পাবার জন্য নিত্যনতুন আনন্দের উপকরণ খুঁজছে। সত্যিই কী নিজের কাছ থেকে রেহাই পাওয়া যায়?

—কী দেখছো?

চমকে ফিরে তাকাল বিনয়। তারপর অপ্রস্তুতভাবে হেসে সোফায় এসে বসল। রজতদা মিটমিট করে হাসছে। বাইরে বেরোবার পোশাক পরে এসেছে। হাল্কা প্রসাধনের গন্ধ টের পেল। উজ্জ্বল চোখ-মুখ। কত বয়স হল রজতদার? প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি। মনে হয় না। অনেক কম মনে হয়। দুচোখের নীচে কালিমা ভাব। প্রসাধনেও তা ঢাকা পড়েনি।

নানারকম খাবার গোল টেবিলের উপর রাখল রামু। তারপর বিনয়ের উদ্দেশ্যে নত হয়ে অভিবাদন করে রান্নাঘরে ফিরে যায়।

—শুরু কর বিনয়। বলে রজত একটা ডিমের চপ মুখে পুরল। ছেলেটা সহজ হতে পারছে না। মনে মনে হাসল সে। বিয়ে করেছে খবর দেয়নি। এখন তাকে টলারেট করতে পারে না। তাকে শত্রুর চোখে দেখে। সব সে জানে বুঝতে পারে। হঠাৎ মনে হল একটু মজা করা যাক বিনয়ের সঙ্গে।

সাত-পাঁচ ভেবে বিনয় খাবারে হাত দিল। এখানে খেতে ওর প্রবৃত্তি নেই। তবু সামনাসামনি তা প্রকাশ করা যায় না। কেমন বাধ-বাধ ঠেকল। স্বেচ্ছায় এসেছে। অনুরোধ জানাতে। চকিতে মীরার মুখ ভেসে উঠল। আর্জি নিয়ে যখন এসেছে তখন অহঙ্কার, মর্যাদাবোধ এসব ভুলে যেতে হবে।

—বিয়ে করেছো শুনলাম।

সামান্য ফ্যাকাসে হয়ে ওঠে বিনয়ের মুখ। চোখাচোখি হল। কৌতুকের হাসি কী রজতদার মুখে? কিন্তু এরকম অস্বস্তির কোন অর্থ হয় না। তাড়াতাড়ি সে একটা সিগারেট ধরায়। হাসিমুখে তাকায়।

—ঠিকই শুনেছেন

—জানালে না কেন?

—এমনি। খুব তাড়াতাড়ি হয়ে গেল। একরকম কাউকেই জানাইনি।

অসংখ্য অস্বস্তি আস্তে ছড়িয়ে পড়ছে সমস্ত শরীরে। বিনয় কথা বলার সময় একদম তাকায় না রজতের দিকে। বিশ্রীভাবে তাকনো, খুকখুক করে হাসি, তাকে কী ছেলেমানুষ পেয়েছে। জেনেশুনে এসব প্রসঙ্গ তোলা কেন বাপু। আসলে তাকে নার্ভাস করতে চায় রজতদা। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে খেয়াল হল প্রায় ঘণ্টাখানেক হল এসেছে। এবার আসল প্রসঙ্গ তোলা যাক। যথেষ্ট ভণিতা করা হয়েছে

—শোন রজতদা। বিনয় দ্বিধাহীনভাবে স্পষ্টকণ্ঠে বলল মীরাকে তুমি মুক্তি দাও। ও ডাইভোর্স চায়।

রজত সোফা ছেড়ে উঠতে উঠতে বলে, গান শোন বিনয়। পাতিবনের গান শুনেছো?

আলমারি খুলে মদের বোতল বের করল। টেবিলের উপর দুটো গ্লাস। রেকর্ড বাজছে। মেঝেতে পা ঠুকে তাল দেয় মাঝে মাঝে রজত। গবগব করে সোডা ঢালে গ্লাসে। ফেনা গ্লাস উপচে পড়ে যায় আর কি। বরফের কুঁচি গ্লাসের ভিতর ফেলে দেয়।

গ্লাসে গ্লাস ঠুকে রজত মৃদু হাসল, চেখে দেখো। এক নম্বর বিলিতি মাল। দেরী কর না বিনয়। পেটে মাল না পড়লে সিরিয়াস বিষয় নিয়ে আলাপ করবে কিভাবে!

এক চুমুকে অনেকটা পান করল রজত। তারপর সিগারেট ধরাল। গ্লাস হাতে সোফার চারধারে ঘুরল কিছুক্ষণ। একটার

পর একটা রেকর্ড বেজে চলেছে। এলভিস্ প্রেস্লি। টুইস্ট নাচার ভঙ্গীতে ঘুরপাক খেল কয়েকবার সে।

—আশ্চর্য! চুপচাপ বসে আছ কেন বিনু। বলে সে গ্লাস বিনয়ের মুখের কাছে তুলে ধরে।

হাত দিয়ে গ্লাস সরিয়ে বিনয় রুদ্ধকণ্ঠে বলল, না! এড়িয়ে যেয়ো না রজতদা, কথার জবাব দাও। মীরা ডিভোর্স চায়। কেন তুমি ওকে অনুসরণ কর? কী লাভ? ও আর ফিরে আসছে না। চিরকালের জন্যে তোমাকে ত্যাগ করে চলে গিয়েছে। লিভ হার এলোন।

—স্বামী বেঁচে থাকতেও কোন বিবাহিতা রমণী কুমারী সেজে বাইরে চলাফেরা করে, এটা আমার জানা ছিল না বিনয়। এটা ফাঁস হলে ওর অফিসে পজিসন কী হবে জান?

—সেইজন্যেই কী ওর অফিস পর্যন্ত ধাওয়া করেছো? বিনয়ের মুখে ঈষৎ ব্যঙ্গের হাসি, এতটা দুর্বল চিত্ত তোমার, জানতাম না। লিভ হার এলোন রজতদা। আমি তোমাকে অনুরোধ করছি।

রজতের মুখচোখ ক্রমশঃ কঠিন হয়ে উঠতে থাকে। সোফা ছেড়ে সে রেডিয়োগ্রামের দিকে এগিয়ে যায়। ক্ষিপ্রহাতে সুইচ অফ করে সোফায় এসে বসে। সিগারেট ধরাবার সময় আগুনের শিখা থরকরক কেঁপে ওঠে। মাঝে মাঝে তাকায় বিনয়ের দিকে।

হঠাৎ সে চিৎকার করে ডাকল রামুকে। এবং হন্তদন্ত হয়ে রামু ছুটে আসলে টেবিলের উপর থেকে কাপ-প্লেট সব সরাতে নির্দেশ দিল।

রামু বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রজত ঠান্ডা গলায় বলল, আবার আমাকে উঠতে হবে বিনয়। বলে সে এক চুমুকে গ্লাসের সবটুকু মদ গিলে নেয়। সমস্ত মুখটা বিকৃত হয়ে যায়। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

একদম পাত্তা দিচ্ছে না রজতদা। বেহেড মাতাল কোথাকার! ইচ্ছে করছিল বিনয়ের, লোকটাকে ধরে দু-চার ঘা লাগিয়ে দেয়। ক্রোধে ওর সর্বশরীর জ্বলছিল। কোন জবাব দেবে না। ইচ্ছাকৃত এড়িয়ে যাওয়া। এখন ফিরে গিয়ে মীরাকে সে কী বলবে। নাকি দিনের পর দিন মীরা ঘরে-বাইরে অসম্মান, অস্বস্তি ও ভয়ের মধ্য দিয়ে দিন কাটাবে?

—যাই কর রজতদা, এটা মনে রেখ, মীরার অসম্মান আমি সহ্য করবো না।

আর অপেক্ষা করে লাভ কি। দ্রুত সিঁড়ি ভেঙে বিনয় নীচে নামতে থাকে। হঠাৎ থমকে দাঁড়ায়। কড়া প্রসাধন মেয়েটির সর্বাঙ্গে। অঙ্গের জন্যে ধাক্কা লাগেনি। একটু সরে দাঁড়াল সে। ভ্রূ কুঁচকে মেয়েটি ওকে একবার দেখে উপরে উঠে যায়।

কে মেয়েটি? ফুটপাতে পা দিয়ে বিনয় আস্তে আস্তে হাঁটে। কোথায় গেল? রজতদার ঘরে কী? চারিদিকে কোলাহল। নরনারীর মিছিল। রেস্টুরেন্ট থেকে উচ্ছল হাসি বাইরে ছিটকে আসছে। রজতদার ঘরে মেয়েটি যেতে পারে। হয়তো ওকে নিয়ে বেরোবে। বেশ যা ইচ্ছে সে করুক। কিন্তু তুমি রজতদা, মীরার পিছনে লেগেছো কেন! তুমি যত খুসী মদ খাও, নিত্যিনতুন মেয়েছেলে এনজয় কর, সে তোমার ব্যাপার। আমরা নাক গলাবো না। তেমনি তোমারও উচিত নয় মীরাকে বিরক্ত করা।

বাড়ি ফেরা পর্যন্ত বিনয় নিজের সঙ্গে নিঃশব্দে কথা বলে চলল।

বারান্দায় পা দিয়ে প্রথমেই মীরার মুখোমুখি হল। ওর দু'চোখে অসংখ্য প্রশ্ন। বিনয় মাথা নীচু করে আস্তে আস্তে হেঁটে নিজের ঘরে চলে আসে। ওর হাবভাব দেখে মীরা নিশ্চয়ই সব অনুমান করতে পারছে। পারা তো উচিত।

ঘর অন্ধকার দেখে বিনয় অনুচ্চস্বরে ডাকল, শেফালী! শেফালী! পর পর কয়েকবার। কোন সাড়াশব্দ নেই। অভ্যাসমাফিক সুইচ টিপে আলো জেলে দেয়। মশারীর ভিতর শেফালী। মশারী অল্প তুলে ওর ঘুমন্ত মুখ দেখল কিছুক্ষণ। ঠোঁটদুটি সামান্য ফাঁক। গোলাকার দুই উরুর মাঝখানে কোলবালিশ।

—এই শুনছো। বাহু ধরে বেশ জোরে নাড়া দিতে শেফালী অস্ফুটস্বরে দুর্বোধ্য কিছু উচ্চারণ করে চোখ খুলল। বিনয় হাসিমুখে তাকাল। 'ওঠ গিন্নী। সবে নটা বেজেছে।। শরীর খারাপ?' বলে সে ঝুঁকে চুমু খেতে গেলে শেফালী সবেগে দূরে সরে যায়।

বিনয় বিমূঢ় দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ লক্ষ্য করল শেফালীকে। এখনও রাগ যায়নি। মনে মনে হাসল সে। পোশাক পাল্টে নিল দ্রুত। তারপর বাথরুম। রান্নাঘরে জোরে জোরে কে কথা বলছে। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসল সে। ফের সুরু হয়েছে কলহ। ছিঃ এ কী কুশ্রী ভাষা পরস্পরের দিকে ছুঁড়ে মারছে।

—আস্তে মা। মীরা, এখান থেকে উঠে যা।

এর বেশি কিছু বলতে পারল না বিনয়। ক্রোধে তার সর্বশরীর ঠকঠক করে কাঁপছিল। ছি! ছি: মনে মনে উভয়কে সে ধিক্কার জানায়।

চলে যাবার মুখে নীহার বাধা দিলেন, শোন বিনু। ওর কথা শুনে পা পিত্তি জ্বলে যায়! পল্টুকে নাকি আমি খারাপ কথা শেখাই। আমার জন্যে নাকি ছেলেটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

—একশোবার! মীরা ফুঁসে উঠল। দু' চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে পড়ছে।

—তোর মুখে পোকা পড়বে। নীহার কান্নাবিকৃত কণ্ঠে বলেন, নচ্ছার মেয়ে কোথাকার! দুটো পয়সা রোজগার কারস অমনি দেমাকে মাটিতে পা পড়ে না। দ্যাখ বিনু, ওর সাজগোজের বাহার দ্যাখ। তোর মতলব বুঝি না ভেবেছিস। ছি-ছি! বেস্নাব মরে যাই।

তারপর প্রবল কান্নায় ভেঙে পড়লেন নীহার। কখন এক ফাঁকে শেফালী এসে দাঁড়িয়েছে। সে দু'হাতে নীহারকে জড়িয়ে সরিয়ে নিয়ে যায়।

স্তম্ভিত চোখ বিনয়ের। মীরার মুখ ফ্যাকাসে। ওর দিকে তাকিয়ে কিছু বলতে চেষ্টা করল সে। শুধু ঠোঁট দুটি নড়ে উঠল কয়েকবার। মীরা দ্রুত ছুটে যায় নিজের ঘরে। সশব্দে খিল এঁটে দেয়।

রাত্রে কেউ খেল না। ঘরে ঘরে আলো নিভে যায়। বিনয় চুপচাপ শুয়ে রইল। শেফালীর আচরণ বিরক্তিজনক। মাঝখানে কোলবালিশ। এত ক্রোধ কেন তোমার শেফালী। কথা বলার প্রবৃত্তি তার নেই। বারান্দায় নেই কোন সাড়া শব্দ। আর কান্নার শব্দ সে পাচ্ছে না। এতক্ষণে মা বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছেন। আর মীরা?

গাঢ় অন্ধকার। পাশ ফিরে তাকাল বিনয়। শেফালী কী ঘুমিয়েছে? ও হয়তো অনেক কিছু ভাবছে। মীরার মুখ রক্তশূন্য হয়ে উঠেছিল। এভাবে কতদিন চলবে জানে না সে। তার করবার কিছু নেই। নিস্পৃহ দর্শকের দৃষ্টিতে শুধু দেখেই যাবে। কেউ শুনবে না তার কথা। না মা, না মীরা।

পরের দিন স্কুল থেকে ফিরলে শেফালী নিস্পৃহ কণ্ঠে জানাল, তোমার বোন চলে গেছে।

—কোথায়? বিনয় বিস্ফারিত চোখে তাকাল। তারপর মীরার ঘরে এসে ঢুকল। খাঁ-খাঁ করছে সমস্ত ঘর। কোন চিহ্ন রেখে যায়নি মীরা। কিন্তু কোথায় গেল? তাকে কিছু না জানিয়ে চলে গেল!

রান্নাঘরে একরকম ছুটে আসে বিনয়। নীহার একবার চোখ তুলে তাকালেন।

—আপদ গেছে। হাড় জুড়িয়েছে আমার!

—মা! আর্তকণ্ঠে বিনয় বলল, এসব কি বলছো তুমি। শেষ পর্যন্ত তাড়ালে ওকে!

—কী বললি? আমি তাড়ালাম। নীহার হঠাৎ কপালে করাঘাত করতে শুরু করলেন। সঙ্গে সঙ্গে সুরু হল অনুনাসিক কণ্ঠে কান্না।

শেফালী শান্ত কণ্ঠে বলল, মার কী দোষ। কেউ স্বেচ্ছায় চলে গেলে আমরা কী করতে পারি। মা! উঠুন আপনি। কাঁদবেন না। আপনি বিশ্রাম করুন। আমি রান্না করছি।

(ক্রমশঃ)

সাঁ স্যুচি থিয়েটার

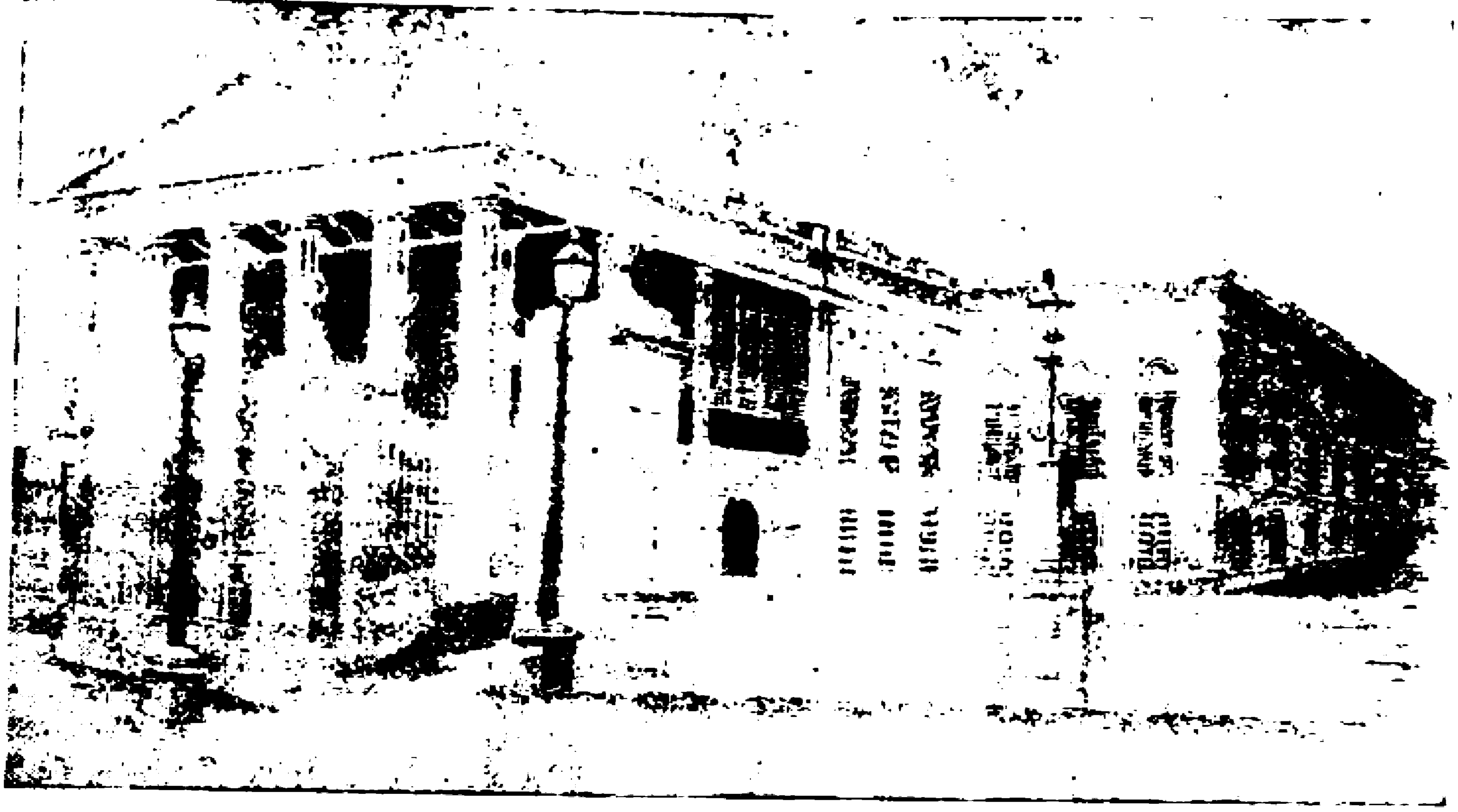

এক বিদেশিনী ও কলকাতার মঞ্চ

বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়

একশ উনত্রিশ বছর আগেকার একটি দিন।

সেদিন সুদূর অস্ট্রেলিয়ার নির্জন বন্দর থেকে একটি জাহাজ আসছিল কলকাতার পথে। ছোট্ট জাহাজ। নীল সমুদ্রের বুকে আঁকিবুকি কাটতে কাটতে ভেসে আসছিল জাহাজটি। মাথার ওপর নির্মল নীল আকাশ, নীচে নীল জলের অনন্ত বিস্তার।

জাহাজের মালিকের নাম হেনরী। সেদিন সকালে কিন্তু হেনরীর মনটা বড়োই অপ্রসন্ন। তার চোখে মুখে বড়োই অসহায় ভাব।

ডেকের ওপর স্ত্রীর পাশেই ঐ অসহায় মুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন হেনরী। স্ত্রী অভিমান করে দাঁড়িয়ে আছে জলের দিকে তাকিয়ে। সুন্দরী স্ত্রী, তাই তার অভিমান বড়ো প্রবল। শ্রীমতীর মুখের ওপর চোখ রেখে কীভাবে মান ভাঙানো যায়, সে কথাই মনে মনে ভাবছিলেন সাহেব।—শ্রীমতীর কেশর-সোনালী চুলে সমুদ্রবাতাস তখন উতরোল। ফুলে ফুলে উঠছে কেশদাম। আবার কখনো আবৃত করছে মুখশ্রী—অধর-কপোল-চিবুক। আর নীল চোখে ঝলসে উঠছে যে-সব বেশালের' নীল ঢেউ।

সহর কলকাতার সঙ্গে হেনরীর পরিচয় ছিল অনেক আগে থেকেই। কেননা, জাহাজেই তিনি ভাকাবুকো। তাঁর পুরোনাম হেনরী লেরমান্তিয়ে। নামেই মালুম যে সাহেব ফরাসী। তৈলচিত্রেই শুধু এ সাহেবটি ছিলেন অ্যাডভেঞ্চার প্রিয়। বিপদের ভেতর ঝাঁপিয়ে না পড়লে আনন্দ পেতেন না হেনরী। তাই অতি অল্প বয়সে এবং অল্প আয়াসে তাঁর একটি চাকরী জুটে গিয়েছিল বাণিজ্য জাহাজে। সেদিন ইউরোপীয় জাতিগুলির ভাগ্য প্রসন্ন। ইতিহাস অনুকূল। ইউরোপীয় বাণিজ্য জাহাজগুলি পৃথিবীর বন্দরে বন্দরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তৈরী করছে নতুন নতুন উপনিবেশ। আর ইউরোপের ঘরে বহন করে নিয়ে আসছে অভাবিত সৌভাগ্য।

হেনরীর ভাগ্যে তেমন বেশি কিছু অবশ্য জোটে নি। তবে অল্প সময়ের ভেতর হয়ে গিয়েছিলেন এক বাণিজ্য জাহাজের ক্যাপটেন। আর পরিণয় হয়েছিল এক ইংরেজ ললনার সঙ্গে। সে ললনা মিস টেলর সাহেবের মেয়ে। মিস টেলর ফরাসী হেনরীকে বিয়ে করে হন মাদাম লেরমান্তিয়ে। কুমারী জীবনে মাদামের ঝোঁক ছিল অভিনয়ে। অভিনেত্রী হিসাবে বেশ ভালোই তাঁর নাম হয়েছিল। অস্ট্রেলিয়ার মঞ্চে এক ডাকে

CENTRAL LIBRARY

সকলে চিনত তাকে। অনেক ছিল তার মুগ্ধ অনুরাগী।

বিয়ের পর হঠাৎ একদিন হেনরী সঙ্কল্প নিলেন যে পাড়ি দেবেন কলকাতায়। বেরিয়ে পড়লেন একটি জাহাজ নিয়ে। এ বিষয়ে শ্রীমতী হেনরীরও খুব উৎসাহ দেখা গেল। থিয়েটারের আকর্ষণ যদিও উতলা করেছিল মাঝে মাঝে, তবু অস্ট্রেলিয়া তাকে পারল না ধরে রাখতে। হেনরীর মুখে সে কলকাতার মঞ্চ ও অভিনয়ের কথা শুনেছিল, সে টানই সেদিন দুর্বার হয়ে উঠল।

কলকাতার পথে সমুদ্রযাত্রা প্রথম প্রথম খারাপ লাগে নি। বরং ভালোই লেগেছিল ঐ অবিরাম ভেসে চলা। ভালোই লেগেছিল ঐ নীলজলের সীমাহীন বিস্তার। ডেকের ওপর বসে বসে কেটে যেত ঘণ্টার পর ঘণ্টা। আশ্চর্যরকম ভালো লাগত সূর্যোদয় আর সূর্যাস্তের মুহূর্তটুকু।

কিন্তু সপ্তাহখানেক যেতে না যেতে সব কিছুই কেমন যেন বিবর্ণ হয়ে উঠল। স্বাদ হারিয়ে গেল প্রতিদিনের জীবনযাত্রায়। শ্রীমতীর কাছে তখন যেন আর কিছুই ভালো লাগে না। মাঝে মাঝে ভেঙে পড়তে ইচ্ছে হয় কান্নায়। কেমন যেন এক নিঃস্তব্ধতা তাকে কুরে কুরে খাচ্ছিল।

এমন বিষণ্ণ কান্নার মুহূর্তে মাদাম দেরমাভিয়ের সব থেকে যাঁকে খারাপ লাগছিল, তিনি হলেন হেনরী। হেনরীকে তার মনে হত একটি ডাকাত। কিংবা কোনো লুটেরা দস্যু। অথচ হেনরী তাকে কত যত্নই না করতেন! কতই না বোঝাতেন।

সেদিনও হেনরী তাঁর মানিনী বধূকে কত বোঝাবার চেষ্টা করলেন। আঁকিবুকি কাটলেন শ্রীমতীর রেশমী চুলে। বললেন, 'ডার্লিং তুমি ভেঙে পড়ো না। আর দু-দিনের ভেতরেই আমরা পৌঁছে যাবো স্যান্ড হেড্স। তখন কলকাতা আর কতদূর। হাতের মুঠোয়।—ডার্লিং, কলকাতা এক আশ্চর্য সহর। তোমাদের একজন স্বজাতি তৈরী করেছে এ সহর। এখন তোমাদের ভাষায় একে বলা হয়, 'সিটি অব প্যালেসেস'। আগে কোনো প্যালেস ট্যালেস কিছুটি ছিল না। ছিল জঙ্গল আর জঙ্গল। আমাদের দেশে যখন ফরাসী বিপ্লব হয়, তার বছর পনেরো-কুড়ি আগেও এখনকার জঙ্গলে তোমাদের ওয়ারেন হেস্টিংস হাতীতে চড়ে বেরত বাঘ শিকার করতে। ডার্লিং, তুমি কি ওয়ারেন হেস্টিংসের ছবি দেখেছ?'

ডার্লিং নীরব। আন্দোলিত বাতাসে কেবল সোনালী চুলে ঢেউ উঠল। হেনরী মনে করলেন তাঁর অভিনেত্রী বধূ হয়ত অভিনয়ের কথা শুনে খুশি হবেন, তাই প্রসঙ্গ বদলে বলতে আরম্ভ করলেন, 'তুমি নিশ্চয় জানো না, তোমাদের কলকাতার ইংরেজেরা কি ভয়ঙ্কর থিয়েটার পাগল। নিউজ পেপার বের হবার অনেক আগেই ওখানে থিয়েটার পত্তন। আর ক বছর গেলেই ওখানকার নাটুকে সাহেবরা হয়ত থিয়েটারের সেন্টিনারী করে বসে থাকবে। তবে মজার ব্যাপার কি জানো, কোনো এক বিশেষ থিয়েটার ওদেশের মাটিতে বেশি দিন টেঁকে না। ম্যাডাম, ডেভিড গ্যারিকের নাম তুমি নিশ্চয় শুনেছ। একটা টেকসই থিয়েটার তৈরী করবার জন্যে ওখানকার সাহেবরা গ্যারিকের কাছে পরামর্শ চেয়ে পাঠাল। গ্যারিক ভারি খুশি। সঙ্গে সঙ্গে পাঠিয়ে দিলেন তাঁর মূল্যবান উপদেশ।—তখন সেই মূল্যবান পরামর্শ পেয়ে কলকাতার ইংরেজরা কি করল জানো?

শ্রীমতীর চোখে সামান্য একটুখানি হাসির রেখা ফুটে উঠল। ঘাড় নেড়ে বলল, 'না'।—হেনরী এতেই খুশি। দ্বিগুণ উৎসাহে সে হাসি হাসি মুখে বলল: 'কলকাতার ইংরেজেরা গ্যারিককে একটি মজার উপহার পাঠালো। মজার উপহার। আর সে উপহারটি কি জানো?—এক জোড়া কাঠের পাইপ।'

বাংলাদেশের উপকূলের খুবই কাছাকাছি ছিল জাহাজটি। তাই কয়েকটি সমুদ্রের পাখিকে দেখা গেল। ঢেউয়ের মাথায়। কখনো দেখা যায় বিন্দুর মতন। আবার কখনো বা তারা হারিয়ে যায়। সকাল বেলাকার স্নিগ্ধ আলোকরশ্মি হাজার হাজার মণিমুক্তোর মত ঝিকিক দিয়ে ওঠে সমুদ্রের জলে। মাদাম দেরমাভিয়েরের চোখে তারই অনিন্দ্যসুন্দর অনুভূতি হঠাৎ জীবন্ত হয়ে ওঠে স্নিগ্ধ হাসিতে। সে হাসি দেখে হেনরী রীতিমত উৎসাহিত হয়ে ওঠেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে বলতে থাকেন, 'কলকাতায় গেলেই, ডার্লিং, আমাদের ভাগ্য খুলে যাবে। ওখানকার বাতাসে শুনেছি ইউরোপীয়দের 'ফরচুন' উড়ে বেড়াচ্ছে। যে যেমনভাবে পারে, গুছিয়ে নিচ্ছে। আমার এক বন্ধু আছে তার নাম স্টোকেলার।—ভেরি অ্যামবিশাস ইয়ংম্যান। ওখানে 'ইংলিশম্যান' বলে একটি কাগজ আছে, সে তারই এডিটর। কিন্তু কাগজের এডিটর হলে কি হয়, ভারি অভিনয় পাগল মানুষ। ওখানকার থিয়েটার মহলে সে একটা কেষ্ট-বিষ্টু। আরেকজন আমার ইন্টিমেট বন্ধু আছেন, তাকেও তুমি চেনো না। সে বন্ধুটির নাম জর্জ হ্যামিলটন ককস। খুব সুন্দর চেহারা তার। এককালে সৈনিক ছিল। ছিল ক্যাপটেন। এখন কাজ করে ফায়ার ইনসিওরেন্স-এ।—মাই লেডি, মাই ডার্লিং, এরা সকলে আমাদের আপনার লোক। খুব কাছের লোক। এরা সাহায্য করবে আমাদের ফরচুন তৈরীতে। কলকাতা বন্দরে গিয়ে নামলে এরা করে দেবে আমাদের জন্য সকল রকম সুব্যবস্থা!—তুমি থিয়েটার করবে আর আমি এই জাহাজ নিয়ে ঘুরে বেড়াব নানান দেশের বন্দরে বন্দরে।'

হেনরীর পালতোলা জাহাজে তখন জোর বাতাস ধরেছে। হু হু করে এগিয়ে চলেছে জাহাজ। সে আঠারোশ একচল্লিশ সালের কথা। বাংলা দেশে তখন বসন্তকাল। সহর কলকাতাতেও তাই। গাছে গাছে নানান ফুলের মেলা। নানা রঙের রং-বাহার। দক্ষিণের বাতাসটুকু ভারি মনোরম। ফাল্গুন হাই হাই করে চলে গেল। পা-পা করে এগিয়ে এলো চৈত্র। সহর কলকাতার আয়েসী মানুষেরা সেদিনের মধুবাতাসেও অনুভব করলেন চোরা গরম।

কলকাতার সাংস্কৃতিক দিকেও চলেছে এমনি চোরা গরম। রামমোহনের কাল থেকে সবে আমরা বেরিয়ে এসেছি। ইয়ংবেঙ্গলেরা তখন রীতিমত উগ্র। মধুসূদন-বিদ্যাসাগর-ভূদেব তখনও ছাত্রজীবনের কুঁড়ির ভেতর সমাহিত। হেম-বঙ্কিম নিতান্তই শিশু। তখনো অবশ্য মাথার ওপর রয়েছেন হেয়ার সাহেব। ক্যাপটেন রিচার্ডসন দুহাতে কবিতা লিখছেন এবং রসিয়ে রসিয়ে সেক্সপীয়ার পড়াচ্ছেন হিন্দু কলেজে। মোটকথা, সহর কলকাতায় সেদিন সুদিন। নবযুগের ইতিহাসে ভরা বসন্ত। সেই বসন্তে আমাদের চোখে সোনালি স্বপ্ন। মাদাম দেরমাভিয়েরও স্বপ্ন দেখতে দেখতে স্বামীর হাত ধরে পৌঁছুলেন এসে কলকাতায়। জাহাজঘাটে অনেকেই এলেন তাদের দেখতে। এলেন স্টোকেলার সাহেব, এলেন হ্যামিলটন ককস। তাঁরা হাত তুলে উভয়কে বিশেষভাবে স্বাগত জানালেন।

হেনরী দেরমাভিয়ে রসিকতা করে বললেন, 'ডার্লিং, এ'দের চিনে রাখো। যদি আমি কোনো দিন দুম করে মরে যাই, এ'রা তোমাকে দেখবেন। দরকার হলে বিয়েরও ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন।'

সকলে হা-হা করে হেসে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমতীও।

সেদিন অপরাহ্ণে মাদামকে নিয়ে সকলে বেরোলেন কলকাতা পরিক্রমায়। না, ঠিক কলকাতা নয়। থিয়েটার পাড়ায়। বসন্তের অপরাহ্ণ ভারি মনোরম। মাথার ওপর পরিষ্কার আকাশ। পলাশে শিমুলে তখন রংয়ের খেলা। গাছে গাছে নানা রংয়ের পাখি বেড়াচ্ছে নেচে-নেচে। তবে কলকাতার রাস্তায় বড্ডোই ধুলো। মাঝে মাঝে এক আধটি ঘোড়ার গাড়ি যায়, আর সারা অঙ্গ ভরে যায় ধুলোয়। এ'রা সকলে ঢাকা পালকিতে চলেছিলেন বলে কোনো অসুবিধা হল না। ধুলোর মেঘ দেখলেই এ'রা টেনে দিচ্ছিলেন পালকির পরদা।

থিয়েটার পাড়াটি ঘুরে ঘুরে দেখতে ভালোই লাগল মাদামের। সেদিনের সাঁ-সুশী থিয়েটারের অপূর্ব শোভা দেখে ধরাই যেত না অতীত দিনের সঙ্কট-শঙ্কিল মুহূর্তগুলিকে। ছেলেখেলা করতে করতে একদিন কয়েকজন সাদা মানুষ যে বড়ো একটি খেলার পত্তন করেছিলেন, সেদিন তা পূর্ণ মহিমায় বিকশিত। শ্রীমতীর চোখে অবশ্য সে অতীত-স্মৃতি কোনো কৌতূহল জাগাল না। মাঝে মাঝে যে পাদ-প্রদীপের আলো নিভে গিয়েছিল এবং রুদ্ধশ্বাস অন্ধকারে যে অনেক প্রতীক্ষার মুহূর্ত কেটেছিল, স্টোকেলারের মুখে সে সব কাহিনী শুনেও রোমাঞ্চিত হল না শ্রীমতীর চিত্ত। কেননা, সেকালের সাঁ-সুশীর দেখে স্পষ্টই প্রতীয়মান হত যে, আশঙ্কার আর কোনো কারণ নেই। মনসন-বারওয়েল-ইম্পের দাক্ষিণ্যের যুগ সে পেরিয়ে এসেছে

অনেককাল। এমা র‍্যাংহামের সখের থিয়েটারের দিকে জ্বল জ্বল করে তাকিয়ে থাকার দিন কেটে গেছে। হোরেসোর পেস থিয়েটার এবং এথেনিয়ামের ব্যর্থতার স্তূপ ডিঙিয়ে ওপর গড়ে উঠেছিল চৌরঙ্গী রঙ্গমঞ্চের খ্যাতির সৌধ। দূরপ্রান্ত ও দেশ-দেশান্তের মানুষ শুনেছিল এখানকার নাম। এ মঞ্চের অভিনেত্রী মিস ম্যালেলের মঞ্চেও অভিনয় করে দেশজোড়া নাম কিনেছিলেন। এবং সেই চৌরঙ্গী থিয়েটার পুড়ে একদিন ছাই হয়ে গেল। হঠাৎ আগুন কেড়ে নিল কলকাতার গৌরব।

তারপর? তারপর কিছুদিন অন্ধকার। অভিনেত্রী এলথার, মসে স্টোকেলার এবং আরো অনেকে নামলেন নতুন উদ্যমে। নতুন থিয়েটার তৈরীর সংকল্প নিয়ে। সেই উদ্যম আর সেই সংকল্প থেকেই তৈরী হল সাঁ-সুসী। নাট্যকে সাহেবদের চোখেমুখে দেখা দিল খুশির ঝিলিক। ওদিকে সখের-বৈঠকখানার আসরও জমজমাট। সেখানকার মঞ্চে নিত্য নতুন নাটক।

না, শ্রীমতী দেরমাঁতিয়ে সখের-বৈঠকখানার পথে আর পা বাড়ালেন না। তিনি দেখতে চাইলেন টাউন হল। সুপ্রিম কোর্টের পাশের সেই বিরাট বাড়িটি। এরকম একটি বাড়ির জন্য সুদীর্ঘকাল স্বপ্ন দেখছিল সেকালের কলকাতা। তৈরী হয়েছিল লটারী কমিটির টাকায়। সে আঠারোশ ছয় সালের বৃত্তান্ত। তিন যুগ আগের ব্যাপার। গারস্টিন আর অবেরী নামে দুজন সুদক্ষ এঞ্জিনীয়ার তৈরী করেছিলেন এ বাড়ি। কলকাতাবাসীর স্বপ্নকে রূপ দিয়েছিলেন তাঁরা বাস্তবে। এরকম প্রশস্ত ও পরিসরওয়ালা বাড়ি সহর কলকাতায় সেদিন দুটি ছিল না। হাজার কয়েক লোক একসঙ্গে বসে সভা করতে পারত। শুধু সভা? নিত্য এখানে লেগে থাকত অভিনয়। টাঙানো হত থিয়েটারের পর্দা। নাচে-গানে জম-জমাট হয়ে উঠত মঞ্চ। সারা কলকাতার লোক সেদিন নাটক-পাগল, সুতরাং টাউন হল কি তা থেকে বাদ থাকতে পারে?

শ্রীমতী দেরমাঁতিয়ে কলকাতা বন্দরে পা দিয়েই শুনেছিলেন যে, তাঁর অভিনয় করবার ব্যবস্থা পাকা হয়ে গিয়েছে। আর সেই অভিনয়মঞ্চ ঠিক হয়েছিল, 'টাউন হল।'—অভিনয়ের নাটক?—হ্যাঁ, তাও ঠিক। নাটকটির নাম, 'টেমিং অব দি শ্রু'। মানিনী দেরমাঁতিয়ে নিজেকে মনে মনে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'আমি কি শ্রু?' না, তা কেমন করে হবে? শ্রু মানে ত 'কলহ-পরায়ণা'। খুব মোটা করে যাকে বলে 'কুঁদুলী', তাকেই তো বলে শ্রু। না, দেরমাঁতিয়ে তা নয়, সে মানিনী, অভিমানিনী। কে জানে শহর কলকাতা এ মানিনীকে বশ করবার কোনো ষড়যন্ত্র পাকা করেছে কিনা!

কলকাতার মাটিতে মাদামের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল তার অভিনয়ের খবর। পঁচিশে মার্চ টাউন হলে হবে সে অভিনয়। ক্যাথেরিনা ও ডার্লিংটনের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে তাকে। কলকাতার কাগজে কাগজেও বেরিয়ে পড়ল এ খবর। আরম্ভ হয়ে গেল টিকিট বিক্রয়। হোটেল স্পেনসেস ও হোটেল অকল্যাণ্ডে খোলা হল টিকেট-কাউন্টার। কাগজ অফিস 'হরকরা'ও বাদ গেল না এ সুবর্ণ সুযোগ থেকে। যদিও তখন খৃষ্টান মহলে 'প্যাসন উইক' আসন্ন, তবু উৎসুক নাট্যমোদীরা তাকিয়ে রইল পঁচিশ তারিখের দিকে। 'বেঙ্গল হরকরা' আরো উদ্দীপিত করে তুলল নতুন অভিনেত্রীর সম্পর্কে কৌতূহল। লিখল : 'এঁর সম্পর্কে যে সুখ্যাতি শোনা যাচ্ছে, সকল দর্শককে ইনি যে প্রীত করবেন সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি?'

এইভাবে একান্তমনে গোটা কলকাতা যখন নতুন অভিনেত্রীকে দেখবার জন্য তৈরী হচ্ছে মনে মনে, তখন দুম করে একটি ঘটনা ঘটে গেল।

ঘটে গেল একটি অঘটন। লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল সে দুঃসংবাদ।—শোনা গেল, মাদামের সর্বনাশ হয়ে গেছে। সর্বনাশ। সকলে দৌড়ুল তার কাছে। গিয়ে দেখে সে এক অভাবিত পরিস্থিতি। মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছে এ ফরাসী-বধূ। মাথায় ভেঙে পড়েছে আকাশ। স্বামী শ্রীযুক্ত দেরমাঁতিয়ে হঠাৎ আত্মহত্যা করে বসে আছেন।

কেন?—কেন? সকলের মুখেই উদ্যত হয়ে উঠল এ প্রশ্ন। কোনো জবাব পাওয়া গেল না শ্রীমতীর কাছে। দু গাল বেয়ে নেমে এলো অশ্রুধারা। কিন্তু নগর কোটাল নীরব থাকলেন না। জিজ্ঞাসুদের কৌতূহল মেটালেন তাঁরা। কোটালমশাই গম্ভীরভাবে জানালেন, মসিঁয় দেরমাঁতিয়ে একজন সভ্য মানুষ নন, সভ্যতার খোলস-পরা এক ডাকু। লুটেরা। জাহাজ চুরি করে এই লুটেরা পালিয়ে এসেছেন কলকাতায়। ভেবেছিলেন জানতে পারবে না কেউ, থাকবেন গা-ঢাকা দিয়ে। কিন্তু তা আর সম্ভব হল না। কলকাতার কোতোয়ালীতে খবর পৌঁছুল। গোপন খবর। লোক-লস্কর নিয়ে কোটালমশাই বেরোলেন চোর ধরতে; কিন্তু তার আগেই চোর জেনে ফেলল খবর। অপমানের আঁচড় গায়ে লাগতে দেবার আগেই সে করে বসল সুইসাইড।'

•

অজানা দেশ। অচেনা মানুষ। সহায়-সম্বলহীনা এক মহিলা। তার ওপর সে যদি আবার সুন্দরী বিদেশী হয়, তার ভয় অনেক। আর সদ্য পতি-বিয়োগের শোক ত' আছেই! শোকে ও ভয়ে বড়োই কাতর হয়ে পড়ল শ্রীমতী দেরমাঁতিয়ে। কাঁদল আকুল হয়ে।

এ কদিনে সামান্য পরিচয় হয়েছিল যাদের সঙ্গে তাঁরা অবশ্য অনেক সহানুভূতির সঙ্গে এগিয়ে এলেন। এলেন স্টোকেলার। এলেন লর্ড হ্যামিল্টন কফস। হ্যামিল্টন আরো ঘনিষ্ঠ হলেন। ডাকাতের বৌ বলে ঘৃণায় তিনি [illegible] ফিরলেন না।

অথচ এ সাহেব কতো বড়ো কুলীন। সেকালের 'বেঙ্গল ক্লাবে' সাহেবের বাসা। সপরিবারেই ইনিই থাকতেন। তবে এ সময় তাঁর কাছে স্ত্রী ছিলেন না। ছিলেন স্বদেশে। ইংলণ্ডে। 'বেঙ্গল ক্লাবের' বাদশাহী আরামে সাহেব একাই ছিলেন আত্মলীন। অভিজাত ব্যক্তি না হলে এখানে সেদিন স্থান সংগ্রহ করা ছিল কঠিনতর। হ্যামিল্টন সেই আভিজাত্যের চূড়ায় গিয়ে বসেছিলেন। সামরিক কাজ অবসর নিয়ে তিনি কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন বীমা কোম্পানীর দায়িত্বভার। এসময়ে তখন সবে বাংলার ইন্সিওরেন্সের কাজ আরম্ভ হয়েছে। সেই প্রারম্ভিক কর্মযজ্ঞে হ্যামিল্টন কফস লেগে গিয়েছিলেন নবীন উদ্যমে।

তবে সাহেবের পারিবারিক জীবন সুখের ছিল না। ঘরে ছিলেন কঙ্কাল স্ত্রী। সে মহিলা একটুকু সুখ দিতেন না সাহেবকে। বন্ধু-বান্ধব থেকে আরম্ভ করে পাড়া-প্রতিবেশী ইউরোপীয় সমাজে সব্বাই সাহেবের এই ব্যর্থ দাম্পত্যজীবনের খবর সকলেই জানতেন। মন্দ লোকেরা আবার তাঁর এই 'ডোমাস্টিক আফলিকসনের' কথা আলোচনা করত রসিয়ে রসিয়ে।

কোথায় তালতলা আর কোথায় বেঙ্গল ক্লাব! কোথায় কফস সাহেব আর কোথায় দেরমাঁতিয়ের নবপরিণীতা বধূ! অনেক দূরত্ব, অনেক ব্যবধান। কিন্তু দুটি প্রান্ত মিলল দুঃখের বন্ধনে। একজনের দুঃখ পতিবিয়োগে, অপরের দুঃখ দাম্পত্যজীবনের ব্যর্থতায়।

কলকাতায় সেদিন বসন্ত বড়োই উগ্র হয়ে উঠেছে। দুপুরের দিকে চোখ গরম। লাল ফুলের আভরণ পরেছে পলাশ-শিমুল। মৌমাছির গুঞ্জনে বেঙ্গল ক্লাবের ফুলের বাগান কেমন যেন মোহময়!

দিনে দুবার করে হ্যামিল্টনকে যেতে হত তালতলার বাড়িতে। বেঙ্গল ক্লাব থেকে এ বাড়ির দূরত্ব একটু বেশি বটে, কিন্তু পালকিতে চড়ে একটি মিষ্টি স্বপ্ন দেখতে দেখতে এই দূরপথ যেতে ভালোই লাগত সাহেবের। তখন অনেক গাছ ছিল কলকাতায়। গাছে গাছে শোনা যেত পাখির মিষ্টি কাকলি। দেখা যেত রঙ-বেরঙের পাখি। স্নিগ্ধ শ্রী মাখানো ছিল শহর কলকাতার অঙ্গে। সেই শ্রী দেখতে দেখতে ও পাখির গান শুনতে শুনতে আবিষ্ট হয়ে যেতেন সাহেব।

মাঝে মাঝে দেখা হত বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে। কিন্তু ভালো করে কথা বলতে ইচ্ছে করত না। কেমন যেন এক ক্লান্তি আসত। একদিন সাহেব গেলেন স্বাস্থ্যপরীক্ষার জন্য ডাঃ গুডিভের কাছে। সেকালের কলকাতার ডাঃ গুডিভ পয়লা নম্বরের চিকিৎসক। একালের বিধান ডাক্তারের মত ছিল তাঁর খ্যাতি। সেই ডাক্তার যত্ন করে পরীক্ষা করলেন হ্যামিল্টনকে, তারপর হা-হা করে হেসে বললেন, 'ভালোই আছো দেখছি। এক্সেলেন্ট হেল্থ!'

'কিন্তু পায়ে যে একটু ব্যথা লাগে'—হাসি হাসি মুখে বলেছিল হ্যামিল্টন।

'ও না। ও কিছু না। ওটা বাত।'

টাউনহল

আরেকদিন হ্যামিলটন গেলেন স্টোকেলারের কাছে। একেবারে কাগজের অফিসে। সম্পাদকের বিরাট টেবিলের ওপাশে বসেছিলেন স্টোকেলার। খুবই ব্যস্ত। তবু হ্যামিলটনকে দেখে হাসিমুখে স্বাগত জানালেন। বললেন 'কী ব্যাপার? মাদাম লেচ-নাঁদিয়ের কাছে গিয়েছিলেন নাকি?'

'হাঁ গিয়েছিলাম। সেখান থেকেই আসছি। তাঁর অভিনয়ের ব্যবস্থা করে দাও।'

'উনি সম্মতি দিয়েছেন?'

'পেয়েছি।'

স্টোকেলার বললেন, 'ঠিক আছে। তবে আসছে সপ্তাহেই অভিনয় হবে।'

ব্যস, ব্যবস্থা হয়ে গেল অভিনয়ের। নিঃস্ব ফরাসী বধূর এ ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। শোকে মুহ্যমান হলেও, জীবিকার জন্য মঞ্চে নামতে হল মাদামকে। অবশ্য নামবার আগে যথারীতি আরম্ভ হয়ে গেল বিজ্ঞাপনের ঢক্কানিনাদ। সেই একই নাটক, 'টেমিং অব দি শ্রু'। সেই একই স্থান টাউন হল।

চৈত্র মাসের তৃতীয় সপ্তাহে টাউন হলে সেই বহুপ্রতীক্ষিত সন্ধ্যাটি এলো। সাহেব-মহলায় তখন 'প্যাসান উইক' চলছে। সব সাহেবরা এই প্যাসান-উইক নিয়ে মগ্ন। টাউন হলে সমবেত ও কৌতূহলী দর্শকদের কাছে দাঁড়ালেন গিয়ে নতুন অভিনেত্রী। শান্ত বিষণ্ণ মুখ। চোখ দুটি জলে ভেজা। নতুন অভিনেতা বা অভিনেত্রীরা সেকালে প্রথম মঞ্চ-আবির্ভাবের মুহূর্তে আত্মকথা বলে নাতিদীর্ঘ পাঠ করতেন। মাদাম লেচ-নাঁদিয়েরও তাই করল। এবার সে তার দুঃখের কথা। মধ্যে মাঝে কণ্ঠস্বর ভেঙে এলো কান্নায়। সেই কান্নাভরা কণ্ঠে প্রবাসী-বধূ নিবেদন করল :

দি উওম্যান, নট দি অ্যাকট্রেস,
সিকস্ নাউ
অ্যালাস! টু নন মাস্ট আই রিজাইন
দি মাস্ক!
নেসেসিটি কমান্ডস্ মি টু টাস্কে।

'কোনো অভিনেত্রীর ভূমিকায় নয়, সামান্য এক নারী হিসেবে আপনাদের কাছে এসে আমি কথা বলছি। হায়, এর পরিণতির আমাকে যে মুখোশ পরতে হবে! প্রয়োজন আমাকে চাবুক মারছে। কমান্ডস্ মি টু টাস্ক।'

অভিনয় শেষে সে রাতে নিজের গাড়িতে করেই অভিনেত্রীকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে গেলেন তরুণ হ্যামিলটন ফকস। গভীর দুঃখ-ভারে ভেঙে পড়লেও মাদামের অভিনয় যে উৎকৃষ্ট, তা অনেকেরই চোখে পড়ল। তবে যথেষ্ট লোক সেদিন অভিনয় দেখতে আসে নি। এটুকুই ছিল ফকস-হ্যামিলটনের কাছে দুঃখের ব্যাপার। অনেকে বলল : প্যাসান উইক চলছে বলে মেমসাহেবরা আসতে পারলেন না। কাগজওলারা লিখল : অভিনেত্রীর রূপের তন্ত্রী এবং সুরেলা কণ্ঠস্বরে মোহিত না হয়ে পারা যায় না।

'না, কোনোটাই নয়,' মনে মনে ভাবলেন হ্যামিলটন ফকস। পরে স্টোকেলারকে ডেকে বললেন, 'সাঁ-সুসীর মতন আরাম ছেড়ে, অমন পয়সামার দাম দিয়ে কে টাউন হলে থিয়েটার দেখতে আসবে? যদি মাদামকে দাঁড় করাতে চাও, তবে মাদামের জন্য সাঁ-সুসীতে অভিনয়ের ব্যবস্থা করে দিতে হবে।'

যে কথা, সেই কাজ। মাদামের জন্য সে চেষ্টা চলল।

এরপরে শ্রীমতী লেক্যাভিকে কিছুদিনের জন্য অভিনয়-বিরতি। আরো ভালো অভিনয়ের জন্য এই অনাথিনী বিদেশিনী তৈরি হতে থাকল মনে মনে। তালতলার বাড়িতে কাটতে থাকল অবকাশ। এদিকে অফিস করার ফাঁকে ফাঁকে হ্যামিলটন ফকস যেটুকু সময় পান, তখন কেবলই ভাবেন এই নতুন বান্ধবীটির কথা। অফিসের পর প্রত্যহ সোজা চলে যান তালতলায়। সেখানে নানারকম কথা ওঠে। নানা গল্প। ওঠে অভিনয়ের কথাও। এবং দেখা যায় দুজনেই মনে মনে আকৃষ্ট হয়ে যাচ্ছেন ধীরে ধীরে।

এমন স্বপ্ন কোনোদিন দেখেন নি তরুণী শ্রীমতী। হেনরীকে নিয়ে সুখ পাননি একদিনের জন্যও। ডাকাবুকো স্বামী। সর্বদাই থাকতে হত ভয়ে ভয়ে। একদিনের জন্যও সুখ ছিল না, সুতরাং স্বপ্ন দেখা ত অনেক দূরের কথা! জীবনের এ মঞ্চে পর্দা ওঠার আগেই নিভে গিয়েছিল পাদপ্রদীপের আলো। আর হ্যামিলটনের কথা ত আগেই বলা হয়েছে। বেচারি ক্যাপ্টেন! এতবড়ো একজন সামরিক লোক হয়েও দজ্জাল স্ত্রীর কাছে চিরকাল থেকেছেন ভয়ে ভয়ে। না পেয়েছেন সুখ না পেয়েছেন শান্তি।

আর দুজনে তাই নতুন করে স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করলেন। অতীতকে মুছে দিয়ে নতুন করে জীবন আরম্ভ করা যায় কিনা, হয়ত সে কথাও ভাবলেন তাঁরা।

•

নাটকটি ভালোই জমে উঠেছিল। কিন্তু হঠাৎ কেন কয়েকটি কালো [illegible] করে দিয়ে গেল।

একদিন সন্ধ্যাবেলায় বেঙ্গল ক্লাবে সাহেব হ্যামিলটন ফকস একটি চিঠি দেখতে পেলেন টেবিলে। হয়ত সেদিনের ডাকেই এসেছে চিঠিখানি। ইংলন্ড থেকে পোস্ট-করা চিঠি। ডাক-বাক্স থেকে বেয়ারা আরো পাঁচখানা চিঠির সঙ্গে সেটি রেখে গেছে টেবিলে।

ছোট একটি চিঠি। আঁকাবাঁকা অক্ষরে ইংরেজি ভাষায় লেখা ছিল মাত্র কয়েকটি লাইন। বেশি নয়। পঞ্চাশেক শব্দও চিঠিতে ছিল কিনা সন্দেহ! কিন্তু চিঠিটি পড়ে সাহেবের মনে হল, না পঞ্চাশ শব্দ নয়। পঞ্চাশেক সৈনিক যেন উদ্যত বেয়নেট নিয়ে এগিয়ে আসছে। এখনই তাকে খুন করবে। হ্যামিলটনের হাত কেঁপে উঠল। চিঠিটা মাটিতে পড়ে গেল। আর সেদিন রাত্রেই সাহেব তাঁর ডায়েরীতে লিখলেন : আজ স্ত্রীর চিঠি পেলাম। তিনি কিছুদিনের ভেতরে কলকাতায় আসছেন। জাহাজ এখন বে অব বেঙ্গলে ঢুকেছে। সুতরাং আর ক'দিন।

পরেরদিন দেখা হয়ে গেল স্টোকেলারের সঙ্গে। তিনি জানালেন, ভালো খবর আছে, মিঃ বকস, মাদাম দেরম্যাঁতিয়ের সাম্প্রতিক প্রেমিকের পাত্তা-হয়ে গেছে।'

বকস সেরকম প্রসন্ন ছিল না। বহু হঠাৎ খুশি হলেও উঠলে মনে হল। কৌতূহলী হয়ে বললেন ঃ 'কবে?'

স্টোকেলার বললেন, 'আগামী তিরিশে এপ্রিল, শুক্রবার। এলফার থিয়েটারে অভিনয় করবেন।' বকস বললেন, 'বা, ভারি সুসংবাদ। তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। অজস্র ধন্যবাদ। প্রকৃত ধন্যবাদ।'

এদিকে সেদিন অফিসে গিয়ে হ্যামিলটন বকস এক কাণ্ড করে বসলেন। তখন, এম ওয়েস্টোরমান ছিলেন তাঁর কোম্পানির মাথা। সটান ডোর ঠেলে সোজা গিয়ে ঢুকলেন তাঁর ঘরে। তাঁর টেবিলের ওপর পেশ করলেন লম্বা-চওড়া একখানি পদত্যাগপত্র। কারণ? না কোনো কারণ-দেখালেন না। তবে পাওনা-গণ্ডা যা ছিল তা বুঝে নেবার জন্য অনুমতি চাইলেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে পেয়েও গেলেন সে অনুমতি।

এরপরে নিজের চেম্বারে এসে বসে ডেকে পাঠালেন হেড-রাইটারকে। সেখানে এই দশ-বিশ-বীমা কোম্পানির হেড-রাইটার ছিলেন এক বাঙালীবাবু। বাবুর নাম শশীভূষণ মুখুজ্যে। বেশ চালাক চতুর লোক আর খুবই সুশিক্ষিত ও চটপটে। হ্যামিল্টন তাকে সামনের চেয়ারে বসিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেমন আছেন বাবু? আপনাকে বেশ এফিসিয়েন্ট মনে হচ্ছে। আমি না থাকলে অফিস চালাতে পারবেন তো?'

শশীকুমার ঘাড় নীচু করে হাসল। সাহেবও হাসলেন। বললেন, 'আমি জানি তুমি পারবে। কোম্পানির বকশা ভালো— ভোটিভিজ প্রেসিডেন্সি—'

ইতিমধ্যে এপ্রিল মাস গড়াতে গড়াতে এসে শেষ নির্দিষ্ট তারিখে গেল। বসন্ত গড়িয়ে গেল মস্ত বৈশাখে। রোদ্দুরে চাঁপা ফুলের গন্ধ পাওয়া গেল। আই-ঢাই গরমে সাহেবটোলা হাঁসফাঁস করতে থাকল। আর সারা দুপুরটা চাঁ-চাঁ রোদ্দুরে, ঝিমঝিম করতে করতে কালবৈশাখীর প্রতীক্ষার রইল। এরই ফাঁকে সহরের কাগজওলারা ঘরে ঘরে খবর পৌঁছে দিল যে এলফার থিয়েটার সন্ধ্যায় আজ রাত্রিতে অভিনয় নামবেন অধিষ্ঠাত্রী শিল্পী মাদাম দেরম্যাঁতিয়ে।

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় সাহেব হ্যামিলটন ডেকে পাঠালেন তাঁর চাকরবাকরদের। পুরনো দিনের কলকাতায় সব সাহেবেরই থাকত একটি করে ভৃত্যবাহিনী। এ ভৃত্যেরা সাহেবের সেবায় সদা নিযুক্ত থাকত। কেউ সেজে দিত হুঁকো, কেউ ভরে দিত চিলিমচিভরা জল। গরমের দিনে কেউ কেউ টানত টানা-পাখা, আর প্রতিদিন পালকি বহন করার জন্য পালকি-বেহারার দল ত' ছিলই। এই ভৃত্যবাহিনীর আবার একজন প্রধান থাকত। তাকে বলা হত হেড-বেহারা। সাহেবের জন্য সে কেনাকাটা করত এবং অনেক সময় টাকা-পয়সাও জমা রাখত।

ছোটখাটো বেহারাদের সঙ্গে দেখা করার পর সাহেব ডেকে পাঠালেন সর্দার বেহারাকে। সাহেবের এই প্রধান ভৃত্যটির নাম ছিল ইছা। বেশ শক্ত-সমর্থ এক মানুষ। নানান সহর ধরে সে হ্যামিলটন বকসের খাজাঞ্চি। খুবই অনুগত। আর খুবই বিশ্বাসী। তার কাছে টাকা-পয়সার সব হিসাব চেয়ে নিলেন সাহেব। দেনা-পাওনা মিটিয়ে দিলেন কড়ায়-গণ্ডায়। ইছা একবার কাঁদো কাঁদো মুখে জিজ্ঞেস করল, 'স্যর, আপনি কি চলে যাচ্ছেন দেশে?'

সাহেব একটু ক্ষীণ হাসলেন, কোনো উত্তর দিলেন না।

ইহার পর ডাক পড়ল প্রধান পালকি-বেহারা নন্দ দাসের। নন্দ ছিল ওড়িশার লোক। গোটা মাথাটা কামানো। লম্বা একহারা চেহারা। পরিধানে স্বল্প কাপড়। সাহেবদের চোখে, 'বেসবহোল্ডেড অ্যান্ড অনমোল্ড নেকেড।'—এই নন্দ দাস লম্বা সেলাম করে এসে দাঁড়াল সাহেবের কাছে। তারও দেনাপাওনা মিটিয়ে দিলেন সাহেব। দিলেন ভালো বকশিস, তারপর বললেন, 'বিকেল চারটের ভেতর বেহারা, পালকি তৈরী রেখো।'

তৈরী ছিল পালকি। বেকারি ক্লকে ঢং-ঢং করে চারটে বাজতেই সাহেব দৌড়ে গিয়ে উঠে বসলেন পালকিতে। সঙ্গে নিলেন একটি বাড়তি স্যুট। যদি হঠাৎ বৃষ্টিতে জামাকাপড় ভিজে যায়।

পুরনো কলকাতার রাস্তা কাঁপিয়ে নন্দ দাস সেদিন বিকেলে সাহেবের পালকি নিয়ে চলল তালতলায়। তালতলার মেম-সাহেবের কাছে বহুবার এসেছে নন্দ। বকশিসও পেয়েছে মাঝে মাঝে। আজ সন্ধ্যায় মেমসাহেব যে থিয়েটারে অভিনয় করতে যাবে, তাও জানে নন্দ দাস।—পথে যেতে এক ঘণ্টা সময় লাগল।

হ্যামিলটন ওখানে গিয়ে থাকলেনও এক ঘণ্টা। সন্ধ্যার ডিনার ওখানেই খেলেন। দুজনে ঘনিষ্ঠ হয়ে অনেক গল্প করলেন। অনেক। হ্যামিলটন এক সময় বললেন, 'কাল থেকে তোমার সঙ্গে আমার আর দেখা হবে না।' 'কেন?' মাদাম দেরম্যাঁতিয়ের চোখে ঘনিয়ে উঠল বিষণ্ণতা। সাহেব হা-হা করে হেসে বললেন, 'এমনিই।'

এরপরে দুজনে খুব তাড়াতাড়ি চলে এলেন থিয়েটারে। থিয়েটার সাঁ-সুসীতে।

এখানে এসে প্রথমে দেখা হয়ে গেল স্টোকেলারের সঙ্গে। সাংবাদিক স্টোকেলার হ্যামিলটনকে দেখে বললেন, 'আপনাকে আজ বেশ খুশি-খুশি দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে, বয়েস অনেক কমে গেছে!' হ্যামিলটন বললেন ঃ 'তা ঠিকই। তবে মশাইকের কম আমোদ দেখছি না তো?'

আরম্ভ হলো থিয়েটার। ওপরের একটি বকসে অভিনয় দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে গেলেন হ্যামিলটন। হঠাৎ যখন চমক ভাঙলো, তখন দেখলেন আধ ঘণ্টা কেটে গেছে।—উঠে বসলেন। মনে পড়ে গেল, কি যেন ড্রিংক করেন নি। কপালে জমে গেছে বিন্দু বিন্দু ঘাম। সুতরাং বেরিয়ে এলেন বাইরে। হঠাৎ বাইরের মুখে সাংবাদিক স্টোকেলারের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। স্টোকেলার জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী ব্যাপার? কোথায় চললেন?'

হ্যামিলটন বললেন, 'না, কোথাও নয়। এখনই আসছি।'

না, তিনি কিন্তু এলেন না। নন্দ দাসকে ডেকে সোজা ফিরে এলেন বেঙ্গল ক্লাবে। ক্লাবে পৌঁছে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলেন যে সওয়া নটা বেজেছে।

বৈশাখের আইঢাই গরম। ওপরের জ্যাকেট এবং ওয়েস্টকোটটি সাহেব এক-টানে টেনে খুলে ফেললেন। হাঁক দিলেন ইছাকে। ইছা এলো। হুকুমদারের কণ্ঠে বললেন, 'আইস সোডা দাও।'—এলো সোডা। সাহেব আলমারী থেকে একটি বিচিত্র আকারের বোতল বের করলেন। এবং সোডা ঢেলে নরম করে একটু ড্রিংক করলেন। তারপর একটু পা-চারি করে ভালো চাপিয়ে নিলেন মর্নিং গাউনটি। জানালা দিয়ে আকাশের দিকে তাকালেন। দেখলেন, সন্ধ্যাবেলাকার উল্কাপুঞ্জি চলে এসেছে আকাশের মাঝামাঝি।

মৃদু আলো জ্বলছিল টেবিলের ওপর। সাহেব হঠাৎ একটি চিঠি লিখে ফেললেন। তারপর হাঁক দিলেন নন্দ দাসকে। নন্দ এলে তার হাতে ধরিয়ে দিলেন চিঠি। তারপর যেন উদাসভাবে বললেন, 'নন্দ, তোমাকে যেতে হবে তালতলায়। সেখানে গিয়ে এ চিঠিটা একবারে মেমসাহেবের হাতে দিয়ে আসতে হবে। আর একবারে খালি হাতে এলে চলবে না। হাতে হাতে উত্তরও আনতে হবে।'

নন্দ ঘাড় নেড়ে বলল ঃ 'যাচ্ছি হুজুর। এখনই যাচ্ছি।' তারপর মাথায় পাগড়ি বেঁধে সোজা রওনা দিল তালতলা।

এদিকে ঘর থেকে বেরিয়ে আসার পর ইছা বসল পাখা টানতে। আই-ঢাই গরমে সাহেবরা বেজায় কাবু হয়ে পড়ে। ইছা এসব ছেলেবেলা থেকেই দেখে আসছে। তাই সে নিজের সাহেবের সেবায় সদা তৎপর। সারা রাত্তির সে সাহেবকে পাখা টেনে ঘুম পাড়িয়ে রাখে। পাখার দড়িটা শোবার ঘরের দরজার মাথা দিয়ে বাইরে পর্যন্ত টানা। বাইরে বসে ইছা পাখা টানে, আর সে টানে ঘরে বাতাসের ঢেউ ওঠে।

সে রাতে সাহেব ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলেন। জানালার পাল্লাগুলিও টেনে দিলেন একে একে। তারপর সাহেব একটু গান গাই-লেন। ইছা জানে যে তার প্রভু খুশি হলে এভাবে মাঝে মাঝে গান গেয়ে থাকেন। শুধু কি গান? মাঝে মাঝে সাহেবের আবার নাচবারও ইচ্ছা হয়। নাচেনও। সে রাতেও নাচলেন। ইছা পায়ে করে একটু তালও ঠুকল।

ওদিকে নন্দ দাস যথাসময়ে গিয়ে পৌঁছল তালতলায়। প্রায় এক ঘণ্টার পথ। সারাটা পথ ছুটতে

আসতে সারা ব্যাপারটিকে সে সাজিয়ে নিল নিজের মনের মতন করে। তার মনে হল, এ চিঠি পড়ে মেমসাহেব নিশ্চয় আজ রাতেই ক্লাবে আসতে চাইবেন। নয়ত কাল সকালেই চলে যাবেন গীর্জায়। সেখানে সাহেবের সঙ্গে বিয়ে হবে। আহা! ভারি সুন্দর মেয়েটি। ভারি নম্র!

নন্দ তালতলায় গিয়ে দেখল মেমসাহেব সবে ফিরেছেন থিয়েটার থেকে। মুখখানি বড়ো ক্লান্ত। বড়ো বিবর্ণ। নন্দ লম্বা একটি সেলাম দিয়ে চিঠিটি এগিয়ে দিল মেমসাহেবের হাতে। চিঠিটি হাতে নিয়ে নন্দকে মেমসাহেব জিগেস করলেন, 'কী ব্যাপার নন্দ। এত্তো রাত্রে!'

নন্দ মিষ্টি হেসে বলল, 'চিঠিতেই সব লেখা আছে, মেমসাব!'

ক্ষিপ্র হাতে চিঠিটি খুলে মেমসাহেব পড়ে ফেললেন। নন্দ দেখল, তাঁর বিবর্ণ মুখ আরও বিবর্ণ হয়ে গেল। এবং কিছু না বলেই তিনি ঘরের ভেতর ঢুকে গেলেন। নন্দ মুখখানি কাঁচুমাচু করে বলল : 'মেমসাব, চিঠির উত্তর!'—কিছুক্ষণ পরে একটি ইউরোপীয় ছোকরাকে নিয়ে এলেন বাইরে। নন্দর কাছে তাকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'একে নিয়ে যাও, নন্দ। এ ছেলেটিই হল আমার উত্তর। তোমাদের সাহেব একে দেখলেই সব বুঝতে পারবেন।'

কেমন যেন সব গোলমাল হয়ে গেল নন্দর কাছে। তালগোল পাকিয়ে গেল তার ভাবনাগুলো। মেমসাহেবের কথা মত সে ঐ ছেলেটিকে নিয়ে ক্লাবে ফেরবার জন্য পা বাড়াল। কিন্তু তার পৌঁছুনোর আগেই এখানে নতুন একখানি নাটকীয় ঘটনা ঘটে গেল।

সাহেবের নাচগান শুনতে শুনতে, এক পাশে তাল ঠুকতে ঠুকতে কখন যেন একটু তন্দ্রা এসেছিল ইশার। হঠাৎ বন্দুকের আওয়াজে ভেঙে গেল তার চটকা। দুম-দুম-দুম!—সাহেবের ঘরের ভেতরেই যেন গর্জে উঠল শব্দ। লাফিয়ে উঠল ইশা। কী যে করবে সে ঠিক করতে পারল না। দৌড়ে গিয়ে ধাক্কা মারল সে সাহেবের দরজায়। নাঃ, দরজা ভেতর থেকে বন্ধ।

তখন সে দৌড়ে গিয়ে খবর দিল ক্লাবের ইউরোপীয় স্টুয়ার্ডকে। স্টুয়ার্ডসাহেব এলেন হন্তদন্ত হয়ে। দরজা ভাঙলেন। এবং তারপর যে দৃশ্য দেখল ইশা, তাতে তার মনে হল পায়ের তলায় মাটি পর্যন্ত কেঁপে উঠছে। দেখল, পিস্তলের গুলি দিয়ে সাহেব নিজেই উড়িয়ে দিয়েছে নিজের মাথা। আর সারা ঘর ভেসে যাচ্ছে রক্তে। সাহেবের সমস্ত অঙ্গ শোণিতাপ্লুত।

এরপরের ইতিহাস এ কাহিনীর উপসংহার। পুলিশ এলো। যেমন আরো পাঁচটা ঘটে থাকে। বসল তদন্ত, যেমন আরো পাঁচটা কেসে বসে। দেখা গেল যে হ্যামিলটন সব দিক ভেবেই রেখে গেছেন সব প্রশ্নের জবাব। রেখে গেছেন কয়েকটি চিঠি। তদন্তকারীদেরও এক কলম লিখে জানিয়েছেন, 'আপনারা ব্যাকুল হবেন না, অনেক ভেবে চিন্তেই আমি এ আত্মহত্যা করেছি।' তারপরে সে চিঠিতেই জানিয়েছেন একটু একটু করে কোথায় তিনি পিস্তল পেয়েছেন এবং কোথায় তিনি কিনেছেন বারুদ।' একবারে শেষকালে কৌতূহলীদের সান্ত্বনা দিয়ে গিয়েছেন, 'ভাববেন না আমি পাগলামি করে এ কাণ্ড করেছি। না, মশাই, আমাদের বংশে কেউ কখনো পাগল ছিল না। ইনস্যানিটি ওয়াজ নেভার বিন ইন মাই ফ্যামিলি।'

চিঠির শেষে পুনশ্চ দিয়ে তিনি লিখেছেন : 'আই সলিসিট, দি চিপেস্ট অ্যান্ড সিম্পলেস্ট ফিউনারাল—নো প্লাম্ড হেড—নো মোর্নিং কোচ'—অর্থাৎ আমি অনাড়ম্বরপূর্ণ অতি সাধারণ সৎকার পেলেই আনন্দিত হব। পাকা সমাধি?—না তার কোনো দরকার নেই। দরকার নেই কোনো শোক মিছিলের।

কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে আরো কয়েকখানি চিঠি লিখে গিয়েছিলেন হ্যামিলটন। এদের ভেতর মধ্যে ছিলেন ডাক্তার গুডিভ এবং সাংবাদিক স্টোকেলার। তদন্ত বসল। এঁদের সকলকেই ডাকা হল তদন্তে। দুজনেই এক বাক্যে স্বীকার করলেন, 'ভারি আমুদে লোক ছিলেন কর্ণেল হ্যামিলটন ককস। ভারি আমুদে আর ভারি ভালো মানুষ।' স্টোকেলার জানালেন যে মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা আগেও তাঁকে দেখেছেন এবং তখনো তিনি ভারি খুশি খুশিই ছিলেন। আর গুডিভ বললেন, 'অমন সুস্থ মানুষ খুব কমই আছে কলকাতায়। খুবই কম। সামান্য একটু বাতের ব্যথা ছিল পায়ে, কিন্তু তার জন্য কেউ কখনো কি আত্মহত্যা করে?'

কিমাশ্চর্যম! তবু আত্মহত্যা করলেন হ্যামিলটন ককস। কাগজওলারা বলল : অসুখী দাম্পত্যজীবনই এর কারণ। স্ত্রীর প্রত্যাবর্তনের চিঠিটিই হল মূল। অবশ্য মন্দলোকে মাদাম দেরম্যাভিলেকে ছেড়ে দিল না।

•

সেদিন তদন্তকারীরা কেউই মাদাম দেরম্যাভিলের কথা তোলেন নি। তার কারণ হ্যামিলটন সেরকম কোনো সুযোগ রেখে যান নি। কিন্তু মন্দ লোকেরা এমন সুযোগ ছাড়বে কেন? তারা মাদামের দিকে বাঁকা চোখেই তাকিয়ে রইল। আর গোঁড়া খ্রীষ্টানরা এমন সুযোগ কখনো কি হেলায় হারাতে পারেন? তাঁরা হঠাৎ কোমর বেঁধে নেমে পড়লেন আসরে। কাগজে কাগজে তাঁরা ফেঁদে বসলেন পরোক্ষ আলোচনা! থিয়েটারগুলির ওপর অনেকদিন থেকেই ছিল তাঁদের রাগ। ঐগুলিকে তাঁরা মনে করতেন পাপের আড্ডাখানা! এ সুযোগে তাঁরা এদের ওপর নিয়ে নিলেন এক হাত। 'ক্রিশ্চিয়ান অ্যাডভোকেট'র পাতায় লেখা হল, 'দি থিয়েটার ওয়াজ, ফ্রম দি ফার্স্ট, দি ফেভারিট হন্ট অব সিন।' অর্থাৎ এই থিয়েটারগুলি আগাগোড়া নরকের দ্বার। সৎ মানুষগুলিকে পাপের ভেতর টেনে আনাই হল তাদের কাজ।

থিয়েটারগুলি যদি নরকের দ্বার হয়, হয় পাপের আড্ডাখানা, তবে তার অভিনেত্রীরা কী। এই মেয়েগুলি নিশ্চয় আরো জঘন্য। বলাবাহুল্য, মাদাম দেরম্যাভিলেকে সেই নারকীয় কলঙ্কে লিপ্ত করা হল। পাড়ায় পাড়ায় নানা রকম রসাল ও মুখরোচক খবর ছড়িয়ে পড়ল। গ্রীষ্মের সুদীর্ঘ অবকাশগুলিতে সহর কলকাতা মগ্ন হয়ে রইল এইসব কুৎসিত রসিকতায়।

কিন্তু কে জানত, নাটকের ওপরেও নাটক হয়।

এবং সব থেকে মজার ব্যাপার, সেই অসম্ভব নাটকই ঘটে গেল। এবং মাত্র বারো দিন পরে। তেরোই মে হঠাৎ খবর পাওয়া গেল যে অভিনেত্রী দেরম্যাভিলে মারা গেছে। —'আনফরচুনেট সিম্পল হ্যাজ অলসো বিন রিমুভড ফ্রম দি স্টেজ অব লাইফ'! জীবনের মঞ্চ থেকেই চিরদিনের তরে বিদায় নিয়েছে হতভাগিনী!—কারণ? কী ভাবে বিদায় নিয়েছে?—না, আত্মহত্যা নয়। হঠাৎ অসুস্থতা। হ্যামিলটনের মৃত্যু থেকে দু সপ্তাহ আর গেল না। তেরোদিনের মাথায় এক বৃহস্পতিবার সকালে কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়ে সকল যন্ত্রণার থেকে মুক্তি পেল বিপন্না ফরাসী-বধূটি! কোনো বাঁকা কটাক্ষই আজ আর তাকে স্পর্শ করতে পারল না।

এ মৃত্যুতে অনেকেই না কেঁদে পারলেন না। কেউ কেউ এ মৃত্যুকে স্বাভাবিক মৃত্যু বলে মেনে নিতে অস্বীকৃত হলেন। বললেন, পুরোপুরি আত্মহত্যা না হলেও এটি যে আত্মত্যাগ, তা সুনিশ্চিত!

খ্রীষ্টান কাগজগুলির কিন্তু এতেও মন উঠল না। সুন্দরীদের ওপর যেন তাঁদের চিরকালের আক্রোশ। যে রমণীর পাল্লায় পড়ে স্বামী ডাকাত হয়, নিরীহ ভদ্রলোককে বিপথে নিয়ে গিয়ে যে সুন্দরী আত্মহত্যার দিকে ঠেলে দেয়, তাকে কখনো কি এঁরা ক্ষমা করতে পারেন? তাই সমবেদনার পরিবর্তে নিষ্ঠুরভাবে মাদাম দেরম্যাভিলের মৃত্যুচর্যায় লিখলেন তাঁরা। লিখলেন, 'শি ওয়াজ নোন টু বি অ্যান হ্যাবিচুয়াল ড্রাঙ্কার্ড, এ প্যারামোর অব সুইন্ডলার অ্যান্ড ভ্যাগাবন্ডস। আপন দিস কনেরিটি টুক নিড্‌লেস।'

অর্থাৎ দুর্বার পানাসক্তি ছিল দেরম্যাভিলের, রোজই নাকি সে মদ খেত। তার-ওপর সে ছিল এক লম্পটের রক্ষিতা, ভ্রষ্টচরিত্রা। সুতরাং এই নিয়ে আর কথা না বাড়ানোই ভালো!—মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

হায় দেরম্যাভিলে! বেচারি কি এ জন্য ভালোবেসেছিল অভিনয়কে? সুদূর প্যারিস থেকে হেনরীর হাত ধরে সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে এই ভয়ঙ্কর স্বপ্নই কি দেখতে দেখতে এসেছিল?—কি মঞ্চে, কি মঞ্চের বাইরে, সেকালের কলকাতায় অনেক নাটক ঘটে গেছে, কিন্তু এমন নিষ্ঠুর নাটকীয় ঘটনা কখনো ঘটেছে বলে শোনা যায় নি। কখনো না।

গোয়েন্দা কবি পরাশর

প্রেমেন্দ্র মিত্র রচিত
শৈল চক্রবর্তী চিত্রিত

পায়ের পদাবলী

বিমল বসু

মেয়েটিকে বেশ মানিয়েছে। যেন পটে আঁকা ছবি। প্রসাধনের সূক্ষ্মতম সুকুমার নিজেকে বিন্যস্ত করে তুলেছে। অঙ্গ-প্রসাধনের আসনে ঠোঁটে। পেন্সিলে আঁকা ভুরু দুটি মনকে বন্দি করে। হাত-আয়নায় হয়ত বারে বারে দেখেছে অনেকক্ষণের কাজ চলছিল হয়তো বড়ো থেকে ছোট পাউডার-পাফ বুলিয়ে। সমস্ত অনুশাসনে প্রস্ফুটিত যৌবনের চারুসজ্জা। চারদিকের কুশ্রীতার আর উগ্রতার মধ্যে মেয়েটি যেন সৌন্দর্য সমন্বয়ের এক আশ্চর্য নিদর্শন।

কিন্তু পায়ের দিকে চোখ পড়তেই গা-টা গুলিয়ে উঠল। একেবারে যাকে বলে কুশ্রী-দর্শন—নোংরা, বেঢপ আকার আর পরিচর্যার অভাবে কেমন যেন হতশ্রী। চোখ তাড়াতাড়ি ফিরিয়ে নিলাম।

ভারতীয় বিশেষ করে বাঙালী মেয়েরা পায়ের যত্ন নিতে একেবারেই জানে না—জানে নিতে চায় না তাচ্ছিল্যভরে। তাই দেহের দৃশ্যমান অংশকেই নিখুঁত করে তুলতে কসমেটিক্স আচ্ছাদনের আড়ালে ফ্যাশানেবল জুতোর মধ্যে লুকানো পা দুটিও যে দেহের অন্যতম অঙ্গ তা যেন আজকাল বাঙালী মেয়েরা একেবারেই ভুলে গেছে।

অথচ ভারতীয় এবং বাংলা সাহিত্যে পায়ের পদাবলি কম পাওয়া যায় নি—চরণ-পদ্মে প্রাণ ডালি দেবার জন্যে কম মাতামাতি হয় নি। শ্রীরামচন্দ্র সীতার কোন হদিশ করতে না পেরে উন্মাদ হয়ে উঠলেও লক্ষ্মণ বনের পথপ্রান্তে কাননের ওপর ক্ষীণ কেবল পদচিহ্ন দেখেই তা সীতা-দেবীর চারু চরণের চিহ্ন বলে চিনতে ভুল করেন নি। সর্ব অবয়বের মধ্যে কেবল লক্ষ্মণ সীতার পা দুটিকেই চিনতেন—বনবাসের চোদ্দ বছর এই চরণপদ্মের দিকে চেয়েই কেটেছিল। এ থেকে এটুকু অনুমান করে নিলে অপরাধ হয় না যে বরবর্ণিনী সীতার চরণকমলের সৌন্দর্য ছিল অপরূপ এবং সেকালের রূপবতীরা বাহির্দেশের রূপ-সাধনায় একালের মেয়েদের মতো পা দুটিকে অনাদর করতেন না।

রামায়ণ-মহাভারতের যুগে যাবার দরকার নেই। এই সেদিনও বছর তিরিশ-চল্লিশ আগে একধরনের মেয়েরা এসে বাড়ির মেয়ে-বউ আর গিন্নিবান্নিদের হাতে-পায়ের নখ কেটে পা দুটির ময়লা ঝামায় ঘসে পরিষ্কার করে আলতা পরিয়ে পায়ের শ্রীর ফিরিয়ে দিয়ে যেত।

তিরিশ-চল্লিশ বছর আগেকার কথা তুললে আপনারা বলবেন 'ব্যাক-ডেটেড'। তাই অত দূরে যাবার দরকার নেই। দেহকে সুন্দর এবং দর্শনীয় করার ও ফ্যাশানেবল হওয়ার প্রথম পাঠ এবং 'আর্ট' যাদের কাছে এদেশের মেয়েরা নিয়েছে এবং নিচ্ছে সেই ভিনদেশী মেয়েদের পায়ের দিকে একবার তাকিয়ে দেখেছেন কি কখনও? দেহের উত্তমাঙ্গের মতো অধমাঙ্গের বিশেষ করে পায়ের দিকে তাদের নজর বড় কড়া—সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠত্বের নিরিখ ভাইট্যাল স্ট্যাটিস্টিক্স ৩৬-২০-৩৬ হলেও এই প্রতিযোগিতার পটভূমিতে নিরাভরণ পদযুগলের ললিত লাবণ্য-এর ভূমিকাটুকু কম জোরদার নয়—পা দুটিকে তারা দেহ-সৌন্দর্যের অন্যতম আধার বলে মনে করে। দেহসৌন্দর্য যেন টসকে না যায় সেজন্যে মুখের মতো পায়ের ওপরও তাদের সমান সতর্ক নজর। কেননা এই পা দেখেই এবং পা থেকেই প্রেম-অনুরাগ-পর্বের প্রথম পালা। প্রেমের প্রাথমিক পাঠ এবং 'পার্ট' ওদেশে এই পা থেকেই শুরু। স্কার্ট আর মিনিস্কার্টের দৌলতে এই পায়ের প্রদর্শনী আরও জোরদার হয়েছে।

পা যে সৌন্দর্যের আধার এ বিচার কিন্তু বিদেশীর নয়—সম্পূর্ণভাবে ভারতীয়। খুব বেঁচে গেছেন আপনারা একালের মেয়ে হয়ে। সেকালের হবু শাশুড়ীরা কনে দেখতে এসে দেখতেন হবু পুত্রবধূর পা 'লক্ষ্মী-পা' কিনা। সেকালে মুখশ্রীর সঙ্গে এই লক্ষ্মী-পায়েরও অন্বেষণ চলত। দেখতে সুন্দর, অপূর্ব চোখ-মুখ কিন্তু খড়ম-পা বলে কত ডানাকাটা পরী সেকালে হরবকত বরবাদ হয়ে গেছে তা বলার নয়। লক্ষ্মী ঠাকরুনের মতো ছোট সুন্দর গড়নের যে মেয়ে সে হত সুলক্ষণযুক্ত বরণীয়া বধূ। আজকাল মেয়ে দেখতে এসে শুধু মুখশ্রীই দেখা হয় বলে আধুনিক মেয়েরা মুখ-চর্চাতেই অনেকখানি সময় দেয়। পায়ের দিকে একেবারেই তাকায় না বলেই এই শোচনীয় হাল। আমার মনে হয় হবু শাশুড়ী নয়—হবু বর আর প্রেমিকরা একটু সজাগ হয়ে 'কন্যার পা' দেখতে চাইলেই মেয়েদের চোখ পায়ের দিকে ফিরবে।

পা দুটির সর্বাঙ্গ শাড়িতে আর পায়ের পাতা জুতোর খোলসে ঢাকা থাকে বলে অযত্ন করা মোটেই উচিত নয়। আপনি হয়তো পায়ের গড়ন না বদলিয়ে দিতে পারেন কিন্তু দেখতে ভাল-নয় এমন পা দুটিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রেখে, পরিমার্জনা করে আলতা পরিয়ে আলগা সৌন্দর্যের ঢেউ তুলে সারা অবয়বে একটা শান্ত শ্রী দুটিতে তুলতে পারেন অনায়াসেই এবং বিশেষ করে শীতের নিষ্করুণ দিনে।

আপনার পা দুটি লক্ষ্মী-পা না হতে পারে। সেজন্যে লজ্জা পাবার কিছু নেই। মুখের মতো পায়েরও একটু যত্ন নিতে হয়। 'এক্সপোজার' বেশি হলে রমণীয় মুখের রঙটাও কালো হয়ে যায়। সব ব্যাপারে বেশিটাই খারাপ। সমস্ত অঙ্গের মধ্যে পা প্রায় সবসময়ে সবচেয়ে বেশি এক্সপোজড হয়—জলে রোদে ধুলোয়। আর আজকালকার মেয়েরা তো সর্বদাই পায়ে-পথে। কেউ বা মোজা ব্যবহার করে। এই কারণেই পা হতশ্রী হয়ে যায়। পায়ের গড়ন আপনি না বদলাতে পারেন কিন্তু পরিমার্জনা এবং পরিচর্যায় পায়ের পাতা, গোড়ালি মসৃণ হবে, নোংরা অপরিচ্ছন্ন পা সুশ্রী হতে পারে, ফাটা বিবর্ণ পায়ে চেকনাই ফুটে উঠতে পারে। এবং তা করতে আপনার দু জাহাজ কসমেটিক্স লাগে না। এখন শীতকাল। পায়ের পরিচর্যা করার এই-ই তো সেরা সময়।

এজন্যে দরকার আপনার সময়ের পাঁচ মিনিট একটু গরম জল, এক টুকরো সাবান, বাতিল করা টুথ-ব্রাস একটা আর ঝামার একটা টুকরো (এখন ঝামা মেয়েদের পায়ের পাতার আকারে হাটে-বাজারে মার্কেটে বিক্রি হয়)।

এ দিয়ে কি করতে হবে তাও কি বলে দিতে হবে? গরম জলে পা এবং পায়ের চারপাশ ভাল করে ভিজিয়ে টুথব্রাসে সাবান ঘসে তা দিয়ে পায়ের চারপাশে, আঙুলের মধ্যেকার জায়গা, পায়ের ওপরের অংশটুকু—আর নখগুলি পর্যন্ত পরিষ্কার করে নিন। পায়ের গোড়ালি ঝামা দিয়ে ঘসে পরিষ্কার করে নেবেন। যাদের পা একটু বেশি ফাটে শীতের দিনে তাঁরা গোড়ালী পরিষ্কার করে তরল গ্লিসারিন লাগাতে পারেন। পায়ের নখ কেটে আলতা পরলে পায়ের বিবর্ণতা এবং অসম্পূর্ণতা দূর হয়ে আপনার শরীরে একটা আলাদা শ্রী এনে দেবে। আর তখন যদি কেউ আপনার প্রসাধিত বাঁকা মুখ আর পরিচ্ছন্ন আলতা-পরা চারুচরণ দেখে মুগ্ধচোখে চরণ-বন্দনার জন্যে জয়দেবকে স্মরণ করে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে তাহলে আপনার বুকের ভেতর সুখের ঢেউ উঠবে না কি?

চিলড্রেন্স ফিল্ম

স্বপনকুমার ঘোষ

দি ফুট্টী

দ্য স্টোলেন এয়ার সিপ

'এখানে এত দুঃখ কেন?' ঘর পালানো ছোট্ট ছেলেটার মুখে কথাটা তুলে যাই কি করে? শিশুদের নিয়ে চলচ্চিত্র ভাবতে গেলে ঋত্বিক ঘটকের দুঃসাহসিক চিত্রকর্ম 'বাড়ি থেকে পালিয়ে' সর্বাগ্রে মনে পড়ে যায়। একটা শিশুর চোখ দিয়ে ক্যামেরায় মহানগর পরিক্রমণ। জীবনকে দেখা। জীবিকাকে অনুভব করা। ছবির মতো আনন্দ-বেদনা হতাশা দুঃখ। সবশেষে শিশু মনে নিঃসঙ্গতা। আশা ভঙ্গের প্রতিচ্ছবি। এক জায়গায় প্রতীক ব্যবহার স্মৃতির এ্যালবামে সাজিয়ে রাখার মতো। ছেলেটি আশাহত। একটা চিল পড়ে আছে। কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'চিল' কবিতা অনুসরণে—গভীরতা অনেকখানি। তাছাড়া সংলাপেও গভীরতা বর্তমান। ছবির শেষ দিকে একটা মুটে বলছে: 'এ লড়াইয়ের জায়গা—কলকাতা শহর—নরনারায়ণ কুছু নেই, ঘা ঘরে চলে যা।'

সুতরাং শিশুচিত্র বা চিলড্রেন ফিল্ম মানেই নিছক ডকুমেন্টারী স্টাইলে পাহাড়ে ওঠবার আডভেঞ্চারাস গল্প অথবা বিস্ময়ে হতবাক করে দেওয়া কোনো ম্যাজিক ছবি কিংবা হাসিতে ফেটে ওঠার মতো প্রমোদ-চিত্র নয়। দেশ-বিদেশে শিশুচিত্র নিয়ে যে সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে—বেশীর ভাগ ছবিতেই কোনো না কোনো সমস্যাকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে যাতে সারাক্ষণ ছবি জুড়ে একটা বিশেষ গভীরতা বজায় থাকে। ছবিকে সহজভাবে গ্রহণ করেও ছবি সম্পর্কে গভীরতর আলোচনা হতে পারে। আগেকার শিশুচিত্র এবং আজকের শিশুচিত্রের ব্যবধান অনেকটা—এই পথ পরিক্রমণের ইতিহাস খুব ছোট নয়। সুতরাং এই প্রসঙ্গে 'গৌরচন্দ্রিকা' আবশ্যক।

রূপকথার যাদুকর ডিজনী ইহজগতে নেই এখন। কিন্তু ওঁর চলচ্চিত্র কর্ম প্রত্যেকটা মানুষের মনে স্মৃতি হয়ে আছে। একদা যিনি সরল নিষ্পাপ বিশুদ্ধ শিশু-হৃদয়কে তৃপ্তি এবং আনন্দ দিতে, ব্যাপ্তি ও গভীরতা দিতে, শিল্পত্রী মানবিকতার উজ্জীবিত করতে চেয়েছিলেন। তাঁর ছবি আজও শিশুদের কাছে এক বিচিত্র অনুভূতি—সাত সমুদ্র তেরো নদীতে উত্তাল তরঙ্গ বহু রঙ্গে রঙ্গীন। অপরূপ স্রষ্টা মানসপটে শিশুদের নিয়ে মেতে থাকতেন সর্বক্ষণ। নির্জনতায় শিশু আর শিশুকে ঘিরে ভেবেছিলেন চলচ্চিত্র—যখন রোমান্টিক আর শ্যামার রাজ্য বহুদূরে সুবিস্তৃত। শিশু মনে নিজের মনকে রাখলেন—অনুভব করলেন ওরা কি চায়। মিকি মাউস, ডোনাল্ড ডাক, ক্ল্যারাবেল কাউ, প্লুটো, গুফী ইত্যাদি সব এক এক জ্ঞানের অনন্যসৃষ্টি। সবচেয়ে বড় কথা এত সব নতুন আঙ্গিক প্রয়োগেও তিনি রূপকল্পে বাস্তবকে পাশ কাটিয়ে যাননি। রূপকথার আশ্চর্য জগতে সৃষ্টি করেছেন 'দ্য লিভিং ডেজার্ট' এবং 'দ্য ভ্যানিশিং প্রেইরী'র মতো সব ছবি। এর উপলব্ধি যাঁরা শিশু বয়সে করেছিলেন আজও ভুলতে পারেন নি। শিল্পকর্মের শেষদিকে শিশুদের জন্য করে গেছেন ডিজনীল্যাণ্ড—যা স্মরণীয় সৃষ্টির ইতিহাস কোনোদিন ওয়াল্ট ডিজনীকে ভুলতে পারবে না। আশ্চর্য সৃষ্টি করেছেন কারণ উনি শিশুদের নিয়ে, ভাববার মতো ভেবেছেন। শুধুমাত্র শিশুচিত্রের ভাবুক হিসেবেই নয়, চলচ্চিত্রের কারিগরী উন্নতি বিধানে তাঁর [illegible] অপরিমিত। শিল্পী নেই—স্মৃতি রয়েছে। পরিমাপ করবার লোক নেই, কিন্তু প্রয়োজন নিশ্চয়ই রয়েছে।

ডিজনীসম এমন কোন বিশেষ প্রতিভা নেই যাঁরা আমাদের ভাবাতে পারেন। সুতরাং একত্র আমি আমার দেখা কয়েকটি উল্লেখযোগ্য শিশুচিত্র সম্পর্কিত আলোচনা ছায়ায় ছায়ায় কোন এক আশ্চর্য প্রতিভার সন্ধানে লেখার কলেবর।

কলকাতায় গত ফরাসী চলচ্চিত্র উৎসবে ক্লদ বেরীর 'দ্য ওল্ডম্যান অ্যান্ড দি চাইল্ড' ছবিটা মনে করে রাখার মতো। ছবির গল্প: একটি শিশু এবং এক বৃদ্ধ দম্পতিকে নিয়ে। সময়: নাজী অধিকারের শেষ কয়েক মাস। স্থান: ফ্রান্সের আলপ্স পর্বতমালার পাদদেশ। বৃদ্ধ দম্পতি অবসর কাটাচ্ছে নির্জনে। যুদ্ধ সম্পর্কে একমাত্র সংগ্রহ তখন বেতার। সরকারী প্রচারে ইহুদীদের এবং কম্যুনিস্টদের সরকারের কাছে ধরিয়ে দেবার কথা বলা হয়। অথচ শিশুটি ছিল ইহুদী—বৃদ্ধ দম্পতি তা জানত না। তারা শিশুটিকে প্রাণের চেয়ে ভালোবাসে। তারপর জানতে পারে। স্কুলে ছেলেটির পরিচয় আবিষ্কৃত হবার পর মাথা ন্যাড়া করে বাড়ী পাঠিয়ে দেওয়া হয়—এই সব দৃশ্যগুলো চিরকালের স্মরণীয়।

তারপর শিশুটির জীবন বাড়ীতেই শুরু হয়ে যায়। গ্রীষ্মের মনোরম দিনগুলোতে। ওরা দুজন ঠিক শিশুর চাপল্যে চপল হয়ে উঠল। তিনটি পুরুষ সবাই যেন শিশুর মতো। তখন তাদের কাছে বিশ্বসংসার, রাজনীতি, সমকালীন ঘটনা এবং ভূগোল হয়ে উঠলো খেলনার মতো।

একটা মর্মান্তিক ছবি দেখেছিলাম—চৌর্য বৃত্তি [illegible] দি রেন। [illegible] স্বাভাবিক-[illegible] অ্যাড-[illegible]

CENTRAL LIBRARY

ফ্লাইট স্টেশনে—তিনি টিকিট কেটেছেন—যাবেন ভেনাসে অথবা শুক্রগ্রহে। ফ্লাইট ছাড়তে কিছু সময় বাকী। ভদ্রলোক ল্যাবরেটরীতে গিয়ে ইলেকট্রিক লোডিংএ বিপত্তি ঘটালেন—অন্ধকার হল—বৈদ্যুতিক গোলযোগে ফ্লাইট স্টেশনে সম্পূর্ণ অন্ধকার। এখানে অনেকটা ছিন্ন সিকোয়েন্সের মতো। ভদ্রলোক চাঁদে যাবার জন্য প্রস্তুত। চাঁদে একটি সুন্দরী মেয়ে ডাকছে। বিভিন্ন উপায়ে যাবার চেষ্টা করলেন। গ্যালিলিও প্রভৃতি দেখালেন ওকে—কিন্তু শেষ পর্যন্ত যাওয়া আর হল না। ফ্লাইট স্টেশনে আলো আর আলো। আপাতদৃষ্টিতে সুন্দর হাসির ছবি কিন্তু ছবিতে যা কিছু দেখানোর নেপথ্যে পরিচালক বলতে চেয়েছেন : চাঁদে যাবার জন্য আমরা ইচ্ছুক। এই ইচ্ছেটা আমাদের গ্যালিলিওর আমল থেকে প্রভাবিত করছে কিন্তু কিছুই অসম্ভব নয়—টিকিট কেটে ভেনাসেও যাওয়া যাচ্ছে।

সুতরাং ইদানীং যেসব শিশুচিত্র দেখার সৌভাগ্য আমাদের হচ্ছে—বক্তব্য গভীরতা এবং বিশেষ বিশেষ সমস্যা নিয়ে। 'ফোর হানড্রেড ব্লোজ' ছবির শিশুটিকে অনুভব করতে দর্শকরা অনেক সময় নিয়েছেন। সেই ছেলেটিকে যখন শেষ দৃশ্যে ফ্রিজ করে রাখা হল—সেখানেই কিন্তু ছবিটার শেষ আবার ভাবনার শুরুও সেখানেই ছবির শুরু।

আবার অনেক শিশুচিত্র দেখা যাচ্ছে যাতে তাদের বাবা-মা'র বিবাহ বিচ্ছেদ প্রভৃতির সমস্যাগুলো প্রকটভাবে দেখানো হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে একটি বেলজিয়াম ছবির উল্লেখ করা যেতে পারে। 'ব্রুনো' ছবির নাম—ছেলেটিরও নাম। বিবাহ বিচ্ছেদের পর বাবা গভীরভাবে ভাবেন ছেলেটি সম্পর্কে। মিষ্টি চেহারা, মিষ্টি স্বভাবের ছেলেটি তার বয়সের তুলনায় তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন। সে বুঝতে পারে এতে তার বাবার দোষই বেশী। মায়ের কাছে থাকত ব্রুনো। ছুটিতে বাবার কাছে এলো। বাবা যথাসম্ভব চেষ্টা করলেন ছেলেকে খুশী করবার জন্য। একসময় ছেলেটি চেষ্টা করে মার কথা বলতে—বাবাকে ভুলটা ধরিয়ে দেবার জন্য। বাবাকে অনুরোধ করে তার সঙ্গে মা'র কাছে যাবার জন্য। বাবা মা'র কাছে আসে। মা অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। ব্রুনোর চোখে ভেসে ওঠে একটা সুখী জীবন—সুখী সংসার—সুখী আবহাওয়া।

এগুলো ঠিক চিলড্রেন ফিল্মের পর্যায়ে আসে না তবুও চিলড্রেনের সমস্যা বিশেষভাবে অঙ্গীভূত। তাই দেশে দেশে এখন এসব সমস্যা নিয়ে একাধিক ছবি হচ্ছে—একান্তভাবেই শিশুদের দেখানো উচিত। চেকোশ্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরী, পোল্যান্ড, জাপান প্রভৃতি দেশেও সমস্যা নিয়ে এবং সমস্যার সমাধান নিয়ে একাধিক ছবি নির্মিত হচ্ছে।

বিশেষ করে সোভিয়েত রাশিয়ায় ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরে, তখনকার সামরিক অর্থনৈতিক অসুবিধা সত্ত্বেও, শিশুদের জন্য এক নতুন, সমাজতান্ত্রিক চলচ্চিত্র শিল্প গড়ে তোলার উদ্দেশ্য পরিকল্পিত কাজ শুরু করা হয়। আজও অব্যাহত এই শিশু চলচ্চিত্র শিল্প। বছরে ২০টি পূর্ণ দৈর্ঘ্যের কাহিনীচিত্র এবং ৫০ রিলেরও বেশি কার্টুন, সরল-বিজ্ঞান ও শিক্ষাচিত্র তৈরী হয়। কেন্দ্রীয় দলিল-চিত্র স্টুডিও 'পাইওনেরিয়া' নামে ছোটদের একটি মাসিক চলচ্চিত্র পত্রিকা প্রকাশ করে। শিশুদের জন্য প্রথম সোভিয়েত চলচ্চিত্রটি মুক্তিলাভ করে ১৯১৯ সালে। শিশু চলচ্চিত্র প্রযোজনার পেছনে বয়স্কদের জন্য চলচ্চিত্রের মতোই অকৃপণভাবে খরচ করা হয়। উল্লেখযোগ্য—পরিচালক থেকে বিদ্যুৎযন্ত্রী পর্যন্ত—বেতনহার সমান।

এবার নিয়ে এই দুবার মস্কো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের কাঠামোর মধ্যে একটি আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। রুশ ফেডারেশনের পরিবেশক সংস্থাগুলি বহু স্কুলে দশ হাজারেরও বেশি ইয়ং পাইওনিয়ার চলচ্চিত্র প্রদর্শন কেন্দ্র রয়েছে। সবিশেষ উল্লেখ্য শিশুরাই এগুলো চালায়।

সোভিয়েত রাশিয়াতে বহু শিশু চলচ্চিত্র তৈরী হয়েছে। পুরো তালিকাটা হবে বেশ কয়েকশো। তার মধ্যে আছে শিল্পগুণসম্পন্ন মহৎ সৃষ্টি—আজ যাকে ক্লাসিক বলে বিবেচনা করা হচ্ছে। ভালো চলচ্চিত্র রয়েছে, মাঝারিও। আবার ব্যর্থতাও আছে। কিন্তু এসবের মধ্যে একটিও নিষ্ঠুর চলচ্চিত্র নেই, একটিও নেই মানবিকতা-বিরোধী। সবকটিরই উদ্দেশ্য হল যা কিছু সুস্থ, উন্নত ও মহৎ তার প্রতি তরুণ দর্শকদের আকর্ষণ ও আগ্রহ জাগিয়ে তোলা।

এক আশ্চর্য প্রতিভা চেকোশ্লোভাকিয়ার—কার্ল জামান। ওয়াল্ট ডিজনীর সমকক্ষ না হলেও উনি শিশু চলচ্চিত্রকার হিসেবে যে সম্মান লাভ করেছেন—তা বিশ্বের আর কোন পরিচালকের ভাগ্যে জুটেছে কিনা সন্দেহ। জামান প্রতিভার নতুনতর দিকদর্শন 'স্টোলেন এয়ারশিপ'। এ ছবি যাঁরা একবার দেখেছেন তাঁরা সারা জীবন মনে রাখবেন সেই পাঁচটি শিশু যারা বেরিয়ে পড়েছিল রোমাঞ্চকর এ্যাডভেঞ্চারে। গিয়ে উঠেছিল এক সমুদ্রের দ্বীপে। ওরা বোধহয় কলম্বাসের মতো আবিষ্কার করেছিল এক নতুন মহাদেশ—সেই জন্যে আনন্দে মাতোয়ারা এক একদিন এক একটা রোমাঞ্চকর অ্যাডভেঞ্চারের সম্মুখীন হল। ওরা বাড়ী থেকে পালানো ছেলে। পালিয়েছিলো একটা পুরোনো আমলের এয়ারশিপে চড়ে। বাড়ী থেকে খোঁজ খোঁজ। সারা শহর তুলকালাম কাণ্ডে ব্যতিব্যস্ত। অ্যাডভেঞ্চারের ফাঁকে ফাঁকে শহর জীবনের একটা বিচিত্র রূপ ক্যামেরায় ধরে দেখিয়েছেন জামান।

দেখিয়েছেন ঐ এয়ারশিপের জন্য অনাস্থা প্রস্তাব—মন্ত্রিসভার পতন। কাগজে বিচিত্র খবর—সাংঘাতিক বিক্রি। রিপোর্টারদের অদ্ভুত সব সংগ্রহ। সেই পাঁচটি ছেলের একজনের দু' চার ধরনের ছবি নিয়ে বিক্রি করল কাগজওয়ালাদের— কাগজওয়ালারা সুন্দর ক্যাপশনে সাজিয়ে এমন সব সংবাদ পরিবেশন করলেন যাতে কাগজের বিক্রি দ্বিগুণ হল। ব্যবসাদার—চোরাকারবারী প্রভৃতিদের কার্যকলাপ। কিভাবে একটা ছোট্ট ঘটনাকে এক্সাজারেট করে কত বড় কাণ্ড হতে পারে তিনি তা দেখিয়ে দিয়েছেন। শিশুদের সারাক্ষণ আনন্দে ডুবিয়ে—বয়স্কদের সূক্ষ্ম কৌতুকরসে ভিজিয়ে—মাঝে মাঝে সমস্যাগুলো সম্পর্কে ভাবিয়ে তুলতে যে দক্ষতা—যে অপরূপ শিল্পসৃষ্টির স্বাক্ষর কার্ল জামান রেখেছেন একটার পর একটা ছবিতে তার অন্য নজীর পাওয়া ভার।

জামান ছাড়া আরো অনেক চেক চলচ্চিত্রকার আছেন যাঁদের শিশুচিত্র দেখলে শিল্পনৈপুণ্যের এক বিচিত্র রূপ লক্ষ করা যায়। এই প্রসঙ্গে স্কালান্স্কির 'কাইট' ছবিখানি উল্লেখ্য। সুন্দর এবং সহজ চিন্তার উন্মেষ সম্পূর্ণ ছবি জুড়ে। ছোট্ট এক শিশু কিভাবে একজন বাজে ছেলের পাল্লায় পড়ে 'ঝরে' গেল সেই গল্প এবং অহরহ এ ঘটনা ঘটছে পাড়ায় পাড়ায়। গল্পে এমন কোন নতুনত্ব না থাকলেও প্রয়োগ পরিকল্পনায় নতুনত্বের বিশেষ 'ইমেজ' এনে দিয়েছেন পরিচালক স্কালান্স্কি। শিশুচিত্রে চেকোশ্লোভাকিয়া একরকম ইতিহাস। বিশেষতঃ জামানের জুলে ভার্নের ওপর বিশেষিত ছবিগুলি একসময় প্রচণ্ড আলোড়ন তুলেছিল। তাঁর ভার্নে ছবি 'ইনভেনশন অফ ডেস্ট্রাকশন' পুরস্কৃত হয়েছিল বিশ্ব প্রতিযোগিতা—ব্রাসেলস-এ অনেক পুরস্কারের এটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য পুরস্কার। জামান সম্প্রতি যে ছবিটি শেষ করেছেন তাও ভার্নের ভিত্তিতে—ছবির নাম : 'অন দি কমেট'। কমেটে করে বিশ্বভ্রমণে বেরিয়েছিল শিশুরা। তাদের চোখ দিয়ে সুখ, দুঃখ, আনন্দ, বেদনা—টুকরো টুকরো মুহূর্তগুলো এক করে সাজিয়েছেন।

বিখ্যাত গোটওয়ালডো ফিল্ম স্টুডিও চেক দেশের শিশুচিত্র নির্মাণের পীঠস্থান। বিখ্যাত চেক শিশু চলচ্চিত্রকার যোসেফ পিনকোজ, কার্ল জামান প্রভৃতি অনেকেই এখানে শুরু করেছিলেন তাঁর শিল্পীজীবন। এখন অনেক চেক চলচ্চিত্রকারই শিশুদের ছবির কথা ভাবছেন এবং প্রয়োগপদ্ধতিতে নতুনত্ব দেখিয়ে বিশ্ব-স্বীকৃতি লাভে উন্মুখ।

শুধু চেক দেশেই নয় দেশে দেশেই আজ ভাবছেন এবং এতে প্রয়োগ পরিকল্পনার একটা সুন্দর দিক রাখছেন—টেকনিকের নতুনত্ব আরোপ করতে পারছেন—তার সুন্দর উদাহরণ সত্যজিৎ রায়ের 'গুপীবাঘা' নয় কি?

ফুল কেন প্রিয়?

সন্ধ্যা সেন

পারিজাত পুষ্পের অধিকার নিয়ে লক্ষ্মী ও সত্যভামার কলহ এবং স্বয়ং নারায়ণের বিপন্ন হওয়ার কাহিনী কারোরই অজানা নয়। দেবতাদের কামনার বস্তু এই ফুল। তাই কি তা মর্তের মানুষকে মর্ত্যসীমার মালিন্য বিস্মৃত করে স্বর্গ-কল্পনায় আত্মহারা করে দিতে পারে? হয়ত তা ক্ষণিকের। কিন্তু ক্ষণকালীন মাধুর্যের গভীরতার মধ্যেই আমরা যে তীব্রতায় বেঁচে উঠি, দীর্ঘ জীবনব্যাপী অনুভূতিহীন শ্রীহীন বাঁচা বাঁচায় তার কাছে মিথ্যে হয়ে যায়। স্বর্গলোক থেকে সুরু করে মর্ত্য অবধি ফুলের স্থান সবার ওপরে।

ফুল দেবভোগ্য। দেবপূজোয় ফুল অপরিহার্য। আবার ফুলেরই দাক্ষিণ্যে মানুষের সামান্য গৃহও অসামান্য সৌন্দর্য-ভূষিত হতে পারে। আসবাবহীন গৃহ-কোণে ফুলদানীতে রাখা একগুচ্ছ ফুলের কাব্যসৌন্দর্য, অভিনন্দন সভা অথবা সঙ্গীতাসরে পুষ্পস্তবক, পশ্চাৎপটে পুষ্প-মাল্যের বাহার, নৃত্যগীতের শেষে ফুলের তোড়া নিয়ে শিল্পী, গুণী অথবা সম্মানীয়কে সম্মান প্রদর্শন বুঝিয়ে দেয় সৌন্দর্যানুভূতির অভিব্যক্তিতে ফুলই শেষ কথা। অনুভবগাঢ়তায় ভাষা যখন স্তব্ধ হয়ে যায়, তখন সেই অনির্বচনীয়কে আমরা প্রকাশ করি ফুলের ভাষায়।

বিবাহের পর বরকনের প্রথম মিলন-রজনীর নাম ফুলশয্যা। এমন কাব্য-সুন্দর নাম ও রূপের স্বপ্ন অন্য কোন দেশের কোন মানুষ দেখেছে কিনা জানি না। তবে বাংলাদেশে আবহমানকাল থেকে এ বস্তু নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসের মতই সহজ হয়ে উঠেছিল। বধূকে পুষ্পাভরণে সজ্জিত করে পুষ্পাস্তীর্ণ শয্যায় পৌঁছে দেওয়া হয়। সে শয্যার বাহারই বা কি! নানা রঙের ফুল বিছানো, ফুলের মশারীর কারিগরী, পুষ্পমণ্ডিত পালংএর প্রতিটি কোনের শিল্পকার্য অবাক হয়ে দেখবার মত। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায় একটি গানের কলি—তথা সাঁওতাল বধূর স্বামীকে শাসানো:—

'হলুদ গাঁদার ফুল রাঙা পলাশ ফুল
এনে দে, এনে দে, নইলে বাঁধবো না—
বাঁধবো না, বাঁধবো না চুল'।

আধুনিক যুগে মেয়েদের সাজে ফুলের বাহার একান্তভাবেই শান্তিনিকেতন তথা কবিগুরুর অবদান। সেদিন মেয়েদের সাজের আলোচনা প্রসঙ্গে কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় বলছিলেন, 'খোঁপায় একগুচ্ছ ফুল ছাড়া অন্য কোনো প্রসাধনের কথা আমি ভাবতেও পারি না।' আর সে সাজ যে কি অপরূপ কণিকাকে দেখেই তা হৃদয়ঙ্গম করা যায়। কবরী সংলগ্ন ফুলের স্তবক দেখে ভ্রম হয় কে কার অলংকার? ঐ ফুলের গুচ্ছই সুন্দর মুখখানিকে কবিত্বময় করে তুলেছে? না মুখের সৌন্দর্যলাবণ্য আত্মপ্রকাশের যথাযথ আধার খুঁজে পেয়েছে ঐ পুষ্পস্তবকের মধ্যে? আর এ হেন শিল্পীর প্রতিটি কথায়, প্রতিটি গানের কলির ছন্দে পুষ্পকলির দুলে ওঠার ছন্দসুন্দর ভাষা, অনায়াসরচিত সৌন্দর্য ছবির,—কোনো জবাব আছে?

সেদিন মহিলা শিল্পী মহলে মাধবী সম্বর্ধনায় শিল্পীরা মাধবীকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন ফুলের অলঙ্কারে সাজিয়ে। পুষ্পসজ্জিতা মাধবীকে দেখে যুগ-যুগান্তরের পথ পেরিয়ে মন হারিয়ে গিয়েছিল সুদূর অতীতে ইতিহাসের একটি পাতায়। বাংলাদেশে এসে শাহ্‌জাহানের পুত্র এক পত্র পিতাকে লেখেন, "কি মণি-মাণিক্যের লোভ দেখাও পিতা! বাংলার ফুলের সাজ দিল্লীর রত্নালঙ্কারকে হার মানায়।"

মানুষের সৌন্দর্য কল্পনা ও সমন্বয়-বোধ কতদূর যেতে পারে ফুল সাজানোর প্রতিযোগিতার নানারঙা ফুলের মিলন সমারোহই তার প্রমাণ।

জাপানে ফুল সাজানো, গৃহসজ্জা, মঞ্চসজ্জা ও দেহসজ্জায় ফুলের একটি বিশেষ স্থানই শুধু নেই—ফুলসজ্জা ওদের গার্হস্থ্যজীবন, সংস্কৃতি লোক ও শিল্প-ভাবনার অঙ্গীভূত।

দক্ষিণ ভারতে মেয়েদের খোঁপায় ফুলের বাহার শুধু প্রসাধনই নয়, কল্যাণ-দ্যোতক অপরিহার্য অঙ্গ। [illegible] মেয়েরা? তারা পরি[illegible] সজ্জা থেকে বাদ পড়েন নি। বাটনহোলে ফুল মুলাবান স্যুটে এক পেলব রমণীয়তার ছোঁয়া নয় কি? স্মার্ট নেহেরুজ্যাকেটে বাটনহোলে গোলাপফুল ছাড়া যেন ভাবাই যায় না।

কবি ও শিল্পীদের কাব্য ও শিল্প-কৃতিতে ফুল ত রীতিমত একটি চরিত্র। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায় এবারের নজরুল-জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত কাজী সব্যসাচীর আবৃত্তি—"যদি আর বাঁশী না বাজে"-তে কয়েকটি পংক্তি যখন কবি তাঁর জীবনের এক মহান অনুভূতির কথা বলছেন "আমার ছেলে মারা গেছে। আমার মন তীব্র পুত্রশোকে ভেঙে পড়ছে। ঠিক সেইদিন সেই সন্ধ্যায় আমার বাড়ীতে হাস্নাহেনা ফুটেছে। আমি সেই হাস্না-হেনার গন্ধ প্রাণভরে গ্রহণ করেছি। ......আমার মৃত্যুর পর হয়ত বা বড় বড় সভা হবে। কত কবিতা, কত বড় বড় কথা, বিশেষণের ঘটা......তখন সেই অসুন্দরের শ্রদ্ধানিবেদনের ভাণ্ডবাসরে বন্ধু তুমি যেন যেওনা। যদি পার তোমার ঘরের আঙিনায় বা আশেপাশে যদি একটি ঝরা পায়ে পেশা ফুল পাও সেইটিকে বুকে চেপে বোলো "বন্ধু আমি তোমায় পেয়েছি।" এখানে কবি তাঁর বঞ্চিত জীবনের ক্ষোভকে রূপ দিয়েছেন দলিত ফুলের মলিন কিন্তু সুকুমার সুষমায়। পুত্রশোকের বেদনার সঙ্গে হাস্নাহেনার করুণ সৌরভ মিলে-মিশে একাকার হয়ে গেছে।

ফুলের প্রসঙ্গে কানন দেবী একদিন বলেছিলেন, "ফুল যে ভালবাসে না—পৃথিবীর যে কোনো রকম ঘৃণ্য কাজ করাই তার পক্ষে সম্ভব। হাজার রকম সৌখিন জিনিসে ঘর সাজিয়েও আমার তৃপ্তি হয় না, যদি না তাতে একটুকুও ফুলের ছোঁওয়া থাকে। মনে হয় কোথায় যেন একটা অসম্পূর্ণতা রয়ে গেল। ঘর সাজানোর শিল্পে কানন দেবীর খ্যাতি কলারসিক মহলে প্রবাদ বাক্যের সামিল। এই কানন দেবীকেই দেখেছি বাগানে যখন ফুল থাকে না অথবা "অগ্নিমূল্যের" কারণে মনের মত ফুল বাজারে পাওয়া গেল না—নানা-রকম পাতা ও অর্কিড দিয়ে ঘরের দেওয়ালে কত রকমারি ডিজাইন তৈরী করে চোখ-জুড়ানো শ্যাম সমারোহের স্নিগ্ধশ্রীতে স্বপ্নময় পরিবেশ রচনা করতে।" "ঘরের ডিস্‌টেম্পারড দেওয়াল, খাট, আলোর ঝাড় যাই-ই থাক তার মধ্যে একটা রুক্ষতা যেন থাকেই। ফুলের স্পর্শে সেটা অনেকটা সহজ ভাবে হয়। তা ছাড়া ফুল দেখলেই প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের আত্মীয় পরিবেশকে যেন নতুন করে অনুভব করি। [illegible] ফুলের [illegible] আভিজাত্য। [illegible]

১৯৭০ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত বাংলা ছবির শ্রেণী বিভাগ, মুক্তির তারিখ, প্রযোজক সংস্থার মাসওয়ারি তালিকা ঃ

ক্রমিক সংখ্যা	ছবির নাম	প্রযোজক সংস্থা	মুক্তির তারিখ	শ্রেণী
১।	সমান্তরাল	শ্যাডো মুভীজ	১ জানুয়ারী	গার্হস্থ্য
২।	অরণ্যের দিনরাত্রি	প্রিয়া ফিল্মস্	১৬ "	রম্যকাহিনী
৩।	দিবারাত্রির কাব্য	নাবিক প্রোডাকসন্স	১৬ "	প্রেমধর্মী গার্হস্থ্য
৪।	শান্তি	হারাদীপ প্রোডাকসন্স	২০ ফেব্রুয়ারী	গার্হস্থ্য
৫।	আলেয়ার আলো	ইউনিট প্রোডাকসন্স অব ইণ্ডিয়া	৬ মার্চ	গার্হস্থ্য
৬।	মেঘ ও রৌদ্র	কে. এল. কাপুর প্রোডাকসন্স	১০ "	গার্হস্থ্য
৭।	কলঙ্কিত নায়ক	বেবী জুন প্রোডাকসন্স	১৫ মে	গার্হস্থ্য
৮।	মুক্তিস্নান	রাধারানী পিকচার্স	১৫ "	গার্হস্থ্য
৯।	শীলা	সিনে ইউনিট	৫ জুন	গার্হস্থ্য
১০।	বিলম্বিত লয়	অনুরাধা ফিল্মস্	৫ "	গার্হস্থ্য
১১।	পদ্মগোলাপ	এস বি পি প্রোডাকসন্স	২ জুলাই	সাসপেন্সধর্মী
১২।	প্রথম কদম ফুল	ইকাস্ ফিল্মস্	২৪ "	প্রেমধর্মী গার্হস্থ্য
১৩।	দুটি মন	এস এস ফিল্মস্	২৪ "	গার্হস্থ্য
১৪।	সাগিনা মাহাতো	রূপশ্রী ইন্টারন্যাশনাল	২১ আগস্ট	সমাজচিত্র
১৫।	এই কোরেছ ভালো	লাইট অ্যাণ্ড শেড	২১ "	কৌতুক
১৬।	নলদময়ন্তী	জে. এস. ফিল্ম প্রোডাকসন্স	২৮ "	পৌরাণিক
১৭।	মেঘ কালো	পবিত্র চট্টোপাধ্যায় প্রোডাকসন্স	৪ সেপ্টেম্বর	গার্হস্থ্য
১৮।	রাজকুমারী	শ্রীলোকনাথ চিত্রমন্দির	২ অক্টোবর	গার্হস্থ্য
১৯।	মহাকবি কৃত্তিবাস	রামায়ণ চিত্রম্	৯ "	জীবনী
২০।	নিশিপদ্ম	চিরন্তন চিত্র	২০ "	গার্হস্থ্য
২১।	প্রতিদ্বন্দ্বী	প্রিয়া ফিল্মস্	২৭ "	সমাজচিত্র
২২।	দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন	মিত্র প্রোডাকসন্স	৫ নভেম্বর	জীবনী
২৩।	ইন্টারভিউ	দর্শকের সংস্থানিকা	১০ "	সমাজচিত্র
২৪।	মঞ্জরী অপেরা	অ্যাপোলো পিকচার্স	২৭ "	সমাজচিত্র
২৫।	রূপসী	এ-আর-সি প্রোডাকসন্স	১০ ডিসেম্বর	গার্হস্থ্য
২৬।	স্বর্ণশিখর প্রাঙ্গণে	সারদা চিত্রমন্দির	২৫ "	গার্হস্থ্য

প্রেক্ষাগৃহ

১৯৭০-এ মুক্তিপ্রাপ্ত বাংলা ছবির [illegible]

নীচের তালিকা থেকেই দেখতে পাওয়া যাবে, ১৯৭০ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত বাংলা ছবির সংখ্যা হচ্ছে ২৬। এর সঙ্গে ২০ নভেম্বরে মুক্তিপ্রাপ্ত বাংলাভাষায় ডাবিংকরা দক্ষিণী ছবি [illegible] মুভীজ-এর [illegible]কে যুক্ত করলে মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ২৭, যা ১৯৬৯-এ মুক্তিপ্রাপ্ত বাংলা ছবির সমান। এ-বছরের ছবিগুলির মধ্যে 'কবি কৃত্তিবাস' ও 'দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন'—এই দুটি হচ্ছে জীবনীচিত্র, যদিও প্রথমখানিতে কবির আত্মজীবনীমূলক সংক্ষিপ্ত কবিতাটি ছাড়া বিস্তৃত উপাদানের অভাবে কল্পনার আশ্রয় নিতে হয়েছে অনেকখানি। বলা বাহুল্য, 'নল দময়ন্তী' হচ্ছে পৌরাণিক। অজিত লাহিড়ী পরিচালিত 'পদ্ম গোলাপ' হচ্ছে এ-বছরের একমাত্র সাসপেন্সধর্মী চিত্র, যেমন হচ্ছে অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত 'এই করেছো ভালো' একমাত্র কৌতুক চিত্র। 'সাগিনা মাহাতো', 'প্রতিদ্বন্দ্বী', 'ইন্টারভিউ' এবং 'মঞ্জরী অপেরা'—এই চারখানি ছবিকেই যদিও সামাজিক শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে, তবু যে-অর্থে 'মঞ্জরী অপেরা' সামাজিক, সে-অর্থে বাকী তিনখানি নয়। বাংলাদেশের যাত্রাজগতের একটি চিত্র ফুটে উঠেছে বলেই 'মঞ্জরী অপেরা' সামাজিকরূপে চিহ্নিত। মালিক ও শ্রমিকের দ্বন্দ্ব অত্যন্ত স্পষ্টভাবে পরিস্ফুট হয়েছে 'সাগিনা মাহাতো'-তে এবং এই কারণেই এটি সামাজিক। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যুবকদের বেকারত্ব আজকের এই শহুরে জীবনে একটি জ্বলন্ত সমস্যা; এই সমকালীন সমস্যাকে তুলে ধরা হয়েছে 'প্রতিদ্বন্দ্বী' এবং 'ইন্টারভিউ', এই দুখানি ছবিরই মাধ্যমে। কিন্তু এই সমস্যা নিয়ে দুজন পরিচালকের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে রয়েছে পার্থক্য; একজন যেখানে কনফর্মিস্ট, অন্যজন সেখানে পুরোপুরি নন্-কনফর্মিস্ট। একের নায়ক যেখানে সমাজের উচুতলার লোকের অবিচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ জানানো সত্ত্বেও জীবনের চিরন্তন মূল্যবোধকে উপেক্ষা করতে পারে না, অপরের নায়ক সেখানে প্রতিবাদে ফেটে পড়ে সমাজের সব-কিছুর উচ্ছেদ করতে চায়। বলাতে দ্বিধা নেই, কনফর্মিস্ট হলেও সত্যজিৎ রায়ের 'প্রতিদ্বন্দ্বী' শিল্পকর্মে যথার্থ আন্তর্জাতিক মানের চলচ্চিত্রের মর্যাদায় ভূষিত। সত্যজিৎ রায়েরই অপর চিত্র 'অরণ্যের দিনরাত্রি'কে আমরা বিশেষ কোনো শ্রেণীভুক্ত করতে না পেরে রম্য-কাহিনী নাম দিতে বাধ্য হয়েছি। এটি কোনো গার্হস্থ্য বা সামাজিক কিম্বা নিছক প্রেমের চিত্র নয়; এর মাধ্যমে কোনো সুসংবদ্ধ কাহিনীও বিবৃত হয়নি অথবা জীবনের কোনোও সমস্যাকেও তুলে ধরা হয়নি। নিত্যনৈমিত্তিক জীবন থেকে ছুটি নিয়ে কয়েকটি বন্ধু বিহারের একটি বনাঞ্চলের সন্নিহিত ডাক-বাংলোতে উঠে দু' তিন দিনের মধ্যে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিল, তারই একটি বিচিত্র চিত্র তুলে ধরা হয়েছে ছবিটির মাধ্যমে। এছাড়া বাকী ১৬টিই হচ্ছে গার্হস্থ্য চিত্র। এবং এদের প্রত্যেকটির মধ্যেই যদিও আছে প্রেম-ভালোবাসার কাহিনী, তবুও 'দিবারাত্রির কাব্য' ও 'প্রথম কদম ফুল'কে বিশেষভাবে প্রেমধর্মী বলে চিহ্নিত করেছি এ দুটির মধ্যে প্রেমই চূড়ান্তভাবে উপজীব্য বলে।

এদের ছবিগুলির মধ্যে 'শান্তি' এবং 'মেঘ ও রৌদ্র'—দুটিই রবীন্দ্রনাথের দুটি ছোট গল্প অবলম্বনে নির্মীত হয়েছে। সত্যজিৎ রায় কৃত দুখানি ছবিরই মূলে রয়েছে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের রচনা। তার

CENTRAL LIBRARY

[illegible] দৃশ্যে / পরিচালনা : [illegible]। ফটো : অমৃত

বিশ্বনাথ রায়েরও দু'টি উপন্যাস (কলঙ্কিত নায়ক ও পদ্মগোলাপ) চিত্রে রূপান্তরিত হয়েছে। এছাড়া আছে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্ত, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়, কালকূট (সমরেশ বসু), গৌরকিশোর ঘোষ, বিধায়ক ভট্টাচার্য, শক্তিপদ রাজগুরু ও প্রশান্ত চৌধুরীর একখানি করে কাহিনীর চিত্ররূপ। পরিচালক অজিত গাঙ্গুলী ও সলিল সেন স্বলিখিত কাহিনী অবলম্বনে তাঁদের ছবিদু'টির রূপ দিয়েছেন। পরিচালক মঙ্গল চক্রবর্তী অজয় করের সহযোগিতায় তাঁর ছবির কাহিনী রচনা করেছেন। ভূতপূর্ব নিউ থিয়েটার্সের প্রতিভাবান চিত্রনাট্য ও কাহিনীকার বিনয় চট্টোপাধ্যায় দু'খানি ছবির মূল কাহিনী রচনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। আশীষ বর্মণ রচিত মূল কাহিনী অবলম্বনে গড়ে উঠেছে মৃণাল সেনের 'ইন্টারভিউ'। সদ্যপ্রয়াত নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় [illegible] চিত্রকল্প-এর চিত্রনাট্য রচনা করেছিলেন। চিত্রনাট্যকার [illegible] 'নল দময়ন্তী'র কাহিনী ও চিত্রনাট্য রচনা করেছেন এবং পরিচালক অশোক চট্টোপাধ্যায় করেছেন তাঁর ছবি 'মহাকবি কৃত্তিবাস'-এর চিত্রনাট্য রচনা।

এবারের ছবিগুলির মধ্যে কর্মপ্রচেষ্টার দিক দিয়ে শীর্ষস্থান অধিকার করেছে তপন সিংহ পরিচালিত রূপশ্রী ইন্দর-নাগাবালেকর ছবি 'সাগিনা মাহাতো'। এই একমাত্র ছবিটিই এ-বছর স্বর্ণ-জয়ন্তী সপ্তাহ পালন করবার পরেও জনাকীর্ণ প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শিত হচ্ছে মধ্য কলিকাতার বিখ্যাত সিনেমায়। ছবিটির এই জনপ্রিয়তার মূলে রয়েছে ছবির নায়কের ভূমিকায় দিলীপকুমারের অনবদ্য অভিনয়।

এবারে সত্যজিৎ রায় ছাড়া আরও তিনজন পরিচালক দু'খানি করে ছবি আমাদের উপহার দিয়েছেন : এক, অজিত গাঙ্গুলী ([illegible] ও রূপসী), দুই, অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় ([illegible] ও নিশিপদ্ম) এবং তিন পীযূষ বসু (দুটি মন ও স্বর্ণশিখর প্রাঙ্গণে)। নতুন পরিচালকরূপে আমরা পেয়েছি [illegible] সরকার ([illegible]) এবং গোপালকৃষ্ণ রায় (নল দময়ন্তী)-কে।

বাংলা ছবিতে নায়কের ভূমিকায় প্রথম অবতীর্ণ হয়েই বাজীমাৎ করেছেন দিলীপকুমার 'সাগিনা মাহাতো'। একথা আগেই বলা হয়েছে যে উনি 'পাড়ি' ছবিতে একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় দেখা দিয়েছিলেন। ওঁর সঙ্গে এই 'সাগিনা মাহাতো' ছবিতেই নেমেছেন সায়রা বানু, বাস্তব জীবনে যিনি দিলীপকুমারের স্ত্রী। সত্যজিৎ রায়ের 'অরণ্যের দিনরাত্রি' ছবিতে অবতীর্ণ হয়েছেন সিমি। আর উল্লেখ্য যে আমাদের বাংলা ছবির একজন নিয়মিত অভিনেত্রী; এ-বছর তিনি দু'খানি ছবিতে নেমেছেন।

বাংলা ছবির মহানায়ক উত্তমকুমার এবারে দু'খানি ছবির নায়ক। তাঁর থেকে এগিয়ে আছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়; তিনি দেখা দিয়েছেন চারখানি ছবিতে। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, মাধবী চক্রবর্তী এবং অপর্ণা সেন—এঁদের প্রত্যেকেই অবতীর্ণ হয়েছেন তিনখানি ছবিতে। বাংলা চিত্রজগতের অভিজাততমা নায়িকা সুচিত্রা সেন মাত্র একখানি ছবিতে (মেঘ কালো) অবতীর্ণ হয়ে তাঁর জনপ্রিয়তার শীর্ষস্থান অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। নতুন যাঁরা বাংলা ছবির জগতে পা বাড়িয়েছেন, তাঁদের মধ্যে আছেন দীপঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (মেঘ ও রৌদ্র), রঞ্জিত মল্লিক (ইন্টারভিউ), এবং ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায়, দেবরাজ রায়, জয়শ্রী রায়, কৃষ্ণা বসু ও মমতা চট্টোপাধ্যায় (প্রতিদ্বন্দ্বী)।

এ-বছর সঙ্গীত পরিচালকরূপে নতুন দেখা দিয়েছেন [illegible] (রূপ-কুমারী) এবং [illegible] (এই করেছো ভালো)। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র, সুধীন দাশগুপ্ত ও রাজেন সরকার প্রত্যেকে দু'খানি ছবির সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন। সত্যজিৎ রায়কে [illegible] দেখতে পাওয়া গেল [illegible] ছবির সঙ্গীত পরিচালকরূপে।

ষ্টার
[শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত নাট্যশালা]

[illegible]

নাটকীয় সংঘাত ও অভিনয়-মাধুর্যে অনন্য।
প্রতি বৃহস্পতি ও শনিবার : ৬টায়
প্রতি রবিবার ও ছুটির দিন : ৩টা ও ৬টায়
।। রচনা ও পরিচালনা ।।
দেবনারায়ণ গুপ্ত
।। রূপায়ণে ।।
অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, অপর্ণা দেবী, নীলিমা দাস, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, সতীন্দ্র ভট্টাচার্য, দীপিকা দাস, শ্যাম লাহা, প্রেমাংশু বসু, বাসবী চট্টোপাধ্যায়, শৈলেন গাঙ্গুলী, গীতা দে ও বঙ্কিম ঘোষ।

চিত্র-সমালোচনা

স্বর্ণশিখর প্রাঙ্গণে কাহিনীটি ছায়াছবিতে রূপান্তরিত হবার জন্যেই রচিত হয়েছিল কি? অন্তত আর, ডি, বনশল নির্বেদিত ও পরলোকগত কালীপদ দত্তগুপ্ত প্রযোজিত সারদা চিত্রমন্দির-এর স্বর্ণশিখর প্রাঙ্গণে ছবিটি দেখে কারুর মনে যদি এই প্রশ্ন জাগে, তাহলে তাকে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না। সেই ত্রিরিশ দশকে প্রমথেশ বড়ুয়া অবিস্মরণীয় মুক্তি ছবি সৃষ্টি করেছিলেন। সেই তখন থেকে আজ পর্যন্ত বাঙালী দর্শক স্বামীর কর্মাসক্তি সম্পর্কে স্ত্রীর সোচ্চার অনুযোগ-অভিযোগের কাহিনীকে বাঙলা চলচ্চিত্রে নানাভাবে রূপায়িত হতে দেখে রীতিমত ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। একটু চিন্তা করলে দেখতে পাওয়া যাবে, দর্শকের ক্লান্তির কারণ আর কিছুই নয়, এইসব কল্পিত অনুযোগ - অভিযোগের ভিত্তিহীন অবাস্তবতা। স্বামী তাঁর কাজ নিয়ে ব্যস্ত না থেকে চব্বিশ ঘণ্টা আমার সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে থাকুন, এ-হেন উৎকট ইচ্ছা মাত্র নববিবাহিতাদেরই মনে জাগ্রৎ থাকে কয়েকটা দিন বা সপ্তাহ কিম্বা বড় জোর দু' তিন মাস। তা নইলে প্রতিটি স্ত্রীরই কাম্য স্বামী যেন যথার্থই কর্মব্যস্ত থাকেন, কর্মব্যস্ততার অছিলায় যেন অপকর্মে ব্যাপৃত না হন। স্বামী একটি

মেরা নাম জোকার-এর প্রযোজক পরিচালক নায়ক রাজকাপুর, সিমি ও কাসানা রেবেনকিনা। ফটো : অমৃত

বিশেষ ধরনের যন্ত্র নির্মাণে ব্যস্ত, তাঁর সেই কাজের জন্যে মাসিক পঞ্চ পঞ্চাশ লক্ষ টাকার ঝুঁকি নিয়েছেন—এই কথা জানবার পরে যে-স্ত্রী তাঁর সাফল্যের জন্যে প্রতি-নিয়ত কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা না করে কারণে অকারণে তাঁকে নানাভাবে উত্যক্ত করে, সেই স্ত্রীকে সমর্থন জানাবে, এমন প্রাপ্তবয়স্ক নরনারী কোথাও আছেন বলে আমাদের জানা নেই।

অথচ সেই কাহিনীরই চিত্ররূপকে যথাসম্ভব গ্রহণযোগ্যরূপে চিত্রায়ন করবার প্রয়াস পেয়েছেন পরিচালক পীযূষ বসু। প্রধানত দার্জিলিংয়ের পটভূমিকায় তোলা ছবিটি মাত্র চিত্রের দিক থেকে নয়নানন্দকর তো বটেই, তার ওপর চলন্ত ট্রেনের কামরায় এবং পরে দার্জিলিংয়ের এখানে সেখানে তিনটি তরুণ, তিনটি তরুণী এবং খিটখিটে মেজাজের দাদু পরমেশবাবুর সমাবেশে যে বৈচিত্র্যময় ও মনোহর পরিস্থিতি রচিত হয়, তাও যথেষ্ট আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। কিন্তু যেখানেই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিরূপতা ও সংঘর্ষ, সেখানেই ছবিটি দর্শকচিত্তকেও বিরূপ করে তোলে। এমন কি, ছবির একেবারে শেষাংশে যেখানে গ্রহটা কার্তিককে উপেক্ষা করে স্বামী অনন্ত স্ত্রী সুস্মিতার সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটাবার পরে কার্তিক সম্পর্কে হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে ওঠে, সেখানে পরিস্থিতির অবাস্তবতা রীতিমত পীড়াদায়ক হয়ে ওঠে।

অভিনয়ে মাধবী চক্রবর্তী, স্বরূপ দত্ত, দিলীপ রায়, তরুণকুমার, অরুণ মুখো-পাধ্যায়, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি তাঁদের নাটনৈপুণ্য প্রকাশের ত্রুটি করেন নি।

ছবির চিত্রগ্রহণের অসামান্যতার কথা বারংবার বলবার মতো। ছবির চারখানি গান সুগীত, কিন্তু সুপ্রযুক্ত নয়।

—নান্দীকর

স্টুডিও থেকে

পরাধীনতার যন্ত্রণা থেকে ভারতবর্ষকে মুক্ত করার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষায় যাঁদের যৌবনের রক্ত টগবগ করে উঠেছিল, সমস্ত বৃটিশ সৈন্যের বেয়নেটের খোঁচা যাঁদের রক্তাক্ত বিপ্লব রোধ করতে পারে নি, যাঁদের আত্মবলিদান ভারতবর্ষকে পরাধীনতার নাগ-পাশ থেকে মুক্তি দিল, সেই বীর সন্তানদের কর্মসাধনার ফসল 'শপথ নিলাম' মুক্তি-প্রতীক্ষায়।

শৈলেশ দে'র কাহিনী অবলম্বনে রচিত এই ছবির প্রযোজক কৃষ্ণা মল্লিক। নবীন অধিকারী পরিচালিত ও সুকুমার মিত্র সুরারোপিত এই ছবির গীতরচয়িতা অমিতাভ নাহা।

কয়েকটি বিশিষ্ট চরিত্রে অভিনয় করেছেন শমিত ভঞ্জ, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, মলিনা দেবী, শমিতা বিশ্বাস, ভাস্কর চৌধুরী, দিলীপ রায়, শেখর চট্টোপাধ্যায়, শিবানী বসু, মৃণাল, মন্মথ, বলাই মুখোপাধ্যায় এবং নবাগত সুনন্দা দাশগুপ্তা। পরিবেশনায় আছেন—ইস্টার্ন ফিল্ম এক্সচেঞ্জ।

পৌষালি ফিল্মস নির্মিত নতুন বাংলা ছবি 'খুঁজে বেড়াই'-এর চিত্র-গ্রহণ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। কলকাতার জীবন ও সমাজের পটভূমিকায় ছবিটির কাহিনী রচিত হয়েছে। সলিল দত্ত ছবিটির কাহিনী, চিত্রনাট্যরচয়িতা ও পরিচালক। রবীন চট্টোপাধ্যায় হচ্ছেন ছবিটির সুরকার।

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এবং অপর্ণা সেন ছবিটির নায়ক-নায়িকা। অন্যান্য বিশিষ্ট চরিত্রে আছেন—বিকাশ রায়, অনিল চট্টো-পাধ্যায়, উৎপল দত্ত, শোভা সেন, দিলীপ রায়, বাঁটুই বন্দ্যোপাধ্যায়, অমরনাথ মুখো-পাধ্যায়, তরুণকুমার, জোছনা বন্দ্যোপাধ্যায়, রেখা থাপা ও সুনীলকা ভট্টাচার্য প্রমুখ।

এস বি ফিল্মস ছবিটির পরিবেশক।

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রযোজিত দেবশ্রী প্রোডাকসন্সের রহস্য-রোমাঞ্চের ছবি 'নিশাচর' সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে শীঘ্রই শহর ও শহরতলীর বিশিষ্ট

শিশু রংমহলে
(C. L. T.)
১লা জানুয়ারী সন্ধ্যা ৬টায়
সংযুক্তা পাণিগ্রাহী
এবছরের CLT তারকা
আকাশের ঠিকানায় নৃত্যনাটিকা
১লা জানুয়ারী, বৈকাল ৩টায় প্রথম উদ্বোধন
নতুনতম প্রযোজনা
আলাদীন
রংমহল ফোন : ৫৫-১২০০

রঙ্গনা বিশ্বরূপার পাশে মার্কুলার রোডের মোড় (৩৩-৬৮৭১)
নান্দীকার
২রা শনিবার ৬টায়
৩রা রবিবার ২॥ ও ৬টায়
তিন পয়সার পালা
৭ই জানুয়ারী বৃহস্পতিবার ৬টায়
যখন একা
কেয়া চক্রবর্তী, দীপালি চক্রবর্তী, রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, ... চট্টোপাধ্যায়, কাবেরী বন্দ্যোপাধ্যায়, ... বন্দ্যোপাধ্যায়, ... শেঠ।
নির্দেশনা : অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বর্ণশিখর প্রাঙ্গণে/পরিচালনা পীযূষ বসু। নায়িকা মাধবী মুখোপাধ্যায়। ফটো : অমৃত

চিত্রে মূর্তিলাভ করবে। ছবিটির চিত্রনাট্য রচনা ও পরিচালনা করেছেন তপন রায়। কালীপদ সেন ছবিটির সুরকার। পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্যামল গুপ্ত রচিত গানগুলিতে নেপথ্য কণ্ঠদান করেছেন—আরতি মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র ও নির্মলা মিশ্র।

রহস্য-রোমাঞ্চে ভরপুর ছবিটির প্রধান কয়েকটি চরিত্রে রূপদান করেছেন—শম্ভু মিত্র, বিকাশ রায়, দিলীপ রায়, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, অসিতবরণ, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, মণি শ্রীমানী, দিলীপ রায়চৌধুরী, অমরেশ দাস, শঙ্করনারায়ণ, মঞ্জু দে, গীতালি রায়, স্মিতা মজুমদার, লীলাবতী দেবী, মণিকা অধিকারী, লিলি রায়, কুমকুম এবং সুস্মিতা সান্যাল।

মন্দিরা ফিল্মস ছবিটির পরিবেশক।

যাত্রার ইতিহাসে এই প্রথম আন্তর্জাতিক পুরস্কার এবং সোভিয়েত রাশিয়ায় যাত্রার আমন্ত্রণ !
ভারতের সবার মুখে একটি নাম
তরুণ অপেরা
আপনার মঞ্চের বায়নার জন্য কলিকাতার অফিসে যোগাযোগ করুন।
১১৩ রবীন্দ্র সরণি, কলিকাতা-৩
ফোন : ৫৫-৭১২১

এস এস মুভিটোনের প্রথম ছবি 'অরণ্য-কন্যা'র চিত্রগ্রহণ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক পরিবেশে ছবিটির দৃশ্যাবলী গৃহীত হচ্ছে। ছবিটির কাহিনী, চিত্রনাট্য রচনা ও পরিচালনা করেছেন—সুনীল ঘোষ। সুর সৃষ্টি করেছেন—নবাগত সুরকার দিলীপ ঘটক। নেপথ্যে কণ্ঠদান করেছেন—হেমন্তকুমার ও সন্ধ্যা সেনগুপ্তা। নতুন ধরনের কাহিনী নতুন পটভূমিকায় নতুন শিল্পী সমন্বয় নতুন সুর সংযোজনা সব মিলিয়ে নতুনের জয়গান গাইবে 'অরণ্য-কন্যা' ছবিটি। চরিত্র-চিত্রণে আছেন নবাগত বৈশাখী চট্টোপাধ্যায়, নবাগত সুজয় দত্ত, রত্না ঘোষাল, ইন্দুলেখা চট্টোপাধ্যায়, সলীলেন ভট্টাচার্য, মানিক রায়চৌধুরী, বিদ্যুৎ গোস্বামী, মমতা দে প্রমুখ।

মঞ্চাভিনয়

আকাশবাণী রিক্রিয়েশন ক্লাবের 'নবান্ন' : বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন'ই হোল সেই নাটক যার মধ্য দিয়ে বাংলা থিয়েটার যুগান্তরের দীপ্তিতে আলোকিত হয়ে উঠেছিল। এই নাটক থেকেই নবনাট্য আন্দোলনের যাত্রা শুরু, আর একে সামনে রেখে যা-কিছু রিয়েলিস্টিক নাট্যচর্চা। সম্প্রতি আকাশবাণী রিক্রিয়েশন ক্লাবের শিল্পীরা এই নাটকের সফল অভিনয় পরিবেশন করে আমাদের মুগ্ধ করেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আজকের নাট্যনিরীক্ষার প্রাথমিক ইতিহাস সম্পর্কে তাঁদের সচেতনতাকেও তাঁরা সোচ্চারে প্রকাশ করতে পেরেছেন। 'নবান্ন' নাটকের অভিনয় এখন আর বেশী হয় না, অথচ এই ধরনের নাটক বারবার নানা কারণেই অভিনীত হওয়া উচিত। আকাশবাণী রিক্রিয়েশন ক্লাবের শিল্পীরা এই অপূর্ণতার বেদনা কেন কিছুটা স্তিমিত করে নাট্যানুরাগীদের কৌতূহলে নতুন করে প্রাণসঞ্চার করেছেন। এর আগের বছর এঁরা অভিনয় করেন দীনবন্ধু মিত্রের বলিষ্ঠ নাটক 'নীলদর্পণ'; 'নীলদর্পণে'র পর 'নবান্ন'—প্রযোজনার পথে এক স্বাতন্ত্র্যদীপ্ত পদক্ষেপ। নাটক নির্বাচনে এঁদের সিরিয়াসনেস নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য। 'নবান্ন'-র মতো নাটককে সার্থকভাবে মঞ্চের আলোয় পরিস্ফুট করে তুলতে গেলে যে সুসংবদ্ধ টিম-ওয়ার্কের প্রয়োজন, তা সেদিনকার শিল্পীদের অভিনয়ে ছিল নিশ্চয়ই। এর জন্য নির্দেশক পিনাকী বসুর প্রয়াস প্রশংসার দাবী রাখে। প্রায় প্রতিটি চরিত্রই সুঅভিনীত হয়েছে। শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন ধীরেন দে, রঞ্জন বসু, বিমল চ্যাটার্জি, বিধান সরকার, তাপস ভট্টাচার্য, সমীর ব্যানার্জি, সুনীল মৈত্র, দুলাল ব্যানার্জি, দিলীপ ঘোষ, প্রশান্ত দত্ত, সুধাময় চক্রবর্তী, শোভন মুখার্জি, শঙ্কর ঘোষ, বিশ্বজিৎ মিত্র, পিনাকী বসু, হিমানী গাঙ্গুলী, আরতি মৈত্র। নাটকের আগে সংগীতে ও আবৃত্তিতে অংশ নেন তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্তপ্রিয় মুখোপাধ্যায়, শংকর ঘোষ ও কেবলুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

লালবাঈ : শুধু ইতিহাসের কয়েকটি ঘটনা পর পর সাজিয়ে গেলেই ঐতিহাসিক নাটক গড়ে ওঠে না; এ-নাটকের উৎকর্ষ নির্ভর করে অবিকৃত ঐতিহাসিক কাহিনীকে সংঘাতসমৃদ্ধ মুহূর্তগুলোকে মঞ্চের আলোয় স্পষ্ট করে তোলার ওপর। 'লালবাঈ' এমনি একটি সার্থক ঐতিহাসিক নাটক, যার পরিচিতি নাট্যানুরাগীদের মনে ইতিমধ্যেই অনেক নিবিড়তা পেয়েছে। সম্প্রতি 'কলামন্দিরে' তালুকদার এন্ড দি রিক্রিয়েশন ক্লাবের শিল্পীরা এই নাটকের একটি সার্থক মঞ্চরূপ পরিবেশন করলেন। বিষ্ণুপুর ঘরানার সামান্য এক নর্তকী লালবাঈ তার রূপ ও যৌবনের উন্মাদ তরঙ্গ তুলে একে একে জয় করেছিল অনেক

কিছুই ; কিন্তু কোন এক মুহূর্তে ব্যর্থতার বিষণ্ণতা তার মনকে নিদারুণভাবে আক্রম করেছিল। এই উচ্চাকাঙ্ক্ষী নর্তকীর ব্যর্থতা এবং বিষ্ণুপুরের রাজা রঘুনাথ ও রানী চন্দ্রপ্রভার জীবনের ট্রাজিক পরিণতি নিয়েই এই ঐতিহাসিক নাটক মুখর হয়ে উঠেছে। এই স্পন্দন সংঘাতে ভরা নাটকটির নির্দেশনায় ভবেন পাল অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন এবং তাঁর সঙ্গে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করেছেন প্রতিটি শিল্পী। সহমর্মিতার এই আন্তর সেতু-বন্ধনে সামগ্রিক প্রযোজনা বৈশিষ্ট্য চিহ্নিতই ছিল। অভিনয়ের দিক দিয়ে যিনি সবার প্রথম দর্শকের মন কেড়ে নেন, তিনি হোলেন শ্রীমতী দীপিকা দাস, 'লালবাঈ' চরিত্রে তিনি যেভাবে প্রাণের স্পর্শ এনেছেন, তার মধ্য দিয়ে তাঁর অভিনয়-নৈপুণ্যের প্রোজ্জ্বলতাই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 'রঘুনাথ' চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন বীরেন্দ্রনাথ রায়। শান্তিময় নাগের 'সোলেমান' হয়েছে অপূর্ব ; গীতা দে ও মমতা চ্যাটার্জি তাঁদের স্বকীয় চরিত্রের দাবী সম্পূর্ণভাবে মিটিয়ে দিতে পেরেছেন। তবে 'গুলজারে'র ভূমিকায় হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের অভিনয় আমাদের প্রত্যাশা মেটাতে পারেনি। অন্যান্য চরিত্রে ছিলেন গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, করুণাময় দাস, শৈলেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সুশান্ত ঘোষাল, দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, বীথি গাঙ্গুলী, বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, মধুপ-কুমার বিশ্বাস, শিবসাধন বন্দ্যোপাধ্যায়।

মঞ্চসজ্জা, আলোকসম্পাত ও আবহ-সংগীতে মূল নাটকের মেজাজটা সব সময়েই ধরা পড়েছে।

বিশ্বরূপার কর্তৃপক্ষ জানাচ্ছেন যে, নাট্যামোদী দর্শকদের সুবিধার জন্য ১৯ ডিসেম্বর শনিবার থেকে প্রতি শনিবার আড়াইটায় 'বেগম মেরী বিশ্বাস' অভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

শিল্পীলোকের ফাঁস—গত ২৭ নভেম্বর কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চে শিল্পীলোক সংস্থা নাট্যকার শৈলেশ গুহ নিয়োগীর ফাঁস নাটক মঞ্চস্থ করে তাঁদের দ্বিতীয় বার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপন করেন।

সভাপতির অনুপস্থিতিতে প্রধান অতিথি শ্রীঅজিত দে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সাব ইন্সপেকটরের ভূমিকায় দর্শকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেছেন শ্রীপরেশ পাইন বিভিন্ন ছদ্মবেশের আড়ালে তাঁর অপূর্ব নাট্যনৈপুণ্যতার পরিচয় দিয়ে। অন্যান্য চরিত্র অংশ নেন বাদল বড়াল, চাঁদ সাহা ও দিলীপ বসু। পুলিশের ডেপুটি সুপারের ভূমিকায় মানু সেনও উল্লেখ্য। অন্যান্য ভূমিকায় কুমারী ছবি ভৌমিক, রেনা মিত্র, ব্রজকিশোর নান, সুনীল সাধুখাঁ, দুলাল দাস, রতন দাস, নিরাপদ পূজারী, দিলীপ দে ও কমল মিত্র চরিত্রানুগ অভিনয় করেছেন। পরিচালনায় সুনীলকুমার সাধুখাঁ কোনো বৈশিষ্ট্যের ছাপ রাখতে পারেননি।

বীণাপাণি সংগীত সমাজ : অনিল স্মৃতি নাট্য নিবেদন উপলক্ষে আগামী ২ জানুয়ারী সন্ধ্যায় বেহালা প্রসূতি সদন ময়দানে মৃণাল ঘোষের ব্যবস্থাপনায় "কেদার রায় নাটকটি মঞ্চস্থ হবে। নাট্যকার শ্রীরমেশ গোস্বামী ও শ্রীঅজিতেশ গঙ্গোপাধ্যায় যথাক্রমে প্রধান অতিথি ও সভাপতিরূপে উপস্থিত থাকবেন। নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে অংশ নেবেন সুশীল চ্যাটার্জী, সন্তোষ লাহিড়ী, প্রকাশ চ্যাটার্জী, অতুল চক্রবর্তী, সুনীল ভট্টাচার্য এবং সুপ্রকাশ ব্যানার্জী প্রমুখ।

অভিনয় বর্ষপূর্তি উৎসব : অভিনয় পত্রিকার বর্ষপূর্তি উৎসব উপলক্ষে আগামী ২৩ ও ২৪ জানুয়ারী মুক্ত-অঙ্গনে সকাল সকাল উনিশশো সত্তর সালের কলকাতার শ্রেষ্ঠ নাট্য প্রযোজনা, নাট্যকার, পরিচালক, অভিনেতা, অভিনেত্রী ও মঞ্চশিল্পী এবং মফস্বলের সর্বাধিক অভিনয়কারী সংস্থা এবং যাঁর নাটক সর্বাপেক্ষা বেশী অভিনীত হয়েছে তাঁদের সম্বর্ধনা ও 'অভিনয় পুরস্কার'-এ ভূষিত করা হবে। এই দুদিন লোকরঞ্জন এবং সায়ক সংস্থা মঞ্চস্থ করবেন "মহাকালী" ও "এক যে ছিল রাজা" নাটক দুটি। মূকাভিনয় পরিবেশন করবেন যোগেশ দত্ত। একদিন শ্রেষ্ঠ প্রযোজনার পুরস্কার প্রাপ্ত সংস্থা তাঁদের নাটকটি মঞ্চস্থ করবেন।

অভিনব সিনেমা মাসিক পত্রিকা

আলোছায়া

প্রতি সংখ্যায় থাকে রহস্য উপন্যাস, শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের গল্প, শ্রেষ্ঠ বিদেশী গল্প, বিভিন্ন অভিনব ফিচার, গান স্বরলিপি, মনস্তাত্ত্বিক আলোচনা ও অসংখ্য সিনেমার রঙীন ছবি।

প্রতি সংখ্যা ৫০ পঃ ঃ বার্ষিক ৬্

১৮/১৭, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

বিবিধ সংবাদ

রবীন্দ্রসদনে একাঙ্কিকা প্রতিযোগিতা

একাঙ্কিকা নাট্যাভিনয়ে উৎসাহ দানের জন্য রবীন্দ্রসদনের কর্তৃপক্ষ এ-বছরে পাঁচ দিনব্যাপী একটি প্রতিযোগিতা উৎসবের ব্যবস্থা করেছেন। 'সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বাঙলা দেশে এই নাট্যশাখাটি কী রূপ পেয়েছে এবং কোন্ পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে, নাট্যরসিক দর্শকদের কাছে তারই একটা সমীক্ষা প্রস্তুত করার মানসেই রবীন্দ্রসদন কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে এই একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে এই প্রথম বছর। অবশ্য এই আয়োজনে কলকাতা শহরকে বাদ দিয়ে মাত্র শহরতলী এবং পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি জেলা থেকে প্রতিযোগী পনেরোটি দলকে অভিনয়ের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। প্রতিযোগী দলগুলি থেকে শ্রেষ্ঠ সংস্থা, শ্রেষ্ঠ নাট্যকার (মৌলিক), শ্রেষ্ঠ পরিচালক, শ্রেষ্ঠ অভিনেতা এবং শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী বলে, যাঁরা বিবেচিত হবেন, তাঁদের প্রত্যেককে ৫০০্ টাকা নগদ পুরস্কার দিয়ে উৎসাহিত করবার ব্যবস্থাও করেছেন কর্তৃপক্ষ। রবীন্দ্রসদন কর্তৃপক্ষের এই সাধু প্রচেষ্টা অবশ্যই প্রশংসনীয়।

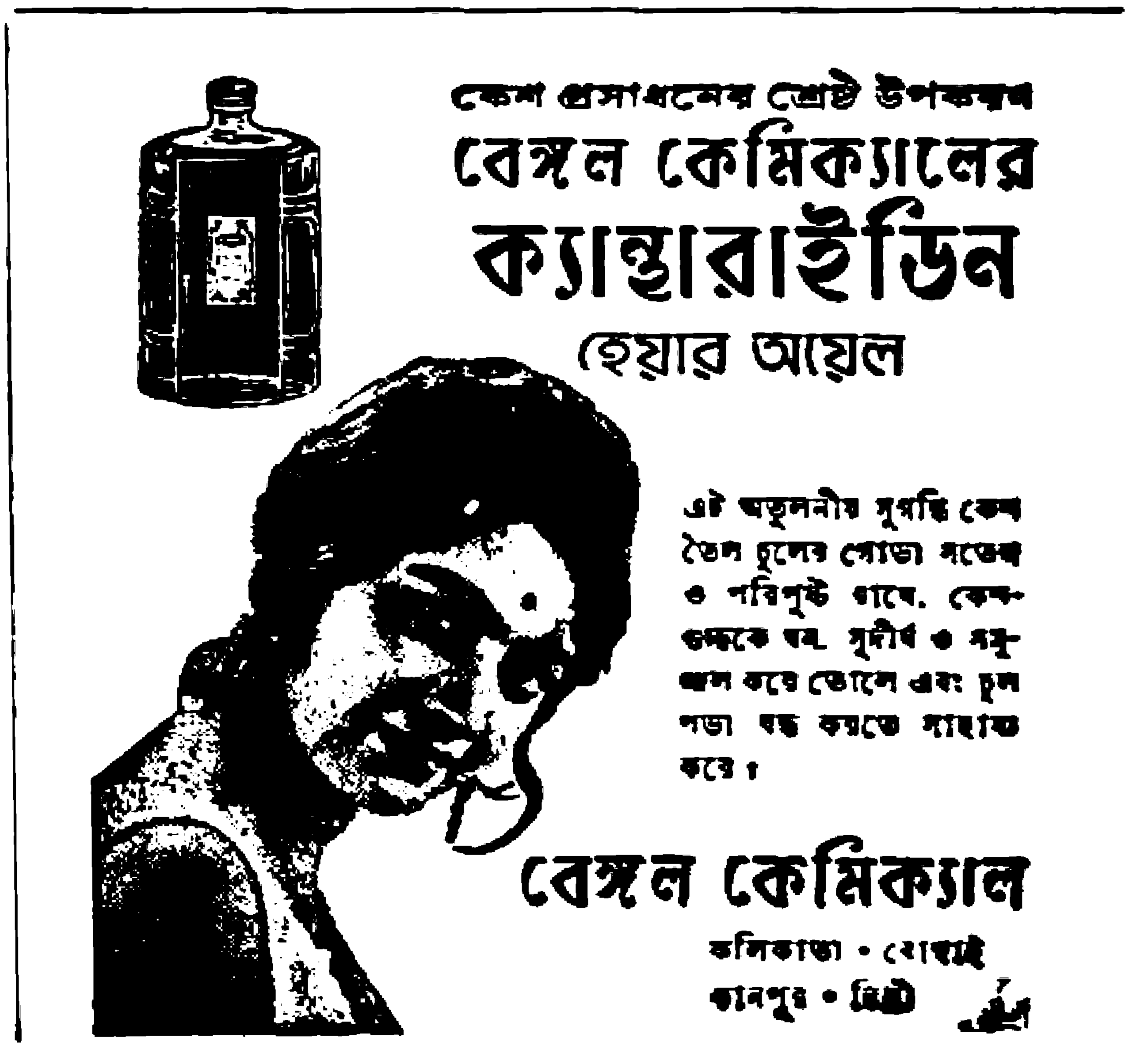

আন্তর্জাতিক অ্যাথলেটিক্স

ক্ষেত্রনাথ রায়

আন্তর্জাতিক খেলাধুলার আসরে অ্যাথলেটিক্সকে শ্রেষ্ঠ কুলীন পর্যায়ে যে পদ-মর্যাদা দেওয়া হয় সে সম্পর্কে বিন্দুমাত্র পক্ষপাতিত্ব নেই। পৃথিবীর প্রাচীনতম খেলা বলতে—দৌড়, লাফ-ঝাঁপ এবং ভারী অথবা লম্বা কোন কিছু শূন্যে নিক্ষেপ করে উচ্চতা ও দূরত্ব অতিক্রম করা। এইগুলি একদিকে যেমন খেলাধুলার আকর্ষণীয় প্রথা তেমনি অপর দিক আজও মানুষের জীবন-ধারণের ক্ষেত্রে অতিপ্রয়োজনীয় অবলম্বন। আধুনিক কালের অ্যাথলেটিক্সে রানিং, ওয়াকিং, লংজাম্প, হাইজাম্প, জ্যাভেলিন-ডিসকাস-হ্যামার থ্রোয়িং প্রভৃতি অনুষ্ঠান-গুলি প্রাচীন খেলাধুলার এক পরিমার্জিত শোভন সংস্করণ। রাশিয়া, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি উন্নতিশীল দেশে বৈজ্ঞানিক এবং চিকিৎসকদের সহযোগিতায় খেলাধুলা সম্পর্কে ব্যাপক বৈজ্ঞানিক গবেষণা চলছে। তাঁদের গবেষণালব্ধ ফলাফল ইতিমধ্যেই খেলোয়াড় এবং কোচদের খেলার মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। বৈজ্ঞানিকরা অ্যাথলেটিক্স সম্পর্কে খুব বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁদের মতে, দেশের জনস্বাস্থ্যের এমন কি সমস্ত খেলারও আসল বনিয়াদ এই অ্যাথলেটিক্স। একজন ফুটবল খেলোয়াড়কে অ্যাথলেটিক্সের সমস্ত বিষয়েই যে তালিম নিতে হবে এমন নয়। অ্যাথলেটিক্সের কোন কোন বিষয় ফুটবল খেলোয়াড়ের ক্রীড়ামান উন্নয়নের পক্ষে সহায়ক হবে তা বিজ্ঞানীরা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন।

অ্যাথলেটিক্সের আন্তর্জাতিক আসরে যোগ্যতা বিচারের শ্রেষ্ঠ মাপকাঠি হল অলিম্পিক অ্যাথলেটিক্সের ফলাফল। অলিম্পিক গেমসের সব থেকে আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান অ্যাথলেটিক্স। অলিম্পিক গেমসের অ্যাথলেটিক্সে আজও আমেরিকা শীর্ষস্থান অধিকার করে থাকলেও রাশিয়া এবং আফ্রিকার সদ্য-স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশ-গুলি আজ আমেরিকার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়িয়েছে। অ্যাথলেটিক্সে আমেরিকার এই বিরাট সাফল্যে আমেরিকার নিগ্রো অ্যাথলিটদের অবদান যথেষ্ট আছে।

অলিম্পিক অ্যাথলেটিক্সের প্রধান আকর্ষণ ১০০ ও ২০০ মিটার দৌড়। বিগত ১৬টি অলিম্পিক গেমসের ১০০ মিটার দৌড়ে আমেরিকা যেখানে পুরুষ বিভাগে পেয়েছে ১২টি স্বর্ণপদক সেখানে বাকী চারটি স্বর্ণপদক পেয়েছে এই চারটি দেশ—দক্ষিণ আফ্রিকা (১৯০৮) গ্রেট ব্রিটেন (১৯২৪), কানাডা (১৯২৮) এবং জার্মানী (১৯৬০)। পুরুষদের ১০০ মিটার দৌড়ের মোট পদক জয়ের তালিকাতেও আমেরিকা বিরাট ব্যবধানে প্রথম স্থান অধিকার করে আছে—আমেরিকার মোট পদক ২৬টি (স্বর্ণ ১২, রৌপ্য ১১ ও ব্রোঞ্জ ৩)। এখানে উল্লেখ্য, ১৯০৪ সালে পুরুষদের ১০০ মিটার দৌড়ের ফাইনালে আমেরিকা প্রথম ৬টি স্থান দখল করে যে অসাধারণ সাফল্যের পরিচয় দিয়েছিল তা অপর কোন দেশের পক্ষে আজও সম্ভব হয় নি। মহিলাদের ১০০ মিটার দৌড়ে আমেরিকার নিগ্রো অ্যাথলীট কুমারী উইমা টিয়াস উপর্যুপরি দুবার (১৯৬৪ ও ১৯৬৮) স্বর্ণপদক জয়ের গৌরব লাভ করেছেন কিন্তু কোন পুরুষের পক্ষে ১০০ মিটার দৌড়ে মোট দুবার স্বর্ণপদক জয়ও সম্ভব হয় নি। পুরুষদের পক্ষে ১০০ মিটার দৌড়ে শেষ স্বর্ণপদক পেয়েছেন আমেরিকার

রে ইউরী (আমেরিকা)
সর্বাধিক স্বর্ণপদক (৮টি) বিজয়ী

আলফ্রেড ওর্টার (আমেরিকা)
ডিসকাসে উপর্যুপরি চারবার স্বর্ণপদক জয়ের সূত্রে অসাধারণ নজির সৃষ্টি করেছেন

জিম হাইন্স (সময় ৯·৯ সেকেন্ড—নতুন অলিম্পিক রেকর্ড এবং বিশ্বরেকর্ডের সমান)।

মেয়েদের ১০০ মিটার দৌড়েও আমেরিকা সর্বাধিক স্বর্ণ এবং সর্বাধিক মোট পদক জয়ের গৌরব লাভ করেছে—আমেরিকার মোট পদক জয় ৮টি (স্বর্ণ ৫, রৌপ্য ২ ও ব্রোঞ্জ ১)।

ডাবল সম্মান

একই বছরের অলিম্পিক আসরে এক-জন অ্যাথলীটের পক্ষে ১০০ ও ২০০ মিটার দৌড়ে স্বর্ণপদক জয় নিঃসন্দেহে বিশেষ সাফল্যের পরিচায়ক। এইভাবে দুটি স্বর্ণপদক জয়কে বলা হয় 'ডাবল' খেতাব লাভ। ১০০ ও ২০০ মিটার দৌড়ে এ পর্যন্ত ১০ জন অ্যাথলীট এই বিশেষ সম্মান লাভ করেছেন—পুরুষ বিভাগে ৬ জন এবং মহিলা বিভাগে ৪ জন। পুরুষ বিভাগে এই সম্মান লাভ করেছেন আমেরিকার পাঁচজন এবং কানাডার একজন—১৯০৪ সালে আর্চি হান (আমেরিকা), ১৯১২ সালে র‍্যালফ ক্রেগ (আমেরিকা), ১৯২৮ সালে পার্সি উইলিয়ামস (কানাডা), ১৯৩২ সালে এডি টোলান (আমেরিকা), ১৯৩৬ সালে জেসি ওয়েন্স (আমেরিকা) এবং ১৯৫৬ সালে ববি জো মোরো (আমেরিকা)।

মেয়েদের পক্ষে এই 'ডাবল' খেতাব পেয়েছেন এই চারজন—১৯৪৮ সালে শ্রীমতী ফ্যানী ব্ল্যাঙ্কার্স কোয়েন (নেদারল্যান্ডস), ১৯৫২ সালে মার্জোরী জ্যাকসন (অস্ট্রেলিয়া) ১৯৫৬ সালে বেটি কাথবার্ট (অস্ট্রেলিয়া) এবং ১৯৬০ সালে নিগ্রো

অ্যাথলীট কুমারী উইলমা রুডলফ (আমেরিকা)।

পুরুষদের ২০০ মিটার দৌড় ১৯০০ সালে এবং মেয়েদের ২০০ মিটার দৌড় ১৯৪৮ সালে অলিম্পিক গেমসের অ্যাথলেটিকসের তালিকায় প্রথম স্থান পায়। পুরুষদের ২০০ মিটার দৌড়ে আমেরিকা সর্বাধিক স্বর্ণ এবং সর্বাধিক মোট পদক জয়ী হয়েছে—আমেরিকার মোট পদক জয় ৩৩টি (স্বর্ণ ১২, রৌপ্য ১২ ও ব্রোঞ্জ ৯)।

মেয়েদের ২০০ মিটার দৌড়ের পদক জয়ের তালিকায় অস্ট্রেলিয়ার স্থান প্রথম—মোট পদক ৬ (স্বর্ণ ২, রৌপ্য ১ ও ব্রোঞ্জ ৩) এবং আমেরিকার স্থান দ্বিতীয়—মোট পদক ৩ (স্বর্ণ ২ ও ব্রোঞ্জ ১)।

দৌড়ে অটুট প্রাধান্য

একই বছরের অলিম্পিক আসরে অ্যাথলেটিকসের কোন একটি বিষয়ে একই দেশের পক্ষে স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পদক জয় নিঃসন্দেহে বিরাট সাফল্যের পরিচায়ক। পুরুষ বিভাগের মোট ৬টি দৌড় অনুষ্ঠানে এ পর্যন্ত মাত্র দুটি দেশ—আমেরিকা এবং ফিনল্যান্ড এই সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন—আমেরিকা ১২ বার এবং ফিনল্যান্ড ১ বার। মহিলাদের দৌড় অনুষ্ঠানে এই ধরনের কোন নজির নেই।

১০০ মিটার : আমেরিকা (১৯০৪ ও ১৯১২)।

২০০ মিটার : আমেরিকা (১৯০৪, ১৯৩২, ১৯৫২ ও ১৯৫৬)।

লাভ করুন 5% করমুক্ত সুদ

7 বছরের জাতীয় সঞ্চয় সার্টিফিকেটে

এতে 5% করমুক্ত সুদ পাওয়া যায়। যদি আপনার আয় বেশী হয়, নিম্নোক্ত হারে আপনি সুদ পাবেন :

যদি আয় হয়	আপনি পাবেন
20,000 টাকা	6.37%
30,000 টাকা	7.99%
40,000 টাকা	9.39%
50,000 টাকা	14.71%

বিশদ বিবরণীর জন্য আপনার বাড়ীর কাছের পোষ্ট অফিসে খোঁজ নিন।

জাতীয় সঞ্চয় সংস্থা

davp 70/346

৪০০ মিটার : আমেরিকা (১৯০৪ ও ১৯৬৮)।
৮০০ মিটার : আমেরিকা (১৯০৪ ও ১৯১২)।
১,৫০০ মিটার : আমেরিকা (১৯০৪)।
১০,০০০ মিটার : ফিনল্যাণ্ড (১৯০৬)।

এখানে উল্লেখ্য, ১৯০৪ সালের অলিম্পিক আসরে আমেরিকা পাঁচটি অনুষ্ঠানে স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পদক জয়ের সূত্রে যে অসাধারণ সাফল্যের পরিচয় দেয় তার নজির আজও কোন দেশ স্পর্শ করতে সক্ষম হয় নি।

অলিম্পিক হিরো ও হিরোইন

অলিম্পিক গেমসের তালিকায় অনেক রকমের খেলা আছে। কিন্তু একমাত্র অ্যাথলেটিকসে যাঁরা অসাধারণ ব্যক্তিগত ক্রীড়াচাতুর্যের পরিচয় দিয়েছেন তাঁদেরই 'অলিম্পিক হিরো বা হিরোইন' আখ্যা দেওয়া হয়েছে এবং সেই বছরের অলিম্পিক গেমস তাঁদের নামেই উৎসর্গীত হয়েছে। এ পর্যন্ত এই দুর্লভ সম্মান লাভ করেছেন পাঁচজন অ্যাথলীট—১৯২৪ সালে প্যাভো নুরমি (ফিনল্যাণ্ড), ১৯৩৬ সালে নিগ্রো অ্যাথলীট জেসি ওয়েন্স (আমেরিকা), ১৯৪৮ সালে দুই সন্তানের জননী শ্রীমতী ব্ল্যাঙ্কার্স কোয়েন (নেদারল্যাণ্ডস), ১৯৫২ সালে এমিল জেটোপেক (চেকোশ্লোভাকিয়া) এবং ১৯৬০ সালে নিগ্রো অ্যাথলীট কুমারী উইলমা রুডল্ফ (আমেরিকা)।

স্বামী-স্ত্রীর সাফল্য

১৯৫২ সালের অলিম্পিক অ্যাথলেটিকসে চেকোশ্লোভাকিয়ার এমিল জেটোপেক তিনটি স্বর্ণপদক (৫,০০০ মিটার ও ১০,০০০ মিটার দৌড়ে এবং ম্যারাথন রেসে) এবং তাঁর সহধর্মিণী শ্রীমতী ডানা জেটোপেকোভা জ্যাভেলিনে স্বর্ণপদক জয় করে অলিম্পিক অ্যাথলেটিকসের আসরে অভূতপূর্ব নজির সৃষ্টি করেন। একই বছরের অলিম্পিক অ্যাথলেটিকসে আজ পর্যন্ত আর কোন দম্পতি এইভাবে স্বর্ণপদক পান নি।

উল্লেখযোগ্য সাফল্য

(উপর্যুপরি ২ বার অথবা মোট ২ বার স্বর্ণপদক জয়)

পুরুষ বিভাগ

৮০০ মিটার দৌড় : ইংল্যাণ্ডের ডগলাস লো (১৯২৪ ও ১৯২৮), আমেরিকার মলভিন হুইটফিল্ড (১৯৪৮ ও ১৯৫২) এবং নিউজিল্যাণ্ডের পিটার স্নেল (১৯৬০ ও ১৯৬৪)।
১০,০০০ মিটার দৌড় : ফিনল্যাণ্ডের প্যাভো নুর্মি (১৯২০ ও ১৯২৮) এবং চেকোশ্লোভাকিয়ার এমিল জেটোপেক (১৯৪৮ ও ১৯৫২)।
ম্যারাথন দৌড় : ইথিওপিয়ার আবেবে বিকিলা (১৯৬০ ও ১৯৬৪)।

এমিল জেটোপেক (চেকো:)
একই বছরে (১৯৫২) ৫,০০০ ও ১০,০০০ মিটার দৌড় এবং ম্যারাথনে স্বর্ণপদক জয়ের সূত্রে অসাধারণ নজির সৃষ্টি করেন

১১০ মিটার হার্ডলস : আমেরিকার লী কলহাউন (১৯৫৬ ও ১৯৬০)।
৪০০ মিটার হার্ডলস : আমেরিকার গ্লেন ডেভিস (১৯৫৬ ও ১৯৬০)।
৩০০০ মিটার স্টিপলচেজ : ফিনল্যাণ্ডের ভলমারি আইসো-হোলো (১৯৩২ ও ১৯৩৬)।
ট্রিপল জাম্প : আমেরিকার মেয়ার প্রিন্সটিন (১৯০০ ও ১৯০৪), ব্রেজিলের অ্যাডহেমার ফেরিরা ডা'সিলভা (১৯৫২ ও ১৯৫৬) এবং পোল্যাণ্ডের জোসেফ স্মিড (১৯৬০ ও ১৯৬৪)।
পোলভল্ট : আমেরিকার রবার্ট রিচার্ডস (১৯৫২ ও ১৯৫৬)।
সটপুট : আমেরিকার রালফ রোজ (১৯০৪ ও ১৯০৮) এবং পেরী ও' ব্রিয়েন (১৯৫২ ও ১৯৫৬)।
ডিসকাস : আমেরিকার মার্টিন সেরিডন (১৯০৪ ও ১৯০৮), ক্লারেন্স হাউজার (১৯২৪ ও ১৯২৮) এবং আলফ্রেড ওর্টার (উপর্যুপরি ১৯৫৬, ১৯৬০, ১৯৬৪ ও ১৯৬৮)।
হ্যামার : আমেরিকার জন ফ্লানাগান (উপর্যুপরি ৩ বার—১৯০০, ১৯০৪ ও ১৯০৮) এবং আয়ারল্যাণ্ডের প্যাট্রিক ও' কালাহান (১৯২৮ ও ১৯৩২)।
জ্যাভেলিন : সুইডেনের এরিক লেমিং (১৯০৮ ও ১৯১২) এবং ফিনল্যাণ্ডের জনি মায়রা (১৯২০ ও ১৯২৪)।
ডেকাথলন : আমেরিকার রবার্ট ম্যাথিয়াজ (১৯৪৮ ও ১৯৫২)।

মহিলা বিভাগ

১০০ মিটার দৌড় : আমেরিকার উইমা টিয়াস (১৯৬৪ ও ১৯৬৮)।
৮০ মিটার হার্ডলস : অস্ট্রেলিয়ার শার্লি স্ট্রিকল্যাণ্ড (১৯৫২ ও ১৯৫৬)।
হাইজাম্প : রুমানিয়ার আইয়োল্যাণ্ডা ব্যালাস (১৯৬০ ও ১৯৬৪)।
সটপুট : রাশিয়ার তামারা প্রেস (১৯৬০ ও ১৯৬৪)।

সর্বাধিক স্বর্ণপদক

পুরুষ বিভাগ — ব্যক্তিগত অনুষ্ঠান

৮টি স্বর্ণপদক : রে ইউরী (আমেরিকা)—স্ট্যাণ্ডিং হাইজাম্প (১৯০০, ১৯০৪ ও ১৯০৮), স্ট্যাণ্ডিং লং জাম্প (১৯০০ ১৯০৪ ও ১৯০৮) এবং স্ট্যাণ্ডিং ট্রিপল জাম্প (১৯০০ ও ১৯০৪)।

৬টি স্বর্ণপদক : প্যাভো নুর্মি (ফিনল্যাণ্ড) — ১,৫০০ মিটার দৌড় (১৯২৪), ৫,০০০ মিটার দৌড় (১৯২৪), ১০,০০০ মিটার দৌড় (১৯২০ ও ১৯২৮) এবং ক্রস কাণ্ট্রি (১৯২০ ও ১৯২৪)।

মহিলা বিভাগে দুই সন্তানের জননী শ্রীমতী ফ্যানি ব্ল্যাঙ্কার্স কোয়েন (নেদারল্যাণ্ডস) ১৯৪৮ সালের অলিম্পিক অ্যাথলেটিকসে এই চারটি অনুষ্ঠানে স্বর্ণপদক জয় করে অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দেন—১০০ ও ২০০ মিটার দৌড়, ৮০ মিটার হার্ডলস এবং ৪×১০০ মিটার রীলে।

অসাধারণ কৃতিত্ব

আলফ্রেড ওর্টার (আমেরিকা) ১৯৬৮ সালে ডিসকাসে স্বর্ণপদক লাভের সূত্রে উপর্যুপরি চারটি অলিম্পিকের ডিসকাস অনুষ্ঠানে স্বর্ণপদক জয়ী হন এবং অলিম্পিকের অ্যাথলেটিকস অনুষ্ঠানে এক অভূতপূর্ব নজির সৃষ্টি করেন। তাঁর আগে অ্যাথলেটিকসের কোন একটি ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানে একজন অ্যাথলীটের পক্ষে মোট চারবার স্বর্ণপদক জয়ই সম্ভব হয় নি, উপর্যুপরি চারবার স্বর্ণপদক জয় দূরের কথা।

বিগত ষোলটি অলিম্পিকেরই পোলভল্টে আমেরিকা স্বর্ণপদক জয়ী হয়েছে। অলিম্পিক অ্যাথলেটিকসের অপর কোন অনুষ্ঠানে কোন একটি দেশের পক্ষে এই রকমের নিরঙ্কুশ প্রাধান্য নেই।

আমেরিকার নিগ্রো অ্যাথলীট কুমারী উইমা টিয়াস মেয়েদের ১০০ মিটার দৌড়ে উপর্যুপরি দুবার (১৯৬৪ ও ১৯৬৮) স্বর্ণপদক জয়ের গৌরব লাভ করেছেন। এখানে উল্লেখ্য, ১০০ মিটার দৌড়ে কোন পুরুষ অথবা অপর কোন মহিলা মোট দুবারও স্বর্ণপদক পান নি।

রুমানিয়ার আইয়োল্যাণ্ডা ব্যালাস মেয়েদের হাইজাম্পে উপর্যুপরি দুবার (১৯৬০ ও ১৯৬৪) স্বর্ণপদক জয়ের সূত্রে অভূতপূর্ব নজির সৃষ্টি করেছেন। হাইজাম্পে কোন পুরুষ অথবা কোন মহিলা এমন কি মোট দুবার স্বর্ণপদক জয় করতে সক্ষম হন নি।

CENTRAL LIBRARY

খেলাধুলা

দর্শক

এশিয়ান গেমস

ব্যাঙ্ককে আয়োজিত ৬ষ্ঠ এশিয়ান গেমস মহাসমারোহে উদযাপিত হয়েছে। চূড়ান্ত পদক জয়ের তালিকায় জাপান সর্বাধিক সংখ্যক স্বর্ণ (৭৪টি), রৌপ্য (৪৭টি) এবং ব্রোঞ্জ পদক (২০টি) জয়ী হয়ে প্রথম স্থান লাভ করেছে। ১৯৬৬ সালের ৫ম এশিয়ান গেমসেও জাপান পদক জয়ের তালিকায় শীর্ষস্থান পেয়েছিল। ১৯৬৬ সালের তুলনায় জাপান এবার যেমন পাঁচটি স্বর্ণপদক কম পেয়েছে তেমনি এ বছরের ক্রীড়ানুষ্ঠানে লন টেনিস এবং টেবল টেনিস খেলা ছিল না।

কি বিরাট ব্যবধান

এবারের পদক জয়ের তালিকায় প্রথম স্থান অধিকারী জাপান যেখানে মোট ১৪৪টি পদক পেয়েছে সেখানে দ্বিতীয় স্থান অধিকারী দক্ষিণ কোরিয়ার মোট পদক সংখ্যা ৫৪টি। আবার লক্ষ্য করুন জাপান একাই যেখানে ৭৪টি স্বর্ণপদক পেয়েছে সেখানে ১২টি দেশ মিলে বাকী ৩১টি পদক সংগ্রহ করেছে। জাপান সর্বাধিক স্বর্ণপদক (৭৪টি), সর্বাধিক রৌপ্যপদক (৪৭টি) এবং দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে যুগ্মভাবে সর্বাধিক ব্রোঞ্জপদক (২০টি) জয়ী হয়েছে।

ফলাফল

ফুটবল : স্বর্ণ ব্রহ্মদেশ (১৯৬৬ সালের বিজয়ী) এবং দক্ষিণ কোরিয়া (যুগ্ম বিজয়ী), ব্রোঞ্জ ভারতবর্ষ।

ভলিবল : পুরুষ বিভাগ : স্বর্ণ জাপান, রৌপ্য দঃ কোরিয়া এবং ব্রোঞ্জ তাইওয়ান।
মহিলা বিভাগ : স্বর্ণ জাপান, রৌপ্য দঃ কোরিয়া এবং ব্রোঞ্জ কম্বোডিয়া।

বাস্কেটবল : স্বর্ণ দক্ষিণ কোরিয়া, রৌপ্য ইস্রাইল এবং ব্রোঞ্জ জাপান

হকি : স্বর্ণ পাকিস্তান, রৌপ্য ভারতবর্ষ এবং ব্রোঞ্জ জাপান। ফাইনালে পাকিস্তান ১—০ গোলে ভারতবর্ষকে পরাজিত করে।

ওয়াটারপোলো : স্বর্ণ জাপান, রৌপ্য ভারতবর্ষ এবং ব্রোঞ্জ ইন্দোনেশিয়া। ফাইনালে জাপান ৪—২ গোলে ভারতবর্ষকে পরাজিত করে।

ব্যাডমিন্টন : দলগত বিভাগ — পুরুষ বিভাগে চ্যাম্পিয়ান ইন্দোনেশিয়া এবং মহিলা বিভাগে চ্যাম্পিয়ান জাপান।

ভারতবর্ষের পদক জয়ের খতিয়ান

	স্বর্ণ	রৌপ্য	ব্রোঞ্জ
অ্যাথলেটিকস	৪	৫	৫
কুস্তী	১	১	৩
হকি	০	১	০
ফুটবল	০	০	১
ওয়াটারপোলো	০	১	০
বক্সিং	১	১	০
ইয়াচিং	০	০	১
মোটঃ	৬	৯	১০

অ্যাথলেটিকস

(প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান)

	স্বর্ণ	রৌপ্য	ব্রোঞ্জ
জাপান	১১	৭	৬
ভারতবর্ষ	৪	৫	৫

মল্লযুদ্ধে

	স্বর্ণ	রৌপ্য	ব্রোঞ্জ
ইরাণ	৬	২	১
জাপান	৪	৫	১
ভারতবর্ষ	১	১	৩
কোরিয়া	০	১	৩
পাকিস্তান	০	০	২

ভারতবর্ষের পদক জয়

স্বর্ণপদক (৬)

অ্যাথলেটিকস (৪), মুষ্টিযুদ্ধ (১), কুস্তি (১)

সটপুট : যোগীন্দর সিং। দূরত্ব ১৭·০৯ মিটার (নতুন এশিয়ান রেকর্ড)।

ডিসকাস : পার্ভীন কুমার। দূরত্ব ৫২·০২ মিটার (নতুন এশিয়ান রেকর্ড)।

ট্রিপল জাম্প : মহীন্দর সিং গিল। দূরত্ব ১৬·১১ মিটার (নতুন এশিয়ান রেকর্ড)

৪০০ মিটার (মহিলা) : কমলজিৎ সান্ধু।

কুস্তি (হেভীওয়েট) : চাঁদগী রাম।

মুষ্টিযুদ্ধ (হেভীওয়েট) : হাওয়া সিং।

রৌপ্যপদক (৯)

অ্যাথলেটিকস (৫), মুষ্টিযুদ্ধ (১), কুস্তি (১), হকি, ওয়াটারপোলো

৫০০০ মিটার : এডওয়ার্ড সিকুইরা।

৮০০ মিটার : শ্রীরাম সিং।

ডেকাথলন : এম জি শেঠি।

ট্রিপল জাম্প : লাভ সিং।

৪×৪০০ মিটার রীলে : ভারতীয় দল।

কুস্তি (৯০ কে জি) : জিং সিং।

মুষ্টিযুদ্ধ (ফেদারওয়েট) : মুনুস্বামী ভেনু।

হকি : ভারতীয় দল।

ওয়াটারপোলো : ভারতীয় দল।

ব্রোঞ্জপদক (১০)

অ্যাথলেটিকস (৫), কুস্তি (৩), ফুটবল, ইয়াচিং

হাইজাম্প : ভীম সিং।

লংজাম্প : লাভ সিং।

৪০০ মিটার : মুচা সিং।

স্টিপল চেজ : গুরমেজ সিং।

৪×১০০ মিটার রীলে : ভারতীয় দল।

কুস্তি (৬৮ কে জি) : ওমপ্রকাশ।

" (৭৪ কে জি) : মুক্তিয়ার সিং।

" (৮২ কে জি) : নেত্রপাল সিং।

ইয়াচিং (এন্টারপ্রাইজ) : সোলি কন্ট্রাকটর এবং আফসার হোসেন।

ফুটবল : ভারতীয় দল।

সন্তরণ প্রতিযোগিতা

স্বর্ণ : জাপান ২৫ এবং দঃ কোরিয়া ৩।

রৌপ্য : জাপান ১৮, ফিলিপাইন ৫, সিঙ্গাপুর ৩, দঃ কোরিয়া ১ এবং ইন্দোনেশিয়া ১।

ব্রোঞ্জ : সিঙ্গাপুর ৭, তাইওয়ান ৫, জাপান ৪, ফিলিপাইন ৪, ইস্রাইল ৩, কম্বোডিয়া ২, দঃ কোরিয়া ১, ইন্দোনেশিয়া ১, থাইল্যান্ড ১।

চূড়ান্ত পদক-তালিকা

(প্রথম ৬টি স্থান)

	স্বর্ণ	রৌপ্য	ব্রোঞ্জ
জাপান	৭৪	৪৭	২০
দঃ কোরিয়া	১৮	১৩	২০
থাইল্যান্ড	৯	১৭	১৩
ইরাণ	৯	৭	৭
ভারতবর্ষ	৬	৯	১০
ইস্রাইল	৬	৬	৫

স্বর্ণপদক : উপরের ৬টি দেশ ছাড়া আরও ৭টি দেশ স্বর্ণপদক পেয়েছে— মালয়েশিয়া ৫টি, ব্রহ্মদেশ ৩টি, ইন্দোনেশিয়া ২টি, সিংহল ২টি, ফিলিপাইন ১টি, তাইওয়ান ১টি এবং পাকিস্তান ১টি।

নতুন এশিয়ান গেমস রেকর্ড

অ্যাথলেটিক্সে ২৪টি এবং সাঁতারে ২০টি।

শ্রেষ্ঠ অ্যাথলীট

বিশেষজ্ঞদের ভোটের মাধ্যমে নিম্নলিখিত অ্যাথলীটরা বিশেষ সম্মান লাভ করেছেন :

বছরের শ্রেষ্ঠ এশিয়ান অ্যাথলীট : চি চেং (তাইওয়ান)। ৬ষ্ঠ এশিয়ান গেমসে শ্রেষ্ঠ অ্যাথলীট : পুরুষ বিভাগে মুশিয়ান রোজা (সিংহল) এবং মহিলা বিভাগে হানা সেকিফ (ইস্রাইল)। রোজা খালি পায়ে পুরুষদের ৫,০০০ ও ১০,০০০ মিটার দৌড়ে স্বর্ণপদক জয়ী হন, অপরদিকে সেকিফ মেয়েদের ৮০০ ও ১,৫০০ মিটার দৌড়ে স্বর্ণপদক পান।

অ্যাথলেটিক্স

অ্যাথলেটিক্সে জাপান যেখানে সর্বাধিক স্বর্ণপদক (১৯টি) এবং সর্বাধিক মোট পদক (৪২টি) সংগ্রহ করে শীর্ষস্থান লাভ করেছে, সেখানে দ্বিতীয় স্থান

অধিকারী ভারতবর্ষের মোট পদক সংখ্যা ১৪টি—স্বর্ণ ৪, রৌপ্য ৫ এবং ব্রোঞ্জ ৫।

ফুটবল

ফুটবল প্রতিযোগিতায় গতবারের বিজয়ী (১৯৬৬) ব্রহ্মদেশ বনাম দক্ষিণ কোরিয়ার ফাইনাল খেলা ড্র যায়। ফলে ব্রহ্মদেশ এবং দক্ষিণ কোরিয়াকে যুগ্ম-বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। এশিয়া গেমসের ফুটবল প্রতিযোগিতায় দুই দেশের যুগ্ম-ভাবে স্বর্ণপদক জয় এই প্রথম। ভারতবর্ষ ১—০ গোলে জাপানকে পরাজিত করে ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছে। সেমি-ফাইনালে ভারতবর্ষ ০—২ গোলে ব্রহ্মদেশের কাছে এবং লীগ পর্যায়ের খেলায় জাপানের কাছে ০—১ গোলে হেরেছিল।

এখানে উল্লেখ্য, বিগত ৬টি এশিয়ান গেমসে মোট পাঁচবার ফুটবল প্রতিযোগিতা হয়েছে। ভারতবর্ষ ফুটবল খেলায় দু'বার স্বর্ণপদক পায় (১৯৫১ ও ১৯৬২ সালে।) ১৯৫৪ সালে ৬ষ্ঠ স্থান পায় এবং ১৯৬৬ সালে মূল প্রতিযোগিতায় খেলবার যোগ্যতা লাভ করতেই সক্ষম হয়নি, ১৯৬৬ সালের লীগ পর্যায়ের খেলায় মালয়েশিয়াকে ২—১ গোলে পরাজিত করে জাপানের কাছে ১—২ গোলে এবং ইরানের কাছে ১—৪ গোলে পরাজিত হয়।

হকি

হকি প্রতিযোগিতার ফাইনালে পাকিস্তান ১—০ গোলে ভারতবর্ষকে পরাজিত করে স্বর্ণপদক জয়ী হয়েছে। ব্রোঞ্জপদক পেয়েছে জাপান। জাপান ১—০ গোলে মালয়েশিয়াকে পরাজিত করে উপর্যুপরি দু'বার ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছে। লীগের খেলায় ভারতবর্ষ ৭—০ গোলে সিঙ্গাপুরকে, ৬—০ গোলে সিংহলকে এবং ২—০ গোলে মালয়েশিয়াকে পরাজিত করে সেমি-ফাইনালে উঠেছিল। অপরদিকে পাকিস্তান লীগ পর্যায়ের খেলায় ৩—০ গোলে জাপানকে এবং ১০—০ গোলে হংকংকে পরাজিত করে থাইল্যান্ডের বিপক্ষে গোলশূন্য অবস্থায় খেলা ড্র করে-ছিল। সেমি-ফাইনালে ভারতবর্ষ ১—০ গোলে জাপানকে এবং পাকিস্তান ৫—০ গোলে মালয়েশিয়াকে পরাজিত করে ফাইনালে উঠেছিল।

তৃতীয় এশিয়ান গেমস থেকে হকি প্রতিযোগিতার আসর বসছে। বিগত চারটি হকি প্রতিযোগিতায় স্বর্ণপদক পেয়েছে পাকিস্তান ৩ বার (১৯৫৮, ১৯৬২ ও ১৯৭০) এবং ভারতবর্ষ ১ বার (১৯৬৬)। ১৯৫৮ সালে পাকিস্তান গোলের গড়-পড়তায় ভারতবর্ষকে পরাজিত করে স্বর্ণ-পদক পেয়েছিল। পরবর্তী তিনটি ফাইনাল খেলার ফলাফল : ১৯৬২ সাল—পাকিস্তান ২ : ভারতবর্ষ ০; ১৯৬৬ সাল—ভারতবর্ষ ১ : পাকিস্তান ০; ১৯৭০ সাল—পাকিস্তান ১ : ভারতবর্ষ ০।

অসাধারণ ব্যক্তিগত সাফল্য

জাপানের ১৭ বছরের স্কুল-ছাত্রী কুমারী ইয়োশিমি নিশিগায়া সাঁতারে ৫টি স্বর্ণপদক জয়ের সূত্রে এশিয়ান গেমসের ইতিহাসে অভূতপূর্ব ব্যক্তিগত সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর আগে কোন এক-জনের পক্ষে একই বছরের এশিয়ান গেমসের আসরে মোট পাঁচটি স্বর্ণপদক জয় সম্ভব হয়নি। কুমারী নিশিগায়া নতুন এশিয়ান গেমস রেকর্ড সময়ে তিনটি ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানে (১০০ মিটার ফ্রিস্টাইল, ২০০ মিটার ফ্রিস্টাইল এবং ২০০ মিটার ব্যক্তিগত মেডলে) স্বর্ণপদক সংগ্রহ করেন। তাছাড়া ৪০০ মিটার ফ্রিস্টাইল রীলে এবং ৪০০ মিটার মেডলে রীলেতে স্বর্ণপদক বিজয়ী জাপান দলের সভ্যা হিসাবে দুটি স্বর্ণপদক পান।

ভারতবর্ষ বনাম জাপান

ভারতবর্ষ তার ভৌগোলিক আয়তন, প্রাকৃতিক সম্পদ এবং জনসংখ্যার দিক থেকে জাপানের তুলনায় অনেক বেশী সমৃদ্ধশালী দেশ। কিন্তু শিক্ষা-দীক্ষা, খেলাধুলো, শিল্প-বাণিজ্য এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে জাপানের থেকে ভারতবর্ষ অনেক দূর ব্যবধানে পিছিয়ে আছে। ভারতবর্ষ যেখানে ৬ বারের এশিয়ান গেমসে ৪০টি স্বর্ণপদক এবং মোট ১১৮টি পদক পেয়েছে (স্বর্ণ ৪০, রৌপ্য ৩৫ ও ব্রোঞ্জ ৪৩), সেখানে মাত্র গত দু'বারের (১৯৬৬ ও ১৯৭০ সাল) এশিয়ান গেমসে জাপানের সংগৃহীত স্বর্ণপদক সংখ্যা ১৫২টি এবং মোট পদক-সংখ্যা ৩১৩টি (স্বর্ণ ১৫২, রৌপ্য ১০৫ এবং ব্রোঞ্জ ৫৬)।

সাঁতার

জাপানীরা জাত-সাঁতারু, তার প্রমাণ দিয়েছে সদ্য-সমাপ্ত ৬ষ্ঠ এশিয়ান গেমসে। সাঁতারের মোট ২৮টি স্বর্ণপদকের মধ্যে জাপান একাই ২৫টি স্বর্ণপদক পেয়েছে এবং দক্ষিণ কোরিয়া পেয়েছে বাকি তিনটি স্বর্ণপদক। জাপান সর্বাধিক মোট পদক জয়েরও গৌরব লাভ করেছে—মোট পদক ৪৭টি (স্বর্ণ ২৫, রৌপ্য ১৮ ও ব্রোঞ্জ ৪)। সাঁতারে যোগদানকারী দেশ ভারতবর্ষ, হংকং, ইরাণ, মালয়েশিয়া এবং দক্ষিণ ভিয়েতনাম কোন পদকই পায়নি।

ইংল্যান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়া

দ্বিতীয় টেস্ট ক্রিকেট

ইংল্যান্ড : ৩১৭ রান (লাকহার্স্ট ১৩১ এবং নটস ৭০ রান। ম্যাকেঞ্জী ৬৬ রানে ৪ উইকেট)

ও ২৮৭ রান (৬ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। এডরিচ নট-আউট ১১৫ এবং বয়কট ৫০ রান। গিলসন ৬৮ রানে ৩ উইকেট)

অস্ট্রেলিয়া : ৪৪০ রান (রেডপাথ ১৭১, গ্রেগ চ্যাপেল ১০৮ এবং আয়ান চ্যাপেল ৫০ রান। স্নো ১৪৩ রানে ৪ এবং সাটলওয়ার্থ ১০৫ রানে ২ উইকেট)

ও ১০০ রান (৩ উইকেটে। স্নো ১৭ রানে ২ উইকেট)

পার্থে আয়োজিত ইংল্যান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় টেস্ট ক্রিকেট খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে। ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় ইনিংসে নামী ব্যাটসম্যান জন এডরিচের নট-আউট ১১৫ রান করার ফলেই খেলার মোড় ঘুরে যায়।

অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক বিল লরী টসে জয়ী হয়ে ইংল্যান্ডকে প্রথমেই ব্যাট করতে পাঠান। প্রথম দিনের ৬ ঘণ্টার খেলায় ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসের ২টো উইকেট পড়ে ২৫৭ রান দাঁড়ায়। লাকহার্স্ট তাঁর ১৩১ রানে ১৩টা বাউন্ডারী করেন।

দ্বিতীয় দিনে ৩১৭ রানের মাথায় ইংল্যান্ডের ১ম ইনিংস শেষ হলে অস্ট্রে-লিয়া প্রথম ইনিংসের ৩টে উইকেট খুইয়ে মাত্র ৮৪ রান সংগ্রহ করেছিল। ১৭ রানের মাথায় তাদের ৩য় উইকেট পড়েছিল।

তৃতীয় দিনে অস্ট্রেলিয়ার ১ম ইনিংসের ৩৫৫ রান দাঁড়ায় (৬ উইকেটে)। আয়ান রেডপাথ ১৫৯ রান করে অপরাজিত থাকেন। ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটিতে গ্রেগ চ্যাপেল (১০৮ রান) এবং রেডপাথ দলের ২১৯ রান সংগ্রহ করেছিলেন। গ্রেগ চ্যাপেলকে নিয়ে অস্ট্রেলিয়ার এগারজন খেলোয়াড় তাঁদের খেলোয়াড়-জীবনের প্রথম টেস্ট ম্যাচ খেলতে নেমে সেঞ্চুরী করলেন।

চতুর্থ দিনে অস্ট্রেলিয়ার ১ম ইনিংস ৪৪০ রানের মাথায় শেষ হলে ইংল্যান্ড ৪৩ রানের পিছনে পড়ে দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নামে এবং ৪ উইকেট খুইয়ে ১৩৭ রান সংগ্রহ করে।

পঞ্চম অর্থাৎ খেলার শেষ দিনে চা-পানের কিছু আগে ২৮৭ রানের মাথায় (৬ উইকেটে) ইংল্যান্ড তাদের ২য় ইনিংসের খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। জন এডরিচ ১১৫ রান করে অপরাজিত থাকেন। টেস্ট খেলায় তাঁর এই নবম সেঞ্চুরী। খেলার বাকি ১৪৩ মিনিটে অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে জয়-লাভের প্রয়োজনীয় ২৪৫ রান সংগ্রহ করা একেবারেই অসম্ভব ছিল। অস্ট্রেলিয়ার ২য় ইনিংসের ১০০ রানের (৩ উইকেটে) মাথায় দ্বিতীয় টেস্ট খেলা শেষ হয়।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

শ্রেষ্ঠ লেখক ॥ শ্রেষ্ঠ রচনা

বিমল মিত্রের

সাহিত্যজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস

কড়ি দিয়ে কিনলাম

প্রথম খণ্ডের একাদশ মুদ্রণ প্রকাশিত হ'ল।

॥ দাম কুড়ি টাকা ॥

দ্বিতীয় খণ্ড এখনও চৌদ্দ টাকায় পাওয়া যাচ্ছে।

॥ মিত্র ঘোষের নূতন অভিযান ॥

বাংলা পকেট বই

প্রথম কিস্তিতে সাতখানি নূতন উপন্যাস প্রকাশিত হচ্ছে

এই বইগুলি পুস্তকাকারে ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়নি

লেখকবৃন্দ : আশাপূর্ণা দেবী, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, অবধূত, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, নীহাররঞ্জন গুপ্ত, মন্মথনাথ ঘোষ, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়।

আনুমানিক সওয়াশ পৃষ্ঠার বই : বহুবর্ণ প্রচ্ছদপট

= মূল্য প্রতিটি পুস্তক মাত্র দু টাকা =

যাঁরা অগ্রিম দুই টাকা জমা দিয়ে গ্রাহক হবেন—তাঁরা এই সাতখানি বই শতকরা কুড়ি টাকা কমিশনে পাবেন—ঐ দুই টাকা সাতখানি বইয়ের মোট দাম থেকে বাদ দেওয়া হবে। তবে বইগুলি একত্রে নিতে হবে।

মফঃস্বল এজেন্ট মহাশয়দেরও অপ্রত্যাশিত সুবিধা দেওয়া হবে।

তাঁরা দয়া করে চিঠি লিখে যোগাযোগ করুন।

আগামী ৩০শে চৈত্রের মধ্যে প্রকাশিত হবে

ডঃ ভবতারণ দত্তের
বাংলা দেশের ছড়া ১০৲

আবদুল জব্বারের
বাংলার চালচিত্র ১০৲

আশাপূর্ণা দেবীর
একাল সেকাল অন্যকাল ১৫৲

অবধূতের
নীলকণ্ঠ হিমালয় ৯৲

বাসুদেব বসুর
নেফা সুন্দরী নেফা ৪॥

প্রমথনাথ বিশীর
শাহী শিরোপা ৩॥

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের
নগরপারে রূপনগর ১৮৲

নজরুল ইসলামের
সন্ধ্যামালতী ৪৲

শঙ্কু মহারাজের
গঙ্গাসাগর ভ্রমণের একমাত্র গ্রন্থ
গঙ্গাসাগর ৮৲
তীর্থের ইতিহাস সহ পূর্ণ বিবরণ ঃ
বহু চিত্র শোভিত

মিত্র ও ঘোষ : ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২ ফোন : ৩৪৩৪৯২; ৩৪-৮৭৯১

কেনার সময় আপনি যে নির্মল বার সাবানই পাচ্ছেন তা বুঝবেন কি করে?

যা-ই কিনুন তা পুরোপুরি খাঁটি কি না
না-দেখেই সরল বিশ্বাসে হয় তো
নিয়ে নেন। কিন্তু সাবধান!
নির্মল বার সাবানের হুবহু নকল
বাজারে বেরিয়েছে।
বাইরে থেকে দেখলে মনে
হবে যেন একই।

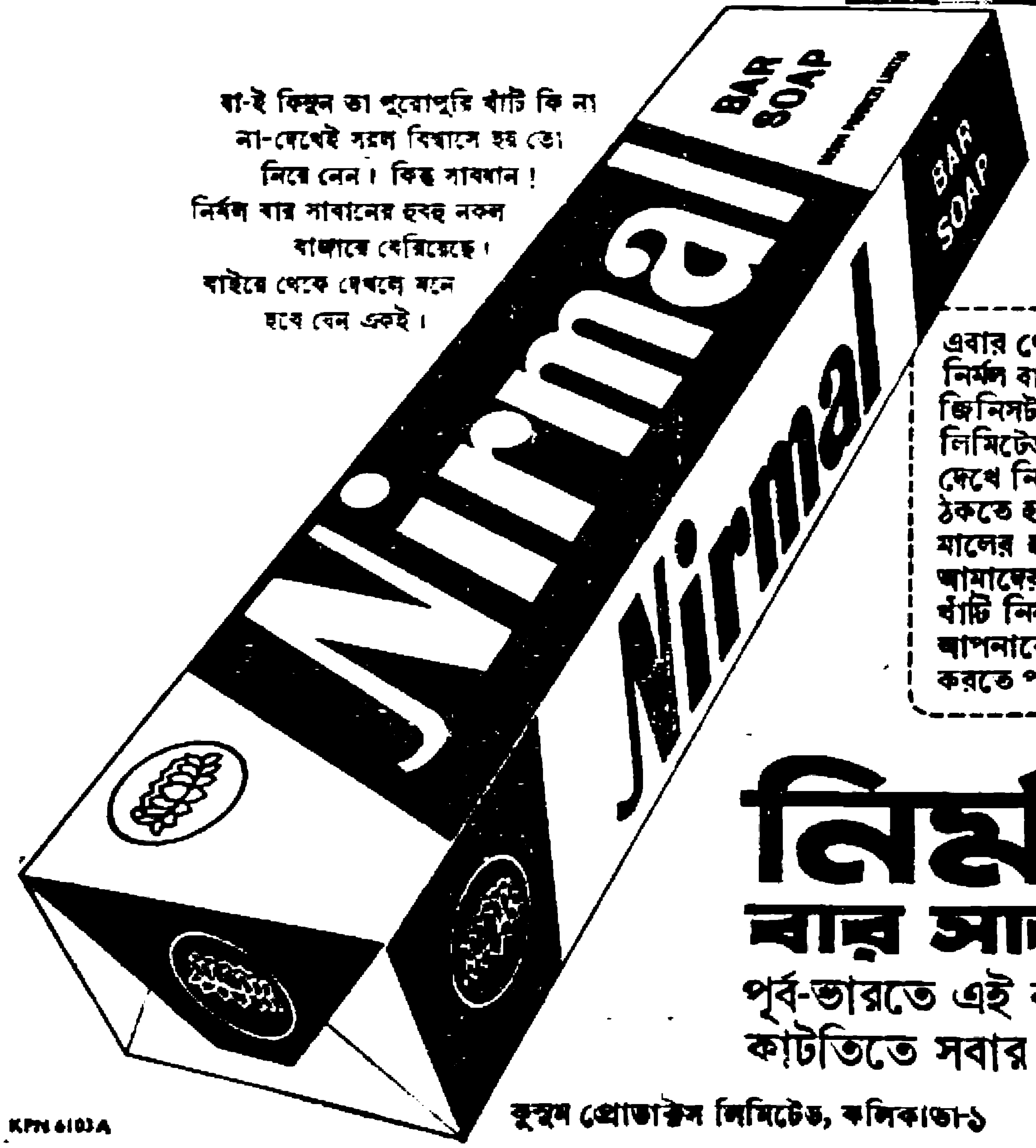

এবার থেকে যখুনি
নির্মল বার সাবান কিনবেন,
জিনিসটা কুসুম প্রোডাক্টস
লিমিটেড-এর তৈরী কি না
দেখে নিলে আর
ঠকতে হবে না। নকল
মালের হদিশ পেলেই
আমাদের জানান, যাতে
খাঁটি নির্মল পেতে আমরা
আপনাকে সাহায্য
করতে পারি।

নির্মল
বার সাবান

পূর্ব-ভারতে এই বার সাবানই
কাটতিতে সবার ওপরে।

KPN 6103A

কুসুম প্রোডাক্টস লিমিটেড, কলিকাতা-১

সেরা বাংলা উপন্যাস

পিটার রঙ্গনাথম

সাদা শিকারী কালো শিকার

দাম নয় টাকা

নীলিমেশ রায়চৌধুরী

জুলেরিমের নেপথ্যে

দাম—চার টাকা

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

ফুটবল খেলার আইনকানুন ৪·০০
ক্রিকেট খেলার আইনকানুন ৪·০০
খেলার রাজা ফুটবল ৫·০০

চিত্ররবি

ভারতীয় ফুটবল ৩·০০
ব্রাবোর্ন থেকেই ইডেনে ২·০০
ভারত কন্যা কেরালা ৬·০০

সুনীল চট্টোপাধ্যায়

ভারত কন্যা কেরলা ৬·০০

কৃষাণু বন্দ্যোপাধ্যায়

বরণীয় মানুষের স্মরণীয় প্রেম ১০·০০

নীললোহিত

দেখা না দেখা ৬·০০

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

সুরা নারী নগরী ৭·০০

নিগূঢ়ানন্দ

বাবু আর বিবি ১০·৫০
[illegible] নগরী ১২·০০

রণজিৎকুমার সেন

মহাকালের স্বাক্ষর ৮·০০

রমাপতি বসু

ভালবাসার রীতিনীতি ৮·০০
উর্বশীর নরক ৬·০০

তান্ত্রিকাচার্য ভৈরবানন্দ

মিলনতীর্থ সীতাকুণ্ড ৯·০০

তরুণ দেও

ভারতের সাধিকা ৮·০০

ফণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

অশান্ত মধুকর ৭·০০

জ্ঞানতীর্থ
১, বিধান সরণী, কলিকাতা-১২

১০ম বর্ষ
৩য় খণ্ড

অমৃত

৩৮শ সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday, 8th January, 1971 শুক্রবার, ২৩শে পৌষ, ১৩৭৭ 40 Paise

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা		বিষয়	লেখক
৭৮৮	চিঠিপত্র		
৭৯০	সাদাচোখে		—শ্রীসমদর্শী
৭৯৩	দেশেবিদেশে		—শ্রীপুণ্ডরীক
৭৯৫	সম্পাদকীয়		
৭৯৬	বাকি, আমার অনেক বাকি	(কবিতা)	—শ্রীঅমরেন্দ্র চক্রবর্তী
৭৯৬	বৃষ্টি মাথায় করে নিয়ে আসি	(কবিতা)	—শ্রীসত্য গুহ
৭৯৬	দেখা দেবে	(কবিতা)	—শ্রীনিশিনাথ সেন
৭৯৭	এই আমাদের দেশ		—শ্রীনন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
৭৯৯	সীমানা পেরিয়ে	(গল্প)	—শ্রীঅতীন বিশ্বাস
৮০৫	সুখের মেলা		—আবদুল জব্বার
৮০৯	তুলসীচরিত	(উপন্যাস)	—শ্রীনন্দীমাধব চৌধুরী
৮১৩	সাহিত্য ও সংস্কৃতি		—শ্রীঅভয়ঙ্কর
৮১৮	বইকুণ্ঠের খাতা		—শ্রীগ্রন্থদর্শী
৮২১	নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে	(উপন্যাস)	—শ্রীঅতীন বন্দ্যোপাধ্যায়
৮২৮	নিকটেই আছে		—শ্রীসন্ধিৎসু
৮৩০	উত্তরবঙ্গের লোকসাহিত্যের উপাদান		—শ্রীস্মরজিৎ চক্রবর্তী
৮৩৫	তোমাকে	(উপন্যাস)	—শ্রীনিমাই ভট্টাচার্য
৮৩৮	মনের কথা		—শ্রীমনোবিদ্
৮৪১	বিজ্ঞানের কথা		—শ্রীঅয়স্কান্ত
৮৪৩	পিঞ্জর	(বড় গল্প)	—শ্রীসুভব সিংহ
৮৪৭	প্রদর্শনী পরিক্রমা		—শ্রীচিত্ররসিক
৮৪৯	অঙ্গনা		—শ্রীপ্রমীলা
৮৫২	গোয়েন্দা কবি পরাশর		—শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র রচিত —শ্রীশৈল চক্রবর্তী চিত্রিত
৮৫৩	জলসা		—শ্রীচিত্রাঙ্গদা
৮৫৫	প্রেক্ষাগৃহ		—শ্রীনান্দীকর
৮৬১	ক্রিকেটে একটি বছর		—শ্রীশঙ্করবিজয় মিত্র
৮৬৩	খেলার কথা		—শ্রীদর্শক

প্রচ্ছদ : শ্রীগৌতম কররায়

VANGUARD
JHAMAPUKUR HOSIERY-CAL-9

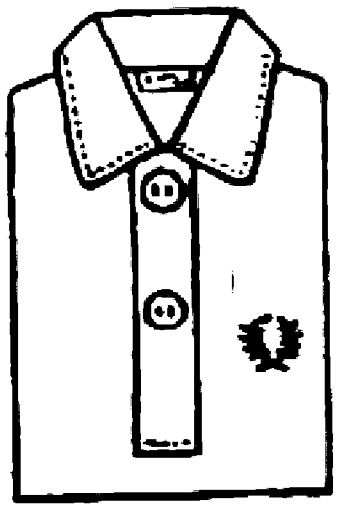

★ COOLTY & TURKISH
★ WHITE & COLOURED
★ ALL SIZES AVAILABLE

JHAMAPUKUR HOSIERY FACTORY (PRIVATE) LTD
22/A, Kalidas Singha Lane, Calcutta-9. 35-4832

চিঠিপত্র

'অমৃতের স্বাদ-বিস্বাদ'

গত ১৮ই ডিসেম্বর তারিখের অমৃতে চিঠিপত্র বিভাগে প্রকাশিত 'অমৃতের স্বাদ-বিস্বাদ' শীর্ষক পত্রটি আমাকে অবাক করেছে। এ-বিষয় আমার কিছু বলার আছে। আশা করি, আমার মতামত প্রকাশের স্থান আপনার পত্রিকায় অসঙ্কুলান হবে না।

উপরোক্ত চিঠিটি পড়ে আমার প্রথমেই মনে হয়েছে, 'অমৃত' যে একটি সাহিত্যপত্র এবং সাহিত্য সংক্রান্ত সংবাদ সরবরাহ-পত্র নয়, সে-কথা ঐ চিঠির লেখক শ্রীসত্যানন্দ গুহ মহাশয় জানেন না। সত্যবাবু সম্ভবত এটাও জানেন না যে, গল্প, উপন্যাস (কোনও বিশেষ গল্প বা উপন্যাস নয়—সাধারণভাবে, যে-কোনও গল্প-উপন্যাস) ও নাট্য-চলচ্চিত্র-সংবাদ জাতীয় আরও যেসব সাহিত্যকর্মকে (?) তিনি বিস্বাদের আওতার বাইরে রেখেছেন—সে সমস্ত অমৃতস্বাদ বস্তু যে-কোনও সিনেমা-পত্রিকাতেই পাওয়া যায়।

অমৃত কর্তৃপক্ষকে আমি ধন্যবাদ জানাই বরং সত্যবাবু উল্লিখিত ঐ বিস্বাদ লেখাগুলির জন্যেই। যদি আদৌ অমৃত পত্রিকার কোনও মৌলিকত্ব এবং নতুনত্ব থাকে, তবে তা আছে নিঃসন্দেহেই ঐ লেখাগুলির মধ্যে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সত্যবাবুর 'দুর্বল' লেখক মনোবিদের লেখাগুলিই আমার আমার সবিশেষ ভাল লাগে। আমরা, সাধারণ মানুষেরা, কৃত্রিম উপগ্রহ-প্রান্ত থেকে শুরু করে মানুষের মহাজাগতিক কার্যকলাপ, পৃথিবীর এ-প্রান্ত থেকে মহাজগতের ও-প্রান্তের আধুনিকতম খবরটি পর্যন্ত রাখি—অথচ নিজেদেরই অন্তস্তল সম্পর্কে আমাদের নিদারুণ অজ্ঞতা। এমনকি যাঁরা মানুষের আশা-নিরাশা ভাবনাচিন্তাকে ব্যক্ত করার ব্রত নিয়েছেন, সেই সাহিত্যিকরাও যখন বিভিন্ন সমস্যার কার্যকারণ বিশ্লেষণের প্রয়াস পান, আমরা দেখি পুরনো কালের সেই ভাববাদী নির্জ্ঞান তত্ত্বের গতানুগতিক। প্রগতির প্রবক্তা অনেক বস্তুবাদী লেখকের লেখার মধ্যেও আজ দেখা যায় ভাববাদী বিশ্লেষণ যা চিন্তাশীল পাঠককে করে বিহ্বল, বিভ্রান্ত এবং বক্তব্য ও উপস্থাপনার এই অন্তর্নিহিত বৈষম্য সাধারণ পাঠকের বিশ্বাসের ভিত্তিকে করে ক্রমশঃ শিথিল। তাই, আমি মনে করি, আজকের দিনে 'মনের কথা' ধরনের লেখার সামাজিক মূল্য অসীম এবং প্রয়োজনও একান্ত। এ-ধরনের লেখা পাঠককে যেন সামাজিক অর্থনৈতিক এবং আন্তর্মানবিক সম্পর্কের বস্তুবাদী বিশ্লেষণী দৃষ্টি—বহুবিধ সমস্যার মূল্য সন্ধানে যা একান্তই অপরিহার্য।

প্রসঙ্গত আর একটা কথা সত্যবাবুকে জানিয়ে রাখা বোধহয় ভাল যে, প্রবন্ধ—বিশেষত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ কখনই প্রবন্ধকারের সাহিত্যনৈপুণ্য, ভাষাজ্ঞান ও রচনাকুশলতা দেখানোর স্থান নয়। অমৃতের মত সর্বজনপাঠ্য সাধারণ সাহিত্য পত্রিকার দাবী অনুযায়ী এক্ষেত্রে বরং তা হওয়া উচিত সহজপাঠ্য ও সহজবোধ্য। সেদিক দিয়ে মনোবিদের এই জাতীয় দুরূহ মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্ব গল্পসুলভ সাবলীলতায় ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা সত্যিই প্রশংসনীয়। সত্যবাবু বোধহয় এই গল্পসুলভ তাত্ত্বিক লেখাগুলির মধ্যে কয়টি ছোটগল্পের আস্বাদ চেয়েছিলেন, সেক্ষেত্রে অবশ্য মনোবিদের লেখা তাঁর 'দুর্বল' (?) লাগা অনেকাংশেই স্বাভাবিক।

রাগিণী রায়
কলিকাতা-৪

(২)

গত ২রা পৌষ সংখ্যায় অমৃত পত্রিকার 'চিঠিপত্রে' প্রকাশিত শ্রীসত্যানন্দ গুহ মহাশয়ের লিখিত 'অমৃতের স্বাদ-বিস্বাদ' শীর্ষক চিঠি পড়ে পাঠক হিসেবে কিছু বক্তব্য রাখতে উৎসাহিত বোধ করলাম।

অমৃত পত্রিকায় সাহিত্য-বিষয়ক আলোচনা, গল্প, উপন্যাস ও বিভিন্ন বিষয়ক রচনাদি 'অমৃত'কে বিভিন্ন রসের স্বাদে সমৃদ্ধ করেছে। বিশেষ করে 'নিকটেই আছে' 'দুখের মেলা' এবং 'মনের কথা' নিবন্ধাদি আমাকে অমৃতের নিয়মিত পাঠক করে তুলেছে। শ্রীগুহ মহাশয় লিখেছেন, 'এই আমাদের দেশ', 'নিকটেই আছে', 'মনের কথা' বিভাগগুলি বিস্বাদ লাগে—"বিষয়বস্তু যাই হোক বড় দুর্বলভাবে উপস্থাপিত করা হয়।" অবশ্য এটা তাঁর ব্যক্তিগত ধ্যানধারণার প্রকাশ। বিষয়গতভাবে বিচার করলে এগুলি অনন্য। বিশেষ করে ধারাবাহিক 'মনের কথা' নিবন্ধটি মনোবিজ্ঞানের বস্তুবাদী অনেক মূল্যবান জটিল তত্ত্ব ও তথ্য কেস-হিস্ট্রির মাধ্যমে সরল ভাষায় বিশ্লেষিত হয়ে পরিবেশিত হচ্ছে। তাতে সাধারণ পাঠকও এই স্নায়ুবিরোধের সম্বন্ধে বিভিন্ন রোগীর তথা মানুষের মানসিকতা ও তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা এ বিষয়ে অবহিত হতে সাহায্য করছে। সম্পাদক মহাশয়কে এর জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।—'অমৃত' স্ব-নামেই সার্থক হয়ে উঠেছে।

সুনীল বিশ্বাস
কলিকাতা-৩৪

বিহারীলালের সারদামঙ্গল কাব্যের নামকরণ প্রসঙ্গে

বিহারীলালের 'সারদামঙ্গল' কাব্যের নামকরণ শিরোনামায় গত ২৫শে অগ্রহায়ণের 'অমৃতের চিঠিপত্র' স্তম্ভে কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিঠিটি পড়লাম।

লেখক যে কবি বিহারীলালের 'সারদামঙ্গলের' নামকরণ তথা কাব্যটির সামগ্রিক মূল্যালোচনা করার চেষ্টা করেছেন তা সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ। কাব্যটির সমালোচনামূলক আলোচনা করতে যাওয়া আমার পক্ষে নিতান্ত দুঃসাহিকতার পরিচায়ক হবে হয়তো। শুধু কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিঠির বক্তব্যের আলোকে দু'-একটা কথা বলার ইচ্ছাটাকে রোধ করতে পারছি না। 'সারদামঙ্গল' কেন গীতিকাব্য সে প্রসঙ্গে লেখক ডঃ সুকুমার সেন মহাশয়ের বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন। কাব্যটির উপাস্যদেবী লোক-উপাস্য দেবী নয়—কাব্য সরস্বতী, ডঃ সেন মহাশয়ের এই অভিমত সম্পর্কে কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় যে প্রশ্ন রেখেছেন, তাও নতুন করে আলোচনার অপেক্ষা রাখে।

সারদা সম্বোধনের বিশ্লেষণগুলির প্রতি লেখক যে আলোকপাত করেছেন এবং কবি বিহারীলালের সঙ্গে তাঁর কাব্যের দেবীর সম্পর্কের যে মূল্যালোচনা করেছেন, তা-ও বিবেচ্য। যদিও এই সম্পর্ক প্রসঙ্গে আরো অনেক ধরনের ব্যাখ্যা থাকতে পারে, তবু কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যাখ্যাটি নিঃসন্দেহে মনোজ্ঞ। কবি বিহারীলালের সমসাময়িককালে মঙ্গলকাব্যের পর্যায়ে কোন কাব্যের উদ্ভব সম্ভব ছিল না এ-কথা সত্য। কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যটিকে আধুনিক খণ্ড-গীতি-কবিতার পর্যায়ে ফেলেছেন। তবে কাব্যটি আত্মসম্পূর্ণতায় পূর্ণ, লেখকের এ-কথা কতদূর সত্য তা ভেবে দেখা দরকার।

'অমৃতের' চিঠিপত্র স্তম্ভ একটি নিয়মিত বিচার। আমি ব্যক্তিগতভাবে 'অমৃতের' গুণগ্রাহী পাঠক হিসেবে এইটুকু

চিঠিপত্র

বলতে পারি যে, 'অমৃতের' চিঠিপত্র স্তম্ভ কত অজানা রহস্যময় জ্ঞানমঞ্জুষার গোপনদ্বার উদ্ঘাটনে সব সময়েই অগ্রণী। এর জন্যে আমি 'অমৃতের' সম্পাদনা বিভাগকে জানাই আমার আন্তরিক অভিনন্দন।

আশিসকুমার রায়,
শিবমন্দির, মাটিগাড়া,
দার্জিলিং।

মফঃস্বলের লিটল ম্যাগাজিন

গ্রন্থদর্শী তাঁর বইকুণ্ঠের খাতায় 'মফঃস্বলের লিটল ম্যাগাজিন' শীর্ষক প্রবন্ধটি লিখেছেন অমৃতের ২৬শ সংখ্যায়; লেখাটি বেশ ভাল হয়েছে। তবে তিনি ১০টি বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ কালে একটা কথা লেখেন নি। আমি সেটা জানাতে চাই।

মফঃস্বলে এবং কলকাতায় আনে পাশে কিছু এমন সম্পাদক আছেন যাঁরা খবরের কাগজের মাধ্যমে লেখা চান। কোন নবীন লেখক হয়ত এই বিজ্ঞাপন দেখে লেখা পাঠান। তার জবাবে তাঁকে জানান হয় যে তাঁর লেখা মনোনীত হয়েছে, তবে তাঁদের সাহিত্য চক্রের সভ্য হতে হবে। সঙ্গে নিয়মাবলীও আসে। ২২ টাকা বা ২৫ টাকা পাঠালে লেখা ছাপা হবে লেখকের ফটোসহ আসন্ন শারদীয় সংখ্যায়। ফটো পাঠাতে অনুরোধ করা হয়। এইরকম প্রতিশ্রুতির উপরে আস্থা রেখে আমার এক বন্ধু এক সাহিত্য চক্রের শারদীয় সংখ্যায় লেখা ও টাকা পাঠান। তবে কাগজ তিনি আজও পাননি। আমি এর আগে এরকম সাহিত্য চক্রের কথা আরও শুনেছি। এঁরা বেশী ভাগই প্রতারক হন। বলা বাহুল্য লিটল ম্যাগাজিনের বিরুদ্ধে আমার বলা উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু এরকম প্রতারকের ফাঁদে কোন পাঠক ভবিষ্যতে যাতে না পড়েন তাই আমি আপনাদের বহুল প্রচারিত সাপ্তাহিকের মাধ্যমে এটা প্রকাশ করতে চাই।

শৈলজা বাগচী
রাউরকেলা-৩

(২)

কার্তিকের ২০ তারিখের 'অমৃতে' 'মফঃস্বলের লিটল ম্যাগাজিন' আলোচনাটি পড়েছিলাম। পড়তে পড়তে মনে হয়েছিল কি দুর্ভাগ্য মফঃস্বলের কবি, সাহিত্যিকদের। লেখাটি পড়ে আমার মনে তাঁদের সম্পর্কে যে বেদনাবোধ এবং প্রশ্নের উদয় হয়েছিল, তারই সহজ সমাধান করে দিলেন মফঃস্বলের স্বল্পখ্যাত তরুণ সাহিত্যিক মনসারঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ৪ অগ্রহায়ণের 'অমৃতে' 'চিঠিপত্র' বিভাগে একটি বলিষ্ঠ চিঠি লিখে। তারপর মনসাবাবুকে, গ্রন্থদর্শীমশাইকে এবং অমৃত সম্পাদকমশাইকে অভিনন্দন জানিয়ে একই প্রসঙ্গে পুনরায় আরেকটি সুন্দর চিঠি লিখেছেন অশোক সাহা। সেই একই আবেগ, সেই একই আর্তি।

এবার বলি, শ্রীদীনেশরঞ্জন দাশ 'কল্লোল' পত্রিকা বের করেছিলেন বলে আজ বাংলা-সাহিত্যের অনেক প্রবীণ লেখকদের নিয়ে আমরা গর্ববোধ করি। এবং বাংলা-সাহিত্যের সেই কালকে 'কল্লোল যুগের' কাল বলে অভিহিত করি। আমরাও চাই 'অমৃত' পত্রিকা মনসাবাবুর মত দুরান্তের অনেক কৃতী সাহিত্যিকদের সহজ আত্মপ্রকাশের সুযোগ দিয়ে 'অমৃতযুগ' সৃষ্টি করুক। এছাড়াও সম্পাদকমশাইয়ের কাছে আমার একটা প্রস্তাব আছে। 'অমৃতে' আমরা বহু বিভাগীয় বৈচিত্র্য দেখতে পাই। সেই সঙ্গে সম্পাদকমশাই যদি 'মফঃস্বলের পাতা' নাম দিয়ে শুধুমাত্র মফঃস্বলের লেখকদের জন্য দু-তিনটি পাতা ছেড়ে দেন, তাহলে মন্দ হয় না। আমার মনে হয় এতে নিতান্তন সাহিত্যিককে পাঠকমণ্ডলীর কাছে পরিচিত করে দেওয়া হবে। কে জানে ভবিষ্যতে হয়তো মফঃস্বলের ঐ তিনটি পাতা থেকেই আমরা অনেক কালজয়ী লেখকের মুখ দেখতে পাব, আর সেই-জন্য বাংলা-সাহিত্যের পরবর্তী ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে কল্লোলোত্তর যুগে অমৃত পত্রিকা।

লীলা রায়,
দুমকা রোড,
সাঁওতাল পরগণা

বইকুণ্ঠের খাতা

অমৃত পত্রিকার গত সংখ্যায় লেখা পৌষ বইকুণ্ঠের খাতা পড়ে আনন্দ পেলাম। ভূমিকায় গ্রন্থদর্শী যে-মন্তব্য করেছেন—"লেখকের নিজস্ব বক্তব্য বা দৃষ্টিভঙ্গি না থাকলে একাধিক জীবনীগ্রন্থ লেখার সার্থকতা কোথায়?" আমিও তাঁর সঙ্গে একমত। কিন্তু তারপরেই তিনি লিখেছেন —"উপলক্ষ্য সন্তোষকুমার অধিকারীর লেখা বিদ্যাসাগর নামে একখানি জীবনীগ্রন্থ।" সন্তোষবাবুর লেখা বিদ্যাসাগর গ্রন্থটি আমিও পড়েছি বলেই বলতে পারছি যে, প্রচলিত জীবনীগ্রন্থ বলতে যা বোঝায় আলোচ্য গ্রন্থটি তা নয়। বইটিতে সন্তোষবাবু বিদ্যাসাগরের জীবনের ঘটনাগুলিকে বিশ্লেষণ করে তাঁর চরিত্র ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সঠিক মূল্যায়ন করতে চেয়েছেন। সন্তোষবাবুর লেখার বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি বিদ্যাসাগরের চারিত্রশক্তির উৎস সন্ধান করেছেন এবং বিদ্যাসাগর যে আধুনিক চিন্তাধারার আলোকেও একই রকম দীপ্ত সেই বিষয়টিই তুলে ধরতে চেয়েছেন। বিদ্যাসাগর জীবনের বহিরঙ্গে যেমন উজ্জ্বল মহৎ, অন্তরঙ্গে তেমনই করুণ নিঃসঙ্গতা। তাঁর মৃত্যুর আশি বছর পরে সেই নিঃসঙ্গ জীবনের আর্তিকে কে ফুটিয়ে তুলতে পারে? হয়তো পারা যায়, কিন্তু সে হবে তাঁর জীবনের তথ্যভিত্তিক রূপায়ণ।

তবুও সন্তোষবাবুর গ্রন্থে বিদ্যাসাগরের নিঃসঙ্গ হৃদয়ের পটভূমিকা আঁকা রয়েছে। যে মানবপ্রেমী ব্যক্তি-মানুষে বিশ্বাস হারিয়েছেন, পারিবারিক জীবনে যিনি বিপর্যস্ত, একমাত্র পুত্রের সঙ্গে যাঁর সম্পর্ক ছিন্ন, দাম্পত্যজীবন যাঁর অসুখী, তাঁর কর্মজীবন এত বীর্যবান ও অনমা হল কেমন করে তা ভাবা যায় না। সন্তোষকুমার অধিকারী তাঁর স্বল্পপরিসর গ্রন্থে সেই চেষ্টাই কি করেননি?

গোরা মিত্র
কলিকাতা-৩

সুখের মেলা

'অমৃত' পত্রিকার আমি নিয়মিত পাঠক। আমাদের অন্যান্যর সুখের মেলা পড়ে বেশ ভাল লাগছে। পল্লী বাংলার সমাজচিত্র এক কথায় অপূর্ব। তবে একটা কথা, লেখক সাহেবের লেখায় যৌনরসের পরিবেশনে কিছুটা বাড়াবাড়ি ঘটছে। এতোটা না হলেও চলে। পাঠককে আরও সম্মোহিত করার জন্য হয়তো এই টেকনিক করা হচ্ছে।

মধু বসু
ভোপাল, ২৪-পরগণা।

শাদা চোখে

নির্বাচন হবে—এই ধারণাটা সুস্পষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই 'মিত্রতা বা সমঝোতার' প্রশ্ন নিয়ে বিভিন্ন দলের মধ্যে আবার মন দেওয়া-নেওয়ার পালা শুরু হয়ে গেছে। এই সংহতিকরণের প্রচেষ্টায় অন্তবাম ও বাংলা কংগ্রেসের বৈঠক সত্যিই তাৎপর্যপূর্ণ। প্রায় পাঁচ মাসের নীরবতা ভঙ্গ করে নববর্ষের দিনে মিলনের সূত্র খুঁজবার জন্য এই বৈঠক বসে। সূচনা খুব শুভ না হলেও আশাবাদী কিছু অন্তবাম শরিক হাল ছেড়ে দিতে রাজী নন। বাংলা কংগ্রেসকে অন্তবামের সঙ্গে আনতেই হবে—এই মনোভাব নিয়ে তাঁরা অগ্রসর হয়েছেন। আর এই আগ্রহ থেকেই জন্মলাভ করেছে নতুন সূত্র 'সীমিত সমঝোতা'।

অন্তবামের নেতাদের ধারণা ছিল, যদি তাঁরা বাংলা কংগ্রেস নেতা শ্রীঅজয় মুখার্জিকে বোঝাতে পারেন যে, অন্তবাম ও বাংলা কংগ্রেস একত্র হয়ে নির্বাচনী লড়াইয়ে অবতীর্ণ হলে জয়মালা তাঁরা পাবেনই—তবে বাংলা কংগ্রেস নিজেদের প্রস্তাব পুনরায় বিবেচনা করে অন্তবামের সঙ্গে কাঁধ মেলাতে পারেন। কিন্তু এই সভায় শ্রীমুখার্জি নাকি বলেছেন, তাঁর দল বাংলা কংগ্রেস বাম কম্যুনিস্ট ও আদি কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তীব্রভাবে লড়বেন। আর এই যুদ্ধে সহকারী হিসেবে তাঁরা শাসক কংগ্রেসকে বেছে নিয়েছেন। অতএব, তাঁদের বন্ধু শাসক কংগ্রেসকে অন্তবাম যদি শত্রু হিসাবে পরিগণিত করে, তবে 'মিত্রতা' কি করে সম্ভব? কথাটা খাঁটি ও বাস্তব। তবে, শ্রীমুখার্জি নাকি অন্তবামের প্রতিনিধিদের একেবারে বিমুখ করেননি। তিনি বলেছেন যে, তাঁর দল অন্য কারও সঙ্গে যদি 'মিত্রতা' বা 'সমঝোতা' করে, তবে অন্তবামের আপত্তির কি থাকতে পারে। অন্তবামের সঙ্গে বাংলা কংগ্রেসের 'সীমিত সমঝোতা'ও ত হতে পারে। এই সীমিত সমঝোতা'র কথা বক্তব্যের মধ্যে পরিষ্কার হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই অন্তবামের কিছু শরিক নাকি কথার জের ধরে ঐ প্রসঙ্গ নিয়ে একটি সুনির্দিষ্ট আলোচনার অবতারণা করবার প্রয়াস পান। অমনি অন্তবামের অন্য কয়েকটি শরিক বাধা দিয়ে বসেন। বাধাটা নীতিগত। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, অন্তবামকে একটি রাজনৈতিক ফ্রণ্টে রূপান্তরিত করার উদ্দেশ্যে যে বক্তব্য রাখা হয়েছে, তাতে বলা আছে যে, অন্তবামের কোন শরিক বা অন্তবাম শাসক কংগ্রেসের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ যোগাযোগ বা সমঝোতা করতে পারবে না। কাজেই 'সীমিত সমঝোতার নীতি মেনে যদি বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে আঁতাত গড়ার কথা ওঠে, তবে অন্তবাম নীতিচ্যুতই হয়। একথা শোনার পর নাকি অন্তবামের অন্যান্য শরিকরাও আলোচনা থেকে বিরত থাকেন এবং অন্তবামের সভায় এই বিষয়ে মতামত বিনিময়ের পর কিছু একটা করা যেতে পারে বলে মন্তব্য করেন।

বস্তুতপক্ষে, অন্তবাম যে রাজনৈতিক বক্তব্য খসড়া করেছিল, তা এখনও খসড়া স্তরেই রয়ে গেছে। হাজার চেষ্টা করেও অদ্যাবধি কোন শরিক তা গ্রহণ করেছেন কিনা তা জানা যায়নি। প্রত্যেকেই বাস্তবতার অজুহাত তুলে প্রশ্নটা সরাসরি এড়িয়ে গেছেন। কাজেই চূড়ান্তভাবে বক্তব্যটা গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত এ-কথা বলা চলে যে, এ অবধি অন্তবামের কোন পরিষ্কার নীতি নেই। শুধু ভাসা ভাসাভাবে বাম কম্যুনিস্ট, আদি ও শাসক কংগ্রেস বিরোধিতার কথাই বলা হচ্ছে মাত্র। নীতিগত বক্তব্য অন্তবামের সভায় আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত কোন দলকেই দোষারোপ করা সম্ভব নয়। মনে হচ্ছে কৌশল হিসাবে অন্তবাম ঐ খসড়া নীতিগত বক্তব্য আপাততঃ গ্রহণ করবে না। অন্তবামের শরিকদের যে বিভিন্ন চিন্তাধারা আছে, সেই অনুযায়ী 'মিত্রতা' গড়ার আকাঙ্ক্ষা তাঁরা মনের গহন কোণে প্রশ্রয় দিয়ে আসছেন। সেটা বাস্তবে রূপায়িত করতে গেলে নৈতিক বাধা-বাধকতার মধ্যে তখন যাওয়া আদৌ সম্ভব নয়। খবর প্রকাশ যে, 'সীমিত সমঝোতার' প্রশ্ন যখন বাংলা কংগ্রেস অন্তবামের সম্মিলিত সভায় উঠেছিল তখন যাঁরা বিরোধিতা করেছিলেন, তাঁদের অন্যান্য অংশীদাররা অন্তবামের যে কোন স্বীকৃত বক্তব্য অদ্যাবধি নেই বা গৃহীত হয়নি, এ-কথা নাকি জোরের সঙ্গে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন।

বাংলা কংগ্রেস ও অন্তবামের মিলিত সভার অব্যবহিত পরেই রাজ্য শাসক কংগ্রেস সভাপতি শ্রীবিজয়সিং নাহার তাঁর দলের কার্যকরী সমিতির প্রস্তাব যখন সাংবাদিকদের কাছে ব্যাখ্যা করছিলেন, তখন প্রসঙ্গক্রমে বলেন, 'বাম কম্যুনিস্টদের রুখবার জন্য ব্যবস্থা করা হচ্ছে।' উক্তিটা বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ, একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। শ্রীনাহার রাজ্য কংগ্রেসের অপর নেতা শ্রীসিদ্ধার্থশংকর রায়কেও অন্তবাম-বাংলা কংগ্রেসের সভার বিবরণী টেলিফোন করে অবহিত করেন। শ্রীরায় পশ্চিমবাংলার সর্বশেষ হালচালের খবর নিয়ে নয়াদিল্লী গিয়ে ইন্দিরাজীর সঙ্গে শলাপরামর্শ করবেন। শ্রীনাহারের আশাব্যঞ্জক উক্তি থেকে মনে হয়, 'সীমিত সমঝোতা'র ফরমূলা কার্যকর করা সম্ভবপর হবে। অন্ততপক্ষে বাংলা কংগ্রেস নেতারা এই সত্য উপলব্ধি করতে পেরেছেন। এবং এই ধারণা না হওয়ার মত কোন কারণও নেই। কেননা, বাংলা কংগ্রেস সম্পাদক শ্রীসুশীল ধাড়া—যিনি অহিংসার প্রশ্নে অটল, অচল, তিনি নাকি অন্তবামের ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হয়েছেন। স্মরণ করা যেতে পারে যে, শ্রীধাড়া ইতিপূর্বে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন, যে-সমস্ত দল হিংসাশ্রয়ী পন্থায় বিশ্বাস করেন, তাঁদের সঙ্গে 'মিত্রতা' ত দূরের কথা 'সমঝোতা'ও হবে না। নাম না করেও শ্রীধাড়া এতদিন বোঝাতে চেয়েছেন যে, অন্তবামের মধ্যে দক্ষিণপন্থী কম্যুনিস্ট ও এস ইউ সি হিংসাশ্রয়ী। আর সব বর্ণের কম্যুনিস্টরা একই বস্তু। তাঁদের মধ্যে মূলতঃ কোন পার্থক্য নেই। তারপর হঠাৎ অন্তবামের হিংসা-সম্পর্কিত বক্তব্য রাখার পর এখন তখন তাঁর-[illegible] পালটে গেছে

দেখা যাচ্ছে, তখন বুঝতেই হবে কিছু একটা ঘটেছে। এর সঙ্গে শ্রীনাহারের সাংবাদিক সম্মেলনের বক্তব্য মিলিয়ে দেখলে তথ্যটা আরও পরিষ্কার হয়ে যাবে। শ্রীনাহারও সাংবাদিকদের বলেছেন যে, তিনিও এখন বাম ও ডান কম্যুনিস্টদের মধ্যে পার্থক্য দেখতে পাচ্ছেন। আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে শ্রীনাহার বলেছেন যে, ডান কম্যুনিস্টরা তাঁদের প্রোগ্রামও অনেকখানি সমর্থন করছেন। নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, এই উক্তির ফল সুদূরপ্রসারী। কাজেই সংহতিকরণের প্রশ্নে নকশালরা ধীরে ধীরে কোনদিকে যাচ্ছে তা কিছুটা আঁচ করা কঠিন নয়।

আবার অন্যদিক থেকে বিচার করলেও, রাজনীতির প্রতিক্রিয়াটা অবশ্য কিছু সরল হয়ে দেখা দেয়। ইতিমধ্যে দেখা যাচ্ছে আদি কংগ্রেসের কর্মীরাও প্রচারকালে কিছু কিছু বক্তব্য রাখছেন। তাঁরা বলছেন, বাম কম্যুনিস্টরাই ত একমাত্র সংগঠিত দল। অন্যরা তেমন কিছু নয়। আদি কংগ্রেসের কর্মীদের বাম কম্যুনিস্টদের প্রতি এই প্রেম-ভাব স্পষ্টই নির্দেশ করে যে, আদি কংগ্রেসকে গণতান্ত্রিক ফ্রন্টে নেওয়ার জন্য বাংলা কংগ্রেস নেতা শ্রীঅজয় মুখার্জি শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের সঙ্গে যে কথাবার্তা চালাচ্ছিলেন, তা ব্যর্থ হয়ে গেছে। এবং হতে বাধ্য। কেননা বাংলা কংগ্রেস যে নির্বাচনী কৌশল স্থির করেছে, তাতে আদি কংগ্রেসকে প্রতিক্রিয়াশীল বলে সরা-

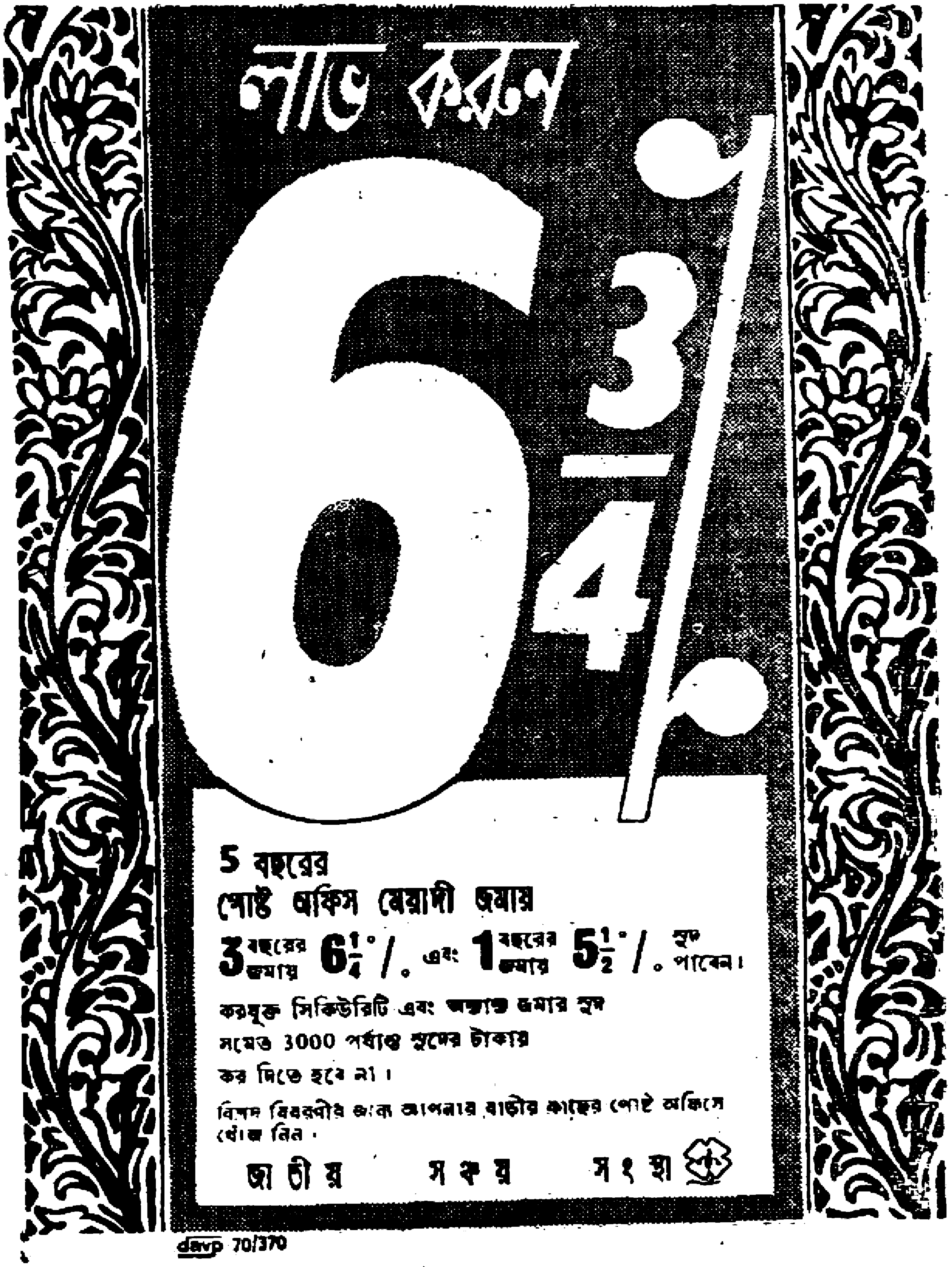

সরি আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় না করাতে পারে, তবে 'কংগ্রেস ভোট' দ্বিধাভক্ত হয়ে যাবে এবং শাসক কংগ্রেসের ভরাডুবি হতে বাধ্য। অতি গরমপন্থীদের বিকল্প হিসাবে এবং অতি প্রতিক্রিয়াশীলদের বিকল্প হিসাবে শাসক কংগ্রেস যে-ভূমিকা নিতে চাইছে তা বানচাল হয়ে যাবে যদি আদি কংগ্রেসের সঙ্গে কোন প্রকার সমঝোতা হয়। শাসক কংগ্রেসের এই যুক্তি বাংলা কংগ্রেসও মেনে নিয়েছে এবং সেজন্যই অন্টবামের সভায় শ্রীঅজয় মুখার্জি বাম কম্যুনিস্ট ও আদি কংগ্রেসকে প্রধান শত্রু হিসাবে ঘোষণা করেছেন বলে মনে হয়।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে পশ্চিমবাংলায়ও কি কেরালার অনুরূপ রাজনৈতিক কৌশল অবলম্বন করা হবে? কথাবার্তার ধরন দেখে মনে হয় ঘটনাটা সেদিকেই এগুচ্ছে। কেরলে যখন মিনিফ্রন্ট ও শাসক কংগ্রেসের মধ্যে সমঝোতা হয়েছিল, তখন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী পর্যন্ত বলেছিলেন যে, তাঁরা যেসব আসনে লড়াই করছেন, সেখানে যদি মিনিফ্রন্ট প্রার্থী না দাঁড় করান, তবে তিনি কি করতে পারেন। কেরালার ক্ষেত্রে এই সমঝোতার ব্যাপারে নেতৃত্ব দিতে হয়েছিল ডান কম্যুনিস্টদের। পশ্চিমবঙ্গে সেই ভূমিকা বাংলা কংগ্রেস পালন করার জন্য প্রয়াস পাচ্ছেন। এখানে বাংলা কংগ্রেস শাসক কংগ্রেস ও অন্টবামের সঙ্গে আসনভিত্তিক সমঝোতা করলে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই থাকবে না। মনে হয় তাই 'সীমিত সমঝোতার' প্রশ্নটাকে উদ্দেশ্যমূলকভাবেই তোলা হয়েছে। অন্টবামের মধ্যে এই নিয়ে মন-কষাকষি হতে শুরু হবে। ফলে কোন সমাধানে পৌঁছবার আগেই ঘাড়ের উপর নির্বাচন এসে যাবে। অতএব, নান্য পন্থাঃ—অয়নায় বিদ্যতে—অন্টবামের যে সমস্ত শরিক নীতিগতভাবে এরকম সমঝোতা চান না—তাঁরা যদি বুদ্ধিমান হন, তবে নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে বাঁচবার পন্থা আবিষ্কারের চেষ্টায় আছেন। নতুবা স্বখাত সলিলে ডুবতে যে হবে, এ-কথা তাঁরা একেবারে বোঝেন না এমন নয়।

শাসক কংগ্রেসের সঙ্গে অপ্রত্যক্ষ মিতালী হলেও ফরওয়ার্ড ব্লক নাকি দ্বিখণ্ডিত হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে সি পি এম-এর সঙ্গে হলেও অবস্থা একই দাঁড়াবে। তাই ফরওয়ার্ড ব্লকের তরফ থেকে মনে হয় অন্টবামের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সন্দিহান হয়েই আর এস পি-র সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করা হয়েছে। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে যে, আর এস পি বেশ কিছুদিন ধরেই কম্যুনিস্ট ও কংগ্রেসের বিকল্প হিসাবে একটি সমাজবাদী শিবির গঠনের কথা বলছেন। অন্টবামে ভাঙন হলে এরকম একটি শক্তির যে উদ্ভব হবে না একথা বলা যায় না। তবে বাম কম্যুনিস্ট পার্টির সম্পাদক শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত বলেছেন, ডান কম্যুনিস্ট, ফরওয়ার্ড ব্লক ও বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে কোনপ্রকার সমঝোতা করার অর্থই হচ্ছে পরোক্ষে ও প্রত্যক্ষভাবে শাসক কংগ্রেসকে মদৎ দেওয়া। শ্রীদাশগুপ্তের বক্তব্যের তাৎপর্য হচ্ছে, তিনি অন্টবামের কিছু শরিককে তাঁর সংযুক্ত ফ্রন্টে নিয়ে আসতে চান। কেননা, শ্রীদাশগুপ্ত হয়তো নিশ্চিত নন যে, তাঁদের সংস্থা এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে ক্ষমতা দখল করতে পারবে কিনা। তাই তিনি শক্তি বৃদ্ধির জন্য আরও কিছু দলকে কাছে আনতে চান। কিন্তু অন্টবামের মধ্যে কিছু নেতা আছেন যাঁরা এ-কৌশল বিলক্ষণ বোঝেন। তাই অন্টবামের প্রতি-সভায় আর কোন বক্তব্যের উপর বিশেষ জোর না দিয়ে বামপন্থী সংকীর্ণতার উপরই বেশী জোর দেওয়া হয় এবং বাম কম্যুনিস্টদের কার্যকলাপের উপর সার্চলাইট ফেলে শরিকদের তার ভয়াবহতা সম্পর্কে সজাগ রাখা হয়। যাহোক, ঘটনার গতি দেখে মনে হয়, 'সীমিত সমঝোতা'র এই নয়া ফরমূলা নিয়ে সংহতির জন্য জোর প্রচেষ্টা চলবে।

আরও একটি প্রশ্ন পরিষ্কার যে, অন্টবাম সমস্ত বিধানসভা ও লোকসভার আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন কিনা এ-কথা বলেননি। কে কত আসনে প্রার্থী দাঁড় করাবেন, তাই নিয়ে তালিকা তৈরী করছেন। তালিকা যখন অন্টবামের সভায় আসবে দেখা যাবে, অন্টবামের শরিকরা অপরের আসনের জন্য প্রার্থী দাঁড় করাতে ব্যস্ত, অথচ ২৮০টি আসনের মধ্যে নিদেনপক্ষে ১৫০ আসনের দাবীদারই নেই। নিজেদের মধ্যে যে বিরোধ সৃষ্টি হবে, সেই নিয়ে মীমাংসার জন্য কথাবার্তা চালাতে চালাতে দেখা যাবে, ১৫০ আসনের জন্য প্রার্থী খুঁজে পাওয়া গেল না। ঐখানেই থাকবে 'সীমিত সমঝোতা'র মিলনক্ষেত্র।

রাজনৈতিক পণ্ডিতরা বলছেন, এ-কৌশল অবলম্বনের মুখ্য কারণ হচ্ছে, সোজাসুজি 'সীমিত সমঝোতা'র প্রশ্ন গ্রহণ করা অন্টবামের পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়। যদি অন্টবাম সিরিয়াস হোত, তবে শরিকদের বিলুপ্ত বিধানসভায় যে আসন ছিল, তা প্রথমেই স্বীকার করে নিয়ে বাকি আসনে কোন দল কত প্রার্থী দিতে চান তা নিয়েই আলোচনা হত! এরকম ঘোরালো পন্থায় আবার গোড়া থেকে সুরু করতেন না। এতে কালক্ষেপণ ঘটছে মাত্র। আর এই কালক্ষেপণও একটা স্ট্র্যাটেজি। অন্টবামের মধ্যে যাঁরা বস্তুতপক্ষে নেতৃত্ব দিতে চেষ্টা করছেন তাঁরা যে রাজনীতির পাকা খেলোয়াড় একথা বুঝতে কষ্ট হয় না। অথচ অন্টবামের শরীকরা জানতেন যে নির্বাচন নিশ্চয়ই অনুষ্ঠিত হবে। ডান কম্যুনিস্ট নেতা ডাঃ রণেন সেন প্রায় দুমাস পূর্বে সহযাত্রীদের এই খবর দিয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও অন্টবাম দৃঢ়তার সঙ্গে তাঁদের অভীষ্টের দিকে অগ্রসর হন নি। এবং এই গড়িমসীর উদ্দেশ্য হচ্ছে, "মিত্রতার" জন্য সহযোগীদের মনোভাবকে নরম করে একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, অন্য কিছু নয়।

অন্যদিকে বাম কম্যুনিস্ট নিয়ন্ত্রিত বামপন্থী ফ্রন্ট নির্বাচনের জন্য সম্পূর্ণ তৈরী। আম জনতার এই ফ্রন্টের প্রতি কতটা অনুরাগ হবে জানি না, তবে একথা বলতে পারা যায় প্রথম থেকেই একটি পরিষ্কার বক্তব্য তাঁরা জনসাধারণের কাছে রেখে অনেকখানি এগিয়ে গেছেন। আবার বাংলা কংগ্রেস ও শাসক কংগ্রেস যে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করবেন একথা আর জনতার অজানা নয়। শুধু বিপাকে পড়েছে অন্টবাম। বিশেষ করে অন্টবামের মধ্যে সেই সমস্ত দলগুলি যাঁরা নীতিগতভাবে শাসক কংগ্রেসকে প্রথম ও প্রধান শত্রু বলে চিহ্নিত করে আসছেন। তাঁদের পক্ষে কোন প্রকারেই অপ্রত্যক্ষভাবেও শাসক কংগ্রেসের সঙ্গে আসনের প্রশ্নে সমঝোতা করা চলবে না। অথচ, অন্টবামের সঙ্গে একত্রে ভোট-যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার আশা নিয়ে তাঁরা এখনও প্রতীক্ষা করছেন। হঠাৎ আশাভঙ্গ যখন হবে, তখন তাঁরা দেখবেন যে শ্যামও গেল, কূলও রক্ষা করা গেল না। তখন নতুন সখা খোঁজ করতে গিয়ে দেখবেন নির্বাচনের জন্য ঠিক মত প্রার্থীও দাঁড় করাতে পারলেন না। ফলে, দুই শক্তির চাপে পড়ে রাজনৈতিক বিলুপ্তির আশঙ্কাই প্রবল হয়ে উঠবে। এ ধারণা ঐ সমস্ত দলের নেতাদের অবশ্য ইতিমধ্যেই কিছুটা ভাবিয়ে তুলেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও মনে হয় যেন তাঁরা কোন পথ খুঁজে পাচ্ছেন না, সব কিছু বুঝেও যেন তাঁরা ক্রমশই স্থবির হয়ে যাচ্ছেন।

যাহোক, আদি কংগ্রেস ও সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রন্ট নিয়ন্ত্রিত দলগুলি ছাড়া অন্যান্যদের জানুয়ারীর মধ্যভাগের মধ্যেই নির্বাচনী কৌশল স্থির করতে হবে। এবং এই সময়টা সত্যিই এই রাজ্যের পক্ষে ভয়ানক গুরুত্বপূর্ণ। এ সময়ের মধ্যে যে হরণ-পূরণের খেলা হবে তার উপরই পশ্চিমবঙ্গে অনিশ্চয়তার অবসান ঘটবে কিনা তার খানিকটা ইঙ্গিত পাওয়া যাবে। অবশ্য, সবই নির্ভর করে পশ্চিমবঙ্গের আম-জনতার উপর। কারণ তাঁরা একটানা কংগ্রেস শাসন প্রত্যক্ষ করেছেন ২০টি বছর। তার পর স্বল্পকাল স্থায়ী হলেও যুক্তফ্রন্টের দুদুবারের রাজত্বকালেও তাঁদের ভূমিকা প্রত্যক্ষ করেছেন। অতএব, এতগুলি নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করার পর তাঁরা যে অনেকখানি জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন—একথা বলাই বাহুল্য।

—সমদর্শী

দেশে বিদেশে

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী

সংঘাত, সংঘর্ষ ও অশান্তির মধ্য দিয়ে, শতাব্দীর সবচেয়ে লোকক্ষয়কর প্রাকৃতিক দুর্যোগের স্মৃতি বহন করে, পৃথিবীব্যাপী জনসংখ্যার আতঙ্কজনক স্ফীতি ও সভ্যতার উচ্ছিষ্ট বিষের দ্বারা সমগ্র জীবন-পরিপোষক পরিমণ্ডল আচ্ছন্ন হওয়ার আশঙ্কার ভিতর দিয়ে মানুষের ইতিহাসের সুখ-দুঃখের, ব্যর্থতা-সাফল্যের, জয়-পরাজয়ের আর একটি বছর পার হল। পার হয়ে গেল বিংশ শতাব্দীর অষ্টম দশকের প্রথম বছরটি। পিছনে পড়ে রইল অনেক অমীমাংসিত বিরোধের, পুঞ্জীভূত বিক্ষোভের স্মৃতি আর সামনে এক বিংশ শতাব্দীর অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। সেই ভবিষ্যতের [illegible] ফিরে তাকালে [illegible] কোন্ ঘটনাটি সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ, সবচেয়ে স্মরণীয় বলে মনে হবে? সত্তরেই মর্ত্যলোকের বিজ্ঞান দূরনিয়ন্ত্রিত যন্ত্রমানুষের সাহায্যে চাঁদের মাটিতে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিল, আবার এই সত্তরেই লক্ষ লক্ষ মানুষ অসহায়ভাবে প্রকৃতির রুদ্ররোষের সামনে আত্মসমর্পণ করেছিল। এই সত্তরেই পশ্চিম জার্মানীর দূরদর্শী নেতা উইলি ব্রান্ট যুদ্ধোত্তরকালের জার্মানীর পক্ষ থেকে সর্বপ্রথম দ্বিতীয় যুদ্ধে দেশের পরাজয়ের পরিণাম শিরোধার্য করে প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে নূতন সম্পর্ক স্থাপন করতে অগ্রসর হয়েছিলেন আবার এই সত্তরেই দ্বিতীয় যুদ্ধের পর, ও অংশত তার পরিণতিতে, জ্বলে ওঠা দুটি যুদ্ধের আগুন ধিকিধিকি জ্বলছিল—একটি ভিয়েতনামে আর একটি পশ্চিম এশিয়ায়। এই সত্তরেই হেলসিঙ্কিতে রাশিয়া ও আমেরিকা পারমাণবিক অস্ত্রসজ্জা হ্রাস সম্পর্কে আলোচনা আরম্ভ করেছিল আবার এই সত্তরেই সর্বপ্রথম ভারত মহাসাগরে ঠান্ডা যুদ্ধের আঁচ লেগেছিল ক্ষুদ্র একটি প্রবালদ্বীপে ইঙ্গ-মার্কিন নৌ যোগাযোগ ঘাঁটি স্থাপনের প্রস্তাবকে কেন্দ্র করে। ভবিষ্যতের দৃষ্টিতে কোন্ ঘটনাটি অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠবে কে জানে?

কিন্তু এবিষয়ে সন্দেহ নেই যে, নিজের দেশের দিকে তাকিয়ে ভারতবর্ষের মানুষ নিঃসংশয়ে বলবে, সত্তর মানে লোকসভা ভাঙার বছর। ভারতবর্ষের প্রজাতন্ত্রের প্রথম কুড়ি বছরের ইতিহাসে এর আগে আর কখনও যা হয়নি তাই হল বছরের প্রায় শেষে এসে। মেয়াদ ফুরোবার আগেই লোকসভা ভেঙে দেওয়া হল এবং অকালবোধন হল ভোটের দেবতার। এই সিদ্ধান্তের মধ্যে থেকে গেল একজন মানুষের বলিষ্ঠ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের নির্ভুল ছাপ। সে মানুষ হচ্ছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। ভারতের কোন মানুষকে যদি সত্তরের মানুষ হিসাবে চিহ্নিত করতে হয় তাহলে তিনি হচ্ছেন শ্রীমতী গান্ধী। [illegible] সত্তরের রাজনীতির [illegible] ঠিক [illegible] গান্ধীর [illegible] কথা [illegible] সিদ্ধান্তে।

রাষ্ট্রপতি ভি ভি গিরি

পূর্ববর্তী নির্বাচনের [illegible] থেকে ভারতবর্ষের রাজনীতিতে যে অনিশ্চয়তা [illegible] হয়েছে সেটা কাটাবার জন্যই শ্রীমতী গান্ধী লোকসভা ভেঙে দিয়ে নূতন করে জনগণের রায় নেওয়ার সিদ্ধান্ত করলেন। এই অনিশ্চয়তার রাজনীতি ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে প্রকাশ পেয়েছে গত বছরে। ঐ বছরই পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন ঘটেছিল ফ্রন্টের শরিকদের মধ্যে কলহবিবাদের ফলে। চরণ সিংহের মন্ত্রিসভা রাজ্যপাল কর্তৃক বরখাস্ত হওয়ার ফলে উত্তর প্রদেশে এবং বিধান সভায় ভোটে হেরে যাওয়ার ফলে বিহারে শাসক কংগ্রেস ক্ষমতাচ্যুত হয়েছে। এই দুই রাজ্যেই গঠিত হয়েছে সংযুক্ত বিধায়ক দল যার মুখ্য শরিক হচ্ছে বিরোধী কংগ্রেস, জনসংঘ, স্বতন্ত্র পার্টি ও এস-এস-পি। বিরোধী কংগ্রেসের নেতারা ভাবছেন যে মহাজোটের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে তারই নামান্তর এই সংযুক্ত বিধায়ক দল। যদিও আয়ু ফুরোবার আগে লোকসভা ভেঙে দেওয়ার ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীই ভারতবর্ষে প্রথম তাহলেও আইনসভা ভাঙার ব্যাপারে পথপ্রদর্শক হচ্ছেন কেরলের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅচ্যুত মেনন। সে ঘটনাও সত্তরের। অচ্যুত মেনন সেই রাজ্যে শাসক কংগ্রেসের সঙ্গে আসন ভাগাভাগি করে নির্বাচন করে ক্ষমতায় ফিরে এসেছেন। বছরের গোড়ার দিকে মনে হয়েছিল, কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে শাসক কংগ্রেসের মৈত্রীর এই চিত্রই হবে পরবর্তী নির্বাচনের সাধারণ চিত্র। বছর যখন গড়িয়ে যাচ্ছে তখন অবশ্য এবিষয়ে কতকটা সন্দেহ দেখা দিয়েছে। অন্তত, লোকসভার অন্ত-

বর্তী নির্বাচনের আগে এটা পরিষ্কার যে, শাসক কংগ্রেস সর্বভারতীয় ভিত্তিতে সি-পি-আই'এর সঙ্গে কোন নির্বাচনী মৈত্রী জোটা করছে না। অপরপক্ষে, বিরোধী কংগ্রেসের এখনো বাঁধাধোপ যদিও বলা হয়েছে যে, তারা আঞ্চলিক ভিত্তিতে অন্যান্য জাতীয় গণতান্ত্রিক দলের সঙ্গে আঁতাত গড়ে তুলবে, তাহলেও বিরোধী কংগ্রেসের নেতারা সর্বভারতীয় স্তরেই অন্য দলের নেতাদের সঙ্গে কথাবার্তা চালিয়ে যাচ্ছেন।

মন্ত্রিসভার বদল হয়েছে আসামেও—যদিও তার সঙ্গে রাজনৈতিক ডামাডোলের কোন সম্পর্ক নেই। অসুস্থতার দরুণ বিমলাপ্রসাদ চালিহা মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব ত্যাগ করেছেন। তাঁর জায়গায় নূতন মন্ত্রিসভা গঠন করেছেন মহেন্দ্রমোহন চৌধুরী।

আন্তঃরাজ্য সম্পর্কে যুক্ত দুটি পুরানো সমস্যার মীমাংসা গত বছর হয়েছে; কিন্তু আর একটি মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। আসামের পার্বত্য জেলাগুলি নিয়ে স্বয়ংশাসিত উপরাজ্য মেঘালয় স্থাপিত হয়েছে এই বছরের গোড়ার দিকে আর বছরের শেষে তাকে পূর্ণাঙ্গ রাজ্যের মর্যাদায় উন্নীত করার সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে। চণ্ডীগড় পাঞ্জাবকে দিয়ে এবং ফাজিল্কা হরিয়ানাকে দিয়ে চণ্ডীগড় সম্পর্কে পুরানো বিরোধের মীমাংসা করা গেছে। কিন্তু নূতন করে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে মহারাষ্ট্র-মহীশূর সীমানা বিরোধ। দীর্ঘকাল অমীমাংসিতভাবে ফেলে রেখেও দুই প্রতিবেশী রাজ্যের নেতাদের একটা স্বীকৃত সিদ্ধান্তে আসার বৃথা চেষ্টা করে ভারত সরকার শেষপর্যন্ত লোকসভা ভাঙার মুখে মুখে মহাজন কমিশনের রিপোর্টটি পার্লামেন্টে পেশ করেছেন। মহীশূরের দাবী, মহাজন কমিশনের সুপারিশই কার্যকর করতে হবে। এই বিরোধের জের একাত্তরেও গড়াবে।

ভারতের ভবিষ্যৎ, ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের স্থায়িত্ব, ইত্যাদি দিক দিয়ে অনেক বেশী বিপজ্জনক আরও একটি বিরোধের জের একাত্তর সালে গড়াবে যার তুলনায় দুটি প্রতিবেশী রাজ্যের এই বিরোধ কিছুই নয়। সেই বৃহত্তর বিরোধের একপক্ষ সরকার ও আইনসভা, অন্যপক্ষে আদালত। এই দেশের সরকার ও আইনসভা সংবিধানের অধীন আর সুপ্রীম কোর্ট বিচারপতিদের জ্ঞানবুদ্ধি ও বিবেক ছাড়া আর কিছুরই অধীন নয়, ভারতবর্ষের সংবিধানেরই এই নির্দেশ। তার মানে, সুপ্রীম কোর্টের 'না'-ই চূড়ান্ত 'না', সত্তর সালে দুবার সুপ্রীম কোর্টের এই 'না' শুনে দেশের বিভিন্ন মহল নিজেদের প্রশ্ন করতে আরম্ভ করেছেন, দেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মতে যেটা সামাজিক নায়বিচার আর সুপ্রীম কোর্টের মতে যেটা আইনের নায়বিচার, সেই দুইয়ের মধ্যে সঙ্গতি আনা যাবে কিভাবে? সুপ্রীম কোর্টের যে দুটি রায় নিয়ে সত্তর সালে ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের অস্তিত্বের মূলে প্রশ্নে টান পড়েছে, সেই দুটির মধ্যে একটিতে ভারত সরকারের ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্তকরণের আইন নাকচ করে দেওয়া হয়েছে আর একটিতে নাকচ করে দেওয়া হয়েছে প্রাক্তন রাজন্যদের স্বীকৃতি বাতিল সংক্রান্ত রাষ্ট্রপতির আদেশ। প্রথম ক্ষেত্রে ভারত সরকারকে নূতন করে আইন আনতে হয়েছে আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ভারত সরকার কি করবেন তা এখনও ঠিক করেন নি। তবে, এবিষয়ে সন্দেহ নেই যে, সুপ্রীম কোর্টের রায় দুটিকে, বিশেষ করে দ্বিতীয় রায়টিকে, বড় নির্বাচন ইস্যু হিসাবে তুলে ধরে শাসক কংগ্রেস দল বৃহত্তর শক্তি ও অধিকতর ক্ষমতা নিয়ে লোকসভায় ফিরে আসার চেষ্টা করবে।

সুপ্রীম কোর্টের তৃতীয় যে রায়টি সত্তর সালে দেশের মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল সেটির দ্বারা রাষ্ট্রপতির পদে শ্রী ভি ভি গিরির নির্বাচন বৈধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

•

বিদেশের দিকে তাকিয়ে আমরা দেখতে পাই, সত্তর সাল আমাদের ঘরের পাশে পাকিস্থানে দুটি বৃহৎ সংবাদ সৃষ্টি করেছে। প্রথম, পূর্ব পাকিস্থানকে হতে হয়েছে বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে প্রাণঘাতী প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের শিকার। সামুদ্রিক ঝড় ও প্লাবনের মুখে জীবন দিল পূর্ব পাকিস্থানের দক্ষিণ অঞ্চলের লাখ পাঁচেক মানুষ। আর এই ভয়ঙ্কর প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ঠিক পিঠ-পিঠ এল পাকিস্থানের ২৩ বছরের ইতিহাসে প্রথম সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ নির্বাচন। সমুদ্রের প্লাবনের মতো সেই নির্বাচনও যেন ভাসিয়ে নিয়ে গেল পূর্ব পাকিস্থানে বহুকালের প্রতিক্রিয়াশীল, সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামির রাজনীতিকে। আর ঢেউয়ের চূড়ায় দেখা গেল যে মুখ সে হচ্ছে শেখ মুজিবুর রহমান। পূর্বে যেমন শেখ মুজিবুর রহমান, পশ্চিমে তেমনি এলেন জুলফিকার আলি ভুট্টো। দুই প্রান্তে এই দুজন আর তাঁদের মাথার উপর জঙ্গী প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁ—এই তিনজনের উপরই নির্ভর করছে একাত্তরের পাকিস্থানের ভাগ্য।

সত্তরে পাকিস্থানের নির্বাচন ছাড়া আরও যে তিনটি জাতীয় নির্বাচন সারা পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল সেগুলি হচ্ছে বৃটেন, চিলি ও সিংহলের নির্বাচন। বৃটেনে অপ্রত্যাশিতভাবে শ্রমিক সরকার নির্বাচনে হেরে গেছেন এবং তাঁদের জায়গায় এসেছেন এডওয়ার্ড হীথের রক্ষণশীল সরকার। চিলির ভোটাররা একজন মার্কসবাদীকে দেশের রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচিত করেছেন। সারা পৃথিবীতে এমন ঘটনা এই প্রথম ঘটল। সিংহলের নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বিশ্বের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী সিরিমাভো বন্দরনায়ক বামপন্থী কর্মসূচী নিয়ে ক্ষমতায় ফিরে এলেন।

সত্তরের শেষ দিকে পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধবিরতি হয়েছে বটে; কিন্তু শান্তি সুদূরে। আর ভিয়েতনামে যুদ্ধবিরতি বা শান্তি কোনটিরই দেখা নেই। উপরন্তু কাম্বোডিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান প্রিন্স নরোদম সিহানুককে ক্ষমতাচ্যুত করে সেখানে ভিয়েতনামের যুদ্ধের আগুন ছড়ান হয়েছে এবং উত্তর ভিয়েতনামের হাতে আটক যুদ্ধবন্দীদের প্রশ্নটি ঘিরে উত্তেজনা বেড়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্সন যদিও ভিয়েতনাম থেকে সরে আসতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ তাহলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উত্তর ভিয়েতনামের উপর বোমাবর্ষণ চালু করে নূতন করে যুদ্ধের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছে।

ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট দ্যগল, সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট নাসের, ইন্দোনেশিয়ার সুকর্ণের ও পর্তুগালের সালাজারের মৃত্যুতেও ১৯৭০ সাল চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

১-১-৭১ —পুণ্ডরীক

সম্পাদকীয়

সত্তরের দশকের নববর্ষ

বিংশ শতাব্দীর অস্তাচলগামী সূর্য সত্তরের দশকে প্রবেশ করল বিশ্ববাসীর আশা-নিরাশা ও দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে। সত্তরের সম্ভাবনাময় দশকেরও সূত্রপাত হল নববর্ষের প্রথম দিন থেকে। এই দিনটিকে আমরা শুভ বলে মানি। সকলের শুভ কামনা করি আমরা। পৃথিবীর শুভ হোক, কল্যাণে পরিপূর্ণ হোক সকল মানুষের জীবন।

যে-বৎসরকে আমরা পিছনে ফেলে এসেছি তার দিকে তাকিয়ে আমরা কী বলব। কত আশা নিয়ে সেদিনের নববর্ষকে জানিয়েছিলাম অভিনন্দন। তার সবটুকু পূর্ণ হয়নি। পূর্ণতা ও অপূর্ণতায় ভরা একটি বৎসর অপসৃত হয়ে গেল কালের অসীম গহ্বরে। তবু আমরা বলব, মানুষের অগ্রগতির পদচিহ্নে এই বৎসরটিও নানাদিক দিয়ে কম উজ্জ্বল নয়। বিজ্ঞানের অগ্রগতি চলেছে সমানে। চাঁদের বুকে স্বয়ংক্রিয় যান মানুষেরই বিজ্ঞান-প্রতিভার নিদর্শন নিয়ে স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে। জীবদেহের কৃত্রিম 'জেন' সৃষ্টির প্রচেষ্টাও ফলবতী হয়েছে বিজ্ঞানীর প্রতিভায়। মানুষের আতঙ্ক ক্যান্সার রোগের প্রতিষেধক আবিষ্কারের প্রচেষ্টা এখনও ফলপ্রসূ হয়নি। তবে এ-কাজে মানুষের প্রতিভা যে জয়ী হবে তার অভ্রান্ত ইঙ্গিত পাওয়া গেছে বিগত বৎসর। এ সবই আশার কথা। মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ। তাই যত ব্যর্থতাই আসুক মানুষ ও মনুষ্যত্বের ওপর রাখতে হবে আমাদের অটুট বিশ্বাস। এই বিশ্বাসই এগিয়ে নিয়ে যাবে আমাদের সত্তরের সম্ভাবনাময় দশকে।

ভারতবর্ষের দিকে তাকালে বিগত বৎসরটিকে বলতে হয় ঘটনার সংঘাতে বিক্ষুব্ধ সময়ের স্মরণিকা। সত্তরের দশক আমাদের দেশের মানুষের কাছেও অনেক আশা নিয়েই উপস্থিত হয়েছে। এই দশকেই আমরা খাদ্যে স্বয়ম্ভর হবার আশা রাখি। এই দশকেই প্রতিশ্রুতি দেওয়া আছে সাধারণ মানুষের ন্যূনতম প্রয়োজন মেটাবার। জানি না সে-প্রতিশ্রুতি সফল হবে কিনা। তবুও আমরা আশা করে থাকব, সকলের শুভবুদ্ধি ও আন্তরিক সহযোগিতায় ভারতবর্ষের মানুষের কাছে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পূরণ করা সম্ভব হবে। সরকার সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য ঘোষণা করেছেন সংকল্প। কিন্তু তার পথে অনেক বাধা। রাজন্যভাতা বিলোপের যে-নির্দেশ দিয়েছিলেন রাষ্ট্রপতি, সুপ্রীম কোর্টের রায়ে তা বাতিল হয়ে গেছে। প্রধানমন্ত্রী জাতির উদ্দেশে বেতারভাষণে জানিয়েছেন, সমাজের পরিবর্তনের পথে কত বাধা। তার জন্য তিনি বর্তমান লোকসভা ভেঙে দিয়ে আবার জনগণের কাছে আসছেন নতুন রায় নেবার জন্য। শান্তিপূর্ণ উপায়ে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য যে মহৎ প্রচেষ্টা চলছে, ভারতবর্ষ সে-পথ থেকে বিচ্যুত হতে চায় না বলেই জনতার রায় পাবার জন্য প্রধানমন্ত্রীর এই আগ্রহ। ভারতের বৈষয়িক উন্নতির পথে যে-বাধা আসছে নানা স্থিত স্বার্থের কাছ থেকে, সে-বাধা অপসারণ না করলে অনিশ্চয়তা ও বিক্ষোভের দিকেই ঠেলে দেওয়া হবে ভারতকে। সেই দুর্দৈব থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য এগিয়ে আসতে হবে সকলকে। সত্তরের দশকের সূচনায় এই আহ্বানই আজ সর্বত্র উচ্চারিত।

আমাদের হতভাগ্য পশ্চিমবাংলায় চলেছে সামাজিক সংক্ষোভ এবং রাজনৈতিক অস্থিরতা। এ রাজ্য সকল দিক দিয়ে আজ পশ্চাদগামী। তার শিল্পায়ন স্তিমিত ও শিথিলগতি। সাড়ে পাঁচ লাখ পঞ্জীভূত বেকার রয়েছে ঘরে ঘরে। এদের কর্মসংস্থানের আশা কোথায়? বৈষয়িক উন্নতি ছাড়া আত্মিক বা সাংস্কৃতিক উন্নয়ন অর্থহীন। ভারতবর্ষে পরিকল্পিত অর্থনীতির কর্মসূচী গ্রহণ করে যে-প্রচেষ্টা চলছে তার অনেকখানিই ব্যর্থ হয়েছে দুর্নীতিপরায়ণ কিছু লোকের জন্য। পরিকল্পনা প্রণয়নকারীদের অন্যতম অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ সেদিন দুঃখ করে এই কথাই বলেছেন যে, দেশপ্রেমের অভাবের জন্যই আমরা আমাদের বৈষয়িক উন্নয়নের লক্ষ্যবস্তুতে পৌঁছুতে পারিনি। অথচ আমাদের জনবল এবং প্রাকৃতিক সম্পদ উপেক্ষণীয় নয়। এই বিপুল শক্তি ও সম্পদকে কাজে লাগাতে পারলে সত্তরের দশকে সাধারণ মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় যা-কিছু তা সরবরাহ করা অসম্ভব হবার কোনো কারণ নেই।

এই লক্ষ্যে পৌঁছুতে হলে বর্তমান হতাশা থেকে মুক্ত করতে হবে দেশের মানুষকে। সামগ্রিকভাবে ভারতের সকল মানুষের কথাই ভাবতে হবে আমাদের। আঞ্চলিকতা বা প্রাদেশিকতা, ধর্মান্ধতা বা সাম্প্রদায়িকতার কোনো স্থান নেই গণতান্ত্রিক সমাজে। দেশের একটি অংশ দুর্বল বা অনুন্নত হলে গোটা দেশের অগ্রগতিকেই তা ব্যাহত করবে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য দেশের সকল অঞ্চলের মানুষ যেমন সমান দুঃখভোগ করেছে, তার উন্নতি ও সমৃদ্ধির সংগ্রামেও তেমনি দেশের সকল মানুষ সমান অংশীদার। কাউকে বঞ্চনা করে কাউকে স্বাচ্ছন্দ্য দেওয়া অপরাধ। দেশের দরিদ্র, বঞ্চিত, বেকার হতভাগ্য সকলেরই কথা মনে রেখেই সমাজ-কল্যাণের কর্মসূচী রূপায়িত করতে হবে। সত্তরের দশককে ভারতের সার্থকতার দশকে পরিণত করতে হলে সকলকেই আজ নতুন সংকল্পে উদ্বুদ্ধ হতে হবে অবিচলিত নিষ্ঠায়। নববর্ষ এই সংকল্পের আহ্বানই নিয়ে এসেছে। তা যেন সার্থক হয় আমাদের জীবনে।

বাকি, আমার অনেক বাকি ॥ অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

এদিক সেদিক অচেনা দিক অনেক দিকে গিয়েছিলাম—
জনস্রোতে জনসভায়;
পায়ের চটি বানের জলে ভেসে যেতে দিয়েছিলাম—
এমনি ছিলাম হাঁটাচলায়।
তাহলে কোন্ যাওয়া বাকি?
জানি তো নই বনের পাখি।
গিয়েছিলাম মুখোশ-আঁটা মানুষজনের শিল্পকলায়।

বাকি, আমার অনেক বাকি,
নইলে কেন প্রবল হাওয়া দেয়াল নাড়ায়!
বাকি, আমার দিনের প্রভার পরম বাকি
আপন মাঠে, ভিতর-পাড়ায়।

বৃষ্টি মাথায় করে নিয়ে আসি ॥ সত্য গুহ

আমার হাসতে দেখে তুমি হিংসেয় জ্বলে যাও
আমার হৃদয় অগ্নি ছুঁড়ে দাও তীক্ষ্ণ অভিশাপ
কী আমার নেবে তুমি, যত কলকাঠিই নাড়াও
তোমাকে করতেই হবে জ্বলেপুড়ে কেবল বিলাপ

আমার তো জানা নেই হাসি ছাড়া অন্য কোনো যাদু
বিপজ্জনকভাবে বেঁচে থাকি, দুঃখই ভূষণ
অল্প যা-কিছু জোটে খুদকুড়ো তাই হে সুস্বাদু
অমরা! পুড়ে যাক। ধুলো পেতে শুয়েছি দুজন

এই বেশ: দুখে সুখে আছি, প্রভু, কাঁদি ও কাঁদাই
এ ওকে পরস্পর বাহুর বাঁধন মেগে জোর
অপো অপো নহবতে বেজে যায় শাশ্বত সানাই
প্রিয়, হে প্রিয়, শূন্য হৃদয় ভরিয়া দাও মোর

সুখে আছি, প্রভু, সব দুঃখের কথা করে গান
বৃষ্টি মাথায় করে নিয়ে আসি জীবনে অঘ্রাণ।।

দেখা দেবে ॥ নিশিনাথ সেন

যেমন বর্ষার শেষে অনন্ত ক্ষেতের মাঝে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে
ফসলের গান
অথবা চৈত্রের অন্ত্যে মরাগাছে প্রকৃতির জেগে ওঠে প্রাণ
তেমনি, অতীত হলে পৃথিবীর পরিধির স্বল্প মলমাস
সূর্যোদয়ে দেখা দেবে অবশ্যই সবুজ সুন্দর সেই ঘাস
রূপে যার দেবতার ঝরে পড়বে মহানন্দ-প্রীতি
আবশ্য প্রজ্ঞায় দেখি এবম্বিধ জগতের রীতি।

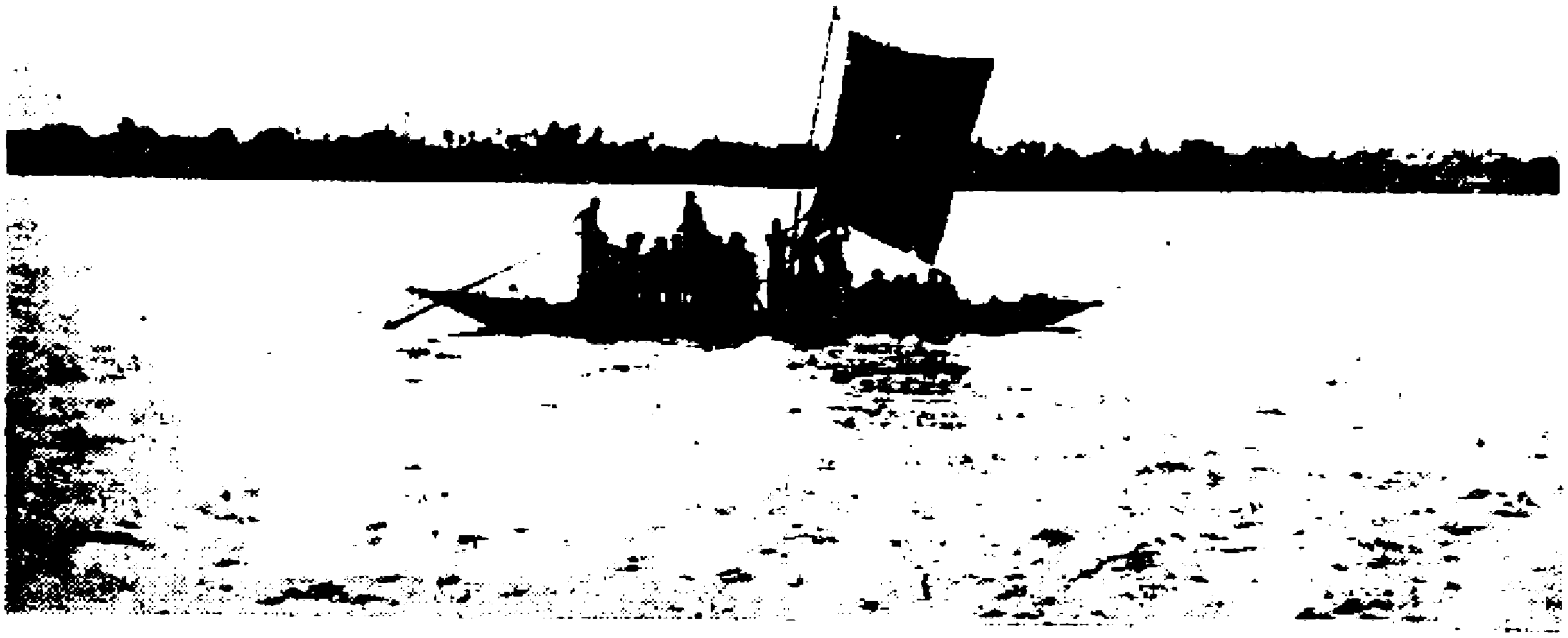

গঙ্গায় জলপথে ভ্রমন

এই আমাদের দেশ

পাহাড়-ভাঙা জলস্রোত নিজের খেয়ালে কোন পথে পরিক্রমা সুরু করবে আগে ভাগে তা বলে দেওয়া কঠিন। কিংবা যে পথে দীর্ঘকাল ধরে আনাগোনা, হাসি-কান্নার ফুল ঝরানো, ঊষর প্রান্তরে ঋতুতে ঋতুতে ফসলের ভারা ভারা, গঞ্জ বন্দরের পত্তনে ব্যাপারী নৌকার ছাউনি ফেলা, জমজমাট হয়ে ওঠা বন্দরে কখন যে চড়া পড়বে তা কেউই বলতে পারে না। নদীর গতিপথ পরিবর্তনের খেসারত দিতে হয়েছে অনেক দেশকেই। অবশ্য বাংলা দেশের কথা আলাদা। জলপথের প্রচুর সম্ভাবনাকে আমরা নিজের হাতে নিজেরা টিপে মেরেছি, খানিকটা সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা না বুঝে, খানিকটা আত্মম্ভরীতায় নিমগ্ন থেকে। অথচ কলকাতার পত্তনই হোত না যদি না গঙ্গা তার দুকূল ছাপানো জলস্রোত নিয়ে মাথা বরাবর দাপট সুরু না করত। বিদেশী বণিকরা জলপথের গুরুত্বটা কিছুটা বুঝেছিল, বুঝেছিল বলেই মক্কে যাওয়ার পূর্বক্ষণ পর্যন্ত টাইকে এক পিঠ ছুঁইকে এক পিঠ দিয়ে ব্যবসা চালিয়ে গেছে।

কলকাতার পূব পাড়ার যাদের বাস জলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা তাদের বেশি। আজ যে খালকে বুজিয়ে রাস্তা তৈরীর পরি-কল্পনা হচ্ছে একদিন সেই খালই সেদিন অন্যতম প্রথম জলপথের দায়িত্ব পালন করেছিল, শহর শহরতলীকে রূপসী করেছিল। পৃথিবীর বহু জমজমাট নগরীর দুর্লভ বন্ধু যে জলপথ, যা দুনিয়ার ব্যবসাদারদের টেনে এনে অর্থ-আনুকূল্য দিতে পারে, ভিড়ের চাপে নাভিশ্বাস-ওঠা শহরকে মুক্তির আস্বাদ দিতে পারে, সেইসব সম্ভাবনাপূর্ণ জলপথের সংস্কার না করে, নিয়মিত লঞ্চ, মোটরবোট সার্ভিস চালু না করে তাদের বুজিয়ে শিল্পলোকের ইন্ধন জোগানো সর্বনাশেরই সামিল।

বেলেঘাটার খালে-খালে বওয়া নৌকোর যাতায়াত দেখে পথের হদিস পাওয়া যায়, কিন্তু আজকের খাল ভরাটের মতই আমরা বুঝিনি এমন অনেক খালের পরিচয়, প্রয়োজন। হেস্টিংস-এর মারাঠা ডিচ খোঁড়ার বহুদিন আগে প্রকৃতির নিজের হাতে গড়া জলপথ ছিল বেলেঘাটার বুক চিরে। জোড়ামন্দির ছাড়িয়ে চিংড়িঘাটার সীমানায় পূর্ব-উত্তরে বয়ে-যাওয়া নতুন খাল আর পূর্ব-দক্ষিণে বয়ে যাওয়া পুরনো খালের দাপট ছিল একদিন। কাল বোশেখীর ঝড়ের মাতন সহ্য করতে হয়েছে অনেক পাকাপোক্ত দাঁড়ি-মাঝিকে। সুন্দর-বনের চমকে দেওয়া উত্তাল নদ বিদ্যাধরীর মুখ এটি চিংড়িঘাটা, সম্ভবত চিংড়ি-ক্রিক এর ঘাটে আজও বেলেঘাটার দক্ষিণে ঐ পুরাতন ও সদ্য-বিলুপ্ত নতুন খালের সংযোগটুকু আছে, ঐ জলপথটি বেলে-ঘাটার বিদ্যাধরীর মুখ থেকে সুরু হয়ে হিন্তালী ধর্মতলা ক্রিক বোর কোল ছুড়ে বয়ে গেছিল গঙ্গা পর্যন্ত।

শ্রীরামপুরের পাদ্রীরা কেরী সাহেবের যুগেও উত্তরবঙ্গ যাওয়ার প্রয়োজনে আসতেন বেলেঘাটায় নৌকা খুঁজতে। আদিগঙ্গা দিয়ে যখন ভাগীরথী প্রবাহিত হতো, তখন যেমন গঙ্গা বেয়ে সাগর-সঙ্গমে সাগর দ্বীপে পৌঁছান যেত, তেমনি বিদ্যাধরীর সংযোগ ছিল আদি গঙ্গার সাথে। সে-পথ গিয়ে উঠল মাতলায়। এই মাতলার বিদ্যাধরীর মোহনায় পোর্ট ক্যানিং-এর ওপর দিকে ছিল প্রতাপাদিত্যের দুর্গ হায়দার-গড়। এখন সেখানে বুরুজ-খানার উঁচু ঢিবি, প্রতাপনগর গ্রাম। এই সেদিনও নৌকা বেয়ে সুন্দরবন যাওয়ার শর্টকাট ছিল বেলেঘাটার খাল, পুরনো খাল বেয়ে মাইল-তিনেক এগিয়ে বিদ্যাধরীতে যাবার লক-গেটে টোল দিতে হোত। তার-পর আরও এগিয়ে গিয়ে জোয়ারের অপেক্ষায় বিশ্রাম নিতে হোত বসরার চরে। জোয়ার এলে বসরার চরের পাশ কাটিয়ে

চলতে চলতে সুন্দরবনের কোলে একেবারে মাতলা মোহনায় গিয়ে পড়া যেত। সে-নদীপথ আজ মজে গেছে।

পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি বিপ্রদাস পিপিলাই তাঁর মনসা মঙ্গল-এ গঙ্গার এক প্রবাহপথের হদিশ দিয়েছেন। বিপ্রদাসের চাঁদ সদাগর তাঁর বাণিজ্যতরী রাজঘাট ভাসিয়ে এগিয়ে চলেছেন সমুদ্রের দিকে। রামেশ্বর পার হয়ে, একে একে পেরিয়ে এলেন অজয় নদী, উজানী, ইন্দ্রাণী নদী, কাটোয়া, ইন্দ্রঘাট, নদীয়া, ফুলিয়া, গুপ্তিপাড়া, ত্রিবেণী, গঙ্গা-সরস্বতী-যমুনা সঙ্গমে সপ্তগ্রাম, কুমারহাট, তারপর ডাইনে হুগলী, বাঁয়ে ভাটপাড়া, পশ্চিমে বোরো, পূবে কাঁকিনাড়া, মূলাজোড়, পশ্চিমে পাইকপাড়া, ডাইনে ভদ্রেশ্বর চাঁপদানী, বাঁয়ে ইছাপুর, বাঁকিবাজার, ডাইনে নিমাবাটী, মাহেশ, রিষড়া, কোন্নগর, চুঁচুড়া, বাঁয়ে খড়দহ, কামারহাটি, চিৎপুর, কলকাতা, কালীঘাট, বারুইপুর তারপর ছত্রভোগ, হাতিয়াগড়, চৌমুখী, শতমুখী, সাগরসঙ্গম পেরিয়ে চাঁদ সদাগরের মেলানী সাগরে ঢুকল। সেদিন পর্যন্ত ভাগীরথী কলকাতা, বেহালা, কালীঘাট পর্যন্ত এসে তারপর দক্ষিণমুখী আদি গঙ্গার বুক বেয়ে সমুদ্রমুখে বয়ে যেত। আদি গঙ্গার প্রশস্ত দুই কূল সমৃদ্ধ ছিল। তারপর সব হয়েছে মজে যাওয়ার পালা।

জলপথে ভ্রমণে এক ধরনের নিজস্ব আনন্দ আছে। নদীর টানে, সাগরের উন্মত্ত নেশায় আজও অনেক ট্রেন-বাসে গিয়ে পৌঁছাই ডায়মণ্ডহারবার, তারপর পঁচিশ-তিরিশ মাইল হেঁটে কাকদ্বীপ। এখান থেকে শেষ পাড়ি সাগর। এপার কাকদ্বীপ, ওপার সাগর; মাঝে চিকচিকানো মড় গাঙের অতল পাথার। পারঘাটে দাঁড়িয়ে ছোট নদীর দ্বীপগুলো ছাড়িয়ে চোখ মেললে, ঝাপসা নজরে পড়বে সাগরদ্বীপের সীমানা। সাগর মেলায় কেউ আসেন ধর্মের টানে, কেউ প্রকৃতির মোহে, কেউ সমুদ্রের অতল আস্বাদ পেতে। কলকাতা থেকে ডায়মণ্ডহারবার স্থলপথে যেতে আমরা অভ্যস্ত। পথটুকু চোখ-কান বুজে পেরিয়ে গেলেই পৌঁছাব জলের কাছে। কিন্তু জলপথে যাবার পরিকল্পনাও অনায়াসেই করা যেতে পারে। ধরা যাক আউটরাম ঘাট থেকে ডায়মণ্ডহারবার পর্যন্ত স্টীমার সার্ভিস যদি চালু করা যায়, আমার তো মনে হয় অনেকেই স্থলপথ ছেড়ে জলপথে যাওয়াই পছন্দ করবেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পর্যটন বিভাগ স্থলপথে ভ্রমণের প্রচুর হদিশ দিয়েছেন, বাস সার্ভিস চালু করেছেন পর্যটকদের আকৃষ্ট করার জন্যে। জলপথে ভ্রমণের সুযোগ-সুবিধাগুলিও ভেবে দেখা যেতে পারে। নিয়মিত স্টীমার সার্ভিস বা ছুটির দিনে ব্যবস্থা করা যেতে পারে। স্টীমারেই থাকবে চা, টিফিন, খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা; এমনকি সকালে গিয়ে সন্ধ্যার দিকে না এসে দু-একদিন স্টীমারে কাটানো গেলেই বা আপত্তি কি! সেক্ষেত্র শোবার ব্যবস্থা করে দিতে হয়। ধরুন, ডায়মণ্ডহারবারের পর কাকদ্বীপ, ফ্রেজারগঞ্জ যদি ঘুরে আসতে হয়, তাহলে একদিনে কুলোবে না। অথচ ফ্রেজারগঞ্জ দেখার ইচ্ছেটাকে দাবিয়ে রাখাও ঠিক হবে না।

সাগর দ্বীপের দশ-বারো মাইল দক্ষিণ-পূবে সাগরের কোলে নারায়ণতলার দ্বীপ। স্থলপথে যেতে হলে নামখানা থেকে নৌকোয় নৌকোয় পেরোনো যায় মাঝের খাড়িটুকু। বালি-বিছানো সাগর-সৈকতের নারকেল গাছের সারি, নির্জন প্রকৃতি সবটুকু সৌন্দর্য ঢেলে দিয়েছে। ফ্রেজারগঞ্জ পেরোলেই সমুদ্রের দক্ষিণ প্রান্ত। সামনে জল, পিছনে জল, দুপাশে জল। সমুদ্রের তরঙ্গে তরঙ্গে দূরে—আরও দূরে এগিয়ে যান। পারহীন, নিষ্ঠুর অথচ মন কেড়ে নেওয়া সমুদ্র। বামে আরও দূরে একের পর এক দ্বীপ। দ্বীপের পর দ্বীপ, মোহনার পর মোহনা। মাকলেনবার্গ, ডালহাউসি, গোনা, চৈরবালি, ভবকুণ্ডা, বাহির জিজিরা প্রভৃতি। উল্লেখ নদীও আছে কালিন্দী, মাতলা, ছোট মাতলা, ছোট হুগলী, হাড়িয়াভাঙা—এমন কত। এর যে-কোন নদী ধরে উজান ঠেলে উত্তরমুখে এগোলেই সুন্দরবন। যত নদী যত নালা এসে মিশেছে এখানে। গঙ্গা এখানে শতমুখী নয়, বলা যায় সহস্রমুখী।

বড়দিনের ছুটিতে প্রাইভেট স্টীমার পার্টি প্রায়ই পাড়ি জমান ডায়মণ্ডহারবারের পথে। একদিনের বা দু-দিনের প্রমোদভ্রমণ যে-কোন পর্যটককে উৎসাহিত করবে। বাড়ির মত সমস্ত ব্যবস্থা স্টীমারে করে নেওয়ার কোন অসুবিধে নেই। জলের উপর রান্নাবান্না থেকে খাওয়া-দাওয়া, গান-বাজনা সবেরই একটা আলাদা আনন্দ আছে। আগেকার দিনে জমিদার-বিত্তবানদের নদীপথে 'বাচ' খেলতে যাওয়ার নজির প্রচুর আছে। এমনকি ছুটির দিনে ফেরী নৌকায় গঙ্গার এপার-ওপার করেও আমরা ভ্রমণের শখ মেটাই। সেক্ষেত্রে তোড়জোড় করে সাজিয়ে-গাছিয়ে স্টীমারে ভ্রমণ উৎসাহের তো বটেই।

এদিকে আউটরাম ঘাট থেকে ডায়মণ্ডহারবার ওদিকে - আপাতত ব্যাণ্ডেল ত্রিবেণী পর্যন্ত ছোট ট্রীপ নেওয়া যেতে পারে। গঙ্গাবক্ষে কলকাতা থেকে ত্রিবেণী —মাঝে দু-পারের দর্শনীয় জায়গা রয়েছে প্রচুর। ঘন্টাখানেকের স্টপ থাকলে জায়গাগুলো ঘুরে নেওয়া যায়, আর একনাগাড়ে চলারও ছেদ পড়ে। দর্শনীয় জায়গাগুলো স্টেশন হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। জলপথে ভ্রমণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পর্যটন বিভাগ একটি পরিকল্পনা নিতে পারেন, আমার মনে হয় এতে প্রচুর সাড়া পাওয়া যাবে।

—নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

সীমানা পেরিয়ে

শচীন বিশ্বাস

চায়ের পেয়ালা সামনে নিয়ে শুভ্রশীল বাইরে হাই স্ট্রীটের দিকে তাকিয়ে লোকজন রিকসো বাস চলাচল দেখছিল। মন্মথ সকালের বহু হাতঘোরা ছেঁড়া-ছেঁড়া কাগজের উপর চোখ বুলোচ্ছে। একটু আগে ওরা পুরনো দিনের কথা বলছিল। এখন চায়ের পেয়ালা সামনে নিয়ে সম্ভবত কোলকাতার সেই ছন্নছাড়া বন্ধনহীন দিনগুলির কথা ভাবতে ভাবতে দুই বন্ধু ফুরিয়ে যাওয়ার শূন্যতায় ক্লান্ত এবং বিষাদগ্রস্ত। সেই রাস্তার মোড় ফুটপাথ কফি হাউস রেস্টুরেন্ট বার—সেই গড়ের মাঠ, গঙ্গার ধার বাঁশদ্রোণীর সেই পাহাড় প্রান্তর: সিনেমা থিয়েটার সাহিত্যের জন্য পাগল হয়ে ছুটো।

শুভ্রশীল সিগারেট ধরাল। বাইরে হাই স্ট্রীটে তখন লোক গিজ-গিজ করছে। রিকসার হর্ণ, বাস-লরীর ঘড়ঘড়ানি, সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশের সতর্ক টহলদারী। শুভ্রশীল বলল, ধুর শালা, কোথাও শান্তি নেই। সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বলল, বুঝলি মন্মথ, বড় হাঁপিয়ে উঠেছি, আমার আর কিছুই ভাল লাগে না—

মন্মথ খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলে বলল, কেন, তোরা সরকারী কর্মচারীরা ত' বেশ আছিস, সম্মেলন করছিস, ধর্মঘটও করলি সেদিন, কাগজে দেখলাম তোদের মাইনে-পত্তরও তো কিছু বাড়ছে—

শুভ্রশীল বলল, মাইনে আমাদের বাড়লে তোরা মাস্টাররাও নিশ্চয়ই কিছু পাবি, আজ নয় কাল। কিন্তু আমি ওসব কোন কিছুতেই থ্রিল পাচ্ছি না, ইনস্পায়ার্ড হতে পাচ্ছি না; আমি জানিস মন্মথ, পুরোপুরি একটা নষ্টম্যান, একদম ফুরিয়ে গেছি—

মন্মথ কিছু বলল না, নীরবে সিগারেট টানতে টানতে তার বর্তমান ছা-পোষা জীবনের কথা ভাবতে লাগল। কুসুমের অসাহিষ্ণু সহানুভূতিহীন ব্যবহার, ছেলে-মেয়ে দুটির শারীরিক অসুস্থতা, স্কুলের নিদারুণ-অনিশ্চিত বেতন, অনিচ্ছা সত্ত্বেও টিউশান করে অর্থ সংগ্রহ, শিক্ষায়তনের সাম্প্রতিক গোলমাল, ছেলেদের পরীক্ষা বন্ধ হওয়া স্কুল উঠে যাওয়ার আশঙ্কা, পাড়ার যখন তখন পুলিশের আবির্ভাব ইত্যাদি মিলিয়ে দিন যাপনের মধ্যে যে কী অপরিসীম শূন্যতা—তা শুভ্রকে সে বোঝাবে কি ভাবে! আসলে কুসুমের কথাই ঠিক, মফস্বলে মাস্টারী নিয়ে কোলকাতার সরকারী চাকরী ছেড়ে আসা খুবই আহাম্মকী হয়ে গেছে—

—তোর ভালো আছিস মন্মথ, শুভ্রশীল শুনো ধোঁয়া ছাড়ল।

—ভালো আছি।

মন্মথ খুব জোর দিয়ে বলল বলতে কি— কোলকাতা আর এখন ভদ্রলোকের বসবাসের মত নেই। ওফ্‌ গীরজন! শুভ্রশীল হঠাৎ উত্তেজিতভাবে রাস্তায় নেমে এসে বলল, চল কোথাও নিরিবিলিতে বসা যাক—তোদের এখানেও দেখছি লোকজন ভিড়, গাড়ি ঘোড়া—ওফ্‌!

মন্মথ বলল, যা যা কোলকাতায় আছে, এখানে সবই আছে, হয়ত কিছু বাড়তি। হাঁ একটা জিনিস কিন্তু নেই, ভিড়ের মধ্যে একা হওয়ার সুযোগটা। ঐটি ছাড়া লোকজন ভিড় শান্তি খুন রেপ প্রেম আন্দোলন ধর্মঘট উগ্রমূর্তি বেকার প্রতিদ্বন্দ্ব ছিনতাই সিনেমা কালচার স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোন্দল—দুটোর ভিতরও—

—ধ্যাৎ শালা, বড্ড হতাশাবাদী হয়ে পড়েছিস—

—হতাশাবাদী হতে পারি। আবার নাও হতে পারি। আমি জানিস ত, ভালো পিতা, স্বামী এবং শিক্ষক, আমি রোজ বাজার করি, ঘাড় ধরে ডাক্তারখানায় যাই, টিউশানীতে একদম ফাঁকি দিই না—ক্ষমতা নেই বুঝতে পেরে গল্প লেখা ছেড়ে দিয়েছি—লাইফ ইন্সিওরেন্সে—

—ওফ্‌, তুই থামতো মন্মথ। চল্‌ কোন নিভৃত নির্জন জায়গায় নিয়ে চল। তোর

এখানে দু-একদিনের জন্য এসে যদি একটু নিভৃত বিশ্রামই না পেলাম—

মন্মথ বলল, নির্জন জায়গা কোথায় এখানে আছে তাই ত জানি না, যেহেতু অনেক কাল আমি বাড়ির বাইরে যাই না—দু একদিন বেরিয়েছিলাম বটে, বাড়ি থেকে পালিয়ে গ্রামের দিকে চলে গিয়েছিলাম—সারাদিন মাঠে মাঠে ঘুরেছিলাম—

—বলিস কি রে, পালিয়ে গিয়েছিলি? হাইলি রোমান্টিক—

—গিয়েছিলাম ত। এই রিকসো। চল শুভ্র, নদীর ধারে যাওয়া যাক। ওদিকটা তোর ভাল লাগতে পারে। এখন ওদিকটা কেমন হয়েছে কে জানে। রিকসায় উঠে বলল, তুই কবিতা-টবিতা লিখছিস না আজকাল? কি রে?

শুভ্রশীল অন্যমনস্কভাবে বলল, বে আর তেমন—

কলেজের বাস স্টপের পরে রাস্তাটা কিছু দূর এসে নদীর পাড়ে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। এখানে খড়ো পাড়। ইটের তৈরি পুরনো রেলিং। মিউনিসিপ্যালিটির ময়লা ফেলার গাড়ি মাঝে মাঝে দু-এক গাড়ি ঘেস ফেলে, বর্ষা আসার সঙ্গে সঙ্গে তা ধুয়ে মুছে যায়। এখান থেকে নদীর পাড় দিয়ে পরে চলা রাস্তা সরু। ইট বের হওয়া এবড়ো খেবড়ো রাস্তা। রিকসো চলতে পারে। শুভ্রশীল নদীর ধার দেখে বলল, এবার হাঁটা যাক—

ওরা যেখানে এসে দাঁড়ালো সেখান থেকে রাস্তাটা সোজা পশ্চিমে চলে গেছে। বাঁ-পাশে সদর-শহরের কর্মক্লান্ত জীবন লোকজন বাজার গাড়ি ঘোড়া বাড়ি ঘর সিনেমা হাউস রেল স্টেশন, ডান পাশে আঁকাবাঁকা জলঙ্গী। রাস্তাটা নদীর পাড় ধরে সোজা গ্রামের দিকে চলে গেছে। শহরের শেষ প্রান্তে মাঠ, চাষের জমি, কোম্পানির বাগান, মাঝে মাঝে রাস্তার দুধারে পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের বড়-বিচালির ছাওনি দেওয়া চালা, এক-আধখানা টিনের চাপড়া। গাছপালার মধ্যে নিঃশব্দে পড়ে পড়ে ঝিমুচ্ছে—

শুভ্রশীলের খুব ভাল লাগছে। এই নদী-তীর মাঠ প্রান্তর ফেলে আসা জীবনের অতীত হয়ে দূর স্মৃতির শিশু-উপলিক্ষা দিয়ে শরীর-মনে শির শির মায়া দিচ্ছে। নেশার মত, দুইস্কির স্বাদ কিম্বা হঠাৎ প্রথম আলোচনের মত একটা ভিজে কড়া অনুভূতি।

মন্মথও অনেকটা হালকা বোধ করছিল। এ-সব অঞ্চল তার কৈশোরের স্মৃতি জড়ানো অতি-পরিচিত : আম-বাগানের পাশে এই যে ফেলা মাঠ, ছেলেরা এখানে ফুটবল ক্রিকেট খেলত, রাস্তার ধারে এইসব কেবলগুলোতে আগে বুড়োরা বসে অবসরের গালগাল্প করত। এখন এখানে দেখছি জোড়ায় জোড়ায় ছেলে-মেয়েরা আসে! এই জলঙ্গী বাঁক, ও-পাশ দিয়ে বড় ঘাট, ওখানে শহরের ঠাকুর বিসর্জন হয়। ও, কতকাল ঠাকুর বিসর্জন দিতে আসি না। ছোটকালে এই মাঠে

পানসি নৌকা এসে লাগত। স্কুলের পরে এখানে এসে কতদিন পানসি নৌকার দিকে তাকিয়ে থেকেছি। মন যেন কোথায় চলে যেত। মনে হত পানসি নৌকাগুলো কতদূর থেকে আসছে কে জানে! ওরা এগিয়ে যাচ্ছিল। আরও কিছুটা এসে মন্মথ বলল, আরে সেই ছোট্ট মাঠখানা। স্কুল পালিয়ে আমরা কত এসেছি এখানে খেলার জন্য আর আড্ডা দিতে। এর নিচেই ত শ্মশান। এই মাঠে বাই-পাসের ক্ষেতের আলের উপর একটা বাবলা গাছের ছায়ায় বসে সুত্রায়ণ কবিতা শুনিয়েছিল। তারপর থেকে কবিতার চর্চা। খুব তিন চার লেখেছিল। একটা কাগজকাগজের পাতা ছিঁড়ে নাকের কাছে ধরে বলল, এখন সুত্রায়ণ রেলে চাকরী করে, কবিতা লেখে না। নাকি লেখে, আমাকে কিছু বলে না।

নীরবে সিগারেট টানছিল শুভ্রশীল। কেবলাবুড় শিরীষ গাছের ছায়া, পাখি-ডাকা বিকেল। গতকাল প্রচণ্ড জল নামার পর আজ আকাশ কিছুটা শুকনো। আকাশে মেঘ আছে বটে, তবে আজকে বাতাসের-ধাক্কায় ছুটোছুটি করছে। এখন বৃষ্টির কোন সম্ভাবনা নেই। স্বচ্ছ নরম হাওয়া। মন্মথর চটিতে ধুলো-মাটি স্মৃতি-রোমন্থন! ক্লান্ত দেহে বাতাস লাগার মত সুখ—

—কিরে, কেমন লাগছে?

শুভ্রশীল অস্ফুটে একটা গানের কলি ভাঁজছিল, বড় বেদনার মত বেজেছো।

সামনে রাস্তার উপর লাল শালুর ফেস্টুন নিয়ে একটা মিছিল এসে থামল। স্লোগানে স্লোগানে হঠাৎ সচকিত নিস্তব্ধ, বন মাঠ নদী। দু একখানা রিকসো। লোকজনের আনাগোনা, চেঁচা-মেচি। শুভ্রশীল বলল, কিরে বাবা, এখানেও মিছিল—

মন্মথ বলল, এখানে একটা ছোট্ট মঞ্চ আছে। মাঝে মাঝে সভা বা অন্য কোন সম্মেলন হয়, সিনেমা-থিয়েটারও হয়। এটাই আমাদের শহরের শেষ কোলাহল, এটাই শেষ সীমা: এর পর আমরা সীমানা পেরিয়ে যাব, যাবি নাকি আর, না ফিরবি?

শুভ্রশীল খুব জোর দিয়ে বলল, আমরা সীমানা পেরিয়ে যাব। হোসিয়ারী শ্রমিকদের সভা হচ্ছিল। দীর্ঘদিন ধরে ওদের আন্দোলন ধর্মঘট চলছে। কোলকাতাতেও ওরা দীর্ঘ মিছিল করেছে কয়েকদিন আগে, দেখেছে শুভ্রশীল। বলল, এখানে হোসিয়ারী শ্রমিক আছে নাকি?

—আছে। এ-অঞ্চলে হোসিয়ারী শ্রমিকরা বেশীর ভাগ পূর্ব থেকে আগত বিকদুজি, পাকনার লোক বেশী—মন্মথ আরও কি সব বলতে যাচ্ছিল, শুভ্রশীল থামিয়ে দিল। দেখ মন্মথ, ঐ বিকদুজি নামটা আর উচ্চারণ করিস না। ওর দিন সব নিরমদেশ দুঃস্বপ্নের দিন গেছে।

নিজের জীবন ধারণের জন্যে খয়রাতী সাহায্য ভিক্ষা করা কী দুর্দৈব!

মন্মথ বলল, আমরা বলি না বলি আবার ত সব বিকদুজিরা আসছে।

বুকে ব্যাজ আটকানো একজন কর্মী কৌটো হাতে করে এগিয়ে এলো, হোসিয়ারী শ্রমিকদের আন্দোলন ফাণ্ডে কিছু দিন—ওরা দুজনেই আবার পকেটে হাত ঢুকালো। কর্মীটি বলল, সিনেমা দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে, দেখবেন না—

মন্মথ বলল, দেখবি নাকি শুভ্র?

—সিনেমা দেখার কথা তুই ভাবতে পারলি মন্মথ। এখানে এই পাখি-ডাকা নদীর ধারে এই শান্ত গোধূলি সন্ধ্যায়—

মন্মথ বলল, আসলে এ-ভাবে ছবি দেখতে তোর ভাল লাগছে না। কত ভাল ভাল ছবি নিত্য দেখছিস—। এখানে চটের উপর বসে—

—বাজে বকিস না, শুভ্রশীল থামিয়ে দিল মন্মথকে, ছবি ত তুইও কম দেখিসনি, দেশী বিদেশী, সিনে ক্লাবের সেই দিনগুলি মনে নেই?

—মনে আছে!

—আমি ত এখন ও-সব ছেড়েই দিয়েছি, ও-সব কাজ অ্যাভেঞ্চেরাস কাজকর্মে আর উৎসাহ নেই। চল, এগিয়ে যাই, আজ আমার অদ্ভুত ভালো লাগছে। আজ আমরা সীমানা পেরিয়ে যাব—বিরক্তিকর প্রাত্যহিকতা থেকে আজ আমরা মুক্ত—

মন্মথর চোখের সামনে ভেসে উঠল কুসুমের খিটখিটে চেহারা, ছেলেমেয়ের দুষ্টির স্নান রোগ পাণ্ডুর মুখের ছবি। সীমানা পেরিয়ে যাব! যাবি শুভ্র, পারবি যেতে!

—কী বিরাট গাছটা! কি গাছ বলতো, শিরীষ? দেখ দেখ মন্মথ, পাখিরা কি সুন্দর কিচির মিচির করছে, অস্তগামী সূর্যের শেষ উজ্জ্বল আভা মগ ডালে। চল আমরা ডাইনের এই মেঠো পথ ধরে হাঁটি—

মন্মথ বলল, ও-পথটা নদীর বুকে নেমে গেছে। বালির উপরে হাঁটতে পা ধরে যাবে, কষ্ট হবে। শুভ্রশীল চলতে শুরু করলে, বলল, আচ্ছা চল। মনের থেকে যেন সায় দিতে পারছে না সে—

সামনে নদীর পাড়ে অতি প্রাচীনকালের একটা তেঁতুল গাছ বর্ষার ভীষণ জল-স্রোতে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে এখন বিকৃত-মূল, পুরনো ঘুণ-ধরা শেকড়ে নিজের বিরাট দেহটা আর যেন ধরে রাখতে পারছে না—। নদীর বুকে হেলে পড়েছে। হয়ত এবারের বর্ষাই গাছটার জীবনে শেষ বর্ষা হবে। সামনে সমান জমি। এই চরটার এখানে-ওখানে কয়েকটি চালাঘর। শুভ্রশীল বলল, নদীতে জল বাড়লে ওদের খুব কষ্ট, না? আজও আগের মতন চেঁচাতে চেঁচাতে ভয়ে ভয়ে হয়ত নদীর গভীর ঘোলা জলের পাকের মধ্যে অতলে তলিয়ে গেছে—

এ হচ্ছে অজয়

ক্লাসের মনিটর, ব্যাটিংএ দারুণ হাত
সব সময় চটপটে চকল

আসল জিনিষটি ওর চাই!

অজয়ের সবুর সয় না, বন্ধুদের বলে—দ্যাখ্ না, বাবার মত বড় হয়ে নিই।

ওর ইচ্ছে, চটপট বড় হবে, সবাইকে ছাড়িয়ে যাবে, সব কিছুতে চ্যাম্পিয়ন হয়ে উঠবে সে।

অজয়ের মা তাই তো ওকে রোজ হরলিক্স খেতে দেন।

হরলিক্সই হ'লো আসল জিনিষ।

হরলিক্সের ওপর ওর মায়ের অগাধ বিশ্বাস, তার কারণ হরলিক্স বাড়তি পুষ্টি আর প্রয়োজনীয় প্রোটিন যুগিয়ে ছেলেমেয়েদের বাড়ন্ত শরীর গড়ে তুলতে বিশেষ সাহায্য করে।

খাঁটি গরুর দুধ, উৎকৃষ্ট যব এবং অন্যান্য পুষ্টিকর খাদ্য দিয়ে তৈরী বলেই হরলিক্সের এত গুণ।

মায়েরা হরলিক্স পেলে আর কিছু চান না। ডাক্তাররা আজ ৮০ বছরের ওপর হরলিক্স খেতে নির্দেশ দিয়ে আসছেন।

রোজ হরলিক্স খেয়ে আপনার ও পরিবারের সকলের স্বাস্থ্য ও শক্তি বজায় রাখুন।

হরলিক্স সত্যিকারের পুষ্টি আর বাড়তি শক্তি দেয়।

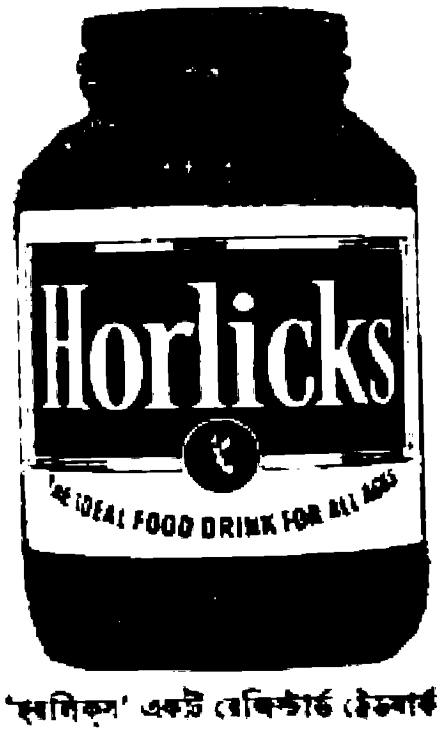

'হরলিক্স' হ'লো আসল জিনিষ

'হরলিক্স' একটি রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক

HL 1856A

মন্মথ বলল, দূর, তা কেন? ওদের অভ্যাস হয়ে গেছে। কোনবার বড় বন্যা না এলেই বরং ওদের ভাল লাগে না। ভাঙাগড়ার মধ্যে একটা থ্রিল আছে না! আমরা ঝুঁকে পড়ছি। দেখ, নদীর তটে আমরা অনেকখানি নেমে এসেছি—পেছনে দেখ—। শুদ্ধশীল এসব কথা শুনতে পেল কিনা সন্দেহ, সে ততক্ষণে অতিরিক্ত গতি পেয়েছে। হুড় হুড় করে দৌড়ে নামছে বালির পাড় ভেঙে। বালির রাস্তা, পা বসে যায়। গরু মোষ উপরে ওঠার জন্য বালি ভেঙেছে বেশী। নতুবা বর্ষাকাল বলে বালি আরও শক্ত থাকত। শুদ্ধশীল হাঁফাচ্ছিল—

মন্মথ ধীরে, সাবধানে নেমে এল। কাঁচা ঘাসের বোঝা মাথায় চাপিয়ে চাষীরা উপরে উঠছে। নদীর চড়া থেকে ঘাস তুলে ধুয়ে ধুয়ে আঁটি বেঁধেছে ওরা। মাথার উপর থেকে টস টস করে জল গড়াচ্ছে শরীরের উপর দিয়ে, ঘাড়ে পিঠে জলের ধারা। কিছুটা সমতলে নেমে শুকনো বালির উপর দাঁড়িয়ে শুদ্ধশীল স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল ওদের—

মন্মথ কাছে এসে বলল, কিহে ভাবটাব এল নাকি? কৃষাণের জীবনের নায়ক মনে হচ্ছে কি নিজেকে?

—নাঃ। বরং অজন্তার পাশের কোন রূপসীর গান গলা বেয়ে ঘাম ঝরার দৃশ্য পর্যন্ত কল্পনা করতে পারি। অমন্ত এই বড় পৃথিবীর কেউ নইরে মন্মথ—

ডাইনে পূবমুখো বড় ঘাটে মানুষের কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। কাউবনের বাঁকটা পেরিয়ে গেলেই বড় ঘাট পাওয়া যাবে। মন্মথর ইচ্ছা হচ্ছিল, ফিরে যায়। মানুষের কোলাহলের দিকে ফিরে যেতে তার মন ছটফট করছিল। শুদ্ধশীল ততক্ষণে পশ্চিম দিকে চলতে শুরু করেছে। ও-দিকে নদীর জলে সামান্য লালের আভা। পরপারে বাবলা বনের আড়ালে সূর্য অস্ত গেছে। শুদ্ধশীল তখন মেজাজ পেয়েছে, ক্ষেপেছে। তখন সেই সীমানা পার হয়েছে। ক্লান্তিকর লোকালয় থেকে এখন মুক্ত। সে একটা নতুন রবীন্দ্রসঙ্গীতের কলি ভাঁজতে লাগল, ও যে সুন্দর বিপুল সুদূর—

মন্মথ কোন না কোনভাবে বাধা দিতে চেষ্টা করল। আসলে সে চাইছিল, শুদ্ধশীল পশ্চিমের দিকে যেন না যায়। পশ্চিমপ্রান্ত এখানে বড় নির্জন, বড় শূন্য—সে জানে। এখানে তাকে আসতে হয়েছিল অজন্তাকে নিয়ে। শুদ্ধশীলকে সে আটকাতে পারল না। সে তখন দ্রুতগতি, অনেকটা পথ এগিয়ে গেছে সামনে। নদীর চড়া এখনও বিস্তৃতই বলতে হবে। আষাঢ় মাসেও তেমন জমাট হয়ে ওঠেনি। বোধহয় দেরীতে বন্যা আসবে। শুদ্ধশীল টেনে টেনে বুক ভরে নিশ্বাস নিতে নিতে এগিয়ে চলেছে। পেছনে মন্মথ, অনেকক্ষণ নীরব। কি সব আজে বাজে ভাবছে। প্রতিটি পদক্ষেপ সে যেন মেপে মেপে ফেলছে। এখানে চড়ায় বালির উপর পোড়া কাঠের টুকরো, কয়লার কুচি পড়েছিল। ডাইনে বামে ইতস্তত ছেঁড়া মাদুর, কয়েক গাছা দড়ি, পোড়া বাঁশের টুকরো এলোমেলো ছড়ানো ছিটানো। জলের ধারে কয়েকটা ছোট বড় মাটির হাঁড়ি মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। শুদ্ধশীল নিচু হয়ে কি যেন তুলল। লোহার বালা একখানা। মন্মথ কাছে এসে বলল, কিহে শ্মশান টশান নাকি? বা বাব্বা—

মন্মথ বালাটি দেখে বলল, বউটি ভাগ্যবতী, এয়োতির চিহ্ন নিয়ে চলে গেছে। তাই না?

—হুঁ। মানুষটি ভাগ্যবান, যেহেতু ভাগ্যবানেরই বৌ মরে—

—সত্যিই যদি মরে তখন মজা টের পাবি।

—মন্মথ, তুই কি সত্যই বিশ্বাস করিস মানসীকে বিয়ে করে আমি সুখী? বল বিশ্বাস করিস? শুদ্ধশীল অস্বাভাবিক জোর দিয়ে ওর অসুখের দিকগুলো বুঝাতে চাইছিল।

মন্মথ বলল, সুখ না অসুখ—এসব কিভাবে ভাবতে হয় শুদ্ধ?

—হোপলেস!

সন্ধ্যা ঘোর হয়ে আসছে। পেছনে অদূরে পাকুড় গাছটা ঘিরে অন্ধকার গাঢ়তর হচ্ছে। উঁচু ডালে শকুনেরা বাসা বেঁধেছে। নৈঃশব্দ্য কাঁপিয়ে মাঝে মাঝে চিঁহি চিঁহি করে ডাকছে, পাখা নাড়ছে বিকট শব্দে। সামনে পরপারের মাঠ, বিস্তীর্ণ প্রান্তর। মাঝে মাঝে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটি বাবলা গাছ। সেই দিকে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে শুদ্ধশীল বলল, বড় পবিত্র জায়গা হে, অপূর্ব! শালার চাল ডাল বাজার বৌ সংসার এখন আর আমাদের স্পর্শও করতে পারবে না। কি রে, কথা বলছিস না কেন? ভাব এলো নাকি?

—ভাব! আমি ভাবছিলাম অন্যকথা। ছেলেমেয়ে দুটি নিয়ে কুসুমকে একা একা খুব ঝামেলা সইতে হবে। ভীষণ রেগে যাবে বুঝলি। বিকেলের বাজার-টাজারও নিয়ে যাবার কথা ছিল—

—গুলি মার তোর বাজারের। দেখ, কি সুন্দর মাথার খুলিটা। চল দেখা যাক। শুদ্ধশীল সত্যিই খুলিটার দিকে ঝুঁকে পড়ল।

অজন্তা নামের মেয়েটা বিদ্যুৎ বেগে মনের উপর দিয়ে হেঁটে গেল। এই পাকুড় গাছটার নিচেই ত অজন্তাকে দাহ করা হয়েছিল। মন্মথ মরীয়া হয়ে বলল, চল ভাই ফেরা যাক—। নাইলে ভীষণ অসুবিধায় পড়তে হবে—

—অসুবিধায় পড়তে চাই, পড়ব। দেখ মন্মথ, আজ আমি যেন কম্প্রমাইসের মধ্যে নেই। আজকালপরশুর সংস্কারকে আমরা অস্বীকার করব। আবর্জনার স্তূপের মধ্যে মুখ গুঁজে নিঃশ্বাস নিতে নিতে আমি হাঁফিয়ে উঠেছিলাম। আজ প্রাণভরে মুক্ত বায়ু নেব। তুই না বাড়ি থেকে একবার পালিয়েছিলি—?

—হুঁ। পালিয়ে বেশীক্ষণ থাকতে পারিনি।

—মর। আয়, ও-সব ঝামেলা তোলার জন্য এই নদীর চড়ায় আমরা দৌড়াই; রেডি, ওয়ান-টু-থ্রি—

শুদ্ধশীল সত্যিই দৌড়তে শুরু করল। মন্মথ বন্ধুর কাছাকাছি থাকতে চাইছিল। পারল না। অনেক পেছনে পড়ে গেল সে। শুদ্ধশীল সামনে এগিয়ে একটা আকন্দ ঝাড়ের পাশে বালির উপর শুয়ে পড়ল। দূর থেকে তাকে দেখা যাচ্ছিল না। মন্মথ নিজেকে হঠাৎ একা ভাবল। যথার্থ একা। যেন জগৎ সংসারে তার কেউ নেই। সে এখন অজন্তা নামের মেয়েটার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ভীষণ নিঃসঙ্গ অসহায় বোধ করতে লাগল। সে প্রাণপণ চীৎকার করল, শু-দ্-ধ-অ—। কোন সাড়া নেই। ও-পার, এ-পার পাকুড় গাছের ডালে সে ডাক আছড়ে পড়ল ঝন ঝন করে। শকুনেরা পাখা ঝাপটাতে লাগল। মন্মথ শুদ্ধশীলের কাছে যাওয়ার জন্য দৌড়াতে লাগল। অনেককাল সে দৌড়ায় না। স্কুলে পড়ার সময় দৌড়ে দ্বিতীয় পুরস্কার পেয়েছিল সে। এখন বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করছে। হৃৎপিণ্ডটা দাপাদাপি করছে। শুদ্ধশীল এতক্ষণে আকন্দ গাছের আড়াল থেকে উৎসাহ দিল, সাবাস জোয়ান, আরও জোরে— আরও—। শুদ্ধশীলের কাছে এসে ভিজে বালির উপর আছড়ে পড়ল মন্মথ। নিশ্বাস নিতে তার খুব কষ্ট হচ্ছিল। সে তাড়া খাওয়া জানোয়ারের মত হাঁফাচ্ছে।

বালির উপর মাথা রেখে চিৎ হয়ে পড়েছিল মন্মথ। শুদ্ধশীল টুকরো টুকরো কথা বলছিল। জীবনানন্দ দাশের কবিতা, শীতের বিকেল জ্যোৎস্না রাতের হিরাকুদ বাঁধ, ধবধবে চাঁদিনী রাতের গড়ের মাঠ, পূর্বা নামের মেয়েটি—এসবই তার কথায় ঘুরে-ফিরে আসছিল। মন্মথ কিছুটা শুনেছিল। অনেকটাই শুনছিল না। এখন এতটা পথ দৌড়ে এসে, রক্তের দ্রুত ওঠা-নামার পরে মন্মথ ক্লান্ত, হাত-পা কেমন ভেঙে আসছে, মাথাটা বালির উপর শিথিল। বাড়ি ছেলেমেয়ে কুসুম লোকালয় আলো—মন্মথকে ফিরে যেতে টানছে। 'আমি আলো চাই, আলো' অস্ফুটে বলল সে। পাড়ার যাত্রাদলে কিশোর বয়সে একবার মেয়ে সেজেছিল মন্মথ। চঞ্চলা কুমারী মেয়ে দাদুর কথায় রাগ করে দ্রুত প্রস্থান করেছে, কপট রাগে সে ফুঁসছে তখন। সেই সময় হঠাৎ খুব আচমকা স্টেজের আলো দপ করে নিভে গেল। আলো নেই, কোথাও আলো নেই। গোটা রঙ্গমঞ্চ জমাট অন্ধকারে ডুবে

গেল। চারদিকে চেঁচামেচি হৈ চৈ। বন্ধু নাদু পাড়ার বলাইদা তখন পাশে. আঠা দিয়ে লাগানো দাড়ি-গোঁফ সমেত মন্মথকে জড়িয়ে ধরে আদর করতে লাগল।... মন্মথর সেদিন দম বন্ধ হয়ে আসছিল। সে আলো চাইছিল, আলো; স্বপ্নমণ্ডপেও ফিরে যাবার জন্যে সে তখন ছটফট করছে—

—তুই কি পাগল হয়ে যাওয়ার মত স্বপ্ন দেখেছিস মন্মথ। টানা চোখ চলতলে মুখ নরম বুক, আর দীর্ঘ একহারা চেহারা—কী বিরাট চুল—দেখেছিস?

মন্মথ বলল, হয়ত দেখেছি। আসলে কি জানিস শুভ্র, অজন্তাকে ভাবতে এখন আমি ভীষণ ভয় পাচ্ছি। আমি ওকে ভুলে যেতে চাই—

কেন?
সে নেই যে—
ও! ভেরি স্যাড্—

নদীর মাঝখান দিয়ে একটা লোক সেই থেকে ডিঙি বেয়ে চলেছে। অস্পষ্ট অন্ধকারে লোকটা কোথায় কতদূরে যাবে কে জানে। মন্মথ নদীর মাঝখানে লোকটার দিকে তাকাল। পেছনে পূর্ব-দক্ষিণ প্রান্তে বুড়ো পাকুড় গাছটা—এখানেই ত অজন্তার রক্ত মাংসের যুবতী শরীরটা পুড়ে ছাই হয়ে যেতে দেখেছে মন্মথ। এক বোঝা কাঠের তলা থেকে শেষবারের মত এক-খানি ছোট্ট কপাল, ধবধবে সাদা সিঁথি আর লম্বা কালো চুল, আর অজন্তার সেই অর্ধ-মুদিত প্রশান্ত আয়ত চোখজোড়া। তার বিকৃত শরীরের বাকি অংশ কাঠের তলায় চাপা পড়েছিল। মন্মথ অস্পষ্ট বিড়-বিড় করছিল। স্কাউণ্ড্রেল ভগ্নীপতিটা অজন্তাকে নষ্ট করেছিল, ওর পবিত্র শরীর-মন দূষিত করে ওকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছিল। শুভ্রশীল তখন পূর্বা প্রসঙ্গে তন্ময়। ফলত ওরা পরস্পর আড়াল হয়ে অন্যমনস্কভাবে জলের দিকে তাকিয়ে বসে ছিল।

কোথা থেকে কি দিয়ে শুরু করবে শুভ্রশীল বুঝতে পারছিল না। কিছুক্ষণ চেষ্টা করার পর হঠাৎ বালির উপর টান টান হয়ে শুয়ে পড়ল। হাত-পা ছুঁড়ে গড়াগড়ি খেয়ে দাপাদাপি করতে লাগল।

মন্মথ হতবাক. বলল, এই শুভ্র, অমন করছিস কেন, ওঠ না—

শুভ্রশীল উঠল না, বালির মধ্যে মুখ ঘষতে ঘষতে বলল, মন্মথরে, আমি বোধ-হয় পাগল হয়ে যাব। আমি দেখ কোথাও শান্তি পাইনে। এখানে এসেও ধর্মঘটে চাকরী যাওয়া অমিতাভদাকে মনে পড়ছে, দুষ্টক্ষত রোগে জরাজীর্ণ মললী, বহুদিন হারিয়ে যাওয়া পূর্বা—সকলেই আমার মাথার মধ্যে কিলবিল করছে—

মন্মথ কিছুটা সামলে নিয়েছিল। বলল, ও-সব রেখে ভুলে যা না। একখানা জমজমাট প্রেমের গল্প শুরু কর, শুনি—

—এই অন্ধকারের মত, এই নদীর স্রোতের মত, ও-পারের বাবলা গাছের অস্পষ্ট ছায়ার মত কোন প্রেমের গল্প বলব?

শুভ্র! অস্ফুট চীৎকার করে সোজা হয়ে বসল মন্মথ। না, তুই বল—

শুভ্রশীলও সোজা হয়ে বসল। কি হলো? বা বাব্বা—

—দে, একটা সিগারেট দে—

শুভ্রশীল প্যাকেট থেকে সিগারেট বের করে মন্মথকে দিল। নিজের মুখে পুরল একটা। ওর হাতে ফস্ করে দেশলাই জ্বালার শব্দ হল। মুহূর্তে একটা আলোর ঝলক। আবার অন্ধকার। মন্মথ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, কি হলো, বল?

শুভ্রশীল বলল, এখন নন্দার জন্যেও দুঃখ হয়। মেয়েটি আমাদের পাশেই ভাড়া থাকত। আমার প্রতি ওর একটা দুর্বলতা ছিল জানতাম। রাস্তার মোড়ে বাস স্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে ছিল। কাছে যেতেই বলল, এত দেরী করে এলেন কেন? দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে আমার পা যে ব্যথা হয়ে গেল। সেই মুহূর্তে ওকে খুব ভাল লাগল। চায়ের দোকানের খুপরির মধ্যে বসলাম দুজনে। আমি বললাম, বল কি খাবে, নাকি খাওয়াবে—

নন্দা বলল, খাওয়াতেও পারি, বলুন?
কি?
কি খাবেন—
অনেক কিছুই ত খাওয়ার ইচ্ছে—
কী অসভ্য!

আমার তখন খারাপ লাগতে শুরু করল। আর এগোতে দেওয়া ঠিক হবে না নন্দাকে। আমার আসল লক্ষ্য ত নন্দা নয়, ওর বন্ধু পূর্বা। আমি দ্রুত আসল প্রসঙ্গে চলে গেলাম। বললাম, পূর্বাকে ত তুমি চেন, একই সঙ্গে পড়তে! ও প্রথমে চুপ, কুচকালো। ওর মুখের আশে পাশে কালো রেখা বিস্তৃত হল। নন্দা পড়ত বটে পূর্বার সঙ্গে, সে স্কুলের গণ্ডীও ছাড়াতে পারেনি। পরীক্ষা এখনও বের, এই মাত্র। বলল, হাঁ পড়তাম, কেন?

একখানা চিঠি ওকে পৌঁছে দিতে পারবে, আজই, খুব জরুরী—

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠল নন্দা, বলল, দূতী হতে পারব না। বলেই দ্রুত বের হয়ে গেল—

চোখের সামনে নদীর মাঝখানে নেংটি পরা মাথায় গামছা বাঁধা লোকটা তখনও ডিঙি বাইছিল। লোকটি কালো অন্ধকারের মত। ও-পারের বাবলা গাছের ছায়ার মত। মন্মথর মুখ থেকে কথাটা বের হয়ে গেল, আমাদের নিয়ে যাবে মাঝি?

মাঝি! মাঝি কোথায় দেখলি? পরে একদিন বেশ মজা হয়েছিল। আমার অফিসের ঘরে, কলেজ পালিয়ে দুপুর বেলা, আমার ছোট্ট চেম্বারে মন দিয়ে বসে পূর্বাকে বলেছিলাম নন্দার কথাটা। পূর্বা দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে চুপচাপ শুনেছিল। সব শুনে বলেছিল, তুমি এত ইয়ে, মানে ক্রুয়েল টাইপ—। বোধ, আমার ত মনে হয়, পূর্বাই অনেক ক্রুয়েল। বহু জানিয়েছে আমাকে। কিন্তু সে কথা তখন বলা চলে না। পূর্বাকে নিয়ে অনেক আকাঙ্ক্ষা মেটানোর ইচ্ছা তখন প্রবলতর, পরিবেশটা তাই হালকা করা দরকার। বললাম, সে ত তোমারই জন্যে, বলে ওর মাথার দীর্ঘ বেণী নিয়ে খেলা করছিলাম। পূর্বা দেওয়ালের দিক থেকে মুখ ফেরাচ্ছিল না। হয়ত ভাবছিল, টিকটিকিটা একদিন, ওর সঙ্গীকে ডেকে নিয়ে নিশ্চয় খেলতে পারে ত—

—তুমি ওদিকে কোথায় যাচ্ছ, মন্মথ জলের দিকে একটু ঝুঁকে পড়ল, ডিঙির ও-দিকটাতে আমাদের নামিয়ে দেবে নাকি?

শুভ্রশীল বিরক্ত হল। বলল, সেই থেকে তুমি অদ্ভুত একটা মাঝি দেখছ। তোমার কি কোন হ্যালুসিনেশন হচ্ছে?

এবং সত্যি সত্যিই মন্মথর চোখের সামনে থেকে নৌকা এবং মাঝিটা তার কালো ছায়াটা নিয়ে মিলিয়ে গেল। মন্মথ ক্রমশ শিথিল হতে লাগল। হাতখানা পর্যন্ত তুলতে পারছে না, এত ভারী! সারা শরীরে ঘাম। এমন হল কেন? অজন্তা কি তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে! মন্মথর এক মুহূর্তও আর এখানে থাকতে ভাল লাগছে না। ছেলেমেয়ে দুটি আর কুসুমের কথা তার খুব মনে পড়ছে। কুসুমের শরীর ভাল নয়। শুভ্রশীলের জন্য নিশ্চয়ই বাড়ে রান্না করতে হবে। বাজার করা হয়নি। দুমাস মাইনে নেই। কুসুম একা একা কি যে করছে—

শুভ্রশীল সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে পূর্বা প্রসঙ্গে আবার ফিরে গিয়ে-ছিল। অনেককাল পরে শ্যামবাজারের মোড়ে দেখা হয়েছিল পূর্বার সঙ্গে। সে এখন মেয়েদের কলেজে পড়ায় নাকি। চেহারা অনেক স্থূল হয়েছে. গলায় ঘাড়ে মাংসের ভাঁজ। গম্ভীর হয়েছে। দুজনেই দুজনের মুখের দিকে তাকিয়েছিল অনেকক্ষণ। কেউই কোন কথা বলল না। এক সময় পূর্বা বাসে উঠলে শুভ্রশীলও হাঁটতে লাগল। সেদিন নাকি শুভ্রশীল একা একা অনেক মদ খেয়েছিল।

মন্মথ চুপ করে আছে। আসলে শুভ্র-শীলের গল্পটা তাকে তেমন আকর্ষণই করতে পারে নি। আজকাল কোন প্রেমের কাহিনীও কেমন যেন আটপৌরে, স্বাভা-বিক এবং রহস্যশূন্য মনে হয়। অথবা এমনও হতে পারে, গল্পটার শুরুতেই অজন্তা এসে তার মনে ভিড় করেছিল।

করে পাল্টে ভালভাবে সে বুঝতেও পারে নি। মৃত্যুর আগে অজন্তা বলেছিল, আবার খুব ভাল লাগছে, তুমি যে পাশে আছো। কথাগুলো মন্মথকে অজন্তার কাছাকাছি টেনে রেখেছিল। অথচ আলাদা করে এ-সব কথা শুদ্ধশীলকে বলাও এখন আর কোন অর্থ হয় না। কেননা বরানগরের বাসস্টপ, শ্যামবাজারের মোড়, ট্রাম-বাসে শহরের যে-কোন তীর্থ স্থানে শুদ্ধশীল হয়ত পূর্বার দেখা পেতেও পারে। কিন্তু মন্মথ অজন্তাকে দেখতে পাবে না কোথাও। ঐ নিঃসঙ্গ ব্যক্তির ছায়ায় ঘরে অজন্তাও এখন অন্তরীণ, মন্মথর আশে পাশেই ঘুরবে, শরীর হয় সুখ অথবা ব্যথা হয়ে, কোন দিনও সে ছুঁতে পারবে না অজন্তাকে—

—তোকে কিন্তু বেশ গম্ভীর দেখাচ্ছে—

—তুই কি লক্ষ্য করেছিস শুদ্ধ, ও-পারের বাবলা গাছগুলো কেমন যেন ছায়া-ছায়া অস্পষ্ট মনে হচ্ছে—

—মনে হচ্ছে, তার কি অন্ধকার হ—

—আমার সামনে দাঁড় নৌকো ও তার মাঝি আবার আসতে পারে—

—পাগল! কি বিজনেস—

—অজন্তার নিরব হাত যদি সে বাড়িয়ে দেয়!

—কি সব ননসেন্স বকছিস?

—জানিস, আমার সামনে প্রিমুসের আলো দপ করে নিভে গেল। তখন কেউ যেন আমার গলা টিপে ধরছে—

—সে ত সর্বত্র জানার। আমাদের সবারই পাঁচটা আঙুল আমাদেরই কণ্ঠনালীতে চেপে আছে। নাথিং নিউ—

মন্মথ চুপ করে থাকল। এখানে বিস্তীর্ণ নদীর তটভূমি, সামনে জলস্রোত, দুপাশে বাবলা গাছের সারি, আকাশে ধীরে ধীরে নক্ষত্রেরা ফুটছে। শুদ্ধশীল বলল, মন্মথ, তুই তোর জীবনের কথা কিছু বল—

মন্মথ নীরব।

—কোন দিন ভালবেসেছিস মন্মথ, পাগলের মত, জন্তু লাইক এনিথিং—ধর, খ্যাপা কুকুরের মত। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে বলল, তুই ভারি চাপা, তিন বছর ত একসঙ্গে কাটিয়েছি কোলকাতায়, এখন দেখছি ঐ সময়টায় তুই নিজের সম্পর্কে কোন কথাই বলিসনি—

বাজে বকিস না। এখন আমি অজন্তার মৃত্যুর পাশে দাঁড়িয়ে আছি। কলিজলের বিবাহ কথা ওর মনে বনে ছিলে গেছে। আইডিয়াল অন্তর্দৃষ্টিটা, বর্জিত শুদ্ধ, শুধু কাজ এ-সব মানুষকে মারা দরকার। অজন্তার শরীরে কষ্ট বড় ছিল। অথচ ওর কুমারী দেহে সন্তানের আবির্ভাব স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে, কি রকম যেন সাদা ফ্যাকাশে হয়ে থাকত—

চলতে চলতে দাঁড়িয়ে পড়ল শুদ্ধশীল। আমরা কোন দিকে যাচ্ছি?

—অজন্তার দিকে—

—এই মন্মথ, পাগলামি করিস না। বল কোন দিকে যাচ্ছি? বুঝতে পারছিস ত, আকাশের তারা দেখে দিক ঠিক কর—

ওরা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকাল। মেঘ মেঘ ধূসর আকাশের কোথাও কোথাও এক আধটা তারা মিটমিট করছে। ছায়াপথ দেখা যাচ্ছে না ত। শুদ্ধশীল উপরে তাকিয়েই বলল, কী অসীম নৈঃশব্দ্য, কী বিরাট।

—বাঁ পাশ দিয়ে চল।

একটু এগিয়ে যেতেই কাঁটার বেড়া, শক্ত এবং উঁচু। বাবলা গাছের কাঁটা-ডাল জড়িয়ে দেওয়া আছে। এই কাঁটার বেড়া ডিঙিয়ে যেতে হবে। তারপর মাঠ, তারপর কৃষকদের চালা ঘর। তারপর এগিয়ে গেলে লোকালয়। শহরের সীমানা—এখানে অনেক মানুষ, কোলাহল। সেই লোকালয়, কোলাহল ওদের সামনে লক্ষ্য। ওরা খন হয়ে হাতে ধরাধরি করে এগিয়ে যাচ্ছিল। পথের কোন চিহ্ন নেই। কাঁটার বেড়া মনে হচ্ছে অনেক দূরে বিস্তৃত। আকাশের দক্ষিণে মেঘ জমছে। ওদের মুখের কথা সংক্ষিপ্ত হয়ে আঃ ওদিকে ইস্, কাঁটা সামনে, ইত্যাদিতে শেষ হচ্ছিল। শুদ্ধশীল চলতে চলতে বলল, আমার পায়ে একখানা বইয়ের কি ঠেকল। দেখ ত। নিজেই দেশলাই জ্বালল। একখানা পাতা ছেঁড়া গীতা। হঠাৎ আলোতে মন্মথ দেখল, আশেপাশে ছেঁড়া কাগজ, টুকরো বাঁশ, কাঠ কয়লা... আবার অন্ধকার।

—আঃ

—কি হলো?

—কাঁটা ফুটেছে পায়ে, চাঁটির পাশ দিয়ে—

—দেখি দেখি, শুদ্ধশীল নিচু হয়ে মন্মথর পায়ের কাছে মুখ নামিয়ে আনল। মন্মথ পা তুলে ধরল। এ যে হাড় একখানা। বা বাব্বা—

—দাঁড়া। আবার দেশলাই জ্বালাব নাকি। তোর পায়ে শালা মানুষের হাড় ফুটেছে—

—অজন্তার নয় ত! কে জানে! শুদ্ধ, আমার মাথাটা কেমন ঘুরছে রে! আমি কি পড়ে যাব!

—কি হচ্ছে এ-সব! এই মন্মথ, এখনও আমরা পথ পাইনি। সীমানার বাইরে রয়েছি—এই হাত ধর। তোদের শ্মশানটা শালা এমন গোলকধাঁধা জানলে কে আসত এখানে—

কিছুদূর এগিয়ে এসে দুজনেই থমকে দাঁড়াল। বিশ্রী একটা পচা গন্ধ। অদূরে শাকুড় গাছে শকুনেরা ডানা ঝটপট করছে। শেয়ালের খাঁক খাঁক, কুকুরের ঘেউ ঘেউ ডাক শোনা যাচ্ছে। শুদ্ধশীল বলল, কাউকে ঠিক সাপ-খোপে বা এমনিতেই ফেলে গেছে। শেয়াল কুকুরে ছিঁড়েছে—এই মন্মথ, এই—কি হলো রে। মন্মথ, কি দেখছি। আমরা এখনও লোকালয় পাইনি, মন্মথ—

বাবলা গাছের কাঁটা ডাল দিয়ে ঘেরা বেড়া ভেঙে শুদ্ধশীল টানতে টানতে মন্মথকে ও-পাশের কৃষকদের ধানের জমিতে এনে ফেলল। দুজনেরই জামা-কাপড় ছিঁড়ে গেল, হাত-পা কেটে রক্ত বের হচ্ছিল। এ-পাশে এসে ধানের জমির মধ্যে কিছুক্ষণ পড়ে থেকে মন্মথ উঠে বসল। শুদ্ধশীল টেনে তুলল মন্মথকে। ধানের মাঠ পার হয়ে মন্মথ বলল, ছেড়ে দে, আমি যেতে পারব। চলতে চলতে বলল, কি যে হঠাৎ হয়ে গেল।

শুদ্ধশীল আর কথা বাড়াল না। দুজনেই ক্লান্ত। কোথায় কতদূরে এক অচেনা জগতে ওরা যেন হারিয়ে গিয়েছিল। এখন অনেক দূরের পথিক যেন ফিরছে। সামনে চাঁটি আর ওরাঁও বনের মাঝখান দিয়ে আলোর রেখা দেখা গেল। আরও একটু এগিয়ে এসে ওরা কৃষকদের চালা ঘর দেখতে পেল। আরও কিছুটা এগিয়ে এসে পাকা সড়কে উঠে দেখলাম, আর দ্বিতীয় পারের ছায়ায় হোমিওপ্যাথী ডাক্তারদের সভা ও অনুষ্ঠান। এখানে অনেক মানুষ। অনেক আলো। ওরা চির পরিচিত লোকালয়ের দিকে, আলোর দিকে হাত ধরাধরি করে ক্লান্ত পায়ে যথাসম্ভব দ্রুত এগিয়ে চলল।

বিনা অস্ত্রোপচারে
অর্শ থেকে
আরাম পাবার
জন্য
হ্যাডেনসা
ব্যবহার করুন!

সুখের মেলা

ভালবাসা রাঙা ডালিম ফুল

গোটা শরীরে হাড়ভাঙা পরিশ্রমের ক্লান্তি। পেটজোড়া ক্ষুধা-নেকড়ের আঁচড়ানি। কিন্তু তবু কেন যেন বুকের বাঁশিতে গুমরে ওঠে মাতাল-করা সুরের কলি।

রায়েদের নৌকো ঘাটে বেঁধে রেখে দাম কড়ি চেয়ে নিয়ে চাল-ডাল কিনে বাড়িতে ফিরে এল সুন্দর।

চাল ধুয়ে রান্না বসালে। কে আর বাটনা বাটে! ডাল কটা এক টুকরো কানিতে বেঁধে ছেড়ে দিলে হাঁড়িতে। চালের বস্তা থেকে আড়বাঁশিটা পেড়ে নিয়ে সারাদিনের পর বসল সে ছিটে-বেড়ার দেওয়ালে হেলান দিয়ে। মাঝে-মাঝে উনোনের জ্বলন্ত কাঠ-কুটোগুলো ঠেলে দেয়। কত কথায় অন্যমনস্ক হয়ে যায়।

নৌকোর লগি ঠেলে এসে সারাদিনটা আজ নির্জলা-পানি অবস্থায় কাটল সুন্দরের। সারা গায়ে পরিশ্রান্তির ব্যথাটা চারিয়ে বেড়াচ্ছে। জ্বর-জ্বর ভাব। মাথাটা ঝিম-ঝিম করছে। একমুঠো রান্না না করলেও নয়।

আজ যদি তার মা কিম্বা বোনটা থাকত তাহলে এত কষ্ট করে এসে আগুনের ধারে বুক পেতে বসতে হতো না।

মা—বাবা—বোন!...

কোথায় যে গেল তারা!

শঙ্খচূড়ের গর্জনে সমুদ্র তরঙ্গ-সংক্ষুব্ধ হয়ে উঠল।

বিরাট একটা পাহাড়-প্রমাণ ঢেউ এসে আছড়ে পড়ল বাসুলী গাঁয়েও। কংকালের হাহাকারে আকাশ আর মাটির ইতিহাস ভরে গেল কালো কলঙ্ক রেখায়।

পঞ্চাশ লক্ষ জীবনের কৈফিয়তহীন রোমহর্ষক একটা কালো রেখা। তারই গভীর অতলে হারিয়ে গেল সুন্দরের নওজোয়ান বাবা, তার মা আর যুবতী বোনটা।

ভোরের আঁধার চিরে পূবের আকাশ আলো করে সূর্য উঠতে তখনো ঢের দেরি। স্পষ্ট মনে পড়ে সুন্দরের : কানাভাঙা মাটির শানকি নিয়ে, সুন্দর যাবে না বলে মেরে-পিটে ফেলে রেখে সেই যে তিনটে বুভুক্ষু প্রাণী চলে গেল কোথায়—কোন্ লঙ্গর-খানার উদ্দেশে, কে জানে! তারা আর ফিরে এল না।

সুন্দর বুকে হাত বেঁধে কেঁদে-কেঁদে অনেক খুঁজেছে। মা-বাবা আর বোনটার কোনো সন্ধানই পায় নি সে।

নিকষ কালো—পোড়া কাঠ কয়লা চেহারা—ক্ষুধার আগুনে ধকধক করে জ্বলছে দুটো ঘোলাটে চোখ। পরনে জড়ানো এক-ফালি নোংরা নাকড়া বয়স তখন আন্দাজ দশ কি বারো।

লহরতলীর নোংরা গলির একটা অতিজঘন্য 'আদর্শ হোটেলে'র সামনে দাঁড়িয়েছিল সুন্দর।

পেটভাতায় থেকেও যদি একটা কাজ পায়...সে বাসন মাজাই হোক আর জল তোলাই হোক।

হোটেলের মালিক একজন অবাঙালি ভদ্রলোক। হাতে-পায়ে ধরে একটু কাকুতি-মিনতি করতেই হয়ে গেল। পেটভাতায়! পরনের কাপড়-চোপড় বা পুজো-পার্বন দেখবার মতো দু-চার আনা পয়সাও না।

বিপদে পড়িয়া সাধু...তাই সই।

কিন্তু বাসি-পচা ডাল-তরকারী খেয়ে-খেয়ে দুবেলাই শুধু ঢেঁকুর উঠতে লাগল সুন্দরের। তারপর ঘুষঘুষে জ্বর। মাকে-

মাঝে কেবলই তার মনে হোত পালিয়ে যাবে সেই শয়তানের আস্তানা থেকে: ছুটে একেবারে বাসুলীর মাটিতে। ঘরখানা পড়ে আছে।...হয়তো ফিরে এসেছে তার মা-বাবা-বোন। না, আর নয়—কালই চম্পট দেবে সে।

হাড়ের মজ্জাগুলো খুঁজে কুরে-কুরে খাচ্ছে জ্বরের পোকাগুলো। হামাড়-ঘেরা পাপের খোপটার মধ্যে মালিক রামহরি যেন কার সঙ্গে মিঠে-মিঠে বাত বলছে! রোজই তো বলে! দুটি ভাত দেবার লোভ দেখিয়ে রোজই ও জোগাড় করবে এক-একটা মেয়ে-মানুষ!

পরের দিন কিন্তু বেড়েছে জ্বর। হুঁস-পবন নেই সুন্দরের। গলির সেই মিতে ছেলেটা এসে মাথা টিপে দিয়ে, নিয়ে গেল তার সুন্দর নকশা-কাটা আড়বাঁশিখানা। মিতে যদি একটু শান্তি-সোয়াস্তি পায়।

কিন্তু রামহরি যে এতক্ষণ চেঁচাচ্ছিল তা বুঝি শুনতে পায় নি সুন্দর? মিতে কাঁচুমাচু হয়ে বললে, 'সুন্দরের জ্বর!'

'জ্বর হওয়া বার করছি! শালা, বদ-মাসের ধাড়ি। বেরো শালা!'

ছুটে এসে একটা লাথি সাঁটলে রামহরি, সুন্দরের ঠিক পাঁজরে! জ্বরের ঘোরে শুধু একবার খানিকটা এঁকে-বেঁকে উঠে আর্তনাদ করে উঠলো সুন্দরঃ 'মাগো!'...

পরের দিন মার-ধাটের হঠাৎ যেন জ্বর-টর সব ছেড়ে গেল সুন্দরের।

দারুণ পিপাসায় কণ্ঠনালী শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। পাশের ঘরে টিমটিম করে আলো জ্বলছে। হামাগুড়ি দিয়ে ফুটোটাতে মুখ গলালে সুন্দর।

একটা মেয়ে যেন চাপাস্বরে আর্তনাদ করছে। অবিকল তার বোনের গলার স্বর যেন!

অস্বচ্ছ আলোয় মুখটা বিকৃত! পাশেই রামহরি।

কট করে হাতটা বাড়িয়ে কি একটা বস্তুকে টেনে তুলে নেয় সুন্দর। কেরোসিনের বোতল। মারবে সে রামহরির মাথায়। কাঁচুড়-কাটা করে দেবে তার বেলের মতো চকচকে টাকওলা মাথাটা। কিন্তু... না, তার বোন নয়।

কোণের ঘুলঘুলি দিয়ে হামাড়ি খেয়ে গলে বেরিয়ে এল সুন্দর। বাইরে এসে একটা নিশ্বাস ফেললে। স্নিগ্ধ এক ঝলক হাওয়া এসে জুড়িয়ে দিয়ে গেল সারা দেহটা।

মাথার ওপরে হীরকখচিত চাঁদোয়ার নীল কাপড়ের সীমাহীন শামিয়ানা পাতা। এগিয়ে চলল সুন্দর শহরতলী ফেলে রেখে সবুজে ঘাসে-মোড়া গভীর রাত্রির কালো অন্ধকার জড়ানো পল্লীর পথে।......

ডাঙটা হয়ে গেছে এতক্ষণে।

ধান কাড়তে হবে।

দুঃস্বপ্ন রাত্রির এলোমেলো স্বপ্নের মতো স্মৃতির কালো ছায়াগুলো সন্তর্পিত পদে ঘোরাফেরা করে।

আটটা বছর কেটে যায় 'কোমেন' দিয়ে।

শুধু রামহরির বেঁটে-খাটো শরীরটা আজও যেন একটা হিংস্র হায়েনার মতো জ্বলজ্বল করে তার স্মৃতির আঁধার আকাশ-পটে। তারপর অবিনশ্বর, অচঞ্চল, অবিস্মরণীয় তিনটে নক্ষত্র কোলাহল-মুখর দিনের আলোতেও ভাস্বর থাকে। তার মা-বাবা-বোন।...

নদীতে, মাঠে-ঘাটে কাজ করে সুন্দর। তিনদিন জন খাটে তো চারদিন বসে থাকে। একদিন রান্না করে, দুদিন খয়ে খায়। যাত্রা শোনে। মিটিং শোনে। শুয়ে পড়ে থাকে। কত কথা ভাবে।

কালো মিশমিশে পাথর-কোঁদা চেহারা। গড়নটা বেশ সুন্দর। মাথায় লম্বা-লম্বা চুল। 'কাঁকুই' দিয়ে ছোট আয়নাটা ধরে কত করেই না আঁচড়ায়। সাজি-মাটি দিয়ে সপ্তায় একবার করে কাচা ফরসা কাপড় পরে বাঁশিতে সুর ভাঁজে। বেহুলা-লখিন্দরের পালা গান। ভাইয়ের গান। বন্যার গান।

গোবিন্দ আসে। ছোকরী তোতলা। তবু সে এক অবাক সুরের লহরায় মশগুল হয়ে টেনে-টেনে গেয়ে যায়। তাল মিলিয়ে বাজায় সুন্দর; সেদিন হয়তো আর কামাই করলে না। ও এক শালার কথাটি। তাছাড়া চাঁদও বাড়ন্ত! তার থেকে সারাটা রাত সে ওই চাঁদের দিকে চেয়ে-চেয়ে গভীরে তান ধরবে আড়বাঁশিতে। সামনের হলদি নদীর চরের ওই শিরীষ শাখার অন্তরালে হঠাৎ ডেকে উঠবে বসন্ত-সুরে একটা কোকিল। উন্মাদ হৃদয় প্রতিটি কণায়-কণায় শিহরণ জাগবে সুন্দরের। অনেক দূর থেকে বয়ে এনে বসানো কামিনী ফুলের চারাটায় মাথায় থোকা-থোকা ফুলের গন্ধ। সৌরভে চারদিকটা মাতিয়ে তুলেছে। আর রক্তরাঙা ফুলে ভরে গেছে ডালিম গাছটার ডাল-পালা। সুন্দরের মনে হয়, একদিন না-একদিন খুব রূপবতী একটা পরী সুরের মোহে পড়ে নেমে আসবে তার বাড়ির উঠোনে। রূপে চারদিক 'উজ্জ্বলা' হয়ে যাবে। তারপরে তার হাতখানা ধরে মিষ্টি সুরে বলবে : আর বাঁশি বাজাও না ওহে অনলায়!...

হঠাৎ হি-হি করে হেসে ওঠে সুন্দর। যাত্রা দলের মেয়ে সেজে তো ও-পাড়ার নিখিল জামার বলে অমন করে!

আজ আর গোবিন্দটা এল না। তালগাছ ধরেছে। সকাল-দুপুর-সন্ধ্যা, তিন টাইম ছটা গাছ বাইতে হয়। এখন বুঝি গুড় জ্বাল দিতে বসেছে। পাটালী করে নিয়ে যাবে কাল গঞ্জের হাটে। ওদের অবস্থাটা তবু আছে একটু! ঘরের ধানের ভাত খেতে পায় পাঁচটা মাস।

ঘর কুড়ি দুলে, দলুই, গন্ধ ব্যাপারী আর চুলীদের নিয়ে সুন্দরদের পাড়াটা, বাসুলীর দলুইপাড়া বলে হাঁকডাক। সরু শীর্ণ নদী হলদির ওপারে বামুন-কায়েত আর জমিদারদের গ্রাম রামচক। সেখানে স্কুল, কাছারী, পোস্টাপিস, বাজার, ধানের আড়ত, খাঁটি সব কিছুই আছে। সেখানের মধ্যবিত্ত চাষাভূষোদের জনধন খেটে 'করে-কম্মে' খায় দলুইপাড়ার মানুষগুলো।

নিম্নবিত্ত হাড়-হাভাতের ঘরে জন্ম সুন্দরের। পাড়ায় পাঁচজনে সুন্দরকে বলে, ছেলেটা কুড়ের 'বোমরা!' না হলে কেউ কি আর ভরসা করে একটা ছুঁড়ি দেয় নে।...

সুন্দর হাসে। পরের উপদেশ বা গাল-মন্দ তাকে গভীরে স্পর্শ করে না। তার অন্তরে যেন একটা নিরীহ মানুষ বাস করে। লোকটা উদাসীন—আত্মভোলা!

গোবিন্দ শুনে গানের ভেতরে দুটো আঙুল পুরে দিয়ে অদ্ভুতভাবে বসে পড়ে গোটা দুই সিটি মারলে। তারপর কাঁধে ঝাঁকি মেরে কাঁধ দুটো তুলে মুখটা লম্বা করে বাড়িয়ে দেয় সুন্দরের দিকে। আনন্দে ভগমগ হয়ে বলে, 'হলদি নদী টৈটুম্বুরে ওগো নাগরে—বলব কেন বাঁশি বাজাও? জালির পীরিতে!'

তোতলা হলে কি হয়, গোবিন্দ মুখে-মুখে বেশ গান বাঁধতে পারে!

মাথায় হাত দিয়ে তিন সত্যি গালতে ভবে না বলেছে সুন্দর!

ব্যাপারটা একটু জটিল।

হলদির ওপরে লগি মেরে খড় বোঝাই নৌকো নিয়ে গেছিল সে হরিণপুরে। মুখ-আঁধারী অন্ধকার নেমে এসেছে ফিরতি বেলায়, রামচকের বামুনপাড়ার ঘাটে দাঁড়িয়ে আছে দুটি মেয়ে। অস্পষ্ট চেনা যায় না। সুন্দরের নাম ধরে ডাক দেয়;

'সোন্দর, ও সোন্দর—আমাদের নিয়ে যা বাবা।'

'সুন্দরদা'—ডালিমের কণ্ঠস্বর না?

লগি মেরে-মেরে চরে ভেড়ালে সুন্দর তার নৌকোখানাকে। ডালিম আর তার বুড়ো মা, অবলা। সিধু বৈদ্যদের ধান ভানতে গেছিল নাকি তারা।

ডালিম তার মুখের দিকে চেয়ে খালি-খামখাই হাসলে এক ঝলক। মলিন ঠোঁট দুটোয় এক চমক বিদ্যুৎ যেন। তারপর মুখটা ঘুরিয়ে রইল ওদিকে করে।

হলদির জলে তখন জোয়ার লেগেছে। উজান পাড়ি মেরে যেতে হবে বাসুলীতে। জলের স্রোতে কলকল ছলছল শব্দ।

বুড়ী অবলা বলে, 'সোন্দর! ও সোন্দর! বলি, এই ন-চাড়া বয়েসে তুই মনের মতনটা খোঁজ নাকি রস ছোঁড়া?'

'কি বলছ মাসী?' লগি তুলে শুধোয় সুন্দর।

'বলি কচ্ছেকে মাছ কটা কিনলি গ্যা বাবা?'

'উ-আর কচ্ছেকে মাসী! ছ' আনা। কেন, লেবে তুমরা? লও না।'

'না, না। উ-তোর আশারের চিজ। তুই নিয়ে যা। 'এ'দে'-বেড়ে খাবি-হোন।'

'না গো মাসী, উ-শালার এক কণাট! তুমি লিয়ে যাও। বাচতে-কুটতে পারবু নি আমি।'

অবলা খুশী হল অন্তরে, ছেলেটার সরলতা দেখে। চোখ উল্টে বললে, 'আর বাবা সি-একদিন গ্যাছে! তোর বাপের মতন কি দুটো মানিষ্যি ই-গেরাম অঞ্চলে ছ্যালো? যেটেটুকুনই মাছ-মাংস নেসুক, তোর ই-মাসীকে দিতে-থুতে কি ভুলত? সারা-দিনটা তো পড়ে থাকত আমাদের বাড়িতে। তোর ঠাগ্-মা 'আত্তিরে' কত কথা বলত যেয়ে আমাকে। বলে, হাঁ-লা বৌ, তুই কি মোর ছাওয়ালটাকে যাদু কল্লি নাকি লা!'

খিলখিল করে হেসে ওঠে ডালিম। পলিমাখা পা দুখানা নামিয়ে দিয়েছে সে হুগলির উদ্দাম জলরাশির বুকে। জল পাক খেয়ে-খেয়ে ছোট-ছোট আবর্ত এঁকে দূরে সরে যাচ্ছে। তেলাকুচোর ফুলের মতো নরম আর উজ্জ্বল রঙ যৌবন-প্রস্ফুট বছর ষোল বয়েসের চেহারা ডালিমের।

বাসুদীর চরে ওদের নামিয়ে দিলে সুন্দর। শালপাতায় মাছ কটা ডালিমের হাতে তুলে দিতে গিয়ে সুন্দরের মুখখানা কাছাকাছি হয়ে গেল ডালিমের মুখের। চোখে তার কেমনতর যেন এক মাতাল-করা চাউনি। ফিরে হাঁটতে শুরু করলে ডালিম। পিঠের দিকের আঁচলে বাঁধা গোটা কতক চাল। দুটি মানুষের সারা দিনের উপার্জন। বেলাচরের কাদা-মাটি মাড়িয়ে দূরে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল ডালিমরা।

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে আবার পাড়ি জমালে সুন্দর। নদীর মাঝ বরাবর যেতেই পুবে আকাশ জুড়ে চাঁদ উঠল থালার মতন। শরীরে হাড়ভাঙা পরিশ্রমের ক্লান্তি। পেটজোড়া ক্ষুধা-নেকড়ের আঁচড়ানি। কিন্তু তবুও কেন যেন বুকের বাঁশিতে গুমরে ওঠে মাতাল-করা সুরের কলি।

রায়েদের নৌকো ঘাটে বেঁধে রেখে দাম-কড়ি চেয়ে নিয়ে চাল-ডাল কিনে বাড়িতে ফিরে এল সুন্দর।

আজ যদি তার মা কিম্বা বোনটা থাকত তাহলে এত কষ্ট করে এসে আগুনের ধারে বুক পেতে বসতে হতো না।

ভাত বেড়ে নিয়ে খেতে বসেছে, এমন সময় কামিনী গাছটার আড়াল থেকে কে যেন অনুচ্চস্বরে ডাক দেয়।

'সুন্দর-দা!'

'কে, গোবিন্দ? আয় না ভাই।'

ঘাড় ফিরিয়ে দেখলে সুন্দর। চাঁদের আলোয় কামিনী গাছটার পাশে দাঁড়িয়ে ডালিম!

ধীরে-ধীরে এগিয়ে এল সে।

'কে ডালিম?'

'খাওয়া হয়ে গেল নাকি তুমার?'

'না। ই-কি! তুই ফিরে তরকারী আনতে গেলি কেন ডালিম?'

অ্যালুমিনিয়ামের তরকারী-ভরা বাটিটা সুন্দরের পাতের পাশে নীরবে বসিয়ে দেয় ডালিম। কোনো কথা বলে না।

বাঁ-হাতে খপ করে তার একখানা হাত ধরে বসে সুন্দর।

'কি!' চমকে উঠে হরিণীর মতন বড়-বড় বোকা চোখ মেলে তাকালে ডালিম।

'কেন তরকারী আনলে!'

'জানি না, যাও! ছাড়ো-না সুন্দর-দা!'

'না, খেতে হবে একসাথে!'

'মা দুষ্টু! ছি-ছি! মা এক্ষুনি ডাকবে। এই—ছাড়ো!'

'না, খেতে হবে।' অবরুদ্ধ কণ্ঠস্বর সুন্দরের।

'যাও!' ডালিম লজ্জায় পড়ে যৌবন-মণ্ডিত দেহটাকে কাৎ করে একটা মোচড় মেরে ছাড়াতে চায়।

'আচ্ছা খাবে না তো?'

'আর একদিন।'

'না, আজ।'

'হুঁঃ!' ফোঁস করে উঠল ডালিম।

ভাতের থাবাটা ওর গালের মধ্যে গুঁজে দিলে সুন্দর।

ঠিক সেই মুহূর্তে ডাক পড়ল ডালিমের।

'ডালিম—ও ডালি—ওলো ও কমবক্ত—আভাগী—বাপখাকী!'...

ডালিম এক রকম পড়ি-তো-মরি করে দৌড় দিলে বনতুলসী আর গুলোঞ্চ তুলসী, চাক-চাকন্দ ঝোপভরা সিঁথির মতো সরু পথটা ধরে।

এক মিনিট!

ভাত কোলে করে বসে রইল সুন্দর। কি যেন কি হয়ে গেল!

এর নাম কী! অন্তরে ঢেউয়ের মাতা-মাতি! বুকের আড়বাঁশিতে গুমরে ওঠে সুরের কলগুঞ্জন।

ডালিম! অদ্ভুত!

উঠে পড়ে ধেই-ধেই করে নাচতে লাগল সে। লম্ফের আলোয় তার কালো ছায়াটাও নাচতে লাগল দেওয়ালে। হঠাৎ সেটা চোখে পড়তে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। কালো ছায়াটাকে সে পদাঘাত করলে। তারপর হাসতে লাগল হা-হা করে।

কোনো রকমে খেয়ে ফেললে শেষ-মেষ। শুয়ে নিয়ে শুয়ে-শুয়ে ভাল করে ভাববে। বাঁশির সুরে-সুরে পাগল হয়ে যাবে। পাগল করে দেবে ডালিমকে।

গোবিন্দর কাছে একবার যেতেই হল।

দিন কেটে যায়, দিন আসে। বাঁশির সুরে-সুরে কি মধুর ইন্দ্রজাল বুনে যায় সুন্দর।

এক রাতে বিছানা ছেড়ে উঠে আসে ডালিম। ধীরে-ধীরে কম্পিত বক্ষে এসে দাঁড়ায় সুন্দরের বাড়ির উঠোনে। সামনে ফুল-ভরা কামিনী গাছটার আড়াল। ধীরে-ধীরে ফিরে যায় ডালিম। রাত্রির অভি-সারিকার চরণে-চরণে বিহ্বল নূপুর ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয় ঝিঁঝিঁদের ডাকে-ডাকে—সুরে-সুরে।

সুজনী প্রেসের বই — প্রকাশিত হল

রাজ চক্রবর্তী

প্রণীত—

সেই মন মন সেই দাহ

প্রেম, পতন ও প্রবঞ্চনার রোমাঞ্চময় একটি অনন্য উপন্যাস ১২·০০

লাস্ট অপারেশন

প্রথম সংস্করণ — নিঃশেষিতপ্রায়

বহু প্রশংসাধন্য লেখকের আরেকটি দুঃসাহস উপন্যাস ৫·০০

পরিবেশক : ১) ডি এম লাইব্রেরী, ৪২, বিধান সরণী, কলি—৬

২) মডেল পাবলিশিং, ২এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি—১২

গোবিন্দর মুখে মতো সুন্দর তার মনের কথাটা আমতা-আমতা করে পেড়েই বসল বুড়ী অবলার কাছে। বুড়ী তার বকের পালকের মতো সাদা ধবধবে মাথাটা নেড়ে-নেড়ে বলে, 'তোর কি আছে রা ব্যাটা! তোকে আমার সোনার চাঁদ মেয়ে দোব? খাটবি নি খুটবি নি, সাত সাঁঝেও হেথা উপো হাঁড়ি চড়ে না'...

'না মাসী, এবার থিকে আমি খাটব। এখন এগলা বলে, হল-হল, নেই-নেই। না খাটলে চলে? কেন্তুন ডালিমকে আমার ঘরে বউরাণী করে নিয়ে যেয়ে কি দুঃখিতে রাখতে পারি? সি ফিরে এ্যাকটা কথার মতো কথা হল মাসী?'

ডালিম দোরের আগড়ের পাশটাতে দাঁড়িয়ে ফিক করে হেসে হাত নেড়ে কি যেন ইসারা করলে। পায়ে ধরতে বলছে নাকি বুড়ীর! তা, তা কাঁহ কি!

হাতটা বাড়িয়ে পা দুটো যেই না 'পাক্কা' করা অমনি আষাঢ়-বর্ষণ-পাকা বেলটার মতো গলে জল হয়ে গেল বুড়ী অবলা।

তবে হাঁ:

'তুই ছাড়া আর কাকেই বা দোব বাবা ছুঁড়িটাকে! তবে কি জানিস! আমাকে দু কুড়ি টাকা দিতে হবে। চাঁদের পানা মেয়ে। পাঁচশ টাকা নিয়ে কত লোক 'খোসামোদ' করতেছে।'

ডালিম মাথা হেঁট করে কি যেন চিন্তা করে। গোবিন্দ কালিঝুলিভরা মাথাটা 'ঝুলঘুলি' (ঘুলঘুলি, ছোট্ট জানালা) দিয়ে ঘরের ভেতরে ঢুকিয়ে চাপা গলায় শুধোয় ডালিমকে:

'কি বললে বুড়ী?'

'চুপ! ডালিম আঙুল তুলে ইসারা করে গোবিন্দকে।

'আচ্ছা মাসী, 'আচ্ছো' দোব দু কুড়ি টাকা।'

'কোথা পাবি?'

'রোজগার করে দোব। কেন, আমি কি মদ্দ-ব্যাটাছেলে নই মাসী? তবে—তবে এট্টুন দেরি করতে হবে।'

বুড়ী রাজি হল।

গোবিন্দ ছুটে এসে লাফ মেরে কাঁধে উঠল সুন্দরের। তাকে কথা মতো এখন সেই শিরীষতলা অব্দি বয়ে নিয়ে যেতে হবে কাঁধে করে।

ডালিম হেসে-হেসে লুটিয়ে পড়ল একান্তে।

তারপর থেকে সারা দিনের মধ্যেও একবার সুন্দরের টিকির নাগাল পেত না গাঁয়ের কেউ। ভোরে উঠে কাজে চলে যেত আর আসত সেই রাত্রে। সপ্তার ভেতরে হয়তো একটিবার মাত্র দেখা হতো তার ডালিমের সঙ্গে।

বলত, 'টাকা জোগাড় করছি।'

ডালিম ম্লান হেসে বলত, 'কত বাকি?'

'আর এক কুড়ি।'

মৃত্যু যদি এসে দাঁড়ায় এখন সুন্দরের সামনে? না, কিছুতেই পারবে না সে মরতে। যুদ্ধ করবে তার কোদাল কাটারী, কাস্তে, লাঙল আর লাগবাড়ি দিয়ে। প্রাণপণ। ডালিমকে তার চাই-ই চাই। সে তার হৃৎপিণ্ড।

চারটে মাস। যেন কালের দুর্লঙ্ঘ্য পাহাড়-পাড়ি।

বাঁশের 'চোঙা' থেকে টাকা-পয়সাগুলো মেঝেয় ঢেলে দশবার করে গুনেছে।

দু কুড়ি! চাল্লিশ!

আনন্দে বুকটা তোলপাড় করে ওঠে। না-খাওয়া না-দাওয়া...চার-চারটে মাস। এক টাকা দু আনা করে জনের দাম। চুষে নিয়েছে তাকে রায়েরা। নিক।...

যাবে নাকি সে এক্ষুনি বুড়ীর কাছে। গড়-গড় করে ঢেলে দেবে টাকাগুলো। চক্ষু চড়কগাছ হয়ে যাবে বুড়ীর। হাঁ, বাপের বেটা বটে সোন্দর।...

না, কাল সকালেই যাবে সুন্দর।

আজ রাতভর বাঁশি বাজাবে। একটা রাঙা ডালিম ফুল ছিঁড়ে এনে অনেকক্ষণ ধরে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখলে সে। ফুলটা নিয়ে চুপি-চুপি গেল সে ডালিমদের বাড়িতে। অবলা বুড়ী সামনের দিকে মুখ করে খেজুর পাতা দিয়ে চাটাই বুনছে মাথা হেঁট করে। পিছন ফিরে বসে ডালিম চাল বাচছে কুলোয়। সুন্দর রক্তরাঙা আধ-ফোটা ডালিম ফুলটা নিয়ে টুক করে ডালিমের খোঁপায় গুঁজে দিয়ে মারলে এক দৌড়।

ডালিম সন্ত্রস্ত হয়ে খোঁপায় হাত দিয়ে ফুলটা দেখে হাসতে লাগল হি-হি করে—তার হাসির কারণ সুন্দর দৌড়তে গিয়ে পায়ের গলুইয়ে ঢল-কলমীর লতা জড়িয়ে পড়ে গেছে। একেবারে চিৎপাত!

বুড়ী চিল্লে ওঠে. হাসি কিসের লা। হাসি কিসের 'হঠাৎ'? ভূত ধরেছে? ফুলটা তখন দেখায় ডালিম তার মাকে।

বুড়ীর গাল হাঁ হয়ে যায়। উঠে এসে উঁকি মেরে দেখে, সুন্দর তখন হাওয়া।

বুড়ী গজ-গজ করে: 'ভালবাসা! ভালবাসার রাঙা ডালিম ফুল! সেই কথায় বলে, পেটে ভাত নেই 'ইয়েতে' সিঁদুর!'

—আবদুল জব্বার

বেঙ্গল কেমিক্যালের
পারফেক্টেড
কোল্ড ক্রীম অব রোজেস
ল্যানোলিন সংযুক্ত
সকল ঋতুতে ত্বক অম্লান ও নিরাপদ রাখে
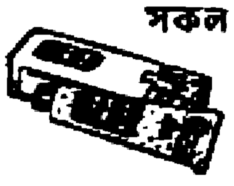
টিউব এবং
সুদৃশ্য আধারে পাওয়া যায়

বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা • বোম্বাই • কানপুর • দিল্লী
Progressive/BC

তুলসীচরিত

ননীমাধব চৌধুরী

(৩২)

মাস কয়েক পরের কথা।

অশোক তীর্থ ভ্রমণে গিয়েছিল, ফিরে এসে সস্ত্রীক দেখা করতে এল। তার স্ত্রী ভিতরে গেলেন মহামায়ার কাছে, হাতে একটা প্লাস্টিকের ঝুড়ি বোঝাই কি সব নিয়ে. অশোক আমার কাছে বসল। তীর্থ প্রসঙ্গ চলল কিছুক্ষণ তারপর অশোক বলল, মাস্টারমশাই, একটা অভিযোগ আছে আমার।

বললাম, অভিযোগ? পাণ্ডারা কিছু বেশী প্রণামী আদায় করেছে জুলুম করে?

হেসে বলল, আমার অভিযোগ মিঃ ভাদুড়ীর বিরুদ্ধে।

-বললাম, বুঝতে পারলাম না, খুলে বলো।

বলল, ফিরে আসবার পরে আমার বড় ছেলে রমেন রিপোর্ট দিল তুলসীর ছোট ভাই ফণী একমাসের নোটিশ দিয়েছে চাকুরি ছাড়বার। ফণীকে প্রশ্ন করে জানা গিয়েছে মিঃ ভাদুড়ী তাকে স্কলারশিপ দিয়ে আমেরিকা পাঠাচ্ছেন ফাউন্ড্রির কাজ শেখবার জন্য।

বললাম, এটা তো ভাল খবর অশোক, ছেলেটার উন্নতি হবে।

বলল, আমি একটি ভাল লোক হারাচ্ছি, আমার কাছে থাকলেও উন্নতি হবে।

. সে কাজ শিখে এলে তাকে রেখো।

বলল, তখন যে মাইনে চাইবে তা কি দিতে পারব?

বললাম, তোমার কাছে যে উপকার পেয়েছে তার জন্য কিছু কমে রাজি হতে পারে, কথা বলে দেখো না।

বিশেষ ভরসা করি না, কথা বলব যখন বলছেন। একটা কাজের লোক তৈরী করে তোলা অনেক সময়, অনেক মেহনতের ব্যাপার।

বললাম, তা তো বটেই।

আরও কিছুক্ষণ গল্প করে অশোক সস্ত্রীক বিদায় নিল।

তুলসী ইস্টার্ন ইন্ডিয়া করপোরেশনে কাজ করছে। মাইনে ছাড়া যাতায়াতের গাড়ী পায়, টিফিন পায়। কাজ তার ভালই লাগছে মনে হয়।

সেদিন অফিস থেকে ফিরে কিছুক্ষণ পরে এক কাপ চা হাতে নিয়ে তুলসী আমার কাছে এসে বসল। বলল, বোর্নভিটা দিয়ে তোমার জন্য চা করেছি, খেয়ে দেখ ভাল লাগে কিনা।

হাত বাড়িয়ে কাপটা নিলাম, বললাম, তোর চা বোর্নভিটা দিয়ে করে নিয়ে আয়।

বলল, তোমার জন্য একটা টিন কিনলাম ফ্যাক্টরির কো-অপারেটিভ স্টোর্স থেকে, আমার চাতে দেব কেন?

দুজনে দু রকমের চা খেতে থাকলে গল্প জমবে না। যা বোর্নভিটা দিয়ে তোর চা নিয়ে আয়।

আমার স্বাস্থ্যের জন্য একটু চিন্তিত হয়েছে তুলসী। কমলা, আপেল, হর্লিক্স, ওভালটিন কিনে আনে, বকাবকি করে খাওয়ায়। আমার স্বাস্থ্য যে কিছু খারাপ হচ্ছে তা নয়, একটা উপলক্ষ ধরে আমার জন্য কিছু করতে চায়, বাধা দিলে চটে যায়, মুখ ভার করে, শেষ পর্যন্ত চোখ ছলছল করে। আপত্তি করা ছেড়ে দিয়েছি তাই। তার অতি অনুগত সন্তানের অভিনয় করি, বৃদ্ধ বয়সে, ভারি খুশী থাকে তাইতে।

চা খেতে খেতে বললাম, ফণীর সঙ্গে দেখা হয় তোর?

হ্যাঁ, কাল দেখা হয়েছিল, ভাল আছে।

কোন খবর দিল না তোকে?

কি খবর দেবে? কিছু বলল না তো? ক্যান্টিন থেকে মাংস কিনে এনেছিল, আমাকে মাংস পাউরুটি খাইয়ে দিল জিদ করে।

বললাম, ফণী অশোকের চাকুরি ছাড়বার নোটিশ দিয়েছে।

সে কি? আর কোথাও কি চাকুরি পেয়েছে? —

স্কলারশিপ নিয়ে ফণী আমেরিকায় যাচ্ছে, ফাউন্ড্রির কাজ শেখবার জন্য। ইউনিভার্সিটির সিলেকশন বোর্ড তাকে নির্বাচিত করেছে।

তুমি কোথায় শুনলে?

অশোকের কাছে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, মিঃ ভাদুড়ীর হাত আছে এর মধ্যে মনে হচ্ছে। জেঠামণি, ফণীকে এ অনুগ্রহ করতে গেলেন কেন তিনি?

অনুগ্রহ আবার কি? এ কাজের জন্য টাকা পেয়েছে সে। কত ছেলে গিয়েছে এর মধ্যে, তাদের প্রতি অনুগ্রহ দেখিয়েছে কি সে? ফণী দরখাস্ত করেছিল, যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে নির্বাচিত হয়েছে।

আবার কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, ফণী উন্নতি করবে। আমাকে খবরটা দিলেও পারত।

তার মুখে শুনলে তুই হয়ত কিছু ভাবিতস হয়ত, তাই বলেনি। এটাও হতে পারে সে ধরে নিয়েছিল তুই জানিস।

তার মানে মিঃ ভাদুড়ী আমাকে আগে থেকে বলেছেন।

হয়ত তাই।

ভালো জেঠামণি, এরকম ভাববার মানে কি হয়?

কোন মানে হয় না, বাজে মাথা গরম করিস না।

'মাথা গরম করিস না' তোমার ছাত্রের সম্বন্ধে আমার অভিযোগ আছে।

বললাম, অভিযোগ আছে? অশোক অভিযোগ করে গেল দেবাশিস তার কারখানা থেকে ফণীকে ভাঙিয়ে নিয়েছে, এখন তুই বলছিস তোর অভিযোগ আছে। কি অভিযোগ আছে শুনি?

বলল, তাঁর ব্যবহার অপমানজনক মনে হয় আমার। তিনি বড় সাহেব, ভয়ানক ব্যস্ত মানি। দেখাসাক্ষাৎ হয় না। কোন কোন দিন ফ্যাক্টরীর কোথাও যেতে আসতে দেখা হলে নমস্কার করি, যেমন আর সবাই করে। কদিন থেকে দেখছি প্রতিনমস্কারটুকুও করেন না ভদ্রতা করে। একটু হেসে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে চলে যান। না হয় তাঁর অধীনে চুনোপুঁটি কেরানীর চাকুরি করি—

বাধা দিয়ে বললাম, শুনলাম তোর অভিযোগ। এর পর দেখা হলে তুইও ঐ রকম অপমানজনক ব্যবহার করিস।

কি হবে তাতে?

কি হয় জানাস আমাকে। দরকার হলে তাকে ব্যবহার সংশোধন করতে বলব।

মাস দুই কেটে গেল, তুলসীর কাছে এ সম্বন্ধে আর কোন খবর পাওয়া গেল না। এর মধ্যে ফণী আমেরিকা চলে গেল।

মাসখানেক পরে তুলসীর কাছে খবর পেলাম দেবাশিস কি কাজে বাইরে গিয়েছে, শুনেছে ফিরতে কিছু দেরি হবে।

খবর শুনে খেয়াল হল বাইরে যাবার সময় দেখা করে যায়নি। খুব ব্যস্ত ছিল সম্ভবত, সময় করতে পারেনি। কদিন পরে তুলসী খবর দিল, শোনা যাচ্ছে বাইরে কোথাও এরই ব্রাঞ্চ খোলা হবে।

এর দিন দশ পরে বোম্বাই থেকে দেবাশিসের একখানা টেলিগ্রাম এল। জানিয়েছে বিশেষ অসুস্থ হয়ে সে বোম্বাইয়ের হাসপাতালে রয়েছে। সেরে উঠতে পারবে কিনা ডাক্তাররা বলতে পারছেন না। যদি সম্ভব হয় তুলসী রাজি হলে তাকে নিয়ে অতি শীঘ্র আসতে পারলে কৃতজ্ঞ হব।

ভয় পেলাম টেলিগ্রাম পেয়ে। কি অসুখ জানায় নি, কিন্তু মৃত্যুর আশঙ্কা করছে টেলিগ্রাম থেকে বোঝা যায়। তুলসী কাজে বেরোচ্ছিল, তাকে আটকালাম। টেলিগ্রামের কথা তাকে জানিয়ে বললাম, অফিসে গিয়ে ফোন খবর এসেছে কি না জানবার জন্য ড্রাইভারকে বলে দে। যদি আজ যাওয়া সম্ভব হয়—যাবি তো তুই?

বলল, আমি গিয়ে কি করব জেঠামণি?

বললাম, তা জানি না। এইটুকু বুঝতে পারছি মৃত্যুর আগে মানুষের মনে দু একটা ইচ্ছা হয়। তোকে দেখবার ইচ্ছা হয়েছে দেবাশিসের, হয়ত কিছু বলতে চায়। ভগবান জানেন বলবার সুযোগ পাবে কিনা।

তুলসী কিছু বলবার আগে গাড়ীর শব্দ পেলাম। বাইরে গিয়ে দেখলাম জেনারেল ম্যানেজার এসেছেন।

নমস্কার করে বললেন, একজন ডাক্তার এবং একজন এসিস্টান্ট ম্যানেজারকে নিয়ে আমি আজ রাত্রের প্লেনে যাচ্ছি। আপনাদের দুজনকে যেতে অনুরোধ করেছেন জানিয়েছেন মিঃ ভাদুড়ী। আপনাদের সীট বুক করব কি রাত্রের প্লেনে?

বললাম, এক মিনিট বসুন।

ভেতরে গিয়ে তুলসীকে জেনারেল ম্যানেজারের প্রস্তাব জানালাম, বললাম, আমাকে যেতে হবে তুলসী, কিন্তু তোকে না নিয়ে কি করে যাই? সীট বুক করতে বলে দিই?

মুখ নামিয়ে বলল, যা তোমার ইচ্ছা।

বাইরে গিয়ে সীট বুক করবার কথা বললাম। জেনারেল ম্যানেজার বললেন, আমি আপনাদের তুলে নিয়ে যাব।

নমস্কার করে তিনি চলে গেলেন। তুলসী কাজে বেরোবে কিনা ইতস্তত করছে দেখে বললাম, যা, ঘণ্টা দুই পরে ফিরে আসিস।

দমদমে যাবার পথে জেনারেল ম্যানেজার জানালেন ভোপালে একটা ফ্যাকটরী করবার কথা কিছুদিন থেকে চলছে। সেখানে কদিন থেকে গোয়ালিয়র, উজ্জয়িনী, নাসিক ও পুনা হয়ে বোম্বাই পৌঁছে মিঃ ভাদুড়ী অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। সম্ভবত কোথাও খারাপ টাইপের ইনফেকশন হয়েছে। আগে নিয়মিত টেলিগ্রাম আসছিল, বোম্বাই পৌঁছে একখানা টেলিগ্রাম করেন। তারপরের টেলিগ্রামে আপনাদের নিয়ে আমাকে যেতে বলেছেন। মনে হয় অবস্থা ক্রিটিক্যাল।

অসুখের তৃতীয় দিন আমরা পৌঁছলাম। একিউট হেপাটাইটিস রোগ হয়েছিল দেবাশিসের।

হাসপাতালে চিকিৎসা চলছিল। জেনারেল ম্যানেজারের কাছে রোগীর পরিচয় জানবার পরে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ আরও তৎপর হলেন।

বোম্বে পৌঁছে কর্তৃপক্ষের বিশেষ অনুমতি নিয়ে হাসপাতালে গিয়েছিলাম তুলসীকে নিয়ে। জেনারেল ম্যানেজার ও সঙ্গের ডাক্তার আগে গিয়েছিলেন অবস্থা দেখতে। জেনারেল ম্যানেজার ফিরে এলেন হাতে কখানা বন্ধ করা খাম নিয়ে। বললেন, অজ্ঞান ভাব আসছে প্রায়ই, সেটা কাটিয়ে উঠতে সময় লাগছে। আপনাদের আসবার কথা বলেছি, জ্ঞান দেখে আসুন।

মিনিট তিন চার বেডের পাশে অপেক্ষা করবার পরে চোখ খুলে তাকাল। একটু হাসল তুলসীকে, আমাকে দেখে। তুলসীর দিকে চেয়ে বলল, তুমি যে আসবে আশা করিনি। এখন বাইরে যাও, এখানে বেশী সময় থেকো না। ভাল বোধ করলে কথা বলতে পারলে ডেকে পাঠাব, এখন বড় কষ্ট হচ্ছে।

তুলসীর দিকে তাকালাম, মুখের চেহারা বিশেষ সুবিধের মনে হল না। বললাম, চল, বাইরে যাই, নার্স যেতে বলছে।

বলল, আসছি, তুমি যাও।

আমাকে সরে যেতে বলছে বুঝলাম। সরে যেতে যেতে দেখলাম বুকের কাপড়ের নীচে থেকে ছোট একটা কৌটা বের করল। তার মধ্যে থেকে কোন জিনিস বের করে কপালে ছোঁয়াল, তারপর বিছানার কাছে এগিয়ে গিয়ে নার্স কিছু বলবার আগে জিনিসটা রোগীর কপালে ছুঁইয়ে তার বালিশের নীচে গুঁজে দিল।

সরে এসে ডাক্তারকে নিম্নস্বরে কি বলল, তিনি মাথা নাড়লেন। আস্তে আস্তে আমার কাছে এসে দাঁড়াল মুখ নামিয়ে। পিঠে হাত রেখে বললাম, ভয় নাই, ভাল হয়ে উঠবে।

আমার হাত চেপে ধরল শক্ত করে। বলল, চলো বাইরে গিয়ে বসি।

সঙ্গের ডাক্তার ও জেনারেল ম্যানেজার কি পরামর্শ করতে লাগলেন।

তুলসীকে নিয়ে আমি হোটেলে ফিরলাম, তাঁরা দুজনে কলকাতা থেকে স্পেশালিস্ট আনবার ব্যবস্থা করতে গেলেন।

পরদিন দুজন ডাক্তার পৌঁছলেন রেডিওগ্রাম পেয়ে।

তিনদিন পরে কলকাতার ডাক্তাররা চলে গেলেন তার একদিন পরে জেনারেল ম্যানেজার চলে গেলেন। আমিও তাঁর সঙ্গে ফিরতে চেয়েছিলাম। তিনি রাজী হলেন না, বললেন, আপনার ভগ্নীর দেখাশোনা করবার ব্যবস্থা করা হয়েছে, ভাবনা করবার কিছু নাই। এসিস্টান্ট ম্যানেজার রইলেন, একজন এসিস্টান্ট রইলেন, তাঁরা থাকবেন মিঃ ভাদুড়ীর ভাল হয়ে ফেরবার অবস্থা না হওয়া পর্যন্ত, আপনারাও থাকুন। মিস ভটচায ডাক্তার, তিনি কাছে থাকলে রোগী মনে ভরসা পাবেন।

তাকালাম তাঁর মুখের দিকে, কোন ইঙ্গিত আছে শেষ কথাগুলোর মধ্যে মনে হল না, যা ফ্যাক্ট তাই বললেন।

বললাম, বেশ যা বলছেন তাই হবে।

আসল কথা থাকতে হল অন হিউ-ম্যানেটেরিয়ান গ্রাউন্ডস' অর্থাৎ তুলসী ও দেবাশিসের জন্য।

হাসপাতাল থেকে দেবাশিস ছাড়া পেলে দেখলাম তাকে সঙ্গে নিয়ে গাড়ীতে বেড়াতে যায় তুলসী। ফিরে এসে গল্প করে। জেঠামণিকেও ডাকে তুলসী কিন্তু জেঠামণি দু'একটা শব্দ প্রয়োগ সমাপ্ত করতে ব্যস্ত বলে নেপথ্যচারী হয়েছেন। তুলসীকে বলেন, তোরা গল্প করগে, আমার হাতে কাজ আছে।

চোখের একরকম ভঙ্গী করে তুলসী তাকায়, তারপর চলে যায়।

ফেরবার ব্যবস্থা হল রেলগাড়ীতে। ডাক্তার হিসাবে রোগীর প্রতি মনোযোগের কোন শৈথিল্য দেখে সমালোচনা করবার সুযোগ পাওয়া গেল না। হয়ত একটু বাড়াবাড়ি ছিল মনোযোগের, কিন্তু রোগী বিরক্তি প্রকাশ না করে হাসিমুখে সেটা সয়ে নিচ্ছিল, কাজেই জেঠামণির মুখের কথা মুখে রয়ে গেল, মুখ থেকে খসাবার প্রয়োজন হল না। তিনি সবকিছু দেখতে লাগলেন আলগা দৃষ্টিতে। সত্যিই তো, আলগা দৃষ্টিতে দেখা ছাড়া তাঁর আর কিছু কি করবার আছে জীবনে?

চুপচাপ শুয়ে বসে কাটিয়ে দিলাম। হাওড়া স্টেশনে পৌঁছবার ঘণ্টাখানেক আগে মুখ ফসকে একটা কথা বেরিয়ে গেল। বললাম, হাসপাতালে দেবাশিসের বালিশের নীচে কি দিয়েছিলি তুলসী?

বলল, এত দেখেছ যখন, কি দিলাম তা কি আর দেখনি?

বললাম, চশমা চোখে ছিল না, ঝাপসা দেখেছিলাম।

কেদারনাথ ও বদরিনাথের নির্মাল্য।

বললাম, ওসব কিছু মানে না দেবাশিস, কেন দিতে গেলি?

চটে গিয়ে বলল, আমি তো মানি। ইচ্ছে হল দিলাম, তুমি চুপ করো এখন।

সারা পথ তো চুপ করে রয়েছি, একটা কথাও কি বলতে দিবি না?

বলল, বেশ, কি বলতে চাও বলো, জবাব চেয়ো না আমার কাছে।

বললাম, জবাব না পেলে কথা বলে কি লাভ হল তুলসী?

সে তুমি বুঝবে, আমি তার কি জানি?

দেবাশিস কি বলছিল বাধা দিয়ে তুলসী বলল, বড়সাহেব, আমার হাতে ওষুধের শিশি নাই, খাবারের ডিশও নাই, আপনার মুখ খোলবার কোন হেতু নাই।

জানালার দিকে মুখ ফেরাল দেবাশিস।

জেঠামণিকে অনেকদিন থেকে শাসন করছে তুলসী, এখন দেখছি ইস্টার্ণ ইণ্ডিয়া করপোরেশনের বড় সাহেবকেও শাসনের আওতার মধ্যে আনতে চাইছে। নতুন ক্ষেত্রে তার শাসক মনোভাবের উৎসের আরও কিছু পরিচয় পাবার ইচ্ছাকে এখনকার মত দমন করতে হল, ভাবলাম, হয়ত সময়ে পরিচয় পাওয়া যাবে।

একটু পরে তুলসী বলল, জেঠামণি, একটা কথা আছে, এদিকে এসো।

কথাটা শুনলাম। বড় সাহেব স্টেশন থেকে নিজের বাড়ীতে গেলে কে তাঁকে দেখবে? মাসখানেক খুব সাবধানে থাকতে হবে ডাক্তার বলে দিয়েছেন।

বললাম, বিস্তর লোকজন আছে দেখবার, ভাববার কি আছে?

লোকজন নাই জেঠামণি, অফিসের লোক দিয়ে কি এ কাজ হয়?

দেখলাম সেও যে অফিসের লোক ভুলে গিয়েছে তুলসী। সে কথা না বলে বললাম, তা নার্স টার্স রাখতে পারে অসুবিধে হলে।

বলল, তোমার মাথার কিছু হয়েছে জেঠামণি। ভাল নার্স কি বোম্বের হাসপাতালে ছিল না? তোমাকে ডাকলেন কেন?

বললাম, আমাকে ডেকেছিল কি? মনে হচ্ছে—

থাক্, মনের কথা মনে রেখে দাও। আমাদের বাড়ীতে অনেক অসুবিধে আছে। ঐ রাস্তার ওপরে যে অফিস-বাড়ী আছে সেখানে থাকলে দুবেলা খবর নেয়া যায়।

বললাম, ভাল মনে হলে সেই ব্যবস্থা করো, আমার কিছু বলবার নাই।

হাসল তুলসী, বলল, আমি একজন ক্ষুদে কর্মচারী, আমি কিছু করতে পারি না, তোমার দ্বারা, তুমি করতে পারো।

মনে মনে বললাম, মন্দ ফন্দি নয় এটা। প্রকাশ্যে বললাম, কি করতে হবে বলো তো বাপু।

এখন আমাদের বাড়ীতে চলো। বাবার পরে ওপরের দুটো ঘর খালি করে মিঃ ভাদুড়ীর থাকবার উপযোগী ব্যবস্থা করতে বলে দিয়ো; নার্স এবং অন্য লোকজন ঠিক করার কথা বলে দিয়ো। ব্যবস্থা হলে কাল ওঁকে ও বাড়ীতে পাঠিয়ো।

জেনারেল ম্যানেজার এবং আরও লোকজন এসেছিল স্টেশনে। দেবাশিসের সামনে তুলসীর শিক্ষামত ব্যবস্থা করবার কথা বললাম। দেবাশিস চুপ করে রইল, জেনারেল ম্যানেজার বললেন, আচ্ছা।

(৩৩)

তুলসীর ইনস্টলমেন্ট।

মিঃ ভাদুড়ী ভাল হয়ে আগের মত কাজকর্ম করছেন, আর সব আগের মত চলছে, শুধু আমার অবস্থা খারাপ হয়েছে দেখতে পাচ্ছি। একটা কৃত্রিম আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছে আমাকে ঘিরে মিঃ ভাদুড়ীর অসুখের পর থেকে। আমার পদের পক্ষে বাহুল্য খাতির করা হচ্ছে আমাকে, একটা মিথ্যা ধারণা জন্মেছে অনেকের মনে আমার প্রভাব সম্বন্ধে। এই আবহাওয়া অসহ্য লাগছে। চাকুরিটা ছাড়তে হবে বুঝতে পারছি।

জেঠামণির জন্য কলকাতার বাইরে যেতে পারব না, কলকাতায় দুবারটে হাসপাতালে খোঁজখবর নিতে লাগলাম। তেমন সুবিধের না হলেও একটা চাকুরি পাবার সম্ভাবনা দেখলাম। ইস্টার্ণ ইণ্ডিয়া করপোরেশনের চাকুরিতে পদত্যাগপত্র খামে পুরে আমার বিভাগীয় বসের হাতে দিয়ে জেঠামণিকে কথাটা জানালাম।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন দেবাশিস জানে রেজিগনেশান দিচ্ছিস?

বললাম, জানতে পারবেন দু'একদিনের মধ্যে।

বললেন, খুলে বলতো তোর মনের কথা। আমি তোকে বাধা দিচ্ছি না, জানতে চাইছি কেন এ কাজ করতে হচ্ছে।

বললাম, খুলে বলছি জেঠামণি। মিঃ ভাদুড়ীর অসুখের সময় আমি যা করেছি সেটা অতি সামান্য। তাই নিয়ে একটা ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়েছে।

বললেন, তুই যা করেছিস সেটা সামান্য তোর মতে?

হাঁ, সামান্য। তোমার স্নেহের পাত্র, আমার ও আমার ভাইয়ের উপকারী তিনি। এতবড় ইন্ডাস্ট্রী গড়ে তুলে বহুলোকের অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা করেছেন যিনি, আরও অনেক বড় কাজ করবার শক্তি রয়েছে যাঁর মধ্যে এমন একজন লোক অসুস্থ হয়ে অকালে মারা যাবেন এই সম্ভাবনা খুব খারাপ লাগছিল আমার। কায়মনবাক্যে চেয়েছি তিনি ভাল হয়ে উঠুন, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছি। তিনি ভাল হয়ে উঠেছেন, আমি আন্তরিক সুখী হয়েছি। এর মধ্যে আর কোন কথা তো নাই। তবে কেন একটা ভুল ধারণা মনে নিয়ে আমাকে অপদস্থ করছেন অনেকে?

জেঠামণি বললেন, আমার বিশ্বাস, তোর অভিপ্রায়ের কথা জানতে পারলে দুঃখিত হবে সে, হয়ত আমার কাছে আসবে তোর পদত্যাগপত্র ফিরিয়ে নেবার কথা তোকে বলতে।

বললাম, তাঁকে বুঝিয়ে বলা আমি অকৃতজ্ঞ নই। তিনি আরও সফলতা লাভ করুন প্রার্থনা করব ভগবানের কাছে, আমি তাঁর একজন এডমায়রার। কিন্তু ইস্টার্ন ইণ্ডিয়া করপোরেশনে চাকুরি করা আমার পক্ষে শক্ত হয়েছে।

বলব। তার আগে তোকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব। দেবাশিসকে পছন্দ করিস তুই?

হাঁ, পছন্দ করি বই কি।

বোকার মত জবাব দিস না। তাকে ভালবাসিস কি?

না জেঠামণি, তোমাকে ছাড়া অন্য কাউকে ভালবাসি না আমি।

আবার বোকার মত জবাব দিচ্ছিস?

আমাকে বোকা বলে যদি খুশী হও তুমি বলো। তুলসী যে তুলসী হতে পেরেছে সেটা তোমাকে ভালবাসি বলে। নবে আমি মরে যেতাম, নয়তো জাহান্নমে যেতাম তোমাকে সব মনপ্রাণ দিয়ে ভাল না বাসলে। তোমার কথাও বলছি জেঠামণি। তোমার নিজের সংসার, ছেলেমেয়েদের ত্যাগ করে এখানে এসে আমাকে এমন করে ভালবাসলে কেন তুমি, আমার সব ভার নিজের কাঁধে তুলে নিলে কেন? আমার বয়েস আটাশ হয়ে গিয়েছে, যে ভালবাসা পেয়েছি যে ভালবাসা দিয়েছি তাইতে আমার চলে যাবে জেঠামণি।

মাথা নামিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন জেঠামণি, তারপর একটু হেসে বললেন, এরকম ভেড়েমেড়ে লেকচার দিলি যে ব্যাপারটা বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে। আরেকটা প্রশ্নের জবাব দে। দেবাশিস তোকে পছন্দ করে মনে হয় কি?

বললাম, তাঁর কাজ থেকেই তো বোঝা যায় পছন্দ করেন, নইলে কিছু করতে

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষের
বিচিত্র কাহিনী
ও
আরও বিচিত্র কাহিনী
পড়ে আনন্দ পাবেন

থাকেন কেন আমার জন্য, আমার ভাইদের জন্য?

তোকে ভালবাসে মনে হয় কি?

বললাম, কি জবাব দেব তোমার প্রশ্নের? আমার মনের কথা বলতে পারি, তোমার মনের কথাও বোধহয় একটু বলতে পারি, অন্য লোকের মনের কথা কি করে বলব? তাছাড়া আর কেউ আমাকে ভালবাসে সেটা আমার পছন্দ নয়। আর প্রশ্ন করো না।

জেঠামণি আর প্রশ্ন করলেন না, চুপ করে কি ভাবতে লাগলেন।

হঠাৎ খেয়াল হল জেঠার মাথায় বোকার মত উত্তর দিয়েছি। উত্তর থেকে বোঝায় আমি পছন্দ না করলেও তাঁর ছাত্র ভালবাসেন আমাকে। কি উত্তর দিলে ঠিক হত মাথায় এল না, এখনও আসছে না। তাছাড়া জানি যে উত্তরই দিই না কেন চালুনিতে ছেঁকে তা থেকে কিছু বের করে নেবে তাঁর বুদ্ধি। চোখের যেটুকু ক্ষতি হয়েছে সবটা ধারালো বুদ্ধিতে যেন আমার ওপরে পরখ করে নেন।

মিঃ ভাদুড়ীর ব্যবহারের মধ্যে জেঠামণির চোখে কিছু পড়েছে, নইলে এরকমের প্রশ্ন করতেন না। কিন্তু চোখে কিছু পড়ে থাকলেও আমাকে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করবার কোন মানে হয় কি? ইস্টার্ন ইন্ডিয়া করপোরেশনে চাকুরি নেবার সময় মিঃ ভাদুড়ীকে যেসব কথা বলেছিলেন জেঠামণি তার কিছু শুনেছি তাঁর মুখে, মিঃ ভাদুড়ীর জীবনকাহিনীও মোটামুটি বলেছেন আমাকে। হয়ত এখনও তাঁর মন সন্দেহমুক্ত নয় যে, মিঃ ভাদুড়ীর মধ্যেকার মনস্টার শান্ত হয়েছে।

মিঃ ভাদুড়ীর সফলতায় আমি সুখী। তিনি প্রতিভাশালী, তিনি জেঠামণির প্রতি শ্রদ্ধাবান, আমাদের উপকারী। কিন্তু জেঠামণির চোখে পড়ে তার ব্যবহারের মধ্যে এমন কিছু আসতে দিয়ে ভুল করেছেন মিঃ ভাদুড়ী। মেয়েদের দুর্বলতাকে এক্সপ্লয়েট করে যাকে কেরিয়ার তৈরী করতে হয়েছে তাঁর চোখে মেয়েদের নিজস্ব কোন মূল্য আছে কি? ঈপ্সিত নারীকে পাবার জন্য ট্যাকটিক্‌স পরিবর্তন করা তাঁর পক্ষে শক্ত নয় এটা তো জানা কথা।

যাক এসব কথা। আজ এতদিন পরে কোন মেয়েকে বিয়ে করে সংসারের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, আরাম ভোগ করবার ইচ্ছা যদি তাঁর মনে এসে থাকে সে পথ খোলা আছে; তুলসী নামে একটি বিশেষ মেয়ের প্রতি ভালবাসার অভিনয় করা একেবারে বাহুল্য।

এক মাসের নোটিশ দিয়েছি মাত্র কাল, এক মাস এখনও কাজ করতে হবে। পরদিন কাজে গেলাম। টিফিন টাইমের আগে আমার বস বললেন, ডাঃ ভট্টাচার্য, মিঃ ভাদুড়ী আপনার খোঁজ করছিলেন। টিফিন টাইমে গেলে চলবে কিনা জিজ্ঞাসা করতে বলেছেন।

দেখা করতে গেলে বললেন, বসো। তোমার রেজিগনেশান দেবার কারণ কিছু দেখাওনি চিঠিতে। বলতে বাধা না থাকলে বলো।

বললাম, বাধা আছে। আপনার কৌতূহল থাকলে জেঠামণির কাছে জানতে পারবেন।

বললেন, চাকুরি যখন করতে চাইছ না আটকাবো না, এক মাসের বেতন দিয়ে কাল থেকে ছেড়ে দিচ্ছি তোমাকে।

বিস্মিত হলাম একটু। বললাম, কাজ না করে বেতন নিতে পারি না।

চাকুরি করতে অনিচ্ছুক লোককে ধরে রেখে লাভ নেই। ধরো এক মাসের নোটিশের জায়গায় এক মাসের বেতন দেয়া হচ্ছে।

আচ্ছা, নমস্কার।

বসো একটু। টিফিন খাওনি মনে হচ্ছে, কিছু খেয়ে যাও।

ধন্যবাদ। ক্যানটিনে গিয়ে খাব।

উঠে দাঁড়ালেন, বললেন, তোমার এভাবে চলে যাবার কোন মানে হয় না তুলসী, অনুতাপ করতে হবে তোমাকে।

কোথাও চাকুরি পাব না, না খেয়ে মরতে হবে বলছেন?

এসব কথা কেন বলছ? তুমি পাশ করা ডাক্তার, তোমার জেঠামণি রয়েছেন—

তাহলে অনুতাপ করতে হবে বলছেন কেন?

আমার ওপরে অবিচার করবার জন্য।

বললাম, মিঃ ভাদুড়ী, কোন অবিচার করিনি আপনার ওপরে। এখানে চাকুরি করা আমার আত্মসম্মানের পক্ষে হানিকর হয়েছে বলে চাকুরি ছাড়ছি।

বললেন, আর কিছু বলব না এখন। যদি অল্প কিছু সময় আমাকে দাও দু'-চারটে কথা বলবার জন্য কৃতজ্ঞ থাকব।

বললাম, বেশ বলবেন, আপনার সুবিধেমত।

পরশু রবিবারে সকালের দিকে কিছু সময়ের জন্য যদি আসতে পারো—

বললাম, চেষ্টা করব।

আচ্ছা, তাহলে এসো এখন। যদি কিছু খেয়ে যেতে—

বললাম, দিন কি দেবেন।

আমার জায়গায় ফিরে যেতে বস বললেন, সেটার উইথড্র করতে হল মনে হচ্ছে।

না, কাল থেকে আমার সার্ভিস টারমিনেট করছে।

বাড়ী ফিরে মিঃ ভাদুড়ীর সঙ্গে আলাপের রিপোর্ট দিলাম জেঠামণিকে। শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে কি ভাবলেন, তারপর বললেন, অবিচারের কথা বলল কেন দেবাশিস?

বললাম, বোধহয় মনে করেছেন তাঁর সম্বন্ধে ভুল ধারণা করে চাকুরি ছেড়ে দিলাম।

হতে পারে।

কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে কোন ভুল ধারণা তো আমার মনে নাই। লোকের মনে ভুল ধারণার পরিচয় পেয়ে খারাপ লেগেছে আমার।

ভুল ধারণা যখন নাই বুঝতে পারছিস তার বাড়ীতে গিয়ে তার কথা শুনতে রাজী হবার কি দরকার ছিল?

বললাম, কি বলতে চান ভদ্রলোক শুনতে আপত্তি করব কেন? আফটার অল, মিঃ ভাদুড়ী তোমার প্রতি শ্রদ্ধাবান ছাত্র, তাঁর সম্বন্ধে সব কিছু জেনেও তুমি তাকে স্নেহ করো, একথা কি ঠিক নয়?

একটু হাসলেন জেঠামণি, কিছু বললেন না।

তারপর প্রসঙ্গ বদলে বললেন, যেখানে চাকুরি ঠিক করেছিস তারা লোকের হাতে চিঠি পাঠিয়েছিল জানবার জন্য আগে যোগ দেয়া সম্ভব কিনা, তাদের লোকের অভাব হয়েছে।

বললাম, ভাল খবর জেঠামণি, বসে থাকতে হচ্ছে না। কাল দেখা করে জানিয়ে দেব আগে যোগ দিতে পারি।

পরদিন শনিবার। আজ সকালে তাড়াতাড়ি খেয়ে কাজে বেরোতে হবে না। পিসিমাকে সরিয়ে দিয়ে দু' একটা পদ রান্না করলাম জেঠামণির জন্য।

এর মধ্যে সস্ত্রীক অশোকবাবু এলেন দেখা করতে।

তারা বিদায় নিলে বেলা সাড়ে এগারোটা নাগাদ কাছের একটা দোকানে গিয়ে ফোন করলাম হাসপাতালে। সুপারিন্টেন্ডেন্টকে চাইলাম। তাঁকে জানালাম চিঠি পেয়েছি, কবে কাজে যোগ দিলে তাঁদের সুবিধে হয় জানতে চাইলাম। বললেন, ইচ্ছা করলে আজই যোগ দিতে পারেন। বললাম, আজ আর হয় না, কাল থেকে যোগ দেব। ভদ্রলোক রাজী হয়ে জানালেন যে, রেফারেন্সের জন্য তাঁরা এইমাত্র ইস্টার্ন ইন্ডিয়ার কর্তাকে ফোন করেছিলেন, তাঁর রিপোর্ট সন্তোষজনক।

নমস্কার জানিয়ে ফোন ছেড়ে দিলাম।

সেদিনের ডাকে আমেরিকা থেকে ফণীর একখানা চিঠি পেলাম। মন দিয়ে কাজ শিখছে ফণী। লিখেছে বছর খানেক পরে সে একসঙ্গে কাজ শিখতে ও কিছু কিছু রোজগার করতে পারবে তাতে করে আরও দু'একটা নামকরা জায়গায় কাজ দেখবার সুবিধে হবে।

খুশী হলাম ফণীর চিঠি পড়ে। ভাল ছেলে ফণী। মানুষ হতে পারবে।

(ক্রমশঃ)

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

রাতের সংলাপ

লুই ফুরনবার্গ এক নিদারুণ সংকটের লগ্নে জন্মেছিলেন, ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক সংকট যে যুগকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে, তিনি সেই যুগের লোক। বিপর্যয়, বিপ্লব এবং বিভীষিকার কালে এই লেখকের উদ্ভব। জীবনের অর্থ সন্ধানে লেখক কৃত্রিম বুর্জোয়া মূল্যবোধ ও আত্মপ্রবঞ্চনার মুখোমুখি এসে পৌঁছেছেন। রিলকের গীতিকবিতা ফুরনবার্গকে প্রভাবিত করেছিল গভীরভাবে এই কাব্যরসে সিক্ত হয়ে একদিকে সৌন্দর্যের জন্য আকুলতা জেগেছে মনে, সৌন্দর্য তৃষ্ণায় তিনি কাতর, আবার অন্যদিকে চারপাশের জগতে দেখেছেন হতাশা আর দীর্ঘশ্বাস। ব্রেখট্ এবং অন্যান্য লেখকের মত ফুরনবার্গ ছিলেন লেখকের দায়িত্ব বিষয়ে সচেতন এবং তিনি বুঝেছিলেন যে অতীতের জগৎ থেকে একেবারে সরে আসতে পারলেই হয়ত ব্যক্তিগত ও ঐতিহাসিক সমস্যাবলীর সমাধান সম্ভব হবে। সর্বজাগতিক অর্থনৈতিক সংকট, হিটলারী ফ্যাসিবাদ, এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ প্রভৃতির ফলে লেখকের মনে এই ভাব আরো সুদৃঢ় হয়ে উঠল যে নতুন সামাজিক ব্যবস্থার প্রয়োজন। সামাজিক রূপান্তরের সমর্থনে তিনি দাঁড়ালেন। ১৯৫৭ খৃঃ ভাইমারে ফুরনবার্গের আটচল্লিশ বছর বয়সে যখন মৃত্যু হল তখন তিনি জার্মাণ সাহিত্যের একজন প্রগতিশীল শক্তিমান লেখক হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছেন।

যে বৈষম্যের তিনি মুখোমুখি হয়েছিলেন এবং তার জট ছাড়ানোর জন্য যে প্রয়াস করেছিলেন ফুরনবার্গের রচনায় সেই মনোভঙ্গী এনেছে দৃঢ়তা এবং স্পষ্টতা। জার্মান-ইহুদী বংশোদ্ভূত এই লেখক ছিলেন চেক-নাগরিক, জাতিগত উন্মত্ততার হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য তাকে অনেক ক্লেশ ও শক্তি প্রয়োগ করতে হয়েছে। আত্মঅবলুপ্তির হাত থেকে আপনাকে ত্রাণ করতে হয়েছে। সর্ববিষয়ে রূপ, সংগীত এবং সততার প্রতি অতিরিক্ত আগ্রহ নিয়ে এই মানুষটিকে বর্বরতা ও পৈশাচিকতায় ভরা এক ভয়ংকর জগতের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হয়েছে।

গেস্টাপোর বন্দীশালায়, প্যালেস্টাইনে নির্বাসনে, এবং য়ুরোপ যাত্রায় বসে তিনি যে-সব কবিতা লিখেছিলেন তার মধ্যে ছিল ভ্রাতৃত্ব এবং প্রেমের শক্তির জয়গান এবং এই কাব্যগ্রন্থই তাঁকে প্রথম শ্রেণীর 'লিরিক পোয়েট' হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এই 'লিরিকধর্মী' কবিতা লেখকের কবিতায় চড়া সুরের বদলে ছিল শান্ত সুর এবং স্বপ্নের গুঞ্জন অথবা যুগের দাবী সম্পর্কে তিনি সর্বদা সচেতন।

মোৎসার্ট এবং গেটের ওপর তিনি দুটি ছোট উপন্যাস লিখেছেন এবং সেই উপন্যাস রচনায় ঐতিহাসিক তথ্যকে আশ্রয় করলেও সর্বদাই যে কাহিনী ইতিহাসনির্ভর করেছেন তা নয়, তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং মনোভঙ্গীও প্রকাশ করেছেন। 'মোৎসার্ট ইন প্রাগে' নিজস্ব ভঙ্গীতে ফুরনবার্গ যে কাহিনী এডুয়ার্ড মোরিকে তাঁর "Mozart auf der Reise nach Prag" নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থে লিখেছেন সেই কাহিনীই তাঁর উপন্যাসে বিধৃত করেছেন। জার্মাণ পাঠকের কাছে এই কাহিনী অতি পরিচিত। উভয় উপন্যাসের উপজীব্য মোৎসার্টের প্রথম আসরের পূর্ববর্তী উত্তেজনাময় দিনগুলির কথা। ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দের শরৎকালে প্রাগে মোৎসার্টের প্রথমতম সঙ্গীত রচনা 'ডন জিওভান্নি'র আসর বসেছিল। ফুরনবার্গের উপন্যাসে কিন্তু সমস্ত ঘটনা ভিয়েনা থেকে মোৎসার্টের যাত্রাপথে নাটকীয় ঘটেছে প্রাগে, ঠিক তখন তাদের সংসার ভাঙার পথে। নিজের রচনায় লেখকের বৈপ্লবিক বৈশিষ্ট্যই প্রকাশিত। ফুরনবার্গ ১৯৪৬ খৃঃ এই উপন্যাস জেরুসালেমে রচনা করেন, দীর্ঘ ছটি বছর সেইখানে তিনি নির্বাসনে কাটান। পরে ফুরনবার্গ বলেছেন তাঁর নিজে প্রাগ শহরের জন্য কাতর হয়ে পড়েছিলাম তাই মোৎসার্টকে প্রাগেই উপস্থাপিত করেছি।"

মোরিকে তাঁর মোৎসার্ট চরিত্রে একটা রোমান্টিক প্রলেপ প্রয়োগ করেছিলেন, কিন্তু ফুরনবার্গ তাঁর নায়ককে আত্মবিশ্বাসী, প্রগতিবাদী এবং সাম্য বিশ্বাসী বুর্জোয়া শিল্পী হিসাবে রূপায়িত করেছেন। এই শিল্পীর শিল্পকর্ম তাঁর কালে বাদানুবাদ সৃষ্টি করেছিল। নিপুণ কৌশল সহকারে প্রাগের সঙ্গীত পিপাসুর সমঝদারের ভবনে তিনি মোৎসার্টের সঙ্গে কাসানোভার সাক্ষাৎকার ঘটিয়েছেন। কাসানোভার তখন বয়স বাষট্টি বছর এবং অতিরিক্ত যৌন আবেগের জন্য সারা য়ুরোপ জুড়ে তাঁর নাম। এই কাসানোভাকেও সেই সময় প্রায় দশ বছর ধরে বোহিমিয়ান কাউন্ট ফন ভ্যালডস্টাইন অ্যাট ডুক্স দুর্গের অনুকম্পা প্রদত্ত অর্থে জীবিকা নির্বাহ করতে হচ্ছিল। ত্রিশ বছর বয়স্ক শিল্পী মোৎসার্টের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু এর স্বপক্ষে কোনো ঐতিহাসিক তথ্য নেই। কাসানোভাকে ফুরনবার্গ মোৎসার্টের বিপরীত জীবিত চরিত্র হিসাবে উপস্থাপিত করেছেন। অভিজাত সমাজের পরগাছা শ্রেণীর মানুষের চূড়ামণি হলেন কাসানোভা, সুতরাং কাসানোভার পক্ষে বুর্জোয়া শিল্পী মোৎসার্টের মধ্যে যে সৃজনশীল বৈশিষ্ট্য আছে, তার বিরুদ্ধে দাঁড়ান সম্ভব।

জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে আর্টের কি ভূমিকা এই প্রশ্নটিই মোৎসার্ট ও কাসানোভার আলাপচারে সর্বাধিক প্রাধান্য লাভ করেছে। এই প্রশ্নটি ফুর্নবার্গের মনে এমনই প্রবল হয়ে উঠেছে যে, তাঁর অন্য দুটি গল্পেও অনুরূপে এই প্রশ্ন উঠেছে। 'মোৎসার্ট ইন প্রাগ'-এ তিনি যে আর্ট জীবনকে ঘিরে আছে তাকে সমর্থন করেছেন এবং মাথার ওপরকার আকাশের তারাকে সমর্থন করতে পারেন নি। 'এনকাউন্টার ইন ভাইমার' উপন্যাসে গেটের জীবনই প্রধান উপজীব্য। দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যায় যে, এই উপন্যাসেও লেখক তাঁর বিশ্বাসকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য বলেছেন, 'শিল্পীর নিশ্বাস নিশ্চয়ই ফুল ফুটিয়ে তুলবে, ফুলকে ঝরতে দেবে না।' আর 'দি হলিডে' নামক উপন্যাসে এই সমাজবাদী লেখক সার্থকভাবে প্রকাশ করেছেন—

> "Man as he is, with all the passion, joys, fears, griefs, bliss and longing and so to give the living a sign, a proof of their ability to organise the world according to the most widespread will and wishes".

আলোচ্য গ্রন্থের অন্তর্গত তৃতীয় উপন্যাসটির নাম 'দি হলিডে'। লেখক যুদ্ধপূর্বকালের এক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এই উপন্যাসটি রচনা করেছেন।

লেখক স্বয়ং দীর্ঘকাল টিউবারকুলোসিস রোগী ছিলেন। নৈতিক ও শারীরিক দুর্বলতাকে পরাক্রান্ত করে গুরুতর পীড়া থেকে রোগমুক্ত হওয়ার কথা তাঁর প্রায় সব রচনার মধ্যে পাওয়া যায়। জীবনের সঙ্গে বোঝাপড়া করা এবং জীবন বিমুখ হয়ে পলায়ন করার মধ্যে যে দ্বন্দ্ব আছে—তা তিনি গভীরভাবে অনুভব করেছেন। টমাস মানের 'ম্যাজিক মাউন্টেনের' প্রতি লেখকের আধা-ভক্তি ও আধা-অভক্তির ভিত্তিতে তিনি এই কাহিনীর আর এক রূপ প্রকাশ করেছেন। 'দি হলিডে' ১৯৪২ খৃঃ প্যালেস্টাইনে রচিত এবং লেখকের মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়।

'এনকাউন্টার ইন ভাইমার' উপন্যাসটি ১৯৫২ খৃঃ শেষ হয়। লেখক বলেছেন, অবান্তরভাবে তিনি কাহিনীর কোনো অংশ উদ্ভাবন করেন নি। গেটে এবং মিকিভিকংকে রূপায়িত করতে তিনি তাদের ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যগুলিই ধরেছেন। ফুর্নবার্গ যে ঘটনার ওপর তাঁর উপন্যাসটি দাঁড় করিয়েছেন, সেটি হল গেটের আশীতম জন্মদিনে প্রখ্যাত পোলিশ কবি আদম মিকিভিকং-এর কবির ভবনে শ্রদ্ধাজ্ঞাপনে উপস্থিতি। দুজনের মধ্যে একটা নিদারুণ নিস্পৃহতা ছিল অর্থাৎ ছিল সুগভীর সহানুভূতি। ফুর্নবার্গের কাহিনী এই দিকটিই ফুটিয়ে তুলেছে। তরুণ পোলিশ কবি এডুয়ার্ড অডিনিক যিনি এই উপলক্ষ্যে প্রবীণ কবির সঙ্গে ছিলেন, তিনি ভাইমারের এই স্মরণীয় দিনগুলির বিবরণ লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলেন, ফুর্নবার্গ সেইসব তথ্যাবলী সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন। যথাযথভাবে কাহিনী বিবৃত করলেও ফুর্নবার্গ ভাইমারে সম্মিলিত এই বিস্ময়জনমণ্ডলীতে একজন আত্মা-প্রভোকেতা সৃষ্টি করেছেন তার নাম সেরউড, তার বিশ্বাসঘাতকতার ফলে ১৮২৫-এর ডিসেম্বিস্টদের জার-বিদ্রোহ চক্রান্ত ধরা পড়ে যায় এবং রাশিয়ার বহু বিদগ্ধ মানুষের নির্যাতন ভোগ করতে হয়। ফুর্নবার্গের এই উপন্যাসাবলী 'কনভারসেসনস ইন দি নাইট' নামে এই প্রথম ইংরেজীতে অনুবাদ করলেন জোন বেকার। ফুর্নবার্গ যে সব মানুষের কথা লিখেছেন, তাঁরা ঐতিহাসিক বা উপন্যাসের মানুষ হলেও জীবন্ত হয়ে চোখের ওপর এসে দাঁড়িয়েছেন।

—অভয়ংকর

CONVERSATIONS IN THE NIGHT: by LOUIS FURNBERG: Published by Seven Seas Books. BERLIN: (Manufactured by G.D.R. 1969).

নতুন বই

রবীন্দ্রনাথ ও বিজ্ঞান (আলোচনা)—পরিমল গোস্বামী। নবগ্রন্থনা, ৮, কৈলাস বসু স্ট্রীট, কলিকাতা—৬। মূল্য—তিন টাকা।

বর্তমান গ্রন্থটিতে লেখকের একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ স্থান লাভ করেছে। 'রবীন্দ্রনাথ ও বিজ্ঞান' নামক এই প্রবন্ধটি শ্রীপুলিনবিহারী সেন সম্পাদিত রবীন্দ্রায়ণের দ্বিতীয় খণ্ডে ইতিপূর্বেই প্রকাশিত হয়ে পাঠক এবং সমালোচকদের প্রশংসা অর্জন করেছে। বর্তমান গ্রন্থে উক্ত প্রবন্ধটি কিছুটা পরিবর্জিত ও সংযোজিত আকারে স্থান লাভ করেছে। বর্তমান গ্রন্থের ভূমিকায় লেখক বলেছেন যে, রবীন্দ্র-সাহিত্যে বিজ্ঞানের অনুপ্রবেশ অবলম্বনে একটি রচনা লেখবার ইচ্ছা তাঁর কিছুকাল পূর্বে হয়েছিল। সেই ইচ্ছার ফলেই তিনি এই প্রবন্ধটি লেখেন। সমগ্র প্রবন্ধটি আবার কতকগুলি পর্বে বিভক্ত। এই নাতিবৃহৎ গ্রন্থটির পৃষ্ঠা সংখ্যা মাত্র বাট।

শ্রীপরিমল গোস্বামী রবীন্দ্রনাথের কবিতা প্রবন্ধ পত্রাবলী থেকে অজস্র দৃষ্টান্ত দিয়ে রবীন্দ্র-সাহিত্যে বিজ্ঞানের অনুপ্রবেশ সম্বন্ধে একটি তথ্যপূর্ণ যুক্তিনিষ্ঠ প্রবন্ধ লিখেছেন। সমগ্র গ্রন্থটি পাঠ করার পর রবীন্দ্র-সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর সুনিবিড় পরিচয়ের যেমন প্রমাণ পাওয়া যায়, তেমনি বিজ্ঞান সম্বন্ধে লেখকের স্বচ্ছ ধারণার পরিচয় পেয়েও বিস্মিত হতে হয়। বর্তমান গ্রন্থের 'অষ্টাদশ শতকে ইউরোপীয় বিজ্ঞান' এবং 'ঊনবিংশ শতকে ইউরোপীয় বিজ্ঞান' অংশ দুটিতে লেখক সংক্ষেপে বিগত দুই শতকে ইউরোপে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার অগ্রগতি সম্বন্ধে পাঠকদের একটা ধারণা গড়ে নেবার সুযোগ দিয়েছেন। রবীন্দ্রসাহিত্য থেকে তিনি শুধু বিজ্ঞান-প্রসঙ্গের উল্লেখের উদ্ধৃতি দিয়েই দায় সারেননি, রবীন্দ্রনাথ সচেতনভাবে তাঁর কাব্যে সাহিত্যে কিভাবে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে প্রয়োগ করেছেন, তাও শ্রীগোস্বামী উপযুক্ত দৃষ্টান্তসহ প্রমাণ করেছেন। বাল্যকাল থেকেই যে রবীন্দ্রনাথের মনে বিশ্ব-বিষয়ে জিজ্ঞাসা জেগেছিল তা লেখক সঠিকভাবেই লক্ষ্য করেছেন এবং রবীন্দ্রনাথের নিজেরও যে প্রকৃত বিজ্ঞানীর মনোভাব ছিল তা রবীন্দ্র-সাহিত্য থেকে বিভিন্ন দৃষ্টান্তের সাহায্যে প্রমাণ করেছেন। তিনি লিখেছেন—'...কিন্তু বিজ্ঞানের যাবতীয় আবিষ্কারও যে একজন কবির চিত্তকে এমন গভীরভাবে এবং ব্যাপকভাবে উদ্বেল করে তুলতে পারে তার দৃষ্টান্ত সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথ একা। বিশ্ব-বিষয়ে তাঁর মনে জিজ্ঞাসা জেগেছিল তাঁর বাল্যকাল থেকেই। এটি তাঁর মতো অসাধারণ জ্ঞানতৃষ্ণার্ত মনের পক্ষে স্বাভাবিক ব্যাপার। মনে হয়, সব ঘটনার অন্তর্নিহিত সত্যটি দেখবার সহজ ক্ষমতা নিয়েই তিনি জন্মে ছিলেন। আর এই অন্তর্নিহিত সত্য আবিষ্কারই হচ্ছে বিজ্ঞানীর মূল লক্ষ্য।' তিনি আরও বলেছেন, 'বিশ্ব-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের যাকে বলে 'কমন-সেন্স ভিউ'—তাই। আর কমন-সেন্সকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করাই হচ্ছে বিজ্ঞানীর কাজ।'

বর্তমান গ্রন্থের যে কটি অংশ পাঠকদের বিশেষভাবে ভালো লাগবে তা হল 'ছোটকে বড়র সঙ্গে মিলিয়ে দেখা', 'রবীন্দ্রনাথ কতখানি অতীন্দ্রিয়বাদী', 'রবীন্দ্র জীবনদর্শনের মূলসূত্র', 'সেই মূলসূত্র—অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের আবর্তন', 'বিবর্তনে বিশ্বাস কবিসত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশ' এবং 'বিজ্ঞানে কবিমানসের বিস্ময়কর ব্যাপ্তি'। সমগ্র গ্রন্থটি পড়বার পর প্রবীণ লেখকের যুক্তিবাদী এবং তথ্যসন্ধিৎসু মনের পরিচয় পেয়ে পাঠক

ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম-জয়ন্তী : গত ১১ ডিসেম্বর সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের ইনস্টিটিউট অব ওরিয়েন্টাল স্টাডিজ-এ ভারতের প্রখ্যাত মনীষী, ভারতীয় সাহিত্য একাডেমীর সভাপতি, জাতীয় অধ্যাপক ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ৮০তম জন্মজয়ন্তী পালিত হয়। সোভিয়েট ও ভারতের বৈজ্ঞানিকরা এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। মস্কোতে ভারতের রাষ্ট্রদূত শ্রীডি পি ধর তাঁর বক্তৃতায় ভারত ও সোভিয়েটের মধ্যে সাংস্কৃতিক ও বৈজ্ঞানিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে ডঃ চাটার্জির মূল্যবান অবদানের কথা সশ্রদ্ধভাবে উল্লেখ করেন।

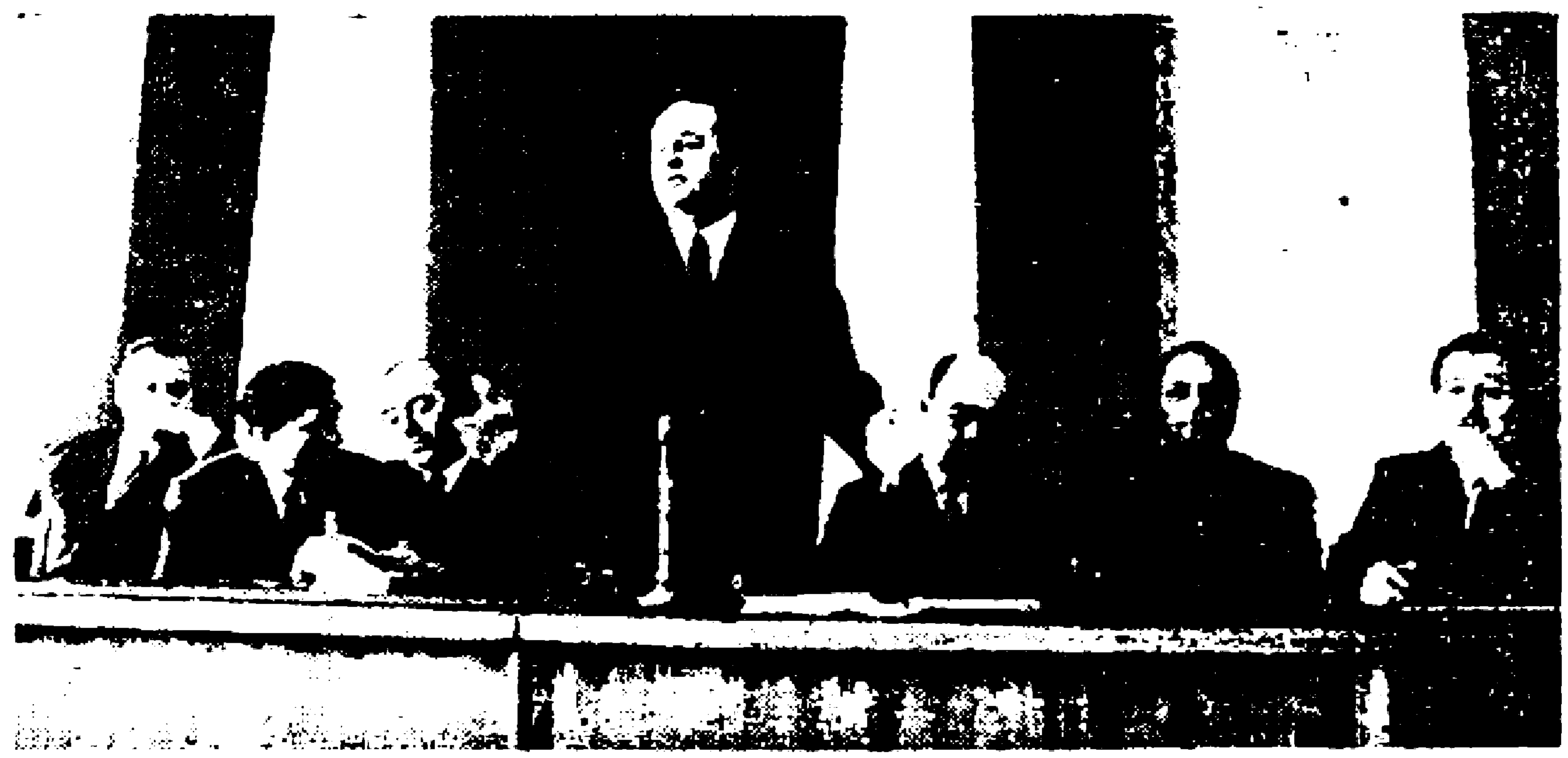

মুগ্ধ না হয়ে পারবেন না। বর্তমান গ্রন্থের সব থেকে বড় বৈশিষ্ট্য বিজ্ঞানের অতি জটিল তত্ত্বকেও শ্রীগোস্বামী তাঁর ভাষার গুণে পাঠকদের সহজবোধ্য করে তুলতে পেরেছেন। স্থানে স্থানে লেখকের পরিহাস-প্রবণতার দৃষ্টান্তও বিরল নয়। গ্রন্থটির প্রচ্ছদ শোভন ও সুন্দর।

বনজংগল ও শিকারের কথা—ভূপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ। ওরিয়েন্ট লংম্যানস্ লিমিটেড। ১৭, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ। কলকাতা-১৩। দাম আট টাকা।

শিকারী জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কাহিনী 'বনজংগল ও শিকারের কথা'। পূর্ব বাংলার প্রাচীনতম জমিদারবংশ সুসংগ রাজপরিবারের সন্তান শ্রীভূপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ একজন প্রথম শ্রেণীর শিকারী। দীর্ঘকাল গারো পাহাড় ও অন্যান্য বনজংগলে ভ্রমণ করেছেন শিকারের সন্ধানে। বন্য জীবনের সংগে পরিচয় তাঁর নিবিড়। শিকারী হয়েও অরণ্যজগৎকে দেখেছেন শিল্পীর চোখে। লেখক সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় শিকার-জীবনের কথা, অতীতের বহু-বিখ্যাত শিকারীর সান্নিধ্য এবং রোমহর্ষক ঘটনাবলী বর্ণনা করেছেন। সেই সংগে শিকার সম্পর্কে শিক্ষণীয় বহু তথ্যও দিয়েছেন। বইটি প্রকৃতির আলেখ্য। তাই কেবলমাত্র হত্যাকাহিনী না হয়ে, বন্য জগতের সৌন্দর্যকে জীবন্ত করে ফুটিয়েছেন প্রবীণ শিকারী। শিকারের কথা প্রথম বেরোয় ১৩৩৫ সালে। ভূমিকায় শ্রীসিংহ লেখেন : "শিকারের কথা প্রকাশের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, রক্তের নেশায় মত্ত না হয়ে বনের জীবজন্তুর দিকে এবং বনজগতের মর্মস্পর্শী সৌন্দর্যানুভূতির প্রতি যাতে আমাদের নবীন যুব-সম্প্রদায়ের মমতাপূর্ণ আকর্ষণ জাগে। এবার নতুন করে 'বনজংগল ও শিকারের কথা' ছাপাবার উদ্দেশ্যও প্রধানত তাই।"—তাই শ্রীসিংহ কাল্পনিক রোমাঞ্চকর কাহিনী সৃষ্টি করে বইটিকে সুলভ চিন্তার পরিচায়ক করেননি। অরণ্যের' সৌন্দর্যও যে হিংস্র প্রাণীদের নিয়েই পূর্ণাঙ্গ, বারবার এ-কথা তিনি জানিয়েছেন ভাবীকালের শিকারীদের। অসংখ্য ছবি বইটির গুরুত্ব বাড়িয়েছে।

সময়ের কাছে কেন আমি বা কেন মানুষ (কবিতা)—শম্ভু রক্ষিত।। পত্রপুট, ১৪, মাকড়দহ রোড, হাওড়া ১।। তিন টাকা।।

বইটির নাম রাখা হয়েছে প্রথম কবিতাটির নাম অনুসারে। বাকি সাতাশটি কবিতার মধ্যে তাঁর অনুভব বিচিত্রভাবে প্রসারিত হয়েছে বলেই মনে করা যায়। তিনি লিখেছেন : "আমার জীবন গূঢ় রহস্যাবৃত এবং আমার মন শব্দে ক্লান্ত আমার শরীরের ওপর শব্দ স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে এবং স্তব্ধ হয়ে শেষ হচ্ছে। মানুষেরা চলে যাচ্ছে এবং পৃথিবী যেন শব্দহীন যাত্রী।"

স্বভাবতই শম্ভু রক্ষিত যে-সময়ের কথা বলেন, তার সংগে বহির্জগতের সম্পর্ক অতি ক্ষীণ, হয়তো ছদ্ম-দার্শনিক অর্থেই তা অনুস্যূত। প্রকাশভঙ্গির দিক থেকে অবজেকটিভ। শিল্পের অনুরোধেও তিনি শব্দসংক্ষেপে সম্মত হননি। পাঠক সেজন্য তাকে অভিযুক্ত করতে পারেন। নিরোনামহীন ভূমিকায় তিনি ঘোষণা করেছেন : "আমার কবিতা অন্তরের স্বর্গীয় ভাবধারার আবিষ্কার। কবিতা ছাড়া অন্য কোনো পবিত্রতায় আমার বিশ্বাস নেই।"

বোধহয়, এ-সঙ্কলনের কবিতাগুলিকে তিনি আত্মদানের সামিল বলে মনে করেন। উৎসর্গপত্রের কয়েকটি পংক্তি পড়ে অন্তত তাই মনে হয়। কবি লিখেছেন : "ঈশ্বরের রোষ থেকে মানুষকে ত্রাণ করার জন্যে আর-এক ঈশ্বর-পুত্রের আত্মাহুতি ও রক্তদান।"

কালক্রম ও প্রতিধ্বনি— কবিতা। দেবদাস আচার্য। অন্তর্বাস প্রকাশনী। মন্তুপাণিডাঙা। নবদ্বীপ, জেলা—নদীয়া। মূল্য—তিন টাকা।

তরুণ কবি দেবদাস আচার্যের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'কালক্রম ও প্রতিধ্বনি'। সম্প্রতি

চেতনার বজ্র বাঁশিও শোনার একটি মন নিয়ে হাজির হয়েছেন। গোটা পৃথিবীতে কফিন পুরে কেন ডাকাতদল মদের গেলাসে উল্লাসের ঢেউ তুলছে তাদের তিনি বারবার সতর্ক করে দিচ্ছেন—"আমার মনে হয় প্রত্যেকের ঘরেই প্রস্তুত রয়েছে বারুদ' অথবা 'আমি জানি একদিন মহাজাগতিক অগ্নিপিণ্ড হয়ে পৃথিবী পর্দা ছিঁড়ে ভেসে যাবে।'

তাই পুলিশ চাপান পশুতুল্য কিছু হিংস্র স্বার্থপর মানুষের মধ্যে যাচ্ছেতাই হয়ে যাওয়া এই বিশ্বে তিনি একটি আশার উর্বর ক্ষেত্রে উত্তরণের মন্ত্র দুর্বোধ্যভাবে উচ্চারণ করেন—

'এই দেশ থেকে হবে প্রেক্ষাপট উল্টে
দিতে হবে
নতুবা যে কলকলাস ফেনার উজ্জ্বল
এই দীঘার সৈকতে
থাক কেটে তাকে নিয়ে যেতে হবে
অভ্যন্তরে
সমুদ্রে জমাতে হবে মাটি
এই বালিয়াড়ি থেকে সেই এক
প্রার্থনা আমার।'

শুধু তাই নয়। শিল্পকে এবং সংগ্রামকে তিনি জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে দেখেছেন। বলেছেন, 'আমি জানি ভাঙা ও গড়ার মধ্যে শিল্পকেও সাজাতে হবে কর্মে।'

মায়ের গান—কল্যাণকুমার মুখোপাধ্যায়। রূপা অ্যান্ড কোম্পানী। ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট। দাম তিন টাকা।

কুমারী মায়ের স্তুতিগান সংগ্রহ। শ্রীমুখোপাধ্যায়ের ভক্তপ্রাণ-নিঃসৃত এই স্তুতিগান সকলেরই ভাল লাগবে। এই ধরনের মাতৃসঙ্গীত দীর্ঘকাল রচিত হয়নি।

সংকলন ও পত্র-পত্রিকা

কালি ও কলম (অগ্রহায়ণ ১৩৭৭)—সম্পাদক : শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা—১২। দাম দেড় টাকা।

কিছুকাল আগে আকস্মিকভাবে পরলোকগমন করেছেন প্রখ্যাত কথাশিল্পী অধ্যাপক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। এই সুলেখক ছিলেন সুরসিক এবং অনন্য-শিল্পবুদ্ধিসম্পন্ন। অতি স্বল্পকালে গল্প, উপন্যাসে বাংলা সাহিত্যকে তিনি সমৃদ্ধ করে গেছেন। 'কালি ও কলমে'র বর্তমান সংখ্যাটি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের অগণিত সাহিত্যিক ও পরিচিত অনুরাগীদের স্মৃতি-অর্ঘ্য নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। লিখেছেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, বনফুল, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, মনোজ বসু, প্রমথনাথ বিশী, বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, আশুতোষ ভট্টাচার্য, গোপাল হালদার, অমলেন্দু বসু, সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, হরপ্রসাদ মিত্র, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ভবানী মুখোপাধ্যায়, জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, দক্ষিণারঞ্জন বসু, সন্তোষকুমার ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, মণীন্দ্র রায়, কৃষ্ণ ধর, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, বিশু মুখোপাধ্যায়, উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, সন্তোষকুমার দে, সুমথনাথ ঘোষ, নবেন্দু ঘোষ, সরোজ দত্ত, গণেশ বসু, অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় এবং আরো কয়েকজন। সম্পাদক শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় পরলোকগত সাহিত্যিকের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে গিয়ে তাঁর এই ক্ষুদ্র মাসিক সাহিত্য পত্রিকাটিকে যথেষ্ট মূল্যবান করে তুলেছেন। নারায়ণবাবুর অকাল মৃত্যু যে প্রতিটি বাঙালীর কাছে কতখানি বেদনার তা এই পত্রিকাটির বিভিন্ন রচনা পাঠে আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

একাল (চতুর্থ বর্ষ : দ্বিতীয়-তৃতীয় সংখ্যা) সম্পাদক : নকুল মৈত্র ও ভরত সিংহ। ২৪ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলকাতা—৩৭। এক টাকা।

বাংলা ছোটগল্প নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। বিশেষ করে তরুণরা এ বিষয়ে বিশেষভাবে উৎসাহী। 'একালে' তারই প্রতিবিম্ব। ছোটগল্প এবং ছোটগল্প সম্পর্কীয় নানান সাহিত্য-ভাবনার খোরাক এতে আছে।

উত্তর সাগর : (প্রথম সংখ্যা—সম্পাদক শৈলেন সাহা ও শুকদেব চট্টোপাধ্যায়। চৈতন্য কলা বিজ্ঞান কেন্দ্র ১০এ নেতাজী সুভাষ রোড, উত্তরপাড়া, হুগলী।। ত্রিশ পয়সা।।

সম্পাদকীয় পড়ে এবং অন্যান্য রচনা-দৃষ্টে অনুমান হয় পত্রিকাটি মূলত শিল্প-সংস্কৃতিমূলক। প্রচ্ছদে 'প্রথম সংখ্যা' ছাপা হলেও সম্পাদক লিখেছেন : 'এই সংখ্যা একটু ছোট করতে বাধ্য হলুম।' শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথের একটি পোর্ট্রেট এঁকেছেন চৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায়। তাঁর লেখা একটি প্রবন্ধ এ সংখ্যার অন্যতম আকর্ষণ। তাছাড়া দিলীপ মুখোপাধ্যায়ের একটি ইংরেজী কবিতা ও রামাই বাউলের কয়েকটি গান ছাপা হয়েছে।

বাংলা ভাষায় সায়েন্স ফিকশ্যান

১

কুন্তলীন পুরস্কার ছিল সে যুগের নবীন সাহিত্য যশঃ প্রার্থীদের অন্যতম কাম্যিত। ১৮৯৩ খৃঃ অথবা ১৮৯৪ খৃঃ এক বাঙালী বিজ্ঞানসেবীর একটি গল্প উপস্থাপিত হয়েছিল প্রতিযোগিতায়। গল্পের নাম 'পলাতক তুফান।' লেখক শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু। বলা বাহুল্য জগদীশচন্দ্র পুরস্কার লাভ করেননি। কিন্তু ঐ প্রথম বাংলা ভাষায় একটি সার্থক বিজ্ঞান-কল্প কাহিনী রচিত হয়েছিল। আজ যেখানে বিজ্ঞানকল্প কাহিনী মর্যাদার আসনে ভূষিত এবং সার্থক বিজ্ঞান কাহিনীর অপ্রতুলতা ও চাহিদা, সেখানে এই গল্পটির সাবলীলতা ও উপস্থাপনা আমাদের চমৎকৃত করে। জগদীশচন্দ্রের আগে অন্য কোন বাঙালী বিজ্ঞানসেবী সাহিত্য রচনায় সচেষ্ট হননি। এবং প্রায় কেউই বিজ্ঞানকে সাহিত্যে ব্যবহারের জন্য সচেতন চেষ্টা করেননি। (১) যদিও আমরা জানি ওদিকে জুলে ভের্নের বিজ্ঞানকল্প কাহিনীগুলি ইউরোপে আলোড়ন তুলেছে। তার ধাক্কা এসে লেগেছে এদেশে। বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে বিজ্ঞানকল্প কাহিনী রচনার সম্ভাবনা ছিল লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু তাঁর মত সিরিয়াস লেখক এদিকে নজর দেবার অবকাশই পাননি। গত যুগ পর্যন্ত ডিটেকটিভ ও রহস্য কাহিনীর সঙ্গে বিজ্ঞানকল্প কাহিনীও ছিল গৌণ সাহিত্যের পর্যায়ে। রবীন্দ্রনাথ সাবলীল দক্ষতায় তাঁর কবিতায় গল্পে উপন্যাসে বিজ্ঞানকে ব্যবহার করেছেন। তিনি ভৌতিক রহস্য গল্প লিখেছেন যদিও, কিন্তু বিজ্ঞান গল্প লেখেননি একটিও। অথচ তাঁর স্পর্শ পেলে পরবর্তীকালে সাহিত্যের এই বিভাগটি পরিপুষ্ট হতে পারত। কিন্তু জগদীশচন্দ্র! রচনাকালে তাঁর মানসিকতায় কি ছিল জানি না। তিনি কি বাংলা সাহিত্যে কোন 'এক্সপেরিমেন্ট' চেয়েছিলেন? বিজ্ঞানকল্প কাহিনী বিষয়ে তাঁর কি কোন সচেতন দৃষ্টিভঙ্গি ও অনুপ্রেরণ ছিল? (২) কিন্তু যাই হোক, জগদীশচন্দ্রের পরেও বহুদিন ওপথ কেউ মাড়াননি।

জগদীশচন্দ্রের অকৃত্রিম রসানুভূতি উদ্ভিদের রচনাটির মধ্যে বৈজ্ঞানিক সম্ভ্রম সৃষ্টির পরিবর্তে একটি লঘু সাহিত্য-রসের আমদানী ঘটিয়েছে। জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞানী মন রচনায় বৈজ্ঞানিক কাঠামোও

* সঠিক তারিখটি মূল্যবান। অথচ ওটি আমার পক্ষে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। কেউ এটি জানালে বাধিত হব। পলাতক তুফান রচনাটি সম্পূর্ণ সংকলিত হয়েছে অব্যক্ত গ্রন্থে। গ্রন্থটি বহুদিন অমুদ্রিত।

প্রত্যয় রাখেনি, তাকে প্রকাশ করেছে। জগদীশচন্দ্রের এই এবং অন্যান্য রচনা পড়লে একথাই মনে হয় একটু সচেতন দৃষ্টিপাত করলেই, বাংলাভাষার সাহিত্যের এই শাখাটি বহু পূর্বেই পুষ্ট হত। জগদীশচন্দ্রই হতেন এই বিভাগের পথিকৃৎ ও অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক। ভাগিরথীর উৎস সন্ধানের মধ্যেও বিজ্ঞানকল্প কাহিনীর মূল ফ্যান্টাসীগত ছাপ রয়েছে।

দুঃখের বিষয় অদ্যাবধি এমন কি একটি বিজ্ঞানকল্প কাহিনীর সাময়িক পত্রিকা কয়েক বছর চালু থাকা সত্ত্বেও বাংলা ভাষায় সার্থক বিজ্ঞানকল্প কাহিনীর তেমন সাক্ষাৎ মিলল না। হল না এমন কি কোন সার্থক লেখক সৃষ্টি। আবার একমাত্র ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য মশাই-ই তাঁর বঙ্গ সাহিত্যে বিজ্ঞান পুস্তকে জগদীশচন্দ্রের ঐ রচনাটির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন। কিন্তু তিনিও রচনাটির যথাযোগ্য স্থান অনির্ণীত রেখেছেন। কোন গবেষক যদি বাংলা সাহিত্যে এই ধারাটির প্রতি আলোক বর্ষণ করতে পারেন, উপকার হয়।

প্রচুর বিজ্ঞান ভিত্তিক গল্প-উপন্যাস বর্তমানে লেখা হচ্ছে। অথচ অধিকাংশ রচনাই অসার্থক তো বটেই, এমনকি প্রায়ই সেসব রচনায় বিজ্ঞান বুদ্ধির লেশমাত্র থাকে না। কারা এ ধরনের রচনায় সার্থক হতে পারেন? সাহিত্যানুশীলনকারী বিজ্ঞানী অথবা বিজ্ঞানে যথেষ্ট উৎসাহী ও শিক্ষিত সাহিত্যিক। আচার্য জগদীশচন্দ্রের স্বল্প পরবর্তীকালে যেসব শক্তিশালী বিজ্ঞানী সাহিত্য চর্চা করেছেন তাঁদের মধ্যে রাজশেখর বসু, চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, জ্যোতির্ময় ঘোষ তথা ভাস্করের নাম স্মরণীয়। কিন্তু এ'দের কেউ বিজ্ঞানকল্প কাহিনী রচনায় চেষ্টা করেননি। চেষ্টা করেননি সমসাময়িক অন্যান্য সাহিত্যিক বা বিজ্ঞানী।

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান ভিত্তিক সাহিত্য সৃষ্টির সূচনা শিশু-কিশোর সাহিত্যের উন্মুক্ত আসরে। সত্য কথা বলতে কি পূর্বাহ্নে যা বলেছি—তথাকথিত সিরিয়াস লেখকদের নাক উঁচু ভাব। অথচ আজ বাংলা সাহিত্য একটা ক্ষীণতনু নদীর অবস্থায়—সেই মধ্যবিত্ত প্যানপ্যানানি ছাড়া আর কথা নেই।

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানকল্প কাহিনীর দুটি ত্রুটি। প্রথমত সাহিত্যিকরা যখন এ-ধরনের রচনা লিখেছেন, তাঁরা বিজ্ঞানের মূল ও প্রাথমিক সর্তগুলিরও কোন তোয়াক্কা করেননি। আবার বিজ্ঞানের ছাত্র যাঁরা, তাঁরা বৈজ্ঞানিক জড়তার ভাবটি কাটিয়ে উঠে গতিশীল ও সাবলীল হতে পারেননি। গল্পগুলিও প্রবন্ধের মত কড়া হয়ে উঠেছে।

ডঃ বৃন্দাবন বাগচী স্বয়ং বিজ্ঞানসেবী হয়েও ছোটদের জন্য কয়েকটি গল্প ও উপন্যাসে তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। 'মহাশূন্যের ডায়েরী' নামক কিশোর উপন্যাস ও শান্তিবাদী বিজ্ঞানী হাজসের গল্পগুলি বড়ই সুন্দর। অধ্যাপক ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য স্বয়ং রসায়নের অধ্যাপক এবং সাহিত্যিক পরিবারের মানুষ। তিনি ছোটদের জন্য কয়েকটি উৎকৃষ্ট বিজ্ঞান-কাহিনী লিখেছেন। তবে ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণের মধ্যে কখনও কখনও বিজ্ঞানকে অতিক্রমের চেষ্টাও দেখা গেছে। এ'দের দুজনেই কোন রচনায় কতটা বিদেশী ছায়ায় প্রভাবিত বলা দুষ্কর। কিন্তু এ'দের মৌলিকত্বও সম্মানার্হ।

শ্রীঅদ্রীশ বর্ধন প্রমুখ কয়েকজন বিদেশী গল্পকে দেশী ছাঁচে পুরে কিছু সুন্দর রচনা উপহার দিয়েছেন। কিন্তু মৌলিকতার চেষ্টা মাত্র প্রায়শঃই ব্যর্থ হয়েছেন। কয়েক বছর পূর্বে লোকান্তরিত ডঃ দিলীপকুমার রায়চৌধুরীও এদিকে চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর লেখাতেও প্রাবন্ধিক বা বিজ্ঞানী ভাবটা বেশী ফুটে উঠেছে এবং একটি স্বচ্ছন্দ গতির অভাব লক্ষ্য করা গেছে। এ-বিষয়ে বড়কটা ব্যতিক্রম বোধহয় প্রেমেন্দ্র মিত্র। তাঁর 'মনুদ্বাদশ' বইটি এদিক দিয়ে শ্রেষ্ঠতম। বইটির বহুল প্রচার না হওয়া দুঃখের। বইটিকে বিশ্ব-সাহিত্যের পর্যায়েও অন্যতম বলতে দ্বিধা হয় না। গত দশ বছরে বাংলা ভাষার একশটি উল্লেখ্য উপন্যাসের নাম করতে গেলে, এ-বইটির স্থান থাকা উচিত।

স্বর্গত হেমেন্দ্রকুমার রায়ের 'মানুষের প্রথম অ্যাডভেঞ্চার' একটি সার্থক বিজ্ঞান-ভিত্তিক কিশোর উপন্যাস। কলকুলের ভালা, শঙ্করের নির্বেদিতা রিসার্চ ল্যাবরেটরী প্রভৃতি দু-একটি রচনায় বিজ্ঞানকে ও বৈজ্ঞানিক পরিমণ্ডলকে সুচারুরূপে ব্যবহারের নিদর্শন মেলে। রবীন্দ্রনাথেই এ-জিনিসের সার্থক সূচনা।

সত্যজিৎ রায় যদিও চেষ্টা করেছেন, তবু তাঁর রচনাগুলি সাহিত্য বিচারে যতটা, বিজ্ঞান-কল্পনার বিচারে ততটা নয়।

ছোটদের জন্য আরেকটি সুন্দর বইয়ের নাম মনে পড়ছে। সেটি সুশীল ঘোষের চাঁদে পাড়ি। নিছক বিজ্ঞানকল্প কাহিনী না হলেও এটি একটি বিজ্ঞানশ্রয়ী উপন্যাস। সমরজিৎ কর কিছু কিছু বিজ্ঞান-ভিত্তিক কাহিনী রচনা করেছেন। তাঁর রচনাগুলির প্রধানতম ত্রুটি এগুলি কেমন নিছক বর্ণনার মত লাগে। যথাযথ সাহিত্য হয়ে উঠতে পারেনি। তবুও ছোটদের কয়েকটি রচনার ক্ষেত্রে তিনি অনেকদূর সার্থক। আরও অনেক নবীন ও আধুনিক লেখক বিজ্ঞানকে গল্পে উপন্যাসে এমনকি কবিতার ব্যবহারের চেষ্টা করছেন। এটি শুভলক্ষণ। এদের অনেকেই বিজ্ঞানের ছাত্র। সাহিত্যিক দক্ষতা এবং বৈজ্ঞানিক মনন-শীলতা উভয়ের মণিকাঞ্চন সংযোগ ভিন্ন সার্থক বিজ্ঞানকল্প কাহিনী রচনা অসম্ভব। বিজ্ঞানকল্প কাহিনীর লেখককে মনে রাখতে হবে তাঁর সৃষ্টি মূলতঃ সাহিত্য। তথাকথিত 'বিজ্ঞান-সাহিত্যের' প্রবন্ধের মত প্রধানতঃ বিজ্ঞান নয়। তবে দ্বিতীয় সত্যই হল বিজ্ঞানকে পাগলের মত অতিক্রম বা অস্বীকার না করা। বাংলা সাহিত্যে যা হচ্ছে হামেশাই।

বাংলা সাহিত্যে এ-ধরনের রচনার আর একটি ত্রুটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে মাত্র গ্রহান্তর অভিযান ও পদার্থবিদ্যার জগতেই সীমাবদ্ধ। আর মৌলিকতার ছাপ প্রায়শঃ অলভ্য। আমাদের লেখকদের এই নাবালকত্ব পীড়াদায়ক। কোন বিশেষ রচনায় অনুকূল আবহ সৃষ্টির জন্য ভাষায় অভিনবত্ব প্রয়োজন। বিজ্ঞানকল্প কাহিনীর উপস্থাপনায় প্রাসঙ্গিক ভাষা নির্মাণে লেখকেরা অধিকাংশই অপারগ থেকে গেছেন। তবে বাংলা ভাষায় বিদেশী বিজ্ঞানকল্প কাহিনীর কয়েকটি বড় সুন্দর অনুবাদ হয়েছে। বিশেষতঃ ছোটদের জন্য।

—সুধীরকুমার সেন

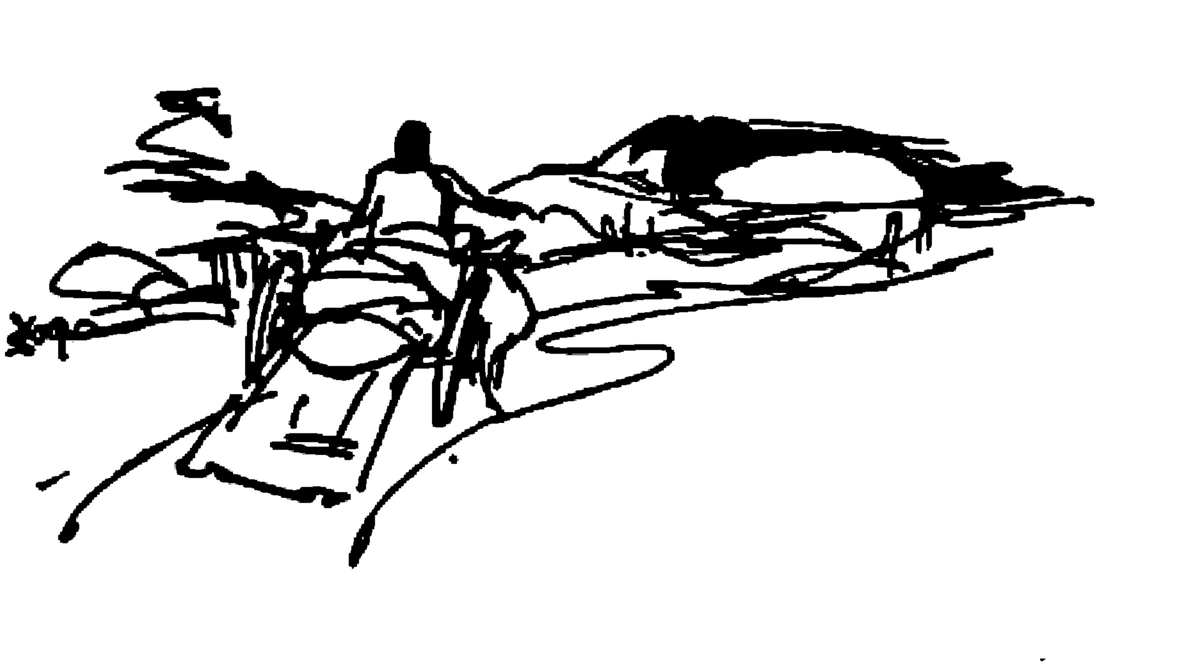

বইকুণ্ঠের খাতা

বইপাড়ার হালচাল : প্রকাশকের অভিমত

বইপাড়ায় এখন পাঠ্য বইয়ের মরশুম। গল্প নয়, উপন্যাস নয়, স্কুল-কলেজের দিকে তাকিয়ে আছেন প্রকাশকেরা। ক্যানভাসাররা ফিরে আসছেন মফস্বলের প্রচার শেষ করে। কেউবা মাস্টারমশাইদের সঙ্গে এখনো ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছেন, যদি দু-একটা বই পাঠ্য-তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা যায়। সারা বছর উপেক্ষিত বিক্রয়-শিক্ষকেরা এখন প্রকাশকদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ মানুষ। প্রধান শিক্ষকেরা তো বটেই।

সেদিন শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ধরে হাঁটছিলাম। দেখলাম, দোকানে কিছুটা ভিড় বেড়েছে। ব্যবসা-সংক্রান্ত কথাবার্তাও কানে আসছিল দু-একটা। একজন পরিচিত প্রকাশককে জিজ্ঞেস করলাম, কি রকম? ব্যবসার খবরাখবর ভালো তো?

ভদ্রলোক হাসলেন নিস্পৃহভাবে। বললেন, একরকম। মানে, কিছুই বুঝতে পারছি না। গত চার-পাঁচ বছর ধরেই খারাপ যাচ্ছিল। এবারের ধরনটা আলাদা। সেজন্যেই মতামত দিতে পারছি না। নতুন বই বের করিনি। পুরনো বই ছেপেছি দু-একটা। ক্যানভাসারদের মুখে বরাবরই আশার কথা শুনে এসেছি। এবারও তার কোনো ব্যতিক্রম ঘটবে বলে মনে হচ্ছে না। সকলেই বলছেন, মন্দ নয়।

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ পাল্টা প্রশ্ন করলেন তিনি, আপনার কেমন মনে হয়? বইয়ের ব্যবসা কি চলবে?

অপ্রত্যাশিত জিজ্ঞাসায় আমি বিব্রত বোধ করছিলাম। বললাম, প্রশ্নটা আমারই হওয়া উচিত ছিল। কেননা, আমি ক্রেতা এবং পাঠক। আপনারাই জানেন, ব্যবসা কিভাবে চলবে বা চলবে না। তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ভাবনাটাও বরং আপনাদেরই।

কিঞ্চিৎ হেসে বললেন, আমি বরাবরই আশাবাদী। এককালে একটা বড় কোম্পানীর ক্যানভাসার ছিলাম। সে-কোম্পানী এখন নেই। আমি বইয়ের ব্যবসা শুরু করেছি সেই অভিজ্ঞতা সম্বল করে। জানি, আজ না হোক দুদিন পরে সবই স্বাভাবিক হবে। শুধু বর্তমানটাকে নিয়ে ভাবছি। সন্ধ্যার পরে একবার এ-পাড়ায় আসবেন। দেখবেন, সাতটা বাজতে না বাজতেই অনেকে দোকান বন্ধ করে দিয়ে বাড়ী চলে যান। অথচ, এ-সময়টায় আমরা অন্যান্য বার একটু বেশী রাত পর্যন্ত থাকতাম।

মাস্টারমশাইরা কি বলেন?

—তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগই তেমন করে উঠতে পারছি না। যাঁদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে, তাঁরা প্রায় সকলেই বলছেন, বই পাল্টানো হবে না। গতবার যেমন ছিল, এবারও তেমনি থাকবে।

বললাম, ভালোই তো! প্রচারের জন্য ছোটাছুটি করতে হল না, ক্যানভাসার পাঠাতে হল না, অথচ ব্যবসাটা আগের মতই সমান চলবে। তাতে তো আপনাদের অনেক খরচ বাঁচলো।

—কিন্তু তা তো হবার নয়। হবেও না। আমরা বড় প্রকাশক নই, এ-লাইনের ফোকর-ফাঁকটা জানি। কন্টেস্টে দুটো-চারটে বই ছাপি, মাস্টারমশাইদের হাতে-পায়ে ধরে পাঠ্য-তালিকার মধ্যে নিজেদের নামটা ঢোকাই, আর তার ওপরে সংসার চলে, দোকানের ঘর ভাড়া দিই, পরের বছরের জন্য প্ল্যান-প্রোগ্রাম তৈরী করি। যদি বই কেটে যায়, তাহলে তো একেবারে মারা যাবো। উঁচু মহলে আমাদের তেমন পরিচয় নেই। হয়তো দেখা যাবে, পরিবর্তন হচ্ছে, নতুন বই ঢুকছে, কেবল আমরাই পাঠ্য-তালিকা থেকে ক্রমাগত নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছি।

একটু হেসে বললেন, আমাদের এই ব্যবসাটা সিজনাল। সাহিত্যের সঙ্গে যোগ সামান্যই। সরস্বতীর চেয়ে লক্ষ্মীর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক বেশী। আমাদের কাজটা চাষের। হেমন্তে বীজ ছড়াই, শীতে ফসল তুলে আনি। বাকি সময়টা শুয়ে-বসে কাটানো। কোনো রকমে দিন গুজরান করা। এ-সময়ে ক্যানভাসাররা আমাদের কাছ থেকে দু-পয়সা পান। মাস্টারমশাইরাও। কোনো কোনো স্কুলের টিচার্স কাউন্সিল বুক স্টল খুলে বসেন। আমরা তাঁদের বেশী কমিশনে বই দিই। নিশ্চিন্ত থাকি টাকা মার যাবে না। এবার কেউ-ই তেমনভাবে উদ্যোগী হচ্ছেন না। মফঃস্বলের দোকানদাররাও কম আসছেন কলকাতায়। তাঁদের মারফতে বই ছড়িয়ে দেওয়া যেত গ্রামে, গ্রামান্তরে। কাগজে কাগজে পাবলিশার্স অ্যাসোসিয়েশন বিজ্ঞাপন দিয়েছেন, যেন শিক্ষকমশাইরা কোনো বইয়ের নমুনা কপি না পেলে বই না কাটেন। চিঠি লিখলেই প্রকাশকরা স্পেসিমান কপি পাঠিয়ে দেবেন। কিন্তু তাতে আমরা নিশ্চিন্ত হতে পারছি কই?

শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের অভিমত

'প্রকাশ ভবনে' বসে কথা হচ্ছিল শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। তিনি

অতটা চিন্তিত নন। বললেন, মূলত আমি সাহিত্যের প্রকাশক, পাঠ্য বইয়ের নই। তবু দুটো-চারটে স্কুল-কলেজের বই বের না করে পারি না। পুজোর পর সাহিত্যের বাজারে কিছুটা ভাটা পড়ে। সেটা সামলে ওঠার জন্যই এরকম কিছু বই বের না করলে চলে না। কেবল অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্যই এসব করতে হয়।

বললাম, বাংলা বইয়ের বাজার কেমন?

—খুব খারাপ। নতুন কোনো গল্প-উপন্যাস এখনই ছাপতে পারছি না। কয়েকটা দিন অপেক্ষা করে দেখি। যে-সব বই ছাপা হচ্ছিল, তাও চলছে ঢিমেতালে। কাগজের দারুণ টানাটানি। দাম বেড়ে গেছে। আগে হোলসেলাররা ধারে কাগজ-পত্র দিতেন। এখন আর দেন না। প্রেসের অবস্থাও তাই। নগদ কারবার করে বইয়ের ব্যবসা চালানো কঠিন। অন্নবস্ত্রের মতো বই তো আর জীবনধারণের পক্ষে অপরিহার্য নয়!

আপনি কি কোনো সঙ্কটের দিকে ইঙ্গিত করছেন?

—সঙ্কট? হ্যাঁ, সঙ্কটই। তবে সেটা বাংলাদেশের। টিটাগড়ে কাগজ তৈরী হয়, কিন্তু আমরা পাই না। শুনেছি, সেসব কাগজ দিয়ে বই ছাপছেন বোম্বে, মাদ্রাজ, দিল্লীর প্রকাশকেরা। ও'রা সরাসরি মিলের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন, অ্যাডভান্স টাকা পাঠিয়ে দিচ্ছেন, আর আমরা এখানে বসে হা-পিত্যেস করছি। মিলওয়ালারা আগে হোলসেলারদের কাছে কাগজ বিক্রী করতেন ধারে। এখন বাইরের চাহিদা থাকায় কেউ ধারে দেন না। ফলে, বাংলার কাগজ বাংলাদেশে দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়েছে।

বললাম, আপনারাই বা নগদ টাকা দিয়ে কাগজ কিনতে পারেন না কেন? দিল্লী, বোম্বাই যদি আপনাদের ওপর টেক্কা দিতে চায়, আপনারাই বা ছাড়বেন কেন?

—না, আমরা পারি না। বাংলা দেশের অধিকাংশ প্রকাশকই অল্প বিত্তের। প্রচুর টাকাকড়ি আর কজনের আছে? তার ওপরে, নগদ টাকা খরচ করে নগদ রিটার্ন পাওয়া যায় না বইয়ের ব্যবসায়ে। সেজন্যে অপেক্ষা করতে হয়, রিস্ক নিতে হয়। স্পেকুলেশনে ভুল হলে সব গেল। দু-চারজনকে বাদ দিলে বাংলা দেশে লাখপতি প্রকাশকের সংখ্যা কম। সকলেই ধারে কারবার করেন।

কাগজের অভাবে আপনার কোন বই কি ছাপা বন্ধ আছে?

—আছে। সেগুলি ধীরে-ধীরে ছাপবো। আপাতত দু-একটা স্কুলপাঠ্য বই ছাপছি। বহু কষ্টে কাগজ জোগাড় করা গেছে। বুক সিজনটা পেরুলেই আবার অন্যান্য বইয়ের দিকে নজর দেব। এখন বেশী দাম দিয়ে কাগজ কেনার উৎসাহও নেই।

বললাম, আপনারা যখন উৎসাহ পাচ্ছেন না, তখন দিল্লী-বোম্বাইওয়ালারা বই ছেপে যাচ্ছেন কি করে?

—তার সঠিক কারণ অবশ্য আমি জানি না। বাংলা দেশে বইয়ের বাজার সঙ্কীর্ণ, প্রকাশকের সংখ্যা বেশি, আনুপাতিক হারে পাঠক ও ক্রেতার সংখ্যা বাড়ছে না বলেই মনে হয়। হিন্দী, ইংরেজীর বাজার মোটা-মুটি সর্বভারতীয়। পাঠকের সংখ্যা বেশি। হয়তো বা বাংলা দেশের তুলনায় সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার পরিমাণটাও ক্রমবর্ধমান। নানা কারণেই পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রন্থাগারে এখন আগের মতো বই-পত্র কেনা হয় না। ফলে, একটা মন্দার ভাব যাচ্ছে কয়েক বছর ধরেই। আগে, জন্মদিন, বিয়ে, উপনয়ন উপলক্ষে নানা রকম বই উপহার দেওয়া হতো। এখন সেই রীতিটাও কমে যাচ্ছে। না হলে, এই মন্দার বাজারেও কিছু বই বিক্রী হতো।

সুপ্রিয় সরকার বলেন,

এম সি সরকার অ্যান্ড সন্সের সুপ্রিয় সরকার প্রায় অনুরূপ কথাই বললেন অন্য একদিন। তাঁর মতে, দিল্লী-বোম্বাইয়ের প্রকাশকরা কলকাতার মতো ঘরকুনো নন, দেশ-বিদেশের প্রতি তাঁদের সমান নজর। নতুন চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তাঁরা ব্যবসায়ে নেমেছেন। এককালে কলকাতার প্রকাশকরা সকলকে পথ দেখিয়েছিলেন, এখন তাঁদের পথ দেখাবেন দিল্লী-বোম্বাইওয়ালারা। আগে বড় ব্যবসায়ীরা কেউ এ লাইনে অর্থ বিনিয়োগ করতে চাইতেন না, এখন এগিয়ে এসেছেন অনেকেই।

বললাম, বাংলা দেশে বইয়ের বাজার খারাপ হওয়ার কারণ কি?

—প্রথম এবং প্রধান কারণ, প্রকাশকদের দৃষ্টিভঙ্গী। তাঁরা বই ছাপেন স্থানীয় পাঠকদের মুখের দিকে তাকিয়ে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জনপ্রিয় উপন্যাস কিম্বা রম্যরচনার দিকে সকলের নজর। অর্থাৎ পাঠক যেমনটি চান, প্রকাশকও তেমনটিই পরিবেশন করেন। এ ব্যাপারে তাঁদের যে কোন দায়িত্ব থাকতে পারে, পাঠকের মানকে উন্নত করার জন্য উদ্যোগ নেওয়ার প্রয়োজন থাকতে পারে—সে সম্পর্কে অধিকাংশ প্রকাশকই নিস্পৃহ। সেজন্যেই সকলের নজর, অমুক-অমুক পত্রিকায় প্রকাশিত উপন্যাসের ওপর। সবাই মারামারি করেন, জনপ্রিয় লেখক-লেখিকাদের নিয়ে। অথচ, বাংলা দেশ ছাড়াও যে বইয়ের একটা জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বাজার আছে, তা কেন কেউ মনেই রাখেন না।

সুপ্রিয়বাবু একটি উদাহরণ দিয়ে বললেন, সম্প্রতি ফ্রাঙ্কফুর্টে যে বইয়ের মেলা হয়ে গেল, তাতে বাংলা দেশের প্রকাশকরা কিসের বই পাঠাতে পারেন নি বললেই চলে — সর্বসাকুল্যে দু-তিনটে। পাঠিয়েছেন দিল্লী-বোম্বাইয়ের প্রকাশকেরা। ইণ্ডিয়ান বুক ইণ্ডাস্ট্রির একটি বিশেষ সংখ্যায় ভারতীয় বইয়ের পূর্ণ তালিকা ছাপা হয়েছে। তা দেখলেই বুঝতে পারেন, বাঙালী প্রকাশকদের অবস্থাটা কি!

একটু থেমে বললেন, আসল কথা হলো মেন্টাল মেক-আপ। আমরা যদি বাই-

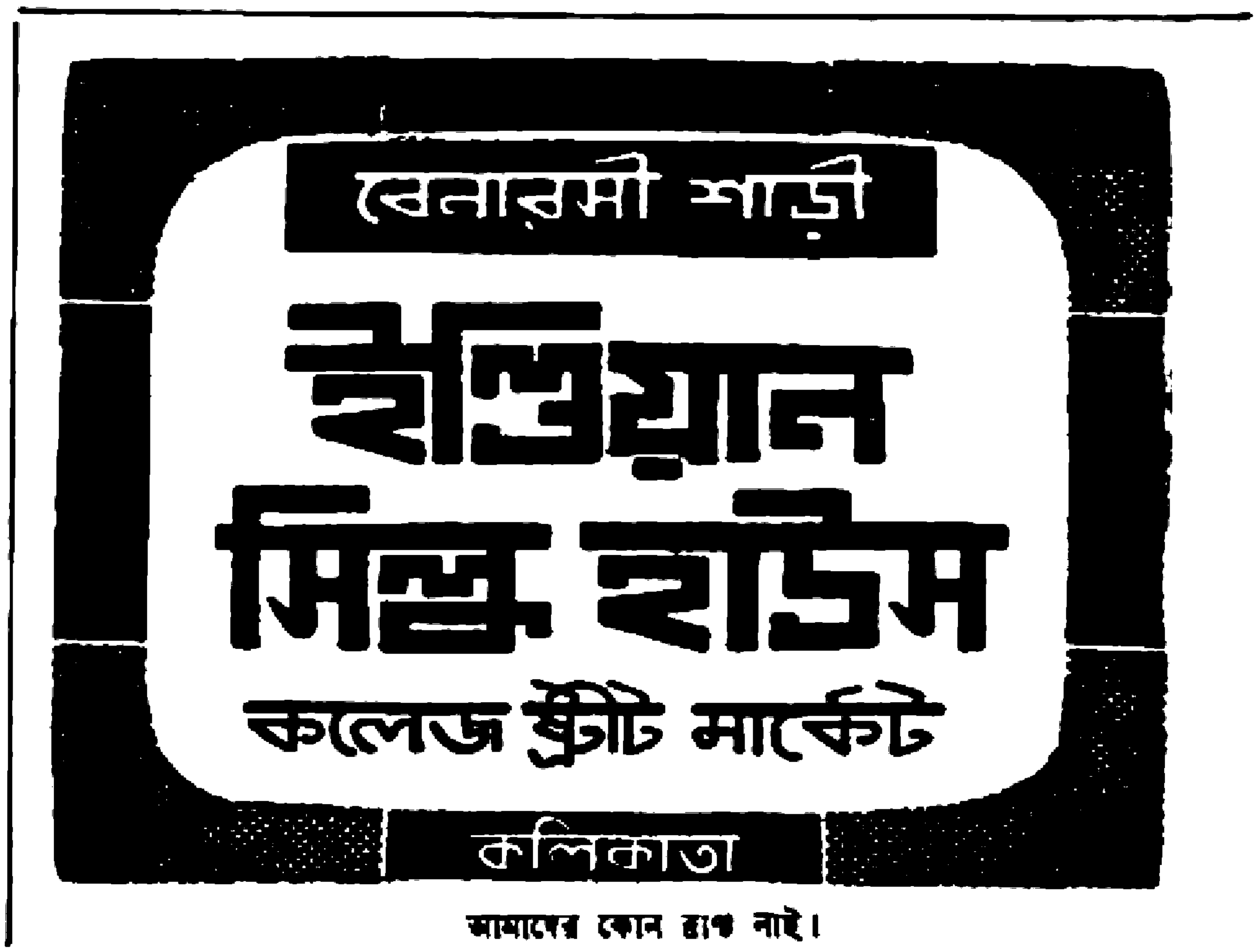

ভারতের দিকে কিছুটা নজর দিতাম, সারা ভারতের দিকে তাকাতাম, তাহলে হয়তো এমন দুর্দশা হতো না। বাংলা ভাষার প্রসারে কেবল বাংলা হরফেরই কারবার করতে হবে—এরকম দিব্যি তো কেউ দেয় নি! কেবল নজরটাকে একটু বড় করতে পারলেই, আমাদের অনেক সমস্যার সমাধান হতে পারতো।

তিনি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোজ বসুর বইয়ের ইংরেজী অনুবাদ বেরুচ্ছে বাংলার বাইরে থেকে। কলকাতার প্রকাশকদের তাই নিয়ে মাথাব্যথা পর্যন্ত নেই।

বললাম, এছাড়া আর কোন কারণ আছে কি?

—আছে হয়তো। সেটা পরোক্ষ। কলেজ স্ট্রীটে এখন লোকের যাতায়াত কম। আগে, মানুষ শো-কেসের দুটো-চারটে বই দেখতে-দেখতে, কিম্বা কোন কাউন্টারে দাঁড়িয়ে সূচীপত্রের পাতা ওল্টাতে গিয়ে কিনে ফেলতেন কোন-না-কোন বই। এখন সে সুযোগটা নেই। বুঝতেই তো পারছেন, অন্যান্য অত্যাবশ্যক সামগ্রীর মতো বই কেনা তেমন কিছু একটা জরুরী ব্যাপার নয় কারো কাছেই। তার ওপরে মানুষ তেল-নুন-ডাল কিনতে গিয়ে হিমসিম খাচ্ছে—বই কিনবেন কি করে? স্কুল-কলেজের লাইব্রেরীগুলোই বই কিনছে না। অন্যান্যবার প্রাইজ ডিস্ট্রি-বিউশনের জন্য স্কুল-কলেজে কিছু বই যেতো। এবার মনে হয়, তাও হলো না।

পাশেই বসেছিলেন সাহিত্যিক শ্রীবিন্দু মুখোপাধ্যায়। তিনি বললেন, বই কেনা-কাটার মধ্যে একটা লাকসারি আছে। এখন লাকসারির সময় নয়।

সুপ্রিয়বাবু অন্য একটা বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, বাঙালী প্রকাশকদের অবস্থা যে কী শোচনীয়, তার প্রমাণ পাবেন ন্যাশনাল বুক ট্রাস্টের একটা চিঠিতে। সম্প্রতি ওরা একটা প্রদর্শনীর আয়োজন করেছেন মাদ্রাজে। তাতে সারা ভারতে প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য বইয়েরই সমাবেশ ঘটে। কিন্তু সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে দেখা যায়, বাংলা বইয়ের সংখ্যা নেহাৎ-ই কম। ওঁরা আমাদের পাবলিশার্স অ্যাসো-সিয়েশনকে বাকি চিঠি দিয়েছেন বাংলা বইয়ের সংখ্যাল্পতার জন্য। যেন দ্রুত আরো বই পাঠানো হয়।

প্রকাশ ভবনের শচীনবাবুর কাছ থেকে বঙ্গীয় প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা সভার একটি নোটিশের কপি এনে তিনি আমাকে দেখালেন। তাতে প্রকাশকদেরই উদ্দেশ্যে আবেদন জানান হয় : 'আগামী ২১শে ডিসেম্বর ১৯৭০ হইতে ১৫ জানুয়ারী ১৯৭১ তারিখ পর্যন্ত মাদ্রাজে ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট-এর উদ্যোগে সারা ভারত পুস্তক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইবে। ন্যাশনাল বুক ট্রাস্টের তরফ হইতে প্রকাশকদের পৃথকভাবে প্রদর্শনীতে পুস্তক প্রেরণের জন্য অনুরোধ জানান হইয়াছে। ট্রাস্টের কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি সভাকে জানাইয়াছেন, পুস্তক প্রেরণের ক্ষেত্রে বাংলা দেশের প্রকাশকদের নিকট হইতে আশানুরূপ সাড়া পাওয়া যায় নাই।'

অর্থাৎ, মাদ্রাজে এখন সর্বভারতীয় বইয়ের প্রদর্শনী চলছে জাতীয় উদ্যোগে। কেবল, বাংলা দেশের প্রকাশকরা কোণঠাসা হয়ে কোন রকমে অস্তিত্ব রক্ষায় সংগ্রাম করে চলেছেন। তার প্রতিকারের উপায় কি, কে বলবে?

বিভাস ভট্টাচার্যের বক্তব্য

সারস্বত লাইব্রেরীর বিভাস ভট্টাচার্যের সঙ্গে একদিন দেখা। কাউন্টারে বসেছিলেন মনমরা হয়ে। বললেন, অবস্থা খুব খারাপ।

বললাম, কি রকম? কেন?

—কেন, বলতে পারবো না। বই বিক্রী হচ্ছে না, শুধু এটাই দেখতে পাচ্ছি। আগে আর কোন বই বিক্রী হোক না হোক, সুকান্তর বই বিক্রী হতো রোজই দু-দশটা। এখন তাও হচ্ছে না। আমাদের একটা বড় ভরসা ছিল জলপাইগুড়ি, আসাম আর কোচবিহারের ওপর। বেশ কয়েক দিন ধরে ওসব জায়গা থেকেও তেমন অর্ডার পাচ্ছি না।

বললাম, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্টের কথা। ওখানে বই পাঠান নি কেন?

তিনি আমাকে হতাশ করে দিয়ে বললেন, কি হবে ওখানে বই পাঠিয়ে? শুধু-শুধু টাকা নষ্ট করা। বই কিম্বা তার দাম কিছুই ফেরৎ পাওয়া যায় না। মাঝখান থেকে ডাকের খরচটা পর্যন্ত নিজেদের দিতে হয়। গতবার এক চালান বই দিয়েছিলাম, কিন্তু কিছুই ফেরৎ পাই নি। বিনা পয়সায় বই দেবার সামর্থ্য আমাদের নেই। উৎসাহও নেই।

একটু থেমে বললেন, বই পাঠাতে আমাদের কোন আপত্তি থাকে না, যদি তার কোন প্রয়োজনীয়তা থাকে। আমরা বই ছাপি টাকা খরচ করে, কমার্শিয়াল পার্পাসে। খবরের কাগজে কিম্বা পত্র-পত্রিকায় সমালোচনার জন্য দিই প্রচারের জন্য। যদি তাই না হয়, তাহলে দেবো কেন? একবার আমরা একটা বই ছেপে-ছিলাম, তার দাম একশ টাকা। সে বই আমরা কোথাও রিভিউর জন্য দিই নি। কারণ, বিনামূল্যে এক কপি বই দেওয়ার চাইতে ঐ টাকায় একটি বিজ্ঞাপন দিলে অনেক বেশী কাজ হয় বলে আমাদের ধারণা। ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট যদি বিক্রীত বইয়ের টাকা ফেরৎ দিতেন কিম্বা ডাক খরচটাও দিতেন—তাহলে অনেক প্রকাশকই এ ব্যাপারে উৎসাহিত হতেন। সরকারী উদ্যোগে যখন হচ্ছে, তখন তাঁরা তো বই কিনে নিতেও পারেন।

প্রসঙ্গক্রমে তিনি জাতীয় গ্রন্থাগারের কথা উল্লেখ করে বললেন, বাংলা দেশে যখন প্রকাশকের অবস্থা সঙ্গীন, তখনও ওঁরা একটা করে চিঠি পাঠান আইনের ধমকানি দিয়ে। নির্দিষ্ট সময়ে বই না পাঠালে কোন্ কোন্ ধারায় আমাদের শাস্তি হতে পারে—সে সম্পর্কে সতর্ক করে দেন আর কি! সরকার যদি একটু সহৃদয়তার সঙ্গে আমাদের সমস্যাগুলিকে তলিয়ে দেখতেন, তাহলে হয়তো বিষয়টি অন্যভাবে ভাবা যেতো। প্রকাশকরা জাতীয় স্বার্থে বিনা-মূল্যে বই দিতে রাজী আছেন, এমন কি ঠিক সময়ে পাঠিয়ে দিতেও। দিনের পর দিন ডাকের খরচা যে হারে বেড়ে যাচ্ছে, তাতেই আমরা ঘাবড়ে যাচ্ছি। বিনামূল্যে পাঠান জাতীয় গ্রন্থাগারের বইগুলি যদি বিনা ডাক খরচে পাঠান যেতো—তাহলে হয়তো কারোরই কোন অসুবিধা হত না।

আগামী সপ্তাহে বেঙ্গল পাবলিশার্স, মিত্র ঘোষ এবং রূপা অ্যান্ড কোম্পানীর সাক্ষাৎকার প্রকাশের চেষ্টা করা হবে।

—গ্রন্থদর্শী

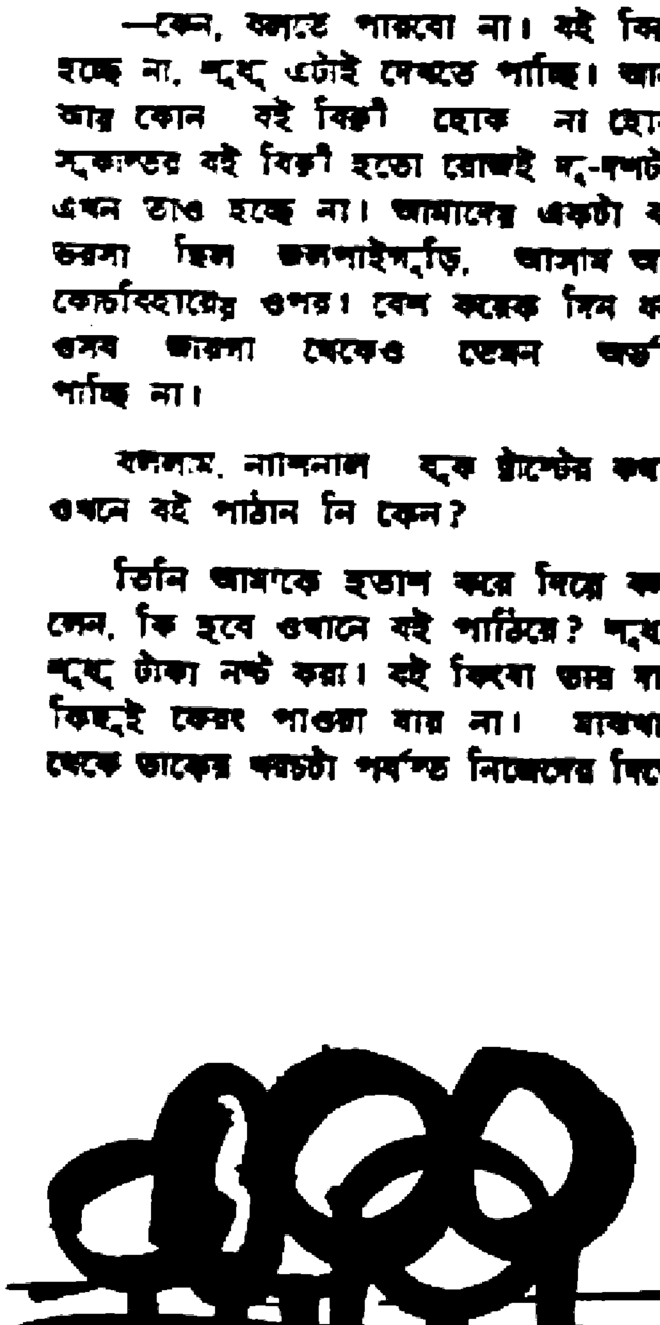

নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

(৩৮)

ঘুম ভাঙাতে ঈশমের বেশ বেলা হল। খুব সকালে ঘুম ভাঙার অভ্যাস। আজ বেলা হওয়ায় সে নিজের কাছেই কেমন ছোট হয়ে গেল। খুব সকাল সকাল সে ঠাকুর বাড়ি উঠে যায়। গোয়াল থেকে গরু বের করতে হবে। মাঠে গরু দিয়ে আসতে হবে। গরুর ঘর পরিষ্কার করা তারপর বাজারে যেতে হতে পারে। তাকে এত বেলা পর্যন্ত না দেখে ছোট কর্তা আবার এদিকে নেমে আসতে পারে। সে ছইয়ের ভিতর থেকে উঁকি দিল। না আসছে না। একটু তামাক খেতে ইচ্ছা হচ্ছে। ভোরের দিকে এখনও ঠাণ্ডা ভাবটা থাকে। কদিন থেকে কুয়াশা পড়ায় সকালের দিকে ঠাণ্ডা ভাবটা কিছুতেই যেতে চায় না।

ঘুম ভাঙার পর আর একটা চিন্তা বেশ ওকে পেয়ে বসেছে। গত রাতে সে কিছু যক্ষ রক্ষ অথবা জিন পরি কিংবা ফেরাস্তা হতে পারে—নাকি প্রথম মানব মানবী সেই আদম ইভ! কারা যে সারারাত জমিতে বিহার করে গেল। সে যে এখন কাকে কিভাবে এর ব্যাখ্যা করবে বুঝতে পারছে না। সে স্বপ্ন দেখেছে কিনা, না তা কি করে হয়, সে তখন তামাক খাচ্ছিল, খুব কাসি পাচ্ছে বলে তামাক খাচ্ছিল এবং যতক্ষণ ওরা বিহার করেছে ততক্ষণ সে দম বন্ধ করে বসেছিল—তবে সে কি করে স্বপ্ন দেখবে! সে স্পষ্ট মনে করতে পারছে, ভোর রাতের দিকে ওরা নদীর পাড়ে হাঁটতে হাঁটতে অন্তর্ধান করেছে। ছইয়ের ভিতর মানুষ আছে বলেই খুব তার কাছাকাছি ওরা আসেনি।

সে গ্রামে উঠে যাবার সময় দেখল শশী মাস্টার অর্জুন গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে দাঁত মাজছে। বাড়ির ছেলেরা ওর পাশে দাঁড়িয়ে দাঁত মাজছে। ছুটির দিন। স্কুলে যাবার তাড়া নেই। দাঁত মাজতে মাজতে ঘাসে বসে বসে ফেনা তুলে ফেলেছে। সে ওদের দেখেই বলল, বুঝলেন মাস্টারমশয়, এক তাজ্জব ঘটনা ক্ষেতের ভিতর।

—কি তাজ্জব ঘটনা। মুখের ভিতরে বোধ হয় ডালের সুতো একটা আঁশ ঢুকে গেছিল। সেগুলো থুথু ফেলার মতো ফেলে দিতে দিতে কথাটা বলল।

—কি যে কমু আপনেরে! ওডা যে কার দেবতা, আপনেগো না আমাগ ঠিক ঠাহর করতে পারলাম না!

—কি হয়েছে বল না!

—দুই ফেরাস্তা মাস্টারমশয়।

—ফেরাস্তা!

—ফেরাস্তা না হইলে মনে লয় আপনেগ দুই দেবদেবী। রাইতের জ্যোৎস্নায় একেবারে পাগল হইয়া গ্যাছে। তরমুজ খেতে সারা রাইত ঘুইরা ফিরা বেড়াইছে।

শশিভূষণ হা হা করে হেসে উঠল। —খুব আজগুবি গপ্পো তুমি যা হোক বললে একটা।

—কি কাণ্ড! আপনের বিশ্বাস হয় না!

—তুমি কি মিঞা বুড়ো বয়সে আফিং ধরেছ!

—কি যে কন! সে কেমন ছোট হয়ে গেল মাস্টারমশাইর কাছে। সে আর দাঁড়াল না। ভিতরে ভিতরে সে চটে গেছে। —তা আপনেরা লেখাপড়া জানেন! আপনেগ কাছে এডা আফিংখোর মানুষের গপ্প। তারপর সে হাঁটতে আরম্ভ করল। এ-সব মানুষের আল্লা যে কত মহান, কি তার বিচিত্র লীলা কিছু বোঝে না। সামান্য মনুষ্য জাতির কি সাধ্য তারে বোঝে—সে খুবই আকাঙ্ক্ষিতকর মানুষকে লীলারহস্য বলতে গিয়েছে। যাকে বললে চোখ বড় বড় করে শুনবে তিনি বড়মামী। এ-সংসারের বড়বৌ। সে দেখল, বড়মামী স্নান করে তারে কাপড় মেলছে। চুল থেকে টপ টপ করে জল পড়ছে বড়মামীর। কাপড় রোদে মেলে দিয়েই চুল দুকনো গামছা প্যাঁচিয়ে খোপা বাঁধছেন। খোপা বাঁধার অপেক্ষাতে সে দাঁড়িয়ে থাকল।

বড়বৌ দেখল আতা বেড়ার পাশে ঈশম দাঁড়িয়ে আছে। কিছু বলবে, কিছু বলার সময়ই সে চুপচাপ এমনভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। —কিছু বলবে আমাকে?

—বড়মামী কাণ্ড একখানা!

—কি কাণ্ড ঈশম!

ঈশম সব বললে, বড়বৌ বলল, তা হবে। এমন নদী আর তার বালুচর, তরমুজের খেত আর ঈশমের মতো মানুষ যেখানে আছে—সেখানে ওনারা নামবে না ত কারা নেমে আসবে।

—তবে তাই কন। শশীমাস্টার মনে করে বইয়ের ভিতরই সব লেখা থাকে।

—তা কি থাকে! কত কিছু আছে এ জগতে, যার মানে সামান্য মানুষ কি করে বুঝবে। বইয়ে সব লেখা থাকে না ঈশম। তুমি ঠিকই বলেছ।

—আমি নাকি আফিং খাই বইলা এমন দ্যাখছি।

—তোমাকে ঠাট্টা করেছে।

—না মামী, এ-সকল আউল বাউল নিয়া আমার ঠাট্টা-তামাসা খারাপ লাগে। ওনারা লীলা খেলা করে। আমি ছইয়ের মধ্যে চুপচাপ বইসা থাকি। কাছে যাই না। কাছে গ্যালে ওনারা রুষ্ট হয়। কি হয় কিনা কন।

—তা হয়। এ-ছাড়া বড়বৌর আর কিছু বলার ছিল না। সাদা জ্যোৎস্নার কুয়াশার ভিতর সে বোধ হয় অন্য এক জগতে যথার্থই চলে গেছিল গত রাতে। তাকে আবার নেমে যেতে হবে। জানালা খুলে রাখলে সাদা জ্যোৎস্নায় তার আবার কোন না কোনদিন তরমুজের জমিতে নেমে যাবার

ইচ্ছা হবে। সে দেখেছে গত রাতে মানুষটা তার খুব কাছের মানুষ হয়ে গেছিল। আত্মনিগ্রহে আর নিজেকে কোন কষ্ট দেন না। এই আত্মনিগ্রহ থেকে রক্ষার জন্য বড়বৌ সুযোগ এবং সময়ের অপেক্ষায় থাকে। মধ্য যৌবনে তারা বালির চরে আদম ইভের মতো ঘোরাফেরা করে। ঈশম ছইয়ের ভিতর তেমনি বসে থাকে। কোন কোন দিন ঘুমিয়ে থাকে। কখনও ডংকা বাজায়। কখনও সে আর এক নূতন বিস্ময়ে সৃষ্টির জন্য তামাক খেতে খেতে এই ভিটা জমিতে বড় একটা জঙ্গল লাগিয়ে দেবে ভাবে এবং এক মন সে সিন্নি দেবে গাছের নিচে এমন ভাবল। মনে হয় তার তখন, হাসানপীর অথবা অন্য আউলেরা এসেছে তার চারপাশে। ওরা সবাই বলছে আল্লার নামে সিন্নি দে ঈশম। আমরা দুইটা খাই। কারণে অকারণে ঈশম ছইয়ের নিচে শুয়ে থাকলে মধ্য যামিনীতে এমন সব আদি ভৌতিক রহস্যের ভিতর ডুবে যায়।

কিন্তু একবার বড়বৌ ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে গেছে। ওরা দুজন বালির চরে চুপচাপ বসে গল্প করছে। ওর সেই শৈশবের গল্প। মানুষটা তার শুনছে কি শুনছে না সে বুঝতে পারত না। কেবল দুটো একটা কথা সংগোপনে বলতেন। সেও খুব সহসা সহসা। বলতেন যেমন, বড়বৌ আমাকে 'ক দরকার ছিল বাবার মিথ্যা তার করার।

তিনি বলতেন, দেখা হলে আমি কি বলব তাকে। সে ত আবার ফিরে আসবে।

বড়বৌ মনে মনে হাসত। মানুষটার বিশ্বাস এখনও সে কোথাও না কোথাও তার অপেক্ষায় আছে। বড়বৌ তখন কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে বলত—তুমি যাবে! আমি তোমাকে তার কাছে নিয়ে যাব। কিন্তু কথা দিতে হবে অকারণে তুমি কবিতা আবৃত্তি করতে পারবে না। গ্যাৎ চোরেৎশালা বলতে পারবে না! কথা দাও আমাকে, তুমি ভাল হয়ে যাবে। তুমি ভাল হয়ে গেলেই, আমি যে-ভাবে পারি তার কাছে তোমাকে নিয়ে যাব।

তিনি আর তখন কথা বলতে পারতেন না। সারাক্ষণ বড়বৌর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তাঁর বুঝি কখনও কখনও ঘুম এসে যেত। নদীর চরে ঠান্ডা হাওয়ায় বড়বৌ জেগে থাকত শিয়রে। মানুষটা এ-ভাবে ঘুমাতে পারলেই ভাল হয়ে যাবেন। সে একবার শিয়রে পাহারা দেবার সময় নিজেই ঘুমিয়ে পড়েছিল। বালির চরে পাতলা সিল্কের উপর ওরা দুজন পাশাপাশি শুয়ে ছিল। খুব সকালে মসজিদের আজানে ঘুম ভেঙে গেল তার। সে উঠে দেখল, তাঁর আগেই ঘুম ভেঙে গেছে। তিনি পদ্মাসন করে বসে আছেন। সকাল হয়ে যাচ্ছে তবু ভ্রূক্ষেপ নেই। বড়বৌর খোঁপা খুলে গেছে। উঠেই সে তার খোঁপা বেঁধে মানুষটাকে বলল, তাড়াতাড়ি এস। ভোর হতে বাকি নেই। বড়বৌ মানুষের কাছে ধরা পড়ে যাবে ভয়ে ভোর রাতের অন্ধকারে ছুটছিল। কারণ আর একটু হলেই ঈশমের কাছে ধরা পড়ে যেত।

পথে মজুরের সঙ্গে দেখা। —ঠাইরেন এই সাত সকালে মাঠে!

বড়বৌ বলল, আপনার দাদার কান্ড। ভোর রাতে বের হয়ে যাচ্ছে। ধরে আনলাম নদীর চর থেকে।

সেই থেকে বড়বৌ আর সাহস পায় না। মানুষটা মাঝে মাঝে ঘুমাতে পারলে ভাল হয়ে যাবেন—সেই আশায় মরিয়া বড়বৌ একা একা স্বামীর হাত ধরে অন্ধকারে অথবা ম্লান জ্যোৎস্নায় নেমে যেত। কলঙ্ক রটতে কতক্ষণ। স্বামীর জন্য সে কিছুই ভ্রূক্ষেপ করত না। কিন্তু এখন আর পারে না। কারণ ভাল হওয়ার কোন লক্ষণই নেই তার। জানালা খোলা থাকলে সে তেমনি দূরের মাঠ দেখতে পায়। কোনোদিন সেই মাঠে তার প্রিয় মানুষ পাগল ঠাকুরকে দেখতে পায়। একা একা মানুষটা আত্মনিগ্রহে চলে যাচ্ছে। যেন পিতৃসত্য পালনের নিমিত্ত এই আত্মনিগ্রহ। সে জানে যদি এই মানুষের সঙ্গে নদীর চরে নেমে যাওয়া যেত তবে আর তিনি দূরে যেতেন না। সকাল না হতেই সে তার ঘরের মানুষ ঘরে নিয়ে ফিরতে পারত।

মানুষটার জন্য আর যা হয়, যখন তখন অবোধ মন তার ভার হয়ে যায়। চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। রাতে এই মানুষ ফিরে না এলে সে জানালা থেকে কিছুতেই নড়তে চায় না। মনে হয় তার মানুষটা তখন কোন গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছেন।

এ-ভাবে জানালায় দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে একদিন বড়বৌ দেখল মাঠের ও-পাশে কিছু মশাল জ্বলে উঠেছে। একটা দুটো করে, অনেক কটা মশাল। মশালগুলো নদীর পাড় পাড় অদৃশ্য হতে থাকল। ওরা ধ্বনি দিচ্ছিল আল্লা-হু-আকবর।

তখন সকলে যে যার মতো ঘর ছেড়ে পালাচ্ছে। ঝোপে-জঙ্গলে আশ্রয় নিচ্ছে। ওরা এ-সব হিন্দুগ্রামে আগুন দেবে বলে উঠে আসতে পারে। বড়বৌ এবং ছোট ছোট শিশুরা, ধনবৌ, গ্রামের নারী এবং শিশুরা যে যার মতো ঝোপে-জঙ্গলে আশ্রয় নিত। বাসনপত্র সব কুয়োতে ফেলে দেওয়া হত। ছাই গাদার নিচে গয়নার বাকস। আর হিন্দু যুবকেরা এক সঙ্গে দাঁড়িয়ে গোপাটে ধ্বনি তুলত, বন্দে মাতরম।

হাজি সাহেবের ছোট ছেলে আকালুর কান্ড এ-সব, সেই এখন এ-সব করাচ্ছে। পাশের গ্রামে উঠে আসতে সাহস পাচ্ছে না। সে দশ-বিশ ক্রোশ দূরে-দূরে কোন-কোন হিন্দু গ্রামে আগুন দিয়ে ফিরছে। তাকে ধরা যাচ্ছে না। সে আছে বেশ তার মতো। কারণ ওরা দলে ভারি। শহর থেকে মানুষ আসে। কেউ বলছে ওরা ঢাকা শহরের মানুষ না, ওরা এসেছে কলকাতা থেকে। কেউ-কেউ বলছে আকালুর এতে হাত নেই। আরও বড় গোছের নেতা এ-সব করাচ্ছে।

কি যে হয়ে গেল দেশটাতে!

ঈশম নদীর চরে বসে তামাক খায় আর আবোল তাবোল বকে। মিঞারা খুব যে খোয়াব দ্যাখতাম। অগ খেলাইবা কোন শালে। নিজের দ্যাশ ছাইড়া কবে কেডা কোনখানে যায়!

তখন সে শুনতে পায় নিশীথে যারা সব চিৎকার করছে নদীর ও-পাড়ে। আল্লা-হু-আকবর ধ্বনি দিচ্ছে। নারায়ে তকবির ধ্বনি উঠছে। এ-পাশের হিন্দু গ্রামে ধ্বনি উঠছে—বন্দে মাতরম। ভারত মাতা কি জয়! ওপাশে ধ্বনি উঠছে—পাকিস্তান জিন্দাবাদ। তখন ঈশম মাঝখানে বসে হা-হা করে হাসে। কার দ্যাশ, কে বা দিবে, কে বা নিবে!

এ দুটো সাল বড় দুঃসময়ের ভিতর কাটছে। যে যার মতো সুপারির শলা শানাচ্ছে। যেন দুঃসময়ের শেষ নেই। আগে পল্টু ওর ছোটকাকার সঙ্গে শুত, কিন্তু এখন শোয় সে তার মার সঙ্গে। রাতে মা আজকাল একা শুতে ঘরে ভয় পান। বাবা থাকেন না রাতে। ওর এক ভয়। সেই যখন মুসলমান গ্রামগুলোতে ক্রমে ধ্বনি উঠতে থাকে—নদীর পাড়ে-পাড়ে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে সেই ধ্বনি বড় ভয়াবহ। বুকের রক্ত শুকিয়ে যায়। সবাই কেমন বোকা-বোকা চোখ-মুখ নিয়ে পরস্পরের দিকে তাকায়। দূর দেশের নানা রকম দাঙ্গার খবর আসে। নৃশংস সব ঘটনা ঘটছে কোথাও। কিভাবে যে এটা হচ্ছে কেউ বুঝতে পারছে না। কেবল শামসুদ্দিন জানে—ডাইরেকট একশানের ডাক দেওয়া হয়েছে। সুরাবর্দি সাহেব পরের হুঁকোতে তামাক খাচ্ছে। নদীর জলে মরা গরু-বাছুর ভেসে যায়। গরু-বাছুর না মানুষ কেউ ইচ্ছা করে আর দেখতে যায় না।

ঘোর দুঃসময়ে বড়বৌ বড় ভাবে এটা দীর্ঘস্থায়ী নয়, সব ঘোর কেটে যাবে, আবার সব ঠিক হয়ে যাবে, তরমুজ খেতে সাদা জ্যোৎস্না উঠবে—তত নিশীথে তার প্রাণে ভয়। সে এখন একা আর দূরে যেতে পারে না। কারণ আজকাল কি যে হয়েছে তার! সেই যে আছে না এক ষন্ড, আটকার ষন্ড, নদীর পাড়ে, তরমুজ খেতে, ভিটা জমির উপর দাঁড়িয়ে থাকে, এক চোখ যে ষন্ডের, কালো রঙ, গলকম্বল তার ধরণীতে লুটোয়—চার পা যেন তার কাঠের আর এত শক্ত এবং এমন বলশালী যে মনে হয় এত দিনের এক সঙ্গে বসবাস মুহূর্তে বিদীর্ণ করে দেবে। সেই ষন্ডের দিকে ভয়ে আর তাকান যাচ্ছে না। সেই দিনের মতো ষন্ড আবার ক্ষেপে গেছে। সেই যে একদিন আন্নু, মরিমরি করে প্রাণ বাঁচানো দায়, শিংয়ের গুঁতো মারল পেটে এফোঁড়-ওফোঁড়—কে আর তখন কাকে রক্ষা করে! প্রাণভয়ে আন্নু সে যাত্রা গরম ফ্যান ফেলে দিয়ে আত্মরক্ষা করেছিল।

রক্ষা পেল আন্নু আর চোখ গেল ষন্ডের। গরম ফ্যান মুখে ফেলে দিতেই একটা দিক সাফ হয়ে গেল। দগদগে ঘা।

ঘাসের জঙ্গলায় কি বড়-বড় ডাঁসের (প্রকাণ্ড মাছি) জ্বালায় ছুটে বেড়াতে পারত না। অনবরত মাঠে নিশিদিন লেজ তুলে ছুটেছে। বড়-বড় ডাঁস কামড়ে খোবলা করে ফেলেছে ঘা। ঘাসের জঙ্গলায় ষণ্ড মরে। রাতদুপুরে দিনদুপুরে ষণ্ড দৌড়ায়। ঘাসের জঙ্গলায়, সেই যে বলে না জ্বালা মরে না জ্বলে, জ্বলা সহে না প্রাণে, জ্বালায় মাসাধিককাল মাঠে-মাঠে একবার পূবে আবার পশ্চিমে ছুটেছে ষণ্ড।

আমু যে ষণ্ডের মুখ পুড়িয়ে দিয়েছিল, কখনও সে কাউকে ভুলেও বলে নি। কারণ ষণ্ড, ধর্মের ষণ্ড, হাজি সাহেবের পেগারের ধন। ছোট পোলার মোতাবেক মানুষ। সে গোপন রেখেছে। না রেখে তার উপায় ছিল না। সে এই ষণ্ডের মুখ না পোড়ালে প্রাণে বাঁচত না, ফেলু মরত, বাছুরটা হাওয়া হয়ে যেত। সে এমন এক কেরামতি কাম কাজ করেছে দেখল বাছুরটা সুড়-সুড় করে পোষ-মানা জীবের মতো মাঠের দিকে নেমে যাচ্ছে। তারপরই যন্ত্রণায় এবং জ্বালায় মাঠের উপর দিয়ে সেই যে লেজ তুলে ছুটতে থাকল, ছোটার আর বিরাম নেই। তবু ষণ্ড আগে দু চোখে দেখতে পেত। এখন এই দুঃসময়ে ষণ্ডের এক চোখ গিয়ে এক চোখে ঠেকেছে। শালা এক চোখে আর কত দেখতে পারে। ফলে তার ডর ফেলুকে, ফেলুর বিবিকে। কেবল ফুঁসে-ফুঁসে মরছে ষণ্ড। তবে সে বাগে পাবে ফেলুকে আর তার সেই আদরের বাগি গরুটাকে। পেলেই লম্বা শিঙে পেটে শূল বসাবে।

ঠিক এই ষণ্ডের মতো এক অতিকায় ভয় এই দুঃসময়। বড়বৌ এবং তার পরিবার অর্থাৎ এই হিন্দু পল্লীতে-পল্লীতে অতিকায় এক এক চক্ষুদানব ক্রমে বড় হচ্ছে। ক্রমে নিশীথে ঘোরাফেরা করছে। হাত-পা তার নিকষ কালো। এবং ঘন-ঘন উষ্ণ নিঃশ্বাস যেন সব নিঃশেষ করে দেবে এবারে। সে নিশীথে দূরে থাকলে টের পায় হাজার-হাজার মশালের আলোতেও কেউ সেই দানবকে পুড়িয়ে মারতে পারছে না। একচক্ষু দানবের ভয়ে গোটা দেশ রসাতলে যাচ্ছে।

আল্লা-হু-আকবর ধ্বনি শোনার সঙ্গে-সঙ্গে মাস্টার, শচী আর পুরুষেরা উঠে পড়ে বিছানা থেকে। কখনও-কখনও ওরা সারা রাত ঘুম যায় না। গ্রাম পাহারা দেয়। আবার কোন রাতে ওরা অন্ধকারে দরজা খুলতে পর্যন্ত সাহস পায় না। আলো জ্বালে না কেউ। ভয়ে গুটি-গুটি বের হয়ে ডাকে, আপনারা কেউ কি কিছু শুনতে পাচ্ছেন না। একটা গুম-গুম আওয়াজ উঠছে! মনে হয় না হাজার-হাজার মানুষ অন্ধকারে চুপি-চুপি আপনাদের পুড়িয়ে মারার জন্য ছুটে আসছে! সবাই আর ঘুম যেতে পারে না তখন। জেগে বসে থাকে—কখন আক্রমণ ঘটবে এই আশায়।

কি যে হল এই দেশে! মুড়াপাড়ার সেই গণ্ডগোলের পর থেকেই এমন হল! সেদিন যে কি তারিখ ছিল, মনে করতে পারছে না বড়বৌ। সব এখন ভুল হয়ে যাচ্ছে। সকালে উঠেই বড়বৌ পুকুর পাড়ে দেখেছে কারা যায়। সার বেঁধে যায়। লুঙ্গি পরে, মাথায় কালো রংয়ের ফেজ এবং হাতে সবুজ রংয়ের নিশান। ওরা ধ্বনি দিতে-দিতে যাচ্ছিল, লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান। ওদের ভিতর কোন চেনা মুখ পড়ে নি। কেবল সে ফেলুকে দেখেছে। ফেলু ভাঙ্গা হাত নিয়ে যাচ্ছে। একটা দড়ি ডান হাতে। কোমরে কোরবানীর চাকু গোঁজা। আর ওর সাথের বাগি গরুটা। গরুটাকে সে তাড়াতাড়ি হাঁটিয়ে নিয়ে যাবে—সেজন্য সে মাঝে-মাঝে লেজ মুচড়ে দিচ্ছে। নতুবা যেন একসঙ্গে যাওয়া যাবে না। মিছিলের সঙ্গে তাড়াতাড়ি যেতে না পারলে নামাজ পড়া হবে না।

তার ক'দিন আগে একটা ঢোল বাজছিল নিশিদিন। শচি এসে বাড়িতে খবর দিয়েছে—হাটে-হাটে একটা লোক ঢোল পিটিয়ে যাচ্ছে। লোকটা ঢোল বাজাতে-বাজাতে বলছিল, তার নাম মহম্মদ, ধর্মের নাম পবিত্র ইসলাম। ধর্মকর্ম সব ভুইলা নিজেরা কাফের হইয়া যাচ্ছেন। এমন বলছিল। বলছিল খান সাহেব গিয়া কালী বাড়ি পার হয়ে, মসজিদে তিনি যে আছেন, থাকেন, কতকাল আছেন টের পান না, খান দান ঘোমান আর কাফের তার কালীবাড়ির পাশে নামাজ পড়তে দিব না কয়। নামাজ না পড়লে গোনাগার হইতে হয়! তারপর সে ড ড ড করে ঢোল বাজাতে-বাজাতে বলে, দীন এলাহি ভরসা। এই সব বলে, কি যে বলতে হবে সঠিক সে জানে না, তাকে লিখে দিয়ে গেছে লীগের পান্ডা আলি সাহেব। তিনি ভাল ভাল ভাষায় লিখে গেছেন। তিনি মুখস্থ করে বাকরণের ধর্ম মানছে না। নিজের মতো করে বলে যাচ্ছে, আর ঢোল বাজাচ্ছে। বলছে, সেই এক পাঁ জমিদার বাবুদের, ছুটে যাবে দশমীর দিনে। বাবুদের বাড়ি-বাড়ি হাতী বাঁধা। কিবা বাহার দ্যাখ রে হাতীর। হাতী যায় যুদ্ধে। তারপরই সে ফের ঢোলের কাঠি পাড়ল। বলল, মানুষ যায় যুদ্ধে। ধর্মযুদ্ধে হাজার-হাজার মানুষ শীতলক্ষ্যার চরে দাঁড়িয়ে ধর্মযুদ্ধের জিগির দিচ্ছিল সেদিন।

হাতীটা এখন আর পিলখানার মাঠে বাঁধা নেই। যুদ্ধের সময় হাতীটাকে সেই যে নিয়ে গিয়েছিল কুর্মিটোলা ক্যান্টনমেন্টে আর ফিরিয়ে আনতে পারে নি। হাতী দুঃখে গিয়ে পাগল হয়ে গেছিল এবং হাতীর প্রাণনাশ হতেই জসীম একা-একা ফিরে এসেছিল। সেই জসীম নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে এসব কাণ্ডকারখানা দেখে একা-একা বক-বক করছে।

জসীম সকাল থেকেই গাছটার নিচে বসে সব দেখছে। সেই সকাল থেকে পায়ে হেঁটে, নৌকায় করে হাজার-হাজার মানুষ জড় হচ্ছে চরে। ওরা সেই ভাঙ্গা মতো শ্যাওলা-ধরা, ভগ্নস্তূপের পাশে হাঁটু মুড়ে নামাজ পড়বে। মিনার অথবা গম্বুজের কোন চিহ্ন নেই। ভাঙ্গা ইঁটের সারি-সারি কঙ্কাল। আর অজস্র ঝোপঝাড়। বাজারের দোকানপাট বন্ধ। দুজন সিপাই কালীবাড়ি ঢোকার রাস্তায় বন্দুক হাতে দাঁড়িয়ে আছে। দলটা লুটপাট আরম্ভ করতে পারে। নামাজ পড়া শেষ হলেই ওরা মশালে জ্বালিয়ে বাজারের সব হিন্দু দোকানপাটিতে আগুন দিতে পারে, বাবুদের বাড়ি-বাড়ি মশাল নিয়ে আক্রমণ করতে পারে। বাড়ির ছাদে-ছাদে এখন সব মানুষ। লোহার সব দরজা নিচে বন্ধ। একটা পাখি পর্যন্ত উড়ছে না ভয়ে। কেমন নদী মাঠ চর চারপাশটা থমথম করছে। সে ভূপেন্দ্রনাথকে গতকাল স্টিমারে নারানগঞ্জে যেতে দেখেছে। আজ সকালের স্টিমারে তিনি ফিরে এসেছেন। সঙ্গে এসেছে পুলিশ সাহেব নিজে। এবং এক কুড়ি হবে বন্দুকধারী সিপাই। দুর্গাগঞ্জের দারোগাবাবু বাবুদের কাছারি-বাড়িতে দু দিন থেকে পাহারা দিচ্ছেন। বাবুদের বৌরা-মেয়েরা শহরে চলে গেছে। ওঁরা পাঠিয়ে দিয়েছেন সবাইকে। যারা জোয়ান, যারা বন্দুক চালাতে জানে এবং লাঠিখেলায়

জানুন পড়ুন ও বিবাহিত জীবন সুখী করুন।

নরনারীর যৌন চরিত্রে রাশি লগ্নের প্রভাব ও যোটক বিচার ...মূল্য—১২, টাকা মাত্র

প্রখ্যাত আবিষ্কারক জ্যোতির্বিদ শ্রীশুকদেব গোস্বামীর গবেষণালব্ধ অভিনব এই পুস্তক (অষ্টাদশ মহাপুরাণের আলোচনাসহ মুখবন্ধ) জ্যোতিষ শাস্ত্রের এক সম্পূর্ণ নূতন পদক্ষেপ।

প্রাপ্তিস্থান :

জ্যোতিষ বার্তালয়
১।২এ, নীলাম্বর মুখার্জী ষ্ট্রীট, (কাঁকুড়গাছি), কলিকাতা—৪

মহেশ লাইব্রেরী
২।১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা—১২

রঘুনাথ লাইব্রেরী—বিধান সরণী, কলি—৬

ওস্তাদ সেই সব মানুষ আছে কেবল। ওরা এখন গুরুটাকে পাহারা দিচ্ছে।

কাছারীবাড়ি, আর সেই ভাঙা ইট-কাঠের জঙ্গলের চারপাশটায় একজন দুর্গাধিপ দ্বারা অধিকার করা হয়েছে। যেন মানুষের সাধা সৌধকে এখনই। এ-পাশে বন্দুক হাতে সিপাই। অন্যপাশে চরে হাজার-হাজার মানুষ। মাঝখানে সড়ক। ওরা সড়ক অতিক্রম করে নামাজ পড়ার জন্য উঠে আসতে পারে ভেবে সিপাইরা বন্দুক উঁচিয়ে রেখেছে। একটা গরু পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে চরে। কোরবাণীর জন্য গরুটাকে বোধ হয় কেউ নিয়ে এসেছে।

ভূপেন্দ্রনাথ এক মুহূর্ত নিঃশ্বাস নিতে পারছে না। এত বড় একটা ধর্মযুদ্ধের দেবালিকা গুরু বলতে গেলে তাকেই সবটা করতে হচ্ছে। সাধারণ মানুষ তোমরা। তোমাদের ধর্মের নামে কৌশলে নিয়ে পিছনে মাতব্বর মানুষেরা তামাসা দেখছে। আমাদের বড় সনাতন। হিন্দুধর্ম, মা কদ্মা-মণী মায়ের আশ্রয় তাদের আবার ভয় কি। শুধু এত সব যে আয়োজন সবই মার ভাবের কৃপায়। তাঁর ইচ্ছা না হলে সাধ্য কি সে এত বড় একটা উন্মত্ত জনতার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। সে বড়বাবুর জন্য একটা দূরবীন কিনেছিল। বড়বাবুর ঘোড়ায় মাঠে যাবার অভ্যাস ছিল। তার সেই দূরবীনটা এখন বড় কাজে লাগছে। সে এবং বাবুদের যুবক ছেলেরা ছাদে দাঁড়িয়ে আছে। নিচে বন্দুক হাতে সুন্দর আলি। উপরে ওরা ওদের পছন্দ মত স্থান বেছে জায়গা নিয়ে নিয়েছে। ভূপেন্দ্রনাথ পুঙ্খানুপুঙ্খ সব বাবুদের বাড়ি হেঁটে-হেঁটে আক্রমণের মোকাবিলা করার সব রকমের ফন্দি-ফিকির করে এইমাত্র ছাদে উঠে চরের দিকে তাকাতেই দেখল, হাজার-হাজার মানুষ চরে কিল-বিল করছে। এ-পাশে ডাক্তারবাবুর বৈঠকখানার নিচে সবুজ যে মাঠ, মাঠের পাশে সিপাইরা দাঁড়িয়ে আছে ঠিক পুতুলের মতো। সে চরে ফের দূরবীনে দেখতেই তাজ্জব বনে গেল। ফেলু এসেছে এই চরে। আর তার হাতের কাছে ওর সেই বাগি গরুটা। গরুটাকে সে এত দূর টেনে নিয়ে এসেছে। এই গরুর জন্য ফেলুর প্রাণপাত। সে এই গরুটাকে শেষে কোরবাণী দিতে নিয়ে এসেছে! তার বড় প্রিয় এই জীব। জীবের জন্য সারাটা শীত-কাল এবং হেমন্তে অথবা বর্ষায় কি না কষ্টে ঘাস সংগ্রহ করে এনেছে!

দূরবীনে চোখ দুটো দেখা যাচ্ছে গরুটার। নীল চোখ। অবলা জীব এমন মানুষের ভিড়ে পাগল হয়ে গেছে। সেই হাতীটার মতো। কজন সিপাই এসেছিল কুর্মিটোলা ক্যান্টনমেন্ট থেকে। হাতীটাকে দূরে নিয়ে যাওয়া হবে। যেমন এ-অঞ্চলে যত নৌকা ছিল যুদ্ধের জন্য সব ইজারা নিচ্ছে সরকার। হাতীটাকেও ওরা ইজারা নিয়ে নিল। হাতী কেন এ সব মানবে। হাতীটাকে কিছুতেই বাগে আনতে পারছিল না। জসীমের উপর তার তাকে খাটিয়ে নিয়ে আসার। জসীমের সাথী কেউ ছিল না। মাহুতহীন এক শিশুকে সে বড় করেছে। আর বড় করেছিল যেন এই হাতীকে। সে সারাক্ষণ হাতীর সুখ দুঃখে নির্বাক্তিক। নিজের কষ্টের সে কিছু জানত না। সে হাতী নিয়ে তার পুত্র ওসমানকে নিয়ে হেমন্তের মাঠে আকাশের নিচে হেঁটে হেঁটে কত দূর দেশে চলে যেত। সেই হাতী খাটিয়ে নিতে না নিতেই কেমন পাগলের মতো করতে থাকল। জসীম কিছুতেই ছেড়ে আসতে পারছিল না হাতীটাকে। জসীমকে কিছুতেই পিঠ থেকে নামতে দিচ্ছিল না। নেমে গেলে সে, ফের শুঁড়ে ওকে তুলে পিঠে বসিয়ে দিয়েছে হাতী।

এই গরু নিয়ে এমনি কতদিন দেখেছে ভূপেন্দ্রনাথ, ফেলু ঝোপঝাড়ের ভিতর বসে রয়েছে। সে চুরি করে কতদিন অন্যের ফসল খাওয়াচ্ছে। মারধোরের ভয় আছে। মেরে ওর হাড় ভেঙে দিতে পারে প্রতাপ-চন্দ্রের সেই ছেলে অথবা গৌর সরকারের চাকরটা, সে সব ভয় তুচ্ছ করে জীবনপাত বাগি বাছুরটাকে বড় করে তুলে এখন তাকেই এনেছে কোরবাণী দেবে বলে।

ভূপেন্দ্রনাথ চোখ থেকে দূরবীনটা নামিয়ে ছাদের আলসেতে ভর দিল। চরের মানুষেরা সহসা সহসা ধ্বনি দিচ্ছে। পাল্টা ধ্বনি দিচ্ছে দীঘির পাড়ে যারা দাঁড়িয়েছিল। যারা সব গ্রামের মানুষ, সবাই এসে দীঘির পাড়ে জড় হয়েছে। রেলিঙের পাশে পাশে গরম জল ফুটছে, ভাঙা ইট জমা করছে এবং বল্লম সড়কি নিয়ে পাহারা। মেয়ে বৌদের ঠেলে সব মণ্ডপের দালানে, ভিতর বাড়িতে রান্নাবাড়ির পাশে আটকে রাখা হয়েছে। এমনকি ওদের ছাদে পর্যন্ত উঠতে দেওয়া হচ্ছে না। গ্রামের মেয়ে বৌরা পর্যন্ত অমানা আলাদা কষ্ট করে, মাপান মোকা-বিলা করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।

এতক্ষণ পর কেমন ভূপেন্দ্রনাথ সব দেখে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। ওরা নামাজ পড়তে না পারলে অন্যদিকে হামলা করবে। লুটপাট করবে। সুতরাং সবদিক থেকেই যাতে মোকাবেলা করা যায়, করতে না পারলে নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটবে। ঠিক যেমন কোরবাণীর পশুর দু চোখ উল্টে থাকে, তেমনি সনাতন ধর্ম চোখ উল্টে থাকবে—যা সব আয়োজন, চোখ উল্টে থাকার আর ভয় নেই। যেদিক থেকেই আক্রমণ আসুক তাকে প্রতিহত করার সব সুবন্দোবস্ত আছে ভেবে সে রুমালে নিশ্চিন্তে মুখ মুছল। আর মনে হল তখনই নদীর চরে একটা অবলা জীব হাম্বা হাম্বা করে ডাকছে। ভূপেন্দ্রনাথের শরীরের ভিতর সব রক্ত এক সঙ্গে টগবগ করে ফুটতে থাকল।

এই নামাজে ফেলু পর্যন্ত এসেছে দশ ক্রোশ পথ হেঁটে। সূর্য এখন নদীর ওপারে অস্ত যাবে। ওরা কি তবে রাতে রাতে উঠে আসবে গ্রামে। দুশ্চিন্তায় ফের ভূপেন্দ্র-নাথের মুখটা নীল হয়ে গেল। বাবুরা সব এখন চণ্ডীমণ্ডপে বসে আছেন। মাঝে মাঝে সব খবর পাঠাতে হচ্ছে। বড়বাবু একবার ছাদে উঠে দূরবীনে সব দেখে গেছেন। এবং কিভাবে ভূপেন্দ্রনাথ এই আক্রমণের মোকা-বেলা করছে দেখে তিনি খুব খুশী হয়েছেন তার উপর।

দূরবীনে নদীর চর বড় দেখাচ্ছে। নদীর জল শান্ত। কাশবনে কোন ফুল নেই। জল খুব নিচে নেমে গেছে। নদীতে একটা নৌকা নেই। যারা নৌকায় এসেছে, তারা নৌকা চরে টেনে তুলে রেখেছে। কালো রঙের সব নৌকা, আর মাথা গিজগিজ করছে। মাথার উপর নিশান উড়ছে এবং হাতের সব সড়কি আসমানের দিকে ছুড়ে দিয়ে বলছে তারা, লড়কে লেঙ্গে পাকি-স্তান। তখন শঙ্কায় ভূপেন্দ্রনাথের বুকটা কাঁপছে।

ভূপেন্দ্রনাথ দূরবীনেই দেখল ফেলু এক হাত সম্বল করেই চলে এসেছে। সম্বল তার এক চোখ।

আর ঠিক সেই প্রকাণ্ড ষণ্ডের মতো এক চোখ নিয়ে দুই পাশে দুই জনতা মোকাবেলায় প্রস্তুত। জসীম গাছের নিচে দুই চোখ খুলে রেখেছে। আর দুই চোখ আছে বলেই বিমর্ষ হয়ে যাচ্ছে। যেমন সে বিমর্ষ ছিল, হাতীটাকে ছেড়ে আসার দিন। সে বার বার হাতীটার পিঠ থেকে নেমে এলে হাতীটা তাকে পিঠে বসিয়ে দিতে থাকল। ক্যাপ্টেন কমাণ্ডার বললেন, জসীম, তুমি এবার নেমেই ছুটে চলে যাবে। হাতীর পায়ে শেকল, শেকলে বাঁধা বলে হাতী ছুটতে পারবে না।

সে নেমে যেতে পারছিল না। শুঁড় দিয়ে ওকে পিঠে তুলে নিচ্ছিল ফের। সে বড় অবলা জীব, জসীম কাছে না থাকলে সে বাঁচবে না এমন আকুল চোখ হাতীর। হাতীর কষ্ট কমাণ্ডার সাব কি জানবেন। সে এই হাতীর জন্য নিজের বিবির কথা ভুলে গেছিল। সে যেদিন ছোট নাবালকের হাত ধরে বিবিকে মাঠে কবর দিয়ে ফির-ছিল, কি তখন অন্ধকার চোখে! কার কাছে রেখে যাবে এই ওসমানকে। ওসমান এখন থেকে কার কাছে থাকবে! ওসমানকে নিয়ে বাবুদের বাড়িতে এসে হাতীর পিঠে চড়ে বসলে তার আর বিবির দুঃখ থাকল না। উন্মুক্ত আকাশের নিচে হাতী, সে এবং তার পুত্র ওসমান। ঘাস কাটতে নদীর চরে নেমে গেলে ওসমান থাকত হাতীটার কাছে। সে বলত, লক্ষ্মী তর কাছে থাকল ওসমান। আমি ঘাস কাটতে যাইতাছি।

তখন যত খেলা হাতীর এই ওসমানের সঙ্গে। সে হাতীকে ছোট ছোট ডাল এগিয়ে দিত, সে হাতীর পায়ে শেকলে প্যাঁচ লেগে গেলে খুলে দিত। অঙ্কুশ

CENTRAL LIBRARY

'সকালের জল খাবারের সঙ্গে তামা আমি রোজই খাই!'

এ ছাড়াও আছে লোহা, ক্যালসিয়াম, আর আয়োডিন! প্রকৃতপক্ষে, উনি খাবারের সঙ্গে পাচ্ছেন ৮টি গুরুত্বপূর্ণ খনিজদ্রব্য আর একান্ত প্রয়োজনীয় ১১টি ভিটামিন। এতসব উনি পাচ্ছেন মাত্র ১টি ভিমগ্র্যান ট্যাবলেটে।

ভিমগ্র্যানে সব ক'টি ভিটামিন আর খনিজদ্রব্য রয়েছে যা স্বাস্থ্য রাখার জন্যে একান্ত প্রয়োজনীয়—ফলে, তা উৎসাহ যোগায়, ক্ষমতা বাড়ায়। যেমন ধরুন, তামা—ঠিকমত রক্ত গড়ে তোলে, কর্মক্ষমতা বাড়ায়। এ ছাড়া, ভিমগ্র্যানে যেসব ভিটামিন আর খনিজদ্রব্য আছে, তার কল্যাণে ওঁর গায়ের চামড়া ভাল থাকে, চোখের দৃষ্টিশক্তি বাড়ে, দাঁত আর হাড় শক্ত হয়।

এখন পাবেন ● গোল আকারে

ভিমগ্র্যান®
মালটিপল ভিটামিন্স-মিনারেল্স ট্যাবলেটস

মাত্র একটি ভিমগ্র্যান আপনাকে সারাদিন কর্মক্ষম রাখে
দাম মাত্র ১৩ পয়সা

SQUIBB®
SARABHAI CHEMICALS

Shilpi-VIM-LIA/70 Ben

চালিয়ে যেখানে যাচ্ছে সামান্য ঘা, সেখানে বড় বড় মাছি উড়ে এসে বসলে খুব কষ্ট হাতীর। ওসমান হাতীর পিঠে বসে মাছি তাড়াত। বাপ যে মালিশ এনে দিত, সে সারাক্ষণ ঘায়ে মালিশ মেখে দিত। কোন কোনদিন সে এইভাবে ঘুমিয়ে পড়ত মাঠে। অথবা হাতীর পেটে পিঠ রেখে শুয়ে থাকত। হাতী অবলা জীব, লক্ষ্মী এবং পয়মন্ত বলে জসীম এসে দেখতে পেত ওসমান হাতীর পেটে পিঠ দিয়ে দুপুরে আমগাছের ছায়ায় ঘুম যাচ্ছে। সে তাড়াতাড়ি ছেলেকে ডেকে তুলত। হাতী এবং ওসমান উভয়কে সে নদীর জলে স্নান করিয়ে, এনে খেতে দিত দুজনকে। ওসমানের জন্য চিড়া-মুড়ি, আর হাতীর জন্য কলাগাছ। বিবি মরে গেলে এই হাতীই ছিল প্রায় বিবির মতো। সে সময়ে-অসময়ে ডাকত, লক্ষ্মী, ও লক্ষ্মী, তরে দিমু খান্য-দুর্বা, তুই বাংলাদেশের নদী পার হইয়া আর কোনখানে যাইস না! তুই থাইকা যা আমার লগে। হাতী বুঝি জসীমের বুকের ভিতর যে একটা কোড়াপাখি ডাকছে শুনতে পেত। শহরে গঞ্জে কত দূরদেশে গিয়েও হাতী কখনও পথ ভুল করত না। একবার জসীমের কি জ্বর। বাবুরা গিয়েছিল বাঘ শিকারে। শিকার শেষে ওরা জয়দেবপুর থেকে ট্রেনে আর জসীম মৃত বাঘ নিয়ে একা। হাতীর পিঠে বাঘ, জসীম। জসীমের এমন প্রবল জ্বর যে সে খর রোদে চোখ মেলতে পারছে না। ক্ষণে ক্ষণে জলতেষ্টা পাচ্ছে। বেহুঁস জসীম। হাতী কেন সব বুঝতে পেরে নদী থেকে জল তুলে দিয়েছিল শুঁড়ে। হতভাগা হাতী নদীর পারে জসীমকে নামিয়ে শুঁড়ে জল তুলে এনে মাথায় ঢাললে জসীম চোখ মেলে তাকিয়েছিল। কোথায় যে যাচ্ছে লক্ষ্মী, সে টের পাচ্ছে না। সে পিঠের উপর উপুড় হয়ে পড়ে আছে। অথচ লক্ষ্মীর যেন জানা, সে দ্রুত পা চালিয়ে সোজা পথ চিনে চলে এসেছিল। পথ সে এতটুকু ভুল করেনি।

সেই লক্ষ্মীকে ওরা মেরে ফেলল। জসীম চলে যাচ্ছে আর আসছে না, বুঝি টের পেয়ে গিয়েছিল হাতী। তাকে কিছুতেই পিঠ থেকে নামতে দিচ্ছিল না। সে সোজা নিচে নেমে এসে শুঁড়ে হাত বুলাতে থাকল। আবার সে দুঃখ শেষ হয়ে গেলেই নিতে আসবে এমন বলল। পাগলামি করলে চলবে কেন। বাবুরা যারা আছে এখানে সবাই ভালবাসবে তাকে। কেউ কোন কষ্ট দেবে না। এত সব বলেও জসীম পার পেল না। সে একটু দূরে গেলেই হাতী প্রথম শুঁড় তুলে কি দেখল। তারপর জসীম ক্রমে দূরে চলে যেতে থাকলে হাতী শুঁড় তুলে চিৎকার করতে থাকল। যখন আর জসীমকে দেখা গেল না, হাতী শেকল ছিঁড়ে ছুটতে থাকল। সামনে সেই ক্যাপ্টেন কমান্ডার—সে রোখকে রোখকে বলে এগিয়ে গিয়েছিল আর পাখে কে, একেবারে হাতীর পায়ের তলায়। তখন সোরগোল চারপাশে। সামনে যেসব তাঁবু পড়ছে সব ভেঙে দিচ্ছে। জসীমের কাছে যাবার জন্য সে সব বাধা লোপাট করে এগুচ্ছে। জসীম দূর থেকে দেখল হাতীটা ছুটে আসছে। আর সোরগোল। হাতী পাগল হয়ে গেছে। পর পর তিনজন মানুষকে পায়ের তলায় পিষ্ট করেছে। সুতরাং দুম্ দুম্। হাতীর সামনে ক্যাপ্টেন দাঁড়িয়ে গুলি ছুঁড়েছিল। জসীমও তখন চিৎকার করতে করতে ছুটে আসছিল—হা আল্লা! সে দেখল তার লক্ষ্মী গুলি খেয়েও পড়ে যায়নি। টলতে টলতে জসীমের পায়ের কাছে এসে হাঁটু মুড়ে শুয়ে পড়ল। কপাল থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত পড়ছে। মুখটা চেনা যাচ্ছে না লক্ষ্মীর। রক্তে সমস্ত মাথা লাল হয়ে গেছে। এমনে মরতেও লক্ষ্মী, কি যে ভালবাসা তার, মাঠের মতো অথবা আকাশে পাখি ওড়ার মতো ভালবাসা। লক্ষ্মী অতিকষ্টে শুঁড়টা বাড়িয়ে দিল। যেন এই শুঁড় বেয়ে জসীম তার পিঠে উঠে বসে। এবং তাকে নিয়ে সেই নদীর পাড়ে সে চলে যায়।

জসীম লক্ষ্মীর মাথার কাছে সেদিন চুপচাপ বসেছিল। কত মানুষ চারপাশে ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল। বড় বড় সাহেব-সুবা এল, তাকে নানারকম প্রশ্ন করল, সে কোন জবাব দিতে পারছিল না। ডিভিশনের তাবৎ মানুষ এসে ওকে দেখে গেছে—এক হাতী আর তার মাহুত, সারাজীবনের সঙ্গী। কবর খোঁড়ার সময় সে শুধু উঠে [illegible] নেমে গিয়ে লক্ষ্মীর ঠাঁই হবে কিনা, এই মাটির নিচে না অন্য কোথাও সে তাকে নিয়ে যাবে, কোথায় আর যাবে, পারলে সে তাবৎ এই মনুষ্যকুলের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, বলে আমি তারে নিয়া যামু নদীর পারে। এখানে তরে কবর দিমু না। কিন্তু সে জানে তার ক্ষমতা সামান্য, সে কি আর করতে পারে! সারাদিন সে হাতীর মাথার কাছে বসেছিল। মাটি খোঁড়ার শব্দ উঠছে। বুকে এসে শব্দটা ভীষণ তার ধাক্কা মারছে। এখানে এই কোপের ভিতর বসে জসীম আর এক ধাক্কার ভিতর পড়ে গেল। সে যাবে কার সঙ্গে! সে চরে নেমে যাবে, না বাবুদের রকার্যে তাদের বাড়ি উঠে যাবে। পিলখানায় ও-পাশের রাস্তায় সে সেই শত মানুষটিকে দেখতে পেল। তিনি যাচ্ছেন মা আনন্দময়ীর বাড়ি। মুণ্ড-মালা গলায় মা হাত তুলে আজ অসুর-নাশিনী। জসীম বলতে চাইল—কাছা অসুর মা জননী। তখনই সে দেখল কোমর থেকে কোরবানের চাকুটা ফেলু খাঁ করে বের করে ধরছে রোদে। রোদ ইস্পাতের উপর সহসা এক ঝিলিক খেলে গেল। ফেলু কোরবানের চাকুতে সূর্যের আলোতে ধরে নানা বর্ণের প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করতে চাইছে। কি ভয়াবহ! চাকুটা দেখেই খাসি গরুটা লাফ মারছে। গরুটা লাফ মারছে, কি মরণ নাচন নাচছে বোঝা যাচ্ছে না। চারপাশে মানুষের বড্ড ভিড়। সে এখন ইস্পাতের উপর সূর্যের আলো ধরে রাখতে চাইছে।

ফেলু দেখল, তখনই আক্কালুদ্দিন ছিক করে পানের পিক ফেলছে। চরে এখন খিচুড়ি রান্না হচ্ছে। বড় বড় মেটে হাঁড়ি। হাঁড়িতে ডাল-চাল সেদ্ধ। যে যার মতো গলা পর্যন্ত খেয়ে নিচ্ছে। নামাজ পড়ার আগে অভুক্ত থাকতে নেই। আকালুদ্দিন কোথা থেকে একটা পান পর্যন্ত সংগ্রহ করে এনেছে। ফেলু বলল, হালার কাওয়া! পান খাইয়া ঠোঁট লাল করছে। হালার কাওয়া। সে এবার লক্ষ্য রাখল ভিড়ের ভিতর আকালুদ্দিন কোনদিকে যায়। যেন আকালুদ্দিন না এলে এই ধর্মযুদ্ধে সে আসত না। সে সব সময় আকালুর উপর কড়া নজর রেখেছে। ধর্মগত প্রাণ তার—নতুবা সে আসত না। পবিত্র ইসলাম সে। তার জন্য কিছু করা চাই। সে প্রায়ই খোয়াব দেখেছে, এক নির্জন মাঠে, ভাঙা ইট-কাঠের সামনে দাঁড়িয়ে সে নামাজ পড়ছে। ভাঙা ইট-কাঠ এবং গম্বুজ কাবা মসজিদের সামিল। মসজিদের পাশে হিন্দুদের দেবদেবীরা পাথর হয়ে আছে। ভাঙা হাত-পা নিয়ে ওরা পড়ে আছে। এমনিতেই ঘুম আসে না। কখন আন্নু রাতে চুরি করে মাঠে নেমে যায় এই এক ভয় তার, আর যখনই ঘুম আসে তখন শুধু একটা দৃশ্য চোখে ভাসে—সে একটা জঙ্গলের সামনে সবুজ ঘাসের উপর বসে নামাজ পড়ছে। বাবুরা ভাঙা মসজিদের চারপাশে কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে রেখেছে। সাতটা মসজিদের খরচ চালায়। তবু তোমরা মিঞা মানুষেরা মা আনন্দময়ীর পাশে এই জঙ্গলে নামাজ পড়তে পাবে না।

এ-ভাবেই জিদ বেড়ে গেছে ফেলুর। সে চলে এসেছে। আসার সময় সারাটা পথ সে নজর রেখেছে আকালুর উপর। হালার কাওয়া—সে আবার সবাইকে ধর্মযুদ্ধে পাঠিয়ে নিজে একা গাঁয়ে থেকে যেতে পারে। আন্নুর সাথে বড় তার পিরিত। পিরিতের জন্যে সে সারাটা পথ, এমনকি এখনও সব সময় চোখের উপর রেখেছে। চোখের উপর থেকে আকালু হারিয়ে গেলেই সর্ষে ফুল দেখছে সে। কিন্তু এখন মুখ দেখে মনেই হয় না আকালুর, সে আন্নুর কথা ভাবছে। ফেলু ভীষণ উত্তেজিত, যেমন সবাই উত্তেজনা নিয়ে এই

চরে ঘোরাফেরা করছে এবং নির্দেশের অপেক্ষায় আছে—কখন ওরা সব ভেঙে তছনছ করে দেবে।

অথচ এই চরে ফেলুর কোরবানের চাকুটা রোদে ঝলসে উঠলে সে দেখতে পেয়েছিল—পিলখানার মাঠ পার হলে একদল পুলিশ সঙিন উঁচিয়ে আছে। ওর কেন জানি প্রাণের জন্য মায়া হতে লাগল। তবু বড় উত্তেজনা। আল্লা সব দেখতে পাচ্ছেন। মাথার উপর এত বড় ফকির মানুষটা যখন রয়েছে, তখন আর ডর কিসের। সব বন্দুকের নল থেকে ধোঁয়া বের হবে, কোনদিন আর গুলি বের হবে না। কারবালা প্রান্তরে হাসান হোসেনের যুদ্ধ, তখন এজিদ, কারা যে কি করে! ধর্ম সার জেনে সে তার মন শক্ত করে রাখল এবং এক হাতে বাঁধা গরুটাকে টেনে রাখল। হালার পাওরা! গরুটা ভয়ে লেজ তুলে ছুটতে চাইছে। অবলা জীব, সে এসবের কোন মানে বুঝতে পারছে না। ফেলু এবার প্রাণের দায়ে হা-হা করে হাসছিল।

তখন দু-পক্ষ থেকেই ধ্বনি উঠছে। এক পক্ষ এই যে দেবী আমাদের সনাতন ধর্মের প্রতীক, গলায় মুণ্ডমালা মা জননীর, হাতে খাঁড়া, চোখে বিদ্যুৎ খেলছে—সৃষ্টি, স্থিতি প্রলয়ের দেবী মন্দিরে আছেন, থাকেন, কার সাধ্য তারে অপবিত্র করে! তার পাশে এক দল যখন নামাজ পড়ে কোরবানী দিয়ে যাবে সে হয় না, রক্তের ভিতর হিন্দু মানুষের হাজার লক্ষ অসুর নাচছে, টগবগ করে রক্ত ফুটছে। ওরা চরে একটা গাইগরুর হাম্বা ডাক শুনে স্থির থাকতে পারল না। হাত তুলে বর্শা নিক্ষেপ করে চিৎকার করে উঠল, বন্দে মাতরম। মা আনন্দময়ী কি জয়!

এভাবে জয়ধ্বনি নদীর দু'পাশে। চরে আর পিলখানার মাঠে। দুই দল যুদ্ধের মহড়া দিচ্ছে। কালীবাড়ির চারপাশটায় যুবকেরা দাঁড়িয়ে সৈনিকের মতো পাহারা দিচ্ছে। পাশের বনটা শুধু একশো চুয়াল্লিশ ধারা আর যা আছে নিজেরা রক্ষা করো—কিংবা সক্কাই আছে, সীমানা কেউ জানে না। কতদূর পর্যন্ত এর বিস্তার। যেমন কেউ জানে না বস্তুত এই ঝোপে জঙ্গলে আদতে এটা কি, মসজিদ, মন্দির না কোন বোম্বেটেদের দুর্গ, কি হাজার রূপসী এখানে নেচে গেয়ে গেছে। কেউ সঠিক জানে না অথচ যে যার মতো একে মসজিদ মন্দির বানিয়ে নিচ্ছে। ভিতরে কেউ যেতে পারে না। রাজ্যের শেয়াল ভাম এখানে বসবাস করে। রাতিকালে আরতির ঘণ্টা বাজলে গণ্ডায় গণ্ডায় শিয়ালের হুক্কা হুয়া। নিশীথে শিয়াভোগ হলে অন্ধকারে একজোড়া নীল চোখ জীবের, বনের ভিতর উঁকি দিয়ে থাকে। সুতরাং এই সব মাংসাশী প্রাণীরা এখন ঝোপের ভিতর থেকে এত মানুষ দেখে বড় তাজ্জব বনে গেছে।

শেয়াল খটাশের বাস। দিনের বেলা ঢুকতে ডর। কত সব বিষাক্ত সাপখোপের বসবাস। সূর্যের আলো পর্যন্ত বনের ভিতর ঢুকতে পায় না। এমন সব নিবিড় জঙ্গল: কি যে ছিল এটা! গম্বুজ দেখে মুসলমানরা ভেবেছে এটা মসজিদ, মিনার দেখে বাবুরা ভেবেছে এটা মন্দির এবং ঐতিহাসিকের মতে—কারণ তারা মিনারে নানারকম হলুদ-নীল কাচের সন্ধান পেয়েছিল, স্থাপত্যশিল্পে পর্তুগীজদের কাছাকাছি—সুতরাং জলদস্যুদের আখড়া না হয়ে যায় না। এই হুজুগের অবস্থায় মানুষেরা এখানে এসে ভয়ঙ্কর এক ধন্দে পড়ে গেছে। মানুষের জন্য মানুষ, না ঈশ্বরের জন্য মানুষ বোঝা যাচ্ছে না। কারণ ভাবলে [illegible] বলা যায় না, এই এক হুজুগের ব্যাপারে এ-দেশে গৃহযুদ্ধ বেধে যেতে পারে। পারে না হয়ত, কোনদিনই পারে কিনা তাও ভাবা যায় না—যদি না এর ভিতর আলি সাহেবের হাসা জেগে উঠত। এই দেশে হিন্দু-মুসলমানে বিদ্বেষ জাগিয়ে দাও। অর্থনৈতিক সংগ্রামের কথা এখন বলা যাবে না, শ্রেণীসংগ্রামের কথাও বলা যেত, কিন্তু কিছু উপরতলার মানুষ রয়ে গেছি আমরা, আমাদের তবে কি হবে! তার চেয়ে ভাল ধর্ম জাগরণ। ধর্মের নামে ঢোল বাজিয়ে আখের গুছিয়ে নাও।

সুতরাং ধর্মের নামে ঢোল বাজিয়ে আপাতঃ আখের গোছানো হচ্ছে। জসীম বসে আছে মাঝখানে। পিলখানার মাঠে। সে হাতীর স্নানের সময় হলেই একটা কাটা গাছের গুঁড়িতে এসে বসে থাকে। তার এটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। সে যে বসে রয়েছে পথ থেকে টের পাওয়া যায় না। কেউ তাকে দেখতে পাচ্ছে না। অথচ সে সব দেখতে পাচ্ছে। সে আছে মাঝখানে। সে বসে দুদিকে দু-দল মানুষের লম্ফ-ঝম্প দেখছে।

আর দেখছে ঈশম। সে দেখছে সকাল থেকেই হাজারে মানুষের মতো লোক যাচ্ছে সেই ভাঙা মসজিদে নামাজ পড়তে বলে। সে যায়নি। সে তরমুজ খেতে বসেই নামাজ পড়ছে। নামাজ পড়ছে না চুপচাপ বসে আছে হাঁটু মুড়ে বোঝা দায়। দু-হাত সামনে প্রসারিত। পায়ের উপর ভর দিয়ে বসে থাকা শান্ত মূর্তি এবং লম্বা সাদা দাড়ি, নীল রঙের তহবন, বিস্তীর্ণ বালুবেলা, সোনালি বালির নদী তবু এক পাগল মানুষ কেবল নদীর পাড়ে পাড়ে হেঁটে হেঁটে যায়—কোথায় সে যায়, কি যে চায় মানুষটা! অথচ তিনি না হেঁটে গেলে কেমন খালি খালি লাগে এই মাঠ এবং নদী। এদেশে তিনি এক হয়ে গেছেন—তিনি না হেঁটে গেলে যেন সূর্য উঠবে না, পাখি ডাকবে না এবং গাছে গাছে ফল ধরবে না, ফুল ফুটবে না। এই পাগল মানুষ আছেন, নির্ভীক তিনি মাঠে মাঠে বনে বনে অথবা বালুবেলাতে পায়ের ছাপ রেখে যান যেন নিত্য বেড়ে-ওঠা ধান ফুল পাখির মতো তিনিও এই জন্মভূমির খণ্ড অংশ হয়ে গেছেন। তাঁর এই কুমারের হাঁটা, কবিতা আবৃত্তি, বড় বড় চোখে তাকানো সকল শিশুর মতো ঈশ্বরের পৃথিবীতে বেঁচে থাকো তোমরা সুখের ভিতরে এমন ইচ্ছা, ঈশমকে কখনও কখনও বড় অভিভূত করে রাখে। সে জানে, কর্তা বাড়ি যান আসমানের অবস্থা ভাল না।

অথচ দ্যাখো আকাশ কি নির্মল! অথচ ঈশম এমন কথা কেন যে বলল! ঈশম কি টের পেয়ে গেছে এখানে একটা দাঙ্গা বেধে যেতে পারে। এই নিষ্পাপ মানুষকে কেউ হত্যা করতে পারে! সে তবে এমন নির্মল আকাশের নিচে বসে পাগল মানুষকে সতর্ক করে দিচ্ছে কেন! আসমানের অবস্থা ভাল না বলছে কেন। ওর ভিতরে কি একটা ভয়ঙ্কর আশঙ্কা জন্ম নিচ্ছে বুঝতে পারছে অন্তত এক আকাশের নিচে ভয়ঙ্কর কালো একটা মেঘ দিনরাত ঝুলছে। সুযোগ পেলেই পাগল মানুষকে ফালা ফালা করে দেবে!

(ক্রমশঃ)

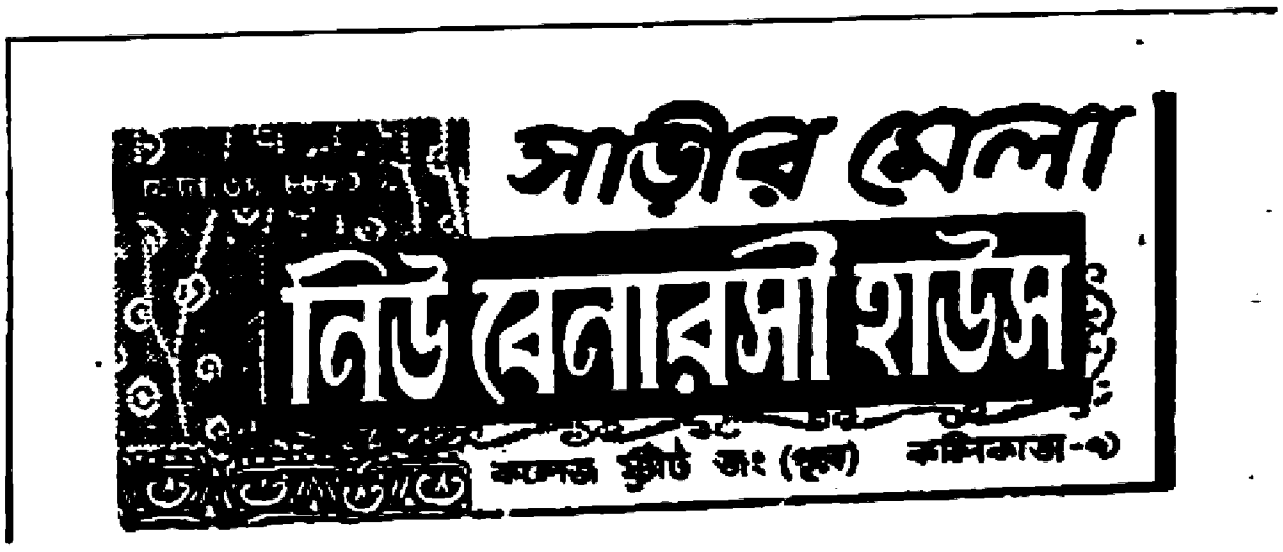

নিকটেই আছে

ক্রমে ক্রমে শিখবে

আমার এই টেবিল থেকে চল জায়গাটা কতদূর? বেশী না, দু বাসে আট পঁচিশ পয়সা লাগবে—গোপালনগর থেকে দশ পয়সার টিকিটে সা-পুর পেট্রোল পাম্প, সেখান থেকে একখানা পনেরো পয়সার টিকিট। বাস, চোখ বুজতে না বুজতেই ঢুলুনির মেজাজটা জমে না উঠতেই, কানে আসবে কন্ডাক্টরের হাত-পা-ছড়ানো চীৎকার—থানা, থানা, নাবুন সব। নামলাম। থানার উল্টো দিকে বড় রাস্তার ওপাশে খোলা ড্রেনের ওপর খাট পেতে, দরমার বেড়া দিয়ে টেম্পোরারী অ্যারেঞ্জমেন্টে পার্মানেন্ট সব পান-বিড়ি-সিগারেটের দোকান। যখন ছাত্র ছিলাম, কেন্দ্রের পড়তে আসতাম এই ইউনিভার্সিটিতে, মনে আছে, রোজ ঘরে ফেরার পথে এইসব দোকান থেকে আমরা সিগারেট নিতাম। তারপর টানতে টানতে, হাঁটতে হাঁটতে মাস্টারমশাইদের পড়ানোর বিশেষ পদ্ধতি নিয়ে নানা রকম চুটকি কাটতে কাটতে এগোতাম বড় মোড়টার দিকে। আমরা পাঁচজন—রথীন, সুনীল, আশীষ, দেবেন আর আমি পি কে—নাইট ক্লাস সেরে যখন বাসায় ফিরতাম তখন নির্জন বড় রাস্তার মোড়ে মাড়মেড়ে বারোয়ারী আলোর তলায় গুটি-সুটি মেরে জনকয়েক ভিখারী আর কয়েকটা বেওয়ারিশ কুকুর দলাদলি পাকিয়ে পড়ে থাকত। সুনসান রাস্তাঘাট। দোকান-টোকান সব বন্ধ। দু একটা সিগারেটের দোকানে তখনো ঝাঁপ পড়ে নি। বাস ট্রাম কোনোটারই পাত্তা নেই। সবাই আমরা তখন ক্লান্ত। সারাদিন স্কুলে বা ফ্যাক্টরীতে কাজ করে, রাতে নাইট ক্লাস করে প্রচন্ড টায়ার্ড। পরদিন ভোর না হতেই ছুটতে হবে। ভাবতেই মাথাটা কেমন গরম হয়ে যেত। মাঝে মাঝে ভাবতাম—দূর কি হবে পড়াশোনা করে। তার চেয়ে বরং যা করছি, তাই করি। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ত, দুটো বছর তো হয়ে গেল, আর তো মোটে দু বছর। তারপরেই ডিগ্রী পেয়ে গেলে, পুরোপুরি ইঞ্জিনীয়ার। তখন আর পায় কে?...

আর এ জন্য কি কম কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে? শুধু অ্যাডমিশন টেস্টটুকু উতরোনোর জন্য পাঁচশ টাকা দিতে হয়নি দত্তকে? দিতে হয়েছে। ভাগিস দিয়েছিলাম। তাই সেদিন নাইটে পড়ার সুযোগ পেয়েছিলাম। আর পেয়েছিলাম বলেই তো আজ খোদ সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের টেস্ট হাউসে ক্লাস ওয়ান গেজেটেড অফিসার হয়ে বসে আছি। বেসিক, ডি-এ, হাউস রেন্ট-টেন্ট মিলিয়ে কম করেও এগারোশ টাকা পাচ্ছি। আমার অফিসে কয়েকটি ডিপ্লোমা-পাস ছেলে কাজ করে। কলকাতা বা মফস্বলের পলিটেকনিক থেকে পাশ করেছে ওরা। দু চারজন আছে বিহার আর উড়িষ্যার। ওরাই আমায় ধরেছে—স্যার আপনি তো নাইটে পড়েছেন ওখানে। আমাদের একটু ঢোকার ব্যবস্থা করে দিন না।

হাসতে হাসতে বলেছি, কেন মার্চ-এপ্রিলে তো ওখানে অ্যাডমিশন টেস্ট হয়। তোমরা দাও, নিশ্চয়ই হয়ে যাবে।

হলে তো স্যার, আপনাকে ডিসটার্ব করতাম না। —মহান্তি ছেলেটা খুব স্মার্ট। বাড়ী জলেশ্বরে। টেস্ট হাউসে আছে বছর খানেক। কাজটাজ করে ভাল। পড়াশোনাতেও চৌখস— দত্তবাবুকে তো আপনি চেনেন। বলে দিন না, আমরাও যাতে ওর কোচিংয়ে চান্স পাই। কোচিংয়ে চান্স পেলে অ্যাডমিশন গ্যারান্টিড।

কি আশ্চর্য! এতদিনেও কিছু পাল্টায় নি! দত্তবাবু, প্রো, সাহা, প্রো, রায়দের কোচিং এই ডামাডোলের বাজারেও বহাল তবিয়তে চলছে। বেকার ইঞ্জিনিয়ারে দুনিয়া উপচে উঠেছে। তবু প্রোমোশন, বেটার প্রসপেক্টের আশায় কাতারে কাতারে ছেলে লাইন লাগাচ্ছে নাইটে। ডিগ্রী পেলে মাইনে উঠবে, পাড়ায় মর্যাদা হবে। একদিন আমিও তো সেই আশাতেই লাইন লাগিয়েছিলাম।

ফিফটি এইটে এল-এম-ই পাশ করে বারাসাতের কাছে একটা হায়ার সেকেন্ডারী স্কুলের টেকনিক্যাল সেকশনে মাস্টারী জুটিয়েছিলাম। বাড়ী গার্ডেন রীচে। বাসে, ট্রেনে যাতায়াত করে হাঁপিয়ে উঠেছিলাম। আশীষ বোসও ঐ স্কুলে মাস্টারী করত। আশীষই বলল—চল না, ডিগ্রী পড়ি নাইটে। ডিগ্রী পেলে চাকরী-বাকরীর ব্যাপারে আর কোন ঝামেলা থাকবে না। তখন দিনকালও ভাল ছিল। ডিগ্রী-ইঞ্জিনিয়াররা পকেটে সর্বদাই খান চার পাঁচেক অ্যাপয়েন্টমেন্ট বা ইন্টারভিউ লেটার নিয়ে ঘুরত। দিনে পয়সার দেশ। [illegible] দেনা মেটানোর জন্য [illegible]

অ্যাপ্লাই করলেই ইন্টারভিউ জুটত। দিলাম অ্যাপ্লিকেশন পাঠিয়ে—নাইটে পড়ার।

পড়ব তো কিন্তু চান্স পাব কি? আমাদের দুজনেরই সন্দেহ হোল। অ্যাডমিশন টেস্টের দুটো পেপারের কোর্স দেখে রীতিমত ঘাবড়ে গেলাম। পেপার ওয়ান ম্যাথস। ম্যাথমেটিকসে ক্যালকুলাস, হাইড্রো-স্টাটিকস পড়তে হবে। পলিটেকনিকে আমরা ক্যালকুলাস পড়ি নি। আর সেকেন্ড পেপারে ইঞ্জিনীয়ারিং মেকানিকস। ডিপ্লোমার অ্যাপ্লায়েড মেকানিকসের সঙ্গে সাবজেক্টটার যথেষ্ট মিল থাকলেও, গরমিল বিস্তর।

নাইটে ভর্তি হওয়ার যোগ্যতা, যা দরকার—ডিপ্লোমা প্লাস চাকরী—সবই ছিল। কিন্তু ঐ টেস্ট উতরোব কি করে? পথ বাতলাল সুশীল। পলিটেকনিকে এক সঙ্গে তিন বছর পড়েছি। পাশ করে ও তখন একটা ওয়াগন ফ্যাক্টরীতে কাজ করছে। ইউনিভার্সিটিতে ঘুরে খোঁজ খবর নিয়ে এসে বলল—সব হয়ে যাবে, কোন ঝামেলা নেই। চাই শুধু পাঁচজনের একটা গ্রুপ আর মাথাপিছু পাঁচশো টাকা।

ব্যাপার কি? না, অ্যাডমিশন টেস্টের পেপার-সেটার আর পরীক্ষকরা মিলে একটা প্রাইভেট কোচিং চালান। কোচিং-এর মধ্যমণি প্রোঃ মধু দত্ত, সঙ্গে আছেন ম্যাথমেটিকসের রীডার প্রোঃ সাহা আর মেকানিক্যালের প্রোঃ রায়। সিভিল ইলেকট্রিক্যাল, মেকানিক্যাল মিলিয়ে ইউনিভার্সিটিতে সীট মোটে নব্বইটা। ক্যান্ডিডেট বছরে চার পাঁচশো। যদি চান্স চাও তো কোচিংয়ে নাম লেখাও। প্রাক্তন ছাত্রদের অভিজ্ঞতার সারাংশ জানাল সুশীল—মোটে টেন পারসেন্ট ঠিক-ঠাক নিজেদের চেষ্টায় চান্স পায়, বাদ বাকী নাইনটি পারসেন্ট আসে ঐ কোচিং থেকে।

কোচিং মানে, নিয়মিত যে ক্লাস হবে তা নয়। বড় জোর দুটো দিন হবে ক্লাস। ঐ ক্লাসেই স্যাররা সাইক্লোস্টাইলড কোশ্চেন পেপার আর সলিউশন দিয়ে দেবেন। তার জন্য লাগবে পাঁচশো টাকা। ডিসেম্বরে পড়তে গেলেও যা দিতে হবে, মার্চে নাম লেখালেও তাই। এ ব্যাপারে স্যাররা খুব ডেমোক্রেটিক। তবে হাঁ, একলা গেলে চিঁড়ে ভিজবে না। পাঁচজনের গ্রুপ, অর্থাৎ থোক আড়াই হাজার টাকার একটা ডালি উপহার দিতে পারলে, তবেই সব ব্যবস্থা পাকা হবে।

তখন স্কুলে মাইনে পেতাম সব শুদ্ধ একশ ষাট টাকা। যাতায়াত ভাড়া আর টিফিন খরচা বাদ দিয়ে বাড়ীতেই কিছু দিতে পারতাম না তো আর জমাব কি। তবু এদিক সেদিক ঘুরে, ধার ধোর করে পাঁচশো টাকা জোটালাম। আশীষও জোটাল। সুশীল ওর দুই কলিগকে ধরে বেঁধে রাজী করাল। তখন আমরা পাঁচজনে—রথীন, সুশীল, আশীষ, দেবেন আর আমি, প্রশান্তকুমার দাস ওরফে পি কে দাস—নাম লেখালাম এক সঙ্গে প্রোঃ দত্তের কোচিংয়ে।

এখনো কানে বাজে প্রোঃ দত্তের সেই সব অমূল্য বাণী। ক্লাসে নোট খুলে, খাতা মিলিয়ে বোর্ডে অঙ্ক কষতেন। মাঝে মাঝে পাতা উল্টে যেত। তিন পাতার পর হয়তো পাঁচ পাতায় চলে গেছেন। খেয়াল নেই। অঙ্কের স্টেপ মেলাতে না পেরে, আমরা উঠে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা পয়েন্ট আউট করলে, স্যার টোমাটোর মত ফুলো ফুলো গাল দুটো নাচিয়ে, ঢুলু ঢুলু চোখের পাতা আধ বোজা করে পেটেন্ট ইংরেজীতে জবাব দিতেন—ইউ উইল লার্ণ গ্রাজুয়ালি গ্রাজুয়ালি। অর্থাৎ তোমরা ক্রমে ক্রমে শিখবে।

পড়াতে পারতেন না কিস্সু। বিলেতে বসে সাত বছর কাটিয়ে এসেছেন। কি যে শিখেছিলেন সেখানে জানতাম না, তবে স্যার ক্লাসে ঢুকলে দামী জর্দার সুগন্ধিতে গোটা ঘর ভরে উঠত। ঢুলু ঢুলু চোখ সর্বদাই আধ বোজা। দারুণ কাজকর্মা পুরুষ। প্রেফ মাস্টারী করেও যে বাপ চারেক ফ্ল্যাটবাড়ী, দুটো ট্যাক্সির মালিক হওয়া যায়, তা আমরা স্যারকে দেখেই বুঝেছিলাম। স্যারের গোপন আয়ের সোর্স তো আমাদের মত নাইটের ছেলেরা, যারা বেটার প্রসপেক্টের আশায় ডিগ্রী পড়তে যেত।

সেই স্যারের কাছেই আজ যাচ্ছি। মহাশিবম সিকোয়েন্স। ওদের স্যারের কোচিংয়ে ভর্তি করে দিতে হবে। আগে এত কড়া ঝামেলা ছিল না। আজকাল ছেলেরা খুব হুল্লোড় করে। তাই স্যার পুরোনো বিশ্বস্ত ছাত্রের রেকমেন্ডেশন না পেলে যাকে তাকে কোচিংয়ে নেন না।

বাস থেকে নেমে দরমার বেড়া দেওয়া দোকান থেকে একটা প্যাকেট কিনলাম, সিগারেট ফুরিয়ে গেছে। একটা সিগারেট ধরিয়ে হাঁটতে লাগলাম। সামনেই ইউনিভার্সিটি। মোটে দুটো স্টপ। এটুকু পথ আর বাসে উঠতে ইচ্ছে হল না। হাঁটতে হাঁটতে একটা অঙ্ক কষছিলাম মনে মনে। এক একটা সিজনে কম করেও আশী পঁচাশীটা ছেলে স্যারের কোচিংয়ে পড়ে। 'পার হেড' পাঁচশো হলে, কম করেও চল্লিশ হাজার টাকা আসে এই কোচিং থেকে। টাকাটা ভাগ করে নেন তিনজনে—প্রোঃ মধু দত্ত, প্রোঃ সাহা আর প্রোঃ রায়। বছরের পর বছর এরা চালিয়ে যাচ্ছেন ব্যবসাটা। সবাই জানে। জানেন ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষও, অথচ প্রতিবাদ করে না কেউ। তাজ্জব ব্যাপার। প্রতিবাদ করবে কি, পাকে-প্রকারে এঁরাই তো ইউনিভার্সিটিটা চালাচ্ছেন।

সামনেই ইউনিভার্সিটির মেন বিল্ডিং। ফুলে ফুলে সাজানো লনের পাশ কাটিয়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে উঠতে আমার বেজায় হাসি পেল—কেন কেউ প্রতিবাদ করে না, তার আসল রহস্যটা তো স্যারই বলে দিয়েছেন—ইউ উইল লার্ণ গ্রাজুয়ালি গ্রাজুয়ালি। ক্রমে ক্রমে শিখতে শিখতে যৌবনের বাঁধটা মরে যায়, তখন আর প্রতিবাদের ইচ্ছেও অবশিষ্ট থাকে না।

—শীর্ষেন্দু

উত্তরবঙ্গের লোকসাহিত্যের উপাদান

অমরজিৎ চক্রবর্তী

(১)

অন্য অনুক্ষেত্রপ্রভৃতি উত্তরের গ্রাম-বাংলাকে প্রভাবিত করতে পারেনি। তাই বাংলার এই প্রান্তের সংগীত ও সাহিত্য জীবন এবং জনমানস নিজস্ব মৌলিকতায় পুষ্ট হবার সুযোগ পেয়েছে। উত্তর বাংলার লোকসংস্কৃতির উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে এখানকার গান। বিভিন্ন গানের বিচিত্র সমাবেশ উত্তরবঙ্গে যেমন ছিল এবং যতটুকু এখনও আছে—বাংলার অন্য কোন পল্লীতে এই ধরনের সংগীত থাকলেও বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে হয়ত উত্তরবাংলাই অগ্রাধিকার দাবি করবে। নানান বিষয়বস্তু নিয়ে বিভিন্ন পালাগান, অনেক এবং বিশেষ প্রকারের ধর্মীয় সংগীত, প্রেম-পীরিতির আনন্দ-আর্তি মেশানো ভাওয়াইয়া এবং চটকা গান, সর্বোপরি অজস্র বিচিত্র গান নিঃসন্দেহে এই অঞ্চলের সঙ্গীতসাধনার ব্যাপকতাই নির্দেশ করে। এই গানগুলি শুধুমাত্র এখানকার সংস্কৃতিকেই সমৃদ্ধ করেনি, লোক-সাহিত্যেরও এগুলি মূল্যবান উপাদান এবং দুষ্প্রাপ্য সম্পদ।

যে সমস্ত পালাগান এখানকার সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে, তাদের ভেতরে প্রথমে উল্লেখ করতে হয় 'বিষহরা' গানের। এই গান চাঁদসাগরের সঙ্গে মনসাদেবীর বাদ-বিসম্বাদের সুপরিচিত কাহিনী অবলম্বনে পালাগান। মনসামঙ্গল মধ্যযুগের লোক-সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট দিক। তবে সঙ্গীত হিসেবেই পদ্মপুরাণ পাঁচালি রচিত এবং প্রচারিত হয়েছিল। আজকের বাংলার অনেক স্থানে হয়ত এই মঙ্গল সঙ্গীতের শ্রোতার সংখ্যা আর খুব বেশী নেই। কিন্তু উত্তরবঙ্গে এখনও এ গানের সমাদর কমে যায়নি। তার প্রধান কারণ এই অঞ্চলে প্রচলিত 'বিষহরা' গানের পাঁচালীতে আধ্যাত্মিকতাবোধের সাথে বাস্তবজীবনবোধের মিলন। তাই এখনও এখানকার কৃষক-শিল্পীরা দল বাঁধেন, গ্রামে গ্রামান্তরে আসর বসান—গান করেন। কেবলমাত্র মায়াই (মনসা) পূজোর সময়েতেই নয়, প্রধান প্রধান সামাজিক উৎসব এবং হাটবাজারে এই [illegible] বাদ্য দেওয়া হয়।

বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্নভাবে মনসামঙ্গল গান প্রচারিত হয়েছে—কোথাও রয়ানীর দলের দ্বারা, কোন কোন স্থানে ভাসানযাত্রার মাধ্যমে, কোথাও বা পুতুল নাচের মধ্য দিয়ে। কিন্তু পদ্মাপুরাণ গান করার উল্লিখিত রীতিগুলির কোনটাই উত্তরবঙ্গের গীদালরা গ্রহণ করেন নি। এদের সঙ্গীত পরিবেশনায় গান, নাচ এবং অভিনয়—এই সব মিশ্রণই রয়েছে। ১৪ জন নিয়ে গঠিত গানের দলে থাকেন দুজন 'খাইন', দুজন 'বাঁশিয়াল', তিনজন পাইল, একজন 'মূল', একজন 'দোয়ারী' এবং পাঁচজন 'ছোকরা' (নারীবেশে)। মূলের হাতে চামর থাকে। খোলাখেল চাপড়ানো (কনসার্ট) দিয়ে শুরু হয় গানের আসর। তারপর গায়করা সঙ্গীত সভায় প্রবেশ করেন। গঙ্গা, শচী-পতি, কালিরাজ, ব্রাহ্মণ, রাম এবং দুর্গা-বন্দনার যে-কোন একটি বন্দনা গান দিয়ে পালার সূচনা। ব্রাহ্মণ বন্দনা গানটির কয়েকটি লাইন এইরূপঃ—

শতেক প্রণাম হঁও মুই ব্রাহ্মণের পদে।
ব্রাহ্মণ উত্তম কুল বলে চারি বেদে।।
আগম পুরাণ বলে বেদ শাস্ত্র স্মৃতি।
দ্বিজের কণ্ঠেতে হইল এ সবের বসতি।।
যাজ্ঞপাক্ দেখিয়া যেবা প্রণাম না করে।
করাতে কৌশল মুণ্ড ফেলে ভূমি তলে।।

এই গানটিতে ব্রাহ্মণকে 'বেদের উদ্ভব কুল' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই চিন্তা থেকে ওদের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় মেলে। ধর্মীয় সংস্কার কিভাবে সমাজ জীবনকে শাসন করে তারই নমুনা এই বন্দনা গানটিতে পাওয়া যাচ্ছে। উত্তরবঙ্গের রাজবংশীদের ভেতরে এখনও অনেকে ব্রাহ্মণদের দেবজ্ঞান করেন, তাঁদের পদরেণু গ্রহণ করেন। দ্বিজের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন ওদের কাছে ধর্মীয় বিধান। অবশ্য যুগবৈশিষ্ট্য শিল্প-সাধনাকে প্রভাবিত করে। মনসা-মঙ্গল যে সময় রচিত হয়েছিল, তখন ধর্মীয় বিষয়বস্তুই ছিল সাহিত্যের প্রধান উপকরণ। তাই সেই গানে সংযোজিত এই বন্দনা গানটিতে এ জাতীয় ধর্মভাবনা থাকবে এটাই প্রাসঙ্গিক। এটি ছাড়া কলি-রাজ বন্দনা গানটিও উল্লেখযোগ্য। গানটিতে কলিকালে কিভাবে সব নাশ হবে তার চিন্তাই বিশেষভাবে স্থান পেয়েছে। গানটি এমনঃ—

বন্দোং প্রভু কলিরাজ
তিলক ভুবন মাঝ
যাহার মাঝার সংসার তারিণা।
কলিকালে যতগুনে
সাবধান হইয়া শুন
দিনে দিনে দেখ না ভাবিয়া
কলিতে বৈষ্ণব হবে
পিতামাতা না মানিবে
এই পাপে যাবে অধোগতি।
শুন নারদ কলির কথা
পুত্রে না মানিবে পিতা
শিষ্যে না মানিবে গুরুজন।।
সধবা হইবে হীন
বিধবায় হইবে দিন
এইমত কলির ব্যবহার।
আইজের কচু খুঁজি খাবে
তাক পেটে না পাইবে
এইমত কলির ব্যবহার।।
সমুদ্রে না হইবে জল
বৃক্ষের হবে অল্প ফল
গাঙেতে বালু দিবে চর।
জমিনে না হবে শস্য
জলে হবে অল্প মৎস্য
গাভীর কমিয়া যাবে দুধ।।
জাতির না থাকিবে ভেদ
ব্রাহ্মণে ছাড়িবে বেদ
এইমত কলির ব্যবহার।।

—কলির ব্যবহার কি হবে তারই বৃত্তান্ত পাওয়া যায় কলিরাজ বন্দনা গানটিতে। কলিকালে পুত্র পিতাকে মানবে না, শিষ্য গুরুকে। সধবার সংখ্যা কমে যাবে, বিধবার সংখ্যা বাড়বে আর মঙ্গা দেখা দেবে যখন মানুষ আজের কচু খুঁজে খাবে এবং তাও মিলবে না। সমুদ্রে জল থাকবে না, বৃক্ষের অল্প ফল হবে এবং নদীতে বালুচর দেখা দেবে। জমিনে শস্য হবে না, জলে অল্প মাছ হবে এবং গোদুগ্ধ কমে যাবে। জাতি-ভেদ থাকবে না, ব্রাহ্মণ বেদপাঠ ছেড়ে দেবেন—এই হবে কলির ব্যবহার।

বন্দনার পর শুরু হয় পাঁচালী গান। প্রথমে দুয়া, তারপর পদ। অপেক্ষার দিকে আয়োজিত [illegible] করা হত।

কিন্তু এখন আর তা হয় না। তাই যে কোন একটা ভাগ, যেমন—'লখীন্দরের বিয়ে' অথবা 'গোদার বাঁক' এক-একটা পালের বৈঠকে ধরা হয়। পালা দীর্ঘ। তাই শ্রোতা-দের বিরক্তি থেকে অব্যাহতি দেবার জন্য 'দোয়ারী' হাস্যরস পরিবেশন করেন। মূলের কাজ সঙ্গীতকে পরিচালনা করা এবং দোয়ারীর সহায়তায় পাঁচালীকে ব্যাখ্যা করা। এক এক পদকা গানের পর 'ঘাট' আসে। তখনই মূল, দোয়ারী, ছোকরা ও অন্যান্যরা পাঁচালীর বিভিন্ন পাত্রপাত্রীদের অংশ গ্রহণ করে অভিনয়ের ঢং-এ শ্রোতাদের বিষয়টি বুঝিয়ে দেন। তারপরে আবার নতুন ধুয়া—পরবর্তী কাহিনীর স্রোত।

একঘেয়ে পাঁচালীর গান যাতে শ্রোতা ও দর্শকদের কাছে ক্লান্তিকর না হয় সেই-জন্য এই গানের ভেতর মাঝে মাঝে 'খোসা' দেওয়া হয়। খোসাগুলি বিভিন্ন বিষয়ের উপর হতে পারে। আবার পাঁচালীর কাহিনীর সঙ্গে সামঞ্জস্য থাকে তার দিকেও নজর রাখা হয়। দুটি উদাহরণ নীচে দেওয়া হল :

ওকি বাংলাদ্যাশে গান করা ভাই বেজায়
　　　　　　　　　　　　ঝকমারি।
আরে গাওয়াইয়া যদি গেইল বাড়ী,
মায়েয়ার হইল তামাক ভারি,
আরে গোয়াইলঘরে দেয় শোয়াল
　　　　　　　　　　　থার পারি—
মিট-কুমড়া আর খেসারীর ডাইল
　　　　　　　　　দেয় ডালি ভরি।

এই খোসাটিতে পল্লীর গায়কদের প্রতি মায়েয়ার (গৃহস্থের) অবহেলার কথা সুন্দরভাবে ব্যক্ত হয়েছে। বলা হচ্ছে—বাংলা দেশে গান করা বেজায় ঝকমারি। গাইয়ে বাড়ীতে এলে গৃহস্থের মেজাজ বেড়ে যায়, গাইয়েদের শয্যারচনা গোয়ালঘরে বিচালি ছড়িয়ে, খাদ্য মিষ্টি কুমড়ো আর খেসারির ডাল। প্রত্যক্ষভাবে মায়েয়ার প্রতি 'আক্রমণ' হলেও পরোক্ষভাবে সমাজের উপর তীব্র কশাঘাত করা হয়েছে—যে সমাজ শিল্পীর যোগ্য সম্মান দিতে জানে না, কিম্বা দিতে চায় না অবহেলা করে।

পাঁচালীর সঙ্গে মিল রেখেও অনেক 'খোসা' রচিত হয়েছে। বেহুলার ভাসানের পর এই খোসাটি শোনা যায় :

গাও কাঁপে মোর থরথর—
　ধর সোনা হে,
ওকি সোনাহে ওহে।
ওরে পুবাল পইচ্ছাওয়ের বাও—
নাওয়ের বাদাম তুলিয়া দেও
চাম্পক নৌকা কিনারোত লাগিয়া।

....

অনুসন্ধানের পর উত্তর বাংলার গ্রাম থেকে এই পালাগানের ছিন্ন পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। লখীন্দরের জন্ম থেকে শুরু করে বেহুলা লখীন্দরের স্বর্গারোহণ পর্যন্ত এই পাঁচালী গানের পদগুলি আলোচনা করলে দেখা যায়, এখানকার গীদালরা মূল কাহিনীটি নারায়ণ দেব এবং অন্যান্য কবিদের পুঁথি থেকে সংগ্রহ করেছেন। পদের ভেতরে—

নারায়ণ দেবে কয়
সুকবি বল্লভ হয়
পদার ছন্দে এক বাঁধিব নাচারী।।

অথবা—

সুকবি নারায়ণ দেবের সুরত পাঁচালী।
বেহুলার করুণাগান বাঁধিব নাচারী।।—

এই ধরনের ভণিতা পাওয়া যায়। আবার একস্থানে—

জগত জীবন কবি নারায়ণ দেবে গায়।

—বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। নারায়ণ দেব রাঢ় দেশ ত্যাগ করে ময়মনসিংহ জেলার বোরগ্রামে বসতি স্থাপন করেন। তবে উত্তর-বঙ্গে তাঁর পুঁথি প্রচারলাভ করে এবং ঐ পথেই তা ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় প্রচারিত হয়েছে বলে অনুমান করা হয়। নারায়ণ দেব ছাড়া আর যে-সব কবির ভণিতা-ভরা পদ-গুলি পাওয়া যায়, তাঁরা হচ্ছেন জগতজীবন, বৈদ্য গোপীচন্দ্র, দ্বিজ বংশী দাস এবং রমাকান্ত।

উল্লিখিত কবিদের কাছ থেকে মূল কাহিনীটি গ্রহণ করলেও এখানকার গীদালরা এই পালাগান নিজেদের ভাষা, সামাজিক পরিবেশ ও নিজেদের সংস্কৃতির উপযোগী করে রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন এবং অনেক ক্ষেত্রেই রূপান্তরের চিত্র অত্যন্ত মনোগ্রাহী, বাস্তব এবং মৌলিক। উদাহরণ-স্বরূপ চম্পক নগর পার হয়ে হরসাধু মণ্ডলের গ্রামে পৌঁছানোর পর সেখানকার মানুষেরা, এমন কি হরসাধুও, লখীন্দরের বিয়ের শোভাযাত্রা দেখে কিভাবে ভয় পেয়ে পালিয়েছিল তার চিত্রটি দ্রষ্টব্য :—

ডোম পালায় ডাওশাই পালায়
ধোপা আর সুরি।
হস্তে লাটি ধরি পালায়
আশিকালিয়া বুড়ি।।
তেলী পালায় মালী পালায়
আর চণ্ডাল হারী।
ঘরে বসে যুক্তি করে
গাবুর গাবুর আরি।।
গাবুর আরি যুক্তি করে
দিদি পলাই কার জই।
নিভাতারির ভাতার পাব
মঙ্গল চণ্ডীর বরে।।
যে পাইকে লইয়া যাবে
তার সঙ্গে যাব।
রান্ধিয়া বারিয়া ভাত
তার বুকে বসি খাব।।
নগরখান পালেয়া গেল
নগরে ভাসে সোনা।
তারপরে পালেয়া গেল
নলী চোড়া জোলা।।
নগরখান পালেয়া গেল
নগরে নাই আর কাউয়া।
তারপরে পালেয়া গেল
চামচটিচোরা নাউয়া।।

....

ডোম, ডাওশাই (যারা শুয়োর চরায়), ধোপা, সুরী, লাঠি হস্তে আশি বৎসরের বুড়ি, তেলী (তেল বিক্রেতা), মালী (প্রতিমা তৈরী করে যারা), চণ্ডাল, হারী নলীচোড়া তাঁতি (জোলা) চামটি চোরা' নাপিত (নাউয়া) সবাই পালিয়ে গেল। নগরে সোনা ভাসছে। নগরে একটি কাকও রইল না—পুরো নগরটাই পালিয়ে গেল। রইলো শুধু যুবতী বিধবা-রা, যারা যুক্তি করছে—যে পাইক নিয়ে যাবে তার সঙ্গেই চলে যাবে—রেঁধে বেড়ে তার বুকে বসে খাবে—অর্থাৎ আধিপত্য বিস্তার করবে। এই বর্ণনায় উত্তরবঙ্গের গ্রামের মানুষের উপ-জীবিকার কথা পাওয়া যাচ্ছে। আর তারই সঙ্গে যুবতী (গাবুর) বিধবাদের জীবন সম্পর্কে চিন্তাও।

লখীন্দরের বিয়ের পর দান-দক্ষিণার বিবরণটিও উল্লেখযোগ্য :—

....

তারপর করে দান কন্যার হয় জ্যাঠো
তাঁয় তো করিল দান গাভীর লেঞ্চু খাটো।।
তারপরে করে দান কন্যার হয় জ্যাটাই।
তাঁয় তো করিল দান সুতা কাটা নাটাই।।
তারপরে করে দান কন্যার হয় খুড়া।
তাঁয় তো করিল দান বিচন ধানের পুরা।।
তারপরে করে দান কন্যার হয় কাকী।
তাঁয়তো করিল দান সুবর্ণের চাকী।।
তারপরে করে দান কন্যার হয় আজু।
তাঁয়তো করিল দান সুবর্ণের বাজু।।

....

তারপরে করে দান কন্যার হয় মামা।
তাঁয়তো করিল দান ভাঙ্গা গাইনের ম্যামা।।
তারপরে করে দান কন্যার হয় মামি।
তাঁয়তো করিল দান ভাঙ্গা কাচির ম্যামি।।
তারপরে করে দান কন্যার হয় মাউসা।
দান নাই দক্ষিণা নাই কেবল কথা চুষা।।
তারপরে করে দান কন্যার হয় মাসি।
ভাঙ্গা খাড়ু হস্তে ধরি
　　　　　　কাকার মুকুর হাসি।।

....

এই পদগুলিতে আঞ্চলিক ভাষার প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয় এবং বিভিন্ন দান-সামগ্রীর তালিকাটিও বৈচিত্র্যময়। কন্যার জ্যাঠা দান করছেন গাভী—যার লেজটা ছোট, কন্যার খুড়ো দান করছেন বীজধান এবং মামা-মামীর দানও পল্লী গৃহস্থালীর উপযোগী টুকিটাকি জিনিষ।

বেহুলার বিয়ের পর পিত্রালয় ত্যাগের প্রাক্কালে তার মা সুমিত্রা দেবী কিভাবে মেয়েকে পরের ঘরে গিয়ে ব্যবহার করতে হবে তার শিক্ষা দিচ্ছেন। এই সংযুক্তিকরণ অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে হবে না যদি এই অঞ্চলের সামাজিক ব্যবস্থার সঙ্গে পরিচয় থাকে। উত্তরবঙ্গে বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল ফলে অল্প বয়সে কন্যার বিয়ে দেওয়ার রীতি ছিল। এই অপরিণত বয়সে যে মেয়েটি মায়ের আঁচল ছেড়ে চলে যাচ্ছে তার ভাল-মন্দের প্রতি মায়ের দৃষ্টি থাকবে এটাই

স্বাভাবিক। তাই বেহুলার মা তাকে কিছু 'শিক্ষার ফল' বলতে আছেন ঃ

মায়ে না শিখান্ বাছা শিক্ষার ফল ধর।
জম্ম বয়সে বাছা যাবু পরার ঘর।।
কান্দো কান্দো বাছা নালিয়া পালিয়া।
অন্তরের হাসিকমল যাইস বোল ছাড়িয়া।।
সুশিয়ার বোলং বাছা শুন রূপবতী।
করবু স্বামির সেবা মা একান্ত ভক্তি।।
শ্বশুর শাশুড়ি তোর হয় গুরুজন।
যতনে করবু সেবা রাখিয়া মন।।
প্রভাত উঠিয়া মা ছাতাছাল দিবু।
আগি জল ভাতের সঙ্গে জনক লাগি যাবু।।
আগি জল খাও বাবে তোর হাসিয়া খেলিয়া।
অভাগিনীর বাছা যাইস ছেড়ে দুঃখ হইয়া।।

স্বামির প্রতি ভক্তি, শ্বশুর শাশুড়ির সেবা এবং তাদের কথায় অনুগত থাকা, সকালে উঠে আঙিনায় ছড়া দেওয়া এবং সত্যম্ভক হয়ে চলাফেরার নির্দেশই নয়, স্নান, রন্ধন, পরিবেশন এবং সন্ধ্যাবেলা প্রদীপ দান সম্পর্কেও 'নিয়ম নীতি' জানিয়ে দিচ্ছেন বেহুলার মা ঃ—

কুঘাটে নাহিয়া সুঘাটে উঠিবু।
ভিজাবস্ত্র ফেলিয়া মা সুকনা পোরাবু।।
কিম্মারে জল দিয়া দুই হাত পাকুলিবু।
রন্ধনশালায় দ্রব্য লইয়া রন্ধনশালায় যাবু।।
রন্ধন করিয়া মা ওডাবু পাট্।
জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ দেখিয়া দেইস অন্ন ভাত।।
প্রথমে দেইস অন্ন শ্বশুর সদাগর।
তারপর দেইস অন্ন স্বামী লখিন্দর।।
তারপর দেইস অন্ন শাশুড়ি তোর মাও।
তারপরে দেইস অন্ন আগি হয় জাও।।

সকলকে দিয়া যে হুষ্ঠি থাকে।
বিড়াল কুকুর আসিলে তাক দিয়া
তুই খাইস শেষে।
মাগো শিখান্ বাছা যত নিয়ম-নীতি।
সন্ধ্যা হইলে মা বাস্তুর দোরে দেইস বাতি।।

পাঁচালীর এই স্থানেই নয় প্রায় সর্বত্র এই ভাবের প্রকাশ লক্ষণীয়। বিশেষত গোদার বাঁকে। গোদা বেহুলাকে তার গৃহস্থালীর সংবাদ এমনি করে দিচ্ছে ঃ

....

গৃহস্থির কথা কন্যা শুন মন দিয়া।
গোটা ছয়েক করছোং নিকা,
গোটা দশেক বিয়া।।
পৃথিবীর অকাল কন্যা হইলে যেই সন।
সেই সন হইচে মোর বড় বিড়ম্বন।।
পাঁচমাস করি চিন্তা নাগিয়ে টাকাত্।
সাতজন গুদানি মইচ্ছে না পায়য়া ভাত।।
নয়জনক লইয়া আমি করি গৃহবাস।
শীতের সময় চাইরজন হইল পরবাস।।
পাঁচজনাক লইয়া আমি সুকে বসি ঘরে।
তিনজনাক পালেয়া নিয়া
গেইল ঠেঁপ্রে চাকোরে।।

ঘর মধ্যে আছে কন্যা কিছু নাই শুন।
পাঁচজনার চিনা আছে ছয় সাত কাউন।।
মাছের শুকুটা আছে ঢুলি নয়েক মন।
কহিলাম গৃহস্থির কথা এই মত পৌরষ।।

ঘর মধ্যে আছে মোর সোনার মাচাখান।
অল্প করি ভরে থুইচোং
খুচি চাইরেক ধান।।
সেই না ধানের কথা শুনেছ উত্তর।
ধরেয়া খাইতানে খারয়া কইরচে জরজর।।।
শনিবারে মঙ্গলবারে মাচা কড়কড়ায়।
না জানোং অভাগির মাচা
কুনদিন ভাঙিয়া যায়।।
কিলাই চইড়লে মাচা মাচা উথাচাউ করে।
ইন্দুর চড়িলে মাচা চিত্তোর হয়া পড়ে।।
ঘর মধ্যে আছে কন্যা একখানি ছেওটা।
কানি যেদিন পেন্দে সেদিন
ধুতি হয় নাংটা।।
যেদিন হাটে যাও দুই ছেওটা পিন্দিয়া।
কানিধুতি বাস থাকে
কুলা আওড়াল দিয়া।।
যেদিন না পেন্দে কানি, আর ধুতি।
সেইদিন যাবোং মুই চলিয়া পাগড়ি।।
সেই না পাগড়ির মাতায় বাংগার ফুল দিয়া।
নগরেতে বেড়াও মুই বসন্ত রসিয়া।।

....

গোদার গৃহস্থালীর সংবাদ অত্যন্ত উপভোগ্য। গোদা ছয়টি নিকা এবং দশটি বিয়ে করেছে। কিন্তু এই ষোলজনের ভেতরে সাতজন মঙ্গার সময় ভাত না খেতে পেয়ে মারা গিয়েছে, চারজন দেশত্যাগী হয়েছে আর তিনজনকে বাড়ীর চাকর ঠেংগ্রো পালিয়ে নিয়ে গিয়েছে। ঘরের সম্বল পাঁচসের চিনা, ছসের কাউন আর শুকনো মাছ নয়-দশ ঢুলি (বড়-বড় ঝাকা)। ঘরের ভেতরে যে সোনার মাচা আছে তাতে ছোট-পাকির চার পালি ধান আছে। কিন্তু সে ধানকেও ইঁদুরে খেয়ে শেষ করেছে। শনিবারে, মঙ্গলবারে মাচা কড়মড় শব্দ করে—কবে ভেঙে পড়বে ঠিক নেই। এমন মাচার অবস্থা যে বেড়াল চড়লেও মচমচ শব্দ হয় আর ইঁদুর চাপলে মাচা চিত হয়ে পড়ে। ঘরে আছে একটি মাত্র ছেওটা (কাপড়ের টুকরো)। কানি সেটা পরলে ধুতি নগ্নদেহে থাকে। আর ঐটি পরে গোদা যেদিন হাটে যায় সেদিন কানি এবং ধুতি, গোদার অবশিষ্ট দুই ভার্যা, কুলো দিয়ে দেহ ঢেকে রাখে। যেদিন কানি ধুতির কেউই ওটা পরে না সেদিন গোদা ঐ ছেওটা দিয়ে রাজার মত পাগড়ি বাঁধে মাথায়, গুঁজে দেয় কার্পাসের ফুল তার উপর—গোদা রসিক আছে।

এই গানের পাঁচালীর আর একটি অংশে শিবের প্রতি চণ্ডীর উক্তিগুলিও দ্রষ্টব্য ঃ—

শুনে শুনে শেষ তুমি দুঃখের কাহিনী।
জানিয়া জ্বলিয়া উঠে মনের আগুনী।।
বারখান ঢেঁকি মোর তেরখান কুলা।
গংগা দুর্গা দুই নারী জাতি
ঘটিয়া ভাঙ্গের গুড়া।।
প্রভাতে উঠিয়া যায় ভিক্ষা মাগিবারে।
যা কিছু খুইয়া আইসে কোচিনির ঘরে।।
কেহ কিছু বলিলে বুড়া মনের বাঘ গর্জে।
আপনে জ্বলিয়া মোক জ্বালায় গুড়া অন্তরে।।
হাঁড়ির ভিতরে ভাত যখন গবগব করে।
ভাত হইলে বুড়া তখন পাত ধরিয়া বইসে।।
ভাঙের দুঃখে ভাত পাসে পাসে খায়।
কার্তিক গনাই দুইটি ছেলে
ডোগোতে নাচায়।।
গংগা দুর্গা দুই নারী মরি পেটের দুঃখে।
আর নারী করিতে চাও কোন ছার মুখে।।
নটী লইয়া কর তুমি নটির ঘরবাড়ী।
মোর গৃহে গেইলে তোর
উক্রাইম পাকাবাড়ি।।

গোদার কথা এবং চণ্ডীর বক্তব্যের ভেতর থেকে এই অঞ্চলের সামাজিক ও আর্থিক জীবনের ছবি মিলছে। গোদা হচ্ছেন উত্তর বাংলার দরিদ্র কৃষক আর শিব হচ্ছেন সংসারের প্রতি উদাসীন ভিক্ষাজীবী ব্রাহ্মণ। কোপনস্বভাবা স্ত্রীর বাক্যবাণে সে জর্জরিত। গায়কেরা কেন্দ্রীয় কাহিনীকে গ্রহণ করে নিজের পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে সামনে রেখেই পাঁচালীর গানে অনেক বিষয় সংযুক্ত করেছেন। গ্রামের সমাজ এবং শ্রোতৃবর্গের দিকে দৃষ্টি রেখে রচিত 'বিষহরা' গানে তাই পল্লীর জীবন ও চিন্তা বিশেষভাবে প্রতিবিম্বিত হয়েছে। ফলে রাঢ়ে যা পূর্বকালে প্রচলিত পদ্মাপুরাণ পাঁচালী গানের সঙ্গে উত্তর বাংলার এই গানের মিল নেই। সেই দিক থেকে উত্তরবঙ্গের 'পদ্মা-পুরাণ' গানের আলাদা মূল্য আছে।

মূল কাহিনীতে বিভিন্ন বিষয় সংযুক্ত করলেও কিন্তু মনসামঙ্গল পাঁচালীর আসল উদ্দেশ্য কোথাও ক্ষুণ্ণ হয় নি। মনসামঙ্গল গানের প্রধান উদ্দেশ্য বিষহরী পুজোর প্রচার এবং এ ব্যাপারে গ্রামের গায়কেরা যে সচেতন তা বেহুলা-লখীন্দরের দেবপুর থেকে প্রত্যাবর্তনের পর চাঁদসদাগরের মনসা-পুজোর আয়োজন এবং তাঁর আরাধনার বর্ণনার ভেতরে স্পষ্ট। এই অংশে সামাজিক ভাবনার চাইতে ধর্মভাবেরই প্রাবল্য দেখা যায়। তাই সামাজিক চিন্তার প্রকাশ এই গানে থাকলেও শেষ পর্যন্ত ধর্মচিন্তাই জয়ী হয়েছে। সংযুক্ত অংশগুলি পল্লীর গানের আসর জমানোর জন্যই রচিত হয়েছে। তা না হলে গ্রামের মানুষের কাছে এর সমাদর থাকতো না। জীবনের সঙ্গে যে গানের যোগ নেই, সে সুর ওদের কাছে 'বিদেশী'। 'বিষহরা' গান ওদের নিজস্বতা-বোধের প্রামাণ্য প্রতীক—নিজেদের সমাজ ও সংস্কৃতির প্রতি আনুগত্যের নির্ভেজাল নিদর্শন।

(২)

'বিষহরা গান' বাদে আর যে সমস্ত পালা গান উত্তর বাংলার লোকসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে তাদের ভেতরে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে 'সোতোরা', 'কুষান' 'ঠুনকী ব্রাহ্মণ', 'রামলীলা', 'কৃষ্ণলীলা', 'জগনামা', 'দুদি-যাত্রা', 'জাগ গান', 'সোনাই যাত্রা' এবং 'কমলা যাত্রা'।

সোতোরার গান প্রধানত প্রেমকাহিনী অবলম্বনে [illegible]। এ গান সোতোরার

সাহায্যে গীত হয়। যে সমস্ত পালাগুলির বৈঠক হয় সেগুলির ভেতরে প্রধান হচ্ছে 'মদনকুমার মধুমালা', 'রাহমদুপজান', 'নিজাম পাগলা', 'করিম বাদশা', 'লক্ষপতি সদাগর', 'রামগোপাল', 'দেবর্ষাত কন্যা', 'মহুচমতী', 'চানমাল সদাগর', 'মালাক্ষ', 'নিদ্রুঞ্জ রাজা', 'চন্দ্রাসতী', এবং 'গজুর বিবি'। এই গানের দলে থাকে একজন বাইন, একজন পাইল, হার্মোনিয়াম একটি, 'ছোকরা' (নারী-বেশে) ৪ জন, বেহালা একটি, মূল একজন এবং দোয়ারী। মূলের হাতে থাকে বোতোরা। উপরে উল্লিখিত যে কোন একটি পালা নিয়ে গানের আসর শুরু হয়। মূল পালা শুরু করার আগে বন্দনা গান গাওয়া হয়। বিভিন্ন বন্দনা গানের একটি—সরস্বতী বন্দনা, নীচে উদ্ধৃত করা হল :—

আইসেক মাতা সরস্বতী রথে করিয়া ভর—
কে ডোলারে নামেক আসিয়া
মোর সভার ভিতর।
মোর সভা ছাড়িয়া যদি অন্যের সভার যাও—
আর কিছু কিয়া না খাও ধর্মের মাতা খাও।
পাইল বাইনের মস্তকে মা দিয়া দুই পাঁও—
মোর মূলের মস্তকে আসিয়া
দোহারী খেলাও।।
মূলের জিবাতে যদি মা এক পদ নড়ে—
লইজ্জা পায় মা জননী সভার ভিতরে।
মোক লইজ্জা দেন যদি মা সভার ভিতরে—
তোমরা লজ্জা পাইবেন মাগো
দ্যাবের দেবপুরে।

শুধু সরস্বতী বা নারায়ণ বন্দনা জাতীয় দেবদেবী বন্দনাই নয় আসরে সমবেত সকলকে এমনি করে প্রণতি জানিয়ে গানের বৈঠক শুরু করা হয় :—

সভা করি বসি আছে হিন্দু-মুসলমান,
সবেরও চরণে আমি করিলাম প্রণাম।

এইরূপে বন্দনার পর মূল পালা শুরু হয়। শুরু করেন মূল। দোয়ারী হাস্যরস পরিবেশন করেন এবং গানকে ব্যাখ্যা করার জন্য মূলকে সহায়তা করেন। এক-এক পসলা গানের পর 'নাট' আসে। তখন মূল, দোয়ারী এবং ছোকরা-নর্তকীরা অভিনয় করে বিষয়টি শ্রোতাদের কাছে তুলে ধরেন। গান ছন্দে বাঁধা। উদাহরণস্বরূপে আমুর বাদশা বা গজুর বিবি পালা থেকে প্রথম কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করা যেতে পারে :—

আমুর নামে ছিল বাদশা ইন্দ্রপুর শহরে,
তাহার মত ধার্মিক নাই রাজ্য সংসারে।
সাত রাণী বিয়া করাইছে রাওয়াস ভিতরে,
কন্যা-পুত্র নাই দেয় আল্লা
বদন কোন্দায় যাবে।
আটকুড়া রয়েছে সে দুনাই সংসারে।

....

সকালে উঠিয়া দেখা হয় আটকুড়া বদন,
দিনান্তর যায় তাদের নাইতের অকরুণ।
নিন্দ হাতে উঠিয়া সেই
দ্যাখে আটকুড়ার মুখ,
দিনভর যায় ক্যাচক্যাচিতে
জোয়ানে না হয় সুখ।

....

এই প্রকারের গান এবং পরে অভিনয়ের মাধ্যমে পালা প্রবাহিত হয়। পালা দীর্ঘ। তাই শ্রোতাদের যাতে বিরক্তি না আসে সেই জন্য এই গানের ভিতরে ভাওয়াইয়া-চটকা গান 'খোসা' দেওয়া হয়। 'খোসা'র একটি নমুনা :—

কানে বন্ধু ধন বাজার কানে—
সে কথা কি আছে মনে,
একদিন আসি গেইছেন ঘুরিয়া।
ওরে যেদিন আসি গেইছেন ঘুরি—
সেদিন আমি জ্বরে পড়ি,
হোর খবার নাই পাং অসুখ ধরিয়া।
ও কইনা যার সঙ্গে যার ভাব থাকে—
হউক বা না হউক আগেয়া যাযে,
না হয় আধান গুয়া দেওয়া যায়।
ওরে খিরকী দিয়া আচোং চায়য়া—
তুই শুতেন্দু গুয়া খায়য়া,
মোন মনটা লোচোর পোচোর করে।
ও কইনা আইত দুপরে গেন্দু বাড়ী—
ওরে দৌড়ি বিড়াইল থাকুন যদি
মোরমাইয়াটা মান্দে দৌয়ায় জল।
ওরে আগম নিগম না বুঝিয়া—
বাদুন দিয়া দিল মারিয়া,
চাইরপর আইটটা কান্দোং বসিয়া।

কথা দিয়ে সময় মত একদিন কন্যাটি বন্ধুর কাছে যেতে পারে নি বলে বন্ধু গোসা হয়েছে। তার অভিমান ভাঙাবার চেষ্টায় মেয়েটি বলছে যে, সে যেদিন এসে ফিরে গিয়েছিল, সেদিন প্রেমিকাটি অসুস্থ ছিল। কিন্তু বন্ধুটি এই ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট নয়। সে বলছে যার সঙ্গে যার ভাব থাকে, সে যেভাবেই হোক একবার এগিয়ে এসে দেখা করে। অন্তত একটা পান তুলে দেয় হাতে। কিন্তু বন্ধুটি জানালা দিয়ে দেখলো মেয়েটি নিজেই গুয়া (সুপারী) খেয়ে শুয়ে পড়লো। এ অবহেলা অসহ্যকর। অথচ মেয়েটির সঙ্গে দেখা করতে আসার জন্য পরে তাকে লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয় নি। বেশী রাতে বাড়ী ফেরার জন্য স্বামী তাকে ঝাঁটা দিয়ে এমনভাবে পিটিয়ে দিয়েছিল যে, 'চার প্রহর রাত' তাকে কেঁদে কাটাতে হয়েছিল।

এই জাতীয় প্রেম-ভিত্তিক গান ছাড়া সমাজের নানা প্রকারের 'সমস্যামূলক' এবং পল্লীর মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন নিয়ে রচিত অনেক 'খোসা' এই গানের ভেতরে পাওয়া যায়। যেমন :—
বুড়া হরির নামের মালা জপে,
একাদশী ব্রত করে—

ঐ বুড়াটা বিয়ের নিবার চায়।
একটা বিধবা ধরি—
বাপে ব্যাটায় কাড়াকাড়ি
এমনি কত কেমন দেখা যায়।
বুড়ার বড় ব্যাটা উঠিয় কয়—
বিধবা দেওয়া হবার নয়,
ঐ বিধবা মোরে দেওয়া যায়।

একজন বিধবাকে নিয়ে পিতাপুত্রে কাড়াকাড়ি করছেন। দুজনেই তাকে আজীবনের সঙ্গী করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

পিতা পুত্র, হরিনাম জপ করেন, একাদশী-ব্রত পালন করেন। একজন ধার্মিক এবং প্রবীণ মানুষের এই জাতীয় মানসিক উচ্ছৃঙ্খলতার 'খাস্‌তামাসা' গানের আসরে নিয়ে সমাজের নিন্দিত বিষয়গুলিকে বিদ্ধ করার চেষ্টার পেছনে একটা উদ্দেশ্য আছে। পত্রিকা যেখানে প্রবেশ করে না, সেখানকার মানুষের জনমত গঠনের এর চেয়ে বড় উপায় আর কি হতে পারে?

গ্রামের মানুষের মানসিক পরিবর্তনের ছবিও 'খোসা'—গুলিতে পাওয়া যায়। যেমন :

মোর দেশেতে নাইরে ভাই ধ্বনের সম্মান।
ভদন পেনবে ছত্রিশ জাতি,
ডোম, ভাওয়াই, চাঁড়াল, মুচি—
মুড়ি, সুরী, নাইয়া, ধোপা
কুমার আর ব্রাহ্মণ।

কলিকালে ভদনের (লুঙ্গির) সম্মান আর নেই। হাঁপ জাতির সবাই ভদন পরিধান করছে। অথচ ভদন একসময় শুধু মাত্র মুসলমানদেরই পরিধেয় ছিল। চিন্তার এই উদারতা কিম্বা প্রসারতা গ্রামেও দেখা দিচ্ছে—এটা কম পরিবর্তনের সূচনা নয়।

দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধোত্তরকালে উত্তর বাংলার সাইকেলের চল খুব বেড়ে যায়। তাও গ্রামের গীদালের দৃষ্টি এড়ায় নি। ভদ্র এবং চাষা সাইকেলকে কিভাবে ব্যবহার করছেন, তার বর্ণনাটিও এদের খোসায় আছে :—

দেখ ভাই কলিকালে সাইকেলের কি সম্মান।
সাইকেলের দাম তামকাসা—
কখন ভদ্র কখন চাষা।

বাবু যারা সাইকেল চেনে—
নাক দিয়া তার ছিটে চড়,
দুই হাতে দুই হ্যান্ডেল ধরে,
দুই পায়ে দুই প্যাডেল মারে,
জল দেখিলে ঘাড়ে করে।
চাষার কথা আমি কই,
সাইকেলে বান্দে একাদিয়া মই।
হুকাছাড় হ্যান্ডেলে বান্দি
চাষের খেতে চলে যায়।

এই গানটিতে হঠাৎ আলোচ-মুখ দেখে 'দুই কি দ্বন্দ্ব রে' গোছের ভাবকে সমালোচনা করা হয়েছে। সাইকেলে মই, হুকো-ছাড় বেঁধে ক্ষেতে কাজ করতে যাওয়ার দৃশ্যটি পল্লী কবির গতানুগতিক চিন্তাকে আঘাত দিয়েছে। অতিশয়োক্তি থাকলেও, অনুকরণকারীদের প্রতি আক্রমণটি খুবই উপভোগ্য। সূক্ষ্ম হাস্যরসবোধ পল্লীর গায়কদেরও কম নেই এ থেকে বোঝা যাচ্ছে।

'খোসা' ছাড়া গানের সঙ্গে খেমটা, পরিবেশন করে ছোকরা নর্তকীরা। নমুনা :—

থাকথাউ করিয়া নাগিল চাঁদের আলো,
দুককুত করিয়া উঠিল দেওয়ার বজা,
দুককুত করিয়া ঘরোত ভাসুরে কান্দে
বড়ুমানাক্ খবর দে'ও তাঁরও না আইসে!

CENTRAL LIBRARY

ধুপ করি পইল বাড়ের মাটি
দর্কি উটিল গাও—
পাচিলাবাড়িত্ বাড়াত্ ঢোকায়
না করং দুই গাও।
ওটা কাব্বা আসিচে—
আই দুই সুটের্সুটিয়া ক'ও—
হিঁজ আইসেক না ক্যানে।

চ্যাপরা আজুর দুইটা মাইয়া
কপড়া করি ধরে—
তার উপরো মোক্ নিবার চায়,
মন মোর কেমন কেমন করে,
মন মোর উড়াও' বাইড়াও' করে।

যে সমস্ত ভাওয়াইয়া এবং চটকা গানগুলি 'খোসা' দেবার জন্য এবং 'খ্যামটা'র ব্যবহার করা হয় তার ভেতরে অনেকগুলি খুব মার্জিত নয়। উদ্ধৃত 'খোসা' এবং 'খ্যামটা'—প্রেম নিবেদনের জন্য গভীর রাতে কোন মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে যারা তারা দুজনেই বিবাহিত। বিশেষত চ্যাপরা আজু (দাদু) যার দুটি স্ত্রী আছে, সেও রাতের অন্ধকারে এমন একজনের পেছন বাড়ীর বেড়ায় টোকা দিচ্ছে যে অন্দরের দেবর পরিবৃত সংসারের গৃহিণী। অবশ্য পরকীয়া প্রেম সামাজিক অনুশাসন-বিরোধী হলেও প্রাচীন এবং আধুনিক যুগের বাংলা সাহিত্যে যথেষ্ট পরিমাণে স্থান পেয়েছে। তাই অসংখ্য বাধা এবং অশেষ বিপত্তির ঝুঁকি নিয়ে চ্যাপরা আজুর একটি বিবাহিত নারীর সঙ্গ লাভের চেষ্টা অসামাজিক হলেও অবাস্তব নয় যদি বাস্তবজীবন সাহিত্যের মুখ্য উপজীব্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়। তবে দোয়ারীদের সূক্ষ্ম রসিকতাবোধ খুব একটা নেই। ফলে অপেক্ষাকৃত আলোকপ্রাপ্ত লোকেরা ঘরা-বাড়ীতে এই গানের আসর বসানোর পক্ষপাতি। তবে বাড়ীর বাহির অঙ্গনেই এই গানের আসর সাধারণত বসে এবং পরিবেশ উপযোগী গান পরিবেশন করা হয়। উপরে উদ্ধৃত গানগুলির বিষয়বস্তুর স্থূলতা থাকলেও একটি দ্রষ্টব্য বিষয় হচ্ছে ভাষা। এই অঞ্চলের ভাষার এর চাইতে অর্কাচীন নমুনা আর হয় না। থাককাউ, হুককুত্, ধুককুত্ শব্দগুলির ঝঙ্কার বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য। তাছাড়া 'পাচিলবাড়িত্' (বাড়ীর পেছন দিক), 'সুটুসুটিয়া' (চুপি-চুপি) 'উড়াও' বাইড়াও'' (আনচান) শব্দগুলিও উত্তরবঙ্গের বাইরের মানুষের কাছে নতুন লাগবে।

দোতোরার পরেই উল্লেখ করতে হয় কুষাণ গানের। কুষাণ রামায়ণের বিভিন্ন ঘটনার অবলম্বনে পালাগান। 'লব-কুশের যুদ্ধ,' 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল', 'রামের বনবাস' 'সীতার বনবাস', সীতার অগ্নি পরীক্ষা', 'রাবণ বধ' প্রভৃতি কৃত্তিবাসী রামায়ণের বিভিন্ন কাণ্ডে ঘটনাগুলিকে সুরে বেঁধে সঙ্গীতে রূপ দেওয়া হয়েছে। এ গানেও মূল, দোয়ারী এবং চ্যাড়ো-নর্তকী থাকে। মূলের হাতে 'বানা' থাকে।

ঠুনকীরাবণ পালাগানে মোট গায়ক সংখ্যা পাঁচজন—চারজন পাইল, একজন মূল। সকলের হাতে একটি করে মন্দিরা। 'মহীরাবণ বধ', 'সীতা অন্বেষণ' 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' পালাগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তবে এ গানের দল এখন অবলুপ্তির পথে। রামায়ণ গান এ যুগের মানুষের বোধহয় পছন্দ নয়। খ্যামটা এবং দোয়ারীর খিস্তি-খেউরের দিকেই আকর্ষণটা যেন প্রবল বলে মনে হয়।

'রামলীলা' গান রামের লীলাকীর্তন করার জন্য পালাগান। এর উল্লেখযোগ্য পালা হচ্ছে 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' এবং 'রাবণ বধ'। এই গানে দুইজন মূল (ডাইনা এবং বায়া), ৪-৫ জন পাইল, ২ জন বাইন ও ৪ জন চ্যাংরা-নর্তকী থাকতো। কোন দোয়ারী দলে থাকতো না। কৃষ্ণলীলায় 'শ্রীকৃষ্ণের জন্ম', 'ব্রজলীলা', 'কংস বধ' প্রভৃতি পালা ছিল। এ গানেও রামলীলা গানের মত দুজন মূল, 'ছোকরা', পাইল ও বাইন থাকতো। দোয়ারীর স্থান ছিল না।

'জগনামা' মুসলমানদের গান। মহরমের সময় এ গান করা হোত হাসান-হোসেনের কাহিনী নিয়ে। মূলের হাতে চামর থাকতো বিষহরা গানের মত। কিন্তু 'বিষহরা'র মুখা-বাঁশী এ গানে ছিল না। খোল, করতাল, 'ছোকরা', অধিকারী এ গানের অঙ্গীভূত ছিল। দুগি-জাতি (যারা চুন বিক্রী করতো) দুগিযাত্রা গানের স্রষ্টা। এর পালাগুলির নাম ছিল মদনামতি, সেন্দুর-মতি ইত্যাদি। এই গানের উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে কণ্ঠস্বরের বিকৃতি। বার-চোদ্দজন গায়ক নিয়ে এই গানের দল গঠিত ছিল। মূল, অধিকারী, বায়েন, দোহার এবং 'ছোকরা' এই দলে থাকতো।

জাগগান আগেকার দিনে বাঁশপুজোর সময় করা হোত। পালা—'দাতা কর্ণ', 'কলঙ্ক ভঞ্জন', 'গুরু দক্ষিণা', 'কৃষ্ণের জন্ম'। মূলের হাতে চামর থাকতো। মূল বাদে গানের দলে ছিল পাইল ৬ জন, বাইন ২ জন, দোয়ারী একজন এবং ছোকরা ৪টি। মূল পদধুয়া শুরু হওয়ার আগে বন্দনা গান গাওয়া হত। সোনাই যাত্রায় সন্ন্যাস কীর্তন করা হোত আর কমলাযাত্রা চাঁদসদাগরের বৃত্তান্ত নিয়ে পালাগান।

পালাগান সম্পর্কে এই আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে যদি বিভিন্ন পালাগানের গায়কদের মানস-গঠন সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত সংবাদ লিপিবদ্ধ করা না হয়। সঙ্গীত-শিল্পী হিসেবে এ অঞ্চলে অনেকেই পূর্বে এবং বর্তমানে যথেষ্ট খ্যাতি এবং জনপ্রিয়তা অর্জন করলেও বাংলার সঙ্গীত-সমাজে এদের আসন নেই, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নেই প্রতিভার প্রচার। অবশ্য গায়ক হিসেবে প্রসিদ্ধির পরিচয়পত্র পাবার জন্য এঁরা খুব একটা ব্যস্ত নন। কারণ সঙ্গীত পরিবেশনা এদের জীবিকা নয়, এটা শুধুই শিল্পের প্রতি শ্রদ্ধা—নিজস্ব সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ। ওঁরা গানের ভাষায় সে কথা বলেন :

গান গান করিয়া সর্বনাশ,
তেঁও না মিটিল মোর মনের হাউস,
কোন কুলেতে জন্ম লইয়া
আমি হইলাম গাওয়াইয়া,
হায়রে আমার পাগল মন ফাকিনার
না পায় এই গানের মায়া।

এই গানের প্রতি 'মায়া' উত্তরের পল্লী বাংলার খেটে-খাওয়া মানুষকে শিল্প-সৃষ্টির অনুপ্রেরণা দিয়েছে। অনশন, অনাদর, অবহেলাকে তুচ্ছ করে ওরা নিজেদের সর্বনাশ করেও মনের আশ মিটিয়ে শিল্পের সেবা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে করেছেন। এই সাধনার স্বীকৃতি হিসেবে কোন সম্পদ লাভ করেন নি ওঁরা, বরং দিয়েছেন—লোক-সংস্কৃতির সমৃদ্ধির জন্য।

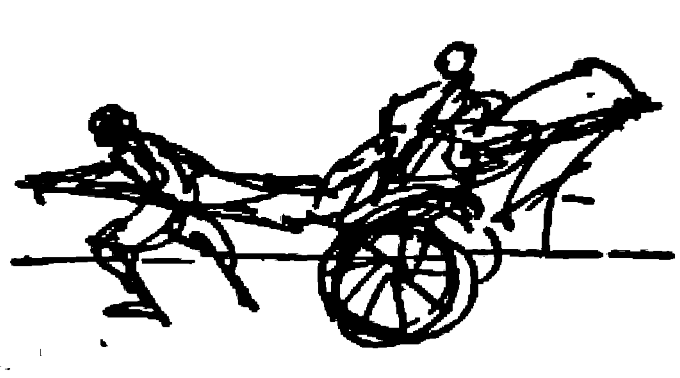

CENTRAL LIBRARY

তোমাকে

নিমাই ভট্টাচার্য

(পাঁচ)

আমরা আবার ড্রইংরুমে ঢুকতে না ঢুকতেই মিসেস রায় বললেন, তোমরা আর এখানে বসো না। খেতে খেতেই গল্প করা যাবে।

মিঃ রায় সঙ্গে সঙ্গে আমার দিকে লক্ষ্য করে বললেন, চলুন, খেতে খেতেই গল্প হবে।

'চলুন'।

ড্রইংরুমের পাশেই ডাইনিং রুম। টেবিল সাজানই ছিল। আমি আর মিঃ রায় বসলাম। মিসেস রায় ভিতরে গেলেন কয়েক মিনিটের জন্য। চাকর খাবার-দাবার আনতেই মিসেস রায় সার্ভ করা সুরু করলেন।

আমি বললাম, ডকটর সরকারকে দেখে ভারী ইন্টারেস্টিং লোক মনে হলো।

মিসেস রায় সার্ভ করতে করতেই বললেন, দাদার মত মানুষ সত্যি বিরল।

মিঃ রায় বললেন, শুধু ডকটর সরকারই নয়, বৌদিও অত্যন্ত ভাল মানুষ। দীর্ঘদিন এখানে আছি কিন্তু এমন মানুষ আর পাইনি।

সুপ খেতে খেতে শুনলাম, ডকটর সরকার একজন যশস্বী ভূতত্ত্ববিদ। কলকাতা ইউনিভার্সিটির ডি এস-সি ছাড়াও বার্লিনের ডক্টরেট। বার্লিনের ডকটরেট পেতে পেতেই হিটলার আত্মজ্ঞানশূন্য হয়ে জুলিয়াস সীজার বা আলেকজাণ্ডারের মত বিশ্ব জয়ের নেশায় মেতে উঠেছিলেন। ডকটর সরকার চলে এলেন লণ্ডনে।

চাকরটা সুপ প্লেট তুলে নেবার সঙ্গে সঙ্গে মিঃ রায় বললেন, ইণ্ডিয়ার একটা প্যাসেজ পাবার জন্য পাঁচ মাস লণ্ডনে ছিলেন। ক্যামডেন টাউনে থাকতেন আর রোজ পিকাডিলি সার্কাসে পি অ্যাণ্ড ও'র দপ্তরে গিয়ে ধর্ণা দিতেন...

'কেন?'

দু'হাত নেড়ে মিঃ রায় একটু উত্তেজিত হয়েই বললেন, জাহাজ কোথায়? প্যাসেঞ্জার লাইনারগুলোকে নিয়ে তখনই যুদ্ধের তোড়-জোড়ে লাগান শুরু হয়ে গেছে।

নতুন ফুল প্লেট এলো, পাশে একটা হাফ প্লেট। ফুল প্লেটে দু'চামচ সুপার ফাইন ডেরাডুন রাইস দিতে দিতে মিসেস রায় বললেন, দাদা এই পাঁচ মাসে ক্যামডেন টাউন-পিকাডিলি সার্কাস ছাড়া লণ্ডনের আর কিছু দেখেননি।

আমার মুখ দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে গেল, সত্যি?

আমার হাফ প্লেটে ফিস ফ্রাই তুলে দিতে দিতে মিঃ রায় বললেন, রিয়েলী সো।

ছোলার ডাল দেওয়া-নেওয়া শেষ করে মিসেস রায় মন্তব্য করলেন, দাদা ঐ ধরণেরই লোক! যখন যা মাথায় ঢুকবে তখন তাই নিয়েই পাগল।

ছোলার ডাল-ফিস ফ্রাই খেতে খেতেই জানতে পারলাম, ডকটর সরকার এখনও কাজ-পাগল। একবার ল্যাবরেটরীতে ঢুকলে ঠিক নেই কখন বেরুবেন। কেন বাড়ীতে? কিন্তু সায়েন্টিস্টদের রিপোর্টের বাণ্ডিল নিয়ে পড়তে বসলেই হলো! বাড়ীতে লোক-জনই আসুক আর অন্য কোন কাজই থাক ওকে স্টাডি থেকে বের করা অসম্ভব।

চিংড়ির মালাইকারী খাবার সময় মিসেস রায় শোনালেন, সিনেমার টিকিট আর ডিনারের নেমন্তন্ন স্পয়েল করতে দাদার জুড়ি পাওয়া দায়।

'তাই নাকি?'

'তবে কি? আমি তো কোনদিন দাদাকে খেতে বলি না—কারণ ওর আসার কি কোন ঠিক আছে? কিছু ভালমন্দ রান্না হলে টিফিন কেরিয়ারে ভরে পাঠিয়ে দিই।'

মিসেস রায়ের কথা শুনে হাসলাম কিন্তু পোলাও আর চিকেনকারী দিতে আসার সঙ্গে সঙ্গে আমার মুখের হাসি উড়ে গেল। 'আজ আর সম্ভব নয় বরং কাল দুপুরে......

মিসেস রায় হাসতে হাসতে বললেন, কাল দুপুরের চিন্তা কালকেই করা যাবে। এখন তো একটু নিন।

সংসারে আর কোন বাচ্চাকাচ্চা না থাকায় মাগো আমাকে ভালমন্দ খাওয়াতে কোনদিন ত্রুটি করেনি। মামা একদিন মাছ না আনলে মাগো কি ভীষণ বকাবকি করত, আচ্ছা তুমি কি বলতো?

মামা বলতেন, কেন?

'জান ছেলেটা একটু মাছ না হলে খেতে পারে না অথচ তুমি......

আমি আমার ঘরে বসে বসেই মামার কথা শুনতাম, আজ তেমন পছন্দমত মাছই দেখলাম না।

আমি পড়াশুনা বন্ধ করে এসব কথা শুনতে শুনতে হাসতাম। মাছ ছাড়া আমি ঠিকই খেতে পারতাম কিন্তু মাগো শান্তি পেত না। তাইতো মামাকে শেষে বলতে হতো, একেলা ডিম-টিম দিয়ে চালিয়ে দাও, ওবেলায় বরং মাছ এনে দেব।

বিকেলবেলা অফিসের পরে মামা বরাক নদীর পাড়ে জেলেদের আড্ডায় গিয়ে মাছ কিনেই বাড়ী ফিরতেন। শুধু মাছই নয়, মাগো আরো কত কি খাওয়াতো। তাছাড়া মাগো কত কি রাঁধতে পারত! ভাবলেও অবাক লাগে। আমি মাঝে মাঝেই রান্না ঘরে গিয়ে মাগোর সঙ্গে গল্প করতাম। রান্না করা দেখতাম।

পাবদে মাছগুলোকে নুন-হলুদ মাখিয়ে এক পাশে সরিয়ে রেখেছে দেখে আমি জিজ্ঞাসা করতাম, মাগো, মাছ কি ওবেলার?

মাগো অন্য কাজ করতে করতেই উত্তর দিত, না, না, ওবেলার কেন হবে?

'তবে যে নুন-হলুদ মাখিয়ে সরিয়ে রেখেছ?'

'নুন-হলুদ না বসলে মাছের পাতুরী ভাল হয় না।'

আমি অবাক হয়ে বলতাম, সে আবার কি?

মাগো হাসতে হাসতে বলতো, দ্যাখ না কি করে হয়।

আমি সত্যি চুপ করে বসে বসে দেখতাম, মাগো মাছগুলোকে অল্প ভেজে তুলে রাখল। তারপর দেখলাম ঐ অল্প অল্প তেলের মধ্যে পেঁয়াজ-লঙ্কা-হলুদ বাটা আর নুন ভেজে নিয়ে বেশ ঘন সরষে বাটার জল কড়ার মধ্যে ঢেলে দিল। একটু পরেই এসব টগবগ করে ফুটতে সুরু করলেই আমি আবার জিজ্ঞাসা করতাম, মাছ দেবে না?

'ঝোলটা একটু শুকিয়ে গেলেই দেব।'

ঝোল শুকিয়ে গেলে মাছ আর কয়েকটা কাঁচা লঙ্কা ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার একটু জল দিত মাগো।

'ঝোল শুকিয়ে যাবার পরে আবার জল দিলে কেন?'

কড়াটা ঢেকে দিতে দিতে মাগো জবাব দিত, মাছগুলো সিদ্ধ হবে তো!

আমি আবার পাল্টা প্রশ্ন করতাম, তা আগে দিলে না কেন?

'তাতে ঠিক টেস্ট হয় না।'

অল্প অল্প ঝোল থাকতে থাকতে কড়া নামিয়ে মাগো বলত, খেয়ে দেখবি নাকি কেমন হয়েছে?

মাগো এইভাবে আমাকে খাওয়া-দাওয়া করাতে সত্যি তবে কোনদিনই বেশী খেতে পারি না। মিসেস রায়কে তাই বার বার অনুরোধ করলাম, কিন্তু শেষে দু' টুকরো চিকেন নিতেই হলো।

হাত-মুখ ধুয়ে ড্রইংরুমে আসার পর হাতে এলো এক প্লেট পুডিং।

শেষ পুডিংটুকু মুখে দেবার পর মিঃ রায় বললেন, আমার তো ভয় হয় ডক্টর সরকারের সঙ্গে আলাপ হবার পর আপনি হয়ত আমাদেরই ভুলে যাবেন।

আমি পুডিং'এর প্লেট সেন্টার টেবিলে নামিয়ে রাখতে রাখতে বললাম, আপনাদের ভুলে গেলেও এমন সুন্দর পুডিং খাবার স্মৃতি তো ভুলতে পারব না।

মিঃ আর মিসেস রায় হাসলেন।

কফি খাবার পরও বেশ খানিকক্ষণ গল্প-গুজব করা হলো। গল্প-গল্পে অনেক রাত হয়েছিল। আমি উঠে পড়লাম। বিদায় নেবার মুখে মিসেস রায় বললেন, কাল দুপুরে খেতে আসতে ভুলে যাবেন না।

আমি ঠাট্টা করে যে কথা বলেছিলাম সে-কথা উনি এখনও মনে করে আছেন দেখে একটু অবাক হলাম। শুধু সৌজন্য বা ভদ্রতার জন্য এসব ঠাট্টা মনে রাখতে হয় না।

মিসেস রায়ের আন্তরিকতায় খুশী হলাম, হাসলাম। বললাম, ব্যাঙ্কে কিছু জমা দেবার আগেই পর পর কয়েকটা চেক কাটলাম। কিন্তু জমা না দিয়ে আর চেক কাটা কি ঠিক হবে?

'আপনার নাম করে যা তুলে রেখেছি, সেসব আর কে খাবে?'

কথাটা শুনেই যেন ইলেকট্রিক শক খেলাম। এমন কথা তো মাগো বলত! আমি বেশী কথা বলতে পারলাম না। বললাম, আসব।

নিউ ফরেস্টের সেই শান্ত, নির্জন, প্রায়ান্ধকার রাস্তা দিয়ে গেস্ট হাউসে আসার পথে আমি আবার আমার মুখোমুখি হলাম। আমি হাঁটছি। পিচের রাস্তার 'পর দিয়ে হাঁটছি। পাশেই শাল-পাইনের বন। স্থিত-প্রজ্ঞ সন্ন্যাসীর মত ওরা অবিচল অপলক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওদের পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কখন যে দাঁড়িয়ে পড়েছি, আমার চলা থেমে গেছে, আমি নিজেই টের পাইনি। শাল-পাইনের বন দেখছিলাম। অবাক হয়ে দেখছিলাম। মুগ্ধ হয়ে দেখছিলাম। গ্রীষ্ম-বর্ষা-শরৎ-হেমন্ত-শীত-বসন্তে একইভাবে মাটির নীচের পাতাল থেকে রস গ্রহণ করে আকাশের কোলে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। এই পৃথিবীর অজ্ঞাত অদৃশ্য দুনিয়া থেকে আমিও কেন চলার পথের রসদ সংগ্রহ করছি না? কেন মুক্ত আকাশের কোলে মাথা উঁচু করে দাঁড়াচ্ছি না?

আবার হাঁটতে শুরু করলাম। একটা সিগারেট ধরালাম। সিগারেট টানতে টানতেই ভাবছিলাম নানা কথা। এই ডেরাডুন, এই নিউ ফরেস্ট আসার আগে তো মিঃ ও মিসেস রায়ের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল না। ভাবতে পারিনি এদের মত দরদী মানুষের সাক্ষাৎ পাব। আচ্ছা আমি যদি ডক্টর সরকারের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠতা করি? নিশ্চয়ই আর একটা দরদী মানুষকে কাছে পাব। এই পৃথিবীতে কখনও অনেক কিছু পেয়েছি, কখনও সব কিছু হারিয়েছি। তা হোক। এ তো জগতের নিয়ম। কিন্তু এই মুহূর্তে আমার ভীষণ ইচ্ছা করছে আরো অনেকে আমাকে ভালবাসুক, আমিও অনেককে ভালবাসি

সিগারেটটা এখনও টানছি। হঠাৎ বখ্শ পাঠান দোকানদারের কথা মনে হলো। সামান্য সিগারেট কিনতে গিয়ে একজন অপরিচিত দোকানদারের সঙ্গে এত খাতির ভালবাসা হবার সম্ভাবনা খুবই কম। তবু হলো। শুধু হলো মানে? দিনে দিনে আমাদের সম্পর্ক নিশ্চয়ই আরো মধুর হবে। তাই না?

মাগো বলত, এক একটা মৌসুম আসে। এক মৌসুমে নদীর জল বাড়ে, এক মৌসুমে কমে। এক সময় আম হয়, এক সময় জাম হয়। এ নিয়ম চলছে, চলবে। কেন ভালবাসা বা দরদী মানুষ হবারও মৌসুম আছে? তবে মৌসুমেও হয় তবে কম, অনেক কম। এখন কি আমার ভালবাসা পাবার মৌসুম এসেছে?

গেস্ট হাউসে ফিরে এসেও অনেকক্ষণ ভাবলাম। অনেক কিছু ভাবলাম। ভাবলাম? না, না, ভাবলাম কোথায়? কিছু পাবার নেশায় মশগুল হয়ে বসে রইলাম।

শুতে শুতে অনেক রাত হলো। সকালবেলা ঘুম ভাঙলো অনেক দেরীতে। বেয়ারার ডাকাডাকিতে। মুখে বিরক্তি প্রকাশ করলাম না। চা রেখে গেল, আমিও মুখ বুজে খেয়ে নিলাম কিন্তু মনে মনে ভীষণ রাগ হলো, বিরক্তি হলো। ঘুম থেকে উঠেই কি এই গাড়োয়ালী বেয়ারার মুখ দেখতে ইচ্ছে করে?

ব্রেক ফাস্ট খেয়েই বেরিয়ে পড়লাম। খানিকটা বিরক্ত হয়েই বেরিয়ে পড়লাম। কিছুটা উদ্দেশ্যহীনও বটে। চাক্রাতা রোডের পর এফ-আর-আই'এর মেন গেটের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই একটা সিগারেট খেলাম। একবার ভাবলাম, বখ্শ পাঠানের কাছে যাই। আবার ভাবলাম, না, না, রোজ রোজ ওর কাছে যাব কেন? গেলাম না। শহরের দিকেই এগুতে শুরু করলাম।

হাঁটতে হাঁটতে ক্লক টাওয়ারের কাছে পল্টন বাজারে এসে গেলাম। সামনেই থানা পোস্টাফিস, দোকান-বাজার, স্কুটার-ট্যাক্সি স্ট্যান্ড। আরো কত কি! ট্রাফিক পুলিশের মত প্রায় রাস্তার মাঝখানেই দাঁড়িয়ে রইলাম। হাঁ করে চার দিক দেখছি। সব কিছু দেখছি। শুধু শুধুই দেখছি। লোকজন দেখতে ভালই লাগছে। ওরা ঘুরছে-ফিরছে কেনা-কাটা করছে। কেউ তাড়াতাড়ি হাঁটছে, কেউ আস্তে আস্তে। কেউ একা, কেউ বা অন্য কারুর সঙ্গে। স্বামী-স্ত্রী, ভাই-বন্ধুর সঙ্গে। কেউ হাসছে, কেউ ভাবছে। কেউ সুন্দর, কেউ কুৎসিৎ। কেউ ধনী, কেউ গরীব। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এদের সবাইকে দেখছি। মুগ্ধ হয়েই দেখছি।

একটা অটো-রিক্সা আমাকে প্রায় ধাক্কা দিয়েছিল আর কি। আমি তাড়াতাড়ি পিছিয়ে গেলাম—রাস্তার ধারে গাছের গোড়ায় পান-সিগারেটের দোকানের পাশে আমি এবার একটা সিগারেট ধরিয়ে চারপাশের মানুষ দেখছি আর ভাবছি। ভাবছি, বাহ্যিক দিক থেকে দুটি মানুষের মিল দেখছি না কিন্তু এরা সবাই যেন কোন এক যাদু মন্ত্রের ইঙ্গিতে পরিচালিত হচ্ছে।

সিগারেট টানছি, দেখছি আর ভাবছি।

না, না, যাদুমন্ত্র কেন হবে? মনে হচ্ছে আমার চারপাশের সমস্ত মানুষ যেন একটা কোরাস গান গাইছে। এক সুরে, এক ভাষা। জীবন সঙ্গীত। আমি শুনতে পাচ্ছি না কিন্তু বেশ বুঝতে পারছি এরা সবাই এক অদৃশ্য সঙ্গীত পরিচালকের নির্দেশে জীবন-সঙ্গীত গাইছে। তাইতো এদের মধ্যে একটা বেশ সুন্দর মিল দেখতে পাচ্ছি। সবার মধ্যে। এই ট্রাফিক পুলিশ, ঐ দোকানদার, ঐ আর্মি অফিসার আর স্ত্রী। সবাই। জীবনের তাগিদে, বাঁচার আনন্দে এরা সবাই মত্ত। হয়ত প্রমত্ত কেউ কেউ। এদের মধ্যে কেউ ভাল, কেউ মন্দ। তা হোক। এরা কেউ হারছে, কেউ জিতছে। কেউ বিয়ে করার নেশায় ছুটছে, কেউ সদ্য বিবাহিতা স্ত্রীকে নিয়ে আরো সম্ভোগের স্বপ্ন দেখছে। কেউ হয়ত রুগ্না মৃত্যুপথযাত্রী স্ত্রীকে বাঁচিয়ে তোলার জন্য ছুটোছুটি করছে। আবার কেউ বা বাবা-মা, হাসিখুশীভরা

রসুই
গুঁড়া মশলা
ফোন : ৩৪-২৪৪১, ৩৩-১৪৭১
রসুই প্রোডাক্টস্
১৭ আর জি কর রোড, কলিকাতা-৪ ॥ ২৩১ মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা-৭

প্রাণপ্রিয় সন্তানদের জন্য পল্টন বাজারে এসেছে।

সিগরেটটা শেষ করে ফেলে দিলাম।

কিন্তু আমি এখানে কি করছি? কার জন্য, কি কারণে এসেছি এই পল্টন বাজারের মোড়ে? ওরা যে খোশমেজাজে গান গাইছে, আমি তা গাইতে পারছি না কেন? আমার জীবনের কোন রাগিণী নেই কেন? গরু মাঠে যায়, ঘাস খায়, নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে কিন্তু ওরাও তো বাছুরকে দুধ খাওয়ায়। আমি? আমি কি তার চাইতেও অধম?

আর দাঁড়িয়ে থাকলাম না। রাজপুর রোডের দিকে গেলাম না। ওদিকটা একটু ফাঁকা। পল্টন বাজারের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। আমি একা। তবু আমার পাশ দিয়ে আরো কত মানুষ যাতায়াত করছে, আমাকে ধাক্কা দিচ্ছে। বেশ লাগছে। ওদের গন্ধ-স্পর্শ আমার ভীষণ ভাল লাগছে।

হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লাম। এই বাজারের মধ্যে অমন সুন্দর স্বামী-স্ত্রী ঝগড়া করছে? বিশ্রী লাগল। একটু কান পেতে শুনলাম ওদের ঝগড়া। স্ত্রী বলছে, আমার জুতো কেনার দরকার নেই। তুমি বরং সার্টটা কিনে নাও। স্বামী প্রতিবাদ করছে। বলছে, আর সার্ট কি হবে? তুমি জুতোটা কিনে নাও, হঠাৎ কোনদিন ছিঁড়ে যাবে। আমি আর দাঁড়ালাম না। এগিয়ে চললাম। মনটা একটা বিচিত্র পরিতৃপ্তিতে ভরে গেল। জানি না জুতো কেনা হলো, নাকি সার্ট কেনা হলো। কিন্তু এইটুকু বেশ বুঝলাম, নিজে উপভোগ করার চাইতে প্রিয়জনকে দেবার আনন্দ অনেক বেশী। আমি কি এই আনন্দ, এই তৃপ্তি কোনদিন পাব না?

আর একটা সিগরেট ধরাতে গিয়েই হাতের ঘড়িতে নজর পড়ল। একটা বাজে। এফ-আর-আই'এর লাঞ্চের ছুটি হয়ে গেছে। মিঃ রায় নিশ্চয়ই আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। পল্টন বাজারের সরু গলি দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে অনেক ভিতরে এসে গেছি।

ক্লক টাওয়ারের কাছে ফিরে আসতে বেশ সময় লাগল। তাড়াতাড়ি একটা অটো-রিক্সা নিয়ে রওনা হলাম। গেস্ট হাউসে গিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে মিঃ রায়ের বাংলোয় হাজির হতে হতে পৌনে দুটো বাজল। গাড়ী দেখতে না পেয়েই বুঝলাম, মিঃ রায় আবার অফিস গিয়েছেন।

মিসেস রায় সামনের বারান্দায় একটা বেতের চেয়ারে বসে বাংলা খবরের কাগজ পড়ছিলেন। আমাকে দেখেই খবরের কাগজ পড়া বন্ধ করে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, আসুন, আসুন।

'আমার জন্য বসে আছেন তো?'

'তাতে কি হলো? আমি কি এর আগে খাই?' হাসি হাসি মুখেই মিসেস রায় বললেন।

এই বাড়ীতে দিনের বেলা আগে আসিনি। এই প্রথম। দিনের বেলায় মিসেস রায়কেও এই প্রথম দেখছি। সন্ধ্যাবেলায় সব মেয়েরাই একটু-আধটু সাজগোজ করে, প্রসাধন চর্চা করে। মিসেস রায়ও করেন। ভালই লেগেছে দেখতে। এখন একটা সাধারণ চিকনের ব্লাউজ আর শান্তিপুরী তাঁতের শাড়ী পরেছেন। চুল এলো, খোঁপা বাঁধতে পারেন নি। কপালের উপর সিঁদুরের টিপটা জ্বল জ্বল করছে। আমি একবার দেখলাম। মুগ্ধ হয়ে দেখলাম।

বললাম, উঠলেন কেন? বসুন।

'উঠব না? আপনার তো নিশ্চয়ই খুব খিদে পেয়েছে।'

'এমন কিছু খিদে পায়নি।'

মিসেস রায় বসলেন। আমি একটু দূরে একটা চেয়ার টেনে বসলাম।

'অত দূরে বসলেন কেন? এদিকে এগিয়ে আসুন।'

আমি চেয়ারটা একটু কাছে টেনে নিতে নিতে ভাবলাম, আমি তো আরো কাছে আসতে চাই, চাই ভক্তি করতে, ভালবাসতে, ভালবাসা পেতে। আমি ভদ্রতা-সৌজন্য রক্ষা করে আপনাদের কাছে আসছি, হাসছি, গল্প করছি। কিন্তু মনে মনে কাঁদছি। হাউ হাউ করে কাঁদছি। সারা পৃথিবীর সবার সঙ্গে শুধু ভদ্রতা-সৌজন্যের সম্পর্ক নিয়ে কি কেউ বাঁচতে পারে? সুখী হতে পারে?

আমি মাথা নীচু করে বসেছি।

'কি ভাবছেন?'

আমি তাড়াতাড়ি একবার মুখ তুলে বললাম, কই, কিছু তো ভাবছি না।

মিসেস রায় বোধহয় আমার দিকে তাকিয়েছিলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, কিন্তু আপনাকে দেখলেই মনে হয় আপনি সব সময় কি যেন ভাবছেন।

কি আশ্চর্য? কি করে ইনি জানলেন? আমি তো কখনও বলি না, আমি ভাবছি, আকাশ-পাতাল ভাবছি। ভাবছি আমার শূন্যতার কথা, তুলনা করছি আশপাশের মানুষের সঙ্গে। প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে।

'কি করে বুঝলেন?'

'যুক্তি-তর্ক দিয়ে বোঝাতে পারব না, তবে আপনার চোখ দুটো আর কপালের রেখাগুলো লক্ষ্য করলে মনে হয় আপনি সব সময় কি যেন ভাবছেন।'

আমি সোজাসুজি উত্তর না দিয়ে বললাম, আমি তো বুঝতে পারিনি আপনি এত ভালভাবে আমাকে লক্ষ্য করেছেন।

তখন আর কিছু বলেননি তবে খেতে খেতে উনি বলেছিলেন, একা একা থাকলে অনেক রকমের চিন্তা-ভাবনা মাথায় আসা স্বাভাবিক। তবে অত ভাববেন না। যখন যা পাবেন, তখন তাই প্রসন্ন মনে দিয়ে গ্রহণ করবেন।

আমি চুপ করে শুনছিলাম। একটু পরে মিসেস রায় আবার বলেছিলেন, জীবনে যত বেশী বিচার করবেন, তত বেশী দুঃখ পাবেন। জীবনকে একটু সহজ-ভাবে নিলেই দুঃখ কম পাবেন।

সত্যিই তাই। জীবনের প্রতি পদক্ষেপে বিচার-বিবেচনা করতে গেলেই দুঃখ বেশী পেতে হয়। মামা কদাচিৎ কখনও মাগোর পর রাগ হলে বড় বেশী চেঁচামেচি করতেন। মাগো একটি শব্দ উচ্চারণ করত না। আমি মাগোর কাছে গিয়ে ফিস ফিস করে বলতাম, মামা শুধু শুধুই তোমাকে বকলেন। তুমি কিছু বল না কেন?

মাগো বলত, বলে কি লাভ? আমি বলব ও দোষী, ও বলবে আমি দোষী। এই বিচার-টিচার করে লাভ কি বল?

আমি হেসে বললাম, আপনি আমার মাগোর মত কথাবার্তা বলেন।

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'ভালই তো।'

অনেক বেলা হয়ে গিয়েছিল। আমি আর দেরী করলাম না। যাবার সময় উনি বললেন, দাদার ওখানে সন্ধ্যা লাগতে লাগতেই যাবেন।

'যাব।'

'আর হ্যাঁ, রাত্রে ওখানেই খাবেন।'

'প্রথম দিন গিয়েই খাব?'

'তাতে কি? দাদার কাছে লজ্জা করার কিছু নেই।'

আমি আর কথা না বলে আস্তে আস্তে গেস্ট হাউসের দিকে রওনা হলাম। অনেক দূর এসে একবার পিছন ফিরে দেখি, মিসেস রায় তখনও আমার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

(ক্রমশঃ)

সারদা-রামকৃষ্ণ

—সন্ন্যাসিনী দুর্গামাতা রচিত—

দৈনিক বসুমতী—এইরূপ বৃহদাকারে রচিত জীবনকথা এই প্রথম প্রকাশিত হল। লেখিকা দেখিয়েছেন যে......তাঁরা অভিন্ন ও একাত্মা।

যুগান্তর—সর্বাঙ্গসুন্দর জীবনচরিত।......গ্রন্থখানি সর্বপ্রকারে উৎকৃষ্ট হইয়াছে॥

বহুচিত্রশোভিত সপ্তম মুদ্রণ—৮,

গৌরীমা

আনন্দবাজার পত্রিকা—বাঙালী যে আজিও মরিয়া যায় নাই, বাঙালীর মেয়ে শ্রীগৌরী মা তাহার জীবন্ত উদাহরণ। ইঁহারা জাতির ভাগ্যে শতাব্দীর ইতিহাসে আবির্ভূতা হন॥

বহুচিত্রশোভিত পঞ্চম মুদ্রণ—৫,

শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম

২৬, গৌরীমাতা সরণী, কলিকাতা-৪

CENTRAL LIBRARY

মনের কথা

অহিফেন সেবীর মন
বিষ্ণুচরণ ও চন্দ্রকান্ত

ইংরেজি ও বাংলা সাহিত্যের পাঠকমাত্রেই অহিফেনসেবীর মনের কথার সঙ্গে অল্পাধিক পরিচিত। ডি কুইন্সী তাঁর কনফেশনস অব এ্যান ইংলিশ ওপিয়ম ইটার-এর ছত্রে-ছত্রে স্বপ্নের মধ্য দিয়ে নিজের মনকে কাছে মেলে ধরেছেন আর বঙ্কিমচন্দ্র কমলাকান্তের জবানীতে 'আফিং চড়াইয়া' তৎকালীন সমাজের অন্যায় সমালোচনা করেছেন। দুইজনেই গুণী সাহিত্যিক হিসেবে পরিচিত। ডি কুইন্সী সত্যিই অহিফেনাসক্ত ছিলেন আর বঙ্কিমের অহিফেন আসক্তি কল্পনিক। এর ফলে ডি কুইন্সীর লেখার দুর্বলতা কমলাকান্তের দপ্তরে নেই। ডি কুইন্সীর লেখায় অনেক জায়গাই 'টর্জিড অ্যান্ড আনরিয়্যাল', আবার জায়গায়-জায়গায় চমক লাগায়। সমালোচকের মতে,—'হি রোট এ লার্জ অ্যামাউন্ট অব প্রোজ; মোস্ট অব ইট ইজ হ্যাক-ওয়ার্ক, এ ফেয়ার প্রোপোর্শন ইজ অব পুওর কোয়ালিটি, অ্যান্ড এ স্মল অ্যামাউন্ট ইজ অব দি হাইয়েস্ট মেরিট।' কমলাকান্তের প্রতিটি ছত্র বুদ্ধি-দীপ্ত, কালজয় ও সামঞ্জস্যপূর্ণ; বাংলা কেন বিশ্বসাহিত্যের ভাণ্ডারে রক্ষিত মহামূল্য মণি-মাণিক্যের মধ্যে স্থান পাবার যোগ্য। ডি কুইন্সীর বই পড়লেই মনে হবে ভদ্রলোক লেখার সময়ে বোধ হয় প্রকৃতিস্থ ছিলেন না। নীরস বর্ণনা ভারাক্রান্ত লেখার মাঝে-মাঝে কৌশলহীন কষ্টাপচা হিউমারের চমক দেবার চেষ্টা অনেক প্রসঙ্গের অবতারণার মধ্যে তাঁর পাণ্ডিত্য বিধৃত, কিন্তু অনেক জায়গাতেই অক্ষরের মধ্যে ভুলভ্রান্তির ছড়াছড়ি। কিন্তু কুইন্সী যখন মাঝে-মাঝে ভাবাবেগে অনুপ্রাণিত, তখন লেখার মধ্যে অপূর্ব শক্তি ও সৌন্দর্যের সমাবেশ, ইংরেজি সাহিত্যে যা দুর্লভ। কমলাকান্তের দপ্তরে এই জোয়ার-ভাঁটা নজরে পড়ে না। ডি কুইন্সীও বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যক্তিগত জীবনের খুঁটিনাটি না জেনেও অনায়াসে দুই লেখার এই পার্থক্য থেকে অনুমান করা চলে যে, লেখার সময় একজনের লেখনী সব সময়ে স্ববশে থাকতো না, আর অপরের লেখনী তাঁর শাণিত মার্জিত বুদ্ধিবোধ দ্বারা সব সময়েই পরিচালিত। ডি কুইন্সীর 'কনফেশনস' তাঁর অহিফেনসেবী মানসিকতার পরিচায়ক।

নিয়মিত আফিম খেলে ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন ঘটে। অনেকের মতে আফিমের নেশায় মনের জোরের মতই ক্রমশ কর্মক্ষমতার ও দক্ষতার অবনতি ঘটে। বিচারশক্তি ও বুদ্ধিবোধ কমতে থাকে, জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা থাকে না, কোনো কিছু গড়ে তোলার ইচ্ছা হ্রাস পায়। কাজ করার ক্ষমতা ক্রমশ কমতে কমতে এমন অবস্থায় আসে যে, খাওয়া-দাওয়ার অতিপ্রয়োজনীয় দৈহিক ব্যাপারেও উৎসাহের অভাব ঘটে। অবশ্য জারক রসের কমতির জন্যেও অগ্নিমান্দ্য দেখা দিতে পারে। নৈতিক অবনতির জন্যে সামাজিক প্রতিষ্ঠা চলে যায়। যেন-তেন-প্রকারেণ ঠিক সময়টিতে আফিম সংগ্রহ হয়ে দাঁড়ায় আফিংখোরের একমাত্র কাজ। তার চিন্তা-ভাবনা শুধু ঐ একই বৃত্তে ঘুরতে থাকে। এত দূর চারিত্রিক অধঃপতন ঘটে যে, নেশার বস্তুটি সংগ্রহের জন্যে চুরি-জোচ্চুরি, কিছুই আর আটকায় না। নিজের নেশার জোগান নিয়মিত করার আশায় এরা নিজের অন্তরঙ্গ বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়, পরিজনকে নেশা করতে শেখায়। এই রকম একজনের সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি।

বিষ্ণুচরণকে এখন দেখলে বোঝাই যাবে না যে এককালে তিনি একজন ডাকসাইটে খেলোয়াড় ছিলেন। ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, তিন বিভাগেই দক্ষতা ছিল। 'এ' ডিভিশনের কোন একটা ক্লাবের হয়ে খেলে কুড়ি বছর আগে নাম করেছিলেন। এছাড়া রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ নিয়েছেন, বক্তৃতা করেছেন, জেল খেটেছেন; কাউন্সিলার নির্বাচিত হয়েছেন। এক কথায় 'চৌকশ' ছেলে ছিলেন, এই বিষ্ণুচরণ। দশ বছর আগে পায়ের একটা হাড় ভেঙে যায়। তখন তিনি এক ছোট্ট মফস্বল শহরের স্কুলমাস্টার। প্ল্যাস্টার দুবার কাটতে হয়েছিল; ঠিকমত হাড়ের মুখ দুটো সেট হয় নি। প্রায় ছ' মাস শয্যাশায়ী থাকতে হয়েছিল। ক্রমে 'বেডসোর' ও পেটের গোলমাল দেখা দিল। স্থানীয় চিকিৎসকের উপর বিশ্বাস হারিয়ে এক হাতুড়ে ডাক্তারের শরণাপন্ন হলেন। তিনি বেদনা দূর করার ও ঘুম আনার জন্যে আফিম খাবার পরামর্শ দেন। সেই থেকে আফিমের অভ্যাস। মাত্রা বেড়ে প্রায় চার গুণ হয়েছে। তবুও ঠিক মত কাজ হচ্ছে না। এখন কোলকাতার কাছাকাছি এক স্কুলের সঙ্গে যুক্ত। মাস ছয়েক হল নিয়মিত স্কুল বসছে না। মাস্টাররা পুরো মাইনে পাচ্ছেন না। আর্থিক অনটন চলেছে। দাদা দিল্লী থেকে কিছু-কিছু পাঠান তাই সংসার চলে। স্ত্রী ও সতেরো বছরের একটি ছেলে নিয়ে সংসার। স্ত্রী একটা প্রাইমারী স্কুলে চাকরী করেন। খুব হিসেবী বলে কোনমতে জোড়াতালি দিয়ে চালিয়ে যাচ্ছিলেন। স্বামীর দৈনিক বরাদ্দের উপর এতদিন হস্তক্ষেপ করেন নি। আফিম ও দুধ মিলে খরচ প্রায় এক টাকা। গত কয়েক মাস ধরে স্বামীর মত নিয়েই এই খরচটা কিছু কমিয়েছিলেন। কয়েক সপ্তাহ ধরে তিনি টের পেয়েছেন যে ছেলে রেশন ও বাজার থেকে পয়সা চুরি করছে। মনে দুঃখ আঘাত পেলেও ছেলের কাছে সেকথা প্রকাশ করেন নি। বিড়ি-সিগারেট খায় না, সিনেমার নেশাও তেমন নেই, তবে পয়সা সরায় কেন? স্বামীকে বিশ্বাস করেন না বলেই ছেলেকে দিয়েই গেল কয়েক বছর ধরে বাজার-হাট করাচ্ছেন, এখন ছেলের উপরও আর বিশ্বাস রাখতে পারছেন না। মাস দুয়েক ধরে স্বামী খাট থেকে আর উঠছেন না। স্কুল বাড়ী ভস্মীভূত। স্বামী-পুত্র দুজনেরই স্কুলে যেতে হয় না। তাহলে দিন-রাত শুয়ে থাকলে চলবে কেন? ছেলেটাও কেমন যেন শুকিয়ে যাচ্ছে, চোখের কোণে কালি পড়েছে, বুকের হাড় বেরিয়ে গেছে। খাওয়া-দাওয়ায় রুচি নেই। বই-খাতা খুলে রেখে বসে-বসে খালি ঝিমুচ্ছে। অনেকবার ডাকলে তবে সাড়া দেয়। বাড়ী থেকে বেরোয় না। খেলাধুলোর ঝোঁক চলে গেছে। তা যাক। ওই বয়সী ছেলেদের এখন বাইরে না বেরুনোই ভাল। যা দিনকাল পড়েছে। মনের মধ্যে এই সব সাত-পাঁচ চিন্তা। হঠাৎ কি কারণে সেদিন সকাল-সকাল স্কুল ছুটি হতে অসময়ে বাড়ী ফিরতে হল। বাড়ী এসে ব্যাপারটা তিনি বুঝতে পারলেন। দু-চারবার ধাক্কা দিতে দরোজা খুললো না। কি রকম জানি মনে হল। একটু ঘুরে গিয়ে ডিঙ্গী মেরে জানালার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখলেন পিতা-পুত্র দুজনে চাপা গলায় ঝগড়া করছে। বাপ ছেলেকে ভর্ৎসনা করছে, ছেলে প্রতিবাদ জানাচ্ছে। বাপের ধারণা ছেলে তার ন্যায্য পরিমাণের থেকে বেশী আফিম আত্মসাৎ করেছে, আর ছেলের ধারণা বাবা সকালে উঠেই দুপুরের গুলিটা গলায় ফেলেছেন এবং সেকথা বেমালুম ভুলে গেছেন। এই নিয়ে ঝগড়া। ভদ্রমহিলা কিছুক্ষণ বজ্রাহতের মত দাঁড়িয়ে থেকে বোধ হয় ঐখানেই বসে পড়েছিলেন। পাড়ার একটি মেয়ে ওঁকে অসুস্থ মনে করে চেঁচামেচি-গোলমাল করাতে দরোজা খুলে বাপ-বেটায় বাইরে এসে ওঁকে ঘরে নিয়ে যায়। এর পর দিনই এক প্রতিবেশীকে নিয়ে উনি আমার সঙ্গে দেখা করেন ও এই ঘটনাটি বলেন। এর কোন প্রতিকার আছে কিনা জানতে চান।

এই রকম মর্মস্পর্শী কাহিনী এর আগে শুনি নি। বিচলিত ও অভিভূত বোধ করলাম। মর্ফিয়া-আফিংখোরের সংখ্যা ক্রমশ

CENTRAL LIBRARY

পাচ্ছে জানতাম, দুই বন্ধু পরস্পর পরস্পরকে ইনজেকশন দিয়ে নেশার বিমল আনন্দ উপভোগ করছে শুনেছি, কিন্তু বাপ ছেলেকে আফিমের নেশায় দীক্ষিত করেছে, এরকম ঘটনা বিরল। মরফিন-অ্যাডিক্টের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবরা এসে মাঝে-মাঝে জানতে চান এই সব নেশাখোরদের চিকিৎসা চলে কিনা, চিকিৎসায় ফল পাওয়া যায় কিনা, এই রকম আরও অনেক কথা। অমুক সাহিত্যিক মদ ছেড়ে আফিম ধরেছেন, অমুক শিল্পী আফিম ছেড়ে মরফিয়া নিচ্ছেন, ইত্যাদি খবর শোনা ছাড়া প্রত্যক্ষভাবে কোন আফিমখোর বা মরফিয়া অ্যাডিক্টের সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতাই আমার ছিল না। কিছু দিন আগে অবশ্য এক ভদ্রলোকের চিকিৎসা প্রসঙ্গে তাঁর অহিফেন-আসক্তির সঙ্গে মোকাবিলা করতে হয়েছিল। তাঁকে আনা হয়েছিল উন্মাদ অবস্থায়, দৈনিক আফিমের বরাদ্দ হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাওয়াতে তিনি নির্যাতন-মূলক ডিলিউশনে ভুগছিলেন। স্ত্রী ও পুত্র তাঁর খাদ্যের সংগে বিষ মেশাচ্ছে সন্দেহে তিনি খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তাঁকে এক নার্সিং হোমে রেখে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। মরফিয়া-অ্যাডিক্ট বা অহিফেনসেবীরা স্বেচ্ছায় চিকিৎসকের কাছে কদাচিৎ আত্মসমর্পণ করেন। শুধু ঘুমের ওষুধ ও বেদনানাশক (এ্যাসপিরিন জাতীয়) ওষুধের অভ্যাস ছাড়াবার চিকিৎসা মাঝে-মাঝে করতে হয়। ওষুধপত্র নিয়ে যাঁদের কাজ-কারবার তাঁরাই সাধারণত এই ধরনের নেশায় আসক্ত হয়ে পড়েন। এঁরা সকলেই শিক্ষিত ও অল্প বয়সেই অভ্যাসটি আয়ত্ত করে বুঝতে পারেন যে, এ অভ্যাস না ছাড়লে জীবন অচল হয়ে পড়বে। তাই তাঁদের মধ্যে সুস্থ হবার আন্তরিক একটা ইচ্ছা থাকে। যাঁদের আগে থেকে কোন মানসিক বিশৃঙ্খলা থাকে না, তাঁরা এ অভ্যাস ছাড়তেও পারেন। কিন্তু আফিমের নেশা ধীরে-ধীরে ব্যক্তিটিকে গ্রাস করে, পূর্ণগ্রাস হবার পর আত্মীয়স্বজন চিকিৎসার জন্য অধীর হয়ে ওঠেন, তখন আর প্রায়ই কোন উপায় থাকে না। এঁরা প্রায়ই মাঝ বয়সী বা বেশী বয়সী; জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা নেই, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা বিলুপ্ত। কাজেই চিকিৎসার অর্থাৎ ভাল হবার ইচ্ছা এদের স্বভাবতই কম। চিকিৎসায় সুফল পাওয়ার আশা আরও কম।

বৃদ্ধ ভদ্রমহিলার অবস্থা দেখে বিচলিত হলাম। মনে হলো একবার চেষ্টা করে দেখা যাক, কিছু করা যায় কিনা? কোন একটা উপলক্ষ করে একবার বিকুচরণের বাড়ী তাঁকে দেখা দরকার। বাপকে না হোক ছেলেটিকে বাঁচান হয়ত যেতে পারে। বিকুচরণকে দেখলাম। হাড়ের উপর চামড়ার আবরণ দেওয়া একটা প্রায় অচল দেহ। চোখ মেলে তাকাবার ক্ষমতা নেই। বিড়বিড় করে অনেকক্ষণ আমার সঙ্গে আলাপ চালাবার চেষ্টা করলেন। তাঁর কথা অসংলগ্ন ও ছাড়া-ছাড়া। বিশেষ কোন অর্থবহ বলে মনে হল না। আমার কিছু করবার নেই, বুঝলাম। হাসপাতালে নেবে কিনা সন্দেহ। হাতের আঙুলগুলো কাঁপছে, মুখের পেশীতেও কাঁপন। ছেলেটি আমাকে দেখেই বাথরুমে ঢুকলো, অনেক ডাকাডাকিতেও দরোজা খুললো না। বিকুচরণের দাদার ঠিকানায় একটা চিঠি দিলাম। ছেলেটির ভার নেবার জন্যে তাঁকে অনুরোধ জানালাম। কয়েক দিন পরে বিকুবাবু স্ত্রী-পুত্রকে অব্যাহতি দিয়ে বাঞ্ছিতধামে প্রস্থান করলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর একখানা ডায়েরীর মত খাতা আমার হস্তগত হয়। কয়েকটি পাতায় নানা রকম ফুল-পাতা আঁকা, কয়েকটি পাতায় দু'ও বছরের আগেকার বিবর্ণ খবরের কাগজের কাটিং। পাঠোদ্ধার করা যায় না, কাগজগুলো গুঁড়ো হয়ে গেছে। অনেক চেষ্টা করলে বোঝা যায় দৈনিক পত্রিকার ফুটবল খেলার বিবরণী। বোধ হয় বিকুচরণের ক্রীড়া-কৌশলের পরিচয় এর মধ্যে লিপিবদ্ধ আছে। মাঝে-মাঝে ডায়েরীর মত সাল-তারিখ দিয়ে জড়ানো অক্ষরে কি সব লেখা। দু-এক জায়গায় পাঠোদ্ধার করতে পারলাম। পাঠকদের অবগতির জন্যে দু-একটা নমুনা তুলে দিচ্ছি। বিকুবাবুর স্বপ্নের মধ্যে ডি কুইন্সীর 'ফ্লাইট অফ ইমাজিনেশন' নেই, শব্দ ঝংকার নেই, সাহিত্যিক মূল্য নেই, তবে অহিফেনসেবীর মনের পরিচয়, সামান্য হলেও আছে।

অনেকটা দূরে অবধি ফ্লাড লাইটের আলো। ক্যালকাটা গ্রাউণ্ডে হাইল্যাণ্ডাররা ব্যাগপাইপ বাজাচ্ছে। আমাদের এখানেও ফ্লাড লাইটে ফুটবল খেলা হচ্ছে। একটা গ্রে-হাউণ্ড চেন ছিঁড়ে রেফারীকে কামড়াতে চায়। গোল হয়েছে। গো...গো...ও...ও...ল। যে গোল দিয়েছে কুকুরটা তারই টুঁটি কামড়ে ধরেছে। তার জার্সি ছিঁড়ে গেল। বিকুচরণ গোল দিয়েছে। গোরার বাজনা সেই পরিচালনা করছে। (সকালের স্বপ্ন)।

আমি যদি মুখচোরা না হতুম তো নিশ্চয়ই...স্পষ্ট কথায় জানিয়ে দিতুম। আমি দিয়েছি এগারোটা গোল আর অজিত ছটা। অজিত কেন চান্স পেল? আমি পেলাম না। কি হবে চান্স পেয়ে? কদিন আর লোকে খেলোয়াড়কে মনে রাখে। তার থেকে বর্ষায় ছাতি মাথায় দিয়ে ছিপ ফেলে মাছ ধরতে মজা বেশী। কেউ দেখবে না, জানবে না, বুঝবে না। সিলেকশন কমিটিকে অজিত টাকা খাইয়েছে কি? না রক্ষিতার বাড়ী গিয়ে বৌদিকে তেলিয়েছে? আমসত্ত ভালো না ক্ষীর কলা দিয়ে মুড়ি? লোটাস-ইটার কারা? (বিকেলের চিন্তা)।

অলিম্পিক সেমিফাইনাল দেখছি। জায়গাটা লণ্ডন না প্যারী? ডবল ডেকারের ছাতে দাঁড়িয়ে খেলা দেখছি। টিকিট পাই নি। আমাকে টিকিট দিলে না আর পাড়ার অ্যাং-ব্যাংরা টিকিট ব্ল্যাক করছে। একটা গর্ত খুঁড়ে টিউব স্টেশনে ঢুকে পড়েছি। এখুনি ট্রেন ধরতে হবে। কি হবে? অন্ধকারে ঘুমুলেই ভালো। ওই তো ওয়েটিং রুমে সব গাদাগাদি করে ঘুমুচ্ছে। আমার না গোষ্ঠের কেউই টিকিট পায় নি। হরেক রকম বাজনা বাজছে। [illegible] স্বরোদ, বীটোফেনের মুনলাইট সনাটা। ট্রেনের চাকায় রবীন্দ্রসঙ্গীত। আমি গুটিয়ে যাচ্ছি, গুটিয়ে যাচ্ছি, গুটি পোকা হয়ে গেছি। আমাকে যদু আমি দেখতে পাচ্ছি না। অথচ আমি বাঁচিয়ে চলেছি। নক্ষত্রবহ ধরে আকাশ ছেড়ে শুক্রগ্রহের দিকে চলেছি। যাঃ! ট্রেন ছেড়ে দিল। খেলা দেখা হলো না। তা হলে ঘুমুনো যাক।

অসংলগ্ন এই সব উক্তি থেকে এইটুকু মাত্র অনুমান করা চলে যে খেলার ব্যাপারে আশাভঙ্গের দরুণ ভদ্রলোক হতাশাগ্রস্ত হয়ে ক্রমশ নিজেকে গুটিয়ে নিতে চেয়েছেন। মাঝে-মাঝে নিজেকে জাহির করতে চেয়েছেন, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার ইচ্ছে হয়েছে, আবার পরমুহূর্তে বাস্তব থেকে সরে গেছেন। লেখাগুলোর মধ্যে বর্তমানের কোন চিন্তা-ভাবনা বা সমস্যার সংকেত মাত্রও নেই। সবই খেলোয়াড় বিকুচরণকে ঘিরে; তাঁর শিক্ষকের জীবন বা পারিবারিক জীবনের কোন 'কক্ষের মধ্যেই যেন তিনি ছিলেন না।

বিকুচরণের কাহিনী লিখতে গিয়ে চন্দ্রবাবুর কথা মনে পড়লো। ডি কুইন্সীর সংগে পরিচয় চন্দ্রবাবুর আশ্রমে। এইবার চন্দ্রবাবুর প্রসঙ্গে আসা যাক। আর একটি 'ওপিয়াম ইটার'। চন্দ্রবাবুর সংগে আলাপ হয় এক অধ্যাপক বন্ধুর মারফত। উত্তরপ্রদেশের এক শহরে বেড়াতে গিয়ে অধ্যাপকের অতিথি হয়েছিলাম। তিনি একদিন চন্দ্রবাবুর কাছে নিয়ে গেলেন। পথে উচ্ছ্বসিতভাবে চন্দ্রবাবুর পরিচয় দিলেন। একটা অদ্ভুত টাইপের মানুষ এই চন্দ্রবাবু। একটা জিনিয়াস, একটা ধাঁধা, অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন একটি অনন্যসাধারণ ব্যক্তি। আফিমের লেথাল ডোজ কত? ·০১ গ্রাম? আচ্ছা যদি কেউ ১ গ্রাম খায়? অভ্যাস হয়ে গেলে হজম করতে পারবে? কিন্তু দেহ-মনের যন্ত্রপাতি ঠিক থাকবে কি? ডাক্তারী মতে তার শরীরের ক্ষয় হবে, ওজন কমবে, ধারণাশক্তি থাকবে না, স্মৃতিশক্তি হ্রাস পাবে। ভদ্রলোকের শক্তি কমা তো দূরে, বেড়েই চলেছে। দিনে তিনশো পাতার বই পড়ে মনে রাখতে পারেন। গড়-গড় করে রবীন্দ্রনাথ, শেলী, কীটস আউড়ে যেতে পারেন। কাণ্টের 'নউমেনাল' আর 'ফেনোমেনাল' নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনা করতে পারেন। আরো অনেক কিছু পারেন; অনেক কিছু জানেন। খাঁটি সিদ্ধপুরুষ, যোগী। আমাকে যদি তাঁর মনে ধরে তবেই মুখ খুলবেন, আর তা না হলে চুপচাপ বসে থাকবেন আর গুলি গিলবেন। ইত্যাদি রকমের ভূমিকার পর চন্দ্রকান্ত-দর্শন ঘটলো। বোধ হয় আমাকে মনে ধরল। আধ ঘণ্টার মধ্যে তিনটি কবিতা আওড়ালেন আর দুবার আফিমের গুলি মুখে পুরলেন। চোখ বুজেই অবশ্য কথাবার্তা চালালেন।

CENTRAL LIBRARY

সত্যিই দর্শনীয় চেহারা এই চন্দ্রবাবুর। দশাসই, মহাবৃক্ষ যাকে বলে, একেবারে তাই। গায়ের রং মিশ কালো, খাড়া নাক, বাবরী চুল, গালপাট্টা সব মিলিয়ে এক ভয়ঙ্কর-ব্যাপার। অথচ বলার ভঙ্গীও মার্জিত-রুচিক। আমার আসার খবর হয়তো আগে থেকেই জেনেছেন। আমার বিদ্যাকে বাদ করেই যেন তিনি কথাবার্তা শুরু করলেন। অবশ্য কথাবার্তা যা বললেন সবই আমার বন্ধুকে সম্বোধন করে, অথচ আমাকে উদ্দেশ্য করে।

—তোমার বন্ধুকে একবার গন্ধবাবার কাছে নিয়ে যেও। যে গন্ধ ইচ্ছে শুঁকতে পারবেন। উনি নিজের হাতেই চাঁপার গন্ধ পেতে পারেন। উনি কি বলেন জানো? সূর্যালোকে বাতাস, গাছপালা ব্রহ্মাণ্ডে আর সব-চন্দ্রবর্ণক এই কৃষ্ণ বটিকা। এই বলে ভিতর থেকে আর একটি সর্বরোগবর্ধক বটিকা মুখে চালান দিলেন। ত্রৈলঙ্গ স্বামী কুম্ভক করে কতক্ষণ থাকতেন জানো প্রফেসর? এক ছোকরা বৈজ্ঞানিক এই নিয়ে সেদিন টিটকিরি দিয়ে কথা বলছিল, ফিজিওলজির ডক্টরেট। অনেক দিন জার্মানীতে থেকেছে। বোধ হয় শুধু জার্মানীর যোগবিদ্যা নাকি ওরা জেনে গেছে! শুধু নাকি অভ্যাস। সবই নাকি কন্ডিশনড রিফ্লেক্স। তুমিও তো মস্ত বড় অধ্যাপক। বল না হে কিছু? আচ্ছা, আফিম খেলে নাকি স্মৃতিশক্তি কমে? তাহলে তো আমার ডোজ কমাতে হচ্ছে। তোমার বন্ধু কিছু জানেন নাকি এ সম্বন্ধে? দেখ তো হে, ঠিক মত বলতে পারি কিনা? না বার্ধক্যেই বাহাত্তুরে হল!

এই বলে তাক থেকে একটা বিবর্ণ ছেঁড়াখোঁড়া বই আমার দিকেই ছুঁড়ে দিলেন। তুলে দেখি বড় কথা আমি মনে-মনে ভাবছিলাম; সেই ডি কুইন্সীর 'কনফেশনস অফ অ্যান ইংলিশ ওপিয়ম ইটার'। একটু অবাক লাগলো। বইটির নাম শুনেছিলাম, পড়া হয় নি। ভদ্রলোক গুট-খেলানো সুরে বলে চললেন— দাই হেয়ার আই লিভ নট হোয়ার—সামহাউ, আই লিভ নট হাউ—বাই দাই বীইং, আই লিভটু হ্যাভ—এ বাটন, এ স্ট্রাইপ, এ্যান এ্যাম্পল ওয়ার্ক কনসার্টিং—ওয়ার্ক ইন্টারলাইন লাইক এ জেট ট্রাম, অর পিস অফ মিউজিক... ইত্যাদি। চন্দ্রবাবু আমাকে পড়ার নির্দেশ দিলেন। আমি মিলিয়ে দেখলাম। হুবহু অক্ষরে-অক্ষরে মিলে যাচ্ছে। প্রায় এক পৃষ্ঠা তিনি বলে চললেন।

মনে হলো কথাগুলো যেন আমাকে চ্যালেঞ্জ করেই বলা হচ্ছে। এর পর যে-কদিন ঐ শহরে ছিলাম, রোজই চন্দ্রবাবুর সঙ্গে প্রায় ঘন্টা তিনেক ধরে আলাপ-আলোচনা করেছি। বুঝেছিলাম তিনি যেন জানতে চান কি করে এটা সম্ভব হলো যে, আজীবন শরীরের উপর নানা রকমের অত্যাচার করে, স্নায়ুতন্ত্রকে খেয়ালখুশিমত উত্তেজিত-নিস্তেজিত করেও তাঁর মানসিক শক্তি অবনতি ঘটে নি। বুদ্ধিবৃত্তি হ্রাস পায় নি। শরীরে জরার আক্রমণ ঘটে নি। অথচ একথা সরাসরি জিজ্ঞাসা করতে তাঁর অহমিকায় বাধছে। তিনি বিজ্ঞানকে অর্বাচীন শাস্ত্র মনে করেন, বোধিকে বুদ্ধির চেয়ে প্রাধান্য দেন। মুখে না বললেও তিনি একটা ঐশী শক্তিকে সব কিছুর চালক বলে স্বীকার করেন। সে যাই হোক, 'ওপিয়াম-অ্যাডিকটের' কোন বৈশিষ্ট্য, কোন উপসর্গ তাঁর মধ্যে প্রকাশ পেল, না কেন? এই চিন্তাতে আমি ডুবে ছিলাম কয়েক দিন। তারপর কোলকাতায় ফিরে আসি। নানা-সূত্রে চন্দ্রবাবুর সম্বন্ধে অনেক কিছু তথ্য জানতে পারি। আরও দুবার চন্দ্রবাবুর সঙ্গে দেখা হয়, আরো অনেক আলোচনার সুযোগ পাই। চন্দ্রবাবু গত কয়েক বছর নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করছেন। এটা তাঁর স্বাভাবিক জীবন যাপন নয়। প্রায় চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছর পর্যন্ত তিনি উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করেছেন। এই কোলকাতা মহানগরী ছিল তাঁর যৌবনের চারণভূমি। প্রচুর পৈত্রিক সম্পত্তি তিনি খামখেয়ালীপনা করে নষ্ট করেছেন। খামখেয়ালীপনা তাঁর এক-এক সময় এক-একভাবে প্রকাশ পেত। কোন এক সময় অখ্যাত লেখকদের লেখা ছাপিয়েছেন হাজার-হাজার টাকা খরচ করে। কোন সময় ভ্রাম্যমান থিয়েটারের দল নিয়ে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছেন। কোন সময় জীবন বীমা কোম্পানী খুলেছেন, কোন সময় বা পতিতা মেয়েদের কো-অপারেটিভ সমিতি খোলার নেশায় মেতেছেন। এই রকম খেয়ালী ব্যবসায় প্রায় লাখখানেক নষ্ট হয়েছে। এছাড়া শিল্পী-সাহিত্যিকদের পার্টি দিয়ে মাঝে-মাঝে টাকা খরচ করতেন। দশ-পনেরো জন বন্ধু-বান্ধব নিয়ে চলে গেলেন শ্রীনগর কিম্বা ওয়ালটেয়ার। পনেরো দিন ধরে মদের স্রোত বইলো, খাবারের পাহাড় ধ্বংস হলো। নিজে প্রত্যহ প্রায় এক বোতল করে মদ্যপান করতেন। রাত্রে হুইস্কি, সকালে জিন, দুপুরে বিয়ার। কোন সময় হয়ত ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে (বর্তমান ন্যাশনাল) ঘন্টার-পর-ঘন্টা পড়ে চলেছেন; তিন মাস চার মাস ধরে। আবার কোন সময় একেবারে 'আউট ওয়ান উইথ নেচার' হয়ে জঙ্গলের মধ্যে জীবন যাপন করেছেন। নামকরা সাহিত্যিকদের সঙ্গে মিশে দেখেছেন তাদের জানাশোনা কিছু নেই তারা সহজাত-প্রবৃত্তিবশে যেন লিখে চলেছে। তিনি যা জানেন তার সিকির-সিকিও জ্ঞান তাদের নেই। তারা নাম করেছে, তাদের লেখার চাহিদা হয়েছে, তাই তারা কিছু দেখে না, কিছু শেখে না, শুধু লেখে। একই লেখাকে নানা রঙে সাজিয়ে বিভিন্ন প্রকাশকদের কাছে বিক্রয় করছে। নিজে লিখেছেন। পছন্দ হয় নি বলে ছিঁড়ে ফেলেছেন। নাটক লিখলে অন্তত শ'র কাছাকাছি যেতে হবে। উপন্যাস লিখলে অন্তত [illegible] 'চৌকাঠে' পৌঁছুতে হবে। এদেশের সব সাহিত্যিককে যাচিয়ে দেখেছেন, তারা সব ফাঁপা, বাতাসে ভরা ফানুস যেন। একমাত্র ব্যতিক্রম রবীন্দ্রনাথ। তিনি হিমালয় আর সব তুলনায় বালুর ঢিবি। সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের উপর বিতৃষ্ণা ধরার পর দর্শন ইতিহাস পড়েছেন। লেখার ইচ্ছা ক্রমশ মনের তলায় চাপা পড়ে গেছে। কি যে চাই, কি যে হবেন, বুঝতে না বুঝতেই বেলা হয়ে যাচ্ছে। জীবনসূর্য পশ্চিম আকাশে হেলে পড়েছে। অনেক মেয়েকে ভালবেসেছেন, কিন্তু ভালবাসা কোথাও দানা বাঁধে নি। বিয়ের কথা মেয়ের তরফ থেকে উঠলেই তিনি সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়েছেন। মেয়েরা সাহিত্যিকদের চেয়েও ফাঁপা, আরো নিরেট। তাদের নিয়ে হৈ-হুল্লা করা যায়, ঘর বাঁধা যায় না। এমনি সময় তাঁর জীবনের পরিবর্তন ঘটলো একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে। খেয়াল বশে এক বন্ধুপত্নীকে নিয়ে গাড়ী চালিয়ে হাজারি-বাগ গিয়ে তার সঙ্গে রাত কাটানোর পরই পুলিশ এসে ওঁদের গ্রেপ্তার করে। মামলা কোর্টে ওঠবার আগেই বন্ধুপত্নী আত্মহত্যা করেন। বন্ধু পুলিশকে বলে-কয়ে মামলা তুলে নেন। তার আগে, শোনা যায়, মত্ত অবস্থায় সে চন্দ্রবাবুকে হান্টার দিয়ে প্রায় দশ মিনিট ধরে অবিরত আঘাত করে যায়। দৈত্যসদৃশ চন্দ্রবাবু কোন বাধা না দিয়ে নীরবে এই আঘাত সহ্য করেন। এর পর থেকে চন্দ্রবাবু মদ ছেড়ে দিয়ে আফিম ধরেন এবং কোলকাতা ছেড়ে ঐ ছোট্ট শহরটিতে অজ্ঞাতবাসে আসেন। বর্তমানে তিনি তাঁর আশ্রমের চৌহদ্দীর বাইরে পা বাড়ান না। ব্যাঙ্কে এখনো যা আছে, বুঝে-শুনে চললে বাকী কটা বছর নির্ঝাটে কাটিয়ে দিতে পারবেন।

আরও জানলাম এবং বুঝতেও পারলাম যে, গত পনেরো বছরের মধ্যে চন্দ্রবাবু নতুন কিছু পড়েন নি। পুরনো পুঁথিগুলোই আজকাল উল্টে-পাল্টে দেখেন। যে সব কবিতা বা গদ্যের লাইন আওড়ান, সে সব ঐ পনেরো বছরের আগে পড়া। পুরনো অভ্যাসগুলোই বজায় আছে, নতুন অভ্যাস কিছু গড়ে ওঠে নি। আমার মত নতুন লোকদের চমক লাগে। ওঁকে যারা অন্তরঙ্গভাবে জানে, তারা বলে পুরনো অনেক কিছু উনি ভুলে গেছেন, বুদ্ধিবৃত্তিও বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে। চমক দেওয়া কথাগুলো যা বলেন, সবই পুনরাবৃত্তি। তবু দেহ-মনের দিক থেকে এই দৈত্যসদৃশ মানুষটির মাদকের প্রভাবে যতটা ক্ষতি হবার কথা, ততটা হয় নি। এর ব্যাখ্যা আজ হয়তো সম্ভব নয়। 'জিন' সম্পর্কিত আরো জ্ঞান থাকলে চন্দ্রবাবুকে আরো ভালভাবে বোঝা যাবে। আমাদের বর্তমানে বিবেচ্য চন্দ্রবাবুর সুরাসক্তি কিভাবে এবং আফিমাসক্তিতে রূপান্তরিত হল।

—[illegible]

CENTRAL LIBRARY

বিজ্ঞানের কথা

আলুর ধসা রোগের প্রতিষেধক

এ-সপ্তাহের বিজ্ঞানের কথা শুরু করার আগে কলকাতার সবকটি বাংলা দৈনিকে প্রকাশিত একটি বিজ্ঞাপন তুলে ধরতে চাই। বিজ্ঞাপনটি দিয়েছেন পশ্চিমবাংলার কৃষি অধিকর্তা। বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছে—'আলুর ধসা রোগ থেকে সাবধান হোন। নাবি ধসা এবং জলদি ধসা রোগে আলুর ব্যাপক ক্ষতি হয়। আকাশ মেঘলা ভাব বা কুয়াশাচ্ছন্ন থাকলে রোগ মহামারীরূপে সমস্ত ফসল নষ্ট করতে পারে। ধসা রোগ থেকে রক্ষা পেতে হলে আলু গাছ ২০-২৫ সেন্টিমিটার বড় হলে প্রতি বারে ২ কেজি ব্লাইটক্স বা ফাইটোলেন বা ক্উপ্রাসল অথবা যে-কোন তামাঘটিত ওষুধ বা এক কেজি ডাইথেন বা ক্যাপটেন জাতীয় ওষুধ ২০০-৪০০ লিটার জলে গুলে ১০-১৫ দিন অন্তর স্প্রেয়ারের সাহায্যে ছিটাতে হবে। ওষুধ এমনভাবে ছিটাবেন যাতে গাছের ডগা ও পাতার নিচেতেও ভালভাবে লাগে। রোগ ফলবলে দিনে ওষুধ ছিটাবেন। ধসা রোগ দেখা দেবার আগে থেকেই ওষুধ ছিটালে ভাল ফল পাওয়া যায়।'

আলুর এই ধসা রোগ শুধু আমাদের দেশের সমস্যা নয়, পৃথিবীর সব দেশের। এই রোগ ঠেকাবার জন্য পৃথিবীর সব দেশেই রাসায়নিক ছেটাবার ব্যবস্থা। এখানে জেনে রাখা ভালো, মানুষকে রোগগ্রস্ত করতে পারে এমন জীবাণুর সংখ্যা যেখানে কয়েক শত, উদ্ভিদকে রোগগ্রস্ত করতে পারে এমন জীবাণুর সংখ্যা সেখানে কম-পক্ষে দশ হাজার। কাজেই মানুষের রোগ হবার সম্ভাবনা যতোটা, উদ্ভিদের রোগ হবার সম্ভাবনা তার চেয়ে অনেক অনেক বেশী মানুষের রোগের ব্যাপক চিকিৎসা আছে, ব্যাপক প্রতিষেধকও, কিন্তু উদ্ভিদের রোগ ঠেকাবার জন্যে এখনো পর্যন্ত ডি ডি টি ও রাসায়নিক ছিটানো ছাড়া অন্য কোনো ব্যবস্থা নেই।

পশ্চিম বাংলার কৃষি অধিকর্তাও তাই আলুর ধসা রোগ ঠেকাবার জন্যে ওষুধ ছেটাবার কথাই শুধু বলতে পেরেছেন। কিন্তু এই ব্যবস্থা কি সর্বোত্তম? বিজ্ঞানীরা কী বলেন? আজকের বিজ্ঞানের কথায় এই বিষয়টি নিয়েই আলোচনা তুলতে চাই। সোভিয়েত তথ্য দপ্তরের একটি বুলেটিনের ভিত্তিতে এই আলোচনা।

উদ্ভিদের রোগ কেন ও কি-ভাবে?

একটা ব্যাপার লক্ষ্য করা যাচ্ছে, চাষ-করা উদ্ভিদে রোগ যতো বেশি, বুনো উদ্ভিদে ততো নয়। বুনো উদ্ভিদ যেন চমৎকারভাবে নিজেদের মানিয়ে নিয়েছে, তাদের অসুখ কদাচিৎ, অসুখে অপমৃত্যু আরো কদাচিৎ।

চাষ-করা উদ্ভিদেই যেন যতো রোগ ভিড় করে আসে—গমে, আলুতে, আঙ্গুরে, কোল্টাতে নয়। ব্যাপারটা কী? মানুষের রোগের সঙ্গে উদ্ভিদের রোগের সাদৃশ্য খুঁজতে গেলে একটি বিষয়ে মিল পাওয়া যায়—যেখানে ভিড় সেখানেই রোগ। বড়ো বড়ো শহরে অল্প জায়গায় অনেক মানুষের বসবাস, রোগের প্রকোপও প্রচণ্ড। অর্থাৎ রোগের জীবাণুগুলো যেন একজায়গায় এতগুলো মানুষকে একত্রে পেয়ে মারমুখী হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। চাষ-করা উদ্ভিদ সম্পর্কেও একই কথা। কৃষক বীজ বাছাই করছে সেরা জাতের, একটি নির্দিষ্ট এলাকায় চাষ করে সেই বীজ থেকে চারা গজাচ্ছে, জমিতে দিচ্ছে সার, গাছের গোড়ায় জল, উদ্ভিদ হয়ে উঠছে শর্করায় ও শ্বেতসারে সমৃদ্ধ—জীবাণুরা এমন একটা ভোজের আয়োজন থেকে সরে থাকবে তা হতেই পারে না। ফলে জীবাণুদের গ্রাসে অতি সহজেই মানুষের এত সাধের ও পরিশ্রমের ফল-ফসল ছারখার হতে বসল। কৃষকদের একমাত্র চিন্তা হয়ে দাঁড়াল—ফসল কি করে বাঁচানো যায়? কৃষিবিজ্ঞানীরা তৎপর হয়ে উঠলেন। সম্ভাব্য সকল উপায়ে ও সকল ব্যবস্থা প্রয়োগ করে পরীক্ষা চলতে লাগল। শেষ-পর্যন্ত দেখা গেল, উদ্ভিদকে জীবাণুর আক্রমণ থেকে বাঁচাতে পারে রাসায়নিক। শুরু হল রাসায়নিকের ব্যাপক প্রয়োগ। উদ্ভিদের রোগ দূর হল। ফসলের ও ফলের ফলন হতে লাগল অপর্যাপ্ত। মনে হতে লাগল, উদ্ভিদজগতের শত্রু নিধনের ব্রহ্মাস্ত্র মানুষের হাতে এসে গিয়েছে, আর ভয় করার কোনো কারণ নেই।

তখন থেকেই ক্ষেতের ফসল ও বাগানের ফল বাঁচাবার জন্যে সর্বাত্মক একটা যুদ্ধের আকারে রাসায়নিক ছেটানো শুরু। এই রাসায়নিক হচ্ছে জীবাণুদের পক্ষে বিষের মতো। রাসায়নিক প্রয়োগের অর্থ, বিষ প্রয়োগে শত্রু নিধন। কিন্তু সর্বাত্মক যুদ্ধ চালাতে হলে বিষের প্রয়োগ একটা নির্দিষ্ট মাত্রায় সীমাবদ্ধ রাখা চলে না। মাত্রা বেড়েই চলে। শেষপর্যন্ত দেখা যায়, বিষ শুধু জীবাণুদেরই ধ্বংস করছে না, মানুষের পক্ষেও ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

ভালো যখন মন্দ হয়

স্পষ্টই বোঝা গেল, যাকে ভাবা হিয়েছিল ব্রহ্মাস্ত্র, তার প্রয়োগে ফলাফল সবটাই ভালো নয়, বেশ খানিকটা মন্দও। রাসায়নিক বিষ ক্ষতি করে শুধু জীবাণুর নয়, মানুষেরও। বিষের প্রয়োগের মাত্রা কড়াকড়ি বেঁধে দিয়েও দেখা গেল, মানুষের ও পশুর খাদ্য বিষাক্ত হয়ে যাচ্ছে। বিজ্ঞানীরা তখন এই রাসায়নিক বিষের ফল বিশ্লেষণ করতে বসলেন। তা থেকে যে ছবিটি বেরিয়ে এল, তা আতঙ্কজনক। দেখা গেল, এই বিষের ক্রিয়া শরীরের মধ্যে জমতে জমতে শেষ-পর্যন্ত জীবকোষের বংশানুক্রমিক যন্ত্রে পরিবর্তন ঘটিয়ে বসে—ক্রোমোজোম ও জীন বিকৃত হয়ে যায়। ব্যাপারটা তখন আর শুধু এক পুরুষেই শেষ হয় না, বংশ থেকে বংশে সঞ্চারিত হয়ে চলে। এমনিভাবে বংশ-গতির ক্ষেত্রে মারাত্মক রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে এবং সুনিশ্চিত মাত্রায় তা বেড়েই চলেছে। এখন সকলেই বুঝতে পারছেন—এমনকি যাঁরা বিশেষজ্ঞ নন তাঁরাও—রাসায়নিক প্রয়োগ করে উদ্ভিদ বাঁচাবার এই পদ্ধতি অবিলম্বে বর্জন করা উচিত।

বিজ্ঞানীরা তাই ভাবছেন, এমন কোনো উপায় কি নেই যাতে উদ্ভিদ নিজেই নিজেকে বাঁচিয়ে চলতে পারে? বুনো উদ্ভিদ কি-ভাবে নিজেকে বাঁচায়? বুনো উদ্ভিদের মধ্যে এমন কী আছে যা চাষ-করা উদ্ভিদের মধ্যে নেই? আধুনিক জীববিদ্যার সরঞ্জামগুলো বিজ্ঞানীদের হাতে আছে, তাই নিয়ে বিজ্ঞানীরা স্থির করলেন উদ্ভিদের [illegible]

মধ্যে—তার জৈব-রাসায়নিক পদার্থের মধ্যে—প্রবেশ করে অনুসন্ধান করে দেখবেন।

কী করলে উদ্ভিদ নিজেই নিজেকে বাঁচাতে পারে

বুনো উদ্ভিদের গুণাগুণ সন্ধান করতে গিয়ে একটি আবিষ্কার করা গেল। বুনো উদ্ভিদে রোগ প্রতিরোধ করে বিশেষ কতকগুলো অ্যান্টি-বায়োটিক উপাদান। এদের নাম দেওয়া হল ফাইটোআলেক্সিন (ফাইটো—উদ্ভিদ, আলেক্সিন — আক্রমণ ঠেকানো)। একটি সুস্থ উদ্ভিদে ফাইটোআলেক্সিন থাকে না, কিন্তু উদ্ভিদের রোগ হবার উপক্রম হলেই ফাইটোআলেক্সিন হাজির হয়। যে উদ্ভিদ যতো বেশি শক্তপোক্ত, তার ফাইটোআলেক্সিন গড়ে তোলার ক্ষমতাও হতো বেশি।

চাষ-করা উদ্ভিদ সাধারণত বুনো উদ্ভিদের মতো শক্তপোক্ত হয় না। কারণ কী? কারণ, চাষ-করা উদ্ভিদ ঠিক প্রকৃতি-জগতে স্বাভাবিকভাবে গজিয়ে ওঠা উদ্ভিদ নয়। সেখানে মানুষের নিজের কেরামতি অনেকখানি। মানুষের হাতে পড়ে তার অনেক কিছু অদল-বদল ঘটেছে—তার গুণে, তার স্বাদে, তার পুষ্টিতে, আরো অনেক কিছুতে। আরো ফলনশীল, আরো স্বাদ ও পুষ্টি বিশিষ্ট বীজ তৈরির করার জন্যে মানুষের পরীক্ষা-নিরীক্ষার অন্ত নেই। গম ও ধানের কথাই ধরা যাক। মানুষের পরীক্ষা-নিরীক্ষার কল্যাণে আজকাল গম ও ধানের বীজ যে চেহারা নিয়েছে তা কয়েক হাজার বছর আগেকার বুনো গম ও বুনো ধানের বীজ থেকে একেবারেই আলাদা। এমনি প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে। এখন সময় হয়েছে উদ্ভিদকে যতোই গুণান্বিত করার চেষ্টা হোক সেটি যাতে শক্তপোক্ত হয়ে বেড়ে ওঠে সেদিকেও নজর দেওয়ার।

উদ্ভিদের মধ্যে যে-সব গুণ থাকলে রোগের প্রতিরোধ হয়, সেই গুণগুলোকে সংক্রম করে তুলতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার টের পেয়ে গেলেন। উদ্ভিদের কোষে অ্যান্টি-বায়োটিক উপাদান সৃষ্টি হতে পারে যেমন রোগের আক্রমণ ঘটলে, তেমনি অনেকগুলো যৌগ রাসায়নিক ক্রিয়াতেও। কিন্তু এক্ষেত্রেও দেখা গেল ব্যাপারটা সম্পূর্ণ নিরাপদ নয়। রাসায়নিক যৌগ প্রয়োগ করে উদ্ভিদের মধ্যে প্রতিরোধ-ক্ষমতা সৃষ্টি করা যাচ্ছে ঠিকই, তার ফলে শত্রুর নিকেশও হচ্ছে, কিন্তু তারপরেও যে-পরিমাণ বাড়তি রাসায়নিক যৌগ থেকে যাচ্ছে তা মানুষের ও পশুর শরীরের পক্ষে বরদাস্ত করার মাত্রা ছাড়ানো। বিজ্ঞানীরা বিষয়টি নিয়ে নতুন-ভাবে ভাবতে শুরু করলেন। রাসায়নিক যৌগ প্রয়োগ করে উদ্ভিদের মধ্যে প্রতিরোধ-ক্ষমতা সৃষ্টি করা যাচ্ছে—তাই যদি হবে তাহলে এমন রাসায়নিক যৌগ কি পাওয়া যায় না, যা মানুষের ও পশুর শরীরের পক্ষে অ-ক্ষতিকর?

বিশেষ বিশেষ রোগের বিরুদ্ধে মানুষের মধ্যে প্রতিরোধ-ক্ষমতা সৃষ্টি করা হয় কি-ভাবে? টীকা বা প্রতিষেধকের সাহায্যে। টীকা বা প্রতিষেধক হচ্ছে যে-রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সেই রোগেরই জীবাণু-খুবই সামান্য মাত্রায়। এত সামান্য মাত্রায় যে, মানুষ অনায়াসেই তা প্রতিরোধ করতে পারে। কিন্তু বিনা আয়াসে নয়। সেই সামান্য মাত্রার রোগ-জীবাণুর বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে গিয়েও শরীরে প্রতিরোধ-ক্ষমতাকে সক্রিয় হতে হয়। অর্থাৎ ব্যাপারটা যেন এই বিশেষ রোগের বিরুদ্ধে লড়াইটা কিভাবে চালাতে হবে তারই একটা মহড়া। ফলে শরীরের মধ্যে একটা প্রস্তুতি থেকে যায়। পরে, বড়ো আকারের আক্রমণ ঘটলেও প্রয়োজনীয় প্রতিরোধ-ক্ষমতা সৃষ্টি হয়ে থাকে।

বিজ্ঞানীরা স্বভাবতই দেখবার চেষ্টা করলেন, উদ্ভিদের মধ্যেও একই উপায়ে রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-ক্ষমতা সৃষ্টি করা যায় কিনা। শক্তপোক্ত উদ্ভিদ রোগের আক্রমণে কাবু হয় না। কেন? রোগের আক্রমণ ঘটলেই উদ্ভিদের মধ্যে প্রয়োজনীয় প্রতিরোধ-ক্ষমতা, বা ফাইটোআলেক্সিন সৃষ্টি হতে থাকে। তার মানে, ধরে নিতে হয়, যে জীবাণুর দ্বারা রোগের আক্রমণ ঘটছে সেই জীবাণুর মধ্যে এমন বিশেষ উপাদান আছে যা ফাইটোআলেক্সিন সৃষ্টি করার সহায়ক। এই উপাদানটি যদি পৃথক করে নেওয়া যায় তাহলে তার প্রয়োগেই তো উদ্ভিদকে নিরোগ রাখার উপায় পাওয়া যেতে পারে।

বিজ্ঞানীদের এখন নজর এই বিশেষ উপাদানটির দিকে যা রোগের বিরুদ্ধে উদ্ভিদের প্রতিরোধ-ক্ষমতাকে সক্রিয় করে তোলে।

আলোচনার শুরুতে আমরা আলুর রোগের কথা বলেছিলাম। একজন সোভিয়েত বিজ্ঞানী আলুর এই রোগের প্রতিষেধক বার করেছেন। তাঁর একটি পরীক্ষার উল্লেখ করেই আমাদের আলোচনা শেষ করছি।

ধসা রোগের প্রতিষেধক

বিজ্ঞানীর নাম অধ্যাপক লিও মেৎ-লিৎস্কি। তিনি ও তাঁর সহকারীরা পরীক্ষা-কার্যটি চালাচ্ছেন সোভিয়েত বিজ্ঞান আকাদেমির বাখ্ জৈবরসায়ন ইনস্টিটিউটে। পরীক্ষাকার্যটি এই রকম :

তাঁরা একটি আলু নিলেন। আলুটি খুব ভালো করে পরিষ্কার করলেন, তারপর ফালি ফালি করে কাটলেন। ব্যাপারটা কী? আলুভাজা হবে নাকি? মোটেই নয়। আলুর ফালিগুলো তাঁরা সযত্নে রাখলেন কতকগুলো ভিজে প্রকোষ্ঠের মধ্যে। তারপরে কয়েকটি প্রকোষ্ঠ আলাদা করে নিয়ে সেই-সব প্রকোষ্ঠের আলুর ফালির ওপরে ছিটিয়ে দিলেন আলুর যা সবচেয়ে মারাত্মক রোগ অর্থাৎ ধসারোগের জীবাণু থেকে পৃথক করে নেওয়া বিশেষ একটি উপাদান। খুবই সামান্য মাত্রায়।

কয়েক দিন পরে সবকটি প্রকোষ্ঠের আলুর ফালির ওপরে প্রচুর পরিমাণে প্রয়োগ করা হল ধসারোগের জীবাণু। আরো কয়েক দিন পরে অবাক কাণ্ড। সবকটি ফালির ওপরেই প্রচুর ছত্রাক হয়েছে, তবে যেসব ফালির আগে থেকে সেই বিশেষ উপাদানটি ছিটানো হয়েছিল সেগুলো তখনো নিরোগ, কিন্তু যে-সব ফালির ওপরে ছিটানো হয়নি সেগুলো রোগগ্রস্ত।

আগে থেকে তৈরী করা আলুর ফালি-গুলোতে রোগ প্রতিরোধ করল কে? সেই বিশেষ উপাদানটি কি? না। আসল ঘটনা সেই বিশেষ উপাদানটি সেই বিশেষ আলুর ফালিগুলোর মধ্যে রোগ-প্রতিরোধের ক্ষমতা সক্রিয় করে তুলেছে।

উপাদান ছেটাবার মাত্রা কী?

প্রতি লিটার জলে দশ মিলিগ্রাম। এখনো পর্যন্ত যে-সব ওষুধ ছিটিয়ে আলুর ধসা রোগ ঠেকাবার চেষ্টা হচ্ছে তার মাত্রার দশ-হাজার ভাগ কম, কোনো কোনো ক্ষেত্রে পঞ্চাশ হাজার ভাগ কম।

এই উপাদানটির নাম দেওয়া হয়েছে 'ল্যুবিমিন'। 'ল্যুবিমেটস' নামে একজাতীয় আলু থেকে এই উপাদানটি প্রথমে আবিষ্কৃত হয় বলে এই নাম।

বিজ্ঞানীদের ধারণা, এই প্রতিষেধকের ব্যবহার শুরু হলে চাষের কাজে আশ্চর্য ফল পাওয়া যাবে। তবে এখনো এ ব্যাপারে অনেক কিছু করার আছে। বিজ্ঞানীদের সামনে এখনো প্রশ্ন : উদ্ভিদে এই প্রতিষেধকটি প্রয়োগ করা হবে কিভাবে? ফাইটোআলেক্সিনের একটা নির্দিষ্ট মাত্রা বজায় রাখার উপায় কী? উদ্ভিদের শুধু একটি বংশকে নয়, গোটা উদ্ভিদটিকেই রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা বিশিষ্ট করা যায় কেমন করে?

এসব প্রশ্নের জবাব ও সমাধান পেতে খুব বেশি সময় লাগবে না, এ আশা নিশ্চয়ই করা চলে।

—[illegible]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

অতি কষ্টে রাগ দমন করল বিনয়। এত স্পর্ধা শেফালীর, এত সাহস। জামা-কাপড় না ছেড়ে সে চেয়ারে বসল। শেষ পর্যন্ত এমন চরম সিদ্ধান্ত নিল মীরা। কোথায় যেতে পারে তা জানতে আর কতক্ষণ। কাল ওর অফিসে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেই জানা যাবে। কিন্তু যাওয়ার আগে পরামর্শ তো দূরে থাক, একবারটি মুখের কথাও জানাল না। কোন প্রয়োজন বোধ করল না। বেশ তাই হোক। দীর্ঘশ্বাস চাপল বিনয়। সেও কোন খোঁজ নেবে না।

—এখনও জামাকাপড় ছাড়নি?

টেবিলের উপর চায়ের কাপ রাখল শেফালী। আর চিঁড়ে ভাজা একটা প্লেটে। গম্ভীর চোখমুখ। ওর দিকে তাকিয়ে বিনয় মেজাজ ঠিক রাখতে পারে না।

—কী চাও? নিজের কণ্ঠস্বরে নিজেই চমকে উঠল বিনয়। সে কী চিৎকার করে উঠেছে?

—চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। বলে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যায় শেফালী।

তাড়াতাড়ি পোশাক পাল্টে নিল বিনয়। তারপর বারান্দা পেরিয়ে হনহন করে এগোল। কোনদিকে না তাকিয়ে দরজার খিল খুলে বাইরে চলে আসে। সিঁড়ি ভেঙে উঠতে যায়। ছাদ তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। রহস্যময় রূপসী নারীর মত তার আকর্ষণ। অতএব অগ্রাহ্য করে সে কিভাবে।

।। নয় ।।

পল্টু একটু আগে কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়েছে। বিছানাতেই ঘুমোবে না। শুধু আবদার। ভীষণ দুষ্টু হয়েছে ছেলেটা। আজ রেগে ওকে মেরেছে মীরা। একটার পর একটা অশান্তি লেগেই আছে! তাতেই মেজাজ তিরিক্ষে। এরপর ছেলের নিত্য নতুন বায়না। সত্যি, এত ঝক্কি আর সামলাতে পারছে না!

ঘরে হাল্কা সবুজ আলো। এখন রাত সাড়ে আটটা। মীরা টেবিলের সামনে বসে একটা বই পড়ার চেষ্টা করছিল। ছোট্ট ঘর। উপায় কি, এরই মধ্যে রান্না-বান্না, আহার, শয়ন সব করতে হয়। তক্তপোষ ঘরের অর্ধেক জুড়ে। তক্তপোষের নীচে রান্নার বাসন-কোসন, বস্তাভি, ট্রাঙ্ক যাবতীয় সব জিনিষ। ভাড়া তিরিশ। বাঁধু আপত্তি করেছিল, ভাড়া দিতে হবে না। মীরা ওর কথা শোনেনি। ভাড়া নিতেই হবে। নইলে ভাই এখানে থাকতে পারবো না। বাঁধু হেসেছে, বেশ তোর যা ইচ্ছে হয় দিস।

মা যেভাবে অত্যাচার শুরু করলেন, অনেক চেষ্টা সে করেছে নির্বিকার থাকতে; কিন্তু একদিন দুদিনের ব্যাপার নয়, রোজ রোজ কুশ্রী কলহ আর চিৎকার—পালিয়ে আসা ছাড়া উপায় কি। ভাগ্যিস বাঁধু ছিল। ওকে সব জানাতেই ও এক্রকম জোর করে নিয়ে এল। ভালই হয়েছে। সর্বদিক থেকে ভাল।

দোতলা বাড়ি। বাঁধু ভাই-বোনদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট। একমাত্র মেয়ে। ওর বড় দুই দাদা। বড়ভাই বিবাহিত। মধ্য-বয়স্ক গম্ভীর মানুষটি। সরকারী অফিসে ভাল চাকরী করে। ছোট ভাই বছর তিরিশের সুদর্শন যুবক। এখনও অবিবাহিত। কীসের যেন ব্যবসা না চাকরী-বাকরী কী করে মীরা সঠিক জানে না। বাপ মা অল্প কিছুদিন আগে মারা গেছেন। বাঁধুর চোখে জল এসে যায় ওর বাবা বা মার প্রসঙ্গ তুললে।

দোতলায় তিনখানা ঘর। দুখানা ঘর ব্যবহার করে বর্তমান অভিভাবক হিমাদ্রী বাবু। তার ছেলেমেয়ে বড় হয়ে উঠছে। ওদের জন্যে আলাদা শোবার ঘর দরকার। বাকি ঘরটিতে ছোট কর্তা অর্থাৎ শোভন থাকে। নীচে দুটো ঘর। বাঁধুর একখানা। অন্যখানায় সম্প্রতি মীরা এসে থাকছে। এ ঘরটায় জিনিষপত্রে বোঝাই ছিল। সব পরিষ্কার করেছে বাঁধু। তারপর চুনকাম করার পর ঘরটার চেহারা খুলেছে। বসবাস-যোগ্য হয়ে উঠেছে।

মনে মনে বাঁধুর কাছে কৃতজ্ঞ সে। মনে হয় বেশ ভদ্র একটি পরিবার। হিমাদ্রী-বাবুর স্ত্রী মাঝে মধ্যে এসে খোঁজ-খবর নেয়। হাসিমুখে কথা বলার অভ্যেস। হিমাদ্রীবাবু বা শোভন এরাও বেশ সম্মানের সঙ্গেই কথাবার্তা বলে। মীরাও অল্প কয়েকদিনের মধ্যে এদের খুব আপন-জন হয়ে উঠেছে। অন্য কোথায়ও এত অল্প সময়ের মধ্যে ঘর পেত কিনা সন্দেহ।

CENTRAL LIBRARY

তাছাড়া তার কুমারীর বেশবাস, সঙ্গে পল্টু—নানারকম সন্দেহ, প্রশ্নের সম্মুখীন, সে এক লজ্জাজনক অস্বস্তিকর ব্যাপার হয়ে দাঁড়াত। এখানে সেসব দিক থেকে নিরাপদ। বীথু বোধহয় ওদের সব জানিয়েছে। ভালই করেছে। আমি এই, তোমরা যখন সব জানলে, আর কে অশান্তিতে থাকতে দাও। মনে হয় এখানে শান্তিতে থাকতে পারবে। দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কী হয়।

এত তাড়াতাড়ি আসা হোল যে, মায়ের সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করতে পারল না মীরা। দাদা হয়তো মনে মনে বিরক্ত হতে পারে। কিন্তু সে রাত্রে হার ওইসব অশ্রাব্য গালাগালি শোনার পর ঘুম আসেনি চোখে। সারারাত নানারকম চিন্তা করেছে। নিঃশব্দে কেঁদেছে। তাকে মনে হয়েছে অত্যন্ত অসহায়, সবচেয়ে বড় শত্রু। পরদিন সকালে স্নান সেরে না খেয়ে বেরিয়ে সোজা অফিস। তারপর বীথুর সঙ্গে পরামর্শ। তখন মাথার কী ঠিক ছিল? সাতপাঁচ কথা ভাববার অবসর কোথায়? অফিসে শরীর খারাপের অজুহাতে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে বাড়ি ফিরে আসা, জিনিসপত্র গুছিয়ে পল্টুকে কোলে তুলে ট্যাক্সি চেপে সোজা বীথুদের বাড়ি। সমস্ত ব্যাপারটা কী দ্রুত ঘটে গেল! এখন ভাবলে রীতিমত অবিশ্বাস্য মনে হয়। এত শক্তি সে পেল কোথা থেকে। যাক সে কথা। দাদার কথাই সে ভাবছে। এখানে এসেছে তা প্রায় এক সপ্তাহের উপর হল। একবারও কী তার কথা মনে হয়নি? একবারটি অফিসে এসে খোঁজ-খবর কী নিতে পারতো না দাদা? সব অপরাধ কী তার?

পাশের ঘরে সরব হাসি। মীরা সমানা চমকে উঠল। বই বন্ধ করে একমুহূর্ত কী যেন ভাবল। পল্টু না খেয়ে ঘুমিয়েছে। এখন ডাকলে কান্না সুরু করবে। স্নেহদৃষ্টিতে সে পল্টুর ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

ঐ কী হাসির বহর দ্যাখ ওদের। ভাই-বোনে খুব জমিয়ে আড্ডা মারছে। মীরা দরজা ভেজিয়ে পাশের ঘরে এল। ওকে দেখে শোভন আর বীথু হাসিমুখে আহ্বান জানায়।

—নিশ্চয়ই আমাদের হাসির শব্দ শুনতে পেয়েছেন?

—পাবে না! যা বাঁদরের মত গলা তোমার! বীথু হাত ধরে টেনে খাটের উপর বসিয়ে দেয় মীরাকে। ছিমছাম ঘর। ঝকঝকে চোখ জুড়িয়ে যায়। একা থাকে। অতএব ফিটফাট রাখতে পারে। পল্টুর মত দুষ্টু ছেলে হলে সব তছনছ করে দিত।

শোভন বলল, আপনি সব সময় এত কী ভাবেন বলুন তো?

—কী আবার ভাববো। মীরা অস্বস্তিবোধ করে এ ধরনের প্রশ্নে। প্রসঙ্গ পাল্টাতে চায়। আলাপ-আলোচনা ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে না এলেই ভাল। কিন্তু শোভন কষ্ট করে এমন সব কথা জিজ্ঞেস করে যে, সে ভীষণ লজ্জায় পড়ে যায়। ঘামতে সুরু করে। তাকাতে পারে না কোনদিকে। বিশেষ করে শোভনের দিকে। নির্নিমেষে তাকিয়ে থাকে শোভন। না, অশোভন কিছু নয়। শুধু সঙ্কোচ লাগে বৈকি।

শোভন আর বীথু পরস্পরকে সুযোগ পেলে আক্রমণ করতে ছাড়ে না। তবে কোন রকম রাগারাগি হয় না। হাসি ঠাট্টার ছলে। বীথু চটে গেলে শোভন হো-হো করে হেসে ওঠে। যতক্ষণ না বীথুর মুখে হাসি ফোটে, রেহাই দেয় না ওকে। বীথুর চেয়ে অন্তত বছর পাঁচেকের বড়। কিন্তু তাই বলে গুরুগম্ভীর মর্যাদা নিয়ে বসে থাকে না। বন্ধুর মত ব্যবহার বীথুর সঙ্গে। ফলে বীথুর ইয়ার্কি অনেক সময় মাত্রা ছাড়িয়ে যায়।

—তোমার আবার মীরার মনের খবর জানবার এত কী দরকার হল? খুব যে দরদ!

—মারবো এক গাঁট্টা। শোভন বীথুর পিঠে একটা কিল বসিয়ে দেয়, ভুলে যাস কেন তোর এই বেকো ইয়ার্কি মীরাদেবীর ভাল নাও লাগতে পারে।

হাসিমুখে চুপচাপ শোনে মীরা। না, বীথুর কথায় সে মোটেই ক্ষুব্ধ হয়নি। নির্দোষ হালকা ঠাট্টা বা ইয়ার্কি সময়-বিশেষে টনিকের কাজ করে। সারাদিন অফিসে কাটিয়ে সন্ধেবেলা রোজ একা ঘরে সময় কাটাতে চায় না। ওদের দুজনের সঙ্গে হাসিগল্পে তবু যা হোক সময় কেটে যায়। বই পড়াটড়া বিশেষ তার ধাতে নেই।

শোভন হাই তোলে কয়েকবার। তারপর কব্জী উল্টে ঘড়ি দেখে দুচোখ কপালে তুলে বলে, সাড়ে নটা। চললাম।

এবার সেও উঠবে। পল্টুকে ঘুম থেকে তুলে খাওয়ানো ভারী কসরৎ। মীরা লক্ষ করল বীথু ওর দিকে তাকিয়ে মিটমিট করে হাসছে। ভ্রু কুঁচকে সে তাকাল।

—তারপর? বীথু আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুলের উপর চিরুনি চালায়। পিঠের উপর একরাশ কালো চুল। সামান্য কোঁকড়ান।

—চলি বীথু! মীরা দু-এক পা এগিয়ে থেমে যায়। একবার তাকায় বীথুর দিকে। অমন ভাবে মুখ টিপে হাসছে কেন মেয়েটা? যাক, এখন আর কথা বাড়াবে না। রাত কম হয়নি!

পরের দিন অফিসে পৌঁছে সবে টাইপ মেশিন পরিষ্কার করতে সুরু করেছে—বেয়ারা এসে জানাল ডিরেক্টর ডাকছেন। মীরা একটু অবাক। সাধারণত বারোটার আগে বড় সাহেবের ঘরে ডাক পড়ে না। নিশ্চয়ই জরুরী কোন ডিক্টেশন আছে। সে খাতা পেন্সিল নিয়ে বড় সাহেবের চেম্বারে গিয়ে ঢুকল।

—বসুন।

ফাইলের উপর মাথা নত। গম্ভীর জমাট মুখ। সেদিকে একপলক তাকিয়ে মীরা চেয়ারে বসল। কম দিন হয়নি মুখোমুখি বসে ডিক্টেশন নিচ্ছে। শুধু চোখের দিকে তাকাতে পারে না। হাতের ছোটো কাজে ফিরে যায় আর প্রতিমুহূর্তে অপেক্ষা করে কখন এঘর থেকে চলে যেতে পারবে।

অথচ সঙ্কোচ বা নার্ভাস বোধ করা একান্তই অসঙ্গত। বড়সাহেব কোনদিন কড়া চোখে বা রূঢ়স্বরে কথা বলেননি। বরং এমন ভদ্র ও রুচিবান পুরুষ খুব কম চোখে পড়েছে। তবে তার পা কাঁপছে কেন? গলা শুকিয়ে আসছে। ছিঃ! নিজেকে ধমক দিল মীরা। একটু সংযত হতে চেষ্টা কর। এত অল্পে মুষড়ে পড়লে চলবে কেন। সবাইকে ছেড়ে এসেছো সে খেয়াল আছে। সাহসে বুক বাঁধ। চাই আত্মবিশ্বাস।

—শুনুন মীরা দেবী। মিঃ কাপুর সামান্য ইতস্ততঃ করে বলেন, কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করবো। অন্যরকম ভাববেন না। প্রশ্নগুলি একটু ব্যক্তিগত।

মীরা একবার চোখ তুলে তাকাল। সত্যি, সে কিছু বুঝতে পারছে না। কোনরকম আঁচ করতে পারছে না। ব্যক্তিগত প্রশ্ন। বুক কাঁপতে সুরু করেছে। সে কিছু বলতে গিয়ে টের পেল গলা দিয়ে কোন স্বর বেরুচ্ছে না। শুধু নীরবে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল। কেননা বড়সাহেব তার মুখের দিকে তাকিয়ে।

—সুব্রত সেন বলে কাউকে চেনেন আপনি?

ভীষণ চমকে উঠল মীরা বিবর্ণ মুখে একবার বড়সাহেবের মুখের দিকে তাকাল। ঠিক এরকম প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে জানলে বোধহয় আগেই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যেত। কিন্তু উনি সুব্রতের কথা জানলেন কিভাবে! কতটুকু জানেন বড়সাহেব?

নীরব থেকে রেহাই পাবে না। সব শেষ হল। এরপর আর কী এখানে চাকরী করা যাবে? অফিসের সবাই জানবে। এসব কথা গোপন থাকে না। সবাই তাকে বিশেষ চোখে দেখবে। বিশেষ করে তার কুমারীর বেশে অফিসে আসা—ছি! সবার কাছে মাথা নত হয়ে আসবে তার। চোখ তুলে তাকাতে পারবে না। নানারকম প্রশ্ন, অযাচিত সহানুভূতি, বন্ধু সেজে অনেকে ঘনিষ্ঠ হতে চাইবে। তাকে ভাববে সহজলভ্য। আরও কত কী ভাববে কে জানে!

আবার চোখ তুলে তাকাল মীরা। বড়সাহেবের মুখে মৃদু হাসি। সঙ্গে সঙ্গে চোখ নামিয়ে নিল সে। ছি ছি! না জানি কত কী ভাবছেন উনি। কিন্তু এভাবে নার্ভাস হলে চলবে না। জবাব দেবে। প্রতিটি কথার জবাব দেবে। যদিও তা বাধ্যতামূলক নয়। স্বেচ্ছায় সে বলবে। সবাইকে ছেড়ে এসেছে। যা হয় হবে। মীরা মরিয়া।

—হ্যাঁ স্যার। লোকটাকে চিনি।

—আপনার স্বামী?

—ছিল। এখন কোন সম্পর্ক নেই।

—সম্পর্ক নেই! মিঃ কাপুর অল্প থামলেন, ডিভোর্স করেছেন?

মীরার চোখমুখ সামান্য কঠিন হয়ে ওঠে। এর কথার জবাব সে দিতে পারবে না। বোঝা যাচ্ছে সব খবর পেয়েছেন উনি। তবু খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে এই প্রশ্ন করা কেন?

—দেখা যাচ্ছে স্যার, সব জানেন আপনি। বলে মীরা একটু থমকে যায়। আঃ ভাবা যাচ্ছে না এত সাহস সে পাচ্ছে কোত্থেকে। একটু আগেও বুক কাঁপছিল। কথা জড়িয়ে যাচ্ছিল ঠোঁটে। কোনদিন এমনি সুরে বড়সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে পারবে কল্পনাও করেনি।

মিঃ কাপুরের মুখ আস্তে আস্তে গম্ভীর হয়ে ওঠে।

—দেখুন মীরা দেবী। আপনাকে এসব প্রশ্ন করার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু কয়েকটা কারণে করতে হল। মনে রাখবেন আমার সেক্রেটারী হিসেবে আপনি কাজ করছেন। সব চেয়ে আগে আমাদের কোম্পানীর সুনামের কথা ভাবতে হয়। নয় কী?

—আমি আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না স্যার। আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারের সঙ্গে কোম্পানীর সুনাম বা দুর্নাম কিভাবে জড়িয়ে যাচ্ছে। কাজ-কর্মে যদি কোন গাফিলতি দেখেন সেটা আলাদা।

—না। সেদিক থেকে কোন অভিযোগ নেই। এবার আসল প্রশ্ন। আপনি গোপন করেছেন কেন যে, আপনার স্বামী নেই। স্বামী বেঁচে থাকতেও কুমারীর পরিচয়ে চাকরীতে ঢোকা কী সম্মানজনক? এর জন্যে অফিস আপনার কাছে কৈফিয়ৎ তলব করতে পারে।

এদিক থেকে যে বিপদ আসতে পারে আগেই ভেবেছে সে। কিন্তু ভেবেছিল এই বিরাট শহরে কে কার খোঁজ রাখে। কে জানবে রজত বোসের কথা। কে জানতে পারবে যে, সে স্বেচ্ছায় স্বামীকে ছেড়ে চলে এসেছে। কার এত মাথা ব্যথা এসব ব্যাপার খুঁজে বের করবে। চোখের সামনে কত কী দেখল। অচল সিকি মোয়ানী চালাবার মত কত কী পার হয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া মনে-প্রাণে সে রজতকে অস্বীকার করে। ডিভোর্স যদিও হল না। বাবাকে অপমান করে ফিরিয়ে দিয়েছে। তবে সে কী করতে পারে? রজতের উদ্দেশ্য আস্তে আস্তে স্পষ্ট হচ্ছে। কিন্তু, দাঁতে দাঁত ঘষে, বড়সাহেব এরপর নিশ্চয়ই তাকে জবাব দেবে—এভাবে রজত তাকে হেনস্থা করতে পারবে না। না-না-না!

—আমার আর কিছু বলার নেই স্যার।

মাথা নীচু করে বসে রইল মীরা। কপালের দুপাশের রগ দপদপ করছে। উঃ কতক্ষণে সে এঘর ছেড়ে বেরোতে পারবে কে জানে। গেল চাকরীটা। তারপর?

—ঠিক আছে। আপনি এখন যেতে পারেন। কী হল? মাথা ধরেছে? বাড়ি যান—বিশ্রাম দরকার। কয়েকদিনের ছুটির দরকার হলে দরখাস্ত পাঠাবেন।

—থ্যাঙ্ক ইউ স্যার।

বাইরে এসে মীরা জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিল কয়েকবার। তারপর বুকের উপর আঁচল জড়িয়ে নিজের সিটে এসে বসল। এক চুমুক জল খেল। দুবার খুলে থাক। গেলাস রেখে বেয়ারাকে ডাক দিল।

—বীথু, ফিজিওথেরাপি একটু ডেকে দাও।

জানালার সামনে এসে দাঁড়াল মীরা। যতদূর চোখ যায়, সে শুধু সারি সারি বাড়ি দেখল। রাস্তায় জনস্রোত। পিল-পিল করে যাওয়া-আসা করছে। এখান থেকে দেখছে বামনের মত। ল্যাম্পপোস্টে লাস্যময়ী অভিনেত্রীর ছবি। হঠাৎ তার মনে পড়ল কয়েক বছর আগে সেও থিয়েটারে কয়েক মাস কাজ করেছিল। শেফালী নিয়ে গিয়েছিল। কোথায় যেন খোঁজ হারিয়ে গেল। কিন্তু তিনি অতলে ডুবে গেছে। হয়তো বিয়ে-থা করে সংসার করছে অথবা থিয়েটার লাইনেই পড়ে আছে। তবে তেমন নামধাম হলে জানতে পারত।

সে কী আবার থিয়েটার কী সিনেমা লাইনে ফিরে যাবে? মীরা কি ভেবে একটু হাসল। আজ তাকে বাধা দেবার কেউ নেই। আজ সে স্বাধীন। নিজের জীবনকে নিয়ে সে ছিনিমিনি খেলতে পারে। ছিঃ! এসব খেয়াল চাপা উচিত নয়।

বীথুদের ওখানে এসে হয়েছে নতুন ঝামেলা। পল্টুকে হিমাদ্রিবাবুর স্ত্রীর হেফাজতে রেখে আসতে হয়। কিন্তু যা দুষ্টু ছেলে, কখন কী করে বসে, ছুটতে গিয়ে হয়তো পড়ে গেল, অথবা ওদের জিনিষপত্র ভেঙে তছনছ করে একাকার—বাড়ি ফেরার পথে অসম্ভব চিন্তা তাকে পেয়ে বসে। হিমাদ্রিবাবুর স্ত্রী হাসিমুখে কথা বললেও—ছেলের অযাধাতার কথা ভেবে মনে মনে মীরা ভারী অপ্রস্তুত হয়ে ওঠে। কিন্তু এছাড়া উপায় কী? একা ওকে ঘরে রেখে আসতে পারে না। আরও বছর দুই না পেরোলে বোর্ডিংয়ে দিতে পারছে না। পল্টু এখন মস্ত সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

—ডাকছিলে মীরা?

—হাাঁ। মীরা ওর মুখোমুখি দাঁড়াল। কিছুক্ষণ দেখল বীথুকে। ওকে সব বলার দরকার নেই। অন্ততঃ এখন। জ্বল জ্বল করছে চোখ দুটো। বেশ আছে মেয়েটা। মাথার উপর দুই দাদা। মাস গেলে মাইনে। সুদর্শন প্রেমিক। হয়তো শিগ্গির বিয়ে হবে। নো প্রবলেম।

বীথু খানিকটা অবাক। ব্যাপার কী, মীরার চোখের পলক পড়ছে না। এসে দেখল জানালার সামনে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে। কাজকর্ম নেই নাকি? অথবা অন্য কিছু। ভাবতেই মনে মনে শিউরে উঠল। সেই লোকটা আবার নতুন কোন উপদ্রব শুরু করেছে কী? লোকটার সঙ্গে দেখা হলে মজা দেখিয়ে ছাড়বে। দাদাদের চূড়ান্ত করাবে।

—হাাঁ করে দেখছিস কী হাঁদারাম! মীরার ধাক্কায় ছিটকে যাচ্ছিল বীথু।

—উঃ! সামান্য মুখ বিকৃত করে মীরা বলল, শরীরটা ভাল লাগছে না। বাড়ি যাচ্ছি।

—কী হয়েছে? বীথু কপালে হাত দেয়। না, বেশ ঠাণ্ডা। কিন্তু মুখচোখ কেমন বিবর্ণ। তীক্ষ্ণ চোখে ওকে দেখল।

মীরা আর দাঁড়াতে চাইল না। বীথু অসংখ্য প্রশ্ন করবে। কথা বাড়াতে চায় না। সে দায়সারা দু' একটা কথার জবাব দিয়ে বাইরে চলে আসে। কোনদিকে না তাকিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামে। কী অস্বস্তি সহকর্মীদের কৌতুক দিকে তাকাতে! অথচ গতকাল এমন ছিল না। কোন রকমে বাড়ি পৌঁছতে পারলে হয়। দপ-দপ্ করছে সমস্ত মাথা। একটা ট্যাক্সী ডেকে উঠে পড়ল। মাথা এলিয়ে দিল সীটের উপর।

কিছুক্ষণ পর টের পেল মীরা, শুধু কপালে নয়, সমস্ত শরীরে ঘাম। বাইরে সবকিছু দ্রুত সরে যাচ্ছে। আঁচল দিয়ে মুখ মুছল সে। তার এমন সর্বনাশ কে করতে পারে সে বিষয়ে অনেক ভেবেছে। একমাত্র ওই লোকটা ছাড়া আর কারও কথা মনে পড়ছে না। হ্যাঁ, সে নিশ্চিত, রজতই বড় সাহেবকে এ-সব জানিয়েছে। অর্থাৎ শুধু পিছন পিছন অনুসরণ করা নয়, আসল জায়গায় আঘাত করেছে রজত।

বড় সাহেব জানালেন কয়েকদিন বিশ্রাম করতে। কিন্তু তারপর? চাকরী থেকে বরখাস্ত করে দেবে কী? ভাবতেই মীরার সমস্ত শরীর থর থর করে কেঁপে উঠল। চাকরী যাওয়া মানে... দাদার ওখানে ফিরে যাওয়া, আবার অনুগ্রহে বেঁচে থাকা, কেন নতুন কাজের সন্ধান, রোজ যার সঙ্গে কুশ্রী কলহ, পাঁচজনে নানান কথা বলা...। উঃ আর সে ভাবতে পারছে না!

বাড়ির সামনে ট্যাক্সী দাঁড়াতে মীরা মিটার দেখে ভাড়া মিটিয়ে টলতে টলতে অগ্রসর হয়। পল্টু কী করছে কে জানে।

শীতের ঠাণ্ডায়
গরম চা সবার প্রিয়
কেনবার সময়
অলকানন্দার এই
সব বিক্রয় কেন্দ্রে
আসবেন
অলকানন্দা টি হাউস
৭ পোলক স্ট্রীট : ২ লালবাজার স্ট্রীট,
কলিকাতা-১
৩৮ চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-১২

ওর জন্যে বাইরে কাকে মন দিতে পারে না। তালা খুলে ঘরে ঢুকল। ঘটুরা টেবিলের উপর রেখে কি ভেবে একবার আয়নার সামনে দাঁড়াল। তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছল। পাউডারের পাফটা সামান্য মুখে বুলিয়ে মাথায় চিরুনি চালাল। তারপর দরোজা বন্ধ করে বাইরে এল।

সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে ঘরে ঢোকার আগে মীরা মৃদু স্বরে ডাকল, পল্টু।

—ঘুমিয়েছে। ভেতরে এসো।

পল্টু ঘুমোলে ওকে বড় শান্ত দেখায়। ওর দিকে এক পলক তাকিয়ে মীরা মৃদু হাসল, আমি বরং পরে আসবো বৌদি। আপনি বিশ্রাম করুন।

অনুভা চিৎ হয়ে শুয়ে। সখেদে বলল, আর বিশ্রাম। দেখছো না কী অবস্থা। মস্তুর আসছে পেটে! ছি! ছেলেমেয়ে বড় হয়ে উঠেছে—ওদের সামনে হাঁটা-চলা করতে বড় লজ্জা। দাঁড়িয়ে কেন বস মীরা। আজ এত তাড়াতাড়ি ফিরলে?

মাঝে মাঝে অনুভা অদ্ভুত এক দৃষ্টিতে ওর সর্বাঙ্গ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে। সে দৃষ্টির সামনে মাথা আপনা থেকেই নীচু হয়ে যায় মীরার। বহুক্ষণ ধরে তীব্র যন্ত্রণা। এখন একটু বিশ্রামের দরকার। বলল, ভীষণ মাথা ধরেছে বৌদি। তাই তাড়াতাড়ি ফিরে এসেছি।

—তবে আর তোমাকে বসতে বলবো না। এখানেও বিশ্রাম করতে পার। বলে খাট দেখিয়ে দিল।

ঘর জুড়ে প্রকাণ্ড খাট। ঘরটা বেশ বড়। বড় বড় জানলা। চারদিকে খোলা-মেলা। প্রচুর আলো-বাতাস আসে। অন্যের বিছানায় সে শুতে পারবে না। হিমাদ্রী-বাবুর মুখ মনে পড়ল। শান্তশিষ্ট ভদ্রলোক। অনুভা পেট ঢাকতে ব্যস্ত। আড় চোখে একবার দেখে মীরা উঠে দাঁড়াল।

একতলায় নামার সময় সিঁড়িতে শোভনের মুখোমুখি হল মীরা। মৃদু হেসে সে পাশ কাটিয়ে নীচে নামতে থাকে। ভাগ্যিস শোভন কোন কথা বলে নি। নিজের ঘরে ফিরে শাড়ি পাল্টে বিছানায় শুয়ে পড়ল। ঘুমোক পল্টু। শোভন কী চাকরী করে? বীথু স্পষ্ট করে কিছু বলে নি। বাবলে, তার অত জানবার কী দরকার। অবাঞ্ছিত কৌতূহল ভাল নয়। ভেবেছিল সিঁড়ির মাঝখানে দাঁড়িয়ে শোভন কথাটথা বলতে চাইবে।

অনেকক্ষণ বিছানায় এ-পাশ ও-পাশ করল সে। না, ঘুম নয়। ঘুমোলে শরীর আরও খারাপ লাগবে। এখন প্রায় চারটে বাজে। আধ ঘন্টা বাদে পল্টুকে নিয়ে আসবে। তারপর স্টোভ জেলে ওর জন্য খাবার তৈরী করা। এক কাপ গরম চা খেলে মাথার যন্ত্রণা কমে যাবে। অনেক কাজ পড়ে রয়েছে। কিন্তু কাল সে কী করবে? কাল বিশ্রাম করবে। সমস্ত দিন। আকাশ পাতাল ভাববে। পরশু অফিসে যাবে। দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কী হয়। এত ভাবলে সে ঠিক মরে যাবে। দুটো চোখ সজল হয়ে ওঠে। সব থাকতেও কেউ নেই তার। সবচেয়ে খারাপ লাগছে দাদার কথা ভাবতে। নাকি আপদ বিদেয় হয়েছে ভেবে চুপচাপ আছে! ওদের সুখের সংসারে সে ছিল অবাঞ্ছিত। সরে এসে ভালই করেছে। ওরা স্বস্তিতে বসবাস করুক।

এক সময় মীরা টের পেল নরম কচি কণ্ঠে কে যেন ডাকছে, মা মা! মীরার তন্দ্রা কেটে যায়। এক লাফে মেঝেতে নেমে ছুটে গিয়ে দরোজা খুলে পল্টুকে কোলে তুলে নেয়।

॥ দশ ॥

বিরাট লম্বা হলঘর। সারি সারি অনেকগুলি বেড। এখন বিকেল। বিনয় মনে মনে হিসেব করে দেখল আরও এক সপ্তাহ তাকে হাসপাতালে থাকতে হবে। বিছানায় আধশোয়া অবস্থায় সে একটা বই পড়বার চেষ্টা করল। ধেৎ! বই মুড়ে উঠে বসল। পিঠে ব্যাণ্ডেজ। ভাগ্যিস ছোরার আঘাত বুকে লাগেনি! বুকে লাগলে বাঁচতো না। দেয়াল ঘড়ি দেখল। সাড়ে চারটে। আর আধঘন্টা পরে ওরা আসবে। মা, শেফালী, বিমল—হয়তো স্কুলের দু-একজন কলীগ। ওদের জন্যে মন ছটফট করে উঠছে।

আশেপাশে যে-যার নিজের বিছানায়। ওদের সবার সঙ্গে আলাপ নেই। কেউ শুয়ে কড়িকাঠ গুনছে, কেউ বা বিস্কুট অথবা ফল খাচ্ছে। অনেকে যন্ত্রণায় অস্ফুটস্বরে চিৎকার করছে। সাদা পোষাক পরা নার্স হিলতোলা জুতো পায়ে খটখট শব্দে হেঁটে বেড়াচ্ছে। কাউকে ইনজেকশান দিচ্ছে—কারুর জ্বর পরীক্ষা করছে। বিনয় লক্ষ্য করে দেখেছে অনেকের চোখমুখে আশ্চর্য বিষাদ। এমন বিষাদের চিহ্ন হয়তো কোন কোন মুহূর্তে তার মুখেও ফুটে ওঠে। সে টের পায় না।

আবার হাসপাতাল! মনে পড়ল কয়েক বছর আগে কয়েক মাসের জন্যে তাকে হাসপাতালে থাকতে হয়েছিল। প্যারাটাইফয়েড অসুখে। অপারেশনের পর সুস্থ হয়। সেই দিনগুলি মনে পড়ে। রঞ্জনা আসতো। মীরা আসতো। নার্স অরুণার কথা মনে পড়ে। কোথায় অরুণা! হয়তো এই বিরাট শহরের কোথাও লুকিয়ে রয়েছে। অকস্মাৎ কোনদিন দেখা হয়ে যেতে পারে। দেখা হলে কী চিনতে পারবে? অরুণার জন্যে তার মনে কী আজও কোন দুর্বলতা আছে? অথচ সে-দিন...অরুণা...দাদা বৌদি...ভাবলে আজ হাসি পায়!

...চোখের সামনে ভাসছে সেই ঘটনা। বিনয় নানাভাবে ঘটনাটির বিশ্লেষণ করতে চায়। কেন এমন হ'ল! কী দরকার ছিল তার কতগুলি বখাটে গুণ্ডা ছেলের অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ করা? রাস্তায় প্রত্যেক দিন কত কী ঘটছে। কত পাপ, কত অন্যায় অবিচার চোখের সামনে ঘটে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত। পারবে কী সে এর প্রত্যেকটির প্রতিবিধান করতে? তবে সেদিন অমনভাবে গুণ্ডা ছেলেগুলির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল কেন?

গঙ্গার ধারে সে রেলিংয়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিছুক্ষণ আগে টিউশানীটা সেরে এসেছে। বাড়ি ফিরতে ভাল লাগছিল না। শেফালীর সঙ্গে কথাবার্তা বলা বা ওর সান্নিধ্য আর তেমন মোহময় লাগছে না। অথচ মনের মধ্যে চেপে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। শেফালী যেন বুঝতে না পারে। এই সব সে ভাবছিল আর দেখছিল অদূরে গঙ্গার জল চাঁদের আলোয় ঝলমল করছে। যেন সোনা গলে গলে জলের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। দূরে দূরে ছোট ছোট নৌকো, পতাকার মত সাদা পাল পত্‌পত্‌ করে উড়ছে। তন্ময় হয়ে বিনয় দেখছিল।

উৎকট হাসি আর শিসের শব্দে বিনয় বেশ বিরক্ত হয়ে তাকিয়েছিল। হাত দশেক দূরে ছোটখাট একটা জটলা। অসহায় নারী কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে। সেই সঙ্গে বীভৎস গলায় অনেকের হাসি। পাঁচ-ছটা ছেলে। একনজরে ওদের দিকে তাকিয়ে বুঝল রকবাজ ছোকরা সব। কুড়ি থেকে তিরিশের মধ্যে বয়েস। পরনে সরু প্যান্ট। কোমরে চওড়া বেল্ট।

নিতান্ত কৌতূহলবশতঃ বিনয় কয়েক পা এগিয়ে গিয়েছিল। দুটি যুবতী। ওদের চোখমুখে ভীতির ছাপ। দুজনেই কাঁপছিল। ওদের চারপাশে ছেলেগুলি। অশ্লীল মন্তব্য ছুঁড়ে মারছে মেয়েদুটির দিকে।

সব গোলমাল হয়ে গিয়েছিল বিনয়ের। স্থান কাল পাত্র বিচার করেনি। ফলাফল ভেবে দেখেনি। হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে মেয়ে দুটির উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করেছিল, কী হয়েছে?

—দেখুন না সেই তখন থেকে এই ছোটলোকগুলি পিছনে লেগেছে। এদের জন্যে কী ভদ্রভাবে রাস্তাঘাটে চলাফেরা করা যাবে না! ঘরে কী এদের মা বোন নেই?

দুজনের মধ্যে চশমা পরা ফর্সা মেয়েটি ক্রোধে ফেটে পড়ল। দু চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে বেরুচ্ছে।

বিনয় ছেলেগুলির দিকে ফিরে তাকাল। মিটমিট করে হাসছে। কী নির্লজ্জ!

অতিকষ্টে সে নিজেকে সংযত করেছিল প্রথম দিকে। বেশ ভদ্রভাবেই বলেছিল ওদের একজনকে উদ্দেশ্য করে, ছি! এ কী নীচ ব্যবহার আপনাদের। চলে যান। মেয়ে দুটিকে বিরক্ত করবেন না।

—আপনি আবার কোত্থেকে এলেন। ওদের একজন মুখোমুখি হয় বিনয়ের, ঝ্যামেলা না দেখিয়ে কেটে পড়ুন। এই তোম্বল ছুঁড়িগুলোর দিকে নজর রাখ! পালিয়ে যেতে পারে।

—ছোট লোক! ইতর কোথাকার। ফর্সা মেয়েটি নীচু হয়ে পায়ের স্যাণ্ডেল খুলে হাতে তুলে নেয়। এতটা বোধকরি মাস্তান ছেলেগুলির সহ্য হ'ল না। ওদের একজন খপ্‌ করে ফর্সা মেয়েটির হাত ধরে মুচড়ে দেয়। মেয়েটি যন্ত্রণায় চিৎকার করে ওঠে।

(ক্রমশঃ)

প্রদর্শনী পরিক্রমা

শিল্পী : সুনীল দাস

ইউ. এস. আই. এস. অডিটোরিয়ামে সুনীল দাসের জলরঙের প্রদর্শনীটি হয়ত অনেকেরই মনে আছে। খবরের কাগজের ম্যাট পেপারকে তিনি তাঁর আপন বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে ব্যবহার করেছিলেন। এবারে ৪ থেকে ১৪ ডিসেম্বর সুনীল দাস কেমুল্ড গ্যালারিতে কতকগুলি চমক দেওয়া ড্রয়িংএর প্রদর্শনী করলেন। ছোট মাপের এই ড্রয়িংগুলি তিনি বিলিতী পত্রপত্রিকার পাতার ওপর সৃষ্টি করেছেন। পাতার ছাপান অক্ষরের সারি বা রঙীন ছবিগুলি তিনি অতি নিপুণভাবে তাঁর ড্রয়িংএর ডিজাইনের অঙ্গীভূত করে নিয়েছেন। অনেক কমার্শিয়াল ড্রয়িংয়ে এ ধরনের ছবি অবশ্য দেখা গিয়েছে তবু সুনীল দাসের সুপটু হাতের ছবিগুলির রসের মূল্য তার জন্যে কমে যায়নি। মুখ এবং নরদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সাজিয়ে কিছুটা ক্যারিকেচারের ভঙ্গীতে আধুনিক জীবনের বিফলতা, ব্যর্থতা বা ধ্বংসোন্মাদনার আভাস কতকগুলি ছবিতে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। কালো কালি কখনো ঘনভাবে লাগিয়ে কখনো বা কলমের সহায়তায় বেশ সুদৃশ্য টেক্সচার তৈরী করেছেন। রঙীন ছবি ছাপা কাগজগুলির রংও খুব সুন্দরভাবে কালো ডিজাইনের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া হয়েছে। ১০ এবং ১২ নম্বরের ছবিটি এদিক থেকে খুবই চমৎকার।

*

কুমকুম মুন্সী ৪ থেকে ১২ ডিসেম্বর ম্যাক্সমুলার ভবনে ত্রিশখানির মত জল-রঙের ছবি দেখালেন। কতকগুলি ছবি বেশ লম্বা—প্যানেল ডেকরেশনের মত। বিমূর্ত রূপ ঘেঁষা কাজ—একটা মহাশূন্যে পরিভ্রমণের আমেজ রয়েছে। ঘোর নীল, সবুজ, হলদে, বেগুনী ইত্যাদি রঙের প্রাধান্য। ঘোর রঙের জমির ওপর হালকা উজ্জ্বল রঙের ছোট ছোট ফুটকি—যেন তারাভরা আকাশের ছবি। কোথাও বা বিভিন্ন জ্যামিতিক আকারের সাহায্যে ডিজাইনের মধ্যে বৈচিত্র্য আনা হয়েছে। মাঝে মাঝে টেম্পারা শাদা দিয়ে দ্রুতগতিতে রেখা টেনে প্যানেলের মধ্যে একটা গতিময়তার সৃষ্টি করা হয়েছে। তবে রবার সলিউশন ও ফটো টিন্টিং রঙ একটু একঘেয়েমি এনে দেয় বৈকি।

৫ থেকে ৭ ডিসেম্বর নৃতত্ত্ব বিভাগের রজত-জয়ন্তী উপলক্ষে কলকাতা তথ্য কেন্দ্রে একটি ছোট কিন্তু তথ্যমূলক প্রদর্শনী হয়ে গেল। চার্ট ও ফটোগ্রাফের সাহায্যে নৃতত্ত্ব বিভাগের বিভিন্ন কাজকর্মের কিছু কিছু হদিশ এখানে পাওয়া গেল। ভারতের বিভিন্ন উপজাতি ও আদিবাসীদের জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতির রূপরেখা, কলকাতা শহরের বিভিন্ন জাতির বাসিন্দা ও তাদের জীবনযাত্রার ধরণ ইত্যাদি বহু জ্ঞাতব্য তথ্য দিয়ে প্রদর্শনীটি আকর্ষণীয় করবার চেষ্টা করা হয়। দর্শকদের আগ্রহ দেখে মনে হল এঁদের প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছে।

*

৪ থেকে ১০ ডিসেম্বর অ্যাকাডেমি অব্ ফাইন আর্টসে 'ওয়ার্ল্ড অব বুকস্ ৭০' প্রদর্শনীটি পুস্তককীটদের প্রচুর তৃপ্তি দিয়েছে। নানা বিষয়ের বিভিন্ন ধরনের বইয়ের মধ্যে শিল্পসংক্রান্ত বইগুলি শিল্পী ও শিল্পরসিকদের বিশেষ আকর্ষণের বস্তু হয়েছিল। প্রাচীন যুগ থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত শিল্পের ক্রম-বিকাশের মোটামুটি রূপরেখা এই বইগুলি দেখলেই অনেকটা ধারণা হয়। প্রাচ্য শিল্প সম্বন্ধে বই অপেক্ষাকৃত কম ছিল এবং বিখ্যাত শিল্পীদের ড্রয়িংয়ের বইয়ের সংখ্যা আরেকটু বেশী হলে ভাল হত। ভাল ছাপা বই আজকাল কলকাতার বাজারে কম আসে। এই প্রদর্শনীতে তার কিছু নিদর্শন পাওয়া গেল।

*

শ্যামশ্রী বসু ৭ থেকে ১৩ ডিসেম্বর অ্যাকাডেমি অব্ ফাইন আর্টসে ৯ খানি পেন্টিংয়ের প্রদর্শনী করলেন। ছবিগুলি অধিকাংশই লম্বা ডেকরেটিভ প্যানেল হিসেবে তৈরী করা হয়েছে। মানুষের দেহকে প্যানেলের ডেকরেশনের অঙ্গ হিসেবে ব্যবহার করে 'শিলুয়েস অব লাইফ', 'আগনি অ্যাণ্ড এক্সটেসি', 'এক্সপ্লোডেড মিথ' ইত্যাদি নানারকম নাম দেওয়া হয়েছে। মোটামুটি বাদামী, কালো, হাল্কা হলুদ বা সামান্য একটু নীলের ছোপ ব্যবহার করে শিল্পী একটু গাঢ় রঙের ছবি তৈরী করেছেন।

কলকাতা তথ্য কেন্দ্রে ১ থেকে ১৬ ডিসেম্বর শুক্তিশুভ্রা বন্দ্যোপাধ্যায় ১৬ খানি জলরং, টেম্পারা ও গ্রাফিক্সের প্রদর্শনী করলেন। প্রথাগত ভারতীয় রীতির সঙ্গে আধুনিক ডিজাইনের একটা সংমিশ্রণ আনবার চেষ্টা করা হয়েছে। ছবির জমিকে কয়েকটি জ্যামিতিক ভাগে ভাগ করে ভারতীয় মিনিয়েচারের ফিগার ও গাছপালা দিয়ে ছবিটি সাজানো হয়েছে। কোথাও বা ছবির অন্তর্গত স্থাপত্যের অংশটি সরল জ্যামিতিক গঠনের মত করে তৈরী করে তার এক কোণে ফিগার বসানো হয়েছে। ফলে 'ড্রীম প্যালেস', 'ম্যাজিক প্যাভিলিয়ন', 'এনচান্টেড ক্যাসল' ইত্যাদি ছবিগুলির একটা বিশিষ্ট রূপ এসেছে। অবশ্য শিল্পীর হাত এখনো যথেষ্ট পাকেনি এবং রঙের ব্যবহার এখনো যথেষ্ট পরিণত নয়। তবে ছবিগুলির মধ্যে কিছু সম্ভাবনা দেখা গেল যার জন্য তাঁকে উৎসাহ দেওয়া প্রয়োজন।

*

সোসাইটি অব কন্টেম্পরারি আর্টিস্টস-এর বার্ষিক প্রদর্শনী বিড়লা অ্যাকাডেমিতে ৯ থেকে ২০ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হল। এবারে ষোলজন শিল্পী এতে অংশগ্রহণ করেন। স্কেচ, ড্রইং, পেন্টিং ও ভাস্কর্য নিয়ে প্রদর্শনীটি বেশ সুসজ্জিত হয়েছিল। জলরঙের ছবির মধ্যে শ্যামল দত্তরায়ের 'ল্যাণ্ডস্কেপ' ছবিটি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। অল্প রঙের ব্যবহারে অনেকখানি স্পেস তৈরী করেছেন। তাঁর অন্য দুটি ছবি তাঁর পুরাতন রীতি অনুযায়ী সুঅঙ্কিত কাজ। ধীরাজ চৌধুরীর নিসর্গ দৃশ্যাভিত্তিক অ্যাবস্ট্রাকশন সুগঠিত হলেও একটু চকচকে এবং যেন কিছুটা কমার্শিয়াল কাজ ঘেঁষা। অনিলবরণ সাহা তাঁর পূর্বের রীতির মত লোকশিল্পের ফর্ম নিয়ে পরীক্ষা করেছেন।

*

তেলরঙের কাজে বিকাশ ভট্টাচার্য এবারে সবচেয়ে ভাল কাজ উপস্থিত করেছেন। তিনটি ছবিই সুঅঙ্কিত, একটি কলাজ রীতিতে করা। তবে 'ভিজিটস' ছবিটিই সবচেয়ে ভাল লাগল। শিল্পীর স্টুডিওতে আগন্তুকদের আবছা আনা-গোনা, টেবিলের রং, তুলি, বাটি, কাগজ ইত্যাদির একটি চমৎকার স্টিল লাইফ। কাত্যায়ন শাহনাজের সুররিয়ালিস্টিক কাজ তেমন জমেনি। তবে তাঁর 'ফ্লোরো' ও 'গেস্ট রাইড' ইন্টারেস্টিং কাজ হয়েছে। লক্ষ্মীপ্রসাদ সাহুর সাদা কালোর অ্যাবস্ট্রাক্ট ড্রইংগুলি বাহুল্যবর্জিত পরিচ্ছন্ন কাজ। মনু পারেখের তিনটি পেন্টিং এবারে ভিন্ন ধরনের। সাদা ক্যানভাসে কিছুটা সাদা কালো ব্রাশিং কিছুটা রঙের ছোঁয়া দিয়ে সুররিয়ালিস্টিক ইমেজ তৈরীর চেষ্টা করেছেন। মনু রাঠোর ও শৈলেশ মিস্ত্রির অ্যাবস্ট্রাকশনগুলির রঙ ও প্যাটার্ন মোটামুটি মন্দ নয়। রাতের অন্ধকারে বন্দী গাছের ছায়ার চিত্র দিয়ে সুহাস রায়ের 'ডেসপেয়ার' ছবিটি তৈরী। ঘোর কালো ও একটু সবুজ নিয়ে তিনি কাজ করেছেন। তবে বড় ছবি মিনিয়েচারের মত ফিনিশ করার চেষ্টা আংশিকভাবে সফল হয়েছে। সুনীল দাস তাঁর আগের স্টাইলে বিভিন্ন প্রতীক চিহ্ন নিয়ে তিনটি পেন্টিং দিয়েছেন। অনাবারের তিনখানি ইন্টাগ্লিওর মধ্যে ৩৫ নম্বরের কাজটি ভাল লাগল। রঘুনাথ সিংহের তিনখানি অ্যাবস্ট্রাক্ট ভাস্কর্যে রঙীন সেরামিকসের ব্যবহার এবারে খুব সংযত। ধর্মনারায়ণ দাশগুপ্ত তান্ত্রিক প্রতীকচিহ্ন নিয়ে তিনখানি কম্পোজিশন তৈরী করেছেন, তাঁর আগের কাজের থেকে বেশী কিছু পরিবর্তন হয়নি। গণেশ পাইনের তিনখানি টেম্পারা প্রদর্শনীর বিশেষ আকর্ষণ। তার মধ্যে 'অন দি ব্যালকনি' ছবিটি সূক্ষ্মতা এবং আবেদনের দিক দিয়ে বোধ হয় সবচেয়ে আকর্ষণীয়। অবনীন্দ্রনাথের 'দর্শন দরবাজাতে আলমগীর' ছবির কথা মনে পড়ে কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গী একেবারে আধুনিক। 'আণ্ডার দি রেড ক্লাউড' রোমান্টিক ছবি এবং রঙও মধুর। 'মাদার অ্যান্ড চাইল্ড' তিনি বলোনা ও কুক এই বিষয়বস্তু নিয়ে কাজ করেছেন। সাহসের কাজ। রঙ অনেক গভীর। মিনিয়েচারের সঙ্গে আধুনিক রীতির বর্ণপ্রয়োগের একটা সামঞ্জস্য তৈরী করতে চেয়েছেন। ছবির বাঁদিক ঘেঁষে ঊর্ধাধঃ সাদা ডিজাইনটি ছবির সুসম্বদ্ধতা ব্যাহত করেছে বলে মনে হল। তবু এবারকার প্রদর্শনীতে গণেশ পাইন ও বিকাশ ভট্টাচার্য নিঃসন্দেহে রসোত্তীর্ণ শিল্পসৃষ্টি করেছেন বলা যেতে পারে।

*

স্টেটসম্যান অফিসের সামনে শিল্পী অশোক সাহা ২৫ নভেম্বর থেকে ১৫টি স্কেচের প্রদর্শনী করেন। স্কেচগুলি মাপে বড় এবং সমাজের অবহেলিত মানুষের দুঃখদুর্দশার ছবিই তাঁর কাজের বিষয়বস্তু। বেশীর ভাগ ছবিতেই দুটির বেশী ফিগার নেই। তাও পূর্ণাঙ্গ নয়। পথের ভিখারী, অনশনক্লিষ্টা মাতা ও সন্তান ইত্যাদি বিষয় নিয়ে কয়েকটি ছবি মন্দ নয়—তবে ক্রাফটসম্যানশিপ আরো উন্নতির সম্ভাবনা রাখে।

৩০ নভেম্বর থেকে ৬ ডিসেম্বর অ্যাকাডেমির পশ্চিমের গ্যালারীতে বাসন্তী সেন, পেগী সাটো ও মরিস সেলিম সর্বসমেত ৩১ খানি ছবির প্রদর্শনী করলেন। বাসন্তী সেনের কাজগুলি প্রধানত স্টিল লাইফ ও নিসর্গ দৃশ্য এবং বিশেষত্ব বর্জিত। একটি স্টিল লাইফ-এর মধ্যে কিছুটা রঙের বৈচিত্র্য এনেছে। পেগী সাটোর কাজগুলি হল প্যাস্টেল ও কালি ড্রইং। প্রধানত নগ্ন মূর্তি স্টাডি—দু' একটি প্রতিকৃতি ড্রয়িংও আছে। সাবলীল রেখার আটসাঁট ড্রয়িং। ৪ ও ৮ নম্বরের নুড উল্লেখ করার মত। মা ও শিশুর ড্রয়িংটিতে অল্প প্যাস্টেলের ব্যবহার ও দ্বিধাহীন রেখাপাত প্রশংসনীয়। মরিস সেলিম-এর ছোট তেল রঙের কাজগুলি গতবারের মত। আধুনিক প্রিমিটিভিজমের ছাপ তাঁর কাজে স্পষ্ট। সমান ওজনের রেখা রঙের ব্যবহারে ছোট ছবিগুলির ফ্ল্যাট প্যাটার্ন পরিস্ফুট। তাঁর সব ছবিই হয় নিসর্গ দৃশ্য, নয় নগরের ছবি। এর মধ্যে 'টেরেস', 'দি চার্চ অ্যাট আটিটলান' বিশেষভাবে ভাল লাগে। হরিদ্বারের ঘাটের একটি ছবিও কম্পোজিশনের সারল্যে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অন্যান্য ছবিতে দাবার ছকের মত ঘর কাটা প্যাটার্নের ব্যবহার কিছুটা একঘেয়েমির সৃষ্টি করলেও রঙের বাহারে দৃষ্টিকে ধরে রাখার ক্ষমতা রাখে।

*

নীরদ মজুমদারের 'শেষ বসন্ত' সিরিজের ১০ খানি ছবির প্রদর্শনী অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে অনুষ্ঠিত হল। মহাভারতের পাণ্ডু রাজার অভিশাপ ও মাদ্রীর ক্রোড়ে মৃত্যু তাঁর ছবিগুলির বিষয়বস্তু। তবে নিছক ইলাস্ট্রেশন হিসেবে ছবিগুলি উপস্থিত করা হয়নি। একটা বিষয়কে যেন আলাপ ও বিস্তারের সাহায্যে তুলে ধরা হয়েছে। ক্যালিগ্রাফি এবং পেন্টিং প্রতিটি ছবিতেই সুসংবদ্ধ ও সুগঠিত ডিজাইন রূপে উপস্থিত করা হয়েছে। একদিকে যেমন ঘূর্ণমান চক্রের মত ডিজাইনে বৈচিত্র্য ও একতার সংঘটিত হয়েছে তেমনি রঙের মোজাইক ছবির নাটকীয়তাকে সাহায্য করেছে। যদিও ছবিগুলি একটি সিরিজের ছবি তবু প্রতিটিই স্বয়ংসম্পূর্ণ। ব্যক্তিগতভাবে রঙ ও গঠন পরিপাট্যে 'বসন্ত', 'মোহ', 'বাসনা' ও শেষ ছবিটি বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছে। প্রদর্শনী ২৮ নভেম্বর থেকে ৫ ডিসেম্বর খোলা ছিল।

অশ্বারোহণ মেয়েদের প্রাত্যহিক দেহচর্চার অঙ্গ

অঙ্গনা

নতুন এক শিক্ষাজগৎ

ছোট-ছোট দুঃখ-বেদনা কোন-কোন সময় বিরাট ব্যাপ্তি লাভ করে। নিজের নিঃসঙ্গতা এবং হারানোর বেদনা তখন এক নতুন রূপে আত্মপ্রকাশ করে। সেই রূপের মধ্যেই সব হারানো বিরাট প্রাপ্তিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এমনি ধরনের ঘটনা সাধারণত গল্প-উপন্যাসেই বেশী ঘটে। বাস্তবত জীবনে দৈবাৎ। জয়পুরের বনস্থলী বিদ্যাপীঠ এমনি দৈবাৎ ঘটনার একটি,—সম্পূর্ণ ব্যক্তিজীবনের হারানো এবং নিঃসঙ্গতা-প্রসূত।

রাজস্থানের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হীরালাল শাস্ত্রীর আদরের মেয়ে শান্তি বাঈ। রাজকার্যের হাজারো ব্যস্ততা এবং ঝামেলার মধ্যেও বাড়িতে তার পরম আনন্দের উৎস সেই মেয়ে। মেয়েকে নিয়ে তাঁর কল্পনা জাল মেলে। কিন্তু মেয়ের যখন মাত্র বার বছর বয়স তখন মৃত্যু এসে তাকে অকস্মাৎ ছিনিয়ে নিল। শোকে-বেদনায় মুহ্যমান হয়ে পড়লেন হীরালাল শাস্ত্রী। মেয়ের মৃত্যুতে তাঁর সব আশা যেন অবশ হয়ে গেল। জীবন হয়ে গেল বিস্বাদ। মেয়ের মৃত্যুর ভাবনায় তিনি যখন গভীরভাবে অভিভূত তখন তিনি এক নতুন বোধে উজ্জীবিত হলেন। তিনি ভাবলেন, শান্তি বাঈ মারা গেছে। মৃত্যু নির্মম এবং নিষ্ঠুর সত্য। একা বেদনা এবং দুঃখে নিজেকে ডুবিয়ে রাখা কোন সান্ত্বনা নয়। কারণ, যে গেছে সে আর আসবে না। কিন্তু এরকম অসংখ্য শান্তি বাঈ তো আমাদের দেশে আছে। যদি তাদের জন্য শান্তি বাঈয়ের মত শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায় তবে এই বেদনা যেমন তার কাছে নতুন-রূপে প্রতিভাত হবে তেমনি এক শান্তি বাঈকে তিনি খুঁজে পাবেন অসংখ্যের মধ্যে।

যেমনি ভাবা তেমনি কাজ। তিনি গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। মেয়ের চিরতরে হারিয়ে যাওয়ার বেদনাকে ভুলবার জন্য যে পথের সন্ধান তিনি আপন অন্তরে উপলব্ধি করেছেন, সেই মতো কাজ শুরু হয়ে গেল। প্রায় জন-ছয়েক মেয়েকে তিনি বেছে নিলেন শান্তিবাঈয়ের স্মরণ পর্বের জন্য। এমনি করে মেয়েদের সংখ্যা ক্রমে বাড়তে লাগলো। তিনি তাদের সকলের শিক্ষার বন্দোবস্ত করলেন। তারপর ১৯৩৫ সালের অক্টোবর বনস্থলীতে স্থাপিত হলো শান্তি বাঈ শিক্ষা কুটির। ছোট-ছোট মাটির ঘরে মেয়েরা পড়াশোনা করতো। কর্মী ছিল মাত্র দুজন। কিন্তু তাতেই কি বিরাট উৎসাহ-উদ্দীপনা। হীরালাল শাস্ত্রীর হাসি-খুশি অন্তর্গুলি দেখে দেখে নিজের মেয়ের কষ্ট ভুলতে তার বেশী সময় লাগে না।

১৯৭০ সালের ১০ ডিসেম্বর উদ্‌যাপিত হলো এই বিদ্যাপীঠের ৩৫তম প্রতিষ্ঠা উৎসব। উৎসবে সভাপতিত্ব করলেন রাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পি এল ভাটনগর। সেই সূচনা থেকে আজকের বিশাল রূপের প্রতিটি সিঁড়ি তিনি উপস্থিত সকলকে স্মরণ করিয়ে দিলেন। শান্তি বাঈ শিক্ষা কুটির যা পরবর্তীকালে রূপান্তরিত হলো

চুলের রহস্য

চুল নিয়ে আমাদের বড়ো জল্পনা। কেউ কেউ মনে করেন, চুলের পরিচর্যায় তেল অপ্রয়োজনীয়। কিন্তু পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, চুলের-জন্য সব সময়ই প্রয়োজন। এক্ষেত্রে দুর্ভাবনার হাত থেকে বাঁচাতে এগিয়ে এসেছে লিওরের 'আমলক হেয়ার অয়েল'। বিশুদ্ধ আমলক তেল থেকে এ জিনিষ তৈরি। সেই সঙ্গে রয়েছে চুলের স্বাস্থ্যের প্রয়োজনীয় খনিজ উপাদান। সবচেয়ে বড়ো কথা যে, এ তেল ব্যবহারে খুস্কীজনক উৎপাদনকারী 'সেবোরিয়া' একেবারে নির্মূল হয়।

আবার যাঁরা চুল শুকনো রাখতে চান, তাঁরা রাতে এই তেল আর সকালে লিওরের আইম শ্যাম্পু ব্যবহার করুন। এই শ্যাম্পুতে চুলের চিটচিটে ভাব এবং ময়লা পুরোপুরি সাফ হয়। সেই সঙ্গে খুস্কির হাত থেকেও নিস্তার পাওয়া যায়। তেল চিটচিটে চুলের জন্য সপ্তাহে তিনদিন আর এমনিতে একদিন চুল শ্যাম্পু করুন।

যদি কেউ একান্তই তেল রাখতে নারাজী হন তাঁরও চুলের দীর্ঘায়ুর জন্য সপ্তাহে দুদিন তেল ব্যবহার করতে হবে। তবেই চুল সম্পর্কে আপনি হবেন দুশ্চিন্তামুক্ত।

চিত্রাভিনেত্রী সিমি নিয়মিত ব্যবহার করেন লিওরের 'আমলক হেয়ার অয়েল' এবং আইম শ্যাম্পু'। তাই তাঁর চুল নিয়ে কোন ভাবনাই নেই। তাই তিনি বলেন, সবাই এভাবে চুল সম্পর্কে দুশ্চিন্তামুক্ত হোন।

বনস্থলী বিদ্যাপীঠে সেই কাহিনীটুকু তিনি উচ্চারণ করলেন পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে।

প্রতি বছর প্রতিষ্ঠা উৎসবের সময় একটি বিরাট মেলা বসে বনস্থলীতে। আশেপাশের গ্রাম থেকে নরনারী ভিড় করে আসে মেলায়। বিদ্যাপীঠের মেলায় এ সময় মেয়েরা নানা খেলাধূলো এবং নাচ-গানের আসর বসায়। দোকানপাট এবং নানা আয়োজনে মেলা হয়ে ওঠে জমজমাট। এই মেলায় অনেকটা সাদৃশ্য মেলে শান্তিনিকেতনের পৌষ মেলার। প্রতি বছর শান্তিনিকেতনের পৌষ মেলা যেমন অনেকের কাছে এক বিরাট আকর্ষণ তেমনি এই বনস্থলীর মেলার জন্যও অনেকে সাগ্রহে অপেক্ষা করে সারা বছর ধরে।

বনস্থলী বিদ্যাপীঠ শুরু হয়েছিল মাত্র জনা-কয়েক ছাত্রী নিয়ে। কিন্তু আজ এর বিশাল রূপ দেখে অবাক হতে হয়। সবশুদ্ধ ১৫৫৭ জন ছাত্রী এই বিদ্যাপীঠে পড়ছে। আর তারা এসেছে ভারতের নানা প্রদেশ থেকে। বিদেশী ছাত্রীও আছে অনেক। মৌলিক দিকেও শান্তিনিকেতন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে এর সাদৃশ্য আছে। সেখানে যেমন সারা দেশ তথা বিশ্ব মিলিত হয়েছে তেমনি এই বিদ্যাপীঠেও। নানা ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয় বনস্থলীতে। সব ভারতীয় ভাষার ছাত্রী এখানকার পড়ুয়া।

ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে কর্মীর সংখ্যাও বেড়েছে। গোড়ায় ছিল মাত্র দুজন কর্মী। ক্রমে সে সংখ্যা আশ্চর্য রকম স্ফীত হয়েছে। মোট কর্মীসংখ্যা এখন ৩৩১ জন। এ ছাড়া ২১২ জন গ্রামের লোক এখানে কাজ করে।

এদের সকলকেই স্থান দেওয়া হয়েছে বিদ্যাপীঠের গণ্ডীর মধ্যে। ১৫৫৭ জন ছাত্রীর মধ্যে ১২৪২ জন বাস করে ৮টি হোস্টেলে। এর মধ্যে সাতটি হোস্টেলের নিজস্ব ভবন গড়ে উঠেছে। শুধুমাত্র অষ্টমটির জন্য একটি অস্থায়ী ব্যবস্থা আছে। তবে শীগগিরই সেটিও স্থায়ী এবং নিজস্ব রূপ পাবে। বাদবাকী ৩১৫ জন ছাত্রী বাস করে তাদের অভিভাবকের সঙ্গে। অবশ্য বিদ্যাপীঠের গণ্ডীর মধ্যেই। তবে এদের স্থান সঙ্কুলানের জন্য আরো দুটি হোস্টেল এখুনি বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

বনস্থলী বিদ্যাপীঠের আর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল যে, এখানে কোন রকম মাইনে নেওয়া হয় না। এটা চলে আসছে সেই সূচনা থেকে। শুধুমাত্র ছাত্রীদের থাকা-খাওয়া বাবদ বাৎসরিক একটা টাকা নেওয়া হয়।

বিদ্যাপীঠের ৩৩১ জন কর্মীর মধ্যেও রয়েছেন ভারতের সব রাজ্যের প্রতিনিধি। ছাত্রীদের দিক বিবেচনা করেই কর্মীদের মধ্যেও এই সর্বভারতীয় চরিত্র রক্ষা করা হয়েছে।

কুড়ি একর জমি জুড়ে সূচনা হয়েছিল এই বিদ্যাপীঠের। কিন্তু বিরাট কর্মকাণ্ড এবং ছাত্রীদের স্থান সঙ্কুলানের জন্য ৮৭৫ একর জমি জুড়ে এখন বনস্থলী বিদ্যাপীঠ বিস্তৃত। স্বাভাবিকভাবেই এর খরচও খুব বেশী। তবে সুবিধা এই যে, কেন্দ্রীয় সরকার এবং বিভিন্ন রাজ্য সরকার থেকে এখানে অর্থ সাহায্য করা হয়। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গও রয়েছে। এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সাহায্যও আছে। চার দিক থেকে এই অর্থ সাহায্যে বিদ্যাপীঠ চলেছে সুষ্ঠুভাবে।

জলের সমস্যা এই বিদ্যাপীঠকে অনেকটা অসুবিধায় ফেলেছে। এজন্য প্রতি বছর বহু টাকা খরচ হয়। এবার হয়তো কিছুটা সুবিধা হবে এবং বিদ্যাপীঠ জলের সমস্যাকে কাটিয়ে উঠতে পারবে। নতুন পরিকল্পনার কাছেই নির্মিত হচ্ছে একটি জলাধার। এটি সম্পূর্ণ হলেই জলের সমস্যার সমাধান হবে। আর এজন্য খরচের বিরাট বহরও অনেক হ্রাস হবে।

সেই টাকা তখন খরচ করা চলবে বিদ্যাপীঠের নানা উন্নয়নমূলক কাজে এবং মেয়েদের শারীরিক চর্চা আর উৎসাহদানে। শরীর চর্চা এই বিদ্যাপীঠের একটি বৈশিষ্ট্য। প্রতিটি মেয়েকে অবশ্যই এতে অংশ নিতে হবে। যে কোন খেলায় অংশ নিয়ে নিজের শরীরকে মজবুত করে তোলার ব্যবস্থাও রয়েছে সুপ্রচুর। প্রতিদিন বৈকালিক ক্রীড়ার আসর তাই এখানে এক বিশেষ চিত্তাকর্ষক বিষয়। এরই মধ্যে মেয়েদের যা বিশেষভাবে আকর্ষণ করে তা হলো ঘোড়ায় চড়া এবং হাওয়াই জাহাজ চালানো। ভারতের আর কোন বিদ্যাপীঠে এরকম ব্যবস্থা নেই। মেয়েদের ঘোড়ায় চড়া শেখানোর জন্য বিদ্যাপীঠের ৩৩টি ঘোড়া আছে। আর হাওয়াই জাহাজ চালানোও মেয়েদের কাছে খুবই আকর্ষণীয়। শ্রীমতী যশোবন্ত কাউর ইতিমধ্যেই পাইলট হিসেবে হাত পাকিয়েছেন। শিগগিরই তিনি বিমান চালনার লাইসেন্স পাবেন। তিনি এই বিদ্যাপীঠের একজন পি এইচ ডি— ইতিহাসের অধ্যাপিকা।

অথচ আশ্চর্যের বিষয় যে, ১৯৫০ সাল পর্যন্ত এই বিদ্যাপীঠ কোন বোর্ড বা বিশ্ব-

বিদ্যালয়ের স্বীকৃতি পায় নি। তার পরই অবশ্য রাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতি লাভ করে। তারপর ১৯৫৭ সালে স্বীকৃতি লাভ করে রাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি কলেজ হিসেবে।

বিভিন্ন মনীষী এবং কৃতবিদ্য ব্যক্তি এই বিদ্যাপীঠের সংস্পর্শে এসেছেন। মহাত্মা গান্ধী এই বিদ্যাপীঠে এসেছিলেন এবং তিনি এর পরিবেশ ও শিক্ষাদর্শে একান্ত মুগ্ধ হয়ে মন্তব্য করেছেন, বনস্থলী বিদ্যাপীঠ তাঁর হৃদয়ে চিরজাগরূক থাকবে। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বিদ্যাপীঠে এসেছেন কম করেও তিনবার। শেষবার তিনি আসেন ১৯৬৩ সালে। তাঁর মন্তব্যটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য : ইফ আই হ্যাড বিন এ গার্ল আই উড কাম টু বনস্থলী ফর মাই এডুকেশন।

১৯৪৬ সালের বাৎসরিক উৎসবে সভাপতিত্ব করতে গিয়ে পট্টভি সীতারামাইয়া বলেন যে, বনস্থলী বিশ্ববিদ্যালয় হওয়ার যোগ্যতা রাখে।

বনস্থলীতে বর্তমানে স্কুল থেকে শুরু করে এম-এ, পি-এইচ-ডি, এবং জার্মান, ফরাসী ও রুশ ভাষা শিক্ষার বন্দোবস্ত আছে। মেয়েদের শিক্ষার ক্ষেত্রে বনস্থলী বিদ্যাপীঠ বিশেষ কৃতিত্বের সংগে কাজ করে চলেছে। জয়পুর থেকে মাত্র ৪৫ মাইল দূরে অবস্থিত দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এবং বৃহৎ আবাসিক বিদ্যাপীঠ বনস্থলী মেয়েদের শিক্ষার এক বিশিষ্ট কেন্দ্ররূপে সারা দেশে খ্যাতিলাভ করেছে। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের অভূতপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে এখানে। ছাত্রের ব্যক্তিত্ব বিকাশে বৈজ্ঞানিক সভ্যতার সংগে ভারতের পারমার্থিক চেতনার দীপটিও প্রজ্জ্বলিত রাখা হচ্ছে।

হীরালাল শাস্ত্রীর কন্যা শান্তি বাঈ আজ অক্ষয় হয়ে লাভ করছে এই শিক্ষা। ব্যক্তিগত শোক আজ বহুজনের আনন্দে পরিণত।

পরিবার পরিকল্পনায় নতুন উদ্যম

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পরিবার পরিকল্পনার অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। জনসাধারণের মধ্যে এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে যে ব্যাপক আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে তা সরকারী কর্মপ্রচেষ্টা ও আর্থিক সাহায্যের থেকে কম নয়। কম সময়ের মধ্যে সাধারণের বাস্তব অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য জন্মহার কমিয়ে আনার একান্ত প্রয়োজন। পরিবার পরিকল্পনার বর্তমান কর্মসূচীর লক্ষ্য আগামী দশ বারো বৎসরে প্রতি হাজারে জন্মহার ৩৯ থেকে কমিয়ে ২৫-এ আনা। নবদম্পতি বিবাহিতদের জন্য একটি বিশিষ্ট কর্মসূচীও গ্রহণ করা হয়েছে। এই কর্মসূচীর উদ্দেশ্য হলো যাতে ছোট পরিবারের আদর্শ সর্বজনগ্রাহ্যরূপে লোকে গ্রহণ করে, সঠিকভাবে প্রত্যেকে জানতে পারে কিভাবে পরিবার পরিকল্পনা করা যায় এবং এর বিভিন্ন পদ্ধতি ও চিকিৎসা যাতে সর্বত্র সহজলভ্য হয়।

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পরিবার পরিকল্পনার পরিচালন কর্তৃত্ব থাকবে কেন্দ্রের হাতে, সমস্ত ব্যয়ভার বহন করবে কেন্দ্রীয় সরকার। দেশের স্বাস্থ্য বিভাগকেও পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই কর্মসূচীর জন্য যে ৩১৫ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে তার ২৯১ কোটি টাকা নগর ও গ্রামাঞ্চলের কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে নির্বীজকরণ ও অন্যান্য ব্যবস্থাদির খাতে ব্যয় করা হবে এবং বাকি ৫৭ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও প্রচারে।

এছাড়াও রয়েছে বিদেশী সরকার এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের আর্থিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি। ইতিমধ্যে যুক্তরাষ্ট্র ১৫ কোটি টাকা দেওয়ার এক চুক্তি সই করেছে। রাষ্ট্রসংঘের শিশু-কল্যাণ সংস্থা প্রসূতি, শিশু-স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা খাতে ৫০ লক্ষ টাকা দান করবে আশা করা যাচ্ছে। নরওয়ে সরকার কর্তৃক চার কোটি টাকা দেবার বিষয়ে এখনো আলোচনা চলছে।

কর্মসূচীকে দ্রুততার সংগে সার্থকরী করার উদ্দেশ্যে এবং তাকে বৃহত্তর এলাকায় সম্প্রসারিত করার জন্য কয়েকটি নতুন কর্মপন্থার প্রবর্তন করা হয়েছে। তার মধ্যে নিবিড় জেলা প্রকল্প, প্রসূতি-কল্যাণ এবং জনশিক্ষার বিষয়ে জোর দেওয়া হয়েছে।

দেশের মোট ৩৩৫টি জেলার ৫১টিতে বাস করে মোট জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ। সেজন্য এই ৫১টি জেলায় জনশিক্ষা ও অন্যান্য সেবা কর্মের নিবিড় কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। ১৭টি জেলায় কাজও শুরু হয়েছে সেই উদ্দেশ্যে। ক্রম অর্থ সাহায্য পাওয়া গেলেই বাকি জেলাগুলিতেও কাজ শুরু হয়ে যাবে। উত্তরপ্রদেশের বারাবাঁকী এলাকায় নিবিড় কর্মসূচী অনুযায়ী কাজ চলছে এবং শীঘ্রই আরো দুটি এলাকায় অনুরূপ কাজ চালু করা হবে।

প্রতি বৎসর প্রসবের জন্য যে বিরাট সংখ্যক মহিলা হাসপাতালে আসেন সেইসব প্রসূতিদের শিক্ষাদান এবং পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে সম্যক জ্ঞান দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ৫৯টি হাসপাতালে এই কর্মসূচী ইতিমধ্যে চালু হয়ে গেছে এবং আরো ৯২টি হাসপাতালে পরবর্তী বৎসরে কাজ শুরু করা হবে।

প্রত্যেকটি পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্রে বিভিন্ন অস্ত্রোপচারের যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হবে যাতে সেখানে নির্বীজন ও বন্ধ্যাকরণ অস্ত্রোপচার এবং লুপ পরানোর কাজ করা যায়। তাছাড়া কয়েকটি সুনির্দিষ্ট হাসপাতালকে এসব যন্ত্রপাতি দেওয়া হবে।

শিশুদের এণ্টিটাইপয়েড এবং সন্তান-সম্ভবা মেয়েদের ধনুষ্টংকারের টিকা ছাড়াও পুষ্টিজনিত রক্তাল্পতা এবং ভিটামিনের অভাবহেতু রাতকানা রোগের প্রতিষেধক দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। এছাড়া শিশু-স্বাস্থ্যের উন্নতি বিষয়ে আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এই সংগে চতুর্থ যোজনাকালে কয়েকটি সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের প্রস্তাব করা হয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে বিবাহের সর্বনিম্ন বয়সকে বাড়িয়ে দেওয়া এবং গর্ভপাতের আইনের কড়াকড়ি হ্রাস। একথা এখন পরিষ্কার যে, এই পরিকল্পনার সাফল্য নির্ভর করবে একে গণ-আন্দোলনে পরিণত করার উপর। সরকার ছাড়াও অন্যান্য বেসরকারী সংস্থাগুলিকে সর্বতোভাবে এর সার্থকতায় এগিয়ে আসতে হবে। সরকারী স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ ছাড়াও কম্যুনিটি ডেভলপমেন্ট, কৃষি উন্নতি প্রভৃতি সমাজকল্যাণ কার্যে নিযুক্ত দপ্তরসমূহকে বিবাহিত জনগণকে পরিবার পরিকল্পনায় শিক্ষাদান এবং এর পদ্ধতিগুলি যাতে তারা সক্রিয়ভাবে গ্রহণ করেন সেজন্যে এই কর্মসূচীর সংগে যুক্ত করা একান্ত প্রয়োজন।

অধিকন্তু সমাজ-কল্যাণ কার্যে অভিজ্ঞতা থাকায় দেশের বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলি ছোট পরিবারের আদর্শ সম্বন্ধে শিক্ষা ও উৎসাহ দানের ব্যাপারে অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। সেদিকে লক্ষ্য রেখে এসব প্রতিষ্ঠানকে এই প্রকল্পের রূপায়ণে পরোক্ষভাবে তাদের সংশ্লিষ্ট করার প্রচেষ্টা হচ্ছে।

—[illegible]

গোয়েন্দা কবি পরাশর • প্রেমেন্দ্র মিত্র রচিত শৈল চক্রবর্তী চিত্রিত

CENTRAL LIBRARY

জলসা

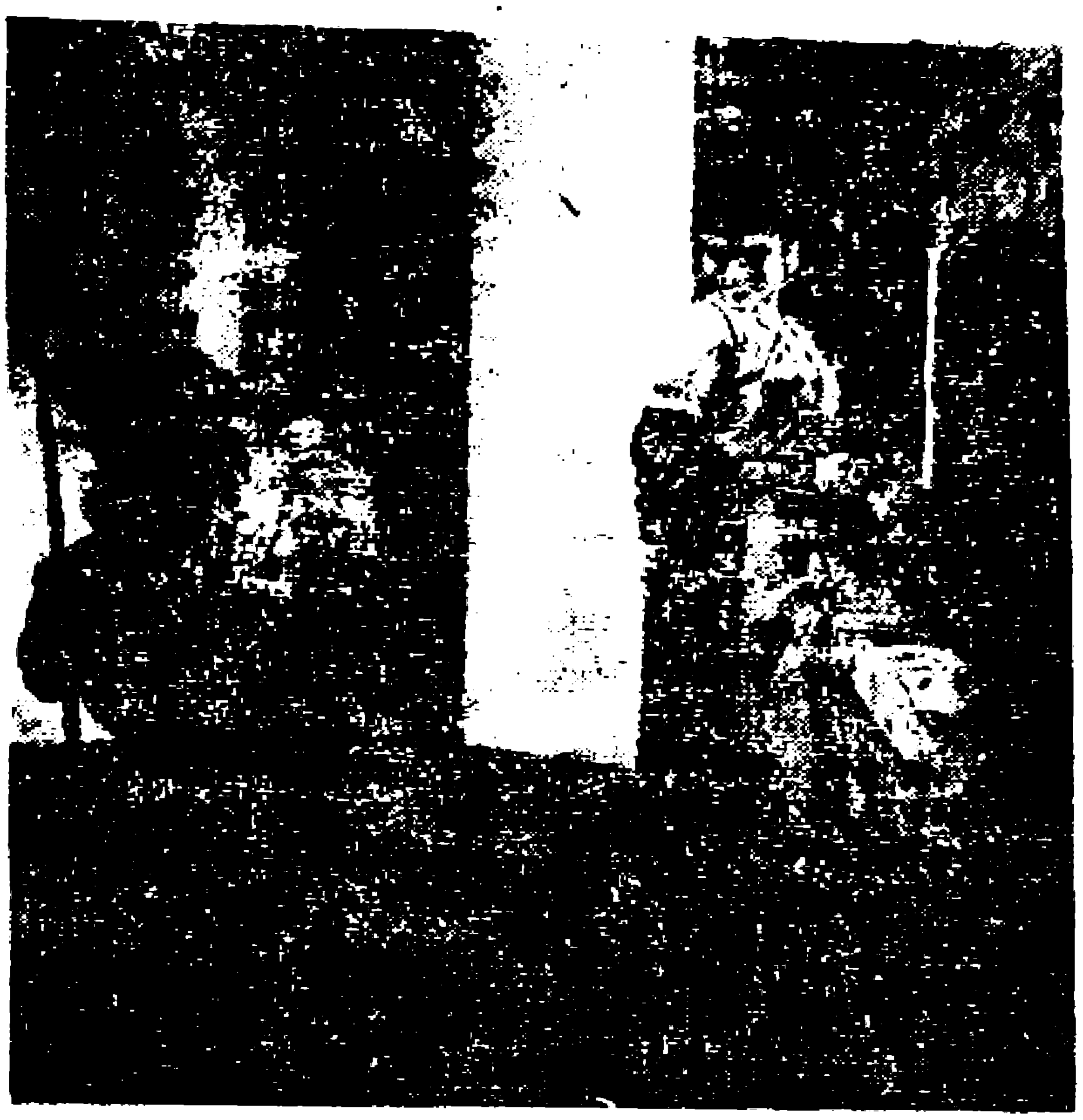

দেখে বিস্মিত হয়েছি। আজব-শহর কলকাতায় অবসর বিনোদনী আনন্দের ভুরিভোজের অভাব নেই, কিন্তু অলোক-সম্ভব প্রতিভার অসামান্য শক্তির বলে প্রতিদিনের বহু ব্যবহারে মলিন, জীর্ণ পর্দাকে এক লহমায় অপসারিত করে জীবনের আলোছায়ার লীলাকে তার বিস্ময়, আনন্দ ও উল্লাসের গৌরবলোকে বিছিয়ে দিয়ে এক দিক্‌দিশারী পটভূমিকার অন্তহীন সম্ভাবনালোক মেলে ধরেছেন সারা বিশ্বের রসিক-মহলের চির-নায়ক উদয়শঙ্কর। শঙ্করস্কোপ শঙ্করের প্রবীণ বয়সের সৃষ্টি। সৃষ্টির অন্তপ্রবাহে অন্তর্লীন যৌবনের আবেগ রঙিন স্বপ্ন। উচ্ছ্বাস-কল্লোলের বিরামহীন দোলায় প্রতি মুহূর্তই যেন রোমাঞ্চিত। আবার শুধু রোমান্স সর্বস্ব হলে এ বস্তু জনচিত্ত, সাধারণ দর্শককে আমোদ দিত। বিদগ্ধ রসিকচিত্তের আনন্দের কারণ হয়ে উঠতে পারত না।

সাংবাদিক সম্মেলনে শঙ্কর আমাদের জানান—'নাটক ও নৃত্যের সঙ্গে ম্যাজিকও থাকবে।' এ ম্যাজিক কি? এ নয় ভোজবাজি সৃষ্টির সস্তা চমক এ ম্যাজিক হোলো শঙ্কর প্রতিভার সেই ম্যাজিক স্টোন যার স্পর্শে অতি সামান্য সাধারণ ঘটনা ও বস্তু দৈনন্দিনের চিহ্নিত সীমা অতিক্রম করে কল্পনার অপরূপতায় অসামান্য হয়ে ওঠে। উদয়শঙ্করের সারা জীবনের শিল্পকীর্তি অধ্যয়ন করলে দেখা যায় প্রতিটি অধ্যায় তাঁর চিত্তের এক আশ্চর্য অভাবনীয় বিকাশ।

প্রথম যুগে প্রতিদিনের অতিজানা ঘটনা দিয়ে গড়া নৃত্যের রূপকল্পনা সারা দেশকে অভিভূত করেছে। 'কল্পনা' চিত্রে এই শিল্প ভাবনারই চিরস্থায়ী রূপ। তারপরের যুগ ছায়ানৃত্যের যুগ। ১৯৫৮তে শুভ্রশ্বেত পর্দার বুকে ছায়ার ভাষায় রাম-লীলার অপূর্ব লীলা সারা জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে, তারপরে রঙীন ছায়ানৃত্যে বুদ্ধজীবনী। আজকের যুগে প্রায় প্রতি নৃত্যানুষ্ঠানে যে ছায়া-নৃত্য প্রায় অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে সেই ছায়ানৃত্য বাংলাদেশে উদয়শঙ্করেরই অবদান।

এ যুগে আমরা পেয়েছি 'সামান্য ক্ষতি', 'প্রকৃতির আনন্দ' যার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের মনন-শীলতার সঙ্গে শঙ্করের প্রাণধর্মী স্বপ্ন-কল্পনার এক শিল্পসুন্দর মিলন ঘটেছে।

কিন্তু সুবিশাল কীর্তিসম্ভারের সামনে দাঁড়িয়েও অতৃপ্ত ক্ষেত্রের সন্ধান শঙ্কর বারবার ভেবেছেন এবার এমন কিছু করা দরকার যা কারো কল্পনাতেও আসেনি। আর এই ভাবনার ফলশ্রুতি হোলো শঙ্করস্কোপ।

শঙ্করস্কোপে নাটক, চলচ্চিত্র, ম্যাজিক, ডায়ালোগ সবই আছে, কিন্তু এ-সবের উপস্থাপনা গোঁজামিল না হয়ে যেন 'বিবাহের রঙে রাঙা হয়ে উঠে' শিল্পীর গোধূলি-লগ্নকে উদ্ভাসিত করেছে।

গভীরবোধের সহজ আলোয় দেখতে যাঁরা জানেন না শঙ্কর-স্কোপের চমকের দিকটিই তাঁদের চোখে পড়বে, আর আপাতত সংলগ্ন কাহিনীগুলি খুব একটা চমকপ্রদ মনে না হতেও পারে।

'অ্যানাউনসার আপসাইড ডাউন'-এ 'অ্যানাউন্সার অ্যান্ড সিংগার' 'লেডি অ্যান্ড দি থীফ' ইত্যাদিতে জীবনের অসঙ্গতির প্রতি যে 'স্যাটায়ার' তার মধ্যে শঙ্করের নিজস্ব ভঙ্গিটি লক্ষ্যটুকু করবার মত। এখানে 'স্যাটায়ার'-এর মধ্যে কোনো ঔদ্ধত্যের চাবুক নেই আছে শিল্পীচিত্তের অশ্রুসজল স্নেহস্পর্শের আশ্বাস।

'কার্তিকের নৃত্য' পর্দার বুকে 'কল্পনা' চিত্র থেকে নেওয়া তরুণ উদয়-শঙ্করের নৃত্য আর তারই সঙ্গে সমান্তরাল ধারায় মঞ্চশিল্পীদের নৃত্যের এমন রূপ আর কোনো শিল্পীর কল্পনায় এসেছে বলে জানা নেই। শুধু সৌন্দর্য-সৃষ্টি বিচারেই এ দৃশ্যের মূল্য নয়। যৌবনের উদয়শঙ্করকে যাঁরা দেখেননি, তাঁরা সুযোগ পাবেন সেই দেবদুর্লভ রূপের নৃত্য ও তাঁর নৃত্যসঙ্গিনী অমলাশঙ্করের 'সিম্বলিক' রূপকে উপভোগ করবার।

এ ছাড়া শিবনৃত্য। ছন্দের স্পন্দনে তিনি অনিত্য চঞ্চল রূপের অন্তরালের অচঞ্চল রূপকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। বলতে চেয়েছেন ক্ষণস্থায়ী বৈচিত্র্যের চেয়ে অনেক বড় শিল্পীর ধ্যানলোক যেখানে তিনি চিরতপস্বী। এরই এক ফাঁকে মমতা শঙ্করের ভারতনাট্যম-এ বর্ষা—কিশোর প্রতিভার উজ্জ্বল বিকাশ আমাদের মনকে নির্মল আনন্দের শরিক করেছে। কবি-গুরুর 'চণ্ডালিকা'র এক সুন্দর প্রতিচ্ছবি অভিনয় চলচ্চিত্রের সঙ্গে প্রকৃতি জননীর মন্ত্রবলে আনন্দকে বাঁধবার মগ্ননৃত্য।

সবশেষে 'বিউটি কম্পিটিসন'-এ রূপগর্বিতা সুন্দরীদের যৌবনান্তে রূপ-লাবণ্য অন্তর্ধানের চিরন্তন ট্র্যাজিডিতে কৌতুকের চেয়েও বড় হয়েছে করুণ রস। হয়ত সেই জন্যই এমন মর্মস্পর্শী। তবে এ দৃশ্য আরও একটু সংক্ষিপ্ত হলে সর্বাঙ্গসুন্দর হোত।

সর্বশেষে আলো-জলা ও নেভার তালে তালে নৃত্যশিল্পীরা যেন মানবিকসত্তা বিলীন করে স্বপ্নলোকের মায়াময় রূপ হয়ে উঠেছেন আর তাঁদের অতৃপ্ত, ক্লান্ত, অপূর্ণতা যেন আলোছায়ার রঙমশালের অনন্তে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। সবটুকু মিলিয়ে যেন একটা হয়ে উঠেছে। এ চিরধর্মিতা একান্তভাবে শঙ্করেরই।

সঙ্গীত সৃষ্টিতে সংযম ও মৌলিকতার প্রশংসনীয় নজীর সৃষ্টি করেছেন কমলেশ মিত্র।

যোকারের ভূমিকায় কেউ কেউ মোটা দাগের স্পর্শ পেতে পারেন। কিন্তু এ কথা মনে রাখা দরকার শঙ্কর কোনো বিশেষ শ্রেণীর জন্য 'শঙ্কর স্কোপ' সৃষ্টি করেননি। বিদগ্ধ রসিক-জনের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ আমোদপ্রিয় দর্শকদের কথাও তিনি মনে রেখেছেন। তাই বিভিন্ন গল্প-গুলির মধ্যে সংযোজনার্থে সংস্কৃত নাটকের সূত্রধারের মত যোকারের ব্যবস্থা করেছেন এবং রূপ দিয়েছেন কতকটা সার্কাসের জোকারের মত। ইচ্ছে করেই তার মুখে দিয়েছেন অ-পরিশীলিত ইংরাজী শব্দ। অশিক্ষিত সাধারণ লোককে যদি হঠাৎ স্যুট পরিয়ে কোনো নামী লোকের কাজের দায়িত্বভার দেওয়া যায়, তবে তার হঠাৎ পাওয়া আভিজাত্যবোধের প্রকাশ কত-খানি হাস্যকর হতে পারে, তারই উদাহরণ এই অবতারণার।

কোনো বড় গল্প কেন নির্বাচন করলেন না এ কথার উত্তরে শঙ্কর বলেছেন, 'এটা একটা এক্সপেরিমেন্ট। এক বছর ধরে কোনো বড় শিল্পীকে প্রচুর দক্ষিণা দিয়ে ধরে রাখা সম্ভব হয়নি। তাই ছোট ছোট গল্প নানান শিল্পী দিয়ে রূপ দিয়েছি। পরে একটা বড় কিছু করার ইচ্ছে আছে।'

শঙ্করস্কোপ অনেকের দিক থেকে অতুলনীয় নিশ্চয়ই, পর্দায় মানুষের পোশাকের রঙের সঙ্গে মিলে মঞ্চে বেরিয়ে আসা অথবা মঞ্চের মানুষের পর্দায় মিলিয়ে যাওয়ার লয়, তাল ও মাত্রা সময়ের একচুলও এদিক ওদিক না হওয়ার কড়া নিয়মের ডিসিপ্লিন দেখে অবাক হতে হয়। এখানে শঙ্কর নিয়মকানুনের কড়া শৃঙ্খলাকে তার প্রতিভার পরশপাথর স্পর্শে স্বাচ্ছন্দ্যে পরিণত করেছেন। শঙ্কর-স্কোপ উদ্ভাবনের আত্মপ্রকাশের প্রয়োজন ও সৌন্দর্য সৃষ্টির প্রেরণা থেকেই উদ্ভূত। আর এ স্বপ্নকে কার্যকরী করার জন্য ধন্যবাদার্হ রবীন্দ্র ভারতী কর্তৃপক্ষ।

যোগদানকারী শিল্পীরা হলেন—শান্তি বসু, সাধন গুহ, ধূর্জটি সেন, রামগোপাল ভট্টাচার্য, সুনীত বসু, দেবজ্যোতি চক্রবর্তী, লোচন দে, ওস্কার মল্লিক, তন্দ্রা চ্যাটার্জি, কে জি মেনন ও আরও অনেকে।

সঙ্গীত ও গীতিকাব্যে—কমলেশ মিত্র ও গৌরীপ্রসন্ন। সজ্জায়—পলি গুহ। চিত্র-রূপে —মহেন্দ্রকুমার। আলোকসম্পাতে—সত্যেন চ্যাটার্জি। শিল্প নির্দেশে—অমিতাভ বর্মন ও আরো অনেকে।

সুরলোকের সঙ্গীত সম্মেলন : গত ২৫—২৭ ডিসেম্বর রবীন্দ্র সরোবর মঞ্চে সুরলোকের উদ্যোগে তিনদিনব্যাপী সঙ্গীত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সঙ্গীত সম্মেলনে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত, রবীন্দ্র সঙ্গীত, নজরুল গীতি, দ্বিজেন্দ্রগীতি, পল্লীগীতি, ভজন অতুলপ্রসাদের গান ও নৃত্য পরিবেশিত হয়। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসরে কান্তি দেব 'মালকোষ' রাগে খেয়াল গেয়ে শোনান। এরপর শিল্পী গৌর বসাক প্রথমে 'বিলাসখানী' রাগে একটি বাংলা খেয়াল ও পরে একটি ঠুংরী পরিবেশন করেন। ভজনের অনুষ্ঠানই বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়। বিভিন্ন দিনে রবীন্দ্রসঙ্গীত ও অন্যান্য লঘু সঙ্গীত পরিবেশনায় ছিলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সুচিত্রা মিত্র, দেবব্রত বিশ্বাস, নির্মলেন্দু চৌধুরী, চিন্ময় চট্টো-পাধ্যায়, রবীন মুখোপাধ্যায়, গৌতম বসু, তুষার ভক্ত, সুস্মিতা রায় চৌধুরী, দীপ্তি রায়, মণিদীপা শ্যাম, মমতা ঘোষ, মধুরিমা বসু, লীলা সেনগুপ্ত, শিপ্রা ভট্টাচার্য, মনালি শীল, লক্ষ্মী গুপ্ত, শাশ্বতী গুপ্ত, সর্বাণী শ্যাম, উমা কর ও অনুরাধা বন্দ্যোপাধ্যায়। গৌর বসাকের পরিচালনায় সম্মেলক ভজন ও পল্লীগীতি এক উল্লেখ-যোগ্য অনুষ্ঠান। নৃত্যে শাশ্বতী বসুরায় ও শকুন্তলা বসুরায় সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। যন্ত্রসঙ্গীতে ও সংগতে সহযোগিতা করেন স্বপন মুখোপাধ্যায়, সুনীল দে ভৌমিক, কিশোর নন্দী, শম্ভু পাল ও দুলাল ভট্টাচার্য। সম্মেলনটি পরিচালনা করেন রবীন চৌধুরী ও সঞ্চালনায় ছিলেন হরিদাস দত্ত।

সংযুক্তা পাণিগ্রাহী

সি-এল-টির উৎসবে সংযুক্তা পাণি-গ্রাহী : সি-এল-টির পক্ষকালব্যাপী উৎসবের এক আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান ছিল ওড়িশার স্বনামধন্যা নৃত্যশিল্পী শ্রীমতী সংযুক্তা পাণিগ্রাহীর ওড়িশী নৃত্য।

১৯৫২ সালে নিউ এম্পায়ারে শিশু-শিল্পীরূপে বাংলা দেশে যে সম্ভাবনা রসিকসমাজের আনন্দের কারণ হয়েছিল নতুন বছরের ১লা জানুয়ারী অবনমহলে তারই পরিণত পুষ্পিত পরিণতি। নৃত্যরসে পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহের দর্শকচিত্তকে উদ্ভাসিত করেছে। অনুষ্ঠান শুরু হয় মঙ্গলাচরণ দিয়ে। সারা মঞ্চে অন্ধকার। মৃদু আলোক-রশ্মি সহসা এসে প্রকট হল মঞ্চোপস্থিত শ্রীজগন্নাথদেবের মূর্তির ওপর। তারপরই ভৈরবী ভীমপলাশী মালকোষের বিভিন্ন রাগাভাসের সঙ্গে সঙ্গে নূপুরনিক্কণ বেজে ওঠে। ভক্তির আবেগে শ্রীমতী পাণিগ্রাহীর নৃত্যের ভাষায় বাগ্‌দেবী বন্দনা যেন মন্দিরের শুচিস্নাত পরিবেশ রচনা করে। সঙ্গীতসংগতে ছিলেন একাধারে তাঁরই শিল্পসাথী ও জীবনসঙ্গী রঘুনাথ পাণি-গ্রাহী। কণ্ঠমাধুর্য ও রাগসঙ্গীতের সাধনা-সিদ্ধ শিল্পীর গান অন্তঃপ্রবাহী রসধারার মতই সংযুক্তা পাণিগ্রাহীর নৃত্যকে সমৃদ্ধ ও অনুপ্রেরিত করেছে। এরপর 'অভিনয়' অংশে কবি ভক্ত বনামালী রচিত গীতি-কাব্যের সংগতে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা রূপায়ণ ও জয়দেব প্রমুখ অন্যান্য কবিদের দৃশ্য-স্বপ্ন। রামায়ণ ও দশাবতার নৃত্য ছিল অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণীয় অঙ্গ। শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলায় বাৎসল্য রসের চিত্রকল্পরূপ মাধুর্য আকর্ষণীয় অভিনয়ে ভাবব্যঞ্জনায় ছড়িয়ে দিয়ে শিল্পী একজন মুগ্ধস্বপ্নের বিচিত্র অধ্যায়ে। এখানে নৃত্য ও সঙ্গীতের মধুর কলহ স্পন্দ মূর্ত হয়ে উঠল। কে, কাকে হারাতে পারে এ দ্বন্দ্বে বিস্ময়কর নৈপুণ্যে অংশগ্রহণ করলেন রঘুনাথ পাণিগ্রাহী ও সংযুক্তা। সংযুক্তার মঞ্জীরে রঘুনাথগীত তানের স্বরলহরীর অনুরণন ও সংযুক্তার নৃত্যের বিভিন্নছন্দী তালের জবাবে রঘুনাথের সুরের সূক্ষ্ম-জাল বোনা—এ দুই-এর কোনটি কেমন চিত্তাকর্ষী বলা শক্ত। শুধু এইটুকুই বার বার মনে হতে লাগল একে অন্যের পরি-পূরক—'দুয়ে মিলেই এক' এবং উভয়ের সুষ্ঠু মিলন মুগ্ধকল্পের প্রাণকেন্দ্রবিন্দু। দ্বন্দ্ব মিলনেরই সোপানমাত্র। ভরতনাট্যমের আঙ্গিকের সঙ্গে ওড়িশীনৃত্যের কোমল মাধুর্য মিলে রামায়ণের বিভিন্ন চরিত্র ও দশাবতারের দশটি রূপ কখনও বহুছন্দী বীরভঙ্গিমায়—কখনও রমণীয় লালিত্যে মর্মগ্রাহী করে শ্রীমতী পাণিগ্রাহী মহা-কাব্যের বিরাট ঐতিহ্যের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করেছেন। আটতালি, এক-তালি, খেমটা-চম্পক ইত্যাদি ওড়িশীছন্দে ওড়িশার ভাবকল্পনার সঙ্গে সঙ্গে অসাধারণ লয়দক্ষতার এক অসাধারণ উজ্জ্বল নজীর যেন বাঙ্ময় হয়ে উঠেছিল। সঙ্গীতের সারল্য লক্ষ্য করবার মতো। রঘুনাথ পাণি-গ্রাহীর কণ্ঠসঙ্গীত ছাড়া উপকরণ ছিল অতি সরল—একটি সেতার, একটি বেহালা ও একটি তবলা। সারল্য ও সীমিত পরি-সরেই রাগসঙ্গীতের সীমাহীন আকাশ বিস্তৃত হয়। মালবী, গুর্জরী টোড়ি, ভীম-পলাশী, কাফি ইত্যাদি রাগের ললিত বিস্তারে ওড়িশী গীতিকাব্যের ভাষার সঙ্গে পদাবলীর সাদৃশ্যে বাংলা ও ওড়িশার মর্মভাবের ঐক্য যেন দুই দেশকে এক করে দিয়েছে। সমর চট্টোপাধ্যায়, অসিত মিত্র ও অন্যান্য সংগঠকবৃন্দ এ অনুষ্ঠানের জন্য ধন্যবাদার্হ।

—চিত্রাঙ্গদা

প্রেক্ষাগৃহ

এ দুনিয়ায় সকলেই সং

রাজকাপুর হিন্দী তথা ভারতীয় চলচ্চিত্রজগতে একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় নাম—সম্ভবত, সবচেয়ে জনপ্রিয় নাম। রাজকাপুর নির্মিত বিভিন্ন ছবি দেখবার পরে আমরা নিশ্চয়ই এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, তাঁর জীবনদর্শনের সঙ্গে বিশ্বের অন্যতম প্রতিভা বলে স্বীকৃত চার্লি চ্যাপলিনের জীবনদর্শনের বোধ করি হুবহু মিল আছে। তাঁর 'আওয়ারা' 'শ্রী৪২০'-তে যার শুরু, তারই চূড়ান্ত রূপ আমরা দেখলুম তাঁর আর কে ফিল্মস নির্মিত টেকনিকলার ছবি 'মেরা নাম জোকার'-এ।

রাজু অবশ্য চার্লির মতো পৃথিবীর বুকে চিরন্তন পথিক—সংসারবন্ধনহীন চিরন্তন পথিক নন। সংসারে তাঁর একটি বন্ধন—বিধবা শোকপীড়িতা জননী। রাজু শুনেছে, তার বাবা ছিলেন সার্কাস ক্লাউন, দর্শকদের হাসানোই ছিল তাঁর কাজ। একদিন তিনি ট্রাপিজ থেকে অসতর্কভাবে পড়ে গিয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন। দর্শকদের চোখের সামনেই তিনি যখন মারা যাচ্ছেন, তখনও পর্যন্ত দর্শকরা কিন্তু মারা যাওয়ার ভঙ্গী করছেন, এই ভেবে হেসেই চলেছে। এই মর্মান্তিক ঘটনার পরে রাজুর মা সার্কাস ক্লাউনের বৃত্তিকে বিতৃষ্ণার চোখে দেখেন এবং রাজু যাতে কোনো দিন ও-পথে পা না বাড়ায়, তার জন্যে নিজে দুঃখকষ্ট সয়ে ওকে ভালো মিশনারী স্কুলে দেন, যাতে ও ভালো শিক্ষা পেয়ে সম্মানজনক কোনো কাজের উপযোগী হয়ে ওঠে। কিন্তু বিধি বাম। বিদ্যালয়ে সভ্য, ভদ্র, বুদ্ধিমান ছাত্র বলে স্বীকৃত হওয়া সত্ত্বেও সে তার বিধবা মাকে অর্থসাহায্য করবার জন্যে পথে সঙ সেজে উপার্জন করে, এই অভিযোগে স্কুল থেকে বিতাড়িত হয়। কিন্তু এই ঘটনার আগেই সে তার প্রিয় ক্লাশ-শিক্ষয়িত্রী মেরীর প্রেমে পড়ে। কিশোর রাজু একদিন মেরীকে নদীগর্ভ থেকে সিক্তবসনে উঠে বস্ত্র পরিবর্তন করতে দেখে; মেরীর যৌবনপুষ্ট দেহ এক মুহূর্তে তাকে প্রাপ্তবয়স্ক করে তোলে: সে মেরীকে বলে : আমি এখন আর শিশু নই। মেরীর বিবাহে সে 'বেস্ট ম্যান' (বরের ঘনিষ্ঠতম বন্ধু) হিসেবে মেরীর গালে চুম্বন করবার সুযোগ পায়। এতে তার দেহমনে বিদ্যুৎ খেলে গিয়েছিল। একদিন সে তার বাবার পরিত্যক্ত যে 'ক্লাউন-ডল'টি মেরীকে উপহার দিয়েছিল 'আমিই এই ক্লাউন-জোকার' বলে, বিদায়গ্রহণের সময়ে মেরী সেটিকেই উপহারস্বরূপ ফিরিয়ে দিয়ে যায়। মেরীর নবপরিণীত স্বামী ডেভিড তাকে বলে : "তুমি একদিন বড়ো হয়ে উঠবে, কিন্তু এই ক্লাউন-পুতুলটি আজকের মতোই তারুণ্যে-ভরা প্রাণোজ্জ্বল থাকবে।" কথাটা রাজুর মনে ধরেছিল।

তাই মায়ের অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাজু শেষপর্যন্ত সার্কাসেই যোগ দিল এবং দৈবের কৌশলে ক্লাউন বা জোকারের কাজেই ভর্তি হল। এই সার্কাসে তখন ভারতীয়দের সঙ্গে রুশ খেলোয়াড়েরা একত্রে খেলা দেখাচ্ছে। রাজুর সরল হৃদয়, তার হাসাবার ক্ষমতা, ক্লাউনরূপে তার সহজাত সাফল্য রুশ-মেয়ে খেলোয়াড় মেরিণাকে তার প্রতি আকৃষ্ট করল এবং দুজনে দুজনের কাছে ঘনিষ্ঠ হবার জন্যে এক অপরের ভাষা শেখবার চেষ্টায় হিন্দী-রুশী সংক্ষিপ্ত অভিধানের আশ্রয় নিল। রাজুর পীড়িত মার মেয়েটিকে দেখে অত্যন্ত পছন্দ হল এবং কোন্ দেশের মেয়ে, তা না জেনেই ওকে পুত্রবধূরূপে দেখবার জন্যে লালায়িত হয়ে উঠলেন। যখন তিনি হঠাৎ শুনলেন, রাজুর সঙ্গে মেয়েটিও সার্কাসে কাজ করে তখন তিনি তাঁর অপটু শরীরটাকে একদিন টেনে নিয়ে গেলেন সার্কাসে। সেখানে দৈবক্রমে যখন রাজু ট্রাপিজ থেকে পড়ে গেল, তখন তাঁর হৃৎস্পন্দন চিরতরে থেমে গেল। কিন্তু ঐ শোকাবহ অবস্থাতেও রাজুকে তার দর্শক-হাসানো ক্লাউনের কাজ চালিয়ে যেতে হল। যেদিন রুশশিল্পীদের স্বদেশে প্রত্যাগমনের সময় এল, সেদিন বিমানবন্দরে মেরিণাকে বিদায় দিতে এসে তারই অনুরোধে তাকে গাইতে হল : মায় আওয়ারা হুঁ! বিচ্ছেদকে সহ্য করল রাজু কালো চশমা দিয়ে চোখকে ঢেকে।

মায়ের মৃত্যুর পরে রাজুর আর কোনো বন্ধন নেই: সে এখন সম্পূর্ণভাবে পথিক। পিতৃপরিত্যক্ত ক্লাউন-পুতুলটি তাকে ফিরে ফিরে বিদ্রূপ করে। তাই সে তাকে সমুদ্রের বুকে ছুঁড়ে ফেলে দিল; কিন্তু একটি কুকুর ক্ষিপ্রগতিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে পুতুলটিকে উদ্ধার করে ওর পায়ের তলায় ফিরিয়ে দিল। কুকুরটি মীনু-মাস্টারের—মীনু-মাস্টার সিনেমার বিজ্ঞাপন সেঁটে বেড়ায়। তিনজনে বন্ধুত্ব গড়ে উঠতে দেরী হল না—রাজু, মীনু-মাস্টার ও মোতি কুকুর। ওরা ভ্রাম্যমাণ সার্কাস দল খুলে পথে পথে ঘুরে রোজগার শুরু করল। কিন্তু সহসা একদিন খেলা দেখাতে গিয়ে মীনুর জামা ছিঁড়ে যাওয়ায় রাজু সবিস্ময়ে আবিষ্কার করল মীনু আসলে একটি মেয়ে। ক্ষেপে গেল রাজু মীনুর এই মিথ্যাচারিতায়। কিন্তু আশ্রয়হীনা নারী বিপদ এড়াবার জন্য এই মিথ্যার আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে, এই কথা ভেবে রাজু মীনাকে ত্যাগ করল না। ওরা দুজনে পথে পথে নেচে-গেয়ে উপার্জন করতে লাগল। সেখান থেকে ওরা উঠে এল স্টেজে—নাচের আসরে, যেখানে রাজুর গানের সঙ্গে মীনা নাচে। কিন্তু যেদিন উচ্চাকাঙ্ক্ষী মীনা মিঃ কুমারের সহচর্যে সাফল্যময়ী

সিনেমা অভিনেত্রী হবার পথে সানন্দে অগ্রসর হল, সেদিন রাজু তার বাবার পরিত্যক্ত 'ক্লাউন-ডল'-এর মতো নিজেকেও উপেক্ষিত, পরিত্যক্ত বোধ করল।

রাজুর এই জীবন-কথা বিবৃত হয়েছে প্রৌঢ় 'জোকার' রাজুর স্মৃতিচারণের মাধ্যমে সেইদিন, যেদিন প্রৌঢ় রাজু তার প্রিয় সার্কাসে তার জীবনের শেষ খেলা দেখাতে এসেছে। বিখ্যাত ক্লাউন বা 'জোকার' রাজু সেদিন এক হৃদ্‌রোগাক্রান্ত রোগী সেজেছে: অপর ক্লাউনেরা তাকে অপারেশন টেবিলে ফেলে তার নিয়মের অতিরিক্ত বড়ো অর্থাৎ এনলার্জড হার্ট (হৃদয়)-কে শরীর থেকে বার করে তাকে দিয়ে বলল : তোমার হৃদয়টা ক্রমে এত বড়ো হয়ে উঠছে যে, একদিন সারা জগতটাই তোমার হৃদয়ে স্থান পাবে। এটিকে সাবধানে রেখ। কিন্তু অতর্কিতে রাজুর হাত থেকে পড়ে গিয়ে রাজুর হৃদয়টি ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল: আর সেই টুকরোগুলিতে ফুটে উঠল রাজুর বাল্যের প্রথম ভালোবাসার পাত্রী, তার সেই বিদ্যালয়-শিক্ষয়িত্রী মেরীর মুখ। অমনই শুরু হল স্মৃতিচারণ। যখন শেষ হল, তখন সেই টুকরোগুলিতে দেখা গেল মীনার মুখ। 'জোকার'-রাজু ভগ্ন-হৃদয়ের এক এক করে তার হৃদয়ের টুকরোগুলোকে তার হাতের বাক্সটির মধ্যে তুলে নিল এবং বলল দর্শকদের : আমার কাহিনী এখনও শেষ হয়নি, কাহিনী চলতে থাকবে। মাঝে পনেরো মিনিট বা পনেরো মাসের জন্যে বিরতি।

ভগ্নহৃদয় রাজুর এই 'সঙ'-এর জীবনী ২৫ রীল দীর্ঘ টেকনিকালার ছবি মারফত প্রায় চারঘণ্টা ধরে দেখানো হয়ে থাকে তিনটি ভাগে। প্রৌঢ় রাজুর শেষ খেলা থেকে শুরু করে কিশোর রাজুর স্কুল-জীবনের অকস্মাৎ সমাপ্তি পর্যন্ত প্রথম খণ্ড। দ্বিতীয় খণ্ডে আছে রাজুর সার্কাসে চাকরির চেষ্টা ও ভাগ্যক্রমে চাকরি লাভ, রুশীয় শিল্পী মেরিণার সঙ্গে ভালোবাসা এবং মেরিণার স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পরে রাজুর একাকীত্ব। মীনার সঙ্গে প্রথম পরিচয় থেকে শেষপর্যন্ত তৃতীয় খণ্ড।

ছবিটিতে রাজকাপুর একাধারে নায়ক, প্রযোজক, পরিচালক ও সম্পাদক। নায়করূপে তিনি করেছেন অনবদ্য অভিনয়; তাঁর মুখে হাসি, চোখে কান্নার তুলনা নেই। প্রযোজকরূপে তিনি বিরাট ছবিটিকে করেছেন সব দিক দিয়ে নিখুঁত ও জাঁকজমকপূর্ণ। অবশ্য একটি খুঁত আছে এবং সেটি হচ্ছে ছবির দৈর্ঘ্য। দ্বিতীয় খণ্ডে মেরিণার স্বদেশ প্রত্যাগমনের পরে ভগ্নহৃদয় 'জোকার'-রাজু যদি সার্কাস-জগৎ থেকে চিরবিদায় গ্রহণের পূর্বে তার শেষ খেলার অনুষ্ঠান করত এবং স্মৃতিচারণের শেষে তার ভগ্ন-হৃদয়-খণ্ডে মেরিণার মুখকে ভেসে উঠতে দেখা যেত, তাহলে 'মেরা নাম জোকার' ছবিটি দর্শকদের কাছে হয়ে উঠত একটি অনবদ্যভাবে উপভোগ্য চিত্র।

পরিচালকরূপে রাজকাপুর প্রায় প্রতিটি ভূমিকাকে তাঁর শিক্ষায় যোগ্য মর্যাদাসম্পন্ন করে তুলেছেন, অসংখ্য জনতার দৃশ্যগুলিকে আশ্চর্যভাবে নিয়ন্ত্রিত করেছেন। এবং সম্পাদকরূপে তিনি এই সুদীর্ঘ ছবিটির গতিকেই শুধু ক্ষিপ্রতা দেননি, সারা ছবির মধ্যে বিভিন্ন রসের উপস্থাপনে একটি আশ্চর্য ভারসাম্য রক্ষা করেছেন।

প্রথম ভাগে শিক্ষয়িত্রী, কিশোর রাজু ও ডেভিডবেশে যথাক্রমে সিমি, ঋষি কাপুর (রাজের ছেলে) ও মনোজকুমার এবং ছেলের দল প্রশংসনীয় অভিনয় করেছেন। ছাত্রদের প্রতি—বিশেষ করে কিশোর রাজুর প্রতি সহানুভূতিশীল শিক্ষয়িত্রীবেশে সিমির ভাবভঙ্গী আশ্চর্য রকমে ভূমিকার উপযোগী। দ্বিতীয় ভাগে প্রীপিঙ্ক-খেলোয়াড়রূপে ধর্মেন্দ্র, রুশ-অভিনেত্রী কিশুনো রাবিয়াস্কিনা, দারা সিং, রাজকাপুর এবং রাজুর মা বেশে অচলা সচদেবের সু-অভিনয় মনোমুগ্ধকর। বিশেষ করে রুশ-অভিনেত্রীটি তাঁর সামগ্রিক সুষমায় একটি অনাস্বাদিত বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করেছিলেন। তৃতীয় ভাগে মীনুরূপে পদ্মিনী পুরুষ ও নারী, উভয়বেশেই—বিশেষ করে পুরুষবেশে যথেষ্ট আকর্ষণীয়। চিত্রপ্রযোজক মিঃ কুমার বেশে রাজেন্দ্রকুমার একটি জনপ্রিয় ব্যক্তিত্বরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়েছেন। প্রথম ভাগে স্কুলের পরিবেশ এবং মধ্যভাগে সার্কাসের পরিবেশ অত্যন্ত নিখুঁতভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ উচ্চ প্রশংসার যোগ্য। সম্মোহনী পরিবেশ সৃষ্ট হয়েছে ছবির সর্বাংশে এবং এর জন্যে সমান কৃতিত্ব দাবী করবেন আলোকচিত্র-পরিচালক রাধু কর্মকার ও শিল্পনির্দেশক এম আর আচরেকার। বিভিন্ন ট্রিক-ফটোগ্রাফীতে বাবুভাই মিস্ত্রী দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। ছবির তেরোখানি গানই সুরযোজনা ও গাওয়ার দিক দিয়ে সার্থক।

রাজকাপুরের নবতম সৃষ্টি 'মেরা নাম জোকার' দৈর্ঘ্যদোষে দুষ্ট হওয়া সত্ত্বেও বক্তব্য, অভিনয়, কলাকৌশল ও সর্বাঙ্গীণ বিরাটত্বের দিক দিয়ে ভারতের চলচ্চিত্র-ইতিহাসে একটি স্মরণীয় সৃষ্টি।

—নান্দীকর

শহরটির নাম কলকাতা / পরিচালনা : কনক মুখোপাধ্যায় ফটো : অমৃত

রঙ্গনা বিশ্বরূপার রাস্তায় সার্কুলার রোডের মোড়ে (৫৫-৬৮৪৬)

নান্দীকার

শনি ৬টায়, রবি ২॥ ও ৬টায়

তিন পয়সার পালা

১৫ই জানুয়ারী বৃহস্পতিবার ৬টায়
উত্তর কোলকাতায় প্রথম
তিনটি একাঙ্ক
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত রচিত

পূর্বরাগ

নির্দেশনা : অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়
ইয়োনেস্কোর 'লেসন' অনুসরণে
উৎপল ঘোষ রচিত

নীলিমা

চেখভের 'সোয়ান সং' অনুসরণে
অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত

নানা রঙের দিন

নির্দেশনা : অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়
অভিনয়ে : অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, কেয়া চক্রবর্তী, অজিত ঘোষ, দীপালি চক্রবর্তী, দেবী পাল, পরিমল মুখোপাধ্যায়, বীণা মুখোপাধ্যায়, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধারমণ তপাদার।

স্টুডিও থেকে

দুজন তরুণ পরিচালকের কথা মনে পড়ছে। একজন অশোক দাস, যিনি এখন 'শবরী' নামে একখানি ছবির কাজে ব্যস্ত। অপরজন সুশীল মুখার্জী, যিনি 'মেঘ কালো' ছবিখানি করেছিলেন। আপাততঃ নীরব তিনি। তবে 'আমি সিরাজের বেগম' নামে নতুন একখানি ছবি শুরু করবেন শুনেছি।

অশোক দাসের 'শবরী'র কাজ ইতি-মধ্যে অনেকটা হয়ে গেছে, কিছুদিন আগে ইলাম বাজারে আউটডোরের কাজও করে এসেছেন। এ ছবির প্রধান শিল্পীরা হলেন অনুপ কুমার, বিদ্যা রাও, সুব্রতা চট্টো-পাধ্যায়, রবি ঘোষ প্রমুখ।

ইনডোর আউটডোর সব মিলিয়ে এখন বাংলা নির্মীয়মাণ ছবির সংখ্যা বেশ আশাপ্রদ বলা যায়। গত সপ্তাহেই বহু ছবির কাজ হয়েছে। যেমন এন-টির এক নম্বরে পীযূষ বসুর 'জীবন জিজ্ঞাসা' (শিল্পী ছিলেন মন্টু ব্যানার্জী, সুনন্দা দাশগুপ্তা ও উত্তমকুমার)। এখনও চলছে। এন্-টির দুনম্বরে সলিল সেনের 'অপর্ণা' (সেটে শিল্পী ছিলেন জহর রায়, অরুণ মুখার্জী ও সৌমিত্র চাটার্জী), ক্যালকাটা মুভিটোনে শচীন অধিকারীর 'রৌদ্রছায়া', টেকনিসিয়ানে বিশ্বজিৎ প্রযোজিত অজয় বিশ্বাসের 'জীবন প্রভাত' (নায়িকা সন্ধ্যা রায়) ইত্যাদি।

সাঁইথিয়ার আউটডোরে কাজ হচ্ছে গুরু বাগচীর 'ছন্দ পতন' (অংশ গ্রহণকারী শিল্পীদের মধ্যে আছেন নন্দিনী মালিয়া, অনিল চাটার্জী, শমিত ভঞ্জ, লিলি চক্রবর্তী প্রভৃতি) ছবির; পরিচালক তরুণ মজুমদার 'নিমন্ত্রণ' ছবির আউটডোর করতে গিয়েছেন তোপচাঁচি। পরিচালক অরবিন্দবাবু কলকাতার অলিগলিতে কিছু দৃশ্য গ্রহণ করেছেন 'ধনী মেয়ে' ছবির জন্য (এ ছবির অন্যান্য চরিত্রে আছেন জয়া-ভাদুড়ী, তপেন চট্টোপাধ্যায় ও উত্তম-কুমার প্রমুখ)। পূর্ণেন্দু পত্রী তাঁর নতুন ছবি 'স্ত্রীর পত্র' ছবির কাজ করেছেন বেলগাছিয়ায় একটি বাড়ীতে। এ ছবির প্রধান কজন শিল্পী হলেন মাধবী চক্রবর্তী, রাজেশ্বরী রায় চৌধুরী, শ্যামল ঘোষ প্রভৃতি।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে বাংলা ছবির ভবিষ্যৎ বাজার একেবারে অন্ধকারাচ্ছন্ন নয়। গত বছরে অনেক গোলযোগের মধ্যেও ছাব্বিশখানা ছবি মুক্তি পেয়েছে। অনেক ছবিই ব্যবসায়িক দিক থেকে সাফল্যলাভ করেছে। আর প্রতিমাসেই একটা না একটা নতুন ছবির খবর কানে আসছে। এ খবর বাংলা ছবির মত ছোটো ব্যবসার ক্ষেত্রে কম আশাপ্রদ নয়।

সাহা ফিল্মস নামে এক নবগঠিত চিত্র-প্রযোজক সংস্থা তাঁদের প্রথম প্রয়াস হিরণ্ময় সেনগুপ্তের কাহিনী অবলম্বনে 'অর্চণা'-র প্রাথমিক কাজ শেষ করেছেন।

মৌসুমী মন / মিতা চৌধুরী এবং শিবানী বোস

সুখেন দাসের চিত্রনাট্য অবলম্বনে ছবির পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন— পীযূষ গাঙ্গুলী ও সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন—অজয় দাস।

বিভিন্ন চরিত্রে এপর্যন্ত যাঁরা নির্বাচিত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে—মাধবী চক্রবর্তী, শুভেন্দু চ্যাটার্জী, সতীন্দ্র ভট্টাচার্য, তরুণ কুমার, সুব্রতা চ্যাটার্জী, সুখেন দাস, শ্যামল ঘোষাল ও সুধীর সাহার নাম উল্লেখযোগ্য। ছবির চিত্রগ্রহণ, সম্পাদনা ও শিল্প-নির্দেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন—এ কে রেজা, রমেশ যোশী ও রবি চ্যাটার্জী।

খবরে প্রকাশ, এ মাসের মাঝামাঝি সংশ্লিষ্ট শিল্পী ও কলাকুশলীদের নিয়ে পরিচালক শ্রীগাঙ্গুলী বহির্দৃশ্য গ্রহণের জন্য ভুটানের শাসচো অঞ্চলে রওনা হবেন।

মঞ্চাভিনয়

'অন্তরাগ' : পঃ বঃ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ প্রমোদ সংস্থা, চন্দননগরের সদস্যরা গত ১১ ডিসেম্বর রঙ্গমহলে তিনকড়ি ঘোষ রচিত 'অন্তরাগ' নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করেন। দলগত অভিনয় প্রশংসার যোগ্য। স্বতন্ত্রভাবে যাঁরা সুঅভিনয় করেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন সর্বশ্রী অসীম দে, সুনীল চক্রবর্তী, বিশ্ব-নাথ মিত্র, রবি ঘোষ, পীযূষ ঘোষ, রবীন রক্ষিত, রবি মুখার্জী, স্বপন চৌধুরী ও অধীর সরকার, অন্যান্য বিভিন্ন চরিত্রে যথাযথ রূপ দেন সর্বশ্রী বিষ্ণু চট্টোপাধ্যায়, কল্যাণ চট্টোপাধ্যায়, মণি মৌলিক, মণীন্দ্র দাশ, দীপক বসু, রঞ্জিত গুহ, সুনীল ঘোষ, রামনাথ উপাধ্যায়, মনোজিৎ বিশ্বাস ও গৌরগোপাল চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। স্ত্রী চরিত্রে সুঅভিনয় করেন শ্রীমতী মায়া বসু ও তৃপ্তি দাশ। নাট্য নির্দেশনার কৃতিত্ব শ্রীপান্নালাল চট্টোপাধ্যায়ের।

স্বিবর্ণ : নাগপুর সিভিল লাইনস গভর্ণমেন্ট কলোনীর সৌখীন অভিনেতা-অভিনেত্রীগণ কর্তৃক মন্টু গঙ্গোপাধ্যায় লিখিত 'দ্বি-বর্ণ' নাটকখানি অভিনীত হয়। বিভিন্ন চরিত্রে অংশ নেন শ্রীমতী রেবা সিন্‌হা, সর্বশ্রী রমেন সিন্‌হা, রঞ্জন দাশ, অজয় সরকার, দুর্জয় অধিকারী, হৃষিকেশ ব্যানার্জী, কাজল দত্ত, আশিষ সিন্‌হা, অপরেশ মজুমদার, দেবী ভট্টাচার্য, চণ্ডী চ্যাটার্জী, প্রকাশ দাস ও রামদাস বসু রায়চৌধুরী।

ডেবসনস্ রিক্রিয়েশন ইউনিট : ডেব-সনস্ রিক্রিয়েশন ইউনিটের শিল্পীরা সম্প্রতি সরলা রায় মেমোরিয়াল হলে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'সাজাহান' নাটক মঞ্চস্থ করে অন্যান্য বছরের মতো এবারেও বলিষ্ঠ দলগত নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। নাটকটির নিরবচ্ছিন্ন গতিবেগ অটুট রাখার ব্যাপারে নির্দেশক সত্যেন গঙ্গোপাধ্যায়ের আন্তরিক প্রয়াস প্রশংসার দাবী রাখে।

'সাজাহান' চরিত্রে সার্থকভাবে রূপদান করেছেন সুখেন্দু রায়; অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্লান্ত

ষ্টারে
[শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত নাট্যশালা]
[illegible]
নাটকীয় সংঘাতে ও অভিনয়-মাধুর্যে অনুপম।
প্রতি বৃহস্পতি ও শনিবার : ৬টায়
প্রতি রবিবার ও ছুটির দিন : ২॥টা ও ৬
॥ রচনা ও পরিচালনা ॥
দেবনারায়ণ গুপ্ত
:: রূপায়ণে ::
অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, অপর্ণা
নীলিমা দাস, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়,
ভট্টাচার্য, দীপিকা দাস, শ্যাম লাহা,
বসু, বাসন্তী চট্টোপাধ্যায়,
গাঙ্গুলী, গীতা দে ও বঙ্কিম

সঞ্জয় সেন পরিচালিত সাতঘরের সংস্থার 'পারবা' নাটকের একটি দৃশ্যে আলো দাশগুপ্ত, আশীষ চক্রবর্তী, শান্তিগোপাল এবং গোপাল সিংহরায়।

কয়েকটি অত্যাশ্চর্য মুহূর্তে শিল্পীর অভিব্যক্তি হয়েছে অনবদ্য। ভাগ্যের বিপর্যয়ে পরিশ্রান্ত নায়ককে প্রাণবন্তভাবে আলোয় দর্শকের সামনে উপস্থিত করেছেন সৌমেন নাগ। সুজিত সেনের 'ঔরংজেব'ও হয়েছে একটি সংহত চরিত্রচিত্রণ। হিমানী দাশগুপ্তার 'জাহানারা' ব্যক্তিত্বে অভিব্যক্ত হয়েছে সপ্রতিভ; প্রতিমা পাল 'পিয়ারা'র ভূমিকায় সজনতাকেই উজাড় করে দিয়েছেন। দিলদার চরিত্রে অনিল সিং-এর অভিনয়ও হয়েছে সংযত ও সাবলীল। অন্যান্য ভূমিকায় ছিলেন বিজয় ভট্টাচার্য, অজয় ব্যানার্জি, মানবেন্দ্র চক্রবর্তী, কিন্তু মিত্র, পার্থ বোস, আশীষ মুখার্জি, মদন ভাণ্ডারী, নিমাই চ্যাটার্জি, গৌরীপ্রসাদ দাস, বীরেন গুহ, রঞ্জিত দাস, কুমারী মুক্তি পাল, তপেন সেন, খগেন্দ্রপ্রসাদ রায়, অমূল্য নাথ, হেমরাজ ভরদ্বাজ, চন্দ্রাণী ব্যানার্জি, রঞ্জনা রায়।

বাটের নতুন নাটক ককটেল : পাটনা থেকে: আসাম মেল ১৯৬৯ থেকে ১৯৭০ 'বিহার আর্ট থিয়েটার', যে সংস্থা আজ নাট্যজগতে বাট্ নামে সুপরিচিত, পর পর আধুনিক জীবনের নানা সমস্যা নিয়ে দশটি নতুন নাটক হিন্দী ও বাংলাভাষায় জনসাধারণকে উপহার দিয়েছেন, তাঁদের আগামী নাটক 'কক্‌টেল'। নাটকটি লিখেছেন বিহার আর্ট থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীঅনিলকুমার মুখোপাধ্যায়। আজকের যুবসমাজের যে প্রচণ্ড বিক্ষোভ তারই পটভূমিকায় রচিত হয়েছে 'কক্‌টেল' নাটক। আগামী বছরের প্রারম্ভেই নাটকটি পাটনাতে মঞ্চস্থ হবে এবং এপ্রিল মাসের ১৬ থেকে ১৮ দিল্লীর ফাইন আর্টস থিয়েটারে অভিনীত হবে।

অখিল বিহার নাট্য সম্মেলন : আসছে ফেব্রুয়ারী মাসের ২৫শে থেকে দশম বিশ্বনাট্য দিবস—২৭শে মার্চ বিহার আর্ট থিয়েটারের তত্ত্বাবধানে এক অখিল ভারত পূর্ণাঙ্গ নাট্য প্রতিযোগিতা এবং নাট্য সমারোহ অনুষ্ঠিত হবে। বিহার রাজ্যের চারটি ডিভিসনাল শহর যথা পাটনা, মজঃফরপুর, ভাগলপুর ও রাঁচীতে প্রথমতঃ আটটি করে নাটক অর্থাৎ সবসুদ্ধ বত্রিশটি নাটক প্রতিযোগিতার জন্য মনোনীত হবে। নাটকগুলি ভারতীয় সংবিধানে উল্লিখিত যে-কোনও ভাষায় এবং বিহারের জনপ্রিয় উপভাষা যথা ভোজপুরী, মৈথিলী, মগহীতে অভিনীত হতে পারে। ডিভিসনাল শহরগুলি থেকে প্রথম ও দ্বিতীয় দুটি করে নাটক রাজ্য সম্মেলনের জন্য মনোনীত হবে এবং ২০শে মার্চ থেকে ২৭শে মার্চ পর্যন্ত এই আটটি নাটক পাটনা শহরে অভিনীত হবার পর নয়টি পুরস্কার দেওয়া হবে—শ্রেষ্ঠ নাটক, শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ও শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী, দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ও শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী, শ্রেষ্ঠ পরিচালক, শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা, শ্রেষ্ঠ মঞ্চপ্রয়োগ ও শ্রেষ্ঠ আলোকসম্পাতে। এছাড়া অনেকগুলি বিশেষ পুরস্কার ও মেরিট সার্টিফিকেট সুযোগ্য নাট্যকর্মীদের দেওয়া হবে।

বিহারের সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে ২৫শে জানুয়ারীর মধ্যে প্রবেশপত্র নেওয়া হবে এবং ৩১শে জানুয়ারী যে বত্রিশটি নাটক মনোনীত হবে, তাদের নাম ঘোষণা করা হবে। এই নাট্য-প্রতিযোগিতার কর্মসূচী এইরকম : ভাগলপুরে—২৫শে ফেব্রুয়ারী থেকে ৪ঠা মার্চ, রাঁচী—২৮শে ফেব্রুয়ারী থেকে ৭ই মার্চ, পাটনা ও মজঃফরপুরে—২রা থেকে ১০ই মার্চ এবং রাজ্য প্রতিযোগিতা পাটনাতে ২০শে থেকে ২৭শে মার্চ অনুষ্ঠিত হবে। দশম বিশ্বনাট্য দিবসে একটি বিরাট থিয়েটার কর্মীদের আলোচনা-সভা (সেমিনার) হবে।

বারেন : জ্যোতু ব্যানার্জির 'বারেন' নাটকটি সম্প্রতি ব্যারাকপুরে অভিনীত হোল। অভিনয়ের আয়োজন করেছিলেন 'মন্দিরা শিল্পীদল'। জ্যোতি মুখার্জির পরিচালনায় নাটকটির বিভিন্ন ভূমিকায় অংশ নেন পতিত মুখার্জি, বেলা সরকার, জ্যোতি মুখার্জি, চন্দন তপাদার, মনোজ নাগ, স্বপ্না মুখার্জি, সুনীল বসু, শান্তি ভৌমিক, খোকন রায়, অনিল পাল, দেবাল সেন, তারক দাস।

কাল অভিনয় : গত ২৯ নভেম্বর বিশ্বরূপা মঞ্চে বেঙ্গল সার্ভিস সোসাইটির প্রযোজনায় শৈলেশ গুহনিয়োগীর 'কাল' নাটকটির অভিনয় করলেন উত্তর কলকাতার বিখ্যাত নাট্যসংস্থা যাযাবর। নাটকটির পরিবেশনায় ও অভিনয়গুণে এদিন প্রতিটি দর্শকমন জয় করেছিল। নাটকটি দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করেন সুনীতকুমার দাস। তাঁর ডেপুটির ভূমিকায় অভিনয়ও একটি অনন্য অভিনয় সাফল্য। দমফাটা এই হাসির নাটকটির মধ্যে যাঁরা অনায়াসে হাসাতে সক্ষম হয়েছিলেন, তাঁরা হলেন—কিশোর প্রামাণিক, বাসুদেব দাস, দীপক ব্যানার্জি, জয়দেব ঘোষ, কেষ্ট দে, পূর্ণচন্দ্র শীল, দীপক ব্যানার্জি, শ্রীধর চ্যাটার্জি, অজিত ঘোষ, নীলু দাশগুপ্ত, গোপালচন্দ্র ভড়, শিপ্রা সাহা ও কাজল ব্যানার্জি।

কোলকাতায় যে সকল সংস্থা নিয়মিত নাট্য প্রযোজনা করে থাকে, পাভলভ ইনস্টিটিউট নাট্য সংস্থা তার অন্যতম। এ সংস্থার বৈশিষ্ট্য শুধু মৌলিক নাটক মঞ্চস্থ করাই নয়, সেই নাটকের বিষয়বস্তুর মাধ্যমে মনস্তত্ত্বের বিশেষ একটি তত্ত্বকে জনমানসের সামনে তুলে ধরা। আজকের মানুষের রক্তক্ষরী যন্ত্রণা এক নতুন দিনের জন্ম সূচিত করছে। সেইদিন সমাগত যেদিন মানুষ প্রযুক্তিগত বিপ্লবের ফলে অনায়াসে দৈব প্রয়োজন মিটিয়ে মানসলোকের ঐশ্বর্য সন্ধানে ব্যাপৃত থাকবে, মানুষে-মানুষে, জাতিতে-জাতিতে, পুরুষে-নারীতে মহত্তর সম্পর্ক স্থাপিত হবে। সেই মূল্যমানের কাব্য, সেই যুগ-যন্ত্রণার নাটক রচনাতে এই নাট্য সংস্থার সমস্ত প্রয়াস নিবদ্ধ। ১৯৫৮ সালে এই সংস্থার প্রথম নাটক 'সম্রাট' মঞ্চস্থ হবার পর থেকেই

রবি ১০ জানুঃ ৬টা
রবীন্দ্র সরোবর মঞ্চ
শতাব্দীর হাসির নাটক
বল্লভপুরের রূপকথা
রচনা ও নির্দেশনা : বাদল সরকার
টিকিট : ১্ থেকে ৫্, ছাত্রছাত্রী ৫০ পঃ
অভিনয়ের দিন বেলা ১টা থেকে হলে

শুধু নাট্যরসিক নয়, বিভিন্ন মহলে সাড়া পড়ে যায়। সেই থেকে গেল বারো বছরে 'সম্রাট', 'মরুকণ্ঠা', 'যুগান্তর', 'একটি স্ত্রী চরিত্র', 'শিলাকমল', 'অপারেশন ফাউস্টাস' 'কলমাষপাদ নাটক' বহুবার মঞ্চস্থ হয়। 'আত্মমিক', 'অনন্বয়', 'নাটক ও ভূমিকা', 'লেনিন সরণী', 'কমম' ইত্যাদি নাটকগুলি প্রকাশিত হলেও এখনও মঞ্চস্থ হয় নি। অভিনীত ও প্রকাশিত নাটকগুলি যথেষ্ট জনসমাদর লাভ করেছে। নাটকে যেমন অভিজ্ঞ শিল্পী অংশ নিয়েছেন, তেমনি সম্পূর্ণ নবাগতও মঞ্চে অবতীর্ণ হয়েছেন। ডাক্তার এবং রোগী, ছাত্র এবং অফিসকর্মী সমান নিষ্ঠার সঙ্গে অভিনয় করেছেন।

আসছে ২৩ ও ২৪ জানুয়ারী, ১৯৭১ বিশ্বরূপা মঞ্চে সকাল দশটায় এঁরা মরুকণ্ঠা' ও 'কলমাষপাদ নাটক' দুটি মঞ্চস্থ করছেন যুগজয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে।

বিবিধ সংবাদ

একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান :

হরনাথ হাইস্কুলে সম্প্রতি রম্য ও আনন্দমুখর পরিবেশে বাগবাজার সার্বজনীন দুর্গোৎসব ও প্রদর্শনী আয়োজিত 'আকি কুপন' পুরস্কার-বিতরণী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব ও পুরস্কার বিতরণ করেন শ্রীমিহিরলাল গাঙ্গুলী। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে শ্রীসুহৃদগোপাল দত্ত উপস্থিত সকলকে স্বাগত সম্ভাষণ জানিয়ে বলেন আমি কখনও লেখাপড়া খেলা-ধুলো কিম্বা ভাগ্য পরীক্ষায় কোন পুরস্কার পাইনি। তবুও পুরস্কার বিতরণ-সভায় আমি উপস্থিত থাকতে খুব উৎসাহ বোধ করি এই কারণে যে, যাঁরা পুরস্কার গ্রহণের জন্য আসেন তাঁদের সান্নিধ্য আমাকে খুব আনন্দ দেয়। সাধারণ সম্পাদক শ্রীঅধীর চ্যাটার্জি উপস্থিত অভ্যাগতদের আপ্যায়িত করেন।

পুরস্কার গ্রহণের জন্য কলকাতা ও শহরতলীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রতিযোগীরা এসে পুরস্কার গ্রহণের সঙ্গে একটি স্নিগ্ধ মধুর সন্ধ্যার যাঁরা শরিক হন তাঁদের সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে সভাপতি শ্রীগাঙ্গুলী এই সদিচ্ছাই ব্যক্ত করেন যে শান্ত সুন্দর একটি সন্ধ্যার স্মৃতি ও রম্য পরিবেশ উপস্থিত সকলের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে দৃঢ় ও জোরদার করে বাংলার সামাজিক জীবনের আলোকবর্তিকার কাজ করবে।

আমেরিকার নীরব চলচ্চিত্র :

গেল ২১ ডিসেম্বর থেকে আমেরিকান ইউনিভার্সিটি সেন্টারে এবং ২৩ ডিসেম্বর থেকে শুরু করে ৬ জানুয়ারী পর্যন্ত ভবানীপুরের সরলাবালা মেমোরিয়াল হলে আমেরিকার নীরব যুগের যেসব চলচ্চিত্র দেখানো হয়েছে তাতে ১৯১১ থেকে ১৯২৯-এর ভিতর তোলা প্রায় পাঁচিশখানি ছবি আছে। এদের মধ্যে যেমন গ্রন্থো বিভিন্ন 'গ্রেস্টার্প' বা ম্যাকসেনেট-এর ছবি স্থান পেয়েছে, তেমনই আছে চ্যাপলিনের ছোট ছোট তিনখানি ছবি, ১৯১৬-তে তোলা 'টোয়েন্টি থাউজ্যান্ড লীগস আন্ডার সী', রুডলফ ভ্যালেন্টিনো অভিনীত 'ব্লাড অ্যান্ড স্যান্ড' (১৯২২), 'ফোর হর্সমেন অব দি অ্যাপোক্যালিপস' লন চানী অভিনীত 'দি আনহোলি থ্রী', বাস্টার কীটনের 'জেনারেল', লরেল হার্ডির ছবি, এফ ডবলু মুরনোর 'সানরাইজ', গ্রেটা গার্বো অভিনীত 'ফ্লেশ অ্যান্ড দি ডেভিল' এবং লিলিয়ান গীস অভিনীত 'দি উইন্ড'। এই আমেরিকান ছবিগুলির সঙ্গে ভারতের প্রথম পূর্ণ দীর্ঘ ছবির পরিচালক ডি জি ফালকের কিছু ছবির অংশ এবং হিমাংশু রায়ের নেতৃত্বে তোলা 'লাইট অব এশিয়া' এবং 'এ থ্রো অব ডাইস' দেখানোর ব্যবস্থা করে ব্যবস্থাপকেরা বহু দর্শকের ধন্যবাদের পাত্র হয়েছেন। আমরা এই দীর্ঘ প্রদর্শনী সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করব বারান্তরে।

আসছে নতুন বছরের ১৭ জানুয়ারী, রবিবার রবীন্দ্রসদনে প্রবীণ ও নবীন শিল্পীর সমন্বয়ে একটি ভারতীয় সম্মেলক যন্ত্রসঙ্গীতের (ইন্ডিয়ান অর্কেস্ট্রা) আসর বসছে। এই সম্মেলক যন্ত্রসঙ্গীতের পরিচালনা করবেন যুগ্মভাবে প্রবীণ স্বরোদী ও সঙ্গীতপরিচালক তিমিরবরণ এবং নবীন শিল্পী ভাস্কর মিত্র।

রবীন্দ্রসদনে একাঙ্কিকা নাট্য উৎসব

গেল ২৫, ২৬, ২৭, ২৯ ও ৩১ ডিসেম্বর পাঁচ দিন ধরে একটি একাঙ্কিকা নাটকের প্রতিযোগিতা উৎসবের আয়োজন করেছিলেন রবীন্দ্রসদনের কর্তৃপক্ষ—সুসংবাদ গেল হপ্তাতেই দেওয়া হয়েছে। প্রতিদিন তিনটি করে পাঁচদিনে পনেরোটি দল এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। বিচারকরূপে ছিলেন সর্বশ্রী ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, ডঃ অজিত ঘোষ, পশুপতি চট্টোপাধ্যায় বীরু মুখোপাধ্যায় এবং সজল সেন। প্রযোজক, পরিচালক, নাট্যকার, অভিনেতা এবং অভিনেত্রীরূপে যাঁরা শ্রেষ্ঠরূপে বিবেচিত হয়েছেন, তাঁদের নাম ঘোষিত ও তাঁরা পুরস্কৃত হবেন ১৭ জানুয়ারী রবীন্দ্রসদনে 'ভারতীয় সম্মেলক যন্ত্রসঙ্গীত' অনুষ্ঠানের আসরে।

শিশু রঙ্গমহলের বিশ বর্ষ পূর্তির উৎসবটি এবারকার প্রাণহীন আনন্দহীন কলকাতার একটি মরূদ্যানের মতো। শীতের কলকাতাতে অন্যান্য বছর বহু আনন্দানুষ্ঠান হয়। এবার পার্ক স্ট্রীটের হল্লা ছাড়া উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ কলকাতা ঝিমিয়ে আছে—একটি স্থান ছাড়া। গড়িয়াহাট মোড়ের বাঁ পাশের ভবনমহল গমগম করছে ছোট—বড়-বুড়োদের আগমনে। পুতুলনাচ, নৃত্যনাট্য, যাত্রা, অভিনয় সব মিলিয়ে এখানকার দিনগুলি একটার পর একটা হাল্কা পাখীর মত উড়ে যাচ্ছে। একটি ছোট মেলা আছে উৎসবের অঙ্গ হিসেবে। কেনাবেচা কিছু কিছু হচ্ছে—নাগরদোলা ও মেরী গো রাউন্ড চলছে।

সার্থক হয়েছে এ-উৎসব। প্রতি সন্ধ্যায় উৎসবমুখর হয়ে উঠেছে সি এল টি প্রাঙ্গণ। রামায়ণ, অবনপটুয়া, সাত ভাই চম্পা, ডিঙ্গো—সবকটি নৃত্যাভিনয় সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে উঠেছে। শিশু রঙ্গমহলের সুহৃদ সদ্য পরলোকগত নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা যাত্রার আসরে ভীম বধ, মন্মথ রায়ের, কানুর বাঁশি, নবপর্যায়ে রামায়ণ, অবনপটুয়া প্রেক্ষাগৃহে বহু দর্শককে আনন্দ দিয়েছে।

ছোটদের ছড়ানৃত্যগুলি সুন্দর হয়েছে। এই হাতেখড়ি থেকেই এদের উত্তরকালের নৃত্যশিল্পীরা আসবে।

ভবনমহলের নিজস্ব একটি রূপ আছে। প্রতি ঘরে ঘরে মহড়া দেবার সমবেত ধ্বনি বাংলাদেশের একটি নিজস্ব সংস্কৃতির ধারক। কোন ঘরে কথাকলি, কোথাও কত্থক, কোথাও অভিনয় চলছে একই সময়ে। এতো আনন্দধ্বনি আর কোন দেশে হয় বলে জানিনে।

বিশ বর্ষ পূর্তির অনুষ্ঠানটিও সুন্দর সহজভাবে করা হয়েছে। পুতুলনাচ সম্বন্ধে আলোচনাতে আসছেন রঘুনাথ গোস্বামী, শৈল চক্রবর্তী প্রমুখ স্রষ্টারা, থিয়েটার সেমিনারে আছেন, মন্মথবাবু, জিতেনবাবু, অজিত বসু, প্রেমেনবাবুরা, তার সঙ্গে নবীনের দল—সমীর চট্টো, শৈলেন ঘোষ। ছোটদের ফিল্ম সম্বন্ধে একটি আলোচনাচক্রে আছেন মৃণালবাবু, পূর্ণেন্দু চট্টোপাধ্যায়, শান্তি চৌধুরী। সর্বভারতীয় পাপেট ফেস্টিভালে আছেন আরো অনেক গুণিজন। ছোটদের সর্বভারতীয় একটি সঙ্গীত প্রতিযোগিতার ব্যবস্থাও করেছেন একটি বিশেষ কমিটি—এতে আছেন জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, রাধিকামোহন মৈত্র, বিমান ঘোষ, সুচিত্রা মিত্র, এ সি সেন এবং আরো অনেকে।

ভাবীকালের কলাকার সৃষ্টি শিশু রঙ্গমহলের একটি মাত্র উদ্দেশ্য নয়। সে কলাকার তো আসবেই কিন্তু শিশুকালের পরিপূর্ণ আনন্দটি দেবার একটি অসাধারণ উৎস কলকাতার ও বাংলার শিশু রঙ্গমহল।

অভিনব সিনেমা মাসিক পত্রিকা

আলোছায়া

প্রতি সংখ্যায় থাকে রহস্য উপন্যাস, শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের গল্প, শ্রেষ্ঠ বিদেশী গল্প, বিভিন্ন অভিনব ফিচার, গান স্বরলিপি, মনস্তাত্ত্বিক যৌনতত্ত্ব ও অসংখ্য সিনেমার রঙীন ছবি।

প্রতি সংখ্যা ৫০ পঃ : বার্ষিক ৬

১৬/১৭, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

পাওয়ার পয়েণ্ট টেনিস
২০.৯৫

দ্রুত পদক্ষেপ আর অনুপম
আরাম—এই অভিপ্রায়ে বাটার খেলার জুতোর
বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ করুন। কুশন আর্চ ও ইনসোল আকস্মিক আঘাত থেকে রক্ষা করে। কয়েলীন
সন্ধিস্থলে টেকসই বন্ধনী। ভারী বাম্পার টোগার্ড। ঢালাই সোল আর হিল এমন
কৌশলে তৈরি যা পারতপক্ষে হড়কাবে না। সব মিলিয়ে
আশ্চর্য সমাবেশ।

পাওয়ার পয়েণ্ট ফুটবল বুট
১৮.৯৫

Bata

CENTRAL LIBRARY

খেলার কথা

ক্রিকেটে একটি বছর

শঙ্করবিজয় মিত্র

কালের মহাযাত্রায় আর একটি বছর সমাপ্তির মুখে। স্বভাবতঃই আমাদের জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের একটা হিসেব-নিকেশ করতে ইচ্ছে হয়। দৈহিক ও মানসিক স্তরে আমাদের কতটা অগ্রগতি হল, তা জানা দরকার বৈকি। তবে মানসিক ক্ষেত্রে আজ যেখানে এসে দাঁড়িয়েছি তাতে এ হিসেব মোটেই সুখপ্রদ হবে না, উল্টে হৃৎকম্প উপস্থিত হতে পারে। দৈহিক সামর্থ্যের হিসেব নিতে গেলে ক্রীড়াক্ষেত্রে ভারতের কৃতিত্বের কথা আসে। এ কৃতিত্বের স্বাক্ষর কি খুব উজ্জ্বল? দলগত ক্রীড়া—হকি, ফুটবল, বাস্কেটবল বা ক্রিকেটে ভারতীয় খেলোয়াড়েরা দেশের মান কি উঁচুতে তুলে ধরতে পেরেছেন? ব্যক্তিগত সাফল্যে টেনিস বা ব্যাডমিন্টন কি ভারতের গৌরব বৃদ্ধি করেছে? এ্যাথলেটিকসের নানা বিভাগে আমরা কটা সাফল্যের নজীর বিশ্ব প্রতিযোগিতায় যোগ্য ফল দেখাতে পেরেছি?

ভারতবর্ষকে একটা উপমহাদেশ বলা হয়। লোক সংখ্যার দিক থেকে সম্ভবতঃ চীনের পরই ভারতের স্থান। প্রায় বাহান্ন কোটি মানুষের বাসভূমি ভারতবর্ষে তেইশ বছরের স্বাধীনতায় কতটুকুই এগোতে পেরেছি আমরা? শম্বুকের মত অগ্রগতির গতি মন্থর। জাঁক করে বলবার মত পাথেয়ও আমাদের নেই। হকিতে দীর্ঘদিনের যে গৌরবময় ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল তা হস্তচ্যুত হয়েছে, খেলার মান বিশ্বের দেশে দেশে যেভাবে দ্রুত উন্নত হচ্ছে ভারত তার সঙ্গে তাল রাখতে না পেরে পেছিয়ে পড়েছে। শুধু তাই নয়, এগোবার বা উন্নতি করার একরোখা প্রয়াসও আমাদের নেই। হৃতমান হলে দৃঢ় সঙ্কল্প ও দৃঢ়তা প্রয়োজন হয়, সুস্থান পুনরুদ্ধারের জন্য আসলে আমাদের জাতীয় চরিত্র থেকে সে দৃঢ়তা ও সঙ্কল্পমনস্কতা তিরোহিত হয়েছে। সবই যেন করতে হয় করে যাচ্ছি, চলতে হয় চলছি। শুধু তাই নয় পরস্পরকে সাহায্য করার মনোভাব নষ্ট হয়ে গেছে। প্রতিভা বিকাশের জন্য জাতির প্রতিটি ক্ষেত্রে যেভাবে সহানুভূতি ও সহযোগিতা দিয়ে তাকে এগিয়ে দিতে হয়, সেভাবে পথ করে দিতে কেউ যেন রাজী নয়। অথচ সাহায্য ও অনুকূল পরিবেশ পেলে অনেক অনেক কৃতী সন্তান আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত হয়ে ভারতের মুখোজ্জ্বল করতে পারত।

ক্রিকেটের কথাই ধরা যাক। ভারতে ক্রিকেট এসেছে উনবিংশ শতাব্দীতে। দেশে-বিদেশে বহু প্রতিযোগিতাতেই ভারত অবতীর্ণ হয়েছে। অনেক প্রতিভাদীপ্ত খেলোয়াড় দেশের সুনাম বৃদ্ধি করেছেন ও ক্রীড়ানৈপুণ্যের অনন্যসাধারণ নজীর রেখেছেন। তবে এ পর্যন্ত ব্যক্তিগত সাফল্যের ঊর্ধ্বে আর কতটুকু আমরা যেতে পেরেছি। দলগত বিচারে ভারত আন্তর্জাতিক আসরে এমন কোন স্থান করতে পারেনি যাকে গৌরবের বলা যেতে পারে। ভারতের রণজিৎ সিং, দলীপ সিং, সি কে নাইডু, মহম্মদ নিসার, অমর সিং, লালা অমরনাথ, মুস্তাক আলি, বিজয় মার্চেন্ট, নাজাজ বিজয় হাজারে, সুঁটে ব্যানার্জি, পলি উমরিগড়, ভিনু মানকড়, সুভাষ গুপ্তে প্রভৃতির ন্যায় বহু দক্ষ খেলোয়াড় যে কোন দেশের গৌরবের স্থল। এছাড়াও এমন বহু ক্রিকেটার জন্মেছেন যাঁদের প্রতিভা সম্যকভাবে কাজে লাগাতে পারলে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার তালিকায় ভারতের নাম জ্বল জ্বল করত। কিন্তু তা হয়নি এবং কেন হয়নি আজ সাধারণ ক্রীড়ামোদীর প্রশ্ন তাই। দেশে প্রতিভার অভাব নেই, কিন্তু তার যোগ্য সমাদর হয় না। দেশের স্বার্থের ও মান-মর্যাদার কথা চিন্তা করে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার সময় যোগ্য দল গঠন করা হয় না। যার ফলে আমরা উপযুক্ত ফলাফল দেখাতে পারি না।

এরই মাঝে যে বছর অতিক্রম করে আমরা এসেছি সে বছরে ক্রীড়াকৃতির দিক দিয়ে আশার আলোর ঝলক যেন এসে পড়েছে। বেশ কয়েকজন তরুণ খেলোয়াড় তাদের প্রতিভার দীপ্তিতে আমাদের সঞ্জীবিত করেছেন। ব্যাটসম্যান হিসেবে বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়ে নূতন অঙ্কুরাদ্গমের আমাদের আশা জাগিয়েছেন—তাঁরা হলেন একনাথ সোলকার, অশোক মানকড় ও ওপেনিং ব্যাটসম্যান হিসেবে এস এস নায়েক ও সি চৌহান। বোলার হিসাবে বাংলার মিডিয়াম পেস বোলার সুব্রত গুহ ও ন্যাটা স্পিনার দিলীপ দোশী। বোম্বাই থেকে আর একজন মিডিয়াম বোলার এ এম পাইও বেশ সুনাম অর্জন করেছেন। রণজি ক্রিকেট ও দলীপ ট্রফি প্রতিযোগিতাগুলি এই সব তরুণ খেলোয়াড়দের সাফল্যের চিহ্নে উজ্জ্বল। ১৯৬৯-৭০ সালে অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড থেকে যে দুটি দল ভারতে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়, এই সব তরুণ খেলোয়াড়েরা সেই সব খেলাতে নিজেদের কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে ভারতীয় ক্রিকেট দলে আসন করে নিতে সমর্থ হন।

বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে প্রতিযোগিতায় দেখা যাচ্ছে যে, বোম্বাই এখনও সকলের ঊর্ধ্বে তাদের নাম চিহ্নিত করার ক্ষমতা রাখে। রণজি ট্রফিটি তারা পর পর এগারবার জয় করে এবং ১৯৩৪ এই প্রতিযোগিতা সুরুর সময় থেকে বোম্বাই কুড়িবার এতে বিজয়ী হয়। কিন্তু এবার এই জয়ের জন্যে তাদের প্রবল প্রতিপক্ষের সঙ্গে যুঝতে হয়েছে। প্রতিযোগিতায় তারা যে কটি ম্যাচ খেলেছে তাতে একমাত্র সৌরাষ্ট্র ছাড়া আর কোন খেলায় সরাসরি বিজয়ী হতে পারে নি। পশ্চিমাঞ্চলের প্রতিযোগিতায় শীর্ষস্থান লাভ করে বোম্বাই রণজি ট্রফির নিয়মানুযায়ী নক-আউট প্রতিযোগিতায় আসে। গুজরাটের বিরুদ্ধে তারা সহজেই জয়ী হয় এবং সেমিফাইনালে রাজস্থানের বিরুদ্ধে ও ফাইনালে বাংলার বিরুদ্ধে তারা প্রথম ইনিংসের খেলায় এগিয়ে থাকার দরুণ বিজয়ী হতে সক্ষম হয়।

বাংলা রণজি প্রতিযোগিতায় এবার ভাল ফল দেখিয়েছে। ১৯৫৮-৫৯ সালের পর এবারই তারা রণজি ফাইনালে উঠেছে। অম্বর রায়ের যোগ্য নেতৃত্বে বাংলা দল যেভাবে খেলেছে, তাতে তাদের জয়ী হবার খুবই সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু ক্রিকেটে ক্যাচ ছাড়লে ম্যাচ ছাড়তে হয়। বাংলাকেও তারই খেসারৎ দিতে হয়েছে।

আঞ্চলিক ভিত্তিতে চ্যাম্পিয়নসিপ প্রতিযোগিতায় পশ্চিমাঞ্চল দল এবার দলীপ ট্রফি পেয়েছে। হায়দরাবাদে দক্ষিণাঞ্চলকে পরাজিত করে পশ্চিমাঞ্চল দল তিন বছর পর এই চ্যাম্পিয়নসিপ পুনরায় উদ্ধার করেছে। হায়দরাবাদের এই খেলায় পশ্চিমাঞ্চলের তরুণ খেলোয়াড়েরা তাদের কৃতিত্বের উজ্জ্বল নিদর্শন রাখে—ব্যাটিং-এ চৌহান ও বোলিং-এ অজিত পাই সকলকে পরিতৃপ্ত করে। চৌহান এই খেলায় একটি সুন্দর সেঞ্চুরী করার ও পাই দক্ষিণাঞ্চলের ছজন ব্যাটসম্যানকে আউট করার গৌরব অর্জন করে।

১৯৬৮-৬৯ সালের রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতা সমাপ্ত হলে বোম্বাই তথা ভারতের অন্যতম পেস বোলার আর বি দেশাই প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট থেকে অবসর গ্রহণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। এই ক্ষুদে পেস-বোলার প্রায় দশ বছর ধরে ভারতীয় দলের সম্পদরূপে পরিগণিত ছিলেন। ১৯৫৮-৫৯

সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল যখন ভারত পর্যটনে আসে, তখন অকস্মাৎ গেলাই-এর আবিষ্কার ঘটে এবং সেই থেকে পেস বোলিংএ তিনি একজন নির্ভরশীল বোলার হয়ে ছিলেন।

গেলাই-এর কথায় আমাদের দেশে পেস বোলারের অভাবের কথা এসে পড়ে। কিন্তু এই অভাবটা খাঁটি না মেকি বলা কঠিন। এই ভারতের মাটিতে প্রবল প্রতাপ বা টসমান বা দুরন্ত বোলার জন্মেছে যাদের কৃতিত্বের ও দাপটের বহু স্মৃতি ক্রীড়ানুরাগীরা এখনও সযত্নে বহন করে চলেছেন। কিন্তু ক্রিকেট কর্তাদের সুনজরে আসতে না পারলে বা তাঁদের মন জুগিয়ে চলতে না পারলে যে প্রতিভার অপমৃত্যু ঘটে সুঁটে ব্যানার্জি তার একটি জ্বলন্ত উদাহরণ। সেই সময় থেকে প্রকৃত পেস বোলারের অভাব সম্পর্কে নানা প্রশ্ন উঠেছে, কিন্তু কোন প্রতিকার হয়নি। একদিকে পেস বোলারের অভাব এবং সেই অভাবের চাপ প্রাণহীন (নিস্তাপ) উইকেট তৈরী করে ভারতের ক্রিকেটকে ক্রমশঃ পঙ্গু করে তুলেছে। আশ্চর্যের কথা এখনও বিদেশে পেস বোলার পাওয়া যায় না। অথচ এই রহস্যের মূল উদ্ঘাটনে কাহুকে এগিয়ে আসতেও দেখা গেল না।

প্রত্যেক দেশেই ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে একটা উন্নতি বা অবনতির যুগ দেখা যায়। কিছুকাল ধরে যেমন ওয়েস্ট ইণ্ডিজের উন্নতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং ১৯৬৫-৬৭ সাল পর্যন্ত এই উন্নতির ধারা বজায় রেখে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বেসরকারীভাবে বিশ্ব চাম্পিয়ন আখ্যায় ভূষিত হয়। কিন্তু তারপর থেকে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের একটা অবনতির সময় এসেছে বলে মনে হয়। সোবার্সের মত দুর্ধর্ষ চৌকস খেলোয়াড় নেতৃত্ব দিয়েও ১৯৬৮-৬৯ সালে অস্ট্রেলিয়া বা নিউজিল্যাণ্ডে ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে বিজয়ী করতে পারেন নি। তেমনি অস্ট্রেলিয়া একটা সাময়িক অবনতির যুগ থেকে নিজেদের উদ্ধারের জন্য চেষ্টা করে চলেছে। ইংলণ্ডের কথাও প্রায় অনুরূপ। কিন্তু ভারত কি কোন দিন উন্নতির যুগ দেখতে পাবে না? বাহান্ন কোটি মানুষের মধ্যে থেকে একটা শক্তিশালী ক্রিকেট দল গড়ে তোলা কি এতই অসাধ্য ব্যাপার?

ভারতের ক্রীড়াক্ষেত্র তার প্রচুর সম্ভাবনা সত্ত্বেও উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটছে না দেখে বিস্মিত হবেন ক্রীড়ানুরাগী মহল বিস্মিত হয়ে উঠেছে। সম্প্রতি বিশ্ব ওলিম্পিকের আন্তর্জাতিক কমিটির সভাপতি মিঃ আভেরি ব্রাণ্ডেজ ভারতে এসে যে মন্তব্য প্রকাশ করেছেন, তাতে এই চিত্রটি পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। তিনি বলেছেন ভারতের মত এত বড় দেশ ক্রীড়া ক্ষেত্রে কোন উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারছে না দেখে বিস্মিত হতে হয়। মনে হয়, ভারতের খেলাধূলার জগতে কোথাও বিরাট ত্রুটি রয়েছে। আর সেই ত্রুটিটি পরিচালকদের। মজার কথা এখনকার ক্রীড়া পরিচালনার ভার নির্দিষ্ট কিছু লোকের কুক্ষিগত হয়ে পড়েছে এবং আঞ্চলিক প্রাধান্যও সুপরিস্ফুট। ভারতের ক্রীড়া পরিচালকরা জনগণের আস্থাভাজন কিনা তাতেও সন্দেহ আছে। আবার পরিচালকদের মধ্যে বিদ্বেষ ও রেষারেষির ফলে ক্রীড়ার অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছে।

ভারতের ক্রীড়া ক্ষেত্রের দুরবস্থার কথা আজ দেশ-বিদেশে সুপরিচিত। কিন্তু এর প্রতিকারের জন্য কোন সক্রিয় চেষ্টা পরিলক্ষিত হচ্ছে না। কবে আমাদের এই দুঃখজনক অবস্থার অবসান হবে! সরকারের পক্ষ থেকেও এর প্রতিকারের আশা নিরর্থক। জনগণের ঐকান্তিক প্রচেষ্টাই আমাদের এই দুঃসহ অবস্থার অবসান ঘটাতে পারে।

খেলাধূলা

দর্শক

আন্তঃ রাজ্য টেবল টেনিস প্রতিযোগিতা

ইডেন উদ্যানের ইনডোর স্টেডিয়ামে আয়োজিত আন্তঃ রাজ্য টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় মহারাষ্ট্র পুরুষ ও মহিলা বিভাগে এবং তামিলনাড়ু বালক বিভাগে দলগত চাম্পিয়নশীপ লাভ করেছে। এখানে উল্লেখ্য, মহারাষ্ট্র এই নিয়ে উপর্যুপরি ৩-বার মহিলা বিভাগের চাম্পিয়ান হয়ে জয়লক্ষ্মী কাপ জয়ী হল। পুরুষ বিভাগে সর্বাধিকবার (১৪ বার) বার্মা শেল্ড কাপ জয়ের রেকর্ড মহারাষ্ট্রের এবং তারা তিন বছর পর (১৯৬৭-৬৯) পুনরায় এই কাপ পেল।

বাংলার খেলা

তিনটি বিভাগের মধ্যে বাংলা কেবল মহিলা বিভাগের চূড়ান্ত লীগ পর্যায়ে খেলবার যোগ্যতা লাভ করে দ্বিতীয় স্থান পেয়েছে। তারা মহিলা বিভাগের পুরস্কার জয়লক্ষ্মী কাপ শেষ পেয়েছে ১৯৬৭ সালে।

চূড়ান্ত লীগ পর্যায়ের খেলা

পুরুষ বিভাগ

	খেলা	জয়	হার	পয়েন্ট
মহারাষ্ট্র (এ)	৩	৩	০	৩
অন্ধ্রপ্রদেশ	৩	২	১	২
মহীশূর	৩	১	২	১
দিল্লী	৩	০	৩	০

মহিলা বিভাগ

	খেলা	জয়	হার	পয়েন্ট
মহারাষ্ট্র (এ)	৩	৩	০	৩
বাংলা	৩	২	১	২
মহারাষ্ট্র (বি)	৩	১	২	১
মহীশূর	৩	০	৩	০

বালক বিভাগ

	খেলা	জয়	হার	পয়েন্ট
তামিলনাড়ু	৩	২	১	২
মহারাষ্ট্র (এ)	৩	২	১	২
অন্ধ্রপ্রদেশ	৩	১	২	১
মহীশূর	৩	১	২	১

জাতীয় টেবল টেনিস প্রতিযোগিতা

ইডেন উদ্যানে অবস্থিত ন্যাশনাল ক্রিকেট ক্লাবের ইনডোর স্টেডিয়ামে জাতীয় টেবল টেনিস এবং আন্তঃ রাজ্য টেবল টেনিস প্রতিযোগিতার আসর বসেছিল। দীর্ঘ ১১ বছর পর কলকাতায় এই দুই প্রতিযোগিতার আসর বসলো। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিল ১১টি রাজ্য এবং ভারতীয় রেল দল। জাতীয় টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় পুরুষদের সিঙ্গলসে ১২৮ জন, পুরুষদের ডাবলসে ৬৪টি জুটি, মহিলাদের সিঙ্গলসে ৬৪ জন এবং মিক্সড ডাবলসে ৬০টি জুটি নিয়ে খেলার তালিকা তৈরী হয়েছিল। আলোচ্য প্রতিযোগিতার প্রধান আকর্ষণ সৃষ্টি করেছিলেন জাপানের এই তিন বিশ্ববিশ্রুত খেলোয়াড়—জাপানের ২নং খেলোয়াড় মিৎসুরু কোনো এবং গতবারের বিশ্ব চাম্পিয়ান ডাবলস জুটি নিৎসু এবং কোন্ডো। কোনো পুরুষদের সিঙ্গলস (প্যারালাল) খেতাব এবং কোন্ডো ভারতের কাশিম আলীর সহযোগিতায় ডাবলস খেতাব পান।

ত্রিমুকুট সম্মান

মহারাষ্ট্রের কুমারী কেটি চার্কমান গত বছরের মত এবারও মহিলাদের সিঙ্গলস, ডাবলস এবং মিক্সড ডাবলস খেতাব জয়ের সূত্রে 'ত্রিমুকুট' সম্মান লাভ করেন। এখানে উল্লেখ্য, তিনি আন্তঃ রাজ্য এবং জাতীয় প্রতিযোগিতায় ও সমস্ত সিঙ্গলস খেলায় স্ট্রেট সেটে জয়ী হয়ে অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দেন।

ফাইনাল খেলার ফলাফল

পুরুষদের সিঙ্গলস : জি জগন্নাথ (রেলওয়ে) ২২—২০, ২১—১০ ও ২১—১৯ পয়েন্টে গত বছরের চাম্পিয়ান মির কাশিম আলীকে (অন্ধ্রপ্রদেশ) পরাজিত করেন।

পুরুষদের সিঙ্গলস (প্যারালাল) : এম কোনো (জাপান) ২১—১১, ১৩—২১, ১৭—২১, ২১—১৭ ও ২১—১৪ পয়েন্টে টি নিশিকে (জাপান) পরাজিত করেন। সেমি-ফাইনালে ভারতবর্ষের জি জগন্নাথ ১৭—২১, ২১—৮, ১৩—২১ ও ১৩—২১ পয়েন্টে জাপানের কোনোর কাছে হেরে যান।

পুরুষদের ডাবলস : কোন্ডো (জাপান) এবং মির কাশিম আলী (ভারতবর্ষ) ১২—২১, ২১—১২, ২১—১১ ও ২২—২০ পয়েন্টে কোনো এবং নিশিকে (জাপান) পরাজিত করেন।

মেয়েদের সিঙ্গলস : কুমারী কৌটি চার্জ-ম্যান (মহারাষ্ট্র) ২১—১৪, ২১—৭ ও ২১—১১ পয়েন্টে কুমারী উষা সুন্দর-রাজকে (মহীশূর) পরাজিত করেন।

মেয়েদের ডাবলস : কুমারী কৌটি চার্জম্যান এবং এন মওলা (মহারাষ্ট্র) ২১—১৯, ১৬—২১, ১০—২১, ২২—২০ ও ২১—১৬ পয়েন্টে রূপা মুখার্জি এবং ইন্দু পুরীকে (বাংলা) পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস : কুমারী কৌটি চার্জম্যান এবং এস আর খোদাজী (মহারাষ্ট্র) ২১—১১, ২১—১৬ ও ২১—১৯ পয়েন্টে কুমারী উষা সুন্দররাজ এবং কে জয়ন্তকে (মহীশূর) পরাজিত করেন।

এখানে উল্লেখ্য ব্যক্তিগত বিভাগের ৯টি খেতাবের মধ্যে মহারাষ্ট্র একাই ৫টি খেতাব জয়ী হয় (মহিলাদের সিঙ্গলস, ডাবলস ও মিক্সড ডাবলস, বালকদের ডাবলস এবং বালিকাদের সিঙ্গলস)। বাকি ৪টি খেতাব পায় জাপান ২টি (পুরুষদের সিঙ্গলস ওয়ারালান এবং যুগ্মভাবে পুরুষদের ডাবলস), রেলওয়ে ১টি (পুরুষদের ডাবলস) এবং কেরালা ১টি (বালকদের সিঙ্গলস)।

জাতীয় স্কুল ক্রীড়ানুষ্ঠান

ত্রিবান্দ্রামে আয়োজিত ১৬তম জাতীয় স্কুল ক্রীড়ানুষ্ঠানে (শীতকালীন) পাঞ্জাব দলগত চ্যাম্পিয়নশীপ লাভ করেছে। পাঞ্জাব পেয়েছে মোট ২৫টি পদক (স্বর্ণ ১৩, রৌপ্য ৪ ও ব্রোঞ্জ ৮) এবং দ্বিতীয় স্থান অধিকারী কেরালা সংগ্রহ করেছে মোট ২১টি পদক (স্বর্ণ ১০, রৌপ্য ৭ ও ব্রোঞ্জ ৪)। পশ্চিম বাংলা নিয়ে এসেছে ৫টি স্বর্ণ এবং ৭টি রৌপ্য পদক। ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়নশীপ লাভ করেছে বালক বিভাগে উত্তর প্রদেশের জয়নারায়ণ সিং এবং ছাত্রী বিভাগে কেরালার এন রাধা। ক্রীড়ানুষ্ঠানে ২০টি রাজ্যের প্রায় ১,৭৬৭ জন ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করেছিল।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য অ্যাথলেটিক্স

রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে আয়োজিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য অ্যাথলেটিক্সে মোহন-বাগান পুরুষ বিভাগে, ইস্টার্ন রেল-ওয়ে মহিলা বিভাগে এবং ২৪-পরগণা জেলা তিনটি বিভাগে (বালকদের ১৮ বছর ও ১৬ বছর বয়সের নীচে এবং বালিকাদের ১৬ বছর বয়সের নীচে) দলগত চ্যাম্পিয়নশীপ লাভ করেছে। ক্রীড়ানুষ্ঠানে ২২টি নতুন রাজ্য রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

দলগত চ্যাম্পিয়নশীপ

পুরুষ বিভাগ : ১ম মোহনবাগান (৮১ পয়েন্ট), ২য় ইস্টবেঙ্গল (৭৮ পয়েন্ট), ৩য় ২৪-পরগণা (৩০ পয়েন্ট)

মহিলা বিভাগ : ১ম ইস্টার্ন রেলওয়ে (৭৭ পয়েন্ট), ২য় ২৪-পরগণা (১৪ পয়েন্ট), ৩য় এরিয়ান্স (৮ পয়েন্ট)

বালক বিভাগ : ১৮ বছর বয়সের নীচে—২৪-পরগণা (৫৬ পয়েন্ট), ১৬ বছর বয়সের নীচে — ২৪-পরগণা (৪৩ পয়েন্ট), ১৪ বছর বয়সের নীচে—সিটি অ্যাথলেটিক ক্লাব (১৮ পয়েন্ট)

বালিকা বিভাগ : ১৬ বছর বয়সের নীচে—২৪-পরগণা (৩০ পয়েন্ট), ১৪ বছর বয়সের নীচে—এরিয়ান্স (২৫ পয়েন্ট)

ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়নশীপ

পুরুষ বিভাগ : জি আর প্যাটেল (মোহনবাগান), ১১ পয়েন্ট

মহিলা বিভাগ : কিঙ্করী দাস ও শ্রীরূপা চ্যাটার্জি (ইস্টার্ন রেলওয়ে), ১৫ পয়েন্ট

বালক বিভাগ : (১৮ বছরের নীচে) এস ব্যানার্জি (২৪-পরগণা), ১১ পয়েন্ট

আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাথলেটিক্স

কটকের বারবটি স্টেডিয়ামে আয়োজিত ৩১তম আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাথ-লেটিক্স মহাসমারোহে শেষ হল। তিন-দিনব্যাপী এই ক্রীড়ানুষ্ঠানে ৫৯টি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রায় ৯০০ জন অ্যাথলীট অংশ গ্রহণ করেছিলেন। ৩১টি বিষয়ের মধ্যে মাত্র তিনটি বিষয়ে নতুন বিশ্ববিদ্যালয় রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। গতবারের ছাত্র বিভাগের চ্যাম্পিয়ান কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবার শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মাত্র একটি বিষয়ে প্রথম স্থান লাভ করে (পোলভল্টে টি দাশ)।

তিনটি বিষয়ে প্রথম স্থান লাভের গৌরব লাভ করেন একমাত্র কুমারী নির্মলা উটিয়া (মহীশূর)। তিনি ১০০ মিটার, ২০০ মিটার এবং ৪০০ মিটার দৌড়ে প্রথম হন। স্প্রিন্টে ডাবল খেতাব লাভ করেন ছাত্রী বিভাগে মহীশূরের কুমারী নির্মলা উটিয়া এবং ছাত্র-বিভাগে বাঙ্গালোরের রবিন পাল।

দলগত চ্যাম্পিয়নশীপ

ছাত্র বিভাগ : গুরু নানক বিশ্ববিদ্যালয় (৪৩ পয়েন্ট)

ছাত্রী বিভাগ : মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় (৩৪ পয়েন্ট)

নতুন বিশ্ববিদ্যালয় রেকর্ড

১০,০০০ মিটার : বি সিং (গুরু নানক)। সময় : ৩২ মিঃ ১·০ সেঃ

১০০ মিটার (ছাত্রী) : কুমারী অলকা ভিদে সময় : ১২·১ সেঃ (হিট)

স্কুল টেস্ট ক্রিকেট

দিল্লীর প্রথম টেস্টের মত ইংলিশ স্কুল বনাম ভারতীয় স্কুল দলের দ্বিতীয় টেস্ট (বোম্বাই) এবং তৃতীয় টেস্ট (আমেদাবাদ) অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে। ভারতীয় স্কুল দলের পক্ষে শেষপর্যন্ত ত্রাণকর্তার ভূমিকা নিয়েছিলেন বোম্বাইয়ের দ্বিতীয় টেস্টে অনিল মাথুর (২য় ইনিংসে নট-আউট ৪১ রান) এবং আমেদাবাদের তৃতীয় টেস্টে রমেশ বোরদে (২য় ইনিংসে নট-আউট ৭২ রান)।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

দ্বিতীয় টেস্ট—বোম্বাই :

ইংলিশ স্কুল : ৩৮১ রান (৮ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। বো ১৩১, ফোর্ট ৫৭ এবং পেজ ৫১ রান)
ও ১০০ রান (৩ উইকেটে ডিক্লে। স্টোভল্ড ৫৬ রান)

ভারতীয় স্কুল : ২১১ রান (এম দাস ৫১ এবং রমেশ বোরদে ৪৪ রান)
ও ১১২ রান (৬ উইকেটে। অনিল মাথুর নট-আউট ৪১ রান)

তৃতীয় টেস্ট—আমেদাবাদ :

ইংলিশ স্কুল : ২৬৩ রান (জি মিলার ৭২ রান। পি ওবেরয় ৬৪ রানে ৫ উই-কেট)
ও ১৫৫ রান (৪ উইকেটে ডিক্লে। ফোর্ট নট-আউট ৫৯ এবং ইউপার ৫৩ রান)

ভারতীয় স্কুল : ১৪৭ রান (বুথ ৪৬ রানে ৩ উইকেট)
ও ১৭৬ রান (৭ উইকেটে। রমেশ বোরদে নট-আউট ৭২ রান)

চতুর্থ টেস্ট—কটক

বারবটি স্টেডিয়ামে আয়োজিত ভার-তীয় স্কুল বনাম ইংলিশ স্কুল দলের চতুর্থ টেস্ট খেলায় ভারতীয় স্কুল দল ১২৫ রানে জয়ী হয়ে ১-০ খেলায় (ড্র ৩) অগ্রগামী হয়েছে। ইংলিশ স্কুল দলের অধিনায়ক জে পেজ টসে জয়ী হয়ে ভারতীয় স্কুল দলকে প্রথম ব্যাট করতে পাঠান। তাঁর এই ভুলের নেওয়াতে শেষপর্যন্ত দলের পরাজয় ঘটে।

প্রথম দিনের খেলায় ভারতীয় স্কুল দলের ৮ উইকেট পড়ে ২০৬ রান উঠেছিল। বোম্বাইয়ের স্কুল-ছাত্র এইচ কে শাহ উভয় দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ৭৬ রান করে আউট হন।

দ্বিতীয় দিনে ভারতীয় স্কুল দলের প্রথম ইনিংস ২২২ রানের মাথায় শেষ হয়। অপরদিকে ইংলিশ স্কুল দলের প্রথম ইনিংস মাত্র ১৫৫ রানের মাথায় পড়ে যায়। ভারতীয় স্কুল দল দ্বিতীয় ইনিংসের দুটো উইকেট খুইয়ে ৪৫ রান সংগ্রহ করে ১১২ রানে এগিয়ে যায়। দ্বিতীয় দিনের খেলায়

জাতীয় টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় পুরুষদের সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ান রেলওয়ে দলের জি জগন্নাথ (বাঁদিকে) এবং পুরুষদের সিঙ্গলসের প্যারালাল চ্যাম্পিয়ান জাপানের মিৎসুরো কোনো

খেলোয়াড়রা প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। মোট ২৪টা উইকেট পড়েছিল—ভারতীয় স্কুল দলের ৪টে (১ম ইনিংসের ২টো এবং ২য় ইনিংসের ২টো) এবং ইংলিশ স্কুল দলের প্রথম ইনিংসের ১০টা।

তৃতীয় অর্থাৎ খেলার শেষ দিনে ভারতীয় স্কুল দল তাদের দ্বিতীয় ইনিংসের ১৫৬ রানের মাথায় (১ উইকেটে) খেলার সমাপ্তি করে এবং মাত্র ১৮ রানের মাথায় ইংলিশ স্কুল দলের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ করে ১২৫ রানে জয়ী হয়। ইংলিশ স্কুল দল চা-পানের পর ২১ মিনিট খেলেছিল।

ভারতীয় স্কুল : ২২২ রান (এইচ কে শাহ ৭৬ এবং ...৬৬ রান। ... ২৬ রানে ৬ উইকেট)

ও ১৫৬ রান (১ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। এইচ কে শাহ ৬০ এবং এন দাস ৩৭ রান। ... ৩১ রানে ৫ এবং বার্কলে ৩১ রানে ২ উইকেট)

ইংলিশ স্কুল : ১৫৫ রান (বার্কলে ৪৮ রান। অনিল মাথুর ৩০ রানে ৪, পি ওয়েবার ৩৩ রানে ২ এবং এস সোম ৩৩ রানে ২ উইকেট)

ও ১৮ রান (রো ৩৭ রান। এস সোম রানে ৫, ইকবাল ৮ রানে ২ মুকুল দাস ১ রানে ২ উইকেট)

ইরানী ট্রফি

কলকাতায় ইডেন উদ্যানে ... স্টেডিয়ামে আয়োজিত বোম্বাই ... অবশিষ্ট ভারতীয় ক্রিকেট দলের ... বোম্বাই প্রথম ইনিংসে বেশী রান সংগ্রহের সুবাদে ইরাণী ট্রফি জয়ী হয়েছে।

বোম্বাই : ৪১৮ রান (অশোক ... ১১০, অজিত ওয়াদেকার ১৬৪ ... অমরনাথ ৫২ রানে ৩, সোলি... ৪৮ রানে ২ এবং কুমার ৪১ ... উইকেট)

ও ১১ রান (১ উইকেটে ... গাভাস্কার নট-আউট ৪৬ রান)

অবশিষ্ট ভারতীয় দল : ৩৭৮ রান (... দুরানী ১০৫ এবং অম্বর রা... রান। সোলকার ১২১ রানে ... মানকাদ ১৮ রানে ২ উইকেট)

ও ২৫ রান (কোন উইকেট না ...

●

কটকের বারবাটি স্টেডিয়ামে ... আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাথলেটিক্স ... পোলভল্টে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ... তপন দাস ৩·৫৫ মিটার ... অতিক্রম করে প্রথম স্থান লাভ করে...

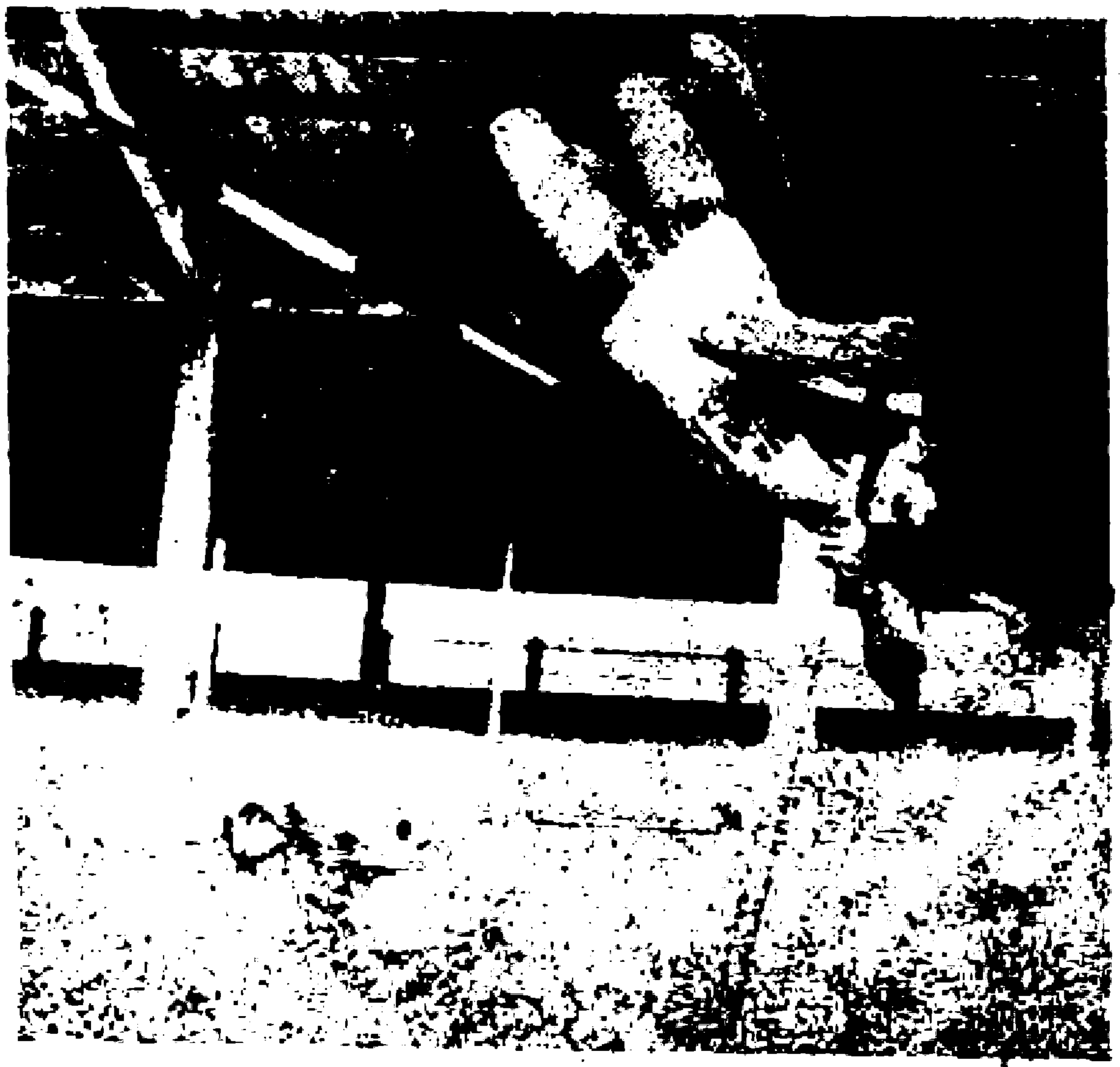

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।